"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

১২শ বর্ষ : ১ম খণ্ড

শুক্রবার : ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯—১২ই শ্রাবণ, ১৩৭৯

Friday : 26th May, 1972 — 28th July, 1972.

লেখক

॥ শ ॥

॥ স ॥

॥ হ ॥

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 5th May, 1972 শুক্রবার, ২২শে বৈশাখ, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

'এক নজরে'

চীনে বিপ্লব : কোন ঘটনার অসম্ভাব্যতা বোঝাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুটি কথা বিশেষভাবে প্রচলিত। কথা দুটি হল—বৃটেন যেদিন প্রজাতন্ত্র হবে বা চীন যেদিন রোমান হরফ গ্রহণ করবে, সেদিনই কেবল এ ঘটনা ঘটা সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় অসম্ভব ঘটনাটি আর অসম্ভব থাকছে না। চীন থেকে সদ্য পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, চেয়ারম্যান মাও চীনের পঞ্চাশ হাজার শব্দ চিত্রকে ২৬টি রোমান হরফে বাঁধার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। চীনের 'একাডেমী অফ সায়েন্সে'-এর এপ্রিল সংখ্যায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

চীনে অবশ্য রোমান হরফ গ্রহণের এই প্রস্তাব হঠাৎ আসে নি। চীনের সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই সেদেশের বুদ্ধিজীবী মহল চীনা হরফ সংস্কারের তাগিদ অনুভব করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগে কোন বড় রকমের চেষ্টা হয় নি। কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সফল হওয়ার পর ১৯৫০ সালে চীন সরকার যে ভাষা সংস্কার কমিশন গঠন করেন, সেই কমিশনই প্রথম সরকারীভাবে রোমান হরফ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হৈ-হুল্লোড়ে সে প্রস্তাব তখন চাপা পড়ে যায়। তারপর এত দিন এ ব্যাপারে আর কোন কথা শোনা যায় নি। কিন্তু এবার একেবারে পাকা ব্যবস্থা, চেয়ারম্যান মাও স্বয়ং বলেছেন, পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখতে হলে চীনের হরফ সংস্কার না হলেই নয়। অবশ্য একাডেমী অফ সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট কুও মো-জো বলেছেন, এ রূপান্তরের কাজ সহজসাধ্য বা স্বল্প দিনের কাজ নয়। এর জন্য দীর্ঘ কয়েক বছর নিরলস পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে।

ভাষা সংস্কারের ব্যাপারে চীনের প্রধান সমস্যাই হল যে তার কোন বর্ণলিপি নেই, যা আছে তা হল চিত্রলিপি। পঞ্চাশ হাজার শব্দের জন্য সমসংখ্যক ছবি। আবার সে ছবিগুলি চীনের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শব্দে পরিচিত। সেকারণে চীনকে প্রথমে আনতে হবে শব্দের সমতা, তারপর সেই শব্দগুলিকে আবার রোমান হরফে বাঁধতে হবে। এ কাজ নিশ্চয়ই সহজসাধ্য নয়। চীনেই প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, পাঁচ হাজার বছরেও সেদেশে কোন বর্ণলিপি গড়ে ওঠে নি। সুতরাং চীনের আজকের সিদ্ধান্ত যে একটি ছোটখাট বিপ্লব তাতে সন্দেহ কি।

আইসল্যান্ডের বড় ক্ষতি : গ্রেট বৃটেনের প্রায় সরাসরি উত্তরে অবস্থিত বরফের দেশ আইসল্যান্ডের একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে, তার একটি দ্বীপ হারিয়ে গেছে। আইসল্যান্ডের চারজন জেলে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা সাঙ্গ করে ঐ দ্বীপটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল নোঙর ফেলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গিয়ে কোথাও তারা সেই অতিপরিচিত দ্বীপটিকে আর খুঁজে পায় নি। নানা কারণে আইসল্যান্ডের এটি একটি বড় ক্ষতি বলে মনে করা হচ্ছে।

আইসল্যান্ডের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত উত্তর অতলান্তিক শক্তিজোটের বিমান ঘাঁটি কেফলাভিক থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত 'গিয়েরফুলাদ রাশুর রক' নামক ঐ দ্বীপটিকে আইসল্যান্ড তার পশ্চিম সীমান্তের শেষ বিন্দু বলে দাবী করত এবং সেখান থেকে ১২ নটিকাল মাইল সে তার দরিয়া অঞ্চল বলে দাবী করত। কিন্তু আজ ঐ দ্বীপটি হারিয়ে যাওয়ায় তার পশ্চিম দিকে দরিয়া অঞ্চল বেশ কয়েক মাইল সংকুচিত হয়ে গেল যেটা আইসল্যান্ডের মতো দেশের পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তার বিষয়। কারণ আইসল্যান্ডের প্রধান জীবিকা হল মাছ ধরা, এবং এ ব্যাপারে তার যে দরিয়া অঞ্চলে ছিল একক অধিকার, তা এখন কয়েক মাইল সংকুচিত হয়ে যাবে।

দ্বীপটি জল থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু ছিল এবং স্মরণাতীতকাল থেকেই আইসল্যান্ডের ধীবরদের সঙ্গে ঐ দ্বীপটির সংযোগ। কিন্তু তলায় তলায় দ্বীপটি যে ক্ষয়ে যাচ্ছিল তা তারা বুঝতে পারে নি। তাই কয়েক দিন ঝড়ের পর তারা গিয়ে দেখল, ছিন্নবৃন্ত দ্বীপটি ঢেউয়ের প্রচন্ড আঘাতে অতলান্তিকের অতলে হারিয়ে গেছে।

মত্ত দাদুরী : মালয়েশিয়ার বিভিন্ন জলা-জঙ্গলেও লড়াই প্রায়ই হয়। গাঢ় বাদামী রং আর হলুদ রং-এর দুই ভিন্ন জাতের ব্যাঙ দু দিকে জড়ো হয় শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে। তারপর তাদের মধ্যে শুরু হয় মরণপণ লড়াই। সে লড়াই চলে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে, বহু ক্ষয়ক্ষতির পর এক পক্ষ রণেভঙ্গ না দেওয়া পর্যন্ত। সম্প্রতি পেনাং-এর এক প্রান্তরে পাঁচ ঘন্টা ধরে ঐ দু জাতের ব্যাঙের যে লড়াই হয় তাতে অন্তত ৭০টি ব্যাঙ মারা যাওয়ার পর সে লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হয়। প্রাণীতত্ত্ববিদরা বলেন, ও লড়াই বাধে বাচ্চা পাড়ার জন্য জমির দখল নিয়ে।

কিন্তু পেনাংবাসীরা ব্যাপারটা অত সহজভাবে নিতে চায় না, তারা বলে, ব্যাঙের লড়াই অশুভের ইঙ্গিত। ব্যাঙের লড়াইর পরেই দেখা যায়, একটা বড় রকমের রাজনৈতিক অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে দেশে। একবার হয়েছিল দাঙ্গা, গতবার হয় বন্যা, যাতে অন্তত পঞ্চাশজনের প্রাণহানি ঘটে।

দন্ডহ্রাস চাই না : দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার এক খুনী অপরাধী ৪৫ বছর বয়স্ক ডেনিস নীল লরেন্স অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনারেলকে জানায় যে, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রীম কোর্ট তাকে যে দন্ড দেয় তা তার অনুমোদন ছাড়া পরিবর্তিত করার এক্তিয়ার কারও নেই। সেকারণে তাকে যে রাজ অনুকম্পা দেখানো হয়েছে সেটাকে সে রাষ্ট্রের এক্তিয়ারবহির্ভূত হস্তক্ষেপ বলে মনে করে।

১৯৭০ সালে জোসেফ সোমার নামক এক মণিমুক্তার কারবারীকে লরেন্স হত্যা করে। সে নিজেও একজন জেমসম্যান ছিল, কিন্তু সে কারবার ফেল মারায় সে বিপদে পড়ে এবং নতুনভাবে জীবন শুরুর বেপরোয়া প্রয়াসে সে ঐ মণিমুক্তার কারবারীকে খুন করে। খুন করার পর কয়েক হাজার ডলার মূল্যের দামী পাথরগুলি নিয়ে পালানোর সময় সে ধরা পড়ে। তারপর বছর খানেক হাজতে থাকার পর দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রীম কোর্টে তার ফাঁসির হুকুম হয়। সেই দন্ডই সে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু দন্ডাদেশের দু মাস পরে সে জানতে পারে যে, রাজ অনুকম্পায় তার ফাঁসির হুকুম রদ হয়েছে এবং তার বদলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। যাবজ্জীবন কারাদন্ড মানে অবশ্য বিশ বছর জেল, যা নানা কারণে কমে প্রায় বারো-চোদ্দ বছরে দাঁড়ায়।

কিন্তু লরেন্সের বক্তব্য, সে মৃত্যুদন্ডের চেয়ে এই দীর্ঘ কারাদন্ডকে অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে করে এবং প্রকৃতপক্ষে অনুকম্পার অজুহাতে তার শাস্তি ও যন্ত্রণাভোগ বাড়ানোরই ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি মানুষকে হত্যার অনুশোচনার যন্ত্রণা তাকে বারো বছর জেলে বসে বসে ভোগ করতে হবে—এর চেয়ে বড় শাস্তি সে কল্পনাও করতে পারে না।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

আমাদের নববর্ষ

অমৃত পত্রিকার জীবনে আজ একটি স্মরণীয় দিন। এগারো বৎসর আগে অমৃত তার সীমাবদ্ধ প্রয়াস নিয়ে শুরু করেছিল সাহিত্য জীবনের যাত্রা। একটি যুগে একটি সাহিত্য পত্রিকার জীবনে নিতান্ত নগণ্য নয়। বিশেষ করে গত এক দশকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে যে-পরিবর্তন ঘটেছে তাতে অমৃত-র একটি ভূমিকা ছিল যা শিল্প ও সাহিত্যানুরাগীদের স্বীকৃতিতে ধন্য। বর্ষ পরিক্রমায় অমৃত প্রথমেই নমস্কার জানায় তার লেখক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগোষ্ঠীকে যাঁদের একনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া আমাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। আমাদের দৃঢ় আশা এই যে, ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা থাকবে অটুট। আমাদের ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে আমরা সব সময়েই সজাগ। আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা যেমন আমাদের প্রশংসা করেন তেমনি আমাদের ত্রুটিগুলো সম্পর্কেও তাঁদের সমালোচনা সব সময়েই এই পত্রিকাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেছে। এই সহযোগিতামূলক মতবিনিময়ই প্রকৃত পক্ষে আমাদের অগ্রগতির একমাত্র পাথেয়। একে শিরোধার্য করেই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।

বাংলা ও বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতির মুখপাত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও অমৃত সব সময়েই মুক্ত দৃষ্টিতে ও উদার মনে এই পরিবর্তনশীল দুনিয়ার ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে তার পৃষ্ঠায়। বাংলা ভাষার পাঠকদের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের, বিশ্বসংস্কৃতির এবং বিশ্বরাজনীতির পরিচয় করিয়ে দেবার আন্তরিক প্রয়াস অমৃত করে আসছে তার জন্মলগ্ন থেকেই। আজকের পৃথিবী আর খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অস্তিত্ব শুধু নয়। এ হল আন্তর্জাতিক উপলব্ধির যুগে। মানুষ তার মেধা, সাহস, সংকল্প ও আত্মত্যাগের দ্বারা যা-কিছু স্মরণীয় কাজ সম্পন্ন করে তা যে-দেশের মানুষই করুক না কেন, মানবিক উত্তরাধিকাররূপেই স্বীকৃতি লাভ করে। আমরা আন্তর্জাতিক এই মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গত এগারো বৎসরে অনেকবার পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছি আফ্রিকার কথা, ভিয়েতনামের কথা, বাংলাদেশের কথা। বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এশিয়া, আফ্রিকার মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সংবাদ পরিবেষণ করেছি বাংলার পাঠকদের কাছে। আমাদের ঘরের পাশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দিনে অমৃত তার সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত বাঙালীর পাশে। অমৃতের পৃষ্ঠায় এ দেশের ও বাংলাদেশের লেখকদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল একালের নৃশংসতম গণহত্যার বিরুদ্ধে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাই পৃথিবীর সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের সঙ্গে অমৃতও আনন্দিত। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সামান্য হলেও অমৃত-র একটি ভূমিকা ছিল তা স্মরণ করে আমরা গৌরব বোধ করি।

এই এগারো বৎসরে আমাদের লক্ষ্য ছিল সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাংলার পাঠকদের মনে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করা। এ কাজে বাংলার বরেণ্য মনীষী, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। অমৃতের পৃষ্ঠা খুললেই দেখা যাবে, বাংলার প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত ও শ্রদ্ধেয় লেখকই কোন-না-কোন সময় তাঁদের অমূল্য রচনা দিয়ে অমৃতকে ধন্য করেছেন। তারই পাশাপাশি অমৃত চেষ্টা করেছে নতুন শক্তিশালী লেখক আবিষ্কারের। এই প্রচেষ্টায় অমৃত নিশ্চিতই সাফল্য দাবী করতে পারে। প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিতদের পাশাপাশি নবীন ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকদের সৃষ্টি অমৃতকে সমৃদ্ধ করেছে। শুধু সাহিত্যিক রচনাই নয়, রাজনৈতিক, ভ্রমণকাহিনী, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়েই আমরা পাঠকদের সামনে সর্বাধুনিক চিন্তা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। তরুণ শিল্পীদের অঙ্কনকলা, অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর নাটক নিয়ে নতুন পরীক্ষা কিম্বা সিনেমা জগতে আঙ্গিক ও প্রয়োগকলার অভিনবত্ব কোনটাই অমৃত-র দৃষ্টি এড়ায়নি। খেলার জগতে নতুন খেলোয়াড়ের আবির্ভাবকে যেমন আমরা স্বাগত জানিয়েছি তেমনি প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়াকুশলীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিতেও আমরা মুক্তকণ্ঠ। সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির পক্ষেই অমৃত সব সময় কথা বলেছে। যা-কিছু বর্জনীয় বা নিন্দনীয় তার বিরুদ্ধে স্পষ্টভাষায় মত ব্যক্ত করতেও অমৃত দ্বিধা করেনি। কারণ, সুস্থ জীবন ও পরিচ্ছন্ন সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আমরা আনন্দের সঙ্গেই বলতে পারি যে, একাজে লেখক, পাঠক ও অনুগ্রাহক সকলের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি নিঃশর্ত সমর্থন।

বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। এই ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের প্রতিবেশীরা শুধু আত্মদানই করেননি, তার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এই ঐতিহাসিক সত্য মনে রেখে এপারের বাংলাভাষী আমাদেরও নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হতে হবে আগের চেয়ে বেশী। এই কর্তব্য পালনে অমৃত আগের মতোই সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করবে। আমরা আশা করি আগামী দিনগুলোতে অমৃত সকল বাংলাভাষীর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করে তার কর্তব্য সম্পাদনে সফল হবে।

অবিস্মরণীয় যামিনী রায়

শিল্পীর মৃত্যু নেই। যিনি স্রষ্টা তাঁকে নিত্যনতুনভাবে আমরা উপলব্ধি করি তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্পী যামিনী রায়ের মৃত্যুতেও এই মহান রূপস্রষ্টার অবিনশ্বরত্বই নতুন করে আমরা উপলব্ধি করলাম। দীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল তিনি উৎসর্গ করে গেছেন ভারতীয় শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যেই তিনি গণনীয়। রঙ ও রেখায় অবিনশ্বর কবিতার রচয়িতা তিনি যার উৎস চিরন্তন বাংলাদেশ এবং চিরন্তন মানবিকতা। বাংলার ভাবলোকের বিচিত্র ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল যামিনী রায়ের ছবিতে। তাঁর ছবি আমাদের এক মহৎ উত্তরাধিকার। আমরা আশা করি, এই মহান শিল্পীর চিত্র-সংগ্রহশালা স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে দেশবাসী তাঁর যোগ্য স্মৃতিরক্ষায় অগ্রণী হবেন। তাঁর অমর আত্মার প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণতি।

পটুয়া শিল্প

যামিনী রায়
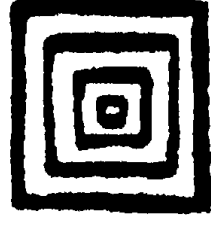
বাংলার চলিত চিত্রকলার সাধারণ বর্ণনা দিয়ে শুরু করা যাক।

চিত্রকলা বাংলাদেশে চলিত ছিল দু'ভাবে: এক হলো ঘরোয়া বা আটপৌরে শিল্প, আর এক হলো পালা-পার্বণের শিল্প যাকে পোশাকী-শিল্প বলা যায়। বাংলাদেশের আটপৌরে ছবি তার পটের ছবি আর তার পালাপার্বণের শিল্প দেবমূর্তি প্রতিমা ইত্যাদি। এ দু'য়ের পার্থক্য স্পষ্ট: প্রথমটিতে প্রসাধনের প্রচেষ্টা নেই, সংস্কারের উৎসাহ নেই। দ্বিতীয় ছবি সংস্কৃত, আলঙ্কারিক। বেদাদির ঐতিহ্য তার নির্ভর। গঠনের দিক থেকে এই দু'জাতের ছবির বহু প্রভেদ।

পটুয়া শিল্প বলতে দেশে কয়েকটা কুসংস্কার আছে। অনেকে মনে করেন যে পটুয়া ছবি আর কালিঘাটের পট দু'টি শব্দই একার্থবাচক। এমন নয় যে এ-কথার পেছনে কিছুমাত্র সত্য নেই; যদিও সত্য যা আছে তা নেহাতই অল্প। কলকাতা শহর যখন সবে গড়ে উঠছে তখন গ্রামের একদল লোক কালিঘাটে এসে বাসা বাঁধল এবং ছবি এঁকে চলল। এরা ছিল গ্রামের শিল্পী, সেখানে গড়ত প্রতিমা। কিন্তু নগর সভ্যতার সংস্পর্শে কিছুটা পরিবর্তন তাদের মধ্যে আসতে বাধ্য হলো। কারণ, এরা আঁকতে শুরু করল শহরের চাহিদা মেটাতে--শহর বা শহরের আশপাশে যে মেলা বসত, সেখানেই তারা ছবি বিক্রী করত। এইভাবে, নগরজীবনের সংস্পর্শে আসার দরুন, নগরজীবনকে অবলম্বন করে আঁকার দরুন সে জীবনের ছাপ এতে এসে পড়ল। এ ছবি তাই আসল পটুয়া ছবি নয়; এর ভাষা রয়ে গেল গ্রাম্য, এর বক্তব্য এলো শহর। প্রসঙ্গ আর আঙ্গিকের মিলন তাই সম্পূর্ণ নয়। আদর্শ বিচ্যুত হলো ছবি। বিদেশের সমালোচকরা ছবি সংগ্রহ করেছেন প্রধানত কালিঘাট থেকে। নানান কারণে এর

বেশী তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই, তাঁরা যে কালীঘাটের ছবির সংগে পটের ছবিকে আলাদা মনে করবেন তাতে বিস্ময়ের অবকাশ অল্প। কিন্তু দুঃখের কথা, দেশের সমালোচকও প্রায়ই বিদেশীদের ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি তোলেন।

যে-ছবি আসল পটুয়া ছবি ইংরেজ আগমনের বহু পূর্বে, কলকাতা শহর গড়ে ওঠবার অনেক আগে বাংলায় তার প্রচলন ছিল। বরং বিদেশীদের আগমনের অনেক আগেই তার দেহে প্রকৃত প্রাণ ছিল। যে আদিম শিল্পীদল বহুদিনের প্রচেষ্টায় এই ছবির মূল গড়ন ও বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিল, তাদের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। কারণ, ছবির জগতে যে কথাটা ধ্রুব সত্য, এরা তার সন্ধান পেয়েছিল। তারপর অবশ্য দিন যত গেলো, পটের ছবি বাংলাদেশে চলিত রইল পটুয়াদের নিছক অভ্যাস হিসেবে এবং শিল্পীরা হয়ে রইল অজ্ঞানেরও অধম। বাংলাদেশে লোকশিল্পের প্রথম যে বোধ এসেছিল সে-বোধ আজকের পটুয়ারা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু, যে শিল্পী সম্প্রদায় এ-বোধ প্রথম পেয়েছিল তারা এত পাকা ভিত্তির উপর একে প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছিল যে বাংলাদেশ আজও, অন্ততঃ অভ্যাস হিসেবে, তার জের টেনে চলেছে, তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারেনি। পটুয়া শিল্পের মূল তথ্যকে তাই শুধু বাংলাদেশের ছবির ইতিহাসে একটা বিশেষ অধ্যায় বললে কমিয়ে বলা হবে। শিল্প-ইতিহাসেরই এটা মূল কথা, সমস্ত দেশেই প্রাগৈতিহাসিক ছবির মধ্যে এই ধরনের নক্সার বিকাশ হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশে অন্যপথে হয়েছিল বলেই কিছুদিনের মধ্যে তার ধারা শেষ হয়ে গেলো। শিল্পের মূল রহস্য কি তা জানতে হলে যে-কোন দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবি বা বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রাকৃত পটুয়া ছবিকে বিশ্লেষণ করতে হবে; কারণ, ছবির মূল সত্যের সন্ধান এখানে এসেছিল।

সব ছবিরই দুটো দিক থাকে, বক্তব্যের কথা আর বলবার ভাষা। প্রসংগ আর আঙ্গিক। মূল পটুয়া ছবিকে দুদিক থেকে দেখলেই বোঝা যাবে কেন একে শিল্প-সাধনার অনিবার্য অধ্যায় বলতে হবে এবং কেন বলতে হবে শিল্পের সত্য এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পটুয়া শিল্পের বলার কথাটা কি? নিঃসন্দেহে বিশ্বপ্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি নয়, অথচ প্রকৃতির মূল কথাটুকু দেওয়া নিশ্চয়ই। 'বিশ্বপ্রকৃতির সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল এ ছবির উদ্দেশ্য।' তাই, পটের ছবিতে একটা গাছ দেখলে বুঝি যে ওটা গাছই, তবু এ-গাছ সে-গাছ কোন গাছের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেবার উপায় নেই। অর্থাৎ গাছের সামান্য সংবাদটুকু আছে মাত্র, বিশেষ গাছের ঠিকানাটা নেই। এদিক থেকে যে-কোন দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবির সংগে পটুয়া ছবির মিল অনেকখানি। অন্যত্রও শিল্পীর আবেগ নির্ভর খুঁজেছে বস্তুর সামান্য স্বরূপে। তবু অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে মূল পটুয়া ছবির তফাৎও আছে: প্রথমত, মূল পটুয়া ছবির আবেগ দানা বেঁধেছিল একটা পুরাণের উপর। ('পুরাণ' শব্দে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের Myth বোঝাতে চাই)। দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকের দিক থেকে, পটুয়া ছবির পাশেই দেশে ছিল সংস্কৃত শিল্প।

পটুয়া ছবি দানা বেঁধেছিল একটা পুরাণের উপর: এমনটা আর কোন প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে হয়নি এবং এমনটা না হলে শিল্পীর একটা প্রধান সমস্যারই সমাধান হয় না। অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক চিত্র কোন নাচের ছন্দ এঁকেছে, কোন মানুষ এঁকেছে, কোন হরিণ এঁকেছে। কিন্তু খাপছাড়াভাবে। সব মিলে একটা জগৎ নয় এবং কোন পুরাণে বিশ্বাস নেই। বাংলার প্রাচীন পটুয়ারা কিন্তু এমন একটা জগতের সন্ধান পেয়েছিল যে জগৎ আগাগোড়া সামান্য লক্ষণের জগৎ এবং একটা পুরোপুরি সংহত পুরাণের উপর যার স্থিতি। সেখানে যে জটায়ু সে তো আর মরলোকের কোন বিশেষ পাখী নয়, অথচ পাখীর মূল কথাটা তার মধ্যে রয়েছে। সেখানে যে হনুমান সে ত আর কোন

নিজের স্টুডিওতে এক বিশেষ মুহূর্তে শিল্পী। আলোকচিত্র : [illegible] রায়

যামিনীদাকে যেমন দেখেছি

দক্ষিণারঞ্জন বসু

তেইশ চব্বিশ বছরের এক তরুণী। দুধে আলতায় রঙ, যামিনী রায়ের ছবির মতোই পটলচেরা চোখ, উন্নত নাক—সিল্কের শাড়ি-পরা অসামান্য সুন্দরী হাসিখুশি অথচ গম্ভীর মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমেই প্রদর্শনীতে ঢুকে পড়লেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে আনন্দ চ্যাটার্জির গলিতে দেশী-বিদেশী লোকদের আনাগোনা লেগেই থাকতো ঐ স্থায়ী ছবির প্রদর্শনীতে। বছরে অন্তত একবার নতুন ছবির মেলা বসতো। ছবির উৎসব। সে উৎসবে দেশ-বিদেশের রসিকজনেরা তো আসতেনই, সাধারণ মানুষও এসে ভিড় জমাতেন খাঁটি গ্রাম বাংলাকে যামিনী রায়ের চিত্রে আস্বাদন করার জন্যে।

তেমনি এক উৎসব উপলক্ষেই সেদিন বিকেলে যে অপরূপা সুন্দরী তরুণী বেশ কিছু সময় কাটিয়ে গিয়েছিলেন যামিনী রায়ের প্রদর্শনীতে তখন কে জানতো তিনিই হবেন একদিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

তখন প্রধানমন্ত্রী না হলেও জওহর-কন্যা ইন্দিরা পাড়ায় এসেছেন সে কথাটা অল্পক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গিয়েছিল ঐ শিল্প-নিকেতনের সামনে। ইন্দিরা তন্ময় হয়ে দেখছিলেন দেয়ালে টাঙানো এক একখানা ছবি এবং স্বয়ং শিল্পী মাঝে মাঝে তাঁর এক একখানি চিত্রের মর্মবাণী অল্পকথায় তুলে ধরছিলেন ইন্দিরার কাছে।

কমকথার মানুষ যামিনীদা সেদিন দু একটি ব্যক্তিগত কথাও বলেছিলেন ইন্দিরাকে। শান্তিনিকেতন - বিশ্বভারতীর ছাত্রী ইন্দিরা শিল্পকলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করবেন, যা সুন্দর তাতেই আকৃষ্ট হবেন— তা ধরে নিয়েই খোলাখুলি বলে ফেললেন যামিনীদা, 'ভারত কন্যাকে ভারতীয় শাড়িতে কী অপূর্ব দেখায়'

হাসির রেশ ছড়িয়ে দিয়ে ইন্দিরা শিশুপুত্রের হাত ধরে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

সেই থেকে গভীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন ইন্দিরা শিল্পগুরু যামিনী রায়ের প্রতি। শিল্পীর কাছে লেখা ইন্দিরার বিভিন্ন পত্র সে শ্রদ্ধার নিদর্শন।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে যামিনী রায়ের বাসভবনে লাট-বেলাটরাও আসতেন, আসতেন মিত্রবাহিনীর সৈন্য-সেনানীরা, দেশের ছোটবড়ো নেতারা, এমনকি স্বয়ং কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথও এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে যামিনী রায়কে কতখানি সম্মান করতেন ও গুরুত্ব দিতেন তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যেতে পারে।

সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্র-শিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে।......আমার সৌভাগ্য এই, বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম, এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।'

এ চিঠিই কি কম বড়ো স্বীকৃতি যে কোনো শিল্পীর পক্ষে।

দীর্ঘ প্রায় দশটি বছর যামিনীদার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাল কেটেছে আমার। যামিনীদা, তারাশঙ্কর ও আমি—আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের একই সারির পর পর তিনটি বাড়িতে পাশাপাশি থাকতাম আমরা। দুই বাঙালী সাধকের সাধনা আমি কাছে থেকে লক্ষ্য করতাম। প্রতিদিন হয়তো দু বেলাই দু' চারটে করে কথাবার্তাও হতো। কখনো কখনো শীতের সকালে বা গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলায় এক একদিন যামিনীদার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে গল্প করে কাটিয়ে দিতাম। আমার পক্ষে সে কি কম সৌভাগ্যের কথা।

সেসব গল্প, সেসব কথা গুছিয়ে লিখতে পারলে একখানা বই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ রচনা ফাঁদতে আমি বসিনি। প্রতিবেশী রূপে যামিনীদাকে যেমনটি দেখেছি, তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর যে সমস্ত অসাধারণ গুণে আমায় আকৃষ্ট করেছিল সেসব সম্বন্ধেই সামান্য কিছু লিখছি।

যামিনী রায়ের ছবি অশ্বারোহী

পূজারিণী

এমন বাঙালী মানসিকতা এবং নির্ভেজাল ভারতীয়তার কাছে মাথা আপনি নুয়ে আসে। শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁর বাড়িতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী দেখতে এলে যে কয়টি ব্যক্তিগত কথা তিনি সেদিন তাঁকে বলেছিলেন তার মধ্যে দিয়ে যামিনী রায়ের স্বদেশপ্রাণতা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যামিনীদার অনেক কথা ধরতে পারতাম না। কখনো কখনো তাঁর কোনো কথাকে হেঁয়ালি বলে মনে হতো। তবু তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ভালো লাগতো। জগৎসংসারের বহু ব্যাপারেই তিনি নিস্পৃহ থাকতেন কিন্তু বড়ো রকমের কোনো অন্যায় বা অশুভ ঘটনায় তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন। এখানে একবারের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। একদিন, তখন সাম্প্রদায়িক হানাহানির সংবাদে শিল্পীমন ভীষণভাবে পীড়িত, সকালে আমি আফিসের দিকে চলেছি, বাড়ির সামনে পাইচারী করছিলেন তখন যামিনীদা। আমায় আটকে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভালো খবর কখন পাচ্ছি—এর মধ্যে কি আর কোনো কাজ করা যায়?

বাস্তবিকই সেই দিনগুলিতে শিল্পীকে কেবলি ছটফট করতে দেখেছি। কাজে তিনি মন বসাতে পারতেন না মানসিক যন্ত্রণায়।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের যে বাড়িটিতে তিনি তিরিশ-বাইশ বছর কাটিয়ে গেছেন সেখানে তাঁর নিজের জগৎ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। বাড়ির একটি ঘরকে তিনি অতি যত্ন করে তাঁর স্টুডিয়ো করে নিয়েছিলেন। সেই স্টুডিয়োই ছিল তার দিনরাতের শিল্প-সাধনার ক্ষেত্র। দিনের বারো আনা সময়ই তাঁর সেখানে কাটতো। তাঁর ছেলে পটল অমিয় ছিল তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের শিল্প-সহকারী। আর এই পটলের সঙ্গে তাঁর বন্ধু মণ্টু ছিল শিল্পীর কাজের সহায়ক হিসেবে।

মানুষ হিসেবে শিল্পী যামিনী রায়ের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সবারই চোখে পড়তো যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতেন। অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন তিনি। পোশাক-আশাকের বাহুল্যের কোনো বালাই ছিল না। ধুতি-ফতুয়া আর বিদ্যাসাগরী চটি এবং শীতের দিনে একখানা খদ্দরের চাদর। হাতের মোটা লাঠিটা নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে বড়ো একটা বেরুতেন না। কখনো বেরুলে ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবীতে সেজেই বেরুতেন লাঠিখানা হাতে নিয়ে। সভা-সমিতিতে যাওয়া পছন্দ করতেন না। বাড়িতে টেলিফোন রাখার বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘকাল [illegible]তে বাস করলেও সম্পূর্ণ-ভাবেই নাগরিকতার মোহমুক্ত ছিলেন যামিনী রায়। জীবনে ও কর্মে উভয় ক্ষেত্রেই তার সুস্পষ্ট ছাপ আমরা লক্ষ্য করেছি।

গ্রাম-জীবনের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ বোধ ছিল যামিনীদার। কথায় কথায় তাঁর সেই পল্লীপ্রেম ও প্রকৃতি চেতনা প্রকাশ পেতো। পল্লীর মানুষ ও নৈসর্গিক চিত্র তাঁর হাতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, সে আজ আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। গ্রামজীবনের ছবির জন্যেই তো তিনি ভাইস-রয়েজ গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন ইংরেজ আমলে। আর দু' তিনটি রঙে আঁকা তাঁর আশ্চর্য সব ল্যান্ডস্কেপ অজস্র বিক্রি হয়েছে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাড়ি থেকে, তা আমরা দেখেছি।

ভারতীয় ঐতিহ্যবাদী এই শিল্পীর চিত্রকলা নিয়ে আলোচনার অধিকার আমার নেই। তবে তাঁকে দেখেছি রামায়ণ-মহা-ভারতের গল্প নিয়ে দিনের পর দিন ছবি আঁকতে। বাইবেলের গল্পও তাঁর ছবিতে স্থান পেয়েছে। দেশী তুলি এবং নানা রঙের দেশী মাটির রঙ তিনি ব্যবহার করতেন। তেঁতুল বিচির আঠা তৈরি করতেও দেখেছি তাঁকে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের স্টুডিয়োতে। রঙ-তুলির খেলায় দেশীয় পদ্ধতি প্রকরণে যামিনী রায় যে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিশ্বের শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধ-সমালোচকদের নস্যাৎ করে দিয়েছেন শাহেদ সোহরাবর্দী, বিষ্ণু দে, জন আরউইন প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচকেরা। তাঁর বিখ্যাত 'গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ' ছবিখানা যখন তিনি আঁকছিলেন সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসছে।

যামিনীদার এক একটি কথায় অবাক হতাম। ভালোবাসার সমুদ্র ছিল তাঁর অন্তরে। বোধহয় ১৯৪৯-৫০এ তিনি তাঁর শ্রীরামপুরে উঠে যান বাগবাজার থেকে।

কীর্তনীয়া
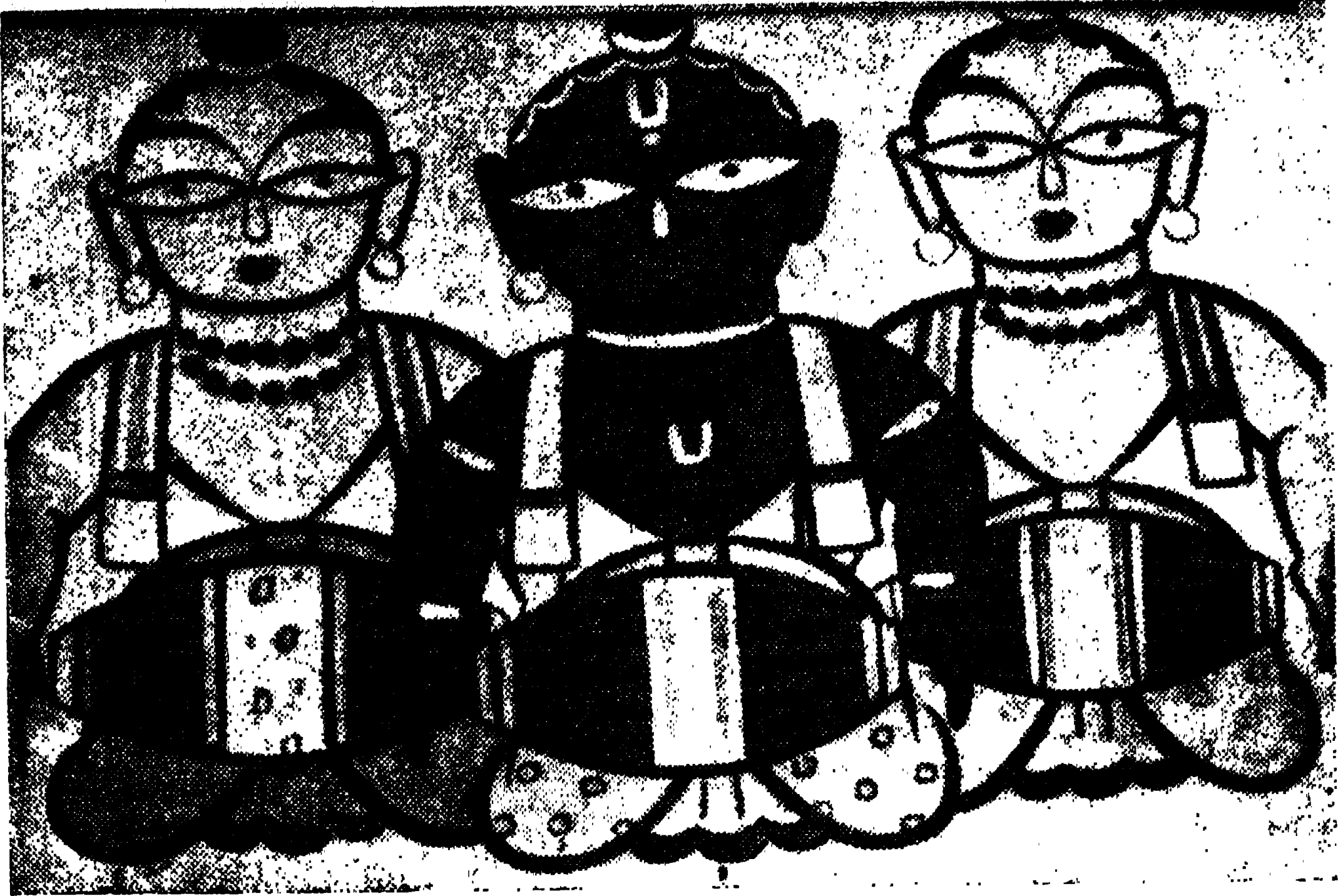
একদিন আমি কথায় কথায় বলেছিলাম তাঁকে, আপনি চলে যাচ্ছেন আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে, পাড়াটা বড্ড খালি লাগবে।

উত্তরে তিনি আমার অদ্ভুত একটি কথা বললেন। বললেন, তোমায় আমি স্থায়ী আশীর্বাদ দেবো।

সে আবার কি?—বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

তিনি বললেন, তোমার একখানা বই-এর আমি নিজে কভার এ'কে দেবো।

যামিনীদা পাড়া ছেড়ে, উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণের অধিবাসী হলেন। মাঝে একবার মাত্র তাঁর নতুন বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন তাঁর 'স্থায়ী আশীর্বাদ'টুকু কুড়িয়ে আনার কথা মনে হলো। বছর আড়াই আগে তাঁর ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়িতে গিয়ে প্রণাম করতেই যামিনীদা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন কিন্তু তিরস্কার করলেন প্রচুর, দীর্ঘকাল তাঁকে ভুলে থাকার অভিযোগে।

কিন্তু আমি যে তাঁকে ভুলে যাইনি, তাঁর স্থায়ী আশীর্বাদ'-এর কথা মনে রেখে তা কুড়োতে এসেছি, তা বলতেই শিল্পগুরু চমকে উঠলেন। বললেন, ও তুমি তোমার বইয়ের 'কভারে'র ব্যাপারে এসেছ। সেতো আমি প্রতিশ্রুত। কিন্তু এখন কি আর আমি তেমনি পারবো?

তবু তিনি কথা দিলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার 'রাত্রিকে দিনকে' কাব্য-সঙ্কলনের 'কভার' এ'কে রাখবেন, আমি যেন গিয়ে নিয়ে আসি।

এক সপ্তাহ পরেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর 'স্থায়ী আশীর্বাদ' আমি নিয়ে এসেছিলাম।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ

বৃন্দাবনে কৃষ্ণগোপী

অমর শিল্পী যামিনী রায়

প্রশান্ত দাঁ
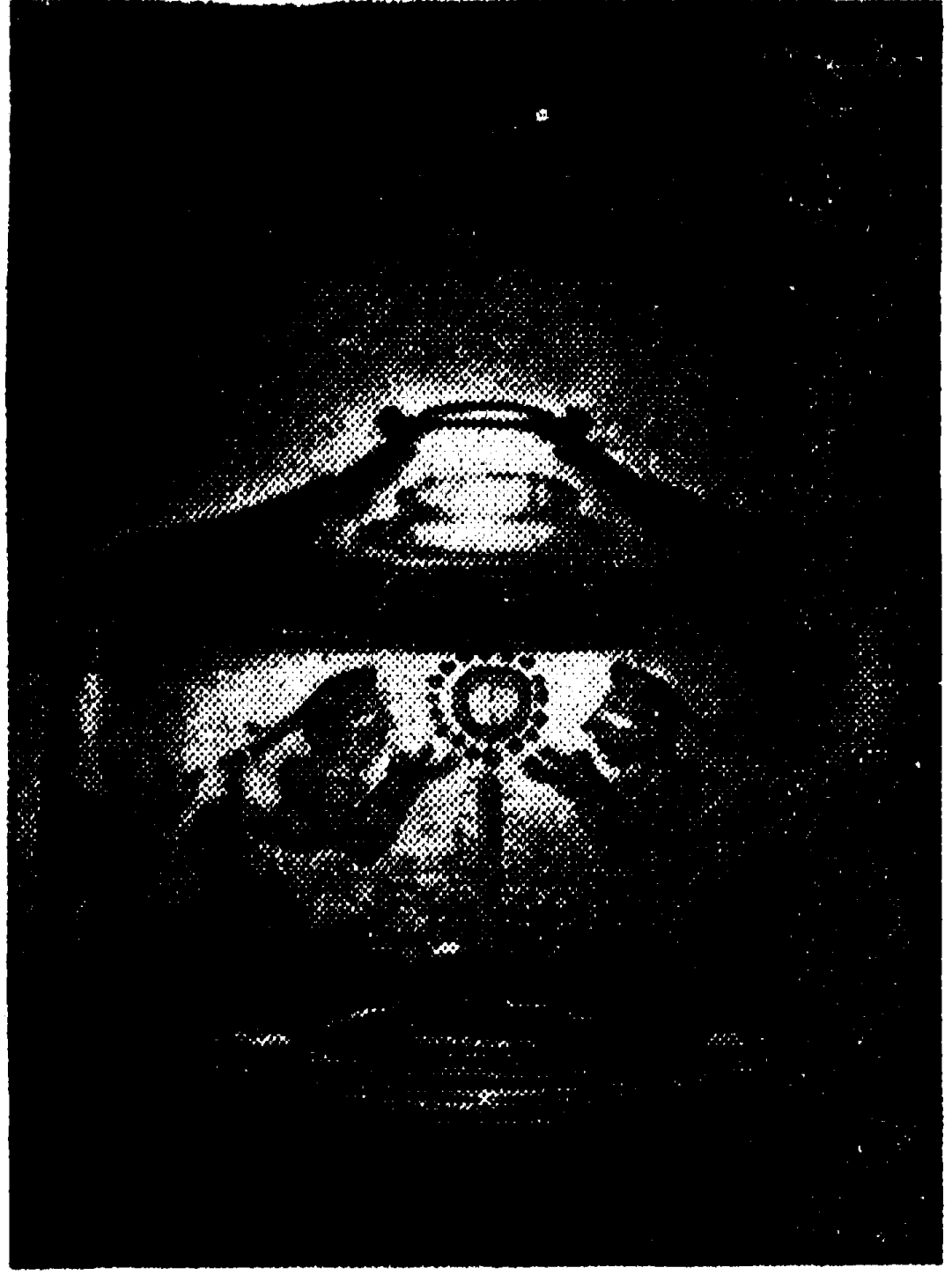
ভারত তথা পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে যামিনী রায় ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতির ধারার ধারক ও বাহক। চিত্র শুদ্ধিতা ও সাবলীল গতি তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য। শিল্পকে তিনি সরল শিশুর মত সহজে চলতে দিয়েছেন। তাই তাঁর ছবি আমাদের কাছে এত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ।

বধূ

পৃথিবী বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে। ছেলেবেলা থেকেই ছিল তাঁর শিল্পের প্রতি অসীম আকর্ষণ। রাস্তা থেকে লাল, নীল, টুকরো পাথর কুড়িয়ে একটার পর একটা সাজিয়ে কত রকম নক্সা করতেন।

বেলেতোড়ের বাড়ীতে প্রতি বছর দুর্গা পূজো হোত। এই ক্ষুদে শিল্পী নাওয়া খাওয়া ভুলে বাড়ীর ঠাকুর দালানের এক কোণে কুমোরদের ঠাকুর গড়া দেখতেন। ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে খুব বড় নাম করা একজন শিল্পী হবেন। সময়ে অসময়ে স্কুল আর বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন কুমোর বাড়ীতে। তন্ময় হয়ে দেখতেন কেমন করে ঠাকুরের নাক, কান, চোখ তৈরী করছে কুমোর।

কবছর পরের কথা। আরও একটু বড় হয়েছেন। আঁকা-জোকা সবে শুরু করেছেন। এমন সময় বাঁকুড়া জেলায় এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হল। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও শিশু শিল্পী যামিনী রায় ঐ প্রদর্শনীতে একটা ছবি পাঠালেন। বিচারক ছিলেন বাঁকুড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি শিল্পীর 'সমাজ' নামক ছবিটি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটি সোনার গিনি উপহার দেন। যামিনীবাবুর শিল্প জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম স্বীকৃতি।

এই স্বীকৃতির উৎসাহই যামিনী রায়ের সুপ্ত শিল্পী মনকে নাড়া দিল। উৎসাহিত হয়ে তিনি ছবি আঁকার দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু সেকালে বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরে নাটক আর ছবি আঁকা ছিল দুঃস্বপ্নের মত; কারণ তখনকার দিনে যে ছেলের কোন কিছু হত না সেই শুধু পা বাড়াত এই দিকে। সমাজের চোখেও তখন এই সব শিল্পীরা ছিলেন অপাংক্তেয়। যামিনী রায়ের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কলকাতায় ছবি আঁকা শিখতে যাবেন শুনে সবাইকার ঘোর আপত্তি; সহায় কেবল যামিনী রায়ের পিতা। প্রগতিশীল পিতা আত্মীয় কুটুম্বদের অনেক সমালোচনা অগ্রাহ্য করে ষোল বছরের ছেলেকে কলকাতায় পাঠালেন চিত্রকলা শিখতে।

১৯০৩ সালের কথা। কিশোর যামিনী রায় কলকাতার গভর্ণমেন্ট স্কুল অফ আর্ট এ ভর্তি হলেন। কলেজের অধ্যক্ষ পার্শী ব্রাউন তাঁর কাজ দেখে খুসী হয়ে তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত যেকোন ক্লাসে ক্লাস করার অনুমতি দিলেন। আর ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর ছবি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখলেন ক্লাসঘরে। এমন সম্মান এমন সুযোগ ইতিপূর্বে আর্ট কলেজের আর কোন ছাত্রের ভাগ্যে জোটেনি।

আর্ট স্কুলের আবহাওয়ায় যামিনী রায়ের শিল্পসচেতন মন কোন দিন ধরা দিল না। তিনি মনে প্রাণে যা চাইতেন আর্ট স্কুলের পরিবেশে তা ছিল না। বেলতোড়ের আকাশ বাতাস, মাটিপাথর, গাছপালা, সাঁওতাল ছেলেমেয়ে, গ্রামের অদূরে ছবির মত আঁকা বিহারের পাহাড়, নদী তীরের উর্বর বদ্বীপের মত সবুজ মাঠ, অনবরত চোখের সামনে ভেসে উঠত। তাই ত আর্ট স্কুলে কোন দিন স্থায়ীভাবে পড়াশুনো করা ত

এক জন্মদিনে

পারলেন না। দীর্ঘ বার বছরে কতবার ভর্তি হলেন, কতবার ছাড়লেন।

জীবনের প্রথম ভাগে ইউরোপীয় কায়দায় যামিনী রায় ছিলেন সুশিক্ষিত শিল্পী। প্রতিকৃতি অঙ্কনে তখন তাঁর দেশ জোড়া নাম। অসংখ্য প্রতিকৃতি এঁকে অজস্র অর্থ উপার্জন করেছেন। তৎকালীন ভাইসরয়ের কাছ থেকে সোনার পদক লাভ করার পর তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমৃদ্ধ বেড়েছে। কিন্তু শিল্পীর আত্মপরিতৃপ্তি নেই। যোগাযোগ ঘটেছে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সংগে। সেখানেও আপন অনুসন্ধিৎসু মনের উত্তর মিলল না। আবার পা বাড়ালেন নতুন পথের খোঁজে।

প্রকাশের বেদনায় ব্যাকুল শিল্পী স্বল্প রংয়ে এবং পরিমিত রেখায় ছবি আঁকা শুরু করলেন। আঁকলেন সাঁওতাল, 'মা ও ছেলে' 'গ্রাম্য চাষী' প্রভৃতি। এই 'মা ও ছেলে' ছবির সংগে একটি ইতিহাস জড়িয়ে আছে। প্রখ্যাত শিল্পরসিক গগনেন্দ্র ঠাকুরের উদ্যোগে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে এক চিত্র প্রদর্শনী হল। সেখানে গগনেন্দ্রনাথ যামিনীবাবুর ছবি দেখে হতবাক। ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি ঐ 'মা ও ছেলে' ছবিটি কিনে নিলেন। শিল্পীর কাছে শিল্পীর ছবি স্বীকৃত হল।

১৯২৮ সাল। যামিনী রায়ের শিল্প মানসভূমিতে আবার অস্থিরতার ঝড় উঠল। 'ফ্ল্যাট টেকনিকের' আশ্রয় ছেড়ে তিনি লাইন ড্রইং-এর দিকে মনোনিবেশ করলেন। সাদা কাগজের ওপর কালো রেখার আঁচড়ে আঁকলেন অসংখ্য জন্তু জানোয়ারের লাইন ধর্মী ছবি।

নিত্য নতুন আবিষ্কারের সাধনায় শিল্পী হয়ে উঠলেন অশান্ত। কিছুকাল পর ফ্ল্যাট টেকনিকের সংগে লাইন ড্রইং-এর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক অভিনব আঙ্গিকের সূচনা করলেন। এই সময়কার আঁকা 'বধূ', 'চাষীর মুখ' প্রভৃতি ছবি বিখ্যাত।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় যামিনী রায়ের শিল্প খ্যাতি দেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশে গিয়ে পৌঁছল। স্বদেশে বিদেশে প্রচুর ছবি বিক্রী হল। দেশের বুদ্ধিদীপ্ত অংশে এবং শিল্পীসমাজে যামিনী রায়ের ছবির আদর বেড়ে গেল। গভর্ণর মিঃ কে সি, বাগেশ্বরী অধ্যাপক সাহিদ সুরাবর্দী, বিখ্যাত শিল্প সমালোচক শ্রীমতী স্টেলা ক্যামিস ও জন আরউইন, কবি বিষ্ণু দে শিল্পী অতুল বসু, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মৃণালিনী এমার্সন, অরুণ সিংহ প্রমুখ সবাই তখন যামিনী রায়ের ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কোন শিল্পীর জীবনে বুঝি পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। চেতন, অবচেতন মনের উচ্ছ্বাস, ভাব ও অভিব্যক্তিকে নতুন আঙ্গিকে নবতর পর্যায়ে প্রকাশের বেদনা থাকে শিল্পীর মনে সদাসর্বদা সচল। চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই বার বার ফর্ম ভাঙা আর গড়া। নিত্য-নতুনের সাধনা। নিত্য নতুন পথে আনা-গোনা।

শিল্পী তাঁর শিল্প বিবর্তনের ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে শিশুর মতই সরল ও ফুলের মত সুন্দর হয়ে পড়লেন। ভাবকে রেখাকে খেয়াল খুসীমত স্বচ্ছন্দে চলতে দিলেন। চিত্রধর্মে শুদ্ধতাই এই সময়কার ছবির লক্ষণীয় বিষয়। প্রাচীন বাংলার লোক শিল্পের সংগে আপন মনের সৌন্দর্য চেতনা ও শিল্প সুষমার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন চিত্ররীতির প্রবর্তন করলেন। এই সময় শিল্পীর মন কখনও বা পরীর রাজ্যে আবার কখনও বা আনন্দ নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যের ভাব প্রকাশে মগ্ন। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা থেকে পূজারিণী মেয়ে, কীর্তন গায়ক, বাউল চাষী, ফকির, সাঁওতাল থেকে রূপকথা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে বিচিত্র রং ও রেখার কারুকাজে।

যামিনী রায়ের এই সময়কার ছবিতে বাংলা দেশের ভূমিজ ঘট পট, কাঁথা পুঁথির আল্পনাই ছিল শিল্পের বুনিয়াদ। তখন লৌকিক ও গ্রামীন শিল্পের দিকে প্রবল ঝোঁক। ছবিতেও ব্যবহার করলেন দেশজ রং। সাধারণ কাপড় বা চটের ওপর গোবর দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন। সাধারণ দেশি রং দিয়ে ছবি আঁকতেন—যেমন সিঁদুর, কাপড় কাচার নীল, সাদা খড়ি, পলি মাটি প্রভৃতি। ভাঙা কাঠির মাথায় দাড়ি, তুলো বা পাট জড়িয়ে তুলি বানালেন। ছবির জগতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করলেন। এক নতুন ইতিহাস রচনা করলেন।

বছর খানেক রোগ ভোগের পর ছিয়াশী বছর বয়সে চিত্রকর যামিনী রায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে চির জাগরূক ও অমর হয়ে থাকবেন তাঁর বিচিত্র শিল্পকর্মে, তাঁর বিশুদ্ধ শিল্প সৃষ্টিতে।

যামিনী রায়ের তুলির টান অনন্তকালের

—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ভারতীয় লোকশিল্পের আধার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী শিল্পগুরু শ্রীযামিনী রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

এক শোকবার্তায় তিনি বলেছেন: যামিনী রায়ের মৃত্যুতে আমরা এমন একজন শিল্পীকে হারালাম যিনি আমাদের দেশ ও নিজেদের পারস্পরিক বোঝাপড়াকে গভীরে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন:

লোকশিল্পের স্থানীয় জীবন-ধারাকে কেমন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাও তাঁর চিত্রে সুপরিস্ফুট। তাঁর তুলির টান অনন্তকালের হয়ে আছে।

স্বাধীনতার আগে থেকেই আমি যামিনী রায়কে চিনি। তাঁর স্টুডিওতেও গেছি। আমরা সকলে একজন গভীর মানবতাবাদী পুরুষ ও প্রথিতযশা ভারতীয়কে হারালাম।

সীমানা ॥

মানস রায়চৌধুরী

যেতে যেতেই পথ ফুরিয়ে যায় যে,
আমাদের আর এগোনোর উপায় থাকে না।
নিরুপায়, নিরুপায়—চড়ায় ঠেকেছে নৌকো, মাঝি
এখন জ্বালাবে ধুনি, শোনাবে লৌকিক গান দিকচক্রবালে
পথের সীমানা থেকে তোমাকে নতুন করে দেখি
পড়ি অনুত্তর দু ঠোঁটের লিপি
সত্যি করে বলো
আমার এ চেনাশোনা তোমার অবাক লাগে কিনা!

পথ তো ফুরোবে, জল পানপাত্রে একদা শুকোবে
তোমার হাতের মুঠো চিরকাল থাকে কি কঠিন
একভাবে দেখে ভাবি অন্যভাবে দেখা ভালো ছিলো
জলমগ্ন নলখাগড়া, শীতল পাটির ঠান্ডা বুক
তোমার বুকের চেয়ে অনুচ্ছ্বাস, আরো কতো দূরে
আমার সীমানা তুমি, তোমাকে পেরোতে গিয়ে ভাঙে অশ্বক্ষুর।

ভীড় ॥

কার্তিকচন্দ্র মিত্র

ভীড় হোক, নেই কোন ক্ষতি
যে নির্দিষ্ট পথ ধরে বাঁচার আকুতি
নিয়ে এত লোক ছুটে চলে—
সে পথে দারুণ ভীড় হলে—
নামেনা বিলোল বিষণ্ণতা বুকের প্রান্তরে।
মানুষের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ জুড়ে
কেন জানি, থামা আর গতির মিশ্রণ।
এই কথা ভেবে ক্ষমা আসে মনে।
পথে আরো ভীড় হোক, আমার মনন।

তবু সামনের লোক ধীর গতি হলে
রি রি জ্বলে স্নায়ু, পা ঠুকি অস্থিরতায়
ভাবি, একটি মুহূর্তে নিটোল পৃথিবী
মহাশূন্যে আঠারো মাইল দূরে সরে।
মুহূর্তের শতেক ভগ্নাংশে
পৃথিবীতে একটি ঘটনা নিয়মে গুটিয়ে
আর একটি ঘটনার শুরু।
সামনের লোক ধীর গতি হলে
রি-রি জ্বলে স্নায়ু।

নির্ভুল নিয়মে ॥

অরূপ তালুকদার

সেই কথা, স্বাধীনতা মানে শান্তির নীড়ে বাস করা
সত্যের সঙ্গে ঘর করা, নগ্ন বিস্তৃত বুকের
অসীম রক্তের স্রোতে ধুয়ে দিয়ে
শহর গ্রাম গঞ্জ জনপদ কোটি মানুষ এই বাংলার
ওড়ায় পতাকা সুনীল শূন্যে, নক্ষত্রবীথিকার তলে
পোড়ামাটি বিধ্বস্ত সংসার অনাহারে ক্লিষ্ট জনতা
অশ্রুমতী সময় দোসর দীপান্বিতা শরীরী দেয়ালে
এঁকে যায় সুবর্ণরেখা নির্ভুল নিয়মে রাত্রি দিন
কোনদিন দেখেছে কে বিষণ্ণ মন্থরতা বহতা নদীর
কে শুনেছে কবে শীতেও ঝরে না পাতা বনস্পতির
ফুলেল শাখা থেকে কিংবা রক্তের বিনিময়ে
আসে না অন্তিম প্রার্থনার শুভ্র ফলোদয়
হাতের মুঠোয় নির্বিকার, তাহলে
এই বাংলার মাটিতে কি লাভ হতো বলো
রফিক জব্বার বরকত সালামের রক্তমাখা
প্ল্যাকার্ড উড়িয়ে এবং নিঃসংশয়ে
শোকের মিছিল শ্লোগান নগ্নপদে প্রভাত ফেরী
বিফল হতো সমস্ত বাংলার জীবনে।

বেকার বান্ধব সমিতি

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

বেকার বান্ধব সমিতির আপিসে আজ বেশ ব্যস্ততা। সমিতিতে জনা দুয়েক নতুন সদস্য এসেছে। সমিতির পুরনো সদস্যদের ঝিমিয়ে পড়া অস্তিত্বে তাই আজ নতুন প্রাণের সাড়া পড়েছে। সমিতি চলে আসছে আগের মতনই। আসছে দিনেও চলবে। কারণ সমিতি চালানোর ব্যাপারে সদস্যদের আন্তরিকতার সামান্য ঘাটতিও নেই। সভাপতি থেকে সাধারণ সদস্যের উদ্যোগ নির্ভেজাল। তবু বেশ কিছুদিন নতুন সদস্যের অভাবে সমিতির প্রাণ যেন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। যাত্রার আসরে দর্শকের মতন। বিদূষকের আবির্ভাব যেমনি যাত্রার আসরের ঝিমুনি কাটায়, নতুন সদস্য আসায় সমিতির সদস্যরাও তেমনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো।

সমিতির সভাপতি শংকর পাল। নতুন সদস্যদের নমস্কার জানিয়ে বলে, বন্ধুগণ, দাদারা। আপনেরা আমাগো সমিতির সইভ্য অইলেন বইল্যা অন্তর থিকা যে কত সুখী অইছি তা আর কওনের নাই। যাউক—সমিতির তরফ থিকা আপনেগো কনগ্রাচুলেশন জানাই। এই নিখ্‌লো...নিখ্‌লা রে? মোজ কইর‍্যা দুই কাপ চা বানাইয়া লইয়্যা আয়।

সমিতির পাশেই নিখিলের চায়ের দোকান। কোন এক কারখানায় কাজ করতো নিখিল। কারখানা লক-আউট বহুদিন। এখন এই চায়ের দোকান খুলেছে। দোকানের নাম 'অমৃতপান'। নামটার ব্যাখ্যা লোকে করে নানানভাবে। কেউ বলে নিখিলের চা অমৃতের সমান। ওই চা পানের অর্থই অমৃতপান। কারুর মতে ওর পানই অমৃতের মতন। কারুও ধারণা নিখিলের চা অমৃতের সমান। সঙ্গে পানও বিক্রি করে। নিখিলকে উদ্দেশ্য করে ওই নামের ব্যাখ্যা আজও কেউ জানতে পারেনি। তবে ওর দোকানে শুধু চা নয়, পান-বিড়ি-সিগারেট আলুর দম, ঘুগনিও পাওয়া যায়। বেকার বান্ধব সমিতির সব চা-ই আসে নিখিলের দোকান থেকে।

রেললাইনের গা ঘেঁষে সমিতির আপিস। নামেই আপিস। হোগলা পাতার ছাউনি আর বেড়া। বাঁশের খুঁটি। একটা তক্তপোশ। গোটা দুয়েক নড়বড়ে চেয়ার আর বেঞ্চ। কবে কেনা হয়েছিল কেউ জানে না। তারপর আর মেরামত হয়নি। তক্তপোশে একটা ছেঁড়া মাদুর। বেড়ায় গোটা দুয়েক ক্যালেণ্ডার। একটা পোসটার। তাতে লেখা : বেকার ভাতা চাই, বেকারদের চাকরি চাই। একজোড়া জলের কুঁজো আর গেলাশ। বাইরে সাইনবোর্ড নেই। তবে সবাই বেকার বান্ধব সমিতিকে চেনে। ঘরটা নাকি বানিয়েছিল কোন এক [illegible]

পরিত্যক্ত হবার পরই বেকার বান্ধব সমিতি গড়ে উঠেছে। ঘরটা দেখে মনে হয় রোদ-জল-ঝড় সয়ে স্থবির দেহটাকে নিয়ে আজও সে দাঁড়িয়ে আছে সমিতির বেকার সদস্যদের জন্যে অসীম মমতায়।

নতুন সদস্য বীরু আর মণ্টু। ওরা চেয়ারে বসে।

সভাপতি শংকর পাল সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মণকে বলে, অরে লক্ষ্মইন্যা—সমিতির স্ট্যাটেজিগুলান ওনাগো জানাইয়া দে। অঃ—এ্যাকেবারে ভুইল্যা গেছি। এই অইল গিয়া লক্ষ্মণ মল্লিক। আমাগো বেকার বান্ধব সমিতির সেক্রেটারি। আর কন ক্যান। বেশি দিন বেকার থাইকলে মেমারির আর কিছু থাকে না। এ্যাকেবারে ভোঁতা অইয়্যা যায়।

ওদের নমস্কার বিনিময় হলো। চা এলো দু ভাঁড়। নিমকি বিস্কুট সঙ্গে।

চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে মণ্টু বলে, এ কেমন হলো? শুধু আমাদের জন্যে! অথচ আপনারা—'

হেসে শংকর পাল বললো, কিছু মনে কইরবেন না দাদারা। এইডা আমাগো সমিতির নিয়ম। নতুনরা আইলে ক্যাবল তাগোই রিসেপশান জানান অয়। কারণডা নিশ্চয়ই বোঝতে পারতাছেন। হেঃ হেঃ আমরা বেকার কিনা।

বীরু আর মণ্টু চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দেয়।

লক্ষ্মণ বলে, সমিতির নিয়ম বলতে বিশেষ কিছুই নেই। তবে এর পরিচালনার ভার পুরোপুরি বেকারদের ওপর। চাকুরেদের এ্যাকটিভ পার্টে রাখা হয় না। কিন্তু বেকারদের মধ্যে যারা চাকরি পায় তারাও এখানে রেগুলার আসে। চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের খরচাটা মেইনলি ওরাই বিয়ার করে। বেকারদের ক্ষমতা অনুযায়ী কনট্রিবিউট করতে হয়। তবে কমপালসারি নয়।

বীরু জিগ্যেস করে, এভাবে কি ডিসিপ্লিন রাখা যায়?

লক্ষ্মণ বলে, আজ পর্যন্ত ডিসিপ্লিন কেউ ভাঙেনি। তবে একটা নিয়ম আমাদের মানতে হয়। সকাল বিকেল সন্ধ্যে যে কোন সময় দিনে অন্ততঃ একবার হাজিরা দিতেই হবে। অসুখ হলে ইনফরম করতে হবে। আমরা সবাই গিয়ে দেখে আসি।

—এখানকার আলোচ্য বিষয় কিভাবে ঠিক করা হয়? জিগ্যেস করলো মণ্টু।

এবার উত্তর দেয়, পণ্টু সেন। সমিতির ক্যাশিয়ার। এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল।

—ব্যাপারটা খুবই সোজা। আলোচনা কি হবে আগে থেকে কিছুই ঠিক করা হয় না। রাজনীতি খেলাধুলো সিনেমা বিজ্ঞান ভূতপ্রেত বাংলাদেশ কিছুই বাদ যায় না। তাছাড়া বেকার-সমস্যাটা তো খুবই কমন ব্যাপার। কেননা এখানে যে আমরা সবাই বেকার।

সবাই একটু হাসে।

লক্ষ্মণ বলে, তবে হ্যাঁ—একটা ব্যাপার আমাদেরকে স্ট্রিকটলি মেনে চলতে হয়। বলতে পারেন এটা সমিতির প্রতি বিশেষ আনুগত্য। সমিতিতে আলোচনার সময় তর্ক হয় বাদ-প্রতিবাদ হয়। আবহাওয়াও অনেক সময় গরম হয়। কিন্তু সমিতির বাইরে তার রেশ নিয়ে যাওয়া গুরুতর অন্যায়। যদি কেউ নেয় তবে তাকে সাসপেণ্ড করা হয় সমিতিকে অমান্য করার অপরাধে।

খানিকক্ষণ সবাই নীরব।

হঠাৎ বীরু জিগ্যেস করে, বেকার সমিতি নামকরণ না হয়ে বেকার বান্ধব সমিতি কেন হয়েছে বুঝতে পারছি না।

উত্তরে সভাপতি শংকর পাল একটু হেসে বলে, এই নামেরও একডা হিডেন-মিনিং আছে। সমিতি বেকারদের ঠিকই। তয় যারা চাকরিয়া তারাও পরম বন্ধুর মতন আমাগো লগে সহযোগিতা কইর‍্যা থাকে। এই নামের দিগ্ থিকা তাগোও বঞ্চিত করা উচিত না।

পণ্টু সেন বলে, আরেকটা ব্যাপার এখানে হয়ে থাকে। সমিতির বেকার সদস্যদের কেউ চাকরি পেলে তাকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়। খরচাটা কিন্তু তার নিজেরই।

সমিতির আর দুই সদস্য কমল ঘোষ আর দুলাল রায় এতক্ষণ নীরবে বসে রয়েছে তক্তপোশের এক কোণে। কমল ঘোষের চেহারায় নায়কোচিত ঢুলঢুলু ভাব। লম্বা জুলপি। মোটা গোঁফ। চুলের টেরিতে যত্নের ছাপ। পোশাকও বেশ ধোপ-দুরস্ত। মোটামুটি দামি। দুলাল অবশ্য আর পাঁচজন কমন বেকার ছেলের মতন।

শংকর পাল কমলকে দেখিয়ে বলে, তার নাম কমল ঘোষ ওরফে কমলকুমার। বেকার বান্ধব সমিতির হিরো। সিরাজারের হিরোর রোল বান্ধা। সিনামায় নামনের চাইষ্টা করতে গিয়া এই পাইকারির নকলের সুযোগও [illegible] কইবার [illegible] এক প্রডিউসাররে ধইরা অ্যাটেলং কইর‍্যা রেস্টুরেন্টে ভালমন্দ খাওয়া পাইয়া একডা রোল যোগাড় করছিল ...তবে দুঃখের কথা আর কি কমু। শেইখানে কাইরা অয়। ডাইরেকটার অরে গ্ল্যাক দিয়া ফলস ক্যামেরা ঘুরাইছিল। তারপর থিকা বাবাজীবন এখন বেকার বান্ধব সমিতির প্রমিসিং ফিগার। কোন ভাবান্তর নেই কমলের মধ্যে।

দুলাল রায় বললো, আমার কথা আমি নিজেই বলছি। সাম্যবাদের একই স্রোতে যখন আমরা গা ভাসাচ্ছি তখন নিজের কথা নিজে বলতে দোষ কি?

—নিশ্চয়ই না। উত্তর দিলো বীরু।

দুলাল বলে, আজ বুঝতে পারছি, লেখাপড়া শেখা একটা বিরাট ভুল। অথচ ভুল করেও আমরা সে পথেই এখনো বার-বার পা দিয়ে চলেছি। কলেজে পড়তে গিয়ে নিজের সম্পর্কে ওভার এস্টিমেট করে ফেলেছিলাম। মেকানিক্যাল ড্রাফটসম্যানশিপ অবশ্য পাশ করলাম। কিন্তু... তারপরই হঠাৎ নজরে পড়লো বাংলাদেশের বহু কারখানার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না।

হতাশা আর ফ্যাকাসে হাসি দুলালের মুখে। খানিকটা অভিযোগও মাখানো রয়েছে।

হঠাৎ সবাই একটু সচকিত হয়। নড়েচড়েও বসে কেউ কেউ। সবার চোখগুলো একসঙ্গে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। কলেজ-গার্ল বোধহয়। এদিকে একবার চেয়ে গেল।

মণ্টু জিগ্যেস করলো, এও কি সমিতির অঙ্গ না কি?

হেসে শংকর পাল বলে, হ তা এ্যাক রকম অঙ্গই কইতে পারেন।

লক্ষ্মণ বলে, এটুকুই তো আমাদের বাঁচার এনার্জি দিচ্ছে। ভেবে দেখুন দোস্ত কি আর আছে আমাদের জীবনে? কেউ আমাদের সঙ্গে সিনেমায়ও যাবে না, ময়দানে রেস্তোরাঁয় ফুর্তিও করতে চাইবে না। আমাদের পিঠে যে সিলমোহর! তাই ওদের কৃপাটুকুই তো আমাদের সম্বল। আমাদের জন্যে ওদের সিমপ্যাথি আছে বলতে হবে। অনেক মাল আবার এখান দিয়ে যেতে গম্ভীর হয়। মুখ ঘুরিয়ে নেয়। শিস দিলেও শোনে না। একটু খিস্তিও করে না। সুশালার ইচ্ছে করে... । আরে আমরা কি আর জানি না ভিজে বেড়াল হয়ে কে কোন্ ঘাটের জল খায়।

অবরুদ্ধ ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের প্রতিবাদ বেরিয়ে আসতে চায় লক্ষ্মণের ভেতর থেকে।

খানিক নীরবে কাটে তারপর এক সময় কথা বলে কমল। নাটকীয় ভঙ্গিতে। ওর বলার ধরণই অমন। চাল-চলনেও নাটকীয়তা।

কমল বলে, দাদার বিয়েতে গতবার গেলুম আসানসোল। একে বরযাত্রী তায় আবার বরের ভাই। কত আশা মনে নিয়েই গেলুম। কিন্তু সব প্ল্যানই মাটি হয়ে গেল। উঃ—কি যে ভয়ংকর ছাপ পড়েছে আমাদের পিঠে। বেকার... আমরা বেকার। দাদার শালীও অনেকগুলো। দেখতেও মাইরি একেকটা খাসা। কত ঘুরঘুর ফুরফুর করলুম। একটারও টেস্ট পেলুম না মাইরি। সুশালা... বেকার বলে আমরা কি মানুষ নই?

লক্ষ্মণ ওকে একটু টিপ্পনী কেটে বলে, তুই বোকা এক আহাম্মক। অভিনয় করিস অথচ মেয়েদের [illegible] না। প্রেমফ্রেম মেয়েদের মধ্যে কিছু নেই। ওরা বড় হিসেবি। ভেবেচিন্তে পা ফেলে। একটু গরমিল হলেই পিছুটান দেয়।

লক্ষ্মণের কথা শেষ হতে না হতেই সমিতির আরেক সদস্য টুনু দাস ভেতরে ঢুকলো।

টুনুকে লক্ষ্য করে শংকর বললো, আহ্ শেঠজি। আইজ এত দেরি ক্যান্?

সমিতিতে শেঠজি নামেই পরিচিত টুনু দাস। চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে ওর ওই নাম রেখেছে সদস্যরা। কোঁকড়ানো চুল। গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা। বেকার জীবনে এই বয়েসে ভুঁড়িও হয়েছে খানিকটা। মোটা গোঁফ। চেহারার সঙ্গে চাল-চলন আর কথাবার্তার বেশ মিল আছে।

বসতে বসতে টুনু বললো, রেশনে লাইন দিয়েছিলুম। সুশালার একটু সুখ করার উপায় আছে?

নতুন সদস্যদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হয় টুনুর।

...শংকর বলে, শেঠজি আমাগো গুরুদেব। ...চরণামৃত খাইয়্যা আমরা ধইন্য অই। ...ই যেনো রাম স্বচ্ছ্ কিচ্ছুই গুরুদেবকে ...কইরতে পারে না। বোতলকে বোতল ...দিব্য ছুইট্যা যায়। আমরাও ...। তয় অব্ব অমন রেন্ডো অইতে পারি ...শেঠজির কোন ভুরুক্ষেপই নাই। ...রে—তোমার ম্যাজাজডা খ্যান্—

...ওর কথা কেড়ে নিয়ে টুনু বলে, ...জ ঠিক থাকে কি করে বল্ দেখি? ...চাকরি করে স্বর্গ জয় করেছে আর ...না নটা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ...আমি সুশালা বেকার হাট বাজার ...ন করে মরছি। দাঁড়াওনা বাপু। একবার ...কির পেলে আমিও তোমাদের কলা ...খাবো। খুব করে মাল টেনে বেলা দশটা ...পর্যন্ত ড্যাড্যাং ঘুম।

সমিতির আরেক সদস্য নকুল চক্রবর্তী ...রে ঢুকে একপাশে বসলো। চেহারায় বেশ ...স্বাতন্ত্র্য রয়েছে অন্যান্যদের সংগে। কালো ...ছিপছিপে চেহারা। খানিকটা গম্ভীর। চোখেমুখে দীপ্তির ছাপ। কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। বাঁদিকে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ানো। নিখুঁতভাবে গোঁফকাটা। ধুতি আর ছাই রংয়ের হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবী। বেশ ধোপদুরস্ত।

শংকর পাল নকুলকে দেখিয়ে বললো, আমাগো কবি নকুল চক্রবর্তী।

গোঁফের নিচে একটু হাসির রেখা বেরিয়েই আবার মিলিয়ে গেল নকুলের। নকুল নমস্কার করে নতুন সদস্যদের। শংকর পালই বলে আবার, আমাগো নিয়া আর ক্যাবা লেখবো? বাঘব বোয়াল ল্যাখকরা আমাগো চোকখেই দ্যাহেনা। হেরা ল্যাহে এয়ার-কন্ডিশনড ঘরে কি কইর‍্যা প্রেম অয়। নাই নকুলই আমাগো কথা ল্যাহে। অবইশ্য নকুলও যেদিন বাঘব বোয়াল অইয়্যা যাইবো, হেইদিন আমাগো কথা আর লেইকবো কিনা কে কইবে। যাউক... আমাগো নকুল বাংলায় এম-এ পাস কইর‍্যা ফালাইছে।

আরেকটু গম্ভীর হয় নকুল।

মন্টু জিগ্যেস করে, চাকরি জুটেছে কিছু?

সামান্য হেসে নকুল বলে, তবে আর বেকার বান্ধব সমিতির এ্যাকটিভ মেম্বার থাকতে পারতুম না। অবশ্য গত বছরটা হাফ-বেকার ছিলুম।

—মানে...?

একটু হেসে নকুল বলে, গত বছর একটা ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে ছিলুম। লাস্ট উইকে নট হয়ে একটা ফেয়ারওয়েল বগলদাবা করে ফিরলুম। সমিতি আবার আশ্রয় দিয়েছে।

—এখন চলছে কি করে?

—লক্ষ্মী আর সরস্বতীপুজো করে।

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে মন্টু নকুলের দিকে।

মুচকি হাসে নকুল। বলে, মানেটা বুঝলেন না তো? ওর অর্থ হলো ট্যুইশানি। আমার দিক থেকে লক্ষ্মীপুজো আর ছাত্রদের তরফে সরস্বতীপুজো। লক্ষ্মী আর সরস্বতীর এমন মণিকাঞ্চন যোগ আর কোথাও হয় না।

—ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল...। চিৎকার করে ওঠে বীরু।

পল্টু বলে, এমনিতেই কি ওকে আমরা কবি বানিয়েছি? লেকচারেও নকুলের দোসর নেই। গরম গরমই বলুন আর কাব্যিক ভাষাই বলুন ও একেবারে ওস্তাদ।

শংকর পাল বলে, এদিকে বাবাজীবন বেকার। তয় পোশাকের বাহারডা দ্যাখছেন। মাইনষে অরে কয় অধ্যাপক।

মন্টু বলে, সে যোগ্যতা কি নেই ওর? কিন্তু...আজকাল যোগ্যতার দাম দিচ্ছে কে? খুঁটির জোর না থাকলে তো এখন চাকরি পাওয়া যায় না। হয় মামা-কাকা নয়তো পার্টি।

নকুল বলে, যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু বেকার বলেই পোশাকেও দৈন্য ফোটাতে হবে এ আমি মানতে পারি না।

কমল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। নকুলের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে বললো, এখানেই কবির সংগে আমার দোস্তি। আমি গরীব হতে পারি। আমার পোশাকগুলো তো গরীব হয়নি।

খানিক নীরবে কাটে আবার।

তারপর শংকর পাল বলে, আপনাগো পাইয়া আমরা যান নতুন কইর‍্যা প্রাণ পাইলাম। এইবার আপনেগো কথা কিছু কন্।

বীরু বললো, বলবো তো বটেই। তবে ঘুরেফিরে আমাদের কথাও তো এই একই। কলেজে যখন পড়ছিলুম বাবা একটা চাকরি যোগাড় করে দিয়েছিল। এক ঘি-কোম্পানীর সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। বাবার ওপর রাগ হয়েছিল ছেলের প্রতি অবিচার করছে বলে। রিফিউজ করলুম চাকরিটা নাক সিঁটকিয়ে। অবশ্য এর পেছনে কৃষ্ণার মদতও ছিল। হুঁঃ... কৃষ্ণাকে আমি কতখানি...। যাক একদিন লাইট হাউস থেকে কৃষ্ণাকে

বেরুতে দেখলুম আমারই বয়েসী একটি ছেলের হাত ধরে। চোরের মতন ওদের অনুসরণ করলুম। ওরা অনিশ্চ হয়ে পার্ক-স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে গেল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বীরু। কি যেন ভাবে।

তারপর বলে, এখন বাবা বাড়ি থাকলে সামনে যাই না। হয়তো কোনদিন বলবে, বাবার হোটেলে আর কদ্দিন? তাই খাওয়া-দাওয়া আর বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়ানো। লোকে সময় পায় না। আর আমি সময় কাটানোর পথ খুঁজে পাই না।

শংকর পাল বলে, ঠিক কইছেন। মাইনষে সোময় পায় না। আমরা সোময়ের বেহিসাবি খরচা করি। বেহিসাবি খরচায়ই তো আনন্দ। টাকাপয়সা ত আর নাই। তাই সোময়ডারেই পয়সার মতন খরচা করি।

মন্টু বলে, আমি অবশ্য আজ পর্যন্ত কোন চাকরি পাইনি। ব্যবসা করতে গিয়ে খানিক টাকা লস করেছি। বাঙ্গালী ব্যবসা করতে জানে না কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়।

মন্টুর কথায় একপ্রকার বিষাদ। সবাই নীরবে থাকে।

নীরবতা ভাঙে মন্টু। সমিতির উঠতি সদস্য। বয়সেও সবার ছোট। ছিপছিপে ফর্সা চেহারা। চোপসানো গাল। খুব বড় বড় চুল। তেলের চিহ্ন নেই। ঝুলপি নেমেছে গাল পেরিয়ে প্রায় থুতনি পর্যন্ত। চাপা ফুলপ্যান্টের ওপর নামাবলিকাটা পাঞ্জাবি।

গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ভেতরে ঢুকলো মন্টু, 'ছোটি আশা ছোটি পেয়ার...'

শংকর বলে, আমাগো সমিতির গায়ক সইভ্য। ওরফে ঘন্টুকুমার। ঠাকমায় অর নাম থুইছিল ঘন্টা। এ্যাহন কেউ অরে কয় মন্টু কেউ কয় ঘন্টা। আমরা অবইশ্য অরে গায়কই কই। বাবাজীবন, গুরুর হিটগান দুই একখান ধরতো। অনেকদিন পরে আসরডা ঘ্যান জইম্যা উঠছে। এ্যাদ্দিন ব্যান মইর্যা আছিলাম। ধর বাবাজীবন ধর। একটু তাজা অই।

ঘন্টুর ফর্সা মুখটা একটু আরক্তিম হয়।

ঘন্টু গান ধরে : 'ললিতা, ও ঘাটে জল আনিতে যাবো না...'

পল্টু আর কমল তক্তপোশে তাল দিতে থাকে।

গান শেষ হয়।

বীরু ঘন্টুকে জিজ্ঞেস করে, আপনার গুরু তবে মান্না?

একটু হাসে ঘন্টু। বলে, গুরু আমার তিনজন। এক নম্বর রফি। দু নম্বর হেমন্ত। আর তিন নম্বর মান্না।

শংকর পাল নিখিলকে ডেকে বলে, এই নিখ্যা, এ্যানার্জি দিয়া যা রে।

নিখিল বিড়ি দিয়ে যায়। বীরু আর মন্টুর দিকে দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে শংকর পাল বলে, লন— এ্যানার্জি লন। দাদা দাওনের সাধ্যি নাই আমাগো। বেকার মাইনষের ভারতের জাতীয় জিনিস খাওনই উচিত।

[illegible] বিড়ি ধরায়।

শংকর বলে, ঘন্টু মন মাতাইয়া রফির দুইখান পেয়ারের গান শোনা বাবাজীবন। আমাগো ঘন্টুকুমার হিন্দি আর ইংরাজ সিনামার পোকা। বাংলা বই অর ভাল লাগে না।

ঘন্টু বলে, ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি ছাড়া বাংলা বইয়ে আছে কি? পয়সা দিয়ে স্রেফ ফুর্তি করতে যাই। সেই ফুর্তিই যদি না হলো—'

ওর কথা শেষ হবার আগেই শংকর পাল বলে, হ তা কইবানা। মনের মইধ্যে সুড়সুড়ি দেওয়া নাচ না দ্যাখলে কি ফুর্তি আয়? হঃ—হেই জন্যেই বাংগালী পোলাগো আজ এই দশা।

মন্টু বলে, সুড়সুড়ি কে না চায় বলতে পারো? তবে অনেকে মুখোশ পড়ে থাকে। বুঝলে হে, ফুর্তি করতে গেলে বুকের পাটা দরকার।

এবার লক্ষ্মণ বলে, হুঁ... একজায়গায় ঘন্টুর বুকের পাটা আছে বলতেই হবে! ঘন্টু শুধু পেয়ারের গানই করে না। টোপ ফেলে একটাকে গেঁথেও ফেলেছে। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে টেক্কা দিয়েছে ও। বিশেষ করে আমাদের কমলকুমারকে।

কমলের দিকে তাকায় লক্ষ্মণ। কমল হাসে। কৃত্রিম হাসি। জোর করে বের করা।

লক্ষ্মণই বলে আবার, কমলকুমার শুধু ল্যাং খেয়েই গেলো। কাউকে বাঁধানো দূরে থাক একটাকেও ল্যাং দিতে পারলো না। তবু বুতুম মরদ। হ্যাঁ—তারিফ করতে হয় ঘন্টাকে। বেকার হয়েও একটাকে জালে তুলেছে।

শংকর বলে, ক্যাবল কি জালেই তুলছে? ঘন্টা বাবাজি ভাগ্যবান। ছেমড়ি হের বাবারে আলটিমেটাম দিয়া কইছে, আমি ঘন্টাকেই বিয়া করমু। ঘন্টা চাকরি না পাইলে আমিই অরে চাকরি কইর্যা খাওয়ামু। বাবাজীবন ঘন্টা! দেহিস, তরে য্যান শ্যাষকালে ঘন্টার মতনই ঢং-ঢং কইর্যা না বাজায়।

ঘন্টা বলে, সে মেয়ে বাংলাদেশে জন্মায়নি।

দুখানা হিন্দী গান গাইলো ঘন্টা।

গান শেষ হলে বীরু প্রশ্ন করলো, সমিতির মেম্বাররা রাজনীতি করে না?

বীরুর এই প্রশ্নে হঠাৎ আবহাওয়াটা বদলে যায়। সবার মুখই থমথম করতে থাকে। কিছুক্ষণ কারও মুখে কোন কথা নেই।

এক সময় লক্ষ্মণ বলে, এটা তো পুরো-পুরি ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপার। বাংলাদেশে আজ এমন একটা সিচুয়েশান তৈরী হয়েছে যেখানে রাজনীতি করিনা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। নয়তো বলবে পলিটিক্যাল-ইডিয়ট। বিশেষ করে আমরা যখন ইয়াং বেকার। অথচ এও ঠিক যে, ইয়াং বেকারদের সবাই রাজনীতি করে না। আমাদের মধ্যে দু-একজন করে বৈকি। তবে সমিতির মধ্যে পলিটিক্স নিয়ে আসা অপরাধ।

শংকর পাল বললো, রাজনীতি করমু কি? এ্যাহন কি আমাগো দ্যাশে রাজ আছে? এ্যাহন অর দলনীতি। হ দাদাগোই ত দ্যাখলাম। আগে দ ল্যাকচার শুইন্যা পাগল অইতাম। দেহি ল্যাকচার ল্যাকচারই। হের কামের কোন [illegible] কামড়াকামড়ি কইর্যা [illegible] আমরা। সাবাস দিতে অয় শেখ মুজিব বাংগালীরে এক আখ্যা বানাইয়া ব পাগল কইর্যা দিছে। সংশয়ার আমাগো দ্যাশে কিছু অইবোনা।

একটা হতাশার সুর ওর কথায়।

একজন বললো, তবে লোকা[illegible] সোশ্যাল ওয়ার্কে আমরা সব সময়ই প[illegible] সিপেট করে থাকি। এই যেমন ধরুন পোড়ানো। রিলিফ-ওয়ার্ক করা। তা[illegible] দুর্গাপুজো কালিপুজো তো আছেই।

শংকর বলে মরা পোড়ানর বি[illegible] সমিতির সইভ্যারা একডা নিয়ম মা[illegible] চলি।

মন্টু জিজ্ঞেস করে, কি রকম?

শংকর বললো, তিরিশ বচ্ছর বয়ে[illegible] মইধ্যে কেউ মইরলে মড়া কান্ধে কই[illegible] আমরা সাইলেন্ট যাই। তিরিশ থি[illegible] পঞ্চাশের মধ্যে অইলে 'বল হরি-হরিব[illegible] কই। তবে ভক্তি মিশাইয়া!

আর পঞ্চাশ পার অইয়া অক্কা পাই[illegible] দাদু-দিদিমাগো একটু আনন্দ কইর্যা লইয়া যাই। হেরা নাতিগো খুব ভালবাসে কিনা।

হাসির রেখা ফুটে ওঠে সবার মুখে।

শংকর পালই বললো আবার, গে[illegible] বিস্যুৎবার আমাগো চিকনদাদুরে পোড়াই[illegible] লিস্টিতে নাম উঠছে এ্যাকশ' তের।

এবার একটু গম্ভীর সুরে লক্ষ্মণ বলে, তবে বাইরে আমরা যা-ই করি না কে[illegible] সমিতির মেম্বারদের জন্যেও আমাদের কিছু করার থাকে। সত্যি কথা বলতে কি ওটুকু যদি না থাকতো তবে সমিতি হয়তো টিকতো না।

একটু ভাবে লক্ষ্মণ।

তারপর বলে, আমরা বেকার। সমাজে আমাদের অবস্থাটা ডাস্টবিনের মতন। বাইরে আমরা অচ্ছুৎ। বাড়িতে সবাই নাক সেঁটকায় আমাদের দেখে। অথচ একথা কেউ ভাবে না যে, আমরা কেউই বেকার হয়ে জন্মাইনি। এ সার্টিফিকেট আমরা পেয়েছি দেশ আর সমাজ থেকে। অথচ তারই গুণগান করতে হয় আমাদের। কিন্তু তা দিয়ে বাস্তবকে কি ঢেকে রাখা যায়? কক্খনো না। তাই আমরা সমিতি গড়েছি অন্ততঃ মনের দিক দিয়ে বাঁচতে। বেকার-জীবনের হতাশাকে ভুলতে চাই। আমরা একে অপরকে সান্ত্বনা দিয়ে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। লক্ষ্মণের কথাগুলো বৃষ্টির শব্দে মিশে গিয়ে সমিতির বেকার সদস্যদের মনে দোল খেতে থাকে। অনেকগুলো কুনো ব্যাঙ আর কোলা ব্যাঙ-এর সানন্দ চিৎকার বেকার বান্ধব সমিতির আবহাওয়াকে আরও ভারি করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খেদ' পাঠভেদের পুনর্বিচার

আদিত্য ওহদেদার

'প্রকৃতির খেদ' রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার [illegible]য়, এবং কবির কাব্যরচনা-প্রকাশের [illegible]পর্ব-ভুক্ত। এযাবৎ যা জানা গেছে, তাতে [illegible] কবির সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা হল ১৮৭৪ খৃস্টাব্দ নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'অভিলাষ' শীর্ষক কবিতা যা বিনা নামে এবং 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত' এই আখ্যা সমেত ছাপা হয়। এর পরের প্রকাশিত কবিতা হল ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় বিধৃত 'হিন্দু মেলার উপহার'; এটি স্বনামে ছাপা হয়। এর পরবর্তী প্রকাশিত কবিতা হল 'প্রকৃতির খেদ' যা ঐ বছরেই ছাপা হয় বিনা নামে, এবং 'বালকের রচিত' আখ্যাযুক্ত হয়ে।

উপরোক্ত তিনটি কবিতাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু লক্ষণীয়, প্রকৃতির খেদ কবিতার দুটি পাঠ। নিজের লেখা কবি রীতিমত কাটাকুটি করতেন, পরিবর্তন পরিমার্জন করতেন, একথা আমাদের জানা— কবির পরিণত বয়সের রচনায় তার নিদর্শন ভূরিপ্রমাণ আছে। কিন্তু সেই বাল্যকাল থেকেই যে তিনি এমন করতেন তার সাক্ষ্য পেতে গেলে এই কবিতাটিকে স্মরণ করতে হবে

যাই হোক, কবিতাটির পাঠদ্বয়ের মধ্যে একটি হল যা তখনকার 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল-মে ১৮৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, আর অপর পাঠ হল যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শকাব্দ ১৭৯৭ আষাঢ় (জুন-জুলাই ১৮৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রতিবিম্বে প্রকাশিত পাঠকে 'প্রথম পাঠ' ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠকে 'দ্বিতীয় পাঠ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই পাঠক্রম স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হবে, কারণ প্রকাশকালের অনুক্রমে প্রতিবিম্বের পাঠের পর পাই তত্ত্ববোধিনীর পাঠ। এইভাবে দেখলে প্রশ্ন হবে, এই পাঠক্রম সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কোথায়। কিন্তু অবকাশ আছে, এবং সেইজন্যেই তো এই আলোচনার অবতারণা।

।। ২ ।।

শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার ওপর নানাভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনিই প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বিনা নামে প্রকাশিত (প্রতিবিম্ব ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উভয় কাগজেই কবির নাম ছিল না)। প্রকৃতির খেদ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী' পত্রিকার ১৮৭৫, ২৬শে মে তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সভার এক বিবরণে স্পষ্ট মুদ্রিত আছে, 'গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সভা হইয়াছিল। প্রায় একশত গ্রন্থকার ও বিদ্বান ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্য পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর।' এই তথ্যটি প্রবোধচন্দ্রই উদ্ঘাটিত করেন। তার আগে, কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের তা জানবার উপায় ছিল পরোক্ষভাবে—রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রকাশিত 'হিন্দু মেলার উপহার' কবিতাটির সঙ্গে এর আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ ও ভাবগত সাদৃশ্য তুলনা করে এবং বৃদ্ধ বয়সে এই কবিতা সম্পর্কে কবির স্মৃতি ও স্বীকৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ করে : 'আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরের পূর্বেকার কথা' (রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ)।

প্রবোধচন্দ্র তাঁর একটি প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ : ভোরের পাখি, দ্বিতীয় পর্যায় : প্রকৃতির খেদ) প্রকৃতির খেদ কবিতার পাঠভেদ প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে এই কবিতার তিনটি পাঠ, যার মধ্যে দুটি পাঠ পাওয়া গেছে, আর একটি লুপ্ত, আজও অনাবিষ্কৃত। তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে যা অবলম্বন করেছেন তা হল, প্রতিবিম্ব পত্রিকায় যে পৃষ্ঠায় প্রকৃতির খেদ ছাপা হয় তার নীচে সন্নিবেশিত একটি পাদটীকা। পাদটীকাটি হল এই—

"আমাদিগের সম্ভ্রান্ত (ছাপার ভুল লক্ষণীয়) লেখক প্রথমে এই পদ্যটির কাপি যেরূপ প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত করিয়া দেন। গত রবিবার 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সভায় কতিপয় মান্য বন্ধুর অনুরোধে রচয়িতাকে সাধারণ সম্মুখে এই কবিতাটি পাঠ করিতে হয়। লেখকের সংশোধিত পদ্যটি তৎকালে আমাদের নিকট থাকায় অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্ধাংশমাত্র মুদ্রিত করিয়া 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সভায় প্রদান করা হয়। এজন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুদ্রিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে।"

উক্ত পাদটীকা নির্ভর করে প্রবোধচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন যে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি তিনবার ছাপা হয় এবং প্রত্যেক পাঠেই কিছু কিছু ভেদ থাকায় কবিতাটির তিনটি পাঠভেদ। তাঁর মতে, কবিতাটির প্রথম মুদ্রিত রূপ ও পাঠ হল বিদ্বজ্জন-সমাগম সভায় পঠিত ও বিতরিত অংশ, দ্বিতীয় মুদ্রিত রূপ তথা পাঠ হল যা প্রতিবিম্বে প্রকাশিত হয়; আর তৃতীয় মুদ্রিত রূপ ও পাঠ হল যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপা হয়। এদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র মনে করেন, কবিতাটির প্রথম পাঠ, অর্থাৎ যা বিদ্বজ্জন-সমাগম সভায় পঠিত ও বিতরিত হয় তা আজ অবলুপ্ত।

।। ৩ ।।

প্রবোধচন্দ্র কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন জোরালো যুক্তি দেখাতে পারেন নি। তিনটি পাঠভেদের পর্যায়ক্রম নির্ণয় করতে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন একটি মাত্র অনুচ্ছেদে। অনুচ্ছেদটি এই—

'এক দিকে বিদ্বজ্জন-সমাগমের আসন্ন অধিবেশন আর অন্য দিকে প্রতিবিম্বের আসন্ন প্রকাশ, এই উভয় তাগিদেই 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি রচিত হয়। কবিতাটির দুই পর্যায় (ভাব পর্যায়) রচিত হবার পরেই ওটি দীর্ঘতর রচনার প্রথম কিস্তি হিসাবে প্রতিবিম্ব পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য প্রেরিত হয়। তার পর কবি 'এই পদ্যটির যেরূপ কপি প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত করিয়া দেন।' ইতিমধ্যে বিদ্বজ্জন-সমাগমের জন্য কবিতাটি মুদ্রণের প্রয়োজন হওয়ায় এবং লেখকের কাছে সংশোধিত কপি না থাকায় 'অসংশোধিত কপিখানি দেখিয়া অর্ধাংশ মাত্র মুদ্রিত করিয়া বিদ্বজ্জন-সমাগম সভায় প্রদান করা হয়। এই জন্য সভার জন্য মুদ্রিত পাঠ ও

প্রতিবিম্বে মুদ্রিত পাঠ, এই উভয় পাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত' হইয়াছিল। অতঃপর কবিতাটির পূর্বে সংকল্পিত শেষাংশ রচনায় অভিপ্রায় কবি ত্যাগ করেন এবং প্রতিবিম্বে প্রকাশিত পর্যায় দুটিতে আরও পরিমার্জিত করার প্রয়োজনবোধ করেন। এই পরিমার্জিত রূপটি পরে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৭৫ শক ১৭৯৭ আষাঢ়)। এই দুই পাঠের মধ্যেও স্থানে স্থানে প্রভেদ লক্ষিত হয়।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি তিনবার মুদ্রিত হয়েছিল। প্রতিবিম্ব ও তত্ত্ববোধিনীর দুটি পাঠ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথম মুদ্রিত পাঠ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।'

উপরোক্ত বক্তব্য সবটাই অনুমান-নির্ভর এবং আপ্তবাক্যতুল্য। প্রকৃতির খেদ কবিতাটি রচনার যে 'উভয় তাগিদে'র কথা বলা হয়েছে তা যথার্থ কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। এমনও তো বলতে পারি যে, বালক কবি আপন প্রেরণায় কোন এক সময় কবিতাটি লিখে থাকবেন, পরে প্রতিবিম্ব পত্রিকায় ও বিম্বজ্জন-সমাগম সভায় কবিতাটি মুদ্রিত ও পাঠ করার সুযোগ পান। অবশ্য আমাদের আসল লক্ষ্যবস্তু অন্য। প্রবোধচন্দ্র ওই যে বলেছেন, প্রতিবিম্বে প্রকাশিত পাঠটি 'আরও পরিমার্জিত' করার প্রয়োজন বোধ করেন কবি এবং এই পরিমার্জিত রূপটি পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—এই উক্তিটিই আমাদের আসল লক্ষ্যবস্তু। প্রবোধচন্দ্রের এই উক্তি অনুযায়ী দাঁড়ায়, তত্ত্ববোধিনীর পাঠ প্রতিবিম্বের পাঠের 'পরিমার্জিত' রূপ। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর পাঠে পরিমার্জনার চিহ্ন কোথায় এবং কতটুকু তার কোন হদিশ প্রবোধচন্দ্র দেন নি। তিনি এই কবিতার পাঠদ্বয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেন নি, এবং বালক রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যচর্চা তথা মানস-বিবর্তনের ধারা এই পাঠভেদের সঙ্গে জড়িত সে বিষয়েও যথোপযুক্ত ধ্যান দেন নি। অথচ একটু অবহিত হলে তিনি নিশ্চয় নিজেই ধরতে পারতেন যে, তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত পাঠ প্রতিবিম্বে প্রকাশিত পাঠের পরিমার্জিত রূপ নয়। আসলে প্রতিবিম্বের পাঠই তত্ত্ববোধিনীর পাঠের পরিমার্জিত রূপ বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

॥ ৪ ॥

আগেই বলেছি, যেহেতু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সংখ্যায় প্রকৃতির খেদ ছাপা হয় তার তারিখ ১৮৭৫ জুন-জুলাই এবং প্রতিবিম্বের যে সংখ্যায় তা ছাপা হয় তার তারিখ ১৮৭৫ এপ্রিল-মে, সেই হেতু সহজে মনে হয় যে তত্ত্ববোধিনীর পাঠ প্রতিবিম্বের পাঠের পরবর্তী প্রবোধচন্দ্র চোখ বুজে এই সহজ সিদ্ধান্তটি করেছেন। কোনো বিশেষ কারণে যে এর উল্টোটাও ঘটতে পারে এমন কথা তাঁর মনে স্পষ্টতই স্থান পায় নি।

আমাদের মতে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠই হল প্রকৃতির খেদ কবিতাটির প্রথম পাঠ, এবং এই পাঠেরই অর্ধাংশ বিম্বজ্জন-সমাগম সভার জন্য মুদ্রিত ও তথায় পঠিত হয়। প্রতিবিম্বে যে পাঠ মুদ্রিত হয়েছে, তা হল তত্ত্ববোধিনীর পাঠের সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ। সুতরাং প্রতিবিম্বে যে পাঠ পাই তা হল প্রকৃতির খেদ কবিতার দ্বিতীয় পাঠ।

সামান্য সতর্ক হয়ে পাঠ করলেই ধরা পড়ে যে তত্ত্ববোধিনীর পাঠ প্রতিবিম্বের পাঠের চেয়ে নিকৃষ্ট। প্রতিবিম্বের পাঠ 'আরও পরিমার্জিত করার প্রয়োজনবোধে' (প্রবোধচন্দ্র যা বলেছেন) যদি তত্ত্ববোধিনীর পাঠ রচিত হত তাহলে সে পরিমার্জনার ফলে তত্ত্ববোধিনীর পাঠে রচনাগত ভাব ও শৈলীর কিছু উন্নতি দেখা যেত। প্রবোধচন্দ্র তত্ত্ববোধিনীর পাঠে কতখানি পরিমার্জনার চিহ্ন আছে তার কোনো আলোচনা করেন নি। এমন কি আভাস-ইঙ্গিতও দেন নি। শুধু প্রবন্ধ শেষে কবিতা দুটির মুদ্রিত রূপ ও পাঠান্তর দেখিয়েছেন। অথচ পরিমার্জনার যা-কিছু চিহ্ন তা রয়েছে প্রতিবিম্বের পাঠেই। উদাহরণে একথা স্পষ্ট হবে।

তত্ত্ববোধিনীর পাঠের প্রথম কয়েক লাইন তুলে ধরছি—

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায়রে।
প্রদীপ্ত তুষার রাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে।।
ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে।
নির্ঝরের একাধারে, দুলিছে তরঙ্গ-ভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাতে পবনে।।

এই লাইনক'টি প্রতিবিম্বের পাঠে পরিবর্তিত হয়ে যা দাঁড়িয়েছে তা হল—

১

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা,
বিধির মানস-বালা,
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে :
প্রদীপ্ত তুষার রাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি উরসে।

২

অদূরেতে দেখা যায়
উজল রজত কায়,
গোমুখী হইতে গঙ্গা ওই বহে যায়।
ঢালিয়া পবিত্র ধারা
ভূমি করি উরবরা,
চঞ্চল চরণে সতী সিন্ধুপানে ধায়।।

৩

ফুটেছে কনক-পদ্ম অরুণ কিরণে।
অমল সরসী পরে,
কমল, তরঙ্গ ভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে।।

উদ্ধৃত দুটি পাঠ পড়লে স্পষ্টই বো
গম্য হয় যে তত্ত্ববোধিনীর পাঠ হেমচন্দ্রের আদর্শে রচিত—ছন্দোবন্ধ এবং ভাব 'অমল সলিলা গঙ্গা অই বয়ে যায়' এই পয়ার মাত্রার চরণ হেমচন্দ্রের 'আ গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' চরণটি স্ম করিয়ে দেয়। কিন্তু প্রতিবিম্ব পত্রি প্রকাশিত রূপটি দেখলেই বুঝতে পা এটি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এ আদর্শে রচিত—সারদামঙ্গলেরই মতো এ পংক্তিবিন্যাস, ছন্দোবন্ধ এবং ভাষা। বর্ণ চিত্রে কল্পনার প্রসার ও আবেদন প্রতি বিম্বের পাঠে অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী। এ সাফল্য যে বালক কবি 'সারদামঙ্গল' অনু সরণ করে প্রাপ্ত হয়েছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এখন প্রশ্ন, বালক কবি কি প্রথমে বিহারীলালকে অনুসরণ করে, পরে তাঁর রচনার পরিমার্জনা করেন হেমচন্দ্রের আদর্শে? বিহারীলাল তাঁর সারদামঙ্গলে বাংলা কাব্যের একটা নতুন বাণীরূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন যা ইতিপূর্বে অন্য কারো রচনায় দেখা যায় নি। বালক কবি নিজের রচনা পরিবর্তন করতে গিয়ে নতুনকে ছেড়ে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরবেন, একথা কেমন করে মানি! বিশেষ করে, যখন জানি যে, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার অভিব্যক্তি হল হেমচন্দ্রের আদর্শ থেকে বিহারীলালের আদর্শে উত্তরণ। তাছাড়া তত্ত্ববোধিনীর পাঠ যে প্রতিবিম্বের পাঠের পূর্ববর্তী তার একটা সহজ প্রমাণ হল এই যে, তত্ত্ববোধিনীর পাঠে একটা ছন্দ-প্রমাদ আছে।

ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে।
নির্ঝরের এক ধারে, দুলিছে তরঙ্গভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে।।

স্পষ্টই দেখছি, প্রথম চরণে শেষ চরণ অপেক্ষা এক মাত্রা বেশী আছে ফলে ছন্দপতনদোষ ঘটেছে। প্রতিবিম্বের পাঠে কোন ছন্দত্রুটি নেই। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাতেই যে প্রখর ছন্দবোধের পরিচয় পাই, তাতে এটা নিশ্চয়ই অভাবনীয় বোধ হবে যে, তিনি নিজের রচনার সংস্কার করতে গিয়ে নির্দোষ ছন্দকে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলবেন।

প্রবোধচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন 'প্রকৃতির খেদ কবিতাটির ছন্দোবন্ধ ও ছন্দগঠন যে সারদামঙ্গল কাব্যের অনুবর্তী তা প্রতিবিম্ব পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রই প্রতীয়মান হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত সংস্করণটি থেকে তা হয় না। কারণ, প্রথমতঃ এই সংস্করণে সারদামঙ্গলের পংক্তিবিন্যাস-পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি, দ্বিতীয়তঃ সমগ্র কবিতাটির স্তবকবিভাগ তুলে দিয়ে এটিকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। বোধ করি স্থানসংক্ষেপের জন্যই এই দুই উপায় অবলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে প্রকৃতির খেদ কবিতাটির মূল রূপটাই প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।'

তত্ত্ববোধিনীর পাঠ যে বাহ্যরূপে ...মাত্র সারদামঙ্গলের সঙ্গে মেলে না, ...কথা প্রবোধচন্দ্র স্বীকার করেছেন: কিন্তু যেহেতু তাঁর ধারণায় তত্ত্ববোধিনীর পাঠ প্রতিবিম্বের পাঠের পরিমার্জিত রূপ, অতএব তিনি আর কোনো কারণ অনুমান করতে পেরে কাগজের 'স্থানাভাব'কে দায়ী করেছেন তত্ত্ববোধিনীর পাঠ সারদামঙ্গলের বাহ্যরূপ না পাবার জন্যে।

কিন্তু 'স্থান সংক্ষেপের' কারণটি একটি বেসামাল সিদ্ধান্তের ততোধিক বেসামাল যুক্তি। অল্পদিন আগে ঐ তত্ত্ববোধিনী কাগজেই বালক কবির একশ' ছাপান্ন চরণের সুদীর্ঘ 'অভিলাষ' কবিতাটি ছাপা হয়েছিল-যাতে উনচল্লিশটি চতুষ্পদী স্তবক ছিল এবং প্রতি স্তবকের শীর্ষে ক্রমিক সংখ্যা মুদ্রিত ছিল। সে-কবিতা ছাপার সময় যদি স্থান সংক্ষেপে প্রশ্ন না এসে থাকে তাহলে প্রকৃতির খেদ ছাপতে গিয়ে কবিতাটির মূল রূপটাই প্রচ্ছন্ন করা হবে এমন স্থান সংক্ষেপের কারণ কেন ঘটেছিল সে-তথ্য বা তার কোনো সম্ভাব্য অনুমান না দিলে স্থান সংক্ষেপের যুক্তি উত্থাপনই করা চলে না।

॥ ৫ ॥

আগেই বলেছি, আমাদের মতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রকৃতির খেদ কবিতার রূপ হল কবিতাটির প্রথম পাঠ। এই কবিতাও 'হিন্দুমেলার উপহারে'র মতো স্বাদেশিকতা-ভাবের প্রেরণায় রচিত। বিষয়বস্তু সেই একই—পরাধীন ভারতের জন্য বিলাপ। এই বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গি তখনকার লোকপ্রিয় কবি হেমচন্দ্র তথা নবীনচন্দ্র-প্রদর্শিত রীতি অবলম্বন করেছে। হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ' কিম্বা 'পদ্মের মৃণাল' এবং নবীনচন্দ্রের 'সায়ংচিন্তা' কবিতায় প্রকৃতির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে কবি-চিত্ত যেভাবে স্বদেশ-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তারই প্রকাশ উচ্ছ্বসিত হয়েছে। প্রকৃতির খেদ কবিতায় দেশের প্রকৃতি স্বয়ং দেশের দুর্দশায় খেদ প্রকাশ করছে। মনে হয় বালক কবি প্রথম যখন কবিতাটি লেখেন, তখন হেমচন্দ্রের পদ্মের মৃণাল কবিতাটি মুখ্যরূপে তাঁর মনের মধ্যে কাজ করে থাকবে। ফলে ঐ কবিতার শৈলী তিনি গ্রহণ করেছেন। যেমন পদ্মের মৃণালে তেমনি প্রকৃতির খেদে, প্রথমে আছে প্রকৃতির বর্ণনা, পরে পরাধীন ভারতের জন্যে বিলাপ। ছন্দের অনুকৃতিও লক্ষণীয়। কয়েকটি চরণ বাদে প্রকৃতির খেদের সবটাই হেমচন্দ্রের অনুকরণে ত্রিপদী ও পয়ারের মিশ্রণে রচিত। তবে হেমচন্দ্রের পদ্মের মৃণাল স্তবকে বিভক্ত এবং ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত। সম্ভবত, বালক রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় নিজের কবিতায় স্তবক বিভাগ করেন নি, এবং পংক্তিবিন্যাস যেভাবে তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয় সেভাবে তিনি নিজেই করেছিলেন। তাঁর কাছে তখন হয়ত এটাই নতুনত্ব ছিল।

প্রতিবিম্ব পত্রিকায় যখন প্রকৃতির খেদ কবিতাটি প্রথম যায়, তখন তাঁর রূপ ছিল যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে পাই। কিন্তু এর প্রুফ যখন বালক কবির কাছে এল তখন তাঁর মন সারদামঙ্গল কাব্যের মোহে আচ্ছন্ন, এমন অনুমান করা চলে। কয়েক মাস আগে আর্যদর্শন পত্রিকায় সারদামঙ্গল কিস্তিতে কিস্তিতে বেরিয়েছে। 'জীবনস্মৃতি' পাঠে জানতে পারি যে, কবির তখনকার সাহিত্যের সঙ্গী 'বউঠাকুরাণী' এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল।' এমন আবহাওয়ায় সারদামঙ্গলের প্রভাব বালক কবির ওপর পড়বে সহজেই অনুমেয়। এরই ফলে প্রতিবিম্ব পত্রিকা থেকে প্রকৃতির খেদ কবিতার যখন প্রুফ এল, কবি তাতে বেশ কিছু রদ-বদল করলেন। কবিতাটির অঙ্গসৌষ্ঠব সারদামঙ্গলের অনুরূপ হয়ে উঠল। আট মাত্রা ও চোদ্দ মাত্রার চরণ মিলিয়ে সেই একই পংক্তিবিন্যাস ও স্তবক গঠন।

বহিরঙ্গের এই পরিবর্তনেই প্রকৃতির খেদ সারদামঙ্গলের কাছাকাছি উত্তীর্ণ হল। তারপর প্রথম কয়েকটি লাইনকে বেশ খানিক ভেঙেচুরে ও প্রসারিত করে সারদামঙ্গলের অনুরূপ একটা ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন বালক কবি। এই ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টির পক্ষে সারদামঙ্গলে 'মানস' কথাটির ঘুরে-ফিরে ব্যবহার খুবই ব্যঞ্জনাময়। বালক কবির মনে এই ব্যঞ্জনার অনুরণন ওতপ্রোত হয়ে ওঠে বলেই তিনিও তাঁর রচনা পরিমার্জনা করতে গিয়ে 'মানস' কথাটি নতুনভাবে একাধিক স্থানে বসালেন। আরও কিছু কিছু শব্দ এমন এল যা বিহারীলাল ব্যবহৃত শব্দেরই প্রতিধ্বনি। আর যা বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হল বানানের আধুনিক রূপদান। যেমন,

'অই'-এর স্থলে 'ওই', য-ফলাযুক্ত ক্রিয়ার য-ফলা তুলে দেওয়া, যেমন রয়্যে, কর্যে-কে করা হল রয়ে করে ইত্যাদি। তবে সব ক্ষেত্রে ক্রিয়ার য-ফলা-কর্তন ঘটেনি। শেষের কয়েক স্থানে রয়্যে, কর্যে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তাছাড়া আরো অনেক পরিমার্জনা করা হল, যা প্রতিবিম্বের পাঠ অনুধাবন করলে ধরা পড়ে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

তত্ত্ববোধিনীর পাঠে আছে—

তাহলে ভারত তোরে, সৃজিতাম মরু করো
তরু-লতা-জনশূন্য প্রান্তর ভীষণ।
প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলনা।।'
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষণ
গলিল তুষারমালা, তরুণী সরসী-বালা
ফেলিল নীহার-বিন্দু নির্ঝরিণী-জলে।
কাঁপিল পাদপ-দল, উথলে গঙ্গার জল
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে।।

প্রতিবিম্বের পাঠে আছে—

৮

তাহলে ভারত! তোরে,
সৃজিতাম মরু করে,
তরুলতা-জনশূন্য প্রান্ত ভীষণ;
প্রজ্বলন্ত দিবাকর,
বর্ষিত জ্বলন্ত কর,
মরীচিকা পান্থদের করিত ছলন!"
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষণ।।

৯

গলিল তুষার মালা,
তরুণী সরসী বালা,
ফেলিল নীহার-নীর সরসীর জলে।
কাঁপিল পাদপ-দল;
উথলে গঙ্গার জল,
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটিল ভূতলে।।

স্পষ্টই দেখছি, তত্ত্ববোধিনীর পাঠে একটি ত্রুটিপূর্ণ মিল রয়েছে (দ্বিতীয় চরণের শেষে ভীষণ, চতুর্থ চরণের শেষে ছলনা)। এই ত্রুটি প্রতিবিম্বের পাঠে নেই। তারপর, প্রতিবিম্বের পাঠে যতিচিহ্নের উন্নততর ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। 'ফেলিল নীহার-বিন্দু নির্ঝরিণী-জলে' (তত্ত্ববোধিনীর পাঠ) অপেক্ষা 'ফেনিল নীহার-নীর সরসীর জলে' (প্রতিবিম্বের পাঠ) মার্জিততর—অনুপ্রাসের ব্যবহারে ও সারদামঙ্গল-অনুসৃত শব্দচয়নে। এইরকম দৃষ্টান্ত একাধিক আরো দেওয়া চলে।

প্রতিবিম্ব পত্রিকায় 'প্রকৃতির খেদ' মুদ্রিত হয়েছে 'ক্রমশ' দিয়ে। প্রবোধচন্দ্রের অনুমানে বালক রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি রচনা করেন, তখনই তাঁর ইচ্ছা ছিল বৃহৎ আকারের কবিতাটি লিখবার, তাই 'ক্রমশ' যুক্ত হয়ে ছাপা হয়। পরে সে-ইচ্ছা তিরোহিত হয়, এবং সে-কারণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাঠে 'ক্রমশ' দেওয়া হয় নি। কিন্তু আমাদের অনুমানে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে পাঠ পাই সেই পাঠই পরিমার্জিত করার কালে বালক কবির মন যেহেতু সারদামঙ্গলের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, সেই কারণে তাঁর কবিতাকে সারদামঙ্গলের মতো বৃহৎ আকারও দিতে ইচ্ছুক হন। তাছাড়া, ভাব-সম্প্রসারণের দিক দিয়ে সুবিধাও ছিল। সারদামঙ্গলে যেমন সরস্বতীর ত্রিবিধ রূপ-কল্পনা ও বন্দনা আছে, প্রকৃতির খেদ কবিতাতেও বালক রবীন্দ্রনাথ হয়ত চেয়েছিলেন ভারতের ত্রিবিধ দশা, অর্থাৎ তার পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করতে। বর্তমান পাঠে হিন্দু যুগ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, মুসলমান-অধিকৃত ও ইংরেজ-পদানত ভারতের দুর্দশা বর্ণনার ইচ্ছা স্মরণে রেখেই বালক কবি প্রুফ দেখার সময় 'ক্রমশ' যুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন। কিন্তু ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়নি, কারণ, তা করতে গেলে সারদামঙ্গল-মুগ্ধ কবিকে সারদামঙ্গলের গীতিসৌন্দর্য অনুসরণ করতে হত। অথচ বালক কবির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, কারণ বছর কুড়ি পরে কবি নিজেই লেখেন, 'সারদামঙ্গলের গীতি-সৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।' (বিহারীলাল, আধুনিক সাহিত্য)

।। ৬ ।।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সঙ্গে বাহ্য প্রমাণও যথেষ্ট প্রবল তত্ত্ববোধিনীর পাঠকে পূর্বগামী বলে চিহ্নিত করার পক্ষে। প্রতিবিম্ব পত্রিকায় মুদ্রিত পাদটীকা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, প্রকৃতির খেদ কবিতার 'অসংশোধিত কাপি' দেখে তার অর্ধাংশ ছাপা হয় বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার জন্যে। সুতরাং এই অর্ধাংশ কতখানি তার পরিমাপ হওয়া উচিত অসংশোধিত কপির পাঠ থেকে। প্রতিবিম্বের পাঠ তো সংশোধিত কপির পাঠ, সুতরাং সে-পাঠ থেকে অর্ধাংশ ছাপা উচিত হবে না। অথচ প্রবোধচন্দ্র তাই করেছেন। তিনি যেহেতু ধরে নিয়েছেন যে, তত্ত্ববোধিনীর পাঠ তৃতীয় মুদ্রিত রূপ বা পাঠ এবং প্রতিবিম্বের পাঠের পরিমার্জিত রূপ, অতএব এই পাঠের দিকে তিনি আর দৃকপাত করেননি। তিনি বলেছেন, 'প্রতিবিম্বে মুদ্রিত কবিতাটির দুটি ভাবপর্যায় সুস্পষ্ট। প্রথম ভাবপর্যায়টি শেষ হয়েছে ষোলো-সংখ্যক স্তবকের শেষে। এই ষোলো-স্তবকের লাইন-সংখ্যা একশো। তার পরেই সপ্তদশ স্তবকে ধুয়াটির প্রথম আবির্ভাব। অতএব এই অনুমান প্রায় অনিবার্য যে, প্রথম ষোলো স্তবকের একশো লাইন এবং সতেরো সংখ্যক স্তবকের এগারো লাইন, কবিতাটির এই অংশটুকু মুদ্রিত হয়ে বিদ্বজ্জন-সভায় বিতরিত হয়েছিল। এই সতেরো স্তবকেই কবিতাটির একটি ভাবপর্যায়ের সমাপ্তি। আয়তনের দিক থেকেও এই অংশটুকু মোটামুটি কবিতাটির প্রায় অর্ধাংশ। কবিতাটির অর্ধাংশমাত্র মুদ্রিত হয়েছিল। প্রতিবিম্ব সম্পাদকের এই উক্তির সঙ্গে উক্ত সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধ নেই।' বিরোধ কিঞ্চিৎ আছে বৈকি। অর্ধাংশ ছাপতে গেলে অসংশোধিত কপির পাঠটি জানতে হবে। আমরা বলেছি, তত্ত্ববোধিনীর পাঠই হল সেই অসংশোধিত কপির পাঠ, অর্থাৎ আদি পাঠ। এই পাঠেও প্রকৃতির খেদ কবিতাটির দুটি ভাবপর্যায় সুস্পষ্ট, এবং কবিতাটি যেভাবে মুদ্রিত হয়েছে, তাতে দেখি এতে আছে মোট একশ' চল্লিশ লাইন আর এরই উনসত্তর লাইনে প্রবোধচন্দ্র-কথিত কবিতাটির প্রথম ভাবপর্যায় (ধুয়া সমেত) সমাপ্ত। অন্যপক্ষে প্রতিবিম্বে কবিতাটি যেভাবে ছাপা হয়েছে, তাতে দেখি এতে আছে দুশ' এগারো লাইন, এবং তারই একশ' এগারো লাইনে প্রথম ভাবপর্যায়টি (ধুয়া সমেত) সমাপ্ত। হিসেব কষলে, বলতে হয়, তত্ত্ববোধিনীর পাঠেরই যথার্থ অর্ধাংশে কবিতাটির প্রথম ভাবপর্যায় সমাপ্ত, এবং প্রতিবিম্ব-সম্পাদকের উক্তিকে সাক্ষ্য রেখে বলতে পারি, এই অর্ধাংশই বিদ্বজ্জন সভার জন্য মুদ্রিত হয়।

।। ৭ ।।

এতক্ষণ প্রকৃতির খেদ কবিতাটির দুটি পাঠ সম্পর্কে তাদের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ পরিচয় অবলম্বনে যে আলোচনা করা গেল, তাতে আশা করি এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রকৃতির খেদ কবিতাটির প্রথম পাঠ মুদ্রিত হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, এবং তার দ্বিতীয় পাঠ মুদ্রিত হয়েছে প্রতিবিম্ব পত্রিকায়। বিদ্বজ্জন-সমাগম সভায় প্রথম পাঠের অর্ধাংশ পঠিত হবার পর কবিতাটির সবটাই 'বালকের রচিত' বলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মুদ্রিত করে, যদিও তার সামান্য কিছু দিন আগে এর সংশোধিত পাঠ প্রতিবিম্ব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সন্তোষকুমার ঘোষ

শেষ নমস্কার

স্পর্শ দিয়ে স্মৃতি নিয়ে
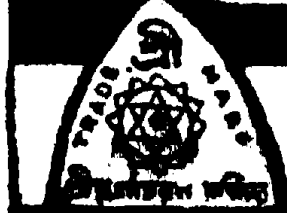
একালের তিনজন কথাসাহিত্যিকের অভ্যুদয় এবং বিকাশের মধ্যে অনেক মিল আছে। এ'রা তিনজনেই মফঃস্বল থেকে কলকাতায় এসেছেন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে। অতি অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য রচনায় আগ্রহী এবং কলিকাতার কর্মকেন্দ্রে এসে তাদের সাহিত্যজীবন বিকশিত হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণতায়—অথচ এ'রা তিনজনেই স্বতন্ত্র, চিন্তায়, আঙ্গিকে ও রচনারীতির বৈশিষ্ট্যে পৃথক। তথাপি কোথায় যেন একটা মিল থেকে গেছে। এই ঐক্য মানসিকতার ঐক্য—এ'রা তিনজনেই মানবদরদী শিল্পী। মধ্যবিত্ত জীবনের সীমিত পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, চার দিকে ছিল নানা বাধা ও বিপত্তি, সেই সব অতিক্রম করে এ'রা অনায়াসভঙ্গীতে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। জীবনকে এ'কেছেন একেবারে সামনে বসিয়ে আর সেই কারণেই এই তিন লেখকের রচনার মধ্যে বাস্তবধর্মিতা এক অপরূপ রূপে প্রকাশিত। এ'দের নাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সন্তোষকুমার ঘোষ।

এই তিনজনের মধ্যে আবার সংখ্যায় কম লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। সন্তোষকুমার কিন্তু সেই ১৯৩৬-এ যখন বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র তখন থেকেই গল্প ও উপন্যাস লিখছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে, সেদিনের সন্তোষকুমার তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বিশিষ্ট কথাকারদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছেন। মনে আছে তাঁর একটি গল্প আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সেই কালে প্রকাশিত হয়ে প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল। সে যুগে একজন কলেজের ছাত্র ও অজ্ঞাত-পরিচয় নতুন লেখকের পক্ষে এ এক অসামান্য সম্মান।

সন্তোষকুমার বিশেষ যত্ন নিয়ে লেখেন। তাঁর রচনার সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হল তাঁর আঙ্গিক। যে আঙ্গিকে তিনি গল্প বা উপন্যাস রচনা করেন এমন কি প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন তার অনুকরণ চোখে পড়ে নি, এদিক থেকেও তিনি এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সন্তোষকুমার 'কিনু গোয়ালার গলি' সম্ভবত কোন মাসিক পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, (ঠিক স্মরণে নেই), তারপর ১৯৫০-এ যখন লেখকের ত্রিশ বছর বয়স তখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন এই উপন্যাসটি বিদগ্ধসমাজে যথেষ্ট আলোচিত হয়। দুটি নবীন প্রাণ ইন্দ্রজিৎ আর নীলা পঁচিশ টাকার ভিত্তিতে জীবনটাকে নতুন করে গড়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। জীবনসংগ্রামের মুখে তারা এক অতি আশ্চর্য হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার নাম মনোবল। এর দু বছর পরে নানা রঙের দিন' আর তারও দু বছর পরে 'মোমের পুতুল'। 'নানা রঙের দিন' একটি পরিবারের কাহিনী—জাতীয় আন্দোলনের মধ্যাহ্নকালের কাহিনী। রাজনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক — মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের তিনটি মুখ্য দিক। একটি অবোধ কিশোরমানসে যে সব ঘটনাপ্রবাহের ছাপ পড়েছিল 'নানা রঙে দিন' তারই ইতিহাস। ১৯২৭—৩৩ খৃস্টাব্দের বাংলাদেশের জীবন-এর মধ্যে প্রতিফলিত—লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, লেখকের জীবনের সাত থেকে তের বছর পর্যন্ত সমকালীন ঘটনাস্রোত এই কালটিতে পরিব্যাপ্ত। শুভাশিসের মধ্যে একটি বালক কিশোর ধরা দেয়। ধরা পড়ে একটি বাপ-মার চরিত্র। এর সাত বছর পরে প্রকাশিত 'মুখের রেখা' উপন্যাসে লেখকের বক্তব্য আরো স্পষ্ট। এতকাল যা ছিল বিমূর্ত, বিক্ষিপ্ত চিন্তার অভিব্যক্তি 'মুখের রেখায়' তা একটা আকার নিয়েছে। লেখক ভূমিকায় বলেছেন—এ উপন্যাস ঘটনাপ্রধান নয় ভাবনাপ্রধান। আর বলেছেন, এই গ্রন্থের সব কথা নায়কের, এই ভূমিকামাত্র লেখকের। এই উপন্যাসে নায়কের ক্রমবিকাশ ঘটেছে টুলু-থেকে-গোর এবং অবশেষে সৌরেশ। এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে জীবন-প্রভাত, জীবনমধ্যাহ্ন ও জীবনসন্ধ্যার। এক জনমে জন্ম-জন্মান্তর ঘটে বার বার, 'মুখের রেখা' তারই এক জলরঙের আঁকা ছবি। আত্ম-সন্ধানী নায়ক জীবনের সত্যের সন্ধান করছেন—'যেদিন তুমি অগ্নিবেশে সব কিছু মোর নিলে এসে/সেদিন আমি পূর্ণ হলেম, ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব/দুঃখ-সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ।।' কবির এই কথাগুলি যেন শুভাশিসের মনের কথা। শুভাশিস আর বিভারা কি সন্তোষকুমারের এই শৃঙ্খলাবদ্ধ উপন্যাসগুলিতে বার বার এসে ধরা দেয় নি—অন্য নামে অথচ অন্যরূপে নয়?
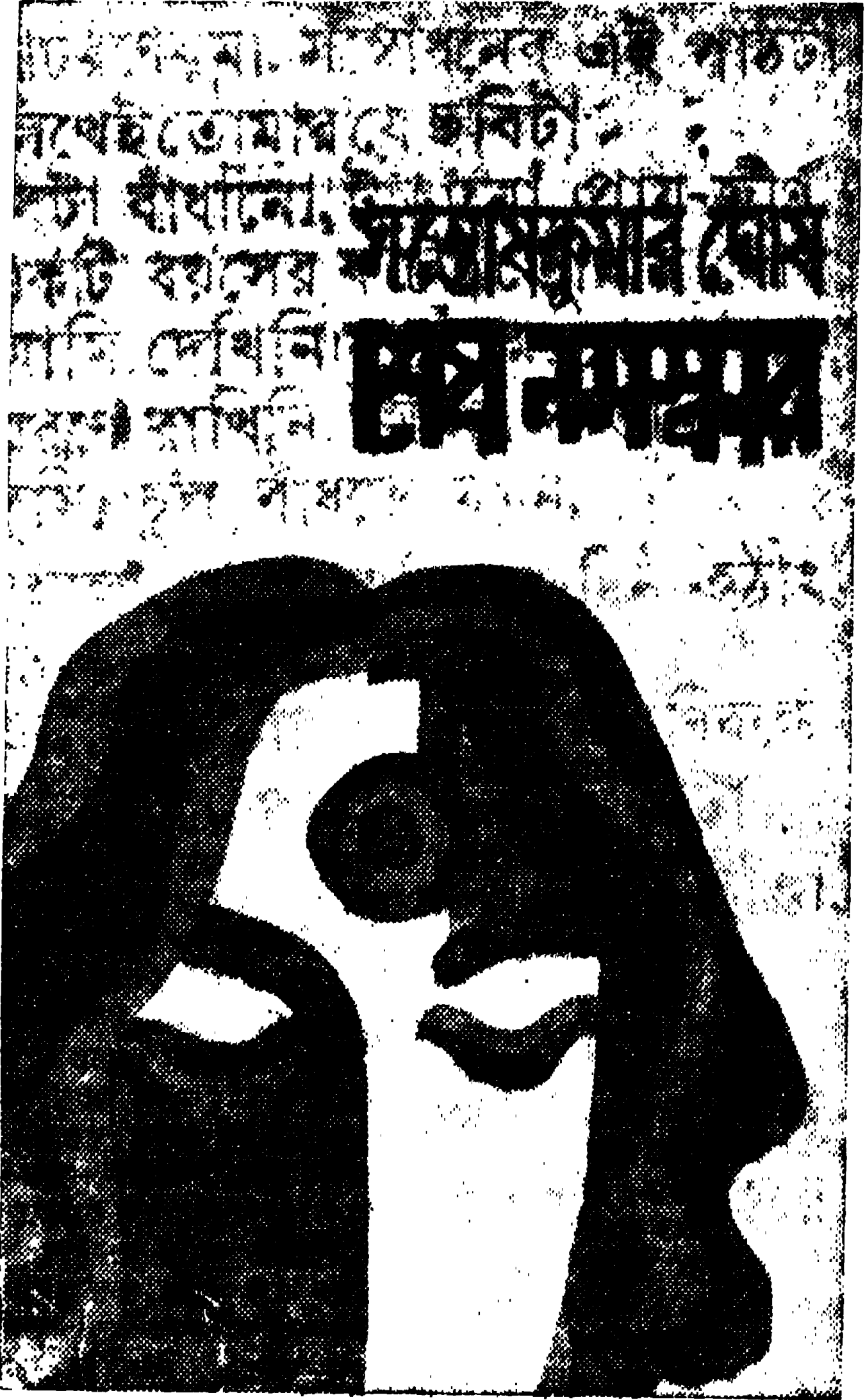
এর পর ১৯৬৭তে লেখক লিখেছেন 'জল দাও'। এই উপন্যাস একটি চতুর্দশপদী সনেটের মত সংহত। এই কাহিনীর-নায়কের

স্বীকারোক্তি 'সে ক্রুশবিদ্ধ আমারই মানব-সত্তা। ছোট ছোট পেরেক ঠুকে আমি আমাকেই মেরেছি।' প্রতি নিমেষের আত্ম-হননের এক ক্লান্তিকর ট্রাজেডির বিষণ্ণ ছবি। ব্যর্থতা ও আত্মগ্লানিতে ভরা মন নিয়ে আমরা সবাই ভাবি 'শিখতে শিখতে একটা জীবন যায়'। এর পর ১৯৬৯-এ লেখক লিখেছেন 'স্বয়ং নায়ক'—এটিও কনফেসন্যাল উপন্যাস। এক অস্থির জীবনের স্বীকারোক্তি। ধারাবাহিক বিবৃতি নয়। টুকরো টুকরো ছবির অংশ, তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা সুস্পষ্ট ছবি পাঠককে গড়ে নিতে হবে। *প্রসঙ্গতঃ বলা যায় বাংলা উপন্যাসে সন্তোষকুমার এই 'মোজাইক' রীতির প্রবর্তক।*

প্রশ্ন উঠতে পারে ধান ভানতে শিবের গীত কেন। সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার' উপন্যাসের আলোচনা লিখতে বসে এত ভণিতা কেন? প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক সন্দেহ নেই, তবে এর জবাবে শুধু এই কথাই নিবেদন করব যে, নিছক প্রাসঙ্গিক-তার প্রয়োজনেই আমাকে এত কথা বলতে হল। 'শেষ নমস্কার' একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস নয়, একথা বলে পাঠককে সতর্ক করা প্রয়োজন। আমাকে এই উপন্যাস একাধিকবার পাঠ করতে হয়েছে এবং লেখকের ভূমিকা থেকে ইঙ্গিত পেয়ে পড়েছি 'নানা রঙের দিন', 'মুখের রেখা', 'জল দাও' ও 'স্বয়ং নায়ক'। 'শেষ নমস্কার' উপন্যাসের গোড়ায় লেখক বলেছেন—'আসলে আমার ধারণা, সব লেখকই সারা জীবন একটা লেখা লিখতে চায়, লিখতে থাকে, ক্রমাগত চেষ্টা করে। আমিও করেছি। পারি নি।' এবং তারপর তিনি উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ করেছেন—তাই যাঁদের এই সব উপন্যাসগুলি পড়া নেই, 'শেষ নমস্কার' পড়ার আগে সেইগুলি পড়া প্রয়োজন। সবগুলি উপন্যাস পড়লে পাওয়া যাবে এক বিস্তীর্ণ পটভূমি, আর সেই পটভূমির ওপর লেখক তাঁর নতুন ছবিটি এঁকেছেন যার নাম—'শেষ নমস্কার/ শ্রীচরণেষু মাকে'। রোগশয্যায় শুয়ে নায়ক তার জননীর কথা স্মরণ করছে স্মরণ করার চেষ্টা করছে তার মার কথা—যে মার মুখে হাসি ছিল না—বিষণ্ণ, গভীর ভীতু-ভীতু মধ্যবিত্ত ঘরের সব মায়েদের ত ঐ একই মূর্তি। তখন আত্মকথনের ভঙ্গীতে যে নায়ক তার কাহিনী বিধৃত করছে তার বয়স কত? বারো-তেরো। সেই সময় তার দাদার মৃত্যু হয়, জীবনে এই প্রথম মৃত্যু। সুধীরমামা এসে বললেন—'ছি আনু, ও রকম করে না, শান্ত হও।' মা ভাঙাগলায় বলেছিলেন—'বলে দাও সুধীরদা, কি রইল আমার, আমি কি নিয়ে থাকবো।' নায়ক এই দৃশ্যের ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে থাকা দর্শক। সুধীরমামা কে? সুধীরমামা ফ্যামিলি ফ্রেন্ড না তারও বেশী। রোজ সকালে আসতেন 'নিশি অবসান হে' গাইতে গাইতে। সুধীরমামা নায়কের দাদাকে ও নায়ককে পড়াতেন। দাদার মৃত্যুর পর খবর পেয়েও বাবা এলেন না। মা অনুযোগ করেন, 'দেখবেই না যদি, তবে সংসার করলে কেন?' শিশু মনে প্রশ্ন জাগে—বাবা কি করে? কোথায় থাকে? মা বলেন—ছি কি করে? কোথায় থাকে? মা বলেন—ছি থাকেন বলতে হয়। উনি দেশের কাজ করেন।'

বাবা যখন ছাড়া পান তখন পালা লেখেন। খাতার পর খাতা বোঝাই পালা লেখেন। এই তাঁর একমাত্র বিলাস। এর জন্য তিনি নলিনীর বাড়ীতে মাতাল সব্যসাচীর হাতে নিগৃহীত হলেন। নায়ক তখন বড়ো হয়েছে। বাবা কিন্তু দাদার মৃত্যুর পর বছর দেড়েকের মধ্যে ঘরে ফেরেন নি। *বাবার নিস্পৃহ নির্লিপ্ততার এ এক পরিচয়। বাবার জন্য মাকে শূন্য শুভ্র এক বিধবার জীবন কাটাতে হয়েছে, তাই নায়ক বাবাকে ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে নি। বাবা এলেন। দেবযানীকে নিয়ে পালা লিখেছেন, মাকে জোর করে শোনান। বাবা ফেরার পর সুধীর-মামা আর আসছিলেন না। সুধীরমামা এড়িয়ে চলছিলেন।*

এর পর বাবা মা-র সঙ্গে যা ব্যবহার করেছিলেন তা অতিনির্মম। নায়ক বলেছে-সেই ভয়ংকর সকালটাকে আজও ভুলি নি। তারপর বাবা নায়ককে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে। নায়কের মনে হচ্ছে সে যেন জানকী, তাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার মন পড়ে আছে সুধীরমামার ওপর। বাবা কিন্তু সচেতন — প্রশ্ন করেন আমাকে কি মনে হয় বদরাগী, খেয়ালী, তাই না? তোকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছি।' তারপর একদিন নায়ক ফিরে এসে ঘন ঘন দরজায় ঘা দিয়ে বলেন—ফিরে এলাম।' বাবা সঙ্গে নেই, মা ঠাস ঠাস করে চড় মারেন পুত্রকে। মার আবার সন্তান হবে, মা বলছেন—দাদা আসছে মা? প্রশ্নের জবাবে মা ঘাড় হেলিয়ে বলেন হ্যাঁ। সুধীরমামা শরীর খারাপের ছুতো করে কাকে এনে পুষছে, মার তাতে রাগ, যেমন রাগ পরে 'নলিনী'র ওপর পড়েছিল, এ রাগ সেই জাতের। কিন্তু এ একটা পর্ব। শ্রীমতীও চলে যায়, সুধীরমামা দুর্বল। তার-পর একদিন পুকুরঘাটে পা পিছলে পড়ে মা ভীষণ আঘাত পেলেন। রক্তাক্ত চাদর। নির্বাক স্তরে উচ্চারণ করল—দাদাও আর আসছে না। এর পর বাবার 'মুন থিয়েটারে' চাকরীর সংবাদ এল। এই মুন থিয়েটারে আসার পিছনে আছে পালা অভিনয় করানোর সখ, যার পরিণতি নলিনীর বাড়ীতে সব্যসাচীর হাতে নিগ্রহ। মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে ছিলেন, মার ছেলেই থাকবি বাবার মতো কখনই না।'

প্রায় ছশো পৃষ্ঠার উপন্যাস—কাহিনীর সুদীর্ঘ অংশ দেওয়া সম্ভব নয়। চিত্র হিসাবে কিছু কিছু অংশমাত্র পরিবেশিত হল। দোষে গুণে আমাদের ঘরে ঘরে এই মাকেই ত আমরা পেয়েছি, এই ত সেই বসু-ন্ধরার মতো সর্বংসহা জননী। জীবনে আশা নেই, আনন্দ নেই, আশ্বাস নেই। ভোলানাথ পিতৃদেব হয় দেশের কাজে নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে। মা নিরুদ্দেশ, শেষ পর্যন্ত আর সইতে পারেন নি—হয়তো আত্মঘাতী। নায়ক মাকে খুঁজে থেকে। তার এই আবিষ্কারের আর নেই—আঘাতে, অভিমানে আর অপমানে হয়ত সেইখানে পেঁৗছেছেন যেখানে আছেন, বাবা আছেন।

কাহিনী অংশ খুবই সরল অনাড়ম্বর, কিন্তু এই কাহিনী কি বাঙ মধ্যবিত্ত ঘরের শতকরা নিরানব্বইটি কাহিনী নয়? সন্তোষকুমার অসা দক্ষতায় সেই সাধারণকে অনন্যসাধারণ ছেন। এই কাহিনী যেখানকার সেই অনেক লেখকেরই পরিচিত, কিন্তু কোনকালে এই বিষয়বস্তুকে ক্যানভ *তোলেন নি,—এখানে রঙের বাহার শুধু কয়েকটি বলিষ্ঠ শাদা ও কালো রেখ ফুটে উঠেছে বাঙালী ঘরের মার প্রতীক রূপ। নায়ক এক সংশয় থেকে আরেক* সংশয়ে পেঁৗছে স্তম্ভিত হয়েছে, বার বার পথ হারিয়েছে, কিন্তু আবার পথ খুঁজে পেয়েছে—মা রয়েছেন অনির্বাণ ধ্রুব তারকার *মতো। 'আমায় ঘিরি আমায় চুমি, কেবল তুমি কেবল তুমি'—এই কথাটাই 'শেষ নমস্কারে'র মর্মবাণী। অথচ এমন একটি কাহিনী কত সহজে ভাবাবেগের বন্যায় ভেসে যেতে পারত—এ ছবি কাঁদে ও কাঁদায়।*

একজন লেখকের ক্রমবিকাশের পথে বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাগুলি সমা-লোচকের নজর রাখা প্রয়োজন। অতি-সতর্কতার সঙ্গে এই স্মরণীয় উপন্যাসটি পড়লে আমার উক্তির সার্থকতা বোঝা যাবে। সুদৃঢ় ভঙ্গীতে বিশ ও ত্রিশের দশকের বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি, অভি-শপ্ত জীবনের ছবি 'শেষ নমস্কার'। লেখক পবিত্র প্রস্তাবনা থেকে কাহিনী শুরু করে-ছেন যখন সব কিছু অপাপবিদ্ধ। যখন প্রজ্ঞা আর প্রেম একাত্ম। যখন মেঘমুক্ত বিস্ময়ভরা দৃষ্টির কাছে সব অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এই কাহিনী সেই মানসিকতার অভিব্যক্তি। এমন কতকগুলি অংশ এই উপন্যাসে আছে যা ঘটনাংশের গভীরতাকে নিখুঁতভাবে উদ্ঘাটিত করে। লেখক এই কালকে দেখেছেন বয়সের পরি-প্রেক্ষিতে। গ্রন্থশেষে নায়ক বলছে জীবন থেকে মায়েরা হারিয়ে যায়, তাই নিয়ম, জানি, তবু সমস্ত জীবন সেই জনাই কি মা-র জন্য একটা শূন্যতা। একটা শোচনা, সতত একটা প্রয়োজনবোধ চেতনাকে আঘাত করে, এমন কি অবচেতনকে?' এই প্রশ্ন চিরন্তন? শুধু মাকে নয়—যিনি মূলাধার তাঁকে, একসঙ্গে উভয়কে।

স্বপ্ন দিয়ে স্মৃতি নিয়ে গড়া এই বাস্তব-ধর্মী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখ্য ঘটনা।

—অভয়শঙ্কর

শেষ নমস্কার/শ্রীচরণেষু মাকে (উপন্যাস)—সন্তোষকুমার ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—দে'জ পাবলিসিং। ৩১।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম—কুড়ি টাকা মাত্র।

নতুন বই

... গেরিলা যুদ্ধ: আবু সায়ীদ। ...য়া (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য ...), ৯ অ্যান্টনিবাগান লেন, ...কাতা-৯। মূল্য: এক টাকা ...র পয়সা।

...য়ের দেশের সাধারণ লোকের যে ... ধারণা 'গেরিলা যুদ্ধ' সম্পর্কে তা ...একজন নিরস্ত্র লোককে চার-পাঁচজন ... মিলে আক্রমণ করে নিষ্ঠুরভাবে ... করা এবং জনগণকে সর্বদা ভীত ...ন্ত রাখা। প্রকৃত পক্ষে ওটা যে তা নয়, ...র পিছনে আছে রাজনীতি, সামরিক উদ্দেশ্য, জনগণের মহত্তর শুভ-কামনা, কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, ত্যাগের দীক্ষা, জনসাধারণের আস্থাভাজন হওয়া প্রভৃতি। ...নীদ আবু সায়ীদের লেখা এই বইটি পড়লে কেবল যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারবেন পাঠক-পাঠিকারা তা নয় গেরিলা যুদ্ধের হাড়-হদ্দও জানতে পারবেন। মাও, চে, ফিদেল প্রভৃতি বৈপ্লবিক মহানায়কদের বাণী ও উপদেশ এবং চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশের প্রকৃত যুদ্ধের বিবরণ সন্নিবেশে বইটি তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের অবহিত করবার জন্যে বইটির ব্যাপক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

পাথর—(সোমেন্দ্রনাথ রায়)— সোনালী প্রকাশন, ২৭-সি, চক্রবেড়ে রোড, নর্থ কলিকাতা। মূল্য : পাঁচ টাকা।

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায়ের 'পাথর' উপন্যাসটির পটভূমি উড়িষ্যার প্রত্যন্ত প্রদেশের রাসোল হিল্লোলগড়ের জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ। একদা এই পরিবেশ শান্ত ছিল, ক্রমশ সর্বগ্রাসী মানবসভ্যতা এর দিকে হাত বাড়ায়। সেই পরিবর্তনের কথাশিল্প হল 'পাথর' উপন্যাসটি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের কালে মানুষ ও প্রকৃতির লোভ-লালসা-বিশ্বাসঘাতকতার যে ভয়ংকর ইতিহাস রচিত হয়েছিল বেথুয়া নদীর বিস্তীর্ণ বালুচরে, তার সাক্ষী প্রাগৈতিহাসিক জীবের কংকালের মত বিপুল একখন্ড পাথর। এই পাথরকে লক্ষ্য রেখে লেখক নায়ক-সওদাগর ব্রিজপ্রসাদ, কলকাতার হেলথপ' কোম্পানীর ডিপো ম্যানেজার বীরেন ব্যানার্জি, বীরেনবাবুর নিঃসন্তান স্ত্রী অরুণা ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অর্থনৈতিক অসহায়তার সুযোগে ব্রিজপ্রসাদ বুদ্ধুপত্নী অরুণাকে লালসায় কাছে আনে, ভোগ করে। একমাত্র উপকারী বন্ধু বীরেন তা বুঝতে পারে একদিন। স্ত্রী অরুণার স্পন্দন তখন তীব্রতম। আত্মতৃপ্ত অরুণার একদিকে অবৈধ প্রণয়ে ও বিপুল অর্থে লোভ, অন্যদিকে গোপনতম সন্তান বাসনা—দু-এর স্পন্দনচিত্রটি লেখক সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। লেখক কাহিনীচয়ন, ঘটনা নির্বাচন ও চরিত্রের এবং পরিবেশের বাস্তবরূপ চিত্রণে সুনিপুণ। লেখকের বলার ভঙ্গী ও ভাষারীতি সার্থক কথাশিল্পের উপযোগী। নতুন ঔপন্যাসিক যে শিল্প-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'পাথর' উপন্যাসে, তা প্রশংসার্হ।

আমার নিজের কোন দুঃখ নেই (কাব্যগ্রন্থ)— অনন্ত দাস।। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ২২বি প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬।। তিন টাকা।।

উপকূলের রৌদ্রে এবং জ্যোৎস্নায় অনন্ত দাশ যতটা আলোড়িত, ঠিক ততটাই বিচলিত রক্তে নিহিত বিষণ্ণতায়। এই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় তিনি নিজের অস্তিত্ব এবং পারিপার্শ্বের বিপন্নতায় পীড়িত হয়েছেন সর্বাধিক। খুবই ভালো লাগে 'আমার শোণিতে উল্কাপাত' কবিতার কয়েকটি লাইন:

'তখন ঐ সূর্যাস্তের মাঠ
অন্ধকারে বল নিয়ে লাফালাফি করে
জেটির চিৎকার থেমে যায়।
সব ক্রোধ, সব ঘৃণা, উল্লাস ছাড়িয়ে
শোঁ শোঁ শব্দে
আমার শোণিতে উল্কাপাত।'

মনে হয়, নগর-জীবনের চেয়ে ভালোবাসার কথায়, প্রকৃতি ও নিসর্গের অনুষঙ্গে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত। অন্তত কবিতার শরীর নির্মাণের যাবতীয় উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন মাঠ, ঘাট, নদ, নদী, গাছগাছালির স্বাভাবিক সান্নিধ্য থেকে। এবং সর্বত্রই দেখতে পেয়েছেন অনিবার্য এক পতনের সংকেত।

আকণ্ঠ শস্যের ক্ষুধা,
ফুসফুসে ক্ষয়ের জীবাণু
নাভির চারদিকে দেখি প্রলয়ের স্মৃতি।'

খুবই আন্তরিক মনে হল কবির কণ্ঠস্বর।। যেন উৎসের গভীর থেকে তিনি কথা বলেন। সকলের কাছেই বইটি ভালো লাগবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

গঙ্গোত্রী : সম্পাদক—শান্তনু দাস। আখাতাব ম্যাক লেন। কলকাতা-২৭। দাম—এক টাকা।

কবিতা এবং কবিতাসম্পর্কিত আলোচনার পত্রিকা গঙ্গোত্রী। বেশ দামী কাগজ, সুন্দর ছাপা, সেই সঙ্গে রমণীয় প্রচ্ছদ। কবিতার পত্রিকা এ দেশে যে এমন সুন্দর রুচিসম্মতভাবে কেউ প্রকাশ করতে পারেন, তা ধারণার বাইরে। কবি বা কবিতা প্রসঙ্গে যে সমস্ত আলোচনা বেরোয় সেগুলি আরও গভীরতর চিন্তার পরিচায়ক হওয়া দরকার। বর্তমান সংখ্যায় সুপরিচিত এবং অপরিচিত দুই বাংলার কবিদের বহু কবিতা ছাপা হয়েছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাদের। দুটি আলোচনা করেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং নারায়ণ চৌধুরী। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে লিখেছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, দিনেশ দাস, কৃষ্ণ ধর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, অনন্য রায় এবং আরো অনেকে।

অভিনয় (দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৩৭৮) —সম্পাদক : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩১, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। তিন টাকা।

মঞ্চ-চিত্র জগতের সামগ্রিক কল্যাণে নিবেদিত অভিনয় মাসিক পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই সাময়িক সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে তার ঐকান্তিকতায়। তবে চিত্রের চেয়ে মঞ্চের দিকেই এর টানটা বেশি। তাই বিশ্বের—বিশেষ করে সারা ভারতবর্ষের থিয়েটার আন্দোলন ও তার অগ্রগতির সংবাদ বিসম্বাদ এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্যা ইত্যাদির হাল-হদিশ বেশি মেলে এতে। আলোচ্য বিশেষ সংখ্যাটিতে এগারোটি একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে নিয়মিত বিভাগে স্থান পেয়েছে চিত্র এবং নাট্য সম্পর্কীয় নানান আলোচনা-পর্যালোচনা। একটি উল্লেখযোগ্য রচনা এদেশে নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুধী প্রধানের। রবীন্দ্রসদন ও ন্যাশনাল থিয়েটার-এর ওপর তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করেছেন। মঞ্চরসিকরা এর মধ্যে অনেক ভাবনার খোরাক পাবেন। বিদেশের এবং অন্য প্রদেশের সঙ্গে গ্রাম-বাংলার মঞ্চ-নিবেদনের বিস্তৃত সংবাদে অভিনয় পরিচালকদের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টির পরিচয় মেলে। নাট্য-জগতের বহু বৈচিত্র্যের সন্ধান দর্শকদের সামনে মেলে ধরবার জন্যে নাট্য-রসিকদের ধন্যবাদার্হ হবেন 'অভিনয়'-উদ্যোক্তারা।

গল্প-সম্ভার (বসন্ত-সংকলন) সম্পাদক : শ্যামলরঞ্জন ভট্টাচার্য। পড়ুয়ামহল, ১৬, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দু' টাকা।

গল্প-কাহিনীর ত্রৈমাসিক পত্রিকায় নতুন লেখকদের নানান ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নব্য লেখকদের মধ্যে নতুন তারা'র অন্বেষণ সম্পাদক আন্তরিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

টেপুলিপালপা (ছড়ার বই)—সলীল ভট্টাচার্য। চৈত্রছায়া, ৩৩২ গাঙ্গুলী-বাগান, কলকাতা-৪৭ এক টাকা।

এক একটি ছড়ায় গোমরা মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেছেন লেখক তীর্যক দৃষ্টিপাতে। ফুটিয়েছেনও।

পুরীর পটচিত্র শিল্প

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

উড়িষ্যা শিল্পীর দেশ। ভ্রমণার্থীরা কটকের রূপোর কাজ, কটক ও সম্বলপুরের শাড়ী, পুরীর চামড়ার কাজ সব কিছুর সংগেই অল্পবিস্তর পরিচিত। কিন্তু পুরীর পটচিত্রের কথা আমরা ক'জন জানি—এক জগন্নাথদেবের পট ছাড়া?

পুরীর সরকারী পান্থনিবাসের আঙিনায় নানা জিনিষ ফেরী করছিল ক'জন ফেরী-ওয়ালা। তাদেরই একজন ঝোলা হতে বার করে দেখালো ছোট বড়ো নানা আকারের পটচিত্র। কাপড়ের ওপরে আঁকা দেবদেবীর চিত্র, পুরাণের নানা কাহিনী। বলতে বাধা নেই এই পটচিত্রগুলির সূক্ষ্ম তুলির টান ও রঙের বাহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। দু-একটি পট কিনে ফেরীওয়ালাটির সংগে আলাপ জমালাম—উদ্দেশ্য এই পটচিত্র সম্বন্ধে দু-চার কথা জানা।

নিজের স্টুডিওতে কাজ করছেন ওড়িশার অগ্রগণ্য পটশিল্পী শ্রীজগন্নাথ মহাপাত্র

শুনলাম পুরী শহরের খুব কাছেই এক গ্রামে এইসব পটুয়াদের বাস। আর এই পটুয়াদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন শ্রীজগন্নাথ মহাপাত্র—যিনি ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতির পদক পেয়েছেন। মনে হোল শিল্পীকে দেখার এই সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না। তাই একটা জীপ যোগাড় করে রওনা দিলাম ঐ গ্রামের উদ্দেশ্যে।

পুরী-কটক বাস রাস্তায় পড়ে চন্দনপুর। সেখান হতে ভার্গবী নদীর ধার ধরে ফাঁড়ি পথ বেরিয়ে গেছে রঘুরাজপুর গ্রামে। ট্রেনে এলে জানকাদেইপুর হল্টে নামতে হবে। ভার্গবী নদীর পাড় ধরে যে পথ তা যেমন সরু তেমনি এবড়ো-খেবড়ো। কিছুটা গিয়ে মনে হোলো একটু এদিক-ওদিক হলেই একেবারে জীপশুদ্ধ সলিল সমাধি ঘটবে। তাই ভয়ে জীপ থেকে নেমে হেঁটেই পাড়ি দিলাম। চন্দনপুর বাজার থেকেই আমাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন রঘুনাথপুরের দু'জন গ্রামবাসী। একজন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন—অন্যজন ছুটে গেলেন গ্রামে খবর দিতে। ফলে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় যখন রঘুরাজপুর গ্রামে জগন্নাথ মহাপাত্রের বাড়ী পৌঁছলাম, তখন দেখি গ্রামবাসীদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত।

ছোট্ট গ্রাম রঘুরাজপুর—প্রায় ২৫টি পটুয়া পরিবারের বাস। জগন্নাথ মহাপাত্রের বাড়ীটিই শুধু পাকা। বাকী সব মেটে

ঘর। শুনলাম অধিকাংশ পটুয়ারাই পট আঁকা ছাড়াও অন্য নানা বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছেন উদরান্নের তাগিদে।

[illegible]থ মহাপাত্র [illegible] পরম সমাদরে বসিয়ে তাঁর আঁকা বিভিন্ন পট দেখালেন। তার কাছ থেকে এই পট-চিত্রের অংকন প্রণালী ও তার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে দু'চার কথা শুনেছি তাই এখানে লিপি-বদ্ধ করছি।

এই পটচিত্র আঁকা হয় সাধারণ কাপড়ে। কিন্তু তার আগে তেঁতুল বিচির গুঁড়ো দিয়ে একরকম আঠা তৈরী করে সেই আঠা ও চকের গুঁড়ো দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। ঐ কাপড়কে রোদে শুকিয়ে পাথর ঘষে পালিশ করে নেওয়া হয়। এরপর ডিজাইন এ'কে রঙ লাগানো। রঙের বিশেষত্ব হোলো যে সব রঙই শিল্পীরা নিজেরাই তৈরী করেন। শাঁখের গুঁড়ো দিয়ে সাদা রঙ, বিভিন্ন পাথরের গুঁড়োতে মেটে, লাল ও হলুদ রঙ। নীলের জন্য সাধারণতঃ রবিন ব্লু ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক রঙের মিশ্রণে তৈরী করা হয় আরো নানা রঙ। কাজল তৈরী করার পদ্ধতিতে তৈরী হয় কালো। রঙ গোলার সময় জলে 'কৈথা' আঠা ব্যবহার করা হয়। তুলিও তৈরী করেন শিল্পীরা নিজে। মহিষের লোমে মোটা তুলি ও ইঁদুরের লোমে সূক্ষ্ম তুলি তৈরী হয়। আঁকার পর অনেকে ওপরে বার্ণিশ লাগিয়ে নেন—যাতে জলে নষ্ট না হয়। কিন্তু জগন্নাথ মহাপাত্র বার্ণিশ লাগানোর বিরোধী। বল্লেন, রঙের ঔজ্জ্বল্য কমে যায় এতে।

পটচিত্রের বিষয়বস্তু ধর্মীয় উপাখ্যান। পটুয়ারা বলেন, 'পরম্পারিক চিত্রশিল্প।' সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারত নৃসিংহ পুরাণ কৃষ্ণলীলা হতে বিষয়বস্তু নেওয়া। রঙের কথা আগেই বলেছি। তুলির টান জীবন্ত অথচ সূক্ষ্ম। চিত্রাংকন পদ্ধতিতে থ্রি-ডাইমেনশনের ভাব আনার প্রচেষ্টা আছে। মূল চিত্রের চারপাশে সাধারণত ফুল বেলপাতার অলংকরণ।

জগন্নাথ মহাপাত্র উড়িষ্যার বর্তমান পট-শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আগেই বলেছি ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। নিজের অনেকগুলো পট দেখালেন তিনি। রঙের ঔজ্জ্বল্যে রেখার সূক্ষ্মতা ও বলিষ্ঠতায় তাঁর [illegible]

অপূর্ব। কম্পোজিসনও চমৎকার। ফেরী-ওয়ালাদের কাছে যেসব পট দেখেছিলাম তার সংগে উৎকর্ষগত পার্থক্যটাও চোখে পড়লো। দেখলাম কোন পটেই শিল্পীর স্বাক্ষর নেই। কিন্তু শিল্পী বল্লেন যে, নিজের আঁকা পট তিনি সব সময়েই চিনে নিতে পারেন—তা সে যতদিন আগেকারই আঁকা হোক না কেন।

শুনলাম তাঁর পটচিত্র সুধীজনের কাছে আদৃত হয়েছিল এক আমেরিকান ভদ্র-মহিলার প্রচেষ্টায়। এর আগে শুধু পুরীর মন্দিরের আশেপাশে এই পট বিক্রী হোত। প্রধানতঃ পুণ্যার্থীদের কাছে। এই বিদেশী মহিলা সেখানে কয়েকটি পট দেখে মুগ্ধ হন ও পটুয়াদের সংগে যোগাযোগ করেন। তিনিই জগন্নাথ মহাপাত্র ও আরও কয়েক-জনের পট সংগ্রহ করে এই শিল্প প্রদর্শনীতে দেন। এই প্রদর্শনীতে জগন্নাথ মহাপাত্রের পট প্রথম পুরস্কার পেল এবং রসিকমহলে আদৃত হোল। তারপর থেকেই জগন্নাথ মহাপাত্রের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার হোল গুণী শিল্পীর পরম স্বীকৃতি।

দেখে অবাক হলাম যে এত গুণ ও প্রসিদ্ধি জগন্নাথ মহাপাত্রের বিনয় ও অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রাকে ব্যাহত করেনি। কথার ফাঁকে ফাঁকে চা খাওয়ালেন। পটুয়াদের দারিদ্র্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। শুনলাম এক হ্যান্ডিক্র্যাফট বোর্ডের মারফৎই কিছু কিছু পট বিক্রী হয়। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। হয়তো এই শিল্পের প্রতি ভ্রমণার্থীদের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকর্ষিত হয়নি। সরকারী সংস্থা-গুলির এবিষয়ে অনেক কিছু করার আছে। বিদেশী ভ্রমণার্থীদের কাছেও এই শিল্পটির উপযুক্ত প্রচার করতে হবে। পটুয়ারা জীবিকার্জনের জন্য রাজ-মিস্ত্রীর কাজ নিচ্ছেন—ভাবতে কষ্ট হোলো। "আমি কিন্তু আশা রাখি দিন ফিরবে—" আত্ম-প্রত্যয়ের সুরে বল্লেন জগন্নাথ মহাপাত্র।

রাতের অন্ধকারে ফিরলাম ভার্গবী নদীর ধার দিয়ে। লন্ঠন হাতে এগিয়ে দিলেন মহাপাত্র নিজে ও তাঁর শিষ্যেরা। জীপ ছাড়লো—ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল পিছনের কটি আলোর বিন্দু। কিন্তু কানে বাজতে থাকলো আশা ভরা কটি কথা—'দিন ফিরবে!'

বিলুপ্ত রাজধানী কর্ণসুবর্ণ
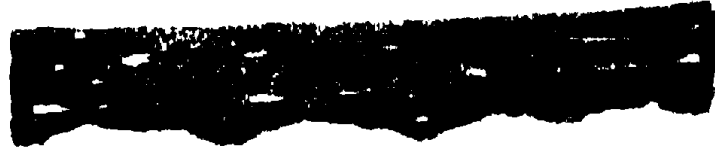
উৎপল চক্রবর্তী

আমি এখন বিশাল ভাগীরথীর বুকে নৌকোয়।

আমার মনে পড়ছে, তেরোশ বছর আগে এমনই একদিন এই ভাগীরথী বেয়েই দুচোখে অসীম কৌতূহল, বিস্ময় আর শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ!

বহুদূর থেকে আসছিলেন তিনি। নালন্দা থেকে মুঙ্গের, সেখান থেকে ভাগলপুর, তারপর প্রায় নব্বই মাইল নদীপথে রাজমহলের কজঙ্গল নগরে। কজঙ্গল থেকে ওই নদী বেয়ে গিয়েছেন করতোয়া তীরের সেই সুবিশাল নগরী পুণ্ড্রবর্ধনে। সবখানেই দেখেছেন হিউ-এন-সাঙ—এই অতুল সম্পদে ভরা দেশের বৈভব আর সৌন্দর্য, ধর্মানুরাগ আর সৎ সরল সহজ জীবন-যাপন, বিদ্যানুরাগ আর সুন্দর আচরণ। মুগ্ধ হয়েছেন তিনি, আর তাই তাঁর পরিব্রাজক মন ক্লান্ত না হয়ে এই মহান দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াবার বাসনায় অধীর হয়ে উঠেছে। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে এবার তিনি এগিয়ে চলেছেন কর্ণসুবর্ণের দিকে। কর্ণসুবর্ণ—মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজধানী।

শুনেছেন হিউ-এন-সাঙ, তাঁর পরম মিত্র সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রধান শত্রু মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছে। বিশাল গৌর রাজ্য অসংখ্য খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। রাজধানী কর্ণসুবর্ণের আর সেই ঐশ্বর্য নেই।

তবু তিনি নিরুৎসাহ হননি। কেননা দেখেছেন তিনি, প্রাচীন 'গঙ্গে' নগরীর পর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার রাজধানী ছিল যে পুণ্ড্রবর্ধন, আজ তার সেই গরিমা না থাকলেও, অতীত বৈভবের বর্তমান ছায়ারূপটিও কম আকর্ষক নয়: এখনও পুণ্ড্রবর্ধন একটি জনবহুল নগরী, ভূমি খুবই উর্বরা, প্রচুর ফলের গাছ সমস্ত নগর জুড়ে যার মধ্যে কাঁঠালই প্রধান, অধিবাসীরা অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী, নগরে এখনো বারোটি সঙ্ঘারাম এবং তিন হাজার ভিক্ষু আছেন। মন্দিরের সংখ্যাও কয়েকশ' হবে। পুণ্ড্রবর্ধন আর রাজধানী নয় এখন। তবু, এখনও তার এই সৌন্দর্য, তার ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিতই হয়েছেন হিউ-এন-সাঙ। আর তাই, তিনি প্রায় [illegible] এগিয়ে চলেছেন কর্ণসুবর্ণের দিকে, জানেন শশাঙ্কের মৃত্যু হলেও রাজধানী কর্ণসুবর্ণের সৌন্দর্য নিশ্চয় এখনও [illegible] আছে।

অনুমান অভ্রান্তই ছিল তাঁর। কর্ণসুবর্ণে পা রেখেই উপলব্ধি করেছিলেন এ রাজ্যের বিশালতা। শুনতে পেলেন, এর আয়তন হবে প্রায় দুশ মাইল। আর রাজধানী কর্ণসুবর্ণের পরিধি প্রায় [illegible] মাইল। স্পষ্টই বুঝতে পারলেন এখানকার অধিবাসীরা খুবই ধনী এবং সংখ্যাতেও [illegible]। জমি উর্বরা। রাজধানীর [illegible] প্রচুর ফল ও ফুলের গাছ। [illegible] বুঝেই আনন্দিত হলেন হিউ-এন-সাঙ। [illegible] অধিবাসীদের [illegible] ও [illegible] আচরণে। [illegible], সব নাগরিকেরা [illegible] তাঁকে। যদিও মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক ছিলেন শৈব, বৌদ্ধবিদ্বেষী [illegible] এমনকি পবিত্র বোধিদ্রুম [illegible] উৎপাটনের অপরাধে অপরাধী, তবু বিস্মিতই হলেন হিউ-এন-সাঙ, এখানে [illegible] সঙ্ঘারাম এবং দুই হাজার ভিক্ষু আছে দেখে। এমনকি রাজধানীর অতি নিকটে, রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের অস্তিত্বই যেন শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের বিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে সগর্বে মাথা তুলে আছে। না, রাজা শশাঙ্ক পরধর্ম বিদ্বেষী নন। আর এই রক্তমৃত্তিকা সঙ্ঘারামে এসে এক মজার কাহিনীও শুনলেন হিউ-এন-সাঙ। কিছুকাল আগে এখানে নাকি দক্ষিণ ভারত থেকে এক দাম্ভিক পণ্ডিত এসেছিলেন। পেটভর্তি বিদ্যার চাপে যাতে পেট ফেটে না যায়, এজন্য সে পেটের উপর তামার থালা বেঁধে রাখত আর দুনিয়ার বোকা লোককে আলো দেখাবার জন্য মাথায় একটা প্রদীপ নিয়ে কর্ণসুবর্ণতে ঘুরে বেড়াত। শেষে, ঐ দক্ষিণ ভারতেরই এক শ্রমণ আসেন রাজধানীতে। রাজা দাম্ভিককে তর্ক করতে [illegible] ঘোষণা করেন শ্রমণ যদি দাম্ভিককে তর্কে হারাতে পারেন, তবে তিনি একটি সঙ্ঘারাম স্থাপন করে দেবেন। তর্কে জিতে ছিলেন শ্রমণ, আর কথামতো সঙ্ঘারাম [illegible] করে দিয়েছিলেন রাজা।

সেই সঙ্ঘারামই কি এই রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার?

হয়তো তাই। আর তাই, কর্ণসুবর্ণের গরিমা নিজের চোখে দেখে, বাংলার এই প্রসিদ্ধ রাজধানীর প্রকৃত রূপ পর্যবেক্ষণ করে তার বিস্তৃত পরিচয় হিউ-এন-সাঙ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে।

কিন্তু এ তো তেরোশ বছর আগের কর্ণসুবর্ণের বিবরণী।

আজ বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে আমি এক অখ্যাত পর্যটক, কি রূপ দেখব কর্ণসুবর্ণের কে জানে!

কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে। নৌকো ধীর গতিতে এগিয়ে চলে ভাগীরথীর জল কেটে কর্ণসুবর্ণের দিকে।

আমি এদিক দিয়ে নাও আসতে পারতাম। কলকাতা থেকে কর্ণসুবর্ণ আসার এটা সহজ পথ নয়। হাওড়া-ফারাক্কা লাইনের যে কোন ট্রেনে উঠে ব্যাণ্ডেল থেকে ৯৪ মাইল দূরের রেল স্টেশন চিরুটী বা চিরুটিতে নামলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় কর্ণসুবর্ণতে। স্টেশন থেকে মাত্র দেড় মাইল দক্ষিণ-পূবে হেঁটেই যাওয়া যায়। কিন্তু আমি এসেছি উল্টো পথে। রাতের ট্রেনে গার্ডের গাড়ীতে করে যাওয়ার একটা দুর্লভ সুযোগ এসে গিয়েছিল বলে বন্ধুবর গৌরীশংকর দে ও অর্ধেন্দুশেখর দেব সহ আমরা তিনজন লালগোলা যাবার শেষ ট্রেনে উঠেছিলাম। গার্ডসাহেবও বন্ধুজন। বললেন, ভোরবেলা বহরমপুরের আগে সারগাছি স্টেশনে নামবেন। ওখান থেকে যাবার সুবিধে হবে।

খুব ভোরে সারগাছি স্টেশনে নেমে আমরা তিনজন যখন নিকটবর্তী কৌসিক ট্রেনিং কলেজের এক অধ্যাপকের বাড়ীর দিকে এগোচ্ছিলাম, তখন সূর্য যেন আমাদের দেখে তার বিস্ময় ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। এই প্রথম আমরাও দিনের প্রথম সূর্যের মুখোমুখি হবার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অমন বিশুদ্ধ প্রত্যুষ বহুকাল দেখিনি। ট্রেণিং কলেজের বন্ধুই সাইকেল যোগাড় করে দিলেন, সঙ্গে একজন ছাত্র পথনির্দেশকও। তখনও জানতাম না, কর্ণসুবর্ণ এত দূরে! সারগাছি লেভেল ক্রশিং পার হয়ে বেশ কিছুদূর এগোবার পর সম্মুখে ভাগীরথী। সেখানে প্রায় নিয়মিতই খেয়া পারাপার হয় দেখলাম। মুসলমান, সাঁওতাল আর মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীন মানুষের সঙ্গে সাইকেলসহ আমরাও নৌকোয়।

—ঐ দূরে রাঙ্গামাটি।

ছাত্রবন্ধুটি বললেন।

—রাঙ্গামাটি!

—হ্যাঁ রাঙ্গামাটি। এখন কর্ণসুবর্ণ নামে আর কেউ চেনে না। এখন মুর্শিদাবাদ জেলার অখ্যাত এক গ্রাম রাঙ্গামাটি আর কানসোনা রক্তমৃত্তিকা আর কর্ণসুবর্ণের স্মৃতি বহন করছে।

খেয়া পার হয়ে আবার সাইকেল-যাত্রা। এবার পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। কিন্তু যত এগোচ্ছি, কৌতূহল আর বিস্ময় মন তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে। কি বিচিত্র এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। মাটি প্রায় সবটাকে লাল, উঁচু বাঁধ, নীচু জলা, এপাশে ওপাশে অরণ্যভূমি, কোথাও আদিগন্ত মাঠ, টিলা, তালবন, মুসলমান ও সাঁওতাল পুরুষ রমণীর যাওয়া-আসা—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য-সম্ভারে পূর্ণ বাংলার কোন অঞ্চল এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি।

যাঁরা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্ভোগের বাসনায় বাংলার বাইরে নানা জায়গায় যান, তাঁদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ, একবার একটু কষ্ট স্বীকার করে মুর্শিদাবাদের অবহেলিত গ্রাম রাঙ্গামাটি, বাংলার প্রাচীন রাজধানী সুবিশাল কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসস্তূপ একবার দেখে আসুন। আমি বিশ্বাস করি, তাঁরা কেউই পরিশ্রম অসার্থক হয়েছে বলে মনে করবেন না। সুনির্মিত রাস্তা বলতে কিছু নেই, বাঁধের উপর দিয়ে অপ্রশস্ত এবড়ো খেবড়ো পথ, সাইকেল নিয়ে মাঝে মাঝে দুর্গম বলে মনে হয়। একটা বাঁক ঘুরলেই বাঁ হাতে কিছু তমাল গাছের সাজানো অরণ্য দেখে আমি আর চোখ ফেরাতে পারি না। বাঁধ থেকে বেশ কিছুটা নীচু জমিতে সেই সারিবদ্ধ গাছগুলো এক অপূর্ব শোভা রচনা করেছে। ঈশ্বরের চেয়ে বড় শিল্পী আর কে আছে।

আর কিছুটা এগোতেই আমাদের দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়ালো উঁচু উঁচু কয়েকটি টিলা।

—ঐ হলো রাঙ্গামাটি গ্রাম। আর ডান হাতে ঐ হলো পুরণো ভাগীরথীর খাত।

সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। এটুকু পথ হেঁটেই যাব। এর প্রতিটি ধূলিকণায় ইতিহাস। আমি তা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিতে চাই।

যতই এগোই, সারা মন বিচিত্র দৃশ্য-সম্ভারের বিপুল বিস্তারে যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

সম্মুখের উঁচু টিলা ক্রমে নিকটে আসে। স্পষ্ট দেখতে পাই, পথ উঠে গেছে টিলার উপর পর্যন্ত এবং সেখানে বহু মানুষ দিব্যি ঘর বানিয়ে নিয়েছেন। বেশ ঘন বসতি মাটি থেকে অতটা উঁচুতে, কেমন যেন অপার্থিব পরিবেশ বলে মনে হয়।

সাইকেলটা পথের ধারে রেখে, আমরা টিলার উপর উঠতে লাগলাম।

অজস্র মাটির তৈরী তৈজসপত্রের ভগ্নাংশ ছড়ানো রয়েছে চতুর্দিকে। মাটির ভেতর থেকে, টিলার গা থেকে অসংখ্য ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের টুকরো অতীত ইতিহাসকে প্রকাশের আগ্রহে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। দু-হাত ভরে সংগ্রহ করলাম তার কিছু, তারপর নেমে এলাম সেই উঁচু টিলা থেকে। কতদিন আগে কোন মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রী ছিল এইসব টুকরো টুকরো স্মারকখন্ডগুলো কে জানে। তাদের হাতের স্পর্শ কি লেগে আছে আজও এদের সর্বাঙ্গে! আমি রোমাঞ্চিত বোধ করি! হাজার বছর আগের মানুষের মমতার সঙ্গে মিশে যায় আমার মমতা—হাজার বছর মাঝখানে সেতুর মতো মনে হয় সেই ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের টুকরোগুলোকে।

সাইকেলটা আর একটু ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতেই এবার পৌঁছে গেলাম আরো অসংখ্য স্মৃতিচিহ্নের মাঝখানে। মাটির উপরে আর বিশেষ কোন চিহ্ন নেই, সবই মাটির নীচে। খনন কার্যের ফলশ্রুতি হিসেবে, মাটির আবরণ সরে গেছে, যেন বিবর্ণ অসহায় অস্তিত্ব নিয়ে কৌতূহলী দর্শকের সামনে কুন্ঠিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে কতকগুলো গৃহের ভিত্তি, ছোট ছোট ইঁটে গাঁথা সুদৃঢ় ভিত—যার উপরে দাঁড়িয়ে একদা সগর্বে মাথা তুলেছিলো রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার!

হ্যাঁ, এই সেই রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের শেষ চিহ্ন—এখন সন্ন্যাসীডাঙা নামে যা পরিচিত।

এই রাঙামাটিই যে কর্ণসুবর্ণ—এ বিষয়ে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ই প্রথম বিশেষ জোর দিয়ে বলেন। যদিও বহুকাল আগে থেকেই এ জায়গা সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি ছড়িয়ে ছিল মুর্শিদাবাদের মানুষের মনে।

আর এই ভিতগুলিই যে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ভিত্তিভূমি তা প্রমাণিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রধান শ্রীসুধীররঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে খনন-কার্যের ফলে।

এখান থেকে পাওয়া গেছে সুনিশ্চিত হবার উপযোগী সীলমোহর।—পার্শ্ববর্তী রাজবাড়ীডাঙা খননের সময় ৫ ফুট মাটির নীচ থেকে পাওয়া সেই গোলাকার সীল-এর মধ্যে বৌদ্ধচক্রের দুপাশে দুটি হরিণের ছবি এবং দু-লাইন লেখা আছে—"শ্রীরক্তমৃত্তিকা মহাবৈহ" এবং 'ষক-আর্য-ভিক্ষু-সংঘসা' যা প্রমাণ করে সেই মহা-

বিহারের অবস্থিতির সঠিক নির্দেশ। এই সঙ্ঘারামের ভেতর শস্যভাণ্ডার ঘরেরও সন্ধান পাওয়া গেছে এবং যার ভেতর মিহি মাঝারী ও মোটা চাল ও গম যে সঞ্চিত থাকত তারও প্রমাণ মিলেছে।

এমন কি সপ্তম শতকে যে নরবলি হত তার স্মারক হিসেবে প্রাচীর ভিত্তির তলে নরকরোটিও পাওয়া গেছে।

কিন্তু এ সব তো রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের চতুষ্পার্শ্বের পরিচয়।

কোথায় মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কর রাজপ্রাসাদের চিহ্ন?

সে কি ঐ রাজবাড়ীডাঙাই যা দীর্ঘকাল ধরে স্থানীয় মানুষের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে!

জিজ্ঞেস করেছি স্থানীয় মানুষকে। অনেকেই সঠিক কোন নির্দেশে আমাকে নিশ্চিত করতে পারেন নি। তবে এখনো এই রাঙামাটি গ্রামকে ঘিরে আশে-পাশের গ্রামের মানুষের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা যে অকপট তার প্রমাণ পেয়েছি। গত বছর বন্যার পর আর একবার গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—রাঙামাটি জলে ডুবে গিয়েছিল কিনা। উত্তরে একজন সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'সে কি। ও জায়গা কি জলে ডোবে। ও যে 'ব্রহ্মডাঙা।'

এই 'ব্রহ্মডাঙা' শব্দটিতে আমার একটু খটকা লেগেছে। এখানে বিভিন্ন স্থানের নাম ঐ 'ডাঙা' শব্দ দিয়েই চিহ্নিত। যেমন রক্তমৃত্তিকা বিহার যেখানে ছিল সে জায়গা সন্ন্যাসীডাঙা এবং রাজপ্রাসাদের স্থানটিই সম্ভবত রাজবাড়ীডাঙা। ঐ রাজবাড়ীডাঙা খননের ফলে শতাধিক সীল পাওয়া গেছে, যার গায়ে বৌদ্ধধর্মের নীতিকথা, বিভিন্ন ব্যক্তির নাম, এবং ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ শতকের দুটি চূণবালির তৈরী মূর্তির (যা গুপ্তযুগের তৈরী বলে অনুমিত,) সন্ধান মিলেছে। ব্রোঞ্জের তৈরী বুদ্ধমূর্তি ও গণেশ মূর্তিও রাজবাড়ীডাঙা থেকে পাওয়া গেছে।

এবং হিউ-এন-সাঙ রক্তমৃত্তিকার পাশে যে বিখ্যাত অশোকস্তূপের বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব সপ্তাহকাল অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন—সেটিই সম্ভবত এখন রাক্ষসীডাঙা নামে পরিচিত। শৈবরাজার অনুগত প্রজাদের চোখে বিধর্মী মানুষেরা হয়তো 'রাক্ষস' হিসেবেই চিহ্নিত ছিলেন। আর রাজার শিবমন্দির ছিল সম্ভবত ঐ ঠাকুরবাড়ীডাঙায়। কিন্ত ব্রহ্মডাঙা বললেন কেন স্থানীয় মানুষটি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কিন্তু কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি তিনি।

আজকের রাঙামাটির মানুষ আর সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারেন না। কয়েকজন বালক শিক্ষার্থী নিকটবর্তী কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ফিরছিল। তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—এ জায়গাটির নাম কি?

—রাজবাড়িডাঙা।

—কি ছিলো এখানে?

—রাজার বাড়ী।

—কোন রাজার?

—জানি না।

—তোমাদের মাস্টারমশায় বলেন নি কিছু?

নীরব হয়ে গেল সেই বালক।

এমন নীরব এখানকার প্রায় সকলেই। অথচ এঁরা জানেনা কতবড় সৌভাগ্য এঁদের. প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার এক গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূখণ্ডে এঁরা বাস করছেন। কে জানাবেন এ কথা তাঁদের? স্থানীয় শিক্ষকগণ কোন্ বই পড়াবেন শিশুদের যাতে বাংলার এই বিলুপ্ত রাজধানীর বর্ণনা আছে? আমাদের পাঠক্রমে এর স্থান কোথায়? বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশে পড়ানো হয় না—এত চেয়ে অশিক্ষিত শিক্ষাচর্চা আর কোন দেশে হয়? কর্ণসুবর্ণে দাঁড়িয়ে আছি, খৃস্টীয় সপ্তম শতকের বাংলার রাজধানী। কেন এর নাম কর্ণসুবর্ণ? ইতিহাস নীরব. শুধু লোকগাথা, লোকশ্রুতি আর কিংবদন্তী এখনো জানিয়ে দেয়, এইখানেই ছিল দাতাকর্ণের রাজধানী। একবার তাঁর ছেলে বৃষ সেনের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্বর্ণলঙ্কার তৎকালীন অধিপতি রাক্ষসরাজ বিভীষণ এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। শিশু বৃষ সেনের কল্যাণকামনায় এখানে তিনি স্বর্ণবৃষ্টি করান এবং সেই কারণেই এ জায়গার নাম হয় কর্ণসুবর্ণ। আর তখন থেকেই এখানকার মাটিও স্বর্ণাভ হয়ে যায়। আজকের রাঙামাটি নামও সেই থেকেই। আর কিছু দূরের ওই গোকর্ণ নামক স্থানেই ছিল দাতাকর্ণের গোশালা।

কিংবদন্তী আরো বলে, ওই রাক্ষসীডাঙায় বাস করত এক রাক্ষসী। তার সংগে তর্ক করার জন্য রাজাকে প্রতিদিন একজন করে লোক পাঠাতে হতো। লোকটি তর্কে হেরে গেলে তাকে রাক্ষসী খেয়ে ফেলত। অবশেষে পীর তুর্কান নামে এক পণ্ডিত আসেন এবং তিনি পরাস্ত করেন রাক্ষসীকে। এবং মেরেও ফেলেন তাকে। রাজা এবং প্রজা উভয়েই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানান পীর সাহেবকে। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃত্যুর পর এখানে সমাহিত করা হয় তাঁকে। এবং ইটের তৈরী সমাধি ভূমি না করে চালাঘর নির্মাণ করা হয়। আজও রাক্ষসীডাঙায় এসে পীর সাহেবকে শ্রদ্ধা জানায় সাধারণ মানুষ। কিন্তু এতো কিংবদন্তী আর জনশ্রুতির কল্পকাহিনী। ইতিহাসে কর্ণসুবর্ণের প্রতিষ্ঠা করে থেকে?

৫নং দামোদর লিপি বলে পুণ্ড্রবর্ধন ৫৪৪ খৃস্টশতক পর্যন্ত জনৈক গুপ্ত রাজের অধীনে ছিল। ষষ্ঠশতকেরই শেষভাগে পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড় একযোগে স্বাতন্ত্র্যের দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে সপ্তম শতকের সূচনায় ... শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে আবির্ভূত হন এবং গৌড়তন্ত্র ... উত্তরপূর্ব ভারতের ইতিহাসে ... অধ্যায় রচনা করে। শশাঙ্কর ... রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

প্রথম, মালবাধিপতি গুপ্তরাজাকে মহাসামন্ত রূপেই শশাঙ্কর প্রথম আবির্ভাব। এবং এই গুপ্তরাজাদের সংগে গৌড়ের অধিকার নিয়ে মৌখরি সম্রাটদের কয়েক পুরুষব্যাপী এক বিবাদ ছিল। এই বিবাদ চূড়ান্ত রূপ নেয় দেবগুপ্ত ও গ্রহবর্মার সময়ে। কবি বানভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত'এ এই সংঘর্ষের একটি সুস্পষ্ট ছবি এঁকেছেন। দেবগুপ্তের পক্ষে ছিলেন মহাসামন্ত শশাঙ্ক। উভয়ের সম্মিলিত আক্রমণে গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন, সিংহাসনে আসেন হর্ষবর্ধনের ভাই রাজ্যবর্ধন। তিনি পরাক্রান্ত দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন, কিন্তু শশাঙ্ক তাকে প্রতিরোধ করেন। কথিত আছে শশাঙ্ক নাকি মৈত্রীবন্ধনের উদ্দেশ্যে রাজ্যবর্ধনকে নিজের শিবিরে আমন্ত্রণ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন তাঁকে।

কিন্তু বানভট্ট বা হিউ-এন-সাঙ কথিত এই কাহিনী হর্ষবর্ধনের লিপিতে সমর্থিত নয় এবং মঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থেও বলা হয়েছে রাজ্যবর্ধন নগ্নজাতির কোন রাজ-আততায়ী দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

এরপর শশাঙ্কর সংগে শুরু হয় হর্ষবর্ধনের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম কাহিনীও বানভট্টের লেখনীতে বিধৃত আছে। কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মার সহায়তা গ্রহণ করে হর্ষবর্ধন যখন গৌড়রাজ শশাঙ্কর রাজধানী কর্ণসুবর্ণের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সংবাদবাহক ভণ্ডীর ... থেকে শুনলেন রাজ্যবর্ধন নিহত হয়েছেন, রাজ্যশ্রী নিরুদ্দেশ, তখন নিজে আর অগ্রসর না হয়ে বিন্ধ্যপর্বতের দিকে দ্রুত চলে গেলেন এবং আত্মহত্যা করার পূর্বমুহূর্তে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করলেন। সসৈন্য ভণ্ডী গেলেন শশাঙ্কর সংগে যুদ্ধ করতে। শেষ অবধি এই যুদ্ধ আর হয়েছিল কিনা বানভট্ট তা লেখেন নি. কিন্তু মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থের লেখক বলেন, হর্ষবর্ধন প্রাচ্যদেশের রাজা সোম অর্থাৎ চন্দ্র অর্থাৎ শশাঙ্ককে পরাস্ত করেন। হতে পারে তা সত্য, তবু ইতিহাস বলে, শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নিজের জীবদ্দশায় সমগ্র গৌড়দেশ মগধ বুদ্ধগয়া উৎকল ও কঙ্গোদ দেশের অধিপতি ছিলেন। কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশীয় অধিপতি মহারাজ দ্বিতীয় শ্রীমাধব রাজের ৬১৯ খৃস্ট শতকের এক লিপি তার প্রমাণ, সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তির মেদিনীপুর লিপিও যে মেদিনী-

পর প্রাচীনকালে মিধুনপুর নামে পরিচিত ছিল) বলে দণ্ডভুক্তিদেশ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল যে, দণ্ডভুক্তির অধীনে ছিল উৎকল দেশ। এই দণ্ডভুক্তিই কি আধুনিক মেদিনীপুরের দাঁতন নামক স্থান? এই দাঁতনেরই কিছুদূরে শরশংক নামে একটি বড় দীঘি আছে। কিংবদন্তী বলে মহারাজ শশাঙ্ক পুরী যাবার সময় বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তে এই দীঘি খনন করেছিলেন। ৫,০০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২,৫০০ ফুট প্রস্থের এই সুবৃহৎ দীঘির সমতুল্য দীঘি বাংলায় খুব কমই আছে।
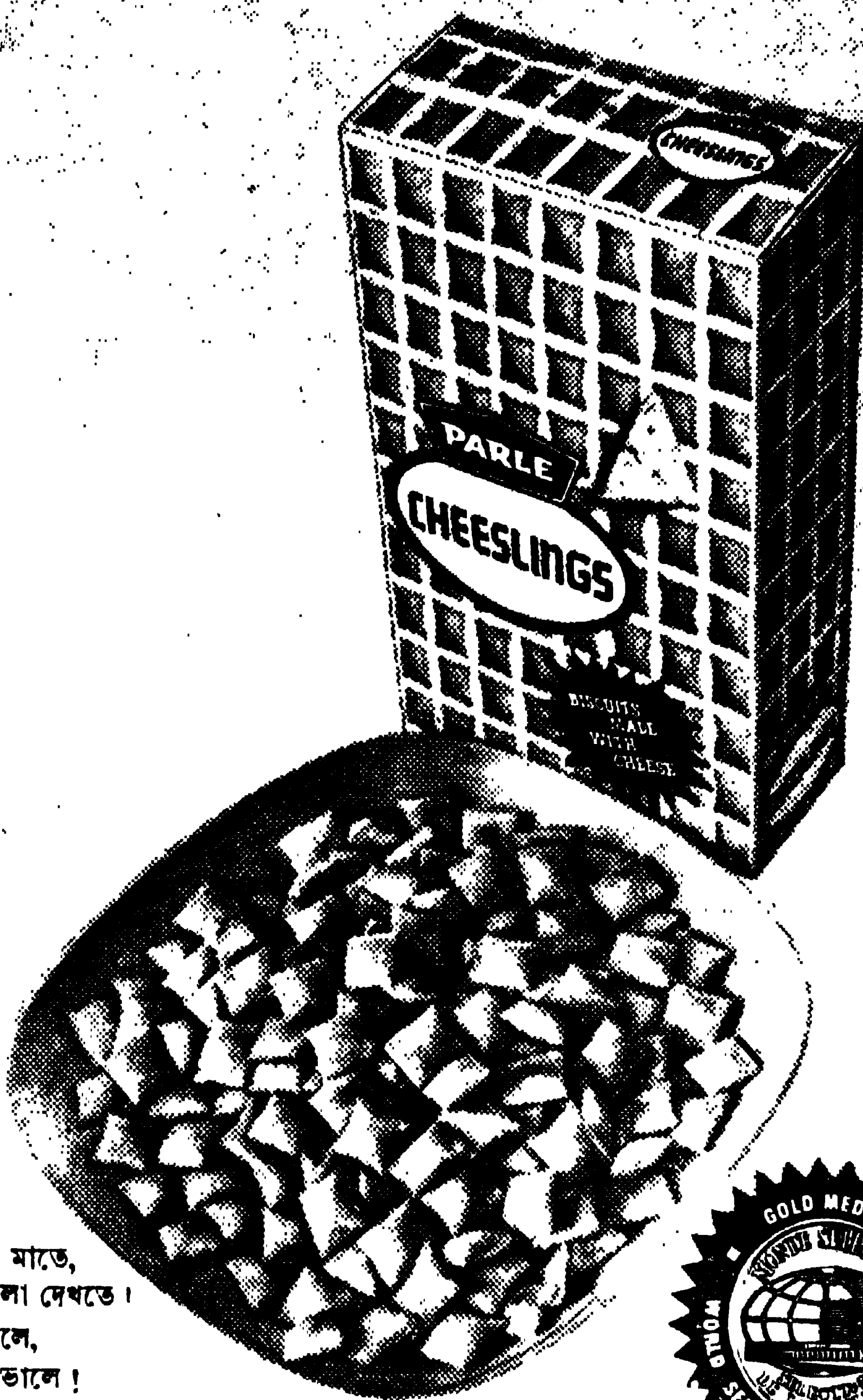
২৪ পরগণার গাইঘাটার কাছে 'জলেশ্বর' নামে একটি স্থানে কয়েকটি সুউচ্চ ঢিবি আছে। তার একটিতে প্রাচীন একটি শিবমন্দির আছে, মন্দিরের সম্মুখে গাছের তলায় ভাংগা একটি মূর্তি আছে। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, এই স্থানটি মহারাজ শশাঙ্কর সময়ের। এই দুটি স্থানের লোকশ্রুতি আজ অবধি শশাঙ্কর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও লোকপ্রিয়তার ইংগিত বহন করছে। হিউ-এন-সাঙ যখন কর্ণসুবর্ণতে আসেন তখন মহারাজ শশাঙ্কর মৃত্যু হয়েছে। অনুমান করেন ঐতিহাসিকগণ, ৬৩৭-৩৮ খৃস্টাব্দের কিছু আগে শশাঙ্ক মারা যান। এবং বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম উৎপাটনের পাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। শশাঙ্কর মৃত্যুর প্রায় সংগে সংগেই গৌড়রাজ্যের পতন শুরু হয়। মানব নামে তাঁর এক ছেলে আট মাস পাঁচ দিন রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তিনি শশাঙ্কর মতো পরাক্রমী ছিলেন না। ফলে সমগ্র বাংলাদেশে তখন যে বিভাগগুলি ছিল অর্থাৎ কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট—এগুলি স্বাতন্ত্র্য-লাভের বাসনায় উদগ্র হয়ে ওঠে এবং হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার ক্ষমতার লড়াইয়ে ক্রমে গৌড়তন্ত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

মানবের পর জয় বা জয়নাগ নামে এক রাজা কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে ক্ষণকালের জন্য আরোহণ করেন, এঁর মুদ্রা বীরভূম-মুর্শিদাবাদে পাওয়া গেছে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও ৬৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই শশাঙ্কর গৌড় একেবারে গৌরবহীন হয়ে পড়ল। কর্ণসুবর্ণের সোনালী দিন শেষ হয়ে গেল। হায়! তারপরের ইতিহাস যেমন দুঃখময় মর্মান্তিক, তেমনই অনিশ্চিত ভয়ংকর অসহায় আর অরাজকতায় বিশৃঙ্খল।

তারানাথের বিবরণীতে সেই মাৎস্যন্যায়ের ভয়াবহ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। গৌড়-বংগ-সমতট—কোথাও কোন রাজার আধিপত্য নেই, সর্বময় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দূর অতীতের ঘটনা, ক্ষত্রিয়, বণিক ব্রাহ্মণ নাগরিক সকলেই রাজা। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প বলে এ সময় শিশু নামে এক রাজা সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে নারীর প্রতাপ দুর্জয় হয়ে ওঠে ও রাজা পনের দিনের মধ্যেই নিহত হন। এ সময় দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়। সারা দেশ জুড়ে অন্যায়ের প্রবল প্রবাহ। শুধু পশুবল আর জিঘাংসা, শুধু ষড়যন্ত্র আর গুপ্ত চক্রান্ত, শুধু হীন বিলাসী ব্যভিচার আর পংকিল জীবনযাত্রার অশুচি পরিমণ্ডল সমগ্র বাংলাদেশকে প্রায় একশ বছর অধর্ষ পংগু হীনবল অশান্ত করে রাখল। এর কিছু পরে, এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য 'প্রকৃতিপুঞ্জ' সম্মিলিত হয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব দিলেন একজনের হাতে, তাঁর নাম গোপাল, তিনি পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে বাঁচালেন। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস। তার সংগে কর্ণসুবর্ণের কোন যোগ নেই। সেই পাল-সম্রাটদের রাজধানী বাদগড় আজকের এই রাঙামাটি গ্রাম থেকে অনেক দূরে!

স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছি আর স্মৃতির পর্দায় ইতিহাসের চলচ্চিত্র প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। হারিয়ে গেছে সেই সুবিশাল স্বর্ণবৃষ্টিতে সিঞ্চিত মহানগরী কর্ণসুবর্ণ! নেই মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কর রাজপ্রাসাদ, নেই হিউ-এন-সাঙ বর্ণিত 'লো-টো-বী-চী' বা লো-টো-মো-চিহ-বা রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার, নেই প্রায় তিরিশটি সংঘারামের একটিও, নেই পঞ্চাশ হিন্দু মন্দিরের একটিও বিগ্রহ।

শোনা যায় এখানকার ঐ যমুনা পুষ্করিণী থেকে একটি বড় অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি একবার পাওয়া গিয়েছিল আর ঠাকুরবাড়ীডাঙা যখন গংগার প্রবাহে ভেংগে পড়ে তখন পাওয়া গেছে একটি সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা। আজ আর সে সবের কোন চিহ্নই নেই। কোথায় ছিল মহানাবিক ও বণিক শ্রীবুদ্ধ গুপ্তের বাড়ী যেখান থেকে তিনি একদিন তাম্রলিপ্তি বন্দর হয়ে যাত্রা করেছিলেন পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রতীরের দেশগুলির দিকে। আজ আর তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাবার কোন উপায় নেই। ভাবতে কেমন রোমাঞ্চিত বোধ করি, আজকের এই নিতান্ত অবহেলায় অযত্নে নির্জনে নির্বাসিত এই গ্রাম রাঙামাটি এক সময় সমগ্র বাংলাদেশের রাজধানী ছিল।

এখানেই এসেছিলেন পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ। কোথায় উঠেছিলেন তিনি? ঐ রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারে? যার কাছে দাঁড়িয়ে আমি এক অখ্যাত পরিব্রাজক তেরোশ বছর আগের কর্ণসুবর্ণের বৈভব আর সৌন্দর্য দেখবার জন্য কল্পনায় অবগাহন করছি! কোথাও কেউ নেই, একজন শ্রমণ নয়, মহারাজের কোন সম্ভ্রম প্রজা নয়—আর গল্প-কথার সেই মানুষটিও নয়—যে লোককে আলো দেখাবার উদ্দেশ্যে মাথায় আলো বেঁধে কর্ণসুবর্ণের পথে পথে ঘুরে বেড়াত! আজ আর কেউ নেই, কিছু নেই। ঐ দূরের বড় বাঁধানো কুয়োটিও কি এই সংঘারামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল! তখন আমার কৌতূহলের সংগে মিশ্রিত ছিল অজ্ঞতা। পরে কর্ণসুবর্ণের খননকার্যের পরিচালক শ্রীসুধীররঞ্জন দাস বলেছিলেন আমাকে যে ওটি ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তৈরী। সম্ভবত নীলকুঠি স্থাপন করে থাকবেন তাঁরা এখানে।

বেলা শেষ হয়ে আসছে। রাঙামাটির লাল পটভূমিকায় লালসূর্য অস্তমিত হচ্ছে! আজ সকালের প্রথম সূর্যকে আমি দেখেছি। সারা দিনে সে আমার সংগী ছিল—এখন ব্যথাতুর ম্লান আলো এই বিলুপ্ত রাজধানী কর্ণসুবর্ণের শেষ শয্যায় কেমন বিষণ্ণতার করুণ ছায়া ফেলেছে।

এইখানেই একদিন মহারাজ শশাঙ্কর নেতৃত্বে সমগ্র বাংলা ও বাঙালী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলো, অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তার স্বাতন্ত্র্য। তারপর এইখানেই মাৎস্যন্যায়ের রক্তাক্ত পরিবেশে সৌভাগ্যসূর্য এমনই বিষণ্ণতার ম্লান আলো ফেলে কর্ণসুবর্ণকে ব্যথাতুর করেছিলো। বাংলার মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছিল! কিন্তু নিঃশেষে হারিয়ে যায় নি, সূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হয় না। এই রক্তাক্ত পটভূমিকা থেকেই নতুন উজ্জীবনের দীক্ষা নিয়ে নতুন বাংলা গড়ে তুলেছিল বাংলার মানুষ নিজেদের মনোনীত অধীশ্বর গোপাল দেবের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে। বাংলার ইতিহাসে সেই প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন, গণদেবতার পূজো। এবার আমি সেই পুণ্যভূমিতে যাবো।

কিন্তু যাবার আগে প্রণাম করব কর্ণসুবর্ণের লাল মাটিকে যেখানে প্রথম একজন মহাপরাক্রমশালী মানুষের নেতৃত্বে সমগ্র বাংলা ও বাঙালী ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিজেদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছিলো এবং নিজেদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান অধিকার করে নিতে পেরেছিলো।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। ১৫ ।।

দেখা গেল মেয়েটির স্বভাব যেমন মিষ্টি—দৃষ্টি সেই পরিমাণেই তীক্ষ্ণ। বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই দিতে কার্পণ্য করেননি ভগবান।

হেমন্তর খেয়াল না থাকলেও তার ছিল। পিসী নিশ্চয় একা আসেনি, আর ঐ যে ছোকরা মুখ গোঁজ করে পিছু পিছু আসছে সেই নিশ্চয় ওর বাহন—এটা অনুমান করে বেশ শ্রুতিগোচরভাবেই পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করে নিল, 'ইনি—পিসীমা?'

'ও, ওটি? ও আমার এক দেওরপো, নিমাই। ওর ভরসাতেই তো আসা।'

'বাঃ, তাহলে তো আমার দাদা হলেন।' এই বলে নিমাই কিছু বোঝার কি বাধা দেবার আগেই হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম করে বসল। সেই সঙ্গে রীতি-মাফিক হেমন্ত আর শ্বশুর-শাশুড়িকেও।

নিমাইয়ের এ অভিজ্ঞতা এই-ই প্রথম। সে এতই হক-চকিয়ে গিছল যে হাঁ-হাঁ করে ওঠা তো দূরের কথা সাধারণ সৌজন্য সূচক কথাগুলোও তার মুখে যোগাল না। তাকে কেউ এত সম্মান দিচ্ছে, বিশেষ এক গয়না পরা এমন সুন্দর চেহারার একটি মেয়ে—এ যেন তার দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছে না।

সে বোকার মতো—সত্যি সত্যিই হাঁ করে (সে মুখ বুজতে বহু বিলম্ব হওয়ায় বিস্ময়টা সকলেরই দৃষ্টিগোচর এবং হাস্যকর হয়ে উঠল) খানিকটা তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'বা বা—আমি একটা বোন পেয়ে গেলুম ফাঁক তালে। তা তাহলে আমিই বা কম যাই কেন, আবুইমাদের পেন্নামটা সেরে নিই।'

এই বলে সে সেইখানেই, আনন্দবাজারের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ঢিব ঢিব করে সবাইকে এক দফা প্রণাম করে নিল। ঝোঁকের মাথায় সদ্য পাওয়া বোনটিকেও করে ফেলত হয়ত—যদি না সে সম্ভাবনা অনুমান করে সে যথাসময়ে খানিকটা পিছিয়ে যেত।

সিঁড়ি দিয়ে মন্দির থেকে নামতে নামতে হেমন্ত কুন্ঠিত কন্ঠে বলল, 'পতানো নয় রক্তের সম্পর্ক—একথা বলতেও মাথা কাটা যায়—যাবারই কথাও—তবু লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, তোমার নামটাই আমার এখনও জানা হল না।'

মেয়েটি হাসল। বলল, 'ওমা, এতে আর লজ্জার কথা কি আছে। দ্যাখোনি কখনও—জন্মে এস্তকই দ্যাখোনি— আসা-যাওয়া খোঁজ-খবর নেই—খামোকা নাম জানতে যাবে কি জন্যে, কেই বা বলবে!... আমার নাম নিতা। ছোটবেলায় ঠাকুদ্দা এক উদখুট্টে নাম রেখেছিলেন—ভুবনেশ্বরী না কি যেন—মাতঙ্গী কি ছিন্নমস্তা রাখেননি এই আমার ভাগ্যি—তা সে নাম এখনও কাগজেপত্তরে কাজে লাগছে—কিন্তু মা আমাকে নিতা বলে ডাকে, সেই নামেই চেনে সবাই। তুমিও আমাকে নিতাই বলো!'

তারপর একটু হেসে 'বাট-জগন্নাথের* কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন, মুচকি হেসে বলল, 'ছোটকার তো সবেতেই রঙ্গ-রস করা—ছোটকাই শুধু নামটা উলটে ডাকত ভানি। বিচ্ছিরি!'

হেমন্ত আবারও যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উদ্বিগ্ন ঈষৎ করুণ কণ্ঠে বলে, 'ডাকত বলছিস কেন রে? তোর ছোটকা—? তার কথা কেবলই চেপে যাচ্ছিস কেন? সে-সে বেঁচে আছে তো? মাথাখাস—লুকোসনি, সত্যি করে বল।'

হাসিটা একেবারে মিলোয় না বটে কিন্তু নিতার মুখও ঈষৎ বিষণ্ণগম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, ডাকত বলেছি—ওটা কথার দোষ। মানে ছেলেবেলায় ডাকত বের পর কি আর ও নামে ডাকতে পারে—সেই জন্যেই। না, মরেনি, বেঁচেই আছে। তবে সে না থাকার মধ্যেই।...চলো না, এই তো বেরিয়েই পড়েছি। আমাদের গাড়ি যাওয়া-আসা ভাড়া করা দাঁড়িয়েই আছে। তোমরা কোথায় আছো। তোমরা কোথায় আছ বললে? ও কাচকামিণীর বাড়ির কাছে সে তো আমাদের ওখান থেকে বড়-জোর এক রশি পথ হবে। চলো চলো, একসঙ্গেই যাই। তোমরা একটা গাড়ি করে নাও পুরুষরা একটা গাড়িতে ওঠো—আমরা আর একটা গাড়িতে যাই গল্প করতে করতে। আমাদের ওখানে নেমে জলটল খেয়ে তবে যেয়ো।'

নিতা যেন ওদের কিছু ভাবার অবসর দেয় না, তার অনুরোধের মধুর আন্তরিক ভঙ্গী আর প্রবল ইচ্ছা শক্তির বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

এপক্ষেও অবশ্য বাধা দেওয়ার ইচ্ছা বা কারণ ছিল না। এমন কিছু বেশী বেলা হয়নি। তাছাড়া হেমন্তর অনেক কথা এখনও শুনতে হবে, অনেক কথা জানা দরকার। এই মেয়েটাকেও ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, ও যেন দশ মিনিটে রাজ্যের মায়া নিয়ে এসে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনের পরিচয় মাঝে কিছুদিন দেখা হয়নি, অনেকদিন ওর পথ চেয়েই ছিল।

সে তাই নিমাইকে একটা গাড়ি ঠিক করে নিতার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে আসতে বলে নিতা আর তার শাশুড়ির সঙ্গে ওদের ছইওলা গরুর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে আর একটি ছোট মেয়েও ছিল দশ-এগার বছরের বোধ হয় নিতার ননদ, তাকে পুরুষদের সঙ্গে ঐ গাড়িতে যেতে বলল, কিন্তু সে প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে বৌদিকে জড়িয়ে ধরল, তাকে ছেড়ে সে যাবে না। অগত্যা চারজনেই উঠল ওরা এক গাড়িতে। একটু ঠাসাঠাসি হল কিন্তু

---

* সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে ডানহাতি যে একটি জগন্নাথ মূর্তি আছে। আগে তাকে বলা হত 'বাট-জগন্নাথ'—এখন অনেকে বলেন 'পতিত পাবন'। যাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই—তাদের [illegible]।

তখন ওদের সেটা খারাপ লাগার কথা নয়। হঠাৎ পাওয়া আত্মীয়ের সঙ্গে এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা বরং ভালই লাগল।

এর ভেতর নিজ কথা বলেই যাচ্ছে। সহজ অন্তরঙ্গ কথা।

'চলো, ওখানে বসে দুদণ্ড জিরোও তো। খুব হাওয়া বাড়িটায় উড়িয়ে নিয়ে যায় একেবারে। চাইকি, রান্নার ব্যবস্থা যদি করা না থাকে—আমি যেয়েই ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি, দুটো ডাল-ভাত খেয়েই যাও একেবারে। আমার দীক্ষা হয়ে গেছে—খেলে দোষ হবে না। বাড়িতে নারায়ণ আছেন, ভোগ রাঁধতে হয় বলে বাবা বের সঙ্গে সঙ্গেই মন্তর দিয়ে দিয়েছেন—নইলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না তো।... বাবা এখানে পেসাদ ছাড়া কিছু খান না—বলেন মাসখানেকের জন্যে এসে আর পুরী পোড়াব না—তা পেসাদ আসতে তো সেই ধরো যার নাম বেলা একটা-দেড়টা—ছেলেমেয়েরা কি ততক্ষণ টাঙ্গিয়ে থাকতে পারে? তাছাড়া—আমাদের পেসাদ ভালই লাগে—কিন্তু আঝালা আতেলা ওরা বেশীদিন হয়ত খেতেও চাইবে না। আবার শুনছি তো মহাপেসাদের সঙ্গে তেলের তরকারী মাছ-মাংস ঠেকাতে নেই। কাজেই আমাদের জন্যে উনুন জ্বালতেই হয়!'

ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে ওরা, গাড়ি চলতে শুরু করেছে স্বর্গদ্বারের দিকে দক্ষিণ মুখো। আস্তে আস্তে চলছে— দুদিকে ভিখিরির ভিড় বাঁচিয়ে সকীর্ণ গলিপথের মধ্যে দিয়ে চলা, দ্রুত চলার উপায়ও নেই। মানুষটানা নয়—এখনও যা দু-একটা বলদে টানা গাড়ি আছে, এ তারই একটা। তবে হেমন্তর পরিচিত ওদের দেশের গো-গাড়ির মতো নিচের বসার জায়গা শক্ত এবড়ো খেবড়ো বাঁশে তৈরী নয়, বেশ মসৃণ, তাতে পাতা, বসতে কোন অসুবিধা নেই।

হেমন্ত বলল, 'তাও তো বটে। আমার কপাল। কথাটা এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি। তোমার ছেলেমেয়ে কটি। কৈ তাদের মন্দিরে আনোনি?'

'আমার পেটের দুটিই। একটি ছেলে একটি মেয়ে। এসেছে তারা। এর আগে দু-তিন দিন দর্শন করে গেছে। তারা ছোটকাকে ছেড়ে আসতে চায় না। ওর সঙ্গেই তাদের জমে বেশী!'

'ছোটকা—মানে শিবু? তোমার সঙ্গে এসেছে? এখানে আছে?'

যেন বিশ্বাই হতে চায় না কথাটা হেমন্তর।

'হ্যাঁ গো, তাই তো আরও টেনে নিয়ে যাচ্ছি তোমায়!' তার পর চোখে একটু কৌতুকের ভঙ্গী করে বলে, ইচ্ছে ছিল হঠাৎ দেখা করিয়ে চমকে দেবো। তাই কথাটা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলুম।... কথার পৃষ্ঠে কথাটা এসে পড়ল বলেই—'

শুধু এখানে বা এখন নয়, অনেকদিন থেকেই নিতার কাছে আছে শিবু।

যেতে যেতে সংক্ষেপে শিবুর অনেক কথাই দিল নিতা।

ওর নিজের প্রসঙ্গেই বেশী অবশ্য।

যাকে বাঙ্গাল দেশ বলে সেইখানেই বিয়ে হয়েছে নিতার। জেলা হিসেবে নদীয়া হলেও আসলে ফরিদপুরের প্রান্তে ওদের গ্রাম। ওর শ্বশুর-শাশুড়ির কথাতে সেই টানটাই স্পষ্ট।

সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ওঁরা, জোতজমা যথেষ্ট। লেখাপড়াও শিখেছে, পয়সা আছে বলে বসে খায় না কেউ। নিতার স্বামী বি-এ পাশ, ওখানকার ইস্কুলে মাস্টারী করে। তবে সেটা নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। দেশের জমিজমা ক্ষেতখামার দেখাশুনো করার জন্যেই কলকাতায় চাকরি নেয়নি, অন্য কোথাও বা অন্য কোন কাজ পাওয়ার চেষ্টা করেনি। নিতার একটি মাত্র দেওর, সে ডাক্তারী পড়ে, তার পক্ষে বিষয়আশয়ের কাজ দেখা সম্ভব নয়। গুরুদাসবাবু বহু-দিন ধরেই সংসারবিমুখ, পুজোপাঠ নিয়েই থাকেন—বৈষয়িক ঝামেলায় আর যেতে চান না। সুতরাং ওদিকের সমস্ত দায়িত্বই নিতার স্বামী অতুলপ্রসাদের।

এই সম্বন্ধ নাকি শিবুই আনে।

সে হতভাগা ভবঘুরে—তার নিজের ভাষাতেই 'ভ্যাগাবেন' কিন্তু তার বন্ধু-বান্ধবদের সবাই ও-শ্রেণীর নয়। তার নিজের মতো একটা সততা ও আত্মসম্মান জ্ঞানের জন্যে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃ-পুরেই যাতায়াত ছিল। অবস্থাপন্ন বন্ধু-বান্ধবরা তো ওকে ভালবাসতই—তাদের অভিভাবকরাও স্নেহের চোখে দেখতেন।

এই রকম একটি বন্ধু পরিবারের সূত্রেই গুরুদাসবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তিনি বড় ছেলের বিয়ে দেবেন এই খবর পেয়ে—পাত্রটিকে দেখে ও তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভাল ছেলে বুঝে—নিতার কথাটা পাড়ে ও গুরুদাসবাবুকে একরকম পাকড়াও করে ধরে এনে মেয়ে দেখিয়ে দেয়।

মেয়ে অপছন্দ হওয়ার কোন কারণ ছিল না, হয়ওনি।

পাত্রপক্ষ বিশেষ কোন কামড়ও করেননি। নগদ টাকা তাঁরা চাননি একটিও—হয়ত মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছিল আর পাত্রীর বাবার অবস্থাও বুঝেছিলেন, সেই-জন্যেই চাননি, পাছে বেশী টানতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে যায়—শুধু 'গা-সাজানো গহনা ও সাধারণ দানসামগ্রী যা হয় দেবেন' এই কথাই বলে দিয়েছিলেন। এছাড়া আর একটি মাত্র শর্ত ছিল—দেশ থেকে জনকুড়ি বরযাত্রী আসবে, তাদের দুদিন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিতার অভিভাবক অশ্বেত বা বাদল চিরদিনের ভাল মানুষ মুখচোরা লোক, সেই হিসেবে একটু বোকাও—সে এক কথায় রাজী হয়েছিল—সম্মত হওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব না বুঝেই। হয়ত তার ধারণা ছিল শিষ্য-শ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন ক্ষীয়মাণ হলেও এখনও যা আছে, কন্যাদায় জানালে তাদের মধ্যে থেকেই এ-টাকাটা অনায়াসে উঠে যাবে।

তাও উঠত হয়ত—যদি তেমন চেষ্টা করা যেত। সে উদ্যম ও বুদ্ধি বাদলের নেই। সুতরাং বিশেষ কিছুই ওঠেনি, যা প্রয়োজন তার অর্ধেকও ওঠেনি নাকি। বাদল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধুই আশা করে বসেছিল—দিনের পর দিন কেটেছে—না পেয়েছে অন্য কোন ব্যবস্থা করতে—না পেরেছে সমস্যার কথাটা কাউকে জানিয়ে সুপরামর্শ চাইতে।

বলেছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। বরযাত্রী এসে পৌঁছবার যখন আর মাত্র দুটি দিন বাকী। বলেছে শিবুকেই, কিন্তু সে কোন উপায় করতে পারবে বা কোন সদ্‌-যুক্তি দিতে পারবে এ-ধরনের কোন আশায় নয়—যেহেতু শিবুই ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, সেইহেতুই শিবুর কাছে বিপদের কথাটা জানিয়েছে—বিয়েটা বন্ধ করা কিম্বা পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা, শিবু সেদিক দিয়ে কিছু করতে পারে কিনা সেই উদ্দেশ্যেই।

সে-সময় নাকি একবার হেমন্তর কথাও তুলেছিল বাদল। শিবুকে তো ভালবাসে। সে গিয়ে চাইলে কি আর এই তিন-চারশো টাকাটা দেবে না হেমন্ত? দান নয়—ধার হিসেবেই চাইবে।

শিবু বলেছিল, না। সে আমি চাইতে পারব না। আর সে দিদি দেবেও না। তোমাদের তো একেবারে গুড়পানা ভাল-বাসে—তা জানো না? মিছিমিছি মুখ নষ্ট। আর ধার বলে চাইবে—শোধ দেবে কোথা থেকে? এই তো এতদিন দেখলে, কোন আয়ের পথ কি করতে পেরেছ একটা? তবে আবার ধার চাও কোন্‌ আক্কেলে? সে জানে আমি কথার ঠিক রাখি, আমি চাইলে হয়ত দেবে—কিন্তু আমি সেইজন্যেই চাইব না। অত টাকা শোধ দেওয়া আমার হাড়ে হবে না। আর আমি যখন পারব না জানি—তখন সে-দায়িত্ব ঘাড়ে নোব কোন্‌ ভরসায়?'

এ-কথার কোন উত্তর দিতে পারেনি বাদল। মাথা হেঁট করে বসে থেকেছে শুধু।

শেষপর্যন্ত শিবুই নাকি অসাধ্য সাধন করেছে। পুরনো নতুন সব পাড়া ঘুরে ওর আলাপী বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেই নাকি ঐ বিপুল টাকাটা তুলেছে সে। বেশী কারও কাছ থেকে নেয়নি, কোন একজনের বোঝা না হয়ে পড়ে। দশ-পনেরো-বিশ করে নিয়েছে—তাও ধার বলে নয়, দান বা সাহায্য হিসেবেই চেয়ে নিয়েছে। স্পষ্টই বলে দিয়েছে চাইবার সময়—'আমার যে শোধ দেবার ক্ষমতা নেই সে তো তোমরা জানোই, আর আমার দাদা আমার মতো বকাটে-বাউণ্ডুলে না হলেও তার অবস্থাও আমার থেকে ভাল নয়। শোধ দিতে পারব না কোনদিনই—এ বুঝে যে দিতে পারবে সে দাও।'

তাই দিয়েছে—যাদের যাদের কাছে গিয়েছিল তাদের প্রায় সবাই। পাঁচ দশ কুড়ি পর্যন্ত দিয়েছে এক-আধজন। তিনদিনের মধ্যেই উঠে গেছে টাকাটা।

সেই ঋণটাই নিতা ভোলেনি। স্বামী শ্বশুরবাড়ি—যাকে ঘরবর বলে—পেয়ে পূর্ণ তৃপ্ত সে। নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে।

শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদরা তাকেই সর্বময়ী কর্ত্রী করে রেখেছে—স্বচ্ছল উপ্‌চে-পড়া সংসার, দেবতার মতো স্বামী। যে অবস্থায়, যে অভাব-অনটন এবং সেই কারণেই অপমানের মধ্যে দিন কেটেছে বাপের বাড়িতে, সে-দারিদ্র্য সেসব দিনের কথা ভাবলে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তা থেকে যে মুক্তি পেয়েছে, এই অভাবনীয় সুখের মধ্যে এসে পড়তে পেরেছে, সে তো শুধু ঐ সকল সুখসৌভাগ্যের আশাহীন, সর্ববঞ্চিত হতভাগ্য কাকাটার জন্যেই। শুধু শেষ মুহূর্তে টাকাটা তুলে দিয়ে বিয়েটা সম্ভব করেছে বলেই নয়—সম্বন্ধটাও সে-ই এনেছিল। নইলে বাদলের সাহসেই কুলোত না এমন পাত্রের দিকে হাত বাড়াবার। হয়ত কোন পাত্রের জন্যেই যথেষ্ট সক্রিয় হতে পারত না, আদৌ যে তার পক্ষে মেয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করা সম্ভব তাই হয়ত মাথায় যেত না তার।

সেইজন্যেই যেদিন শুনেছে যে শিবুর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। বোধহয় আর বেশী দিন বাঁচবেই না—প্রকৃতি এইবার এতদিনের অনাচার-অবহেলার শোধ নিতে শুরু করেছেন—সেদিন আর স্থির থাকতে পারেনি। আগে স্বামীকে বলেছে, তাঁর মত নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়িকে বলেছে। তাঁরা যে শুধু আপত্তি করেননি তাই নয়, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, নিজেরাই তৎপর হয়ে লোক সঙ্গে দিয়ে নিতাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন শিবুকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সঙ্গে বেশী করে টাকা দিয়ে দিয়েছেন যে অবস্থা যদি খুব খারাপ দেখে তো যেন ভাল বড় কোন ডাক্তার দেখিয়ে কিছুটা সুস্থ করে তুলে ট্রেনে সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ করিয়ে যেন নিয়ে যায়।

এত কাণ্ডর প্রয়োজন হবে প্রথমে তা ভাবেনি নিতা। গুরুদাসবাবু যখন একেবারে দুশো টাকা ওর হাতে দিয়েছেন, তখন সে আপত্তিই করেছে। গুরুদাসবাবু একরকম জোর করেই দিয়েছেন টাকাটা। কদিনের পরিচয়ে তিনিও এই বাউণ্ডুলে প্রায়-আত্মঘাতী ছেলেটাকে স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। এমন নিজের হাতে নিজের জীবন উড়িয়ে দেওয়া দেখলে সাধারণত লোকে অবজ্ঞার চোখে দেখে—তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চায়—কিন্তু শিবুর মধ্যে কী একটা ছিল, সময়ে সময়ে তার মন মহত্তর চিত্তবৃত্তির স্তরে উঠে যেতে পারত অনায়াসে। তার মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্বের প্রকাশও অস্বাভাবিক বোধ হত না। সেইজন্যেই অনেক ভদ্রছেলে বা ভদ্রলোক ওকে ভালবাসত, প্রশ্রয় দিত, সেই কারণেই গুরুদাসবাবুও এত বিচলিত হয়েছিলেন।

বাপের বাড়ি পৌঁছে মিতা দেখেছিল, শিবুর অবস্থা—ও যতটা আশঙ্কা করে এসেছিল তার থেকে অনেক খারাপ। শিবুর স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না—ওর জন্মের সম্ভাবনারও অনেক আগে থেকে ওর মার শরীর ভেঙে গেছে, নানারকম রোগে শরীর জীর্ণ হয়েছে। সেই প্রায়-মুমূর্ষু অবস্থাতেই গর্ভে বহন ও জন্মদান করেছেন তিনি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বুকের দুধ দিতে পারেননি—জলবার্লি খেয়ে মানুষ হয়েছে। অর্থাৎ ভিতটাই গাঁথা হয়েছে পুরো বালিতে।

তার ওপর, যেটুকু যত্নে ও নিয়মে থাকলে শরীর বাঁধতে পারত—তার কিছুই হয়নি, একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো সে বরং বিপরীতটাই করেছে। জোর করে, যেন জীবনটাকে নষ্ট করার জন্যেই—যত রকমে সম্ভব অনাচার আর অনিয়ম করেছে। নেশা করেছে অথচ তার সঙ্গে যা খাওয়া দরকার তা খায়নি। অর্ধাহারে, অনাহারে থেকে ক্ষয়কারী নেশা করে গেছে। নিয়মিত খাওয়া বা কোন পুষ্টিকর খাওয়ার কথা তো কল্পনাতীত—সবদিন অর্ধাহারও হয়ে ওঠেনি।

এসত্ত্বেও যে এতকাল বেঁচে ছিল—শুধু এই উচ্ছৃংখলতার সর্বপ্রধান আনুষঙ্গিক যেটা—স্ত্রীলোক-ঘটিত অনাচারটা তার ছিল না বলেই।

তবু প্রকৃতি বেশী দিন এ-ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন তা সম্ভব নয়। তিনি প্রথম প্রথম কয়েকবার হুঁশিয়ার করে ছেড়ে দিয়েছেন, শিবুর নিজের ভাষায় 'ওআর্নিং' দিয়ে—সে সতর্কবাণীতে জেমেশুনেও কান দেয়নি শিবু, গ্রাহ্য করেনি। বহুদিন সহ্য করে থেকে থেকে শেষপর্যন্ত সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন তিনি। মিতা যখন গেছে তখন আর ওঠার অবস্থা নেই। গ্রহণী রোগ ধরেছে, দৈনিক উনিশ-কুড়িবার পাইখানায় যেতে হয়। কিছুই সহ্য হয় না—সামান্য ঝোলভাতও খেতে পারে না। পেটে খাদ্যনালীতে বোধহয় ঘা হয়েছে, লঙ্কা তো অসম্ভব—নুন-দেওয়া কোন খাবার খেলেও অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ডাক্তার বলেছে দুধ-ভাত খেতে—কিন্তু গুড় বা চিনি ছাড়া দুধ-ভাত খেতে পারে না, খেলে বমি হয়ে যায়। সুতরাং প্রায় অনাহারেই দিন কাটছে।

এর ওপর ঘুষঘুষে জ্বর আসছে রোজ। তার সঙ্গে চটচটে ঘাম। ডাক্তাররা আশঙ্কা করছেন টি-বি, আগে যাকে থাইসিস বলা হত। যক্ষ্মারোগ। যদিচ তার চূড়ান্ত নির্ণয় তখনও কিছু হয়নি।

তখনও অবস্থা দেখে প্রথমটা তো মিতা কেঁদে বাঁচে না। তবে সেও ওদেরই ভাইঝি, বেশীক্ষণ হাল ছেড়ে বসে বৃথা কান্নাকাটি বা হা-হুতাশ করার লোক নয় সে। সক্রিয় হয়ে উঠতে—মন থেকে হতাশার ভাব দূর করে ফেলে গাঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতে—এক-ঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি তার। সে একেবারেই বড় ডাক্তার নীলরতন সরকারকে আনিয়েছে, তাঁর নির্দেশমত দামী ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেছে, ঠিক টি-বি না অন্য কিছু নির্ণয় করার জন্যে যা যা পরীক্ষা করার সব করিয়েছে।

তবু কিছু সংশয় ছিল, নীলরতনবাবুরই পরামর্শে বিধানবাবুকে এনেও দেখিয়েছে। তিনি অভয় দিয়েছেন, এ-জ্বর যক্ষ্মার জ্বর নয়, দূষিত লিভারের জন্যেই এ-জ্বর হচ্ছে। তবে এও বলে দিয়েছেন, হার্ট বা ফুসফুসের অবস্থা খুব ভাল নয়। অচিরেই হাঁপানির মতো টান দেখা দিতে পারে। যত শীঘ্র হোক কলকাতার বাইরে কোন স্বাস্থ্যকর—নিদেন ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করাই উচিত, তাহলে কিছুটা অন্তত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

মাসখানেক চিকিৎসা চালিয়ে, খানিকটা আশার দিকে মোড় ফিরছে দেখেই, নিতা ওকে নিয়ে নিজের শ্বশুরবাড়ি ফিরে এসেছে। এর মধ্যে আরও টাকা পাঠিয়েছেন গুরুদাসবাবু, শিবুর বন্ধুদের ভেতরও দু-একজন এসে কিছু কিছু টাকা দিয়ে গেছেন। সুতরাং চিকিৎসার কোন অসুবিধা হয়নি—ত্রুটি ঘটেনি। কিন্তু যার দেহে একেবারেই কিছু নেই—শুধু ওষুধপত্রে তাকে কতটা চাঙ্গা করা যায়? আলগা বালির ওপর ভিত করে বিশাল ইমারত তৈরীর মতোই অবাস্তব সে-চেষ্টা।

বলা বাহুল্য ওর জন্যে চিকিৎসার এই ঘটা—বিশেষ নিতার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি করেছিল শিবু। শেষের দিকে তো একেবারেই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। হাঁটাচলার অবস্থা থাকলে পালিয়েই যেত বোধহয়—কিন্তু নিতান্ত নাছোড়বান্দা, ওর সামনে ঢিব-ঢিব করে মাথা খুঁড়ে ওকে রাজী করিয়েছে।

সেই থেকেই মিতার কাছে আছে শিবু। গোড়ায় গোড়ায় খুব ছটফট করেছে চলে আসতে চেয়েছে—তারপর ক্রমে পোষ মেনেছে খুব বেশী আপত্তি করেনি আর। পল্লীগ্রামের জীবন, নিতাদের আদরযত্ন—সবচেয়ে নিতার ছেলেমেয়ে দুটোর মায়া—এসব কাটিয়ে চলে যেতে পারেনি। ঐ কুঁচো দুটোর টানেই আরও পুরী আসতে রাজী হয়েছে। ওরা যেন শিবুর গায়ের পোকা, সর্বদা ঘিরে আছে। অবশ্য ওকে আনার জন্যই আরও নিতাদের পুরীতে আসা, সমুদ্রের হাওয়া লাগলে বুকটা সহজ হবে—এই আশায়।

সংক্ষেপে বললেও অনেকটা সময় লেগেছে।

গোরুর গাড়ির মন্থর যাত্রাও এক সময় শেষ হয়েছে, গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ, এদের খেয়ালও হয়নি। শেষপর্যন্ত পিছনের গাড়িওলার তাড়নায়

জোয়াল থেকে বলদ দুটোকে খুলে সরিয়ে দিতে যখন গাড়িটা সামনের দিকে হেলে পড়েছে—তখন চৈতন্য হয়েছে ওদের। তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে।

শ্মশানের ওপরই বলতে গেলে একতলা বাড়ি একটা—নিতারা ভাড়া নিয়েছে। বাড়িটা নতুন, হাওয়া-বাতাস আছে। সামনেই চওড়া বারান্দা খানিকটা। হেমন্ত নামতে নামতেই লক্ষ্য করেছে, এক অতি শীর্ণ পলিত কেশ বৃদ্ধ বাইরের বারান্দায় বসে দুটি ছোট ফুটফুটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলছে। কে তা কে জানে, হেমন্তর মন এবং চোখ তখন শিবুকেই খুঁজছে। একবার মাত্র বারান্দাটার দিকে চোখ বুলিয়ে শিবু নেই দেখে উৎসুক চোখে ঘরের ভেতরটা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে বারান্দার দিকে এগোচ্ছে—সেই বৃদ্ধটি মুচকি হেসে বলে উঠল, 'আমার মন কেমন যেন বলছিল দিদি যে তুইও আসবি এখানে—তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জগন্নাথ যে বলে অন্তর্যামী হয়ে সকলের মনের খবর জেনে বাঞ্ছা পূরণ করেন— তা কথাটা দেখছি নিহাৎ মিথ্যে নয়।'

পাথরের মতো হয়ে দাঁড়িয়ে গেল হেমন্ত।এই রুগ্ন অতি বৃদ্ধ লোকটাই শিবু? তার অনেক পরের ছোট ভাই?

(ক্রমশঃ)

কথা

সুশান্তকুমার মিত্র

এক-একজন এক-একটি বিশেষ গুণের জন্যে অমর হয়েছেন জগতে। যুধিষ্ঠির সত্যবাদিতায়, সীতা-সাবিত্রী সতীত্বে, পার্বতী দুঃখ-তপশ্চর্যায় হারকিউলিস বীরত্বে, আর 'জুলিয়াস সিজারে'র এণ্টনি এবং আমাদের মঙ্গলকাব্যের ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীল চরিত্রদ্বয় শুধু কথায়।

কথা বলতে ট্যাক্স লাগে না, তাই আমরা হামেশাই অনর্গল বকে যাই। কখনো কেজো কথায় করি কথার সদ্ব্যবহার, কখনো বা বাজে কথার অপব্যবহার। অনেকটা কর্পোরেশনের কলের জলের মতো। কিন্তু পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় জিভের সাহায্যে ও মনের সাহচর্যে আমরা যা প্রকাশ করি, আসলে তা একটি শিল্পসৃষ্টি। কথার একটা মোহ আছে, মায়া আছে। সুন্দর করে বলতে পারলে, প্রাণ সৃষ্টি করতে পারলে, অপরের মনে রামধনুর সাতটা রঙ জাগিয়ে তোলা যায়। কথা হয়ে ওঠে ভাবপ্রকাশের পরশমণি।

কিন্তু সকলে তা পারে না। 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।' তাই গ্লাডস্টোন, ডিজ্রেলী, বার্ক প্রমুখ বক্তারা একদিন কথার মায়ায় জগতকে ভুলিয়েছিলেন, এ দেশের-বিদেশের বহু কবি-সাহিত্যিক কথা লিখে যুগকে অতিক্রম করেছেন কথার মায়াজাল বিস্তার করে। সুবক্তা বা অধ্যাপকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতাকে আবিষ্ট করে রাখেন। শব্দের এই অলৌকিক ক্ষমতার জন্যেই বোধহয় উপনিষদ্ বলেছেন—'শব্দব্রহ্মঃ'!

এই ব্রহ্মই আবার সময় সময় ব্রহ্মাস্ত্র-রূপে শ্রোতার কর্ণপটহ বিদ্ধ করে থাকে। সভা-সমিতিতে প্রায়ই দেখা যায় এক শ্রেণীর দিগ্‌ভ্রান্ত বক্তা বক্তৃতাযন্ত্রকে পরমাত্মীয় করে যেন মহাকালের সঙ্গে অলিখিত চুক্তির বলে, কিন্তু মহাকালের একটি পল অতিক্রম করার পর অলিহিক্‌ শ্রোতার দুর্যোগপূর্ণ করতালি সত্ত্বেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি তা' উপেক্ষা করার দুঃসাহস রাখেন, কারণ এখন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে আকাঙ্ক্ষা আবেগ ও জ্ঞানই মানুষের কর্মের উৎস এবং আরিস্টটলের মতে আবেগধর্মী প্রকাশব্যাকুলতা থেকেই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব তখন সংবিধান-প্রদত্ত বাক্ প্রকাশের মৌলিক স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে বাধা কোথায়?

শ্রোতারা আগ্রহসহকারে হেঁদো কথা শোনে, অথচ ক্যালোয়াতি গানের মতো বক্তৃতার প্রতি চিরকালই বিরূপ। আধুনিক কবিতা বা চিত্রকলার দুর্বোধ্য ব্যঞ্জনা যদি সমাজের সকলেই মেনে নেয়, ম্যালেরিয়া রোগীকে স্বাস্থ্যের কারণে পাঁচন গেলানোটা যদি ন্যায়নীতি হয়, তবে বক্তৃতাকেও আপন আসনে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে বক্তার কণ্ঠের জোরে। অবশ্য এটা হচ্ছে যে-কোন বাক্যবাগীশের জীবনদর্শন। কিন্তু মানুষ তা মানে না, শোনে না। সে থাকে তার ভালমন্দ লাগার জগৎ নিয়ে। হয়তো স্বাধীনোত্তর চব্বিশ বছরের সুদীর্ঘ বাণী শুনে আজ এই যুগমানসের কথার প্রতি এত অনাসক্তি জেগেছে। আসলে 'কথা বলবার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে বেশি কথা বললে কেউ শুনতে চায়না আবার অল্পের মধ্যে সংকীর্ণ করে বললেও কেউ বুঝতে পারে না।' পঞ্চাশ বছর আগে সুকুমার রায় এ-সত্যটা বুঝেছিলেন। কিন্তু এ-যুগে এ-দুয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে যারা শ্রোতার মুখপাত্তানি মাসিপিসি হয়ে ওঠেন, তারা কথায় অলৌকিক মায়ার জগৎ সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত (যদিও দার্শনিক মিলার বলেছেন—

'An artist is best known by what he omits'

একশনের যেমন রি-একশন আছে, কারণের পেছনে আছে কার্য, তেমনি নীরস বক্তৃতা নিছক শিল্পসৃষ্টি করতে না পারলেও, শিল্পী সৃষ্টি করে থাকে। শিবরাম চক্রবর্তীর কথায় বলি—'কারো বক্তৃতার ফাঁকে আপনি গান গাইতে পারেন না, অথচ কাগজ-পেনসিল নিয়ে ঐ অবকাশে অনায়াসেই ছবি আঁকা যায়।...আমি যে চিত্রশিল্পে সিদ্ধহস্ত একথা বলি না, তবে আর কয়েকটা সভা-সমিতিতে যোগ দিতে দিতেই পারদর্শী হতে পারব এমন আশা রাখি।'

বোবা এবং কালাদের ভগবান বাঁচিয়েছেন কিনা জানি না, তবে আমরা—সাধারণ মানুষেরা কথার বিচিত্ররস আস্বাদন করি। যেমন শালা শব্দটি অতি প্রাঞ্জল শব্দ। শিশুর মুখে শুনলে মনপ্রাণ সব জল হয়ে যায়, বড়দের মুখে শুনলে প্রাণটা সেই

পরিমাপেই জন্লে। শব্দব্রহ্মের কি বিচিত্র-লীলা! কি ম্যাজিকরস!

আবার খেন্তির পিসির খ্যান খ্যানে কথায় তার ভিটেতে অনাহূত কাকচিলও বসতে ভরসা পায় না; অথচ কৌতুক অভিনেতার কথা শোনবার জন্যে লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কেনে। কথার কি বিচিত্র প্রেম! কি আকর্ষণী-বিকর্ষণী শক্তি!!

কথায় কিনা হয়? কথায় চিঁড়ে ভেজে, এককথায় রামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্যে বনে যান, স্বাধীনোত্তর ভারতের উন্নয়ন শুধু কথার সেতু রচনা করেই বাস্তব প্রগতিকেও ছাপিয়ে যায়। কথার বিরাট কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের শ্রদ্ধাবিশ্বাস আস্থা এবং অনাস্থাও। তাই আবহবার্তা শুনে আমরা অক্লেশে বুঝে নি বরুণদেবের রসিকতাটা। কথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের মনের অসংখ্য ভাব—স্পষ্ট অস্পষ্ট ব্যক্ত অব্যক্তভাবে। তাই সুচারুবাকের মাধ্যমে আমরা যে স্বাদ পাই তা 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরম্'।

ব্রহ্মাস্বাদ আবার ব্রহ্মদৈত্যের দাঁত খিঁচুনি হয়ে উঠতে পারে যদি বক্তাকে তার চারুবাকের জন্যে জবাবদিহি করতে হয়, সমালোচকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই দুঃখ করে বলেছেন—"কথা বলার দায়িত্ব আমার, কিন্তু মানে করার দায়িত্ব আমার নয়। সুতরাং কোন্ কথার টিকে কখন কোন চালে আগুন ধরায়......।"

দৈনন্দিন জীবনে কাজের কথার মূল্য বেশি, তার চেয়েও মূল্যবান গোপন কথা—যা "এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়।" কিন্তু কথা যেখানে বাক্যহারা, ব্যথা যেখানে অতলস্পর্শী, সেই কথাই গভীর ব্যঞ্জনাময় ও মর্মস্পর্শী। মুখের ভাষা যখন নীরব হয় তখন চোখের ভাষায় ঘটে তার প্রকাশ। সেই কথার মধ্যেই মানুষের অন্তরের অন্তঃপুরের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু জীবননদী মানে তো অতলগর্ভ ক্ষীণস্রোতা নয়—কখন খরস্রোতা লঘু চপল ঝর্ণাও। তাই মানুষ "গভীর সুরে গভীর কথা"র সঙ্গে সঙ্গে বলে ভাবের কথা, রসের কথা, রাগের কথা, কথার কথা, মনরাখা কথা, মনের কথা, লঘু চপল হাল্কা কথা, অনুভূতির কথা। কিন্তু অধিকাংশ সময় যেটা বলে থাকে সেটা হচ্ছে বাজে কথা। চাণক্য পন্ডিত বাজে কথায় বিদ্যে জাহির হবার সম্ভাবনায় ব্যক্তি-বিশেষকে "কিঞ্চিন্নভাষতে" অর্থাৎ কিছু না বলতে অনুরোধ করেছেন। অথচ "বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। কাজের কথায় আমরা প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। সেখানে আমরা সকলেই এক, অভিন্ন। কিন্তু বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।" (রবীন্দ্রনাথ)।

রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'অপরাধী'কে সকলেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় মিথ্যে কথা বলার জন্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানেন মিথ্যে আর সত্যের অপলাপের সূক্ষ্ম পার্থক্যটা কোথায়।

স্বভাব ওর আসর-জমানো;
কথা কয় বিস্তর,
তাই, বিস্তর মিছে বলতে হয়—
নইলে ফাঁক পড়ে কথার ঠাস-বুনোনিতে।
মিছেটা ওর মনে নয়,
সে ওর ভাষায়—
ওর ব্যাকরণটা যার জানা
তার বুঝতে হয় না দেরী।...
সত্যকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে
দিয়ে ও নিন্দে বানায়—
যার নিন্দে করে তার
মন্দ হবে বলে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের
ভালো লাগবে বলে।

বাস্তব সত্যের চেয়ে সাহিত্যের সত্য তাই অধিকতর সত্য। যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। কবির 'মনোভূমি' তাই অযোধ্যার চেয়েও সত্যতর হয়ে আছে।

এই কারণেই প্রমথ চৌধুরীর আমল থেকে বাংলাসাহিত্যে "বাজে কথার ফুলের চাষ" সুরু হয়েছিল। সাহিত্যের বাজারে বাজে কথারই চল বেশি—কাজের কথা সেখানে অচল। অনেকটা টাকার বাজারের মতো। যে টাকাটা বাজে, সেটাই চলে, বাজে না যেটা, অচল সেটা। সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোন বিশেষ কথা বলার স্পর্ধা রাখে না। তাই সৃষ্টি করে অপ্রয়োজনের আনন্দ। যেমন, সংস্কৃত সাহিত্যের 'মেঘদূত', বাংলাসাহিত্যের 'ক্ষণিকা' ইংরেজি সাহিত্যের বহু রম্যরচনা। আজকের সমস্যাসংকুল জীবনে মানুষ খোঁজে এক উদারমুক্তি; তাই নীতি-গর্ভ কথার চেয়ে হাল্কা চালের মনভোলানো কথাই বেশি জনপ্রিয়। ডঃ জনসন, রাসকিনের চেয়ে মন্তেই, বীরবোম এবং পরবর্তীকালে চার্লস্ ল্যাম্ব প্রমুখের রচনা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে জনপ্রিয়, উপভোগ্য। আসলে "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" তাই রবীন্দ্রনাথ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক হলেও কৃত্তিবাস কাশীরামদাস বা শরৎচন্দ্রের মতো কথা-সাহিত্যে গভীর কথাকে সহজ সুরে প্রাণের ভাষায় প্রকাশ করে সর্বসাধারণের আত্মীয় হয়ে উঠতে পারেন নি।

বর্তমান যুগটা বুদ্ধিবাদ যুক্তিবা তাই সোজা কথাও হয়ে উঠেছে তির্যক, কটাক্ষ, ন্যাটায়ার, শ্লেষকাতর অথবা গ ব্যঞ্জনাময়। রূপকথা, উপদেশ কথার গ্রহণ করেছে কথাসাহিত্য, রম্যরচনা। প্র প্রকৃষ্ট বন্ধনের হয়তো অভাব, বন্ধন কিন্তু গাঁথা হয়ে আছে লেখকের মুড, ম এমনকি ভ্রমণকাহিনী, নকসা, জী খুঁটিনাটি ঘটনা, স্মৃতিকথা, আধ্যা রচনাকেও মনোরম করে বলা হচ্ছে শুনবে বলে।

শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টা বলেছেন, কথার দ্বারা মানুষ একে অ নিকট নিজের মনের ভাব বা চিন্তা ব করে—এই কথার সাহায্যেই মানুষে মা মিলন ঘটে। কিন্তু "মানুষের প্রে কথাটাই সোজা নয়। আমরা ভিক্ষনা যে কথার এক মানে বেঁধে দিই মানবজী মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায়—সা কাছে এসে গঙ্গার মতো।"

সুতরাং কথার আর্ট আজ এমন স্তরে এসে পৌঁচেছে যার সাহায্যে অ হরণ করা যায় মুহূর্তেই। কথাকে ম দান করেছে বক্তার সুকন্ঠ এবং সেই ধ্বনিরস চিত্ররস সঙ্গীতরস কাব্যরস কথা আমাদের যুক্তিবাদী বুদ্ধিবাদ মেনে নেয় না, কিন্তু মনে নেয়, হয়তে বররুচির অরসিকেষু ভীমমণীর মতো নিক্ষেপ করে, তবুও তা গজমুক্তা স্ব প্রয়োজন বাস্তব চরিতার্থতার নাগা বাইরের জিনিস। বলার গুণেই তত্ত্বকথা হয়—যা ধর্ম নয়, কর্ম নয়, তত্ত্ব নয় নয়। যেমন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, স দত্তের ছন্দঝঙ্কার। অর্থ সেখানে গৌণ; অ মন্থর অসংলগ্ন মনের কথা, প্রাণের স সৌন্দর্যের স্পন্দ, শিল্পের আস্বাদ। যেম এলোমেলো চিন্তা (dispersed meditatio ডঃ জনসনের অসংযত উচ্ছ (a loose Sally of the min অথবা রবীন্দ্রনাথের বাজে কথা বা মানসি পায়চারির মধ্যে কৃত্তিগত কোন পাপ নেই। সুন্দর কথা সুন্দর ভাব সৃষ্টি কর গেলে মনোরম শব্দের মালা গাঁথতে হয়। প্রাচীন বৈয়াকরণ আচার্য ভগবান্ ভর্তৃ বলেছেন—জগতে এমন কোন বিজ্ঞান সম্ভ পর নয়, যার সঙ্গে শব্দ অনুস্যূত হয়ে নে সমস্ত জ্ঞানই শব্দের দ্বারা অনুবি (অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে মহাকবি কালিদাসও বলেছেন—শব্দই জ্ঞা মাত্রের একমাত্র প্রকাশক (বাগর্থা সম্পৃক্তৌ)। কোন চিন্তাই শব্দের আ ছাড়া বাঁচতে পারে না—স্বীকার করেছে মনীষী ক্রোচেও। বর্ণের সমন্বয়ে যার জ বাক্যের আশ্রয়ে যার বৃদ্ধি, সেই কথ ভাবের সেতু রচনা করে রসের পরপ উত্তীর্ণ করে দেয় আমাদের। যে কথা তুলে মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনায় মুখরিত, যা অনু করি, উপলব্ধি করি,—শব্দের স্বরলিপি আমরা তাকে বেঁধে রাখি, প্রকাশ কা কথা তাই 'অগম পারের দূত 'অবাঙ্‌মানসগোচর'।

রাজা নিজিরির পরিবার

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

যতদূর জানা যায়, মাউন্ট কেনিয়ার হাজার ফিট উঁচু অধিত্যকায় তিন হাজার একর বিস্তৃত কিকাউয়ু রাজ্যের অধিশ্বর চীফ নিজিরি হচ্ছেন জগতের সবচেয়ে অধিক বহুবল্লভ। তাঁর বর্তমান ('৭২) বয়স ৯১ বছর। সর্বসমেত তিনি অন্তত ৫৪ বার বিয়ে করেছেন। সন্তানের সংখ্যা অন্তত ১৮৫ এবং সর্বকনিষ্ঠের বয়স মাত্র ৮ বছর। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ২৪ জন এখানো বেঁচে আছেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠাতমার বয়স ১০০ এবং কনিষ্ঠাতমার ৩০ বছর!

সে ছিল এ শতাব্দীর প্রারম্ভ। কেনিয়া তখনো নিরীহ ও হিংস্র, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জাতির আদিম উপজাতি অধ্যুষিত অরণ্যমান ভূমি। ইংরাজ রাজত্বের শাসনশৃঙ্খলা তখন রেলপথ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। কিকাউয়ু অঞ্চল তখন নারী ও পশুপশুলোভী মাসাই উপজাতিদের দ্বারা উপদ্রুত। নিজিরই তখনই কিকাউয়ুর নায়ক ও সম্মানিত সর্দার। তিনি যখন শুনলেন যে, একদল শ্বেতবর্ণের লোক দুর্গম অরণ্যের ভয়াবহতা তুচ্ছ করে রেলের লাইন পেতে ক্রমশ তাঁর কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসছে। তখন তিনি ঠিক করলেন যে সেই শ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতা অথবা সহযোগিতা করবেন সেই সিদ্ধান্ত নেবার আগে একবার নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাই মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে তিনি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনাহূত বিদেশী আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাদের তাঁর পছন্দ হলো। তারাও কিকাউয়ুর সেই সম্মানিত সর্দারকে যথেষ্ট খাতির করে। নিজিরি তাদের দোভাষী নিযুক্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯০৪ খৃঃ নিজিরির কাজে তুষ্ট হয়ে ইংরাজরা তাকে কিকাউয়ুর জায়গীরদার বলে স্বীকার করে নিল। সেই শেষবারের মত নিজিরী মাউন্ট কেনিয়ার ছ হাজার ফিট চড়াই বেয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। আর কখনো রাজ্য সীমানার বাইরে আসেন নি। সেখানেই আজো সেই শীতল কিন্তু রৌদ্রোজ্জ্বল পার্বত্যভূমিতে তিনি চৌদ্দ স্টোন ভারী বিপুল বপুটি বাঁদর চর্মের পোষাকাবৃত করে খেতে-খামারে তাঁর স্ত্রীদের কৃষকাজ পরিদর্শন করে বেড়ান। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর পৌরুষ ও প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও ঐকান্তিকতায় নিজের জীবনের হাটে বনিতাদের মেলা বসিয়েছেন।

কিকাউয়ু সমাজের রীতিনীতি

আজ শতাব্দীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়ে যাবার পরেও কিকাউয়ুর সামাজিক বিধিনিষেধ ও বিবাহ প্রথায় বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আজো যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই ছুতুড়ে ও হাতুড়ে ডাক্তাররা মেয়েদের ছুন্নৎ করে দেয়। সেই সময় ওই উৎসৃষ্টেরা তাদের পিতামাতাদের কাছ থেকে বিবিধ উপঢৌকন লাভ করে। তার মধ্যে থাকে বৃক্ষ বল্কল নির্মিত 'কয়নড' নামে একটি ছোট কড়ি এবং একটি তুক করা তেপায়া টুল। কোন মেয়ে যদি ব্যভিচারিণী হবার পর সেই টুলটিতে বসে তবে সে বন্ধ্যা হয়ে যায়, এই হচ্ছে কিকাউয়ুর সংস্কার।

অন্য পাঁচ জনেরই মত সামাজিক রীতি অনুযায়ী নির্জারির ও তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জ্যোৎস্নার চন্দ্র নামা রাতে লোকনৃত্যের আসরে। প্রথাগতভাবে তিনিও তাঁর সেই তরুণী অভিসারিকাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তাঁর খেতে কাজ করতে রাজি কিনা এবং তিনি তাঁকে খাদ্য দান করবেন কিনা? যদি সেই পাণিপ্রার্থীকে তরুণীটির মনে ধরে তবে তিনি প্রথাগত-ভাবেই তার উত্তর দেন যে তাঁর বাবার খেতের কাজ শেষ হলে তিনি তা করে সুখীই হবেন। নির্জারিকে উপেক্ষা করেন এমন তরুণীর সংখ্যা তখন কিকাউয়ু ভূমিতে বিরল। তাই প্রত্যাশিত উত্তরই তিনি পেলেন। সুতরাং এর পরের পর্ব হচ্ছে তরুণীর পিতার সঙ্গে বোঝাপড়া। সে কাজটা অবশ্য নির্জারির মত প্রতিপত্তিসম্পন্ন ভূপতির পক্ষেও সহজ সাধ্য নয়।

সুতরাং আর পাঁচজন পাণিপ্রার্থীর মত সেই তাৎপর্যপূর্ণ উত্তরলাভ করে কনের পিতার কাছে ইক্ষুরসে প্রস্তুত 'প্রস্তাব মদ্য' পাঠিয়ে দিলেন। তার কয়েক দিন পরে দ্বিধায় জড়িত পদে ভাবী শ্বশুরের কাছে হাজির হলেন। যথারীতি সম্মান প্রদর্শনের পর দুরু দুরু বক্ষে নিবেদন করলেন যে, অবশেষে তিনি তাঁর আত্মার যমজ সঙ্গীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবার তাঁরা বিবাহের চিরবন্ধনে বন্দী হতে চান। ভাবী শ্বশুর সেই প্রস্তাব শুনে প্রথাগতভাবেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। মৌজ করে বসলেন। তারপর কন্যার পাণিপ্রার্থীর উৎসাহে জল ঢেলে, ঘাড় নেড়ে সেই প্রাথমিক প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন। খানিক পরে, যেন বিবাহ-উদ্‌গ্রীব সেই প্রত্যাখ্যাতের বিহ্বলতা লক্ষ্য করে, একটু অনুকম্পা দেখিয়ে আশ্বাস দিলেন যে, আরেক প্রস্থ মদ পেলে তিনি প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। সেই মদের তত্ত্ব এলে ভাবী শ্বশুরমশায় তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পাত্রের স্বভাব-চরিত্র, বংশ-পরিচয় সর্বোপরি তার পণ-জোগানের সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয় খোঁজ নেবার জন্যে গোপনে নিয়োজিত করলেন। পাত্রপক্ষও অনেকটা একই ধরনের খোঁজখবর শুরু করে দিল। সব কিছু মনোমত হলে পাত্রের পিতা, কিম্বা পাত্রপক্ষের কোন ভারিক্কি ব্যক্তি ভাবী বেয়াই মশায়কে আবার মদের তত্ত্ব পাঠান। হবু বেয়াই সেটা তোয়াজ করে পান ও তারিফ করে পাত্রপক্ষকে জানিয়ে দেন যে, তিনি তখনো তৃষিত। আবার মদ আসে। এবার কনের বাবা তাঁর বড় ছেলেকে দিয়ে তার বোনের কাছে কিছু মদ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করান, 'আমরা যদি এ মদ পান করি তবে ফের তা বমি করে উগলে দিতে হবে না তো?' মেয়ে যদি বলে 'হাঁ', তবে সম্বন্ধ ভেঙে যায়। আর যদি বলে 'না' তবে পণ নিয়ে দরকষাকষি সুরু হয়।

কিকাউয়ুর প্রধানতম যৌতুক হলো ছাগল, ভেড়া, মদ ও মধু। রাজা নির্জারি সগর্বে দাবী করেন যে, তিনি তাঁর প্রতিটি বিয়েতে পুরো কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সমান পণ দিয়ে এসেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি দিয়েছেন, ৮০টি ছাগল, ৮টি কেঁদো ভেড়া ও এক টিন করে মধু। কিন্তু তাতেই কি সব ঝামেলা মিটেছে নাকি? প্রায় প্রত্যেকটি বিয়েতেই সব পাবার পরও বাপ বেঁকে বসেছেন। বলেছেন, আহা, বাদ হবার কি আছে? মেয়ের বিয়ে কি দিলেই হলো? তার জন্যে তৈরী হতে হবে না?—অর্থাৎ আরো দাও। সুতরাং আবার তত্ত্ব পাঠাও —মধু, বাছুরের চামড়ার তৈরী পোষাক, রান্নার পাত্র, ত্রিশ বোঝা জ্বালানী কাঠ, গুড়ুল, চামড়ার তৈরী মদের পাত্র, ভাবী শাশুড়ীর জন্যে তামাক ও নস্যি। তারপর আবার কয়েকটা সপ্তাহ কাটিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে ধন্না। এবার শ্বশুর হয়তো বলবেন, 'আর ওকে আমার প্রয়োজন নেই। এবার তুমি ওকে নিয়ে যেতে পারো।' নির্জারি ধনী ব্যক্তি। তাই তাঁর ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা ছাড়া হবু শ্বশুরদের পণের খাঁইটা তেমন মারাত্মক নয়। কিন্তু সীমিতবিত্ত অন্যান্য কিকাউয়ু যুবকদের কাছে সেটা একটা গুরুতর ব্যাপার। সুতরাং তারা কিস্তিতে পণ্য শোধের প্রথা চালু করেছে। সব পণ শোধ করার আগে কেউ কেউ কয়েকটি সন্তানের জনক হয়ে যায়।

বিয়ে ও মধুযামিনী

হবু শ্বশুরের অনুমতি পাবার পর জামাইয়ের ইয়ারবকসীরা কনের বাড়ীর চারপাশে ঝোপেঝাড়ে ওৎ পেতে বসে থাকে। তারপর এক সময় যেন হঠাৎ কনেকে গায়েব করার মত করে তুলে নিয়ে গিয়ে সোজা তার হবু শাশুড়ী অর্থাৎ ছেলের মায়ের কুঁড়েতে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। সেখানে তাকে পরবর্তী আট দিন থাকতে হবে। সেই আট দিন তাকে জোরসে কান্না-কাটি ও হাতপা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে হবে। ভাবী শাশুড়ীর দেওয়া খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। তখন কোন পুরুষের মুখ দেখতে পাবে না। ইতিমধ্যে সংগোপনে একে-একে কনের আত্মীয়স্বজনরা খাবার দাবার নিয়ে সেই কুঁড়েতে হাজির হবে এবং এসেই কনের সঙ্গে কোরাসে কান্না জুড়ে দেবে।

ইতিমধ্যে বরের বন্ধুরা নবদম্পতীর জন্যে একটি কুটীর নির্মাণ করবে। অষ্টম দিনের প্রভাতে নববধূ নদী তীরে গিয়ে তিনটি বড় বড় পাথরের টুকরো সংগ্রহ করে সেই কুটিরে আগমন করবে। পাথর তিনটি দিয়ে নতুন গৃহের উনুন স্থাপিত হবে। কনের কাঁদুনে আত্মীয়রাও দল বেঁধে সেখানে হাজির হবে। কিন্তু উনুন তৈরী হয়ে গেলেই কনের রূপ সহসা পালটে যাবে। সে তার সেই আত্মীয়ার দলকে হাঁকিয়ে বিদায় করে দেবে। সেই দিনটির নাম 'ইগুরোবিয়া'। সেইটাই যথার্থ অর্থে বিয়ের দিন। বর ও কনে সেই দিন পুরো ২৪ ঘণ্টার জন্যে দুয়ারবন্ধ ঘরে কাটাবে। তার মধ্যে গভীর রাত্রে মাত্র একবার কনে ঘর থেকে বেরিয়ে একটি ঝোপের কাছে হাজির হবে। সেখানে তার সেই যৌবনোদ্‌-[illegible]

বৃক্ষ-বল্কল নির্মিত কিরমণ্ড ঝাঁড়াটি লুকানো আছে। কনে যদি সতী হয়, তবে সে সেই ঝোঁড়াতে একটা গোবরের তাল রেখে আসবে। আর যদি ইতিপূর্বে তার জীবনে অন্যকোন পুরুষের সংসর্গ ঘটে থাকে তা হলে একটি কালো কলায় আধখানা রেখে আসবে। সংস্কারের ভয়ে কিকাউয়ু মেয়েরা মিথ্যাচারিণী বড় একটা হয় না। তাই পরের দিনটা তাদের বিবাহিত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন।

আগের দিন উনুন পাতার পর কনে কর্তৃক বিতাড়িত হলেও, তার আত্মীয়রা বিশেষ করে বুড়ো দলের, কেউই সোজা সোজা ঘরে ফিরে যায় না। পাত্র পক্ষের অন্য মেয়ে বুড়িদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে তারা নবদম্পতীর কুটিরের চারপাশে উঁকি-ঝুঁকি মারে, আড়িপাতে। ভোর হলেই তারা পাড়ার একটি বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় কিরমণ্ডে কি পড়লো তা দেখবার জন্যে। গোবরের তাল পড়লে তাদের মধ্যে আনন্দের ঢল নামে আর কালো কলার আধখানা হলে সবাই [illegible] গম্ভীর হয়ে যায়। কনে লজ্জায় [illegible] নীচু করে। কনের মার ডাক পড়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে হাজির হন। [illegible] পাড়াপড়শীরা এক বাটি ঠাণ্ডা পানীয় [illegible] দেয়। অবশ্য তারপর সব মিটমাট [illegible] যায়।—রাজা নির্জারির ৫৪টি বিয়েতে কতবার গোবরের তাল এবং কতবার [illegible] কলার অর্ধেক আবিষ্কৃত হয়েছে তা [illegible] একটি রাষ্ট্রগত গোপন তথ্য।

নির্জারির চতুর্পঞ্চাশ অঙ্গনারা

রাজা নির্জারী তাঁর [illegible] পঞ্চান্নবার বিয়েতে যত কনে পণই দিয়ে থাকুন, আর শ্বশুরদের পাল্লায় পড়ে যত নাস্তানাবুদই হয়ে থাকুন না কেন, প্রতিটি বিয়ের ফলে মোদ্দা কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্য বৃদ্ধিই ঘটেছে। কারণ বংশ কিম্বা শ্রেণী-পরিচয় নির্বিচারে কিকাউয়ু মেয়েরা খেটে খায়। রাজা নির্জারি বিয়ের পর তাঁর প্রতিটি রাণীকে দিয়েছেন একটি কুটির, দশ একর জমি। রাণীরা সেই জমিতে ফলিয়েছেন বজরা, সীম, তাঁর দরকার এবং কিছুটা চা। খেতের উৎপাদনে তিনি তাঁর নিজের ও সন্তানদের খাদ্য প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং উদ্বৃত্ত যা কিছু বেচে নির্জারিকে নগদ টাকা জুগিয়েছেন। অথচ সেই স্বাবলম্বিনী ও স্বয়ংসম্পূর্ণা সবাই খুশি, সবাই স্বামীগর্বে গরবিনী। তার একটা কারণ বোধ এই যে নগাণ্ড শ একবার যে-সমস্যাটি বুদ্ধিমতী মেয়েদের সামনে তুলে ধরেছিলেন—কোনটি বাঞ্ছনীয় —একটি দশম শ্রেণীর পুরুষের সবখানা, না, একটি প্রথম শ্রেণীর পুরুষের দশ ভাগের একভাগ?—কিকাউয়ুর রাণীরা [illegible] সেই ধরনের সমস্যায় পড়ে সদর্পে উত্তর দিয়েছেন নির্জারির মত পুরুষোত্তম হলে 'দশভাগের একভাগ।'

শিক্ষিত, আনাড়ী ও কল্পনা-বিলাসীদের কাছেই নারীচরিত্র জটিল, [illegible] নির্জারির

মত ধুরন্ধরের কাছে তা পাকা দাবা খেলোয়াড়ের কাছে বড়ের মত। চুয়াল্লোটি স্ত্রী নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাধা তো দূরের কথা, বরং তাঁর যে উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রায় দুশত সন্তান লাভ হয়েছে, এখনো একশ-এগারো বছর বয়েসেও মনের শান্তি এবং দেহের স্বাস্থ্য অটুট আছে—এর কারণ বিশ্লেষণে তিনি ভাগ্যের ভূমিকাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করেন। তিনি বলেন যে, তার প্রধান কারণ—হচ্ছে বৌ বাছাই। সেই বাছাইয়ে চুয়াল্লো-বার তাঁর কোন ভুল হয়নি।

'তা ছাড়া', রাজা নিজিরি তাঁর অতি-দূর স্মৃতিকথার চারণে বলেন, 'আমার যতগুলি স্ত্রী ছিল আপনারও যদি তাই থাকে তবে আপনাকে কূটনীতিবিদ হতেই হবে। যেমন ধরুন আমি, সন্ধ্যার পর কোন স্ত্রীর কুটিরে রাত কাটাইনি। তার বদলে স্ত্রীদের সব কুটিরগুলোর মাঝখানে নিজের জন্যে একটি কুঁড়ে বানিয়ে নিয়েছিলাম। দিনেরবেলাতেই মনে মনে ঠিক করে রাখতাম যে সে রাত্রে কোন স্ত্রীটিকে আমি চাই। সেই অনুযায়ী সেই বিশেষ রাত্রের সহচরীকে জানিয়ে রাখতাম ঠিক কোন সময়ে তাকে আমার প্রয়োজন। ঐ কৌশল করে বছরের পর বছর আমি প্রতি রাত্রে, তিনজন করে স্ত্রীর সহচার্য উপভোগ করেছি অথচ এক স্ত্রীর সঙ্গে আরেক জনের সংঘাত তো দূরের কথা সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। একই রাত্রে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গ আমি প্রধানত সন্তান কামনাতেই চেয়েছি। যদিও পরম করুণাময় ঈশ্বর অকৃপণভাবেই আমার মনোবাসনাপূর্ণ করেছেন তবু আমি কেবলমাত্র তাঁর কৃপার ওপরই নির্ভর করে থাকিনি। কারণ আমি জানি ঈশ্বর আত্ম-নির্ভরতা পছন্দ করেন এবং আমি বীর পুরুষাকারকে। তাই আমি নিয়মিতভাবে দুধ মধু ও মাংস খেয়েছি। আর খেয়েছি মাঝে মাঝে মিষ্টি আলু সেদ্ধ। পৌরুষের তেজবৃদ্ধিতে তা তুলনাহীন।

এখন ধরুন, উপরোক্ত কৌশলের পরিবর্তে আমি যদি আমার স্ত্রীদের কুটিরে নৈশ যাপনের অবিবেচক পথ অবলম্বন করতাম, তা হলে স্ত্রীদের মধ্যে এটা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে যেতো যে আমি কার ঘরে সবচেয়ে বেশি করে রাত কাটাই। তাতে হিংসে আর কোঁদল বেড়ে যেতো। অশান্তিতে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হতো। আমার উদ্ভাবিত কৌশলে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রীর সঙ্গে যত রাত্তি ইচ্ছে কাটাতে পারি। অথচ স্ত্রীরা তা টেরও পাবে না। ফলে তারা সবাই খুশি, সবাই অনুগতা। আর প্রত্যেকেই ভাবে যে তার মত আর অন্য কেউকেই আমি ভালবাসি না।'

তৎসত্ত্বেও নিজিরির মত একজন চতুর ব্যক্তি তো আর 'চান্সের' ওপর নির্ভর করে থাকতে পারেন না। তাই তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা যখন রীতিমত বৃদ্ধি পেল তখন তিনি একটি মাঠে বৃত্তাকারে তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে নতুন করে ঘর বেঁধে দিলেন। প্রত্যেক ঘরের চারপাশে আবার খুঁড়লেন পরিখা। পরিখার মধ্যে ছুঁচলো বর্শার মত করে সারিবদ্ধ বাঁশের বেড়া। পরিখা পার হবার জন্যে একটি করে বাঁশের সেতুর ব্যবস্থা রইলো। প্রতি রাত্রে নিজিরি সেই সেতু-গুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতেন।

নিজের মেয়েদের ওপরও নিজিরির নজর খুবই কড়া। তবে সর্বসমেত তাঁর যে মেয়ে ঠিক কটি তা তিনি জানেন না। বাটটা পর্যন্ত তিনি সঠিক হিসেবই রেখে ছিলেন। তারপর থেকে একটু গণ্ডগোল পাকিয়ে গেছে। সে যাই হোক তাঁর সব নিবাহাবাগ্যা মেয়েরা একটি বড় কুটিরে থাকে। তাতেই তাদের ওপর নজর রাখা সুবিধে।—মেয়েদের সম্পর্কে ঐ সাবধানতা থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে নিজিরি পিতা হিসেবে খুব কড়া। আসলে মেয়েরা যদি সতী না থাকে তা হলে বিয়ের বাজারে তাদের দর পড়ে যায়। ভাল পণ পাওয়া যায় না। নিজিরির পারিবারিক অর্থনীতিতে পণের গুরুত্ব রীতিমত। কারণ তাঁর মেয়ের চেয়ে ছেলের সংখ্যা বেশি। পরিবারের সম্মান অনুযায়ী তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিতে হয়। রীতিমত পণ দিয়ে সুপাত্রী ঘরে আনতে হয়। সে সবে খরচ বহুৎ। তাই মেয়েদের বিয়ের পাওনা পণ থেকে তা পুষিয়ে নিতে হয়।

ছেলেদের সঙ্গে নিজিরির সর্ত—হচ্ছে যে ভবিষ্যতে তাদের বৃদ্ধা মায়েদের সব দায়িত্ব তাদের নিতে হবে। 'নয়তো' নিজিরি নির্দ্বিধায় বলেন, 'আমার অতগুলো বুড়ির ঝক্কি অকারণে বইতে হবে। কারণ কিকাউয়ু রীতি অনুযায়ী একটা বয়সের পর পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের আর কোন যৌন সম্পর্ক থাকে না। স্ত্রীর প্রধানতম প্রয়োজন হচ্ছে সন্তান উৎপাদনে। সেই ক্ষমতা যখন তার চলে যায় তখন তার উচিত হচ্ছে স্বামীকে সেকথা জানানো এবং তার চেয়ে বয়স কম মেয়েদের পথ ছেড়ে দেওয়া।

আজ বছর কয়েক থেকে আমি নিজেও অনুভব করছি যে আমার বয়স হয়েছে। তাই আমারও আর তেমন নারী-সঙ্গ-লিপ্সা নেই। নারী-সঙ্গ আমি একরকম ছেড়েই দিয়েছি।'

তা হলে কি হবে?—নর-নারী সম্পর্ক-সম্পর্কে রীতিমত বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং নিজিরির নতুন কিছু শেখার ছিল। কিছু-কাল আগে নিজিরি অসুস্থ হয়ে একটি রোমান ক্যাথলিক মিশন হাসপাতালে যান। সেখানে গিয়ে মিশনারীদের আলাপ-আচরণ ও পরহিতব্রত তাঁর ভালো লাগে। তিনি খৃষ্টান হবার সংকল্প করেন। তখন কি তিনি জানতেন যে তাতে ফ্যাসাদ কত! তাঁর ধর্মান্তরিত হবার বাসনা শুনে মিশনারীরা তো খুবই খুশি। কিন্তু সেই আপাত নিরীহ, অথচ সম্পূর্ণ বেআক্কেল ও বেরসিক লোকগুলি তার পরিবর্তে যে প্রস্তাব করে বসলেন তা শুনে তো নিজিরির আক্কেল গুড়ুম! তাদের প্রথম প্রস্তাব মাত্র একটি স্ত্রী বাদে অন্য সব স্ত্রীদের ওপর নিজিরিকে অধিকার ত্যাগ করতে হবে! আর শুধু কি তাই?—স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে বিবাহিতা, অতএব বৃদ্ধাতমাও বটে, তাঁকেই ধর্মপত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পাদরীদের নির্দেশিতা সেই ভাগ্যবতীর বয়স তখন ১০৭ বছর—কঠিন ব্যাধিতে তিনি শয্যা-শায়িণী। অতএব সেই মৃত্যুপথ যাত্রিণীকে বেছে নেবার কোন সার্থকতা নিজিরি খুঁজে পেলেন না। সুতরাং তিনি সব স্ত্রীদের নিয়ে একটি পরামর্শসভা আহ্বান করলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্না সেই মহিলারা স্বামীর একাদশতমা স্ত্রীকে স্বামীর ধর্মপত্নী হিসেবে মনোনীতা করলেন। তাঁর বয়স তখন ৭৮ বছর। কিন্তু রীতিমত কর্মঠা। তাছাড়া তাঁর বার্ধক্যে দায়িত্ব নেবার মত কোন বিবাহিত পুত্র ছিল না। তদুপরি তিনি উদারপ্রাণা। ধর্মপত্নীতে উন্নীত হয়েই অন্য সপত্নীদের হেনস্থা করবার মত মহিলা নন। গীর্জায় গিয়ে খৃষ্টমতে তাঁদের বিয়ে হলো।

আজ কয়েক বছর পরে ঐ ঘটনাটা নিজিরির কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়। তিনি বলেন যে, 'অতগুলি স্ত্রী এবং প্রত্যেককেই বহু সন্তানের জননী করে দেবার ক্ষমতা আমাকে কিকাউয়ু ভগবান দান করেন। খৃষ্টানদের ভগবানের তা যদি অপছন্দই হয়ে থাকে তো বহু আগেই তিনি আমাকে সেই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করলেই পারতেন?'

তাছাড়া অন্য স্ত্রীদের প্রতি তিনি তাঁর নৈতিক দায়িত্বের কথাই বা কি করে ভুলতে পারেন? খৃষ্টধর্ম দীক্ষা সময় তার কনিষ্ঠতমা স্ত্রীর বয়স ২৮ বছর। তখনো তাঁর কোন স[illegible] হয়নি। অথচ খৃষ্টান হয়ে গেছেন ব[illegible] বিষয়ে তিনি যুবতী স্ত্রীকে ব্যক্তিগ[illegible]বে সাহায্যদানেও অপারগ। কিন্তু তাই বলে একটি নারী সন্তান-সৌভাগ্য থেকে চিরবঞ্চিত হবে? সুতরাং তিনি তাঁকে জানালেন যে কথাটা যদি গোপন থাকে তাইলে তবে অন্য কোন পুরুষের সাহায্যে তিনি সন্তানবতী হলে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

ওদিকে তাঁর ধর্মপত্নী যে নতুন, বিশেষ অধিকার লাভে খুব খুশি তাও বলা চলে না। তিনি বলেন, 'বহু বিবাহ খুব ভালো এবং প্রয়োজনীয় প্রথা। এমন এক সংসারে গিয়ে আমি কখনোই খুশি হবো না যেখানে আর কোন বৌ নেই, আমাকেই সব কাজ করতে হয়। আমরা নিজিরির সব বৌরা যৌথভাবে খুশি এবং সুখী ছিলাম।'

নিজিরি তাঁর তরুণ নাতিদের এখন প্রায়ই ডেকে ডেকে উপদেশ দেন যে সত্যি-কারের পুরুষমানুষ কখনই একটি বিয়ে করে তৃপ্ত থাকতে পারে না। অতএব যত-গুলি সাধ্যে কুলোয় ততগুলি বিয়ে করো। তবে শিক্ষিত মেয়েদের এড়িয়ে চলো। তাদের নিয়ে নানা ঝামেলা। তারা ভাগ করে নিতে জানে না। সদা হিংসুটে। ঝগড়া করে।*

---

* ছবি ও উপাদানের জন্যে লেখক রবিবাসরীয় টাইমসের কাছে ঋণী।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। তেইশ ।।

গাছপালার দিক থেকে কী একটা পাখি ডাকছিল সেই সকাল বেলায়, নিজের ভিতরকার চাপা গোপন কষ্টটার মতো। বুকের কোনখানে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না—সেই রকম। মনে হল, অনেকদিন টানা অসুখের পর সবে আজ পথ্য পাবে। আর ঠিক তেমনি খুঁত-খুঁতেমি নিয়ে সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল দেয়ালগুলো। খুঁজছিল। খুব কঠিন অসুখটার কোন চিহ্ন কিংবা আরও কিছু স্মৃতি। দেয়াল ধবধবে সাদা, চিকন। তাই শূন্যতা মনে হল। কিছু নেই, অথচ কিছু ঘটেছিল। হ্যাঁ, কাল রাতেই তো! কাল সারা রাত ধরে একটা ভয়ঙ্কর উপদ্রবের মধ্যে ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছিল সে। ঝড় কিংবা আগুন। কিংবা বন্যা।...

তারপর সে ধুড়মুড় করে উঠে বসল। জানলা দিয়ে একথাবলা রোদ উপচে এসেছে মেঝেয়। লাল সিমেন্টের ওপর খানিকটা খুসি চকচক করছে। বাইরের সেই পাখির ডাকটা তখনও বুকের ভিতর কষ্ট হয়ে বাজছে। সে ভাবল, এটা ঠিক নয়। তার খুসি হওয়া উচিত। এই সকালে পৃথিবীতে এখন অনেক খুসি। অনেক সুখের মধ্যে নিজের অসুখের কথা ভুলে যাওয়া ভালো।

এবার সে বিছানা আর দেয়ালগুলো ভালো করে দেখে নিল। আর তখনই টের পেল, কী কী ঘটেছিল। এই ঘরটা রাধার। এই ঘরে তাকে ব্রজ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ধরাধরি বয়ে এনেছিল রাস্তা থেকে। বেশ কয়েকবার বমি করেছিল সে। তার শ্বাস-কষ্ট হচ্ছিল। মাথা ঘুরছিল। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না।

হাসি পেল এবার। মদ তাকে মাতলামি ছাড়া আরও একটু দিয়েছিল, সেটা শারীরিক কষ্ট। তার বেশি কিছু নয়। মদ আর কীই বা দিতে পারত! মাতলামি তার স্মৃতিকে তো নষ্ট করতে পারছিল না। স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল ভয়ার্ত জন্তুর মতো—কিছুদিন থেকে। সে চাইছিল একটা আশ্রয় হয়তো, যেখানে বিস্মৃতি সব অতীতকে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ কিছু মিলল না। উপদ্রুত রাতের হাতে মুহুর্মুহুঃ মার খেল সে।

ব্রজও কি রাতের পর রাত এমনি করে মার খায়? ভালবাসে মার খেতে? ব্রজও কি তার মতো বিস্মৃতির জন্যে হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করে? আবার হাসি পেল তার। মাতলামি আর শারীরিক কষ্ট ছাড়া মদ আর কিছু দিতে পারে না। ব্রজ বোকা। সে নিজেও আজ বোকা হয়ে পড়েছিল। মদ আর খাবে না সে।

বাইরে অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ শোনা গেল এতক্ষণে। সে লজ্জা পেল। লোকের সামনে এখন তাকে বেরোতে হবে। লোকেরা জানবে ছোটবাবু রাধার হোটেলে রাত কাটিয়েছে। সে উদ্বিগ্ন হল। ব্রজ কোথায় আছে? সে এখনও এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে না কেন? ঘড়িটা হাতে যথারীতি বাঁধা রয়েছে। প্রায় সাতটা বাজে। স্নান করা দরকার। প্রথম ট্রিপের সময় হতে হতে তাকে তৈরী হয়ে নিতে হবে। মেঝেয় কয়েক-মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল গতরাতে বাবা এসেছেন জিয়াগঞ্জ থেকে। ব্রজর বাড়িতে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আরও লজ্জায় পড়ে গেল সে। অনুশোচনা এল। চুলগুলো আঁকড়ে ধরল। এই রুক্ষ চেহারা, এলোমেলো পোশাকে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো অশোভন হবে। ও'রা জানেন, চন্দন রূপপুরে এসে পরেশের মতোই সোনার খনির খোঁজ পেয়ে গেছে। চন্দন এখন মান্যগণ্য মানুষ। একটা গাড়ি আছে তার। এসবের সঙ্গে এই নোংরা হয়ে ওঠা পোশাক আর বিধ্বস্ত চেহারা মোটেই মানাবে না।

এখন ব্রজকে খুবই দরকার। রাতে ব্রজ এখানে ছিল কি না কে জানে। চন্দন পা বাড়াল। রাধা হয়তো বাইরের হোটেল ঘরে রয়েছে। এ ঘরের দরজা থেকে কিচেনের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামে কিশোরীটি উনুনে আঁচ দিচ্ছে। সন্ধ্যাকেই ডাকবে ভাবল। চোরের মতো পা টিপে-টিপে চলা নিজের এই সতর্ক গতিবিধিগুলো কিছু দুঃখে টের পাচ্ছিল চন্দন। পরেশ হলে নিশ্চয় এমন করত না। বুক ফুলিয়ে গট গট করে কিংবা টলতে টলতেই সোজা বেরিয়ে যেত। অত সাহস চন্দনের নেই-ই। সে আর যাই হোক, পরেশ মজুমদার হতে পারছে না—এটা ঠিক। সুনন্দিতা তাকে ঠিকই বলেছে। চন্দন পরেশের টাকা পরেশের বউ বা শালীর অজানতে মেরে দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও মনের গভীরে কিছু কিছু নীতিবোধ সমানে কাজ করে যাচ্ছে। তব সে কাটাতে পারছে না। লজ্জা তাকে জড়িয়ে ধরছে পায়ে-পায়ে। না—রাগ দিয়েও এগুলো এড়ানো যাচ্ছে না—যায় না।

সেই মুহূর্তে রাধা এসে পড়ল। একটা নিঃশব্দ উজ্জ্বল হাসি তার ভরাট মুখের চামড়ায় প্রতিফলিত হল।...উঠে পড়েছেন?...চাপা গলায় সে বলল!...বারান্দায় জল আছে। মুখ ধুয়ে নিন। টুলের ওপর মাজন আছে, সাবান আছে—সব ঠিকঠাক রেখেছি। কোন অসুবিধে হবে না, ছোট-বাবু। আমার ভাগ্যি।

চন্দন হাসতে পারল না। খুব অকারণে তার মধ্যে রাগ ঠেলে এল। স্থির

নির্বিকার তাকিয়ে সে শুধু বলল, ব্রজ কোথায় ?

বেজো ?...খিকখিক করে হেসে উঠল রাধা। সারারাত্তিরটা ওই উঠোনে পড়েছিল মিনসে। ওরা সব্বাই। যাকে বলে, গলাগলি জড়াজড়ি ভাবের নদীতে সাঁতার কেটেছে ছোটবাবু। তা পরে প্রথম রোদটা গায়ে পড়তেই উঠে বসেছে। তখন আর কী ? নিত্যি যেমন করে, এই পোড়ামুখীকে শাপান্ত করতে করতে কেটে পড়েছে। যেন, আমিই ওদের যত খোয়ারের মূলে। ('মূল' শব্দটা রাধা মূ আর ল'এর মধ্যে অস্পষ্ট হ্রস্ব ইকার মিশিয়ে উচ্চারণ করল।

চন্দন ভ্রূ কুঁচকে উঠোনটা দেখে নিল। সতরঞ্চিটা দলা পাকিয়ে পড়ে রয়েছে এখনও। কয়েকটা বোতল গেলাস, মাটির ভাঁড় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কিছু এঁটো শালপাতা আছে। একটা কুকুর চেটেপুটে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে এককোণে। মাতালের বমিগুলো নির্ঘাৎ ওই জন্তুটাই শেষ করেছে। কুকুরটা মাতাল হয়ে পড়েনিতো ? কুকুর কি মাতাল হয় ? দৃশ্যটা চন্দনের মনে ঘৃণাভাব আনল। নিজের ওপর। ব্রজর ওপর। এবং যারা-যারা মদ খায়, তাদের প্রত্যেকের ওপর। তারপর সে বলল, আমি যাই, রাধা।

রাধা হন্তদন্ত বলল, সে কী! তাই হয় নাকি ছোটবাবু ? না— না। হতভাগিনীর 'ছাঁয়ায়' যখন পদার্পণ করেছেন, সেবা করতেও কি দেবেন না ? আমার ভাগ্যি!

চন্দনের ইচ্ছে হল, প্রশ্ন করে এই নীচ-জাতীয় স্ত্রীলোকটিকে, তোমার কিসের ভাগ্যি রাধা ? তোমার সেবা কথাটার মানে কী ?... প্রশ্ন করল না। বলল, যথেষ্ট তো করেছ। আর করার কিছু নেই, রাধা। দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।

রাধার মুখ থেকে হাসি নিভল। গম্ভীর দেখাল তাকে। একটা হালকা প্রশ্বাস ফেলে মাথাটা সামান্য দোলাল সে।...হ্যাঁ, যাবেন বই কি। রাধার ঘরে কেউ চিরকাল থাকে না। ছোটবাবু, কিন্তু একটা কথা। নিজের জামাকাপড়ের অবস্থাটা একবার দেখুন। বলছিলুম কী, গণশাকে তক্ষুণ পাঠিয়ে ব্রজর বাসা থেকে আপনার জামা-কাপড় আনিয়ে দিই। আপনি মুখ ধুয়ে চা-টা খান। বেজোও হয়তো এসে যাবে। যত মাতালই হোক, লোকটার দায়িত্বজ্ঞান খুব আছে, ছোটবাবু। ভাববেন না। মালিককে এখানে ফেলে রেখে সে গাড়ি নিয়ে চলে নিশ্চয় যাবে না।

রাধাকে বুদ্ধিমতী দেখাল। অভিভাবিকার মতো প্রাজ্ঞ আর বিচক্ষণ। চন্দন কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে ওকে বুঝতে চেষ্টা করে বলল, আমার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন, রাধা ?

রাধার ঠোঁটের কোণে কেমন হাসি ঝিলিক দিল।...ভাবনা ? তা হয়। আমি তো সারা জীবন কম মানুষ দেখলুম না ছোটবাবু। মানুষ আমি চিনতে পারি। কোনখানে কার ঘা, ঠিকই বুঝে নিই। থাক ও কথা। আপনি মুখ ধুয়ে নিন। চা আনছি।

রাধা বেরিয়ে গেল। খাটের পাশে দেয়ালে মস্তো আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল চন্দন। নিজেকে দেখে নিল। কে ও ? চেনা মনে হল না। ওই লোকটার বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি। ওর সারা চেহারায় অনেক যন্ত্রণার ছাপ। লোকটা কোথায় কী অপরাধে পুলিশের হাজতঘরে বাস করেছে যেন—তার আঙুলে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাঠকাঠে ঝুলিয়ে বেটমের বাড়ি মারা হয়েছে, একটা স্বীকারোক্তির জন্যে ক্রমাগত তার শরীরকে পীড়ন করা হয়েছে—তবু সে বেকবুল থেকেছে। শেষরাতের দিকে অজ্ঞান হতে হতেও সে যেন বিড়বিড় করে বলেছে, আমি কিছু জানি না, কিছু জানি না!

আর কী বলে গেল ওই মেয়েটা ? কোনখানে কার ঘা—কিসের ঘা ? ঘা যা কিছু, ওই তো শরীরে। মনে কি কিছু গুরুতর আছে ? কিছু গোপনীয় সিকালিশ, একটা ক্যানসার ? খুব ভয় পেয়ে গেল হঠাৎ। সরে এল। একটা কদর্য বর্তমানের মধ্যে সে আটকে পড়েছে গেছে। শুধু মনে পড়ছে, এমন সে ছিল না কোনদিন। সে ছিল মুক্ত মানুষ। সে ভালবাসতে জানত। শ্রদ্ধা করতে পারত। আজ তার মধ্যে শুধু ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা!

এক্ষুনি স্নান করতে পেলে ভালো হত। থাক। মুখটুখ ধুয়ে রাধার সেবা নেওয়া যাক। সে বারান্দায় এল। একটা জলচৌকি পাতা রয়েছে। পাশে বালতিতে জল আর প্লাস্টিকের মগ। দাঁতের মাজন। সাবান কৌটো। একটা ভাঁজকরা পরিচ্ছন্ন সবুজ তোয়ালে। এর মধ্যে নিষ্ঠার প্রকাশ অনুভব করল সে।

মুখ ধুতে ধুতে সে টের পাচ্ছিল, অদূরে দাঁড়িয়ে রাধা তাকে দেখছে।...

সেই খাটের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আবার ঘরের ভিতরটা দেখে নিল চন্দন। এই ঘরটা রাধার। এই বিছানায় রাধা শোয়। দেয়ালগুলো তখন শূন্য মনে হয়েছিল এখন দেখল তা ঠিক নয়। ছাদ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে অনেক বাঁধানো ছবি রয়েছে। সবই দেব-দেবীর ছবি। তাকে লক্ষ্মীপ্রতিমা। টেবিলে চিরুনি, কিছু প্রসাধন কৌটো আর শিশি। রাধাও সাজে তাহলে! জীবনকে ভোগ করে! যা তার দখলে, তা নিষ্ঠায় ভোগ করতে জানে সে। ওই ফোটোটা কার ? ভালো করে দেখার জন্যে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল চন্দন। চিনতে পারল না। জায়গায়-জায়গায় রং চটে গেছে। এক যুবক-যুবতীর ছবি। ওই যুবতীটিই কি রাধা ? যুবকটি কে ?

পিছনে রাধার কথা শোনা গেল।...কী দেখছেন ছোটবাবু ? চিনতে পারছেন ?

চন্দন ঘুরে দেখল, রাধার হাতে ট্রে। ট্রেতে চায়ের কাপ, প্লেটে সিঙাড়া আর জিলিপি। চন্দন একটু হাসল।...তোমার ছবি ?

হ্যাঁ।...রাধা বিছানায় ট্রে রাখল। চন্দনের পাশে এসে দাঁড়াল। ছবিটা বহরমপুরে তুলেছিলাম। তা বছর চোদ্দ—না, বারো হবে—সেই যেবার খুব ঝড় হল।

চন্দন বলল, পাশেরটা কে ?

রাধা খাটের দিকে এসে বলল, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেয়ে নিন। গণেশকে পাঠিয়েছি আপনার কাপড় আনতে।

চন্দনও সরে এল। পা ঝুলিয়ে খাটে বসল।...বললে না যে ?

রাধা মুখ তুলল। কয়েক মুহূর্ত কেমন শান্ত তাকিয়ে থাকার পর জবাব দিল, চিনবেন না।...পরক্ষণে হাসল সে।...ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল, হয়নি। হয়নি—সে তো ভালই হয়েছে। ভগবান সব ভালোর জন্যেই করেন, ছোটবাবু। করেন না ?

আমি জানিনে।...চন্দন অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

আমি কিন্তু জানি। বিয়েটা হলে খুব কষ্ট পেতুম। ঠকতুম।...রাধা হাসতে লাগল। ঝড়ের রাতে মিনসের বুকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, ছোটবাবু। আর সে আসেনি। বেঁচে আছে কি না, তাও জানিনে।

ছবি রেখেছ যে ?

রাধা সকৌতুকে বলল, আমার ছবি আছে যে! মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি ছোটবাবু। অবাক মানি। মনে মনে ওকে বলি, তুই কী বোকা ছিলিস রাধা! হ্যাঁ, ওই বোকা মেয়েটাকে একশো ঝাঁটা মারি মনে মনে। সেজন্যেই ওকে আস্ত রেখে দিয়েছি। আমার চুপকথাটি বলার মানুষ তো আর নাই। ওকে গাল দিই, শাপান্ত করি। আবার সুখ-দুঃখের কথাও বলি। আর কাকে বলব, কে শুনবে ?...একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, তবে আমি এখন সুখী ছোটবাবু—আপনাদের দশজনের আশীর্বাদ। আমার কোন দুঃখ নেই। খুব ভালো আছি। না—বলবেন, টাকা-পয়সার ভালো থাকা—তা নয়। সে অন্যরকম।

গণেশকে পাঠিয়েছ ব্রজর বাড়ি ? চন্দন বলল।

রাধা উঠে দাঁড়াল।...হ্যাঁ, এসে পড়বে এক্ষুনি। বসুন। জামা-কাপড়গুলো রেখে যান। লণ্ড্রিতে পাঠিয়ে দেব'খন। একটু বসুন।

রাধা চলে যাবার একটু পরেই আচমকা হাসি এসে পড়ল।...কী মানুষ তুমি। ছি, ছি! এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার নেই ?

চন্দন প্রস্তুত বাধা দিল।...বুদ্ধিশুদ্ধি কি তোমারও আছে হাসি ? এমন করে তোমার না এলে চলত না ?

হাসি খবরের কাগজে মুড়ে প্যান্ট-শার্ট এনেছে। বিছানায় রেখে কড়া চোখে বলল, থামো। আর বাহাদুরি দেখিও না। গণশাকে পাঠিয়েছ কেন ? একটু না সামলালে তোমার বাবার সামনেই কী সব বলে ফেলত। এই শিগগির!...চারপাশটা চকিত চোখে দেখে নিয়ে ফের ফিস ফিস করে সে বলল, আর কোথাও জায়গা পাওনি। এখানে এসে জুটেছিলে! ছিঃ!

চন্দন একটু হেসে, ভ্রূ কুঁচকে বলল, না। তোমার ভয় নেই। রাধার বিছানায় আজ রাধা শোয়নি—আমি একা ছিলুম।

যার শুলেও তখন আমার কোনরকম আন-
াত্তি ছিল না। তোমার হিংসের কারণ
নই, হাসি।

হাসি তেতোমুখে বলল, বয়ে গেছে আমার হিংসে করতে। দেরী করো না। তোমার বাবা চলে যাবেন বলছেন।

চন্দন হাসির সামনেই শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেলল। আন্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় কাগজের মোড়কটা খুলতে খুলতে বলল, রাজা কোথায়? বাড়ি যায়নি?

কে জানে কোন চুলোয়। আমি এত খবর রাখিনে।...হাসি ঘরের ভিতরটা দেখতে দেখতে জবাব দিল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল চন্দন। এবার মোটামুটি নিজেকে চেনা যাচ্ছে। টেবিল থেকে চিরুনি নিয়ে ঝড় করে চুল আঁচড়াল সে। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, তুমি—হাসি, তুমি কি এবার আমার পাশে-পাশে হেঁটে যাবে?

যাঃ! তুমি রিকশো করে চলে যাও।...হাসির মুখে একটা লজ্জা ঝিলিক দিচ্ছিল।...আমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছি'খন! আর শোন, তোমার বাবাকে আমি বলেছি, ছোটবাবু কী কাজে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে—বাইরে কোথায় গিয়েছিল। বুঝেছ?

বুঝেছি।...বলে চন্দন বাইরের হোটেল-ঘরে গিয়ে ঢুকল। রাধা নেই ওখানে। হয়তো কিচেনে আছে। হোটেলঘরে জনাচার গ্রামের লোক চা খেতে খেতে গল্প করছে। তারা চন্দনকে লক্ষ্য করল না। চন্দন রাস্তায় গিয়ে রিকশো ডাকল।...

ব্রজর বাড়ির দরজায় রমণীমোহনকে ব্যস্তভাবে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছিল। চন্দনকে দেখে তিনি দু-চার পা এগিয়ে এলেন।...এস। আমি গতকাল সন্ধ্যায় এসেছি। জরুরী খবর আছে।

রিকশোর ভাড়া মেটানোঅব্দি চন্দন কোন কথা বলল না। শান্ত ও গম্ভীর হয়ে বাড়ি ঢুকল। রমণীমোহন সেটা গ্রাহ্য করছিলেন না সম্ভবত। বারান্দায় উঠে তিনি মোড়ায় বসলেন। চন্দন একপাশে দাঁড়াল। রমণীমোহন বললেন, জায়গাটা ভালোই মনে হচ্ছে। তোমার ড্রাইভারের বউটিও খুব ভালো মেয়ে। কোন অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হল না। যাক গে, শোন। বলছিলুম কী, এখানে বাড়িটাড়ি করার চেয়ে জিয়াগঞ্জে যদি তেমন তৈরী ভালো বাড়ি পাও, তোমার আপত্তি আছে?

চন্দন নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, কী জরুরী কথা আছে বলছিলেন?

রমণীমোহন সতৃপ্ত হাসলেন।...ওই কথাটাই। হারুকে তুমি তো চেনো—সাব-রেজিস্ট্রি অপিসের মুহুরী—যুগল, তোমার বন্ধু যুগলের দাদা। হারু কদিন আগে একটা খবর দিয়েছিল। বামুন-তলার ঘাটের ওপর সেই বাড়িটা, মানে রাজুদার বাড়ির সামনাসামনি, একেবারে গঙ্গার ধারে দোতালা বাড়ি...

চন্দন বলল, হ্যাঁ। বলুন।

আচাবিয়মশাইরা তো এখন কলকাতায় থাকেন। আগে মাঝে মাঝে আসতেন। গত ক'বছর থেকে আর আসছিলেন না। আচাবিয়মশাইকে তোমার চেনার কথা নয়। যাই হোক, উনি বাড়িটা বেচবার জন্যে কদিন হল, জিয়াগঞ্জ এসেছেন। আজ বুধবার তো? উনি রোববার ফিরে যাচ্ছেন। হারু বললে, পুরো টাকা এখন না দিলেও চলবে—বায়না করে দিলেই হল। পরে...

চন্দন বলল, কত চায়?

বায়না?

উঁহু। পুরো দাম।

একটু দমে গেলেন যেন রমণীমোহন।...সে অবশ্যি কম নয়। তবে আজকাল আমাদের মতো ফ্যামিলির বাড়ি বানাতেও তো কমে কুলোয় না। দোতালা বাড়ি। খুব বেশি হলেও তোমার বয়সী হবে। ওপরে নিচে আটখানা ঘর। রান্নাঘর প্রকাণ্ড। ভাঁড়ারঘর আছে। পায়খানা আর টিউবেল হলেই ব্যস। সে আস্তে আস্তে করলেই চলে।

চন্দন লোভার্ত রমণীমোহনকে একবার দেখে নিয়ে ফের বলল, কত চায় ওরা?

সাঁইত্রিশ হাজারে রফা হয়েছে। চল্লিশ হেঁকেছিল।

চন্দন মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমার অত টাকা আছে জানলেন কীভাবে?

রমণীমোহন চমকে উঠলেন। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না—মানে, এখানে বাড়ি করবে লিখেছিলে তো। তাই ভাবলুম, চান্সটা নিই।

চন্দন শুকনো হেসে বলল, বাড়িটা টিঁকবে তো?

কেন?

গঙ্গার ধারে, বললেন।

না, না।...ব্যস্তভাবে দুহাত নাড়তে থাকলেন রমণীমোহন।...সে ভয় নেই। এপারটা তো বরাবর ভরাট—আমার বাল্য-কাল থেকে দেখছি। তাছাড়া ভিতের পিছনে অনেকটা নিচেঅব্দি মজবুত গাঁথনি আছে। সেকালের গাঁথনি। তুমি ভেবো না। কোলের ছেলেকে মা গঙ্গা কখনো আছড়ে ফেলেন না।...হেসে উঠলেন রমণী-মোহন। তারপরই কণ্ঠস্বর চেপে সতর্কভাবে বললেন, তা আছে টাকা? কী করবে? যা বলার আজই গিয়ে শেষ কথা বলতে হবে।

চন্দন আস্তে বলল, ঠিক আছে।

তাহলে এখনি বেরোতে হয়।... রমণী-মোহন উঠে দাঁড়ালেন।

চন্দন বলল, আমি গিয়ে কী করব? আপনাকে টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি যা করার করবেন।

ভয়ার্ত মুখে রমণীমোহন বললেন, আ-আমি অত টাকা নিয়ে যাব। আজকাল পথঘাটের অবস্থা ভালো বটে, কিন্তু...

কিছু হবে না।...চন্দন আশ্বস্ত করল।..আপনার কাছে টাকা আছে, কেউ জানবে না।

সে ঘরে ঢুকল। পরেশের টাকার অবশিষ্টটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সচ্ছন্দ [illegible] জীবনযাপন করতে আর হয়তো বাধা থাকল না। সবটা নগদ সেই কাছে। কান্দী যেতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিতে হবে। আজ ব্রজ একা গাড়ি নিয়ে ট্রিপ দিক।...

কান্দী শহরে সব কাজ চুকিয়ে বাবাকে বাসে তুলে দিল যখন, তখন দুপুর গড়াচ্ছে। খুব হালকা লাগছিল নিজেকে। এ একরকম ভালোই হল। এখানে বাড়ি করে পারিবারিক জীবনযাপন করার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। এবার তার সত্যিসত্যি ছুটি। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে যাবে যথারীতি। আর কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না। সবুজ গাড়িটা তাকে যে জীবন দিয়েছে, সেখানে স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছন্দেই বিচরণ করবে সে দায়বিহীন। যা খুসি করবে সে।

একটা বিশাল শিরিস গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে খুসি মনে সিগ্রেট ধরাল সে। হ্যাঁ, যা খুসি করবে। আবার মদ খাবে। মাতলামি করবে। শরীরের কষ্টকে সুখ বলে মানতে চেষ্টা করবে।

সে অলস চোখে পৃথিবীর দিকে তাকাল। এইসব ভনভনকরা মাছির মতো মানুষ, দোকানপাট, ঘরবাড়ি, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সারাবেলা, মুহূর্তে-মুহূর্তে হাস্যকর আর তুচ্ছ হতে থাকল তার কাছে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে কতক্ষণ ধরে ফেলে-আসা জীবনটাও দেখে নিল স্মৃতির দিকে। কিসের কষ্ট, কেন কষ্ট? কেন সে নিজেকে বঞ্চিত বা প্রবঞ্চিত মনে করছে? কোথায় ভালবাসার আশা করেছিল, ভালবাসা চেয়েছিল বলে এই অসুখ-ভাব সমানে টেনে আনছিল এতদিন?

নমস্কার ছোটবাবু!

ট্রাকটা তার সামনে এসে আচমকা ব্রেক কষেছে এবং শংকর ড্রাইভার স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে নমস্কার করছিল। ট্রাকটা ভর্তি। ত্রিপলে ঢাকা দেওয়া খোল। তার ওপর জনাচার-পাঁচ কুলি বসে রয়েছে। চন্দন মাথাটা একটু দোলাল। রাতের কথাটা মনে পড়ে লজ্জা পাচ্ছিল সে।...রূপপুরে ফিরে যাচ্ছ নাকি? বলল সে।

শংকর জবাব দিল, না স্যার। পুশলে চললুম। আসুন না আপনিও। ব্রজকে পেয়ে যাবেন। ব্রজর কাছে শুনছিলুম তখন, আপনি আজ ট্রিপে থাকছেন না।

চন্দন হঠাৎ উৎসাহে এগিয়ে গেল।... হ্যাঁ, এখানে কাজ ছিল। চলো, পুশলেতেই যাই।

শংকর গীয়ারে বিশ্রি শব্দ করে দরজা খুলে দিল। চন্দন উঠে বসার পর গড়াতে থাকল ট্রাক। শংকর খুসি হয়ে বলল, আর বলবেন না স্যার। সেই ভোরবেলা বেরিয়েছি। বহরমপুর, তারপর গেলুম বেলডাঙ্গা, সেখান থেকে সটান ফেরত হয়ে আবার কান্দী—এবার চললুম পুশলে। নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছে চন্দ্রবাবু। মাঝে মাঝে মনে হয় যাই গাড়িশুদ্ধ পরেশবাবুর মতো উল্টে!

বিকট হাসতে থাকল সে। চন্দন বলল, [illegible] কোথায়?

এখানেই। রূপপুরে আছে রাধার হোটেল, এখানে চাঁপার। দু মাগীই সমান— 'দুই ন্যাথ দুই ন্যাথ' যাকে বলে।...শংকর জীপটা দাঁড়িয়ে দিল চৌরাস্তায় এসে। সামনে সূর্য। শংকরের মুখটা ঘেমে তেতে লাল হয়ে গেছে। গোঁফের নিচে দাঁতগুলো নিঃশব্দ হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে।... বুঝলেন স্যার? বে-লাইনে আছি, রাধা চাঁপা দুজে বিস্তর আছে—পথের দুধারে ফুলফলের বাগান, স্যার। মন্দ লাগে না। আপনারও লাগবে না।...বলে সে চন্দনের মুখটা দেখে নিল একবার।

চন্দন বলল, পদ্মপুরে থেকে ফিরবে কখন?

ঠিক নেই।...শংকর বলল।... একগাড়ি সময়ে ভীষ এই সব বোঝাই হবার কথা। বেচুবাবু আগাম গিয়ে বসে আছে ওখানে।

বেচুবাবু?

বেশ চমকালেন স্যার!

নাঃ, চমকাবো কেন?...চন্দন হেসে উঠল।

লোকটা ভারি ঘুঘু।...শংকর চাপা গলায় বলতে থাকল।...এদিকে মাগীবাজও কম নয়। কাল রাতে আপনি যখন মন্টু-বাবুর ওখানে গিয়েছিলেন...

চন্দন রুদ্ধশ্বাসে বলল, তুমি কেমন করে জানলে?

শংকর মুচকি হেসে জবাব দিল, জানি। যেভাবে হোক, জানতে পেরেছি। আমার স্পাই আছে স্যার। ছেড়ে দিন, যা বল-ছিলুম। আপনি রাতে যখন মন্টুবাবুর ওখানে গিয়েছিলেন, শালা বেচুচন্দ্র তখন মন্টুবাবুর বউর ঘরে ছিল। দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে?

চন্দন শুকনো গলায় বলল, নাঃ।

জোর হেসে শংকর বলল, কী কান্ড! থাক গে, রাধার ঘরে এসে ভালো কর-ছিলেন। অযত্ন করার মতো মেয়ে ও নয়। মানীর মান রাখতে জানে রাধা।

গাড়ি সমান বেগে এগোচ্ছিল। এবার বাঁদিকে মোড় নিল, পদ্মপুরের রুটে। ঢালু হয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে অনেকদূর। সামনে দূরে ঘন সবুজ গাছপালার স্থির দেয়ালটা রোদে তরতর করে কাঁপছে।

...বুঝলেন স্যার? যতটা মন্দ মেয়ে বলে লোকে ওকে ভাবে, ঠিক ততটা ও নয়। তবে এও ঠিক, ধোওয়া তুলসী-পাতাটিও নয়। মানুষ যখন, রক্ত-মাংস শরীরে আছে। বাসনা-কামনাও থাকবে বইকি। লাইফে তো কম দেখলুম না।

চন্দন নিস্পৃহভাবে বলল, আমাকে বিছানা ছেড়ে দিয়ে রাধা কাল শুল কোথায়?

জানেন না?

না।

উঠোনে তো আমরা চার মাতাল গড়া-গড়ি খাচ্ছি। জ্যোৎস্না আমাদের গায়ের ওপর গড়াতে গড়াতে পাঁচিল টপকে পালাল। হঠাৎ শালা ঘুমটা গেল চিড় খেয়ে। এমন তো হয় না। কেন হল? উঠে বসে তাই ভাবছিলুম। নাকি রাধার কাছে গিয়ে শোব— জিভ কাটল শংকর। সরি স্যার, আই অ্যাম ভেরি ভেরি সরি।

না, তুমি বলো।...চন্দন একটু হাসল।

হোটেলঘরে তালা। কিচেন ভেতর থেকে বন্ধ। এই গরমে শ্রীরাধিকের সাধ্যি নেই ওখানে থাকে। বারান্দায় সে নেই। তাহলে গেল কোথায়? ওর ঘরে তো আপনি রয়েছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, আপনি তো অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে পড়েছেন—তাহলে ওঘরে ভেতর থেকে খিল আঁটল কে? ধরে নিলুম, নির্ঘাৎ ভিতরে ও মাগী— থুড়ি, রাধাই রয়েছে।

চন্দন অপ্রস্তুত স্বরে বলল, কিন্তু আমি তো টের পাইনি। সকালেও কোন বিছানা দেখলুম না মেঝের।

না স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—শালীর সাধ্য ছিল না আপনার বিছানায় গিয়ে শোয়। সেকথা নয়। ছিল মেঝেতেই। ফুল স্পীডে ফ্যান চলছিল। ব্যস!

তাহলে রাধার সঙ্গে এক বিছানায় না হোক, একই ঘরে রাত কাটিয়েছে সে। ভাবতে চন্দন আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। কেন এগুলো ঘটতে সুরু হয়েছে তার জীবনে? কে যেন ষড়যন্ত্র করে কোথায় নিয়ে চলেছে তাকে তার অজানতে—ক্রমশ অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর জায়গায়। পরিশেষে নরকের দরজায় গিয়ে কি এই রথটা থামবে কোন একদিন? চন্দন জোর করে হাসতে লাগল।... কী সর্বনাশ!

শংকর স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত তুলে বলল, কিচ্ছু সর্বনাশ নয়। আপনার সঙ্গে বদমাইসি করবে, সে জোর ওর কোথায়?

চন্দন টের পাচ্ছিল, শংকরকে আগে যত মন্দ কুচুটে লোক ভাবত, বস্তুত সে তা নয়। তাকে পছন্দ করা চলে। অন্তরঙ্গ হতেও বাধা নেই। হাসিনের সেই গ্রামটা পেরিয়ে যেতে যেতে শংকর বলল, পাঁচ-দশ মিনিটের জন্যে সামনের গাঁয়ে একবার দাঁড় করাব। আপনাকে গাড়িতে রেখে একবার পাশের বাড়িতে ঢুকব।

কী ব্যাপার? চেনা কেউ নাকি?

শংকর নিঃশব্দ হাসিতে দাঁত বের করল।...কতকটা। আপনাকে বলতে লজ্জা কী— দু-চার চুমুক তালের তাড়ি খেয়ে নেব স্যার। আজকাল থরার দুপুরের তেষ্টা জলে মেটে না।

তাই বলো!...চন্দন সিগারেট বের করে জেবলে নিল। শংকরকেও দিল।

শংকর বলল, জেবলে ঠোঁটে গুঁজে দিন। দিন না, আমি বলছি।

একটু পরেই গ্রামটা এসে গেল। একটা বিশাল তেঁতুলগাছের নিচে গাড়ি থামিয়ে শংকর নামল।...দশ মিনিটের বেশি হবে না। এলুম বলে এক্ষুনি।...যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে এল সে। ফের বলল, ততক্ষণ গাড়িতে না বসে আসুন না আমার সঙ্গে। এরা চমৎকার লোক। আসুন স্যার, আসুন। আপনাকে মোড়া দিতে বলব। আপনি মোড়ায় জজসায়েবের মতো বসে দেখবেন। বদমাইসি করলে মার লাগাবেন। জজ্যুতি করলে চাঁটি মারবেন। তবে স্যার, নিজের মাথাটিও কুল রেখে রাখবেন কিন্তু। ভেরি ডেঞ্জারাস।

ওর কথার ভঙ্গীতে রাজ্যের আদল রয়েছে। নাকি ইচ্ছে করেই রাজকে অনুকরণ করছে শংকর—চন্দনকে বশ মানাতে? উদ্দেশ্য কী শংকরের?...কিন্তু শেষঅব্দি নামল চন্দন। ওকে অনুসরণ করল। শংকর পিছন ফিরে গাড়ির ভরা খোলের ওপর বসে থাকা লোকগুলোর উদ্দেশ্যে বলে গেল, মাল ছেড়ে সরবি না।...

মাটির ছোট ছোট ঘর, খড়ের চাল। স্পষ্ট বোঝা যায়, সমাজের সবচেয়ে নিচু-তলার মানুষগুলো এসবের মালিক। শংকর চড়া গলায় ডাকছিল, ভূষণ! ওরে ভূষণো!

ডাকতে ডাকতে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। গুঁফো বেঁটে কালোকুচ্ছিত একটা প্রৌঢ় লোক দাওয়ায় গড়াচ্ছে দেখা গেল। একপাশে তিনটে তাড়ির কলসী—মুখে ন্যাকড়াবাঁধা রয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে মধ্যবয়সিনী একটি মেয়ে বেরিয়ে ঘোমটা দিল মাথায়।...আসুন বাবু। এত দেরী যে?

শংকর সেই ভূষণকে খোঁচাখুচি কর-ছিল। ভূষণ একবার লালচোখে তাকিয়েই আঙুল তুলে হাঁড়িগুলো দেখাল, এবং ফের শুয়ে পড়ল। বোঝা যায় প্রচন্ড নেশায় সে বুঁদ। শংকর বলল, মলোচ্ছাই!

মেয়েটি বলল, খালি পেটে সকাল থেকে গিলছে। সইবে কত? [illegible] ভাঙতে সেই সন্ধে। বাবু বসুন। [illegible] আনছি। সুখি থাকলে কত খুসি হত—নেই। আজ সকালে জামাই এসে নিয়ে গেল।

শংকর কিছু ভাবছিল। বলল, না থাক। একটা নিয়েই যাই। পদ্মপুরের নদীর চড়ায় বসে খাব।...বলে পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে ফেলে দিল সে।

কলসিটা বয়ে আনতে আনতে শংকর বলল, যে জন্যে আপনাকে ডেকে আনলুম, তা হল না। ছুঁড়ি নেই। ভূষণের মেয়ে। অমন জিনিস ছোটলোকের বাগানে কুটছে কীভাবে, বুঝতে পারবেন না। ফিলিম স্টার স্যার, জ্যান্ত সিনেমা।

চন্দন চমকে উঠেছিল। শংকর তাকে কী ভেবেছে! কিন্তু আত্মসম্বরণ করে সে একটু হাসল। শুধু বলল, তাই নাকি!

(ক্রমশঃ)

কুব্জার অভিজ্ঞতার

শীলাদিত্য

(১)

গোপবালা নবযৌবনা কুব্জা রূপসী হলেও হতে পারত। মাথায় কুঞ্চিত কেশ, কাজল হরিণ চোখে মদির কটাক্ষ, বর অঙ্গে পদ্মকোরকের আভা, তনুভরা যৌবন, এত রূপ নিয়েও সে সুন্দরী নয়। করাল বাতব্যাধি তাকে ত্রিবক্রা করে দিয়েছে। তাকে দেখে কোন ব্রজগোপ আসক্ত হয় না। ব্যর্থ যৌবনার হৃদয় মথিত করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সেই নিঃশ্বাস অগতির গতির কর্ণে আর্তি জানায়। ভাগ্যানিপীড়িতার দুঃখে দুঃখবিমোচনের আসন টলে ওঠে।

মথুরায় কুব্জাকে সকলেই চেনে। অঙ্গরাগ রচনায় সে সিদ্ধহস্তা। কজ্জল, অঞ্জন, নখরঞ্জক, গাত্রাবলেপন, পুষ্পসার, কুসুমমাল্যাদি প্রস্তুতিতে তার অসাধারণ নিপুণতা। যশোগৌরবের প্রতিষ্ঠায় সে মথুরাপতি কংসের অঙ্গলেপনকারিণী। বিকট মূর্তি কংসরাজ কুব্জার শ্রীহস্তাবলেপে নিত্য শ্রীমান হয়ে ওঠেন। রাজার সান্ধ্যসজ্জা সমাপন হলে, সে মৃদু গাইতে গাইতে ঘরে ফেরে,

'কে আর অসার না কর বিচার
কে তুমি কর কি কাজ।
পরের কারণে শরীর খোয়ালে
আপন কাজেতে বাজ।।'

(২)

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। মথুরাপুরীর স্ফটিকতুঙ্গ গোপুরে, তোরণের স্বর্ণকপাটে, আতাম্রশস্যাগারে, রম্য উপবনে জ্যোৎস্নাধারার অপরূপ অবলেপ পড়েছিল। মথুরাপুরী মায়াপুরী হয়ে উঠেছিল। এমন উজ্জ্বল সন্ধ্যাবেলাতেও কুব্জার অবসর নেই। দৈনন্দিন কর্তব্যের দায়ে রাজপ্রাসাদের পথে সে নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে চলছিল। এক মধুস্রাবী স্বর কানে আসায় চমকে উঠল। চোখে পড়ল এক নয়নলোভন মূর্তি। সে-মূর্তি চেনাতে হয় না। চোখই চিনিয়ে দেয়,

'জলদসুন্দর কাঁতি মধুর মধুর ভাতি
বৈদগ্ধি অবধি সুবেশ।
পীত বসন ধর আভরণ মণিবর
ময়ূর চন্দ্রিকা কুন্তু কেশ।।'

কানে এল মধুর প্রশ্ন, 'বরাননে, তুমি কে? তোমার নাম কি?'

কুব্জাকে এমন মধুস্বরে কেউ কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। প্রশ্নে যেন সুধা ঝরে পড়ল। সে লাজকম্পিত স্বরে উত্তর দিল, 'আমি ত্রিবক্রা' মহারাজ কংসের অঙ্গলেপন দাসী। রাজার প্রিয় বিলেপন প্রাসাদে নিয়ে চলেছি।

সুমিষ্ট অনুরোধ হল, 'আমার অঙ্গ বিলেপন করে দেবে? দিলে তোমার ভালই লাগবে।'

কৃষ্ণের সৌকুমার্যে মুগ্ধা কুব্জা সহাস অনুরোধে বিমোহিতা হয়ে গেল। নিজের কোমল করপল্লব দিয়ে ব্রজমোহনের সর্বাঙ্গ ঘন অনুলেপনে সুরঞ্জিত করে দিল। অঙ্গরাগে সুশোভিত হয়ে বরতনুতে অপরূপ শোভা ফুটে উঠল। কুব্জা আত্মহারা হয়ে দেখতে লাগল।

'মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম বিলেপন
মোহন মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলী শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি
মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ।।'

(৩)

কৃষ্ণ দেখলেন বিম্বাধার সর্বাঙ্গ ব্যথায় কাতর। তিনি কুব্জাকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নিলেন। কুব্জার সর্বাঙ্গ থরথর কেঁপে উঠল। তারপর কুব্জার পায়ের উপর নিজের রক্তিম চরণকমল স্থাপন করে, ডান হাতের দুই আঙুলের চাপে তার চিবুক তুলে ধরলেন। কুব্জা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দেখল এক নয়নাভিরাম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

হঠাৎ এক প্রবল উর্ধ্বাকর্ষণে কুব্জা ঋজু-দেহশালিনী হয়ে গেল। তার শরীরে লাবণ্যের বন্যা এল, মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। ভক্তদুঃখহারী মধুর হেসে উঠলেন। কুব্জার বুকে আলোড়ন উঠল। বিশ্ব-বিমোহনকে নিতান্ত আপন করে পাবার আশায় সে উতলা হয়ে উঠল,

'কৃষ্ণ করপদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল
জিনি কর্পূরবেণামুলচন্দন।
একবার যারে স্পর্শে স্মরজ্বালা বিষ ধর্ষে
তার স্পর্শে লুব্ধ নারীগণ।'

প্রেম দুঃসাহস বাড়ায়। কুব্জা কৃষ্ণের উত্তরীয় প্রান্ত ধরে নিজেকে তাঁর দেহলগ্না করে রাখল। তারপর তার নিজের নিকুঞ্জে নিয়ে যাবার সাদর আমন্ত্রণ জানাল,

'কৃষ্ণ মোর জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ সেবা করি সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান।।'

কৃষ্ণ মহাবিপদে পড়লেন। কংসকে বধ করবার জন্যে তিনি মথুরায় এসেছেন। সে কাজ অসমাপ্ত রেখে, ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার অবসর নেই। অথচ তদ্গতপ্রাণার [illegible] দিতেও পারেন না। তিনি কুব্জাকে আদরে আলিঙ্গনে তুষ্ট করে আশ্বাস দিলেন, 'প্রবাসে তুমিই আমার পরম আশ্রয়স্থল। আমি কাজ সেরে তোমার কাছেই ফিরে আসব।'

কৃষ্ণ চলে গেলেন। কুব্জা অশ্রুরুদ্ধিত-স্বরে গেয়ে উঠল,

'আমি কৃষ্ণপদ দাসী তিঁহো রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দরশন জারে আমার তনুমন
তবু তিঁহো মম প্রাণনাথ।।'

(৪)

দিন যায়। কংস নিধন হল? কৃষ্ণ কুব্জার কুঞ্জে আসতে পারলেন না। তাঁর তখন মথুরায় অন্য লীলা চলছে। কুব্জা প্রিয়-সমাগম প্রার্থনায় কাতর আকুতি জানায়। সে আকুতি মথুরার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়,

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো!
হে নাথ! হে রমন! হে নয়নাভিরাম!
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশো মে।
(১)

ভক্তের ক্রন্দন ভক্তবৎসলের হৃদয় আকুল করে তুলল। তিনি কুব্জাকে জানিয়ে দিলেন কবে আসবেন।

কুব্জা অপরূপ সজ্জায় গৃহসজ্জা করল। মুক্তাদাম পতাকা উড়িয়ে দিল, চন্দ্রাতপের আচ্ছাদন দিল সুন্দর শয্যা ও আসন পেতে রাখল। সুগন্ধি ধূপদীপ ও কুসুমমাল্যে গৃহ অনঙ্গ নিকেতন হয়ে উঠল। সে নিজেও সাজল মোহিনী মূর্তিতে। স্নান ও অনুলেপনের পর, অমৃত তুল্য আসব মার্জনে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলল। তারপর বসন-ভূষণ ও পুষ্পমাল্যে নিজেকে অপরূপা করল। তাম্বুল রক্তাধরাকে অপ্সরী বিনিন্দিতা দেখাচ্ছিল।
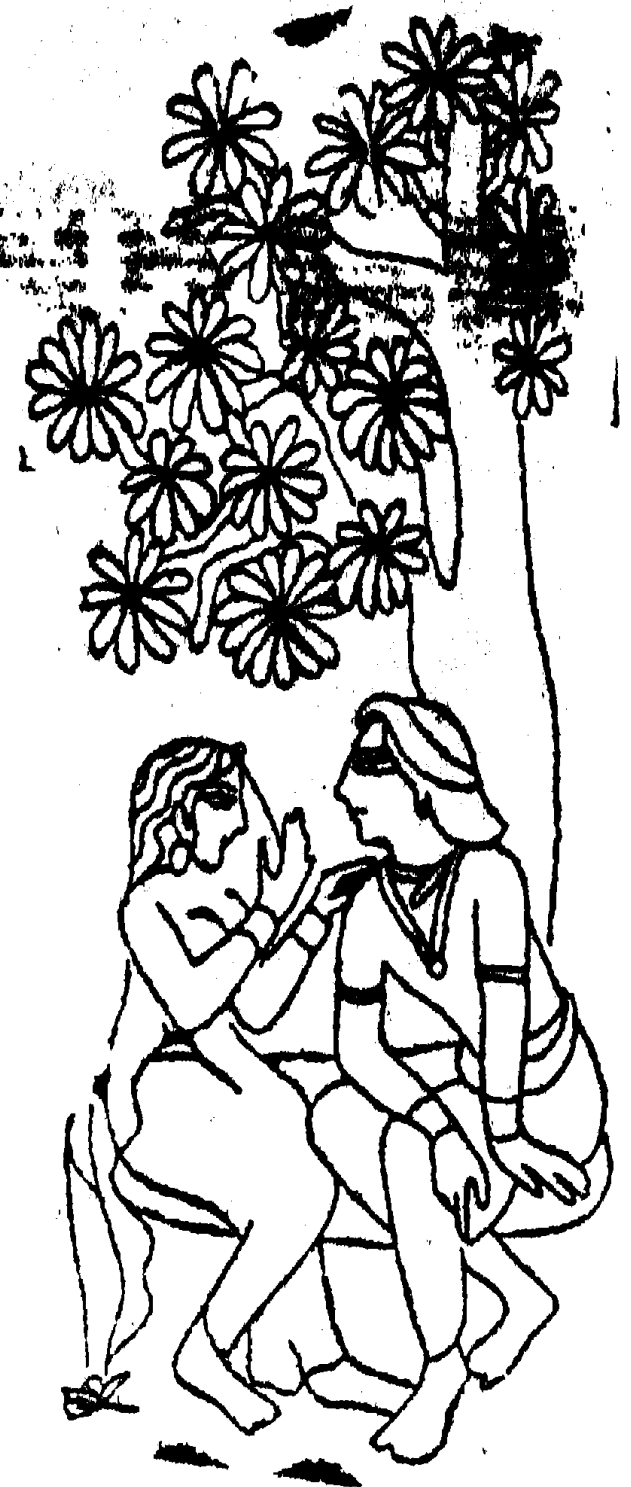
কৃষ্ণ এলেন? প্রেমময় মূর্তিতে এলেন? কুব্জা সলাজ গতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। কৃষ্ণ তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। কুব্জা ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিল। কৃষ্ণকে সাদরে নিজের বিহার শয্যায় নিয়ে গেল। শয্যায় বসিয়ে কৃষ্ণের চরণ কমল অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দি[illegible] প্রেম বিহ্বলকে কৃষ্ণ নিজের পাশে ব[illegible] নিলেন। কুব্জা দৃঢ় আলিঙ্গনে কৃ[illegible]কে বুকে চেপে ধরল। কোমল কুচয[illegible] মধ্যে কৃষ্ণের সুন্দর মুখের যেন প্রতিচ্ছ[illegible] তুলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। আবেশে তার চোখ বুজে এল? সে আত্মহারা হয়ে প্রিয়সঙ্গ ভোগ করতে লাগল।

চেতনা হল সুমধুর প্রশ্নে, 'কি চাও প্রিয়তমে?' কুব্জা ধীর কুণ্ঠিতস্বরে প্রাণের কামনা নিবেদন করল, 'কিছুদিন আমার কাছে অমার প্রেমে নিমগ্ন থাক।'

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'তাই হবে প্রাণাধিকে, আমি দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস, তোমার মনের মধ্যেই থাকব।'

আজও কুব্জা কৃষ্ণহৃদিলীনা। তার প্রেম নিত্য বিবর্ধমান। তার হৃদয়ে কৃষ্ণমূর্তি, কণ্ঠে কৃষ্ণনাম। জগৎ তার কাছে বিলুপ্ত,

'লাবণ্য কেলিসদন জননেত্র রসায়ন
সুখময় গোবিন্দ বদন
যার পুণ্যপুঞ্জফলে সে মুখ দর্শন মিলে
দুই আঁখি কি করিবে পানে।'

---

(১) হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবন মধ্যে একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণার একমাত্র সিন্ধু, হে নাথ, হে রমন, হে লোচনস্নিগ্ধকর, কবে তুমি আমার নয়ন গোচর হইবে।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু   সুহৃদ ঘোসাল দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৯ সালের ৩০শে মার্চ আদালতের কাজ যথারীতি আরম্ভ হোলো। তার আগে ৩শে মার্চ থেকে চিত্তরঞ্জনের অবিস্মরণীয় সওয়াল-জবাব চলছে—সেদিন শেষ হবে। সেরাজের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাবসমৃদ্ধ চিত্তরঞ্জন আদালত-কক্ষে প্রবেশ করলেন। নিস্তব্ধ আদালত-কক্ষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোলো আবিষ্ট চিত্তরঞ্জনের শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি-সমর্থন যুক্তি :

মাননীয় জজ সাহেব এবং এ্যাসেসর মহোদয়গণের জ্ঞাতার্থে সবিনয় নিবেদন—অবশেষে বিচারের শেষ দিনটিতে এসে আজ আমাদের সকলের মধ্যেই একটি স্বস্তির আনন্দ। এই স্বস্তির আনন্দ, বিশেষ করে আলিপুরের আসামীদের, কারণ এই বছরের অধিকাংশ ভাগ সময় কারাজীবন ভোগ করবার পর আজ, আপনাদের সামনে তাদের বিরুদ্ধে আরোপিত সরকার পক্ষের অভিযোগগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণের সময় এসেছে। আসামীদের বিরুদ্ধে এ যাবৎকাল যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলির সম্পর্কে আমাকে আমার বক্তব্য পেশ করতে হবেই, কিন্তু তার আগে এই মামলার কয়েকটি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। (আমি জানি) মিস্টার বার্লি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, তিনি এই মামলা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়েছেন, যা বাস্তবিক পক্ষে অস্বাভাবিক আগ্রহ, কারণ এই মামলাটির অস্বাভাবিকত্ব।—এবং, আপনারাও সরকারী পক্ষের সাক্ষ্য-বিবরণীর গতি-প্রকৃতির মধ্যে সেই অস্বাভাবিকত্ব দেখতে পারেন। এখানে, কি ঘটেছে তার উল্লেখ না করে, মামলাটি করে মামলাটি এখানে আসবার আগে বিবৃতিগ্রাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের কাছে যা ঘটেছিল তার উল্লেখ করছি। অস্বাভাবিকতার বীজ ঐখানেই বপন করা হয়েছিল। আপনারা দেখতে পাবেন যে, মিস্টার বার্লি (বর্তমানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা অনু-সারে অভিযুক্ত আসামীদের) কেবলমাত্র সন্দেহের বশে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরের-দিনই (অর্থাৎ ৩রা মে) বিচার করতে চেয়ে-ছিলেন—যখন ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শুধু-মাত্র পুলিশের সন্দেহ হয়েছিল যে, ওরা বোমা ও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে—যার যথার্থতা প্রমাণ করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।

সরকারী পক্ষের কথা অনুযায়ী, এই সব অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ২রা মে তারিখে কেবল সন্দেহের বশে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ও হাজতে আটকে রাখা হয়। তাদের, নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়নি—অবশ্য সরকার যদি পুলিশ কমিশনারকে ম্যাজিস্ট্রেট বলে ধ'রে নেন, সেকথা স্বতন্ত্র। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ৩রা মে মিস্টার বার্লি এদের বিচার করা মনস্থ করেছিলেন। সেই অনুযায়ী ৪ঠা মে এদের তাঁর সামনে হাজির করা হয়েছিল। আমরা আরও দেখতে পাই যে, মিস্টার বার্লি একজন অতি বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারীর বাড়িতে গিয়ে এদের কয়েকজনের জবানবন্দী—(যা পুলিশের মতে পুলিশের কাছে এদের স্বীকারোক্তি) পড়ে আসেন। আমি বলছি যে, এই পদ্ধতি স্বভাববিরুদ্ধ, এমন একটি পদ্ধতির উল্লেখ আমরা আজ অবধি কোনো মামলায় পাইনি। এরপর তিনি আরও কি বলেছিলেন? ৪ঠা মে তারিখে ধৃত ব্যক্তিদের কয়েকজনকে তাঁর সামনে নিয়ে যাওয়া হয়ে-ছিল এবং তিনি তখনি ওদের জেরা করতে উদ্যোগ হয়েছিলেন। সরকারী অভিশংসকের বক্তব্য যে, মিস্টার বার্লি দণ্ডবিধির একটি বিশেষ ধারা অনুযায়ী ওদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে আমি পরে যখন আমার বক্তব্য পেশ করবো তখন আপনারা দেখবেন যে, বার্লি সাহেবের জিজ্ঞাসা প্রশ্নগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওদের কাছে অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের নাম সংগ্রহ করা। এই কাজটি ৪ঠা মে তারিখে করা হয়েছিল। ৩রা মে তিনি এই মামলাটির বিচার করবেন বলে মনস্থ করেন; ৪ঠা মে তারিখেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং তাদের বিরুদ্ধে (তথাকথিত) প্রমাণের স্তূপ তাঁর সামনে হাজির করা হয়—তিনি নিজেই ওদের জেরা করেন এবং জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। তারপর তিনি ওদের জামিনে খালাস-পাবার আবেদনপত্রগুলি গ্রহণ করেন এবং সবাইকার আবেদনই না-মঞ্জুর করেন। পরে ১৮ই মে বার্লি সাহেব মিস্টার ফ্রিজোনিকে জেরার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেন। সেইদিনই বার্লি সাহেবের অধিকার-বৈধতার প্রশ্নটি ওঠে। পরের দিন বার্লি সাহেব তাঁর আদেশ দানের নথি-পত্রে তাঁর গত ৩রা মে তারিখের আদেশের উল্লেখ ক'রে তাঁর বিচারের অধিকার সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করলেন। অপর একটি স্বাভাবিক পদ্ধতির ব্যতিক্রম সম্পর্কেও আমি উল্লেখ করবো।
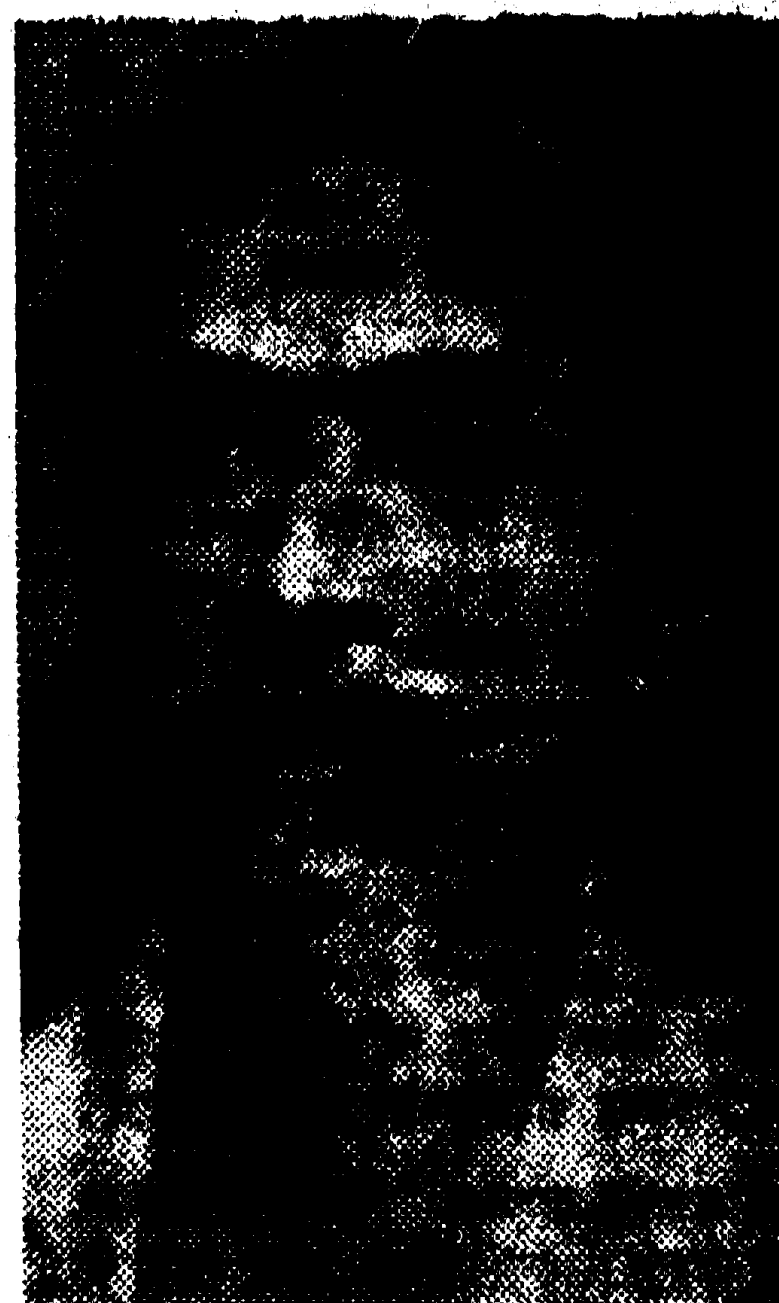
ফ্রিজোনিকে ১৮ মে আংশিক জেরা করবার পর, ১৯ মে তারিখে তিনি একটি আদেশ জারী করেন—যা আমি আপনাদের পড়ে শোনাব। সেই আদেশপত্রে কিন্তু ফ্রিজোনির সাক্ষ্য-গ্রহণ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নাই। কিন্তু সাক্ষীদের জেরা করার বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি হওয়ার আশঙ্কায় (কারণ আদালতের এ রকম কোনো নির্দেশ ছিল না) তিনি ১৯ তারিখে আদেশ জারী করে পরে সাক্ষীকে জেরা করা যুক্তিযুক্ত

(১৯) পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। পৃঃ ৪২।

মনে করেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? আমার নিবেদন, বার্লি সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল ক্রিজোনির প্রথম দিনের সাক্ষ্য গ্রহণের নীতিবিরুদ্ধ ভাবটি সামলানো, যা আইনজ্ঞের দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই বলে তিনি ভালভাবেই জানতেন। সুতরাং এটাই সুস্পষ্ট যে, ১৮ যে তারিখে তাঁর কাছে কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ ছিল না, এবং যখন তিনি আদেশ পেলেন তখন তিনি সাক্ষীকে আদেশমত পুনর্বার জেরা সুরু করেননি—যা করতে তিনি আইনের বলে বাধ্য। আমার সবিনয় নিবেদন, সমস্ত পদ্ধতিটাই বিধি-বহির্ভূত হয়েছিল। উনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে না। অথবা কোনো আইন অনুযায়ীই গ্রহণযোগ্য নয়। আমার কাছে আমার বন্ধুবরের এই নীতি-অবমাননার অভিসন্ধিটুকু খুবেই স্পষ্ট, তা সত্ত্বেও আমি স-ভরসায় বলছি যে, ঐ নীতি সরকারী মামলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং বিশেষ করে এমনি একটি মামলা যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির গুরুতম অভিযোগ আনা হয়েছে। সংগৃহীত ঐ সাক্ষ্য প্রমাণগুলি যখন আমি সমীক্ষণ করবো, তখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে, ঐগুলির শতকরা নব্বই-ভাগই গ্রহণের অযোগ্য, এবং শতকরা নব্বই ভাগই ওদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-গুলির উপর কোনো আলোকপাত করে না। ফলে জনসাধারণের সময় ও অর্থের অপচয় তো হয়েইছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্তূপীকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সুবিচারের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে।

এই ধরনের মামলায় প্রথমে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করা উচিত এবং পরে ঐ প্রমাণসিদ্ধ ষড়যন্ত্রের সহিত প্রকৃত ষড়যন্ত্র-কারীদের জড়ানো উচিত। কিন্তু এখানে আমার বন্ধুবর কর্তৃক কি পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে? জবানবন্দী বা স্বীকারোক্তি অথবা লিপিবদ্ধ প্রমাণ ব্যতিরেকে, কেবল আনু-মানিক অভিযোগের ভিত্তিতে ওদের আসামী বিবেচনায় তিনি বিচার সুরু করেছিলেন। তিনি ওদের অপরাধ কল্পনা করে সেই অপরাধের প্রমাণগুলির সঙ্গে ওদের জড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি একটি চিঠি পড়লেন এবং তা থেকে এ-জি অক্ষর দুটির উল্লেখ করলেন। এই উল্লেখ করার পিছনে তাঁর যুক্তি কি? তিনি কি কোনো প্রমাণের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, এ জি অক্ষর দুটি 'অরবিন্দ ঘোষ' নামের সংক্ষিপ্ত রূপ? না। তাঁর যুক্তি হোলো, 'আমি বলছি যে, ঐ অক্ষর দুটি হোলো 'অরবিন্দ ঘোষ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।' অভিযোগের সন্দেহ-টুকুর ভিত্তিতে কোনো তদন্তের শুরুতে কেবলমাত্র জেরাই করা চলতে পারে এবং পরে এই সম্পর্কে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি অনুসন্ধানের প্রশ্ন ওঠে। '(এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল)'।

এইবার ছাত্রভাণ্ডারের কথা ধরা যাক! অরবিন্দ ঘোষ একজন ষড়যন্ত্রকারী—কারণ, তিনি ছাত্রভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমার সবিনয় নিবেদন, এইভাবে অভিযোগ করবার প্রচেষ্টা নীতি-বহির্ভূত—এই ধরনের প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত কোনো ধর্মাধি-করণের সামনে স্বীকৃত হয়নি। আপনার এজলাসে (আলিপুর সেশনস কোর্টে) আমার বন্ধুবরের নিবেদন করা উচিত ছিল যে, এই সব সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা এখনো পর্যন্ত অভিযোগমত দোষী প্রমাণিত হয়নি—সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যদি নির্ভুলভাবে এদের দোষী প্রমাণ করা সম্ভব হয় তবেই আপনারা এদের অপরাধী সাব্যস্ত করবেন।

এখনো আর একটি বিষয় বলবার আছে—সেটি হোলো অরবিন্দের পারিবারিক পত্রগুলি সম্পর্কীয়। এই পত্রগুলি পড়ুন—পড়লে, সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ঐগুলি অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-গুলির উপর কোনো আলোকপাত করেনি। এই সমস্ত একান্তভাবে পারিবারিক স্বত্ব-সংরক্ষিত পত্রগুলিকে আম-দরবারে উপস্থিত করবার অনধিকারকে নিছক খেয়ালের বশে অন্যায়ভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে। আপনাদের কাছে ওদের অপরাধী প্রমাণ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই কি ঐ প্রচেষ্টা করা হয়ে-ছিল? আমার বিনীত নিবেদন, মোটেই ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ কাজ করা হয়নি। কারণ ঐ পত্রগুলির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনোখানেই এমন কিছুই নেই যা ওদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণের সহায়ক। এর পরেও রয়েছে এই সম্বন্ধে আমার বন্ধুবরের চমৎকার যুক্তি, 'চিঠির সবটা পড়ে তার অর্থ যা হয় তা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে চিঠির অংশ বিশেষের অর্থটাই বিবেচ্য এই যুক্তির দ্বারা বোঝায় যে, যদিও চিঠির ভাষা ষড়যন্ত্রের অনুকূলে যায় না বা কোনো অপরাধে লিপ্ত থাকার নির্দেশ দেয় না, তবু এই নির্লিপ্ততায় আপনি যেন বিভ্রান্ত না হন। আপনারা কি নিশ্চিত যে অরবিন্দ অপরাধী? আপনারা কি নিশ্চিত যে, অরবিন্দ প্রকৃত-পক্ষে রাজদ্রোহী? যদি নিশ্চিত হন তবেই তাকে অপরাধী বলবেন। তার বরোদার গতিবিধিকে বোমা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এমন কি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ-গুলিকেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সেই প্রবন্ধগুলি ছিল স্বাধীনতার বা পূর্ণ স্বরাজের আদর্শের ধারক ও বাহক। কিন্তু এমন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কোথায় যার দ্বারা নিঃসন্দেহে দেখানো সম্ভব হবে যে, 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার প্রতিটি প্রবন্ধই অরবিন্দের লেখা। আমার বন্ধুবর তাঁর বক্তৃতার সুরুতেই বলেছিলেন যে, ঐ প্রবন্ধে উল্লিখিত আদর্শগুলির সঙ্গে কোনো ইংরাজ ভদ্রলোকের বিরোধ ঘটতে পারে না। যদিও প্রবন্ধে অরবিন্দ আদর্শ প্রচার করেছে, তথাপি ঐগুলি পড়বার সময়ে ঐগুলি বোমা এবং রাজদ্রোহের সম্পর্কীয় হিসাবে পড়তে হবে। ও'দের সওয়ালবৃত্তির মধ্যে এই ধরনেরই ছল-চতুরীর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

আমি ইতিপূর্বে আপনাদের বলেছি যে, অরবিন্দের চিঠিপত্রগুলি আপনাদের নিকট দেওয়া হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে ভদ্র-মহোদয়গণ, অরবিন্দের জীবনের গোপনীয় বলতে আর কিছুই নেই। আমার বন্ধুবরের অভিপ্রায় হোলো যে, অর-বিন্দের অন্তর্জীবনের সঙ্গে যুক্ত ঐ সকল প্রমাণগুলি অরবিন্দের ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরিচায়ক। আমি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উক্ত চিঠিপত্রগুলি সম্পর্কে সওয়াল করবো, আমি আপনাদের নিকট যুক্তিসহ প্রমাণ করবো যে, অরবিন্দের জীবন (লেখার দিন থেকে ধরাপড়ার দিন পর্যন্ত) এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। অরবিন্দের বরোদা থেকে লেখা চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধগুলি আমি আপনাদের সামনে নিবেদন করবো, যেগুলি অরবিন্দের লেখনী-নিঃসৃত অথবা ভাষণ-প্রসূত, এবং আমার নিবেদনের মাধ্যমে আমি আপনাদের দেখাতে সক্ষম হবো যে, ঐগুলির মধ্যে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রপূর্ণ কোনো ইঙ্গিতই ছিল না। অরবিন্দ সব সময়েই এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রেরিত ছিলেন। আপনারা বুঝতে পারবেন যে, ১৯০৪ সালের মধ্যভাগ থেকে, ১৯০৫, ১৯০৬ এবং বন্দীজীবনের ঠিক আগে পর্যন্ত অরবিন্দের কর্মজীবন সেই মহৎ আদর্শেই অনুপ্রেরিত ছিল। সেই আদর্শের বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে মন্তব্য করার আগে সাধারণভাবে সেই প্রসঙ্গে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার বন্ধুবর তাঁর সওয়ালে সে-গুলির প্রতি বিদ্রূপ করতে দ্বিধা বোধ না করলেও আমি তাতে নিরাসক্ত, কারণ সমগ্র জাতির কাছে ঐগুলি ছিল পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ; প্রতিটি দেশবাসীর কাছে ঐগুলি ছিল স্বারাজ্য-সিদ্ধি বা ব্রহ্ম-সাযুজ্যের নীতিকথা। এই আদর্শের সঙ্গে ভারতের পরিচয় বহু পুরাতন। যাদের এই আদর্শের সঙ্গে মোটেই পরিচয় নেই তাদের পক্ষে এর অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে পারা দুঃসাধ্য কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এই ভাবধারার সঙ্গে নিশ্চয় পরিচিত।

বেদান্তের মূল কথাই হোলো জীবাত্মা (মানুষের মধ্যে যার অবস্থান), পরমাত্মা বা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নয়। অর্থাৎ আপনি যদি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চান তাহলে ঈশ্বরকে আপনার মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনার অন্তরের মণিকোঠায়, আপনার আত্মায় ঈশ্বরের অধিষ্ঠান এবং সেই জন্যেই আত্ম-উপলব্ধি দ্বারা ঈশ্বর-সান্নিধ্যে না এলে কোনো মানুষ জীব-দ্দশায় নির্বাণলাভ করতে পারে না। সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও, অন্য সব কিছু প্রশ্ন ব্যতিরেকে, ঐ একই উপলব্ধি প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির মধ্যে এই ঊর্ধ্বতম, মহত্তম ও বৃহত্তম উপলব্ধি না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। কোনো ব্যক্তির পক্ষে

ই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্যে কোনো হ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, ব্যক্তি- ত আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ও সাধনাই একমাত্র াপনাকে আপনার মধ্যে অবস্থিত ভগবানের পলব্ধি এনে দেবে, আত্মার সঙ্গে পরম- ত্মার মিলন ঘটাবে। ব্যক্তিগত জীবনের র্ধগতি বা উন্নয়নের পক্ষে প্রযোজ্য ই সত্যটি জাতীয় জীবনের র্ধগতি বা অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ই পথে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি তঃস্ফূর্তভাবেই আসবে এবং বাহ্যিক গনো সাহায্য ব্যতিরেকেই জাতীয় মুক্তি ম্ভব হবে। (মুক্তির আস্বাদন সম্পূর্ণ ক্তিগত উপলব্ধি) সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে পর কোনো ব্যক্তি বা বিদেশী মুক্তি এনে তে পারে না। এই সত্যাশ্রয়ী জাতীয় তনার আবাহন বা জাতীয়তাবাদের াণ-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে দেশবাসীর পরই নির্ভরশীল। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত বাণী অরবিন্দ সব সময়েই প্রচার রেছে এবং ঐ জাতীয়তাবাদের প্রাণ- তিষ্ঠা সনাতন আর্যধর্ম বিরোধী কোনো দ্ধতিতে করার কথা কোনোদিন অরবিন্দ রেনি। আমি বিশেষ করে এই বিষয়টির পর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—

অরবিন্দের চিন্তাধারায় 'পূর্ণ স্বরাজ' মুক্তিলাভ পদ্ধতি কখনো তার দেশের তিহাস এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী হয়ে ঠেনি এবং সেই জন্যেই আপনারা দেখবেন , বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় আসবার অরবিন্দ যে সব বাণী প্রচার করেছে গুলি হিংস্র, পাশবশক্তির জাগরণের ণী নয়, সেগুলি সংযম, আত্মনিগ্রহ এবং ষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শক্তির আবাহক বাণী। কোনো মতেই বোমা নয়—সংযমের ত্তিতে ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। গুপ্ত মিতির হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের প্রতিকূলে রবিন্দ আবেদন জানিয়েছে এবং তাদের াগ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের শিক্ষায় অনু- রণা দিয়েছে। এমন যদি কোনো আইন কে যা জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রতি অবিবেচক বং ক্ষতিকর তাহলে সেই আইন এক হান পরিণামের পরিপন্থী বিবেচনায় ঙে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অরবিন্দ তাঁর খনীতে অথবা ভাষণে কখনো বা কোথাও প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেনি। যদি রকার উপযুক্ত বিবেচনায় এমন কোনো াইন প্রনয়ণ করেন যা মুক্তি বা মোক্ষ- াভের প্রতিবন্ধক হবে, সেক্ষেত্রে অরবিন্দের র্দেশ হোল্যো—সেই আইন অমান্য করে াইনটির অস্তিত্ব লোপ করা। এই নির্দেশ াবেকের শাশ্বত নির্দেশ, এই নির্দেশ ধিলিপি। ঐই আইন অমান্য করার ফলে দ কারাজীবন বরণ করতে হয় তাহলে াদির্বধায় কারাজীবনে প্রবেশ করবে। রবিন্দের প্রচারিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ীতির এই কথাগুলিই সারাংশ। পৃথিবীর র্বত্র মুক্তিলাভের জন্যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ীতি কি একই কথা বলে নি? কিন্তু ই দেশে এই নীতি কি এতই বিসদৃশ— ই আন্দোলন—যা মিস্টার নর্টনের বমাননাকর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে? ইংলণ্ডবাসীরা কি এই ধরনের আন্দোলন বারংবার করেন নি?

আমি বলতে চাই যে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ার দিন পর্যন্ত অরবিন্দ ঐ নীতিই প্রচার করে গেছেন। তার দেশবাসী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সবকিছু হারাতে বসেছে, এই হতাশায় অরবিন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আপনারা দেখতে পারেন, সেই জন্যে অরবিন্দ তার বাণী প্রচারের প্রতিটি মুহূর্তেই ঐ ব্যাপারটি সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছিল। অরবিন্দ বলেছে, আত্মবিশ্বাসী হও, আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হবে না। অনুরূপ নীতি জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জাতি যদি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের প্রতি সচেষ্ট বা সচেতন না হয়, তবে জাতির ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক। এই ভাব অনুযায়ী অরবিন্দের বাণীতে বলা হয়েছে—'তোমরা কাপুরুষ নও, তোমরা একদল সামর্থ্যহীন মানুষ নও, কারণ তোমাদের মধ্যে দিব্যশক্তি নিহিত রয়েছে। নিজের উপর আস্থা রাখ, এবং সেই অবিচলিত আস্থার উপর নির্ভর করে এগিয়ে চল অভিষ্ট সন্ধানে এবং ক্রমশঃ জাতীয় জীবনে পূর্ণ বিকশিতরূপে প্রতি- ষ্ঠিত হও।'

এইবার আমি আমার বিজ্ঞ বন্ধুবরের সাক্ষ্য-প্রমাণ উদ্ধৃতি অনুযায়ী ১৯০২ সাল থেকে বন্দীজীবনের শুরু অবধি অরবিন্দের গুপ্ত-জীবন সম্পর্কে সওয়াল করবো। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, ১৯০২ বা ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বারীন এবং অরবিন্দের মধ্যে কোনোই সহযোগ ছিল না।

প্রমাণসিদ্ধভাবে আপনারা জানেন যে, অরবিন্দ ইংলণ্ডে গিয়েছিল। ইংলণ্ড থেকে ফিরে বরোদায় কর্মজীবন উপলক্ষে সে প্রবাসী হয়। সেই সময়ে বারীন দেওঘরে পড়াশুনো করতো। সেখান থেকে বারীন এফ্-এ পরীক্ষার জন্যে ঢাকায় গিয়েছিল। ঢাকা থেকে সে পাটনায় এবং পরে বরোদায় যায়। ১৯০২ বা ১৯০৩ সালে আমরা বারীনকে বরোদায় দেখতে পাই। আমার বিজ্ঞ বন্ধুটি তাঁর সওয়ালে বলেছেন যে, ১৯০২-১৯০৩ সালে বারীনের বরোদায় থাকার সময়ে তার মনে অরবিন্দ বিপ্লবের বীজ বপন করে। বারীন তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে যে, ১৯০৩ সালের কোনো সময়ে সে বরোদা পরিত্যাগ করে দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিল। আমার বিজ্ঞ বন্ধুর মতে এই উক্তিটির যথার্থতা দ্বিধাহীন স্বীকৃতি পাবে সুতরাং এই উক্তির ভিত্তিতেই তিনি বললেন যে, বিপ্লবের মন্ত্র বারীন বরোদা- তেই পেয়েছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথমত সুকুমার মিত্র এবং পদু তেওয়ারীর সাক্ষাৎ থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, ১৯০২- ১৯০৩ সালে বরোদায় সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত বারীন ও অরবিন্দের কোনো যোগা- যোগ ছিল না। ওদের সাক্ষ্য থেকে আরো জানতে পারবেন যে, বারীনের দেওঘরের জীবনে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। বারীন দেওঘর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকায় এফ্-এ পড়তে যায়, সেখান থেকে বাঁকীপুর হয়ে এক রকম উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই বরোদায় যায়। এর কিছুদিন পরে বারীন বরোদা ত্যাগ করে স্বাধীনতার বাণী প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। কেবল মাত্র এই থেকেই তথ্য নিয়ে আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, অরবিন্দ বারীনের মনে বিপ্লবের বিষ ঢুকিয়েছে। ব্যাপারটার সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য, ১৯০২-১৯০৩ সালে যখন বরোদায় ওরা দুজন এক সঙ্গে ছিল সেই সময়ে অরবিন্দের নিজের কথাগুলোই ধরা যেতে পারে—এই প্রসঙ্গে ২৯২।১, ২৯২।৩ এবং ২৯২।৫ নম্বরের নথিভুক্ত প্রমাণগুলি পরীক্ষা করা যাক। আমি ঐ নথিভুক্ত প্রমাণ অর্থাৎ চিঠিগুলি ছাড়া ঐ সময়ের অন্য কোনো চিঠি সম্পর্কে অবহিত নয়। ২৯২।১ নম্বর প্রমাণটি হোলো অরবিন্দের লেখা ১৯০২ সালের ২রা জুলাই তারিখের একখানি চিঠি। এই পত্রে (মৃণালিনী দেবীকে লিখিত) আপনারা সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচনা অথবা রাজ- দ্রোহিতার পক্ষে কোন প্রমাণ আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি?

যতীন্দ্র সম্পর্কীয় উক্তির প্রসঙ্গে আমি পরে আলোচনা করবো। অরবিন্দ তার স্ত্রীর জন্মকুণ্ডলী চেয়েছিল যতীন্দ্রকে দেখাবার জন্যে—যতীন্দ্র বরোদা রাজ্যের কর্মচারী এবং জন্মকুণ্ডলীর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গণনা করায় বিশেষজ্ঞ ছিল। যতীন্দ্র সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করে দেখাবো যে, যতীন্দ্র অপরাধী কি না, কারণ সে এখনো অবধি দণ্ডবিধির আওতায় আসে নি। অবশ্য এটা ১৯০২ সালের ঘটনা। যে ঘটনা বর্তমান মামলার ভাগ্য নির্ধারণে অভিযোগকারীদের অনুকূলে কোনো আলোকপাত করবে না। যে চিঠিগুলির কথা আপনাদের বলছিলাম তার মধ্যে অরবিন্দের লেখা ১৯০২ সালের ২০শে আগস্টের চিঠিখানিও বিবেচ্য। এই পত্রে ব্যক্তিগত উন্নতি ছাড়া একটিই প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ রয়েছে এবং সেই কথাটি হোলো একান্ত অনুগত হিসাবে অরবিন্দের সনাতন হিন্দুসমাজের মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন। এই সব চিঠিপত্রগুলিকে সংগ্রহ করে নথিভুক্ত প্রমাণ হিসাবে রাখা হয়েছে— কারণ এইগুলির সাহায্যে অরবিন্দের ১৯০২ সালের চিন্তাধারার হদিস পাওয়া যাবে। এর পরেই বারীন বরোদা থেকে চলে গিয়ে স্বাধীনতার বাণী প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠে। ১৯০৪ বা ১৯০৫ সালে বারীন আবার বরোদায় যায়, যে সময়ে অরবিন্দ বারীনের গতিবিধি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে— যার প্রমাণ পাওয়া যাবে ২৮৬।৪ নম্বর প্রামাণ্য নথিতে (অরবিন্দের লেখা ১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখের চিঠি)। এই চিঠির বক্তব্য ও সুকুমারের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, অরবিন্দের

বারীন সম্পর্কে অভিযোগ ছিল, 'বারীন বড় চঞ্চল, তার কাজকর্ম করার দিকে মন নেই'। সুতরাং বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ঐ সময়ে বারীনের আত্মীয়স্বজন চেয়েছিল যে, বারীন উপজীবিকার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করুক। অরবিন্দ অভিযোগ করেছে, 'সে অশান্ত, সে দেশসেবার কাজে ঘরের বাইরে থাকতে চায়।'—এই অভিযোগ সুকুমারের সাক্ষ্যে স্বীকৃত হয়েছে। এই সব থেকে সেই সময়ে অরবিন্দ ও বারীনের মত ও পথের বিভিন্নতার একটা ধারণা করা যায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আপনাদের ঐ সময়টিতে অরবিন্দের মত ও পথ কি ছিল তা পর্যবেক্ষণ করতেই হবে। এই পর্যবেক্ষণের জন্য ১৯০৫ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে অরবিন্দের স্ত্রীকে লেখা চিঠিখানি (যে চিঠিখানি পুলিশ অরবিন্দকে ধরবার দিন সংগ্রহ করে) আপনাদের সামনে নিবেদন করবো। সেই সময়ে বারীন বরোদায় অরবিন্দের কাছে ছিল।

আমি ইতিপূর্বে অরবিন্দের লেখা ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে আপনাদের দেখিয়েছি যে, অরবিন্দ বারীনের মতিগতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে—এই অক্টোবর মাসেও বারীন বরোদায় ছিল। আরো দেখা যাক, ঐ সময়ে অরবিন্দের একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল, যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে বাঙলায় লেখা এই চিঠিখানিতে (প্রামাণ্য নথি নম্বর ২৮৬।১ এবং ২৮৬।২)। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, ঐ সময়ে অরবিন্দের বাঙলা ভাষায় খুব বেশী দখল ছিল না। তার বাঙলা ভাষা ছিল সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিশ্চয় 'অন্ধ রাজার মহিষী' কথাটি মনে আছে। এই কথাটি 'রানী গান্ধারী'-র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে—গান্ধারী তাঁর স্বামী অন্ধ-রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বের সমব্যথী হবার জন্য নিজে সব সময়ে চোখ বেঁধে রাখতেন। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা দেখুন যে, এই চিঠিতে অরবিন্দ নিজেকে পাগল (যে আপন ভাবে বিভোর) বলে বর্ণনা করেছে এবং নিজের স্ত্রীকে তার চলার পথ স্থির করতে বলেছে। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ 'গান্ধারী'-র কথা উল্লেখ করে এই আশা করেছে যে, তার স্ত্রীর দেহে যখন হিন্দু-রক্ত রয়েছে তখন সে হিন্দুধর্মের আদর্শ অনুযায়ী স্বামীর অনুসৃত পথেরই অনুগামিনী হবে। ঐ চিঠিতে অরবিন্দ তার জীবনের গতিপথের যে বর্ণনা দিয়েছে সেই পথ তখন সে একনিষ্ঠভাবেই অনুসরণ করছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নামমাত্র অর্থ নিজের রেখে সে তার উপার্জিত অর্থের বাকি সবটাই দেশের কল্যাণে দান করতো। তার জীবনের প্রথম মহান আদর্শের উল্লেখ করে সে এই পত্রে লিখেছিল যে, তার উপার্জিত অর্থের বিধি-নিযুক্ত অছি হিসাবে তার কর্তব্য, বেঁচে থাকার জন্য যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন কেবল সেইটুকু গ্রহণ করে বাকী অর্থ বিধি-নির্দিষ্ট কাজে ব্যয় করা। কি ভাবে ব্যয় করা হবে? ব্যয় হবে বিধি-আদিষ্ট কাজের মাধ্যমে— ক্ষুধিতের সেবায়, দীন-দুঃখী, দরিদ্র-নারায়ণের সেবায়। এই পথে চললে তবেই বিধি-ঋণে আবদ্ধ মানুষ বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবে প্রত্যার্পণের মাধ্যমে। এই পথ অনুসরণ না করলে মানুষ তস্কর-বৃত্তির পরিচয় দেবে। এই পথ তার নিজের কামনা-বাসনা জড়িত স্বার্থ সিদ্ধির পথ নয়। সে নিজের জন্য নামমাত্র অর্থ রেখে বাকীটুকু দেবসেবায় প্রত্যর্পণ করতো।—যা আপনারাও প্রত্যর্পণ করতে পারেন গোপন দানের মাধ্যমে, ক্ষুধিতের অন্ন সংস্থানের কারণে, নিঃস্ব ব্যক্তির প্রয়োজনের জন্যে।

তার জীবনের দ্বিতীয় মহান আদর্শের উল্লেখ করে সে লিখেছিল—নিজের জীবনে ঈশ্বর দর্শনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস—এই দর্শন করা অর্থে চোখে দেখা নয়, হিন্দুধর্ম অনুযায়ী নিজের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপলব্ধি। মানুষ সাধনার দ্বারা স্বীয় চেতনার অবলম্বনেই সেই সৎ ও আনন্দময় চেতনার সান্নিধ্যলাভ করে। এটা ছিল তার জীবনের দ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রসঙ্গে সে অধ্যাত্ম উপলব্ধির দীক্ষার জন্য গুরুর প্রয়োজন সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছিল। কারণ, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, কোনো হিন্দু যখন গুরুর নির্দেশে মন্ত্র-দীক্ষা নেয় তখন সমস্ত ব্যাপারটি তাকে গোপনীয় রাখতে হয়। এই গোপনীয়তা ধর্মের নির্দেশ। গুরুর আদেশ ব্যতীত ব্যাপারটি এমন কি, নিজের স্ত্রীর কাছেও গোপনীয় রাখতে হবে। পত্রে লেখা ছিল—'যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে' অর্থাৎ যে ভাবে সাধনা করলে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব—যে ঈশ্বর তার অন্তর্লোকে আসীন—সেই সাধনার পথ—কোনো এক ব্যক্তি অরবিন্দকে দেখিয়ে দিয়েছে। সেই নির্দিষ্ট পথে সাধনার অভ্যাস অরবিন্দ তখন করছিল। এই সব পত্রালোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের সাধন পথের উপযুক্ত সহায়িকারূপে গ'ড়ে নিতে চেয়েছিল।

তারপর সে লিখেছিল যে, গুরু-নির্দিষ্ট পথে চলবার পর 'এক মাসের মধ্যে অনুভব করিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি,' ... 'সেই পথে সিদ্ধি সকলেরই হইতে পারে'। 'কিন্তু সেই পথে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে'। কিন্তু এই পথে প্রবেশ করা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব'। অরবিন্দ এ কথাও লিখেছিল যে, 'কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব'। আমি আপনাদের এই বিষয়টি মনে রাখতে অনুরোধ করছি কারণ অরবিন্দের পরবর্তী পত্রে এই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে—যে আলোচনার সূত্র আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর তাঁর সওয়ালে উল্লেখ করেছেন।

চিঠিতে অরবিন্দ তার তৃতীয় মহান আদর্শের কথাও উল্লেখ করেছে। এই তৃতীয় আদর্শটি ছিল তার স্বদেশ প্রেমের মূল কথা। এই আদর্শও বেদান্তের ভিত্তিতে গঠিত। আপনারা জানেন যে, বেদান্তের মতে এই বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের অভিব্যক্তি—নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ প্রকাশ। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এই দৃশ্যমান জগৎকে দেবলীলার প্রকাশরূপে উপলব্ধি করতে পারছেন, নিজের দেশকে সেই দিব্যশক্তির প্রতিমূর্তি হিসাবে উপলব্ধি করতে পারছেন, ততক্ষণ সব কিছুই অসার অনিত্য —যতদিন এই যোগমুদ্রাটির উপলব্ধি না আসে,—এখানে বিশ্বপ্রকৃতি ও পরমা-প্রকৃতির মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রটির উপলব্ধির কথাই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু যখন আপনার উপলব্ধি আসবে যে, বিশ্ব-প্রকৃতি পরমাপ্রকৃতি থেকে ভিন্ন নয়, এগুলি সেই একেরই ভিন্নরূপ—সেই নির্গুণ, নিরাকার, নিরঞ্জন ব্রহ্মের প্রকাশ, তখনই আপনার অজ্ঞানতার অবসান হবে, দিব্যজ্ঞান আসবে—যা চিরন্তন সত্য চেতন। আপনারা দেশকে কি ভাবে দেখেন? দেশ বলতে কতকগুলি নদী, মাঠ, পর্বত বুঝায় না। অরবিন্দের দৃষ্টিতে দেশমাতৃকা সেই অব্যক্ত পরমা-প্রকৃতির মাতৃরূপ—যা হিন্দু-ধর্ম অনুযায়ী দিব্যশক্তিরই একটি অপরূপ রূপ। অরবিন্দের স্বদেশ-প্রেমের সারাংশ অনুযায়ী, 'দেশকে মা বলে জানবে, ভালবাসবে পূজা করবে তবেই দেশের মধ্যে সেই দিব্যশক্তির মাতৃরূপ উপলব্ধি করতে পারবে'। দেশপ্রেম এমনি হবে যে, তার মধ্যে দিয়েই দিব্য শক্তির মাতৃরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। যিনি বেদান্তে বিশ্বাসী তাঁর কাছে অরবিন্দের এই আদর্শের সারমর্ম বুঝে ওঠা মোটেই কষ্টকর নয়। এই হোলো তার স্বদেশপ্রেমের মূল বক্তব্য। আপনাদের স্বদেশের দিব্য সত্তাকে বুঝতে হবে। অরবিন্দের চেতনায় সার্বভৌম মানবিকতা ব্যতিরেকে জাতীয়তাবাদের কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না। সমগ্র জাতির মধ্যে এই সচেতনতা না জাগলে মানবিকতার আদর্শে বা লক্ষ্য কখনও পৌঁছানো যাবে না। আমি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার একটার পর একটি প্রবন্ধ থেকে দেখাতে পারবো যে, ব্যক্তিগত জীবনের প্রকাশ যেমন সমাজভিত্তিক, তেমনি জাতীয় জীবনের প্রকাশ মানবিকতাভিত্তিক —এ ছাড়া ঐ সম্পর্কীয় সমস্ত উন্নত চিন্তাধারাই সম্পূর্ণ অর্থহীন। অরবিন্দ দেশকে মা বলে মানতেন এবং ভালবাসতেন। কারণ আমি ইতিপূর্বেই বুঝিয়েছি যে দেশমাতা জগন্মাতারই এক অপরূপ অভিব্যক্তি।

অতঃপর অরবিন্দ সেই 'পতিত জাতিকে উদ্ধার করা' বা পূর্ণ স্বরাজ লাভ করা সম্পর্কে ঐ অনুচ্ছেদের সব শেষে লিখেছে, 'কার্য সিদ্ধি আমি থাকতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই'। 'মা-র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্ত পানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে?' এই প্রশ্নকে

ন্দ্র করে অরবিন্দের নিজস্ব মুক্তি কৌতু-
ন উদ্দীপক। 'যে ছেলের বন্দুকও নেই,
রবারিও নেই, সেই ছেলে কি করবে'—তা
লিখেছে। তার নিজের মনের প্রশ্নের
াব সে নিজেই দিয়েছে। কি-ভাবে সে
তিকে উদ্ধার করতে চায়। 'আমি জানি
: পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল
মার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়,
বারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে
ইতেছি না, জ্ঞানের বল।' আমার বিজ্ঞ
ুবর তাঁর সওয়ালে যুক্তিধারা বুঝিয়ে-
। যে অরবিন্দ তার দলের উপদেষ্টা ছিল
: তার আদেশ বা উপদেশ অনুযায়ী তার
ুগামী বা সমর্থকরা বোমা ও আগ্নে-
্র ব্যবহার করতো। এখন আপনারাই
ন যে, এই সব চিঠিতে ঐ ধরণের কথা
থায় আছে? আমার বিজ্ঞ বন্ধুবরের
: বলেছিল যে, এই চিঠিপত্রের আলোচ্য
য়বস্তুর ভিত্তিতে আপনারা সিদ্ধান্তে
াতে পারবেন যে, অরবিন্দ অপরাধী।
লে আপনাদের চিঠিপত্রগুলি ভালভাবে
ত হয়। আমার বন্ধুবরের মনোমত
: অনুযায়ী অরবিন্দ বলতে চেয়েছিল
সে নিজে ব্রহ্মতেজ প্রয়োগ করবে এবং
দের ক্ষত্রতেজ প্রয়োগ করাবে। এই
গুলি পড়লে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে
বেন যে, অরবিন্দ ক্ষত্রতেজের বিরোধী
াদেই প্রচার করেছে। সে একমাত্র ব্রহ্ম-
জই নির্ভরশীলতা প্রকাশ করেছিল।
বলেছিল যে, একমাত্র ব্রহ্মতেজের
র এই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণী-
ার বুনিয়াদ গড়ে উঠবে। আমি স-
নে আপনাদের নিবেদন করতে চাই যে,
ার বন্ধুবরের সওয়ালের ইঙ্গিত—
বিন্দ বন্দুক এবং তরবারিতে আস্থা-
সম্পূর্ণ অবাস্তব। যে কেউ তার
গুলি পড়লেই সিদ্ধান্তে আসতে
বেন যে, অরবিন্দ শারীরিক বলের
ত দেয় নি, দেশের ভাবী কল্যাণী-
র জন্যে সে চরিত্রবল বা জ্ঞান-বলের
ষের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দিয়েছে।
ন্দ বলেছে, 'ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ
ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের
প্রতিষ্ঠিত'। সেই তেজের উপর আস্থা
সেই পথেই মুক্তি আসবে। কিন্তু
রের সওয়াল-যুক্তিতে অরবিন্দের বাক্য-
য় যে ভাব আরোপ করা হয়েছে সেই
র্থের অনুমোদন আমার পক্ষে সম্ভব

পত্রের যে অংশে লিখিত আছে 'মা-র
র উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্ত-
উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি
' এই অংশটি উল্লেখ করে কৌসুলি
ব বলেছেন—এই কথার অর্থ কি?
কি? এটা একটা উপমা মাত্র। তিনি
ছেন—অরবিন্দ বলেছে যে, সে তার
: কেবল মাঠ, পাহাড়, বন, ইত্যাদির
বলে মনে করে না, তার কাছে দেশ
মতন। তাপর সে বলেছে যে, দেশ
পরাধীন। এর পরে সে একটা রূপকের
যা দেশবাসীকে চুপচাপ বসে না-থেকে
আদর্শ ও লক্ষ্যে উপনীত হতে অনু-

রোধ করেছে। চিঠিখানি ছেপে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লেখা হয় নি, এটা তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে লিখিত 'খোলা-চিঠি' নয়—চিঠিখানি তার নিজের স্ত্রীকে লেখা। কিন্তু এই লেখা থেকে কি এটাই বুঝতে পারা যায় না যে, তাদের দেশের অবস্থা খুব শোচনীয়, দেশের স্বাধীনতা অনেক দূরে, দেশ এখন পরাধীন? সুতরাং দেশের মুক্তির আদর্শ সম্বন্ধে প্রতিটি ভারতবাসীকে সচেতন হতে হবে। অরবিন্দের দেশপ্রেমের মূল কথা—দেশ তার কাছে দেশমাতৃকা—মায়ের মতন। তার কাছে দেশ একটা জড়বস্তু নয় দেশ দিব্য সত্তার একটি অপরূপ অভি-ব্যক্তি। তার মূল বক্তব্য ছিল—দেশমাতাতেই জগন্মাতার প্রকাশ। সেই দেশের পুন-র্জাগরণ আনতে হবে চারিত্রিক বল ও জ্ঞানের বলের মাধ্যমে—দৈহিক বল প্রয়োগের পথে নয়। পরের অনুচ্ছেদে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন যে, 'স্ত্রী স্বামীর শক্তি' এই কথাগুলির সাহায্যে সে কি বলতে চেয়েছে। অরবিন্দের চিন্তা অনুযায়ী দিব্য-সত্তা একটি শক্তি এবং এই ভাব অনুযায়ীই সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে দেখেছে এবং বলেছে যে, 'স্ত্রী হচ্ছেন শক্তি'। এই চিন্তার মাধ্যমে সে পুরুষ ও স্ত্রীর উন্নততম যোগসূত্র সম্পর্কে তার চিন্তাকে প্রকাশ করেছে। 'তুমি উষার শিষ্য হইয়া সাহেব-পূজা মন্ত্র জপ করিবে?'—এই কথার উল্লেখ করে কৌসুলি সাহেব বলেছেন যে অরবিন্দের জিজ্ঞাস্য ছিল—'তার স্ত্রী কি পাশ্চাত্য আদর্শের পূজারিণী হবে?' অর্থাৎ এই কথার মাধ্যমে অরবিন্দ যেন পাশ্চাত্য আদর্শের অনুগামীদের অবজ্ঞা করতে চেয়েছে।

'এই ছিল সেই গোপনীয় কথা'—অরবিন্দ তার চিঠিতে গোপনীয় কথাগুলি লিখে তারপর তার স্ত্রীর সহযোগিতা চেয়েছে। সে তার স্ত্রীকে বলেছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, তাহলেই সবকিছু বুঝতে পারবে। এই চিঠিতে তার স্ত্রীর স্বভাবের একটি দোষের কথা উল্লিখিত আছে, যে-দোষ অরবিন্দের মতে—কালের দোষ। কারণ অরবিন্দ পরে লিখেছে, 'লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীরভাবে শুনিতে পারে না, ধর্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়।'

মহামান্য ধর্মাবতার, আমি ১৯০৫ সালের ৩০শে আগস্টের চিঠির কথা উল্লেখ করছি। আমার নিবেদন, ঐ চিঠিতে এমন কিছুই লেখা নাই যার ভিত্তিতে অরবিন্দের শারীরিক বলপ্রয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়। বরং অরবিন্দ যে ব্রহ্মতেজের উপর আস্থাবান ছিল—একথা বুঝতে পারা যায়। পরবর্তী সময়ে সে যে সব সময়েই এই ব্রহ্মতেজের উল্লেখ করে গেছে, তা আপনি সহজেই পারবেন। সে এমনি একজন মানুষ, যে বিশ্বাস করে যে, সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ অনুযায়ী ব্রহ্মতেজের বিকাশ সাধনেই ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব। এখন আপনিই স্থির করুন—এই মানুষটির আন্তরিক ইচ্ছাটি কি ছিল? অরবিন্দের ঐ বিশ্বাসটি হচ্ছে তার রাজনৈতিক দর্শনের অন্তর্নিহিত সত্য। এই প্রসঙ্গে আপনি ভেবে দেখুন যে, কোনো সরকার, রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র, জন-গণের আস্থাভাজন না হলে স্থায়ী হতে পারে না। এই ধ্রুব সত্যটি নীতিবিদ হবস থেকে স্পেন্সার ও তাঁদের পরবর্তীকালেও স্বীকৃত হয়েছে। যখন কোনো সরকার স্থায়ী হয় তখন দেখা যায় যে, সেই সরকার জন-গণের আস্থাভাজন হয়েছে। অরবিন্দ প্রচার করেছে—যাদের মধ্যে ব্রহ্মতেজের বিকাশ ঘটেছে, দেশের মুক্তি তারাই আনবে। সে প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছিল, কারণ প্রথমত সে বিশ্বাস করতো—যতদিন পর্যন্ত না জন-মানসের রূপান্তর হচ্ছে; ততদিন পর্যন্ত অভীষ্ট লাভ হতে পারে না। সে বারবার অবিচল আস্থা নিয়ে বলেছে যে, মোক্ষলাভ একটি জন্মে আসবে না—মোক্ষলাভের জন্যে জন্মজন্মান্তরের একাগ্র সাধনা প্রয়োজন। কিন্তু সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার জন্য মানুষকে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হতেই হবে। এবং এই ধরনের ব্রহ্মনিষ্ঠ মানুষের বা শিক্ষিত মানুষের সম্মতির বিরুদ্ধে কোনো সরকার বা শাসকগোষ্ঠীর শাসনের অস্তিত্ব স্বভাবতঃই লোপ পাবে।

সে কলকাতায় এসে কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল? সে জাতীয় শিক্ষার ভার নিয়েছিল। বন্দী হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত তার কর্মজগৎ জুড়ে ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সফল করবার জন্যে সে তার সমস্ত পার্থিব সুখ বিসর্জন দিয়েছিল। সে জাতীয় শিক্ষা উপদেশক-সংস্থায় যোগ দিয়ে সেখানে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় কর্মরত ছিল। সে স্বদেশী শিল্পের প্রসার এবং বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে তার বিশ্বাস ছিল যে, দেশবাসীর স্বদেশপ্রীতির চেতনা উন্মেষিত হওয়ার জন্যে তাদের অবশ্যই দেশের শিল্পের প্রতি আগ্রহী হতে হবে। তার স্বদেশী শিল্পের প্রসার নীতির সমর্থনের পিছনে দেশের শিল্প-সমৃদ্ধির বিকাশসাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আমি ঐ আন্দোলনের সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগকে শিল্প-সমৃদ্ধির সূত্রে গ্রোথিত করতে নারাজ। আমি এই কথাই বলবো যে, অরবিন্দের সবকিছু আন্দোলনের বুনিয়াদ ছিল সেই জাতীয়তা-বাদের মন্ত্র সিঞ্চিত, যার উৎস ছিল বেদান্তসূত্রে নির্দিষ্ট ভারতের সনাতন-ধর্ম। তার স্বদেশী শিল্পের প্রসার ও তৎসহ বিদেশী পণ্য বর্জন নীতি, এবং জাতীয় শিক্ষা-নীতি—এই দুইয়ের পথ-নির্দেশক উপদেশাবলী মূলতঃ জাতীয়তাবাদ-উদ্দীপক মন্ত্র হিসাবেই গ্রাহ্য ছিল, এছাড়া এই দুটির কোনো সঙ্কীর্ণ অর্থই নিরর্থক। এই পথেই অরবিন্দ চলতো। এই সম্পর্কে

বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য নিয়ে আলোচনা করবার আগে আমাকে আপনারা এমনি দুটি চিঠি উল্লেখ করবার অনুমতি দিন, যে-চিঠিগুলি এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবে। এই চিঠিদুটির একটি ১৯০৫ সালে ৩০শে আগস্ট লেখা এবং অপরটি ১৯০৭ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা। এই-খানে আমি ১৯০৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা একটি চিঠির কথাও উল্লেখ করবো, যেটি আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর উল্লেখ করেননি। প্রথমে এই চিঠিটি শুনুন : (বাংলা ও পরে ইংরাজি তর্জমা)—

(২৩, স্কট লেন, কলিকাতা।
১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭)

'অনেক দিন চিঠি লিখি নাই....১৮ জানুয়ারি আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম।'

এই চিঠির উপর কেৌঁসুলি মন্তব্য করেছেন যে, চিঠির উক্তিই প্রমাণ করে যে, অরবিন্দ অন্যত্র গিয়েছিল। বিভিন্ন সাক্ষী জেরার উত্তরে এই যাওয়ার বিষয়টি সমর্থন করেছে। অরবিন্দের বক্তৃতাগুলিও তার মত ও পথের নির্দেশ—আগের চিঠির সঙ্গে কোনো সঙ্গতি না রেখে দিয়েছে। এখন আমার নিবেদন এই যে, অরবিন্দ যে কাজই করে থাকুন না, তা ছিল ধর্মসম্মত। আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর বোধহয় ভেবেছিলেন যে, অরবিন্দ স্বীয় বক্তব্যে নিজেকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু অরবিন্দ তার বক্তব্যে বলেছে যে 'আমার সব কাজ, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, অথবা অন্য কিছু' সবকিছুই বিধি-নির্দিষ্ট, দৈববাণীর রূপায়ণ। রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ সে নিজেই স্বীকার করেছিল। আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর অরবিন্দকে ভুল বুঝবার এক অত্যাশ্চর্য প্রতিভা আছে। আর একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপারের উল্লেখ পাওয়া যায় আমার বিজ্ঞ বন্ধুবরের সওয়ালে। অরবিন্দের চিন্তাধারা কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, তা বোঝাতে গিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেন যে, 'মিণ্টোয়ের চিঠি' পাবার পর অরবিন্দের মত ও পথে পরিবর্তন এসেছিল। তিনি তাঁর ইচ্ছামত এই চিঠিখানির কথা উল্লেখ করে দেখান যে, অরবিন্দ আগাগোড়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তিনি যে-কথাগুলির উল্লেখ করেছেন —'মিণ্টোয়ের চিঠি' প্রসঙ্গে—সেগুলি দিয়ে অরবিন্দের এই বিচিত্র পরিবর্তনের প্রমাণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এর পরে কেৌঁসুলি সেই আগের চিঠির কিছুটা পড়েন, যেখানে অরবিন্দ লিখেছে, 'আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে...আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন, সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।' মাননীয় ধর্মাবতার, আপনি দেখবেন যে, অরবিন্দের বিশ্বাস উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু চিন্তাধারা আপনার অজানা নয়। মাননীয় ধর্মাবতারের কাছে, প্রসঙ্গত, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের বাণী উল্লেখ করবো। কোনো কাজের কর্তারূপে নিজেকে ভাবা হিন্দুধর্মের নীতি-অনুগ নয়, কারণ, হিন্দুধর্মে বলে—'তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র'। অর্থাৎ (হে ঈশ্বর) তুমি সকল কাজের কর্তা, আমি তোমার আদিষ্ট কাজের কারণ বা যন্ত্র। এই চিন্তাধারার ভিত্তিতেই অরবিন্দ ৩০শে আগস্ট তার স্ত্রীকে লিখেছিলো—'এই ভাব নূতন নহে, আজকাল-কার নহে, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।'

চিত্তরঞ্জন এই সময় দেব-ভাষায় গীতার উদ্ধৃতি করে বলেন—ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'—এবং এর ইংরাজি অনুবাদ করে শোনান। এই ধরনের চিন্তাধারার মধ্যে বোমার ইঙ্গিত আছে কি? এই চিন্তাধারা অর-বিন্দের আধ্যাত্মিক চেতনা প্রস্ফুরণের ইঙ্গিত দেয়। অরবিন্দ আরো লিখেছিল—'তুমিও ভগবানের করুণা লাভ করিবে।' 'তিনি তোমাকেও পথ দেখাইবেন'। এই-গুলি কি তার স্ত্রীকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া এবং বোমার আঘাতে ইংরেজদের হত্যা করার ইঙ্গিত দেওয়া? স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে ধর্ম পালনে সহায়তা করা। অরবিন্দ সেইহেতু সহধর্মিণী কথাটি চিঠিতে ব্যবহার করেছিল। সে তার স্ত্রীকে হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী সহধর্মিণীরূপে দেখেছিল। আমার মতে এই পরিণত চিন্তাগুলিই অরবিন্দের অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের স্ফুরণসূচক। স্ত্রী স্বামীর সাধনার একান্ত সহকারী। অরবিন্দের কথায়—'রোজ আধ-ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়।... তাঁর কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়—আমি যেন স্বামীর জীবন উদ্দেশ্য ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্বদা সহায় হই, সাধন-ভূত হই।'

'এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ, যে-কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়।' চিত্তরঞ্জন বলেন—হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণের সময় মন্ত্র গোপনে দেওয়া হয় এবং গুরুর অনুমতি ছাড়া মন্ত্রটি অপর কোনো ব্যক্তির, এমনকি স্ত্রীরও জানা নিষিদ্ধ। অরবিন্দ লিখেছিল 'গোপনীয়'—এই লেখার অর্থ জটিল হলেও এর অর্থ একটিই হয় এবং দ্বিতীয় কোনো অর্থ আরোপ করা অনভিপ্রেত। 'তোমাকে ছাড়া কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ'। কিন্তু কেন এই নিষেধ? এটা যদি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত কোনো নির্দেশ হোতো তাহলে সেটা তো ষড়যন্ত্রকারীদের জানবারই কথা—তাহলে অরবিন্দ 'নিষিদ্ধ' বলবে কেন? সরকারী তর্জমা অনুযায়ী, 'এই কথা জানানো নিষেধ'। আমার নিবেদন, ঠিক তর্জমা হয়নি। ঠিক তর্জমা হবে, 'জানানো অনুমতি সাপেক্ষ' (গুরুর অনুমতি সাপেক্ষ)। ৩০শে আগস্টের চিঠিখানি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, অরবিন্দ বৈষয়িক ব্যাপারগুলি সরোজিনীকে লেখা হয়েছে বলে ঐ চিঠিতে উল্লেখ করেছিল। কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে অরবিন্দ নিশ্চয় মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিল এবং সে তার স্ত্রীকে এই দীক্ষায় দীক্ষিত করবার জন্যে উদ্‌বিগ্ন ছিল।

বারীন ১৯০৫ সালে বরোদায় গিয়েছিল। সরকারী কেৌঁসুলি সাহেবের মতে—এই সময়েই বিপ্লবের বীজবপন করা হয়েছিল। ২৪৬।৩ নম্বর নথিভুক্ত প্রমাণ চিঠিখানি অরবিন্দের কলকাতায় বাস শুরু হওয়ার আগে লিখিত। এই চিঠি থেকে প্রথমত বুঝতে পারা যায় যে, সেই সময় অরবিন্দ কলকাতার রাজনীতি-চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল না বা ঐ ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। সে বাংলায় রাজনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল না অবশ্য স্বদেশী আন্দোলন ব্যতিরেকে; কারণ স্বদেশী আন্দোলন তখন ভারতবর্ষের সর্বত্র সুবিদিত। চিঠিতে আরো লিখিত ছিল, 'আমাকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়েছে। আমার মনে আর একটি আন্দোলনের পরিকল্পনা রয়েছে যার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।'

কিন্তু এই পরিকল্পনার আন্দোলনটি কিসের? সরকারী কেৌঁসুলী সাহেব বুঝিয়েছেন যে, ঐ আন্দোলনটি আমাদের আলোচ্য আন্দোলন—রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের আন্দোলন। কিন্তু এর অস্তিত্ব তখন কোথায়? ১৯০৫ সালে কি এই আন্দোলন সুরু হয়েছিল? সুতরাং আমার মতে অরবিন্দের সেই পরিকল্পনার আন্দোলন বোমার আন্দোলন নয়, সেই আন্দোলন ছিল জগৎব্যাপী বেদান্ত-দীক্ষার আন্দোলন। অরবিন্দের ইচ্ছা ছিল দেশ ছেড়ে বিশ্বময় বেদান্তের বাণী প্রচার করবার। অরবিন্দ নিজে একজন বেদান্তী এবং তাঁর কর্মধারা ছিল বেদান্তভিত্তিক। তাই সে বেদান্তের সূত্র ও সিদ্ধান্তের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্ম সংরক্ষণের ব্রত গ্রহণ করেছিল। এটা প্রহসন নয়—কারণ আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে ইতিমধ্যেই বেদান্তবাদের ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছে—অবশ্য ইংলণ্ডে অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া আমার বিজ্ঞ বন্ধু তাঁর সওয়ালে বলেছেন—যে সময়ে এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল তার কিছুদিন বাদেই কলকাতায় বোমার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যেখানেই আমার বন্ধুবর 'আন্দোলন' কথাটি পেয়েছেন সেখানেই উনি সেটিকে বোমার আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাননীয় ধর্মাবতার, আমি এই চিঠির বিষয়ে আর কিছু উল্লেখ করে আপনাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন দেখি না।

(ক্রমশঃ)

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সঙের ছড়া ও গান

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

(বাংলাদেশে বিভিন্ন পুজোপার্বণে সঙ বের করার প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছে। সকলকে আনন্দ দেবার জন্যই সেকালের মানুষ পুজোপার্বণে সঙ বের করতেন। মুখ্যত চিত্তবিনোদনের জন্যই সঙের সৃষ্টি হয়েছিল। সেকালে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হত। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন গাজনের দল বিভিন্ন পথে ঢাক ও কাঁসি বাজিয়ে ঘুরত এবং সেই সঙ্গে সঙ বের করত। সঙ শুধু চৈত্র মাসেই বের হত না। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পুজোপার্বণে সঙ বের করার একটা রেওয়াজ হয়েছিল। সঙের হাসির গান যেমন সকলকে প্রচুর আনন্দ দিত ঠিক তেমনি সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির ওপর কশাঘাত করে দায়িত্বশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সমাজ চেতনামূলক গান ও ছড়াগুলি এদিক দিয়ে নৈতিক শিক্ষার মূল্যবান উপাদান বলে স্বীকৃত)

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সেদিন দেশপ্রেমিকেরা সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একতার কথা বারে বারে প্রচার করেছিলেন। আমাদের দেশ গড়ে উঠেছে বহু ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দল ও নেতাদের প্রকাশ্য বিদ্বেষমূলক প্রচার কার্যের ফলে বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের মিলন সেদিন এক বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। এমন কি বিভিন্ন সময় লজ্জাকর বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দল ও নেতাদের ঘৃণ্য, নোংরা ও নিষ্ঠুর কার্যকলাপের ফলে বহু নিরীহ নরনারী এবং শিশু দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে।

সঙ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে প্রচারও করেছিল। দেশের ক্ষতি-কারক দল ও নেতাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের ঘৃণ্য ও নোংরা কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও মানুষকে সচেতন করার চেষ্টায় তাঁরা ত্রুটি করেন নি। সঙ শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং রঙ্গরস করেনি। বাংলাদেশের কয়েক স্থানের সঙ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের মধ্যে প্রীতি ও একতার কথাও বলেছিল। অবশ্য রঙ্গরসের সমাবেশে কথা বলার সুযোগ বেশি ছিল না। তবু তাঁরা সঙের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি যাতে নষ্ট না হয় তার চেষ্টা সাধ্য মতো করে-ছিলেন। অনেক জায়গায় সচেতন পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা সঙের মাধ্যমে গান গেয়ে প্রচার চালিয়েছিলেন। সঙের গান শোনার জন্য সেদিন প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড় হত। সঙের মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ফেরিওয়ালা, দোকানদার এবং ক্রেতা এসে কেনাবেচা করতেন। সেকালে কলকাতা শহরে গরুরগাড়ি, মহিষের গাড়ি এবং ঘোড়ার গাড়ির অধি-কাংশ গাড়োয়ান, কোচোয়ান ছিল মুসলমান। সঙের মিছিলে এদেরও দেখা যেত। সঙের মিছিল ও মেলাকে কেন্দ্র করে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মেলামেশা করার একটা সুযোগ ঘটত। কিন্তু সেকালে বিদ্বেষভাবাপন্ন সাম্প্রদায়িক নেতারা একে ভালো চোখে দেখেননি। কলকাতার জেলে-পাড়ার সঙের মিছিল বের করা নিয়ে এদের জন্যই কয়েক বছর বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। শোনা যায় কয়েক জায়গায় সঙের মিছিলে মুসলমান গায়ক ও বাদক যোগদান করতেন। এও শোনা যায় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সঙ বের করার জন্য বহু মুসলমানও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। সেকালে কলকাতার হ্যারিসন রোডে বহু পেশাদার ব্যান্ডপার্টির দল ছিল। এই সব দলের বাদকেরা অধিকাংশ ছিলেন মুসল-মান। তাঁদেরও বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে সঙের মিছিলে বাদ্যযন্ত্র বাজাবার জন্য ডাক পড়তো। খিদিরপুর (মনসাতলার) সঙের মিছিলে কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান পল্লী-বাসী উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন। ঐই প্রসঙ্গে কলকাতার খিদিরপুর (মনসাতলার) দুটি ছড়া এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১)

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার যত বিদেশী তস্কর,
সজাগ হয়েছে দেশবাসী, মজুর-চাষী-লশকর।
আমরা হয়েছি এক, কেরাণী, উকিল, মাস্টার,
আমরা তোমাদের লুটতে দেব না আর।
হিন্দু-মুসলমান গায় স্বরাজের গান,
আমরা সবাই হয়েছি এক প্রাণ।

(২)

বছরের শেষে গাও ভাই হেসে হেসে,
স্বরাজের গান, হয়ে এক প্রাণ,
গোলামী আর সহে না,
শত বিরোধের বাণী, নিয়ে যারা করে কানা-
কানি,
তাদের চোখে যেন পড়ে শুধু ছানি,
একতা ছাড়া স্বরাজ হবে না।
হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান,
সবার এই দেশ, সবার এই স্থান,
সবার তরে মোরা স্বরাজ চাই,
করো না আর অভিমান,
হয়ে মোরা এক প্রাণ,
স্বরাজের গান গাই।

খিদিরপুর (ভূকৈলাসের) সঙ বলেছিল :

ও ভাই হিন্দু ও ভাই মুসলমান
বিদেশীকে দূর করে আগে বাঁচা প্রাণ।
স্বরাজ কেউ পাঠিয়ে দেবে নাকো জাহাজ
ভরে,
আনতে হবে হেঁচকা টানে সবার হাত ধরে।
সবারে ডাকো ভাই বলো—সবাই মোদের
দেশবাসী,
স্বরাজ এলে দুঃখ যাবে, ফুটবে মুখের
হাসি।

কলকাতার খিদিরপুর (পদ্মপুকুর) সঙের মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল ঃ

এবার হাত পড়েছে পেকেটে।
ও ভাই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সিপাহী ঘোপ্সেটে।।
বিদেশী মাল হলো পরমাল, বিকায় না প্রায় আর হাটে।
বিদেশী নুন, চিনি, বসন, দূর কর ঝাটার চোটে।।
গোরার পায়ে তেল না দিয়ে, আপন বসে খাও খেটে।
হিঁদু-মুসলমান, সব মিলে কোমরটা ভাই বাঁধ এঁটে।।
দেশের মাতৃসেবক যারা, মোদের জন্যে জেল খাটে।
এবার মরণ কামড় দিয়ে সবাই চেপে ধর বয়কটে।।

হাওড়া (খুরুটের) সঙ বলেছিল ঃ

বিভেদ জ্ঞান ভুলে রে ভাই, আয়না সবাই সে গান গাই।
যে গানে প্রাণ মাতোয়ারা, বসুন্ধরা কাঁপে ভাই।।
এক মায়ের সন্তান মোরা, পরতো কভু নইরে ভাই।
ভালবাসা দূরে ফেলে দলাদলি কেন ভাই।।

ঢাকা (ইসলামপুর) মিছিলের একটি গানে বলা হয়েছিল ঃ

হিন্দু-মুসলমান জাগরে সমান,
প্রাণে প্রাণে বেঁধে রাখ কষিয়া,
ঘুম ভাঙ্গ দেশবাসী মিলিয়া,
দেখ দেশের ধন কাহারা যাইতেছে লুটিয়া।

সেদিনের সাধারণ মানুষ সঙ সেজে মুখে রঙ-কালি মেখে হাসি-ঠাট্টার ভেতর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক সমহান আদর্শের বাণী প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। অধিকাংশ স্থানে যাঁরা সঙ বের করতেন অথবা সঙ সাজতেন তাঁরা ছিলেন খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, বরং বলা যেতে পারে সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষ। তবু তাঁরা তাঁদের সাধ্য মতো দৃঢ়তার সঙ্গে সঙের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। ওই সব ছড়া ও গান তারই নজির। ছড়া ও গানগুলির হয়তো কাব্যিক মূল্য বেশি নেই। কিন্তু সেদিনের বহু সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িকতার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে যে কাজ করেছিলেন, সে কথা ইতিহাসের পাতায় সত্য উজ্জ্বল হয়ে থাকার যোগ্য। ছড়া ও গানগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দেশের সকল সম্প্রদায়ের নাগরিকদের প্রতি গাঢ় অনুরক্তি এর প্রাণসম্পদ।

প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে শিল্পী পূর্ণ পাল ও রণজিৎ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ক একটি পোড়ামাটি মূর্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। তাঁদের বিষয়টি সময়ানুগ, কিন্তু শিল্প হিসেবে পোড়ামাটির কাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে গেলে তাঁদের আরো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। পোড়ামাটির ফ্রেম কীভাবে পূর্ণ করতে হয়। কী হলে একটি প্লাক ভাস্কর্যের মর্যাদা পায় সে বিষয়ে এঁদের এখনো অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে বলে মনে হয়। এঁরা যদি কয়েকদিনের জন্য বিষ্ণুপুর ঘুরে আসেন—যেখানে মন্দিরে-মন্দিরে এ শিল্পের হাজার-হাজার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে—তাহলে তাঁরা লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। পোড়ামাটির প্লাক বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় শিল্প—কিন্তু আধুনিক কালের শিল্পীদের দ্বারা অবজ্ঞাত। আমাদের পোড়ামাটির কাজ শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের মৃৎ মূর্তির মালিন্যে পর্যবসিত হয়েছে। আধুনিক ধারায় যদি এই শিল্পকে কেউ পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন। তাহলে একটি বড়ো কাজ হয়—কিন্তু সেজন্য সতেরো-আঠারো শতকের শিল্পীদের কাজ থেকেই প্রথম পাঠ নিতে হবে তাঁদের—তার সঙ্গে পরে মেশাতে হবে আধুনিক ধ্যান, রূপকল্প ও শিল্পকৌশল পূর্ণ পাল ও রণজিৎ সরকারকে অনুরোধ, পোড়ামাটিতে কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্য বর্জন করে তাঁরা যেন সত্যিকারের বাংলাদেশকে অনুসন্ধান করে আনেন।

*

অ্যাকাডেমিতে শ্রীসমর ভৌমিকের পঁয়ত্রিশটি ছবির যে প্রদর্শনী হয়ে গেলো, সেটি ক্ষুদ্র হলেও নানাদিক দিয়ে স্মরণীয়। মাধ্যম ও আঙ্গিক বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রতিটি ছবিই আকর্ষণীয়। কোনোটিতে পরীক্ষা বিষয় নিয়ে—যেমন ডিভেলপমেন্ট অভ একসচেঞ্জ মীডিয়া ইন ইন্ডিয়া। ভারতীয় রীতির সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় রীতির সংমিশ্রণে আঁকা বিরাট ছবি—ভারতবর্ষে মুদ্রা বিনিময় প্রথার ইতিহাস। বড়ো ছবি আঁকার দিকে তরুণ শিল্পীদের হালে বেশ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে—এই প্রবণতা প্রশংসনীয়। কিছুকাল আগে বিড়লা একাডেমিতে বিকাশ ভট্টাচার্যের এমনি একটি লক্ষণীয় বড়ো ছবি চোখে পড়েছিলো। বৃহৎ ক্যানভাসে বৃহৎ বিষয় অবতারণা করার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ আশা ও অস্তিত্ববাদের পরিচয় পাওয়া যায়—মনে হয়, অনেকদিনের নেতি-নেতির পর শিল্পীরা আবার আশা ও আনন্দের দিকে মহৎ ভাবনা ও বিশালতার কল্পনার দিকে ঝুঁকছেন। সমর ভৌমিকের জলরং, তেলরং বা চারকোল—সমস্ত মাধ্যমেই পরীক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলো। তাঁর শাদার ব্যবহার, কাগজের শাদা অংশ ছেড়ে রাখার মধ্যে দিয়েও তাঁর দুঃসাহসী পরীক্ষা প্রবণতার পরিচয় মেলে। টেউতোলা মোড়কের কাগজের উপর চারকোলে আঁকা ছবিগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জমির বিশেষত্বকে শিল্পী যথেষ্ট চাতুর্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন।

—চিত্ররসিক

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সজলও উঠে গিয়ে পকেট থেকে
ন্দেশের বাকসটা বের করে হারাধনের হাতে
তে, সে তো অবাক! বাকসে যে দোকানের
ম লেখা আছে, হারাধন জীবনে সে
াকানের সন্দেশ চোখে দেখে নি!

সজল বলল, 'আমার সামনে একটা
য়ে দ্যাখো। তোমার জন্যই নিয়ে এলাম।'

হারাধনের চোখ দুটো কেমন ছল-ছল
র উঠল।

সজল আবার বলল, আমি ভালোভাবে
শ করেছি। বইর দোকান দিয়েছি একটা।

কথা বলতে গিয়ে হারাধনের জিভ
ড়িয়ে যাচ্ছিল। কোনভাবে বলল, 'জানি
ই একটা পন্ডিতের পো পন্ডিত। ইড়িং
ড়িং করে যা ইঞ্জিরি বলিস, পাশ হবে
তোর! দাঁড়া আঁচটা ধরাই। বুড়ো ক্ষেপে
ছে।'

কিছুক্ষণ পরে হারাধন একটা প্লেটে
ণময়কে দুটো সন্দেশ দিয়ে এসে নিজে
কটা খেল। সজলকেও একটা জোর করে
ওয়াল। বাকিটা অন্য সময় খাওয়ার জন্য
র ভাংগা সুটকেশের মধ্যে রেখে এসে
ল, 'তুই বোস, আমি তরকারিগুলো
ট। আঁচ ধরে গেছে'।

সজল একটা ময়লা ছেঁড়া বেতের
াই টেনে নিয়ে বসে বলল 'হারাধনদা,
ই আমার বাসার ঠিকানা। একদিন যাবে
ন্তু। যেদিন যাবে, সেদিন তোমাকে খেয়ে
সতে হবে।'

হারাধন মাথা নাড়ল, সে নিশ্চয়ই যাবে।
ায় পেলেই গিয়ে উঠবে বাসায়।

সজল হারাধনদার তরকারি কোটা
ধছিল। সেই ছোট্ট ছোট্ট আলু। কুচো-
ড়ির মাথাগুলো প্রায় খসে গেছে।
য়কটা আধপাকা পটল, কাস্তের মত এক-
লি কুমড়ো।

গুণময়ের খাওয়া হয়ে গেলে হারাধনদা
চটা-উঠা কলাই করা থালার এক থালা ভাত
নিয়ে এই রান্নাঘরেই খেতে বসবে। একধারে
গর্ত করে জোলো ডাল খানিকটা, বাটিতে
একটু তরকারি। ক্ষিধের সময় হারাধনদা
তা-ই গোগ্রাসে গিলবে!

সজল চুপচাপ বসে বসে নিজের
কল্পনাতে এই দৃশ্য দেখছিল। হারাধনদার
দীর্ঘ দশ বছরে চাকরী জীবনের এই পরি-
ণতি। জীর্ণ, চুনবালিখসা, ঝুলপড়া অতি
ছোট দরিদ্র ঘরটার মতই এই জীবন দরিদ্র,
বিবর্ণ, করুণ। কিন্তু মনটা? এই দারিদ্র্যের
মধ্যেও হারাধনদার মনটা বড় নদীর মত
চওড়া। হারাধনদা তার নতুন জীবনের প্রথম
আশ্রয়, হারাধনদার ঋণ সে কখনও শোধ
করতে পারবে না!

আজো হারাধনদা, ছেঁড়া তেল চিটচিটে
লুঙ্গিটা পরে সজলকে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে
দিতে এল।

হাটতে হাটতে দুজনে সেই খাবার
দোকানটার কাছে এসে দাঁড়াল। বালিগঞ্জ
স্টেশনে সর্বস্ব হারিয়ে যেদিন প্রথম সজল
হারাধনদার বাসা খুঁজে খুঁজে এসেছিল,
সেদিন এই দোকানের সামনে রাস্তায়-পাতা
বেঞ্চে বসিয়ে হারাধনদা তাকে খাইয়েছিল।

হারাধন বলল, 'আবার আসিস রে
সজল। আমি যাই, ভাত ফুটে গেল বোধ
হয়'।

'আমি আসব হারাধনদা, তুমি যেও
কিন্তু'।

'যাব একদিন, ঠিক যাব'। বলতে বলতে
হারাধন চলে গেল।

সজল কিন্তু তখনও দাঁড়িয়েছিল। মনটা
কেন যেন বড় ভারি হয়ে আসছিল তার।
কি ভেবে ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারের দিকে
এগিয়ে চলল।

জায়গাটায় আজো তেমনি প্রচুর লোক-
জন, চিৎকার, মাঝির নাম ধরে হাঁকডাক। কত
নৌকায় মাল উঠছে, কত লোক স্নান
করছে। কয়েকশ' নৌকা ভীড় করে রয়েছে
নদীর ধারে। দেখতে দেখতে সজল সেই
জেটিটার সামনে এসে দাঁড়াল। এই তার
সেদিনের রাতের আশ্রয়! কত রাত্রি এরই
ওপর শুয়ে কাটিয়েছে সে! একপাশে ঝাঁকা
মুটেওয়ালা, রাস্তার গরু, কুকুর!

সজল কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
সামনে লোহার নির্বাক জেটিটা জলের ওপর
দিয়ে কিছু দূর চলে গেছে।

নদীটা এখন গভীর রাত্রির মত শান্ত
নয়। এখন এখানে ভূমার কোন স্পর্শ নেই।
বড় বাস্তব, বড় নিষ্ঠুর বাস্তব!

সেই রাত্রিগুলির কথা ভাবতে ভাবতে
সজল ফিরে চলল। সে ভাবছিল, এগিয়ে
চলতে হলেই, পিছনে কিছু পড়ে থাকে,
থাকবে। এবং সে জন্য ব্যথাও বাজে! কিন্তু
তাই বলে থামলে চলবে না, চলে না।

এগিয়ে চলাটাই জীবন, এগিয়ে না
চলাটাই মৃত্যু!

।। ৮ ।।

একটা সিনেমা মাসিক নতুন বেরিয়েছে।
সেটা দেখার জন্য দোকানে ভিড় লেগেছিল।
দু-একটা বিক্রিও হোল। কিন্তু অধিকাংশ
লোক সিনেমা অভিনেত্রীদের নানান ভঙ্গির
ছবি দেখেই কাগজটা রেখে চলে গেল।

এর মধ্যে কিশোর যুবক বৃদ্ধ সব
বয়সের লোক আছে। মেয়েদের ঝোঁক
আরও বেশী। অভিনেত্রীর ঢঙে, ভঙ্গিতে,
সাজতে পারলেই জীবন সার্থক। ওদের
নাড়ী-নক্ষত্র মেয়েদের সব মুখস্ত।

অভিনেতা আর অভিনেত্রীরাই যেন
দেশের আদর্শ!

সজল সিনেমা পত্রিকা পড়ে না।

ভিড়টা একটু হাল্কা হতেই সে
দোকান বন্ধ করতে যাবে, এমন সময় এক
ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন।

গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবী,
কাঁধে ঝোলান সুন্দর একটা ব্যাগ। উজ্জ্বল,

বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ভালো কবিতার মত একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও'কে ঘিরে আছে।

'শুনুন'।

সজল বই-গুটানো বন্ধ করে তাকালো।

'এই ম্যাগাজিনের কয়েক কপি রাখবেন আপনার কাছে? যদি বিক্রি হয়?'

ভদ্রলোক বই ভর্তি ব্যাগ থেকে কয়েকটা পত্রিকা বের করে সজলের হাতে দিলেন।

সজল একটা পত্রিকা উল্টে-পাল্টে দেখল, রাজনৈতিক প্রবন্ধ পত্রিকা। নাম 'নয়া-মানবতাবাদ'।

'রেখে যান, দেখব যদি বিক্রি হয়'।

'আপনাকে কমিশন কত দিতে হবে?'

'অপরকে যা দেন'।

'ঠিক আছে। আমি কয়েক দিন পরে আসব'।

সজল কি ভেবে বলল, 'সম্পাদকের নাম তো কখনো শুনি নি। এতো পত্রিকা আছে আমার কাছে।'

'নতুন পত্রিকা, সম্পাদকও নতুন'। ভদ্রলোক হেসে বললেন। গলার স্বরটা সুন্দর, সুরেলা।

সজলও একটু হেসে বলল, 'দোকান-দারও নতুন'।

'তবে তো মিলে গেল। আজ চলি ভাই'।

সজল একটু বিস্মিত হল। এমন সুন্দর মার্জিত আন্তরিক ব্যবহার একজন ফুটপাতের বইয়ের দোকানদারের সঙ্গে সচরাচর কেউ করে না।

অরুণার কথা অবশ্য আলাদা।

সজল ইচ্ছে করেই খরিদ্দারকে বুঝিয়ে সুজিয়ে 'নয়া মানবতাবাদ' বিক্রি করল কয়েকটা। আসলে পত্রিকাটা নিজেরই ভাল লেগেছিল। সম্পাদক — বিশ্বময় মুখো-পাধ্যায়ের নিজেরই একটি প্রবন্ধ ছিল শেষের দিকে—'মানব মুক্তির পথ'। সজলের অবশ্য প্রবন্ধটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল।

কয়েক দিন পরে বিকেলের দিকে ভদ্র-লোক এসে হাজির।

সজল পাঁচটা টাকা ও'কে দিয়ে বলল, 'দশটা কপি বিক্রি করেছি'।

'কিন্তু সব টাকা দিচ্ছেন কেন? আপনার কমিশনটা নিয়ে নিন'?

'কমিশন লাগবে না'।

'কেন?'

'এতো আর কমার্শিয়াল কাগজ নয়। একটা আদর্শ, মতবাদ প্রচারের জন্য। না, না, কমিশন দিতে হবে না আপনাকে।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সজল বই গুছোতে গুছোতে বলল, 'আচ্ছা, এই সম্পাদক কে? তাঁর প্রবন্ধটা আমি পড়েছি। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি ঠিক বোঝাতে পারি নি হয়ত।' সজল তাকাল, 'ও, আপনিই সম্পাদক?'

এর আগে সজল কখনও কোন পত্রিকার সম্পাদককে দেখে নি। সম্পাদকরা তার কাছে চিরদিনই এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

বিশ্বময় বলল, 'চলুন, কথা বলতে বলতে যাওয়া যাক।'

'আমি যে হাজরার মোড়ের দিকে যাব।'

'আমিও।'

বয়ে নিয়ে যাবার সুবিধার জন্য সজল বইয়ের বোঝাটা দুটো ভাগ করে নিয়েছিল। দু হাতে নিয়ে যাবে। বিশ্বময় বলল, 'একটা দিন আমাকে।'

সজল অবাক হয়ে বলল 'সে কি? আপনি বইতে যাবেন কেন?'

'আপনার সুবিধার জন্য। দিন, একটা দিন আমাকে।'

বিশ্বময় নিজেই জোর করে একটা ব্যাগ নিল। বলল, 'এক্ষুনি দোকান বন্ধ করে দিলেন যে বড়ো?'

'শরীরটা ভালো নেই।'

বিশ্বময় আবার বলল 'দেখুন—আপনাকে খুব 'অ্যানন্যাচারাল' লাগছে। বইয়ের দোকানদার বলে মনেই হয় না। কি নাম আপনার?'

নামটা শুনেই বিশ্বময় দাঁড়িয়ে পড়ল। 'আচ্ছা 'স্বদেশ' পত্রিকায় কয়েক সংখ্যা আগে এই নামে এক ভদ্রলোকের একটা কবিতা ছিল। দেখুন মশায় আপনি নন তো?'

সজলের পা দুটো নিশ্চল হয়ে উঠছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কথাটা সে শুনল। নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না তার!

আস্তে আস্তে বলল, 'ওটা আমার লেখা। আপনি পড়েছেন? কেমন লেগেছিল বলুন তো?'

এই মুহূর্তে বিশ্বময়কে সজলের বড় আপনার বলে, বন্ধু বলে মনে হচ্ছিল।

'আপনি জাত কবি।'

সজল ঠিক বুঝল না।

বিশ্বময় বলল, 'কবিতা লিখলেই সকলে কবি হয় না, সকলে কবিও নয়। অনেকেই 'ক্রাফটসম্যান'। জাত কবির কবিতা আলাদা। — খুব খুশী হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। কিন্তু আপনি ফুটপাতে দোকান দেন কেন? আই মীন—আমি দোকান করার নিন্দা করছি না। শুধু আপনার সঙ্গে ব্যাপারটা খাপ খাচ্ছে না, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

সজল নিজের কাহিনীটা বলে গেল।

বিশ্বময় সাহস দিয়ে বলল, 'আগাল করুন। আমরাতো রইলাম। ও হ্যাঁ, আমার ঠিকানাটা রাখুন। আপনার ঠিকানাটাও দিন আমাকে — আর নিজেকে গরীব মনে করছেন কেন? মনে করুন সম্রাট! সারা দুনিয়ার গরীবরা একদিন সম্রাট হবে! আজ আসি ভাই! যাচ্ছেন কিন্তু একদিন। অনেক কথা বলব।'

বিশ্বময় ব্যাগটা সজলের হাতে দিয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ল। যেতে যেতে বলল, 'আসব, আমি আবার আসব'—

বাসায় ফিরেই সজল অবাক! মিনু একটা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছে। কি যে আনন্দ হচ্ছিল সজলের। আঁকা-বাঁকা কাঁচা হাতের লেখা কার্ডটা সজল কয়েক বার পড়ল। 'দাদা বাড়ী আসিবে। আমার জন্য একটা বই আনিবে। জামাটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর শেলাই করা চলে না। সাদা গাইটার একটা বাছুর হইয়াছিল। বাছুরটা বেশ ছুটোছুটি করিত। কিন্তু কয়েক দিন হইল মারা গিয়াছে। ছোটমার মন খারাপ। তাড়াতাড়ি আসিবে। টাকা পৌঁছিয়াছে।...'

পোস্ট কার্ডটা সজল অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল। এই অপটু অক্ষরগুলির মধ্য দিয়ে মিনু আজ তার বুকের খুব কাছে এসেছে। সজল মনে মনে কল্পনা করছিল, মিনু এক মাথা রুক্ষ চুল নিয়ে অমৃত-পুরের ডাকঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একটা পোস্টকার্ড চাইছে। মাস্টার মশায় হয়ত দাদার কথা একবার জিজ্ঞেস করল। কার্ডটা নিয়ে এসে মিনু দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরটা বিছিয়ে দোয়াত কলম নিয়ে বসল। ছোটমা বলে বলে দিচ্ছে চৌকাঠের ওপর বসে। মিনু সারা হাতে কলমের কালি মাখিয়ে ফেলল চিঠি লিখতে গিয়ে। খুব সাবধানে লিখছে যেন বানান ভুল না হয়। তাহলে, দাদা বকবে!

কি একটা অলস, উদাসীন তৃপ্তিতে, বিষণ্ণতায় সজল পাতা বিছানাটায় শুয়ে পড়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। এই ঘরের সামনের ছোট্ট উঠোনে এখন অন্ধকার। ওপাশের কল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দটা থেমে থেমে, কেমন করে এই রাত্রির থমথমে পরিবেশকে, একটা বিশেষ ছন্দে, অলস উদাসীন মন্থর করে তুলছিল।

জল নেবার পর কেউ কলটা ভাল করে বন্ধ করে নি।

এমন দিনে এ সময় অমৃতপুরের মাঠের ওপর রাত্রির স্তব্ধতা, কুয়াশা, বিছিয়ে পড়ে। একটা মিষ্টি গন্ধ ওঠে—গন্ধটা নতুন পাকা ধানের। আজ কলকাতার এই বস্তিতে এই জীর্ণ, শীর্ণ ছোট ঘরটার মধ্যে শুয়ে থেকে সজল সেই ধান মাঠের কথা ভাবছিল। সে ধীরে ধীরে, এই মাঠ গ্রাম খাল-বিলের স্পর্শ থেকে, গন্ধ থেকে ক্রমশ দূরে, বহু দূরে সরে যাচ্ছে! অতীত জীবন অস্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ।

আশ্চর্য! সজল ভাবছিল, জীবন কেমন করে পাল্টে যাচ্ছে। জানার, চেনার অগোচরে কোথায় কে একজন পরম শক্তিমান পুরুষ বসে বসে জীবন উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ঠিকভাবে সাজিয়ে রেখে, গুছিয়ে রেখে চলেছেন। মিনু, হারাধনদা, দুলুবৌদি,

া, অরুণা কি করে তার উঠোনে
ধীরে এগিয়ে এসেছে। জীবনের এই
সের মর্যাদাতা কে। কে এমন করে
রকে একটি জ্যোৎস্না মণ্ডপের নিয়ে
ছড়িয়েছে!

াকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত বলত,
: ঈশ্বর।

ইরে কড়া নাড়ার শব্দ। সজল কান
শব্দটা ক্রমশ জোর হচ্ছে। আকাশ-
জাবা বন্ধ করে সজল উঠে দাঁড়াল।

ব্বাঃ, সেই কতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি।
াছিলে একা একা? ঘুমুচ্ছিলে
— বলতে বলতে অরুণা ঘরে
ঢলো।

াল আলোটা জ্বালাল। 'আরেঃ

ার আগে বলো, এই ঘরটা জোগাড়
কোত্থেকে?'

ন?'
গলি সে গলি এসে মনে হোল,
না, এ যে একটা গড়ের মাঠ। কেউ
উকে যে জিজ্ঞেস করব।'

াল হেসে বলল, 'এইটাই আমার
ভাল লাগে।'

ুণা ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল,
আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে।'

াল অরুণার সুন্দর সাজগোজ
, ভাল লাগছিল তার। অরুণা যেন
এই বিষণ্ণ মুহূর্তগুলি থেকে
া জন্য কিছু উজ্জ্বলতা, আনন্দ নিয়ে

ুণা ছোট্ট রুমালটা ভ্যানিটি ব্যাগ
র করে খুব সাবধানে মুখ মুছল।
দরিদ্র ঘরে রুমালের সেই পরিচিত
গন্ধটা কি একটা ফুলের কথা মনে
দিচ্ছিল।

ুণা বলল, 'আরে, তুমি যে দাঁড়িয়ে

লের মনে হচ্ছিল, অরুণা এমন করে
ছে যেন এঘরে আসতে সে অভ্যস্ত,
কোন সঙ্কোচ নেই!

রে অন্ধকার হয়ে আসছিল।
দিয়ে আকাশের যে ভগ্নাংশ সজলের
ড়ল, তাতে রাত্রির আভাস।

ণা সজলের দিকে একটা টফি
দিল। নিজেও মুখে পুরল একটা।

জটা ছাড়ানোর সময় সজল দেখল,
হাতের আঙুলের নখগুলি লাল
নো। নখে অরুণা চকল রঙ মাখে,
বড় করে রাখে, সজল তার কোন
জে পেল না। তবে ভাল লাগল,
াঙুলগুলোর জন্য একটা আকর্ষণ
ল।

ার রূপ সাজসজ্জা এবং শরীর
র একটা আলো আছে, বুদ্ধির

দিনে যে ধরনের আলো দেখে তার গ্রামের
বাড়ীর সামনের উঠোন বা ছোট্ট বাঁশবাগান
থেকে জিয়ে পোকাগুলো জড়ো হত।

এবং জড়ো হলেই পুড়ে মরত।
পুড়ে মরার কথাটা মনে আসতে সজল
কেমন নিরুৎসাহ হল একটু। কিন্তু
নিরুৎসাহ ভাবটা প্রকাশ হয়ে পড়লে অরুণা
পাছে কি ভাবে, তাই সজল জোর করে
বলল, 'শরীরটা খারাপ ছিল। তুমি আসতে
বেশ ভাল লাগছে।'

অরুণা হেসে বলল, 'আচ্ছা সজল,
তোমার শরীর আর মন খারাপ থাকার'
ব্যাধিটা কদ্দিনের বলত?'

'ঠিক মনে পড়ছে না। কেন? চিকিৎসা
করবে নাকি?' সজল হাসতে হাসতে বলল।

'আমি বাপু ঐ সব শরীর খারাপ
গোমড়া মুখ সইতে পারি না। হৈ হৈ
করবে, আড্ডা মারবে, গান গাইবে, তবে ত!'

সজল বলল, 'তোমার প্রেসক্রিপশনের
কোনটাই আমার ধাতে সয় না।'

'সওয়ালেই সইবে। এই দ্যাখ না আমার
কি কম কষ্ট? কী দুঃখে সংসার যে চলে!
চাকরির চেষ্টা কদ্দিন ধরে করছি, সেত
বলেছি তোমাকে। আজ পর্যন্ত একটাও
জুটল না। তাই নিয়ে দিদির সঙ্গে বুঝতেই
পারছ। কিন্তু ঘর থেকে যেই বেরলাম, ব্যাস,
সব ঠিক হয়ে গেল। মনটা তখন একদম
হালকা।'

অরুণা এমন করে বলছিল, যেন তার
সংসারে কষ্ট বলে কিছু নেই। কথাটা বেশ
ভাল লাগছে সজলের। সংসারে দুঃখ-
দারিদ্র্য যেমন সত্য, আনন্দও তেমনি সত্য!
সজল তবে কেন দুঃখের দিকটাকে বেছে
নেবে! কেন সে আনন্দের দিকটাকে উপেক্ষা
করবে?

অরুণা বলে যাচ্ছিল, 'বুঝলে সজল,
তোমার এই মন খারাপের ব্যাধিটা আমি
সারাব।'

'তা পারলে সারাবে।' সজল বলল।
'কিন্তু দ্যাখো, তোমাকে এক কাপ চাও
খাওয়াতে পারব না। কিচ্ছু নেই।'

'মরে যাই আর কি?' অরুণা হেসে
বলল। 'এই, চলো একটা রেস্টুরেন্টে বসে
চা খাব।'

'কিন্তু, আঁচ ধরাতে হবে, রান্না করতে
হবে।'

'হবে, সব হবে। এখন ওঠো।'

অরুণা জোর করে সজলকে নিয়ে
রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে হরিশ মুখার্জি
রোডের ডান দিকের ফুটপাত ধরে হাঁটছিল
দুজন। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।
দেবদারু গাছগুলোর মলিন পাতাগুলিতে
এখন অন্ধকার জড়ানো।

অরুণা এমনভাবে হাঁটছিল, যেন তাড়া
নেই, উদ্দেশ্য নেই চলার। সজল দেখছিল,
এই ছায়ায় মাঝে মাঝে এই ফুটপাতের
দরিদ্র আলোয় অরুণাকে চেনা যাচ্ছে না।
এ অরুণা অনেক বেশি সুন্দর, সুন্দর ওর
চোখ, নিচু করে রাস্তা হাঁটার অপূর্ব
ভঙ্গীটি।

বকুল একদিন বেড়াতে গিয়ে, তার হাতটা
চেয়েছিল। আজ সজলের ইচ্ছা করছিল,
ঠিক তেমনি। কিন্তু সে ভিক্ষার সঙ্কোচ
কাটিয়ে ওঠা ভীরু সজলের পক্ষে অসম্ভব।
অরুণা সজলের দিকে তাকাল। 'তোমার
সঙ্গে সঙ্গে গেলে আমাকে বড্ড বেশি
মনে হয়, তাই না?'
সজল পাশে সরে এসে বলল, 'ভেবে
দেখিনি।'
'তবে কি ভেবে দেখেছ? এই যে কদিন
একসঙ্গে গেলাম রেস্তোরাঁয়, খেলাম, এতে
কিচ্ছু ভাবলে না?'
'ভাববার কি আছে? মন্দ জোর একটু
ভালো লাগছে। এই ত?'
'তবু আমার ভাগ্যি! আমি ত ভাবছি-
লাম তুমি একজন আপটুডেট শঙ্করাচার্য!'

সজল ইঙ্গিতটা হজম করল।

অরুণা বলল, 'দেখ মনটন খারাপ হলে
তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে হয়। আর
বোঝই ত, একখানা ঘর। দিদির পুরুষ
বন্ধুরা আসে। আমার থাকাটা কেমন
বিশ্রী। আগে পার্কে বসে বাদাম খেতাম।
এখন তোমার সঙ্গে কাটাই। কি? খারাপ
লাগে? বলত আর আসব না?'

সজল ব্যগ্র হয়ে বলল, 'না, না, আসবে
না কেন? কিন্তু তুমি ত নিজেই বললে,
আমি আপটুডেট শঙ্করাচার্য! এতে কি
ভাল লাগবে?'

'হয়েছে বাবা ঘাট হয়েছে! এই এমনি
বললাম। অঙ্ক-টঙ্ক কষে কথা বলা আমার
ধাতে নেই।' আসলে তুমি দেখতে বড্ড
ইনোসেন্ট!' আমার আবার জানো, একটু
এগ্রেসিভ একটু রাশ মানুষ পছন্দ।'

সজল ভাবছিল, অরুণার সঙ্গে চলতে
চলতে কেমন একটা ঘন আকর্ষণ বোধ
করছে। এরই নাম কি তবে ভালোবাসা?
'এ্যাই, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? আমরা
এসে গেছি।'
সজল তাকিয়ে দেখল, সামনে সেই
রেস্তোরাঁটা।

রাত তখনো ভোর হয়নি। সজল বালিচক স্টেশনে নামল। স্টেশনটায় হালকা অন্ধকার। নানান জিনিসপত্র, এখানে ওখানে ছড়ানো। একরাশ মাদুর পড়ে আছে। 'বুক' হয়ে কলকাতা যাবে। সজল সেই সেবার কলকাতা যাবার সময় যে রেস্তটায় বসেছিল, হারাধনদার সঙ্গে যেখানে পরিচয় হয়েছিল, সেখানে এখন কেউ নেই। ওপরের শিরীষগাছের কয়েকটা হলদে ফুল, মরা পাতা এখন সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

স্টেশান পেরিয়ে বালিচক বাজারের রাস্তা ধরে সজল হাটছিল। শশীর হোটেল পার হয়ে এল। একটু দক্ষিণে গেলেই বাস-স্ট্যান্ড। এখন থেকেই লোকজন বাস-এ উঠে বসে আছে। ছাড়বে সেই সকাল আটটায় বা ছাদ পর্যন্ত যখন লোক ভর্তি হয়ে যাবে।

খোয়া ওঠা সুরকির রাস্তা, চালকলের উদ্ধত চিমনি। বাঁধানো প্রশস্ত চাতালে ধান শুকোচ্ছে। সামনেই একটু ছোট্ট ধান ক্ষেত।

সজল আজ কতোদিন ধান ক্ষেত দেখেনি। পাকাধান শুয়ে আছে মাঠের কোলে। কোথাও কোথাও ধান কাটা হয়ে গেছে। তাহলে দেখতে দেখতে সাত-আট মাস কেটে গেছে কখন।

মিনুর অসুখ, দেশের মাটিতে ফিরে আসার এক অপরিচিত অনুভব, সেই চেনা জায়গার দৃশ্য, সজলকে এই সকাল বেলায় কেমন অন্যমনস্ক করে তুলছিল।

বেলা প্রায় এগারটা বাজে। কেলেঘাই নদীর পুব ধার দিয়ে হাটতে হাটতে সজল এক সময় মঙ্গলামাড়োর রাস্তা ধরল।

নিজের মনে আকাশ পাতাল ভাবছিল। আচ্ছা, মিনুর যদি কিছু হয়ে থাকে? চিঠিটা আসতে অনেক দিন লেগেছে। যাই হোক, এ কদিনে ম্যালেরিয়া জ্বরে কিছু হয় না। সেও তো একবার এই জ্বরে পড়েছিল। ভাত খেত আর জ্বরও হত।

কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বর হলে তাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলবে কেন?

গ্রামের যত কাছাকাছি যাচ্ছে, ততই ভয়টা বাড়ছে। পা দুটো যেন আর মাটিতে পড়ছে না! শরীরটা অবশ হয়ে আসছে।

দূরে থানার প্রকান্ড শিরীষগাছের উঁচু মাথাটা ক্রমশঃ চোখে পড়ছে। আকাশ ছোঁয়া গাছটার শাখাপ্রশাখা আর ঘন পাতার অরণ্যের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা সজল অনুভব করছিল।

গাছটার নিচেই টিউব ওয়েল। মিনু এই টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে আসে।

হ্যাঁ, বেলা এখন প্রায় বারোটা।

শিরীষ গাছের ওপরের আকাশটা একটা বিরাট শূন্যতা নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। গিরিদের বাড়ীর সজনে গাছটা চোখে পড়ল। একটাও পাতা নেই।

তেমাথানি পেরিয়ে এল সজল। বটগাছটা তেমনি আছে। হাটের দিনে এখানে বুড়ো কাশী জ্যাঠা ভূষিমালের দোকান নিয়ে বসে। দোকানটা ওরই মত দরিদ্র, শ্রীহীন। কয়েকটা পুরনো ছেঁড়া চটের ছোট ছোট থলি, একটা টোল-খাওয়া টিনে কেরোসিন তেল। একপাশে পড়ে থাকে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রংয়ের বোতলের সারি।

গতকাল হাটবার ছিল। জায়গাটায় একটা আধখোলা খালি দেশলাই পড়ে আছে। কাঠি নেই দেখে কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

দুপুর রোদ্রে গ্রামটা কেমন চুপচাপ থমথমে। কোন চেনা লোক পথে চোখে পড়ল না। জানাদের বাড়ীর উঠোনে গরুগুলো তেমনি বাঁধা আছে।

কেবল একটা বিরাট শূন্যতা, রিক্ততা এই রোদে বিছিয়ে আছে বলে সজলের মনে হচ্ছিল।

রাস্তার বাঁকটা পেরোতেই নিজের বাড়ী। সজলের ইচ্ছে করছিল, এক দৌড়ে এবার সে নিজের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়, ছেলেবেলা যেমন করে মায়ের কোলে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত!

কিন্তু উঠোনে, দাওয়ায় কেউ নেই। শুধু লালা গরুটা একপাশে বাঁধা আছে। এই গরুটা তার খুব প্রিয়।

লকে দেখে মালা গলাটা বাড়িয়ে

াজ এই স্তব্ধ, নির্জন, থমথমে
নিজের উঠোনে পরম্ভির গলায়
পরে-হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কেন
জলের কান্না পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল,
ঠানে, এই দাওয়ায়, এই পুকুরঘাটে
গ্রামের পথে মিনুর দুষ্টু পদক্ষেপ
অনেক দিন হল মুছে গেছে।
র ওই সাদা আর লাল রংমেশা
াকের ফুলগুলোর মত নীরব চোখ
র মেয়েটা ঘুরে বেড়াত, সে যেন
রের মাটি, গাছপালা, আলোর মধ্যে
শেষ বিকেলের ম্লান রোদের মত
হারিয়ে গেছে।

বা এই মধ্যাহ্ন আকাশের স্তব্ধতা
ভীর, এমন করুণ, এমন বিষণ্ন
বে কেন?

টমার কান্নায় সারা পাড়াটা হঠাৎ
উঠেছিল।

এলি? কেন আর দুদিন আগে
পারলি না? বাচ্চা মেয়েটা কেবল
দাদা' বলে মারা গেল। 'হ্যাঁরে, তুই
পারলি না।'

র মাটির দাওয়ায় মাথা গুঁজে চুপ
সছিল সজল। ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা
লেবু, একটা বেদানা। 'কাল রাত্রে
মারা গেল কবে?'
শেষ ভোরে। ইস সারারাত কাঁদছে
থালি দাদা কখন আসবে!' দাদা
া কেন? দাদাকে দেখব!' সজল
বুঝতে পারেনি সারা মুখ কখন
ভেসে গেছে। অনেক কষ্টে কান্না
লল, 'ডাক্তার ডাকোনি'?
রেন দাস বলল, বেয়াড়া সান্নি-
বড় ডাক্তার দেখাও। তা বড় ডাক্তার
াথায়? সেই এগরা থেকে আনতে
ার হলে ঘটিবাটি বন্ধক দিয়ে তাই
। কিন্তু হতভাগী কি বাঁচতে
? শেষরাতে মাথার কাছে বসে
কাঁদতে কাঁদতে কি বলল জানো?
দাও, ঔষধ শিশিটা ধুয়ে ঐ জল

তে কাঁদতে সজল মুখ তুলে
'ঔষধ শিশি ধুয়ে জল?'
তে চেয়েছিল, বুঝলি হতভাগী
চয়েছিল। আমি তখনি বুঝেছি,
ার লোক এসে গেছে! পাগলের
নিকটা এদিক-ওদিক কি খুঁজল।
তোকে দেখতে চেয়েছিল রে।'
মা দেয়ালে বারবার মাথা ঠুকতে

ভীর বেদনা, কন্ত্রণায় উঠোনের
দ তখন অশ্রুর সমুদ্র হয়ে উঠেছে।

ন পরে সন্ধ্যা বেলায় সজল বাবার
খুলে নিয়ে বসেছিল। ধড়ক্ত
জ জমেছে। পূর্ব ঘরের কুলু-

ঙ্গিতে সেই যে পড়ে আছে কে আর
খুলবে?

পুরনো বইর পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে
উঠেছে। না, এবার যাওয়ার সময় বাবার
বইগুলো সে সঙ্গে নিয়ে যাবে!

কঠোপনিষৎ বইটি প্রথম হাতে পড়ল।
বাবা ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে পাখার কলম
দিয়ে শ্লোকের নিচে দাগ দিত। সামনে
থাকত ক্ষুদ চোয়ানো কালির দোয়াত।
পুরনো দৃশ্যগুলি কী করুণ স্মৃতি হয়ে
ওঠে!

পাতা উল্টাতে উল্টাতে সেই শ্লোকটা
চোখে পড়ল। নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মার
কথা—যাঁকে জানলে পৃথিবীর সমস্ত
দুঃখকে অতিক্রম করা যায়।

'মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন
শোচতি'—আত্মাকে জানাই শোক জয়ের
পথ।

সেই আত্মাকে জানার জন্য কত
জিজ্ঞাসা! কিন্তু তাঁকে জানার ত কোন
সহজ পথ নেই। শাস্ত্রপাঠের দ্বারা, বুদ্ধির
দ্বারা, শোনার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না।
আশ্চর্য! শুধু 'না' 'না', না। উপনিষদ কি
তবে কেবল নেতিবাচক উত্তরের মধ্য দিয়ে
শেষ সমাধানের দিকে শুধু এগিয়েছে?
নইলে আত্মাকে জানার সাধনা কেবল কতক-
গুলো 'না' এর অন্ধকারের দিকে চলছে
কেন? আবার বলা হচ্ছে, 'আত্মা' যাকে
অনুগ্রহ করেন, সে-ই তাঁকে জানতে পারে।
কিন্তু 'আত্মা' কাকে অনুগ্রহ করবেন?

পরের শ্লোকেও আবার সেই 'নেতি'র
অন্ধকার—'যে পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত
হয়নি, ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তি যার শেষ
হয়নি, যার চিত্ত একাগ্র নয়, সমাধির সাফ-
ল্যের জন্য যে অস্থিরতা ত্যাগ করেনি—
সে আত্মাকে প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে না।'
আত্মাকে জানলে শোক, দুঃখ অতিক্রম করা
যায়। অথচ জানার পথটা, অস্পষ্টতার
ছায়ায় ঢাকা! সজল এর কোনো অর্থ বুঝে
উঠতে পারে না!

অমৃতপুরের জীবনে পরিবর্তন এসেছে।
পরিবর্তন এসেছে সজলের জীবনেও।
মিনু নাই। তাই ঘরটা শুধু খালি খালি
লাগে। ছোটমার সঙ্গে সম্পর্ক ভাসা-ভাসা।
গ্রামের পুকুর, পথ গাছপালা, অথবা দক্ষি-
ণের সেই বিরাট মাঠ, অথবা উঁচু যে সড়কটা
খড়ুইর মুসলমান পাড়ার মাঝখান দিয়ে
পুরনো শিব মন্দিরটাকে ডাইনে রেখে দূরে
এগরার দিকে চলে গেছে, সেই সড়কটা, আজ
আর কৈশোরের স্বপ্নের মত মধ্যাহ্নের দূরে
উদাসীনতায় বাজে না। শুধু প্রতাপদীঘির
সেই খুব উঁচু কৃষ্ণচূড়া গাছটা নীল দিগ-
ন্তের ক্যানভাসে, কেমন আশ্চর্য শান্ত
নিথর নির্জন বলে আজো মনে হয়।

জীবন বোধহয়, শুধু এমনি এক
সুদূরের নিমন্ত্রণ!

মনে পড়ে হারাধনদা সুলেতাদির কথা,
অশোকের কথা, আখতারের কথা, আখতারের

সেই ছাত্রী শান্ত সুন্দর, শ্যামল আরতির
কথা। মনে পড়ে ক'দিনের ছাত্র অজয়ের
কথা।

সকালবেলা বেলাশেষের আলোকে দেখা
ছবি!

ভোর হয়নি তখনও। সজল নন্দীগ্রাম
হয়ে কলকাতা যাবে। ছোটমা রাত থেকে
উঠে চাট্টি ভাত বসিয়ে দিয়েছিল। সজল
মাথাটা ধুয়ে নিয়ে খেতে বসল। কিন্তু গলা
দিয়ে ভাত নামছিল না তার। আজ মিনু
নাই! থাকলে দাদার পাতের কাছে বসে
থাকত, কেবল পেছনে ঘুরত! আচ্ছা,
পূর্বঘরের ছোট্ট জানালা দিয়ে মিনুর আত্মা
কি, তার এই যাবার দিনে, তার দিকে
তাকিয়ে দেখছে!

সজল চারধারের দাওয়ার দিকে তাকাল।
কিন্তু কোথাও কেউ নেই। মাটির দাওয়ার
ধূসর রং আর কয়েকটা বাঁশের জীর্ণ খুঁটি
চোখে পড়ল।

ছোটমা একটু দুধ রেখে গেল একটা
বাটিতে।

যাওয়ার আগে সজল পূর্ব ঘরের
কুলুঙ্গির সামনে একবার দাঁড়াল। বাবার
বইর দপ্তরটা কাল সন্ধ্যারই গুছিয়ে
নিয়েছে। ওতে পানিনির ব্যাকরণ, কুমার-
সম্ভব, উপনিষদগুলি আছে! আর হাতে
লেখা একটা খাতা। সেই খাতায় কয়েকটা
কবিতা। বাবা কখনো কখনো লিখত! কিন্তু
এ ছাড়াও যেন কিছু নেওয়া হয়নি।

হাঁ, সজল মিনুর বইর দপ্তরটাও
কোলে টেনে নিয়ে খুলল, ধুলো ঝাড়বে
বলে। না, কেউ হাত দেয়নি এতে। খুলে-
তেই তার ভেতর থেকে একটা হুইশিল
বেরিয়ে পড়ল। সেবার ফুটবল খেলায়
রেফারি হবার সময় কেন সেটা পাওয়া যায়নি,
সজল এবার এতদিনে বুঝতে পারল। মিনু
লুকিয়ে রেখেছিল ওটা।

সজল নীরবে, সেই আবছা অন্ধকারে
মিনুর দপ্তরটাকে বুকের কাছে নিয়ে এসে,
ভালো করে বেঁধে নিজের অন্যান্য জিনিসের
সঙ্গে গুছিয়ে রাখল।

এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা অধ্যায়
শেষ হয়ে যাচ্ছে জীবনের। এই গাছপালা
পথ ঘাট, পুকুর পাড়, বাঁশ বনের নিস্তব্ধ
ছবি দেখার জীবনের অধ্যায়ের আলো নিভে
আসছে!

মুখ নিচু করে সজল ঘর থেকে বেরল।
ছোটমাকে প্রণাম করল। তারপর উঠোন
পেরিয়ে, শীতলা মন্দিরের পাশ দিয়ে বড়
সড়কটার দিকে এগিয়ে চলল। ভোর হয়ে
গেছে ততক্ষণে। থানার উঁচু শিরীষ গাছটার
মাথায় সূর্যের প্রথম রোদ। সামনে টিউব-
ওয়েলের কাছে, এ বেলায় কেউ নেই। শুধু
বাঁধানো, শূন্য চাতলটা খাঁ খাঁ করছে।
বেলা পড়ে এলে মিনু এখানে জল আনতে
আসত। আর কখনো সে আসবে না!

না, সজল ওদিকে তাকাবে না। তা ছাড়া
এই পথ, এই গরুর গাড়ীর চাকার দাগ-
গুলো সব কেন যেন অস্পষ্ট হয়ে উঠছে!

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

ঘরের শোভা : গৃহিণীর দায়িত্ব

নিজেরা আমরা সাজগোজ করতে ভালবাসি, কিন্তু ঘরদোর সাজানোয় অনেকেরই মন নেই। অথচ ছিমছাম আর পরিপাটি থাকায় আগ্রহ সকলের। ঋতুভেদে পোশাক আমাদের বাংলে দিতে হয় না। কোন্ সময় কোনটা উপযোগী, সে-জ্ঞান আমাদের টনটনে। প্রচন্ড রোদ্দুরে চড়া রঙের আঁটোসাঁটো পোশাকে বড়ো অস্বস্তি—একটু ঢিলেঢালা হলে ভালো হয়। আবার শীতে কার্ডিগান-শাল সব বাদ দিয়ে স্টোল চাপালে একদিকে যেমন হাল-ফ্যাশানে ডগমগ হওয়া যায়, তেমনি অন্য-দিকে অর্থেরও কিছুটা সাশ্রয় হয়। কিন্তু ঋতুভেদে ঘরের শোভায় এই বৈচিত্র্য আনার কথা আমাদের ঠিক সব সময় মনে থাকে না। সাধারণ ছোটখাটো ব্যাপারে এই ত্রুটি আরো বেশি নজরে পড়ে।

ঘরের দরজা জানালার পরদা কোন কোন বাড়িতে দেখা যায় ধুলোয় ধুলোক্কার। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধুলোর আক্রমণ থেকে ঘরকে বাঁচানোই পর্দার কাজ। কিন্তু তার মধ্যে রুচির ছাপ অনুপস্থিত থাকবে কেন? এগুলো মাঝে মাঝে ধুয়ে বদলে দিলে ঘরের শোভা যেমন বাড়ে, তেমনি রুচির পরিচয়ও মেলে। কিন্তু সেই লাগানো থেকে পালটানো পর্যন্ত এতে আর হাত পড়ে না। এই একই আচরণ লক্ষ্য করা যায় সোফাসেটের ঢাকনার বেলায়ও। আগেকার দিনে বাড়িতে লোকজন আর অতিথি-অভ্যাগত এলে শীতল পাটি পেতে বসতে দেওয়া হতো। সে-রেওয়াজ এখন প্রায় অচল। হাল আমলে সে-জায়গা নিয়েছে সোফাসেট। তাই অনেক বাড়িতেই এই বস্তু ইদানীং নজরে পড়ে। অনেকেই সোফা কিনেই দায় সারেন। বড়জোর কেউ কেউ প্রথম দিকে ঢাকনা দিয়ে সেগুলি একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। তারপর আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁরা পান না। অথচ এই ঢাকনা যে শুধু সোফাকে অহেতুক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচায় তাই নয়, ঘরের শোভা বৃদ্ধিতেও অনেকখানি সাহায্য করে। সেদিক থেকে বিবেচনা করে জানালা-দরজার পরদা আর সোফার ঢাকনা সম্বন্ধে আমাদের সাজ-গোজের মতই গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কারণ দুয়েরই উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং দুই-ই রুচির পরিচায়ক।

গৃহসজ্জা বিশেষজ্ঞের মতে প্রচন্ড শীতে জানালা-দরজার পরদা আর সোফার ঢাকনায় ফুলকারি চড়া রঙ ঘরের শোভা বাড়ায়। কিন্তু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের উত্তপ্ত দুপুরে আর এই রঙ চলবে না। তখন তাই হালকা রঙ। চড়া রোদ্দুরে দিশেহারা মানুষ এসময় একটু চোখ জুড়োন শান্তি চায়। এজন্যই হালকা রঙের পরামর্শ। গ্রীষ্ম বিদায় নিয়ে আসবে শীত। শীতের পর বসন্ত। তখন আর একবার পরিবর্তন। এবার বাসন্তী রঙে ঘরের শোভা সবাইকে নতুনের পরশ দেবে। সেই সঙ্গে ঋতুর পরিবর্তনের এক মধুর স্বাদ উপভোগ করা যাবে রুচিকর পরিবেশে।

সোফার ঢাকনা আর দরজা-জানালার পরদার জন্য খুব একটা বাজার তোলপাড় করার দরকার নেই। পছন্দসই কাপড় এখন অনেক। সেই কাপড়টুকু কিনে আনাই যা একটু ঝামেলা। তারপর নিজের হাতেই অবসরমতো সব তৈরি করে নেওয়া চলবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, কাপড় যেন টেঁকসই আর রঙ যেন পাকা হয়। সোফা ঢাকনার রঙ ফিকে হয়ে গেলে সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। কোন কোন কাপড় আবার কাচার পর খেপে যায়। তাই ঢাকনা তৈরি করার সময় মাপ সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকতে হয়। তাছাড়া ঢাকনা হবে একটু ঢিলেঢালা। এইসঙ্গে ঝালর রাখা যেতে পারে। তাহলে কাপড় আর একটু বেশি লাগবে। কিন্তু তাতে সৌন্দর্য বাড়বে অনেক গুণ। এ প্রসঙ্গে একটা কথা জানা দরকার যে, ঢাকনা কাচার পর একদম শুকিয়ে গেলে সোফায় পরানোর একটু অসুবিধা হয়। সেজন্য মোটামুটি শুকিয়ে গেলেই সোফায় পরিয়ে দিতে হয়। একটু ইস্ত্রি করে নিতে পারলে অবশ্য এই অসুবিধা আর পোয়াতে হয় না।

ঘরের শোভা বাড়ানোর কাজে গৃহিণী যদি একবার হাত লাগান, তবে তিনি আরো কতগুলি কাজ করতে পারেন। তাতে ঘরের শোভা তো বাড়বেই, পয়সাও সাশ্রয় হবে এবং সকলের তারিফ মিলবে। অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করলেই এই কাজগুলি করা সম্ভব।

ঘরে বসে সুন্দর সুন্দর ল্যাম্পশেড তৈরি করা আজ আর কোন সমস্যাই নয়। বানানোর পদ্ধতি সবকিছুর একইরকম। তফাৎ হলো শুধুমাত্র আকৃতিতে—সেটা যাঁর যেমন পছন্দ। কারো পছন্দ একটু লম্বা আবার কারো বা পছন্দ একটু গোল। ল্যাম্পশেডের জন্য জালিদার পরদার কাপড়ই ভাল। অন্য কাপড়েও অবশ্য চলে। তবে ভালো ল্যাম্পশেডের জন্য ভালো কাপড় দরকার। ল্যাম্পশেড তৈরি হয়ে গেলে অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, এতো সুন্দর জিনিস বাজার ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় বা উত্তম কারিগর ছাড়া আর কেউ বানাতে পারে। বুদ্ধিমতী গৃহিণী অবশ্য কখনোই ফাঁস করবেন না যে, এই কারিগরীর পেছনে রয়েছে টিনের কৌটা, বোতল আর ল্যাম্প-শেডের ফ্রেম। ল্যাম্পশেড কি ধরনের হবে সেটা আগে স্থির করে নিতে হবে। সেই মাপ অনুযায়ী কাপড় কেটে নিয়ে রঙীন উজ্জ্বল দিকটা উপরে রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, কাপড় যেন ফ্রেম বরাবর ঠিকমতো বসে। তারপর ফ্রেমের উপর দিয়ে কাপড় সেলাই করে দিতে হবে। স্ট্যান্ডের জন্য প্রয়োজন একটি টিনের কৌটা বা বোতল। সেটা চাউল বা বালি দিয়ে ভর্তি করে নিতে হবে যাতে শেডের ভারে স্ট্যান্ড না উল্টে যায়। এটি ভালো করে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ঋতুভেদে ঘর সাজানো হলো। ল্যাম্প-শেডের উজ্জ্বলতায় ঘরের শোভা আরো বাড়লো। আরও একটু কাজ বাকি রয়ে গেছে। গৃহিণীকে এবার বসতে হবে কিছুটা মাটি নিয়ে। এজন্য তিনি যেন না ভাবেন যে, তিনি কুমোর হয়ে গেলেন। আগেই বলেছি যে, ঘরের শোভা বাড়ানোর জন্য সবটাই হলো সময়ের সদ্ব্যবহার। সকলের মধ্যেই কিছু শিল্প প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে। এই মাটির কাজ সেই সুপ্ত প্রতিভারই সুপ্রয়োগ। মাটি দিয়ে নানা বস্তু ঘরে বসেই তৈরি করা সম্ভব। এতে শিশুদের মনোরঞ্জনও হয়। সেই সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যও সাধন হয়।

ঘরের টেবিলে রাখার জন্য মাটির পেন্সিল-দান যে কোন গৃহিণী নিজেই তৈরি করতে পারেন। আধসের আন্দাজ ভালো মাটি হাতে নিয়ে ভালো ভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। আস্তে আস্তে এই মাটির গোলাটিকে এমন রূপ দিতে হবে যে, দেখলে যেন মনে হয় একটি বড়ো ন্যাসপাতির অর্ধেক। কাটা-আকৃতি জায়গাটা আর একটু কেটে ঢালু মতো করে দিতে হবে। তারপর আঙুলের চাপে সেই অংশে শামুকের খোলের মতো আকৃতি করে নিতে হবে। এরপর পিঠে কয়েকটি ছিদ্র করে পেন্সিল রাখার জায়গা বানাতে হবে। ছিদ্র-গুলি ছুরি দিয়ে বানাতে হবে।

এই হলো প্রাথমিক কাজ। এবার এই বস্তুটি রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হবে। একটু সামান্য ঘষামাজা করে রঙ চড়ালে জিনিসটির চেহারা আমূল বদলে যাবে। তখন যে-কোন শৌখিন ঘরে এটি পেন্সিল-দান হিসেবে ব্যবহার করা চলবে।

গৃহিণী যদি সৌন্দর্য-সচেতন হন, তবে গৃহসজ্জা তাঁর কাছে কোন সমস্যাই নয়। তিনি নিজেও মাথা খাটিয়ে ঘর সাজানোর অনেক রাস্তা বের করতে পারবেন। যার ফলে ঘরের শোভা বাড়বে, রুচি পরিতৃপ্ত হবে আর মনের আকাশে সৌন্দর্যের নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে।

—প্রমীলা

বাহারী খেলা, খেরো আর তোয়ালে

হস্ত শিল্প প্রদর্শনী

হলা সেবা সমিতি গত ১৫ এপ্রিল ১৭ এপ্রিল ৮নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস একটি হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর ন করেছিল। প্রদর্শনী কক্ষটি বেশ হালকা ও সস্তা অথচ রুচিকর জিনিষ দিয়ে এখানকার সভ্যারা সাজিয়ে দর্শক ও ক্রেতাদের মনো- করতে সক্ষম হয়। শোলার ফুল, স, রঙীন সুতো, কাপড়ে আঁকা ড়া, মাটির প্রদীপ কক্ষ সজ্জার কাজে ্যবহার করেছেন।

১৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথমে সামান্য নে কয়েকজনের উদ্যোগে এই টির কার্য শুরু হয়। বর্তমানে এর থন বিরাট না হলেও পূর্বের এই সমিতির কার্য অনেক বিস্তৃত ভবিষ্যতে আরও বাড়বে এটাই আশা য়।

চ বোনা, মশলা ঝাড়াই-বাছাই প্লাস্টিকের মোড়কে সেই া ঢোকানোর কাজ এই ছাত্রীরা করে থাকেন। সাধারণতঃ কাজে জন্য পঁচিশ ও মশলাঝাড়াই দশ-পনেরো জন মহিলা আছেন। এছাড়া এখানে বয়স্কা র মধ্যে শিক্ষা দেবার এক সুব্যবস্থা

লো কাপড়ের খেশ, খেরো এরা চাহিদা অনুযায়ী তৈরী করে হরিণ, হাতির ডিজাইন ছাড়াও । রঙীন সুতো দিয়ে খেশ তৈরী খেরো আর তোয়ালে নতুন সুতো রী। মশলা ঝাড়াই-বাছাই ও পিষতে বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও সেই হামান দিস্তায় সমিতির মহিলারা কাজ করে চলেছেন। অথচ মধ্যপ্রদেশে অতি দরিদ্র ব্যক্তিও সামান্য পয়সায় মশলা এমনকি চাল মেসিনে পিষে নিচ্ছেন। এতে অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশী কাজ করতে পারছেন। অথচ মহিলা সমিতিতে সব কাজেই বেশী সময় নিয়ে করতে হচ্ছে, অনুমান করা যায় এটা অর্থনৈতিক সংকটের ফল। সমিতির শিক্ষক-শিক্ষকার সংখ্যা সর্বসমেত চারজন।

এই সমিতি একদিকে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে ভদ্রভাবে দু-চারটে পয়সা উপার্জন করারও এক প্রতিষ্ঠান। সমিতির ছাত্রীই হোন আর সভ্যাই হোন, তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী অনেকে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করে থাকেন। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করছেন। শ্রী শিক্ষায়তন, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, অভিনব ভারতী, গ্রেট ইস্টার্ন স্টোর্স, টেলিফোন ভবন এককথায় অফিস ফেরতা অনেকেই এখান থেকে নিত্যব্যবহার্য মশলা কিনে এই সমিতিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করছেন। রকমফের খেশের চাহিদাও অফিস-ফেরতাদের মধ্যে মন্দ নেই।

বিক্রয়প্রসঙ্গে আলোচনা করতেই এখান-কার শিক্ষিকা শ্রীমতী সুনীতি দাস ও শ্রীমতী প্রতিমা চক্রবর্তী একযোগে জানালেন 'মাঝে মাঝে এদের চাহিদা আমরা ঠিকমতো মেটাতে পারি না। অবশ্য চাহিদা বেশী হলে দু পয়সা বেশী আয়ও আমাদের মেয়েদের হয়ে থাকে।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম 'এই প্রদর্শনী করে আপনাদের কেমন বিক্রী হচ্ছে?'

শিক্ষিকা দুজনের একজন বললেন, 'মোটেই ভাল নয়। অফিস পাড়ায় অফিস বন্ধ থাকলে আর লোক আসবে কেন? এমনি দিনেই আমাদের যা বিক্রী হয় সেটা এর চেয়ে অনেক বেশী।'

ছোটদের সামনে সাবধানে বাড়ীর বড়রা মুখ খুলুন

বিশ শতকে যেখানে রকেট ছুটছে গ্রহ থেকে গ্রহে, যেখানে মানুষ ঘূর্ণী ঝড়ের মত আবর্তিত হচ্ছে উদরের ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টায়, সেখানে দাঁড়িয়ে কোন মানুষের গালগল্প করে সময় কাটাবার অফুরন্ত অবসরের কথাটা ভাবা যায় না। আজকের দিনে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে নারীরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছেন জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে সেখানে মনদিদিমা কোন কোন ক্ষেত্রে পিসি-মাসীদের ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনে সচেতন হবার কথা বলাটাও বোধহয় সেকেলে ঠেকবে। কিন্তু বিজ্ঞান যত এগিয়ে যাক, মানুষ যত আধুনিকই হোক, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনটা কি ততটা এগিয়ে যেতে পারছে? অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা আরও বিশেষ বিশেষ দিনে বাড়ীর বাইরে অথবা বাইরে থেকে বাড়ীতে রাত কাটানো নিয়ে কি মনটা এখনও খুঁত

খেয়াল করে না? শুধু কি তাই তাঁরা কি অনেক সময়ই ভুল করছেন না ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলে? আবার অনেকেই আছেন যাদের বোঝালেও বুঝতে চান না যে ছোটদের সামনে কত সাবধানে, কত খেয়ালে কথা বলতে হয়। তাঁদের অসাবধানতার ফল অনেক সময় বিষময় হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। শীতের এক বিকেলে এক পরিচিত মহিলার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁর বাড়ীর দরজাতে পা দিয়ে একটা সোরগোল শুনলাম। মনে হল সোরগোলটা বাড়ীর ভিতর থেকে আসছে। আমি ইতস্ততঃ করে ওপরে উঠে গেলাম। ঘরে পা দিয়ে দেখলাম ভয়াবহ মূর্তিতে গৃহিণী জানলায় দাঁড়িয়ে সামনের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়ানো ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাদানুবাদ করছেন। বলাবাহুল্য বারান্দার ভদ্রমহিলারও মূর্তি রণচণ্ডী। আমি মহা ফাঁপরে পড়লাম। যাক, আমার উপস্থিতিতেই বোধহয় গোলটা এ পক্ষের মুলতুবী করলেন। জানলাটা ওপক্ষের সামনে ঝটাপট বন্ধ করলেন। আমি এহেন আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মুখের সামনে জানলা বন্ধ করার কথা এযাবৎ শুনেই এসেছি, সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম। অবশ্য এটা রণক্ষেত্রে ছিল।

মহিলাটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসলেন। খানিক কুশল জিজ্ঞাসার পর তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'দেখুন তো কি খারাপ কথা—এবাড়ী-ওবাড়ী ঝগড়া হচ্ছে।'

মনে মনে ভাবলাম, এটা আর কি বলার মত। আমি তো প্রত্যক্ষদর্শী। কোনরকম কৌতূহল না দেখিয়ে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। বুঝতে পারলাম উনি ঘটনাটা বলার জন্য উশখুশ করছেন। আমি তবুও নির্বিকার।

আমাকে চুপচাপ দেখে উনি বলতে আরম্ভ করলেন, 'গাছে গোটাকয়েক মাত্র বেল হয়েছে। এই বেল নিয়ে পাড়াপ্রতি-বেশীদের ঘুম নেই। আর সামনের বাড়ীর একটা ছেলে যেই গাছ থেকে বেল পড়লো অমনি কোথা থেকে হনহন করে ছুটে এসে সেটা নেবেই। আমি কথা প্রসঙ্গে আমার খোকার সামনে বলে ফেলেছিলাম 'ছেলেটা যে দিনের পর দিন চোর হয়ে উঠলো। বাপ-মায়েরা চোর ছেলের বেল বেশ স্বাদ করেই খাচ্ছেন।' কথায় কথায় খোকা আমার আজকেই ঐ কথাটা সেই ছেলেটির মায়ের কাছে বলে ফেলেছে। তারপর থেকেই দুজনে কুরুক্ষেত্র নেমেছি।'

আমার আর বলার কিছুই রইলো না। শুধু ভাবলাম, কিছু বলার থাকলে সেই ছেলেটির মাকে উনি নিজে ডেকেই বলে দিতে পারতেন। তা না করে অসাবধানেই হোক আর যাইহোক খোকার সামনে নোংরা কথাটা বলে তাকে চোর কথাটির অর্থ শিক্ষা দেওয়া, উপরন্তু ঘৃণিত ঝগড়ায় অবতীর্ণ হওয়া! বরাবরই শুনে এসেছি, পরের বাগানের ফল-পাকুড় পেড়ে না খেলে নাকি মজা লাগে না। খেজুরের রস চুরি না করলে নাকি থ্রিল থাকে না। তবে কি বেল চুরিকে ফল চুরির পর্যায়ভুক্ত করা যায় না? আর এ নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া! আমরা আছি কোথায়?

ছোটদের অবিমৃষ্যকারিতার ফল কত-ভাবেই না বড়দের নাজেহাল করে যদি না তাদের সামনে ভেবেচিন্তে কথা বলা যায়। রমলামাসীকে আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। গম্ভীর ভদ্রমহিলা। এই রমলামাসীর বাড়ীতে এক প্রতিবেশিনী রোজ গল্প করতে আসেন। রমলামাসী তাকে বেশ বিরক্ত বোধ করেন আর ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর ছোটবড় সকলের সামনেই গজগজ করেন। রমলামাসীর ছোট ছেলে সরলমনে রমলামাসীর মনের কথাটি প্রতিবেশিনীকে একদিন ব্যক্ত করলো। রমলামাসী নিরুত্তর। ভদ্রমহিলা বিনাবাক্যব্যয়ে চটি গলিয়ে সেই যে সেদিন ওবাড়ী থেকে বেরুলেন, আর কোনদিন কি ঐ বাড়ীতে ফের এসেছিলেন?

আর একদিন বড়দের ভুলেই একটি বাচ্চা মেয়েকে এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে ফেলে ফেলে কাঁদতে দেখেছিলাম। অসম্মানে, অপমানে মেয়েটি সেদিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, তার কথা সে আর কাকে বলতে পারবে? মেয়েটির সহপাঠিনী সারা ক্লাসের মেয়েদের গল্প করে বলেছে যে তার মা বলেছে পাশের মেয়েটির পিতা তার মাকে অকথ্য গালাগাল ও মারধর করে। স্বভাবতঃই ক্লাসের সকলে মুখরোচক আলোচনা সেদিন সেটাই হয়েছিল। নিরপরাধ মেয়েটিকে সেদিন সকলের সামনে হেয় করা হল, তার মূলে কে আছেন? আছেন তার এক সহপাঠিনীর মা। অথচ ভাবলে অবাক লাগে মায়ের কি মেয়ের কাছে গল্প বলার এ জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই। এতে কি তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে কোনরকম সুশিক্ষা দিতে পেরেছিলেন? অকালে পক্ক করে দিয়ে নিজের মেয়ের কত বড় সর্বনাশ করলেন সে শুধু ভবিষ্যতে বোঝার অপেক্ষায় রইল।

অথচ একটু বিবেচনা, সামান্য চিন্তা করে ছোটদের গল্পের মাধ্যমে কত ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় সেটা অনেকে জেনেও সদ্ব্যবহার করেন না। একটু সাবধান হলেই ছোটবেলা থেকে এদের আমরা সুশিক্ষায় মানুষ করে গড়তে পারি।

—অঞ্জলি চৌধুরী

রঙীন সুতো, মাটির ঘড়া-প্রদীপ, কাপড়ে আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো

ভাবীকালের ঘরকন্না

বেলা দে

কিছু দিন আগে ভাবীকালের ঘর-
াার কথায় বলেছিলাম ভবিষ্যতের জানলা
লে দেখলে সবচেয়ে আগে চোখে পড়বে
র ঘরে লোকজনের অভাব। কাজেই সেই
া মনে করে এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুত
কতে হবে। অর্থাৎ অন্যান্য দেশের মত
কন্নার কাজগুলোকে সংক্ষেপ করতে হবে।
গ করতে হবে।

আজকের যুগটি বিজ্ঞানের যুগ। এখন
কেই গৃহিণীরা তাঁদের ঘরকন্নাকে সেই
জ্ঞানের সাহায্যে কিছুটা গড়ে তুলতে
ষ্টা করছেন। কাজেই একটু একটু করে
নন্দিন কাজগুলোকে সংক্ষেপ করা এবং
জ্ঞানের সাহায্য নেওয়া। শহরে বৈদ্যুতিক
লো আছে অথচ আমরা বিদ্যুৎকে বিশেষ
জে লাগাই না—আলো জ্বালাতে প্রতি
নিটে আমাদের খরচ হয় চৌদ্দ পয়সা
চ প্রতি ইউনিটে চার পয়সা। খরচ করলেই
ার কাজ সহজেই সেরে নেওয়া যায়।
টি একটি বৈদ্যুতিক উনুনের জন্য
লাদা রান্নাঘরেরও দরকার হয় না। যে
ন একটু ছোট্ট জায়গায় একটি উঁচু
বলের ওপর এই উনুনটি রাখা যেতে
রে। সংসারটি ছোট হলে এতেই সব কাজ
। যাবে। অথচ ঘুঁটে কয়লা কেরোসিন
য় ব্যস্ত থাকতে হল না এবং কিছুটা
সময়ও পাওয়া যাবে।

বিদেশে দেখেছি ছোটখাট সংসারে
বাড়ীর গিন্নি চা প্রস্তুতের জন্য কেটলিতে
সুইচ টিপে রাত্রে শুয়ে পড়লেন। সকালে
বোঁ বোঁ শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল এবং
দেখতে পেলেন চাও তৈরী হয়ে গেছে।
অবশ্য আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা
এখনো নানা কারণে সময়সাপেক্ষ। ওসব
রেডিও চুল্লী একটি অভিনব জিনিস। বাড়ীর
ছেলেমেয়েরা সকালে স্কুলে যাবার আগে
পাঁচ মিনিটে প্রাতঃরাশ তৈরী করে নেয়
এই চুল্লীতে। ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য
'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার' ব্যবহার হয়ে থাকে।
এতে সামান্য পরিশ্রমেই ঘরের মেঝে ধোয়া
পরিষ্কার করা যায়, এমন কি কার্পেট
পরিষ্কার পর্যন্ত হতে পারে। বাসনপত্র
ধোয়ার জন্য ওদেশে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা
আছে। তবে আমরা লোকজনের অভাবে
আর একটি ব্যবস্থা করতে পারি। যেমন
একটি বড় গামলায় গরম জলে সোডা বা
ভীম জাতীয় কিছু মিশিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে
নিতে পারি। ইলেকট্রিক বা গ্যাসে রান্না
করলে বাসনপত্রে কালিও লাগে না। কাজেই
নিজেরাই সহজে ধুয়ে নিতে পারি।

তারপর আছে আমাদের মশলা বাটার
হাঙ্গামা— এটিও তুলে দিয়ে যদি গুঁড়ো
মশলার ব্যবহার করা যায় তাহলে প্রতি-
দিনের একটি মস্ত হাঙ্গামার হাত থেকে
রেহাই পাওয়া যাবে। সব রকম মশলা ঝেড়ে
বেছে রোদে দিয়ে শুকনো খোলায় ভেজে
যদি হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে আলাদা
আলাদা শিশিতে প্রত্যেকটি শিশি বা টিনের
গায়ে মশলার নামগুলিও লিখে রাখেন
তাতে কাজের বেশী সুবিধা হবে।

বাজার দোকান তো আজকাল অধিকাংশ
বাড়ীর মেয়েরাই করেন। এতে সবচেয়ে বড়
সুবিধা হল সংসারের যা দরকার তা বাড়ীর
মেয়েদের জানা থাকায় সেগুলো নিজেরা
আনলে অসুবিধায় পড়তে হয় না।

আরো কয়েকটি কথা—যেমন বর্ষাকালে
কাপড়চোপড় শুকোনো, কাপড় ইস্ত্রি করা,
এগুলোও জানা থাকলে এবং এই বৈদ্যুতিক
শক্তির সাহায্যেই তা সহজে করা যায়। এতে
সুবিধা হচ্ছে আজকের দিনে মেয়েরা শুধু
ঘরেই বসে থাকেন না প্রয়োজনে বাইরেও
যেতে হচ্ছে কাজেই ঘরকন্নার কাজগুলোকে
সহজসাধ্য করে নিলে অসুবিধায় পড়তে
হয় না। প্রতিদিন বাজার থেকে জিনিসপত্র
এনে রান্না করে যদি অফিসে যেতে হয়
তাহলে সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে
অফিসে হাজির হতে পারবেন না—এমন
ক্ষেত্রে যদি বাড়ীতে একটি রেফ্রিজারেটার
রাখা যায় তাহলে কত যে সুবিধা সে কথা
বলাই বাহুল্য। অনেকে হয়তো বলবেন
সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে একটি ফ্রিজ কেনা
খুব সহজ কথা নয়—সেকথা আমিও
অস্বীকার করি না কিন্তু যদি কিছু টাকা
জমিয়ে অথবা মাসিক কিস্তিতে কেনার
ব্যবস্থা করা যায় তবে বোধহয় এ ব্যবস্থা
করতে সবাই প্রস্তুত তাই না?

এ ছাড়া সুগৃহিণীকে আরো কিছু
ভাববার আছে। সেটি হল সংসারের কাজ-
গুলির সুশৃঙ্খল পরিচালনা করতে হলে
প্রত্যেকের পরিশ্রম ও বিশ্রামের সঙ্গে
সামঞ্জস্য রেখে কাজের একটি তালিকা তৈরী
করে নেওয়া দরকার। এই তালিকা তৈরী
করতে হলে প্রথমেই ভেবে নিতে হবে কোন্
কোন্ কাজগুলি আমাদের প্রতিদিনই
করতে হয়। যেমন, রান্না, খাওয়া, বিছানা
করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা ইত্যাদি।
আবার প্রত্যহ করতে হয় না, সপ্তাহে এক-
বার করলেই হবে এমন কাজ হলো আসবাব-
পত্র পরিষ্কার রাখা, আলমারী গোছানো,
কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে কাচা, ইস্ত্রি করা,
রান্না ও ভাঁড়ার ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি,
সাপ্তাহিক জিনিস কেনা ইত্যাদি। এর জন্য
সপ্তাহে এক একটি দিন ধার্য করা যেতে
পারে। যেমন রবিবারে কাপড় কাচা, ইস্ত্রি
করা সোমবার ঘরদোর পরিষ্কার করা
ইত্যাদি। আরো কতকগুলো কাজ আছে
যেগুলো মাসে একবার করলেই হবে।
সেগুলো হলো তোলা বাসনপত্র পরিষ্কার করা,
গরম জামা-কাপড় রোদে দেওয়া ইত্যাদি।
এইভাবে সংসারের কাজের একটি তালিকা
সাজিয়ে নিলে প্রতিদিন আর অসুবিধায়
পড়তে হয় না। এখানে একটি কাজের
তালিকা তৈরী করে দিচ্ছি তবে যদি এর
কিছু অদল-বদল করতে চান করে নিতে
পারেন।

(১) দৈনিক বা রোজের কাজ—শোবার ঘর,
খাবারঘর, রান্নাঘর, স্নানেরঘর মোছা-
মুছি পরিষ্কার করবেন। এছাড়া রান্না
করা ও খাওয়া। বাসনপত্র ধোয়া, কিছু
জামাকাপড় জলকাচা করা দরকার।

(২) সপ্তাহের কাজ—কাপড়চোপড় কাচা ও
ইস্ত্রি করা। জামা, ফ্রক ইত্যাদি সেলাই
করা, পুরনো কিছু থাকলে তাকে রিপু
তালি দেওয়া, এক একদিন এক এক-
খানি ঘর নিখুঁত করে পরিষ্কার করা।

(৩) মাসের কাজ—তোলা বাসনপত্র
পরিষ্কার করা। সিল্কের জামা-কাপড়ের
তদারক করা। বই ইত্যাদি ঝেড়ে
পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা।

এইভাবে তালিকা করা থাকলে লোকজন
না থাকলেও আপনি অসুবিধায় পড়বেন
না এই সব কাজের জন্য, তখন এইভাবে
কাজ ভাগ করে নিলে এটি অভ্যাস হয়ে
যাবে। তবে বিদেশের মত যদি এমন লোক-
জনের ব্যবস্থা করা যায় যে, লোকটি শুধু
উদয়াস্ত আপনার বাড়ীতেই কাজ করবে
না, একটা সময় ঠিক করে নিলে সে অনেক
বাড়ীতেই কাজ করতে পারবে এবং টাকাও
বেশী রোজগার করবে আর আমরাও
অসুবিধায় পড়ব না।

মানুষকে ভালভাবে বাঁচতে হলে নিজে-
দের সুবিধা অসুবিধার কাজগুলো আগে
থেকে চিন্তা করে নিতে হবে। কারণ
আজকের দিনে মেয়েরা অধিকাংশই বাইরের
কাজ করছেন সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঘর-সংসার
নিয়ে থাকা সম্ভব নয় তাই প্রয়োজন কাজকে
সংক্ষেপ করা।

ভুল

সমস্ত দেওয়ালটা শাদা ঝকঝক করছে, মেঝে থেকে এক ফুট উঁচু করে লাল সিমেণ্টে মোড়া। বড় বড় জানালার মধ্য দিয়ে রোদ্দুর অবলীলাক্রমে ঢুকছে, সেই সঙ্গে পর্দা উড়িয়ে মাতাল মানুষের মতো বাতাসও কলকাতার এই অঞ্চলে সাধারণতঃ এত বাতাস থাকে না, আজ যেন রোদ্দুর আর বাতাস সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলছে। জানালায় হলুদ গ্রিল, তার পাশেই মাদুর-রঙা সোফাসেট, ছোট্ট সেণ্টার টেবিলে ফুলদানি। ভেতরে কোন ফুল নেই। কাগজ ওল্টানো বন্ধ করে মনন ঘরটার চার পাশ দেখতে লাগল। দেওয়ালে হিজিবিজির মত একটা ছবি দেখতে পেয়ে মনন সোফা ছেড়ে উঠে ছবিটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। গাঢ় কমলা রঙের জমির ওপর কালো রেখায় টানা দুজন মানুষের ছবি। একজনের মুখ নিচের দিকে, দু'চোখ বন্ধ, সে শুয়ে আছে। দু'পাশ দিয়ে আড়াআড়িভাবে ঝুলে রয়েছে তার হাত। অন্যজন তারই পাশে চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে, চোখ দুটি বিস্ফারিত। কিছুদিন আগে প্রদর্শনীতে দেখা টুকু নন্দীর ছবির কথা মনে পড়ল তার। তারপর সে হেঁটে এসে ছোট সোফায় হেলান না দিয়ে বসল। এটা একতলার ঘর হওয়াতে, জানালা দিয়ে লোক চলাচল বেশ নজরে আসে। পর্দা উড়ে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে মনন রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল। ফুটপাতের ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে, তারের জালের ভেতর এক নাম-না-জানা গাছ। গাছটায় বড়ো আকারের হলুদ ফুল, গন্ধহীন। হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো খুব জোরে জোরে দুলছে। গাছের গোড়াটা অপরিষ্কার। গাছের মাথাটা কিছুতেই দেখা যায় না। তুমিই মনন?—এই গম্ভীর গলার স্বরতরঙ্গের মত ঘরময় ছড়িয়ে গেলে মনন পেছনে ফিরল।

ভদ্রলোককে প্রণাম করা উচিত কি না, মনন ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। কোনক্রমে ছোট্ট হ্যাঁ বলেই, সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বালকবেলার স্বভাবসিদ্ধ নরম স্বরে মনন বলল, মনন দাশগুপ্ত।

তুমি বোধহয় এ বাড়িতে এই প্রথম এলে?

হ্যাঁ, চশমার আড়ালে ভদ্রলোকের জ্বলজ্বলে তেজী চোখের বদলে, আজ শান্ত দুটি চোখের আভাস পেল মনন। এযাবৎ তার মুখে ঔদাসীন্য ও মানুষজনের প্রতি তুচ্ছতাই দেখে এসেছে মনন। আজ সে সব কিছু অন্যরকম লাগছে। ভদ্রলোকের চোয়ালের দিকে তাকিয়ে মনন বলল, আপনার পুরোনো বাড়িতে আমি দু একবার গিয়েছি।

তোমার বয়স এখন কত?

এই চব্বিশ মত, মনন বলল। নারীর সরু হারের ওপর রোদ্দুর পড়ার মত একটা হাসি ছুঁয়ে গেল মননের ঠোঁট। নড়েচড়ে বসল মনন। আজ সে শুষ্ক এক অভ্যর্থনা ও বিদ্রূপের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, তার বদলে নরম ব্যবহার পেয়ে মনন কিছু অস্বস্তিবোধ করছিল। এজন্য তার গলার স্বর বারবার ভোরবেলার কুয়াশার মত নরম হয়ে আসছিল।

রেজেস্ট্রির সার্টিফিকেটটা তোমার কাছে আছে!

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাল্কা সবুজ রঙের একটা কাগজ বার করল মনন। আজকাল এক কপিই দেয়, বলতে বলতে সে কাগজটা বাড়িয়ে দিল। সে লক্ষ্য করল, কাগজটা নেবার সময়, ভদ্রলোকের দীর্ঘ আঙুলগুলো কাঁপছে।

কিছুক্ষণ এরকম নীরবতার মধ্যে কাটল। নীরবতার শরীর স্পর্শ করে যাচ্ছিল বিনম্র ছায়া, ছায়াটিকে মনন যেন দেখতে পাচ্ছিল। এখনো রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। প্রায় ন'টা বাজে। ছুটির দিন বলেই বোধহয় এইরকম। সবুজ গাছ ও তার ফুলগুলো আর একবার দেখল মনন। তুমি কত মাইনে পাও? নিজেদের বাড়ি? এসব প্রশ্নের উত্তর মনন দিল। প্রথমটির উত্তর যদিও তেমন সন্তোষজনক ছিল না।

তোমার বাবা কি করেন?

গত বছর মারা গেছেন।

মা?

অনেকদিন আগেই, আমি তখন খুব ছোট...মনন মাথা নিচু করল।

অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন।

আছেন হয়তো। আমি কারো সংগে যোগাযোগ রাখি নি, আমার ভালো লাগে না, নিস্পৃহভাবে মনন বলল।

সার্টিফিকেটটা ফেরত পাবার পর মনন আগের মত ভাঁজ করে সেটাকে পকেটে রাখল। ভদ্রলোক এখন মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটি হাত হাঁটুর পাশ দিয়ে ঝুলছে, হঠাৎ পর্দার আড়ালে অরুণিমাকে দেখতে পেল মনন। আর দেখা-মাত্রই, সেই প্রথম দিকটায় যেমন হত, তার হাত কেঁপে উঠল। মাথার ভেতর ঝনঝন একটা শব্দ দ্রুত বাজতে থাকল। শব্দগুলো যেন মাথার ফাঁদে আটকা পড়ে পালাতে পারছে না। চোখে চোখ পড়ার পর অরুণিমা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। তারপর সরে গেল। মনন ঠিক বুঝতে পারল, অরুণিমা খুব কাছাকাছিই কোথাও আছে। যেন তার গন্ধ পাবে, এমনভাবে শ্বাস নিল মনন। দীর্ঘশ্বাসের মতন করে নিঃশ্বাসটা অনেকটা ধরে ছাড়ল।

তুমি তো জানো, তৃষ্ণার মা নেই।

ঘাড় নাড়ল মনন।

তোমরা আমাকে জানাও নি কেন? আইনের বিয়েটা সারবার আগে, আমাকে একবার জানালে কি ক্ষতি হত। লুকিয়ে লুকিয়ে এরকম করাটা কি খুব বাহাদুরি?

...ভদ্রলোকের গলার স্বর এখন কিছু দ্রুত।

মননের মনে অনেকগুলো যুক্তি এলেও, সে কোন কথা বলল না।

আমার ইচ্ছে তোমরা একটা সামাজিক বিয়ে কর...মনন, আমার কোন আপত্তি নেই, বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আর একদিন এসো, রবিবার হলেই ভালো।

তিনি ভেতরে চলে গেল মনন একবার মাত্র পর্দার দিকে তাকিয়ে বাইরে পা দিল।

অন্য ফুটপাতে যাবার সময় দোতলা শাদা বাড়ীটাকে আর একবার দেখে নিল মনন। ভালো করে লক্ষ্য করল, দোতলার বারান্দা, অরুণিমাকে সে দেখতে পেল না, এত সহজে কথাবার্তা মিটে যাবে, মনন আশা করে নি। সে বরাবর অরুণিমার বাবার তেজী মেজাজ ও মনোভাবের কথাই শুনে এসেছে: এখন ভদ্রলোকের এই পরিবর্তিত রূপ থেকে মনন অবাক হয়ে গেল। অন্য মনে সে বড় রাস্তায় উঠল। লাল দোতলা বাস গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ছুটির দিনে বাস অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। মনন বসে বসে ভাবতে লাগল। অরুণিমাকে আজ একবার দেখা করতে বললে কেমন হয়! জানালা দিয়ে বাঁ দিকে তাকিয়েছিল মনন। বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের ওপর রোদ্দুর বেশ জম-জমাট হয়ে শুয়ে আছে। ফাঁকা গড়ের মাঠে দুয়েকজন নিম্নজাতীয় লোক। দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ঘনিষ্ঠভাবে হেঁটে যাচ্ছে। কেমন যেন হঠাৎ, মনন আর অরুণিমার কথা ভেবে কোন গর্ব অনুভব করল না। হঠাৎ তার মনে হল, হয়তো অরুণিমাকে সে ঠিকমত ভালোবাসে না, একমাত্র দুচারটি মুহূর্ত ছাড়া তাদের কোন প্রকৃত মুহূর্ত নেই। তার ভালোবাসা এরকম কয়েকটি মুহূর্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ ভালোবাসার গাছের মতো কাণ্ড নেই, বরং ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো এ এক ছবি। স্মৃতিতে থাকলে যেন মানাত ভালো। আবেগের নাম যদি প্রেম না হয় তবে তার এই চব্বিশ বছরের যন্ত্রণা কত মিথ্যে হয়ে যাবে। কে জানে, সে এতদিন শব্দ নিয়ে কবিদের মতন মিথ্যের পেছনে খেলা করেছে কি না...একটু পরেই মনন আশ্বস্থ হল। অরুণিমাকে সে আজীবন জলের মতো স্বচ্ছ ভালোবাসা দিয়ে যাবে, সে অনায়াসে ভাবল।

আজ নিয়ে দ্বিতীয়বার মনন শাদা বাড়ীটার ভেতর পা দিল। আজ একতলার

বসবার ঘরের বদলে দোতলার কোণ ঘেঁষা ছোট্ট স্টাডিতে অরুণিমার বাবা শুয়েছিলেন। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ মলিন হয়ে এসেছে যেন। চকচকে গালের দু'পাশে বেড়ে উঠেছে দিন তিনেকের না-কামানো দাড়ি। কাঁচাপাকায় মিলেমিশে অদ্ভুত রঙ। আমি কয়েকদিন অফিসে যাচ্ছি না, বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে অরুণিমার বাবা বললেন, তুমি ঐ চেয়ারটায় বোসো।

মনন বসে বসে দেওয়ালভরা বই দেখল। টেবিলের ফুলদানিতে ঝরে-যাওয়া রজনীগন্ধার ঝাড়ের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ পেল মনন, যা ঠিক ফুলের গন্ধ নয়। একটু অন্যরকম। কাঁচের ফুলদানির বুক অব্দি বহুদিনের না পাল্টানো ভারী জল। কোনরকম ভূমিকা না করেই ভদ্রলোক বললেন, তোমরা কবে নাগাদ বিয়ে করতে চাও?

যে কোন দিন।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, একটা সামাজিক কিছু করতে চাই—কেন জানো?

আঘাত করবার মতো একটা কথা মুখে এলেও মনন চুপ করে থাকল। তার একরোখা ভাবটা গত সাতদিনে একেবারে মরে গেছে। ছোটবেলায় স্কুলের কোন বন্ধু ইরেজার বা পেন্সিল কেড়ে নিলে মনন যে স্বরে কথা বলত, আজ তার গলার স্বর অবিকল সেইরকম। সে শান্ততম গলায় বলল, এটা হয়তো আপনার একটা সংস্কার। আমার তেমন কোন সংস্কার নেই।

আমারও নেই। তাছাড়া তুমি এও ভেবো না, আমি কোনরকম সামাজিক সম্মানের কথা ভেবে এরকম বলছি। আমি কয়েকদিনের মধ্যে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। বাড়িটাড়ি বেচে হয়তো কোথাও চলে যাবো। তার আগে এটা করে গেলে, তৃপ্তি পাবো।

এটা সংস্কার না, কি বলব...তুমি বোধহয় বুঝতে পারছো।

আপনি কোথায় যাবেন?

কি জানি, উদ্ধত যুবকের মতো ভদ্রলোকের ঘাড় টানটান হয়ে উঠেছিল। কুড়ি বছর বয়সে আমি একা আসি কলকাতায়। প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সার্টিফিকেটের বেশি কিছু ছিল না। তারপর নানারকম চেষ্টা ও যোগাযোগের ফলে আমি আস্তে আস্তে... কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আর এখনও আমি নিজেকে বদলে ফেলতে চাই, আরো আগেই বদলানো উচিত ছিল, অরুণিমার মা মারা যাবার পর। আমি তখনো ঠিকমতো বুঝতে পারি নি। বৃষ্টি ঝুপ করে নামলে সবাই যেমন ত্রস্তভাবে গাড়ীবারান্দার দিকে দৌড়োয়, ভদ্রলোকের গলা ঠিক তেমন কাঁপছিল।

আপনি আমাদের এড়াতে চাইছেন।

তা কেন। আমি তোমাদের এড়াতে চাইব কেন। এলোমেলো চুলের ভেতর হাত চালাতে চালাতে বললেন, যদিও ঘটনাটা আমার অজ্ঞাতে ঘটেছে, তবু আমি তো মেনেই নিয়েছি। তুমি আমাকে বুঝতে পারছো না।

প্রকৃত কথা খুঁজে না পেয়ে মনন মাথা নিচু করল।

দুপুরবেলায় ঘুম থেকে উঠে মননের মনে হল, তার ঘরের দৃশ্যটা যেন বদলে গেছে। এরকম ছায়া-ছায়া অন্ধকার সে যেন আগে দেখেনি কখনও। চাকর চা দিয়ে গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ, ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া চায়ে চুমুক দিয়ে মনন জানালার পর্দা সরিয়ে দিল। ফ্যানের হাওয়াতে হ্যাঙ্গারে টাঙানো জামাটা অল্প অল্প কাঁপছে। ক্যালেন্ডার ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে অর্ধবৃত্তাকার ক্ষত তৈরী করেছে। সমস্ত কিছুই চিরাচরিত, পুরোনো, তবু ঘরটাকে কেমন অচেনা মনে হচ্ছে। তাহলে সে কি নিজেই বদলে গেছে, ভাবনাটা আকস্মিকভাবে মাথায় এল মননের, এলোমেলোভাবে তার মনে হল, হয়তো অরুণিমাকে আদৌ সে ভালোবাসে না, বরং 'ভালোবাসি' এই শব্দটির পেছনেই সে খেলা করে বেড়িয়েছে এতকাল, এবং এই শব্দটির ফাঁদে পড়েই সে অপরিসীম দুঃখ দিয়েছে অরুণিমার বাবাকে। মনন এই চিন্তাটি ত্যাগ করার চেষ্টা করল। সে পারল না। এমন সময় সে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেল। শব্দটা শুনেই সে বুঝতে পারল কে। অরুণিমা ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল। একি ঘরে আলো জ্বালাওনি কেন? এরকম ভূতের মত বসে আছ যে...

তোমার বাবা খুলেই ভেঙে পড়েছেন?

তোমার মাথা। আমার বাবাকে আমি চিনি। কই, আমার সঙ্গে তো তেমন কথা বলছে না। তোমাকে দলে টানতে চাইছে?

তার মানে?

মানে আবার কি। রূপসীরা অকারণ হাসতে পারে, এমন একটা ভঙ্গীতে হাসল অরুণিমা। বাবা চায়, তুমি নীচু হয়ে থাকো। আমি বলে দিচ্ছি, ওবাড়ীতে আমি বেশিদিন থাকতে পারবো না। পর্দা ধরে অকারণ নাড়াচাড়া করতে করতে অরুণিমা বলল, বেরোবে নাকি?

একদম ভালো লাগছে না, ঘুম ঘুম পাচ্ছে। হাই তুলতে তুলতে বলল মনন। অরুণিমার শিল্পিত মুখটিকে কেমন অসুন্দর দেখাচ্ছে হঠাৎ। অরুণিমা আয়নার কাছে গিয়ে এখন চুল ঠিক করে নিচ্ছিল। আলমারি থেকে জামাপ্যান্ট বার করে মনন বাথরুমে গেল। আজ তার, কেন কে জানে, এই বিকেল ও অরুণিমার সান্নিধ্যও ভালো লাগছে না।

পরদিন অফিস থেকে বেরোবার সময় বাস জ্যামে আটকা পড়ায় মনন হাওড়া ময়দানের সামনে বাস থেকে নেমে পড়ল। এটুকু হেঁটে হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে যাওয়াই ভালো। সে রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাতে চলে এসেছে যখন, তখন তার অদ্ভুতভাবে কতগুলো কথা মনে হল :

শরীরের মধ্যে একগাদা বুনো গাছপালা আছে। না, সবকটি বোধহয় বুনো নয়। কিছু মননের নিজের হাতে তৈরী। কষ্ট করে তৈরী করা। মনন হাত ভাঁজ করে দেখল, দিনদিন সরু হয়ে আসছে তার হাত কাঁধের চওড়া ভাব যেন কমে গিয়েছে। তবু, এই তো সেই মনন। যেন মনন নিজেকে বাজিয়ে দেখে নিতে চাইল। চারদিকে থেমে রয়েছে সবকিছুই। ময়দানের ভাঙা রাস্তার গর্তে আটকে রয়েছে লরীর টায়ার, ট্যাক্সিওয়ালা গলা বার করে দেখে নিচ্ছে পূর্ববর্তী জ্যাম। সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তের রোদ স্থির আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছে গাছের মাথায়, যেন ঘুমোবার জন্যই প্রত্যেকে অপেক্ষা করে আছে। একবার মননের মনে হল, সে থেমে রয়েছে এক জায়গায়, সেখান থেকে সে আর নড়তেই পারে নি। মনন বড় ক্লান্তভাবে হাসল। তারপরই সামনের এক বিজ্ঞাপন-বিভূষিত ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

মননের মনে পড়ে গেল, অরুণিমার বাবার মুখটিকে। বিকেলের শেষ রোদের ভেতর মনন ভদ্রলোকের রেখাময় মুখটিকে দেখতে পেল। সে ক্রমশঃ এক অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সে ঠিক করল, দেখা হলেই অরুণিমাকে বলবে, অরুণিমা আমরা এক মহাপাপ করে ফেলেছি। না ভয়ে করে আমরা কোন অপরাধ করি নি আসল কথা হল এই যে, মানুষ চিনতে আমরা ভুল করেছি। তোমার বাবার কথাই বলছি। না, না তুমি অমনভাবে হেসো না। আমরা হয়তো আমাদেরও ঠিকমত চিনতে পারি নি। মানে, আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলোকে। এখন থেকে আমরা দুজন নিজেদের শুধু দুঃখ দিতেই থাকবো। আর দ্যাখো, গত চার বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আমরা মিশেছি, মনে হয়েছে, আমরা ভালোবেসেছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, ভালোবাসা দেবার ও নেবার ক্ষমতা অতি দুর্লভ জিনিস। এ আমাদের নেই। বয়সে উপনীত হলে মানুষ ভুল করে বসে। আমরাও তাই করেছি। আমাদের এ রূপ, যেন ছবিতে মানাত ভালো। তা না করে আমরা এক গুহায় ঢুকে পড়েছি। এখন কি দেখব, আমি জানি।

কথাগুলো ভাবার পর মনন খুব সংকোচবোধ করল।
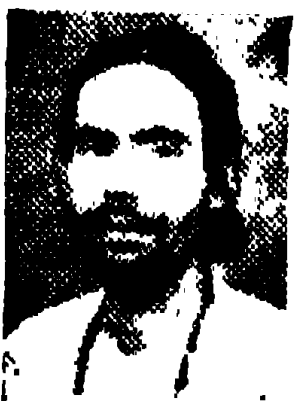
উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার থেকে ইউ এস এস টিকনডেরোগা জাহাজে অবতরণের পর অ্যাপোলোর তিন যাত্রী (বাম থেকে দক্ষিণে) ইয়ং, ডিউক ও ফ্যাটিংলিকে স্মিতহাস্যে দেখা যাচ্ছে। প্রকাশ, চন্দ্রাভিযানের পর মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে।

দেশে বিদেশে

কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন, সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা মুখে বলুন না কেন, নির্বাচনোত্তর পরি ভালভাবে পর্যালোচনা করার পর শুধু নির্বাচনে কারচুপির নালিশ না কিছু আত্মসমালোচনাও করবেন। দের এই ধারণা মিথ্যা হয়ে গেছে। দিল্লীতে সম্প্রতি পার্টির পলিট ব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটির যে অধিবেশন হয়ে া, সেখানে পার্টি তাদের পুরানো অভি-গেরই পুনরাবৃত্তি করেছে। নির্বাচনের গে সি পি এম 'ইন্দিরা-ইয়াহিয়া এক য় স্লোগান দিয়েছিল। বাংলাদেশের ধীনতা যুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েট শিয়ার ভূমিকার উপর পার্টি খুব বেশি ুত্ব আরোপ করতে চায়নি। এমনকি লাদেশে তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ি সংশয়ও সৃষ্টি করতে চেয়েছে। শ্চমবঙ্গের নির্বাচনে পার্টির পরাজয় এই নীতিগুলিকে ভুল প্রমাণিত করেছে কিনা তা নিয়ে পলিট ব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রকাশিত সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যা থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা ভুল স্বীকার করার কোন কারণ দেখতে পেয়েছেন।

সি পি এম যেমন আত্মসমালোচনার পথে যায়নি, তেমনি আবার এই ধারণারও সৃষ্টি করতে চায়নি যে, সংসদীয় গণ-তন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে তারা অতঃপর সংসদ-বহির্ভূত বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। বরং তারা এখন নিজেদের সংসদীয় গণতন্ত্রের রক্ষক হিসাবেই উপস্থিত করবে। নয়াদিল্লীর সিদ্ধান্ত দেখে মনে হয়, ন্যায্য ও অবাধ নির্বাচনকে বানচাল করে দিয়ে যে 'আধাফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস কায়েমের' যে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল, একথা দেশের মানুষকে বোঝানই এখন মার্কসবাদী-কম্যুনিস্ট-পার্টি তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ বলে গ্রহণ করবে। এই আন্দোলনের পথে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সামনে একটি বড় প্রশ্ন হল : আন্দোলন চালাতে গিয়ে তারা কি জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস প্রভৃতি দলের সঙ্গে হাত মেলাবে? এবারকার নির্বাচন সম্পর্কে ঐসব দলেরও অভিযোগ রয়েছে এবং তারা ও সি পি এম প্রায় একই ভাষায় এই অভি-যোগ করছে। নির্বাচন সম্পর্কে ঐসব দলের যে অভিযোগ আছে সেটা সি পি এম তাদের প্রস্তাবে 'লক্ষ্য' করেছে। কিন্তু সি পি এম এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন না হয়ে পারে না যে, তাদের বামপন্থী সত্তা বজায় রাখতে হলে দক্ষিণপন্থী দলগুলির খুব কাছাকাছি আসা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো সেই কারণেই এবার সি পি এম স্পষ্ট করে বলেছে যে বিহারের কয়েকটি নির্বাচন-কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ বাদে দেশের অন্যান্য অংশে নির্বাচন সম্পর্কে তাদের কোন অভিযোগ নেই। তার মানে মধ্যপ্রদেশে যে জনসঙ্ঘের পরাজয় হয়েছে অথবা গুজরাটে সংগঠন কংগ্রেসের যে হার হয়েছে, সে-সবের মধ্যে সি পি এম অস্বাভাবিক কিছুই দেখে না। অন্য যেসব দল নির্বাচনে জবরদস্তি ও কার-চুপির অভিযোগ করেছে, তাদের পক্ষে একথা মেনে নেওয়ার অর্থ একমাত্র সি পি এম ছাড়া অন্য সব দলের পরাজয়কেই [illegible]-

মণ্ডলীর রায় বলে স্বীকার করে নেওয়া। এই একরারনামা দিয়ে অন্য দলগুলি সি পি এম-এর সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করবে, এটা সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগের ভিত্তিতে যাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা যায় অথচ বামপন্থী নাম খারাপ করতে না হয় সেজন্য সি পি এম অন্য পথের সন্ধান করছে। সংবাদে প্রকাশ যে, তারা নাকি এইসব অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য জয়-প্রকাশ নারায়ণকে রাজি করিয়েছে। তাছাড়া, অবাধ নির্বাচন সম্পর্কে এম সি চাগলার সভাপতিত্বে দিল্লীতে একটি সম্মেলন করারও কথা হচ্ছে। এই ধরনের আন্দোলনই এখন সি পি এম-এর পক্ষে সবচেয়ে সুবিধা-জনক।

সি পি এম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিট ব্যুরোর এবারকার অধিবেশন দিল্লীতে হয়েছে। পার্টির সদর দপ্তর এখন কলকাতায় এবং গত কয়েক বছর যাবৎই কলকাতায় পার্টির কমিটি বৈঠকগুলি বসছিল। এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কলকাতার বদলে দিল্লীতে বৈঠক হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ এই হতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের উপর ইদানীংকালে পার্টি যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিল এখন আর ততটা গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন দেখছে না। পার্টি গুটোতে গুটোতে শুধু একরকম কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পার্টির ভেতর অভিযোগ উঠেছে যে, বি টি রণদিভে বা পি সুন্দরায়ার মত মার্কসবাদী নেতারা সর্বক্ষণ কলকাতায় পড়ে না থেকে যদি নিজেদের রাজ্যে কতকটা সময় দিতেন, তাহলে মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের নির্বাচনে সি পি এম আর একটু ভাল ফল দেখাতে পারত। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সি পি এম হয়তো পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে পার্টির কাজ পরিচালনা করা অধিকতর নিরাপদ বোধ করছে। পার্টির সদর দপ্তর কলকাতা থেকে আবার দিল্লীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা এখনও ওঠেনি। কিন্তু উঠলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

●

সি পি এম-এর পলিট ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পাশাপাশি সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশনেও নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে পর্যালোচনা হয়ে গেল। সি পি আই-এর সিদ্ধান্ত হল, জমিদারির বিরুদ্ধে ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এবং উচ্চ মূল্য, বেকার ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য নির্বাচকমণ্ডলী সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন। সি পি এম যখন বলছে, নির্বাচনের নাম করে ফ্যাসিজম আনা হচ্ছে, তখন সি পি আই বলছে, এই নির্বাচন ভারতবর্ষের রাজনীতিকে আরও বামে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে। সি পি এম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে আর সি পি আই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি রূপায়ণের জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ বাড়াতে চাইছে।

নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে সি পি আই লাভবানই হয়েছে। বিধানসভাগুলির সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে সি পি আই ভারতবর্ষে কংগ্রেসের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে—যদিও প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে ব্যবধান বিরাট। সি পি আই বুঝতে পেরেছে যে, কংগ্রেস নির্বাচনে যে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে তাতে কংগ্রেসের উপর সি পি আইয়ের চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ খুব বেশি নেই। তবুও, সি পি আই-এর বিশ্বাস, কংগ্রেসের ভেতরকার বামপন্থীদের সহায়তায় ঐ দলের আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধের সুযোগ নেওয়া সম্ভব। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সি পি আই ঘোষণা করেছে যে, 'জাতির রায় কার্যকর করার জন্য' তারা আগামী মে দিবস থেকে দেশ-ব্যাপী অভিযান আরম্ভ করবে।

●

পাণ্ডিচেরীর আরিয়ানকুপ্পম্ কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস ও ডি এম কে প্রার্থী পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর থেকেই ঐ দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। আবার কংগ্রেস-ডি এম কে সম্পর্ক যতই খারাপ হচ্ছে তামিলনাড়ুর স্বায়ত্তশাসনের দাবী ততই সোচ্চার হয়ে উঠছে।

এদিকে, মুত্তুভেল করুণানিধি নরম-গরম গাইছেন। তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্য-মন্ত্রী আবার ডি এম কে দলের সভাপতি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে, তারা যে স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলছেন সেটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। আবার দলের নেতা হিসাবে তিনি তাঁর দলের লোকদের, এমন কি মন্ত্রী ও এম এল এ-দেরও, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাতে দিচ্ছেন।

এই জেহাদের একটি দৃষ্টান্ত দলের কাঞ্চীপুরম্ সম্মেলনে দেখা গেল। ডি এম কে দল সম্প্রতি জেলায় জেলায় সম্মেলন করার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সেই সেই কর্মসূচী অনুসারেই কাঞ্চীপুরমে ঐ সম্মেলন হয়েছে। তামিলনাড়ুকে বাংলাদেশ এবং করুণানিধিকে মুজিবুর রহমান বানাবার যে আওয়াজ ডি এম কে দল তুলেছে সেটাই আর একবার কাঞ্চীপুরমে শোনা গেল। ডি এম কে-র বক্তারা ঐ সভায় এই বলে সাবধান করে দিলেন যে, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার যদি ইয়াহিয়া শাসনের অনুকরণ করেন তাহলে তামিলনাড়ুর প্রতিটি গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে মুজিবুর রহমান বেরিয়ে আসবে। বাঙলা-দেশের উদাহরণটি বড় করে তুলে ধরার জন্যই সম্ভবত কাঞ্চীপুরমের সম্মেলনে করুণানিধির একটি ছবি রাখা হয়েছিল, যাতে তাঁর পরনে ছিল মুজিব কোট—যদিও তিনি ঐ ধরনের কোট কখনও পরেন না।

কাঞ্চীপুরমে মঞ্চের উপর থেকে যখন ঐ ধরনের বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐসব বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন নি অথবা বক্তাদের বাধা দেন নি। একবার অবশ্য তিনি একজন সদস্যকে বলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে তামিলনাড়ুকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন প্রস্তাব তোলা হলে তিনিই সবচেয়ে আগে সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন।

এই সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি নয়াদিল্লিতে এসেছিলেন। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে ঘণ্টাখানেক কথা বলেন। এই সাক্ষাৎকারের পর তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীকে তিনি আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে, প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে তামিলনাড়ুর সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না বলে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। নয়াদিল্লির এই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি স্পষ্ট করে একথাও বলেছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রেরণা যোগাবে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের সঙ্গে তিনি একমত নন। কেননা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র রয়েছে, পাকিস্তানে তা নেই।

মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি আরও জানিয়েছেন যে, জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য তামিলনাড়ু যে ৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে সেটা গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর আমন্ত্রণে মাদ্রাজে আসতে সম্মত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর অনুষ্ঠিত উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি কংগ্রেস ও ডি এম কের মধ্যে সমঝোতার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

রাজধানীতে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য ও কাঞ্চীপুরমে তাঁর দলীয় সম্মেলনের সুর, দুইয়ের তুলনা করে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, চোখ রাঙিয়েই হোক অথবা মিষ্টি কথাতেই হোক, কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপসে আসার জন্য ডি এম কে দল ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

●

ভারতবর্ষের দক্ষিণে একটি রাজ্যের একটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক যখন এভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছে তখন দেশের পূর্বপ্রান্তে আর একটি অঞ্চলে আর একটি আঞ্চলিক দলের কাছে কংগ্রেসকে পরাজয় বরণ করতে হল। অঞ্চলটির নাম হল মিজোরাম এবং সেখানকার জয়ী আঞ্চলিক দলের নাম মিজো ইউনিয়ন।

মিজোরাম এই সবে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে গণ্য হয়েছে। এর আগে এটি ছিল আসাম রাজ্যের একটি জেলা। তখন তার নাম ছিল মিজো পাহাড় জেলা। অন্যান্য পার্বত্য জেলার মত এই জেলাটিও

আসামের সঙ্গে কখন সহজ মনে মেনে নেয় নি। 'মিজো' নামে পরিচিত এই জেলার উপজাতীয় অধিবাসীরা কখনই আসামের সমতলের অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন নি। রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে অসমীয়াকে যখন মিজোদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল। লালডেঙ্গার নেতৃত্বে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট স্বাধীন মিজোরামের আওয়াজ তুলেছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও চীনের শাসকদের প্রশ্রয়ে ও সাহায্যে ফ্রন্ট বেশ কতকটা শক্তি সঞ্চয় করেছিল। এই বিদ্রোহ দমন করতে ভারত সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। মিজোরামের সীমান্তে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়ায় এখন মিজো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়েছে। লালডেংগা ও তাঁর হাজার তিনেক অনুচর এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মিজোরা যদিও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যাখ্যান করেছেন তা হলেও তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। সেই কথাটাই মিজোরামের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল। এই বিধানসভার ৩০টি আসনের মধ্যে যে ২৭টির ফলাফল এখন পর্যন্ত জানা গেছে তার ভেতর ২০টিতেই জয়ী হয়েছেন মিজো ইউনিয়নের প্রার্থীরা। এই মিজো ইউনিয়নের প্রধান শ্লোগান ছিল, মিজোরামকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে। নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পন্থ বলেছিলেন যে, মিজোরামকে যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেটা তাকে পৃথক রাজ্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার পথেই প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে, মিজোরা এই ধরনের আশ্বাসের উপর আস্থা রাখতে পারেন নি।

নির্বাচনে মিজো ইউনিয়নের এই সাফল্য কংগ্রেসের পক্ষে একটা নিষ্ঠুর পরিহাস। কারণ, পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত মিজো ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। পরে আসামের কংগ্রেস নেতারা মিজো ইউনিয়নকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের সঙ্গে হাত মেলান। মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ততদিনে মিজো ইউনিয়নও কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যায়।

নির্বাচনে মিজো ইউনিয়নের জয়ের পর এখন মিজোরামকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবি ঠেকিয়ে রাখা খুবই কঠিন হবে। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, মণিপুর ও মেঘালয়ে একই দাবি মেনে নেওয়ার পর এখন মিজোরামও দিল্লির আঁচল ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য বায়না ধরবে, এটা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়।

•

গত ২৩ এপ্রিল ইউরোপে দুটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ ভোট গ্রহণপর্ব অনুষ্ঠিত হল। দুটির ফলাফলই সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রনায়কের উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে।

পশ্চিম জার্মানির বাডেন-ভুরটেমবার্গ রাজ্যের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। অর ফলে হিলি ব্রান্টের সরকারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। কিন্তু শুধু তাই নয়। এই নির্বাচনের তাৎপর্য আরও সুদূরপ্রসারী।

কেননা, এই নির্বাচনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার ও পোল্যাণ্ডের চুক্তির ভাগ্য। গত বছর চ্যান্সেলর ব্রান্ট তাঁর 'অস্টপলিটিক' অর্থাৎ 'পূর্ব দেশের রাজনীতি' অনুযায়ী ঐ দুটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এখন পশ্চিম জার্মানির পার্লামেন্টে ঐ দুটি চুক্তি অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে। এই চুক্তি অনুমোদন করা হবে কিনা, এই প্রশ্নের ভিত্তিতেই বাডেন-ভুরটেমবার্গের নির্বাচন হয়েছে। ঐ নির্বাচনে হিলি ব্রান্টের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল ও তাদের সহযোগী ফ্রি ডেমোক্র্যাট দল যে পরাজয় বরণ করল সেটাকে ঐ দুই চুক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানির রায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এদিকে পশ্চিম জার্মানির পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ 'বুন্দেস্টাগ'-এর আর একজন ফ্রি ডেমোক্র্যাট সদস্য দলত্যাগ করায় এখন ঐ পরিষদে শাসক জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর থাকল না। ঐ অবস্থায় হিলি ব্রান্ট তাঁর 'অস্টপলিটিক'-এর চুক্তিগুলি অনুমোদন করিয়ে নিতে পারবেন কিনা সে-বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিল। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্রান্ট হয়তো এখন পশ্চিম জার্মানিতে নতুন নির্বাচনের আহবান দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাঁকে সেই সুযোগ না দেওয়ার জন্য বিরোধী সদস্যরাও বদ্ধপরিকর। বুন্দেস্টাগে অনাস্থা প্রস্তাব এনে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এবং তাদের জায়গায় ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট নেতা বারজেলের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের জন্য বিরোধী পক্ষ ইতিমধ্যে উদ্যোগী হয়েছেন।

যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে ব্রান্টের সরকারের অস্তিত্বের প্রশ্নই জড়িত নয়, এই সরকার যে নতুন শান্তিনীতি চালু করেছিলেন তারও ভবিষ্যৎ এই সংকটের সঙ্গে জড়ান। হের ব্রান্ট তাঁর শান্তিনীতির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। কিন্তু এখন তাঁর পার্লামেন্টই যদি তাঁকে বাধা দেয় তাহলে কি হবে? ইউরোপ কি আবার ঠান্ডা লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে ফিরে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ এখন বন-এর দিকে তাকিয়ে আছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভোট গ্রহণ করা হয়েছে ফ্রান্সে। সেখানে 'রেফারেন্ডাম' বা গণভোট নেওয়া হয়েছিল। এই গণভোটের বিবেচ্য বিষয় ছিল, বৃটেন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশকে ইউরোপের অভিন্ন বাজারের সদস্য করা হবে কিনা। যদিও অধিকাংশ ভোটদাতা বৃটেনকে সদস্য করার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাহলেও এই গণভোটের ফলাফল ফ্রান্সের বর্তমান পম্পিদু সরকারের বিপক্ষে গেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, শতকরা ৪৫ জন ভোটদাতা এই রেফারেন্ডামে ভোট দেননি অথবা ভোটের বাকসে সাদা ব্যালট পেপার ফেলেছেন। যাঁরা ভোট দেন নি এবং যাঁরা বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা একত্র করলে 'না'-এর দিকেই পাল্লা ভারি হবে। ফ্রান্সের দুই প্রধান বিরোধী দল ভোটের এই ফলাফলকে তাদের জয় হিসাবেই গণ্য করছে। কেন না, কমিউনিস্টরা কমন-মার্কেট সম্প্রসারণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এবং সোস্যালিস্টরা তাঁদের সমর্থকদের এই রেফারেন্ডামে যোগ না দিতে আহবান জানিয়েছিলেন।

•

পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গেস্টাপো বাহিনীকে কাজে লাগান হচ্ছে, এই মর্মে একটি বক্তৃতা দিয়ে সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু সম্প্রতি লোকসভা গরম করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করা মাত্র এক রকম তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়েই স্বতন্ত্র সদস্য পিলু মোদি টিপ্পনি করেন 'সুতরাং কংগ্রেস কর্মীদের উচিত জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে আত্মসমর্পণ করা।'

•

ভিয়েতনামে লড়াই শেষ হয়নি, কিন্তু শান্তি আলোচনা আবার শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি রণবিধ্বস্ত দেশ ভিয়েতনামে যখন যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সপ্তদশ অক্ষরেখার উভয় দিকে আমেরিকান বিমান থেকে বোমা ও আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলা ফেলার যখন বিরাম নেই, তখন প্যারিসে ভিয়েতনাম সম্পর্কে স্থগিত শান্তি আলোচনা নতুন করে আরম্ভ হয়েছে।

আসলে, ওয়াশিংটন ও সায়গন প্যারিসের শান্তি আলোচনায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সব হিসাব গোলমাল হয়ে গেছে। সপ্তাহখানেক আগেও মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব রজার্স বলেছিলেন, উত্তর ভিয়েতনাম যতক্ষণ যথার্থ আলাপ-আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ না করছে, যতক্ষণ সে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে না নিচ্ছে, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা প্যারিস বৈঠকে ফিরে আসবে না। আমেরিকার হয়তো আশা ছিল যে, আমেরিকান মারণাস্ত্র ও ঐ অস্ত্রে সজ্জিত বলদৃপ্ত সায়গন বাহিনীর সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর ভিয়েতনামের সামরিক অভিযান প্রতিহত করা যাবে এবং তারপর আমেরিকান পক্ষ দাপটের সঙ্গে প্যারিসের আলোচনায় [illegible] পারবেন। কিন্তু অতীতে বহু [illegible] হয়েছে তেমনি আর একবার ভিয়েতনামের রক্তে-ভেজা মাটিতে আমেরিকার হিসাবের ভুল হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অভিযানের সামনে আমেরিকার হাজার হাজার টনের
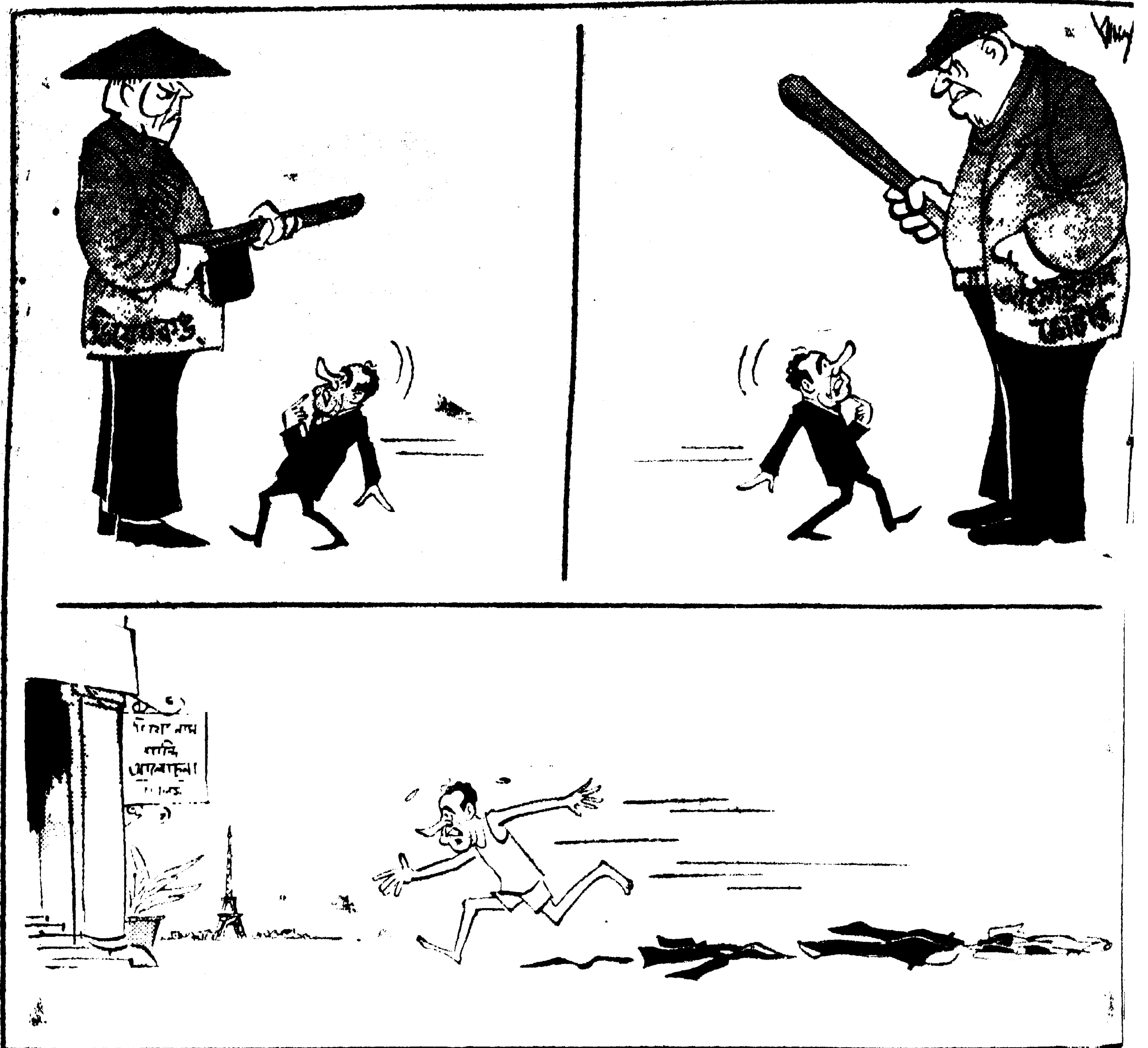
বোমা ও গোলা, আমেরিকার অস্ত্রসম্ভারে বলীয়ান সায়গনবাহিনীর বিক্রম সবকিছু মিথ্যে হয়ে গেছে। সপ্তদশ অক্ষরেখার দক্ষিণে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যে অঞ্চলটা এখনও হাস্যকরভাবে 'বাহিনীমুক্ত অঞ্চল' বলেই পরিচিত, সেখানে একটি বৃহৎ অংশ এখন কম্যুনিস্টবাহিনীর অধিকারে। প্রাদেশিক রাজধানী ও জেলা শহর ছেড়ে থিউ-বাহিনী দক্ষিণ দিকে পিছু হঠে আসছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলের মালভূমিতে, সায়গনের মার্কিন সামরিক মুখপাত্রের ভাষায় 'বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে।' মুক্তিবাহিনীর হেরে যাওয়ার অথবা সরে যাওয়ার কোন লক্ষণই নেই।

এই অবস্থায় নিকসন সরকার নিজেদের দেশের মানুষের কাছেও বেইজ্জৎ হচ্ছিলেন। নিকসন সরকার বুঝিয়ে আসছিলেন যে, তাঁদের 'ভিয়েতনামীকরণের' নীতি সফল হয়েছে অর্থাৎ আমেরিকার বিমানবল, নৌবল ও অস্ত্রবলের সাহায্যে এখন সায়গন-বাহিনীকে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যুঝবার মত শক্তি যুগিয়ে দেওয়া গেছে। কিন্তু ভিয়েতনামের রণক্ষেত্রে বাস্তবে যা ঘটেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে এখন আমেরিকার মানুষ নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, নিকসনের ঐ দাবী কত অসার। সায়গনবাহিনীর আর যে বলই থাকুক, মনোবল নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকা যখন স্পষ্টই ভিয়েতনাম যুদ্ধের সঙ্গে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে, তখন প্রেসিডেণ্ট নিকসন তাঁর দেশবাসীকে কি করে বোঝাবেন যে, আমেরিকা আস্তে আস্তে ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেকে সরে আসছে? আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ভিয়েতনামের যুদ্ধ উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভ তীব্রতর হচ্ছিল।

প্যারিস বৈঠকের টেবিলে আমেরিকার ফিরে আসার পিছনে এইসব বাস্তব অবস্থার চাপ তো ছিলই, তাছাড়া খুব সম্ভবত সোভিয়েট রাশিয়ার পরামর্শও আমেরিকার কানে জল ঢুকিয়েছে। ডাঃ হেনরি কিসিঙ্গার এরই মধ্যে আর একবার গোপন দূতিয়ালি সেরে এসেছেন মস্কোতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে সোভিয়েট নেতাদের কি কথাবার্তা হয়েছে, তার কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। তবে ডাঃ কিসিঙ্গারের এই সফরের অব্যবহিত পরেই প্যারিসের বৈঠক শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এই যোগাযোগ লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

সর্বশেষ অবস্থা হল: যুদ্ধও চলছে, শান্তির আলোচনাও চলছে। উভয় পক্ষই এখন পর্যন্ত তাঁদের মূল বক্তব্য আঁকড়ে ধরে আছেন। আমেরিকান পক্ষ বলছেন, উত্তর ভিয়েতনাম আগে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সরে যাক। কম্যুনিস্ট পক্ষের বক্তব্য: আমেরিকান সৈন্য আগে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে চলে যাক। শান্তির আলোচনায় অগ্রসর হতে হলে উভয় পক্ষকে আগে যুদ্ধবন্ধের আলোচনায় আসতে হবে। এখন যুদ্ধ বন্ধ করা মানে আলোচনার টেবিলে কম্যুনিস্ট পক্ষকে আরও বেশি দর-কষাকষির সুযোগ করে দেওয়া। আমেরিকা সেটা হতে দিতে চাইছে না, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি আমেরিকাকে সেদিকেই ঠেলে দিচ্ছে।

২৭।৪।৭২ —পুণ্ডরীক

রাতের রজনীগন্ধা / উত্তমকুমার ও অপর্ণা। পরিচালনা : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

ভারত সরকার ও বিদেশী ছবি

[illegible] বোম্বাই কলকাতা মাদ্রাজ [illegible] প্রভৃতি বড় বড় শহর এবং এদের আশে পাশে অন্যান্য জেলা-[illegible] বিদেশী ছবি দেখবার জন্যে [illegible] নির্দিষ্ট, যেসব ছবিঘর আছে, [illegible] একশোর বেশী নয়। এই [illegible] এখনও পর্যন্ত প্রধানত [illegible] হয়ে থাকে আমেরিকান বা হলিউড ছবি। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তিন বছরের মধ্যে গড়পড়তা বছরে [illegible] খানা আমেরিকান ছবির ২৫৭ খানি প্রিন্ট এই সব ছবিঘরের মারফত প্রদর্শিত হয়েছে। এই ছবিগুলি পরিবেশিত হয়েছে [illegible] আমেরিকান পরিবেশক সংস্থা দ্বারা, [illegible] মধ্যে নাম করা যেতে পারে— [illegible] ফিল্মস অব ইণ্ডিয়া লিঃ, মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার্স ইণ্ডিয়া লিঃ, প্যারামাউণ্ট [illegible] অব ইণ্ডিয়া লিঃ, টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিঃ এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স, সেভেন আর্টস [illegible] ন্যাশনাল পিকচার ইনকর্পোরেশন)-[illegible]। এই আটটি পরিবেশক সংস্থা এক-যোগে **'কিনেমেটোগ্রাফ রেণ্টার্স সোসাইটি** লিঃ' নাম নিয়ে আমেরিকান ছবির এই ভারতব্যাপী পরিবেশনার কাজ করে থাকেন। এই কিনেমেটোগ্রাফ রেণ্টার্স সোসাইটি লিঃ যে সংস্থার কাছ থেকে আমেরিকান বা হলিউডি ছবিগুলি পেয়ে থাকেন, তার নাম হচ্ছে **'মোশান পিকচার একসপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা'**। বোম্বাই শহরের পি. নরিমান স্ট্রীটস্থ [illegible] হাউসে কিনেমেটোগ্রাফ রেণ্টার্স সোসাইটির অফিসেই উক্ত মোশান পিকচার একসপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভারতীয় অফিসটি অবস্থিত। এমন কি সংস্থা দুটি নামে পৃথক হলেও একই টেলিফোন ব্যবহার করে থাকেন। এতকাল বৈদেশিক দপ্তর মারফত ভারত সরকারের সঙ্গে একটি এক-তরফা চুক্তির বলে 'মোশান পিকচার একসপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ভারতে এই আমেরিকান ছবিগুলি আমদানী করতেন। সরকারী হিসেব থেকে জানা যায়, ২৫৭ খানি প্রিন্ট আনতে খরচ পড়ত কমবেশী সাড়ে এগারো লাখ টাকা (১১,৫০,০০০৲) মাত্র প্রিন্টগুলির মূল্য বাবদ। ছবিগুলির ভারতে প্রদর্শনস্বত্ব যদি একেবারে কিনে নিতে হত, তাহলে তার জন্যে ঢের বেশী দাম দিতে হত। কথাটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনীয়তা আছে। ধরুন, কলকাতার কোনো চিত্রপরিবেশক বোম্বাইয়ে তৈরী কোনো হিন্দী ছবির পূর্বাঞ্চলে (পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মণিপুর ইত্যাদি) প্রদর্শন স্বত্ব কিনতে চান। অনেক বাদানুবাদের পর চুক্তি হল, তিনি প্রযোজককে এর জন্যে দশ লক্ষ টাকা দেবেন এবং প্রযোজক তাঁকে প্রদর্শনী স্বত্ব সমেত ঐ ছবির ২০টি প্রিন্ট দেবেন। কথা রইল, পরিবেশক যদি আরও বেশী প্রিন্ট চান, তাঁকে সেই প্রিন্টগুলির জন্যে ন্যায্য খরচ দিতে হবে। এখন এক একটি প্রিন্টের জন্যে ধরুন খরচ হয় ১০,০০০৲ (দশ হাজার টাকা)। তাহলে তিনি চুক্তির শর্তানুযায়ী যে ২০ খানি প্রিন্ট দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ, তার জন্যে ব্যয় হচ্ছে ২,০০,০০০৲ (দু লক্ষ টাকা); আর বাকী ৮,০০,০০০৲ (আট লক্ষ টাকা) প্রযোজক নিচ্ছেন পূর্বাঞ্চল পরিবেশন স্বত্বটি বিক্রী করবার জন্যে। এই টাকাটা ছবি তৈরী করতে তাঁর যে বিরাট খরচ হয়েছে (ধরুন, ৬০ কি ৮০ লক্ষ টাকা), সেই খরচের

আংশিক উসুলে যায়। মোশান পিকচার এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারতীয় অাপিসকে কিন্তু আমেরিকান ছবির ভারতে পরিবেশন স্বত্ব লাভের জন্যে একটি পয়সাও ব্যয় করতে হয় না। কারণ, ভারতে ছবি প্রদর্শনের ব্যবসা কায়েমী করবার জন্যেই মেট্রো-গোল্ডউইন, প্যারামাউণ্ট প্রভৃতি আমেরিকান প্রযোজকরা একযোগে মিলিত হয়ে এই রপ্তানী সংস্থাটিকে গড়ে তুলেছেন এবং ভারত সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবার জন্যেই ঐ সংস্থার একটি ভারতীয় শাখা স্থাপন করেছেন বোম্বাই শহরে। আবার ভারতে তাঁদের পরিবেশকও প্রদর্শনী শাখাগুলি নিজ নিজ সংস্থা নির্মিত ছবিগুলির জন্যে পৃথক পৃথকভাবে কাজ করে গেলেও ভারতে ছবির আমদানী ব্যাপারটাকে সংহত করবার জন্যে একযোগে কিনেমেটোগ্রাফ রেন্টার্স সোসাইটি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা আসলে মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারতীয় শাখার অপর পিঠ।

একতরফা চুক্তির বলে এতদিন ধরে যে ঢালোয়াভাবে আমেরিকান ছবির আমদানী ঘটত আমাদের ভারতে, ১৯৭১ সালের জুন মাসে সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তর ঐ ধরনের একতরফা চুক্তি করতে অস্বীকার করেন পূর্ববর্তী চুক্তির একটি বিশেষ শর্ত পালিত না হওয়ায়। সেই বিশেষ শর্ত অনুসারে মোশান পিকচার এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছবির জন্যে একটি বাজার প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনীকে সম্ভব করার জন্যে যথাসাধ্য উদ্যোগী হওয়ার কথা ছিল। ও'দের জবাব হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের ছবিঘরগুলির মালিকেরা যদি ভারতীয় ছবি দেখাতে না চান, তাহলে তাঁরা তাঁদের জোর করতে পারেন না। কিন্তু এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা যে অন্তত একখানিও ভারতীয় ছবির জন্যে যথার্থই চেষ্টা করেছিলেন, কাগজে-কলমে এমন কোনো প্রমাণ নেই। আসলে ও'রা ঐ বিশেষ শর্তটির কোনোরকম গুরুত্বই দেননি। ফলে আবার করে এক-তরফা চুক্তি আর হয়নি। পরিবর্তে ভারত সরকার এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা সংস্থাকে মাত্র ততগুলিই আমেরিকান ছবি আমদানী করতে দিতে সম্মত আছেন, পরিবর্তে যতগুলি ভারতীয় ছবিকে তাঁরা ব্যবসায়িকভাবে আমেরিকায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছেন। আমেরিকাতে ভারতীয় ছবি রপ্তানী করবার দায়িত্ব তাঁরা নিতে চাননি। ফলে, ১৯৭১-এর জুনের পরে আমাদের দেশে নতুন করে কোনো আমেরিকান ছবি আমদানী হয়নি।

ভারত সরকার মোশান পিকচার এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সঙ্গে নতুন করে কোনো চুক্তি না করবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল, তাহলে ভারতে কি আমেরিকান ছবি দেখানো চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে? ভারত সরকার স্থাপিত সংস্থা ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের কর্তা মিঃ তারিখ জানিয়েছিলেন, ঐ কর্পোরেশনের মাধ্যমে ভারতে আমেরিকান ছবির আমদানী করা হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর, বৈদেশিক অর্থ ও বাণিজ্য এবং স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ বৈদেশিক চলচ্চিত্র আমদানী বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এতে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধি নাকি বলেছেন, কর্পোরেশনের অধীনস্থ ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার কর্পোরেশন যদি এখন তার কর্মপরিধিকে বাড়িয়ে বৈদেশিক চলচ্চিত্র আমদানী করার কাজে হাত দিতে চায়, তাহলে তার জন্যে অতিরিক্ত অর্থ-ভাণ্ডারের প্রয়োজন হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্মী সংগঠনেরও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু বর্তমানে এ দুইয়েরই অভাব আছে।

বৈদেশিক অর্থদপ্তর অবশ্য বিদেশী ছবির আমদানীর জন্যে ৩৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ বিনিময়ের সুবিধা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু সরকারী সংস্থাকে আমেরিকান ছবি আমদানী করতে হলে যে 'নিম্নতম অর্থ অঙ্গীকার'-এর ভিত্তিতে (মিনিমাম গ্যারাণ্টি বেসিস-এ) ছবিগুলির পরিবেশন স্বত্ব ক্রয় করতে হবে, তাতে যে ক'খানি ছবি তাঁরা সংগ্রহ করতে পারবেন তা ভাববার কথা। কাজেই অবস্থা বিবেচনা করে কে'চে গণ্ডূষ করা হবে কিনা, মোশান পিকচার এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সঙ্গে আবার নতুন করে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে হবে কিনা, তাই হয়েছে এখন আসল ভাবনা।

—নান্দীক

স্টুডিও সংবাদ

কোলকাতায় গরমের মাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এ-অসহ্য গরমে সবাই যখন পাগল, এমনি এক প্রচণ্ড রোদ্দের দুপুরে (গত শুক্রবার) প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে অবস্থিত স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে ঢুকে সামনে গোলমত এক সুন্দর ছোট্ট বাগানকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়েই পর পর দুটো ফ্লোর। আমি সোজা ডানদিকের ফ্লোরে ঢুকেই এক আজব কাণ্ডকারখানার সম্মুখীন হলাম। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম সুব্রতা চ্যাটার্জি পর পর চারবার ওঠ-বস করলেন। একে প্রচণ্ড গরম তার ওপর এ ওঠ-বস করার ফলে সুব্রতা গলগল করে ঘামতে শুরু করলো। তার সামনে একটি চেয়ারে বসে অগ্রদূত গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রীবিভূতি লাহা মুখটা থমথমে গম্ভীর। সুব্রতার ঐ কাণ্ড কারখানায় তিনিও যেন একটু বিস্মিত। সুব্রতা ঐ অবস্থাতেই বিভূতিদা (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিভূতি লাহা এই ফিল্ম লাইনে খোকাবাবু নামে পরিচিত) সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে তার সংলাপ আবৃত্তি করার মত করে বলতে লাগলো—খোকাদা আমার অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে। আর কোনদিন এমনটি হবে না।

এবারে খোকাদা হেসে ফেললেন আমি তো হতবাক। একিরে বাবা! লাইট জ্বললো না, পাখা বন্ধ হোল না, পরিচালকের কণ্ঠে সাইলেন্স প্লিজ শোনা গেল না—অথচ স্যুটিং হচ্ছে? তবে কি এটা ফাইনালটেক্ করার পূর্বের মহড়া? ঐ স্যুটিং জোন থেকে আমার দৃষ্টিটা প্যান করে ফ্লোরের অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছেন শ্রীবীরেশ্বর সরকার, তরুণকুমার এবং তাঁদের পাশে হাতে ফাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—খোকাবাবুর সহকারী সুভাষবাবু। তারাও ঐ দৃশ্যটা বসে বসে উপভোগ করছিলেন। আমার এই উৎসুক দৃষ্টিটা অনুসরণ করে তরুণকুমার আমায় যেন অভয় দেবার ভঙ্গীতে কাছে ডেকে জানালেন—না, না, মশাই এটা আজকের

[illegible]টিংয়ের কোন দৃশ্য নয়। আসলে [illegible]ব্রতার আজ সাড়ে দশটার মধ্যে [illegible]ডিয়োয় আসবার কথা, কিন্তু বেচারার [illegible]রী হয়েছে বলে ও খোকাদাকে তার [illegible]ভিনয়চাতুর্যে ম্যানেজ করে নিল। আমি [illegible]থ মেরে বসে পড়লাম। এবারে সুব্রতা [illegible]বীকে উদ্দেশ্য করে বললাম—বাব্বা! [illegible]পনি তো আমায় রীতিমত তাজ্জব [illegible]নয়ে দিয়েছিলেন? সুব্রতা দেবী মৃদু [illegible]সতে হাসতে আমার পাশে এগিয়ে এসে [illegible]নে কানে বললেন—মেক-আপে বসে আগে [illegible]কেই শুনেছিলাম খোকাদা ভীষণ রেগে [illegible]ছেন। তাই স্ব-রচিত চিত্রনাট্যে এ দৃশ্যের [illegible]তারণা না করলে আজ আমার রক্ষা [illegible]ল না। সুব্রতা দেবীর বলার ভঙ্গীতে [illegible]স্বিত আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

আমার আরও অবাক হবার পালা [illegible]কী ছিল। ফোরে সবগুলো লাইট জ্বলে [illegible]তেই তাকিয়ে দেখলাম—আমরা যেন [illegible] একটি পাহাড়ী এলাকায় এসে [illegible]। সামনে উঁচু নীচু পাহাড়। পাহাড়ের [illegible] দিকে ছড়ানো বড় বড় পাথরের [illegible]। দূরে পাহাড়ের ওপরে একটি [illegible] ছোট মন্দিরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। [illegible] বোঝবার উপায় নেই—পাহাড়টি [illegible] সেট তৈরী। চমৎকার সেটটি তৈরী [illegible] শিল্পনির্দেশক [illegible] [illegible]।

এবারে খোকাদার গম্ভীর আওয়াজ [illegible] অল লাইটস! সঙ্গে সঙ্গে [illegible] সহকারী সুভাষচন্দ্রকে নির্দেশ [illegible] সুব্রতা ও তরুণকে ডায়লগ এবং [illegible]। সুভাষবাবু [illegible] এবং [illegible] পূর্বেন্দুবাবুও [illegible] বুঝিয়ে দিলেন। [illegible] [illegible] এই পাহাড়ী অঞ্চলে [illegible] এসে [illegible] একটি [illegible] উপস্থিত [illegible] থেকে রমলা নাম্নী এক তরুণী ছুটে [illegible] উদ্দেশ্যে। এবারও [illegible] [illegible] কণ্ঠস্বর। গানের কথাগুলো [illegible] ঃ

'[illegible] আমার মন—
কিসের ঘরে দেয় না ধরা
ভালবাসার ধন।
সুরের হাওয়ায় মরিস খুঁজে
আকুল হৃদয় মন।'

এবারে দৃশ্যগ্রহণ শুরু হোল। খোকা-[illegible] দুবার মনিটর নিয়ে ফাইনাল টেক [illegible] হবার আগে ক্যামেরায় লুক-থ্রু করে [illegible] নিলেন। দৃশ্যটা নিম্নরূপ ঃ

[illegible]বেলা রমলা একাকী একটা জায়গায় চুপ করে বসে আছে। রমলার মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ। এমন সময়ে সেখানে লেখক এসে বললেন।

[illegible]খক—আরে আপনি এখানে, আর ওদিকে আমরা সবাই খুঁজছি।

[রমলা গম্ভীর ও বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লেখকের দিকে তাকায় কিন্তু কোন কথা বলে না]

লেখক—আপনার বেড়ানোর—সমস্ত আনন্দটাই নষ্ট হয়ে গেল।

[রমলা তবুও নিরুত্তর]

লেখক—সারাদিন খুঁজেও লোকটাকে পাওয়া গেল না। গেলে বোধহয় আপনার ভুলটা ভাঙানো যেত। সবাই বলেছে ও একটা পাগল, ভবঘুরে ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ দেখলেই ও ভয় পায়। হয়তো ভয় পেয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে গেছে।

রমলা—(আনমনে) কে জানে—

লেখক—আজ সকালে আপনার বৌদির কথায় আপনি বোধহয় রাগ করেছেন, কিন্তু ও কিছু না জেনেই—

রমলা—না না, রাগ করবো কেন, তাছাড়া ওদেরই বা কি দোষ। দূর থেকে শিল্পীদের বেখেয়ালী, উদ্দাম, উশৃংখল জীবনটাই আমরা দেখি, কিন্তু ওদের ভেতরের যন্ত্রণাটা আর কজন জানতে পারে! না হলে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন অতনুবাবু (লেখকের নাম) জীবনে যে নাম যশ অর্থ—সব কিছু পেয়েছিল, সামান্য একটু ভালবাসা পাবার জন্য তাঁর—

[ক্যামেরা ধীরে ধীরে ট্রাক ফরোয়ার্ড করে এগিয়ে আসে রমলার মুখের দিকে। ওর মুখে-চোখে ঘন হয়ে আসে আবেগ, চাপা উত্তেজনা। লেখক গভীর কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে রমলার মুখের দিকে]

রমলা—আপনি তো লেখক, লিখবেন সে কথা? সেই মিথ্যে কলংকের জবাব? আজ থেকে সাত বছর আগে যার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতো—যার একটুখানি গান শোনার জন্য লোকে উন্মুখ হয়ে থাকতো—যাকে একটুখানি দেখার জন্য লোকে উন্মাদ হয়ে যেত—

পরিচালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কাট্—! পট্‌পট্ সেটের সব আলোগুলো নিভে গেল।

খোকাবাবুর কাছে জানতে পারলাম—ছবির ফ্লাশ-ব্যাক এখান থেকেই শুরু।

লেখক আর রমলার চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করলেন তরুণকুমার এবং সুব্রতা চ্যাটার্জি।

এতক্ষণ আপনারা স্যুটিং পর্বের যে বিবরণ পড়লেন—তা সরকার ফিল্মস প্রযোজিত 'সোনার খাঁচা' ছবির। বীরেশ্বর সরকার রচিত ও সুরারোপিত এই ছবির শিল্পী-তালিকায় আছেন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, সুব্রতা, নির্মলকুমার, কণিকা মজুমদার তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী, হারাধন ব্যানার্জি, অপর্ণা দেবী, রবীন মজুমদার প্রভৃতি। বীরেশ্বরবাবু অপূর্ব সুরারোপ করেছেন ছবিতে। নেপথ্যে কণ্ঠ-শিল্পীদের মধ্যে আছেন—লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখার্জি ও দ্বিজেন মুখার্জি। বীরেশ্বরবাবু কথাপ্রসঙ্গে জানালেন—আর দুদিন কাজ হলেই ছবির চিত্রগ্রহণপর্ব শেষ।

এবারে অন্যান্য দুটি ছবির খবর জানিয়ে এবারের স্টুডিও পরিক্রমা শেষ করছে।

পরিচালক শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য তাঁর প্রথম পরিচালিত 'অমৃতের স্বাদ' ছবির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সুরারোপ করেছেন—হীরেন ঘোষ।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন শুভেন্দু চ্যাটার্জি, মাধবী চক্রবর্তী, শমিত ভঞ্জ, সুব্রতা চ্যাটার্জি, জহর রায়, ঝুমা মুখার্জি, কমল মিত্র, মলিনা দেবী, অসিতবরণ সহ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

পরিচালক সলিল সেন তাঁর পরবর্তী ছবি 'হার মানা হার'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু করে দিয়েছেন। সেবক চিত্রশিল্পের পতাকাতলে নির্মিত জরাসন্ধের '[illegible]' অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন বাংলা চিত্রাকাশের সর্বজনপ্রিয় জুটি সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার। সুরারোপের দায়িত্বে আছেন—সুধীন দাশগুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

'বাঙালী' যাত্রাভিনয়

কোলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদএর শিল্পীরা গত ২২শে এপ্রিল শনিবার দমদম সি-আই-টি বিল্ডিংস প্রাঙ্গণে (১৬, দমদম রোড) শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'বাঙালী' যাত্রাভিনয় বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে করেন। এঁরা যাত্রাভিনয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এঁদের অভিনয়ে সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সহস্রাধিক দর্শক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। প্রত্যেকটি চরিত্র সার্থকভাবে দলগত সংহতি দেখার মত। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নাটকটির পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন ও দায়ুদ খাঁর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

শ্রীকৃষ্ণকুমার সিংহ, পূর্ণেন্দুনাথ পাল, গৌতম মুখার্জি, সনৎ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র সেন, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কার্তিক বাগচি, সুরেশ ঘোষ, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, নিমাই দে, পূর্ণেন্দু মুখার্জি, ইন্দু মুখার্জি, তপন সরকার, সন্তোষ চক্রবর্তী, সুলেখা ব্যানার্জি, সুধা রায়চৌধুরী, অরুণা ঘোষ প্রমুখ এ নাটকে অংশ গ্রহণ করেন।

"প্রীতি সম্মেলন"

পানিহাটি বান্ধব পাঠাগারের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি পাঠাগার প্রাঙ্গণে এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৮-৩০ মিঃ পাঠাগারের সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পতাকা উত্তোলন করেন। সন্ধ্যার পর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীবিমল বসু। এই অনুষ্ঠানে বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্য শ্রীতপন চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সভাপতির সময়োপযোগী ভাষণের পর সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ঃ সর্বশ্রী শুকতারা বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্দ্রা সাহা, বিমল ঘোষ, অমিয় বসু, কমলেশ ঘোষ, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার দাস, হীতি দাস, শ্রীপতি দাস, নিখিল সেনগুপ্ত ও অশোক রায় প্রমুখ শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীপ্রবোধ সরকার। পরিশেষে পাঠাগারের কর্মসচিব শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে পাঠাগারের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানান।

রজত জয়ন্তী ও নববর্ষ উৎসব

সোদপুর ক্লাবের মাঠে ১লা বৈশাখ ১৩৭৯ বৈকালে ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের রজত জয়ন্তীর তিন দিবসব্যাপী উৎসব সুরু হয় বর্ষবরণ দিয়ে। এই উৎসবে পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠানের ২৫০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সমবেত ব্যায়াম, ব্রতচারী, নানা খেলাধুলা সোদপুরের উপস্থিত জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা লাভ করে। এই উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ সঙ্ঘকে শুভেচ্ছা বাণী পাঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ। উদ্বোধন করেন শ্রীবিমল বসু। সংকল্পবাণী পাঠ করান শ্রীব্রজরঞ্জন রায়। সম্পাদকীয় বিবৃতি দেন শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষাল ও শ্রীমন্টু সাহা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেজর বি প ঘোষ ডাইরেক্টর, ভারতীয় রেডক্রশ।

দ্বিতীয় দিনের উৎসবে কুচকাওয়াজ ও ড্রিল প্রতিযোগিতায় তিরিশটি প্রতিষ্ঠানের ৫০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবি এন পোদ্দার আই-এ-এস। পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীবি এন মুখার্জি আই-পি-এস ব্যারাকপুর। প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবি এন মুখার্জি, মেজর পি এন মুখার্জি ও শ্রীবি ধারী। কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় বালিকা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে জয়ন্তী সম্মিলনী এ্যাথলেটিক ক্লাব, বালক বিভাগে আড়িয়াদহ সেবা সমিতি ও ড্রিল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে জাগরণী অভিযাত্রী দল, পানিশলা। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী বি এন পোদ্দার।

শেষ দিনের উৎসবে বেলঘরিয়া ছাত্র মঙ্গল সমিতিতে সেনানী ও কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চাটার্জি। উদ্বোধন করেন শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস। সভাপতিত্ব করেন শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক। এতে ২০০ সেনানী ও কর্মী উপস্থিত হয়। বিকাল ৩ ঘটিকায় পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅজিতকুমার গাঙ্গুলী, মহকুমা শাসক, ব্যারাকপুর। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রভাসচন্দ্র সিংহ।

দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড

দাদাসাহেব ফালকে ভারতীয় ছায়াছবির জনক হিসেবে সারা বিশ্বের চিত্রজগতের এক বরণীয় মানুষ। তাঁর পুণ্যস্মৃতি বহনকারী অ্যাওয়ার্ড ভারতীয় চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ সম্মানের স্মারক। ফিল্ম ফোরাম ১৯৭১ থেকে 'দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড' ভারতীয় ভাষায় সেরা চিত্রকে দেবার ব্যবস্থাপনা করেছে। গত বছর এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল কানাড়ী ছবি 'সংস্কার'। পরে এই সংস্কারই সর্বভারতীয় ছায়াছবির ক্ষেত্রে 'জাতীয় পুরস্কার' লাভ করে।

এবছরেও এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। পরিচালকের প্রথম পরিচালনার ফসল হিসেবে ভারতীয় যে কোন ভাষায় গৃহীত কাহিনীচিত্র এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ১৯৭১ খৃঃ ৩০ এপ্রিল থেকে সুরু করে ১৯৭১ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সেন্সর করা এরকম ছবি প্রতিযোগিতার জন্য বিবেচিত হবে। আবেদনপত্র ফিল্ম ফোরামের অফিসে ১৯৭২ সালের ৩১শে মে'র মধ্যে পৌঁছানো দরকার।

শপথ নিলাম / অমিত ভঞ্জ ও সুনন্দা দাশগুপ্ত

ফিল্ম ফোরাম প্রবর্তিত দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে ফোরাম কর্তৃপক্ষ সর্বভারতীয় ছায়াচিত্রজগতের সমস্ত পরিচালক ও প্রযোজকদের সাদর আহ্বান জানিয়েছেন।

এসম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ও আবেদন পত্রের জন্যে লিখতে হবে এই ঠিকানায় : সেক্রেটারী, দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড কমিটি, ফিল্ম ফোরাম, ৪২১ হিন্দ রাজস্থান সেন্টার, দাদাসাহেব ফালকে রোড, দাদার, বোম্বাই ১৪।

মঞ্চাভিনয়

ঋতুরাজ-এর 'অজানা কাহিনী' : ঋতুরাজ-এর শিল্পী সদস্যরা সম্প্রতি নাট্যকার দীপ্তকুমার শীল রচিত 'অজানা কাহিনী' নাটকটি রাণীপুর লোক-উৎসব-এ জনতা মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। সামগ্রিক অভিনয়দীপ্ত নাটকটি দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন : দীপ্তকুমার শীল, দিলীপ বসাক, সত্যেন ঘোষ, কমল দাস, যাদব বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ মদন মজুমদার, শংকর চট্টো, সুকুমার পোদ্দার, অশোক চন্দ্র ও শুভময় গুপ্ত। নাট্য-পরিচালনা নাট্যকারের।

সাজাহান মঞ্চাভিনয়—সুষ্ঠু পরিবেশনার গুণে ঐতিহাসিক নাটক আজও যে দর্শকমনকে গভীর আনন্দে আপ্লুত করতে সক্ষমতার প্রমাণ রাখলেন কুচবিহারের সরকারী জেনকিন্স স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। সম্প্রতি স্থানীয় রাষ্ট্রীয় পরিবহন মঞ্চে পরপর দু' রজনী ডি এল রায়ের সুবিখ্যাত ও বহু অভিনীত 'সাজাহান' নাটকখানির অভিনয় করে।

একমাত্র দৃশ্যসজ্জার কথা বাদ দিলে অভিনয়ের প্রতিটি বিভাগেই লক্ষ্য করা গেল অপূর্ব নিষ্ঠার ছাপ। সুপ্রযুক্ত আবহ সংগীত, পরিমিত সম্পাদনা, কুশলী পরিচালনা, আর উন্নতধর্মী অভিনয় কুশলতায় শিক্ষক মহাশয়দের এ প্রচেষ্টা প্রতিটি দর্শকের আন্তরিক অভিনন্দন অর্জন করে।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন : মোহিতরঞ্জন কুণ্ডু, শংকরদেব চক্রবর্তী, সমাপ্তি দেবী, অমিয় অধিকারী, শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তী, দিলীপ দত্ত, রামপ্রসাদ নায়েক, বিনয় সেন, শিলা দেবী, অনিল সিংহ, নীরেন ঘোড়, রবীন্দ্র কর্মকার ও সারদা দেবী।

শৌভনিক সম্প্রদায়ের 'কারাগার'

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে শৌভনিক সম্প্রদায় বর্তমানের প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত পৌরাণিক নাটক 'কারাগার'কে মঞ্চস্থ করছেন। একদা ইংরেজ আমলে অধুনালুপ্ত নাট্যনিকেতন দ্বারা মঞ্চস্থ হয়ে এই নাটকটি তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পৌরাণিক পটভূমিকায় তাৎকালীন ভারতের অবস্থাকে প্রতিফলিত করে এবং ফলে ইংরেজরাজ নাটকটির অভিনয়কে নিষিদ্ধ করে দেন। যদিও যুগ পরিবর্তন হয়েছে, তবু 'কারাগার' নাটকের বক্তব্য প্রায় সর্বকালীন এবং সেই কারণে আজও এর আবেদন রয়েছে। আমরা পরান্তরে শৌভনিক সম্প্রদায় অভিনীত 'কারাগার'-এর আলোচনা করবার আশা রাখি।

রজতজয়ন্তী উৎসব

পাস্তুর লাবরেটরীজ প্রাইভেট লিমিটেডের রজত-জয়ন্তী উৎসব গেল ১৮ই মার্চ পূর্বাহ্নে বিধান সরণির ভবন-প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের অংগ ছিল একাধিক—মঙ্গলাচরণ, আদর-আপ্যায়ন ও কর্মীদের পুরস্কার প্রদান। মহাজাতি সদনে সান্ধ্য সমাবেশের আনন্দ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডেপুটি ডিরেক্টার অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী, প্রধান অতিথি হয়েছিলেন ড্রাগস কন্ট্রোলের ডাইরেক্টার ডাঃ এ সি কর। এই আনন্দ-উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল কর্মীদের নাটকাভিনয়। তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে 'ফাঁস' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র, অমরেশ দাস ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্যরাও চরিত্রানুগ অভিনয়ে নাটকটির সাফল্যের পথে অনেক সহায়তা করেন।

খেলাধুলা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল

১৯৭২ সালের রঞ্জি ট্রফি জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ২৪৬ রানে বাংলাকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ১৪ বার এবং মোট ২৩ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য বোম্বাইয়ের এই ২৩ বার ট্রফি জয় প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার ট্রফি জয়ের রেকর্ড এবং তাদের উপর্যুপরি ১৪ বার ট্রফি জয় যে-কোন দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার ট্রফি জয়ের বিশ্ব রেকর্ড।

চতুর্থ দিনে চা-পানের পর বোম্বাই মাত্র ২০ মিনিট খেলেছিল। বোম্বাইয়ের ২য় ইনিংস ২৫৮ রানের মাথায় শেষ হয়। বাংলার একাধিকবার 'ক্যাচ' ফেলার ফলে বোম্বাইয়ের যথেষ্ট সুবিধা হয়। ৩৭৫ মিনিটের খেলায় যেখানে বাংলার জয়লাভের জন্য ৩৫৩ রানের দরকার ছিল সেখানে তারা কোন উইকেট না খুইয়ে ২৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে বাংলার ২য় ইনিংস ১০৬ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ২৪৬ রানে জয়ী হয়। বাংলা ২য় ইনিংসের খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। শিভালকার ৪৩ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোম্বাইয়ের জয়ের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। এই খেলায় তিনি ১১৮ রানে ৯টা উইকেট পেয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ৩৭৭ রান (গাভাস্কার ১৫৭, ওয়াদেকার ৫৭ এবং মানকাদ ৪২ রান। সুব্রত গুহ ৭৫ রানে ৩, সমীর চক্রবর্তী ৭৭ রানে ৩ এবং দিলীপ দোশী ১০৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৫৮ **রান** (মানকাদ ১৮ এবং নায়েক ৪৩ রান। দোশী ৭৩ রানে ৩ উইকেট)

বাংলা : ২৭১ রান (গোপাল বসু ৭৩, অম্বর রায় ৭১ এবং অশোক গান্ধোত্রা ৯২ রান। শিভালকার ৭৫ রানে ৩ এবং বেগে ৮০ রানে ৩ উইকেট)

ও ১০৬ **রান** (কে চৌধুরী ২০ রান। শিভালকার ৪৩ রানে ৬ উইকেট)

বোম্বাইয়ের উপর্যুপরি ১৪ বার জয়

১৯৫৯ সালে বাংলাকে ৪২০ রানে, ১৯৬০ সালে মহীশূরকে এক ইনিংস ও ২২ রানে, ১৯৬১ সালে রাজস্থানকে ৭ উইকেটে, ১৯৬২ সালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ২৪৭ রানে, ১৯৬৩ সালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ১৯ রানে, ১৯৬৪ সালে রাজস্থানকে ৯ উইকেটে, ১৯৬৫ সালে হায়দরাবাদকে এক ইনিংস ও ১২৬ রানে, ১৯৬৬ সালে রাজস্থানকে ৮ উইকেটে, ১৯৬৭ সালে রাজস্থানকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে, ১৯৬৮ সালে মাদ্রাজকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে, ১৯৬৯ সালে বাংলাকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে, ১৯৭০ সালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ৫৯ রানে, ১৯৭১ সালে মহারাষ্ট্রকে ৯৮ রানে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাকে ২৪৬ রানে পরাজিত করে বোম্বাই উপর্যুপরি ১৪ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়।

রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে বোম্বাইয়ের ২য় ইনিংসের খেলায় দোসীর বলে মানকাদ বাউন্ডারী করেছেন। মানকাদ ১৮ রান করে আউট হন।

এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

ব্যাংককে ১৪তম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইজরাইল ১—০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে মোট ৮ বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করে। ইতিপূর্বে ইজরাইল উপর্যুপরি চারবার (১৯৬৪-৬৭) এবং ১৯৭১ সালে সরাসরি চ্যাম্পিয়ান হয়। তাছাড়া তারা ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ২ বার (১৯৬৪ ও ১৯৬৬) যুগ্মবিজয়ী হয়েছিল।

১৯৭২ সালের সেমি-ফাইনালে **ইজরাইল ১—০ গোলে ইরানকে এবং**

…তে বছরের রানার্স আপ দক্ষিণ কোরিয়া …—০ গোলে তাইল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

ডেভিস কাপ

পূর্বাঞ্চলের খেলা

১৯৭২ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৫—০ খেলায় মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ— নিউজিল্যাণ্ড

পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলা

পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের শেষ এবং পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলাটিও আগের চারটির মত অমীমাংসিত থেকে গেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স এই অমীমাংসিত ফলাফলের জন্যে নিউজিল্যাণ্ডের খেলার নীতিকে দোষারোপ করে বলেছেন নিউজিল্যাণ্ডের অতি আত্মরক্ষামূলক খেলার ফলেই সিরিজের খেলা ড্র গেল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্স আগের চারটির মত পঞ্চম টেস্ট খেলাতেও টসে জয়ী হন। টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই টসে জয়ী হওয়া এক অসাধারণ ঘটনার পর্যায়ে পড়ে।

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২৭৮ রান সংগ্রহ করেছিল। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ৮৫ (কোন উইকেট না পড়ে)। নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় কালীচরণ ১০১ রান করে টেস্ট খেলায় 'সেঞ্চুরী' করার গৌরব লাভ করেন। তাঁর ১০১ রানে ছিল ১৩টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৩৬৮ রানের মাথায় শেষ হয়। লাঞ্চের সময় তাদের ৫টা উইকেট পড়ে ৩০৮ রান দাঁড়িয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ দিকের খেলা মোটেই সুবিধার হয়নি। খেলার এক সময় যেখানে ৫ উইকেট পড়ে তাদের ৩১২ রান উঠেছিল সেখানে ৩৬৮ রানের মাথায় ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায়

পি কে শিভালকার
৪৩ রানে ৬ উইকেট

নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের ৫৩ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলার গতি নিজেদের অনুকূলে ঘুরিয়ে নেয়।

তৃতীয় দিনে বৃষ্টির জন্যে মাত্র দুঘণ্টা খেলা সম্ভব হয়েছিল। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়লাভের সম্ভাবনা খুবই হ্রাস পায়। তৃতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১২৩ (৬ উইকেটে)। 'ফলো-অন' থেকে ছাড়ান পেতে তখনও তাদের ৪৬ রানের প্রয়োজন ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লেফট-আর্ম স্পিন বোলার ইনসান আলি ৪৫ রানে ৩টে উইকেট নিয়ে নিউজিল্যাণ্ডকে এই শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছিলেন।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ১৬২ রানে মাথায় শেষ হয়। এইদিন ৪৩ মিনিটের খেলায় তারা বাকি চারটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসে ৩৬৮ রান করার সুবাদে ২০৬ রানে এগিয়ে থেকেও নিউজিল্যাণ্ডকে 'ফলো-অন' থেকে ছাড়ান দেয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এইদিন ২য় ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৯২ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৯৮ রানে এগিয়ে আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের খেলা খুব খারাপ হয়েছিল। তাদের ৯৭ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আহত ডেভিড হলফোর্ড (২৫ রান), ইনসান আলি (১৬ রান) এবং হোল্ডার (নটআউট ৪১ রান) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মুখ রক্ষা করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসে ব্রুস টেলর ৪১ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে সাফল্যের পরিচয় দেন। টেলর ৪র্থ দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওপনিং ব্যাটসম্যান রয় ফ্রেডারিকসকে আউট করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে ২৩টি উইকেট পান এবং সেই সূত্রে নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে টেলরের উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭টি।

পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংস ১৯৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থেকে ৪০০ রানের পিছনে পড়ে নিউজিল্যাণ্ড ২য় ইনিংস খেলতে নেমে কোন উইকেট না খুইয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করে। খেলায় জয়লাভের জন্যে তাদের আরও ৩৫০ রানের প্রয়োজন ছিল। বৃষ্টির জন্য মাত্র ১১৩ মিনিট খেলা হয়েছিল। এই বৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচায়।

৬ষ্ঠ অর্থাৎ শেষ দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের ২৫৩ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হলে খেলা ড্র যায়। ৮ম উইকেট জুটি ওয়াডসওয়ার্থ (৪০ রান) এবং টেলর (৪২ রান) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রবল আক্রমণের মুখে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করেন এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে দলকে পরাজয় থেকে রক্ষা করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৬৮ রান (ফ্রেডারিকস ৬০, কালীচরণ ১০১, ডেভিস ৪০ এবং হলফোর্ড ৪৬ রান। টেলর ৭৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৯৪ রান (হোল্ডার ৪২ রান। টেলর ৪১ রানে ৫ এবং হাওয়ার্থ ৭০ রানে ৩ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড : ১৬২ রান (জার্ভিস ৪০ রান। আলি ৫৯ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৫৩ (৭ উইকেটে। টার্নার ৫০, কংডন ৫৮, ওয়াডসওয়ার্থ নটআউট ৪০ এবং টেলর নটআউট ৪২ রান। হোল্ডার ৪১ রানে ৪ উইকেট)

চিঠিপত্র

বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসি প্রসঙ্গে

গত ২৪শে চৈত্র 'অমৃত'-এর চিঠিপত্রে প্রকাশিত শান্তিপদ নন্দের 'বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসী প্রসঙ্গে' লেখাটি পড়লাম। এ বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলাম।

'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' অনুযায়ী কংগ্রেস পক্ষে মহাত্মা গান্ধীর অবশ্যপালনীয় অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি শর্ত ছিল 'আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা' এবং তদানীন্তন গভর্নমেন্টের পক্ষে বড়লাটের অবশ্য-পালনীয় অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি শর্ত ছিল 'অহিংস আন্দোলনের ব্যাপারে কারারুদ্ধ সকল রাজবন্দীকে একসঙ্গে মুক্তি দেওয়া'। কিন্তু কথা হচ্ছে, ভগৎ সিং কি গান্ধীজীর এই অহিংস সংগ্রামের সৈনিক ছিলেন? কংগ্রেসের মতে ভগৎ সিং যে গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামে জড়িত ছিলেন না বরং হিংসার পথেই তাঁর পদচারণ ছিল, তা আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি, তাঁর ফাঁসীর পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে। এই সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের সাহস ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করা হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এরকম হিংসাত্মক কাজের প্রবল নিন্দা করা হয়। সুতরাং এই চুক্তি অনুযায়ী সরকার পক্ষ ভগৎ সিং-এর মুক্তির জন্য আইনত বাধ্য ছিলেন কিনা এবং কংগ্রেসের তরফে নীতিগত ও আইনগতভাবে এ সম্বন্ধে জোরালো কিছু করার ছিল কিনা—তা বিবেচনাসাপেক্ষ। যাই হোক, এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনাটি কি, তা সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা 'ভারতের মুক্তিযুদ্ধ ১৯২০-৪২' বই থেকে উদ্ধৃত করলাম—"...বোম্বাই হইতে মহাত্মা দিল্লী রওনা হইলেন এবং ঐ একই ট্রেনে তাঁহার সঙ্গে আমি গেলাম। ফলে বোম্বাইয়ের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করিবার আরও একটি সুযোগই কেবল নয়, উপরন্তু এই চুক্তির দ্বারা জনগণের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে উহা লক্ষ্য করার সুযোগও আমি লাভ করিয়াছিলাম। সর্বত্র তিনি যে সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, তাঁহার জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছে। এমন কি ১৯২১ সালের ইতিহাসকেও ইহা অতিক্রম করিয়াছে। দিল্লীতে পৌঁছিয়াই আমরা নিদারুণ বিস্ময়ে এই সংবাদ পাইলাম যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে দুই-জনকে গভর্নমেন্ট ফাঁসী দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই যুবকদিগের প্রাণরক্ষার্থ চেষ্টা করিবার জন্য মহাত্মাকে চাপ দেওয়া হইল এবং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়েই আমি প্রস্তাব দিয়াছিলাম যে, যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে এই প্রশ্নটিতেই বড়লাটের সহিত তাঁহার আলোচনা ভাঙিয়া দেওয়া উচিত কারণ এই ফাঁসী আক্ষরিক অর্থে দিল্লীর চুক্তির বিরোধী না হইলেও ইহার উদ্দেশ্য বিরোধী।...কিন্তু মহাত্মা বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতে চাহেন নাই এবং তিনি অতদূর অগ্রসর হইবেন না: বড়লাট যখন বুঝিলেন যে, মহাত্মা আলোচনা ভাঙিয়া দিবেন না তখন স্বভাবতঃই অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার দাঁড়াইল। যাহা হউক, লর্ড আরউইন সে সময়ে মহাত্মাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বহু লোকের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত পাইয়াছেন যাহাতে লাহোরের ঐ তিনজন বন্দীকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে লঘু দণ্ড দিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে: তিনি সাময়িকভাবে তাঁহাদের ফাঁসী স্থগিত রাখিয়া বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে উহার বেশী তাঁহাকে চাপ দেওয়া হউক ইহা তিনি চাহেন না। বড়লাটের এই মনোভাব হইতে মহাত্মা এবং প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত ফাঁসী রদ করা হইবে এবং সারা দেশব্যাপী, বিশেষতঃ যে বাংলাদেশেও কয়েকজন বিপ্লবী বন্দীর ফাঁসী হইতে চলিয়াছিল সেখানেও আনন্দোল্লাস দেখা গেল। এই ঘটনার প্রায় দশ দিন পরে করাচীতে কংগ্রেসের অধি-বেশন হওয়ার কথা। সকলেরই প্রত্যাশা ছিল যে, ফাঁসী রদ করা হইবে; সুতরাং ২৪শে মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে করাচী যাওয়ার পথে যখন আমরা সংবাদ পাইলাম যে, পূর্বদিন রাত্রে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে তখন ইহা অতীব বেদনাদায়ক ও অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।"

গান্ধীজীর অহিংসার পথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার নিশ্চয়ই কিছু সংগত কারণ আছে। গান্ধীজী মনেপ্রাণে ছিলেন একজন ভারতবাসী। তিনি এটা ভালভাবে জানতেন যে, ভারতবর্ষীয় সমাজ প্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে,—এখানকার জাতির প্রাণ হোল ধর্মগত, পাশ্চাত্য জাতির মতো রাষ্ট্রগত নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে যে জীবনধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তার গতি নির্দিষ্ট করেছে ধর্মই। কিন্তু অনেক কাল থেকেই সংস্কারের আবর্তে পড়ে তার প্রাণশক্তি লোপ পেতে বসেছিল। গান্ধীজী সেই নষ্টপ্রাণ ধর্মকে সজীব, সতেজ করে তুলে [illegible] উপলব্ধি করলেন স্বাধীনতার পথ। পাশ্চাত্যের পরাধীন জাতিরা তাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে [illegible] গান্ধীজীর আগে ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরা অনেকেই সেই পন্থাকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন। কিন্তু গান্ধীজী বুঝলেন, ভারতের মতো এক অতি প্রাচীন বিশাল দেশকে জাগিয়ে তুলতে হলে [illegible] থেকে ধার করা হাতিয়ারে বেশিদূর এগোনো যাবে না, দেশের উপযুক্ত পন্থা আবিষ্কার করতে না পারলে দেশের উঁচু-নীচু সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি গভীরভাবে জন্মলাভ করতে পারবে না। তাই তিনি 'অহিংস অসহযোগ নীতি' ধর্মানুরক্ত ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্ট উপায় বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর এই নীতি অনুসরণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জাতি যেভাবে আত্মশক্তির পরিচয় পেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল, তা সত্যই অভাবনীয়। এই আত্মশক্তিরই ভাবী ফল হোল, আজকের এই স্বাধীনতা।

বারিদবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

২ সংখ্যা
মূল্য—২৲ টাকা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট—২৲ টাকা ২ পয়সা

Friday 12th May, 1972 শুক্রবার, ২৯ বৈশাখ, ১৩৭৯ Rs. 2.02

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৭৯

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৭৯

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

সম্পাদকীয়

নবজীবনের কবি

কবি চিরকালই নবজীবনের অগ্রদূত। তাঁর বাঁশীতে যে-সুর বাজে নবপ্রভাতের ভৈরবীর সঙ্গেই তার আত্মীয়তা। এ সত্য আরও বেশি করে মনে পড়ে পঁচিশে বৈশাখে কবির জন্মদিনে। তিনি জন্মেছিলেন বলেই না এই তাপদগ্ধ বৈশাখও আমাদের কাছে রমণীয়। তিনি এসেছিলেন বলেই না বৈশাখে এত উৎসব। জগতে আনন্দযজ্ঞে যিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আজ তাঁর জন্মদিনে বিশ্ববাসী সকলের আমন্ত্রণ। কারণ তিনি ছিলেন পৃথিবীর কবি। এই বিপুল পৃথিবীর যেখানে যত ধ্বনি ওঠে সবই এই কবির মনের বীণাতন্ত্রীতে তুলত প্রতিধ্বনি। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন জাতীয়তাবাদের মহত্তর উত্তরণ আন্তর্জাতিকতাবাদ। বিশ্বজনীনতাই ছিল তাঁর মৌল দৃষ্টিভঙ্গি। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করলেই আমরা এই মহান কবি, শিক্ষক ও সত্যদ্রষ্টার আসল পরিচয় লাভ করতে পারব।

কী চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? এর উত্তর পাওয়া যাবে কবির রচনাবলীতে, তাঁর জীবনচর্যায় এবং তাঁর হাতেগড়া লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। মহৎ কবি অন্য দেশে, অন্য জাতির মধ্যেও জন্মেছেন। ইংরেজরা পেয়েছিল শেকসপীয়রকে, গেটে শিলার জার্মানদের বহু সাধনার ধন, পুশকিন তলস্তয় রুশ সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত। কিন্তু বাঙালী বা ভারতীয়দের কাছে রবীন্দ্রনাথ শুধু মহৎ কবি নন, তিনি আমাদের চেতনা-পুরুষ। বাইরের লোক ঠিক এ বিষয়টি সহজে বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালীর এই উৎসব আনন্দ তাঁর প্রতি এমন প্রশ্নহীন আনুগত্যকে অবাঙালীরা ভাবপ্রবণ জাতির আতিশয্য বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু সীমান্তের ওপারে নতুন এক বাঙালি জাতির অভ্যুদয় প্রমাণ করেছে যে, বাংলাভাষীদের মনে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রভাব শুধু ভাবাবেগই তৈরি করেনি, তাকে কঠিন সংকল্প গ্রহণে জুগিয়েছে অসাধারণ অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বলা হত 'বাঙালি আজ গানের রাজা বাঙালি নহে খর্ব।' এই দেশেই এককালে রবীন্দ্র-বিরোধীরা রবীন্দ্রনাথের গানের অপব্যাখ্যা করেছেন নিজেদের নির্বুদ্ধিতায়। রবীন্দ্রনাথের গান যে কত শক্তিধর, তার ক্ষমতা যে কত অসাধারণ আমরা তা দেখেছি বঙ্গভঙ্গের যুগ থেকে শুরু করে অতি সম্প্রতি বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সময়ে। বাঙালির মনে নির্মল স্বাজাত্যবোধ, সংস্কারমুক্তির প্রেরণা, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির অবসান এবং নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মসাধনা এবং তাঁর সাহিত্যরচনার প্রভাব অতুলনীয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি কীভাবে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার চেষ্টা হয়েছিল পাক ঔপনিবেশিক শাসনের কালে। আমরা এও দেখেছি কীভাবে ওপারের বাঙালিরা একযোগে সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে এটাই আমাদের উপলব্ধির বিষয় যে, রাষ্ট্র বা ভূগোলের সীমানার চেয়ে সংস্কৃতির ও উত্তরাধিকারের সীমানা প্রশস্ততর ও দৃঢ়তর। দুই পারের বাঙালি তাই এক জায়গায় পরস্পরের সমধর্মী, পরস্পরের ভাই। রবীন্দ্রনাথের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। কবিকে নিবেদন করি আমাদের প্রণাম। কিন্তু শুধু প্রণাম নিবেদনেই আমাদের সব কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না। ওপারের বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথকে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছেন। সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথের ভাষার জন্য তাদের মমতার অন্ত নেই।

আমরা কি বাংলাভাষার জন্য এতটা ত্যাগস্বীকার করেছি। বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের জন্য আমাদের গৌরববোধ থাকলেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা আমরা দিতে পারিনি। কিছু গল্প উপন্যাস প্রকাশ করাই একটি ভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। মাতৃভাষাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের, প্রতিদিনের কাজকর্মের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পারলেই তার সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ নিজে মাতৃভাষাকে এই সম্মান দেবার জন্য আবেদন জানিয়ে গেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পরেও আমাদের দেশে, পশ্চিমবাংলায়, সরকারী কাজকর্মে বাংলা প্রবর্তিত হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতেও বাংলা দ্বিতীয় সারিতে। উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে বাংলাভাষায় পুস্তক রচনাতেও শিক্ষিতজনের অবহেলা মর্মান্তিক। বাংলাভাষার গবেষণাকর্মেও পশ্চিমবাংলায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি সাম্প্রতিককালে। তাহলে আমরা কী নিয়ে কবির জন্মোৎসবের অংশভাগী হব? ওপারের বাঙালিদের পাশে আমরা কী নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব কবির জন্মোৎসবে? হিন্দীভাষীরা তাঁদের ভাষার প্রতি যতটা মমতা দেখান, তামিলরা তাদের মাতৃভাষার জন্য যতটা আগ্রহী আমরা পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা কেন তা দেখাতে পারব না? আমরা কি শুধু উৎসবের জন্যই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করব? আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটবে? সাহিত্যপ্রেমী বাঙালি পাঠকদের কাছে কবির জন্মজয়ন্তী উৎসবে এটুকুই আমাদের বিনম্র জিজ্ঞাসা।
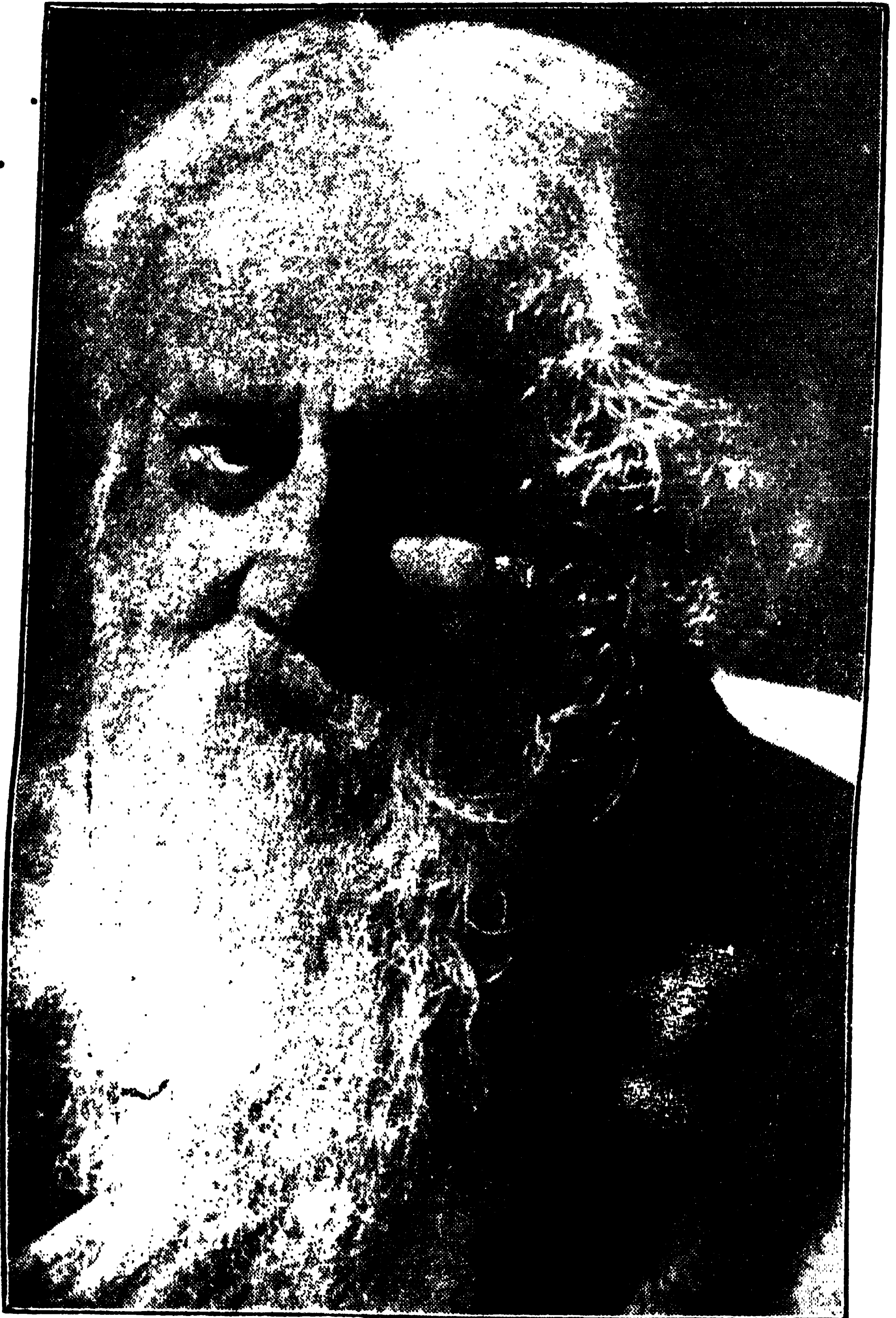
জন্মদিন ২৫ বৈশাখ ।।

রবীন্দ্রচর্চা: আপন আলোয় আত্মসমীক্ষা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আপন জীবন ও কর্মকে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে দেখতেন তা জানার আগ্রহ আছে নিশ্চয় সকলেরই। নিজের ছোটবেলার কথা লিখেছেন তিনি জীবনস্মৃতিতে। ছেলেবেলা বলে আরো একখানা বই আছে তাঁর আপন ছেলেবেলা সম্বন্ধে। এ ছাড়া নানা সময়ের চিঠিপত্রে, ইউরোপ প্রবাসীর পত্র জাপান যাত্রী, জাভা যাত্রীর ডায়েরী পশ্চিম ভ্রমণ কাহিনীতে, শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় এবং নানা সময়ের টুকরো লেখায় তাঁর আপন-জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য ও চিন্তার খবর পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনকে নিজে দর্শক হিসাবে দেখে তিনি ধারাবাহিকভাবে কিছু লিখে যান নি। অথচ এ রকম একটি জিনিস পেতে আগ্রহী নন কে?

১৯৩৬-৩৮ সালে যখন আমি বিশ্বভারতীতে সাহিত্যের অধ্যাপক ও কবির সাহিত্য বিষয়ক সহকারী বা লিটেরারি সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করছি, তখন এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, তার একটু সংক্ষিপ্তসার এখানে বলছি। এই কথাবার্তা হয়েছিল ১৯৩৭ সালে পৌষ মেলার পরদিন। যে বৈঠকে হয়েছিল কথাবার্তা, তাতে রথীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিনী, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, নন্দিতা দেবী, অনিলকুমার চন্দ ও তাঁর পত্নী রানী দেবী উপস্থিত ছিলেন। আজ পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখছি শেষের দুজন ছাড়া অন্যেরা সবাই বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। বিদায়ের বেলা কার জন্যে কখন নির্ধারিত হয়ে আছে কে জানে? কাজেই প্রয়োজনীয় কথাগুলো এখনি বলে রাখা ভাল।

পৌষ উৎসব উপলক্ষে মন্দিরের ভাষণে কবি অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন বিশ্বাত্মবোধ নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, নিজের সীমা অতিক্রম করে সর্বজনের জীবন ও মনের গভীরে পৌঁছতে পারি যখন তখনই আসে বুদ্ধির বিমুক্তি। স্বার্থের কারাগার থেকে বেরতে পারি বলে নিজেকেও তখন চিনতে পারি, চিনতে পারি অন্যকেও। আমার জীবনে এই আত্মনিরীক্ষার লেখা সুরু হয়েছে বহুদিন আগে, প্রায় যৌবনেই। পূর্ণতায় এসেছি দেরীতে। এই কথার সূত্র ধরে প্রশ্ন তুললে তিনি বললেন, সত্যকার বিচারে আমি একজন বিশ্ব মানবতাবাদী। অর্থাৎ ভৌগোলিক বা ধর্মগত পরিচয়ের গন্ডীতে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারিনি আমি। সেইজন্যেই পৃথিবীর দূর-দূরান্তে কোন ঘটনা ঘটলে, মানুষের কল্যাণাত্মক কোন কাজ হলে কিংবা কোন বিপদ দেখা দিলে তা আমাকে প্রীত বা ব্যথিত করে। যাদের দেখিনি, জানি না, জানবও না হয়ত কোন দিন, তাদের সঙ্গেও একটা আত্মিক ঐক্য অনুভব করি যেন আমি।

সবিনয়ে বললাম, কিন্তু বিশ্বমানবতাবাদ ত একটা ভাবমাত্র। আসলে মানুষ যে মাটিতে জন্মায়, যে পরিবেশে বড় হয়, তার সঙ্গেই থাকে তার আত্মিক ঘনিষ্ঠতা, কারণ সেটিই সত্য। আপনি যতখানি বাঙালী বা ভারতবাসী, ততখানি কি বিশ্ব মানবতাবাদী?

এ কথার উত্তরে কবি বললেন, ঠিক হিসাব করে হয়ত বলতে পারব না। তবে নিজের দিকে তাকিয়ে আমি উপলব্ধি করি যে আমি একে একে অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করে এসেছি। সর্বশেষে যে সোপান, সেখানে পা দিয়ে সত্যিই আজ আমি আর ঠিক ভূগোলের মানুষ নই।

তখন ধরলাম এই সোপানগুলি পূর্বাপর একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?

তিনি বললেন, বলছি। জীবনের একেবারে প্রথম ধাপে আমি ছিলাম বাংলাদেশের কবি। বাঙালীর সুখ দুঃখ, বঙ্গপ্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য, বাংলা সংস্কৃতির নমনীয় প্রাণময়তা আমাকে একান্তভাবে অধিকার করেছিল। আমার কবিতায় ছোট গল্পে বাংলার আকাশ বাতাস জল পাখী ফুল সবই যেন জীবন্ত হয়ে কথা কয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সারা বাংলা জুড়ে জেগেছিল যে উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ, অনেকের মত আমিও জড়িয়েছিলাম তাতে। তার উত্তাপে উৎসারিত হয়েছিল আমার অনেক গান, অনেক কবিতা ও বক্তৃতা। তার মানে কবিজীবনের সূচনা থেকে প্রায় যৌবনের মধ্যপর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশই প্রাধান্য নিয়েছে আমার লেখায়।

এই পর্যন্ত বলে তিনি বললেন, এর পর দেশে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ক্রমে হিংস্র সন্ত্রাসের মূর্তিতে শিখা বিস্তার করল। শ্রেয়মূল্য হারিয়ে উত্তেজনা এবং আঘাতকেই আমরা বড় করে তুললাম। বোঝা গেল আমাদের সাধনায় ফাঁকি ছিল। সিদ্ধিও তাই গেল পিছু হটে। অনিবার্যভাবেই পিছিয়ে আসতে হল আমাকে। একটু আগে থেকেই খুঁজেছিলাম আমি ধরে দাঁড়ানর মত একটা শ্রেয় আশ্রয়। প্রাচীন ভারতের তপোবন সংস্কৃতির আদর্শ স্পর্শ করেছিল আমার মনকে। তৈরি হয়েছিল তাই শান্তিনিকেতন আশ্রম। তারপর দ্রুত তালে ঘটনার পট পরিবর্তন হল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আমার সংসারজীবন। স্ত্রী লোকান্তরিতা হলেন। হল আরো অনেক বিপর্যয়। এই সময় একটি গভীর আত্মজিজ্ঞাসা আমাকে টেনে নিয়ে গেল উপনিষদ, বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র, বৈষ্ণব পদাবলী এবং সন্ত সাধক বাউলদের রচনার দিকে। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে আমার মন ব্যাপ্ত হল বিশাল ভারতবর্ষে। অর্থাৎ বলতে পার আমি উন্নীত হলাম ভারতের কবিতে।

গোরা উপন্যাস, কতকগুলি প্রসিদ্ধ কবিতা এবং আলোচনামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের নামোল্লেখ করলেন তিনি উদাহরণস্বরূপ। এর পর প্রশ্ন করলাম তাঁকে,

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গদর্শন

শিবদাস চক্রবর্তী

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা যখন আত্মপ্রকাশ করে, রবীন্দ্রনাথ তখন এগারো বছর বয়সের বালক। আর রবীন্দ্রনাথ যখন 'নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি চল্লিশ বছরের প্রবীণ যুবক। রবীন্দ্রজীবনীকারের ভাষায়, তখন রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে। চিরকুমার সভার শেষ কিস্তি ভারতীর সম্পাদিকার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, নষ্টনীড় উপন্যাস বোধ হয় লেখা শুরু করিয়াছেন। বিনোদিনীর (চোখের বালি) খাতাখানি বাহির করিয়া কয়েকটি পরিচ্ছেদ পুনরায় নূতন করিয়া লিখিয়া ফেলিয়াছেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া এখনো শিলাইদহে আছেন; গৃহবিদ্যালয়ে সন্তানেরা পড়াশুনা করে। মোটকথা জীবনের সরু মোটা সব তারগুলি সমভাবে ঝঙ্কৃত হইতেছে।' এমন সময় তিনি কলকাতা থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁর অনুজ শৈলেশচন্দ্রের কাছ থেকে নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান পেলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই আহ্বানে সাড়া দিতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। বরং তিনি পত্রযোগে বন্ধুবর প্রিয়নাথ সেনকে ঐ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং শৈলেশচন্দ্রকে 'বঙ্গদর্শন থেকে বিরত' করবার উদ্দেশ্যে একখানি পত্রে লিখলেন—এখন দুর্ভিক্ষ মহামারীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার কাল—এখন কে বসে মাথামুণ্ডু রচনা করবে—আর কেই বা বসে বসে মাথামুণ্ডু পড়বে?'

কিন্তু শ্রীশচন্দ্র এবং শৈলেশচন্দ্র সে আপত্তিতে কর্ণপাত না করে বঙ্গদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এর একটা কারণও ছিল। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে মাঘ পর্যন্ত চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা তাঁর হাতে বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, মনে বরাবর একটা ক্ষোভ ছিল। বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের বন্দোবস্ত করে শ্রীশচন্দ্র দীর্ঘকালীন ক্ষোভের কারণ দূর করবার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, পুনঃপ্রকাশিত বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার অর্পণ করতে চান সমকালীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রথী রবীন্দ্রনাথের হাতে।

একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হলে শ্রীশচন্দ্রের মন থেকে দীর্ঘদিনের দুর্ভাবনার পাষাণ-ভার নেমে যায়। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩০৮) শ্রীশচন্দ্র তাঁর 'নিবেদন'-এ লেখেন—'বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িকপত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড়ো লজ্জিত ছিলাম।...সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।'

বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ যে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি, তার প্রমাণ মেলে তাঁর ত্রিশ বছর পরের একটি লেখায়। তিনি লিখেছিলেন—'বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়... আমার নাম যোজনা করা হলো, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে আমি জয়লাভ করতে পারিনি. এবারও তাই হলো' (রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড)।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ এবং নব পর্যায়ে তার পুনরুজ্জীবন—এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঊনত্রিশ বছরের। এই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও যেমন তখনকার চেয়ে অনেক বেশী, লেখক এবং পাঠকের সংখ্যা এবং রুচিও বহু ও বিচিত্র। এই বাস্তব পরিস্থিতি স্মরণে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় 'সূচনা-অংশে' পত্রিকার নীতিগত উদ্দেশ্য ঘোষণার সূত্রে লিখলেন—'এখনকার বঙ্গদর্শন কোন উপায়েই তখনকার বঙ্গদর্শনের স্থান লইতে পারিবে না। এমন কি, এই বঙ্গদর্শন সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র হইবার আশাও করিতে পারে না। এই বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, বঙ্গদর্শনের আদি সম্পাদকের ন্যায় সমস্ত পত্রটিকে নিজের অপ্রতিহত প্রভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া, লেখকদিগকে নিজের প্রতিভার বন্ধনে বাঁধিবার স্পর্ধা রাখেন না।......এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ, ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে, চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র-মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে।' সংশয়ের দিকটি এইভাবে অকপটে উদ্ঘাটন করে পরিশেষে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে তিনি ঘোষণা করেন—'আমরা যখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য আমাদের পক্ষে অমার্জনীয়।'...বঙ্গদর্শনের আদি এবং নব সম্পাদকের লেখনী থেকে প্রায় একই সুরের অংগীকার উচ্চারিত।

সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই প্রথম নয়। এর পূর্বে তিনি 'সাধনা' (১৩০২) এবং 'ভারতী' (১৩০৫) নামে দু-খানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব বহনের পঞ্চম বর্ষে তিনি 'ভাণ্ডার' নামে আর একখানি মাসিক পত্রের (১৩২২) সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তারপর 'তত্ত্ববোধিনী'-র সম্পাদনা করেন ১৩১৮-১৯ বঙ্গাব্দে। তবে রবীন্দ্রনাথের সাধন-জীবনের ইতিবৃত্তে নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তা তাঁর স্ব-সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকার আছে বলে মনে হয় না। কারণ, এই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার পরিণত মূর্তিটি প্রতিফলিত, এই বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক-সত্তা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম লৌকিক জীবনের বাস্তব সমস্যামূলক উপন্যাস বাংলা পাঠক-সমাজকে উপহার দেন। রবীন্দ্রজীবনীকারও বলেছেন—'মানব জীবনের বৃহত্তর পটভূমিতে সমস্যা আলোচনার জন্য উপন্যাসের অবতারণা হয় বঙ্গদর্শনের এই নবযুগ হইতে। প্রবন্ধসমূহও নূতন গঠনমূলক বাণী বহন করিয়া আনিল।'

নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাদে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা', দীনেশচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা প্রাচীন গদ্য সাহিত্য' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদমূলক রচনা 'ভালোবেসো চিরকাল'। এছাড়া এই সংখ্যায় একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা-পর্যায়ে বারোটি চতুর্দশপদী কবিতা, 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক সুপরিচিত প্রবন্ধ এবং যুগ-প্রবর্তক উপন্যাস 'চোখের বালি'র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ

"আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে, কী জানি,
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে; নবসূত্রে গড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণ লিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।"

এবং রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় 'চোখের বালি'র প্রথম প্রকাশ সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে একটি কৌতূহলোদ্রেকী ঘটনা। কারণ, দু-খানি গ্রন্থই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে যুগ-প্রবর্তক সৃষ্টি। একই প্রেম-সমস্যার বাস্তব রূপায়ণ বিষবৃক্ষ এবং চোখের বালি যথাক্রমে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেম, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রেমের বিশ শতকীয় প্রথম সংস্করণ। বিষবৃক্ষ এবং গৃহদাহের অন্তর্বর্তী স্তরে অবস্থিত হয়ে চোখের বালি বঙ্কিম-যুগ এবং শরৎ-যুগের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত পাঁচ বছরকাল রবীন্দ্রনাথ নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব বহন করেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে এই সময় কাটেনি। রবীন্দ্রজীবনীকারের ভাষায়—'তাঁহার বিচিত্ররূপিণী জীবনদেবতা তাঁহাকে বিবিধ কর্মের মধ্যে ঘুরাইয়া মারিতেছে। তাঁহার সম্পাদকীয় সত্তা যথা নিয়মে বঙ্গদর্শনের নিত্য চাহিদা আদায় করিয়া লইতেছে, তাঁহার জমিদারী সত্তা তাঁহাকে উত্তরবঙ্গের জলেস্থলে অর্থের সন্ধানে ফিরাইতেছে, আর তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তা সংসারের জাল কাটিয়া বাহির হইবার জন্য বৃথায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।' কিন্তু মনে মনে যখন তিনি সংসারের জাল ছিন্ন করে মুক্তির আশায় আকুল, তখন সংসার তাঁকে নতুন জালে বদ্ধ করবার চক্রান্তে ব্যস্ত। কারণ, এই সময়ের মধ্যে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁর উপর নতুন দায়িত্ব বর্তে এবং এই সময়ের মধ্যে কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর অকালে পরলোকগমনে (৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯) সাংসারিক জীবনের বৃহত্তর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়।

বঙ্গভঙ্গের পুনর্মিলন সাধনের জন্য সমস্ত দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে আর সেই আন্দোলন দমনের জন্য বিদেশী রাজের প্রশাসন-যন্ত্র বেপরোয়া। এই অবস্থায় বরিশালে অনুষ্ঠের প্রাদেশিক সম্মিলনীর 'যজ্ঞভঙ্গের' পর রবীন্দ্রনাথ বরিশাল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। তখন 'একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া' বসবার ইচ্ছা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। এই ইচ্ছার তাগিদেই সম্ভবত তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকপদ ত্যাগ করলেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হলেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। সম্পাদকের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করলেও বঙ্গদর্শনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ছিন্ন হলো না। শৈলেশচন্দ্র 'নিবেদন'-এ স্পষ্টই ঘোষণা করলেন—'...আজও তাঁহারই নির্দেশে ও উপদেশে বঙ্গদর্শন প্রচারে ব্রতী রহিলাম।...তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে, প্রধানতঃ তাঁহারই সহায়তায় বঙ্গদর্শন পরিচালিত হইবে।' সুতরাং বঙ্গদর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পাদনাকালের পরবর্তীকালও গণনীয়।

এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে। চোখের বালি (বৈশাখ ১৩০৮—কার্তিক ১৩০৯) এবং নৌকাডুবি (বৈশাখ ১৩১০—আষাঢ় ১৩১২) উপন্যাসের কথা বাদ দিলে

প্রবন্ধ এবং স্বদেশী গানই বৈচিত্র্যে এবং বৈশিষ্ট্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী গানগুলি প্রকাশিত হয় স্বদেশী যুগে,—সকারীভাবে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করবার সমসাময়িককালে। 'আমার সোনার বাংলা...' এবং 'ও আমার দেশের মাটি...' এই প্রারম্ভিক পংক্তি বিশিষ্ট গান দুখানি প্রকাশিত ১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার বঙ্গদর্শনে। আর 'নিশিদিন ভরসা রাখিস...' 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি'... এবং 'আমি ভয় করবো না...', এই প্রারম্ভিক পংক্তিবিশিষ্ট তিনখানি গান কার্তিক সংখ্যার প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তখন 'ভাণ্ডার'-এরও সম্পাদক। সুতরাং এই সময় ভাণ্ডার পত্রিকাতেও তাঁর অনেকগুলি স্বদেশী গান প্রকাশিত হয়। অনুভূতির গভীরতায় এবং আবেদনের অন্তরঙ্গতায় মুখ্যত বাউল সুরে বাঁধা এই গানগুলির অধিকাংশ সমকালের দাবি পূরণ করেও চিরকালের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

১৩০৮ থেকে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ এবং কিছু কিছু বিচিত্র বিষয়ক গদ্য রচনা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে। প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই স্বাদেশিকতামূলক। বাকী গুলি শিক্ষা-সমস্যামূলক এবং সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি প্রবন্ধই লোকোত্তর প্রতিভার মনন-ঐশ্বর্যে এবং লেখন-মাধুর্যে উপভোগ্য। কিন্তু স্বল্প পরিসরে সমস্ত প্রবন্ধের আলোচনা কখনই সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-প্রতিভার চিন্তার ব্যাপ্তি উপলব্ধির জন্য এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সু-নির্বাচিত প্রবন্ধের উল্লেখ এবং কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্দেশই যথেষ্ট।

স্বাদেশিকতামূলক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো : 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (বৈশাখ ১৩০৮), 'নকলের নাকাল' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮), 'নেশন কি' (শ্রাবণ ১৩০৮), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (ভাদ্র ১৩০৯), 'মা ভৈঃ', 'অত্যুক্তি' এবং 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' (কার্তিক ১৩০৯), 'রাজকুটুম্ব' (বৈশাখ ১৩১০), 'বঙ্গবিভাগ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১১), 'স্বদেশী সমাজ' (ভাদ্র ১৩১১) 'সফলতার সদুপায়' (চৈত্র ১৩১১), 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (বৈশাখ ১৩১২), 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' আশ্বিন ১৩১২) 'বিজয়া সম্মিলন' এবং রাখী বন্ধনের উৎসব' (কার্তিক ১৩১২), 'দেশনায়ক' (আষাঢ় ১৩১৩), 'জাতীয় বিদ্যালয়' (ভাদ্র ১৩১৩), 'শক্তি' (মাঘ ১৩১৪), 'পথ ও পাথেয়' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫), 'সমস্যা' (আষাঢ় ১৩১৫) এবং 'দেশহিত' (আশ্বিন ১৩১৫)। প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতামুখী স্বদেশ চিন্তার ঐশ্বর্যে মহিমময়। শ্রেণীগত পরিচয় প্রবন্ধসমূহের মূল উপজীব্য হচ্ছে : যুগ-প্রবণতার বিচার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়; সমাজ-নির্ভর গঠনমূলক স্বাদেশিকতা; এবং বিদেশী রাজ্যের অবিচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।

শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো : 'শিক্ষা-সমস্যা' (আষাঢ় ১৩১৩), 'আবরণ' (ভাদ্র ১৩১৩) এবং 'তত্ত্বঃ কিম' (অগ্রহায়ণ ১৩১৩)। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পটভূমিকায় শিক্ষিত বাঙালীর মনে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন সাধনের জন্য যে প্রবল আগ্রহের উদ্রেক হয়, এই প্রবন্ধগুলি সেই সমকালীন মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। কিন্তু প্রবন্ধগুলি সমকালের প্রয়োজন পূরণ করে চিরকালের বাণী ধারণ করে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন শিক্ষা-চিন্তার পূর্ণ রূপ অনুধাবনের জন্য এই প্রবন্ধত্রয়ীর সঙ্গে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় 'ভাণ্ডার'-এ প্রকাশিত 'শিক্ষা-সংস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধটিও অবশ্য পঠনীয়।

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে বিধৃত দুটি বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'শকুন্তলা' যথাক্রমে বঙ্গদর্শনের ১৩০৮ বঙ্গাব্দের পৌষ এবং ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বে প্রকাশিত 'মেঘদূত' এবং 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র আলোচনাভঙ্গীর সঙ্গে এই দুটি প্রবন্ধের আলোচনাভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্ট। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'শকুন্তলা' বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচনা, শুধু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য অনুধ্যান নয়। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'সাহিত্য সমালোচনা' (আশ্বিন ১৩১০), 'সাহিত্যের সামগ্রী' (কার্তিক ১৩১০), সাহিত্যের তাৎপর্য' (অগ্রহায়ণ ১৩১০), 'বিশ্বসাহিত্য' (মাঘ ১৩১৩), 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' (বৈশাখ ১৩১৪), 'সাহিত্য সৃষ্টি' (আষাঢ় ১৩১৪), 'সাহিত্য সম্মিলন' (ফাল্গুন ১৩১৩)। প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ।

উপন্যাস, গান এবং প্রবন্ধ বাদে রবীন্দ্রনাথের কিছু সংখ্যক কবিতাও বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে। সেগুলির মধ্যে 'শিবাজী-উৎসব' ও 'শেষ খেয়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতা দুটি যথাক্রমে ১৩১১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন এবং ১৩১২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্যোগে শিবাজী-উৎসব প্রথম বাংলায় প্রবর্তিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে সখারাম 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী'-উৎসব' কবিতাটি ছিল তার ভূমিকাস্বরূপ। আর কবিচিত্তের এক অনন্য-উজ্জ্বল মুহূর্তের ভাব অনবদ্য বাঙ্ময়মূর্তি লাভ করেছে 'শেষ খেয়া' কবিতার মধ্যে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের জন্মলগ্ন আসন্ন। সারা দেশ কর্মোন্মাদনায় মুখর। 'একদিকে দেশের উচ্ছ্বাস আবেগ টানে কর্মের মধ্যে, অন্যদিকে অন্তরের শান্তময় বলে আশ্রমের শান্তিনীড়ের মধ্যে থাকিতে'। কবির এই মানসিক পরিবেশে কবিতাটি রচিত।

আদি পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে যেমন সাধারণতঃ লেখার সঙ্গে লেখকের নাম প্রকাশের রীতি ছিল না, নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে তা নয়। এখানে সাধারণতঃ লেখার সঙ্গে লেখকের নাম মুদ্রিত হতো। তবে সম্পাদকের অনেক রচনা নামবিহীন অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র ক যেমন একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছি রবীন্দ্রসম্পাদিত বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র ক তেমনি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই সময় পত্র-পত্রিকা সংখ্যায় অনেক হও কোনো পত্র-পত্রিকার পক্ষেই কোনো লেখক একান্তভাবে নিজের গোষ্ঠীর বলে ম করবার অসুবিধা ছিল। নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পাদক ব যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র [illegible] জগদানন্দ রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী [illegible] চন্দ্র মজুমদার, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ধন বিদ্যার্ণব, চন্দ্রশেখর মুখোপা[illegible] কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবে বীরেশ্বর গোস্বামী, সখারাম গণেশ দেউস্ক সতীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরে নাথ দত্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রিয়ম্ব দেবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, শিবনাথ শা প্রমুখ।

বঙ্গদর্শনের আদি সম্পাদকের বক্ত অনুসরণে বলা যায় যে এই নবপর্যায়ের ব দর্শনও 'কালস্রোতের নিয়মাধীন জলবুদ্বু স্বরূপ' ভেসে আবার 'নিয়মবলে বিল হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এর আয়ুষ্ক নিষ্ফল হয়নি। কারণ 'এ সংসারে জলবুদ্বুদ নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।' স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে, সমসাময়িককা এবং অব্যবহিত পরে নব পর্যায়ের বঙ্গদ দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে, স্বাদেশিকত প্রচারে এবং বিদেশীরাজের অত্যাচা উদ্যত অসির সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় কর্ত নির্ধারণে যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করে ছিল, তা বাঙালীর স্বদেশচর্চার ইতিহা একটি বিশিষ্ট অধ্যায়রূপে সংযোজিত হবা দাবি রাখে।

...মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি, আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে। দিনগুলো অবকাশে ভরা—সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙিন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী... মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা।...

রবীন্দ্রতীর্থ শিলাইদহ
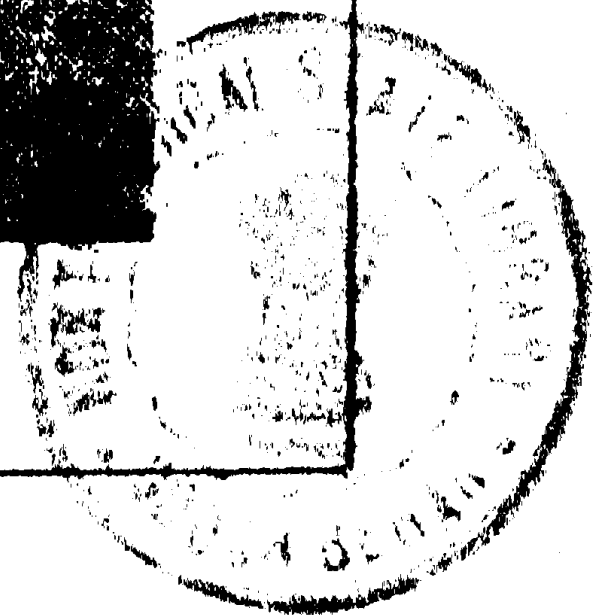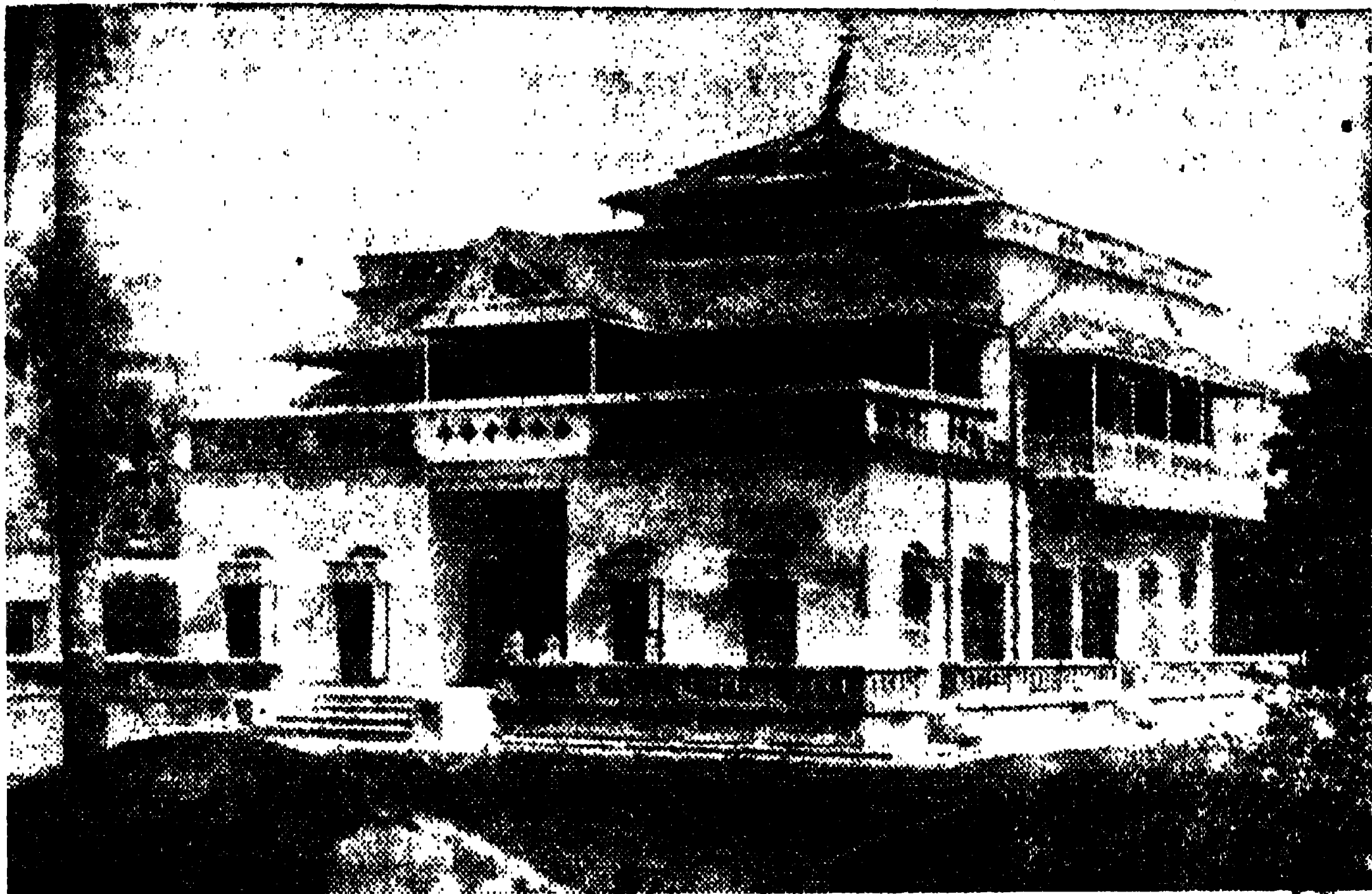
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির উৎস কবিতীর্থ শিলাইদহের কুঠিবাড়ী পাক জঙ্গীশাহীর বিগত ন' মাসের ধ্বংসযজ্ঞে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। তাই মুক্তির লগ্নে সবার আগে কয়েকজন সাংবাদিক স্বচক্ষে দেখার জন্য শিলাইদহের কুঠিবাড়ি ছুটেছিলাম। বাঙালী সংস্কৃতি ধ্বংসকারী অত্যাচারী জঙ্গীশাহীর করালগ্রাস স্পর্শ করতে পারেনি বিশ্বকবির জীবননাট্যশালার মধ্যমণি শিলাইদহের কুঠিবাড়ি। স্মৃতিবিজড়িত সাহিত্যতীর্থ আজও ঠিক আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে ঝাউ-মেহগিনী বীথির ছায়ায় শিলাইদহের শান্ত তরঙ্গভঙ্গ পদ্মার পাড়ে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যমন্ডিত কুষ্টিয়া জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালি থানায় শিলাইদহ অবস্থিত। শিলাইদহ প্রমত্তা পদ্মার দক্ষিণ তীরে, আবার এর প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে পদ্মাদুহিতা গড়াই নদী। কথিত আছে যে এক সময়ে শিলাইদহে কুঠির হাটের সামনেই পদ্মা ও গড়াই নদীর সঙ্গমস্থল ছিল। দর্শনা-গোয়ালন্দ রেলপথের কুষ্ঠিয়া বা কুমারখালি স্টেশনে নেমে শিলাইদহ যাওয়া যায়। কুমারখালি রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৫ মাইল কাঁচা রাস্তা গাড়ি দিয়ে কুঠিবাড়ি পেঁছান যায়। আবার কুষ্ঠিয়া অথবা কুষ্ঠিয়া কোর্ট স্টেশনে নেমে কুষ্টিয়া শহরের উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত গড়াই নদী নৌকায় পার হয়ে দীর্ঘ সাত মাইল কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করে ঐতিহাসিক কুঠিবাড়ি পেঁছান যায় এবং এই কাঁচা রাস্তাটির নাম রবীন্দ্র রোড। দীর্ঘদিন যাবৎ এই রাস্তাটি ভেঙেগ দশ-ধারটি গর্তকাটা অবস্থায় পড়ে আছে।

খোরশেদপুর গ্রামে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি অবস্থিত। প্রসিদ্ধ খোরশেদ ফকিরের হাতেই এই গ্রামের পত্তন হয়। এই ফকিরের দরগা ও মাজার এই গ্রামেই অবস্থিত। খোরশেদপুরের ফকিরের দরগার শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য একদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আকৃষ্ট করেছিল এবং ১৯০৭ সালে তিনি ফকিরের মাজার পাকা করে দিয়ে ফকিরের প্রতি তাঁর ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন বলে জানা যায়। বহুকাল ধরে খোরশেদ ফকিরের দরগায় অসংখ্য পুণ্যার্থী হিন্দু-মুসলমান উক্ত উরস পালন করত বলে শোনা গেছে। এই গ্রামে খোরশেদ ফকির সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একটি জনশ্রুতি এইরূপ ঃ তখন পদ্মানদী এই এলাকা দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এখানে খেয়া নৌকায় মানুষ পদ্মা পারাপার করতো। একদিন খোরশেদ ফকির নৌকায় খেয়া পার হচ্ছিলেন। মাঝ নদীতে মাঝি ফকিরের কাছে খেয়ার পয়সা চাইল। ফকির বললেন, 'আমার কাছে কোন পয়সা নেই, আমি ফকির, আল্লার আদেশে আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।' মাঝি ক্ষেপে উঠে বললো, 'পয়সা নেই তো নৌকায় উঠলে কেন? ফকির হও আর যাই হও, খেয়ার পয়সা তোমাকে দিতে হবে।' ফকির বললেন, [illegible] আমি নেমেই যাচ্ছি।' হঠাৎ প্রমত্তা নদীর মাঝে ভেসে উঠল বিরাট এক চর এবং হাসিমুখে খোরশেদ ফকির সেই চরে নেমে পড়লেন। এই চরই হল ফকিরের আস্তানা। মাঝি ফকিরের কাছে ক্ষমা চেয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো এবং ফকিরের এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বহু লোক এই ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই চরে বাস করতে আরম্ভ করলো। এইভাবে নয়া চরের নামকরণ হল খোরশেদপুর।

'শিলাইদহ' নামটি এই এলাকার অত্যাচারী নীলকর সাহেবের নামে সৃষ্টি। নীলকর সাহেবের নাম ছিল শেলী। শেলীর দহ থেকে শিলাইদহ নামের উৎপত্তি। এই দহের উপরেই নীলকর শেলী সাহেবের পুরনো কুঠি ছিল। একদিন পদ্মানদী গতি পরিবর্তন করে নীলকরদের পুরনো এই কুঠিকে গ্রাস করতে এগিয়ে এল। কুঠিটি নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই ভেঙে ফেলা হল। ভগ্ন নীল কুঠির মালমসলা দিয়ে তৈরী হয় শিলাইদহের বর্তমান কুঠিবাড়ি ও পদ্মার তীরের জমিদারী কাছারি বাড়ি।

শিলাইদহ বিরাহিমপুরের জমিদারীর অন্তর্গত। এই জমিদারী অত্যন্ত পুরনো। এই জমিদারীর মালিক ছিলেন যশোরের মোহাম্মদপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার সীতারাম রায়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নবাব মুরশীদকুলী খাঁ নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনকে এই জমিদারী দান করেন। নাটোরের রানী ভবানী খোরশেদপুরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ খৃঃ-এ রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নীলামে এই জমিদারী খরিদ করেন। ঠাকুর পরিবারের জমিদারী বাটোয়ারা হলে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে পড়ে শিলাইদহের জমিদারী। ১৯৩৭ সালে বন্ধকীসূত্রে ভাগ্যকুলের জমিদার শ্যামারঙ্গিনী রায়চৌধুরী শিলাইদহের জমিদারী হাইকোর্টের নীলামে খরিদ করেন। ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল আইনের বলে বিরাহিমপুরের জমিদারী তদানীন্তন সরকারের দখলে আসে। কিন্তু শিলাইদহের কুঠিবাড়ি ভাগ্যকুলের কুন্ডু জমিদারদের পারিবারিক বাসস্থানরূপে তাদের হাতেই থেকে যায়। ১৯৫৭ সালে জুলাই মাসে 'এনসিয়েন্ট মনুমেন্ট প্রিজারভেশন এ্যাক্ট' অনুযায়ী তদানীন্তন পাক সরকার এক ঘোষণায় শিলাইদহের কুঠিবাড়িকে প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত সংরক্ষিত সম্পত্তি বলে চিহ্নিত করা হয়।

কবিতীর্থ শিলাইদহের কুঠিবাড়ি প্রায় সাত বিঘা জমির উপর অবস্থিত। চৌহদ্দি ছোট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কুঠিবাড়ির দক্ষিণ দিকের লোহার গেট দিয়ে সুদৃশ্য ত্রিতল কুঠিবাড়িতে প্রবেশ করতে হয়। পূর্বদিকে বিরাট আমবাগান, পশ্চিমে সুন্দর ফুলবাগান, সান বাঁধান পুকুর ও বাঁধানো ঘাটের দুপাশে বকুল গাছ। সমুখে একদকালে সুন্দর ঝাউ ও মেহগনি বীথি ছিল। মেহগনি গাছ সব কেটে ফেলা হয়েছে। উত্তরেও সুন্দর আমকাঁঠালের বাগান। ত্রিতল ভবনটির দোতালার পূর্বদিকের বড় কামরায় কবির শোবার ঘর ছিল। ত্রিতলের ছোট ঘর থেকে পদ্মানদী দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলে নীলতর পাড়ের মত ঐ যে বাষ্পরেখাটির মত দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার পদ্মা।' তাছাড়া এখান হতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও পূর্ণিমা রাতের মনোমুগ্ধকর শোভা কবিচিত্তে সৌন্দর্যের প্লাবন আনতো। কুঠিবাড়িতে ১৫টি ঘর ছিল। দক্ষিণপূর্ব কোণের চাতালটির উপর এক সময়ে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক লরেন্স সাহেবের বাংলো ছিল বলে জানা গেছে। কবি যখন প্রথম শিলাইদহে আসেন তখন তাঁর পাঁচটি সন্তানই জীবিত ছিল। ত্রিশ বছরের কবি সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ এবং কন্যা বেলা, রেণুকা ও মীরাকে নিয়ে শিলাইদহে সুখের সংসার পাতেন। তারপর স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর দাম্পত্য জীবনের এক মধুময় অংশ কাটে শিলাইদহে। পিতৃ নির্দেশে ১৮৯১ খৃঃ হতে ১৯০১ খৃঃ পর্যন্ত জমিদারী পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ কবিতীর্থ কুঠিবাড়িতেই অবস্থান করেন। সেই সময় রাজশাহী জেলার পতিসর (কালীগ্রাম), পাবনা জেলার শাহজাদপুরে ও বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার বিরাহিমপুরে পরগণা এই তিন অংশে ঠাকুর পরিবারের উত্তরবঙ্গের জমিদারী বিভক্ত ছিল এবং বিরাহিমপুর পরগণার প্রাণকেন্দ্র ও সময় কাছারী শিলাইদহেই শুধু কবির বাসযোগ্য পাক কুঠিবাড়ি ছিল, সেজন্য কবি কুঠিবাড়িকেই তাঁর জমিদারীর প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। ১৯০২ খৃঃ নভেম্বর মাসে আকস্মিকভাবে পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে কবি-পত্নী মারা যাওয়ার পর কবির জীবনে দুর্ভাগ্যের পালা শুরু হয়। মায়ের মৃত্যুর ছয় মাস পরে কবির দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা দেবী মারা যান। স্ত্রী বিয়োগের পর হতে বলাকা কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসতেন। ১৯১৬ সালের পর সম্ভবতঃ তিনি আর শিলাইদহে আসেন নি। অবশ্য স্ত্রী বিয়োগের পর কবি প্রায়ই নদীবক্ষে বোটে থাকতেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বিশ্ববিখ্যাত বহু মনীষীর শুভাগমন ঘটেছিল। কবির সঙ্গে চার্লস এণ্ড্রুজ কিছুকাল শিলাইদহে বাস করেন। কবির বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু সপ্তাহন্তে শিলাইদহে এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। লোকেন পালিত, ভগিনী নিবেদিতা, কর্ণেল মহিম ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরাও কুঠিবাড়ি মুখরিত করে রাখতেন।

শিলাইদহের স্নিগ্ধ-শ্যামল প্রকৃতি ও পল্লীর অকৃত্রিম জীবনযাত্রা মানবে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে, কবি করে ছেড়েছে। এখানকার মনোরম, মনোমুগ্ধকর গ্রাম্য আবেষ্টনীর ভিতর জমিদার রবীন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত কবিসত্তা ভাবে ও অনু-

ভূতিতে অহরহ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তাই শিলাইদহে আগমনের পরবর্তীকালে রচিত কাব্যগ্রন্থ 'সোনার তরী'র কবিতাগুলিতে সেই ভাবানুভূতির বিচিত্র রূপে নবনব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'সোনার তরী', কাব্যগ্রন্থ, 'বিদায় অভিশাপ', কাব্যনাটিকা, 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ, 'চিরকুমার সভা', অচলায়তন, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা নাটক, 'গোরা' উপন্যাস, 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' নামক দার্শনিক রচনাটি, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের কিছু গান, ছিন্নপত্রের কতকগুলি চিঠি এবং চিত্রা, কল্পনা ও বলাকার কিছু কবিতা শিলাইদহে বসে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। জমিদাররূপে শিলাইদহে বসবাসের সময় পল্লীর নর-নারীর ঘরকন্নার খুঁটিনাটি, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমানের সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। এবং এর থেকেই বিষয়বস্তু আহরণ করে তিনি এই সময় শুরু করলেন ছোটগল্প লেখা। এখানে বসেই তিনি লিখেছেন 'পোস্টমাস্টার', 'বোস্টমী', 'জীবিত ও মৃত' গল্প। একবার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্বকবির কাছে কিছুদিন শিলাইদহে ছিলেন এবং সেই সময় কবিকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি করে নতুন গল্প তাঁকে শোনাতে হত। এইভাবে 'সদর ও অন্দর', 'উদ্ধার', 'দুর্বুদ্ধি', 'ফেল', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'উলুখড়ের বিপদ', গল্পগুলি কবি রচনা করেছিলেন। শিলাইদহে পোস্ট আফিসের পিয়ন গগনচন্দ্র দাসের বাঁধা গান 'আমার মনের মানুষ যেরে আমি কোথায় পাব তারে' এখানে শুনেই একই সুরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'—যা এখন আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে।

শিলাইদহে নাকি বাউল কবিসম্রাট লালনসাহের সংগে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৮৯১ সালের অনেক আগে এবং সেই সময় কবি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সংগে শিলাইদহের নীচে পদ্মায় নদীর উপর বোটে বাস করতেন। অবশ্য এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন।

শিলাইদহে একবার শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। হঠাৎ শান্তিনিকেতন আশ্রমে একবার বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল এবং এই সময় তরুণ কবি সতীশ রায় মারা যান। তখন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকেই ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং এই স্থানান্তর সাময়িকভাবে করা হয়েছিল।

কুঠিবাড়ি ছাড়া শিলাইদহে প্রায় ৫০০ গজ দূরে পদ্মানদীর নিকটবর্তী উত্তরদিকে কবিগুরুর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও শিলাইদহ সদর কাছাড়ীবাড়ি অবস্থিত। দুটি ভবনই পাকা দোতলা। মহর্ষির নামযুক্ত

সব আমার প্রনতি
গ্রহন করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত
দিনাবসানের বেদীতলে।

দাতব্য চিকিৎসালয়টি পরিচালনের দায়িত্ব শিলাইদহ ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর থাকলেও এর অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সাইনবোর্ড ছাড়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের কোন কাজ চলে বলে মনে হয় না। কাছারী-বাড়ির বিভিন্ন ঘরের কাগজপত্র অনুসন্ধান করে কবির হস্তাক্ষর কোথাও মেলেনি। কাছারী ভবনটি যে-কোন সময় ধ্বসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুঠিবাড়িতে কবির স্মৃতিচিহ্ন বলতে একখানা পা-ভাঙ্গা লম্বা বেতের ইজি-চেয়ার, দুটি ভাঙ্গা পালকী ও সম্প্রতি কাছারী ভবন প্রাঙ্গণ হতে আনা একটা মোটরবিহীন মোটর বোটের কাঠামো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। সংরক্ষিত সম্পত্তি বলে ঘোষণা করার প্রায় এক দশক পরে তদানীন্তন পাক-সরকার কুঠিবাড়িতে একটি লাইব্রেরী খুলে কিছু রবীন্দ্রনাথের উপর পুস্তক সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন বলে শুনা যায়। এই লাইব্রেরীতে সর্বসাকুল্যে ৫০০-এর বেশী বই ছিল না, তন্মধ্যে রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬ খণ্ড ভারত সরকারের দান বলে জানা যায়। এর বহুসংখ্যক বই আবার অজ্ঞাত কারণে নাকি অন্যত্র পাঠানো হয়। কাজেই পূর্বতন পাক-সরকারের এ কাজকে চেষ্টার প্রহসন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এখন অবশ্য সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা আরও অনেক কমেছে। কিছু নতুন আসবাবপত্র আমদানী এবং কয়েকজন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। এইসব কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেছে যে, কবিগুরু সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। এখানে কবিগুরুর কোন একটি ভাল তৈলচিত্র রাখা হয় নি। কুঠিবাড়িতে কোন দিন ২৫শে বৈশাখ বা ২২শে শ্রাবণের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। পূর্বের রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাবই এর জন্য দায়ী। দেশ বিভাগের পর বিগত ২৪ বছরের মধ্যে শিলাইদহে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করা হয় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত জেলার সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিবসে। কুঠিবাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণের চাতালের উপর সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে। কুষ্টিয়া জেলা বোর্ডের তদানীন্তন ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব নূরউদ্দিন আহমদ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বেতারে প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ হোসেন, বাণী মিত্র, অঞ্জলি রায় ও সমর রায় এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সেদিন এত জনসমাগম হয়েছিল যে, কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণে আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। কর্তৃপক্ষের সমস্ত ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে জেলা উদযাপন কমিটির সম্পাদক হিসেবে এই প্রতিনিধিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক কুঠি-বাড়ির প্রাঙ্গণে শেষ করতে সেদিন ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল। সম্ভবতঃ ১৯৬৬।৬৭ সালে ২২শে শ্রাবণ ঢাকার ছায়ানটের উদ্যোগে কুঠিবাড়িতে আর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং অনুষ্ঠানের পর ঢাকার বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও ছায়ানটের কর্মকর্তারা কুষ্টিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে নাকি সৌজন্যমূলক আচরণ পান নি। তারপর শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে আর কোন দিন রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন হয়নি।

তারপর স্থানীয় রবীন্দ্র-ভক্তদের চাপে জেলা কর্তৃপক্ষ ১৯৬৭ সালে পর্যটক উপদেষ্টা বোর্ডের কাছে ৬ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দাখিল করেছিল। সব সময়ে চলাচলের উপযোগী করে রবীন্দ্র রোডকে নির্মাণ করা এবং বহিরাগতদের জন্য শিলাইদহে একটি রেস্ট হাউস নির্মাণ ও পর্যটকদের বর্ষার সময় কুঠিবাড়ি যাওয়ার জন্য একটি স্পিডবোট ক্রয়ের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তদানীন্তন বোর্ড এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে কুষ্টিয়া স্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একালে কবিগুরুর কুষ্টিয়া শহরের বাসস্থান 'টেগোর লজ' ভবনটি সংরক্ষিত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতেও ব্যর্থ হয়েছে তদানীন্তন পূর্ব-পাক সরকার।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নানা গল্প, কবিতা ও গানের অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ এবং এই স্মৃতিকে পুনরুদ্ধার করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংকল্পবদ্ধ। কুষ্টিয়া জেলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের রবীন্দ্র-ভক্ত জনসাধারণ আশা করেন বিশ্ব-কবির পদরেণুতে ধন্য শিলাইদহ আবার হয়ে উঠবে শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোর মত পুণ্য কবিতীর্থ এবং এখানে আবার আনন্দঘন পরিবেশে কবি-সাহিত্যিকের কলকাকলীমুখর হয়ে উঠবে।

(দৈনিক বাংলা, ঢাকা : বৃহস্পতিবার : ২৩ চৈত্র, ১৪৭৮, নিজস্ব সংবাদদাতার —রচনাটির পুনর্মুদ্রণ)

...এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা—এখানে আমার উপরে, আমার সময়ের উপরে, আর কারও কোনো অধিকার নেই।...যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশী পাড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।...

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি

পুরানো শিলাইদহে সবই তেমনি আছে—বাড়ির দক্ষিণ দিকে সিসুবীথিকায় অবিশ্রাম মর্মর ধ্বনি চলছে, পূব দিকের আমবাগানে দুই কোকিলে সমস্ত দিন কুহু-ধ্বনির কবির লড়াই চলেইচে, চষা মাঠের মাঝে মাঝে গ্রামগুলি অবগুণ্ঠিতা গ্রাম-বধূর মত বেণুবনের ছায়ায় ঢাকা দাঁড়িয়ে আছে, পুকুরপাড়ে দুটো-একটা গোরু আলস্যমন্থরভাবে চরে বেড়াচ্ছে, বাগানের পাঁচিলের ধারে নারকেল আর সুপারি গাছ ঠিক যেন শিশুর মতো আকাশের দিকে কেবলি হাত নাড়চে,—আকাশের নীল স্তব্ধ আর পৃথিবীর সবুজ চঞ্চল, এই উভয়ের মধ্যে দিনরাত কেবলি রঙের ইসারা চলচে, দিনগুলো খেলার নৌকার মত কেবলমাত্র পাখীর গান, কনক চাঁপার গন্ধ বেণুবনের মর্মর আর আলোছায়ার ঝিকিমিকি বোঝাই হয়ে আকাশের পূব ঘাট থেকে পশ্চিম ঘাটে পারাপার করচে—সবই তেমনি আছে কেবল আমার চির-পরিচিত পদ্মা শিলাইদা ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেছে তার আর নাগালে পাবার জো নেই। আমার পক্ষে এই বিচ্ছেদটি সামান্য নয়—যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই—সোনার নূপুরগুলি রয়েচে পড়ে, মুরজমুরলী মৃদঙ্গ কিছুরই অভাব নেই, কেবল যে পা দুখানি নিরন্তর নৃত্য করে বেড়াত তারাই গেছে কোথায় চলে। যেখান থেকে কিছু দিনের জন্যেও চলে যাই ঠিক সেখানটিকে কিছুতেই আর পৌঁছতে পারিনে—রেলের স্টেশন ঠিক আছে, রেল-গাড়িও চলচে কিন্তু আসল জায়গাটি লুকিয়ে কোথায় যে সরে যায় তার ঠিকানা পাবার জো থাকে না।'

(অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে)

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কত-বার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে।...মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।

....

বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে কোনো দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল, তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দর মহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানা-শোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদবোধন এসে-ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোট গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম, যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।

সোনার তরী : রচনাবলী সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ)

শেরে-বাংলা ফজলুল হক রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রটিতে তাঁদের গভীর আলোচনামগ্ন দেখা যাচ্ছে।

পুরনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউ গাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবের দরবার একেবারে থম থম করছে। কোথায় নীল-কুঠির যমের দূত সেই দেওয়ান, কোথায় লাঠি-কাঁধে কোমর-বাঁধা পেয়াদার দল, কোথায় লম্বা-টেবিল-পাতা খানার ঘর যেখানে ঘোড়ার চ'ড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত—ভোজের সঙ্গে চলত জুড়ি-নৃত্যের ঘূর্ণিপাক, রক্তে ফুটতে থাকত শ্যাম্পেনের নেশা, হতভাগা রায়তদের দোহাই-পাড়া কান্না উপরওয়ালা-দের কানে পেঁছিত না, সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লম্বা হয়ে চলত। সেদিনকার আর যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউ-গাছগুলি দোলাদুলি করে বাতাসে, আর সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাতনিরা কখনো কখনো দুপুরে রাত্রে দেখতে পায় সাহেবদের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির জোড়া বাগানে।

একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তাই থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল—ঝরেও গেছে।

(ছেলেবেলা ।। রবীন্দ্রনাথ)

যত দিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে—তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে—মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠে-ছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করতুম কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবন সঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

(পল্লীপ্রকৃতি ।। রবীন্দ্রনাথ)

আমার গত জীবনের আনন্দ উৎসাহ সাহিত্য, সবই পল্লী-জীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনের অনেক দিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মা নদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব-অভিযোগ এবং কত বড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায়ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ-দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি একথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে কবিতায় পেয়ে থাকবেন।

(পল্লীপ্রকৃতি ।। রবীন্দ্রনাথ)

অনেক বছর পরে আমি আবার আমার প্রজাদের মধ্যে এসে পড়েছি। আমার আসাটা যে একান্ত দরকার ছিল, তা আমিও বুঝতে পারছি, ওরাও বুঝতে পেরেছে। এদের মধ্যে আমি যখন প্রথম জীবনে এসেছিলুম সে ছিল আমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। সেই সময়ে প্রথম আমি জীবনের বাস্তব সংস্পর্শে এলুম। এসব সরল গ্রামবাসীদের মধ্যেই আমি মানুষের নিকট-স্পর্শ অনু-ভব করি। এদের কাছে এলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না, তাই মানুষ যে মানুষের কত আপ-নার, তা বুঝতে পারি। যে মাটির উপর সর্বদা চলাফেরা করি, তার কথাও তো আমরা মনে রাখিনে, ঠিক সে-ভাবে এদের আমরা অনেক সময় ভুলেই থাকি।

কিন্তু এই মানুষগুলিই তো জগতের বড়ো অংশ জুড়ে আছে, এরাই তো সব সভ্যতাকে ধারণ করে রয়েছে। এরা নিজেরা কোনো মতে বেঁচে থেকেই খুশি। এরা এ রকম স্বল্পে সন্তুষ্ট বলেই অন্যরা প্রমাণ করতে পারে যে, কোনো মতে বেঁচে থাকার চেয়ে মানুষের জীবন অনেকখানি বড়ো। নীচের স্তরের লোক এরা, এবং সংখ্যায় এরা অগণ্য। এরা জীবনের মান নীচু করে ধরে রেখেছে বলেই উপরতলার অল্পসংখ্যক লোকের জীবনের অগ্রগতি অবাধে চলেছে।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী থেকে)

এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শত-সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ

"হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।।"

অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন—আর এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ, এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ পাঠশালা!

পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখি নে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব সহকারে গাছপালা গ্রাম-নগরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে—এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো, বাট আই গো-অন ফর এভার—কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে—তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে, আর এক প্রান্ত মরণসাগরে; দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি; কোনোকালে এর আর শেষ নেই। ওই শোনো মাঠে চাষা গান গাচ্ছে, জেলেডিঙ্গি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে, ঘাটে কেউ স্নান করছে, কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে—এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে, গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায়, শতশত বৎসর গুনগুন শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে—এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে : আই গো-অন ফর এভার।

এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত-শূন্য পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না— সে যেন আরও লক্ষ যোজন দূরে। রাঙিন সকাল এবং রাঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্নকণ্ঠহার থেকে এক-একটি মাণিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না!

দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বালির চর ধূ-ধূ করছে—তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা, সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের চিরাভ্যস্ত; তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করিনে—কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সবচেয়ে বেশি শূন্য বলে মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই—কেবল একটা উদাস কঠিন নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে; ওপারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্নে নদীর ধারের হাটে কলধ্বনি; দূরে পাবনার পারে তরু-শ্রেণীর ঘননীল রেখা— কোথাও গাঢ় নীল কোথাও পাণ্ডু নীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটির ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মতো ফ্যাকাসে সাদা। সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই কেবল আমি একলা।

(ছিন্নপত্র থেকে)

যা হয়েছিল

বনফুল

'মিসেস মিত্র আজও কিন্তু আপনার লেট হয়েছে। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে—' মিসেস মিত্র অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন একটু। তার পর তাঁর সুমিষ্ট হাসিটি হেসে বললেন—'আমি এর জন্যে খুবই দুঃখিত মিস্টার লাহিড়ী। কিন্তু আমার শাশুড়ির অসুখ হয়েছে ক'দিন থেকে। ডাক্তারবাবু দেরি করে আসেন। তাই আমার দেরি হয়ে যায়—'

মিস্টার লাহিড়ী আই, এ, এস কড়া অফিসার। মুখটা ঈষৎ সুচলো করে বললেন—'ও তাই বুঝি। শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু তবু আমাকে বলতে হচ্ছে, এ রকম দেরি করা তো চলবে না। ঠিক সময়ে আপিসে না এলে আপিসের কাজ চলবে কি করে'। অনেক ফাইল জমে গেল—'

'বাকি কাজগুলো শেষ করে দেব আজ।'

'বেশ। বাই দি বাই, আপনাকে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে হয় কেন? বাড়িতে আর কেউ নেই?'

'না। আমার স্বামী তো শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে গেছেন। বাড়িতে আমি আর একটি ঝি আছে। মায়ের টাইফয়েড হয়েছে ডাক্তারবাবু বলছেন।'

'এ অবস্থায় আপনাদের তো একজন নার্স বাহাল করা উচিত।'

নার্স বাহাল করবার ক্ষমতা আমাদের নেই স্যার। রোজ পঁচিশ টাকা করে লাগবে। এমনিতেই তো ডাক্তারবাবুর ফি আর ওষুধ,বিষুধে রোজ পনেরো টাকা করে খরচ হচ্ছে—'

'হাসপাতালে ভরতি করে দিন তাহলে।'

'হাসপাতালে জায়গা পাওয়া শক্ত। তাছাড়া মা হাসপাতালে যেতেও চান না।'

'আই সি। আচ্ছা যান, এরিয়র ফাইল-গুলো ক্লিয়ার করে ফেলুন।'

মিসেস মিত্র নিজের টেবিলে গিয়ে বসতেই মনোরঞ্জন এসে হাজির হলেন। মনোরঞ্জন মিসেস মিত্রের সহপাঠী ছিলেন। এক সঙ্গেই এম, এ পাশ করেছেন দুজনে। আর একটা কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনোরঞ্জন মিসেস মিত্রের প্রণয়ীও। ছাত্রজীবন থেকেই এই রোমান্সের জ্বরে তিনি ভুগছেন। এখনও আরোগ্য হন নি। সুদর্শন বলিষ্ঠ মনোরঞ্জনের চাকরি করার প্রয়োজন ছিল না। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র তিনি। কিন্তু তিনি যে-ই শুনলেন মিসেস মিত্র এই আপিসে চাকরি নিয়েছেন অমনি তিনিও জোগাড়-যন্ত্র করে ঢুকে পড়েছেন আপিসে। সামান্য বেতনে, সামান্য কেরাণীর কাজ করেন. একশ টাকা মাইনের একটা কেরাণীর পদে একজন ফার্স্ট ক্লাস ইংলিশের এম, এ-কে পাবেন এ আশা কর্তৃপক্ষও করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে বাহাল করেছিলেন।

মনোরঞ্জন বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন ছাত্রজীবনেই। মনোরঞ্জন সব শর্তই পূরণ করেছিলেন, একটি কেবল পারেন নি। বেনের ছেলে কায়স্থ হতে পারেন নি।

গোঁড়া পরিবারের মেয়ে মিসেস সুশীলা মিত্র। সত্যিই সুশীলা। তিনি বাবা মায়ের অবাধ্য হতে চান নি। বাবা মায়ের নির্দেশ মেনে নিয়েই মিস ঘোষ মিসেস মিত্র হয়ে-ছিলেন। বেশী দিন আগে নয়, মাত্র ছ' মাস

আগে। বিয়ে করবার আগেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন তিনি। বিয়ে করার পরও চাকরি করছেন। স্বামী বলদেব মিত্র বলেছিলেন চাকরি ছেড়ে দিতে। চাকরি ছাড়েন নি সুশীলা মিত্র। তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর স্বামীর রোজকারে সংসার চালানো যাবে না। আড়াইশ টাকায় এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব। চাকরি ছাড়েন নি তিনি। বলদেব কিন্তু খুঁত খুঁত করছিলেন। এর মধ্যে হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন তিনি। সুশীলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেন না বলে আরও বিরক্ত হলেন মনে মনে। মা বললেন, আমি তোমার কাছেই থাকব। নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না। কিন্তু কদিন থেকে জ্বরে পড়েছেন তিনি। সুশীলার মনে হচ্ছে বটে যে এখন আপিসে না গিয়ে তাঁর কাছে থাকাই উচিত কিন্তু, আপিসের ছুটি নেই। দেরি হলেও 'বস্' বকছেন।

কিন্তু সুশীলা সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছেন মনোরঞ্জনকে নিয়ে। মনোরঞ্জন যদি খারাপ লোক হত তাহলে অনায়াসে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সুশীলা জানেন মনোরঞ্জন সাত রাজার ধন মাণিক। যদিও তিনি মাণিকটাকে আঁচলে বাঁধতে পারেন নি, কিন্তু মাণিকটা সঙ্গ ছাড়ে নি তাঁর। বারবার বলছে তুমি আমাকে আঁচলে বাঁধ আর নাই বাঁধ আমি তোমার সঙ্গে চিরকাল থাকব। ঠিক এই ভাষায় বলে নি, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে তাই মনে হয়।

সেদিন মনোরঞ্জন বললেন—'আমরা দুজনে মিলে আজ এরিয়ার ফাইলগুলো ঠিক করে ফেলব। আজই হয়ে যাবে সব। ও জন্যে চিন্তা নেই। আমি বলছি কি তুমি তোমার শাশুড়ির দেখাশোনা করবার জন্যে একটা ভালো নার্স বাহাল করে ফেলো। টাকার জন্যে ভেবো না।'

'ভাবতেই হবে। টাকা নেই বলেই নার্স রাখতে পারি নি'

'টাকা আমি দেব—'

'তোমার টাকা আমি নেব কেন'

'বিয়ে হলে তো নিতে। বিয়ে হয় নি বলেই কি আমি তোমার পর হয়ে গেলাম? বিশ্বাস করতে পারছ না যে আমি তোমার সত্যিই আত্মীয়?'

সুশীলা লজ্জিত হলেন একটু। ঘাড় হেঁট করে লজ্জাটা গোপন করবার চেষ্টা করলেন।

তারপর বললেন—'এর একটা অন্যদিকও আছে। তোমার টাকা যদি নিই তাহলে উনি কি মনে করবেন'

'এতে মনে করবার কি আছে? বন্ধুর বিপদে বন্ধু সাহায্য করে না?'

সুশীলা তার সুমিষ্ট হাসিটি হেসে বললে, 'বন্ধুটি যদি তোমার মতো রূপবান একটি যুবক হন তাহলে লোকে অন্যরকম অর্থ করবে বই কি'

মনোরঞ্জনের মধ্যে একটি অত্যন্ত জিদি গোঁয়ার লোক প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকত। এই ব্যক্তিটিই অতীতে তাকে অনেক রকম দুঃসাধ্য কাজ করিয়েছে। তিনি পদ্মা নদী সাঁতরে পেরিয়েছেন, ভরপেট খাওয়ার পরে এক পরাত পায়েস খেয়েছেন। সেই ব্যক্তিটি সহসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

তিনি বললেন—'আমি তোমাকে সাহায্য করবই'

'পারবে না। আমি কিছুতেই নেব না তোমার টাকা'

'নিতেই হবে'

সেদিন আপিস থেকে ফিরতে একটু রাত হল। ফিরে যা দেখলেন, তাতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তে হল তাঁকে।

মা জ্বরের ঘোরে বিছানা থেকে পড়ে গেছেন। অজ্ঞান হয়ে আছেন তারপর থেকে। পাড়ার ডাক্তারবাবু এসে বললেন 'কংকাশন হয়েছে'।

মারা গেলেন তিনি পরদিন।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর বলদেব সুশীলাকে বললেন—'আমার মা যখন অসুখে ছটফট করছিলেন তখন তুমি আপিসে কলম পিষছিলে। যাক—যা হবার তাতো হয়ে গেছে। এইবার তোমাকে একটি সাফ কথা আমি বলে দিতে চাই, হয় তুমি চাকরি ছাড়, না হয় আমাকে ছাড়। দু নৌকায় পা দিয়ে চলা যায় না।—'

এরপর কি হয়েছিল?

এর পর হতে পারত

(১) সুশীলা বললেন—আমি চাকরি ছাড়ব না, তোমাকেই ছেড়ে যাচ্ছি—

(২) সুশীলা চাকরি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অতি কষ্টে সংসার চলতে লাগল তাঁদের। এমন সময় অত্যন্ত নাটকীয় ঘটনা ঘটল একটা। রেজেস্ট্রি ডাকে একটি চিঠি এল। সুশীলা খুলে দেখলেন—একটা উইল। মনোরঞ্জন তাঁর আড়াই লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি সুশীলাকে দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সুশীলা কিন্তু নিলেন না তাঁর টাকা। সে টাকা দিয়ে করে দিলেন মনোরঞ্জন বিদ্যালয়

(৩) সুশীলা চাকরি ছাড়লেন না। কিছুদিন পরে তাঁর স্বামী বলদেবের মনে হল ভাগ্যে ছাড়েনি। কারণ রাস্তায় 'বাস' অ্যাকসিডেন্টে তার দুটো হাতই জখম হয়ে গেল। দুটো হাতই কেটে ফেলে দিলেন ডাক্তাররা।

এসব কিন্তু কিছুই হয় নি।

যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। চাকরি করা নিয়ে সুশীলা আর বলদেবের প্রায়ই তুমুল তর্ক হত। সুশীলা কিন্তু চাকরি ছাড়েন নি তৎসত্ত্বেও। স্বামীকেও ছাড়েন নি। মনোরঞ্জন ছাড়েন নি সুশীলাকে। প্লেটোনিক প্রণয়ের উদাহরণ হয়ে ঘুর ঘুর করতেন তিনি সুশীলার চারপাশে। এই বেতালা ত্রিপদী কবিতাই মূর্ত হচ্ছিল তাঁদের ঘিরে। নাটকীয় কিছু হয় নি।

আঁধারের শিশির

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শেষকালে একটা কুকুরছানা পালতে বসল।

'এটাকে আবার কোত্থেকে জোটালে?' কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে মুখিয়ে উঠল মধুশ্রী।

'আমি শয্যাশায়ী রুগী, আমি কোত্থেকে জোটাব? ও আপনা থেকেই এসেছে।'

'এসেছে তো তাড়িয়ে দাও। যেখান থেকে এসেছে সেখানে চলে যাক।'

'চলে যাক? তোর শরীরে কি একটুও দয়া-মায়া নেই? তাড়িয়ে দিলে যদি রাস্তায় ও গাড়িচাপা পড়ে?'

'আসতে যখন পড়ে নি তখন যেতেও পড়বে না।' মধুশ্রী তেমনি নির্মম মুখে বললে, 'আর পড়লে পড়বে। যার কুকুর সে দেখে না কেন?'

'কিন্তু তুই বল, দেখতে খুব সুন্দর না বাচ্চাটা।' কুকুরের গায়ে সস্নেহে হাত বুলোল প্রতিভা: 'বিলিতি—তাই না?'

'তাই বলে তুমি ওকে কোলের উপর টেনে নেবে? দাও নামিয়ে দাও।'

মেয়ের কথা গ্রাহ্য করল না প্রতিভা। স্নেহবিহ্বল স্বরে বললে, 'আদর করতে বেশ লাগছে। কত দিন কাউকে আদর করি না। তুই ওর জন্যে দুধ আর বিস্কুট নিয়ে আয়।'

'আর মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই।' মধুশ্রী তেমনি বিমুখ রইল: 'যার কুকুর সে খোঁজ পেয়ে এখুনি ছুটে আসবে।'

'আসুক, প্রমাণ দেখিয়ে নিয়ে যাক। যতক্ষণ না আসে—'

'ওটাকে নিতে আবার প্রমাণ দেখাতে হবে নাকি?'

'বা, প্রমাণ দেখাতে হবে না? মুখে আমি বললেই ছেড়ে দেব?' কুকুরছানাটাকে যেন আরো বেশী আঁকড়াল প্রতিভা। মিনতি করে বললে, 'দুখানা বিস্কুট আর আধ-পেয়ালা দুধ নিয়ে আয় না। অবোলা জীব।'

আমি পারব না। ঝিকে বলো। মধুশ্রীর ইচ্ছে হল মুখঝামটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু কবে সে মায়ের কথায় অবাধ্যতা করেছে?

'কই গো প্রতিভা-দি কেমন আছ?' পাশের বাড়ির গৃহিণী পদ্মরাণী পাশে-রাখা চেয়ারে না বসে একেবারে প্রতিভার বিছানায় এসে বসল।

'অপারেশানের পর যন্ত্রণাটা নেই, কিন্তু কদিন ধরে জ্বর হচ্ছে।'

'ও কিছু নয়। ও সেরে যাবে।' পদ্মরাণী প্রতিভার একখানা হাত নিজের হাতের উপর টেনে আনতে গেল। গিয়েই চমকে উঠল: 'ও কি, ওটাকে পেলে কোথায়?'

'ভগবান পাইয়ে দিয়েছেন।'

'তাই বলে পাশে নিয়ে শুয়েছ?'

'বড্ড আদর খেতে ভালবাসে।' ঘাড় কাত করে প্রতিভা বাচ্চা কুকুরটাকে নিজের কাছে আরো একটু জড় করে আনল।

হেসে উঠল পদ্মরাণী। বললে, 'কোথায় মেয়ের বিয়ে দিয়ে নাতি-নাতনির আদর কাড়বে, তা নয় কিনা—'

'মেয়ের আর বিয়ে দিতে পারলাম কই!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রতিভা।

'কী যে বলো, এমন তোমার গুণের মেয়ে—কলেজে পড়ায়—'

মধুশ্রী ঘরে নেই—দেখে নিল প্রতিভা। বললে, 'গুণ থাকলে কী হবে, রূপ নেই। মেয়ে আমার কালো। কোন পাত্রই পছন্দ করল না।'

মানুষের কাছে খুব সহজে যা আসে, খুব দ্রুত যা আসে, তার নাম দুঃখ। সেই দুঃখই পাশের ঘরে মধুশ্রীর কাছে হাওয়ায় ভেসে এল। সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল বিষাদ হয়ে।

কেউই পছন্দ করল না! কেন, সৌগত? মা তাকে ভুলাল কী করে?

'আমাকে তুমি কি বলে ভালবাসলে?' সৌগতের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল মধুশ্রী: 'আমার রূপ নেই।'

'রূপ কোথায়?' সৌগত বলেছিল: 'রূপ বস্তুতে নয়, যে দেখে তার চোখে। আমার চোখ যখন তোমাকে রূপসী বলে জেনেছে তোমার আর ত্রাণ নেই।'

'তুমি তো সৈনিক, তুমি এত কবিত্ব শিখলে কোথায়?'

'বা, সৈনিক বুঝি কবি হতে পারে না? কত সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে বসে কবিতা লিখেছে।' তপ্ত হয়ে উঠল সৌগত: 'আর এ তো কবিত্বের কথা নয়, এ অস্তিত্বের কথা।'

সান্নিধ্য আরো একটু নিবিড় হয়ে ওঠবার আগেই পাশের ঘর থেকে প্রতিভা চেঁচিয়ে উঠল: 'কোথায় গেলি তুই? আমাকে ওষুধ দিবিনে?'

মধুশ্রী দ্রুত শিথিল হতে চাইল। মুখে মধু ঝরিয়ে বললে, 'যাই মাকে ওষুধ খাইয়ে আসি।'

সৌগত পকেট থেকে রুমাল বের করে মধুশ্রীর মুখের ঘাম মুছে নিল। বললে, 'তুমি যখন কাছে থাক তখন যেমন একটা অলৌকিক গন্ধে ভরে থাকি তেমনি যখন দূরে সরে যাও, কি আশ্চর্য তখনো সেই গন্ধই নিশ্বাসে লেগে থাকে। একটুও নষ্ট হয় না।'

মাকে ওষুধ খাইয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল মধুশ্রী। দেখল সৌগত চলে গেছে। মধুশ্রী খোলা দরজার উপর দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাল—কেউ কোথাও নেই। মনে-মনে বললে, তুমি যখন চলে যাও তখন লৌকিক-অলৌকিক কোন গন্ধই আমি টের পাই না, শুধু বুকের মধ্যে একটা শূন্যতার হাহাকার শুনি।

কিন্তু, ওষুধের নাম শুনে কি দ্রুতই চলে গেল সৌগত!

কোন পাত্রই পছন্দ করল না! মধুশ্রীর ইচ্ছে হল মায়ের চোখের উপর চোখ ফেলে নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এত যে মিথ্যে কথা বলে তার অসুখ সহজে ভাল হয় কি করে?

মায়ের তো সুবিধে। একটু পর-পরই বাস্তব-চোখ বন্ধ করবে। বলবে, বড্ড যন্ত্রণা।

সন্দেহ কি, যন্ত্রণা তো আরো বাস্তব।

মায়ের জন্যে তাই আবার মায়া হয় মধুশ্রীর। আহা বেচারী! কি করবে, কোথায় যাবে? এই মেয়ে ছাড়া তার যে আর কেউ নেই। আশ্চর্য, মৃত্যুও নেই।

এত যন্ত্রণায়ও প্রতিভা যে মরতে চায় না। ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা করে মরবার জন্যে করে না, ভাল হবার জন্যে করে। দয়া করে আমাকে তুলে নাও, একথা বলে না, বলে, কৃপা করে আমাকে ভাল করে দাও। ভগবান মারেও না সারায়ও না, মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখে।

যাই মাকে ওষুধ খাইয়ে আসি।

মধুশ্রী ঘরে ঢুকে প্রতিভার জ্বর নেয়, ওষুধ দেয়, পথ্য কি রুচিকর হবে তার জোগাড় দেখে।

পদ্মরাণী তম্ময়ের মত বললে, 'লক্ষ্মী মেয়ে, দিন-রাত একমনে মায়ের সেবা করছে।'

'আমি তো ওর উপাধি দিয়েছি—সেবালক্ষ্মী।' মুগ্ধগদ হয়ে সমর্থন করল প্রতিভা।
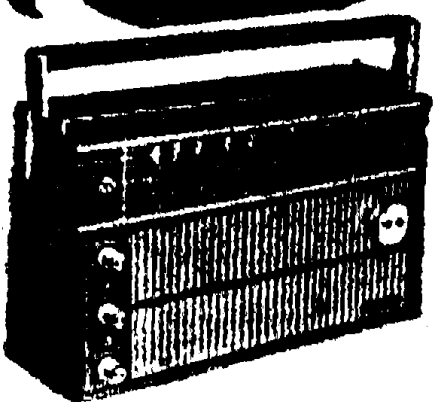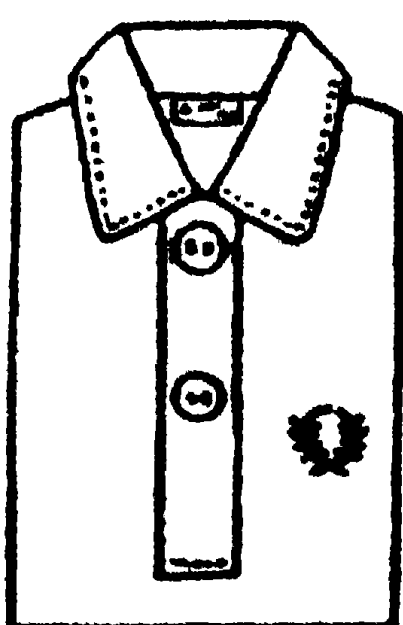
'যে দু হাতে মায়ের এত সেবা করছে তোর সৌভাগ্য অবধারিত।' পদ্মরাণী মধুশ্রীকে আশীর্বাদ করল।

মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে প্রতিভা বললে, 'তেমনি একটি সিভিল সার্ভিসের ঠান্ডা পাত্র দেখ না ওর জন্যে। যদি কলকাতার উপরে হয়, তাহলে তো কথাই নেই। আশে-পাশে হলেও চলবে। আর দেখছ তো আমার এই অসুখ, আমার তাই এই ছোট্ট একটু আবদার', প্রতিভা অন্তরঙ্গ হতে চাইল : 'হয় মেয়ে আমার কাছে থাকবে নয় আমি মেয়ের সংসারে থাকব।'

এই আবদার সৌগতের কাছে প্রশ্রয় পাবে না ভেবেই প্রথম দিন থেকেই তার প্রতি বিমুখ প্রতিভা।

'দেরাদুনে মিলিটারী স্কুলে পড়ে।' প্রথম আলাপের দিনে মধুশ্রী এমনি গর্বের টান দিয়ে পরিচয় করিয়েছিল।

প্রতিভা বলেছিল : 'মিলিটারী! দেরাদুন!'

উৎসাহ-উদ্বেল প্রাণ-দুর্মদ সৌগত লাফিয়ে উঠেছিল : 'তারপর যখন যুদ্ধে ডাক পড়বে তখন কোন পাহাড়ের চূড়ায় বা গভীর জঙ্গলে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হাজির হবে কেউ জানে না।'

দু চোখে আরতির দীপ জেলে বলেছিল : 'আমার-তোমার সকলের চেয়ে বড় হচ্ছে দেশ—দেশের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা নিটুট রাখবার জন্যে যারা লড়ে, প্রাণ দেয় সর্বস্ব দেয়, তারা সকলের চেয়ে বরণীয়।'

পরে মধুশ্রীকে নিভৃতে ডেকে এনে প্রতিভা প্রায় তিরস্কারের সুরে বলেছিল : তুই ওর সঙ্গে ভাব করতে গেলি কেন?'

'ভাব আবার কেউ করে নাকি? ভাব হয়ে যায়।' মধুশ্রীও বলেছিল রুষ্ট হয়ে।

'ছেলেটা তো দেখতে খুব ব্রাইট। তোর মতন একটা বাজে মেয়েকে ও বিয়ে করতে রাজি হবে?'

'বিয়ের কথা এখনো ওঠে নি। ও এখনো ছাত্র। আমিও তাই। আর, তাছাড়া, বিয়েটা এসেনসিয়্যাল নয়।'

বিয়ের কথা উঠল যখন ট্রেনিং শেষ করে সৌগত লেফটেনেণ্ট হিসেবে প্রথম পোস্টিং পেল।

'তোমার মায়ের কাছে কথাটা পাড়ি।' ব্যস্ত হয়ে উঠল সৌগত।

'আরো কিছু দিন যাক।' মধুশ্রী চোখ নামিয়ে আচ্ছন্ন গলায় বললে, 'মায়ের অসুখটা এখন বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।'

'হাসপাতালে দাও না কেন?'

দিই তো ক'দিন পরে অবস্থা একটু ভালোর দিকে যায়, মা আবার বাড়িতে ফিরে আসে।'

'বাড়িতে আকর্ষণ কী? তুমি?'

ম্লান একটু হেসে মধুশ্রী বললে, 'না, বাড়িই মার আকর্ষণ। এই ছোট বাড়িটি বাবা মাকে তৈরী করে দিয়েছেন। বাবা যখন এ বাড়িতে মারা গিয়েছেন তখন মারও সাধ এই বাড়িতেই তিনি চোখ বুজবেন। তাই এত মায়া!'

'মার পরে তুমি তাহলে একা একটা বাড়ির মালিক হবে?'

'সে আশাও নিবু-নিবু।'

'কেন?'

'মার এই দীর্ঘ অসুখ। মার হাতের টাকা ফুরিয়ে গেছে। তাই বাড়িটাকে মর্টগেজ দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে জানো?' মধুশ্রীর মুখে করুণ একটি কুয়াশা নামল : 'শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাবে আর আমি সেই ক্রেতার অধীনে ভাড়াটে হয়ে থাকব।'

'একা এখানে তুমি থাকবে কি। তুমি তো তখন আমার কোয়ার্টার্সে।'

ইঙ্গিতটা তাহলে বুঝেছে সৌগত। এ বাড়িতে মধুশ্রীর একা হওয়া পর্যন্ত তাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

'ছেড়ে দাও বিবর-আগার।' সবল বাহু মেলে মধুশ্রীকে অনেক কাছে টেনে আনল সৌগত। বললে, 'তুমিই আমার সবচেয়ে বড় বিষয়। তোমাকে আমার চাইই চাই।'

'আর তুমিই আমার সবচেয়ে বড় আশ্রয়— বড় শান্তির।' আনন্দ-আভর সজল চোখে তাকাল মধুশ্রী : 'আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।'

'নতুন র‍্যাঙ্ক পেয়ে তোমার জন্যে কি প্রেজেন্ট এনেছি তাই তোমাকে দেখানো হয় নি।' সৌগত আবার চঞ্চল হল। ব্যাগ খুলে একটা প্যাকেট বের করে বললে, 'মামুলি শাড়ি-গয়না নয়, একবাকস চিঠির কাগজ আর খাম, আর এই একটা ফাউন্টেন-পেন। আর এই এক শিশি সেন্ট। সেবার হোলির সময় চিঠির সঙ্গে যে আবির পাঠিয়েছিলে তাতে কি একটা গন্ধ মিশিয়েছিলে, সেটা খুব মনমাতানো ছিল না। এবার এ সেন্টটা মিশিয়ে দিয়ো। শুধু হোলির আবিরে নয় প্রত্যেক চিঠিতে। মাসে যদি চারখানা চিঠি লেখ তবে চার ফোঁটা। বুঝব, মাসে আমার জন্যে চার ফোঁটা হৃদয়নির্যাস খরচ করেছ।'

'কেন, আমার আগের চিঠিতে নির্যাস কিছু কম ছিল?' অভিমানের সুর ফোটাল মধুশ্রী।

'কিন্তু তার গন্ধ খুব নম্র ছিল, লাজুক ছিল। এখন আর আমি ছাত্র নই। এখন আমি অফিসর। তাই গন্ধটা উগ্র হোক, স্পষ্ট হোক এই আমার ইচ্ছে। কি, রাজি?'

লজ্জালু চোখে মধুশ্রী বললে, 'রাজি।'

'দেখ আমার-তোমার চক্ষুলজ্জা আছে, কিন্তু চিঠির কোন লজ্জা নেই।'

'চিঠি অপূর্ব।' প্যাকেটটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরল মধুশ্রী।

'আমাদের হৃদয়ে একটা করে সোনার সিন্দুক আছে।' সৌগত বললে, 'চিঠিই সেই সিন্দুকের চাবি।'

'সুতরাং—' মধুশ্রী চোখে ঝিলিক দিল। 'সুতরাং চিঠি লিখো।' মনে করিয়ে দিল সৌগত : 'সেন্টেড চিঠি।'

যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল প্রতিভা, ডাক্তার এসে ইনজেকশান দিল। উপশমের এলাকায় এসে চোখ মেলে প্রতিভা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে, 'সৌগত কী বলে?'

'কী আবার বলবে? লেফটেনেন্ট হয়েছে, কোয়ার্টার্স পেয়েছে, এখন সুস্থ মানুষের মত বিয়ে করতে চায়।'

'তুই কী বললি?'

'বললাম, মায়ের এমন সাংঘাতিক অবস্থা, এখন বিয়ে হয় কী করে?'

'ফিরিয়ে দিলি?'

'না। অপেক্ষা করতে বললাম।'

কী অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর কথা! অপেক্ষা করতে বললাম! তার অর্থ বুড়ি আগে মরুক, পরে আমি ড্যাং ড্যাং করে বিয়ে করতে যাব।

কটমট করে মেয়ের দিকে তাকাল প্রতিভা। মনে মনে বললে, তুইও একদিন বুড়ি হবি। তোরও ব্যাধি হবে। তখন দেখব তোকে কে দেখে।

যন্ত্রণা আরো বাড়ল প্রতিভার। কিন্তু শত যন্ত্রণায়ও অন্ধকার অদৃশ্য লোকে এ প্রার্থনা পাঠাল না যে আমাকে মৃত্যু দিয়ে যন্ত্রণার অবসান ঘটাও। বরং বারে বারে সেই পুরানো কথাই বলতে লাগল—যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে আমাকে ভালো করো, সুস্থ করো, আমি আবার বেঁচে উঠি, বাড়িটাকে দায় মুক্ত করি, একটি সিভিল সার্ভিসের ঠান্ডা পাত্র দেখে মেয়েটার বিয়ে দিই। যে হয় এ বাড়িতে থাকবে, নয়তো তার বাড়িতে আমাকেও থাকতে দেবে।

'বাঁচবার কী আশা, কী আসক্তি! তাই দ্বিতীয় অপারেশানের জন্যে হাসপাতালে যাবার আগে প্রতিভা অনুনয় করে বারে বারে বলে গেল মেয়েকে : 'কুকুরছানাটার কিন্তু অযত্ন করিসনে। পেট ভরে খেতে দিস। আমি যেন ফিরে এসে দেখি ভালো আছে, বাঁধা আছে।'

সৌগতকে চিঠি লিখছে মধুশ্রী : মাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। আবার অপারেশান করতে হবে। এই দ্বিতীয় অপারেশনের ধাক্কা কি মা সামলাতে পারবেন? ডাক্তাররা আশা দিচ্ছে না। তবু মায়ের কী আগ্রহ, বাড়ি ফিরে এসে তাঁর পোষা কুকুরছানাটাকে দেখবেন। দেখবেন কী? বাড়িতে আমিই কি মাকে আবার দেখব?

চিঠিটাতে সেন্ট লাগাতে ভুলে গিয়ে ছিল—খাম খুলে মধুশ্রী নতুন করে সেন্ট লাগাল।

আবার লিখতে হল মধুশ্রীকে :

শুনে সুখী হবে, মা দ্বিতীয় অপারেশানটাও চমৎকার সামলেছেন। ডাক্তাররা সবাই অবাক হয়ে গেছে। বলছে, কী আশ্চর্য স্ট্যামিনা! জানবে আমি সেই মার মেয়ে। তাই অনন্ত যন্ত্রণা আমিও সইতে পারি।

হ্যাঁ, মা বাড়ি এসেছেন। তাঁর কুকুরছানা ফিরে পেয়ে শিশুর মত আনন্দ করছেন। মাঝখানে একদিন কুকুরছানাটা হারিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম আর পাওয়া যাবে না। এই খবর মায়ের কাছে পৌঁছুলে ভয় হয়েছিল মা-ও আর বাঁচবেন না। কিন্তু না, কুকুরছানাটা পথ চিনে-চিনে ফিরে এসেছে। মা-ও ফিরে এসেছেন।

প্রথম দিন-তিনেক নার্স ছিল। অত খরচ চালাব কী করে? তাই আমিই এখন অহোরাত্র নার্সিং করি। পাড়ার পদ্মমাসী আমাকে উপাধি দিয়েছে সেবালক্ষ্মী। কথাটা সুন্দর, তাই না?

সৌগত উত্তর দিল : কিন্তু লক্ষ্মী, আমার সেবা করবে কবে?

সহর্ষে লিখল মধুশ্রী : আমি তো অহর্নিশ তোমার সেবায় নিযুক্ত। বিরহে পত্রসেবা, মিলনে সর্বাঙ্গসেবা। আমি তো শুধু সেবালক্ষ্মী নই, আমি আবার সেবাদাসী। রাণী হয়েও দাসী, দাসী হয়েও রাণী।

আর আমি? উত্তর দিল সৌগত : মিলনে শুধু—পতি আর বিরহে? বিরহে সেনাপতি।

আমি কি সব ফেলে তোমার কাছে চলে যেতে পারি না? পারি। কিন্তু আমি জানি তুমিই বারন করবে। বলবে, সবার চেয়ে কর্তব্য বড়, কর্তব্য আগে।

আর আমি কি তোমার শরীরে এখনি একটি প্রতীক্ষার বীজমন্ত্র বপন করতে পারি

না ? পারি; কিন্তু আমি জানি তুমই কারণ করবে। বলবে, সবার আগে নিয়মনিষ্ঠা, সবার বড় সৈনিকের ডিসিপ্লিন।

চিঠিই এক মহাকাব্য। আদি থেকে অন্ত সমস্ত রসের মোহানা।

সব কথাই মুছে যায়। শুধু চিঠি থাকে। কালের পটে কাটে কম্পমান মুহূর্তকে স্থির করে রাখে।

কিন্তু এমনিভাবে কতদিন চলবে?

সৌগত লিখল : আমি এখন ক্যাপটেন হয়েছি, কিন্তু আমার জাহাজ কই?

পরে আবার লিখল : আমি এবার মেজর হতে চলেছি কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমি এখনো মাইনর-ই থেকে গেলুম।

তারপর যুদ্ধ বাধল। কলকাতার উপর বোমা না পড়লেও বোমা পড়ল মধুশ্রীদের বাড়িতে। প্রতিভা মারা গেল। তারপরই তার কুকুরছানাটাকে মধুশ্রী তাড়িয়ে দিল। যাতে আবার ফিরে না আসে, কড়া হাতে পিঠে বসিয়ে দিল দু ঘা।

পাওনাদার আগেই নালিশ করে ডিক্রি করে রেখেছিল, এবার জারি করল। নিলামে বিক্রি হয়ে গেল বাড়ি-ঘর। বলে-কয়ে কয়েক মাসের সময় চেয়ে নিল মধুশ্রী। যদি এর মধ্যে এই পুরোনো ঠিকানায় সৌগতর একটা চিঠি আসে।

আশ্চর্য, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, তবু সৌগতের ব্ল্যাক-আউট শেষ হল না? কবেই তো তার মাইনরিটির অবসান হয়েছে, তবে আর তার উৎসাহ নেই কেন?

সেন্টের শিশিতে তো এখনো কয়েক ফোঁটা অবশিষ্ট আছে। সৌগতের নিশ্বাসেই কি আর সেই সুগন্ধ নেই?

তবে কি যুদ্ধে সৌগত মারা গিয়েছে?

না কি আর কোথাও ঘর বেঁধেছে?

না কি শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে?

যাই হোক, বাঁচুক কি মরুক, অন্যত্র বিয়ে করুক কি না করুক, বন্দী হোক কি মুক্ত থাকুক, মধুশ্রীর যা করণীয় তাই সে করে যাবে। তার করণীয় কী? তার ব্রতে উদয়াস্ত নিশ্চল থাকা। তার ব্রত কী? অনন্ত ব্রত। সেবা ও পূজার ডালি সাজিয়ে অনন্তকাল প্রতীক্ষা করা।

নিলাম-খরিদদার আর সময় দিতে রাজি হল না। দরকার নেই সময়ের—মধুশ্রী ইতিমধ্যে পশ্চিমের এক শহরে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেছে। তারই উদ্দেশে একদিন ঝাড়া-হাত-পা হয়ে রওনা হল।

যাবার দিনও শেষ ডাকের আশায় লেটার-বক্সটা হাতড়ে গেল। এটাই তো জানা ঠিকানা—শেষ ঠিকানা। শুন্য ঠিকানা।

কবিতা

বর্ষারম্ভে জল্পনা ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আগুন হয়ত একদিন নেভে,
কিন্তু শেষ কই
আকাশে কালিমা-লেপা ধোঁয়ার!
বন্যা যদি বা সরে যায়।
তার ফেলে যাওয়া
পঙ্ক প্রলেপের জড়তা
প্রাণের পদক্ষেপকে
আশা দিয়ে এখনো করে বিদ্রূপ।

মহাশূন্যের যাত্রী
পৌঁছোতে চলেছে অয়নান্তে,
তবু অবিরাম ধূমায়িত
শঙ্কা আর সংশয়,
ঘৃণা আর হিংসায়
কালের দিগন্ত আচ্ছন্ন।
আমার ভূগোলময়
হিংস্র লুব্ধতার রক্তাক্ত থাবার ছাপ।
কোথায় তা ধুয়ে হব শুদ্ধ?
সব নীল সাগর বিষাক্ত
লোলুপ সভ্যতার লালায়!

ঝড়ের হাওয়ার দুঃসাহসে
শালের অরণ্য ছড়ায় ঘূর্ণিবীজ
অজানা সুদূর কোনো স্থিতির আশায়।
তেমনি কি আমাদের
মহাশূন্যের পাড়ি
প্রাণের পবিত্র উপনিবেশ পাততে
কোনো কুমারী গ্রহের গর্ভে?

হায় দুরাশা!
মুখে যে এখনো রক্ত
আর ক্লেদের ধোঁয়া।

তোমাকে দেখে স্পষ্ট হয় ॥

বিষ্ণু দে

তোমাকে দেখে স্পষ্ট হয় : স্মৃতি ভিক্টোরিয়ার চূড়া,
তোমার কথা মনে বাজায় উজ্জীবনী কোয়ার্টেট।
অথচ তুমি সর্বক্ষণ উপস্থিতও নয়!

বিচিত্র, না? কিন্তু তাই সত্য উপলব্ধি।
যদিচ মানি জীবনে কি যে ল্যাজা কোন্‌টা মুড়া
প্রত্যহই ঘুলিয়ে যায়, কে যে পাঠায় ভেট!

কারণ দীন দিন-যাপন, অনিশ্চিত রুজি,
তাও বুঝি না, কিংবা বলো মানি না এই ক্ষয়।
কারণ দেখি সেই পাহাড় যেই না চোখ বুজি।
কান ঢাকলে 'নিখ্যুট ভাঁসে টেরনে' সদা সর্বত্রই শুনি।

শুনব জানি অনেক দিন—আমার কাল অবধি,—
কেমন কাল হবে কে জানে! প্রতিটি দিন স্বর্ণ।।

নতুন দুয়ার ॥

মনিরুজ্জামান

আমার প্রাণের রুদ্ধ দুয়ারে
উৎসব জেগে ওঠে,
বসন্ত পিক থেকে থেকে গায়
ডালে ডালে ফুল ফোটে।
নতুন সূর্য পাঠায় সনদ
সুবর্ণ অক্ষরে—
আশার সোপানে যতো যতো লোক
আনন্দে গান করে।।

আমি একজন সামান্য মানুষ॥

অরুণ মিত্র

আমি একজন সামান্য মানুষ,
অনেকগুলো দিন আর রাত্তির চলতে চলতে
আমি একই জায়গায়,
আমি তাদের জড়িয়ে ধুলোয় মুখ রগড়াই;
দু-এক পশলা বৃষ্টির সুর
জমে উঠবে ভাবি অমনি হাওয়ায় যন্ত্রণা
এখানে ওখানে গোঙানি
আমি যদি বা পা বাড়াই যদি বা থামি
মস্ত নদীর এপারে নদীর ওপার থেকে.
দুই পলিমাটির তট
কবরে কবরে চিতায় চিতায় ঝাঁঝরা।
প্রথম চীৎকার আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল
কিন্তু আমি ছিটকে আগুনের মধ্যে যাইনি
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের মতো কেঁপেছি
এবং আমার গা থেকে বছরগুলো ঝরে ঝরে
ধুলোয় মিশে গেছে.
আর এই একটা বছর
ঝড়ের নখে কুটিকুটি।

আমি একজন সামান্য মানুষ.
গোলামির মজলিসে
আমি বত্রিশ পাটি দাঁতে হাহা করি
ঝকঝকে নীল মহিমার কথা শুনি
এবং পুরু গালচের উপর কুকুরকুণ্ডলী হয়ে
ছুঁড়ে-দেওয়া মোহরগুলো বিশ আঙুলে ছাতড়াই।
তারপর আসর ভাঙে
ছাতি ফাটা শেষরাতে
মাটির উপর পা ফেলতেই আমি হাহাকারে।

আমি এই সামান্য মানুষ,
তবু এখন আমার রক্তে
গর্ব ঝমঝম করে,
আমার ভাইরা সকালের রোদ
মুঠো করে ছড়িয়ে দিয়েছে.
তাদের গলার আওয়াজ
লাল নদীর স্রোত পেরিয়ে আমার কানে।
আমি কিছুই পারিনি
তবু তাদের রক্তের অক্ষর
বাংলায় আগাগোড়া আমার ভোরের নাম ডাকে-
পাঁজরের আগুন নিয়ে তারা
ভোরে।
আরো বড়ো অন্ধকারের ভিতরে
আমি যদি তাদের বুকের পাশে বুক রাখতে পারি।

উদাত্ত বাংলা॥

সুফিয়া কামাল

উদ্‌বেলিত সিন্ধুর সমান
গরজিয়া সাত কোটি বাংলার সন্তান
শোনিত সাগর সন্তরিয়া
পরপারে উত্তরিবে গিয়া।
প্রাণেরে রেখেছে এরা পণ
নিরস্ত্র বুভুক্ষু অর্ধাশন
খিন্ন দেহ দীপ্ত প্রাণাবেগে তারা চলে।
প্রবল আঘাতে পড়ে ঢলে
মাতৃবক্ষে সন্তানের দেহ
তবুও সম্মুখে চলে, পশ্চাতে চাহে না ফিরে কেহ।
মৃত্যুর মদিরা করি পান
অবহেলে প্রাণ করে দান—
শাসকের শোষকের পীড়কের নিষ্ঠুর পীড়ন
রোধিতে করেছে যারা পণ
যারা এ মাটিরে ভালোবেসে
ফলায় সোনার শস্য আপনার দেশে।
আপন শ্রমের মূল্যে জঠর ক্ষুধার সুধাধারা
তাহারে কাড়িয়া নিতে যারা
বাড়াইছে লোভী শত কর
নিরন্নের অভিশাপ তাহাদের পর
নামিয়া আসিবে ধীরে ধীরে।
দীপ্ত দিকচক্রবাল ঘিরে
পুঞ্জীভূত ঘৃণাধূম্রে আকাশ আচ্ছন্ন করি জমে,
সেথা হতে বজ্রানল নামি এসে ক্রমে
অসুর শক্তিরে করি নাশ
আবার নতুন সূর্যে পূবের আকাশ
উদ্ভাসি উঠিবে দীপ্ত প্রভাতের কালে
জয়টিকা আঁকি দিবে ভালে—
সাত কোটি সন্তানের রক্তে অবগাহি
বাংলার জননী আছে উর্ধ্ব মুখে চাহি
সে প্রভাত তরে।
মুক্তির আলোকশিখা পশিবে যে প্রতি ঘরে ঘরে।
সেই শুভদিন লাগি পথ চাহি জাগে—
জননী-ভগিনী-বধূ বিধাতার আশীর্বাদ মাগে।

জেগে উঠে॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মুছে যেতে রাতের আঁধার
জেগে উঠি সূর্যের চুমুয়;
নিরপেক্ষ সময়ের সাথে কিছুক্ষণ
বসার সুযোগ পাই, আলোচনা হয়।
চিন্তার নৌকো ছাড়ি পাল তুলে দিয়ে,
বেশ লাগে শান্ত মন-মধুমতী নদী।
অতীতের পটে বর্তমান, তার সাথে
ভবিষ্যতও আলোচ্য বিষয়।
কখনো মাতাল হই হঠাৎ হঠাৎ
গুন্ গুন্ সঙ্গীতের সুরের সুরায়,
কখনো বা নুয়ে পড়ি আকণ্ঠ বিলাপে
ক্রীতদাসী জীবনের ঘন বেদনায়।
ছলনার পাশা খেলা চলে পূর্বাপর
শেষরক্ষা স্বপ্ন দুরাশার,
ব্যর্থ রাজা দর্পী দুর্যোধন
ডুবেছেন স্বখাত সলিলে।
এ যুগেও ইতিহাসে একটি অধ্যায়
সহসা বিদায় নেয় রক্তে হাত ধুয়ে।
সমস্ত চক্রান্তজাল ছিন্নভিন্ন করে
পৃথিবীর মানচিত্রে ঘটে অকস্মাৎ
নবীন স্বাধীন এক রাষ্ট্র অভ্যুদয়:
পূর্বাশায় ঝাঁকে ঝাঁকে শান্তির কপোত।

পরিশুদ্ধ অমল প্রাণের ডাক॥

কায়সুল হক

হ্যাঁ, ফিরে আসছে
পিছনে রাধিকাপুর বিরল ছাড়িয়ে
কাঞ্চনের ভাঙা ব্রিজ—পায়ে হেঁটে
কাঁধে মাথায় যে যার সম্বল চাপিয়ে
সকলে আসছে ফিরে দ্রুত
দীর্ঘ ন' মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ করে।

পথ ঘাট যেন এই ন' মাসে বদলে
গেছে আশ্চর্যরকম।
যেখানে গ্রামের হাট বসত সেখানে
জনমানবের চিহ্ন নেই আজ,
চারিদিকে ধু ধু মাঠ পড়ে আছে ফসলবিহীন,
যতদূর দৃষ্টি যায়
শুধু কবরের মত উঁচু উঁচু অসংখ্য অজস্র ঢিবি;
নদীতে নামতে ভয়—কখন ঠেকবে পায়ে কার পাঁজরের হাড়,

বা কার মাথার খুলি
খুব সন্তর্পণে তাই
নদী পার হচ্ছে শরণার্থীর দল।

কী আশ্চর্য গুলিবিদ্ধ বৃক্ষরাজি
সবুজ পল্লবে পুনঃ নিবিড় হয়েছে
আত্মীয় স্বজন হারা মানুষ যেমন
স্বাধীনতার উল্লাসে ভুলে গেছে ব্যক্তিগত শোক।

পরম নিশ্চিন্তে শান্ত বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে,
(যদিও কপাট নেই, জানালার শিক নেই, নেই আরো কত কিছু)
তবু মনে হয়
কল্যাণের নূতন পৃথিবী
রক্তমাখা বাংলার বুকের মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছে :
মসজিদে মসজিদে ভয়হীন মুয়াজ্জিন,
নিকানো উঠোনে তুলসীর চারা খুশি মনে
প্রেমের মতন প্রসারিত:
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর
কেমন সহজ আজ সখ্যতার সফল জীবন!

শরণার্থী শিবিরের কানাই সালাম
চিনেছে পরস্পরকে
চিনেছে কে শত্রু কেবা মিত্র।
পঁচিশ বছরে জন্ম নিলো
পরিশুদ্ধ অমল প্রাণের ডাক :
শুনহে মানুষ ভাই!
প্রিয় শব্দগুলো বুক ভরে উচ্চারণ করো
স্বাধীনতা......মানবতা......
পৃথিবীর কেউ কোনোদিন কেড়ে নিতে পারবে না।।

আমি তো মেলারই লোক ॥

শামসুর রাহমান

আমি কি মেলারই লোক? বেলাবেলি এসে গেছি রঙিন চাঞ্চল্যে
এই মুক্তাঙ্গনে আজ? নাগরদোলায় দুলে কিংবা
সবুজ বাদামি শাদা ঘোড়া দেখে দেখে,
• মাদল কর্তাল
শুনতে শুনতে,
কোর্তাপরা বাঁদর নাচিয়ে
কেটে যাবে বেলা,
অথবা পথের ধারে বেচবো পুতুল,
ঘটিবাটি সূর্যাস্ত অবধি।

আপনারা যারা এসেছেন কাছ থেকে দূর থেকে
তারা কি আমার কোনো ইন্দ্রজাল দেখার আশায়
ব্যাকুল উড়িয়েছেন ধুলো পথেঘাটে, ঠেলেছেন ভিড়?
হে দর্শকবৃন্দ
বাঘের মুখের
ভেতর গচ্ছিত রেখে মাথা ফের আনবো নিপুণ
ফিরিয়ে অক্ষত, যদি ভেবে থাকেন তা হলে
প্রতারিত হবেন নিশ্চিত।
না, আমি সে-খেলা
শিখি নি কখনো। এমন কি কালো গোল
টুপির ভেতর থেকে শাদা কবুতর
ওড়ানোর কৌশল অথবা আঙুলের
ডগায় গোলাপ ফোটানোর
মায়াবী কায়দা জানা নেই।
আমার রঙিন তাস নেই, টিনের কৃপাণ নেই,
মুখোশ ইত্যাদি নেই। হে দর্শকবৃন্দ
শুনুন আপনাদের কোনো প্রমোদের, বিনোদন-শিহরিত
প্রহরের আশ্বাস পারি না দিতে। বিশ্বাস করুন
এই দুঃখে মাথা নীচু করে সরাসরি
নির্বাসনে যেতে ইচ্ছে হয়।

তা বলে এক্ষুনি মেলা দেবেন না ভেঙে
রেগে মেগে, 'তুমি আজেবাজে পদ্য লেখো হে কিস্তর'
বলে গোবেচারী
দীনার মতন আমাকেও অচিরাৎ
দেবেন না ঠেলে
যমের দুয়ারে। যদি অপেক্ষা করেন
কিছুক্ষণ, এই ব্যর্থ আমি, এই অক্ষম আমিও
পারবো দেখাতে কিছু। এই যে দেখুন
আমার দু-চোখে দগ্ধ গ্রাম বেশুমার,
আমার ললাটে
আহত শহরগুলো ব্যাণ্ডেজ সমেত
শুয়ে আছে। দেখুন আমার বুকে রক্তে-ভেসে-যাওয়া
মরিয়ম নিঃস্পন্দ কেমন;
আমার বাহুর কোণে ছিন্ন-ভিন্ন ভয়ানক শীতল বাবলু
অচঞ্চল; আমার পাঁজরে
শচীন শাঁখারি, রাজমিস্ত্রী জাবেদালি
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, শরীরে ভীষণ ফুটোগুলো
নন্দন চক্রময়।

আমার চিবুকে কতো ভগ্ন সেতু, যানুদের আশে
ভরপুর কতো যে পরিখা,
আমার চোয়ালে লগ্ন লক্ষ্মীবাজারের
সুহাসিনী দেবীর রক্তিম শাড়ি, যেন স্বাধীনতার পতাকা।

আমি তো মেলারই লোক, বেলাবেলি এসে গেছি এই
মণ্ডপের কাছে,

ঘুরবো, থাকবো
নাগরদোলার কাছে, ঘোড়াদের কাছে,
নৌকো আর পুতুলের ভিড়ে
ঘুরবো, থাকবো,
কিছুকাল, চন্দ্রমল্লিকার
ডাকে সাড়া দেবো,
ঘুরবো, থাকবো,
তুলে নেবো হাতে জ্যোৎস্নার সুস্মিত রাখী
বিশদ রুপালি প্রতিবেশিতায়। মেঘের আশ্রয়
বেশীদিন খুব
সুখের হয় না, বৃষ্টি হয়ে ঝরে যেতে হয় পদ্মের পাতায়
কাকের ডানায় কিংবা বাঘের দু-চোখে।
আমি তো মেলারই লোক, বেলাবেলি এসে যাই। দূর
টিলায় সূর্যাস্ত দেখে, বেয়নেটবিদ্ধ আকাশের
রক্তবমি দেখে, দেখে কুমোরের প্রেমিকা-পুতুল
কখন হারিয়ে যাবো এক বুক হাহাকার নিয়ে।

গেরিলা যুদ্ধ ॥ জগন্নাথ চক্রবর্তী

সারাদিন পথ ভাঙে কাব্যের স্বপ্নেরা
গদ্যের কণ্টকীলতা দুই হাতে ছিঁড়ে
শব্দের গ্রেনেডগুলি সযত্নে লুকিয়ে
ক্লান্ত পথে অক্লান্ত কবিতা।

গেরিলা স্বপ্নেরা কিন্তু পিপাসার জল নেয় অন্ধ হ্রদ থেকে
যেখানে ওড়ে না কোনো মানস-বলাকা,
গাছের তলায় বসে দোতারাবাদক এক ভিক্ষুকের সাথে
ছায়া ভাগ করে নেয় যেন রুটি, কখনো বা ট্রাকে করে ছোটে
পূর্ত শ্রমিকের দলে গন্ধময় ধুলোকাদামাখা।

সারাদিন পথ ভেঙে নানাদিক থেকে
ক্রমাগত লক্ষমুখী এই গেরিলারা
রাত্রিতে গদ্যের দুর্গ ধূলিসাৎ করে,
বিজয়ী স্বপ্নেরা অবশেষে
সবলে দখল নেয়,
বন্দী প্রমিথিউসকে মুক্ত করে,
যুক্তির বাংকার ভাঙে
হেলমেট গুঁড়োয়
রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে গোলা ছোঁড়ে
কল্পনায় রকেট উড়ায়।

এই দুর্গ রোজ ভাঙে
এই দুর্গ রোজ গড়ে ওঠে
এইভাবে যুদ্ধ চলে
এইভাবে রোজ স্বপ্ন ফোটে।

ঘোলাটে আলাপ ও মিহি সোনার কাজ ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

পটে ছবি ফোটাবার বুকের আগুনে শুধু ছাই,
কিছুতে জ্বলে না মন হে সময়, তোমারে জানাই।
প্রখর বৈশাখী রোদে দু চোখে সেসব ছায়া পড়ে
বিবিক্ত অস্থির সত্তা সংকুচিত দৃশ্যে নড়ে চড়ে।
ময়দানে প্রকাণ্ড গাছে কোকিল ডাকেই মাঝে মাঝে।

রাজ্যে রাজ্যে উত্তেজনা, যুদ্ধ দূরে কাছে তারপরে
প্রত্যহ নতুন আরো নানাবিধ জবর খবরে
চেতনার প্রান্ত থেকে প্রান্ত বাঁধা ঘোলাটে আলাপে।

সময়ের এ নির্যাস প্রত্যেক অন্তরে এসে ঢোকে।
ছড়ায় হাওয়ায় শূন্যে, যে যার সামর্থমতো পেতে
বুদ্ধিতে বিচারে বোধে করে প্রাণপণ।
এ সকল কি যে এক ভয়াবহ নাটকের ক্ষণ।
অন্তিমে সর্বাঙ্গে মনে রেখে যায় শ্রান্তির জৃম্ভণ।

এই মৃত্যুগুহা থেকে দূরের দিগন্তে অন্য কালে
একা একা চলে মন হে সময়, নিভৃত আলোতে
সময়ের সঙ্গে যুঝে সময় পেরোনো তার খেলা।
সেই পথে দেখা দেয় রবি ঠাকুরের দূর বেলা—
থেমে-যাওয়া গান যেন নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলা
আধো-চেনা ভালবাসা গুণ্ঠনে সোনার মিহি কাজ।

শেষ সাঁকো ভেঙে যেতে ॥

তরুণ সান্যাল

কবিতা সে কার নাম, কি জানি যা নন্দনতাত্ত্বিক
নানা ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু শিয়রে খড়্গের শাদা শান
যার জানা সেই জানে শব্দপাত একান্ত আপন
শহীদান, কবিতাকে বুকে পাওয়া, এমন-কি ছেড়ে যেতে
শেষ সাঁকো ভেঙে যাওয়া
কবিতা বা অ-কবিতা এমন সময় আসে
যখন প্রবলবোধে ভস্মসাধ শস্যস্বাদ সকলই সমান।

মাটিতে যে-বীজ পড়ে সবই তারা অঙ্কুর জাগায়?
এমন-কি পুষ্ট যারা তারাও কি ফসলে সফল? দানা দিতে?
যেমন মাঠের কাদা, খরা বন্যা বৃষ্টিপাত, শুখাহাজা, হাজার দাগায়
দিনরাত্রি প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলিও একই,
তুমি কে কবিতা, তুমি ঘুম ভাঙাবে
লাঙলের কোলে শুয়ে মাটির নিভৃতে?

কবিতা কেবলই মৃত্যু, আমার নিজস্ব মৃত্যু, আমারই একার
কবিতা কেবলই জন্ম, আমার একার, কিন্তু আরো অনেকের
গোপন নিজস্ব বৃক্ষ ঝরে গেলে একা আমি বিপর্দিত
কলরবে চলে যায় ফুলকুড়ানিরা, ফল সঞ্চয়ের বালকেরা
বহু অলেখার
কাহিনী ছড়িয়ে যায় ধুলোয় পায়ের চিহ্নে
বিস্মরণ এসে অকৃতার্থ দুটি চোখ মুছে দিতে দিতে বলে,
হতভাগ্য, আর বড়ো আদরে আমাকে ডেকে নেয়।।

ঘৃণা-ক্রোধের বারুদ ॥

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

ঘরের ভেতর ঢুকলো মিলিটারী
ছড়িয়ে দিল গুঁড়ো এবং
জ্বালিয়ে দিল আগুন

মুহূর্তে সব ভস্ম হল :
দাদার যত দলিল এবং
দাদির যত মধুর স্মৃতি,
নক্সিকাথা, তোরংভরা পুঁথি,
কোরাণশরিফ;

পিতার যত পত্রাবলী, আলমারীতে
বাঁধানো বই : রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন,
সুপ্রিয় শেক্সপীয়র;
মায়ের শাড়ী, হাঁড়িকুড়ি, সাজানো সংসার,
খাটের বাজু, তোষক, বালিশ,
মশারি; আর উক্ত আমার গ্রন্থাবলী;
কনিষ্ঠদের পাণ্ডুলিপি, নিষিদ্ধ বই,
পাঠ্যকেতাব, খাতা, কলম, টেবিল, চেয়ার,
চালের বাতায় গোজা টেলিগ্রাম :

'আব্বা, খবর খুবই খারাপ,
শহর ছেড়ে আপনারা সব
গ্রামে গেলেই ভাল;

ঘরের মধ্যে ঢুকলো মিলিটারী
ছড়িয়ে দিল গুঁড়ো এবং
জ্বালিয়ে দিল স্মৃতির ঘরে আগুন।

রক্তে এবং ভস্মে চাপা রইল শুধু
কী দুঃসহ ঘৃণা-ক্রোধের বারুদ।

দহন অপার হলে॥

রাম বসু

দহন অপার হলে ফুলের বাগানে
তোমরা যেও না কেউ
দুঃখ হয় তীব্র বর্শা ফুলের বাগানে
নিঃশব্দ করাত চেরে বুকের পাঁজর।

আমি তাই কুয়াশায় মোড়া এই জ্বলন্ত বৈশাখে
ভয় করি আমার দু-হাত। আমার দু-হাত
কণ্ঠনলী ছিঁড়ে এনে এখুনি ঝোলাতে পারে ছাদের কার্ণিশে
ইস্পাতের গোঁজ পুরে দিতে পারে হৃদয়ে, যেখানে
নিশীথ নৈঃশব্দে জন্ম নেয় প্রেম, স্বপ্ন প্রতিধ্বনি
কাঠবেড়ালির মতো ছুটোছুটি করে ইচ্ছা
রোদে ও জ্যোৎস্নায়

দহন অপার হলে তুমি কিন্তু ফুলের বাগানে
স্থির, ফলের নিহিত বীজ, স্তব্ধ, তুমি
কেন হাত রাখো পুষ্পিত বাতাসে? মন্ত্র [illegible]
যা এই মাটির অন্তর্গত উপাদান
যা শোনা যায় না এমন রহস্য-স্বর
যার নিচে দৃষ্টিও পাথর।

জীবন সযত্নে বোনে জটিল প্যাটার্ন
দর্পনের চেয়ে স্বচ্ছ মৃতদের মুখ
আমি ঝুঁকে কি যে খুঁজি নিজেই জানি না
দেখি, দহনের কেন্দ্রে তুমি মন্ত্র খোঁজ
মন্ত্র খোঁজ ধুলো ও কাদায়।

শোকসভা আজ সমগ্র বাংলাদেশ

অরূপ তালুকদার

কে কাকে করে নিমন্ত্রণ এখন কেননা
শোকসভা আজ সমগ্র বাংলাদেশ

ঘরে ঘরে আজ দ্যাখো উড়ছে শোকের পতাকা
এই একই ছবি বারবার দেখেও যেন
অনেক অনেক স্মৃতি রয়ে যায় অগোচরে
অনেক অনেক কথা না বলাই থেকে যায়
সমস্ত জীবনে

দ্যাখো, শোকসভা আজ সমগ্র বাংলাদেশ।

পঁচিশে মার্চ, ১৯৭১॥

সানাউল হক

কেঁপে কেঁপে ওঠে ত্রাসে নীলাম্বর, বাংলার পল্বল প্রান্তর
কবিতার নীলকুঞ্জ, জলাসিঁড়ি নদী ঘাট গৃহীর অন্তর
বাঙাবউ দাঁত কাটে ঃ শ্লথশাড়ি নারী লজ্জা দুর্বৃত্তে হেরেমে
কর্মচ্যুত কাসফুল, কণ্ঠহৃত সাতনরী মাতৃ আশীর্বাদ
অপহৃত টাকা কড়ি নাকের নোলক, জানমাল ধেনুধান
লুণ্ঠিত ভাঁড়ার দোকান খামার হাট—পঁচিশে মার্চের রাতে
আদম সন্তান যখন আক্রান্ত পশুর থাবায়, আমাদের
মাংস ডিশে যখন আয়োজন ভোজ—তুমি কি তখন
শান্তি সুমহান ঘুমন্ত বিবেক অকৃত্রিম আমার বিধাতা।
রাঙাদা নিখোঁজ—মাজেদার স্তনে রক্ত দুধের নদীতে চর—
পদ্মার মাঝির কান্না, বাঁয়ে বিবি ডানে ছেলে নেই—কোলে কাঁদে
শিশুহারা বধু, জলকে চলার নেশা আজ স্মৃতি ধূসরিম।

॥ ২ ॥

ঝিমঝিম বাজে না নূপুর প্রেক্ষাগৃহে, পার্কে মাড়ায় না পথ
হাতে-হাত কেউ, শূন্য ঘাট আহা পল্লীবধূ ভাসায় না জলে
স্নানার্থী আসে না ঘাটে, শালিকেরা ছেড়ে গ্যাছে কাঁঠালের পাড়
বাঁশবনে ঝরে না চাঁদের আলো, নেবু গন্ধে ঘোরে না ভ্রমর,
শূন্য হাট তরুচ্ছায়াতল পাকাধান চাষীরা কাটে না এসে
নবান্নের স্খলিত সময়, শিশুরা খায়না দোল দোলনায়,
গোল্লাছুটে ছোটে না পাড়ার ছেলে, গৃহী নেই, নৌকো শূন্য নদ
জেলেরা ফেলে না জাল, জঞ্জাল মন্ত্রণা চাল জারিজুরি—
লক্ষ্মীছাড়া যুবারা দেয় না চোখ ও-বাড়ির খোঁপার গবাক্ষে,
সুবিশাল শূন্যতার প্রতিচ্ছবি যেন দেশ আমার স্বদেশ
যেন খাঁ খাঁ বালুচর রাক্ষুসিনী পদ্মার দৌরাত্ম্যে—কীর্তিনাশা
কীর্তির সঙ্গমে কাল সমকাল মুখোমুখি যেন সন্ধিক্ষণে।

সেই স্মৃতি

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

শিকারা থেকে হাউসবোটের সিঁড়ির উপরে একটা পা দিয়েই মানিকের সেজকাকা থমকে দাঁড়ালেন, আর শক্ত করে একটা হাত চেপে ধরলেন আমার। আমি ভেবেছিলাম যে শিকারাটা ডাল লেকের জলে টলমল করে উঠবে ভেবেই তিনি আমার হাত চেপে ধরেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম যে তা নয়। এতক্ষণ যে প্রসন্নতা তাঁর মুখে লেগেছিল, সহসা তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে, ভয়ার্ত হয়েছে দৃষ্টি। আমি সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে পাশের হাউসবোটের বারান্দায় একজন পুরুষকে দেখতে পেলাম একটি মেয়ের সঙ্গে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের যুবক, তার পরনে ভারতীয় সেনা-বাহিনীর পোষাক। যে মেয়েটি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তার ফর্সা মুখখানা চৌকো ধরনের, চোখে কালো চশমা। কোন্‌দিকে চেয়ে আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কী হল সেজকাকা?

না কিছু হয় নি।

বলে সেজকাকা তাঁর দ্বিতীয় পা সিঁড়িতে তুললেন। শিকারা দুলে উঠল কিন্তু তার জন্যে আমার কোন অসুবিধা হল না। আগে ভয় হত, বুঝি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাব। কিন্তু এখন আর সে ভয় নেই, এখন বেশ সহজভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, আর সিঁড়ির রেলিং না ধরেই হাউসবোটে উঠে যেতে পারি সচ্ছন্দে।

সেজদাদা এবারে ত্বরিত করে উপরে উঠে গেলেন। সামনের বারান্দাতেও দাঁড়ালেন না, তৎপরভাবে ঢুকে গেলেন বসবার ঘরে। আমিও তাঁকে অনুসরণ করে বসবার ঘরে চলে এলাম।

শিকারাওয়ালাকে ভাড়া দেবার প্রশ্ন নেই। আমাদের হাউসবোটের শিকারা। একে শিকারা বললে শিকারার অপমান হবে। এ শিকারা ভাড়ার শিকারার মতো রেশমি ঝালর দিয়ে সাজানো নয়, বসবার গদি নেই, ছাদও নেই উপরে। এ একখানি ডিঙি নৌকো, আমাদের হাউসবোটের বেয়ারাই শিকারাওয়ালার কাজ করে। নিজেরাও যাতায়াত করে, দরকার হলে আমাদেরও পৌঁছে দেয়। আবার ফেরার সময় ওপারের ঘাটে দেখতে পেলে শিকারা গিয়ে আসে হাউসবোটে পৌঁছে দেবার জন্যে। রাস্তাতো দূরে নয়, ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায়। একটুখানি দাঁড়াতে বলে হাউসবোটের পিছন থেকে শিকারা নিয়ে বেরিয়ে আসে। টেবল টেনিসের ব্যাটের মতো গোল দাঁড়টার ছপছপ করে জল কেটে এপারে চলে আসে, তারপর হাউসবোটের কাঠের সিঁড়িতে পৌঁছে দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। হাউসবোটের পাশে পাশে অসংখ্য নালা ভিতরে ঢুকে গেছে। সুন্দর হাউসবোটগুলো বাঁধা আছে শক্ত মাটিতে, কিন্তু তার পিছনেও যে অসংখ্য পুরনো হাউসবোটে বহু মেয়ে পুরুষ বাস করছে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। হাউসবোটের মালিক-

সপরিবারে বাস করছে সেখানে, বেয়ারা, বাবুর্চি মেমসাও আছে। পুরোনো জীর্ণ হাউসবোটে তাদের বাস, সেখানেই বান্না বান্না সব সংসার। সে এক বিচিত্র জগৎ।

বসবার ঘরে এসে সেজকাকা একটা চুরুট ধরালেন, খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন কার্পেটের উপর, তারপরে বসে পড়লেন। গভীর অসন্তোষ দেখলাম তাঁর মুখে চোখে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন : তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো।

সাহস পেয়ে আমি বললাম : আপনি কি এখন একটু কফি খাবেন?

কফি!

বলে তিনি যেন ভাবলেন কিছু, তারপর বললেন : না, থাক।

তারপরেই আবার বললেন : কেন, তোমার কি কফি খাবার ইচ্ছা হয়েছে?

আমি জানি যে তাঁর নিজের জন্য বললে তিনি কিছুতেই রাজি হবেন না, অথচ এক পেয়ালা কফি পেলে তাঁর মেজাজ প্রসন্ন হয়ে উঠবে। তাই বললাম : আপনার সঙ্গে একটু খেতে পারতাম।

ও।

বলে সেজকাকা তাঁর মুখের চুরুট সরিয়ে বললেন : তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন, বলে এসো না।

আমি আর অপেক্ষা না করে ভিতরে চলে গেলাম।

আমরা একখানি ছোট হাউসবোট ভাড়া নিয়েছি। বসবার ঘরেই আমাদের খাবার টেবিল ভাঁজ করা আছে কাঠের দেওয়ালের সঙ্গে, খাবার সময় খুলে বসতে হয়। দুখানা শোবার ঘর, বাথরুম দুটো। আর পিছনের দিকে একটুখানি জায়গায় রান্না ও খাবারের বাসনকোসন রাখবার ব্যবস্থা। সেজকাকা নোংরামি পছন্দ করেন না বলে ওদের কিচেন বোটে রাঁধতে দিচ্ছেন না। রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে এইখানেই। টুকরো কাঠ রেখে তার উপরে একটা কেরোসিনের স্টোভ রাখা হয়েছে। স্টোভেই রান্না হয়। সেজকাকা এই স্টোভ আর প্রেসারকুকার সঙ্গে এনেছেন। পার্টটাইম বেয়ারা বাবুর্চির বদলে তিনি একজন লোক নিয়েছেন সারাক্ষণের জন্য। নাম তার আমিরা। সেই আমাদের শিকারা চালায়, সেই বাজার করে, রাঁধে, খাবার খাওয়ায়, আবার ঝাঁটপাট ঝাড়পোঁছও করে। সকালের চা খেয়ে সেজকাকা হাঁটতে বেরোন, তার সঙ্গে থাকতে হয়। ফিরে এসে কফি খান এক পেয়ালা, সে কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়। আবার তাঁর জন্যে কিছু করা হচ্ছে শুনলে রেগেও যান। কখনও খিটখিটে মেজাজ, কখনও প্রসন্ন মন; কখনও ভারে গম্ভীর, কখনও হাসিতে উচ্ছল। মানিক ভয় পায় তার সেজকাকাকে, তাই আমাকে তার বদলি পাঠিয়েছে। আমি এই মানুষটাকে ভয় পাইনে, কিন্তু ঠিক চিনতেও পারিনি। তাই একটু সাবধানে মন বুঝে সমঝে চলি।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম যে আমরা তার শিকারা বেঁধে দিয়ে এসেছে। এক গাল হেসে বলল : কফি?

লম্বা রোগা চেহারার এই মানুষটি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলে। মুখের হাসিটি তার সারাক্ষণ লেগেই আছে। দোষ করে বকুনি খেলে মাথা চুলকোয়, কিন্তু কৈফিয়ৎ দেয় না। মনে হয় যে তার হাসিটিও বোধহয় মিলিয়ে যায় না। সরল হাসি, ভাল লাগে বেশ। তাই হেসে উত্তর দিতে হয় : হুঁ।

আমিরা মাথা নেড়ে দেখিয়ে দেয় যে স্টোভে জল চাপিয়ে দিয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বসবার ঘরে ফিরে এলাম।

সেজকাকা তখন গভীর ভাবনায় ডুবে গেছেন। হাতের চুরুটে ছাই জমেছে অনেকখানি, কার্পেটের উপরে, এখনই হয়তো ভেঙে পড়বে। কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু কিছু দেখছেন বলে মনে হল না। আমি নিঃশব্দে একখানা সোফায় বসে পড়লাম। আমার মনও নানা ভাবনায় ভারাক্রান্ত হল।

সেজকাকা কি আর্মির ঐ অফিসারটিকে চেনেন? মানিকের কাছে শুনেছি যে তিনিও সেনাদলে কাজ করতেন। এখনও তাঁর পুরনো বন্ধুরা তাঁকে মেজর বলে। মেজর ভাদুড়ী। কোন গোলমালের জন্য চাকরি ছেড়ে সরকারী দপ্তরে ঢুকেছিলেন কিনা জানি না। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। অনেকদিন থেকেই কাশ্মীরে একবার আসবার ইচ্ছা, মানিককে অনেকবার বলেছেন সঙ্গে আসবার জন্য। কিন্তু মানিক রাজী হয় নি। সে বলে, সেজকাকা তো একটা পাগল, বিয়ে-থা করে সংসার না করলে মানুষ ঐরকম হয়। কাজেই আমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছিল তার সেজকাকার সঙ্গে। আর আমি তার অনুরোধ ঠেলতে পারিনি। আমি চলে এসেছি তাঁর সঙ্গে।

আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভদ্রলোককে একেবারে ভয় পাইনি। মুখখানা স্বভাবত একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর বটে, কড়া করে ছাঁটা গোঁফ জোড়াও যেন মারমুখো হয়ে আছে। কিন্তু এই মুখখানা তো সারাক্ষণ এরকম থাকে না। আমাকে বলেছিলেন, আমি বাঘ না ভালুক যে তোদের খেয়ে ফেলব ভাবিস! বলে যখন হা-হা করে হেসেছিলেন, তখন রাস্তার লোকে ভয় পেলেও আমি ভয় পাইনি। ভেবেছিলাম যে এরকম করে যে মানুষ হাসতে জানে তাকে হাসাবার কায়দাটি শুধু জেনে নিতে হয়। সামনের একটা রুক্ষ্য যবনিকার আড়ালে বইছে স্নেহের ফল্গু। একবার সেই অন্তঃসলিলার সন্ধান পেলে মানুষটিকেও ভাল লাগবে। এই আশাতেই আমি রাজী হয়েছিলাম। আর তার জন্যে এখনও পর্যন্ত আপশোস করতে হয়নি।

বোটে একখানা ট্রের উপরে দু'পেয়ালা কফি নিয়ে আমিরা এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেজকাকার সামনেই প্রথমে এসেছিল, কিন্তু তিনি তাকে দেখতে পাননি। আমি উঠে গিয়ে পেয়ালাটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলাম। তিনি একটু চমকে উঠেছিলেন, তারপরেই সোজা হয়ে বসে বললেন : ও।

চুরুটটার দিকে চোখ পড়তে সেটা ঝেড়ে ছাইদানির খাঁজে রেখে দিলেন। ট্রে থেকে আমার পেয়ালাটি তুলে নিতেই আমিরা ফিরে গেল, আর আমি নিজের জায়গায় এসে বসে পড়লাম।

আমি কোন কথা বলবার চেষ্টা করলাম না। আমি যে এখন কোন কথা বললে তাঁর জানি চিন্তাধারা ব্যাহত হবে বিরক্ত হবেন তিনি। আর চুপ করে বসে থাকলে নিজেই কথা বলবেন। দু'তিন চুমুক কফি খাবার পর তাঁর মন একটু হাল্কা হল, বললেন : বুঝলে মিহির, আর্মি অফিসারের প্রেম আমি বরদাস্ত করতে পারিনে।

মেজকাকা আরও কিছু বলবেন, এই আশাতেই আমি নীরব হয়ে রইলাম। কিন্তু আর কিছু বললেন না দেখে আমিই কথা কইলাম, বললাম : ও মহিলা তো ওর বিবাহিত স্ত্রীও হতে পারেন।

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, বললেন : বিবাহিত স্ত্রী! কখখনো নয়। অমন আর্মি অফিসার ইন ইউনিফর্ম বিবাহিত স্ত্রী নিয়ে থাকবে হাউসবোটে! অসম্ভব! খোঁজ নিয়ে দেখ, এদেশের একটা মেয়ে নিয়ে—

হঠাৎ থেমে গিয়ে বললাম নো, হাব ডিচাস—

কথাটা সম্পূর্ণ করলেন না সেজকাকা! তাঁকে বড় উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আবার বললাম : বলুন।

না থাক।

বলে সেজকাকা ছাইদানির উপর থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে গভীরভাবে টানতে লাগলেন। আমার মনে হল যে এই মেয়েটির চেহারা দেখে তাঁর কিছু মনে হয়েছে, সেটি বলতে দ্বিধা করছেন। আর আমিও কৌতূহল বশে সেই কথাটি জানবার জন্যে বললাম : চেহারা দেখে আমার এ দেশী বলে মনে হচ্ছে না।

কেন?

বলে সেজকাকা আবার সোজা হয়ে বসলেন।

আমি বললাম : এদেশের মেয়েদের মুখতো ঠিক চৌকো ধরনের নয়, এদেশের মেয়েদের মুখে বাঙালী মেয়ের কমনীয়তা আছে!

এক্‌জ্যাক্‌টলি সো। ঐ ছোকরা অফিসারটি একটি গাধা। আগুন নিয়ে যে খেলা করছে তা বুঝতে পারছে না।

না না, মেয়েদের আপনি আগুনের সঙ্গে তুলনা করবেন না, ওদের যদি আলো থাকে তো তা চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ।

রাবিশ!

বলে মেজকাকা চক চক করে কফিটা

শেষ করে ফেললেন। তারপরে বললেন : মেয়ে বলেই চাঁদের সঙ্গে তুলনা !

আমি লজ্জা পেলাম তাঁর কথা শুনে। কিন্তু তিনি থামলেন না, বললেন : তোমার বন্ধুর নাম কী? আমার ভাইপো ?

আমি বললাম : সীতাংশু।

সীতাংশু মানে কী?

চাঁদ।

জন্মের পরে মিষ্টি মুখ দেখে দাদা ঐ নাম রেখেছিলেন। এখন কি ওর নামটা পাল্টে দেবে, না তোমার সঙ্গে বদল করবে?

আমি লজ্জা পেলাম তাঁর কথা শুনে। কিন্তু তিনি বললেন : তোমার নামের মানে জানতো?

মিহির মানে যে সূর্য তা অভিধান খুলে জেনেছিলাম। তাই মাথা নেড়ে জানালাম যে নামের মানে জানি।

সেজকাকা বললেন : নামের যে একটা মানে হয় তা আজকালকার ছেলেমেয়েরা মানে না, শুনতে ভাল একটা শব্দ পেলেই সেই নাম রাখে। রাখুক। নামের সঙ্গে যখন প্রকৃতি মেলে না, তখন কিন্তু এবং অতএব নাম রাখলেও চলে। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মেয়ে দেখলেই তাকে আকাশের চাঁদ ভেবো না। কবিতো জিনিষটা বইএর পাতাতেই ভাল, জীবনের জন্যে সাদা চোখের দরকার।

আমি খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বললাম : কিন্তু এতো সাদা চোখের মতো কথা হল না সেজকাকা। একটা মেয়ের সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু না জেনেই আপনি ক্ষেপে উঠেছেন!

সেজকাকা বললেন : আমার বিশ বছরের ধারণা তো আজ তোমার কথায় পাল্টাবে না। তোমার বিশ্বাস না হয়, তুমি খোঁজখবর নিতে পার।

বিশ বছরের ধারণা!

তা হবে বৈকি, ১৯৪৭ থেকে ধর, ১৯৬৫। আঠারো বছর তো হয়েছে। ১৯৪৭এ কী হয়েছিল সেকথা আমার জানা নেই। তাই আশ্চর্য হলাম তাঁর কথা শুনে। আর সেজকাকা স্বগতভাবে বললেন : সেদিনও এমনি একখানা মুখ দেখেছিলাম, এমনি চৌকো ধরনের! কী মর্মান্তিক সেই অভিজ্ঞতা!

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। মনে হল যে আমার নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁর কানে পৌঁছলে হয়তো আর কিছু বলবেন না। বুঝতে পারছি যে নিজের বিগত যৌবনের কথা তাঁর মনে পড়েছে। ১৯৪৭ সালে তাঁর বয়স আর কত হবে! চাকরি থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন এই বছরে, মানে ১৯৬৫ সালে। কাজেই ১৯৪৭ সালে তাঁর বয়স ছিল সাঁইত্রিশ। আমাদের চেয়ে বছর দশেকের বড়। এ কালে আমরা যতদিন অবিবাহিত থাকি, সেকালে তা কেউ থাকত না। অল্প বয়সে বিবাহ বাংলাদেশ থেকে উঠে গেছে অর্থনৈতিক কারণে। লেখাপড়া শিখে আমরা যখন উপার্জন শুরু করি, তখন আয়ের স্বল্পতার জন্যে নিজেরাই বিবাহ করতে ভয় পাই। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশটা এরকম ছিল না। সেজকাকা কেন বিবাহ করেননি, তা আমাদের জানা নেই। জানবার উপায়ও নেই। তার কারণ এসম্বন্ধে আমাদের কোন কৌতূহল ছিল না। আজ এই মুহূর্তে আমার কৌতূহল জন্মাল। মনে হল যে এই আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মানুষটির জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল যে মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর একটা ভয় জন্মেছে। সে কি ১৯৪৭ সালের ঘটনা! সে তো আমাদের দেশ স্বাধীন হবার বছর। আনন্দের বছর! না না, আনন্দের বলব না, দুঃখেরই বলা উচিত। চার যুগের ভারতবর্ষ দুভাগ হয়ে গেল। রাজনীতির করাত দিয়ে দুখণ্ড করা হল বাংলা আর পাঞ্জাবকে। কতলোকের যে প্রাণ গেল, তার হিসেব আমার মনে নেই। তখন আমাদের বয়স কম, স্কুলে পড়ি খুব নিচের ক্লাসে। রাজনীতি বুঝি না, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতাও হয়নি। চারদিকে অরাজকতা দেখেছিলাম, আর দেখেছিলাম কান্না। অন্ধকার হলেই মানুষের কান্না শুনতাম। তারপর সব শান্ত হয়ে গেল এই ঘটনার কথা বেমালুম ভুলে গেলাম।

কিন্তু সেজকাকা এই ১৯৪৭ সালের উল্লেখ কেন করলেন! তাঁর বুকে কি কোন কান্না বিঁধে আছে! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : ১৯৪৭ সালে আপনি কোথায় ছিলেন সেজকাকা?

সেজকাকা কোন উত্তর দিলেন না, গম্ভীরভাবে চুরুট টানছিলেন তিনি। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করবার সাহস আমার হল না। কিন্তু হঠাৎ জেগে ওঠার মতো করে সেজকাকা জিজ্ঞাসা করলেন : কী বললে?

১৯৪৭এ আপনি কোথায় ছিলেন তাই জানতে চাইছি।

কতকটা স্বগতভাবে তিনি উত্তর দিলেন : এই কাশ্মীরে।

কাশ্মীরে!

আশ্চর্য অভিভূত হলাম আমি। সেজকাকা একদিনও বলেন নি যে কাশ্মীরে তিনি কোনকালে এসেছিলেন, বরং বলেছিলেন : একবার কাশ্মীরে যাবার বড় শখ হয়েছে।

দেশে তিনি এই কথা বলেছিলেন, চাকরি থেকে অবসর নেবার পরে। আমরা ভেবেছিলাম যে এদেশটা তাঁর দেখা নয় বলেই বোধহয় দেখবার শখ হয়েছে। আমারও তো তাই। এই শখ না হলে কি মানিকের সেজকাকার সঙ্গে আসতে রাজী হয়েছি। ভদ্রলোক বললেন, তোমার খরচের কোন ভাবনা নেই, আমার ভাবনা ভাবলেই তোমার চলবে। আমি ভাবলাম এ সুযোগ হারালে আমার চলবে না। সুযোগ জীবনে একবারই আসে। কাজেই কাশ্মীর দেখার সুযোগ আমি হারাইনি, সেজকাকার সঙ্গে মানিয়ে চলবার দায়িত্ব নিয়ে আমি চলে এসেছি। আজ মনে হল যে এই ভদ্রলোককে আবিষ্কার করতেও আমি সক্ষম হব। তার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন। সেজকাকা কোন উত্তর দিলেন না দেখে আমি আর কোন কথা বললাম না।

(দুই)

খোলা দরজা দিয়ে আমি বাহিরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। নানা পণ্যসম্ভার নিয়ে শিকারাগুলি যাতায়াত করছে। আমরা যেখানে আছি, তা ডাল গেটের কাছে নয়, আবার ডাল লেকেও নয়। নদীর মতো যে জলরাশি ডাল লেক আর ঝিলাম নদীকে যুক্ত রেখেছে, আমরা তারই উপরে আছি, নেহরু পার্কের কাছাকাছি। এ জায়গাটা পরিচ্ছন্ন অথচ নির্জন নয় ডাল লেক বা নাগিনলেকের মতো। আবার ডালগেট অঞ্চল বা চেনার বাগের মতো অপরিচ্ছন্নও নয়। পাশাপাশি হাউসবোটগুলো নোঙর করে আছে। পিছনে শক্ত মাটি আর সামনে জল। এই জল পেরিয়ে রাজপথ শহরের দিক থেকে গেছে মোগল গার্ডেনের দিকে। তার পিছনে শঙ্করাচার্য পাহাড়, চুড়োর উপরে মন্দিরটা নিচে থেকে দেখা যায় না। দেখা যায় দূরে গেলে। হাউসবোটের ভিতরে বসে আমরা পাহাড়ের ন্যাড়া দেহ দেখি, আর দেখি সজারুর মতো ঝাউগাছ এই পাহাড়ের ধূসর দেহটা সবুজ করে রেখেছে। কখনও একখানা টাঙ্গা বা মোটর বাস যাচ্ছে মোগল গার্ডেনের দিকে, কখনও ভ্রমণ বিলাসীদের দীর্ঘ দল বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে। বৈচিত্র্য শুধু শিকারার। এই শিকারা দেখেই অনেক সময় কাটানো যায়। শৌখিন লোকেরা হাউসবোট থেকে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। কেউ মোগল গার্ডেনস দেখতে বেরিয়েছে—চশমা শাহী, নিশাত বাগ প্রভৃতি। কেউ ডাললেকের চার চিনার দেখবে, কেউ দেখবে নাসিমবাগ। কেউ বা হরি পর্বত হজরতবল মসজিদ দেখতে দেখতে নাগিনলেক চলে যাবে। কেউ আবার উল্টোদিকেও যাচ্ছে ডালগেটের দিকে। গেট পেরিয়ে চেনার বাগের ভিতর দিয়ে ঝিলম নদীতে পৌঁছবে, সেখানে দেখবে সাত পুলের শহর শ্রীনগর। এইসব সাজানো সুন্দর শিকারাগুলির ফাঁকে ফাঁকে পণ্যসম্ভার নিয়ে অন্য শিকারও ঘোরাফেরা করছে। এগুলির কারও ছাদ আছে, কারও নেই, ঝালর আর পর্দা নেই কারও, গদি আঁটা বসবার জায়গাও নেই। সে জায়গায় তারা মনোহারি জিনিষ সাজিয়েছে শাকসব্জী ফল ফুল, সবার আলাদা শিকারা। রেশমি ও পশমী কাপড়, কাঠের জিনিষ পেপার-মেসি কী নেই। ফটোগ্রাফার যাচ্ছে, হাউসবোট থেকে এক্সপোজড ফিল্ম নিয়ে গিয়ে ডেভেলপ ও প্রিন্ট করে পৌঁছে দিয়ে যাবে। পোস্ট-অফিস ভেসে যাচ্ছে—চিঠি ফেল, মনিঅর্ডার কর রেজেস্ট্রী কর, ডাকটিকিট পোস্টকার্ড কেনো। শুধু ডাকপিয়ন আসে না শিকারায় চেপে, তারা রাস্তা থেকে হাউসবোটের নাম ধরে ডাকে। প্রত্যেক হাউসবোটের নাম আছে, নাম আছে ভাড়ার শিকারার। নানারকমের দেশী ও

বিদেশী নাম। ডাক শুনলেই হাউসবোটের লোকেরা কান খাড়া করে, নিজেদের নাম শুনলেই শিকারা নিয়ে ছুটে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসে। এ এক বিচিত্র জগৎ। এ জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। তাই এখনও অনেক কৌতূহল আছে। সেজকাকা গভীর ভাবনায় ডুবে গেছেন দেখে আমি বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে ডাললেকের দিক থেকে একটা জেলের নৌকো এদিকেই আসছে। কাশ্মীরের ট্রাউট মাছ শুনেছি ভারি সুস্বাদু। ওরা মাছ বিক্রি করবে কিনা দেখবার জন্যে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

নৌকোটা এদিকেই আসছিল। আমি দেখলাম যে এ নৌকাটা শিকারার মতো নয়, আমাদের দেশের ডিঙিনৌকোর চেয়ে চওড়া বেশি, উপরে একটা নিচু ছই আছে, তার ভিতরে বসবাসের ব্যবস্থা। একটি গোলগাল ছেলেকে কোলে নিয়ে একটি স্ত্রীলোক বসেছিল বাহিরে, কী করছিল তা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। পুরুষ মানুষটি দাঁড়িয়ে জাল ফেলছিল জলে। আর স্রোতে ভাসতে ভাসতেই নৌকোটা এদিকে আসছিল।

একটুখানি পরেই আমি আশ্চর্য হলাম আমিরাকে দেখে। হাউসবোটের পাশের সরু তক্তার উপরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকাতে দেখেই দাঁত বার করে হাসল। আমি তার ভাষা জানি না, সেও বোঝে না আমার ভাষা। তাই ইসারাতেই কাজকর্ম সারতে হয়। সে বোধহয় জিজ্ঞাসা করল ঃ ডাকব ওকে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম ঃ হাঁ।

ঠিকই বুঝেছি, সেও বুঝেছে আমার কথা। মুখটা উপরে তুলে ডান হাতটা মুখের উপরে এনে একটা টারজানি কায়দায় চিৎকার করল। আর দূরের নৌকো থেকে স্ত্রীলোকটি ফিরে তাকাল আমাদের দিকে। আমিরার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে সে এখন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছে। শুনতে পেয়েছে তার ডাক, জাল গুটিয়ে এবারে এদিকেই আসবে। এলোও তাই। জালটা নামিয়ে রেখে গোল দাঁড় ছপ ছপ করে বেয়ে চলে এল।

আমার হয়ে আমিরাই কথাবার্তা বলল। নৌকোর পাটাতনের নিচে থেকে একটা চকচকে জ্যান্ত মাছ বার করল লোকটা, হাত বাড়িয়ে আমিরা সেই মাছটি হাতে নিয়ে আমাকে দেখাল। রুই নয়, কাৎলাও নয়, এরই নাম ট্রাউট কিনা জানি না। ট্রাউট তো ইংরেজি নাম, এরা কী বলে সে প্রশ্ন আমি বোঝাতেই পারলাম না। আমিরা ভাবল যে আমি দাম জানতে চাইছি। দরাদরি করে দুসেরের মাছটার দাম এক টাকায় নামায়। তারপর আঙুলে দেখিয়ে বোঝাল যে এক টাকায় রফা হয়েছে। কলকাতার মানুষের কাছে এ অবিশ্বাস্য ঘটনা। পকেট থেকে আমি একটি টাকা বার করে দিলাম।

বাহিরে কোলাহল শুনে সেজকাকাও বেরিয়ে এসেছিলেন। বললেন ঃ মাছ কিনলে নাকি?

আমি বললাম ঃ হুঁ।

আমিরা মাছ নিয়ে চলে গেল। আর সেজকাকা বললেন ঃ তোমরা যে কলকাতার ছেলে আমি তা ভুলেই যাই। মাছের কথাটা আমার মনে থাকে না। ওকে বলে দাওনা, রোজ এমনি করে মাছ দিয়ে যাবে।

আমি চেষ্টা করলাম সেই কথা বোঝাবার, কিন্তু পারলাম না। এরা হিন্দী ভাল বোঝে না, উর্দু বোঝে কিনা তা জানবার উপায় নেই। আমিও উর্দু জানি না। ইংরেজী অচল। কাশ্মীরের এই মানুষগুলির সঙ্গে আমাদের ইসারায় ভাব বিনিময় করতে হবে।

কিন্তু এরকমের মানুষের সংস্পর্শে আমরা কম আসি। যাদের আমরা শ্রীনগরের পথেঘাটে দেখি, দেখি দোকানে হাটে শিকারায় টাঙ্গায়, তারা প্রায় সব ভাষাই বোঝে। ব্যবসায়ীরা এমনি পটু যে সকল দেশের মানুষকে তারা সমান ঠকাতে পারে। নিজেদের দেশের সরল মানুষকেও তারা ঠকায়। তাদের শ্রমের সিকি মূল্য দিয়ে বিদেশীদের কাছে ষোল আনার বেশি আদায় করে। সেজকাকা আমার বিফল চেষ্টা দেখে হেসে বললেন ঃ থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে তোমার মাছটা যাতে নষ্ট না হয় তাই দেখ। মাছ রাঁধতে জানত? না জানলে লজ্জা পেওনা, আমি বাতলে দেব।

আমি বললাম ঃ খানকয়েক ভাজা, আর বাকিটা ঝাল।

সেজকাকা বললেন ঃ কিন্তু সবটা একবেলায় খেও না। শুনেছি—না থাক শোনা কথা। শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। যতটা খেতে পার খাও, বাকিটা রেখে দিও। ভেজে রেখে দিলে এদেশের আবহাওয়ায় বোধহয় নষ্ট হবে না।

ঠিক এই সময়ে ফুলওয়ালা এসে নৌকো বাঁধল আমাদের সামনে। সরু ডিঙি নৌকো, তার ছাদ নেই উপরে। একধারে ফুলওয়ালা বসেছে দাঁড় হাতে, অন্যদিকে অজস্র মরসুমি ফুল। এ লোকটা পরিস্কার হিন্দী বলে; ফুল সাজিয়ে দেব?

বসবার ঘরের দেওয়ালে আমি ফুলদানি দেখেছি, ফুলদানি আছে সেণ্টার পিসের উপরেও। ভেবেছিলাম, কিছু ভাল ফুল বেছে নেব। কিন্তু সেজকাকা গর্জন করে বললেন ঃ নো।

নৌকোর উপরে বসেই লোকটা চমকে উঠল, আর আমার দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেই নৌকো নিয়ে সরে গেল।

আমার দিকে চেয়ে সেজকাকা বললেন ঃ তুমি জান না মিহির, এইসব ফুলওয়ালা আর—

কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। সহসা তিনি কোন শব্দ শুনে উৎকর্ণ হলেন। একটা গানের সুর আমি শুনতে পেলাম। পাশের হাউসবোটে সেই মেয়েটি বোধহয় গাইছে, কিংবা রেডিওতে গান হচ্ছে। না, গানের সঙ্গে তো বাজনা বাজছে না। তবে মেয়েটি বোধহয় খালি গলায় গাইছে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন সেজকাকা, বললেন ঃ কাণ্ড দেখেছ!

বলে দুপদাপ শব্দে কাঠের পাটাতন কাঁপিয়ে তিনি বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন; চেঁচিয়ে ডাকলেন ঃ আমিরা।

আমি তাঁর পিছনে ঘরে এসে ঢুকতেই বললেন ঃ ডাকোতো আমিরাকে, এধারের জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিক।

আমি আশ্চর্য হলাম ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে। ফুল ভালবাসেন না, গান শুনে ক্ষেপে যান। এরকম মানুষ আমি এই প্রথম দেখলাম। কিন্তু তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারলাম না। আমিরাকে ডাকবার জন্যে বেরোতে গিয়েই দেখলাম যে সে নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছে। সেজকাকার কথামতো জানালাগুলো সে বন্ধ করে দিল। কিন্তু জানালা বন্ধ করে দিলেই যে পাশের হাউসবোটের গান শোনা যাবে না, এমন কথা নয়। সেজকাকাও তা শুনতে পাচ্ছিলেন। এক সময় অত্যন্ত বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হিন্দী গান, না বাংলা

বললাম ঃ তা বোঝা যাচ্ছে না।

সেজকাকা বললেন ঃ বাঙালী মেয়েদের মাথা খেয়েছে রবি ঠাকুর।

আপত্তি জানিয়ে আমি বললাম ঃ এ আপনার রাগের কথা। রবীন্দ্রনাথের জন্যেই বাঙলার মাথা উঁচু হয়েছে। পৃথিবীর লোক স্বীকার করছে যে ভারতবর্ষের লোকেও ভাবতে জানে সভ্যমানুষের মতো।

সেজকাকা বললেন ঃ ও তুমিও একই দলে!

দলের কথা নয় সেজকাকা, আপনিই বলুন, গর্ব করবার মতো বাঙালীর আজ আর কী আছে!

তুমি যে দেখছি নেতাজীর মতো কথা বলছ! নেতাজীইতো বলেছেন, বাঙালীর ভাবপ্রবণতা আর কল্পনা শক্তি আছে, আছে আদর্শ আর আত্মবিশ্বাস। আর এই সম্বল আছে বলেই দুঃখকষ্ট আর অত্যাচারের চাপে বাঙালীর মেরুদণ্ড আজও ভাঙে নি।

একটু থেমে বললেন ঃ নেতাজী বিশ্বাস করতেন যে বাঙালীর মেরুদণ্ড কোনদিন ভাঙবে না, কিন্তু—

সেজকাকা থামতেই আমি বললাম ঃ বলুন।

তিনি ইতস্তত করলেন একটুখানি, তারপরে বললেন ঃ ঐ ভাবপ্রবণতার জন্যেই বাঙালী মরবে। এ যুগে বাঁচতে হলে ঐ বাস্তবকে দেখতে হবে মুখোমুখি, ভাবপ্রবণ হলে চলবে না। বুঝলে মিহির—

সেজকাকা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সহসা থেমে গেলেন। পাশের হাউসবোটের গান যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। না, এ বোধহয় খালি গলার গান নয়, টেপরেকর্ডে গান বাজছে। কিংবা গানের কেউ তাল দিতে শুরু করেছে। তাই জমে উঠেছে গান। সেজকাকা অস্থিরভাবে বলে উঠলেন ঃ না, এখানে আর আমাদের থাকা চলবে না।

আমি উত্তর দিলাম না কোন।

সেজকাকা বললেন : তুমি ভাবছ, আমি ...ন ভালবাসি না বলে এই কথা বলছি। কিন্তু তা নয়। আমি ঐ চোকো মুখ আর ...য়ানের মধ্যে একটা—

একটা কী সেজকাকা?

একটা ভয়ানক আশঙ্কা করছি। তুমি ছেলেমানুষ মিহির, আর আর্মিতে কখনও কাজ করনি। কাজেই তুমি এই পৃথিবীটা যে চোখে দেখ, আমি সে চোখে দেখতে পারি না। আমার চোখ অন্যভাবে অভ্যস্ত হয়েছে। আমি দিগন্তের গাছের পিছনে কামান সাজানো আছে কিনা দেখতে চেষ্টা করি।

আমার হাসি পেয়েছিল, কিন্তু এক-রকমের ভয়ে আমি হাসি সম্বরণ করলাম। বললাম : এ খুব সাধারণ ঘটনা সেজকাকা, এর উপরে আপনি খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

যতখানি দেওয়া উচিত ততখানিই দিচ্ছি। কিন্তু ঐ অর্বাচীন অফিসারটি কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেই আশ্চর্য হচ্ছি। এর ভুল করা উচিত নয়।

আমি চুপ করে রইলাম, কিন্তু সেজকাকা চুপ করলেন না। বললেন : গত এপ্রিলের ঘটনা তোমরা এত শীঘ্র ভুলে গেলে?

এপ্রিলে কোন ঘটনার কথা সেজকাকা বলছেন, আমি তা বুঝতে পারলাম না। তাই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম নীরবে।

সেজকাকা বললেন : এই যে রান অব কচ্ছে যে ঘটনাটা ঘটে গেল তারপর কি আমাদের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত নয়? বিশেষ করে এই কাশ্মীরে?

মনে পড়েছে। মাস চারেক আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান কচ্ছের সীমান্তে সংঘর্ষ বাধিয়ে-ছিলেন। মনে হয়েছিল যে তাঁর সেনা-বাহিনী আক্রমণ করছে ঐ অঞ্চল। কিন্তু ঐ অনুর্বর জলহীন অঞ্চলটি আক্রমণ করে দখল করবার চেষ্টার আমি কোন অর্থ খুঁজে পাইনি। কিন্তু তার জন্যে সেজকাকা আমাদের সতর্ক হতে বলছেন কেন? আমি প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে।

সেজকাকা কতকটা শান্ত হয়ে বললেন : এ কথা তুমি না বুঝলে তোমাকে দোষ দেব না। কিন্তু বোঝালে তুমিও বুঝবে।

বলে সেজকাকা আমাকে আয়ুব খানের প্ল্যান বোঝাতে বললেন। আয়ুব নাকি মাওএর কাছে এই শিক্ষা পেয়েছে। বললেন : মনে নেই তোমার বছর তিনেক আগেও 'হিন্দী চীনা ভাই ভাই' ছিল। চৌ এন লাই দিল্লী এসে নেহরুর গলা জড়িয়ে ধরে ভাব দেখিয়ে গেল, আর দেখে গেল ভারতের আভ্যন্তরিণ গোলমাল। আমাদের দলাদলি তো ঐতিহাসিক। কলিঙ্গ যুদ্ধে অশোক তার তলোয়ার ফেলে দিয়ে অহিংসা শেখালেন দেশের লোককে। যুদ্ধ ছেড়ে আমরা শান্তিকামী হয়ে উঠলাম। এই বাণী নিয়ে দেশদেশান্তরে ছুটলাম। আর অন্য দেশের ধর্মের বাণী শেখাতে এ দেশে এসে দেশ দখল করে বসল। সেও আমাদের দলাদলির সুযোগ নিয়ে। অস্বীকার কর এই কথা?

বলে সেজকাকা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললাম : ইতিহাস তো তাই বলে।

বলেতো! তবেই দেখ, এই ইতিহাস পড়ে বিদেশের লোক কী ভাবে আমাদের সম্বন্ধে! দলে দলে দলাদলি নয়, দলের মধ্যে দলাদলি। লাল আন্দোলনে দেশটাও খণ্ড খণ্ড হচ্ছে। আর এরই জন্যে নেতারা উঠে পড়ে লেগেছে। দেশের উন্নতি হোক বা না হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না, নিজের উন্নতি হলেই হল। আর ভিতরের এই খবরটি চরের মুখে জেনে মাও একদিন খেলা দেখাতে চাইল। ১৯৬২ সালে নেফার সীমান্তে আক্রমণ শুরু করবার আগে আকাসি চীন লাদাখে বাধাল সীমান্ত সংঘর্ষ। উদ্দেশ্য দুটো—ভারতের শক্তির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে, আবার একটা দেশের কিছু অংশ কেড়ে নেবার সপক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও হবে।

আমি বললাম : কিন্তু চীনারা তো কিছু কেড়ে নেয় নি, হঠাৎ একদিন যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে গিয়েছিল।

সেজকাকা গম্ভীর হয়ে বললেন : বিদেশীদের মতো সেদিন আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম এই ভেবে যে জয়ের মুখে তারা যুদ্ধ বন্ধ করল কেন! কী মনে হয়েছে জানো? আমার মনে হয়েছে যে ভারত-বাসী যে এমন দেশাত্মবোধের মরণপণ নিয়ে সহসা সংহত হয়ে উঠতে পারে, মাও তা স্বপ্নেও ভাবে নি। তাই ভারতের পাল্টা আক্রমণের আগেই তারা সসম্মানে সরে গিয়েছিল। আর আয়ুব খান সেদিন ভারতের দুর্দশা দেখে কাশ্মীর জয়ের জন্যে কোমর বাঁধতে লেগেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের হিসেব কিছু রাখ, না তার কোন দরকার মনে কর না?

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

সেজকাকা নিজেই বললেন : কাশ্মীরে সিজ-ফায়ার লাইন হল চারশো সত্তর

মাইল। আর এই লাইনে সিজ-ফায়ার ভায়োলেসন ১৯৬৩ ও ৬৪ সালে ছিল ৪৪৮ আর ৫২২। এ বছরের প্রথম সাত মাসে কত হয়েছে জান? আঠারো শো। বিশ্বাস করতে পারবে এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই! চীনাদের হাতে মার খেয়েও এদের অপমান বোধ জাগে নি, তাই দায়িত্ব-হীনের মতো নাচগান করছে কাশ্মীরের হাউসবোটে। ছোঃ।

বলে প্রবল ঘৃণায় সেজকাকা নাক সেঁটকালেন। আর আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

—তিন—

দুপুরের আহারের সময় সেজকাকা বললেন: তুমি আমাকে পাগল ভাবনি তো মিহির?

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম: পাগল ভাবব কেন?

মিথ্যে বোলো না, তুমি আমাকে পাগল ভাবলেও আমি আশ্চর্য হব না। তুমি এ যুগের ছেলে হয়েও ঠিক এ যুগের নও, তাই একথা বলছ। শীতাংশু হলে তোমার মতো বলত না।

আমি নিঃশব্দে খেতে লাগলাম। আর সেজকাকা খানিকক্ষণ পরে বললেন: আমার বন্ধুবান্ধবরাও অনেকে আমাকে পাগল ভাবে, তাদের কথাবার্তাতেই আমি তা বুঝতে পারি। নিজেদের মধ্যে যে হাসি-মস্করাও করে, তাও বুঝতে পারি।

একটু থেমে বললেন: কিন্তু মিহির, পাগল বলতে তোমরা যে পাগল ভাব, আমি ঠিক সে-ধরনের পাগল নই। এরোপ্লেন তৈরি হবার আগে যে-লোকটা আকাশে উড়বে ভেবেছিল, তাকে তোমরা পাগল বলবে। কিন্তু সত্যিই কি সে পাগল? নিশ্চয়ই না। তার ভাবনা যুগের ভাবনায় প্রভাবিত নয়। সে ভবিষ্যৎ ভাবছে। নিজের দূরদৃষ্টি দিয়ে কেউ ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছে দেখলেই তাকে তোমরা পাগল বল। বল, তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু বিদেশীর কাছে বারে বারে মার খাবে, এ আমি সইতে পারব না।

আমি বললাম: মার খাবার কথা আপনি ভাবছেন কেন? ঐ একটি মেয়েকে দেখে, আর তার গান শুনে?

সেজকাকা বললেন: ওকে তোমার সঙ্গে দেখলে আমি কিছু বলতাম না। আমার যৌবন আর নেই বলে কি তোমাদের যৌবনকে আমি অস্বীকার করি! কখনই না। ঐ লোকটা আর্মির অফিসার, ইউনিফর্ম পরে আছে। পিছন ফিরে ছিল বলে ওর র‍্যাঙ্ক আমি দেখতে পাইনি। ক্যাপ্টেনই হোক, আর মেজরই হোক, এই সময় কি ওর মেয়েমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি সাজে!

বাধা দিয়ে আমি বললাম: মেয়েমানুষ বলবেন না।

আলবৎ বলব। ও ওর স্ত্রী নয়, প্রেমিকাও নয়। ও কাশ্মীরী নয়, হিন্দুও নয়। ওকে আমি চিনব না!

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সেজকাকা। তারপরেই নিবে গেলেন ভিজে বারুদের মতো। তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে বললেন: বুঝলে মিহির, সিঁদুরে মেঘ দেখলে আমি আজও ডরাই। তুমি কিছু মনে কোরো না যেন।

বলে উঠে পড়লেন।

এ একেবারে অন্য মানুষ, গলার স্বরও যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তিনি নিজে ঘরপোড়া গরু কিনা, এ-কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। সে-প্রশ্ন আমার মুখে বড় অশোভন হত। কিন্তু তাঁর মনের একটা গভীর বেদনা আমি অনুভব করলাম। সিঁদুরে মেঘের নামে অতীতের কোন দুরন্ত ঘটনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

বাথরুমে মুখ-হাত ধুয়ে সেজকাকা এখন বিছানায় শোবেন, ঠিক আধঘণ্টা ঘুমোবেন। তাঁর নাক ডাকবে, আর আধ-ঘণ্টা পুরো হলেই নাক ডাকা থেমে যাবে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠবেন তিনি, চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে বসবার ঘরে চলে আসবেন। তারপর বসবেন চার্চিলের বই নিয়ে। বুয়োর যুদ্ধের কথা তিনি আগেও পড়েছেন, আবার পড়ছেন। চার্চিলকে তিনি বোধহয় ভালবাসেন।

সেজকাকার ঘুমের অভ্যাস দেখে আমি প্রথম দিন আশ্চর্য হয়েছিলাম। তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে, খাবার পর আধঘণ্টা ঘুমোবার অভ্যাস। নেপোলিয়নের মতো ঘোড়ার উপর ঘুমোতে পারবো না, কিন্তু দাঁড়িয়ে বা বসে ঘুমোতে পারেন। বসে ঘুমোতে তাঁর কোন অসুবিধাই হয় না। আর্মির কয়েকজন গার্ড নাকি ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটতে পারত। ইউনিফর্ম-পরা অবস্থায় কাঁধে বন্দুক নিয়ে গার্ড দিয়েছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত হেঁটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। কোন শব্দ হলেই জেগে যাবে, কিন্তু চমকে উঠবে না। সেইভাবে হাঁটতে হাঁটতেই ব্যাপারটা বুঝে নেবে। এরকম গার্ড তিনি নিজের চোখেও দেখেছেন। আমি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ঘুমোলে ঠিক আধঘণ্টা পরে উঠে পড়েন কী করে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই তিনি এই গল্প বলেছিলেন। তাঁর মতে ডিসিপ্লিন মানে নিয়ম মানাটাই বড় কথা। নিয়ম মানার অভ্যাসে মানুষ যন্ত্র হয়ে যাবে। ঘড়িতে যেমন এলার্ম বাজে, সৈনিকের চেতনা সেই রকম ঘড়ির অ্যালার্মের মতো। ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেবে।

আর্মি ছাড়বার পরে সিভিল অফিসেও তিনি এই নিয়ম মেনে চলেছেন। দেড়টায় তাঁর টিফিনের ছুটি হত। দুখানা স্যান্ডুইচ আর এক কাপ কফি তিনি সঙ্গে নিয়ে অফিসে যেতেন। এই টিফিনে তাঁর পাঁচ মিনিট সময় লাগত। পঁচিশ মিনিট তিনি চোখ বুজে ঠিক দুটোয় সোজা হয়ে বসতেন। সেজকাকা হেসে বলেছিলেন: আমার কলিগরা বলত, মেজর, তোমার ঘুম ভাঙা দেখে আমরা ঘড়ি মেলাই। বলে প্রবল কণ্ঠে তিনি হেসে উঠেছিলেন।

এ-কথা যে সত্য, কয়েকদিনেই আমি তা মেনে নিয়েছি। ঘড়ির কাঁটা ধরে তিনি সকালবেলায় ওঠেন বাড়িতে। মর্ণিং টির পরে হাঁটতে বেরোতেন, এখানে ব্রেক-ফাস্টের পরে বেরোচ্ছেন। সে আমার আলস্যের জন্যেই। আমি তাঁর মতো সকালে উঠতে পারি না। দিনের বেলায় গরম থাকলেও রাতে শীত করে। কম্বল ফেলে দিয়ে ভোরবেলায় উঠতে বেশ কষ্ট হয়। মর্ণিং টির অভ্যাস আমার নেই। বাড়িতে এসব শৌখিনতার কথা বললে মার খেতে না হলেও টিটকিরি শুনতে হবে বৌদিদের। সেজকাকা নাকি নিজেই চা তৈরি করে খান, তারপর বেরিয়ে যান এক-একদিন এক-একদিকে। ফিরে এসে আর পাঁচজনের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খান। এখানে তিনি আমাকেও মর্ণিং-টির জন্যে ডেকেছিলেন। কিন্তু ভোরবেলার এই চায়ের থেকে কম্বলের তলাটা আমার বেশি আরামপ্রদ মনে হয়েছে। আর শুয়ে শুয়ে সেজকাকার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিতে লজ্জা হয়েছে বলেই তাঁর প্রস্তাবে রাজী হইনি। ব্রেক তৈরি হয়েছে খবর পেয়ে আমি উঠে পড়ি, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে টেবিলে এসে বসি।

তারপর সেজকাকার সঙ্গে আমার বেরোতে হয়। হন হন করে ভদ্রলোক হাঁটেন, তাঁর সঙ্গে সমানে পথ চলতে কষ্ট হলেও তা আমি প্রকাশ করতে লজ্জা পাই। আর কষ্ট হচ্ছে না বলে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলে খুশী হয়ে বলেন: তুমি দেখছি এ-যুগের ছেলে হয়েও ঠিক এ-যুগের মতো নও। কাটি কাটি করে সত্য কথা বলতে পার না। শীতাংশু হলে তোমার মতো মিথ্যে বলতে পারত না।

আমি মিথ্যা বলেছি বুঝতে পেরেও তিনি বলেছেন: বুঝলে মিহির, আমি তোমার নিন্দে করছি না। আমাদের যুগে এটা প্রশংসার কথাই ছিল। কিন্তু দিন এমন পাল্টে গেছে যে, আমরা যা ভাল বলেছি, তাকে মন্দ বলতেই হবে। যে বলে না সে বোকা। কিন্তু সকালবেলায় এই হাঁটার অভ্যাসটা যে বোকামি নয় তা দেখতেই পাচ্ছ। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছি, কোনদিন অসুখ করতে দেখেছ আমার। পি টি মানে ফিজিক্যাল ট্রেনিং নিয়েছি আর্মিতে, সেই অভ্যাসটা আজও ছাড়িনি। ভারতীয় সাধুদের দেখেছ? ভোরবেলায় স্নান করে আসন করেন। সেও পি টি। সাধুদের স্বাস্থ্য দেখো, কখনও অসুখ করে না। চুপচাপ বসে থাকে বলে ওরা আর একটি জিনিস করে। স্নানের পরেই সারা গায়ে ভস্ম মাখে। লক্ষ্য করলে দেখবে যে, ঐ শুকনো ভস্ম দেখতে দেখতেই ভিজে যায়। তারপর হাওয়ায় আবার শুকোয়। মানে, দেহের রস বাইরে টেনে নেয় ঐ ভস্ম, সারাদিন বসে থাকলেও বাতে ধরবার ভয় নেই। বুঝলে?

আশ্চর্য মানুষ এই সেজকাকা, যতই তাঁকে দেখছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি। অকারণে কোন কাজটি করো না, আবার কারণ থাকলে সব কাজই করো। খেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম করাও বোধহয় স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু আমার এ-অভ্যাস নেই। আমরা নাকে মুখে খেয়ে স্কুল-কলেজে দৌড়েছি। এখন চাকরি করতেও ছুটছি। দুপুরে ঘুমোই শুধু ছুটির দিনে, সে প্রায় সারা দুপুর ধরে। একবার শুয়ে পড়লে আধঘণ্টা পরে আমি কিছুতেই উঠতে পারব না। আর এই কাশ্মীরের আবহাওয়ায় আমার শোবার ইচ্ছাও হচ্ছে না। আমি খেয়েদেয়ে হাউসবোটের ছাদের উপর উঠি। সেখানে একখানা বড় ছাতার নিচে খান-দুই চেয়ার আর টেবিল আছে একখানা। বিকেলের চা-খাবার ব্যবস্থা আছে। কাঠের মই দিয়ে উপরে উঠতে হয়। চারিদিকের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারি সুন্দর দৃশ্য। শৌখিন যাত্রীদের যাতায়াত অব্যাহত থাকে। কেউ ফিরছে, কেউ বেরোচ্ছে। জোড়ায় জোড়ায় বেরোয় এক-একখানা শিকারায়। সে-সব শিকারার এক-জন মাঝি। লোক বেশি হলে দুজন মাঝির দরকার। বড় বড় পার্টির জন্যে অন্য ব্যবস্থা।

আজও আমি খাবার পরে উপরে উঠলাম। এখন উত্তাপ রয়েছে। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় এখন গ্রীষ্মকাল। অগস্ট মাস পড়েছে। দিনের বেলায় গরম কাপড়ের দরকার হয় না। সকাল-সন্ধ্যায় একখানা চাদর গায়ে থাকলেই যথেষ্ট, কিংবা একটা হাত-কাটা সোয়েটার। আর দুপুরে রোদের উত্তাপ এমন বাড়ে যে ছাতার নিচেই আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু উপরে উঠে আমি হকচকিয়ে গেলাম। পাশের হাউসবোটের ছাদে সেই মেয়েটি বসেছে আর্মি অফিসারের কাছ ঘেঁষে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বসেছে। সামনের পাহাড়ের দিকে তাদের মুখ ছিল, আর চোখে কালো চশমা ছিল সেই মেয়েটির। আমাকে দেখতে পেয়েছিল কিনা জানি না, আর আমি বসব না নিচে নেমে আসব তাও বুঝতে পারছিলাম না। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে আমি নিঃশব্দে চেয়ারখানার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বসে পড়লাম। যেন তাদের দেখতে পাইনি, আর এদিকে মুখ করে তাদের দেখতেও পাব না।

কিন্তু মন আমার উল্টো মুখে থাকতে রাজী হল না। বারে বারেই ফিরে আসতে লাগল পিছনের মানুষদুটির দিকে। সেজ-কাকার যুক্তি আমি মেনে নিয়েছি। আর্মির অফিসার যদি ছুটিতে আসে কাশ্মীরে আর হাউসবোটে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে, তাহলে কারও কিছু বলবার নেই। এ-ভদ্রলোক যে ছুটিতে নেই, তা এর ইউনিফর্ম দেখেই বুঝতে পারছি। কোন কাজেই এসেছে এখানে, হয়তো কয়েকটা দিন স্ফূর্তি করে যাবে। কিন্তু এই মেয়েটা কে? কাশ্মীরী মেয়ে বলে সত্যিই মনে হচ্ছে না, মুখখানা তেমন গোলগাল কোমল নয়, সে সরস প্রসন্নতাও নেই মুখে। চোখের চাহনি আমি দেখতে পাইনি, কালো চশমায় ঢাকা আছে তার চোখদুটি, কিন্তু ঠোঁটের ভঙ্গিতে একটা শক্ত ভাব যেন দেখতে পেয়েছি। সেজকাকা তাকে হিন্দু মনে করেন না কেন, তা বুঝতে পারলাম না। বিদেশী তো নয়, খৃস্টানও নয় বলে আমার মনে হয়েছে? তবে কি কোন মুসলমান মেয়ে? অসম্ভব নয়, ভাল স্বাস্থ্যের জন্য তার মুখখানা চৌকো দেখাচ্ছে না। চোয়ালদুটো বোধহয় একটু উঁচু, তাইতেই চৌকো দেখায়। আমি এক-জন মুসলমান মহিলার এই রকম মুখ দেখেছিলাম। বোরখার নিচে বেগমদের মুখ কেমন হয়, আমার তা জানা নেই।

কিন্তু মুসলমান মহিলা বলে সেজকাকা বেশ সন্দেহ করলেন। হিন্দু মেয়ের কি এরকম চৌকো মুখ হয় না! নিশ্চয়ই হয়। আমি নিজে এই রকমের মুখ আগে দেখেছি। চৌকো মুখ দেখেই তার ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কখনও যায় না। আর হলেই বা মুসলমান! ভারতে মুসল-মান তো আমাদের প্রতিবেশী, আমরা পাশাপাশি বাড়িতে শান্তিতেই বসবাস করছি। ভারত আমাদের সর্বধর্মের দেশ। মুসলমান বা খৃষ্টান বলে তো কাউকে আমরা ঘৃণা করি না। সন্দেহও করি না কাউকে। কিন্তু সেজকাকা কেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন বুঝতে পারি না।

পাশের হাউসবোটের নিচে মানুষের গলা শুনতে পেলাম। নিচে থেকে হেঁকে জিজ্ঞাসা করল: শাল দেখিয়ে মেমসাব, পশমিনা জামেওয়ার।

মুখ ফিরিয়ে আমি দেখলাম যে, নিচে একজন শালওয়ালা তার শিকারা থেকে ছাদের উপরের মেমসাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। উপর থেকে মেম-সাহেব কী উত্তর দিল শুনতে পেলাম না। কিন্তু শালওয়ালা এগিয়ে চলে গেল।

এবারে অন্য একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। উচ্চস্বরে বলল: আখরোট সেও বাবুগোসা?

কিন্তু সেও কোন আশ্বাস না পেয়ে এগিয়ে গেল। আপেল এখনও পাকেনি, কাঁচা আপেল, তাই বিক্রি হচ্ছে। বাবু-গোসার নাম আমি এখানেই প্রথম শুন-লাম। লম্বা জাতের পেয়ারা ভেবেছিলাম, কিন্তু ফলওয়ালা ছিল নাছোড়বান্দা। কাঁচা আপেল বলতেই বাবুগোসা আমাকে গছাবেই। একটা কেটে এগিয়ে দিল। ঝর-ঝর করে রস পড়ছিল। একটুকরো খেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এমন সরস মিষ্টি ফলের নাম আমি শুনিনি। কিছু কিনবার পরে সে বলল: আরও কিছুদিন পরে এর স্বাদ আরও মধুর হবে।

কিন্তু এ-ফল চালান যায় না কেন কলকাতায়?

ফলওয়ালা বলল: আজকাল মোটরে দিল্লী পর্যন্ত যাচ্ছে, আগে কাশ্মীরের বাইরে কখনও যেত না।

কেন?

আপেলের মতো বেশি দিন রাখা যায় না। খুব স্বল্পায়ু ফল।

সুন্দর একখানা শিকারায় এক তরুণ দম্পতি বেড়াতে বেরিয়েছিল। মন্থর গতিতে ডাল লেকের দিকে চলেছে। পাশে বোধহয় রেডিও বাজছে। একটা সিনেমার গান। ফলওয়ালা তার নৌকো ঠেলে তাদের শিকারার পাশে এসে উপস্থিত হল। পাশে পাশে চলতে চলতেই নানারকম ফল দেখাতে লাগল। মেয়েটি বোধহয় আখরোট কিনল এক ঠোঙা, ভেঙে খেতে খেতে যাবে। কিন্তু আখরোট ভাঙা যে সহজ কাজ নয়, পরে তা বুঝবে।

পিছন ফিরে আমি একবার আমার প্রতিবেশীদের দেখবার চেষ্টা করলাম। মেয়েটি খুব ঘনিয়ে বসে কথা কইছে আস্তে আস্তে। শোনা যাচ্ছে না কিছু, অথচ দূরত্ব আমাদের সামান্যই। দুধারে যতদূর দেখা যায়, শুধু হাউসবোট। কোনটা ছোট, বড় কোনটা। কোনটা স্পেশাল ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস কোনটা। সেকেন্ড বা থার্ডক্লাস হাউসবোট এ দিকটায় নেই। সেসব ডাল গেটের কাছে চেনার বাগে বোধহয়, সবাই থার্ড ক্লাস। ঝিলম নদীর তীরে বোধহয় সবরকম হাউসবোটই আছে। যে শৌখিন অঞ্চলটা বাঁধ নামে পরিচিত, তার নিচে ভাল হাউস-বোটগুলো, খারাপগুলো নোংরা এলাকায়। নাগিন লেকের হাউসবোট আমি দেখিনি, শুনেছি বিদেশীরাই বেশি থাকে। খুব ভাল না হলে নিশ্চয়ই তারা থাকত না।

আর একটা মজার জিনিস দেখেছিলাম পরে। পয়সা দিলে হাউসবোটগুলোকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। তার জন্যে অনেক মাঝি-মাল্লা লাগে, অনেক উদ্যোগ আয়োজন। কাছি খুলে শিকারার মতো হাউসবোটকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলে ডাললেক থেকে নাগিন লেকে। ঝিলমে নিয়ে যেতে সাহস পায় কিনা জানিনে। খরস্রোতা নদী, স্রোতের টানে পড়লে কি ফিরিয়ে আনতে পারবে! একদিন আমাদের সামনে দিয়ে একটা হাউসবোটকে যেতে দেখেছিলাম। জিজ্ঞাসা করে জেনে-ছিলাম যে তারা ডাললেকের একটা নির্জন জায়গায় দিন কতক থাকবে। বিদেশীরাই এই সব করে। তারা স্নান করে লেকের জলে। নাগিন লেকে তাদের স্নানের জায়গা আছে। আর একটা অদ্ভুত খেলা তারা জলের উপরে খেলে। তার নাম সার্ফ রাইডিং। ডাল লেকে আমি একদিন এই খেলা দেখেছিলাম। একটা ছোট মোটর লঞ্চ বিদ্যুৎ বেগে ছোটে জলের উপর দিয়ে। তার সঙ্গে দড়ি ধরে এক খণ্ড কাঠের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে এক-জন। দড়ির টানে সেও ছুটছে, ঘুরছে, ফিরছে, বেসামাল হয়ে পড়েও যাচ্ছে। তখন তাকে তুলে নেওয়া হচ্ছে লঞ্চের উপরে। সাহেবরা খেলায় নামে, আর মেমসাহেবরা দাঁড়িয়ে মজা দেখে, হাততালি দেয়, চিৎকার করে।

পাশের ছাদের উপরে মেয়েটি এবারে গুণগুণ করে গান ধরল। আমি কান পেতে

সেই গান শোনবার চেষ্টা করলাম। গানের সুর নয়, কথাগুলো শোনবার জন্যেই আমার কৌতূহল ছিল বেশি। কোন্ ভাষায় কথা বলে তারা! কোন্ দেশের ছেলেমেয়ে! বাঙালী নিশ্চয়ই নয়। বাঙালীর মতো আচরণ নয় মেয়েটির। তাই বা কী করে বলি। বাংলার মেয়েদের আচরণ দেখে কি আজকাল বাঙালী বলে চেনা যায়! ভারতীয় বলে অবশ্যই বোঝা যায়। ভারতীয় মেয়ে চট্ করে মেমসাহেব হয়ে উঠতে পারবে না। সকল ব্যাপারে মেমসাহেবদের নকল করলেও দেশী বলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। এই মেয়েটিকেও বুঝতে পারছি। বিদেশী নয়, রঙীন শাড়ি পরেছে, আর রং মেখেছে অনেক। ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে লাল দেখাচ্ছে। এও লিপস্টিকের রং, আর রং দিয়েই আঁকা ভুরু। চোখ ঢাকা কালো চশমায়। আর এই চশমার আড়াল দিয়ে সে যে আমাকে দেখছিল তা বুঝতে পারলাম পরক্ষণে। আমি আবার পিছন দিকে তাকাতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপরেই বুঝতে পারলাম যে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোকও উঠে পড়ল। আমার মনে হল যে কতকটা বিরক্ত-ভাবেই তারা নিচে নেমে গেল।

প্রথমটায় লজ্জা পেয়েছিলাম। তারপরে ভাবলাম যে আমার লজ্জা কিসের! আমি তো কোন বেহায়াপনা করিনি, তাদেরই বরং লজ্জা পাওয়া উচিত। বাইরে খোলা ছাদে বসে অমন ঘনিষ্ঠ তারা নাও হতে পারত। এবারে আমি আমার চেয়ার ঘুরিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। কাশ্মীরের জীবন এখানে মন্থর গতিতে চলেছে।

চার

কাশ্মীরের কথাই আমি ভাবতে লাগলাম। আমরা কাশ্মীর দেখতে এসেছি। কলকাতায় সেজকাকাও কাশ্মীর দেখবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অবসর নেবার আগে থেকেই একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন। শীতাংশু রাজী হয়নি, চুপি চুপি আমাকে বলেছিল রাজী না হবার কারণ। ভদ্রলোক নাকি এখনও নিজেকে একজন সেনাপতি ভাবেন, মনে করেন যে, সবাই তাঁর শাসনে থাকতে বাধ্য। একালের পুলিশ তাদের দলপতির শাসনে নেই। পুলিশের বড়কর্তারা সারাক্ষণ চোর হয়ে আছেন সাধারণ পুলিশের বেলেল্লাপনার জন্যে। আর সৈন্যরা কি আগের মতো সেনাপতির শাসনে আছে! বাড়ির লোককেও শাসন করতে চায় সেজকাকা। শীতাংশুর ধারণা যে, সে একা তাঁর সঙ্গে কাশ্মীরে গেলে দুজনের মধ্যে একজন দেশে ফিরবে।

কিন্তু ঐ শক্ত সমর্থ মানুষটি একা কেন আসতে চাননি তার কারণ আমি আজও বুঝতে পারিনি। একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমাকে যখন তিনি সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তখন আমি তাঁর কণ্ঠে একটা অসহায় ভাব যেন দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল যে, আমি রাজী না হলে তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণ আর হবে না। আরও একটা ভয় তাঁর মধ্যে অনুভব করেছিলাম। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল অবিলম্বে কাশ্মীর দেখা না হলে এ সুযোগ আর কখনও মিলবে না। তাঁর বয়স বা কর্মক্ষমতা এমন নয় যে, তিনি বার্ধক্যের ভয় পেয়েছিলেন। তবে কি তিনি মনে করেছিলেন যে, এই সুন্দর দেশটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে! আজ তাঁর কথায় যেন এই ভয়টাই খানিকটা ফুটে উঠেছে। এ ভয় যে তিনি অকারণে পাননি, দিন কয়েক পরেই তা বুঝতে পারলাম। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক-সময় মনে হয়েছিল যে, এদেশ থেকে বোধ-হয় আর ফিরতেই পারব না। একই অবস্থা হবে দুজনের। সেই অবস্থার কথা ভেবে আমি আঁৎকে উঠেছিলাম, আর স্মরণ করেছিলাম ভগবানকে।

সেজকাকার বাস্তবতার কথা আমার মনে আছে। কলকাতায় তিনি আমাকে বলেছিলেন, না মিহির, পাঠানকোট এক্সপ্রেসে নয়, ওতো গরুর গাড়ির মতো চলবে। চল পাঞ্জাব মেলে।

আমি বলেছিলাম ঃ কিন্তু পাঞ্জাব মেল তো পাঠানকোট যায় না, যায় অমৃতসর। গাড়ি বদল করতে গিয়ে হয়তো আরও বেশি সময় লাগবে।

সেজকাকা মেনে নিয়ে বলেছিলেন ঃ তা ঠিক। তাহলে ঐ গরুর গাড়িতেই চল।

পরক্ষণেই আমার অমৃতসর ও জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা মনে পড়েছিল। বলেছিলাম ঃ পাঞ্জাব মেলে গেলে অবশ্য অমৃতসরটাও দেখা হয়ে যাবে।

না না, ওসব পরে দেখব। তুমি পাঠানকোটে যাবার ব্যবস্থাই কর।

তারপরে ট্যাক্সি করে দুজনে ফেয়ারলি প্লেসে এসে পাঠানকোট এক্সপ্রেসেই যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম দুদিন পরেই। সেজকাকা বললেন ঃ কাল বেরতে পারলেই ভাল হত। বুঝলে মিহির, শুভ কাজে দেরি করতে নেই।

পনর দিনের ছুটি নিলাম আমি। এক-দিনেই গুছিয়ে নিলাম সবকিছু। সেজকাকা বলেছিলেন পনর দিনেই ঘুরে আসবেন। তারপরে গাড়িতে চেপে বলেছিলেন,—ভাল লাগলে মাসখানেক। আমি বলেছিলাম ঃ মাসখানেক তো থাকতে পারব না, আমার পনর দিনের ছুটি।

সেজকাকা হেসে বলেছিলেন ঃ থাকতে পারব না বোলো না, বল ছুটি বাড়াতে হবে।

কথাটা হেসে বললেন বটে, কিন্তু আমার মনে হল যে, এ তাঁর আদেশ। কাশ্মীরে পৌঁছে তাঁর ভাল লেগেছে জানতে পারলেই আমাকে ছুটি একসটেনশনের জন্য দরখাস্ত পাঠাতে হবে। শীতাংশুর কথা তখনই আমার মনে পড়েছিল। শীতাংশু বলেছিল, তোর সেকেলে মেজাজ, সারাক্ষণ হুকুম মেনে তুইও চলতে পারবি না। রিটার্ণ টিকিটটা কেটেই যা। কিন্তু আমি সেজকাকার কথায় কোন উত্তর দিইনি।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে আমরা শিয়ালদহ থেকে গাড়িতে চেপেছিলাম। টাইম টেবল দেখে সেজকাকা বলেছিলেন ঃ পাক্কা দুটো দিন গাড়িতে কাটবে। আজকের দিনরাত, কালকের দিনরাত, পাঠানকোট পৌঁছব পরশু ভোরবেলায়।

আমি বলেছিলাম ঃ কপাল মন্দ হলে গাড়ি লেটও হতে পারে।

না না, অলুক্ষুণে কথা বোলো না। সকালে যখন পৌঁছব, তখন প্রথম বাসখানা ধরা যাবে কিনা জানিনে। শুনেছ তো, প্রথম বাসখানা ধরতে না পারলে পথেই একটা রাত কাটাতে হবে।

সে কথা আমিও যেন কোথায় পড়েছিলাম। তাই বললাম ঃ শুনেছি।

গাড়ি আমাদের রাইট টাইমেই চলতে লাগল। গয়ায় রাতের খাবার খেলাম, সকালে চা খেলাম লখনৌএ। বেরেলীতে দুপুরের ভাত আর লকসরে রাতের রুটি খেয়ে সেজকাকার নির্দেশে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। ভোরবেলায় উঠতে হবে, পাঠানকোটে গাড়ি পৌঁছলেই ছুটে গিয়ে বাস ধরা। কপালে চা জুটলে ভাল, না জুটলে জম্মুতে গিয়ে চা। কিন্তু কথায় বলে যে মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর। রাতে কোথায় কী গোলমাল হল জানিনে, শেষ-রাতে উঠে বিছানা বেঁধে বসে রইলাম দুজনে, কিন্তু পাঠানকোট পৌঁছলাম না। দিনের আলো প্রখর হয়ে উঠল, কত [illegible] পৌঁছলাম তাও বুঝতে পারলাম [illegible] আমাদের ইস্টার্ণ রেলের টাইম [illegible] জলন্ধরের পরেই পাঠানকোট। মা[illegible]র কোন স্টেশনের উল্লেখ নেই। যাত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে ট্রেন লেট চলছে, নটা-দশটার আগে পাঠানকোট পৌঁছবে না।

সেজকাকা চটে উঠলেন। কড়া করে ছাঁটা গোঁফের উপরে একবার হাত বুলিয়ে বললেন ঃ রাবিশ।

তারপরেই একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে চুরুট ধরালেন।

সেজকাকা যে হতাশ হয়েছেন তা বুঝতে পারি, তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম ঃ ভালই হয়েছে, পথে আমরা জম্মু শহরটাও দেখে নেব।

শেষ পর্যন্ত এছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমরা যখন পাঠানকোটে পৌঁছলাম, তখন সকালের সব বাস ছেড়ে চলে গেছে। স্নানা-হার সেরেই যাত্রা করা ভাল, আর জম্মুতেই রাত কাটানো সুবিধে। থাকবার ব্যবস্থা ভাল, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা পথে আর কোথাও নেই। কতকটা বাধ্য হয়েই সেজকাকা রাজী হলেন।

খেয়ে দেয়ে পাঠানকোট জায়গাটা আমি দেখে নিয়েছিলাম। বেশ জায়গা, ছোটখাট শহর একটি, সমতলভূমিতে পার্বত্য এলাকার একটি ঘাঁটি। বড় লাইনের রেল গাড়ি এইখানেই শেষ হয়েছে, খেলনার মতো ছোট লাইন শুরু হয়েছে এইখান থেকেই। সে লাইন বাংড়ার উপত্যকার উপর দিয়ে যোগী-ন্দর নগর পর্যন্ত যাবে, পথে জ্বালামুখী রোড স্টেশন, কাংড়া পালমপুর ও বৈজনাথ

দ্রষ্টব্য স্থান। ঐ পথে বাসও চলে, আর সব জায়গায় তাড়াতাড়ি পৌঁছলো যায়। ডালহৌসির বাস, ধর্মশালার বাস, জ্বালা-মুখী বৈজনাথের বাস। কুলু ও মানালির বাস কাংড়া উপত্যকা ছাড়িয়ে মন্ডি হয়ে চলে যায়। এখান থেকে চাম্বা উপত্যকাও যাওয়া যায়। আবার জম্মু শ্রীনগর।

পাঠানকোট থেকে জম্মুর দূরত্ব একশো মাইলের কম, আর পৌনে দুশো মাইলের বেশি জম্মু থেকে শ্রীনগর। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর একদিনে যাওয়া সত্যিই দুষ্কর তবু যাওয়া যায়। সকালের বাস না পাওয়ার জন্যে আমাদের আর দুর্ভাবনা ছিল না। বিকেলের বাসে শ্রীনগরের টিকিট কেটে আমরা জম্মু যাত্রা করলাম, জম্মুতে রাত্রি-বাস করে সকালবেলায় আবার বেরোতে হবে।

সুন্দর আরামদায়ক বাস, গোনাগুণতি যাত্রী। আরাম করে হেলান দিয়ে আমরা চলেছি। এ রকম আরামে বাসে চলতে আমরা মোটেই অভ্যস্ত নই। সেজকাকা জানালার-ধারে বসেছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসেছিলাম ভিতরের দিকে। আর প্রথমে বাস ভাড়ার কথাই ভাবছিলাম। সাতাশ টাকায় রিটার্ন টিকেট, পথের এদিকের পরিমাণই দুশো সাতষট্টি মাইল। এত কম ভাড়াতে তিনটি বাস কোম্পানী বাস চালাচ্ছে শুনে আশ্চর্য হতে হয়।

সেজকাকার দিকে তাকিয়েও আমি আশ্চর্য হলাম। ছেলেমানুষের মতো তিনি বাহিরের দৃশ্য দেখছিলেন। একটি সুন্দর জায়গার পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি সোজা হয়ে বসলেন। একটি নদীর উপরে পুল, কিছু ঘর বাড়ি মনোরম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। দেখতে দেখতেই তিনি বলে উঠলেন ঃ ইরাবতী নদী না?

এর উত্তর আমার জানা ছিল না। আমি অন্য যাত্রীদের দিকে তাকালাম। শুনতে পেলাম যে একজন যাত্রী তার সহযাত্রীকে জায়গাটা চিনিয়ে দিচ্ছে। বলছে, এই নদীর নাম রাভি বা ইরাবতী। এধারের শহর মাধোপুর পাঞ্জাবে, ক্যানাল ডিপার্টমেন্টের সব ঘর বাড়ি। নদীর ওপারে থেকে জম্মু রাজ্য।

বাস নদীর পুলের উপরে উঠল, আর সেজকাকা চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর কৌতূহলের যেন শেষ নেই।

দেখতে দেখতে দিনের আলো নিবে এল, অল্প অল্প করে অন্ধকার নামল চারিদিক ঘিরে। পথের দৃশ্য যখন আর দেখা গেল না, তখন সেজকাকা আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন ঃ এইজন্যেই ভোরবেলার বাস ধরতে চেয়েছিলাম।

আমি বললাম ঃ তাহলে কি শ্রীনগরের উপত্যকার দৃশ্য দেখতে পেতেন? শ্রীনগর পৌঁছবার অনেক আগেই অন্ধকার নামত।

সেজকাকা এ কথার উত্তর দিলেন না। বললেন ঃ কাশ্মীরের সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা আছে তো?

উত্তরে আমি বোধহয় বলেছিলাম ঃ খুব সুন্দর দেশ কাশ্মীর, হামেশা বাহারের দেশ। আর এই উত্তর শুনে সেজকাকা ক্ষেপে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন ঃ বাহারের কথা আমি বলছি না, আমি ভূগোল ও ইতিহাসের কথা বলছি। কাশ্মীরের ভূগোল জান?

ভয় পেয়ে আমি বলেছিলাম ঃ না।

তবে জান কী? আর দেখবেই বা কী?

আমি বলতে পারতাম যে ভূগোল জানবার জন্যে কাশ্মীরে আসছি না, ভূগোল বা ইতিহাস কলকাতার ঘরে বসেই পড়া সম্ভব হত। কাশ্মীরে আসছি শোভা সৌন্দর্য দেখবার জন্য। আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল বলেছিলেন, হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। আর একজন কবি নাকি বলেছিলেন যে কোন প্রাণী এখানে এলে নবজীবন লাভ করে, আর কাবাব-করা মুর্গিও ডানা মেলে উড়ে যায়। আমি এসেছি সেই শোভা দেখতে, আর সেই আবহাওয়া উপভোগ করতে। তাই সেজ-কাকার কথার কোন উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম না।

কিন্তু তিনি আর নীরবে থাকতে পারলেন না। বললেন ঃ এই দেশটার বর্তমান নাম জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট। রাজ্যের দুটি প্রদেশ—জম্মু আর কাশ্মীর। তাদের চারটি করে জেলা। জম্মুতে কাঠুয়া জম্মু উধমপুর ও ডোডা, কাশ্মীরে শ্রীনগর বারামূলা অনন্তনাগ ও লাদাখ।

একটু থেমে বললেন ঃ সংস্কৃতির বিচারে লাদাখ একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়া উচিত ছিল। তার কারণ এই রাজ্যের অধি-বাসীদের মুখ্যত তিন ভাগে ভাগ করা যায় —জম্মুর ডোগরা জাত কাশ্মীরী আর লাদাখী। লাদাখীদের ধরণ ধারণ অনেক পরিমাণে তিব্বতীদের মতো। আর এইজন্যই চীনারা একবার এদিকে হামলা করেছিল।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পি-ও-কে কথাটা শুনেছ?

আমি বললাম ঃ না।

পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর। ১৯৪৭ ৪৮-এর কথা মনে নেই?

না।

না কী হে! অতবড় একটা ঘটনা তোমরা এর মধ্যেই ভুলে গেলে?

লজ্জিতভাবে আমি বলেছিলাম ঃ আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম। স্কুলে নিচের ক্লাসে পড়তাম।

তবে তো ইতিহাসেই পড়েছ সেকথা।

অনেক ইতিহাসে এখনও লেখা হয়নি।

কোন গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন সেজকাকা। অনেকক্ষণ নীরব হয়ে ছিলেন। তার পরে আস্তে আস্তে বলেছিলেন ঃ সেদিনের গল্প একদিন বলব তোমাকে।

তারপরে আর কোন কথা বলেননি।

সেজকাকার দিকে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল যে, এই গল্পের সঙ্গে তাঁর নিজের কোন সুখের বা দুঃখের স্মৃতি আছে জড়িয়ে। কিন্তু সে যে কত মর্মান্তিক তা আমি একবারও অনুমান করতে পারিনি। এই কঠিন মানুষটার জীবনেও যে একদিন যৌবন জেগেছিল, পরে তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

সেজকাকা চুপ করে ছিলেন, কিন্তু আমি নজর রেখেছিলাম পথের দিকে। গাড়ির গতি মন্থর হচ্ছিল, আর লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল কাছে ও দূরে। অন্ধকারে বাতি দেখলেই লোকালয় বলে বোঝা যায়। এক ঝাঁক জোনাকীর সঙ্গে ভুল হয় দূরের একটা ছোট গ্রামকে। কিন্তু কাছের বাতি দেখলে সে রকম ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

আমরা এতক্ষণ সমতল ভূমির উপর দিয়েই এসেছি মনে হচ্ছিল। কিন্তু শুনলাম যে জম্মু একটি সুন্দর পার্বত্য-শহর, কিন্তু সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র এক হাজার ফুট উঁচু। একথা না বলে দিলে নাকি আরও উঁচু বলে মনে হবে। তাওই নামে একটি ছোট নদী এঁকে-বেঁকে বয়ে গেছে, চন্দ্রভাগার উপনদী। মনোরম দৃশ্য। কিন্তু অন্ধকার রাতে আমরা কিছুই দেখতে পাইনি।

বাজারের সদর রাস্তা ছেড়ে মোটর বাস এসে যেখানে দাঁড়াল, সেখানেই আমরা নেমে পড়েছিলাম। সামনে একটুখানি এগিয়ে বিরাট ডাক-বাংলো। যাত্রীদের জন্যে এখানে পঞ্চাশটি ঘর আছে। রেস্তোরাঁও আছে একটি। যাহোক আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। খেয়ে-দেয়ে আমরা আরামে রাত্রিবাস করেছিলাম। পাঠানকোট এক্সপ্রেস লেট হবার জন্য আর আমরা আপশোস করিনি।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। চকিতে পেছন ফিরে দেখলাম যে যা অনুমান করেছি তাই। ছাদে উঠবার সিঁড়ির উপরেই পায়ের শব্দ। পরক্ষণেই একটি নোংরা টুপি দেখতে পেলাম, আমিরার হাসি মুখখানা তারপর ভেসে উঠল। এইটুকু উঠবারই তার প্রয়োজন ছিল, কোন কথা না বলে সে নেমে গেল। নিচে যে চা দেওয়া হয়েছে আমি তা বুঝতে পেরেছি। দেরি না করে আমি নিচে নেমে এলাম।

শ্রীনগরের সংক্ষিপ্ত দুপুর ফুরিয়ে গেছে।

পাঁচ

বসবার ঘরে এসে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেজকাকা আজ বেরবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন। অন্য দিনের মতো তাঁর হাতে চার্চিলের বইখানা নেই। আমি নেমে আসতেই বিরক্তভাবে বললেন ঃ এখানে কি শুয়ে বসে সময় কাটাবার জন্যে এসেছ—না বাইরে বেরিয়ে কিছু দেখবার ইচ্ছাও আছে!

আমি এ অভিযোগ মেনে নিতে রাজী ছিলাম না। বেরোবার জন্য আমার যথেষ্ট আগ্রহই ছিল। কিন্তু সেজকাকার একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখেই চুপ করে আছি। দু-তিনটি দিন আমাদের শুয়ে বসে কেটেছে সত্যি কিন্তু সে আমার আগ্রহের জন্য নয়। তাই বললাম ঃ আপনাকে ক্লান্ত দেখছি বলেই চুপ করে আছি।

আমাকে ক্লান্ত দেখছ! সেজকাকার আত্মাভিমানে যেন আঘাত লাগল, এমনি

ভাবেই কথাটা বললেন। উত্তরে আমি বললাম : ক্লান্ত না হলেও একটা নির্বিকার ভাব দেখছি আপনার। আপনি বেরোলেই আমি বেরোব।

সেজকাকা অস্বীকার করলেন না একথা। বললেন : চা খেয়েই তাহলে তৈরি হয়ে নাও।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে আমার বেশি সময় লাগেনা। শীতের পোষাক তো পরতে হয় না। প্যান্ট সার্টের উপরে একটা হাতকাটা সোয়েটার নিলেই হল। মোজা না পরলেও চলে। কিন্তু সেজকাকার এতে ভারি আপত্তি। বলেন : এ তোমাদের কীরকম পোষাক বুঝিনা। না এদিক, না ওদিক।

আমি উত্তর দিই : আজকাল এই রকমই হয়েছে। প্যান্টের উপরে বুশসার্ট পরলেই পোষাক পরা হয়ে গেল। পায়ে চপ্পল বা মোকাসিন, মোজার দরকার নেই।

গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সেজকাকা নিজের পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। সুট পরেন তিন পিসের, ওয়েস্ট কোটের পকেটে চেন-দেওয়া পকেট ঘড়ি। মোজা জুতো। গলায় টাই, মাথায় ফেল্টের টুপি। তারপরে বলেন : আগে আমাদের সকাল-বিকেলে পোষাক বদলাতে হত। ডিনারের অন্য পোষাক। আমাদের বাপ-পিতামহকে এর চেয়েও বেশি নিয়ম-কানুন মানতে হত। তাঁরা টেইলকোট আর টপ হ্যাট পরে ছড়ি হাতে বেরোতেন। ইংরেজ সাহেবদের ছবি দেখনি?

দেখেছি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেজকাকা বলেন ; দেখতে দেখতেই এটিকেট উঠে গেল, ডিসিপ্লিন গেল, ম্যানার্সও নেই। সমাজে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র নেই। সবাই সমান। শুধু মেজাজে সমান হলেই সমান হওয়া যায় না। যোগ্যতায় সমান হতে হয়। যোগ্যতার দাম না থাকলে সমাজে থাকল কী! দেশের সরকারই বা চলবে কী করে। এসব হল ঘুড়ির সুতোর মতো। লাটাইটা আলতো করে ধরলেই আকাশের ঘুড়ি হুড়হুড় করে সুতো টানবে। তারপর সেই সুতো গোটানো কি সোজা কাজ! একেবার ঢিলে দিলেই গেল।

কিন্তু আজ আমার পোষাকের দিকে সেজকাকা তাকালেন না। বোধহয় এই পোষাক তাঁর চোখে কতকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কিংবা মেনে নিয়েছেন আমার অবাধ্যতা। আমি বেরিয়ে আসতেই বললেন, চল, আর দেরি হলে বোধহয় কাজ হবেনা।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম : কিসের কাজ!

সেজকাকা হন হন করে এগিয়ে বললেন : চলই না, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।

শিকারা নিয়ে আমিরা সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করছিল। সেই প্রসন্ন মুখ আর হাসি, সে মুখে কোন দুশ্চিন্তা নেই, ব্যস্ততা নেই, নেই কোন অনুযোগ। একে অপেক্ষা করতে দেখে সেজকাকা খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। এমন হন হন

করে বেরিয়েই থেমে পড়লেন কেন তা বোঝবার জন্য আমি চারিধারে তাকালাম। যা অনুমান করেছিলাম তাই সত্য দেখলাম: আমার সেই অফিসারটি তাঁর কালো চশমার সঙ্গিনীকে নিয়ে একখানা শিকারায় বসে ভেসে যাচ্ছিল। আমাদের ঠিক সামনে দিয়েই গেল। তাদের চিনতে আমার এতটুকু সময় লাগল না।

মুহূর্তে সেজকাকা তাঁর সমস্ত তৎপরতা হারিয়ে ফেললেন। শিকারাটা দূরে চলে যাবার পরেও তিনি যেন সম্বিত ফিরে পাচ্ছিলেন না। আমি তাঁকে আগাবার জন্য বললাম ঃ সেজকাকা চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের।

দেরি! হ্যাঁ, দেরি হচ্ছে বৈকি!

বলে তরতর করে শিকারায় নামলেন। আমিও তার পিছনে নামলাম। আমিরা হাউস বোটে হাত দিয়ে শিকারাটা ঠেলে দিল, তারপর ছপাছপ্ করে জল কেটে পারের দিকে এগোতে লাগল।

সেজকাকা আবার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। স্বগতভাবে বললেন ঃ দেরি সবাই করছে, কিন্তু কেন দেরি করছে জানি না।

আমি এই স্বগত উক্তির উত্তর দিলাম। বললাম ঃ আপনার কথা ঠিক হেঁয়ালির মতো বলে মনে হচ্ছে।

সেজকাকা বললেন ঃ হেঁয়ালি নয় নিরেট হেঁয়ালি আমিও বুঝি না। যা সত্য হবে বলে বুঝেছি, তা কেন সত্য হয়ে উঠছে না। তাই ভাবছি। পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ করবেই, তার ভূমিকা সে শেষ করেছে অনেকদিন। কিন্তু কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে তা বোঝা যাচ্ছে না। ঐ ছোকরা ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার। কিন্তু মেয়েটি পাকিস্থানের চর কিনা তা বলতে পার?

চর!

আমি চমকে উঠলাম তাঁর কথা শুনে।

সেজকাকার সমস্ত মুখ কুঁচকে উঠল ঘৃণায়, খোঁচা খোঁচা গোঁফ যেন আরও শক্ত হয়ে উঠল। বললেন ঃ আঠারো বছর আগে—

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললাম ঃ বলুন।

পারের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। নামবার জন্যে তৈরি হয়ে সেজকাকা বললেন ঃ এখন থাক সে কথা।

কী হয়েছিল আঠারো বছর আগে তা আমার জানা হলনা। তবে বুঝতে পারলাম যে সেজকাকার জীবনে পাকিস্তানী চরের অভিজ্ঞতা হয়েছে। কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা, তাকেই কি তিনি সিঁদুরে মেঘ বলেছেন ঃ কিন্তু সিঁদুরে মেঘের যে একটা রূপের আকর্ষণ আছে সেই রূপ! পরক্ষণেই আমার মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। রূপ আছে মেয়েটির, রূপের আকর্ষণও আছে। সেজকাকা কি তাকেই সিঁদুরে মেঘ ভাবছেন! কে জানে।

আমাদের শিকারা এসে ঘাটের সিঁড়িতে ঠেকেছিল। আরও অনেক শৌখিন সাজানো শিকারা লেগে আছে এই ঘাটে। তারই ফাঁক দিয়ে কোন রকমে ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকতে হয়। আমিরা আগেই নেমেছিল, শিকারার একটা কোনো টেনে নিয়ে গিয়ে ধাপের উপরে উবু হয়ে বসেছিল। আমরা নেমে পড়তেই প্রসন্ন মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে শিকারায় লাফিয়ে উঠল। আমরাও পথের উপরে ডান দিকে শহরের পথ ধরলাম। সেজকাকা আর কোন কথা কইলেন না। নিঃশব্দে পথ চলতে লাগলেন তিনি।

মাঝে মাঝেই তাঁকে এমনি নীরব হয়ে যেতে দেখি। জম্মুতেও এমনি দেখেছি। ভোরবেলায় বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে আগে ভাগে এসে বাসে বসেছিলেন। একজন যাত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ রঘুনাথজীর মন্দিরে গিয়েছিলেন তো?

আশ্চর্য হয়ে আমি বলেছিলাম ঃ সে আবার কোথায়!

যান নি মন্দিরে!

বলে ভদ্রলোকও তাঁর অসীম বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তারপরে বলেছিলেন ঃ এই মন্দির দর্শনের জন্যেই তো কাশ্মীরের যাত্রীরা জম্মুতে রাত্রিবাস করে। একসঙ্গে অনেকগুলো মন্দির, অনেক জায়গা জুড়ে আছে। জম্মুকে তো অনেকে মন্দিরের শহর বলে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বলেছিলাম ঃ খুব কাছে বুঝি!

দূরেও নয়। কিন্তু এখন গিয়ে দেখে আসবার কি সময় পাবেন।

বলে নিজের ঘড়িটি দেখলেন। তারপরে বললেন ঃ তার চেয়ে ফেরার পথে নেমে পড়বেন এইখানে, মন্দির দেখে পাঠানকোট ফিরবেন সকালের বাসে। রাতে পৌঁছে তো পাঠানকোটেই রাত্রিবাস করতে হবে!

সেজকাকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে এ সব কথা তাঁর কানে যায়নি। তিনি এখন একখানা মানচিত্র খুলে তারই ভিতরে ডুবে গেছেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম যে সেখানা কাশ্মীরেরই মানচিত্র, সমস্ত কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের পথঘাট দেখানো আছে। কোন কোন জায়গা লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া আছে। বোধহয় তিনি নিজেই দাগ দিয়েছেন।

হঠাৎ গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। বাসের ড্রাইভার নিজের জায়গাটিতে লাফিয়ে উঠেই হর্ন বাজাতে শুরু করেছে। অল্পক্ষণ পরেই কন্ডাকটরকেও দেখা গেল পিছনে। সে যাত্রীদের গুনে আর চিনে নিচ্ছে। যারা নিচে দাঁড়িয়ে ছিল বা নিকটে কোথাও গিয়েছিল, এই হর্নের শব্দ শুনে তারা ছুটে এল। তারপরেই বাস ছাড়ল।

সেজকাকা মানচিত্রটি গোটালেন না কিন্তু মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকালেন। পরম আগ্রহে জম্মু শহরটাকে দেখতে লাগলেন। এই সুযোগে আমি মানচিত্রটা একবার দেখে নিলাম।

পাঠানকোট থেকে [illegible] একেবারে পাকিস্তানের সীমান্ত [illegible] মাধোপুরে ইরাবতী নদী পেরিয়ে আমরা প্রথমে জেলা শহর কাঠুয়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরে অন্ধকারে দায়লো চক সাম্বো ছাড়িয়ে জম্মুতে এসে রাত্রিবাস করেছি। পাকিস্তানের শিয়ালকোট থেকে জম্মুর দূরত্ব হবে মাইল আটাশেক, ভাল পথ আছে। শিয়ালকোট থেকে পাকিস্তানের ওয়াজিরাবাদও কাছে। চেনাব বা চন্দ্রভাগার দক্ষিণ তীরে ওয়াজিরাবাদ, উত্তরে গুজরাত, এ গুজরাত ভারতের পশ্চিম প্রান্তের রাজ্য গুজরাট নয়। শহর গুজরাত। খানিকটা উত্তরে ঝিলম নদীর তীরের ঝিলম শহর, আরও কিছু উত্তরে রাওয়ালপিন্ডি। পাকিস্তানের এসব শহরও কাশ্মীর সীমান্ত থেকে দূরে নয়। বৃটিশ আমলে রাওয়ালপিন্ডি থেকে মারি হয়ে শ্রীনগরে যেতে হত। মারির পর ঝিলম পেরিয়ে নদীর ধারে উত্তরে যেতে [illegible] ডোমেল ও মুজফ্ফরাবাদ ঝিলম নদীর এপারে ওপারে দুটি শহর পাকিস্তানের সীমান্তে।

ঝিলাম নদীর গতি বড় বিচিত্র। যে পথে আমরা চলেছি, সেই পথের ধারেই বানিহাল টানেল পেরিয়ে ভেরিনাগে তার উৎস। ভেরিনাগ একটি স্ফটিক জলের কুণ্ড। সেই কুণ্ড থেকে বেরিয়ে উত্তরবাহী ঝিলাম পোঁছেছে শ্রীনগরে। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়ে উলার হ্রদে পড়েছে, আবার সেখান থেকে বেরিয়ে পশ্চিম মুখে বারামুলার পথে এসে ডোমেল-মজফ্ফরাবাদ। তারপর দক্ষিণ মুখে কাশ্মীর ও পাকিস্তানের সীমানায় প্রবাহিত হয়ে ঝিলম শহরের পর পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলেছে পাকিস্তানে। কাশ্মীরের প্রাণ এই নদী, এই নদী না থাকলে কাশ্মীর বাঁচত না।

জম্মু শহর যে আমরা ছাড়িয়ে এসেছিলাম আমি তা খেয়াল করিনি। খেয়াল হল সেজকাকার কথায়। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : জম্মুর দুর্গ দেখলে?

আমি সত্যি কথাই বললাম : দেখিনি।

সেজকাকা চটে উঠলেন : বললেন : দেখিনি মানে! ঘুমোচ্ছিলে, না চোখ বুজে ছিলে?

এবারেও আমি সত্য কথা বললাম : বাসের মাঝখানে বসলে তো দুপাশের ঘর-বাড়ি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। আমি তাই আপনার ম্যাপ দেখছিলাম।

একথায় সেজকাকা শান্ত হয়ে গেলেন। বললেন : ম্যাপ দেখছিলে বুঝি! তা কী দেখলে বলতো?

তারপরে নিজেই বললেন : এই পথটা প্রায় পাকিস্তানের গায়ের ওপর। পাহাড়-পর্বতের বাধা না থাকলে পাকিস্তানীরা সব পায়ে হেঁটেই ঢুকে পড়ত।

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলেন : বাঁ-হাতে আখনুরের পথটা দেখেছ তো!

বললাম : না।

দেখনি! জম্মু থেকে বিশ মাইল দূরে একেবারে পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর এই শহর চেনাব নদীর ওপারে। আখনুর থেকে নোশেরা মীরপুর। মীরপুরও সীমান্তের কাছাকাছি। আবার নোশেরা থেকে রাজৌরি মেনধার ও পুঞ্চ। গত যুদ্ধের সময় এসব জায়গার নাম শোন নি?

আমি বললাম : সে যুদ্ধের কথা আমাদের মনে নেই।

মনে নেই?

সেজকাকা হিসেব করে দেখালেন, তারপর বললেন : হ্যাঁ, তা সতের আঠারো বছর হল বৈকি। তোমরা তখন ছোট ছিলে খুব।

জম্মুর পরেই পাহাড়ের আরম্ভ। আরও একশো তিরিশ মাইল এগোলে জম্মু রাজ্য শেষ হবে। ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের বাস ছুটেছিল। এখন আর দেখবার কিছু নেই বলে সেজকাকা তার মানচিত্রটি গুটিয়ে বললেন : বুঝলে মিহির, এই জম্মু হল ডোগরাদের দেশ। ডোগরা রাজপুত। বড় বলিষ্ঠ জাত এরা,অনেক যুদ্ধ করে সাম্প্রতিক কালে। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের নাম জানতো?

বললাম : জানি।

তাঁরই সেনাদলে এক ডোগরা রাজপুত খোলাব সিং ছিলেন তরুণ সেনাপতি। রণজিৎ সিং-এর কাছে থেকে গোলাব সিং জম্মু রাজ্যটা পেয়েছিলেন। আর রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে ইংরেজকে সাহায্য করে নিজের রাজ্য বাড়িয়েছিলেন, কাশ্মীর ও গিলগিটও এসেছিল তাঁর অধিকারে। এ বোধহয় একশো-সোয়া শো বছর আগের কথা। কাশ্মীরের ইতিহাস জানতো? কাশ্মীর হিস্ট্রী?

আপনি কি রাজতরঙ্গিনীর কথা বলছেন?

রাবিশ!

চাপা গর্জনের মতো মন্তব্য। আমি একেবারে চুপ মেরে গেলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেজকাকা বললেন : আমাদের কাশ্মীরের একালের কথা বলছি। গোলাবসিং-এর পৌত্র প্রতাপ সিং আর অমর সিং-এর কথা। ছোটভাই অমর সিং-এর সঙ্গে চক্রান্ত করে ইংরেজ রেসিডেন্ট গিলগিট কেড়ে নিয়েছিল, প্রতাপ সিংকেও বলতে গেলে রাজ্যচ্যুত করেছিল। কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছিল প্রতাপ সিং। চক্রান্ত ধরা পড়ে যাবার পরে আবার রাজ্য হাতে পেরেছিল। কাশ্মীরের শেষ রাজা হরি সিং প্রতাপ সিং-এর ভাইপো, মানে অমর সিং এর ছেলে। মরবার সময় প্রতাপ একেই রাজত্ব দিয়েছিলেন।

সেজকাকা এর পরে ডোগরাদের কথা বললেন : এরা যুদ্ধ যেমন করেছিল, তেমনি দুর্গও তৈরি করেছিল অনেক। জম্মুর উঁচু উঁচু জায়গায় যেসব দুর্গ আছে, তার নাম বাহু দুর্গ। এই দুর্গের ভিতর বাহু রাজাদের সদর দপ্তর ছিল। শহরের উত্তর প্রান্তে আর একটি দুর্গ আছে, তার নাম রামনগর দুর্গ। গম্বুজের মতো আকার। তারই কাছে অমরমহল প্রাসাদ। সাম্বা নামে যে জায়গার উপর দিয়ে আমরা এলাম, সেখানেও রাজপুত সর্দারদের একটা দুর্গ আছে। তাতে এখন স্কুল আর সরকারী দপ্তর।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর সেজকাকা আবার প্রশ্ন করলেন :.আখনুরের নাম মনে আছে? নোশেরা ঝানগড় পুঞ্চ?

মানচিত্রে আমি এই সব জায়গার নাম এইমাত্র দেখেছি। তাই উত্তর দিতে দেরি করছিলাম।

সেজকাকা কিন্তু আরও নাম বলে গেলেন: মীরপুর ভীমবার? উরি বারামুলা? ইতস্তত করে আমি বললাম : নামগুলো শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে তো!

খুশী হলেন সেজকাকা। বললেন : এসব ঐতিহাসিক নাম, মানে কাশ্মীরের নতুন ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন এই সব নাম স্থান পেয়ে যাবে। জম্মু ও কাশ্মীরকে রক্ষা করতে হলে এই সব জায়গায় ঘাঁটি থাকা দরকার। ১৯৪৭-৪৮ সালে তুমি ছোট ছিলে বললে, তাই না?

আমি সংক্ষেপে বললাম : হ্যাঁ।

সেজকাকা বললেন : সেই জন্যেই তোমার কিছু মনে নেই। স্বাধীন ভারতের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে। বুকভরা দেশাত্মবোধ নিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা এসেছিল এখানে। এই যুদ্ধের কথা শুনলে গর্বে তোমারও বুক ফুলে উঠবে।

আমি বললাম : বলুন না গল্পটা।

সেজকাকা কী যেন চিন্তা করলেন, তারপরে বললেন : একদিন বলব। কী বলছিলাম যেন?

আমি বললাম : গড়ের কথা।

হ্যাঁ, এই জম্মুতে প্রত্যেক রাজার নামে গড় আছে। গোলাব গড়, রণবীর গড় অমর গড়। এরা তো বাড়ি তৈরি করত না, করত গড়। বাস করাও যায়, আবার শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করাও যায়। শত্রু কথাটাই খারাপ।

কেন?

তুমি ভাল মানুষ সেজে ভাবছ তোমার শত্রু নেই, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ যে ঐ ভাল মানুষির জন্যেই এক ধরনের শত্রু সৃষ্টি হচ্ছে।

ভাল বুঝতে না পেরে আমি বললাম : কথাটা আপনি বুঝিয়ে বলুন।

সেজকাকা বললেন : কাশ্মীরের শেষ রাজা হরি সিং-এর কথাই ধর। কারও সঙ্গে তিনি শত্রুতা করেননি, বিদেশে গিয়ে বিলাস ব্যসনে কিছু ব্যয় করেছিলেন, এই যা। আর রাজকোষে যখন টান পড়েছিল তখন সব রাজারা যা করেন তিনিও তাই করেছেন, আমাদের স্বদেশী সরকারও তাই করছেন। অথচ দেশে ধুয়ো উঠল যে হিন্দু রাজা মুসলমান প্রজাদের উপরে অত্যাচার করছেন। এই সময়ে দেশে স্বাধীনতা এল। রাজাদের বলা হল, হয় এধারে নয় ওধারে, মানে ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দাও। হরি সিং মনস্থির করতে না পেরে চুপ করে বসেছিলেন কিছুদিন। আর এই তাঁর কাল হল। মার মার করে পশ্চিম থেকে পাকিস্তানীরা ঢুকে পড়ল। নিরীহ প্রজাদের মেরেই দেশটা দখল করে নেবে। সেদিন আর উপায়ান্তর না দেখে হরি সিং ভারতে যোগ দিলেন সরকারীভাবে। ভারতীয় সৈন্য এগিয়ে এল জম্মু আর কাশ্মীর রক্ষায়। সেই যুদ্ধের কথা তোমার কিছুই মনে পড়ে না।

বললাম : একটু একটু মনে পড়ে।

বলব, বলব একদিন।

বলে সেজকাকা আবার চারি দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

পীর পাঞ্জালে পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা ক্রমেই উপরে উঠছিলাম। প্রথমে উধমপুর, তারপর কুড। পাটনি টপ নামে একটা জায়গা সব চেয়ে উঁচু, তারপর নিচে নেমে বাটোট। এ সব ছোট ছোট পাহাড়ী শহর বা গ্রাম। হোটেল রেস্তোরাঁ আছে, রাত কাটাবার ব্যবস্থাও আছে। ডাক বাংলোও আছে।

বাটোট থেকে নেমে আসতে হয় রামবাণে, চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এই ছোট শহরটি। পুল পেরিয়ে আবার চড়াই বানিহাল পর্যন্ত। এ সময় এই পাহাড়টা টপ-

কাতে হত, সে ছিল ভারি কষ্টের কথা। এখন একটা দেড় মাইল লম্বা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের ওপারে পৌঁছতে হয়। ওপার থেকেই কাশ্মীরের উপত্যকা শুরু হয়েছে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। দেখতে দেখতে আমরা বাজিগুন্ড খানাবল বিজবিহার ছাড়িয়ে গেলাম। পথের ডান ধারে দেখলাম অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ। পামপুরের জাফরাণের ক্ষেতও দেখলাম। তারপরে পান্দ্রাথান ছাড়িয়ে শ্রীনগর শহর। সন্ধ্যার আগেই আমরা শ্রীনগর শহরে পৌঁছেছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা স্রোতখানি আমরা দেখতে পাইনি।

সেজকাকার সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কখন ডালগেট ছাড়িয়ে খানের পুল পেরিয়ে টুরিস্ট অফিসে এসে পৌঁছেছিলাম তা খেয়াল করিনি। শ্রীনগরে এসে প্রথম দিন আমরা এইখানেই বাস থেকে নেমেছিলাম। আজ আবার এসেছি, কেন এসেছি তা সেজকাকাই জানেন।

ছয়

গেট দিয়ে ঢুকে টুরিস্ট অফিসের প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি সেজকাকা একবার ভাল করে দেখলেন। বাঁ হাতের শেডের সামনে আমাদের বাস এসে দাঁড়িয়েছিল। খানিকটা এগিয়ে গেলে পর পর দুখানা দোতলা বাড়ি যাত্রীদের আবাস। তার সামনে লন ও ফুলের বাগান। ডান দিকে যে বিরাট দোতলা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি, তার নিচের তলায় টুরিস্ট ও বুকিং অফিস আর রেস্তোরাঁ। উপর তলাতেও যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা। এত ঘর, অথচ আমরা সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ঘর পাইনি। অনেক ঘর খালি ছিল বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু টুরিস্ট অফিসার বলেছিলেন যে সেগুলো রিজার্ভ করা আছে। কার জন্যে, তা তিনি বলেননি। সেজকাকার ব্যবহার বোধহয় পছন্দ হয়নি। বলেছিলেন, বাইরের ময়দানে তাঁবু আছে, সেখানে থাকুন। কিংবা হাউস বোটে চলে যান।

এই কথা শুনেই হাউসবোটের দালালেরা এগিয়ে এসেছিল। সরকারী রেট বলেছিল। সে প্রায় আকাশ ছোঁয়া রেট, শৌখিন টুরিস্টদের উপযোগী বটে। কিন্তু সেজকাকা রেগে গিয়ে বলে উঠেছিলেন : চলে এস আমার সঙ্গে।

দরাদরি করবার সুযোগ আমি পাইনি! কিন্তু সেজকাকা যখন মালপত্র নিয়ে একটা টাঙ্গায় উঠলেন, তখন আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম তাঁর কাণ্ড দেখে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কোথায় যাচ্ছি আমরা?

গম্ভীরভাবে সেজকাকা বলেছিলেন : হাউস বোটে।

হাউস বোটে! তাহলে ওদের সঙ্গে কথা কইলেন না কেন!

রাবিশ!

বলে সেজকাকা আমাকে থামিয়ে দিলেন। কর্কশ কণ্ঠে টাঙ্গাওয়ালাকে বললো : চল ডাল লেকের দিকে।

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম : ডাল লেকের দিকে খরচ খুব বেশি বলে শুনেছি। সেজকাকা এ কথায় উত্তর দিলেন না দেখে বললাম : ঝিলমের দিকটা সস্তা।

না না, ওদিকে নয়।

সেজকাকার উত্তর শুনে মনে হল যে তিনি বোধহয় ভয় পেয়েছিলেন ঝিলমের নামে। কিন্তু এতে ভয় পাবার কী আছে, আমি তো ভেবে পেলাম না।

যেদিক থেকে আমরা আজ এসেছি, আমাদের টাঙ্গা চলল সেই দিকেই। অন্ধকারে সব কিছু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম যে একটা পুল পেরিয়ে খানিকটা এগিয়েই ডান হাতের পথ ধরেছি। আমাদের মালপত্র ছিল সামনে, আর আমরা দুজন বসেছিলাম পিছনে। সেজকাকা বামে জলের দিকে চেয়ে রইলেন নিবিষ্ট মনে। একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এলাকায় পৌঁছে হুকুম দিলেন : সামনের ঘাটে বাঁধবে।

অল্প খানিকটা এগিয়েই টাঙ্গাওয়ালা থেমেছিল। আর টাঙ্গা থেকে নেমে আমার মনে হয়েছিল যে, এ অঞ্চলটা সেজকাকার পরিচিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা তিনি আমাকে বললেন না। যে শিকারাওয়ালারা পথের উপর উঠে এসেছিল, তাদের একজনকে বললেন : একটা ছোট হাউস বোটে নিয়ে চল। দরাদরি করতে যেন না হয়।

টাঙ্গা থেকে মালপত্র সে নিমেষে নামিয়ে নিয়ে গেল। ভাড়ার কথা তিনি টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন না, তার হাতে কী দিলেন তাও আমি দেখতে পেলাম না। সে বেচারা কিছু বলবার চেষ্টা করতেই একটা ধমক খেয়ে পিছিয়ে গেল। তারপর আমরা দুজনে শিকারায় উঠে বসলাম।

সে এক বিচিত্র রূপ দেখেছিলাম শ্রীনগরের। সরু নদীর মতো জল পেরিয়ে সাদা সাদা বকের মতো সারি সারি হাউস বোট যেন পাখা মেলে আছে। বাতি জ্বলছে অনেক হাউস বোটে, আবার কতগুলি অন্ধকার। কাছে গিয়ে দেখা গেল যে, তাতে কাপড়ের নিশানে টুলেট লেখা আছে। চারিদিকে সাদা ও কালো কাপড়ের ঝালর, দরজা জানালায় সুন্দর পর্দা, সামনের বারান্দায় ফুলের টব আর ছাদের উপরে ছাতা। রহস্যময় মনে হচ্ছে সমগ্র পরিবেশ।

হাউস বোটের জন্য দরাদরি করতে হল না। সেজকাকা ঘুরে ফিরে সমস্ত হাউসবোটটা দেখে বললেন : পছন্দ হয়েছে। থাকব এখানে। কিন্তু এক দর। বেশি বললেই বেরিয়ে যাব।

হাউস বোটের মালিক মাটিতে উবু হয়ে বসেছিল হাতজোড় করে গরুড় পাখির মতো ভঙ্গিতে।

সবিনয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করল : খানা দিতে হবে না?

ধমকের মতো সুরে সেজকাকা বললেন : না।

চাকর বাকর?

একজন সারাক্ষণের জন্য।

মালিক তার দেশী ভাষায় কথা কইল শিকারাওয়ালার সঙ্গে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট খুলে সেজকাকার দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়েই সেজকাকা বললেন : রাবিশ! দিন বারো টাকা দেব।

এক কথায় রফা হয়ে গেল। আর আমার বিস্ময়ের সীমা রইলনা। টুরিস্ট অফিসে ছত্রিশ টাকা বিয়াল্লিশ টাকা আটচল্লিশ টাকা শুনেছিলাম এই সব হাউসবোটের দিন ভাড়া। সেজকাকা বারো টাকা কেন বললেন, আমার কাছে তা হেঁয়ালি মনে হল। তিনি কি এদের কথোপকথন শুনে কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। না তাঁর অভিজ্ঞতা আছে এ সম্বন্ধে! কিন্তু সাহস করে আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

হাউস বোটের মালিক সিগারেটের প্যাকেট সরিয়ে নিয়ে পায়ের ধুলো নেবার ভঙ্গিতে সম্মতি জানিয়েছিল। এবারে জিজ্ঞাসা করল: রাতের খানা?

শিকারাওয়ালা ইতিমধ্যেই মালপত্র তুলে এনেছে হাউস বোটে। তার দিকে চেয়ে সেজকাকা বললেন : না। আমরা বেরব এখনই। অপেক্ষা কর।

হাউসবোটের মালিক বলল : তার দরকার কী! আমাদের শিকারায় করে যাবেন। আমিরা নিয়ে যাবে আপনাদের।

রাইট।

বলে সেজকাকা শিকারাওয়ালার ভাড়াও মিটিয়ে দিলেন। সে কোন প্রতিবাদ করল না, ব্যবসা জানে সে। এর পরে চারিদিকে ঘোরাবার সময় সুদে আসলে উসুল করবে। তাই মস্ত একটা সেলাম করে বলল : কাল সকালে আসব।

নানা কারণেই সেজকাকা আমার কাছে রহস্যময় হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু টুরিস্ট অফিসের প্রাঙ্গণে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠলেন : দাঁড়িয়ে রইলে কেন। এস আমার সঙ্গে।

বলে টুরিস্ট অফিসের একটা কাউন্টারে এসে গুলমার্গের টিকিট কাটলেন। পরের দিনের টিকিট পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল দুদিন পরে! সকাল সাড়ে নটায় বাস ছাড়বে, এক ঘণ্টা আগে আমাদের আসতে হবে এইখানে। টিকিটের উপরে সীটের নম্বর আছে, বাসের নম্বর দেওয়া হল। সেই নম্বর মিলিয়ে ঠিক জায়গায় উঠে বসতে হবে। নিজের পকেটেই টিকিট দুখানা রেখে সেজকাকা বললেন : চল।

আমি তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগলাম।

খানিকক্ষণ নীরবে চলবার পরে সেজকাকা বললেন : গুলমার্গের টিকিট কেন কিনলাম জান?

এ কথা যে আমরা জানা নেই, তা তিনিও জানতেন। তাই উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে বললেন : ঐ দিকটা সকলের আগে দেখাই ভাল।

কেন?

কেন! তা কি বুঝবে তুমি!

বোঝালে নিশ্চয়ই বুঝব।

টুরিস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে সেজকাকা বাঁ হাতের পথ ধরেছিলেন। নির্জন পথে খানিকটা হাঁটবেন। নির্জনতাই তিনি বেশি পছন্দ করেন দেখেছি। চলতে চলতেই বললেন: মহারাজা হরি সিং যদি এই কথাটি বুঝতেন তাহলে আধখানা কাশ্মীর আজ পাকিস্তানের কবলে যেত না।

সেজকাকা যে আবার অতীতের মধ্যে ফিরে গেছেন, তা বুঝতে আমার দেরি হল না। নীরব থেকে আমি তাঁকে নিরুদ্বেগে চলবার সুযোগ দিলাম।

সেজকাকা বললেন: হরি সিং বুঝতে পারেননি যে, যে-পথে টুরিস্টরা আসত কাশ্মীরে অবকাশ যাপনে, সেই পথেই একদিন শত্রু আসবে এদেশে। তুমি তো জান, কাশ্মীরে আগে রাওলপিণ্ডি মারি হয়ে আসতে হত, জম্মু হয়ে আসবার কোন পথ ছিল না। মারির পর ঝিলম পার হয়ে উরি বারমুলার পথে শ্রীনগর আসতে হয়। এই পথেই আমরা গুলমার্গ যাব।

একটু থেমে বললেন: এ পথ আর কতদিন খোলা থাকবে জানিনে। বন্ধ হবার আগেই দেখে আসা ভাল।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: বন্ধ হবার কথা কেন ভাবছেন?

কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের লোভ তো একটুও কমেনি, দিনে দিনে বাড়ছে দেখছি। ভারতের মাটিতে জন্ম নিয়েই পাকিস্তানের দৃষ্টি পড়েছে এই দিকে। দেশ বিভাগের সময় হায়দ্রাবাদ পায়নি, জুনাগড়ও পায়নি। কাশ্মীরও হাত ছাড়া হয়ে যাবে, এই ভয়েই তো সেদিন হাত বাড়িয়েছিল। বারমুলার পথেই এগিয়ে এসেছিল শ্রীনগর দখল করতে।

আমার মনে হল যে, এ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেই সেজকাকা বলবেন, আজ থাক পরে একদিন বলব। তাই আমি কিছু জানতে চাইলাম না। আর এই জন্যেই বোধহয় সেই পুরনো গল্প তিনি আমাকে সংক্ষেপে শোনালেন।

এদেশের দেশীয় রাজারা একে একে কেউ ভারতে কেউ পাকিস্তানে যোগ দিল। কিন্তু হরি সিং কোন দেশে যোগ দিলেন না। তাঁর রাজ্যে মুসলমান প্রজা বেশি, কিন্তু তিনি ডোগরা রাজপুত, তার প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। বোধহয় ভাবছিলেন, স্বাধীন থাকা সম্ভব কিনা। এমনি সময় পাকিস্তানীরা দেশে ঢুকে পড়ল উরি বারমুলার পথে।

শিশু পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কায়েদ-ই-আজম মুহম্মদ আলি জিন্না তখন অ্যাবেটাবাদে, কাশ্মীর সীমান্ত থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। তিনি বললেন, ওরা পাকিস্তানী সৈন্য নয়, উপজাতীয় হানাদার। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড নামে ওরা পরিচয় দেয়। ওদের সঙ্গে পাঠান আফ্রিদি ও মুসলিম লীগের ভলান্টিয়ারও আছে অসংখ্য।

এই আক্রমণের আগে পাকিস্তান কাশ্মীরের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। ভাতের পাতে নুন নেই, পেট্রলের অভাবে পথ চলাও বন্ধ। দুর্দশার অন্ত নেই কাশ্মীরবাসীর। তবু মহারাজ হরি সিং বুঝতে পারেননি বিপদের কথা। সেকথা বুঝলেন সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং-এর মৃত্যুর পরে। নিজেদের সামান্য সৈন্য নিয়ে তিনি হানাদারদের ঠেকাতে এসেছিলেন উরিতে। যুদ্ধে তিনি মারা পড়লেন। হানাদাররা মোহরার পাওয়ার হাউস দখল করল, অন্ধকার হয়ে গেল শ্রীনগর, গোটা কাশ্মীর রাজ্যে নামল ভয়।

আত্মরক্ষার জন্য হরি সিং ভারতবর্ষে যোগ দিলেন, সাহায্য চাইলেন ভারতীয় সৈন্যের। কিন্তু ভারত থেকে সৈন্য আসার পথ তখন ছিল না। যে পথে আমরা এসেছি, সে পথ তখনও তৈরি হয় নি। শ্রীনগর থেকে শত মাইল দূরে ছোট একটি এরোড্রোম ছিল রাজার নিজের ব্যবহারের জন্য। সেখানে সেনাবাহিনীর প্লেন নামতে পারবে কিনা তাও জানা ছিল না। অথচ প্লেন ছাড়া অন্য যানবাহনে আসাও সম্ভব নয়। কাশ্মীরীরা ভেবেছিল যে হানাদারের হাত থেকে এ দেশ রক্ষা পাবে না। ভারতবাসীও সেদিন তাই ভেবেছিল। কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল সেনাবাহিনী। সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করেছিল। কাশ্মীরের এই যুদ্ধের কথা তো তোমাদের মনে নেই, স্বাধীন ভারতের প্রথম জয়ের কথা তোমরা জানবার চেষ্টাও করনি।

বলে সেজকাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমি বললাম: একটা বইএ পড়েছিলাম বলে মনে পড়ছে।

পড়েছ! কোথায় পড়েছ?

বললাম: সেকথা মনে পড়ছে না।

কিন্তু সেজকাকা আমার উত্তর শুনে উৎসাহ হারালেন না, বললেন: সে সময়ের ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন হেমন্তকাল, অকটোবরের শেষাশেষি হুকুম হল কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য যাবে যুদ্ধ করতে। হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে কাশ্মীর রাজ্য। হানাদাররা তখন বারমুলা দখল করে ফেলেছে, ধেয়ে আসছে শ্রীনগরের দিকে। এই খবর নিয়েই ভারতীয় সৈন্য দিল্লী থেকে আকাশে উড়ল। সেদিন বোধহয় ১৯৪৭ সালের সাতাশে অকটোবর। শিখ রেজিমেন্টের লেফটেনান্ট কর্ণেল দেওয়ান রণজিৎ রায় তিনখানা ডাকোটা বিমানে শখানেক সৈন্য নিয়ে শ্রীনগরের সেই ছোট এরোড্রামে এসে নামলেন। বারমুলার কাছাকাছি এগোলেন হানাদারদের ঠেকাতে। কাশ্মীর রাজের সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংজীর বাধাকে তারা বাধা মনে করেনি, কিন্তু একশো সেনার সেনাপতি রণজিৎ রায় নিজের প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন যে ভারতীয় সেনা আসছে, কাশ্মীর দখল করতে তারা পারবে না।

গভীর আবেগে সেজকাকার কণ্ঠ রোধ হয়ে গিয়েছিল। থমথমে স্বরে বললেন: মিহির বারমুলায় এখনও বোধহয় যেতে দেয় না, সেখানে পৌঁছবার আগেই গুলমার্গের পথ বেঁকে গেছে। তা না হলে কর্ণেল রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারতাম।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর কী হল?

তারপর!

বলে সেজকাকা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আর আমি হাঁটতে লাগলাম নিঃশব্দে। খানিকক্ষণ পরে তিনি বললেন: জিন্নার পরিকল্পনা তুমি বোধহয় জান না। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তিনি কাশ্মীর জয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, আর মুখে বলছিলেন যে এ হল ধর্মযুদ্ধ। মুসলমান উপজাতিরা কাশ্মীরের হিন্দুরাজার হাতে মুসলমান প্রজার দুর্দশা দেখে তারা ধর্মযুদ্ধে নেমেছে। পাকিস্তানের এতে কোন হাত নেই। কিন্তু তিনি খবর পেলেন যে ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে পৌঁছে গেছে, আর বাধা পেয়েছে হানাদাররা, সেদিনই তিনি পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন পারেন নি?

প্রবল কণ্ঠে হেসে উঠলেন সেজকাকা, বললেন: এতো জিন্নার মুজাহিদ বা রাজাকর নয়, এ হল রেগুলার আর্মি। প্রথম ধাক্কা খেলেন তাঁর কমান্ডার-ইন-চীফ লেফটেনান্ট জেনারেল ডগলাস গ্রেসীর কাছে। তিনি বললেন, ইন্ডিয়ার কমান্ডার-ইন-চীফ লেফটেনান্ট জেনারেল সার রবার্ট লক হার্ট যুদ্ধে নেমেছেন ফিল্ডমার্শাল সার ক্লড অকিনলেকের হুকুমে। তিনিই আমাদের সুপ্রিম কমান্ডার, তাঁর হুকুম না পেলে আমি এক পা-ও এগোতে পারব না। বোঝ ব্যাপারখানা। বাঘের বাচ্চা বলেই জিন্নাকে বলতে পেরেছিলেন এই কথা। আর জিন্না জেদী। দিল্লী থেকে অকিনলেককে ডেকে আনলেন লাহোরে। অকিনলেকও বললেন, না, ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ হতে পারে না, কাশ্মীর যোগ দিয়েছে ভারতে, দুদেশের শর্ত মতো ভারত কাশ্মীরকে রক্ষা করতে গেছে।

সেজকাকা বলতে লাগলেন: জিন্না তারপরে ভারতের গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। পণ্ডিত নেহরুকেও ডেকেছিলেন, কিন্তু নেহরু গেলেন না। অনেক তর্কাতর্কি হয়েছিল দুজনে, কিন্তু মিটমাট হল না। জিন্না বলেছিলেন, তোমাদের সৈন্য ফিরিয়ে নাও। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন হানাদারদের ফেরাবে কে? জিন্না তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, আমি। জিন্নার এই উত্তর শুনে সেদিন সমস্ত পৃথিবীর লোক হেসেছিল, প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল যে হানাদারদের কাশ্মীরে পাঠিয়েছিল নতুন পাকিস্তান সরকার।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেকদূরে চলে গিয়েছিলাম। সেজকাকাও সেকথা

বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আর না এগিয়ে পিছন ফিরলেন। ফেরার পথে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কাশ্মীর রক্ষা হল কী করে?

সেজকাকা অবিলম্বে বললেন : কাশ্মীর রক্ষা করেছিলেন দু'জন ভারতীয় সেনাপতি—ব্রিগেডিয়ার লাওনেল প্রতীপ সেন, আর ব্রিগেডিয়ার ওসমান। ব্রিগেডিয়ার সেন এসেছিলেন শ্রীনগরে, আর ঝানগড়ে গিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান। শ্রীনগরে এসেই সেন দেখলেন যে হানাদাররা বাদগামে এসে গেছে, হাত বাড়ালেই বিমানঘাঁটি দখল করে নেবে। একটা গাড়োয়ালি রেজিমেন্ট ওই ঘাঁটি রক্ষা করছিল, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল। নতুন সৈন্য পাঠিয়ে সেন এই হানাদারদের তাড়ালেন। একজন মেজর মারা গেলেন বাদগামের এই যুদ্ধে। মেজর সোমনাথ শর্মা। তারপর আমরা ঘাঁটি মজবুত করার কাজে লাগলাম।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম : আমরা!

সেজকাকা যেন একটু থতমত খেলেন বলে মনে হল। কিন্তু সামলে নিলেন তখনই, বললেন : আমরা মানে ভারতীয় সেনারা। অনেক সৈন্য এল কাশ্মীরে। বেসরকারী প্লেনে চেপে দিল্লী থেকে উড়ে এল। অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম সব এল। স্যাপার্স মাইনার্স আর এম-ই-এসের লোকেরা বনজঙ্গল কেটে রাস্তা ও পুল তৈরি করে আর্মার্ড কার আসতে লাগল এক ডিভিশন। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরি শুরু হয়ে গেল। তখন আমরা পাহাড় উপত্যকা বনজঙ্গল থেকে হানাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

সেজকাকার মুখে দ্বিতীয়বার এই আমরা কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হল। কেন জানি না আমার সন্দেহ হল যে তিনিও সেসময় এই কাশ্মীরে এসেছিলেন যুদ্ধ করতে। নিজের চোখেই সব কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু সেকথা গোপন করতে চাইছেন কোন কারণে। আমি তাঁকে বাধা দিলাম না। নিঃশব্দে শুনতে লাগলাম তাঁর গল্প।

কতকটা অনামনস্কভাবে সেজকাকা বললেন : সেদিনের কথা আজও মনে আছে। নভেম্বরের ছ' তারিখ বিষ্যুৎবার। ব্রিগেডিয়ার সেন হুকুম দিলেন, কাল থেকে পাল্টা আক্রমণ কর, সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকা শত্রুমুক্ত করতে হবে। সমস্ত হানাদারদের উরি পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাতদিন সময় লেগেছিল। তিন সপ্তাহ আগে কাশ্মীরের সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংজী যেখানে তাদের বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই উড়িতে আমরা ভারতের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলাম নভেম্বরের চৌদ্দ তারিখে। তার আগেই সাহরা অধিকার করে শ্রীনগরে বাতি জ্বালানো হয়েছিল। বাতি যে ভারতীয় সেনা জ্বেলেছে, একথা বিশ্বাস করতে কাশ্মীরীদের অনেক সময় লেগেছিল।

অনেকক্ষণ কথা কইলেন না সেজকাকা, বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। কিংবা ভাবছিলেন কিছু। এক সময় বললেন : জম্মু অঞ্চলের যুদ্ধের কথা আমি জানিনে। শুনেছিলাম যে ব্রিগেডিয়ার প্রীতম সিং ও ব্রিগেডিয়ার ওসমান ঐ অঞ্চল শত্রুমুক্ত করবার জন্য দীর্ঘদিন লড়াই করেছিলেন। কোট নোশেরা ঝানগড় দখল করবার পর ব্রিগেডিয়ার ওসমান মারা পড়েছিলেন। সেদিন ছিল জুলাই মাসের চার তারিখ। আর পুঞ্চ এলাকায় যুদ্ধ করছিলেন ব্রিগেডিয়ার প্রীতম সিং। আমাদের এয়ার কমোডর মেহের সিংএর সাহায্য না পেলে তিনিও কাবু হতেন। ও অঞ্চলে তাঁদের অনেক বেশি বেগ পেতে হয়েছিল।

এবারে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন?

ঘরের শত্রু বিভীষণ ছিল সেদিকে। রাজনৈতিক নেতারা স্থানীয় মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। নানাভাবে তারা শত্রুতা করেছে।

সেজকাকা আবার নীরবে পথ চলতে লাগলেন। পরিচিত পথে আমরা ফিরে এলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছিল ধীরে ধীরে। চেনারবাগের পুল পার হয়ে ডাল-গেটের কাছে এসে পৌঁছলুম। তারপরে ডাললেকের পথে খানিকটা এগিয়ে আমি বললাম : আপনার গল্প শুনে মনে হচ্ছে যে এসব যুদ্ধ আপনি নিজের চোখে দেখেছেন।

সেজকাকার জুতোর খট খট শব্দ হল, বললেন : না। যুদ্ধ দেখিনি, যুদ্ধ করেছি। তারপর আহত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছি এইখানে, ঝিলমের উপরে একটা হাউসবোটে।

সেজকাকার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একথা তিনি কোনদিন বলেন নি। সীতাংশুও বোধহয় একথা জানে না, জানলে নিশ্চয়ই আমাকে বলত। কিন্তু এতদিন কেন বলেন নি, সেকথা সহসা বুঝতে পারলাম না।

আরও খানিকটা এগিয়ে সেজকাকা বললেন : একটা কথা এখনও আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়। সমস্ত হানাদার তাড়িয়ে দেশটা পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করবার আগে যুদ্ধ কেন থামিয়ে দেওয়া হল জানতে পারিনি। জম্মুর সর্দার ইব্রাহিম খান নতুন সরকার গড়ে নাম দিয়েছিল আজাদ কাশ্মীর। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ফিরতে না বললে কাশ্মীরকে যে পাকিস্তানে পাঠানো যেত, তাতে কারও এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

সে সময়ের কথা আমার জানা নেই। আমি আশ্চর্য হলাম সেজকাকার কথা শুনে।

—সাত—

অন্ধকারে ফিরলে আমরা আমাদের দেখতে পায় না। পারে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করা সেজকাকা পছন্দ করেন না। আমরা তাই একখানা শৌখিন শিকারায় উঠে বসলাম। বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ এসেছে দু'সপ্তাহ আগে। এখন অগস্ট মাসের প্রথম। ১৯৬৫ সাল। যে ঘটনার কথা শুনলাম, তারপর প্রায় সতের আঠারো বছর কেটে গেছে। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বিবাদ শেষ হয়নি। পাকিস্তান এই বিবাদ আজও জিইয়ে রেখেছে। ইউনাইটেড নেশানসএ আবেদন নিবেদন করেছে, রক্ত চক্ষুও দেখিয়েছে। তাতে ফল হয়নি দেখে আয়ুব খান নেহরুকে ডেকেছে আলোচনার জন্য। সে প্রায় বছর চরেক আগে। ছল চাতুরিতেও কোন ফল হল না দেখে আয়ুব খান ভাবলেন, যেন তেন প্রকারেণ কাশ্মীর দখল করতেই হবে।

সেজকাকাই এসব কথা বলছিলেন। চীনের সঙ্গে লড়বার জন্য পাকিস্তান আমেরিকার কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছিল। তিন বছর আগে যখন চীনারা মাথা তুলল উত্তর সীমান্তে আয়ুব ভাবল এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। ব্ল্যাকমেল করে সৈন্য ঢুকিয়ে দেবে। তার জন্যেই তোড়জোড় করতে লাগল তাড়াতাড়ি। কিন্তু বাদ সাধলেন ভগবান। ২১শে ডিসেম্বর হঠাৎ শোনা গেল যে চীনারা লড়াই বন্ধ করে ফিরে যাচ্ছে। পৃথিবীর লোক আশ্চর্য হয়েছিল, আর মর্মাহত হয়েছিল পাকিস্তান। তার পরের ঘটনা তোমার মনে আছে?

বলে সেজকাকা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললাম : কোন ঘটনা?

সেজকাকা বললেন : মাও-এর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন আয়ুব খান, একটা চুক্তি সই করে এসেছিলেন। তার পরিবর্তে কী দিয়েছিলেন বোধহয় জান না?

আমি স্বীকার করলাম : জানিনে।

কাশ্মীরের যে অংশ ছিল পাকিস্তানের অধীনে, তারই এক খণ্ড চীনারা দাবী করে আসছিল। সেই জায়গাটি চীনাদের দিয়ে পিণ্ডি-পিকিং সন্ধি হল। আমেরিকানরা তাদের পয়সা দিচ্ছিল, অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছিল, মাটির নিচে এরোড্রোম তৈরি করে দিচ্ছিল চীনের সঙ্গে লড়বার জন্যে। আর তারা চীনের সঙ্গে সন্ধি করে এল কার সঙ্গে লড়বে বলে বল। ভারতের সঙ্গেই তো? তাদের সীমান্তে ছিল রাশিয়া, তাদের মতিগতি ভাল নয়। তাই চীনকে জায়গা ছেড়ে দিল রাশিয়াকে আগলাবার জন্যে। তাই না?

বলে আমার দিকে তিনি তাকালেন।

আমি এসব বুঝি না, তাই কোন মন্তব্য করতে পারলাম না।

জল পেরিয়ে আমরা হাউসবোটের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা গানের সুর শুনতে পেলাম পাশের হাউস-বোটে। সেই মেয়েটাই যে এখন গান গাইছে তাতে সন্দেহ নেই। মিষ্টি সুর, কিন্তু সেজকাকার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। শক্ত গোঁফের উপরে তিনি একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। বিরক্তি ফুটে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

কিন্তু গানের সুর আমার ভাল লেগেছিল। আধুনিক গান হলেও যেন ঠিক

আধুনিক নয়। একটা ধ্রুপদী ঢং আছে সুরে। বসবার ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, কিন্তু দরজা জানালায় লেসের পর্দা ঝুলছে বলে ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে সেই পর্দা অল্প অল্প দুলছে। কিন্তু তার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখতে পাবার আগেই আমরা হাউসবোটের সিঁড়িতে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের হাউসবোটটা চিনিয়ে দিতে হল না দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। লোকটা কি আমাদের চেনে! তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম যে সে হাসছে, আমিরার মতো অবাক হাসি নয়, ঐ হাসি গৌরবের। তারপরেই বুঝতে পারলাম যে, এই লোকটাই আমাদের এই হাউসবোটে এনেছিল প্রথম দিনে।

হাউসবোটের দরজা বন্ধ ছিল। সে দরজা খুলে গেল। আমিরাই খুলে দিয়েছে দরজা। দরজায় তালা নেই, তালা দেবার রীতি নেই এই পাহাড়ী দেশে। চোর নেই। চুরি নেই। হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে এ নিয়ম আজও অনেক স্থানে অপরিবর্তিত আছে। অভাবে মরে গেলেও চুরির অভ্যাস তারা আজও আয়ত্ত করে নি। একথা শুনে সেজকাকা বললেন : করবে। আমরাই তাদের চুরি জোচ্চুরি শেখাব, বেইমানি শেখাব। এ না শেখালে দেশটা সভ্য করেছি বলে গর্ব করব কী নিয়ে!

তারপর বললেন : এসব আমাদের কে শিখিয়েছে! গত মহাযুদ্ধের কথা ভাব। জাপানীরা ভারত আক্রমণ করতে এল, শোনা গেল নেতাজী নিজে এসেছেন ভারত জয়ে। যুদ্ধের রং যেন বদলে গেল। নেতাজী আছেন শুনে ভারতীয় সৈন্যই ওদলে চলে যেতে চায়। ইংরেজ তাই আমেরিকাকে ডাকল। বুঝতে পারল যে ভারতকে আর বেশি দিন দখলে রাখা যাবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি ধরে টানল, অভাব অভিযোগ ব্ল্যাক মার্কেট আর কালো টাকার উল্লম্ফ করে দিল দেশটাকে। কয়েক বছরেই দেশের নীতিবোধ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

বসবার ঘরে বসেই সেজকাকা একটা চুরুট ধরালেন। খানিকক্ষণ চুরুট টানলেন নিঃশব্দে। আমি একখানা বই-এর পাতায় মন দেবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ তাঁর গলা শুনতে পেলাম। তিনি বললেন : মিহির, মানুষের ভালটা আমরা চোখে দেখতে পাইনে, দেখি মন্দটা। এই মন্দটাই আগে শিখি। তা না হলে ইংরেজের কি কিছু ভাল ছিল না, না আমেরিকানদেরই কি কিছু নেই! কিছু ভাল না থাকলে ইংরেজ দুশো বছর ধরে সসাগরা পৃথিবী শাসন করল কেমন করে, আর আমেরিকাই বা এখন পৃথিবীটাকে কিনে নিচ্ছে কেমন করে! আজ আমরা চীনাদের গালাগালি করছি, কিন্তু কদিন আগে তো তাদের গলা ধরে হিন্দু-চীনা ভাই ভাই বলেছিলাম! ওদের মধ্যেও নিশ্চয়ই কিছু ভাল আছে। সে জিনিসটা কী বলতে পার? একটা জাতির গৌরববোধ। ওরা ইংরেজ, আমেরিকান বা চীনা বলে গৌরব বোধ করে। আমরা ভারতীয়রা তা করি না। ইংরেজ আমাদের মাথায় হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। দেশটা ভাগ হয়ে গেল। এখন আর আমরা ভারতকে হিন্দুর দেশ বলে ভাবি না। এখন আমরা বাঙ্গালী বলে মাদ্রাজী বলে নিজেদের পরিচয় দিই, ভারতীয় বা হিন্দু বলি না। বিদেশীরা আমাদের দুর্বলতার কথা জানে। তলায় তলায় তারা আমাদের আরও ওস্কাচ্ছে। পাঞ্জাবীদের ভাগ কর, মাদ্রাজীদেরও। ভাষা নিয়ে আন্দোলন করে আরও খন্ড খন্ড কর দেশটাকে। দেশটা দিনে দিনে দুর্বল হলেই তো তাদের সুবিধা।

এর পরে সেজকাকা অনেকক্ষণ চুরুট টানলেন নিঃশব্দে। তারপরে বললেন : যুদ্ধে সেবারে হেরে গিয়ে পাকিস্তান এবারে খুব সাবধান হয়েছে। তলায় তলায় তারাও পটিয়েছে কাশ্মীরীদের। আমাদের এই বোকা আমিরা কী ভাবে জান?

জানিনে তো?

জানি, তুমি জাননা। কিন্তু আমি ওকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। অনেক দূরের এক গ্রাম থেকে ও এখানে চাকরি করতে এসেছে। যতদিন টুরিস্টরা আসবে, ততদিনই চাকরি। খুব কম মাইনে। এই টাকা সে মালিকের কাছেই জমাচ্ছে, আর বকশিশের টাকা নিয়ে সে শীতের সময় নিজের গাঁয়ে ফিরবে। কোন রকমে বেঁচে থাকবে শীতের কয়েকটা মাস। দুবেলা খেতে পায় না তার পরিবার। শীতে জমে মরে যায় না বলে আপশোষ করে। ভাবতে পার তাদের কষ্টের কথা!

তারপরে বললেন : এ লোকটাও এমন ভাবছে যে পাকিস্তান এলে তার দুঃখ আর থাকবে না।

আমি চমকে উঠলাম এই কথা শুনে। আর সেজকাকা দেখতে পেলেন আমার চমকানি। বললেন : চমকে উঠলে কেন! এতো ওর নিজের কথা নয়। ওকে শিখিয়েছে কেউ। সেই কথাই ও বলছে, ওর পরিবারও বলছে। এমনি কাশ্মীরের অনেক মানুষ আজ এই কথাই সত্য বলে ভাবছে। এর পিছনে আছে প্রচার। পাকিস্তানী প্রচার। গতবারে তারা কাশ্মীরীদের সাহায্য পায় নি। এবারে যাতে পায় তার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করেছে।

একটু থেমে বললেন : এবারের যুদ্ধ আগের বারের মতো সহজ হবে না। সেবারে এখানে ঘরের শত্রু ছিল না, তাই তাদের তাড়াতে পেরেছিলাম। ঘরের শত্রু ছিল বলে জম্মু এলাকায় কাজটা খুবই কঠিন হয়েছিল। এবারে সর্বত্র কঠিন হবে। কিন্তু ভারত সরকার কি এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন! আমার মনে হয়, না, থাকলে তাঁরাও অপপ্রচার বন্ধ করতেন। দিল দরিয়া হাতে টাকা ঢালছেই হয়ত। আমেরিকা তাহলে ল্যাটিন আমেরিকায় মার খেত না। তাদের তো টাকার অভাব নেই।

আমি স্তব্ধ হয়ে সেজকাকার কথা শুনছিলাম। কোন উত্তর দেবার মতো কথা আমার জানা ছিল না। সেজকাকা তাঁর নিজের ভাবনায় ডুবে রয়েছিলেন। ধোঁয়ার কুন্ডলীতে ভরে গিয়েছিল তাঁর চারিপাশ।

কিন্তু পাশের হাউসবোটের গান তখনও থামে নি। মাঝে মাঝেই আমার মন সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে ওরা জীবনটাকে উপভোগ করছে, আর আমরা উপহাস করতে এসেছি কাশ্মীরকে।

হঠাৎ এক সময় সেজকাকা বললেন : ভারত সরকার বোধহয় কাশ্মীর সম্বন্ধে গভীর ভাবে কিছু ভাবেনি, ভাবলে এই সতেরো বছরে কাশ্মীরের চেহারা বদলে যেত।

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম : কী করে?

সেজকাকা সংক্ষেপে বললেন : একসচেঞ্জ অফ পপুলেশন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন : ইচ্ছা করলেই ভারত সরকার সিমলা পাহাড়ে একটা শালের কারখানা খুলতে পারত, কিংবা ডালহৌসিতে একটা কাঠের বা পেপার মেসির ফ্যাক্টরি। মোটা মজুরি ঘর বাড়ি ছুটি-ছাটার লোভ দেখালেই কাশ্মীরের মুসলমান কারিগর সব হুড়হুড় করে চলে আসত। তার বদলে কাশ্মীরে খোলা যেত একটা এমন কারখানা যার সব মজুরকে সেই রকমেরই লোভ দেখিয়ে ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত। ভারত সরকার কাশ্মীরের জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। কিন্তু এভাবে কিছু খরচ করলে তা আখেরে কাজ দিত।

সেজকাকার এই পরিকল্পনা আমার কাছে অসম্ভব কিছু বলে মনে হল না। বরং মনে হল যে এ একটা খুব সহজ ব্যবস্থা। আমিরার মতো যেসব সরল লোক আজ পাকিস্তানী প্রচারে ভুলে ভাবছে যে ভারতের অবহেলার জন্যই তাদের দুর্দশা আর পাকিস্তান এলেই তাদের দুঃখের দিন ফুরোবে, ভারতে গিয়ে তারা ভারতের অবস্থা দেখবে, আর ভারতীয়দের দেখে কাশ্মীরীরাও বুঝবে কিছু। অন্ততঃ কাশ্মীরে ভারতীয় হিন্দুর বসবাস শুরু হলে পাকিস্তানী প্রচার যে আর তেমন কার্যকরী হবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঠিক এই সময় সেজকাকা বাধা পেলেন। গানের সঙ্গে নাচ শুরু হয়েছে বলে মনে হল। কিংবা টেপ রেকর্ডে এমন কোন নাচের বাজনা বাজছে। মন সেদিকে যেতেই মনে হল যে শব্দ যেন স্পষ্টতর হয়েছে। সেজকাকার বিরক্তিও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি তাঁর চওড়া গোঁফের উপরে দু-তিনবার হাত বুলিয়ে চললেন ঘন ঘন। চিৎকার করে উঠলেন : আমিরা।

আমি তাঁর ভাবান্তর দেখে ভয় পেলাম। সেজকাকা কি আমিরাকে পাশের হাউসবোটে পাঠাবেন গান থামাবার জন্যে! ছি ছি, সে ভারি লজ্জার কথা হবে। তারাও তো এখানে এসেছে শখে। তাদেরও আছে স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার তো সেজকাকার নেই!

আমিরা এসে দরজার কাছে দাঁড়াতে আমি আরও ভয় পেলাম। সেজকাকা কী আদেশ দেন তা জানবার জন্য আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল আমিরা। পাশের হাউসবোটে নাচ ও গান তখন আরও জমে উঠেছে।

সেজকাকার মধ্যে আমি খানিকটা অস্থিরতা দেখতে পেলাম। তিনি বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমিরার দিকে তাকাতেই তিনিও সেই দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপরে কঠিন স্বরে আদেশ করলেন: বোতল লাও, ঔর গেলাস।

আমিরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল আমার মুখের দিকে। এ রকম আদেশ সে আগে কখনও পায় নি, এ আদেশ কেমন করে পালন করবে তাও জানে না। আমিও সেজকাকাকে বোতল বার করতে দেখিনি. তবে শীতাংশুর কাছে শুনেছি—যে মাঝে মাঝে তিনি মদ খান, কিন্তু বেসামাল হন না। পুরনো অভ্যাস, ছেড়ে দিয়েও নাকি ছেড়ে দিতে পারেন নি। পুরনো নেশা ঝাঁপির মধ্যে বদ্ধ সাপের মতো। সুযোগ পেলেই ফণা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু এই নাচ-গানের শব্দে সেজকাকা কেন অস্থির হয়ে উঠলেন!

আমিরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেজকাকা আবার গর্জন করে উঠলেন: দাঁড়িয়ে কেন, যাও, জলদি লাও।

আমিরা আর অপেক্ষা করল না, ছুটে গিয়ে একটা গেলাস আর এক জগ জল এনে হাজির করল।

সেজকাকা বললেন: বোতল!

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন: নেই জানতা! মিহির, আমার সুটকেশ থেকে বার করে আন।

আমি জানি যে সেজকাকাকে সামলাবার চেষ্টা এখন বৃথা হবে। তাই উঠে গিয়ে তাঁর সুটকেশের ভিতর থেকে কাগজে জড়ানো একটা বোতল বার করে আনলাম। চোখজোড়া তাঁর ঝকঝক করে উঠল। বোতলটা খুলে আনতে দিলেন আমিরাকে। তার পরে গেলাসটা হাতে নিয়ে বললেন: খাবে?

লজ্জিত ভাবে আমি বললাম: না।

লজ্জা কিসের! এ হল অমৃত। যদি কিছু ভুলতে চাও তো খেয়ে নাও খানিকটা। আর কিছু বলতে চাইলেও খানিকটা খাও। মাত্রা না ছাড়ালেই হল।

আমিরা বোতল খুলে নিয়ে এল। সেজকাকা খানিকটা ঢেলে নিলেন গেলাসে। তারপরে জল মিলিয়ে চুমুক দিলেন তাতে।

আমিরার দিকে চেয়ে দেখলাম, সে মুখে আর কোন ভয় ভাবনা নেই, নিশ্চিন্ত হয়ে সে হাসছে আগের মতো সরল ভাবে। আমার দিকে একবার চেয়েই সরে গেল দরজা থেকে।

কয়েক চুমুক পেটে যেতেই সেজকাকা বললেন: মিহির, নাচ-গান শুনলেই আমার পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। উরির যুদ্ধে আহত হয়েছিলাম আমি, তারপর ঝিলমের উপরে যখন আমি ছুটিতে ছিলাম তখন— না, আজ থাক সেকথা।

সেদিন রাতে সেজকাকা আর কোন কথা বললেন না।

—আট—

পরের দিন ব্রেকফাস্টের টেবিলেই সেজকাকা বললেন: আমিরা, একখানা শিকারা ডাক।

আর আমার দিকে চেয়ে বললেন: দুপুরে ভাত না খেলে কি তোমার কষ্ট হবে মিহির?

আমি বললাম: কষ্ট কিসের?

তবে খানকয়েক রুটি আর ফল নাও সঙ্গে। পাউরুটি নাও মাখন বা মার্মালেড মাখিয়ে আর খাবার জলের জন্যে একটা জায়গা নিও।

জল নিতে হবে না?

বলে আমি আশ্চর্য হয়ে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে।

সহাস্যে সেজকাকা বললেন: খাবার জল আমরা চশমাশাহী থেকে নেব।

সে জায়গা কোথায়, সে-কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেজকাকা বললেন: ঐ জলের জন্যে যাত্রীরা অযথা ভিড় করে, আর তুমি কি চাও যে আমরা এখানকার পচা জল যত্ন করে ধরে নিয়ে যাই! তুমি কি হলফ করে বলতে পার, এরা আমাদের ডাল লেকের জল না খাইয়ে কলের জল ধরে দিচ্ছে!

ভয়ার্তস্বরে আমি বললাম: না না, এই নোংরা জল নিশ্চয়ই খাওয়াচ্ছে না। মাটির উপরে আমি কলের জলের ট্যাপ দেখেছি।

এই ভেবেই নিশ্চিন্ত থাক। আর এই-জন্যেই ঝিলমের হাউসবোটে এখনও যাত্রীর বেশি ভিড়। হাউসবোটগুলো পুরনো হতে পারে, কিন্তু ঝিলমের জল টলটল করে সারাক্ষণ। সে-জল খাওয়াচ্ছে শুনে আঁৎকে উঠতে হয় না।

জলের ব্যবস্থা আমি এখানে ভাল করে দেখেছিলাম। তার কারণ ছিল। বাথরুমের জল ডাল লেকে যায় কিনা তা না দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। দেখেছি যে হাউসবোটের গায়ে একটা করে ট্যাংক লাগানো আছে, বাথরুমের নোংরা জল জমে সেখানে। মেথর সেই জল রোজ পরিষ্কার করে। কিন্তু সেজকাকার কথায় সন্দেহ হল যে সেই জল হয়তো তারা মাটিতে না ফেলে জলেই ঢেলে দেয়। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি! আমরা তো আর ডাল লেকের জল খাচ্ছি না! আমি দেখেছি যে জলের ট্যাপে রবারের নল লাগিয়ে হাউসবোটের ছাদের ট্যাংক তারা ভরে দিচ্ছে। সেই জলে আমরা স্নান করছি, ব্যবহার করছি নানা কাজে। তবে রান্নার কাজে এরা ডাল লেকের জল তুলে নেয় কিনা কে জানে। সারাক্ষণ তো সামনে থাকি না। আর যারা এদের কাছে খাওয়ার ব্যবস্থা করে, তাদের অবস্থা জানিনে। অন্ধকারে কিচেনবোটের ভিতরে কী করে তা অন্তর্যামীও জানতে পারেন কিনা সন্দেহ।

সেজকাকা যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, তা দেখে লজ্জা পেলাম। তাই দেখে তিনি যেন আরও প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, বললেন: নাও, আর ভাবতে হবে না তোমাকে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড় শিকারায়।

আমিরা এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। সেজকাকার মুখে শিকারা শব্দটি শুনেই সহাস্যে সরে গেল। তার মানে, সে যে শিকারা এনে হাজির করেছে, তা আমরা বুঝতে পেরেছি জেনে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আমরা শিকারায় উঠলাম। সেই শিকারাওয়ালা, যে আমাদের এখানে এনেছিল। এও বোধহয় এ-দেশের রীতি। প্রথমে যে এসেছে, বারে বারে সেই এগিয়ে আসছে। সে উপস্থিত থাকলে আর কারও এগিয়ে আসার অধিকার বোধহয় নেই। কোথায় যেতে হবে, সে-কথা জানতে চাইবারও বোধহয় দরকার নেই। কাশ্মীর ভ্রমণের একটা অলিখিত ছক তৈরি আছে বলেই মনে হয়। শ্রীনগরে পৌঁছবার পর দু-একদিন বিশ্রাম, তারপর শিকারায় করে মোগল উদ্যান দর্শন। টুরিস্ট বাসে অবশ্য এক-বেলাতেই সব দেখা হয়ে যায়, কিন্তু সে-দেখা সকলের ভাল লাগে না। সেজকাকাও কাল টুরিস্ট বাসের খোঁজ করেননি। শিকারায় চেপেই আমরা মোগল উদ্যান দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু এ-কথা আমি আগে বুঝতে পারিনি। সেজকাকা নিজে কিছু বলেননি, শিকারাওয়ালাও প্রশ্ন করেনি কোন। শহরের দিকে না এগিয়ে শিকারাওয়ালা যখন উল্টোদিকে এগোয়, তখন আমিই প্রশ্ন করলাম: আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি সেজকাকা?

সেজকাকা তখন শিকারার গদিতে পা ছড়িয়ে বসে একটা চুরুট ধরাচ্ছিলেন। বসবার ব্যবস্থা সত্যিই ভাল। আমাদের দেশের ডিঙি নৌকোয় কাঠের তক্তার উপরে বসতে হয়, কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সারাক্ষণ। এখানে পা ছড়িয়ে বসবার জায়গা দুদিকে। মাথার উপরে ছাদ, উপর থেকে পর্দা ঝুলছে। আড়ালের দরকার না থাকলে পর্দা সরিয়ে বসা যায়। দুদিকে দুজন করে বসা যায় স্বচ্ছন্দে। মাঝি ডিঙির ডগায় বসে নৌকো বেয়ে এগিয়ে যায়। এমনি করে অনেক শিকারা যাতায়াত করছে। কেউ নিঃশব্দে চলেছে, কেউ যাচ্ছে আনন্দ-কলরব করতে করতে, আবার কারও শিকারায় রেডিও বা টেপ-রেকর্ডারে গান বাজনা হচ্ছে। পাশাপাশি বা আগে ও পিছনে দু-তিনখানা শিকারার যাত্রীরা উচ্চস্বরে গল্পগুজব করেও এগিয়ে চলেছে। এই বিচিত্র জগতেও আমার গন্তব্যস্থলের কথা মনে এসেছিল, তাই উত্তরের জন্য সেজকাকার মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

কিন্তু তিনি ধীরে সুস্থে চুরুট ধরিয়ে খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে সংক্ষেপে বললেন: কাশ্মীর দেখতে।

এ-কথায় কিছুই বোঝা গেল না, তাই আমি এর পরে কিছু জিজ্ঞাসা করব কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বললেন: কিছু বুঝতে পারলে না বুঝি!
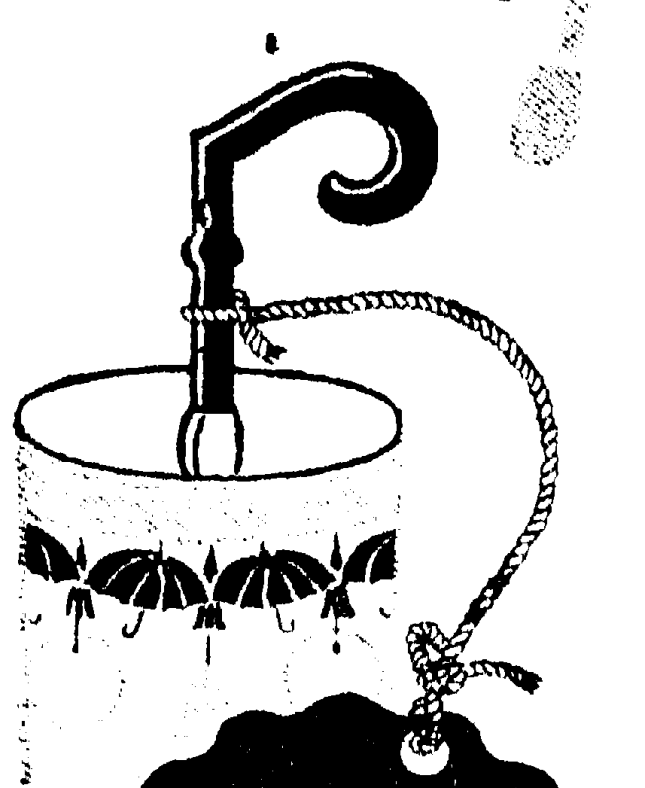
আমি সরলভাবেই স্বীকার করলাম : না।

সেজকাকা বললেন : কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলেছিলেন কে, জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ না!

আমি বললাম : বোধহয় তাই।

সেজকাকা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন : দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে করি কথাটা।

বলে ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন : আগর ফিৰ্দৌস বের রু-ই- জমিন অস্ত্, হামিন অস্ত্ ও হামিন অস্ত্ ও হামিন অস্ত্। এই পৃথিবীতে যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে তো এইখানেই। কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদশার বাপ আকবর বাদশাহ তাঁর আগেই এই ভূস্বর্গে এসেছিলেন। আর তাঁর মন্ত্রী আবুল ফজল সব দেখেশুনে বলেছিলেন, ইয়ে দেশ হ্যায় হামেশা বাহারীক। চিরবসন্তের দেশ কাশ্মীর। মোগল বাদশাহরা চারপুরুষ এখানে যাতা-য়াত করেছেন, কেন করেছেন তাই তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি চুপ করে ছিলাম, কিন্তু সেজকাকা আজ চুপ করে রইলেন না। বললেন : এসব কথা আমিও জানতাম না। আমি যার কাছে শুনেছিলাম—

বলে তিনি নীরব হলেন। কিন্তু আমি আর নীরব থাকতে পারলাম না। বললাম : বলুন না।

না, থাক তার কথা।

কিন্তু আজ আমার সাহস বেড়েছে অনেকখানি, বললাম : থাকবে কেন, বলুন না।

সেজকাকা এ-কথার উত্তর দিলেন না। আমি দেখলাম যে, তিনি কোন গভীর ভাবনায় ডুবে গেছেন। বোধহয় অতীতের কোন বন্ধ দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। ঘরের ভিতর আলো আছে না অন্ধকার, তা জানিনে। দরজায় কড়া নাড়তে হবে না আপনি খুলে যাবে দরজা তাও জানিনে। তবু আমি সাহসে ভর করে বললাম : আপনার মনটাও অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।

সেজকাকা যেন চমকে উঠলেন, বললেন : কী বললে?

বললাম : পুরনো কথা বলে ফেললে মনটা হাল্কা হবে আপনার।

হুঁ।

বলে সেজকাকা আরও কিছুক্ষণ সময় নিলেন, তারপরে বললেন : কাশ্মীরের বাহার দেখতে তো আমরা এদেশে আসিনি, এসেছিলাম যুদ্ধ করতে। তারপর আহত হয়ে কিছুদিন ছুটি পেয়েছিলাম।

গোলাগুলি লেগেছিল বুঝি?

সেজকাকা মাথা নাড়লেন। বললেন : হাতে একটা গুলি লেগেছিল। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। আর পড়ে গিয়েছিলাম বলেই প্রাণটা বেঁচেছিল।

সেজকাকার মুখোমুখি বসেছিলাম আমি, এবারে সোজা হয়ে বসলাম। কিন্তু তিনি কিছু লক্ষ্য না করেই বললেন : সেনাদলে বেপরোয়া বলে নাম ছিল আমার। তাই বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করবার ভার পড়েছিল আমার ওপরে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই প্রাণটা যেতে বসেছিল। গুলি লেগে পড়ে মরেছি বলে শত্রুপক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে-ছিল। কিন্তু হাতে গুলি লেগে প্রাণটা তো যায়নি, মরার ভান করে সারাদিন পড়ে-ছিলাম। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এসে-ছিলাম। হাতটা দেখনি আমার?

আমি বললাম : না।

দেখাব তোমাকে, গুলিটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, ছুটির আমার দরকার নেই, কিন্তু ডাক্তার বলেছিল, আছে। তাই আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা হল ঝিলমের উপরে একটা হাউসবোটে। আর সেইখানেই তার সঙ্গে দেখা।

কার সঙ্গে?

বলে আমি প্রবল কৌতূহল নিয়ে তাকালাম সেজকাকার মুখের দিকে। আর তিনি একটা শুষ্ক হাসি হেসে বললেন : আমাদের পাশের হাউসবোটের মেয়েটাকে দেখেছ তো? ঠিক অমনি দেখতে, ফর্সা চৌকো মুখ, শক্ত ঠোঁট যেন দৃঢ় সংকল্প-বদ্ধ। কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারিনি, সে ফাঁকি দিয়েছিল আমাকে। নিজের পরিচয় গোপন করে আমাকে ভোলাতে এসেছিল, আর—

আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগ-লাম।

আর সেজকাকা এক মুহূর্তে ইতস্তত করে বললেন : তোমার কাছে লুকোব না, তার শুধু রূপে নয়, ব্যবহারেও ভুলেছিলাম আমি।

সেজকাকা এবারে চুরট টানতে লাগ-লেন অন্যমনস্কভাবে। তারপরে বললেন : তখন আমার বয়স কত তাই ভাবছি। ১৯৪৭-৪৮, আর ১৯১০। তার মানে সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। বর্মায় জাপানীদের সঙ্গে লড়ে নাম হয়েছিল, অহংকারও ছিল মনে। তাই বিয়ে করিনি। ভাবতাম, ভাল যোদ্ধা হতে গেলে পেছুটান থাকা উচিত নয়। তাই মেয়েদের সংস্পর্শে খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে চলতাম। তবু, আজও লজ্জা করে সে-কথা মনে হলে, তবু তাকে, হ্যাঁ, আশাই বলব তাকে, আমাকে কাবু করেছিল খুব সহজে। এখন মনে হয় যে, সে খুব উঁচু দরের অভিনেত্রী ছিল, বেশ নিখুঁত অভিনয় করেছিল আমার সঙ্গে। আমার অজ্ঞাত দুর্বলতার পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছিল সেই মেয়েটা। অথচ তাকে আমি কোনদিন সন্দেহ করিনি। বিশ্বাস করতে পারিনি যে, সে কোন প্রয়োজনে আমার সঙ্গে অভিনয় করতে এসেছিল।

আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অভিনয় করতে কেন?

কেন! চোখে সেদিন যৌবনের ঠুলি ছিল বলে বুঝিনি।

তারপরেই বলে উঠলেন : না বুঝে ভালই হয়েছিল। অভিনয়কে সত্য ভেবে-ছিলাম বলেই একটা নতুন জীবনের আস্বাদ

পেয়েছিলাম। স্বল্পকালের জন্য হলেও সেই স্মৃতি নিয়ে আজও বেঁচে আছি। আশা যে আমার কাছে অভিনয় করেছিল, তা আজও অবিশ্বাস করবারই চেষ্টা করি।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। হাউসবোটের সারি শেষ হয়ে গেছে। নেহরু পার্ক পেরিয়ে ডাল লেকে পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি। চারিদিকে নীল জল ছলছল করছে, তার পিছনে পাহাড়। দূরে দূরে হাউসবোট দেখা যাচ্ছে এক-আধখানা, শিকারাও চলেছে, আর জেলে-ডিঙি। একধার থেকে শাক-সবজি নিয়ে ডিঙি আসছে। কিন্তু অন্য কোন পণ্য-দ্রব্যের পসরা নিয়ে কেউ যাতায়াত করছে না। আমরা নিঃশব্দে খানিকটা পথ অতিক্রম করলাম। তারপর সেজকাকা আবার কথা কইলেন। বললেন ঃ এখন বুঝতে পারি যে, আশার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার বেশ আকস্মিক। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরেই আমি ছুটি পেয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি যাবার টান ছিল না, আর কোন জায়গায় যাবার আকর্ষণও বোধ করিনি। ভেবেছিলাম যে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারলে আবার লড়তে যাব। তাই ঝিলমের উপর একটি হাউসবোটে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

সেজকাকা বলতে লাগলেন ঃ কদিন পরে ঠিক মনে নেই। যত দূর মনে পড়ছে, দু এক দিন পরেই সেই ঘটনা ঘটল। বিকেল বেলা হাউসবোটের ছাদের উপরে উঠেছিলাম। আগের দিনও ছাদে বসে অনেকক্ষণ কাটিয়েছি। চা খেয়েছিলাম, তারপর চুরট ধরিয়েছিলাম। দিনের আলো নিবে যাবার পর বিজলির আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠল। অন্ধকার শ্রীনগরে আমরাই আলো জেলেছিলাম। সেই আলো দেখে মনে বেশ পুলক এসেছিল মনে আছে। গুন গুন করে গান গেয়েছিলাম কিনা মনে নেই, তবে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার কলি মনে পড়েছিল—'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোত খানি বাঁকা, যেন খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।' অনেক চেষ্টা করেও পরের লাইন আর মনে করতে পারিনি। চারিদিকের দৃশ্য দেখে সত্যিই ভাল লেগেছিল। নদীর দুধারেই শহর, মাঝখানে পুরনো আমলের পুল। পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আবার ঝিলমের কলধ্বনিও শুনছি। আর পাশাপাশি অনেকগুলো হাউসবোট নিস্তরঙ্গ জলে শ্রান্ত মরালের মতো ঈষৎ দুলছে। অন্ধকার হবার পরেও আমি অনেকক্ষণ উপরে বসেছিলাম, তারপরে নেমে এসেছিলাম নিচে।

কিন্তু পরের দিন তাল যেন কেটে গেল। বিকেল বেলায় ছাদের উপরে উঠে দেখলাম যে পাশের হাউসবোটের ছাদে একজোড়া মেয়ে-পুরুষ বসেছিল। মেয়েটি গান গাইছিল গুন গুন করে। রবীন্দ্রসংগীত বলেই আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার পায়ের শব্দে মুখ ফিরে চেয়েই মেয়েটি থেমে গেল। নিতান্ত কাছে বলে তাদের আমি ভালভাবেই দেখতে পেয়েছিলাম। একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল মেয়েটির মুখে, গান আর গাইল না। ছেলেটি বোধ-হয় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। মেয়েটি কোন কথাই শুনল না, নেমে গেল ছাদের উপর থেকে। আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। আমার জন্যেই যে তারা নেমে গেল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি নেমে গেলে যে তারা উপরে উঠবে তার নিশ্চয়তা নেই। অথবা আমাকে নামতে দেখে অন্য কিছু না ভাবে, এই ভয়ে আমি ছাতার নিচে চেয়ারে বসে পড়লাম। কিন্তু মনটা আমার সংকুচিত হয়ে রইল। শ্রীনগরের অপরাহ্ণ তার আগের মতো সুন্দর মনে হল না। অপ্রসন্ন মনে আমি লাইটার জেলে এক হাতেই চুরট ধরালাম।

কিন্তু বেশিক্ষণ আমাকে একা বসে থাকতে হল না। নিচে কারও কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমার বেয়ারার সঙ্গেই বোধহয় কেউ কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ

পরেই বেয়ারা একটা স্লিপ হাতে করে উপরে উঠে এল। অনুকূল সরকার নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। কাশ্মীরে বাঙালী ভদ্রলোক! নিজের দেশের লোক! প্রথমটায় আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি, তারপরেই বললাম, উপরে নিয়ে এস। ভদ্রলোক উপরে এলেন। নমস্কার বিনিময় হল। হেসে বললেন, আপনাকে দেখেই আমি বাঙালী বলে সন্দেহ করে-ছিলাম। আশা আমার কাছে হেরে গেল।

আশা? আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আশা কে? ভদ্রলোক আমার উত্তর দেননি, তার বদলে চেঁচিয়ে ডেকে-ছিলেন আশাকে। পাশের হাউসবোটের সেই মেয়েটির নামই আশা। অপ্রসন্ন মনে সে উঠে আবার ছাদের উপরে উঠেছিল। আর অনুকূল সরকার সগৌরবে ঘোষণা করে ছিল যে বাজীতে জিতেছে সে। আশা নাকি বলেছিল, আমি নিশ্চয়ই বাঙালী নই, বাঙালীর নাকি অমন কড়া করে ছাঁটা গোঁফ থাকে না।

সেজকাকা বললেন ঃ আশা সেদিন আমার কাছে আসেনি। কিন্তু অনুকূল সরকার অনেকক্ষণ বসে গল্প করেছিল, কফি খেয়েছিল আমার সঙ্গে। তারপর ফিরে গিয়েছিল। পরদিন সকালে এসেই জিজ্ঞেস করেছিল, বেরোবেন বেড়াতে? শিকারায় করে আমরা মোগলগার্ডেন দেখতে যাচ্ছি। আমি দেখলাম, সেজেগুজে আশা শিকারায় উঠে বসেছে। আমাকে তাকাতে দেখে হেসে বলল, আসুন না।

সেজকাকা বললেন ঃ বুঝলে মিহির, আশার মুখে আমি একটুও বিরক্তি দেখ-লাম না, দেখলাম না কোন অপ্রসন্নতা। চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা আকর্ষণ বোধ করলাম যে, তাকে না বলতে পারলাম না। চুরটের পাউচ আর লাইটার নিয়ে আমি তাদের শিকারায় নেমে পড়লাম। এইতো চশমাশাহী এসে গেছি দেখছি। এখান থেকে হাঁটতে হবে খানিকটা।

মাঝি আমাদের শিকারা এনে পারে লাগাল। আমরা নেমে পড়লাম। সেজকাকা বললেন ঃ সেদিনও আমরা এইখানে নেমে-ছিলাম।

তারপরেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সেজকাকার। নিঃশব্দে তিনি হাঁটতে লাগলেন।

—নয়—

মাটির উপরে শক্ত পথ ধরে চলতে চলতে সেজকাকা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ঃ এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি জান?

আমি বললাম ঃ না।

সেজকাকা আমার উত্তরের আশা করেন নি, বললেন ঃ চশমাশাহী। চশমা মানে ঝর্ণা। বাদশাহী ঝর্ণা। আকবর বাদশাহর নাতি শাজাহান এই বাগানটি তৈরি করে-ছিলেন একটি ঝর্ণার ধারে। জলের বোতলটি নিয়েছ তো?

এই বোতল নেবার কথা তিনি শিকারা থেকে নামবার সময়ে বলেননি, শিকারা-ওয়ালা আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। বললাম ঃ নিয়েছি।

সেজকাকা বললেন ঃ শহর থেকে আমরা পাঁচ মাইলের বেশি এসেছি। কিন্তু তা মনে হচ্ছে কি?

বললাম ঃ না।

মনে হবে না। এখানে তো তবু হাঁটতে হচ্ছে, এর পরে আর হাঁটতেও হবে না।

মনে হচ্ছিল যে আমরা পাহাড়ের ঢালু পথ ধরে উপরে উঠছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই পৌঁছে গেলাম চশমাশাহীতে। প্রশস্ত পথ এসেছে বাগানের দরজা পর্যন্ত। গাড়িতে এলে আমাদের হাঁটতেই হত না।

একটি ছোট বাগান। নানা রঙের মরশুমি ফুল ফুটে আছে চারিধারে। তিনটি স্তর এই বাগানের, ধাপে ধাপে উপরে উঠতে হয়। বাগানের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি ঘর, এই ঘরেই ঝর্ণা, চশমাশাহী। এই ঝর্ণার জল নাকি ভারি উপকারী, তাই যাত্রীরা অঞ্জলি ভরে জলপান করছে। আমরাও জল খেলাম, আর বোতল ভরে জল নিয়ে নিলাম।

ফেরার পথে সেজকাকা বললেন ঃ এবারে যেমন সহজে এলাম এখানে, সেবারে তেমন পারিনি। ঝিলম থেকে ডাল লেকে আসবার কায়দা কানুন অনারকম। ঝিলম নদী জানতো, বাংলায় বিতস্তা বলে। কাশ্মীর রাজ্যের প্রাণ হল এই ঝিলম, ঝিলমের জন্যেই তার সমৃদ্ধি। কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণে ভেরিনাগে তার উৎস, কিন্তু উত্তরে খানাকল পর্যন্ত নৌকো চলে না। তারপর থেকে বারামুলা পর্যন্ত পঁয়ষট্টি মাইল স্রোতে নানা জাতের নৌকোয় কাশ্মীরের বাণিজ্য চলে অব্যাহতভাবে। এরই মধ্যে স্বাদু জলের হ্রদ উলারে পড়েছে, আবার বেরিয়েছে সেখান থেকে। বারামুলার পরে পার্বত্য এলাকা, ঝিলম সেখানে খরস্রোতা। কিন্তু কাশ্মীরের তাতে ক্ষতি হয়নি, অল্প দূরেই রাজ্যের সীমান্ত।

নিজের কথা ভুলে গিয়ে সেজকাকা ঝিলমের কথাই বলতে লাগলেন ঃ শ্রীনগরে ঝিলম উত্তরবাহী। দুধারে সমৃদ্ধ শহর সাতটি সেতু দিয়ে যুক্ত। সেতুকে এরা কদল বলে। আমিরা কদল হল প্রথম পুল, তারপর হাওয়া কদল ফতে কদল পর্যন্ত ঘন বসতি। নতুন যে পুলটির উপর দিয়ে সারাক্ষণ গাড়িঘোড়া চলছে, তার নাম বাদ-শাহ ব্রিজ। এ পুল নতুন হয়েছে। আর এরই ধারে পুরনো রাজপ্রাসাদে বসেছে নতুন সরকারী অফিস।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ঃ ঝিলম থেকে ডাল লেকে আসতে হয় কেমন করে জান?

বললাম ঃ না।

একবার না গেলে ঠিক বুঝতে পারবে না। নিয়ে যাব একদিন। তাতে ডালগেটের ব্যবস্থাও দেখবে, আবার ঝিলমের দু ধারে শহরও দেখতে পাবে। জলপথের ব্যবস্থা দেখে আমার কী মনে হয়েছে জান? মনে হয়েছে যে ঝিলম নদী প্রবাহিত হয়েছে খাদের মতো নিচু জমি দিয়ে, আর এই ডাল লেক উঁচু মালভূমির। আগে এদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না, অথচ দরকার ছিল। কিন্তু খাল কেটে যুক্ত করে দিলেই ডাললেকের সমস্ত জল ঝিলম দিয়ে বয়ে চলে যেত। এই আশংকা-তেই আগে একটা গেট তৈরি হয়েছে। উঁচু-নিচু জলধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে দু পাল্লার লক-গেট। ঝিলম নদী থেকে একটা সরু খাল বেরিয়ে শ্রীনগর শহরটাকে বেষ্টন করে আবার ঝিলমেই পড়েছে। এরই উপরে লক-গেট।

পরে একদিন এই ব্যবস্থা আমি মনো-যোগ দিয়ে দেখেছিলাম। ডালগেটের নিকটবর্তী অঞ্চল অপরিচ্ছন্ন, বাতাস আর্দ্র ও স্যাঁৎসেঁতে। দুতিনখানা শিকারা এসে পৌঁছতেই গেট উঠল। আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু বেরোতে পারলাম না। অন্য ধারে আর একটা গেট আছে। যে গেট দিয়ে ঢুকলাম, সেটা বন্ধ হয়ে যেতেই আমরা দু গেটের মধ্যে বন্দী হয়ে গেলাম। তার পরে যেন নিচে নামতে লাগলাম। জলের বুকটাই নেমে যাচ্ছে। কোথা দিয়ে জল বেরিয়ে গেল বা কতটা নিচে নামলাম, তা বোঝবার আগেই আর একটা গেট খুলে গেল। গেটের অন্য ধারে বেরিয়ে এলাম আমরা। এ সেই ঝিলমের খাল। বড় বড় চেনার গাছের ছায়ায় ঘেরা বলে লোকে বলে চেনার বাগ। ঝিলম নদী এখান থেকে দূরে নয়।

পায়ে হেঁটে আমরা শিকারার কাছে ফিরে এলাম। আরও কয়েকটি শিকারা আছে দাঁড়িয়ে। রূপ দেখে চেনা যায় না। মাঝি দেখেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। শিকারার নাম দেখে রাখলে আর কোন ভাবনা নেই। যেমন হাউসবোট, তেমনি সব শিকারার গায়েই বড় বড় ইংরেজী হরফে নাম লেখা আছে। সুন্দর সব নাম, বেশির ভাগই বিলিতি নাম। সাহেব সুবোদের মনোরঞ্জনেই যে এসব নাম রাখা হয়েছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মাঝি আমাদের দেখতে পেয়ে উঠে এসেছিল। আমরা উঠে বসতেই শিকারা নিয়ে এগিয়ে চলল।

সেজকাকা বললেন ঃ তোমাকে হাঁটতে হবে না। ঘাটের কাছেই নিশাতবাগ আর শালিমার বাগ।

ডাললেকের ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে যে এইসব উদ্যান রচনা হয়েছিল তা বুঝতে পারছি। এসব উদ্যান যে একই ধরনের হবে তাও অনুমান করতে পারছি। এ সবের চেয়ে সেজকাকার যৌবনের গল্প আমার কাছে বেশি লোভনীয় হবে মনে হয়। তাই আমি সেই প্রসঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। বললাম ঃ অনুকূল সর-কারই আপনাকে এইসব দেখিয়েছিল, তাই না?

অনুকূল সরকার!

সেজকাকা চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন ঃ অনুকূল সরকার একটা

বাজে লোক ছিল, দেখতে শুনতেও তেমনি। পুরুষের মতো শক্ত ও কঠিন হাব-ভাব হলে আমি তাকে বরদাস্ত করতে পারতাম, কিন্তু লোকটা মেয়েদের মতো ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলত, সারাক্ষণ যেন মন রাখবার জন্যেই ব্যস্ত।

আশাকে আমি এই ভদ্রলোকের স্ত্রী ভেবেছিলাম। কিন্তু সেজকাকা বললেন : কিন্তু আশা ছিল অন্য ধরনের মেয়ে, তার একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, ভাই-এর মতো মেরুদণ্ডহীন ছিল না।

ভাইবোন!

ভাইবোনই তো। তুমি কি অন্য কিছু ভেবেছিলে নাকি?

আমি বললাম : ওদের সম্পর্কের কথা তো আগে বলেন নি, আমি তাই কিছু ভাবতেই পারিনি। তবে দুজনে আপনাকে ডেকে আনলেন—তখনই বুঝেছিলাম যে—

কী বুঝেছিলে?

প্রেমিক নয় কথাটা মুখে এল না, বললাম : স্বামীস্ত্রী নয়।

শুধু ভাল যে আর কিছু ভাবনি।

একটু থেমে বললেন : অনুকূল সরকার বোধহয় লেখাপড়াও বেশি করেনি, কৃষ্টি সংস্কৃতিরও ধার ধারে না। আর তার বোন আশা একেবারে উল্টো ধরনের মেয়ে। ঝিলমের স্রোত দেখে একটুখানি এগিয়েই আমাকে কী বললে জান? বললে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কাশ্মীর এসেছিলেন। অপরিচিত মেয়ে, তাই তাকে আমি আপনি বলেই প্রথম কথা বলেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ কথা কেন বলছেন? আশা কী উত্তর দিলে জান? বললে, নিজের চোখে না দেখলে ঝিলমের কথা ঠিক এমনভাবে লিখতে পারতেন না। শোন কথা। আমি ইংরেজির পণ্ডিত ছিলাম, তখন ভারত সরকারের পণ্ডিত। আমি রবীন্দ্রনাথের কী জানি বল! কিন্তু ঝিলমের বাঁকা স্রোতের কথাটা যে জানি, তা এ জানল কী করে তা বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হলাম। মনে হল যে, কাল বোধহয় গাইতে না পেরে জোরে জোরেই আবৃত্তি করেছিলাম এই লাইনটা। আর আশা তা শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু তাহলে বাঙালী কিনা এই নিয়ে বাজী ফেলল কেন!

সেজকাকা থামলেন না, বলতে লাগলেন : বুঝলে মিহির, আজ তোমাকে আমি এই সন্দেহের কথা বলছি, কিন্তু সেদিন আমার মনে এ সন্দেহ আসেনি। সেদিন বরং বাহাদুরী নেবার জন্যে বলেছিলাম, সন্ধ্যাবেলায় কি সত্যিই ঝিলমের বাঁকা স্রোতে দেখে খাপে ঢাকা তলোয়ারের কথাই মনে হয়। আশা হেসেছিল আমার মুখের দিকে চেয়ে, বিজয়িনীর মতো হাসি, আর অনুকূল সরকারের মুখের দিকে চেয়ে আমার গা জ্বলে গিয়েছিল। লোকটাকে আরও বিশ্রী দেখাচ্ছিল তখন।

ডাল লেকের জলে স্রোত নেই। স্থির জলের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে নৌকো এগোচ্ছে। আর আমি সেজকাকার মুখে গল্প শুনছি পুরনো দিনের। তিনি বলতে লাগলেন : অনুকূল সরকারও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আমার মনের কথা। আমাকে কিছু বলতে হল না, নিজে থেকেই সে পিছিয়ে পড়তে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত—

সেজকাকা কী বলবেন বোধহয় ভেবে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি কোন তাড়া না দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষে তিনি নিজেই বললেন : আমরা দুজনেই বেড়াতে লাগলাম। খুব তাড়াতাড়ি ঘটেছিল এই পরিবর্তন, কিন্তু তা আমার চোখে দৃষ্টিকটু লাগেনি, কোন সন্দেহও জাগেনি মনে। অনুকূল সরকার আমাদের সঙ্গে চশমাশাহীতে এসেছিল হেঁটে, জল খেয়েছিল একসঙ্গে। নিশাতবাগেও বেড়িয়েছিল আমাদের সঙ্গে। কিন্তু শালিমারে এসে একটা গাছের ছায়ায় ঝুপ করে বসে পড়েছিল। বলেছিল, আমি আর হাঁটতে পারছি না। আশা যেন এই রকম আশংকাই করেছিল, বলেছিল, অনেক হেঁটেছ, এইবারে শুয়ে একটা ঘুম দিয়ে নাও। বলে আমাকে ডেকে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ের দিকে।

তারপর?

বলে আমি সাগ্রহে তাকালাম সেজকাকার মুখের দিকে। আর সেজকাকা বললেন : তারপর নয়, তার আগের কথা বলি।

কী একটু ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার বয়স কত হয়েছে বলতো? সাতাশ আটাশ?

বললাম : ঐ রকম হবে।

মেয়েদের সম্বন্ধে তোমরা কৌতূহলী হয়েছ কতদিন থেকে? বছর দশেক?

সেজকাকার এই প্রশ্ন শুনে আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে দেখে বললেন : লজ্জা কিসের! দু'এক বছর আগে পরেই না হয় হল, প্রকৃতির নিয়মে তাই হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার বেলায় অন্যরকম হয়েছিল। আমি সেই নিয়ম অমান্য করার চেষ্টা করেছিলাম। একালের ছেলেমেয়েদের মতো আমরা একসঙ্গে পড়িনি, মেলামেশা করবার সুযোগও ছিল না আমাদের সময়। স্কুল-কলেজে ভাল ছেলে বলে নাম ছিল। পড়ায় ভাল নয়, ভাল খেলায়। খেলার মাঠে আমার জুড়ি ছিল না, খেলা ছাড়া আর কিছু আমার মাথায় ঢুকতো না। এমন কি মেয়েদের প্রসঙ্গও ভাল বুঝতাম না। সেই জন্যেই ভাল ছেলে বলে নাম ছিল। এখনকার দিন হলে লোকে গাধা ছেলে বলত। মেয়েরাও হয়তো গাধা বলে গাল দিত। কিন্তু সেকালে গাধা ছেলেদের মেয়েরা সমীহ করত কেন বুঝি না।

সেজকাকার কথার ধরনে আমার হাসি পাচ্ছিল। তা লক্ষ্য করে তিনি বললেন : তোমরা এ যুগের ছেলে, তোমরা হাসবেই তো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে তোমরা প্রভেদ দেখ না, একসঙ্গে পড়, একসঙ্গে কাজকর্ম কর, খেলাধুলো রাখ রেস্তোরাঁ—বন্ধুর মতো ব্যবহার। কিন্তু আমাদের যুগে তা হত না। মেয়েদের আমরা দু দলে ফেলেছিলাম। মা মাসি দিদি বৌদির দলে না পড়লেই প্রেমিকার ভূমিকায় দেখতাম। হয় নিজে প্রেমিকের ভূমিকায় নাম, নয় দূরে রাখ প্রেমিকাকে—মধ্যপথ নেই। আমি শেষেরটাই বেছে নিয়েছিলাম, দূরে রেখেছিলাম মেয়েদের। কিন্তু সে যে কত সর্বনাশা ব্যাপার তা বুঝেছিলাম আশাকে দেখবার পর।

একটু থেমে বললেন : তোমার বয়স কত বললে? সাতাশ? আমার বয়স তখন সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। দশ বছর আগে মেয়েদের বিষয়ে কৌতূহলী হয়েছ। আরও দশ বছর চোখ বুজে থাকবার পর কী অবস্থা হতে পারে, তা তুমি বুঝবে না মিহির। সে কতকটা বারুদের মতো ব্যাপার, একটুখানি আগুনের অপেক্ষা। একদিনেই আশা আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। ইচ্ছা করে সে আগুন ধরিয়েছিল কিনা, সেকথা বুঝবার চেষ্টাও সেদিন করিনি।

সেজকাকা যেন খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তা সংবৃত করবার জন্যেই বোধহয় খানিকক্ষণ নীরবে রইলেন। আর আমি কোন কথা বলে তাঁকে বিরক্ত করলাম না। ডাললেকের শান্ত জলের উপর ছপছপ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। আকাশের সূর্য এখনও মাথার উপরে ওঠেনি। উঠলেও কোন ক্ষতি ছিল না। শিকারার ছাদ আছে, পর্দাও আছে, আর আছে শীতল বাতাস। বসন্ত শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু পৃথিবী এখনও উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি।

হঠাৎ এক সময় সেজকাকা বললেন : আমার কী মনে হয় জান? মনে হয় যে, একালের ব্যবস্থাই ভাল। ছোট থেকেই ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় ক্ষতির সম্ভাবনা কম। তা না হলে মাথা ঘুরে যাবার সম্ভাবনা। হোঁচট খেয়ে পদস্খলনও হতে পারে। আমার নিজের কথাই ধর না। অনুকূল সরকার কে, কী করে, কাশ্মীরে এসেছে কেন—এসব কথা আমার মাথায় এল না। আশা তার কী রকমের বোন, সত্যিই বোন কিনা, চেহারার ও প্রকৃতির পার্থক্য দেখেও মনে কোন সন্দেহ এল না। এসব কথা ভাবলে এখন লজ্জাই করে।

আমাদের শিকারা এসে ঘাটে ভিড়ল। নিশাতবাগের ঘাট। সেজকাকা একটুও অন্যমনস্ক ছিলেন না, মাটিতে নেমে মাঝি শিকারা সামলাতেই তিনি লাফিয়ে নেমে পড়লেন। আমিও নামলাম। তারপরে এগিয়ে গেলাম নিশাতবাগের দিকে।

চশমাশাহীর মতো ছোট বাগান এ নয়, এ মস্ত বড় উদ্যান। যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায়। ডাল লেকের ধার থেকেই স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। দু-তিনটে নয়, গোটা-দশেক ধাপ। বাগানের মাঝখান দিয়ে যে জলের ধারা বইছে তা এই দশ জায়গায় ঝরনার মতো ঝরছে। চারিদিক উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আর

মাঝখানে একটি দোতলা বাড়ি। বিশ্রামের জন্যেই বোধহয় তৈরি হয়েছিল।

ঘুরে ঘুরে আমরা বাগানটি যখন দেখছিলাম, তখন সেজকাকা বললেন : এই বাগানটি কোন বাদশাহর তৈরি নয়। নিশাতবাগ মানে প্রমোদ উদ্যান, এটি তৈরি করেছিল নুরজাহানের ভাই আমদ শাহ। শাহজাহান বাদশাহর মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য কেন?

বাদশাহর চেয়ে বড় বাগান তৈরি করেছে তার মন্ত্রী!

সেজকাকা বললেন : শুধু মন্ত্রী তো নয়, মামা হয় সম্বন্ধে। জাহাঙ্গীর বাদশাহর সম্বন্ধী।

নিশাতবাগ থেকে শালিমার বেশি দূরে নয়, মাইল-দেড়েক পথ। শিকারায় আসতেও আমাদের বেশি সময় লাগল না। সেজকাকা বললেন : শালিমার কথার মানেও বোধহয় জানো না! প্রেমের আবাস। এটি জাহাঙ্গীর বাদশাহ নুরজাহানের জন্যে তৈরি করেছেন, না নুরজাহান জাহাঙ্গীরের জন্যে তা জানা নেই। এই সজীব সুন্দর বাগানটি আজও সকলের মনোহরণ করছে।

খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমি বাগানটি দেখলাম। নিশাতবাগের চেয়ে কিছু ছোট হতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যে নূন নয়। এ-বাগানের পিছনেও পাহাড়, আর তারই পাদদেশ থেকে ফুলের বাগান ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। অজস্র ফোয়ারা, ঝর্ণার মতো জল নামছে পাথরের গা বেয়ে, দু ধারে ফুলের সমারোহ। পায়ে চলার পথ পাথর দিয়ে বাঁধানো। আমি এই পথ ধরে এগোতেই সেজকাকা বললেন : ঐ আপেল গাছটা দেখতে পাচ্ছ? ঐ রকমের একটি গাছের নিচে অনুকূল সরকার বসে পড়েছিল, আর আশা তাকে বলেছিল শুয়ে ঘুমিয়ে নিতে। আমরা এমনি করেই এগিয়ে গিয়েছিলাম।

বাগানের মাঝখানে আমরা পৌঁছে গেলাম। একটি কালো কঠিন পাথরের বাড়ি। দুপাশে ঘর, আর মাঝখানে খোলা। কয়েকটি কালো পাথরের মসৃণ থামের উপরে চারচালার মতো রঙীন ছাদ। জলের ধারা এখানে নদীর মতো বইছে। মুগ্ধ হয়ে আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেজকাকা আমাকে ডেকে বললেন : এস, ঐ বড় চেনার গাছটার ছায়ায় একটু বসি। তারপরে বললেন : আশা আমাকে ঐ গাছের নিচেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

—দশ—

শালিমার থেকে ফিরে সেজকাকা আমাদের মাঝিকে বললেন : চার চিনার চল। সেখান থেকে নাগিন লেক।

আমার দিকে ফিরে বললেন : পথে তোমাকে আকবর বাদশাহর নাসিমবাগ আর ফ্লোটিং গার্ডেন দেখাব। হরি পর্বত আর হজরতবল মসজিদও দেখতে পাবে দূরে।

সেজকাকা তাঁর গল্পের থেকে দূরে সরে গেছেন। আমি ভেবেছিলাম যে শালিমারে সেই চেনার গাছের ছায়ায় বসে তিনি আমাকে তাঁর বিগত বসন্তের কথা বলবেন। কিন্তু তার বদলে তিনি যা বললেন, সে-কথা আমি ভাবতে পারিনি।

প্রেম!

সেজকাকা নাক সিঁটকেছিলেন এই শব্দটি উচ্চারণ করে, বলেছিলেন : পুরুষকে বোকা বানাবার জন্যে এর চেয়ে শাণিত অস্ত্র মেয়েদের আর নেই। প্রেমে পড়েছি ভেবে পুরুষ তার গলার দড়িটি নিজের প্রেমিকার হাতে ধরিয়ে দেয়। আর সেই মেয়ে যখন ন্যাকা কথার ডুগডুগি বাজায়, তখন সেই বীরপুরুষ দুহাত তুলে নাচতে শুরু করে পোষা বাঁদরের মতো। স্থান-কাল পাত্রাপাত্রের বিচার পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়। ছোঃ!

বলে সেজকাকা তাঁর গভীর ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন সেই চেনার গাছের নিচে। আর আমি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিলাম, সেজকাকা আজ এ কী বলছেন। পরে তাঁর এই রাগের কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আশার সংস্পর্শে এসে তিনি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যে, এতদিন পরে তিনি পেয়েছেন জীবনের স্বাদ। সাঁইত্রিশটা বসন্ত ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়েছিল, নূতন বসন্তকে আকণ্ঠ উপভোগের জন্য তিনি মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সৈনিকসুলভ সতর্ক দৃষ্টি অতর্কিতে লোপ পেয়েছিল, প্রেম নামের একটা পাগলামিতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

এসব কথা সেজকাকা সাজিয়ে বলেননি, বলেছিলেন এলোমেলোভাবে। অনেক কথাই বলেছিলেন। সেই চেনার গাছের দিকে এগোতে এগোতে তিনি পিছন ফিরে দেখেছিলেন যে, অনুকূল সরকার সত্যিই শুয়ে পড়েছে। আর আশার সঙ্গে তিনি নিশ্চিন্তে আলাপ করছিলেন চেনার গাছের শীতল ছায়ায়। কত অর্থহীন অনাবশ্যক কথা। আশা অকপটে বলেছিল তার জীবনের অনেক বেদনার কথা। বলেছিল, তার নিঃসঙ্গ জীবনে একজন সঙ্গী সে আজও খুঁজে পায়নি। পুরুষকে সে পুরুষের মতোই দেখতে চায়—বলিষ্ঠ নির্ভীক উদ্যমশীল। মধ্যযুগের পুরুষের মতো নারীকে সে জয় করুক কর্মে, কথায় নয়। কিন্তু আশার দুর্ভাগ্য যে, সে-রকমের পুরুষের পরিচয় সে আজও পায়নি। এতদিন যারা তার কাছে এসেছে, তারা তাকে প্রেমিকের চোখে দেখেছে। সেই ঢুলুঢুলু চোখ দেখে আর ন্যাকা-ন্যাকা কথা শুনে বিবাহের বাসনা তার শুকিয়ে গেছে। তার জন্যে আশার ক্ষোভ নেই এতটুকু। ভবিষ্যৎ-জীবনের সম্বন্ধে সে এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে।

কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে, এ-কথা শুনেই সেজকাকা অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যে অন্য জাতের পুরুষ তা প্রমাণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। মুখে তিনি এ-কথা বোধহয় বলেননি, সুযোগ বুঝে শুনিয়েছিলেন তাঁর বীরত্বের কাহিনী। আমার কাছে ঐ কথা তিনি সরলভাবেই স্বীকার করেছেন। হাসতে হাসতে বলেছেন : শেকস্পীয়রের ওথেলো তুমি পড়েছ তো?

আমি বলেছিলাম : পড়িনি।

সে কি! কলেজে তোমাদের টেক্সট ছিল না?

আমরা ম্যাকবেথ পড়েছি।

সেজকাকা বললেন : আমার অবস্থা হয়েছিল ওথেলোর মতো। কালো সেনাপতি ওথেলো সাদা মেয়ে ডেসডিমোনাকে শোনাতে লাগল তার নানা বীরত্বের কাহিনী। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেমন করে সে বেঁচে এসেছে বারবার—সেইসব কথা।

তারপর স্মরণ করে আবৃত্তি করলেন :—

Wherein I spoke of most
disastrous chances,
Of moving accidents by flood
and field;
Of hairbreadth scapes i' the
imminent deadly breach;
Of being taken by the insolent
foe,
And sold to slavery; of my
redemption thence,
And portance in my travel's
history.

অত্যন্ত সহজভাবে আবৃত্তি করছিলেন সেজকাকা। হঠাৎ থেমে বললেন : ওথেলোর সঙ্গে আমার একটু তফাৎ ছিল। ডেসডিমোনার বাবা ওথেলোর কাছে এইসব কথা শুনতে চাইতেন। কিন্তু আশার ভাই অনুকূল সরকার আমাকে কিছু বলত না, পালিয়ে যেত আগেই। আমি নিজেই আশাকে এইসব কথা শোনাতাম। আর—

She gave me for my pains a
word of sighs:
She swore, — in faith, 'twas
strange, 'twas passing
strange;
'Twas pitiful, 'twas wondrous
pitiful.

সেজকাকা থামলেন একটুখানি, তারপরে বললেন : বুঝলে মিহির, আমার জীবনে আশাই প্রথম মেয়ে যে আমার এই-সব কথা শুনে ডেসডিমোনার মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, আশ্চর্য দুঃখের কথা। দু-একদিন যেতে না যেতেই আমার মনে হয়েছিল—

She lov'd me for the dangers I
had pass'd;
And I lov'd her that she did
pity them.

তোমার কাছে লুকোব না মিহির। ওথেলোর মতো আমিও বিশ্বাস করেছিলাম যে, অনেক বিপদ অতিক্রম করে এসেছি বলে আশা আমাকে ভালবেসেছে, আমার দুঃখে বেদনা বোধ করেছে বলেই আমি তাকে ভালবেসে ফেললাম।

এর পরে অনেকক্ষণ কোন কথা কইলেন না সেজকাকা।

মাঝি আমাদের নৌকো পারের কাছ থেকে ঠেলে এনেছিল ডাল লেকের মাঝখানে। আরও খানিকটা উত্তরে একটা ছোট দ্বীপের

মতো দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে চারটি চিনার গাছের ছায়ায় কয়েকটি ছোট চালা-ঘর। দূরে লেকের পরপারে পাহাড়ের গায়ে মেঘ জমে আছে। কেউ না বলে দিলেও বুঝতে পারলাম যে, এই দ্বীপের নামই চারচিনার। এরই উল্টোদিকে নাসিমবাগ—বড় বড় চিনার গাছের উদ্যান। এমন কোন দর্শনীয় স্থান না হলেও খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবার মতো জায়গা এই চারচিনার। এখানেই দুপুরে আহার সেরে নিলাম, তারপরে অগ্রসর হলাম নাগিন লেকের দিকে।

মেয়েদের সামনে পুরুষ কত বোকা হয়ে যায়, সেজকাকা আমাকে সেই কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন : আমি সৈনিক. আমার দৃষ্টি হল শ্যেনপক্ষীর মতো। কিন্তু তোমাকে বলব কি মিহির, সেই দৃষ্টি আমার নষ্ট হয়ে গেল। তা না হলে অনুকূল সরকারকে আমি সেদিন চিনতে পারলাম না, আর বুঝতে পারলাম না আশার ছলনা!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : তারা আপনাকে ছলনা করেছিল!

তাদের আমার গুলি করে মারা উচিত ছিল।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এ সেজকাকার মুখের কথা নয়, এ তাঁর মনের কথা। ক্ষুধার্ত বাঘের মতো জ্বলজ্বল করছে তাঁর দৃষ্টি। বললেন : অনুকূল সরকারকে আমি দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। সেই আপেল গাছের নিচে সে শুয়ে পড়েছিল, ভাণ করেছিল ঘুমিয়ে পড়ার। কিন্তু আমরা যখন ফিরছিলাম, তখন দেখতে পেয়েছিলাম যে, সে উঠে বসে তার নোটবুকে কী সব টুকছে। আমাদের সে দেখতে পায়নি, আর আশা তাকে দেখতে পেয়ে আমাকে অন্য পথে নিয়ে গেল। যখন সে ফিরিয়ে আনল, তখন দেখলাম যে অনুকূল সরকার চোখ বুজে শুয়ে আছে। তোমাকে আমি দিব্যি করে বলছি মিহির, আশাকে দেখে আমার মাথা ঘুরে না গেলে সেদিনই আমি অনুকূল সরকারের টুঁটি টিপে ধরতে পারতাম। যেদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলাম, সেদিন আমার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছিল। তুমি বিশ্বাস কর মিহির, হাতের কাছে বন্দুক ছিল না বলে আমি আমার পদত্যাগপত্র লিখে ব্রিগেডিয়ার সেনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন আপনি?

আমি সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে। আর তিনি বলেছিলেন : না, চাকরি ছাড়তে পারিনি। ব্রিগেডিয়ার সেন আমার চাকরি নেননি, নিয়েছিলেন মাথা। ডেকে পাঠিয়ে সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন, তারপর হেসে বলেছিলেন, সেরে উঠে চটপট বিয়ে করে ফেলবেন, তাহলে আর ভুল হবে না। লজ্জার মাথা হেঁট করে আমি ফিরেই এসেছিলাম। তুমিই বল মিহির, মাথাটা না নিয়ে চাকরিটা নিলেই কি ভাল ছিলনা। এর পর, আর কখনও আমি ব্রিগেডিয়ার সেনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি।

ডাল লেকের মাঝখান থেকে আমরা আবার পারের দিকে চলে এলাম। এ জায়গার জল আর টলটল করছে না। জলাভূমির মতো জঞ্জালে ভরা বলে মনে হচ্ছে। পদ্মবনের ভিতর দিয়ে মাঝি বেশ সন্তর্পণে সাবধানে এগোতে লাগল।

একটু পরেই আমরা ফ্লোটিং গার্ডেন দেখতে পেলাম। ডাল লেকের মাঝখানের গভীরতা শুনলাম দশ ফুটের কিছু বেশি, পারের কাছে অনেক কম। সেখানে পুরু শ্যাওলা জড়ো করে তার উপরে মাটি ফেলে শাকসব্জির চাষ হয়েছে। একটি দুটি নয়, এই অঞ্চলে এমনি ভাসমান বাগান অনেক আছে। অনেক শাক-সব্জি হচ্ছে এইসব বাগানে। একজন চাষীকে এই বাগানে কাদা করতেও দেখলাম। তার পায়ের চাপে বাগান অল্প অল্প দুলছে, জল উঠছে নিচে থেকে। লোকটা ঘুরে ঘুরে বাগানের তরি-তরকারি তুলছে।

আর এক জায়গায় হাট বসেছে দেখলাম, জলের উপরেই হাট। অসংখ্য ডিঙিনৌকোর উপরে নানা পণ্যের বেচাকেনা হচ্ছে। ডাঙার হাটের মতোই কলরব। কিন্তু সবাই এসেছে নৌকোয় চেপে, নৌকোয় বসেই দরাদরি ও কেনাবেচা হচ্ছে। বেশ বিস্ময়ের মনে হল আমাদের কাছে।

এই পথেই আমরা নাগিন লেকে পৌঁছে গেলাম। ডাল লেকেরই এ একটা অংশ, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত। কিন্তু আরও নিরিবিলি ও সুন্দর। হ্রদের জলও বেশি স্বচ্ছ ও গভীর। এখানেও অনেক সৌখিন হাউসবোট আছে দূরে দূরে। বিদেশীরা নাকি এই জায়গাটাই বেশি পছন্দ করে। স্নান করে, মাছ ধরে, আর সার্ফ রাইডিং নামে একটা মজার খেলা খেলে।

পথে যেতে যেতেই আমরা হরি পর্বত দুর্গ আর হজরতবাল মসজিদ দেখেছিলাম। খুব উঁচু পাহাড় নয়, তার উপরে একটি দুর্গ। হজরতবাল মসজিদ নাসিমবাগের কাছেই ডাল লেকের পশ্চিম তীরে। হজরত মুহম্মদের কেশ রক্ষিত আছে বলেই এই মসজিদ মুসলমানদের কাছে এত পবিত্র।

একথা বলবার সময় সেজকাকা বললেন : কায়েদ-ই-আজম জিন্নার কথা তোমাকে বলেছি। তাঁর নাকি সখ ছিল কাশ্মীর অধিকার করে এই মসজিদে এসে নমাজ পড়বেন। কী একটা পর্ব ছিল তখন, সেই জমায়েতেই জিন্না সাহেবের নমাজ পড়বার কথা ছিল। বিধির বিধানে [illegible] হল না, আমরা তার আগেই এসে [illegible] গেলাম। জিন্না সাহেবের মর্ম-বেদনা [illegible] ও আমরা শুনেছি। পাকিস্তানের সমস্ত সৈন্য এনে কাশ্মীর রাজ্য উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। জেনারেল আকিনলেকের জন্য তা পারেন নি।

সেজকাকা হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, তুমি ভেবো না মিহির যে পাকিস্তান এই অপমানের কথা ভুলে গেছে। শুধু মনে রাখা নয়, দেশের লোকের কাছে এই অপমানের আগুন সারাক্ষণ জ্বালিয়ে

রেখেছে। কবে কীভাবে তাদের লোভের হাত এদিকে বাড়াবে, তাই দেখবার জন্যেই আমি এসেছি। সেবারে কোন প্রস্তুতি ছিল না বলেই তারা হেরে গেছে, এবারে কি খুব সহজে তাদের হারানো যাবে!

আমি যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলাম।

মানিকের কথা আমার মনে পড়ল। মানিক তার সেজকাকাকে পাগল মনে করে। এই ভেবেই সে তাঁর সঙ্গে আসেনি। তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে না, এই তার ভয় ছিল। কিন্তু এই মানুষটার আপাত-কঠিন স্বভাবের আড়ালে যে বেদনা রুদ্ধ হয়ে আছে, মানিক সে খবর রাখে না। এ খবরের প্রয়োজন তার কাছে নেই, এ যুগের মানুষের কাছে হৃদয়ের খবর অবান্তর। তবু তো হৃদয় আছে, হৃদয়চর্চাও থাকবে চিরদিন। হৃদয়কে বাদ দিয়ে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারবে না। কিন্তু সেকথা কি সবাই বোঝে?

সেজকাকা শক্ত হয়ে বসেছিলেন, আর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূরে। আমি সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম যে তীরের কাছে জনকয়েক লোক খুব তৎপরভাবে কিছু করছে। তাদের পোশাক ঠিক কাশ্মীরীদের মতো নয়, আর আকৃতিও নয় তাদের মতো। মনে হল তারা সালোয়ার কামিজ পরেছে, সবুজে রঙের আশপাশের গাছপালার সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে। সেদিক থেকে আমি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না।

কিন্তু সেজকাকা যে আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন, তা তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারলাম।

বললেন ঃ এধারেও দেখ।

এধারে!

বলে আমি অন্য ধারে তাকালাম একখানা ডিঙ্গি নৌকো আসছিল সেদিক থেকে। বেশ বেগেই আসছিল। কিন্তু তার কোন মাঝি নেই, তার বদলে একজন মেয়ে সেই ডিঙ্গি চালাচ্ছে; সর্বাঙ্গ তার কালো বোরখায় ঢাকা। আমাদের শিকারা চলেছিল ধীরে ধীরে। সাঁৎ করে সেই ডিঙ্গি নৌকো আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই সেজকাকা বললেন ঃ ধীরে চল।

বললেন আমাদের মাঝিকে। আর লক্ষ্য করলেন সেই ডিঙ্গি নৌকোর বোরখা-পরা মেয়ের দিকে। ডিঙ্গির মুখ ঘুরল। আর সেজকাকাও যেন মুখ ফিরিয়ে বললেন, যেন সেদিকে তার দৃষ্টি নেই। আমিও আড় চোখে সব দেখতে লাগলাম।

সেজকাকা বোধহয় ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। তীরের যেখানটায় সেই লোকগুলো কাজ করছিল, ডিঙ্গি নৌকো সেখানেই গিয়ে ভিড়ল। লাফিয়ে নামল সেই বোরখা-পরা মেয়ে, আর পরক্ষণেই মিশে গেল লোকগুলোর মধ্যে। আমরাও আড়াল হয়ে গেলাম। তাদের আর দেখতে পাওয়া গেল না।

সেজকাকা এবারে এগিয়ে বললেন, তারপর বললেন ঃ কী দেখলে?

বললাম ঃ লোকগুলো কী করছে তা বুঝতে পারলাম না।

সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে তো?

তা হয়েছে।

সেজকাকা গম্ভীর ভাবে বললেন ঃ পথে ঘাটেও এমনি সন্দেহজনক লোক দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যাদের সন্দেহ করা উচিত তারা কিছুই করছে না। আর আমি যদি কিছু বলি, তাহলে আমাকেই পাগল বলবে। এ যুগে পাগলের সংজ্ঞা তো জান? শাদা চোখে যেসব কিছু দেখে, তাকেই লোকে পাগল বলে। আমাকেও যে অনেকে পাগল বলে তা শুনেছ তো!

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি কোন উত্তর দিচ্ছি না দেখে বললেন ঃ সত্যি কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছ কেন!

আমি হেসে বললাম ঃ পাগলরাই অপরকে পাগল ভাবে।

সেজকাকাও হেসে বললেন ঃ ঠিক বলেছ।

তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এবারে আমরা নতুন পথ ধরে ফিরছিলাম। বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন জলপথ। ঘরবাড়ি লোকজন কিছু নেই কোনদিকে। হাউসবোট নেই, কোন শিকারাও এ পথে চলছে না। মাঝি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, একথা মনে আসতেই সামনে শঙ্করাচার্য পাহাড় দেখতে পেলাম। দুখানা হাউসবোটের মাঝখান দিয়ে আমাদের শিকারা পরিচিত স্থানে বেরিয়ে এল। চিনতে কষ্ট হল না যে আমরা ডালগেট ও ডাল লেকের মাঝে কোনস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি। মাঝি ডান দিকে ফিরল। আমাদের হাউস-বোট বোধহয় এই দিকেই।

সেজকাকা হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন ঃ আমাদের পাশের হাউস-বোটের দিকে একটু নজর রেখো তো। মানে সেই আর্মির অফিসারটি আছে কিনা, আর—

আর কী?

আর সেই মেয়েটি।

সেজকাকার কথার ধরনে মনে হল যে তিনি ঐ মেয়েটিকেই যেন সন্দেহ করছেন। আর্মির অফিসারটির অবর্তমানে যেন সেই মেয়েটিই বোরখা পরে বেরিয়ে পড়েছে। আর একটা নির্জন স্থানে কয়েকজন সন্দেহজনক মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে কোন গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে। কী অদ্ভুত সন্দেহ সেজকাকার। এই মুহূর্তে আমার তাঁকে পাগল বলেই মনে হল। কিন্তু আমি মুখে বললাম ঃ আচ্ছা।

॥ এগারো ॥

সকালে উঠে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা গুলমার্গ যাত্রা করলাম। সঙ্গে দুপুরের খাবার নেবার প্রয়োজন ছিল না। সেজকাকা বলেছিলেন, তার দরকার নেই। ভালমন্দ অনেক হোটেল আছে গুলমার্গে।

বেশি তাড়াহুড়ো করবার দরকার ছিল। সকাল নটার পরে বাস ছাড়ে, তার এক ঘণ্টা আগে ট্যুরিস্ট অফিসে পৌঁছবার নিয়ম। এই জন্যেই তাড়া। তবু সেজকাকা বাইরে বেরিয়ে পাশের হাউসবোটের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলেন। না, কেউ জেগে নেই। ঘর দোর এখনও বন্ধ আছে। ভিতর থেকে কোন কথাবার্তার শব্দও আসছে না।

গতকালের কথা আমার মনে পড়ছে। নাগিন লেক থেকে আমরা যখন ফিরেছিলাম, বেলা তখন পড়ে এসেছিল। কিন্তু এই হাউসবোটে কাউকে দেখতে পাইনি। বোধহয় তারা বেড়াতে বেরিয়েছিল। রোজই বেরোয়, বেড়াবার জন্যেই লোক এখানে আসে। কিন্ত সেজকাকার সন্দেহ খুব গভীর ছিল। তাই তিনি ছাদের উপরে চা খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন ঃ চল, আজ ছাদে বসে চা খাই, তাহলে চারিদিকের শোভা সৌন্দর্যও দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি বুঝেছিলাম যে আসল উদ্দেশ্যের কথা সেজকাকা বললেন না। তবু বললাম ঃ সেই ভাল।

আমিরাকে চায়ের হুকুম দিয়ে আমরা উপরে গিয়ে উঠলাম। দুখানা ডেক চেয়ার ছিল ছাতার নিচে, তারই উপরে দুজনে বসলাম। কিন্তু পরক্ষণেই সেজকাকা উঠে বললেন ঃ একটু এগিয়ে বোসো।

আমি একটু হেসে চেয়ারখানা এগিয়ে নিয়ে গেলাম। আমার সন্দেহ যে ঠিক, তাতে আর সন্দেহ রইল না। পিছনে বসে চারিদিকের শোভা সৌন্দর্য ভালই দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু পাশের হাউসবোটের সামনেটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। এবারে আর তা দেখার অসুবিধা রইল না। সেজকাকা সামনের দিকে চেয়ে থাকলেও মাঝে মাঝে পাশেও দেখছিলেন।

যথা সময়ে আমাদের চা এল, সেই চা খেয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখবার পরেই আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। ইউনিফর্ম পরা সেই আর্মির অফিসারটি ডালগেটের দিকে থেকে একটা শিকারায় করে আসছিল। দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম। ভদ্রলোক একা, সঙ্গে সেই মেয়েটি নেই। সেজকাকাও তাকে দেখেছিলেন এবং পরম পুলকে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বুঝতে পারলাম যে এ অকারণ পুলক নয়, নিজের সন্দেহের সমর্থন পেয়েই তাঁর মনে এই পুলকের সঞ্চার হয়েছে।

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে শিকারা থেকে হাউসবোটে উঠল। দরজা বোধহয় খোলাই ছিল। পায়ের শব্দে বোঝা গেল যে ভিতরে চলে গেল এক ঘর থেকে অন্য ঘরে এবং শেষ পর্যন্ত সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উপরে উঠেও ছাদের উপরটা দেখে নিচে নেমে গেল।

সেজকাকা এতক্ষণ চুপ করে সব দেখছিলেন। এইবারে বললেন ঃ দেখলে তো!

দেখলাম ঠিকই। কিন্তু এর থেকে তো

নেক কিছুই ভাবা যায়। তাই আমি নীরব ইলাম।

সেজকাকা বললেন : পাখি উড়ে ছে।

তারপরেই বললেন : না, একেবারে উড়ে বে না। আবার আসবে, আবার যাবে।

আমি কোন প্রতিবাদ করিনি। অন্ধকার ভীর হবার পরে দুজনে নিঃশব্দে নেমে সেছি উপর থেকে। মেয়েটি তখনও ফেরেনি. তে কখন ফিরেছে, বা ফিরেছে কিনা, তা খতে পাইনি।

সেজকাকা এই জন্যেই তাকিয়েছিলেন পাশের হাউসবোটের দিকে। বন্ধ দরজার আড়ালে আজ দুজনে আছে না একজন, তা বুঝতে পারলাম না।

আমাদের গুলমার্গের বাস সাড়ে নটায় ছাড়ল। এক ঘন্টা আগে কেন আসতে বলে তার কারণ বুঝতে পারলাম। টিকিটে সীটের নম্বর আছে. বাসের নম্বর নেই। সাত সকালে এসে কাউন্টারের সামনে যাত্রীরা ভিড় করে। বাসগুলো টুরিস্ট অফিসের চত্বরে এসে দাঁড়াবার পর টিকিট-বাবু টিকিটের পিছনে বাসের নম্বরটি লিখে দেন। সব দেখে শুনে সেজকাকা বললেন : রাবিশ।

আমি বললাম : এছাড়া আর কী করতে পারে!

সেজকাকা চটে উঠলেন. বললেন : কেন, বাস নম্বর এক দুই তিন বলতে পারে না! বাসের উপরে গুলমার্গ লেখা থাকবে. আর ছোট ছোট টিনের প্লেট ঝুলিয়ে দেবে নম্বর লেখা। সেই নম্বর দেখে যাত্রীরা বাসে উঠতে পারবে না!

আমি মেনে নিয়ে বললাম : তা পারবে না কেন!

তবে!

বলে সেজকাকা একটা ভেংচি কাটলেন।

ঝিলমের পুল পেরিয়ে আমরা বারামুলার পথ ধরলাম। ন'দশ মাইল যাবার পর বাঁ হাতে গুলমার্গের রাস্তা। টেঙ্গমার্গ নামে একটা জায়গায় বাস দাঁড়াবে, শ্রীনগর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে। তারপরে চার মাইল চড়াই ভেঙে গুলমার্গ। সে পথটুকু হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে উঠতে হবে। খিলেনমার্গ আরও চার মাইল উপরে শুনেছি। সে পথের চড়াই আরও বেশি।

বাস আমাদের ক্রমেই উপরে উঠছিল। শ্রীনগর পাঁচ হাজার দুশো ফুট উঁচু মালভূমিতে, আর গুলমার্গ সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু। শেষ চার মাইল বাস চলে না। যেখানে আমরা বাস থেকে নামলাম সেই ছোট লোকালয়ের নামই টেঙ্গমার্গ। ছোট ছোট ঘরবাড়ি দূরে পাহাড়ের কোলে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। বাস-স্ট্যান্ডেই। শুধু লোকজন ঘোড়া ও ডাণ্ডিতে জমজমাট। যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার ও হোটেল আছে। আমাদের মতো রিটার্ণ টিকিট কেটে যারা এসেছে, তারা বিকেলের বাসে ফিরবে। আবার কেউ দু'চারদিন গুলমার্গে থাকতে যাচ্ছে।

সেজকাকা এগিয়ে গিয়ে একটা লম্বা চওড়া ঘোড়া নিলেন, আমার জন্যেও একটা ভাল ঘোড়া পছন্দ করলেন। কিন্তু সেই তেজী ঘোড়া আমার পছন্দ হল না। ভয়ে ভয়ে বললাম : আমি হেঁটেই উঠব।

সেজকাকা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন : কী, ঘোড়ায় চড়তে ভয় করছে!

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই বললেন : এই জন্যেই আজও বাঙালীর দুর্নাম ঘুচল না।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগল আমার। বললাম : ঘোড়াটা বেয়াদবি করছে কিনা, তাই এ কথা বলেছি।

বলেই একটা ছোটখাট টাট্টু ঘোড়া পছন্দ করে নিলাম। দুধারের মাটিতে পা না ঠেকলেও পড়ে হাড় ভাঙবার ভয় কম। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে বললাম : চলুন।

সেজকাকা অবলীলাক্রমে ঘোড়ায় উঠলেন, আর শপাং করে একটা চাবুক মেরে এগিয়ে গেলেন। আর আমি আমার ঘোড়াওয়ালাকে পাশে পাশে চলতে বললাম।

কিন্তু এই ছোট্ট ঘোড়াও যে বেয়াড়া তা খানিকক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম। অসমতল পাথুরে পথের এক ধারে পাহাড়, আর অন্য ধারে গভীর খাদ। ঘোড়া ঐ খাদের ধার ধরেই চলতে লাগল। রাশ ধরে অনেক টানাটানি করেও তাকে পাহাড়ের দিকে আনতে পারলাম না। অথচ খাদের ধার ঘেঁষে চলতেও ভয় করছে, পাশে তাকালেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে, নিচে গড়িয়ে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে সেজকাকার ঘোড়া পথের মাঝখান দিয়ে টগবগ করে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোড়াওয়ালা আমাকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করে বলল : ভয় নেই বাবু, খুব শান্ত ঘোড়া আমার।

কিন্তু ভয় তো ঘোড়াকে নয়, ভয় খাদের ভয় গড়িয়ে পড়বার। ঘোড়া একটা পিঠ ঝাড়লেই আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে সব ভয়ই ধাতস্থ হয়ে যায়। খানিকক্ষণ চলবার পরে আমার ভয়ও কমল। যথাসময়ে আমি গুলমার্গে পৌঁছে গেলাম।

ঘোড়া থেকে নেমে সেজকাকা একটা গাছে ছায়ায় অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে পৌঁছতে দেখে বললেন : যাক, ঘোড়ায় চেপেই এসেছ তাহলে।

লজ্জা পেয়ে আমি চুপ করে রইলাম।

সেজকাকা বললেন : খিলেনমার্গে উঠবে তো?

সভয়ে আমি বললাম : এমনি করে আরও চার মাইল! আপনি একাই দেখে আসুন। হাহা করে হেসে উঠলেন সেজকাকা, বললেন : তুমি দেখছি খাঁটি বাঙালী।

কয়েকটি ছোট বড় বাড়ি। আর একটি বিরাট ময়দান, এই হল গুলমার্গ। বাড়ি-গুলির বেশির ভাগই হোটেল, আর খানিকটা এগিয়ে টুরিস্ট অফিস। গুলমার্গ মানে ফুলের উপত্যকা, কিন্তু ফুল কোথাও দেখতে পেলাম না। যা দেখলাম, তা ঝাউএর বন। চারিদিকের পাহাড়ের কোল ঘিরে অসংখ্য ঝাউগাছ আকাশের নীল মেঘ আটকে রেখেছে। আধ মাইল চওড়া ও মাইল দুই লম্বা এই উপত্যকার মাঝখান দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বছরের কোন সময় হয়তো এই নদীর দুধার ফুলে ভরে যায়. তারই জন্যে নাম হয়েছে গুলমার্গ।

সেজকাকা বললেন : ঐ দূরে দিয়ে যে সার্কুলার রোড দেখতে পাচ্ছ. পরিষ্কার দিনে সেখান থেকে বরফের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়. ঝিলম নদী ও উলার লেকও নাকি দেখা যায়। এসব দেখবার যদি শখ থাকে তো খিলেনমার্গ চল।

আমি বললাম : তারচেয়ে চলুন কোন হোটেলে গিয়ে বসি।

সেজকাকা হেসে বললেন : বুদ্ধিমানের কথা।

বলে ঘোড়াওয়ালাদের ছুটি দিয়ে একটা হোটেলের দিকেই এগোলেন।

গুলমার্গ দেখা আমাদের হয়ে গেল। কিন্তু ফেরার পথে যে বিপুল বিস্ময় আমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। বাসস্ট্যান্ডের কাছে চা খেতে বসে আমরা সেই সংবাদ পেলাম। আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, আর সেজকাকার মুখ গভীর আত্মপ্রসাদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

ঘোড়ায় চেপে আমি গুলমার্গ থেকে নামতে পারিনি। পড়ে যাবার ভয়ে ঘোড়া থেকেই আমি নেমে পড়েছিলাম। তারপর হেঁটেই নেমেছিলাম চার মাইল পথ। গাছের ছায়ায় শীতল হয়ে আছে পথ, রৌদ্রেও ছিল না উত্তাপ। তাই নামতে কষ্ট হয়নি। শুধু চায়ের জন্যে মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল! বাস ছাড়তে দেরি আছে বলে আমরা হোটেলে ঢুকে চা খেতে বসেছিলাম।

কথাটা গুনগুন করেই সবাই বলছিল। চাপা গলার খবর, ভয়ও পেয়েছিল অনেকে। আবার অনেকে এটা সুখবর বলবে কিনা তা নিয়েও আলোচনা করছিল। সেজকাকা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন : চুপ, বুঝতে দাও ব্যাপারটা।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের একটুও সময় লাগে নি। তার কারণ ঘোড়ার আড্ডা থেকে হোটেল পর্যন্ত আসবার পথেই আমরা অনেক কিছু জেনেছিলাম। দারাকাশী গ্রামের মহম্মদ দীন নামে এক রাখাল বালক হঠাৎ নায়ক হয়ে উঠেছে। সবুজ রঙের শালোয়ার কামিজ পরা বন্দুকে কাঁধে দুজন বিদেশী নাকি তার সঙ্গে তার

করতে এসেছিল। আর চারশো টাকা দেবার লোভ দেখিয়ে বলেছিল, কোথায় খাদ্য পাওয়া যাবে সেইখানে নিয়ে চল। দু'চার টাকা নয়, চারশো টাকা। আর দু'জনের খাবার নয়, খাদ্যের আড়ৎ আর যানবাহনের আড্ডার খবর তাদের চাই। ছেলেটা ভয় পেয়ে টেঙমার্গের থানায় ছুটে এসে খবর দিয়েছে।

তারপর?

তারপরের খবরও আমরা পেয়েছি। এই খবর পেয়েই সিকিউরিটি ফোর্স ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের নাকি ধরতে পারে নি। লোকগুলি গুলি চালিয়েছিল, এ পক্ষও গুলি চালিয়েছে। আর এই সুযোগে বিদেশীদের দল নাকি গা-ঢাকা দিয়েছে।

সেজকাকা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : বুঝতে পারছ কিছু।

আমি বললাম : ভয়ের কথা।

সেজকাকার ঠোঁটে আমি আত্মপ্রসাদের হাসি দেখলাম। বললেন : এতদিনে বুঝলে!

চা খেয়ে আমরা যখন বাস স্ট্যান্ডে এলাম নিজেদের বাসে চাপবার জন্য, জনতার মুখে তখন নানা রকমের কথা ছড়িয়েছে। কেউ বলছে, ওরা পাকিস্তানের সৈন্য। কেউ বলছে গেরিলা সৈন্য। আবার কেউ বলছে, না, ওরা মুজাহিদ। রাজাকার বলছে কেউ। কিন্তু ওরা যে ঠিক কী, জোর করে তা কেউ বলছে না। কাশ্মীরে ওরা কেন এসেছে, তা নিয়েও জল্পনা কল্পনা হচ্ছে। কেউ বলছে, ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরকে মুক্ত করতে এসেছে। কেউ বলছে সেবারের অত্যাচারের কথা মনে নেই? ওরা ভাঙার জন্যে আসছে না মন্দ অভিসন্ধি, তা নিয়েও তর্ক বেধেছে। এসব তর্ক ঘোড়াওয়ালাদের সঙ্গে ডাণ্ডিবাহকের কিংবা দোকানের ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার। এ জনতা রাজনীতি বোঝে না, যা বোঝানো যায় তাই বোঝে। বাইরে থেকে যেকেউ এলেই যে ভাল হবে, তাও বোঝাচ্ছে দু-একজন। তাদের আচার আচরণ একটু অন্যরকম। তারা ঘোড়াওয়ালা নয়, ডাণ্ডিবাহক নয়, তারা যে কী চেহারা দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না।

এস।

বলে সেজকাকা বাসে উঠে পড়লেন। আমিও উঠে তাঁর পাশে বসলাম। আমাদের সীটের নম্বর দেখেই আমরা বসেছিলাম।

সেজকাকা বললেন : প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কোন এলাকা ছিনিয়ে নেবার সভ্য রীতি হল এই রকম। সেই এলাকার ভিতর ও বাইরে থেকে একটা দাবী তুলতে হবে—এ এলাকা আমার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের একটা জনমত গড়ে তুলতে হবে কিছুদিন ধরে। তারপর ইনফিলট্রেশন। মানে সেই এলাকায় নিজেদের কিছু লোক ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারা নিজেদের শক্তি সংহত করতে থাকবে সবার অলক্ষ্যে। তারপর দলে দলে ইনফিলট্রেটর ঢুকবে সীমান্ত পেরিয়ে। চারিধার থেকে অগ্রসর হবে। এইসব লোক ঢুকে যাবার পর সীমান্তে সংঘর্ষ বাধাতে হবে, দু পক্ষে গোলাগুলি বর্ষণ হবে আর সীমান্তরক্ষীরা ব্যস্ত হয়ে থাকবে এই সংঘর্ষে। আর ভিতরের লোকগুলো নানা জায়গায় গোলমাল বাধাতে থাকবে, একটা অরাজকতার সৃষ্টি করে এমন অবস্থা আনবে যে তখন দেশবাসীকে রক্ষার নামেই ঢুকে পড়বে সেনাদল। সামান্য আয়াসেই সমস্ত এলাকাটা দখল করে বসে যাবে।

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম : তবে কি আমরা এই রকমের কোন অবস্থার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি?

সেজকাকা নির্লিপ্তভাবে বললেন : এখনও তোমার সন্দেহ আছে। কাল ওদের তৎপরতা দেখেছ, আজ ওদের কথা শুনলে। দু-একদিনের মধ্যেই সব দেখতে পাবে।

উদ্বিগ্নভাবে আমি বললাম : এখানে বসে আমরা সব দেখব, না দেশে ফিরে যাব?

ভয়!

বলে সেজকাকা হাসলেন। তারপর বললেন : ভয়কে জয় করতে পারলে একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা হবে। আর—

আর কী?

আমার মনে হয়, এখন ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হবে না।

কেন?

আটকা পড়ব পথে। জম্মু থেকে শ্রীনগর আসবার পথই আগে বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর বললেন : কাগজে একটা খবর পড়নি? কাশ্মীরে একটা আলজিরিয়া টাইপের গোলমাল শুরু করার কথা বছর খানেক থেকেই পাকিস্তানের নেতারা বলে আসছিল, সেখানকার সংবাদপত্রেও নাকি বেরিয়েছে। পিণ্ডি আর মারীর মিলিটারী অফিসারেরা মাও-এর গেরিলা যুদ্ধের রীতিনীতি মুখস্থ করে ফেলেছে আর চীন থেকে একসপার্ট এনে তিরিশ হাজার গেরিলা যোদ্ধা তৈরি করেছে। এসব কথা আমাদেরও অজানা নেই। গত মাসে এখানে একটা বৈঠক বসেছিল কাশ্মীর ও ভারত সরকারের হোম মিনিস্টার। সব কিছু দেখে শুনে তাঁরা বলেছেন যে, গেরিলারা স্যাবোটাজ করতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের আশঙ্কা নেই।

একটুখানি থেমে সেজকাকা বলে উঠলেন : মূর্খ তারা। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা যখন শ্রীনগরে পৌঁছলাম তখন টুরিস্ট অফিসের অঙ্গনে এক বিরাট জনতা টাঙমার্গের খবরের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। কী করে আমরা ফিরে এলাম, এটাই তাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য। কত পাকিস্তানী সেনা গুলমার্গ ঘিরে ফেলেছে, কতদূর এসেছে তারা, কত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, এই সব নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল যাত্রীদের।

চলে এস।

বলে সেজকাকা আমাকে ভিড়ের ভিতর থেকে বাইরে টেনে আনলেন। তারপরে হোটেলের দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন : এখন থেকে শোনা কথা আর একটিও বিশ্বাস করবে না। নিজের চোখে যা দেখবে, শুধু তাই সত্য বলে মনে করবে।

শ্রীনগরের আকাশে তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে।

॥ বারো ॥

সেজকাকা ঠিকই বলেছিলেন। পরবর্তী কয়েকটা দিনে আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল জীবনের। এ অভিজ্ঞতা বোধহয় সারা জীবনেও আমি সঞ্চয় করতে পারতাম না। বন্যা দুর্ভিক্ষ বা ভূমিকম্পের মতো কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়নি, আকাশ থেকে বোমা পড়েনি বা আগুন লাগেনি কোনখানে। দেখতে দেখতে হাউসবোটগুলো সব খালি হয়ে যেতে লাগল। কাশ্মীরের ভ্রমণ বিলাসীরা প্রাণের ভয়ে পালাতে লাগল। শুধু বাসে নয়, অগ্নিমূল্যে স্টেশন ওয়াগান বা ট্যাক্সি ভাড়া করে সবাই শ্রীনগর ত্যাগ করে চলে যেতে লাগল।

দারাকাশীর মহম্মদ দীনের পরেই জম্মু থেকে ওয়াজির মহম্মদের খবর এল। মেন্ধারে গালুতির কাছে যে কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক

দেখতে পেয়েছিল। তাদের হাবভাব দেখে সন্দেহ হয়েছিল এই গ্রামবাসী ওয়াজির মহম্মদের। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়েছিল। আর তখনই তার একটা ব্যবস্থা হয়েছিল।

গুজবে কান দিওনা কথাটা বলা যত সোজা, মানা তত সোজা নয়। দু-তিনদিনের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে কম করেও তিন হাজার লোক কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছে, আরও হাজার দুই ঢুকছে। সীমান্তে সংঘর্ষের খবরও আসতে লাগল, অকারণে পাকিস্তানীরা গোলাবর্ষণ করছে। এর পরই গেরিলারা পুল উড়িয়ে দেবে, কোন কোন জায়গা আগে দখল করবে, সে সব খবরও শোনা যেতে লাগল। আমিরা আমাদের খবর দিয়ে গেল ঃ নও তারিখ।

কী না তারিখে?

তার প্রসন্নমন, হাসিখুশি ভাব। কিন্তু না তারিখে কী তা বলতে পারল না। সে খবর আমরা হাউসবোটের মালিকের কাছে পেলাম। সে বেচারা ভয়ে ভয়ে বলল ঃ না তারিখে ওরা শ্রীনগর দখল করবে।

আমি ভয় পেলাম এই কথা শুনে, কিন্তু সেজকাকা একেবারেই বিচলিত হলেন না। বললেন ঃ এসব গুজব, বিশ্বাস কোরোনা এসব কথায়।

কিন্তু চুপ করে তিনি বসে রইলেন না। [illegible] বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন ঃ বেরিয়ো না কোথাও। [illegible] একটু [illegible] ফিরব।

একটু পরে নয়, অনেকক্ষণ পরে ফিরলেন সেজকাকা। [illegible] মনে হল যে [illegible] খবর [illegible] একটা নিশ্চিন্ত [illegible] কিন্তু প্রথমেই কিছু বললেন না। [illegible] একটা [illegible] বললেন ঃ বলেছি তো, গুজবে কান দিয়ো না।

[illegible] খবর শোনবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়েছিলাম। বললাম ঃ কী খবর পেলেন?

সেজকাকা বললেন ঃ যে খবর পেয়েছ তা ঠিক। ৯ই আগস্ট হল পাকিস্তানের ন্যাশনাল ডে। আয়ুব খান স্থির করেছেন যে সেদিন তিনি কাশ্মীর উপহার দেবেন তাঁর দেশবাসীকে।

সর্বনাশ!

সেজকাকা বললেন ঃ শোন সব কথা, তারপর মন্তব্য কোরো। কাল কত তারিখ?

বললাম ঃ না তারিখ।

কোথাও বেরিয়োনা কাল। সত্যিই একটা গোলমাল হবে। তার জন্যে প্রস্তুত আছে সবাই। পাকিস্তানীরা ক্ষমতা দখল করতে চাইছে শ্রীনগরে। কাজেই একটা গোলমাল হবেই। আর এরই সুযোগ নিয়ে তারা একটা রিভলিউশনারী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করবে। আর যদি পারে তো রেডিও স্টেশনটা দখল করবে।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম ঃ এসব খবর আপনি কোথায় পেলেন?

গম্ভীরভাবে সেজকাকা মাথা নাড়লেন, বললেন ঃ তোমার ট্রানজিস্টার ঠিক আছে তো, ওটা এবারে কাজে লাগবে।

রেডিওর কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বললাম ঃ সত্যিই তো। দুদিনের খবরই আমরা শুনতে পারি।

শুনলামও তাই। আর কখনও ভয়ে কখনও বিস্ময়ে আর কখনও আনন্দে অভিভূত হয়ে যেতে লাগলাম। সেজকাকাও সারাক্ষণ খবর শুনতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন ঃ দেখছ তো!

ন তারিখে শ্রীনগর দখল হল না। শুধু আগুনে পোড়ানো হয়েছিল একটা পাড়ায়। পাড়ার নাম চাটামাহল্লা, মধ্যবিত্ত লোকের বাস, সঙ্গতিমানুষও আছে অনেক। সে পাড়াটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু রেডিওতে শুনলাম যে সরকারী দপ্তর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ একটা নতুন রেডিও স্টেশন। তার নাম সদা-ই-কাশ্মীর। শোনা গেল, পাকিস্তানীরা কাশ্মীর রেডিও দখল করে নিয়েছে। সেখান থেকেই এই খবর প্রচারিত হল।

কিন্তু সেজকাকা পুরনো কথাই বললেন ঃ নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস কোরোনা কিছু।

এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে বললেন ঃ চল, নিজের চোখেই দেখে আসা যাক।

হাঁটতে হাঁটতেই আমরা ঝিলম নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। শ্রীনগরের সেক্রেটারিয়েট আমরা চিনি। সে বাড়িটা সামনের তালা ঝুলে আছে, ভিতরের একটি ফাইলও [illegible] পোড়েনি। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা [illegible] অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেল। শতিনেক নিরীহ লোকের বাড়ি পুড়েছে, আর সে এলাকার একজন প্রভাবশালী ভদ্রলোকের বাড়িটি বেঁচে গেছে। বেঁচে গেছে নয়, সে বাড়িতে আগুন দেওয়া হয় নি। রক্ষা করা হয়েছে সেই বাড়িকে। বাড়ির মালিক পাকিস্তানের সাহায্যকারী বন্ধু।

পাকিস্তানের রেডিও থেকেও শ্রীনগর দখলের খবর প্রচারিত হল। তারাও বলল যে কাশ্মীর সরকারকে তাড়িয়ে তার জায়গায় রিভলিউশনারি কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দু-একদিন পরেই আমরা করাচীর জন পত্রিকা পেলাম, হাতে হাতে বিলি হচ্ছে, ডাকেও এসেছে কিছু। একই খবর। দেশপ্রেমিকদের রিভলিউশনারি কাউন্সিল এখন কাশ্মীরের জাতীয় সরকার, সাম্রাজ্যবাদী ভারত ও কাশ্মীরের সমস্ত চুক্তি তারা বাতিল করে দিয়েছে। বিশ্বের কাছে ও পাকিস্তানের কাছে তারা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

প্রতিদিনই আমি সেজকাকাকে ব্যস্ত দেখেছি। যখন আমাকে বলেছেন, তুমি একটু বোসো মিহির, আমি চট করে ঘুরে আসছি।

তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, কিছুই আমাকে বলেন নি, শুধু একটা আত্মপ্রসাদ নিয়ে তাঁকে ফিরতে দেখেছি। যেন কোন মস্ত বড় কর্তব্যকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে ফিরে এলেন, কখনও বলেছেন, ভুল মানুষ একবারই করে, বারে বারে করে না।

কিন্তু অতীতে কী ভুল করেছেন, তা কোনদিন ভেঙে বলেন না। আশার গল্পও অসমাপ্ত আছে। একদিন আমি জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, কিন্তু সেজকাকা এড়িয়ে গেছেন সে প্রসঙ্গ। বলেছেন ঃ আরে রেখে দাও আশার কথা। তাদের ভুলে যেতেই দাও।

আমি বলেছিলাম ঃ তাদের গল্প তো আপনি শুরু করেছিলেন মাত্র, কিছুই বলেন নি।

ভুলে যাবার কথা তো ওঠে সব শোনার পর।

হুঁ।

বলে সেজকাকা খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তার পরে বললেন ঃ পাশের হাউসবোটের উপরে নজর রেখেছ তো?

আমি বললাম ঃ অনেকদিন থেকেই তো সে হাউসবোট ফাঁকা পড়ে আছে।

দরজা-জানালা বন্ধ আছে বলে, ভিতরে কেউ আছে কিনা জান!

চারদিক বন্ধ করে কেউ থাকবে কেন, আর কোন সাড়া শব্দই বা করবে না কেন?

থাকে ছেলেমানুষ আছ।

বলে সেজকাকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু আশার কথা বললেই সেজকাকার এই হাউসবোটের কথা কেন মনে পড়ে জানি না। অবশ্য [illegible] যে তাঁর ঐ [illegible] মনে পড়ে। এমন কোন [illegible] যে আশার সঙ্গে ঐ [illegible] একেবারে এক সূত্রে জড়িয়ে [illegible] কিন্তু আশার কথাও বলতে চাইছেন না কিছুতেই।

আমি ভাবলাম, সেজকাকার রাগ বোধহয় অনুকূল সরকারের উপরে। গোড়া থেকেই সে লোকটাকে তিনি পছন্দ করেননি, সেই লোকটা এমন কিছু করেছিল যে আশার স্মৃতি সেজকাকার কাছে তিক্ত হয়ে গেছে। নানারকম সন্দেহের কথা আমার মনে হতে লাগল। বিদেশীরা স্ফূর্তি করতে আসে কাশ্মীরে। সঙ্গীহীন সাহেবও আসে অনেকে। তাদের সঙ্গীর দরকার। হাউসবোটের মালিকেরা শুনেছি তাদের সব রকম প্রয়োজন মেটাতো। কাশ্মীরের বাইরে থেকেও মেয়েরা রোজগারের জন্য আসত কিনা আমার জানা নেই। সেজকাকাকে আমার গোঁড়া লোক বলে মনে হয়। তিনি এমন কোন অভিসন্ধির কথা সন্দেহ করেছেন কিনা কে জানে! ব্যাপারটা নোংরা হলেই হয়তো আর বলতে চাইছেন না। তাই আমি এ প্রসঙ্গ নিয়ে জবরদস্তি করতে সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু আমার প্রচ্ছন্ন মনে একটা বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। সেই বাসনা এই আপাত-কঠিন মানুষটাকে আবিষ্কার করার। দূরে থেকে তাঁকে যখন

দেখেছি, তখন এঁকে সাধারণ মানুষ বলেই আমার মনে হত! মালিকের কাছে নানা কথা শুনেও কোন কৌতূহল জাগেনি মনে। এখানে তাঁকে কাছে দেখেও সুস্থ ও স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল। প্রৌঢ় মানুষ, বিবাহ করেন নি, সংসার নেই, কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন। এ রকম মানুষের যে রকম হওয়া উচিত, সেই রকমই তাঁকে দেখেছি।

কিন্তু ইদানীং তিনি রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। কাশ্মীরে যে তিনি প্রথম আসছেন, এই কথাই আমি জানতাম। এখানে এসেই জানলাম যে এর আগেও তিনি এখানে ছিলেন, এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে এই দেশটাকে দেখে গেছেন। এখানকার অনেক পুরনো স্মৃতি তাঁর বুকে আজও সজীব হয়ে আছে। একথা তিনি আগে প্রকাশ করেননি কেন, তার কোন যুক্তি খুঁজে পাইনি। এ কথা তিনি যেন গোপন করবারই চেষ্টা করেছিলেন। আরও একটা কথা বুঝতে পেরেছি, কাশ্মীরকে তিনি ভালবাসেন! সুদূর বাংলা দেশে থেকেও তিনি কাশ্মীরের খবর রেখেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। এখানকার জনগণের কথা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, রাজনৈতিক পরিবেশ এমনকি কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ খবরও সব তাঁর জানা। পাকিস্তান যে কাশ্মীর দখলের চেষ্টায় তার সর্বশক্তি প্রয়োগে উদ্যত এ খবরও তাঁর জানা। তাই তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে গুলমার্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং মহম্মদ দীনের খবর পেয়ে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হননি। বরং পরবর্তী ঘটনার কথা বিবৃত করেছেন সূত্রধারের মতো। সবই যেন তাঁর জানা, এর পরও যা ঘটবে তাও হয়তো জেনে নিশ্চিন্তে বসে আছেন।

ঠিক নিশ্চিন্তে নয়। সকালে বিকালে তাঁকে ব্যস্ত হয়ে বেরোতে দেখি। আমাকে সংগে নিয়ে বেরোতে চান না, কোথায় যান তাও বলেন না। তবে প্রসন্ন মনেই ফিরে আসেন। একটা আত্মপ্রসাদের ভাব দেখি তাঁর চোখে মুখে, যেন কোন অসাধ্য সাধন করে এলেন। অনেক খবরও সংগ্রহ করে আনেন। আমিরার বাদে বা হাউসবোটের মালিকের কাছে আমি যে সংবাদ পাই, তার কতটা গুজব আর কতটা সত্য, তাও আমাকে বলে দেন। পাকিস্তানী হানাদাররা যে শায়েস্তা হয়েছে, সে কথাও আমাকে বলেছেন। প্রথম দফায় যে তিন হাজার হানাদার ঢুকে পড়েছিল, মার খেয়ে তার এক হাজার পিছু হটে পালিয়ে গেছে, হাজার খানেক নিহত বা আহত হয়ে ধরা পড়েছে। এ হল ন' তারিখের খবর। বাকি এক হাজার আত্মগোপন করেছিল তারাও ধরা পড়ছে। আর নতুন হানাদার ঢোকবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৪ই আগষ্ট পার হয়ে গেল, আয়ুব খান কাশ্মীর উপহার দিতে পারলেন না পাকিস্তানের জনগণকে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় হাউসবোটে ফিরে সেজ কাকা বললেন : এবারে একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : কী রকম! কে কাকে আক্রমণ করছে?

গভীর দৃষ্টিতে সেজকাকা আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন ভারত কোনদিন পাকিস্তান আক্রমণ করবে, তুমি ভাবতে পার?

তৎপরভাবে আমি বললাম : না।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সেজকাকা বললেন : এতদিন ধরে এমন হৈ হৈ করেছে পাকিস্তান, আর এখনও করছে যে কাশ্মীর আক্রমণ না করে আর কোন উপায় তাদের নেই। সেই আক্রমণটা কবে হবে এবং কী রকমের হবে, তাই আমাদের দেখতে বাকী।

আপনি কি এ আশঙ্কা এখনই করছেন?

বলে আমি সেজকাকার মুখের দিকে তাকালাম।

গম্ভীরভাবে তিনি বললেন : পাকিস্তান সেনা কাল জম্মু আক্রমণ করছে, শুনলে আমি অবিশ্বাস করব না।

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম : তবে আমরা এখানে পড়ে আছি কেন! দেশে ফিরে গেলেই তো পারি!

সহাস্যে সেজকাকা বললেন : ভয়!

তারপরে সেই পুরনো মন্তব্য করলেন এই জন্যেই বাঙালীর কিছু হল না।

এ রকমের আফশোষ তাঁর মুখে অনেক শুনেছি। বাঙালীরা ভীরু কাপুরুষ। বাঙালীর বাঁকা দৃষ্টি সংস্কারের ঠুলি পরে বিশ্বের প্রগতিতে সন্দেহ প্রকাশ করছে, কীর্তন ও রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আর পদ্য লিখে একটা প্রেমিকের জাত তৈরি হয়েছে অভিনয়ে যেমন দড় কর্মনিষ্ঠায় তেমনি কাঁচা। নানা প্রসংগে এইসব কথা তিনি আমায় শুনিয়েছেন। মৃদু প্রতিবাদ করেছি আমি, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। বরং প্রতিবাদ শুনলেই তিনি আরও নির্দয় হয়ে উঠেছেন। বলেছেন যে জীবনের আদর্শকে বাঙালী ন্যাকামি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। দিনের আলোয় যা ঝকঝক করছে, চোখে গগলস্ পরে তাকে অন্ধকার দেখছে বাঙালী। আমাকে সতর্ক করে বলেছেন; তোমার এখনও বয়স আছে মিহির, চোখ খুলে সব দেখ, দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াও বীরের মতো।

কিন্তু এমন প্রেরণাতেও আমার মনে বীরত্বের সঞ্চার হয় নি। আর সত্যি বলতে কি আমি একা হলে এতদিন এখান থেকে পালিয়েই যেতাম। ভয় পাবার জন্যে পাকিস্তানের হানাদাররাই যথেষ্ট, সেনাবাহিনীর আক্রমণ দেখবার দরকার নেই। আমি তাই নীরবেই তাঁর অভিযোগ মেনে নিলাম।

সেজকাকা বোধহয় চেয়েছিলেন যে আমি তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করব। তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন : চিরদিন বাংলাদেশেই আছ তো, তাই নিজেদের চরিত্রবল যাচাই-এর সুযোগ পাওনি।

তারপরেই কী একটা মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, হাঁক দিলেন : 'আমিরা'! মুহূর্তের মধ্যে সেই সরল আনন্দের প্রতীক নীরব মানুষটি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আর একদিনের মতো সেজকাকা হুকুম করলেন : গিলাস লাও, ঔর বোতল।

আজ আমিরা একটুও দেরি করল না, কাচের জগ আর গেলাস আনল একটি। বোতল বার করে আনবার জন্য আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু তার আগেই আমিরা তা এনে হাজির করল। সেজকাকা তারিফ করলেন : সাবাস।

আর পছন্দমতো পানীয় তৈরি করে বললেন : চলবে একটু? লজ্জা কিসের হে? দু এক চুমুক মুখে নিয়েই বললেন : দেবতারা একে সোমরস বলত, আমরা বলি টনিক। খানিকটা পেটে পড়লে ভয়ও দূর হয়, মেজাজও খোলে। আনো না একটা গেলাস।

আমি লজ্জা পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু কাজে লাগলাম তাঁর এই মেজাজটা। বললাম : তার চেয়ে আপনি গল্প বলুন, আমি শুনি।

এবারে সেজকাকা ঢক ঢক করে খানিকটা মদ খেলেন, তারপরে বললেন : তুমি তো সেই এক কথাই জিজ্ঞেস করবে, আশার কী হল। আরে, আশা ওর নাম ছিল না, নাম ছিল আয়েষা। নাম ভাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় গোপন করে আমার পেট থেকে কথা বার করতে এসেছিল। কী সাংঘাতিক মেয়েমানুষ বল!

উৎকণ্ঠায় আমি সোজা হয়ে বসলাম, বললাম : কী বলছেন আপনি!

এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদের আনন্দে উদ্ভাসিত হল সেজকাকার সারা মুখ, বললেন : বুঝলে মিহির, এ হল আর্মি অফিসারের চোখ, দু মাইল দূরে ঝোপের ভিতর বসে থাকলেও আমরা রাইফেলের নাক দেখতে পাই, তার জন্যে বাইনাকুলারের দরকার হয় না।

বলে সেই ঘটনাটি বিবৃত করলেন আমার কাছে। অনুকূল সরকারের মুখ ফস্কেই নাকি নামটা বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অনুকূল সরকারের নাম আবদুল সাত্তার কিনা তা তিনি জানতে পারেন নি। অথচ একদিন গল্পে গল্পে এই সরকার বলেছিল যে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের বাড়ি। মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল ভারতে। কী বিশ্বাসঘাতক বল।

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

আর সেজকাকা বললেন : আমার কাছে কেন এসেছিল জান? আমাদের গতিবিধির কথা জানতে। আমি ছিলাম সকলের আগে, হানাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম সীমান্তের দিকে। ওরা ভেবেছিল যে আমার কাছে হয়তো কোন চাবিকাঠির সন্ধান মিলবে।

চর! পাকিস্তানের স্পাই ছিল আশা! বিস্ময়ের আমার শেষ রইল না।

সেজকাকা রহস্যময় হাসি হাসলেন, বললেন : বলব, আমার কথা একদিন তোমাকে বলব।

আমি জানি যে আজ তিনি এর বেশি কিছু বলবেন না, বলবেন কাল সকালে। যেদিন মদ খান, সেদিন গম্ভীর হয়ে যান। যা বলেন পরের দিন। এই সংযমও বোধহয় তিনি অভ্যাস করেছেন।

ট্রানজিস্টারে আমি খবর শুনতে লাগলাম। বিভিন্ন রেডিও স্টেশনের খবর।

।। তেরো।।

ভোরবেলায় সেজকাকা আমাকে জাগিয়ে দিলেন, বললেন : চল, আজ তোমায় পহলগাম দেখিয়ে আনি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : পহলগাম!

হ্যাঁ, পহলগাম। জম্মুর পথ বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু পহলগামের পথ কিছুতে কারে বন্ধ হবে না।

কেন?

ওটা পশ্চিমে নয় যে পাকিস্তানীরা ওদিক থেকেই আসছে। পহলগাম হল পূবে দিকে হিমালয়ের কোলে। ঐ দুর্গম পাহাড় যদি কেউ পেরোতে পারে তো লাদাখ বা তিব্বতে পৌঁছবে।

কিন্তু যানবাহন পাওয়া যাবে তো!

সেজকাকা জোর দিয়ে বললেন : আলবৎ পাওয়া যাবে।

তারপরে যুক্তি দিলেন এই কথার। বললেন : ঐ পথে যাতায়াত কোনদিন বন্ধ হবে না। বাস চলাচল শুরু হবার আগে লোক পায়ে হেঁটে যেত। এখনও লোকে পহলগাম থেকে অমরনাথ যাচ্ছে পায়ে হেঁটে। শ্রাবণপূর্ণিমা কবে জান?

বললাম : জানি না।

সে পর্যন্ত যদি থাকতে হয় তো দেখতে পাবে যাত্রীর ভিড়। মানুষ আজও হাজারে হাজারে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে ঐ দুর্গম-তীর্থে যাত্রা করছে। তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি।

বলে তিনি নিজে তৈরি হবার জন্যে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। সেজকাকাকে ক্রমাগতই রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। একদিকে যুদ্ধ নিয়ে অস্থির হয়ে উঠছেন। মনে হচ্ছে যে, এখনও যেন তাঁর অনেক দায়িত্ব আছে যুদ্ধ পরিচালনায়। খুঁটিনাটি খবর রাখছেন, প্রতিটি গুজব দেখছেন যাচাই করে, শত্রুর পরবর্তী অভিযানের অভিসন্ধি বুঝবার জন্যও চেষ্টা করছেন। এবং কোন স্থানে গোপনে যাতায়াত করে বোধহয় এইসব আলোচনা করেই একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন। শেষের খবরটি আমার কাছে গোপন রেখেছেন। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি বাধা দিয়ে বলেছিলেন : না না, তুমি এখানেই থাক। ঘরের ভিতরে ভাল না লাগে তো ওপরে ছাদে গিয়ে বোসো। কিংবা পায়চারি কর সামনের রাস্তায়। সময় খুব খারাপ। দূরে কোথাও যেও না।

বলে নিজে বেরিয়েছিলেন একা। সময় খারাপ ভাববার পর থেকে তিনি একাই বেরোচ্ছেন। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি ভাব দেখছি তাঁর মধ্যে। কাশ্মীর সম্বন্ধে একটা দুর্বলতাও যেন প্রকাশ হয়ে পড়ছে। একদা এই দেশটাকে তাঁর ভাল লেগেছিল, তাই যেন প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

সকালের চা খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : দুপুরের জন্যে কিছু সঙ্গে নিতে হবে কি?

সেজকাকা বললেন : তার দরকার নেই। পথে যা পাওয়া যাবে, তাই খেয়ে নেব।

না পেলে কী হবে, তা ভাবতে ইচ্ছা হল না। নতুন দেশ দেখার আনন্দে খেতে পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্ন যে বড় হয়ে উঠবে না, তা জানি। তাই প্রসন্ন মনেই আমরা জল পেরিয়ে হেঁটে অগ্রসর হলাম।

টুরিস্ট অফিসে এখন আর বেশি যাত্রী নেই। কাল রাতে জম্মুর দিক থেকে একখানাও বাস এসে পৌঁছয়নি। এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। পাকিস্তানের সীমানা জম্মুর খুব কাছে। এই দিক দিয়ে ঢুকে পড়লে যে জম্মুর পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ভাবনাতেই অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু সেজকাকা এসব উপেক্ষা করে সরাসরি টিকিটের কাউন্টারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিছুদিন আগে অ্যাডভান্স টিকিট কাটতে হত, আর সে-টিকিটও যেদিন ইচ্ছা সেদিন পাওয়া যেত না। আজ সকালের বাসেই জায়গা পাওয়া গেল। আর সেও টুরিস্ট বাসে। জানা গেল যে, সপ্তাহে দুদিন এই টুরিস্ট বাস অচ্ছাবল ও কোকরনাগ হয়ে পহলগামে যায়। অন্যদিন যে বাস ছাড়ে তা যায় সোজা পথে। সেজকাকা বললেন : এ ভালই হল। দেখতে দেখতেই যাওয়া যাবে।

বলে রিটার্ন টিকিট নিয়ে নিলেন।

সকাল সাড়ে আটটায় ছাড়ল পহলগামের বাস। কিন্তু এ-বাস ঝিলম পেরিয়ে পশ্চিমমুখো চলল না, এ-বাস দক্ষিণের পথ ধরল। এই পথেই আমরা শ্রীনগরে এসেছি। কিন্তু অন্ধকারে এসেছি বলে কিছুই দেখতে পাইনি। একটুখানি এগিয়েই সেজকাকা বললেন : জান মিহির, আশা আমাকে এ-পথেও টেনে এনেছিল। বলেছিল, যুদ্ধ করতে এসেছ বলে কাশ্মীর না দেখে ফিরে যেও না। আর যদি না আস তো সারাজীবন দুঃখ থেকে যাবে। তখনই আমার অনুকূল সরকারের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, আর আশা সন্দেহ করেছিল আমার মনের কথা। বলেছিল, দাদা যেরকম গোঁয়ো, আমার মনে হয় না যে রাজী হবে যেতে। তারপরেই বলেছিল, তা নাই বা গেল, আমরা তো সন্ধ্যাবেলাতেই ফিরে আসব।

একটু থেমে সেজকাকা বললেন : তোমার কাছে লুকোব কেন মিহির, আমার মনে হয়েছিল যে অনুকূল সরকার না গেলেই ভাল, ও সঙ্গে থাকলে সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। তাই বলেছিলাম, কী অনুকূলদা, বেরোবেন নাকি? আর অনুকূল সরকারও আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিল। ভেংচি কেটে বলেছিল, পাগল হয়েছেন! একদিনে অত পথ ঠেঙালে আমার কোমরের হাড় কি আস্ত থাকবে! তারপরেই আশাকে বলেছিল, ঐ সেনাপতির কোমর শক্ত, ওর সঙ্গেই ঘুরে এস। একথা শুনে অনুকূল সরকারকে আমি বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম। মনে হয়েছিল যে সে আমাদের জন্যেই যেতে রাজী হল না। কিন্তু একথা একবারও মনে হয়নি যে, লোকটা কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে আশাকে আমার সঙ্গে পাঠাল।

সেজকাকা চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপরে বললেন : মিহির, সেদিন আমি বসেছিলাম তোমার জায়গায়, আর আমার জায়গায় বসেছিল আশা। তার দুটি বড় বড় চোখ আমি আনন্দে উজ্জ্বল দেখেছিলাম। খুশিতে সে যেন উপছে পড়ছে। কয়েক মাইল যেতে না যেতেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, দেখ দেখ, কী করছে লোকগুলো। জানালা দিয়ে আমি বাইরের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম। ক্ষেতে কাজ করছে কিছু লোক, কিন্তু ধান বা গমের ক্ষেত নয়। ঘাসের মতো নিচু কোন চারা গাছের পরিচর্যা করছে লোকগুলো। বাসের যাত্রীদের কাছেই জানতে পেলাম যে, এ-জায়গার নাম পামপুর, দুদিকে জাফরাণের ক্ষেত। ঘাসের মতো গাছ, ফুল হয়। সেই ফুল থোকায় থোকায় শুকিয়ে বাজারে বিক্রি হয়। জলে ভিজলেই তার রং আর গন্ধ ফিরে আসে। এই জাফরাণ না হলে মোগলাই খানা এক সময় বাদশাহদের মুখে রুচত না। জাফরাণের কদর আজও যায়নি, তবে দিনে দিনে দুর্মূল্য হয়েছে বলে পোলাও ও কোর্মাতে আমরা কদাচিৎ ব্যবহার করছি।

আমিও জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। শ্রীনগর থেকে ন মাইল দূরে অবস্থিত এই পামপুর আমরা পেরিয়ে এসেছি কিনা বুঝতে পারলাম না। আরও ন মাইল এগিয়ে বাস এসে অবন্তীপুরে দাঁড়াল। টুরিস্ট বাস বলে এই বাস এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, যাত্রীরা রাস্তার বাঁদিকে দেখবে অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু আজকের বাসের যাত্রীরা এসব দেখবার জন্যে বেশি উদ্গ্রীব ছিল না। কিন্তু সেজকাকা নেমে পড়লেন, বললেন : এস।

বলে একটা জায়গায় আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন : দেখতো কিছু দেখতে পাও কিনা!

অতীতের শিল্পকলার কিছু অপরূপ নিদর্শন আমি দেখতে পেলাম। তারপরে দূর থেকে দেখলাম সমগ্র এলাকাটা। ভিৎ

আছে, থাম আছে, নেই শুধু উপরের ছাদ। মন্দিরের দেউল কেমন করে ভেঙে পড়ে গেছে তা জানা গেল না। বাসে এসে উঠবার আগে সেজকাকা বললেন : সেদিন আশা আমার পাশে ছিল।

এর বেশি আর কিছু তিনি বললেন না।

অবন্তীপুর থেকে চোদ্দ মাইল এগিয়ে খানাবল বড় রাস্তার উপরে একটি ছোট শহর। কিন্তু বাস এখানে দাঁড়াল না। এখান থেকে দু মাইল দূরে অনন্তনাগে পৌঁছে কিছুক্ষণ থামল। সেজকাকা বললেন : এখানে অনন্তনাগের মন্দির আছে। কিন্তু সেখানে যাবার পথ জানি না।

যাত্রীরা কেউ নামল না দেখে আমরাও বসে রইলাম।

এখান থেকে বাস যখন ছাড়ল, তখন সেজকাকা বললেন : এখন আমরা কোকরনাগ যাচ্ছি, পহলগামে যাবার সময় আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে। ঝিলমের উৎস ভেরিনাগে যারা যাবে, তারা অন্য পথ ধরবে। কোকরনাগ থেকে ভেরিনাগের দূরত্ব মাত্র আট মাইল, কিন্তু যানবাহন চলাচলের কোন পথ নেই।

আচ্ছাবলের উপর দিয়েই আমরা কোকরনাগে পৌঁছে গেলাম। বাস থেকে নেমে খানিকটা পথ হাঁটতে হল। ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে সেই পথ এল একটা বাগানের কাছে। নানা রকমের মরশুমি ফুল ফুটে আছে। আরও খানিকটা এগিয়ে পাহাড়ের গা থেকে একটা ঝর্ণা ঝরঝর করে ঝরে পড়ে নদীর স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। ওপারে অরণ্যময় পর্বত, কিন্তু একটা পায়ে চলার পথ পুল পেরিয়ে বোধহয় ভেরিনাগের দিকেই চলে গেছে।

সেজকাকা এই ঝর্ণার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : এখানেও একটা মোগল উদ্যান রচিত হতে পারত। কিন্তু শাহজাহানের পর ঔরংগজেব বাদশাহ হয়েছিলেন বলে জানি। তাঁর শিল্পবোধ ছিল না।

এই কথা শুনে আমার আশ্চর্যবোধ হল। সেজকাকার মুখে আমি ঠিক এরকমের কথা আশা করিনি। তাই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি কী বুঝলেন জানি না, বললেন : এ আমার নিজের কথা নয়, একথা বলেছিল আশা। ঠিকই বলেছিল। সুন্দরকে আরও সুন্দর করতে জানত মোগল-বাদশাহরা, কাশ্মীরকে তারাই কাশ্মীর করেছিল।

ফেরার পথে আমরা আচ্ছাবলের প্রমোদ উদ্যানে এসে নামলাম। এই বাগান তৈরি করেছিলেন শাহজাহানের কন্যা জাহানারা। সমুদ্র সমতল থেকে সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের ধারে এই উদ্যান চিনার গাছের ছায়ায় শীতল হয়ে আছে। আর পাহাড়ের গায়ে ঝাউগাছগুলি বাতাসে অল্প অল্প দুলছে। অন্যান্য মোগল উদ্যানের সঙ্গে এরও কোন পার্থক্য নেই। বাঁধানো পথ, প্রপাতের মতো জলস্রোত আর ফোয়ারা, বিশ্রামের একটি গৃহ—এখানেও সব আছে। সেজকাকা বললেন : মিহির, এখানে বসে সময় নষ্ট করলে চলবে না। ট্রাউট মাছের হ্যাচারি দেখতে না চাও, ডাকবাংলোয় গিয়ে কিছু খেতে হবে।

ডাকবাংলোয় খেতে খেতে সেজকাকা হেসে বলেছিলেন : সেবারে আমাদের খাওয়া হয়নি।

কেন?

খাবার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জলের যে ধারা দেখলে ঝর্ণার মতো ঝরে পড়ছে, তারই পাশে বসে আমরা গল্পে ডুবে গিয়েছিলাম। যখন খেয়াল হয়েছিল, তখন আমাদের বাস ছাড়ছে। ছুটে গিয়ে বাসে উঠে পড়েছিলাম।

তারপর?

তারপর আর কী? বাসে বসে আশা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। খেতে পাইনি বলে বিরক্ত হয়েছিলাম আমি, জিজ্ঞেস করেছিলাম, অত হাসি কিসের? হাসতে হাসতেই আশা বলেছিল, সেনাপতি সাহেব আজ খাবার কথাই ভুলে গেছে। তারপর সোজা হয়ে বসে বলেছিল, যেদিন যুদ্ধের কথা ভুলে যাবে, সেদিন আমি—

সেদিন কী হবে?

আমিও ঠিক এই কথাই তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আর আশা বলেছিল, পরে বলব। একথা চেপে যাবার সময় তার মুখখানা যে রাঙা হয়ে উঠেছিল, তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

অনন্তনাগ পেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন যাত্রী বাস থামাতে বলল না। অনন্তনাগের মন্দির দেখবার আগ্রহ নেই কারও। সবাই পহলগামেই পৌঁছাতে চায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু বাস এসে ভাবন নামে একটা জায়গায় দাঁড়াল। একটি বাগানের ধারে মন্দির। কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ড-মন্দিরের কথা আমি শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম যে, এই সেই মন্দির। কিন্তু একথা শুনে সেজকাকা হেসে বললেন : না, সে-মন্দির এখান থেকে দু মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ে উঠে ভাঙ্গা সূর্য-মন্দির দেখতে অনেক সময় লাগে।

এখান থেকে বাস লীডার নদীর উপত্যকায় পৌঁছে গেল। পহলগামের পথ গেছে এই নদীর ধারে ধারে। সুন্দর মনোরম পথ। এক সময় আমরা লোকালয় দেখতে পেলাম। তারপর পহলগামের বাজার। সদর রাস্তা ধরে খানিকদূর এসে ডান দিকে বাস স্ট্যান্ডে এসে নামলাম।

পাহাড়ের গায়ে দূরে দূরে এক একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। হোটেল আছে অনেক। যাত্রীদের রাত্রিবাসের নানারকম ব্যবস্থা। তাঁবুও ভাড়া পাওয়া যায়। এই সব তাঁবু অমরনাথের যাত্রীদের দরকার। সে পথে যাত্রি নিবাস নেই, ছোটখাট ঘরে জনকয়েক যাত্রী থাকতে পারে। লোকের বসতিও নেই যে তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া যায়। কাজেই সকল যাত্রীকেই রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু নিয়ে যাত্রা করতে হয়।

বাস থেকে নেমে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। সেজকাকা চারিদিকে একবার চেয়ে দেখেই বললেন, চল, পহলগামের জায়গাটা তোমাকে দেখিয়ে দিই।

পহলগামের বাজারে একটি মাত্র পথ। এক সারি দোকান পেরিয়ে একটা খোলা মাঠ, তারপরে লীডার নদী। ঝিলমের মতো প্রশস্ত নয়, কিন্তু খরস্রোতা। দু-ধারের উপলখণ্ডে শব্দ করে সবেগে বয়ে যাচ্ছে। নদীর ওপারেও মাঠ, তারপর নাড়া পাহাড়, আর কিছু ঝাউ গাছ। শীতের সময় যে বরফে শাদা হয়ে যায় তা বোঝা যাচ্ছে। নদীর উপর পুল আছে, দুধারে দুটো পুলে পেরিয়ে ওপারে যাবার পথ। দু-একটা ঘর বাড়িও দেখা যাচ্ছে।

সেজকাকা বললেন : মিহির এই পহলগাম বড় রমনীয় জায়গা। এখানে এলে একটা রাত অন্তত কাটাতে হয়।

তারপরেই আর্তনাদের মতো সুরে বললেন : না না, একদিনও থেকো না এখানে, এখানকার বাতাসে জাদু আছে। নিজের সব সংকল্প তুমি ভুলে যাবে।

বলে নদীর ধার থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন।

আমি তাঁকে অনুসরণ করে জিজ্ঞাসা করলাম : আর কিছু দেখবার নেই এখানে?

দেখবার জায়গা? হ্যাঁ, তা আছে বৈকি। কোলাহাই হেলশিয়ার দেখতে চাও তো লীডার নদীর তীরে তীরে উজানে চলে যাও, আর তীর্থ দর্শনের বাসনা থাকলে যাও অমরনাথে। আর শুধু সময় কাটাতেই যদি এসে থাক তো ঘোড়ায় চড়ে অমরনাথের পথে চন্দনবাড়িতে গিয়ে আইস ব্রিজ দেখে এস।

আমি বললুম : সময় থাকে তো চলুন না, চন্দনবাড়ির আইস-ব্রিজ দেখে আসি।

রাবিশ!

বলে সেজকাকা যেন গর্জন করে উঠলেন। তারপরে ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন : এখানে এলেই দেখছি এই সব দুর্মতি হয়। আশাও ঠিক এই রকম করে বলেছিল, চল। আজ সেখানে গেলে শ্রীনগরে ফেরা সম্ভব নয় জেনে বলেছি, তবে কালই আমরা ফিরব।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : গিয়েছিলেন আপনারা?

সেজকাকার উত্তাপ তখন জল হয়ে গিয়েছিল, বললেন : আশা আমার কোন যুক্তি মানেনি। অনুকূলে সরকারের নাম শুনে বলেছিল, দাদা রসিক লোক, যা বোঝবার তাই বুঝবে। বিকেলের বাসে তাই আমাদের ফেরা হল না। একটা হোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে আমরা চন্দনবাড়ি গিয়েছিলাম। ফিরেছিলাম বিকেল বেলায়। তার—

আর কী?

আশার সঙ্গেই একটা ক্যামেরা ছিল। অনেকগুলো ছবি তুলেছিল আমার। আর আমিও তার কয়েকখানা ছবি তুলেছিলাম।

সে সব ছবি আপনার কাছে আছে?

মাথা নেড়ে সেজকাকা বললেন : না। তার আগেই আশার চক্রান্ত আমার কাছে

ধরা পড়ে গিয়েছিল, আর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল অনুকূলে সরকার।

হঠাৎ সেজকাকা আমার একটা হাত চেপে ধরলেন, বললেন ঃ এস তো মিহির, এখানে একটা দোকান আলুর ভাল টিকিয়া ভাজে, দেখি তো সেই দোকানটা এখনও আছে কি না!

বলে হন হন করে এগিয়ে গেলেন।

পথের ধারেই একটা ছোট চায়ের দোকানে একটি লোক লোহার বড় তাওয়ায় টিকিয়া ভাজছিল। আর ধোঁয়া উঠছিল গরম চাটু থেকে। অন্য সময় সেজকাকা নাক সেঁটকান এসব জায়গায় দাঁড়ালে। কিন্তু আজ আমার হাত ধরে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

— চোদ্দ —

শ্রীনগরে ফেরার পথে সেজকাকা আর একটি কথাও বললেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি একটি মোহময় রাত কাটিয়েছিলেন এই পহলগাম শহরে। সেই রাতের মধুর স্মৃতি আজও তাঁর হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই স্মৃতিকে তিনি মিথ্যা মনে করতে পারছেন না বলেই হয়তো কোন ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি কাঁদছেন কিন্তু সেই কান্না ঢেকে রেখেছেন কঠিন অভিনয় দিয়া।

শ্রীনগর পৌঁছতে আমাদের রাত হয়ে গেল। কিন্তু টুরিস্ট অফিসের প্রাঙ্গণে নেমে যা শুনলাম তাতে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। সেজকাকা ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন, পাকিস্তানী সেনা কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। একে আক্রমণই বলতে হবে। চোদ্দই অগস্ট এক ব্যাটেলিয়ান মানে প্রায় এক হাজার সেনা জম্মুর কাছে ছাম্ব এলাকায় সিজ ফায়ার লাইনের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। ভারতীয় সেনার সঙ্গে তাদের প্রবল লড়াই হচ্ছে।

সেজকাকা আমাকে ভিড়ের বাহিরে টেনে আনলেন, বললেন ঃ এসব কথায় কান দিয়ো না। এ যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের পাঁয়তাড়া, আমাদের শক্তি বাজিয়ে দেখছে।

সত্যি আমরা এরকম খবর রোজ পেতে লাগলাম। ভারতীয় সেনা এই চাপ সইতে পারছে না, অথচ শত্রুকে ঠেকাবার মতো কিছু করতেও পারছে না। পাকিস্তানের সীমান্ত খুব কাছে, সেখানে শিয়ালকোট খারিয়াল ও গুজরাটে তারা বহু সৈন্য সমাবেশ করেছে।

পরে শুনেছিলাম যে ইউনাইটেড নেশনের অবজার্ভাররা এসব খবর আগেই পেয়েছিলেন ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। জেনারেল নিম্মো ইউ, এন, সেক্রেটারি জেনারেলকে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের উদ্যোগের খবর ছিল। এই রিপোর্ট বেশ কিছুদিন চেপে বসে না থাকলে নাকি পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করতে পারত না। তাদের দুরভিসন্ধি আগেই ধরা পড়ে যেত।

সত্যিকার যুদ্ধ বাধল ১লা সেপ্টেম্বর। বিকেলের দিকে আমরা খবর পেলাম যে ভোর চারটের সময় পাকিস্তানী সেনা বিপুল শক্তি নিয়ে ছাম্ব এলাকায় এগিয়ে আসছে। নৌসেরার উত্তরে ঝাংগরে অনবরত গোলা পড়ছে। আর গোটা ছাম্ব অখিপুর এলাকা ধরে শত্রুরা এগোচ্ছে। তাদের সঙ্গে আছে আমেরিকার দেওয়া শ'খানেক পেটন ট্যাঙ্ক। সারাদিনে তিনবার আক্রমণ চালিয়েছে তারা, ভারতীয় সেনা তাদের তুলনায় অনেক দুর্বল। এইরকম চাপ চলতে থাকলে তাদের পিছু হঠতেই হবে, আর তাহলে জম্মু-শ্রীনগর রোডে যোগাযোগই প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সেজকাকা বললেন ঃ পাকিস্তান আমাদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটিই আক্রমণের জন্যে বেছে নিয়েছে। আমাদের ট্যাঙ্ক কম, এ অঞ্চলে কোন ট্যাঙ্ক বোধহয় নেই। আর সিজ-ফায়ার চুক্তি অনুসারে যে সৈন্য আমাদের কাশ্মীরে আছে, তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করা মুশ্কিল।

দুশ্চিন্তায় রাতে আমার ঘুম হল না, কিন্তু পরদিন সকালে শুনে আশ্চর্য হলাম যে রাতারাতি পাকিস্তানের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এই অসাধ্য সাধন করেছে ভারতীয় বিমান বাহিনী। জেনারেল চৌধুরী নাকি বিমানবাহিনী তলব করেছিলেন উপায়ান্তর না দেখে। পরে এই ঘটনার বিবরণ আমরা জেনেছিলাম, সারাদিনের যুদ্ধ দেখে বিকেল সাড়ে চারটেয় জেনারেল চৌধুরী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, বিমান বাহিনীর সাহায্য না পেলে আখনুর ও জম্মু শহর রক্ষা করা যাবে না। তখনই তিনি এই কথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী যশবন্তরাও চাবনকে বললেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী সম্মতি নিলেন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর। পাঁচটা দশ মিনিটে মার্শাল অর্জুন সিং হুকুম পেলেন। আর পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান আকাশে উড়ল। ছটার সময় হাহাকার পড়ে গেল পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মধ্যে, আকাশ থেকে গুলি বর্ষণ করছে ভারতীয় বিমান।

পাকিস্তান এই বিমান যুদ্ধের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভারতীয় বিমান আনতে জেনারেল চৌধুরীর দেড় ঘণ্টাও সময় লাগেনি। পাকিস্তানের সময় লাগল দেড়দিনেরও বেশি। ততক্ষণ তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। তারপরে আকাশে এক ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। পাকিস্তানীরা আনল আমেরিকার সেই ভয়াবহ বড় বিমান সেবারজেট। আর ভারত তার ভ্যাম্পায়ার সরিয়ে নিয়ে লাগাল ভারতের তৈরি ছোট ছোট বিমান ন্যাট। সে নাকি এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ। স্কোয়াড্রন লীডার ট্রেভর কীলার গুলি করে পাকিস্তানের প্রথম সেবারজেট কিল করলেন, আর ফ্লাইট লেফটেনান্ট পাঠানিয়া তার পরদিনই আর একখানা সেবারজেট নামালেন আখনুরের আকাশে যুদ্ধ করে। সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

সেজকাকা আমাকে বোঝালেন যে এ কৌশলের যুদ্ধ হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের রোলস কোম্পানী নাকি ইঞ্জিন দিয়েছে আমেরিকার সেবারজেটের জন্যে, আবার তারাই ভারতীয়দের দিয়েছে ন্যাটের ইঞ্জিন। সেবারজেট আকারে বড়, অনেক পেট্রল নিয়ে অনেক ক্ষণ আকাশে উড়তে পারে। তাই বহুদূরে থেকে এসে বোমা বর্ষণ করে ফিরে যেতে পারে। আর ন্যাট ছোট ছোট বিমান, অল্প তেল নিয়ে খুব অল্পক্ষণই আকাশে থাকতে পারে। কিন্তু গতি অত্যন্ত দ্রুত। তাই সেবারজেটের পেটের তলায় আশ্রয় নিয়ে তাকে গুলি করে ভূপাতিত করতে পারে। ভারতীয় বীরেরা অসম সাহসে এই অসাধ্য সাধন করছে।

পাকিস্তানের অগ্রগতি থমকে গিয়েছিল, কিন্তু থেমে যায়নি। উপরে বিমান ও নিচু ট্যাঙ্কের সাহায্যে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল আখনুরের দিকে। ভারতীয় সেনার গুলিতে পেটন ট্যাঙ্ক অকেজো হয়ে গেল। কিন্তু আমেরিকা এ কথা বিশ্বাস করল না। জেনারেল চৌধুরী যে ট্যাঙ্ক যুদ্ধে বিশ্বের সেরা সেনাপতিদের অন্যতম, এ কথা তারা পরে জেনেছিল ট্যাঙ্কের দুর্দশা দেখে।

সারাদিন আমরা ট্রানজিস্টারে যুদ্ধের খবর শুনতাম। নানা দেশের খবর শুনে রীতিমতো ধোঁকা লেগে যেত আমাদের। কিন্তু সেজকাকা শান্তভাবে বিশেষ বিশেষ খবরগুলো টুকে রাখতেন।

দোসরা সেপ্টেম্বর ইউনাইটেড নেশনের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট ভারত ও পাকিস্তানকে চার তারিখ থেকে যুদ্ধ বন্ধ করবার অনুরোধ জানালেন। পাকিস্তানী বাহিনী তখন আখনুরের ছ'মাইল দূরে পৌঁছে গেছে। তিন তারিখে উ থান্ট তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন সিকিউরিটি কাউন্সিলে। আর চার তারিখে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী করাচীতে এসে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে ছ'ঘণ্টা আলোচনা করে বললেন, পাকিস্তান ঠিকই করেছে। ভারত যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান রাজী হল না।

পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো তখন দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদল ভারতকে বলছে আক্রমণকারী, আর একদল পাকিস্তানকে দায়ী করছে। মজা দেখছে অন্য সব দেশ। এমনি সময় সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখে একটানা পাকিস্তানের সেবারজেট এসে অমৃতসরের কাছে বোমা ফেলে গেল। নিরীহ লোক মারা পড়ল অনেক। জেনারেল চৌধুরী বললেন, আর নয়, কাশ্মীর রক্ষা করতে হলে এবারে পাকিস্তান আক্রমণ করতে হবে। দিল্লীর সমর্থন পেলেন তিনি। আর ছ' তারিখে দিল্লীর লোকসভায় গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী যে ভারতীয় সেনা পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। এক জায়গায় নয়, লাহোরের ত্রিশ মাইল এলাকায় একসঙ্গে তিন জায়গায় আক্রমণ করা হয়েছে। বিপুল কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল সরকারের এই ঘোষণায়।

জয়ধ্বনি কেন! যে দেশের লোক এক গালে চড় খেলে আর একটা গাল বাড়িয়ে দেয় নিজে থেকে, সে দেশ আক্রমণ করল পররাজ্য! আর দেশের লোকেরা নিজেদের আদর্শ ভুলে সমর্থন করল এই কাণ্ড!

সেজকাকা বললেন ঃ কেন সমর্থন করবে না! প্রতিদিন পাকিস্তান যে বিষ উদ্গীরণ করছে, বিশ্বের দরবারে নীচ প্রতিপন্ন করতে চাইছে ভারতীয়দের, সর্বোপরি নিজেরা আক্রমণ করে অন্য দেশকে দিয়ে বলাচ্ছে যে ভারতই আক্রমণ করেছে আগে আর তারা কোমর বেঁধে স্বাধীনতা রক্ষায় নেমেছে এসব শুনেও কি ভারতের জনমত বদলাবে না। আর তিন বছর আগে আমাদের অপমানের কথা মনে কর। চীনারা এসে আমাদের মাথা হেঁট করে দিয়ে গেছে। এবারে পাকিস্তানও তাই করবে! তার চেয়ে একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক। তারা যদি শক্তিশালী হয় তো কাজে তা প্রমাণ করুক। গালাগালি ওসকানি আর খোঁচাখুঁচি আমরা সহ্য করব না।

সত্যই সেদিন আমাদের ভারতীয় সেনা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সামরিক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে এগিয়ে গেল লাহোরের দিকে। লাহোরের প্রতিরক্ষার জন্য ইচ্ছোগিল নামে যে খাল কাটা হয়েছিল সাত বছর আগে, ভারতীয় সেনা তার ধারে পৌঁছে গেল দশ তারিখ রাত সাড়ে এগারটায়।

সেজকাকা বললেন ঃ শুনে তুমি আশ্চর্য হবে মিহির যে পাকিস্তান এই খাল তৈরি করেছিল লাহোরের প্রতিরক্ষার জন্য। আর আমাদের সরকারও নাকি অনেক টাকা দিয়েছিল। এখন আমি সরকারকে গালাগালি করছিলাম। আজ শুনে আনন্দ হচ্ছে যে ভারতীয় জওয়ানরা তার সদ্ব্যবহার করছে।

দিনকয়েক আগে আমরা যে ভয় পেয়েছিলাম, এখন আর সে ভয় নেই। এখন পাকিস্তান নিজেদের সামলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেকোন মুহূর্তে লাহোরের পতন হতে পারে। এই ভয়ে ওরা অনেক সৈন্য সামন্ত ও ট্যাংক আর দেমন জম্মু এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থায়। যুদ্ধের চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। রুদ্ধ আশায় আমরা লাহোরের পতন হয়েছে এই খবর শোনবার জন্যে রেডিও খুলে বসে থাকি।

কিন্তু ভারতীয় সেনা ইচ্ছোগিল খালের ধারে যেন নির্বিকারভাবে বসে আছে। একদিন নাকি কিছু সৈন্য খাল পার হয়ে লাহোরের উপকণ্ঠে বাটার ফ্যাক্টরি পর্যন্ত এগিয়ে ছিল, কিন্তু ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। তারপরে খাল পার হবার কথা আর শোনা যাচ্ছে না।

সেজকাকা বললেন ঃ লাহোর আমরা দখল করব না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম ঃ কেন?

লাহোর জয় করা কঠিন হবে না, কিন্তু তা রক্ষা করতে আমাদের অনেক শক্তি ক্ষয় করতে হবে। বিদেশীদের একটা কথা বোধহয় শুনেছ!. তারা বলছে যে পাকিস্তানীরা তাদের কোয়ালিটি দিয়ে আমাদের কোয়ান্টিটির সংগে লড়ছে। অর্থাৎ তারা বলতে চায় যে তারা অল্প কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে ভাল অস্ত্রপাতি দিয়ে লড়ছে। কিন্তু ভারতের সৈন্য সংখ্যা বেশি, অস্ত্রপাতিও অনেক, কিন্তু সেসব পাকিস্তানের চেয়ে নিকৃষ্ট। এসব কথা বলবার সময় ওদের লজ্জা করে না। দুদেশের সৈন্য সংখ্যায় এক আধ-ডিভিসনের তফাৎ। আর যে সব অস্ত্রশস্ত্রের বড়াই তারা করছে, তার ব্যবহার তো দেখাই যাচ্ছে। শুনেছ তো, ওদের পেটন ট্যাংক কব্জা করে ওদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার হচ্ছে। ওদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্রই কাজে লাগাচ্ছে আমাদের জওয়ানরা।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমাদের সৈন্য কত, আর তাদের জন্য কত খরচ হয়, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে?

বললাম ঃ না।

সেজকাকা বললেন ঃ বিশ্বের চতুর্থ শক্তি আমরা, আমাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। চীনের পঁচিশ, রাশিয়ার কুড়ি ও আমেরিকার আঠার লক্ষ সৈন্য। তারা এই সেনাবাহিনীর জন্যে কত খরচ করে শুনে আশ্চর্য হবে। চীন বাহাত্তর লক্ষ ডলার, রাশিয়া চার কোটি ডলার আর আমেরিকা প্রায় আট কোটি ডলার।

ভারত?

কত মনে হয় তোমার? সত্যি কথা বিশ্বাস হবে? পনর লক্ষ ডলারও খরচ করতে পারে না।

বিস্ময়ের আমার সীমা রইল না। কিন্তু সেজকাকা বললেন ঃ এই সামান্য পুঁজি দিয়ে দেশরক্ষার কাজ চলে কোনরকমে। লাহোর জয় করে বিশ্বের কাছে বড়াই করতে গেলে নিশ্চয়ই ভুল হবে। জেনারেল চৌধুরী এ রকমের ভুল কিছুতেই করবেন না।

তবু আমি লাহোর জয়ের খবর শোনবার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইচ্ছোগিল খালের ধারে ওরা চুপ করে বসে আছে শুনলেই রাগ হত। এই গাড়িমসি আমার মোটেই ভাল লাগত না। ইচ্ছে হত যে সেখানকার সেনাপতিকে সরিয়ে তরুণ মেজর ভাস্কর রায়কে সেখানে পাঠিয়ে দিই। ছাম্বে ট্যাংক যুদ্ধে মেজর ভাস্কর রায় অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছেন, তিনি মহাবীর চক্র পাবেন। ডোগরাইএর যুদ্ধের জন্য মেজর ত্যাগীও মহাবীর চক্র পাবেন, কিন্তু সেই বীর হাসপাতালে মারা গেছেন। বন্দুক দিয়ে চারটি ট্যাংক ধ্বংস করে পরমবীর চক্রের অধিকারী হয়েছেন হাবিলদার আবদুল হামিদ। তিনিও আর বেঁচে নেই। আখের ক্ষেতের ভিতরে তিনি শত্রুর চারটি ট্যাংক দেখতে পেয়েছিলেন। একটা ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে পরপর চারটি ট্যাংক গুলী করে নষ্ট করার পর চতুর্থ ট্যাংকের গুলীতে তিনি শূন্যে উঠে যান। ট্যাংক যুদ্ধের সম্বন্ধে আমরা নানা কথা শুনতে পাচ্ছি। আমেরিকানদের পেটন ট্যাংক একটা দুর্গের মতো, চুয়াল্লিশ টন ওজন নিয়ে চল্লিশ মাইল বেগে চলতে পারে। রাতে দেখবার জন্যে ইনফ্রা-রেড চোখ আছে। দু'হাজার গজ দূরের লক্ষ্য বিদ্ধ করতে সক্ষম। এছাড়াও পাকিস্তানীদের শেখ ও শেরম্যান ট্যাংক আছে। ভারতীয়দের আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত সেঞ্চুরিয়ান ও শেরম্যান ট্যাংক। আমেরিকানরা দাবী করেছিল যে পেটন ধ্বংস করতে পারে এমন অস্ত্র এখনও তৈরি হয়নি। আর এই সাহসেই পাকিস্তানীরা ভেবেছিল যে গ্রান্ড ট্যাংক রোডে একবার উঠতে পারলে গড় গড় করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু ভারতীয় সেনা যখন একটা একটা ট্যাংক নষ্ট করতে লাগল, তখন প্রথমটায় কেউ একথা বিশ্বাস করেনি। মেজর ভাস্কর রায় ছাম্বেই ছটা পেটন ধ্বংস করেছিলেন।

ট্যাংক যুদ্ধের সম্বন্ধে আরও একটা গল্প শুনলাম সেজকাকার কাছে। এবার বেড়াতে গিয়ে তিনি এই খবর সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেপ্টেম্বরের দশ তারিখের গল্প। পাকিস্তান তখন প্রবল ট্যাংক যুদ্ধে নেমেছে। আমাদের কিছু সেঞ্চুরিয়ান ট্যাংক আখের ক্ষেতে লুকিয়ে আছে, আর পাকিস্তানীরা তাদের পেটন ট্যাংক নিয়ে বীরবিক্রমে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ গোলাগুলী আসতে দেখে তারা অন্যদিকে ফিরল। সেদিকে আমাদের সেঞ্চুরিয়ান। পালাবার পথ নেই। একটা নালা কেটে দেওয়া হয়েছিল। তার জলে জমি কাদা হয়ে গেছে, ভারি পেটনগুলো কাদায় ডুবে যাচ্ছে। এমনি সময় আমাদের ব্রিগেডিয়ার ভাগরাজ হুকুম দিলেন, ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গে গোলাবর্ষণ শুরু হল। ট্যাংক চালকেরা ট্যাংক ফেলে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। পনেরোটা চালু ট্যাংক এল আমাদের হাতে।

সেজকাকা বললেন ঃ এই যুদ্ধে শুনেছি পাকিস্তানের মেজর জেনারেল নাসির আমেদ খান মারা পড়েছেন।

মেজর জেনারেল!

সেজকাকা বললেন ঃ হ্যাঁ। পাকিস্তানের ফার্স্ট আর্মাড ডিভিসনের জি ও সি। খবরটা আমাদের অবজারভেসন পোস্ট থেকে বেরিয়েছে, এখন বোলো না কাউকে।

এখানে বলবার তো লোক নেই, তবু বললাম ঃ বলব না।

সেজকাকা বললেন ঃ সকাল সাড়ে এগারটায় আমাদের জীপ ওয়ারলেসে একটা খবর শুনল, ইমামের কাছে থেকে ইমাম-বাজারের কাছে খবর যাচ্ছে ইসলাম আর পাকিস্তানের নামে সামনে এগোও। এর উত্তর এল, তা সম্ভব নয় স্যার, চারিদিকে ভারতীয় ট্যাংক। ইমাম বললেন ঃ তবে পিছিয়ে এস। এর উত্তর এল, তাও সম্ভব নয়, পিছনেও ভারতীয় ট্যাংক। ইমাম তখন রেগে বললেন, তবে দাঁড়িয়ে থাক, আমি আসছি।

সেজকাকা গর্বিতভাবে তখন রেগে বললেন ঃ তুমি শুনে আশ্চর্য হবে মিহির আমাদের জওয়ানরা ইমামের ট্যাংক ঠিক চিনেছিল। নির্বিঘ্নে আসতে দিল দু'মাইল,

তারপরে আক্রমণ করে ট্যাঙ্কটি ধ্বংস করল। সেই ট্যাঙ্কের ভিতরে ছিলেন ইমাম। ওয়ারলেসে খবর গেল, হামারা সরমে চড়া ইমাম মর গয়ে।

বড়ো করে ছাঁটা গোঁফের উপরে হাত বুলিয়ে সেজকাকা বললেন: আমাদের জওয়ানরা যা করছে, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। পৃথিবীর লোকেরও সময় লাগছে বুঝতে। যেদিন বুঝবে সেদিনই যুদ্ধ থেমে যাবে।

কীরকম?

পাকিস্তানের উপরে সহানুভূতি আছে অনেক দেশের। আমেরিকা ভাবছে, ভারত তো নিরপেক্ষ দেশ। চীনাদের প্রসার প্রতিরোধ করতে হলে পাকিস্তানেই ঘাঁটি করতে হবে। এই আশাতেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে, মাটির নিচে বিমানঘাঁটি তৈরি করে দিয়েছে। তাতেও তারা সহানুভূতি হারায় নি, হারাবেও না। শুনতে পাচ্ছি, তারা তিন সপ্তাহে ছমাসের গোলাবারুদ খরচ করে ফেলেছে, ট্যাঙ্ক বিমান ও অস্ত্রশস্ত্রও নষ্ট হয়েছে অনেক। সব জিনিস তারা আবার দেবে, জঙ্গের ভয়ে দেবে। আর একথাও আমি বলছি মিহির, পাকিস্তান কোনদিন ওসব চীনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না, বরং দরকার হলে প্রকাশ্যে গলা জড়িয়ে ধরে বলবে ইসলাম চীনা ভাই ভাই।

হঠাৎ এক সময় সেজকাকা বললেন: সেপ্টেম্বরের আজ কত তারিখ মিহির?

বলাম: বাইশ।

গম্ভীরভাবে তিনি মন্তব্য করলেন: দুএকদিনের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

কেন?

কেন আবার! পাকিস্তানের মেরুদণ্ড তো ভেঙে গেছে, পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে ইছোগিল খালের ধারে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সেনা মজা দেখছে, আর মুখ ভেঙাচ্ছে।

এবারের শান্তি প্রস্তাব তারা লুফে নেবে।

তাই হল। তেইশে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ থেমে গেল। ২২শে সাড়ে বারোটায় যুদ্ধ থামাবার জন্য ইউনাইটেড নেশনের আদেশ পাকিস্তান মেনে নিয়েছে।

—পনেরো—

সেজকাকার আনন্দের যেন আজ সীমা নেই। বললেন: এস মিহির, আজকের দিনটা সেলিব্রেট করা যাক, একটা উৎসব কর।

দুদিন আগেই তিনি বলেছিলেন: বুঝলে মিহির, ইছোগিল খালের ধারে আমাদের জওয়ানরা থাবা পেতে বসে আছে। এগোচ্ছে না, পিছিয়েও আসছে না। এইভাবেই চলতে থাকলে বাড়িতে 'তার' পাঠাতে হবে। পয়সা কড়ি যে ফুরিয়ে এল। এতদিন থাকব বলে তো আসি নি।

আজ তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। দেশের বিপদই কাটেনি, আমাদের সমস্যাও দূর হয়েছে। এবারে দেশে ফিরতে পারব নিশ্চিন্ত মনে। তাই বললাম: কী করতে চান বলুন।

সেজকাকা একবার পাশের হাউসবোটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, বললেন: ওরা পালিয়েছে। জানতাম ওরা পালাবে।

বলে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম: আজ ভাল-মন্দ খাবার আয়োজন করা যাক। বাধা দিয়ে সেজকাকা বললেন: আয়োজন কোরোনা, যা করবার চটপট করে ফেল। খেতে হলে আয়োজন তো করতেই হবে!

কিন্তু সেজকাকা এ কথায় অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। একরকমের অদ্ভুত ভাবান্তর দেখলাম তাঁর চোখে মুখে। আমি কোন প্রশ্ন করব কিনা, সেই কথাই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু সেজকাকা নিজেই কথা কইলেন। আস্তে আস্তে বললেন: জান মিহির, আমার একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। পহলগাম থেকে ফিরে আসবার পর আশা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তাদের হাউসবোটে। আশার বাবা-মা নাকি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন, অনুকূলে সরকারের সঙ্গে আশা কাশ্মীরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আর সেই ছিল আশার অভিভাবক। তাদের অনুষ্ঠানে অনুকূলে নাকি আমাকে একটা আশ্চর্য খবর দেবে, এই কথা ছিল।

তারপর!

তারপর?

সেজকাকা হাসবার চেষ্টা করলেন, প্রাণহীন শুষ্ক হাসি তাঁর ঠোঁটেই বিকৃত হয়ে গেল। মনে হল যে তাঁর বেদনার্ত হৃদয় থেকে একটা কান্নার শব্দ উঠছে। কোন রকমে বললেন: সেদিন তাদের অনুষ্ঠানে গিয়েই জানলাম যে আশা আশা নয়, সে আয়েষা। অনুকূলের মুখেই নাকি আমি এই নাম শুনলাম। তারপর চলে এলাম সেখান থেকে। আমার কাছে এর বেশি আর কিছু জানতে চেওনা। বলে সেজকাকা নীরব হয়ে গেলেন।

বিকেলে ছাদের উপরে বসে আমি দেশে ফেরার কথা ভাবছিলাম। এমন সময় আমিরা এসে খবর দিল যে নিচে সেজকাকা আমাকে ডাকছেন। কিন্তু নিচে এসে দেখলাম যে সেজকাকার সঙ্গে একটি বালক বসে আছে। বয়স তেরো-চোদ্দ বছরের বেশি হবে না। কিন্তু বুদ্ধিমান চেহারা, ধারালো দৃষ্টি আর প্রসন্ন মুখ। আমাকে আসতে দেখে উঠে এসে আমার পায়ের ধুলো নিল। থাক থাক বলে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম, আর আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিলাম সেজকাকার দিকে।

তিনি বিরক্তভাবে বললেন: কী ঝামেলা দেখ। এই ছেলেটি বলছে, আমাদের আত্মীয়, কিন্তু কীরকমের আত্মীয় তা বলতে পারছে না। এমন কোন নাম বলতে পারছে না যে চিনতে পারি। অথচ এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। তাদের বাড়িতে আজ রাতে খেতে হবে।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল, বলল: আজ যুদ্ধ জয়ের জন্যে আমাদের বাড়িতে উৎসব হবে, আপনাদের আসতেই হবে। পিসিমা বলেছেন, আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতে।

আমি বললাম: পিসিমা কে?

ছেলেটি বলল: আমার পিসিমা। বললেই চিনতে পারবেন।

আমি হেসে বললাম: বেশ কথা।

বলে সেজকাকার দিকে তাকালাম। তিনি বললেন: চেহারা দেখে বেশ চালাক চতুর বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধি দেখ।

আমি হেসে বললাম: বিদেশী বাঙালী ছেলে তো, চলুননা দেখেই আসি।

খুশী হয়ে ছেলেটি বলল: পিসিমা বলেছেন, তাঁকে দেখলেই আপনারা চিনতে পারবেন।

অনেকটা অনিচ্ছাতেই সেজকাকা রাজী হলেন। বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

হাউসবোটের নিচে একখানা শিকারা অপেক্ষা করছিল। সেই শিকারায় আমরা উঠে বসলাম। ছেলেটি আমার পাশে এসে বসল, সেজকাকা একা বসলেন অন্য ধারে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার নাম কী।

গৌতম। আগে একটা খারাপ নাম ছিল। পিসিমা এই নাম রেখেছেন।

আমি বললাম: আমাদের কথা তোমার পিসিমা জানলেন কী করে?

গৌতম বলল: তিনি তো আপনাদের দেখে গেছেন!

সোজা হয়ে বসলেন সেজকাকা, বললেন: দেখে গেছেন!

আমি বললাম: তবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন নি কেন?

সহাস্যে গৌতম বলল: পিসিমা বললেন, এখন যুদ্ধ চলছে, এখন আর ওদের বিরক্ত করব না। যুদ্ধ থামলে বাড়িতে ডেকে আনব।

আমি ভেবেছিলাম যে শিকারা বোধহয় ঘাটে লাগবে, কিন্তু দেখলাম তা নয়। ডাল গেটের দিকেই শিকারা চলছে। জিজ্ঞাসা করলাম: তোমরা আছ কোথায়?

গৌতম বলল: বাঁধের কাছে। এখান থেকে টাঙ্গা করে আমরা যেতে পারতাম। কিন্তু পিসিমা বললেন, ওদের কষ্ট দিসনে, শিকারায় করেই নিয়ে আসবি—ডাল গেট দিয়ে ঝিলম দিয়ে। শিকারাওয়ালাকেও এই কথা বলে দিয়েছেন।

আমরা ডাল গেটের ভিতরে এসে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তারপর জল নিচে নামতে লাগল। নৌকো যেন অতলে নেমে যাবে। কিন্তু তার আগেই অন্যদিকের দরজা খুলে গেল। আমরা বাহিরে বেরিয়ে এলাম। চেনারবাগের খালে আমরা পৌঁছে গেছি।

বড় বড় চেনার গাছের ছায়ায় চলেছি আমরা। বহু কাঠ জলে ভাসছে, অনেক পুরনো হাউসবোটও ভাসছে। তার ভিতরেও লোকজনের বাস, রান্নার ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প।

একসময় নৌকো গিয়ে ঝিলমে পড়ল, তারপর ঝিলমের স্রোতে ভেসে চলল বাঁধের দিকে। সেজকাকার দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হলাম। তিনি যেন অশান্ত হয়ে উঠেছেন, ঘামছেন অল্প অল্প। তাঁর হাতের পাইপ কখন নিবে গেছে, তা খেয়াল

করেন নি। আমি বললাম : আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে!

সেজকাকা বললেন : এই ঝিলম নদীটা আমার ভাল লাগে না, বুঝলে মিহির। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করি।

বাঁধের কাছাকাছি এসে সেজকাকা বললেন : বুঝলে মিহির, তুমি এক কাজ কর। গৌতমের সঙ্গে তুমি তার পিসিমার কাছে যাও। আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাও এইখানে।

কিন্তু আমি কোন কথা কইলাম না।

সেজকাকা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন : এই, রোকো।

বিনীতভাবে শিকারাওয়ালা জবাব দিল : আ গিয়া হুজুর।

কোথায় আ গিয়া :

ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে সে জবাব দিল : কোঠি।

বাঁধের উপরে উঠে সেজকাকা বললেন : তুমি একা যাও মিহির, আমি ফিরে যাচ্ছি।

কিন্তু এ কথার উত্তর দিলেন এক অপরিচিতা মহিলা। লম্বা ঋজু দেহ, আভিজাত্যে গম্ভীর, প্রৌঢ় বয়স, সাদা নিরাভরণ বেশ। প্রসন্ন মুখে বললেন : এত দূরে এসে ফিরে যাবে কেন! এস।

আমি না ধরে ফেললে সেজকাকা বোধহয় পড়ে যেতেন। ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠলেন : তুমি!

কিন্তু সেই মহিলা হেসে বললেন : ভূত নই। আমি মানুষ।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন : এস, এই আমার বাড়ি। বলে কাছেই একটা বাড়িতে আমাদের নিয়ে এলেন।

বসবার ঘরটি তাঁর সুন্দর করে সাজানো।

ঘরজোড়া কাশ্মীরী কার্পেট, মাঝখানে একটি নকশা করা সেন্টার পিস, আর দুপাশে সোফা সেট দুটো ডিজাইনের। রেডিওগ্রামের উপরে তামার পুষ্পপাত্রে ফুল সাজানো আছে।

তোমরা বোসো, আমি আসছি।

বলে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যেতেই আমি সেজকাকার মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কোন কথা না বলেই একখানা সোফার উপরে কাৎ হয়ে বসে পড়লেন। আশ্চর্য মানুষ! সমস্ত বীরত্ব তাঁর একটি মহিলাকে দেখেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

গৌতমও বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছিল, কিংবা হয়তো বাড়িতে ঢোকেই নি। আমি ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখতে লাগলাম। সর্বত্র এক শিল্প বোধের পরিচয়, কাশ্মীরের কাজের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কাজও মিলে আছে। জওহরলালের পাশে আছেন রবীন্দ্রনাথ। বুক কেসের ভিতরেও জওহরলাল আর রবীন্দ্রনাথ আছেন পাশাপাশি। আর তার উপরে একখানা ছবি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেজকাকার যৌবনের ছবি। চন্দন বাড়ির আইস ব্রিজ আমি দেখিনি, কিন্তু মনে হল যে সেখানেই বোধহয় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে এক অদ্ভুত প্রসন্নতা। তার পাশেই আর একজন পুরুষের ছবি আছে, দার্শনিকের মতো গম্ভীর প্রকৃতির।

ভদ্রমহিলা কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা খেয়াল করিনি। আমাকে তাকাতে দেখে হেসে বললেন : ছবি দেখছ বুঝি?

তারপরে বললেন : তুমি ওর ভাইপো তো, তাই তোমাকে আপনি বলব না। ওঁকে তো চিনতেই পারছ। আর ইনি আমার স্বামী মিস্টার পণ্ডিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

ছিলেন!

হ্যাঁ বিয়ের কিছুদিন পরেই মারা গেছেন। কাশ্মীরের সংস্কৃতি আন্দোলনের সময় একটা গুলি লেগেছিল তাঁর বুকে।

সেজকাকার মুখে আমি মিসেস পণ্ডিতের নাম শুনেছি। কিন্তু যে নামটা আমার মনে এসেছিল তা জেনে নেবার সাহস আমার হল না।

এই সময়ে গৌতমকে আসতে দেখে ভদ্রমহিলা সেজকাকাকে বললেন : গৌতমকে দেখে বোধহয় চিনতে পেরেছিলে!

সেজকাকা বিষণ্ণ মুখে বসেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু মিসেস পণ্ডিত বললেন : আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি চিনতে পারবে। আর সেই জন্যেই বাঁধের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ও দেখতে ঠিক ওর বাপের মতো হয়েছে।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম : ওর বাবা কে?

বলব!

বলে মিসেস পণ্ডিত সেজকাকার দিকে তাকালেন।

গম্ভীর স্বরে সেজকাকা বললেন : মিহিরকে তোমার কথা বলেছি।

বলেছ! তবে অমন হাঁড়ি মুখ করে আছ কেন!

বলে হাসতে হাসতে ভদ্রমহিলা বললেন : গৌতম আমার জ্যাঠতুতো দাদা [illegible] সরকারের ছেলে। নিজেদের বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে দাদা পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরতে পারেন নি। বাপ-মা হারিয়ে অবধি এই ছেলেটা আমার কাছেই মানুষ হচ্ছে।

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন আমার মনে জট পাকিয়ে ফেলল। সেসব ছাড়াবার [illegible] বললাম : আমি শুনলাম, গৌতমের [illegible] আপনি পাল্টে দিয়েছেন?

ভদ্রমহিলা এবারে সজোরে হেসে উঠলেন। বললেন : শুনেছ সেকথা। ফকির সরকার নাম শুনলে তোমার কাকা ওকেও পাকিস্তানের চর ভাবত। তাই ওকে বিশুদ্ধ [illegible] পরিচয় দিয়েছি।

সেজকাকা তার মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। আর মিসেস পণ্ডিত আমাকে চুপি চুপি বললেন : ফাল্গুনে আমার জন্ম হয়েছিল, আর বাবা তখন বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী পড়ছিলেন। তাই শখ করে নাম রেখেছিলেন আয়েষা। দেশ স্বাধীন হবার সময় আমি বলেছিলাম, ও নাম এখন আর মানাবে না, আমাকে এখন থেকে আশা বোলে ডেকো। দাদা একদিন ভুল করেছিল, আর তোমার কাকা ভুল করেছিল কিনা তাকেই জিজ্ঞেস কোরো।

বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর এই হাসি কি কান্নার মতো মনে হচ্ছে। তবু আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার বাবা মা এখন কোথায়?

মিসেস পণ্ডিত সংক্ষেপে উত্তর দিলেন : পাকিস্তান থেকে বেরোতে পারেন নি।

রাতে আমরা একসঙ্গে খেতে বসলাম। অনেক রকম রান্না রেঁধেছিলেন মিসেস পণ্ডিত। আমার পাতে বড় বড় দুটো কোফ্‌তা তুলে দিয়ে বললেন : এই জিনিষটা খেয়ে যাও মিহির, দেশে ফিরে গল্প কোরো, গুস্তাবা খেয়ে এসেছি। কাশ্মীরীদের প্রিয় খাবার, পণ্ডিত নেহেরু খুব ভালবাসতেন।

কিন্তু নিজে এসব কিছুই খেলেন না। আমি ভেবে করেছিলাম কিছু খাবার জন্যে। তিনি হেসে বলেছিলেন : রাতে আমি শুধু দুধ আর ফল খাই। আজ তো বিষ্যুৎবার। বাঙালীর মেয়ে, লক্ষ্মী পুজো না করে আজ ভাত খেতে পারব না।

সেজকাকা অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : আমাদের খবর তুমি কার কাছে পেলে?

এই প্রশ্ন শুনে মিসেস পণ্ডিত হেসে ফেললেন। বললেন বলব, তোমার ভাইপোর সামনে মান যাবে না তো।

আমি যে সেজকাকার ভাইপো নই, তাঁর ভাইপোর বন্ধু, সেজকাকা এ কথা বললেন না। [illegible] হেসে বললেন : বল না।

মিসেস পণ্ডিত আমার দিকে [illegible] বললেন : [illegible] হাউসবোট থেকেই পালিয়ে এল [illegible] : এক বুড়ো [illegible] চোখে [illegible] দেখছি। [illegible]

[illegible] সে কথা। আমার [illegible] একদিন [illegible] দেখে গেলাম। [illegible] মানুষ তো [illegible] নেই।

আমাদের [illegible] সময় মিসেস পণ্ডিত বললেন : [illegible]

কেন, তা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। তিনি নিজেই বললেন : প্রায় আঠারো বছর আগে তোমার কাকাকে একদিন খেতে ডেকেছিলাম। কিন্তু সেদিনও না খেয়ে চলে গিয়েছিল। [illegible]

আমি ভাবলাম, এবারে বোধহয় মিসেস পণ্ডিত একটা উপদেশ দেবেন [illegible] বড়, না [illegible] প্রেম বড়, এই ধরণের কোন কথা। কিন্তু তিনি সেসবের ধার দিয়েও গেলেন না। সেজকাকার অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়ে বললেন : যদি ভাল লাগে তো আবার এস।

তারপরেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর বেদনার্ত স্বর শুনতে পেলাম, কিন্তু চোখের জল দেখতে পেলাম না। কাশ্মীরে আজ এ কী রকমের আলো।

উদয়শঙ্কর

সন্ধ্যা সেন

উদয়শঙ্কর—যিনি নৃত্যজগতে একটা প্রচণ্ড বিস্ময়, জীবদ্দশায়ই রূপকথা শুধু একটা অন্তহীন বিপ্লব, কবিগুরু যাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন 'তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী করে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা করে রেখেছে জয়মাল্য নয়—আশীর্বাদ-পূত বরমাল্য। বাংলার কবির হাত থেকে আজ তুমি তা গ্রহণ করো।'—

শুধু কি তাই? ছ বছর আগে ইসরাইলের নৃত্যশিল্পী নৃত্যবিদ ও নৃত্য-সমালোচিকা শ্রীমতী বাটোনিক একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, শঙ্কর ইজ দি স্পিরিচুয়াল লিডার অব মডার্ন ইন্ডিয়া।

কিন্তু শঙ্করের হওয়ার কথা ছিল মস্তবড় চিত্রকর কিন্তু প্রথম জীবনের শুরুও সেইভাবেই। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাটা ছিল অন্যরকম। তাই জীবনের সব ঘটনা, সুধীজনের সংস্পর্শ এমন কি চিত্রশিক্ষাও তাঁর জীবনপ্রবাহের গতিস্রোত ফিরিয়ে দিল নৃত্যের দিকে। আর এইটেই হোলো জীবনের এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। কারণ যে যুগে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নৃত্য—বিলাস-ব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়, যেমন বাঈজির নাচ—সে যুগে রূপবান বিত্তবান অভিজাত বংশের দুলাল উদয়শঙ্কর কিনা নৃত্যকেই বরণ করলেন জীবনের শ্রেয়রূপে?

'এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হলো?' সোজা প্রশ্ন করলাম—উদয়শঙ্করকে।

'কি বললে খুশী হবে? বলব নৃত্য আমার জীবনে এল স্বয়ং নটরাজের আজ্ঞায়? মহাদেব একদিন আমায় স্বপ্নে আদেশ দিলেন, 'হে শঙ্কর নৃত্যে নিজেকে প্রকাশ কর আর নৃত্যের মাধ্যমেই আমার বাণী জগতে প্রচার কর?'—মুখে সেই চিরতরুণ কৌতুকী হাসি।

'শোনো—সত্যি কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। নৃত্যজীবনের প্রথম যুগ থেকে শুরু করে নৃত্যশিল্পীরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি নাচ আমায় কেউ শেখায়নি। শিক্ষা যা কিছু হয়েছে অনেক পরে সৃষ্টিশীল শিল্পীরূপে ইউরোপে সমাদৃত হওয়ারও পরে—কিন্তু ক্ষমা করবেন দাদা, একদম না জানলে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্যানুষ্ঠানের সাহস পেলেন কেমন করে—আর তার আগের প্রেরণাই বা এল কোথা থেকে? বিশেষ করে সেই যুগে—যে যুগে নৃত্য কোনো অভিজাত শিল্পরূপের মর্যাদা পায়নি—এ ছিল সমাজের বাইরে একঘরে হয়ে, বিলাসীদের বিকৃত আনন্দের অশ্রদ্ধার উপকরণ হিসেবে।

'খুব সুন্দর প্রশ্ন—জান সন্ধ্যা—আমরা আমরা আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা নই। ওপর থেকে একজন আমাদের জীবন ও কর্ম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। নৈলে দেখ আমার পারিবারিক ঐতিহ্য ছাড়াও যে কজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমায় ভারতীয় শিল্পসৃষ্টির দিকে ঠেলে দিয়ে জীবনের গতিপথের মোড় ঘুরিয়েছেন তারা সবাই-ই অ-ভারতীয়। আর তারই ফলশ্রুতি কি? না—চিত্রকর—উদয়শঙ্কর হলো নৃত্যশিল্পী—উদয়শঙ্কর। খুব ছোটো বেলায়—ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই আমি আপনমনে নাচতাম, চারপাশে যা কিছু দেখতাম—সব অনুকরণ করে। বড় থেকে ছোটো অবধি সকলের চলা, কথা বলার ভঙ্গী, হাসি, রাগ—কাজ করা, গল্প করা, এই সবই ছিল আমার নাচের বিষয়বস্তু। আর এই সবেতেই আমাদের পরিবারের সকলের খুব উৎসাহ থাকত। বিশেষ করে আমার মার। মা গ্রামোফোন রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে আমায় নাচতে বলতেন। নানারকম গান ও সুরের সঙ্গে ভঙ্গী মেলাতে গিয়ে কত-রকম ছন্দ, কত বিভিন্ন ভঙ্গী আপনা থেকেই এসে যেত। সেই নানাভঙ্গীর গতির মধ্যেই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। আর এই হারিয়ে ফেলার আনন্দের কাছে পৃথিবীর আর সবই তুচ্ছ মনে হতো।

'আমার বাবা ঝালোয়ারের মহারাজার মন্ত্রী ছিলেন জানো ত? আমার যখন চোদ্দ কি ষোল বছর বয়স তখন থেকেই বাবার সঙ্গে ঝালোয়ার দরবারে যাতায়াত করতাম। ঐ দরবারেই নানারকম নাচ দেখতাম—আর নাচের বর্ণপরিচয় না জেনেই সেইসব নাচ হুবহু তুলতে পারতাম।

'এছাড়া বিষ্ণু দিগম্বর স্কুল অফ মিউজিকে আমি বেশ কিছুদিন বীণা সেতার সুরবাহার ও বাঁশী শিখেছিলাম—সাদও কোনটাতে যাকে বলে মাস্টার তা ছিলাম না। আর যেহেতু আমার বাবা ঝালোয়ার স্টেটের পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তাঁর সঙ্গে লন্ডনের যত লর্ড লেডী, কাউন্ট কাউন্টেস, আর্ল ও নাইট তথা উঁচুমহলের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। বাবা যখনই লন্ডনের কোনো বড় উৎসবে যেতেন আমায় সঙ্গে করে নিয়ে

যেতেন—আর সেখানে নাচতে বলতেন—কখনও বা যন্ত্রও বাজাতে বলতেন।

'একবার লন্ডনের রিজেন্ট পার্কে' (১৯২২ সালের ৩০শে জুন) লীগ অব মার্সি-র দেওয়া একটি পার্টিতে রাজা পঞ্চম জর্জের সামনে সোর্ড ডান্স (তরবারী নৃত্য) দেখিয়েছিলাম। সে রাতটা সারাজীবনের আনন্দভাণ্ডারের সঞ্চিত হবার মতই এক বিশেষ মুহূর্ত। আমার নাচ পঞ্চম জর্জ কি দারুণভাবে এ্যাপ্রিশিয়েট করলেন। নাচের শেষে আবেগভরে আমার করমর্দন করে—অকৃপণ উচ্ছ্বাস ও অভিনন্দনে আমায় যেন ধন্য করে দিলেন। প্রেস-ফোটোগ্রাফাররা কত ছবি তুলল—পরদিন ওখানের বড় বড় কাগজে প্রশংসা ও অভিনন্দনের যেন বন্যা বয়ে গেল।

'এই 'সোর্ড ডান্স'—কম্পোজ করেছিলাম কি ভাবে জান? তখনকার দিনে মেলায় অথবা পালেপার্বণে নানারকম ছোরা খেলা, লাঠি খেলা তলোয়ার খেলা শেখা যেত। নাচের ভঙ্গীমা ও ছন্দ নিয়ে তাদের অনুসরণ করে এই নাচের সৃষ্টি। বিশ্বাস করবে ?' হাসিমুখে শংকর চেয়ে রইলেন।

'বিশ্বাস অবিশ্বাস অথবা সম্ভাব্য, অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন ওঠে অতি সাধারণদের ক্ষেত্রে। আপনার বেলায় নয়। তবে একটা কথা—সসংকোচে প্রশ্ন করি—মানুষ যতবড় প্রতিভার অধিকারীই হোক না কেন—যে-কোনো শিল্প অথবা বিদ্যা কিছুটা শিক্ষা-সাপেক্ষ নয় কি? নৃত্যও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম নয়? যেমন ঐ সোর্ড ডান্স-এর কথাই। তরবারীর ভাষা না হয় দেহ ও হাতের ভঙ্গীতে ফোটালেন। আপনার মত কবিপ্রাণ কল্পনাপ্রবণ রসিক সৃষ্টিশীল প্রতিভার পক্ষে সেটা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু হাত ও দেহের মুভমেন্টের মধ্যে গতিরেখার সমতা, অথবা মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি গতিরেখার ও ভঙ্গী পরিবর্তনের কারুকৃতির ভাবসাম্যতা রাখা—এসব খানিকটা শিক্ষার আওতায় পড়ে না কি ?'

'দেয়ার ইউ আর'—চিরনবীন শংকর উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন আর কি (সত্যি কি তাঁর বয়স সত্তরের এ ধারে? বিশ্বাস হয় না)—এইখানেই ওপরওলার নির্দেশে বিশ্বাস না করে উপায় নেই সন্ধ্যা। ছোটোবেলা থেকেই ড্রয়িংপেন্টিং-এর দিকে সহজাত প্রবণতা থাকায় আর্টে ডিপ্লোমা নেবার জন্য বাবা আমায় বোম্বেতে জে জে স্কুল অফ্ আর্টস-এ ভর্তি করালেন ১৯১৯ সালে। আরও আশ্চর্যের কথা কোনো প্রাথমিক অথবা অন্তবর্তী ক্লাশে শিক্ষা ছাড়াই একেবারে ফার্স্ট ইয়ারেই ভর্তি হয়েছিলাম। পরীক্ষায় স্কলারশিপও পেয়েছিলাম।

'এই ছবি আঁকা বিশেষ করে ড্রয়িং জানাটাই হয়ত অজানতেই কাজ করে গেছে নৃত্যে যথাযথ সমমাত্রিক গতিরেখা সৃষ্টি করতে। তা ছাড়া স্টেজে দাঁড়ান বসা, গ্রুপ-ডান্সের নানা ধাঁচ। সাজ-সজ্জার রঙের সমন্বয়—এ সবের সার্থকতার যোগফলই ত তোমাদের উদয়শংকরের নৃত্য? তখন একটা সৃষ্টির নেশায় কাজ করে গেছি। আজ নিরালা মুহূর্তে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারি এ সবকিছুরই মূলে ছিল ঐ ড্রয়িং ও পেন্টিং-এর অভিজ্ঞতা।' শংকর থামলেন যেন ফেলে আসা অতীতেরই পথের বাঁকে।

—এবারে বলুন—চিত্রকরের সেই আশা রূপান্তরের কাহিনী।

'হ্যাঁ, সে-কথাই বলি এবার। ১৯১৯এ বাবার টেলিগ্রাম পেয়েই লন্ডনে গেলাম। বয়স তখন উনিশ কি কুড়ি। লন্ডনের রয়েল কলেজ অফ্ আর্টস-এ ভর্তি হলাম স্কলারশিপ নিয়েই। আর সেখানে পাঁচ বছরের কোর্স তিন বছরেই কমপ্লিট করে এ আর সি এ (লন্ডন) ডিগ্রী পেলাম। 'সেলফ-পোর্ট্রেট' এবং অন্যান্য ফিগার কম্পোজিশনে ডিপ্লোমা প্রাইজও পেয়েছিলাম। লন্ডনের বিখ্যাত স্থানীয় পত্রিকা দি ডেলী মেল-এ বেরোলো ফর দি ফার্স্ট টাইম ইন দি হিস্ট্রী অফ আর্ট স্কেচ ক্লাব এ্যাট সাউথ কেনিংটন অ্যান ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট হ্যাজ ওয়ান দি স্পেন্সার প্রাইজ অ্যাওয়ার্ডেড ফর এ পিস অফ ইমাজিনেটিভ পেন্টিং এ্যান্ড অল্‌সো দি জর্জ ক্লসেন প্রাইজ ফর সেলফ প্রোর্টেটার।'

'লন্ডনে প্রথম যখন যাই তরুণ বয়সের আর পাঁচটা ছেলের মতই ও দেশের গ্ল্যামার বাইরের চাকচিক্যে চটকদার চালচলনের প্রতি প্রবল মোহ। হয়ত বা সে যুগের এক হামবড়া বাঙ্গালী সাহেব হয়েই ফিরে আসতাম। কিন্তু এই সঙ্কটের হাত থেকে বাঁচালেন যাঁরা—আগেই বলেছি অ-ভারতীয় হলেও তাঁদের ভাব, চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনায় ছিল ভারতের অন্তর্মুখী ঐশ্বর্যের প্রতি বিস্ময়ের দোলা লাগানো শ্রদ্ধা—এঁদেরই একজন হলেন রয়েল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্যার উইলিয়ম রোথেনস্টেইন, একজন আনা পাভ্‌লোভা ও মিস এলিস বোনার।

প্রথমে বলি রোথেনস্টেইনের কথা। একদিন পেন্টিং-এর ক্লাসে আঁকছি। হঠাৎ স্যার রোথেনস্টেইন ক্লাশে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ ধরে আমার আঁকা দেখে যাবার সময় বলে গেলেন—কাজ শেষ হলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। করলাম দেখা। বললেন—শংকর তোমার পেন্টিং দেখে মনে হোলো ইউরোপের নব্যযুগের চিত্রাঙ্কন শৈলীতে তুমি আকৃষ্ট। কিন্তু কেন? হোয়াই ইউ আর ক্যারিয়িং আওয়ার ডিজিজেস টু ইওর কানট্রি? আই হ্যাড দি অপরচুনিটি টু মিট টেগোর এ্যান্ড ইন্ডিয়া। প্লিজ ট্রাই টু ডু সামথিং ইন ইন্ডিয়ান ওয়ে।—তারপর আমায় একটা চিঠি দিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কিউরেটারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন—আর বললেন, একমাস তোমার ক্লাশে আসবার দরকার নেই।

'কিউরেটারের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি খুব সমাদর করে আমায় নিয়ে গেলেন একটা নির্জন ঘরে। সেখানে মস্তবড় ঘরের সমান এক টেবিলে দেখি—ইয়া বড় বড়

...লপ্রমেব সব বই—ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প সম্বন্ধে। একমাস ত ছার! বছরের পর বছর বোধহয় শুধু সেইসব বই দেখে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

'এক একটা পাতা উল্টাই আর চমকে যাই। দেখলাম অজন্তা-ইলোরার আর্ট। দেখলাম মন্দিরশিল্প, দেখলাম গ্রামের পথে-ঘাটের মুক্ত হাওয়ার আনন্দ। আমাদের ভারতে এত অফুরন্ত ঐশ্বর্য আর আমি ভ্রান্তের মত বহির্মুখী চটকের দিকে ছুটেছি? নিজের দেশের সাথে সেই প্রথম পরিচয়ের শুভদৃষ্টি ঘটল। আর এ পরিচয় ঘটালেন এক বিদেশী। মনে মনে তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানালাম।

'এই সব ভাস্কর্যের মূর্তি রং রেখা—নরুমার পেলবতা কাব্যসৌন্দর্য আমায় যেন পাগল করে দিল। এরা যেন সেই সৌন্দর্যলোকেরই বাসিন্দা যে সৌন্দর্য মানুষের বক্তা মন খুজে বেড়াচ্ছে অনুক্ষণ। অথচ জানি না কি খুঁজছি। রাতে ঘুম নেই, দিনে শান্তি নেই। সবসময় মন অস্থির, কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি করি? কেমন করেই বা করে।

'এমনি এক বিনিদ্র রাত্রে হঠাৎ একলাফে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সেইসব ভাস্কর্যের নানা ভঙ্গি আবিষ্টের মত অনুসরণ করে যেতে লাগলাম। কখনও তপস্যারত বুদ্ধের কখনও মহাদেবের তান্ডবভঙ্গি।

কালিদাসের যুগের প্রেমিকের ললিত ভাব, যেন বিভিন্ন সৌন্দর্যতরঙ্গের মধ্যে দেহ ভেসে চলল—কত, অনায়াস দক্ষতায়।

অথচ নৃত্যের আঙ্গিক সম্বন্ধে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কোনোটাই নেই—যাকে বলে 'বেসিক একসারসাইজ' তাও ত করিনি কোন দিন। সেই রাত থেকে আমার মধ্যে এল একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের ঢেউ যেন বিপ্লব। সেই রাতেই গভীর আনন্দের মধ্যে আমার যেন নবজন্ম হোলো। সেই রাতেই জ্বলে উঠল নতুন এক উপলব্ধির আলো 'নৃত্যেই আমার জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা—নৃত্যই আমার স্ব-ধর্ম শ্রেয়। আর এই নৃত্যের সহায় যাঁরা হবেন তাঁরাই আমার আপনার, আর সবাই পর।

'রাধাকৃষ্ণ' ব্যালে নৃত্যে উদয় শংকর এবং আনা পাবলোভা

শুভোর হোলো। এক পরমাশ্চর্য অনুভূতিলোক যেন খুলে গেল চোখের সামনে। এই যে দেহ, তপস্যা, সাধনা সবের পথেই যার তাগিদ বাধা হয়ে ওঠে সেই দেহ-ই কত বড় অঘটন ঘটাতে পারে—একমাত্র নৃত্যেই। নৃত্যের ছন্দস্পর্শে এই মাটির দেহই হয়ে ওঠে যেন বিদ্যুতের সমধর্মী। দেহ নিয়েই হয় দেহাতীতের আরতি।

'এমনই আরো কতশত ভাবের বন্যা যেন মনের সকল দ্বিধাকে ভাসিয়ে দিল।'

স্বনামধন্যা রুশী নৃত্য শিল্পী আনা পাভলোভা তখন লণ্ডনে। তিনি ভারতীয় নৃত্য শেখবার জন্যে শিক্ষকের খোঁজে ছিলেন এবং এই উপলক্ষেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। পাভলোভা আমায় অনুরোধ করলেন তাঁর দলের শিল্পীদের নিয়ে দুটি 'ইণ্ডিয়ান ড্যান্স' রচনা করতে। ওঁর ট্রুপের জন্য করলাম 'হিন্দু বিবাহ' নৃত্য আর স্বয়ং পাভলোভা ও আমার যুগ্মনৃত্য 'রাধাকৃষ্ণ' নৃত্য। সুকঠিন অনুশীলন, পরিশ্রম, সূক্ষ্ম বিচার ও তৎসত্ত্বে সাধনায় সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতি ও ভাবভঙ্গিমার নাচ এঁদের শেখাতে হয়েছে ভাবা যায় না। পরিশ্রমে যে এত আনন্দ আছে তা কি আগে জানতাম।

"ওদিকে আবার মহাসমস্যা। শঙ্কর আনা পাভ্লোভার দলে যোগ দিয়েছে শুনে স্যার রথেনস্টাইন খুবই মর্মাহত। যে শঙ্করের জন্য তিনি কোথায় ওদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'প্রি-ডি-রোম' স্কলারশিপ জোগাড় করে তাকে রোমে পাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন সেই শঙ্কর কিনা আনা পাভ্লোভার পার্টিতে নৃত্যরচনায় রত?—এ কি হয়? না হওয়া উচিত?

'এরপর বাবা, রদেনস্টেইন ও পাভ্লোভার মিলিত বৈঠকে তুমুল আলোচনা আমার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র নিয়ে। তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে আমার ওপরই ছেড়ে দিলেন—আমার পথ বেছে নেবার। আমার অবস্থা তখন লক্ষ্যভেদ সভায় অর্জুনের মত মীনচক্ষু আমার অভিষ্ট। একটি পথের নিশানাই আমায় ডেকে ডেকে ফিরছে। উত্তরও ঐ এক—ছবি আঁকা নয়—আমি নাচব। আমার জীবনের পালাবদল সেই শুরু।

"এরপর। রয়েল অপেরা হাউস, কনভেণ্ট গার্ডেন ইত্যাদি অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে আনা পাভ্লোভার সম্প্রদায়ের সেইদিন নাচ মঞ্চস্থ হোলো যার মধ্যে ছিল আমার দুটি রচনা।

পাভলোভার সঙ্গে নাচবার আগে আমি খুব 'একসাইটেড' আবার 'নার্ভাস'। এমন ভুবনখ্যাতা শিল্পীর সঙ্গে একসঙ্গে নাচা? এও কি সম্ভব? কিন্তু এও শুধু সম্ভবই হোলো না ওদেশের সেরা কলাসমালোচকদের ভাষায় 'ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দি কালারফুল এ্যাণ্ড বিউটিফুল ব্যালেজ পাভলোভা হ্যাজ এভার প্রোডিউসড।'

আমার মন তখন আকাশের বুকে পক্ষিনী মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনও বা বাস করছে 'কল্পনার অভ্রভিমনারে'। তারপর দীর্ঘ ন মাস ধরে পাভলোভার সঙ্গে সারা ইউরোপ ঘুরে, না, না, ঘুরে নয় জয় করে বেড়ালাম।

'দেখলাম পাভলোভার পার্টিতে আমার মাত্র দুটি নাচ—কিন্তু তারই জন্য অসম্ভব রকম পারিশ্রমিক দিচ্ছেন। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতে লাগল। একদিন পাভলোভাকে পরিষ্কার বললাম, —'দেখুন মাত্র এইটুকু কাজের জন্য এতগুলো ডলার নিতে আমার বিবেকে বড় বাধছে। আমায় আপনার অন্যান্য নাচেও একস্ট্রার রোলও কিছু কিছু দিন না—ইউরোপীয়ান ডান্সও আমি শিখে নিতে পারব।'

'পাভলোভা ত চটে অস্থির। বললেন, 'শঙ্কর তুমি জান না, ইণ্ডিয়াকে আমি কত শ্রদ্ধা করি, আর তোমার ওপর আমার কত আশা। কেন? বিকজ আই হ্যাভ সিন দ্যাট ইণ্ডিয়া ইজ দি সোর্স অফ ওয়াণ্ডার্স।' গো টু ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ব্রিং ইওর ডান্স হেয়ার ইন ইউরোপ টু প্রোভাইড আস দি গোল্ডেন অপারচুনিটি টু নো এ্যাবাউট দি হাইলি ডেভলপড ইণ্ডিয়ান কালচার হুইচ ক্যান নট বি কমপেয়ারড উইথ এনি আদার কাল্চার অফ দি ওয়ার্ল্ড'। পাভলোভা সব সময় বলতেন: 'আওয়ার ডান্স ইজ ফিজিক্যাল, ইণ্ডিয়ান ডান্স ইজ স্পিরিচুয়াল।'

'কাজেই বুঝতে পারছ স্যার রথেনস্টেইন আর পাভ্লোভা এই দুজনই ভারতীয় শিল্পকলার অন্তহীন রূপ এবং বিশালত্ব সম্বন্ধে আমার তৃতীয় নয়নের উন্মীলন ঘটালেন। —এর অনেক পরে জীবনে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ (রথেনস্টেইন-এর উদ্যোগেই তাঁর সঙ্গে একবার লণ্ডনে আমার দেখা হয়েছিল)। তাঁর কথায় পরে আসছি। তার আগে বলি, এলিস বোনারের কথা যে বিদেশিনীর ঋণ জীবনে শোধ হবার নয়।

'আনা পাভলোভার ঐ কথার পর তাঁর ট্রুপ ছেড়ে দিলাম। তারপর কিছুদিন বড় কষ্টে কেটেছে। তবে প্রথমে ছোটো ছোটো ক্যাবারে আরো নানা জায়গায় প্রোগ্রাম করে আস্তে আস্তে অর্থ, যশ দুই-ই আসতে লাগল। তখন বড় বড় থিয়েটার হলেও অনুষ্ঠানের জন্য ডাক এল।

'এই সময়ই একটা ডান্স ট্যুরে মিস এলিস্ বোনারের সঙ্গে দেখা। ইনি চিত্র ও ভাস্কর্যে সুনিপুণা, মস্ত বড় অভিজাত ঘরের মেয়ে। বোনারের সঙ্গেই নিয়ে এগারো বছর বাদে এঁরই সঙ্গে ভারতবর্ষে ফিরলাম।

'তারপর বোনারের সঙ্গে ঘুরলাম কাশ্মীর থেকে মালাবার হিলস অবধি সারা ভারতবর্ষ। নিজের দেশের সঙ্গে যেন নতুন করে পরিচয় হল—দেখতে শিখলাম নতুন চোখে। দেখলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সেই ছবির অজন্তা, গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের নাচ। কি ঐশ্বর্য, কি [illegible] লাবণ্য তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে। এই সময় মালাবারে কথাকলি নৃত্য দেখে মুগ্ধ হলাম—লক্ষ্য করলাম কথাকলিতে সুবিস্তৃর্ণ নাটকীয় সম্ভাবনা যা অন্যান্য নাচে বিরল। আমিই সর্বপ্রথম বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজে সাংবাদিক ও [illegible] কথাকলির উজ্জ্বল ও অন্তহীন সম্ভাবনার দিকে রসিকজনের দৃষ্টি ফেরালাম।'

একটা কথা দাদা, দিন-দিন জীবনের চালচলন, কথাবার্তার ধরনে আপনি ত পুরো পাক্কা যাকে বলে সাহেব' মানুষ—অথচ আপনার নাচ যখন দেখি একেবারে অন্য মানুষ — আপনিই যেন হাত ধরে নিয়ে যান আর এক জগতে—পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের যুগে। এই 'আধ্যাত্মিকতা' কি নিছক কল্পনা? কোনো বাস্তব আদর্শের স্পর্শ ছাড়াই অধ্যাত্ম-আবেদনের এমন প্রাণময়তা থাকা সম্ভব? —যেমন ধরুন আপনার ইন্দ্রনৃত্য। যা দেখে মন্টুদা (দিলীপ কুমার) বলেছিলেন—স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র যদি মর্তে এসে নাচতেন—তবে কি এরচেয়ে অপরূপ কিছু নাচতেন? কথাগুলো সঠিক মনে আমার মনে নেই। তবে বক্তব্যটা ছিল এই।'

'ধরেছ—। এই প্রসঙ্গে বলি ইউরোপে থেকেছি অনেকদিন। কিন্তু কি

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে
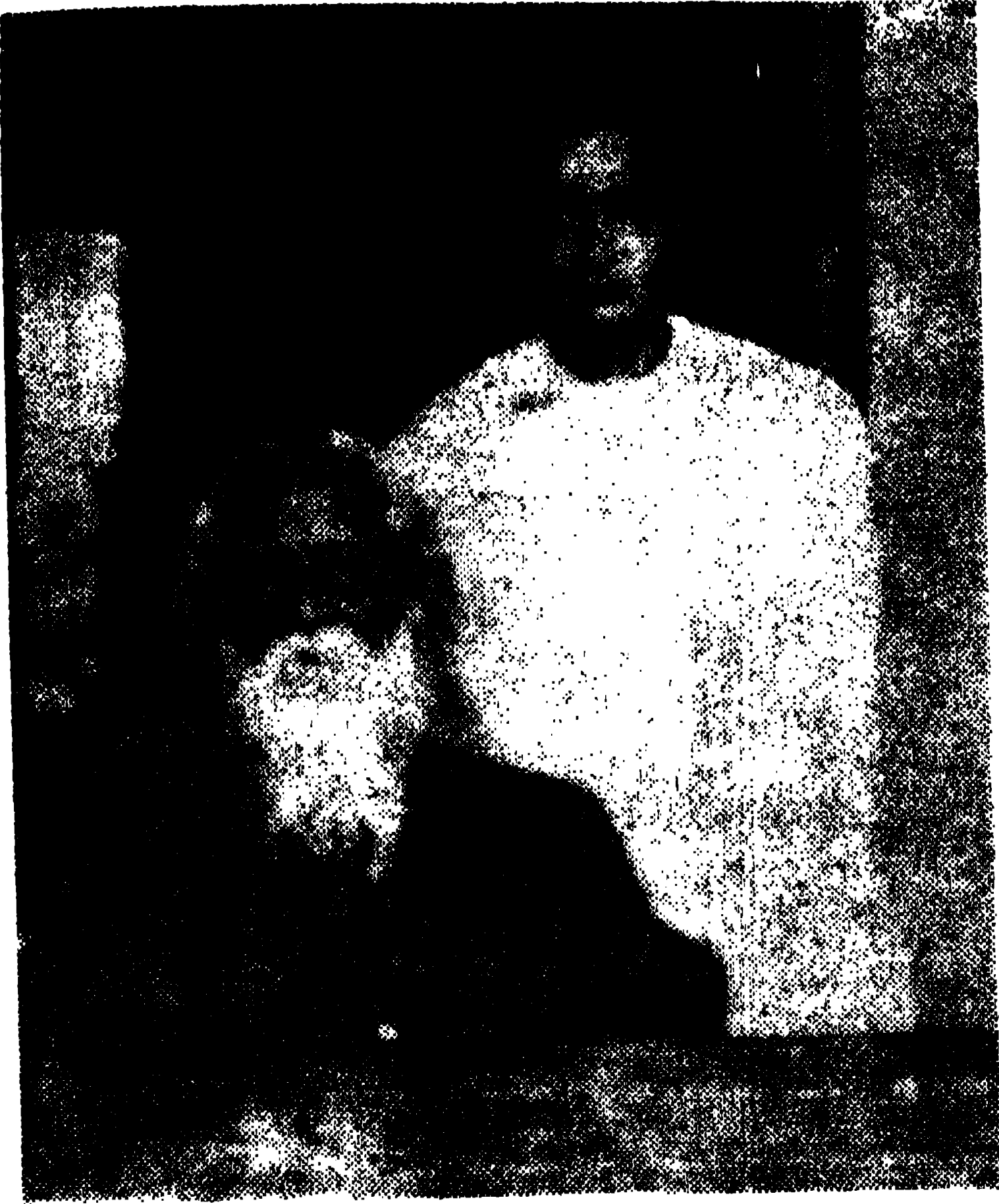
উচ্চাঙ্গ, কি লোকনৃত্য—ওদের কোনো নাচই আমি এতটুকুও গ্রহণ করিনি।

'ওদের কাছে নিয়েছি কি ? প্রচণ্ড কর্ম-প্রেরণা গঠন-শক্তি, ডিসিপ্লিন আর 'শো-ম্যানশিপ' —কেমন করে ঠিক কতটুকু দিলে একটা দশ মিনিট, পনেরো মিনিট বা পাঁচ মিনিটের নাচ দেখিয়েও দর্শককে ইম্প্রেস করা যায়।

'শুধু ইউরোপেই বা কেন, মালয়, রেঙ্গুন, ইন্দোনেশিয়া বা সিলন—কোথাও কোনো নাচ শিখিনি—এমন কি ভারতবর্ষেও না। আমার লোকনৃত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের লোকনৃত্যের কোনো মিল দেখতে পাবে না— অথচ এ নাচ খাঁটি ভারতীয়। পুরোপুরি আমার দেশের মাটির গন্ধ এতে পাওয়া যায়। বিকজ আই হ্যাভ এ্যাকসেপটেড দি লাইফ অফ ফোক— নট দি মনোটোনাস কনভেনশন।'

'কিন্তু ভারতীয় কলাশিল্প ত গুরুমুখী বিদ্যা। একেবারে কিছু না শিখলে—'

'সেই কথাতেই আসছি। একবার তাঞ্জোরের মহারাজার দরবারে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে সেখানে দেখি গুরু শংকরম নম্বুদরীকে। কথাকলি শিখি তাঁরই কাছে, কারণ না শিখে উপায় ছিল না—এমনই ছিল তাঁর দেবতার মত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। নম্বুদরদীকে যদি দেখতে সুধ্যা। ছাব্বিশ বছর ধরে মানুষটা শুধু বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পড়েছে। প্রতি স্তোত্র তার কণ্ঠস্থ শুধু নয়—এ নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাই প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান—মনের অতলে থিতিয়ে যেয়ে তাঁর চরিত্রে, ভাব, ব্যবহারে, এমন একটা শান্ত নম্র শুচিতা এনেছিল যে তাঁকে দেখলে মাথা আপনিই নত হয়ে যেত। আর কী রূপ! মনে হোতো তিনিই যেন ভগবান। কথাকলি-নৃত্য তাঁর ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তের উচ্ছ্বাস যেন।

গুরু নম্বুদরী আমার জন্য 'কার্তিকেয়' নাচ রচনা করলেন—পুরোপুরি কথাকলি আঙ্গিকেই। সেই আমার প্রথম গুরুর কাছে শেখা নাচ। যতদিন মঞ্চে নেচেছি, এ নাচ বাদ যায়নি।

'এমন গুরু পেয়েছি বলেই কথাকলি এমন করে আমায় আবিষ্ট করেছে। কথাকলি মানে ? গল্প-বলা। ভারতনাট্যমের চাউনি, কটাক্ষ, সূক্ষ্ম অঙ্গিক এখানে যেন আরো তীব্র, আরো ওজসদীপ্ত, আরো পৌরুষব্যঞ্জক। আমার ব্যালেতে দেখবে কথাকলির প্রভাবই বেশী যদিও কোমল শান্ত ভাবের প্রকাশে মণিপুরী ছোঁয়াও আছে কিছু কিছু। তবু বলব—কোনো আঙ্গিকের বন্ধনেই আমার নাচ বাঁধা নয়—সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত। যে কোনো রূপের আধারে যতক্ষণ খুশী আশ্রয় নিতে পারে—কিন্তু রূপের সঙ্গে চিরকাল ঘর করার কোনো দায়-দায়িত্ব তার নেই। যখন খুশী রূপান্তরে পাল্লা বদলের স্বাধীনতা তার আছে। তবে এই পালা বদলের গতিটি সৌন্দর্যঅভিমুখী হওয়া দরকার। অসুন্দর হলেই ছন্দপতন।

'এখন বুঝলে ত কেন আমার নাচে 'আধ্যাত্মিকতা' এত বাস্তব? এক নম্বর—রোথেনস্টেইনের বাণী 'ইণ্ডিয়া হ্যাজ এনার্জ অফ ইনট্রসপেকটিভ রিসোর্সেস ইন দি ফিল্ড অফ আর্ট।' দু নম্বর পাভলোভার সাবধান বাণী 'ইণ্ডিয়ান ডান্স ইজ স্পিরিচুয়াল'।

'তারপর শংকরম নম্বুদরীর অন্তর্মুখীন সাত্ত্বিক জীবন ও আদর্শ। তারও পরে জীবনে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আশীর্বাদও আমার নৃত্যজীবনের এক বিরাট প্রেরণা।'

'কি ভাবে?'

'ইউরোপ থেকে ফেরার পর গেলাম শান্তিনিকেতনে। গুরুদেব বললেন আমায়

একটা কিছু দেখাতে পার — যদিও নৃত্যের কোনো সরঞ্জামই এখানে নেই।'

'গুরুদেব স্বয়ং আমার নাচ দেখবেন? অ্যান্ড আই উইল ডান্স ফর সাচ এ গ্রেট পার্সন? সে রোমাঞ্চ আজও ভুলিনি। বললাম কিছু চাই না। চাই একগাছি পৈতে—(কারণ জাতি ব্রাহ্মণ হলেও পৈতেটা সব সময় থাকত না) আর ধুতি।

'উদয়নে নাচ হোলো। সে সন্ধ্যা কি ভোলার? গুরুদেব বসে, তাঁর শান্ত, সমাহিত ভঙ্গীতে। সামনে প্রকান্ড ঘটে রাখা একরাশ রজনীগন্ধা। ধূপ জ্বলছে। মুক্ত আকাশের নীচে অগণিত দর্শক। কোনো মিউজিক ছিল না। কিন্তু অনুভব করছিলাম — গাছের পাতার শব্দে, আকাশের তারায়, মুক্ত হাওয়ায় আর মাটির তলা থেকে অনুরণিত হচ্ছে—যেন অশ্রুত কলতান, তারই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাচলাম 'ইন্দ্রনৃত্য'। সারা প্রাঙ্গণে যাকে বলে 'পিনড্রপ' সাইলেন্স'।

'নাচ শেষ হোলো। কবিকে ইম্প্রেস করতে পেরেছি কি? ভয়ে ভয়ে তাকালাম। দেখলাম কবির দু-চোখ দিয়ে যেন আশীর্বাদ ঝরছে। আশ্রম ছাড়বার আগে কবি গুরুদেব একটি চিঠি দিয়েছিলেন।'

'চিঠিটি দেখলাম। কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি —একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রবাহ ছিল উদ্বেল। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতোপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে সে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি এই নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্বোধিত করে আনন্দের এই বাণীকে আবার একবার জাগিয়ে তুলেছ... পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে...এই প্রাণজীবনী নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে সমলতা থেকে রক্ষা করো।'......

'এদেশে এসে প্রথম পাবলিক পারফরমেন্সের অভিজ্ঞতা কি রকম?'

'দারুন। নিউ এম্পায়ারে গেট ভেঙেছিল টিকিট না পাওয়া নৃত্যদর্শন ব্যাকুল দর্শনার্থীদের করাঘাতে। সারা ভারতে তুমুল সাড়া জাগল। কিন্তু প্রথম প্রথম খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অখ্যাতিও কিছু কম পাই নি। বিরুদ্ধ সমালোচনাও কম শুনিনি। কেউ বললেন: এ নাচ চলবে না—এ ত ঠিক কথাকলি নয়, এ ত ঠিক মণিপুরী নয়। শিব ত ওভাবে নাচতে পারেন না। এ শাস্ত্রসম্মত শোভনসুন্দর পুরাণে এ নেই ও নেই ইত্যাদি। আমি বললাম— 'আমার শিব আমার কাছে থাক আপনাদের পুরাণের শিবকে পুরাণেই বন্দী রাখুন। আর ঠিক কথাকলি, কি ঠিক মণিপুরী তা আমি দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিই নি। আমার নাচ ভাবের অনুসারী, সে কোনো টেকনিকের দাসত্ব করবে না।

হরপার্বতী নৃত্যাম্পদ

'যাই হোক, এসব ক্রিটিসিজম বিরস বিরূপ সমালোচনা ক্রমশ মরে গেল। সারা দেশ যে আজ নাচের নেশায় মেতে উঠেছে এর মূলে কবিগুরুর সঙ্গে আমার আন্তরিক প্রচেষ্টাও যে যুক্ত হয়েছিল এ চিন্তাটাও আজ আনন্দের। কবি আমাকে বলেছিলেন, বাবা, সমালোচনা আমি অনেক শুনেছি। তুমিও শুনবে। কিন্তু তাতে নিরস্ত হলে চলবে না। তোমার প্রতিভা আছে সেই কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে তোমার সৃষ্টি কোনো অতীত যুগের অনুবৃত্তিতে বা প্রাদেশিক অভ্যস্ত সংস্কারে জড়িত হয়ে থাকবে না।'

যাই হোক আজ যখন অন্যের নাচে আমার ছায়া দেখি অবাক হয়ে যাই। কি করে এল? প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সবাই আমায় নিল ত? ভালবাসল ত আমার সৃষ্টিকে?

'তারপর তিমির এল আমার সঙ্গে। শচীন দেববর্মণ কৃষ্ণচন্দ্র দে বড় বড় সব গাইয়ে বাজিয়েরা আমায় সাহায্য করতে সানন্দে রাজী। সমস্ত ভারতীয় যন্ত্র ও সংগীত নিয়ে বিরাট অর্কেস্ট্রার পার্টি গড়া হোলো। গুরু আলাউদ্দিন, আলি আকবর, রবু সবাই এলেন।

দলবল নিয়ে দ্বিতীয়বার ইউরোপে গিয়ে প্রথম শো দিলাম প্যারিসে। সবচেয়ে অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ সাদা বাংলায় যাকে বলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। 'হাউস ফুল' ত বটেই। যাঁরা টিকিট পান নি তাঁদের জেদ 'উই ক্যান স্পেন্ড এনি অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর এ টিকেট অফ দি শো।'—এই রকম সাড়া ইউরোপে পেয়েছি, বিশেষ করে, জার্মানীতে। তাঁরা ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অনুবাদ পড়ে ভারতীয় দেবদেবীদের জানতেন চিনতেন আমার চেয়ে অনেক বেশী। তাই নাচের শেষে দেখতাম পুরুষ মানুষেরও চোখে জল।

'আনা পাভলোভার আনন্দ আর ধরে না। উচ্ছ্বসিত হয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'এ হবে আমি জানতাম'। সেদিন আনন্দে গৌরবে আমার চোখে জল এসেছিল এই ভেবে যে সৌভাগ্যসূত্রে আমি অগ্রবর্তী।

'আর আমাদের তবলা দেখে ওখানের মস্তবড় সংগীতশিল্পী হাইজিলার বলেছিলেন, 'এ কান্ট্রি দ্যাট ক্যান প্রোডিউস সাচ ড্রাম—দ্যাট কান্ট্রি ইজ ওয়াণ্ডারফুল।' পরে [illegible] এসে যোগ দিয়েছিলেন। এ-নাচে আকৃষ্ট হয়ে ইনি ভারতেও এসেছেন।

চোদ্দবার ইউরোপে গেছি, তিরিশ বছর ধরে ঘুরেছি সারা পৃথিবী। অনুভব করেছি ভারতের অন্তর্মুখীন অধ্যাত্মসম্পদই ওদের টানে—আর নৃত্য, সংগীত, শিল্প ও সংস্কৃতিতে সত্যিই 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

'প্রথম দীর্ঘ এগারো বছর বাদে যখন দেশে এসে শো দি সেদিনের কথা আজও ভুলিনি। সারা কোলকাতা তখন কি ছিল। দর্শকদের মধ্যে তখন সেরা মানুষদের সমাবেশ—থাকতেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ, দেশবন্ধুর মত মানুষরা।

'এরপর আলমোড়ায় সেন্টার খুললাম। ১৯৩৯এ। সেখানে শিক্ষা দিতেন শঙ্করম নম্বুদরী, গুরু আমোবা সিং, পিলাই, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মত গুরুরা। নৃত্য যেন চরিত্র গঠনের সহায়ক ধর্মবুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে জাগ্রত করে এইটেই ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমার কোর্সে এত শিক্ষার্থীর ভীড় যে জায়গা দেওয়া যেত না। শিখতে আসতেন বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পপতি। এক মস্তবড় ডাক্তার ফিরে যেয়ে আমার চিঠিতে লিখেছিলেন, 'দাদা, দিস ইজ ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ দ্যাট আই রিয়েলাইজড হোয়াট ইজ মাই জব'।—স্বপ্ন সফল হবার মুখেই সেন্টারটি তুলে দিতে হোলো। যুদ্ধ লাগল ফুড সাপ্লাই ইত্যাদির অসুবিধার কারণে।

'ভারতের এই ধ্যানমুখীনতা ইউরোপ কত শ্রদ্ধা করে বুঝতে পারবে একটি ঘটনায়। ও দেশের মস্তবড় নাট্যকার মাইকেল শেকভ একবার তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আমার নাচ দেখতে এলেন। নাচের পর তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগল? কেউ বলল, 'ওয়াণ্ডারফুল', কেউ বলল 'আনথিঙ্কেবল্' ইত্যাদি সবার শেষে শেখভ বললেন—'আমি অবাক হয়েছি কি দেখে জান? ঐ যে গজাসুর বধ নৃত্যে অসুর ও দেবীর অমন যে তাণ্ডবলীলা চলছে তার মধ্যে মহাদেব কেমন করে বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন? দি গ্রেটেস্ট পার্ট অফ দি হোল থিং দি হাইয়েস্ট পিচ অফ দি ড্রামা ওয়াজ দেয়ার।

'আলমোড়ার কেন্দ্র উঠে গেলেও আমি কখনও থেমে থাকিনি। কারণ থামতে পারি নি। আমার মনটা সব সময় চায় নতুন নতুন আরও নতুন সৃষ্টি।

কথাকলি নৃত্যের একটি বিশেষ মুদ্রা
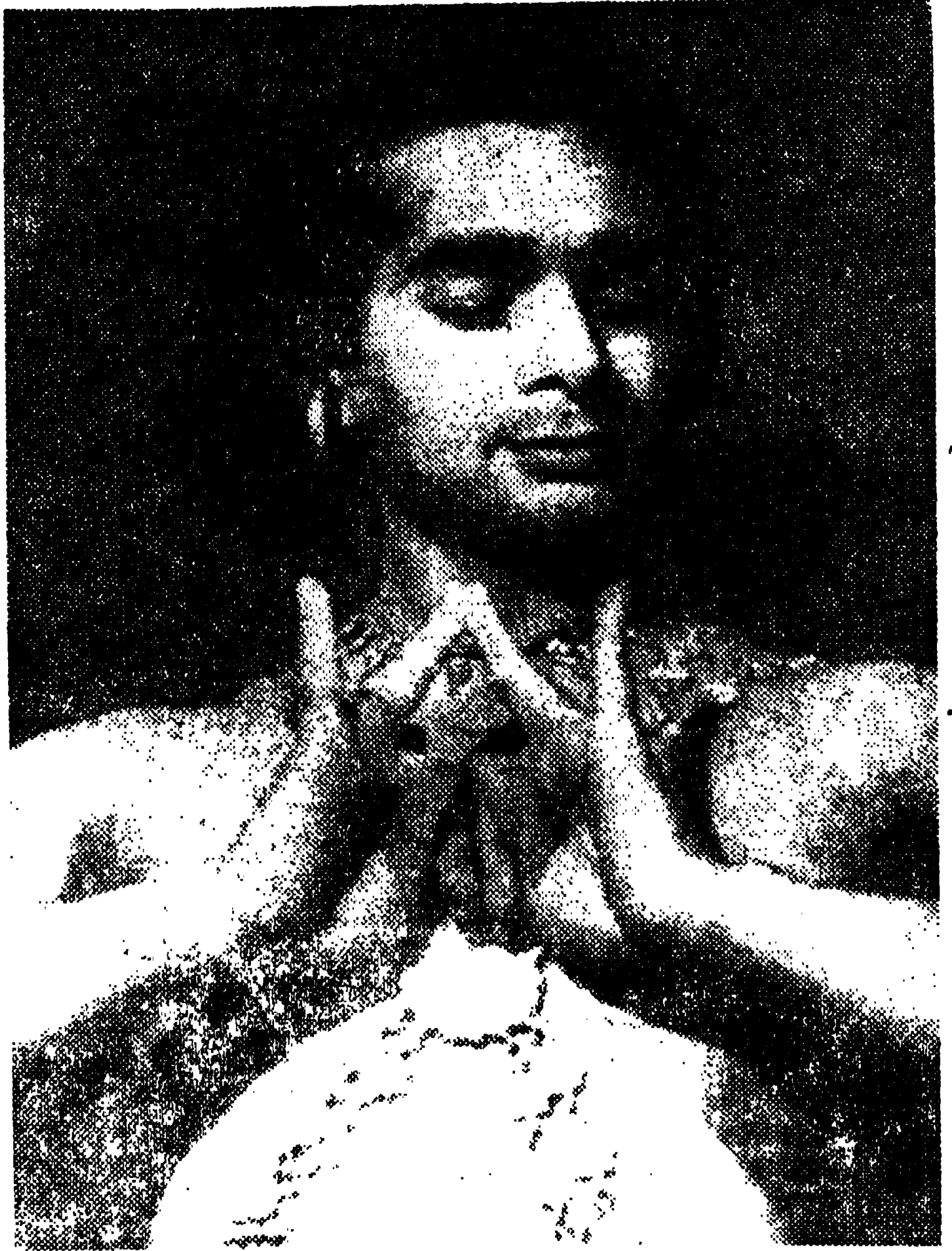
'সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল 'কল্পনা' ও-দেশে অনেকে তিরিশবারও দেখেছেন।

'এরপর ছায়ানৃত্যে, 'রামলীলা'—তারপর রঙিন ছায়ানৃত্যে 'রিনান্সিয়েশন অফ বুদ্ধ' তারপর স্যাডো, স্টেজ ও অডিটোরিয়াম কম্বাইন করে 'সামান্য ক্ষতি'—পরে 'প্রকৃতি আনন্দ'।

'এখন অমলা যা করছে তার স্কুলে তাও আমার নৃত্যচিন্তাকেই ছড়িয়ে দিতে।

আমার সাম্প্রতিক সৃষ্টি 'শঙ্করস্কোপ'-কে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। বলেছেন শঙ্কর চীপ হয়ে গেছে, কমার্শিয়াল হয়ে গেছে। কিন্তু এটা কেউ বুঝতে চাইলেন না—আমাদের দেশে এটা কতবড় দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। যাঁদের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছি—স্টেজ, স্ক্রীন কম্বিনেশনের ব্যাপার শুনে সবাই ভেবেছেন বুড়ো বয়সে শঙ্করের মাথাখারাপ হয়েছে। রঞ্জিতমল অর্থ সাহায্য না করলে যা করেছি তাও সম্ভব হোতো না। কিন্তু এর মধ্যে কত বড় সম্ভাবনা আছে সেটা যেন রসিক, বিদগ্ধ সমাজ ভেবে দেখেন। ভবিষ্যতে উপযুক্ত অর্থসাহায্য পেলে এ নিয়ে ফুল লেংথ ডান্স ড্রামা হতে পারে। এতে রামায়ণ, মহাভারত বেদ পুরাণের নৃত্যনাট্য হতে পারে, নন্দনতত্ত্বের যে কোনো দিকের শিল্পসম্মত প্রতিফলনের অন্তহীন অবকাশ এই শঙ্করস্কোপে।

'তাছাড়া এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতার ফসল। এরপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নানান দিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করে আরো কম খরচে হতে পারে অনেক বড়, অনেক গভীর বস্তু।

দুঃখ বাজে ভাবতে 'কল্পনা'কে ব্যাকগ্রাউণ্ডে রেখে প্রকৃতি-আনন্দ থেকে সব যুগকে ছুঁয়েছি, আধুনিক যুগের টুইস্টও বাদ যায় নি এই শঙ্করস্কোপে। আমি জীবনরস রসিক। জীবনকে বাদ দিয়ে অবাস্তব আর্টে বিশ্বাসী নই। বাস্তবতা থাকবে। আবার তাকে উত্তরণের মহৎ প্রয়াসও থাকবে। দুটোর একটাকেও বাদ দেওয়া যায় না।

যদি সুযোগ পাই এই শঙ্করস্কোপ দিয়ে কি করা যায় দেখাবার বাসনা আছে। যদি না পাই এইটুকু সান্ত্বনাই রইল নতুন একটা কিছু করলাম ত যা এদেশে কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।
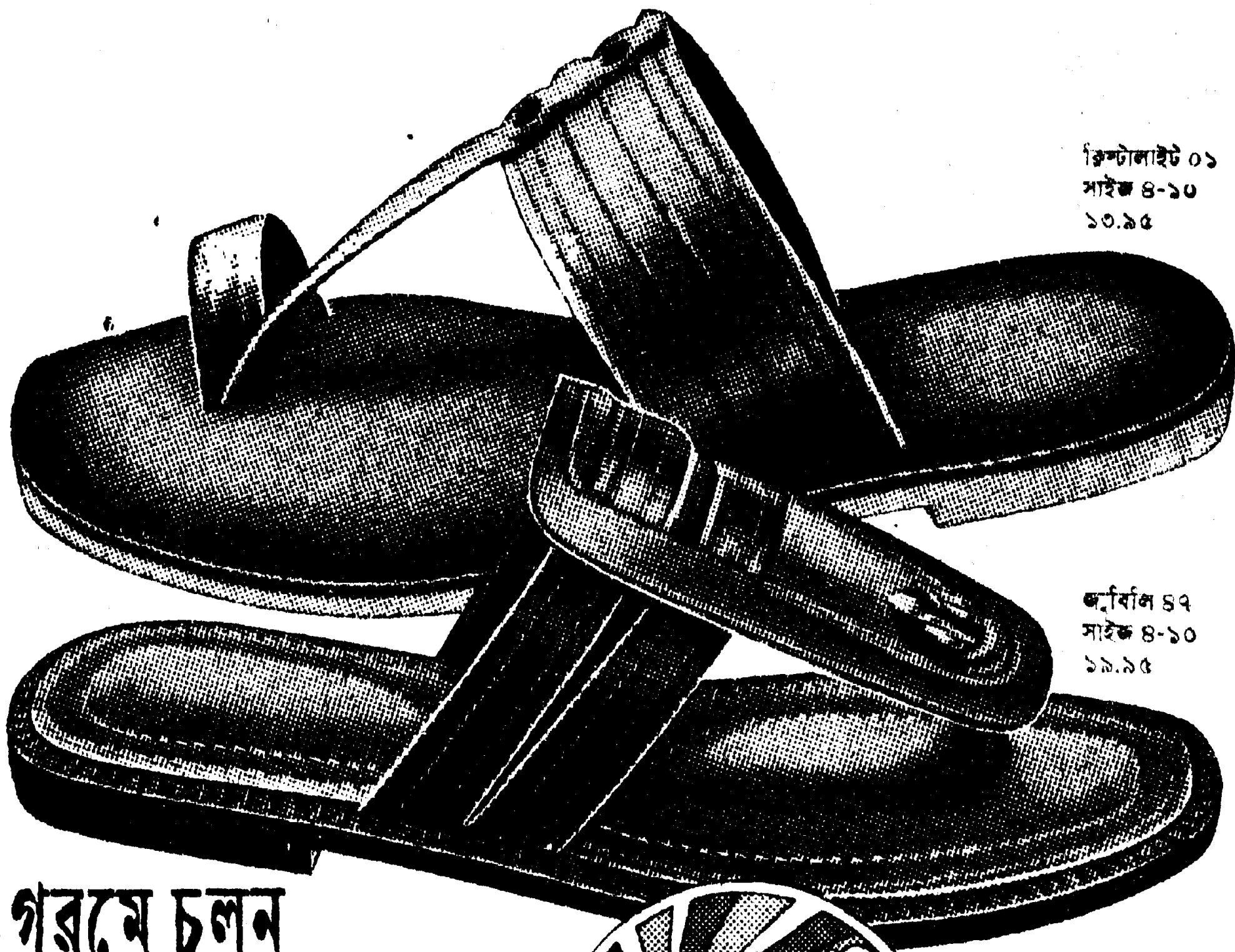
গঙ্গামাঈ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
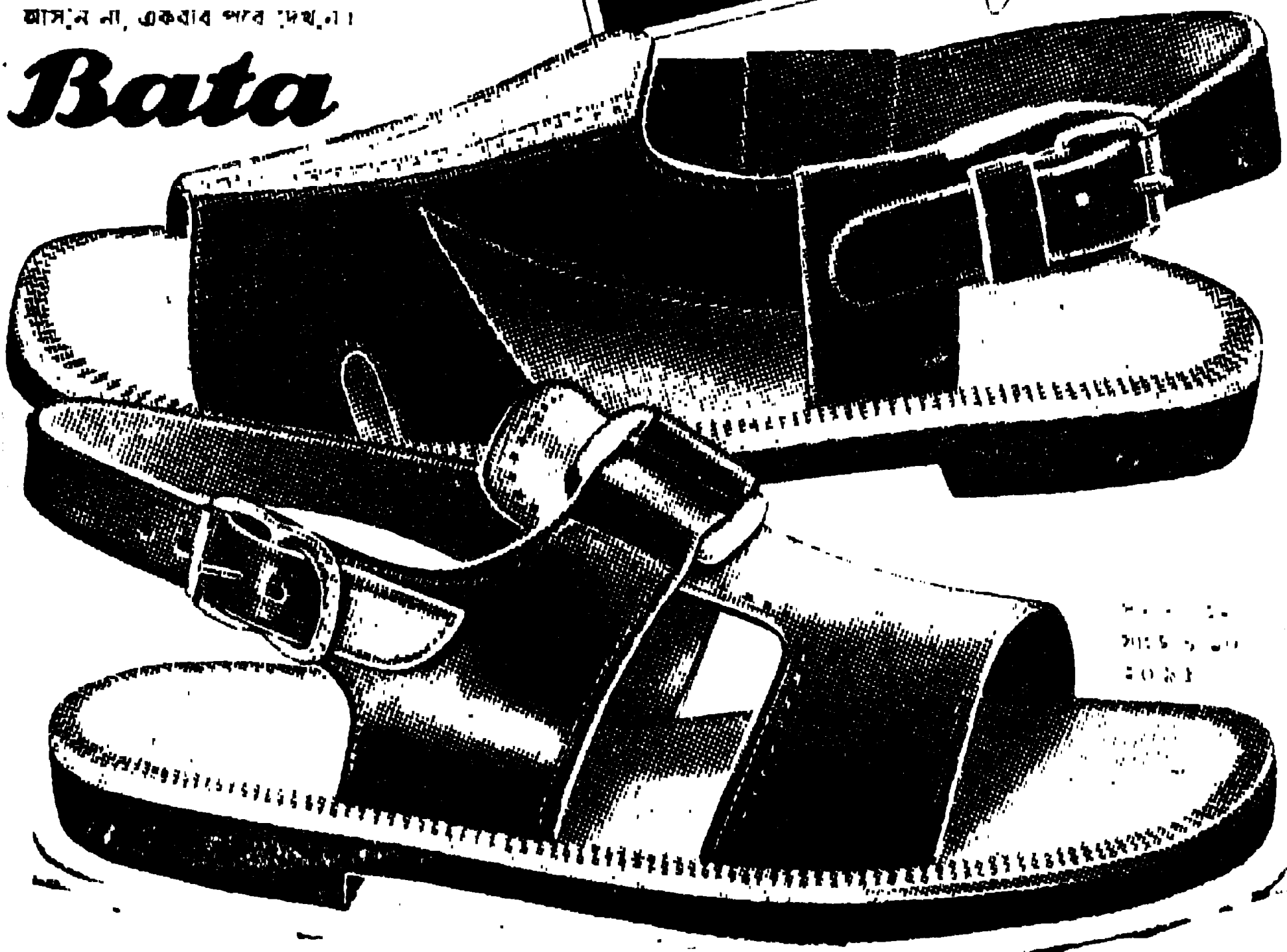
বাড়ি থেকে কলকাতায় আসছি।

মাঝে গঙ্গার নূতন পুল। তার আগে পুরাতন সিমারিয়াঘাটের নামটা বজায় রেখে একটা ছোট স্টেশন। তবে একটু গুরুত্ব আছে, প্রায় সব গাড়িই দাঁড়ায়। পুরানো সিমারিয়াঘাট গিয়ে এখন এইটেই পালে-পার্বণে সিসিলার লোকেদের গঙ্গা-স্নানের ঘাটি।

কার্তিক মাস। এই সময় আবার কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত কল্পবাসের প্রথা চলে আসছে। গঙ্গার তীরে বহু খড়ের ছাউনি পড়ে, যাত্রীসমাগম হয়, দোকানপাট বসে, মেলা লেগে যায়। পূর্ণিমার পর থেকে আবার সব আস্তে আস্তে গুটিয়ে আসতে থাকে।

ফার্স্ট ক্লাসে রয়েছি। আমার দখলে নীচের গোটা একটা বার্থ। সামনের বাংকটায় একটি বৃদ্ধ প্রায় আগাগোড়া একটা মোটা এণ্ডির র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন; তাঁর মাথার শিয়রে একজন যুবা পা ঝুলিয়ে বসে একটা বই পড়ছে; এদিক থেকে মনে হোল কোন হিন্দী নভেল।

তারই মধ্যে এক একবার বৃদ্ধের মাথায় একটু করে হাত বুলিয়েও দিচ্ছে। বার দুই তিন ঝুঁকে প্রশ্নও করল বৃদ্ধ আছেন কেমন। ক্ষীণ কণ্ঠে কি উত্তর হোল বোঝা গেল না।

এ-প্রান্তে, বিশেষ করে বারৌনীর এই এলাকাটাতে ডেমোক্রেসীর ধাক্কাটা বেশ প্রবল, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর প্রভেদ থাকে না। তবে, খানিক আগে গাড়ি থামিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট-চেকিং হয়ে গেছে, আমাদের গাড়িটা মুক্ত। নিশ্চয় সমস্ত ট্রেনটাই যা নাকি ছাত পর্যন্ত বোঝাই ছিল। বেশ হালকা গতিতেই চলেছে গাড়িটা। আমি একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পড়ছি। তারই ফাঁকে কয়েকবার ওদিকে দৃষ্টি পড়ায় মনে হোল ছেলেটি যেন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আমায় লক্ষ্য করছিল, চোখোচোখি হতে মুখটা বইয়ের আড়াল করে নিল।

কৌতূহল হতে একবার প্রশ্ন করলাম —'আমায় কিছু বলবে?'

হঠাৎ প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল—'আজ্ঞে না...তেমন কিছু...'

'কোথায় যাচ্ছ? উনি তোমার কে?'—প্রশ্ন করলাম আমি।

ছোকরা মৈথিল; ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ যাই হোক। চেহারায় মৈথিলী একটা কমনীয়তা রয়েছে। আন্দাজে মৈথিলীতে প্রশ্ন করায় মৈথিলীতেই জবাব দিল।

জানাল, যিনি শুয়ে রয়েছেন তিনি ও শ্বশুর। অসুস্থ, বয়সও বেশ হয়েছে তিয়াত্তর চলছে এখন, এর ওপর ঝোঁ ধরেছেন গঙ্গায় কল্পবাস করবেন। বিপদ তো এ-অবস্থায়, কার্তিকের নূতন শী গঙ্গার তীরে কল্পবাস করলে সে-ব উঠিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সম্ভাব খুবই কম। বাড়ির সবাই টের বোঝা কিন্তু জমিদার মানুষ—জমিদারী থাকলেও মেজাজটা তো আছে -মন ফের কার সাধ্য। সন্তানের মধ্যে একটি মে ছোকরার পরিবার, আর একটি নাবা ছেলে, বছর তের চোদ্দ বয়েস, গ্রা স্কুলে পড়ে। একে নাবালক, তায় চালাক চতুরও নয় যে বাপের পাশে কাজ-কর্ম, বিষয়-সম্পত্তি আস্তে আ বুঝে নেবে। এ-অবস্থায় ছোকরা পড়াশুনা ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি একর আটকে থাকতে হয়েছে। বিশেষ করে বছর তিনেক থেকে। হায়ার সেকেণ্ড পাস করে পার্ট ওয়ান শুরু করেছিল।

বেশ চলছিল, তারপর এই বে 'আমায় নিয়ে চলো। আমার বাঁচা আর তবু যদি গঙ্গা-মাঈয়ের একটু দয়া প

১৬২

কথাটা বলে ছোকরা আমার মুখের পানে একটু চাইল।

কারণটা ঠিক বুঝতে না পেরে আমি বললাম—'তুমিই যখন সব দেখাশোনা করছ, নিশ্চয় তুমি একটু কড়া হয়ে থাকলে...'

'আমি! আমায় তো কতরকম প্রলোভন. —এই তালুক লিখে দোব—অমুক পুকুরটা...'

—বলেই ছোকরা হঠাৎ মুখটা নামিয়ে ডাকল—'বাবুজী!'

খুব ক্ষীণ একটা আওয়াজ হতে আস্তে আস্তে মাথায় করাঘাত করে বলল —'না, ঘুমুচ্ছেন, ঘুমোন, এখনও দেরি আছে।'

এর পরেই একেবারে চুপ করে গেল। সম্পূর্ণ ভাবান্তর। বেশ অন্যমনস্ক হয়ে একটু বাইরের দিকে চেয়ে রইল। এর পর দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ভেতরে আনতে গিয়ে আমার মুখের ওপর পড়ে যাওয়ায় একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে আবার তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। কাগজটা আড়াল করে দিয়ে অপাঙ্গে লক্ষ্য করলাম যেন কোন একটা দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে কঠিন সংকল্পে মুখের রেখাপুঞ্জ শক্ত হয়ে উঠেছে। মনে হোল, গড়গড় করে এক-নিশ্বাসে বেশ খানিকটা ঐভাবে, বকে গিয়ে হঠাৎ যেমন থেমে গেল, যেন আরও কিছু আছে পেটে, অস্বস্তি বোধ করছে।

কৌতূহলটা বেশ উদ্রিক্ত করে দিয়েছে। আর একবার চোখোচোখি হতে আবার একটু উসকে দিতে যাব, তার আগেই, যেন সমস্ত মনোবল একত্র করে নিয়ে নিজেই একটু কাচুমাচু হয়ে বলল—'বাবুজী, একটা প্রশ্ন, যদি বেয়াদপি না মনে করেন।'

উত্তেজনায় পাদুটো ঘন ঘন দোলাচ্ছে। বললাম—'করো না, একটা প্রশ্ন করবে তাতে বেয়াদপির কি আছে?'

'জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি কি কিল?'

একটু হতচকিতই হয়ে গেলাম ভেতরে ভতরে, আমার সাতপুরুষে কেউ উকিল য়নি। তবে, কৌতূহলটা খুবই জেগে ঠেছে, এই পথেই ভেতরকার রহস্যটা রিয়ে আসতে পারে আন্দাজ করে মনের বটা চেপে একটু আধা-স্বীকৃতির হাসি সে বললাম—'তুমি কি করে বুঝতে রলে?'

কৃতকৃতার্থ হয়ে পায়ের দোলানিটা ড়য়ে দিয়ে বলল—'মামলা-মোকদ্দমা য়েই কাটে, শ্বশুরের বিষয়সম্পত্তি সব মাকেই তদ্বির করাতে হচ্ছে তো, উকিল ন নিতে দেরি হয় না। ...তাহলে একটা া বাবুজী, ঘাটটা একটু পরেই এসে বে। আহা-হা, আর একটু আগে যদি চয়টা হোত! তা, এখনও আছে সময়।'

উকিল না হই, জামাই, মৃতকল্প াযাত্রী শ্বশুর—সমস্ত পরিবেশটা একত্র কী একটা অস্পষ্ট সন্দেহ যেন উঁকি-কি দিচ্ছে সবে। বললাম—'বলো, অল্প কথাতেই বুঝে নিতে পারব, এই কাজই তো করছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ তা পারবেন বৈকি। তায় বাঙালী উকিল, উকিলের জাতই আপনারা ...তাহলে—'

চনমনে হয়ে উঠেছে। একবার মুখটা ঝুঁকিয়ে ডাকল—'বাবুজী, ঘুমুচ্ছেন?'

উত্তর না পেলেও আস্তে আস্তে মাথায় একটু করাঘাত করে সন্তর্পণে উঠে এসে আমার পায়ের কাছটায় বসল, আমিও পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। গাড়ির আওয়াজ রয়েছে, তবু মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে নিম্নস্বরেই আরম্ভ করল—একবার ওদিকটা দেখেও নিয়ে—

'আপনি ঐ যে বললেন উকিলসাহেব, দেখাশোনা আমিই করছি, একটু কড়া হলে কি আটকাতে পারতাম না? তা হয়তো পারতাম—অন্তত টিকিট না কিনলে তো হেঁটে আসতে পারতেন না। তারপর ভাবলাম, উপযুক্ত ছেলে নেই, আমার ওপরই নির্ভর, অন্যদিকেও তো আমার একটা কর্তব্য আছে। বয়েস হয়েছে, গঙ্গা-মাঈয়ের টান ধরেছে, উচিত কি আমার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো ক্ষমতা আছে বলেই?'

আমার মুখের দিকে বেশ স্পষ্ট দৃষ্টিতে চাইল, যেন অন্তঃস্তলের ভেদ করবার চেষ্টা করছে।

হাসি ভেতরে গুড়গুড়িয়ে উঠছে, অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে ওর বক্তব্যটাই একটু সরস করে দিয়ে বললাম—'আর ফিরেই যে যাবেন না তীর্থ করে তাই বা কে বলতে পারে?'

একটু যেন কি রকম হয়ে যেতে তখনই দক্ষ উকিলের মতো জুড়ে দিলাম—'তবে, সেরকম দেখছি ওঁকে—তায় কার্তিক মাস, গঙ্গার তীর...'

মুখটা আবার দীপ্ত হয়ে আসছিল, তারই ওপর চেষ্টা করে একটা বিষাদের ছায়া টেনে এনে বলল—'আজ্ঞে, সে কথাও বইকি, যতই না কেন অমঙ্গুলে হোক, গেরস্তকে ভাবতেই হয়; তুলসীদাসই তো বলে গেছেন—

শুনহু ভরত, ভাবী প্রবল, বিলপি কহে
রঘুনাথ,
হানিলাভ, জীবনমরণ, যশ অপযশ
বিধিহাত

কথাটা কাটতে পারা যায়, বলুন?'

'পারা যায় কখন? মহাপুরুষের কথা।' —উত্তর করলাম—'তাই বলছিলাম......এই দেখুন, কী যে বলতে যাচ্ছিলাম ভুলে ভুলে যাচ্ছি...কর্তার এরকম অবস্থা, মনটা নিজের জায়গায় নেই তো। ...হ্যাঁ, এই যে হয়েছে, ভালোমন্দ কিছু হওয়ার আগে, একটু কিছু লিখিয়ে টিখিয়ে নেওয়া ঠিক হয় না—এই উইল-টুইল ধরনের—দানপত্র...?'

সমর্থনের আশা নিয়ে মুখের দিকে চাইল, একটু কাতর দৃষ্টিতেই।

বললাম—'বিষয়ী লোক, যাদের বেঁচে থাকতে হবে, ভাবতে হয় বৈকি তাদের'—বিচক্ষণ উকিলের মতোই অভিমত দিলাম।

পা দোলানো ছায়া কাঁপতে শুরু করছে; বলে চলল—'বেশি নয়, অর্ধেকটা লিখে দিন, আমার সব তহসিল দেখা আছে, আমিই সব দেখছি-শুনছি, পর নয় নিজের জামাই...'

'আর আজকাল মেয়েদের অধিকারও তো স্বীকার করছে কোডে।' —উকিলের সলা দিলাম।

'আর একটা কথা, যতদিন ছেলে না সাবালক হচ্ছে জামাই-ই থাকবে গার্জেন—ম্যানেজার...'

'ওঁরই তো লাভ, নিশ্চিন্দি হয়ে চোখ বুঝতে পারবেন...' —সায় দিলাম।

'তাহলে একটা অনুরোধ উকিলবাবু, গঙ্গামাঈ যখন পাইয়ে দিয়েছেন আপনাকে। কত ফী আপনার?...যতই হোক হাজির আছি—দু' তিনটে দিন আপনাকে নেমে কাটিয়ে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—উকিল সাক্ষী, উকিলের হাতের মুসাবিদা।—এদিকে গঙ্গার তীর—এ সুবিধে আমি ছাড়ব না... আর, আপনার যাতে কোন কষ্ট না হয়...'

হঠাৎ বুকটা ছাঁৎ করে উঠল, হালকা-রহস্যের মধ্যে দিয়ে একি এক ফাঁদের মধ্যে পা গলিয়ে দিয়ে বসেছি!

আরও আবেগভরে হাতটা চেপে ধরে মুখের পানে চেয়ে আছে, কাঁপচে, পা দুটো ঘন ঘন দুলছে। মুখটা শান্ত করে নিয়ে বললাম—'এখন নামা তো মোটেই সম্ভব নয়—এত তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাওয়া ঠিকও নয়—আমি ঘুরে আসছি শীগগির—কিরকম থাকেন না থাকেন সেটাও দেখতে হবে। আবার লিখিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থা...বুঝলে না?'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলাম মুখের দিকে। বলল—'আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি বৈকি। তাহলে কতদিনে ফিরছেন?...এই আমার আর কর্তার নাম লিখে দিচ্ছি, খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। বড় ক্যাম্প আমাদের।'

গাড়ির গতিবেগ কমে এসেছে। পকেট থেকে একটা পকেট বুক ছিঁড়ে ফাউণ্টেন-পেন দিয়ে কম্পিত হস্তে নামধাম লিখে হাতে দিয়ে প্রশ্ন করল—'তাহলে কবে?'

বললাম—'সপ্তাহখানেক লাগবে আমার।'

'মনে রাখবেন দয়া করে। ফী ডবল চান, রাজী।'

গাড়ি থামতে চারজন বেয়ারা একটা খোলা পালকি এনে নামাল ফার্স্ট ক্লাসের সামনে, সঙ্গে আরও দুজন পেয়াদা— —কারকুন গোছের লোক। সবাই ধরাধরি করে বৃদ্ধকে নামিয়ে গদিপাতা পালকিটাতে শোওয়াল। ইতিমধ্যে পাশের সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে দুজন মহিলা নেমে দাঁড়িয়েছেন, সঙ্গে একটি তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে। মহিলাদের মধ্যে একজন বেশ বর্ষীয়সী, অপরটি যুবতী—নিশ্চয় শাশুড়ী আর বধূ যুবকের, ছেলেটি নাবালক শ্যালক।

যাওয়ার সময় যুবক হাত তুলে নমস্কার করে বলল—'তাহলে মনে রাখবেন উকিল...ইয়ে...বাবুসায়েব।'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়, ভুলতে পারি?...আমি না আসা পর্যন্ত কিছু কোর না।'—যেমন হন্যে হয়ে আছে, শেষে এটুকু জুড়ে দিলাম। কথার মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ভুলেই গিয়েছিলাম, পথের বিস্মৃতির মধ্যে এ কৌতুকাভিনয়ও কবে মিলিয়ে গিয়েছিল, ফিরছিলামও প্রায় তিন সপ্তাহ পরে।

সিমারিয়া ঘাটে গাড়ি থামতে আবার সেই খোলা পাল্কি, আর যেন সেই দলই। স্মৃতিটা একটু সচেতন হয়ে উঠতে কিন্তু একটু দ্বিধায় পড়ে যেতে হোল—এঁকেই কি সেদিন এণ্ডির চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম!...বেশ সুপুষ্ট শরীর, টকটক করছে রং, শুভ্র কেশের মাঝখানে গেরো-দেওয়া সুপুষ্ট শিখা—পরনে গোলাপী রঙে ছোবানো মৈথিল ধরনে ত্রিকোচা করে পরা ধুতি, গায়ে এণ্ডির চাদর। একজন আদর্শ মৈথিল অভিজাত শ্রেণীর পুরুষ। মনে হোল সদ্য স্নান করে এসেছেন। হেঁটেই এসেছেন।

তারপরেই পাল্কির দিকে দৃষ্টি গেল, ততক্ষণে আরোহীকে তুলেও নিয়ে এসেছে। এবার সবাই প্রথম শ্রেণীতেই উঠেছে।

সেই যুবকই তো, কিন্তু এ কী হাল? বেশ শীর্ণ হয়ে গেছে, তার চেয়েও বেশি যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। আমার দিকে নজর পড়তে যেন স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার মতো করে একটু পিটপিট করে চাইল, তারপর তাকে সামনের বার্থে শুইয়ে দেওয়া হোল।

একটু বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। বৃদ্ধ গোছগাছ করে নিয়ে বসে যেন কিছু মন্ত্র আওড়ালেন, যা হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। পাশেই বসেছেন, শেষ হলে বললাম—'একটা প্রশ্ন, সেদিন—এই প্রায় সপ্তাহ-তিনেক হোল—আপনারাই কি এখানে এসেছিলেন—কল্পলোকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—একটু কৌতূহলের দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—'আপনিও যেন ছিলেন মনে হচ্ছে—আমার শরীর এমন খারাপ। তবু যেন...'

বললাম—'হ্যাঁ, ছিলাম।...কিন্তু...'

'বুঝেছি যা বলবেন। সেদিন আমি ছিলাম পড়ে, আজ সেই জায়গায় ও পড়ে। আমার জামাই। আশ্চর্য ব্যাপার—গঙ্গার হাওয়া লেগে আমি যেমন এদিকে হু-হু করে সেরে উঠছি—দেখতেই পাচ্ছেন চেহারা—ও তেমনি সেই হাওয়া লেগেই যেন ক্রমেই কাহিল হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমার সঙ্গে বৈদ্য রয়েছে, সে বলছে, কিছুই হয়নি। হাওয়াটা লাগবে আশা করে দিনকতক দেখলাম—এদিকে আমি যতই ফুলে উঠছি ও যেন ততই শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষে বারৌনী থেকে ভালো ডাক্তারও আনিয়ে দেখালাম—ঐ একই কথা, রোগ কিছুই নেই। হার মেনে এই নিয়ে যাচ্ছি। গাঁয়ে ভালো জ্যোতিষ পণ্ডিত আছে, একটু ভালো করে গণনা করাব...'

চুপ করে গিয়ে হঠাৎ মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—'আপনি কি করেন।'

যুবকটি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল, মনে হোল যেন একটু নড়ে উঠল। উত্তর করলাম—'জেলা কোর্টে, ওকালতি করি।'

'বেশ, বেশ। এই জন্যে জিজ্ঞেস করছিলাম—বাঙালীরা একটা পেশা নিয়ে থাকেন, কিন্তু আবার অনেক রকম বিদ্যা আয়ত্ত করে নেন সঙ্গে সঙ্গে, শখের। আছে নাকি কিছু করকোষ্ঠী বিচার জানা?'

একটু হেসে বললাম—'আছে কিছু কিছু, এক্ষেত্রে লক্ষণ দেখেই বুঝে নিতে পেরেছি। চিন্তার কিছু নেই আপনার। গিয়ে দেখবেন আবার কাজকর্ম করতে করতে যেমনকে তেমনি হয়ে উঠবেন। কী জানেন, গঙ্গামাঈয়ের মর্জি, তাঁর হাওয়াটা সবাইকে সমানভাবে লাগে না।'

—এবার যুবক, মনে হোল একটু ঘুরে চাইতে গিয়ে আবার ভালো করে পাশ ফিরে গুটিশুটি মেরে শুল।

আমার একবার বারৌনীতেই দরকার। গাড়ি থেমেছে 'কিছু ভাববেন না।'—বলে আর একটা আশ্বাস দিয়ে নমস্কার করে নেমে গেলাম।

মুখের রেখায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রথম দর্শনেই আঁতকে উঠলাম। গলা কাঠ, জিভ শুকনো। বুকের তলার ধুকপুকুনিও যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে রইল। সকালের শুরুটাই ভিতরে একটা অশুভ দাগ কেটে দিল।

...বড় রাস্তার একেবারে মাঝখানে লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে দুই দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে মাথার ওপর খোলা আকাশ দেখছে। প্রায় নিজের অগোচরে ঘাড় উঁচিয়ে ওপরের দিকে তাকালাম একবার। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরের তপ্ত সূর্য একরাশ আলোর হুল ফুটিয়ে গোটা মাথাটাকেই মাটির দিকে নামিয়ে দিল। সকাল সবে সাতটা এখন। এরই মধ্যে বৈশাখের সূর্য তেতে উঠেছে।

...কিন্তু লোকটা নিষ্পলক চেয়েই আছে। তপ্ত অগ্নিপিন্ড উপেক্ষা করে আধা বিস্ময়ে নীল আকাশ দেখছে। হাত-পাঁচেক ফারাকে কম করে পঞ্চাশ-ষাটজন মানুষের একটা ঘন বৃত্ত তৈরি হয়েছে তাকে ঘিরে। তারাও দৃশ্যটা দেখছে, কেউ কেউ অস্ফুট মন্তব্যও করছে। প্রশস্ত ব্যস্তসমস্ত রাজপথে যানবাহন চলাচল একেবারে ব্যাহত হয়নি তাবলে। বৃত্তটার কাছাকাছি এসে সেগুলোর গতি কমছে, ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়ে সেগুলো পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, আরোহীরা ঘাড় ফিরিয়ে জটলার কারণ অনুমান করতে করতে চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য, লোকটা জীবিত নয়, মৃত। একমাত্র পাগল ভিন্ন কোনো জীবিত মানুষ বড় রাস্তার মাঝখানে এভাবে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে পারে না। আর পাগলেও আর কিছু না হোক সূর্য তুচ্ছ করে অমন পরিষ্কারভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না।

অথচ আশ্চর্য, জন-বৃত্তের যেদিকে দাঁড়িয়ে দেখছি আমি সেখান থেকে অন্তত লোকটাকে একবারও মৃত বলে মনে হয় না। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েই আছে মনে হয়। পরনের আধা মলিন জামা-কাপড়ও তেমন বিস্রস্ত নয়। প্রাক-মৃত্যুর কোনরকম ধস্তাধস্তির লক্ষণ নেই। এদিক থেকে ছোট-বড় কোনো জখমও চোখে পড়ছে না। শুধু মনে হয় দুনিয়া দেখা শেষ করে এখন আধা বিস্ময়ে আকাশটাকে দেখে নিচ্ছে শুধু। হাতদুটো দু'পাশে চিৎ করে ছড়ানো, পা-দুটো অল্প ফাঁক। শিথিল শয়ন-ভঙ্গিটা সব মিলিয়ে আয়েস করে শোয়ার মতো।

জন-বৃত্তের উল্টোদিকের কৌতূহলী পর্যবেক্ষণ আর মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকটার ওদিকের ঘাড়ের নীচে মৃত্যুজনিত ক্ষত একটা আছে। ওদিকের মাটিতে খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে, সে-কথাও কানে এসেছে। কিন্তু ভরসা করে ও-দিকটায় যেতে পারছি না। যেটুকু দেখছি, তাইতেই স্নায়ু স্তব্ধ।...তাছাড়া মৃত্যুর এই অটুট গম্ভীর বিস্ময়ের রূপের সঙ্গে কোনোরকম বীভৎস দৃশ্যের যোগ যেন কাম্য নয়।

ওই দার্শনিক বিস্ময়ের ব্যাঘাত যারা ঘটাচ্ছে তারা পুলিসের লোক। আমি অবশ্য তাদেরই একটা গাড়িতে এখানে এসেছি। এদিককার ভারপ্রাপ্ত ও. সি-টি সম্পর্কে আমার ভাগ্নে। সম্পর্কটা একেবারে সাক্ষাৎ নয়, দূরের। কিন্তু আত্মীয়তার থেকে হৃদ্যতার দিকটা বড়। বয়সে আমার থেকে বছর দুই মাত্র ছোট। এক কলেজে উঁচু-নীচু

ক্লাসে পড়েছে, এক হস্টেলে থেকেছি। তখন ভাগ্নের দিবারাত্র বিলিতি ডিটেকটিভ বই পড়ার একমাত্র ফল দেখছি এই পুলিশের চাকরি। আমার তাতে লাভই হয়েছে। গল্প-উপন্যাস লেখার ব্যাপারে অনেক বিস্ময়কর বাস্তব রসদের জন্য ওর কাছে ঋণী আমি।

সকালের মর্ণিং ওয়াক সেরে এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে চা খেয়ে রাস্তায় নেমেছি যখন, সকাল তখন সাড়ে ছ'টা। শব্দ করে একটা পুলিশের ট্রাক পাশেই থেমে গেল। ট্রাকের সামনের দিকটা এগিয়ে গেছে, পিছনের দিকে জনা আট দশ সশস্ত্র সেপাই আর অফিসার। আমি বোকাবোকা চোখে তাদের দিকে চেয়ে পায়ে পায়ে এগোচ্ছি। বন্দুক কাঁধে একজন সেপাই টক করে লাফিয়ে নেমে শশব্যস্তে কাছে এলো।
—সাব্ বোলাতে'।

আমি হাঁ। মুহূর্তের জন্য অহেতুক অস্বস্তি একটা। সাদাসিধে শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি, কোনো কিছুর সাতে-পাঁচে নেই, এর মধ্যে সাত সকালে পুলিশের ডাকাডাকি কেন রে বাবা!

পাঁচ গজ এগোতে ধরা চূড়া পরা টুপী মাথায় ড্রাইভারের অপর পাশ থেকে মুখ বাড়ালো। তাও চট করে বিচ্ছিন্ন মুখখানা আমার নজরে এলো না। ওই সরকারী পোশাকে ওদের সকলের মুখই আমি অনেকটা একরকম দেখি। কিন্তু তারপরেই আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়। কারণ এই মুখ এখানে অপ্রত্যাশিত। আমি জানি ভাগ্নে উত্তর কলকাতার কোনো থানার চার্জ এ আছে।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে উৎফুল্ল মুখে বলে উঠলাম, তুই এখানে, কি ব্যাপার?

ভাগ্নের ঠোঁটের ডগায় সামান্য হাসির রেখা পড়ল। নীচের অফিসার বা কর্মচারীদের সামনে এদের হাসি বা কথাবার্তা বরাবরই মাপা ছাঁদের লক্ষ্য করেছি। জবাব দিল আমি এক মাস ধরেই এখানে। ড্রাইভারের দিকে একটু সরে বসল, উঠে পড়ো—

ওকে দেখে সত্যিই খুশি আমি। —এক মাস ধরে এখানে মানে, এদিকে বদলি নাকি?

মাথা নাড়ল। তাই।

—আমি উঠব মানে, কোথায় চলেছিস?

—আরে বাবা ওঠোই না, এখন তো আবার জমানা বদলেছে, পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা আর আঁতকে উঠার মতো কিছু নয়।

খোঁচা খেয়ে সুড় সুড় করে উঠে বসলাম। খুব মিথ্যে বলেনি বোধ হয়। বছর খানেকের মধ্যেও ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। যে দিন পড়েছিল, এখনো তার ছায়া সরেনি যেন। এর মধ্যে পুলিশের দপ্তরে হানা দিয়ে হৃদ্যতা অথবা আত্মীয়তা বজায় রাখার তাগিদ শুনো মিলিয়ে গেছল সত্যি কথাই। ওর ছেলের পৈতের নেমন্তন্ন রাখতে পর্যন্ত যেতে পারিনি।

জিজ্ঞেস করলাম, থানা তো এদিকে নয়, চললি কোথায়?

—একটা মার্ডার কেস্ দেখতে, রাস্তায় পড়ে আছে। চলো, বিশ ত্রিশ মিনিটের বেশি লাগবে না, তারপর তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া—আজ আর এ-বেলা বাড়ি ফিরতে পারছ না।

শেষেরটুকু ভালো করে কানে ঢুকল না। গোড়ারটুকু শুনেই আঁতকে উঠেছি। অথচ এতদিন এ-রকম খবর শুনে দু'কান অভ্যস্ত হয়ে যাবার কথা। গত কটা বছর ধরে কেবলই মনে হয়েছে, এই রাজ্যে সব কিছু মহার্ঘ—চাল ডাল তেল নুন বাসস্থান সুস্থ আলো-বাতাস সব একমাত্র সস্তা মানুষের জীবন। চাইলেই পাওয়া গেছে, নেব বললেই নেওয়া গেছে। সকালের কাগজ খুললে মৃত্যুর মিছিল, পথে বেরুলে মৃত্যুর ভ্রূকুটি। এক বৃহৎ মৃত্যুর বাতাসের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা। বৃহৎ, কিন্তু মহৎ নয় একটুও—হিংস্র নিষ্ঠুর ভয়াল কাপুরুষোচিত।

আশ্চর্য, এর পরেও মৃত্যুর খবর শুনলে ভিতরে চমক লাগে, ইচ্ছে করে ছুটে পালাই। বললাম, এর মধ্যে আবার আমাকে কেন, নামিয়ে দে, দুপুরে না-হয় তোর ওখানে যাবখন।

ভাগ্নে হাসল, আচ্ছা ভীতু তুমি—চলোই না, লেখার রসদও পেয়ে যেতে পারো।

মিনিট বারোর মধ্যে ট্রাক ঘটনাস্থলে এসে গেল। ওরা সব নেমে মুহূর্তের মধ্যে কাজে লেগে গেল। পুলিশ এসে ঘিরে দাঁড়াতে জনবৃত্তটা আরো অনেকটা বড় হয়ে গেল।

...দেখছি। বছর পঁয়তাল্লিশ হবে লোকটার বয়েস। বড় চুল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কিন্তু তা সত্বেও বেশ কমনীয় আর ভদ্র মুখ। পরণে আধ-ময়লা মোটা ধুতি, গায়ে মোটা ফতুয়া। নীচু মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন হবে।

পুলিশের লোকগুলো যেন এই দর্শন-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এর মধ্যে ফরেন-সিকের লোক এসে গেছে। পুলিশ কুকুর এসেছে। দেহের চারদিকে সাদা বেস্টনী আঁকা হয়েছে। তারপর দেহটাকে নাড়াচাড়া করে দেখা হচ্ছে। দেখছি আমিও, আর অস্বস্তি বোধ করছি।

...চমকে উঠলাম। চিরনিদ্রায় শয়ান লোকটার মুখে নিবারণ সেনের আদল আসছে কেন? আমার চোখের সামনে লোকটার মুখটা বদলে যাচ্ছে নাকি।

—বাবা, কাল খুব ভোরে বাজারে না গেলে কিন্তু আপিসের আগে ভাত দিতে পারব না, ঘরে একদানা চাল নেই, আটা যা আছে রাতে টায়েটোয়ে চলে যেতে পারে।

...নিবারণ সেনের উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে রমার গলার স্বরটুকু ভারী মিষ্টি।

শুধু এই জন্যেই মেয়েটাকে ডেকে ডেকে কথা বলতে ইচ্ছে করত আমার। চেহারাও মোটা মুটি সুশ্রী। অভাবের ঘর না হলে আরো ভালো দেখাতো। কিন্তু ও-ঘর থেকে মেয়ের কথা কানে আসতে নিবারণ সেনের চোখে মুখে বিরক্তির ছায়া আর রেখা পড়তে দেখেছিলাম। তার ছোট ছেলেটার জ্বর কদিন ধরে, আমার একটু আধটু হোমিওপ্যাথী পড়া আছে, তাই আপিস ফেরত সেদিন আমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনে ছিল।

...পরদিন সকালে উঠে চাল কিনতে গেছল নিবারণ সেন। ছত্রিশ ঘন্টা বাদে পোস্টমর্টেম শেষে খাটিয়ায় শুয়ে বাড়ি ফিরেছিল। সেখান থেকে শ্মশানে। তার ঘাড়ে পিঠে বুকে মাথায় কম করে আট দশটা মারাত্মক আঘাত। শুনেছি, একটা চিৎকার করে ওঠারও অবকাশ পায় নি।

...পাঁচটি ছেলে মেয়ে নিবারণ সেনের। ওই রমাই বড় তার মধ্যে। রমার জন্য বড় দুশ্চিন্তা ছিল নিবারণ সেনের। পাড়ার সব ছেলে নয়তো যেন নেকড়ের পাল।

জোর করে দুচোখ বুজে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকিয়ে নিলাম একটু। আশ্চর্য, নিবারণ সেন কবে ছাই হয়ে গেছে অথচ এই লোকটার মুখে তার মুখখানাই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে

লোকটাকে ধরে এবারে নাড়াচাড়া করে দেখছে ওরা। কিন্তু ওই দুটো চোখ তেমনি দুর্বোধ্য বিস্ময়ে স্থির। আবার যেন ঝাঁকুনি খেলাম একটা। চাউনিটা অবিকল বীরু ঘোষের বাবার সেই অপলক চাউনিটার মতো। ...অলক সোমের বাবা নিঃশব্দে কাঁদছিল আর বীরু ঘোষের বাবা তার দিকে চেয়েছিল। বীরু ঘোষ আমার ভক্ত গোছের একজন ছিল। বয়েস মাত্র বাইশ তেইশ। কিন্তু শেষের দিকে তার ভক্তিটুকু উবে গেছল। মুখের ওপর একদিন স্পষ্টই বলে বসেছিল, আপনারা যা লেখেন কারো তাতে কানা-কড়িও উপকার নেই। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করতাম রাতারাতি ও অনেক কিছু জেনে ফেলেছে বুঝে ফেলেছে, শিখে ফেলেছে।

...সেদিন খবরটা কানে আসতে আঁতকে উঠে হাসপাতালে ছুটেছিলাম। একেবারে শেষ অবস্থা নাকি বীরু ঘোষের।

...হাসপাতালে গজ পনের বিশ তফাতে দুটো শয্যার একটাতে বীরু ঘোষ শয়ান, অন্যটাতে অলক সোম। অলক সোমকে আমি চিনতাম না, হাসপাতালে এসে নাম শুনেছি, চেহারাখানা দেখেছি। বেশ কচি, মিষ্টি চেহারা। একটু আগে মারা গেছে শুনলাম। তার বাবা শয্যার ওপাশে মাটিতে বসে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বীরু ঘোষের অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু অলক সোমও একেবারে অপ্রস্তুত ছিল না, নিরস্ত্র তো ছিলই না। মাটি নেবার আগে সেও মোক্ষম আঘাত করতে পেরেছিল। রিভলভারের গুলী তার তলপেট ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এখন সংকট অবস্থা তার, অক্সিজেন চলছে।

......পায়ে পায়ে বীরু ঘোষের বাবা অলক সোমের বাবার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর দুর্বোধ্য অপলক চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। ঠিক এই লোকটা যে-রকম চেয়ে আছে।

ভাগ্নেকে ফেলে আমি কি ছুটে পালিয়ে যাব এখান থেকে? চোখে দেখা আর কানে শোনা বা কাগজে পড়া অনেক অদেখা মুখের মিছিল যেন সার বেঁধে আমার চোখের সামনে এগিয়ে আসছে। সকলের সঙ্গেই এই চাউনি আর মুখের আদল মেলে যেন। নিঃশব্দে একরকম জোর করেই আমি যেন সেই মূর্তিগুলো ঠেলে সরাচ্ছি।

—চলো।

চমক ভাঙলো। অনেক পথ কিরণ করে এখান থেকে এইখানেই ফিরলাম যেন আবার। ভাগ্নের পাশে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ট্যাক্সি ছুটল।

একটু বাদে জিজ্ঞাসা করলাম। কি মনে হল?

নির্লিপ্ত জবাব দিল, কেউ মেরে রাস্তায় এনে ফেলে দিয়ে গেছে। মনে কিছু হচ্ছে না, দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। চারদিকে এ-সব বন্ধ হয়ে এসেছে, এর মধ্যে আমার কপালে এসে জুটলেন ইনি।

ভাগ্নের বিরক্তির কারণ অনুমান করতে পারি। নিজের স্নায়ুগুলোও তেমন বশে নেই। মাঝ পথে জোর করেই নেমে গেলাম। ভাগ্নেকে কথা দিলাম, দুই একদিনের মধ্যে ওর ওখানে আসছি।

মাঝে দুটো দিন বাদ দিয়ে সত্যিই গেছি। যাবার জন্যে অকারণ একটা তাগিদও বোধ করছিলাম।

ভাগ্নে তার আপিস ঘরেই ছিল। সেখানেই বসলাম। ঘর ফাঁকা হতে জিজ্ঞাসা করলাম, সেদিনের মার্ডার কেস-এর কে হদিস মিলল?

—কোন্ মার্ডার কেস! ও তার পর দিনই তো ধরা পড়েছে, দুটোকেই লক্-আপে পুরেছি।

...দুজনে মেরেছে?

—না ছেলে মেরেছে বাপকে, অন্যজন উপলক্ষ।

আমি হতভম্ব। ছেলে বাপকে মেরেছে পোলিটিক্যাল?

ভাগ্নে মুচকি হেসে জবাব দিল না রমণীঘটিত। কারখানার চাকুরে বাপের একমাত্র অপদার্থ ডানপিটে ছেলে বিয়ে করবে বলে কোথা থেকে একটা সুশ্রী মেয়ে ভাগিয়ে এনেছিল। বাপ তখন মেয়েটাকে জুতো-পেটা করে তাড়িয়েছিল বাড়ি থেকে। পরে ওই মেয়ের জন্য সেই বাপেরই মুণ্ডু ঘুরেছে টের পেয়ে ছেলের মাথায় খুন চাপে, তারপর এক-ঘায়ে খতম।

আমি ভাগ্নের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।

টেবিল

আহমদ বুলবুল ইসলাম

রবিবারের ছুটির এই একটা সুবিধে। ভাবা যায়।

‘এতো কি ভাবছিস রফিক?’

‘অনেক কিছু...। অতীত... বর্তমান... ভবিষ্যৎ।’

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভাবনাকে আশ্রয় দেবার নৈঃশব্দ শুধু। সুনীল টেবিলের উপর পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছিলো। টেবিলের উপর জমা করা খবরের কাগজগুলি ওর পা লেগে পড়বার অপেক্ষা শুধু। ওর সীটের পাশেই জানালাটা। ও জানালার দিকে তাকিয়েছিলো। বোধ হয় আকাশ দেখছে।

রবিবারের সকালে আয়েস করে আলস্যটা উপভোগ করা যায়। আর তাই সবাই একটু দেরী করে বিছানা ছাড়ে।

সুনীলের ঠোঁটে স্টার সিগারেট। নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে সিগারেট টানছে ও, যেমন করে ওর অফিসের বড়ো সাহেব চুরুট টানেন। আজ মতিনের বাজার করার পালা।

আমি শুধু ভাবছিলাম। টেবিলের উপর আমার প্রিয় বইগুলি অগোছালো। ধুলোর পুরো স্তর পড়েছে। আমার কলেজ জীবনের তোলা একটা ফটোও রয়েছে স্ট্যান্ডে। তাও মাকড়সার জালে আর ধুলোয় অপরিচিত হয়ে উঠেছে। আগে সাজাতাম। খুব সুন্দর করে আমার পড়ার টেবিল সাজাতাম। এক এক রোববারে এক এক রকম করে সাজাতাম। খুব ভালো লাগতো। দেয়ালের কোণে কাচের বালবে একটা মানিপ্ল্যাণ্ট লাগিয়েছিলাম। ঘন সবুজ পাতা ছেড়েছিলো। অথচ মানিপ্ল্যাণ্টটা মরে গেলো। ঘন সবুজ পাতাগুলো হলদে হয়ে গেলো। সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিনে খুব ইচ্ছে হয় আর ভাবি, আগামী রোববারে সব ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠিক করবো। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে না।

টেবিলের উপর ধুলো জমে উঠেছে। আমার প্রিয় দামী বইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তেলা পোকা ইঁদুরে খেয়ে কুটি কুটি করছে। আর আমি তা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি। শুধু শেষ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় ভুগছি। আমি বুঝতে পারছি আস্তে আস্তে আমি যেন ক্রমশঃ ইচ্ছেহীন হয়ে পড়ছি।

রহমত...... রহমত...... সুনীল ডাকলো রহমতকে।

এই নে চার আনা। দু' আনার মুড়ি আর দু' কাপ চা। আর শোন দোকানদারকে বলিস বাকী টাকাটা আগামীকাল দিয়ে দেবো। মুড়িটা পেঁয়াজ আর সরসের তেল দিয়ে মাখিয়ে আনবি বুঝলি?

সুনীল সিগারেটের ধোঁয়ায় শেষটান দিয়ে রিং বানালো।

রিংগুলো বাতাসে ভাসতে ভাসতে জানালা দিয়ে পালিয়ে গেলো।

'কত টাকা পাবে দোস্তবন্ধু?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পাঁচ টাকা......।'

'কাল কোত্থেকে দিবি?'

'অফিস থেকে অ্যাডভান্স নিতে হবে এই আর কি। শালার জীবনটা এ্যাডভান্স ভোগ করে গেলাম। কি বলিস। ভাগ্যটাই শালার আমাদের অমনি। গত রোববারে রেড স্টারের টিকিটটা কিনে আরেকজনকে দিয়ে দিলাম। শেষে রেড স্টারই বাজী মারলো। শালার বাজী মেরে দিলো!'

সুনীলের কথাগুলি নতুন কিছু নয়। চার বছর ধরে ওর সংগে বাস করে আসছি এই মেসে—পথিকাবাস যার নাম।

আপাতদৃষ্টিতে সুনীল বক্তা আর আমি শ্রোতা। কিন্তু আমরা কেউ-ই এখানে সত্যিকার অর্থে শ্রোতা নই। নিজেদের কথা নিজেদেরকেই শুনাই।

আমরা এই অকালের...চিহ্নহীন বোধহীন অকালের শ্রোতাহীন রঙ্গমঞ্চে নিজ নিজ পার্ট স্বগতোক্তি করে চলেছি। বাইরে তাকালাম।

কিছু কিছু বাতাস আর বৃষ্টি কৃষ্ণচূড়া গাছের চেরা চেরা পাতায় দোলা দিচ্ছিলো। একটা ফিংগে তার লম্বা লেজ ঝুলিয়ে ইলেকট্রিক তারে বসে দুলছিল।

কৃষ্ণচূড়া গাছটায় রংয়ের সমারোহ। লাল রং।

ঢাকা শহরের এখন নতুন সাজ। পত্রিকার পত্রিকায় লাল কৃষ্ণচূড়ার ছবি ছাপা হবে। অর্থাৎ ঋতুর পরিবর্তন এসেছে। আমরা সবাই কী কাঙ্গালের মতো ঋতু চাই, এবং আজীবন ঋতুর প্রতীক্ষা করতে থাকি।

রেল লাইনের ওপারের সারি সারি কালোনীর বিল্ডিংগুলি এইমাত্র বৃষ্টিস্নাত হয়ে উঠেছে। হলুদ হলুদ বিল্ডিংগুলো দুঃসময়ের স্যাঁত-স্যাঁতে হাওয়ায় কালো সবুজ শ্যাওলার জন্ম দিয়েছে। হঠাৎ দূরাগত ট্রেনের বংশীধ্বনি শোনা গেলো।

অর্থাৎ ট্রেন আসবে।

নৈঃশব্দের অন্ধকার থেকে আমার আত্মা কথা বললো।

'সুনীল আবার তুই রেসের মাঠে যেতে শুরু করেছিস?'

'হুঁ, তাতে কি হয়েছে?'

'কী আর হবে, দেখবি জুয়া খেলে একদিন ফতুর হয়ে গেছিস?'

'ফতুর? ফতুর তো হয়েই আছি বন্ধু। তার চেয়ে বল রাজা হয়ে যাবো একদিন। রাজা! শালার রাজা হয়ে যাবো রে!

সেদিন রেডিও-টেপরেকর্ডার-টেলিভিশন-গাড়ী-বাড়ী-সুন্দরী বউ. অর্থাৎ সম্ভ্রম, সমৃদ্ধি আর সুখের সব সামগ্রীগুলি একদিনেই করে ফেলবো বুঝলি!'

'সেদিন সময়কে অস্বীকার করবো। নজরের দুঃশীল পিঠটার দিকে চেয়ে আমি ভাবলাম—সেদিন সময়কে, এই দুঃসময়কে কাঁচকলা দেখাবো!' হো হো করে হাসলো সুনীল। কিন্তু সে হাসির কোনো অর্থই খুঁজে পেলাম না আমি।

না আনন্দের, না ক্ষোভের, না উপহাসের—কোন কিছুতেই সে হাসিকে ধরা যায় না।

নিশ্চিত রাজা হয়ে যাবার সম্ভাবনায় মনে হলো ওর চোখগুলি চক চক করছিলো।

সেদিন আমাদের ভুলে যাবি না তো, বলতে বলতে বাজারের থলে হাতে ঢুকলো মতিন।

'আরে দূরে! তোদের ভুলবো কী করে? বন্ধুদের নাম কী ভোলা যায় কখনো?'

'আর জুয়া? জুয়াতো তুমিও খেল বন্ধু।' আমার দিকে চেয়ে বিকৃত হেসে বললো সুনীল।

'আমি! কে বললে তোকে? কখনো না, নো নেভার......।'

ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়লাম আমি।

'এই যে বছর বছর না পড়ে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করে ফেলবার জন্য প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ফেল মেরে এতোগুলো টাকা গচ্ছা দিচ্ছো, তা কী জুয়া নয়? ভাগ্যোন্নতির জুয়া!'

মতিন এবার কথা বললো।

সুনীল ঠিকই বলেছে। আমরা একটা রেসের ঘোড়ামাত্র। লাগামহীন বল্গাহীন ছুটে চলেছি উন্মত্তের মতো শুধু।

আগামীকালের রাজা তখন তেল-নুন-পেয়াজ মাখানো মুড়ি খাচ্ছিলো। আর খানিক পরে পরেই চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলো।

নাস্তা খাওয়া শেষ হলে আবার সিগারেট ধরালো সুনীল। দুমরানো মোচরানো চাদরের উপর বসেছিলো সে। চাদরটা কবে ধোয়া হয়েছিলো জানা নেই কারো।

বালিশের ওয়াড়গুলো ময়লা তেল-চিটচিটে। মশারি কেনার পর ধোয়া আর হয়নি।

সমস্ত ঘরটা সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ, স্পঞ্জের ফিতা, কলার খোসা আর ঝালমুড়ির ঠোঙ্গাতে ভর্তি।

'ঘরটা খুব ময়লা হয়ে গেছে। পরিষ্কার করা দরকার। কি বলিস মতিন?'

মতিনের সম্মতির প্রত্যাশায় একটি আহত পাখীর সুতীক্ষ্ণ চীৎকার যেন ছুঁড়ে দিলাম—ও কোল দেবে বলে।

'কী আর হবে...' বললো সুনীল।

আর মতিন শুধু মুখটা ঘুরিয়ে নিলো।

আমি চেয়ে দেখলাম—দেয়ালের কোনার কোনায় মাকড়সার জাল আর ঝুল জড়াজড়ি করছে। একটা ইঁদুর-মরা ভ্যাপসা গন্ধও অনুভব করলাম।

কী করে যে আমরা সবাই দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরেই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছি। সবাই আমরা সাগরের উন্মুক্ত জলে স্নাত হতে চাই। অথচ বদ্ধ জলের এঁদো ডোবায় আমরা মগ্ন চিরকাল।

'আচ্ছা সুনীল, আমরা বোধ হয় প্রেমহীন হয়ে পড়েছি; সংগে সংগে ইচ্ছেহীনও তাই না রে?'

ওরা দুজনেই হাসলো।

কিন্তু সে হাসি অদৃশ্য ইথারের বুকে কোন তরঙ্গ রেখায় চুম্বন এঁকে দিলো না। শুধু জমাট শব্দহীন ক্যানভাসে কালির পোচ এঁকে দিলো।

'কিন্তু বলতে পারিস, এই ইচ্ছের মৃত্যু কবে থেকে হয়েছে, ঠিক কবে থেকে?'

ওরা কেউ কথা বললো না। শুধু বাইরের দিকে তাকালো।

একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ আসছিলো। জমাদার শশিনাথ বোধ হয় গরুর গাড়ীতে করে ময়লা নিয়ে যাচ্ছে। তারই শব্দ।

আমাদের স্বকালের নষ্ট যুবতীদেহে ওর গাড়ীর চাকা কেটে কেটে দাগ বসিয়ে যাচ্ছে আগামী কোন সকালের জন্ম দেবার জন্য, কে জানে।

সুনীলের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললো: 'ব্লেড আছে.. ব্লেড?'

না, নেই তো বললাম আমি।

'মতিন তোর আছে?'

'আছে......পুরনো।'

'তাই দে আপাততঃ।'

ভাঙ্গা আয়নায় ওর মুখের তসবির দেখে দেখে শেভ করছিলো সুনীল, আর কথা বলছিলো।

'মানসীর কথা তোর মনে পড়ে রফিক?'

'হ্যাঁ, পড়ে বৈ কি। তা ওতো চুকে বুকে গেছে। আবার ওর কথা বলছিস ক্যান?'

সেদিন হঠাৎ-ই নিউমার্কেটে দেখা হয়ে গেলো কিনা। সমীরের সংগে হাত ধরাধরি করে মার্কেটিং করছে। আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারলো না। বরং শব্দ করে হাসতে হাসতে চলে গেলো।

ওর প্রথমদিককার চিঠিগুলির কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো হঠাৎ। মানসী লিখেছিলো পর্ণকুটিরে বাস করতে হলেও আমাকে ছাড়া নাকি তার চলবে না।

অথচ ঐদিন দেখলাম, ভালোই মানসীর।

কারো জন্য কারো আটকে থাকে না. তাই না রফিক?

'হয়তো তাই। জানিস আমরা এখানে তীর্থহীন পথিকমাত্র।'

'কিন্তু এই পথের শেষে আমরা আবাস চেয়েছিলাম—যেখানে সুখ সম্পদ আর ভালোবাসা থাকবে।'

'সুখ-সম্পদ আর ভালোবাসা বোধ হয় সবাই পায় না।' মতিনের এ কোন কণ্ঠ?

'আমরা তো বেশী কিছু চাইনি। খেয়ে পরে বাঁচা, আর দশটা সত্যিকারের সুখী মানুষের মতো নিশ্চিত জীবনের আশ্বাস আর নিরাপত্তা......'

নিরাপত্তা? আশ্চর্য ভঙ্গি করে চাইলো সুনীল. যেন একটা মজার কথা শুনেছে। তারপর হো হো করে অট্টহাসি করে উঠলো সুনীল। হাসি থামলে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললো. আমরা. এই তিনজন ইডিয়ট যে বেঁচে আছি. এটাই কী যথেষ্ট নয় বন্ধু? আর কিসের নিশ্চয়তা আর নিরাপত্তা চাও তুমি?

'আসলেই জীবনে উদ্বেগহীন নিশ্চয়তা নেই। শুধু শুধু আমরা ভেবে মরি। আর একগাদা 'কবরের অন্ধকারময় জীবনে নিশ্চয়তা প্রত্যাশা করাও বাতুলতা মাত্র,' একজন সর্বকালদর্শী প্রাজ্ঞ বয়োবৃদ্ধের মতো বললো মতিন।—

চল আমরা এই অবৈধ কালকে জিন্দাবাদ দেই।

বুঝলি মানসীকে দেখে ওই মুহূর্তে বড্ড ফাঁকা, শূন্য আর অসুখী মনে হয়েছিলো নিজেকে। মনে হয়েছিলো আমি বড়ো কাঙাল। একটু ভালোবাসার কাঙাল। ভিক্ষে চাইলেও কেউ আমাকে এতটুকু দেবে না।

সে রাতে মেসে ফিরিনি। একটু থামলো সুনীল।

'ওদিকে আমরা হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি করে হয়রান। কিন্তু বললি না তো কোথায় ছিলি?'

'হ্যাঁ, আজ বলবো বন্ধু। সেদিন আমি ...আমি—বেশ্যালয়ে ছিলাম।' হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো সুনীল।

চার বছরের ভেতর কোনদিন কাঁদতে দেখিনি ওকে।

'একি বলছিস সুনীল! তোর এতো অধঃপতন?'

ক্ষমা কর দোস্ত। ওইটুকু আমার প্রয়োজন ছিলো। আর তা না হয় আমাকে আত্মহত্যা করতে হতো।

ঘৃণায় তখনো আমার সারা গা রি-রি করছিলো।

'ছিঃ ছিঃ তুই এতো জঘন্য। কেন তুই এই জঘন্য পাপ করতে গেলি?'

যাই বলিস আজ আর রাগ করবো না। আমি সেই দেহপসারিণীকে মানসী বলেই ডেকেছি। ওর কবোষ্ণ বুকে আমি উন্মত্তের মতো আমার মুখ ঠোঁট ঘষেছি। বিশ্বেস কর, আমি অন্যায় কিছু করতে চাইনি। শুধু ওর পাখীর মতো পেলব নরম বুকে আমার দুর্বিণীত আত্মার প্রশান্তি খুঁজতে চেয়েছি।

ওর উরুতে মাথা রেখে বলেছি, "ওগো মানসী তুমি আমায় ভালোবাসার সংলাপ শুনাও।"

বলতে বলতে সুনীল আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরলো। কেঁপে কেঁপে উঠলো ওর কণ্ঠ, আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু......।

আমি বাইরের দৃশ্য তখন দেখতে পাচ্ছিলাম না। চোখ দুটি শুধু জ্বালা করছিলো। আমার মনে হলো বন্ধঘরে একটা সুন্দর পাখী দম বন্ধ হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। মুক্তি-উন্মুখ সেই পাখীর ক্ষীণ কণ্ঠ দেয়ালের ওপারে পৌঁছুতে পারছে না। আকাশের অসংখ্য মুক্তপক্ষ পাখীর ঝাঁকের সঙ্গে সে কোনদিন দিগন্তে উড়ে যেতে পারবে না।

বিকেল তিনটে।

সুনীল বললো, চল তোদের আজ এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

'তোর ঐ রেসের মাঠে তো...।'

'হাঁ দেখিস আজ নির্ঘাৎ বাজী মারবো। বাজী মেরে দেবো। গ্রীণ এ্যারো ধরবো। কেলকিউলেট করে রেখেছি। দেখিস ঠিক লেগে যাবে।'

বেচারা! ওর দিকে চেয়ে উপহাসের হাসি হাসলাম, সে ভাবছে, প্রত্যাশা করে আছে রেস খেলেই একদিন রাজা হয়ে যাবে—।

তবু তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে রেসের মাঠে আমরাও গেলাম। ওকে খুব খুশী খুশী লাগছিলো কেন জানি।

আমাদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে সুনীলের ঘোড়াই জিতলো। ওর ভাগে পড়লো দুশো টাকা।

আনন্দে ও আত্মহারা হয়ে পড়লো। এবারই তার প্রথম জেতা। দারুন আত্মবিশ্বাস এসে গেলো সুনীলের।

'দেখছিস কেমন বাজী মেরে দিলাম। শালার রাজা হয়ে যাবো একার। রাজা!'

দুটো রিকসা করে আমরা রমনা রেস্টুরেন্টের গেটে এসে নাবলাম। সুনীল থ্রি ক্যাসলস কিনলো এক প্যাকেট।

অনেকযুগ পরে আমরা রমনা রেস্টুরেন্টের চেয়ারে বসলাম। অনেক লোক খাচ্ছে গল্প করছে। কাঁটা চামচে আর ছুরিতে টুং টাং শব্দের তরঙ্গ, অনুচ্চ হাসির ছিটেফোঁটা, বেয়ারাদের ছোটাছুটি সব মিলে যেন এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ জগৎ—এক রাজপুরী। শিক কাবাব, মটন-কাটলেট প্যাসট্রি প্যাটিস, সুইট স্ন্যাক-কোল্ড ড্রিংক ইত্যাদি অনেক কিছু অর্ডার দিলো সুনীল। খাওয়া দাওয়ার পর সুনীল বললো, চল একটু ঘুরি।

'অনেকদিন বেড়ানো হয়নি পার্কে, তাই না রে?'

অতএব, আমরা হাঁটতে শুরু করি।

তিনজনের হাতে থ্রি ক্যাসলস। রিং বানাতে বানাতে আমরা রমনার সবুজ ঘাসের বুকের উপর দিয়ে হাঁটছিলাম। আমরা তিনজন। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম চার পাশের মানুষ, যারা ঘন সবুজের সরোবরে ডুবে থেকে আকণ্ঠ পান করছে ওই নিসর্গ শোভা।

কতো লোক কতো কোলাহল কতো যুবক যুবতীর হাস্য লহরী আর শিশুদের কলতান।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ভেসে যাচ্ছিলাম এক অজ্ঞাত অনাস্বাদিত আনন্দের জগতে। পায়ের নীচে সবুজ দূর্বাঘাস মড়মড়িয়ে উঠছে—ভেঙ্গে পড়ছে—গুঁড়িয়ে পড়ছে।

সামনে পড়লো এক ঝাঁক ফুলের ঝাড়। আমরা সবাই থেমে গেলাম। আমার তৃষ্ণার্ত চোখ দুটি ঐ ফুলের কণ্ঠে ভালোলাগা খুঁজলো। অনেকদিনের আগের হারিয়ে যাওয়া সেই ভালোলাগা!

'সুনীল?'

'কী...।'

'বল ত পারিস এই ভালোলাগা কবে থেকে হারিয়ে ফেলেছি, ঠিক করে থেকে?'

ওরা কেউ কথা বললো না। বলার প্রয়োজনও বোধহয় ছিলো না। আমরা সবাই চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম শুধু ভালোলাগায় পরশ নিয়ে। দেখলাম সবুজ ঘাস, লেকের ঢেউ, ইউক্যালিপটাস আর ধূসর আকাশ...অসংখ্য পাতার বটবৃক্ষ।

কিন্তু কে যেন আমার কানে কানে বলে উঠলো, তোমরা ভালোলাগা হারিয়েছো সেদিন থেকে, যেদিন তোমরা নষ্ট আত্মার ভ্রূণ ধারণ করেছো—আপোষহীন অমোঘ আকাঙ্ক্ষাকে জন্ম দিয়েছো। অর্থাৎ যেদিন থেকে তোমরা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছো অবৈধ কালের সঙ্গমে।

ফুলগুলোতে হাত বুলালাম। ভালোবেসে ফেললাম ঐ ফুলগুলিকে। অথচ ঐ ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা সাপ! আশ্চর্য ঐ ফুলের ভেতর থেকে!'

আমাদের ঠিক পায়ের সামনে ফণা তুলে দাঁড়ালো। আমাদের চলন্ত পা থেমে গেলো। যাত্রা আমাদের থেমে গেলো। আমরা ডাইনে বামে পিছনে পালিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু আমাদের ইচ্ছাগুলো যেন একটা অনুভূতিহীন শব হয়ে গেলো। ওই সামনে মৃত্যু ফোঁস ফোঁস করছে। সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। চীৎকার করে সব মানুষদের আমাদের বিপদের কথা জানাতে চাইলাম।

কিন্তু আমার কণ্ঠ আমার হয়ে কথা বললো না। পালাবার সব পথগুলো যেন রুদ্ধ হয়ে গেলো আমাদের জন্য। সামনে ওই বিষাক্ত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। আমরা তখন মৃত্যুময়ী সম্মোহনের শিকার মাত্র। আশে পাশে কতো মানুষ। কিন্তু কেউ আমাদের চরম সর্বনাশকে তাকিয়ে দেখতে পেলো না।

কেউ বাদাম খাচ্ছে, কেউ হাসছে কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে সবুজমিহিন ঘাসে। কেউ রেডিও খুলে দিয়েছে—সেখান থেকে ভেসে আসছে আনন্দময়ী গান।

ওই অদূরে লেকের জলে কী সুন্দর ছোট ছোট ঢেউ ভেঙেগ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়ছে। লেকের ধারে পাথরের বেঞ্চটাতে ওইতো ওরা দুজন—যুবক যুবতী।

ওরা বোধহয় পরস্পরকে ভালোবাসে।

কী নিবিড় আলাপে মগ্ন!

অথচ আমরা সবার মাঝ থেকে সমস্ত ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে মরে যাচ্ছি।

সাপটা হিস হিস বুক কাঁপানো শব্দে তার লকলকে লোভী জিহ্বাটা বের করছে আর ভেতরে নিচ্ছে। মৃত্যুর অনুভূতি কী ভয়ঙ্কর! ও আমাদের ছোবল দেবে। তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে হয়তো।

আর আমরা আমাদের চিরকালের নিয়ম, দুর্বিনীত, আজন্ম বাসনাকে ক্রমশঃ বিশাল হয়ে সাপের নির্বিষ ঐ ভয়ঙ্কর মণিতে জ্বল জ্বল করতে দেখলাম।

উপায়হীন এই আমরা আনন্দের সরোবর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে, সমস্ত সবুজের পটভূমি থেকে চিরকালের মতো উৎখাত হয়ে, নিশ্চিত নির্মম বিষাক্ত ছোবলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমশঃ আজন্ম সম্মোহিতের মতো...।

আমরা এখন অবধারিত সম্মোহন-এর শিকার মাত্র।

সাহিত্য সংস্কৃতি ও মহিলা সমাজ

লায়লা সামাদ

আমাদের দেশের আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী-সমাজ বরাবর উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। এ সমাজে নারী পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের বাইরে তাদের কোনও স্বাধীন ভূমিকা থাকতে পারে একথা আমাদের সামাজিক পরিবেশে ছিল অবিশ্বাস্য।

অবশ্য আজ বিংশ শতকের প্রায় শেষ সীমানার ওপর দাঁড়িয়ে অবস্থার বহু পরিবর্তন হয়েছে এ কথা বলতেই হবে। শৃংখলিত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বহু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অনেক নতুন মূল্য বোধ চিন্তা-কোষে স্পন্দন জাগিয়েছে। জনসংখ্যার অধিকাংশকে বাদ দিয়ে সমাজের সামগ্রিক কোন অগ্রগতি যে সম্ভব নয় তা আজ অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন।

এই উপলব্ধির ফলে সামাজিক অগ্রগতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও নারীর ভূমিকার অপরিহার্যতার কথা ক্রমাগত বেশী-ভাবে স্বীকৃত হচ্ছে এবং ছোট বড় সকল সাংস্কৃতিক আয়োজনেই আজ মেয়েদের জন্য কোথাও না কোথাও স্থান নির্দেশ করা হচ্ছে। তাই আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আমাদের মেয়েদের অবদান কি এবং এ-দায়িত্বে মেয়েরা কতটা অংশ গ্রহণ করতে পেরেছে বা পারেনি, না পারলে তার কারণ কোথায় এবং কি এর সম্ভাবনা এসবের মূল্য যাচাই করতে হলে আমাদের সামাজিক জীবনে নারীর স্থান ও ভূমিকা কি সে বিষয়ে আলোচনা করে দেখার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

কারণ ইতিহাসের অনিবার্য ধারাই মেয়েদের স্থান নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে যুগে যুগে এবং এই ইতিহাসের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমাদের ভবিষ্যত পন্থা নির্ধারণের মূল সূত্র নিহিত আছে।

আমাদের সমাজে নারীর যে স্থান নির্দিষ্ট ছিল তা অমানুষিক। এ সমাজে আমাদের মেয়েরা চিরকাল নিকৃষ্ট জীব হিসাবেই গণ্য হয়ে এসেছে। উৎপাদন শক্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রপাত থেকেই মেয়েদের এই অবলাঞ্ছিত জীবনের শুরু। দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন শক্তির বিকাশ লাভ না ঘটিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কে চির প্রচলিত যুক্তি হল মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল এবং তাই তাদের এ পরাধীন অবস্থা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই তাদের স্থান নির্দেশিত পুরুষের নিচে। সামন্ত প্রভাবিত আমাদের সমাজেও তাই নারীর ওপর পুরুষের একচেটিয়া প্রভুত্ব ও অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। নারীর চারপাশে অবরোধের বেড়া টেনে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তার কাজের ক্ষেত্র, সংকুচিত করা হয়েছিল তার স্বাধীনতাকে। নারী তার অবরুদ্ধ অন্তঃপুরে গৃহপালিত পশুর মত বন্দিনী হয়েছিল পুরুষের হাতে।

পাক-ভারত উপমহাদেশে যখন ইংরাজ রাজত্ব করেছে তখন শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের দেশে দেশে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে, সামন্তবাদের স্থলে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এমন কি নারী পুরুষের সামন্ততান্ত্রিক সম্বন্ধের বৈষম্য লুপ্ত হতে চলেছিল। নতুন উৎপাদন শক্তির সেই বিকাশ অন্যান্য অগ্রসর দেশে সামাজিক সম্বন্ধের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার প্রভাব আমাদের দেশেও আলোড়ন সৃষ্টি করবে এটাই ছিল ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা সে পরিবর্তন সাধিত হতে দেয়নি।

তার কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিল প্রভুত্বের রাজদন্ড হাতে নিয়ে। এই দুই দেশের আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো বিধ্বস্ত করে দিয়ে সামন্তবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই সে আমাদের দেশে সমৃদ্ধি সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে শিল্পোন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল দেশে দেশে পরিবর্তনের প্রবল স্রোতকে সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রবেশ করতে দেয়নি। তারা একে ঠেকিয়ে রেখেছিল সুপরিকল্পিত উপায়ে।

শোষণের চাপে জীবনের স্বচ্ছলতা ঘুচে গিয়ে দেখা দেয় সমাজজীবনের ভাঙ্গন এবং তার আনুসাঙ্গিক অধঃপতনের লক্ষণ। হাসি আনন্দে পরিপূর্ণ দেশবাসীর জীবন স্তিমিত হয়ে আসে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় সমাজে নারীর মর্যাদারও কোন স্বীকৃতি সম্ভব হয় না। এই ঘুণে ধরা সমাজের চিতায় নারী সমাজ তার স্বাভাবিক সৃষ্টিধর্ম জীবনের স্ফূর্তিকেই অজ্ঞাতেই বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। যুক্তি ও বিজ্ঞানের পরিবর্তে সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কার।

শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছু চলে যায় শুধু নারী কেন পুরুষের নাগালের বাইরে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নির্মমতা তার প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ব্যবস্থা আমাদের দেশের সংস্কৃতি বিকাশের স্বাভাবিক গতিকে, তার স্বচ্ছ ধারাকে ব্যাহত করেছে। সাম্রাজ্যবাদের হাতে পড়ে সংস্কৃতি পরিণত হয়েছে প্রাণহীন খোলসে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কুটিল, নির্মম অকটোপাশের বাহু বেষ্টনী আমাদের সমাজকে বিকৃত পঙ্গু করে ফেলার আগে আমাদের দেশে যে উজ্জ্বল সংস্কৃতি জীবন প্রচলিত ছিল তা আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি। শংকাহীন সুস্থ জীবনের প্রকাশ হিসাবে আমাদের সংস্কৃতি জীবন ছিল আপন ভাবধারায় সমৃদ্ধ। ইতিহাসের পাতা উলটালে এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর মিলবে। সে দিনের নারী জীবনেও উজ্জ্বল সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ জীবনের ছাপ ছিল।

বাংলার নদ-নদী, তার শস্য শ্যামল-প্রান্তর তার পূজা-পার্বণ, তার আবহাওয়া তার বিভিন্ন পরিবেশে এক স্বচ্ছ জীবনযাত্রা

পড়ে তুলেছিল সোনার বাংলার নারী। এর উজ্জ্বল পরিচয় আমরা পাই আমাদের লোক-সাহিত্যে ও লোকশিল্পে।

বিভিন্ন পালা-পার্বণে, ছড়া, কীর্তন, কথকতা, ব্রতকথা, রচনায় পুরুষের পাশা-পাশি মেয়েরাও ছিল সমান অংশীদার। বাংলার ঘরে ঘরে চোখে পড়ত পট্টবস্ত্রে সজ্জিত সীমন্তিনীরা পূজোর আয়োজন করছেন নিজের রচিত গান গেয়ে। পূজো-পার্বণ উৎসবাদিতে মেয়েরা প্রাঙ্গণ প্রাচীর-চিত্রিত করতেন নানা আলপনায়। মেয়েদের ছড়া, গল্প, গাথা গানে পল্লীজীবন মুখরিত হয়ে উঠতো। ফসল ঘরে তোলার নবান্ন উৎসবে দেখা যেত কৃষক রমণীকে যোগ দিতে। মহরমের সময় মেয়েদের সমবেত করুণ কণ্ঠের মর্শিয়ার ঝংকার সরল প্রাণ গ্রামবাসীদের মন স্পর্শ করত। ঘরে ঘরে সুর করে কোরান ও রামায়ণ পাঠ। তার মর্ম-বাণী ব্যাখ্যা করার কাজেও মেয়েরা ছিল উৎসাহী।

মেয়েদের হাতের কাজ বাঙালী সংস্কৃতির এক গৌরব বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সূচীশিল্পে তারা ছিল নিপুণা। বাংলার কাঁথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম লোকশিল্প সমূহের মধ্যে অন্যতম। আগেকার দিনে মেয়েদের হাতে প্রস্তুত জামদানী শাড়ী বস্ত্র শিল্পে এক আশ্চর্য অবদান। এছাড়া আমাদের সহস্র কুটির শিল্পে বাংলার নারীর যে সুন্দর স্বাক্ষর আমরা লক্ষ্য করি সে কথা উল্লেখ করতেও গর্ববোধ হয়।

এইভাবে শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নারী এককালে আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিতে যে প্রাণসঞ্চার করেছে তা আমাদের গণজীবনে প্রেরণা জুগিয়েছে কম নয়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট সামন্তবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির এই জীবন শক্তিকে নিষ্পেষিত করে তোলে তার স্বাভাবিক পরিণতির পথ রুদ্ধ করে। বাংলার মানুষ নির্বিকারভাবে এটাকে গ্রহণ করেনি। বার-বার দৃপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছে, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এই কুটিল চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

ইংরাজ আমলে আমাদের সংস্কৃতির আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এলেও নিঃশেষিত হয়নি। বিদেশী শাসন ও পাশ্চাত্য ভাবধারার আধিপত্যের মাঝেও আমাদের প্রাচীন ধ্যান ধারণা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার একেবারে পরিবর্তিত হয়নি। তবে একথাও ঠিক যে সফল বিপ্লবের আঘাতে আমাদের জীবন বিকাশের বাধা আমরা একেবারে অপসারিত করতে পারি নি। তাই আমাদের সংস্কৃতি জীবনকেও বারবার মাথা আছড়াতে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নির্মম শৃঙ্খলে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর সকল বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিক মহিলা কি পরম [illegible] আশা করেছিলেন অতীতের নির্মম অধ্যায়ের অবসান হবে, সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট দুইশত বৎসরের আবর্জনা সরিয়ে ফেলে নতুন সংস্কৃতি জন্ম নেবে আমাদের জন্মভূমিতে। শিক্ষা, সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আসবে নবজীবনের জোয়ার। স্বাধীনতা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনবার পথ খুলে দেবে, কিন্তু তা হয়নি। সাম্রাজ্য-বাদী প্রতিরোধের পাহারা ঘিরে ধরেছিল আমাদের সংস্কৃতিকে। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিহত করবার চেষ্টা চালিয়েছিল প্রতি পদে পদে। অতীতের রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষের জীবনকে, সাহিত্যিক শিল্পীর মানসকে পরিবর্ধিত করবার উপযুক্ত রসদ দেয়নি, দেয়নি মানুষের মত বাঁচবার অধি-কার। আমাদের সংস্কৃতিতে যে প্রাণধারার প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করেছিলাম তার গতি স্তব্ধ করে ভিন্ন মুখে প্রবাহিত করবার ষড়যন্ত্র চলে এসেছিল এতদিন। একদিকে উর্দু অপরদিকে ইংরাজীর প্রভাবে বাংলা-ভাষার শ্বাসরুদ্ধ ছিল প্রায়। বাংলা ভাষার একান্ত প্রাণধর্ম ক্ষুণ্ণ হতে চলেছিল। চার-দিকের সেই নিশ্ছিদ্র কুয়াশা আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

কিন্তু শত প্রতিকূল অবস্থাও আমাদের দেশের নারীকে অবরুদ্ধ করতে পারে নি। যেমন পারেনি দেশের স্বাজাত্যবোধ ও গণ-তান্ত্রিক চৈতন্যকে অবদমিত করতে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রয়োজনে প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষা তৎকালীন ইউরোপের যে বুর্জোয়া আদর্শের আমদানী করে, তাতে একদিকে যেমন এইদেশে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ও উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রীতি গণতন্ত্র ও মানবিকতার বিকাশ হয়, তেমনি অন্যদিকে মানবিক অধিকারের দাবীতে নারী সমাজও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজে সামন্ততান্ত্রিক চাপ অপ্রতিহত, তাই এই চাঞ্চল্য মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে এগিয়ে নিয়েছে। তাই আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মেয়েদের সংখ্যা বেশী হবার কথা নয়। আমাদের সাহিত্য, চারুকলা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প কারিগরীতে মেয়েদের প্রবেশ খুবই কম। অশিক্ষা, নানা প্রকার কুসংস্কার মেয়েদের এক্ষেত্রে আনাগোনাকে সঙ্কুচিত করে রাখে। যদিও এসব বাধাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টাই চালিয়ে এসেছে তারা। আমাদের সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে মেয়েদের অবদান নেহায়তই নগণ্য তবে দু-একজন দুঃসাহসী ও নিষ্ঠাবতী মহিলা যাঁরা এক্ষেত্রে স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেই নয়। এদের মধ্যে ছিলেন নূরন্নেসা বিদ্যাবিনোদিনী যিনি মুসলমান মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা নামে উপন্যাস রচনা করেন ১৩৩০ বঙ্গাব্দে। এটি ছিল সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। তিনি সর্বমোট ৭খানি উপন্যাস রচনা করেন। এরপর আমরা বেগম রোকেয়ার কথা উল্লেখ করতে পারি। তার রচিত পদ্মরাগ বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। ১৩৩৫ সালে জাহানারা নেসা রচনা করেছিলেন মোসলেম সতী। বেগম সুফিয়া, বেগম শামসুননাহার মাহমুদ [illegible]

এদের পর যারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি নিয়ে এসেছেন তাদের নাম হলো, রাবেয়া খাতুন, রাজিয়া খান, লতিফা হিলালী, জাহানারা আরজু, জোবায়দা খানম মকবুলা মনজুর প্রমুখ। এঁরা ছাড়াও আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে এখন নিত্যনতুন লেখিকার আবির্ভাব ঘটছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে অনেক মহিলাই উপন্যাস লিখছেন। যাঁদের সাধনা তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করা যায় না মোটেও।

বেশ কিছুসংখ্যক মহিলা পত্রপত্রিকা সম্পাদনার কাজেও এগিয়ে এসেছেন। বিভাগোত্তর কাল থেকেই অনেক পত্রপত্রিকা মহিলা দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। স্বল্প পরিসরে অবশ্য সব নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে বহুল প্রচারিত পত্রিকা হিসেবে আমরা সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকার উল্লেখ করতে পারি। পূর্ব বাংলার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা হলো 'অনন্যা' যা সম্পাদনা করতাম আমি নিজে। এ ছাড়াও মিনার ও খেলাঘর নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে ললনা সাপ্তাহিক নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'চিত্রিতা' পত্রিকাটিও আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো তবে একাত্তরের পঁচিশে মার্চের বিপর্যয়ের পর থেকে এর প্রকাশনা সম্প্রতি বন্ধ আছে। প্রয়োজনের খাতিরে বলা হয়ত অশোভন হবে না যে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'চিত্রিতার' আবির্ভাব এক যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করেছে। সাহিত্যামোদী ও সংস্কৃতিমনা মানুষের কাছে চিত্রিতা অত্যন্ত প্রশংসা অর্জন করেছে।

নানা বাধার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে বলেই আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেশী মেয়ের স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়নি। নারী প্রগতির মূল্যবোধ ছিল সংকীর্ণ। বৃহত্তর সমাজে মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় আজও আমাদের পদে পদে বিপর্যস্ত করেছে। পর্দার কলঙ্ক অপসারিত করে, নারীর আর্থিক স্বাধীনতা ও অধিকার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। পারেনি সোনার বাংলার সে লক্ষ্মীরূপিনী নারী, আপন আত্মমর্যাদায়, যে উদ্বুদ্ধ আপন অধিকারে যে অগ্রসর, জীবনের স্বচ্ছতার যে স্নিগ্ধ ও শান্ত তাকে ঘরে ঘরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে।

কিন্তু আজ অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে মহা বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে নতুন চেতনার প্রদীপ্ত শিখায় উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলার দিক দিগন্ত। সেই মহাজাগরণের উত্তাল ঢেউ এ উদ্বেল হয়ে উঠেছে শতকোটি মানুষের হৃদয়। বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী বাঙ্গালীর ঐক্যবদ্ধ মুক্তি সংগ্রাম বিশ্বের বুকে সৃষ্টি করেছে এক নতুন ইতিহাস। এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি আজ আমরা।

ভালবাসার আয়ু

আশাপূর্ণা দেবী

কিছুদিন থেকেই ওদের চিঠিপত্রের সুরে যেন একটা ঝড়ের সংকেত শুনতে পাচ্ছিলেন এঁরা। সুজাতা ব্যানার্জি, আর ভবানী ব্যানার্জি।

কানাঘুষোতেও কানে আসছিলো কিছু কিছু। ব্যাঙালোর প্রত্যাগত দু'একজন আত্মীয় বন্ধু বেড়াতে আসার ছল করে জানিয়ে গিয়েছিল শুভময় আর মনীষার মধ্যেকার সম্পর্কের একটা ভয়াবহ পরিণতির আভাস।

তবু এঁরা এই অসম্ভব অবিশ্বাস্য কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না।

ক্রমশঃ মনীষার চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয়ে গেল, শুভময়েরও না আসে সংক্ষিপ্ত। যেন সমুদ্রে যে আলোড়ন উঠেছিল। সেটা দৃঢ় সংকল্পে স্থির হয়ে গেছে। তাহলেও অবস্থাটা কি পরিষ্কার বোঝা যায় দূর থেকে? অবশেষে হঠাৎ 'শেষ সমাচারটা' এসে গেছে।

শুভময় ছেলেটাকে নিয়ে কলকাতায় আসছে ছেলের ঠাকুমার কাছে রেখে যেতে, মনীষা আগেই মেয়ে দুটোকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে পাটনায়।

তার মানে তিন ছেলেমেয়ের মা বাপ ওরা। বড় ছেলেটার বয়েস সাত, অতএব অন্ততঃ বছর আস্টেক বিয়ে হয়েছে ওদের।

সুজাতা বললেন, 'আট বছর? আট বছর কী বলছো গো? পুরো দশটি বছর। বিয়ের তিন বছর পরে বোমার পিকলু হলো না?'

ভবানীবাবু বললেন, 'ও!'

যেন খুব একটা বড়ো ভুল সংশোধন করে নিলেন।

সুজাতা বললেন, 'এ যুগে তো কায়দা অনেক? বিয়ের পর কিছুদিন নিজেরা বেড়াবে ঘুরবে, মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে, তাই বাচ্চা কাচ্চাদের তাড়াতাড়ি আসতে দেয় না; ইচ্ছে হলে, সময় সুবিধে হলে, তবে আনে।

'তবে আনে?'

ভবানীবাবু হঠাৎ একটা বোকার মতো কথা বলে বসলেন, 'তা' তখন যদি ওরা না আসতে চায়? যদি বলে, 'যাবো না যা আমাদের বুঝি একটা মানসম্মান নেই?'

'কী যে বলো!'

সুজাতা বললেন, 'এই নিয়মেই এখন জগৎ চলছে! এলো তো তারপর একে একে ষেঠের তিনটি। খোকা যখন ম্যাড্রাসে বদলী হয়ে ভালো কোয়ার্টার্স পেয়ে বসলো, তখন পিকলু হলো, তারপর ব্যাঙালোরে যাবার পর কাটু, ঝুটু।'

ভবানীবাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কতোদিন মেয়ে দুটোকে দেখিনি!'

'পুরো তিনটি বছর! ঝুটি যখন সাত মাসের তখন চলে গেছে,' সুজাতা বললেন, 'এখন সাড়ে তিন হলো। 'মুখে ভাত' দিয়েই পাঠিয়ে দিলাম।'

ভবানীবাবু যেন কেমন অবাক হয়ে তাকালেন, 'আচ্ছা এই সব ওরা মানে?'

সুজাতা ঠিক বুঝে পেলেন না কী বলতে চাইছেন ভবানীবাবু। তিনিও অবাক গলায় বললেন, 'কী সব?'

'এই সব মুখে ভাত, অন্নপ্রাশন!'

'ওমা শোনো কথা! মানেনা কি? বৌমাই তো জোর করে বললো, 'ওখানে গিয়ে পড়লে আর হবে না, হঠাৎ শুধু শুধু ভাত খাওয়া হয়ে যাবে হয়তো। যাবার আগে আপনি ব্যবস্থা করে করিয়ে দিন মা! তার ক'দিন আগেই ওদের বিবাহ বার্ষিকীর ধুমধাপটা হয়ে গেছে, তাই মুখেভাতে তেমন ঘটা হলো না।'

ভবানীবাবু একটুক্ষণ পরে বললেন, 'আশ্চর্য!'

সুজাতা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সেটা আশ্চর্য? না এটা আশ্চর্য?'

'কিজানি বোধহয় দুটোতে মিলিয়ে—'

সুজাতা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

মনীষা তাঁর কাছে মেয়ের মতো সহজ হয়ে কতো সময় কতো আবদার করেছে। পুরনো গহনা ভেঙে নতুন গহনা গড়াবার ইচ্ছে হলে নিজের মাকে দেয় না, সুজাতার কাছে দেয়।

বলে, 'আপনারই পছন্দ ভালো মা, আমার মাতো বরাবর বেহারে পড়ে থেকে প্রায় বেহারী হয়ে গেছেন।'

সেটা কোনো কথা নয়, সুজাতার উপরই তার আস্থা। সুজাতার মনের মধ্যে ভয়ানক একটা আলোড়ন উঠলো। মনীষা আর আসবে না তাঁর কাছে।

আচ্ছা এটা কী কখনো সম্ভব হতে পারে?

অথচ নাকি হচ্ছে সম্ভব।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না; বারান্দার ধারে বসেছেন বলে এখনো সন্ধ্যে হওনাটা টের পাচ্ছেন না, ঘরের মধ্যে চাকর আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যে হলে একবার সারা বাড়িটায় আলো জ্বালাতে হয়, এটা সুজাতার নির্দেশ! ছেলেবেলা থেকে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া অভ্যাস।

ভবানীবাবু আবার কথা বলে উঠলেন, 'আচ্ছা খোকা তো 'ভাব' করে বিয়ে করেছিল, তাই না?'

সুজাতা এই অবান্তর প্রশ্নে রেগে উঠলেন। বললেন, 'সেটা আবার জিগ্যেস করছো কী? সেই নিয়ে বলে, কতো কথা, কতো কাণ্ড, কতো মন কষাকষি—'

'মনকষাকষি?'

ভবানীবাবু যেন অন্য কোন খান থেকে কথা বললেন, 'মন কষাকষি কেন? তুমি যে বললে, 'ভাব করে বিয়ে করেছে খোকা!'

'আঃ তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসাই ঝকমারি! এতো ভুলে যাও। বৌমার বাপেরা ঘোষ না? তোমার ভাইয়েরা, দিদিরা শুনে রাগারাগি করেন নি? বলেন নি, এ বিয়েতে আসবেন না। বলেন নি, 'গোয়ালা ঘোষ' কিনা তাই বা কে জানে! শম্ভোর একটা বামুনের ঘরের মেয়ে জুটলো না?'

ভবানীবাবু বিস্ময়ের গলায় বলেন, 'কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ওরা সবাই এসেছিল!'

'আহা, সহজে এসেছিলেন না কি? খোকা যখন জেদে অটল রইলো, ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো ওর কাছে পৃথিবী একদিকে আর ওর ওই ভালবাসার মেয়ে একদিকে, তখন আমি জনে জনে ওঁদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে প্রায় হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে রাজী করে আসিনি?'

'আচ্ছা! আচ্ছা! মনে পড়ছে—' ভবানী-বাবু বলেন, 'দিদি বলেছিল যাবো কিন্তু খাবো না,' তাই না? তুমি বললে, 'দেখি কেমন না খেয়ে চলে যেতে পারেন। আমিও তাহলে হাঙ্গারস্ট্রাইক করে দরজা আটকে পড়ে থাকবো।'

ভবানীবাবু এতোটা মনে করতে পেরে, বেশ যেন গৌরব বোধ করলেন।

সুজাতা বললেন, 'তবু ভালো যে এটুকু মনে রেখেছো!'

ভবানীবাবু ইজিচেয়ারে বসে রয়েছেন, যেন ডুবে যাচ্ছিলেন ক্রমশঃ, হঠাৎ নিজেকে টেনে তুলে বললেন, 'আচ্ছা, এতো কেন করেছিলে তুমি?'

'এতো কেন করেছিলাম?' সুজাতা ঝংকার দিয়ে ওঠেন। 'না হলে আসতেন তোমার মহামানী ভাইবোনেরা? ছেলের ব্যাপারে লজ্জায় আমি তো তখন চোর!'

'না, বলছি। তুমিতো ওদের ছেড়ে দিতে পারতে? বলতে পারতে, ওরা না আসুকগে বয়ে গেল!'

'কথার কী বাহার! দিদিরা, ঠাকুরপোরা, এদের ছেড়ে দেব! বলবো, ওরা না আসুকগে বয়ে গেল।' চমৎকার! এমন এক একটা মাথামুণ্ডুহীন কথা বলো তুমি!'

ভবানীবাবু আবার ইজিচেয়ারটায় তলিয়ে গেলেন যেন, খুব আস্তে বললেন, 'অথচ দেখো, বৌমা অনায়াসে শম্ভোকে ছেড়ে দিচ্ছেন।'

সুজাতা একবার কেঁপে উঠলেন।

তারপর আস্তে বললেন—'দুটো দিন শম্ভোকে ছেড়ে থাকতে পারে না বৌমা—'

'পারতো না।'

সংশোধন করে দিলেন ভবানীবাবু।

'রান্নার লোক থাকতেও রোজ রোজ নতুন নতুন রান্না নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ায়।'

'খাওয়াতো।'

'বৌমার একটু মাথা ধরলে শম্ভো চোখে অন্ধকার দেখে—'

'দেখতো—'

ভবানীবাবু যেন প্রুফ রিডারের ভূমিকায় রয়েছেন।

'বৌমা একটু মুখ ভার করলে শম্ভো তটস্থ হয়ে থাকে—'

'থাকতো।'

'কী আশ্চর্য! সব চলে গেছে? সব অতীত হয়ে গেছে?

'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে?'

'বিশ্বাস না হলেও কিছু এসে যায় না।'

সুজাতা মুখটা ফেরালেন।

সুজাতার হঠাৎ রাস্তাটা দেখার খুব দরকার পড়লো।

তারপর সুজাতা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা বলো দিকি আমাদের বিয়ের কতো বছর হলো?'

সুজাতাদের আমলে বিবাহ বার্ষিকীর রেওয়াজ ছিল না, সাল তারিখটাই সবাই মনে রেখে উঠতো কিনা সন্দেহ, সুজাতা তবু মনে রেখেছেন। বছর বছর ওই দিনটিতে গৃহদেবতাকে একটু বিশেষ ভোগ দেন। তাও একালের মতো ঢাক পিটিয়ে নয়, কেউ যদি প্রশ্ন করে 'হঠাৎ? আজ কী?'

সুজাতা বলেন, 'এমনি।'

অবশ্য এখন আর আছে কে? মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে বিদেশে।

ভবানীবাবু সুজাতার প্রশ্নে একটু চমকে গেলেন, বললেন 'কতো বছর তুমিই ঠিক বলতে পারবে।'

'তা জানি! নেহাৎ আমি এই একখানি জগদ্দল পাথর চোখের সামনে সর্বদা বিরাজিত আছি, তাই বিয়ে যে করেছিলে একদা সেটা ভুলে মেরে দাওনি। এই আষাঢ়ে চল্লিশ বছর পুরবে। বুঝলে!'

'চল্লিশ!'

'তা হবে না? দিন কি বসে থাকে? খোকারই তো সাইত্রিশ বছর বয়েস হলো!'

'আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করি এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কতোবার ঝগড়া হয়েছে আমাদের?'

'কতোবার?'

ভবানীবাবু হঠাৎ একটু হেসে উঠলেন, বললেন, 'চল্লিশকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে গুন করে দেখো, যা হয়।'

'আহা তা বলে তা নয়। রোজ আমি ঝগড়া করি?'

'গড়ে বলেছি! কোনোদিন নয়, কোনো দিন তিনবার!'

'আচ্ছা বেশ বেশ! আমি খুব ঝগড়াটি, কুঁদুলী, হলো তো? তবে আসলে 'সিরিয়াস' ঝগড়ার কথা হচ্ছে।'

'এই সেরেছে! সেরকম কিছু হয়েছে নাকি কোনোদিন?'

সুজাতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'হবে না কেন? কতো হয়েছে। সেই যেবার তোমার পিসিমার অসুখ বলে আমাকে আমার দিদির মেয়ের বিয়েতে শ্রীরামপুরে যেতে দিলে না? মনে আছে? বললে—পিসিমাকে একা ফেলে রেখে দিয়ে যাওয়াটা খুব হৃদয়হীনতার কাজ হবে। সেবার তো তোমার হৃদয়হীনতায় আমার বিষ খেতে ইচ্ছে হয়েছিল।'

ভবানীবাবু আর একবার একটু হেসে উঠলেন। বললেন, 'ভাগ্যিস খাওনি!'

সুজাতা অনামনস্ক হয়ে অতীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কী মর্মান্তিকই হয়েছিল সেই না যেতে পাওয়াটা! দিদি জামাইবাবুকে পরে কতো গঞ্জনা দিয়েছেন। বলেছেন, 'এতোই যদি ইয়ে, নিজে অফিস ছুটি নিয়ে পিসির সেবা করলেই পারতেন বাবু। কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো হতো! তা নয় ছেলে-মানুষ বৌটাকে—'

তা ছেলেমানুষই বৈ কি! কতোই বা বয়েস তখন! অথচ কেউ সহানুভূতি দেখায়নি ছেলেমানুষ বলে! শ্বশুর, পিসশাশুড়ী, তিন বড়ো ননদ, দুষ্টু, দুষ্টু দ্যাওরো সকলেই সুজাতার কাছে নিখুঁত কর্তব্যের দাবি করেছে। আর সেটা ওদের আশানুরূপ না হলে, কতো লাঞ্ছনা গঞ্জনা নিন্দাবাদ! স্বামী চেয়েও দেখেননি, সেখানে কতোখানি অমানবিকতা হচ্ছে!

এখনকার মেয়েরা ধারণা করতে পারবে এসব?

পারবে না, একেবারেই পারবে না। তবুও—তারা আশ্চর্য!

কখনো যদি সুজাতা স্বামীকে একটু দুঃখের কথা জানাতে গিয়েছিল বিরক্ত হয়েছেন ভবানীকুমার। বলেছেন তোমাদের ওইসব মেয়েলি কথা আমার মাথায় ঢোকে না। অথচ সুজাতার এতোটুকু ত্রুটি দেখলে মাথায় চড়কতো তাঁর।

হয়তো সেটাই ওঁর নিজের ধরনে ভাল-বাসার প্রকাশ। স্ত্রীকে অপরের চোখে নিখুঁৎ দেখাতে চেয়েছেন।

কিন্তু, সে বোধ তখন আসেনি সুজাতার।

তখন একা সেই রাগ দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা বহন করেছেন। আর কষ্টে বুক ফেটেছে।

এক একদিন ইচ্ছে হয়েছে, বিষ খাই, গলায় দড়ি দিই, কেরোসিনে পুড়ে মরি। ইচ্ছে হয়েছে—জীবনে ওর সঙ্গে কথা না বলি, কিন্তু সে সবের কিছুই হয়ে ওঠেনি।

হয়তো সুজাতার ইচ্ছের মধ্যে তীব্রতার অভাব ছিলো।

কিন্তু যদি থাকতো তেমন তীব্রতা?

'সুজাতা' নামের একটা জীবন সেই বিদ্রোহের তীব্রতার মধ্যে মহান হতো?

জীবনকে ধিককার দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে মর্যাদার আসনটা টুটুট থাকতো তার? ওইটা ছাড়া মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আর কি উপায় ছিল?

তা এতো কথা ভেবে দেখার অবকাশ হয় নি কখনো।

কোথা দিয়ে কী হয়ে গেছে, আবার কখন সহজ জীবন ছন্দে ফিরে এসেছেন।

কী করে ফিরে এসেছেন, তার কোনো স্পষ্ট ইতিহাসও তো নেই। দিনরাত্রির আবর্তনে আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে গেছে বিদ্রোহ, জ্বালা, প্রতিশোধ-বাসনা।

একবার তো বাড়ি থেকে চলে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরার সঙ্কল্পে স্থির হয়েছিলেন, কুড়ি বছরের সুজাতা।

দাদা আর দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে সুজাতারা তিন বোন দুঃসাহসিকতায় ভর করে শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার দেখতে গিয়ে-ছিলেন, ফেরার সময় শেষ পথে দাদার বন্ধু একা সুজাতাকে তার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, কারণ গাড়িটা তারই, আর তার বাড়িটা সুজাতাদেরই পাড়ায়।

সেই রাত্রে সুজাতার জীবনে একটা ভূমি-কম্প ঘটে গিয়েছিল যেন। নেহাৎই আলা-ভোলা অনামনস্ক এই ভবানীকুমার হঠাৎ এমন একটা কটুকথা বলে বসেছিলেন, যাতে সুজাতা অপমানে দিশেহারা হয়ে গিয়ে-ছিলেন।

পরে অবশ্য বুঝেছিলেন, সংসারের সকলের সামনে সুজাতা অপরাধিনী হলো, এই রাগেই অমন কটু কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল স্বামীর। কিন্তু সেদিন সঙ্কল্পে স্থির হয়েছিলেন, ভোরবেলা পিসিমার কাছে বায়না করবেন তাঁর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাবার, তারপর প্রতিজ্ঞা পালন করবেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সেই রাত্রেই হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেল ভবানী-কুমারের। ব্যস, সব বনাচাল হয়ে গেল সুজাতার।

ঘরে যতো লেপ কম্বল ছিলো সব ভবানীকুমারের উপর চাপিয়ে, মনে মনে ভগবানের নাম করতে লেগেছিলেন।

তরাপর?

তারপর যখন জ্বর ছাড়লো, ভগবানের কাছে সাতবার ক্ষমা চাইলেন, অমন দুর্মতি যেন কখনো না হয়। অমন গম্ভীর মানুষটা জ্বর অসুখ হলে স্রেফ ছেলেমানুষের মতো হয়ে যায়। ছটফটানি, বাপরে মারে! সুজাতা যদি না থাকতো কী হতো?

সেই থেকে এই অবধি ওকে একা ফেলে রেখে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবনাতেই আসে না।

অনেকক্ষণ পরে সুজাতা কথা বললেন, 'খোকা কাল কখন আসবে?'

'ট্রেন লেট না হলে, বেলা সাড়ে এগারোটায়।'

'লেট তো রোজই হয় বলছিলে?'

'তাই তো শুনি।'

'কালও হয়তো লেট হবে।'

'অসম্ভব নয়।'

'এই সেরেছে সাড়ে ছটা বেজে গেল, তোমার অষুধটা খাওয়া হলো না যে—'

'থাক থাক একটু পরে খেলেই হবে।'

'চমৎকার। ছটায় খাবার কথা, সাড়ে ছটা বেজে গেল, এখনো পরে খেলে হবে!'

সুজাতা উঠে গেলেন, ওষুধ আর জল নিয়ে এসে দিলেন।

'উঃ ট্যাবলেটগুলো এতো বড়ো!'

ভবানীবাবু নামানো গেলাশটা তুলে নিয়ে আবার একটু জল খেলেন, গলা থেকে যেন নামতে চায় না।

সত্যি, এবারেরটা যেন আরো বড়ো। কাল থেকে না হয় গুঁড়ো ক[illegible]

'রামবলো! তাতে তে[illegible] হয়ে যাবে না? ক্যাপসুল কি গুঁড়ি[illegible] খায় নাকি?'

'গিলতে কষ্ট হয় বলেই বলছি।'

'কী আর করা!'

জল আর ওষুধ রেখে এলেন সুজাতা, বললেন 'অবনীকে বলে এলাম তোমার রুটিটা একটু সকাল করে করতে। ডাক্তারবাবু বলে গেলেন—'

'রাখো তোমার ডাক্তারবাবু। নটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়তে পারা যায় না।'

'শরীরের জন্যেই বলা হচ্ছে।'

ভবানীবাবু আর কিছু বললেন না। সুজাতার ওই এক বাতিক।

একটু পরে সুজাতা আস্তে বললেন একে সবাই নামে। এবার খোকা একা নামবে। 'ওরা আসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি, একে যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

'পিকলু নামবে।'

'ও হ্যাঁ পিকলু! আচ্ছা পিকলু আমাদের কাছে থাকতে পারবে?'

ভবানীবাবু বললেন, 'পারা আর না পারা এই শব্দ দুটোর কোনো মানে নেই। কতো ছেলেমেয়েকে তো বোর্ডিংয়েও থাকতে হয়।'

'খুব সুখে থাকে না।'

ভবানীবাবু কথা বললেন না।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

সুজাতা আবার বললেন, 'ছেলেটাতো এক নম্বরের মা ন্যাওটা ছিল।'

'বাবাকেও ভালোবাসে—'

'আহা আমি কি বলেছি, বাসে না? তবে মাকেই বেশী জড়ায়। চিঠিপত্রেও তো তা লিখতো বৌমা। ওদিকে আবার লাটটার [illegible] বাবা অন্তপ্রাণ! রাত্তিরে জল তেষ্টা পে[illegible] বাবা উঠে জল দেবে, কাঁদলে বাপ ভোলা[illegible] ঘরের বাইরে নিয়ে এসে ঘুম পাড়া[illegible] তাছাড়া জামা পরিয়ে দেবে বাবা, চুল আঁচ[illegible] দেবে বাবা! দেখেছি তো সেবার।'

ভবানীবাবুর এই ইজিচেয়ারটা একেব[illegible] পুরনো আর ঢিলে হয়ে গেছে, তাই মনে হ[illegible] ক্রমশঃই যেন নেমে যাচ্ছেন তিনি। সেই জ[illegible] কি ওঁর গলার স্বরটাও অমন নেমে [illegible] যাচ্ছে? সেই রকমই লাগলো, যখন বলবে[illegible] 'অথচ দেখো আশ্চর্য! ভাগটা ঠিক উ[illegible] হয়ে গেল। মার ভাগে মেয়ে বাপের [illegible] ছেলে।'

'বালাই ষাট ভাগ আবার কী? এমন অনাছিষ্টি কথা বলো!'

'অনাছিষ্টি মানে? ভাগই তো! রীতিমত ন্যুন সঙ্গত ভাগ।... আচ্ছা ছোট মেয়েটার কী ব্যবস্থা হলো? দেড়খানা করে তো ভাগ হবার নয়? তাহলে ছ মাস মার কাছে ছ মাস বাপের কাছে?'

'আঃ থামো তো! যতো সব উৎকট চিন্তা তোমার। যেন সেকালের 'কাজীর বিচার' পেয়েছো—'

'সেকাল কি কোনো খানে চলে গেছে ভেবেছো সুজাতা? আছে! সব আছে। মানুষের মনের মধ্যে আছে, আদালতের আইনের মধ্যে আছে। কাজী না হয় কেটে দু-ভাগ করে দিতে বলতো। তা এও—'

'আঃ দুগগা দুগগা। এমন অলক্ষুণে কথাও মুখে আসে তোমার। কাল অমনি খোকার টেলিগ্রামটা পেয়ে বলে উঠলে, ছোড়দি মারা যাওয়ায় ছোট জামাইবাবু কে এই রকম টেলিগ্রাম করে গৌতমকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।' কথাটা বলা তোমার উচিত হয়েছিল?'

'বোধহয় হয় নি। স্বীকার করছি।'

'আর বোলো না! বৌমা আমার বেঁচে থেকে থাক, সত্যিতো আর বরাবরের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকবে না! ছেলেপুলের মাই—'

ভবানীবাবু একটু হাসলেন।

সুজাতা কাঁদো কাঁদো হলেন, 'তুমি হাসলে? তুমি বলতে চাও ওরা চিরকালের জন্য? ঘরের গিন্নী, ছেলেপুলের মা—'

'আমি কিছুই বলতে চাই না সুজাতা, যা হয় না, তা হবে না সেই কথাই বলছি।'

সুজাতা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

জগতে এতো সমস্যা তার ওপর আবার নিজেকে একটা সমস্যা করে তোলে কেন মানুষ! সেকেলে সুজাতা কথাটা মুখে উচ্চারণ করলেন না তাই রক্ষে।

ভবানীবাবু বললেন, 'বেশ বাতাস উঠছে, তুমি ঘরে গিয়ে বসলে পারো। তোমার তো একটুতেই গলা ব্যথা—'

'এতো কিছু হাওয়া নয়।'

'তবু সাবধান হওয়া ভালো। সেদিন পীজের জল খেয়ে কতো ভুগলে।'

'হাওয়া লাগা তোমারও কিছু ভালো না।'

'আমায় তো ডাক্তার খোলা হাওয়াতেই থাকতে বলে—'

হাওয়া হঠাৎ কেমন থেমে গেল।

প্রসঙ্গটাও।

অনেকক্ষণ পরে সুজাতা আবার কথা বললেন, 'আচ্ছা, ওদের কী নিয়ে মনান্তর হতে পারে, বুঝে উঠতে পেরেছো? পয়সার অভাব নেই, আরাম আয়েসের 'অধিবধি' নেই, সাতটা চাকর লস্কর, রাজসই কোয়ার্টার্স, স্কুলের তিন ছেলেমেয়ে, আর খোকা তো আমার যাকে বলে বৌয়ের প্রজা মাত্র। মনীষা যা বলবে, তাই হবে। মনীষার ওপর কথা চালানো যাবে, এমন কথা ভাবতেই পারে না! তাহলে?'

ভবানীবাবু আস্তে থেমে থেমে বললেন, 'ও ছাড়াও আরো কতো কারণ থাকতে পারে।'

'খোকার স্বভাব চরিত্র গঙ্গাজলে ধোওয়া। তবে আর কী কারণ থাকতে পারে জানি না। ভেবে ভেবে তো কিছুই মনে এলো না। অথচ মনীষা নাকি ভেবে দেখেছে এভাবে মনের আর মতের অমিল নিয়ে চিরকাল কাটানো যায় না।'

ভবানীবাবুর ঘাড়টা গোঁজা গোঁজা লাগলো, আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ আমাকেও খোকা ওইরকমই কী একটা লিখেছে।'

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো?'

সুজাতা বললেন, 'ওরা যদি এখানে থাকতো, হয়তো এরকম হতো না।'

'কী? তুমি সালিশী করতে?'

'আচ্ছা, খুব হয়েছে! তা বলছি না। বলছি পরস্পরের স্বভাবের মতো খোঁচা-খাঁচা, সেগুলো আমাদের ওপর এসে পড়তো। মনে করতো দুজনেই এক শাসনের নীচে, দুজনে দুজনকে তীর ছুঁড়তো না। তীর ছুঁড়লে এদিকে ছুঁড়তো!'

'এসব তোমার কথা! তুমি কি তোমার ছেলে বৌকে শাসন করো?'

'করি না! তবু ওদের হয়তো আমাদের উপস্থিতিটাই শাসন মনে হয়।'

'এও তোমার মনগড়া। আসলে ওদের সেই 'ভাবে'র আয়ুটা ফুরিয়ে গেছে।'

সুজাতা নিঃশ্বাস ফেললেন।

'খোকা কদিন থাকবে লিখেছে?'

'ক' দিন কী আবার? শুধু তো তিনটে বেলা?'

'বাস?'

'কাল একটু মৌরলা মাছ আনতে দেব, খোকা ভালোবাসে।'

ভবানীবাবু কোনো কথা বললেন না।

সুজাতা একটু অপেক্ষা করে বললেন, 'তোমার দ্বারা তো কখনো বাজার দোকান হলো না। যা করবে অবনী। সেজঠাকুরপো শুনি প্রতিটি দিন নিজে হাতে বাজার করে।'

ভবানীবাবু নীরব।

'পিকলুটা যে কী খায় না খায়!'

ভবানীবাবু উত্তর দিলেন না।

সুজাতা একটু বিরক্ত হলেন।

তারপর উঁকি মেরে দেখলেন, ইজি-চেয়ারের খোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন ভবানীবাবু।

একটা নিশ্বাস চাপলেন। চিরটাকাল মানুষটার একরকমে গেল। কথার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়া।

ভাবছিলেন, কোনো ছলে কৌশলে মনীষাকে যদি এই সময় আনা যেতো এখানে; হয়তো সব ঠিক হয়ে যেতো! সেই পরামর্শটাই করতেন একটু। ধরো যদি টেলিগ্রাম করা যায় 'সুজাতা মৃত্যুশয্যায়।' না এসে পারবে?

এখন যে আর 'সুজাতা' নামের মানুষটা মনীষার জীবনের কোথাও নেই, এমন কথা মাথায় এলোনা সুজাতার।

সুজাতা মনে মনে কল্পনা করতে লাগলেন—সুজাতা 'মৃত্যুশয্যায়' এ খবর পেয়ে ধড়ফড় করে ছুটে চলে এসেছে মনীষা, সুজাতা তখন বলছেন, 'তোমাদের এই মনোমালিন্যের খবরই আমার মৃত্যু তুল্য হয়েছে বৌমা! এসব সর্বনেশে বুদ্ধি ছাড়ো তুমি। তোমার জীবনটা যে ভেস্তে গেছে, তোমাদের ভালবাসার বিয়েতেও যে তুমি হেরে গেছো, এটা লোকসমজাকে ঢাক পিটিয়ে জানানোর মধ্যে কোনো সম্মান নেই। জগতের সামনে হেরে যাওয়া মূর্তি নিয়ে কোন্ আত্মসম্মান নিয়ে তুমি ধুয়ে জল খাবে?'

মনীষা তাঁকে মায়ের মতো ভালবাসে, শুনবে নিশ্চয় তাঁর কথা। আর এই বাড়িতে এসে যখন ওদের ফুলশয্যার ঘরটা দেখবে বৌ-বরণের উঠোনটা দেখবে, ঠিক মন ঘুরে যাবে।

সুজাতার এই কল্পনা যে কতো অলীক, সে কথা হয়তো ভবানীকুমার বুঝিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু ভবানীকুমার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুজাতার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করলেও চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন, ওঁর নিজে থেকে ঘুম ভাঙার।

ডেকে ঘুম ভাঙানোর জো নেই হার্টের রুগী—ভবানীকুমারের তাতে বুক—' ধড়ফড় করে।

মুখোমুখি

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এদিকটা অন্ধকার। পর পর রাস্তার দুটো আলো জ্বলে নি। অন্ধকার এলাকাটুকু একটু দ্রুত পায়েই পার হচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা কাতর কণ্ঠধ্বনিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কুড ইউ হেল্প মি বাবু।

নারী কণ্ঠ, শুধু তাই নয়, মনে হল এ কণ্ঠ যেন আমার পরিচিত।

ঝাঁকড়া একটা গাছ। তার তলায় অস্পষ্ট একটা ছায়ার মতন। শুধু অবয়বের কাঠামো। আর কিছু দেখতে পেলাম না।

অবশ্য পকেট থেকে কিছু খুচরো বের করে ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারতাম। আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্য যে অর্থ সাহায্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমার পকেটও তো প্রায় শূন্য।

পরিচিত কণ্ঠস্বর অতিক্রম করতে পারলাম না।

শিরজ বাবু।

এবারে আরো নিশ্চিত হলাম।

সম্পূর্ণ অসম্ভব জেনেও আন্দাজে বললাম।

নোরা।

কয়েকটা শব্দহীন মুহূর্ত। অল্প বাতাসে পাতার কাঁপন।

তারপর নিশ্বাসের শব্দ। এবারের স্বরে অসহায় আর্তি।

কে, কে আপনি ?

সঙ্গে সঙ্গে গাছের তলা থেকে ছায়া সরে এল। পথের একধারে পাশের বাড়ীর জানলা থেকে আলোর রেখা বিচ্ছুরিত হয়েছে। সেই আলোয় এসে দাঁড়াল।

এবার আমি শিউরে উঠলাম।

এলোমেলো বিশৃঙ্খল চুলের রাশ। কোটরগত দুটি চোখ, নিষ্প্রভ। সারা মুখে শ্বেতীর দাগ। পরণে তালি দেওয়া স্কার্ট।

যৌবনের ভগ্নস্তূপ। এর মধ্যে পুরনো দিনের নোরাকে আবিষ্কার করা যথেষ্ট দুরূহ।

সব বদলেছে নোরার, শুধু ওই কণ্ঠস্বর ছাড়া।

রজত।

নোরাও চিনতে পারল আমাকে।

মনে মনে হিসেব করার একটা চেষ্টা করলাম। বছর দশেক তো নিশ্চয়। তার কিছু বেশীও হতে পারে।

তখন সবে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। মারা আচমকা। কলেজ থেকে ফিরে অপেক্ষা করছিলেন বিকালের চায়ের। চাকর যখন চায়ের কাপ নিয়ে এসে দাঁ তখন বাবা নেই। হার্টফেল করেছেন।

ঘটনার আকস্মিকতা আমাকে বি করেছিল।

নামী কলেজের বাবা অধ্যাপক ছিলেন অবশ্য অধ্যাপনার খ্যাতির সঙ্গে তাল বেতনের কৌলীন্য খুব ছিল না। কলেজ ছাড়াও বাবার শেয়ার মার্কেট সেখানে ধুলোমুঠো তিনি স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছি এছাড়া, বন্ধুবান্ধবদের ব্যবসায় অথ দিতেন, যাকে বলা যায়, বিজনেস লোক

তাই বাবার মৃত্যুর পর হিসাব দেখা গেল, শহরে দক্ষিণ অঞ্চলে পৈত্রিক বাড়ী ছাড়াও নগদে ব্যাঙ্কে প্রচু লক্ষ টাকার আমি একমাত্র ওয়ারিসন

আমি তখন এম-এ ক্লাশের ছাত্র। ছিলাম অর্থনীতিতে এম-এটা পাশ বাবার সাহায্যে তাঁর কোন বন্ধুর নিজের একটা ব্যবস্থা করে নিতে পা

কিন্তু তার প্রয়োজন হল না।

বহু পরামর্শদাতা এসে জুটল। সারা শহরে আমার যে এত হিতাকাঙ্ক্ষী ছড়ানো আছে, জানা ছিল না।

কেউ বলল, ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করতে। কেউ উপদেশ দিল, বাপের মত শেয়ার মার্কেটে লেগে থাকতে, আবার কেউ পরামর্শ দিল, রেসের মাঠে পক্ষীরাজের পায়ে টাকা ঢালতে। টাকা ডবল হয়ে ফিরে আসবে।

সমবয়সী সতীর্থরা অন্য কথা বলল।

আরে বাদার জীবনটা উপভোগ কর! অর্থ যদি ভোগেই না এল, তবে তার সার্থকতা কোথায়!

মনের সঙ্গে আলোচনা করলাম।

মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স বছর সাতেকের বেশী নয়। সংসারে নারীর মমতা ছিল না। প্রায় ঝি-চাকরের হাতে মানুষ হয়েছিলাম। বাবা এত ব্যস্ত লোক ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে বিশেষ দেখাই হত না।

তবু আমার জীবন বল্গাহীন ছিল না। নিজেই একটা ছক বেঁধে নিয়েছিলাম, ছাত্র-জীবন সীমিত ছিল সেই ছকবাঁধা পথে।

বাবার সঙ্গে বিশেষ দেখা না হলেও, বাবার ছায়া গোটা সংসারের ওপর গভীর ভাবেই ছিল।

সে ছায়া আচমকা সরে যাওয়াতে, কিছুটা অসহায়ত্বের ভাব থাকলেও, তার সঙ্গে একটু যেন মুক্তির স্বাদও উপভোগ করলাম।

মানুষের মনের প্রকৃতি অনেকটা জলের মতন। যেদিকে নিচু সেদিকে যাবার প্রবণতা তার বেশী।

মনোমত সঙ্গীও জুটে গেল।

ব্যারিস্টার দীপেন বোসের ছেলে রীতেন। রীতেনও ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত গিয়েছিল, কিন্তু ছ বছর পরে ফিরল বিলিতি আদব-কায়দায় দীক্ষা নিয়ে।

এক পাড়ার বাসিন্দা। আগে অল্প আলাপ ছিল, এবার পিতৃশোকে সান্ত্বনা দিতে এসে রীতেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেল।

জীবন পানপাত্রে ভরা, মামুলি এই পরম সত্য আওড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বলল, পৃথিবীতে উপভোগের অজস্র উপকরণ ছড়ানো। জানবার জন্য, আস্বাদন করবার জন্যই এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম। সে জন্ম সার্থক করে তোলার চেষ্টা সকলেরই করা উচিত।

এই রীতেনই আমাকে রেনবো ক্লাবের সন্ধান দিয়েছিল।

শুধু সন্ধান দেওয়াই নয়, তার নতুন কেনা ফিয়াটে, অবশ্য বাপের পয়সায়, আমাকে পাশে বসিয়ে প্রথম দিন নিয়েও গিয়েছিল।

অনেকদিন আগে আমাদের বাগানে এক গোছা গোলাপ ফুল ফুটেছিল, সাদা, লাল, হলদে নানা রংয়ের। সম্ভবত গন্ধের জন্যই একঝাঁক প্রজাপতির আমদানী হয়েছিল।

রেনবো ক্লাবে পা দিয়েই আমার সেই প্রজাপতির ঝাঁকের কথা মনে হয়েছিল। বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র সাজের তরুণীর দল। বিভিন্ন প্রদেশের।

আমাদের দেশে এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত বেদনা পুঞ্জীভূত, আগ্নেয়গিরির অন্তর্বাপের উত্তপ্ত লাভার মতন, এত বিক্ষোভ সঞ্চিত। সেকথা কিন্তু এ পরিবেশে বিস্মৃতই হয়ে যেতে হয়।

রীতেনই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

ইঙ্গ-ভারতীয় মেয়ে। নাম নোরা স্মিথ। রেনবো ক্লাবের প্রাণকেন্দ্র।

বাপ অ্যালফ্রেড স্মিথ কোন এক নামী ফার্মের রেফ্রিজারেসন ইঞ্জিনীয়ার। পোশাকে, লাবণ্যে, আভিজাত্যে, চলনে, বলনে নোরা যেন যুগের প্রতীক।

গীটারের সঙ্গে একক নাচ শেষ করে নোরা তখনও হাঁফাচ্ছিল, রীতেনের ডাকে উঠে এল।

নোরা, আমার বিশেষ বন্ধু রঞ্জিত সেন।

আঁকা ভ্রূ দুটি ঈষৎ তুলে নোরা বিস্মিত হবার ভান করে বলেছিল।

একে এর আগে তো কখনও দেখি নি।

রীতেনই উত্তর দিয়েছিল।

আমার বন্ধু আজই প্রথম এসেছে এখানে।

নোরা বেশীক্ষণ থাকতে পারে নি। নাচের আসর থেকে তার ডাক এসেছিল।

সেদিন আমি চলে এসেছিলাম, কারণ রীতেনের কি একটা কাজ ছিল। তিনি [illegible] বাড়ি দিয়ে [illegible] গিয়েছিলাম।

এবার রীতেন সঙ্গে ছিল না, কাজেই ট্যাক্সিতে।

নোরা তখনও আসে নি। আসরও জমে নি।

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন বসেছিল।

প্রথম দিনই আবেদনপত্র সই করে, টাকা জমা দিয়ে আমি রীতিমত সভ্য হয়েছিলাম।

একধারে টেবিলের ওপর বহু পত্র-পত্রিকা ছড়ানো ছিল। একটা চেয়ার টেনে সেখানেই বসেছিলাম।

হ্যালো, কতক্ষণ?

নোরার কণ্ঠস্বরে চমকে পিছনে ফিরেই অবাক হলাম।

আজ তার পরণে ঝলমলে শাড়ী-ব্লাউজ। সেদিনের মতন স্কার্ট নয়।

তবে ব্লাউজ রীতিমত দুঃসাহসিক, আর শাড়ী পরার ধরনে দেহবল্লরী সুপরিস্ফুট।

সংকোচ সরিয়ে বলেই ফেললাম।

আজ এই পোশাকে খুব লোভনীয় দেখাচ্ছে।

দু গালে রক্তের আধিক্যের জন্য নোরা আরক্তিম হল কিনা, বোঝা গেল না।

পাশের চেয়ারে বসে বলল।

আজ আর নাচব না, তাই এই পোশাক।

সে সন্ধ্যায় সারাক্ষণ নোরা আমার পাশে পাশে রইল।

বাড়ীতে মা না থাকায়, কোন মহিলার আসাযাওয়া ছিল না। কাজেই তরুণীর সান্নিধ্যে অভ্যস্থ ছিলাম না। কিন্তু অস্বীকার করব না, নোরার অঙ্গরাগ, বিদেশী গন্ধসারের সুরভি রীতিমত উন্মাদনার সৃষ্টি করছিল।

রীতেন এল অনেক পরে। সঙ্গে উগ্র-আধুনিক বঙ্গললনা।

সেই শুরু। কিন্তু সেটা যে অধঃপতনের শুরু সেটা ভাবিনি। ভাবার কোন প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করি নি।

পতঙ্গ যেমন আলোর শিখাকে পরিক্রমা করতে করতে নিজেদের পাখা পোড়ায়, আমার অবস্থাও তেমনই।

রীতেনই যোগাযোগ করে অ্যাম্বাসাডার কেনাল। তার চালনচক্র হাতে তুলে নিয়ে শিক্ষকতা করল। দিন পনেরো পরেই নোরাকে পাশে নিয়ে ডায়মন্ডহারবার ঘুরে এলাম।

সামনে অবারিত জলস্রোত। এখানে হৃদয়ও যেন বাধাহীন হয়ে পড়ে।

প্রায় ঘন্টা তিনেক পর যখন মাটির পৃথিবীতে ফিরে এলাম, তখন দুজনে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা। সে বন্ধন মুক্ত করার সাধ্য বা অভিপ্রায় কোনটাই আমাদের ছিল না।

এ যুগে ধর্ম একটা বাধা নয়। তবু মনে মনে এও ঠিক করলাম যে প্রয়োজন হলে ধর্মান্তর গ্রহণ করব। ধর্ম হৃদয়ের চেয়েও বড় নয়।

নোরাই একদিন আমন্ত্রণ জানাল।

রজত, আমাদের বাড়ীতে এস। মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

যথাসময়ে গিয়ে হাজির হলাম।

অ্যালফ্রেড স্মিথ ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিলেন। পাশে নোরার মা লিজা।

অ্যালফ্রেড দুঃখ করলেন।

দেশে স্বাধীনতা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। অনেক ইঙ্গ-ভারতীয় অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন। লিজারও তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অ্যালফ্রেড বাধা দিয়েছিলেন। এ দেশের মজ্জায় মজ্জায় তিনি এমনভাবে মিশে গিয়েছিলেন যে তাঁর পক্ষে এ দেশ ছাড়ার কল্পনা করাও অসম্ভব।

অ্যালফ্রেড আসল কথা বললেন লিজা আর নোরা ড্রইংরুম থেকে সরে যাবার পর।

তুমি তো জান আমি একজন রিফ্রিজারেসন ইঞ্জিনীয়ার। আমার খুব ইচ্ছা পরের গোলামী না করে নিজে কিছু একটা করি। এদেশে একটা কোল্ড স্টোরেজ করতে পারলে প্রচুর লাভ। কোল্ড স্টোরেজ ভাড়া দেওয়া বেশ লাভজনক ব্যবসা। আমার এক বন্ধু কিছু টাকা ঢালতে রাজী। আমার সামান্য যা আছে আমি দেব। এ বিষয়ে তোমার যদি আগ্রহ থাকে, তুমি আসতে পার।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি অ্যালফ্রেডের সমস্ত কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি নি। ভেবেছিলাম নোরার বাবা-মা আমাদের দুজনকে নিভৃতে আলাপ করার সুযোগ দেবেন, কিন্তু সে আশা মনে হচ্ছে সুদূরপরাহত।

আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব মিস্টার স্মিথ।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, কোন তাড়া নেই। তুমি চিন্তা করে আমাকে খবর দিও।

দিন পনের পরে নোরাই কথাটা বলল।

ময়দানের আলো-আঁধারে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিলাম।

নোরা বলল।

রজত, তুমি বাবাকে কি টাকা দেবে বলেছিলে?

স্বপ্নের ভুবন থেকে আচমকা মাটির ওপর পড়ে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।

উত্তর দিলাম, টাকা কিসের টাকা?

নোরার হাত আমার হাতে বাঁধা। সে বন্ধন সে দৃঢ়তর করল।

বিজনেস লোন দেবার কথা বলেছিলে? তোমার কথার ওপর নির্ভর করে বাবা চাকরিতে রিজাইন দিয়েছে। নিজে কি একটা ব্যবসা শুরু করবে।

সে রাতে বাড়ীতে ফিরে হিসাবের খাতা নিয়ে বসলাম।

ইতিমধ্যেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। উপার্জন নেই, শুধু ব্যয়। এভাবে সাগরও শুকিয়ে যায়।

ঠিক করলাম, নিজের প্রয়োজনের মতন দুটো কামরা রেখে পৈত্রিক বাড়ীটা ভাড়া দেব। মাসিক স্থায়ী একটা আয় হবে।

দিন সাতেক পরে আলফ্রেড স্মিথের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা চেক তুলে দিলাম।

পরের দিন নোরা আমার সঙ্গে দার্জিলিং রওনা হল।

এর আগেও বার দুয়েক দার্জিলিং এসেছি, কিন্তু এত ভাল লাগে নি। সকাল-বিকাল ঘুরে বেড়ানো। সারা দুপুর আর রাত্রির অর্ধযাম পর্যন্ত নোরার সঙ্গে অফুরন্ত কথার ফুলঝুরি।

প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করলাম, নোরা ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন। প্রতিবন্ধক হবে আমার জীবনে এমন কেউ নেই। কোন গুরুজনের ভ্রূকুটি আমার সিদ্ধান্তকে বিচলিত করতে পারবে না। জননীস্থানীয়া কোন নারীর অশ্রুসজল অনুরোধ আমার চলার পথ পিচ্ছিল করবে, এমন সম্ভাবনাও নেই।

সুতরাং, কোথাও কোন অসুবিধা নেই।

নোরার সম্মতি পেতেও দেরী হল না।

দার্জিলিং থেকে ফেরার দিন কয়েক পরেই রীতেন এসে হাজির।

থমথমে মুখে প্রশ্ন করল।

তুমি নাকি নোরাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ?

মাথা নাড়লাম। হাঁ।

হঠাৎ এ দুর্মতি হল কেন?

দুর্মতি? তার মানে?

মানে, নোরার সম্বন্ধে কতটুকু তুমি? ধর্মের বাধার কথা আমি বলছি এ মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তোলা যায়

তুমিই তো আলাপ করিয়ে দিয়েছি

মূর্খ, রীতেন উচ্চহাস্য করল, মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া তাকে ধর্মপত্নী করতে বলা নয়। উপভোগ করার উপকরণ তুমি খুঁজে আমি সেই উপকরণ জুটিয়ে দিয়েছি এসব মতলব ছেড়ে দাও

আমরা পরস্পরকে ভালবাসি।

রীতেন উঠে পড়ল। যাবার সময় ছুঁড়ে দিয়ে গেল। ইডিয়ট।

সেদিনই সন্ধ্যায় রেনবো ক্লাবে নো বললাম।

তোমার বাবার কাছে যেতে চাই তাঁর মত পেতে বোধ হয় অসুবিধা না।

নোরা সলজ্জকণ্ঠে বলল।

আর কিছুদিন অপেক্ষা কর বাবা নতুন ব্যবসা নিয়ে ভীষণ রয়েছে। এখন তার মাথায় কিছু না।

জানতাম অ্যালফ্রেড তারকেশ্বরের কোথায় একটা কোল্ডস্টোরেজ কিনে চারপাশ জুড়ে আলুর এলাকা। হিমঘরে আলু জমিয়ে রাখে। প্রচুর সম্ভাবনা।

স্থির করলাম, একটা মাস অ করব।

ইতিমধ্যে ঘরদোর সাজাবার আরম্ভ করলাম।

অস্বীকার করব না, মনের মধ্যে বারে উপশিরার অন্তরালে তীব্র একটা যন্ত্রণার স্পর্শ। হতে হবে। নাম বদলাবে, আচা প্রতি রবিবার নোরাকে নি হাজিরা দিতে হবে।

পরিচিত পাড়ার বাজার কৌ দৃষ্টির সামনে দিয়ে।

তার চেয়ে ফিরিঙ্গিপাড়ায় বোধ বাসা নিলে হত।

মন যখন এরকম দোটানায় চঞ্চল, বাড়ীর সামনে একটা ট্যাকসি এসে দা এবং সেই ট্যাকসি থেকে যিনি নামলেন দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম।

অঙ্গে গৈরিক বাস, শ্বেত আবক্ষ মাথায় গেরুয়া টুপি, হাতে মোটা দুটি চোখের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ন।

বাড়ীর বুড়ো চাকর ছুটে নিচে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল।

ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকে নী ধরণে উচ্চস্বরে বললেন।

রজত, আমি তোমার জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই! আবছা স্মৃতির মধ্যে ছেঁড়া ছেঁড়া কয়েকটা ঘটনা। আমি খুব ছোট তখন একবার এঁকে

ছিলাম। তখন গৃহীর বেশ। শুনেছিলাম, তিনি কুমার, সংসারে বীতরাগ। এর কিছু পরেই সংসার ত্যাগ করেছিলেন।

তারপর কখনও কোন চিঠি আসতে দেখি নি। বাবার মুখে এঁর নামোল্লেখও শুনিনি।

এত বছর পরে, আজ হঠাৎ।

প্রণাম করলাম মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

নিজের আসার উদ্দেশ্য বললেন।

হরিদ্বার থেকে নেমে এসেছেন। যাবেন পুরী। হঠাৎ এখানকার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলেন দিন সাতেক এখানে কাটিয়ে যাবেন।

বলা বাহুল্য, এমন একজনের আগমনে বিশেষ খুশী হলাম না। নোরাকে দিন-সাতেক বাড়ী আনা চলবে না। রেনবো ক্লাব থেকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাড়ী ফেরার ব্যাপারেও সাবধান হতে হবে।

অথচ দিনান্তে নোরাকে একবার দেখতে না পেলে আমার অবস্থা কাহিল

বাবার মৃত্যুসংবাদ ভৃত্যের মারফৎ পেয়েছিলেন। তা নিয়ে কোন শোক করলেন না, কারণ সন্ন্যাসীর শোক প্রকাশ নিষেধ।

তারপরই আমার জীবনে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল।

জ্যাঠামশাই সাত দিনের জন্য এসেছিলেন, রয়ে গেলেন প্রায় একমাস।

পৃথিবীতে খুব ঝড়জল আরম্ভ হয়েছে। প্রকৃতি শান্ত হবার অপেক্ষায় রইলেন।

এতসব স্মৃতি মন্থন করে যখন খেয়াল হল দেখলাম নোরা আমার সামনে একভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কি ভাবছ? তোমার চেহারাও তো ভাল ঠেকছে না?

কি করে ভাল থাকবে! এই ক বছরে আমারও নিঃসম্বল অবস্থা। জমানো টাকা শেষ। বসতবাড়ীও হস্তান্তরিত।

নোরা জীবন থেকে সরে গিয়েছিল। সে রেনবো ক্লাবে আসত না, বাড়ী গেলেও দেখা করত না।

অ্যালেক্সেন্ডের কাছে ধর্না দিয়ে আসল কথা জানতে পেরেছিলাম।

নোরার দেহে কুষ্ঠের আক্রমণ শুরু হয়েছে। মুখে, গালে রক্তাভ চাকা চাকা দাগ। একদিন চোখাচোখি দেখাও হয়ে গেল।

মুহ্যমান হয়ে পড়লাম। এ রোগকে অস্বীকার করে নোরাকে ঘরণী করব এমন সাহস আমার নেই।

তোমার সঙ্গে কথা আছে রজত।

কি বল?

তোমার এক জ্যাঠামশাই ছিলেন সন্ন্যাসী, তাঁর খবর জান?

বিস্মিত হলাম। আমার জ্যাঠামশাইকে নোরার চেনবার কথা নয়। তাঁর অস্তিত্বও সে জানে না।

তুমি তাঁকে চিনলে কি করে?

উদভ্রান্তের মতন নোরা হেসে উঠল।

তাঁকে চিনব না। তিনিই তো আমার জীবনের শনি।

শনি?

এই আলো-আঁধারিতে সামনে দাঁড়ানো যৌবনের কঙ্কাল, তার তীক্ষ্ম দুর্বোধ্য সংলাপ সব যেন অপার্থিব মনে হল।

ভদ্রলোক আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন। রুদ্ধদ্বার ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা বাবার সঙ্গে আলোচনা, তারপর তাঁদের সামনে আমার ডাক পড়ল।

বাবা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল।

ইনি কি বলছেন শোন।

তোমার জ্যাঠামশাই বললেন।

তোমার আর রজতের অন্তরঙ্গতার কথা আমি সব শুনেছি মা। তোমার কথা জানি না, কিন্তু রজতের ভালবাসা খাঁটি নয়। সে শুধু তোমার যৌবনোচ্ছল দেহ ভালবাসে, মনকে নয়। এই দেহকেন্দ্রিক ভালবাসার পরমায়ু খুবই ক্ষীণ।

আমি উত্তর দিলাম, আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

তুমি প্রমাণ চাও?

চাই।

তোমার জ্যাঠামশাই পাশে রাখা থলি থেকে কয়েকটা শিকড় বের করলেন।

এগুলো বেটে মুখে মাখ। দু-তিন দিনের মধ্যে তোমার মুখে সাদা দাগ দেখা দেবে। এক সপ্তাহের মধ্যে সে দাগ অবশ্য মিলিয়ে যাবে, কিন্তু তার মধ্যেই তোমার মোহচ্যুতি হবে।

আমি বাবার দিকে চোখ ফেরালাম। বাবা সায় দিল।

তোমার জ্যাঠামশাইয়ের চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম।

কয়েক দিন রেনবো ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করলাম। তুমি বাড়ীতে এলেও দেখা করলাম না, কারণ দেখা করার আমার কোন উপায় ছিল না।

শিকড়বাটা মাখার দিন দশেকের মধ্যে মুখে কয়েকটা দাগ দেখা গেল। তোমার মনে আছে কিনা জানিনা, সেই সময় ইচ্ছা করেই তোমার সামনে একবার গিয়েছিলাম। তুমি আমার বিকৃত মুখের চেহারা দেখে আতকে উঠেছিলে।

কিন্তু পনের দিন পার হয়ে গেল। মুখের দাগ তো গেলই না, সারা শরীরে রক্তাভ দাগ ফুটে উঠল। চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

রাত্রির অন্ধকারে নিজেকে ঢেকে বাড়ী গিয়ে শুনলাম তোমার জ্যাঠামশাই চলে গেছেন। তাঁর ঠিকানা কারও জানা নেই।

উন্মাদিনীর মতন ডাক্তারের কাছে ছুটলাম। নির্মম সত্য জানতে পারলাম। কুষ্ঠ নয়, বিষাক্ত গন্ধের প্রতিক্রিয়া। এ সারবার নয়।

বাবার কাছে কেঁদে গিয়ে পড়লাম।

তার কাছে শুনলাম আমি এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। বাবা এভাবে শিকড়বাটা মাখানোর পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু তোমার জ্যাঠামশাই তাকে বুঝিয়েছিলেন, সমস্ত ব্যাপারটা সাময়িক। সাত দিন পরেই সব দাগ মিলিয়ে যাবে।

বাবার সামনে তোমার জ্যাঠামশাই আর এক লোভের প্রস্তাব রেখেছিলেন। তুমি বাবাকে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যবসার জন্য ধার দিয়েছিলে, সেই চুক্তির কাগজ তিনি বাবাকে ফেরত দেবেন। অবশ্য দিয়েও ছিলেন।

এবার নোরা কেঁদে উঠল।

আমি তোমাকে ভালবেসে, তোমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এমন কি অপরাধ করেছি রজত যে সারা জীবন আমাকে তার খেসারত দিতে হবে। পরিচিত কোন আশ্রয় আজ আর আমার জন্য খোলা নেই, আত্মীয়-স্বজন বিষাক্ত সাপের মতন আমাকে পরিহার করে। তোমার প্রেমের পরীক্ষা নিতে গিয়ে নিজেকে এমন চরম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কল্পনাও করিনি।

এই মুহূর্তে চোখের সামনে জ্যাঠামশাইয়ের মূর্তি ভেসে উঠল।

গৈরিক পরিহিত, রুদ্রাক্ষের মালা-শোভিত সংসারত্যাগী প্রাজ্ঞের মুখে কুটিল হাস্যের আভাস। বংশধরকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একি নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছিলে সন্ন্যাসী?

নোরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চরম সত্য উপলব্ধি করলাম।

সত্যিই কি জ্যাঠামশাই বংশধরকে বাঁচাতে পেরেছেন?

ওভাবে সমস্ত দেহে বিষাক্ত দাগ ফুটে ওঠে নি বটে, কিন্তু দুর্মর এক ব্যাধি কি আমাকেও গ্রাস করেনি?

নোরা জীবন থেকে সরে গিয়েছিল, কিন্তু তার দাহ, তার জ্বালা অপসৃত হয় নি। লালসা তার অক্টোপাশবাহু দিয়ে আমাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করে ধরেছিল।

ধাপে ধাপে অধঃপতনের পথে নেমেছি। এক লালসা থেকে আর এক লালসার বাহুতে দেহ তপ্ত করার প্রয়াস। এক সর্বনাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছি আর এক সর্বনাশের পঙ্ককুণ্ডে।

জমানো টাকা নিঃশেষ হয়েছে। বাড়ীও গেছে। বস্তিতে নেমে এসেছি।

নোরার মতন প্রকাশ্য পথে হাত পাততে পারি নি, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গোপন ভিক্ষাবৃত্তি চলেছে।

সেদিন নোরাকে দেখে সভয়ে সরে এসেছিলাম, আজ তো পালাবার কোন কারণ নেই। আজ দুটি বিষদগ্ধ শরীরের একই অবস্থা।

নোরাকে এই মুহূর্তে কাছে টানতে বাধা কোথায়!

সাংবাদিকের ডায়রি

লীলা মজুমদার

গোড়া থেকেই বলে রাখি যে, আমি ভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাসও করি না আবার অবিশ্বাসও করি না। মনটাকে খোলা রাখি। সংবাদিকদের যে তা না করে উপায় নেই, সে-কথা রোজকার সংবাদপত্র একবারটি খুললে, তাদের দ্বারা সংগৃহীত খবরগুলো পড়লেই বোঝা যায়। সত্যি কথা বলতে কি অনেক সময় নিজেদের জোগাড় করা একেকটা সংবাদ পড়ে নিজেদের-ই চুল-দাড়ি খাড়া হয়ে যায়। জানেনই তো যে আজ-কাল আমাদের প্রচুর চুল-দাড়ি-ও থাকে।

অবিশ্যি আমার নিজের এই অভিজ্ঞতার কাহিনী কোথাও প্রকাশিত হয় নি এবং তার সহজ কারণ হল স্রেফ—সে যাক গে, এখন আসল কথায় নামা যাক। হালের ঘটনা : বাংলাদেশ পত্তনের প্রথম উচ্ছ্বাসটা কমে গেছে, কর্তারা নতুন উত্তেজনার খোঁজে আছেন। এমন সময় লাখখানেক পরের টাকা সহকারে নরেশ নেউগীর অন্তর্ধানের ব্যাপার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে নিদারুণ চাঞ্চল্য দেখা গেল। তা তো হবেই, জনসাধারণ-ই যে ঐ হারানো টাকার বেশির ভাগের মালিক। বিকেলে বিপিনদা আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাড়ি না বীরভূমে?' 'হ্যাঁ, স্যার'।

'তাহলে বোধ হয় ওখানকার বন-বাদাড়, খানা-খন্দ, গলি-ঘুঁজি সবই তোমার নখাগ্রে। ওখানকার প্রত্যেকটি বাসিন্দার সঙ্গে নিশ্চয় তোমার ছোটবেলা থেকে দহরম-মহরম। কাজেই তোমার সাইকেলে চেপে সেখান থেকে দুষ্কৃতকারী ধরে আনা তোমার পক্ষে নিশ্চয় খুব শক্ত হবে না? অবিশ্যি, দুষ্কৃতকারীকে দিয়ে আমাদের কোনো দরকার নেই, শুধু তার সংবাদ-টুকু আনলেই যথেষ্ট। সরকারের অন্যান্য অপটু ও অক্ষম বিভাগের সহায়তা করার জন্য আমরা কিছু আপিস খুলে বসিনি। বিশেষ কিছু করতে হবে না, শুধু নেউগীর গোপন আস্তানার খবরটুকু, বাস! এটাকে কিছু একটা কঠিন কাজ বলতে পার না। আধ ঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে সন্ধ্যার গাড়ি ধরবে। সাইকেল সঙ্গে নেবে।'

আমি বললাম—'আপনার মটর-বাইকটা' 'মটরবাইক'!! বল কি!! ফট-ফট-ফট করে আধ মাইল দূর থেকে জানান দিলে কি আর নেউগীর টিকির ডগা দেখতে পাবে, সাক্ষাৎকার তো দূরের কথা। না হে ট্রেন থেকে বোলপুরে নামবে রাত-দুপুরে; কিম্বা হয়তো আরো পরে, ট্রেনের যা সময়-নিষ্ঠা। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সাইকেলে চেপে তদন্ত শুরু করবে। যাও, আর দেরি নয়।'

বললাম, 'ইয়ে, যদি কিছু ডিরেকসন দিতেন, স্যার, মানে একটা কোনো জায়গা থেকে তো তদন্ত শুরু করতে—'না হে না, একটা কোনো জায়গা না হে, সবটাকেই স্রেফ সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়াবে, চালনি দিয়ে ছাঁকবে। তবে এটুকু খবর দিতে পারি যে ইলেমবাজারের ওদিকে ঘন শালবনের মধ্যে বেশ কটা পুরনো গ্রাম আছে। কি-যেন না ভুলে গেছি, মাছের মুড়োমুড়ো খাবার তো আর পয়সা নেই যে স্মৃতিশক্তি বাড়বে। সে যাই হোক না, ঐ দিকেই কোথাও ওর পিতৃপুরুষদের আদি-বাড়ি। এ-খবর কেউ জানে না, আমিও যে খুব ভালো জানি তাও নয়, তবে ওর-ই মধ্যে খুঁজে খুঁজে দেখ না কিছু না কিছু বেরিয়ে পড়তে পারে! খরচপত্র কিছু হবে, এই নাও, ধর। তবে সঙ্গে বেশি রেখ না। জানই তো ওদিককার ঐতিহাসে ইলেমবাজারের প্যারিস শ. স্টোরে আমাদের গোড়াবাবু আছে, তার কাছে রেখে দিও নাও, আর দেরি কর না।'

অন্যদের কথা জানি না, আমার তো ওই যথেষ্ট। যথেষ্ট কেন, আশাতীত বলতে হবে। এর চেয়ে অনেক কম তথ্য থেকে কত সময় কত বড় বড়—মানে উদ্ভাবনশক্তি না থাকলে কখনো খাঁটি খবর বের করা যায়?

বিপিনদা মুখে যাই বলুন না কেন শুনেছি উনি বেলঘরিয়ার চেয়ে দূরে কখনো পদার্পণ করেন নি। ইলেমবাজার পৌঁছে, সটান গোঁড়াবাবুর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটালাম। পরদিন সকালে উঠে গোটা শালবন গোরুখোঁজা করে ফেললাম। ভাবতে পারেন, চার কিলোমিটার লম্বা চার কিলোমিটার চওড়া এক টুকরো বনভূমির মধ্যে চুরানব্বুইটি ছোট বড় গ্রাম আছে। বেশির ভাগই বেজায় পুরনো; প্রায় সবগুলোই প্রায় জনশূন্য; নেহাৎ যাদের আর কোথাও যাবার কোনো উপায় নেই, তারা ছাড়া কেউ থাকে না। ঘরদোর সব ভেঙে পড়ছে; কোনোরকমে শালকাঠের গোঁজ দিয়ে ঠেক দেওয়া হয়েছে। ঘাট বাঁধানো প্রায়—শুকনো পুকুর; বেজায় পুরনো বটগাছ;

তারি ছায়ায় তিন-চার শো বছর আগেকার টেরা-কটার মন্দির; হঠাৎ হঠাৎ বড় বড় খিলান দেওয়া দু-চারটে প্রকাণ্ড প্রাসাদ; তাদের দশা দেখলে কান্না পায়। বাড়িঘর ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরি, চারদিকে শুকনো খোলা লাল মাঠ—ধু [illegible]। আশ্চর্যের বিষয় যে, এখানকার [illegible] সংগীতের তুলনা হয় না। ঐ ধানই হল এদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। বছরে একবারই তোলা হয়; পৌষে কাটা হয়; চারদিক সুগন্ধে মো-মো করে। তবে এক জায়গায় গমের শিষ দেখে বুঝলাম আজকাল অন্য চাষের চেষ্টাও চলছে। কোনো গ্রামের চারদিকে এক মানুষ পুরু তিন মানুষ উঁচু মাটির দেয়াল; মাঝখান দিয়ে একটা চওড়া পথ গেছে, তার দুই মাথায় দেয়ালের গায়ে এক সময় দুটি দরজা ছিল, এখনো মাটির গাঁথনিতে পাথরের থামের, কামারের হাতে গড়া প্রকাণ্ড কব্জার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ঐসব জায়গায় নাকি ভুবনডাঙ্গার ঠ্যাঙাড়েদের বড় বেশি উৎপাত ছিল। সে যাই হোক, নরেশ নেউগীর কোনো পাত্তাই পেলাম না। মাঝখান থেকে শুধু খানিকটা কাঁচা পেঁয়াজ আর মুড়ি খেয়ে সারা দিন ঘুরে ঘুরে হয়রান হলাম।

বিকেলে যখন তালগাছের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে এসেছে, তখন মণি-মাধবী বলে একটা ছোট গ্রামে পৌঁছে, এক পাড়া কুঁড়েঘরের মাঝখানে দেখি দশ বিঘে মতো জায়গা ঘিরে দু মানুষ উঁচু পাকা ইঁটের পাঁচীল দেওয়া। ওদিককার গাঁগুলোর নাম ঐ রকম শুনতে মিষ্টি। জায়গাগুলো অতি বদ্। না পাওয়া যায় কোনো খাবার-দাবার, না পাওয়া যায় শোবার জায়গা। গাঁয়ের লোকদের কারো কারো পূর্বপুরুষদের অন্ততঃ অবস্থা ভালোই ছিল; এখনো তাদের নড়বড়ে বাড়িতে খালি ঘর কি আর নেই। তবু ঐ অচেনা মুখ দেখলেই কেমন সব চুপ মেরে যায়, দরজাটা এতটুকু ফাঁক করে, জায়গা নেই বলেই, দুম করে খিল তোলে। আমারো আর নড়াচড়ার ক্ষমতা ছিল না। এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে সাইকেল ঠেলে ঠেলে হাতে এই বড় বড় কড়া পড়ে গেছিল; পায়ে ফোস্কা; পেটে খিদে; চোখে অন্ধকার।

এমন সময় এক পাল ন্যাংটো ছেলে-মেয়ে বগলে ভাঙা পোলো, খ্যাপলা জাল ইত্যাদি নিয়ে, হল্লা করতে করতে, সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে, অচেনা মুখ দেখে থমকে দাঁড়াল। একটা মেয়ে বলল, 'নেউগীদের মন্দির দেখতে এসেছ বুঝি? সে তো এখানে নয়, ঐ বটতলায়। ঐ বড় বাড়িটা ওদের জামাইবাড়ি। কেউ থাকে না, সব ঘর খালি, ওখানে রাত কাটালে কেউ কিছু বলবে না। অন্দর মহলের কুয়োর জল বড় মিষ্টি। আমরা সবাই খাই।' বলে হাসতে হাসতে তারা চলে গেল। আরেকজন ডেকে বলল, 'পরশু জামাইবাড়ি নিলেম হয়ে যাবে। তবে আজ থাক না গিয়ে সেখানে। হি, হি।'

আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। সারা দিনের মধ্যে এই প্রথম নেউগীদের নাম শুনলাম। উঠে পা দুটোকে টেনে টেনে বটতলা অবধি গেলাম। ছোট একটা টেরাকটার মন্দির, তার তিন দিকের দেয়াল লেপা-পোঁছা। শুধু সামনের দিকে ভাঙাচোরা তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে, অদ্ভুত সুন্দর কারিকুরি করা, দুই পাল্লা দেওয়া, কাঠের দরজা। দরজার খিলানের ওপর দিয়ে ঘুরে ও সমস্ত সামনের দেয়াল জুড়ে, অপূর্ব নকসাকরা সব টেরাকটার টালি। তার কোনো দুটো এক রকম নয়। এক সারিতে দেখলাম হিন্দু দেবদেবীদের চেহারা; আবার তার পরের সারিতে গ্রামের

লোক, রাজা-উজীর, নবাব, আমীর, ওমরাহ, বিদেশী নাবিক, সম্ভবতঃ পর্তুগীজ বণিক, এইসব। সূর্যের পড়ন্ত রোদে তাই দেখে মুগ্ধ হলাম। ভাঙ্গা সিঁড়ির নিচে একটা টালিতে লেখা নীলমাধব নেউগী, ১২০০ বঙ্গাব্দ। মনটা ভালো হয়ে গেল বটে, সারাদিনের ভোগান্তিটাকেও সার্থক মনে হল, কিন্তু এতে তো আমার ক্লান্তিও ঘুচবে না, পেটও ভরবে না। অগত্যা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে আবার জামাইবাড়ির ধ্বংসাবশেষের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আশ্চর্যের বিষয় গাঁয়ে লোক আছে টের পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু একটা লোক এসে একটা কথা শুধোল না। এমন সময় ভাগ্য প্রসন্ন হল। জামাইবাড়ির প্রকাণ্ড ভাঙা ফটকের ভিতরে ঢুকেই লম্বা একটেরে দুটি পাকা বাড়ি। হয়তো এককালে ওদের সেরেস্তাদার মুহুরীদের বাসস্থান ছিল, এখন জীর্ণ হলেও বাসযোগ্য। বাস করেও কেউ এবং তার শখও আছে; কারণ দাওয়ার নিচে নানারকম ফুল গাছ, বেল, যুঁই, স্থলপদ্ম, কাঁটাচাঁপা। ঠিক এই সময় এক হাতে হুঁকো ধরে, ঠুকঠুক করতে করতে পরিষ্কার সাদা ধুতি ফতুয়া গায়ে, এক বুড়ো ভদ্রলোক এসে দাওয়ায় উঠলেন।

আমি এগিয়ে যেতেই দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, "না, না, জায়গা কোথায় যে দেব? জায়গা কোথাও পাবেন না মশাই। পরশু জামাইবাড়ি নিলেম হবে যারা কখনো গ্রামে আসে না, তারাও এসেছে। কিছুনা কিছু না করেও, বেশ কয়েক হাজারে বিকোবে, সবাই বলছে। সরকারের ট্যাক্সোর খাজনা শোধ হয়ে যা বাকি থাকবে, তারি ওপর সকলের নজর। অথচ কারো যদি কোনো ন্যায্য অধিকার থাকে তো সে আমার আছে। মানে আমার পরিবারের আছে। তার কত্তাদিদিমাকে তাঁর বাবা সব লিখে দিয়েছিলেন, কে না জানে। কিন্তু সে দলিল খুঁজে পেলে তবে তো! অন্য গাঁয়ে দেখুন, মশাই, এখানে আজ কেউ অচেনা লোককে ঠাঁই দেবে না।" এই বলে দিব্যি আমার নাকের ওপর দরজাটি এঁটে দিলেন।

বেজায় রাগ হল। কত্তখানিই বা জায়গা জুড়ে থাকতাম? আর খাবার? সঙ্গে খাবারের ভালো ব্যবস্থা না করে পথে পা দেবার লোক আমি নই। তাছাড়া আমাদের আপিস থেকেই সব পাথেয়র ব্যবস্থা করা হয়। বেশ জামাইবাড়িই সই। সেখানেই গেলাম। কেউ ঠাঁই না দিল তো থোড়াই কেয়ার করি। সাইকেলে বাঁধা বেতের বাক্সে সব ব্যবস্থা না রেখে, সাংবাদিকরা কখনো এরকম কাজে নামে না।

তখনো দিনের আলো ছিল। ওদিকে পূর্ণিমা হতে দিন দুই বাকি, আকাশে চাঁদও উঠে পড়েছিল। কাজেই কোনো কষ্ট হল না। জামাইবাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকে দেখি প্রথমে প্রকাণ্ড বাঁধানো আঙিনা; এতটুকু টসকায় নি। তারপর প্রকাণ্ড বাড়িটা শিরশির ঝুরঝুর করছে, বাইরের সব পলেস্তারা খসে গেছে, ইঁটের পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ছোট ইঁট, শালকাঠের আঁচে জ্বালানো, তাতে এতটুকু নোনা ধরে নি। মনে হয় অমনি তুলে নিয়ে নতুন বাড়ি তৈরী করা যায়।

বাড়ির গায়ে অন্দরমহলে যাবার মস্ত দরজা দিয়ে ঢুকে, অন্ধকার হলঘর পেরিয়ে, ওদিকে ভেতরবাড়ির উঠোনে পৌঁছনো যায়। অদ্ভুত জায়গাটা। চারদিকে চকমেলানো তিনতলা বাড়ি। তার দরজা জানলার বালাই নেই, সব শূন্যে খাঁ খাঁ করছে! কিন্তু এমন পাকা গাঁথনি যে দেয়াল কিংবা ছাদ ধ্বসে পড়ে নি। দোতলার তিনতলার কাঠের বারান্দার চিহ্ন নেই, কিন্তু বারান্দার নিচেকার কারিকুরি করা কাঠের কড়িগুলো তেমনি রয়েছে। ছাদ থেকে জল নামার নালী কাটা রয়েছে। নল হয়তো কোনো কালেই ছিল না। জল নেমে একতলার বুকের কাছে বাঁধানো লম্বা চৌবাচ্চায় জমা হত। বোধহয়, বাগানে ব্যবহার হত। সমস্ত উঠোনের ধারে ধারে কত শখের গাছ, কত যত্নে পাতাবাহার, জন্মেছে, বেড়েছে, ঝরেছে, মরেছে আবার এক নতুন বংশ জন্মেছে। এমনি কতকাল ধরে হয়েছে। জায়গাটাতে এখনো শুকনো পাতা, খসা ফুল, পাকা ফলের সুগন্ধ লেগে রয়েছে।

কিন্তু আমি তো আর কবি নই, তার উপর পেটে খিদে। চেয়ে দেখি উঠোনের কোণে ছোট্ট এক গভীর কুয়ো, একটা নুড়ি ফেলেই টের পেলাম, ভেতরে জলও আছে। এর কথাই না সেই ছোট মেয়ের কাছে শুনেছিলাম। কুয়োর পাশের একতলার ঘরটিও বেশ। হয়তো পঞ্চাশ বছর আগেও কেউ থাকত। একটা প্রকাণ্ড তক্তাপোষ এখনো রয়েছে। দেয়ালে কুলুঙ্গী। পলেস্তারা খসা, কিন্তু শুকনো খটখটে, শ্যাওলার চিহ্ন নেই। শুকনো খবার দেশ। হাওয়াটা নাকে মিষ্টি লাগল।

সাইকেলটাকে টেনে ঘরে তুললাম। বেতের বাক্স খুলে নাইলনের দড়িতে বাঁধা প্লাস্টিকের কলসি নামিয়ে কুয়োর জল তুললাম। ঢোমপরানো মোমবাতি জ্বাললাম। তেলের খুদে স্টোভ বাগিয়ে ভাতে ভাত চড়ালাম। তার সঙ্গে তেলেপানার চিংড়ি মাছের আচার। ও জিনিস যে খায় নি, সে কিছুই খায় নি। মোটেই অসুখ করে না, তেজমসলা দিয়ে এক ধোঁয়ায় এমনি পাকানো যে কখনো খারাপ হয় না। দিলাম ভাতে খানিকটা ঢেলে, চারদিক গন্ধে মোমো করতে লাগল আর আবছায়া উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ির পাশ দিয়ে, ঝটকা, বুচকুচে কালো দুই নারীমূর্তি, গায়ে সাদা চাদর জড়িয়ে, দুপাটি করে সাদা দাঁত বের করে ঘরে এসে ঢুকল। একজনের বয়স সত্তর হবে, অন্যজনও কাছাকাছি। হয়তো মাছের গন্ধেই সঙ্গে এসে ঢুকল গোটা তিন কালো বেড়াল। স্টোভ থেকে একটু দূরে তারা গোল হয়ে বসে, নখ চাটতে লাগল। বুড়িদের বললাম, "কি চান?" তাই শুনে খোনাখোনা গলায় তাদের কি হাসি। "ও মা! কি বলে! আমাদের বাড়ি ঢুকে আমাদের বলে কি চান? কত্তাদাদামশাই না এই ঘরেই ঠাকুরপুজো করতেন আর তুমি বাছা হেথা দিব্যি মাছ রাঁধছ! গন্ধে চারদিকে জানান দিচ্ছে! এ্যাঁ!"

ছোটজন বলল, "বেশ খাচ্ছেদাচ্ছে, অথচ দলিলটা খুঁজে দেবার নাম নেই! বলি ওরে অলপ্পেয়ে, কত্তাদাদার নাতনির নাতনি না খেয়ে মলে তোর কি এসে যায়, তাই বল!"

হয়তো যেখানে কুলুঙ্গির পাশে সাইকেল ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, সেখানকার দেয়ালটা কমজুরি ছিল। কিম্বা যে কারণেই হক ঠিক এই সময় ঝুরঝুর করে একরাশ বালি, সুরকি, নিচে পড়ল আর অমনি আঁই মাঁই করে তারা দুজনও ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বেড়ালগুলো তখনো ছিল, কিন্তু যেই না কুলুঙ্গির ওপর থেকে খানকতক ইঁট নেমে এল, তারাও চোঁ-চাঁ দৌড় দিল। আমি পালাই নি দরজার চৌকাঠ অবধি এসে, বড় টর্চের আলো ফেলে চারদিকটা দেখে নিলাম কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। বুঝলাম না, বাপু।

তারপর ঘরে ঢুকে বেশ করে হাত-পা ধুয়ে প্লাস্টিকের থালায় ভাত ঢেলে, নুন কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেখে, সাপটেশুপটে সব খেয়ে নিলাম। তারপর বাসনপত্র ধুয়ে তুলে, তক্তাপোষ ঝেড়ে, চাদর জড়িয়ে, সাটটা পাকিয়ে মাথার নিচে দিয়ে, এক ঘুমে রাত কাটালাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি ইঁট পাটকেলের সঙ্গে সেই হারানো দলিলটা মাটিতে পড়ে আছে। বোধহয় গোপন জায়গায় লুকোনো ছিল।

তবু মনটা খারাপ ছিল। সব তো হল, কিন্তু নরেশ নেউগীর পাত্তা কোথায় পাই? যাই হক, পায়ের ব্যথা সেরে গেছিল, সেও কম কিছু কথা নয়। যাবার আগে বুড়োর বাড়ি গিয়ে বললাম, "নরেশ নেউগীর খবর দিলে হয়তো দলিলের কিছু হদিস মেলে।" বুড়ো তাই শুনে উঠল। "ও বাটা লক্ষ্মীছাড়াকে চেনেন নাকি? কাল এসে আজ নিলেম ডাকার কথা লিখেছিল। আসে নি মশাই। আমার দূর সম্পর্কে শালা হয়, মশাই, পাজির পা-ঝাড়া!" দিয়ে এলাম দলিলটা। বাড়িসুদ্ধ সব বেরিয়ে এল। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই দুজনকে দেখলাম না। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। "মশাই, বড় উপকার করলেন। কি করে পেলেন বলুন তো?" কেন জানি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "পিওর অ্যাক্সিডেন্ট, আমার কোনো বাহাদুরি নেই।" বলতে বলতে গা-টা শিরশির করে উঠল। খালি বাড়িতে মাছের গন্ধ, উ-ফ্! কাঁচুমাচু মুখ করে আপিসে ঢুকে শুনি নরেশ নেউগী কলকাতাতেই ধরা পড়েছে।

প্রাত্যহিকী

মহাশ্বেতা দেবী

রূপা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। একবার দোকানটা পেরিয়ে ওদিকে চলে যাচ্ছিল, আরেকবার এদিকে চলে আসছিল। কাচের ভেতর দিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছিল রামলাল। যদি অন্য কোন মেয়ে হত, তাহলে রামলাল দোকান থেকে নেমে এসেই জিগেস করে বসত মতলবটা কি। কেউ ওকে কিছু বলতেও না। রামলালকে এখানে কে আর কি বলবে। কেন বলবে।

রূপা বলেই রামলাল কিছু বলল না। ওর কলেজের এক সময়ের সহপাঠীদের ও বলত রূপার জন্যে ওর রীতিমত একটা সেণ্টিমেণ্ট আছে। তখন রামলাল সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। রামলালের বাবার ছিল পয়সা। ওর নিজের ছিল স্বাস্থ্য। পিপের মত বুক, লোমশ হাতের কবজিটা এই চওড়া। শুধু স্বাস্থ্যের জন্যে ওর শরীরটা অ্যাকশান চাইত। তখন অ্যাকশান কথাটার মানে অন্য রকম ছিল। মারামারি করত, ঘুষি মেরে নারকেল ফাটাত।

আর প্রোটেকশান দিত। পাড়ার মেয়েদের ও সেধে গিয়ে প্রোটেকশান দিত। মেয়েরা ওর প্রোটেকশান নিত। কেননা রামলাল ওদের তুই-তোকারি করত। দোকানে খাওয়াত।

রূপার বাবা সাহিত্য আর রাজনীতি করত। ঝাঁকড়া চুল, গেরুয়া জামা, কাঁধে একটা ঝোলা, রূপার বাবা রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালাদের ভাই বলত, আপনি বলত। মিটিং করত, সমিতি করত, শিয়াখালার এক চাষী-বাড়ি গিয়ে মাঝে মাঝে জনসংযোগ করত। শিশুর মত হাসত। বাড়িতে বিশেষ থাকত না।

লোকটা খুব ভাল ছিল। এখনো ভালই আছে। এখনো শিশুর মতই হাসে। রিকশাওয়ালাদের ভাই বলে। কোদালে, বেড়াতে গিয়ে চাষীর বাড়ি থাকে। জনসংযোগ করে। দেখে কেউ বুঝতে ভুল করবে না লোকটা সাহিত্য আর রাজনীতি করে। বাড়িতে বিশেষ থাকে না।

রূপার মা চাকরি আর রাজনীতি করত। এখন প্রেস চালায় আর রাজনীতি করে। তাছাড়া অজস্র সমিতি, সংগঠন, বন্ধুবান্ধব। রূপার মাও বাড়িতে থাকত না। এখনো থাকে না। রূপার মা ঠিকে ঝি-কে আপনি বলে আর ওদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বলে, তাই ওদের বাড়িতে ঠিকে লোক তেমন টেঁকে না।

ওদের সংসার দেখত মনোরমা। এখন দেখে লীলা।

রূপাকে রাতদিন পথে দেখা যেত। ফুটপাথে ঘুরছে। এ-মেয়ে ও-ছেলের বাড়ি গিয়ে বসে আছে। যাদের বাড়ি তারা বাড়ি যেতে না বললে রূপা বাড়ি যেত না। সব সময়ে যেতে বললেও যেত না। বলত—

গিয়ে কি হবে?

মা-বাবা ভাববেন তোমার।

মা-বাবা ত ফিরবে রাত এগারোটায়।

একদিন রামলালের মা বলেছিল—

মেয়েটা ফুটপাথে ঘুরে ঘুরেই বড় হচ্ছে। মা-বাপ ত দেখে না। এদিকে কোন-

দিন যদি কোন বিপদ হয়? হাজার হলেও মেয়ে ত!

সেই থেকে রামলালের ওর ওপর একটা সেণ্টিমেণ্ট এসে গিয়েছিল। রূপাকে চিঠি দিয়েছিল বলে ও কুণালের মুখে ঘুষি মেরেছিল একবার। বলেছিল আমার পাড়ার মেয়েকে বেপাড়ার ছেলে হয়ে চিঠি দিচ্ছ?

রূপা কিন্তু কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। চোখটা কেমন হিংস্র আর সরু করে রামলালকে বলেছিল, লজ্জা করে না? বয়সে ধাড়ি, কড়া জোয়ান, একটা রোগা ছেলেকে মারছ? বেশ করবে চিঠি দেবে!

রামলাল বলেছিল, বাড়ি যা, বাড়ি যা!

ও বিশেষ আমল দেয়নি ঘটনাটাকে। বরঞ্চ মজাই লেগেছিল বেশ। তবে আরেকটা ছেলে একদিন স্কুটার থামিয়ে রামলালকে বলে গিয়েছিল পাড়ার মেয়ের ইজ্জত নিয়ে যদি এতই ভাবনা থাকে রামলালের, তাহলে মেয়ের দিকেও একটু নজর রাখতে হয়। সব মেয়েকে ত সব ছেলে চিঠি দিচ্ছে না। রূপা যদি স্কুলের সময়টা বাদ দিয়ে সব সময় ফুটপাথে ঘোরে আর আড্ডা দেয়, তাহলে এসব ঘটবেই।

রামলালের মনে হয়েছিল, ছেলেটা ঠিক কথাই বলে গেল। ও রূপাকে সেদিন ডেকে কথা বলেছিল।

রূপা বিরক্ত মুখ করে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। রামলাল ওকে কিছু না বলে ওদের বাড়িতে ঢুকে গিয়েছিল। রূপাকে ও ইচ্ছে করেই কিছু বলেনি। তখন স্মার-ভাঙ্গায়, স্বজাতের মধ্যে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে প্রায়। মেয়েছেলের ব্যাপারে ও জড়াতে চায়নি। তাছাড়া রূপাকে ও নেহাৎ ছোট মেয়েই ভেবেছিল। পনেরো বছর আবার একটা বয়স না কি?

কিন্তু রূপার বাবার কথা শুনে ও বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিল। রামলালকে রূপার বাবা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, রামলাল জানে না, রূপাকে একেবারে অন্যভাবে মানুষ করা হয়েছে। তাকে কে চিঠি দিল না দিল তা নিয়ে রামলালের চিন্তা করবার দরকার নেই। বলেছিল—

আমি বিশ্বাস করি না যে, রূপা সেই ছেলেটাকে কোনরকম উস্কানি দিয়েছে। কেন, আমার মেয়ে যদি তার কোন বন্ধুকে...

ব্যাটাছেলে যে মশায়!

ছেলে অথবা মেয়ে বন্ধুকে বাড়ি আনতে চায়, আনতে পারে। আমি তাকে সে-স্বাধীনতা দিয়েছি।

তা বলে বেপাড়ার ছেলে এসে আপনার মেয়েকে...

রামলাল ঘাড়, গলা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসেছিল। যা ব্বাবা, এরা যে দেখছি বেজায় আজব চিড়িয়া। এই প্রথম রামলালের নিজের মুংগেরকুমারী মা-র বুদ্ধির ওপর শ্রদ্ধা হয়েছিল।

মা ঠিকই বলে। বাপ-মা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মেয়েটাকে ভগবানের নামে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে একেবারে।

বেরিয়ে এসে দেখেছিল রূপা রাস্তার ওপারকার সিঁড়িটায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে। তখন ওর আরেকরকম সেণ্টিমেণ্ট হয়েছিল। মেয়েদের নোটন নোটন ভাব দেখলে ওর সাধারণ সেণ্টিমেণ্টটা হয় দিই ওকে জব্দ করে। ভয়ংকর বিচ্ছিরি কটা কথা বলি।

এখন রূপাকে দেখে ওর মনে হয়েছিল আরেকটু ছোট হয়ে যাক রূপা। ওকে বাবার দোকানে নিয়ে গিয়ে টুলে বসিয়ে রেখে দেবে রামলাল। হয়ত এক সময়ে একটা বিস্কুট খেতে দেবে। তারপর ওকে আরো যত্ন করে...খুব ছোট শিশুকে ধুলোয় বসে রোজ একা একা খেলতে দেখলে যেমন মনে হয়। মনে কর তোমার ঘরে সবকিছুই আছে। সেই গানের বাতি আর সাথী, তাছাড়া বিছানা-মাদুর, পরিষ্কার জামাকাপড়, মায়ের কোল। সবই তোমার আছে। শুধু তুমি যখনি জানলায় দাঁড়াও, তখনি দেখ ফুটপাথে বসে একটা শিশু রোজ ধুলো নিয়ে খেলে, রোজ ধুলো নিয়ে খেলে।

রামলালের সেইরকম সেণ্টিমেণ্ট হয়েছিল। এখন সব মনে পড়ল। এত বছর পর। রামলালের দোকানের কাচে রূপার ছায়া। ছায়াটা পড়ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে। পড়ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে।

কত বছর কেটে গেল? দশ বছর। রামলালের বয়স আটাশ হয়ে গেল। কবে বাপ মরে গেল, কলেজ ছেড়ে দিল। বিয়ে করল, দোকানে বসল। বন্ধুরা একটু ক্ষুণ্ন হল। জগত বলল, মাউড়ারা শুধু সাদী বুঝে আর পয়সা চিনে।

জগত ওকে সত্যি ভালবাসত। বন্ধুরা খুব ভালবাসত রামলালকে। তাই ত রামলালকে বিয়ের পর ওদের হোটেলে খাওয়াতে হয়েছিল।

এখন রামলালের একটা ছেলে, একটা মেয়ে। বয়স আটাশ। রূপার বয়স তেইশ। রূপা ফুটপাথে হাঁটছে আর হাঁটছে কেন? রূপার ফুটপাথে হাঁটা আর বন্ধ হল না।

সবটাই ওর ফুটপাথ। সেই এক সময় আড্ডা দেওয়া ছেলেদের সঙ্গে, পথে হ্যা-হ্যা করা। সেই ওর বাবা মার চোখের সামনে ফুটপাথে ছেলেদের সঙ্গে রং খেলা দোলের দিনে। সেই রূপাই একদিন ওকে হঠাৎ বলেছিল—

এই, আমাকে তোমার বউ দেখালে না?

তুই দেখবি?

দেখব। আমাদের যেতে বলনি কেন?

তোর বাবা ত কারো বিয়েতে যায় না।

যায় না কেন, যায়। তবে প্রেজেণ্ট দেয় না বাবা-মা। তা বলতে পার।

কেন দেয় না?

ওগুলো বাজে, ভদ্দরলোকের অভ্যেস।

রূপা নাকটা কুঁচকে রামলালের দিকে তাকিয়েছিল। হেসেছিল। দুজনেই হেসেছিল।

রামলালের বউ বিদ্যাকুমারীকে দে রূপা কি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ওর আঙুলের গয়না, চোখের কাজল, সব ভালো করে দেখেছিল। বলেছিল—

আমার সঙ্গে ভাব করবে?

বিদ্যাকুমারী ফিক করে হেসেছিল। কিন্তু রামলালের মা অপ্রসন্ন হয়ে বলেছিল,

বউ মানুষ, তোমার সঙ্গে ভাব করবে কি? ও বাড়ির বড় বউ হল। ওকে শেখাতে হবে ত! কত কাজ ওর!

রূপা আর কিছু বলেনি।

তারপরও রূপা ফুটপাথেই হাঁটত, অন্য ফুটপাথে। হঠাৎ দেখা গেল রূপা গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। সব সময়ে বই পড়ে, কলেজে যায়।

জগত, মানিক, সুমন, ওরা বলল রূপা এখন দুর্দান্ত আঁতেল হয়ে গেছে। শুধু আঁতেলদের সঙ্গে মিশছে। রূপা এখন না কি ফিলিম ক্লাব করে। কাঁধে জালের থলি ঝোলায়, তাতে বই বোঝাই করে ন্যাশনাল লাইব্রেরী যায়।

ওরা তিনজনই বলল রূপা খুব মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। আগে ও রাস্তায় দাঁড়করানো গাড়ির বনেটে বসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে, ছেলেরা একুশটা ল্যাং বললে গুনে গুনে বাইশটা ল্যাং বলত। এখন নাকি মেয়েটা হঠাৎ বেজায় লুসলো হয়ে গেছে। ওর প্রতিটি কথা যেন আইসক্রীম মাখানো।

রামলাল ওকে গড়িয়াহাটায় দেখত। গড়িয়াহাটার ফুটপাথে। একদিন বলেছিল

রূপা, তুই ভালো হয়ে গেছিস শুনলাম?

কেন, কে বলেছে?

জগত বলেছে।

হয়েছি। তুমি কেমন আছ? তোমার বউ কি মোটা হচ্ছে বল ত? সেদিন দেখলাম।

দোকানীর বউ ত। দুপুরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয় আর কি?

এই সময়েই কিন্তু রামলাল বুঝেছিল রূপার জীবনে কোন একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে। যেন রূপার বিষয়ে ওর মনে কতকগুলো রেডিওর এরারিয়েল দাঁড় করানো আছে। রূপার কিছু ঘটলে ও টের পায়। সেই যে কি একটা ছবি ওর মনে ভাসত, ওর কোন কবি বন্ধুই কি বলেছিল না কি? বর তোমার সব আছে। সেই যে গানের বাঁশি তার সাথী। আলো কত কিছু। তুমি শুধু জানলায় দাঁড়াও, রোজ দেখতে পাবে একটা শিশু ধুলোয় বসে এলোটি খেলছে মন রোজ দেখ।

রামলালের জেলাসি হয়নি। ও শুধু কৌতূহল থেকে, অসম্ভব কৌতূহল থেকে একদিন বড়বাজার কিরীতি মুরে কফিহাউসে ঢুকেছিল। দেখেছিল টেবিলে অনেক ছেলে আর মেয়ে কিন্তু একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে রূপার মুখ আলো হয়ে গিয়েছে।

ছেলেটার মুখ পাতলা, লম্বা। নাকটা একটু যেন গোলগোলো। ময়লা রং। ঘন ভুরু, পাতলা ঠোঁট। রামলাল হঠাৎ ভেবেছিল নাকের পাশে একটু কাটা দাগ এখনো আছে নাকি? এ ত সেই কুশল। সেই বেপাড়ার ছেলে। পনেরো বছরের রূপাকে চিঠি দিয়েছিল বলে ষোল বছরের কুশলকে মেরেছিল না রামলাল?

অন্য ছেলেমেয়েরাও কি ভাবে কুশলের কথা শুনছিল। তার নেতা। একটা মেয়ে নোটন হয়ে বসেছিল। ফ্যানসী। এসব মেয়ে দু চারদিন শখে ঘোরে, এখানে বসে বড়লোককে গাল পাড়ে। তারপরই গিয়ে একটা বড়লোককে বিয়ে করে। বন্ধুদের হীরের আংটি দেখিয়ে হবু বরের নাম করে বলে টুন্‌টুনে আমায় আংটি দিয়েছে।

রূপা ওর মত অপদার্থ নয়। রূপার চোখে-মুখে আলো জ্বলছিল। রূপাকে মনে হচ্ছিল নরম আলো দিয়ে তৈরি একটা নতুন মেয়ে যেন।

রূপা আর কুশল ফুটপাথেই ঘুরত। গড়িয়াহাটার ফুটপাথে ওদের খুব বেশি দেখা যেত।

তারপর একদিন কি হল, আর ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা গেল না। একসঙ্গে দেখা যাওয়ার উলটো অংকটা হচ্ছে আলাদা আলাদা দেখা যাওয়া। এক্ষেত্রে তাও হল না।

খুব দেখা যেত রূপাকে। দুপুরে ফিরছে, রাতে ফিরছে, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হতাশ আর রুক্ষ চেহারা। যেন ভেতরে ভেতরে ও জ্বলছে।

তারপর একদিন ও রামলালের দোকানে হঠাৎ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কাচে। বলেছিল

কিছু খাওয়াবে?

বলেছিল আজ বেলা তিনটে থেকে গড়িয়াহাটে এই রোদে পুড়ে, তারপর রাত ন-টা অব্দি......।

কেন রূপা অতক্ষণ গড়িয়াহাটায় দাঁড়িয়েছিল রামলাল জানতে চায়নি। কোকা-কোলা খাইয়েছিল একটা। বসে থাকতে থাকতে রূপা হঠাৎ জিগেস করেছিল ঐ কমলা রংয়ের শার্টটার দাম কত?

উগ্র কমলা রংয়ের শার্ট, গলায় চিকনের কাজ করা।

কিনতে হবে না। বিয়ে কর। আমি প্রেজেন্ট করে দেব।

রূপা কিন্তু ওর কথাটা কানে নেয়নি। যেন প্রশ্ন করেই ওর জানবার ইচ্ছে ফুরিয়ে গিয়েছিল। খুব উদাস আর করুণ চোখে ও বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। যেন সেই এক সময়কার রূপা। বাপ-মা ফিরে দেখে না, বিশ্ব সংসার উদ্ধার করে বলে যে রূপা একা একা ফুটপাথে ঘুরত, দাঁড়াত, সঙ্গী খুঁজত।

রামলাল ওকে গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। দেখলে পরে পাড়ায় বিচ্ছিরি গুজব রটত কিন্তু রামলাল অতটা তলিয়ে ভাবেনি।

তারপর গত এক বছরে রূপাকে রামলাল কমই দেখেছে।

আবার আজ দেখল, এতদিন পরে, দোকান বন্ধ করবার মুখে।

হঠাৎ ঢুকল রূপা। রামলাল জানত ও ঢুকবে। ঢুকে বলল তোমার দোকানে কমলা রংয়ের কোন জামা আছে?

সেই জামাটা ছিল না। রূপা আরেকটা জামা কিনল। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে এল। রামলাল পেছনে পেছনে এল।

ট্যাকসি খুঁজছে রূপা! চল, আমি পৌঁছে দেব।

তুমি?

রূপা ওর দিকে তাকিয়ে রইল। এখন ওর মনে হল রামলাল বোধ হয় ওকে ভালবাসত এক সময়ে। রূপা একটু হাসল। বলল ওর দাদা বউদি সবাই সরে গিয়েছে। তুমি যেতে চাও? এর মধ্যে কেউ নিজেকে জড়ায় নাকি?

কোথায় যাচ্ছিস?

হাসপাতালে।

রূপা মাথা নাড়ল। ওর চোখে জল। এখন একটা ট্রাম আসছে। রূপা উঠে বসল। রামলাল ট্রামটাকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেখল। ও বুঝতে পারল ওর জানলার কাচে আর রূপার ছায়া পড়বে না।

খুব দুঃখ হল ওর। রূপা কেন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে এখন? হাতে একটা কমলা রংয়ের জামার প্যাকেট নিয়ে? জামা-টামা কারা পায় তা কি রূপা জানে?

খুব দুর্বোধ্য আর হেঁয়ালি সব। বুকের নিচে কিসের ব্যথা যেন। রামলাল আজ দোকান বন্ধ করে আগুন জ্বালাতে, তালায় আগুন ছোঁয়াতে ভুলে গেল।

এই আমার বিশ্ব, আমার জীবন

মণীন্দ্র রায়

কার কাছে দাঁড়াব আমি এই রাতে—
এই অন্ধকারের কড়াইয়ে, কালো আগুনের তাপে উন্মাদ!
কার কাছে জুড়াব এই দাহ, যদি-না তুমি আমার আকাশ
নক্ষত্রের মশাল জেলে অভ্যর্থনা করো আমাকে?
আর, তুমি আমার মাটি, গ্রহণ করো আমাকে প্রিয়ার মতো?
কার কাছে উন্মুক্ত করব এই আমার বিধ্বস্ত হৃদয়:
কে আমাকে বাঁচাবে এই বিষের ছোবল থেকে?
আমার শিরার মধ্যে আজ সময়ের সাপ;
আমার বুকের মধ্যে তার চেরা জিহ্বায়
দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল চেতনা:
ঐ কলার মান্দাসে ভেসে যায় আমার স্বপ্ন, আমার আগামী;
আর শোকের তীর-বেঁধা অন্ধ বাঘের মতো
নপুংসক আমার বিক্রম,
নাগিনীর পায়ে সঁপে দিয়ে আমার বাঁ হাতের ঐ পুজো
পালিয়ে এসেছি এই মিনারে, এই অন্ধকারের চূড়ায়।
কার হাতে তুলে দেব আমার এই পরাজিত হৃদয়ের অস্ত্র!

ও আকাশ, আমার জন্মদিনের প্রথম নিশ্বাস,
বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলে তুমি
কোটি কোটি বছরের লুপ্ত জীবনের কান্নার আনন্দে;
তোমারই জানলায় আমার প্রথম বিস্ময়:
আমার জেগে-ওঠা যৌবনের প্রথম আলিঙ্গনের চাপা গর্জন
তোমারই কানে;
আমার প্রথম অশ্রুর নিঃশব্দ ধ্বনিও
বাঁধা আছে জানি তোমারই বুকে।
আজ মধ্যজীবনের এই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে
শোনো আমার গ্লানি, আমার লজ্জা, আমার ক্রোধ—
শিকলে-বাঁধা একপাল হিংস্র কুকুরের মতো
দু হাতে টেনে রেখেছি জন্তুগুলোকে আমার এই
বুকের গহ্বরে,
উন্মত্ত চিৎকারে তাদের কেঁপে উঠছে আমার মজ্জা,
নখের আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন আমার শিরা উপশিরা!
আমি অটল; দাঁড়িয়ে আছি যেন পাহাড়;
কে জানে আমার এই বুকের নিচে অগ্নিগিরির গর্জন,
এই লাভা!
আমার রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড আমি দু হাতে চেপে
এই নিদ্রিত নগরীর ছাদের ওপর
দাঁড়িয়েছি এসে আজ একা।
ও আকাশ, আমার আকাশ,
কাঁদিনি আমি, হারিনি:
আমার শেষ বিশ্বাসকে ধ্বনিত করে যাব তোমারই গম্বুজে।

আর, ও মাটি, আমার দেহকে ছুঁয়ে-থাকা মাটি,
তুমিও শোনো আমার এই সংলাপ,
যেমন করে শুনেছে আমার জায়া আমার শয্যায়,
শুধু বুকের ওপর বুক দিয়ে নয়,
নয় রক্তের শৃঙ্গারে শুনে রক্তের উল্লাস;
আমার বিদীর্ণ লাঙলের আঘাতকে ঢেকে দাও
যেমন তুমি শস্যে,
আমার বাড়িয়ে দেওয়া পায়ের পিছনে
যেমন তুমি ধরে থাকো দাঁড়িয়ে-থাকা পা,
আর দাঁড়িয়ে-থাকা পায়ের শুশ্রূষায়
সঞ্চারিত করো রণতুরঙ্গের সাহস,
ও মাটি, তুমিও শোনো আমার এই পতনের চিৎকার:
মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে যেমন আমি
কাৎরে উঠেছিলাম বেঁচে-ওঠার যন্ত্রণায়,
চেতনার এই দ্বিতীয় প্রসবে ছিন্নমূল আজ আমি
তোমারই করতলে;
সময়ের বিষাক্ত নাগিনী আমাকে সাতপাকে জড়িয়ে
মুখোমুখি তুলে ধরেছে তার ফণা;
আর, হা রে মানুষ, হা আমার তেজ,
তারই পায়ে দিলাম আমার বাঁ-হাতের ঐ ফুল;
আর আধখানা বাজে-পোড়া বটগাছের মতো
পুড়ে গেলাম আমি আধাআধি;
আমার এই যন্ত্রণা আমি প্রোথিত করে দেব কার বুকে?
ও মাটি, আমার জন্মদিনের মাটি।

॥ ২ ॥

ওরা বলে, মৃত আমি, বাতিল।
তবে কেন এই গরল, এই দাহ আমার শিরায়?
কেন সন্তাপ, এই দ্রোহ, আমার প্রতিবাদ;
ফাঁদে-পড়া হাতির মতো বুকচেরা চিৎকারে কেন
কেঁপে ওঠে এই আমার বনস্থলী মন?

যদি-না জ্যান্ত আমি, কেন তবে ঐ জান্তব আগুন
এমন করে পোড়ায় আমার স্নায়ু, এমন পীড়ন—
যেন বুকের ওপর বসে কেউ টেনে বার করছে
আমার হিংসা, আমার ক্রোধ, আমার অভিশাপ,
আর চেতনায় সুড়ঙ্গ কেটে ঐ আমার পাতাল,
আর তার জ্বলন্ত গন্ধক আর ধোঁয়া, আর পূতিগন্ধ নরক;
আর আমি যেন সেই স্বর্গ থেকে বিতাড়িত শয়তান—
অপমানের বজ্রগুলোকে পায়ের তলায় ফেলে
লাফিয়ে উঠতে চাইছি তার চূড়ায়,
আর প্রতিটি ধাক্কায় যেন কেঁপে উঠছে আমার সারাৎসার,
আর ফোঁড়ায় বাঁধা লাল-নীল কাচের মতো
ক্ষণে ক্ষণে বদলে ফেলছে তার বহুবর্ণ ছক।

আহ্, কী দারুণ আমার এই যন্ত্রণার!
সুন্দর আমি, হা মোহিনী, সাপের নাগিনী,
[illegible] দিয়ে গিয়েছে সময়ে দাঁড়াই [illegible] ঐ জলায়!
[illegible] ওপর [illegible] যেমন [illegible] পড়ে যেমন
[illegible] নিজের [illegible] আগুনে,
আমার মনের [illegible] পেখম উড়িয়ে দিল
[illegible] কলাপ;
[illegible] আমি, [illegible] উড়িয়ে [illegible] সাতে ভাসতে যেমন
[illegible] পার [illegible] কোনো [illegible] দ্বীপের ডাঙা,
[illegible] তেমনি [illegible] অভিযান;
[illegible] এই [illegible] আমার জোয়ার,
[illegible] পড়া [illegible] দ্যাপারই পারে
[illegible] আমার [illegible],
[illegible] নিয়ে
[illegible] প্রতিরোধে আমি দাঁড়িয়ে আছি প্রাণপণে
[illegible] পায়নি
শুধু আমারই জন্যে
[illegible] তার শক্তির শেষ [illegible] রেখে যায়
[illegible] শিরস্ত্রাণের স্ফুলিঙ্গ!

॥ ৩ ॥

স্ফুলিঙ্গই স্মৃতি এখন, কিংবা উল্কাবৃষ্টি;
আমি বুক চেপে তাই আজ দাঁড়িয়েছি এসে এই অন্ধকারে,
আর ঝড়ে ছিটকে-পড়া ঈগলের মতো বিধ্বস্ত,
মিনারের চূড়ায় ফিরে দেখছি আমার আকাশ।......
শুধু নয় যৌবন, সেই সমুদ্র-দেখা অভিযান,
নয় সেই সপ্তডিঙার উথাল পাতাল, উপকূলের খাঁড়ি,
আর অজানা বন্দরের বিদেশী মানুষ,
আর সোনা, আর ক্রীতদাস,
ভাষাহীন গণিকার চোখের বিদ্যুৎ,
আর জুয়া, আর অন্ধকারে ঝিকিয়ে-ওঠা ছুরি,
নয় শুধু সেইসব পুরুষালি কামনার রোমশ উল্লাস;

জীবন দেখেছি আমিও, তার ভেতর থেকে বাইরে,
যেমন খাটের তলায় আধো-অন্ধকারে ঢুকে
শিশু দেখে নতুন চোখে তার পরিচিত আঙিনার বিস্ময়,
আমি দেখেছি তেমনি করে মানুষকে
মানুষের ঘরে মানুষ, মানুষের বুকের মধ্যে মানুষ,
রক্ত স্মৃতি আর আগামী প্রজন্মের অভিযানের দিকে তার দ্যোতনা,
যেন টাট্টু ঘোড়ার বুকের পাশে গোড়ালির ইঙ্গিত;
ধান কেটে, ধান তুলে, ইটের পর ইট সাজিয়ে মহান;
রোদ্দুরে হীরের মতো ছড়িত হয়েছে তা পরিশ্রমের ঘাম;
আমি চোখ মেলে দেখেছি,
মাটির ওপর পা রেখে
তার পাথরে খোদাই-করা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার তৃপ্তি,
আমি হাত দিয়ে ছুঁয়েছি অন্ধের স্পর্শের মতো
নামহীন স্বপ্নের বিচিত্র কতো অবয়ব—
আর, রাত্রির নির্জন পথে দূর থেকে শোনা নর্তকীর
নূপুরের মতো
জাগিয়ে তুলেছে তারা আমাকে আকাঙ্ক্ষায়!
আমি ঘুমন্ত শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে-পড়া
বিদেশী সৈন্যের মতো
নিজের ভেতর থেকেই লুঠ করে এনেছি সোনা;
আর সে ঐশ্বর্যে ঝলমল করে উঠেছে
আমার যৌবদিনের প্রেয়সী এই আমার সংসার;
আর নাটকের রাজার মতো সিংহাসনের ওপর কাৎ হয়ে বসে
আমি হেসেছি।

সে হাসি কোথায় গেল, এই রাতে
এই অন্ধকারের ছাদের ওপর, একা,
সময় যখন বিষাক্ত নাগিনীর মতো সাতপাকে জড়িয়ে
মুখোমুখি তুলে ধরেছে তার ফণা,
আর এই মধ্যদিনের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে
তার চেরা জিহ্বায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল আমার চেতনা;
যখন পরাজয়ের পায়ে সঁপে দিয়ে আমার বাঁ-হাতের ঐ পুঁজো
পালিয়ে এসেছি এই ধিক্কারে,
আর শিকলে বাঁধা একপাল কুকুরের মতো
হিংসা লজ্জা ঘৃণার আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন যখন আমার শিরা-উপশিরা,
[illegible] করতলে পাব আমার এই জর্জরিত হৃদয়ের শুশ্রূষা?
আমার বিগত দিনকে আড়াল করে দাঁড়ায় দেখি
পাহাড়েরই মতো এক জল-বিভাজিকা,
যার করুণার সমস্ত প্রপাত ঝরে যায় আজ অন্য দিগন্তে।

হা আমার পূর্বপুরুষ, আমার আকাশভরা নক্ষত্র,
ক্রান্তিবলয়ের মাঝামাঝি আজ এই নোনাজলের সমুদ্রে
কোনদিকে ফেরাব আমার এই চিড়ধরা গলুই?
রক্তের লোভে হন্যে হয়ে ছুটে আসছে হাঙর,
আর ঝড়ের দেবতার বিদ্যুতের চাবুক খেয়ে
গর্জে উঠছে পিছমোড়া বাঁধা ক্রীতদাসের মতো মেঘ;
মরণের এই চক্রান্তে, ও আমার পিতৃপুরুষ,
তোমার আলোকস্তম্ভের বাতিগুলোও আজ
ঝনঝন আতঙ্কে ভেঙে পড়ল ঐ পাথরে;
আর 'কে' বলে চিৎকার করে উঠলে
কারা ঐ দশদিক থেকে বিদ্রূপ করে—
'কে?'

।। ৪ ।।

প্রশ্নটা আমারও ছিল, তাই
শিলালিপির হরফে যাতে ঘোষণা করে তারা আমার নাম--
বাণিজ্যে আর মন্দিরে,
কোটালের দরবারে আর শ্রেষ্ঠীজনের সভায়--
কাজকে খুঁজেছি আমি; ছুঁড়ে দিয়েছি ঐ
জলদস্যুর বুকের দিকে রক্তাক্ত আমার বল্লম;
আর, বাঁজা মাটিকে কেয়ারি দিয়ে ঘিরে
সাজিয়ে তুলেছি বাগান,
রাজনটীর চোখের মণিতে দেখতে চেয়েছি নিজের মুখ,
আর পোষা তিতিরকে কাঁধের ওপর বসিয়ে
বেরিয়ে পড়েছি শিকারে।

আর, লাথিতে লাথিতে আজ ভেঙে পড়ল
সেই আমার জয়স্তম্ভ!
কলার মান্দাসে ভেসে গেল আমার স্বপ্ন
আমার শিরার মধ্যে নড়ে উঠল সাপ;
আমি ভয়ংকর ধ্বংসের শিখরে জেগে উঠেছি আজ একা,
আর মৃত্যু তার অমোঘ ত্রিশূলে আমার পাতাল থেকে
টেনে বার করেছে শয়তান,
আর আগুন-লাগা বাড়ির মানুষের মতো
দাউ দাউ সেই শিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে
উন্মাদের মতো বার করে আনতে চেয়েছি আমার
ঝলসে-যাওয়া যতো ভালোবাসা--
আর করুণার সমস্ত প্রপাত ঝরে যায় আজ অন্য দিগন্তে!

কার কাছে তবে দাঁড়াব আজ এই রাতে?
কার কাছে উন্মুক্ত করব এই বিধ্বস্ত হৃদয়,
এই অন্ধকারের কড়াইয়ে কালো আগুনের তাপে উন্মাদ,
কার কাছে জুড়াব এই দাহ?
পৃথিবীর সমস্ত ফুটে-ওঠা ফুলের পাপড়িতে আমার তৃষ্ণা;
সমস্ত পেকে-ওঠা শস্যের মধ্যে আমার ক্ষুধা;
শিশুর গালে-নাক-ঘষা নতুন মায়ের মতো
নিবিড় হয়ে উঠতে চায় আমার মমতা;
আমার সারাদিনের ক্লান্তিকে আমি ডানার ভিতর ভাঁজ করে
পাখির মতো খুঁজে পেতে চাই আমার শাখা;
আমি পাথরের বিরুদ্ধতাকে ছেনির দাঁতে ছিঁড়ে
খুঁদে বার করতে চাই আমার অবয়ব;
আর এখন, আমার রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড দুহাতে চেপে
এই নিদ্রিত নগরীর ছাদের ওপর
দাঁড়িয়েছি এসে একা।
কার হাতে তুলে দেব এই আমার পরাজিত হৃদয়ের অস্ত্র?
হারিনি আমি, ছাড়িনি,
আমার শেষ বিশ্বাসকে ধ্বনিত করে যাব কার কানে!

।। ৫ ।।

হে আমার স্বপ্ন, আমার আগামী, আমার জীবন,
আমার ডান হাতে এখনো প্রোথিত করে রেখেছি মহাকা[illegible]
আমি পাপের ছোবলে হুমড়ি খেয়েও
দেখতে পাই তার ফণার ওপরে মণি--
আর ধিক্কার দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াই তার ছলনায়;
আমার নিভন্ত হৃদয়ের মেঘের ওপর
পেখম ছড়িয়ে দিল তার দাউ দাউ জ্বলে ওঠা কলাপ;
আর সুন্দর কেবলি আমাকে মানুষের দিকে টানে;
মানুষ আমাকে জাগিয়ে তোলে কামনায়;
আর কোটি কোটি বছরের লুপ্ত জীবনের কান্নায়
আমি চিৎকার করে উঠি!

হে মানুষ, আমার নষ্ট দিনের সাহস, আমার প্রেম,
রক্ত ক্লেদ আর যন্ত্রণার মধ্যে
জন্ম নিতে চাই আমি তোমারই ঘরে।
তুমি দুর্গম অরণ্যের বুকে কোথায় রেখেছ তোমার নির্ঝর?
আমি পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে
রাত্রির তৃষিত চিতার মতো
ছুটে চলেছি শুধু জলেরই আহ্বানে!

আর, এই আমার বিষ, আমার জীবন।।

আই-খানুমে প্রাপ্ত গ্রীক সম্রাট আগাথোকল
রাজের মুদ্রায় বিষ্ণুমূর্তি
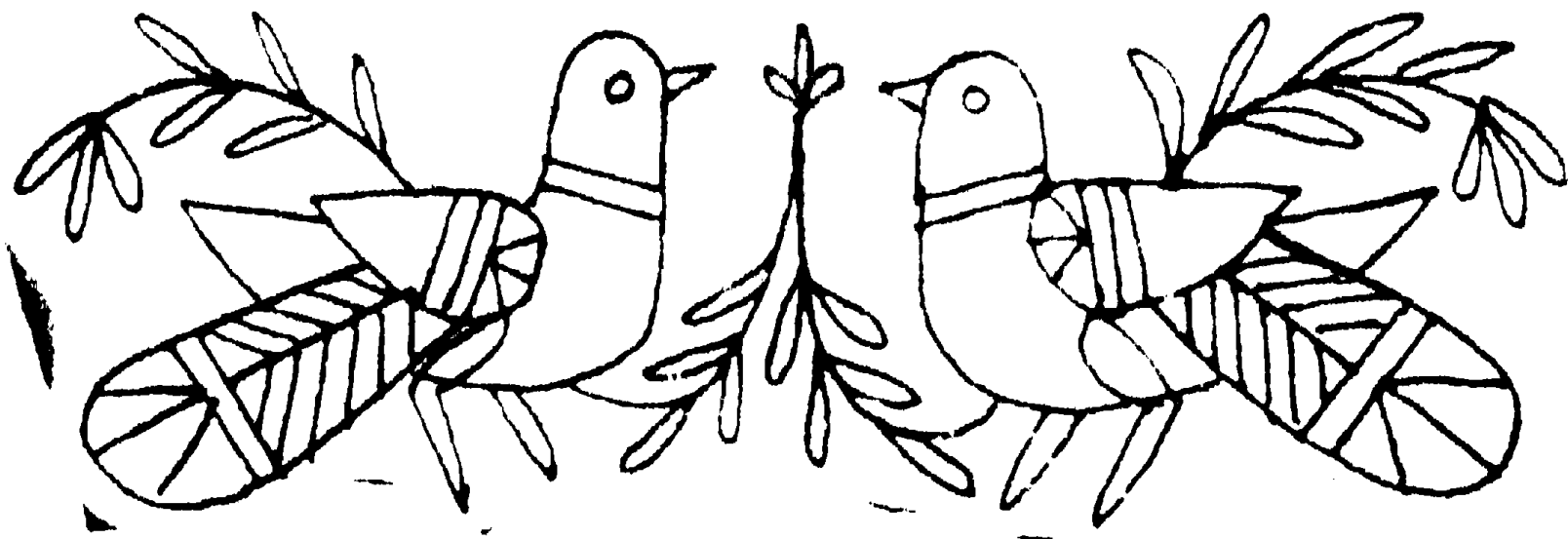
মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃতি

দিলীপ মালাকার
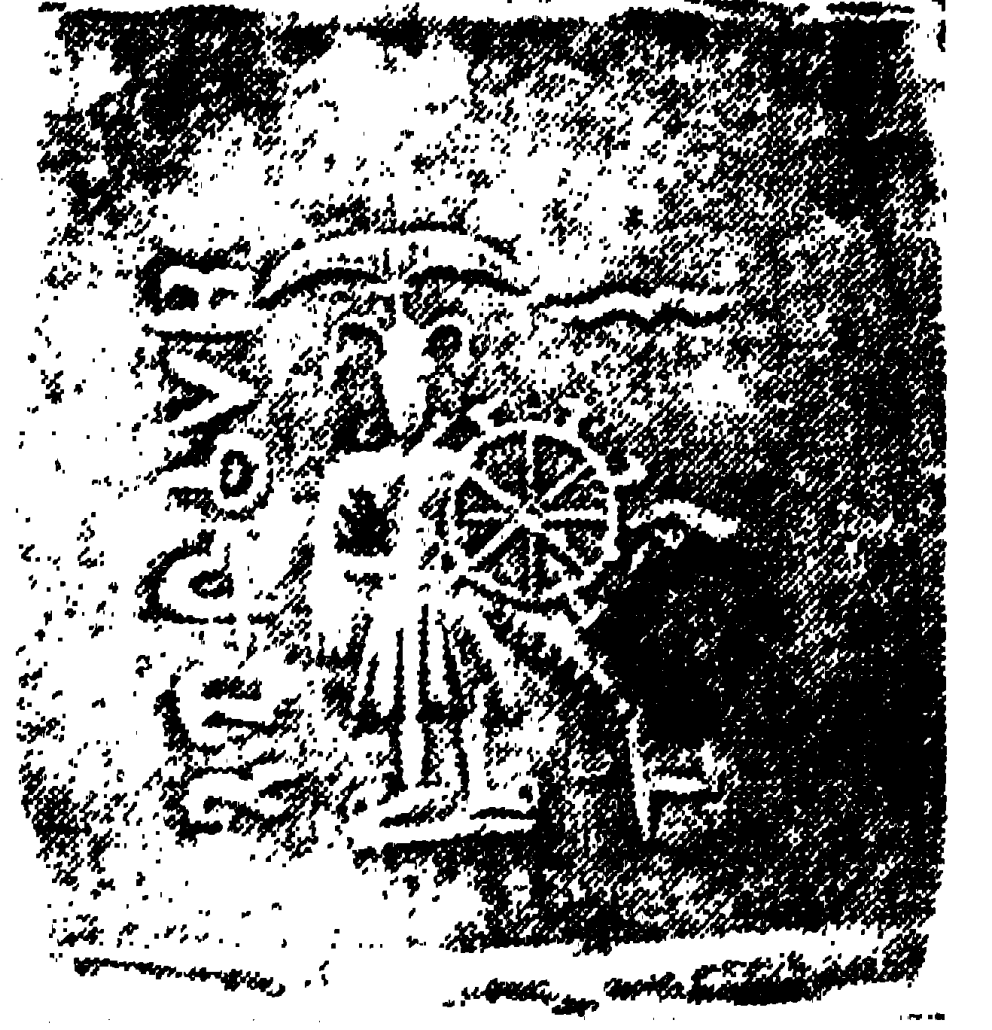
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি দল সম্প্রতি ইরানে অনুসন্ধান চালিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার ভারতীয় সভ্যতার সন্ধান পেয়েছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধানকারী দলের নেতৃত্ব করেন ডঃ ল্যামবার্গ কার্লোভস্কি এবং এই দলে একজন ভারতীয় গবেষকও আছেন, তিনি ডঃ নাগরাজা রাও।

সম্প্রতি আফগানিস্থানে মৌর্য সাম্রাজ্যের ও হিন্দু দেব-দেবীর কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছেন একটি ফরাসী অনুসন্ধানী দল। আড়াই হাজার বছরের পুরোনো কিছু মুদ্রাও তাঁরা পেয়েছেন।

আরেকটি ফরাসী অনুসন্ধানী দল হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার বেশ কিছু নিদর্শন, সম্রাট অশোকের শিলালিপি পেয়েছেন সিরিয়া ও ইরাকে।

ইরানের শোগান উপত্যকায়, পারস্য উপসাগর থেকে ষাট মাইল উত্তরে টেপ ইয়াহিয়া স্তূপ খনন করে মার্কিন অনুসন্ধানকারী বলেছেন, ছোটখাট একটি শহর ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে ছিল এতদিন, বহু নগর জীবনের সব নিদর্শন তাঁরা পেয়েছেন, এবং এই শহরটি ছিল সিন্ধু উপত্যকা ও মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে সংযোগস্থল। এর ইতিহাস মহেঞ্জোদড়োর সমান অথবা কয়েক'শ বছরের বেশী পুরোনো, সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্বাব্দ ২৯০০ থেকে ২৭০০-র মধ্যে।

মেসোপোটেমিয়া অর্থাৎ বর্তমান ইরাক ও সিন্ধু উপত্যকা অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তানের মধ্যে জলপথে যে বাণিজ্য হত সাড়ে চার হাজার - পাঁচ হাজার বছর আগে তখন টেপ ইয়াহিয়া নগরটির গুরুত্ব ছিল সংযোগকারী বন্দর-নগর হিসেবে। দুই দিক থেকে সমান দূরত্ব ছিল ছ'শ মাইল। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, তখন নৌ-বাণিজ্যে ব্যবহার হত 'চালান বিল', বাণিজ্যের ভাণ্ডার বাণিজ্যের নির্দেশনামা, তার শিলমোহর কিছু খোদাই করা পাথর পাওয়া গেছে।

খাদ্যশস্য মজুত করার গোলা, আধার ইত্যাদিও পাওয়া গেছে সেখানে। ইঁটের তৈরী বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাটের নমুনার সন্ধান মিলেছে। এই সব নমুনা, শিলমোহরে ভাষার নমুনা দেখে অনুসন্ধানকারী ভারতীয় সভ্যতার কথাই বলেছেন। অথবা ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল ছিল ঐ সভ্যতার।

মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন নগর জীবনের যে সব ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে আছে, টেপ ইয়াহিয়ার নগর জীবন তাদের চেয়ে আরও এক হাজার বছরের পুরোনো। ওই নগরে ছিল সেক্রেটারিয়াট বিল্ডিং অর্থাৎ সচিবালয়, দপ্তরে ছিল সরকারী বাণিজ্যিক কাজে লেন-দেনের শিলমোহর, আর্থিক লেনদেনের হিসেবপত্র, মৃৎপাত্র ও অফিসে ব্যবহৃত বহু সাজ-সরঞ্জাম। নগরজীবনে যে ধরনের নিয়মকানুন ও দ্রব্যাদি থাকা উচিত তার অনেক কিছুর নিদর্শন পাওয়া গেছে সেখানে। অতি উচ্চ মানের নাগরিক সভ্যতা সেখানে বিরাজ করত। নিরক্ষর জ্ঞানের গ্রাম্য জীবন থেকে এই সভ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এই সভ্যতা বিরাজ করেছে খৃষ্টপূর্বাব্দ ২৯০০ থেকে ২৫০০এর মধ্যে। পারস্য উপসাগরের ওপরে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে যে প্রাচীন এলাম সাম্রাজ্য ছিল, টেপ ইয়াহিয়া সভ্যতা তার চেয়েও প্রাচীন।

পাঁচ হাজার বছর আগেকার মেসোপোটেমিয়ার 'সুমের' সভ্যতার যে সব দলিল পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায়, তিনটি স্থানের নাম, যেমন, দিলমন, মগন ও মেলুহা। এখন বোঝা যাবে যে, ঐ দিলমন হল পারস্য উপসাগরে বাহেরিন দ্বীপপুঞ্জ, মেলুহা হল সিন্ধু উপত্যকা এবং মগন হল পারস্য উপসাগরের উত্তর উপকূল অঞ্চলটি। মার্কিন অনুসন্ধানী দল বলেছেন, টেপ ইয়াহিয়াই হল মগন।

টেপ ইয়াহিয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি ইঁটের তৈরী বিরাট বাড়ী পাওয়া গেছে, যেটি দেখে মনে হয় কোনো অবস্থা-

টেপ ইয়াহিয়ার ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলমোহর
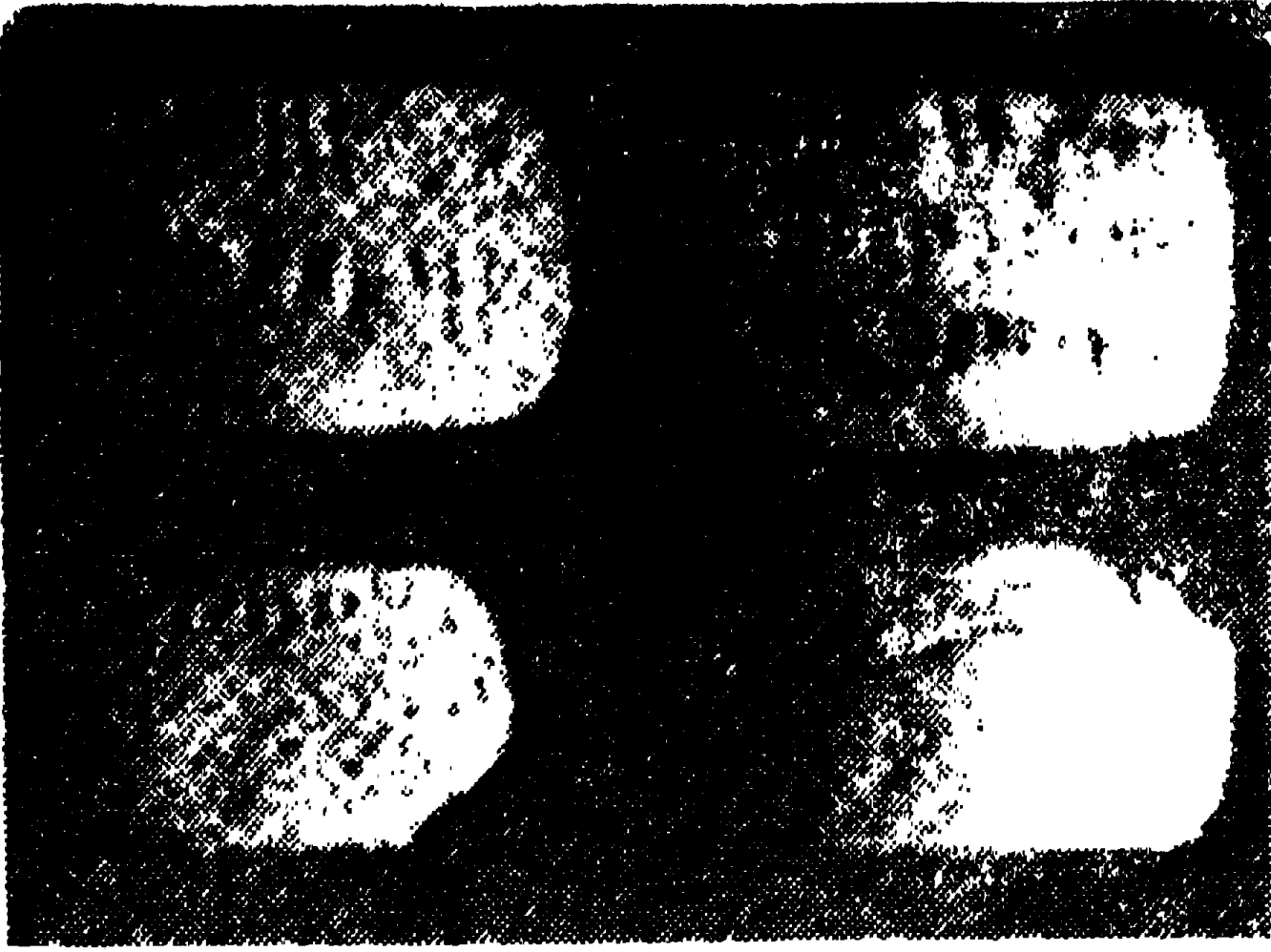
পন্ন জমিদারের বাড়ী, কৃষকদের কাছ থেকে শস্য কিনে বিদেশের বাজারে লেনদেন করতেন, এবং তার জন্য ছিল তার একটি অফিস, কর্মচারী ইত্যাদি। এসব দেখে উন্নত মানের সভ্যতাই প্রমাণিত করে। আরও যে সব জিনিষপত্র, শিলালিপির ভাষা পাওয়া গেছে তা দেখে মনে হচ্ছে সেগুলো সিন্ধু সভ্যতার একটি শাখা বিশেষ। ওই সময়ে সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে নৌ বাণিজ্য চলত।

একটি বাড়ীতে পাওয়া গেছে অফিসের ব্যবহৃত টেবিল, টেবিলের ওপর রয়েছে শিলমোহর, ছোট ছোট ঘটি-বাটি ইত্যাদি।

অনুসন্ধানীরা জানিয়েছেন, যে সব শিলমোহর, দলিলপত্র পাওয়া গেছে, সেগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসেব, বিল-বই, রসিদ, চালান-বিল, বন্দরে জাহাজ ভেড়ার নথীপত্র, শস্যের হিসেব ইত্যাদি। কিন্তু ধর্ম বা ইতিহাসের কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন বা লেখন পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বন্দরে ব্যবসায়ীদের দপ্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসেব তারা রাখত। ধর্ম বা সংস্কৃতির ইতিহাস রাখত না।

টেপ ইয়াহিয়ায় যে সব চীনামাটির পাত্র ও এক ধরনের নরম পাথরের পাত্র পাওয়া গেছে সে ধরনের পাত্রের সন্ধান সিন্ধু উপত্যকায়ও মেলে। একই ধরনের নরম পাথরের খনি ছিল সিন্ধু উপত্যকায়, দিক দিয়ে বিচার করলে সিন্ধু উপত্যকার মেসোপোটেমিয়া ও টেপ ইয়াহিয়ায়। সব সভ্যতার বিস্তৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয় টেপ ইয়াহিয়ায়।

হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদরো সভ্যতার বিস্তৃতি শুধু সিন্ধু উপত্যকায়ই নয়, গুজরাট ও রাজস্থানে ইদানীং তার বহু নিদর্শন পেয়েছে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। তারই সীমানা এখন দেখা যাচ্ছে সুদূর ইরান ও ইরাকে। এ বিষয়ে আরও আলোকপাত হলে, আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে।

ইদানীং একটি ফরাসী অনুসন্ধানকারী দল আফগানিস্থানের আই-খানুমে অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে খৃষ্টপূর্বাব্দ তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতকের মৌর্য সাম্রাজ্যের মুদ্রা ও হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিকৃতি পেয়েছে। এই অঞ্চলটি খৃষ্টপূর্বাব্দ চতুর্থ শতকে ছিল গ্রীক - ব্যাকট্রিয়ান সাম্রাজ্যের এলাকা। এই পথ দিয়েই গ্রীকরা ভারতে প্রবেশ করে।

আই-খানুমের ধ্বংসস্তূপ থেকে যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। ওই জায়গাটা ছিল গ্রীক সাম্রাজ্যের এলাকা। ওখানে গ্রীক দেব-দেবীর বদলে পাওয়া গেছে বিষ্ণুর মূর্তি। মধ্য এশিয়ায় গ্রীক সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনায় যতখানি রসদ জোগাতে পারে এই সব অনুসন্ধান তার চেয়েও বেশী রসদ জোগাবে ভারতীয় সভ্যতার আই-খানুমে'এ গ্রীক সম্রাট আগাথোক্লে এর রাজত্ব চলেছিল খৃষ্ট-পূর্বাব্দ দেড় শতকে, সম্রাট আগাথোক্লের মুদ্রার এক পিঠে কোনো গ্রীক দেব-দেবীর মূর্তির বদলে পাওয়া গেছে বিষ্ণুর মূর্তি। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্বাব্দ তিন-চার শতকে অন্ততঃ আফগানিস্থানের ঐ অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার প্রাধান্য ছিল এটাই প্রমাণ করে।

সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য শুধু ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তারিত হয় ইরান, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া এমন কি গ্রীসের প্রান্ত পর্যন্ত। এ সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সেমিটিক ভাষার অধ্যাপক আঁদ্রে দুপঁ - সোমের। অধ্যাপক দুপঁ - সোমের বলেছেন, অশোক সাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তারিত ছিল মধ্য প্রাচ্য ও গ্রীসের প্রান্তসীমা পর্যন্ত। তার প্রমাণ-স্বরূপ আরামীন ভাষায় লেখা একটি অশোক শিলালিপির পাঠোদ্ধার করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। বর্তমান সিরিয়া ও ইরাকে খৃষ্টপূর্বে প্রচলিত ছিল সেমিটিক ভাষা গোত্রের এই আরামীন ভাষা। আরামীন ভাষায় লেখা শিলালিপিতে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কথা লেখা আছে এবং এতে বহু সংস্কৃত শব্দও পাওয়া গেছে।

এই শিলালিপিটি পাওয়া যায় আফগানিস্থানের কান্দাহার (সেকালের গান্ধার) শহরের এক বাজারে বছর কয়েক আগে। ইতালির এক সংগ্রহশালায় এটি এখন জমা আছে। ঠিক এই ধরনের আরেকটি শিলালিপি পাওয়া যায় বছর কয়েক আগে গ্রীক ভাষায়। সে সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ করেছেন আরেক ফরাসী অধ্যাপক দানিয়েল স্লুম বাজার। সেই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোকের প্রভাব গ্রীসেও পৌঁছয়।

আরামীন ভাষার শিলালিপির মতন ভারতীয় ভাষায় আরও দুটো শিলালিপি আবিষ্কার করেন অধ্যাপক দুপঁ - সোমের ১৯৫৮ সালে তক্ষশীলা (পাকিস্তান) ও আফগানিস্থানের পল-ই-দারুণ্ঠ গ্রামে। অধ্যাপক দুপঁ - সোমের বলেছেন, খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল সমগ্র ভারত ও আফগানিস্থান জুড়ে এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে প্রতিনিধি পাঠান সুদূরে ইরান ও গ্রীসে।

আরামীন ভাষায় লেখা শিলালিপি থেকে জানা গেছে যে, অশোকের প্রতিনিধিরা সিরিয়া ও ইরাকেও গিয়েছিলেন এবং প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অবশ্য মধ্য প্রাচ্যে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃতি অশোকের সময়েই ঘটেনি, তারও বহু পূর্বে খৃষ্টপূর্বাব্দ আড়াই-তিন হাজার বছরেও যে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ছিল সে আলোচনা আমরা আগেই করেছি।

আমরা নাটক করব

সুশীল রায়

মনোরঞ্জনের বৈঠকখানা-ঘর

এখানে রোজ আড্ডা বসে। আড্ডার অনুপান চা আর বিস্কুট। এবং সেই সঙ্গে তাস। কতকগুলো চায়ের পট পড়ে আছে। তাস চলেছে। মনোরঞ্জন, হৃদয়, অবিনাশ, পুলকেশ—এই চারজন খেলছে। বুকের মধ্যে হাঁটু গুঁজে এক পাশে বসে দুলছে ত্রিদিবেশ।

এমন সময়ে নিত্যানন্দের প্রবেশ

নিত্যানন্দ : বাস্, বাস্, বাস। জুটে গেছ পঞ্চপাণ্ডব? সেই এক কাজ—সেই আড্ডা, সেই তাস?

[কেউ ফিরে চাইল না। ত্রিদিবেশের হাতে তাস নেই, সেই কেবল তাকাল]

তুমি কি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নাকি হে ত্রিদিবেশ? তুমি দিব্যি গা বাঁচিয়ে বসে আছ? এই পাপিষ্ঠদের থেকে আলাদা হয়ে?

ত্রিদিবেশ : আমরা পঞ্চভ্রাতা। এখানে পাঁচজনে আমরা সমবেত। আমার কোনো ভ্রাতা পাপিষ্ঠ নয়। আমি যদি ধর্মরাজ, আমি ধর্মাত্মাই। আমার এই চারভ্রাতা—মনোরঞ্জন হৃদয় অবিনাশ পুলকেশ—এরাও আমার মতই—

পাত্র-পাত্রী

মনোরঞ্জন হৃদয় অবিনাশ পুলকেশ ত্রিদিবেশ নিত্যানন্দ	ছয় [illegible]

মালতী ॥ মনোরঞ্জনের শ্যালিকা

মনোরঞ্জনের স্ত্রী

একটি মেয়ে : বয়স নয়-দশ

একটি ছেলে : বয়স পাঁচ-ছয়

নিত্যানন্দ : দুরাত্মা। সব ক'টা দুরাত্মা। শুধু আড্ডা, শুধু আড্ডা। এভাবে সময় নষ্ট করলে গভীর গাড্ডায় পড়তে হবেই তোমাদের।

মনোরঞ্জন : ডোন্ট ডিসটার্ব।

অবিনাশ : ডোন্ট ডিসটার্ব। সিট ডাউন।

নিত্যানন্দ : স্ট্যান্ড আপ্। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। ওঠো, জাগো। এভাবে ঝিম মে[রে] বসে থাকলে, হে পঞ্চপাণ্ডব, আমাদে[র] পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

পুলকেশ : উঃ, বড্ড কঠিন বাংলা বলছে[ন] ডিক্সনারি খুলে মানে দেখে নিত[ে] হবে। অবশ্যম্ভাবী মানে কী হে? পরাজয় কিসের হে?

নিত্যানন্দ : হে কৃষ্ণ, হে বাসব! হে ভগবা[ন] হে জগদীশ্বর! এদের সুমতি দাও এরা তাস নিয়ে কালক্ষেপ করছে এদের একটু তাসাও।

অবিনাশ : (হাতের তাস রেখে) আম[রা] সবাই মিলে তোমাকে তাসাব। রো[জ] হুট করে আসবে, রোজ ডিসটা[র্ব] করবে। শোনো হে মনোরঞ্জন, তোমা[র] এ বৈঠকখানা আমরা ছাড়ব। ঘাঁটি বড্ড জানাজানি হয়ে গিয়েছে। হু[ট] পাট করে অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে পড়ছে এতে আমাদের কাজের খুব ক্ষ[তি] হয়ে যাচ্ছে। চলো, আমরা চলে যা[ই] অজ্ঞাতবাসে।

নিত্যানন্দ : যাহার বিনাশ নাই তাহাকে কহে অবিনাশ। তোমার নাম সার্থ[ক] হে অবিনশ্বর মহাপুরুষ।

অবিনাশ: আর, তোমার নাম নিত্যানন্দ কে রেখেছিলেন? যিনিই রাখুন, তাঁর দূরদৃষ্টি আছে। নিতাই যে অনেক কাজ বন্ধ করে সেই তো নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ: অহো! কী বুদ্ধি! পুঁতিলে গাছ হইবে। অহো, কী ব্যাকরণ জ্ঞান, ইঁহার ব্যা করণই কর্তব্য। নিত্য প্লাস আনন্দ হচ্ছে নিত্যানন্দ—একে বলে সন্ধি, নিত্য যাহার আনন্দ তাকে বলে সমাস। এর সঙ্গে বন্ধের কোনো সম্বন্ধ নেই।

মনোরঞ্জন: আরে, এ-যে বড় মাস্টারি আরম্ভ করে দিল!

নিত্যানন্দ: মাস্টারি নয় হে, মাস্টারি নয়। আমি যে নিতাই আনন্দ, এই সোজা কথাটা—

মনোরঞ্জন: খুব হয়েছে। বোসো। বসে যাও। সিট ডাউন।

নিত্যানন্দ: নো, নো, নো। স্ট্যান্ড আপ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। উঠে দাঁড়াও, জেগে ওঠো। আড্ডা হচ্ছে গাড্ডা, তাস হচ্ছে সর্বনাশ।

অবিনাশ: তবে, করতে হবে কী?

নিত্যানন্দ: উঠে দাঁড়াতে হবে, জেগে উঠতে হবে।

অবিনাশ: তৎপর?

নিত্যানন্দ: তার পরে যা করতে হবে তার নাম নাটক। গলা শুকিয়ে গেছে, চা বোলাও।

মনোরঞ্জন: চা খেতে হলেও তো বসতে হবে। (জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে) কণা এসেছে। চা লাগবে এখানে।

নিত্যানন্দ: কথাটা কি যেন বললে?

মনোরঞ্জন: তোমার কর্ণ নাই? শুনতে পেলে না?

নিত্যানন্দ: আছে কর্ণ—এক জোড়াই আছে। সেই কর্ণদ্বয় দিয়েই তো শুনলাম—

মনোরঞ্জন: যা শুনেছ ঠিকই শুনেছ। তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে ঠিকই।

পুলকেশ: কী ব্যাপার হে! এমন কঠিন কঠিন বাংলা বলছে সকলে—

নিত্যানন্দ: নাটক। আমরা নাটক করব। এ তারই মহড়া।

পুলকেশ: ক্ষেপেছ! নাটক বললেই নাটক! কড়া-কড়া বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেই বুঝি নাটক করা যায়? নাটক বুঝি অতই সোজা কাজ?

নিত্যানন্দ: পৃথিবীতে সব কাজই কঠিন। যতক্ষণ তুমি না-শিখছ ততক্ষণই কঠিন। শিখে নিলেই সোজা। যোগ অঙ্ক যখন জানতে না তখন মনে হত-না, যোগই জানিনে, লোকে ভাগ করে কী করে? যখন এম-এ-ডি ম্যাড জানতে না তখন ম্যাডাগাস্কার বানান সাংঘাতিক কঠিন মনে হত না?

মনোরঞ্জন: ম্যাসাকার করল দেখছি। লোকটা এম-এ-ডি-ই হয়েছে নিশ্চয়। মাথার ট্রিটমেন্ট করানো দরকার হয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে।

নিত্যানন্দ: তা করিয়ো পরে, আগে আমাদের নাটকের ট্রিটমেন্টটি হোক—এটা একটু ভেবে করতে হবে—

(চায়ের পট নিয়ে মালতীর প্রবেশ)

নিত্যানন্দ: চাতক হয়ে আছি। নিয়ে আসুন, নিয়ে এসো, নিয়ে আয়— এত আনন্দ আমার হয়েছে যে, কাকে কী সম্বোধন করে থাকি সব ভুল হয়ে গেছে। চা-তক কেবল আজ ঘনিষ্ঠতা নয়, মালতী, আমরা আজ চলে যেতে চাই নাটক-তক। ইউরেকা, ইউরেকা!—কে বলেছিল হে?

হৃদয়: আর্কিমিডিস, হে, আর্কিমিডিস।

নিত্যানন্দ: (হতাশভাবে) হল না। সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। তোমাকে অমন পাণ্ডিত্য জাহির করতে কে বলল হে, হৃদয়? ওটা বাত-কী-বাত, ও-রকম জিজ্ঞাসা করতে হয়, কিন্তু উত্তর দিতে হয় না। উত্তর দিলে, এতে তোমার পাণ্ডিত্য জাহির হল, তোমার মতন বিদ্বান ত্রিভুবনে নেই তার প্রমাণ হল। কিন্তু কী ক্ষতি তুমি করলে তা জান? এখানকার আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মালতী: আবহাওয়ার কি হল জানিনে, কিন্তু, চা কিন্তু গেল জল হয়ে।

নিত্যানন্দ: কী সুন্দরভাবে বললেন—বললে—বললি কথাটা, হৃদয় আমার জল হয়ে গেল। এক্সকিউজ মি মনোরঞ্জন, একটু অনধিকার চর্চা করে ফেলছি, তোমার শ্যালিকা, তুমিই এর মালিক। এক্সকিউজ মি হৃদয়, তোমার নামটা ব্যবহার করে ফেলেছি। কিন্তু এর কথায় যা জল হয়েছে তা তোমার কিছু নয়, সে আমারই হৃদয়।

মালতী: আপনাদের ঐ জিনিসটা বুঝি বরফ দিয়ে তৈরি? একটুতেই যে জল হয়ে যায়?

নিত্যানন্দ: (চায়ে চুমুক দিয়ে) হবে, হবে, হবে। ইউরেকা, ইউরেকা। দোহাই, আবার কেউ বিদ্যে ফলিয়ে বোসো না। হাওয়াটা আমি জলবৎ রাখতে চাই, তা যেন কঠিন বরফবৎ না হয়ে যায়। কিন্তু সবার আগে একটা কথা এই তাসের আসরে বা আড্ডার গাড্ডায় জানাতে চাই যে, আমাদের কারও হৃদয়ই বরফ নয়, বরফের মত ঠাণ্ডা নয়, বরফের মত কঠিন নয়—

হৃদয়: ওয়া। সুন্দর বলেছ নিত্যানন্দ। ঠিক হৃদয়ের কথাটাই বলে ফেলেছ। ইউরেকা, ইউরেকা—

নিত্যানন্দ: অর্থাৎ—

হৃদয়: পেয়ে গেছি। পেয়ে গেছি আমাদের মুখপাত্র, আমাদের সবার হয়ে যে কথা বলবে, সকলের হৃদয়ের কথা যে-যাকে বলে—প্রকাশ করবে।

পুলকেশ: কঠিন অবস্থা। সকলেই বেশ গুছিয়ে কথা বলছে, কাজ গুছিয়ে নেবার জন্যে সকলেই যেন বেশ তৈরি। এ বিষয়ে মালতীর বক্তব্য যদি কিছু থাকে, আমরা তা জানতে পারলে—

মালতী: সে কথা খুলে বললে হার্ট-ফেল করতে হবে।

হৃদয়: আনন্দে, না, বেদনায়? এটুকু অন্তত খোলসা করে জানতে পারব কি?

মালতী: কোথায় যেন পড়েছিলাম—মরি কি না-মরি তা পরখ করে দেখার জন্যে মারাত্মক বিষ খাওয়া, সেই রকম অবস্থা আর-কি!

পুলকেশ: আজ অবস্থা বড় কঠিন। সকলে কঠিন কথা বলছে—জ্ঞানের কথা বলছে, নাটকের কথা বলছে, হার্ট-ফেলের কথা বলছে। এর মধ্যে তাস খেলা পণ্ড হল, হা তাস হা তাস করছি মনে মনে, আর, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি সকলেই কতটা হতাশ।

মালতী: বাব্বা! কথায় কথায় কেবল কবিতা!

হৃদয়: কেউ আনে বিষ, কেউ-বা বালিশ। মালতী, তুমি যে একটা বিষবাড়ি, এ কথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি যে বিষ-কুম্ভ এ কথাও আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি প্রত্যাহার করো তোমার মারাত্মক বিষের কথা, আমি তবে পুলকেশকে দিয়ে তার কবিতা উঠিয়ে নেব।

পুলকেশ: আমার কবিতা কোথায় পেলে? আমি কবিতার ক জানিনে, আমার নামে এ কী দুর্নাম?

হৃদয়: মিথ্যে কথা বোলো না এই মাত্র তুমি যা তাস বলেছ, তার সঙ্গে হতাশ বলেছ। এটা কবিতা না?

পুলকেশ: একে বুঝি কবিতা বলে?

হৃদয়: ইয়েস। আলবৎ। একটু মিলের গন্ধ আছে, ছন্দ থাক বা না-থাক, ভাব থাক বা না-থাক, একটু ইয়ে ইয়ে ভাব—তাকেই সকলে কবিতা বলে। ঐ জিনিসই জোর চলেছে। পড়াশুনো কি করা হয় কারও, কাগজপত্রে পাতা উল্টানো হয়। চোখে পড়েনি এরকম জিনিস? বালিশ!

নিত্যানন্দ: সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমরা নাটক করব বলে তৈরি হচ্ছি, তার মধ্যে এসে গেল কবিতা, সেই কবিতা! সমালোচনা-প্রসঙ্গে হৃদয় যা বলল তা আবার একটা প্রবন্ধ। কিন্তু, আমার জিজ্ঞাসা—নাটক কি হবে না? নাটকের বিরুদ্ধে তোমাদের সংঘবদ্ধ এই চক্রান্ত, একে বানচাল করতেই হবে, মালতী।

মালতী: বা, বেশ মজা। নিজেরা-নিজেরা ঝগড়া করবে, আর, বিপদে পড়লেই—মালতী!

হৃদয়: ঠিক। মালতী, তুমি বিষকুম্ভ নও, তুমি মঙ্গলকলস। তোমাকে আমরা আমাদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করলাম।

নিত্যানন্দ: তবে হোক আমাদের নাটকের উদ্বোধন। মনোরঞ্জন, এ তোমারই ঘর, তোমারই বৈঠকখানা, ইনি তোমারই শ্যালিকা। এখানে যা-কিছু সবই তোমার। এমন কি আমরাও তোমার—

তোমারই বন্ধু। অতএব আজ তুমিই সর্বময়, তুমিই তবে ফিতে কাটো।

মনোরঞ্জন: ফিতে? সে আবার কী জিনিস?

নিত্যানন্দ: এটা নিয়ম। কোনো কিছুর উদ্বোধনে ফিতে কাটতে হয়। আমরা নাটক করব যখন স্থির হয়েই গেল, তবে তার উদ্বোধন হোক।

মনোরঞ্জন: তা তো শুনেছি। কিন্তু এখানে ও-জিনিস পাব কোথায়?

নিত্যানন্দ: পাবে। মালতী রাজি হলেই পাবে।

মালতী: (বিব্রত) সে কী কথা? এরা-সব পাগল হল নাকি?

নিত্যানন্দ: হয়তো তা হয়েছি। কিন্তু পৃথিবীতে কোনো মহৎ কাজ করতে হলেই পাগল হতে হয়। জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাহিত্যে দর্শনে—সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়,—কেন, দেখনি?—যাঁরা ভীষণ ভাবে তাঁদের কাজে ডুবে গিয়েছেন তাঁরা কেউই সাধারণ নন, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর পাগল।

মনোরঞ্জন: ডোবালো দেখছি।

নিত্যানন্দ: মালতীর বেণীতে ফিতে আছে. ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিয়মরক্ষা করো. তাই একটু কাটো। হয়ে যাক উদ্বোধন।

মালতী: ইশ, এই ফিতে দিচ্ছি আর-কি!

নিত্যানন্দ: সিরিয়াস কাজের সময় অবাধ্যতা করতে নেই—বি রেডি, বি বোল্ড। পারিবে না দিতে / এতটুকু ফিতে? এমন মঙ্গলদিনে, মঙ্গলকলস?

মালতী: বাব্বা. কথায়-কথায় কেবল কবিতা: অসহ্য হল দেখছি।

হৃদয়: কেউ আনে বিষ, কেউ-বা রাবিশ। আজ কার মুখ দেখে না এখানে এসেছিলাম। আজ সব ভণ্ডুল হল।

নিত্যানন্দ: তা বটে। কুড়েমিতে বাধা পড়ল, তাই বুঝি সব ভণ্ডুল? তাস বন্ধ, তাই বুঝি মনে হচ্ছে বাতাসও বন্ধ! তুমিই প্রতিষ্ঠা করলে এই মঙ্গলকলস, আর নিজেই কিনা এমন অলস!

মালতী: অসহ্য হল দেখছি। আমি পালাই।

হৃদয়: যা বলেছ। আমারও পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে। বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে চলেছিল আমাদের আসর, তার মধ্যে এলোমেলো কথা এনে সব তছনছ করে দিল নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ: দ্যাখো হৃদয়। হৃদয়বিদারক কথা বোলো না। মুখে লম্বা লম্বা কথা বলছ, যেন খুব নির্লিপ্ত, যেন কিছুতে গরজ নেই, কিন্তু তোমার হৃদয়ও যে দ্রবীভূত হয়েছে—এতে আর সন্দেহ নেই।

পুলকেশ: অবস্থা খুব জটিল। এমন ভাষা এরা ব্যবহার করছে যে, মনে হচ্ছে, এদের সঙ্গে কিছুদিন মিশলে বুঝি বাংলাই শিখে ফেলব।

নিত্যানন্দ: বেশ চালিয়াতি শিখেছ তো, পুলকেশ। বাংলা শিখে ফেলব! যেন বাংলা জানিনে, ঐ কথা বলায় যেন

মস্ত বাহাদুরি। বাংলা শিখে ফেলব! এর আগে যেন হিব্রু চাইনিজ ইংরেজি ফ্রেঞ্চ সব শিখে ফেলা হয়ে গেছে, সব ভাষা গুলে খাওয়া হয়ে গেছে। যত-সব বুজরুকি!

পুলকেশ: বলছিলাম কি—

নিত্যানন্দ: বলতে হবে না। হৃদয়ের কথাটা সেরে ফেলি। হৃদয় বেশ যেন নির্লিপ্ত, এই রকম ভঙ্গি করছে; কিন্তু আসলে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে ও। আমাদের এখানে মঙ্গলকলস প্রতিষ্ঠা করল কে? মালতীকে ফ্ল্যাটার করল কে, কে ওকে বলল—তুমি বিষ-কুম্ভ নও। একটু তোষামোদ করতে হবে, তাই অযথাই টেনে আনা হল কথাটা। সব বুঝি হে, সব বুঝি। কেবল তুমি আমাদের বন্ধু, আর, মালতী হচ্ছে মনোরঞ্জনের শ্যালিকা, তাই মুখ ফুটে কিছু বলিনে। সব বললে একটা স্ক্যান্ডাল হয়ে যাবে।

মালতী: অসহ্য, অসহ্য। এরা এত বাজে বকতেও জানে!

নিত্যানন্দ: (হাত বাড়িয়ে) হাত মেলাও। একটু কম্‌প্লিমেন্ট তবে পেয়ে গেলাম। নাটক করব ঠিক করেছি, বাজে বকতে না পারলে নাটক হয় না। অবান্তর ডায়ালগ দিয়ে যেতে হবে, অর্থহীন সংলাপ—তবেই জমে উঠবে নাটক, হয়ে উঠবে আসল ড্রামা। বাজে বকতে যখন জানি, তখন অবশ্যই জমে যাবে আমাদের নাটক। কি, কথা বলছ না কেন তোমরা। কিছু বলো!

ত্রিদিবেশ: অহো! বন্ধ বাক্।

নিত্যানন্দ: হেতু?

ত্রিদিবেশ: মুখে বিস্কুট।

অবিনাশ: অবাক হয়ে শুনছি তোমাদের কলরব। কিন্তু একটা প্রস্তাব আছে। উল্‌টে-পড়ে-থাকা সামান্য একটা বিস্কুট দিয়েই ও যখন নিজের মুখ বন্ধ করতে পেরেছে, তখন ও পারবে। এ নাটকের মুখবন্ধের ভার দেওয়া হোক ওকে। সামান্য ব্যাপার দিয়ে অসামান্য কাজ ও করতে পারে, তার প্রমাণ ও দিয়েছে।

হৃদয়: বলো কি! নিত্যানন্দ বড়-মুখ করে একটা প্ল্যান নিয়ে এসেছে, আমাদের উচিত তার মুখরক্ষা করা। তার বদলে তার মুখ বন্ধ করা হবে?

অবিনাশ: ভগবান, এদের ক্ষমা কোরো। এরা যে মূর্খ হয়ে এসেছে, এজন্যে দায়ী তুমি, হে ঈশ্বর। এজন্যে দোষী এরা নয়। মুখবন্ধ মানে জানে না। মালতী, ডিক্সনারি আনো। ওদের দেখাও।

মালতী: (জোরে হেসে উঠে) ওই সামান্য কথার মানে জানার জন্যে আবার ডিক্সনারি?

অবিনাশ: হ্যাঁ, নারী। নিয়েই এসো। ওরা সব মূর্খ পুরুষ।

মালতী: মুখবন্ধ মানে তো আরম্ভ, যাকে বলে সূচনা।

অবিনাশ: ইয়েস। একটা সামান্য কথা নিয়ে এতগুলো ডায়ালগ হয়ে গেল।

নিত্যানন্দ: এটাই নাটকের ধর্ম। এটাই নাটকের প্রাণ। আমাদের জীবননাট্যই বলো, সংসার-নাট্যই বলো, সেখানেও তো অকারণে অনর্গল কথা। তাছাড়া, যাকে মঞ্চনাট্য বলে সেসব নাটক আজকাল বুঝি বিশেষ দেখা হয় না? তা তো বটেই! সময় কোথায়? তাস তাস তাস—

অবিনাশ: এবার আমার প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা করা হোক। ত্রিদিবেশকে দেওয়া হোক ভার। কীভাবে আরম্ভ করা হবে বলুক ও।

মালতী: আমাকে আটকে রাখলেন কেন? আমি যাই?

মনোরঞ্জন: মালতীর কথা শুনছ তোমরা? ওর দিদি বাসায় নেই। খোকাখুকুকে নিয়ে তিনি চিড়িয়াখানায় গেছেন। সংসার ওর উপর ফেলে। ওকে আটকে রাখবে? ওর কিন্তু অনেক কাজ।

হৃদয়: কী কাজ? রান্না? যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না? চিড়িয়াখানায় যাওয়া যদি ওর দিদির কাজ হয়ে থাকে, তবে এখানে ওর উপস্থিত থাকাটাও একটা কাজ। বেশ গুরুতর রকমেরই কাজ।

পুলকেশ: অর্থাৎ প্রকারান্তরে তুমি বলতে চাও যে, এটাও একটা চিড়িয়াখানা? দ্যাখো, তোমাদের ছোঁয়াচে কতটা এগিয়েছি। প্রকারান্তরে কথাটা কেমন অবলীলাক্রমে বলে গেলাম।

নিত্যানন্দ: দিব্য বাংলা শিখে ফেলেছ কিন্তু তুমি, পুলকেশ। তোমার এই উন্নতি দেখে পুলকে আমার কেশ—

মনোরঞ্জন: বা, জমেছে বেশ। কত মজার মজার তাজা তাজা বাংলা শব্দ বেরিয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, নাটক হবে।

অবিনাশ: তবে, এগিয়ে এসো, ত্রিদিবেশ। মুখবন্ধটুকু করো।

নিত্যানন্দ: ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলে মনে হয়েছিল ওকে। এখন বুঝতে পারছি—ও হচ্ছে একটা বক-ধার্মিক। সবচেয়ে ডেঞ্জারাস। তোমরা চারজনে খেলছিলে, ভালো হোক মন্দ হোক, কাজ হোক, অকাজ হোক—কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে তোমরা ব্যস্ত ছিলে। আলস্য হোক, কুড়েমি হোক—কিছু একটা ব্যাপারে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছিলে। কিন্তু ত্রিদিবেশ ছিল যেন পাঁচজনের একজন নয়—একেবারে পঞ্চম, একেবারে আলাদা। খেলছিল না, তাসের হিসেব-নিকেশ করছিল না, বুকে হাঁটু গুঁজে দুলছিল। এরকম অকৃত্রিম আরাম, এরকম নির্ভেজাল ফাঁকি বড়-একটা দেখা যায় না। সে কিনা করবে মুখ-বন্ধ? বাধা দেব না। যদি করে করুক।

মনোরঞ্জন: তা করুক। তবে আরম্ভ করো হে ত্রিদিবেশ। বেলা হয়ে যাচ্ছে।

(ত্রিদিবেশ গা-মোড়ামুড়ি দিতে লাগল)

মালতীকে একটু ছুটি দিয়ে দাও। ওকেও বাধা দিয়ো না। ওকেও বাধা কোরো না এখানে অকারণে সময় নষ্ট করতে।

নিত্যানন্দ: এভাবে কথা বোলো না, মনো-রঞ্জন। একজন মহিলাকে নিয়ে এরকম ওকালতি করলে স্বভাবতই আমাদের মনে নানা রকম সন্দেহ এসে যাবে। তার দিদির অবর্তমানে—থুড়ি, অনুপস্থিতিতে তুমি যদি তাকে নিয়ে এত মাতামাতি করো, তাহলে আমাদের মনে নানারকম অসভ্য চিন্তা এসে যাবে।

মালতী: অসভ্য!

নিত্যানন্দ: শোনো। একে বলে ভর্ৎসনা। মালতী আমার সঙ্গে যে একমত তার কথাতেই তা প্রমাণ হল। হল না? আমি বললাম যে, আমাদের মনে অসভ্য চিন্তা এসে যাবে, একথা শোনা মাত্র মালতী সমর্থন জানাল ঐ কথা বলে।

মালতী: অসভ্য। আমি চললেম।

[প্রস্থানোদ্যত

ত্রিদিবেশ: (উঠে দাঁড়িয়ে) তিষ্ঠ ক্ষণকাল। পন্ড কোরো না এই পরিকল্পনা।

মালতী: আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

ত্রিদিবেশ: এত অল্পেই অতিষ্ঠ হলে তো চলবে না। সারাটা জীবন পড়ে আছে সম্মুখে। এত অল্প সময়ে পুরুষের সংস্পর্শে যদি ধৈর্য হারাও, তবে তোমার ভবিষ্যৎ কী? সেটা কি ভেবে দেখেছ? সারাটা জীবন তো পুরুষ নিয়েই কাটাতে হবে, নারী।

নিত্যানন্দ: জমেছে, জমেছে। হবে, হবে। হতেই হবে আমাদের নাটক।

মনোরঞ্জন: ও যখন বি-এ পড়ে তখনই বিয়ের কথা হয়েছিল।

ত্রিদিবেশ: এখন কী পড়ছে?

মনোরঞ্জন: বুঝতেই পারছ—এম-এ।

ত্রিদিবেশ: কী বললে? প্রেমে?

মালতী: অসভ্য। আপনারা ভীষণ অসভ্য হয়েছেন।

হৃদয়: প্রেম অতি পবিত্র জিনিস। প্রেমে পতনটা খুব খারাপ জিনিস নয়। একবার পড়ে দেখো। এ পতনে হাত-পা একদম ভাঙে না। কিন্তু হৃদয়টা একটু মচকায়।

মালতী: বা, কত জানেন দেখছি। আপনি নিশ্চয় পড়েছেন।

হৃদয়: এত লোকের সামনে সেই গোপন কথাটা প্রকাশ করতে বলো? এটা যদি আসল নাটক হত, অর্থাৎ যে জিনিস আমরা করব বলে স্থির হয়েছে, তা যদি শেষ পর্যন্ত হয়ই, তবে অবশ্য গোপন কথাও সবার সামনেই বলা চলে। চেঁচিয়ে বলব, আর, ধরে নেব কেউ শুনতে পেল না।

মালতী: (হেসে) তাই বুঝি? সে আবার কি?

হৃদয়: স্বগত উক্তি। ব্র্যাকেটে লেখা থাকবে—স্বগত। ব্যস, অমনি বোঝা

গেল—কেউ শুনতে পেল না। তেমন যদি সুযোগ পেতাম, তবে এখনই এখানেই চেঁচিয়ে বলে উঠতাম—

প্রেমে পড়িয়াছি
সে-পতন যদি অধঃপতন, তবে
সে-মহাপতন যুগে-যুগে আমি চাই।

সকলে: আমরা শুনতে পাইনি, শুনতে পাইনি।

হৃদয় : এটা এমন হৈ হৈ করে বলার কী আছে? শুনতে পাবে না—এটা তো স্বাভাবিক। আমি তো স্বগত বলেছি।

নিত্যানন্দ: হবে, হবে, হবে। হবে আমাদের ড্রামা। জমেছে, জমেছে।

মনোরঞ্জন: আগে থেকেই ও-ভাবে ড্রাম পিটানো, নিত্য। আগে হোক।

হৃদয়: আমার কথা ওরা তো কেউ শুনতে পায়নি। তুমিও কি শুনতে পাওনি, মালতী? যদি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে সংকোচ হয়, স্বগত বলো।

মালতী: অত চ্যাঁচালেন, শুনতে পাব না? আমি কানে কালা নাকি?

সকলে: হল না, হল না, হল না। এ রকম ডায়ালগ নাটকে অচল।

হৃদয়: তোমরা শুনলে কী করে? মালতী, তুমি স্বগত বললো কেন।

মালতী: আপনাদের মত আমার মাথাখারাপ হয়নি।

নিত্যানন্দ: তা হয়তো হয়নি। তোমার মাথায় ছিট নেই, এই তো? কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস আছে তোমার মাথায়। একটু এগিয়ে দাও ত্রিদিবেশকে—ও কাটুক। মুখবন্ধ করতে উঠেছে ও। মুখবন্ধ মানেই উদ্বোধন। ফিতে না কেটে উদ্বোধন হয় না।

মালতী: বেণী আঁট করে জড়িয়ে নিয়ে। বিনা ফিতেতেও এসব হয়।

হৃদয়: বিনা-মেঘে বজ্রপাতের মত শোনাল তোমার একথা। নারী-বিবর্জিত প্রেম-কাহিনী আর ফিতা-বিবর্জিত উদ্বোধন? বেশ, তবে তাই হোক।

অবিনাশ: তুমি আরম্ভ করো, ত্রিদিবেশ।

ত্রিদিবেশ: (গলা সাফ করে) এখানে আমরা মিলিত হয়েছিলাম একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। তাসের প্রাসাদের মত আমাদের সে উদ্দেশ্য ধূলিসাৎ হয়েছে। প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণীঝড়ের মত নিত্যানন্দ এই আসরে এসে উপস্থিত হয়ে আমাদের উদ্বাস্ত করে তুলেছে। তাসের প্রাসাদ ভেঙেছে সেই ঝড়ে। আমরা এখন গৃহহারা, আমরা আশ্রয়হীন—অর্থাৎ আমরা উদ্বাস্তু। এইটেই আমাদের পক্ষে একটা মস্ত ইয়ে—ইয়ে আর-কি—যাকে বলে সুযোগ। উদ্বাস্তুদের নিয়ে কেবল রাজনীতিই জমে না, গল্প-উপন্যাসও জমে। নাটকও তাই জমার কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—মোদ্দা কথাটা কী হবে। প্রেম, প্রতিহিংসা, লালসা—কিসের উপরে হবে এর ভিত্তি? আমাকে তোমরা যুধিষ্ঠির বানিয়েছ—কেন না এখানে আমরা পাঁচজনে জমে থাকি, সুতরাং আমরা নাকি পঞ্চ পাণ্ডব। বেশ তো, আমি যদি যুধিষ্ঠির, তবে ভীম কে, অর্জুন কে, নকুল কে, সহদেব কে? সেটা ঠিক করে নিতে হয় তবে আগে। আমার প্রস্তাব আছে—আমি যুধিষ্ঠির হতে রাজি হলাম, হৃদয় একটু শক্তসমর্থ আছে — ও তবে ভীম, মনোরঞ্জন অর্জুন — তৃতীয় পাণ্ডব, অবিনাশ নকুল, আর ইয়ে, কি বলে, পুলকেশ সহদেব। মহাভারতের কাহিনী নিয়েই তবে তৈরি করা হবে ড্রামা। সবাই রাজি?

সকলে।। বেশ তো, আপাতত রাজি।

ত্রিদিবেশ।। আর, নিত্যানন্দ যে কী তা তো তোমরা আগেই সাব্যস্ত করে রেখেছ ও হচ্ছে কর্ণ।

মালতী।। কি বললেন? কণ্ব? সেই কণ্ব-মুনি?

ত্রিদিবেশ ।। এটা আশ্রম নয়, এটা যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রকাণ্ড করতে চলেছি আমরা। ও কণ্ব নয়, ও হচ্ছে কর্ণ। ও যদি কণ্ব হত তাহলে তোমাকে শকুন্তলা বানাতে পারতাম, কিন্তু তা হল না। তোমাকে নিতে হবে অন্য ভূমিকা।

মালতী।। ভূমিকা বাদ দিয়ে আসল কথা বলুন।

ত্রিদিবেশ।। তুমি দ্রৌপদী। যাকে বলে পাঞ্চালী।

মালতী।। ওসব যাচ্ছেতাই ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

হৃদয়।। যাচ্ছেতাই নয়। তোমার যা ইচ্ছে এটা তাই। জানো না—

পঞ্চস্বামী নিয়ে ঘর করে পঞ্চস্বামী-সোহাগিনী কী চমৎকার এই লাইনটা! আবার বলছি, শোনো—

পঞ্চস্বামী নিয়ে ঘর করে পঞ্চস্বামী-সোহাগিনী একটি মেয়ে পাঁচটি পুরুষকে স্বামী বানিয়ে পাঁচজনের সোহাগ আদায় করছে। ভাগ্যবতীই বলতে হয় তাকে। কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট নিয়ে অনেক কথা আজকাল বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে—পাঁচজনে মিলে সমবায় প্রথায় কাজ করলে সমাজের সংসারের অনেক কল্যাণ। কিন্তু এটাই হচ্ছে সমবায়-প্রথার উদ্বোধন — দাম্পত্য-জীবনেও এই প্রথা চালু করলে ফল যে ভালো হয় তার প্রমাণ দিয়ে গেছে পাণ্ডবেরা। অনেকে অবশ্য একে ব্যঙ্গ করে, বলে—

দাম্পত্য-জীবনে ব্যবসায়ী-সম সমবায়-প্রথা, তা বলুক। পৃথিবীতে কোন ব্যাপারে লোকে একমত? এমন ভালো জিনিসকেও অনেকে তাই বিদ্রূপ করেছে। আমরা পাঁচজন আছি, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, মালতী।

মালতী।। ইয়ার্কি আর কি। অন্য কাউকে জোগাড় করে নিন গিয়ে। জীবনে নাটক করিও নি, করতেও চাইনে। আপনাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি করার মতন অনেক কাজ আছে—চাষ-বাস করুন, ধান ভোরান, পোলট্রি খুলুন—

ত্রিদিবেশ।। চটেছে, চটেছে। শোনো মালতী, যে জিনিসের মুখবন্ধ করতে আমি আরম্ভ করেছি, তা আজ এখানেই বন্ধ হয়ে যাবে। নাটক করা সোজা কাজ না। এখানে আমরা কতকগুলো আজগুবি কথা বলেই সব ইস্তফা করে ফেলব।

মালতী।। (হাস্য) তাই বলুন। নাটক তবে হবে না তো?

ত্রিদিবেশ ।। নাটক ম্যাজিক নয়। হাত-সাফাই নয়। অত সহজ আর সস্তা ব্যাপার নয় নাটক।

নিত্যানন্দ।। তবে এত নাটক হচ্ছে কী করে ত্রিদিবেশ। আমাদের দেশে নাটক নেই নাটক নেই বলে হাহাকারও যত শুনেছ, চারদিকে নাটক মঞ্চস্থ করার কলরবও তত। যেসব নাটক

হচ্ছে সেসব কি নাটক-পদবাচ্য তবে নয়?

ত্রিদিবেশ।। ঈশ্বর জানেন। কিন্তু ব্যাপার কি জান? ওর মধ্যে কৌশল থাকা চাই চোখ-ধাঁধানো ফোকাস চাই, মন-মাতানো ডায়ালগ।

নিত্যানন্দ।। ওসব না হয় আমরাও রাখব। কিন্তু ঐ জিনিসই আমাদের সর্বস্ব হবে না। চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব আমরা, নতুন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করব, নাটকীয় পরিবেশ—

অবিনাশ।। শুনতে বেশ ভালো লাগছে। ইচ্ছেটা বেশ লম্বা-চওড়াই বটে। কিন্তু ভাই, মহাকাব্য লিখব বললেই লেখা যায় না। তার জন্যে দরকার মহাশক্তি।

নিত্যানন্দ।। ওসব মহাকাব্যের মতন মহাকাব্য এখন থাক। ও ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়ে লম্বা বক্তৃতা দেওয়া সোজা। নিজে কিছু করব না, অন্যে কিছু করতে গেলে বাধা দেব—এ-রকম ঘৃণ্য পন্থা না নিলে। আমরা নাটক নিয়ে আলোচনা করছি. 'আমি লিখব মহাকাব্য'—এ রকম সংকল্প আমাদের নেই। আমরা সামান্য একটা ঘটনা ঘটাতে চাই—একটা নাটক করতে চাই, এর মধ্যে এমন কী ভয়ংকর ব্যাপার তুমি দেখলে যে, মহাকাব্যের কথা তুলে মহাপাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবার জন্যে লালায়িত হলে?

মনোরঞ্জন।। থাক থাক থাক! ওসব কথা নিয়ে কথা-কাটাকাটির কোনো দরকার নেই। এখন আসল কথায় এসো। ত্রিদিবেশ, তুমি কাকে কি-কি ভূমিকা যেন দিয়ে দিলে? আমাকে কি বানালে তুমি? আর একটু পরিষ্কার করে বলো।

ত্রিদিবেশ।। নিজের ভূমিকাটি আগে জেনে নাও। তুমি তৃতীয় পাণ্ডব, অর্থাৎ অর্জুন। খুব ভালো পার্টটি পেয়ে গেলে। দ্রৌপদীর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র।

হৃদয়।। বা, বা, বা। মোক্ষম ভূমিকাটি নিয়ে নিলে? আর, আমরা সকলে বুঝি তা হলে অপ্রিয়পাত্র। আমি না ভীম, আমি এর ঘোরতর প্রতিবাদ করছি। আমি সামান্য কেউ হলে হুংকার দিতাম, কিন্তু আমার বীরত্ব প্রকাশের জন্যে আমি হুহুংকার দিচ্ছি। আমি অর্জুন হব।

ত্রিদিবেশ।। তোমার ও ফিগারে তোমাকে অর্জুনে মানাবে না, হৃদয়। যা বলছি শোনো।

হৃদয়।। তবে ঘোষণা করা হোক—ভীমও দ্রৌপদীর প্রিয়পাত্র।

মালতী।। ত্রিদিবেশদা ঘোষণা করলেই বুঝি হয়ে গেল? আর বুঝি কারও কিছু বলবার নেই?

হৃদয়।। আবার কে বলবে?

মালতী।। কেন দ্রৌপদী নিজে।

হৃদয়।। তবে, তুমিই বলো, মালতী। আমি কি তোমার প্রিয়পাত্র নই? প্রকাশ্যে না বললে, স্বগত বলো।

মালতী।। নিশ্চয় কিছু নেশা করা হয়েছে আজ। নইলে এভাবে সবাই কথা বলছেন কেন। বলবে দ্রৌপদী, কিন্তু আপনি বলছেন আমাকে বলতে। মানে কি বলুন তো?

হৃদয়।। ত্রিদিবেশ যে তোমাকে দ্রৌপদী বানালো।

মালতী।। বানালো, আর আমি বনে গেলাম? আমি বলে দিয়েছি তো, ওসবের মধ্যে আমি নেই। জানালাটা বন্ধ করে দিই, নইলে পাশের বাড়ির লোকেরা ভাববে—

হৃদয়।। ভাববে — আমরা নেশা করেছি। আমরা নিজেরা নেশা করেছি, কি, আমাদের কেউ নেশা করিয়েছে — কে জানে। খেয়েছি তো মাত্র নিরীহ চা। চা দিয়েছ তুমি। চায়ে কিছু মিশিয়েছ কিনা — তুমিই জান।

মালতী।। (বিস্মিত) আপনারা মানুষ খুন করতে পারেন দেখছি।

নিত্যানন্দ।। তোমাদের ডায়ালগগুলো মনে-মনে টুকে রাখছি। ভাবছি, যে নাটক লেখা হবে তাতে এর থেকে বাছাই করে কিছু জুড়ে দেব। কিন্তু ব্যাপার কি জান? একটা কথা বসে-বসে ভাবছিলাম। তোমরা তো সবাই ভীম অর্জুন ইত্যাদি হয়ে গেলে। কাজ গুছিয়ে নিলে। কিন্তু আমি বেচারা? তোমরা প্রিয়পাত্র হলে, প্রিয়তর পাত্র হলে, আর আমি?

ত্রিদিবেশ।। কেন তুমি তো কর্ণ।

নিত্যানন্দ।। অর্থাৎ কানটি আমার মলে দিলে। দ্রৌপদীকে নিয়ে তোমরা পাঁচ ভাই মেতে রইলে, আর আমি পড়ে রইলাম আগেকার মতন গতেই।

অবিনাশ।। ভগবান, এদের ক্ষমা কোরো। এরা অজ্ঞ, এরা মূর্খ। এরা মহাভারত জানে না। কুরুক্ষেত্রের লড়াইটাই এরা দেখেছে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে একটা যে কারুক্ষেত্র ছিল, তা দেখেনি। মনের নিভৃতে চলেছিল যে একটা গোপন স্রোত, একটা আবেগের প্রবাহ, তা কেউ দেখল না। এটা আক্ষেপের বিষয়।

নিত্যানন্দ।। কি, ব্যাপারটা কি, তা খুলে বলো। অত গুরুগম্ভীর ভাষণ একেবারেই ভালো লাগছে না। বক্তব্য-বিষয়ে যদি কোনো সার না থাকে তাহলে ভাষার একটা ভার চাপিয়ে বেশ ভারিক্কে হওয়া যায়। এ কৌশল ছাড়ো, অবিনাশ। কি বলতে চাও তা খুলে বলো।

অবিনাশ।। কর্ণের উপরেও দ্রৌপদীর টান ছিল পঞ্চ স্বামীতেও তার মন ভরেনি — সেটা কি জান?

ত্রিদিবেশ।। একজন ভদ্রমহিলার নামে কুৎসা রটনা কোরো না তুমি, অবিনাশ। ওটা কি জান? ওটা মানুষের মনের দৈন্য, ওর নাম হিংসে। এক সাধ্বী মহিলা পাঁচটি স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করছে, তা কারও সহ্য নয়। সেইজন্যে তার সতীত্বের উপর ঐ কলংক আরোপ করা আর কি।

অবিনাশ।। এসব আমার কথা নয়। মহাভারতের কথা। পাঁচজন নিয়েই যে ঘর করতে পারে, সে যদি বাড়তি আর একজনকে চায় তা হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

ত্রিদিবেশ।। কিন্তু ও কথা চিন্তা করতে আমাদের মন বড় অপবিত্র হয়।

মালতী।। বেশ ভণ্ডামি জানেন কিন্তু আপনারা। এত-সব বাজে কথা বলে চলেছেন, তাতে কিছু ক্ষতি হল না, আর সামান্য ঐ একটা কথাতেই সব অপবিত্র হয়ে গেল?

অবিনাশ।। আমি তো সামান্য লোক। আমি নকুল মাত্র। তুমি তো মহীয়সী মহিলা তুমি দ্রৌপদী। তুমিই বলো তো!

হৃদয়।। অবিনাশের কথা ঠিক হতে পারে। কর্ণ - দ্রৌপদীর কেচ্ছা নিয়ে কোথায় যেন একটু পড়েছিলাম—

পথে বাঙ্গা পূর্ণ নয়, শোনা যায় কর্ণে আকর্ষণ।

তা হলে এ আকর্ষণ একটু ছিল। যা রটে, তা কিছু বটে। সুতরাং নিত্যানন্দ, মাভৈঃ। তুমি কর্ণ। তুমি আকর্ষণীয়।

মালতী।। (হাসা) খুব মজা হবে তাহলে। দ্রৌপদী এসে কান ধরে টানবে।

নিত্যানন্দ।। নাটক করব ভেবে এসেছিলাম। অবশেষে এই কিনা তার নাটকীয় পরিণতি! তবে আমি চলি, তোমাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না তা বোঝা গেল। [প্রস্থানোদ্যত

মালতী।। (বাধা দিয়ে) আমার কথায় রাগ হল বুঝি? আসুন, আসুন। (হাত ধরে) চা খাওয়াব।

নিত্যানন্দ।। বন্ধুর শ্যালিকা। আমাদের সকলেরই প্রিয়পাত্রী। হাত ধরেছ, থাকতেই হচ্ছে। কানও যদি ধরতে, কী আর করতে পারতাম বলো।

মালতী।। অনেক হয়েছে এবার নাটক-ফাটক বাদ দিয়ে অন্য কথা বলুন।

হৃদয়।। অন্য কোনো কথা নেই আমাদের আজ দ্বিপ্রহরে। কেবল নাটক চাই : চাই চা-ই যাতে তৃষ্ণা হরে।

পুলকেশ।। হৃদয়, এটা কী হল?

হৃদয়।। কবিতা হৃদয় থেকে উৎসারিত।

পুলকেশ।। উ, বড্ড কঠিন বাংলা বলছ কিন্তু, হৃদয়। তোমার আজ কী-যেন হয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিনে। তুমি কি কারও প্রতি আসক্ত হয়েছ?

হৃদয়।। হতে তো ইচ্ছে। কিন্তু ঘাটিটা বড় শক্ত (মালতীর দিকে চেয়ে) বলতে ইচ্ছে করছে—

প্রেমে পড়িয়াছি

অপরাধ যদি করে থাকি কোরো ক্ষমা।

মনোরঞ্জন ।। আমি আর স্থির থাকতে পারছি নে, হে সভ্যবৃন্দ। তোমাদের এই অসভ্য আচরণ ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারি করা। আমার শ্যালিকা, সে আমারই শ্যালিকা — তার উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু তাকে নিয়ে তোমাদের এত রাগ আর অনুরাগ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। জেনে রাখো — আমি অর্জুন।

মালতী ।। মনোরঞ্জনদা, আপনিও যেন ক্ষেপেছেন। কী বলছেন?

মনোরঞ্জন ।। এখনো বলিনি। এবার বলব। এদের আচরণে আমি কেবল দুঃখিত ও মর্মাহত হইনি, আমি উত্তেজিতও হয়েছি। তোমাকে ওরা বানিয়েছে দ্রৌপদী, যার অন্য নাম পাঞ্চালী, আমাকে ওরা করেছে তৃতীয় পান্ডব — অর্জুন।

মালতী।। তাই হয়েছে কী?

মনোরঞ্জন ।। অনেক-কিছু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

মালতী ।। যথা—

মনোরঞ্জন ।। অযথা উত্তেজিত করে তুলো না, পাঞ্চালী।

সকলে।। জমেছে। জমেছে।

নিত্যানন্দ ।। নাটক আমাদের হবে। এই রকম এক-একটা সিচুয়েশন করে তুলতে পারলে তাকেই তো বলে নাটকীয়, তাই তো নাটক।

মালতী ।। আমি চললাম। আমার পা ধরে গেল। (প্রস্থানোদ্যত)

নিত্যানন্দ ।। তুমি আমার হাত ধরেছিলে। কিন্তু আমি তো তোমার পা ধরতে পারিনে। কিন্তু পথরোধ করতে পারি। দিদির হাজব্যান্ডরা একটু-আধটু উপদ্রব করে থাকে, তাতে বিরক্ত হতে নেই।

মালতী ।। বিরক্ত হইনি। বিব্রত হয়েছি।

পুলকেশ ।। সত্যি, এরা কত কথা জানে! ভাবতে অবাকই লাগে। এত কথা এরা শিখল কোথায় কবে কী করে?

মনোরঞ্জন ।। যে কথা এখনো বলিনি এবার তা বলব। তুমি বিরক্ত হও, বিব্রত হও, বীতশ্রদ্ধ হও — যাই হও-না কেন, মনটা আজ বেশ হালকা-হালকা ঠেকছে। সংসারের বোঝা যেন নেমে গেছে ঘাড় থেকে। কত কথাই যেন বলতে ইচ্ছে করছে।

মালতী ।। কী কথা বলতে ইচ্ছে করছে, শুনি।

মনোরঞ্জন ।। বলি তবে? বলতে ইচ্ছে করছে—

প্রতিটি পঞ্চম রাত্রে মোরে তুমি
জানাবে আহ্বান
তোমার পান্ডবে।

মালতী ।। বা, বেশ তো। বেশ তো মজা করে কথা বলতে পারেন?

মনোরঞ্জন ।। সবটুকু এখনো বলিনি। বলি?

পান্ডব এসেছে দ্বারে খোলো দ্বার,
হে সতী পাঞ্চালী।
পান্ডব এসেছে দ্বারে।
রুদ্ধ করে রেখো না কপাট।
দুয়ারে অতিথি তব তৃতীয় পান্ডব।

(মালতী হতভম্ব, মনোরঞ্জন উল্লসিত

সকলে ।। জমেছে। জমেছে

মালতী ।। (রুষ্ট) দাঁড়ান আজ মজা বুঝবেন।

হৃদয় ।। মজা আর বোঝার কী আছে? এখানে যে কতটা মজা হল, তা কি বুঝতে পারলাম না আমরা?

মালতী ।। দিদি আসুক। সব বলে দেব ভেজা-বেড়াল হয়ে তো থাকতে দেখি। কিন্তু পেটে-পেটে এত ইয়ে?

মনোরঞ্জন ।। আমি তো নাটক করছিলাম। সত্যি কথা বলছিলাম ভেবেছ?

মালতী ।। ঐ কথাই তো বলব দিদিকে।

ত্রিদিবেশ ।। দ্যাখো মালতী। তুমি খুকি নও। সব কথা সবাইকে বলতে নেই। এমন কি, নিজেও যদি কখনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে কোনো অন্যায় করে ফেল, নিজের স্বামীকেও তা বলবে না।

নিত্যানন্দ ।। তা তো বটেই। নিজের চোখে দেখা এক জিনিস, অন্যের মুখ থেকে শোনা অন্য। বলতে নেই।

মনোরঞ্জন ।। এর মধ্যে অশোভন কথা কী আছে—

প্রতিটি পঞ্চম রাত্রে
মোরে তুমি জানাবে আহ্বান
তোমার পান্ডবে
এর মধ্যে খারাপ কথা কী আছে?

মালতী ।। কথা খারাপ না হতে পারে। কিন্তু ইঙ্গিতটা বাজে।

নিত্যানন্দ ।। (ঘড়ি দেখে) একটা বাজে। একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। এবার পট-পরিবর্তন করা হোক। মালতী, যাও। পরিবর্তন করো পট। নতুন পটে করে এবার চা আনো।

মালতী ।। (চায়ের পট কুড়িয়ে নিতে-নিতে) বাঁচা গেল।

(প্রস্থান।

(সকলে স্থির হয়ে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

হৃদয়।। আমরাও বাঁচলাম। উঃ, শরীরের উপরে, মনের উপরে কী-একটা প্রেশার ছিল এতক্ষণ।

নিত্যানন্দ।। রক্তের উপরেও হয়তো। ব্লাড-প্রেশার হয়ে যাবার অবস্থা। একজন মহিলা সম্মুখে থাকলে হাওয়াটা জমে বটে, কিন্তু খুব ফ্রী হওয়া যায় না। আমরা এখন ফ্রী।

ত্রিদিবেশ।। কিন্তু মনোরঞ্জনকে ঠিক ফ্রী বলে মনে হচ্ছে না। ওর চরিত্রের আবার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ওর স্ত্রীকে দেখে ও একটু ভয় করে।

অবিনাশ।। এটা বৈশিষ্ট্য নাকি? সকলেই ভয় করে। যে ভয় করে না, সে পুরুষ নয়, সে কাপুরুষ। তাছাড়া, একটা ব্যাপার কি জানো ভাই? স্ত্রীকে ভয় করে না, এমন দু-চারজন লোক পৃথিবীতে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু স্ত্রীকে ভয় করিনে বলে যারা নিজেদের জাহির করে, তারা কিন্তু সমাজে

তেমন মর্যাদা পায় না, এমনকি পুরুষমহলেও না। স্ত্রীকে হয়তো রেখেছে একটা দাসীবাঁদীর মত করে, কিন্তু মর্যাদা পাওয়ার জন্যে বাইরে বলবে—শিগ্গির ফিরতে হবে, নইলে ম্যাডামকে কী কৈফিয়ত দেব।

নিত্যানন্দ।। এইটেই হচ্ছে জীবনের নাটক। এইটেই জীবনের ট্র্যাজেডি। আমার ইচ্ছে, আমরা আমাদের আসল জীবনটা মেলে ধরব মঞ্চের উপরে। সকলে দেখুক নিজেদের। নিজের মুখ আমরা ক'জন চিনি? অনেক সময় অজানা জায়গায় হঠাৎ একটা বড় আয়নার মধ্যে নিজের ছায়া দেখে আমরা চমকে উঠি নে? উঠি। কেন উঠি? নিজেকে ভালোমত চিনিনে বলেই তো! কিন্তু কেন আমরা চিনব না নিজেদের? এসো, আমরা সেই রকম একটা নাটক করার চেষ্টা করি, যাতে আমরা বুঝব প্রকৃতপক্ষে আমরা কী ও কে।

হৃদয়।। খুব সীরিয়াস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কথা। অর্থাৎ এখানকার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা ভালো হচ্ছে না কিন্তু, নিত্য। একটু ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলো।

পুলকেশ।। মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভালো। কিন্তু ঠাণ্ডামাথা আদৌ ভালো নয়। যে-মাথা দরকারের সময় গরম হতে পারে, তাকে দরকার-মত ঠাণ্ডা রাখতে হয়। কিন্তু যে-মাথা একেবারেই ঠাণ্ডা সে-মাথা সব সময়ই হিম, দরকার হলেও তা গরম হবার উপায় নেই। সে-মাথা সুতরাং মাথাই নয়, সেটা বরফের একটা পিণ্ড।

নিত্যানন্দ।। এই পিণ্ডরাই পিণ্ডদান করছে নাটকের। হৈ-হৈ করে হয়তো তা চলছে। যা চলে তাই কি সব সময় সচল? ঝুটো টাকাও তো গড়িয়ে দিলে গড়গড় করে চলে, তবু লোকে তাকে অচল বলে কেন?

মনোরঞ্জন।। প্রথমে আমি নিত্যানন্দের প্রস্তাবে তেমন গা করতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা আমাদের একটা করণীয় কাজই বটে।

হৃদয়।। আঘাত না পেলে লোকে মানুষ হয় না। ফূর্তি করে যে জীবন কাটিয়ে দিল, সে ফূর্তিবাজ। কিন্তু বেদনায় যে-জীবন সঞ্জীবিত হল সে বেদব্যাস।

পুলকেশ।। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আজকের কথাবার্তায়। এদের পেটে-পেটে এতও ছিল? আজ যেন সকলে ইন্‌সপায়ার্ড? সকলেই যেন আজ বেদনার বেদব্যাস হয়ে উঠেছে। ব্যাপার কি?

নিত্যানন্দ।। ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। পড়নি ছোটবেলায় পাঠ্য-কেতাবের সেই কবিতা? 'যে চাষা আলস্যভরে/বীজ না বপন করে/পক্ব শস্য পাবে সে কোথায়?' তোমরা তাসে ও আলস্যে সময় কাটিয়ে চলেছ। কৃষি-কাজ তো করতে হবে! সৃষ্টির কাজও তো করতে হবে।

(গুনগুন করে গান)

'মন রে, কৃষিকাজ জান না!
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।'

হৃদয়।। ওরে সোনা রে, জাদু রে আমার! আজ গলায় গানও বেজে উঠেছে দেখছি। তবে এসো ভাই সকলে—

(গান)

আমরা ফেলে দিয়ে তাস-পাশা
হবই চাষী হবই চাষা
আলস্যে রইব না আটক
রচনা করব নাটক
সঙ্গে আছে সঙ্গী ভীষণ—বাংলাভাষা।

সকলে।। (কোরাসে ঐ গান)

নিত্যানন্দ।। (প্রাণখোলা হাসি হাসতে-হাসতে) উ, কী সৌভাগ্য আমার। আমি জাগিয়ে দিয়েছি এদের, মাতিয়ে দিয়েছি, তাতিয়ে তুলেছি।

হৃদয়।। ওহে কর্ণ, আকর্ণ বিস্ফারিত ঐ হাসি হেসো না। তুমি জাগাও নি, তুমি মাতাও নি, তুমি তাতাও নি। যিনি সংগোপনে এই কাজটি করে গেছেন, তিনি উনি। যাঁর সাহায্য পেয়ে আমরা চেতনা লাভ করেছি, তিনি এখন নেপথ্যে। তিনি পট পরিবর্তন করতে গিয়েছেন।

ত্রিদিবেশ।। ঠিক বলেছ। মানুষের মন মানুষেরই মন। ওকে পাগুলী বানিয়ে আমরা ছয়জনেই যে ওঁর অনুগামী তা প্রমাণ করতে গিয়ে আমাদের মন একটু দুর্বল কি হয়নি হে? আমরা সকলেই কি, একসাকিউজ মী মনোরঞ্জন, অল্পবিস্তর আসক্ত হইনি ওঁর প্রতি? এই আসক্তিই মনে আনে চেতনা, প্রাণে আনে প্রেরণা। অমনি সমস্ত কথা হয়ে যায় গান, তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম আমরা, জানতে আশ্চর্যই লাগে, আমরা গান গাইলাম।

অবিনাশ।। ঠিক। নারীই হচ্ছে সঞ্জীবনী-সুধা।

পুলকেশ।। যাকে বলে মৃতসঞ্জীবনী আর-কি। মরণদশা সব।

ত্রিদিবেশ।। অস্বীকার করলে চলবে না, পুলক। এমনি একটা ব্যাপারে যদি না ঘটানো হত, যদি এখানে নিত্যানন্দের নাটক করার অভিলাষ নিয়ে আমরা কথা-কাটাকাটি করে যেতাম, আর মাঝে মাঝে পটে-পটে চা সাপ্লাই করে চলে যেত আমাদের মনোরঞ্জনের সুযোগ্যা শালিকা তবে কি জমে উঠত আসর, মেতে উঠত সকলে, মেতে উঠত সকলে? কক্ষণো না। উনি এলেন, পণ্ডপাণ্ডবের মধ্যে পড়ে গেলেন, তারপর কর্ণ এলেন, পড়ে বাঙ্গাল পট নয় ইত্যাদি বচন শুনলেন, কর্ণে আকর্ষণের কেলেঙ্কারির কথা শুনলেন, মনে-মনে উনিও মেতে উঠলেন, আর প্রকাশ্যে তেতে উঠলাম আমরা।

হৃদয়।। ও-ও তবে মেতেছে? বলো কী!

ত্রিদিবেশ।। তুমি একটা হাঁদা। অবশ্য তুমি একা না, পুরুষ মাত্রেই হাঁদা। একটুখানি মাতলেই তারা চারগুণে মাতাল হয়ে ওঠে। কিন্তু ওরা? ওরা দশগুণ মাতলেও তার এক-দশমিক টের পাবে না।

হৃদয়।। বলো কি! টের না পেলে এগোবো কী করে?

মনোরঞ্জন।। তোমাকে এগোতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা—

পুলকেশ।। উ, কী কঠিন ভাষা। বা-ধ্য-বা-ধ-ক-তা। হৃদয়, তোমার গানের কলিটা মনে পড়ছে—সঙ্গে আছে সঙ্গী ভীষণ বাংলা ভাষা। ভীষণই বটে।

নিত্যানন্দ।। ওসব অবান্তর কথা থাক। আজ যখন মেজাজ সকলের এসেছে, তখন এখনি প্ল্যান ছকে ফেলা চাই। লোহা গরম থাকতে-থাকতেই হাতুড়ির ঘা দিতে হয়। একটা নাটক তবে করা যাক। বিষয় একটা ঠিক করে ফেলা যাক।

হৃদয়।। বিষয় হোক প্রেম।

নিত্যানন্দ।। না। ওটা বড় পানসে ব্যাপার। ওতে কেবল প্যানপ্যানানি হবে, এমন কথা বলতে পারো, ওই ক[illegible] আগে হচ্ছিল। সব পুরুষই স্ত্রীকে ভয় করে—এইটেই হোক বিষয়বস্তু। স্ত্রীদের বিরুদ্ধে [illegible]। কেন তারা ভীতিপ্রদর্শন করে [illegible] পুরুষদের প্রতি এই আচরণ করবে কী অধিকার তাদের?

মনোরঞ্জন।। ওটা বড় বাড়াবাড়ি [illegible]। অবশেষে স্ত্রীদের [illegible] হয়ে যাচ্ছে। [illegible] নিয়েই [illegible], স্ত্রীর [illegible] ভীতিপ্রদর্শন [illegible] একটা [illegible] দরকার নেই।

অবিনাশ।। ওদের নিয়ে কটা নাটক করলেই ওরা পুরস্কার পেয়ে যাবে? বলো কি। দেখছ না, হাজার হাজার নাটক হচ্ছে কত অজস্র রকমের সাবজেক্ট নিয়ে, থীম নিয়ে। সে সব নাটক চলছেও বটে, কিন্তু পুরস্কার কি কেউ পাচ্ছে। কেউ না, সুতরাং ওই সাবজেক্টই থাক।

হৃদয়।। তবে তাই হোক। এখানকার এই রেজলিউশন শিরোধার্য।

(গান)

আমাদের স্ত্রী-কেশী ওগো ললনা
নিতি-নিতি এত ভীতি
এ কি গো তোমার প্রীতি
অথবা মোদের প্রতি শাসানি—
তা খুলে বলো-না!

(একটি গোলাকার কাঁসার থালায় ছয় পট চা নিয়ে মালতীর প্রবেশ)

গান চলছেই

মালতী ।। (কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ঐ গান শুনে) কী হল, কী হল, কী হল?

হৃদয় ।। (ঐ সুরেই) কিছু হল না
কিছু কি হবার আছে,
খুলে বলো-না!

মালতী ।। আজ আপনাদের কী-যেন হয়েছে।

হৃদয় ।।আমরা সঞ্জীবিত। (একটু থেমে) আমরা মৃতসঞ্জীবিত।

মালতী ।। (বিনীতভাবে) ট্রে নেই তাই থালায় করে আনলাম।

মনোরঞ্জন ।। তুমি কথা বলতে একেবারে জান না মালু। মানমর্যাদা রাখতে একেবারে শেখনি। ট্রে নেই কি বলতে আছে? বলতে হয়—দিদি কোথায় রেখে গেছে খুঁজে পেলাম না, হয়তো আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে গেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়েও তুমি মধ্যবিত্তের কিছু পেলে না। না তাদের আচরণ, না তাদের—

ত্রিদিবেশ ।। কিন্তু এটাকে কি মর্যাদা রাখা বলে?

মালতী ।। আপনাদের তর্ক রাখুন। চা ধরুন।

[একে-একে সকলে চা নিল

হৃদয়।। গান গেয়ে-গেয়ে শুকিয়ে গেছে।

মালতী ।। আ-হা-হা। কী-সব গান, কী-সব সুর, কী-সব গলা।

হৃদয় ।। তা হলে তারিফ করছ তুমি। তাও তো রেওয়াজ একদম করিনে।

মালতী ।। রেওয়াজ করলে আওয়াজ আরও সাংঘাতিক হত নিশ্চয়।

পুলকেশ ।। আ, কী সুন্দর ভাষা। আ মরি, বাংলা ভাষা।

নিত্যানন্দ ।। সেই ভাষাই তোমার ভালো করে শেখা হল না—এ জন্যে আমাদের খুব আফশোস হচ্ছে। কিন্তু ও-সব কথা থাক। নাটকে এসো। আমাদের বিষয়বস্তু স্থির হয়ে গেছে। এবার তার একটা খসড়া করতে হয়—নাটকের খসড়া।

অবিনাশ ।। হৃদয়ের উপর দেওয়া যাক এই ভার। ও বেশ বড়-বড় কথা বলছে, বড়-বড় গান বাঁধছে। ও পারবে।

হৃদয় ।। আমার প্রতিভার উপরে তোমাদের এই বিশ্বাস দেখে আমি অভিভূত। কিন্তু ভাই, আমি অক্ষম। মুখে বড়-বড় কথা কেবল আমি কেন, অনেকেই বলে। ওটা ফ্যাশান, ওটা ফানুস—বাইরে চাকচিক্য, কিন্তু ভিতরটা হাওয়া। কিন্তু লেখা-কাজটা আলাদা। দেখনি, বৈঠকী গল্প যারা বলে তারা কেউ লিখতে পারে না, তারা যদি তা পারত তাহলে তাদের বৈঠকী গল্পগুলোই সাহিত্যের বাজারে আসর জুড়ে বসত। তাই বলি—কাজটা আমাদের উৎসাহী বন্ধু নিত্যানন্দই করুক।

নিত্যানন্দ ।। আ হে, নাটক তো তুমি লিখছ না, তুমি বানাচ্ছ একটা খসড়া। আজ এখানে যা-যা কথা হল তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে একটা কাঠামো খাড়া করো, তারপর আমরা তো আছি।

মালতী ।। (অনেকক্ষণ ধরে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল) কি ব্যাপার বলুন তো! কী হয়েছে?

হৃদয় ।। আমাদের প্রেমে পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পড়েছি ফাঁপরে। নাটকের খসড়া তৈরি করতে হবে।

মালতী ।। ও হরি, নাটকের ভূত এখনো নামেনি ঘাড় থেকে? আমি ভাবলাম এতক্ষণে বুঝি নাটক ছেড়ে গানে চলে গেছেন আপনারা।

অবিনাশ ।। গানে গিয়েছি বটে, কিন্তু নাটক ছাড়িনি। গান ছাড়া কি নাটক হয়? সব নাটকে গান চাই-ই। আমাদেরও আছে সে চাহিদা। আমরা এক্ষুনি তা চাইব।

ত্রিদিবেশ ।। ঠিক কথা। ঠিক বলেছ। মালতী একটা গান করুক।

হৃদয় ।। আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। পুরুষকন্ঠের গান যেন রাগ, নারীকন্ঠের গান হচ্ছে রাগিনী।

মালতী ।। গান আমি জানিই নে।

ত্রিদিবেশ ।। কি মনোরঞ্জন, তোমার শ্যালিকার এ কথা সত্যি?

মনোরঞ্জন ।। ওর মধ্যে আমাকে জড়িয়ো না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমি ওকে গুন গুন করতে শুনেছি অবশ্য।

পুলকেশ ।। আমাদের মতন মানুষ যদি গানে গলা দিতে পারে, তাহলে সকলের অধিকার আছে গানে গলা যোগ করবার। হোক একটা গান।

মনোরঞ্জন ।। গাও, মালু গাও।

মালতী ।। মনোরঞ্জনদা, আপনিও এদের তালে তাল দিচ্ছেন, দিদি আসুক, সব বলব।

হৃদয় ।। আ রে, সে সব নালিশ পরে হবে। গান গাওয়া যদি অপরাধ তবে সে অপরাধ আগে করে ফেলা যাক। নাও, গাও।

সকলে ।। গাও, গাও।

মালতী ।। আমি চললেম। আমার দ্বারা হবে না।

মনোরঞ্জন ।। হবে না কেন। চেষ্টা করলেই হবে।

নিত্যানন্দ ।। আমরা জীবনে নাটক করিনি নাটক লিখিনি। কিন্তু আজ আমরা ঠিক করেছি আমরা চেষ্টা করব। আর, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম নেই। দিদি এলে নালিশ অবশ্যই করবে। আমাদের নাটকের সাবজেক্টও ওই।

মালতী ।। বেশ, তৈরি হোন আপনারা। কানে আঙুল দিন।

নিত্যানন্দ ।। আমি কর্ণ। আপাদমস্তক আমি কর্ণ। অঙ্গুলি দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত করা অসম্ভব। সুতরাং আমি নির্ভীক হয়ে বসলাম।

মালতী ।। (কয়েকবার গলা সাফ ক'রে হেসে ফেলল) হবে না, হবে না।

হৃদয় ।। হবে, হবে। আমরা চোখ বুজেছি বরঞ্চ। কান খোলা রইল। খোলা রইল মন।

মালতী ।। কেউ সমালোচনা করবেন না তো? গলা দিয়ে পাঁচ-সাত রকম আওয়াজ বেরিয়ে যেতে পারে কিন্তু। দিদি বাড়ি নেই, আপনারা যা-সব আরম্ভ করেছেন। কই, অন্যদিন তো এমন করেন না। তখন তো বেশ শান্তশিষ্ট দেখি।

নিত্যানন্দ ।। ও সব হচ্ছে মেজাজের ব্যাপার। রোজ কি মেজাজ আসে? আর, আমরা যে নাটক করব ঠিক করেছি, তাও হবে ঐ ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই।

মালতী ।। সেটা কী?

নিত্যানন্দ ।। স্ত্রী-ভীতি। স্ত্রীদের দেখে পুরুষদের ভয়।

মালতী ।। (হাস্য) বা, বেশ মজার নাটক হবে তো!

হৃদয় ।। খুব জমবে। কি বলো? তুমি যখন মজার নাটক হবে বলে ধরতে পেরেছ, তখন তোমার উপরেই এর খসড়াটা তৈরির ভার দিতে ইচ্ছে করছে।

মালতী ।। ঈশ! আপনাদের এত ইচ্ছে ও এত আকাঙ্ক্ষা—এর যেন আর শেষ নেই। এক-একবার ইচ্ছে করে, আপনাদের সব ইচ্ছে আর আকাঙ্ক্ষা যদি পূরণ করে দিতে পারতাম, তাহলে বোধহয় সব ইতি হয়ে যেত। নিশ্চিন্ত হতে পারত তাহলে সকলে। কর্ণে বাঞ্ছা, না, কি-যেন বললেন আপনারা?

হৃদয় ।। বেশি কিছু বলা হয়নি, বলেছিলাম মাত্র একটা লাইন—
পণ্ডে বাঞ্ছা পূর্ণ নয়,
শোনা যায় কর্ণে আকর্ষণ।

মালতী ।। ঐ কথা শুনে মনে হয়েছিল, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারলে বুঝি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ত্রিদিবেশ ।। কি হৃদয়, আমি বলি নি? এখন বিশ্বাস হচ্ছে?

হৃদয় ।। কী-যেন বলেছিলে, ভাই? সেই মেতে ওঠার কথা? সেই তেতে ওঠার কথা? হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে এখন একটু-একটু।

মনোরঞ্জন ।। (এগিয়ে এসে)
পান্ডব এসেছে দ্বারে
খোলো দ্বার হে সতী পাঞ্চালী
দুয়ারে অতিথি তব তৃতীয় পান্ডব।

মালতী ।। (খুশির হাসি হেসে) সত্যি, বেশ মজা করছেন কিন্তু আজ আপনারা। আপনাদের এই পাগলামির মধ্যে বেশ কায়দা করে আমাকেও জড়িয়ে নিয়েছেন।

হৃদয় ।। আমাদের প্রস্তাবিত স্ত্রী-ভীতি নাটকের খসড়া না হয় অন্য কেউ আমরা করব, কিন্তু এই নাটকে স্ত্রী-ভূমিকাটি নিতে হবে তোমাকে।

মালতী ।। না বাপু, আমি কাউকে ভয় দেখাতে পারব না।

হৃদয় ।। ভয় দেখাতে হবে না, দেখলেই আমরা ভয় পেয়ে যাব।

মালতী ।। তা হলে ভয়ংকর চেহারার মেক-আপ নিতে হবে তো?

ত্রিদিবেশ ।। কী মুশকিল! অতি কোমল অতি শান্ত অতি নিরীহ অতি নম্র—সাধারণত মেয়েদের চেহারা যেমন হয় আর-কি। তাই হলেই হবে। তাতেই আমরা ভয় পাব।

মালতী ।। কী জানি! সে আবার কি রকমের ভয়।

হৃদয় । স্ত্রী-ভূমিকা তাহলে তোমারই রইল।

মালতী ।। দেখা যাবে।

নিত্যানন্দ ।। নাটকের ব্যবস্থা তো হয়ে গেল। এবার তবে গানটা হোক।

মালতী ।। ও হরি আপনারা ভোলেন নি দেখছি। আমাকে দিয়ে এত কান্ডও করাতে চান আপনারা! আমাকে নিতে হবে স্ত্রী-ভূমিকা। আমাকে গাইতে হবে গান?

হৃদয় ।। আমাদের নাটকেও তো স্ত্রীর গলায় গান দিতে হবে। আগে থেকেই তার একটা খসড়া—একটা মহড়া—হয়েই যাক না!

মালতী ।। হারমোনিয়ম নেই, তবলা নেই, খালি-গলায় গান কেমন হবে, ঈশ্বর জানেন।

হৃদয় ।। দেশলাই বাজিয়ে তাল দিতে পারব। অসুবিধে হবে না কিছু।

মালতী ।। মুন্নুদার ঘুঙুর বোধ হয় আছে, দাঁড়ান, দেখি।

[মালতীর দ্রুত প্রস্থান

সকলে ।। (চাপা গলায়) জমেছে। জমেছে!

মনোরঞ্জন ।। হয়তো আছে ঘুঙুর। আমার মেয়েটিকে নাচের স্কুলে দিয়েছি। নাচ শিখুক না-শিখুক, ওসব তো চাই।

নিত্যানন্দ ।। ঘুঙুর বাজাবে কে?

হৃদয় ।। দেশলাই বাজাতেই যখন রাজি হয়েছি, ঘুঙুর বাজাতে আর কী। আমিই বাজাব।

[ঘুঙুর হাতে ঝমঝম শব্দে মালতীর প্রবেশ।

মালতী ।। পেয়েছি। এই নিন। কে বাজাবেন, নিন।

হৃদয় ।। (হাত বাড়িয়ে) দাও, আমাকে দাও।

ত্রিদিবেশ ।। না, না, না। তা হবে না। তুমি তাল ঠিক রাখতে পারবে বলে আমার ভরসা হচ্ছে না, হৃদয়। তুমি হাত সরাও।

হৃদয় ।। তবে হাত বাড়াও তুমি।

ত্রিদিবেশ ।। আমিও না, তুমিও না।

হৃদয় ।। তবে কে? মনোরঞ্জন?

নিত্যানন্দ ।। না। কারও দরকার হবে না। আমাকে দাও।

মালতী ।। ঘুঙুর নিয়েই যখন এত টানাটানি, তখন থাক ঘুঙুর। দরকার নেই এসবের। এমনিতেই করছি গান।

অবিনাশ ।। যে জিনিস এসে গেছে তাকে অস্বীকার করা ঠিক হয় না। সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ইচ্ছে আজ মালতীর। আমার একটি ক্ষুদ্র মনোবাঞ্ছা এখানে জানাই। আশা করি, কেউ বাধা দেবে না।

হৃদয় ।। কি, কথাটা কী? তা বলা হোক তবে।

অবিনাশ ।। মালতী যে গানটি গাইবে তার সুর তাল লয় সম্বন্ধে সে নিশ্চয় ওয়াকিবহাল। সে নিজেই বাজাক। তাহলে বাজবে ভালো। সমের মুখেই পড়বে তাল। তাল কাটবে না।

মনোরঞ্জন ।। এটা তো কঠিন কথা কিছু নয়। তার জন্য এত লম্বা বক্তৃতার দরকারই ছিল না।

অবিনাশ ।। কিন্তু হাত-দুটো মুক্ত থাক, যদি গানের ভাব বাৎলাবার জন্যে কোনো মুদ্রার দরকার হয়—

হৃদয় ।। ও, বুঝেছি। বুঝেছি।

মালতী ।। আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না।

অবিনাশ ।। না-বুঝবার কিছু নেই। ঘুঙুর যেখানে পরে সেখানেই পরো তুমি। পা দিয়ে তাল দেবে।

মালতী ।। আমাকে দিয়ে আজ আপনারা নাচিয়েও ছাড়বেন বলে মনে হচ্ছে।

অবিনাশ ।। না। কারও ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাই নে।

হৃদয় ।। যদি জানা থাকে নাচ, তাহলে গানের সঙ্গে একটু-আধটু, নেহাত মন্দ হবে না। কি বলো তোমরা?

মনোরঞ্জন ।। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো? সে কথা তোমরা কিন্তু ভেবে দেখো। এসব নিয়ে আবার কোনো কথা না হয়।

মালতী ।। দিদিকে কিছু না-বললেই মিটে গেল।

মনোরঞ্জন ।। তাহলে চলুক। আমার আর আপত্তি কি।

হৃদয় ।। হৃদয়, সংযত হও। নিত্যানন্দ যে প্রস্তাব নিয়ে আজ এসেছে, সেই প্রস্তাব অনুসারে আমাদের কাজ যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে—এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

মালতী ।। তা হলে কী করব বলুন।

মনোরঞ্জন ।। পরে নাও পায়ে। সকলেরই যখন তাই ইচ্ছে।

[মালতী পায়ে ঘুঙুর বাঁধতে লাগল

পুলকেশ ।। আমার জীবনে আজ এ নতুন অভিজ্ঞতা। আমি অতি সাধারণ মানুষ। জীবনে খুব বেশি-কিছু দেখিনি। দেখি, আজ এদের নাচ ও গান কেমন জমে।

অবিনাশ ।। কেন। জমবে না বলে মনে হচ্ছে নাকি তোমার? নাটক যদি করতে হয় তাহলে তার সব-রকম প্রয়োজনের জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

ত্রিদিবেশ ।। নাটকের মুখবন্ধ করার ভার পড়েছিল আমার উপর। মুখবন্ধটা ভালোই হয়েছে বলতে হবে।

হৃদয় ।। অহো, বন্ধ বাক্।

[ঘুঙুর-বাঁধা সাঙ্গ করে পা ঝাঁকি দিয়ে-দিয়ে দেখে নিতে লাগল মালতী। একটু পায়চারি করে নিল

অবিনাশ ।। সকলে চুপ করো। এইটেই আমাদের শেষ আইটেম। এর পরেই আসর ভাঙবে।

মালতী ।। বসে বসেই আরম্ভ করি [illegible] তার পর যদি ইচ্ছে হয়, পরে [illegible] যাবে।

[মালতী চৌকির কো[illegible] [illegible]
[মালতী চোখ বন্ধ করে ডা[illegible] [illegible]র উপরে গাল রাখল। গুন গু[illegible] [illegible] করল। পায়ে তাল দি[illegible] [illegible]। ঘুঙুর বেজে বেজে উঠছে। কিছুক্ষণ ধরে চলল এই প্রস্তুতি।

মনোরঞ্জন ।। এই। ড্রপ। ড্রপ। ড্রপ।

অবিনাশ ।। কেন। কী হল? এখানে ড্রপ-সীন কোথায়?

মনোরঞ্জন ।। না। ড্রপ। ড্রপ। ড্রপ দি আইডিয়া।

[মনোরঞ্জন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মুখ ফ্যাকাশে।

অবিনাশ ।। কিছু বুঝতে পারছি নে। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে ঘাটের পাষাণে লেগে এ-যে নৌকোডুবির মতো মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি হে, মনোরঞ্জন?

[অনেকগুলি রঙবেরঙের বেলুন উড়িয়ে ছেলে ও মেয়ের হাত ধরে মনোরঞ্জনের স্ত্রীর প্রবেশ

স্ত্রী ।। কি হচ্ছে এখানে সব? ওদিকে উনুনে ভাত পুড়ে ছাই।

[দিদির গলা শুনে মালতী চোখ খুলল। চোখ খুলেই অবাক। মনোরঞ্জন-সহ সকলে হুড়মুড় করে অন্য দরজা দিয়ে চম্পট দিল

স্ত্রী ।। আশ্চর্য। অদ্ভুত!!

যবনিকা

সঠিক ঠিকানায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
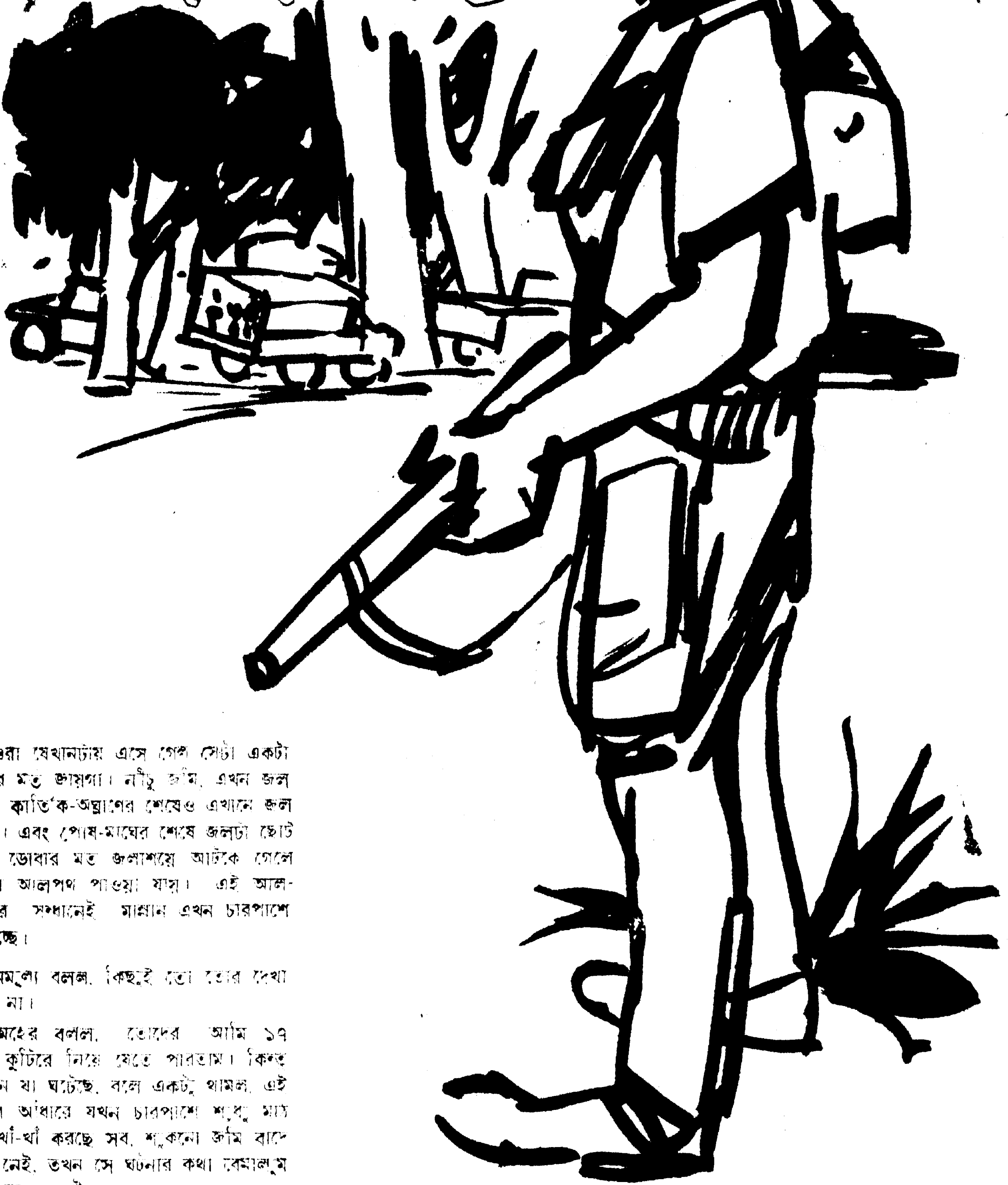
ওরা যেখানটায় এসে গেল সেটা একটা বিলের মত জায়গা। নীচু জমি, এখন জল নেই। কার্তিক-অঘ্রাণের শেষেও এখানে জল থাকে। এবং পৌষ-মাঘের শেষে জলটা ছোট ছোট ডোবার মত জলাশয়ে আটকে গেলে একটা আলপথ পাওয়া যায়। এই আল-পথটার সন্ধানেই মান্নান এখন চারপাশে তাকাচ্ছে।

অমলো বলল, কিছুই তো তোর দেখা যাচ্ছে না।

মেহের বলল, তোদের আমি ১৭ নম্বর কুটিরে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সেখানে যা ঘটেছে, বলে একটু থামল, এই রাতের আঁধারে যখন চারপাশে শুধু মাঠ এবং খাঁ-খাঁ করছে সব, শুকনো জমি বাদে কিছু নেই, তখন সে ঘটনার কথা বেমালুম চেপে যেতে চাইল।

অমলো বলল, যা বলার সোজাসুজি বলে ফেল।

—এখন না। আগে এ-বিলটা পার হয়ে যাই।

বাস্তবিকপক্ষে এ-বিলটা এখন পার হওয়া দায়। এত বড় বিল, এবং মাঠের চারপাশে ঝিঁ-ঝি পোকার ডাক, শুকনো জমি, ঘাস লতাপাতা মিলে ওদের কিছু সময়ের জন্য আবিষ্ট করে রেখেছে। ওরা সেই কবে বের হয়েছে, মনে হয় অনেকদিন অথচ দিন গুনলে খুব বেশী দিন নয়। লায়লা এখন কোথায় কে জানে। যদি ওরা এসে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলে এবং যা সব খবর আসছে, মান্নানের মুখটা যে শুকিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল। সে বলল, আশেপাশেই পথটা আছে। বুদু আমাকে ভুল খবর দিতে পারে না।

মেহের বলল, মাঠের ওপর দিয়েই হাঁটি না।

সাবু কিন্তু সায় দিল না। সে বলল, আমরা কোন্‌দিকে হাঁটছি বুঝতে পারছি না।

মেহের বলল, তা ঠিক।

—তবে! এটা একটা গোলকধাঁধা হয়ে যেতে পারে। সারারাত হেঁটে তুমি আমি দেখব সকালবেলা, যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। দিনের বেলা এখানে থাকলে তুমি আমি কেউ পার পাব না।

আকাশ মেঘলা। অথচ বৃষ্টি হচ্ছে না। কাল রাতে ওরা একটা বড় ঝুপড়ি অশ্বত্থ গাছে রাত যাপন করেছে। এবং যখন দুপুর রাত, তখন কেউ এসে ডেকে দিয়ে গেল, আপনারা নাইমা আসেন। তারপর হাঁটেন। সুজাপুরের মাঠে আপনাগো রাইত থাকতে থাকতে যাইতে হইব। সুজাপুরের মাঠে যখন ওরা এসে পৌঁছেছিল, তখন নয়াপাড়ার নিমগাছটার ফাঁকে লাল সূর্যটা দেখা যাচ্ছিল। মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল। এ-অঞ্চলে ওরা নেমেই বুঝতে পেরেছিল, ওদের দেখে কেউ কেউ সাহস পাচ্ছে। কেউ এসে ওদের প্রশ্ন করেছিল, ঢাকায় কি হইতাছে?

—ঠিক বলতে পারব না। শুধু আমরা যারা বেঙ্গল রেজিমেণ্টের লোক, তাদের কিছু খবর রাখি।

ওরা বলেছিল, সব নাকি মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিছে।

—জানি না চাচা। শুধু জানি আমাদের ব্যারেক ওরা গোলা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।

প্রাণপণ লড়ে পার পাইনি। এখন কোথাও চলে যাচ্ছি. কোথায় যাচ্ছি জানি না।

—আমাদের গাঁয়ের ইসাহাকের বেটা মুক্তিফৌজে চইলা গেছে। ছাওয়াল-পাওয়াল নিয়া কি যে করি!

—কেন, কি হল?

—রক্ত টগবগ কইরা ফোটে। কথায় কথায় আমার পোলাডা কয় থামু গিয়া। আমি কই কোনখানে যাইবি, সব আবার ঠিকঠাক হইয়া যাইব।

মান্নান ক্লান্ত ছিল. সে আর কথা বলতে পারেনি। মান্নানের উঁচু লম্বা শরীর। গায়ে খাঁকি জামা-প্যান্ট। কাঁধে রাইফেল। সব মিলে সকালের সূর্যে বেশ তাজা দেখাচ্ছিল! ওরা চারজন এ-গ্রাম থেকেই কিছু নাশতা সেরে নেবে ভেবেছিল, কি আর নাশতা, বুদু এসেছিল মাথায় চারটা শানকি নিয়ে—এক বদনা পানি, শানকিতে পান্তা ভাত। জল, ভাতের চেয়ে বেশী। এবং নুন এক পোটলা। নুনের পরিমাণ এতটা পান্তা-ভাতের তুলনায় কম, তবু ওরা গোপনে চাচার ঘরে একটা মাদুর বিছিয়ে পান্তা-ভাতক'টা খেয়েছিল—খুব সাদাসিধে খাবার, লেবু পাতা, শুকনো লঙ্কা পোড়া এবং যে-নুনটা ওদের জন্য বরাদ্দ, সবটা ওরা খায়নি, আর্ধেকটা রেখে দিয়েছে। এই একটু নুনের প্রয়োজন ওদের জীবনে এখন খুব বেশী। ওরা আবার হাঁটছে।

মান্নান বলল, এদিকটায় আয়তো?

অমূল্য একটু এগিয়ে গেল। খুব অন্ধকার, দুটো একটা বিলের জোনাকি ওদের মাথার উপর উড়ছে। কোন ডোবা অথবা আল থেকে অথবা জলা থেকে মাছের ঘাই শোনা যাচ্ছে। এ-সব বিলে শোল বোয়াল শিং কই মাছ খুব একটা থাকে। জলা শুকিয়ে গেলে ওরা জলায় আটকে যায়। দূরে দূরে দুটো-একটা লণ্ঠন জ্বলছে। কেউ রাত জেগে সেই জলার মাছ হয়তো পাহারা দিচ্ছে। সকালে জাল ফেলে মাছ ধরা, এবং মাছ বাজারে গঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া। এতটা দূরে, বোধহয় গাঁয়ে গঞ্জে ঢেউ এসে এখনও লাগেনি। শুধু মানুষজন শহর ছেড়ে গাঁয়ে চলে আসছে। ওরা যাবে আট নম্বর কুটিরে। কুটির কোথায় আছে তাদের জানা নেই। কুটির দরকার হলে নির্মাণও করে নিতে হতে পারে। কি করতে হবে বুঝতে পারছে না তারা। কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করবে, কার সঙ্গে করলে, এই দেশের মাটি এবং মানুষের সঙ্গে ঠিক মিশে যাওয়া যাবে বুঝতে পারছে না মান্নান। ওরা দিন রাত বর্ডার পাবে বলে হেঁটে যাচ্ছে। সোজা যেতে পারছে না। আজ হয়ত ওরা যে-পথটা ধরে এল, কাল শুনল, ওটা নিরাপদ নয়, এখান থেকে ওদের অন্য পথ অথবা অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে হাঁটতে হবে। এবং মান্নান, অমূল্য সবাই বুঝতে পারছে ওরা এভাবে হেঁটেও খুব একটা বেশী বর্ডারের কাছাকাছি আসতে পারেনি।

মেহের বলল, আমি ভাবছিলাম ছই-এর ওদিকটায় খবর নিলে হত।

অমূল্য বলল, ওরা কাদের লোক কে জানে।

মান্নান বলল, যাদেরই হোক। এখন আর উপায় নেই। এদিক-ওদিক হলে আমাদেরও এদিক-ওদিক করে ফেলতে হবে।

এ-সব হামেশাই হচ্ছে। কে যে বিশ্বাসী, কে যে আপনার জন এবং কে যে সারারাত ওদের পিছু পিছু হাঁটছে ঠিক বুঝতে পারছে না। ফলে এক সন্দেহ, এবং আকস্মিক সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত আগেও জানত না এ-ভাবে কোন মানুষ মুখ থুবড়ে মাটির ওপর পড়ে যেতে পারে। বুকের রক্তে মাটি ভেসে যেতে পারে। ইঁদুর ব্যাং মেরে ফেলার মত অথবা কীট-পতঙ্গের আওয়াজ পেলে যে সামান্য ভীরুতা জাগে, এই সব বেইমান মানুষের কাময় সেই ভীরুতা পর্যন্ত টের পায় না মান্নান। মান্নান কেমন ক্রমে শক্ত এবং কঠিন মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, আয়।

ওরা এগোতে থাকল।

ওরা জলার ধারে ধারে হাঁটছে। কিছু কিছু মাঠে ধানের চাষ, পাটের চাষ আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্ধকারেই হাঁটতে হাঁটতে ওরা টের পায় পায়ের নীচে মাটি, ঘাস, পাটের চারা অথবা ধানগাছ সব মিলে একটা খস-খস শব্দ—আর চারজন মানুষের ছায়াবিহীন শরীর অন্ধকার পিছনে ফেলে সেই লণ্ঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা জিজ্ঞাসা করে নেবে, আলপথটা কোথায়? কোন্‌দিকে, কি-ভাবে ওরা কমলাপুরের ঘাটে নেমে যাবে। সেই গঞ্জেও ওদের লোক থাকার [illegible]। এতটা পথ ওরা এসেছে কমলাপুর [illegible] বলে।

—পথটা তোমার জানা আছে [illegible]

মান্নান বলল, চারজন একসঙ্গে [illegible] থলে চেঁচামেচি করতে পারে। ভয় পে[illegible] পারে। সাবু তুই যা। গিয়ে জেনে আয়। আমরা এখানটায় বসে থাকলাম। তোকে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। বেশ দূর মনে হচ্ছে।

ওরা তিনজন বসে পড়ল ঘাসের ওপর। গরমকাল। অথচ একটা ঠাণ্ডা বাতাস বিলের, ওদের যে ঘামটুকু ছিল শরীরে ওটা শুষে নিচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। সাবুকে দেখা যাচ্ছে না। ওর শরীর ক্রমে অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেল। এবং ওরা প্রথমে বুঝতে পারল না, সাবু কতদূরে গেছে।

মান্নান বলল, অমূল্য তোর কষ্ট হচ্ছে না তো?

—কষ্ট হবে কেন?

—তুই তো আমাদের মতো রাইট-লেফট্ করা মানুষ নস।

—তার জন্য কি হয়েছে।

—আমাদের অভ্যাস আছে, তোর নেই।

—কিসের অভ্যাস বলতে চাস?

—এই একনাগাড়ে হেঁটে যাওয়া। একবার আমাকে কোম্পানী কমাণ্ডার সারাদিন কম্বল প্যারেড করিয়েছিল। তবু আমি হেলে পড়িনি।

অমূল্য জানে মান্নান ভীষণ জেদী এবং গোঁয়ার। সে যা ভাল বুঝবে, করবে।

সে অন্ধকারে এখন মান্নানের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ওর সঙ্গে কথা বললে যেন বলে যাবে, অমূল্য তুই কেন এলি, কি দরকার ছিল। তুই যুদ্ধ করতে জানিস না। রাইফেল জীবনে হাতে নিয়ে দেখিসনি, তোকে নিয়ে আমরা কি করব! অথচ সে জানে মুখ ফুটে মান্নান কিছুই বলতে পারবে না। ওর এখন নানারকম চিন্তা, অমূল্য এবং সে অথবা গ্রামের আরও পাঁচ-সাতজন মানুষ কেবল ব্যাপারটা জানে—এবং খবর যে কারা পৌঁছে দিল, মান্নান পালিয়ে তার গাঁয়ে চলে এসেছে। অমূল্য এখন দু-পা ছড়িয়ে দেবার সময় বলল, লায়লা কি করছে কে জানে!

মান্নান বলল, ও-সব কথা তুলছিস কেন?

অমূল্য বুঝল এখন সত্যি ওসব কথা তোলা ঠিক না। যেন তুললেই যে আশ্চর্য এক শক্তি মনে মনে গড়ে উঠছে সেটা ভেঙে যাবে।

মেহের বলল, সাবুটা এতক্ষণ কি করছে! কতক্ষণ হয়ে গেল, এখনও ফিরছে না!

—তাইতো!

—তুই যাবি? অমূল্য মেহেরকে বলল।

—ঘুরে এলে হয়।

ঘুরে এলে হয় বলেও মেহের কি বলবে বলবে করে ইতস্ততঃ করছিল। সে যাচ্ছে না। সে মান্নানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মান্নান বলল, যা না। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?

মেহের যেন এবার না বলে পারল না। —পথটা জেনে এলেই হয়ে যাবে। আমাদের আর কিছু লাগবে না!

—আর কিছু লাগবে না। ঠাণ্ডা গলায় মান্নান জবাব দিল।

এমন কথা শুনলে মেহের ভয় পায় মান্নানকে। মান্নানের সঙ্গে অনেকদিন বাখরগঞ্জের ক্যাম্পে ছিল। তখনই সে দেখেছে, মান্নান যা বলে তা করে। ওর এই জেদী স্বভাবের জন্য হাবিলদার র‍্যাঙ্কে উঠতে পারল না। মেহের সব জানে বলেই আর কথা বাড়াল না। সে ছইয়ের দিকে হাঁটতে থাকল।

তখন ফের মান্নানের গলা, এই, কি বলতে এসে না বলে যাচ্ছিস কেন।

মেহের ফিরে দাঁড়াল। লজ্জা করছে বলতে, এমন গলায় বলা, ঐ লোকটাকে সঙ্গে করে পাশের গাঁয়ে গেলে হত না! কিছু না খেলে!

—তোর এটা বলতে লজ্জা করছে! মান্নান হা হা করে হেসে উঠল। আমারও তাই মনে হচ্ছিল, আর হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। পেটটা কেমন চোঁ চোঁ করছে।

অমূল্য বলল, কিছু না খেলে হবে না।

ওদের কাছে কিছুই নেই। সেই সকালে নাশতা করেছে। এখন প্রায় রাত আটটা বাজে। এতক্ষণ ওরা কেবল হেঁটে এসেছে বনের ভিতর দিয়ে অথবা কাশের জঙ্গল যেখানে তার ভিতর দিয়ে। একনাগাড় হাঁটা। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো। কোন দিকে যেতে হবে সঠিক রাস্তা জানে না, কেবল আন্দাজে আন্দাজে যাওয়া।

অমূল্য বলল, এখানে বসে কি হবে। বরং চল সবাই যাওয়া যাক।

ওরা গিয়ে আশ্চর্য হল। শুধু লণ্ঠন জ্বলছে, একটা ছেঁড়া মাদুর, কোন লোক নেই ভেতরে। এমন কি সাবুকে না দেখে ওরা কেমন ভীত হয়ে পড়ল। হ্যারিকেনের আলোটা উসকে দেও না। ছইয়ের চারপাশে শুকনো ঘাস। ভিতরে খড় বিছানো। অন্ধকারে গোটা ব্যাপারটাই কেমন রহস্যজনক মনে হল ওদের কাছে।

অমূল্য বলল, সাবুকে ডাকি।

মান্নান একটু কি ভাবল। বলল, না। আয়। আমরা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকি।

মেহের বলল, তুই কিরে মান্নান! বলে ডান কাঁধের রাইফেল বাঁ কাঁধে নিয়ে এল।

—কেন কি হয়েছে!

—কিছু হয়নি বলতে চাস! তুই এখনও নিশ্চিন্ত। এতক্ষণ কোথাও সাবু চুপচাপ থাকতে পারে!

এখন নানারকমের সংশয়। সাবু কোথায় যেতে পারে। ভিতরের লোকটিই বা কোথায়। অথবা কি ওরা কোন ট্র্যাপে পড়ে গেল! কি যে করবে বুঝতে পারছে না!

এ সময় এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া যাচ্ছে না। সাবু কোথায় আছে, সে এখানে নেই কেন, সে এসে কি দেখেছিল, এখানে কি সেও দেখেছে শুধু হ্যারিকেন জ্বলছে, কোন মানুষ নেই, সে কি সেই খবর দিতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে, না সে একা ছিল বলে ভয়ে কোথাও সংজ্ঞা হারিয়েছে—এতসব প্রশ্ন মাথায় এলে ওরা কিছুতেই চলে যেতে পারত না।

মান্নান বলল, সাবুকে ডাক।

অমূল্য অন্ধকার মাঠে ডাকল, সা...বু আমরা এ...খা...নে। ... ...

অন্ধকারে কোন সাড়া পাওয়া গেল না! এমন কি রাতের অন্ধকারে প্রতিধ্বনি ওঠার কথা, যেন মনে হয় একটা ডাকই বার বার ঘুরে ফিরে আসছে, কেউ যেন ডেকে ডেকে যাচ্ছে—অথচ তেমন কিছুই হচ্ছে না, ওরা চারপাশে অন্ধকারে সাবুকে খুঁজছে, এমন একটা বিশাল বিলের মাঠে শুধু একটা হ্যারিকেনের আলো, মনুষ্যবিহীন মাঠ এবং অন্ধকারে তিনজন। কোথাও কোন গুলি গোলার শব্দ উঠছে কিনা কান পেতে লক্ষ্য করলে মনে হল অনেক দূরে একটা পাকা সড়ক। এবং সড়কের উপর গাড়ির আলো। মনে হচ্ছে গাড়িগুলো এদিকেই নেমে আসছে। কারণ আলো ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

মান্নান বলল, অমূল্য কি করবি?

অমূল্য অনেক দূরে গাড়িগুলো দেখছে। চষা মাঠের ওপর দিয়েই গাড়ীগুলো মনে হয় নেমে আসছে। অমূল্য বলল, চষা জমির ওপর দিয়ে গাড়িগুলো নেমে আসছে কেন বুঝতে পারছি না।

এবং ওরা আরও কিছু দূরে গেলে দেখল, বড় একটা নালা। জল কম। দু পাড়ে কিছু গাছপালা। জায়গাটার সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। মান্নান বলল, টর্চ জেলে দেখবি?

অমূল্য এখন টর্চ জ্বালাতে নিষেধ করল। —ওগুলো কি সেই সব গাড়ি! ওদের ধরার জন্য কেউ নেমে আসছে! এমন একটা প্রশ্ন উঁকি দিতেই অমূল্য বলল, আমাদের এক্ষুণি যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাওয়া উচিত।

কিন্তু সাবু, সাবুকে ফেলে...

মেহের বলল, সাবু টের পেয়ে পালাতে পারে। সেই হয়ত এই আলোটা দেখেই বুঝতে পেরেছে কোথাও কিছু হচ্ছে।

মান্নান হেসে দিল। বলল, সাবু এমন ভীরু আমার বিশ্বাস হয় না।

এবং ক্রমে গাড়িগুলো নেমে আসছে। কটা গাড়ি ঠিক বুঝতে পারছে না। মান্নান বলল, একটা এনকাউণ্টারে নেমে গেলে কেমন হয় এবং এমন ভাবতেই ওরা দেখল গাড়িগুলো ডান দিকে ঘুরে যাচ্ছে। মান্নান বলল, তোরা শুয়ে পড়। এখন যেভাবে গাড়ি ঘোড়াচ্ছে, আলো এসে আমাদের মুখে পড়তে পারে।

তবে দূর থেকেও এই মাঠে আমাদের ওরা দেখে ফেলবে। এত রাতে এমন একটা বড় মাঠে মানুষগুলো কি করছে ওরা ভাববে। ওদের সন্দেহ হলে ওরা গুলি চালাবে।

ফলে ওরা তিনজনই শুয়ে পড়ল। অমূল্যর পিঠে ছিল চারটা মোটা কালো রংয়ের কম্বল। আর একটা মগ। প্রত্যেকের জন্য দুটো করে লুংগি একটা হাফসার্ট। তাও তার পিঠে বোঁচকাবুঁচকির ভিতর আছে। মান্নানের কাঁধে রাইফেল। পিঠে হ্যাভরসেক। সেখানে, সে বের হবার সময় কিছুই নিতে পারেনি। এখন সেখানে আছে একটা ভাংগা চিরুনি, ভাংগা আয়না আর কিছু টুকিটাকি জিনিস। যেমন খুব সকাল হলে মান্নান সব পারে, কিন্তু মটকলা ডালে দাঁত না মেজে পারে না। কিছু কাটা মটকলার ডাল ব্যাগের ভিতর। এবং আর যা আছে, সেটা খানিকটা নুন পুঁটলিতে। মেহেরের পিঠেও একটা ব্যাগ, কাঁধের রাই-ফেলটা সে ডানদিকে রাখল এবং তারপর পুরো লাইং পজিশান। ওরা ডান হাতে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছে, ওরা বুকের ওপর ভর দিয়ে চলছে, কারণ মনে হচ্ছে গাড়িগুলো এদিকেই নেমে আসছে।

আর এখন মনে হল, ওরা যেখানটায় এসে পৌঁছেছে—চার পাশে কেমন পচা গন্ধ। এবং মনে হচ্ছে মাথার ওপর সব গাছপালা। একটা নালার মতো জলের রেখা বিলের ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেছে। দুপাড়ে তার গাছপালা। এবং বড় বড় সব তার ছায়া। অন্ধকারেও গাছের ছায়া ধরা যায়। ছায়ার ভিতর এলে আর কিছুই দেখা যায় না। ওরা যে কোথায় ভুল পথে নেমে আসছে। আর আশ্চর্য গাড়িগুলো বড় আস্তে আস্তে আসছে। যতই আস্তে হোক ওদের পক্ষে সম্ভব নয় আর কোথাও ভেগে পড়া। বড় বা সব গাছ গাছালি আছে মাথার ওপর, সেখানে উঠে গেলে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। এ সময় মাথা গরম করে লাভ নেই।

এবং গাছে উঠে গেলেই মনে হল, সামনে ওরা যা নালা অথবা খাল ভেবেছিল—আসলে ওটা নালা নয়। মস্ত বড় ঝিল। কারণ গাড়ির আলো তখন গাছের ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে চলে গেছে। এমন কি জলে যেসব শালুকফুল ফুটে আছে তাও দেখা যাচ্ছে। কিছু পদ্মপাতা আছে এবং জলের শ্যাওলা জাতীয় ঘাস, জলের ওপর কলমি লতা সব মিলে জায়গাটা ভারি সুন্দর। কারণ এই অন্ধকারে গাড়ির সরল রেখার আলো, কখনও বেঁকে যাচ্ছে, কখনও কাঁপছে, কখনও হঠাৎ উঁচু হয়ে যাচ্ছে, গাড়িগুলো চলছে তো চলছেই এবং এক সময় ওরা গাছের ওপর থেকে দেখে অবাক হল, গাড়িতে কিছু মানুষ। এক দুজন নয় বেশ সারি সারি। হাত পা বাঁধা মানুষ। এবং লণ্ঠনের আলোটা তখন মাঠে নিভে গেছে।

মান্নান বুঝতে পারল, লণ্ঠনের আলোটা মাঠে সিগনেলিংয়ের কাজ করছে। গাড়ি-গুলো লণ্ঠনের আলো দেখে ঠিক ঠিক জায়গায় নেমে আসছে। চার পাঁচ ক্রোস দূরে হবে চারপাশের গ্রাম গঞ্জ। এত বড় বিলে বোধ হয় ওরা সুবিধে পেয়ে গেছে মানুষগুলোকে ভাসিয়ে দেবার। মান্নান কথা বলতে পারছে না। পাশের ডালে অমূল্য। ওর বোচকা-বুচকি ডালে বাঁধা। নীচ থেকে আলো ফেললে টের পাবে না কেউ। কারণ গাছগুলো সুপুরির মতো। লতাপাতা এত বেশী যে যে কোন মানুষ অনায়াসে গভীর অরণ্যে লুকিয়ে আছে এমন ভাবতে পারে। পাশাপাশি ডালগুলো এঁকে বেঁকে গেছে, এবং ঝোপঝাড় ফাঁক করে ফেললে ওরা দেখতে পেল সেই সব ট্রাক গাছের নীচে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রথম গাড়িটা খুব বড় নয়। জিপ গাড়িকে ছোট ট্রাকের মতো করে নিয়েছে, পরের গাড়িটাতে কত-জন লোক আছে বোঝা যাচ্ছে না। কারণ গাড়ির হেড-লাইটের আলো নেভানো। বড় একটা টর্চ জেলে ওরা বিলের ভিতর কি দেখছে। ওদের মাথায় হেলমেট, ওদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওদের পিঠে ছোট ছোট হালকা মেসিনগান। যেন ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে। এবং হাত পা বাঁধা মানুষগুলোকে ঠেলে ঠেলে গাড়ি থেকে ফেলে দিচ্ছে। তারপর যেমন হেঁটে যেতে বলা, এই আদমিলোগ হাঁটনা অভি, আওর কিয়া কাম, তুমলোগ বহুত বড়া সফরমে চলতা—এসব এক ধরনের উক্তি যা শুনলে মান্নানের রক্ত কেমন কেঁপে কেঁপে যায়—সে দেখল মানুষগুলো কেঁপে কেঁপে হাঁটছে, ওদের পরণে লুংগি, পায়জামা, ছেঁড়া জামা এবং কিছু মেয়ে বৌ, ওরা কেন এখানে, মান্নানের রক্ত কেমন করে উঠছে। অমূল্য বলল, মান্নান আমাদের কুটিরে যেতে হবে, উত্তেজনা ভাল না।

মান্নান কোন কথা বলছে না। সে গুণছে, এক দুই তিন, ত্রিশ, চল্লিশ। এবং এক যুবতী মেয়ে টর্চের আলোয় মুখ তুলতে পারছে না। মেয়েটার শরীরে—না আর দেখা যাচ্ছে না, মান্নান চোখ বুজে ফেলল।

টর্চের আলো বেশ লম্বা হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এবং ট্রাকের শব্দ, বোধ হয় গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিলের দিকে। অন্ধকারে ওরা হালকা মেসিন গান দাগলে—বুঝি ফল হবে না। ওরা মাত্র নজন। মান্নান গুণে গুণে দেখল মাত্র নজন। চারটে ছোট বড় ট্রাকে প্রায় দেড়-দুশো মানুষ, যেন চালানি মানুষ, গরু-ছাগল বিক্রি করে দেবার মতো করে নিয়ে এসেছে।

একজন যুবতী মেয়েকে ওরা হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কি করে টের পেল যুবতী মেয়ে এর ভিতর রয়ে গেছে। ওকে এভাবে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি করে দেয়া যায় না। ওকে পাঁজাকোলে তুলে নিলে মনোরম, ওর চোখমুখ দেখা যাচ্ছে না, চুলে ঢেকে আছে সব। এবং মেয়ের হাত শক্ত, শক্ত শরীর, নানা রকমের নদীনালার দাগ শরীরে। কতদিন মেয়েটা একটা হিজলের ডাল খুঁজেছে। ঝুলে পড়বে বলে বের হয়ে পড়েছিল। পারেনি। কেবল হাত বদলের পালা চলছে।

বোধ হয় হাত বদলের পালা বলে ওরা বেছে বেছে যুবতীদের সরিয়ে দিচ্ছে। ওদের ফের ট্রাকে তুলে দিল। এখন পাশের বিল, শাপলা শালুক, পদ্মপাতা এবং কলমি লতার বন সব স্পষ্ট। প্রায় দিনের মত। ওরা ঘুরিয়ে রাস্তার ও-পারে টর্চ ফেলছে। কারণ রাস্তার ও-পাশটা অন্ধকার। গাড়ি-গুলোর মুখ উত্তরে। সব হেডলাইট জ্বালা। গাড়ির ওপরে কিছু যুবতী মেয়ে। কেন জানি মান্নানের মনে হল—এর ভিতর যদি লায়লা থাকে।

তারপর সে নিজের মনেই হাসল। থাকার কথা নয়। অনেকদিন থেকে ওরা হাঁটছে। অতদূরে থেকে লায়লাকে নিয়ে আসার কথা না। ওখানে অনেক বধ্যভূমি রয়েছে কিন্তু যদি এমন হয়ে থাকে, মান্নান বাড়ি থেকে রাতে সরে পড়ার পর ওরা এসে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, এই কদিনে মান্নান চোখের ওপর কতবার দেখেছে, দিগন্ত রেখায় আগুনের হলকা, সারা আকাশ লাল হয়ে যাচ্ছে মানুষের আর্তনাদ এবং দূর থেকে কেমন করুণ গাধার ডাক, লায়লা পাগলের মত পালাচ্ছে, এক অগণিত অমানুষের জনতা লায়লাকে ধরতে আসছে এবং তার দুই ছেলের আর্ত কান্না। ওদের বোধ হয় আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। মান্নান ভাবতে ভাবতে কাঠ হয়ে গেল।

এবং এ-সময়েই সেই দুঃখী মান[illegible] হাঁটছে। হাত বাঁধা। ওদের শরীরে [illegible] লাইটের আলো। গাড়ির ভিতর [illegible] যেন হাঁকছে—দোহাই আল্লার—ওদের তোমরা মের না। আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাও। যা-কিছু ইচ্ছা করতে পার। দোহাই আল্লার, ওদের তোমরা মের না।

মান্নান, অমূল্য এবং মেহের অন্ধকারে আঁৎকে উঠল। চেনা গলা। ঠিক লায়লা অবিকল এইভাবে কতবার বলেছে, দোহাই আল্লার, তুমি ওদের ওভাবে মের না। মান্নান বাড়ি এলে কখনও কখনও জাফরের দুষ্টামীতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে মারধোর করত। লায়লার খুব কষ্ট হত তখন।

অমূল্য বলল, মান্নান আমাদের অনেক কাজ।

মান্নান ডালের সঙ্গে সেঁটে আছে। সে শক্ত হয়ে আছে। মেহের একটু কাছে এগিয়ে গেল। অনেকটা গাছের জীবের মতো সে মান্নানের পায়ের কাছে বসে আছে। এবং সেই মানুষেরা সারি সারি হেঁটে যাচ্ছে তখনও। ঝিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। হেড-লাইটের আলো স্থির। চষা-জমির মাটি দেখা যাচ্ছে। কিছু ধানের চারা

পাটের চারা, আর জমিতে মানুষের পায়ের দাগ। আর নজন মাত্র মানুষের হাতে নটা মেসিন গান। ওগুলো ঠিক মেসিন-গান কিনা মান্নান তাও বলতে পারে না। মান্নান খুব বেশী দেখলে স্টেন গান দেখেছে। ওদের কাজ-কারবার শুধু রাইফেল নিয়ে। তার বেশী তারা কিছু জানে না। তবু মান্নান এখন শক্ত কাঠ হয়ে আছে।

মেহের টু শব্দ করছে না। এই গলা সেও যেন চিনে ফেলেছে। যেন সেদিন সে আর ঐ মেয়ে কোন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গল্প করেছে। কলেজের ছুটির পর পালিয়ে নদীর ধারে বসে রয়েছে। এমন অনেক কথা মনে হলে, একজন মানুষের অপেক্ষায় বসে থাকে তারা, সে তাদের নদী পার করে নিয়ে যাবে।

অমূল্য বলল, কি করবি?

মেহের বলল, সাবুটা যে কোথায় গেল।

মান্নান বলল, আয় নামি।

মেহের বলল, তুই পাগল মান্নান। ওরা নজন. গাড়িতে দুজন করে বসে আছে, আমরা যেখানটায় বসেছিলাম, সেদিকে চারজন হেঁটে গেল। ওরা মোট একুশ জন।

মান্নান বলল, আমরা অনেক। আমাদের পক্ষে সব। এই জমি মাটি গাছপালা সব আমাদের পক্ষে!

মেহের আর কিছু বলতে পারল না। এ-ভাবেই কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। এবং এ-ভাবেই গাছ ফুল ফল পাখি সব মানুষের জন্য সজীব থাকলে, এক অদৃশ্য আকাঙ্ক্ষা মানুষের, মানুষ এখন নিজের স্বাধীনতার কথা ভাবে। সে রাতে মান্নান গাড়ির ফাঁকে লুকোয় নি। একটু নীচে নেমে তিনজন ওরা বড় বড় গাছের মোটা শেকড়ের আড়ালে মাথা রেখে, কারণ যতবার হেড-লাইটের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছিল, ততবার ওরা দেখল, বড় বড় গাছের শেকড়, কালো সরিসৃপের মতো পড়ে আছে. কোথাও কোন ভয়ঙ্কর মানুষদের আসতে দেখা যাচ্ছে না। এখানে এই গণ-কবরভূমিতে ওরা একটা লণ্ঠনের আলো রেখে দেয় শুধু, একজন মানুষ আসে সেই দূর গ্রাম থেকে, সে আলোটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে। দুপুরের দিকে রওনা হয়, সন্ধ্যায় আলো জেলে এই গাড়িতে চলে যায়। লোকটার এবং সাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না। আর অবাক ওরা দেখল, সারি সারি মানুষের মাথায় বুকে গুলির ঝাঁক উড়ে আসবার মতো—তখন কিনা কোথা থেকে পর পর কটা আওয়াজ, আর আশ্চর্য, কিছু মানুষের ছায়া অদৃশ্য হয়ে যায়. কিছু মানুষের মুখ দেখা যায় না, যারা মেসিনগান দাগাচ্ছিল তাদের আর দেখা যাচ্ছে না, চষা জমির ওপর ওরা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। এবং মানুষের এমন নিরিবিলি একটা সময় আছে ভাবা যায় না, সব পাথরের মতো স্থির, যারা এসেছিল গণ-কবরে, তাদের মুখে আলো এবং সাদা জ্যোৎস্নার মতো তারা স্থির হয়ে আছে।

মান্নান ফিস ফিস করে বলল, কি হল!

—কিছু বুঝতে পারছি না।

অমূল্য বলল, চুপ।

কেউ যেন হামাগুড়ি দিয়ে ও-দিকটায় উঠে যাচ্ছে। আবার গুলি। এবং কোথায় যে কি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। খুব দ্রুত হেড-লাইটের আলো ঘুরে যাচ্ছে। চষা জমির ওপর দিয়ে সেই আলোর রেখায় মায়াবী এক দৃশ্য তৈরী হচ্ছে, এবং মানুষেরা কেউ ঝিলের পারে নড়ছে না। এই সময় বুঝে ওরা কেউ আবার মেসিনগানে হাত রাখলে অতি নিপুণভাবে শেষ করে দিল শেষ মানুষটাকে।

মেহের বলল, কিরে এটা কি হচ্ছে!

অমূল্য বলল, কেউ আমাদের পক্ষ হয়ে লড়ছে!

মান্নান বলল, জানি না। যেন ওর বলার ইচ্ছা হল, এ-ঠিক কোন দেবদূতের কাজ অমূল্য। আমরা জানি না।

তারপর আবার খানিকক্ষণ কোন শব্দ উঠছে না। ঝিলের পারে মানুষগুলো কাঁপছে। হেড লাইট আর ঘুরছে না। স্থির হয়ে আছে। তবু কোথাও কোন গুপ্ত জায়গায় কেউ ওঁৎ পেতে থাকতে পারে, মান্নান সেজন্য ওদের ওঠার কোন নির্দেশ দিল না। ওরা বন্দুকের নল উঁচু করে মাটিতে পড়ে থাকল। ঠিক এরা কতজন এসেছে সে জানে না। একটা অযথা অঘটন ঘটতে দেওয়া ঠিক না। বরং গাছের আড়ালে পাড় থেকে এক এক করে সবকটা দৃশ্য দেখে ফেলতে পারলে সে স্থির করতে পারবে—ওর কি করণীয়। সে বলল, অমূল্য আমার মনে হচ্ছে আর হেড-লাইট ঘুরবে না। সব কটা শেষ।

আবার তখনই মাঠের কিছু দূরে শব্দ উঠছে। বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হলে মাঠের ভিতর এমন ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা জাগে ভাবা যায় না। মান্নান বলল, এখনও দেখছি শেষ হয়নি।

তারপরই মনে হল দূরে থেকে কেউ ছুটে আসছে, পাগলের মতো ছুটে আসছে—আর কি আশ্চর্য সাবু এবং একটা লোক, ওরা হেড-লাইটের সামনে এলে দেখল, রক্ত-পাত ওদের হাতে পায়ে, এবং ওরা টলতে টলতে মানুষগুলোর দিকে যাচ্ছে। মান্নান পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, সাবু!

সাবু কথা বলতে পারছে না। ওর শরীরে এখন যেন কঠিন অসুখ, সে হাঁটতে পারছে না। সে তবু সেই সব মানুষের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, ওদের হাতের পায়ের দড়ি-দড়া বেয়নেট দিয়ে কেটে দিচ্ছে, আর পিছন থেকে মান্নান অমূল্য মেহের এসে ওকে জড়িয়ে ধরছে, তবু এখন সময় নয় আনন্দ করার ওর। সাবুকে একটা গাড়িতে তুলে নিল। এবং ওদের ছেড়ে দিতেই মনে হল, গাড়িতে নারী যুবতী আছে, ওরা মাথা গুঁজে বসে আছে। ওরা অপরিচিতা, ওদের ঘর কোথায় এখন যেন ভুলে গেছে। হাত বদলের জন্য ওদের চোখ-মুখ কাতর, ছিন্ন-বাস, এবং চুল রুক্ষ।

তারপর দেখা গেল সব মানুষেরা কোথাও চলে যাচ্ছে। ওরা একটা দল হয়ে গেছে। মান্নান গাড়ি চালাচ্ছিল, খুব ধীরে ধীরে, আহত সাবুকে তুলে নিয়েছে। একটা গুলি ওর বাঁ কাঁধের পাশ থেকে বের হয়ে গেছে। ওদের, এখন সবাইকে বর্ডার পার করে দিতে হবে। ওর ভাল লাগছিল ভাবতে, চারটা গাড়ি পেয়ে গেছে। ওগুলো নিয়ে সে নিজেই একটা বাহিনী এখন গড়ে তুলতে পারে। সে বলল, সাবু এটা কি করে হল।

সাবু কিছু বলতে পারছে না। সেই লোকটা কেবল বলছে—সে এক অদ্ভুত গল্প। বিশ্বাস করতে কষ্ট, মানুষ স্বাধীনতার জন্য কি না করে!

ওরা চষা জমির ওপর দিয়ে গাড়ি-গুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি এগোতে পারছে না। চাকা বসে যাচ্ছে। এতসব লোক—ওদের প্রাণে কি যে দুর্জয় সাহস। মেয়েদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে। কারণ মান্নান এখন আর আলাদা করে কোন মেয়েকে যেন চিনতে পারে না। সবাই তার কাছে আম্মা অথবা জননীর মতো। যেন লায়লাকে এখন বাপের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। লায়লার জন্য তার এখন কোন আর দুঃখ থাকছে না।

শুধু লণ্ঠন যে নিয়ে আসত সেই লোকটা কেমন কোরাণ পাঠের মতো সব পবিত্র কথা আওড়ে যাচ্ছে, কি করে এই তেপান্তরের মাঠে তার রোজকার সফর ছিল লণ্ঠন পৌঁছে দেওয়া, কিন্তু মানুষের অপার মহিমা, বোঝা দায় সব, গাড়িতে তার ফেরার কথা। কোথা থেকে ফেরাস্তার মতো একটা মানুষ এসেছিল, কাঁধে তার রাইফেল, সে এসে বলল, সঠিক পথের সন্ধান আছে মিঞা। তখন সে বলেছিল, এখানেই পয়লা বিশমিল্লা বলে জান দিয়ে লড়াই কর মিঞা, পথ ঠিক পেয়ে যাবে।

মান্নানের মনে হল, এ-ভাবেই সে এখানে থেকে যাবে, তাকে আর বর্ডার পার হতে হবে না, সে তার বাহিনী নিয়ে নিজের মতো করে নদী পার হয়ে যাবে। পথটা তার এখন খুব চেনা চেনা লাগছে। কারণ সঠিক ঠিকানায় সে আজ পৌঁছে গেছে।

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

দেয়াল

দু বাড়ীর মাঝে একটি মাত্র দেয়ালের ব্যবধান। পাশাপাশি দরজা, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, এমনি বিভ্রাট প্রায়ই দেখা দেয়। যারা নতুন আসে, দেয়ালের ব্যবধান না বুঝে ভুল করে বসে। ভেতরে ঢুকলে অবশ্য ভুলটা ধরা পড়ে, যখন হাশেম আলী ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে, 'এটা ভদ্রলোকের বাড়ী...'। বাকী কথা শোনার জন্যে আগন্তুক আর অপেক্ষা করতে সাহস করে না, মুহূর্তে পালিয়ে যায়। কিন্তু হাশেম আলীর রাগ কমে না, বারান্দায় বার বার পায়চারি করে, দেয়ালের ওপারে আলো দেখে, হাসি শোনে...। ঘরের দিকে মুখ করে হাশেম চেঁচিয়ে বলে, যেন ওপারের লোকেরা শুনতে পায়, নীরু...নীরু আমার লাঠিটা এনে দেতো, আর কেউ ঢুকবে তো ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবো। শালারা পেয়েছে কি, ভদ্রপাড়ায় থেকে...। বাকী কথাটুকু রাগে চিবিয়ে চিবিয়ে নিচু স্বরে বলে, যেন দেয়ালের ওপারে না পৌঁছায়। আর নীরু-বীরুর সামনে বলতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে হাশেম আলীর হাজার হোক ওদের বয়স হয়েছে—বয় হয়েছে বললে ভুল বলা হয়—বয়স পেরো যাচ্ছে। মুখে কিছু না বলুক, চোখের ভা পড়তে তো আর অসুবিধে হয় না। তাদ শান্তশিষ্ট সোনার মত বোনগুলির সাম হাশেম আলী কেমন ক অশ্রাব্য কথাগুলো দেয়ালের ওপারে ছুঁড়ে দেবে? মাঝে ম ক্রোধ যখন চরমে ওঠে, গলা ফাটিয়ে ও অশ্লীল ভাষা শোনাতে পারলে, মনে হ কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেতো। কি ওপারের আলো আর হাসি এমনি তীক্ষ এবং দুর্বিনীত, হাশেমের সাহস হয় না অশ্লীল শব্দগুলি দু ঠোঁটের মাঝে লেংড়ে লোফালুফি করে খেলে।

মনে মনে বকুনি দিতে ভারি সুবি কাউকে তোয়াক্কা করতে হয় না, ইচ্ছেম মনের ঝাল মিটিয়ে ফেলা যায়। হাশে যে সব অশ্লীল শব্দ দিয়ে প্রতিপক্ষের দে থু থু ছিটিয়ে দেয়, তার একটি শব্দ যদি ওপার বাসিনীদের কানে প্রবেশ ক পরদিন তাকে এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যে হতে পারে,—হাশেম তা ভালো ক জানে। আর এ দুঃসময়ে এত কম ভাড় এমন বাসোপযোগী বাড়ী পাওয়া স মুস্কিল, হাশেম তার তিরিশ বছরের জী ও অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব তীক্ষ্ণভাবে অনু করতে পারে। তার স্বল্প বেতনে অ কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় জেনেই ওদের ঘেঁটে হাশেম নিরাপদে থাকতে চায়। এক ব্যবধান সৃষ্টি করে, নিজেদের আত্মসম্ম ও নৈতিক বোধের চারপাশে সতর্ক তা কাঁটার বেড়া দিয়ে রাখে, যেন কো অসতর্ক মুহূর্তে দেয়ালের ওপারের দূষি হাওয়া এপারের জীবনকে গ্রাস না করে

কতদিন আর প্রহরীর দৃষ্টি রাখা যা ঘরে এমন জলজ্যান্ত দুটি অবিবাহি বয়স্কা বোন, মুখে কিছু না বলুক, চোখে

ষা তো আর লুকোনো যায় না। অফিসে য়ে ভাবনা তাড়াতে পারে না, রাতে নিদ্রা হয় না। দায়িত্বের বোঝা বুকে পাথর পে থাকে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নী গত হয়েছেন শৈশবে, পিতার কথা ন করে খিস্তি আউড়াতে ইচ্ছে করে শেমের। শালা, মরবি তো মর, আর বছর পর মরলে কি হতো? বোন দুটোকে র করে না হয় স্বর্গের টিকিট কাটাত। শ্রদ্ধা আর বিতৃষ্ণার কীট হাশেমের সারা ত্তায় সজীব পোকার মত কিলবিল করে ঠে। অথচ হাশেম দায়িত্বহীন হতে পারে । আদর্শ ভায়ের মত বোন দুটিকে য়িত্বের খাঁচায় আটকে রাখে। তার এ বয়সে ন প্রতিজন (তার বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-, সহকারী সবাই) রাতের বিছানায় রী দেহের রমণীয় গন্ধ শোঁকে, হাশেম ন নিঃসঙ্গ বিছানায় দীর্ঘশ্বাস আর লীল খিস্তিতে রজনীকে বিদ্ধ করে খে। সতর্কে কান পাতে, পাশের ঘর কে কোনো করুণ দীর্ঘশ্বাস এ ঘরের জায় পৌঁছায় কিনা। নীরু-বীরুর সঙ্গ • যন্ত্রণা দু হাতে বুকে চেপে ক-জননীকে অভিশাপ দেয়। নিজের বয়স সেব করতে গিয়ে হাশেম প্রায় চিৎকার র উঠতে চায়, অস্থির যন্ত্রণায় অন্ধকারে জ দরজা খোঁজে, আলো এবং হাওয়া র্থনা করে; কিন্তু সব দরজায় তালা লাছে, ঘরময় শতাব্দীব্যাপী অন্ধকার। রু ও বীরুর বয়সের হিসেব কিছুতে লাতে পারে না হাশেম। এত দ্রুত বয়স ড়ে, ঘুড়ির মত সাঁই সাঁই উপরে ওঠে । সেদিনের নীরু-বীরু, বয়স মেলে না ।চিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ—হিসেবে বার ভুল হয়। হাশেমের কান্না পায়।

অফিসের সহকর্মীরা মাঝে মধ্যে কথনো কতা করে, কি হাশেম সাহেব, বুড়ো চললেন যে! এবার একটা বিয়েসাদী ন।

বিয়ে! হাশেম চমকে ওঠে। কেমন বস্তি বোধ করে, বোকার হাসি দেখায়। বিড় করে কি যেন বলতে চায়। সহ-রা নাছোড়বান্দা। বলে, আপত্তি সের? আমাদের সমান টাকা কামাচ্ছেন, রা তো সাহেব দু'তিন ছেলেমেয়ের বাপ গেছি…।

হাশেম মনের ভেতর চিৎকার করে বলে, নো আপত্তি নেই। আমিও আপনাদের রাতের বিছানায় একটা সতেজ নারী চাই। কিন্তু চোখে নীরু-বীরু ভাসে। শম আবার সহকর্মীদের সরল হাসি তে চেয়ে নিচুস্বরে বলে, ঘরে দুটো , ওদের বিয়ে না দিয়ে তো…।

পাশের টেবিল থেকে একজন উচ্চস্বরে ওঠে, আরে সাহেব, ঐ কইয়া কইয়া শ্যাষ কইরবেন…।

রসিকতা মনে করে সবাই হেসে ওঠে। শম সহকর্মীদের চোখে অসহায় দৃষ্টি । দ্রুত ফাইল ঘেঁটে অক্ষমতা তাড়াতে । ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নির্জনে বার বার অনুরোধ জানায়, বোনদের জন্য চলনসই ছেলের খোঁজ দিতে।

অনেকে অনুরোধ রাখতে সচেষ্ট হয়।' মাঝে মাঝে লোকজন আসে মেয়ে দেখতে। হাশেম সেদিন বেশী করে কান রাখে দেয়ালের ওপারে। ওপারের কোনো পাপ যেন এপারের শ্রুতিতে ধরা না পড়ে, আগমনকারীদের দৃষ্টিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন না দেখা দেয়। যদিও সারাদিন এবং বিকেল-গুলোতে হাশেমের ভয় নিরর্থক। কোনদিন দিনের বেলায় দেয়ালের ওপারের জীবনে ভদ্র গার্হস্থ্য জীবন থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি দেখা যায় না। বরং মনে হয়, ওপারের জীবন বুঝি এপারের চেয়েও পবিত্র এবং নিরুপ-দ্রব। মেয়েরা গোছল করে ভেজা শাড়ী ঝুলিয়ে শুকিয়ে দেয়, টেবিলের উপর সুচারু রুচিতে বই সাজিয়ে রাখে, মনে হয় কলেজ ফেরতা আদুরে মেয়েরা এবার ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে আহ্লাদী ঢঙে হেসে উঠবে, জানিস, আজ কলেজে যা একটা মজার কাণ্ড হয়েছে না…। ফুলদানিতে ফুল সাজায়, বিছানা পরিপাটি; সাজানো দেয়ালে রুচিশীল চিত্র শোভা পায়, মেয়ের মা রান্নাঘরে সুস্বাদু খাবার তৈরী করে, মেয়েরা নিজেদের আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তোলে, কখনো দেয়ালের এপারে দৃষ্টি রাখার কৌতূহল অনুভব করে না, জানতে ইচ্ছে করে না দেয়ালের বিপরীতের জীবন; মেপে হাসে, কথা বলে আরো নীরবে। বাড়ীর কর্তা সুখী মানুষদের মত ফিন-ফিনে পাঞ্জাবীতে নরম হাওয়া লাগিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বের হন। ফেরেন একটু রাত করে, যখন ঘরের দরজায় কোনো মোটরগাড়ী আর দাঁড়িয়ে থাকে না। সুখী ভদ্র মানুষের মত জীবন, দিনের বেলায় কিছুই বোঝার উপায় নেই। তবুও হাশেম মনের ভেতর ভয় লালন করে, একে-বারে তাড়াতে পারে না। যদি দেয়ালের ওপারের কেউ এপারের আয়োজন দেখে বিদ্রূপে হেসে ওঠে, প্রমত্ত হিংসায় চিৎকার করে নীরু-বীরুর কুৎসা করে, আগমন-কারীরা তাদের অপমানের গহ্বর্তে ফেলে পালিয়ে যায়।—এমনি আশংকা হাশেম বৃথা লালন করে। কারণ, এ পর্যন্ত কোনো দিনও এমন ঘটেনি। যারা নীরু-বীরুকে দেখতে আসে, রূপ এবং রূপার অপর্যাপ্তের জন্য পালিয়ে যায়। হাশেম আলী নিরাশ হয় না, আবার লোক দেখতে আসে। নীরু-বীরুর বয়স যত বাড়ে, ওদের দেখতে আসার লোকও তত কমতে থাকে।

নীরু ও বীরু হাশেমের অলক্ষ্যে ফিস ফিস করে নিজেদের রূপ এবং যৌবন নিয়ে বিদ্রূপ করে, হাসে।

এখন লোক দেখিয়ে কি হবে! যখন দেখার বয়স ছিল, কেউ আসেনি। শরীরে কি আছে যে, পছন্দ করবে! যে স্বাস্থ্য, আর এইতো চেহারার ছিরি!

বীরু ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, আমরা তো আর রাজপুত্র চাচ্ছিনে। ভাত-কাপড় দিতে পারে এমন একজন পুরুষ হলেই তো হলো; এত কি অভাব?

নীরুর দু চোখে রহস্যময় হাসি খেলা করে, কি ভীষণ সর্বনাশের ইঙ্গিত দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। দেয়ালটাকে দৃষ্টির ইঙ্গিতে বিদ্ধ করে হাসতে থাকে। বীরুর শরীরে অশ্লীল ধাক্কা দিয়ে বলে, অভাব কিরে, দেখিস না ওপারে…কতলোক…।

বীরু হাসতে চেয়ে নিথর হয়ে যায়। নীরুও আর হাসতে পারে না। দুজনেই সন্দেহ নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যার শুরুতে ও-বাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোগুলি যেন এ-বাড়ীর কেরোসিনে জ্বলা হারিকেনগুলিকে বিদ্রূপ করার জন্যই জ্বলে ওঠে। সন্ধ্যা একটু গভীর হলে ও-বাড়ীর দরজায় মৃদু শব্দ করে গাড়ী থামে, ও-বাড়ীর তিন বোনের কেউ হয়তো গাড়ীর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাকী দুজন ঘরে থাকে, অতিথিদের নির্জন ঘরে আপ্যায়িত করে, কখনো সিনেমায় যায়। যারা আসে এমনি ভদ্র মুখোস থাকে, বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় থাকে না। অথচ দেয়ালের এপারে সব ভেসে আসে। ওপারের হাসি আর আনন্দ যেন এপরের নিঃসঙ্গতাকে আরো তীব্র এবং প্রখর করে তোলে। এবাড়ীতে বসে হাশেম, নীরু বীরু সবাই শোনে, তীব্রভাবে অনুভব করে নিঃসঙ্গতা, দুঃখ এবং বিতৃষ্ণা। অনেক সময় সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। কয়েক বছর আগে, যেদিন হাশেম প্রথম আবিষ্কার করলো, ও-বাড়ীর নিমন্ত্রিত পুরুষ মানুষগুলি, যাদের ওরা মামা-ভাই ইত্যাদি পরিচয় দিয়ে থাকে, আসলে ওদের কেউ নয়। এবং ওরা অসৎ ব্যবসায়ে সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনছে। অর্থনৈতিক কাঠামো তাদের চেকে পর্যুদস্ত থাকা সত্ত্বেও, হাশেম দেখলো, ওরা কি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মেয়েগুলির গায়ে দামী জামাকাপড় উঠছে, ঘরের চেহারা পাল্টাচ্ছে, আসবাবপত্র হচ্ছে। এই আবি-ষ্কার করে চরম উত্তেজনায় হাশেমের ক'রাত্রি ঘুম হয়নি। কি করে এই সমাজ-বিরোধী কাজ জনসমক্ষে প্রকাশ করবে, এই ভেবে ক'দিন নানা পরিকল্পনায় কাটিয়ে দিলো। অফিসে সহকর্মীদের সব ঘটনা বললো। অনেকে বিশ্বাস করলো না, মুখ-রোচক গল্প হিসেবে শুনে গেলো। একজন বললো পুলিশে খবর দিতে। অন্যজন এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখালো পুলিশ যদি কোনো প্রমাণ না পায়, তাহলে হাশেমের বিরুদ্ধে মানহানির কেস হবে। তার চেয়ে মহল্লার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানানো ভালো। হাশেমের কাছেও তাই অধিকতর যুক্তি-সংগত মনে হলো। এবং পরপর কয়েক দিন যখন ওবাড়ীর উজ্জ্বল আলো ও হাসি দেয়ালের এপারে এসে হাশেমকে অসহ্য করে তুললো, সে মহল্লার সর্বাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এ ঘটনা জানাতে গেলো।

হাশেম ভেবেছিলো, মহল্লায় এমন একটি অধর্মের কাজ হচ্ছে জেনে লোকটি নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে। এবং হাশেম নিজেই অবাক হলো, যখন লোকটি তার

অক্ষমতার কথা জানালো। এবং এও জানালো, ও বাড়ীতে যারা যাতায়াত করেন তারা গণ্যমান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। কুমীরের সংগে শত্রুতা করে জলে বাস করা সম্ভব নয়। অতএব এইটুকু সহ্য করে থাকতে হবে।

হাশেম সহ্য করেই থেকেছে। বিশ বছর আগে ভাড়া নেয়া বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকা হাশেমের পক্ষে অসম্ভব। অতএব এমনি তালে সময় কাটে। হাশেম প্রখর দৃষ্টি রাখে ও বাড়ীর কোনো পাপ যেন এবাড়ীর পবিত্র জীবনে প্রবেশ না করে। আগে এ-বাড়ীর বারান্দা থেকে খাটো দেয়াল ডিঙিয়ে ও-বাড়ীর অনেক দৃশ্য দেখা যেতো। হাশেম দেয়ালটাকে উঁচু করে তুলে দিয়েছে, যেন ওবাড়ীর কোনো দৃশ্য এবাড়ীর কাউকে দেখতে না হয়।

তবু ওবাড়ীর আলো আর হাসিকে রোধ করতে পারে না হাশেম। এবাড়ীর জীবনকে বার বার বিদ্রূপ করে যায়। অসহ্য লাগে হাশেমের। অক্ষম দু'হাত বজ্রমুঠি করে আক্রোশে বার বার উপরে ছুঁড়ে দেয়। যেন অবিচারক ঈশ্বরকে ক্রোধে ঘৃণা ছুঁড়ে দিচ্ছে হাশেম।

একদিন অনেক রাত হলেও হাশেমের চোখে ঘুম নামছিলো না। ওবাড়ীর অতিথিরা দু-একজন করে চলে যাচ্ছে। দু-একটি করে বাতি নিভে আসছে। নীরু-বীরু ঘরের খিল এঁটেছে অনেকক্ষণ। হাশেম ঘর ছেড়ে, অন্ধকার উঠোনে দেয়ালের কাছ ঘেঁসে হাঁটতে থাকলে, হঠাৎ ওপাশে হাসির আনন্দে চমকে উঠলো। দেয়ালের এত কাছ থেকে হাসি ছুটে এলো, প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে অন্ধকার দেয়ালের উপর মাথা রাখলো। ক্রোধে ছিটকে নেমে এলো হাশেম। ওবাড়ীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটি—কি যেন নাম—হাশেম মনে করতে পারলো না; একজন পুরুষ ওকে জড়িয়ে ধরতে অমনি আনন্দে হেসে উঠেছে। মুহূর্তে কি হয়ে গেলো, হাশেমের চোখের চারপাশে অন্ধকার পৃথিবী ঘুরে উঠলো, কবে বাগান সাজিয়ে ছিলো—থরে থরে রক্তগোলাপ মনে নেই, মনে নেই...। কিছুই মনে থাকে না, সোনালি প্রদীপ নিভে গেলে আর আলো দেয় না। কোথা থেকে হিংস্রেরা ছুটে আসে, ক্রোধ আসে—কোথাও রক্তগোলাপ নেই, প্রদীপ জ্বলে না, বড় বেশী অন্ধকার। রক্তাক্ত ক্রোধে হাশেম ওবাড়ীর দরজায় পৌঁছে গেলো।

দরজা খুলে যে দাঁড়ালো, সে অন্য মেয়ে, ওবাড়ীর কনিষ্ঠাজন। হাশেমকে দেখে অবাক, ওর চোখে-মুখে কি খুঁজলো, দু'ঠোঁটে মোনালিসার হাসি ঝুলিয়ে হাত ধরে ভেতরে এনে সোফায় বসালো। দরোজা ভিড়িয়ে দিয়ে আনন্দের স্বরে বললো, আমি ভাবতেও পারিনি আপনি আসবেন। আমার কতদিনের স্বপ্ন...।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর এত নরম, আবেগে থির-থির কাঁপছে, হাশেমের মনে হলো সে যেন কিছু শুনছে না। সে প্রচণ্ড কিছু বলবে ভেবে যে ক্রোধ নিয়ে এসেছিলো, সব ভুলে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে ঝুলছে স্বর্গের সেই লোভনীয় গন্ধম ফল। মেয়েটি আরো ঘনিষ্ঠ, চোখে-মুখে জয়ের আনন্দ, হাশেমের একহাত ধরে রেখেছে। হাশেম কাঁপছে, ভেতরে ভূমিকম্প, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—হে বিধাতা, রক্ষা করো, রক্ষা করো। হাশেম ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে চেয়ে, মেয়েটির নরম হাত সোফায় ছুঁড়ে পরাজিত হৃদয় নিয়ে বেরিয়ে আসে।

ক'টাদিন ঘোরের মাঝে কাটে হাশেমের। ওবাড়ীর দিকে তাকাতে ভয় হয়। আগের মত দেয়ালের গোড়ায় সতর্ক কান রাখে না। ক'দিন ধরে ভাবছে, দেয়ালটা আরো পুরু করে গাঁথবে, যেন ওবাড়ীর কোনো শব্দ এবাড়ীর কানে ধরা না দেয়। বিকেলে বারান্দায় বসে নীরু-বীরুকে মাঝে মাঝে ধর্মের কথা বলে হাশেম। ওদের মনকে ওবাড়ীর হাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

বুঝলি, বেঁচে থাকা মানে সৎ পবিত্র হয়ে বাঁচা। আমাদের নবী বলেছেন...।

বেশীদূর এগুতে পারে না হাশেম। নীরু-বীরু চুপ করে থাকে, কোনো সাড়া শব্দ মেলে না। ওদের দীর্ঘশ্বাস বড় করুণ হয়ে বাজে। আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘোরাতে চেষ্টা করে হাশেম।

নীরু, দেয়ালটা আরো পুরু করে দেবো ভাবছি। তোরা কি বলিস?

চাপা স্বরে নীরু যেন হেসে ওঠে, ওর দু'চোখে অবজ্ঞার ঘন ছায়াঃ দেয়াল পুরু করে কি হবে! দেয়ালটা থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি।

হাশেম বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে, অাঁ, কি বললি!

নীরু আর কিছু বলে না। দু'ঠোঁটে হাসির রহস্য ঝুলিয়ে রাখে।

হাশেম যেন ক্ষুব্ধ হয়েছে, এমন স্বরে বলে, তোরা কি যে ছাই বলিস, কিছুই বুঝতে পারিনে। বীরু হাশেমের চুলে আঙুল নাড়াতে নাড়তে হঠাৎ অবাক হয়ে বলে, ওমা, তোমার কত চুল যে পেকে গেছে! তুমি যে বুড়ো হতে চললে, ভাইয়া। এবার আমাদের একটি ভাবী এনে দাও।

নীরু-বীরু ওদের যন্ত্রণা আর প্রয়োজনের কথাটাই যেন নতুন করে জানিয়ে দিচ্ছে হাশেমকে। বয়স দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, সময় দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করো...সময় নেই...। হাশেম আবার নতুন করে ছেলের সন্ধান করে। এখন আর অত বাছবিচার নেই। যেমন-তেমন করে বোনদের বিদায় করতে পারলেই হলো। তার দিকটাও দেখা উচিত। চুল পাক হয়েছে, বয়স তাকে দ্রুত মৃত্যুর নিয়ে যাচ্ছে। সেও প্রয়োজনকে অ করতে পারে না। কয়েকদিনের চেষ্টায় দূরে এক দোজবরের সন্ধান গেলো। লোকটির বয়স একটু দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করতে চাইছে। ঘটকের কথায় রাজী [illegible] যায় এ দিনই কথাবার্তা [illegible] করা হবে ক করা হয়। জরুরী কাজে সে বাড় ফিরবে না, নীরু-বীরুকে আগেই ছিলো হাশেম। প্রতিবারের মত এবারও নিরাশ হলো এবং বড় বাড়ী ফিরে এলো।

বাড়ীতে ঢুকতে গেলে হাশে হলো, ত্রিরিশ বছরের জীবনে এ তার ভুল হয়েছে। বাড়ীর ভেত অপরিচিত হাসি আসছিলো। অ অতি উজ্জ্বল আলো নেই। কে কারা ওবাড়ীতে ঢুকে পড়েছে [illegible] আজ অসময়ে আলো নিভিয়ে হাশেম অন্ধকার উঠানে দাঁড়িয়ে নাগরদোলায় দুলতে থাকে। ঘরে থেকে অপরিচিত হাসি আর হাশেমকে দ্রুত কাছে টানতে [illegible]

ঘরের দরজা খুলে কে একজন এলো। হাশেমকে দ্বিধার মাঝে থাকতে দেখে নিচু স্বরে বললো, কেন, ভেতরে চলে যান, কেউ নেই। শুনে ঘর থেকে একজন মেয়ে এলো, চাপা স্বরে বললো, কেগো, আমরা নতুন ঘর খুলেছি...।

হাশেম ভয় পেয়ে বেরিয়ে এ হলো, সে ভুল ঠিকানায় এসেছে বাড়ীর সেই দরজার সামনে গিয়ে যেখান থেকে আর একদিন সে এসেছিলো। সেই মেয়েটি দরজা খু আর অবাক হলো না। হাশেমের অন্ধকারে প্রস্থান করে বললে জানতাম আপনি একদিন আসবেন

পরদিন হাশেম শাবল দিয়ে ভেঙে ফেলছে। নীরু-বীরু অবাক, নীরবে দাঁড়িয়ে দেয়াল দেখছে। কত সাধনায় এবং নৈতিক দেয়ালটা গড়ে উঠেছিলো, প্রহরী দৃষ্টি রেখেছিলো; এখন শাবলে আঘাতে কেমন ধ্বসে পড়ছে। হলে ভয়ে বিস্ময়ে ওরা দুজন করে উঠতো। আজ ওদের দুজনে যেন পাপ-পুণ্যের ভয় নেই। বাধা নেই। হাশেমের চোখেও [illegible] কাঁপে। নীরু-বীরুর দৃষ্টিতে [illegible] বললো, ভেবে দেখলাম, এই দেয়ালটার কথা বাইরের কেউ জানতে পারছে না।

সমীর রক্ষিত

কোন এক মায়ের স্বগতোক্তি

জোছনা উঠেছে না? খুব আস্তে ওরা দিচ্ছে। জানলার বাইরে জবা গাছের ঝালচে পাতাগুলোতে পাঁউটি-রের ঝাঁকের মত শাদা জোছনা খেলে যাচ্ছে। মনে আছে বিভু, জোছনা উঠলেই বায়না ধরতিস তিস্তার ধারে বেড়াতে ব বলে? আর আমি তোকে আর তোর দিকে নিয়ে পুরানো অস্টিন গাড়িটা ড় তিস্তার পাড়ে রেসকোর্সের মাঠে ড়াতে যেতাম?

গাড়ি থেকে নেমেই তুই বিরাট মাঠটায় ছোটাছুটি করতিস, তিস্তার পাড় ঘেঁষে উঁচু টিলাটা উঠেছে, সেটার একবারে রে চলে যেতিস, তারপর দুহাত দুদিকে ড়য়ে সাঁ করে নেমে পড়তিস। তখন র হাত দুটোকে পাখির ডানার মত মনে হত, জোছনায় তোর শাদা জামা জ্বলজ্বল করত পাখির শরীরের মত।

কখনো তুই আমার হাত ধরে টানাটানি করে বলতিস—'আমার সঙ্গে রেস দেবে, চলো না মা?' আমি হেসে বলতাম—'আমি কী তোর সঙ্গে ছুটে পারি রে বোকা ছেলে?' 'দেখই না'—তুই একেবারে নাছোড়। আমি হারব জেনেও তোর সঙ্গে ছুটতাম। তুই দুরন্ত হরিণের মত ছুটে যেতিস। আর আমি হেরে গিয়েও কী যে আনন্দ পেতাম—সে তো তুই জানতেও পারতিস না। আমি বলতাম—'অনেক হয়েছে এবারে চলো বাড়ি ফিরি।' তোকে কী তখন আনা যায়—জোরজার করে ধরে আবার তোকে গাড়িতে তুলতে হত।

সেই অস্টিন গাড়িটা ছমাস ধরে গ্যারেজে পড়ে রয়েছে। ওটার আর কোন-রকম সারাই মেরামতও চলবে না। ড্রাইভার বংশীলাল চলে গেছে। বংশীলাল একবার তিনদিন জ্বরে ভুগেছিল, তুই নাওয়া খাওয়া ছেড়ে বংশীলালের কাছে বসে থাকতিস, মনে আছে বিভু? চলে যাবার সময় বংশীলাল তোর কথা খুব বলেছিল—'খোকাবাবু ঠিক ফিরে আসবে দেখো মাইজি।' যে যাই বলুক আমার মনে হয় সবাই আমাকে ভোলাচ্ছে। সত্যি কী আর তুই ফিরবি না বিভু? কতদিন হয়ে গেল—প্রায় বুঝি দেড় বছর তোকে দেখি না—আমি রোজদিন তোর জন্য জ্বর গায়ে বসে থাকি আর মনে মনে তোর সঙ্গে কত কথা যে বলি—

আমার অবস্থাটাও এখন অই অস্টিন গাড়িটার মতই। আর বোধহয় মেরামতও চলবে না। মাঝে মধ্যে পেটের যন্ত্রণায় আমি

অজ্ঞান হয়ে যেতাম মনে আছে? কত ডাক্তার বদ্যি ঝাড়ফুঁকওলা পর্যন্ত এল কিন্তু কেউ কি কিছু করতে পারছে? কেউ বোধ হয় কিছু আর করতেও পারবে না। এখন জোরে হাওয়া দিলে যখন জানলার পর্দা ওড়ে ফাৎ ফাৎ করে—ঘরের বাইরে সুপুরী গাছের পাতায় ছড়ছড় করে আওয়াজ হয়—তখন আমার সারা গা ছমছম করে ওঠে, মাথার ভেতরটা ফাঁকা লাগে, বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে যায়—চোখে সব কিছু ঝাপসা অস্পষ্ট লাগে—মনে হয় কখন যে এক ফুঁয়ে সব আলো বরাবরের মত নিভে যাবে। এখন এই যতক্ষণ বেঁচে আছি—সবাইকে দেখতে ইচ্ছা করে—সবাইকে কাছে ডেকে খবরাখবর নিতে ইচ্ছা করে। দু'পা হেঁটে বারান্দায় গিয়ে বাইরের সব কিছু দেখতে সাধ হয়। কিন্তু আমি এই বিছানা ছেড়ে কতদিন উঠি না—কোথাও যেতে পারি না। শুধু সারাদিন তোর সঙ্গে কথা বলি। তুই এত জেদী বিভু, তুই কী সত্যি ফিরবি না?

তোর মনটা তো কোনদিন এত কঠিন ছিল না বিভু? ন' বছর বয়েসে তুই বংশীলালের অসুখে অস্থির হয়ে উঠেছিলি। আমরা বলেছিলাম হাসপাতালে দিয়ে দিই। বংশীলালও রাজি ছিল। তুই যেতে দিসনি, বলেছিলি—'আমি ডাক্তার ডেকে আনব মা, বংশীদা বাড়িতেই থাক।' সত্যি তুই নিজে গিয়ে সুধীর ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলি। আমার মনে আছে সুধীর ডাক্তার আমাকে বলেছিল, 'আপনার বিভু তো দেখছি খুব কাজের ছেলে হয়ে গেছে।' আমি হেসেছিলাম। তুই জানিস না সেদিন কীরকম গর্ব হয়েছিল আমার। আমি বলেছিলাম—'ওর মনটা খুব নরম ডাক্তারবাবু।' আর দেখছিলাম বংশীলালকে নিজে হাতে ওষুধ খাওয়াতে তোর কী উৎসাহ।

বার বছর বয়েসে তোর ছোটমাসির সঙ্গে তুই বেড়াতে গিয়েছিলি কলকাতায় একমাসের জন্য। মনে আছে আটদিনের মাথায় তুই ফিরে এসেছিলি? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'তোমরা এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?' তোর মেশো বলেছিল—'আপনার ছেলে তো প্রায় কান্নাকাটি জুড়ে দেয় আরকি।' তুই খুব লজ্জা পেয়ে বলেছিলি—'দূর আমি কখন কান্নাকাটি করেছি?' তোর মেশো বলেছিল—'ওই হল, সারাক্ষণ তো বলছিলে আমার আর ভাল লাগছে না, আমাকে বাড়ি দিয়ে এসো।' জানি, আমাকে ছেড়ে তোর বেশী দিন বাইরে মন টিকত না বিভু! কিন্তু তুই যে আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছিলি তাও কী আমার চোখে পড়েনি?

যেবার তুই সবে কলেজে ভর্তি হয়েছিস ঠিক সেবারেই বন্যায় মণ্ডলঘাটের কত বাড়ি ভেসে গেল, কত লোকজন গরুবাছুর মরে গেল। তোদের কলেজ থেকে কী একটা টীম হয়েছিল, তুই চলে গেলি। তিনদিনের নাম করে দশদিন থেকে এলি। ফিরে এসেও যেন তোর স্বস্তি ছিল না। আবার যাই যাই করছিলি। শেষ পর্যন্ত আমার অসুখের কথা তোর পড়াশুনোর কথা বলে আমি তোকে আটকে দিলাম।

তখনি বুঝি মলয়ের সঙ্গে তোর পরিচয়? যেদিন তুই তোর মলয়দাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এলি সেদিনই আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। নিজের বাড়িঘর মা বাপ সবই তো ছেড়েছিল মলয়। তুই এসে হাত নেড়ে বলতি—'জানো মা, কোকড়াঝাড় চা-বাগানের কুলিরা বেলাকোবা রাজগঞ্জের চাষী আর গৌরীহাটের উদ্বাস্তুরা দেবতার মত মান্য করে মলয়দাকে, যেখানে যাবে শুধু মলয়দা আর মলয়দা।' মলয় নাকি ওদের নিয়ে শহরে আসে—খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওদের বাড়িঘর তৈরীর জন্য—লাঙল বলদ কেনার জন্য টাকার দাবী জানায়। মলয়দা ওদের জন্য নিজের সর্বকিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়েছে। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকেই তোর ছটফটানি বেড়ে গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির টান গেল কমে।

প্রায়ই এসে তুই বলতি—'মা আমি মলয়দার সঙ্গে একবার বেলাকোবা যাব।' আমার ভয় করত। আমি বলতাম—'কী দরকার অত ঘোরাঘুরিতে, বাড়িতে বসে লেখাপড়া করো।' সঙ্গে সঙ্গে তোর জবাব—'বাহ্‌, সারাক্ষণ পড়ব নাকি? গ্রামে গিয়ে কীরকম ভাল লাগে তুমি জানো না।' 'পরে যেও—তখন অনেক সময় পাবে'—আমার কথায় তোর মুখ টসটস করত। আমি আরো বলতাম—'আমাকে ছেড়ে থাকতে বুঝি আর তেমন কষ্ট হয় না তোর?' তুই বলেছিলি—'বাজে কথা বলো না। যাও আমি যাব না।'

তুই গেলি না ঠিকই কিন্তু বাড়িতে তোকে খুব বেশী সময় দেখতে পাওয়া যেত না এরপরে। আর সেই থেকে তোর মুখের সেই হাসি যেন উপে যেতে লাগল। সব সময় গোমড়া গোমড়া বিরক্ত মুখ তোর আর একেকদিন এসে তুই একেকরকম প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলি। 'রাজগঞ্জে বাবার কত বিঘা জমি মা? কার কার নামে?' তোর প্রশ্ন শুনে আমার আতঙ্ক হত। আমি জানতাম রাজগঞ্জে যে সত্তর আশি বিঘা জমি আছে তা শুধু তোর বাবার নামে নেই, আমাদের বিভিন্নজনের নামে আছে। কিন্তু আমার ভাল লাগত না এসব কথা—আমি বলতাম—'ওসবে কী দরকার? তাছাড়া আমি কী অতশত জানি?'

আর একদিন এসে তুই হঠাৎ প্রশ্ন করলি—'সরোজের মায়ের কথা তোমার মনে আছে মা? ওর সঙ্গে বাবার কী নিয়ে মামলা হয়েছিল বলতো?' যেসব কথা আমি মনেপ্রাণে ভুলে থাকতে চাইতাম—তোর প্রশ্নের ঘায়ে সে কথাগুলোকে তুই যেন কবর থেকে খুঁড়ে বার করতিস বিভু! সরোজের মাকে কী ভুলতে পারি, এখন যেখানে আমাদের দোতলা বাড়িটা সে জমিটা আগে সরোজের মায়েরই ছিল। সরোজের বাবার টিবি হয়েছিল, তার চিকিৎসার জন্য বাঁধা দিয়েছিল এই জমি তোর বাবার কাছে, তারপর কী যে মামলা মোকদ্দমা হল—পেছনের পুকুর আমবাগান সব সুদ্ধ আমাদের হয়ে গেল। সরোজের মায়ের কান্না আমি এখনো ভুলতে পারি না কিন্তু ভুলতে চেষ্টা করি।

তাই তোকে আমি সেদিন জোর ধমক দিয়েছিলাম—'আমাকে কেন তুই এসব প্রশ্ন করিস বলতো রোজ রোজ? আমাকে কী সবই জানতে হবে?' 'রেগে যাচ্ছ কেন মা?' বলে তুই এমন নিঃশব্দে হেসেছিলি, আমার মনে হয়েছিল এর থেকে তুই চীৎকার করে উঠলে আমি বেশী স্বস্তি পেতাম। তোর মুখ দেখে মনে হত তোর ভেতরে প্রতিদিন যেন থেকে থেকে আগুন দপদপিয়ে উঠছে আর আমি শুধু জল ঢেলে দেবার চেষ্টা করছি। আর সে জন্যই ভয় হত একদিন তুই ভয়ানক জ্বলে উঠবি। কিন্তু আমি ভাবতাম এসব প্রশ্নের কী দরকার, তুই লেখাপড়া করবি মন দিয়ে, পাশ করে বেরিয়ে একটা ভাল চাকরী করবি—কোন গোলমাল হুজ্জুতে যাবি না, আমি তোকে ভালো ছেলে বলে লোকের কাছে গর্ব করব, একদিন তোকে বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনব। আমার সেসব স্বপ্ন তুই দুহাতে ফু... ছেঁড়ার মত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক... দিলি।

তোর তখন যেন একটা জেদ চে... গেছে—প্রশ্নগুলো তুই ক্রমান্বয়ে শান দি... দিয়ে ধারালো ছুরির মত, ঝকঝকে ক... তুলছিস। একদিন এমনি একটা চকচ... ছুরি তুই আমার দিকে ছুঁড়ে দিলি—'তু... কেন চাবাগান থেকে চলে এসেছিলে মা... এমন সহজ প্রশ্ন এমন মারাত্মক ভয়ংক... হতে পারে আমি আগে কখনো ভাবতে পারিনি। মুহূর্তে আমার সমস্ত শরী... অবশ হিম হয়ে গিয়েছিল। তুই লক্ষ... করেছিলি বিভু আমার মুখ শুকি... এতটুকু হয়ে গিয়েছিল? যন্ত্রণায় আমা... সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠেছিল? আমি... দুহাতে আমার পেট চেপে ধরে বসে পড়ে... ছিলাম। মাঝে মধ্যে আমার পেটে যে যন্ত্রণা... হত, সেদিন আমি তার ভাণ করেছিলাম...

আর তখন আমি আশা করেছিলা... তুই উদ্বেগে আমার কাছে ছুটে আসবি যেমন তুই আগে ছুটে আসতিস, তোর চোখে মুখে আমার জন্য উৎকণ্ঠা উপচে পড়ত। আমি ভেবেছিলাম সেদিনও তুই ছুটে এসে আমার পিঠে হাত রেখে বলবি—'কী হল মা? তোমার শরীর খারাপ লাগছে? সুধীরবাবুকে ডাকব?' কিন্তু না,—আমি অবাক হয়ে দেখলাম—তুই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস, তোর মুখ আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। তোর চোখে উদ্বেগ নেই—বরং অবিশ্বাস—বোধহয় ঘেন্না উপচে পড়ছে। অগত্যা আমি বলেছিলাম—'আমার শরীরটা ভাল লাগছে নারে বিভু, আমি ওঘরে যাচ্ছি—'. আর তুই পেছন থেকে আমাকে চাবুক মারার শব্দে বলেছিলি—'পালিয়ে যাচ্ছ মা?'

হ্যাঁ, সত্যি আমি সেদিন তোর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম বিভু। আমি তোকে সেদিন বলতে পারতাম—'তোদের লেখাপড়ার জন্য চাবাগান থেকে চলে এসে...

ছিলাম বিভু, বাগানের ইস্কুলটা তো ভাল না, জলপাইগুড়ি শহরের ভাল ইস্কুলে তোদের পড়াব—তোরা ভালভাবে মানুষ হবি—এজন্য চলে এসেছিলাম।' সেটা হয়তো খানিকটা সত্যি বলা হত কিন্তু সবটা নয়। আমি যে আর বাগানে থাকতে পারছিলাম না সেটাই বেশী সত্যি। কিন্তু কেন যে বাগানে থাকতে পারছিলাম না সেকথা তোকে বলা সম্ভব ছিল না। এখন ভাবছি সেদিন বলাই উচিত ছিল। তোকে তো শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারলাম না। সেদিনই বলে দিলে হত সাবিত্রীর কথা। আমার বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে এসে যে কামিনটা দেখতে দেখতে প্রায় বাড়ির কর্ত্রী হয়ে গেল। আর তার স্বামী আর কুলিধাওড়ার কুলিরা সাবিত্রীকে উদ্ধার করে দেবার জন্য ম্যানেজারকে গিয়ে ধরল। চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে গেল। আর আমি ঝগড়া করিনি প্রতিবাদ করিনি শুধু নিজের মান বাঁচাতে তোদের নিয়ে চলে এসেছিলাম এখানে—সেই আঠার বছর আগে—তুই তখন চার বছরের ছেলে।

তোর বাবাকে শাসন করতে পারি—শোধরাতে পারি এমন ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু তুই আমার ছেলে—আমার রক্ত তোর শরীরে—দশ মাস তোকে আমি পেটে ধরেছি—তোকে আমি জন্ম দিয়েছি—তোকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার পেট কাটতে হয়েছিল বিভু। মায়ের মন তুই বুঝতে পারবি না—তোর গায়ে যাতে কখনো কোন

নোংরা না লাগে—তুই যাতে মানুষ হয়ে উঠিস সেজন্যে আমি পালিয়ে এসেছি। আর তোর প্রশ্নের উত্তর জেনেও আমি না জানার ভান করেছি। তুই একদিন দুম্ করে আমাকে বলেছিলি—'তুমি সব জানো মা, তুমি আমাকে কেন রোজ রোজ মিথ্যে বলো?' আমি মিথ্যেবাদী হয়ে গিয়েছিলাম তোর কাছে। 'যদি বলেই থাকি মিথ্যে কথা তাহলে কী অন্যায় করেছি?'—আমি তোকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম। তুই আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলি—'অন্যায় করনি, জেনেশুনে সব চেপে গেছ। কোনদিন প্রতিবাদ করতে পারনি? তোমার মুখে থুথু ওঠে না? থুথু ছিটিয়ে দিতে পারনি বাবার মুখে?'

তুই বড় জেদী ছেলে বিভু—তোর বড় রাগ। রাগে তোর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তাই তোর চোখে আমাকে তুই পরিষ্কার দেখতে পাসনি। থু থু কী ওঠেনি আমার মুখে—ঘেন্না কী হয়নি আমার? নয়তো পালিয়ে আসব কেন? কেন তোর বাবাকে কখনো বাড়িতে আসতে দিতাম না? এলেও একদিন দুদিনের বেশী থাকতে দিতাম না। কিন্তু প্রতিবাদ আমি করতে পারিনি কখনো। ভয় করত। এখনো করে, ভয় মনের ভেতরে চাপা পড়ে ক্রমে আরো বেড়ে যায়। ভয় যে কেন করে তাত তুই জানিস না বিভু, জানলে কী তুই এমন কঠিন হতে পারতিস আমার ওপরে?

যখন তোদের নিয়ে আমি চাবাগানে ছিলাম — ভয়টা তখন থেকেই আমার শিরদাঁড়ায় একটা বিষাক্ত সাপের মত জড়িয়ে ধরেছিল। বাগানে কুলিমজুরদের প্রতি সপ্তাহের শেষে পেমেন্ট হত—হাটবারে বিষ্যুদবার। বিকেল থেকে শুরু হত পেমেন্ট—ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত তোর বাবার। ফিরেই ঘরের দরজা বন্ধ করে ব্যাগ খুলে ফেলত—খুচরো পয়সা আর নোট ছড়িয়ে পড়ত বিছানার ওপরে। তোর বাবার দুচোখ জ্বলজ্বল করে উঠত। কুলিমজুরদের নাম থাকত হাজিরা-খাতায় —তাতে এমন সব কুলিকামিনের নাম থাকত যারা কবে মরে গেছে। কিম্বা এমন সব নাম যে নামে কোন দিন কেউ ছিল না। কিন্তু খাতায় তাদেরও পেমেন্ট হত। আর সেই সব টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিত আমার বিছানায়। আমার বুকটা কেঁপে উঠত।

কুলি-মজুরেরা লেখাপড়া জানত না, আজো বা কজন জানে! তাদের সারা সপ্তাহের তোলা চা পাতার হিসেব থাকত খাতায়। সেই ওজনের পরিমাণের ওপর তাদের পাওনাগণ্ডা ঠিক হত। কিন্তু সবার ওজনই কী সঠিক লেখা থাকত? সবাই কী ঠিক পাওনাটা পেত? বাড়তি পয়সাটা আসত আমাদের ঘরে—আমার বিছানার ওপরে পড়ত ছড়িয়ে। আমার বুকটা কেঁপে উঠত। আমি একদিন তোর বাবাকে বলেছিলাম —'এসব কি উচিত হচ্ছে?' তোর বাবা বলেছিল —'খুব উচিত হচ্ছে, সব ব্যাটাই মারে। জানো না পেমেন্ট দেবার জন্য বাবুদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়?"

রেশনে খুব কম দামে চাল গম তেল পেত কুলিরা—বাবুরাও। বাইরে সেসব জিনিষের দাম ছিল চার গুণ পাঁচ গুণ। তোর বাবা তখন স্টোরকীপার—রেশনের অনেক চাল গম তেল চলে যেত খিড়কি দরজা দিয়ে—লোক ঠিক করাই ছিল। পয়সা আর নোট ছড়িয়ে পড়ত আমার বিছানায়—আমার বুক কেঁপে উঠত। আমি বলতাম—'তোমার কী ভয়-ডর নেই?' তোর বাবা বলেছিল —'ভয় শুধু আমার? খোদ ম্যানেজার বড়বাবু সাঁট করে ট্রাকে ট্রাকে চায়ের পেটি সরাচ্ছে সে খবর রাখো না? সব শালাই আমার মত।' 'কিন্তু কুলিমজুররা ওরা যদি ক্ষেপে যায়?' —আমার আশংকা কিছুতে যেত না। তোর বাবা ক্ষেপে উঠত —'ওরা? ওদের ক অক্ষর গোমাংস, তাছাড়া গামলা-গামলা হাঁড়িয়া গিলে ব্যাটারা ভেড়া বনে আছে? ওরা কী করবে?' তখন একদিন আমি বলেছিলাম —'কিন্তু তোমার ধর্ম?' হঠাৎ ক্ষ্যাপা হাতীর মত গর্জে উঠেছিল তোর বাবা—'চোপ—নিকলো ইঁহা সে!'

আমি চা খাচ্ছিলাম। হাত থেকে আচমকা কাপটা পড়ে যাচ্ছিল। তারপর তোর বাবা যথারীতি বাইরের ঘরে বসে মদ গিলে গভীর রাতে ঘুম থেকে আমায় জাগিয়ে তুলে লাল রক্তবর্ণ চোখে আমাকে গম্ভীর গলায় বলেছিল—তুমি থাকবে সংসারের কাজ নিয়ে বুঝেছ? আমার ব্যাপারে কখনো নাক গলাতে আসবে না—বুঝেছ? আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দু মুহূর্ত পরে আবার আর্তনাদ উঠেছিল—বুঝেছ? আমি ঘাড় কাৎ করেছিলাম। আমি জ্ঞান হারাইনি। কিন্তু ভয় বিষাক্ত একটা সাপের মত আমার শিরদাঁড়া জড়িয়ে ধরেছিল। ছেলেবেলা থেকে আমি মাতালদের ঘেন্না করতাম, তার চেয়ে বেশী করতাম ভয়।

ধমক খেয়ে আমি জ্ঞান হারাইনি! শুধু মাঝেমধ্যে পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় আমার জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। আর যখন জোরে হাওয়া দেয়—যখন জানলার পর্দা ওড়ে ফাৎ ফাৎ করে—যখন জানলার বাইরে সুপুরী গাছের পাতায় ওঠে ছড়্-ছড়্ শব্দ—তখন শুধু আমার গা ছমছম করে যায়। মনে হয় কারা যেন ওৎ পেতে আছে—আমাকে নিয়ে যাবে বলে। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে—বুকটা শূন্য হয়ে যায়—মনে হয় এক ফুঁয়ে এক্ষুনি সব আলো নিভে যাবে। কোনদিন আমি আর কারো মুখ দেখতে পাব না। তখন শুধু তোকে দেখতে ইচ্ছা করে বিভু, শুধু একটু চোখের দেখা। আমি জ্বর গায়ে বসে থাকি—তুই আসবি এই আশায়। আমাকে ছেড়ে আমাকে না দেখে এতদিন তুই কী করে আছিস বিভু?

তুই এখন আমাকে দেখলে আঁতকে উঠবি। সারা গায়ে আমার হলুদ মাখিয়ে দিয়েছে যেন কারা। কী যে রোগ ভেতরে জানি না—শুধু জানি সেটা আমার সব রক্ত সব রস সব আয়ু কেবলি শুষে নিচ্ছে। এ রোগ সারবার নয়। কত ডাক্তার যে এল কত বদ্যি কত ঝাঁড়-ফুঁকঅলা। চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখছে না তোর বাবা। তুই তো ক্ষেপে যাবি, বলবি—'ওই পাপের টাকা, চুরির টাকায় চিকিৎসা করাচ্ছ তুমি, তোমার লজ্জা নেই—তোমার মুখে থুথু ওঠে না?' ওঠে বিভু, ঐ পাপের টাকায় চিকিৎসা হচ্ছে জেনেও যে আমি কিছু বলতে পারি না সে তোর জন্য। তোকে শুধু দেখব বলে আমি বেঁচে থাকতে চাই—যতদিন পারি—যতক্ষণ পারি আমি বাঁচতে চাই। নয়তো আমি যদি না চাই তাহলে কী আর জোর করে আমার চিকিৎসা করাতে পারত কেউ? ওই যে হাতের কাছে রয়েছে শিশি ভর্তি ওষুধ, পেটের যন্ত্রণা বেশী হলে ঘুমের জন্য ওর থেকে একটা করে খাবার কথা। আমি কী পারি না একসঙ্গে সবগুলো খেয়ে নিতে? কিম্বা ওই যে মালিশের ওষুধটা যার গায়ে লাল অক্ষরে 'বিষ' এই কথাটা লেখা আছে—সে কী আমি খেয়ে ফেলতে পারি না। পারি না সব চুকিয়ে বুকিয়ে নিতে? পারি না শুধু তোর জন্য বিভু—আর কারো ওপরে আমার কোন টান নেই আর কোন সাধ বাকী নেই আমার—

তোর বাবা কেন আমাকে বাঁচাতে এত উঠেপড়ে লেগেছে বলতো? ডাক্তারের পর ডাক্তার আসছে, ওষুধের ওপর ওষুধ। আজো আবার এক নতুন ডাক্তার আমাকে দেখে গেল। এই ত মিনিট কুড়ি পঁচিশ আগে ঠিক সন্ধেবেলা। কলকাতার খুব নামী ডাক্তার কর্নেল চক্রবর্তী। দার্জিলিং গিয়েছিল বেড়াতে, ফেরার পথে সুধীরবাবুর বাড়িতে উঠেছে। সুধীরবাবুকে ধরে তোর বাবাই ওকে বলে কয়ে এনেছিল। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে পরীক্ষা করে গেল গম্ভীর মুখে। এখন ওরা সবাই সুধীর ডাক্তারের বাড়ীতে, তোর বাবাও।

ডাক্তার যখন বেরিয়ে যায়, আমি দেখেছিলাম তোর বাবা একবার আমার দিকে তাকিয়ে কীরকম ক্লান্ত পায়ে ডাক্তারের পিছু পিছু চলে গেল। সারাক্ষণই গম্ভীর উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত পরশু থেকেই কেমন করছে এই ভাবনাটা যেন বেড়েছে, দুশ্চিন্তা আর গাম্ভীর্যও। কেন জানিস বিভু [illegible] গাঁয়ের চাষীরা নাকি এবারে নানা [illegible] ঘোঁট পাকাচ্ছে। তাদের পাওনা ফসল নাকি এবারে তারা নিজের ঘরে তুলবে। সে খবর আবার গোপনে দিয়ে গেছে তোর বাবারই এক খাতক চাষী। সেই থেকে মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে রে।

আর সেই থেকে বারবার আমার ঘরে ঘুরে ঘুরে করছে—'অই কুলাঙ্গারটাকে তোমার দেখতে ইচ্ছা করে না, শান্তি?' তুই চলে যাবার পর এই প্রথম তোর প্রসঙ্গে কথা বলল তোর বাবা। 'তুমি কী ভেবেছ ও কী আর কখনো ফিরবে?' আমি বলেছি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। 'কেন, সেটা না তোমার একেবারে আদরের দুলাল, কত টান শুনতে পাই?' তোর বাবার গলার স্বরে ব্যঙ্গ। রাগে আমার শরীর রী রী করে উঠেছিল, আমি বলেছি—'ওকী আর কোনদিন তোমার মত বাবার মুখদর্শন করবে?' হঠাৎ রেগে উঠেছিল তোর বাবা—'তোমার জন্যই হারামজাদার অত পায়া বেড়েছিল, আমি যদি একবার ওকে হাতের কাছে পাই!'—

যেন তোকে দুহাতে পিষে মেরে ফেলবে এমন মুখ করেছিল তোর বাবা। ক্ষিপ্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেছিল—'তুমিই আস্কারা দিয়ে ওকে একটা পশু বানিয়েছ।'

মনে পড়ে বিভু, তুইও একদিন এমনি করে আমাকে দায়ী করেছিলি, তোর বাবার সব অপকর্মের জন্য। সেই যেদিন তোরা বাপ-ব্যাটায় তুলকালাম কান্ড করলি। তোর সেদিনকার সেই আগুনের মত শরীরটা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। চোখ বুজলেই আমি যে কোন মুহূর্তে তোর সেই তেজী ছিপছিপে অস্থির শরীরটা দেখতে পাই। ফর্সা গালে তখন লাল রক্ত-বিন্দুগুলো যেন ছটফট করছে, প্রতিটি রোম-কূপ দিয়ে যেন যন্ত্রণার ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসবে। তার দিনদুই আগেই তোর বাবা চা-বাগান থেকে ফিরেছে।

হঠাৎ ঠিক দুপুরবেলা রোদে তেতে-পুড়ে একটা পাগলের মত চোখ করে এসে তুই আমাকে বলেছিলি—'আমাকে কেন মিথ্যে কথা বলেছ মা?' তখনই আমার সারা বুক কেঁপে উঠেছিল আশঙ্কায়। তুই একদিন জানলে উঠবি এ আশঙ্কা আমার অনেক দিনের। আমি হাসি দিয়ে সে আশঙ্কার ভাব গোপন করে সহজভাবে বলেছিলাম—'কী আবার মিথ্যে বললাম তোকে?' বলে তোর কপালে হাত রাখতে যাচ্ছিলাম—'তোর শরীর খারাপ করেনি তো বিভু? তোকে এমন দেখাচ্ছে—?' তুই এক ঝটকায় আমার হাত ঠেলে দিয়ে বলেছিলি—'ন্যাকামো করোনা—কী মিথ্যে বলেছ জানো? বাবা এমনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছে? আমি শুনেছি—'

আমি জানতাম তুই কী শুনেছিস। আমিও জানতাম তোর বাবা ইচ্ছে করে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আসেনি, তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে এবং আর কোনদিনই ফিরতে পারবে না বাগানে এসে বেঁচে গেছে—আর কিছুক্ষণ বাগানে থাকলে তার জ্যান্ত শরীর নয়, তার লাশটা বাড়ি পৌঁছাত। সেই গামলা গামলা হাড়িয়া-টানা নিরক্ষর কুলি-গুলো আর আগেকার মত হাবাগোবা গোবেচারা নেই। ক্ষেপলে ওদের প্রাণ দিতে ও প্রাণ নিতে কোনটাতেই ভয় থাকে না।

কিন্তু আমি সব জেনেশুনেও আগের দিনই তোকে বলেছিলাম—'চাকরী-বাকরী ভাল লাগছিল না, তাছাড়া রাজগঞ্জের জমি-জমাও নিজে দেখাশোনা করা দরকার, তাই চলে এল চাকরী ছেড়ে দিয়ে—' তখনই সন্দেহে চোখ তেরছা করে আমার দিকে তাকিয়েছিলি।

কিন্তু আমি কী করে বলতে পারতাম তোর বাবার চলে আসার আসল কারণটা। মা হয়ে কী করে ছেলের কাছে বলি—তোর বাবা কুলিদের বাড়ি তৈরীর জন্য আনা বস্তা বস্তা সিমেন্ট আর লোহা বেচে দিয়েছিল, কী করে বলি ওদের শীতের জন্য দেয়া শ' তিনেক কম্বল আর ঘর তৈরীর দশ বাণ্ডিল টিন আত্মসাৎ করে কোয়ার্টারের পেছনে ফুলের বাগানের মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল আর সে খবর জানতে পেরে মাঝরাতে হাজার খানেক কুলি—

তুই আবার আমাকে ধমক দিয়েছিলি—'চুপ করে আছ কেন, কী মিথ্যে বলেছ মনে পড়ছে না?' ঠিক এমনি সময়ে—'কী, হয়েছে-টা কী, এত হট্টগোল কিসের?'—বলে তোর বাবা এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। আর তুই যেন মুহূর্তে একটা খাঁচা-ছাড়া বাঘের মত গর্জে উঠেছিলি—'চাকরী ছেড়ে এসেছ কেন?'—তীব্র তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। সামান্য হকচকিয়ে গিয়ে তোর বাবা মুহূর্তে সামলে নিয়েছিল, তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনি মুখ করে গম্ভীরভাবে বলেছিল—'সে কৈফিয়ৎ কী তোকে দিতে হবে নাকি?' 'সে মুখ তোমার আছে? চুরি করে ধরা পড়ে মারের ভয়ে পালিয়ে এসেছ'—তোর কথা-গুলো শুনে যত না তার চেয়ে বেশী তোর শরীরটা দেখে আমি আঁৎকে উঠেছিলাম বিভু। তোর দুহাত যেন আগুনে তাতানো দুটো লোহার রডের মত জ্বলজ্বল করছিল। তোর বাবাও বোধহয় এতটা ভাবতে পারেনি, কোন বাবাই কী পারে? সব ভুলে গিয়ে সে চীৎকার করে উঠেছিল—'চুপ কর ইতর—ছোটমুখে বড় কথা।'

'ইতর আমি না তুমি? আমাকে তোমার মাইনে করা চাকর পেয়েছ যে ধমকে চুপ করাবে? ভেবেছ ধমক দিয়ে পার পেয়ে যাবে'—তুই এত কঠিন কথা বলতে পারিস বিভু? আমি কোনদিন ধারণাও করতে পারিনি। আমারটা খেয়ে আমার পরে মানুষ হয়ে এখন সুপুত্তুর আমারি ওপর খবরদারি করছে—লায়েক ছেলে হয়েছে। বেরিয়ে যা এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে'—তোর বাবার কথা শেষ হতে পারেনি—তুই একটা ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে প্রায় তোর বাবার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলি—'কার বাড়ি? ভেবেছ কী করে বাড়ি করেছ—জমি করেছ এসব আমি জানি না? আর খাওয়া-পরা? কেন খাইয়েছ, কেন পরিয়েছ কেন জন্ম দিয়েছ?' 'কী করছিস বিভু?'—বলে আমি তোর দুহাত জড়িয়ে ধরেছিলাম।

আর তোর বাবা দুপা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল—তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল—'নাটক হচ্ছে? এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে'—'ভেবেছ বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে তুমি পার পেয়ে যাবে, না? আমি জানি তোমার কী ব্যবস্থা করতে হয়।' তোকে ধরে রাখি এমন ক্ষমতা আমার ছিল না বিভু, তুই ঝটকা মেরে সরে দাঁড়িয়েছিস তখন। 'তুই যা করবি আমার জানা আছে। এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা তুই,—জীবনে আমি তোর মুখদর্শন করব না'—শরীর শক্ত করে তোর বাবা বলছিল বটে এসব কথা, কিন্তু সেই প্রথম আমি লোকটার মুখে সত্যিকারের ভয় দেখতে পেয়েছিলাম। মুখটা হয়ে গিয়েছিল রক্তশূন্য।, সারা শরীরে আতঙ্ক। এ ভাব কেউ গোপন করতে পারে না। আমি দেখছিলাম দুচোখ ভরে—আর সেই মুহূর্তেই আমি চমকে উঠে দেখে-ছিলাম—তুই হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছিস—

ছুটে গিয়ে আমি তোর হাত চেপে ধরে-ছিলাম—'কোথায় যাচ্ছিস বিভু?' তুই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলি—'হাত ছাড়ো। তোমার জন্যই ঐ লোকটার এত পয়া বেড়েছে।' 'আমার জন্য?'—আমি হতবাক হয়ে তোকে প্রশ্ন করেছিলাম। তুই শক্ত হয়ে বলেছিলি—'হ্যাঁ তোমার জন্য। সারাজীবন ওর অপ-কীর্তি দেখেছ আর মুখ বুজে সয়ে গেছ: প্রতিবাদ করতে পারনি—মুখে থুথু ছিটোতে পারনি—' বলে একটা উল্কার মত উঠোন পার হয়ে চলে গিয়েছিলি। আমি তবু এক-বার পিছু ডেকেছিলাম—'কোথায় যাচ্ছিস বিভু, শুনে যা—'

তুই একবারও আর পেছনে তাকাসনি। আর তখন আমি ভেবেছিলাম—কতক্ষণ আর থাকবে এ রাগ। ঘুরে-ফিরে মাথা ঠাণ্ডা হলে রাতে ঠিক ফিরে আসবি তুই, শুয়ে পড়বি এসে নিজের ঘরে। আর আমি গিয়ে তোকে খেতে ডাকব, তুই উঠবি না সহজে। কিন্তু তুই তো জানিস তুই না খেলে আমি কোনদিন খাই না বিভু, কাজেই অন্ততঃ আমার দিকে চেয়ে তোকে উঠতে হবে, শেষ পর্যন্ত তুই আমার পাশে এসে খেতে বসবি। কিন্তু না, সে রাত গেল—পরের দিন গেল। এক এক করে দেড়টা বছর পার হয়ে গেল, তুই এলি না। আমি যে না খেয়ে আছি সেই থেকে—তা নয়। খেতে আমাকে

হবিবপুরের ফটিক দিদি

শৈলেন রায়

NITAI GHOSH

শান্তিপুরে যাচ্ছিলাম। ন কাকা নতুন বাড়ি করেছেন সেখানে। অনেকদিন ধরেই যেতে লিখছেন, আজ যাব কাল যাব করে এতদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আমার কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশের বাইরে। বছরে ছুটি-ছাটায় কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় আসি, তখন অন্য কোথাও আর যেতে ইচ্ছা করে না,- বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সিনেমা, থিয়েটার আছে। তা-ছাড়া সুরমা আছে। সুরমা আমার স্ত্রীর নাম। ওর একটা বিরাট বাপের বাড়িও আছে। বাড়িটা বিরাট, আত্মীয়স্বজনও অসংখ্য। সেই গণ্ডী ছাড়িয়ে ওকে বাইরে নিয়ে আসা অসম্ভব এবং একটা মস্তো কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, সুরমাকে ছেড়ে একা কোথাও যেতে আমার ইচ্ছা করে না ভাল লাগে না।

কিন্তু এবারে সুরমাকে ছাড়াই শান্তিপুরে যাচ্ছিলাম। এই অঘটন ঘটাবার মূলে রয়েছে সুরমা নিজেই। ও-ই এক-রকম জোর করে আমাকে পাঠাল। ওর একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে, যদিও উদ্দেশ্যটা আমার কাছে আর গোপন নেই। সুরমা অকপটে আমার কাছে স্বীকার করেছে, আমার এই অভিযানের মধ্যে ওর (সুরমার) একটা স্বার্থ লুকনো আছে। অনিমা সুরমার ঠিক পরের বোন। মেয়েটির রং ময়লা বলে এতদিন বিয়ে হয়নি। এবারে কলকাতায় আসতেই সুরমার মা সুরমাকে খুব জোর করে চেপে ধরলেন যাতে অনিমার বিয়ের ব্যবস্থাটা আমরা থাকতে থাকতেই হয়ে যায়। অনেক ভেবে চিন্তে সুরমা শেষ পর্যন্ত ন কাকার ছেলেটিকেই পাত্র মনোনীত করে ফেলল। ছেলেটি ভালই। অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে চাকরী করে।

সেই, সুবাদেই আমার শান্তিপুরে যাওয়া। চৈত্রের মাঝামাঝি। সকালের রোদ কিছুক্ষণের মধ্যেই শাদা হয়ে উঠল। গাড়ি যতক্ষণ চলছে সর সর করে শুকনো বাতাস কামরায় ঢুকছে। নাকে মুখে ঝাপটা মারছে, শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাপসা গরম। মনে মনে বিষম বিরক্ত বোধ করছিলাম। প্রথমে রাগ হোল অনিমার ওপর। মেয়েটা যদি আর কিঞ্চিৎ ফর্সা হোত, নির্ঘাৎ এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত, আমাকেও ঘর্মাক্ত কলেবরে শান্তিপুর ছুটতে হোত না। তারপর রাগ ধরলো সুরমার ওপর, এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল ন কাকার ওপর। ভদ্রলোক যদি বারংবার অত করে যেতে না লিখতেন, সুরমার নজর কিছুতেই ছেলেটার ওপর গিয়ে পড়তো না, আমার দুর্দশাও এমন চরমে উঠতো না ত. হলে।

কিন্তু কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে শান্তিপুর যেতে হচ্ছে

লোকাল ট্রেন। অসম্ভব ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যেই রকমারি কারবার চলছে। লবেঞ্চুসঅলা রসিয়ে রসিয়ে লবেঞ্চুসের বিজ্ঞাপন ছাড়ছে, কাটা - ঘা - দাদ - পাঁচড়ার মলম বিক্রীর তাল খুঁজছে অন্য একজন, অন্ধ ভিখিরিটি ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের দুর্দশার কথা জানাল খানিকক্ষণ, একজন অখ্যাত গ্রাম্য গায়ক পরিবেশন করল রামপ্রসাদী সঙ্গীত। সব কিছুই দেখছিলাম একটা বিতৃষ্ণা নিয়ে। গরমে আর ভীড়ে কিছুই ভাল লাগছিল না। মাঝে মাঝে দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল স্টেশনের দিকে। অসংখ্য পোস্টার পড়েছে সেখানে। কিছুদিন আগেই নির্বাচন পর্ব শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বড় হরফের লেখাগুলো এখনও জ্বল জ্বল করছে। অলস চোখে সেই সব দেখছিলাম, আর মনে মনে গাল দিচ্ছিলাম অনিমা, সুরমা আর ন কাকাকে।

একটা স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল। দৃষ্টি গিয়ে আটকে পড়ল এক জায়গায়। বড় বড় অক্ষরে স্টেশনের নাম লেখা রয়েছে, হবিবপুর। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। ত্বরিত গতিতে উঠে দাঁড়ালাম এবং হুড়মুড় করে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই হুইসিল বাজিয়ে ট্রেন চলে গেল। বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। একটা বহু পুরনো স্মৃতি মনের নিচ থেকে ওপরে ভেসে উঠল। মনে পড়ল, বিয়ের পর ফটিকদি যখন স্বামীর ঘর করতে এল, অন্যান্য দু-চারজন আত্মীয়ের সঙ্গে আমিও এসেছিলাম হবিবপুরে। এই স্টেশনেই দাঁড়িয়েছিলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

হবিবপুরকে চেনার চেষ্টা করতে লাগলাম।

স্টেশন বেশ উঁচুতে। নিচের একটা গাছে অসংখ্য ঝুমকো রক্ত-জবা ফুটে রয়েছে, গ্রীষ্মের বাতাসে ওরা শির শির করে কাঁপছে। বড় বড় গাছে অসংখ্য সজনে ডাঁটা ঝুলে আছে। একটা ছেলে আম গাছ লক্ষ্য করে ক্রমাগত ইঁট ছুঁড়ছে, সব কিছুই গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছিলাম, আর পুরনো একটা ছবির সঙ্গে নতুন ছবিটার মিল খুঁজছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, বছর-কুড়ি আগে যখন হবিবপুরে এসেছিলাম তখন গাছের পাতায় পাতায় এমন ঘন সবুজের সমারোহ ছিল কিনা, আর স্টেশনের নিচের দিকে রক্ত-জবার এই গাছটা বা গাছের ডালে ডালে লাউ-ডগা সাপের মতন ঝুলে থাকা সরু সরু সজনে ডাঁটাগুলো; কিম্বা এই ধরনের কোন ছেলে, ছোট্ট একটা নেংটি জড়ানো কোমরে, কালো লিকলিকে শরীর, পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ইঁটের টুকরো গিয়ে পড়ছে নিচের মাটিতে, ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সেই তরঙ্গগুলো। কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না।

কিন্তু একটা কথা খুব সহজেই মনে পড়ে গেল।

মনে পড়ে গেল, সেদিন ফটিকদির সঙ্গে যে কিশোর বালকটি স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার চোখে কিম্বা মনে কোন ঔৎসুক্য ছিল না, পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। এক দুরন্ত অভিমান শুধু তার ছোট বুকে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। প্রতিমুহূর্তেই সে কামনা করছিল, ফটিকদি সব উৎসব আয়োজন তুচ্ছ করে তার দিকে ছুটে আসুক, তার ঘন চুলে ভরা মাথাটি নিজের বুকে চেপে ধরে বলুক, নকুল তুই আমার কাছে কাছে থাক, এই সব অচেনা মানুষের মধ্যে তুই-ই তো আমার একান্ত আপন জন। কিন্তু ফটিকদি সে রকম কিছুই করল না। ঘোমটা সরিয়ে একবার তাকে দেখল না। মাথা নিচু করে একটা পালকিতে গিয়ে উঠে বসল, কয়েকটা লোক সেই পালকি কাঁধে নিয়ে চলে গেল।

ফটিকদির সেই দিনের সেই বিচিত্র আচরণ কী ভোলার মত!

বহু দিন আগেকার সেই পুরনো ছবিটা নতুন করে চোখের সামনে জ্বল জ্বল করতে লাগল। চৈত্রের বাতাস আমাকে নিয়ে খেলা করছে। আমার নাকে মুখে চোখে ঝাপটা দিয়ে সরে যাচ্ছে, আবার নতুন উদ্যমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এককালে বাতাস নিয়ে খেলতাম, আনন্দ পেতাম। সে বয়স আর নেই। আনন্দের চেয়ে এখন বিরক্তিই ধরে। নির্জন স্টেশনে দাঁড়িয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকেই গাল দিতে লাগলাম। অহেতুক আবেগের বশে মাঝপথে নেমে পড়া কোনমতেই উচিত হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কলকাতায় ফেরার ট্রেন নেই সন্ধ্যেবেলায়, অর্থাৎ কিনা আরও ঘন্টা ছয়-সাতেক পরে।

শান্তিপুরে যাব বলে ট্রেনে উঠেছিলাম কোথায় যেতে কোথায় এলাম।

দুরন্ত রোদের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, লাভও নেই কোন। রাস্তায় নেমে এলাম। সেবারে ফটিকদিদের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। সবার অলক্ষ্যে ফিরতি ট্রেনেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। ফটিকদির স্বামীর নাম পর্যন্ত মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে সেইদিন বিয়ের লগ্নে যে লোকটি ফটিকদিদের বাড়ির সামনের ঘরে এসে বসেছিল, কোন ক্রমেই তাকে বর বলে ভাবা যায় না। একজন প্রৌঢ় লোক, পাকানো শরীর, মুখে চোখে এক ধরনের রুক্ষতা, যা মানুষকে কাছে টানে না, দূরে ঠেলে দেয়। দূরে থেকেই সে দিন ফটিকদির বরকে দেখেছিলাম, কাছে যাবার প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম, ফটিকদির মত সুন্দরী একটি মেয়ের ভাগ্যে এর চেয়ে ভাল বর কেন জুটলো না, সেই দিনের অপরিণত মন দিয়ে বুঝতে চেয়েছি, পারিনি, আজও পারলাম না। চিরদিনের মত রহস্য হয়ে থেকে গেল। নাকি এটা কোন রহস্যই না, গরীব মেয়েদের চিরদিনই ফটিকদির মতই ভাগ্য হয়।

কয়েকটা ছেলে জটলা পাকিয়ে খেলছিল। শুনেছিলাম ফটিকদির নাকি জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। এর বেশী আর কিছুই জানা ছিল না। জমিদার বাড়ির কথা শুনে ছেলেরা সামনের একটা কাঁচা রাস্তা দেখিয়ে সোজা চলে যেতে বলল।

সময় নষ্ট না করে সোজা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

সরু কাঁচা রাস্তা। দু-পাশে মেটে বাড়ি মাঝে মাঝে দু-একটা কোঠা বাড়ি। কাছের কোন গাছ থেকে একটা কোকিল ক্রমাগত ডাকছে। একটা ন্যাড়া মাদার গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ গাঢ় লাল কুসুম ফুটে রয়েছে। চৈত্রের বাতাস যেন ওদের নিয়ে খেলা করছে। কিছুক্ষণ আগে এই বাতাস আমার সঙ্গে খেলতে এসেছিল, আমি সাড়া দিই নি, হাঁটতে হাঁটতে মনের ক্ষোভ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। এক সময় এমনও মনে হতে লাগল, এই যে শান্তিপুর যেতে যেতে হঠাৎ মাঝপথে নেমে পড়লাম, গ্রীষ্মের এক প্রখর দুপুরে একা একা গ্রাম্য পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি, হেঁটে চলেছি কেন, না বিশ বছর আগের দেখা একজনকে দেখবো, এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও যাকে দেখিনি, যার কোন খবরই আমি রাখি না, তাকে দেখতেই চলেছি—এই চলার মধ্যে একটা উত্তেজনা আছে। সত্যি সত্যি আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফটিকদিকে দেখবো, সেই ফটিকদি, যে অকারণে হাসতো, হাসতে হাসতে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠতো, এমন লাল যে মনে হোত, চামড়া ছিঁড়ে এক্ষুনি রক্ত ছিটকে পড়বে

পাতলা একটা মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিল। ছায়া-ছায়া মতন দেখাচ্ছে পৃথিবীকে। আমার সমস্ত শরীর এতক্ষণ জ্বলছিল, এখন আর সেই জ্বালা নেই। সর সর করে বাতাস বইছে, আমাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে সুরমাকে গাল দিচ্ছিলাম সঙ্গে ছাতা দেয়নি বলে। সুরমার ওপর আমার আর রাগ নেই। কারও ওপর রাগ নেই। আমার এক বন্ধু টি কে কৃষ্ণমূর্তি, ওর কুকুরটা একবার আমাকে কামড়ে দিয়েছিল, কুকুরটা ভয়ানক শয়তান; এই মুহূর্তে আমি যেন তাকেও ক্ষমা করে দিলাম।

ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল রংয়ের একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি সেই বাড়িটাকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছি। এই গরমের মধ্যে এতটা পথ ছুটে এলাম, ঘামে আমার শরীর ভিজে গিয়েছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে উঠেছে, স্বাভাবিকভাবে নিজেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে মনে হওয়ার কথা, কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের মধ্যে এক প্রচণ্ড বলবান পুরুষকে আবিষ্কার করলাম। বলবান এবং তরুণ এক পুরুষ।

একটা অতিকায় সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলাম। চোখের সামনে বিরাট একটা ঘর। গোটা কয়েক জীর্ণ আসবাবপত্র ইতস্তত ছড়ানো কোণের দিকে দেওয়াল ঘেঁষে নিচু একটা তক্তপোষ, সেই তক্তপোষের ওপর উবুড় হয়ে বসে আছে একটি মানুষ। কী যেন লিখছে। ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুখ তুলে ডাকল লোকটি, বলল, 'কাকে চান?'

ভদ্রলোক মুখ তুলতেই চকিতে পিছনের একটা অংশ চোখের খুব সামনে সরে এল, ফটিকদিদের বাড়ির উঠনে মেয়েরা সব ছুটে এল। 'বর এসেছে, বর এসেছে' রব উঠল। পরক্ষণেই সবাই মুখ বিকৃত করল। মৃদু গুঞ্জন উঠল, 'এই বর!' অবিকল ফটিকদির বরের মতন দেখতে এই ভদ্রলোককে।

উনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'কাকে চাই?'

কী বলবো! ফটিকদির বরের নাম তো আমি জানি না। অথচ চুপ করে দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। আমতা আমতা করে বললাম, 'আমি নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ফুলিয়ার নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ফটিকদির দেশের লোক।'

ভেল্কিবাজির মত কাজ হোল। স্প্রিং-দেয়া পুতুলের মত তক্তপোষের ওপর উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, তারপর আমার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'কী আশ্চর্য, ফুলিয়া থেকে আসছেন, অথচ এতক্ষণ বলেন নি!' বলতে বলতে ভদ্রলোক আমাকে ছেড়ে দিয়ে উর্ধশ্বাসে বাড়ির ভেতর দিকে দৌড় দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'আপনি ভেতরে আসুন।'

শুরু হোল অভিনব এক অভিযান। উনি আগে আগে চলেছেন, পিছনে আমি। ঐতিহাসিক শিল্পকলা দেখা আমার এক নেশা। সেই সুবাদে বহু প্রাচীন বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করতে হয়েছে। মনে হচ্ছিল, আমি সেই ধরণের কোন বাড়ির মধ্য দিয়ে চলেছি। জায়গায় জায়গায় ভেজা দেওয়ালের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ বুকের নিঃশ্বাস ভারী করে তুলছে; কোথাও বা এক ফালি খোলা জায়গা পরক্ষণেই আবার পাতলা রহস্যময় অন্ধকার। কখনও সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছি, কখনও নিচে নামছি। ভয় হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত না সাপখোপের মুখে প্রাণ যায়। ভদ্রলোক যেন মনের কথা বুঝতে পারলেন, নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললেন, আগে সিঁড়িতে লণ্ঠন জ্বলতো সব সময়। কেরোসিনের খুব অভাব আজকাল। কোন ভয় নেই, আমাকে লক্ষ্য করে আসুন।'

এক সময় অভিযান শেষ হোল। বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। নিচু গলায় ডাকলেন ভদ্রলোক, 'মা!'

ভেতর থেকে মেয়েলী কণ্ঠে উত্তর এলো, 'কে দীনু, ভেতরে এসো।'

হাতের ইসারায় তাঁকে অনুসরণ করতে বলে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়লেন। আমাকেও পিছন পিছন যেতে হোল। কিন্তু চোখের এত কাছে যে এমন একটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখবো, মুহূর্ত আগেও কী কল্পনা করতে পেরেছিলাম। দেখলাম, ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা পালঙ্ক পাতা রয়েছে, তার ওপর সাদা ধবধবে চাদর বিছানো, আর সেই চাদরের ওপর রাজরাণীর মত বসে রয়েছে ফটিকদিদি। যদিও ফটিকদির পরনে একটা সাদা থান কাপড়, এবং সেই বেশে কাউকে রাজরাণী কল্পনা করা যায় না, কিন্তু এই মুহূর্তে ফটিকদিকে দেখে আমার সে রকমই মনে হয়েছিল। আর একটা বিষয়ও আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। এই দীর্ঘ কুড়িটা বছর ফটিকদির চেহারায় বিশেষ কোন পরিবর্তনই ঘটাতে পারে নি। একপলকেই ওকে আমি চিনতে পারলাম। ফটিকদির চোখের তারা দুটো এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, পরক্ষণেই ওরা চঞ্চল হয়ে উঠল, পালঙ্ক ছেড়ে উঠে এল ফটিকদি। আমার খুব কাছে সরে এল। এত কাছে যে ফটিকদির শরীর যেন আমার শরীর স্পর্শ করল। মৃদু স্বরে ফটিকদি বলল, 'নকুল! এতোদিন পর!'

পালঙ্কের এক কোণায় বসে পড়লাম, এতক্ষণ মনে হোল, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, সত্যিই আমি খুব ক্লান্ত।

একটা হাত-পাখা নিয়ে আমাকে বাতাস করতে লাগল ফটিকদি। চেষ্টা করেও ফটিকদিকে বারণ করতে পারলাম না। বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ফটিকদি হাসতে হাসতে বলতে লাগল, 'কীরে, চিনতে পারছিস তো। কত বদলে গেছিস নকুল।' তারপর সেই ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'বৌমাকে বল একটু মিষ্টি আর সরবৎ পাঠিয়ে দিতে।' এবারেও ফটিকদিকে বারণ করতে পারলাম না। নির্বাক বিস্ময়ে এক রহস্যময় নাটকের দর্শক হয়ে আছি শুধু। কে এই মানুষটি যাকে ফটিকদি দীনু বলে সম্বোধন করল, আমার জন্য মিষ্টি আর সরবৎ পাঠিয়ে দিতে বলল।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই ফটিকদিকে প্রশ্ন করলাম, 'উনি কে?'

ফটিকদি ভ্রু কাঁপিয়ে বলল, 'আমার বড় ছেলে।'

আমার বাক্‌রোধের উপক্রম, 'তোমার ছেলে?'

'হ্যাঁ, কর্তার প্রথম পক্ষের ছেলে। আমি তো তৃতীয় পক্ষের।' কথা বলতে বলতে ফটিকদি হাসছিল। আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল, ইচ্ছে হোল ফটিকদির একটা হাত ধরে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলি, 'তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারি ফটিকদি' কিন্তু আমি একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলাম না। দুঃখটা বুকের মধ্যে শুধুই পাক খেতে লাগল।

'খুব মজার ব্যাপার নারে!' যদিও ফটিকদি তখনও হাসছিল, ফটিকদির চোখে কোন মজাই দেখতে পেলাম না। এক এক-জন মানুষের চোখ দেখে মনের কথা বোঝা যায়। অন্তত ফটিকদির চোখ দেখে বোঝা যায়।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর এক হাতে থালায় গোটা কয়েক মিষ্টি, অন্য হাতে সরবৎ। টেবিলে থালা গ্লাস নামিয়ে রেখে মহিলাটি চলে যাচ্ছিলেন, ফটিকদি বলল, 'বৌমা, এই যে নকুল।' উনি ফিরে দাঁড়ালেন, ঘোমটা সরিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। বিষম সঙ্কুচিত বোধ করতে লাগলাম। কেউ এভাবে আমাকে দেখতে থাকলে সংকোচ হয়। কিছুক্ষণ আমাকে দেখার পর উনি চলে গেলেন। বিরক্তভাবে ফটিকদিকে বললাম, 'আমি কি সঙ, যে লোক ডেকে দেখাবে?'

ফটিকদি একটুও রাগল না, বরং ওর চোখে মুখে এক ধরণের বিচিত্র আলো ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগল ফটিকদি, 'তোর কত গল্প করেছি সবাইকে। তুই আমার খুব ন্যাওটা ছিলি, পেটের অসুখে ভুগতি খুব, ভুগে ভুগে কেমন নাকি সুরে কথা বলতিস, চুরি করে এটা ওটা খেতিস, ধরা পড়ে গেলে বেমালুম আমাকে দেখিয়ে বলতিস, ও দিয়েছে—মনে আছে তোর নকুল? মনে আছে, তোদের বাড়ির চিলে কোঠার ছাদে লুকিয়ে লুকিয়ে আচার খেতাম, তুই কয়েদ বেলের মাথা খেতে ভালবাসতিস, বারণ করতাম, কিছুতেই শুনতিস না, জিদ ধরতিস মনে আছে তোর? এখনও সেরকম জেদী আছিস?' বলতে বলতে ফটিকদি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল। ওর চোখের তারা স্থির হয়ে আছে আমার চোখের ওপর। ওরা যেন কী খুঁজছে, একটা হারাণো জগৎ আবিষ্কার করতে চাইছে কি!

উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে রইলাম। কী উত্তর দেবো? জেদী আছি কিনা? বলতে ইচ্ছা হোল, কে আমার জিদ শুনবে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করবে, রেগে গেলে রাগ ভাঙ্গাবার জন্য সাধ্য সাধনা করবে? ফটিকদিকে একথা বলা যায় না। বাধ্য হয়েই চুপ থাকতে হোল। হঠাৎ ফটিকদি টান দিয়ে আমার একটা চুল তুলে ফেলল। চোখের সামনে চুলটা তুলে ধরে বলল, 'ওমা, তোর চুল পেকেছে নকুল।'

বলার মত কথা পেয়ে খুশী হলাম, বললাম, 'বয়স তো আর কম হোল না, জানো, সামনের মাসে আমার ছেলে সাতে পড়বে।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল ফটিকদি, 'যাঃ।'

'সত্যি, বিশ্বাস কর।'

ফটিকদি বিশ্বাস করল, দেখতে দেখতে ফটিকদির স্বচ্ছ চোখে কীসের ছায়া পড়ল। মনে হোল, নিমেষে ফটিকদি অনেক দূরে চলে গিয়েছে। নদী নালা খন্দ পেরিয়ে ছায়া-সুশীতল এক গ্রাম, বড় বড় বাঁশ আর তার নিচে গো-সাপের আনাগোনা, বিরাট এক দীঘি, সেই জলে হুটোপুটি করে স্নান কর[illegible] দিগন্ত ছাপি[illegible] বৃষ্টির মাঝে উর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া—উদ্দেশ্যবিহীন, গন্তব্যহীন, কিন্তু জীবনের উষ্ণতায় ভরপুর; কিম্বা কাঠ-ফাটা রোদে ঝলমল করছে পৃথিবী, বহু উঁচুতে নীল আকাশে ডানা ছড়িয়ে ভাসছে দুটো চিল, সেইদিকে অ-কারণে চেয়ে থাকা—পাশাপাশি দুজনে; বা চিলে কোঠার ছাদে পা ছড়িয়ে আচার খেতে খেতে সহসা উন্মনা হয়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, যে সম্মুখে অফুরন্ত শূন্যতা ছাড়া দেখার মত আর কিছুই নেই।

অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল ফটিকদি। ওর এই ধ্যানমগ্ন রূপ আমাকে নির্বাক করে রেখেছিল। নিজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও যেন প্রকট হয়ে কানে বাজতে লাগল।

এক সময় ফটিকদির সম্বিৎ ফিরে এল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইস কত বেলা হয়ে গেল, অথচ আমি গল্প করতে বসে গেলাম এখন।' আমাকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই ফটিকদি বেরিয়ে গেল।

ফিরল অনেকক্ষণ পরে। একাই ফিরল না, পিছনে নিয়ে এল বাচ্চা ক্ষাচ্চার বিরাট এক দঙ্গল। ওরা হুটপাট করে আমাকে প্রণাম করতে লাগল। বিশ্রী রকমের অস্বস্তিকর পরিবেশ। কচি কচি হাতগুলো পা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, এ ধরণের অভিজ্ঞতা আজ পর্যন্ত হয়নি। চেঁচামেচি হৈচৈ লেগে গিয়েছে ওদের মধ্যে। আমার অবস্থা দেখে ফটিকদি হেসে কুটিপাটি। হাসির ফাঁকে এক সময় বলল, 'আমার নাতী নাতনী।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকা হাওয়ার মত ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল শুধুমাত্র একটি মেয়ে। শ্যামলা শ্যামলা গায়ের রং, চোখ দুটো বড়, দুই ভ্রূর মাঝ-খানে খয়েরের ছোট্ট একটা টিপ, মেয়েটি আমার দিকেই তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই মাথা নিচু করল। ফটিকদি বলল, 'ও রজনী, আমার ছোট ছেলের মেয়ে।' রজনী এসে আমাকে প্রণাম করল, তারপর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, সেই-দিকে তাকিয়ে থেকে ফটিকদি বলল, 'রজনী খুব ভাল মেয়ে সব সময় আমার কাছে কাছে থাকে, আমাকে খুব ভালবাসে। গত বছর ওর মা মারা গেছে। ওর জন্যেই আমার চিন্তা। মেয়েটার একটা ভাল বিয়ে [illegible] পারলে হয়।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল ফটিকদি, তার-পর বলল, 'খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে চল।'

বিরাট একটা ঘরে সবাইকে এক সঙ্গে খেতে দেওয়া হয়েছে। ছেলে বুড়ো নিয়ে প্রায় জনা ত্রিশেক হবে। এককালে যে ফটিকদিদের অবস্থা ভাল ছিল বোঝা গেল। সমস্ত বাড়িতে সেই ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে। আজ যে অবস্থা পড়ে গিয়েছে, তাও বোঝা গেল। আমাদের পরিবেশন করছিলেন [illegible]কালে হয়ত ঠাকুর-চাকরেই এ কাজ করতো। ফটিকদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া দেখছিল, এবং এটা ওটা নির্দেশ দিচ্ছিল। সবাই ফটিকদির কথা শোনে। এত বড় বড় ছেলে, ছেলের বৌরা, কিন্তু সবাই কত সমীহ করে ফটিকদিকে। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠল। মনে মনে এ বাড়ির প্রতিটি মানুষকে কৃতজ্ঞতা

জানালাম। ফটিকদিকে ওরা সমীহ করে বলেই কৃতজ্ঞতা জানালাম।

খাওয়া শেষ হতে বেলা প্রায় গড়িয়ে এল।

ফটিকদি আবার আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। নিজের হাতে বিছানা পেতে দিয়ে বলল, 'তুই একটু বিশ্রাম কর। বৌমাদের খাইয়ে আসি।'

'তুমি তো সবাইকে খাইয়ে বেড়াচ্ছ, তোমাকে কে খাওয়াবে ফটিকদি।'

ফটিকদি চোখ নাচিয়ে হাসল, 'কেন, তুই।' ফটিকদি আর দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আমাকে একটা স্বপ্নের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল। স্বপ্ন নয় অবশ্য, বাস্তবই ছিল এককালে, এখন মনে হচ্ছে, একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমাদের বাড়িতে তখন খুব ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হতো। উপোস করে পুজোর যোগাড় করতো ফটিকদি। ও যতক্ষণ উপোস করে থাকতো আমার ভীষণ অস্বস্তি হোত, কোন কাজেই মন বসতো না। ফটিকদি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারতো। আমাকে কষ্ট দেবার জন্যই পুজোর পরেও অযথা দেরী করতো, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। কিছুতেই খেতে চাইতো না। আমি জোর করে একবার ফটিকদির মুখে নারকেলের নাড়ু গুঁজে দিয়েছিলাম। ফটিকদি আমার আঙুল এমন জোরে কামড়ে দিয়েছিল যে আর একটু হলে রক্ত বেরিয়ে পড়ত। কী যে দুষ্টু ছিল ফটিকদি।

'কী রে, ঘুমোস নি!' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল ফটিকদি। আড়ামোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসলাম। আর শুয়ে থাকা চলে না। বেলা পড়ে এল, এবার যেতে হবে।

ফটিকদি আবার বলল, 'একটা দিন থেকে যা না নকুল, কোন কথাই হলো না। কত কথা জানতে ইচ্ছে করে। বিয়ের পর আর তো বাপের বাড়ি যেতে পারিনি।'

'যেতে পারো নি বলো না, বলো যাও নি।'

ফটিকদি শান্তভাবে হাসল, 'এত বড় সংসার ছেড়ে কী যাওয়া চলে, তুই-ই বল।' উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। কী হবে শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে। হয়তো ফটিকদি আঘাত পাবে।

বলাম, দিনকাল ভাল না। বাড়ির সবাই চিন্তা করবে। তার চেয়ে আর একদিন বরং আসবো।

ফটিকদি খপ করে আমার একটা হাত ধরেই ছেড়ে দিল, 'সত্যি করে বল, আসবি ?

আবার সেই দল বেঁধে প্রণাম করবার ধুম। ছেলেমেয়েরা ধুপধাপ করে প্রণাম করছে, ফটিকদি দাঁড়িয়ে আছে নিষ্পলক চোখে। ফটিকদি সামনের দিকে তাকিয়ে আছে. সেখানে বড় বড় কয়েকটা গাছ, গাছের ওপরে বিরাট আকাশ। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, ফটিকদি গাছ কিম্বা আকাশ কিছুই দেখছে না, শুধুই তাকিয়ে আছে।

একটা রিকসা এসে দাঁড়াল। ফটিকদির বড় ছেলে দীনু রিসসায় উঠে বসলেন, আমাকেও উঠতে বললেন। আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন তিনি।

অতর্কিতে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। আবেগে আমার গলা থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমি বলতে লাগলাম, 'তুমি চিন্তা করো না ফটিকদি, তোমার রঞ্জনীর জন্য ভাল পাত্র আমি যোগাড় করবো। ন' কাকার ছেলেটি ভাল, ওর সঙ্গেই রঞ্জনীর বিয়ে দেবো।'

বলতে বলতে ভুলে গেলাম, আমি—শ্রীনকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সরকারের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী একজন, ন্যায়নিষ্ঠ, দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন, আমার স্ত্রী সুরমা আমারই আশায় পথ চেয়ে রয়েছে, যেহেতু একটা সুসংবাদ বহন করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমারই ওপর ন্যস্ত হয়েছে আজ; সবকিছু ভুলে গিয়ে ব্যগ্র প্রতীক্ষায় ফটিকদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম; একটু আশা, দিনান্তের মন্থর আলোয় সেই মুখে ক্ষীণ হাসি দেখতে পাবো, যে হাসিতে মাখানো রয়েছে গভীর এক সুখ।

শনিবার

বারীন্দ্রনাথ দাশ

NITAIGHOSH

সেদিনও শনিবার। তিনটে বাজতেই দেবাশিস আকাশের দিকে তাকালো। ইদানীং প্রায়ই বিকেলের দিকে বৃষ্টি হচ্ছে। গত শনিবার হয়েছিলো, তার আগের শনিবারও হয়েছিলো। প্রথম দিন মন্দ লাগেনি, কারণ বৃষ্টি আরম্ভ হবার আগেই স্বাতী গাড়িবারান্দার তলায় পৌঁছে গিয়েছিলো। দেবাশিস প্রত্যেক শনিবারের মতো আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো। স্বাতী তাকে দেখে হাসলো। সে স্বাতীকে দেখে হাসলো। স্বাতী তার দিকে এগিয়ে এলো, সে স্বাতীর দিকে দু'পা এগোলো। আকাশ এরই মধ্যে মেঘে মেঘে কালো হয়ে গেছে। দেবাশিসের খুব দুর্ভাবনা হয়েছিলো যদি স্বাতী এসে পৌঁছাতে না পারে। নানারকম কথা ভাবছিলো। এখন আর সেসব মনে রইলো না। এমন সময় আকাশের এপার থেকে ওপার বিদ্যুৎ খেলে গেল। খুব জোরে ময়দানের ওদিকে বাজ পড়লো। চেপে বৃষ্টি নামলো। জলের ছাট এসে পড়ছে স্বাতীর গায়ে। অথচ এত ভিড় গাড়িবারান্দার নিচে, কোনোদিকে সরে যাওয়ার উপায় নেই। তখন স্বাতী দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেছিলো, বেশ লাগছে।
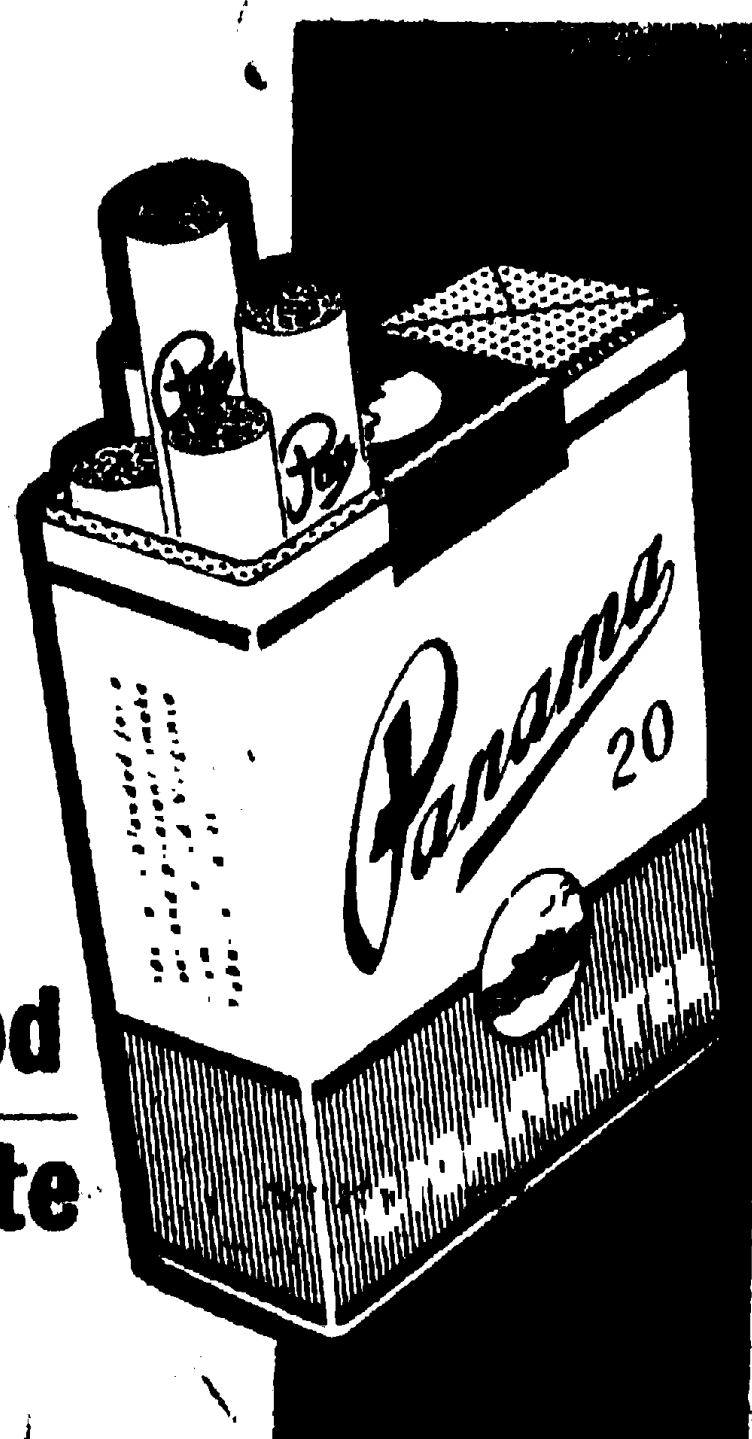
সেটা হলো পনেরো দিন আগেকার কথা। একনাগাড়ে অনেকদিন ভ্যাপসা গরমের পর চেপে বৃষ্টি ভালো লাগবারই কথা। দেবাশিস অফিস ফেরত, স্বাতীও অফিস-ফেরত, দুজনেই সারা দুপুরের গরমে আলুসেদ্ধ হয়ে গেছে। সেদিন ভালো লেগেছিলো। অন্যান্য শনিবারের মতোই প্রোগ্রাম ছিলো সেই শনিবার, কিন্তু চারদিকের ঝাপসা বৃষ্টির মধ্যে দুজনে ভিড়ের একপাশে গাড়িবারান্দার তলায় গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং সেটা ভালো লেগেছিলো সেকথা মনে আছে।

তার পরের শনিবারও বৃষ্টি হয়েছিলো। আকাশ কালো দেখেই তিনটে বাজতে না বাজতে দেবাশিস অফিস থেকে বেরিয়ে দৌড় মারলো সেই গাড়িবারান্দার দিকে। হেঁটে এখান থেকে পনেরো মিনিট। ট্রামে যাওয়ার উপায় নেই। খানিকটা যেতে না যেতেই খুব জোরে বৃষ্টি নামলো। পথের ধারে এক জায়গায় আশ্রয় নিতে হোলো। বৃষ্টি আর থামেই না। দেবাশিস খুব উদ্বিগ্ন, স্বাতী এসে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে গাড়িবারান্দার নিচে। আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা, দেড় ঘন্টা, পৌনে পাঁচটায় বৃষ্টি থামলো। জল হয়ে গেছে চারদিকে। সেই জল ভেঙে দেবাশিস হাজির হোলো তাদের সেই গাড়িবারান্দায়। সেখানেও পায়ের গোড়ালি অবধি জল। সেই জলের মধ্যে দেবাশিস দাঁড়িয়ে রইলো। ঘড়ির দিকে তাকালো, পাঁচটা প্রায় বাজে। আজ

বোধহয় স্বাতী আর এলো না। দেবাশিস তিন চারবার হাঁচলো। আর পাঁচ মিনিট দেখি, দেবাশিস ভাবলো। তারপর যখন চলে আসবে ভাবছে, এমন সময় দেখে জল ভেঙে স্বাতী আসছে। তার মুখে হাসি। দেবাশিস জানে একটু আগে ওই মুখ ছিলো মেঘে-ঢাকা আকাশের মতো।

কেমন মজা,—স্বাতী বললো,—কালিদাসের নায়ক-নায়িকা আমাদের মতো কাপড় তুলে জল ভেঙে পাশাপাশি হাঁটবার সাধ কোনোদিন পেয়েছে?

স্বাতী খুব দুনিয়াদারি মেয়ে। কিন্তু দেবাশিসের সঙ্গে থাকলেই অন্যরকম হয়ে যায়। সে দেবাশিসের দিকে তাকালো হিন্দি সিনেমার নায়িকার মতো চোখ করে।

এত দেরি করে এলে কেন?—দেবাশিস জিজ্ঞেস করলো।

—আমি ঠিক সময়ই বেরিয়েছিলাম অফিস থেকে। কিন্তু বৃষ্টি নামলো যে।

—কোথায় ছিলে?

—রাস্তার মোড়ের ওই দোকানের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছিলাম।

দেবাশিস একটা নিশ্বাস ফেললো লম্বা করে টেনে। গাড়িবারান্দার তিন মিনিট দাঁড়িয়েছিলো স্বাতী, আর পাঁচ মিনিট পশ্চিমে দেবাশিস। দুজনের মাঝখানে একটা বৃষ্টি ওদের সাম্প্রতিক জীবনের একটি বহুমূল্য শনিবারের বিকেল ধুয়ে নিয়ে গেল।

দুটি ঘন্টা,—দেবাশিস ভাবলো,—দুটি বহুমূল্য ঘন্টা। দেবাশিস ঘড়ির দিকে তাকালো। যাক এখনো হাতে একঘন্টা সময় আছে। ছটা পাঁচিশে যে গাড়িটা আছে সেটা ধরলেই চলবে। ছটা পর্যন্ত ওদের একটু কফি খাওয়া যেতে পারে।

স্বাতী মাথা নাড়লো। তাকে ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। তার ছোটো বোনকে দেখতে আসছে আজ সন্ধ্যার পর। এসপ্লানেডে বাস ধরে তাকে যেতে হবে সুদূর দক্ষিণে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ।

চলো আমায় বাসে তুলে দেবে—স্বাতী বললো।

জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এসপ্লানেড এলো। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে স্বাতী বাসে উঠলো। বাস চলে গেল। বাসস্টপের ভিড়ে দেবাশিস একলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর রাস্তা পেরিয়ে হাওড়ার বাস ধরলো।

এটা সাতদিন আগেকার কথা। সেদিন আর বসে গল্প করার সুবিধে হয়নি বলে মন একটু বেজার হয়েছিলো। তবু, যখন মনে পড়লো মেঘলা বিকেলে জল ভেঙে ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাসস্টপের দিকে যাচ্ছিলো, তখন আবার বেশ ভালো লাগলো।

কতো বছর এমনি করে কেটে গেছে। কতো শনিবারের পর শনিবার। প্রথম প্রথম ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে বসতো, সিনেমায় গিয়ে বসতো, এখন ভিড়ের মধ্যে ভালো লাগে, মানে ভিড়ের মধ্যে যেন আরো অনেক বেশী নিরিবিলি। প্রথম প্রথম হাত ধরতে ভালো লাগতো, এখন সেটা অবান্তর মনে হয়: ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সে যে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে যায়, মনে হয় এ যেন অনেক বেশী আপন করে পাওয়া। এখন একসঙ্গে বসে নানারকম খাবার খেতে ভালো লাগে। কখনো চীনে, কখনো মোগলাই। এখন একসঙ্গে বাজার করতে ভালো লাগে। দেবাশিস বাড়ির জন্যে কিনে নেয় এক কিলো পটল, স্বাতী মায়ের জন্যে কেনে দুতিন গজ লংক্লথ।

স্বাতী একদিন হেসে বলেছিলো,—ভালো করে অভ্যেস করে নিচ্ছি। যখন আমরা একসঙ্গে থাকবো তখন তো প্রত্যেকদিনই এমনি করে একসঙ্গে বাজার করবো।

—তখন কিন্তু গাড়িবারান্দার তলায় প্রত্যেকদিন আসতে হবে। দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবো।

—আমার ভারী বয়ে গেছে প্রত্যেকদিন আসতে। আমি আমার মতো বাড়ি ফিরবো। তুমি তোমার মতো বাড়ি ফিরবে।

যখন আমরা একসঙ্গে থাকবো—। দেবাশিস নিজের মনে হাসে একথা ভাবলে। এই কটি কথা দিয়ে তারা কতো বাক্য রচনা করেছে স্কুলের কম্পোজিশনের মতো। প্রত্যেকটি বাক্য এক একটি ছোটো ছোটো স্বপ্ন।

এমনি করে কেটে গেছে বেশ কয়েকটি বছর। এখন ভাবতে বসলে টুকরো টুকরো কতকগুলি ছবি মনে হয়। একসঙ্গে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকা। একসঙ্গে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়া। ময়দানের ধারে একসঙ্গে ফুচকা খাওয়া। একসঙ্গে জমকালো দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম দামী জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে দেবাশিস আকাশের দিকে তাকালো। আজও মেঘ করছে আকাশে। এই বেলা বেরিয়ে পড়া উচিত। সরকারীভাবে ছুটি একটায়। কিন্তু চারটের আগে কারো কাজ শেষ হয় না। দেবাশিসের মার্চেন্ট অফিসেও এই রীতি, স্বাতীর আধা-সরকারী অফিসেও এই রীতি।

দেবাশিস তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গুছোতে লাগলো।

পাশের টেবিলের অমর হেসে বললো, শনিবার তিনটে বাজলে দাদার আর তর সয় না।

ওধার থেকে সুব্রত বললো,—এমনি করে আর কদ্দিন। একদিন সবাই ধাতে ঘটা করে নেমন্তন্ন খেয়ে উপহার-টুপহার দিয়ে আসতে পারি তার ব্যবস্থা করো।

দেবাশিস হাসে। কোনো উত্তর দেয় না। এরা অনেক বছরের সহকর্মী, খুব অন্তরঙ্গ, এদের কথায় কিছু মনে করা যায় না। অনেক সময় পড়ে থাকা কাজ এরাই করে দেয়।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও এরা জানতো না। তখন পর্যন্ত দেবাশিস তিনটের সময় কেটে পড়তো পিসীর অসুখ কি ভাগ্নীর জন্মদিন এরকম কোনো একটা অজুহাত দিয়ে। তারপর একদিন সুদীপ্তা দেখে ফেললো।

তাদেরই অফিসে কাজ করে সুদীপ্তা। সেলস ম্যানেজারের ঘরের সামনে একটি ছোটো টেবিলে বসে। খুব চটপটে মেয়ে, অল্প বয়েস, দেখতে ভালো। অফিসে সবার সঙ্গে অল্পবিস্তর কথাবার্তা বলে, কিন্তু বেশী মাখামাখি করে না।

সেদিন শনিবারেও দেবাশিস গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছিলো। হঠাৎ দেখলো সুদীপ্তাও এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে দেবাশিসের অস্বস্তি লাগলো, মনে হোলো সুদীপ্তাও যেন খুব সহজ বোধ করতে পারছে না। সুদীপ্তা অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। দেবাশিসও অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

একটু পরে স্বাতী এলো। সুদীপ্তা তখন তাকিয়ে দেখলো। স্বাতী আর দেবাশিস যখন চলে আসছে, দেবাশিস লক্ষ্য করলো আরেকটি অল্পবয়েসী ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে সুদীপ্তার সামনে।

পরদিন দেবাশিস সুদীপ্তার চোখ এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করলো। সুদীপ্তাও অফিসের কাজে দু-একবার দরকারী কথা ছাড়া আর কিছু বললো না।

তার পরদিন সুদীপ্তা দেবাশিসকে দেখে একটু হাসলো। দেবাশিসও হাসলো। তবে সেদিন দেখা হওয়া নিয়ে কেউ কাউকে কিছু বললো না।

শনিবার এলো।

ঘড়ি দেখে দেবাশিস যখন উঠে পড়বার উপক্রম করছে অমর জিজ্ঞেস করলো,—দেবাশিসদা অতো তাড়াহুড়ো করে কোথায় চললে?

—জ্যাঠাইমার সঙ্গে একটু জরুরী কাজ আছে।

—ওনাকে তুমি বুঝি জ্যাঠাইমা ডাকো?—সুব্রত জিজ্ঞেস করলো।

—কাকে?

—যিনি গাড়িবারান্দার তলায় এসে অপেক্ষা করেন তোমার জন্যে?

দেবাশিসের মুখ লাল হোলো।

—তোমরা কি করে জানলে?

সুদীপ্তার কাছে থেকেই বেরিয়েছে খবরটা। সে বলেছে বড়োসায়েবের স্টেনো অনুপমাকে।

—ভাই, টপ সিক্রেট, কাউকে বলবি না।

অনুপমা বলেছে রিসেপশনিস্ট তপতীকে।

—টপ সিক্রেট, কাউকে বলবি না।

তপতীর সঙ্গে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ সেনগুপ্তের খুব মাখামাখি।

—কাউকে বোলো না যেন, টপ সিক্রেট।

সেনগুপ্ত বললো ক'কে, ক বললো খ'কে, খ বললো গ'কে। এমনিভাবে ঙ-চ-ছ হয়ে এলো সুব্রত আর অমরের কানে।

সুদীপ্তা?—বললো দেবাশিস,—বলেছে বুঝি?

কিন্তু আর কিছু বললো না। সে জানে চুপ মেরে থাকলে কেউ মাথা ঘামাবে না। যা দিনকাল, যে যার নিজের ভাবনায় মশগুল, নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

দেবাশিস কিছুই বললো না। এমন কি

সন্দীপ্তাও গিয়ে যে গাড়ি বারান্দায় নিচে দাঁড়ায় সে-কথাও বললো না।

প্রত্যেক শনিবারই দেখা হয় সন্দীপ্তার সঙ্গে। কিন্তু ওখানে কেউ কাউকে চেনে না। দেবাশিস স্বাতীর সঙ্গে চলে যায়, সন্দীপ্তা চলে যায় তার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে।

আজও সেখানে গিয়ে দেখতে পেলো সন্দীপ্তাকে। তার আগেই গিয়ে পৌঁছে গেছে। কিন্তু স্বাতী আসে নি তখনো।

সন্দীপ্তা দাঁড়িয়ে আছে দেবাশিসের বেশ কাছেই। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। দেবাশিস একটু পেছনে সরে গেল।

আকাশে বেশ মেঘ করেছে। হয়তো বৃষ্টি নামবে একটু পরে। জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে। সন্দীপ্তার মাথার উপর দিয়ে দেবাশিস সামনের রাস্তার দিকে তাকালো। স্বাতীর দেখা নেই। ঘড়ির কাঁটা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

কি হোলো স্বাতীর?—দেবাশিস ভাবলো। এত দেরী তো সে কখনো করে না, নেহাৎ যদি বৃষ্টিতে আটকে না যায়। বড় জোর পনেরো মিনিট কি কুড়ি মিনিট। হ্যাঁ, একবার সে সময় দিয়েও আসে নি। সেদিন প্রায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করে দেবাশিস ক্ষেপে গিয়েছিলো। কিন্তু পরে অনুতাপ হয়েছিলো। সেদিন স্বাতী অফিসে আসেনি। তার একশো তিন জ্বরে। অফিসে ফোন করে খবর দেবার উপায় ছিলো না। পাড়ায় ধারে কাছে কারো বাড়িতে ফোন নেই।

শুধু ওই একদিন আসে নি। সেদিন ছাড়া প্রত্যেক শনিবার এসেছে। দেবাশিসও আসতে পারে নি একদিন। সেদিন ট্রেন বন্ধ ছিলো সকাল থেকে। অফিসেই আসতে পারে নি। স্বাতীকেও আসতে হয়নি সেদিন। অফিসে এসে শুনতে পেয়েছিলো হাওড়ায় সব ট্রেন বন্ধ। তখন একবার খবর নিয়েছিলো দেবাশিসের অফিসে। শুনলো দেবাশিস আসে নি, স্বাতী বাড়ি চলে গিয়েছিলো।

দেবাশিস ঘড়ি দেখলো। চারটে প্রায় বাজে। স্বাতীর কি হোলো আজ? সারা দিন অফিসে খাটুনি গেছে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।

শনিবারের পর শনিবার এভাবে আর কদ্দিন? দেবাশিস ভাবলো।

হঠাৎ মনে হোলো যেন স্বাতী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

এত দেরী কেন?—বলতে বলতে দেবাশিস মুখ ফেরালো এবং বেশ অপ্রস্তুত হোলো।

কারণ, হাসিমুখে সন্দীপ্তা উত্তর দিচ্ছে, —আমারও তো সেই একই প্রশ্ন।

দেবাশিস শুধু হাসলো, কি উত্তর দেবে ভেবে পেলো না।

সন্দীপ্তা বললো,—আমার শ্রীমান তো আর এলো না। মনে হচ্ছে আপনার উনিও হয়তো আর এলেন না।

দেখি আরো কিছুক্ষণ,—দেবাশিস বললো। আবার ঘড়ির দিকে তাকালো।

সন্দীপ্তা চারদিকে তাকালো। ধারে-কাছে বিশেষ কেউ নেই। দেবাশিসের দিকে ফিরে বললো,—আমি কিন্তু আপনার কাছে একটু অপরাধী হয়ে আছি।

কেন?—দেবাশিস হেসে জিজ্ঞেস করলো।

—আমার কাউকে বলার ইচ্ছে ছিল না। অনুপমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

—তাতে কি হয়েছে? এ তো স্কুলের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ব্যাপার নয় যে অভিভাবকের কানে গেলে বকুনি খেতে হবে।

না, তা নয়,—সন্দীপ্তা মুখ নিচু করে হাসলো, তারপর বললো,—আমার পরে ভয় হয়েছিলো যে আপনি আমার কথাটাও বলে দেবেন। কিন্তু যখন দেখলাম আপনি বলেন নি, খুব লজ্জা করলো, নিজেকে খুব ছোটো মনে হোলো।

এসব সামান্য ব্যাপার,—দেবাশিস বললো, —এত গুরুত্ব দিতে নেই।—তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যেই বললো, —আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, উনিও এদিকের কোনো অফিসে চাকরি করেন বুঝি?

না,—মাথা নাড়লো সন্দীপ্তা।—একেবারে বেকার।

ও, —বললো দেবাশিস,—তাহলে তো মুশকিল।

—কেন মুশকিল কিসের?

কিছু না, এমনি বলছিলাম,—প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইলো দেবাশিস।

সন্দীপ্তা হেসে ফেললো।—বিয়ে করা মুশকিল। সেকথাই তো বলতে চাইছিলেন?

চাকরি থাকলেও কি বিয়ে করা যায়?—কথাটা হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়লো। দীর্ঘনিশ্বাসটা চাপবার চেষ্টা করলো দেবাশিস।

সন্দীপ্তা মুখ তুলে একবার তাকালো। তারপর মুখ নামিয়ে বললো,—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো কিছু মনে করবেন না?

—না। বলুন।

—শুনেছি আপনারা অনেক বছর ধরেই একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেন। এখনো বিয়ে করেন নি কেন?

দেবাশিস চুলের ভিতর আঙুল চালালো। বোধ হয় অনুভব করলো পাক-ধরে যাওয়া অল্প কয়েক গাছি চুল। এদিক-ওদিক তাকালো। স্বাতীর দেখা নেই। দেবাশিস বললো,—স্বাতীর রোজগারে ওদের সংসার চলে। ওর অনেক ভাইবোন। ভায়েদের মানুষ করতে হবে। বোনেদের বড়ো করতে হবে।

সন্দীপ্তা চুপ করে রইলো।

দেবাশিসের মনে পড়লো, স্বাতী একদিন বলেছিলো,—আমার বুঝি ইচ্ছে করে না তোমার সঙ্গে থাকতে? কিন্তু কি করবো বলো।

কিছুক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়েছিলো দেবাশিস। তারপর বলেছিলো,—চলো এক কাজ করি। তুমি আর আমি পুরী বেড়িয়ে আসি। ওখানে আর কে জানছে। হোটেলে স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দেবো।

বেশ হয়, না?—একগাল হেসে দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বলেছিলো,—ওই কদিন আমি সিঁথিতে সিঁদুর পরবো। তুমি নিজের হাতে প্রত্যেকদিন সকালে আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেবে।—বলতে বলতে হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো— না, দেবাশিস, সে হয় না।

দেবাশিস চারিদিকে তাকালো। কেন আসছে না স্বাতী? কতো বছর হয়ে গেল। শরীর ভারী হয়ে গেছে। মুখে ছায়া পড়ে গেছে। কতো বয়েস হোলো স্বাতীর? ছত্রিশ কি সাঁইত্রিশ বোধ হয়। দেবাশিসও আটত্রিশ পেরিয়ে এবার উনচল্লিশে পড়বে।

আর এরা কি সুখী,—ভাবতে ভাবতে দেবাশিস সন্দীপ্তার দিকে তাকালো,—কতো বয়েস হবে এর? তেইশ কি চব্বিশ। যে-ছেলেটি এর সঙ্গে এসে দেখা করে তারও বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়। এরা কতো সহজভাবে ঘুরে বেড়ায়, কতো সহজভাবে গল্প করে। হয়তো সন্দীপ্তার সঙ্গে বিয়ে হবে সেই ছেলেটির, সম্ভবত এই শ্রাবণেই।

সন্দীপ্তা চুপ করে কি যেন ভাবছিলো, তারপর দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে বললো,—সবারই অবস্থা একই রকম।

—কেন?

—কেন আবার? নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস—এই আর কি।

দেবাশিস তাকিয়ে রইলো। কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

সন্দীপ্তা বললো,—আপনি বোধ হয় ভাবছেন, ওই ছেলেটির চাকরি হলেই তাকে বিয়ে করবে এই মিষ্টি দেখতে মেয়েটি। না মশাই, তা নয়। অরূপকে আমি বিয়ে করছি না।

—কেন?

—অরূপ একটা স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানী যাচ্ছে। আর আমার বিয়ের কথা হচ্ছে অন্য জায়গায়। ভালো ছেলে। চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট।

তাই নাকি?—দেবাশিস অবাক হোলো। এখনকার অল্প বয়েসীদের কি রকম যেন একটা কথা বলার ধরণ। খুব সহজ, খুব হালকা, কিছুতেই যেন জড়িয়ে নেই। অথচ চোখ দেখে মনে হয় মনে মনে যেন খুব গম্ভীর। দেবাশিসের মনে হোলো, আমরা যা পারিনি, এরা বোধ হয় তা পেরেছে, অর্থাৎ আমরা মেনে নিতে পারি না জীবনে শুধু দুঃখ, শুধু ব্যথা পাওয়া, আমরা আশা করে বসে থাকি যে একটু ধৈর্য ধরে থাকলে সামনে একটা সুখের দিন আছে। কিন্তু এরা বোধ হয় মেনে নিয়েছে যে জীবনে অঙ্ক মিলিয়ে কিছু হয় না, ব্যথা পাওয়া, দুঃখ পাওয়াটাই চিরন্তন রীতি, সুতরাং এই জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে একটা রফা করে ওপর ওপর

যতোটা সহজ হয়ে থাকা যায় ততোটুকুই সুখ।

দেবাশিস চারদিকে তাকালো। তার স্বাতীর দেখা নেই।

সন্দীপ্তা চারদিকে তাকালো, তার অরূপের দেখা নেই।

দেবাশিস ঘড়ির দিকে তাকালো।

সন্দীপ্তা ঘড়ির দিকে তাকালো।

অরূপ বোধ হয় আজ আর আসবে না,—সন্দীপ্তা বললো।

বোধ হয় স্বাতীও আসবে না,—বললো দেবাশিস।

সন্দীপ্তা দেবাশিসের দিকে তাকালো।

দেবাশিস সন্দীপ্তার দিকে তাকালো।

সন্দীপ্তা একটু হাসলো।

হাসলো দেবাশিসও।

সন্দীপ্ত বললো—আমরা যখন দাঁড়িয়েই রইলাম এতক্ষণ আর ওরা যখন এলোই না তখন আমরাই কোথাও বসে একটু চা খেতে পারি, গল্প করতে পারি।

দেবাশিস সন্দীপ্তার দিকে তাকালো। সন্দীপ্তার পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে গেল। মনে মনে একটু বিষয় বোধ করলো। তারপর বললো,—হ্যাঁ, তা পারি।

তাহলে চলুন,—বললো সন্দীপ্তা।

সন্দীপ্তার পাশাপাশি রওনা হোলো দেবাশিস। আর ঠিক সেই সময় দেখতে পেলে, অন্যদিক থেকে স্বাতী এগিয়ে আসছে।

অন্তরের শান্তি, ও আমার গোরাং—গোরাং সেবা কৃষ্ণের লাইগা পাগল অইছিলো, আমিও হবো। আমার মনে অইলো ও আমার গোরা। ছেইজন্যেই তো নইদার চান নাম রাখলাম, বুঝ্যা।'

'রেলগাড়ী ডলামারা
ব্যাঙ চ্যাপটা,
পথের মধ্যে কুড়াইয়া
পাইলাম ম্যানিব্যাগটা।' —ওই আইতাছে আমার নাজান ঃ মুহূর্তের মধ্যে বসা থেকে খাড়া হলো কিরপান বেওয়া। আর পুত্রকে দেখে অভিমানও যেন আড়মোড়া ভাঙলো

—হ্যাস পর্যন্ত আইলি তুই? আমি হেই কহন থেইক্যা পত্ চাইয়া রইছি।'

—'পত্ চাযা রইলা ক্যান, আমি কি কইছি, তুই আমার নেইগা চোক ফটকায়া চায়া থাক!'

জবাব শুনে কিরপানি বেওয়ার চোখ জলে ভরে উঠতে চাইলো, অতি কষ্টে নিজেকে স্থির রেখে বললো,

'আমি মইরা গেলে বুজবি—'

'মরণ্যা তুই—না করচে কারা। তুই মরলেও আমি হেই নইদাই থাকমু। দে, ভাত দে খিদা নাগছে!'

কিরপানি বেওয়া অভিমানে আর কথা বলে না। নিঃশব্দে থালায় ভাত বাড়ে দুজনের, আর কুপির আলোতে লক্ষ্য করে নইদার মুখ। দেরীতে আসার কারণ খুঁজে-বার জন্য। ঠিকই বরেছে কুরপান বেওয়া, ঐ তো মুখ চোখ রঙে ভর্তি। আইজও বুইলে সং দেখাইবার গেছিল। সং দেখানো নইদার সচাইতে বড় সখ। যত দূরেই হোক যদি শোনে আসর বসেছে, নইদা লাইন ধরে যেখানেই এবং সং দেখাবে। আমি দেখেছি আনন্দহলায়। আনুহলা প্রাইমারী স্কুলকে সরকার হাইস্কুল করলো। সেই উপলক্ষে কিছু টাকা তুলবার উদ্দেশ্যে ধর্মসভা ডাকা হলো আর সুলপুরী মওলানাকে খবর দেয়া হলো। সুলপুরী মওলানা এলো, দাওয়াতে আর নইদা বে-দাওয়াতে ববাহুত হয়ে। আজকের দিনে রেওয়াজ আছে কিনা জানি না, তবে আগে ছিল। কোন স্কুল বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ধর্মসভা ডেকে মওলানা ভাড়া করে এনে বক্তৃতা করিয়ে টাকা তোলা হতো। লাল, নীল, হলদে অথবা ফিকে রঙের কাগজের উপর ছাপানো খোলা কাঁচির মতো দুটি ছোট্ট পতাকার পর বলা হতো 'বেরাদারানে ইসলাম, আসসালামু আলাই-কুম বাদ আরজ এই যে অমুক দিন বাদ জুম্মা জহুর নামাজের পর এক ধর্মসভা হইবে। উক্ত ধর্মসভায় দীন-দুনিয়া ও আখে-রাত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন মাওলানা অমুক অমুক ছাহেব। আপনারা সদলবলে উক্ত ধর্মসভায় যোগদান করতঃ অশেষ ছোয়াবের ভাগীদার হউন এবং আখেরাতের পুলসিরাত পার হইবার বুলন্দ নসীব লাভ করুন। নিবেদক ইতি—খাকছার বান্দা অমুক তমুক। ইত্যাদি ইত্যাদি।' আনুহলা স্কুলের জন্যও অনুরূপভাবে একটি ধর্ম-সভা আহ্বান করা হলো স্কুলমাঠে।

সামিয়ানা ও দরপরদা টাঙানো হলো। স্কুল ঘরের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটাতে একটি লাল নিশান ওড়ানো হলো। জোহরের নামাজের পর থেকে মাগরেব পর্যন্ত সুলপুরী মাওলানা (আসল নাম সম্ভবতঃ মওলানা শামসুল হক কিংবা শামসুল ইসলাম বারী—ময়মন-সিংহের সুলপুর—সেজন্যেই সুলপুরী) ছাহেব দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে জ্বালা-ময়ী বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত মুসলমানদেরকে কাঁদিয়ে ফেললেন। মাওলানা ছাহেব ফর-মাইলেন ঃ 'পেয়ারে নবী হযরত মহম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলা-য়হে অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি স্কুল বা মাদ্রাসার জন্য এক টাকা দান করিবেন, আল্লাহ পাক তাহাকে হাশরের দিন একশত টাকা দান করিবেন। যে ব্যক্তি একশত টাকা দান করিবেন হাশরের দিন আল্লাহ তাকে দিবেন এক হাজার টাকা। যে ব্যক্তি এক পাখি জমি দান করিবেন, আল্লাহ পাক তাহাকে দশ পাখি দান করিবেন এবং অত্যন্ত আদব কায়দার সহিত তাহাকে বেহেস্ত নসীব করিবেন।'

ধর্মপ্রাণ উপস্থিত মুসলমানেরা কেউ টাকা, কেউ পয়সা কেউ ধান চাল, কেউ জমি, জমির দলিল, খতিয়ান নম্বর সুল-পুরী মওলানার সামনে জমা দিয়ে আখে-রাতে নিরাপত্তার অলিখিত সার্টিফিকেট প্রাপ্তির শান্তি পেতে লাগলো। হঠাৎ দেখি একজন কালো কুচকুচে তালপাতার সেপাই তার গামছার খুঁট থেকে একটা কাঁচা টাকা মওলানার হাতে দিয়ে মওলানার পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো। সন্ধ্যার পর চিনলাম লোকটাকে। এরই নাম নইদা। আনুহলা, বাগনোটাল, আলতিপাড়ার একমাত্র প্রাণ। একমাত্র হাসির খোরাক। আরো শুনলাম নইদা চোর না। বদমাস না। গুণ আছে। মাছ মারতে পারে। ভালো গোল্লাছুট খেলতে পারে। যখন যে কেউ কুট ফরমাশ দিক না, না করবে না। কালো মুখ আরো কালো করবে না। করে দেবে সে কাজ। যার জন্য আনুহলা বাগনো-টাল আর মালতী পাড়ার সকল নারী-পুরুষের কাছে নইদা সুপরিচিত এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই তারজন্য দ্বার খোলা। হাজারো পর্দানশীল মহিলা হোক, নইদাকে দেখে ঘোমটা দেবে না বরং কাছে ডেকে এটা-সেটা আনতে বলবে, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে হাসাবে, নিজেরাও হাসবে (আসলে নিজেরাই হাসতে চায় ওকে কেন্দ্র করে)।

সেই নইদা সন্ধ্যার পর সং দেখাবে। সে নাকি খুব ভাল সং দেখায়। স্কুলঘরের মাঝখানের ঘরখানার বাঁশের বেড়া খুলে ফেলে একখানা নৌকার সাদা বাদাম টাঙানো হয়েছে। দু'তিনটে চৌকি ফেলা হয়েছে। বাড়ী বাড়ী থেকে মেয়েদের পুরনো কাপড় এনে পিছনে এবং দুপাশে ঝুলানো হয়েছে। এছাড়া দুপাশে দুটো ডে-লাইট দেয়া হয়েছে, তাতে রাজ্যের পোকা ভীড় করেছে। আমরা ছেলেপিলেরা সামনে শতরঞ্জির উপর। আমাদের পেছনে ঘোমটা দেয়া গুটি কয়েক মহিলা। সবার পিছনে বসে এবং দাঁড়িয়ে অন্যান্য পাবলিক এবং সুলপুরী মাওলানা। গোটা কয়েক গান এবং আবৃত্তির পর এলো নইদা। নইদা

স্টেজে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হো-হো, হি-হি হাসির রোল উঠল। আমরাও হাসি পেলো। হাসি পেলো ওর চেহারা দেখে। মুখে চুন আর কালি মেখেছে। মাথায় বেঁধেছে গামছা। সারা গতর খালি। লুঙ্গিটা খুব টাইট করে কাছা মেরেছে। বুকে পেটে পিঠে পায়ে চুন আর কালি দিয়ে নকশা করেছে।

হাত ছুঁড়ে পা ছুঁড়ে লম্ফ দিয়ে সে সং দেখাচ্ছে—রেলগাড়ী ডলামারা ব্যাঙ চ্যাপটা, পথের মধ্যে কুড়িয়ে পেলাম মানি-ব্যাগটা। স্টেশনে কুলিগিরি করতে গিয়ে এক কুলি একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেলো। খুশী হলো খুউব। বাড়ীতে টাকা দিয়ে 'বউডারে শাড়ী দেওন যাইবো' কিন্তু ফাঁকে নিয়া খুলে দেখলো চাকায় থেতলিয়ে-যাওয়া মানিব্যাগটা চ্যাপটা অইয়া গ্যেছে ঠিকই, ট্যাহা নাই একটাও তাতে—হো হো করে হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। হাসলো মুলপুরী মাওলানাও। 'মাশাল্লাহ বহুত খুশ দিতে পারে ছোকরা'—এক ফাঁকে মাওলানা মন্তব্য করলো। হাসতে হাসতে পেট চাপড়াচ্ছিলো কদম মোল্লারও। ঘোমটার আড়াল থেকে মিহি গলায় খবিরনকেও হাসতে শুনেছি।

'পোলাও এ্যাক খান—মা, মাহু হাসাই-বারও পারে, প্যাটটা ব্যাদন অইয়া গেছে।' কদি হাজির স্ত্রী অনুষ্ঠান শেষে বাড়ী যাওয়ার পথে মন্তব্য করছে। পাশে রয়েছে তার মেয়ে খবিরন। পেছনে আমি চলেছি। আমি খবিরনকে চিনি না। চিনলাম দুদিন পরেই। স্কুলমাঠে আমরা গোল্লাছুট খেলছি। ঠ্যাংগা পোলা হয়েও নইদাকে আমরা নিয়েছি। কিন্তু ওর সঙ্গে দৌড়ে সবাই মিলেও পারি না। লম্বা লম্বা কাইক। আমাদের কাইকের তিন ডবল হবে। তবু খেলা জমে উঠেছে। হঠাৎ উত্তর দিকের আকাশ লাল টকটকে হয়ে উঠলো। গরম বাতাস লাগলো গতরে। তাকিয়ে দেখলাম ও-পাড়ায় আগুন ধরেছে। আগুনের লাল জিহ্বা আকাশ ছো ছো করছে। চোখের পলকে নইদা অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমিও গেলাম সেদিকে। কদি হাজির বাড়ীতে আগুন। বড় বড় টিনের ঘর পুড়ছে। ফট ফটা ফট আওয়াজ হচ্ছে। লোকজন কাছে যেতে পারছে না। পাড়াগাঁ, দমকল কোথায় পাবে। শহর থেকে দমকল আসতে ধলেশ্বরী পাড়ি দিতে হবে। হঠাৎ চোখে পড়লো নইদা আগুনের ভেতরে একটা দরজা ধাক্কাচ্ছে। উপস্থিত সবারই চক্ষু স্থির।

'কি দামাল ছেলেরে বাবা! আগুনের হলকার মধ্যে ঢুকেছে। পুইড়া যে ছাই হবে! ভাগ্যিস ওর মা নেই, ফকিরী করতে গেছে। নইলে, দেখলে ঝাঁপ দিয়ে আগুনে পড়তো।' নইদা ঢুকেছে ঘরটার মধ্যে। শ্বাসরুদ্ধ কয়েকটা মুহূর্ত। 'ঊইযে উইযে নইদা, কিন্তুক অর কোলে ওডা কি?' নইদা আগুনের হলকার বাইরে এলো। কোলে কদি হাজির যুবতী মেয়ে খবিরন।

খবিরনকে সে মাটিতে শুইয়ে দিইয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছে। সবাই ঘিরে ধরেছে নইদাকে। নইদার মাথার চুল পুড়ে গেছে। চোখের ভ্রূ পুড়ে গেছে কিন্তু সেদিকে ওর লক্ষ্য নাই। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে খবিরনের দিকে। একটু পরে খবিরন চোখ মেলে চাইলো। মুহূর্ত কয়েক ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো নইদার দিকে এবং তারপর হঠাৎ আগুনের দিকে চোখ পড়তেই 'মাগো' আর্তচীৎকার দিয়ে নইদার বুকে মুখ লুকালো। নইদা ওর সর্বশক্তি দিয়ে খবিরনকে বুকে চেপে ধরল, কিন্তু মুখে কোন সান্ত্বনার শব্দ উচ্চারণ করতে পারলো না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে গুড় দিয়ে ছাতু খেলাম। মনে পড়লো গতকালের আগুনের কথা। পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কদি হাজির বাড়ী গেলাম। সবগুলো ঘরই পুড়েছে। বড় বড় খড়ের পালা ছিল, তাও। গাছগুলো পুড়ে পুড়ে কুষ্ঠ রোগীর মত হয়ে রয়েছে। আরও দু-চারজন—কদম মোল্লা, নিশানবয়াতী, কিরমানী বেওয়া এসেছে। সান্ত্বনা দিচ্ছে।

কদম মোল্লা বলল, 'আল্লা যহন ছাইবা যাইবার চায় তহন বাধা দেওন লাগে না। ধৈর্য ধর আল্লাহ আবার দিবো।'

কিরমানী বেওয়া কদি হাজির বউকে বললো: 'বুইন বুকে পাষাণ বান্দো—পাইবা, সয় সম্পত্তি আবার অইবো। আমি কিরমানী ফকিরানী কইয়া গেলাম।'

কদি হাজির স্ত্রী কিরমানী বেওয়ার হাত ধরে বললো: 'বুইন তোমার পোলা আমার মাইয়াডার জীবন বাঁচাইছে। নইদা এককালে আমার প্যাডের সন্তান আছিল। আমার খবিরনরে আমি আজ পাইতাম না যদি তোমার নইদা—' কেঁদে ফেললো কদি হাজির স্ত্রী। কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর হিসেবে চোখের জল কদি হাজির স্ত্রীর গাল বেয়ে পড়তে লাগলো। 'ওডা কি কও বুইন, আল্লায় বাঁচানেঅলা আমার নইদা উছিলা মাত্তর। প্যাডের পোলার লাহান দেইখো তাই আমি খুশী।' তাকিয়ে দেখলাম, নইদা তাঁবু বাঁধছে ওদের থাকার জন্যে। আর খবিরন দুটি হাঁসকে কুঁড়ো গুলে দিচ্ছে।

কদি হাজির বাড়ীতে নইদার প্রয়োজন দেখা দিল ভীষণভাবে। ঘর পুড়ে গেছে ঘর তুলতে হবে। বেড়া পুড়ে গেছে বেড়া লাগাতে হবে। কাপড় পুড়েছে কাপড় আনতে হবে। কামলা-জামলা দেখতে হয়, হাটেগঞ্জে যেতে হয়—এতোদিক সামলানো বুড়ো কদি হাজির পক্ষে অসম্ভব। তাই নইদাকে বললো: 'নইদা বাবা তুই নিশান বয়াতীরে কইস আমাগোরে কতা, দেহনই তো তেনার শরীরের ধকল—তুই না আইলে এগুলা করবো ক্যারা?' জবাব দেবার আগে নইদা তাকালো সামনের দিকে, খবিরন সেখানে দাঁড়িয়ে একমাথা কালো চুল শুকুচ্ছে। ঃ'নইদা কি কারু কোন কাম না করছে কোনদিন তুমিই কও চাচী?' খবিরন ওদের কথাবার্তা শুনেছে কিনা বলা মুশকিল, কেননা সে পেছন ফিরে চুল শুকোচ্ছে।

কদি হাজির বাড়ীতে নইদার কাজ পড়েছে ভীষণ। তাই আজকাল আর গোল্লাছুট খেলতে আসে না। দু-একবার যদিওবা দেখি, মাথায় ধানের বোঝা কিংবা চালের বস্তা। যদি বলি 'খেলতে আসবে না?' বোঝার তলা থেকেই উত্তর দেয়ঃ 'না বাই, কাম কইরা খাড়া অইবার পারি না।'

কদি হাজির বাড়ীতে আবার ঘর উঠলো। আবার ধানের পালা উঠল। গরু-বাছুর জুটলো। হাঁস-মুরগীর ডাক শোনা
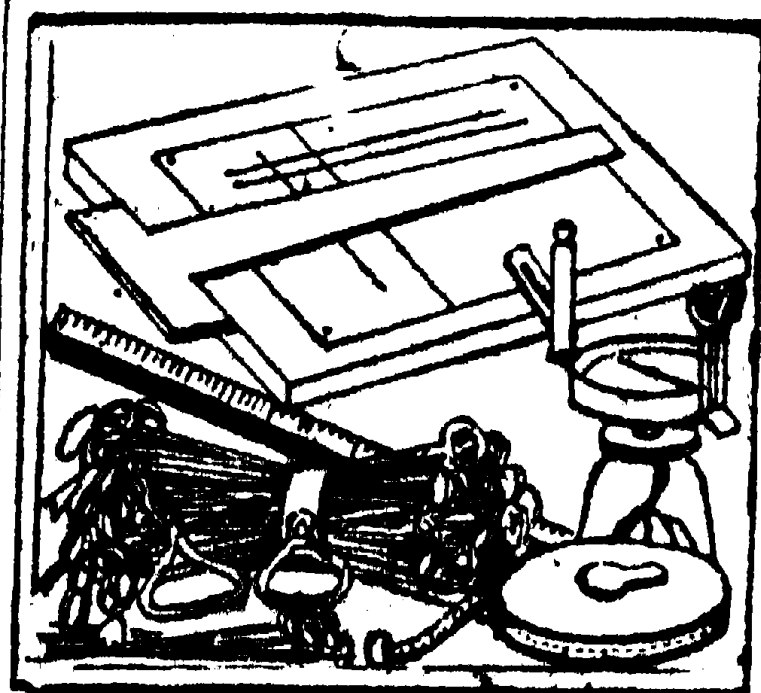
গেলো। কাদি হাজির বাড়ীতে গোখ-পাহালী আর মানুষের প্রাণ নতুনভাবে শুরু হলো।

দেখতে গেলাম। নইদার খোঁজও নিতে গেলাম দিন সাতেক পর। নইদা উঠানে বসে তামাকের গাছ কাটছে। দা দিয়ে 'খাইটা'র উপর তামাক পাতাগুলো রেখে কাটছে। হাঁটুর উপর কাপড়। আমাকে দেখে খুশি হলো। 'কি বাই, তুমি এহনও যাও নাই—আর যাইবা ক্যান. থাকো আরো কয়েকদিন। আমার বাড়িত আইলে কি সহজে যাওন লাগে?' : 'তামুক কাইটাই কি দিন কাটাবি, নাহি কিছু খাবি?' হাসলো কথা শুনে নইদা। আস্তে বললো : 'না খাইলেও চলবো।' : 'কি কতা কয় যে!—আনমু? ছাতু গুলাছি, নিয়া আহি?'

'আইচ্ছা।'

খাঁবিরন আবার ঘরে ঢুকলো। একটা থালাতে ছাতু নিয়ে এসে নইদার সামনে ধরলো। খাঁবিরনকে দেখে নইদা তাড়াতাড়ি লুঙ্গি ঠিক করে বসলো। : 'তুমরা বড়লোক মের্দাবাড়ীর মানষ! তুমারে তো ছাতু দেওন যাবো না!' 'খাঁব'—: 'তোমার ছিকান লাগবো না' : 'দেখছো বাই খালি মুখ ঝ্যামটা দেয় : 'আমার নামে কুটনামী করবার নইছস?'—খাঁবিরনের মুখে দুষ্টুমীর হাসি, হাতে এক গেলাস শরবৎ। 'কাদি আজি আছনি!' গলা খাকারি দিতে দিতে কদম মোল্লা বাড়ীর ভিতর ঢুকলো। ঢুকেই খাঁবিরনকে দেখলো হাতে শরবতের গ্লাস মুখে হাসি। সামনে নইদা পাশে আমি। 'ওমা!' বলেই গ্লাসটা মাটিতে রেখেই ঘোমটা টেনে খাঁবিরন ছুটে পালালো। কদমমোল্লা আড় চোখে দেখলো এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো : 'কি মিয়া কি খবর? দিনকাল কেমন চলতোছে।—আজি নাই নাহি? যাইগা পরে আবার আহুমান।' কদম-মোল্লা ফিরে গেল (আজ বুঝি, সেদিন কদমমোল্লার কথায় কিছু একটার ইংগিত ছিল)।

কথায় যে ইংগিত ছিল তা বোঝা গেলো পরের দিন। বিকেল থেকে ফুসুর-ফাসুর। তার মর্মকথা হচ্ছে : নইদা আর খাঁবিরনের সম্পর্কটা বর্তমানে মোটেই আর ভালো লাগছে না। ওদের হাসাহাসি ঢলাঢলি বেপর্দার পরাকাষ্ঠা। 'গেরামের ইজ্জত নিয়া অরা টানা-হ্যাচড়া করতাছে।' কদম-মোল্লা নিশানবয়াতীকে বলেছে। নিশান-বয়াতী কিছুক্ষণ ঝুম মেরে থেকে বলেছে, 'আমার কাছে ও বিষয়ডা ক্যামন যেন লাগতাছে—আমার কাছ থিকা ট্যাহা চাইয়া আনছে পাওনা আছিল অর। হে ট্যাহা নাহি অর মায়েরে দেয় নাই।' 'দিবো আর কারে, ঐ খাঁবিরনরে নোলক কিনা দিছে।' কদমমোল্লা ফোঁড়ন কাটলো।

তবে সে যাই বলুক, কেউই সহজে ফুসুর-ফাসুরগুলো কানে তুলতে চায় না। এর কারণ খাঁবিরন আর নইদার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। কাদি হাজির মেয়ের সঙ্গে নইদার কোনকালে বিয়ে হতে পারে না। তাছাড়াও নইদা সেরকম মানুষই না। ভালমানুষ না হলে প্রত্যেক বাড়ীতে তার জন্য অবাধ দ্বার থাকতো না।

কিন্তু কথা যা ওঠে তাতো থামবার জন্য ওঠে না। ঢেউয়ের মতো পানির গতরে ধাক্কা দিয়ে নতুন নতুন ঢেউয়ের সৃষ্টি করে। তেমনি নইদা খাঁবিরনের প্রসঙ্গটা লতাপাতা ডালপালা গজিয়ে বেড়েই চললো এবং অবশেষে কাদি হাজির কানেও উঠলো।

: 'নইদা অমন পোলাই না। এ্যাদ্দিন থইরা আমাগো বাইত্তে রইছে, আমার চোকে তো কিছু পড়ছো?' স্ত্রীর কথা শুনে গম্ভীর গলায় কাদি হাজি বললো। : 'মানলাম নইদা খাঁবিরনের বাঁচাইছে, মানলাম ভালো পোলা ও। গেরামে থাকন লাগবো—তাই তুমি অরে 'না' কইয়া দিও।'

ওদিকে কিরমানী বেওয়ার কানেও কথাটা ওঠে। কিরমানীকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুললো। সে সিদ্ধান্তও নিয়ে নিলো, এলেই বলবে। নইদাও এলো।

: 'তুই আর কাদি হাজির বাইতে কাম করিস না প্যাদা, নানাজনে নানানকথা শুরু করছে—'

: 'কইগগ্যা, তাতে আমার কি অইবো'—

: 'না, আর এক জায়গার কাম খুঁজ—ওহানে আর যাইবার পারবি না।'

: 'প্যানপ্যানাইও না, খাওন দ্যাও।'

নইদা মায়ের কথায় প্রতিবাদ করলো ঠিকই, কিন্তু চিন্তা যে হলো না তা নয়। নিশানবয়াতীর কাছ থেকে পাওনা পনেরো টাকা এনেছে—নাকের নথ, কানের মাকড়ী, তেলের বোতল ও আলতা কিনেছে। এগুলো দেবে কি করে। না দিলে যে শান্তি পাবে না নইদা। তখনই চললো সে কাদি হাজির বাড়ীর দিকে। সোজা গেলো সে খাঁবিরনের ঘরে। খাঁবিরন তখন কাঁথা সেলাই করছে। নইদাকে দেখে চমকে উঠলো। ভয় পেলো। সুচ সুতো রেখে তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে নামলো।

: 'যে কতা হুনতাছি তাকি হাঁতা?'
'হ্যাঁ, তুই আর আহিস না!'

: 'আমি যে তোমার নগা ত্যাল, আলতা কানের মাকড়ি কিনছি—'
: 'আমি কি করমু?'

: 'বাইত্তে সক্কাগ থাইকো, টোকা দিলে বাইর অইও।'

: 'ক্যাডা কতা কয়রে?' খাঁবিরনের মা এসে উঠলো ঘরে।

: 'ও! নইদা? বাবা! তুমারে একডা কতা কই, তুমি আর আইও না আমাগো বাইত্তে। বুঝোতো, গেরামে থাকতে অইলে সমাজ মাইনা চলন লাগে—নানানজনে নানান-কতা কইতাছে।' নইদা কোন কথার উত্তর না দিয়ে খাঁবিরনের দিকে অর্থপূর্ণ একটা দৃষ্টি ফেলে প্রস্থান করলো।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে, আর নইদাও হাজির হয়েছে কাদি হাজির বাড়ীর পেছনে। নইদা জানে খাঁবিরনের ঘরের পেছনে লেবুগাছের বাগান। খুব আস্তে পা ফেলে ফেলে লেবু গাছের আড়াল দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো নইদা। ঐতো কাদি হাজি আর তার বউ কথা বলছে, ওদের ঘরে। একটা, দুইটা, তিনটা। খাঁবিরন কান খাড়া করলো প্রথমে তারপর দরজা দিয়ে বের হয়ে একটা বদনা হাতে নিলো। একবার তাকালো বাপের ঘরের দিকে তারপর সন্তর্পণে পা ফেলে ঘরের পেছনে গেলো। খাঁবিরনকে—আসতে দেখে আনন্দ আর ত্রাসের উত্তেজনায় নইদার দেহ থির-থির করে কেঁপে উঠতে থাকলো। খাঁবিরন কাছে আসতেই নিজকে সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়লো নইদার পক্ষে। সে কোন কথা উচ্চারণ না করে জাপটিয়ে ধরলো খাঁবিরনকে। আর সংগে সংগে টাল সামলাতে না পেরে কাঁটাসহ লেবু গাছের ডালপালাসহ খাঁবিরন মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়েই সে ভয়ে আর্তচীৎকার দিয়ে উঠল 'মাগো' 'বাবাগো!' চীৎকার শুনে ওর বাবা-মা দৌড়ে এলো। দেখলো লেবুগাছের বাগানে দুজনকে। সংগে সংগে কাদি হাজির মাথায় রক্ত উঠে গেলো। সে নরম খুললো পা থেকে। 'এতবড় আসপদ্দা : আমার মাইয়ারে!—তোকে আইজ আর আস্তো রাহুম না।' বেদম প্রহার শুরু করলো কাদি হাজি। খাঁবিরনকে মাটি থেকে তুলে তার মা ঘরের দিকে নিয়ে গেলো। পেছনে গজরাতে গজরাতে গেল কাদি হাজি। : 'খাঁবিরন!'—: 'উইযে উইযে আবার আইচে হারামজাদা!' : 'খাঁবিরন এই-গুলি তুমি নেও। তোমার জন্য আনছিলাম' : 'তুই দূর হইয়া যা আমার চোখের সামনে থিকা, তরে আমি দ্যাখবার চাই না—তুই আমার শত্রু—তোর জিনিষ তুই নেগা।'

শত্রু! আমি খাঁবিরনের শত্রু! রক্তাক্ত দেহের নইদার হৃদয়টা যেন শুধু এই কথাটাতেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। সে আলতার শিশি, নাকের নথ, কান মাকড়ি ইত্যাদি সহ পা টেনে টেনে কাদি হাজির বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

পরেরদিন সকলে আমরা রেল স্টেশনে। মামাবাড়ী বেড়ানো পর্ব শেষ। তাই আবার আমরা শহরের আস্তানায় চলেছি। হঠাৎ লাইন পাড়ে জটলা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল মনটা। এগিয়ে গেলাম : বিলি কেটে কেটে সামনে এগিয়ে উঁকি দিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নইদার রক্তাক্ত দেহখানা পড়ে রয়েছে। তারই ধার ঘেষে ছড়িয়ে রয়েছে আলতার শিশি, নাকের নথ, কানমাকড়ি।

ট্রেন যখন চলতে শুরু করল তখন তার কামরায় বসে চাকার শব্দের সংগে ধ্বনিত হতে লাগল আমার হৃদপিণ্ডের ধ্বনিও—

'রেলগাড়ী ঝমাঝম
ব্যাঙ চ্যাপ্টা—'

ভারতদর্শন

হেরাসিম লেবেদেফ

(সোভিয়েত ইউনিয়নের চোখে ভারতের চিত্রটি কী? বলা বাহুল্য, তা কিপলিং কিংবা ক্যাথরিন মেয়োর আঁকা চিত্রের মতো নয় অবশ্যই। বস্তুত রুশদেশে ভারতের চিত্রটি সব সময়েই উজ্জ্বল রঙে আঁকা হয়েছে। বহু বিচিত্র সংস্কৃতিসম্ভারে সমৃদ্ধ যে দেশের সভ্যতা একদা এশিয়ার জীবন সংগঠনে বেশ কিছুটা সাহায্য করেছিল এ-চিত্র হল সেই ভারতের।

উপরোক্ত পটভূমিতে সোভিয়েতের জনগণের মধ্যে স্বাধীন ভারতের জনগণের জন্যে বন্ধুত্বের মনোভাব গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল। এ-কারণেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষায়, ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক একটি 'বিশেষ ধরনের' যোগসূত্র।

হেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৯), তাঁর নিজের ভাষায় 'ঝড়ঝঞ্ঝা তুচ্ছকরা' এক 'মুসাফির' ভারত ভ্রমণকারী রুশ পর্যটকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম প্রথম। এই বাংলায় তিনি বারো বছর ছিলেন এবং এদেশে ইয়োরোপীয় নাটকের প্রবর্তন করেছিলেন। যদিও পন্ডিত গবেষক বলে নাম ছিল না তাঁর, তবু তাঁর ভারত সফরের বিস্তৃত বিবরণী সোভিয়েতে বহু পরিচিত। লেবেদেফকে সঠিকভাবেই রুশদেশে ভারতচর্চার আদি প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে। নিচে তাঁর ভারত সফরের বিবরণী থেকে কিছু কিছু কৌতূহলো-দীপক অংশ উদ্ধৃত করা হল।)

পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রীতিনীতি, তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং ওই অঞ্চলের সাধারণে প্রচলিত আচার-আচরণ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার কাজটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য।

কাজটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে পূর্ব ভারত তার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের জন্যে শুধু য়ুরোপ কেন সম্ভবত সারা বিশ্বেরই ঈর্ষার পাত্রী। তাছাড়া এই অঞ্চলটি পৃথিবীর সেই আদিতম স্থান, বহু বিচিত্র লেখকের সাক্ষ্য অনুযায়ী যেখান থেকে মানবজাতি একদিন ভূগোলক জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, এ-কারণে এখানকার জাতীয় ভাষা সংস্কৃতের নিয়মকানুনের সঙ্গে শুধুমাত্র এশিয়ার অনেক ভাষাই নয় বহু য়ুরোপীয় ভাষারও নিয়মের স্পষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

তদুপরি, একদিকে আছে জগৎ দেখার, আমার সহজাত ক্ষমতার বিকাশসাধনের এবং নিজের জন্যে ও আমার দেশবাসীর জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সব জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য আমার নিজস্ব প্রবল আগ্রহ, এবং অপর দিকে মানুষের পক্ষে যা করা অসম্ভব তাকে সম্ভব করে তোলার জন্যে সর্বশক্তিমান ভাগ্যনিয়ন্তার প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ...

...শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ ও পন্ডিতদের তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মণ্য বর্ণমালা, শব্দসম্ভার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র আয়ত্ত করতে সক্ষম হলুম আমি। আরও কিছু কিছু বিষয়ে অল্পস্বল্প শিক্ষালাভে সমর্থ হলুম। ব্রাহ্মণদের পান্ডিত্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের ফলে তাঁদের কাছ থেকে আমি সংস্কৃত ভাষা ও তার দেবনাগরী হরফ এবং যে-প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার জন্ম সেই মাগধী প্রাকৃত সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আহরণে সমর্থ হই। সেই সঙ্গে সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও সাধারণে প্রচলিত রীতিপ্রথা সম্পর্কেও আমার ধারণা জন্মায়।...

দীর্ঘ বারো বছর কলকাতায় বাসকালে যে-সকল তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি নিচে তার বিবরণ দিচ্ছি। আমি মনে করি, জ্ঞান অর্জনে যাঁরা সত্যিকার আগ্রহী এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসু, তাঁরা এই সব তথ্য জেনে আনন্দিত হবেন।

সফরের সূচনায় ও সফর চলাকালে আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের সহজাত শক্তি ও স্বদেশের গৌরব ও সাফল্য বৃদ্ধি করা এবং সেইসঙ্গে যে-দেশের বিষয়ে আলোচনা করছি তার প্রতি ন্যায়বিচারেও কুণ্ঠিত না-হওয়া ...আমি তাই ঠিক করেছি আমার এই গ্রন্থের নামকরণ হবে, পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম, তার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সাধারণে প্রচলিত রীতিপ্রথার নিরপেক্ষ অনুধাবন।...

পূর্বসূরীদের গ্রন্থসমূহে যেমন নানা অসম্পূর্ণতা ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েছে, ঠিক তেমনই ভারতের অধিবাসীদের ধর্মমত ও আচারআচরণ-বিষয়ে পন্ডিত গবেষকরা সম্ভবত আমার এই গ্রন্থেও বহু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করবেন সন্দেহ নেই। এ জন্যে সকলের আমি ক্ষমাপ্রার্থী......

ঈশ্বরের কৃপায় যদি অকালে আমার মৃত্যু না ঘটে এবং শিল্পীদের কাছ থেকে যে-ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম সে-রকম বাধা-বিপত্তি যদি অপসারিত হয় তবে দেশের অনুগত নাগরিক হিসেবে আমার কর্তব্য হবে শুধুই পূর্বোল্লিখিত কলকাতার বিশুদ্ধ ও মিশ্র কথ্যবুলির ব্যাকরণ লিখে প্রকাশ করাই নয়, সেইসঙ্গে বাংলাভাষার একখানি ব্যাকরণ, একটি অভিধান ও পাটিগণিত-গ্রন্থ এবং কয়েকখানি নাটক আমার রুশ ভাষায় এবং ভারতীয় নানা ভাষায় ছেপে প্রকাশ করা।

ভারতীয় রীতিপ্রথা-বিষয়ে

আগে যা বলেছি আশা করি তা থেকে এটা যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে যে ভারতীয়রা মোটেই বর্বর হিসেবে চিত্রিত হতে পারেন না, বরং উল্টো, যারা তাঁদের প্রতি হিংস্রতম বন্য জন্তুর চেয়েও নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকে তাদেরই ভারতীয়রা উপরোক্ত নামে ডাকার অধিক অধিকারী।

ভারতীয়দের প্রতিমা-উপাসকও বলা চলে না, বরং তাঁরাই যে-সব উদ্ধত বিদেশী তাঁদের দেশে এসে অপরিসীম সম্পদলালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশকে-দেশ গ্রাস করে নেয় ও মানবজাতির অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কারক হয় তাদেরই ওই নামে অভিহিত করে থাকেন।

ভারতীয়রাই সত্যিকার একেশ্বর-বিশ্বাসী এবং বহু বহু য়ুরোপীয় জাতির চেয়েও আগে থেকে সত্যিকার খৃস্টীয় ধর্মানুশাসন প্রতিপালন করে আসছেন। তবে তফাৎ শুধু এইটুকু যে তাঁদের সমাজে এখনও কিছু কিছু অখৃস্টীয় কুসংস্কার ইত্যাদি টিকে আছে এবং এই পশ্চাদপদতায় তাঁরাই দুনিয়ায় একমাত্র জাতি নন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভারতে যুগ যুগ ধরে অনবরত বিদেশী শত্রুর আক্রমণ সে-দেশের মানুষকে যেন ঘাড় ধরে বাধ্য করেছে মনুষ্যত্ববোধটুকু বিস্মৃত হতে।

অবশ্য সর্বপ্রকার স্বৈরশাসন ও উৎপীড়নের শিকার হয়েও, সকল প্রলোভনের মুখোমুখি থেকেও, তাঁরা নিজ ধর্মবিশ্বাসে ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে অচলা নিষ্ঠা বজায় রাখতে পেরেছেন। এদিক থেকে তাঁরা অন্যান্য জাতির অনুকরণের যোগ্য।

ভারতের রূপকাশ্রিত দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি বিদেশী আগন্তুকদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। মূল সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকায় তাঁরা ওই মূর্তিগুলির তাৎপর্য ধরতে পারেন না ঠিকই। কিন্তু আমার তো মনে হয়, এ-ব্যাপারে ভারতীয়দেরই বেশি অধিকার আছে আগন্তুকদের বিদ্রূপ করার, কারণ বিদেশীরা নিজেদের ধর্মমত সম্পর্কে অহংকার প্রকাশ করা সত্ত্বেও ভুলে যান যে স্বয়ং মানবত্রাতা যীশুখ্রীষ্টই নীতিগর্ভ

সোভিয়েত-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে।

রূপককাহিনীর মধ্যে দিয়ে তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন।

ভারতীয়রা যখন কোনো কথা রাখার কিংবা কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করাকে পবিত্র কর্তব্য জ্ঞান করেন এবং নিজ সম্মান, সুনাম এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে তোলেন তবু শপথ ভাঙেন না। এর প্রমাণ আমি আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই দিতে পারি।...

ভারতীয় পিতামাতা সন্তানদের ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে বেড়ে উঠতে দেয়াকে পরম লজ্জার ব্যাপার জ্ঞান করেন। লেখাপড়া শেখার বয়স হলে একটুও সময় নষ্ট না করে তাঁরা সন্তানদের টোলে-পাঠশালায় পাঠিয়ে থাকেন। এইসব টোল-পাঠশালা চতুষ্পাঠী সেদেশে কোথাও কোথাও সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত, তবে বেশির ভাগই পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। এবং শুধু শহরেই নয়, গ্রামে গ্রামে এই ধরনের অজস্র শিক্ষাকেন্দ্র দেখতে পাওয়া যায়।

শিশু ও বালকেরা সেদেশে কঠিন শাস্তির ভয়ে পিতামাতার প্রতি বাধ্যতা ও সম্মান প্রদর্শনের সীমা লঙ্ঘনে সাহস করে না।

...রক্তপাতের সঙ্গে অধিকাংশ ভারতীয়ের সম্পর্ক এতই সুদূর যে তাঁরা শুধু জীবজন্তুই নয়, সরীসৃপ ও পোকামাকড় পর্যন্ত মারাকে পাপ গণ্য করেন। এ-কারণে

মাঝে মাঝে কোনো কোনো নির্বোধ তাঁরা কখনও মাছমাংস খান না, মাটি থেকে জাত তরিতরকারি ও ফলেই তৃপ্ত থাকেন।

কিন্তু যে য়ুরোপীয়রা তাঁদের উপর অধিকার কায়েম করেছে তারা অধিকাংশ ভারতীয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের দিয়ে মাংসের ব্যবসা প্রচলনের চেষ্টা করছে। সত্যি বলতে কি, য়ুরোপীয়রা ইতিমধ্যেই একটা কসাইখানার পত্তন করেছে। তবে এই কসাইখানায় এখনও পর্যন্ত হিন্দুরা কাজ করেন না, এটা কেবলমাত্র মুসলমান ও অচ্ছুতদের দিয়ে পরিচালিত। এর উদ্দেশ্য হল, ভারতীয়দের য়ুরোপীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তোলা। তবে এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক কাজকর্মের ফলে প্রায়শই জীবনযাত্রায় ঐক্য গড়ে তোলার বদলে হতাশা ও গোলযোগেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ভারতের অধিবাসীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে বড় বেশি অভ্যস্ত। তাঁরা খেতে বসার আগে ও পরে ভালো করে হাত-পা ধুয়ে থাকেন এবং প্রতিদিন দুবার গঙ্গাস্নান করেন।

ভারতীয়রা মদ্যপানকে ভীষণ ঘৃণা করেন। তাঁরা ভোদকা জাতীয় মদ তো খানই না, এমন কি আঙুরের রস থেকে তৈরি মিঠে আসবও স্পর্শ করেন না। একমাত্র 'গাঁরি' নামে পরিচিত অন্ত্যজ অচ্ছুতরাই মদ খেয়ে থাকে।

যে-সব য়ুরোপীয় ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে তারা এটা জানে। তাই তাদের জাহাজে ভারতীয় লস্কর নিযুক্ত করার দরকার পড়লে তারা আড়কাঠিদের নির্দেশ দেয় যে তারা যেন ভারতীয়দের তামাক খাবার সময় এই উগ্র পানীয়ও প্রচুর পরিমাণে পান করায়। মদ্যপান করালে ভারতীয়েরা যেহেতু অস্বাভাবিক উচ্ছল ও ও কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন, তাই তখন তাঁদের পক্ষে ক্ষতিকর নানা কাজকর্মও তাঁদের দিয়ে করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়।...

খাঁটি ভারতীয়রা বিবাহবন্ধনকে পবিত্র জ্ঞান করেন...বাড়িতে কোনো অপরিচিত লোক এলে কোনো মহিলা বা বালিকা তাঁর সঙ্গে কখনও এক ঘরে থাকেন না, অপরিচিত ব্যক্তি আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পাশের ঘরে চলে যান...তবে এ-সব কিছু সত্ত্বেও সেদেশে অনেক মুক্তদ্বার-গৃহ (বেশ্যালয়) আছে এবং বিশেষ করে যে-সব জায়গায় বিদেশীরা যাতায়াত করে সেই সব স্থানেই এগুলির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি...

আগেই বলেছি, ভারতীয়রা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিবেকবুদ্ধির অধিকারী এবং ন্যায়-বিচার ও আনুগত্যে অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠাবান। তবে তাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে যুক্ত বিদেশীদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা পেয়ে ও শিখে বিদেশীকে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিতেও কার্পণ্য করেন না তাঁরা।

তাঁরা অন্যের জিনিস চুরি করতে অভ্যস্ত নন। অন্য কোনো জাতিকে ঈর্ষা করারও প্রয়োজন পড়ে না তাঁদের।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে পদ, মর্যাদা, উপাধি ইত্যাদির তারতম্য লক্ষ্য করার মতো। এটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে ভারতের প্রতিটি বর্ণ বিশেষ একেকটি বৃত্তিজীবী। ওই বর্ণভুক্ত মানুষেরা স্বেচ্ছায় কখনও তাঁদের পেশায় পরিবর্তন ঘটান না। এক বৃত্তি বা পেশার মানুষ কখনও অন্য বৃত্তি অবলম্বন করেন না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল প্রাচীন ভারতের সেই দাস-সম্প্রদায়, যারা বর্তমানে 'গাঁরি' নামে পরিচিত স্বাধীন কিন্তু অন্ত্যজ জাতি বলে গণ্য। এই অন্ত্যজরা বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠী থেকে যে উৎপন্ন হয়েছে তা নয়। এরা কিছু কিছু ভারতীয় অভিযানের ফল-স্বরূপ বিদেশাগত বন্দী কিংবা নির্বাসিতের বংশ থেকে উদ্ভূত।

ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান হল, পঞ্চ-অভিষেক বা উপনয়ন। ব্রাহ্মণ বালকদের বারো বছর বয়সে, চান্দ্র-বর্ষে বৃহস্পতি গ্রহের প্রাথমিক বিবর্তনের স্মৃতিতে, এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আমাদের বেলায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদান উৎসব যা, ওঁদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উৎসব ঠিক তাই।

উপরোক্ত পঞ্চ-অভিষেকের [illegible] অনুসারী 'মন্দির' নামে অভিহিত প্রত্যেক ভারতীয় গির্জার অধীনে [illegible] ঈশ্বরের পাঁচ শ্রেণীর ভক্তমণ্ডলী আছে। এই পাঁচটি শ্রেণীর প্রত্যেকে [illegible] পঞ্চ-অভিষেক উৎসব সম্পাদনে [illegible] নিজ স্বতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের জন্যে [illegible]।

গঙ্গানদীতে স্নান এই সব আধ্যাত্মিক অভিষেক উৎসবের একটি অঙ্গ। কতগুলি বিশেষ মন্ত্রপাঠের সঙ্গে এই স্নানপর্ব সারা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, অগ্নি ও আত্মা থেকে যার সৃষ্টি হয়নি সে ব্যক্তি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকারী নয়।

বারো বছর বয়সের আগে ভারতীয় বালকবালিকাদের বিবাহাদি হয় না। বিবাহ-কালে ব্রাহ্মণ-সন্তানদের এই মর্মে মন্ত্রপাঠ করে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয় যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছে সর্বপ্রকারে দায়িত্ববদ্ধ থাকবেন। প্রচলিত ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বিবাহকালে তাঁরা ঈশ্বরের কাছে উর্বরা-শক্তি, পারস্পরিক সমন্বয় ও সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে থাকেন। কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে তা তাদের পিতামাতারা সন্তানদের ছ-বছর বয়সেই স্থির করে রাখেন, একমাত্র অদৃষ্টপূর্ব কোনো অঘটন কিংবা স্পষ্ট আইনগত বাধা না থাকলে পিতা-মাতাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কখনও কোনো নড়চড় হয় না।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ১৬ ॥

কথাটা সহজভাবেই বলেছিল শিবু, হেমন্তর ওপর যে এতখানি প্রতিক্রিয়া হবে তা ভাবেনি।

যার চেহারা খারাপ হয়ে যায়, স্বাস্থ্য ভাঙে, সে নিজে বুঝতে পারে না ঠিক কতটা খারাপ দেখতে হয়েছে তাকে। আয়নায় মুখ দেখার সময় হয়ত একটু চমকে ওঠে—কিন্তু অন্য সময় অভিজ্ঞতাটা অত মনে থাকে না। সে নিজের চোখ দিয়ে যখন আর সবাইকে দেখে, দেখে তাদের চিনতে পারে—তখন আশা করে যে, তাকে দেখেও সবাই চিনবে, কেন চিনতে পারবে না!

শিবুরও সেই অবস্থা। হেমন্তর যে তাকে চিনতে পারার কোন অসুবিধা আছে—তা ওর মাথাতেই যায়নি। সে সাধারণভাবেই কথাটা বলেছিল, দিদি ওকে দেখে খুশী হবে, বড়জোর এতদিন ডুব মারার জন্যে তিরস্কার করবে—এই ধরনের সব প্রতিক্রিয়ার কথাই ভেবেছিল। এমন স্তম্ভিত অবস্থা হবে, এতটা সশঙ্ক বিস্ময় বোধ করবে তা ভাবেনি। কে জানে, হয়ত হেমন্তর এই বিহ্বল দৃষ্টিতে নিজের অবস্থাটা সম্বন্ধেই নতুন করে সচেতন হয়ে উঠে সেও আঘাত পেল একটা। আস্তে আস্তে বললে, 'কী হল? ভূত দেখলি নাকি?'

তাতেও, তখনই উত্তর দিতে পারল না হেমন্ত। তারপর সেও গাঢ় ধীরকণ্ঠে—এখন তার পক্ষে এতখানি হৃদয়াবেগও কতকটা অস্বাভাবিক—বলল, 'না, ভূত তো শুনেছি মানুষের দেহ ধরেই আসে। চিনতে কোন অসুবিধে হয় না। আমি ভাবছি অন্য কেউ। তোমার মধ্যে শিবুর চেহারার মিল কিছু আছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করছি।'

শিবু হেসে বলল, 'ভাবছিস অন্য কেউ এসে শিবুর পরিচয় দিয়ে এদের আদরযত্ন খাচ্ছে কিনা?...তা একরকম তাই বটে। যে শিবুকে তুই চিনতিস—মানে ওদিকে কদিন দেখেছিলি—সে শিবু আমি নই। এই দু-তিন বছরের মধ্যে কোন নেশা করিনি—শুনলে অবাক হয়ে যাবি!'

ততক্ষণে নিতার শাশুড়ি ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি একটা শতরঞ্জি এনে পেতে দিয়েছে। বসে পড়তে পেয়ে যেন বেঁচে গেল হেমন্ত। পায়ের জোরটা হঠাৎ আশ্চর্যরকমভাবে কমে গেছে তার, দাঁড়িয়ে থাকার বা চলার ক্ষমতা নেই। এখনও যে মনের মধ্যে এতখানি উদ্বেগ আর আবেগ আছে কারও জন্য। ওর পক্ষে এতখানি বিচলিত হওয়া সম্ভব, তা কিছুক্ষণ আগেও ভাবতে পারত না সে। সেই আবেগেই আরও এই দুর্বলতা বোধ করছে—বুকের মধ্যেটা হঠাৎ যেন খালি হয়ে গেছে।

এতখানি বয়সে অনেক দেখল সে। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। এই যে অকালবৃদ্ধ লোকটি তার সামনে বসে হাসবার চেষ্টা করছে—যে হাসির চেষ্টায় ওর অস্বাস্থ্যবিকৃত মুখটা বিকৃততরই হয়ে উঠছে শুধু—মানুষের মুখের যে হাসি অধিকাংশ সময় দর্শকদের মনে আনন্দ বা কৌতুকের প্রতিধ্বনি জাগায়, এ সে হাসি নয়, এ হাসি দেখলে বুকের মধ্যেটাও কেমন যেন গুর-গুর করে ওঠে—ওকে যতই যত্ন করা হোক, যতই চিকিৎসা করানো হোক। এ আর বেশী দিন বাঁচবে না। এই জীবনচঞ্চলা পৃথিবীতে এর অবস্থিতির কাল সীমিত হয়ে এসেছে, এর পরমায়ু তার নির্দিষ্ট পরিমাণের শেষ প্রান্তে পেঁাচেছে। সেটা বুঝেই হঠাৎ এমন দুর্বল, অসহায় বোধ করছে।

অনেকক্ষণ পরে অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে শিবুই আবার প্রশ্ন করল, 'কী দেখছ অমন অবাক হয়ে? ভয় পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে?...বাঁচব না বেশীদিন আর—এই তো?...তা এতে আর ভয় পাবারই বা কি আছে, অবাক হবারই বা কি কারণ?... কেনই বা বাঁচব? বাঁচার জন্যে যা করা দরকার কিছুই তো করিনি কোনদিন। এখন হঠাৎ বাঁচতে চাইলে চলবেই বা কেন? আর সত্যি কথা বলতে কি, আমার বাঁচার কোন অধিকারও নেই আর—চলে যাওয়াই উচিত। মিছিমিছি, যতদিন বাঁচব নিজের ভোগান্তি, পরকেও বিব্রত জ্বালাতন করা। খেটেখুটে নিজের ভাত নিজে রোজগার করে খাওয়ার মতো অবস্থা আর কোনদিনই হবে না। আমি গেলে এই ভাতটা অন্য একটা লোকের কাজে লাগবে—যার প্রাণের দাম আছে।'

আবারও হাসে সে, কথা শেষ করে।

অর্থাৎ হাসির ভঙ্গীতে মুখটা বিকৃত হয় আর একবার।

এতক্ষণে ভাল করে তাকাতে পেরেছে হেমন্ত। সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে কিছুক্ষণ—নরদেহের পরিহাস—ঐ শরীরটার দিকে চাইতে। লোকে উপমা দেয় প্রেতের মতো। কিন্তু প্রেত কেউ দেখেনি, সে যে ভয়ঙ্কর হবেই তার কোন মানে নেই। মানুষের মূর্তি ধরে যদি আসে তো তাকে মানুষের মতোই দেখতে হবে। এ মানুষের মতো নয়। এর দিকে চাইলে ভয় হয়, বুকের মধ্যে কেমন করে।

রঙটা আগেই তামাটে হয়ে গিয়েছিল—এখন রীতিমতো কালো। দেহে মাংস বলতে কিছু নেই, কঙ্কালের ওপর একটা চামড়া ঢাকা শুধু: সে-চামড়াও কুঁচকে কেমন শিথিল হয়ে গিয়েছে, খড়ি-ওড়া-ওড়া খসখসে বহুদিনের মৃত পশুর চামড়ার মতো নির্জীব—তেল রাখায় যে চামড়ায় কুপি হয়—অনেকটা সেইরকম।

চোখের কোণে সর্বদা একটা জলের আভাস, অশীতিপর বৃদ্ধদের যেমন হয়—তাও সকলের না। সে জল ঝরে পড়ে না—টলটল করে। কাপড়ে মুছলেও সংগে সংগে আবার ভরে যায়। দাঁত বেশির ভাগই পড়ে গেছে—যা গোটা-দুই-তিন আছে, তার জন্যে মুখটা আরও বীভৎস দেখায়।

হেমন্ত সেদিকে চেয়ে থেকেই তেমনি ধরা-ধরা গলায় বলল, 'এমন দশা হয়েছিল, তা আমার কাছেও তো যেতে পারতিস! তোকে তো কোনদিন আমি যেতে বারণ করিনি, দূর ছাইও করিনি!'

'সেইজন্যেই তো যাওযা যায় না ভাই। কখনও কিছু দিতে পারলুম না—ভক্তি-ছেদ্দা ভালবাসা তো চুলোয় যাক—কোনদিন খোঁজটা পর্যন্ত করলুম না, এতটুকু উপকারে লাগলুম না জীবনে—দেখা হওয়ার পরও নিজের দরকার ছাড়া কখনও খবর-টুকুও নিলুম না। আমাদের বংশের দ্বারাই তোমার কোন উপকার হল না কখনও। এখন নিজের দোষে নিজের শরীর নষ্ট করে গিয়ে তোমার ঘাড়ে চাপব কোন্ আক্কেলে। সেটুকু বোধ তখনও ছিল—যতটা অমানুষ হলে লোক এসব বিবেচনা হারায় অতটা বোধহয় হতে পারিনি।...এই তাই দাদার ওপরও বোঝা হয়ে চাপার ইচ্ছে ছিল না—বারবার বলেছি যে, হাসপাতালে ফেলে দিয়ে এসো। পালাবার ক্ষামতা থাকলে কোথাও কোন দূরে দেশে গিয়ে পথের ধারে পড়ে থাকতুম। আমার কোন পাওনা নেই কারও কাছে—তা আমি বেশ জানি, শুধু শুধু চাইবই বা কেন নেবোই বা কেন?...দাদা-বৌদি চিরকালের বোকা—তাই ছাড়ল না। আর তেমনি কাঠ বোকা এই ছুঁড়িটাও, ঘাটের মড়াকে এনে ঘরে তুলল। মাঝখান থেকে বেয়াইবেয়ান নাজেহাল—শুধু শুধু কতকগুলো খরচান্ত!'

নিতা এবার ধমক দিয়ে উঠল, 'আমাও দিকি বাপু একটু—তোমার বগবগানি! একটা খেই পেলে কি অমনি বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল। য্যাদ্দিনে এই প্রথম পিসীকে পেলুম—একটু আলাপ-পরিচয় করি, একটু চা-জলখাবার খাক—নিরম্বু টাঙিয়ে আছে এত বেলা অব্দি—তা নয়, আপনার কথাই পাঁচ কাহন!'

স্নেহ-করুণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে শিবু বললে, 'দাদার চাইতেও বোকা হয়েছে এ-মেয়েটা—আইরি বলছি দিদি।...পাগল একটা। আস্ত পাগল! ওর এখনও আশা আমাকে বাঁচিয়ে ভাল করে তুলবে। আবার আমি আগের মতো বেপরোয়া নেশাভাঙ করে হল্লা হল্লা করে ঘুরে বেড়াবো।...আচ্ছা, আচ্ছা, এই চুপ করলুম। দে, কি দিবি দে—ওদের খেতেটেতে। মিষ্টি পেসাদ এনে-ছিস কিছু? আমাকেও একটু দিস তাহলে!'

নিতা জলখাবার সাজাতে সাজাতে ঘর থেকেই বলল, 'কিছুতে রুচি নেই, একটা কিছু যদি মুখে তুলবে! কৌভাগ্যি—বাবার প্রেসাদ আসে—তাই একগাল একগাল যায় কোন কোন দিন—নুন-ঝাল কম বলেই মহা-প্রেসাদে একটু যা হোক আর ঐ প্রেসাদী মিষ্টিও—এমনি রসগোল্লা সন্দেশ কিছু খাবে না। জগন্নাথের ভোগের মিষ্টি নরম যা—তাই একটু-আধটু।'

'প্রাচিত্তির করছি রে—প্রাচিত্তির। পরমহংস না কে যেন বলেছে জগন্নাথের পেসাদে মহাপাতক কেটে যায়—আর জন্মাতে হয় না।...অনেক অনাচার অনেক পাতক জমা আছে, সেইটেই ক্ষ্যায় করে নিচ্ছি—যাতে মরার সময় নিভ্‌ভয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে যেতে পারি!'

বলতে বলতে—ওদিকে থেকে কড়া শাসানির ভয়েই বোধহয় চুপ করে গেল। নিতা এতক্ষণে তালপাতার ঠুঙ্গিতে করে মিষ্টি প্রসাদ সাজিয়ে এনে হাত দিয়ে জায়গাটা মুছে হেমন্ত নিমাই আর শিবুর সামনে দিয়েছে। গুরুদাসবাবুর জন্যে ভেতরে ব্যবস্থা। তাঁর স্ত্রী অল্প তো একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে একঘটি জল খেয়ে—একখানা পাখা হাতে করে ওদের সামনে এসে বসলেন। হাওয়া করার দরকার নেই—হু-হু করে ঝড়ের মতো বইছে সমুদ্রের হাওয়া—এটা শুধুই অভ্যাস, সৌজন্য রক্ষার অংগ একটা।

খাবার নামাতে নামাতে কৈফিয়ৎ দিল নিতা, 'মাছ খাওয়া বাসনে মহাপ্রসাদ দিতে নাই—এখানে আর পুজোর বাসন কোথায় পাব—তাই তালপাতার এই বাটিই আনিয়ে রেখেছি। বাবা অন্নপ্রসাদ খান পাতায়।'

'তুমি নিলে না? বেয়ান—?' হেমন্ত প্রশ্ন করে।

নিতার আগে বেয়ানই উত্তর দেন, 'আপনাদের হোক তারপর আমরা শাশুড়ি-বৌ খাব নিশ্চিন্ত হয়ে। নইলে—আমাকে খাওয়াবার দায় না থাকলে ও যা বৌটি, আমার দাঁতে কুটো কাটবে না। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসে যাবে। মন পড়ে আছে ওর সেইখানেই। উনুন ধরে গেছে তো। ছোট বেয়াই উনুনে ধরিয়ে রেখে দেন যে—ফেরার সময় আন্দাজ করে।'

এমনি টুকরো টাকরা কথাবার্তা—প্রীতির ছোট ছোট আদান-প্রদান। হেমন্তর বুকটা ভরে যায়। সেই সংগে কোথায় যেন একটু দুঃখও অনুভব করে, অতৃপ্ত তৃষ্ণার বেদনা একটা। এদের সে-ই পর করে দিয়েছে, দিয়ে পাজীর বংশ ওর শ্বশুর-বাড়ির ঝাড় এনে পুষছে—অকৃতজ্ঞ বেইমান অমানুষের ঝাড়।...যা হবে না, হবার নয়—সেই ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা তার।...

এরাই ওর আপন হতে পারত। এই মেয়েকে আপন মেয়ের মতোই কাছে রেখে মানুষ করতে পারত। মেয়ের মতোই দেখত শুনত। ঐ ফুটফুটে ছেলেমেয়ে-দুটোকে দিয়ে নাতি-নাতনীর অভাব মিটত।

আবার পরক্ষণেই শিউরে ওঠে মনে মনে।

দরকার নেই, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। তার যা অভাগা কপাল, ভাল কিছু সইত না। এদের মানুষ করতে গেলে, এরাও বাঁচত না হয়ত। সংসার পাতা তার কপালে লেখেননি ভগবান, হুতাশনী মেয়েমানুষ সে, যেদিকে চাইবে জ্বলে-পুড়েই যাবে।

তন্ময় হয়েই ভাবছিল কথাগুলো, মন চলে গিয়েছিল কোন্ সুদূরে—নিজের অতীত জীবনের অগণিত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে—হঠাৎ কানে গেল নিতার শাশুড়ি বললেন, 'আপনি কবে আসছেন আমাদের ওখানে তাই বলেন। চলেন না কেন এই যাত্রাই আমাদের সাথে। বেশ আনন্দ করতে করতে যাওয়া যাইব।'

যেন চমকে ঘুম ভাঙ্গল হেমন্তর।

'আপনাদের ওখানে? যাব বৈকি। নিশ্চয়ই যাবো। তবে এ যাত্রায় হবে না ভাই। আপনাদের ওখানে যাব যখন বেশ কিছুদিন থাকব, নিশ্চিন্ত হয়ে আপনাদের আদরযত্ন খাবো।'

আস্তে, আস্তে, দন্তবিরল মুখে পাকলে পাকলে খাচ্ছিল শিবু, খাওয়া শেষ করে প্রসাদের হাত মাথায় মুছে বলল, 'উঁহু, উঁহু— এখন না দিদি, বলে রাখলুম। যখন ঠেকবি, শরীর ভাঙবে দেখার কেউ লোক থাকবে না—তখন একে-বারে গিয়ে আশ্রয় নিস্। স্বচ্ছন্দে—কিছু ভাবিসনি, কোন সংকোচ করিসনি। তোরও তো কেউ নেই, মরণকালে দেখার কি কেবা করার, এই মেয়ের কাছেই যাস—মাথায় করে রাখবে। ওকে ভগবান ঐ একরকম করে তৈরী করেছেন, ওর ওপর যা খুশি, যত খুশি বোঝা চাপানো যায়—এতটুকু 'কিন্তু' হওয়ার দরকার নেই।...তেমনি গিয়ে পড়েওছে—যেমন আমার জামাইটি, তেমনিই বেয়াই বেয়ান। বৌ যদি দুনিয়ার সমস্ত হাঘরে, ভবঘুরে বাউণ্ডুলে খাইয়ে যথা, সব্বস্ব উড়িয়ে দেয়—তাও কিছু বলবে না। বলবে,

বেশ করেছ বৌমা, বেশ করেছ। ভালই তো। ভাল বুঝেছ করেছ। তোমারই তো সব মা —আমাদের জিজ্ঞেস করার কোন দরকার নেই। আর তুমি তো কোন অন্যায় করছ না। কুণ্ঠিত হওয়ারই বা কী আছে এতে?'

'দ্যাখো দ্যাখো, কথার ছিরি দ্যাখো ছোট্‌কার।' নিতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'কোথাই কিছু নেই মরণকালের কথা টেনে আনল! কবে মরণকাল ঘনাবে, অক্ষ্যাম হয়ে পড়বে—তবে পিসী যাবে ভাইঝির বাড়ি বেড়াতে।...কেন এমনি বুঝি যেতে নেই, দরকার না পড়লে? বেশ তো, এখন থেকে গিয়েই তো থাকলে পারে— আর কলকাতায় পড়ে থাকার দরকারটা কি?'

বেলা হয়েছে এই অজুহাতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হেমন্ত।

কতকটা যেন নিজেকে টেনেছিঁড়ে নিয়েই উঠতে হয়। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে নেশা লেগে যাবে। তাছাড়াও, সে না যাওয়া পর্যন্ত মেয়েটা রান্নাঘরে যেতে পারছে না, মনে মনে হাঁনটান করছে। রান্না এখনো চাপাতে পারল না, ছেলেমেয়েগুলো রোগীর হয়ত দেরি হয়ে যাবে খেতে।

টেনেছিঁড়ে চলে গেল বটে কিন্তু দূরে থাকতেও পারল না। এরপর, যে কদিন নিতারা রইল এই বাড়ি এই বারান্দা যেন অমোঘ আকর্ষণে টানতে লাগল। শান্তির সংসারটাই যেন তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। দেখে দেখে ওই যেন সাধ মেটে না।

রোগা মৃত্যুপথযাত্রী ভাইটাও তার একটা আকর্ষণ। এমন করে কাছে কখনও পায়নি। ওর মনটা যে এত ভাল, এত কোমল তাও দেখেনি এর আগে। কোমল বলে, মানুষের প্রতি অবিচারে ক্ষুণ্ণ বলেই —আরও ওর বাবার আচরণে, দাদার মৃত্যুতে, ওদের পরনির্ভরতার চেহারা দেখে —নিদারুণ অভিমানেই সে নিজেকে অমন-ভাবে নষ্ট করেছে। ভালবাসে সবাইকে— কারুও ভাল করতে না পেরে নিজের ভালর পথটা বন্ধ করেছে।

অনেক কথা ওর মুখ থেকে শোনে হেমন্ত। বোনদের কথা তাদের ইতিহাস, বাবার কথা—বাবা নাকি বৃদ্ধ বয়সে আর একটা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, এক শিষ্যকে আদেশ করেছিলেন তার কন্যাকে দান করতে। নিহাৎ সে শিষ্যর মেয়ে গলায় দড়ি দিতে চেয়েছিল, আর শিবু রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল বলেই পেরে ওঠেননি। তারপর আর বেশী দিন বাঁচেননি অবশ্য।

আরও অনেক খবর পায় সে আস্তে আস্তে।

নিতার ইতিহাসটাই তো অবিশ্বাস্য এক কাহিনী। নিতা নাকি ওর দাদার আপন মেয়ে নয়। ওদের এক পিসতুতো দাদা থাকতেন ভাটপাড়ায়—তাঁকে দেখেছে হেমন্তও ছেলেবেলায়। ছায়ার মতো মনে আছে, রামধন ভটচায নাম আপন পিসতুতো ভাই ওদের—তাঁরা নাকি এক চৈত্র মাসে সপরিবারে তারকেশ্বরে গিয়েছিলেন কী মানসিকের দণ্ড খাটতে। সেখানেই কি অনিয়ম হয়ে থাকবে—ফিরেই ওলাউঠো হয় —এশিয়াটিক কলেরা যাকে বলে— একদিনে স্বামী-স্ত্রী, বড় ছেলে, এক বিধবা দিদি —সব শেষ। শুধু বেঁচে ছিল ঐ নিতাই। ছ'মাসের শিশু, মুখে জল দেবার কেউ নেই, কলেরার ভয়ে তাকেও কেউ ঘরে আনতে পারেনি।...খবর পেয়ে বাদলই ছুটে যায়, মেয়েটাকে নিয়ে চলে আসে। এতেও তাদের পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন, মন্দ-ভাগ্য মেয়েকে বাড়িতে রাখলে সকলের অমঙ্গল হবে—অনাথ আশ্রমে দিতে বলে-ছিলেন। কিন্তু এই একটা আদেশ তাঁর কিছুতেই শোনেনি বাদল—নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছে নিতাকে। নিতা এখনও ওদেরই মা-বাবা বলে জানে, ওরাও তাকে নিজের মেয়ে মনে করে— বোধহয় আর কেউই এখনও জানে না যে নিতা বাদলের আপন মেয়ে নয়।

বাদলের খবরও পায় কিছু কিছু। বলতে চায় না শিবু, হেমন্তর অনুগ্রহের দান তাকে নিতে হয়—সেটা ওর আজও পছন্দ নয়। শুধু অতিকষ্টে এইটুকু জানতে পারে যে ওদেরই এক শিষ্যবংশ কিছু জমিজমা দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রামে বসত করিয়েছে, এখন সেখানেই আছে তারা, কোনমতে দিন চলে যাচ্ছে। একটি ছেলে, লেখাপড়া তেমন না শিখলেও কোনমতে রেলে একটা চাকরি যোগাড় করেছে—বিহারের দিকে কোথায় সাহেবগঞ্জ না কোথায় থাকে, তার বিয়েথাও হয়ে গেছে। সে সেইখানেই থাকে। ছোট ছেলেটিই চাষ-বাস দেখে, এখনও একটি অবিবাহিতা বোন আছে, তার বিয়ে না হলে সে বিয়ে করবে না।

সসঙ্কোচেই দেয় খবরটা, খবর দিয়েও শিবু বলে, 'একটা কথা বলব দিদি? ওদের দিন চলে যাচ্ছে, এতকাল যেভাবে কেটেছে, সেইভাবেই কেটে যাবে। তুই আর ওদের সাহায্য করার চেষ্টা করিসনি। ও ছেলেটাও হয়ত তাহলে অমানুষ হয়ে যাবে। খেটে খেতেই শিখুক, সে-ই ঢের সম্মানের। ঢের সুখের।'

এ-কথার কোন উত্তর দেয়নি হেমন্ত, কোন প্রতিবাদও জানাতে পারেনি।

হেমন্তর খুব ইচ্ছে ছিল ওদের সকলকে রেঁধে খাওয়ায়। কিন্তু গুরুদাস-বাবু তো প্রসাদ ছাড়া কিছু খাবেনই না, নিতার শাশুড়ীকেও বলতে ভরসা হল না। জেনে-শুনে ওর এই হাতের জল খাওয়াবে না সে। আজ ও'রা সম্পূর্ণ পরিচয় জানেন না ওর, একদিন হয়ত জানতে পারবেন—সেদিন ক্ষুণ্ণ হবেন, নিতাকেও দু-দশ কথা শোনাবেন। একদিন একবেলা খাওয়াতে গিয়ে নিতার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য লাঞ্ছনার কারণ হতে পারবে না সে।

তাই শুধু নিতা আর ছেলে-মেয়েদেরই খেতে বলল, সেই সঙ্গে শিবুকেও। শিবু অবশ্য কিছুই খায় না প্রায়—খাওয়ার উপায়ও নেই—পায়েসটাই যা একটু তৃপ্তি করে খেল। শিবুকে দু-একটা দিন রাখতে চেয়েছিল নিজের কাছে, শিবু রাজী হল না।

বলল, 'ওদের বাড়ী ওদের আশ্রয় সয়ে গেছে। ঐখানেই বেশ থাকি, শান্তি পাই।... এখন থাক, যদি সত্যি সত্যিই কোন দিন ঐ আবাগীর ইচ্ছেটা ফলে—একটু অন্তত উঠে-হেঁটে বেড়াবার মতো জোর পাই— সেদিন কলকাতায় এসে তোর বাড়ীই উঠব, কিছু দিন থাকব বরং। এখন না। ছেলে-মেয়ে দুটোও ভারী বন্ধন হয়েছে আমার— ওদের ফেলে থাকতেও পারি না কোথায় গিয়ে। ওরাও আবার—যতই ন্যাওটা হোক, মাকে ফেলে থাকতে পারবে না।'

আর জোর করে নি হেমন্ত। কদিনই না আছে আর। যেখানে থেকে শান্তি পায় সেখানেই থাক।

মুশকিল হল নিতারা যাওয়ার সময়।

ওরা হেমন্তদের অনেক আগে এসে-ছিল—ওদের ফেরার সময়টাও এদের আগেই পড়া উচিত। মাস হিসেবে বাড়ীভাড়া নেওয়া—দু-তিনটে দিনও বেশী থাকার জো নেই, পুরো এক মাসের ভাড়া দিতে হবে তাহলে আবার। কে জানে হয়ত আগে থেকে অন্য ভাড়াটেও ঠিক হয়ে আছে পরের মাসের—সেক্ষেত্রে তো টাকা দিলেও থাকা চলবে না।

নিতারা চলে যাওয়ার পর আর এক মিনিটও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল না।

মেয়েটা ওকেই শুধু মায়ায় জড়িয়ে ফেলে নি—নিজেও জড়িয়েছে। কেন তা হেমন্তও জানে না, এই তো প্রথম দেখা-শুনো, কদিনের মাত্র পরিচয়। এমন কিছুই করতে পারে নি আদর-যত্ন—স্নেহেরও কোন পরিচয় দেবার সুযোগ পায় নি। উপকারে তো লাগার কথাই ওঠে না। বোধহয় নিতার সম্বন্ধে শিবুর হিসেবটাই ঠিক, দুনিয়ার যত অভাগার ওপরই মেয়েটার অহেতুক স্নেহ। হেমন্তর দুর্ভাগ্যের বিবরণই নিতার অন্তরে মমতার আসনে যাবার প্রবেশপত্রের কাজ করেছে। মায়াটাই বেশী ওর। নিমাই-এর নিজস্ব ভাষায়—'আমার এই নতুন বোনটা খুব মায়াবী—কী বল গা জ্যাঠাই?'

বিদায়ের সময় প্রণাম করতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ছিল নিতা। হেমন্ত ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, অনেক বলে, অনেক আদর করেও থামাতে পারে নি। কে জানে কেন বেয়ানের চোখ দুটোও ছলছল করে এসেছিল। ভালবাসা সে পেয়েছে বৈকি, এর আগে, কমলাক্ষের কাছ থেকে পরিপূর্ণ প্রেমই পেয়েছে সে—কিন্তু এমন অহেতুক স্নেহ জীবনে এই বোধ করি প্রথম পেল। আত্মীয়ের স্নেহ, আত্মীয়তার প্রীতি, বন্ধন। তার কাছে প্রত্যাশী অনেকে, দেয় না কেউই। এই প্রথম একজন দিল—কিছু পাওয়ার আশা না রেখেই। (ক্রমশঃ

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু   সুহৃদগোপাল দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরবর্তী প্রশ্ন আসবে—অরবিন্দের কলকাতায় বসবাস করা শুরু হওয়ার পর। সে ১৯০৬ সালের মে মাসে কলকাতায় আসে এবং আবার বরোদায় ফিরে যায়। এই (দিন বা সময়) প্রসঙ্গটি খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য। এই দেখুন, ।২৯২।৬ নথিভুক্ত প্রমাণ) ৮ই জুন তারিখে অরবিন্দের শ্বশুর মহাশয়কে লেখা চিঠি। চিঠিখানি কলকাতা থেকে লেখা। চিঠিতে লেখা আছে, 'আপনি মৃণালিনীকে কলকাতায় পাঠাতে আগ্রহী হয়ে থাকলে পাঠিয়ে দিন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। বারীন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি মনে করি যে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে শিলংয়ে যাক্। যদি সে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আপনি তাকে দেখাশোনা করবেন—আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত। বারীন একটু অস্থির প্রকৃতির। যে সময়ে তার বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়া এবং স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া উচিত সেই সময়ে তাকে হৈ চৈ করে বেড়াবার জন্যে উন্মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি তাকে এই ব্যাপারে নিরস্ত করার ব্যাপারে অনভ্যস্ত। যদি আমি তাকে বাধা দিই তাহলে সে আরো বিগড়ে যাবে।'

দেখা যাচ্ছে আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর এই চিঠির ভাষ্যকার হিসাবে বলেছেন যে, অরবিন্দ ভ্রাতৃস্নেহপ্রবণ ছিল।

৭ই জুলাই তারিখে অরবিন্দ (দেখা যাচ্ছে) বরোদায় ছিল। এবং ৬ই জুলাই থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত এমন কোনো চিঠি নেই যা এ সম্বন্ধে অবহিত করতে পারে। যদি ১ নম্বর প্রমাণ-সংগ্রহ পুস্তকের ২৫৪ পৃষ্ঠাটি দেখেন তাহলে পৃষ্ঠাটির নিচে দেখতে পাবেন যে, অরবিন্দকে চাকুরিয়া (জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রামাণ্য দলিলের তারিখ ছিল ১লা আগস্ট, ১৯০৬। সুতরাং এই দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, অরবিন্দ ঐ সময়ে কলকাতায় ছিল। ১লা আগস্টের কিছুদিন আগে সে কলকাতায় এসেছিল। সাক্ষী সুকুমার মিত্রও ঐ কথাই বলেছে. অবশ্য তার সাক্ষ্যে তারিখের ব্যাপারটি খুব পরিষ্কার করে বলা হয়নি। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, অরবিন্দ মে মাসে কলকাতায় আসার পর আর বরোদায় ফিরে যায়নি—এখান থেকেই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই সময়ে 'জাতীয় কলেজ' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, অরবিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ পদ পেয়েছে, এবং এই বছরের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়টিকেই আমার বিজ্ঞ বন্ধু তাঁর সওয়ালে 'আন্দোলনের লগ্ন' হিসাবে বিবৃত করেছেন। এই সময়েই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। অরবিন্দ নিঃসন্দেহে এই 'বন্দেমাতরম্' সংস্থা এবং 'ছাত্র ভাণ্ডার' নামে অপর একটি সংস্থার উদ্যোক্তা ছিলো। এইগুলির সঙ্গেই অরবিন্দের কর্মতৎপরতা জড়িত ছিল। কিন্তু আমি প্রমাণ দেবো যে, 'ছাত্র-ভাণ্ডার' সংস্থার সঙ্গে অরবিন্দ যুক্ত ছিল না সে কেবল এই সংস্থার দলিলের একজন সাক্ষী হিসাবে সই করেছিল। সে 'জাতীয় শিক্ষা উপদেশ সংস্থা' এবং 'বন্দেমাতরম্'—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত ছিল। অবশ্য আমি কখনই মানতে রাজী নই যে, সে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক ছিল। তবে নিয়মিত লেখক হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে তার যোগাযোগ আমি অস্বীকার করবো না।

'ছাত্র-ভাণ্ডার' প্রসঙ্গে বিজ্ঞ বন্ধুবর বলেছেন যে, এই সংস্থাটি ছিল ষড়যন্ত্রের অন্যতম কেন্দ্র। যেহেতু অরবিন্দ অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী বা অরবিন্দ এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই হেতু 'ছাত্র-ভাণ্ডার' ষড়যন্ত্রের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এখন আমার জিজ্ঞাস্য—'অরবিন্দ কি ষড়যন্ত্রকারী'? দেখা যায় যে, 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর সঙ্গে অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতার সন্দেহে ষড়যন্ত্রের অভিযোগটি অরবিন্দের উপর আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এই সংস্থার ব্যবসায়িক অন্তর্ভুক্তির দলিলটি দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, অরবিন্দের নামোল্লেখ হয়েছে দলিলটির অন্যতম সাক্ষীরূপে। বন্ধুবরের মতে, নথিপত্র অনুযায়ী এটি একটি সীমিত দায়িত্বপূর্ণ সংস্থা বলে মনে হলেও আসল রূপ প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্যেই সংগঠকরা এই ছলের আশ্রয় নিয়েছিল।

[নর্টন সাহেব চিত্তরঞ্জনের এই উক্তির প্রতিবাদ করেন—'আমি কখনো বলি নাই।']

নর্টন সাহেবের প্রতিবাদ করায় চিত্তরঞ্জন বলেন—হতে পারে কারণ আমার স্বল্পবুদ্ধির জন্যে হয়ত আমি আমার বন্ধুবরের বিবৃতি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, তার পরিকল্পনা অপ্রকাশ্য রাখবার জন্যেই সংস্থাটিকে সে ঐ রকম একটা রূপ দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সংস্থাটির শর্তাবলীর তিন নম্বর শর্তটি আমি উল্লেখ করছি। এই শর্তটিতে লেখা আছে যে, সংস্থাটি একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে বিভিন্ন মাল আমদানি, রপ্তানি এবং পাইকারি ও খুচরা মালপত্র ক্রয়-বিক্রয় করবে। দেখা যাচ্ছে যে, 'ছাত্র-ভাণ্ডার' কেবল স্বদেশী পণ্যের বিপণি ছিল না—বাইরে থেকে মাল আমদানি করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য আমদানি বিষয়টি নিয়ে মতান্তর হতে পারে—বিশেষভাবে, অর্থ বিনিয়োগ বিষয়ে—আমি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই না। তবে ঐ শর্তটির 'ডি' অর্থাৎ 'পাইকারি ও খুচরা মালপত্রের ব্যবসায়ী' কথাটির মধ্যে রাজনৈতিক পরিকল্পনার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের নাম গন্ধও নেই। মিস্টার নর্টন মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রতিষ্ঠানটি একটি দুরভিসন্ধি গোপন রাখবার উদ্দেশ্যেই গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির শর্তাবলী থেকে দেখা যায় : প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার সীমিত। পরিচালকমণ্ডলীর ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন অংশীদার স্বীকৃতি পায়। দশ নম্বর

শর্তে বলা হয়েছে যে, কোনো অংশীদারই নিজের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজের স্বত্ব-স্বামিত্ব ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু ছয় নম্বর শর্ত এবং দশ নম্বর শর্তের বয়ান অনুযায়ী স্বাভাবিক অবস্থায় স্বত্ব-স্বামিত্বের ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন-সিদ্ধ। নতুন অংশীদার গ্রহণেও কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। এই সমস্ত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আমার বিজ্ঞ বন্ধুর ধারণা যে 'ছাত্রভাণ্ডার' একটি দুরভিসন্ধি গোপন রাখবার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর বলেছেন যে, ছাত্র-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যই ছিল ষড়যন্ত্রে সাহায্য করা—কারণ প্রতিষ্ঠানটির লভ্যাংশের শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র অধিকারীদের প্রাপ্য হিসাবে দেওয়ার পর শতকরা ৩০ ভাগ, জনকল্যাণের নামে, প্রকৃতপক্ষে দুরভিসন্ধি-মূলক কাজে ব্যয় করা হোতো।

ধর্মাবতারের নিশ্চয় জানা আছে যে, এই দেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরি-চালকমণ্ডলী লভ্যাংশের কিছুটা জন-কল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় করে থাকেন—সম্পূর্ণ সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই। এই প্রথা আপনি ছোটখাট দোকানদারদের মধ্যেও প্রচলিত দেখতে পাবেন—এরা এই দেয় অর্থকে বলে 'বৃত্তি'।

[মিস্টার নর্টন এই সময়ে প্রশ্ন করেন—'এর কোনো প্রমাণ এখানে আছে?']

এই মামলার নথিপত্রে এর কোনো প্রমাণ না থাকলেও—এটা এই দেশে একটি অতি প্রচলিত রীতি এবং সেইজন্যেই আমি এখানে এর উল্লেখ করছি। ধর্মাবতার নিশ্চয় তাঁর এজলাসে অন্য মামলায় এই ধরনের নজির পেয়ে থাকবেন। 'বৃত্তি' দান করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন—সাধারণত প্রতিটি জিনিস বিক্রি করবার পর তারা অন্তত একটা পয়সা বৃত্তির জন্য আলাদা করে রাখে। আপনার নিজের ঘোড়া অপটু হয়ে গেলে আপনি ঘোড়াটিকে সোদপুরের যে খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দেবেন—সেই প্রতি-ষ্ঠানটিতেও এই রীতির প্রচলন আছে।

আমার নিবেদন এই যে, ছাত্রভাণ্ডারের আসল রূপটি ঢেকে রাখবার যদি সত্যিই কোনো উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে এই প্রতি-ষ্ঠানের পরিচালকরা সীমিত দায়যুক্ত প্রতিষ্ঠান করবেন কেন? তাঁরা মালিকানা স্বত্ব নিয়েই প্রতিষ্ঠানটি গড়তে পারতেন। যাই হোক, এই প্রতিষ্ঠানটির গঠনের বৈশিষ্ট্য থেকে মোটেই প্রমাণ হয় না যে, তাঁরা তাঁদের লভ্যাংশ কোনো দুরভিসন্ধি-মূলক কাজে ব্যয় করতেন। এই ধরনের কোনো অসদুদ্দেশ্য থাকলে তাঁরা অনায়াসেই একটি দোকান খুলতেন—সেখানে হিসাবপত্র থেকে তাদের অসদুদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হোতো না।

[এই সময়ে মিস্টার নর্টন বলেন—'প্রতিষ্ঠানটির লাভ কোনোদিনই হয়নি।']

আর কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়ে লাভ নাই করে থাকে, তাহলে সেখান থেকে অসদুদ্দেশ্যে ব্যয়ের কোনো প্রশ্নই উঠে না। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। 'অরবিন্দের দুরভি-সন্ধি ছিল'—এই অনুমানের ভিত্তিতে কি ক'রে বলা যায় যে, অরবিন্দ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল? সে কেবল দলিলের সাক্ষী হিসাবে সই করেছিল। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে, ছাত্রভাণ্ডারের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি। ৮৪ নম্বর সাক্ষী, পবিত্র দত্ত বলেছে, 'আমি সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে সুবোধ মল্লিক ও অরবিন্দ ঘোষকে পেয়ে তাদের ঐ দলিলের সাক্ষী হিসাবে সই করাই—কারণ উভয়েই নামী লোক ছিলেন।'

মিস্টার নর্টন এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। পবিত্রের কথাতে খুবই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, অরবিন্দকে ও সুবোধ মল্লিককে নামী লোক বিবেচনায় সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষী হিসাবে নির্বাচিত করেছিল। সুবোধ মল্লিক বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের জন্যে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তাঁকে কলকাতার সবাই মহৎ ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করতো। পবিত্র তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, অরবিন্দ সেই সময়ে ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে থাকতো: সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে পবিত্র যেদিন দলিলে সই করাবার জন্যে গিয়েছিল, সেদিন অরবিন্দ সেখানে বসেছিল এবং সুবোধ মল্লিক (অরবিন্দকে দেখিয়ে) পবিত্রকে অরবিন্দের সই নিতে বলেছিলেন। বন্দে-মাতরম পত্রিকার সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে, মিস্টার নর্টন বলেছেন, 'অরবিন্দ পত্রিকার সম্পাদক ছিল, কি না,—তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কারণ, আমি বলছি যে, অরবিন্দই বন্দেমাতরম-এর সর্বেসর্বা ছিল।' এইবার সুকুমার সেনের সাক্ষ্য (যা লিপি-বদ্ধ করা হয়েছে) পড়ে শোনাচ্ছি। ন্যাশা-নাল কলেজের অধ্যাপক, সুকুমার সেন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, 'অরবিন্দ কখনও সহিংস নীতির প্রচার করেনি—যা করেছে বলে মনে পড়ে না। বন্দেমাতরম্ প্রতি-ষ্ঠানটি ছিল একটি আদর্শ জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, ওটা ঠিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই ব্যবসার চেয়ে রাজনৈতিক আদর্শেই অনুপ্রাণিত ছিল।'

আমি যা বুঝেছি তা হোলো—অরবিন্দ বন্দেমাতরম প্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে এর সঙ্গে যুক্ত ছিল: সে ঐ প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি সভায় উপস্থিত ছিল; এবং সে কখনো পত্রিকাটির ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করেনি। অরবিন্দ কিছুদিনের জন্যে প্রতি-ষ্ঠানটির মুখ্য-পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে-ছিল। নথিভুক্ত প্রমাণ নম্বর ৯১০/ডি উদ্ধৃত ক'রে আমি আপনাদের বলতে চাই যে, অরবিন্দ কোনো সময়েই পত্রিকাটির সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক পদে আসীন ছিল না। তার সঙ্গে তারবার্তা গ্রহণ বা [illegible]-মুদ্রণ বিভাগীয় কাজকর্মের কো[illegible] সম্পর্ক ছিল না। মাননীয় ধ[illegible]রের জ্ঞাতার্থে আমি নিবেদন করছি [illegible] বন্দে-মাতরম্ পত্রিকা অভিযুক্ত হ[illegible] জন্য পত্রিকাটিতে 'যুগান্তর' পত্রি[illegible] একটি প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হওয়ার ঘটনাই দায়ী ছিল।

[এই সময়ে জজসাহেব প্রশ্ন করেন যে, সাক্ষী সুকুমার সেন কি বলেন নি যে, বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?]

সাক্ষী সুকুমার সেনের সাক্ষ্য অনুযায়ী এইটুকুই জানতে পারা যায় যে, বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক থাকতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। বিপিন পাল সব দায়িত্ব নিয়ে প্রধান সম্পাদক হোতে ইচ্ছা করে-ছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় অরবিন্দ ঘোষকেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু অরবিন্দ তাতে অসম্মত হয়। কারণ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না—সেই সময়ে তার উপর ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষপদের গুরু-দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। সেই জন্যে দেখা যায় যে, পত্রিকার কেবলমাত্র একটি সংস্করণেই অরবিন্দ ঘোষের নাম ছিল। পরবর্তী সংখ্যা থেকেই নাম বাদ দেওয়া হয়।

[এই সময় জজসাহেব বলেন যে, কিছু প্রবন্ধ বা ভাষণ অরবিন্দ ঘোষের কাছে সম্পাদক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।]

অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদক আছেন এই অনুমানের ভিত্তিতে কিছু প্রবন্ধ বা ভাষণ তার কাছে পৌঁছে দেওয়া হলেও বন্দে-মাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বা ভাষণগুলির কোনোটিই তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়নি। 'সম্পাদক' এই আখ্যার মধ্যে কোনো যাদুকরী প্রভাব নিশ্চয় নেই (অর্থাৎ সম্পাদক নামের ছোঁয়া লেগেই সম্পাদনার কাজ আপনাথেকে বা সম্পাদকের অজ্ঞাতেই হয়ে যাবে)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমান পৃথ্বীরাজ / পরিচালক : তরুণ মজুমদার। অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরী। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

আশার বাণী

একদা বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ এই রাজ্যে সিনেমা টিকিটের ওপর 'সেস্' (উপকর) বসিয়ে যে-টাকা পাওয়া যাবে, তাকে এই রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যয় করবার প্রস্তাব করেছিলেন রাজ্যসরকারের কাছে। সরকার কিন্তু এই প্রস্তাব দ্বারা চালিত হয়ে সিনেমা টিকিটের ওপর বসিয়েছেন 'শো ট্যাক্স' বা প্রদর্শনী-কর এবং এথেকে যে-অতিরিক্ত আয় হচ্ছে, তাকে সাধারণ অর্থভাণ্ডারেই জমা করছেন চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি করবার কথা বেবাক ভুলে গিয়ে।

তাই সেদিন যখন বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর) ৩৫তম বার্ষিক শংসাপত্র বিতরণী উৎসবে (অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড গিভিং ফাংসান-এ) প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় একটি সরকারী গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে বললেন, উনি (ওঁর সরকার) পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা-টিকিটের ওপর 'সেস্' ধার্য করবার কথা চিন্তা করছেন এবং তার থেকে আদায়ীকৃত টাকা এ রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্যে ব্যয় করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তখন ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়, ঠিক সেইভাবেই আমাদের মনে শঙ্কা জাগল, আবার পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হবে না তো! আবার অর্থ মন্ত্রকের কারসাজিতে 'সেস্' 'শোট্যাক্সে' পরিণত হয়ে সাধারণ তহবিলে প্রবেশ করবে না তো!

না, কিছুতেই না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে আমরা অন্য ধাতু দিয়ে গড়া বলেই জানি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকে বারংবার আমরা সোচ্চার হতে দেখেছি অতীতে। কাজে ও কথায় তিনি এক। কাজেই তিনি যখন বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পকে তার ন্যায়সঙ্গত মর্যাদার আসনে বসাতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর এবং তার জন্যে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি শিল্পপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, তখন আমাদেরও মন আশাবাদী হয়ে বলতে চাইছে দিন আগত ঐ!

এই উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দিনী সত্পথীও বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে উচ্চ প্রশংসায় অভিষিক্ত করে বলেছেন, 'বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প যে-সব বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন, তা' আমার অজ্ঞাত নয়। আমি স্থিরনিশ্চয়, এই শিল্পে যে-সব জটিল সমস্যা বর্তমান, তা' এই রাজ্যের জনপ্রিয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির সমস্যার সমাধানের জন্যে উপযুক্ত পন্থাও নির্ণীত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারও সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে আগ্রহান্বিত।'

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্প একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাঙালীর সংস্কৃতির যোগ্য ধারক ও বাহক রূপে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক, আমাদের অন্তরে এই কামনা যেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পরিচালিত রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় অচিরেই পূর্ণ হয়।
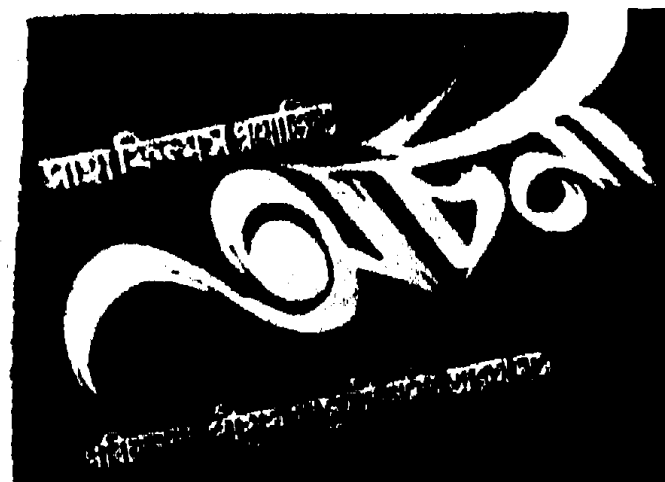
চিত্র-সমালোচনা

(১) সন্ত্রাসবাদীদের একজন

দমননীতিতে বিশ্বাসী, ব্রিটিশ আমলের কলকাতা শহরের কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার সার চার্লস টেগার্টকে আমরা দেখেছি কোঁচানো ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী ও হুড-বার্ণিশের পাম্পসু পরা অবস্থায়। রঙটা বাদ দিলে কার সাধ্য বলে যে, বাঙালী নয়। মুখে একেবারে আপনার আমার মতো বাংলার খৈ ফুটছে, কালেভদ্রে এক আধটা বেমক্কা টান ধরা পড়ত। একহারা চেহারা। আবার যখন সাদা জিনের পোশাক পরে পুরোপুরি কমিশনারের বেশ ধারণ করতেন, তখন মেজাজই আলাদা, তেজে মটমট করছেন—যেন একখানি স্টীলের চকচকে পাত। অগ্নিযুগের গোপন সুড়ঙ্গচারী সন্ত্রাসবাদীদের তিনি ছিলেন যম। তাদের নিপীড়নের ক্ষেত্রে তিনি কোনো আইনকানুনের ধার ধারতেন না। বিনা ওয়ারেন্টে অ্যারেস্ট করা থেকে শুরু করে দুপুর রাত্রে পাঁচিল টপকে বাড়ীতে ঢুকে শোবার ঘরের দরজা লাথি মেরে ভেঙে ফেলে সন্ত্রাসবাদীর ওপর গুলী চালানো পর্যন্ত কিছুই তাঁর আটকাত না। এ হেন দুর্দান্ত টেগার্টকে একেবারে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা সন্ত্রাসবাদীরাও কম করেন নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের চেষ্টা বিফল হয়েছিল। প্রথম, ১৯২৪ সালের জানুয়ারীতে গোপীনাথ সাহা টেগার্ট মনে করে আর্নেস্ট ডে নামে একজন সাহেবকে গুলী করে মেরে পালাবার সময়ে গ্রেপ্তার হয়ে ফাঁসী যায়। দ্বিতীয় বার ১৯২৯-এ ড্যালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়ীতে বোমা মেরে তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন অনুজা সেনগুপ্ত ও দীনেশ মজুমদার। কিন্তু টেগার্ট যায় বেঁচে। অনুজা ঘটনাস্থলেই মারা যায়, আর দীনেশ অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়ে পালাবার পরে ধরা পড়ে যায়। বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

—এই দীনেশ মজুমদারকে নায়ক করে তৈরী হয়েছে রূপ ও বাণী নিবেদিত ও কৃষ্ণা মল্লিক প্রযোজিত 'শপথ নিলাম'। শৈলেশ দে রচিত মূল কাহিনী আমরা পড়িনি, কিন্তু ছবিতে নায়ক দীনেশ মজুমদারের যে-কার্যকলাপ দেখানো হয়েছে, তা যথেষ্ট উন্মাদনা সৃষ্টিকারী ও নাটকীয় কিনা, এ-প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভারতকে স্বাধীন করবার জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ একদল 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত যুবকের রোমাঞ্চকর কাহিনী শেষ পর্যন্ত টেগার্ট-হত্যার চেষ্টায় পর্যবসিত হয়ে ওদের আদর্শকে করেছে দর্শকের চোখে ছোট। নাটকীয় বলতে মাত্র সমবেত সঙ্গীতের মধ্যে দীনেশের জেল থেকে পালানোর দৃশ্যটি মনে রাখবার মতো। এছাড়া ছবির কোনো ঘটনাই মনে দাগ কাটে না। এমন কি, টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা, ব্যর্থ হওয়া, চন্দননগরের গোপন আস্তানায় পুলিশের সঙ্গে লড়াই প্রভৃতি কোনো ঘটনাই দর্শক কৌতূহলকে জাগ্রত রাখতে পারেনি।

অভিনয়ে সমিত ভঞ্জ (দীনেশ), দিলীপ রায় (রসিক), শেখর চট্টোপাধ্যায় (টেগার্ট), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (সুহাসিনী), শমিতা বিশ্বাস (কল্যাণী), নিরঞ্জন রায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকাকে প্রাণবন্ত করবার যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছেন।

ছবির প্রস্তাবনায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেপথ্য ভাষণ স্বদেশ প্রেমের দ্যোতক। স্বদেশী গান দুখানিও যথেষ্ট ভাবগম্ভীর। জেলের অভ্যন্তরে 'হে রাম' সমবেত-সঙ্গীত চমৎকার উপভোগ্য। ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণ পর্যায়ের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দেশাত্মবোধক ছবিটিকে প্রমোদকরমুক্ত করেছেন।

(২) 'নিশিপদ্ম'র হিন্দী চলচ্চিত্ররূপ

বাংলা কাহিনী অবলম্বনে গঠিত একটি বাংলা ছবি যখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়, তখন সেই কাহিনীকে আশ্রয় করেই একটি হিন্দী ছবি তৈরী করবার একটি বিশেষ প্রবণতা হিন্দী ছবির প্রযোজকদের মধ্যে বর্তমানে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংগে সংগে এও লক্ষ্য করা যায় যে, ছবিটিকে সর্বভারতীয় দর্শকদের প্রমোদোপকরণ করে তোলবার সাধু চেষ্টায় প্রেম, হাসি, নাচ, গান, খলতা, পশ্চাদ্ধাবন, নায়ক ও খল-নায়কের মধ্যে যুদ্ধ ও শক্তির লড়াই বা জাপানী জুডো থেকে সোজা ঘুসোঘুসি ও রক্তারক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত—প্রভৃতির প্রচুর অনুপ্রবেশের ফলে তা এমন কিম্ভূতকিমাকার রূপপরিগ্রহ করে, যা থেকে মূল বাংলা কাহিনীটি উদ্ধার করা রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কিন্তু সুখের বিষয়, **শক্তি ফিল্মস নিবেদিত এবং শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত ইস্টম্যানকলারে তোলা ছবি 'অমর প্রেম'** এই ধারার একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বলা যেতে পারে, একমাত্র 'আজ

রাত্রে আর যাত্রা শুনতে যাব না'—এই অতি জনপ্রিয় গানটির কথা বাদ দিলে, হিন্দী অমর প্রেম বাংলা নিশিপদ্ম-এর একেবারে কার্বন কপি। আর তা না হলেও বা কেন? পরিচয়লিপি থেকে দেখা যাচ্ছে, হিন্দী সংস্করণের চিত্রনাট্যটি বাংলার চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়েরই রচনা। কিন্তু শুধু চিত্রনাট্যেরই মিল নয়, রুচিসম্মত ভাবভঙ্গীসহ অভিনয়ে এমন বাংলা মেজাজ বোধ করি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো হিন্দী ছবিতে দেখা যায়নি। জানি না, এই বাংলা মেজাজী অভিনয় সাধারণ হিন্দী ছবির দর্শকদের ভালো লাগছে কিনা। তবে হিন্দী ছবিতে এই রকম রুচিসম্মত উন্নতধারার অভিনয় প্রচলন করার যে আশু প্রয়োজনীয়তা আছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। যেখানে অসম্ভব রকম অশালীনতার সুযোগ ছিল, সেই বেশ্যাপল্লীর চিত্রণে হাবে, ভাবে, বেশভূষায় যে-সংযম পরিলক্ষিত, তা রীতিমত বিস্ময়কর। সাধুবাদ দিই প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্তকে এই দুঃসাহসিক পন্থা অনুসরণের জন্য।

জানিনা, রাজেশ খান্না কখনো বাংলা 'নিশিপদ্ম' ছবিখানি দেখেছেন, কিন্তু স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত প্রেমের এমন মাধুর্যমণ্ডিত অভিনয় তিনি আর কখনও করেননি। মনে হয়, এ-ধরনের চরিত্রাভিনয় তার জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা। পুষ্পার চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর ভাগ্যতাড়িত একটি নিষ্পাপ জীবনের মর্মকথাকে অত্যন্ত দরদী অভিনয় দ্বারা চিত্রিত করেছেন। পুষ্পার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়কে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন নৈপুণ্যের সঙ্গে। পরিস্থিতি অনুযায়ী রূপসজ্জা চরিত্রটিকে আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। বাচ্চা নন্দুর চরিত্রটিতে ... ইরাণী'র চেহারা এবং অভিনয় দুইই মিষ্টি। অপরাপর ভূমিকায় মদনপুরী, ওম প্রকাশ, ফরিদা জালাল, মনোমোহন, সুজিত বিন্দু, লীলা মিশ্র প্রভৃতি সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। ছখানি গানের প্রতিটিই রাহুল দেববর্মণ দ্বারা চিত্তাকর্ষকভাবে সুরারোপিত। ওরই মধ্যে 'হুয়ে কা হুয়া কৈসে, কব হুয়া' (রাজেশ খান্নার মুখে), 'রৈনা বীতী যায়ে শ্যাম ন আয়ে' এবং 'বড়া নটখট হৈ রে কৃষ্ণ কনহৈয়া' এই তিনটি গানের তুলনা নেই। বারংবার শোনবার মতো এই গান কখানি।

শক্তি ফিল্মস্ নিবেদিত, শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'অমর প্রেম' হিন্দী ব্যবসায়িক চিত্রজগতে একটি নূতন দিগন্তের পানে সুদৃঢ় পদক্ষেপ বলে অভিনন্দিত হবে।

স্টুডিও সংবাদ

মুক্তি পথে : নতুন দিনের আলো

বাদল পিকচার্সের প্রথম নিবেদন 'নতুন দিনের আলো'র চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ হয়ে মুক্তির দিন গুণছে। কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। ডি জি আর পিকচার্স পরিবেশিত এ ছবির সুরকার হলেন নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে আছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, তরুণ রায়, বিকাশ রায় (অতিথি), বিদ্যা রাও, দীপান্বিতা রায়, বাণী গাঙ্গুলী, হাস্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনতা রায়, শমিতা বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, দেবরাজ রায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ, প্রমোদ গাঙ্গুলী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য, মাঃ সৌমেন্দ্র এবং আরো অনেকে।

শেষের রজনীগন্ধা'

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ আর সি প্রোডাকসন্সের 'রাতের রজনীগন্ধা' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে একটানা চিত্রগ্রহণের কাজ চলছে। এন এ ফিল্মস পরিবেশিত এ ছবির কাহিনী লিখেছেন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রশান্ত দেব।

পরিচালনা করছেন অজিত গাঙ্গুলী। সুর দিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। চিত্রগ্রহণে আছেন অনিল গুপ্ত। প্রধান ভূমিকায় আছেন, উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, শ্যামল ঘোষাল, তরুণকুমার, অনুভা মুখোপাধ্যায়, অনিতা গুপ্ত, বঙ্কিম ঘোষ এবং আরো অনেকে। কাহিনী বৈচিত্র্যে ও বলিষ্ঠ অভিনয়ে 'রাতের রজনীগন্ধা' চিত্রজগতে এক বিশেষ স্থান দখল করবে বলে জানা গেছে।

'শেষ পর্ব' মুক্তি পাচ্ছে

আসছে ২৯শে মে থেকে শুভায়ু পিকচার্সের 'শেষপর্ব' নবসাজে সজ্জিত ভারতী এবং রূপবাণী, অরুণা ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচী।

কে এল কাপুর ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত ছবিটিতে অভিনয় করেছেন— পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, সমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, জহর রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কিরণ চক্রবর্তী, অনুভা গুপ্ত, শোভা সেন, ও নবাগতা মিঠু মুখোপাধ্যায়।

●

সংবাদে প্রকাশ, অভিনেত্রী সংঘের প্রযোজনায় একটি ছবি নির্মিত হতে চলেছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে পরিচালক পীযূষ বসুর ওপর। ছবির নাম স্থির হয়েছে ...স। ...মানে পরিচালক শ্রীবসু চিত্রনাট্যের কাজে ব্যস্ত আছেন।

'শুভা ও দেবতার গ্রাস' এবং 'হংস-মিথুন' ছবির পর বহুদিন তরুণ পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর আর কোন খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না। খবরে প্রকাশ, বর্তমানে তিনি তাঁর পরবর্তী ছবি বিমল কর রচিত 'যদুবংশ' ছবির চিত্রগ্রহণ এ-মাস থেকে শুরু করছেন। ভূমিকালিপিতে এপর্যন্ত যাঁদের নির্বাচিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে—অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, শর্মিলা ঠাকুর ও ধৃতিমান চ্যাটার্জির নাম উল্লেখযোগ্য। পরিচালনা ছাড়া শ্রীচৌধুরী চিত্রনাট্য রচনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন।

পরিচালক অজিত লাহিড়ী তাঁর পরবর্তী ছবি 'আরণ্যক' ছবির দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ সম্পন্ন করলেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। বর্তমানে তিনি তাঁর শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে উড়িষ্যার সারাণ্ডা ফরেস্ট অঞ্চলে শেষ পর্যায়ের বহির্দৃশ্য গ্রহণে ব্যস্ত আছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাসিক উপন্যাস 'আরণ্যক'-এর বিভিন্ন চরিত্রগুলোর সার্থক রূপায়ণে আছেন—সমিত ভঞ্জ, মাধবী চক্রবর্তী, সুব্রতা চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, প্রসাদ চক্রবর্তী, চেতনা তিওয়ারী, রাস-বিহারী সিংহ, প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বম্বের সোনিয়া সাহনী। সংগীত-পরিচালনায় আছেন কালীপদ সেন। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন সীমা ফিল্মস্।

বিবিধ সংবাদ

বি-এফ-জে-এর সংবাদপত্র বিতরণী উৎসব

গেল ৫ মে, সন্ধ্যা ৫-৩০টায় রবীন্দ্র-সদনে বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের (বংগীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক
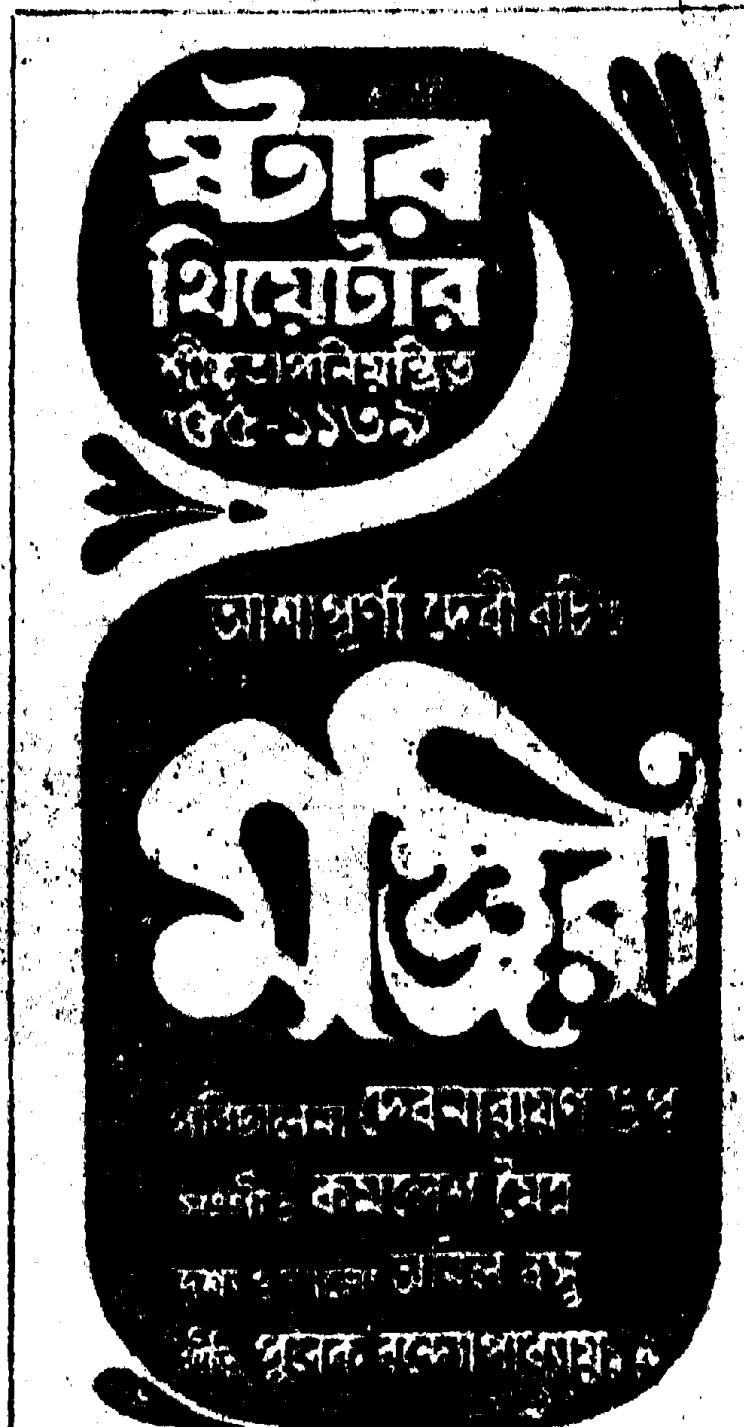
সঙ্ঘের) ৩৫তম অ্যাওয়ার্ড গিভিং ফাংশান (শংসাপত্র বিতরণী উৎসব) অনুষ্ঠিত হল। এবারের অনুষ্ঠানে যে-অসাধারণ জনসমাবেশ হয়েছিল সঙ্ঘের ইতিহাসে তার নজীর নেই। সভার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দিনী সতপথি এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থসভাপতি মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। বাংলা চলচ্চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও শংসাপ্রাপকদের মধ্যে বোম্বাই থেকে এসেছিলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় উনি শংসাপত্র গ্রহণ না করেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন), বাসু চট্টোপাধ্যায়, রেহানা সুলতান, ফরিদা জালাল, অমিতাভ বচ্চন এবং হসরৎ জয়পুরী।

১৯৭১-এর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

সত্যজিৎ রায়ের বাংলা ছবি 'সীমাবদ্ধ' এবার শ্রেষ্ঠ ছবি বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে বাসু ভট্টাচার্যের হিন্দী ছবি 'অনুভব'। জাতীয় সংহতি পুরস্কার লাভ করেছে কে এ আব্বাসের 'দো বুন্দ-পানি'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন এম জি রামচন্দ্রন (তামিল ছবি রিকসাকরম)। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ওয়াহিদা রেহমান (হিন্দী রেশমা ঔর সেরা)। শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন কানাড়ী ছবি বংশবৃক্ষ এর যুগ্ম-পরিচালক গিরিশ কার্নাড ও বি ভি কারান্ত। শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী মাস্টার শচীন (মারাঠি ছবি আজব দুজে সরকার)। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক জয়দেব (রেশমা ঔর সেরা)' শ্রেষ্ঠ গীতিকার—প্রেম ধাওয়ান (নানকনাম দুখিয়ারী সব সংসার)। শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র—এখনই (তপন সিংহ), সাদাকালো ছবির চিত্রনাট্য নন্দু ভৌমিক কৃত অনুভব, রঙীন ছবির চিত্রনাট্য—সি. রামচন্দ্রকৃত রেশমা ঔর সেরা। শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (নিমন্ত্রণ), শ্রেষ্ঠ নেপথ্যগায়িকা—পি সুশীলা (সবালে সমালি)। শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবি : ফিরতি (হিন্দী), নিমন্ত্রণ (বাংলা), শান্ততা কোর্ট চালু আহে (মারাঠি), অরণ (অসমীয়া), ভেগুলিপেন (তামিল), মাত্রিলোমানিকাম (তেলেগু), বংশবৃক্ষ (কানাড়ী) এবং করকনক কদল (মালয়ালম)।

তরুণ অপেরার সম্বর্ধনা : যাত্রা শিল্পী সংঘ আগামী ১৯ মে সম্বর্ধনা জানাবেন তরুণ অপেরা, শান্তিগোপাল ও অন্যান্য শিল্পীদের। সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার পাওয়ার পর লেনিন পালাভিনয়ের সকল শিল্পীদের এই প্রথম সম্বর্ধনা জানান হবে। পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য যাত্রাভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীকেও সম্বর্ধনা জানান হবে।

সংগীত বিদ্যায়তন বৈতানিক: স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ঢাকার সেগুন বাগিচাস্থ সাবেক আর্টস কাউন্সিল ভবনে বৈতানিক সঙ্গীত বিদ্যায়তনের ক্লাস পুনরায় শুরু হয়েছে। পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস ও শ্রীসুবিনয় রায় ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক হিসেবে বৈতানিকে যোগদান করতে রাজী হয়েছেন।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি জসিমুদ্দিন

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমন্ত্রণে কবি জসিমুদ্দিন স্ত্রী-কন্যাসহ ২রা বৈশাখ সকালে বাংলা বিভাগে উপস্থিত হয়েছিলেন। [illegible] ছাত্রছাত্রীরা কবিকে মাল্যচন্দন দিয়ে বরণ করেন। 'আমার সোনার বাংলা' [illegible] গেয়ে শোনান ছাত্র-ছাত্রীরা। [illegible] সকলের পরিচয় করিয়ে দেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ [illegible] বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম [illegible] সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং [illegible] কবর কবিতাটি আবৃত্তি করে [illegible] মাননীয় অতিথিকে দেখা জানান ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সূর্যনারায়ণ [illegible]

সঙ্গীতালয়ের উদ্বোধন

গত পয়লা বৈশাখ সন্ধ্যায় ৮-ই [illegible] নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে [illegible] সংগীতালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন [illegible] অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীঅশ্রুময়ী লোক [illegible] এতদুপলক্ষে পরিবেশিত 'আহ্বান' নৃত্যানুষ্ঠানে সংগীতাংশে দীপ্তি দে, [illegible] নাগ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সজল [illegible] ও নৃত্যাংশে রঞ্জিতা বর্মণ ও কবিতা [illegible] প্রভৃতি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সংগীত পরিচালনা করেন সহাধ্যক্ষা ডঃ [illegible] সেন।

শাস্ত্রীয় সংগীত সমাজ

সম্প্রতি আর্য সঙ্গীত বিদ্যালয়ে দক্ষিণ কলিকাতার শাস্ত্রীয় সংগীত সমাজে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমিতাভ সেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীঅরুণ বাগচি।

সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংগীত সমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বর্তমান কালে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসারের প্রয়োজনীয়তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে শুদ্ধ-কল্যাণ রাগে খেয়াল গান পরিবেশন করেন শ্রীশিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যোগ রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরি গেয়ে শোনান রুক্মিনী বাঈ (সেনগুপ্ত)। রাগেশ্রী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। এঁর মীড় ও গমকের কাজ খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীগীতা মুখোপাধ্যায় রাগেশ্রী রাগে সেতার বাজিয়ে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী সংগীতাচার্য সুখেন্দু গোস্বামী। বেহাগ রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরি গেয়ে তিনি শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। তানের চেয়ে তাঁর বিস্তারের অংশ মনোগ্রাহী হয়েছিল। তবলা সহযোগিতা করেন শ্রীচন্দ্রমোহন দাস এবং অনিল রায়চৌধুরী। হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন শ্রীআমির আলি খাঁন ও মারফুক খাঁ।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য উন্নয়ন সমিতি

কিছুকাল আগে মিনার্ভা থিয়েটারে কলিকাতা পৌরসভার অযৌক্তিক নাটাকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুই শতাধিক নাট্যকর্মী মিলিত হয়েছিলেন। নাট্যরসিকরা শুনে খুশী হবেন যে গত ৫ এপ্রিল বেলা ১২টায় সমিতির একটি প্রতিনিধিদল পৌর প্রশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি উক্ত কর বিনাশর্তে রদের কথা ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় একটি প্রস্তাবে নাটক ও নাট্যকর্মীদের ওপর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের আক্রমণ প্রতিহত করা ও নাটকের উন্নতিতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে একটি কনভেনশানের মাধ্যমে এই সংস্থাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেবার জন্যে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ কুণ্ডুকে আহ্বায়ক নিয়োগ করে সুধী প্রধান, দিলীপ ঘোষাল, শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বসু, দেবেশ চক্রবর্তী, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। সমিতির নাম 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য উন্নয়ন সমিতি।' ১৩১, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬। (ফোনঃ ৪৭-৫৩৩৭)।

অভিনয় পত্রিকা দপ্তরে বাংলাদেশের নাট্যশিল্পী দল : ভারত-বাংলাদেশ সংস্কৃতি ও মৈত্রী মেলায় যোগ দিতে এসেছিলেন বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক, কলাকুশলী-নাট্যকার-অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ। গত ১৮ এপ্রিল অভিনয় পত্রিকা দপ্তরে এঁদের একাংশের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এপার বাংলার কিছু নাট্যরসিক। ঘরোয়া পরিবেশের এই সভায় ওপার বাংলার নাটকের গত ২৪ বছরের গতি-প্রকৃতির ওপর আলোচনা করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক মণিরুজ্জমান, শেখ কামাল, এস-এম মহসীন প্রমুখ। এপার বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রবীর মুখোপাধ্যায়, রথীশ সাহা, রবীন দেবরায়, নির্মল সাহা, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল দে।

মঞ্চাভিনয়

'পুতুল নাচের ইতিকথা' : শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরায়ত উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সঙ্গে আমাদের প্রায় সকলেরই এক নিবিড় পরিচিতি আছে। মানুষের মনের গভীরতম রহস্যের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছে এই উপন্যাস, এর প্রতিটি পাতায় একটি গ্রামের কয়েক ঘর মানুষের জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলো একে একে উন্মোচিত হয়েছে। নানা চরিত্র নানা গোপন অনুভূতির স্পন্দন তুলে পুতুলের মত সৃষ্টির খেলায় মেতে রয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অবিস্মরণীয় উপন্যাসটির একটি সার্থক নাট্যরূপ সম্প্রতি পার্ক স্ট্রীট রিক্রিয়েশন ক্লাব স্টার রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করলেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীরতনকুমার ঘোষ। শ্রীঘোষ পূর্বে তারাশঙ্করের মঞ্জরী অপেরা', 'গণদেবতা' ও বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসের অসাধারণ নাট্যরূপ দিয়ে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, 'পুতুল নাচের ইতিকথা'তেও তাঁর সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

'পুতুল নাচের ইতিকথা'তে আবেগের উচ্ছ্বাস কম, মনোজগতের বিশ্লেষণই এর

প্রাণ সম্পদ। তাই এর অভিনয় রীতিও একটু দুরূহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই প্রতিটি শিল্পী এই দুরূহ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। এর জন্য শিল্পীদের সঙ্গে ধন্যবাদ পাবেন নির্দেশক রতনকুমার ঘোষ।

আন্তরিক সপ্রতিভ অভিনয়েই এই আয়োজনটি নানা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। যাঁরা নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁদের স্ব স্ব চরিত্রগুলোকে প্রাণময় করে তুলতে পেরেছেন তাঁরা হলেন দাশরথী দে (শশী), বসন্ত চৌধুরী (গোপাল), রঞ্জিত রায় (যামিনী), মমতা চট্টোপাধ্যায় (কুসুম), তিয়া চ্যাটার্জি (সেন দিদি), সুশান্তকুমার বসু (কুমুদ)।

আমি সিরাজের বেগম/বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেন চিত্তরঞ্জন কর (যাদব), প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (নন্দ), দেবব্রত করগুপ্ত (পরাণ), প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় (নিতাই), সুভাষ মৌলিক (শ্রীনাথ), কৃষ্ণচন্দ্র রায় (গোবর্ধন), বিমল রায়চৌধুরী (শীতলবাবু), ক্ষিতীশ বসু (অধিকারী), সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (অনন্ত), শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, কল্পনা বিশ্বাস (মতি), মীরা বসু (বিন্দু)।

'লবণাক্ত' : আজকের সমাজে যে-সব তরুণ নানা রকম প্রতিবন্ধকতার চাপে দিশেহারা হয়ে, হতাশা আর যন্ত্রণার নিঃসীমতায় নিপর্যস্ত হতে চলেছে, তাদের সামনে কি জীবনে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার আলো তুলে ধরা যায় না? হয়ত এ প্রশ্নই তুলেছে পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' নাটক। এই সব দিগভ্রান্ত তরুণদের বিচিত্র উপেক্ষিত জীবন, তাদের চরম মানসিক গ্লানিকে যেমন এই নাটকের মুখরতা ভাষা দিয়েছে, তেমনি এর সংলাপের প্রোজ্জলতায় আর বক্তব্যে গভীরতায় গ্লানিমুক্ত সুস্থ জীবন কি করে এরা গড়ে তুলতে পারে, তার ইঙ্গিতও হয়েছে সোচ্চার। সম্প্রতি এই বলিষ্ঠ বক্তব্যধর্মী নাটকটিকে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করলেন ত্রিলোকিনী কাল-চারাল এ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীরা। 'বিশ্ব-রূপা' মঞ্চে পরিবেশিত এই নাটকটির সামগ্রিক প্রয়োজনায় শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রায় প্রতিটি চরিত্রের রূপকারই দর্শকদের মন স্পর্শ করতে পেরেছেন। বিশেষ করে রবীন চ্যাটার্জি'র বিনয়, অলোক মল্লিকের বিজয় ও সোমেন মুখার্জির অরুণ তিনটি দীপ্ত চরিত্রচিত্রণ হতে পেরেছে। বাণীর ভূমিকায় বেবী সেনগুপ্ত বেশ সুন্দর ভঙ্গিমায় অভিনয় করেছেন। চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি'র বিমলে খুব একটা স্বাভাবিক চরিত্রচিত্রণ হতে পারে নি। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন মৃদুলা সেনগুপ্ত, কান্তিপ্রিয় সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি, দুর্গাপদ দে, শিবনারায়ণ ক... অরুণকুমার বসু, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী, ... সুকুমার ভট্টাচার্য, ত্রিলোকেশ ভট্টাচার্য, স্বপ্না মুখার্জি।

নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন শ্রীঅরুণকুমার সরকার।

'রাজা অয়াদিপাউস' : শ্রীশম্ভু মিত্র অনূদিত আলোড়নসৃষ্টিকারী নাটক 'রাজা অয়াদিপাউস' সম্প্রতি কোন্নগরে পরিবেশিত হল। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন কোন্নগর সাংস্কৃতিক পরিষদের শিল্পীরা। বলা যেতে পারে সামগ্রিকভাবে নাটকটির প্রয়োজনা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দই হয়েছিল। এর জন্য বেশ খানিকটা কৃতিত্বের দাবী রাখেন নাট্যনির্দেশক কমল পাল। নামভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও হয় বেশ মর্মস্পর্শী। শক্তি মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রেয়ান' ও সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের 'তাইরেসিয়াস' দুটি স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চরিত্রচিত্রণ।

অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন শেলী পাল, সুশান্ত পাল, বিজয় রায়, বীরেশ চক্রবর্তী, শেখর সরকার, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, রুমা দে, মাঃ হিমাংশু।

নয়া মিছিল/শাওলী মিত্র

জীবন সৈকতে/সৌমিত্র এবং অপর্ণা

আলোকসম্পাতে মাঃ লাল গভীরতম শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন।

মিলন সঙ্ঘের 'মুকুট' : ঢাকুরিয়া মিলন সঙ্ঘের কিশোর সদস্যরা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটকের অভিনয় করলেন। পার্থ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকের প্রযোজনা নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সুবিমল ঘোষ, স্বপন ভট্টাচার্য, দেবাশীষ দত্ত, অনিন্দ্য দাস, প্রদীপ মিত্র, সুধীর গুপ্ত, অমিতাভ সেন, সৌমিত্র বসু, সুমথ ঘোষ, বাবুলাল দাস, অরুণ দত্ত, দুলু দাস, প্রদীপ মুখার্জি, রামাউতার সাউ।

ধ্রুপদী নাট্যসংস্থা

একটি নতুন নাট্যসংস্থা গঠিত হয়েছে, নাম 'ধ্রুপদী'। 'ধ্রুপদী' কবিতা পত্রিকার এটি নাট্যশাখা। নাম দেখে এবং কবি ও কবিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখে, আমাদের আশা যে, এই সংস্থার কাছ থেকে আমরা উজ্জ্বল নাটক পাব।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে সম্প্রতি শ্রীযুক্তা চিত্রিতা দেবীর গৃহে এই সংস্থার উদ্বোধনী সভা হয়। সভায় অনেক নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক উপস্থিত ছিলেন যথা—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় সরকার, শ্রীনবগোপাল দাস, শ্রীপার্থসারথি চৌধুরী, শ্রীচণ্ডী সেনগুপ্ত, শ্রীশৈবাল চক্রবর্তী।

সভাপতির ভাষণে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ আশা প্রকাশ করেন যে, এই সংস্থার সঙ্গে উৎসাহী ও উদ্যোগী সাহিত্যিকেরা যখন যুক্ত আছেন তখন এঁরা ভিন্নজাতের ও ভিন্নস্বাদের নাটক উপহার দিতে পারবেন। উপস্থিত সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই সভাপতির উক্ত সমর্থন করেন।

জয়দেব নাট্যাভিনয়

গত ১লা মে সুপ্রাচীন সৌখিন নাট্যসংস্থা রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির সাংস্কৃতিক শাখার সভাবৃন্দ তাঁদের ভক্তিমূলক নাট্যার্ঘ 'জয়দেব' অভিনয় করলেন উত্তর দমদম হরিসভার আহ্বানে। সুন্দর অভিনয়শৈলী ও মধুর সুরমূর্চ্ছনার সমন্বয় সংগতির ফলে নাটকটি শুরু থেকেই সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। বিশেষ করে মনে দাগ রাখে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অল্প বয়স্কা কুমারী শর্মিষ্ঠা ঘোষ ও জয়দেবের ভূমিকায় শ্রীআশীষ ভট্টাচার্যের অভিনয়। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন কানাইলাল ঘোষ (নিরঞ্জন), সুনীতি দাস (পদ্মাবতী), কালাচাঁদ ঘোষ (সভাপণ্ডিত), বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (লক্ষ্মণ সেন), ঝুমা ঘোষাল (অরুণা), অনাদি ভট্টাচার্য (বিমলা), রেণুকা দেবী (সুমতি), কার্তিক দাস (সুদেব), শিবসুন্দর সিংহ (দিগম্বর) ও দীপালী দাস (বসন্ত)। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সর্বশ্রী রাধিকামোহন মুখোপাধ্যায়, অমর ঘোষ, রবীন দে, দুলাল ঘোষ (রাজগুরু), মন্দির দাস, কুমকুম ঘোষাল, জয়া ঘোষ, শিপ্রা দাস, শিখা দাস, রিণা দাস প্রভৃতি। পরাশরের ভূমিকায় শ্রীপ্রভাত ঘোষ অপূর্ব সংগীতলহরীর মাধ্যমে ভক্তদর্শকমণ্ডলীকে আপ্লুত করে তোলেন। সমগ্র নাটকটি শ্রীশশাঙ্ক ভট্টাচার্যের সুপরিচালনায় সার্থক হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্র সদনে : জিন্দের বন্দী

এবার ট্রাক্টারস ইণ্ডিয়া এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব রবীন্দ্র সদনে নিবেদন করেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জিন্দের বন্দী, গত ২২ এপ্রিল। আলোকসম্পাতে, দৃশ্যসজ্জায় এবং যন্ত্রসঙ্গীতে যথেষ্ট ত্রুটি ঘটেছিলো। অনেক সময়তো শিল্পীদের আলোর অভাবে তাদের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ স্পষ্ট দেখা যায় নি। সর্দার ধনঞ্জয় ক্ষেত্রীর অভিনয় দেখে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যান। অভিনয় করেছিলেন শ্রীহরবিলাস চক্রবর্তী। শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেন দ্বৈতভূমিকায় অর্থাৎ শঙ্কর সিং আর গৌরীশঙ্করের। ময়ূরবাহন এবং উদিত সিং চরিত্রে দক্ষতার

পরিচয় দেন যথাক্রমে শ্রীঅজিতকুমার মজুমদার আর শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ। শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায় ভবানীপ্রসাদ চরিত্র সুঅভিনয়ে দর্শকদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন।

স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন চরিত্রাভিনেতার কৃতিত্বের উল্লেখ না করে বলা যায়, সামগ্রিকভাবে দলগত অভিনয় প্রশংসা-যোগ্য। নাটকটি পরিচালনার কৃতিত্ব হলো ইন্দ্র রায়ের। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন শ্রীডবলিউ উইলিয়ামশন, ম্যানেজিং ডাইরেকটার, ট্রাকটারাস ইণ্ডিয়া লিঃ আর মিসেস উইলিয়ামশন পুরস্কার বিতরণ করেন।

ক্যালকেমিকোর 'একটি পয়সা'

গত ১১ই এপ্রিল '৭২ ত্যাগরাজ হলে ক্যালকেমিকো ইনস্টিটিউটের সারস্বত সম্মেলন উপলক্ষে সংস্থার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'একটি পয়সা' নাটক অভিনীত হয়। বহু অভিনীত এই যাত্রার নাটকে রূপান্তর ও পরিবেশনার গুণে দর্শকমণ্ডলী তৃপ্তি লাভ করেন। শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীকার্তিক ভট্টাচার্য পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। দিবাকর, শুভঙ্কর, হীরালাল, ঘোষাল, অশোক ও বদ্রীপ্রসাদের ভূমিকায় যথাক্রমে সর্বশ্রী জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, প্রফুল্লকুমার সিংহ, পঞ্চানন ব্যানার্জি, সত্যব্রত মৌলিক, তপন লাহিড়ী ও উমাশঙ্কর চ্যাটার্জি খুবই দক্ষতার পরিচয় দেন। অন্যান্য ভূমিকায় সর্বশ্রী শ্যাম মৈত্র, হিরণ্ময় মজুমদার, প্রবোধ রায়চৌধুরী, সুকৃতিমোহন ভৌমিক, শৈলেন মৈত্র, নিত্যানন্দ অধিকারী, বাপী সিংহ চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেন। স্ত্রী-ভূমিকায় সুধামুখী, শবরী, রাঙাবৌ মৌসুমীর অভিনয়ে যথাক্রমে রাজলক্ষ্মী (ছোট) আরতি ঘোষ, রাণী ব্যানার্জি, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি সুঅভিনয় করেন। আলোকসম্পাতে শ্রীদিলীপ ঘোষ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। ব্যবস্থাপনায় সর্বশ্রী তারাদাস ব্যানার্জি, গৌর ভট্টাচার্য ও সমর মুখার্জি কৃতিত্বের দাবী রাখেন।

আর্ট থিয়েটার—কাঁচড়াপাড়া

১৫ই এপ্রিল শনিবার ১৯৭২, রেলওয়ে আর্ট থিয়েটারের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক তুলসী লাহিড়ী রচিত ব্যঙ্গ নাটক 'মণিকাঞ্চন' পরিবেশিত হয় রেল রঙ্গমঞ্চে। নাটকটির সুষ্ঠু রূপায়ণ দর্শকদের সহর্ষ অভিনন্দন লাভ করে। গণপতির ভূমিকায় অনিল মুখার্জির অভিনয় মনে রাখবার মত। শিশু শিল্পী দীপ্তি দত্ত ও রিংকু মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছে। এছাড়া, নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কালী ভৌমিক শৈলেন রায়, নিধি ব্যানার্জি, ভজন দাশগুপ্ত ও যূথিকা বসু। পরিচালনা সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বয়েজ ক্লাব

স্বরূপগঞ্জ বয়েজ ক্লাবের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ২২ এপ্রিল শনিবার স্বরূপগঞ্জ বারোয়ারী প্রাঙ্গণে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সেনগুপ্ত। উদ্বোধনী ভাষণে মনোজ বসু সংঘের উন্নতি কামনা করে তাঁর বক্তব্য রাখেন। এরপর সংঘের সভ্যবৃন্দ শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'কাম্প ফ্রি' মঞ্চস্থ করেন। দলগত অভিনয়ের গুণে নাটকটি দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন: দিলীপ বিশ্বাস, মলয় পাল, অজন্তা কর, অমিত বিশ্বাস, দুলাল দাস, হরিপদ আচার্য, প্রশান্ত ঘোষ, ভোলানাথ হালদার, জয়ন্ত মজুমদার, মনোজ বসু, স্বপন দে ও সাধন কুণ্ডু।

ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট

দর্শক

আয়ান চ্যাপেলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড সফর শুরু হয়ে গেছে। ১৯৭২ সালের এই ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে যে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হবে তা এই দুই দেশের ৫১তম টেস্ট সিরিজ, অপরদিকে ইংল্যান্ডের মাটিতে উভয় দেশের ২৫তম টেস্ট সিরিজ।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয় ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ। দুই দেশের এই খেলাটিই আবার পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা। ১৮৭৭ সালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জিতেছিল। ইংল্যান্ড স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে ওভালে, ১৮৮০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। এই খেলায় ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে জয়ী হয়। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম জয় ১৮৮২ সালের ওভালে, ৭ রানে। অস্ট্রেলিয়ার এই জয় খুবই অপ্রত্যাশিত এবং এই জয়কে কেন্দ্র করে যে 'এ্যাসেজ' কথার ব্যবহার হয় তা শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় অমরত্ব লাভ করেছে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার এক নতুন নামকরণ হল—'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ' অর্থাৎ 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'।

১৮৬১ সালের ১৮ই অকটোবর সারে কাউন্টির এইচ এইচ স্টিফেনসনের নেতৃত্বে ইংলিশ ক্রিকেট দল প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রথম ইংল্যান্ড সফরে এসেছিল চার্লস লরেন্সের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার ওয়েরামব্রুক উপজাতি ক্রিকেট দল ১৮৬৮ সালে। এই দলে ছিল ১৩ জন উপজাতি খেলোয়াড়। ইংল্যান্ড সফরে এই দলটি যে ৪৭টি ম্যাচ খেলেছিল তার ফলাফল দাঁড়ায় : জয় ১৪, হার ১৪ এবং ড্র ১৯। অস্ট্রেলিয়া থেকে শ্বেতকায় ক্রিকেট দলের প্রথম ইংল্যান্ড সফর ১৮৭৮ সালে, ডি ডবলিউ গ্রেগরীর নেতৃত্বে। এই সফরে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : মোট খেলা ৩৭, জয় ১৮, হার ৭ এবং ড্র ১২ (প্রথম শ্রেণীর খেলা ১৫, জয় ৭, হার ৪ ও ড্র ৪)।

১৯৪৮ সালে অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ডন ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেয়—'রাবার' জয় এবং ইংল্যান্ড সফরে প্রথম অপরাজেয় সম্মান লাভ (মোট খেলা—৩৪, জয় ২৫, ড্র ৯, হার ০)।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা উপলক্ষ্য করে গত ৯৫ বছরে ঐতিহ্যের যে সুমহান সৌধ গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে তার তুলনা নেই। আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা ২০০তম সংখ্যায় পূর্ণতা লাভ করে বর্তমানে ২১৩তম সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে।

ছাই নিয়ে যুদ্ধ

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আর এক নাম—'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'। অস্ট্রেলিয়ার দুই খেলোয়াড়—স্পফোর্থ এবং মাসাই এই অদ্ভুত নামকরণের হেতু হয়েছিলেন। ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠে মাসাই এবং স্পফোর্থ যদি না খেলতেন তাহলে এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে 'ছাই' কথার আবির্ভাব হত কি? মাসাই উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান (৫৫) করেন এবং স্পফোর্থ ৯০ রানে ১৪টা উইকেট পেয়েছিলেন। এই দুজনের বিরাট সাফল্য পুঁজি করেই অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়েছিল। পর্যাপ্ত সময় হাতে পেয়েও ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৫ রান তুলতে পারেনি। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৭৭ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৭ রানে জিতে যায়। ইংল্যান্ডের এই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ বোলার স্পফোর্থ ৪৪ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের বাড়া ভাতে 'ছাই' দিয়েছিলেন।

বিবিধ রেকর্ড

একটি খেলায় সর্বাধিক মোট রান

১,৭৫৩ রান (৪০ উইকেটে), এডিলেড, ১৯২০-২১

একটি খেলায় সর্বনিম্ন মোট রান

(পুরো চার ইনিংসের খেলায়)

২৯১ রান (৪০ উইকেটে), লর্ডস, ১৮৮৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ৯০৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ), ওভাল, ১৯৩৮ (আজও বিশ্ব রেকর্ড)

ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)

আয়ান চ্যাপেল
অধিনায়ক : অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া : ৭২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ), লর্ডস, ১৯৩০

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬, বার্মিংহাম, ১৯০২

ইংল্যান্ড : ৪৫, সিডনি, ১৮৮৬-৮৭

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ৩৬৪ রান—লেন হাটন, ওভাল, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪ রান—ডন ব্র্যাডম্যান, লিডস, ১৯৩০

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

(ব্যক্তিগত রানের সমষ্টি)

অস্ট্রেলিয়া : ৯৭৪ (গড় ১৩৯-১৪)—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০ (আজও বিশ্ব রেকর্ড)

ইংল্যান্ড : ৯০৫ (গড় ১১৩·১২) ওয়াল্টার হ্যামন্ড, ১৯২৮-২৯

সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রান

অস্ট্রেলিয়া : ৫,০২৮ রান—ডন ব্র্যাডম্যান (খেলা ৩৭, ইনিংস ৬৭, নটআউট ৭ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ১৯ এবং গড় ৮৯·৭৮)

ইংল্যান্ড : ৩,৬৩৬ রান—জ্যাক হবস (খেলা ৪১, ইনিংস ৭১, নটআউট ৪ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৮৭, সেঞ্চুরী [illegible] গড় ৫৪·২৬)

সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৯টি—ডন ব্র্যাডম্যান

ইংল্যান্ড : ১২টি—জ্যাক হবস

এক সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

১৭টি, (অস্ট্রেলিয়া ৯ এবং ইংল্যান্ড ৮), অস্ট্রেলিয়াতে, ১৯২৮-২৯

খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

১৭৬ ও ১২৭—হার্বার্ট সাটক্লিফ, মেলবোর্ন, ১৯২৪-২৫

১১৯* ও ১৭৭—ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, এডিলেড, ১৯২৮-২৯

১৪৭ ও ১০৩*—ডেনিস কম্পটন, এডিলেড, ১৯৪৬-৪৭

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

১৩৬ ও ১৩০—ডবলিউ বাড্সলে, ওভাল, ১৯০৯

১২২ ও ১২৪*—আর্থার মরিস, এডিলেড, ১৯৪৬-৪৭

একটি সিরিজে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরী

ডন ব্র্যাডম্যান : ২৫৪ (লর্ডস, ৩৩৪ (লিডস) ও ২৩২ (ওভাল) ১৯৩০ সালের সিরিজ (আজও বিশ্ব রেকর্ড)

লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (৩ জন) :

(১) ভি টি ট্রাম্পার (১০৪ রান), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯০২

(২) সি জি ম্যাকার্টনি (১৫১ রান), লিডস, ১৯২৬

(৩) ডন ব্র্যাডম্যান (৩৩৪ রান), লিডস, ১৯৩০

দ্রষ্টব্য : যে রানের মাথায় খেলোয়াড় আউট হন তা বন্ধনির মধ্যে দেওয়া হল।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আজও কোন খেলোয়াড় লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করতে সক্ষম হননি।

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৭টি সেঞ্চুরী, নটিংহাম, ১৯৩৮

ইংল্যাণ্ড : ৪টি (২১৬ নটআউট পেণ্টার, ১২৬ বার্নেট, ১০২ কম্পটন এবং ১০০ হাটন)

অস্ট্রেলিয়া : ৩টি (২৩২ ম্যাককেব, ১৪৪ নটআউট ব্র্যাডম্যান এবং ১৩৩ ব্রাউন)

টেস্ট খেলার ফলাফল

স্থান	খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	খেলা ড্র
ইংল্যাণ্ড	৯৬	২৬	২৫	৪৫
অস্ট্রেলিয়া	১১৪	৪২	৫৫	১৭

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

স্থান	সিরিজ	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	সিরিজ ড্র
ইংল্যাণ্ড	২৪	১২	১০	২
অস্ট্রেলিয়া	২৬	১০	১২	৪
মোট :	৫০	২২	২২	৬

টেস্ট খেলার ফলাফল

(ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন মাঠে)

মাঠ	মোট খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	খেলা ড্র
ওভাল	২৪	১২	৪	৮
লর্ডস	২২	৫	৮	৯
ম্যাঞ্চেস্টার	২০	৪	৪	১২
নটিংহাম	১১	২	৩	৬
লিডস	১৪	২	৫	৭
বার্মিংহাম	৪	১	০	১
শেফিল্ড	১	০	১	০
মোট :	৯৬	২৬	২৫	৪৫

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউণ্ডারী

৪৬টি (৩৩৪ রানের মধ্যে) : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), লিডস, ১৯৩০ (আজও বিশ্ব রেকর্ড)

ব্যক্তিগত ৩০০ রানের ইনিংস

অস্ট্রেলিয়া : ডন ব্র্যাডম্যান—৩৩৪ রান (লিডস, ১৯৩০) এবং ৩০৪ (লিডস ১৯৩৪); ববি সিম্পসন—৩১১ রান ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৬৪); বব কাউপার—৩০৭ রান (মেলবোর্ন ১৯৬৫-৬৬)

ইংল্যাণ্ড : লেন হাটন—৩৬৪ রান (ওভাল, ১৯৩৮)

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

৩০৯ রান : ডন ব্র্যাডম্যান, লিডস, ১৯৩০ সালের ১১ই জুলাই (আজও বিশ্ব রেকর্ড)

দ্রষ্টব্য : প্রথম দিনের (১১ই জুলাই, ১৯৩০) ৩৪০ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ৪৫৬ রানের মধ্যে ব্র্যাডম্যান একাই ৩০৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ৩৩৪ রান করে আউট হন।

একদিনে সর্বাধিক রান

৪৭৫ রান (২ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়া, প্রথম দিন ওভাল, ১৯৩৪

দীর্ঘতম ব্যক্তিগত ইনিংস

৮০০ মিনিট : লেন হাটন, ওভাল, ১৯৩৮। এই সময়ে হাটন ৩৬৪ রান করে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য জয়

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : এক ইনিংস ও ৫৭৯ রানে (ওভাল, ১৯৩৮)—আজও বিশ্ব রেকর্ড

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : এক ইনিংস ও ৩৩২ রানে (ব্রিসবেন, ১৯৪৬-৪৭)

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

৪৬টি (গড় ৯·৬০)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), ১৯৫৬; ৩৬টি (গড় ২৬·২৭)—এ মেইলী (অস্ট্রেলিয়া), ১৯২০-২১

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

১৯টি (৩৭ রানে ৯ ও ৫৩ রানে ১০)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৬ (আজও বিশ্ব রেকর্ড)

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

১০টি (৫৩ রানে)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ (আজও বিশ্ব রেকর্ড)

৯টি (১২১ রানে)—এ মেইলী (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ন, ১৯২০-২১

হ্যাটট্রিক

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে (৩জন) :

(১) ডবলিউ বেটস (মেলবোর্ন, ১৮৮২-৮৩),

(২) জে ব্রিগস (সিডনি, ১৮৯১-৯২) এবং

(৩) জে টি হিয়ার্নি (লিডস, ১৮৯৯)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (২ জন) :

(১) এফ আর স্পফোর্থ (মেলবোর্ন, ১৮৭৮-৭৯) এবং (২) এইচ ট্রাম্বল ২ বার (মেলবোর্ন, ১৯০১-২ ও মেলবোর্ন ১৯০৩-৪)

একটি খেলায় সর্বাধিক ডিসমিস্যাল

৯টি (কট ৮ ও স্টাম্পড ১)—জি আর ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া), লর্ডস, ১৯৫৬ (আজও বিশ্ব রেকর্ড)

এক সিরিজে সর্বাধিক ডিসমিস্যাল

২৪টি (কট ২১ ও স্টাম্পড ৩)—এ. পি. ই. নট (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৭০-৭১।

টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই জয়

অস্ট্রেলিয়া ১৯২০-২১ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়ারউইক আর্মস্ট্রংয়ের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে এই দুর্লভ সম্মান প্রথম লাভ করে। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে এ ধরনের নজির আর নেই।

* নট আউট

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

৩ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 19th May, 1972 শুক্রবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

এক নজরে

লজ্জার কিছু নেই : ক'দিন আগে রাজধানীতে ভারতীয় সাধু সমাজের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন পৌরোহিত্য করছিলেন তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক সাধু সে সভায় উপস্থিত হয়ে সকলকে হতবাক করে দেন। সে দিগম্বরকে সভায় প্রবেশে বাধাদানের কোন উপায় ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন বাহান্নজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ঐ সাধু সমাজের অন্যতম সদস্য এবং সেকারণে সভায় সসম্মানে আমন্ত্রিত।

এটি অবশ্যই একটি নজরকাড়া সংবাদ, কিন্তু এর জন্য সভ্যতাভিমানী ভারতবাসীর লজ্জা পাওয়ার কোন বিশেষ কারণ আছে বলে মনে করি না। বরং বিশ্বজুড়ে নগ্নতাবাদ যে সর্বাধুনিক ফ্যাশন হয়ে দেখা দিয়েছে ভারতকে তার পথিকৃৎ ভেবে কিছুটা শ্লাঘা বোধ করা যেতে পারে। কদিন আগের খবর, আমেরিকায় যে 'সান-বেদিং এসোসিয়েশন' আছে সেখানে পাঁচ ডলার টিকিটের বিনিময়ে যে কোন লোককে প্রবেশাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ঐ এসোসিয়েশন হল ১৩০ নরনারীর একটি বিচ্ছিন্ন, অরণ্য পরিবৃত উপনিবেশ। ঐ সূর্যস্নাত উপনিবেশীরা সেখানে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি-আশ্রিত হয়ে দিনাতিপাত করেন। অনভিজ্ঞ দর্শকরা সেখানে প্রথম প্রথম পরিচ্ছদসহ প্রবেশের অনুমতি পাবেন, কিন্তু যাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করবেন তাঁদের 'আদম ও ইভ' আইন মেনে চলতে হবে। এসোসিয়েশনের সভাপতি রবার্ট জনসন বলেছেন, বনবাসী দার্শনিক হয়ে না থেকে তাঁরা এখন মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে চান।

ঐ রকম আর একটি খবর পশ্চিম জার্মানী থেকেও এপ্রিল মাসের মাঝের দিকে পাওয়া গেছে। সেখানকার ইউসবাডেন শহরের পাবলিক সুইমিং পুলে নরনারীদের এক সঙ্গে নগ্ন অবস্থায় স্নান ও জলকেলীর সুযোগ দেওয়া হলে নগ্নতাবাদের সমর্থকরা বেশ শান্তভাবে ও সুশৃঙ্খলার সঙ্গে তার সুযোগ নেন। ৬৭২ জন নরনারী সারিবদ্ধ হয়ে ঐ সুইমিং পুলে প্রবেশ করেন এবং সাগ্রহী দর্শক সমাবেশে সে স্নানপর্ব বেশ ভালভাবেই সমাধা হয়। সুইমিং পুল কর্তৃপক্ষ পরে জানান যে, টিকিট কেটে ঐ স্নানলীলা দেখতে যারা দর্শক গ্যালারী পূর্ণ করে তাদের মধ্যে তরুণদের তুলনায় মধ্যবয়স্ক ও প্রৌঢ়দের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী।

খুনের খতিয়ান : সারা ভারতের পক্ষে একটি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সংবাদ, খুন এদেশের প্রায় সকল রাজ্যেই দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। তবে যাঁরা ভাবছেন, আর পাঁচটা তালিকার মতো এ তালিকারও শীর্ষস্থানটি পশ্চিমবঙ্গ দখল করে আছে তাঁরা কিন্তু ভুল করেছেন। সম্প্রতি '৬৮, '৬৯ ও '৭০ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে খুনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, একাজে শীর্ষস্থানাধিকারী রাজ্য হল উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থান নবম। উত্তরপ্রদেশের লোকসংখ্যা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক কম লোক বাস করে যেসব রাজ্যে সে রাজ্যগুলিও মানুষ খুনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। মোটামুটি হিসাবে ১৯৬৮ সালে সারা ভারতে লোক খুন হয়—১৩ হাজার ৮৪১, পরের বছর ১৪,৭৩২ এবং ১৯৭০ সালে ১৫,৭০৪। ঠিক এই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে উত্তরপ্রদেশে ঐ তিন বছরে খুন হয়েছে ২,৯২৮ জন, ৩,১৪৭ জন ও ৩,৫০২ জন। উত্তরপ্রদেশের পরে স্থান মধ্যপ্রদেশের, ভৌগোলিক আয়তনে যে রাজ্যটি বৃহত্তম হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে যার স্থান ষষ্ঠ। মধ্যপ্রদেশের এই দ্বিতীয় স্থান অর্জনের পিছনে চম্বলের ডাকাতদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। মধ্যপ্রদেশে ঐ তিন বছরে খুনের সংখ্যা ১,৬৭৭ জন, ১৭৩৯ জন ও ১৭২৫ জন। তারপর আছে যথাক্রমে বিহার, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহীশূর, গুজরাট এবং তার পরে পশ্চিমবঙ্গ। উল্লেখিত রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহীশূর ও গুজরাটের লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কম এবং জনসাধারণ্যে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশী শান্ত ও সুস্থির রাজ্য বলে প্রচারিত। 'পশ্চিমবঙ্গের 'অশান্তি' থেকে অব্যাহতি পেতে বহু পুঁজিও স্থানান্তরিত হয়েছে ঐ সব রাজ্যে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৮-'৬৯-'৭০ সালে মানুষ খুন হয় যথাক্রমে ৬৩১-৭০৯-১১৪০ জন। নকসালি তৎপরতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ১৯৭০ সালই ছিল পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অশান্ত বছর, এবং সে বছরই পশ্চিমবঙ্গের কুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলিতেই মহীশূর, অন্ধ্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে বড় বড় বিজ্ঞাপন প্রচার করে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের 'অশান্ত' পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে তাদের রাজ্যের 'শান্তিপূর্ণ' পরিবেশে নতুন শিল্প উদ্যোগ শুরু করার আহ্বান জানান হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ঐ বছরেও উত্তরপ্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে খুনের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ আর পুঁজিপতিদের আদর্শ রাজ্য মহারাষ্ট্রেও ঐ বছর খুন হয় ১৭২৫ জন, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে প্রায় ৬০০ বেশী। পশ্চিমবঙ্গের পরে স্থান যথাক্রমে পাঞ্জাব, আসাম, ওড়িশা, কেরল ও রাজস্থান রাজ্যের।

অপরাধের ক্রমবিবর্তন : রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে এক সমীক্ষার উত্তরে পৃথিবীর ৬৯টি রাষ্ট্র যে মতামত পাঠিয়েছে তাতে দেখা যায় যে, শতকরা ৭৫টি রাষ্ট্র অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ড রদের বিরোধী। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, সভ্যতার অগ্রগতি ও সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধেরও রূপ পরিবর্তন ঘটছে এবং মানুষ খুনই আজকের দিনে সবচেয়ে বড় অপরাধ নয়। আজকের দিনে বহু অপরাধী এমন সব অপরাধে লিপ্ত যা একাধিক মানুষের এমনকি একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমাজের জীবনকে বিপন্ন করে। এই প্রসঙ্গে হাইজ্যাকিং, ওষুধে ভেজাল প্রয়োগ, আফিং মারিজুয়ানা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের চোরাচালান প্রমুখ অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ঐসব অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিরা একসঙ্গে বহু ব্যক্তির জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। সে কারণে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের কিছুই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না। ইরানের পক্ষ থেকে জানান হয় যে, শুধু আফিং ও অন্যান্য মারাত্মক মাদক দ্রব্য চোরাচালানে লিপ্ত শতাধিক ব্যক্তিকে সেদেশে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের পর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

মানুষ খুনের জন্য প্রাণদণ্ড রহিতের চিন্তা প্রায় সব দেশেই মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি লাভ করছে, কিন্তু নিতানতুন নানা অপরাধ এ ব্যাপারে চিন্তাশীল সমাজকে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দিচ্ছে না।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

বৃহত্তর সংকটের ছায়া

এক দশক আগে ১৯৬২ সালের অকটোবরে ঠিক এ-ধরনের সংকট দেখা দিয়েছিল পৃথিবীর বুকে। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে ক্ষেপণাস্ত্রবাহী রুশ জাহাজের গতিরোধ করেছিল মার্কিন নৌ ও বিমান শক্তি। কিউবাতে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণে বাধা দানই ছিল আমেরিকার উদ্দেশ্য। সেদিনও ছিল বিশ্বযুদ্ধের আশংকা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারেই যার ভয়াবহ পরিণতি হতে পারত। একদিকে ছিলেন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ। কী হয় কী হয়, এই ছিল দুনিয়াজোড়া আশংকা। সেই আশংকা দূর করেছিলেন ক্রুশ্চেভ। তিনি আমেরিকার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হননি। ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর ক্ষেপণাস্ত্রবাহী জাহাজ। ভেঙে দিয়েছিলেন হাভানার কাছে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি আমেরিকার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক কিউবার স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি। ইয়োরোপ থেকে আমেরিকাকে সরাতে বাধ্য করেছিলেন পারমাণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি যার প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল রাশিয়া।

এক দশক পর আবার অনুরূপ একটা চ্যালেঞ্জ এসেছে রাশিয়ার কাছে। ভিয়েতনামে মুক্তিফৌজের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে আমেরিকা আবার সেই মুখোমুখি সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে। প্রেসিডেণ্ট নিকসন উত্তর ভিয়েতনামকে বোমাবর্ষণে ধ্বংস করেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। তিনি তার একমাত্র বন্দর হাইফং অবরোধ করে কার্যত গোটা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের কাছে দিয়েছেন এক চরমপত্র। এই কাজ করার কারণ হিসেবে প্রেসিডেণ্ট নিকসন যা বলেছেন তার যুক্তিগুলো যে কত অসার তা সাধারণ মানুষের কাছেও আর অজানা নেই। উত্তর ভিয়েতনাম যাতে অস্ত্রশস্ত্র না পায় এবং যাতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দেড় কোটি মানুষ কমিউনিস্টদের খপ্পরে না পড়ে ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে বাকী ষাট হাজার মার্কিন সৈন্য যাতে নিরাপদে দেশে ফিরে আসতে পারে তার জন্যই নাকি তিনি এই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিউবা ছিল আমেরিকার দরজার গোড়ায় মাত্র ৯০ মাইলের মধ্যে। সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বানালে আমেরিকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এ যুক্তি মেনে নিলেও ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে মার্কিন সৈন্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হবার যুক্তি কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, ভিয়েতনাম আমেরিকার দরজার গোড়ায় নয় এবং মার্কিন দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের সৈন্যরা সেখানে যায়নি। নিকসনের অন্য যুক্তি হল, তাঁরা চলে এলে কমিউনিস্টরা তাদের শাসন চাপিয়ে দেবে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের ওপর। কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহাবস্থানে নীতিগতভাবে আমেরিকার আপত্তি থাকলে রাশিয়া এবং অতি সম্প্রতি চীনের সঙ্গে যেচে গিয়ে ভাবভালবাসা দেখাবার গরজের হেতু কি? এ হল বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি। ১৯৫৪ সালে জেনিভা চুক্তির সময়েই যদি ফ্রান্স ও বৃটেনের মতো আমেরিকা ইন্দোচীনে বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নিত তাহলে আজ তার এই অবস্থা হত না। ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে সেখানকার মানুষ। তার জন্য নিরপেক্ষ তদারকীতে নির্বাচন হল অন্যতম পন্থা। এ বিষয়ে প্যারিসে শান্তি-আলোচনার বৈঠকে যে-প্রস্তাব আছে তা বিচার বিবেচনা না করে এভাবে বৃহৎ শক্তির দম্ভে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া অত্যন্ত নিন্দার্হ। প্রেসিডেণ্ট নিকসনের রাজনীতি যে ভুল এবং তার পরিণতি যে ভয়াবহ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকার অনেক দায়িত্বশীল নেতা এবং জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ নিকসনের এই নীতির বিরোধী। এ হল ডালেসের যুগের যুদ্ধের কিনারা ঘেঁষা নীতিতে ফিরে যাওয়া। এর দ্বারা তিনি মার্কিন সৈন্যদের নিরাপত্তা বিধান দূরের কথা তাদের আরও বিপদে ফেললেন।

আমেরিকার তুলনায় উত্তর ভিয়েতনাম হল হাতীর কাছে পিঁপড়ের মতো। তার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাইরের অস্ত্রশস্ত্রের ওপরেই যদি নির্ভর করত তাহলে অনেক আগেই মার্কিন বাহিনীর আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যেত। হাইফং বন্দর অবরোধ করে যে তাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম বন্ধ করা যাবে না তা প্রেসিডেণ্ট নিকসন যে জানেন না তা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি এই আন্তর্জাতিক সংকটের ঝুঁকি নিলেন কেন? তিনি কি মনে করেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে এভাবে চাপ দিয়ে তিনি উত্তর ভিয়েতনামীদের অভিযান বন্ধ করতে পারবেন? ভিয়েতনামীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য কত আত্মদান করতে পারে তার প্রমাণ নিশ্চয়ই আমেরিকা পেয়েছে। অন্য কারো চাপে আমেরিকার শর্তে রাজী হবার জাত ভিয়েতনামীরা নয়। হো চি মিনও বলতেন এবং এখনকার ভিয়েতনামী নেতারাও বার বার এই কথা বলেন যে, আমেরিকার সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই। ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য চলে গেলে আমেরিকার সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে কোনো বাধা থাকবে না। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ভিয়েতনামীদের এই মৈত্রীর মনোভাবকে আমল না দিয়ে সায়গনে তাঁর তাঁবেদার সরকারকে রক্ষা করার জন্য এই সাংঘাতিক পথ বেছে নিয়েছেন। শুভবুদ্ধি ফিরে না এলে এবং রাষ্ট্রসংঘ আমেরিকার এই মারমুখী হাতটাকে চেপে না ধরলে ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে আবার সংকটের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসবে।

পটভূমি

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সামনে এখন প্রধান সমস্যা, কী করে একটি সুসংহত দল হয়ে ওঠা যায়। বিধানসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে দলের যে শক্তি প্রতিফলিত হয়েছে, সংগঠনের চেহারাটা আসলে যে ঠিক ততোটা সুসংহত নয় তা কংগ্রেস নেতারাও জানেন। আর নির্বাচনের আগে (এবং পরেও) দলের যে-প্রসার ঘটেছে সেটাও ঠিক বাঞ্ছিত পথে ঘটেছে কিনা সেটা শুধু চিন্তার নয়, উদ্বেগের বিষয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য কংগ্রেসের জন্যে যখন অ্যাড হক কমিটি তৈরি হয় তখনও উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনের আগে দলকে একটা নতুন চেহারা দেওয়া। অবশ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল তারও আগে—সেই এপ্রিল থেকে। তখন বিজয় সিং নাহার ছিলেন সভাপতি। তিনি আবার ছিলেন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীও। এদিকে কংগ্রেসের নিয়ম—একই লোক সংগঠন ও সরকারে দুটি পদ আঁকড়ে থাকতে পারবেন না। এই নিয়মের ভিত্তিতে বিজয়বাবুকে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরানোর জন্যে দাবি দলের মধ্যে বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বিজয়বাবু কিন্তু দল বা সরকারের কোনো পদই ছাড়তে রাজী হননি। কোয়ালিশন সরকার মাস তিনেকও টেঁকে নি। কিন্তু বিজয়বাবুর উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ চলে গেলেও সভাপতি-পরিবর্তনের দাবি কিন্তু থেকেই গেল। নানা পরস্পর-বিরোধী সংবাদের মধ্যে অবশেষে তিনি স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তারপর নতুন সভাপতির খোঁজ সুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শোনা গেল দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আবদুস সত্তারের নাম। অ্যাড-হক ঘোষিত হওয়ার দিন কয়েক আগে দেবীবাবু সভাপতি পদের প্রার্থী হিসেবে নাম প্রত্যাহার করে নেন। সত্তার সাহেবই সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হবেন, এটাই যখন এক রকম ঠিক, তখনই অ্যাড-হক কমিটি গঠনের কথা ঘোষিত হয় দিল্লি থেকে। তবে সেই কমিটির প্রথমে আহ্বায়ক এবং পরে সভাপতি মনোনীত হন সত্তার সাহেবই।

সত্তার সাহেবের নেতৃত্বে অ্যাড হক কমিটি যে তাঁদের দায়িত্ব খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁরা বিধানসভার নির্বাচনে দলকে যে-বিপুল সাফল্য এনে দিয়েছেন তার কোনো নজির নেই। শুধু রাজ্যের রাজনীতিতে কংগ্রেসের গৌরবজয় পুনর্বাসনই ঘটেনি, পাঁচ বছরের জন্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তারও অবসান ঘটেছে। তবে যে নতুন কমিটি গঠনের দরকার হয়ে পড়ল তার মূলেও কংগ্রেসের ঐ 'একটি লোক, একটি পদ' নীতি। বিধানসভার নির্বাচনের পর দেখা গেল, কংগ্রেস সভাপতি থেকে সুরু করে সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি অ্যাড-হক কমিটির অনেকেই মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন। সংগঠনের কাজ সর্বক্ষণ দেখার মতো কোনো লোকই নেই। অন্যভাবে বললে বলা যায়, রাজ্য কংগ্রেসের সদর দপ্তরটাই যেন রাইটার্স বিল্ডিংসে স্থানান্তরিত হয়েছিল। মন্ত্রীদের পক্ষে দপ্তরের কাজ সামলে সংগঠনের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করাও সম্ভব নয়। আর সংগঠনের এই রকম প্রায় 'নেতৃত্বহীন' অবস্থা ঘটছিল ঠিক তখনই যখন একটা বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দরকার সবচেয়ে বেশি। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে নতুন ইমেজ তৈরি হয়েছিল তার ফলে কংগ্রেসে নতুন লোকের ভিড় সুরু হয়েছিল আগে থেকেই। নির্বাচনে কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্যের পর সেই ভিড় স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে যায়, কারণ বিজয়ী দলের জয়রথে লাফ দিয়ে ওঠার লোকের কখনোই অভাব হয় না। একটি হিসেবে দেখা যায় যে, মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে এ-পর্যন্ত সদস্যপদের জন্যে অন্তত লাখ পাঁচেক ফর্ম বিলি করা হয়েছে।

*

কংগ্রেসের নতুন সভাপতি অরুণ মৈত্র এবং সাধারণ সম্পাদক প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর সামনে নানা সমস্যার মধ্যে দলের এই বিস্তার একটা বড় সমস্যা। তাঁরা বোঝেন যে, নতুন যাঁরা কংগ্রেসে এসেছেন বা আসতে চাইছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের মতাদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং কংগ্রেসকে তাঁরা নতুনভাবে গড়ে তুলতেও চান। বামপন্থী রাজনীতির একটা নির্দিষ্ট বিকল্প হিসেবেই তাঁরা কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু নতুন যাঁরা কংগ্রেসে এসেছেন তাঁদের সকলের সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। অনেকে এসেছেন নিতান্তই বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। অনেকে নিছক রাজনৈতিক সুবিধাবাদের পথ ধরে।

কিন্তু দলের কাছে এখন এঁরাই প্রধান সমস্যা নন। কারণ, ক্ষমতাসীন দলে এই ধরনের লোকের ভিড় বরাবরই হয়ে থাকে। বিশেষত সি পি এম বা এস ইউ সি যে-অর্থে পার্টি কংগ্রেসকে ঠিক সেই অর্থে পার্টি বলা যায় না, তাই কংগ্রেসে এই ধরনের লোকের ভিড় করার সুবিধে বেশি। তবে সি পি এমেরও যখন বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তখন ঐ দলেও যে অনেক সুযোগ-সন্ধানী ভিড়ে পড়েছিল তাও অনেকেই জানেন। এই ধরনের লোককে চেনাও সহজ। ভাবনা তাই এঁদের নিয়ে ততোটা নয়। ভাবনা হলো আরো 'গূঢ় উদ্দেশ্য' নিয়ে যাঁরা কংগ্রেসে এসেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাঁদের নিয়ে। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল মহল থেকেই বলা হচ্ছে যে, বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের অনেকে কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তাদের উদ্দেশ্য একদিকে কংগ্রেসকে হেয় করা এবং অপর দিকে তলে তলে কংগ্রেসের শক্তি কমানো। কংগ্রেসের নাম করে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তুলে বা হামলা করে এই ধরনের লোকই কংগ্রেসের বদনাম ডেকে আনছে।

তাই দলের নতুন নেতারা এই ধরনের 'অনুপ্রবেশ' রোধ করতে বিশেষ আগ্রহী। কংগ্রেসের সদস্যপদ দেওয়ার জন্যে এখন যে নিয়মকানুন চালু আছে তা অনেক দিন আগের তৈরি। যে-রাজনৈতিক পটভূমিতে ঐ সব নিয়মকানুন তৈরি হয়েছিল সেই পটভূমি আজ আর নেই। তাই নেতারা চাইছেন নতুন সদস্য গ্রহণের আগে আরো একটু কড়াকড়ি করা হোক। সদস্য হওয়ার জন্যে যে-ফর্ম ভর্তি করতে হয় তার জায়গায় নতুন ধরনের ফর্ম চালু করা হোক। তাতে 'স্ক্রিনিং' করার সুবিধে হবে। কিন্তু ঐ সব নিয়মকানুন পাল্টানো অথবা নতুন ফর্ম চালু করার এক্তিয়ার রাজ্য কংগ্রেসের নেই। শুধু কেন্দ্রীয় নেতারাই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সে-কেউ যাতে কংগ্রেস সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে কাজ গোছাতে না পারে সেজন্যে ছবি সহ পরিচয়পত্র চালু করার প্রস্তাবও রাজ্য কংগ্রেসের কোনো কোনো মহলে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই ধরনের নিয়মকানুন চালু করে না-হয় অবাঞ্ছিত 'অনুপ্রবেশ' বন্ধ করার ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু ইতিমধ্যেই যারা ঢুকে পড়েছে অথচ যারা অবাঞ্ছিত তাদের সম্পর্কে কী করা হবে? এই ধরনের 'অনুপ্রবেশ' কংগ্রেসের যুব ও ছাত্র সংগঠনেই বেশি ঘটেছে। সুতরাং সেখানেই সমস্যা বেশি। অনেক জায়গাতেই তাই ঐ দুটি সংগঠনের কমিটি বাতিল করে দিতে হয়েছে। অবাঞ্ছিত লোকেরা যাতে ক্ষমতা দখল করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কংগ্রেসের নতুন নেতারা জেলা কংগ্রেসগুলিকে ঢেলে সাজানোর কথা ভাবছেন।

এটা কোনো গোপন কথা নয় যে, বিভিন্ন জেলায় এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের বিরোধী। তাঁরা যে দলে নতুন এসেছেন তা নয়। বরং অনেকে বেশ পুরানো। কিন্তু তাঁরা বর্তমান নেতৃত্বের ওপর খুশি নন, কারণ তাঁরা বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না। সেই ক্ষোভে তাঁদের একটি গোষ্ঠী এক লম্বা স্মারকলিপি নিয়ে দিল্লি গিয়ে দরবার পর্যন্ত করে এসেছেন। সেই স্মারকলিপিতে অনেক অভিযোগ আছে, এমন কি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ পর্যন্ত। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয়নি। কারণ দিল্লিতেও তাঁরা তেমন পাত্তা পাননি।

•

কিন্তু নতুন সদস্য গ্রহণে কড়াকড়ি অথবা বিভিন্ন জেলা কমিটিকে ঢেলে সাজালেই কি কংগ্রেস রাজনৈতিক দল
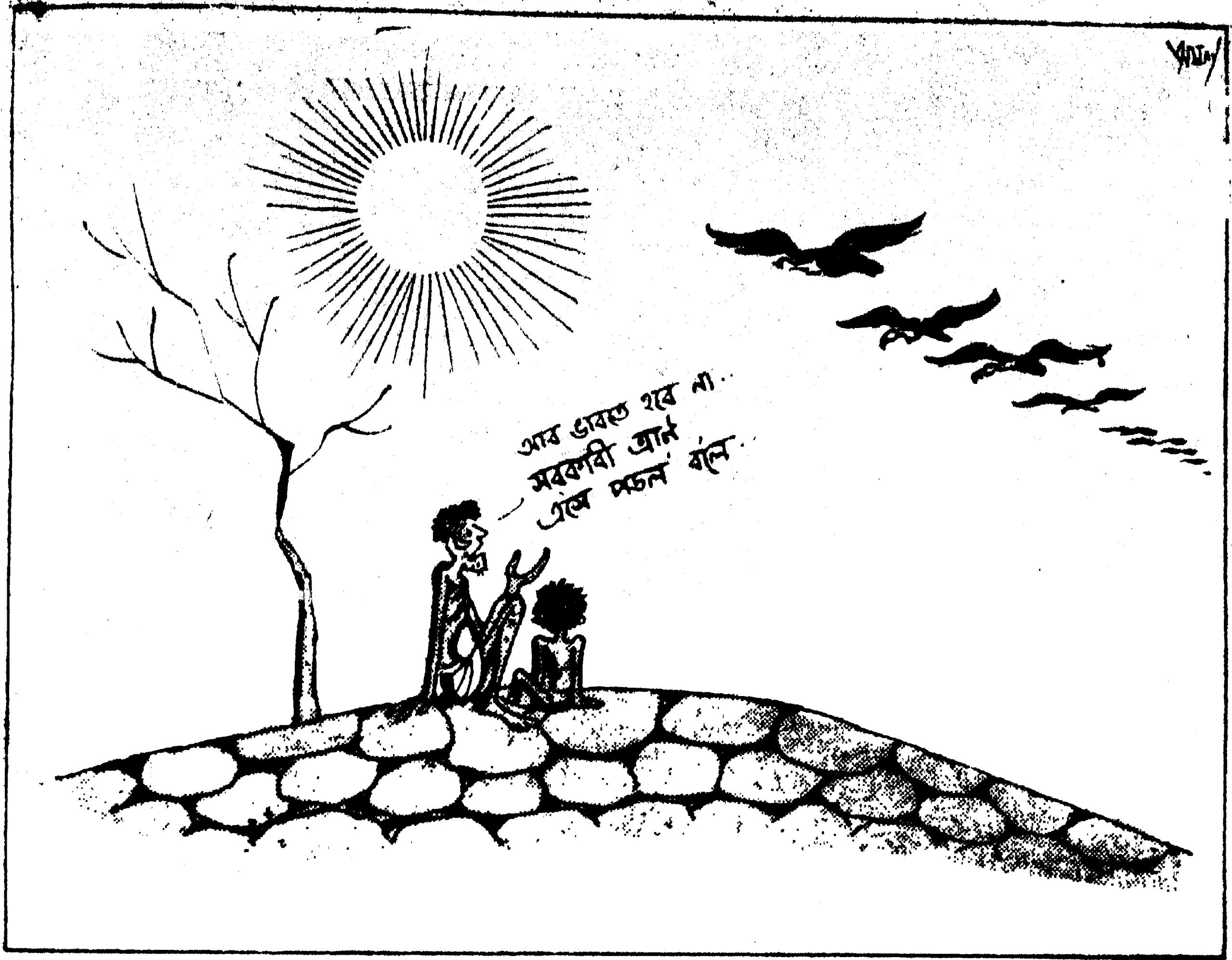
হিসেবে সুসংহত বা সংগঠিত হয়ে উঠবে? ঠিক একটা রাজনৈতিক দল বলতে যা বোঝায় কংগ্রেস যে কোনো দিনই তা হয়ে উঠতে পারে নি তার কারণ দলের ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে। গোড়ায় কংগ্রেস বলতে একটা প্লাটফর্মই বুঝিয়েছে, একটা পার্টি বোঝায় নি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারাই যোগ দিয়েছেন তারাই কংগ্রেসে এসেছেন। স্বাধীনতার আগেই অবশ্য রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্যে অনেকে কংগ্রেস ছেড়েছেন, স্বাধীনতার পরে তো বটেই। তবু কিন্তু কংগ্রেসের চরিত্রটা মোটামুটি একই ধরনের থেকে যায়—অর্থাৎ নানা ধরনের মতাবলম্বী লোক কংগ্রেস পতাকার তলে সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে কেউ সমাজবাদের স্বপ্ন দেখেছেন, আবার তাঁদের অনেকের সঙ্গে স্বতন্ত্র বা জনসঙ্ঘের লোকজনের বিশেষ তফাৎ ছিল না।

১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের মধ্যে দুটি বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রকাশ করেছিলেন নাটকীয়ভাবে। কংগ্রেস ভাগের মূলে ব্যক্তিগত কারণ ছিল না তা নয়, কিন্তু মতাদর্শের বিরোধও রীতিমতোই ছিল। তখন যাঁরা সংগঠনপন্থী বা সিণ্ডিকেটপন্থী কংগ্রেসী বলে পরিচিত হলেন তাঁদের অনেকের মানসিক মিল যে স্বতন্ত্র বা জনসঙ্ঘের সঙ্গে, তা ১৯৭১ সালে লোকসভার নির্বাচনেই খুব ভালো করে বোঝা যায়। কারণ তখন ঐসব দল মিলে একটি 'মহাজোট' তৈরি করেন।

কিন্তু তবু এখনও একথা বলা চলে না যে নতুন কংগ্রেসের মধ্যেও নানা মতের লোক নেই। বিভিন্ন উপলক্ষে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন সম্প্রতি হয়েছে চাষের জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ নিয়ে। কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল তরুণেরা বলছেন যে, কংগ্রেসেরই একাংশ ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ বানচাল করে দিতে চাইছে।

কোনো একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদকে ভিত্তি করে। কংগ্রেসের নিজস্ব কোনো মতবাদ নেই, এ-কথা কেউই বলবেন না। কিন্তু আগেই বলেছি, ঐতিহাসিক কারণেই এ-ব্যাপারে কংগ্রেস একটু ঢিলে-ঢালা। এই ধরনের ঢিলে-ঢালা ভাব কিন্তু কোনো কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব।

আশার কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নতুন নেতারা এ-সম্পর্কে সচেতন। কংগ্রেসকে যখন তাঁরা নতুনভাবে এবং সুসংহত দল হিসেবে গড়ে তুলতে চান তখন তাঁরা সদস্যদের এই আদর্শগত নিষ্ঠার কথাটাও ভুলে যেতে দিতে চান না। তাঁরা এটা বোঝেন যে এই আদর্শগত নিষ্ঠা ছাড়া কোনো দলেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে না। এই কথাটা বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে এই কারণে যে, নতুন যাঁরা কংগ্রেসে এসেছেন বা আসছেন তাঁদের অনেকেই বয়সে তরুণ। তরুণ মন স্বভাবতই একটা নির্দিষ্ট আদর্শ বা মতবাদ খোঁজে। এতদিন পর্যন্ত তরুণেরা যে কংগ্রেসের তুলনায় বামপন্থী দলগুলির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে এসেছেন তার কারণ, ঐ নির্দিষ্ট মতবাদের আকর্ষণ। বামপন্থীরা তাদের নিরাশ করেছে বলেই তারা কংগ্রেসের কাছে এসেছে। সুতরাং এখন কংগ্রেসকে একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের ওপর জোর দিতেই হবে।

রাজনৈতিক মতবাদ থাকাটাই যথেষ্ট নয়। কংগ্রেসের একটা মতবাদ তো আছেই। দরকার হলো সেই মতবাদকে সুনির্দিষ্টভাবে হাজির করা এবং প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা। একবার নয়, এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কাজ নিয়মিতভাবে চালানোও দরকার। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস নেতারা একথাটা খেয়াল করেন নি যে, শুধু সদস্য বা কর্মী সংগ্রহই যথেষ্ট নয়। তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের সামনে একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী পেশ করা খুবই দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতারা এই কাজে হাত দিয়েছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর কথাও তাঁরা ভাবছেন।

১২।৫।৭২ —দেবদত্ত

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের একাধিক অঞ্চল ছেড়ে চলে যাচ্ছে গ্রামবাসীরা

দেশে বিদেশে

ইন্দোচীনে মার্কিন নীতির মানরক্ষা ঢাকতে গিয়ে ওয়াশিংটনের নেতারা এতকাল যে কায়দায় ধাপের পর ধাপে ভিয়েতনামের যুদ্ধ তাতিয়ে এসেছেন ঠিক সেই কায়দায়ই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঐ যুদ্ধের আগুনকে আরও একটু তাতিয়ে দিলেন। কিন্তু অন্যান্য বারের তুলনায় এবারকার তফাৎ এই যে, ভিয়েতনামের লড়াইকে উপলক্ষ করে এবারই সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। ১৯৬২ সালের কিউবা সংকট পার হয়ে আসার পর আর কখনও পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি এভাবে প্রায় একটা সংঘর্ষের কিনারায় এসে দাঁড়ায় নি। যদিও বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে বলেই মনে হয়, তাহলেও কি-হয় কি-হয় ভাবটা রয়ে গেছে এবং সারা পৃথিবী রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় এখন উত্তর ভিয়েতনামের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

উত্তর ভিয়েতনামের ঐ সমুদ্রে মার্কিন বিমান থেকে ছাড়িয়ে রাখা মাইনগুলি এখন সক্রিয়। উত্তর ভিয়েতনামের বন্দর থেকে বেরোবার অথবা বন্দরে ঢোকার মুখে কোন জাহাজ ঐ মাইনের সংস্পর্শে এলেই বিস্ফোরণ ঘটবে আর সেই বিস্ফোরণের ঢেউ উত্তর ভিয়েতনামের সমুদ্র ছাড়িয়ে কতদূরে যে ছড়িয়ে যাবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

প্রকৃতপক্ষে, গত ৮ মে প্রেসিডেন্ট নিকসন যেসব ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করেছেন সেগুলির মধ্য দিয়ে একটি বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র সরাসরি আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা না করে সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, উত্তর ভিয়েতনাম এবং খাস আমেরিকা সহ সারা পৃথিবীর যুদ্ধবিরোধী মানুষদের যতখানি প্ররোচনা যোগান যায়, প্রেসিডেন্ট নিকসন তা যুগিয়েছেন। তিনি জানেন, উত্তর ভিয়েতনাম বিদেশ থেকে যেসব রসদ পায় তার শতকরা ৮০ ভাগ আসে সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে। সেকথা জেনেও তিনি হুকুম দিয়েছেন, উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরগুলির প্রবেশপথে মাইন বিছিয়ে ঐ বন্দরগুলি অবরুদ্ধ করা হবে এবং উত্তর ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ জলপথে ও আঞ্চলিক দরিয়ায় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে হ্যানয়ের রসদ পাওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া হবে। উত্তর ভিয়েতনামের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিমান থেকে বোমাবর্ষণের দ্বারা নষ্ট করে দেওয়ার আদেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন জেনেশুনেই ভিয়েতনামের যুদ্ধকে চীনের সীমান্তের অত্যন্ত কাছে নিয়ে গেছেন। অনেক লোকক্ষয়, অনেক ধ্বংস ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েও ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষদের মনোবল নষ্ট হয়নি জেনেও তিনি ঐ মানুষগুলির সামনে নতুন হুমকি রাখছেন। আমেরিকার মানুষ ভিয়েতনামের এই দীর্ঘ জয়ের সম্ভাবনাহীন যুদ্ধ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে আসতে চায় জেনেও এবং বক্তৃতায় সেকথা স্বীকার করেও প্রেসিডেন্ট নিকসন আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীকে সেই যুদ্ধের জালে আরও ভাল করে জড়ালেন। আর, যিনি নিজের দেশেরই জনমতের তোয়াক্কা করেন না তিনি বিশ্বজনমতের তোয়াক্কা করবেন কেন?

এই বেপরোয়া ঝুঁকি নেওয়ার সপক্ষে প্রেসিডেন্ট নিকসন দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত ১ কোটি ৭০ লাখ দক্ষিণ ভিয়েতনামীর উপর কম্যুনিস্ট শাসন চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রোধ করার জন্যে এবং দ্বিতীয়ত দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে ৬০ হাজার মার্কিন সৈন্য রয়েছেন তাঁদের নিরাপত্তার জন্যে নাকি এটা করার দরকার হয়ে পড়েছে।

এমনকি আমেরিকার কংগ্রেস সদস্য সংবাদপত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছেও এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, এই দুই যুক্তির কোনটিই খুব টেঁকসই নয়। ১ কোটি ৭০ লাখ দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে কম্যুনিস্ট শাসন থেকে রক্ষা করার নাম

করে আমেরিকা আসছে তাঁদের উপর বশম্বদ থিউ সরকারকে চাপিয়ে রেখেছেন। কম্যুনিস্টদের চেয়ে ঐ সরকার যে সেদেশের জনসাধারণের বেশি আস্থাভাজন তা প্রমাণিত হয়নি। যদি তাই হত তাহলে কম্যুনিস্ট অভিযানের মুখে সায়গনের প্রতিরোধ এভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত না, বিনা যুদ্ধে কোয়াং ত্রি শহর ছেড়ে সায়গন বাহিনীর সৈনিকরা এভাবে উর্দি খুলে রেখে পালিয়ে যেত না। আমেরিকান সৈনিকদের বিপদের যে কথা বলা হচ্ছে সেটাও খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। মার্কিন সেনাবাহিনীর যে ৬০ হাজার লোক এখন দক্ষিণ ভিয়েতনামে রয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র হাজার পাঁচেক হচ্ছে অস্ত্রধারী যোদ্ধা। এরাও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করছে না। এবারকার যুদ্ধে মার্কিন সেনাদের হতাহতের সংখ্যা খুবই কম। জমির ওপর লড়াই করবে শুধু থিউ বাহিনী, এটাই যদি আমেরিকার নীতি হয় তাহলে বিপন্ন এলাকাগুলি থেকে মার্কিন সৈন্যদের সরিয়ে আনা আমেরিকার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়।

এবারকার এই সঙ্কটের সঙ্গে দশ বছর আগেকার কিউবা সংকটের সাদৃশ্য কারও কারও কাছে স্বস্তিকর মনে হচ্ছে এই আশায় যে একইভাবে এবারকার সঙ্কট মিটে যাবে। কিন্তু সেই আশা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে। কারণ দুটি পরিস্থিতির মধ্যে বৈসাদৃশ্যও কম নয়। কিউবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী। সেদেশে সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি বসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপন্ন বোধ করে। একথায় তবু কতকটা যুক্তি থাকতে পারে। (অবশ্য তাহলে একথাও মেনে নিতে হয় যে, তুরস্কে মার্কিন ঘাঁটি রাশিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক।) কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামীরা সোভিয়েট ট্যাঙ্ক বা বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পেলে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী আমেরিকার নিরাপত্তা নষ্ট হয়, একথার যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়ত, কিউবা থেকে বেরিয়ে আসা সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে যতটা সহজ হয়েছে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে ততটা সহজ হবে না। কারণ, উত্তর ভিয়েতনাম সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে কিউবার মত দূরের দেশ নয়, উত্তর ভিয়েতনাম এশিয়ারই একটি দেশ এবং সোভিয়েট রাশিয়াও নিজেকে এশিয়ার দেশ বলেই গণ্য করে। তাছাড়া, আমেরিকা যেখানে তার মিত্রদের জন্য এতখানি ঝুঁকি নিচ্ছে সেখানে সোভিয়েট রাশিয়া তার মিত্রদের জন্য কতখানি ঝুঁকি নেবে সেই পরীক্ষা আজ তার সামনে রয়েছে।

তবু, কিছু পর্যবেক্ষক আছেন যারা মনে করেন যে, এই সঙ্কটের মীমাংসা করার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি সঙ্ঘর্ষের পথ এড়িয়ে বরং নতুন করে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার উপরই জোর দেবে। যাঁরা এমন মনে করেন তাঁরা কয়েকটি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। যেমন, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ঘোষণায় সোভিয়েট

আহত সহযোদ্ধাকে পিঠের ওপর নিয়ে চলেছে একজন সায়গনী সৈন্য

রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া বেশ নরম। নিকসন তিন দিনের মেয়াদি চরমপত্র দিয়েছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়াও একটি পাল্টা চরমপত্র দিতে পারত। তা সে দেয় নি। শুধু 'অবিলম্বে' অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দাবী জানিয়েছে। নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া অতীতে যেভাবে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের মস্কো সফরের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিল সেভাবে এবারও সে প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রস্তাবিত মস্কো সফর বাতিল করে দিতে পারত, কিন্তু তা দেয় নি। বরং এই পরিস্থিতির মধ্যেও সোভিয়েট বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াশিংটনে রুশ-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে গেছেন এবং বলেছেন যে, ২২ মে তারিখে প্রেসিডেন্ট নিকসনের মস্কোতে যাওয়ার প্রস্তাব বহাল আছে।

কিছু ভাষ্যকার আরও একটু এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, এই সঙ্কটের মীমাংসা কিভাবে হবে সে-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে

বোঝাপড়া আছে। যাঁরা এরকম মন্তব্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সোভিয়েট-বিশেষজ্ঞ ভিকটর জোর্জা। আমেরিকার 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' ও 'বল্টিমোর সান' পত্রিকায়ও অনুরূপ সংবাদ বেরিয়েছে।

এরকম হলে অবশ্য চীনের খুব সুবিধা হয়। এতে তার সব দিকই রক্ষা হয়। তাকে নিজের এলাকার উপর দিয়ে সোভিয়েট অস্ত্র ভিয়েতনামে পাঠাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় না, আবার আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়ার আবহাওয়া ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ঝগড়াটা বজায় রাখা যায়।

• • •

ভূমি সংস্কার সম্পর্কে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞ উলফ লাডেজিনস্কি কিছুকাল আগে লিখেছিলেন, 'ভারতে কৃষি সংস্কারের সমগ্র ইতিহাসে কোন রাজ্য কখনও প্রকাশ্যে সংস্কারের ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন নি। অন্ততপক্ষে প্রকাশ্যে কেউ অন্যায়ের সপক্ষে কথা বলে নি। ওপরে ওপরে ছকটা মেনে নিও আর কার্যত সেটা অনেকখানি পরিমাণে অগ্রাহ্য কর—এভাবেই বরাবর কাজ হয়ে এসেছে।'

জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নিয়ে কংগ্রেস দলের ভেতর ও কেন্দ্রীয় ভূমি-সংস্কার কমিটিতে যে বিতর্ক হয়ে গেল তার মধ্য দিয়ে লাডেজিনস্কির ঐ কথাগুলির সত্যতাই আর একবার প্রমাণিত হল। এই বিতর্কের সুযোগ নিয়ে দলের একাংশ বৃহৎ ভূস্বামীদের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের প্রয়াস বানচাল করার জন্যে আর একবার চেষ্টা করলেন।

বিতর্কের ইতিহাস খুবই মজার। রাজ্য সরকারগুলি যে যার খুশিমত জমির সিলিং বেঁধেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই সিলিং অত্যন্ত বেশি, একথা উপলব্ধি করে ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনে বিষয়টি বিবেচনা করা হল। মুখ্যমন্ত্রীরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করলেন। প্রথম, জমির ব্যক্তি-মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোটামুটি একই রকম করতে হবে এবং যেসব জমিতে সেচের সুবিধা রয়েছে সেসব জমির ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ সীমা অপেক্ষাকৃত কম করতে হবে।

এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্যে বিষয়টি পাঠান হল কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটিতে। ভূমি সংস্কারের কর্মসূচীর অগ্রগতির প্রতি নজর রাখার জন্যে এবং এ-বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে ১৯৭০ সালে এই কমিটি গঠন করা হয়। প্রথমে এই কমিটিতে ছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী (সভাপতি), পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, খাদ্য ও কৃষি দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভূমি সংস্কারের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। পরে কমিটিতে কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীকেও গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ও আগস্ট মাসে কমিটির দুটি বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল, অথবা আদৌ কোন সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে পরে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তবে, এবার লোকসভায় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যে রিপোর্ট দেওয়া হল তাতে কমিটির দুটি সিদ্ধান্তের কথা জানান হল। প্রথম, 'যেসব জমিতে হামেশা সেচের জল পাওয়া যায় অথবা যেসব জমিতে বছরে দুটি চাষ করার মত জল সরকারী সূত্র থেকে পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে সেই সব জমির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিতে ব্যক্তিমালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০ থেকে ১৮ একরের মধ্যে স্থির করা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে জল পাওয়ার সুবিধা, উর্বরতা, মাটির শ্রেণীভেদ, উৎপন্ন ফসল প্রভৃতি বিবেচনা করে উচ্চতর সীমা ধার্য করতে হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই এই সীমা ৫৪ একরের বেশি হবে না।' দ্বিতীয়, 'এই সিলিং সমগ্র পরিবারের ওপর প্রযোজ্য হবে।'

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এই রিপোর্ট পার্লামেন্টের সদস্যদের হাতে পড়া মাত্রই গোল বাধল। কংগ্রেস দলের কয়েকজন 'তরুণতুর্কী' বললেন, যাঁরা সরকারী সূত্র থেকে সেচের জল পান শুধু তাঁদের ক্ষেত্রেই জোতের সিলিং অপেক্ষাকৃত কম করা হবে, যাঁরা বেসরকারী সূত্র থেকে (অর্থাৎ যেমন, নিজেরা টিউবওয়েল বসিয়ে) সেচের জল পান তাঁদের ছাড় দেওয়া হবে, এমন কোন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটি নেননি, এটা কৃষি মন্ত্রণালয় নিজেরা জুড়ে দিয়েছেন। এই 'তরুণ তুর্কী'রা আরও বললেন, কমিটি এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত করতে পারেন না, কেননা, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে জমির সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারী সেচ ও বেসরকারী সেচের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

এই বিতর্ক তোলার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ভেতর বৃহৎ ভূস্বামীদের সমর্থকরা গুঞ্জন করে উঠতে থাকলেন। এই দলের মধ্যে বড় বড় জমির মালিকদের প্রাধান্য বরাবরই ছিল, নির্বাচনের পরও সেই প্রাধান্য একেবারে দূর হয়নি। যেমন, একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, পাঞ্জাবের ৬৬ জন কংগ্রেস এম-এল-এর মধ্যে ৩০ জন বড় বড় জমির মালিক। এই ৩০ জনের মধ্যে ডজনখানেকের জমির পরিমাণ খুবই বেশি আর জন তিনেক তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বৃহত্তম জমিদার বলে গণ্য। হরিয়ানা বিধানসভার ৫২ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ৩০ জন বড় জমির মালিক। কংগ্রেসের ভেতর এই সব স্বার্থের পোষকরা এই নতুন বিতর্কের সুযোগে ভূমি সংস্কারের রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করলেন। পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীরা বললেন, যাঁরা নিজেদের উদ্যোগে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের জমির সিলিং কমিয়ে শাস্তি দেওয়া হলে চাষে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যাবে। অপরপক্ষে, পরিকল্পনা কমিশন মত দিলেন যে, যাঁরা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁরাই সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরা সেচের ব্যবস্থা করতে পারেন, সুতরাং সিলিং-এর ব্যাপারে তাঁদের ছাড় দেওয়ার কোন দরকার নেই।

বিতর্কটি এখন পর্যন্ত এখানেই ঠেকে আছে। কেননা, ভূমি সংস্কার কমিটি এই বিতর্কের মীমাংসা না করতে পেরে সেটি বিবেচনার ভার মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কমিটি অবশ্য কৃষিমন্ত্রীকে তাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর কারচুপি করার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে নতুন সিলিং আইন আনা হচ্ছে। এই সব আইনে কোথাও কোথাও গুরুতর ফাঁক থেকে যাচ্ছে বলে প্রকাশ। যেমন, একই পরিবারের স্বামী স্ত্রী, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও অবিবাহিতা মেয়েরা যাতে নিজেদের নামে আলাদা আলাদা জমি লিখিয়ে পরিবার-ভিত্তিক সিলিং ফাঁক দিতে না পারে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না। (পশ্চিমবঙ্গের আইনে এই ব্যবস্থা আছে।) অন্যদিকে, আইন ফাঁকি দেওয়ার জন্য জমি হস্তান্তর করার হিড়িক পড়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশের একটি জেলাতেই জমি হস্তান্তরের জন্য কয়েক দিনের মধ্যে ১১ লাখ টাকার স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি হয়েছে বলে প্রকাশ। নিম্নতর সিলিং-এর আওতায় যাতে আসতে না হয় সেজন্য কোন কোন জমির মালিক জমি থেকে টিউবওয়েল খুলে নিচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে।

• • •

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশনে প্রসঙ্গটি নিয়ে বেশ কিছু বিতর্কের ঝড় উঠবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

• •

কংগ্রেসের ভেতর ভূস্বামীদের একজন বড় সমর্থক পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী জৈল সিং। যেসব জমিতে ট্রাক্টর চালান হয় সেগুলিতে ও সুপরিচালিত খামারগুলিতে পাঞ্জাবের ভূমিপতিরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী জৈল সিং এইসব সুবিধা ছাটাই করে জমির ব্যক্তিমালিকানা হ্রাস করতে ইচ্ছুক নন। কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটিতে তিনি সিলিং আইনের তিনটি বিকল্প খসড়া নিয়ে এসেছিলেন। তিনি পাঞ্জাবে ফিরে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে ঐ ধরনের একটি সিলিং পাশ করিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁদের মধ্যে ঐ সাক্ষাৎকার পাঁচ মিনিটেই শেষ হয়ে যায়।

এখন পাঞ্জাব বিধানসভার অধিবেশন বাড়িয়ে নতুন সিলিং আইন বিবেচনা করা হচ্ছে।

এই খবর 'ফিনান্সিয়াল একসপ্রেস' পত্রিকার।

১৩-৫-৭২ পুণ্ডরীক

আনলক ঃ আহত দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা একটি হেলিকপ্টার দেখে ছুটে যাচ্ছে অবরোধ অবস্থা থেকে মুক্তির আশায়।

ভিয়েতনাম ঃ পুরোণ যুদ্ধ, নতুন লড়াই

সুধীরকুমার সেন

১লা এপ্রিল যখন ১৭শ প্যারালেলবর্তী সৈন্যমুক্ত অঞ্চল পার হয়ে উত্তর ভিয়েতনামীদের অভিযান আরম্ভ হয়েছিল তখনই বলা হয়েছিল যে, ১৯৬৮ সালের টেট পর্বের (চান্দ্র বৎসরের সূচনা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পর্ব) পর এরকম বড় অভিযান আর হয় নি। অভিযানের শুরুতেই মার্কিন পক্ষের হিসাবমত ৩০ হাজার উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রবেশ করেছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারী সৈন্যদের প্রতিরোধ এবং মার্কিন বিমান বহরের প্রবল বোমাবর্ষণে সেই অভিযান কখনও বা শ্লথ হলেও স্তব্ধ হয় নি এবং এই লেখার সময় পর্যন্ত উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যরা রাজধানী সায়গনের উত্তর-পশ্চিমবর্তী আন লকে এসে পৌঁছেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলীয় মালভূমি বরাবর এই অভিযানে কোয়াং ট্রি দখল হয়েছে এবং হুয়ে, দানাং কোন্টুম, বিন দিন, প্লেইকু প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহর দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের হাতছাড়া না হলেও গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়ে রয়েছে। সায়গনের অদূরবর্তী (৯৬ কিলোমিটার) আন লকে যে উত্তর ভিয়েতনামীরা পৌঁছেছে তারা সম্ভবত লাওসের সীমান্তবর্তী হোচি মিন সড়ক ধরে এগিয়েছে। এবং শুধু সৈন্য নয়, ট্যাঙ্ক, কামান প্রভৃতি ভারী অস্ত্রের যে বিপুল সমাবেশ হয়েছে তার আঁচ পেয়ে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আন লকের ওপর আক্রমণে যে ট্যাঙ্ক বহর ও ভারী কামান ব্যবহৃত হচ্ছে তা নাকি কাম্বোডিয়ার রবার আবাদ থেকে বেরুচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্ত থেকে এই আবাদ মাত্র ৪৮ কিলোমিটার দূরে। অথচ এখানকার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি লেঃ জে নগুয়েন ভ্যান মিন বলেছেন যে, এখানে যে এত অস্ত্রের মজুদ হয়েছে তা তিনি জানতেন না।

আমেরিকায় গোড়া থেকেই যাঁরা প্রেসিডেন্ট নিকসনের যুদ্ধ ভিয়েতনামীকরণের নীতির বিরোধী ছিলেন তাঁরা এখন নিকসন নীতির ব্যর্থতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। অবশ্য ১৯৬৯ সালে নিকসন যখন এই নীতির কথা ঘোষণা করেন তখন তাঁর সামনে অন্য কোন পন্থা

ছিল কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জনসন ভিয়েতনামে সাড়ে পাঁচ লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েও যুদ্ধ শেষ করতে পারেন নি। ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিনী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে দেশের মধ্যে তখন আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। দেশবাসীদের এই প্রবল প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই নিক্সন ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন স্থল সৈন্যদের পর্যায়ক্রমে সরিয়ে আনার কার্যসূচী ঘোষণা করেন। তাঁর এই কার্যসূচী অনুসারে ভিয়েতনামে এখন মার্কিন স্থল সৈন্যদের সংখ্যা ষাট হাজারে পৌঁছেছে এবং অন্ততঃপক্ষে মার্কিন ঘোষণা অনুযায়ী এরা যুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন অংশ গ্রহণ করছে না। নিক্সনের নীতি অনুযায়ী লড়াইয়ে ভিয়েতনামীদের সাহায্য দানের দায়িত্ব ছিল মার্কিন সপ্তম নৌবহর এবং থাইল্যাণ্ড, গুয়াম প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত মার্কিন বিমান বহরের ওপর।

এর কিছু দিন আগে — জানুয়ারীর শেষাশেষি প্যারিসের আলোচনা বৈঠকে নিক্সনের এক শান্তি পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। এই পরিকল্পনায় ভিয়েতকং ও উত্তর ভিয়েতনামকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, আমেরিকান যুদ্ধবন্দীদের যদি মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে ভিয়েতনামে যুদ্ধের বিরতি ঘটিয়ে সমস্ত মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হবে এবং আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে ভিয়েতনামে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। নির্বাচনের এক মাস আগে প্রেসিডেন্ট থিউ পদত্যাগ করবেন।

অপরপক্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ৩রা ফেব্রুয়ারী নিক্সন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে নতুন শান্তি পরিকল্পনা পেশ করে তাতে প্রেসিডেন্ট থিউর অবিলম্বে পদত্যাগ এবং মার্কিন সৈন্য অপসারণের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার দাবী করা হয়। মার্কিন সৈন্যদের অপসারণের তারিখে মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। দেশে নির্বাচনের প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলা হয় যে, *অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর দেশে নির্বাচনের বিধি ব্যবস্থা স্থির করবে।*

বলা বাহুল্য, মুক্তিফ্রন্টের এই প্রস্তাব যথারীতি আমেরিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং প্যারিস শান্তি বৈঠকের অধিবেশন বন্ধ হয়ে যায়।

আলোচনা বৈঠকের ব্যর্থতার পরই উত্তর ভিয়েতনামীদের নতুন অভিযানের প্রস্তুতির একটা আভাস, পাওয়া যাচ্ছিল থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১লা এপ্রিল তা শুরু হয়ে যায়। প্রথমতঃ যুদ্ধ দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ১৬ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট নিক্সন হঠাৎ উত্তর ভিয়েতনামের শহরগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করার নির্দেশ দেন যা প্রায় চার বছর যাবত বন্ধ ছিল। এবং তাতেও উত্তর ভিয়েতনামীদের মনোবল হানি করতে না পেরে ৮ই মে উত্তর ভিয়েতনামের জলপ্রাঙ্গণ মাইন দ্বারা অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন যাতে কোন বিদেশী জাহাজ উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরে ভিড়ে কোন সরবরাহ না পৌঁছে দিতে পারে। মাইন সক্রিয় করার জন্য তিন দিন সময় হাতে রেখে যখন সমস্ত বিদেশী জাহাজকে উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরগুলো থেকে সরে যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয় তখন সেখানে যে ৩৬ খানা বিদেশী জাহাজ ছিল তার মধ্যে ১৬ খানাই সোভিয়েটের এবং ৫ খানা চীনের। মাইন

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী এবং পুতুল সরকারের সৈন্যবাহিনীকে যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ৩১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত গিয়া দিন প্রদেশে মুক্তিবাহিনী ৩০০ জনেরও বেশী শত্রুসৈন্যকে হত্যা, আহত অথবা বন্দী করেছে। ১০টি জলযান ডুবিয়ে দিয়েছে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করেছে এবং হাজার হাজার মানুষকে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সামিল হতে সাহায্য করেছে। ছবিতে মুক্তিবাহিনীর গুলীতে ভূপাতিত একটি মার্কিন হেলিকপ্টারকে দেখা যাচ্ছে।

সক্রিয় হওয়ার আগে পর্যন্ত কোন জাহাজই মার্কিন সতর্কবাণী মান্য করে বন্দর ত্যাগ করে নি। সোভিয়েট অবশ্য নিকসনের এই হঠকারিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সমুদ্রে জাহাজের কোনভাবে হস্তক্ষেপ না করার জন্য মার্কিনকে সতর্ক করে দিয়েছে। চীনও তার জাহাজের ওপর বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সোভিয়েটের ভাবগতি এখন পর্যন্ত অপরিজ্ঞাত হলেও উত্তর ভিয়েতনামের সমুদ্রপথ এইভাবে অবরোধ করে প্রেসিডেন্ট নিকসন যুদ্ধ বিস্তৃতির যে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এবং নিকসনের স্বদেশেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। ভারত, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতিও নিকসনের এই হঠকারিতায় শঙ্কা প্রকাশ করেছে।

অবশ্য ভিয়েতনামের যুদ্ধে হস্তক্ষেপের দুর্বুদ্ধিতার জন্য অন্যান্য প্রেসিডেন্টের তুলনায় নিকসনের দায়িত্ব সব চেয়ে কম হলেও, গত কিছু দিনের মধ্যে বিশ্ব-রাজনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং আমেরিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও যেভাবে বদলেছে তাতে তাঁর সামনে ভিয়েতনাম থেকে সোজাসুজি সরে যাওয়ার সুযোগও সম্ভবত একটা এসেছিল যা অন্যান্য প্রেসিডেণ্টের সামনে আসে নি। ভিয়েতনামের যুদ্ধের এইভাবে একটা হেস্ত-নেস্ত ঘটাবার ক্ষমতাও যে আমেরিকার হাতে নেই সেকথাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তা না হলে যুদ্ধের ভিয়েতনামী-করণের প্রশ্নও তিনি তুলতেন না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জনসনের মতই একটা সত্য তিনি স্বীকার করে নিতে রাজী হন নি যে, সমগ্র ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য উত্তর ভিয়েতনামীরা গত ২৭ বছর ধরে প্রথমে জাপানীদের সঙ্গে, পরে ফরাসী এবং এখন আমেরিকার সঙ্গে যে যুদ্ধ করছে তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যাবে না।

ভিয়েতনামের যুদ্ধের এই ২৭ বছরে পদার্পণ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই পূর্বকথা কিছু আসবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে ফরাসী শক্তির অবসান ঘটলে জাপানীরা এসে তৎকালে ফরাসী-তাঁবেদার সম্রাট বাও দাই শাসিত ইন্দোচীন দখল করে। ১৯৪৫ সালে জাপ শক্তির পরাজয়ের পর ফরাসীরা আবার ইন্দোচীনে ফিরে আসে। পর বছর কম্যুনিস্ট মুক্তি-যোদ্ধাদের নায়করূপে ভো ন্গুয়েন গিয়াপ নামে এক অজ্ঞাতপরিচয় সেনানী জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। এই যুদ্ধ চলল ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত যখন গিয়াপ (বর্তমানে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী) ডিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসীদের ওপর চরম আঘাত হানলেন। ডিয়েন বিয়েন ফুতে ফরাসী সেনাপতি আঁরি নাভারের শোচনীয় পরাজয় প্রমাণ করল যে, এশিয়ায় শ্বেতজাতি আর অপরাজেয় নয়।

এর পর ফ্রান্সের আর ইন্দোচীনে থাকার ইচ্ছা ছিল না। ফলে এই বছর ইন্দোচীনের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে জেনেভায় এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ফ্রান্স, বৃটেন, সোভিয়েট, কম্যুনিস্ট চীন, লাওস, কাম্বোডিয়া ও উত্তর ভিয়েতনাম স্বাক্ষর করল। যুক্তরাষ্ট্র ও দঃ ভিয়েতনাম সম্মেলনে যোগ দিলেও চুক্তিতে স্বাক্ষর করল না, কারণ, তাদের মতে, এতে কম্যুনিস্টদের বেশী সুবিধে দেওয়া হয়েছিল।

জেনেভা চুক্তিতে ভিয়েতনামকে ১৭শ প্যারালেল বরাবর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে সাময়িকভাবে ভাগ করা হল এবং লাওস ও কাম্বোডিয়া স্বাধীনতা পেল। ফরাসীরা তাদের সৈন্য সমস্ত রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং ভিয়েৎমিন কম্যুনিস্টরা উত্তরাঞ্চলে চলে গেল। চুক্তির আর একটা ব্যবস্থা ছিল উভয় ভিয়েতনামের সংযুক্তির জন্য দু বছরের মধ্যে নির্বাচন, যা এখনও পর্যন্ত হয় নি।

বৃটেন ও সোভিয়েট ছিল এই সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি। চুক্তির ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য ভারত, কানাডা ও পোল্যাণ্ডকে নিয়ে এক আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা হল।

কিন্তু দঃ ভিয়েতনামে শান্তি এল না। যুদ্ধশান্তির পর বেশীর ভাগ কম্যুনিস্ট চলে গেল উত্তরে রাজ্য গড়তে, কিছু রয়ে গেল দক্ষিণে। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী উত্তর ভিয়েতনামের নায়ক হোচি মিনকে অনেক-খানি ভূমি ছেড়ে দিতে হল। তবু তাঁর আশা ছিল যে, নির্বাচনে তিনি সমস্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট মার্কিন সমর্থনপুষ্ট দিয়েম চুক্তি অস্বীকার করে নির্বাচনে রাজি হলেন না। এই নির্বাচনে অস্বীকৃতিই দক্ষিণ ভিয়তনামের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে আনল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কম্যুনিস্টরা ভিয়েৎকং নাম নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল। এদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা দিয়েমের ছিল না। তিনি সাহায্য চাইলেন আমেরিকার কাছে। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। দিয়েমের সৈন্যদের গৃহযুদ্ধের মোকাবিলায় জন্য তৈরী করতে তিনশ সৈন্যের এক মার্কিন মিশন ১৯৫৫ সালে ভিয়েতনামে পদার্পণ করল। যুদ্ধ চলল এবং এরই ফাঁকে ফাঁকে ভিয়েতনামের সরকারী পটে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন ঘটতে লাগল। ১৯৬৩ সালে দিয়েম বরবাদ হলেন এবং প্রায় সপরিবারে নিহত হলেন। তারপর এলেন ন্গুয়েন খান। তারপর চান ভান হুয়ং। কাও কাই। এবং শেষ পর্যন্ত ন্গুয়েন ভান থিউ যিনি এখন প্রেসিডেন্ট। এবং এই দুর্নীতিদুষ্ট, অযোগ্য, মুমূর্ষু শাসনযন্ত্রকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য মার্কিনের সামরিক সাহায্যও ধাপে ধাপে বাড়তে লাগল। ১৯৬৫ সালে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াল ২৩ হাজারে যারা তখনও নামে উপদেষ্টা ও টেকনিসিয়ান। ঐ বছরেই জুন মাসে তাদের সংখ্যা পৌঁছল ৫১ হাজারে। তারপর '৬৬র জানুয়ারীতে ২,৬৭০০০। ঠিক এক বছর পরে ৩,৫০,০০০ হাজার। ১৯৬৮তে ৫,২৫,০০০ হাজার। এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের বিদায় পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ লক্ষ। এর সঙ্গে ছিল দক্ষিণ ভিয়েত-নামের সরকারী সৈন্য ৭ লক্ষ এবং মিত্র সৈন্য ৫৮ হাজার। অপর পক্ষে, '৬৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন পক্ষেরই হিসেব মত দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধরত উত্তর ভিয়েত-নামী ও ভিয়েৎকং সৈন্যদের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৭৮০০০। এই সময়ে ভিয়েত-নামের বাবদে মার্কিন সরকারের দৈনিক অর্থ ঢালতে হত কুড়ি লক্ষ ডলার।

এই বিপুল অর্থব্যয় ও অপরিমিত মার্কিন রক্তক্ষয় সত্ত্বেও ভিয়েতনামের যুদ্ধের কোন কিনারা করতে না পেরে প্রেসিডেন্ট জনসন পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন। নতুন প্রেসিডেন্ট নিকসনকেও দেশের এই আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ভিয়েতনামের যুদ্ধ সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ করতে হয় যার মোদ্দা কথা হল দঃ ভিয়েতনামের অপদার্থ সরকারকে টিঁকিয়ে রাখতে ভিয়েতনামীদের দিয়েই ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিকসনের সেই ভিয়েতনামীকরণের নীতি আজ ধুলোয় ধুসরিত। ভিয়েতনামীদের যুদ্ধের বহর দেখে প্রেসিডেন্ট থিউই এ পর্যন্ত তিনজন সেনাপতিকে বরখাস্ত করেছেন আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে সব সংবাদদাতারা উপস্থিত আছেন তাঁরা খবর দিচ্ছেন যে, সরকারী সৈন্যরা এমন বেসামাল অবস্থায় পালাচ্ছে যে, প্রায়ই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে পারছে না এবং উত্তর ভিয়েতনামী বা ভিয়েৎকংরা তাদেরই পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করছে।

চীনে গৃহযুদ্ধের অবসানে মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ার-ম্যান সিনেটর টাফট কমিটির বৈঠকে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে। টাফট বলেছিলেন, নানকিং পিকিং, সাংহাই প্রভৃতি শহরে আমাদের যে সব পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা দেখেছেন যে, কম্যুনিস্ট সৈন্যরা মার্কিন অস্ত্র নিয়ে কুওমিন্টাং সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়ছে। এ থেকে মনে হয় যে, আমেরিকাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল কম্যুনিস্টদের অস্ত্রশালা এবং চিয়াং কাইশেকের ভূমিকা ছিল তাদের হাতে অস্ত্র যোগানো। চীনের গৃহযুদ্ধে কুওমিন্টাং সৈন্যরা সামান্য কয়েকটা সিগা-রেটের বিনিময়ে কম্যুনিস্ট সৈন্যদের কাছে নিজেদের অস্ত্র বিলিয়ে দিয়েছে এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে। আজকে আর এক দুর্নীতিদুষ্ট অযোগ্য সরকারের যুদ্ধে অনিচ্ছুক সৈন্যরা চীনের সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেছে। থিউর পরিণতিও হয়ত চিয়াং কাইশেকের চেয়ে ভিন্নরূপ হবে না।

শিলাইদহে ২৫শে বৈশাখ : রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বাঙলাদেশের মন্ত্রী মিজানুর রহমান ও চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেমসহ মৈত্রেয়ী দেবী। —ফটো : ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড লাইফ

এবারের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

চিরঅম্লান, চিরউজ্জ্বল পঁচিশে বৈশাখ। বাঙালীর জীবনে এক জাতীয় উৎসবের দিন। একশ এগার বছর পেরিয়ে গেল, মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আজও স্বতোৎসারিত। আজও বাঙলার বুকে আন্তরিক অভিজ্ঞানের শোভাযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর আত্মার আত্মীয়। তাই তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি, তাঁর স্মৃতিকে ম্লান করে দেয় নি আমাদের কাছ থেকে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, জীবন সাধকও। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি তিনি, কোন প্রেক্ষিতে কোন ঘটনাপ্রবাহে। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের কবি অসংকোচে বলতে পারেন, 'আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো।'—সত্যিই তাই। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন।

কবিগুরুর রচনাবলী ও কর্মজীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন।

সাজাদপুর, পতিসর, কালিগ্রামে অবরুদ্ধ রবীন্দ্র প্রীতির মুক্তি ঘটেছে। রাজনৈতিক ধাঁধায় বাঙালী মানসিকতায় এসেছে বার বার বিপর্যয়। সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে মানসিকতা। সেই ঘূর্ণাবর্তে উজ্জ্বল আলোক শিখা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। দেখিয়ে দিয়েছেন কোন পথ নির্মল মঙ্গলময়।

বাঙলাদেশ, যা এক সময় ছিল পূর্ব পাকিস্তান, সেই পূর্ব বাঙলা, খণ্ড বাঙলায় ছিলেন নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ। তিনি সেই নিষেধের বেড়াজাল উত্তীর্ণ হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে-স্বাধীন দেশে এ বছর উদ্‌যাপিত জন্মজয়ন্তী উৎসব তাৎপর্যময়।

শিলাইদহ রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যের এক নির্বাক সাক্ষী। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে মনোরম পরিবেশে এ বছর তিন দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয় সাড়ম্বরে। বাঙলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন উৎসবে। এদিন উভয় বাঙলার মানুষ পুণ্যলগ্নে পদ্মা নদীর তীরে মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে, 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

মঞ্চের দু পাশে রবীন্দ্রনাথ এবং শেখ মুজিবর রহমানের ছবি। সকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড প্রধান ডঃ মযহারুল ইসলাম, জনাব শাহ মোয়াজ্জম হোসেন, মৈত্রেয়ী দেবী, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত কবিগুরুর ও কর্মজীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন।

২৫শে বৈশাখ সকালে রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্মোৎসব।
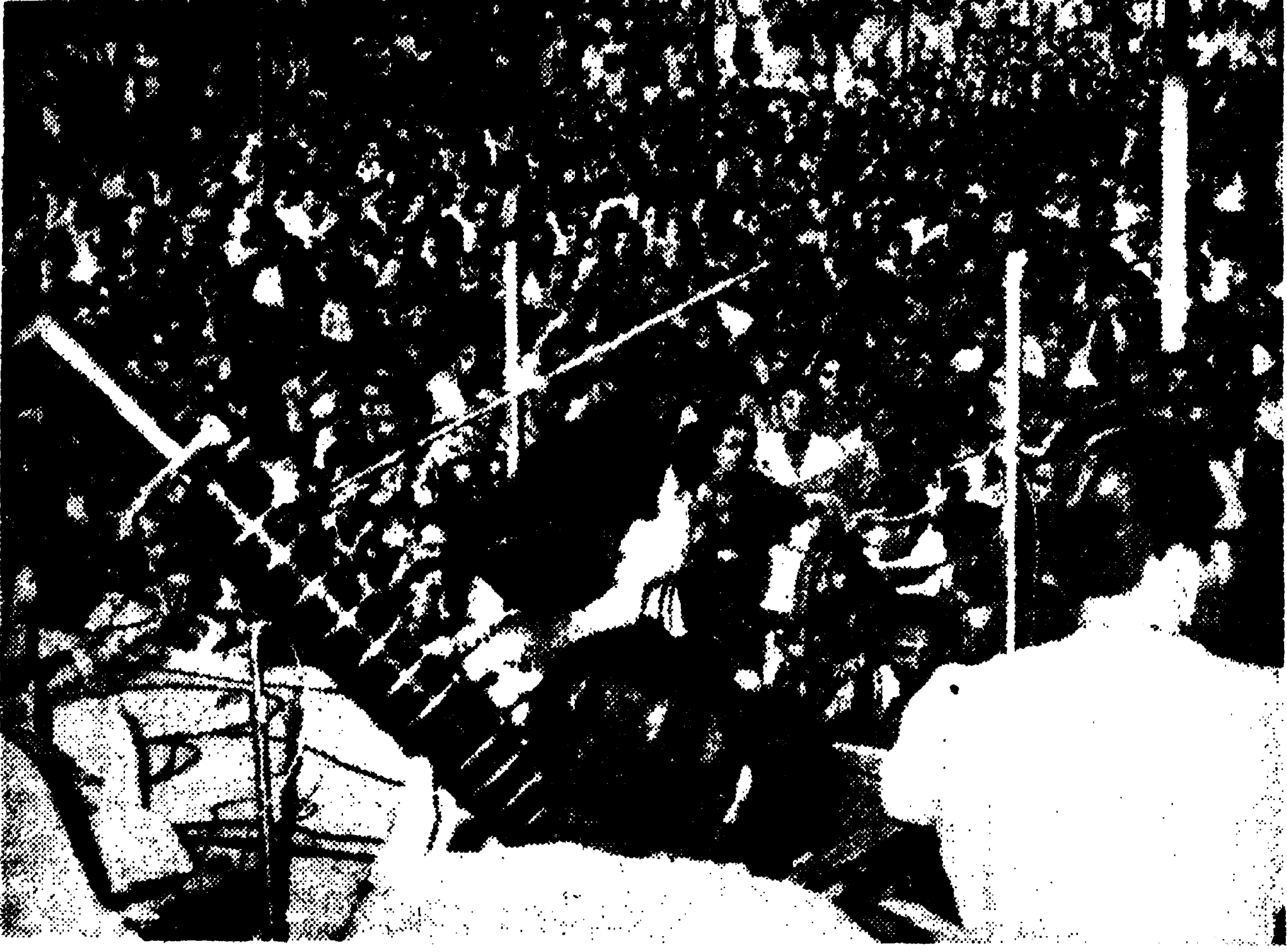
প্রধান অতিথির ভাষণে তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ীকে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন হিসাবে গড়ে তোলা হবে।' জনাব চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'পদ্মা হাউজ বোট' থেকে রবীন্দ্রনাথ যে সকল কবিতা লিখেছেন তাতে বাঙলাদেশের সত্য ছবির প্রতিফলন আছে। বস্তুত কবিগুরুর সমগ্র সৃষ্টি বাঙালীদের সর্বদাই প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। তাঁর গল্পে বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ছবি ফুটে উঠেছে। এতে বাঙলা জাতীয়তাবাদ উজ্জীবিত হয়েছে। কবিগুরু সাফল্যের সঙ্গে বাঙালীদের জীবন ও সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনিই বিশ্বসভায় বাঙালীদের পরিচয় করিয়েছেন।'

রবীন্দ্র অনুরাগী বাঙালীর কাছে আনন্দের সংবাদ, বাঙলাদেশ সরকার শিলাইদহ কুঠিবাড়ী সংস্কার করছেন। জনাব শাহ মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন কবিগুরুর কুঠিবাড়ী সংস্কার ও নির্মাণের জন্য সরকার ১৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন।

রবীন্দ্র জন্মদিনের একদিন আগে, চব্বিশে বৈশাখ বাঙলা আকাদমি জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রেরিত বাণীতে বলেন : 'নতুন পরিবেশ ও নতুন চেতনায় এবার স্বাধীন বাঙলাদেশে প্রথম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ ও অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু সত্য, শ্রেয়, ন্যায় ও স্বাজাত্যের যে চেতনা বাঙালী কবিগুরুর কাছ থেকে লাভ করেছে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে তারও অবদান অনেকখানি। বাঙালীর সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে। বাঙালী তার বুকের রক্ত দিয়ে তার রবীন্দ্র অধিকারকে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আকাদমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তার কণ্ঠে এই একই মন্তব্য শোনা গিয়েছিল : রবীন্দ্রনাথ আত্মার আত্মীয়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব, রবীন্দ্রনাথ একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন আকাদমি প্রধান কবীর চৌধুরী, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডঃ মণিরুজ্জমান এবং অধ্যাপক আকরাম হোসেন। আলোচনাসভার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রচনা থেকে পাঠ করে শোনান অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান ইমাম, ইকবালবাহার চৌধুরী, জিয়া হায়দার, গোলাম মোস্তাফা ও হাকিমভাই।

কবীর চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথের খণ্ডিত বিচার যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নানা দুঃখ কষ্টে আমরা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত নিকটে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ভারতের হয়েও একান্তভাবে বাঙলাদেশের। রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছেন এবং দেশ গঠনেও প্রেরণা জোগাবেন।

ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, রবীন্দ্রনাথকে আমরা বীর বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের বাণী সৃজনশীলতার বাণী। রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে অবলম্বন করে সৃজনশীলতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশব্যাপী তার পরিব্যাপ্তি ঘটাতে হবে।

পাকিস্তান আমলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছি—হিংস্র অস্ত্রের বিরুদ্ধে—একথা বলেন ডঃ মণিরুজ্জামান। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ উচ্চবিত্তের সংস্কৃতিকে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, আমাদের দায়িত্ব তা যতটুকু সম্ভব সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

অধ্যাপক আকরম হোসেন বাঙলাদেশ ও রবীন্দ্র চিন্তায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও বিভিন্ন সমস্যার চিন্তাধারার কথা তুলে ধরেন।

সভানেত্রীর ভাষণে ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম বলেন যে, নতুন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আর রাজনৈতিক শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার না করে সাহিত্যে ফিরিয়ে আনার আহবান জানান।

সভাশেষে সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন সনজিদা খাতুন, ইকবাল আহমেদ, তাজিম চৌধুরী, অজিত রায়, সাইফুল ইসলাম, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, ইস্তেফাক ওমর, নাসরিন হেদায়তুল ইসলাম এবং মিলিয়া ইসলাম।

নিউ বেলী রোডে গাইড ভবনে বাঙলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে গণপরিষদের স্পীকার জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের একমাত্র কবি, যার সঙ্গীত দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। পূর্বে আমরা বহু বার রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি পালন করেছি, কিন্তু এবারই সর্বপ্রথম মুক্ত বাতাসে মুক্ত আলোকে এবং মুক্ত মানুষ হিসাবে আমরা তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করার সুযোগ পেয়েছি। তাই এর একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। বিগত চব্বিশ বছর আমরা একটা নিকৃষ্ট ঔপনিবেশিক শক্তির অকটোপাশে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, কবিগুরুকে ভুলতে পারি নি। তাঁর বিশ্বপ্রেম ও জাতীয় প্রেমের মধ্যে কোন মানসিক সংস্কারের প্রাচীর ছিল না। তাঁর অসাধারণ দেশপ্রেমের মধ্যে বিধৃত হয়েছে বিশ্বের ও উদার বিশ্বমানবতার আদর্শ। মুক্ত বাংলা ভাষাকে যেমন বাঙালীর থেকে আলাদা করা যায় না তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাদ দেওয়া যায় না। আমরা যদিও আজ সোনার বাংলা ফিরে পেয়েছি, কিন্তু কবিগুরুর গানে এবং কবিতায় যে সোনার বাংলার ছবি ফুটে উঠেছে সেই সোনার বাংলা আজও ফিরে পাই নি। যেদিন আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে এ বাংলাকে প্রকৃত সোনার বাংলায় পরিণত করতে পারবো সেদিনই কেবলমাত্র কবিগুরুর স্বপ্ন সফল হবে।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচীতে ছিল গান, আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত, প্রবন্ধ পাঠ। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয় সমাপ্তিতে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের গার্ল গাইড ও রেঞ্জাররা অংশ নেয়।

মৌলবীবাজারে স্থানীয় ছাত্র লীগের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান হয় মৌলবীবাজার শহীদ সুলেমান হলে। সভাপতিত্ব করেন মৌলবীবাজার কলেজের অধ্যাপক রেবতীমোহন দাস। সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান বলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন এবং মানব জাতির জন্য তাঁর বিশ্বজনীন ভালবাসা পৃথিবীতে এক অদ্বিতীয় অবদান। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং মানিক চৌধুরী।

নরসিংদীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন বিভিন্ন সংস্থা। পশ্চিম কান্দাপাড়া নেতাজী ক্লাবের আয়োজিত উৎসবটি সব থেকে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সভাপতিত্ব করেন সরোজেন্দ্রলাল সাহা এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ভাস্কর সম্পাদক জনাব দৌলতুর রহমান আশরাফী। আবৃত্তি করেন নিরঞ্জন, সুধীর সাহা, ঝর্ণা চক্রবর্তী, নমিতা সাহা এবং তারাপদ সাহা। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন সুশীল চক্রবর্তী, কেশবলাল ঘোষ, শ্রীদাম কর্মকার দিলীপ সাহা, পরিমল কর্মকার। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহম্মদ তালেব হোসেন। প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব আশরাফী বলেন, রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলায় এই প্রথম রবীন্দ্র জন্মতিথি পালিত হচ্ছে। বৎসরান্তে ঘুরে আসে পঁচিশে বৈশাখ, ডাক দিয়ে যায় বাঙালীর ঘরে ঘরে, বাণী পৌঁছে দেয় চিরনতুনের আর নববোধনের। তাই সব মানুষের মনে আগমনী সঙ্গীত বেজে ওঠে। কবিগুরুর জন্মতিথির প্রথম শুভক্ষণে বাংলার মানুষ স্বাগত জানায়।

শাহজাহানপুর মহিলা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ও আলোচনা করা হয়। স্বগত আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন রণেশ দাশগুপ্ত এবং সনজিদা খাতুন।

রবীন্দ্র জন্মতিথিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কারিগরী মিলনায়তন মঞ্চে বুলবুল ললিতকলা আকাদমি পরিবেশিত শ্যামা নৃত্যনাট্য সব থেকে আকর্ষণীয়। ১৯৭০ খৃঃ অকটোবরে যে সব শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন, এবারও তাঁরাই আছেন। শ্যামা জিনাত আলেয়া পনি, বজ্রসেন হুমায়ুন কবীর এবং উত্তরীয় আমির হোসেনবাবু। সখীদের ভূমিকায় ছিলেন

ঢাকায় 'বুলবুল-ললিতকলা-এ্যাকাডেমিতে' 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের দৃশ্য।

ঢাকায় ছায়ানটের সঙ্গীতানুষ্ঠান

নীলি রহমান, লুবনা মরিয়ম, সাঈদা রহমান, রেশমা শরমিন, সোলনা হোসেন, মিনুবিল্লাহ এবং আফরোজা। আতিকুল ইসলাম ও হামিদ আতিকের কণ্ঠে বজ্রসেন ও শ্যামা শ্রুতিমধুর। কণ্ঠসঙ্গীতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন নায়লা জামান, রাবেয়া ইসলাম। শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি।

রমনা পার্কের বটমূলে আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছিলেন বলাকা গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা। মুকুল মেলা, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায়তন, বিশ্ব বাঙালী যুব সংস্থা আরামবাগ বালিকা বিদ্যালয়, বাসাবোর সবুজ সংঘানী, পুরনো পল্টন বালিকা বিদ্যালয়, ইয়াকুব মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, ইয়াকুব মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ ছাত্র শক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আলোচনা সভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মতিথি পালন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুলে ছায়ানট আয়োজন করেছিলেন একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। ছায়ানটের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেন। পরিচালনা করেছিলেন জাহেদুর রহিম।

২৫ বৈশাখ উয়াড়ীর বলধা বাগানে এক মনোরম পরিবেশে আমরা কজনার শিল্পীরা কবিতা পাঠ ও সংগীতানুষ্ঠানের আসর বসিয়েছিলেন। জাগো ললিতকলা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে আলোচনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান। জয়পাড়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন শ্রেষ্ঠ স্মৃতি শিল্পী সংসদ। প্রধান অতিথি ছিলেন সুচিত্রা মিত্র। অংশ নেন ফিরোজা বেগম, মালেকা, আজিম খান, আনিসুর রহমান, রাখি চক্রবর্তী, তপন ভট্টাচার্য এবং কালিম শরাফী।

(২)

পঁচিশে বৈশাখ প্রাতে জোড়াসাঁকোয় কবিগৃহে শ্রদ্ধানত মানুষের সমাবেশ ঘটে। রবীন্দ্র সদনে আঠাশ দিনব্যাপী উৎসবের এবং রবীন্দ্র কাননে পক্ষকালব্যাপী রবীন্দ্র মেলার উদ্বোধন হয় পবিত্র দিনে। নামী অ-নামী অগুন্তি সংস্থা সশ্রদ্ধ চিত্তে কবির প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে পাঠ নৃত্যনাট্য, আলোচনা সভার কার্যসূচী পালিত হয় প্রায় সর্বত্র।

বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ এসেছিলেন এ বছর জোড়াসাঁকোয় কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানাতে। অসংখ্য মানুষ সকাল থেকে কবি কক্ষে প্রবেশ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভীড় বাড়ছে প্রতি বছর। এবার যেন অনেক বেশী। স্থান সংকুলান ছিল কষ্টকর। তরুণ কবিরা বিশেষ কবিতা সংকলনগুলি বিক্রি করছিলেন জনসাধারণের কাছে।

বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র ভারতী সমিতি এবং রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্র-ভারতী প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন হয়, প্রতি বছরের মতো। অনুষ্ঠান প্রারম্ভিক সূচী পালিত হয় বেদ গান দিয়ে। সমাপ্তি ঘটে 'হে নতুন দেখা দিক' গান দিয়ে। দুটি গানই সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্র রচনা থেকে পাঠ করেন বাঙলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলি, রমা চৌধুরী, প্রতুল গুপ্ত, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাজী সব্যসাচী। সঙ্গীতে অংশ নেন শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরা সর্বাধিকারী, সুপর্ণা চৌধুরী, নীলিমা সেন, ঋতু গুহ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, স্বপন ঘোষাল, মায়া সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূরবী মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ বিশ্বাস, সুশীল মল্লিক, সাগর সেন, বাণী ঠাকুর, সুমিত্রা সেন।

রবীন্দ্রসদনে আটাশদিনব্যাপী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হাজার হাজার মানুষ মিলেছিল সেদিন রবীন্দ্র সদনের সামনে। নব-নালন্দা মিউজিক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কবি বন্দনা করেন। সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন গীতবিতান। শ্রীঠাকুর সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, জন্মদিনের উৎসব এই বিশ্বলোকে শুধু মানুষের জন্য। এই উৎসব হোচ্ছে চেতনার স্ফুরনের উৎসব, চেতনার কাকলী অন্তরে শোনা যাচ্ছে। মানুষের জীবনে 'হয়ে ওঠার' সাধনা আছে। কত পথ মানুষ চলে এসেছে ও চলছে, বার-বার মানুষ তার জীবনের সেই প্রথম দিনটিতে, তার যাত্রারম্ভের দিনটিতে ফিরে যেতে চায়। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। তার অন্তরের শুদ্ধ নির্মল অনুভূতি দিয়ে তিনি জীবনের নিত্যরস পান করলেন।

তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তিদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস, সুবিনয় রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, শৈলেন দাস, অনুপ ঘোষাল, হিমাংশু রায়চৌধুরী, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অমল নাগ, কাজী [illegible] [illegible], চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ

রায়চৌধুরী, অশোক মুখোপাধ্যায়, সুপ্রকাশ চাকী, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত, সুবিদ ঠাকুর, সোমা সর্বাধিকারী, গৌতম মিত্র, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অমলেশ নন্দী, সুমিত্রা সেন, পূরবী মুখোপাধ্যায়, মায়া সেন, নীলিমা সেন, বনানী ঘোষ, বাণী ঠাকুর, কল্যাণী ঘোষ, শর্বাণী সেন, চিত্রলেখা চৌধুরী, স্বপ্না ঘোষাল, নূপুর সেন, বুলবুল সেন, পদ্মিনী দাশগুপ্ত, সুমিত্রা রায়, ঋতু গুহ, শিবানী রায়চৌধুরী, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, নমিতা ঘোষাল, রবিতীর্থ, বৈতালিক, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ প্রভৃতি। আবৃত্তি করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রদীপ ঘোষ, নীলাদ্রিশেখর বসু, সৌমিত্র মিত্র, পিনাকী চক্রবর্তী, দিলীপ ঘোষ, সুশান্ত ঘোষ, জগন্নাথ বসু, শতাব্দী রায়। সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় কবি সম্মেলন। পঙ্কজকুমার মল্লিক, অনাদিকুমার দস্তিদার, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, কনক বিশ্বাস (দাস), মালতি ঘোষাল এবং অমিয়া ঠাকুরকে সম্বর্ধনা জানান হয়।

রবীন্দ্র মেলায় বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধান অতিথি বাঙলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী বলেন, তাঁকে আমরা পেয়েছি অন্তরের বাঁচবার প্রেরণায়। আমাদের কাছে তিনি প্রিয়তম। তিনি আমাদের আপন জাতীয় ও গণ-সত্তারই অখণ্ড অংশ। ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে কোন মহৎ প্রাণকে বেঁধে রাখা যায় না। তাই বাঙালী হয়েও তিনি বিশ্বকবি। কবি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখেছেন। সেখানে আচারভিত্তিক কোন সংস্কার ছিল না। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা রবীন্দ্র মানসধর্মের একটি বিশেষ দিক। রবীন্দ্র জীবন দর্শন বাংলাদেশের মহামূল্যবান এক নতুন আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ। রক্ত দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছি, স্বাধীনতার সংগ্রামে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু সংগ্রামের প্রেরণা জোগায় নি, মুক্তি সৈনিকেরা 'আমার সোনার বাংলা'র সুরে হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

মঙ্গলাচরণ, বরণ, মাল্যদান, বেদ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র মেলার উদ্বোধন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। মেলার উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ভাষণ দেন। শ্রীরায় তাঁর ভাষণে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বর্তমান যুগে কবির যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করেন।

পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ মিশনের সামনে কলকাতা যুব সঙ্ঘের রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস ও দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন। দুই বাংলার শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতি বছরের মতো এবারও ভ্রাম্যমাণ রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন করেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। গঙ্গার বুকে নৌকায়ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। রবিরঞ্জনীর উদ্যোগে বালিগঞ্জ জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করেন অমিতা ঠাকুর।

অন্যান্য বছরের মত এবারও শান্তিনিকেতনের ভাবগম্ভীর পরিবেশে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়। মন্দিরে আশ্রমবাসীরা সমবেত হন। উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। গান মন্ত্র ও গুরুদেবের রচনা থেকে পাঠ হয়। সন্ধ্যায় ছিল বিচিত্রানুষ্ঠান। বোলপুরেও উদ্দীপনার সঙ্গে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়েছে।

শহরতলীতে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালক আশ্রম, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীসারদা দেবী বালিকা বিদ্যামন্দির এবং বেলঘরিয়ায় গীতবাণী, শিশুতীর্থ গ্রন্থাগার ও নারী কল্যাণ বয়ন সমিতির অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। রহড়ার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিত্যানন্দ। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, ফণী দে, মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়, মমতা সেন, প্রণব ভট্টাচার্য প্রশান্ত রায়, প্রশান্ত মৈত্র, বিকাশ ভট্টাচার্য এবং মনোজিৎ সাহা।

পশ্চিম বাঙলায় রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম আমরা। দীর্ঘদিনের প্রথাসিদ্ধ কর্মসূচী বৈচিত্র্যহীন এক নিরুত্তাপ পৌনঃপুনিকতার জন্ম দিয়েছিল। এবার সেই উৎসবে লেগেছে জোয়ার। দু-পার বাঙলার মানুষের মিলিত শোভাযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ আজ জীবন্ত। তাঁর আশীর্বাদ আজ দু'পার বাংলার নবজীবনের পাথেয়।

রবীন্দ্রকাননে রবীন্দ্র মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলিকে বরণ করা হচ্ছে। পাশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়।

ক্ষণিকের অতিথি

গোষ্ঠ শেঠ

—'দেখতে দেখতে আমাদের বিদায়ের মুহূর্ত এগিয়ে এসেছে। বাংলোর অদূরে গাড়ীতে মাল উঠোতে ড্রাইভার কন্ডাকটার-দের হৈ-হুল্লোড়, যাত্রীদের হাঁকডাকে ঝালিয়াড়ির দুধারের নির্জন পথ সরগরম। ঝাউকুঞ্জের পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের শন শন শব্দ মনে জাগায় বিরহীর মর্মোচ্ছ্বাস। সামনের অনুচ্চ বালিয়াড়ি ছাড়িয়ে চোখে ভাসে সাগরের ফেনিল উচ্ছ্বাস। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেংগে পড়ছে সাগরবেলায়। শত মিনতি জানিয়ে তারা যেন বলতে চাইছে—'যেও না, ওগো যেও না।'

বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে সকালের রোদে ঝলমল সাগর বেলার পানে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল, দুদিন ধরে যমলাকে ঘিরে যে খেলাঘর পেতেছিলাম, আজকেই তার পরিসমাপ্তি। সাগরের উচ্ছ্বাসের মাঝে নিজের মর্ম-ব্যথার ছোঁয়া দেখতে পেয়ে আমার দুচোখ ভরে গেছে জলে—ঝাপসা হয়ে এসেছে আমার উদাস দৃষ্টি দিগন্তের পানে চেয়ে। ভেবেছি ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসে, আমার মনোবীণায় যে সুর সে বাজিয়ে গেল, তা কি চিরদিন বাজতে পারে না?'

বুক কেসের নিচের শেলফে ডায়েরি খুঁজে দেখছিলাম বন্ধুর দিল্লীর ফোন নম্বর। দশ বছর আগেকার ডায়েরির কয়েকটি ছেঁড়াপাতা আটকে থাকতে দেখলাম দুটো শেলফের মাঝে। ডায়েরিগুলো নামাতে গিয়ে হয়ত কখন পাতা দুটো ছিঁড়ে আটকে গেছে কাঠের ফাঁকে। আমার যাযাবর জীবনের দশ বছর আগেকার ঘটনাপঞ্জীর কটি পাতা—দীঘার সাগরবেলায় বসে লেখা।

এক যুগ আগেকার কথা, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন এই সেদিনের। আমার মনের বন্ধ আলমারীর কোন তাকে ধুলি-ধুসরিত হয়ে এতকাল পড়েছিল জানি না, আজ হঠাৎ দিল্লীর ফোন নম্বরের খোঁজে বিস্মৃত-প্রায় স্মৃতি সজীব হয়ে আমাকে টেনে নিতে চাইছে দশ বছর আগে। ফেলে-আসা অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে সে হয়ত আমাকে বোঝাতে চাইছে কিছুই হারিয়ে যায়নি। সব কিছু জমা হয়ে আছে আমার স্মৃতির এ্যাবলাম। সময় সুযোগের অভাবে কিছুকাল চাপা থেকে ভিন্ন পরিবেশে সে আবার উঁকি মারতে সুরু করেছে আমার অন্তরের মণিকোঠায়।

সাত তাড়াতাড়ি কাজের বোঝা নামিয়ে এটাচি হাতে ছুটে এসেছি হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে, মাত্রার অনেক খবরাখবর পর্যন্ত গিয়ে বন্ধুর গাড়ীতে দীঘা যাওয়ার স্থির আছে। সম্ভব হলে একবার মেদিনীপুর ঘুরে যাওয়ার ইচ্ছেও আছে।

মন্থর গতিতে স্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে, ঝড়ের বেগে মেল ছুটে এসেছে নদীনালা, পথপ্রান্তর পার হয়ে। ভ্যাপসা গুমোট বাতাসকে কামরার বাইরে সরিয়ে দিয়ে, সন্ধ্যার আগে ট্রেন এসে থেমেছে জংসন স্টেশনে। গাদাগাদি প্যাসেঞ্জারদের গা বাঁচিয়ে নামতে বেশ কিছু সময় কেটে গেছে আমার। ওঠানামা ধস্তাধস্তিতে অস্বস্তি অনুভব করেছি বেশ। এককথায় টেনে হিঁচড়ে নামতে হয়েছে আমাকে। তারও অনেক পরে ধীর পায়ে নেমেছে রেলের কুলী মালপত্র নিয়ে।

প্লাটফর্মের উপর সঞ্জীবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল রেল রেস্তোরায়। টোস্ট ওমলেটের অর্ডার দিয়ে বসল, আমার মতামত না জেনেই। আধ ঘণ্টারও উপরে কেটে গেল চায়ের আসরে গালগল্পে। রেলওয়ে পার হয়ে ওপারে পৌঁছোতে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল স্টেশনের আশপাশে, মিটমিট করে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল রেল কলোনির পথে পথে।

বাসস্ট্যান্ডে অসম্ভব ভীড়, গাড়ির দেখা নেই। পথে কোথায় এক্সিডেন্টের জন্য সেদিন দীঘার বাস আসেনি। বিভ্রান্ত যাত্রীরা এ-ওর সাথে যুক্তি আঁটছে নজরে পড়ল। আমাদের গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া যাত্রী সঞ্জীব আর আমি। আমাদের গাড়ীতে উঠতে দেখে নমস্কার করে এক ভদ্রলোক বললেন—'স্যার, আপনারা কি দীঘা যাচ্ছেন?'

অনুমানে ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসার কারণ বুঝতে দেরী হ'ল না—ভদ্রতার খাতিরে বললাম—'হ্যাঁ, কেন বলুন ত?'

আমতা আমতা করে তিনি বললেন—'আমি সস্ত্রীক রাণাঘাট থেকে এসেছি দীঘা যাব বলে। বাস না থাকায় বেকায়দায় পড়ে গেছি। আপনাদের গাড়ীতে যদি আমাদের একটু লিফট দেন'—অনুরোধের সুর তার গলায়।

এক মিনিট ভেবে বললাম—'কাঁথিতে আমাকে নামতে হবে, দীঘা যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে আপনাদের।'

কৃতজ্ঞতার সুরে তিনি বললেন— 'দেরী হলোই বা, কি আসে যায়? সারারাত ত আমাদের স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই কাটাতে হবে। সকাল আটটার আগে দীঘায় কোন বাস নেই শুনেছি।'

ভদ্রমহিলার কথা ভেবে তাদের আসতে বললাম, আমাদের গাড়ীতে। পেছনের সিট তাদের ছেড়ে দিয়ে আমরা ফ্রন্ট সিটে উঠে বসলাম।

প্রায়ান্ধকারে ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠে মুখ কাচুমাচু করে ভদ্রলোক বললেন—'আপনাদের কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো—বিদেশ বিভূঁয়ে আপদ থেকে বাঁচালেন আমাদের। কলকাতা ফেরার গাড়ী রাতদুপুরে। তা না হলে দীঘা যাত্রায় এবারকার মত ইস্তফা দিয়ে ফিরে যেতাম।'

'কি আর এমন উপকার করলাম আপনাদের'—তাকে আশ্বস্ত করতে বললাম—'গাড়ীতে দুটো সিট খালিই পড়ে থাকত, বিপদে-আপদে মানুষের সাহায্য মানুষেই করে'। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন—'আজকের দিনে ওসব কথা অচল স্যার। কে কার কথা ভাবছে বলুন। সবাই আত্মকেন্দ্রিক'।

'সবাই কি? এখনও কিছু কিছু মানুষ আছে যারা পরের কথা ভাবে—অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তা না হলে সমাজের গতি নিথর হয়ে যেত এতদিনে।'

একটানা সোজা পথ চলে গেছে দক্ষিণে মাঠের বুক চিরে। দুধারে গাছের সারি। শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদের আলো নীল আকাশের পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ছে পথের উপর। দখিনা বাতাস দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের বুক চিরে তীরের ফলার মত শোঁ-শোঁ শব্দে আছড়ে পড়ছে চোখে-মুখে। ফাঁক জোছনার ভেতর দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে ষাট-সত্তর মাইল স্পিডে। হেডলাইটের তীব্র আলোতে দূর থেকে গাছের তোরণ চোখে ভাসছে। বনফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠছে মন। নিজের মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য সুধা পান করে চলেছি। গাড়ীর পেছনের সিটে বসা মানুষগুলি, আমার পাশে বন্ধু সঞ্জীব—সবাই যেন মুহূর্তের ভেতর কোথায় উবে গেছে আমার কাছ থেকে। আমি যেন মহাশূন্যে ভেসে চলেছি দখিনা বাতাসে পাখনা মেলে, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ভুলে।

আমার স্বপন-ঘোর ভেঙ্গে গেল পেছনের সিটে ভদ্রমহিলার বীণানিন্দিত স্বর কানে লেগে—'কি সুন্দর রাস্তা—দুচোখ জুড়িয়ে যায়—হিমেল হাওয়ায় প্রাণ বাঁচল।'

কাকে উদ্দেশ করে তিনি কথাগুলি বলছিলেন, ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করেছিলাম। গলার স্বর যেন কতকাল আগে শোনা পরিচিতের মত ঠেকছিল। কেউ তার কথার জবাব দিল না দেখে সৌজন্যের খাতিরে বললাম—'আমরা সোজা চলেছি দক্ষিণে। সাগরের দূরত্ব এখান থেকে ষাট মাইলের মত। জোড়ো হাওয়া সাগরের বুক বেয়ে এসে কত জনপদ প্রান্তর পার হয়ে হিমেল হয়ে বয়ে এসেছে গাড়ীর গায়।'

উত্তরের প্রত্যাশা করিনি—উত্তরও পেলাম না, আমার কানে ঠেকতে লাগল গাড়ীর গর্জন, হাওয়ার ঝটপটানি। মন-প্রাণ সজাগ করে চেয়ে রইলাম প্রান্তরের বুকে গ্রামের ঘরের পানে। মাটির প্রদীপের মৃদু আলোক শিখা প্রাণবন্ত হয়ে আমার মনে জাগিয়ে তুলল অতীতের স্মৃতি। গেরস্তের ঘরে-কোটায় কেরোসিন ল্যাম্পের আলো একে-বেঁকে ভেসে গেল দূর-দূরান্তরে। দুধার মাইল পর পর গ্রাম গঞ্জের সীমানা ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে চললাম আমরা। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার জাল বুনে ভাবতে লাগলাম—'কোথায় কতকাল আগে এ সুর আমি শুনেছি। স্মৃতির রুদ্ধ দুয়ার খুলে ভাবতে লাগলাম কটি কথা কেন আমার মনে এমন আলোড়ন তোলে? কোন বিস্মৃত নদী তীরের বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, উন্মুক্ত প্রান্তরের মুক্ত হাওয়ায়, রূপসাগরের ঢেউয়ের আলোড়নের ভেতর এমন মিষ্টি সুর শুনেছি আমি, ভাবতে ভাবতে আধ ঘণ্টার পথ চলে গাড়ী এসে থেমেছে বেলদাতে।

চা খাওয়ার তাগিদে ড্রাইভার গাড়ী বেঁধেছিল, তার সঙ্গে আমাদেরও চায়ের তেষ্টা পেয়ে বসল। সঞ্জীব আমার মনোভাব আঁচ করে বলল—'রমেনদা, শুধু চা চলবে না তার সাথে আর কিছু।'

না ভেবেই বললাম—'বেলদার রাজভোগ না খেলে, চায়ের যে জাত মারা যাবে।'

গাড়ী ছেড়ে পায়চারি করতে লাগলাম চৌরাস্তায়। এর ভেতর সঞ্জীব চা জলখাবার এনে ধরেছে সকলের সামনে। ভদ্রলোক মিষ্টি মুখে দিয়ে বলে উঠলেন—'এমন সুন্দর মিষ্টি বহুদিন মুখে ওঠেনি আমাদের। মিষ্টিমুখ করালে আত্মীয়তা হয়, জানেন ত?'

তার রসিকতার রসে, মুখ ফসকে সঞ্জীবকে বললাম—'এক প্লেট করে রসমাধুরী খাওয়াও এঁদের।'

হাসির ঝলক আত্মবিস্মৃত আমাকে কোথায় যে টেনে নিয়ে চলেছে তা বুঝলাম আধঘণ্টা পরে আমার মুখে কথা জোগাতে। কেবলই আমার মনে হতে লাগল, মিষ্টি কথা, মধুময় হাসির রেশ যার মুখে, সেরা সুন্দরী তিনি নিশ্চয়।

বেলদা ছাড়িয়ে, পূব-দক্ষিণ কোনের আঁকা-বাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ী ছুটতে শুরু করেছে আমাদের নিয়ে। জোছনার আলোক-রেখা ম্লান হয়ে জানিয়ে গেল রাত হয়েছে। পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের পথ, মহাকুমা শহর কাঁথিতে আমাদের গন্তব্য পথের ক্ষণিক বিরতি। সারি সারি গরুর গাড়ী দল বেঁধে চলেছে খুকুড়দার হাটে, গাড়ীর নীচে বাঁধা লন্ঠনের আলোকে দূর থেকে মনে হয় দীপাবলীর দীপশিখা, কেঁপে কেঁপে নিভছে জ্বলছে বাতিগুলি।

পশ্চিম আকাশে বিলীয়মান চাঁদের আলো এতক্ষণ ছুটে এসেছিল গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা করে। এগরাতে পৌঁছে সে আমাদের বিদায় জানিয়ে নেমে গেল দিক চক্রবালে

নীচে। অন্ধকার পথে এবার আমাদের পাড়ি দিতে হবে, কাছের সাক্ষী ওপাশের গাছ-পালা এক হয়ে মিশে গেল সে আঁধারে। কথা নেই, আলবার তাগিদ নেই, শুধু সামনের উঁচু-নীচু পথ বেয়ে মাতালের মত টলতে টলতে গাড়ী এগিয়ে চলেছে শেষ রেসের বাজী জিততে। ছুটতে ছুটতে তার হাঁপ ধরে গেছে যেন।

কাঁথি পৌঁছোতে নটা বেজে গেল। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা সঞ্জীবের বাড়ীতে, সে জানাল রাস্তায়। মুস্কিলে পড়লাম সহযাত্রীদের নিয়ে। অচেনা অজানা হলেও তারা আমার পথের সাথী। তাদের ছেড়ে একা খেতে যেতে রুচিতে বাধল। শহরে ঢোকার মুখে আগেকার কথার পুনরাবৃত্তি করে বললাম—'কাজ সেরে এখান থেকে বের হতে রাত হতে পারে। আপনারা কোন বোর্ডিংয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পারেন।'

'আমাদের একটি ভাল হোটেল দেখিয়ে দিন। খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে গাড়ীতে বিশ্রাম করবো'—প্রথমবারের মত এবারেও ভদ্রলোক প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেও, ভদ্রমহিলার মুখে কথা নেই। ঘুমিয়ে কি জেগে তাও বুঝলাম না।

সঞ্জীবের গ্যারেজে গাড়ী বাঁধতে নেমে পড়লাম। আমার সহযাত্রীরাও আমাকে অনুসরণ করল। বাতাসে অসংবৃত আঁচল ঠিক করতে গিয়ে, আচমকা ভ্যানিটি-ব্যাগ ছিটকে পড়ল ভদ্রমহিলার হাত থেকে। শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকাতে চোখাচোখি হয়ে গেল তার সঙ্গে। বিস্ময়ে আমার চোখ ঠিকরে পড়ার উপক্রম হলেও, চোখ ফিরাতে পারলাম না। হাত তুলে ছোট একটি নমস্কার করে, হ্যাণ্ডব্যাগ কুড়িয়ে নিলেন তিনি। পেছন পেছন আমাকে অনু-সরণ করে তিনি উঠে এলেন সঞ্জীবের অফিসে। ভদ্রলোককে হোটেল দেখাতে নিয়ে গেল সঞ্জীব।

নিষ্প্রভ বাতির আলোতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম সেই চোখ, সেই মুখ, সেই প্রাণমাতানো হাসি—যেমনটি দেখে-ছিলাম দশ বছর আগে। এমন কি চলার গতিটুকুও তেমনি ছন্দময়। দুধে আলতা গোলা গায়ের রঙে বয়সের ছাপ পড়েনি এতটুকুও। ভাবছিলাম পথের পরিচয়ের সূত্র ধরে অতীতের পরিচয়ে ফিরে যাওয়া কি ঠিক হবে? অনুমানে হয়ত আমার মনের কথা বুঝে নিয়ে তিনি বললেন—'চিনতে পার?'

কি উত্তর দেবো তাই ভেবে হয়ত তিনি কথা বাড়ালেন না। তার ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম—'তোমার মত একজনকে চিনতাম। তোমার সঙ্গে আমার পথের পরিচয়, ক্ষণিকের অতিথি।'

'রমলা কি তোমার মন থেকে হারিয়ে গেছে?'

'মন থেকে না হারালেও, [illegible] স্বীকৃতি কারও নেই। তাদের বাস্তব নিষ্ঠুর—তার কাছে ক্ষমা নেই।'

'তাকে কি আজও ক্ষমা করতে পারোনি তুমি?'

'যাচাই করে দেখিনি কোনদিন। পথের মাঝে হঠাৎ দেখা কতকাল পর। পরিচিত স্বর শুনে যার মুখ সারা রাস্তায় আমার মনে কম্পন তুলেছে তাকে ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে কি?'

'তবে'—রমলা থেমে যায় বেয়ারাকে চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে। পাখার হাওয়ায় চা ঠাণ্ডা হতে দেখে বললাম—'চা খেয়ে নাও, খেতে যেতে দেরী আছে, হোটেল বেশ খানিকটা দূরে।'

'সেদিন তুমি অমন করে ভুল বুঝলে কি করে? অনেকবার তলিয়ে দেখেছি, কিন্তু আজও বুঝে উঠতে পারিনি। তোমার কি মনে হয়েছিল তোমার চেয়ে অসীমকে আমি বেশী আমল দি?'

আমার হাসি পাচ্ছিল রমলার প্রশ্ন শুনে। স্থান কাল ভেবে চুপ করে গেলাম। কথা বলছি না দেখে রমলা অনুরোধের সুরে বলল—'আমার মন থেকে একটা সন্দেহ তুমি দূর করবে রমেন? অতীতের সেই তুমি, এই তুমি নও বুঝি। তবু পরিচয়ের দাবী নিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর কি আশা করতে পারি না?'

অতীত পরিচয়ের সুতো ধরে রমলা টান দিতে সুরু করেছে বুঝে আমার মুখের হাসি পলকে মিলিয়ে গেল। সজোরে কে যেন চাবুক মেরে আমার সারা মুখে দাগ কেটে গেল। নিমেষে ফ্যাকাশে রক্তহীন হয়ে গেল আমার মুখ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আগুন জ্বলে উঠল আমার মাথায়। ঝিমু-ঝিম করতে লাগল আমার সারা শরীর। টেবলের উপর কনুই রেখে, দু'হাতে মাথা চেপে ধরলাম আমি। ভয় পেয়ে রমলা বলল'—দোহাই তোমার, সেদিনের মত আজকে আমাদের ছেড়ে যেও না। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আজকে আমাদের কি যে হাল হত? উত্তর আমি চাই না রমেন। তুমি স্বাভাবিক হয়ে বস।'

নকল হাসি হেসে বললাম—'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। উত্তর খুঁজ-ছিলাম, তাই হয়ত আমাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। 'অসীমকে তুমি ভালবাসতে কিনা জানি না; তবে তার দুর্বলতাকে সেদিন প্রশ্রয় দিয়েছিলে, একথা তুমি অস্বীকার করবে না নিশ্চয়।'

—'অফিসের বসের সঙ্গে কাজের সম্পর্ককে তুমি প্রশ্রয় বল কি করে? কাজ ছাড়া তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? তোমাকে যে চোখে দেখতাম কোনদিন তাকে কি তা দেখেছি? কেন তুমি মিথ্যা সন্দেহে আমার উপর অবিচার করলে?'

—'বিচার আমিও পাইনি রমলা। দু' হাত পেতে যাকেই আমি কাছে চেয়েছি সে দূরে সরে গেছে। ভেবেছে আমার বাইরের কঠোর রূপ নির্মমতায় ভরা। অভিশপ্ত জীবনের বোঝা বইতে, নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, ভুল বুঝে নয়।'

—'ভুল না বুঝলে, আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক এত সহজে তুমি ছেদ টানতে পারতে না—তা কি আমি বুঝি না মনে কর।'

'—সম্পর্ক কি শুধু কাছে থাকলেই গড়ে ওঠে? দূরে সরে গেলেই কি সম্পর্কে ছেদ পড়ে?'

সঞ্জীবের সাথে রমলার স্বামীকে ফিরতে দেখে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। মুখে হাসি টেনে রমলা আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে বললে—'রমেন-বাবু এক সময় আমাদের অফিসে কাজ করতেন। চাকরী ছেড়ে হঠাৎ যে কোথায় উধাও হয়েছিলেন, দশ বছর পরে, আজ দীঘার পথে তাঁকে—আবিষ্কার করলাম।'

হেসে বললাম—'উধাও ঠিক হইনি, শহর ছেড়ে শহরতলীর জীবন বেছে নিয়ে-ছিলাম। অসাধারণদের কাছ থেকে সরে এসে সাধারণের সাথে মিশে, তাদের ভেতর নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম।'

কথার মাঝে বাধা দিয়ে সঞ্জীব বলল—'চাকরীতে ইস্তফা না দিলে, বাংলাদেশ—তোমার মত দরদী মানুষকে পেত না। তোমার লেখনী দিয়ে তুমি ফুটিয়ে তুলেছ রিক্তের বেদনা।'

রাত অনেক—কটা বেজেছে তা জানবার ইচ্ছে নেই কারও। অন্ধকারে মাঠের বুক চিরে গাড়ী ছুটে চলেছে দীঘার পথে। এবার পথ বেঁকে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। সাগরের মত্ত হাওয়া উড়িয়ে নিতে চাইছে যাত্রী শুদ্ধ গাড়ীকে। নিকষ কালো অন্ধকারে সারা জগৎ আচ্ছন্ন—আকাশের গায় লক্ষ তারা সাক্ষী তার প্রাণের স্পন্দনের। আড়ষ্ট হয়ে আমি বসে চলেছি গাড়ীতে—আশাহীন, ক্ষোভহীন, মমতাহীন জড়পিণ্ডের মত। কোনও অভিযোগ আমার নেই কারও কাছে, রাগ নেই কারও উপর। টান নেই কারও দিকে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি যেন ঘুরতে বেরিয়েছি নীহারিকার পথ ধরে। কারও কাছে আমার ঠাঁই নেই, সাহিত্যের বাসরে আমার আসন পাতা নেই, প্রেমের দেউলে শূন্য পাত্র ভিখারীর মত আমি রিক্ত। আমার কানে ভেসে আসছে ধ্যানমগ্ন নিস্তব্ধতার ধ্বনি। চোখে [illegible]

আঁধারের কালিমা, মনে জাগছে নিঃস্বের বেদনা। মহাসাগরের হাহাকার রব যেন আমারই শূন্য মনের বিরাট এক অভিব্যক্তি।

ঢেউয়ের শব্দে চমক ভেঙে বুঝলাম সাগর সৈকতে আমরা পৌঁছে গেছি। তিনটি প্রাণী নিঝুম নিশুতি রাতে এসেছি দুদিনের মত যাযাবর জীবনের ছক পাততে, সৈকতাবাসের নির্দিষ্ট স্যুটে আমার মালপত্র তুলে, রমলাদের জন্য হোটেল খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলের ম্যানেজার জানাল রুম খালি নেই। টুরিস্ট লজ, ডেভেলাপমেন্টের বাংলো ঘুরে ঘুরে কোথাও জায়গা মিলল না।-সব জায়গায় এক কথা—ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। রমলাদের তুললাম আমার স্যুটে। রাতে বিশ্রামের জন্য ড্রয়িং-রুমে ডিভানে ছড়িয়ে বিছানা পেতে নিলাম।

সারাদিনের বিশ্রান্তিতে, গাড়ীর ধকলে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলেও দু'পাতা এক করতে পারলাম না সারা রাত। চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম দশ বছর আগের দেখা রমলার কথা। কি ভালই না বাসতাম তাকে সেদিন, প্রতিদানে তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম কুণ্ঠা, আর ভয়। বার বার তার ভুল শুধরাতে গিয়েও পারিনি। হার মানতে হয়েছে আমাকে। সে ভুল বুঝেছে, সন্দেহ করতে শিখেছে আমার ভালবাসাকে। অসীমের কাজের অজুহাতকে সে প্রশ্রয় দিয়েছে, কর্তব্য মনে করে। মুখ বুজে সহ্য করেছে তার অন্যায় আচরণ, প্রতিবাদ করার মত সাহস তার জোগায়নি।

আমার অভিমানে, অভিযোগেও তার অনুকম্পা জাগেনি। উল্টে সে আঘাত করেছে আমাকে। অফিস, সংসার, বজায় রেখে বাড়তি সময়টুকু যা সে দিয়েছিল, তার জন্য কত শুনতে হয়েছে আমাকে, নিজেকে বার বার তার দিকে এগিয়ে ধরলেও, সে তার সুযোগ নিতে চায়নি—পেছিয়ে গেছে। আজ দীঘার পথে, হয়ত তার সেদিনের সুপ্ত অন্তর জেগে উঠে হারানো প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে—'ভুল বুঝে কেন আমি দূরে সরে গেলাম ?'

নিশিশেষে কখন আমার দু'চোখ জুড়ে নেমে এসেছে তন্দ্রার ঘোর। শীতল হাওয়ার পরশ এড়াতে ঘুমের ঘোরে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছি বেডসিট। কপালে কোমল হাতের স্পর্শে বুঝলাম আমার মত আরও একজন জেগেছিল রাতে। আমার ঠাণ্ডা লাগতে পারে ভেবে সে হয়ত দেখতে এসেছে রাতভোরের আগে। সারারাত ঝোড়ো হাওয়ার ভেতর কাটাতে দেখে তার মনে আমার জন্য জেগেছে অনুকম্পা। আমার দেহের উত্তাপ অনুভব করতে সে বাড়িয়ে ধরেছে তার অন্তর হাত—নিস্তাবনায়।

না জাগার ভান করে শুয়ে শুয়ে অনুভব করলাম রমলার সান্নিধ্য। তার হাতের স্পর্শে আমার দেহে মনে বুলিয়ে দিল শান্তির প্রলেপ। আমার বুভুক্ষু অন্তর তার ছোঁয়াটুকু হারাতে রাজী নয় বলে অসাড় হয়ে শুয়ে রইলাম গাঢ় তন্দ্রার ভান করে। ডিভানের এক প্রান্তে বসে রমলা কি করছে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করলেও চোখ বন্ধ করে রইলাম। দু ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল আমার মুখের উপর গড়িয়ে পড়তে অনুমানে বুঝলাম, দশ বছর আগেকার রমলা নিঃশব্দে জীবন্ত হয়ে আছড়ে পড়তে চাইছে আমার বুকে—হয়ত তার সমগ্র সত্তা দিয়ে সে মিশে যেতে চাইছে আমার দেহ-কারার অন্তরালে, একান্ত নির্ভর আশ্রয়ের আশা নিয়ে।

সাত সকালে আমরা বেরিয়ে পড়েছি সাগর সৈকতে। ঢেউ ছুঁয়ে চলেছে রমলার চঞ্চল পা দুখানি। হেসে লুটোপুটি খেয়ে সে ছুটোছুটি করছে ঢেউয়ের পিছু পিছু, দুষ্টুমী করে ঢেউ তার উপর শোধ নিচ্ছে পরণের সায়া কাপড়ের অংশ ভিজিয়ে, একাকার করে। ফেনা হাতে তুলে দু হাতে সে মেখে নিচ্ছে প্রসাধনের মত। ভেজা বালুর উপর তার পায়ের দাগ—এঁকে-বেঁকে চলে গেছে দূর-দূরান্তে। বালুকা বেলায় বালুর ঘর বাঁধছে সে ছেলে খেলার মত। চোখের পলকে—ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে পড়ছে তার ঘরের বনেদ। ছেলে-মানুষের মত হেসে গড়িয়ে পড়ছে, সে সাগর বেলায়। তার ছন্দময় চপলতা আমি উপভোগ করছি মন-প্রাণ দিয়ে, দু চোখ ভরে দেখছি তার উচ্ছ্বসিত যৌবনের চঞ্চলতা, ভুলেও মনে পড়ছে না সে আমার ক্ষণিকের অতিথি। সাগরে স্নান করতে নেমে রমলা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঢেউ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। আমার সাথে সে ব্রেকার এড়িয়ে দু ঢেউয়ের মাঝে শান্ত জলে ডুবছে, উঠছে। ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে। তার চপলতা আমাকে ঘিরে মূর্ত হয়ে উঠতে চাইছে।

অস্তমিত সন্ধ্যার বুকে আমার সাথে সমান তালে পা ফেলে সে এগিয়ে গেছে সুবর্ণরেখার বালুচরে। উদ্গত বাদাম ফুলের সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে উপকূলের বাদামের ঝোপঝাড়ের আড়ালে, লুকোচুরি খেলার মেতে। ঝাউকুঞ্জের শান্ত পরিবেশে সে খুঁজে পেয়েছে নিজের হারিয়ে যাওয়া মন, জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে সাগরের মর্মোচ্ছ্বাসের ভেতর সে খুঁজে পেয়েছে তার বুকের চাপা বেদনা, নিশীথে মর্মতলে সে ছটফট করেছে অজানা বেদনায়। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ভেতর সে রচনা করেছে শান্তির নীড়, সৈকতাবাসের একটি স্যুটকে ঘিরে দু দিনের মতন। ভুলেও সে ভাবে নি দুটি দিন দুটি রাত্রির অবসানে সে নীড় বাঁধার অবসান ঘটবে।

চোখের উপর দু দিন কেটে গেছে। মনেই পড়ে না কারও দুটো পুরো দিন কেটে গেছে এত শীঘ্র, তাই বিদায় মুহূর্ত এগিয়ে এলেও আমরা বুঝি নি সে মুহূর্তটি এত শীঘ্র এসে যেতে পারে। বৈচিত্র্যহীন ছন্নছাড়া যাযাবর জীবনের ভেতর, প্রাণবন্ত দিন দুটির ছোঁয়া আমি পেয়েছিলাম রমলার স্নেহের পরশে, ঠাঁই পেয়েছিলাম তার স্নেহের আঁচলে পূর্ণ দেখেছিলাম নিজেকে তার মাঝে, শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম বুক ভরে — তারা যেন বিদায় মুহূর্তে আমার গতি রোধ করে সবাই এক সাথে বলতে চাইছে—'যেও না, তুমি যেও না'।

সময় নিজের খাতে বয়ে চলে, সে কারও অপেক্ষা করে না। প্রশান্ত সাগর বেলা, মনোরম বেলাভূমি, মনমাতানো ঝাউ-কুঞ্জ, পুষ্পিত বাদামের ঝোপঝাড়, সাগরের ব্যাকুল মিনতি—সব ছেড়ে আমাদের যাত্রা করতে হয়েছে একঘেয়ে জীবনের মাঝে ফিরে যেতে। পেছনে ফেলে এসেছি দুটি দিনের স্মৃতি, নাম-না-জানা বনফুলের মত যারা ফুটে রইল দীঘার পথের দু ধারে, বালিয়াড়ীর বুকে, ঝাউকুঞ্জের মর্মর ধ্বনির ভেতর, সাগরের ফেনিল উচ্ছ্বাসের মাঝে। আমাদের বয়ে নিয়ে বজ্রনির্ঘোষে যন্ত্রদানব ছুটে চলল শহরের পথে, একান্ত উদাসীর মত। মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশার সাক্ষী সাগরবেলা পেছোতে পেছোতে দূরে বহু দূরে সরে গেল, আমাদের চোখের আড়ালে। গাড়ীর গতির সঙ্গে পাল্লা করে আমার মন কেবলই ছুটে বেড়াতে লাগল সৈকতাবাসের দুটি ঘরে, সাগর বেলায় সংখ্যাহীন বালি কাঁকরের বুকে। ছুটতে ছুটতে অজান্তে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'জীবন বীণার সুর কি মধুর হয়ে বাজতে পারে না এ জনমের মত ?

সোনার বাঙলা

শিপ্রা আদিত্য
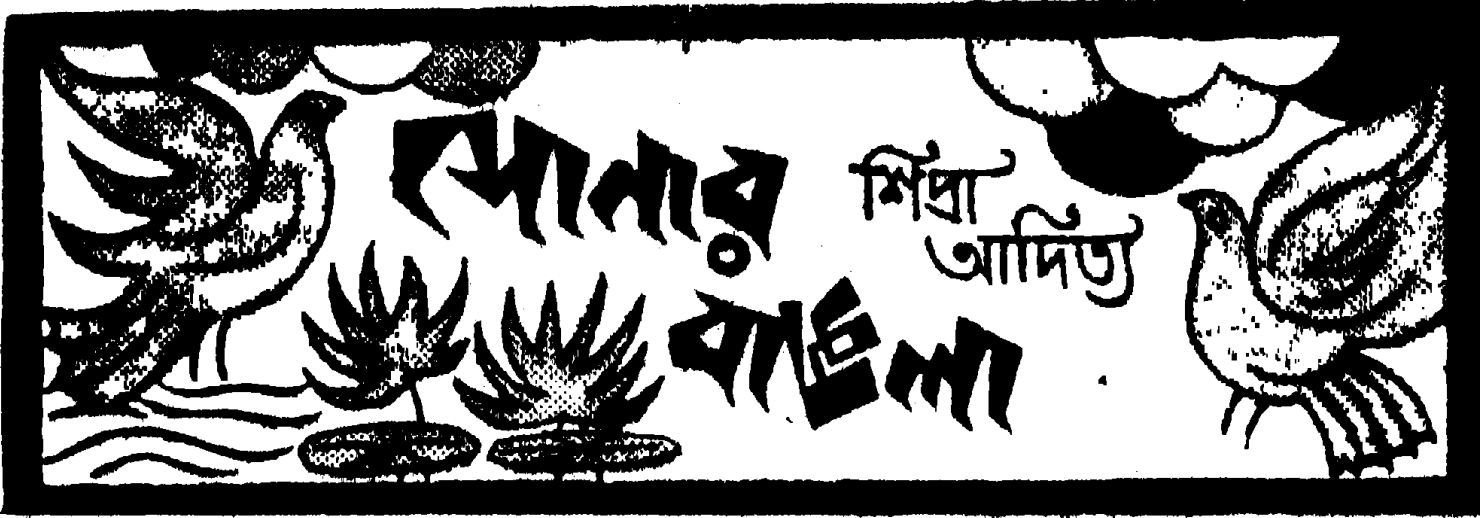
ইংরেজের স্বার্থভিত্তিক অবৈজ্ঞানিক দেশবিভাগের ঘটনাকে নাকচ করে দিয়ে আজ পূর্ববাঙলা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ। পাক দুঃশাসনের বর্বরতা থেকে মুক্তিকামী লক্ষ লক্ষ তরুণ বাঙালীর আত্মদানের রক্তধারার সঙ্গে প্রতিবেশীর দুঃসহ অবস্থা আর দুরন্ত স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত দুঃসাহসী ভারতীয় জওয়ানদের সহমর্মী রক্তস্রোতে স্নাত বাঙলাদেশের মাটি আজ নতুন এক ইতিহাস রচনা করলো। বিশ্বের দরবারে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যে বাঙলাদেশ আর একটি উজ্জ্বল নাম।

নতুনদিনের নতুন দেশে আজ তাই সবার আমন্ত্রণ। দেশ-দেশান্তরের সহমর্মী মানুষ—আজ তাই তীক্ষ্ন নজরে লক্ষ্য করছে বাঙলাদেশে আগামী দিনের সৃজনশীল সাংগঠনিক কর্মযজ্ঞ। সদ্যমুক্ত নবীন চেতনার পথানুসন্ধান প্রচেষ্টা থেকে সুগম্য পথের নির্দেশ খুঁজছেন জগতের শুভচেতনা। সদ্যমুক্ত বাঙলাদেশে স্বাধীনচেতা বাঙালীর এ দিগন্বেষী অভিযানের পাথেয় হল তার সংস্কৃতির ঐতিহ্য। এই সংস্কৃতি চেতনায় তার গণঅভ্যুত্থানের প্রাণশক্তি। এমন সংস্কৃতি কেন্দ্রিক গণবিদ্রোহ এবং পরিণতিতে দেশ ও দেশজ সংস্কৃতির মুক্তির এমন সাফল্য সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। তাই শহীদের রক্তাপ্লুত স্বাধীন বাঙলাদেশ সম্বন্ধে পৃথিবীর মুক্তি ও শান্তিকামী মানুষের আজ এত আগ্রহ। সে দেশের মাটি, সেখানের লোকজন, সেখানের গণচেতনা সে দেশের ইতিহাসকে জানবার জন্য আজ দিকে দিকে তাই এত উৎসাহ। সহমর্মী ভারত তথা অন্তরঙ্গ পশ্চিম বাঙলাবাসীদের মন আজ তাই বাঙলাদেশের ডাকে উন্মেল। সীমান্তের বাধ্যবাধকতা আজ তার কাছে অবান্তর।

বাঙলাদেশের আজকের কথা তাই আজ জগৎজোড়া সংবাদবিচিত্রার বিচিত্রতম খবর। সেখানের দৈনন্দিন আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের প্রতিটি ঘটনা, তাই পৃথিবীর প্রতিটি সংবাদ প্রচার মাধ্যমের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়। তাই এ রচনা আজকের সংবাদের সীমা ছাড়িয়ে সংবাদ রচয়িতাদের প্রেরণার উৎস সন্ধানে ফিরে যাচ্ছে বিগত দিনের সাংস্কৃতিক চেতনার কাছে। বাঙলাদেশকে দেখতে গিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির পূর্বসূরীদের ইতিহাস ও কীর্তিমালা না জানা বা না দেখা আজকের বাঙলার পরিচিতিকে অসম্পূর্ণ রাখবে।

পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের সংস্কৃতি-সচেতন লোকেদের কাছে ভারতীয় তথা বাঙালীদের কাছে বাঙলাদেশ দর্শনের মধ্য দিয়ে মানুষের সাংস্কৃতিক অভিযানের ইতিহাস এবং আত্মদর্শনের সুযোগ মিলবে। প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চলের এই বাঙলা সেদিন প্রাচ্য সংস্কৃতির অগ্রাভিযানের যে প্রেরণা জুগিয়েছিল তার অন্যতম উত্তরসূরী বাঙলাদেশ আজ প্রাচ্যের মুক্তিকামী প্রতিটি দেশকে নতুন করে উৎসাহ দিয়েছে তাদের মুক্তি-সংগ্রামে। স্বভাবতই মুক্তিপাগল বাঙালীর ইতিহাস জানতে গেলে একদিকে যেমন জানতে হবে সমগ্র বাঙলার যুগ যুগ ব্যাপী স্বাধীনতার সাধনাকে, অন্যদিকে তেমনি বাঙলাদেশের এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক স্মৃতিসৌধ ও কীর্তিমালার মধ্য দিয়ে। স্বাধীন বাঙলাদেশকে তার নবীন অভিযাত্রীদের জানতে গেলে তাদের ইতিহাস আজ নতুন করে জানতে হবে। তারই প্রচেষ্টায় এ প্রাথমিক রচনা।

— ঢাকা —

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে সুবাদার ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খৃঃ বাঙলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করে ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগরে পরিবর্তিত করে। সে সময় মহারাজ মানসিংহ এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। সমকালে বিস্মৃত ঢাকানগরী সেদিন আবার বাঙলার রাজধানীরূপে পরিচিত হলো। ঢাকা বাঙলাদেশের একটি অতি প্রাচীন নগরী। কালিঘাট থেকে কলকাতার নামকরণের মতই সম্ভবত স্থানীয় ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম থেকেই এ শহর নাম গ্রহণ করেছিল ঢাকা। দক্ষযজ্ঞের পরিণতিতে সতী-শব বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হলে তার কীরিট ভূষণের "ডাক' নাকি ওখানে পড়ে। ডাক—স্থানীয় শব্দ। অলঙ্কারের কারুকার্য প্রতিফলিত করবার জন্য, জরোয়ার গহনার নিচে যে পশ্চাদপট ব্যবহার করা হয় তাকে ডাক বলা হয়, অর্থাৎ— (background) সম্ভবত এই ডাক থেকেই দেবী ঢাকেশ্বরী নাম পেয়েছে। ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায়ে ঢাকেশ্বরী দেবীর উল্লেখ আছে — 'বৃদ্ধ গঙ্গাতটে বেদবর্ষ-সাহস্র ব্যতায়ে স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈ র্জাগরং পত্তনং মহৎ। তত্রদেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্য প্রিয় সদাঃ গাস্যান্তি পত্তনং ঢক্কা সঙ্গকং দেশবাসিনঃ'।

যখন জাহাঙ্গীরের পত্তন করা নগরের এ প্রক্ষিপ্ত পৌরাণিক উল্লেখ আধুনিক হলেও অন্য সূত্রে ঢাকার প্রাচীনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ঢাকানগরীর আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি এ অঞ্চলের প্রাচীনত্বের হদিশ দেয়। পরিত্যক্ত প্রাচীন গঙ্গাপ্রবাহ বুড়িগঙ্গাতীরে ঢাকা অবস্থিত। ভবিষ্য পুরাণে ব্যবহৃত 'ঢক্কা' কথাটি সম্ভবত বৌদ্ধযুগে ব্যবহৃত একটি শব্দ। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় ঢক্কা কথাটির অর্থ প্রাচীন নদীবিশেষ। এই সূত্রানুসারে প্রাচীন নদী তীরে অবস্থিত অর্থাৎ ঢক্কা তীরে অবস্থিত স্থানীয় কোন বৌদ্ধ বিহারের বজ্রযানি বৌদ্ধতন্ত্রের শক্তি দেবী ঢাকেশ্বরীর মন্দির থেকেই স্থানমাহাত্ম্যে সম্ভবত নাম হয় ঢক্কা, তার থেকেই ঢাকা। অন্য মতে বৌদ্ধ যুগের অধঃপতনের সময় দেবী ঢাকেশ্বরী সম্ভবত গুপ্ত বা ঢাকা ছিল। পরে মহারাজা বল্লালসেন দেবীকে আবিষ্কার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দেবী ঢাকা ছিলেন বলে তার নাম ঢাকেশ্বরী হয় এবং শহরের নামও 'ঢাকা'য় পরিবর্তিত হয়।

দেশবিভাগের পর ঢাকা শহরের পরিবর্তন বিস্ময়কর। আধুনিকীকরণের প্রাবল্যে ঢাকা তার প্রাচীন ইতিহাসকে হারিয়ে ফেলেছে অনেকটা। তবু ঢাকার এ উন্নতি এই প্রথম নয়। মধ্যযুগের তারিখ-ই-ঢাকা অনুসারে জানা যায় সেদিনের চরম উন্নত ঢাকার পরিধি ছিল পশ্চিমের জাফরাবাদ থেকে পোস্তাগোলা পর্যন্ত ১০ মাইল ও উত্তরে টঙ্গোনদী পর্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল এবং ওখানের লোকসংখ্যা তখন ছিল ৯ লক্ষ। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সময় ১৯০৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে রচিত নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল।

সাম্প্রতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে খান সেনাদের দ্বারা বিপর্যস্ত ঢাকা এর আগেও মাৎস্যন্যায়ের সুযোগে বহুবার লাঞ্ছিতা হয়েছে। মোঘল যুগে মগেরা ২।৩ বার ঢাকা লুঠ করে। পলাশী যুদ্ধের পর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় ১৭৬৩ খৃঃ ঢাকা আবার লুঠ হয়। তবে ঢাকার স্থানীয় পুরাকীর্তির মধ্যে এক ঢাকেশ্বরী মন্দির ছাড়া, রমনার বুড়োশিব ও কালীমন্দিরই প্রাচীনতম ছিল। বল্লালসেন নির্মিত আদি ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি বহুবার সংস্কৃত হয়ে রূপ পরিবর্তন করলেও তার পেছনের অংশ প্রায় অ-বিকৃত অবস্থায় ছিল। অনেকের মতে রমনার বুড়োশিবই ঢাকার প্রাচীনতম দেবতা। এটি নাকি শংকরাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রমনার কালীমন্দিরটিও শংকরাচার্য সৃজিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদাসীদের মঠের মধ্যে অবস্থিত ছিল। মন্দিরটির গঠন স্থাপত্যে উত্তর ভারতের প্রভাব দেখা যায়। সম্প্রতি ভারতের শিখ সঙ্গত কর্তৃক গ্রন্থসাহেব ও গুরু গোবিন্দ সিং-এর ব্যবহৃত তরোয়াল উপহার দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। রমনার কালীবাড়ীর পশ্চিমে একটি অতি পুরোনো শিখ সঙ্গত আজও আছে। ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দের সময় নাথসাহেব ধর্মপ্রচারের জন্য ঢাকায় এসে এই সঙ্গতটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই এটি নাথা সাহেবের সঙ্গত নামে পরিচিত। অন্যমতে — অনেকের ধারণা আওরঙ্গজেবের রাজত্বে নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুর ঢাকায় এসে এই সঙ্গতটি প্রতিষ্ঠা করে যান। এ সঙ্গতের মধ্যে অবস্থিত ইঁদারাটির গায়ে সঙ্গতের মহন্ত প্রেমদাস কর্তৃক ১৭৪৮ খৃঃ ইঁদারা সংস্কারের একটি প্রস্তর ফলক লিখিত আছে। অষ্টকোণ-যুক্ত এই ইঁদারা। প্রবাদ এই যে—গুরু নানক একবার ঢাকায় এসে এই ইঁদারার জল পান করেন। ফলে লোকবিশ্বাস ইঁদারার জল অলৌকিক গুণসম্পন্ন। শিখ ধর্মের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ সুপ্রাচীন। গুরু গোবিন্দের তরবারি তাই যথাযথ জায়গায় প্রদত্ত হয়েছে।

মুসলমান যুগের প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে—সিয়া সম্প্রদায়ের সৈয়দ মীর মুরাদ কর্তৃক ১৬৪২ সালে নির্মিত ইমাম-বাড়ী-হুসেনী দালান। জাফরা বাজার ও বাঁশবাড়ীতে শায়েস্তা খাঁ নির্মিত সাত গম্বুজ মসজিদ। শহরের পশ্চিমে বুড়ীগঙ্গাতীরে আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজম নির্মিত লালবাগ কেল্লা। শায়েস্তা খাঁ সংস্কৃত পরীবিবির মকবরায় চন্দন কাঠের দুয়ার-

শেরে বাংলা ফজলুল হকের কবর
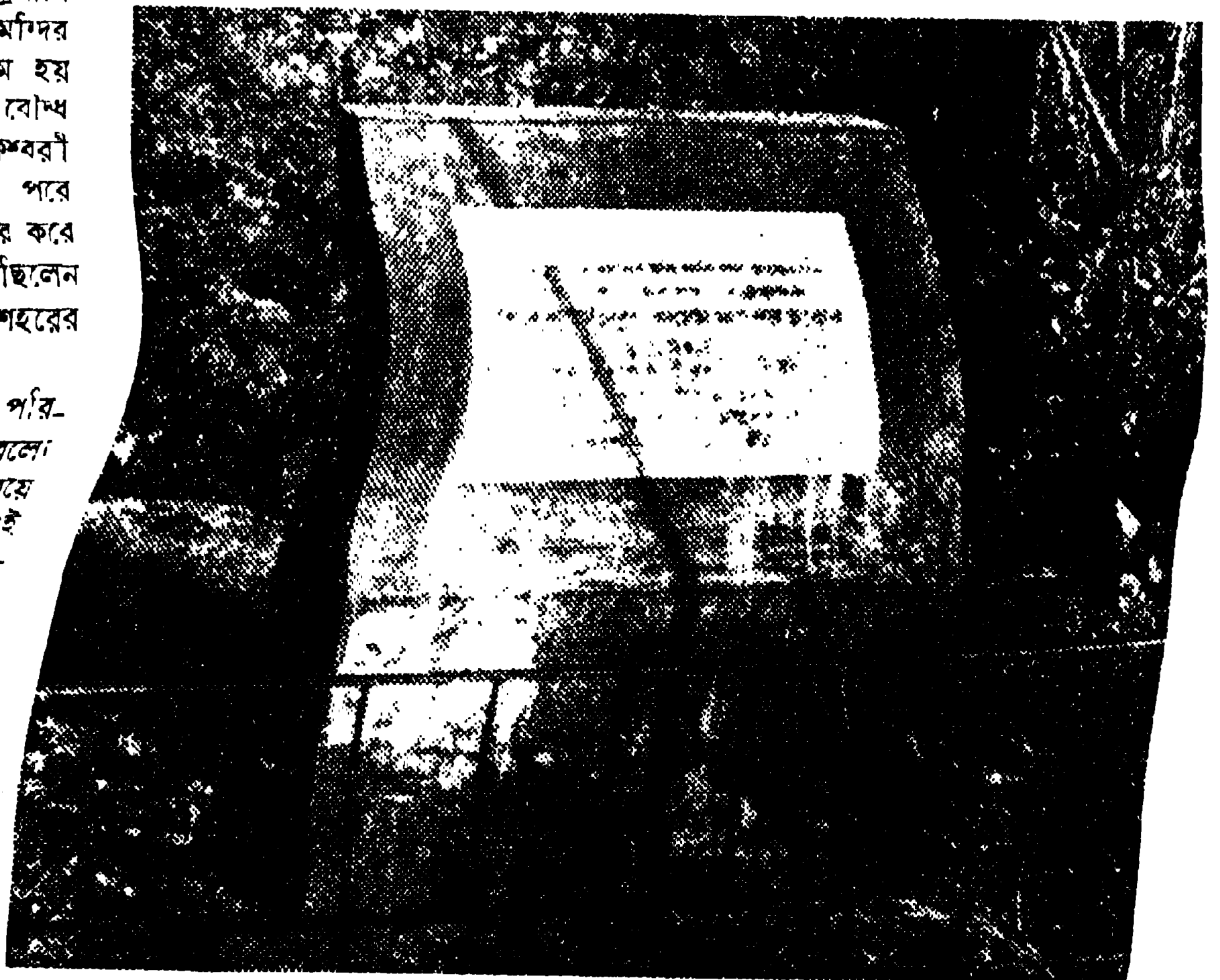
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
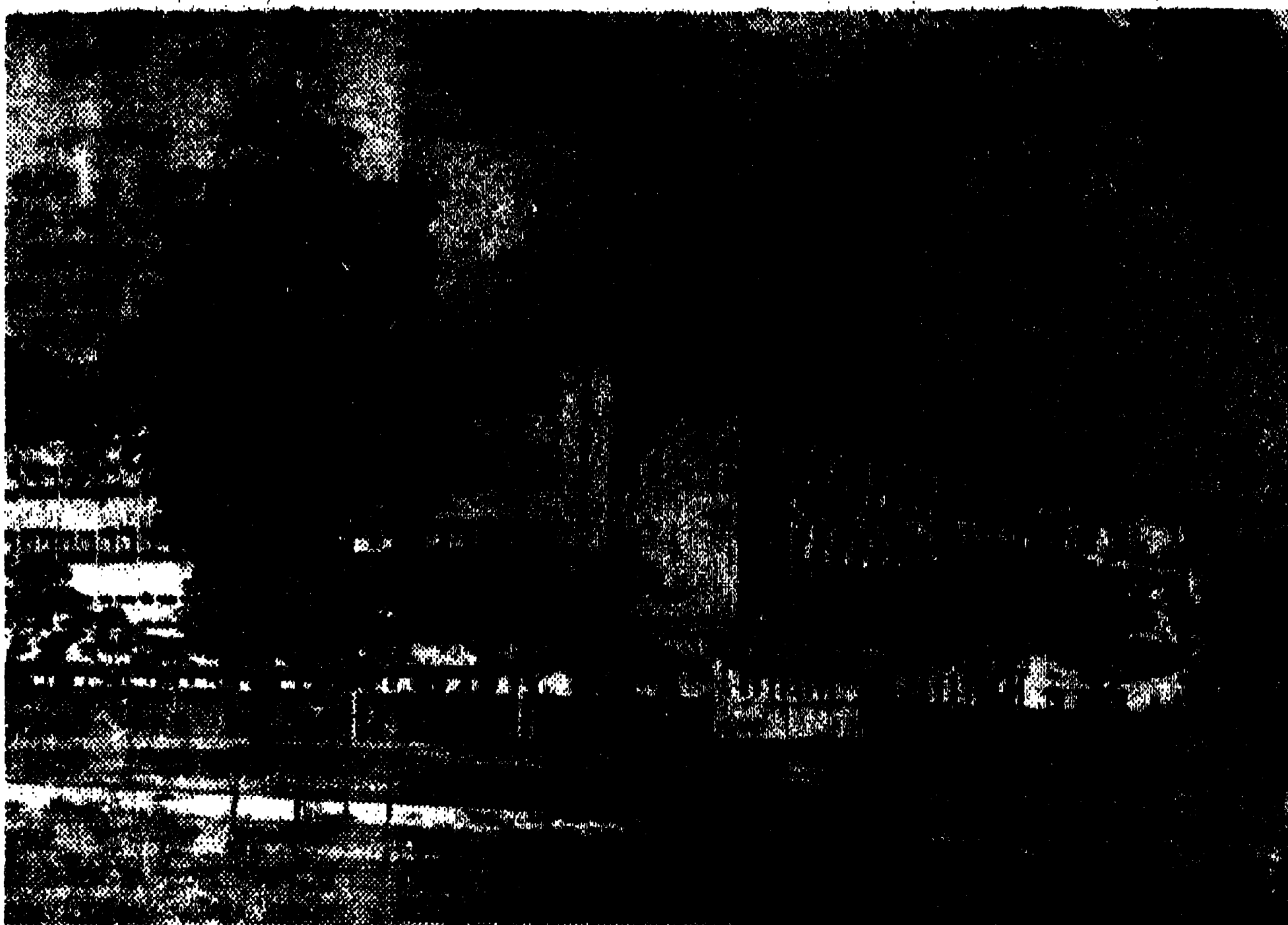
গুলি প্রাচীন হিন্দু রীতির সাক্ষীস্বরূপ। মকবরার ছাদের নির্মাণ কৌশলও তৎকালীন হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণে। মকবরার দক্ষিণে সম্রাট ফরুক শিয়র নির্মিত লাল-বাগ মসজিদ আছে। এর কাছেই ছিল নবাব আজিম-উস-সান নির্মিত পোস্তা প্রাসাদ। বুড়ীগঙ্গার গর্ভেই তার বিলুপ্তি ঘটে। বুড়ীগঙ্গাতীরে বাকল্যান্ড বাঁধের ধারে শাহাসুজান নির্মিত বড়কাটরা নামে সরাই-খানা আছে। এর কাছেই শায়েস্তা খাঁ নির্মিত সরাইখানায় ছোট কাটরার মধ্যে রয়েছে চম্পাবিবির সমাধি। এর নাম থেকে স্থানটির নাম চাঁপাতলি হলেও চম্পাবিবির বিশদ কিছু ইতিহাস জানা যায়নি। বড় কাটরার সামনে বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরায় বাঙলার ইতিহাসের এক শোচনীয় অধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৬২০ খৃঃ সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ নির্মিত প্রাসাদের যে ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায় সেই জিঞ্জিরা প্রাসাদেই পলাশী যুদ্ধের শেষ অংকে আলিবর্দির কন্যা ঘেসেটি ও আমিনা বেগম এবং সিরাজদ্দৌলার বেগম ও শিশু-কন্যাসহ বন্দিনী ছিলেন। মিরজাফর পুত্র মীরন তাদের মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাবার ছল করে পথমধ্যে নৌকা ডুবিয়ে হত্যা করেন। এ ছাড়াও আছে ইশা খাঁ মসনদ-ই-আলা প্রপৌত্র রচিত নবাবপুরের মানোয়ার খাঁর বাজার, ১৬৭৬ খৃঃ শায়েস্তা খাঁ নির্মিত চকবাজারে বড়চক মসজিদ এবং বাবু বাজারের মসজিদ। জেল হাসপাতালের প্রাঙ্গণে ছিল ইসলাম খাঁর দুর্গ ও টাকশাল। শায়েস্তা খাঁর প্রধান খোজা খাজা অম্বরের মসজিদ আছে রেল স্টেশনের কাছে। মুর্শিদকুলি খাঁ নির্মিত বেগম বাজারের মসজিদটি ঢাকার বৃহত্তম মসজিদ। আর নারিন্দা মহল্লায় ১৪৫৬ খৃঃ নির্মিত বিনতবিবির মসজিদটি ঢাকার সবচেয়ে পুরনো মসজিদ। রমনা মহল্লার—নায়েব-নাজিম নবাব জসারৎ খাঁর প্রাসাদের দ্বার-দুয়ারী বা বৈঠকখানাই বর্তমানে ঢাকা সংগ্রহশালা। এ সংগ্রহশালায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরানো শিল্পকর্মের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। ঢাকা ভ্রমণকারীদের কাছে এটি অবশ্যই দর্শনীয় স্থান।

ঝুনা, সবনব্, আবরোয়ান, শবনাতি, সরবতি, রঙ, সরকার আলি আলবালেল, তঞ্জেব, নয়নসুখ, তারেন্দাম, সরবন্দ, কুমসী, বদন খাস, মলমল খাস, খাসা, জঙ্গলখাসা। কিংবা রাজকোট, কাগজাহি, পাদশাহীদার, কলাবাত, অথবা চারখানা এর বহুরূপ যেমন নন্দনশাহী, আনারদানা, সাকুতা, কবুতরখোপা, পাছাদার প্রভৃতি। কসিদা-র বিভিন্ন রূপ যথা—কাটাউমি, মৌঘাতি, আজিজল্লা, দোছাক। এছাড়া জামদানির বিচিত্ররূপ—তোরাদার কারেলা, বুটিদার তেবছা, দুলবার, পান্নাহাজার, মেল, দুবলি, দুবলীজাল, ছাড়িয়াল, সাবুরগা, এতো গেল ঢাকাই মসলিনের বিচিত্র রূপের বিভিন্ন নাম। কত বিচিত্র রূপেই না ঢাকাই মসলিন সেদিন বিশ্ব-সুন্দরীদের মনজয়ের অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল। এছাড়া ঢাকায় বহু জাতের বাপ্তা কাপড় তৈরী হত। যেমন—হাম্মাম, ডিমটি, সাল, জঙ্গলখাসা, গলাবন্ধ প্রভৃতি। মধ্যযুগের প্রখ্যাত পরিব্রাজক টাভার্নিয়ারের লেখায় জানা যায় ইরানের দূত মহম্মদ আলি বেগ দেশে ফেরার সময় শাহকে উপহার দেবার জন্য ঢাকা থেকে একটি ৬০ হাত লম্বা মসলিন নিয়ে যান, এক ছোট্ট নারকেল খোলের মধ্যে করে। ১ গজ চওড়া কুড়ি হাত লম্বা একটি মসলিনকে জড়িয়ে অতি সহজেই একটি আংটির মধ্যে দিয়ে এপার ওপার করানো যেত। ৩০ হাত লম্বা, ২ হাত চওড়া এক-একটি মসলিনের ওজন ছিল ৪।৫ তোলা। তার দাম সেদিনের বাজারেই ছিল—৪০০/৫০০ টাকা। আরো জানা যায় ১৮৪৬ খৃঃ মসলিন তৈরীর এক ফেটি সুতো যার ওজন ছিল আধসের, লম্বায় তা প্রায় ২৫০ মাইল। কোম্পানীর আমলে অসম প্রতিযোগিতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ কুঠিয়ালদের জঘন্য অত্যাচারে এ শিল্প কলাটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়। যেমন আজ অবহেলায় আর প্রতিবেশীদের অসহিষ্ণুতায় ধ্বংস হয়েছে ঢাকার বিখ্যাত রূপোর তারের কাজ, শঙ্খশিল্প, সোনার কাজ প্রভৃতি।

—মীরপুর—

ঢাকার উপকণ্ঠে আজকের বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের রক্তস্নাত বিহারী উপনিবেশ মীরপুর-এর রক্তপিপাসার ইতিহাসও লুকিয়ে আছে প্রসিদ্ধ, আউলিয়া হজরত শাহ আলি সাহেবের দরগা-য়।

বোগদাদের রাজকুমার হজরৎ শাহ আলি ও তার ৪ জন শিষ্য এখানে আসেন প্রায় ৪০০ বছর আগে। তারপর এ মসজিদের দরজা বন্ধ করে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হন শাহ আলি। দেড় বছরের জন্য তপস্যায় থাকবেন বলে শিষ্যদের তিনি নিষেধ করেন দরজা খুলতে। দেড় বছর পূর্ণ হবার মাত্র একদিন আগে অসহিষ্ণু শিষ্যরা মসজিদ মধ্যে অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেয়ে দরজা ভেঙে দেখেন—ফাঁকা মসজিদ, আগুনের ওপর একটি পাত্রে রক্ত ফুটছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশবাণী-রূপে ক্রুদ্ধ গুরুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল শিষ্যরা। তিনি নির্দেশ দিলেন—ঐ পাত্রের

ঢাকার নবাববাড়ীতে শহীদ-স্মৃতিস্তম্ভ
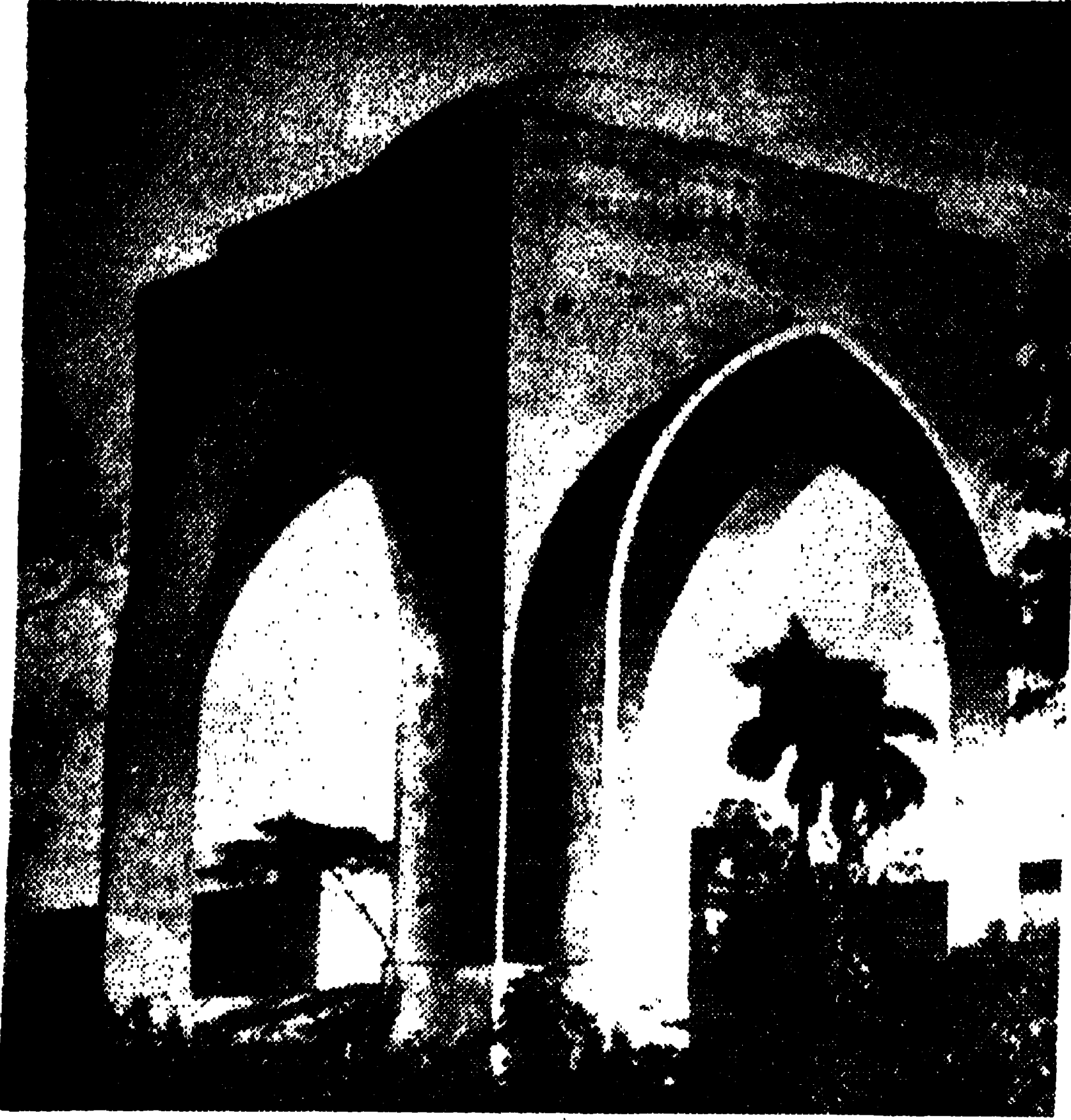
রক্ত যেন সমাহিত করা হয়। সে প্রায় ১৫৭৭ খৃঃ-র কথা। কিন্তু তিনি যে মসজিদে সমাহিত তা প্রায় ১৪৮০ খৃঃ নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। তাই সেদিনের মীরপুরের রক্তক্ষুধা বুঝি আজও শেষ হয়নি।

—সাভার—

সাভার ঢাকা থেকে ১৬ মাইল। ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সংগমে মেদনীপুরের হরিশচন্দ্র পাল এসে যে রাজ্য স্থাপন করেন তার সেদিনের নাম—সম্ভার বা সম্ভাগ, পরে এটির নাম হয় সর্বেশ্বর নগর বর্তমানে যার নাম—সাভার। হরিশচন্দ্র রাজার দুই রাণী কলাবতী ও ফুলেশ্বরীর নাম নিয়ে এই অঞ্চলেও দুই গ্রাম আছে—কলাপাড়া ও ফুলবাড়িয়া। এদের দুটি মেয়ের উদুনা ও পদুনার সঙ্গে বিয়ে হয় নাথপন্থী ময়নামতীর বিখ্যাত রাজা গোপীচন্দ্রের সঙ্গে। সাভার-এর পূর্বদিকে কালিমোহর-এ এই সেদিনও রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ও হরিশচন্দ্রের দুর্গ কোঠাবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ দেখা যেত। আজ, খান সেনাদের গড়া বাঙ্কার বা ট্রেঞ্চের পূর্বস্মৃতি সেদিনের এ দুর্গের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত। এখানের এক গর্ত থেকেই সেদিন সৈন্যরা নিরাপদে গোলাগুলি ছুঁড়তো বলে অনুমান করা হয়। এ অঞ্চলের কর্ণপাড়ার রাজার তাম্বুলবাড়ী বলে পরিচিত স্তূপটি সম্ভবত একটি বৌদ্ধচৈত্য-এর ধ্বংসাবশেষ। এখানের জঙ্গলের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা অলংকরণ খচিত বহু পাথর ও পোড়ামাটির টুকরো বৌদ্ধযুগের ইতিহাসকে আজও ধরে রেখেছে। সাভার প্রভৃতি গ্রামে এ কবিতার পংক্তিটি আজও প্রচলিত।

'বংশাবতী পূর্ব তীরে
সর্বেশ্বর নগরী
বৈসে রাজা হরিশচন্দ্র
জিনি সুরপুরী।।'

—ধামরাই—

সাভার থেকে ৪ মাইল দূরে ধামরাই বা ধর্মরাজিয়া গ্রাম। অনেকে মনে করেন সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত ৮৪ হাজার ধর্মরাজিকা স্তূপ বা স্তম্ভের ১টি এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধ ত্রিরত্ন পুজোর প্রতীক জগন্নাথ মন্দিরও এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রবণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বজ্রযানী শক্তিপুজোর পরিচয়ও সম্ভবত লুকিয়ে আছে এ অঞ্চলের প্রচলিত বনদুর্গাপুজো ও তার শুকরবলীর মধ্যে। পূর্ব বাঙলা খ্যাত ধামড়াই-এর যশোমাধবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা যশপাল। পুরীতে রাজা ইন্দ্রদুম্ন কর্তৃক বালিয়ারীতে জগন্নাথ মন্দির আবিষ্কারের কাহিনীর মত রাজা যশপালের যশমাধব আবিষ্কারের কাহিনীও একই রকম। এক দন্ত সাদা হাতীর পিঠে ভ্রমণের সময় এক গ্রামের উঁচু ঢিবির কাছে হাতীটির বিচিত্র আচরণেই যশোপালকে মাধব মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস আদি যশোমাধব প্রতিমা নির্মিত হয়েছিল পুরীর আদি জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণের অবশিষ্ট কাঠ দিয়ে। এখানের রথের মেলাও বিখ্যাত।

—রাজাসন—

সাভার থেকে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নান্নার ও বদ্রাপুর গ্রাম দুটির মাঝে প্রায় আধমাইলব্যাপী 'রাজাসনের ভিটা' নামে এক মাটির স্তূপ আছে। স্থানীয় বিশ্বাস এটি বজ্রাসন মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সংস্কারক সেই যুগের অদ্বিতীয় জ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর এই বিহারেই নাকি বারো বছর শিক্ষালাভ করেছিল। নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক সাধনায় বজ্রাসন নামে একটি পরিচিত আসন আছে।

—বিক্রমপুর—

উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণে ইদিলপুর পরগণা, পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে পদ্মা—এই চতুঃসীমার মধ্যেই বিক্রমপুর পরগণা। বিক্রমপুরের প্রাচীন অশেষ কীর্তি নাশ করেই পদ্মা কীর্তিনাশা নাম কিনেছে। বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ মহকুমার মধ্যে। মুন্সিগঞ্জ থেকে ৩ মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী রামপাল সম্ভবত পালবংশীয় রাজা রামপাল দেবের নাম থেকেই এ নামকরণ। বিক্রমপুরের বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া পাল যুগের কলাবস্তু প্রস্তর মূর্তি ও পোড়ামাটির কাজ ইত্যাদি এ অনুমানকে বাস্তব ভিত্তি দিয়েছে। সেনবংশীয় নৃপতি বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রফলকে উল্লেখিত শ্রীবিক্রমপুর সম্ভবত এই রামপালকেই নির্দেশ করে. স্থানীয় বিপ্রকল্পকথা গ্রন্থ অনুসারে সেনবংশীয় রামবিক্রমসেন বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা। বাঙলাদেশের শেষ হিন্দু রাজবংশ এই রামপাল নগরেই বহুদিন রাজত্ব করেছিল। 'লঘুভারত' গ্রন্থ অনুসারে মহারাজা লক্ষণসেন রামপালে জন্মগ্রহণ ক[illegible]। বল্লালসেন নির্মিত প্রাচীন প[illegible]দের ভগ্নাবশেষ এখন এখানে বল্লালবাড়ী নামে পরিচিত। রামপাল দীঘি, বল্লাল দীঘি, নামের বৃহৎ দীঘিগুলি এখনও তাঁদের স্মৃতি বহন করছে। এখানে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্রদেব-এর ১ খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছিল। গত শতাব্দীতে এখানের একজন কৃষক তার ক্ষেত থেকে এক বহুমূল্য হীরক খণ্ড খুঁজে পেয়েছিল। রামপালের কাছে ধামদ গ্রামে প্রতিটি ৩০ ভরি ওজনের ২৪ পৃষ্ঠার একটি সোনার পুঁথি পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন—নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ, মহাস্থবির শীলভদ্র এই রামপালেই জন্মগ্রহণ করেন। এখানের আশপাশের পঞ্চসার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর, জোড়াদেউল প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। সেনবংশের রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেনের সঙ্গে স্থানীয় এক ফকিরের বিরোধের মধ্য দিয়ে এখানের হিন্দু রাজবংশের পরিণতি ঘটে। রামপালের উত্তরে কাজি কসবা গ্রামের

শহীদ সুরাবর্দীর কবরে লিপিবদ্ধ শেষ চিঠি
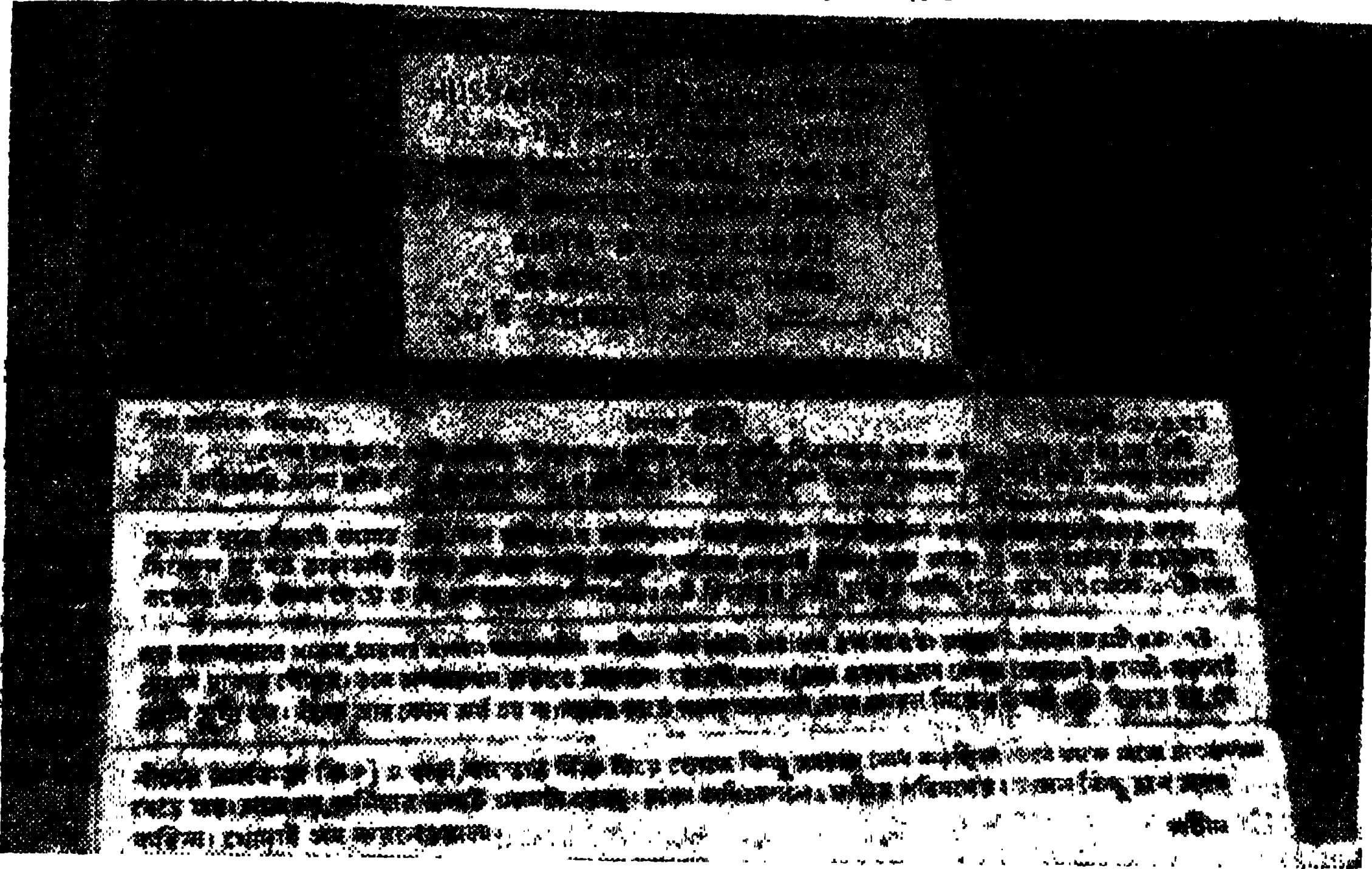
দুর্গাবাড়ী নামক স্থানে আদম শহীদ-এর প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। তার শিলালেখ থেকে জানা যায় যে—১৪৮৩ খৃঃ সুলতান জালালউদ্দীন ফতে শাহের সেনাপতি খোজা মালিক কাফুর এটির নির্মাতা।

জ্যোতিষ ও সংস্কৃত চর্চার জন্য বিক্রমপুর বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। বিক্রমপুরে বাঙলা পঞ্জিকা রচনার খ্যাতি ছিল। বিক্রমপুরের স্থানীয় সময় উজ্জয়িনী থেকে এর দেশান্তরে দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল ঠিকভাবে গণনা করে, পঞ্জিকায় দেওয়া হত। পরে যখন নবদ্বীপ ও কলকাতায় পঞ্জিকা রচনা শুরু হয় তখনও বিক্রমপুরের এই সময় নির্দেশ ব্যবহার করার রীতি ছিল।

—বজ্রযোগিনী—

রামপালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আছে বজ্রযোগিনী গ্রাম। গ্রামটি বিরাট। ২৭টি পাড়া নিয়েই এ গ্রামটি। এক একটি পাড়া প্রায় এক একটি গ্রামের সমান। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ৯৮০ খৃঃ বৌদ্ধযুগের মহাজ্ঞানী পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দীপংকরের পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী। কাছের বজ্রাসন মহাবিহারে ১২ বছর পাঠ শেষ করে দীপংকর সুবর্ণদ্বীপ বা ব্রহ্মদেশের পেগু জেলার সুধর্মনগর বা আজকের থেটন-এ যান। সেখানের এক বিহারে মহাসংঘাকিকাচার্যের কাছে আরো ১২ বছর অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে আসেন। পাল রাজবংশের মহারাজা নয়পাল এই অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতকে স্থানীয় বিক্রমশিলা মহাবিহারে সর্বাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন। তারপর তিব্বতরাজের অনুরোধে তিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন। এখনও তিব্বতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বজ্রযোগিনী প্রতিমা নিয়মিত পূজিত হয়। তিব্বতে দীপংকরের মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। দার্জিলিং জেলার ঘুমের বৌদ্ধ বিহারেও দীপংকরের একটি স্বর্ণমণ্ডিত প্রতিমা নিয়মিত পূজিত হচ্ছে। দীপংকর শতাধিক ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার ভাই-এর ছেলে দান-শ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত বলে প্রখ্যাত ছিল। বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপংকরের জন্মভূমি এখনও নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটে বলে পরিচিত।

—পানাম—

নারায়ণগঞ্জ থেকে ৮ মাইল পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যস্থলে পানাম গ্রাম আজ জঙ্গলাকীর্ণ। এক সময় সুবর্ণ নগরী বা সোনার গাঁও এর নাম ছিল। বারো ভূঁইয়ার অন্যতম রাজা ঈশা খাঁর সময় সোনারগাঁ বিখ্যাত ছিল। আজ বিস্তৃত গড় ও প্রাকারের ধ্বংসস্তূপই এর সাক্ষ্য। পানামের কাছে হুসেন শাহের রাজত্বকালে ১৫১৯ খৃঃ মোল্লা আকবর খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি লাল রঙের মসজিদ আজও দেখা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভ্রমণকারী ইবন বতুতার রচনা থেকে জানা যায়—সোনার গাঁও থেকে যবদ্বীপে ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিমত লেন-দেন ছিল। তার রচনায় সোনার গাঁও একটি বাণিজ্য পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে।

—নারায়ণগঞ্জ—

কলকাতা থেকে ২৫৯ মাইল। শহরে হাজীগঞ্জ ও সোনাকান্দা মহল্লার দুটি পুরানো গোলাকার জলদুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বর্ষাকালে এখনও এটির চারদিকে নৌকা করে ঘোরা যায়। সেখানের গোল দেওয়ালে দু-হাত অন্তর কামান বসাবার ছিদ্র এবং মঞ্চের ওপর বড় কামান বসাবার জায়গা দেখা যায়। সম্রাট আওরংগজেবের রাজত্বকালে পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ থেকে রাজধানী ঢাকাকে বাঁচাবার জন্যই ছিল এত বিধি-ব্যবস্থা। মুন্সিগঞ্জের কাছে কলাগাছিয়া নদীর মোহনায় এমন আর একটি জলদুর্গের ধ্বংসাবশেষ সন্ধান পাওয়া যায়।

দেওয়ানবাগের মাটির ভগ্নস্তূপে ৭টি কামান পাওয়া যায়, সেগুলি ঢাকার সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হত। প্রাচীন কালের বিক্রমপুর ও আজকের ঢাকাকে ঘিরে যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা সেদিন প্রবাহিত হয়েছিল সেই জাগ্রত চেতনার আর এক রূপ প্রকাশিত হয়েছে এবার স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলাদেশের যুব-চেতনার মধ্যে। আজকের বাঙালীকে জানতে গেলে সেদিনের বাংলাকেও চিনতে হবে। তা না হলে জিন্না, আয়ুব, ইয়াহিয়া, ভুট্টোর মতই বিভ্রান্তি ঘটবে বাঙালী চেতনাকে চিনতে। কাল ও যুগ পরিবর্তনের সূত্র ধরে বাংলার মানুষ যুগবিড়বাস, ধর্ম বিশ্বাসের সমন্বয় সাধন করে এগিয়ে নিয়ে গেছে তার সাংস্কৃতিক সদ্চেতনাকে হিন্দু থেকে বৌদ্ধ বা জৈন, আবার হিন্দু বা অবক্ষয়ী বৌদ্ধতান্ত্রিক। তারপর নবধর্মের অভ্যুদয়ে ধার্মিক চেতনায় বা রাজনৈতিক চাপে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অথবা বর্ণাশ্রমের কঠিন বন্ধনে আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়ে মুক্তি খুঁজেছে সহজিয়া লোকযানের মধ্যে, প্রেমনির্ভর বৈষ্ণববাদের সহজ পথে সমন্বয় সাধনে রত রয়েছে বাঙালী। ধর্ম ও সমাজ বন্ধনের প্রয়োজনে এ প্রচেষ্টার গুরুত্ব ছিল। কিন্তু ধর্ম ও সমাজবন্ধন কোন দিনই বাঙালীর সংস্কৃতি বা সমাজ চেতনাকে দমিয়ে ধর্মান্ধতা বা সমাজবন্ধনের সীমিত গণ্ডির মধ্যে তাকে আটকে রাখতে পারে নি। বাংলার ইতিহাস, বাঙালীর শুভবুদ্ধিজাত সমাজ চেতনা ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির ইতিহাস।

বেতার বিচিন্তা

অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কলিকাতা কেন্দ্রের ঐতিহ্য প্রায় অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী। পূর্বে এর নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন এবং এর কর্ণধার ছিলেন এক বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তখন ইংরাজ রাজত্ব, তাঁদের কৃপাদৃষ্টির অভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা ছিল প্রায় মুমূর্ষু, এই প্রতিষ্ঠানটিকে সেইকালে যাঁরা নানা-ভাবে প্রাণরসে পূর্ণ করে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে নলিনীকান্ত সরকার, বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বাণীকুমার প্রমুখ আজও জীবিত। যাঁরা আজ পরলোকগত তাঁদের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, গল্পদাদু (বসু মহাশয়), মোহনবাগান খ্যাত রাজেন সেন প্রমুখের কথা মনে পড়ে। আরো অনেকে ছিলেন এবং আছেন যাঁদের নাম এখনই স্মরণে আসছে না। বিশেষ করে কলিকাতা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করার অনেক হেতু। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের অবদান অবিস্মরণীয়। স্মরণে আছে ১৯২৯ সালেও বর্তমান লেখকের ২৫শে বৈশাখ তারিখের রবীন্দ্র-নাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের আসরে অংশ-গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এর কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কার্সিয়াং থেকে সরাসরি কবির 'জন্মদিন' কবিতাটি কবিকণ্ঠে সম্প্রসারিত হয়। সেই ত্রিশের দশকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নাটক বেতার মাধ্যমে প্রচারিত হত, এইভাবে রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকটি বেতার মারফৎ প্রচারিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম বেতারের কার্যসূচীসহ সাহিত্য বিষয়ক রচনাদিসহ প্রকাশিত হয়, সম্পাদক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। পরে নলিনীকান্ত সরকার। এর নামকরণ করা হয় 'বেতার জগৎ'। আজো 'বেতার জগৎ' নামেই কলিকাতা কেন্দ্রের বেতার কার্যসূচী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এই দীর্ঘ কাল ধরে অনেক নতুন সাহিত্য (গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও রম্য রচনা) কলিকাতা কেন্দ্র থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে। সম্প্রতি কালের সঙ্কটমুহূর্তে বেতারের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্র-নাথের শতবার্ষিকী ও এই জাতীয় অন্যান্য বাৎসরিক স্মরণীয় ঘটনাবলী উপলক্ষ্য করে যে সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার অধি-কাংশ সুপরিকল্পিত। মনে হয়, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয়তা এইকালে যেভাবে বেড়েছে তার মূলে আছে কলিকাতা বেতারের সাংস্কৃতিক কার্যসূচী। এই সব কারণে কলিকাতা কেন্দ্রের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ঘটনাবহুল ইতিহাস প্রচার করার সময় এসেছে একথা কর্তৃপক্ষদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

স্প্যান পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ভয়েস অব আমেরিকার ত্রিশ বৎসর পূর্তির এক কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, সেই প্রবন্ধটি পড়ে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কথা মনে এল।

ভয়েস অব আমেরিকার ভূমিকা অবশ্য অন্যরূপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে প্রতিষ্ঠিত এই বেতার কেন্দ্র সরকার-নিয়ন্ত্রিত এবং এই শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র মারফৎ মার্কিন নীতি এবং মার্কিন জন-গণের সংস্কৃতিবিষয়ক অনেকরকম তথ্যাদি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬২-তে এই বেতার প্রতিষ্ঠান বিষয়ে একটি চমৎকার কথা বলেন—

'অলিভার ক্রমওয়েল তাঁর নিজের পোর্টরেট দেখে মন্তব্য করেছিলেন

> Paint us with all our blemi-shes and warts, all the things about us that may not be so immediately attractive—'

ভয়েস অব আমেরিকাও সেই চেষ্টা করে থাকে।'

ভয়েস অব আমেরিকার কাজকর্ম প্রেসিডেন্টের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত, তাঁর মতে একেবারে খাঁটি খবর পরিবেশিত হওয়া চাই।

এই কারণে ১৯৪২-এর ২৮শে ফেব্রু-য়ারী 'ভয়েস অব আমেরিকা' থেকে ঘোষিত হয় 'আজ আমেরিকা ৭৯ দিনব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত। আমরা যুদ্ধরত আমেরিকা বিষয়ে আপনাদের কিছু বলব। এই সংবাদ ভালো বা মন্দ হতে পারে। আমরা শুধু সত্য বলব।'

এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন অল-ইণ্ডিয়া রেডিও বিগত কয়েকটি যুদ্ধের সময় এই নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। অল-ইণ্ডিয়া রেডিও মারফৎ প্রচারিত যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিবরণে সত্য সংবাদই পরিবেশিত হয়েছে, আর সেই কারণেই আকাশবাণীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভয়েস অব আমেরিকা ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী ইতালীয়ান এই চারটি বিভিন্ন ভাষায় য়ুরোপে এক রকম তার সূচনা থেকেই সংবাদ ও তথ্যাদি প্রচার করে থাকেন এবং ওয়াশিংটনের তেইশটি স্টুডিয়ো থেকে বাংলা, পোলিশ, আরবী, হিন্দি, পোর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষায় সংবাদাদি প্রচারিত হয়।

এই সব দেশের সময় বিভিন্ন, তাই বিভিন্ন সময় নির্দেশক ঘড়ি আছে 'মাস্টার কণ্ট্রোল' কক্ষে। সেখানে কলিকাতা, ব্যাংকক, টোকিও হনলুলু, নিউইয়র্ক, লণ্ডন মস্কো প্রভৃতি দেশের সময় দেখা যায়, সেই সময় অনুসারে বেতার মারফৎ সংবাদাদি প্রচারিত হয়। এর পিছনে অত্যন্ত জটিল যান্ত্রিক কলা-কৌশল আছে।

ভয়েস অব আমেরিকার প্রধানতম ভিত্তি হল সংবাদ। সংবাদ পরিবেশনই এর মুখ্য কর্ম। সমগ্র সংগঠনটি তাই সংবাদসম্পর্কিত। তাই অজস্র সংবাদ-প্রেরক, সংবাদ-লেখক ইত্যাদি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ভয়েস অব আমেরিকার একটি বিশেষ বাতায়ন, তার রাজনৈতিক নীরস বিষয়ের সঙ্গে বেতার বিশেষজ্ঞবৃন্দ নিরন্তর নিত্যনূতন মার্কিন বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য এবং সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে গবেষণা করে যখন দশভণ মাইক্রোফোনের মাধ্যমে জন-সমাজে সম্প্রসারিত করছেন। শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, কারিগরীগত বিদ্যার অগ্রগতি, আর মহাজাগতিক ক্ষেত্রে মার্কিন অভিযান বিষয়ে সকলকে অবহিত করার দিকে ভয়েস অব আমেরিকার বিশেষ লক্ষ্য আছে, আবার সেই সঙ্গে 'ইয়াংকী ডুডল' এই সুরের সম-কালীন মার্কিন সঙ্গীতরচয়িতাদের আধু-নিক সঙ্গীতপ্রচেষ্টা প্রসারিত হয়ে থাকে। মার্কিন জনপ্রিয় সঙ্গীত ও জাজ সঙ্গীতের প্রতি বিশ্বব্যাপী আগ্রহ থাকায় 'মিউজিক ইউ এস এ' এই বিভাগটির ওপর সকলের আগ্রহ।

১৯৬৬-তে প্রথম প্রসারিত 'নিউ সাউণ্ড' বিভাগটিও এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই বিভাগে দ্রুততালে বিশ্বসংবাদ, বিশেষ কাহিনী, সঙ্গীত, আবহাওয়া এবং কমেডি

বিষয়ে আলোচনা থাকে। ভয়েস অব আমেরিকার একজন প্রাক্তন ডাইরেক্টর জন চ্যান্সেলরের মতে—

'Vigourous, amusing, avant garde—the first with the latest'.

'দি ফাস্ট উইথ দি লেটেস্ট'—এই নীতি হল যে-কোনো বেতার সম্প্রসারণের প্রাণ।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বি বি সি দীর্ঘকাল ধরে বেতার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে আছেন। বি বি সি'র বেতার সূচীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় তা অভিনব। এর পিছনে আছে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা। বি বি সি'র বাংলা কার্যসূচী বিশেষ প্রশংসনীয়।

আমরা বাঙ্গালী, সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আমরা বিদেশী বেতারের বাংলা কার্যসূচীতে বেশী আগ্রহী। এই কার্যসূচীর মাধ্যমে যদি সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ করা যায় সেদিকে কর্তৃপক্ষদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিদেশী সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ছায়াচিত্র বিষয়ে এদেশের রসিক শ্রোতাদের আগ্রহ বেশী। পরমহংসদেব বলেছেন গোলাপের নির্যাস যে শিশিতে থাকে তার চারপাশে একটু কাঁঠালের রস মাখিয়ে দাও, তাহলেই মাছি এসে জুটবে, তারপর ছিপি খুলে দাও সে গোলাপের নির্যাস নিতে বাধ্য হবে। যে কোনো বেতার প্রচারব্যবস্থায় নীতি হিসাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপরোক্ত মন্তব্য অবশ্য স্মরণীয়। প্রয়োজনীয় বক্তব্যের সঙ্গে অন্য পাঁচ রকম মনোহারী বিষয়বস্তুর মিশ্রণ প্রয়োজন।

আকাশবাণীর পুনর্বিন্যাসের জন্য অশোক চন্দ কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকরী করা হয় নি। যদি কোনো দিন অশোক চন্দ কমিটির সুপারিশ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন তাহলে আমাদের 'আকাশবাণী' বেতারের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেতার প্রতিষ্ঠান বি বি সি ও ভোয়ার সমতুল্য হয়ে উঠবে।

—[illegible]

সাহিত্যের খবর

জব্বলপুর বিচিত্রা সাহিত্য বাসর

বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের ৪র্থ বার্ষিক বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন গত ২৩ এপ্রিল নির্মলবালা বসু লাইব্রেরী (সিটি বেঙ্গলী ক্লাব) অ্যাসোসিয়েশন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় প্রবীণ হিন্দি সাহিত্যিক ব্যওহার রাজেন্দ্র সিংজি। সাহিত্য শাখার পৌরোহিত্য করেছেন জব্বলপুরের তরুণ হিন্দি কথাসাহিত্যিক শ্রীকৈলাশ নারদ। স্বাগত ভাষণ দেন বিচিত্রার সভানেত্রী শ্রীমতী হেনা হালদার। বিচিত্রার সম্পাদক কুসুমবিহারী চৌধুরী বাংলা ভাষার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য স্থানীয় বাঙালীদের কাছে বাড়িতে বাংলার চর্চা রাখতে, বাংলা বই ও পত্রপত্রিকা রাখতে এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাংলা বই পাঠের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে আবেদন জানান। ব্যওহার রাজেন্দ্র সিংজি হিন্দিভাষী হয়েও বাংলাতে তাঁর বিদগ্ধ উদ্বোধন ভাষণ দিয়ে উপস্থিত বিদগ্ধ বাঙালী শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। হিন্দি কথাসাহিত্যিক কৈলাশ নারদ হিন্দিতে তাঁর ভাষণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের কথা স্বীকার করে বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। জীবন ও সাহিত্য তাঁর বক্তব্যের প্রধান বিষয় ছিল। সংগীত পরিবেশন করেন অশ্রু রায়, শুক্লা ঘোষ প্রভৃতি। সাহিত্য সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন কবি হেনা হালদার, কবি অশ্রু রায়, কবি শ্যামল মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ মিত্র, দীপ্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সেনশর্মা, মাধব বল ও সুখেন্দু চন্দ প্রভৃতি। পরিশেষে একাঙ্ক নাটক কণ্ঠস্বর অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী অশ্রু রায়, মিসেস চক্রবর্তী, রঞ্জন রক্ষিত, সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ বসু ও মোহিত কুমার। সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখলেও বিশেষভাবে অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন মিসেস চক্রবর্তী, অশ্রু রায় ও রঞ্জন রক্ষিত। এই উপলক্ষে আয়োজিত বাংলা পত্রপত্রিকা ও জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের প্রদর্শনী সকলের প্রশংসা লাভ করে।

শিশু ও তরুণদের জন্য পুস্তক: শিশু ও তরুণদের জন্য বই রচনার বিষয় ক্রমশঃ অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হোচ্ছে পশ্চিম জার্মানীতে। ওকেন বাখের ক্লিংগসপোর সংগ্রহশালার ডিরেক্টার মিঃ হান্স আডলফ হালবে, শিশুদের সচিত্র পুস্তকের উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে প্রচেষ্টা করছেন। তাঁর সংগ্রহশালায় সপ্তদশ আন্তর্জাতিক সচিত্র পুস্তক মেলা আয়োজিত হয়। জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জি ডি আর প্রভৃতি ১৫টি দেশের পুস্তক প্রদর্শিত হয়েছে সেখানে। 'শিশুদের রঙ্গীন জগত' নামে প্রদর্শনীতে সম্প্রতিকালের প্রকাশিত সচিত্র পুস্তকাবলীর একটি অন্তর্নিহিত চিত্র পাওয়া যায়।

গত ডিসেম্বর মাসে মিউনিখে তরুণদের উপযোগী বই-এর দ্বাবিংশতম আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। ব্যাভেরিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগারে পৃথিবীর চল্লিশটি দেশের প্রায় চার হাজার শিশু ও তরুণদের জন্য লিখিত পুস্তকের সমাবেশ ঘটে। এছাড়া আন্তর্জাতিক যুব গ্রন্থাগারে ডেনিশ ও রুমানিয়ার গ্রন্থাবলী (এই প্রথম মিউনিখে) বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থমেলায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে সংগ্রহ ছিল, তা ফ্রান্স, জাপান এবং পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রুরুৎসিং স্কায়া রিপাবলিক, বাল্টিক তীরবর্তী ভাষা অঞ্চল, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ড প্রভৃতির অলৌকিক ও হাস্যরস প্রধান গল্পগুলির যা এতাবৎ জার্মানীতে অজানা, সেই সব সংগ্রহের দ্বারা প্রদর্শনীটি সমৃদ্ধ ছিল। এই প্রদর্শনীর আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই প্রথম মিউনিখে আয়ারল্যান্ডে উত্তরাঞ্চলীয় 'গেলিক' ভাষায় লেখা

ভ্রম সংশোধন

বিশেষ সংখ্যা 'অমৃত'-এ ১২-৫-৭২ তারিখে ১৫৪ পাতায় বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত মৎপ্রণীত গ্রন্থের নাম "কীভাবে কোষ্ঠী" পরিবর্তে "কীভাবে কোষ্ঠী দেখবো" পড়তে হবে।

—রণীন্দ্র অধিকারী
২৮।৩এক।২, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড
কলিকাতা ৫৪।

বই পাঠান হয়েছিল। মিঃ অটাফ্রট প্রয়েসলার লিখিত সোরাবিয়ান পৌরাণিক কাহিনী 'ক্রাবাট', যাতে 'মানবতার পট-ভূমিতে ব্যক্তির শিক্ষা' সম্বন্ধীয় বিশ্ব-জনীন আলেখ্য রূপায়িত হয়েছে, তা বিচারকের রায়ে তরুণদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে বিবেচিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সুইডেনের বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রতারণা, ডেনমার্কের দূষিত পারি-পার্শ্বিকতা, জাপানের নগর সমস্যা ও চাকুরীরতা মাতাদের সন্তান, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের বর্ণবৈষম্য এবং ফেডারেল রিপাবলিকের ধর্মীয় প্রবৃত্তি ও ঔষধের অপপ্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের রচনা স্থান পেয়েছিল। মিঃ ম্যাক্স ফ্রিশ তাঁর পুস্তক 'ভিল হেলম্ টেল ফুর ডের শুলে' (বিদ্যালয়ে ভিলহেলম্ টেল) পুস্তকটির মাধ্যমে টেল সম্পর্কিত কল্পিত কাহিনীকে বিকৃত করতে চেয়েছেন। প্রদর্শনীতে রক্ষিত প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থগুলির মধ্যে ক্রীড়া পুস্তকও ছিল। যেমন ড্যুরার রচিত 'ড্যুরার স্পিল বুখ' বেগুলি কলেজে এবং নতুন সৃষ্টি হিসাবেও পুনর্বিন্যস্ত করা চলে।

উৎকল সাহিত্য-সমাজের হীরক জয়ন্তী

বরবাটি স্টেডিয়াম হলে উৎকল সাহিত্য সমাজের হীরক-জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল সম্প্রতি। মে মাসের ৬, ৭ এবং ৮ তারিখে। ওড়িয়া সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পবিদেরা। বিভিন্ন অধি-বেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাধানাথ রথ, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীমতী নন্দিনী সত্পথী ও মণীন্দ্র রায়। এ উপলক্ষে উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু সাহিত্যোৎসাহী ব্যক্তির সমাগমে রীতিমত উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল।

নতুন বই

ফার্স্ট স্পার্ক অব রেভল্যুশান—অরুণ-চন্দ্র গুহ। ওরিয়েন্ট লংম্যান। দাম—৪০ টাকা।

সাধারণ পাঠক যাঁরা এ বই পড়বেন, তাঁরা এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে মুহূর্তের জন্যেও ক্লান্তি বোধ করবেন না। পাঁচশ আঠাশ পৃষ্ঠার একটি বৃহদায়তন ইংরিজি প্রবন্ধের বইয়ের পক্ষে এটা কম কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা নয়। এবং যাঁরা গবেষক, ইতিহাসের সূত্র সংধান করছেন, তাঁদের কাছে এই বই একটা মূল্যবান আকর বলেই মনে হবে, কারণ এর মধ্যে এত ব্যক্তি, এত ঘটনা ও এত অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটেছে যা এই ধরনের অন্য কোনো বইয়ে পাওয়া দুর্লভ। উভয় শ্রেণীর পাঠকের জন্যেই শ্রীগুহের বইটি এমন একটি ভাষায় ও ভঙ্গীতে লেখা যার মধ্যে অনাবশ্যক গৌরবায়ন অস্বাভা-বিক বীরপূজা কিম্বা অযৌক্তিক নিম্নকথন কোনোটাই নেই। তাঁর বই ভারতে বিপ্লব চেতনার প্রথম উন্মেষের যুগের একটি সরল ইতিহাস—ঠিক যেমনটি ঘটেছিল, যেভাবে ঘটেছিল, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ কাহিনী। কতগুলি বিচ্ছিন্ন সংবাদপত্র-প্রবন্ধ থেকে শ্রীগুহ একটি অর্থ-পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছেন, এবং এমন একটি বিন্যাসে যে, মনে হয় ঐ ইতিহাসের কাল আমরা যেন সদ্য অতিক্রম করে এলাম।

সে এক সুবর্ণ যুগ গেছে ভারতের জাতীয়তাবাদের। কিন্তু এর একটা ট্র্যাজিডির দিকও ছিল। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে অগ্নি-সন্তানেরা এদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁরা যেন একটি গ্রীক নাটকের নায়ক। শ্রীগুহর বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা যখন সেই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কাহিনী পাঠ করি, যখন দেখি এদেশের আনাচে-কানাচে বিপ্লবীদের জার্মান অস্ত্রের প্রত্যাশা এক একটি পুলিশী অভিযানের মধ্যে অসহায়-ভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু আশার বিরুদ্ধে আশা নিয়ে এক পরম বিশ্বাস নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে তারা লড়াই করে যাচ্ছে, তখন মনে হয় ভাগ্য যেন নির্মম হাতে তাঁর [illegible]

ভাগ্য ছিল না। বিপ্লবী সংগঠনের চাইতে বৃটিশ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ যে অনেক বেশী সজাগ ছিল একথা অস্বীকার করা নিতান্ত গোঁড়ামী। আর সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে জার্মানীর সহযোগিতার সংবাদ আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছ থেকেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। শ্রীগুহ এসব কথা তাঁর বই থেকে বাদ দেন নি। কিন্তু তবু তাঁর কাহিনীর শেষ লাইনটুকু পড়বার পর এই ভাগ্যহত বিপ্লবের ট্র্যাজিডির উর্ধ্বে যে ভাবটি পাঠকের হৃদয়কে অভিভূত করে রাখে তা হলো তার সুবর্ণ গৌরবের—যে, এরা অপূর্ব বীরত্ব নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিল, ভাগ্যের কাছে তাদের প্রতিজ্ঞাকে সমর্পণ করেনি।

এই উদ্দীপনাই শ্রীগুহর কাহিনীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এর মূল্য এইখানে যে, এর ওপর তাঁর অভিজ্ঞতার প্রলেপ পড়েছে। তিনি নিজে ঐ বিপ্লব-সাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং এখন তার সম্পর্কে রায় দেবার মতো সময়ের দূরত্ব অর্জন করেছেন। তিনি যেমন অনেক বিপ্লবী প্রয়াসের আরম্ভ দেখেছিলেন, তেমনি অনেক বিপ্লবীর পরিণতিও দেখেছেন। সুতরাং ইতিহাসের গুরুত্বের উর্ধ্বেও এ বইয়ের একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। বিশেষ করে একটি পুরো অধ্যায় তিনি বাংলার বিপ্লব-সাধনার সেই সব উপেক্ষিতা-দের জন্য ব্যয় করেছেন সেই বড়-পিসীমা, ক্ষীরোদাসুন্দরী, ননীবালা, সিন্ধুবালা, বিনোদবালা, দুকড়িবালা ও সরোজিনী দেবীদের জন্যে, যাঁরা বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন, তাঁদের স্ত্রী সাজতেন, কিম্বা মা, বোন দিদি তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন

যাঁরা না থাকলে বিপ্লবীদের সাধনা অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যেত, যাঁদের কথা আরও বৃহৎভাবে লেখা উচিত।

—বরুণ রায়

আশা-মরীচিকা (উপন্যাস) — যতীন্দ্রনাথ মজুমদার। পরিবেশক : জেনারল বুকস। এ-৬৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। ছয় টাকা।

যত দূর মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের পর সীতারামকে নায়ক করে বাংলায় আর কেউ উপন্যাস লেখেন নি। সেদিক থেকে লেখকের এই প্রয়াস মনে রাখবার মতো। স্বদেশ প্রেম ও প্রীতি এই উপন্যাসের উপজীব্য। ভাল-মন্দ আলোয়-আঁধারে মেশা বাঙালীর সপ্রাণ ছবি সার্থকভাবে এঁকেছেন লেখক শ্রীমজুমদার। সীতারামের ইস্পাতদৃঢ় চরিত্রের মধ্যে দীপ্তভাবে ফুটেছে বাঙালীর স্বাধীনতাপ্রিয়তার অনির্বাণ শিখা। এটা এক দিক। অন্য দিকে তেমনি তার পরাজয়ের মূলে রয়েছে বাঙালী চরিত্রের অন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা। দুটো ছবি, দুই সত্য—আপাত বিরোধী এই দুই দিক নিয়েই বাংলা ও বাঙালীর সত্যিকার বাস্তব চেহারা। দেশপ্রেম ও প্রাণাবেগের বন্যা এই উপন্যাসের কাহিনীতে স্বতন্ত্র স্বাদ এনে উপন্যাসটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প—সঙ্কলন-সম্পাদনা : ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ মল্লিক। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। ৩·২৫ টাকা।

বাংলাসাহিত্যের স্বনামধন্য কথাকারদের ক্লাসিক গ্রন্থগুলি তরুণদের উপযোগী করে কিশোর ও তরুণদের সামনে মেলে ধরা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় সাহিত্যকর্মটি প্রশংসনীয়ভাবে করেছেন ঊষাপ্রসন্ন মুখো-পাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ মল্লিক। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বারোটি উপন্যাসের কাহিনী সংক্ষেপিত আকারে 'বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প'-এ পরিবেশিত হয়েছে। তরুণদের কাছে এধরনের কাহিনী যে যোগ্য সমাদর লাভ করেছে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প'এর দ্বিতীয় সংস্করণে তার প্রমাণ মেলে।

সাহিত্য বাসরের বাৎসরিক সমাবেশ

সাহিত্য বাসরের পুরস্কারবিজয়ী ঃ (বাম থেকে) সর্বশ্রী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, অখিল নিয়োগী, আল মামুদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সন্তোষ ঘোষ ও শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী ঃ দেখা যাচ্ছে। শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী তাঁর পিতা শ্রীমনীশ ঘটকের হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

বিগত শনিবার ৬ই মে তারিখে দক্ষিণ কলকাতার সরলা মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে এই বছরের সাহিত্য পুরস্কারগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকদের দেওয়া হয়। সভার মঞ্চটি অত্যন্ত সুরুচিসঙ্গত-ভাবে রজনীগন্ধার স্তবকে সাজানো হয়েছিল।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সমাগত সুধীমন্ডলীকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলেন—"এই অনুষ্ঠানটির বয়স আঠারো বছর হল, আমার স্বর্গত বন্ধু সুধীরচন্দ্র সরকার সর্বপ্রথম এই সাহিত্য সমাবেশের আয়োজন করেন। পরে আজ পনের বছর কাল ধরে আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ পত্রিকা ও অমৃতবাজার, যুগান্তর পত্রিকার তরফ থেকে এবং উল্টোরথ ও মৌচাক পত্রিকার তরফ থেকে সাহিত্যিকদের সম্বর্ধিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। গত বছর থেকে বেঙ্গল পাবলিশার্সের 'জয় বাংলা' পুরস্কার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই রকম একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক-বৃন্দ সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ পান বর্তমানকালে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে একথা বলাই বাহুল্য।

গত বৎসর আমাদের মন ছিল ভারাক্রান্ত। সেই সময় বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ জীবন পণ করে মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন—আজ সেই বাংলা স্বাধীন, প্রবল এক পশুশক্তির নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত, এ বড় আনন্দ সংবাদ।"

এরপর শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে (বনফুল) সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন, শ্রীসুপ্রিয় সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করার পর সভার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

প্রথমে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত গায়ক অর্ঘ্য সেন ও পরে কুমারী সর্বানী সেন অতুলপ্রসাদের একটি গান পরিবেশন করেন।

এরপর সভাপতি ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণ দান করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলেন—

"সর্বপ্রথমেই আপনারা আমার নববর্ষের শুভকামনা ও নমস্কার গ্রহণ করুন। এ সভায় আমার যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাঁদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি, আর আশীর্বাদ করছি বয়ঃকনিষ্ঠদের। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃতী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করবার জন্য আর যাঁরা সে পুরস্কার দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। গুণীদের এবং গুণীর সমজদারদের সাধুবাদ করবার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।"

এরপর সভাপতি 'বনফুল' পুরস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলেন, তিনি বলেন—

"আমার মনে হয় সাহিত্যিকরা জীবনে তিনবার পুরস্কার পান। প্রথম পুরস্কার পান

তিনি নিজের কাছ থেকে। কোনও রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি যখন তিনি সম্পাদিত করতে পারেন তখনই তাঁর অন্তর্যামী মন বাহবা দিয়ে ওঠে। তখন যে আনন্দ তিনি লাভ করেন তা অনির্বচনীয়। এই আনন্দের প্রেরণা এবং লোভ তাঁকে সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত করে। এই আনন্দ, এই আত্মপ্রসাদই স্রষ্টা সাহিত্যিকের প্রথম পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।”

তারপর লেখকের প্রশংসা আসে পাঠকের কাছ থেকে যখন তাঁর লেখা পাঠকের হাতে পৌঁছায়। কিভাবে সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয় সেই বিষয় বনফুল বললেন—

‘লেখক দ্বিতীয়বার পুরস্কৃত হন পাঠক-পাঠিকার প্রশংসা লাভ করে। পাঠক-পাঠিকার জগৎ সুবিস্তৃত, সব পাঠক-পাঠিকার রুচি একরকম নয়, তাই এ জগতে সব লেখকদের সমান আদর হয় না। তাঁরা কাউকে সম্রাট, কাউকে শাহানশাহ, কাউকে উজীর, কাউকে নাজির বানিয়ে এমন একটা গোলমালের সৃষ্টি করেন যে সাহিত্যিকদের মধ্যেই একটা দলাদলি হয়ে যায়। বস্তুত রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের জগতে উচ্চনীচ শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বলে কিছু নেই। সব সার্থক সৃষ্টিই স্বয়ম্প্রভ, স্বকীয় মহিমায় প্রদীপ্ত। যাঁদের রসবোধ কম তাঁরাই এসব নিয়ে ঘোঁট করেন। সাহিত্যিকদের দুর্ভাগ্য যে এইসব ঘোঁট-বাজ লোকেদের দরবারেই তাঁদের অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে যাচাই করবার জন্যে নিয়ে যেতে হয়। সান্ত্বনা এই যে প্রকৃত রসিক সুলভ না হলেও দুর্লভ নয়। প্রকৃত রসিকের কাছেই প্রকৃত স্রষ্টারা দ্বিতীয়বার পুরস্কৃত হন।”

বনফুল এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উক্তি করেন, তিনি বলেন, ‘যে লেখক কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুরস্কৃত হন তিনিই যে দিগ্বিজয়ী লেখক আর যাঁরা হন না তাঁরা যে নিম্নমানের একথা মনে করবারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। এদেশে এবং বিদেশে অনেক শ্রেষ্ঠের শিল্পী আছেন যাঁরা কোন পুরস্কার পান নি।’

বনফুল এই সূত্রে পরশুরামের একটি সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যটি শ্রেষ্ঠ লেখকের সংজ্ঞা সম্বন্ধে পরশুরাম করেছিলেন—

‘পরশুরাম আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—‘যে লেখক শুধু পাঠকের রুচিবশে চলেন, তিনি পেশাদার মাত্র। যিনি নিজের নব নব রসানুভূতি ব্যক্ত করে পাঠকের রুচি প্রভাবিত করতে পারেন তিনিই শুধু শ্রেষ্ঠ লেখক।’

বনফুলের ভাষণের শেষাংশে সাহিত্যিক-দের তৃতীয়বার পুরস্কারপ্রাপ্তি কখন ঘটে তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। বনফুল বললেন :

‘লেখকরা তৃতীয়বার পুরস্কার পান মৃত্যুর পর। সে পুরস্কার দেন মহাকাল। সব লেখকদের ভাগ্যে এ পুরস্কার জোটে না। যাঁরা এ পুরস্কার পান তাঁরা ধন্য। তাঁরা শাশ্বতলোকবাসী অমর। তাঁরা মহাকালের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা যাঁদের দিকে চেয়ে গভীর অন্ধকারেও মানবজাতি আশা পেয়েছে, সান্ত্বনা পেয়েছে।’

এরপর এই বছর যেসব সাহিত্যিকবৃন্দ বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের একে একে পুরস্কার দেওয়া হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর কর্তৃক প্রদত্ত এই বছরের শিশিরকুমার পুরস্কার পেয়েছেন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সঙ্গীতসাধক দিলীপকুমার রায়। এই পুরস্কারটি সাহিত্যচিন্তায় মৌলিকত্ব প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হয়। গত কয়েক বছরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, সুধীরচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যসাধকদের এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

এই বছরের ‘মতিলাল পুরস্কার’ দেওয়া হয় উপন্যাসকার হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে। কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, পরিমল গোস্বামী, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিমল মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ উপন্যাসকারগণ এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

এই বছর আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার প্রফুল্লকুমার পুরস্কার পেলেন অম্লান দত্ত এবং সুরেশচন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। ইতিপূর্বে ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, শঙ্কর, জ্যোতিরিন্দ্র ঘোষ ও সত্যজিৎ রায় প্রমুখ সাহিত্যিকারগণ এই দুটি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

এই বছরের উল্টোরথ পুরস্কার দেওয়া হল প্রবীণ কবি মণীশ ঘটককে। ইতিপূর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ কবিবৃন্দ এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

এই বছর মৌচাক পত্রিকার সুধীরচন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হল অজিত নিয়োগীকে। ইতিপূর্বে লতীকান্ত গুহ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, নরেন্দ্র দেব, সুখলতা রাও প্রমুখ এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

বাংলাদেশের লেখকদের সম্মানিত করার জন্য গত বছর থেকে মেসার্স বেঙ্গল পাবলিশার্স ‘জয় বাংলা’ পুরস্কার প্রচলন করেছেন। এই বছর সেই পুরস্কার দেওয়া হল বাংলাদেশের কবি আল আহমদকে। গত বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয় উপন্যাস লেখক শহীদুল্লা কায়সারকে।

এই বছরের পুরস্কারসভায় নাটকীয়ভাবে ঘোষিত হয় যে আনন্দবাজার পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে তিনজন সাহিত্যিককে। এই তিনজন সাহিত্যিক হলেন বুদ্ধদেব বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ ও সমরেশ বসু। বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত এই তিনজন লেখকই সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলি।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সভাপতি ও অতিথি অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রচুর জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

এই সভায় যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা ব্যতীত এই বাংলার যে সব বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, জয়ন্তী সেন, মায়া বসু, উমা রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, জরাসন্ধ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল রায়, অমিতাভ চৌধুরী, সাগরময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, সুকমলকান্তি ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কবিরুল ইসলাম, সন্তোষ দে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ভবতোষ দত্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, মনোজিৎ বসু, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ মিশনের অস্থায়ী প্রধান আনোয়ার উল করিম চৌধুরীও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

—বিশেষ প্রতিনিধি

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তার ফলে, নিতারা চলে গেলে, ওর মনে হল—এই শহর কেন, ওর জীবনটাই যেন নতুন করে অন্ধকার হয়ে গেল। এবার এখানের বাস যথার্থ প্রবাস হয়ে উঠল—আর জগন্নাথের কাছে, মনে মনে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। ঠাকুর অন্তর্যামী, তিনি জেনে বুঝে মাপ করুন। আর ওর এই মনোভাবের জন্যেও কি তিনিই দায়ী নন?

আরও সেই জন্যেই জোর করে রইল পাঁচ-সাতটা দিন।

দুদিনের মায়া—সে মায়ায় জড়িয়ে পড়ে নিজেকে এমন দুর্বল করে লাভ নেই। জোর করে কাটিয়ে ফেলাই ভাল। সত্যিই সেখানে গিয়ে কিছু থাকতে পারবে না। আট-দশ দিনের পরিচয়ের জোরে আত্মীয়তার দাবীতে কুটুমবাড়ী গিয়ে ওঠা যায় না। উঠলেও দু-চার দিনের বেশী থাকা সম্ভব নয়। ওসব চিন্তা ত্যাগ করাই দরকার। তার যে জীবন, যে জীবনের পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে — সেই জীবনই তাকে বহন করতে হবে পরমায়ুর শেষ দিন পর্যন্ত—বজ্রদগ্ধ, মরুভূমিতুল্য—মিছিমিছি স্নেহ মায়া প্রীতি—এসব সুখের স্বপন দেখে লাভ নেই।...অকারণে যন্ত্রণা ভোগ। এ লোভ, এ দুরাশা দূর করাই মঙ্গল।...

নিমাইয়েরও এ কদিনে খুব মায়া বসে গিয়েছিল। সেও এত আদর-যত্ন এমন খাওয়া-দাওয়া বহুকাল পায় নি। তবু নিতাদের অভাবে তার যে পুরী থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা হয় নি, তার কারণ নিজের স্বাস্থ্য। তার ধারণা এখানে বেশী দিন থাকলে শরীর বেশী ভাল হবে। তাই সে আর কটা দিন থেকে যাবার জন্যেই বরং পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

এর মধ্যে বাড়ীওলার এজেন্টের সঙ্গে কথাও কয়ে এসেছে। তিনি আরও পনেরো দিনের ভাড়া নিয়ে আট-দশ দিন থাকতে দিতে রাজী হয়েছেন। কারণ এর মধ্যে আর কোন ভাড়াটে আসার সম্ভাবনা নেই। যা আসবে সেই রথের সময় একেবারে। তখন এই উদারতার দাম পুষিয়ে নিতে পারবেন তিনি।...

আর যা অন্য বাধা—বাড়তি ছুটি তার জন্যেও কোন দুশ্চিন্তা নেই নিমাইয়ের। মাত্র দুটি টাকা খরচ করে—ওর ভাষায় একটা 'মির্টিকেল' ছাড়লেই পাওয়া যাবে—তারা বাপ বাপ বলে ছুটি দিতে পথ পাবে না। কথাটা হেমন্তকে জানিয়েও দিয়েছিল সে। জ্যাঠাইয়ের 'শরীলটা' ভেতরে ভেতরে গুমরে দুর্বল হয়ে গেছে — সুতরাং কটা দিন এখন থাকা দরকার—বার বার এই কথাটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিল জ্যাঠাইকে।

হেমন্তও হয়ত রাজী হত শেষ পর্যন্ত, তার কাছে পুরীও যা কলকাতাও তাই—সেখানে গিয়েই যে ভাল লাগবে তার কোন মানে নেই। স্মৃতিটা অত পীড়া দেবে না এই পর্যন্ত। এখানে যেমন স্বর্গদ্বারের রাস্তা দিয়ে আসতে গেলে বাড়ীটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আসতে হয়, অনেক সময় হরিদাস মঠের দিকে ঘুরে গৌরবাট-শাহী দিয়েও যায়, এক আনা বেশী ভাড়া কবুল করেও—সেইটে থাকবে না। তবে—এ মায়া যখন ভুলতেই হবে, এইখান থেকেই ভোলা ভাল, এমন করে পালিয়ে যাওয়ারও কোন অর্থ হয় না।

দোনামনা করে নিমাইয়ের প্রস্তাবের দিকেই ঝুঁকছে একটু একটু করে—ওর জন্যে নিমাইয়ের যে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই তা বুঝতে পারবে, ... না ... আবার...

এমনিই নিজেকে শক্ত করার জন্যেই রাজী হচ্ছিল—অকস্মাৎ জগন্নাথই বুঝি বাদ সাধলেন। জ্যেঠাইকে সম্মতি দেওয়ার জন্যে নিমাইয়ের মণিকোঠায় বার বার মাথা ঠোকাতেও কোন উপকার হল না। কলকাতা থেকে ঠিকানা বদল হয়ে একখানা চিঠি এসেই সব গোলমাল করে দিল।

চিঠিটা এসেছে গোরাদের ইস্কুল থেকে। গত বছর থার্ড ক্লাসে (ওদের ওখানে কি ক্লাস এইট না কি বলে) ফেল করেছিল গোরা। তখনই রেকটর চিঠি দিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন পড়াশুনোয় ছেলেটির একেবারেই মন নেই, হেমন্তের অনুরোধে ও'রা যে কোচিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়ে-ছিলেন সেখানের রিপোর্টও খুব খারাপ—বিষম অমনোযোগী ও ফাঁকিবাজ — এই কথাই প্রতি সপ্তাহে জানাচ্ছেন তাঁরা—যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তো তাঁরা আর রাখতে পারবেন না। এর পরের পরীক্ষা পর্যন্ত দেখতে পারেন—তবে সেই-ই শেষ সুযোগ, তখনও যদি এই রকমই ফল দেখা যায় তো তাঁরা সেসন-এর মধ্যেই ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবেন। সুতরাং অভিভাবিকার ইচ্ছা থাকলে এখনই ছাত্রকে নিয়ে যেতে পারেন।

সেই সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন যে, ও'রা নানা রকমে পরীক্ষা করে দেখেছেন ছাত্রটির মাথা একেবারে নিরেট নয়—অমনোযোগ ও পাঠে বীতস্পৃহাই এই রকম ফল হওয়ার প্রধান কারণ।

হেমন্ত সে চিঠির কোন জবাব দেয় নি। নিয়ে এসে কি করবে? কোথায় দেবে? গোরাকেই একটা কড়া চিঠি দিয়ে-ছিলেন যে, এখনও যদি তার চৈতন্য না হয়, পড়ায় মন না দেয় তো অতঃপর পথে পথে ...

পাকাতে কি কোচোয়ানী করতে হবে—হেমন্তর কাছে আর স্থান হবে না।

যার মন একেবারেই লেখাপড়ার দিকে পিছন ফিরেছে, সম্পূর্ণ বিরূপ—সে এই হুঁশিয়ারীতে হঠাৎ মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করবে—তা সম্ভব নয়। হেমন্তও তা আশা করে নি। তবু সত্যি সত্যিই যে স্কুলের কর্তৃপক্ষ বছরের মাঝখানে ছাড়িয়ে দেবেন তা ভাবে নি। হয়ত এও মনে করে ছিল যে—একেবারে যখন গবেট নয়, তখন সামান্য কিছুও উন্নতি করতে পারে—দশ নম্বর বেশী পেলেও আইনে বাঁচে। তাও হয় নি। রেকটর জানিয়েছেন যে, বর্তমান 'পিরিয়ডিক্যাল' পরীক্ষায় গোরা আরও কম নম্বর পেয়েছে। তিনটি বিষয়ে তো একেবারেই শূন্য, তার মধ্যে দুটি বিষয়ে স্রেফ সাদা খাতা দিয়ে বেরিয়ে গেছে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই। তা ছাড়াও ওর স্বভাবে এবং চরিত্রেও নানা রকম দোষ ও উচ্ছৃংখলতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আর কোন মতেই তাঁরা ওকে স্কুলে রাখতে রাজী নন, অভিভাবক পক্ষ যেন সাত দিনের মধ্যে এসে ছেলেকে নিয়ে যান। এর বেশী সময় তাঁরা দিতে পারবেন না কোন মতেই।

অতঃপর পুরীতে আরও কটা দিন থেকে যাওয়ার কথা বলতে নিমাইয়েরও সাহসে কুলোল না।

॥ ১৭ ॥

মুখে যতই যা বলুক যা চিঠিতে ভয় দেখাক যে—ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে এ বাড়ীতে আর স্থান হবে না। বিড়ি পাকিয়ে অথবা কোচোয়ানী করে খেতে হবে, কার্যত সে ব্যবস্থা করা গেল না, বাড়িতেই এনে তুলতে হল। তবে নিজে আর গেল না, সেখানে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে মুখ দেখাতে লজ্জা করল। ভাড়াটে ভদ্রলোকের দু-তিন দিন ছুটি ছিল, তাঁকেই গাড়িভাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিল—সেই সঙ্গে কিছু টাকাও দিয়ে দিল হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে আসতে।

গোরকে কিন্তু বিশেষ লজ্জিত কি অনুতপ্ত বোধ হল না। দুঃখিত তো নয়ই। কে জানে, লজ্জা ঢাকতেই হয়ত বাড়ি ঢুকল সে আস্তে শিস দিতে দিতে। সে যে বেপরোয়া এটা বুঝিয়ে দিতেই।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওর চেহারায়ও। বয়সটা—মনে মনে হিসেব করে দেখল হেমন্ত—আঠারো বছর পার হতে চলেছে। গোঁফের রেখা ঘন হয়ে উঠেছে। দাড়ির লক্ষণও সুস্পষ্ট। গায়ের রঙ বা চেহারার আদলটা বংশের ধারায় গেলেও সে পিলে-রোগা ভাবটা নেই। বোধ হয় স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার জন্যেই—বেশ জোয়ান হয়ে উঠেছে।

এতদিন ধরে প্রায়ই দেখছে বলে বোধ হয়—কখন যে বালক গোর তরুণ বয়সীতে পরিণত হয়েছে তা লক্ষ্য করে নি হেমন্ত। এই তো মাস কতক আগেও দেখেছে। এবার হঠাৎই যেন পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। ছেলেদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা বোধ হচ্ছে বলেই পড়াটা আরও অরুচিকর হয়ে উঠেছে। একেই বেশী বয়সে পড়াশুনো শুরু করেছে—তার ওপর সঙ্গী অন্য ছেলেরা ওপরের ক্লাসে উঠে গেছে, সে আরও লজ্জার কারণ। লজ্জা থেকেই বিতৃষ্ণার উৎপত্তি।... হয়ত ভুলই করেছে সে জোর করে ওখানে ফেলে রেখে—প্রথম ফেল করার পরই এখানে আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

নিমাই সৎ পরামর্শই দিতে গেল, 'আর ও চেষ্টায় দরকার নেই জননী, এ আমড়া-গাছে ন্যাংড়া কেন—টোকো আমও ফলবে না। আমাদের বংশের যা বিদ্যের দৌড়, তার বেশীই গেছে তবু। ঐখানেই ইতি করো। তোমার এত জানাশুনো, কাউকে ধরে চাকরিতে ঢুকিয়ে দাও। পড়ালেখা আর ওর দ্বারা হবে না। দেখছ না—জোয়ান হয়ে উঠেছে, চনমন করছে—। যে দিলে এখনই ছেলেপুলে হতে শুরু করবে। ঐ দিকেই এখন ঝোঁক যাবে ওর। আর এ তো হতেই হবে, তোর পিছে কেন খাড়া—না বংশা-বলীর ধারা! মিছিমিছি ওর পেছনে আর পয়সা ঢেলো না।...যা হোক তো কিছু শিখেছে, আমাদের মতো মুখ্খু—ক-অক্ষর-গো-মাংস তো নয়, নোহা ঠেঙানো কাজ করতে হবে না, চেষ্টা করলে কলম-পেষার কাজই পেতে পারবে।'

কথাটা হেমন্তর পছন্দ হল না। আস্তে আস্তে আবারও একটা আশা হয়ত গড়ে উঠেছিল গোরকে কেন্দ্র করে সেটায় প্রবল আঘাত লেগেছে, তার গোড়াটা গেছে আলগা হয়ে—তাতে মনে মনে একটা বিপুল ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, সেইটেই বেরিয়ে এল এবার, জ্বালাটা গিয়ে পড়ল নিমাইয়ের ওপর।

'অ। ল্যাজকাটা শিয়াল—ওরও ল্যাজটা কাটতে না পারলে চলছে না বুঝি! এখনই ওর লেখাপড়া ঘুচিয়ে কোথাও একটা নিজের মতো কুলী-মিস্ত্রীর কাজে ঢুকিয়ে না দিলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না—না! কেন, ও কি খেতে পাচ্ছে না—না আমারই ভাত জুটছে না?...না কি ওর পেছনে পয়সা না ঢাললে সে পয়সা তোমার ভোগে লাগবে তাই এঁটে আছ!'

'ঐ লাও!' হতাশার ভঙ্গী করে নিমাই, 'বলে যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! তবে আর কলিকাল বলেছে কেন। যার ভাল করতে যাবে সে-ই উলটো বুঝবে!... পড়াও বাবা, পড়াও। যত পারো তেল ঢালো। পয়সা কুট কুট করছে বৈ তো নয়। খানিকটা বাজে খরচ না হলে কুটকুটুনি সারবে কেন? তবে এখানে এনে শহরে রাখছ কলকেতার ইস্কুলে দিচ্ছ — তাহলে কিছু কিছু ওর হাতেও দিও, হাত খরচা। নাতি তো বিড়ি বার্ডসাইতে পক্ক হয়ে উঠেছে—ইরি মধ্যে ঠোঁটে দাঁতে কালো ছাপ— সেটা একটু তাকিয়ে দেখে ব্যবস্থা করো। নইলে যা শিখেছে তা তো শিখেছেই, পয়সা না পেলে বাকস ভাঙতেও শিখবে।'

মারের বদলে এই চরম মার দিয়ে নিমাই দ্রুত সেখান থেকে সরে যায়, চোপাগুষ্টি উদ্ধার করা—শোনার জন্যে বসে থাকে না।...

কালো দাগ যে চোখে না পড়েছে তা নয়। তবে ওটা বয়সের ধর্ম ভেবেই গায়ে মাখে নি হেমন্ত। সব দিকে বাঁধতে গেলে চলবে না, দড়ি ছিঁড়তে চাইবে। আর সবাই যে তারক হবে তার কোন মানে নেই। নিমাইয়ের এই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াতেই সে বরং বিরক্ত হল। বস্তু গায়ের জ্বালা আসলে ওর। এই ছেলেটাকে তাড়াতে পারলেই ষোলকলা আশা পূর্ণ হয়, সবটা ওর ভোগে লাগে—এই ভাবছে বসে বসে।...দাঁড়াও, ভোগ করাচ্ছি। আর কিছু না হোক, গোরার ভাল দেখে একটা বিয়ে দিয়ে—ভাল ঘরের বৌ এনে পনটাতো পালটাতে পারব। ও মানুষ না হোক, ওর ছেলে মানুষ হবে। তাদেরই দোর। তাও না হয়—কুকুর বেড়ালকে খাইয়ে যাবো, তবু ও হিংসুটে কুচক্কুরেকে দোব না।

ছেলে মানুষের মতোই মনে মনে গজরায় সে। আশাভঙ্গের আঘাতে বুদ্ধি-সুদ্ধি সব যেন কোথায় গুলিয়ে গিয়ে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েদের পর্যায়েই পৌঁছে যায় এক নিমেষে।

কলকাতাতেও কোন কোন স্কুলের বোর্ডিং আছে, ওর ভাড়াটে লেবেনবাবু তার একটা তালিকাও সংগ্রহ করে দেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বোর্ডিং-এ দেয় না হেমন্ত, বাড়িতেই রেখে পড়ার ব্যবস্থা করে। ওখানের ফলাফল দেখে কোন ভাল স্কুল ছেলেকে নিতে চায় না, বিশেষ বছরের অর্ধেক কেটে গেছে—অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্কুলেই দিতে হয়। তাও অনেক বলা-কওয়া ধরাধরির পর রাজী হন তাঁরা। হেডমাস্টার মশাইয়ের পরামর্শক্রমে দুটি প্রাইভেট টিউটর ঠিক করল—নইলে তিনি বললেন, ভর্তি করাই সার হবে, আর মাইনের টাকা গোনা।

বললেন, 'যা ওর পড়াশুনোর অবস্থা হয়ে আছে দেখছি, এই চার-পাঁচ মাস পরে এগজামিন দিয়ে পাস করতে পারবে না। আবারও একটা বছর নষ্ট হবে। যদি পড়াতেই হয়—সেই জন্যে ব্যবস্থা করুন। তারপর কি জানেন—ছেলে বড় হয়ে গেছে, বেশী বাজে সময় হাতে না রাখাই ভাল, নইলে বদ ছেলেদের বাজে আড্ডায় গিয়ে পড়বে।'

ঠিক হল একজন সকালে পড়াবেন, শুধু অঙ্ক—আর একজন সন্ধ্যায়, ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়। সকালের মাস্টার মশাইকে দশ টাকা দিতে হবে সন্ধ্যায় যিনি পড়াবেন তাঁকে পনেরো। এতগুলো টাকা বাজে খরচ হচ্ছে দেখে নিমাইয়ের গা গস-গস করে, আড়ালে-আবডালে তা নিয়ে টিটকিরিও দেয় সে, কিন্তু হেমন্ত এ খরচা গায়ে মাখে না। রাঁচীতেও যে কোচিং-এর ব্যবস্থা ছিল—তার জন্যে কুড়ি টাকা দিতে হত বাড়তি, এ যেমন পাঁচ টাকা বেশী যাচ্ছে তেমনি অন্য অন্য খরচ ঢের কমে গেল। তাছাড়া জোরে দুবেলা আটকে

হেডমাস্টার মশাই বলেছেন, 'যদি দেখেন এই এগজামিনেশানে রেজাল্ট ভাল হয়—একজনকে ছাড়িয়ে দেবেন, ধরণীবাবুই সব সাবজেক্ট পড়াবেন এখন!'

তবে সে আশা সুদূরপরাহত।

হেমন্তর এমনি লেখাপড়া কিছু নয়—তবে এতকাল বহু শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে এসে এ বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান তার হয়েছে। লেখাপড়ার আসল চেহারাটা ধরতে কোন অসুবিধা হয় না। আর সেই জন্যেই তোড়জোর করে লেখাপড়ার পর্ব শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে যে ফল তেমন কিছুই হচ্ছে না, হবেও না কোনদিন। সে মনই আর ছেলেটার নেই। ওর তরফে এতদিন ছাত্রাগিরিতে বিতৃষ্ণা ছিল—এবার হয়ত, সেটা বিলম্বিত করার জন্যে, একটা বিদ্বেষ দেখা দেবে এদের ওপর।

আর, সেটা বোঝে বলেই মনে মনে হিম হতাশার ভাব একটা অনুভব করে, হার মানার গ্লানি একটা। ভাগ্যের কাছে হার মানাটা এতদিনে অভ্যেস হয়ে গেছে, নিমাইচরণের কাছে যে হার মানতে হচ্ছে, ওর ব্যঙ্গ টিটকিরি খেয়ে চুপ করে যেতে হচ্ছে, সেইটেই আরও অসহ্য।...

তবু হাল ছাড়ে না। দুবেলা পড়ার সময় ঘরের বাইরে মাদুর পেতে বসে থাকে—যাতে মাস্টার মশাইদের না বেশী বিরক্ত করতে পারে, অথবা তাঁরাও ফাঁকি না দেন কিম্বা সকাল করে না পালিয়ে যান। ঐ ইস্কুলেরই শিক্ষক ও'রা—ও'দের কাছে প্রত্যহ খবর নেয়, ছাত্র কেমন পড়াশুনো করছে, ক্লাসে ঠিক মত থাকে কিনা—ইত্যাদি। হাত খরচা দেয় কিছু কিছু তবে এমন দেয় না যাতে বেশী কোন বদ খেয়ালে খরচ করতে পারে। টিফিনের পয়সা বলেই দেয়, টিফিন করে দিতে চেয়েছিল, ওর নাকি স্কুলের মধ্যে বসে বাড়ি-থেকে-নিয়ে-যাওয়া খাবার বার করে খেতে লজ্জা হয়, ছেলেরা উত্যক্তও করে. তাই গোজা রাজী হয় নি—তবে এমন হিসেব করে দেয় যাতে খাবার খেয়েও দু-একটা পয়সা বাঁচে, এক-আধটা সিগারেট খাওয়ার মতো।

অবশ্য তাতে ওর কুলোয় না, পয়সার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে—এটাও লক্ষ্য করেছে। এক-আধবার বেচে বাজার করে দিতে চেয়েছে, হেমন্ত রাজী হয় নি। সোজাই বলেছে 'কি বাজার থেকে চুরি করে তাতে একটা, পয়সার লোকসান শুধু—তোমাকে দিলে ডবল ক্ষতি, পয়সাকে পয়সাও যাবে, হয়ত বেশীই যাবে, তোমাকেও একটা চোর বানানো হবে, বেশী করে নেশাভাঙ করতে শিখবে, আল-টপকা-পাওয়া বাড়তি পয়সার নেশা চাপবে তার ওপর। সে হবে না। যেমন আছ তেমনি থাকো।'

পরীক্ষার ফল অবশ্য একেবারে খুব খারাপ হল না। হেমন্ত যতটা ভেবেছিল ততটা নয় অন্তত। অঙ্ক আর ইতিহাসে মাত্র ফেল করেছে, ইংরেজীটায় টায়ে-টায়ে পাস (পরে জেনেছিল, প্রাইভেট মাস্টার মশাই ধরণীবাবুই ঐটুকু করে দিয়েছিলেন নিজের চাকরীটা রাখতে, নইলে নাকি দশ নম্বরও পাওয়ার কথা নয়)—তবে ওখানকার মতো শূন্য কোন বিষয়েই পায় নি। দুটো বিষয়ে ফেল হওয়া সত্ত্বেও, সকল দিক বিবেচনা করে হেডমাস্টার মশাই ক্লাসে উঠিয়ে দিলেন। এই ক-মাসেই যেটুকু উন্নতি করেছে সেইটেই যথেষ্ট তাছাড়া আবারও এই থার্ড ক্লাসে ফেলে রাখলে একেবারেই মন ভেঙ্গে যাবে, জীবনে আর লেখাপড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না—এই ভেবেই। সেটা হেমন্তর সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে বলেও গেলেন। পাস করেছে ভেবে উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নেই, হাল ছেড়ে দিলেও চলবে না। এখনকার মতোই কড়া-হাতে রাশ ধরে রাখতে হবে।...

তবু রাশ বোধ হয় একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল। হেমন্তর এই বয়সে অতটা অতন্দ্র থাকা হয়ত সম্ভবও নয়—অবশ্য, শুধু লেখাপড়ার দিকটাতেই কড়া নজর রেখেছিল, ইস্কুলের দৈনন্দিন জীবনের দিকেই—অন্য দিকের কথা অত ভাবে নি। অত মনেও হয় নি। ঘরেই আছে, ওর

চোখের সামনে—এই তো যথেষ্ট। নিজের সজাগ-সতর্কতা সম্বন্ধেও একটু গর্ব ছিল, এখানে ওর চোখ এড়িয়ে কিছু করতে পারবে না। আর, তাছাড়া, বদখেয়ালের কোন উপকরণ বা মানুষও তো বাড়িতে নেই।

ওদিকটা অত ভাবে নি বলেই সম্ভাবনার কথাটা মনে পড়েনি।

নইলে—ওদের নতুন ঝি হরিমতী যে একটু বেশী আগ্রহের সঙ্গে গোরার ফাই-ফরমাস খাটে—এটা লক্ষ্য করতে পারত। গোরাও ইদানীং একটু বেশী খুনসুটি করে ওর সঙ্গে—অকারণে হুকুম করে, খাটায়, ক্ষেপায়। কথাবার্তায় একটা কৃত্রিম কলহের সুরও বাজে মধ্যে মধ্যেই।

অর্থাৎ অনভিপ্রেত ঘনিষ্ঠতার আভাস। একটু নজর করলেই দেখতে পেত হেমন্ত। পাওয়া উচিত ছিল। বাইরের দিকে চোখ খোলা ছিল বলে ঘরের দিকে চাওয়া হয়ে ওঠে নি।

হরিমতী সবে বছরখানেক বাহাল হয়েছে এ বাড়িতে। সে গোরাকে এর আগে ভাল করে দেখেনি। বড়দিনের ছুটিতে গোরা বাড়ি আসেনি—তার আগে পুজোর ছুটি শেষ হবার মুখে হরিমতী এসেছে। এবারই প্রথম দেখল বলা চলে। মনিবের আদরের নাতি তাকে যত্ন করাই উচিত। যত্নটা একটু বেশী করেই করবে—মনিবকে দেখিয়ে—সেটাও স্বাভাবিক। হেমন্তও তাই ভেবেছিল।

অস্বাভাবিকও মনে হয়নি—অশোভনও না। হরিমতীর বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়; গোরার আঠারো। দেখতেও এমন কিছু ভালো নয় হরিমতী। রঙটা অবশ্য ফর্সা ঘেঁষাই, যাকে মাজা রঙ বলে তার চেয়েও দু'পোঁচ উজ্জ্বল, গড়নটাও পুরন্ত—কিন্তু মুখখানা লেপা-মোছা মতো, দেখলে বিরূপতা জাগে না হয়ত, তবে আকর্ষণও বোধ করার কথা নয়।

ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেছিল একজন—এবং করে খুশীই হয়েছিল।

নিমাইচরণের লক্ষ্য করার কারণও ছিল, সে কারণ ঈর্ষার জ্বালা—দুদিকেই। হরিমতীর এই সেবা ও মনোযোগ সেই পাবে এমনি একটা ইচ্ছা ও আশা তারও ছিল। পেলে মন্দ লাগত না, এই কথাই ভেবেছে। যে পেল, পাচ্ছে—তার সম্বন্ধে তো আরও জ্বালা, কাকার সঙ্গে কুকুর বেড়ালের মতো ব্যবহার করে তার মাথার ওপর ভাইপোকে তুলে ধরা, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে সেই এবাড়ির এ বিপুল সম্পত্তির ভাবী মালিক। কাকা আশ্রিত চাকর-বাকর শ্রেণীর একজন বৈ বেশী কিছু নয়—এতটা নির্বিকারে সহ্য করা কঠিন।

তবু, এতটা বিষ জমে থাকা সত্ত্বেও, হয়ত বা সেই জন্যেই—নিমাইচরণ এর বিন্দু বাষ্প আড়াল দেয়নি কাউকে। হেমন্তকে সতর্ক করে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। গোরা সম্বন্ধে নিমাইচরণের কোন সৎ পরামর্শই সে নেয়নি, উলটে কটূক্তি করেছে, মর্মান্তিক রূঢ় কথা শুনিয়েছে। সেক্ষেত্রে তার কাছে এ তথ্য জানানোর দায়িত্ব আর যারই হোক, ওর নয়। তা ভিন্ন, জানাতে গেলেও গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়ার অবস্থা হবে হয়ত।

কেউ আভাস পায়নি, পাত্র-পাত্রী দুজনেও তাই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোঝেনি।

নিমাইকে এ পরিবারের একজনের মধ্যে, এমন কি মানুষের মধ্যে গণ্য করার কথা কখনও ভাবতে শেখানো হয়নি গোরকে—তাকে হিসেবের বাইরে ধরাটা তাই অভ্যাস, ক্রমে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ওর। তার কাছে নিজের আচরণ আবরিত রাখার কি সতর্ক হওয়ার কোন কারণ আছে তাই গোরার মাথাতে যায়নি। সে যে দেখতে পায়। লক্ষ্য করে—এবং একদিন সে লক্ষ্য করার ফলাফল অন্যত্র পৌঁছে দিয়ে বিপদের কারণ ঘটাতে পারে—তা কোনদিন মনে হয়নি। সে সতর্ক হয়নি বলেই হরিমতীও হতে পারেনি। প্রথম প্রথম কাকাবাবুর সামনে একটু হুঁশিয়ার হয়ে থাকার চেষ্টা করত—গোরাই সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিল। ওর তাচ্ছিল্য ও অবহেলা দেখে হরিমতীরও একটু একটু করে ধারণা হল যে নিমাইচরণ এবাড়ির আসবাবগুলোর মতোই প্রাণহীন—দৃষ্টিহীন।

নিমাইচরণও সেই ভাবটাই বজায় রেখেছিল। বোধোদয়ের সেই পুত্তলিকার মতোই—'কর্ণ আছে শুনিতে পায় না, চক্ষু আছে দেখিতে পায় না।' মাস্টারমশাই চলে গেলে, হেমন্ত পুজোর ঘরে ঢুকেছে কিম্বা বেরিয়ে এসে হিসেবের কাগজপত্র নিয়ে বসেছে টের পেলে—নিমাই বাড়ি ফিরলে পাহারা শিথিল করে নিজের কাজে উঠে যায় আজকাল—গোর পা ছড়িয়ে পড়ার মাদুরে শুয়ে পড়ে বলে, 'এই মতি, পা টিপে দিয়ে যা।'

(হরি উচ্চারণ করতে নেই বলে হেমন্ত শুধু মতী বা মতি বলে—সেই থেকেই সংক্ষিপ্ত নামটা প্রচলিত হয়েছে এ বাড়িতে)।

ফরমাশ করা মাত্র হরিমতী এসে পা টিপতে বসে। পা-হাত-কোমর-উরুও। অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে নিমাই দেখে হরিমতীর সাগ্রহ সেবা। মনের দাহ প্রাণপণ চেষ্টায় সংযত রাখে সে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সোপানের পরবর্তী ধাপে পৌঁছনোর।

তার বিলম্বও হয় না বেশী। আড়ালে আবডালে, সিঁড়ির নিচের অন্ধকারে—একটির পর একটি ধাপ পার হতে থাকে ওরা—অতি সত্বর, আশাতিরিক্ত দ্রুত বেগে।

এরপর রাত জাগতে হয় বৈকি। অনুমানের ওপরই কষ্ট করা। তবে অনুমান মিথ্যাও হয় না। দু'এক দিন জেগে বসে থাকার পরই সে কষ্টের ফলটা পেলে। গোরা নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারেই বেরিয়ে এসে সিঁড়ির কোণে—হরিমতীর শয্যার দিকে চলে যায়—দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে ঘুমোয় নিমাইচরণ, কদিন পরে।

পরের দিন ইচ্ছে করেই আপিস কামাই করে সে। শরীর খারাপের অজুহাতে বিছানায় পড়ে থাকে। বিশ্রামের একটু প্রয়োজনও ছিল কদিনের অনিদ্রা ও উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার পর। তবে তাই বলে বেলা চারটে পর্যন্ত ঘুমোয় না। হেমন্ত আড়াইটে নাগাদ উঠে চিঠিপত্র লিখতে বসে—চিঠির কাজ তেমন না থাকলে খবরের কাগজ পড়ে—কাজের কথা পাড়ার সেই উৎকৃষ্ট অবসর।

হেমন্তর চা খাওয়ার সময় সেটা নয়। গোর স্কুল থেকে ফিরলে চা খাবার তৈরি হয়। সেই সময়ই খায় সে। নিমাইয়ের আপিস যাওয়ার দৌলতে দুপুরবেলা চা খাওয়ার অভ্যেস হয়েছে, সে উঠে কেরোসিনের স্টোভ জেলে নিজেই কলাইয়ের একটা মগ ভর্তি চা তৈরি করে এনে জ্যাঠাইয়ের সামনে জেঁকে বসল।

এ বসার ধরণ হেমন্ত চেনে। কোন কাজের কথা আছে নিশ্চয়, মানে নিমাইয়ের নিজের তরফে কোন কাজের কথা। হয়ত কোন প্রার্থনা আছে। সেই জন্যে। আজ আপিস যায়নি—এতক্ষণে বুঝতে পারে। সেও বৃথা বাক্য ব্যয় করে সময় নষ্ট করে না, মিনিট পাঁচেক পরে হাতের চিঠিটা লেখা শেষ করে সোজাসুজিই বলে, 'তা কী বলবে বলে ফ্যালো। আমার বিস্তর কাজ হাতে।'

'বলবার আর কি আছে বলো। বললেই বা শুনছে কে। বলে—অন্ধ জাগো না আমার কিবে রাত্তির কিবে দিন। চোখ বুজে যে থাকবে বলে ঠাউরেছে—তাকে কি কিছু দেখানো যায়।'

বলার রকমটা ভাল লাগে না। অন্যদিন হ'লে হেমন্ত ধমক দিত। কিন্তু নিমাইয়ের গলার জোরটা কানে বেজেছে। তার সঙ্গে কথা বলার সময় গলায় এতটা জোর দেওয়া স্বাভাবিক নয়। অনেকখানি বুকের বল নিয়েই এসেছে নিশ্চয়ই।

সে মিনিটখানেক ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে। তারপর মৃদু বিরক্তির সুরে বলে, 'তোমার ও হেঁয়ালির মানে ভাবার আমার এখন সময় হবে না বাবা, যদি কাজের কথা কিছু থাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলো।'

'স্পষ্টাস্পষ্টি বললে কি শুনবে তুমি—মাথা ঠাণ্ডা করে? অনেক আগেই বলতে পারতুম। বলা হয়ত উচিতও ছেল—কিন্তু সাহসে কুলোয় না যে!...পেয়ারের পুষ্যি এঁড়ের সম্বন্ধে যত হিতকথাই বলি না—

তোমার কানে বিপ্লবীদের শোনাবে, নাম [illegible] রণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাচছে [illegible] সেই [illegible]। তোমায় চিনি তো!"

অর্থাৎ সেই পুরোনো ঈর্ষার জ্বালা।

বিরক্তি আরও বেড়ে যায়, কঠিন হয়ে ওঠে হেমন্তর কণ্ঠ।

'তার মানে? তোমার ভাইপো আবার নতুন কি করলে! তার নামে চুকলি খাবার জন্যেই আপিস কামাই করে ঘরে বসে আছ বুঝি! তার আড়াল না হলে সুবিধে হচ্ছে না বলে? যদি কোন দোষ করে থাকে তার মুখের সামনে বলতে পারো না?'

'সব দোষ কি সকলের মুখের সামনে বলা যায় মা ঠাকরুন! সব দোষের কথা বলারও নয়—দেখাতে হয়। বলি অত গরম হয়ো না। কথা আমি একটিও বলব না, বলতে চাইও না। বললে ঢের দিন আগে বলতে পারতুম। তুমি কানা বলে তো আর আমি কানা নই। তোমাকে চিনি বলেই সে আহাম্মুকী করিনি।... তবে এবার আর কিছু না করলেই নয়, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—এরপর আমারই নাতির দোলনা কিনতে বাজারে ছুটতে হবে কিম্বা দুধের জন্যে গাই খুঁজতে —সেই জন্যেই মুখ খোলা। তবে আজও বলব না কিছু, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোব।...আর আমাকেই বা দেখাতে হবে কেন? আজ রাতটা একটু চোখ কান খুলে থেকো মটকা মেরে পড়ে—যা দেখার নিজেই দেখতে পাবে। তোমরা তো বোষ্টম, কীর্তনে যা কিছু ভগবান করেন তা গৌরচন্দ্র করছেন বলে গান শুরু করে না?...তা তোমারও ধরগে রাসলীলার গৌরচন্দ্রিকা দেখে চক্ষু সার্থক হয়ে যাবে... হরি বলো, হরি বলো!'

আর সেখানে বসে না নিমাই, বসতে সাহস হয় না।

সাহস হয় না দু কারণে। জ্যেঠাইয়ের মেজাজ সে চেনে, হয়ত এখনই বোমার মতো ফেটে উঠে তার মরা বাপের মুখে ময়লা দেবে, চাইকি দুটো লাথি কষিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়।

আরও একটা কারণ—হরিমতী তার কোন দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিছল, এখনই ফিরে এসেছে। নিচে দোর খোলার আওয়াজ পেয়েছে। ঘর থেকে চলে এসেও ঠাকুর ঠাকুর করতে লাগল, যা চণ্ডাল রাগ বুড়ীর—ওর সামনেই না গাল মন্দ দিয়ে সব ফাঁস করে দেয়।

কিন্তু হেমন্তর তখন রাগারাগি বা চেঁচামেচি করার [illegible]

হয়ে গিয়েছিল ঐ কটা কথা [illegible] [illegible]। সবটা বুঝতে পারেনি তখনই—শুধু মনে ইঙ্গিতটাই ধরেছে।

এমন কোন আশা রাখে নি গৌরের ওপর—এতদিন নিজেকে বুঝিয়েছে—শুধু কর্তব্য মাত্র করে যাচ্ছে, এই কথাই ভেবেছে বা ভাবার চেষ্টা করেছে। আর বুকের—একখানি দুর্বলতার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। আশা না থাকলে আশাভঙ্গের এতটা আঘাত লাগা সম্ভব নয়। আসলে নিজে-কেই নিজে মিথ্যে বুঝিয়েছে এতকাল।

কিন্তু পাথর হয়ে থাকলে চলবে না। হরিমতী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। সাধারণত এসময় এ ঘরে আসে না। তবে একেবারে আসা অসম্ভবও নয় কোন কাজ থাকলেই আসবে। 'রাসলীলা' শব্দটা মুখে উচ্চারণ করেনি নিমাই, রাসলীলা কিছু একাও হয় না। সঙ্গিনী একটা থাকা দরকার। হেমন্ত ছাড়া স্ত্রীলোক বলতে তো ঐ এক হরিমতী বাড়িতে। ভাড়াটেদের ঘরেও তেমন কমবয়িসী ঝি-বৌ নেই, তাছাড়া তাদের সঙ্গে তেমন লেপ্‌চাও নেই। সুতরাং—কথাটা যতই অবিশ্বাস্য অসম্ভব মনে হোক—হরিমতীকে একেবারে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।...

মনোভাব দমনের শিক্ষা বহুকালের, বহু আঘাতে পোক্ত খাওয়া—আজও সেই শিক্ষাই কাজে লাগল। খানিকটা পরে হরিমতী যখন এ ঘরে এল তখন হেমন্তর কথায় গলার আওয়াজে বা মুখভাবে কোন বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ পেল না। গৌরের ইস্কুলের কথা, পড়ার কথা জিজ্ঞেস করল। ইস্কুলের কথা, পড়ার কথা জিজ্ঞেস করল। ওর এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে নিমাই পর্যন্ত আড়ালে হাত তুলে নমস্কার করল। হাজার চেষ্টা করলেও তার দ্বারা—তাদের দ্বারা মনকে এতটা শাসন করা সম্ভব হবে না।

রাত্রে যখন ধরণীবাবু পড়িয়ে চলে গেলেন, তখন অন্য দিনের মতোই হেমন্ত কাগজপত্র নিয়ে বসেছে। উঁকি মেরে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েই পা টিপতে গেল হরিমতী। কিন্তু চোখ মেলে রাখা সম্ভব না হোক—কানটা এদিকে খাড়া ছিল, এই পদসেবার পর্বটা জানতে অসুবিধে হল না। ও এই প্রথম জানল ব্যাপারটা—হয়ত প্রতি দিনই এই কাণ্ড হয়। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরই গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করল ওর।...নির্বুদ্ধিতা নিমাইকে অকারণে—বিচার না করে মুড়ে কথা বলা তাকে বিশ্বিষ্ট করে রাখা—নইলে অনেক আগেই সে সতর্ক করে দিতে পারত। আসলে সে গৌরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এটা ধরে না নিয়ে তার পরামর্শই শোনা উচিত ছিল—[illegible]

[illegible] কথা। [illegible] [illegible] আন্দোলনে [illegible]—তাতে [illegible] বয়সী [illegible] পড়তে [illegible] [illegible] হয়ে গেছে।

[illegible] হয়েছে অনেক, অনেক দিক দিয়ে। স্কুলের দিকেই সমস্ত নজরটা রাখতে গিয়েছিল। দিনকাল খারাপ—স্কুলের ছেলেরাও আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনে মেতে উঠেছে—ইংরেজের কোপে পড়ে মার খাচ্ছে, জেল খাটছে। পূর্ণবাবুর এক দৌহিত্র মার খেয়ে চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে। ঠিক এ সময়টায় সোজাসুজি আন্দোলন না হলেও এদিকে-ওদিকে হচ্ছে বৈকি। লুকিয়ে লুকিয়ে নাকি বোমাও তৈরী করছে কেউ কেউ—কলেজের ছেলেরাই বেশীর ভাগ, তার মধ্যে স্কুলের ছাত্রদেরও টানছে। ধরা পড়লে ফাঁসি অনিবার্য। অত বড় ছেলে দেখে গৌরকেও যদি ঐ সর্বনেশেগুলো দলে টানে। ও যা বোকা, হয়ত এমনি যেতে বললে ছুটে যাবে।

সেই জন্যেই আরও বাড়ি ফিরলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্কুলের কথা, বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করত। ইদানীং খেলতে যাওয়া বন্ধ করেছিল গৌর—হেমন্তরই আপত্তি, গৌরও তা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করে নি—সেটাকে সুবুদ্ধির পরিচয় ভেবে আরও বরং নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বাইরের প্রতি ঔদাসীন্যের মধ্যে যে গৃহের প্রতি টানটা বড় কথা—তা মনে হয় নি একবারও। বিপদের মূলটা যেখানে—যেখান দিয়ে সত্যকারের সর্বনাশ ওর আসার কথা—সেখানকার কথাই চিন্তা করে নি কখনও—ওদের বংশের ধারা!

আঠারো বছরের ছেলে আর ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েছেলে—এই হিসেবটা মেলাতে পারে নি বলেই এদিকটাতে চোখ পড়ে নি। আজ মিলল। ওদের রক্তেই সে হিসেব লেখা আছে। সেইটে ভেবে দেখা উচিত ছিল।

এই নিমাইয়ের মুখেই বহু গল্প শুনেছে সে। বিষ্ণুচরণ তার ছেলেমেয়ের ঘরে আড়ি পাতত জানলার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারেই দেখার চেষ্টা করত তাদের বিছানাটা। নইলে নাকি তার নিজের অসুবিধে হত। শিবচরণের ভয়ে কোন ঝি ওদের গোয়াল কাড়তে কি বাসন মাজতে রাজী হত না, সে নাকি পাগল হয়ে উঠেছিল এই ব্যাপারে। স্ত্রীর হাতে সত্যি সত্যি ঝাঁটা খেয়েও তার রোগ সারে নি। এমনি নানা বিচিত্র ও বিভৎস বিবরণ। হেমন্ত ধমক দিয়েছে, কাহিনীর সূচনাতেই থামিয়ে দিয়েছে—অনেক সময় বলে তবু হয়ত সব কথা বলতে পারে নি।

এর পর সে বংশের ছেলের কাছে কি আশা করবে সে?

(ক্রমশঃ)

রত্নগর্ভা আটঘরা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

রামায়ণের বালকাণ্ডে নিম্নবঙ্গের উল্লেখ রয়েছে 'রসাতল' বলে। মহাভারতের অর্জুন মুক্তবেণী গঙ্গার সাগরসঙ্গমের পুণ্যসলিলে অবগাহন করে কলিঙ্গের বৈতরণী তীর্থপথে যাত্রা করেছিলেন। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে এ অঞ্চলের আরও বিশদ বিবরণ রয়েছে। সাগরসঙ্গমে সুষেন নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা রাজত্ব করতেন। সেখানে ছিল বিস্তৃত জনপদ আর গভীর অরণ্য। সে অরণ্যে দীপান্তী-নগরের রাজনন্দিনী ও তালধ্বজ নগরের রাজকুলবধূ সুলোচনা পুরুষের ছদ্মবেশে ভীমনাদ নামে এক গণ্ডার বধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্লিনি, ভার্জিল, দিয়োদোরাস, কার্টিয়াস, প্লুতার্ক, মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রেকোরোমান লেখকদের রচনায় ও টলেমীর ভূগবুকে এ দেশ বা গঙ্গারিডির কিছু কিছু প্রকৃত ভৌগোলিক তথ্য ও বিবরণ পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে ইতালী দেশের মহাকবি ভার্জিল তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'Georgis' যে এদেশ বাসিগণের বীরত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন—

"On the doors will I represent in solid gold and ivory the battle of Gangaridae and the arms of Conquiring Quirinuss".

আনুমানিক চতুর্থ শতকে রচিত মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশে'র চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও এদেশবাসীরা যে পরাক্রমশালী ও নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন তার উল্লেখ আছে। তালবনশ্যাম তটভূমের সুহ্ম জনপদজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে দিগ্বিজয়ী রঘু নাকি 'গঙ্গা স্রোত হন্তরে' বিজয়স্তম্ভও স্থাপন করেছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন ধরে পলিমাটি গঠিত নদীমাতৃক নিম্নবঙ্গের নদীখাতের পরিবর্তন ও ভূমি-সংস্থানের আলোড়নের ফলে আদিকালের গঙ্গারিডি বা ষষ্ঠ শতকের 'নব্যাবকাশিকা' মাটির গভীরে আত্মগোপন করেছে। মহাকাব্যের 'রসাতলে'র বর্তমান আটপৌরে নাম দাঁড়িয়েছে 'ভাটিদেশ'।

সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, শিয়ালদহ দক্ষিণ শহরতলী রেলপথের বারুইপুর জংশনের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে, মৌজা আটঘরা ও সন্নিহিত অঞ্চলে জঙ্গল হাসিল, চাষাবাদ, গৃহাদি নির্মাণ, জলাশয় খনন ও সংস্কারের কালে যে সকল বিচিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় ভূমিসীমায় পূর্বে প্রাচীন বিদ্যাধরী নদী ও পশ্চিমে আদিগঙ্গার বর্তমান মজাগর্ভের মধ্যবর্তী এই অঞ্চলে সুপ্রাচীনকালে এক বিস্তৃত জনবসতি গড়ে উঠেছিল। আটঘরায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পুরাবস্তুগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে, প্রাচীন গ্রেকোরোমান লেখকদের বর্ণিত ও টলেমির মানচিত্রে প্রদর্শিত গঙ্গারিডি সাম্রাজ্যে বর্তমানের আটঘরা একটি অন্যতম নগরী ও ইন্দোরোমান বাণিজ্যের বর্ধিষ্ণু কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের অন্যান্য প্রত্নস্থল তাম্রলিপ্ত, হরিনারায়ণপুর, বোড়াল ও চন্দ্রকেতু গড়ে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলির সঙ্গে আটঘরায় প্রাপ্ত অনুরূপ দ্রব্যের নিকটতম সাদৃশ্য রয়েছে। গভীরভাবে এ অঞ্চলের ভূ-সংস্থান, সভ্যতার স্তরবিন্যাস ও বিচিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে মনে হয় প্রত্নস্থল আটঘরা মৃত্তিকাজঠরে সুপ্রাচীন এক অতীতের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ভূ-সংস্থান বা টপগ্রাফির দিক থেকে বিচারে আটঘরা পার্শ্ববর্তী সুবুদ্ধিপুর, মদারআট, সোলবোয়ালিয়া, সীতাকুণ্ডু, চিত্রশালী, বেগমপুর প্রভৃতি অঞ্চল হতে উঁচু ভূমিস্তর বা কনটুরে অবস্থিত। আটঘরার পশ্চিম সীমায় 'ক্ষর্দির বাঁধা' নামে যে দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে বর্তমানে জলাভূমি বা নিম্ন আবাদি জমি রয়েছে, খুব উঁচু স্থান থেকে লক্ষ্য করলে মনে হয়, প্রাচীনকালে এটি ছিল নদীখাত—সর্বপাপহারিণী গঙ্গার সমতলে শতমুখী হয়ে সাগরসঙ্গমে চলাপথে একটি ধারা। কালের করালগ্রাসে মজে নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়ে গেছে। এখনও দেখেছি ভরা ভাদ্রে এ পথে দক্ষিণে জলস্রোত চলে।

নানা সময়ে আটঘরার মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত বিচিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত আটঘরার সভ্যতার স্তরবিন্যাস চলে এসেছে। যদিও কোন কোন স্তরে রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনজীবনে বিশৃঙ্খলার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তবুও এ অঞ্চলে জীবনযাত্রা হয়ত কখনও সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়নি। মৃত্তিকার মধ্যযুগীয় সভ্যতার স্তরে, নিম্নবঙ্গের অন্য দু'একটি প্রত্নস্থলের মত প্রথম জনজীবনে কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও পরবর্তীকালে অপূর্ব এক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নিদর্শন রয়েছে। প্রাচীন কোন বিবরণে, গ্রন্থে বা মানচিত্রে 'আটঘরা' নামের উল্লেখ অনেক অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। টলেমির গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানচিত্রের প্রসিদ্ধ 'গাঙ্গে' বন্দর অথবা অন্যতম নগরী 'অন্তাগোরা'কে, নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া, বর্তমানের আটঘরা বলে অনুমান করা কষ্টকর কল্পনামাত্র। তবে অনেকে মনে করেন মধ্যযুগের 'আটিসারা' ও বর্তমানের আটঘরা একই স্থান নির্দেশ করে। বৃন্দাবন দাসকৃত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডে মহাপ্রভুর নীলাচলে

যাত্রাপথের বিবরণে আদিগঙ্গার তীরে আটিসারা নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় :

"হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কথা কহিতে কহিতে।
উত্তরিয়া আসি আটিসারা নগরেতে।।
সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্তনাম।।"

কিন্তু এ অনুমানের সমর্থনে সঠিকভাবে কিছুই বলা চলে না। মনে হয়, মধ্যযুগের আটিসারা বর্তমানের বারুইপুরের গর্ভেই বিলীন হয়েছে। মহাপ্রভুর পদরেণুস্পর্শে আটিসারায় বৈষ্ণবসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। বারুইপুরে আজও এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য আছে। কিন্তু বর্তমান আটঘরায় তাঁদের তেমন প্রাধান্য নেই বললেই চলে। তাছাড়া বারুইপুরের গঙ্গার মজাগর্ভে কীর্তন খোলাঘাট, সদাব্রতঘাট, কর্তাকপুকুর, কালীদহ, শ্রীঅনন্তের পাট প্রভৃতি মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রাপথের পুণ্যস্মৃতি বহন করে চলেছে।

বর্তমানের আটঘরার ছায়াসুনিবিড় রূপটি নয়নমুগ্ধকর। চষা মাঠ, শব্জীর ক্ষেত, তালনারিকেল বন, লিচু পেয়ারা বাগিচা ও কুমারের চাকের ঘূরপাকে বয়ে চলেছে গ্রামবাংলার বিচিত্র জীবনপ্রবাহ। কিন্তু এই শান্তসমাহিত রূপের অন্তরালে গ্রামটি মাটির গভীরে বহন করে চলেছে কোন সুদূর অতীতের কর্মচঞ্চল জীবনপ্রবাহের অজস্র নীরব স্বাক্ষর। আটঘরার উঁচু ঢিবি বা ডাঙ্গাগুলি, বেশ কিছু ছোটবড় সংস্কৃত বা পাঁকল দীঘি, মাটির গভীরে আদিকালের বহুদূর প্রসারিত গড় প্রাচীর ও বসতির ধ্বংসাবশেষের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে আছে অজস্র প্রত্নরত্ন।

আটঘরার ঢিবিগুলির মধ্যে 'দমদমা' প্রধান। আয়তনে এককালে এটি ছিল প্রায় তিন একর জমি জুড়ে। চাষাবাদের ফলে চারপাশে মাটি কেটে কেটে দমদমার বর্তমান আয়তন অনেক কমে গেছে। প্রায় দশ মিটার উঁচু ঢিবির গা জুড়ে অসংখ্য ঝোপঝাড় আর মাথায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে কাঁটা বড় বড় গাছ। চাষাবাদের কালে ঢিবির মাটি কাটার সময় অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এর গর্ভ থেকে। তার মধ্যে রয়েছে পোড়ামাটির বিচিত্র সব মূর্তি পুতুল, খেলনাগাড়ী, প্রাচীনমুদ্রা ও মৃৎপাত্র। কয়েক বছর আগে স্থানীয় উৎসাহী কয়েকজন যুবক ঢিবির মাথায় মাটি খুঁড়ে বিশালাকৃতির কয়েকটি শিলনোড়াজাতীয় দ্রব্যও পেয়েছিলেন। এ ধরনের দ্রব্য প্রাচীন পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষেও পাওয়া গেছে। ঢিবিরগর্ভে প্রাচীন ইষ্টকনির্মিত কক্ষাদির চিহ্ন আছে বলে অনেকে মনে করেন। দমদমা ছাড়াও আটঘরায় আরও কয়েকটি প্রত্নসম্পদপূর্ণ ঢিবি বা ডাঙ্গা আছে। ফাঁসিডাঙ্গা, গাজি ডাঙ্গা প্রভৃতি মাটিউচ্চ ঢিবিগুলিতেও চাষাবাদের সময়ে বিভিন্ন স্তরে, পুরাকাল থেকে আরম্ভ করে বাদশাহী আমল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। ফাঁসিডাঙ্গার নিম্নভূমিস্তরে বিশালাকৃতি মৃত জীবজন্তুর কঙ্কালের ফসিলের চিহ্নও পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া আটঘরা গ্রামের ভিতর ছড়িয়ে আছে ছোটবড় অনেক জলাশয়। কতগুলি পঙ্কিল, আর কতগুলি সংস্কারের ফলে ব্যবহারের উপযুক্ত। এসব প্রাচীন জলাশয়ের গর্ভ থেকে বিভিন্ন কালের বিচিত্র সব পুরাবস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। দীঘি বা জলাশয়গুলির মধ্যে পুরাবস্তু প্রাপ্তির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হ'ল—গাজীডাঙ্গাখানা, সীতামারপুকুর, নিরামিষপুকুর, চালধোয়াপুকুর, পাদ্যপুকুর ও চটাপুকুর। সীতামারপুকুরের গর্ভ থেকে কয়েক বছর আগে সংস্কারের কালে সুঙ্গকুষাণযুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। নিরামিষপুকুর, চালধোয়াপুকুর ও পাদ্যপুকুর সংস্কারকালে পালসেন আমলের কয়েকটি কালো পাথরের মূর্তির ভগ্নাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। গাজীডাঙ্গাখানার প্রাচীনযুগের মৃৎপাত্র, টেরাকোটা মূর্তি পুতুল, মুদ্রাও খুবই দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি ব্রাহ্মী-অক্ষর ও প্রাক্-বঙ্গাক্ষর ক্ষোদিত সংক্ষিপ্ত-লিপি ও শীলমোহর পাওয়া গেছে।

বর্তমানে আটঘরায় দুটি ভিন্ন ধর্মীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ দেবস্থান আছে। স্থান দুটিতে যে সামান্য দালান রয়েছে তার নির্মাণকাল খুব বেশীদিন নয়। তবে দেবস্থান দুটি বেশ উঁচু জায়গায় অবস্থিত—মনে হয় দুটিই প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তিভূমির উপরে। এর ভেতর একটিতে টালির ছাউনী দালানে 'সীতামার থান'। অপরটিতে দেওয়ান গাজীর মাজার। সীতামারথানে হালআমলের মাটির কিছু দেবদেবী মূর্তি আর দুএকটি কালোপাথরের দেববিগ্রহের সামান্য ভগ্নাংশ রয়েছে। আশেপাশে পাঁচ দশ গাঁয়ের বাসিন্দারা এখানে মানৎ করে, ঢেলা বাঁধে। আর দ্বিতীয় স্থানটি সীতামার থানের বিপরীত দিকে অপেক্ষাকৃত বেশ উঁচু ডাঙ্গায়। ক্ষুদ্রাকৃতি পিরামিড্ শীর্ষযুক্ত দালানে গাজীর কবর। ভিত্তিভূমি ও দালানের সংস্থান দর্শকজনকে বিস্মিত করে। ডাঙ্গার আশেপাশে মাটি বর্ষার প্রবলধারায় ধসে পড়ায় প্রাচীন বৃহদাকৃতি ইঁটের ধ্বংসপ্রাপ্ত ভিত্তিভূমি আত্মপ্রকাশ করেছে। গাজীর মাজারের দালানের প্রবেশ দ্বার দক্ষিণমুখী—অর্থাৎ আরাধনা উত্তরমুখী হয়ে! মাজারের দক্ষিণে বিরাট পঙ্কিল দীঘি—নাম চালধোয়া পুকুর। বেশ কয়েক বছর আগে দীঘিটি সংস্কারের কালে কয়েকটি কালোপাথরের দেববিগ্রহের খণ্ডিত অংশ দীঘির তলদেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিম্নবঙ্গের সমাজজীবনে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের নিদর্শন। সীতামা আর দেওয়ান গাজীর রেষারেষি, সংঘর্ষ আর নিষ্পত্তির কাহিনী নিয়ে এ অঞ্চলে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আজও মাঘের শীতে তাজা রোদে জিরানকাটি খেজুর রসের নলেন জ্বাল দিতে দিতে পাড়ার বারোয়ারী ঠানদিদি ঘিরে বসা নাতিনাতনীদের গল্প করেন—সীতামার মনধাঁধানো রূপের—তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার—কাকচক্ষু টলমল দীঘির জলে সোনার কৈ মাছ আর রূপোর কুমীরের। সে আরেক কাহিনী। তার জনশ্রুতি আছে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নেই।

আটঘরার প্রাচীনত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন মৃত্তিকাগর্ভে আদিকালের বহুদূরে প্রসারিত গড় প্রাচীরের চিহ্ন। দমদমা ঢিবির ধার দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে মাটির গভীরে প্রাচীরের বিস্তৃতি অনেক দূর। মাটির উপর হতে প্রায় তিন মিটার নিচে ইঁটের প্রথম স্তর। ইঁটের প্রথম স্তর থেকে প্রাচীরের গভীরত্ব কোথাও কোথাও আট থেকে দশ মিটার পর্যন্ত। প্রাচীরটি উপরের দিকে প্রস্থে প্রায় তিন মিটারেরও বেশী। ভিত্তিভূমি আরও প্রশস্থ। কোথাও প্রাচীরের সংলগ্ন কতগুলি ইঁটের তৈরী 'খুপরি' বা কক্ষের চিহ্ন আছে। এগুলির গর্ভে একপ্রকার পোড়ামাটির অসংখ্য কঠিন

গঙ্গারিডি-সুন্দরী, আটঘরায় প্রাপ্ত পঞ্চচূড় যক্ষিণী
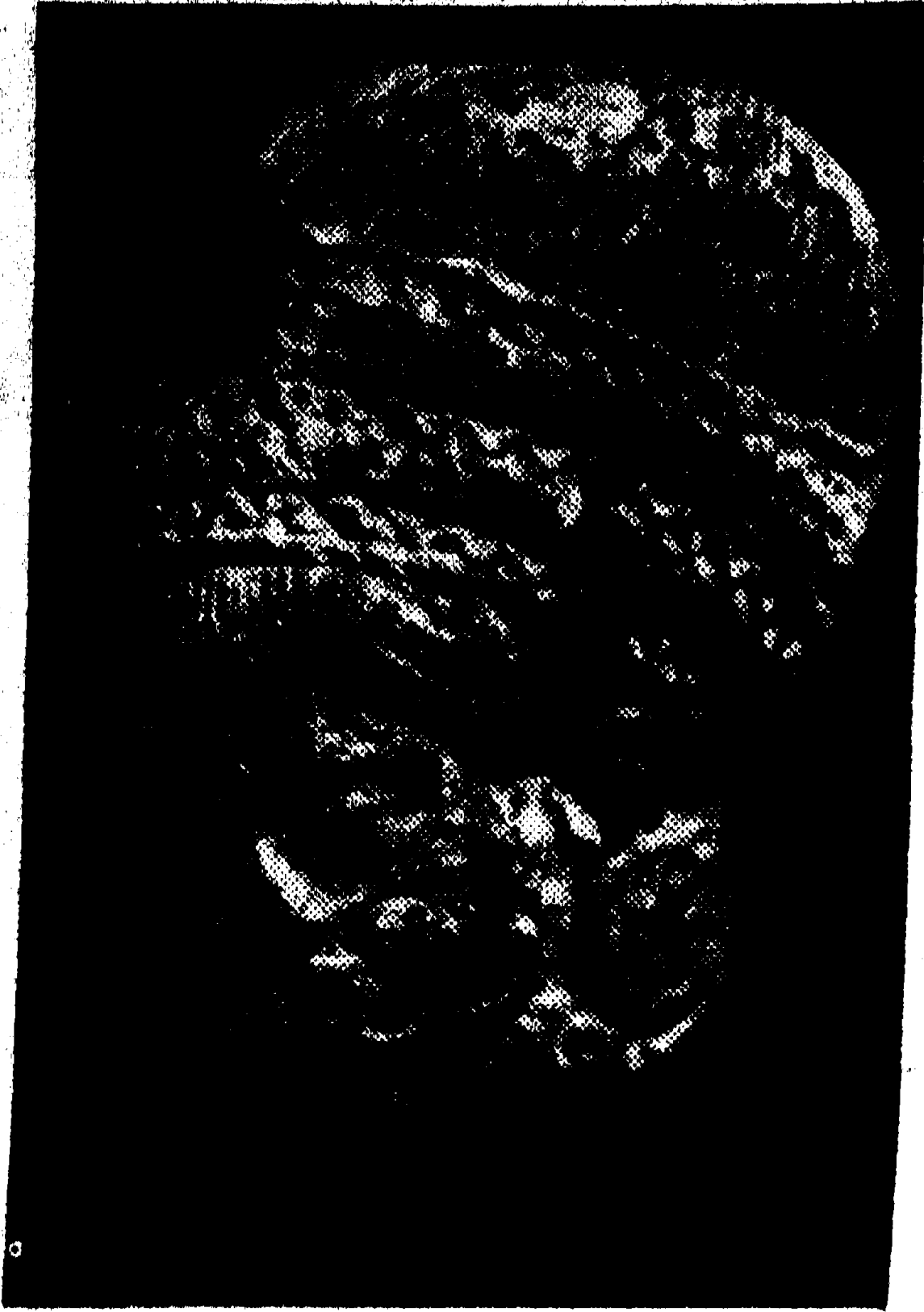
গোলাকার বস্তু পাওয়া গেছে। এগুলি বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাচীনকালের একপ্রকার 'মিসাইল' বা ক্ষেপণাস্ত্র। ধনুক বা গুলতি জাতীয় কোন আয়ুধের ছিলার দ্বারা এগুলি নিক্ষেপ করা হত। প্রাচীরের খুপরিতে দু'একটি ধাতুনির্মিত বর্শা-ফলকাকৃতি ক্ষুদ্র অস্ত্র শীর্ষও পাওয়া গেছে। সব মিলেয়ে মনে হয় এটি একটি নগর-বন্দর বা দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসস্তূপ। তবে জনৈক পুরাতত্ত্ববিদ নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গের প্রত্নস্থলসমূহের একটি মানচিত্রে মাটির গভীরে এ প্রাচীরটিকে 'সুন্দরবন এমব্যাঙ্কমেন্টস' এর অংশরূপে চিহ্নিত করেছেন। মনে হয় সিদ্ধান্তটি ত্রুটিপূর্ণ। ইঁটের আকৃতি ও প্রাচীরের সংলগ্ন কক্ষে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুরাবস্তুগুলি পরীক্ষা করে মনে হয় প্রাচীরটি নিদেনপক্ষে সুঙ্গ-কুষানযুগে।

নানা সময়ে মাটির গভীরে বিভিন্ন স্তরে আটঘরায় যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে তার একটি শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে—বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র ও খোলাকুচি, পোড়ামাটির মূর্তিপুতুল নানা ধরনের মুদ্রা, সংক্ষিপ্ত লিপিফলক ও শীলমোহর এবং প্রাচীনত্বের কিছু প্রস্তরের নিদর্শন।

আটঘরায় ছোটবড় নানা ধরনের বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ ও বর্ণের মৃৎপাত্র, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, খোলাকুচি পাওয়া গেছে। এর ভিতর কতগুলি আরশির ন্যায় উজ্জ্বল মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ প্রলেপযুক্ত বা নর্দার্ন ব্ল্যাক পটারির শ্রেণীভুক্ত। আবার কতগুলির উভয় পৃষ্ঠে দুটি বিভিন্ন উজ্জ্বল রংয়ের লাল ও কালো প্রলেপযুক্ত। বিশেষজ্ঞ মহলে এগুলি ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড পটারী বা লাল-কালো মৃৎপাত্র বলে সুপরিচিত। মাটির অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে কতগুলি মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে যার বর্ণ খুবই উজ্জ্বল ও সুন্দর। এগুলির ভিতরে সাধারণ পোড়ামাটির লালরং। কিন্তু বাইরের দিকে উজ্জ্বল আসমানী বা জাফরাণী রঙের প্রলেপ। গৌড়ের মৃত্তিকাস্তরে এধরনের কিছু কিছু পাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। মনে হয় যেন পাত্রের উপরে মিনা বা কলাইয়ের কাজ গাজীর ডাঙ্গার-খানায় কতগুলি ধূসরবর্ণের দীর্ঘ গলাযুক্ত পানপাত্র, জাগ ও ভৃঙ্গার জাতীয় পাত্র পাওয়া গেছে। পাত্রগুলির গড়ন রোমক পাত্রের অনুরূপ। কতগুলি পাত্রের ভগ্নাংশ বিচিত্র চিহ্নযুক্ত। এর ভিতর কিছু জ্যামিতিক চিহ্ন, কিছু রেখাঙ্কিত মৎস্য, হস্তি ও মনুষ্য চিহ্নযুক্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত এধরনের মৃৎপাত্রগুলির নির্মাণকাল আনুমানিক ৫০০ খৃঃ পূঃ হতে খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের মধ্যে বিস্তৃত।

মাটির গভীরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি পুতুলগুলি আটঘরায় প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন। এর ভিতর রয়েছে কয়েকটি যক্ষ ও যক্ষিণীমূর্তি। পোড়ামাটির এ ক্ষুদ্র মূর্তিগুলি অধিকাংশই ভগ্ন। প্রজননের দেবী যক্ষিণীর যে কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন আয়ুধশোভিত পঞ্চচূড় ও একটি দশচূড়। একটি যক্ষিণীর অপূর্ব কেশবিন্যাস ও মুখশ্রী দর্শকমনকে মুগ্ধ করে। জনৈক পুরাতত্ত্ববিদ রহস্য করে এর নামকরণ করেছেন 'গঙ্গারিডি সুন্দরী'। অপর একটি যক্ষিণীমূর্তির নিম্নাংশ অত্যন্ত সুন্দর। তা ছাড়া বিভিন্ন 'মোটিফ'-শোভিত অসংখ্য খেলনাগাড়ীও পাওয়া গেছে। মোটিফের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুসজ্জিত হস্তি, মেষ, অগ্নিমূর্তি, শালভঞ্জিকা, ভীষণাকৃতি রাক্ষস ও ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির। হস্তি মোটিফের প্রাচুর্য গঙ্গারিডি সাম্রাজ্যের হস্তিবাহিনীর গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আলেক-জান্ডার নাকি প্রাসী ও গঙ্গারিডির বিশাল হস্তিবাহিনীর সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে-ছিলেন। রোমক ঘাগরাপরিহিত যোদ্ধা-মূর্তির ভগ্নাংশ, রোমনাকৃতি মুখাবয়ব বিশিষ্ট কতগুলি নারী ও পুরুষ মূর্তির ভগ্নাংশ রোমক সংস্কৃতির সঙ্গে এ অঞ্চলের নিবিড় সম্পর্কের কাহিনী নির্দেশ করে। আটঘরায় প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলির নারীত্ব প্রকাশে অকপটতা বিশেষ লক্ষণীয়। অধিকাংশ মূর্তিই শিল্পরিসরাকৃতি। কয়েকটি মূর্তি প্রাগৈতিহাসিক শিল্প-শৈলীর সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করে। একটি পদ্মপাদিত কণ্ঠহারযুক্ত জটাজুটধারিণী আবক্ষ মাতৃমূর্তি নিশ্চিতভাবে প্রাগৈতি-হাসিক। ক্ষুদ্রাকৃতি এই মাতৃমূর্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান। প্রাচীনত্ব ও গুরুত্বের দিক হতে এই সালঙ্কারা মাতৃমূর্তি যে কোন সংগ্রহ-শালার গৌরব বৃদ্ধি করবে। অসংখ্য মূর্তি-পুতুলের মধ্যে অন্ততঃ আরেকটির উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন। ক্ষুদ্রাকৃতি এই পোড়ামাটি মূর্তিটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রাচীন—সুঙ্গ-কুষাণযুগের। দীর্ঘকণ্ঠযুক্ত মুকুটশোভিত পুরুষমূর্তির মুখমণ্ডলটি সম্পূর্ণ অভগ্ন। কণ্ঠের নিম্নে দ্বৃত্তাকার পাদপীঠ। বর্তমান-কালের নিম্নবঙ্গের লৌকিক দেবতা 'দারা ঠাকুরে'র সঙ্গে এর নিকটতম সাদৃশ্য যে কোন গবেষককে বিস্মিত করে। মূর্তিটির সঙ্গে য্যান-হ্যান্ট কালচারেরও গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মূর্তিটি স্থানীয় এক অধ্যাপকের সংগ্রহে আছে।

নিম্নবঙ্গের অন্যান্য প্রত্নস্থলের মত আটঘরার মৃত্তিকাগর্ভে কিছু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে অঙ্কচিহ্নযুক্ত ও ঢালাই উভয় প্রকারের মুদ্রাই আছে। এগুলির আকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। তবে গোলাকার বা অসম-চতুষ্কোণের সংখ্যাই বেশী। মুদ্রানির্মাণে তাম্রের ব্যবহারই অধিক। কতগুলি মুদ্রায় নানাপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত। কতগুলিতে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন দ্বারা গঠিত অস্পষ্ট কতগুলি

বৃত্তাকার রেখামাত্র আছে। আবার কত-গুলিতে চৈত্য, হস্তি ও বৃষের প্রতিকৃতি রয়েছে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির কয়েকটি মুদ্রায় বিচিত্র রেখার বেষ্টনীর মধ্যে ম, ব, হ অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ। অক্ষরগুলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপির অনুরূপ। ঐ অক্ষর চিহ্নিত মুদ্রাগুলির অপর পৃষ্ঠে অনবগোত্র। টাং বা তুলাদণ্ডের প্রতিকৃতি। বিশেষজ্ঞদের মতে এ লিপিগুলি খুব সম্ভবত প্রাচীন-যুগের কোন বণিকগোষ্ঠীর প্রচলিত চিহ্ন। এধরনের মুদ্রা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত, নিম্নবঙ্গের অন্যতম প্রত্নস্থল, হরিনারায়ণপুরেও পাওয়া গেছে। এছাড়া আটঘরার সন্নিকটে ফাঁদ রণাদায় মাটি কাটার সময়ে কিছুকাল পূর্বে কয়েকটি কুষাণযুগের দ্বিতীয় হুবিষ্কের আমলের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। ফাঁসিডাঙ্গা ঢিবিতে কিছুকাল আগে চাষের সময়ে মাটির গভীরে একটি আতস্কদ্র পাত্রের মধ্যে চার পাঁচটি মুদ্রা ও ছোট্ট পোড়ামাটির একটি শীলমোহর পাওয়া যায়। মুদ্রাগুলির মধ্যে গুপ্তযুগের একটি সুবর্ণ ধনুর্ধর মুদ্রা ছিল। মৃত্তিকার অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে খৃঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের ও পরবর্তীকালে গৌড়ীয় সুলতানদের কিছু কিছু মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

আটঘরায় প্রাপ্ত আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হল কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি শীল, শীলমোহর ও কিছু সংক্ষিপ্ত লিপি ফলক। ছোট একটি টেরাকোটা শীল খুবই মূল্যবান। শীলটিতে সুগঠিত দেহশালী ধনুর্ধর পুরুষের প্রতিকৃতি। মনে হয় রাজা বিজ্ঞপ্তক কার্যে শীলটি ব্যবহৃত হত। কয়েকটি শীলমোহরে দীর্ঘ লাঙ্গুলযুক্ত বানরের প্রতিকৃতি, হস্তিযূথের চিত্র, এক শৃঙ্গযুক্ত বিচিত্র জীবের মূর্তি। আরেক ধরনের শীলমোহরও খুবই মূল্যবান। মিথুনমূর্তিশোভিত পোড়ামাটির এ শীল-মোহরগুলি বিশেষজ্ঞদের মতে কামশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারেই উৎকীর্ণ। এ-ধরনের শীলমোহরের আরেকটি বৈচিত্র্য হল, শুধু নরনারীর মিলনদৃশ্যই নয়, পশু-পক্ষীর দু-একটি মিথুনমূর্তিযুক্ত শীলমোহরও পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালের নিম্ন গাঙ্গেয় উপ-ত্যকার অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনায় এগুলি মূল্যবান উপাদান। শীলমোহর ছাড়া কতগুলি সংক্ষিপ্ত লিপি আটঘরায় পাওয়া গেছে। এর ভিতর দু-একটি পরীক্ষা করে মনে হয় গালা-জাতীয় দ্রব্যের উপর ক্ষোদিত ব্রাহ্মী অক্ষর। আরও কয়েকটি পাঞ্জাজাতীয় গোলাকার-ত্রিকোণযুক্ত শীল-মোহর পাওয়া গেছে। কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি এই বস্তুগুলির একপৃষ্ঠে দু-এক পংক্তির সংক্ষিপ্ত লিপি আর অপর পৃষ্ঠে কত-গুলি সাংকেতিক চিহ্ন।

আটঘরার প্রাচীন সভ্যতার স্তরবিন্যাস যেন অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। সুঙ্গ-কুষাণ যুগের পরবর্তী ইতিহাসের সাক্ষ্যরূপে পাল সেন আমলের কিছু প্রস্তর-নিদর্শনও আটঘরায় পাওয়া গেছে। বেশ কয়েক বছর আগে চালধোয়া পুকুর সংস্কারকালে পাল-সেন আমলের কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে রয়েছে দুটি বিষ্ণু বিগ্রহ। একটির নিম্নাংশ ভগ্ন। অপরটি প্রায় অভগ্ন। তাছাড়া নিরামিষ পুকুরে দুটি মূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। দুটিই পালশিল্পশৈলীর নিদর্শন। একটি নবগ্রহ-ফলকের অংশ অপরটি সূর্যবিগ্রহের নিম্নাংশ। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেবের সারথী ও ধনুর্বাণ হস্তে উষা ও প্রত্যুষা বিদ্যমানা। পুরুষ মূর্তিসমূহের পদযুগল-সকল বুটজুতা পরিহিত। বাংলাদেশে এ-ধরনের সূর্যমূর্তি খুবই বিরল। এ-মূর্তিতে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এছাড়া কালো পাথরের ভগ্ন নৃসিংহ মূর্তি, গজলক্ষ্মীমূর্তি ও বাসুদেব মূর্তিও পাওয়া গেছে।

দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের কাজে যাতায়াত করে আটঘরার মাটি, জল, গাছপালা আর মানুষের প্রতি গড়ে উঠেছে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ। গ্রামবাংলার সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সংস্কৃতির অপূর্ব সম-ন্বয়ের রূপে মন মুগ্ধ হয়েছে। চৈত্রের কোন নিথর দুপুরে, চটাপাড়ের কোন চষা মাঠের ধারে আমবনের ছায়ে বা শ্রাবণের কোন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় সব্জীবাজারের কোন দোকানের দাওয়ায় পরিশ্রান্ত দেহে, তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ভিড় করেছে অজস্র হারিয়ে যাওয়া মানুষের মিছিল...হর্ম্য-শোভিত পরিখাবেষ্টিত নগর-দুর্গ-বন্দর... সপ্ত ডিঙ্গায় পাল তুলে ফিরে এ-বন্দর থেকে সওদাগর হীরা জহরৎ, সূক্ষ্ম রেশম কার্পাস মসলিন, দারুচিনি-এলাচ-লবঙ্গ, আতরের বেসাতি নিয়ে ছুটে চলেছে ঈজিয়াম ও ভূমধ্যসাগরের রোম, কার্থেজ, পারস্য ও মিশর দেশের বন্দরে বন্দরে...ও-দেশের বণিক ভিড় করেছে এ-বন্দরে তাদের সওদা ফিরি করতে। ...বিশাল কৃষ্ণজলদসম হস্তি-বাহিনী তড়িৎগতি বিহারিণী নৌবহর, ইতিহাসের ধারা বয়ে চলেছে মৌর্য সুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন...রাজাধিরাজ, পরমভট্টারক, আসমুদ্রহিমাচলাধিপতি, রাজ-চক্রবর্তী রাজন্যবর্গের কিরীটকুণ্ডলশোভিত মুখশ্রী...। সবই যেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে আবার ঝাপসা হয়ে মিশে যায়। শুধু পড়ে থাকে আদিকালের আটঘরা... গর্ভে তার অজস্র প্রত্নরত্ন...আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তার বোবা কান্না। জানি না কবে কোন রামচন্দ্র এসে মুক্তি দেবে এ-অহল্যার !

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু · সুহৃদ গোপাল দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মিস্টার নর্টন বলেছেন যে, সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দের নাম থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি এটার উপর আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছেন না, কারণ তিনি জানেন যে, 'বন্দেমাতরম্' মানেই অরবিন্দ এবং ঐ পত্রিকার অস্তিত্বই ষড়যন্ত্রের জন্যে। এখন ভালভাবে দেখা যাক যে, ঐ পত্রিকার মধ্যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক কিছু ছিল কি না: যা এমন কিছু ছিল কিনা, যা বোমা, ষড়যন্ত্র বা রাজদ্রোহিতার ইঙ্গিত দেয়? মহামান্য ধর্মাবতারের কাছে আমি ইতিমধ্যেই যা জানিয়েছি, তার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে, ঐ ধরণের কোনো ইঙ্গিত দূরের কথা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যগুলি মুক্তি-আদর্শের উদ্দীপক ছিল এবং অভীষ্ট লাভ করবার একটিই মাত্র পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেটি হোলো অসহযোগ আন্দোলন। যে আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা, স্বদেশী এবং (বিদেশী পণ্য) বর্জন নীতিই মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল। ঐগুলির প্রচারই ঐ পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল। এছাড়া স্বরাজ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা থাকতো। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি মাত্র নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া থাকতো— যা আমি এর আগে অনেকবার বলেছি। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যের মাধ্যমে গুপ্ত সমিতি গঠনের কোনো উপদেশ তো দেয়ইনি, উপরন্তু এই বিষয়ে কোনো প্রচেষ্টা পত্রিকার গোচরে আনা হলেই পত্রিকা সে-বিষয়ে প্রতিবাদ-মুখর হয়েছে। আমি কখনো বলিনি যে, বন্দেমাতরম্-এর আদর্শ 'পূর্ণ স্বরাজ' ছিল না। 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রতিষ্ঠাই পত্রিকার এক-ও-অদ্বিতীয় আদর্শ ছিল এবং এরা মধ্যপন্থা অবলম্বনে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভার সদস্যরূপে বা বড়লাট সাহেবের উপদেষ্টা সভায় সদস্যরূপে বিদেশী সরকারের শাসন কাজে সহায়তা করার ঘোর বিরোধিতা করতো। এ-কথা বারবার বলা হয়েছে ঐ পত্রিকা/প্রতিষ্ঠান সংস্কার (Reform) করবার পন্থাকে কোনো সময়েই অনুমোদন করেনি কিন্তু গঠন বা নতুনভাবে তৈরি করার পন্থাকে একান্তভাবেই চেয়েছিলো। বৈদেশিক শাসন-নীতিকে বাঁচিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা কোনো দিনই সম্ভব নয়—এই সারমর্মের ভিত্তিতেই লর্ড মর্লির পরিকল্পনা/নীতিকে 'বন্দেমাতরম' ধিক্কার দিয়েছিল, যেগুলি অভিযোগ তথ্য হিসাবে আপনার সামনে সরকারী অভিশংসক নিবেদন করেছেন। ঐ সারমর্মের বক্তব্যই 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সং উদ্দেশ্য ছিল। যদি ঐ সং উদ্দেশ্যের মধ্যে রাজদ্রোহিতার নাম গন্ধ থাকে তাহলে অরবিন্দকে রাজদ্রোহী বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। আমার যুক্তি দিয়ে আমি প্রমাণ করতে চাই যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করাই ঐ সংস্থার সভ্যদের মূল প্রচেষ্টা ছিল এবং বন্দেমাতরম পত্রিকাতে স্বাধীনতা অর্জন করবার পন্থাগুলি আলোচিত হতো —যেমন অসহযোগ আন্দোলন বর্জন-নীতি অনুসরণ, জাতীয়তাবাদের অনুগামী শিক্ষা এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। যেখানেই হিংসাত্মক কার্যকলাপের ইঙ্গিত আছে, সেখানেই মাননীয় ধর্মাবতার কোনো আক্রমণ প্রতিরোধ করার পরিচয় পাবেন। আমি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করে প্রমাণ করতে পারবো যে, 'বন্দমাতরম পত্রিকাটি ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল'—একথা সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে আমি ১৯০৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'দ্যাট সিনফুল ডিসায়ার' শীর্ষক আলোচনাটির উল্লেখ করবো। এই আলোচনাটিতে জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। আমার নিবেদন এই যে, ঐ আলোচনায় অপরাধমূলক কিছুই ছিল না, অবশ্য যদি না আলোচনার বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে ধরা হয়।

তারপর আরো দুটি আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি 'দি আইডিয়া অফ্ ন্যাশানাল কাউন্সিল' শীর্ষক —যেখানে গুপ্ত সমিতিগুলি সম্পর্কে বন্দেমাতরম পত্রিকার মনোভাব আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ১৯০৮ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে লিখিত 'গোল্ডেন বেঙ্গল স্কোয়াড' শীর্ষক (যে আলোচনাটির ভিত্তিতে পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীকে জেরা করা হয়েছিল)।

এখন ন্যাশানাল কাউন্সিল সম্পর্কে আমার কিছু বলার রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সম্পর্কেও নর্টন সাহেবের যুক্তি আমার বোধগম্য হয়নি। কারণ তাঁর মতে এই প্রতিষ্ঠানটিও রাজদ্রোহিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। আমি যতটা বুঝেছি, (অবশ্য মাননীয় ধর্মাবতারের কাছে স্বীকার করছি যে, আমার হয়তো ভুল হোতে পারে) আমার বন্ধুবরের বক্তব্য ছিল যে, অরবিন্দ ঐ ন্যাশানাল কাউন্সিলকে স্বীয় দুরভিসন্ধীমূলক পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করবার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। আমার অনুমান সত্য হলে অরবিন্দের সঙ্গে ঐ কাউন্সিলের সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আমি মহামান্য ধর্মাবতারকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকতে অনুরোধ করছি। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হয় তাহেল আমাদের আরো ভেবে নিতে হবে যে, ন্যাশানাল কাউন্সিল একটি নির্দোষ প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং প্রমাণ করতে হবে যে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি ষড়যন্ত্রের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।
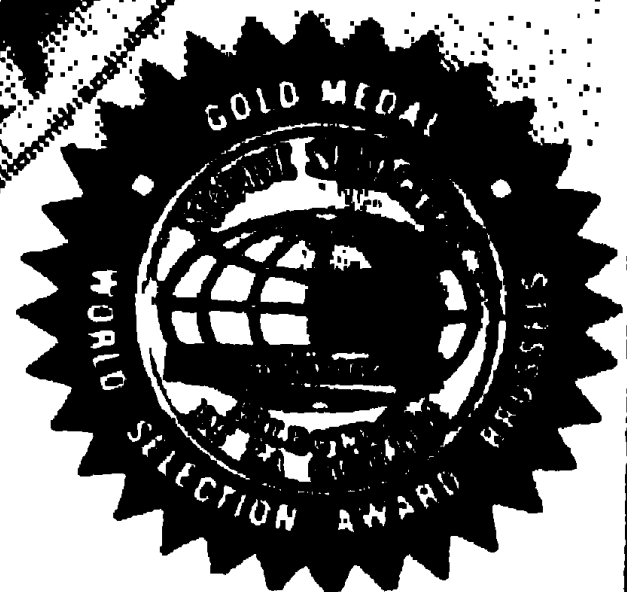
সেটি প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত, কেবল সম্পর্কটুকুর ভিত্তিতে অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি জানতে পারবেন যে, অরবিন্দ এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত হওয়ার আগেই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং একে পরিচালনা করবার দায়িত্ব নেবার জন্যেই অরবিন্দ বাংলাদেশে এসেছিল। সতীশচন্দ্র মুখার্জির সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, অরবিন্দ প্রতিষ্ঠানটিকে কখনই রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক এমন কোন দলের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছা পোষণ করে নি। যখন এই ন্যাশানাল কাউন্সিল সৃষ্টি হয় তখন আমরা এর সঙ্গে কাদের জড়িত দেখেছি? ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—যাঁদের কোন দিনই কেউ সংকীর্ণ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে না। এই থেকেই প্রমাণিত হয়—প্রতিষ্ঠানটির নীতির উপর অরবিন্দের কেবল কর্তৃত্ব ছিল না, অথবা থাকলেও প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনীতির দলীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত করবার কোন অভিসন্ধি তার ছিল না। বাঙালীরা ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখতে চেয়েছিলেন। আমি যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের চিন্তাধারা এই রকমই ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত কর্মপন্থার পুস্তিকাটি পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতির উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা কর্মকর্তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সব দিক বিবেচনা করে ন্যাশানাল কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ অরবিন্দকে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে অরবিন্দ যখন কলকাতায় এসেছিল, সেই সময়ে সে বরোদার মহারাজার অধীনস্থ কর্মচারী ছিল। ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করবার পর অরবিন্দ বরোদার চাকরীতে ইস্তফা দেয়। এই বিষয়টি আদালতে প্রদত্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জির সাক্ষ্যে স্বীকৃত হয়েছে। অরবিন্দের এই কলেজের পাঠ্যক্রম নির্বাচনেও কোন হাত ছিল না। আমার নিবেদন যে, অরবিন্দ এই মামলার অভিযোগ অনুযায়ী দোষী কি না সেই বিষয়ে ন্যাশানাল কলেজের ব্যাপারটি কোনভাবেই আলোকপাত করে না। আমি এ কথাও বলবো যে, যদিও ন্যাশানাল কলেজের ব্যাপারটি অরবিন্দকে আসামী হিসাবে প্রমাণ করতে সাহায্য করবে না—যা ইতিপূর্বেই আমি বলেছি—তবুও এই ব্যাপারটি অরবিন্দ ঘোষের ১৯০৫ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের লিখিত চিঠির বক্তব্যের অনুগামী বলা যেতে পারে। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত অরবিন্দ সম্পর্কে আমার এইটুকুই বলবার ছিল।

এর পর আমি ১৯০৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের গতিবিধি সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করবো। এই সময়টিতে অরবিন্দ অসুস্থ থাকায় বিশেষ কোনো কাজ করতে পারেনি। ১৯০৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অরবিন্দ দেওঘরে ছিল; তারপর ১৯০৭ সালের ২৭শে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আবার সে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে দেওঘরে থাকে। সুকুমার সেন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, অরবিন্দ দেওঘরে যাবার দিনে সন্ধ্যার সময়ে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দের নাম রাখার জন্যে তার অনুমতি চাওয়া হলে অনুমতি পাওয়া যায়নি এবং সেইমত পরের দিন থেকে পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দের নাম প্রকাশ করা বন্ধ রাখা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমি অন্যান্য যে তারিখগুলির উল্লেখ করেছি আদালতে সেই সম্পর্কে নথিভুক্ত কোনো প্রমাণ না থাকলেও অরবিন্দের লিখিত বিবৃতির ভিত্তিতে সেগুলি প্রমাণ করা যায়। অরবিন্দ সেই সময়ে অসুস্থ ছিল। এই জন্য অরবিন্দকে ন্যাশানাল কলেজ থেকে বহুবার ছুটি নিতে হয়েছিল। এই ব্যাপারটির উপর সতীশচন্দ্র মুখার্জিকে জেরা ক'রে জানতে পারা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দ অসুস্থতার জন্যই ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছিল। আরো বলা যায় যে, এই সময়ে 'শীলস্ লজে' কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেনি। 'শীলস্ লজের' ঘটনাটি ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে কোনো সময়ে ঘটেছিল।

নর্টন সাহেব বলেছেন যে, ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বন্দেমাতরম পত্রিকায় স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ, ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি জাতি-বিদ্বেষী ছিল; সেগুলির মধ্যে মানবপ্রেমের পরিবর্তে রাজদ্রোহী কার্যকলাপের অনুকূলে উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় ধর্মাবতারের কাছে আমার নিবেদন এই যে, ঐ সমস্ত আলোচনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বার পর আমি ঐ লেখার মধ্যে রাজদ্রোহিতার কোনো আভাস পাইনি। মিস্টার নর্টন কি বুঝেছিলেন জানি না, আমি যা বুঝেছি তা হোলো—পত্রিকার আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণ স্বরাজ চাওয়া হয়েছিল। অভিযোগ হিসাবে এই একটি বিষয়েই উল্লেখ করা যেতে পারে। আমি যা বুঝেছি তা হোলো—নর্টন সাহেবের মতে যে পদ্ধতিতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছিল সেই পদ্ধতিটি আইনানুগ নয়, এই কারণেই স্বরাজের আদর্শ নীতিগর্হিত হয়ে উঠেছিল। তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন এবং আমি বলবো—তিনি এটা বলতে চেয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ঠিকই করেছিলেন।

এই আলোচনাগুলি সম্পর্কে আমার আরজি—বন্দেমাতরম পত্রিকার বিরুদ্ধে ঐ আলোচনাগুলির ভিত্তিতে জাতি-বিদ্বেষের কোনো অভিযোগ করা চলে না। ঐগুলির মধ্যে দেশবাসীর কল্যাণ কামনাই করা হয়েছিল—এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। হয়তো লেখার মধ্যে জাতি-বিদ্বেষের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল—(তা থাকলেও সেটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না) কারণ, আলোচনার মধ্যে বিদেশীয় জাতি সম্পর্কে কোনো প্রশংসাসূচক মন্তব্য ছিল না। মহামান্য ধর্মাবতার যদি ঐ আলোচনাগুলি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন ঐ আলোচনার মধ্যে কোনো জাতিকেই হেয় প্রতিপন্ন করার কোনো ইঙ্গিত ছিল না কিন্তু জাতীয় সম্পদগুলির সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবার ইঙ্গিত ছিল। যে কথা আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ ভিন্ন জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে বৈদেশিক জাতির প্রতি কটাক্ষ ছিল, কারণ ঐগুলিতে ভারতীয়দের ইউরোপীয়-জাতিগুলির প্রতি মোহান্ধতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং উক্ত প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয়দের ইউরোপীয় জাতিগুলির প্রতি অন্ধ আকর্ষণ থেকে মুক্ত করা। ইউরোপীয় সভ্যতা যে খারাপ তা নয়, তবে উহা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দেরই উপযোগী। ইউরোপীয় জাতিগুলি তাদের পক্ষে উপযুক্ত পদ্ধতিতেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক—তারা স্বীয় ঐতিহ্যগুলির উপর নির্ভর করে মহীয়ান হয়ে উঠুক। অনুরূপভাবে ভারতীয়েরা সমৃদ্ধ হোক; তারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক। ইউরোপীয় সভ্যতা খারাপ—একথা সত্য নয়। আমি বিশেষভাবে আপনাকে নিবেদন করছি যে, উক্ত আলোচনাগুলির মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতাকে হেয় জ্ঞান করার কোনো ইঙ্গিত আপনি খুঁজে পাবেন না। কিন্তু আপনার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে যে, ভারতীয়দের পক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতাকে, তার ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। —এই সার মর্মটি উক্ত আলোচনাগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

ইউরোপীয় সভ্যতা-বৃক্ষটি ইংলণ্ডের মাটিতে বৃদ্ধি পেয়েছে; আপনি তাকে এদেশের মাটিতে রাখলে উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে তার বৃদ্ধি ব্যাহত হবে। ঠিক সেইরকম, কোনো জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে সেই জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর। বিদেশীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে কোনো জাতির সমৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। মানবতার প্রতি দ্বেষ বা অশ্রদ্ধা ঐ আলোচনাগুলিতে কোনো রকমেই প্রশ্রয় পায়নি। আমার সবিনয় নিবেদন, বন্দেমাতরম পত্রিকার একান্ত ইচ্ছাগুলি নর্টন সাহেবের বিচারে স্বীকৃতি পায়নি। (আমার মতে) এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মতে—মানবতা ব্যতিরেকে জাতীয়তাবাদের পরিকল্পনা অবাস্তব চিন্তা। আমি ঐ সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পড়বার অনুমতি প্রার্থনা করছি। প্রবন্ধগুলি রূপকাশ্রয়ী

হলেও এইগুলির মধ্যেই বন্দেমাতরম লেখক-গোষ্ঠীর মূল চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে।

এখন দেখা যাক, ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত (অর্থাৎ অরবিন্দ ঘোষের রাজদ্রোহের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া পর্যন্ত) সময়ে অরবিন্দের গতিবিধি কি ধরনের ছিল। এই সময়ে অরবিন্দ প্রধানত ন্যাশানাল কলেজ এবং বন্দেমাতরম পত্রিকার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতো। [এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের রাজদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর জাপান থেকে প্রেরিত একটি সহানুভূতিসূচক পত্রের কিয়দংশ পাঠ করেন। এ ছাড়া বন্দেমাতরম পত্রিকার ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত 'দি সিক্রেট অফ প্রুডেন্স এণ্ড মডারেসন' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধগুলিতে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছিল।...... 'প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি নিজস্ব পদ্ধতি থাকে। আমরা অসহযোগ আন্দোলনকে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের নিজস্ব পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করবো ইত্যাদি'] ...অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পড়ে, আমি মহামান্য ধর্মাবতারকে আর বিব্রত করতে চাই না; কারণ, বিষয়বস্তুগুলি প্রায় একরকমের—কংগ্রেসের বিষয়ে, স্বরাজের বিষয়ে, ইত্যাদি।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হোলো অরবিন্দের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণগুলিই সন্দেহজনক। মহামান্য ধর্মাবতার লক্ষ্য করবেন যে, অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির মধ্যে অস্বাভাবিকতা পুরোপুরি রয়েছে, সমগ্র ব্যাপারটি বুঝতে পারা খুবই শক্ত। আমার নিবেদন, ধর্মাবতারের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতেও সমগ্র ব্যাপারটি অস্বাভাবিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ মনে হবে। যখন ধর্মাবতারের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে যে, একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অভিযোগগুলি প্রমাণ করবার প্রচেষ্টা বহুবার করা হয়েছে, তখন এই অস্বাভাবিকতার নজিরগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নর্টন সাহেবকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, আপত্তিকর অংশগুলিকে তিনি চিহ্নিত করে রাখেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, ঐ অংশগুলি তিনি নীল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন কিন্তু দাগগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। আমার বিনীত নিবেদন, এই আলোচনাগুলিতে এমন কিছু ছিল না যা অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

এইবার ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়টি ধরা যাক। ধর্মাবতার, আপনি দেখুন—১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের শেষপর্যন্ত অরবিন্দ অসুস্থতার জন্য দেওঘরে ছিল। এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রমাণগুলির প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই, কারণ এগুলির গুরুত্ব কেবল এই প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে।

এখন শুনুন, কংগ্রেসের মধ্যে অরবিন্দের ভূমিকা সম্পর্কে মিস্টার পাল্কো কি লিখেছেন। পাল্কো অনেক চরমপন্থী প্রতিনিধিদের হিসাবে আমন্ত্রণ করেছিলেন। অরবিন্দ কংগ্রেস সম্মেলনে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দের মতে এই সম্মেলনকে জাতীয় সম্মেলন হিসারে অনুষ্ঠিত করতে গেলে যথার্থভাবে সমগ্র জাতির প্রতিনিধিদের সম্মিলিত করতে হবে।

মিস্টার বীচক্রফ্ট : জাতীয় কংগ্রেস সংস্থাটি কি এখনও বর্তমান? চরমপন্থীদের মতে—জাতীয় কংগ্রেসের এখন কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মধ্যপন্থীদের মতে—সংস্থাটি এখনও সক্রিয়। যেমন, একটি প্রবাদ আছে, 'ডুমা বিলুপ্ত। ডুমা দীর্ঘজীবী হোক্।'

[অতঃপর চিত্তরঞ্জন বন্দেমাতরম পত্রিকায় আলোচনার জন্য প্রেরিত সংবাদটির উপর সওয়াল করেন।]

মাননীয় ধর্মাবতার, মিস্টার বি, কে, দত্তের সাক্ষ্য থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, মিস্টার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও উক্ত সম্মেলনে বর্জন নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিছুদিন বাদে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয় যে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে সবকিছুই পড়ে। উগ্রপন্থীদের মতে এ-বিবৃতিটি বর্জন নীতির সমর্থকদের বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ ঘোষকে লিখিত মিস্টার তিলকের পত্রটিও উল্লেখযোগ্য। এই পত্রে অরবিন্দ ঘোষকে অধিক সংখ্যক চরমপন্থীদের সম্মেলনে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। মিস্টার তিলক এই জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে কংগ্রেসের সম্মেলনের পরে অন্য একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসকে বিনষ্ট করবার কোনো উদ্দেশ্য এদের ছিল না। এরা চেয়েছিল ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে নির্বাচিত করবার বিকল্পটি ভোটের সাহায্যে নিষ্পত্তি করবার। চরমপন্থীরা একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনে প্রয়াসী হয়েছিল। ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র সংস্থা আছে—লিবার‍্যাল পার্টি, কনজারভেটিভ পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ইত্যাদি। এই সব রাজনৈতিক দলগুলির মুখপাত্রদের বা প্রতিনিধিদের বক্তব্যগুলিই কংগ্রেসে উপস্থাপিত হয় এবং প্রয়োজনমত কংগ্রেসকে পথ চলার নির্দেশ দেয়। আমার বিনীত নিবেদন, জাতীয়তাবাদীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে কিছু প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সব প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসকে বিনষ্ট করবার জন্যে সম্মিলিত হয়নি। তারা কখনো বলেনি যে, 'যদি আমাদের মতবাদ গ্রহণ না করো, তাহলে তোমাদের মাথা ভেঙে দোব।' তাদের মনে বোমা সম্পর্কীয় কোনো মতলব ছিল না। আমি নর্টন সাহেবের মতো বলতে পারবো না যে, তাদের মনে বোমার পরিকল্পনা ছিল।

মিস্টার বীচক্রফ্ট : তারা কংগ্রেসের উপর জোর করে তাদের মতবাদ চাপাতে চেয়েছিল?

মিস্টার নর্টন : নিশ্চয়ই।

চিত্তরঞ্জন : প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তা বলছি। জাতীয়তাবাদীরা ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করতে চায়নি। তারা লালা লজপত রায়কে সভাপতি করতে চেয়েছিল। লালাজীর অনুপস্থিত থাকলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে তারা সভাপতি করত। বস্তুতঃ চরমপন্থীদের সঙ্গে মধ্যপন্থীদের আদর্শগত কোনো ভেদ ছিল না। মধ্যপন্থীরা ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং চরমপন্থীরা স্বয়ংনির্ভর পূর্ণ স্বরাজ চেয়েছিল।

মিস্টার নর্টন : মধ্যপন্থীরা একটি রাজ্যের অধীনে ঔপনিবেশিক সরকারের পত্তন করার আদর্শ গ্রহণ করেছিল।

চিত্তরঞ্জন : সুতরাং পার্থক্য কোথায়? উপনিবেশ-রাজ্যের উপর ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব কোথায়?

মিস্টার বীচক্রফ্‌ট : এটি সম্পূর্ণ নীতিগত ব্যাপার।

চিত্তরঞ্জন : ঠিক কথা। এটি আদর্শগত ব্যাপার নয়। আইনসভা বা ব্যবস্থাপক সভা তার মতবাদ জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। চরমপন্থীরা একটি সুচিন্তিত যুক্তির ভিত্তিতে তাদের আদর্শ উপস্থাপিত করতে চেয়েছিল। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা এই বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে বিবৃত করে। মধ্যপন্থীরা এবং চরমপন্থীরা একই কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু মধ্যপন্থীরা চরমপন্থীদের মতো স্পষ্ট বক্তা হতে পারেনি। মিস্টার তিলকের লেখা ঐ পত্রটিতে 'গভর্নমেণ্ট এক্‌সপ্রেসন' হিসাবে দুটি কথা ছাপা হয়েছে—এবং মনে হচ্ছে যেন তিলক সাহেব বলতে চেয়েছিলেন,

> 'if Dr Ghosh was rejected there would be 'Government Expression'.

মিস্টার বীচক্রফ্‌ট : মনে হয় কথাগুলি হবে 'Government Repression'.

মিস্টার বীচক্রফ্‌টের উক্তির পর চিত্তরঞ্জন মতিলাল ঘোষকে লেখা তিলকের পত্রটির উল্লেখ করে বলেন যে, এই পত্রটিতেও তিলক মতিলাল ঘোষকে ডক্‌টর রাসবিহারী ঘোষের বিরোধিতা করতে অনুরোধ জানান। কৌঁসুলি অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক চরমপন্থীদের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য আবেদনটির উল্লেখ করেন।

মাননীয় ধর্মাবতার কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে পরিকল্পনার কথা নিশ্চয় শুনেছেন। এই বিষয়টির উপরও চরমপন্থীদের যথেষ্ট মতবিরোধ ঘটেছিল। মিস্টার নর্টন বলেছেন যে, তিনি এই ব্যাপারটি সুরাটে জানতে পেরেছেন—এবিষয়ে বিতর্কের কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমি যা বুঝেছি তা হোলো—কংগ্রেসের মত ও পথের পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল—যার মধ্যে জাতীয় তহবিল, সালিশী-আদালত, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বরাজ এবং বর্জন-নীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিষয়গুলি, হয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অথবা জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসে আলোচিত হওয়ার জন্য উপস্থাপন করা হবে। আমাদের মামলার দিক থেকে এজলাসের আঙিনায় সালিশী পদ্ধতির উল্লেখটি খুবই ক্ষতিকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়, কারণ এই পদ্ধতির মধ্যে বোমা, ষড়যন্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছু ছিল না।

ঐ সময়ের আরও কয়েকটি চিঠিপত্র রয়েছে। আমি ঐগুলি আর পড়তে ইচ্ছুক নই। ঐ চিঠিগুলির প্রত্যেকটিই অরবিন্দের বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। এই সম্পর্ক অনস্বীকার্য। আমি যে চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করে অরবিন্দের দেওঘরে থাকা প্রমাণ করেছি, সেই চিঠিখানিতে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সংস্কার সম্বন্ধে লেখক তার মতগুলি ব্যক্ত করেছিল। লেখক বোম্বাই শহরের অধিবাসী। তার ধারণা ছিল যে, বন্দেমাতরমের উপর অরবিন্দের কিছুটা কর্তৃত্ব আছে, তাই সে অরবিন্দকে এই ব্যাপারে লিখেছিল। এই থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বন্দেমাতরম পত্রিকার উপর অরবিন্দের কিছুটা কর্তৃত্ব ছিল—আমি এই প্রসঙ্গে এবং এই মামলার সওয়াল করতে গিয়ে অন্যান্য কয়েকটি প্রসঙ্গেও তা স্বীকার করেছি।

অরবিন্দ যা-কিছু করে থাকুক, সে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকাকে ভালবাসতো বলেই করেছিল। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় যে-সব লেখা প্রকাশিত হোতো, সেগুলির প্রত্যেকটির জন্যে অরবিন্দকে দায়ী করা চলে না। কারণ, তার স্বাস্থ্য এবং সময় দুই-ই পত্রিকাটি তত্ত্বাবধান করার অনুকূলে ছিল না বা তা করার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। এই কারণেই অরবিন্দ পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। অরবিন্দ কোনো সময়েই পত্রিকার সম্পাদক পদ গ্রহণ করেনি। ইংরাজী সংবাদপত্র বা পত্রিকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাংবাদিকরা তাদের সংবাদগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সংবাদগুলি সম্পাদকের দায়িত্বে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে পত্রিকার সঙ্গে অরবিন্দ যুক্ত ছিল বটে, কিন্তু সম্পাদকীয় হিসাবে যা প্রকাশিত হোতো, সেগুলির দায়িত্ব তার ছিল না। আমি মহামান্য ধর্মাবতারকে সবকিছুই পড়তে অনুরোধ করছি না তবে এইটুকু বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি যে, ঐ লেখাগুলির মধ্যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যার ভিত্তিতে অরবিন্দের দায়িত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। মহামান্য ধর্মাবতার সমীপে নিবেদন করার মতো আরও কিছু লেখা আমার কাছে রয়েছে। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যা প্রকাশিত হয়েছে, সেটি নিবেদন করছি। আমার কাছে অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতবাদের উপর ৩।৪টি প্রবন্ধ রয়েছে। অরবিন্দ ১৯০৮ সালের ২রা মে ধৃত হয়। আমার কাছে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রকাশিত সব প্রবন্ধগুলিই রয়েছে। ঐসব প্রবন্ধগুলি আমি শুরু থেকে শেষ অবধি যা বলতে চেয়েছি তার অনুকূলে সাক্ষ্য দেবে।

আমি এতক্ষণ পর্যন্ত [illegible] ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য প্রমাণের উপর সওয়াল করেছি এবং এইবার আমি মহামান্য ধর্মাবতারের সমীপে মধ্যপন্থী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত (বিশেষ করে 'বেঙ্গলী' এবং 'ইন্দুপ্রকাশ') মতবাদের সঙ্গে এ্যাংলো - ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত (বিশেষ করে ;স্টেট্‌স্‌ম্যান' 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' 'পাইওনীয়র' এবং 'ইংলিশম্যান') মতবাদগুলির সাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করবো। যদিও সংবাদপত্রগুলির মতবাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবুও এই সব মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আমার এই অনুমান আক্রমণাত্মক নয়। এই সব মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও প্রতিটি সংবাদপত্রই স্বয়ংনির্ভরশীল এবং স্বতন্ত্র। ধর্মাবতারের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এই স্বাতন্ত্র্যভাবটি নিশ্চয় ধরা পড়বে। আপনি জানেন যে, 'বেঙ্গলী' এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' সংবাদপত্রদুটি মধ্যপন্থীর। আমি বুঝতে পারছি না, কেন নর্টন সাহেব এতদূর পর্যন্ত জল গড়িয়েছিলেন!

(ক্রমশঃ)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। চব্বিশ ।।

রূপপুর চটির বাসস্ট্যান্ডে সবে গাড়ি পৌঁছেছে, অমনি সন্ধ্যার আকাশ তোলপাড় করে ঝড়জল এসে গেল। চন্দন দৌড়ে সীতাংশুর চায়ের দোকানে এসে ঢুকল। যাত্রীরাও ছুটোছুটি করে কে কোথায় গিয়ে মাথা বাঁচাল। দেখতে দেখতে রূপপুরের সব রূপ এলোমেলো ভাঙচুর ছত্রখান। হাইওয়ে একেবারে নির্জন হয়ে গেছে। গাছপালা উথালপাতাল দুলছে। লাইট-পোস্টে ঢাকনা দেওয়া জ্বলন্ত বাতিগুলো কাঁপতে লেগেছে। আকাশ ঝলসে উঠছে, চিড় খাচ্ছে বারবার। কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে মেঘের আওয়াজ। মোটা ফোঁটায় ঘন বৃষ্টি ঝরছে উদ্দাম। সীতাংশু ঝুঁকে আকাশ দেখতে দেখতে বলল, মরশুমের প্রথম কালবোশেখী। কিন্তু খুব অসময়ে এসে পড়ল যে!

চন্দন ব্রজকে লক্ষ্য করছিল। বাসস্ট্যান্ডে বাসগুলো ভিজছে। একটা বাসের দরজা থেকে ঝুঁকে কে যুগের মামতো হেঁকে রসিকতা করল। স্টেশনওয়াগনের ভিতর চুপচাপ বসে ছিল ব্রজ—হঠাৎ গাড়িটা গড়াতে থাকল। চমকে উঠল চন্দন। মাথা খারাপ হয়েছে ব্রজর? এই দারুণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি রাখতে হাটুবাবুর গ্যারেজে চলল! চন্দন চেঁচিয়ে বারণ করবে ভাবল। কিন্তু ব্রজ আচমকা মোড় করে হাইওয়েতে গিয়ে পড়েছে।

আজ বিকেলে একবার মাতাল হয়েছিল ব্রজ। পুশুলিয়ায় নদীর চড়ায় শংকরের সঙ্গে সেই তাড়ির কলসীটা সাবাড় করে-ছিল। শেষ ট্রিপ যখন ছাড়ল, তখনও সে বেশ নেশাগ্রস্ত। চন্দনের ভয় হচ্ছিল, কোন অ্যাকসিডেন্ট না ঘটায়। ঘটেনি অবশ্য।

কিন্তু সারাপথ ব্রজ আজ কেমন গম্ভীর থেকেছে। যাত্রীদের সঙ্গে রসিকতা করেনি। টলতে টলতে এসে স্টিয়ারিং ধরেছিল, একবার মাত্র হেঁকেছিল—সোনাডাঙা প্রতাপপুর রূপপুর! ছেড়ে গেল!

চন্দন যায়নি ওদের তাড়ির আসরে। দূরে দূরে একা বালির চড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে সে। ভেবেছিল গৌরী আসবে—আসেনি। হয়তো আসবার সুযোগ পায়নি। মনটা সেই থেকে খারাপ হয়ে আছে। আজ এত দেখতে ইচ্ছে করছিল মেয়েটাকে! গৌরী যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে পুশুলিয়া থেকে।

হয়তো কাল আবার দেখা হবে। সন্ধ্যার নদীর নির্জন বুক ভরিয়ে দেবে আবার। বলবে, কাল আমাকে খুঁজেছিলে নাকি? মা আসতে দেয়নি। কী করব বলো! মা আজকাল সবসময় বড্ড চোখে চোখে রাখছে।......

আজ সারারাত চুপচাপ শুয়ে গৌরীর কথা ভাবতে ভালো লাগবে তার।

সীতাংশু বলে উঠল, আরে! ব্রজটা কি পাগল, না মাথা খারাপ!

চন্দন তেতো মুখে বলল, পাখা উঠেছে পিঁপড়েটার। কোন মানে হয়?

কে ঘরের ভিতর থেকে মন্তব্য করল, বেজোর মরণ নেই। কত ঝড়জল ঠেঙাল চিরটাকাল।

সেটা হয়তো ঠিক। পথে এই দুর্যোগ নামলেও নামতে পারত। তখন কী হত? এর পর হয়তো কতো ঝড়ের বিকেলসন্ধ্যা পথে কাটাতে হবে। কালবোশেখির দিন এসে গেল। তারপর একসময় বর্ষা আসবে। বর্ষার মধ্যে সবুজ গাড়িটা রূপপুর থেকে পুশুলিয়া যাবে, পুশুলিয়া থেকে রূপপুর আসবে। বিরামবিহীন আসা-যাওয়ার ছন্দে বাঁধা তার জীবন।

সীতাংশু বলল, চা খাবেন তো?

থাক্। ...চন্দন বৃষ্টি দেখতে দেখতে জবাব দিল। বড্ড ক্লান্তি লাগছে। ব্রজর বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে ভালো হত। কিন্তু সেখানে হাসি আছে। হাসি তাকে জ্বালাবে। হাসির কথা মনে পড়তেই মন আরও তেতো হয়ে গেল। কদিন থেকে হাসি বলছে, কী একটা গোপন খবর শোনাবে তাকে। কী হতে পারে সেটা? ক্রমশ অসহ্য লাগছে গায়েপড়া বেহায়া মেয়েটাকে। প্রথম প্রথম কোন মেয়ের ছেনালীপনা ভালো লাগে, তারপর অসহ্য হয়ে ওঠে। হয়তো এটাই শরীরের নিয়ম, মনের নিয়ম।

বরং রাধার ওখানে যাবে। ঝড়বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে! সে কালো আকাশ দেখতে একটু ঝুঁকল, সেই সময় সীতাংশু বলল, আরে কী কাণ্ড দেখছেন! ভুলে গিয়েছিলুম একেবারে।

চন্দন তাকাল।

দাঁড়ান। খুঁজে পাচ্ছিনে যে!...... সীতাংশু টেবিলের কাগজপত্র হাতড়াচ্ছে ব্যস্তভাবে। ...মলো ছাই! এখানেই যে রেখেছিলুম, গেল কোথায়?

চন্দন নিস্পৃহভাবে বলল, কী?

চিঠি। বা বাবা! এই বাঁদরগুলোর জ্বালায় কিচ্ছু ঠিক থাকবার যো নেই। দেখছ কাণ্ড?

চন্দন কৌতূহলী হল। ...চিঠি? কার চিঠি?

চোখ নাচাল সীতাংশু। ...আপনারই। বিকেলে দিয়ে গেল একটা ছোকরা। এই যে, [illegible]।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল চন্দন। শাদা মুখআঁটা খামে ভরা পাতলা চিঠি। ওপরে তার নামটা ইংরিজিতে লেখা। অক্ষরগুলো স্পষ্ট। কিন্তু কার হাতের লেখা চিনতে পারল না। তার গা ঘেঁষে অনেক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ-কেউ লক্ষ্য করছে। থাক্, পরে খুলবে। সে চিঠিটা হাতের মুঠোয় গুটিয়ে রেখে সিগ্রেট ধরাল। কিন্তু একটু পরেই টের পেল, এই কাগজের টুকরোটা তাকে খুব ভিতর থেকে উত্যক্ত করছে। কার চিঠি? কে লিখেছে তাকে—কী লিখেছে? যে দিয়ে গেছে, তাকে সীতাংশু চেনে কি না জানতে অস্বস্তি হচ্ছে। তখন সে সাবধানে খামটা ছিঁড়ল। ভাঁজ খুলে ভিতরের ধূসর রঙের লাইনটানা কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল। অমনি সারা শরীর কাঁপিয়ে বাইরের ঝরবৃষ্টিটা ভিতরে ঢুকে পড়ল যেন। রুমা তাকে চিঠি লিখেছে! প্রথম লাইনের প্রতিটি অক্ষর ধীরে পেরিয়ে যেতে যেতে সেই সময় আচমকা সব আলো নিভে গেল। রূপপুর চটি পলকে ডুবে গেল বিশাল অন্ধকারের তলায়। ঝড়ের শব্দ বৃষ্টির শব্দ, লোকজনের অস্ফুট চিৎকার, সীতাংশুবাবুর গর্জন—মোমবাতি কই, মোমবাতি! ......এবং চিঠিটা চন্দনের হাতে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

মোমবাতি জ্বলে ওঠার আগেই সে এক লাফে বাইরে চলে এসেছে। তারপর দৌড়তে শুরু করেছে। অন্ধকার, এখন এত অন্ধকার! হাতের মুঠোয় চিঠিটা ভিজছে টের পেতেই সে প্যান্টের পকেটে গুঁজে রাখল। ...প্রথম লাইনটা কী ছিল যেন? আর মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। একটা নির্জন বাতি চাই এই অন্ধকারে। একটুখানি আলো দরকার। একান্তে, গোপনে, একলা—একটুকু আলো!...

ঝড় কমেছে ততক্ষণে। বৃষ্টি বেড়েছে। সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে। এই আকাশ-চোয়ানো ধারা অনেক সুখ অথবা অনেক দুঃখের মতো মনে হয়।

কিন্তু কোথায় চলেছে সে? কেন বেরিয়ে পড়েছে? থমকে দাঁড়াল পথে।...... প্রথম লাইনটা কী ছিল যেন? ...আমি তোমাকে অনেক...অনেক কী? দুঃখ? অপমান? কী রুমা, কী করেছ তুমি? না—তুমি কিছুই করনি রুমা। সব দোষ আমার।

চোখ ছাপিয়ে জল এল এতক্ষনে। এই উদ্দাম অন্ধকারে রূপপুর-পুশুলিয়া রুটের 'ভ্যানগাড়ির' ছোটবাবু বৃষ্টির জলে চোখের জল মেশাচ্ছে, কেউ দেখতে পেল না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার পা বাড়াল সে। চেনা যাচ্ছে না কোনটা কী, কোথায় রাধার হোটেল, কতদূরে রুমাদের পেট্রোল পাম্প কোথায় পাণ্ডেজীর গদী, কিংবা ব্রজ ড্রাইভারের বাসায় যাবার পথ। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। ব্রজর মতোই এখন সে রাস্তার মানুষ হয়ে উঠেছে। অনন্ত বৃষ্টির মধ্যে অন্তহীন সময় ধরে অশেষ পথের ওপর টলতে টলতে সে আজীবন আমৃত্যু হেঁটে যেতে পারলে হয়তো তার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যেতে পারে।

মনে মনে প্রার্থনার মতো সে উচ্চারণ করল : আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! আকাশের এপার-ওপার চকিতে ছুটে গেল তীব্র আলোর চাবুক। ভয়ঙ্কর শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। বিশাল সব ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকল কারা। গুমগুম শব্দে অন্ধকার ভরে গেল। ...আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! ...টলতে টলতে এগোল সে। সারা শরীর বেয়ে অশ্রুপাতের মতো বৃষ্টি গড়াতে থাকল। সব পাপ ধুয়ে যায় না কি এমনি করে? সব দুঃখ নেমে যায় না পায়ের তলায়?

কে? ...একঝলক বিদ্যুতের আলো—তারপর কে যেতে যেতে চেঁচিয়ে উঠেছে।

চন্দন দাঁড়াল।

ছোটবাবু না? ...দৌড়ে এসেছে ব্রজ ড্রাইভার। ...ছোটবাবু, স্যার!

ব্রজ?

হ্যাঁ, স্যার। এমন করে অন্ধকারে ভিজতে ভিজতে কোথায় যাচ্ছেন?

তুমি এমন করে অন্ধকারে ভিজতে ভিজতে কোথায় যাচ্ছ, ব্রজদা?

হাসল ব্রজ। ...আমার ভালো লাগল, স্যার। অনেক গরম গেছে আজ সারাটা দিন—তাই ভিজতে ইচ্ছে হল।

আমারও তাই ব্রজদা।

কিন্তু ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়?

চন্দন কেমন হাসল। ...কে জানে! কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, এত অন্ধকার!

বাসায় চলে যান শিগগির। অভ্যেস নেই, জ্বরটর হয়ে যাবে। আসুন, আপনাকে পেঁছে দিয়ে আসি। আমি শালার কথা ছেড়ে দিন! আজ সারারাত টোটো করে ঘুরব।

ব্রজর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো সে টলছেও। কিন্ত সুস্থ মানুষের মতো কথা বলছে সে। এটা সে পারে। চন্দন বলল, আমারও আজ ঘুরতে ইচ্ছে করছে।

না স্যার, না। আসুন। আমি পেঁছে দিচ্ছি! হাসি বেচারা একলা আছে। চন্দন ফুঁসে উঠল। ...তোমার হাসি একলা থাকলে আমার কী?

ব্রজ হো হো করে হেসে উঠল। ...না কিছু না। হাসি আমার বউ। কই, আসুন!

চন্দন গম্ভীর স্বরে বলল, তোমার বাসায় আমি যাব না, ব্রজদা।

কী মুশকিল! তাই, বলে এমনি করে ভিজবেন? তাহলে বরং রাধার ওখানে চলুন। রাধা খুব খুশি হবে। আমার নেশাটাও চটে গেছে বিষ্টিতে—চাঙ্গা করে নেব। ইচ্ছে করলে আপনিও...

মদ আর আমি খাবো না।

খাবেন না? বাঃ, সে তো ভালই। কই, আসুন!

চন্দন অন্ধকার বৃষ্টিমুখর রূপপুরকে দেখছিল। পাণ্ডেজী যখন এখানে এসেছিলেন, তখন রূপপুর চটির রূপ ঝড়-বৃষ্টির রাতে হয়তো অবিকল এমনি ছিল। জনমানুষহীন গভীর অন্ধকার। শুধু বৃষ্টির শব্দ। ঝড়ের শব্দ। পাণ্ডেজী কি এখন তাঁর দোতালার ঘরে বসে এরূপ দেখছেন? তাঁর 'বহু রূপকুমারী' আবার আদিম হয়ে উঠেছে! সেইসব রাতে কি এমনি করে কেউ তীব্র অন্তর্জ্বালায়, বিমূঢ় আবেগে, আশা-হতাশায় তোলপাড় হতে হতে পথে বেরিয়ে পড়ত? চোখের জলের সঙ্গে বৃষ্টির জল মিশে ঝরে পড়ত পথের বুকে!

ব্রজ হাত ধরে টানল। বলল, আপনার কষ্ট হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, আমি বুঝি—আমি আনএজুকেটেড মানুষ হলেও বুঝতে পারি। কিন্তু মনের ঘা খোঁচালেই জ্বালা বাড়ে।

চন্দন ওর টানে পা বাড়াল। কী বলতে চায় এই লোকটা! একটা নির্বোধ মাতাল ভাঁড়! ...বৃষ্টির ফোঁটা আর গায়ে বেঁধে না। সারা শরীর ভিজে অবশ হয়ে গেছে। ব্রজ অনর্গল কী বলে চলেছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে—কিছু অস্পষ্ট। গলার ভিতর থেকে কথা আসছে ব্রজর। চন্দন কান করছে না আর।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্রজ বলল দুঃচ্ছাই! রাধার ঘরটা কই? কোথায় এ[illegible] উঁহু—ঠিক আছে। ওই তো! [illegible]ন, রাধার সামনে আজ আপনাকে একটা খুশির খবর দেব।

●

রাধা সত্যি সত্যি খুশি হয়েছে। বলল, এইসব সময় খুব ভয়ে-ভয়ে থাকি, ছোটবাবু। এই সময়টাতে যত চোরডাকাতগুণ্ডা এসে হামলা করে কি না!

ব্রজ বলল, তোমার ঘরে টর্চ নেই রাধা?

আছে। আবার কোথায় মরতে বেরোবি বেজো? কেমন মেঘ ডাকছে, শুনছিস? এলি, বোস্। ভালো জিনিস আছে—এনে দিচ্ছি। মৌজ করে খা। কী বলেন ছোটবাবু?

ব্রজ বলল, ছোটবাবু ভিজে গেছেন দেখছিস না, ছুঁড়ি?

এ্যাই বেজো, আকথা কুকথা কইবিনে—খবর্দার। ...রাধা কপট রাগ দেখাল। ...আমাকে ছুঁড়ি বলছিস, আমি কি ছুঁড়ি রে মুখপোড়া? ছুঁড়ি তোর ঘরে আছে, দ্যাখগে।

চন্দন বলল রাধা, দাও না ওকে টর্চ। আমার জামাকাপড় এনে দিক।

রাধা যেন এতক্ষণে চন্দনের পোশাক দেখল। ...অই মা! এ যে সোয়ামীর জামা একেবারে! আসলে হয়েছে কী জানেন তো? এত কম আলোয় আর চোখে দেখতেই পাইনে। ছিঃ। অ সন্ধে, সন্ধেমণি! খাটে বালিশের কাছে হ্যারিকেনটা বাতি আছে, এনে দে তো মা। আর শোন, আলনায় নতুন তোয়ালে রয়েছে, নিয়ে আয়। সেই সকালে খুলেছি যেখানা—বুঝলি তো? ছোটবাবুকে মুখ মুছতে দিয়েছিলুম।

ভিতর থেকে সন্ধ্যার জবাব এল, বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। গলা ফাটিও না।

রাধা হাসল।...এ ছুঁড়ির তেজ হয়েছে রে বেজো। শুনলি, গলার টানখানা?

ব্রজ চোঁ চোঁ করে সিগ্রেট টানছিল—মেঝের দিকে মুখ। বলল, রাধা, আজ তোদের একটা খুশির খবর শোনাব। বুঝে আসি। তারপর।

রাধা ভ্রু কুঁচকে বলল, তোর আবার খুশির খবর কীসে জিনলে? রাগ ছিরোরে নাকি?

ব্রজ মুখ তুলল। সারা মুখে হাসি। ভিজে গোঁফদাড়ি থরথর করে কাঁপছে। শুধু বলল, মাইরি!

এ্যাঁ! রাধা কপালে চোখ তুলল।...সত্যি বলছিস?

তোমার দিব্যি।...ব্রজ খিকখিক করে হাসতে লাগল।

যাঃ!

ব্রজ চটে গিয়ে বলল, কেন? আমার বুঝি ছেলেপুলে হতে নেই? রাজ্যের লোকের ছেলেপুলে হচ্ছে—আর আমার হবে না? শুনুন স্যার, হোটেলওয়ালির কথাটা একবার শুনুন।

সন্ধ্যা এসে তোয়ালে আর টর্চ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ব্রজর কথা শুনছিল। রাধা তাকে ধমক দিয়ে বলল, আ মর! তুই আবার হাঁ করে কী গিলছিস? গুয়ের ডিম ভাঙেনি এখনও—তোর সবতাতে কান কেন রে?

ব্রজ বলল, বারে! শুনবে না কেন? আলবাৎ শুনবে। রূপপুর থেকে পুশপুলে সব্বাই শুনবে। ব্রজগোপাল ড্রাইভারের ছেলে হবে!

রাধা হেসে গড়িয়ে পড়ল।...মিনসের মুখের রাখঢাক নেই! তা হ্যাঁ রে বাঁদর, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তা জানলি কেমন করে?

আমার মন বলছে রাধা, ছেলেই হবে। না হয়ে পারে? উ রে ব্বাস! নিজের হাতে ছেলেকে ড্রাইভিং শেখাব—গাড়ি চলবে যেন তুফান মেল! কী বলেন স্যার?...বলেই সে টর্চটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চন্দন কাঠ হয়ে বসে ওর কথা শুনছিল। রাধা সন্ধ্যাকে ঠেলে দাওয়ার ভিতরে পাঠিয়ে দিল। তারপর ফিসফিস করে বলল, মদে-ভাঙেতে লোকটার মাথা এবার যেতে বসেছে ছোটবাবু। কী বলে গেল শুনলেন?

চন্দন খুব আস্তে—অন্যমনস্কভাবে বলল, কেন রাধা? ব্রজ তো পুরুষমানুষ—ঘরে বউ রয়েছে। তা...

রাধা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিকৃতমুখে চাপা গলায় বলল, পুরুষ! আপনাকে বলতে আমার লজ্জা কিসের ছোটবাবু? ব্রজর শরীলে দোষ আছে—বউর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়, ওইটুকুনই। ব্যস! ছেলে হবে বললেই হল? যদি হয়, জানবেন—অন্য কারো সঙ্গে ওর বউটা নষ্ট হয়েছে। এ হতেই পারে না কক্ষনো।......এই যে, তোয়ালে নিন, বাবু।

চন্দন মুখ ফিরিয়ে বাইরে অন্ধকার দেখতে থাকল। একটু পরে সে বলল, তুমি কেমন করে জানলে রাধা?

রাধা মুখ ফেরাল—যেন লজ্জা পেল। বলল, জানি বইকি। আমি অনেকের অনেক কথা জানি, ছোটবাবু।

ব্রজর সঙ্গে তোমার কোনদিন কিছু ভাব ছিল রাধা?

ভেবেছিল রাধা চটে যাবে। রাধা কিন্তু চটল না। খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, আজ আপনাকে কেমন-কেমন লাগছে কেন গো ছোটবাবু?

কেমন লাগছে?

মনমরা। কী হয়েছে? শরীল খারাপ?

চন্দন শুকনো হেসে বলল, হ্যাঁ—মা ব্যথা। ভিজলুম কতক্ষণ।

সন্ধ্যাকে বলব, টিপে দেবে বরং। এখানেই শোবেন তো?

দেখি।...একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল চন্দন, আজ কিছু ঠিক নেই, রাধা।

রাধা একটু দাঁড়িয়ে ভিতরে চলে গেল। হেরিকেনটা তুলে কাছে আনল চন্দন। পকেট থেকে চিঠিটা বের করল এবার। ভিজে গেছে অনেকটা। কালির হরফ ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। ...আমি তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি... মুখ তুলল চন্দন। কে কাকে দুঃখ দিয়েছে? সব গুলিয়ে যাচ্ছে—অর্থহীন, এই অন্ধকারের মতো একাকার। চিঠিটা দলা পাকাতে থাকল সে। তারপর ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে আসা পোকাগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে। হেরিকেনটা দূরে খাবার টেবিলে রেখে এল। তারপর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল। ব্রজগোপাল ড্রাইভার এইমাত্র ধ্যাবড়া হাতে বড় বড় হরফে লিখে দিয়েছে: আমার ছেলে হবে। তার মানে, তার বউ খালি মা হতে চলেছে। হাসি কেন চন্দনকে একথা বলেনি? নাকি লজ্জা পেয়েছে বলতে? নাকি বলার অপেক্ষায় থাকবে আজ রাতে? ...হ্যাঁ, হাসি একটা খবর শোনাবে বলেছিল। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আবার। কিছুই স্পষ্ট নয়। রাধা বলল, ব্রজ পুরুষহীন। রাধা জানে। রাধার এসব জানাশোনা জানার কথা। সে অনেক পুরুষের পাশে শুয়েছে। ব্রজর পাশেও শুয়েছে কতবার। তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্রজর পুরুষত্ব নেই। ছেলেপুলের বাবা হতে সে পারে না। তাহলে হাসির পেটে যে বাচ্চাটা এসেছে, তার বাবা কে? ...বুক দুমড়ে মুচড়ে কেঁপে উঠল চন্দনের। প্রচণ্ড জ্বরে তার শরীর অবশ হয়ে পড়ল।

ছোটবাবু!

কে?

এই যে! হনুমানের গন্ধমাদন তুলে আনার মতো করে ফেলেছি স্যার। আপনার স্যুটকেশসুদ্ধ এনে দিলুম। চাবি নেই—কী করব বলুন?...ব্রজ হাসতে লাগল।...ব্রজ হাসি ক্ষেপে গেছে একেবারে। ভাবছি, কখন এসে না হানা দেয় রাধার আখড়ায়! কোথায় আছেন বলিনি অবশ্য।

কেন ব্রজদা? হাসি ক্ষেপল কেন?... নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করল চন্দন।

ক্ষেপবে না? বাসায় না ফিরে বাইরে-বাইরে কাটাচ্ছেন! রান্নাটান্না জুড়োচ্ছে ওদিকে।

তোমার বাসায় আর যাব না ব্রজদা।

ব্রজ যেন চমকে উঠল।...কেন স্যার, কেন?

বৃষ্টি ছেড়েছে বাইরে?

হ্যাঁ। তবে এখনও চাঁদ ওঠেনি। ভীষণ অন্ধকার।

আমি বেরোব, ব্রজদা।

এ্যাঁ! বেরোবেন? কোথায় যাবেন আবার?

জিয়াগঞ্জ চলে যাব। চলো, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ব্রজ ধুপ করে পাশে বসে পড়ল। ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটু কেসে গলা

চেয়ে বলল, কেন স্যার? কী দোষ করেছি আমি?

তুমি কোন দোষ করনি ব্রজদা। আমার ...আমার আর সইছে না। ক্লান্তি লাগছে। প্রতিদিন ওই একই রাস্তায় দুবেলা যাওয়া আর আসা, আসা আর যাওয়া,......আমার হাঁফ ধরে গেছে।...চন্দন ভাঙা গলায় বলতে থাকল। তাছাড়া, ঠিক এসব আমার পোষায় না। আস্তে আস্তে আমার ভিতরটা কালো হয়ে যাচ্ছে। একটু করে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি। আমার খুব ভয় হচ্ছে ব্রজদা...ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু বলো, আমাকে কি এসব মানায়—আমি তো পরেশদা নই।......

ব্রজ যেন মন দিয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিল। কোন জবাব দিল না। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে থাকল।

রাধা এল।......চলুন ওঘরে জায়গা করেছি।

চন্দন বলল, ওঘরে যাব না রাধা। আমি জিয়াগঞ্জ ফিরে যাচ্ছি।

রাধা চমকে উঠে বলল, সে কী! কী হল হঠাৎ? খারাপ খবরটবর এল নাকি? ও বেজো, কী খবর আনলি রে?

ব্রজ মুখ তুলল। তার দুচোখে জল ছল-ছল করছে।...রাধা ছোটবাবু আর থাকতে চাইছে না রে। তবে হাঁ, এ আমি জানতুম, বুঝলি রে? ঠিক জানতুম।

চন্দন বলল, তোমার ভাবনা নেই ব্রজদা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই তুমি গাড়ি নিয়ে চলে আসবে। গাড়ি তোমার জিম্মাতেই রইল। যেমন চলছিল, চলবে। ওঠ—আর দেরী করো না।

রাধা মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী জানি বাবা, কিছুই বুঝতে পারলুম না! হঠাৎ সব এমন করে এলই বা কেন, চলেই বা যাচ্ছে কেন! ও সন্ধে, তেলের কড়াই নামা মা—আর ভাজতে হবে না। ভাবলুম, বিষ্টি-বাদলার দিন, মৌজ করবে—তেলেভাজার চাট করে দিই। আমার কপাল।

চন্দন তাড়াতাড়ি রাধার সামনেই জামা-কাপড় বদলে নিল। ওরা দুজনে হাঁ করে তাকিয়ে আছে—মুখে কোন কথা নেই। তার-পর চন্দন ডাকল, এস ব্রজদা।

ব্রজ নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করল। রাধার টর্চটা তার হাতে রয়েছে। সামনে এগিয়ে সেটা জ্বালতেই চন্দন বলল, থাক্। চোখ জ্বালা করছে। অন্ধকারই ভালো।

বৃষ্টিধোওয়া আকাশে নক্ষত্র ঝকমক করছে। তখনও কোথাও কোন আলো নেই। হয়তো ঝড়ে মেইন লাইনের তার ছিঁড়ে গেছে কোথাও। দিনের আলো না ফুটলে কিছু করা যাবে না। হাটুবাবুর গ্যারেজ থেকে অনেক চেঁচামেচি করে গাড়ি বের করল ব্রজ। সবাই ঘুমোচ্ছিল। এ রাতে ব্রজ ছাড়া আর কে জ্বালাতন করতে পারে।

তারপর অন্ধকার হাইওয়েতে ছুটে চলেছে সবুজ স্টেশনওয়াগন। ব্রজ মাঝে মাঝে আড়চোখে ছোটবাবুকে দেখে নিচ্ছে। তীব্র হেডলাইটের ছটায় দুধারে সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে গাছের ছায়াগুলো। ক্বচিৎ শেয়ালের জ্বলন্ত নীল চোখ নেমে যাচ্ছে মাঠের দিকে। চন্দন ডাকল, ব্রজদা!

বলুন, স্যার।

গাড়িটা তোমার নামে লিখে দেব, ভাবছি।

ব্রজ ভাঙা গলায় বলল, কেন? বেশ তো আছে। আর—আমার তো পয়সাকড়ি কিছু নেই—আমি একটা ভিখিরি মানুষ, স্যার।

চন্দন একটু হাসল।...পয়সাকড়ি লাগবে না।

গাড়ি আমি চাই। কিন্তু তার মালিক হওয়া আমার সইবে না স্যার, আমাকে ক্ষমা করবেন।...ব্রজ একটু ইতস্তত করে আবার বলল, লোকে পাঁচকথা বলবে। এখনই তো বলতে শুরু করেছে—তো আমাকে এমনি-এমনি গাড়ি দিয়েছেন শুনলে রক্ষে নেই।

কী বলছে লোকে?...চন্দন সোজা হয়ে বসল। তীক্ষ্ম দৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকাল।

না বোঝবার মতো মূর্খ আপনি নন।

ব্রজদা!...অস্পষ্ট চেঁচিয়ে উঠে চন্দন থেমে গেল।

হ্যাঁ—সবাই বলাবলি করে আজকাল। আমার কানে আসে। চুপ করে থাকি—কী বলব? আমার নিজের মুখটাই যে বাঁধা।... একটু চুপ করে থেকে আবার বলল ব্রজ, হাসির পেটে বাচ্চা এসেছে। এবার তো সবাই আরও বলবে। বলুক, কিন্তু সইব। হাসির ওপর কোন জুলুমও করতে পারবো না সেজন্যে। ও বেজাতের সঙ্গে জাতঘর সব ছেড়েছিল একদিন। আমি শুধু এজন্যেই ওকে বরাবর ক্ষমা করে আসছি স্যার, বুঝলেন? শুধু এজন্যেই। নয়তো...থাক। তখন বলছিলুম না, মনের ঘায়ে খোঁচাতে নেই! জ্বালা বাড়িয়ে লাভ কী বলুন?... সে অস্পষ্টভাবে হাসল। তারপর ক্যাঁচ করে নাক ঝাড়ল।

ব্রজদা, তুমি আমাকে সন্দেহ করো—তাই না?

আপনি উঁচু গাছ—কী আসে যায় তাতে আপনার? ব্রজর মতো একটা অধম বাগদী-সন্তান কী সন্দেহ করল, না-করল, তাতে আপনার গায়ে কালির ছিটে লাগবে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।...ব্রজ হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দিল গাড়ীর। থরথর করে কাঁপতে থাকল গাড়িটা।

একটু স্পীড কমাও। রাস্তা ভিজে—স্লিপ করতে পারে।

ভয় পাবেন না। মনে কোন মন্দ ইচ্ছে নেই।...ব্রজ হাসতে লাগল।...আমি শালা ছোটলোক মানুষ—কত বিষ হজম করে দিব্যি বেঁচে থাকতে জানি। ভয় নেই—ঠিকই পৌঁছে দেব।

চন্দন রুক্ষভাবে বলল, ব্রজদা, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমি ভয় পাই নি।

পেয়েছেন, স্যার।

কেন অমন শাবো, শাহীন?

ব্রজ সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, মনকে শুধোন। কিন্তু ব্রজগোপাল ঠিক আছে। তার হাত স্টিয়ারিং হুইলে কাঁপে না।...

একটু পরে চন্দন ডাকল, ব্রজদা!

উঁ?

চন্দন পরক্ষণে চমকে উঠল।...এ কী! তুমি কাঁদছ ব্রজদা?

উঁহু।

না—তুমি কাঁদছ!

এ আমার সুখের কান্না স্যার—হাসির ছেলে হবে! হাসির বড় সাধ ছিল, সে মা হবে—ভগবানের আশীর্বাদে তাই হতে চলেছে সে। এ যে কত আনন্দ, বোঝাব কেমন করে? আমি আনএজুকেটেড ম্যান—আমি ভাল করে কথা বলতে জানি নে। কিন্তু ভগবান প্রত্যেক মানুষকে সমানভাবে ভাগ করে মমতাটা তো দিয়েছেন! হাসির জন্যে—তার পেটের বাচ্চাটার জন্যে আমার মমতার শেষ নেই।

চন্দন তার কাঁধে হাত রাখল।...ব্রজদা, তোমার মতো মানুষ আমি কখনও দেখিনি। তুমি অনেক বড়ো—তুমি অনেক...

সরে বসুন স্যার। এ সব শুনলে সত্যি আমার হাত কাঁপে। মাথা গোলমাল হয়ে যায়। আমি সামান্য ড্রাইভার—বাগদীর ছেলে!

ব্রজদা, তোমাকে আজ লুকোব না। চুরি করা টাকায় আমি এ গাড়িটা কিনিনি। লোকে যাই বলুক, পরেশদা টাকাগুলো আমার জন্যেই রেখে গিয়েছিল—সে আমি বেশ বুঝেছি। তা না হলে সে সেগুলো রুক্মার কাছেই রেখে দিত। তাই বলছি, তুমি ভয় পেয়ো না। গাড়িটা নিলে তোমার কোন পাপ হবে না।

ব্রজ কেমন হাসল।...টাকার গায়ে পাপ-পুণ্য লেখা থাকে না স্যার। টাকায় পাপ-পুণ্য কিসের?

তবে নেবে না কেন গাড়ি? লোকের কথায় তো তুমি কান দাও না ব্রজদা! তুমি তো কাকেও গ্রাহ্য করো না!

ব্রজ গোঁফে তা দিয়ে বলল, হ্যাঁ, করিনে বটে।

চন্দন একটু ঝুঁকে এসে বলল, আমি তোমাকে বিক্রিকবলা করে দেব, ব্রজদা।

ব্রজ আপনমনে ফিক ফিক করে হাসল। তারপর বলল, ও কথা শুনলে আমার আত্মা কষ্ট পাবে। ছেড়ে দিন!

চন্দন চুপ করে থাকল। এই ব্রজ ড্রাইভারের একটা আত্মা আছে—যেন চন্দনের নেই। চন্দনের আত্মা যেন কষ্ট পায় না।

দূরে দিগন্তে কিছু আলোর আভাস। এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে। দুপাশে বিস্তৃত মাঠের ওপর রাতের রং বদলাতে শুরু করেছে। তারপর সামনের আকাশে ভাঙা চাঁদটাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ব্রজ ডাকল, স্যার!

বলো, ব্রজদা।

—দুঃশ্বপ্ন ছেড়ে যেন পালাচ্ছেন, তা জানি। কিন্তু পালিয়েও কি বাঁচবেন ভেবেছেন? বাঁচবেন না। আমি আনএজুকেটেড বাগদীর ছেলে—আমি বুঝে বুঝে দেখেছি, কোথাও যদি জড়িয়ে পড়লে কষ্ট পেতে হয়, আর আপনি এডুকেটেড ম্যান ভদ্দরলোক হয়েও বুঝতে পারেন নি। আমার খুব অবাক লাগে। ছোটবাবু স্যার, পথ দিয়ে যেতে হয়—না গেলে চলে না। কিন্তু পথ তো ঘর নয়—পথে ঘর বাঁধবার জেদ করেই আপনি কষ্ট পেলেন!

কী বলতে চায় ব্রজ ড্রাইভার? চন্দন তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। স্টিয়ারিং-এ দু হাত রেখে সামনের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে কথা বলছে ব্রজ। ওর চোখ দুটো এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

ব্রজ বলল, নয় কি? বুকে হাত রেখে বলুন।

চন্দন আস্তে বলল, আমার বলার কিছু নেই, ব্রজদা।

ব্রজ হাসল।...কদিন জিরিয়ে নিন বাড়িতে। আগাগোড়া সব ভেবে দেখুন। তারপর খবর দেবেন। আমি আসব। আপনাকে নিয়ে যাবো।

চন্দন বলল, এসো। কিন্তু আমি আর সত্যি ওখানে ফিরে যাবো না, ব্রজদা।

হঠাৎ ব্রজ মুখ ফেরাল। ওর মুখে কী একটা দুর্বোধ্য আবেগ যেন থমথম করে উঠল। বলল, যদি হাসি আমার সঙ্গে এসে বলে, চলুন ছোটবাবু? তাও যাবেন না?

চন্দন প্রথমে শিউরে উঠেছিল, বুকের ভিতর হাতুড়ি নেমেছিল যেন, পরক্ষণে রাগে জ্বলে উঠল সে।...ব্রজদা! হাসির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!

ব্রজ হাসতে লাগল আবার।...নাঃ, ঠাট্টা করছি। ও কিছু না—ছেড়ে দিন। বলেছি না, আমি শালা আনএজুকেটেড ম্যান, কখন কী বলতে কী বলে ফেলি! আমাকে ক্ষমা করুন।...কী কাণ্ড! এরই মধ্যে কখন বহরমপুর ব্রীজ এসে গেল নাকি? খুব জোর আসা গেছে দেখছি! ও ছোটবাবু! ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে এবার সিগ্রেট খাবেন না? আহা, মা গঙ্গাকে কতদিন দর্শন করিনি!

একটু পরেই গাড়িটা ব্রীজের মাঝামাঝি গিয়ে থামল। দুদিক থেকে দুজনে বেরিয়ে পরস্পর উল্টোদিকের রেলিংয়ে ঝুঁকে এবং সিগ্রেট টানতে টানতে নিচে কালো জল দেখতে থাকল। সেই রহস্যময়ী গঙ্গা। যার কাজল জলের অলৌকিক ফসল—রুপোলি ইলিশের মতো এক বালিকার দেহ, উরুতে স্নিগ্ধ ক্ষতের ক্ষতছবি, সদ্যোদ্ভিন্ন দুটি মৃদু স্তনের মাঝে পরম নীলাভ তিল।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ওরা ও আমরা

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

আমরা চার বন্ধু কার্সিয়াং থেকে ফিরছিলুম; সপ্তাহ-অন্তে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই এমনি করে। সেদিন গিয়েছিলুম কার্সিয়াং, ফিরছিলুম ট্রেনে। ট্রেনেই তিনজন তরুণ 'সাহেবে'র সঙ্গে দেখা, তাঁরা ফিরছিলেন দার্জিলিং থেকে। এসেছেন ভারতে ছুটি কাটাতে। এ'দের মধ্যে দুজন ইংরেজ, একজন আইরিশ। করেন অধ্যাপনা।

কথায় কথায় বললুম, বাংলায় এসে তোমরা কী কী দেখেছো?

এ'দের একজন ফিরিস্তি দিলেন।

পুনরায় আমার প্রশ্ন—শান্তিনিকেতনে গেছেন?

শান্তিনিকেতন!

সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় তিনজনের মুখেই বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে বললুম, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন।

এ'দের আর একজনের জিজ্ঞাসা, ইনি ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপক, কে রবীন্দ্রনাথ?

—টেগোর, রবীন্দ্রনাথ টেগোর! তাঁর লেখা পড় নি? শোনোনি তাঁর কথা? তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন—

আমাকে হতাশ হতে হল। না, অনেক চেষ্টা করেও এরা রবীন্দ্রনাথের নাম মনে করতে পারলেন না। তখন সন্ধ্যা গাঢ়তর, পাহাড়ের কোলে, খাঁজে খাঁজে নামছিল অন্ধকার। এবং আমার দু'চোখ জুড়ে, আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে। আমার মনে পড়ছিল আইনস্টাইনের কথা, মনে পড়ল ডবলিউ বি ইয়েটস, স্টার্জ মুরের কথা; মনে পড়ল রোমাঁ রোলাঁর কথা। আর কোন কথা না বলে আমি অন্ধকারে তাকিয়ে রইলুম।

ট্রেন থেকে নেমে অতঃপর ক্যাম্পাস অভিমুখে। ফেরার পথে হঠাৎ আমার মনে হল, মিথ্যে ওদের ওপর ক্ষুব্ধ হচ্ছি। ওরা তো ইয়েটসের লেখাও পড়ে নি, ক্ষীণভাবে নাম শুনেছে মাত্র, সেকথা জানিয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের লেখা যদি না পড়ে, তাতে দুঃখিত হবার কী আছে? ওরা জন্মেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। '৪৭এর পর থেকে ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে দূর সম্পর্কের প্রবাসী আত্মীয়ের মত। আর, তাছাড়া— এক সময় ওরা ছিল রাজা, আমরা ছিলুম প্রজা। ওদের কালচার জানতে হয়েছিল আমাদের, কিন্তু রাজার পক্ষে প্রজার কালচার জানার দরকার কী? উনিশ শতকের শেষ দিকে সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল ওদের উপনিবেশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সত্যিই সূর্য অস্ত যেত না। অঢেল টাকা খাও-দাও, ঘুমোও। ফায়ার প্লেসের পাশে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পড়তে থাকো পেপারব্যাক উপন্যাস। কোন সমস্যা তো নেই, স্রেফ সময় কাটানো। কার এমন মাথাব্যথা হয়েছে যে, অপরের কথা ভাবে।

নোবেল প্রাইজ য়ুরোপের দেওয়া। কিন্তু সে তো প্রতি বছরই কেউ না-কেউ পেয়ে থাকেন। বিশেষত, ১৯১৩ সালের সঙ্গে ওদের সময়ের ব্যবধান তো কম নয়।

সর্বোপরি য়ুরোপীয় সংস্কৃতির মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনে যেখানে ইয়েটসের মতো মানুষই অপরিচিত, সেখানে কে একজন রবীন্দ্রনাথের কথা যদি ওরা না জানে, তাহলে ওদের দোষ দেওয়া যায় কি? ইত্যাদি, নানা চিন্তার অন্তরে হচ্ছিল যত, মনে মনে ততই ভাবছিলাম, না—ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওরা যদি বাংলায় এসে রবীন্দ্রনাথকে না স্মরণ করে, তবে তার জন্য ওদের সত্যিই দোষ দেওয়া যায় না।

এবং সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আর একটা কথা মনে হল: আমরাই বা কজন রবীন্দ্রনাথকে জানি? বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, শান্তিনিকেতনের রূপ বাড়ছে কালকেতুর মত; আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের বেশ একটা বড় গোছের স্থান হয়েছে, তবু—তবু, যদি [illegible] সহজ একটা প্রশ্ন করা যায়: আমা[illegible] একটা গোটা কবিতা মুখস্থ বলা [illegible] যাবে? 'ক্ষণিকা'র কবিতা বাদে অবশ্যই [illegible]? আমরা যারা অধ্যাপক, নিয়মিত রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চা করি, নির্দিষ্ট করেকাটা কোটেশান বাদে আমরা ক'জন রবীন্দ্রসাহিত্যের খবর রাখি? রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষত গান [illegible] নিতান্ত ললিত নয়, তার একটা শক্তির, একটা দৃঢ়তার ও পৌরুষের দিক আছে, আমরা সেই রবীন্দ্রনাথকে কি দেখেছি বা দেখাতে পেরেছি? এককথায় বলতে গেলে, আমরা সত্যিকারের ক'জন রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছি? তা যদি না করে থাকি, তাহলে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের ওদের কাছ থেকে অমন আবদার করতে পারি না। অথচ, শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় বা বসন্তোৎসবে তো ভিড়ের কমতি নেই। তাহলে? আমরা কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে পেরেছি?

আমি তন্ন তন্ন করে আমার মনের দিকে তাকালুম কমলাকান্তের মত, তাকালুম বাইরে—বাংলায়, ভারতবর্ষে; আমার দৃষ্টি গেল শান্তিনিকেতনে, কলকাতার— সর্বত্র। না, কোথাও রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম না, দেখতে পেলুম না। আমার কেবলি

মনে হতে লাগল, আমরাও রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে পারিনি, তাঁর জীবনাদর্শের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। অথচ, আমরা ক্লাশে নিরাসক্ত রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য তত্ত্ব, জীবন-দেবতা-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করি, ছাত্ররা তা শোনে (?)। বইয়ের দোকানে রবীন্দ্রনাথের বই কেনার জন্য তাগিদের অভাব নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওপর গবেষণার (!) জন্য পি-এইচ-ডি প্রার্থীদের সংখ্যা বিপুল থেকে বিপুলতর হয়ে চলেছে। বিয়ের উপহার হিসেবে আজো বোধ হয় 'সঞ্চয়িতা'র কদর কমেনি। তবু, তবু—আমরা যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারিনি, তা আমাদের জীবনের, দেশের যে-কোন দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মিলবে। অন্ধকার আবর্জনাভরা আমাদের জীবনে আর যার স্থান থাক, রবীন্দ্রনাথের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ দূর অস্ত্।

অথচ, ভাবতে গেলে ভারী অবাক লাগে, এত অল্প দিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে গেলেন কেন। কথাটা নতুন করে ভাববার সময় এসেছে, কেন এমন হল।

আমার নিজের ধারণা, মূল কারণ আসলে একটিই—রবীন্দ্র-জগৎ ও আজকের জগতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান : প্রথমটিতে আছে জীবনের কতকগুলি ধ্রুব বিশ্বাস ও মূল্য-বোধ, আছে আনন্দ কল্যাণ, সুন্দরের আশ্বাস ও ছবি, আছে জীবনের অর্থপূর্ণ আশাপূর্ণ অস্তিবাচক ইঙ্গিত। দ্বিতীয়টির মূল কথা—প্রায় সব কিছু সম্পর্কে মূল্য-বোধহীনতা, অনাস্থা, অবিশ্বাস, হতাশা, বীভৎসতা, সন্দেহ, সংশয়, ভয় ও অপরি-সীম গ্লানিবোধ। সুতরাং এমন অবস্থায় এমন একটা জগতে যে রবীন্দ্রনাথের স্থান হতে পারে না, তা স্বাভাবিক বৈকি।

আজকের এই শূন্য বুসর জীবনের ছবি এ যুগের প্রায় সকল কবি শিল্পীর সৃষ্টিতেই ধরা পড়েছে। এ যুগের কথা বলতে গিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেল ভারী সুন্দর একটা উপমা দিয়েছেন, আমরা হচ্ছি সাপে-তাড়া করা খরগোসের মত, একটা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি। টি এস এলিয়টের কবিতায় একই ছবি :

> O dark dark dark . . .
> all go into the dark

অথবা, হেনরী রীডের 'Lessons of the war' : 1. Naming of Parts কবিতার কথা স্মরণ করা যাক—

> To-day we have naming of parts. yesterday.
> We had daily cleaning. And to-morrow morning.
> We shall have to do after firing. But to-day.
> To-day we have naming of parts.

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যেও ভাষা-ন্তরে একই সুর—

> আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
> পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
> ভালবাসা দিতে গিয়ে তবু,
> দেখেছি আমার হাতে হয়তো নিহত
> ভাইবোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে
> পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
> মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।
>
> (সুচেতনা/জীবনানন্দ দাশ)

শুধু জীবনানন্দের মতো কবির মধ্যেই নয়, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন চক্রবর্তী প্রমুখ ছোট-বড় অনেক কবির, বলা উচিত প্রায় সব কবির কবিতার মধ্যে এই অসুস্থতার ছবি আঁকা হয়েছে। শুধু কাব্যই বা বলি কেন, রবীন্দ্র-পরবর্তী (সেই কল্লোল যুগের গল্প-উপন্যাস থেকে শুরু করে আজকের সাম্প্রতিকতম) কথা-সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রায় সব লেখকই একটা অসুস্থ যৌনাক্রান্ত বিকৃত জীবনের সঙ্গে ক্রন্দনপূর্ণ, হতাশা-পূর্ণ জীবনের ছবি এঁকে চলেছেন। এ-যুগটাই যে অসুস্থ। এ যুগের দিকে তাকিয়ে কেবলি মনে হয়, আমরা ক্রমশ আলো থেকে অন্ধকারের দিকে, অসুস্থ জীবনের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি, যেন আমরা, এলিয়টের ভাষায়, শবদেহ-যাত্রীর দল। এবং যদি আত্মদর্শন করি, বলতে আপত্তি নেই, এইরকম একটা অসুস্থ মানসিকতার অংশীদার আমরা সকলেই।

স্বভাবতই, এ জগত রবীন্দ্রনাথের জগত থেকে অনেক দূরের, বলা চলে, রবীন্দ্র-কল্পনার বাইরের জগত। এ যুগের যে কোন মানুষ নৈরাশ্যবাদী, এমন কি নৈরাজ্যবাদী হতে বাধ্য। তাই আমাদের মন গ্রামছাড়া রাঙা মাটির পথ দিয়ে হাঁটতে চায় না, ভোলা দূরে থাক; বনের পথে যেতে যেতে ঘাসে ঘাসে পা ফেলার সময় ফুলের গন্ধে চমক লাগে না। কিন্তু গোয়ালার গলির ধোঁয়াশার মধ্যে সিন্ধু-বারোয়াঁর তানে মন হয় না পুলকিত, কিংবা আকাশভরা সূর্যতারা ও বিশ্বভরা প্রাণের মধ্যে নেই কোন আনন্দের সম্ভাবনা। অথবা, অসুস্থ মানসিকতায় ভুগতে ভুগতে কখনো মনেই হয় না—আমাদের এই দেহটি তুলে ধরে দেওয়ালীর প্রদীপ করা যায়। আমাদের এখন সময় কোথায় যে এসব দেখবো, ভাববো। এবং এসব শুধু কাব্য করে বলা নয়, এ অনুভব বাস্তব সত্য, অভিজ্ঞতার ব্যাপার। তাই, রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্যবোধ, আনন্দ ও মঙ্গলের ধারণা আজ আমাদের কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে বস্তুত আমাদের মনের ও মননের কোন যোগ নেই। এই অবস্থায় এ যুগের পাঠক যদি আর রবীন্দ্রনাথকে মনে রাখতে না পারেন, তবে সত্যিই কি দোষ দেওয়া যায় ?

সুতরাং ওরা যদি আমাদের রবীন্দ্র-নাথকে না জেনে থাকে, তাহলে ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, তোমরা, তোমরা, আমরা আমরা। আসলে এ যুগে ওরা ও আমরা একই, কোন পার্থক্য নেই।

প্রেম ও কবিতা॥

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আসোনি তো কই যখন আকুল ডেকেছিলো যৌবন,
অনুকূল হাসি হাসোনি কখনো মেনেছি যাকে আরাধ্য:
বুঝেছি তোমাকে জীবনে ভিড়ানো হবে না আমার সাধ্য.
হাহাকার করে শুকিয়েছে মনে ছায়ার কুঞ্জবন।
আসোনি স্বয়ং, দূতী পাঠিয়েছো ভুলিয়ে রাখতে মন—
সে নায়িকা নিজে মেলে না, মিলোয়—হয়ে থাকে বটে বাধ্য!
এও কি বোঝোনি নকল-নায়িকা করে যে তোমার শ্রাদ্ধ—
তাকে নিয়ে খেলে ক্ষইয়ে ফেলেছি কত বসন্তক্ষণ!

অদৃশ্যন্তী তুমি প্রেম আর দূতীর কবিতা নাম;
তোমাকে না পেয়ে তাকেই যে আমি আশ্রয় করলাম।
তবু মাঝে মাঝে পুরনো দিনের সৌরভ বয়ে চুলে
কেন আসো যাও, শরীর তো নেই, তবু শরীরিণী, আরে!
মিলে ও অমিলে গড়া জীবনের যত ঠিকে আর ভুলে
দেখি চুপে এসে দাঁড়ালে কখন ভিজে স্বপ্নের ধারে।।

কেউ কেউ॥

অমলকান্তি ভট্টাচার্য

জানি, তার সম্ভার অনিঃশেষ। নামহীন কিংবা অতিনামী,
শীলিত অথবা ব্রাত্য, জিতেন্দ্রিয় কিংবা ইন্দ্রস্বভাবে উত্তাল-
তাতেই নিঃশ্বাস নেয় শত্রুমিত্র।
এমনকি তারই জন্যে, আমি
দেখেছি, অচল সিকি চিক্‌মিকিয়ে করে খায় বণিকের পাল,
উকিলে মামলা জেতে। ছাড়পত্র নেই কোনো, ঝুঁকি না, ঝক্কি ন
নিত্য আবাগ্মীবাচাল তাকে, রসনাগ্রে, নাচায় উচ্ছিত্রফেন;
আর, তার প্রসাদেই আজও যতো বাস্তুঘুঘু কুড়োয় দক্ষিণা—
জনতা গণেশ হয়, রুপোর চামচ নিয়ে মা-লক্ষ্মী আসেন ঃ
তরঙ্গে তরঙ্গে চলে অবিশ্রান্ত দুনিয়াভুঞ্জন-জলকেলি।

কেউ কেউ বিজনে, ইত্যবসরে, বেছে নিলো একান্ত মেয়েলি
কোনো এক পরিশ্রম। বিউগিলের গর্জনেও বাইরে এলো না।
কবে এক উপচ্ছায়া দেখেছিলো চন্দ্রাহত নির্ঘুম মাঝরাতে—
অস্পষ্ট, অনবয়ব; গুণ্ঠনে সংকেতময়ী অতৃপ্ত কল্পনা
যাকে, চুপে, রেখে যায় বেপমান; অপাঙ্গে, চকিত নেত্রপাতে
দেখা না দেখায় মেশা অস্থির—আকার এক মেঘলা অচেনা
মূর্তি, সম্বিতের লজ্জিত সীমায়:—তাকে দিতে অলজ্জ উদ্ভা
ভাষার সংস্থান ভেঙে নিয়ত সীবন করে পুনর্বিন্যাস ঃ

অন্যমনস্ক এই সংসার কখনো যার সন্ধান রাখে না।

সেই হাতটা॥

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

উষ্ণ হাতটা অনেক কথা বলেছিল,
অন্ধের মতো ইঁটগুলোতে
হাত বুলিয়েছিল...।
রাতটাও শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে
বসেছিল।
হলদে পাখির বাঁক ঠোঁট—
মুছেছিল ঐ কবোষ্ণ—
হাতে।
রক্ত বেরোয়নি তবুও।
অথচ... সেতারের
আলাপ তুলতে গিয়ে
ক্ষতবিক্ষত হাতটা অন্ধের মতো
ইঁটকে ছুঁয়েছিল।

অনেকদিন পরে ভগ্ন হাতটা
আমার ভালবাসাকে জয় করে
নিল।
ও হাতকে আমি আর
কখনও
কলঙ্কিত হতে দেবো না।

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

।। ১ ।।

ভয়ঙ্কর গুজবে শহর ভরে গেছে, কলকাতায় দাঙ্গা হবে।

রাম অবতার বলল, 'কাল আর দুকান নিয়ে বসা আচ্ছা হবে না'। সজল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল 'কেন?'

'জোর লড়াই হোগা। আচ্ছা শুনিয়ে, ঐ দিদিমণি কিতনা টাইম আসিয়ে ছিল।'

মুশলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণার খবরটা সজল কাগজে পড়েছে। কিন্তু এই সংগ্রামের অর্থটা সে বুঝতে পারেনি। কলকাতা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আজো সামান্য।

নানান খবর গুজব শুনে সজল ভীত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আব্বাস যেখানটায় থাকে সেটা মেশামেশি। ওর আসার কথা আছে। এলে ওকে সাবধান করে দেবে। দরকার হলে কয়েকদিন নিজের বাসায় এনে রাখবে। দরকার হলে অন্য পরিচয় দেবে। সুখের বিষয় তার বাসাটা এমন, লোকজনের আনাগোনা কম। সজলের বাড়ীতে কে আর আসে। এক অরুণা।

অনেকদিন দোকান বন্ধ থাকার জন্য বিক্রি আদৌ হচ্ছে না। একটু দূরে আর একটা দোকান হয়েছে। এরকম হলে দোকান তুলে দিতে হবে। আসলে তার মধ্যে দোকানদারির কোন চরিত্র নেই। চাকরির চেষ্টা এবার ভালো করে করতে হবে। রেজাল্ট বেরোবার পর দরখাস্ত দু-চার জায়গায় পাঠিয়েছে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে।

'এই দোকানদার 'স্টেনোগ্রাফার' পত্রিকা বেরিয়েছে?

সজল মুখ তুলে দেখে, অরুণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সজল ঠাট্টা করে বলল, 'না বেরোয়নি মিস রায়।'

অরুণা খিল খিল করে হেসে উঠল। 'তা মশায়ের কি একটু উঠে আসা হবে।'

দেশ থেকে ফেরার পর অরুণার সংগে এই প্রথম দেখা।

একটু এগিয়ে এসেই অরুণা হাত তুলে একটা ট্যাকসি থামাল। সজলের মনে হচ্ছিল, আব্বাস আসতে পারে। রাম অবতারকে বলে এলে ভালো হোতো। কিন্তু ট্যাকসিটা এগিয়ে এসেছে।

অরুণা সজলের খুব কাছ ঘেঁষে বসেছে। অনেকদিন দেখা না হওয়ার ফলে অরুণা যে খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, খুব কাছে বসার উত্তাপ থেকে সজল তা অনুভব করছিল।

সজল চুপ করে বসেছিল শুধু। কেন যেন সে ভেতরে ভেতরে একটা দুর্বলতা বোধ করছে।

ট্যাকসিটা ভিকটোরিয়ার সামনে দিয়ে রেড রোডে পড়তেই সজল জিজ্ঞেস করল 'কোথায় যাচ্ছি?'

অরুণা সজলের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজে বলল, 'নরকে। কি? আপত্তি আছে?'

ফাঁকা রাস্তা, গাড়ীটা দ্রুত চলছিল। অরুণার মাথার স্যাম্পু করা কিছু অবাধ্য চুল সজলের কপালের ওপর এসে পড়েছিল। সজল সরিয়ে দিল।

গঙ্গার ধারে এসে ট্যাকসিটা থামল। সজল টাকাটা মিটিয়ে দিল। আজ যা বিক্রি হয়েছিল, প্রায় সবটাই চলে গেল বলে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল একটু।

জোড়া জোড়া প্রেমিকা-প্রেমিকার দল বসে থাকায় এই ছায়া-ছায়া গংগাতীর কেমন রোমান্টিক লাগছে। সবুজ প্রান্তর, নদী সব কিছু স্বপ্নময় বলে মনে হচ্ছে।

সজল চুপ করে নদীর দিকে তাকিয়েছিল। জেটিতে শুয়ে থাকার দিনগুলি সে কখন পেরিয়ে এসেছে!

অরুণা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি ভাবছ পাগলের মত, বসবে না কোথাও?'

'ও বসতে বলছ? তা রাত কত হোলো?'

অরুণা কোন উত্তর না দিয়ে সজলের হাত ধরে মাঠের দিকে নিয়ে গেল।

সজল বসতে গিয়ে বলল 'না,না, নদীর দিকে মুখ করে বসব। নদীটা দেখতে খুব ভালো লাগছে। তোমার—'

অরুণা রাগ করে সজলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'তবে দু'চোখ ভরে তাই দ্যাখো। আমি চলে যাই।'

অরুণা হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

সজল আহত হোলো একটু। ভাবল, সত্যি সে ম্যানার্স জানে না! তাই অরুণাকে খুশি করার জন্য বলল, 'তুমি রাগ করলে? অথচ জানো, এরি মধ্যে আমার জীবনে কতো কিছু ঘটে গেল।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি না বলেছিলে পরশুর আগের দিন আসবে? আমি কয়েকবার খুঁজতে গেলাম দোকানের জায়গায়। ওমা, টিকির দেখা নেই।'

সজল বলল, 'সুলতাদির বাড়ী হয়ে এলাম। তাই দেরি হোলো।'

'সুলতাদি? সেটি আবার কে? তুমি বেশ আছ মাইরি।'

অরুণার বলার ভঙ্গীতে সজল বিরক্ত হোলো। বলল, 'এই যে আমাকে যেভাবে দেখছ, এসবই সুলতাদির জন্য। ওর টাকায় দোকান। নইলে কলকাতায় খেতে পেতাম না।'

'ও মা সে কি কথা! দিদিটির বয়েস কত?'

'তা আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হবে।'

অরুণা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'তবে তো বুড়ী হয়ে গেছে।'

'বুড়ী? সুলতাদির মতো এতো সুন্দর, এতো ভালো আর কাউকে কখনো দেখিনি।'

অরুণা দু-চোখ কপালে তুলে বলল, 'দিদির রূপটি তো বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছ বাপু।—আচ্ছা সজল, আমি দেখতে কেমন বল তো?'

'তুমি? তুমি একরকম সুন্দর, সুলতাদি আর এক রকম। সুলতাদিকে দেখলে প্রতিমার কথা মনে পড়ে।'

অরুণা খুশিগলায় বলল, 'আর আমাকে মানবীর মত। বেশ, বাবা বেশ। আমার এই ভালো। প্রতিমার মত দেখতে হয়ে কাজ নেই।—আচ্ছা সজল, ঠিক করে বলতো, তুমি আমায় ভালোবাসো?'

'কি জানি বলতে পারব না। তবে ভালো লাগে, নইলে আসব কেন?'

'বাড়ীতে আমার কথা মনে পড়ত?'

'প্রথমে পড়েনি, পরে মনে পড়ত। নইলে চিঠি লিখতাম বুঝি?'

'জানো সজল, আমার স্মৃতি তোমাকে ভালোবাসিতে ইচ্ছে করে। কাউকে না ভালো-বাসলে বড্ড খালি খালি লাগে। কিন্তু জানো, কেমন যেন পারি না।'

সজল কথাটা বুঝতে পারল না।

অরুণা তেমনি শুকনো গলায় বলে চলল, 'আসল ব্যাপার কি জানো—ভালো-বাসতে হলে যে মন চাই, যে ক্যারেক্টার চাই, সেটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এ মাটিতে শুধু ক্যাকটাস হবে, টকটকে লাল গোলাপ আর কখনো হবে না।' অরুণা চুপ করল।

ভালোবাসা শব্দটার মধ্যেই একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। নইলে অরুণা এমন শিথিল, হয়ে উঠবে কেন?

কতক্ষণ কেটে গেল। গঙ্গার তীর থেকে লোকজন চলে যাচ্ছে। চারপাশে অন্ধকার ভিড় করে আসছে।

সজল অরুণার দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছিল। পরিপাটি কবরীটা কখন ছড়িয়ে পড়েছে। সুমিষ্ট গন্ধ আসছিল তার। অরুণা পাগলের মত সজলের মুখটা আরো কাছে নিজের মুখের ওপর টেনে আনল। নিজের হাত দিয়ে ওর মুখ-চোখ ঢেকে দিল একবার। আবার সরিয়ে নিল।

সজল নির্বাক, তার কোন সত্তা নেই, স্বাতন্ত্র্য নেই। অরুণা এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে।

সজল কী একটা তীব্র মাদকতার মধ্যে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সচেতন পরিক্রমা এই সন্ধ্যার আকাশে মাটিতে স্তব্ধ হয়ে আসছে ক্রমশঃ!

অথচ সজল কি একটা কথা মনে করতে চায় কিন্তু পারছে না। কার গলার স্বর নিজের বুকের ভেতর থেকে শুনতে পাচ্ছে সে।

অরুণা রেগে বলে উঠল, 'একি? চললে কোথায়?'

সজল বলল, 'দ্যাখো, আমায় এক্ষুনি যেতে হবে। আব্বাস আসতে পারে। কাল কি সব গন্ডগোল হবে শুনছি। না না ওঠো।'

অরুণা রাগে ক্ষোভে কোন কথা বলল না। কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দুজনে ইডেন গার্ডেনের কাছে এসে পৌঁছল।

কাছ দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। সজল ডাকল না, এতো পয়সা তার কাছে নেই।

এসপ্ল্যানেডে এসে সজল দেখল ট্রাফিক বন্ধ। কোথায় গন্ডগোল হয়েছে। অরুণা পাশেই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কোন কথা বলছিল না। মুখটা বড় গম্ভীর।

সজল এক সময় বলল, 'হাঁটতে পারবে?'

'অদ্দুর পারব না। তার চেয়ে একটু দ্যাখো। ট্রাম পেয়ে যাব।'

ভাগ্যি একটা ট্রাম পাওয়া গেল। দোকানের কাছে যখন নামল তখন রাত প্রায় ন'টা। বইয়ের ব্যাগটা নিতে যেতেই রাম অবতার বলল, 'এতনা রাত দেখে আব্বাস চলে গেল।'

শেষ পর্যন্ত সজলের আশংকাই সত্য হয়েছে। আজ অরুণার সঙ্গে যাওয়া উচিত হয়নি।

অরুণাও রাগ করে বাসায় চলে গেছে। যাওয়ার আগে কিছু বলল না।

সজল কি ভেবে রাম অবতারকে জিজ্ঞেস করল, 'আভি এখন গেলে আব্বাসের সঙ্গে দেখা হবে?'

রাম অবতার একরাশ বিরক্তি নিয়ে জবাব দিল, 'হম ক্যা জানে।'

সজল ভাবল এখন গেলে আর ফেরার সম্ভাবনা কম। আব্বাস হোটেলে খেতে যায়। ফিরতে অনেক রাত হয়। কাল আবার কি সব গন্ডগোল হবে শোনা যাচ্ছে! না, অরুণা সব গন্ডগোল করে দিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সজল শেষ পর্যন্ত একটা অপরাধী মন নিয়ে বাসার দিকে চলল। তার মনে হচ্ছিল, সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করল কারুর সঙ্গে যা করা তার উচিত নয়, ধর্ম নয়।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। কলকাতা এখন এক রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র। সারা শহরের আকাশ-বাতাস বিষাক্ত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চতুর্দিকে আগুনের হলকা। সিমেন্টের ওপর মানুষের তাজা রক্ত, আর শত শত বিকৃত মৃতদেহ এখানে ওখানে ইতস্ততঃ ছড়ানো। রাস্তায় কুকুর শবদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে, শকুন নামছে ঝাঁকে ঝাঁকে, পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধ আসছে।

সজল একটা পীড়িত, বেদনার্ত মন নিয়ে আগে বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। আব্বাসের বাসায় যাওয়া এবেলাতে সম্ভব হল না। ট্রাম-বাস বন্ধ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হিংস্র অন্ধকার-গুলো রাজপথে ঢেকে আসছে এখন। আকাশের কোন কোন অংশ বস্তিপোড়ার আগুনে লাল হয়ে উঠছে।

সজল নিজের মনেই ফুটপাত ধরে হাঁটছিল।

মোড়ের কাছে জটলা হচ্ছিল। দাঙ্গার কথা হচ্ছে শুনে সজল দাঁড়াল, যদি সুরেন ব্যানার্জী রোড অঞ্চলের কোন খবর পাওয়া যায়।

কিন্তু ধর্মতলা বা ঐসব অঞ্চলের কোন খবর পাওয়া গেল না। সজল এগিয়ে চলল।

কিছু দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসছিল। আগুন লাগানোর কোলাহলও ক্রমশঃ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। রাত্রি গভীর হচ্ছে ক্রমশঃ। রাস্তার আলোর বাল্বগুলো গতকাল থেকেই নেই। সব ভেঙে দেওয়া হয়েছে। রাস্তাঘাটে নরকের অন্ধকার।

এই অন্ধকারের মধ্যে একদল মানুষের উন্মত্ত হিংস্র উল্লাস দেখে সেই আদিম বর্বর যুগের কথা সজলের মনে হচ্ছিল, যখন উলঙ্গ মানুষগুলো মেরে-ফেলা আধ-পোড়া মানুষের ছাল ছাড়িয়ে খাওয়ার আগে আগুনে জ্বালিয়ে এমনি প্রেত-নৃত্য করত।

'মার, মার, মার'—একসঙ্গে কয়েকজন চিৎকার করে উঠল।

শব্দটা শুনেই সজল তাকাল। একজন হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা করতে করতে বড় রাস্তার দিকে ছুটে যাচ্ছে। লোকটি ভদ্র, অভিজাত শ্রেণীর।

সজলের পাশ দিয়েই লোকটি দৌড়ে গেল।

'ধরে ফেলুন, মশায় ধরে ফেলুন।'

সজল ধরল না, মনে মনে শুধু ভাবছে আহা কোন ক্রমে লোকটি যেন আশুতোষ মুখার্জি রোডে গিয়ে পৌঁছয়! পৌঁছলে বেঁচে যেতে পারে!

'কোথাকার বেল্লিক হে তুমি লোকটাকে ধরতে পারলে না?' প্রশ্ন ও গালাগালি দুটোই সজলের উদ্দেশ্যে।

সজল কোন উত্তর দিল না। একটা কুৎসিত খিস্তি করে লোকটা ডান্ডা নিয়ে আবার দৌড়াল।

সজলের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল—'ও মশায় শুনুন, শুনুন।'

লোকটা থমকে দাঁড়াল।

সজল বলল, 'আমার পকেট থেকে পার্কার কলমটা পড়ে যাচ্ছে যে।'

লোকটা কলমটা ঠিক করে রেখে আবার ছুটল।

সজল মনে মনে খুশি হোলো, অন্ততঃ একটা মিনিট সময় দিয়েছে, লোকটি যদি বড় রাস্তায় পৌঁছে যায়!

সজল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল—আর একটু, শুধু ঐ পানের দোকানটা পার হলেই—।

হঠাৎ একটা আকাশ-ফাটা আর্ত চিৎকার!

সজল চোখ বুজল। কিন্তু সেই বন্ধ চোখ ছাপিয়ে জল এল। অজস্র অশ্রু। সজল কিছু দেখতে পাচ্ছে না। শুধু শুনতে পাচ্ছে, ঐ মৃতদেহটা ঘিরে লোকগুলো উল্লাসে ফেটে পড়ছে!

সজল মনে মনে ভাবল, হে ঈশ্বর তুমি কি এই সব মানুষকে সৃষ্টি করেছিলে? এরা কি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজীর দেশের মানুষ? এরা কি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলে?

কতক্ষণ সজল দাঁড়িয়েছিল। জামার হাতায় চোখের জল মুছে সামনের গলিটা দিয়ে ধীরে ধীরে পা চালাল। এগিয়ে গেলে হরিশ মুখার্জী রোড কোথাও না কোথাও পড়বে।

যেতে যেতে আবার জটলা চোখে পড়ল। অনেকগুলো বর্বর মানুষের চিৎকার ও উল্লাসের শব্দ ভেসে আসছিল যেন আদিম অসভ্য যুগের নরমাংসভোজী মানুষের একটা বড় শিকার ধরেছে! সে শিকারও মানুষ!

কাছে গিয়ে সজল দেখল, লোকগুলোর মাঝখানে একটি বারো চোদ্দ বছরের সুন্দর কিশোর পুতুলের মত বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কান্নায় ফোলা দুটো উদ্‌ভ্রান্ত চোখ

কাপড়-চোপড় দেখে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে বলে মনে হয়।

ভয়ে ছেলেটি কাঁদছে না। ঠিক বলির আগে পাঁঠা যেমন করে তাকায় তেমনি কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে।

একজন বলে উঠল, 'অরি করিমদিন, কাজে লেগে পড়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ শুভস্য শীঘ্রম'—আর একজনের মন্তব্য।

ছেলেটির কানে বোধহয় লোকগুলোর কথা পৌঁছচ্ছে না। নইলে এত নিশ্চুপ, এত প্রাণহীন কেন? অন্ততঃ কাঁদলেও কারুর প্রাণে একটু দয়া জাগতে পারে।

পাশের একজন বুড়ো মত লোককে সজল জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

লোকটার দাঁতগুলো বড় বড় এলো-মেলো। চোখ দুটো নেকড়ের চোখের মত শিকারের লোভে চকচক করছে। বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'হচ্ছে নয়, হবে।'

সজল একটু এগিয়ে গিয়ে অনুনয় করে বলল, 'ওকে ছেড়ে দিন।' যে লোকটা সামনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে উঠল, 'কোন শালার দরদ উথলে উঠল রে।'

'আরে ওটার গালে একটা থাবড়া লাগাত'—কে একজন বলে উঠল।

সজল বলল, 'এই ছেলেটাকে মারলে সব শোধ হয়ে যাবে? আপনারা ছেড়ে দিন ওকে। আমি থানায় পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'ভাগ শালা—।'

সেই সামনের লোকটা আদ্দির পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলে একজন সাকরেদের গায়ে ছুঁড়ে দিল। তারপর ছুরিটার ধার পরীক্ষা করল একবার।

ছেলেটা বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ছুরিটার দিকে।

লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, মানুষ জবাই করাই এর পেশা!

ছেলেটার শরীর একবার কেঁপে উঠল।

সজলের মনে হচ্ছিল, কেঁদে উঠুক, একবার কেঁদে উঠুক ছেলেটা! কিন্তু কাঁদল না। এখন রাত্রির এই প্রথম প্রহরে এই গলিটার কাছে একটু পরে কি ঘটবে সে বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছে না।

লোকটা একবার দেখল ছেলেটাকে। সজলের কিছুমাত্র বুঝে উঠবার আগেই লোকটা মুহূর্তের মধ্যে ছেলেটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গলাটা টিপে ধরল।

বীভৎস, জঘন্য, নিষ্ঠুর দৃশ্য! বিংশ শতকের সমস্ত পাপ, সমস্ত অপরাধ, সমস্ত হিংসা যেন এই অন্ধকারে মানুষগুলোর চোখে জিভে জড় হয়ে উঠছে।

আর চিন্তা করার সময় নেই। সজল চিৎকার করে লোকটার হাতটা চেপে ধরল—'ছেড়ে দিন, ওকে ছেড়ে দিন।'

'তবে রে শালা—এটাকেই আগে—'

'মার মার ও শালাকেই আগে মার।'

মুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে সজলের ওপর কিল ঘুঁষি লাথি পড়তে লাগল।

সেই খুনে লোকটা সজলের জামার কলার ধরে মুখের ওপর ঘুঁষি মারছিল। সজল কিছুক্ষণ হাত দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার চেতনা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে আসছে। কে কোথায় মারছে, সে বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু চোখে পড়ল, লোকটা এবার সেই ছুরিটাই সজলের বুকের সামনে—।

হঠাৎ চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সেই ছেলেটা সজলকে জড়িয়ে ধরল। এই অবসরে কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

একটা আকুল আর্তনাদে ওপরের অন্ধকার আকাশটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

'এাই ক্যা হোতা? হল্লা কেঁও'—কেউ লক্ষ্য করেনি কোথা থেকে দুজন সিপাহী ছুটে এসেছিল।

'ভাগো শালালোগ ভাগো।'

একজন সিপাহী সেই খুনে লোকটার পেটে রুলের একটা গুঁতো মেরে রেগে বলল—'আভি ছোড় দো।'

লোকটার আর সে তেজ দেখা গেল না। ইতিমধ্যেই ভিড় ফাঁকা। যে সব বীর এতক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করছিল, তারা কে কোথায় কেটে পড়েছে।

একজন সিপাহী ছেলেটাকে সংগে নিয়ে থানার দিকে গেল। অন্য সিপাহীটি সজলকে জিজ্ঞেস করল, 'আপ কঁহা যায়েংগা?'

সজল বলল, 'সিপাহীজী আপনারা এসে না পড়লে ছেলেটাকে খুন করে ফেলত ওরা।'

সিপাহী বলল, 'হুম দুরসে দেখা। আপ উসকো বাঁচায়া। লেকিন আপ কাঁহা যায়েংগে?'

সজল বাসার ঠিকানা বলল। কিন্তু হাঁটতে গিয়েই দেখল, পা ফেলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মাথা ঘুরছে।

সিপাহী সজলের মুখে ঠোঁটে রক্তের দাগ দেখল। কি ভেবে হাতটা বাড়িয়ে দিল, 'পাকড়াইয়ে'।

সজল ধীরে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছিল। সামনে তাকিয়ে দেখল, একটু দূরে অন্য সিপাহীটির সংগে ছেলেটি যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে তাকাল।

ফুটপাতের আবছা অন্ধকারের দূরত্বে দেখা গেল না তার চোখে জল ছিল কিনা, বেদনা, যন্ত্রণা ছিল কিনা।

সিপাহীটি বলল, 'জামানা বদল গিয়া, বাবু। মিলিটারী মার্ক শুরু হো গিয়া।'

ইঁহা গড়বড় দেখেগা, গুলী। একদম খতম'।

সজল ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, 'রায়ট কবে বন্ধ হবে সিপাহীজী?'

'আভি বন্ধ হো যায়েগা, বাবু'।

'আচ্ছা, সিপাহীজী সুরেন ব্যানার্জি রোডমে গণ্ডগোল হুয়েছে'?

'হাঁ হাঁ হোয়েছে। সারা কলকাত্তাকা আদমি জানোয়ার বন গিয়া। কে হিন্দু হো, কে মুসলমান হো'।

সজল আর হাঁটতে পারছিল না। তাই বলল, "আমাকে ছেড়ে দিন সিপাহীজী। আমি কোনভাবে চলে যাব'।

'নেহি নেহি, আপ নেহি সমঝতে'হে। আপকে ঘর পৌঁছা দেগা। ও শালা হারামিকা বাচ্চোঁরা ফিন আয়েগা। আপকো খুন কর শকতা'।

'কিন্তু আমি যে আর চলতে পারছি না সিপাহীজী'।

সিপাহী চারদিক তাকাল। না একটা রিকসাও নেই।

'আউর কেতনা দূর, বাবু?'

'না—খুব বেশি না।'

সিপাহীজী সজলের ডান হাতটা নিজের গলার কাছে টেনে এনে বাঁহাত দিয়ে তাকে খানিকটা তুলে ধরল, যেমন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈনিককে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে যায়।

সজল এবার একটু একটু হাঁটতে পারছিল।

সজল ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আপ ঘর পৌঁছ গিয়া। এবার হামি যাই।'

সিপাহীজী তার ডায়েরী খাতাটা খুলে ধরল—'লিখ দিজিয়ে বাবু, আপকো নাম, আউর পতা। আউর লিখ দিজিয়ে কে, ম্যানে আপকো ঘর পৌঁছা দিয়া।'

সবকিছু লিখে সজল ডায়েরীটা বন্ধ করে ফেরত দিতে গিয়ে নামটার ওপর চোখ পড়ল : শেখ মহম্মদ আলি।

সজলের হাতটা কাঁপছিল। কোন কথা সে বলতে পারছিল না। দুচোখে তার জল ভরে আসছিল। সে অশ্রু আনন্দের, কৃতজ্ঞতার না বেদনার—তা সে নিজেও জানে না।

'ক্যা হুয়া? দিজিয়ে বাবু?'

ডায়েরীটা বুক পকেটে রেখে ডান হাতে রুলটা ধরে শেখ মহম্মদ ধীরে ধীরে গলি দিয়ে চলে গেল। একবারও পেছনে তাকাল না।

কতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়েছিল সজলের মনে নেই। হঠাৎ মনে হোলো কে যেন কড়া নাড়ছে।

এখন রাত্রি কত? উঠতে বড় কষ্ট হচ্ছে। কোনভাবে উঠে সজল দরজা খুলল। দেখল, অরুণা।

(ক্রমশঃ)

বিমান ছিনতাই রোধে বিজ্ঞান

রাকেশ চক্রবর্তী

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অপরাধের মধ্যে বিমান ছিনতাই বোধহয় অভিনবত্বে এবং বৈশিষ্ট্যে কিছুটা স্বতন্ত্র। কারণ বিমান ছিনতাই যেমন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য করা হয়ে থাকে, তেমনি গোষ্ঠীগত স্বার্থে বা রাজনৈতিক কারণে বৈরীভাবাপন্ন কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের বিমান ছিনতাই করতে কার্পণ্য করেন না। সাম্প্রতিককালে এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ, পাকিস্থান কর্তৃক ভারতবর্ষের বিমান অপহরণ ও পরে লাহোরে বিমানটিকে ধ্বংস করে ফেলা।

যদিও বিমান ছিনতাই বর্তমান যুগে অপরাধীদের সাম্প্রতিক অবদান নয়, তবুও পরিসংখ্যানবিদদের মতে ১৯৬৮ সনে অপহরণের সংখ্যা সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পায়। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তখন যেন বিমান ছিনতাই-এর প্লাবন বয়ে যায়। অতিতুচ্ছ কারণে বা শুধুমাত্র বীরত্ব (?) দেখাবার জন্য কিছু সংখ্যক উদ্ধত যুবকের মধ্যে এই ধরনের অপরাধে ব্রতী হবার অভিপ্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। এবং সেই সময় থেকেই বিভিন্ন বিমান পরিবহন সংস্থায় আলোচনা শুরু হয় কি করে বিমান ছিনতাইয়ের এই ঊর্ধ্বগতি প্রবণতাকে রোধ করে যাত্রীদের নিঃশংকচিত্তে বিমানবিহারে সুযোগ দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে বিমান পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং কতিপয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করা হয় এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনে। এবং তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। যদিও বিমান অপহরণকে আজবধি সমূলে বিনষ্ট করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তবুও দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে বিমান অপহরণের সংখ্যা বর্তমানে প্রভূত নিম্নগামী। যদিও আরো উন্নততর কৌশলের আবিষ্কারে বিজ্ঞানীরা এখনো নিরলস অধ্যবসায়ে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন এবং আজবধি সাফল্যের পূর্ণ কৌশলটিকে যথেষ্ট গোপন রেখেছেন তবু আলোচ্য প্রবন্ধে সেই যান্ত্রিক কলা-কৌশলটির যতটা সম্ভব প্রাপ্ত বিবরণ—উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এইটি সহজবোধ্য যে বিমান ছিনতাইকে প্রতিরোধ করতে হলে বিমানদস্যুকে বিমানে আরোহণ করতে দেওয়া চলবে না। এই সর্বজনগ্রাহ্য চিন্তাধারাটিকে সামনে রেখে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা চালান। আমেরিকার 'ফেডারেল-এ্যাভিয়েশন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন'—যাদের সংক্ষেপে বলা হয় এফ এ এ, তাঁরাই, বলা যেতে পারে, এই ছিনতাই প্রতিরোধে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন। 'এফ এ এ'-র অন্তর্গত 'অফিস-অফ-এ্যাভিয়েশন—মেডিসিন' ব্যাপক অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তেআসেন যে, আকাশদস্যুরা যখন কোন বিমান অপহরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিমানে আরোহণের চেষ্টা করেন, তখন তাঁদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে সাধারণ যাত্রীদের অপেক্ষা বিপরীত কতগুলি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিহ্নগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন বিশেষভাবে শিক্ষিত শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন অভিজ্ঞ কর্মীর।

নিউ অরলিয়েনস আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর সর্বপ্রথম এই ধরনের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেন বিমান যাত্রীদের উপর নজর রাখার জন্য। পর্যবেক্ষকরা সাধারণ যাত্রীর ছদ্মবেশে বিমানবন্দরে প্রবেশের মূল দরজা থেকে অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে আরোহণেচ্ছুক যাত্রীদের উপর নজর রাখেন। যদি কোন যাত্রীর আচার-ব্যবহারে সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ে তখন কৌশলে এয়ারপোর্ট অফিসারদের উক্ত যাত্রী সম্বন্ধে জানিয়ে দেন। এয়ারপোর্ট অফিসাররা তখন যাত্রীটিকে তাঁদের দপ্তরে নিয়ে যান। দপ্তরে প্রথমে যাত্রীটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। জিজ্ঞাসাবাদে যদি তাঁরা যাত্রীটি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত না হন, তখন তাকে 'অস্ত্র-নির্দেশক' কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

'এফ এ এ' যে 'অস্ত্র-নির্দেশকটিকে ব্যবহার করেন সেইটি একটি বিশেষ ধরনের ম্যাগনেটোমিটার। দুটি ছয় ফিট লম্বা এ্যালমুনিয়ামের দণ্ডকে তিন ফুট ফারাকে স্থাপিত করে এমন একটি আয়তাকার ফ্রেমের সৃষ্টি করা হয় যাতে এর মধ্যে দিয়ে অতি সহজে যাতায়াত করা যায়। এই দণ্ডদ্বয়ের সঙ্গে একটি মনিটর সংযুক্ত করা থাকে এবং প্রত্যেকটি দণ্ডের মধ্যে চারটি করে ম্যাগনেটিক ডিটেক্টর লুকানো থাকে। যখন কোন অস্ত্র বা লোহজাত কোন বস্তুকে এই ম্যাগনেটোমিটারের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ঐ অস্ত্র বা বস্তুটি কর্তৃক ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, সেই আলোড়নসহ অস্ত্র বা লৌহ নির্মিত বস্তুটির নিজস্ব চৌম্বক প্রবাহকে এ্যালমুনিয়ামের দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে লুকানো ম্যাগনেটিক ডিটেক্টর ধরে ফেলে ও মুহূর্তের মধ্যে দণ্ডদ্বয়ের সঙ্গে সংযুক্ত 'মনিটর' তা পাঠিয়ে দেয়। 'মনিটরে' এই নির্দেশ আসার ফলে সে তখন স্বয়ংক্রিয় সতর্কীকরণ কেন্দ্র বা এলার্ম ইউনিটকে সজাগ করে দেয়। এবং ফলস্বরূপ একটি সুক্ষ্মধ্বনির সঙ্গে একটি নীলাভ বাতি জ্বলে ওঠে।

এই 'এফ এ এ' ধরনের অস্ত্রনির্দেশকের প্রধান ত্রুটি হোল এরা যাত্রীবাহিত লৌহ-নির্মিত নিরীহ দ্রব্য এবং লুকানো বেআইনী অস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে
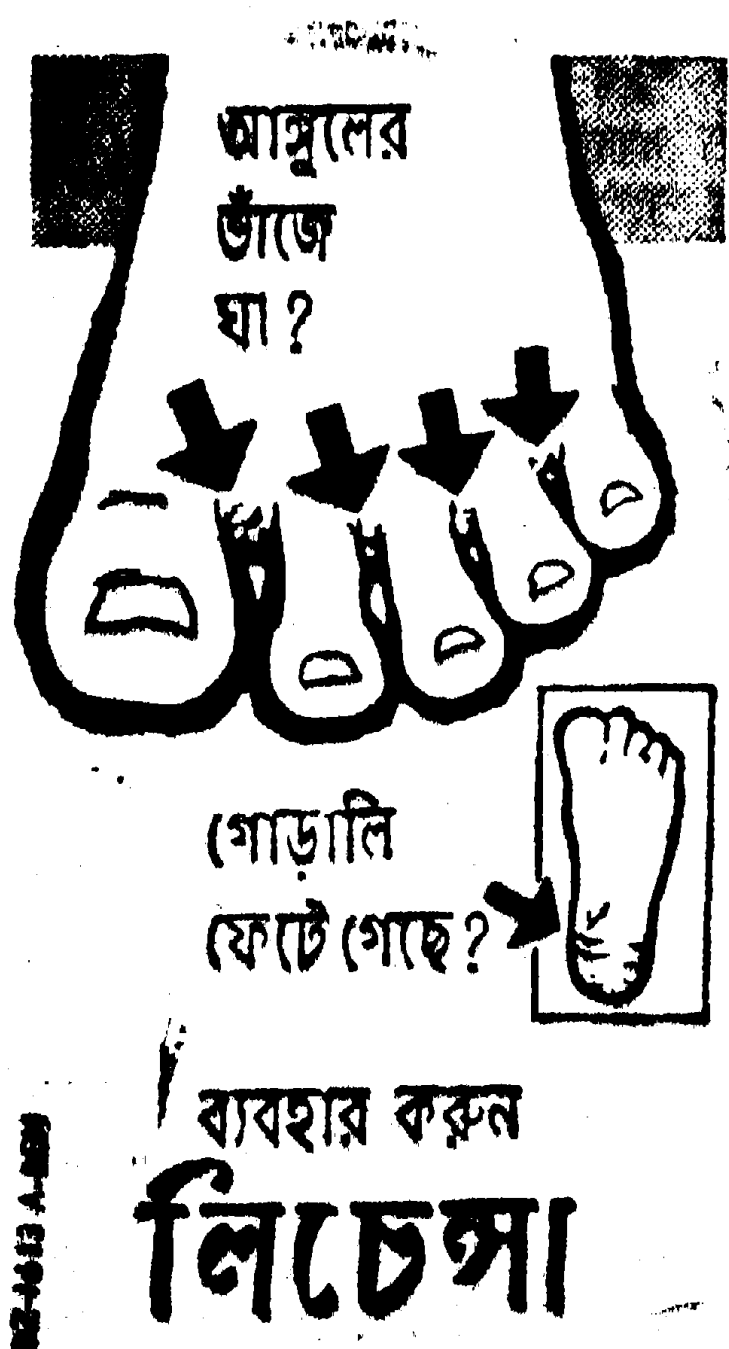
অক্ষম। যেহেতু এই ম্যাগনেটোমিটারটি লৌহ নির্মিত যে কোন বস্তুর ক্ষেত্রে সমানভাবে সক্রিয়। এই জন্য অনেক বিমান পরিবহন সংস্থা বা বিমান কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ম্যাগনেটোমিটারকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন।

'ফেডারেল এ্যাভিয়েশন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন' প্রভৃতি তথ্যানুসন্ধান এবং পরীক্ষার পরে জানিয়েছেন যে যদিও প্রায় ৫০% থেকে ৬০% বিমানযাত্রীরা লোহা বা স্টিলজাতীয় সামগ্রী বহন করে থাকেন, কিন্তু ৩-৫% ...ীর থেকে কমসংখ্যক যাত্রীরা 'বিমান-...নতাই' ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে ...কেন।

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে জাপান ...য়ার লাইনস কর্তৃপক্ষ টোকিওর আন্ত-...াতিক বিমানবন্দরে 'ডেনসক ম্যাগনেটিক ...াই' বা 'ডেনসক-চুম্বক-চক্ষু' নামক একটি ...তর 'অস্ত্র নির্দেশক' যন্ত্র বসান। এই ...্রটি তৈরী করেছেন টোকিওর 'ডেনসক ...রিং ইনস্ট্রুমেন্ট ওয়ার্কস'।' এই ...দেশকটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে যথাক্রমে ৮ ...ট ১০ ইঞ্চি এবং ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি, ...য়তাকার ধাতব একটি ফ্রেম। প্রকৃতপক্ষে ... নির্দেশকটি একটি তড়িৎ চুম্বকরূপে ...জ করে। যখন কোন ধাতববস্তু এই ...নসক-চুম্বক-চক্ষু'র চৌম্বকক্ষেত্রে প্রবেশ ...র, তখনই নির্দেশকের চৌম্বকাবেশে ...তিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এবং ফলস্বরূপ ...কীকরণ কেন্দ্রটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ...ন্দ্রটি 'ডেনসক-চুম্বক-চক্ষু'র' ঠিক মাথার ...পরে সিলিং-এ আটকানো থাকে। ...মাদের অতি পরিচিত ট্রাফিক সিগনালের ...নটি আলোর মতো এই সতর্কীকরণ ...ন্দ্রটি তিনটি লাল আলোতে গঠিত। ...রি বা ছুরি জাতীয় আকারের কোন ...তু ধরা পড়লে একটি আলো জ্বলে ...ঠে। পিস্তল, রিভলবার বা ঐ আকৃতির ...তুতে দুটি আলো এবং স্টেনগান, সটগান ... ঐ আকৃতির বস্তুতে তিনটি আলো ...লে ওঠে।

ইংল্যাণ্ডের 'ডাইভার ডিটেকসন ...ডাইস লিমিটেড' যে 'অস্ত্র-নির্দেশকটি ...রী করেছেন তার কার্যাবলী বেশ উল্লেখ-...যোগ্য। এই 'অস্ত্র-নির্দেশকটি ৭২ ইঞ্চি ...চু এবং তেত্রিশ ইঞ্চি ফারাকে অবস্থিত ...টি নির্দেশক স্তম্ভের দ্বারা গঠিত। ...ন ধাতব পদার্থকে এই অস্ত্র-নির্দেশকের ...ম্বকক্ষেত্রে নিয়ে আসা হলে চৌম্বকক্ষেত্রে ... আলোড়নের সৃষ্টি হয় তা নির্দেশক-...স্তম্ভদ্বয়ে ধরা পড়ে। নির্দেশকস্তম্ভদ্বয় ...ই বার্তাকে সোজাসুজি শ্রবণযোগ্য ...নিতে রূপান্তরিত করার জন্য সতর্কী-...করণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। তদুপরি এই ...অস্ত্র-নির্দেশক' যন্ত্রটির নির্দেশকস্তম্ভদ্বয়ের ... পার্শ্বে একটি বিশেষ ধরনের পর্দা ...লানো থাকে। যখন কোন ব্যক্তি কোন ...য়িত অস্ত্র বা ধাতববস্তুসহ এই অস্ত্র-...র্দেশকটির আওতার মধ্যে প্রবেশ করেন

তখন মুহূর্তের মধ্যে পর্দায় ব্যক্তির প্রতি-ফলিত অবয়বের চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে এবং নির্দেশকস্তম্ভদ্বয়ের মুখোমুখি অবস্থিত লাল সংকেত আলো (এক্ষেত্রে সংখ্যায় চারটি) জ্বলে ওঠে। সুতরাং বৃটিশ নির্মিত অস্ত্র-নির্দেশকটি তিনভাবে কাজ করে। (১) শ্রবণযোগ্য ধ্বনির সৃষ্টি, (২) লাল আলোর সংকেত, (৩) নির্দেশকস্তম্ভ সংলগ্ন পর্দায় ব্যক্তির আলোকিত প্রতি-ফলন।

উপরে বর্ণিত এই অস্ত্র-নির্দেশক-দ্বয়ের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি হোল এরা যেমন "ফেরাস" তেমনি "নন-ফেরাস" বস্তুর ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে অনেকসময় সতর্কী-করণ কেন্দ্রের মিথ্যাজ্ঞাবণে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিরক্ত হতে হয়। সেইদিক দিয়ে 'এফ এ এ' ধরনের ম্যাগনেটোমিটার অস্ত্রনির্দেশকটি অনেকটা নির্ভরশীল। কারণ এই ম্যাগনেটোমিটারটি শুধু লোহা বা স্টিলকেই (অস্ত্রনির্মাণে ব্যবহৃত) নির্দেশ করে। তবে উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হোল এরা যেমন ভয়ংকর কোন লুক্কায়িত অস্ত্রকে নির্দেশ করে তেমনি নিরীহ ধাতববস্তুকেও নির্দেশ করে। যেহেতু বিমান কর্তৃপক্ষরা এই অস্ত্রনির্দেশকগুলিকে এমন জায়গায় স্থাপন করেন যার আওতায় প্রত্যেকটি যাত্রীকেই আসতে হয়। বিমানবন্দরে প্রবেশের মূল দরজাগুলিতে এইগুলি বসানো থাকে বা হয়তো কাস্টমস চেকিং সেন্টারে যাবার পথে বা বিমানে আরোহণের জন্য রানওয়েতে যাবার নির্গম পথে অস্ত্র-নির্দেশকগুলিকে বসানো হয়। সুতরাং অনেক সময়েই অনেক যাত্রীকেই বিমান

কর্তৃপক্ষের সন্দেহে পড়তে হয়। এইসব ত্রুটিকে অবশ্য যতটা সম্ভব দূর করার জন্য আরো সুহৎ গবেষণা বর্তমানে চলছে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য ফিলিপস ব্রডকাস্টিং ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন নির্মিত 'এক্স-রে আই' বা রঞ্জন-চক্ষুর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই 'রঞ্জন-চক্ষু' আজবধি নির্মিত বিবিধ 'অস্ত্রনির্দেশকের' মধ্যে সর্বাপেক্ষা ত্রুটিহীন এবং অত্যাধুনিক। এই রঞ্জন-চক্ষুর কার্যাবলী যে কজন ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন তাদের একজন বলেছেন, 'আমি একটি প্রমাণ আকারের এয়ার ব্যাগের মধ্যে অনেকগুলি জামা, দুটি বই, সেভিংরেজার, একটি পত্রিকা এবং একটি ছোট্ট রিভলবার এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঢোকালাম যাতে এই অস্ত্রটিকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করেও ধরা সম্ভব নয়। এয়ার ব্যাগটিকে অতঃপর পরীক্ষার জন্য 'রঞ্জন-চক্ষু'র কাছে নিয়ে যাওয়া হোল। একটি বোতাম টেপা হোল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে রক্ষিত একটি টেলিভিশন মনিটর পর্দায় রিভলবারটির পরিষ্কার স্বচ্ছ একটি ছায়া ফুটে উঠল। অনুরূপভাবে লুক্কায়িত একটি ডিনামাইট বোমাকেও 'রঞ্জন-চক্ষু' সরাসরি জনসমক্ষে প্রতিস্থাপিত করে।'

এই 'রঞ্জন-চক্ষু'র কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

একটি টেলিভিশন ক্যামেরা; একটি টেলিভিশন সেট, একটি অতি কমমাত্রার এক্স-রে উৎপাদনের যন্ত্র, একটি ফ্লুরো-স্কোপ' ধরনের বিশেষ পর্দার সমষ্টি হোল এই 'রঞ্জন-চক্ষু'। উপরোক্ত বস্তুগুলিকে এমনভাবে কাস্টমসচেকিং কাউন্টারে

বসানো হয় যাতে বিমানযাত্রীদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা গোচরীভূত না হতে পারে। চেকিং কাউন্টারের উপরতলে ভূমির সমান্তরালে রক্ষিত চওড়া অংশে কাস্টমস অফিসারদের দিকে মুখ করে টেলিভিশন সেটটিকে বসানো হয়। এই টি ভি সেটটিকে এমনভাবে একটি আয়তাকার বা বর্গাকার ফ্রেমের মধ্যে রাখা হয় যাতে বিমানযাত্রীরা এইটিকে অতি সাধারণ একটি আধার ব্যতীত কিছুই ভাবতে পারে না। এই টি ভি সেটটিকে কারিগরী ভাষায় বলা হয় 'টেলিভিশন মনিটর।'

টেলিভিশন ক্যামেরা, ফ্লুরোস্কোপ-পর্দা এবং একস-রে উৎপাদনের যন্ত্রটিকে একই সারিতে চেকিং কাউন্টারের দ্বিতীয়-তলে বসানো হয়। ফ্লুরোস্কোপ পর্দাটিকে রাখা হয় টি ভি ক্যামেরা এবং একস-রে উৎপাদনের যন্ত্রের মধ্যবর্তী অংশে। কোন বিমানযাত্রীর ব্যাগ বা বাহিত অন্য লাগেজকে প্রথমে ফ্লুরোস্কোপ পর্দা সংলগ্ন করে একস-রে উৎপাদন যন্ত্রটির সামনে রাখা হয় এবং সুইচ টেপা হয়।

একস-রে বা রঞ্জন-রশ্মির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল, এরা কম পারমাণবিক ওজন সমন্বিত বস্তু ভেদ করে চলে যায় কিন্তু উচ্চ পারমাণবিক ওজন সমন্বিত বস্তুর কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই দ্বিতীয় বস্তুটিকে যদি কোন ফটোগ্রাফিক প্লেট সংলগ্ন করা যায় তাহলে এই দ্বিতীয় বস্তুটির একটি চমৎকার ছবি ঐ প্লেটে ফুটে ওঠে। 'একস-রে'-এর এই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যটিকে 'রঞ্জন-চক্ষু'তে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যখনই কোন বিমান-যাত্রীর ব্যাগটিকে ফ্লুরোস্কোপ ধরনের বিশেষ পর্দা সংলগ্ন করে একস-রে উৎপাদনের যন্ত্রটির বোতাম টেপা হয় তখনই ব্যাগ মধ্যস্থ জামা-কাপড় প্রভৃতি বস্তু ভেদ করে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন চলে যায় কিন্তু রিভলবার বা সেই জাতীয় উচ্চ পারমাণবিক ধাতু দ্বারা গঠিত বস্তুতে ইলেকট্রন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থেকে যায় এবং গতিশীল ইলেকট্রনের এনার্জি 'একস-রে'তে রূপান্তরিত হয়ে ঐ বস্তুটির ছায়া ফ্লুরোস্কোপ পর্দার পরিষ্কার ফুটে ওঠে। পর্দার ফুটে ওঠা এই ছবিটিকে পর্দার অপর পার্শ্বে রক্ষিত টেলিভিশন ক্যামেরা ধরে ফেলে ও সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন মনিটরে পাঠিয়ে দেয়। 'মনিটর' তখন তার পর্দার অস্ত্রটির একটি চমৎকার ছবি ফুটিয়ে তোলে এবং অচিরেই তা কাস্টমস অফিসারের দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ে।

'একস-রে' যন্ত্রটির বোতাম টেপা থেকে শুরু করে টেলিভিশন মনিটরে অস্ত্রের ছবিটি ফুটে উঠতে সময় নেয় এক সেকেণ্ডের কাছাকাছি। এবং মুছে না ফেললে মনিটর পর্দায় এর স্থায়িত্ব দশ থেকে পনেরো মিনিট। টি ভি ক্যামেরা থেকে টি ভি মনিটরে অস্ত্রের ছবিটি যেতে সময় নেয় পঞ্চাশ (৫০) ন্যানো-সেকেণ্ড।

এবং 'একস-রে' উৎপন্ন হবার দরুন যে তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হয় তার পরিমাণ ০-১ মিলিরনটজেন যা প্রকৃতি থেকে প্রতিদিন আমরা যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ করি তার থেকে অনেক কম ও অক্ষতিকারক।

বর্তমানে অনেক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বিমান পরিবহন সংস্থা এই 'রঞ্জন-চক্ষু' এবং উপরে বর্ণিত 'ডেনসক-চুম্বক-চক্ষু' বা বৃটিশ নির্মিত অস্ত্রনির্দেশকটিকে যুগপৎ একই সঙ্গে ব্যবহার করে থাকেন। প্রথম মূল দরজা যেটি দিয়ে বিমানযাত্রীরা কাস্টমস চেকিং কাউন্টারে প্রবেশ করেন, সেখানে একটি 'অস্ত্রনির্দেশক' বসানো থাকে। কাস্টমস চেকিং কাউন্টারে 'রঞ্জন-চক্ষু' এবং যে দরজা দিয়ে বিমানযাত্রীরা রানওয়েতে যাবেন, সেখানে দ্বিতীয় আর একটি অস্ত্রনির্দেশক বসানো থাকে। হয়তো কোন বিমানযাত্রী কাস্টমস চেকিং কাউন্টারে আসার সময় প্রথম 'অস্ত্রনির্দেশক'কে সক্রিয় করে তুললেন। বিমান কর্তৃপক্ষ সেই যাত্রীটির প্রতি নজর রাখলেন। যাত্রীটি এবার কাস্টমস চেকিং কাউন্টারে এসে রঞ্জন-চক্ষুর মুখোমুখি হলেন। 'রঞ্জন-চক্ষু' যাত্রীটির ব্যাগ বা অন্যান্য লাগেজ পরীক্ষা করে লুক্কায়িত অস্ত্রের সন্ধান দিয়ে দিলো। যদি অস্ত্রটি ব্যক্তিটি স্বদেহে গোপন করে রাখেন, তখন অবশ্য 'রঞ্জন-চক্ষু' সেটিকে বার করতে সক্ষম হবে না। তখন ব্যক্তিটিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর নির্দিষ্ট সময় পরে যখন যাত্রীটি বিমানে আরোহন করার জন্য দ্বিতীয় অস্ত্রনির্দেশকটির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবেন তখন দেখা যাবে ব্যক্তিটি পুনরায় তাকে সক্রিয় করে তোলেন কিনা। যদি করেন তখন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বুঝবেন জিজ্ঞাসাবাদ এবং অনুসন্ধানে লুক্কায়িত সব অস্ত্র বার করা হয়নি। তখন তারা পুনরায় যাত্রীটিকে পুঙ্খানুপু[ঙ্খ]রূপে তল্লাসী করবেন।

যদিও বর্তমানে আরো উন্নততর অ[স্ত্র] ব্যবস্থার প্রচলন-উদ্দেশ্যে পৃথিবীর [...] সব কটি উন্নত-কারিগরী এবং বিজ্ঞা[ন] পরিপুষ্ট দেশগুলিতে গবেষণা চলছে, ত[বু] সন্দেহ থেকে যায় 'বিমান-ছিনতাই' সম্পূ[র্ণ] রোধ করা সম্ভব হবে কিনা। কারণ য[দি] কোনদিন আধুনিকবিজ্ঞান অধাতব পদা[র্থ] দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণে সক্ষম হয়ে ও[ঠে] তখন বর্তমানে ব্যবহৃত সব কটি অ[স্ত্র]নির্দেশকই অচল হয়ে যাবে। [...] বর্তমানের অস্ত্রনির্দেশকগণ কেবল [...] নির্মিত অস্ত্রকে নির্ণয় করতে সক্ষম।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে [...] একটি বুলেট একটি বিমানকে ধ্বংস কর[তে] অক্ষম। যেহেতু আমাদের সাধারণ মান[ুষের] প্রত্যেকেরই একটি বদ্ধমূল ধারণা [...] ঊর্ধ্বাকাশে বিমানদস্যুর রিভলবার [...] পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গু[লি] অবলীলাক্রমে একটি বৃহৎ বিমানকে ভে[ঙে] চুরমার করে ফেলতে পারে।

বিমান ইঞ্জিনীয়াররা দৃঢ়ভাবে জানি[য়ে]ছেন গুলীতে যদি কোন বোয়িং বিমা[নে] (১০×১৪) বর্গ ইঞ্চি পরিমিত গর্তের সৃ[ষ্টি] হয়ে থাকে তবুও বিমানের মধ্যেকার চাপ [...] না বৃদ্ধি করেও বিমানটি উড়তে পারবে [...] অবশ্য শর্ত হোল বিমানটির কার্যক্ষমতা[কে] পূর্ণতায় আনতে হবে।

বিমানদস্যুদের প্রায় প্রত্যেকেই বিমা[ন] ছিনতাই কালে একই পন্থা অবলম্বন ক[রে] থাকেন। সেটি হোল রিভলবার বা [...] নিয়ে ককপিটে প্রবেশ করে পাইলট [...] কো-পাইলটকে স্বনির্বাচিত স্থানে বিমানটি[কে] নিয়ে যাবার নির্দেশদানে। কোন বিমান[দস্যু] যাত্রীদের আসনের কাছা[কা]ছি দাঁ[ড়িয়ে] ঘোষণা করে না যে [বিমা]নটির গতি[পথ] বদলাতে হবে; তা না হলে এখানে [...] বা গুলী ছোড়া হবে। যেহেতু সে [...] বিমানটির ধ্বংসে তার মনোবাসনা [...] হবে না। বিমান দস্যুদের এই মনোভাব[...] মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ ক[রে] ব[...] ককপিটটাকে 'বুলেট-প্রুফ' করে [...] হোক। এবং ককপিটে প্রবেশ পথ[কে] দুভাগে ভাগ করে এমন স্বয়ংক্রিয় [...] করা হোক যাতে বিমানদস্যুরা কক[পিটে] প্রবেশ করার অব্যবহিত পূর্বেই প্র[বেশ] পথের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞা[নী]দের এই অভিমতটিকে কতটা কার্য[কর] করা হচ্ছে তাতে অবশ্য গবেষকরা [...] নীরবতা বজায় রেখেছেন। তবে [...] ব্যবস্থা নেওয়া হোক না কেন, [বিমান]দস্যুদের নির্ণয়ে যদি বিমানবন্দরেই পু[ঙ্খানু]পুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে বিমানযা[ত্রীদের] বিমানে আরোহণের অনুমতি দেওয়া [হয়] তবেই 'বিমান-ছিনতাই' প্রতিরোধ করা [...] নয়তো বিপদের ঝুঁকি রাখতেই হবে।

তোৎলামি যদি শারীরিক কোনো ত্রুটির জন্য না হয় তাহলে সহজেই সারিয়ে তোলা যায়। বাচন-চিকিৎসাবিদের তত্ত্বাবধানে মাত্র তিন মাসের চিকিৎসায় একটি তোৎলা-ছেলে বা মেয়েকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব। এজন্য অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বড়ো রকমের উদ্যম থাকা দরকার। নিচের ছবিটি পূর্ব জার্মানী বা জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের একটি স্বাস্থ্য-নিবাসের, যেখানে তোৎলা বা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না এমন ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা করা হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ছোট ছেলেটি আয়নার সামনে বসে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে সঠিক উচ্চারণ শিখছে।

বিজ্ঞানের কথা

- তোৎলামির চিকিৎসা
- হাতে খিল ধরা
- মশা মারতে রসুনের তেল
- ছবি আঁকার যন্ত্র

সোভিয়েত ইউনিয়নে তোৎলামির [চিকি]ৎসা নিয়ে আগের একটি সংখ্যায় [লিখে]ছি। ইতিমধ্যে পূর্ব জার্মানি বা [জার্মা]ন গণতান্ত্রিক রিপাবলিককে তোৎলামি [সারানো]র আয়োজন সম্পর্কে কিছু খবর [আমা]দের হাতে এসেছে, তাও উপস্থিত [করা] চাই। আমি যতোদূর জানি, তোৎলা [বা যা]রা ঠিকভাবে কথা বলতে পারে না, [সেসব] ছেলেমেয়েদের সারিয়ে তোলার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এমন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পৃথক কোনো আয়োজনও নয়। অথচ ঠিকভাবে কথা বলতে না পারাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো প্রত্যঙ্গগত খুঁতের জন্য নয় (প্রত্যঙ্গগত খুঁতের জন্য হলে ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে যায়, কেননা সেক্ষেত্রে সরাসরি চিকিৎসা চলে)। ঠিক বয়সে ঠিকমতো নজর দিতে পারলে কথা বলার খুঁত পুরোপুরি সেরে যায়, এমনকি তোৎলামিও। বিষয়টি তুচ্ছ করার মতো নয়। ঠিক সময়ে নজর না দিলে এই ত্রুটি সারা জীবন থেকে যাবার সম্ভাবনা। এবং এই ত্রুটি থাকার ফলে কোনো ছেলের বা মেয়ের গোটা জীবনটাই মাটি হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একটি ছেলেকে জানি (অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র) যে চমৎকার গান গাইতে পারে। আশ্চর্য এই, গান গাইবার সময়ে সে সামান্যতম তোৎলাও নয়, কিন্তু কথা বলতে তার কী যে কষ্ট। আমার ধারণা, ঠিক বয়সে ঠিকমতো নজর দিতে পারলে ছেলেটির এই তোৎলামি সেরে যেত। শুধু বাপ-মা বা অভিভাবকের দ্বারা এই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালিত হতে পারে না। এজন্য চাই বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও সুনিবদ্ধ আয়োজন। পূর্ব জার্মানির মতো ছোট একটি দেশেও (মোট জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ) এ-বিষয়ে কতখানি আয়োজন রয়েছে ও রাষ্ট্র কতখানি দায়িত্ব পালন করছে, নিচের সংক্ষিপ্ত খবর থেকে তা জানা যাবে।

স্থানটির নাম থালহাইম শিশু স্যানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাস। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত এখানে ৩৫০ জন ছেলেমেয়েকে তোৎলা বা

ঠিকমতো কথা বলতে পারে না) চিকিৎসা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনেরও বেশি পুরোপুরি সেরে গিয়েছে, বাকিরাও প্রায় পুরোপুরি।

চিকিৎসা করা হয় ৯ থেকে ১০ বছরের মধ্যে, তিন মাসের জন্য। এই বিশেষ বয়সটি বেছে নেবার বিশেষ কারণ আছে। এ-বয়সের ছেলেমেয়েদের এটুকু বোঝার ক্ষমতা থাকে যে, চিকিৎসা কেন করা হচ্ছে ও সেরে ওঠাটা কেন দরকার। তাছাড়া, এইসব ছেলেমেয়ের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে তখনো পর্যন্ত পদার্থ-বিদ্যা বা জীববিদ্যা বা রসায়নের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে বাড়তি চাপ থেকে তারা মুক্ত। ৯ থেকে ১০ বছর বয়সটাই তোতলামি বা বাচনের ত্রুটি সারাবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

চিকিৎসার সময়ে শিক্ষা ও পরিচর্যার ভার থাকে মিলিতভাবে বাচন-চিকিৎসাবিদ ও ডাক্তারের ওপরে। ছেলেমেয়েরা এখানে আসে বিভিন্ন স্কুল থেকে, স্কুলের পড়া যাতে বজায় থাকে সেজন্য শিক্ষকরাও আসেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। এই অপরিচিত মানুষজনের মধ্যে থেকে ছেলেমেয়েরা সহজেই নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। চিকিৎসায় সুফল পেতে হলে এটা দরকার।

চিকিৎসায় তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বের স্থায়িত্ব দশ দিন। এই দশ দিনে ছেলে-মেয়েরা দিনে একুশ ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমোয় এবং যতোদূর সম্ভব কম কথা বলে। এর ফলে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা কমে।

দ্বিতীয় পর্বের স্থায়িত্ব ৩৮ দিন। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলা অভ্যেস করে। এজন্যে সহজ পাঠ্যবইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়।

তৃতীয় পর্বে (বাকি ৪২ দিনে) স্বাভাবিকভাবে কথা বলার ব্যাপারে ছেলে-মেয়েদের পুরোপুরি ধাতস্থ করে তোলা হয়।

চিকিৎসা করা হয় এই লক্ষ্য সামনে রেখে যে, চিকিৎসার পরে ছেলেমেয়েরা যেন সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলে গিয়েই পড়াশুনো করতে পারে, তাদের যেন আবার তোতলা বা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না এমন ছেলেমেয়েদের স্কুলে ফিরে যেতে না হয়। এ-কারণে তৃতীয় পর্বের অনেকখানি সময় ছেলেমেয়েদের বাসয়ে রাখা হয় সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলের ক্লাশে, যাতে তারা সাধারণ শিক্ষারীতির সঙ্গে পরিচিত হয়।

চিকিৎসার পরে ছেলেমেয়েরা যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় তখনই আসে আসল পরীক্ষা, তখনই বোঝা যায় চিকিৎসার সুফল স্থায়ী হচ্ছে কিনা। এটা অনেকখানি নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের পরিবেশের ওপরে। এ-কারণে চিকিৎসা শেষ হবার পরেও এইসব ছেলেমেয়েকে পরিচর্যায় রাখা হয়, স্বাস্থ্যনিবাসের শিক্ষকরা বাড়িতে ও স্কুলে এসে এইসব ছেলেমেয়ের অবস্থা দেখে যান। দরকার হলে তাদের জন্য মেডিক্যাল পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

তোতলা বা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না এমন ছেলেমেয়েদের সারিয়ে তোলার জন্য পূর্ব জার্মানির গভর্নমেন্ট মাথাপিছু প্রায় ৩,০০০ মার্ক (প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা) খরচ করে থাকেন।

এমনি ধরনের স্বাস্থ্যনিবাস পূর্ব জার্মানিতে এই একটিই নয়, আরো আছে। তাছাড়া আছে বিশেষ কিন্ডারগার্টেন। বড়োদের জন্য আছে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে এখনো এ-ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাষ্ট্রীয় বরাদ্দেরও অভাব। অথচ তোতলা বা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না এমন ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব কোনোক্রমেই শুধুমাত্র বাপ-মা বা অভি-ভাবকের ওপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উদ্যমও থাকা দরকার।

হাতে খিল ধরা

লেখক যদি লিখতে বসে টের পান যে তাঁর হাতে খিল ধরেছে, আঙুল সাড়া দিতে চাইছে না, কলম বাগিয়ে ধরাই একটা অসম্ভব ব্যাপার—তাহলে লেখকের পক্ষে সেটা কী মর্মান্তিক অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। লেখক হওয়া সহজ নয়, অনেক সাধনা ও অনেক চর্চা চাই সেজন্যে। কিন্তু এমন একটি দুরূহ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের পরেও যদি শুধু হাতে খিল ধরার জন্যে লিখতে না পারা যায় তাহলে লেখকের পক্ষে তা হয়ে ওঠে মৃত্যুর শামিল। অথচ শুধু লেখকদের বেলাতেই নয়—নাপিত, স্যাকরা, দরজি, চুরুটপ্রস্তুতকারক, বেহালা-বাদক ইত্যাদি অন্ততপক্ষে চৌত্রিশ রকমের জীবিকার ক্ষেত্রে এই একই লক্ষণ ধরা পড়েছে। তবে লেখকের হাতে খিল ধরাটাই এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ ইংরেজিতে বলা হয় রাইটার্স ক্র্যাম্প।

এটা যদি কোনো রোগ হত (অপুষ্টির দরুন বা চোট লাগার দরুন) তাহলে তার চিকিৎসা হতে পারত। নানাভাবে চিকিৎসাও করা হয়েছে—যেমন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করা, ট্র্যাকশন দেওয়া, ভিটামিন খাওয়ানো, প্লাস্টারের ছাঁচ পরানো ইত্যাদি—কিন্তু কোনো ফল হয়নি। লেখকের হাতে খিল লাগাটা কোনো শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির জন্যে নয়। এই লক্ষণগ্রস্ত লেখক যতোভাবেই বা যেমনভাবেই চেষ্টা করুন না কেন একটি-দুটি শব্দ লেখার পরেই তাঁর কলম থেমে যায়।

চিকিৎসকদের অভিমত, লেখকের হাতে খিল লাগার কারণটা একেবারেই মানসিক। অতএব একমাত্র মানসিক চিকিৎসাতেই এই লক্ষণটি দূর করা যেতে পারে। তবে এমনও দেখা গিয়েছে, বহুকাল হাসপাতালে রেখে উপযুক্ত পরিবেশে কষ্টসাধ্য মানসিক চিকিৎসায় লক্ষণটি হয়তো দূর করা গেল, কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়ে আবার কাজ শুরু করার পরে কোনো একটি সামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়তেই লেখক আবার এই লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, শরীর ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত আমরা সামান্যই জানি।

তবে সুখের বিষয়, এখনো পর্যন্ত লেখকের হাতে খিল ধরার লক্ষণটি মোটে ব্যাপক নয়।

মশা মারতে রসুনের তেল

দুজন ভারতীয় জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী সম্প্রতি রসুন থেকে এমন একটি নির্যাস তৈরি করতে পেরেছেন যা মশার বংশ সম্পূর্ণ নির্বংশ করতে পারে। তাঁদের ধারণা, ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই নির্যাসটি প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

এই দুজন ভারতীয় জৈবরসায়ন বিজ্ঞানীর নাম এস ভি আমোনকর ও [illegible] ব্যানার্জি। তাঁদের গবেষণা শুরু হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁরা তখন দেখেছিলেন যে, সদ্য-কুচনো রসুন থেকে নিষ্কাশিত তেল মশার শূককে ধ্বংস করে (তেলের ঘনত্ব দশলক্ষের ২০ ভাগ)। তার পরে তাঁরা বোম্বাইয়ে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে এই বিষয়টি নিয়ে দু-বছর ধরে গবেষণা করে সুনির্দিষ্ট ফল লাভ করতে পেরেছেন।

রসুন থেকে নিষ্কাশিত তেলে শূক নাশক পদার্থ হচ্ছে দু-রকমের সালফাইড। এই দুটি সালফাইডকে মিশিয়ে মাত্র দশ লক্ষে ২ ভাগ ঘনত্বে প্রয়োগ করলেই মশার শূক ধ্বংস হয়। অতঃপর এই দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী এই দুটি সালফাইড থেকে শূক নাশক একটি তেল প্রস্তুত করতে পেরেছেন। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, যেহেতু রসুন থেকে তৈরী অতএব মানুষের শরীরের পক্ষে এই তেল কোনোক্রমেই ক্ষতিকারক নয়। এদিক থেকে ডি-ডি-টির চেয়ে এই তেল প্রয়োগ করার সুবিধা অনেক বেশি। ডি-ডি-টির বিরুদ্ধে প্রধান যেটা আপত্তি, —ডি-ডি-টি মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর— তা এই রসুনের তেলের বেলায় টেঁকে না। সেই প্রাচীনকাল থেকেই রন্ধনের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে রসুন। অতএব রসুন তেল সম্পূর্ণ নিরাপদ ও যদৃচ্ছ [illegible] চলে।

কিন্তু এই কথাধার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উঠেছে। প্রতিবাদ করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার কাম্পিউটের বিজ্ঞান বিভাগের জন ম্যাককার্থি। তাঁর বক্তব্য এই: কোনো একটি পদার্থ বহুকাল ধরে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে না পদার্থটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এমনও হতে পারে আজকের দিনে যারা নিয়মিত রসুন খায় তাদের সন্তানদের মধ্যে খুঁতো সংখ্যা যারা রসুন খায় না তাদের সন্তানদের চেয়ে এক শতাংশ বেশি। এবং এমনও হতে পারে, প্রথমোক্ত সন্তানদের আয়ু শেষোক্ত সন্তানদের আয়ুর চেয়ে এক বছর কম। ব্যাপক পরিসংখ্যান না পাওয়া পর্যন্ত এবিষয়ে নিশ্চিত কোনো মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। এক সময়ে তো তামাক, অ্যালকোহল ও ম্যালেরিয়াবাহী মশাকেও অ-ক্ষতিকর মনে করা হত। অ্যালার্জিক

মাত্রই নিরাপদ, এমন একটি বিপদের কারণ হতে পারে। মশার ধ্বংস করার কাজে রসুনের তেল তাঁর প্রধান আপত্তিঃ ক্লিন্ডিক্স-টি ন ক্ষতিকর, এই তেল তার চেয়ে ক্ষতিকর এমন কথা কিছুতেই ধরে চলে না। যে-সব পশু-পাখি রসুনে তারা এই রসুনের তেলের সংস্পর্শে রাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হবে না, এমন জোর দিয়ে বলা চলে না।

পর জনসংখ্যা কমছে

সের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফিক স্টাডিজ-এর একজন বিজ্ঞানী র উনিশটি দেশের জনসংখ্যার পর্যালোচনা করে দেখেছিলেন যে জন্মের হার কমছে। একমাত্র ফ্রান্সেই হার মৃত্যুর হারের চেয়ে সামান্য কিন্তু পশ্চিম জার্মানি, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, পর্তুগাল, চেকো-কয়া ও হাঙ্গেরিতে জন্মের হার হারের চেয়ে কম। সুইজারল্যান্ড, ও পূর্ব জার্মানিতে জন্মের হার হারের সমান, অর্থাৎ এই দেশ- জনসংখ্যা কমেও না, বাড়েও না। জনসংখ্যা আস্তে আস্তে কমছে। তে জন্মের হার কমের দিকে। ড জনসংখ্যা ১৯৬৮ সাল থেকেই তে বেড়ে চলেছে।। সোভিয়েত ন জন্মের হার ১৯৬০ সাল যতোটা চাবে কমছিল এখন আর তা নেই।

মেরিকায়

জ্ঞান ও ধী-বিরোধী কার্যকলাপ এমন য়েক বছর আগেও যা ছিল এখন চেয়েও অনেক বেশি ব্যাপক। রকান কলেজ-ছাত্রদের ভিড় জ্যোতি-নের চেয়ে জ্যোতিষীতে দশগুণ (আমেরিকার পদার্থবিজ্ঞানী ডি নের অভিমত, 'টাইম' পত্রিকা থেকে ই জানুয়ারি 'নিউ সায়েন্টিস্ট' য় পুনর্মুদ্রিত)।

আঁকার যন্ত্র

ই সঙ্গে যে ছবিটি দেওয়া হল সেটি অতি-আধুনিক কোনো ভাস্করের মনে হতে পারে। আসলে এটি একটি আঁকার যন্ত্র, নাম 'মেটামিটিক', একজন ররই সৃষ্টি। ১৯৫৯ সালে এই ক প্যারিসের একটি প্রদর্শনীতে ত করা হয়েছিল। দর্শকরা যতোবার যন্ত্রের ফুটোয় পয়সা ফেলেছিল র (মোট প্রায় ৪০,০০০) এই যন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল এক-একটি বহুবর্ণ এক-একটি ছবি আঁকা হতে সময় প্রায় পনেরো মিনিট করে: প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন।

বে যন্ত্র বলতে যা বোঝায়, ছবি জন্য তেমনিধারা একটি যন্ত্র প্রথম হয়েছে জাপানে, ১৯৬৮ সালে। নাম 'অটোমেটিক পেইন্টিং মেশিন নং ১।' প্রস্তুতকারক: টোকিওর কম্পিউটার টেকনিক গ্রুপ। ১নং বলা হলেও ২নং যন্ত্র কোনো কালেই তৈরি হয়নি।

যন্ত্রটি চারটি বিভিন্ন উপায়ে চালিত হতে পারে—পৃথক পৃথকভাবে বা যৌথ-ভাবে। এক হাতে চালানো, দুই, কাগজের ফিতেয় প্রোগ্রামের দ্বারা চালানো; তিন, ঘটনার এলাকা থেকে আগত শব্দের দ্বারা চালানো। চার, ঘটনার এলাকা থেকে আগত আলোর দ্বারা চালানো। তাছাড়া পিয়ানোর কী-বোর্ডের মতো একটি ব্যবস্থার চাবি টিপেও যন্ত্রটি চালানো যেতে পারে।

ঘটনার এলাকা হচ্ছে সামনের গ্যালারি। সেখানে মানুষজনের যাতায়াতের ফলে বিভিন্ন শব্দ হচ্ছে ও বিভিন্ন আলো—তারই ফলে ক্যানভাসের ওপরে রঙের প্রলেপে তারতম্য ঘটছে।

ছবি আঁকার জন্য আছে চারটি রঙ ছিটোবার ব্যবস্থা বা স্প্রে, চারটিতেই প্রাথমিক রঙ। বৈদ্যুৎ-চুম্বক ভালভ-এর মধ্যে দিয়ে চালিত সংনমিত বাতাসের দ্বারা এই চারটি স্প্রে চালিত।

আয়োজন ও ব্যবস্থা ছিল এমনই যে প্রস্তুতকারকরা আশা করেছিলেন, যন্ত্র থেকে ভয়ানক সব ছবি পাওয়া যাবে। সুখের বা দুঃখের কথা, তা পাওয়া যায়নি। এই যন্ত্রটি থেকেও নয়, মেটামেটিক থেকেও নয়। পিকাসো নাকি দূরে থেকে ক্যান-ভাসের ওপরে রঙ ছুঁড়ে দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন। এই যন্ত্র তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি—মানুষজনের চলাফেরার শব্দ ও আলো ধরার এত যান্ত্রিক আয়োজন সত্ত্বেও।

পুরনো ইতিহাস থেকে

১৯২০ সাল, আইনস্টাইন তখন থাকতেন বার্লিনে, ৫নং হাবেরলান্ডস্ট্রাসে-তে। বার্লিনে যাঁরাই আসেন এই ঠিকানায় একবার আসা চাই-ই। পরবর্তী কালে তাঁরা অনেকেই স্মৃতিকথা লিখেছেন, যা থেকে আইনস্টাইন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গিয়েছে।

বাড়ির মালিক এক ধনী ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন আইনস্টাইনের একান্ত গুণ-গ্রাহী এবং আইনস্টাইনকে ভাড়াটে হিসেবে পাবার জন্যে তাঁর ব্যগ্রতার সীমা ছিল না। আইনস্টাইনের ফ্ল্যাট ছিল নয়-কামরার। সেখানে তিনি থাকতেন তাঁর স্ত্রী এলসা, স্ত্রীর আগের পক্ষের দুই কন্যা ইলজ ও মার্গোট ও অল্প কিছুকালের জন্য তাঁর মাকে নিয়ে।

বাড়ির আসবাব ছিল খুবই সাধারণ। দেয়ালে উজ্জ্বল ফুল আঁকা কাগজ, পরি-বারের লোকজনের ছবি, দুই কুকুর সমেত ফ্রীডরিখ দ্য গ্রেটের প্রতিকৃতি ও কোণের দিকে পিয়ানো। বার্লিনের অন্য যে-কোনো ফ্ল্যাট থেকে এটি কোনো দিক থেকেই পৃথক ছিল না। যদি কেউ শুধু আসবাব দেখে আইনস্টাইন সম্পর্কে ধারণা করতে চাইতেন তবে তাঁকে হতাশ হতে হত। মানুষটিকে বোঝা যেত একমাত্র তাঁর লাইব্রেরি-ঘরে প্রবেশ করার সুযোগ পেলে।

এই লাইব্রেরি-ঘরটি ছিল অন্য সমস্ত ঘর থেকে একটু তফাতে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে। জানলার ধারে কাল ও সাদা কাপড় ঢাকা গোল টেবিল, তার ওপরে ছড়ানো তামাকের ছাইয়ের মধ্যে অজস্র পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা। দেওয়ালের তাকে তাকে বৈজ্ঞানিক বই, পত্রিকা ও দুটি মোটা বাইবেল। দুটি চেয়ার ও একটি কৌচ। একটি তাকে ভয়ানক রকমের চুল-ভর্তি মাথা এক বৃদ্ধ ইহুদীর মূর্তি। এই মূর্তির একটু ইতিহাস আছে। আইন-স্টাইনের মাথা থেকে প্রচণ্ডভাবে চুল উঠতে শুরু করেছিল। তখন এলসা পরামর্শ দিলেন প্রচুর পেঁয়াজ খেতে, পেঁয়াজ থেকে নাকি চুলের গোড়া শক্ত হয়। আইনস্টাইন এই পরামর্শ শুনলেন। তখন কন্যা মার্গোট মূর্তিটি তৈরি করে আর নাম দেয় 'স্বাবি স্বাবেল' (জার্মানভাষায় স্বাবেল অর্থ পেঁয়াজ)। আইনস্টাইনকে মার্গোট বলে, 'পেঁয়াজ খেলে এমনি মাথাভর্তি চুল হবে আর কোমর পর্যন্ত দাড়ি।' মূর্তিটি আইন-স্টাইনের খুবই পছন্দ হয়েছিল।

পরিবারের মধ্যেকার সহজ ও অন্তরঙ্গ আবহাওয়াটি এই মূর্তির মধ্যে যেন ধরা পড়েছিল। এছাড়া ছিল আগেকার ভাড়াটের ফেলে যাওয়া আরো কিছু টুকিটাকি জিনিস। এতে আইনস্টানের কোনো অসুবিধে হত না অপরের রুচিকে তিনি সহজেই গ্রহণ করতে পারতেন। তাঁর টেবিলের ওপরে ছিল নিউটনের একটি ছবি আর তার পাশেই ছোট একটি টেলিস্কোপ। বাইরের লোক দেখা করতে এসে কখনো কখনো জিজ্ঞেস করত টেলি-স্কোপটি তিনি কখনো ব্যবহার করেছেন কিনা। আইনস্টাইন জবাব দিতেন, 'না বন্ধু আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যেস আমার নেই। আমার আগে এখানে থাকতেন একজন মুদী, এই টেলিস্কোপটি তাঁর। আমি এটাকে শুধু একটা খেলনার মতো রেখে দিয়েছি।' কখনো বা প্রশ্ন হত, তাঁর নিজের যন্ত্রপাতি তিনি কোথায় রেখেছেন? আইনস্টাইন হাসতেন আর নিজের কপালে টোকা দিয়ে দেখাতেন। কখনো বা প্রশ্ন হত, তাঁর ল্যাবরেটরি কোথায়? আইনস্টাইন নিজের কলমটি দেখাতেন।

'আপনি কতক্ষণ কাজ করেন?'

আইনস্টাইন এধরনের প্রশ্নের কোনো জবাবই দিতে পারতেন না। চিন্তা করাটাই ছিল তাঁর কাজ।

আইনস্টাইন পাল্টা প্রশ্ন করতেন, 'আপনি দিনে কত ঘণ্টা কাজ করেন?'

'এই ধরুন, আট কি নয় ঘণ্টা।'

কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে আইনস্টাইন বলে উঠতেন, 'আমি অতক্ষণ কাজ করতে পারি না না, দিনে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আসলে হচ্ছে আমি মোটেই অধ্যবসায়ী নই।'

—অমরকান্ত

শ্রীমা'র আশীর্ব্বাদধন্যা নীরদা

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

সেই সায়েবের এক পা খোঁড়া ছিল।

খোঁড়া পায়ে সায়েব ঘোড়া হাঁকিয়ে পল্লীতে কখনো এসেছিল কিনা তা তাঁর জানা ছিল না। সায়েবকে দেখাও যায়নি কখনো। জ্ঞান হবার পর থেকে শুনে আসছিলেন পল্লীর সবাই বলতো 'খোঁড়া সায়েবের বাগান'।

নীরদাসুন্দরীর একটা চোখের মণি শুকিয়ে গেছে। মণিটা শুকিয়ে একটা ঢেলার মত হয়ে গেছে। ডান চোখটা নিতান্ত নিস্তেজ। অথচ এই দুটো মণিই একদিন চক চক করত। বয়স যখন আট বছর তখন থেকে বার্ধক্য নামার অনেকগুলো দিন আগে পর্যন্ত ঐ দুটো চোখের মণি হাসত। কখনো কথা বলত। গানের সংগে চোখ দুটো যেন গাইত। নাচের তালে তালে এই চোখ দুটো যেন নাচত। দর্শকরা একদিন এই দু চোখের করুণ অভিব্যক্তিতে ব্যথিত হতেন, আবার এই চোখেরই মিষ্টি দৃষ্টিতে হতেন খুশি। উদ্বেল। সেই চোখ দুটো আজ থেকেও নেই। ডান দিকের চোখটা থেকে জ্যোতি সরে গেছে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। চোখ দুটোর নীচেকার মাংস ঝুল ঝুল করছে। চায়ের কাপটা যতক্ষণ হাতে ছিল ততক্ষণ জলতরঙ্গের মত একটা শব্দ তুলছিল। মাঝে মাঝে হাঁপাচ্ছিলেন। একটু বিশ্রাম। তারপর এক সময় সেই চোখ দুটো বুজলেন একসময় নীরদা সুন্দরী। আমি বুঝলাম স্মৃতির অলিন্দে যেন একবার ঘুরে এলেন তিনি।

বললেন, এখন যেখানে 'গিরিশপার্ক' সেখানে একটা পল্লী ছিল, যাকে সবাই বলতো 'খোঁড়া সায়েবের বাগান'।

হ্যাঁ ঠিক তাই।

প্রায় আশী বছর আগে ঠিক তেমনিই ছিল। কয়েকটা টিনের ছাউনী দেওয়া, পাকা আর মাটির কাঁচা দেওয়ালের বাড়ি ছিল। অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা গোটা একটা বস্তি। তারই একটা ঘরে এই নীরদা সুন্দরীর প্রথম পৃথিবীর আলো দেখা। পৃথিবীর আলোয় আসা। এ ঘটনা আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগেকার ঘটনা।

আর আজ আশী বছর পর এখানে। এই শ্যামপুকুর।

বিছানার উপরে একটা হাত।

মাংসশূন্য দুর্বল হাতটা দিয়ে বিছানার উপরে কি যেন খোঁজার চেষ্টা। মনের অলিন্দে গভীর অন্ধকারে চাপা পড়ে যাওয়া অতীতটাকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেলেন নীরদা সুন্দরী। বুঝলাম। নীরবে দেখলাম। এই বিছানা। এই নোংরা-মলিন বিছানা আমার মনের রং-এ রাঙানো কল্পনার সেই অতীত বিলাসের একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের ছবি যেন ভাবনার আলোয় মূর্ত হয়ে উঠল। কথা বলতে বলতে নীরদা সুন্দরী মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছেন। আবার দাঁত-বিহীন মুখে হাসি। সতেজ শুদ্ধ কণ্ঠস্বর। স্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ। কাঁপা কাঁপা স্বরে নীরদা সুন্দরী বললেন, আমার আবার দেশ কোথায়! আমার দেশ এই কলকাতা। জন্মস্থান বলতে ঐ খোঁড়া সায়েবের বাগান—কথাটা শেষ করে আবার হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

নীরদা সুন্দরীর বাবা ছিলেন ডাক্তার। আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন নীরদা সুন্দরী। কন্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, আপনারা আমাকে কি মনে করেন বলুন তো? জানেন না আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন?

কথাটা শেষ করে আবার হাসলেন। বললেন, তা জানবেও কি করে আপনারা? তিনি তো স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন না—

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল দত্ত ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। অখ্যাত ডাক্তার। ডাক্তার ছিলেন বটে মহেন্দ্রলাল তবে ডাক্তারীতে পসার ছিল না। সেদিক থেকে নিতান্ত সাধারণ এক পরিবারে নীরদা সুন্দরীর জন্ম। ১৮৯৪ কিংবা '৯৫ খৃস্টাব্দে জন্মেছিলেন নীরদা সুন্দরী। এই প্রসঙ্গে কিছু বলতেই ইচ্ছে ছিল না তাঁর। রীতিমত খিটখিটে মেজাজ নিয়ে বললেন, অত সাল তারিখ কে মনে রাখে বাপু—এখন আমার আটাত্তর-আশী বছর বয়স হিসেব কষে বার করুন আমাকে বিরক্ত করবেন না—আবার সেই বিছানায় হাত বোলানো। হয়তো আবার হারানো অতীত খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা।

নীরদা
(স্টুডিও মীরেনের সৌজন্যে)

জ্ঞান হবার পর এই দীনতা-দারিদ্র্য দেখে নীরদা সুন্দরীর এতটুকু দুঃখ ছিল না। দু বেলা ভাল করে খাওয়াও জুটতো না সেই কিশোরী নীরদার। হাসি হাসি মুখে আবার বললেন নীরদা সুন্দরী, আমার খুব লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করত, কিন্তু তা আর হল না, দু বেলা ভাল করে খেতে পেতুম না বলেই তো মা আমাকে কাজে লাগিয়ে দিলে—

নীরদা সুন্দরীর মা 'তরঙ্গিনী' আট বছরের কচি মেয়ে নীরদাকে পাঠালেন কুসুমের কাছে। নটী কুসুমকুমারীর তখন নাট্যজগতে খুব খ্যাতি। তরঙ্গিনীর সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল কুসুমকুমারীর। আবার হাসলেন নীরদা সুন্দরী। এক গাল খুশির হাসি। হাসতে হাসতে বললেন, আপনারা জানেন না কুসুমকুমারীকে? ওই যে অমর দত্তের কুসুমকুমারী—কথা বলতে বলতে মুহূর্তে অভিব্যক্তির পরিবর্তন। একরাশ বিরক্তিতে গোটা মুখটা বিকৃত। রীতিমত বিরক্তির সুরে বললেন, অমর দত্তকে জানেন না? 'ক্লাশিক থেটারের' অমর দত্ত, কুসুমকুমারী ছিল তার মেয়েমানুষ, সেই কুসুমকুমারী আমার মাকে দিদিমা বলে ডাকত—আমার মার দেশ কোথায় ছিল আমি তো জানি না, শুনেছি আমার মার দেশের মেয়ে কুসুমকুমারী। আমার মা তাই তাকে খুব ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে কুসুমকুমারী যখন আমার মার কাছে আসত, শুনেছি তাকে খুব স্নেহ করতেন। মুড়ি ভেজে খাওয়াতেন।—

'তরঙ্গিনী'র অনুরোধ তাই সেদিন প্রত্যাখ্যান করেন নি কুসুমকুমারী। সব কথা শুনে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্লাশিক থিয়েটারে' নীরদাকে নিয়েছিলেন কুসুমকুমারী। তখন নীরদা সুন্দরীর বয়স আট অথবা ন' বছর। অমরেন্দ্রনাথের থিয়েটারে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষানবীশ হিসেবেই আসতে হয়েছিল নীরদা সুন্দরীকে। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত খ্যাতিতে, প্রাচুর্যে তখন নাট্যজগতের মধ্যাহ্ন গগনে। অমরেন্দ্রনাথের 'ক্লাশিক থিয়েটার' তখন বিডন স্ট্রীটে। ক্লাশিক থিয়েটার বিডন স্ট্রীটের যেখানে অবস্থিত ছিল বর্তমানে সেই জমি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর নীচে চাপা পড়ে গেছে। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাশিক থিয়েটার অমরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় নির্মিত কোন রঙ্গমঞ্চ নয়। আসলে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে 'এমারেলড্ থিয়েটার ভাড়া করে সেখানে 'ক্লাশিক থিয়েটার' খোলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটু বিস্তারিত বলা দরকার।

আজকের স্টার থিয়েটারের গোড়াপত্তন হয় 'ক্লাশিক থিয়েটার' বিডন স্ট্রীটের যেখানে অবস্থিত ছিল সেই জমিতে। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, তাঁর নাম গুরমুখ রায় ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে সেই জমির উপরে স্টার রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। রঙ্গমঞ্চের মালিক ছিলেন গুরমুখ রায়, কিন্তু জমির মালিক ছিলেন কীর্তি মিত্র মহাশয়। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে যখন গুরমুখ রায় মারা গেলেন তখন সেই রঙ্গমঞ্চটি কিনে নেন অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র। বাংলা দেশে তখন সাধারণ রঙ্গশালার মোটামুটি স্থিতাবস্থা। দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও স্টার থিয়েটার চালাতে পারেন নি। অনেক টাকা ঋণও হয়ে যায়। বলা বাহুল্য গিরিশ ঘোষ তখন এই মঞ্চে যোগদান করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে এই মঞ্চেই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পদধূলি দেন।

রঙ্গমঞ্চ চালাবার ব্যাপারে অমৃতলাল বসুরা যখন অক্ষম হলেন তখন মতিলাল শীলের বংশধর গোপালচন্দ্র শীল এই রঙ্গমঞ্চটি কিনে নেন। শুধুমাত্র স্টার এই নামটি তিনি কিনতে পারেন নি। তাই গোপাল শীল রঙ্গমঞ্চের নামকরণ করেন 'এমারেল্ড থিয়েটার'। এই মঞ্চে এলেন আরও অনেক খ্যাতিমান নটনটী। ১৮৯৬ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া করে ক্লাশিক থিয়েটার নাম দিয়ে থিয়েটার শুরু করেন। নীরদা সুন্দরী এলেন সেই থিয়েটারে।

নীরদা সুন্দরীর মুখটা চক চক করে উঠলো। খুশি খুশি মন নিয়ে বললেন, আমি তখন থেকে অমরেন্দ্রনাথের কুসুমকুমারীর কাছে থেকে গেলুম—থাকতুম অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বাগান বাড়িতে, বাগমারীতে অমরেন্দ্রনাথের বাগানবাড়ি ছিল—এখন যেখানে রেলপুল, তার গায়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে অমরেন্দ্রনাথের বাগান বাড়ি ছিল—

কুসুমকুমারী থাকতেন সেই বাগানবাড়িতে। নীরদা সুন্দরীকেও কুসুমকুমারী সেই বাড়িতে নিজের কাছে রাখলেন। নীরদা ওখানে থাকতেন আবার কুসুমকুমারী অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসতেন বিডন স্ট্রীটে ক্লাশিক থিয়েটারে। ওখানে নাচগান শিখতেন। নাটকের রিহার্সাল হত। তারপর আবার ওদেরই সঙ্গে ফিরে আসতেন বাগমারীতে।

নীরদা সুন্দরী অনেকক্ষণ পর চোখটা খুললেন। নিস্তেজ চোখ জোড়া নিয়ে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করলেন। কথা বলতে গেলে এখন কষ্ট হয় নীরদা সুন্দরীর। নিজের হাতে নিজের বুকটা মাঝে মাঝে চেপে ধরেন। এখন ঠিক এই মুহূর্তে তাই হল। একটু বিশ্রাম নিলেন। হাসতে হাসতে একটা দুঃখের কথা বললেন। বললেন, নাচ শিখতুম, গান শিখতুম, থিয়েটার শিখতুম—ওদের বাগানবাড়িতে থাকতুম, ওরা আমাকে খেতে দিত, জামাকাপড় কিনে দিত আর অমরেন্দ্রনাথ দশটা করে টাকা দিত আমার মাকে—

নীরদা সুন্দরীর তবুও লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক। বই পড়বার জন্য বালিকা নীরদার ভিতরকার মানুষটা ছটফট করত। কুসুমকুমারী বুঝেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন। তারপর একদিন নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন হেদুয়ার পিছনে একটা ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলে। ডাফ লেনে ডাফ স্কুলে। তখন মেমসাহেবেরা ছিলেন ওখানকার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বললেন নীরদা সুন্দরী। কুসুমকুমারীর অনুরোধে নীরদাকে তাঁরা ভর্তি করে নিলেন। কদিনের মধ্যে বেতন মকুব। হাসতে হাসতে বললেন নীরদা সুন্দরী, আপনারা আমার বয়সের অনেক ছোট, নাতির বয়সী—'তুমি' বলাই উচিত, তবুও তুমি বলতে পারি না কাউকে—আমি লেখাপড়াজানা মেয়ে—বয়সে ছোট আর বড় যা-ই হোন 'তুমি' বলে ডাকাটা অন্যায়, অসভ্যতা, সেই ছোট বয়েসেও আমি আমার সমবয়সীদেরও আপনি বলতাম, আমি হতে পারি ঝিয়ের মেয়ে, হতে পারি ছোট, তবুও শিক্ষা তো ছিল—তাই ডাফস্কুলের মেমসাহেবরা আমাকে খুব ভালবাসতেন, মাইনে নিতেন না—

কুসুমকুমারীর মেয়ে নীরদা সুন্দরী। তখন সবাই তাই জানতো। ক্লাশিক থিয়েটারের অন্য সমবয়সী মেয়েরাও জানতো কুসুমকুমারীর মেয়ে নীরদা। কুসুমকুমারী ঠিক তেমনিভাবেই ভালবাসতেন নীরদাকে। নীরদা বললেন, আমি ক্লাশিক থিয়েটারে কার কাছ থেকে গান শিখতুম জানেন না? ন্যাপেন বাবুর কাছে—

কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার নৃপেন্দ্রনাথ বসুর তখন খুব খ্যাতি। গোটা নাট্যজগতে তখন তাঁর খুব নামডাক। সেই নৃপেন্দ্রনাথ বসুর কাছে গান শিখতেন নীরদা। কথা বলতে বলতে রেগে গেলেন নীরদা সুন্দরী। তিরিক্ষি মেজাজে বললেন, বললুম তো ওই বয়সেই আমাদের সব শিখতে হত। অপেরা মাস্টার দেবের কাছেই তো নাচ শিখেছিলুম।

অপেরা মাস্টার বলতেই সবাই এক ডাকে চিনতেন দেববাবুকে। দেবকণ্ঠ বাগচী তখন নৃত্যশিল্পী হিসাবে স্বনামধন্য। দেবকণ্ঠ বাগচীর কাছেই নাচ শিখতেন নীরদা সুন্দরী। আর অভিনয় শেখাতেন স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'তরঙ্গিনী' মাঝে মাঝে মেয়েকে গিয়ে দেখে আসতেন। এইভাবেই বছর দু-তিন কাটল।

নীরদা সুন্দরীর বয়স যখন এগার ঠিক সেই সময় বাবা মারা গেলেন। মহেন্দ্রলাল দত্ত মারা যাবার পর তরঙ্গিনী পড়লেন দুর্বিপাকে। দারিদ্র্য যেন গ্রাস করতে চায়। তরঙ্গিনী শুরু করলেন কাজ। আজকে অনেকের কাছে যে কাজ মূল্যহীন, যে জীবন ঘৃণ্য তরঙ্গিনী সেই পথেই চললেন। শুরু করলেন ঝি-বৃত্তি। কলকাতার কয়েকটি বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে লাগলেন তরঙ্গিনীর মা। নীরদা সুন্দরী তখন ক্লাশিক থিয়েটারে নিয়মিত শিল্পী। 'নির্মলা' নাটকের একটি চরিত্রের অভিনেত্রী। 'নির্মলা' যখন খোলা হয় নীরদা তখন ক্লাশিক থিয়েটারে। অনেক দিন ধরে রিহার্সাল দেবার পর নীরদা সুযোগ পেলেন অভিনয় করার। এ নাটকে 'বাঁশরী' কোন বিশেষ চরিত্র নয়। অনেকের মধ্যে বাঁশরী একজন। বাঁশরী এ নাটকে অনেকের সঙ্গে নাচত, গাইত। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'নির্মলা' নাটকের বাঁশরী বলে একটি মেয়ের ভূমিকায় নীরদা নিয়মিত অবতীর্ণ হতেন। এইভাবেই চলছিল। এই নাটকে প্রথম কিছুদিন খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তদানীন্তনকালের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী।

নির্মলা চরিত্রে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিছুদিন পর সেই নির্মলা নাটকের নির্মলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তখনকার দিনের স্বনামধন্যা শিল্পী প্রমদা সুন্দরী। 'কেষ্ট' চরিত্রে অভিনয় করতেন কুসুমকুমারী স্বয়ং।

নীরদা সুন্দরী আবার সহজ হলেন। হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের আমলে নাটকের চরিত্রগুলো ঠিকমত ফুটিয়ে তোলার জন্য ছেলে কিংবা মেয়ে বিচার করা হত না। কোন পুরুষ চরিত্রের যদি মঞ্চে গান গাইবার প্রয়োজন হত তখন গান জানা পুরুষ মানুষ না পাওয়া গেলে, গান জানা মেয়েমানুষকে দিয়েই সেই পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করতে হত—'কেষ্ট' চরিত্রের জন্য তাই কুসুমকুমারী নির্দিষ্ট ছিলেন—কথা বলতে বলতে ভারাক্রান্ত হলেন নীরদা সুন্দরী। ভারী স্বরে বলেছিলেন, অমরেন্দ্রনাথের মত মানুষ কজন আছে?

অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার চালাতে গিয়ে কোন ব্যাপারে তিনি ভীত হতেন না। ভাল নাটক না পেলে তিনি যেমন মুহূর্তে নাটক লিখে নিতে পারতেন, তেমনি কেউ তাঁর প্রতি কটাক্ষ করলে তিনি তার জবাব দিতেও দেরী করতেন না। একাধারে তিনি ছিলেন অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, নাট্যকার; অন্যদিকে নাট্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সাধারণ রঙ্গশালার উন্নতির জন্য অমরেন্দ্রনাথ দত্তের দান নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস কখনও ভুলতে পারবে না। অমরেন্দ্রনাথ নাটক আর নাট্যশালার জন্য প্রকৃতপক্ষে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন তা নয়, নাটক আর নাট্যশালার প্রসার এবং প্রচারের জন্য তিনি একটি পত্রিকাও প্রকাশ করে-

ছিলেন। নাম ছিল 'রঙ্গালয়'। রঙ্গালয় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী। ক্লাশিক থিয়েটার থেকেই প্রকাশিত হত 'রঙ্গালয়'।

আজকের দিনে মঞ্চ বিষয়ক পত্রপত্রিকার প্রাচুর্য অনেক না হলেও কয়েকটি বিদ্যমান। 'রঙ্গালয়' ছিল মঞ্চবিষয়ক পত্র-পত্রিকার পথ-প্রদর্শক। অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রবর্তক।

এই পত্রিকার প্রকাশনার পর থেকেই প্রায় প্রতিদিনই অমরেন্দ্রনাথকে একটার পর একটা জটিল সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। প্রতিটি সমস্যাই অমরেন্দ্রনাথ হাসিমুখে কাটিয়ে উঠেছিলেন বটে, তবে মানসিক একটা যন্ত্রণা তার ছিলই। কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সেই সমস্যা তিনি নস্যাৎ করে দিতেন। তার প্রথম সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। তিনি আশা করেছিলেন 'রঙ্গালয়ের' সম্পাদক হবেন। তা হন নি। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পত্রিকাটিকে চালাবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক নির্বাচন করেছিলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়কে। ওদিকে পূর্ণচন্দ্র দুঃখিত। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত না হয়েও রীতিমত চ্যালেঞ্জ করে 'নবযুগ' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করেছিলেন। 'রঙ্গালয়' তখন সবারই প্রিয় হয়ে উঠেছে। 'রঙ্গালয়' পড়বার জন্য তখনকার প্রায় সকলেই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ কাগজকে দাঁড় করাবার জন্য মরিয়া হয়ে গেলেন। একটি কাগজের ছাপতে খরচ হত ছয় পয়সা কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ সেই 'রঙ্গালয়' বিক্রী করতেন মাত্র দুই পয়সায়। মূল্যবান আর্ট পেপারে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবিও ছাপতেন। অমরেন্দ্রনাথ পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখে বুঝলেন, কাগজের শ্রীবৃদ্ধি বাড়লে, চাহিদা বাড়লে ক্লাশিক থিয়েটারেও দর্শক সংখ্যা বাড়বে। এই কথা ভেবে অমরেন্দ্রনাথ কাগজের গ্রাহক সংখ্যা লক্ষাধিক করার জন্য এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি রঙ্গালয়ের যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁদের বিনা পয়সায় গিরিশ-গ্রন্থাবলী অমর-গ্রন্থাবলী প্রভৃতি উপহার দিতে মনস্থ করলেন, এতেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না। ঠিক করলেন বছরে একদিন ক্লাশিক থিয়েটারে গ্রাহকদের থিয়েটার দেখাবেন। যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার রসিদ দেখাতে পারবেন তাদেরকেই বিনা পয়সায় নাটক দেখানো হবে। হলো তাই। গ্রাহক সংখ্যাও বাড়ল। অন্যদিকে অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাও হতে থাকল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছুদিন পর 'রঙ্গালয়' প্রসঙ্গে তাঁর অনেক চেষ্টায় তৈরী করা পাঠক আর গ্রাহকদের কাছ থেকে অনেক অভিযোগ আসতে শুরু করল। থিয়েটার নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকার জন্য রঙ্গালয়ের দিকে ভাল করে তাকাবার অবকাশ তখন ছিল না অমরেন্দ্রনাথের। রঙ্গালয় দিন দিন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। ব্যথিত হলেন অমরেন্দ্রনাথ। একদিন পাঁচকড়িবাবুকে ডেকে এই অভিযোগ-অনুযোগের কথা বললেন তিনি। বললেন, আমার গ্রাহকরা অনুযোগ করুক আমি চাই না—টাকা যত লাগে আমি দেব আপনি শুধু ভাল করে চালান—পাঁচকড়িবাবু আবার পূর্ণোদ্যমে কাগজ চালাতে লাগলেন। এদিকে লোকসানের খাতায় দাঁড়াল ষাট হাজার টাকা। এর মধ্যে আবার দুটো মানহানির মামলাও চলছিল অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

একটি মামলা সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু-সহচর পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে। অন্যটি তদানীন্তন কালের বসুমতী পত্রিকার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় মামলাটি যদিও আপোসে মিটে গেল। পূর্ণবাবু কিন্তু দমতে চাইলেন না। পূর্ণবাবু অবশেষে মামলার নেশায় বুঁদ হয়ে হাইকোর্টে আপিল করলেন। ফলে একদিন হাইকোর্টের মামলার খরচ চালাতে গিয়ে পূর্ণবাবু জড়িয়ে পড়লেন ঋণে। তখন তাঁর নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম।

নীরদাসুন্দরী একটা শুকনো নিশ্বাস ফেললেন, একটা চাপা যন্ত্রণায় তিনি কাতর মনে হল। বললেন, অমরেন্দ্রনাথের মত মন—তার মত উদার মানুষ আর দেখা যায় না। এই মামলার ব্যাপারে কোথায় তিনি পূর্ণবাবুকে তিরস্কার করবেন তা নয়—ভদ্রতা করলেন—টাকা দিয়ে শত্রুকে সাহায্য করলেন—

একদিন ক্লাশিক থিয়েটারে এসে হাজির হলেন পূর্ণবাবু।

অমরেন্দ্রনাথ ভাবলেন হয়তো থিয়েটার দেখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পূর্ণবাবু জানালেন তিনি থিয়েটার দেখতে আসেননি। তারপর বললেন মামলা চালাতে গিয়ে তিনি আজ সর্বস্বান্ত। অনেকদিনের বাড়ি ভাড়াও বাকি পড়েছে। পরিবারবর্গ নিয়ে পথে দাঁড়াবার অবস্থা।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সব শুনে সেদিনকার টিকিট বিক্রীর সব টাকা কাউন্টার থেকে আনিয়ে তুলে দিয়েছিলেন পূর্ণচন্দ্রের হাতে। এ ছাড়া নাট্যজগতের ইতিহাসে আরও অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়ে গেছেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নীরদাসুন্দরী চুপ করলেন। ইদানীং এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বললে শ্বাস-কষ্ট হয়। তেমনি একটা কষ্ট হচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে, খানিকটা সুস্থ হবার পর বললেন, জীবন ছিল এই সব মানুষদের, গিরিশ ঘোষদের,—আমাদের আবার জীবন! নটী জীবন জানবার জন্য কার বা মাথাব্যথা।

চুপ করলেন। একটা অভিমান। কিসের অভিমান তা বলতে চান না নীরদাসুন্দরী।

আট বছর বয়সেও ঠিক এমনি একটা অভিমান বালিকা মনে বাসা বেঁধেছিল। প্রকাশ করেন নি। মাথা পেতে নিয়েছিলেন মায়ের বিধান। নির্মম রায়।

তখন বিয়ে ছিল ছুরি-কাঁচি রুপোর চাঁদের সঙ্গে। যে মেয়েরা থিয়েটারে আসবে তার আবার বিয়ে! সংসার জীবন নিলে নটী জীবনের প্রতি অবহেলা হবে এমন একটা ধারণা ছিল অনেক মায়ের। তাই তারা মেয়েকে থিয়েটার লাইনে ছেড়ে দেবার আগে ছুরি অথবা কাঁচি কিংবা রুপোর চাঁদ বানিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিতেন। বলতেন এই তো তোর বিয়ে হয়ে গেল। মনে কর এই ছুরিটা তোর বর। তোর সোয়ামী।

এ সবের মানে তারা তখন বুঝত না। বয়স বাড়লে যখন বুঝতে পারত তখন আর নতুন করে সংসার জীবনে ফিরে আসবার মত অবস্থা থাকত না। বিশেষ করে মন। মনটা তখন মরে যেত। ফলে তাদের গোটা জীবনটা একটা অনিশ্চিত পথে শুধু ঘুরে বেড়াত। সমাজ বলতে তাদের অবশিষ্ট যা থাকত তা ঘৃণা।

নীরদা সুন্দরী বললেন, আমার কিন্তু ছুরি-কাঁচির সঙ্গে বিয়ে হয়নি, মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। রক্ত-মাংসের একটা ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। কথা বলতে বলতে নীরদা সুন্দরী বিষণ্ণ হলেন। একটা চাপা যন্ত্রণায় ওঁর ভিতরটা যেন সহসা কুঁকড়ে যেতে লাগল। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'তরঙ্গিনী' থিয়েটার জগতে নীরদাকে পৌঁছে দেবার আগে একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেটি নীরদাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তরঙ্গিনী রাজি হননি। ভবিষ্যতে সে আর নীরদাকে পাবে না এমন একটা নির্দেশও জারী করে দিয়েছিলেন। সেই শেষ দেখা।

হয়তো স্বামীকে চোখেও দেখেনি নীরদা। শুধু শুনেছিলেন তাঁর বিয়ে হয়েছে একজন জীবন্ত মানুষের সঙ্গে। নামটাও মনে নেই নীরদা সুন্দরীর। মনে রাখার দরকার ছিল না। পরে সেই মনও ছিল না তাঁর তাকে খুঁজে বার করার। নামে মাত্র বিয়ে। তারপর নীরদা একদিকে। আর একদিকে সেই ছেলেটি। পৃথিবীর আর কোন ঠিকানায় তাঁকে কেউ খুঁজতে যায়নি।

নীরদা সুন্দরী হাসি দিয়ে ভিতরকার চাপা যন্ত্রণা ঢাকতে ঢাকতে বললেন, ছেলেটি কে ছিল জানেন? আমার মা তরঙ্গিণী দেবীর এক বন্ধুর ছেলে। মা কটা [illegible] জোগাড় করে এনে তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, নীরদাকে বিয়ে করলে বটে তবে ও থিয়েটার করবে—ঘর করবে না কোনদিন।

নীরদা তারপর থেকে নটী জীবনের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

অমর দত্ত আর কুসুমকুমারী বাগমারী থেকে গাড়ি করে নিয়ে আসতেন থিয়েটারে, আবার গাড়ি করে নিয়ে যেতেন নারকোলডাঙ্গা রেলপুলের গায়ে সেই বাগানবাড়িতে।

এরই মধ্যে নীরদার বয়স বাড়ল একদিন।

বয়স যখন চোদ্দ তখন মারা গেলেন নীরদাসুন্দরীর মা তরঙ্গিনী। নীরদার আপনজন বলতে তখন কুসুমকুমারী আর অমরেন্দ্রনাথ। এর অনেকদিন আগেই পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। শুধু থিয়েটার। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারে 'নির্মলা' নাটকের পর আর যত নাটক হয়েছিল সবগুলো নাটকেই অভিনয় করতেন নীরদাসুন্দরী। অভিনয় ঠিক নয়। অনেকের মধ্যে শুধু গাওয়া আর নাচা।

ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্থায়ীভাবে এলেন 'ক্লাসিক থিয়েটারে।' ১৩০৪ বঙ্গাব্দ। এই সালে 'ক্লাসিক থিয়েটারে' ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ এই 'আলিবাবা' নাটকের সময়েই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবং এই সময় তিনি নাট্য 'রঙ্গালয়' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন, তার পাশাপাশি একই বিষয়ে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'আলিবাবা'র পর ক্ষীরোদপ্রসাদ ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। এলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অবশ্য ক্লাসিক থিয়েটারের প্রথম নাটক ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'হারানিধি'। সে নাটক জনপ্রিয়তা আনতে অক্ষম হয়নি। তারপর এই পুনরায় গিরিশচন্দ্র এলেন ক্লাসিকে। এরপর এই ক্লাসিক থিয়েটারে পর পর অনেকগুলি নাটক লেখেন গিরিশ ঘোষ। 'দেলদার', 'পান্ডব গৌরব', 'অশ্রুধারা', 'মনের মতন', 'শান্তি', 'আয়না', 'সৎনাম' নাটকগুলি বেশ খ্যাতির সংগে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

ইতিমধ্যে নীরদাসুন্দরী এসেছেন ক্লাসিক থিয়েটারে। এখানে এসে প্রথম তিনি গিরিশচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করেন। নীরদা তখন নিতান্ত কিশোরী। কিশোরী-মনে তাই গিরিশ ঘোষ নামটি একটি নাম মাত্র। গিরিশ ঘোষকে ভাল করে চিনবার আগে, জানবার আগে তাঁর কাছে অভিনয় শিক্ষা পাবার অনেক আগেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ আবার ক্লাসিক থিয়েটার থেকে চলে গেলেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'সৎনাম' নাটকটির অভিনয় হয়। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকের পরই গিরিশচন্দ্র ছেড়ে ছিলেন ক্লাসিক থিয়েটার।

নীরদাসুন্দরী একটা শুকনো নিশ্বাস ফেললেন। বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, তখন আমি খুব ছোট তাই গিরিশবাবুকে ঠিক চিনতাম না—গিরিশবাবু মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, বেশ স্নেহভরে ডাকতেন কাছে—গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন—আমি শুধু অবাক হয়ে তাঁর দিকে তখন চেয়ে থেকেছি—

১৯১০ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্লাসিক থিয়েটার' উঠে গেল।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এলেন ষ্টার থিয়েটারে। পরিচালক হিসেবে ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হলেন। নীরদাসুন্দরী তখন পূর্ণ যুবতী। সতের অথবা আঠার বছরের নীরদা-সুন্দরী তখন প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। ভাগ্য তখন তাঁর অনিশ্চয়তার পথে নিশ্চিত-পথের সন্ধান করে বেড়াতে লাগল। সেই বন্ধুর পথে বন্ধুর সন্ধান মিলল তাঁর। এখন যেখানে ছাতুবাবুর বাজার সেখানে একটা সুরকীর কল ছিল।

সেখানে তৈরী হয়েছিল বেঙ্গলী থিয়েটার। বেঙ্গলী থিয়েটারে তখন কাজ করতেন শিশির মিত্র। (ইনি বর্তমান শিশির মিত্র নন)। বেঙ্গলী থিয়েটারে এই সময় তার একটা থিয়েটার কোম্পানী খোলা হয় কিছুদিনের জন্য। তার নাম ছিল 'অরোরা থিয়েটার'। শিশির মিত্র সেই অরোরা থিয়েটারে নিয়ে এলেন নীরদাসুন্দরীকে। এই অরোরা থিয়েটারের বিলুবাবু তখন দল নিয়ে বাংলাদেশের বাইরে বাইরে থিয়েটারের ব্যবসা করতেন।

এ কোম্পানীগুলোকে বলা হত প্রাইভেট থিয়েটার। ঠিকে পার্টি বলেও ডাকতেন অনেকে।

অরোরা থিয়েটারের সঙ্গে নীরদা-সুন্দরীও বেরিয়ে পড়তেন। কখনও এক-নাগাড়ে ষোল দিন, কিংবা আট দিন অথবা কমপক্ষে চারদিনের অভিনয় শেষ করে আবার ফিরে আসতেন ও'রা।

নীরদাসুন্দরী বললেন, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সেই ঠিকে পার্টির বিলুবাবু যেখানে নিয়ে যেতেন আমাকেও যেতে হত। রোজ কত করে পেতুম জানেন না? চার টাকা রোজ—

নীরদাসুন্দরীর মুখটা একরাশ বিরক্তিতে কাতর হয়ে উঠল।

এই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ এলেন মিনার্ভা থিয়েটারে।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই সময়টি গিরিশ যুগ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। নাটক রচনার মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে গিরিশচন্দ্র একশোখানার উপরে নাটক রচনা করে নয়, নট এবং নাট্যপরিচালক হিসেবে তিনি তখন এক এবং অদ্বিতীয় প্রতিভা।

ন্যাশনাল থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার (প্রথম আমলে এবং মধ্য পর্বে) এমারেল্ড থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে গিরিশপ্রতিভার চরম নিদর্শন রেখে যান। স্বনামে এবং ছদ্মনামে যে নাটকগুলি তিনি রচনা করেন তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতি-হাসেই নয়, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেও চির-অমর হয়ে রইল। থাক সে কথা।

ক্লাসিক থিয়েটারে থাকাকালীন গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন নীরদা-সুন্দরী।

তার অনেকগুলো বছর পর এই আবার গিরিশচন্দ্রের পাশে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'ছিলেন ষ্টার' থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত।

ষ্টার থিয়েটারে এই বছরই তিনি 'কালাপাহাড়' এবং 'মায়াবসান' নাটকগুলির মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। এই পর্ব তখন গিরিশ প্রভাবিত পর্ব।

১৮৮৭ সালের পর আবার গিরিশচন্দ্র ফিরে এলেন ক্লাসিক থিয়েটারে।

গিরিশ ঘোষ ষ্টার ছেড়ে দিয়ে চলে আসার সময়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন মঞ্চে।

স্বরচিত নাটক নিয়ে সদলবলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব এই প্রথম।

'রবীন্দ্রনাথ 'ষ্টার' থিয়েটারে যোগ দিলেন বটে, তবে তাঁর নাটকের সঙ্গে তখন-কার দিনের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর কোন সম্পর্ক রইল না।

বাল্মীকি প্রতিভায় যাঁরা অভিনয় করে-ছিলেন তাঁরা সকলেই ঠাকুর পরিবারের। কথা ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হননি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ষ্টার থিয়েটার ছেড়ে দেবার পর রাজকৃষ্ণ রায় এলেন 'ষ্টারে'। স্থায়ীভাবে নাট্যকার হিসেবে যুক্ত হলেন তিনি।

একদিকে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নরমেধ যজ্ঞ', 'বনবীর', 'লয়লা মজনু', 'ঋষ্যশৃঙ্গ' অন্য-দিকে মিনার্ভা থিয়েটার গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিভায় ভাস্বর।

নীরদা ধন্য হলেন।

নীরদাকে গ্রহণ করলেন গিরিশচন্দ্র।

সংগীতগুরু যেমন নিজের সব সুর প্রধান শিষ্যকে ঢেলে দিতে কার্পণ্য করেন না, প্রকৃত শিল্পী যেমন প্রকৃত শিষ্যের জন্য ভিতরে ভিতরে আকুলি-বিকুলি করেন ঠিক তেমনি যেন গিরিশচন্দ্র একজন মনের মত শিষ্য খুঁজছিলেন। নীরদাকে পেয়ে গিরিশ-চন্দ্রের যেন স্বস্তি। সব সুর যেন তিনি ঢেলে দিতে চাইলেন।

নীরদাসুন্দরীকে মনের মত করে গড়ে তুললেন।

তালিম দিলেন অভিনয়ে। নৃত্যে। সংগীতে।

নীরদা হাসলেন। বেশ তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বললেন, গিরিশবাবু আমাকে সব শেখাতেন বলে সবাই বলত নীরদা গিরিশ ঘোষের মন্ত্রশিষ্যা—

সময় পেলেই নীরদাসুন্দরী যেতেন গিরিশ ঘোষের বাড়িতে। পরিচর্যা করতেন। গিরিশবাবুর বাড়ির সবাই ভালবাসত নীরদাকে। এদিকে নিয়মিত অভিনয় চলছে তখন। গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' নাটকে প্রথম গিরিশ ঘোষের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পান তিনি। বিশিষ্ট কোন চরিত্র নয়।

তারপর 'প্রফুল্ল' নাটকে যাদবের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। 'জনা'য় কোন মুখ্য চরিত্র না হলেও এই নাটকে নাচতে হত, গাইতে হত নীরদাসুন্দরীকে।

এরপর এল নীরদাসুন্দরীর প্রতিষ্ঠা লাভের লগ্ন। গিরিশবাবু একদিন সস্নেহে নীরদাকে কাছে ডেকে বললেন, 'তপোবন' নাটকে একটি মুখ্য চরিত্রে তোমাকে প্লে করতে হবে।

নীরদা এই দিনটির জন্য অপেক্ষা কর-ছিলেন যেন।

নীরদাসুন্দরীর ভিতরকার মানুষটা সেই মুহূর্তে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। 'তপোবন' নাটকে 'ব্রহ্মণ্যদেব' চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেলেন তিনি। এই নাটকটি থেকেই নীরদাসুন্দরীর নটী-জীবনের পূর্ণতা।

এই নাটক থেকেই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শুরু করেন নীরদাসুন্দরী।

ব্রহ্মণ্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে আশাতীত খ্যাতি পান নীরদাসুন্দরী। উত্তরোত্তর খ্যাতি বাড়তে থাকে।

'তপোবন' নাটকের পর নীরদাসুন্দরী সুযোগ পেলেন 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকে প্রথম দিকে 'রাখাল বালক'-এর ভূমিকায় যদিও অভিনয় করতে

হয়েছিল নীরদাসুন্দরীকে। তবুও এই নাটকেরই প্রধান চরিত্র 'পাগলিনী'র ভূমিকার কিছুদিন পর থেকে অভিনয় করার দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁরই ওপর।

'পাগলিনী' চরিত্রে প্রথম অভিনয় করতেন তখনকার দিনের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী সুশীলাবালা। 'নীরদাসুন্দরী' ছিলেন সেই সুশীলাবালার ডুপ্লিকেট। ডুপ্লিকেট হিসেবে থাকলেও 'রাখাল বালক' চরিত্রে অভিনয় করতে হত নীরদাসুন্দরীকে।

সুশীলাবালা মারা যাবার পর নীরদাসুন্দরী গিরিশ ঘোষের প্রায় সব নাটকেরই প্রধান নটী।

'চন্দ্রশেখর' নাটকের সময়ও সুশীলাবালা ছিলেন মুখ্য অভিনেত্রী। 'চন্দ্রশেখর' নাটকের 'দলনী' চরিত্রে অভিনয় করতেন সুশীলাবালা। অশোক নাটকে 'কাঞ্চনমালা'র ভূমিকায় অভিনয় করতেন নীরদাসুন্দরী। এই সময়ে চারুশীলা দেবীর খ্যাতিও অনেক। চারুশীলা দেবী ছিলেন তখনকার দিনের আর একজন খ্যাতনাম্নী শিল্পী, কিন্তু অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা প্রচন্ড ছিল বটে, ভাল গাইতে পারতেন না। ভাল গাইতেন না বললেও ঠিক বলা হল না। 'চারুশীলা দেবী' গাইতে পারতেন না একদম। সুতরাং সুশীলাবালার সঙ্গে অনেক নাটকেই অভিনয় করতে হত নীরদাসুন্দরীকে।

নীরদাসুন্দরীর মুখটা আগের মত কঠিন হল না।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওঁর মুখের চেহারাটা আবার অস্বাভাবিকভাবে পাল্টে গেল। কোথায় যেন একটা ব্যথা। আর সেই ব্যথার বোধকরি আশী বছরের নড়বড়ে দেহটার ভিতরকার শিরা উপশিরাগুলো টনটন করে উঠল। মুখে সেই ব্যথার প্রকাশ। ভারাক্রান্তভাবে বললেন, যেসব ঘটনা গত হয়ে গেছে, যেসব মানুষরা চলে গেছেন তাদের কথা ভাবতে গেলেও এই বুকের ভিতরটা কেমন টনটন করে—এই দেখুন না, সুশীলাবালার সেই মৃত্যুর ছবিটা এই সময়ে আমার মনে পড়ে গেল—

'চন্দ্রশেখর' চলাকালীন চারুশীলার একবার বসন্ত হয়।

সর্বাঙ্গে দগদগে ক্ষত নিয়েই সুশীলা এসেছিলেন থিয়েটার করতে। গায়ে ভীষণ জ্বর। গিরিশবাবু এই অবস্থায় তাকে আসতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। দানীবাবু, হীরেনবাবু, অহীনবাবু সকলেই বিস্মিত। চারুশীলার মুখে হাসি। নাটক আর রঙ্গমঞ্চকে জীবনের প্রথম দিন থেকে যাঁরা তীর্থজ্ঞানে পুজো করেছেন সেই রঙ্গমঞ্চ থেকে একদিনের জন্যও অবসর নিয়ে থাকা যে কী বেদনার তা শুধু তিনিই জানেন। চারুশীলা রঙ্গমঞ্চকে ঠিক তেমনি ভালবাসতেন। অপরিসীম মনোবল নিয়ে চারুশীলাদেবী সেদিন অভিনয় করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন পাদপ্রদীপের সামনে। পারেননি। শেষবারের মত প্রিয় দর্শকদের তিনি আর অভিবাদন জানাতে পারেন নি। সেই তাঁর শেষ মঞ্চে আসা। চন্দ্রশেখরই তাঁর শেষ নাটক।

তারপর থেকেই নীরদাসুন্দরী অভিনয়-জীবনের গতি গেল বেঁকে। চারুশীলার পরিবর্তে 'দলনী' চরিত্রে পরবর্তী সময়ে অভিনয় করেছিলেন নীরদাসুন্দরী।

তারপর থেকে নীরদাসুন্দরীর পারিশ্রমিকের মাত্রা গিয়েছিল বেড়ে। এখানে-সেখানে বাড়িতে-সে বাড়িতে যে নীরদা অনেকগুলো বছর নিতান্ত অসহায়ার মত কাটাতেন, তাঁর অবস্থারও খানিকটা পরিবর্তন ঘটে গেল। নীরদাসুন্দরী নিজের অভিনয় প্রতিভায় অভিনেত্রী জীবনের স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন।

একটা ঘর ভাড়া করলেন নীরদাসুন্দরী। মিনার্ভা থিয়েটারের কাছেই, রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীটের সেই ঘরে একলাই থাকতেন নীরদাসুন্দরী। মাঝে মাঝেই যেতেন গিরিশবাবুর বাড়িতে।

স্মৃতি যে মাঝে মাঝে সুখের হয় তা নীরদাসুন্দরীর অভিব্যক্তি থেকেই বোঝা গেল। অনেকটা হাসি হাসি মুখে বললেন, তিন মহলার বাড়ি ছিল গিরিশবাবুদের। বিষয়-আশয়ে অন্য ভাইদের মত তাঁর কোন আসক্তি ছিল না; বিষয়ের বিষ গিরিশবাবুর শিল্পী মনটাকে মাঝে মাঝে যে কী নিদারুণভাবে আঘাত করত তা আমি মাঝে মাঝে বুঝতাম। মদ কি মানুষটা এমনি খেত? শেষপর্যন্ত মদ তো মানুষটাকেই খেয়ে ফেলেছিল। কথা বলতে বলতে একটা শুকনো নিশ্বাস ফেললেন নীরদাসুন্দরী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ির ভিতরে একটা গাছ ছিল। আমড়া গাছ। সেই সামান্য একটা গাছ একদিন একান্নবর্তী পরিবারের মাঝখানে বিশাল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। পারিবারিক ক্ষেত্রে সেই আমড়াগাছটি একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে দেখা দিল। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হল সেই আমড়া গাছের অবস্থান নিয়ে। এমনকি মামলা উঠল কোর্টে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হল এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এই পারিবারিক ঝগড়া নিয়েই গিরিশচন্দ্র যে নাটক রচনা করলেন তার নাম 'বকমারী'।

নীরদাসুন্দরী চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। কাপটা যতক্ষণ হাতে ছিল ততক্ষণ জলতরঙ্গের মত একটা শব্দ তুলেছে। দুর্বল হাতের উপরে একটা ভারী বস্তু। চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে ঘরের দেওয়ালে দৃষ্টি পড়ল। এক চোখের নিস্তেজ দৃষ্টি নিয়ে কি যেন দেখলেন। বললেন, দেওয়ালে একটা মেয়েমানুষের ফটো দেখতে পাচ্ছেন? ওকে চেনেন? আমি—আমার ছবি—ওই দেখুন ঐ আমি, আর এই দেখুন এই আমি —ঐ আমি 'কিন্নরী'—

মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন এই 'কিন্নরী' নাটকে অভিনয় করে এই নীরদাসুন্দরী আলোড়ন তুলেছিলেন। কিন্নরীর উড়ে যাওয়া দৃশ্য দেখে সেদিনকার দর্শকরা হতেন বিস্মিত, অভিভূত কিন্নরীর অপরূপ রূপলাবণ্যে। নীরদা বললেন, কী চেহারা ছিল আমার দেখেছেন?—আবার হলেন ভারাক্রান্ত।

'সুধনকেই মন দিয়েছিল কিন্নরী। মকরমকরী চেয়েছিল কিন্নরীকে। একটা সুবৃহৎ জাল বিস্তার করে কিন্নরীকে ধরার চেষ্টা করত মকরমকরী। কিন্নরীর হাতে থাকত মণি। সেই মণি ছিনিয়ে নেবার আকুলতা ওদের। সেই চন্ডালদের কাছে কিন্নরী মণি তুলে দিল। তারপর নিজের পরিচয় দিল সুধনের মায়ের কাছে। সুধনের বাড়ি থেকে মণি হাতে কিন্নরী আকাশপথে উড়ে আসবে। উড়ে এসে আবার দাঁড়াবে মঞ্চের উপরে, এই দৃশ্যটা দেখার জন্য দর্শকরা ব্যাকুল হয়ে থাকত।

নীরদাসুন্দরী হাসতে হাসতে বললেন, এখনকার মত তখন আলোর খেলা দেখাবার মত এত দামী দামী সরঞ্জাম তো ছিল না—তবুও মঞ্চে এমন সব কান্ডকারখানা দেখানো হত যা বিস্ময়কর। এই যে আমি উড়তাম তা কি কম বিস্ময়কর? এখন বোধহয় জানতে ইচ্ছে করছে যে ঐ চেহারা নিয়ে আমি কেমন করে উড়ে যেতাম, মানুষ আবার উড়ে চলে কেমন করে? তাই না—আসলে যাদু করা হত। গিরিশবাবু অনেক মাথা খাটিয়ে একটা উপায় আবিষ্কার করেছিলেন —তা কি জানেন?

কয়েক মুহূর্তের জন্য আলো নিভিয়ে দেওয়া হত। আবছা আলোয় দেখা যেত গান গাইতে গাইতে সেই মণি হাতে একটু একটু করে কিন্নরী সরে আসত উইংসের পাশে। মঞ্চের সামনে ড্রপ সীনের মত একটা জাল ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হত। দর্শকরা দেখতেন কিন্নরী গাইতে গাইতে ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে একটু একটু করে। নীরদাসুন্দরী বললেন, আমি অতি ধীরে ধীরে উইংসের পাশে আসতাম, ওখানে একটা ঘোরাণো সিঁড়ি করান থাকত। আমি গান গাইতে গাইতে, গান দিয়ে দর্শকদের মন ভুলিয়ে দর্শকের দিকে তাকিয়েই ঘোরাণোর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকতাম—

কিন্নরীর পূর্ণাঙ্গের একটা তৈলচিত্র আঁকা হয়েছিল।

যে রূপসজ্জায় সজ্জিতা কিন্নরী পাদপ্রদীপের আলোয় দর্শকদের সামনে হাজির হতেন তারই হুবহু প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছিল। রক্তমাংসের কিন্নরী যখন একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে গান গাইতে গাইতে উঠতে শুরু করত তখন তার পাশাপাশি একটু একটু করে টেনে তোলা হত সেই তৈলচিত্র। মুহূর্তে আসল কিন্নরী মঞ্চ থেকে উধাও হতেন, আর তারই সেই প্রতিকৃতিকে একটা তারের সাহায্যে টেনে মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো। তারপর সেই প্রতিকৃতিকে অদৃশ্য করে দেবার সময়ে আবার মঞ্চে দেখা যেত বাস্তব কিন্নরীরূপী আসল নীরদাসুন্দরীকে। ছবিটা আঁকা হয়েছিল উড়ে যাবার ভঙ্গিমায়। এতটুকুও বোঝা যেত না। দর্শকরা অভিভূত হয়ে দেখতেন।

নীরদাসুন্দরী নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়ে বললেন, কত কথাই মনে পড়ে, কিন্তু এখন আমার স্মৃতির কোন শক্তি নেই, সব কথা তাই গুছিয়ে হয়তো বলতে পারি না—যে ঘটনাগুলো আমার মনে রেখাপাত

করে আছে তার কিছু কিছু হয়তো মনে করতে পারি—মনে পড়লে আজ আর তার জন্য ভাবি না—যদি কোন দুঃখের ঘটনা মনে পড়ে তাহলে এখন আর দুঃখ পাই না—কোন সুখস্মৃতি রোমন্থন করলে এখন আর তৃপ্তি পাই না—তবে কিন্নরী নাটকে শুধু নয় 'দক্ষযজ্ঞে'র সময়েও মঞ্চের উপর যেসব ঘটনা ঘটাতেন গিরিশবাবু তা সত্যিই অবিশ্বাস্য—দক্ষরাজার যজ্ঞে আসল আগুন জ্বালানো হতো—দক্ষরাজের ছাগমুণ্ড হয়ে যেত মঞ্চের উপরে—

'দক্ষযজ্ঞে' তখন অভিনয় করতেন দিক-পাল অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

দানীবাবু অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ স্বয়ং সাজতেন মহাদেব। 'দক্ষ' হতেন গিরিশ ঘোষ। সতীরূপে অবতীর্ণ হতেন ভূষণ-কুমারী। সুদেষ্ণা হতেন নীরদাসুন্দরী। 'দক্ষযজ্ঞ' শুধু মিনার্ভায় নয় গোটা নাট্য-জগতে একটা আলোড়ন তুলেছিল একদিন। একদিকে পিতা-পুত্রের অবিস্মরণীয় অভিনয়, অন্যদিকে নীরদাসুন্দরীর সুললিত কণ্ঠ-স্বরের উদাত্ত গান তখনকার দিনের দর্শকদের মন কেড়ে নিত। তার উপরে ছিল কয়েকটা বিস্ময়কর আঙ্গিক।

মঞ্চের উপরে একটি সুবৃহৎ পাত্রে দাউ দাউ করে জ্বলত যজ্ঞের আসল আগুন। মহাকাল রুদ্রমূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়াতেন দক্ষরাজের সামনে। অভিশাপ দিতেন মহাদেব। তাঁর সেই অভিশাপে দক্ষরাজের মুণ্ড ছাগমুণ্ডে পরিণত হত।

নীরদাসুন্দরী হাসতে হাসতে বললেন, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটনাটা ঘটত স্টেজে। ছাগমুণ্ডের মুখোস হাতে উইংসের পাশে তৈরী থাকত একজন। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আলো নিভিয়ে দেওয়া হত। দক্ষরাজ মুহূর্তে ছুটে যেতেন উইংসের পাশে। আর তৎক্ষণাৎ সেই লোকটি দানীবাবুর মুখে পরিয়ে দিত সেই ছাগমুণ্ড। এই দৃশ্যে দর্শকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন।

এমনি করে একটির পর একটি নাটকে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে চললেন নীরদা-সুন্দরী।

ওদিকে একটু একটু করে একটা যুগের অবসানের লগ্ন এল এগিয়ে।

মধ্যাহ্নগগনের সূর্য একটু একটু করে এগিয়ে গেল অস্তাচলের পথে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ অসুস্থ হলেন। নীরদা-সুন্দরীর ভিতরকার মানুষটা একটা চাপা যন্ত্রণায় দিনরাত শুধু ছটফট করছে। গিরিশ ঘোষের মঙ্গল কামনায় নীরদা তখন আকুল।

গোটা নাট্য ও নাট্যসাহিত্য ক্ষেত্রের সবাই বিমর্ষ। নীরদা একদিকে অভিনয় করতে লাগলেন আবার অবসর সময়ে গিরিশবাবুর সেবা করার সৌভাগ্য থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করলেন না।

গিরিশবাবু সস্নেহে নীরদাসুন্দরীকে বসতে দিতেন তাঁর শয্যার পাশে। এমনি করে কত বিনিদ্র রজনী অতিক্রান্ত করেছেন নীরদাসুন্দরী বাংলার নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের সেই অমর কথাশিল্পী অবিনশ্বর রূপকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরিচর্যা করে।

দৃঢ় মনোবল নিয়ে সেই ভগ্ন শরীরেও গিরিশ ঘোষ তাঁর কর্মসাধনায় অটুট ছিলেন। উপস্থাপনা করতে চেয়েছিলেন 'গৃহলক্ষ্মী' নাটক। রঙ্গমঞ্চের তীর্থে 'গৃহলক্ষ্মী'কে নিয়েই তাঁর শেষ তীর্থ পরিক্রমার ইচ্ছে পূর্ণ হল না।

মাত্র চার অঙ্ক পর্যন্ত লিখতে পেরে-ছিলেন মহাকবি। সমাপ্ত করতে পারেননি সে নাটক।

'গৃহলক্ষ্মী'র চক্ষুদানের আগেই কালের মহান সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৯১২ সালে একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। বাংলার নাট্য সাহিত্য ও শিল্পের ভাগ্যাকাশ থেকে ঝরে গেল একটি নক্ষত্র। গিরিশচন্দ্র ঘোষ চলে গেলেন পরপারে।

নীরদাসুন্দরীর ভিতরটা কাঁদল। দুটো চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিলেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন, গিরিশবাবু বলতেন কারও বিয়োগের পর তা নিয়ে শোক করে সময় কাটানো অন্যায়—যতক্ষণ শোক করবে, ততক্ষণ কাজ করলে স্টেজের নাটকের উপকার হবে—

গিরিশচন্দ্রকে হারিয়ে সবাই শোকে মুহ্যমান হলেন কিন্তু কেউ চুপ করে থাকলেন না।

নীরদা বললেন, শেষ পর্যন্ত ব্যাঙবাবু আমাকে মেরে ফেললেন—আমাকে মেরে ফেলেছিলেন বলে সেবার কী প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল আমার—আবার হাসলেন নীরদা-সুন্দরী।

ভদ্রলোকের আসল নাম ছিল জ্ঞান-বাবু। সবাই ডাকতেন ব্যাঙবাবু বলে। জ্ঞানবাবু ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের অন্তরঙ্গ সহচর। গিরিশ ঘোষ মারা যাবার পর গৃহলক্ষ্মীর বাকি অংশটুকু লিখেছিলেন জ্ঞানবাবু। গৃহলক্ষ্মী নাটকে ফুলী নামে একটি বিশেষ চরিত্র সৃষ্টি করে গিয়ে-ছিলেন গিরিশবাবু। নাটকের শেষদৃশ্য পর্যন্ত ফুলী বাঁচবে এমন একটা পরিকল্পনার কথা নীরদাকে বলেই গিয়েছিলেন গিরিশ ঘোষ। তা হলো না। তিনি মারা যাবার পর সব কিছুরই একটা বিরাট পরিবর্তনের ছবি দেখা গেল। ফুলীর মৃত্যু দিয়ে সেই পরি-বর্তনের সূত্রপাত।

নাটক লিখতে লিখতে যাঁদের দিয়ে অভিনয় করাবেন তাও ভেবেছিলেন গিরিশবাবু। ফুলী চরিত্রে নীরদারই রূপদান করার কথা ছিল। নীরদা অবশ্য রূপদান করেছিলেন; তবে ব্যাঙবাবু ফুলীকে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে দেননি। মেরে ফেলেছিলেন। নীরদাসুন্দরীর নটী জীবনের একটা তাজা মন সেই মুহূর্তে মারা গিয়েছিল।

এর পর নতুন অধ্যায়।

গৃহলক্ষ্মী বন্ধ হয়ে গেল। তারপর একের পর এক চলতে থাকল পুরোনো নাটক।

মিনার্ভায় এলেন অপরেশবাবু। অপরেশ মুখার্জী লিখলো রামানুজ। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে রামানুজ নাটকটিকে কেন্দ্র করে শুরু হলো আর এক নতুন ইতিহাস।

মা ডাকলেন, এস মা চমম্বা এস, আমার কাছে এস—

চমম্বার দু' চোখে বিস্ময়! সে অবাক হয়ে দেখছিল মাকে। ছুটে গিয়ে মায়ের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে কোথায় যেন একটা সংকোচ।

নাটকের শুরু থেকে চমম্বা এক বদমাইশ, নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ।

চমম্বা তার স্বামীর ঘর করে না। স্বামী থাকতেও সে ভ্রষ্টা। স্বামীর নাম লক্ষণ। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষণের।

চমম্বা তার বিপরীতধর্মী। নাটকের মধ্য অঙ্ক থেকে চমম্বার নতুন জীবন।

চমম্বা পরজন্মে এক মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েছিল। মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েও লছিমা কৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা।

পরজন্মে চমম্বাই হলো লছিমা। লছিমা লাঞ্ছিতা হয়েও কৃষ্ণমাহাত্ম্য নিয়ে বিভোর।

নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে লছিমার মৃত্যু।

কৃষ্ণমূর্তি বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে লছিমা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। আর সেই পথের বুকেই প্রাণ হারাবে লছিমা।

নীরদাসুন্দরী দু' হাত জোড় করে প্রণাম করলেন যেন কার উদ্দেশ্যে।

প্রণাম সেরে হাসতে হাসতে বললেন, কাকে প্রণাম করলুম বলুন তো? মাকে। সারদা মাকে। ঐ শ্রীমাকে।

রামানুজ দেখতে এসেছিলেন মা। নাটক দেখতে হয়তো আসেননি। রঙ্গমঞ্চে, এই মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পদধূলি দিয়ে হয়তো শোধন করতে এসেছিল মানবমূর্তিতে স্বয়ং সর্বশক্তিস্বরূপিণী মা মহামায়া।

সেদিন কাশীর মহারাজাও এসেছিলেন নাটক দেখতে।

নাটকের শেষে রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে এলেন স্বয়ং মহারাজ। কে যেন হন্তদন্ত খবর দিলেন নীরদাসুন্দরীকে মহারাজ স্বয়ং তার সংগে দেখা করতে চান। সতের-আঠার বছরের যুবতী নীরদার তখন মানসিক অস্থিরতা। একটা সংকোচ। কি বলবেন তিনি? কেমন করে একজন মহা-রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। অনেক ভেবে নীরদা মেক-আপ তুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের ভিতরে এখন যেখানে ক্যান্টিন তার গা ঘেঁসে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। সেই গাছেরও বয়স তখন অনেক ছোট ছিল। নীরদা গ্রীণরুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্য-সুন্দর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাশীর মহারাজা। দৃঢ় পদক্ষেপে মহারাজা আরও দু'পা এগিয়ে গেলেন, নমস্কার করলেন নীরদাসুন্দরীকে।

নীরদাসুন্দরী বললেন, আমি কি তখন অতশত বুঝতুম ? শুধু অভিনয় জীবনের মধ্যে আমি চলছিলাম। ধরে নিতে পারেন রীতিমত একটা অন্ধকারে তখন আছি, সুতরাং মহারাজা-টাজা দেখা করতে এলে কেমন করে তাঁদের সম্মান জানাতে হয় তা ভাল করে জানি না। বাইরে এসে আমি অবশ্য হাত তুলে নমস্কার করেছিলাম—। মহারাজা বলেছিলেন, এদিকে একটু এস, মা তোমাকে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন।—শুধু মহারাজাই নয়, সেখানে উপস্থিত অনেকেই বললেন, মা তোমাকে দেখতে চান নীরদা—যাও মাকে প্রণাম করে এস—। আমি শুধু ভাবছি—কে মা ? কার মা ? আমি কি তখন ছাই সারদামাকে ভাল করে জানি ? —কে যেন বললে সারদা মাকে জান না নীরদা ? ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্ত্রী—

নীরদাসুন্দরীর কানে কথাটা যেতেই সেই মুহূর্তে তাঁর তন্ত্রীতে এক শিহরণ খেলে গেল। সে এক নতুন খুশীর হিল্লোল বয়ে গেল নীরদার যুবতী মনের রক্তে। আনন্দের আতিশয্যে সেদিন নীরদাসুন্দরী কেমন যেন অভিভূত। মুহূর্তে আবার তার মুখটা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল। নীরদা সেই মুহূর্তে বড় বেশী করে ভাবতে শুরু করলেন নিজেকে।

বিবেকের দংশনে তিনি যেন কাতর হয়ে পড়লেন। তবুও নিজেকে সংযমী করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নীরদাসুন্দরী। দূরে থেকে সারদা মা আকুল হয়ে দু'টো বাহু প্রসারিত করে বললেন, এস মা, চমম্বা এস, আমার কাছে এস—নীরদাকে চমম্বা বলেই সম্বোধন করলেন শ্রীমা।

নীরদা মায়ের দিকে তাকিয়ে যেন পাষাণ হয়ে গেলেন। দু' চোখ ভরে শুধু দেখছিলেন মাকে, কাছে যেতে সাহস হচ্ছিল না। অতি ধীরস্বরে বললেন নীরদাসুন্দরী, আপনাকে ছুঁলে কোন দোষ হবে না তো, আমি নটী—

সারদা-মা এগিয়ে এলেন কাছে। দু' বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন নীরদাসুন্দরীকে। কপালে, গালে চুম্বন করলেন মা। তারপর বললেন, বস আমার কোলে বসো—

কথাটা বলে মা সারদা নীরদাসুন্দরীকে বসালেন কোলের উপরে। নীরদাসুন্দরীর বয়স তখন আঠার উনিশ। মিনার্ভা থিয়েটারে সেই মুহূর্তে এক মহান দৃশ্যের অবতারণা হয়ে গেল। রচিত হলো এক মহান অধ্যায়।

স্তিমিত হয়ে এল মিনার্ভা থিয়েটারের তদানীন্তন প্রতাপ।

একের পর এক অভিনীত হতে থাকল পুরনো নাটক। মিনার্ভা থিয়েটারের শিল্পী-দের মধ্যে তখন নীরদাসুন্দরী। নীরদা-সুন্দরী আবার মুখ খুললেন, বললেন, মনটা তখন খুব খারাপ। এমন সময় আমার মিনার্ভা ছাড়ার সুযোগ এসে গেল। তখন আমাদের কেউ এক থিয়েটার থেকে আর এক থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইলে কমপক্ষে তিন বছরের জন্য বুক করে নিত—

একস্‌ক্লুসিভ আর্টিস্ট হিসেবেই প্রবোধবাবু তাঁর থিয়েটারে নিয়ে গেলেন নীরদাসুন্দরীকে। প্রথম এক হাজার টাকা বোনাস হিসাবে পেয়েছিলেন তিনি। তারপর তিন শো টাকা করে বোনাস পেতেন প্রতি তিন বছর অন্তর। মাইনে আলাদা।

নীরদাসুন্দরী হাসতে হাসতে বললেন, মাইনেটা আলাদা ছিল, কত যে পেতুম মাইনে তা আজ আর মনে নেই, তা ছাড়া আমি তো প্রবোধবাবুর বাড়িতে যেতুম—থিয়েটারের ব্যাপারে প্রবোধবাবুর সংগে নানা জায়গাতেও যেতে হতো।

এখন যেখানে বিশ্বরূপা থিয়েটার ওখানে একটা সুরকীর কল ছিল।

সেই জমিতে প্রবোধ গুহ 'নাট্য নিকেতন' তৈরী করেছিলেন। সেই নাট্য নিকেতন মঞ্চে নীরদাসুন্দরীকে এনেছিলেন প্রবোধ গুহ। নাট্য নিকেতনে তখন বাঘা বাঘা অভি-নেতারা। শিশির ভাদুড়ীও তখন নাট্য-নিকেতনে।

'সীতা' নাটকে অভিনয় করেছিলেন নীরদাসুন্দরী। যোগেশ চৌধুরীর সীতা।

নাট্যনিকেতনেই সীতা প্রথম অভিনীত নাটক নয়।

১৯২৩-২৪ সালে একবার ইডেন গার্ডেনে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি সুবৃহৎ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসাবে কর্তৃপক্ষ সেখানে থিয়েটারের ব্যবস্থাও করেন। তৈরী করেন থিয়েটারের জন্য মুক্ত অঙ্গন। বিরাট মঞ্চ। দর্শকদের মাথার উপরে সামিয়ানা টাঙানো। সেই মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় যোগেশ চৌধুরীর সীতা। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সীতা। সীতার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রভাদেবী। রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে-ছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। লব-কুশের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জীবন গাঙ্গুলী রবি রায়। আর অভিনয় করেছিলেন তখনকার দিনের স্বনামধন্য অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আর শিশিরবাবুর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ী।

এরপরই নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয় সীতা।

নীরদাসুন্দরী অভিনয় করেছিলেন তুঙ্গভদ্রার চরিত্রে।

এরই মাঝে কিছুদিন মনোমোহন বোর্ডে থিয়েটার করেছিলেন নীরদাসুন্দরী। ক্লাসিক থিয়েটার উঠে যাবার পর সেখানে মনোমোহন পাঁড়ে যে থিয়েটার তৈরী করেন তার নাম মনোমোহন থিয়েটার।

পরবর্তীকালে অহীন চৌধুরীর সংগেও অভিনয় করেছিলেন নীরদাসুন্দরী।

অভিনয় করেছিলেন শান্তি গুপ্তার সংগে।

তখনকার দিনে সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে আলেয়ার ভূমিকায় খ্যাতির সংগে অভিনয় করতেন মিনার্ভা থিয়েটারে শান্তি গুপ্তা। শান্তি গুপ্তার সংগে সেখান থেকেই আলাপ নীরদাসুন্দরীর।

নীরদাসুন্দরী একটা শুকনো নিশ্বাস ফেললেন। ভারাক্রান্ত মনে বললেন, সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না। অভিনয় জীবনের সব কথা পর পর সাজিয়ে বলতে আর পারব না, এখন আর মনে রাখতে পারি না অনেক কিছু—যে কথাগুলো, যে ঘটনাগুলো আমার মনের ভিতরে দাগ রেখে গেছে তাই মোটামুটি বলবার চেষ্টা করলুম। তার মধ্যে এই শান্তি গুপ্তার কথাও একটি। প্রথম থেকেই ও আমাকে খুব ভালবাসত। মানুষকে যে এমন করে ভালবাসে সেই তো মানুষ—দরদী মানুষ—

'সিরাজদ্দৌল্লা'র আলেয়া ভালবেসেছিল—সিরাজদ্দৌল্লার ঘসেটী বেগমকে। বাস্তব ভালবাসা। একান্ত আকস্মিকভাবে যেদিন একটি জীবন নাটকের উপর যবনিকা নেমে এসেছিল সেদিন পরমাত্মীয়ের মত এগিয়ে গিয়েছিলেন শান্তি গুপ্তা।

নীরদাসুন্দরী বেশ গর্বের সংগে বললেন, হঠাৎ আমার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল—আমি সম্পূর্ণ অচল হয়েছিলাম—তখন এই শান্তি গুপ্তা আমাকে সসম্মানে তার কাছে নিয়ে এসেছিল—

আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় একটা তাজা ঝকঝকে মানুষ হলেন পংগু। অথর্ব। বিধির বিধান শুধু এইভাবেই রচিত হয়নি। পা দুখানা ভাল হবার পর নীরদাসুন্দরী হারালেন একটা চোখ। তারপর একটু একটু করে গোটা মানুষটা হলেন ক্ষীণ। দুর্বল। তারপর একদিন যৌবন শেষ হয়ে গেল। বার্ধক্য এসে ভর করল নীরদাকে।

প্রায় সাতাশ আঠাশ বছর আগে শ্যাম-পুকুর স্ট্রীটে শান্তি গুপ্তার এই বাড়িতে এসেছিলেন বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একজন পরমাত্মীয়, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের তীর্থক্ষেত্রের একজন অন্যতম যাত্রী। বাংলার রঙ্গমঞ্চের এক অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা।

নীরদাসুন্দরী সামনে দেওয়ালের দিকে তাকালেন।

একটি কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে রুপোর বিল্বপত্র। শিল্পীজীবনের স্বীকৃতি, অতীত প্রতিভার প্রতি বর্তমানের সম্মান। বিশ্বরূপা থিয়েটার ও নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পক্ষ থেকে এই অভিজ্ঞানপত্র দিয়ে ভূষিত করা হয়েছিল নীরদাসুন্দরীকে। অনুষ্ঠান রজনীতে বিশ্বরূপার পাদপ্রদীপের সামনে এই মহান শিল্পীকে সম্মানিত করে-ছিলেন রাসবিহারী সরকার। রুপোর বিল্ব-পত্র প্রদান করেই নয় সেই সংগে একখানা মূল্যবান শাড়িও পুরস্কার হিসেবে হাতে তুলে দিয়েছিলেন নীরদাসুন্দরীর। কথা বলতে বলতে নীরদাসুন্দরীর চোখে জল চিক্ চিক্ করে উঠল।

নীরদাসুন্দরী বললেন, জানি না আজও কেন বেঁচে আছি। হয়তো বেঁচে আছি বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি দেখব বলে, বাংলাদেশে—সবাই কেমন গম্ভীর শ্রদ্ধার সংগে এই রঙ্গমঞ্চের স্বীকৃতি দেবেন, বাংলার রঙ্গমঞ্চ তীর্থে পরিণত হবে তাই দেখব বলেই হয়তো আমার এই জেগে থাকা—

রংতুলি হাতে অবসর

অনেক গৃহিণীই অবসর কাটানোর ভাবনা নিয়েই অবসরটুকু শুধু ভেবে ভেবেই কাটিয়ে দেন। এই অবসর কাটানোতে একটু নতুনত্ব চাই। সেলাই করে, বই পড়ে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেক্ষেত্রে অন্য কিছু হস্তশিল্পের প্রচেষ্টা করলে হয়তো একটু রুচি বদলাতে সক্ষম হবেন। যে কেউই ইচ্ছে করলে কাগজ প্যাঁচিয়ে, জল দিয়ে মণ্ড তৈরী করে নিজের পছন্দমত ফুলদানি, নানারকম পুতুল গড়ে রং দিতে পারেন। এতে একদিকে যেমন সুন্দরভাবে, তৃপ্তির সঙ্গে সময় কাটানো হবে অন্যদিকে নতুন কিছু সৃষ্টি করে ঘর সাজিয়ে আনন্দ পেতে পারেন।

অনেকে হয়তো বলবেন পেন্সিল দিয়ে একটা সোজা লাইন টানতে পাঁচবার রাবার ঘষতে হয়, আমরা আবার তুলির কাজ করবো! মানুষ জন্ম হতেই সৌন্দর্যবোধ ও রুচি নিয়ে জন্মায়। কারও হয়তো সে বোধ একটু তীক্ষ্ণ কারও বা ততটা নয়, তবুও অভ্যাসে অনেক কিছুই আয়ত্ত করা সম্ভব। কাঠের খেলনা বা পুতুল রং করে টেবিল, ঘরের তাক বেশ জমকালো করে সাজানো যায়।

কাঠের ব্যবহার আমাদের দেশে বহু পুরনো। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হতে বিশিষ্ট মত ব্যক্ত বা যাগযজ্ঞ প্রভৃতির প্রতীক বা স্মারকচিহ্ন হিসাবে স্তম্ভ বা ধ্বজ তৈরী করার প্রচলন ছিল। মৃতব্যক্তির স্মারকচিহ্নরূপে কাষ্ঠনির্মিত স্তম্ভকে বৈদিক সাহিত্যে স্তূপ বলা হত। এছাড়া চৈত্য নির্মাণের প্রথম দিকে স্থপতিরা কাঠের কার্পেন্টারী প্রথাকে অনুসরণ করে পাথরের ব্যবহার করতেন। এই ধ্বজ বা স্তম্ভ ও বাসগৃহ ছাড়া কাঠ দিয়ে নানারকম খেলনা, পুতুল, মূর্তি তৈরী করা হোতো। বর্তমানে তার ব্যাপক রেওয়াজ আছে।

মোগলসরাই বা লক্ষ্ণৌ স্টেশনে গাড়ী ভিড়লেই ট্রেনে বসে হরেক রকমের কাঠের খেলা-বিক্রেতারা জানলার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে ট্রেনযাত্রীদের দিকে এগিয়ে দেয় একটু বড় আকার থেকে শুরু করে দুই ইঞ্চি, এক ইঞ্চির নানারকম কাঠের তৈরী পশুপাখী কাগজের বাকসে সাজিয়ে হাতের নাগালে পৌঁছে দেবে। সেই খেলনাগুলোর আকর্ষণ এতই বেশী যে, রেলযাত্রীরা তা উপেক্ষা করতে পারবেন না। উপরন্তু সযত্নে সেগুলোর দাম মিটিয়ে দিয়ে বাকসে, ব্যাগে ঢুকিয়ে দেবেন। বেড়িয়ে ফিরে উপহার দেবার মত সুন্দর সব সামগ্রী। আর এই সব সামগ্রী তৈরী করছেন সেখানকার নারী-পুরুষেরা সমানভাবেই। এই সব লোকশিল্পে বরাবরই নারীরা পুরুষদের সাধ্যমত সহযোগিতা করছেন। বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে খেলনার আকার, গড়ন, রং প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে ভাবের আদান-প্রদান, জিনিসের রদ-বদলের ফলে দিন দিন সেই পার্থক্য কমে এলেও দেশজ বা স্থানীয় চিন্তাধারা, রীতি বা প্রভাব শিল্পীরা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই সেগুলো এত সুন্দর ও সার্থক।

অন্যান্য হস্তশিল্পের মত কাঠের কাজ বহুদিন থেকেই জনপ্রিয়। ঋকবেদে এবং অন্যান্য প্রাচীন পুঁথিতে কাঠের কাজের উল্লেখ আছে। সংস্কৃতে যাঁরা কাঠের কাজ (পেশাগতভাবে) করতেন তাঁদের বলা হত সূত্রধর। ভারতবর্ষের সর্বত্রই কাঠের কাজে মানুষ লিপ্ত। কাঠের বাকস, খেলনা, পুতুল, মুখোশ, পাত্র, সংগীতের যন্ত্রপাতি, জলযান ইত্যাদি নানারকম জিনিস সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তৈরী করতে শিখেছে। কাঠ দিয়েই মানুষ প্রথম বাসগৃহ নির্মাণ করতে শিখেছিল। সুতরাং বাসগৃহ অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন একদিকে কাঠ দিয়ে তৈরী হচ্ছে, অন্যদিকে পুতুল, খেলনার মত হাল্কা জিনিস প্রত্যেক প্রদেশে জনপ্রিয়। অন্ধ্রপ্রদেশে নানারকম রং দিয়ে হাল্কা কাঠের খেলনা যেমন তৈরী হয় আবার তিরুপতিতে সাধারণতঃ লালকাঠে ধর্মীয় মূর্তিগুলো খেলনা হিসেবে গড়া হয়ে থাকে। বাংলা এবং বিহারের কাঠকে পুতুলের আকারে কেটে তাতে রং দেওয়া হয়। নবদ্বীপের কাঠের পুতুল ছোটবড় সকলেরই পরিচিত। কাশীতে সূত্রধররা জন্তুজানোয়ারের মূর্তি গড়তে ভালবাসেন এবং সেই জন্তুজানোয়ারের অঙ্গে শোভা পায় নানাবিধ রং। দিল্লীর টেবিল-ল্যাম্প, ফুলদানি, পাউডার কেস্, সিঁদুরের কৌটোর বিরাট চাহিদা দিল্লীর বাইরেও। কেরালা এবং সৌরাষ্ট্রে ছোট অথবা সামান্য বৃহদায়তনের বাক্সকে সুন্দর করে রং করা হয়। এই বাক্সগুলোর কোনটা ঘর সাজানোর আবার কোনটা পয়সা জমানোর পাত্র হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। আখরোটের ওপর কাশ্মীর, গোলাপকাঠের ওপর কেরালা ও মাদ্রাজ স্টেটে সুন্দর সুন্দর খোদাইকার্য ও রং-চং দেওয়া হয়। প্রতিটি কাজেরই একটা নিজস্ব রং আছে। গুজরাটের পুরনো শহরের অট্টালিকার কাষ্ঠনির্মিত দরজার খোদাইকাজ প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই খোদাইকাজ পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য ধরনের অনেক আসবাবপত্রে লক্ষ্য করা যায়।

আদিবাসীরাও কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তাদের বাসস্থান সাজাতে তৎপর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাদের খেলনা আর পুতুল—নকসা ও রং-এ স্বতন্ত্র।

স্বাধীনতার পর অনেক বছর পেরিয়ে গেল। অথচ বেকার সমস্যার সমাধান অনিশ্চিত। সে সব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার সমস্যা সমাধানের একটা ভূমিকা নিতে পারে। কাঠের খেলনা আর তৈরী পুতুলে রং দেওয়ার কাজ কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও ঘরে ঘরে অবসর সময়ে প্রায় সকলেই করতে পারেন। আর যে সব মহিলা একাজে পটু বা দক্ষ তাঁরা অপটু মহিলাদের কাজে সাহায্য করতে পারেন। তাতে একদিকে যেমন সমাজসেবা হবে অন্যদিকে দুঃস্থ ও দরিদ্ররা সেই কাজ দোকানে দোকানে সরবরাহ করে সৎভাবে কিছু উপার্জন করতেও সক্ষম হবেন। তাতে বেকার সমস্যারও কিঞ্চিৎ গুরুভার লাঘব হতে পারে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

ধ্যানেশ খাঁ

জলসা
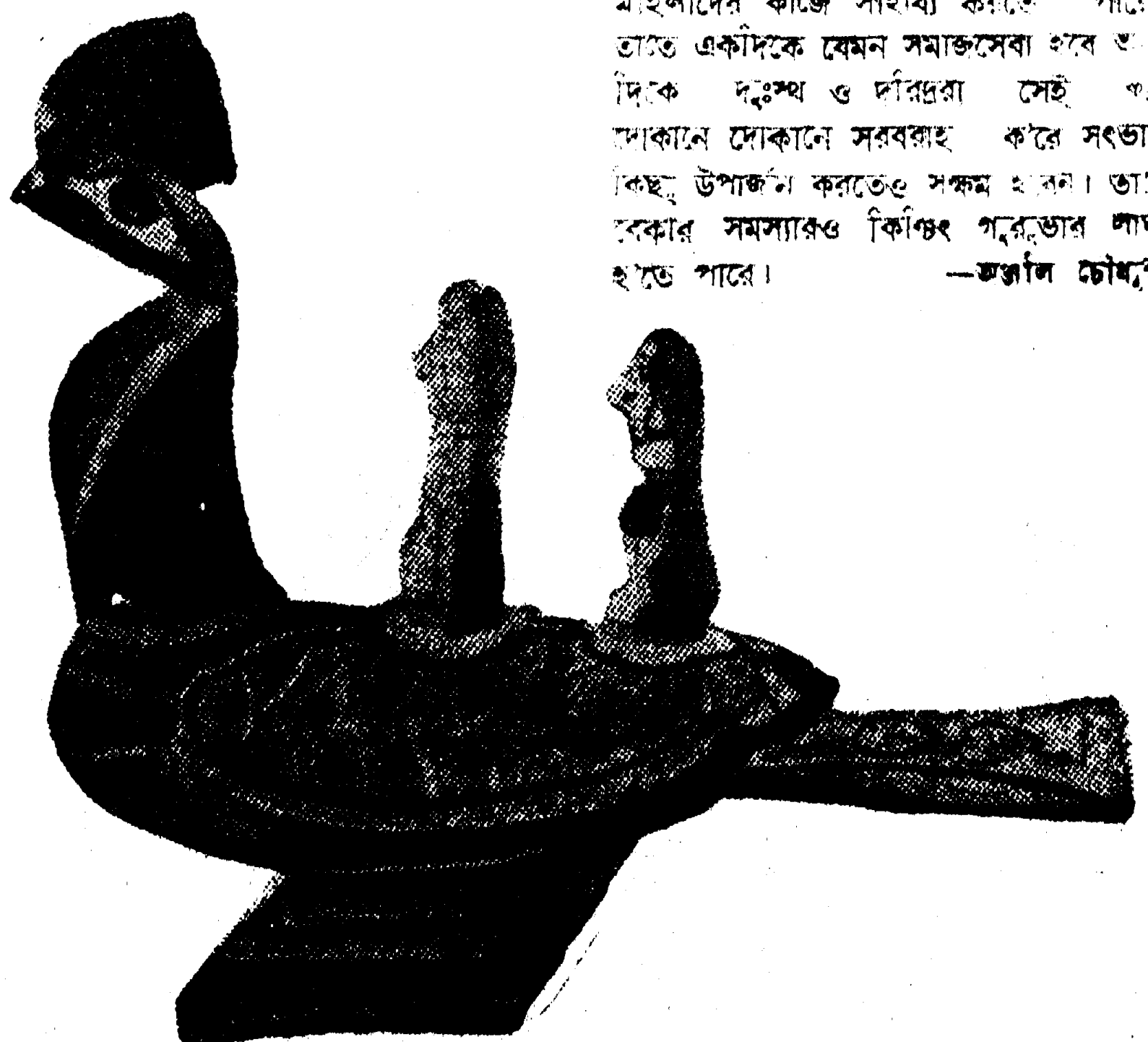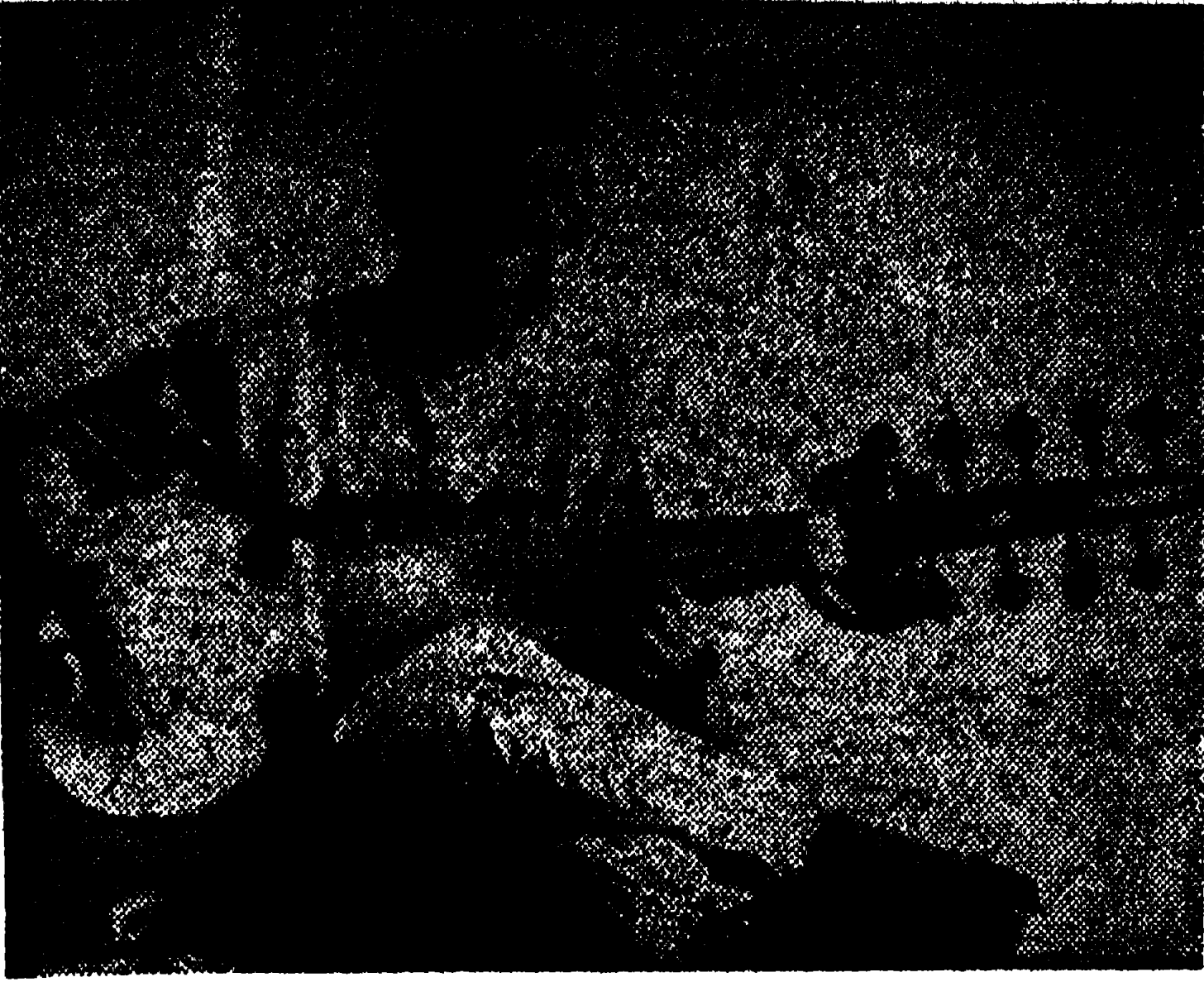
অবাক হয়ে গেলাম থিয়েটার স্ট্রীটের ফাউন্টেন কোর্টে ডাঃ এম সি চক্রবর্তী আহূত একটি প্রেস কনফারেন্সের আমন্ত্রণ পেয়ে। উদ্যোক্তারা সাংবাদিক মহলের সঙ্গে আলি আকবর খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র ধ্যানেশ খাঁকে পরিচিত করতে চান—সঙ্গে তাঁর সরোদ বাজনার একটি অনুষ্ঠানও থাকবে।

মনে হয়েছিল এ-বস্তু অবান্তর। অপ্রয়োজনীয়। ধ্যানেশ খাঁকে ত আমরা সবাই চিনি। কয়েকটি কনফারেন্সে তাঁর বাজনাও শুনেছি। হঠাৎ তাঁকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করার কি উদ্দেশ্য? গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের এবং তৎপুত্র আলি আকবর শিল্পীর প্রথম জীবনে নিষ্ঠাভরা সাধনায় বিশ্বাসী। আত্মপ্রকাশ অনেক পরের কথা। কিন্তু ধ্যানেশের ক্ষেত্রে উল্টোরীতি কেন?

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সূত্রে জানা গেল—পাঁচ বছর বয়সেই প্রথমে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে ধ্যানেশের সঙ্গীত জীবন শুরু হয়। অনেক পরে তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী হয়ে সরোদকেই আপন যন্ত্ররূপে গ্রহণ করে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শিক্ষাধীনে কঠিন রেওয়াজ শুরু করেন।

বোম্বে দিল্লী ও কোলকাতার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও তরুণতম সঙ্গীত পরিচালকরূপে বোম্বেতে 'প্রতিমা' কথাচিত্রের সঙ্গীতরচনা করেছেন। এ'রই সুরে গান গেয়েছেন আশা ভোঁসলে ও মান্না দে। গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত 'এলিফেন্ট কোর'-এর সঙ্গীতও এ'রই রচিত।

বাদনশৈলীতে ইনি পিতা আলি আকবর খাঁ সাহেবের ধ্রুপদী রীতি অনুসারী। একজন সাংবাদিক বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করলেন: আলি আকবর খাঁ সাহেব প্রবর্তিত বাদন পদ্ধতিতে নতুন কিছু নিজস্ব সঙ্গীত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার পরিকল্পনা তাঁর আছে কিনা।

উত্তরে লাজুক শিল্পী সবিনয়ে, কিন্তু দৃঢ়ভঙ্গিতে জানালেন, 'সরোদের এমন কোনো দিক নেই যা আমার বাবা অসম্পূর্ণ রেখেছেন। **বাবাকেই আমি সরোদের 'শেষ কথা' বলে মনে করি।** তিনি যেখানে পৌঁছেছেন তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেই নিজেকে আমি ধন্য মনে করব।'

ধ্যানেশ বর্তমানে পিসিমা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে তালিম নিচ্ছেন।

এরপর শুরু হোলো বাজনা। আলাপ, জোড় ও ঝালা বাজালেন 'বেহাগ' রাগে। পুরোপুরি ধ্রুপদী আঙ্গিকে—ব্যর্থ প্রতীক্ষিতা কিন্তু মর্যাদাময়ী নায়িকার প্রকাশকণ্ঠ বেদনার রুদ্ধ আবেগ যেন চাপা কান্নার মতই অস্ফুট গুঞ্জনে ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি স্বরের ধীরছন্দী বিস্তারে। ইদানীং কালে একক আসরেই কোনো কোনো যন্ত্রীকে একাধিক মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে দেখেছি। কিন্তু বিনা মাইক্রোফোনেই আলাউদ্দিন ঘরানার দৃপ্ত-গম্ভীর 'বাজ'—সুরেলা টিপ, প্রতিটি স্বরশ্রুতির সূক্ষ্মতম রেশ দিয়ে এমন রসাবেশ সৃষ্টি করতে কোনো শিল্পীকে শুনিনি। বিশেষ করে ধ্যানেশের মত কিশোর শিল্পীর কাছে ত এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এক বছর আগে ধ্যানেশের বাজনা শুনেছি। বিশেষ তারিফ করবার মত তখন কিছু পাইনি এ'র বাজনায়, এক আলাউদ্দিন ঘরানার রাজকীয় টোকা ছাড়া।

এবার শুনে বিস্ময় যেন আর বাধা মানে না। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে এমন অভাবনীয় গৌরবোজ্জ্বল রূপান্তর জোড়ের সঙ্গে যোগসূত্র লরীজোড়, গমক জোড়—সবই ছিল কিন্তু কি অসম্ভব সংযম ও শিল্পবোধে পরিমিত। এক কান্নার অশ্রু। বিরহীর বুকফাটা আর্তনাদ আনাগ সুরে, মতে ও মধ্যে কারুণ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেই প-ধা-প ম গমর বিলীয়মান রেশে বাজনা-গতীর সমাপ্তিতে যখন পৌঁছল, এক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল আশ্বাসে প্রতিটি শ্রোতৃচিত্ত দুলে উঠেছে—'ধ্যানেশ খাঁ প্রথম শ্রেণীর তরুণ যন্ত্রীদের তালিকায় নিঃসন্দেহে এক নতুন সংযোজন'। দ্বিতীয় রাগ আলি আকবর সৃষ্ট 'চন্দ্রনন্দন'—এও খাঁ সাহেবের মেজাজ, প্রকাশভঙ্গি ও সংযম-গভীর কিন্তু নিপুণতাদীপ্ত ছুট-তান। আড়ি দেড়ী ও আন্ধাছন্দের তান-বাহার আবার সচেতন করল যে **আপন সাধনায় একনিষ্ঠ থাকলে ধ্যানেশকে অস্বীকার করার সাধ্য** কারো নেই, সকল বাধাকে ইনি অনায়াসে অতিক্রম করে আলাউদ্দিন ঘরানার ঐতিহ্যধারা ভাবীকালের সঙ্গীতরসিকের দরবারে পৌঁছে দিতে পারবেন।

এই সার্থক সঙ্গীতাসরে কৃতিত্বের একটি বড় অংশ প্রাপ্য স্বপন চৌধুরীর তবলাসঙ্গতের।

আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হোলো ধ্যানেশের এহেন বৈপ্লবিক রূপান্তরের অন্তরালে যাঁর অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে, তিনিই আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সুযোগ্যা কন্যা ভারতের শ্রেষ্ঠতম যন্ত্রীদের অন্যতমা **শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী।**

আবদুল করিম সঙ্গীত সম্মেলন

মহাজাতি সদনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আব্দুল করিম সঙ্গীত সম্মেলনে করিম খাঁ সাহেবের প্রতিকৃতি উন্মোচন করলেন তাঁরই শিষ্য শ্রীবালকৃষ্ণ কাপলেশ্বর।

উদ্বোধন-সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী বিজয়সিং নাহার, মন্মথনাথ ঘোষ, বালকৃষ্ণ কাপলেশ্বর, এস সি ডুগার।

আব্দুল করিম খাঁর নামে উৎসর্গীকৃত সঙ্গীত সম্মেলনে কণ্ঠসঙ্গীতের দিকটি সমৃদ্ধ হবে—এইটেই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যন্ত্রসঙ্গীতের তুলনায় কণ্ঠসঙ্গীত ছিল দুর্বল।

উদীচীর রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ সোমবার সন্ধ্যায় উদীচীর শিল্পী গোষ্ঠী তাদের শিক্ষায়তন ভবনে একাদশোত্তর শততম রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করলেন অনাড়ম্বরভাবে। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে পল্লী সুর' গীতি আলেখ্যটি ছিল ঐদিনের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভজন, ঝুমুর ও কথকতার সুরের প্রভাব যে সব রবীন্দ্রসঙ্গীতে বর্তমান সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করেন উক্ত শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীরা। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন তপন সিংহ এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা ও পরিকল্পনা করেন খেলেশ ভড়।

—চিত্রাঙ্গদা

বি-এফ জে-এর অনুষ্ঠানে : শ্রীমতী মায়া রায়, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, বাগীশ্বর ঝা এবং সঙ্গীত পরিবেশনরত রবীন মজুমদার।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

রাজরাণী পিকচার্সের 'জীবন সৈকতে'

রাজরাণী পিকচার্স নিবেদিত স্বদেশ সরকার পরিচালিত 'জীবন সৈকতে' অপর্ণা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মর্মস্পর্শী অভিনয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ছবির কাহিনী (মূল কাহিনী [illegible] চট্টোপাধ্যায়) মোটামুটি এইরূপঃ চিকিৎসা বিদ্যার সর্বোচ্চ এম এস ডিগ্রীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেও ডাক্তার স[illegible] ব্যানার্জী কেরিয়ারের দিকে না [illegible] পড়ে রইলো বাবার মত গরীব দুঃখী সাধারণ মানুষের সেবা নিয়ে আর কোল-কাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত এক চ্যারিটেবল হাসপাতালে ডাক্তারী করে।

একদিন ঐ হাসপাতালের ডিউটি সেরে সম্বিৎ তার ডাক্তার-বন্ধু অজয়ের সঙ্গে গাড়ীতে ফেরার সময় অসতর্ক মুহূর্তে সম্বিতের গাড়ী একটি রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা লাগায়, রিক্সার দুই আরোহিণী মহিলা রাস্তার উপর পড়ে যান। আরোহিণীদের মধ্যে একজনের বেশী আঘাত লাগে। এসব দুর্ঘটনায় সাধারণত পথচারীরা গাড়ীর আরোহীদের নিগ্রহ করে। কিন্তু এ-যাত্রায় সম্বিৎ এবং তার বন্ধু অজয় দুর্ঘটনায় পতিতা সামান্য আঘাতপ্রাপ্তা সুচেতার উপস্থিত বুদ্ধিতে রক্ষা পায়।

শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন তরুণ মজুমদার, সন্ধ্যা রায় এবং শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বি এফ জে-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়, জয়া ভাদুড়ী এবং রেহানা সুলতান।

*

পুরস্কার গ্রহণ করছেন উত্তমকুমার, অমিতাভ বচ্চন এবং ফরিদা জালাল।

—ফটো : অমৃত

জানা যায়, সুচেতা এখানকার এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, সংসারে বাবা বর্তমান। তিনিও স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

সুন্দরী শিক্ষিতা সুচেতার সঙ্গে সম্বিতের মেলামেশা আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। সম্বিতের মাও অজয়ের মুখে সব জানতে পেরে সুচেতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে তিনি সানন্দে সম্মতি দেন। সম্বিত ও সুচেতার বিয়ে হয়ে যায়। এভাবে সুখে-স্বচ্ছন্দে চলে সংসার।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় প্রফেসর চ্যাটার্জির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সম্বিত জানায় কঠিন অপারেশনের সময় সার্জেনের নার্ভটাই হোল আসল। প্রফেসর চ্যাটার্জি সম্বিতের যোগ্যতা প্রমাণ করতে একটি দুরূহ অপারেশন কেস গ্রহণ করবার জন্য সম্বিতকে পাঠিয়ে দেন প্লাজা নার্সিং হোমে। সম্বিৎ সানন্দে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। অপারেশন হয়—এই কঠিন অপারেশনে সফল হয়ে সম্বিৎ সার্জারী জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করে। সুচেতাও স্বামীর সাফল্যে খুশী হয়। বিলাতি আদব-কায়দায় রপ্ত প্লাজা নার্সিং হোমের মালিক মিসেস রুদ্র ও তাঁর বিলাতি রুচিসম্পন্না কুমারী কন্যা রিকি সম্বিৎকে পাকাপাকিভাবে বেঁধে ফেলে। কেরিয়ারের দিকে ঝুঁকে পড়ে সম্বিৎ। ইতিমধ্যে সম্বিৎ একটি সুন্দর ছেলের বাবা হয়েছে। অন্যদিকে কুমারী রিকি ক্রমশঃ সম্বিৎকে তার ছলা-কলায় আকৃষ্ট করে। শুরু হয় রিকির সঙ্গে সম্বিতের গভীর মেলামেশা। অবস্থা একদিন চরমে উঠে যেদিন সুচেতা-সম্বিতের বিবাহ-বার্ষিকী রাত্রে রিকি মত্ত সম্বিৎকে গাড়ী করে পৌঁছে দেয়। প্রতীক্ষা-ক্লান্ত এই অবহেলা সহ্য করতে না পেরে সুচেতা বাপের বাড়ী চলে যায়। অশান্তি ক্রমে চরমে ওঠে এবং অবশেষে মিসেস রুদ্র ও কুমারী রিকির প্ররোচনায় সম্বিৎ সুচেতার সঙ্গে বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করে। কোর্টের নির্দেশে সুচেতাই ছেলেকে পায়। সম্বিৎ এদিকে ছেলে বাবুলকে না পাওয়ায় তার চেতনা ফিরে আসে ও অনুতপ্ত হয়।

● [illegible]

গুপ্তধন অনুসন্ধানের হিড়িক পড়ে গেছে। এ-খবর, বোধকরি, পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পুরোনো।

ছায়াচিত্রজগতের রাঘববোয়ালদের গুপ্ত-ধন খুঁজে বার করার জন্যে দিল্লী থেকে যে-অভিজ্ঞ গোয়েন্দা এসেছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই বোম্বাই শহরের আন্ধেরী থেকে মালাবার হিল এবং ওর্লি থেকে গামদেবী পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার ১১০টি স্থানে হানা দিয়েছেন। আরও শোনা যাচ্ছে, এবারের অনুসন্ধানে নগদ টাকার পরিবর্তে হীরে জহরৎ পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে।

শেষ-পর্ব/সমিত ভঞ্জ এবং মিঠু মুখার্জি

মঞ্চাভিনয়

'পাহাড়ী ফুল' : স্নিগ্ধ পাহাড়ের কোলে হাল্কা মেঘের মতো বয়ে যাচ্ছিল যে স্বচ্ছন্দ দিনগুলো, তা আকস্মিকভাবে বিপর্যস্ত হোল শহরজীবনের কয়েকটি কৃত্রিম অনুভবের ছোঁয়ায়। পাহাড়ী ফুলের যে লাবণ্য টলমল করে উঠেছিল তা হঠাৎ যেন বিষন্নতায় স্তিমিত হয়ে গেল। কিন্তু মন ভরে রইলো এই ফুলের স্মৃতি, নীল আকাশের তলায় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেবার মধুর মুহূর্তগুলো। এই কোমল প্রাণময় অশ্রুসিক্ত অধ্যায়টিকে পটভূমিতে রেখে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'পাহাড়ী ফুল' নাটকের সংলাপ ও সংঘাত মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্তরঙ্গ সুরে বাঁধা এই নাটকটিকে কিছুদিন আগে 'কলামন্দিরে' পরিবেশন করলেন মাহীন্দ্র এন্ড মাহীন্দ্র লিঃ (ইনস্ট্রুমেন্টেশন ডিভিসন) এমপ্লয়িস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নাট্যকার স্বয়ং।

নির্দেশকের শৈল্পিক চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্র রূপকারদের নিবিড় আন্তরিকতা—এ দুয়ে মিলে সেদিন 'পাহাড়ী ফুলে'র সামগ্রিক প্রযোজনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অথচ এক সুন্দর জীবন-পিয়াসী 'অলোক' চরিত্রটিকে মঞ্চের আলোয় সুস্পষ্ট করে গেলেন অজিত রায়। প্রাণচঞ্চলা পাহাড়ী মেয়ে 'রূপা' যে 'অলোকে'র জীবনসেতারে এক মধুরতম ঝংকার তুলেছিল, তার চরিত্রচিত্রণে অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন প্রতিমা পাল। শিল্পীর কয়েকটি অভিব্যক্তি আশ্চর্য-রকমের মর্মস্পর্শী হয়েছে। প্রণব বসুর 'ডাক্তার' ও পরিমল দত্তের 'জংসিং আরো দুটি দরদী চরিত্রচিত্রণ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্র মল্লিক (অসিত), কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় (শংকর), রণজিৎ মুখোপাধ্যায় (বিকাশ), মণিভূষণ পতিতুন্ডা, দিলেশ্বর রাও, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী সতীপ্রসাদ কর্মকার, রজনীকান্ত রায়, ইন্দিরা দে।

আলোকসম্পাতে পিন্টু বোসের প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

উল্কা মঞ্চাভিনয়

কৃষ্ণনগর ফৌজদারী আদালত কৃষ্টি-গোষ্ঠী সম্প্রতি দুদিন ধরে রবীন্দ্র ভবনে নিবেদন করলেন 'উল্কা'। পরিচালনা করেন মানিক রায়। অভিনয় করেন কমলেন্দু দাক্ষিত, শ্যামাপদ নন্দী, বারিন গঙ্গো-পাধ্যায়, অমর সিংহ, প্রশান্ত সরকার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, সমাদ্রী বিশ্বাস, সোমেন মুখোপাধ্যায়, প্রাণদুলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, কালিপদ দাস, অজিত বিশ্বাস, রামচন্দ্র ঝাঁ, সাধন হাইত, তপগোপাল পাল, রবিন মাঝি, আনন্দ বিশ্বাস মানিক রায়, যূথিকা চট্টোপাধ্যায়, স্নেহলতা চট্টো-পাধ্যায় দীপালী বর্মণ, শম্পা সিংহ ও দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ সজ্জায় ছিলেন চিন্ময় রায়চৌধুরী ও সত্যনারায়ণ মোদক। গোষ্ঠীর সভাপতি সদর (দক্ষিণ) মহকুমা শাসক শ্রীকমলেন্দু দাক্ষিত নদীয়া জেলা শাসক শ্রীদীপক ঘোষের হাতে গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ৭০২-০০ টাকা প্রতিরক্ষা ও ত্রাণ তহবিলে দান করেন। সমগ্র অভিনয় অনুষ্ঠান মনোজ্ঞ হয় এবং দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

জাগরণী সংঘের মঞ্চাভিনয়

২৯শে এপ্রিল জাগরণী সংঘ হুগলীর শিবরামবাটিতে তাঁদের তৃতীয় নাট্য নিবেদন হিসেবে 'ফেরিওয়ালা' ও 'জাগো জনতা' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন, বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন তপন ভট্টাচার্য, হৃদয়রঞ্জন দাস, অশোক দাস, প্রদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ, নেপথ্য সংলাপে ছিলেন গৌতম ভট্টাচার্য, স্বপন দাস, পরিচালনায় নিধি-রাম কর্মকার।

খেলাধূলা

দর্শক

ডেভিস কাপ

পূর্বাঞ্চলের খেলা

ব্যাঙ্গালোরে ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলাটি বৃষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট দিনে আরম্ভ হয়নি, এমনকি তারপরের তিন দিনেও নয়।

পূর্বাঞ্চলের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৫—০ খেলায় মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষ এপর্যন্ত ৩-বার খেলে প্রত্যেকবারই জিতেছে। ভারতবর্ষ ১৯৬৩ সালে ৪—০ খেলায় (বৃষ্টির জন্যে ৫ম খেলা পরিত্যক্ত) এবং ১৯৬৯ সালে ৫—০ খেলায় মালয়েশিয়াকে হারিয়েছিল। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া [illegible] খেলায় জাপানকে হারিয়ে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, গত বছর এই পূর্বাঞ্চলের এ গ্রুপেরই ফাইনালে জাপান ২২-বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে অপ্রত্যাশিতভাবে হারিয়েছিল।

ইতিপূর্বে ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষ [illegible] খেলেছিল। অস্ট্রেলিয়া ১৯০৯ সালে [illegible] ফাইনালে [illegible] এবং ১৯৬৬ সালে চ্যালেঞ্জ [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible] ৪—১ খেলায় ভারতবর্ষকে হারিয়েছিল। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের জয় মাত্র একবার—১৯৭০ সালে ব্যাঙ্গালোরে [illegible] ৩—২ খেলায়।

রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

[illegible] সরকার [illegible] সূত্রে [illegible] করেছেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : [illegible] ১৫—১০, ১৫—[illegible] ও ১৫—৪ পয়েন্টে [illegible] পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : [illegible] এবং [illegible] ১৫—৩ ও ১৫—৩ পয়েন্টে অখিল ব্যানার্জি ও [illegible] ঘোষকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : অনুরাধা সরকার ১১—৬ ও ১১—১ পয়েন্টে [illegible] ঘোষকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : অনুরাধা ঘোষ এবং দীপা চ্যাটার্জি ১৫—৮ ও ১৫—৭ পয়েন্টে ছায়া ব্যানার্জি এবং রীণা চ্যাটার্জিকে পরাজিত করেন।

সিনিয়র ক্রিকেট লীগ

স্পোর্টিং ইউনিয়ন সি এ বি পরিচালিত সিনিয়র বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার ফাইনালে কালীঘাটকে পরাজিত করে ১৯৭২ সালের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইতিপূর্বে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দু'বার লীগ চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রথম ইনিংস ১৮৩ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় কালীঘাট ২ উইকেট খুইয়ে ৪৯ রান সংগ্রহ করেছিল। স্পোর্টিং ইউনিয়নের ১ম ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান (৬৩ রান) করেছিলেন অম্বর রায়।

চার্লস ব্যানারম্যান (অস্ট্রেলিয়া)
সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম রান, প্রথম বাউণ্ডারী এবং প্রথম সেঞ্চুরী করেন।

দ্বিতীয় দিনে কালীঘাটের ১ম ইনিংস ১৩৮ রানের মাথায় শেষ হলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৪৫ রানে এগিয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। স্পোর্টিং ইউনিয়নের ২য় ইনিংসের ১৩১ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় কালীঘাট পরাজয় স্বীকার করে নেয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ১৮৩ রান (অম্বর রায় ৬৩ রান। টি জে ব্যানার্জি ৪৯ রানে ৬ উইকেট)

ও ১৩১ **রান** (৩ উইকেটে। অম্বর রায় ৫২ নট আউট। টি জে ব্যানার্জি **২৯** রানে ২ উইকেট)

কালীঘাট : ১৩৮ **রান** (আর মুখার্জি ৩৩ রান। কে সামানী ২৮ রানে ৪ এবং অম্বর রায় ১৫ রানে ২ উইকেট)

ডন ব্র্যাডম্যান
ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরী করেন।

এফ এ কাপ

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত এফ এ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে (১৯৭২) লিডস ইউনাইটেড ১—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী আর্সেনাল দলকে পরাজিত করেছে। লিডস ইউনাইটেডের পক্ষে এই প্রথম এফ এ কাপ জয়। ইতিপূর্বে লিডস ইউনাইটেড দল দু'বার—১৯৬৫ এবং ১৯৭০ সালের ফাইনালে খেলে পরাজয় স্বীকার করেছিল।

বেটন কাপ

১৯৭২ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ১—০ ও ০—০ গোলে এ-বছরের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানকে পরাজিত করে বেটন কাপ বিজয়ী হয়েছে। গত বছর এই দল যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, মোহনবাগান এপর্যন্ত ৮-বার বেটন কাপ জয়ী হয়েছে এবং একই বছরে 'ডাবল' খেতাব অর্থাৎ প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান খেতাব এবং বেটন কাপ পেয়েছে ৪-বার (১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬৯ ও ১৯৭১)।

কাগজে-কলমে মোহনবাগানের থেকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের নামডাক অনেক বেশী। আগামী মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল গঠনের উদ্দেশ্যে জলন্ধরে যে অলিম্পিক কোচিং বসবে, সেখানে বর্ডার সিকিউরিটি দলের ৭ জন খেলোয়াড় আমন্ত্রণ পেয়েছেন। অপর দিকে মোহনবাগানের পেয়েছেন মাত্র ৩ জন।

১৯৭১ সালের বেটন কাপ ফাইনালে মোহনবাগান এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

টেস্ট উল্লেখযোগ্য প্রথম

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় উল্লেখযোগ্য প্রথম নজির-গুলি নীচে দেওয়া হল—

টেস্ট খেলার সূচনা

অস্ট্রেলিয়াতে : ১৫ই মার্চ, ১৮৭৭, মেলবোর্ন

ইংল্যান্ডে : ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮০, ওভাল

এফ আর স্পফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া) সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় প্রথম 'হ্যাট-ট্রিক' করার গৌরব লাভ করেন।

প্রথম জয়

অস্ট্রেলিয়া : ৪৫ রানে (মেলবোর্ন, ১৮৭৭)

ইংল্যান্ড : ৪ উইকেটে (মেলবোর্ন ২য় টেস্ট, ১৮৭৭)

প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৬৫*—চার্লস ব্যানারম্যান, মেলবোর্ন, ১৫ই মার্চ, ১৮৭৭

ইংল্যান্ড : ১৫২—ডবলিউ জি গ্রেস, ওভাল, ১৮৮০

প্রথম 'ডাবল' সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ২১১—ডবলিউ মার্ডক, ওভাল, ১৮৮৪

ইংল্যান্ড : ২৮৭—আর ই ফস্টার, সিডনি, ১৯০৩

প্রথম 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪—ডন ব্র্যাডম্যান, লিডস, ১৯৩০

ইংল্যান্ড : ৩৬৪—লেন হাটন, ওভাল, ১৯৩৮

প্রথম টসে জয়

ডি ডবলিউ গ্রেগরী (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ন, মার্চ ১৫, ১৮৭৭

প্রথম বোলিং

টি আর্মিটেজ (ইংল্যান্ড), মেলবোর্ন, মার্চ ১৫, ১৮৭৭

প্রথম ব্যাটিং, প্রথম রান, প্রথম বাউন্ডারী

চার্লস ব্যানারম্যান (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ন, মার্চ ১৫, ১৮৭৭

প্রথম 'হ্যাটট্রিক'

এফ আর স্পফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ন, ১৮৭৯

এক ইনিংসে প্রথম ৫০০ রান

৫৫১ রান অস্ট্রেলিয়া, ওভাল, ১৮৮৪

ইংল্যান্ড দলে ভারতীয় খেলোয়াড়

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সরকারী টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত এই চারজন ভারতীয় খেলোয়াড় ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন : কে এস রঞ্জিৎ সিংজী, কে এস দলীপ সিংজী, পতৌদির নবাব ইফতিকার আলি এবং সুব্বা রাও। এখানে উল্লেখ্য, এই চারজনই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেন : কে এস রঞ্জিৎ সিংজী (নটআউট ১৫৪ রান), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮৯৬ : কে এস দলীপসিংজী (১৭৩ রান), লর্ডস, ১৯৩০ ইফতিকার আলি (১০২ রান), সিডনি, ১৯৩২-৩৩ এবং সুব্বা রাও (১১২ রান), বার্মিংহাম, ১৯৬১।

লেন হাটন (ইংল্যান্ড)
ইংল্যান্ড - অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে একমাত্র 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী করেছেন
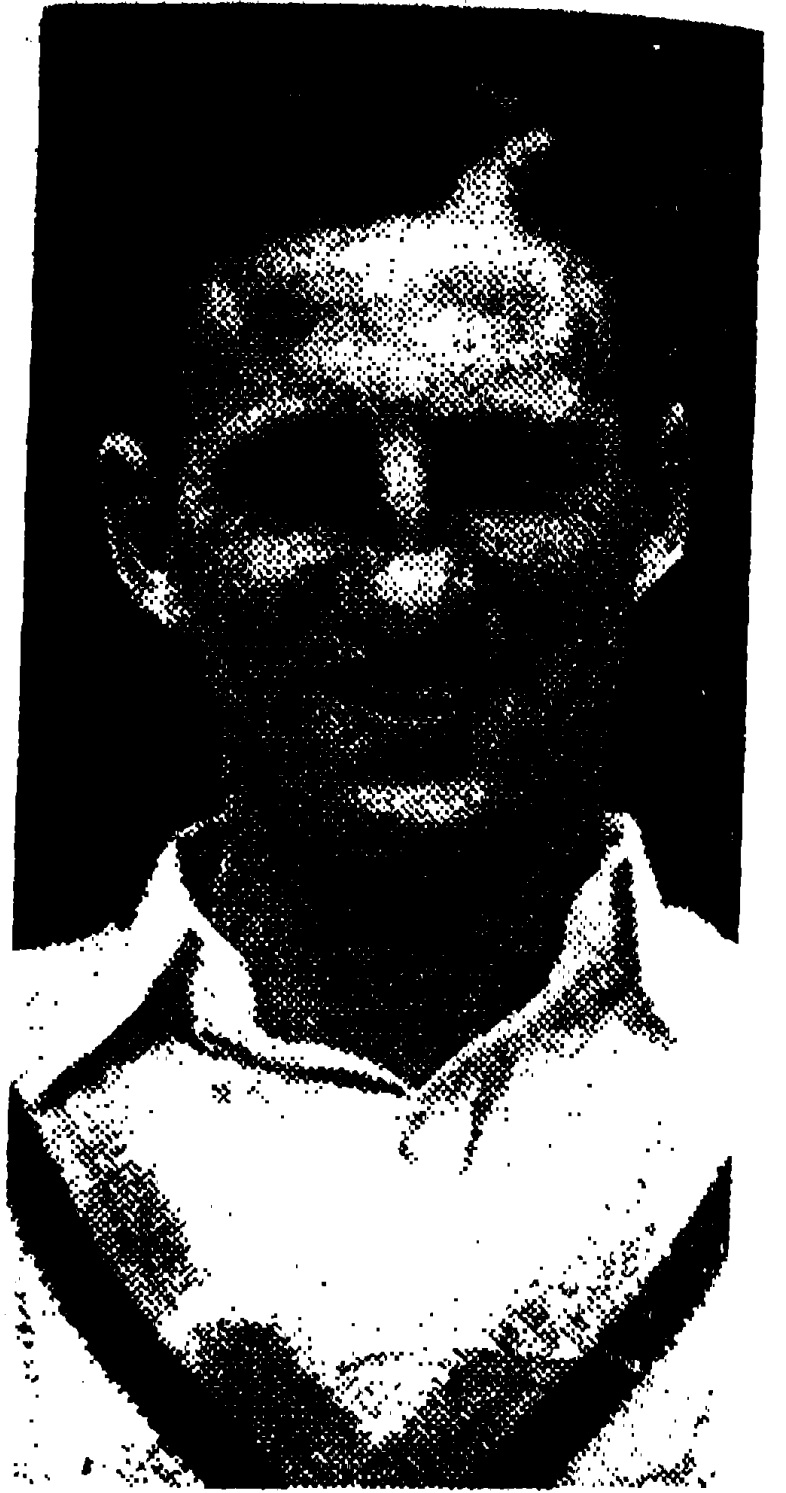
টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম খেলতে নেমে সেঞ্চুরী

খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে এ পর্যন্ত [illegible] জন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ডের ১২ জন, অস্ট্রেলিয়ার ১০ জন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭ জন, ভারতবর্ষের ৬ জন, নিউজিল্যান্ডের ২ জন এবং পাকিস্তানের ১ জন খেলোয়াড়। টেস্ট ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার হাতেখড়ি হয়েছে ১[illegible] সালে। তাদের দুর্ভাগ্য যে, আজও তাদের কোন খেলোয়াড় এই গৌরব লাভ করতে পারেননি।

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ দুর্লভ সম্মান প্রথম লাভ করেন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারম্যান (রান নট আউট ১৬৫ [illegible] বিপক্ষে ইংল্যান্ড মেলবোর্ন ১৮৭৬-৭৭।

খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী এবং সর্বোচ্চ রান করেন ইংল্যান্ডের আর ই ফস্টার (রান ২৮৭, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, সিডনি, ১৯০৩-০৪)।

খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছেন একমাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজের লরেন্স রো (২১৪ ও ১০০ নট আউট, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, কিংস্টন, ১৯৭২)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাষিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

অমৃত

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

৪ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 26th May, 1972 শুক্রবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল সাহা

রাজা রামমোহন রায়
জন্মদ্বিশতবর্ষ
১৯৭২

সম্পাদকীয়

রামমোহন রায়

ভারত পথিক রামমোহন রায়ের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী আমাদের কালে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই উৎসব উপলক্ষে আমরা তাঁর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি। দুই শতাব্দী আগে আমাদের এই ভারতবর্ষে রামমোহন যখন জন্মেছিলেন সেদিনের সঙ্গে আজকের ভারতবর্ষের পার্থক্য বিচার করলেই বোঝা যায় তিনি কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এদেশের জন্য কি মহৎ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের প্রবর্তক রামমোহন। তিনি যে-ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন তার আমূল পরিবর্তন করে নিজের সংকল্প ও সাধনার পরিচয় চিরকালের জন্য অম্লান করে রেখে গেছেন উত্তরকালের ভারতে। মধ্যযুগের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতা ভারতের জনজীবনকে বৃহৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। যা চিরাচরিত, যা সনাতন তাকেই চিরসত্য বলে মনে করে সমস্ত জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল অনড় সমাজ। ভারত তার প্রাচীন গৌরবকেও হারিয়েছিল, পৃথিবীর মানুষের নতুন মহিমাকে গ্রহণ করার মতো উদারতাও তার ছিল না। এই সময়ে এলেন রামমোহন রায়। সে এক অন্ধকার যুগ। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রেই অন্ধ সংস্কার সূচনা করেছিল এক চরম অবক্ষয়ের। বেদনার্ত রামমোহন বিনা প্রশ্নে এই অবক্ষয়ের অবমাননা স্বীকার করে নেন নি। তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। স্বচ্ছদৃষ্টি, মুক্তচিন্তা, বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি অকুতোভয় বীরের মতো সমস্ত অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সনাতনী রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সহজ কাজ ছিল না। রামমোহন একা এই কাজ করেছিলেন। ভারতবর্ষকে আধুনিক কালে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তিনি। তিনি না এলে আরও বহু দিন আমাদের সেই কুসংস্কারে ও শাস্ত্রীয় বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হত। তিনি এসেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে আমরা পেয়েছিলাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, পেয়েছিলাম উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যান্য নেতাদের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাকৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব।'

তাঁকে বলা হয়েছে ভারতপথিক। বাংলাদেশে জন্মালেও সর্বভারতীয় চেতনার প্রকাশই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল কথা। ভারতীয়ত্বের চেতনা তিনিই জাগিয়েছিলেন আমাদের মধ্যে। এবং এই ভারতবর্ষ কতকগুলো অন্ধসংস্কার আর শাস্ত্রের জীর্ণ আচারের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ ছিল আধুনিক কালের উপযোগী চিন্তা ও কর্মের গৌরবে উজ্জ্বল। এই স্বপ্ন ও সংকল্প তিনি ভারতবর্ষ থেকেই আহরণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন 'রামমোহন রায় বলেছিলেন, আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা; মনের স্বাস্থ্যকে আত্মার শক্তিকে প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে, ভারতের একান্ত আপন যে সাধন-সম্পদের ভান্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন।'

এজন্যে রামমোহনকে অনেক প্রতিবন্ধকতা, তিরস্কার ও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুতেই তিনি পিছু হটে আসেননি। যাকে সত্য বলে জেনেছিলেন, তার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হননি তিনি। এ কারণেই ভারতবর্ষের নবযুগের প্রবর্তকরূপে সবার আগে আমরা অভিনন্দন জানাই এই মানুষটিকে যিনি দেশের ও দশের জীবন থেকে অজ্ঞতা ও জীর্ণ সংস্কারের গুরুভার চিরতরে দূর করার জন্য নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, সংকল্প ও সাধনা উৎসর্গ করে গেছেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর জীবন থেকেই প্রথম আমরা উপলব্ধি করার সুযোগ পাই। কারণ, যে মুক্ত দৃষ্টি ও সুস্থ চিন্তা এই মহত্ত্ব উপলব্ধির সহায়ক তা তিনিই আমাদের দিয়ে গেছেন। যে ভারতবর্ষ একদিন বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা', যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলতে পেরেছিল 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' রামমোহন সেই গৌরবময় ভারতবর্ষেরই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আমাদের জীবনে যার সঙ্গে বিশ্বমানবের চিরকালীন মৈত্রী। আজ বিশ্বব্যাপী মানবতার ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনের যে মহান ব্রত উদযাপিত হচ্ছে তারই পটভূমিকায় আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই ভারত ইতিহাসের উজ্জ্বল পুরুষ রামমোহন রায়কে।

কবি নজরুল

কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিন বাংলা ও বাঙালির জীবনে বিশেষ তাৎপর্যময়। নজরুল বাংলার যৌবনের কবি, প্রাণশক্তির উজ্জ্বল প্রতীক তিনি। একদিকে তিনি সংগ্রাম করেছেন পরশাসনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে শাণিত আঘাত হেনেছেন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। আমাদের গভীরতম দুঃসময়ে তিনিই আশার আলোকশিখার মতো চিরদীপ্যমান। প্রতিবেশী বাংলাদেশে যে-সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অন্যতম প্রেরণা নজরুল ইসলাম, তাঁর জীবন ও সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাংলার চিরভাস্বর সত্যের প্রতীক। এই সত্য থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই। কবির জন্মদিনে এই আমাদের প্রার্থনা। কবি নিরাময় হয়ে বাঙালির এই গৌরবের দিনে দেশবাসীর সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

পটভূমি

যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উদ্বেগ এখন খরা, তবু রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে তার ফলে স্তব্ধ এমন কথা মনে করার কারণ নেই। এরই মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য পরিষদের বৈঠক হয়ে গেল। তার কিছু দিন আগেই হয়ে গেছে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির বৈঠক। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ নিয়ে তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ।

জয়প্রকাশজীর উদ্যোগ এখনও কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেয় নি। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ সম্পর্কে বেসরকারী তদন্ত যদি হয় তবে সেই তদন্ত কমিশনে কে থাকবেন তা-ই এখনও ঠিক হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে কোনো বিচারপতিকে এই কমিশনের সভাপতির পদে বসানো যায় কিনা তার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে জুনের আগে এ-সম্পর্কে যে কিছুই জানা যাবে না, এ-কথা জয়প্রকাশজীই জানিয়েছেন। কিন্তু সভাপতি পাওয়া গেলেই যে, তদন্ত ঠিকমত হতে পারবে এমন কথা বলা যায় না। কারণ তদন্ত করতে গেলে দু পক্ষ— অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনতে হয়। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী প্রথমে জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের রাজত্ব সম্পর্কে তদন্ত হলে কংগ্রেস জয়প্রকাশজীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী। কিন্তু পরে সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র উভয়েই নির্বাচনে কারচুপি সম্পর্কে তদন্তে কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন।

সেটাই স্বাভাবিক। এই কারচুপির অভিযোগ ওঠার পর থেকেই কংগ্রেস নেতারা তা সরাসরি অস্বীকার করে এসেছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এই অভিযোগকে আমল দিতে চান নি। তাই বামপন্থীরা সরকারী তদন্তের যে-দাবী তুলেছিলেন তা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সি পি এম এবং অন্যান্য বামপন্থী নেতারা বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কারচুপির কথা বলে বেড়ালেও কংগ্রেস এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতাই অবলম্বন করে এসেছে। এখন বেসরকারী তদন্তের প্রস্তাবেও কংগ্রেস রাজী হতে পারে না। কারণ তা হওয়ার অর্থই হলো, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে যে অভিযোগের একটা সারবত্তা আছে তা মেনে নেওয়া।

অথচ কংগ্রেস যদি বেসরকারী তদন্ত কমিশনের সামনে হাজির হয়ে তাদের বক্তব্য পেশ না-করে তবে সেই একতরফা মামলার শুনানী এবং রায় তেমন জোরদার হয়ে উঠতে পারে না। বামপন্থী নেতারা তো গত মাসেই দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে কারচুপি সম্পর্কে বিশদ তথ্যাদি পেশ করেছিলেন। সেটাই তো ছিল একতরফা সওয়ালের মতো। বেসরকারী তদন্ত কমিশনের সামনেও তাঁরা ঐ ধরনের তথ্যাদি পেশ করতে পারবে, কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষ না থাকলে এবং বক্তব্য পেশ না-করলে সব ব্যাপারটাই জোলো হতে বাধ্য।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত বেসরকারী তদন্ত কমিশন আদৌ হবে কিনা সে-সম্পর্কেই এখন রীতিমত সন্দেহ রয়েছে। সি পি এম অবশ্যই এই ধরনের তদন্তে খুব আগ্রহী। সি পি এম এবং অন্যান্য বামপন্থীরা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ নিয়ে আদালতে বা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে যেতে চান না। কারণ এই অভিযোগ তুলে তাঁরা যে-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাইছেন, আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তা সিদ্ধ হবে বলে তাঁরা মনে করেন না। কোনো একটি বা একাধিক কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে আদালতের রায় যদি বামপন্থীদের পক্ষে যায়ও তবু তা জয়প্রকাশজীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তদন্তের শুনানী ও রায়ের মতো নাটকীয় হবে না। বিশেষত জয়প্রকাশজীর উদ্যোগে তদন্ত অনুষ্ঠিত হলে তার শুনানী সারা দেশ জুড়ে প্রচার লাভ করবে, এমন কি দেশের বাইরেও কিছুটা প্রচার সম্ভব। সি পি এমের প্রধান আকর্ষণ এই প্রচারের দিকটাই। সর্বোদয় ও মার্কসবাদের মধ্যে সাদৃশ্য যদিও সামান্যই, তবু সি পি এম নেতারা যে জয়প্রকাশজীর শরণাপন্ন হয়েছেন তার কারণও তাই। জয়প্রকাশজী সরাসরি রাজনীতিতে না-থেকে একজন এল্ডার স্টেটসম্যানের ভূমিকা গ্রহণেই আগ্রহী। তাঁর অনেক উদ্যোগ (কাশ্মীর অথবা নাগাভূমি সম্পর্কে) বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করলেও সব সময়েই তাঁর ক্রিয়াকলাপ যে তাঁকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসে, এটা একটা বড় সুবিধে। সি পি এম সেই সুযোগটাই নিতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কতো দূর সফল হবে সে-সম্বন্ধে এখনও বেশ অনিশ্চয়তা রয়েছে।

*

অবশ্য সি পি এম এখন শুধু বেসরকারী তদন্তের ওপরেই ভরসা করে নেই। নির্বাচনে পর্যুদস্ত হওয়ার পর বিধানসভা বয়কটের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সি পি এম নেতারা পরবর্তী কর্মসূচী তৈরীর জন্যে প্রায় মাস ছয়েক সময় নিয়েছেন। এটা হয়ত একেবারেই তাৎপর্যহীন ব্যাপার নয় যে, এই নতুন কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে দিল্লীতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর। বিধানসভা বয়কট সি পি এমের পক্ষে পার্লামেন্টারী পথ বর্জনেরই পূর্বাভাস কিনা, এই জল্পনার হাওয়া এ কদিন ভারী হয়েছিল। পার্টির নবম কংগ্রেস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটি যে-খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা থেকে এ-কথা অন্তত স্পষ্ট যে, পার্টির কৌশল আপাততঃ অপরিবর্তিতই থাকছে।

স্মরণ থাকতে পারে যে, গত জানুয়ারীতে মেদিনীপুরে সি পি এমের পশ্চিমবঙ্গ শাখার দ্বাদশ সম্মেলনে পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনার সময় অবস্থার প্রয়োজনে পার্টির গোপনে কাজ করার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। স্বয়ং শ্রীসুন্দরাইয়া পর্যন্ত এমন কথা বলেছিলেন। কিন্তু এপ্রিলে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে এমন কোন কথা স্থান পায় নি। সুতরাং, যদি মনে করা যায় যে, পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্মেলনে যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছিল তাতে কেন্দ্রীয় নেতারা সায় দেন নি, তবে হয়ত ভুল হবে না।

এখন পশ্চিমবঙ্গে তাই পার্টি গণ-আন্দোলনের পথকেই বেছে নিয়েছে। সেই আন্দোলনের জন্যে পাঁচ-দফা কর্মসূচীও ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। সেই কর্মসূচীর মধ্যে আছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন, বর্গাদার উচ্ছেদ ও জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ; বন্ধ কারখানা খোলার দাবি, চাকরির নিরাপত্তা ও শ্রমিকদের ওপর গুণ্ডাদের আক্রমণ বন্ধের দাবিতে সভা-সমাবেশ: বেকারী সম্পর্কে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলা, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে কংগ্রেসী শাসকদের ওপর চাপ দেওয়া, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা দাবি, বেকার ভাতা দেওয়ার দাবি; এবং শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন। এই পাঁচটি দফা ছাড়াও অবশ্য চলবে মালদা, জয়নগর এবং রায়গঞ্জ কেন্দ্রে নির্বাচন বয়কটের জন্যে আন্দোলন। কারণ পশ্চিমবঙ্গে এখনও "অবাধ" নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয় নি।

এই ধরনের আন্দোলন সি পি এমের পক্ষে নতুন কিছু নয়। পার্টির মধ্যে এবং বাইরে সি পি এমকে যাঁরা আরো বৈপ্লবিক ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা হয়ত এই কর্মসূচীতে কিছুটা নিরাশ হবেন। কিন্তু পার্টির নেতাদের বিশ্বাস, এ-পথেই তাঁরা সিদ্ধিলাভ করবেন। কারণ, নির্বাচনী কারচুপি সম্পর্কে তাঁরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে আন্দোলন চালিয়েছেন তাতে বেশ সুফল পাওয়া গেছে বলে তাঁদের ধারণা। তাঁরা নাকি দেখেছেন, কংগ্রেসের মধ্যেও একাংশ এখন এই কারচুপির অভিযোগ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

তা ছাড়া সি পি এম এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে যে, কংগ্রেস ক্রমশই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কারণ অর্থনৈতিক সঙ্কট যতই গভীর হচ্ছে, কংগ্রেস সম্পর্কে জনসাধারণের হতাশাও ততোই গভীর হচ্ছে। তাই সি পি এম এবং অন্যান্য
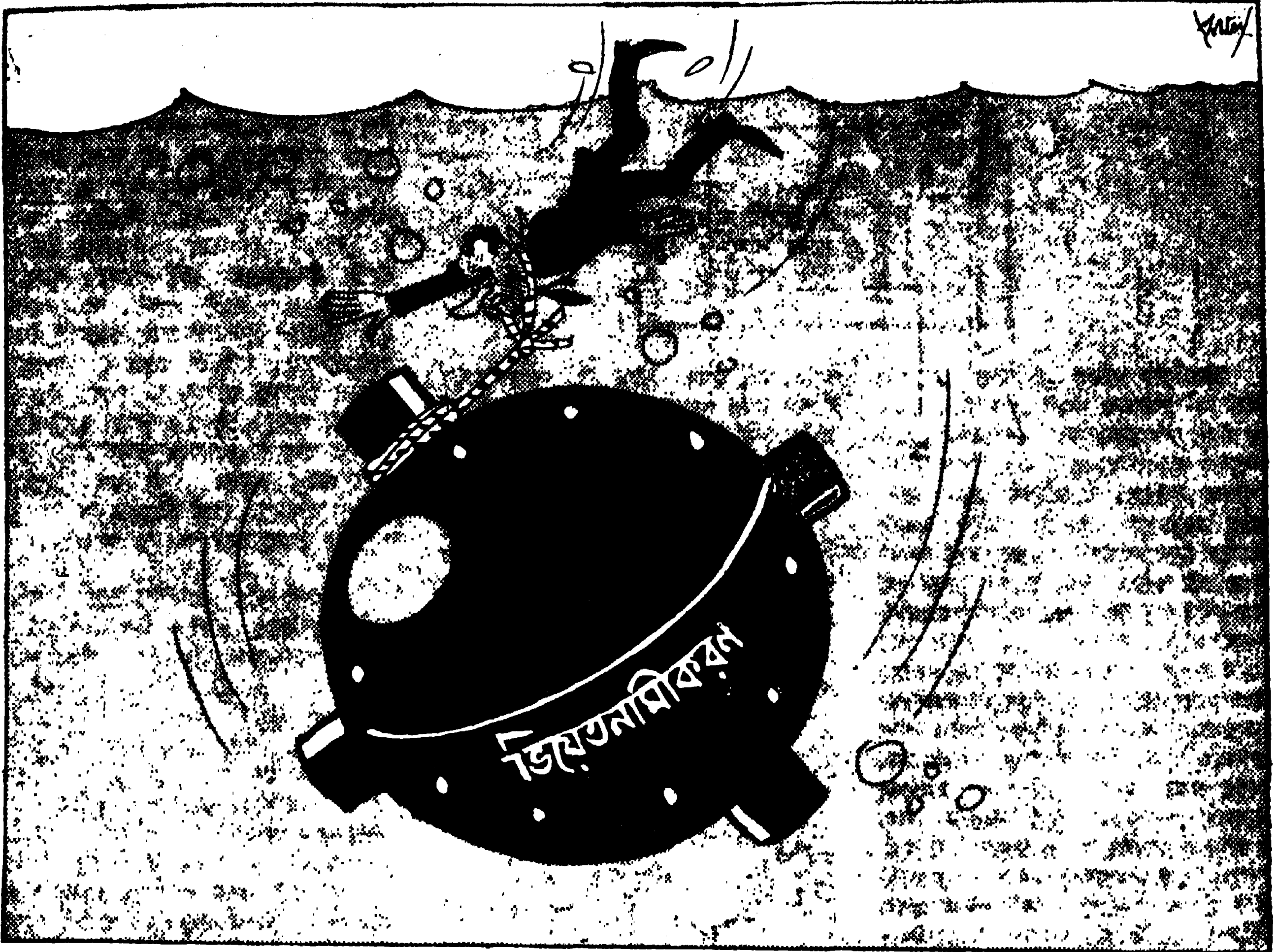
বামপন্থীরা তাদের আন্দোলনে জনসাধারণকে সহজেই সঙ্গে পেয়ে যাবে।

অবশ্য জনসাধারণ থেকে কংগ্রেসের এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই বিশেষত্ব বলে মনে হয়। কারণ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বশেষ প্রস্তাবেও স্বীকার করা হয়েছে যে, দেশ জুড়ে "ইন্দিরা কংগ্রেস" নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে তাদের ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্ক আবার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। আগে যারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল তাদের অনেকে আবার কংগ্রেসের পতাকাতলে ফিরে এসেছে। সি পি এমের অষ্টম কংগ্রেসে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, কংগ্রেস দলের এতটাই পতন ঘটেছে যে তার আর উদ্ধারের আশা নেই। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় কমিটিও স্বীকার করছেন যে, কংগ্রেসের আগের অবস্থা আর নেই।

তবে এই বিশ্লেষণটা সি পি এমের মতে পশ্চিমবঙ্গের বেলায় খাটে না। তার কারণ এই রাজ্যে কংগ্রেসের জয়ের একমাত্র কারণ "আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস"। এখানে জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে অতি মাত্রায় সচেতন এবং সেই জন্যেই তারা কংগ্রেস-বিরোধী। কংগ্রেস অই পরাজয় নিশ্চিত জেনেই পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস ও কারচুপির সাহায্যে নির্বাচনে জিতেছে—সি পি এমের এই বক্তব্য ইতিমধ্যে বেশ পুরানো হয়ে গেছে।

কিন্তু সি পি এমের এই বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত পার্টি বলছে, অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস জনসাধারণের ভোটেই জিতেছে। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল তো অন্যান্য রাজ্যেও নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ তুলেছে। সে-সম্পর্কে তা হলে পার্টির বক্তব্য কী? দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের "ভয়াবহ ঘটনাবলীর" কথা বাইরে পৌঁছয় নি বলেই নাকি ঐ সব রাজ্যে কংগ্রেস এই বিরাট সাফল্যলাভ করেছে। কিন্তু সুদূর মহারাষ্ট্র-গুজরাটের কথা না-হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, ত্রিপুরা, আসাম বা বিহারেও কি পশ্চিম বাংলার "ভয়াবহ ঘটনাবলীর" কথা কেউ জানতে পারেন নি?

এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া সহজ নয়। তবু কেন্দ্রীয় কমিটিকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের অবস্থার পার্থক্যের কথা বলতে হয়েছে খানিকটা বাধ্য হয়েই। শোনা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে পার্টির বিপর্যয়ের যে-কারণ রাজ্যের নেতারা পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সব সদস্য তা নাকি মেনে নিতে পারেন নি। এই মতবিরোধের ফয়সালা হিসেবেই হয়ত জোড়াতালি-দেওয়া একটা প্রস্তাব নিতে হয়েছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে "সন্ত্রাসের" কথা স্বীকার করা হলেও অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে তা স্বীকার করা হয় নি। তবে এই ধরনের জোড়াতালি দিতে গিয়ে যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবাস্তব ব্যাখ্যাও হাজির করতে হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচনের ওপর বাংলাদেশের ঘটনাবলীর চূড়ান্ত প্রভাব পড়েছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার নির্বাচকমণ্ডলীর মনে এই ঘটনাবলী কোনো ছাপই রাখে নি। কিন্তু যে-রাজ্য বাংলাদেশের সবচেয়ে কাছে, যে-রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ একই ভাষার সূত্রে বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে কাছের লোক, যে-রাজ্যের মানুষ বাংলাদেশ সম্পর্কে দৃশ্যতঃই বেশি আলোড়িত হয়েছিলেন, বাংলাদেশের মুক্তিতে যে-রাজ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল সেই রাজ্যের নির্বাচনেই বাংলাদেশের ঘটনাবলীর কোনো প্রভাব পড়ল না? যতো প্রভাব পড়ল গিয়ে অন্যান্য রাজ্যের ভোটদাতাদের ওপর? ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অনেকের কাছে বিসদৃশ মনে হবে। কিন্তু সত্যের দিক থেকে মুখ সরিয়ে থাকতে গেলে এমন অনেক স্ববিরোধিতা তো দেখা দেবেই।

১৯।৫।৭২ —সেবাব্রত

দেশে বিদেশে

আমেরিকা যদিও প্রকাশ্যে স্বীকার করে নি তাহলেও লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, সে উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরগুলি থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছে অথবা ঐ অবরোধ শিথিল করেছে। আমেরিকা প্রথমে বলেছিল, সমুদ্রবক্ষে সে যে মাইন পেতে রেখেছে সেগুলি কেউ সরাবার চেষ্টা করলে আমেরিকা তাকে বাধা দেবে। পরে এই হুমকীর সুর নরম করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলল, মাইন সরালে আবার নতুন করে মাইন পাতা হবে। মার্কিন সংবাদপত্রে যখন খবর বেরোল যে, উত্তর ভিয়েতনামের সমুদ্র থেকে অবরোধ তুলে কয়েকটি মার্কিন রণতরী দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমুদ্রে সরে গেছে তখন মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্র অবরোধ তুলে নেওয়ার কথা অস্বীকার করলেন, যদিও কয়েকটি রণতরী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করেন নি। যদিও ইতিমধ্যে হাইফং বন্দরে গোটা তিনেক সোভিয়েট জাহাজ আমেরিকান বিমানের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে তাহলেও আমেরিকা তার হুমকী অনুসারে কোন সোভিয়েট বা অন্য কোন বিদেশী জাহাজকে উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরে অস্ত্র বা রসদ খালাস করতে বাধা দিয়েছে বলে খবর নেই। কোন রুশ বা অন্য জাহাজ উত্তর ভিয়েতনামের বন্দর থেকে বেরোতে বা বন্দরে প্রবেশ করতে গিয়ে আমেরিকান মাইন বা আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজের সম্মুখীন হয়েছে এমন কোন সংবাদও নেই। ফলে সপ্তাহখানেক আগে প্রেসিডেন্ট নিকসন কর্তৃক এই অবরোধ আরোপের প্রথম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন মার্কিন-সোভিয়েট সাক্ষাৎ সংঘর্ষের যে সম্ভাবনাটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটা এখন কতকটা দূরে সরে গেছে।

ইতিমধ্যে অবশ্য খবর আছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোট ২৪টি জাহাজ উত্তর ভিয়েতনামের বন্দর অভিমুখে যাচ্ছে। এই ২৪টির মধ্যে আটটি মালবাহী সোভিয়েট জাহাজও আছে। কিন্তু এখন এটা এক রকম ধরেই নেওয়া যায় যে, ঐ জাহাজগুলি এসে পৌঁছলেও আমেরিকা তাদের বাধা দেওয়ার জন্যে খুব বড় রকমের একটা কিছু চেষ্টা করবে না।

ভিয়েতনামের যুদ্ধকে প্রচণ্ড হঠকারিতার সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের কিনারায় নিয়ে যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নিকসন এভাবে চুপসাড়ে পিছিয়ে এলেন কেন? একটা কারণ এই হতে পারে যে, তাঁর আসন্ন মস্কো সফর বাতিল হয়ে যাচ্ছিল দেখেই প্রেসিডেন্ট নিকসন পশ্চাদপসরণ করলেন। জাপান রেডিও থেকে একটা খবর দেওয়া হয়েছিল যে, রাশিয়া আমেরিকাকে নাকি বলে দিয়েছে, ১৭ তারিখের মধ্যে উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরগুলি থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া না হলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আর মস্কোয় আসার দরকার নেই। জাপান রেডিওর এই খবর পরে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার মস্কো সংবাদদাতার দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিকসনের নিজের রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যতের স্বার্থেই তাঁর পক্ষে এখন মস্কো সফর বাতিলের ঝুঁকি নেওয়া কঠিন। দীর্ঘ দিনের প্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দেশবাসীকে এই সফরের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। এখন এই সফর বাতিল হলে তাঁকে আগামী নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কৈফিয়ং দিতে হবে। হয়তো সেই কারণেই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা না করেও কার্যত উত্তর ভিয়েতনামের সমুদ্রপথ থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছেন।

আমেরিকার এই অঘোষিত পশ্চাদপসরণের আরও একটা কারণ থাকতে পারে। সেটা হয়ত এই যে, উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করার ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন অবস্থার চাপে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হচ্ছিল। মার্কিন অবরোধ এড়াবার জন্যে চীন হয়ত রাশিয়াকে তার এলাকার ওপর দিয়ে উত্তর ভিয়েতনামে রসদ পাঠাতে দেবে, এমন একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। লক্ষণটা আমেরিকার পক্ষে স্বস্তিকর হতে পারে না। কম্যুনিস্ট দুনিয়ার বিভেদ মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে আমেরিকা নিশ্চয়ই সমুদ্রে মাইন পাতে নি।

*　　*　　*

ভিয়েতনামের অন্য যুদ্ধ কিন্তু এদিকে যথারীতিই চলেছে। সীমান্তের দুই দিক মিলিয়ে মার্কিন বিমান থেকে প্রতি দিন হাজার দশেক বোমা ফেলা হচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন রণতরী বাহিনীর বৃহত্তম সমাবেশ ঘটান হয়েছে, কোন কোন অঞ্চলে সায়গনের সরকারী বাহিনী ভাল লড়াই করছে, কিন্তু ভিয়েতকঙ বাহিনী সরকারী প্রতিরোধ ভেঙ্গে মোটের উপর এগিয়ে যাচ্ছে এবং কম্যুনিস্ট গেরিলারা থিউ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে।

আর এরই মধ্যে চলেছে প্রেসিডেন্ট নিকসনের মস্কো সফরের প্রস্তুতি। প্রথমে শ্রীমতী নিকসন এবং তারপরে প্রেসিডেন্ট নিজে জানিয়েছেন যে, এই সফর নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারেই হবে। রাশিয়ার সংবাদপত্রেও এই সফরের প্রস্তুতির খবর [illegible] ছে। রাশিয়ার নেতারাও প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই সফর বানচাল হতে দিতে চান না বলেই মনে হচ্ছে। সম্ভবত সেই কারণেই উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন অবরোধ সম্পর্কে তাঁদের প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া খুবই সংযত। অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া যদি আমেরিকার ওপর কোন চাপ দিয়ে থাকে তাহলে সেই চাপ দিয়েছে পর্দার আড়ালে, যাতে আমেরিকা মান না খুইয়েও পিছু হঠে আসতে পারে।

*　　*　　*

মস্কোর শীর্ষ সম্মেলন পূর্ব নির্দিষ্ট তারিখেই হচ্ছে, এদিকে ভারত-পাকিস্তান শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ অনিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর মধ্যে পত্র বিনিময়ের খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু পত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয় নি। দুই নেতাই বিদেশ সফরে বেরোচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ফিরে আসা আর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর রওনা হওয়ার মধ্যে মাত্র দু দিনের ব্যবধান থাকছে। জুন মাসে ঐ শীর্ষ বৈঠক হতে হলে ঐ দু দিনের মধ্যে (২১ ও ২২ জুন) হতে হবে। কিন্তু তা হবে কি? শ্রীমতী গান্ধীর বিদেশ সফরের কথা পাকিস্তান সরকারকে আগেই জানান হয়েছিল, কিন্তু ভুট্টোর বিদেশ সফরের কথা আগে জানান হয় নি। এখন মনে হচ্ছে, ভুট্টো সাহেব এই শীর্ষ বৈঠক বিলম্বিত করতে চাইছেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তান কাশ্মীরে যুদ্ধাবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকদের ডেকে আনার চেষ্টা করছে। ভারত পরিষ্কার বলেছে যে, কাশ্মীরকে একটা আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত করতে দেবে না। অথচ পাকিস্তান সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে আর এভাবে শীর্ষ সম্মেলনের আবহাওয়াটাই নষ্ট করে দিচ্ছে।

*　　*　　*

ওড়িশার বিজু পট্টনায়ক কোন অবস্থাতেই হাত গুটিয়ে বসে থাকার মানুষ নন। তিনি বহুকর্মা ও উচ্চাভিলাষী। তিনি একজন শিল্পপতি। একজন দুঃসাহসী পাইলট হিসেবে তিনি প্রাক-স্বাধীনতার যুগে জাতীয় নেতাদের নানাভাবে গোপনে সাহায্য করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার নেতারা যখন ওলন্দাজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন সে সময়ে শ্রীপট্টনায়ক নেহরুর নির্দেশে ঐ নেতাদের গোপনে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তিনি এক সময়ে নেহরুর খুব কাছের মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের একজন সোচ্চার প্রবক্তা হিসেবে নিজের জন্য বেশ কিছুটা স্থানও করে নিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ওড়িশার

মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। পরে জনবিক্ষোভের মধ্যে তাঁকে সরে যেতে হয়। তার পর থেকে পট্টনায়ক আর কখনও তাঁর আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারেন নি। কিন্তু কখনও আশা ছাড়েন নি।

১৯৭১ সালে ওড়িশা বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় বিজু পট্টনায়ক আর একবার ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য জোর চেষ্টা করেন। ঐ নির্বাচনের পর তাঁর দল অন্য দুটি দলের সঙ্গে স্বতন্ত্র পার্টি ও ঝাড়খণ্ড দলের সঙ্গে জোট বেঁধে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। কিন্তু পট্টনায়কের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়ল না। কারণ ঐ নির্বাচনে বিধানসভার চারটি ও লোকসভার একটি কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে সব কটিতেই তিনি হেরে গিয়েছিলেন। তাছাড়া, স্বতন্ত্র পার্টিও তাঁকে যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

ওড়িশার যুক্তফ্রন্টের শরিকরা সেদিন দলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কোন নেতাই খুঁজে পেলেন না। অগত্যা তাঁরা নিয়ে এলেন ওড়িশার প্রবীণ নেতা বিশ্বনাথ দাসকে। শ্রীদাসের বয়স এখন ৮২ বছর এবং যুক্তফ্রন্টের তিন দলের কোনটির মধ্যেই তিনি নেই। (এখনও তিনি নির্দলীয়)।

শ্রীবিশ্বনাথ দাসকে যখন এভাবে বিধানসভার যুক্তফ্রন্ট দলের নেতৃত্ব ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্বে বরণ করে নেওয়া হল তখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে, তাঁকে সাময়িকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া হল। তার পর তেরো মাস সময় পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে শ্রীদাস উপনির্বাচনে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিজু পট্টনায়কও ইতি-মধ্যে বিধানসভার সদস্য হয়েছেন। অন্যান্য দিক থেকেও শ্রীপট্টনায়কের শক্তি বেড়েছে। মধ্যে কিছু সময় তিনি নিজে কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার ও তাঁর দল উৎকল কংগ্রেসকে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা ওড়িশা কংগ্রেস সংগঠনের ভার শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী ও ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় পট্টনায়কের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তার পর থেকে পট্টনায়ক স্বতন্ত্র দলের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছেন। ঐ চেষ্টা ইতিমধ্যে অনেক-খানি সফল হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি এমন কি তাঁর দলের সঙ্গে স্বতন্ত্র দলের সংযুক্তিরও প্রস্তাব দিয়েছেন। এতে পট্ট-নায়কের কিছুটা সুবিধে হয়েছে। তাছাড়া তিনি ইদানীং ওড়িশার প্রতি কেন্দ্রের অবিচারের জিগির তুলে আসর জমাবার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি কয়েকটি বক্তৃতায় তিনি এই বলে শাসিয়েছেন যে, কেন্দ্রের এই অবিচারের প্রতিকার করা না হলে ওড়িশায় 'বাংলাদেশ' তৈরী হবে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি যেসব অভিযোগ তুলেছেন সেগুলির মধ্যে আছে, ভারত সরকার এক-দিকে হলদিয়ার জন্যে ও অন্যদিকে বিশাখা-পত্তমের জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ওড়িশার পরাদীপ বন্দরকে কানা করার ষড়যন্ত্র করছেন, ওড়িশার ন্যায্য

দাবী উপেক্ষা করে তাঁরা দক্ষিণ ভারতে নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপন করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধিতার ভয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ওড়িশায় সরিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করছেন।

এই রকম একটা অবস্থায় পট্টনায়ক যখন স্বাভাবিকভাবেই আশা করছিলেন যে, এবার মুখ্যমন্ত্রীর আসন তাঁর কপালে নাচছে তখন মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের এক চতুর চালের ফলে তাঁর সে আশায় কাঁটা পড়ল। ৮৩ বছর বয়স্ক দাস মশাই রটিয়ে দিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রিত্ব তিনি ছেড়ে দেবেন। রাজ্যপালকেও তিনি সেকথা জানিয়ে দিলেন। ফল হল এই যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে যাঁরা পট্টনায়কের ক্ষমতালাভ আটকাতে চান তাঁরা বিশ্বনাথ দাসের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ পদত্যাগের হুমকী দিয়ে ওড়িশার প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা প্রকারান্তরে দেখিয়ে দিলেন যে, ওড়িশার যুক্তফ্রন্ট এখনও শ্রীদাসের বদলে শ্রীপট্টনায়ককে মুখ্যমন্ত্রিত্ব দিতে রাজি নয়। নিজের শক্তির এই প্রমাণ দেওয়ার পর শ্রীদাস তাঁর পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ওড়িশার রাজনীতিতে এটাই হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

* * *

এটা এক রকম অবধারিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হবেন রিচার্ড মিলহাউস নিকসন। কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাবেন কে? এই মনোনয়ন লাভের জন্যে প্রার্থীদের মধ্যে রীতিমত দৌড়ের পাল্লা চলছে। আর সেই দৌড়ের পাল্লায় যাঁর নামটা ইদানীং অন্যান্য প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে বিস্ময়করভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল তিনি হলেন জর্জ কর্লে ওয়ালেস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দক্ষিণী রাজ্য অ্যালবামার গবর্নর ৫২ বছর বয়স্ক ওয়ালেস রাজনীতিতে একজন কট্টর রক্ষণশীল। উদারনীতিবাদ, বর্ণসাম্যবাদ, এসব ভাল মানুষীতে তাঁর মোটেই রুচি নেই। ভিয়েতনামে, অর্থনীতিতে, আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে মার্কিন সরকার যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তার সুযোগ নিয়ে তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের মুখপাত্র হওয়ার চেষ্টা করছেন।

নির্বাচনে দাঁড়ান যেন জর্জ ওয়ালেসের একটা নেশা। তাঁকে ভালভাবে জানেন এমন একজন বলেছিলেন, 'মাতাল যে কারণে হুইস্কী খায় সেই একই কারণে ওয়ালেস নির্বাচনে দাঁড়ান। লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, উনি কি দাঁড়াচ্ছেন তখন আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, সামনে কি কোন নির্বাচন আছে?'

১২ বছরে ওয়ালেস ছয়টি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন:—১৯৫৮ সালের গবর্নর পদের জন্য দাঁড়িয়ে হেরে যান, ১৯৬২ সালে গবর্নর পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন, ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলের মনোনয়ন লাভ করার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান, ১৯৬৬ সালে স্ত্রী সুর্লিনকে অ্যালবামার গবর্নর পদে নির্বাচিত করে নিয়ে এসে বকলমে নিজে ক্ষমতা পরিচালনা করেন। (সুর্লিন পরে মারা যান। পরে জর্জ আবার বিয়ে করেন। তাঁর বর্তমান স্ত্রীর নাম কর্ণেলিয়া)। ১৯৬৮ সালে তিনি আবার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন প্রার্থী হন, ১৯৭০ সালে তিনি আবার অ্যালবামার গবর্নর পদে নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার জন্যে তিনি ১৯৬৮ সাল থেকেই কাজ করে যাচ্ছেন। ঐ বছরই তিনি তাঁর নির্বাচনী অভিযানের দপ্তর একটি নতুন ঠিকানায় সরিয়ে নিয়ে যান ও ঐ দপ্তরের পোষ্ট বকস নম্বর বদলে ১৯৬৮-এর জায়গায় ১৯৭২ করে দেন।

এবার প্রচার অভিযানে নেমে ওয়ালেস ডেমোক্র্যাটিক দলের অন্যান্য অনেক মনোনয়নপ্রার্থী যেমন হুবার্ট হামফ্রি, জর্জ ম্যাকগবার্ণ, এডমন্ড মাস্কি প্রভৃতিকে বেকায়দায় ফেলেছেন। তিনি যেসব মতামত প্রকাশ করছেন ফ্লোরিডার প্রাইমারীতে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়ে তিনি সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

ডেমোক্র্যাটিক দলের যে অংশ আমেরিকান নিগ্রোদের শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়ার বিরোধী জর্জ ওয়ালেস সেই অংশেরই একজন প্রতিনিধি। ১৯৬২ সালে গবর্নর নির্বাচনে তাঁর শ্লোগান ছিল নিগ্রোদের পৃথক করে রাখা হচ্ছে, রাখা হবে। ইদানীংকালে তিনি তাঁর নিগ্রো-বিরোধী সুর কতকটা নরম করেছেন বটে, কিন্তু মূলত এখনও তিনি শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্যে বিশ্বাসী। সরকারী অর্থে পরিচালিত স্কুলগুলিতে যাতে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গরা একসঙ্গে পড়ার সুযোগ পায় সেজন্যে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ আছে যে, নিগ্রো পাড়ার ছেলেমেয়েদের বাসে করে শ্বেতাঙ্গ এলাকার স্কুলে এবং শ্বেতাঙ্গ পাড়ার ছেলেমেয়েদের বাসে করে নিগ্রো এলাকার স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। এই নির্দেশের বিরোধিতা করে গবর্নর ওয়ালেস সম্প্রতি খুব দারুণ একটা সোরগোল বাধান। তিনি বলেন, 'আমি যদি প্রেসিডেন্ট হতাম তাহলে আমি দেশের সর্বত্র বর্ণসমতার জন্য ছেলেমেয়েদের বাসে করে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিতাম।'

অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে ওয়ালেসের মত হল: 'লালচীনের কাছে আমাদের ভিক্ষা করার বা অনুনয়বিনয় করার দরকার নেই। আমি বলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি লালচীনকে আসন দিতে চায় তাহলে আমরা আমাদের আসনটা তাকে দিয়ে রাষ্ট্রসংঘকে রাশিয়ায় সরিয়ে নিয়ে যেতে বলি।'

'একটি জাতির কথা (অর্থাৎ ভারত) আমি জানি যারা আপনাদের কষ্টার্জিত ডলার থেকে দেওয়া ট্যাকসের এক হাজার কোটি ডলার পেয়ে রাষ্ট্রসংঘের মাথায় পা দিয়েছে, আপনাদের মুখে থুতু দিয়েছে এবং ভিয়েতনামে কম্যুনিষ্টদের জয় কামনা করছে।'

'উদারনীতিক হচ্ছেন সেসব মানুষ যাঁরা নিজেদের মস্তিষ্কের ক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষিত এবং নিজেদের বাইসাইকেল সোজা করে রাখতে পারেন না।'

'আপনাদের কড়ে আঙুলে যতখানি বুদ্ধি ধরে নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকের মাথায় ততখানি বুদ্ধি নেই।'

যে প্রার্থী এই ধরনের মতামত পোষণ করেন ও প্রকাশ করেন তিনি নিজের দেশের মানুষের একাংশের বিরাগভাজন হবেন, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু রাজধানী ওয়াশিংটনের সংলগ্ন মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ পল্লীতে যে ধরনের আমেরিকানরা ওয়ালেসের সমর্থক তাঁদের মধ্যে তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ আততায়ীর গুলির লক্ষ্য পরিণত হবেন সেটা হয়তো অনুমান করা যায় নি। ভাগ্য ভাল, তিনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু তাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবু ওয়ালেসের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি মনোনয়ন লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবেন না।

গুলীতে জখম হওয়ার পর তিনি মেরিল্যান্ড ও মিশিগান রাজ্যের প্রাইমারীতে জয়ী হয়েছেন। যদি তিনি শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে তাঁর ডেমোক্র্যাটিক দলের মনোনয়ন লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যদি তেমন হয় তাঁকে আটকাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত এডওয়ার্ড কেনেডি হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন। এখন পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন না বলেই স্থির করে রেখেছেন। কিন্তু জর্জ ওয়ালেশ যাতে ডেমোক্র্যাটিক দলের মনোনয়ন না পান সেজন্যে দরকার হলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।

১৯-৫-৭২ —পুণ্ডরীক

হে রামমোহন, আজি শতেক বর্ষের করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অর্থাৎ ১২৬ বৎসর পূর্বে তখনকার বর্ধমান জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে রাধানগর গ্রামে, রাজা রামমোহন রায় ভূমিষ্ঠ হন। তিনি অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। রামমোহন রায়ের মাতার নাম তারিণী দেবী ছিল, লোকে তাঁহাকে 'ফুলঠাকরুণ' বলিয়া ডাকিত। লোকে বলে 'মায়ের গুণে ছেলে ভাল হয়।' কথাটা বড় ঠিক। রামমোহন রায়ের মা ফুলঠাকুরাণী বড় সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি ধর্মে-কর্মে নিষ্ঠাবতী ও তেমনি তেজস্বিনী নারী ছিলেন।

রামমোহন রায় যে সময় জন্মিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এখনকার সময়ের তুলনাই হয় না। তখন না ছিল রেলের গাড়ী না ছিল ঘোড়ার গাড়ী, না ছিল ভাল পথঘাট, না ছিল স্কুল-কলেজ, না ছিল এখনকার মত এতরকম সুখসুবিধা। শোনা যায়, তখন হুগলী হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে মহা হুলস্থুলে পড়িয়া যাইত। যেন মানুষ কত দূর দেশেই যাইতেছে। আজকালকার ছেলেদের মত রামমোহন রায়ের লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা ছিল না। তখনকার লোক ইংরাজী পড়িত না, আরবী ও পারসী পড়িত। কারণ যদিও ইংরাজের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি সরকারী কাজ-কর্মে তখনও মুসলমানী আমলের ব্যবস্থা চলিতেছিল। আরবী পারসী জানিলে লোকের বড় বড় চাকরি হইত, তাই লোকে ছেলেদিগকে আরবী পারসীই পড়াইত। রামমোহন রায় যখন খুব ছোট, তখন তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। তখনই তাঁহার আশ্চর্য বুদ্ধি ও স্মৃতি-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের পিতা খুব ছোটবেলা হইতেই তাঁহাকে আরবী ও পারসী পড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং ৯ বৎসর বয়সে উত্তমরূপে আরবী-পারসী শিখিবার জন্য পাটনায় একজন মৌলবীর কাছে পাঠান। পাটনা শহরে তখন ঐ দুই ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান স্থান ছিল। রামমোহন রায়ের বুদ্ধি এমনি প্রখর ছিল যে পাটনায় দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই উত্তমরূপে আরবী-পারসী শিখিয়া ফেলেন। এমনকি এরূপ কথাও প্রচলিত আছে যে তিনি ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এরিস্টটলের গ্রন্থের আরবী অনুবাদ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এরূপ শোনা যায় যে, পাটনাতে আরবী ভাষাতে আদি কোরাণ গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বালক রামমোহনের মনে একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরাগ ও নানা দেবদেবীর উপাসনার প্রতি অনাস্থা জন্মে।

পাটনা হইতে ১৫।১৬ বৎসরের সময় পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি খানাকুলের বাড়ীতে আসিলেন। তখন পিতা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, রামমোহন মধ্যে মধ্যে ঘর বন্ধ করিয়া একমনে কি লেখেন। তিনি নিজে পারসী ভাষা বেশ জানিতেন। একদিন পুত্রের অনুপস্থিতিকালে তার বাক্স হইতে কাগজ বাহির করিয়া দেখেন যে, পুত্র পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া পারসী ভাষায় এক বই লিখিতেছে। তখন পিতাপুত্র, তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ আরম্ভ হইল। কারণ রামকান্ত রায় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়কে অনেক বুঝাইলেন, অনেক শাসন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। বালক রামমোহন যে কোথায় গেলেন পিতা-মাতা বহু বৎসর আর তার উদ্দেশ পাইলেন না। পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, এই সময় তিনি পদব্রজে ভারতের নানা তীর্থে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময় পথঘাট ছিল না, পথে দস্যু-তস্করের ভয় ছিল, হিংস্রজন্তুর ভয় ছিল। তাহার মধ্যে একাকী বালক কিরূপে এত দেশ ভ্রমণ করিল। এরূপ অনুমান করা যায় যে, পিতৃ-

গৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি সন্ন্যাসী ফকিরদের সঙ্গ লইয়া থাকিবেন, সন্ন্যাসী-ফকিরেরা চিরদিন তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, তাহা হইলেও ১৬ বৎসরের বালক রামমোহনের এই দেশ-ভ্রমণ নিতান্তই উপকথার মত বোধ হয়: তিনি যদি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে উপন্যাসের মত সেই গল্প আমরা পাঠ করিতাম।

এই সময় তিনি যে কেবল ভারত-বর্ষের নানা স্থানে বেড়াইয়াছিলেন, তাহা নহে, হিমালয় পার হইয়া তিব্বত দেশেও গিয়াছিলেন। একবার ম্যাপ খুলিয়া দেখ, তিব্বত যাওয়াটা কি ব্যাপার। এখনই মানুষ সহজে তিব্বত যাইতে পারে না। অত্যুচ্চ হিমালয় পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া কোথায় পথ আছে তাহা সে দেশের লোক ভিন্ন কেহ জানে না। পাহাড়ের মাথায় অনেক হাজার ফুটের উপর দিয়া যাইতে হয়। শরীরে রক্ত জমিয়া যায়, পা ফাটিয়া যায়, প্রাণ সংশয় হয়। ঐসব স্থলে চমরী গরু ভিন্ন বাহন কাজে আসে না, এরূপ কোন পথে বালক রামমোহন তিব্বত গিয়া থাকিবেন। কোন্ পথে গিয়াছিলেন তাহা এখন ঠিক বলিতে পারা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় পরে তিনি 'কৌমুদী' নামে যে বাঙলা খবরের কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে নাকি তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহাও এখন পাওয়া যায় না।

> এত ভ্রান্তি কেন মন
> দেখ আপন অন্তরে।
> যার অন্বেষণ কর
> সে নিবসে সর্বান্তরে।
> —রামমোহন

যাহা হউক যখন তিনি তিব্বত গিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি অনেক কষ্টে সেখানে গেলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বৌদ্ধধর্মের কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেখানকার লোক বিদেশী বালকের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইল। এরূপ শোনা যায়, তিব্বতের মেয়েদের সাহায্যে অনেক কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়া সেখান হইতে কোনপ্রকারে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই কারণেই নাকি স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার চিরদিন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তিব্বত হইতে ফিরিয়া কাশীতে আসিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতামাতা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পিতার সাহায্যে কয়েক বৎসর কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামমোহন সংস্কৃতপাঠে মনোনিবেশ করিলেন এবং হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্রসকল পাঠ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এরূপ শোনা যায়, তিনি রামমোহন রায়কে তাঁহার সম্পত্তির একাংশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় প্রথমে তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহার মা পুত্রের ধর্মমতের জন্য এতদূর বিরক্ত ছিলেন যে জ্ঞাতিগণের প্ররোচনায় তাঁহাকে বিষয়ে বঞ্চিত করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়কে অর্থাভাবে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালেকটরের অধীনে দেওয়ানি করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে দেওয়ান রামমোহন বলিত। রামমোহন রায় নানা স্থানে জজের সেরেস্তাদারির কাজ করিয়া অবশেষে রংপুর সেরেস্তাদারি কর্মে প্রতিষ্ঠিত হন। এখানে থাকিতে থাকিতে তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরের কাল হয়, এবং তাঁহার জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার পরামর্শ করেন। জ্ঞাতিদের হস্ত হইতে বিষয় উদ্ধারের জন্য এবং দেশের হিতসাধনে নিযুক্ত হইবার জন্য ১৮১৩ সালে বিষয়কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন।

এখানে আসিয়া তিনি নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে হাত দেন। প্রথম, কতিপয় বন্ধুকে লইয়া 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া ধর্মালোচনাতে প্রবৃত্ত হন, এবং উপনিষদ ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থসকল অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তৎকাল-প্রসিদ্ধ হিন্দু বিধবাদিগের সহমরণ প্রথা নিবারণের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। তিনি সে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে ১৮২৯ সালে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক রাজবিধির দ্বারা সহমরণ নিবারণ করেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার ও তাঁহার বন্ধু ডেভিড হেয়ার সাহেবের চেষ্টাতে এদেশীয়দের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয়। অপরদিকে তিনি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভূগোল প্রভৃতি রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হন। তিনিই ১৮২১ সালে 'কৌমুদী' নামে বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির করিয়া সংবাদপত্র প্রকাশের পথ প্রদর্শন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পারসী ভাষাতেও একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্বে কর্মকাজে থাকিবার সময় তিনি 'তহতুন মোহদীন' নামক পারসী ভাষাতে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকা আরবী ভাষাতে লিখিয়াছিলেন। এই সময়েই একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য তিনি ইংরাজীতে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা লইয়া ইংরাজ পাদরীদিগের সহিত তাঁহার বিচার উপস্থিত হয়। সেই বিচারকালে তিনি গ্রীক ও হিব্রু ভাষা হইতে বচন তুলিয়া বিচার করেন। তিনি বাঙ্গালা ইংরাজী, পারসী ও আরবী ভাষাতে সুন্দর লিখিতে পারিতেন, এবং হিব্রু, গ্রীক বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার মত এত সুপণ্ডিত মানুষ বাঙ্গালা দেশের মধ্যে আর দেখা যায় নাই।

একদিকে যখন এইসকল বিচার চলিতেছিল, তখন অপরদিকে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিলেন। সেই সময় গবর্নমেণ্ট একটি আইন করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। রামমোহন রায় প্রথমে সেরূপ আইন পাস হইবার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৩৫ সালে অদানীন্তন গবর্নর জেনারেল সার চার্লস মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আইন বিধিবদ্ধ করেন।

কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান কার্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন। ১৮২৮ সালের ৬ই ভাদ্র কলকাতায় চিৎপুর রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সেখানে বন্ধুবান্ধব লইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। এইরূপে তিনি আমাদের সর্বপ্রকার উন্নতির দ্বার যেন খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের ছবি দেখিয়া তিনি যে বেশ সুন্দর ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বোধহয় ইহা তাঁহার ঠিক ছবি নয়। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। যেমন দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, তেমনি গৌরকান্তি, সুন্দর, উজ্জ্বল মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, প্রকাণ্ড সুগঠিত মস্তক। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর বীরমূর্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বড় দুর্লভ। যেমন সুন্দর মূর্তি তেমনি আশ্চর্য বল তাঁহার দেহে ছিল। কি মানসিক, কি শারীরিক শক্তিসামর্থ্যে তাঁহার সমকক্ষ আজও কেহ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। তাঁহার আকৃতির মত প্রকৃতিও অতি সুন্দর ছিল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। জননীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। রামমোহন রায়ের রমাপ্রসাদ ও রাধাপ্রসাদ নামক দুইটি পুত্র ছিল। তাহাদিগকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি যখন বিলাতে যান, তখন রাধাপ্রসাদ অত্যন্ত কাঁদিতেছিলেন, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিলেন, 'পুরুষ বাচ্চা, কাঁদ কেন?' রাজারাম নামে তাঁহার এক পালিত পুত্র ছিল। তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং অকাতরে সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন। ইহা ভিন্ন সকল বালকবালিকাকেই রামমোহন রায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহাদিগকে লইয়া আমোদআহ্লাদ করিতে ও খেলিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ছেলেরা দুলিবে বলিয়া বাগানের একটা গাছে দোলনা টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে ছেলেদের সঙ্গে তিনিও মাঝে মাঝে দুলিতেন। ছেলেদের দোলা শেষ হইলে নিজে দোলনায় বসিয়া বলিতেন, 'এবার আমার পালা'। সকলে মহা আনন্দে তাঁহাকে দোল দিত। একদিন তিনি এইভাবে দোলায় দুলিতেছেন এমন সময় এক বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কি মহাশয়? এ কি করিতেছেন?' রামমোহন রায় বলিলেন, 'আজ্ঞে, আমি জাহাজে করিয়া সমুদ্রে যাইব কি না, সমুদ্রে জাহাজ বড় দোলে, তাই আগে থেকে দুলিতে শিখিতেছি, তা না হলে সমুদ্রে পীড়ায় বড় কষ্ট পাইব।'

রামমোহন রায় বালকের মত সরল, অমায়িক এবং দয়ালু লোক ছিলেন। তিনি এদেশবাসীর জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যন্ত বড় মন না হইলে মানুষ অপরের জন্য ধন-প্রাণ সকলই বিসর্জন করিতে পারে না।

দেশের গরীব প্রজাদিগের দুঃখে বিশ্বপ্রেমিক রামমোহন রায়ের বিশাল হৃদয় সর্বদাই কাঁদিত। তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সুদূর বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতীয় প্রজাদিগের দুঃখ বিমোচনের জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছেন। রামমোহন রায় আমাদিগের জন্য যে প্রকার

ব্রিস্টলে সমাধি সৌধ
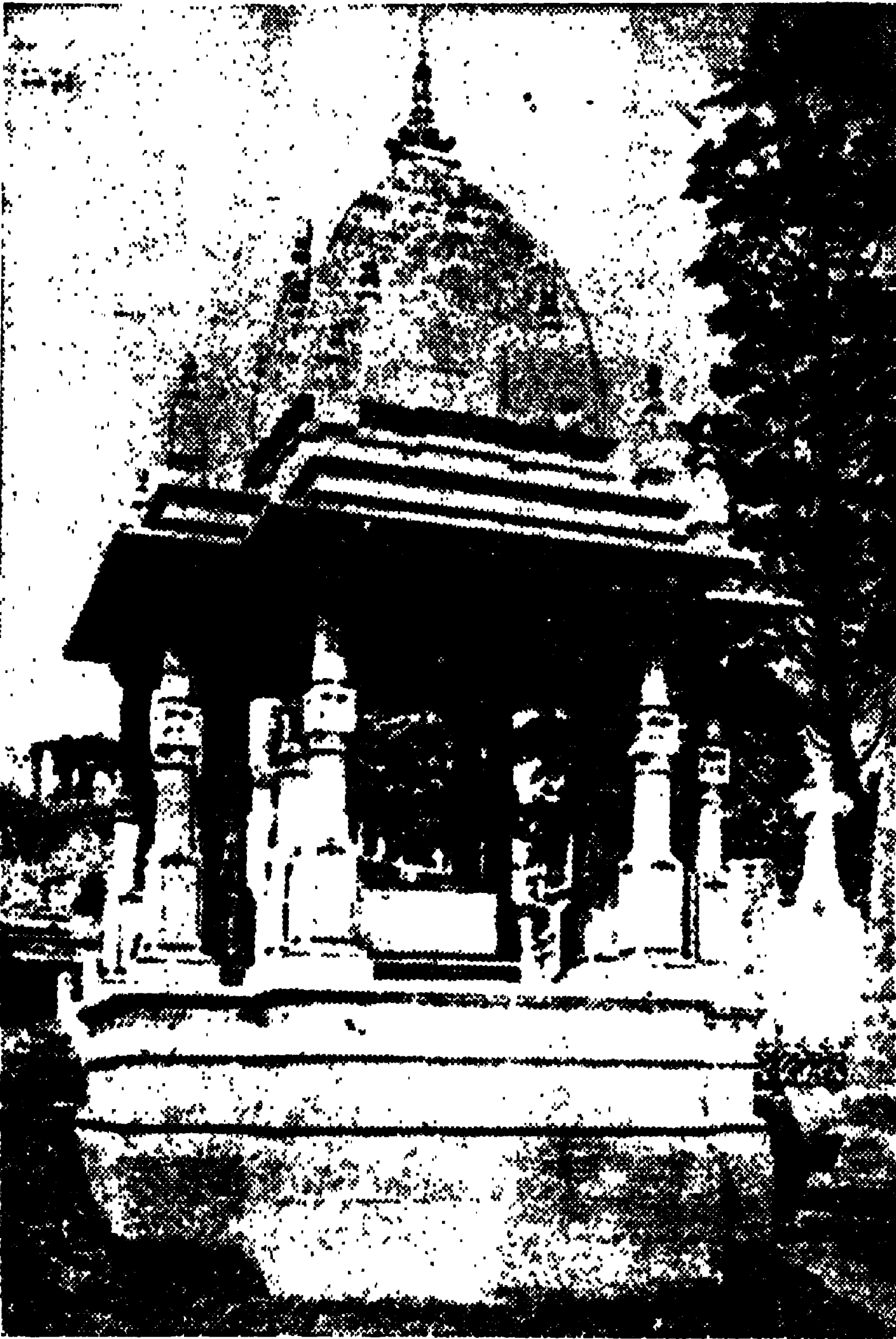
পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ে ধারণ করা যায় না। যেমন বিশাল হৃদয়, তেমনি আশ্চর্য বুদ্ধি ও মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল। তাঁহার কথা ভাবিলে তাঁহাকে কখনই সেই সময়ের লোক বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা বলিয়া ও যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার গুরুত্ব এখনও এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই। শিক্ষার এই উজ্জ্বল আলোকময় দিনে দেখ দেখি কোথায় সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, পারসী, উর্দু, ইংরাজি, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু ভাষায় এমন সুপণ্ডিত লোক দেখিতে পাও। তিনি অনর্গল সংস্কৃত আরবী পারসী কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র সকল তন্নতন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন। জানি না সর্বতোভাবে এবং সর্ব-বিষয়ে এমন আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ইউরোপ খণ্ডেই বা কয়জন জন্মিয়াছেন? সে দেশ ধন্য, সেজাতি ধন্য, যথায় রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(রামমোহন রায় সকল বিষয়েই আমাদের নেতা। এদেশবাসীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে যান। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত হইয়া, দিল্লীশ্বরের কোন কোন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবেদন করিতে, দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বিলাতে পাঠান। তিনিই রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দেন। ভারতের দুঃখী প্রজাদিগের জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় আন্দোলন করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে, তিনি পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন, রামহরি এবং দুই-একজন ভৃত্য লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। জাহাজে তাঁহার জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্নস্থানে রন্ধন করিত। তিনি ক্যাবিনে বসিয়া আহার করিতেন। রামমোহন রায় কোন মতেই হিন্দু রীতিনীতি অতিক্রম করিতেন না। তথাপি তখনকার লোকে রামমোহন রায়কে নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া গালি দিত এবং তাঁহার বিলাত যাত্রার কথা শুনিয়া দেশে মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল।

জহুরীই মাণিক চেনে! বিলাতের গুণগ্রাহী মহাত্মারা প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহার অসাধারণত্ব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু দুদিনের পরিচিত ব্যক্তিরা তাহার ভিতর এমন কি দেখিয়াছিলেন, যাহার জন্য ৫০ বৎসর ধরিয়া অতি সন্তর্পণে, অতিযত্নে, তাঁহার উপবীত, তাঁহার কেশ ও হস্তাক্ষর অমূল্য সম্পত্তির মত বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন? তাঁহারা রামমোহন রায়ের সেই বীরজনোচিত সুন্দর মূর্তিতে এমন কি বিশেষত্ব দেখিয়াছিলেন যে, তাহার মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া রক্ষা করিয়াছেন। ভাগ্যে তিনি এদেশে দেহত্যাগ না করিয়া বীর প্রসবিনী রত্নখনি ইংলণ্ড ভূমিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নচেৎ আমরা আজ কখনই তাহার উপবীত, কেশ এবং অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত তাহার সেই সুগম্ভীর মূর্তি দেখিতে পাইতাম না। আমাদিগেরই জন্য গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগে তিনি শয্যাগত হইলেন আর উঠিলেন না। ২৭ সেপ্টেম্বর রাত্রি ২-৩০ ঘটিকার সময় সকল শেষ হইল। ঘোর অন্ধকারময় ভারতাকাশের উজ্জ্বল তারকা সেদিন ব্রিস্টল শহরে চিরদিনের মত অস্ত গেল। ইংলণ্ড-বাসী বন্ধুগণ কাঁদিলেন, কিন্তু যাহাদিগের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তাহার সবল সুন্দর বলিষ্ঠ দেহপাত হইল, তাহারা একবার আহাও বলিল না। রামমোহন রায়ের মত এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন আর কে আছে?

রামমোহন রায় মৃত্যুর পূর্বে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন তাহাকে খৃষ্টান বা অন্য কোন জাতীয় লোকের সহিত একই স্থানে সমাহিত করা না হয়। সেই জন্য তাঁহার বিলাতের বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্রিস্টল নগরে একটি উদ্যানে সমাহিত করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন ঐ স্থান হইতে তুলিয়া আরনোস ভেল নামক স্থানে তাঁহার দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উপর নিজ ব্যয়ে এক সুন্দর সমাধিমন্দির নির্মাণ করেন। যাহোক তাঁহার সমাধিমন্দির যে ইংরেজ বন্ধুদিগের দ্বারা নির্মিত হয় নাই, তাহার জন্য এদেশবাসিগণ চিরদিন দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।*)

---

* প্রবন্ধটি আনুমানিক ৭০ বছর আগে লেখা

রামমোহনের আত্মীয়সভা ও ব্রাহ্মসমাজ

বারিদবরণ ঘোষ

(১)

বিদগ্ধ মহলে সম্প্রতি একটা ঝড় উঠেছে রামমোহন কোন সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, বাঙালীর ইতিহাস নেই। আমরা পাণ্ডিত্যের যতই যুযুৎসু দেখাই না কেন, পূর্বপুরুষদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধের অভাবের পরিমাণ স্মরণ করলে বঙ্কিমবাবুর চেয়েও দুঃখিত হতে হয়। পরবর্তীকালে রামমোহনকে আমরা গদ্যের গ্র্যানিট স্তম্ভ, ভারতের জনক, রাষ্ট্র নেতা, সংস্কারক ইত্যাদি যতপ্রকার আখ্যাই দিই না কেন, তাতে অকৃতজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় কিনা জানি না। কিন্তু এমন একজন যুগন্ধরের জন্ম তারিখ পর্যন্ত সঠিকভাবে স্মরণে রাখার মত স্মৃতিশক্তির অপ্রাচুর্য আমাদের ঘটেছিল দেখে বিস্মিত হই।

বর্তমানকালে রামমোহন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে না ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। তা না থাকুক, একটা লাভ অবশ্য হয়েছে, মাঝখান থেকে রামমোহন বলে একটি ব্যক্তিত্ব বইয়ের পাতা থেকে বহুজন পাঠ্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো বহুজনের সঙ্গে এই নামটির পরিচয় ঘটছে।

দশকের বা শতকের মাইল স্টোনে দাঁড়িয়ে আমরা বিগত যুগকে একবার দেখতে চেয়ে থাকি। আন্তরিকতা এই চাওয়ায় থাকে না, এমন বলি না; কিন্তু রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এমন বহু ব্যক্তিকে স্মরণের সুযোগ বর্তমানকালে এসেছে, একান্ত অ্যাকাডেমিক ব্যক্তিরা ব্যতীত তাঁদের কথা কারও মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে কিনা সন্দেহ। অথচ এই নিয়ে সভা-সমিতির অন্তও তো নেই।

রামমোহন আজ থেকে দুশো বছর আগে না একশো আটানব্বই বছর আগে জন্মেছিলেন—এ আলোচনায় আমাদের সর্বশক্তি ব্যয়িত হলেও তাতে রামমোহনকে কতখানি শ্রদ্ধা জানানো হবে জানি না। কারণ দুশো বছর পরে একবার রামমোহনের জন্য হৈচৈ করলে, নরম-গরম বক্তৃতা দিলে, অথবা দু-চারটে প্রবন্ধ রচনা করে দুশো এক বছরের মধ্যেই তাঁকে বিস্মৃতির চির-অন্তরালে প্রেরণ করলে বাঙালীজাতির অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে—এমন বিবেচনা করি না। রামমোহনের জন্ম তারিখ নির্ণয়ে উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই সব নয়। তাঁর কর্মভাবনাকে অন্তরে পুনর্জাগ্রত করে তার রূপায়ণে উদ্যোগী হওয়াই প্রাতিপদিক কর্তব্য।

২

রামমোহনের জীবনী পাঠে একটি তথ্য নিঃসন্দেহে জানা গেছে, তাঁর সর্ববিস্তারী ব্যক্তিত্ব কলকাতা আগমনের পর থেকেই দেশের সর্বস্তরে বিচ্ছুরিত হতে পেরেছিল। কলকাতা আগমনের সঠিক তারিখ নিয়েও মতান্তরের অভাব নেই—কারও মতে ১৮১৫, কেউ বা বলেন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে। কলকাতা আগমনের পর থেকে শিক্ষা জগতে পরিবর্তনের উদ্যোগ ব্যতীত দেশের তৎকালীন লোকাচার এবং ধর্মভাব রামমোহনকে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা উদ্বিগ্ন করেছিল। রামমোহনের ধর্মভাবনা ও সংস্কারচিন্তা স্ফটিক-দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসমাজ' ও ব্রাহ্মসমাজের অগ্রদূত 'আত্মীয় সভা'র একটি তথ্যনিষ্ঠ রূপরেখা অঙ্কনে উদ্যোগী হয়েছি। আলোচনাটি পূর্বকালে বহুপৃষ্ঠা ব্যয়িত করিয়েছে। সমাজ ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সঠিক নাম কি ছিল এই সমাজের ইত্যাদি নানা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয়। এগুলি আলোচনা করে রামমোহনের ধর্মভাবনার প্রকাশ বেদীটির স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করছি।

৩

কলকাতা আগমনের পর বৎসরেই রামমোহন সরাসরি দেশের সাহিত্য-ধর্ম-রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁর মহৎ পদক্ষেপ ঘটে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ বাংলার ইতিহাসে নানা দিক থেকে স্মরণযোগ্য। অষ্টাদশ শতক-বাহিত নানা বিচিত্র সংস্কারে গত শতাব্দী নানাভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল। রক্ষণশীলতাকে প্রার্থনা, আবার তার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পরস্পরবিরোধী দুটি ইচ্ছা এ সময় থেকেই সমাজে জাগ্রত হচ্ছিল। এই কালের মধ্যে দেশে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। স্বদেশ থেকে আমলাদের নিয়ে এসে শাসনকার্য পরিচালনা বাতুলতা ভেবে ইংরেজ সরকার এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর ফলে তাদের লাভের অঙ্ক কতগুনে বর্ধিত হয়েছিল, ইতিহাসবেত্তারা তার খতিয়ান করেছেন; কিন্তু এদেশের নবালোক-প্রাপ্ত জনমানসে সমাজ-চাপমুক্তির যে ইচ্ছা অস্ফুট ছিল, তা স্ফুটবাক হবার সুযোগ পেল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু স্কুল এই সুপ্ত কামনাকে প্রকাশ করতে সহায়তা করেছিল।

এই সময়ে বাংলা দেশে বেদান্তচর্চা ধীরে ধীরে মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। নগেন্দ্রনাথ সেকালের ধর্মভাবের অবস্থা সম্পর্কে একটি সুনিপুণ চিত্র রচনা করেছেন তাঁর রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে। আমরা অংশবিশেষ চয়ন করছি। 'বেদের যে কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান তার আদর এখানে কিছুই ছিল না।...তখনকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। কিন্তু আদি শাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্রপাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ।'১ অবস্থা বুঝে রামমোহন কলকাতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই অনুবাদ ও ভাষ্যসহ 'বেদান্তগ্রন্থ'২ প্রকাশ করলেন।

৪

কেবলমাত্র গ্রন্থপ্রকাশ করলেই দেশের ধর্মভাবনায় পরিবর্তন ঘটবে, এমন তরল বিশ্বাস ও অদূরদর্শিতা রামমোহনের ছিল না। দেশে এজন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে বুকে বসা সংস্কারের মূলোৎপাটন করার জন্য তিনি তাঁর আন্দোলনকে চতুর্মুখী করে তুললেন। সভাস্থাপন করলেন, পুস্তকপ্রকাশ করলেন, আলোচনা ও বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য সর্বাংশে তৎপর হলেন।

কলকাতায় বসবাস করার আগে রংপুরে থাকতেই ধর্ম সংস্কারের ব্যাপারে তিনি আন্দোলন উপস্থিত করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গে ধর্মালোচনাতে কালযাপন—রামমোহনের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল রংপুরে থাকতেই। সকলে একে পরিষ্কার চোখে দেখেননি। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু রামমোহন সৃষ্টি করেছিলেন রংপুরে বাসকালেই।

ইতোমধ্যে ডিগবি অসুস্থ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন—বিত্তবান রামমোহনও

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭), পৃঃ ৬০—৬১।

2 The Bengalee Translation of Vedant or Resolution of all the Vedas; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, establishing the unity of the supreme being and that He is the only object of worship. Together with a preface, by the Translator Calcutta : From the Press of Ferris and Co. 1815.

আমহার্স্ট স্ট্রীটের এই স্মৃতিময় সুবৃহৎ বাড়ীটিতে এখন কেউ প্রবেশ করতে পারেন না।
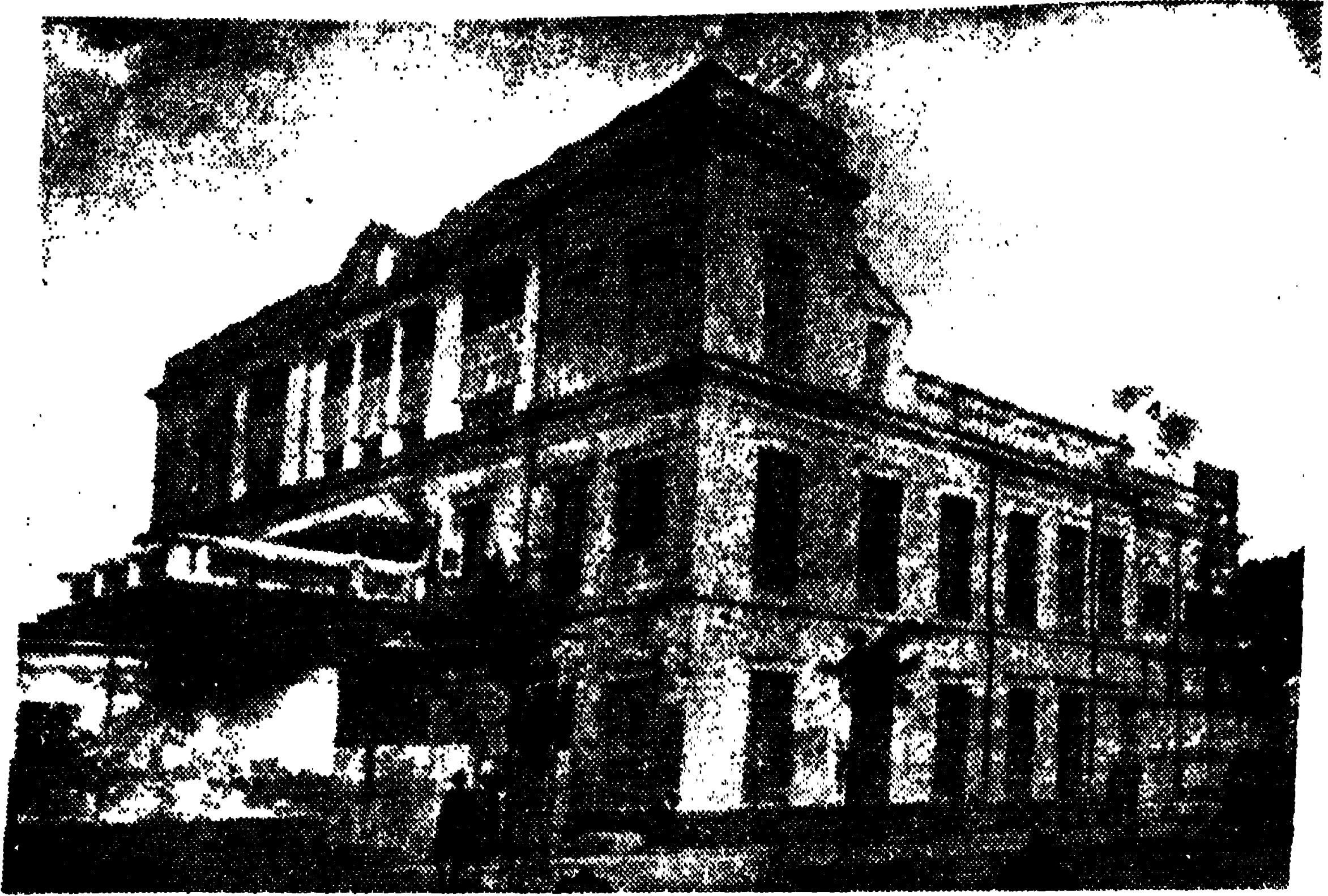
কলকাতায় এলেন স্থায়ীভাবে বাস করার জন্যে জ্ঞাতিভ্রাতা রামতনুর সহায়তায় একটি বাড়ী তৈরী করালেন সার্কুলার রোডে। অচিরকাল মধ্যে এখানেও এক বিদগ্ধমণ্ডলী রামমোহনের বাড়ীতে এসে সংস্কার সম্পর্কে নানা আলোচনায় লিপ্ত হতে লাগলেন। অবশ্য স্বার্থান্বেষী মধুমক্ষিকার ভিড়ও জমতে লাগল। চিন্তাশীল ও সমাজ প্রধানদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ পাথুরিয়া ঘাটার জমিদার বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীনিবাসী বাবু কালীনাথ মুনশী, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা বৃন্দাবন মিত্র, তেলিনিপাড়ার বিখ্যাত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু স্কুলখ্যাত বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়, রামমোহনের গুরুকল্প হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বৃহস্পতির চতুষ্পার্শ্বে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মত বিরাজ করতে লাগলেন। এদের সঙ্গে রামমোহন তাঁর প্রতিষ্ঠিত যে সভায় প্রায় নিয়মিত পেতে লাগলেন তার নাম 'আত্মীয় সভা'। 'আত্মীয়সভা'র প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ। এই সভাই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অগ্রদূত।

প্রধানতঃ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য আত্মীয়সভা স্থাপিত হয়। ধর্মমূলের বাঙলানুবাদ এই সভার অন্যতম প্রকৃতি ছিল। ঠাকুর পুতুলের দেশে রামমোহন এই সভা থেকে একেশ্বরবাদী বেদান্ত দর্শন ও নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচার করতে শুরু করলেন। অমনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের রসনা প্রতিবাদে নৃত্য করতে লাগল। নাস্তিক ও পাষণ্ড রামমোহনের ডাকনাম হয়ে উঠল। চারিদিকে একটা গেল গেল রব উঠল। মাদ্রাজবাসী শংকর শাস্ত্রী যুদ্ধং দেহি বলে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন। বললেন, নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপন্ন করছে সত্য, কিন্তু দেব-দেবীর উপাসনাও মিথ্যে নয়। রামমোহন বেদান্তের যুক্তি দিয়েই শংকর শাস্ত্রীকে পরাস্ত করলেন।

বাঙলী পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বিরোধিতার কথা সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন। তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রিকা' রামমোহনের বিরুদ্ধে রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। বিদ্যালংকারও রামমোহনের যুক্তিদর্শনে পশ্চাদপদ হলেন। গোস্বামী, কবিতাকার, ভট্টাচার্য নামধারী ব্যক্তিরাও কুৎসা সহযোগে রাজাকে আক্রমণ করলেন এবং পূর্বোক্ত দুজনের গতিপ্রাপ্ত হলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বোধকরি সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর বিরোধিতা। অশেষ দম্ভভরে তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করলেন—বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নেই, রামমোহন তাই বেদান্তের দোহাই দিয়ে যা নয় তাই বলে বেড়াচ্ছেন। তাঁর নিরাকার তত্ত্ব তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। বিচারের জন্য এক মহাসভার আয়োজন হল বিহারীলাল চৌবে নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। লোকে লোকারণ্য সভাস্থলে তিলার্ধমাত্র স্থান নেই—রামমোহনের সঙ্গে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর বিচার হবে। রামমোহন দলবল নিয়ে, সুব্রহ্মণ্যও সংগীদলসহ উপস্থিত, আর এসেছেন সপারিষদ হিন্দুকুলচূড়ামণি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। সুব্রহ্মণ্যের আস্ফালন প্রায় সত্য হতে চলল—সমবেত ব্রাহ্মণরা কেউ ওঁর সম্মুখীন হতে পারলেন না। এবারে রামমোহন এগিয়ে এলেন, তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হল। শাস্ত্রী পরাভূত হলেন। আমার মনে পড়ছে চৈতন্যদেবের কাছে বাসুদেব সার্বভৌমের পরাজয়ের কথা। যারা ভেবেছিলেন রামমোহন রায়কে সুব্রহ্মণ্য চুণকালি মাখাবেন, রামমোহনের বিরুদ্ধে তারা যেন দ্বিগুণ আক্রোশে ফেটে পড়তে লাগলেন। এই আগুনে ঘৃতাহুতি দিল, যখন 'আত্মীয়সভা'র সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে রামমোহন সতীদাহ নিবারণ বিষয়ক কয়েকটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইংরাজি ও বাংলাতে প্রকাশ করলেন।[3] সকলেই বুঝতে পারলেন এই সভা দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সভার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য রক্ষণশীল হিন্দুরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতে লাগলেন। যাঁরা প্রতি সপ্তাহে সভায় আসতেন, তাঁরা যোগাযোগ প্রায় রহিত করে দিলেন। জয়কৃষ্ণ সিংহ প্রকাশ্যে পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। 'আত্মীয়সভা'র বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে তিনি সর্বশক্তি ব্যয়ের সংকল্প করলেন, বলতে লাগলেন, রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'তে গোহত্যা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তখনি সভার সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহনের কাছে ব্রহ্ম জেনে থাকলেও হরিমোহন ঠাকুরের কাছে নিজেকে পরম

৩ Calcutta Journal 1819, April 10, pp. 119.

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭), পৃঃ ৬০-৬১।

বিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করতে লাগলেন। সভ্য সংখ্যা স্বভাবতই হ্রাস পেতে লাগল। রামমোহন তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। স্বল্প কয়েকজন আত্মার আত্মীয়কে নিয়ে তিনি 'আত্মীয়সভা'য় ধর্মালোচনা করতে লাগলেন।

শুধুমাত্র হিন্দুদের সঙ্গেই নয়, খৃষ্টীয় মিশনারীগণের সঙ্গেও তাঁকে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় মিশনারীরা বেদ, বেদান্ত, হিন্দুদর্শন, তন্ত্র ও পুরাণাদির তীব্র সমালোচনা করতে থাকলে রামমোহন প্রতিবাদের জন্য 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে পত্রিকা প্রকাশ করলেন। বিশেষতঃ যীশুখৃষ্টের প্রকৃত সত্তা খৃষ্টানগণকে জ্ঞাত করাবার জন্য তিনি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে 'প্রিসেপটস অফ জেসাস দি গাইড টু পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হল। হিন্দুরা ভাবলেন, নাস্তিক রামমোহন এবারে বুঝি পুরোপুরি খৃষ্টান হয়ে গেলেন, আর খৃষ্টানগণ দেখলেন যে, রামমোহন যীশুর অবতারত্ব স্বীকার করেন নাই। রামমোহন তাঁর যুক্তির সারবত্তা প্রমাণের জন্য কয়েকবার 'অ্যাপিল' প্রকাশ করলে তাঁরা রামমোহনের যুক্তি মেনে নিলেন। এতো গেল একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের কথা। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী টাইটলার সাহেবের সঙ্গে রাজার বিতণ্ডা উপস্থিত হল। 'রামদাস' ছদ্মনামে রামমোহন টাইটলার সাহেবকে বিধ্বস্ত করলেন।
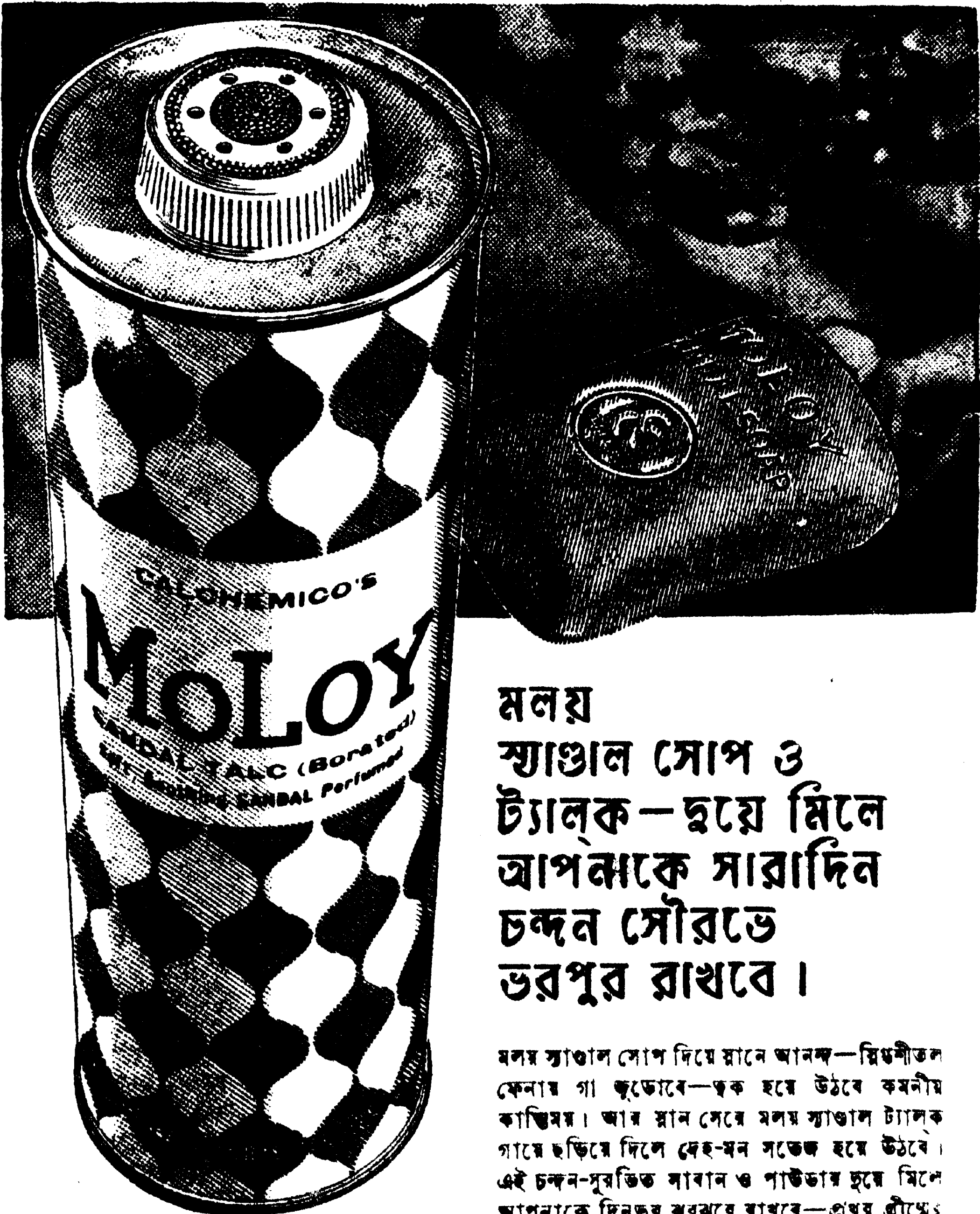
'আত্মীয়সভা'র কর্যাক্রম সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে আমাদের কৌতূহল স্বভাবতই উদ্রিক্ত হতে পারে। এই সভার আসল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা বিরোধী বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদকে প্রয়োগ করা। এই সভা স্থাপনের সংবাদ পেয়ে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা (২২শে মে ১৮১৯, ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ সংখ্যা) লিখেছে—

বেদান্ত মত।

"—৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং মৃধৃতি স্ত্রীর স্বামী মরণান্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপ করার কর্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্মের বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনাদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

অনেক পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা 'আত্মীয় সভা' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবন্ধ করেছে। সম্পাদক লিখেছেন, 'পরমশাস্ত্র প্রতিপাদ্য সনাতন ব্রহ্মোপাসনা যখন এদেশে প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছিল, তখন রামমোহন রায় 'বিচার দ্বারা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনারূপ সত্য-ধর্ম স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন।'

'সায়াহ্নকালে আত্মীয়সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত হইত, কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসংগীত গান করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর তথায় সময় সময় উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু এবং মদনমোহন মজুমদার ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনারূপ পরমধর্মের অবলম্বন করিলেন।' (৬) তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব-বাহাদুর, রঘুরাম শিরোমণি, হরনাথ তর্ক-ভূষণ প্রমুখেও প্রথম দিকে এই সভায় মাঝে মাঝে আসতেন।

আত্মীয়সভার অধিবেশনগুলি সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। বিশিষ্ট এবং রামমোহনের নির্বাচিতব্যক্তিগণই এই সভায়

রামমোহনের একটি চিঠি

From the Rajah Ram Mohun Roy
to Miss Kiddell, The Rev'd [illegible]
Miss Castle, Stapleton Grove
near Bristol —

[illegible]

Dear Madam

I hope you & your friends
are at [illegible] from [illegible]
[illegible] — I beg your acceptance
of the accompanying volume
containing a series of sermons
preached by Dr. Channing
which I prize very highly.
I also beg you will
oblige me by [illegible] the
small pamphlet, [illegible]

উপস্থিত থাকতেন। অবশ্য এর সদস্য সংখ্যা কত ছিল তা জানতে পারিনি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন লিখেছেন,

'The meetings were not quite public and were attended chiefly by Rammohun's personal friends.'

অন্যত্র, 'সে সভা প্রকাশ্যরূপে সাধারণের জন্য ছিল না।' ৮

'আত্মীয়সভা' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি এবং এর অধিবেশনগুলিও নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। মিস্ কলেট-রচিত রামমোহন-জীবন-চরিত থেকে জানতে পেরেছি ১৮২১ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনগুলিতে যতিপাত ঘটেছিল। ৯

কাজেই 'আত্মীয়-সভা' সম্পর্কে আমরা যা জানলাম, তা সংক্ষেপে হল এই—

এক, আত্মীয়সভা রামমোহনের বন্ধুদের ব্যক্তিগত ধর্মালোচনার স্থান ছিল। এর লক্ষ্য সর্বজনের হিতসাধন হলেও, প্রকাশ্যরূপে এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সভাটির একজন সম্পাদক বা কার্য-নির্বাহক (বৈকুন্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) থাকলেও সভা পরিচালনের জন্য অন্য কোন পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে মনে করি না।

দুই, সভার জন্য কোন স্থায়ী গৃহ নির্মিত হয়নি।

তিন, অধিবেশনগুলি নিয়মিত কাল ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হত না; এবং এগুলি পালাক্রমে বিভিন্ন সভ্যের গৃহে অনুষ্ঠিত হত।

চার, কোন আচার্য কর্তৃক সাপ্তাহান্তিক ব্যাখ্যান-পাঠ বা উপদেশ দান প্রথা প্রবর্তিত হয়নি।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০০।

৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯, শক, ৫০তম সংখ্যা।

7. Indian Mirror, 7 July, 1865.

৮। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেস প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৭৯৩ শকাব্দ, পৃঃ ৪৫।

9. S. D. Collet, Life of Rammohun Roy (4th Edition), pp 39.

by ... acceptable to Miss Kiddle. Be so obliging as to induce her to write a letter of thanks for such a trifling present, I have refrained (delicacy) from sending it to Miss Kiddle. Had I not been engaged to a dinner party today, I would have made another trial of Miss Kiddle's generosity this afternoon. I will endeavour to pay you a short visit tomorrow between the hours of 10 & 12 should you be at home. I remain

Yours very sincerely,

§ Rammohun Roy.

পাঁচ, সাধারণের প্রবেশ নিষেধ ছিল বলে বেদপাঠের ব্যাপারে কোন অংশ-নির্বাচনের বাধাবাধকতা ছিল না।

'আত্মীয় সভা'র এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গুলি আমরা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, ১৮২৮ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে 'আত্মীয় সভা'র চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কাজেই এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমতা লক্ষ্য করার কোনো কারণ দেখিনা,—যদিও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বীজ এই সভাতেই উপ্ত হয়েছিল। 'আত্মীয় সভা' একান্তভাবেই রাজার 'আত্মীয়'গণের সভা ছিল। অপরপক্ষে ব্রাহ্ম-সমাজ ছিল সর্বজনহিতায় সাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান।

'আত্মীয় সভা'র সদস্যসংখ্যা হ্রাসের কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তদুপরি ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে সম্পত্তিগত বিরোধে রাজাকে প্রায় তিন বছর ধরে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল বলে 'আত্মীয় সভা' পর্যন্ত আর হইত না। 'আত্মীয় সভা'র গুঞ্জন এক-সময় স্তব্ধ হয়ে গেল—কিন্তু একটি সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর প্রতি সন্ধ্যায় দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করত,—সে স্বরে ছিল আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যত-ভারত গঠনের দূরদর্শিতা, আর সেই স্বরের অধিকারী ছিলেন ভারতপথিক রামমোহন রায়। ১০

১০। এই প্রসঙ্গে আরও একটি 'আত্মীয় সভা'র কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। রাখাল-দাস হালদার, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং অনংগ-মোহন মিত্রের উৎসাহে দেবেন্দ্রনাথের ভবনে ১৮৫২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাম-মোহনের 'আত্মীয় সভার নামানুসারে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভা-পতি ও অক্ষয়কুমার দত্ত এর সম্পাদক নির্বাচিত হন।

§ Sivanath Shastri, History of Brahmo Samaj of India, Vol I, pp11.

(৫)

খৃস্টধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে রামমোহনের বিতণ্ডার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ সময়ে উইলিয়ম অ্যাডাম নামক একজন ব্যাপটিস্ট পাদরী রামমোহনের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। ইনি প্রথমে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে রামমোহনের সঙ্গে আলোচনার ফলে একেশ্বরবাদেই বিশ্বাস স্থাপন করেন। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে অশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তারা অ্যাডামের এই পরি-বর্তনকে 'সেকেণ্ড ফল অফ অ্যাডাম' নামে প্রচার করতে লাগলেন। যাই হোক, এই অ্যাডাম সম্ভবতঃ রামমোহনের পরামর্শক্রমেই একটি একেশ্বরবাদী প্রার্থনা সমাজ স্থাপন করলেন।

'হরকরা' পত্রিকা অফিসে এই ইউনিট্যারিয়ান কমিটি স্থাপিত হল ১৮২১ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রতি রবিবার অ্যাডামেরআচার্যত্বে এই গৃহে একেশ্বরের উপাসনা শুরু হল। রামমোহন তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়, পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ ও বন্ধুদের কয়েকজনকে নিয়ে এই উপাসনা-লয়ে যেতে লাগলেন। এখানে অনুমান করা অসংগত হবে না যে, এই কালের মধ্যে 'আত্মীয় সভা' রহিত হয়েছিল। ইউনিটারি-য়ানেরা যীশুকে মধ্যবর্তী করে পরমেশ্বরের স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করেন না; রামমোহনের এই উপাসনা পদ্ধতি খুব ভাল লাগত। কথিত আছে, নিজেকে তিনি 'হিন্দু ইউনি-টেরিয়ান' বলতে ভালবাসতেন। শেষ পর্যন্ত এই সভাও একসময় বন্ধ হয়ে গেল।

৬

ইতোমধ্যে একটি 'মহদ্ব্যাপার সমুদ্ভূত' হল। একদিন রামমোহন অ্যাডামের প্রার্থনা সভা থেকে বাড়ী ফিরছিলেন, এমন সময় তাঁর দুই সহযোগী (আমরা যাদের বন্ধু বলে মনে করি, রামমোহনের সেই অর্থে কোনো বন্ধু ছিল বলে মনে করি না। কারণ তাঁর মত বিরাট ব্যক্তিত্বের সমকক্ষ বা সম-মর্মিতা কেউ দাবী করতে পারেন, এ যেন একেবারে অবিশ্বাস্য) তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব পথের মধ্যে তাঁকে বললেন, 'যে বিদেশী লোকের ধর্মযাজক গৃহে যাইয়া আমারদিগের উপদেশ শুনিতে হয়, আমার-দিগের এমত কোন সাধারণ স্থান নাই যে তথায় বেদ অধ্যয়ন বা অন্যপ্রকার পরমার্থ প্রসঙ্গ হয়। ইহা অতি অসুখের কারণ। এই মহৎ প্রস্তাবেই সাধারণ১১ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূত্র হইল।১২

রামমোহন সম্মত হলেন: কারণ তিনি জানতেন যে, পৌত্তলিকতা বা তার আনু-ষঙ্গিক ধর্মানুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্তাদি—সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির একটা বড় বাধা-স্বরূপ। ডিরোজিও-র নাস্তিক্যবাদ এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তাই তিনি

১১। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নয়। এখানে সাধারণ অর্থে পাবলিক বোঝানো হয়েছে।

১২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯ শক, ৫০তম সংখ্যা।

'এক বিশ্বধর্ম' সংস্থাপনে অগ্রসর হলেন। এ ব্যাপারে তাঁর জীবন সংগ্রাম পর্যন্ত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কেন তিনি এই অবাঞ্ছিত সংগ্রামে নেমেছিলেন, তার কৈফিয়ৎ তিনি নিজেই দিয়ে বলেছেন,—

> My constant reflections on the inconvenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu idolatry which, more than any pagan worship destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error, enable them to contemplate with devotion the Unity and Omnipresence of Nature's God.
>
> By taking the path which consciene and sinerity direct, I born a Brahmin have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends on the present system.

কাজেই এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির পরিবর্তে একটি মাত্র ফর্মলেস সুপ্রিম বিং-এর যদি উপাসনা করা যায়, তাহলে সারা ভারতবর্ষে 'একজাতি একপ্রাণ একতা'র মহৎ আবির্ভাব ঘটবে।১৪

ভেবে দেখা দরকার, এই একেশ্বরের উপাসনায় কাউকে ধর্মান্তরিত হওয়ার আহ্বান রামমোহন জানান নি। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান সকলেই নিজ স্বতন্ত্র বজায় রাখতে পারবেন এবং তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভারতবর্ষ বা বিশ্ববাসী নামে এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হোক—এই ছিল তাঁর প্রার্থনা। বিপিনচন্দ্র পালের কথায় বলি—

> মিটে যায় সব ধন্দা
> যাঁহা রাম রহিম এক বান্দা
> কাফেরে মুসলমানা। ১৫

একমু-এর নৈবেদ্যের উপাচার হবে শুধু দয়া ও প্রীতি ফুল, ফল বা অর্থ নয়। বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক মহান আহ্বান এই সমাজ থেকে উদ্গীত হোক—এই প্রার্থনা করে 'শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয় সভার বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।'১৬ প্রস্তাব সমর্থন করে বন্ধুরা এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

প্রতিষ্ঠিতব্য সমাজের জন্য রামমোহন একখণ্ড জমি সংগ্রহ করতে চাইছিলেন। শিমুলিয়ায় একখণ্ড জমি প্রায় ঠিক হয়েও শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে গেল। তাই শেষ পর্যন্ত একটি ভাড়া বাড়ীতে সমাজ স্থাপনের জন্য তিনি উদ্যোগী হলেন।

তখন ১৭৫০ শকের (১৮২৮ খৃস্টাব্দ) ২০এ আগস্ট, বাংলা ১২৩৫ সনের ৬ই ভাদ্র তারিখে চিৎপুর-জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা কমল বসুর১৭ বাড়ীর একাংশ মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল। বাড়ীখানি দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীর কাছেই অবস্থিত ছিল। সেজন্য রামমোহন ঐ বাড়ীতেই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন উপযুক্ত বিবেচনা করলেন। তাছাড়া চিৎপুর রোডই ছিল উত্তর কলকাতার প্রধান রাস্তা। ঐ অঞ্চলেই কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ বসবাস ছিল। এখানে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে অধিক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, রামমোহন হয়তো এই ধরনের অনুমান করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠা দিবসে যে ব্রহ্মোপাসনা হয় তাতে রামমোহনের গুরুকল্প হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর অনুজ, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য, ২৪ বৎসর বয়স্ক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটি ব্যাখ্যান পাঠ করেছিলেন। এই প্রথম ব্যাখ্যানটি সে সময়ে মুদ্রিত হয়েই পঠিত হয়েছিল।—

> পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান ।। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম কর্তৃক ।। ব্রাহ্মসমাজ। কলিকাতা। বুধবার ৬ ভাদ্র। শকাব্দ। ১৭৫০।

এই প্রথম ব্যাখ্যানটি থেকেই আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের সঠিক নাম জানতে পারলাম—ব্রাহ্মসমাজ। একথা এখানেই উল্লেখ করছি একারণেই যে, পরবর্তীকালে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত এই সমাজের নাম নানাজনে ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মসভা, ব্রাহ্মসভা, ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসভা ইত্যাদি বলতেন। প্রকৃতনাম ব্রাহ্মসমাজ। তাছাড়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস সম্পর্কেও এককালে (বিশেষ করে ১৯২৮ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্‌কালে) তীব্র মতান্তর উপস্থিত হয়েছিল—১৮২৮ খৃস্টাব্দের ৬ই ভাদ্র, না ১৮৩০ খৃস্টাব্দের ১১ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠা দিবস। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের এই ব্যাখ্যানটি আমাদের এই সন্দেহসমূহের নিরসন ঘটিয়েছে।১৮

যাই হোক, সভার প্রথম কার্যনির্বাহক বা সম্পাদক নিযুক্ত হলেন পূর্বোক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্তী। পূর্বোক্ত 'আত্মীয়সভা'র সঙ্গে এই নবস্থাপিত সমাজের চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। কারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হল।

সমাজের কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা আরও জানতে পারি—

> 'তৎকালে প্রতি শনিবার সায়ংকালে সমাজ হইত. তাহাতে প্রথমত দুইজন তৈলঙ্গি ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, তদনন্তর শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন, পরিশেষে ব্রহ্মসংগীত হইয়া সমাজের কার্য সম্পন্ন হইত।'১৯

দেবেন্দ্রনাথও লিখেছেন—

> 'তখন সূর্য অস্ত হইবার কিছু পূর্বে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্বগৃহে উপনিষদ পাঠ করিতেন—সেখানে কেবল রামমোহন রায়, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পাইতেন, শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না। ২০ সূর্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদীতে বসিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ ব্যাখ্যা করিতেন এবং কখন কখন বেদান্ত দর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সেই সমাজ ভঙ্গ হইত। সেই সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, খৃস্টান, মুসলমান, সকলেরই সমান অধিকার ছিল।'২১

১৩। দ্রষ্টব্য, কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ (১৩৬৩), পৃঃ ৯।

14. Jagananda Das, Studies in the Bengal Renaissance, Ed. by Atul Gupta, The Brahmosamaj.

১৫। বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা (দ্বিতীয় সং ১৯৬৮), পৃঃ ৩৭৭

১৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭) পৃঃ ৯৮।

১৭। যোগেশচন্দ্র বাগল, তাঁর 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র' (১৩৬৬) গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন এই 'কমল বসুর পুরানাম কমললোচন বসু।' সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীও এই নাম সমর্থন করেছেন,—দ্রষ্টব্য, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী' (৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২), পরিশিষ্ট পৃঃ ৩১১। কিন্তু কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন 'কেহ কেহ রামকমল বসুর নাম কমললোচন বসু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সত্য নহে। রামকমল বসু ইংরেজ বণিকের অফিসে কাজ করিতেন, কিঞ্চিৎ ইংরেজীও জানিতেন। ইংরেজের আচার ব্যবহারও অনুকরণ করিতেন, তাই লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল 'ফিরিঙ্গী কমল বসু'। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না, তাই ব্রাহ্মসমাজের জন্য বাড়ী ভাড়া দিয়াছিলেন।' কমল বসুর বাড়ীটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজ স্বগৃহে স্থানান্তরিত হলে এই গৃহেই রামমোহনের সহায়তায় পাদ্রী আলেকজান্ডার ডাফ ১৮৩০ খৃস্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে প্রথম স্কুল স্থাপন করেন। আর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্বে ১৮১৯ খৃস্টাব্দে হিন্দু-স্কুলও কিছুদিনের জন্য এখানে স্থানান্তরিত হয়।

১৮। এই প্রথম ব্যাখ্যানটি শুধু বাংলাতেই মুদ্রিত হয়নি, এর একটি ইংরেজি অনুবাদও করা হয়েছিল। বন্ধুদের এগুলি বিতরণ করতে গিয়ে রামমোহন অন্ততঃ যে তিনখানি চিঠি লিখেছিলেন, সেগুলির তারিখ যথাক্রমে ১৯, ২১ এবং ২৫এ নভেম্বর ১৮২৮ খৃস্টাব্দ। উপরোক্ত পত্রত্রয়ের জন্য দ্রষ্টব্য, The New Dispensation, Vol. I No. II, dated June 1881.

১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯ শক।

২০। কারণ শূদ্রসমক্ষে বেদপাঠের নিমিত্ত কোন ব্রাহ্মণই তখন পাওয়া যেত না। বস্তুতঃ ১৮৪৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়াই দুষ্কর ছিল। দেবেন্দ্রনাথই প্রথম এই প্রথা রহিত করেন।

২১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০), পৃঃ ১৩-১৪।

এ সময়ে রামমোহন ব্রহ্মসঙ্গীত গাইবার রীতি প্রবর্তন করেন। কিন্তু ব্রহ্মসংগীত নামে নতুন ধরনের প্রার্থনা সংগীত প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম গায়কের নাম বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। সমাজ স্থাপনের প্রথম দিবসাবধি ইনি গায়ক নিযুক্ত হন। আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের ষষ্ঠভাগ পর্যন্ত প্রায় সকল গানেরই সুর বিষ্ণু কর্তৃক আরোপিত। একথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, যোগদানের পর থেকে আমৃত্যু একটি দিনের জন্যও বিষ্ণু সমাজে অনুপস্থিত হন নাই।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—

'প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত সভার কাজ হইত। বাওজী নামে এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করিতেন। পরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। এই সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী ও পাখোয়াজ বাজাইতেন আব্বাস নামে একজন মুসলমান। ২২ শেষ ব্যক্তিটির নামের দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল সে সম্পর্কে অধিক মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ হয় না।

১৮২৮ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ১৮৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গৃহান্তরিত হওয়ার সময় পর্যন্ত নবস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে দুটি সমসাময়িক পত্রিকা থেকে এর কার্যবিবরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করছি। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমাজ সম্পর্কে যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন, তাও আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি।

প্রথম পত্রিকাটির নাম জন বুল। পত্রিকাটি এর ২৩এ আগস্ট ১৮২৮ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে খৃস্টধর্ম প্রচারের আশা নির্মূলিত দেখে লিখেছেন,—

'A friend to whom we are generally indebted for information on what is going on in the religious world, tells us that al this Chapel (Brahmo Samaj) which was only opened a few days ago, the service commences with the singing of hymn, after which a prayer is offered up. Some doctrinal part of the Ved is then read after which follows another hymn. Then comes the sermon from a text selected from the Veds. — the officiating minister lecturing from a separate room, that the Veds may not be desecrated by being in the same apartment with the profanun vulgus of hearers'. 23

২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, প্রথম খণ্ড, রামমোহন রায়, পৃ ৫৯-৬০।

23. Satischandra Chakravarty ed. the Brahmo Samaj centenary of 1928, (1928), Pp 17.

দ্বিতীয় পত্রিকাটির এবং দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য আমরা কিছু পরে উল্লেখ করছি। কারণ ১৮৩০ খৃস্টাব্দে সমাজের মন্দির স্থাপনার কাল পর্যন্ত সমাজের চরিত্রগত পার্থক্য যে আদৌ ছিল না, তা দ্বিতীয় পত্রিকাটি ও দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যাই হোক, ভাড়াটে বাড়ীতে সমাজকে বেশী দিন থাকতে হয়নি। 'আত্মীয় সভা' বা ইউনিটেরিয়ান কমিটির মত ব্রাহ্মসমাজ অস্থায়ী গৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে বিলুপ্ত হল না। এক বছর না ঘুরতেই ঐ চিৎপুর রোডের ভাড়াবাড়ীর সন্নিকটে একটি স্থায়ী পাকাগৃহ নির্মাণের জন্য চার কাঠা দু' ছটাক জমি পাওয়া গেল। দাম লাগল চার হাজার দু'শো টাকা। জমির মালিক ছিলেন সুতানুটি-নিবাসী কালীপ্রসাদ রায়। তিনি ১৮২৯ খৃস্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে কবালা রেজিস্টারি করে জমিটি দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক ও রামমোহন রায়কে বিক্রি করেন। শীঘ্রমধ্যে গৃহনির্মাণের কাজ শুরু হল এবং প্রায় ছ' মাসের মধ্যে সমাপ্ত হল। ২৪

৭

এই কালের মধ্যে সমাজের বেশ কিছু অর্থাগমও হয়েছিল। সেজন্য একটি বডি অফ ট্রাস্টিস্ গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ১৮৩০ খৃস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে একটি ট্রাস্ট ডীড্ সম্পাদিত হল। রামমোহন রায়, কালীনাথ চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই ট্রাস্ট ডীডে বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী, রাধাপ্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুরকে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের ট্রাস্টী নিযুক্ত করলেন।

ব্রাহ্মসমাজ নতুন বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এই সংবাদ পেয়ে 'সমাচার দর্পণ' লিখল,—

'চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম-শালা—গত সোমবারের ইন্ডিয়া গেজেটে লেখে যে, কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্মাণ করাইতেছেন। তাহার ট্রস্টডীডে অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে ট্রস্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎসৃষ্টি স্থিতি কর্তা ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টচারি লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সহরন্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান কি নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রতিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে-কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিয়া তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকার কহা যাইবে না এবং যে ধর্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের সৃষ্টি-ও স্থিতিকর্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম যাহাতে জন্মে এতদ্ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ট্রস্টিরা তত্ত্বত্যারাধনার্থে একজন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন ঐ স্থানে প্রতিদিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে একদিন আরাধনা হইবে।' ২৫ এমন বিশ্বজনীন উদার ভিত্তির উপর পৃথিবীর আরও কোনও ধর্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানি না।

২৪। যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র (১৩৬৬), পৃঃ ৫১-৫২।

২৫। সমাচার দর্পণ, ১৬ই জানুয়ারি ১৮৩০, ৪ই মাঘ ১২৩৬ সংখ্যা।

গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হলে গৃহপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা গেল। ২৩এ জানুয়ারি, ১৮৩০, ১১ই মাঘ ১২৩৬ তারিখে নবনির্মিত গৃহে উপাসনার সূত্রপাত হল।

প্রায় পাঁচশোজন এদেশীয় এই উৎসবে যোগদান করেন। একমাত্র ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন রামমোহনের অনুরক্ত ও বেঙ্গল হেরাল্ডের সম্পাদক মণ্টগোমারি মার্টিন। উপস্থিতজনের অধিকাংশই হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। ২৬ মুসলমানেরাও উপস্থিত ছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। কারণ আব্বাস নামে একজন মুসলমান সমাজে পাখোয়াজ বাজাতেন, তা আমরা দেখেছি। তাছাড়া 'এই স্থানে মধ্যে মধ্যে দিবাবসানকালে মোসলমান ও ফিরিঙ্গি বালকেরা পারসিক ও ইংরাজী ভাষাতে পরমেশ্বরের স্তবগান করিত, তৎকালে মেকিন্টস্ কোম্পানি সমাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।' ২৭

উৎসবে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের ধন বিতরণ করলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি শহরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, প্রতি বছর ভাদ্র মাসে সমাজের জন্মদিনে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দান বিতরণ করা হত। দিনে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক প্রমুখেরা। 'কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সমাজ হইতে অতি সংগোপনে দান প্রতিগ্রহণ করিতেন।' ২৮

২৬। মনে রাখতে হবে সমাজে তখন ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত রয়েছে।

২৭। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯ শক।

যাঁরা ৬ই ভাদ্র ১৮২৮কে সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস বলে মনে করতে চান না, তাঁদের দৃষ্টি এই দান বিতরণের তারিখের প্রতি আকৃষ্ট করছি)। মন্টগোমারি মার্টিনও এই দানের কথা উল্লেখ করেছেন। ২৯ সমসাময়িক পত্রিকাগুলি এই দানের জন্যে রামমোহনকে নানাভাবে সমালোচনা করলেও দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত এই দক্ষিণাদান রীতি প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মসমাজ নতুন গৃহে স্থাপিত হলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে তৎকালে প্রচারিত এশিয়াটিক জার্নাল কিছু মন্তব্য করে। এই পত্রিকাটির কথাই আমরা পূর্বে বলবো বলেছিলাম। ২০এ আগস্ট বা ৬ই ভাদ্র-ই যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস একথা রিফরমার পত্রিকা থেকে পুনরুদ্ধার করে 'এশিয়াটিক ইনটেলিজেন্স' শিরোনামায় এশিয়াটিক জার্নাল তার জানুয়ারি ১৮৩২ সংখ্যার ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

> "THE BURMHO SHUBHA"
> We are glad to avail ourselves of the present opportunity to bring before the notice of the public an institution which has for sometime existed among us. We confess with regret we did not long ere now perform this part of our duty. The Bhurmo Shubha, a Vedant Institution, was established in the year 1828, by our enlightened and celebrated countryman Baboo Ram Mohan Roy, in conjuction with several other intelligent Hindoos and it has ever since continued to flourish, and to bestow mental benefits on our countrymen from the rich treasure of theological and moral instructions contained in the Vedant. Its meetings are held every Saturday evening, at a well known house in Chitpore Road, where preaching from the Vedant and singing psalms in praise of One true God occupy the time of those who meet under this roof to worship the eternal Creator of the Universe, and to pour forth their supplications at his throne without being detracted (Sic by the unmeaning and gaudy pageantry of superstition.) christians and men of every other persuation are permitted to be present at the religious acts that are performed within this sanctuary, and as the preaching from the text of the Vedant is in pracrito bhasa or the Vernacular Bengalee, all can understand what is said No image of any kind is allowed to enter this house, nor is there any kind of sacrifice'.

২৮। তদেব।

29. S. D. Collet, Life of Rammohuan Ray (4th Ed), Pp 164-167, 161.

30. The Brahmo Samaj centenary of 1929, Ed, S. C. Chakravarty PP, 29-30.

উদ্ধৃতিতে নিম্নরেখ বাক্যাংশ দুটির প্রথমটিতে ব্রাহ্মসমাজ যে ১৮২৮ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিরামহীনভাবে এগিয়ে চলেছিল, তার ইঙ্গিত রয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যাংশটি এর নিয়মিত অনুষ্ঠানকে ইঙ্গিত করেছে।

পূর্ব-প্রতিশ্রুতিমত এবারে আমরা দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধার করছি। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রবাসগমনের পরেও যে ব্রাহ্মসমাজ ছেদহীনভাবে এগিয়ে চলেছিল, তার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথমাবধি প্রচলিত উপাসনার দিন শনিবার থেকে বুধবারে পরিবর্তনের কথারও উল্লেখ করেছেন।—

> 'প্রথমে যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনিবারে সমাজ হইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল, শনিবার রাত্রিতে অধিককাল পর্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাঁহারা সহযোগী, তাঁহারদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার, সুতরাং সেদিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন, এই জন্য বুধবার সমাজের দিন স্থির হইল। আমরা যখন সমাজে আসি, তখন বুধবারেই সমাজ হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইয়াছে।' ৩১

এই সমাজে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান পাঠ করতেন, সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজার বিলাতগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই (মুদ্রিত) ব্যাখ্যানসমূহের সংখ্যা ছিল ৯৮—একথা (ব্যাখ্যানসমূহের মধ্যে ১৭টি ব্যাখ্যানের সংকলয়িতা) ঈশানচন্দ্র বসু আমাদের জানিয়েছেন। এই ব্যাখ্যানগুলির তারিখ থেকে জানা যায় যে, ২০এ আগস্ট ১৮২৮ থেকে ৩০এ অকটোবর ১৮৩০ পর্যন্ত মোট তিনটি বুধবার ও ১১৩টি শনিবারে ব্যাখ্যান পঠিত হয়েছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় স্থাপনের পর প্রায় দু' বছর দু' মাস কালের ব্যাখ্যানগুলি শনিবারে পঠিত হয়েছিল। রাজার বিলাতগমনের সময়েই বুধবারে দিন পরিবর্তিত হয়।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনটি ছিল বুধবার, এবং নবনির্মিত গৃহে স্থানান্তরের তারিখটিতে ছিল শনিবার।

ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান কবে হওয়া উচিত, একথার উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ, এ থেকে রামমোহন কোন্ তারিখকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন ভাবতেন, তাও পরোক্ষভাবে জানা যাবে। ১৭৬১ শকের (১৮৩৯ খৃঃ) আশ্বিন মাসে দেবেন্দ্রনাথ যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি শেষ পর্যন্ত ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, ফলে আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনীর সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠিত না হয়ে ব্রাহ্মসমাজের গৃহপ্রতিষ্ঠার দিন ১১ই মাঘে অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে। ৩২ জাঁকজমকের সঙ্গে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। তারপর থেকেই ১১ই মাঘকে সাধারণভাবে (মাঘোৎসব নামে প্রচলিত) ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস মনে করা হয়। এই ধারণা ভ্রমাত্মক এবং তথ্যানুসারী নয়। কারণ রামমোহন ৬ই ভাদ্রে ৩৩ অনুষ্ঠিত ভাদ্রোৎসবকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাদিবস মনে করতেন। রামমোহনের বিলাত গমনের পরবর্তী ভাদ্র মাসে (১৮৩১ খৃঃ) সমাজের বাৎসরিক যে উদ্‌যাপিত হয়, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৩১ সংখ্যার 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে তা জানা যায়। ৩৪ মাঘ মাসে সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক আরব্ধ হয়।

এবারে আমরা আগের কথা শেষে বলতে যাচ্ছি। সমাজের নাম ব্রাহ্মসমাজ জেনেছি। কিন্তু 'ব্রাহ্ম' শব্দটির উৎপত্তি কোথা থেকে, কেই বা এই সামজকে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিলেন, তা জেনে নেওয়া উচিত।

ব্রাহ্ম শব্দটি বৈদিক 'ব্রহ্ম'-শব্দ নিষ্পন্ন। ব্রহ্মসম্বন্ধীয় একথা বোঝাতে ব্রাহ্ম শব্দের ব্যবহার প্রাচীন। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মের উপাসক অর্থে বাঙলায় এই শব্দের ব্যবহার রামমোহনই প্রথম করেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় এবং 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকায় এই অর্থেই তিনি 'ব্রাহ্ম'-শব্দের ব্যবহার করেছেন। অবশ্য রামমোহন তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন। সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্ম-শব্দটির সংযুক্তিও রামমোহন করেছিলেন বলে মনে হয়।৩৫ দেবেন্দ্রনাথের পর থেকেই 'ব্রাহ্ম'

৩১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৩৬০), পৃঃ ১৭।

৩২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২), পৃঃ ৩২।

৩৩। এছাড়া এই তারিখে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাদানের রীতির কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

৩৪। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, পরিশিষ্ট পাদটীকা, পৃঃ ৩২।

৩৫। প্রথম ব্যাখ্যানটি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাঠ করলেও তার বাংলা ও ইংরাজী উভয় সংস্করণ রামমোহনই রচনা করেছিলেন—এই অনুমান সম্ভবত ঠিক।

এবং 'ব্রহ্মধর্ম' নাম দুটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করি।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকে তৎকালীন হিন্দু ও খৃস্টান কোন সমাজই সাদা চোখে দেখেন নি। সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু ১৮৩০ খৃস্টাব্দে নবনির্মিত গৃহে সমাজ স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই রামমোহনকে প্রতাপশালী হিন্দুগণের একাংশের তীব্র প্রতরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল একথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে। কারণ এই বিরোধিতা রামমোহনকে তাঁর সঙ্কল্পিত পথ থেকে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানচ্যুত করতে পারে নি। এই সময়ে সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনও তুঙ্গস্থান অধিকার করে। রামমোহনের বিরোধীগণ রাধাকান্ত দেবকে অগ্রণী করে 'ধর্মসভা' নামে একটি সভা স্থাপন করলেন ১৮৩০ খৃস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ঐ জোড়াসাঁকোতেই। মতিলাল শীল এই ধর্মসভার একটি শাখা স্থাপন করলেন কলুটোলাতে। রামমোহনের এক কালের সহযোগী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার কার্যনির্বাহক নিযুক্ত হয়ে 'দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত হিন্দুধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যেদিন ধর্মসভার অধিবেশন হইত সে দিন শহরের ধনীদের গাড়ীতে রাজপথ পূর্ণ হইয়া যাইত। সভাতে সমবেত সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, তাঁহারা অনেক দিন রামমোহন রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। আর উপেক্ষা করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন।৩৬ সভার কার্য-পরিচালনার জন্য এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হল। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' মন্তব্য করেছে,—

> 'আমারদিগের দেশে ধর্মশাসন কর্তৃত্বাভাবে ধর্মহানি হইতেছে অতএব সধর্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি রক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের ঐক্য হইয়া' যে ধর্মসভা স্থাপিত হয়, তার 'নিমিত্ত এই মহানগর মধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।'৩৭

ধর্মসভার উগ্রপন্থী সভ্যেরা রামমোহনকে হত্যা করার অশেষবিধ চেষ্টা করতে লাগলেন। 'সেকালের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার (রামমোহনের) এই নিয়ম ছিল যে, তিনি উপাসনা মন্দিরে আসিবার সময় পদব্রজে আসিতেন, ফিরিবার সময় নিজ গাড়ীতে ফিরিতেন। গাড়ীতে যাইবার সময় কোন কোনও দিন পথের লোকে ইঁট, পাথর, কাদা ছুঁড়িয়া মারিত ও বাপান্ত করিত, তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ীর দ্বার টানিয়া দিতেন ও বলিতেন 'কোচম্যান হেঁকে যাও।'৩৮

৩৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১০৪।

৩৭। সমাচার দর্পণ, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩০, ২৫-এ মাঘ ১২৩৬।

৩৮। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১০৪।

এই হাসি রাজার প্রসন্ন মুখে সর্বদাই বিরাজ করত। তাঁর নির্ভীক হৃদয় ও অটল সংকল্প কোন বাধাতেই বিচলিত হত না। তিনি সপ্তাহান্তে অত্যাল্প সংখ্যক বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিতেন। তাই দেখি ধর্মসভা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ নানা পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা অতিক্রম করে আজও রামমোহনের একেশ্বরের ধারণার জয় ঘোষণা করছে।

আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবদ্দশায় উপাচার্যের কাজ করতেন ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন।৩৯ এঁর পরের উপাচার্য শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ। 'ইঁহার পর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আচার্যপদে বৃত হন। বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহিত মিলিত হইয়া আচার্যের কার্যনির্বাহ করিতেন।৪০

৮

১৮৩০ খৃস্টাব্দে রামমোহন ইংলণ্ড যাওয়া স্থির করলেন। এই সময়ে তারাচাঁদ চক্রবর্তীও অবসর গ্রহণ করেন। কার্যনির্বাহক পদে নিযুক্ত হলেন বিশ্বম্ভর দাস। রামমোহনের অনুপস্থিতিতে সমাজের কার্য পরিচালনার জন্য ১৮৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (পৌষ ১৭৫১ শক) রমানাথ ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী এবং রাধাপ্রসাদ রায় 'সমাজগৃহের বিশ্বস্ত হইলেন।' আর রামমোহনের অনুপস্থিতির কালে সমাজের ব্যয়নির্বাহের ভার গ্রহণ করেন স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর। কারণ ১৭৫৪ শকের পৌষ মাসে কোষাধ্যক্ষ ম্যেকিন্টস কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবসার পতন হওয়ার আগেই তিনি তাদের কাছে সমাজের গচ্ছিত মূলধন ৬০৮০ টাকা নিজের কাছে গচ্ছিত রাখেন। এর সুদ থেকে ব্যয়নির্বাহ হত। ব্যয়ের অতিরিক্ত ভার দ্বারকানাথ নিজে বহন করতেন।

১৭৫৫ শকের আশ্বিন মাসে (২৭-এ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খৃঃ) ব্রিস্টলনগরে প্রবাসে

৩৯। উপাচার্যের কাজ করলেও ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে এঁর কতখানি বোধ ছিল, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করি। দেবেন্দ্রনাথ যখন সমাজে প্রথম আসেন, তখন তিনি দেখেন ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন।' দেবেন্দ্রনাথের আপত্তিতেই তিনি 'উক্ত কর্ম হইতে অবসৃত হন।

৪০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯ শক।

রামমোহনের 'জীবতারা খসে' পড়ল। পত্র রাধাপ্রসাদ 'পিতৃপ্রাপ্যধন' আনার জন্য দিল্লী যান। 'এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সকলেরই উপেক্ষা হইল।' এতকালের ধন বিতরণ প্রথা '১৭৫৫ শকে নিরস্ত হইল।' এসময়ে নির্বাহক ছিলেন রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রায় দশ বছর ধরে (১৮৩৩-৪২) ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা 'ম্লান' হয়ে রইল।

রামমোহনের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মসমাজের অধোগতি দ্রুত আরম্ভ হয়—যে পর্যন্ত না দেবেন্দ্রনাথ সমাজে যোগ দেন। এর অন্যতম কারণ রামমোহনের অনুবর্তীরা অন্তরে অপরিমেয় শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় 'রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই, উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।৪১ এই অপরিমেয় মনুষ্যত্বের ও বিশিষ্ট বোধের অনুসরণ তাঁর সহযোগীরা করতে পারেননি। তাই তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলি ১৮৩১ খৃস্টাব্দেই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলে 'তিনি রামমোহনের দলের লোক আর রিফরমার পত্রের পরিচালক, অথচ তাঁর বাড়ীতে দেবী পূজা হয়।' প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নের মত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সংযুক্ত ব্যক্তিগণের অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের মূলসূত্রাদি অনুধাবন করতে পারেননি বলে অনুমান করি। তাছাড়া ধর্মসভার বিরোধিতাও সমাজকে কিছুটা দুর্বল করেছিল বই কী। সেকারণে ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থানের জন্য রামমোহনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী দেবেন্দ্রনাথের সমাজে যোগদানের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

৯

রামমোহন বালক দেবেন্দ্রনাথকে (জন্ম ১৮১৭ খৃঃ) 'বেরাদর' বলে আদর করে ডাকতেন। বিলাত যাবার সময় রাজা তাঁর সুহৃদ দ্বারকানাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথকেও ডেকে পাঠান এবং এবং 'নীরব করমর্দন করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও বিদায় গ্রহণ করেন।' ৪২

এই করমর্দনে তাঁর অকৃতকার্য, অকথিত বাণী, অগীত সংগীতকে সার্থক করার নীরব আহ্বান ছিল। আমাদের সৌভাগ্য, রামমোহন আমাদেরও পূর্বপুরুষ। তাঁর চিন্তাধারাকে আপন অন্তরে গ্রহণ ও কর্মে অনুবাদ করতে পারলেই তাঁকে শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ নিবেদন করতে পারবো।।

৪১। শিবনাথ শাস্ত্রী, সাহিত্য রত্নাবলী, পৃঃ ২৫।

৪২। বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ৬৮।

রাজা রামমোহন

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দুই শতাব্দী পূর্বে, রাজা রামমোহনের আবির্ভাবকাল বর্ণনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার, এক কথায় ভারত-আত্মার পুনরুজ্জীবনে রামমোহনের ভূমিকা পর্যালোচনাকালে কবি আর এক জায়গায় বলেছেন, 'তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন, সেই বাণী ভারতের স্বকীয় দৈন্য নিয়ে নয়, দুর্যোগ নিয়ে নয়, সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিয়ে।'

স্বামী বিবেকানন্দও পাশ্চাত্য সমাজে প্রাচ্যের প্রথম প্রতিনিধিরূপে রামমোহনের ভূমিকার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে সময়কে 'কালরাত্রির অন্ধকার' বলে উল্লেখ করেছেন, স্বামীজী সে-সময়ের বর্ণনাকালে বলেছেন—'ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছিল, শামুকের মতো দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে নাই। আমাদের পতনের প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অন্য জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই।'

তারপর ঐ গতিহীন, বদ্ধ জাতীয় জীবনকে পুনরায় প্রাণচঞ্চল স্রোতস্বিনীর মতো বেগময় করার কাজে রামমোহনের ভূমিকার উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন, 'যেদিন হইতে রাজা রামমোহন রায় ঐ সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতের ইতিহাস অন্যপথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে।'

(স্বামীজী রামমোহন সম্পর্কে উল্লেখিত উক্তি করেন ১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, কলকাতায় এক সম্বর্ধনা সভায় এবং রবীন্দ্রনাথ করেন ১৯৩৩ খৃঃ, রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতপথিক রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কালে।)

রামমোহনের সময়কালীন সমাজের অবস্থা বর্ণনায় শিবনাথ শাস্ত্রী, তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, 'শহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া ধনী হওয়া কিছু লজ্জার বিষয় ছিল না।...ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদপ্রমোদ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না।'

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তৎকালীন সমাজের ধর্মভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়, 'দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকের মহা আমোদ ছিল।...অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষ রূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত।'

কিন্তু এসবের চেয়ে অসহনীয় নিষ্ঠুর অন্যায় ছিল ধর্মের নামে নারী ও শিশু হত্যা। প্রথম সন্তান মেয়ে হলে সে-শিশুকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল আর যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল মৃত স্বামীর সঙ্গে এক বা একাধিক স্ত্রীর সহমরণ।

সমগ্র সমাজ যখন এইভাবে কুসংস্কার, দুর্নীতি ও দুরাচারে পঙ্গু, ধর্ম যখন আত্মিক যোগশূন্য আচারসর্বস্ব অনুষ্ঠানে পর্যবসিত এবং নারীহত্যা শিশুহত্যার মতো জঘন্য পাপ যখন কীটপতঙ্গের মৃত্যুর মতো উপেক্ষিত ছিল, মনুষ্যত্বের সেই চরম অবমাননার দিনে, সেই 'কালরাত্রির অন্ধকারে' মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে রামমোহনের আবির্ভাব ঘটে।

জন্ম ও শৈশব

১৭৭২ খৃঃ (মতান্তরে '৭৪ এবং দ্বিতীয় মতেই ঐতিহাসিক সমর্থন বেশি) হুগলি জেলার (তখন বর্ধমান জেলা) খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। তাঁর শৈশব ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, ৯।১০ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে শিক্ষালাভের পর, পিতা রামকান্ত রায়ের ব্যবস্থানুসারে, পার্শি ও আরবি ভাষা শেখার জন্য তিনি পাটনা শহরে যান এবং ১৫।১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে থেকে ঐ দুই ভাষায় সুশিক্ষিত হন। সেই সময় কোরান পাঠের পর নাকি তাঁর হিন্দুদের পৌত্তলিকতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে এবং মাত্র ষোল বছর বয়সে পৌত্তলিকতার নিন্দা করে পার্শি ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এতে তাঁর সঙ্গে পিতার মনান্তর ঘটে এবং রামমোহন তখন গৃহত্যাগ করে দেশভ্রমণে বার হন ও নানা দেশ ও তীর্থ পর্যটন করে তিব্বতে যান। তিব্বতে বৌদ্ধদের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার নিন্দা করাতে রামমোহনের জীবন বিপন্ন হয়। কিন্তু কয়েকজন তিব্বতী রমণীর কল্যাণে তিনি রক্ষা পান ও সেখান থেকে কাশীতে এসে সংস্কৃত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময় রামমোহনের সঙ্গে আবার তাঁর পিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বিষয়কর্মে মন দেন। স্বগৃহে অবস্থানকালে তিনি ইংরেজী শেখেন এবং ২২।২৪ বছর বয়সে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। প্রথমে রামগড়, ভাগলপুর অঞ্চলে অবস্থানের পর তিনি রংপুরের কলেক্টর ডিগ্‌বি সাহেবের সেরেস্তাদার বা দেওয়ান পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৩ খৃঃ রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয় এবং ১৮১৪ খৃঃ তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। রামমোহনের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের ঘটনার উল্লেখ করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "১৮১৪ সাল আর এক কারণে স্মরণীয়। ঐ সালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিষয়কর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার ও পরিরক্ষণের মানসে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিলেন, এবং প্রধানরূপে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কার্যে ব্রতী হইলেন।'

রামমোহনের প্রথম জীবনের উল্লেখিত ঘটনাবলী সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক ও গবেষক এখন ভিন্নমত পোষণ করেন। তার প্রধান কারণ, রামমোহন নিজে এসম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় কোন কিছু লিখে যাননি, এবং তাঁর আত্মজীবনী বলে যা প্রচলিত আছে তাও প্রমাণসিদ্ধ নয়। তারপর যে ব্যক্তির কৈশোর ও যৌবনের প্রাক্কাল এত উদ্দাম ঘটনাবহুল ও রোমাঞ্চকর, তাঁর যৌবন ও প্রাক্-প্রৌঢ়কাল এত শান্ত ও সমাহিত হয় কেমন করে? প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহনের জীবনের প্রথম তিরিশ বছরের সুনিশ্চিত সর্বজনগ্রাহ্য ইতিহাস এখনও লিখিত হয়নি। এসম্বন্ধে ডঃ কালিদাস নাগ বলেছেন—

> The first thirty years of the life of Rammohun Roy are more or less veiled in obscurity. The stories of his early life depicting his preoccupation with religious reform and consequent conflict with his family a stronghold of orthodoxy, and of his wonderings in different parts of eastern India and even as far as Tibet, may or may not be true.

রামমোহনের আত্মজীবনী বলে যা প্রচলিত তাতে আছে : 'ষোল বছর বয়সে আমি হিন্দুদের পৌত্তলিকতার সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। এতে পরিবারের সকলের সঙ্গে আমার মনান্তর হয় এবং আমি তখন দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। বেশি ভাগই

রামমোহনের একশত মৃত্যু দিবসে গান্ধীজী স্মরণ করেছেন

True celebration not in singing praises but determination copying his great virtues,

Gandhi

দেশের অভ্যন্তরে ঘুরি, কিন্তু মাঝে মাঝে হিন্দুস্তানের বাইরেও যাই।'—সম্ভবত এই কথাগুলি থেকেই রামমোহনের দেশভ্রমণ ও তিব্বত গমনের কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এসম্পর্কে ডঃ কালিদাস নাগের অভিমত ঃ

> The authenticity of the Autobiography sketch however, is admitted by some and disputed by others and for that reason, we cannot affirm that Rammohun composed the manuscript above referred to. In any case, the manuscript was probably never printed, nor has it yet been traced. (The cultural Heritage of India, The Brahmo Samaj)

রামমোহনের পার্শি ভাষায় গ্রন্থ রচনার ব্যাপারেও ডঃ নাগ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন আরবি অথবা পার্শি ভাষায় রামমোহনের ব্যুৎপত্তির প্রমাণ আর একটিও কোন দলিলে বা নথিপত্রে পাওয়া যায় না।

হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ

রামমোহন কখনও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেননি এবং ব্রাহ্মণ বলে পৈতা ছিল তাঁর গলায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি প্রকৃতপক্ষে সংগ্রাম করেন হিন্দুধর্মের নামে প্রচলিত নানা কুসংস্কার ও সহমরণ প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে। আর এ-ব্যাপারে তিনি একা ছিলেন না, কলকাতার বহু অভিজাত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়াও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও লেখকরাই তাঁর সমর্থক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই রামমোহনকে হিন্দু সংস্কারক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, রামমোহন কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেই প্রভাবশালী হিন্দুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে, ১৮১৫ খৃঃ, রামমোহন 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন এবং বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার ছিল সে-সভার প্রধান বিষয়। ঐ সময় থেকে পাঁচ বছর রামমোহন বেদান্তদর্শন, বেদান্তসার, কেন ও ঈশোপনিষদ প্রভৃতি অনুবাদে ব্যস্ত থাকেন। একাজে গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ১৮১৬ সালে ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের মধ্যে আলোচনার ফলে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ প্রভাবশালী ধনী হিন্দুদের অনমনীয় বিরোধী মনোভাবের জন্য রামমোহনকে ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করতে হয়। রামমোহনের কলকাতা আগমনের বৎসরকালের মধ্যেই প্রভাবশালী হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ ও মনান্তরের কারণ সুস্পষ্ট নয়, বিশেষ করে যে-সময় তিনি বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি অনুবাদের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন।

পরবর্তীকালে যখন ব্রাহ্মসমাজ একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে, তখন ঐ সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রভাবশালী হিন্দুদের বহু ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে দেখা যায়। ১৮৫১ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর যে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামক প্রথম জাতীয় সংগঠন গঠিত হয় তার সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি।

সতীদাহ নিবারণ

সতীদাহ রদের জন্য আন্দোলনকালেই রামমোহনের সঙ্গে সনাতন হিন্দু সমাজের বিরোধ চরমে ওঠে। এ-ব্যাপারে অবশ্য ইংরেজ সরকারের উদ্যোগ কয়েক বছর আগেই শুরু হয়, শুধু এদেশের লোকেদের ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পরিণতি সম্পর্কে ইংরেজ শাসকদের মনে আশঙ্কা ছিল বলেই তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারেননি। তবু, রামমোহনের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের কয়েক বছর আগেই ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ সরকার সব জেলা কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, কোন বিধবাকে যাতে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাহ করা না হয়, সেদিকে জেলা প্রশাসকরা যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ১৮১৫ খৃঃ ভারত সরকার সতীদাহ সম্পর্কে বিশেষ তথ্যানুসন্ধানে উদ্যোগী হন এবং ঐ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ১৮১৭ খৃঃ সহমরণ সম্পর্কে কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। তাতে বলা হয় যে, সহমরণেচ্ছু বিধবাকে চিতারোহণের আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তদধীন কোন রাজকর্মচারীর কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হবে।

ঐ আদেশ জারি হওয়ার পরে হিন্দুসমাজে তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা রাজ-আদেশের সমর্থনে এগিয়ে আসেন ও নিজ মতবাদ প্রচারের জন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। রামমোহনের সমর্থক ছিলেন টাকীর কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি। রামমোহনের বিরোধী পক্ষে ছিলেন 'সংবাদ চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন (কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ) প্রভৃতি।

দেশের বিশিষ্ট লোকদের সমর্থন লাভের পর ইংরেজ সরকার সতীদাহ নিবারণের জন্য আরও কঠোর মনোভাব নিতে থাকেন। ১৮২৫ খৃঃ গভর্নর জেনারেল লর্ড এমহার্স্টের শাসনকালে আদেশ জারী হয় যে, সহমরণার্থিণী বিধবা যদি স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তদধীন কোন রাজকর্মচারীর কাছে সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করে তবেই তাকে অনুমতিপত্র দেওয়া হবে অন্যথায় নয়; সহমরণে সহায়তাকারী কোন-

বহু স্মৃতিবিজড়িত সার্কুলার রোডের সেই বাড়িটি এখন একটি পুলিশ স্টেশন

ব্যক্তিকে সরকারী চাকরী দেওয়া হবে না **এবং সহমৃতার** স্বামীর সব সম্পত্তি **সরকার কর্তৃক** বাজেয়াপ্ত হবে।

ঐ নিষেধাজ্ঞাগুলি আরোপিত হওয়ার **পর সহমরণ** বিশেষভাবে হ্রাস পায়। তার-**পর ১৮২৯** খৃঃ লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসন-**কালে সতীদাহ** সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও মনুষ্য **হত্যার সমান** অপরাধ বলে ঘোষণা করা **হয়।**

সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহনের **ভূমিকা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ও গৌরবময়। কিন্তু** এ ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের সদিচ্ছা **এবং সতর্ক** ধৈর্য ও দৃঢ়তাকে অস্বীকার **করা ঠিক** হবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গ আলোচনা-**কালে বলেন,** 'রাজা রামমোহন রায়ই এই **প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন** আরম্ভ করেন **এবং একে** রহিত করার জন্য গভর্নমেন্টের **সহায়তা লাভে** কৃতকার্য হন। যত দিন না **তিনি আন্দোলন** আরম্ভ করেছিলেন, তত **দিন ইংরেজরা** কিছুই করে নি।'— সবিনয়ে **নিবেদন** করি, স্বামীজীর এই উক্তি **ইতিহাস সমর্থন** করে না।

বাঙলা গদ্যের সমৃদ্ধি

রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না এই **অর্থে** যে, সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশে তিনি **কলম** ধরেন নি। তিনি ছিলেন মূলত **মানবতাবাদী** এবং প্রগতিশীল ধর্ম ও সমাজ **সংস্কারক।** সনাতনপন্থী সংস্কার-বিমুখ হিন্দু সমাজের অসার যুক্তি খণ্ডনের **জন্যই তাঁকে** লেখনী ধারণ করতে হয় এবং **১৮১৫** থেকে ৩০ সালের মধ্যে, মোট **পনের বছরে** তিনি অন্তত ত্রিশখানি বাংলা **পুস্তিকা** রচনা করেন। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে চলে তাঁর সনাতন-পন্থীদের বিরুদ্ধে লিপিযুদ্ধ। আর ঐ তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি ও প্রতিযুক্তির তীক্ষ্ণতা ও ঋজুতা বাংলা গদ্য লিখন-রীতিতে আনে সাবলীল গতি ও দার্ঢ্য।

রামমোহনের কলকাতা আসার আগেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রধান অধ্যাপক কেরী সাহেবের উদ্যোগে বাংলা গদ্য রচনা শুরু হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন কেরী সাহেব স্বয়ং, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি। পাণ্ডিত্য ও লিখন প্রতিভার বিচারে ঐ লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তাঁদের অধিকাংশ রচনাই রামমোহনের কলকাতা আসার আগে লিখিত হয় এবং তা সবই ছিল পার্শি, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ। কোন মৌলিক রচনা তাঁদের ছিল না। রাম-মোহনই প্রথম বাংলা গদ্যে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। নিজ প্রতিভায় রামমোহন প্রমাণ দিলেন, সদ্যোজাত বাংলা গদ্য অতি উচ্চ পর্যায়ের যুক্তিভিত্তিক আলোচনারও উপযোগী ভাষা, তাঁর যুক্তি ছিল অকাট্য, কিন্তু ভাষা ছিল অতি শিষ্ট ও সংযত। তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের মত অশালীন ভাষা তিনি কখনও ব্যবহার করেন নি। সর্বোপরি তাঁর সব যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতো নির্যাতিত নারীকুলের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি।

তবে, যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে **রামমোহন সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কলম** ধরেন নি, সে অবকাশও ঐ **কর্মযোগী** পুরুষের ছিল না। তাঁর বক্তব্য বিষয় যদি অন্য কাউকে দিয়ে লেখানো সম্ভব হত, তাহলে হয়ত তিনি কলম নিয়ে বসতেনই না, সে সময়টুকু অতিবাহিত করতেন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগে অথবা সমাজ সংস্কার আন্দোলনে। রামমোহনের ভাষা ছিল সহজ ও গতিশীল, কিন্তু তা সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি বলে সাহিত্যের মার্জিত ভাব ও মাধুর্য তাতে ছিল না। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের বিশেষ অনুরাগী কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন : দেওয়ানজী (রাম-মোহন) জলের ন্যায় সহজ ভাষায় লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।

দুই শতাব্দীর মূল্যায়ন

রামমোহনের মৃত্যু **শতবার্ষিকী** উপলক্ষে এক সভায় রবীন্দ্রনাথ **সক্ষোভে** বলেন, 'এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখনও তাঁর সত্য পরিচয় দেশের কাছে অসম্পূর্ণ।' — কবির এই উক্তি রাম-মোহনের দ্বিশত জন্মবার্ষিকীকালেও দুর্ভাগ্যবশত, অসত্য হয়ে যায় নি। রাম-মোহনেরও তিন শতাব্দীকাল আগে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্য আজও এদেশের, বিশেষ করে পূর্ব ভারতের ঘরে ঘরে নিত্যস্মৃত নিত্যপূজ্য প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর। রামমোহনের অব্যবহিত পরে, রাম-

মোহনের ফেলে-যাওয়া লাগাম হাতে তুলে নিয়ে যিনি সমাজরথকে অতি দুর্গম বন্ধুর পথে আরও অনেক খানি চালিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই বিদ্যাসাগর বাঙালীর হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত প্রাতঃস্মরণীয় পরমপুরুষ। রামমোহনের প্রায় শত বর্ষ পরে এসেছিলেন যে আর এক ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী সেদিন সাড়ম্বরে পালিত হল সারা ভারতে। মুখ্যত মারাঠী ও তামিল অনুরাগীদের উদ্যোগে ও ভারতের সকল রাজ্যের সশ্রদ্ধ দানে কুমারিকা অন্তরীপের উপকূলে গড়ে উঠল ভারতের নতুন তীর্থ বিবেকানন্দ স্মারক সৌধ ও মন্দির। অথচ আধুনিক যুগের এশিয়ার প্রথম জাগ্রত মানুষ রামমোহনের প্রকৃত পরিচয় দেশের কাছে অসম্পূর্ণই থেকে গেল।

এই অসম্পূর্ণতার প্রধান কারণ দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজা রামমোহনের ঘনিষ্ঠতার অভাব। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়, প্রথম চল্লিশ বছর রামমোহন প্রায় অজ্ঞাতবাসেই অতিবাহিত করেন। তারপর কলকাতায় এসে যে পনের বছর কাটান তার প্রায় সবটাই কেটে যায় গ্রন্থ রচনায় ও পত্রিকা প্রকাশনায়। সে সময় কলকাতার অভিজাত মহল ও শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষাব্রতীদের বাইরে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসার কোন অবকাশই হয় নি তাঁর। তারপর জীবনের শেষ তিন-চারটি বছর কাটে ইংলণ্ডে। অপর দিকে শ্রীচৈতন্য, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের জীবন প্রকৃতপক্ষে চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার আগেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং তা করে হাজারো জনতার সঙ্গে চলতে চলতে। তাঁদের জীবন ছিল কৌপীনবন্ধ সন্ন্যাসীর মতো রিক্ত নিঃস্ব, সেকারণে মূর্খ দরিদ্র চণ্ডাল ভারতবাসীও অতি সহজেই তাঁদের আপনজন বলে ভাবতে পারে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা রাজা রামমোহন ছিলেন ইংরেজ শাসনের একেবারে গোড়ার যুগের লোক। এদেশে অরাজকতা ও মাৎস্য ন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজরা কিভাবে সভ্য সুশৃংখল আইনের রাজ্য কায়েম করেছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ইংরেজ শাসনের অবসানের কথা ত তিনি চিন্তা করেনই নি, পরন্তু ইংরেজদের দলে দলে এদেশে নিয়ে এসে উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ইংরেজের সংমিশ্রণে জাতি হিসাবে ভারতীয়রা উন্নত হবে। পরবর্তীকালে যে নীলকরদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সারা দেশজুড়ে প্রবল আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেই নীলকরদেরও তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশায় স্বাগত জানিয়েছিলেন। ফলে কয়েক দশক পরেই দেশে যখন প্রবল জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার এল তাতে হারিয়ে গেলেন রাজা রামহোমন। কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রেই একথা জানেন যে, রামমোহনোত্তর যুগের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিপ্রস্তর রামমোহনই স্থাপন করে গিয়েছিলেন।

দুশ বছর আগে নিরক্ষরতা ও নিষ্ঠুর ... কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অন্ধকারময় এই দেশে একটি মানুষ একই সঙ্গে ধর্মীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, শিক্ষা বিস্তার করেছেন, সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে নানা পরিকল্পনা রচনা করেছেন, দেশ-বিদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জয়যাত্রাকে সোচ্চার অভিনন্দন জানিয়েছেন—আধুনিক ভারতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি অন্যতম গৌরবের কথা।

রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কোলেট-এর রচনায় রামমোহনের এই বহুমুখী প্রতিভা ও উদ্যোগের কথাই বিশেষ করে বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন—

> He was the arch which spanned the gulf that yawned between ancient caste and modern humanity, between ancient superstition and science, between despotism and democracy, between immobile custom and a conservative progress, between poeytheism and theism!

> আমার মৃত্যু হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।
>
> —রামমোহন

রামমোহন জননী তারিনী দেবী

বেলা দে

যুগোত্তকারী মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের জননী শ্রীমতী তারিণী দেবী। রাজার জীবনে অবশ্য তারিণী দেবীর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়নি অন্যান্য মহাপুরুষদের মত। তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে শুধু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। সে সংগ্রামে তিনি ছিলেন একক যোদ্ধা। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনঘোর তিমিরাবৃত হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁকে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় তাঁর স্নেহময়ী জননী তারিণী দেবীর সঙ্গেও পৌত্তলিকতার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেই মাতাপুত্রের পারিবারিক বিচ্ছেদ ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল। অবশ্য এ সংগ্রামে কে জয়ী হয়েছিলেন তা জানবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট হবে যে মাতা ও পুত্র দুজনেই সমান অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। মাতা তাঁর অপত্যস্নেহের দুর্বলতাকে অগ্রাহ্য করে আপনার আজন্ম লালিত সংস্কারের বিরুদ্ধবাদী হতে চাননি। পুত্র ঠিক সেই একই দৃঢ়তার সঙ্গে সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করেছিলেন। এ কোনও তুচ্ছ জিনিস নিয়ে সংগ্রাম নয়, এ অজ্ঞানের বিরুদ্ধে জ্ঞানের সংগ্রাম, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের অভিযান।

তাই মনে হয় রাজা রামমোহনের বিরুদ্ধে তাঁর মায়ের সংগ্রামকে ক্ষুদ্র করে দেখবার প্রয়োজন নেই। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মোগল রাজত্ব স্তিমিতপ্রায় আর ইংরাজ রাজত্বের সবে সূত্রপাত হয়েছে, সেই যুগে কোনো হিন্দু কুলরমণীর পক্ষে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচারণ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি পুত্রকে ত্যাগ করেছেন কিন্তু নিজের আজন্মলালিত বিশ্বাসকে ত্যাগ করতে পারেননি। পুত্রের আদর্শ হয় তো মহৎ এটা তিনি পরে বুঝেছিলেন তাই পুত্রকে ক্ষমাও করেছিলেন। কিন্তু পুত্রের আদর্শে নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে পারেননি। এইখানেই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার পরিচয় স্পষ্ট। তার এই দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা রামমোহনের জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। যে শাশ্বত সত্যের জন্য রামমোহন প্রাণপণ করেছিলেন, তার জন্যে যে দৃঢ়তার ও উদ্যমের প্রয়োজন হয়েছিল, সেই দৃঢ়তা তিনি তাঁর মার কাছে পেয়েছিলেন।

তারিণী দেবীকে পরিবারের সকলে ফুলঠাকরাণী বলে ডাকত। তাঁর পিতৃগৃহ ছিল শাক্তর উপাসক কিন্তু পতিগৃহ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ছিল। তিনি সানন্দে পতিগৃহে এসে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। শ্বশুরকুলের গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের পূজায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। তাঁর স্বামী রামকান্ত রায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। হুগলি জেলার খানাকুল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা নেন। এই কারণে বর্ধমানের রাজার সঙ্গে প্রায়ই কলহ হোত। শেষে বিরক্ত হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হরিনাম জপ করতেন, আর স্ত্রী তারিণী দেবী সমস্ত জমিদারীর কাজ দেখতো। রামমোহনের শিক্ষার প্রতিও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু ষোলো বছর বয়সে রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। আত্মীয়-স্বজন এজন্য বিশেষ বিরক্ত হলেন। জননী পুত্রকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন। চার বছর বাইরে ভ্রমণ করার পর স্বামীর অনুরোধে তারিণী দেবী রামমোহনকে গৃহে প্রবেশ করতে অনুমতি দেন। কিন্তু পিতা-পুত্রের মধ্যে অবিরত তর্কের স্রোত বয়ে যেতো। পুত্রকে কিছুতেই স্বমতে আনা গেল না। রামমোহন আর একবার গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন।

রামমোহন তাঁর যুগের বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন। মাতার সঙ্গে পুত্রের বিবাদে মা নিশ্চয়ই খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত ইটালীয়ান কবি লিও পারডি তাঁর বোনের বিবাহে বোনকে একটি কবিতা উপহার দিয়েছিলেন, যার অর্থ হল: 'ভীরু অথবা অসুখী পুত্রের মধ্যে অসুখী পুত্রই কাম্য।'

রামমোহন সেইরূপ পুত্রই ছিলেন যিনি প্রচলিত রীতিনীতি নিয়ে সুখী হতে পারেন নি। দেবসেবার জন্য রামমোহন অর্থদান করতে অস্বীকৃত হওয়ায় মাতা-পুত্রের বিবাদ আরম্ভ হয়। মকদ্দমা রুজু হবার পর তারিণী দেবী কিছু নরম হয়েছিলেন। তিনি রামমোহনকে বলেছিলেন মুসলমান নবাব যদি হিন্দুকে দেবসেবার জন্য অর্থদান করতে পারেন, তাহলে রামমোহন নিজে পূজা না করলেও সেরূপ অর্থ দিতে পারেন। কিন্তু রামমোহন তাতে স্বীকৃত হননি। মাতা-পুত্রের এই বিবাদ ইতিহাসের একটি করুণ কাহিনী হয়ে আছে।

শেষজীবনে পুত্রের কাছে কোন প্রকার সাহায্য না নিয়ে তিনি শ্রীক্ষেত্রে চলে যান। পুত্রকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বিরুদ্ধে যেতে পারেন নি। সংস্কারের উপরে তিনি উঠতে পারেননি সেটা ঠিক। কিন্তু সেই সংস্কারের জন্য পুত্রের সঙ্গে বিরোধ চলার মধ্যে যে দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, তখনকার রমণীদের মধ্যে তা দুর্লভ। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন চন্দ ডাক্তার কার্পেন্টারের লিখিত রামমোহনের জীবনচরিতে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধে লিখেছেন 'রামমোহনের পরিবারের প্রত্যেকেই তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। রামমোহনের জীবনের প্রথম ভাগে তাঁহার মাতা সুবুদ্ধিমতী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাবে তিনি পুত্রের ঘোরতর শত্রুগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। রামমোহন কিন্তু মাতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করতেন। স্নেহজড়িত নয়নে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি যে আচরণ করেছিলেন তার জন্য তিনি অনুতাপও করিয়াছিলেন। যদিও তিনি জানিতেন, রামমোহনের মতই সত্য, তথাপি তিনি পৌত্তলিক আচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারেন নাই। শেষবার জগন্নাথ তীর্থযাত্রার পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন—'রামমোহন তোমার কথাই সত্য—আমি অবলা নারী এই সকল আচার অনুষ্ঠান আমাকে শান্তিদান করে; এই বৃদ্ধ বয়সে ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি না।'

জগন্নাথ তীর্থে তারিণী দেবী দেহত্যাগ করেন।

> একদিন আসিবে যখন আমার এই বিনম্র প্রযত্ন সকল ন্যায় দৃষ্টিতে বিচারিত হইবে এবং সম্ভবতঃ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে।
>
> —রামমোহন

রাজা রামমোহনের জন্মসন

একটি বিতর্ক

গোরাচাঁদ মিত্র

বিশ শতকের ...ভাগে দুর্ভাগ্যও আমাদের মধ্যে রামমোহনের জন্মসন সম্বন্ধে এক বিতর্ক প্রচলিত আছে। রাজার জন্মাব্দ নিয়ে তিন প্রকার মত প্রচলিত ছিল—১৭৮০ খৃঃ, ১৭৭৪ খৃঃ এবং ১৭৭২ খৃঃ। বর্তমানে অবশ্য ১৭৭৪ খৃঃ ও ১৭৭২ খৃঃ—এই দুটি মতই প্রচলিত। আমাদের প্রথমতঃ দেখতে হবে কবে থেকে বর্তমান কালের বিতর্কের শুরু এবং এমন কোন পুরোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় কিনা যার ওপর নির্ভর করে আমরা রাজার জন্ম বৎসর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারি। এই বিতর্কের শুরু হয় রামমোহনের মৃত্যুর (১৮৩৩ খৃঃ) সাতচল্লিশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৮০ খৃঃ। সুতরাং বিচার করতে বসলে এ কথাটা সর্বাগ্রে মনে রাখা কর্তব্য। রাজার পুত্রদের কেউই তখন আর বেঁচে নেই। ১৮৮০ খৃঃ পর্যন্ত রাজার প্রায় সমস্ত জীবনীকারই ১৭৭৪ খৃঃ পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। আদালতের নথিপত্র কিংবা অন্য কোথাও কোনরূপ প্রামাণ্য তথ্যাদি না থাকায় সমসাময়িক কালের মতামত ও ঘটনা পরম্পরা অনুযায়ী যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যকেই সত্য বলে মেনে নিতে আমরা বাধ্য।

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সংগঠক এবং রামমোহনের পুত্রপ্রতিম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে ১৭৮৬ শকের ২৬শে বৈশাখ শনিবার 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। রামমোহন প্রসঙ্গে তিনি বলছেন— '...রামমোহন রায়, আপনার গৃহকার্য্যে যে চেষ্টা না করিয়াছিলেন, তাহার শতগুণ এক ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থাপনের জন্য তাঁহার করিতে হইয়াছিল—ইহার জন্য তিনি শরীর মন সর্ব্বস্ব দিয়াছিলেন। একদিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে ঊনষাটি বৎসর পর্যন্ত ইহাতে সমানভাবে তাঁহার যত্ন ছিল...।' ব্রিস্টলে রামমোহন পরলোকগমন করেন ১৮৩৩ খৃঃ। সুতরাং মহর্ষির উপরোক্ত উক্তি দ্বারা রামমোহনের জন্মবৎসর ১৭৭৪ খৃঃ সমর্থিত হয়। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসভার বার্ষিক সভায় ১৭৮২ শকের ২৪শে পৌষ 'ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক' যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। সেই সময় রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর প্রবন্ধে বলছেন—'হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে ঐ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।' অমৃতলাল বসুর মতে—'বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতি, আপাততঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ১১৮১ সালে (১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, ১৬৯৫ শকে) রামকান্ত রায়ের পুত্র রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন' (জীবনী সংগ্রহ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ)। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী জি এস লিওনার্ড তাঁর 'হিস্ট্রী অব দি ব্রাহ্মসমাজ' গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখছেন—'রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃঃ (১৬৯৫ শকাব্দ; ১১৮১ বঙ্গাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন।' বইটি ১৮৭৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ঐ একই সালে প্রকাশিত 'লাইফ অব আলেকজাণ্ডার ডাফ' গ্রন্থের লেখক ডঃ জর্জ স্মিথ ১৭৭৪ খৃঃ সমর্থন করেছেন।

হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জেমস সাদারল্যান্ড রামমোহনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ ১৮ ফেব্রুয়ারীর 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় রামমোহন-স্মৃতিকথার এক জায়গায় তিনি লিখছেন—'পরিণত বয়সে তাঁর পৌরুষদীপ্ত দেহটি ভেঙ্গে পড়ে এবং ষষ্টিতম বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।' ১৮৬৫ খৃঃ পাক্ষিক ইন্ডিয়ান মীরর পত্রিকায় কেশবচন্দ্র সেন লিখছেন—রামমোহন তাঁর ষষ্ঠিতম বৎসর বয়সে ১৭৫৫ শকাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৩৩ খৃঃ) পরলোকগমন করেন।' এই প্রবন্ধটি ১৯০৪ খৃঃ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠিতম বৎসরে মৃত্যু হলে রাজার জন্মবৎসর হয় ১৭৭৪ খৃঃ। রাজার মৃত্যুর পর প্রবাসে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডঃ ল্যান্ট কার্পেন্টার 'এ রিভিউ অব দি লেবারস ওপিনিয়নস অ্যান্ড ক্যারেক্টার অব রামমোহন রায়' গ্রন্থে লিখছেন—'রামমোহন রায় খুব সম্ভবতঃ ১৭৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।' ডঃ কার্পেন্টার তাঁর উক্তিতে 'মোস্ট প্রবাবলি' ও 'এ্যাবাউট' শব্দ দুটি ব্যবহার করলেও উক্ত বাক্যটি দ্বারা রাজার জন্ম সাল ১৭৭২ খৃঃ সমর্থিত হয় না। বইটি ১৮৩৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর পর ডঃ কার্পেন্টারের কন্যা মিস কার্পেন্টার তাঁর 'দি লাস্ট ডেজ অব রামমোহন রায়' গ্রন্থে পিতার রচিত রাজার জীবনীখানি পুনঃমুদ্রিত করেন। মিস

কার্পেণ্টার পুনঃমুদ্রণে রাজার জন্মমাস পরিবর্তনের কোনরূপ প্রয়োজনীয়তা দেখেন নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৬৬ খৃঃ পর্যন্ত রাজার জন্মসাল সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে কার্পেণ্টার-পরিবারকে কোনরূপ পত্র লেখার প্রয়োজনীয়তা কেউই উপলব্ধি করেন নি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭৭ খৃঃ প্রকাশিত 'তাঁর দি লিটারেচর অব বেঙ্গল' গ্রন্থে রামমোহনের জন্মাব্দ ১৭৭৪ খৃঃ বলেছেন। ১৮৯৬ খৃঃ বইটির যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন রামমোহনের জন্মসাল সম্পর্কিত বিতর্ক সম্বন্ধে রমেশবাবু পুরোপুরি জ্ঞাত থাকলেও রাজার জন্মবৎসর পরিবর্তন করেননি। ১৮৮১ খৃঃ প্রকাশিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭৭৪ খৃঃ স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বইটির চতুর্থ সংস্করণে তিনি মত পরিবর্তন করেন। ১৭৭২ খৃঃ স্বপক্ষে তাঁর যুক্তির বক্তব্য পরে আলোচিত হয়েছে।

১৯০০ খৃঃ প্রকাশিত হোল মিস সোফিয়া ডবসন কলেট রচিত 'লাইফ অ্যাণ্ড লেটারস অব রাজা রামমোহন রায়।' রামমোহনের জন্মসন সম্বন্ধে বর্তমান বিতর্কের সূচনা করে তিনি লিখলেন—'রামমোহন রায় ১৭৭২ খৃঃ ২২ মে জন্মগ্রহণ করেন।' ফুটনোটে তিনি যা লিখলেন তার মর্মার্থ হল: রেভাঃ সি এইচ এ ডাল ১৮৮০ খৃঃ ১৮ জানুয়ারী সানডে মিরর পত্রিকায় একটি পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে, ১৮৫৮ খৃঃ রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ রায় বন্ধু-বান্ধবদের এক ঘরোয়া সভায় বলেন যে, তাঁর পিতা ১৭৭২ খৃঃ মে মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডাল সাহেব রাজার জন্মতারিখ জিজ্ঞাসা করলে রমাপ্রসাদ তা বলতে পারেননি। কিন্তু রামমোহনের অপর একজন বংশধর বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন যে রামমোহন ১৭৭২ খৃঃ ২২ মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই তথ্যের জন্য মিস কলেট রাজশাহী কলেজের ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। ফণীবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ললিতমোহন রবীন্দ্রনাথের কাছে তথ্যটি প্রকাশ করেন। ১৭৭২ খৃঃ স্বপক্ষে উপরোক্ত দুটি প্রমাণ আমাদের বর্তমান বিবেচ্য বিষয়।

রেভাঃ ডাল সানডে মিরর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে লিখছেন—'১৮৫৮ খৃঃ এক ঘরোয়া আলোচনাচক্রে রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ রায় তাঁর পিতার জন্মসন সম্পর্কিত বিতর্ক সম্বন্ধে পরিষ্কার অভিমত প্রকাশ করেন।...ঐ সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র উপস্থিত ছিলেন...আমি অন্যতম শ্রোতা ছিলাম। রমাপ্রসাদ বলেছিলেন—'আমার পিতা কৃষ্ণনগরের কাছে রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ খৃঃ মে মাসে অর্থাৎ বাংলা ১১৭৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন।' আমি তাঁর পিতার জন্মতারিখ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে পিতার কোষ্ঠী না দেখে জন্মতারিখ বলা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়।' স্বাভাবিকভাবেই ডাল সাহেবের চিঠির সত্যতা সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমতঃ রাজার ভুল জন্মসাল ও তারিখ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে একথা জেনেও রমাপ্রসাদের মত একজন বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কেন প্রকাশ্যভাবে তা সংশোধন করলেন না—একান্ত ব্যক্তিগতভাবে 'চায়ের আসরে' সংশোধন আনলেন কেন? দ্বিতীয়, রমাপ্রসাদ ঐরূপ উক্তি করে থাকলেও রেভাঃ ডাল সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পর যখন রমাপ্রসাদ ও কিশোরীচাঁদ উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তখন সাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন কেন? ডাল সাহেব বর্ণিত উক্ত ঘটনার পর ১৮৬৬ খৃঃ কিশোরীচাঁদ মিত্র ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় মেরী কার্পেণ্টারের 'দি লাস্ট ডেজ অব রামমোহন রায়' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন—'ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম সংখ্যায় এই লেখক রামমোহনের বংশ পরিচয়, বাল্যজীবন, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বিবরণী দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, সুতরাং পুনর্বার এই প্রবন্ধে ঐ সকল বিষয়ের উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে লেখক মনে করেন না।' ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম সংখ্যায় কিশোরীচাঁদ লিখছেন—'রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন।' ডাল সাহেব বর্ণিত ঘটনা সত্য হলে কিশোরীচাঁদ ১৮৬৬ খৃঃ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এই উক্তির সংশোধন করতেন। সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পর (১৮৮০) যখন ডাল সাহেব চিঠি লিখলেন তখন পত্রের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার মত কেউই আর ইহলোকে নেই এবং ডাল সাহেব এই সুবর্ণ সুযোগের সুন্দর সদ্ব্যবহার করেন।

মিস কলেটের দ্বিতীয় তথ্যটি সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে। প্রথমত, ললিতবাবু কেন প্রকাশ্যে এই মারাত্মক ভুল সংশোধন করলেন না? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কেও এই প্রশ্ন রাখা যায়। এর মাত্র দুটি কারণ থাকতে পারে—প্রথমত ললিতবাবু জন্ম-সন সম্পর্কিত কোন তথ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে বিবৃত করেন নি, দ্বিতীয়ত ললিতবাবুর কাছ থেকে প্রাপ্ত রামমোহনের জন্ম সাল-তারিখ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন নি। ধরা যাক, ললিতবাবু ১৭৭২ সালের স্বপক্ষেই মত দিয়েছিলেন। ললিতবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সহোদর) নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৮৮১ খৃঃ 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প সংগ্রহ" নামে একটি পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় নন্দমোহন লিখছেন—'১৭৭৪ খৃঃ হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়।' মিস কলেট প্রদত্ত ললিতমোহনের সন্দেহজনক (?) উক্তি অপেক্ষা নন্দমোহনের বইটি অনেক বেশী প্রামাণ্য। যেহেতু মিস কলেট তাঁর গ্রন্থে নন্দমোহনের উল্লেখ করেন নি সেহেতু নন্দবাবুর উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়—এমন যুক্তি দেখাতে বোধ করি কেউ সাহস করবেন না। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খৃঃ। সেক্ষেত্রেও রাজার জন্মবৎসর পরিবর্তিত না হওয়ায় বা এ সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ না থাকায় ধরে নেওয়া যায় বইটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকা সত্ত্বেও ললিতবাবু কোন প্রতিবাদ করেন নি। কলেট প্রদত্ত ললিতবাবুর উক্তি সম্পর্কে আরও সন্দেহ বেড়ে যায়।

রামমোহন রায়ের জন্মবৎসর ১৭৭৪ খৃঃ-এর সব চাইতে বড় প্রমাণ রামমোহনের একাধারে মনিব সুহৃদ জন ডিগবীর উক্তি। '১৮০৫ খৃঃ-এর মধ্য ভাগ হইতে ১৮১৪ খৃঃ-এর মধ্য ভাগ পর্যন্ত রামমোহনের সহিত ডিগবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যুগ। এই সময়ে রামমোহন ডিগবীর সহিত প্রথমে রামগড়, পরে রামগড় হইতে যশোহর, যশোহর হইতে ভাগলপুর এবং সর্বশেষ ভাগলপুর হইতে রংপুরে যান। কিন্তু ডিগবীর সহিত রামমোহনের কেবলমাত্র মনিব কর্মচারীর সম্বন্ধ ছিল না। রামমোহন ডিগবীর নিকট গভীরভাবে ইংরাজী শিক্ষা করেন। ডিগবীও রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন—'। (রামমোহন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। জন ডিগবী উদ্যোগে ১৮১৭ খৃঃ লণ্ডন থেকে রামমোহনের বেদান্ত ও কেন উপনিষদ অনুবাদ প্রকাশিত হয় (ট্রান্সলেষণ অব এন এব্রিজমেণ্ট টু দি বেদান্ত—লাইকওয়াইজ এ ট্রানস্লেষণ অব দি কেন উপনিষদ)। এই পুস্তকে ডিগবী সাহেব রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ পরিচয় দেন। ডিগবী সাহেব লিখছেন—'তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্ক রামমোহন রায় বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।... বাইশ বৎসর বয়সে তিনি ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন কিন্তু যথাযথ প্রয়োগরীতি জানতেন না, তার পাঁচ বৎসর পর (১৮০১) যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখন তিনি চলনসই ইংরেজী বলতে পারতেন।' ১৮১৭ খৃঃ ৪৩ বৎসর বয়স হলে রামমোহনের জন্মবৎসর হয় ১৭৭৪ খৃঃ। ডিগবী আরও লিখছেন রাজার ২৭ বৎসর বয়সে (১৮০১) তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। ডিগবী ১৮০০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন এবং পর বৎসর (ইং ১৮০১) কলিকাতায় রামমোহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৭৭২ খৃঃ রামমোহনের জন্ম ধরিলে ১৭৯৯ খৃঃ ২৭ বৎসর হয়। কিন্তু

১৭৯৯ খৃঃ ডিগবী এদেশেই আসেন নাই, —রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ত দূরের কথা—' (রামমোহন রায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

রামমোহনের জন্মসন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভারতের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা ১৭৭৪ খৃঃ রাজার জন্মবৎসর হিসেবে মনে করেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকার (ইণ্ডিয়া থ্রু দি এজেস), দীনেশচন্দ্র সেন (হিস্ট্রী অব বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ এণ্ড লিটারেচর), সুশীল দে (বেঙ্গলী লিটারেচর ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী) এবং প্রোঃ মনিয়ার উইলিয়াম (রিলিজিয়স থট এ্যাণ্ড লাইফ অব ইণ্ডিয়া)—এঁদের মধ্যে অন্যতম। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর হিস্ট্রি এ্যাণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পীপল গ্রন্থের দশম খণ্ডে রামমোহনের জন্মমাস প্রসঙ্গে লিখছেন—

> "The date given on his tomb is 1774 and there seems to be adequate reason to disbelieve it. Miss Sophia Dobson Collet, in her 'Life and letters of Rajah Rammohun Roy' gives the date as 1772, on grounds which do not carry conviction."

রামমোহনের অকৃত্রিম সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর স্টেপলটন গ্রোভ থেকে রাজার সমাধি আর্নোস ভেলে স্থানান্তরিত করেন এবং তার উপযুক্ত সংস্কার সাধন করেন। এই সমাধির ওপর প্রস্তরফলকে লেখা আছে যে রামমোহন ১৭৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সমসাময়িককালের ঘটনাবিন্যাস এবং উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজার সঠিক জন্মবৎসর তাঁর প্রতিভার মূল্যায়নে কোনরূপ নতুন আলোকপাত করে না সত্য, তথাপি আজ তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী নিকটবর্তী হওয়ায় এ প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে। আধুনিক ভারতের নির্মাতা যুগস্রষ্টা লোকনায়কের দ্বিশত জন্মজয়ন্তী ভারতের জাতীয় উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই জাতীয় কৃত্য সঠিক তারিখে হওয়াই শোভন।

'বায়ুপোতে অতিউর্ধ আকাশে যখন ওঠা যায়, দৃষ্টিচক্র যত দূর হয় তার এক দিকে তখন থাকে যে দেশকে বহু দূরে অতিক্রম করে এসেছি আর এক দিকে থাকে সম্মুখে যা এখনও আছে বহু যোজন দূরে। রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।...বর্তমান যুগ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশীল, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

> য একোহবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ
> বর্ণান অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
> বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।।

প্রার্থনা করছে—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।।" (রবীন্দ্রনাথ)

রামমোহন ॥ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী

১৭৭২ : (?) মে জন্ম। হুগলী জেলায়, গ্রাম রাধানগর।

—গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ।

—নয় দশ বছর পর্যন্ত বাড়ীতে শিক্ষালাভ।

—আট বছর বয়সে প্রথম বিবাহ।

—নয় বছর বয়সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবাহ।

—পার্শি ও আরবি শিক্ষার জন্য পাটনায় গমন। সেখানে পনের বছর বয়স পর্যন্ত ভাষা শেখেন।

—ষোল বছর বয়সে পৌত্তলিকতার নিন্দা করে পার্শি ভাষায় পুস্তিকা রচনা করেন।

—পিতার সঙ্গে মত পার্থক্য। গৃহত্যাগ।

—দেশ ভ্রমণ শুরু করেন।

—তিব্বতে যান। বৌদ্ধধর্মের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার নিন্দা করায় জীবন বিপন্ন হয়। তিব্বতী রমণীদের সহায়তায় তিব্বত ত্যাগ।

—কাশী এসে সংস্কৃতি শিক্ষায় আত্মনিয়োগ।

—পিতার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন।

—গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং ইংরেজি শিক্ষা শুরু।

১৭৯১ খৃঃ—পিতা রামকান্ত রাধানগর বাসস্থান ত্যাগ করে চলে আসেন লাঙ্গুল পাড়ায়। এটি ছিল তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি।

১৭৯৬ খৃঃ—রামকান্ত উইল করে জগমোহন রামমোহন এবং রামলোচনের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেন। রামমোহন পান জোড়াসাঁকোর বাড়ী।

১৮০১ খৃঃ—প্রথম পুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম।

—সিভিলিয়ন জন ডিগবীর সঙ্গে পরিচয়।

১৮০৩ খৃঃ— ঢাকা-জামালপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হন।

—পিতা রামকান্তের দেহত্যাগ।

১৮১৪ খৃঃ—ডিগবিসাহেব চাকরি ছেড়ে দেশে চলে যান।

—রামমোহন রংপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য।

১৮১৫ খৃঃ—ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানির প্রেস থেকে রামমোহনের বেদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

—আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা।

—শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম ইয়েটস-এর সঙ্গে রামমোহনের সাক্ষাৎ।

—বেদান্ত সূত্রের বাংলাভাষায় প্রকাশ।

—ভারত সরকার সতীদাহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে উদ্যোগী হন।

১৮১৬ খৃঃ—রামমোহনের অনূদিত ইংরেজি বেদান্তসার প্রকাশিত হয়।

—বেদান্তসূত্রের উর্দু ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ।

—বেদান্তসারের ইংরেজি ও জার্মাণ অনুবাদ বেরোয়।

১৮১৬ খৃঃ ১৪ মে—হেয়ার, বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, রামমোহন, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—একটি কলেজ স্থাপনের উদ্দেশে মিলিত হন—একটি কমিটি গঠিত হয়।

১৮১৭ খৃঃ—রামমোহন, ডেভিড হেয়ার এবং প্রধান বিচারপতি ওয়েটস-এর চেষ্টায় হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা।

—ভারত সরকার সহমরণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করেন। সহমৃতার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিপত্র নিতে হবে।

১৮১৮ খৃঃ—সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ খৃঃ জুন—রামমোহন এবং সাংবাদিক বাকিংহাম সাক্ষাৎকার।

১৮২০ খৃঃ—রামমোহনের 'শান্তি সুখের পথ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৮২১ খৃঃ—৪ঠা ডিসেম্বর সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা প্রকাশ।

১৮২২ খৃঃ—হিন্দু সম্পত্তির দায়াধিকার সম্পর্কে রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশ।

১২ই এপ্রিল মীরৎ-উল-আখবার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

—রামমোহন নিজের চেষ্টায় 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮২৩ খৃঃ—রামমোহনের 'পাদরী ও শিষ্য সংবাদ' পুস্তিকা প্রকাশ।

১৮২৪ খৃঃ—ফরাসী এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক সম্মানিত বিদেশী সদস্য চিত।

১৮২৫ খৃঃ—গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে সহমরণার্থিণীর অনুমতিপত্র গ্রহণের আদেশ জারী।

১৮২৮ খৃঃ—কমল বসুর বাড়িতে উপসনা-সভা স্থাপিত।

১৮২৯ খৃঃ—৮ নভেম্বর সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের মিনিট রচনা।

—আগস্ট বাদশাহ রামমোহনকে রাজা উপাধি ভূষিত করে।।

—৪ ডিসেম্বর—সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন পাস। সতীদাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং মানুষ হত্যার সমান অপরাধরূপে ঘোষণা।

১৮৩০ খৃঃ—১৭ জানুয়ারী রামমোহন বিরোধীরা জোড়াসাঁকোয় ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন।

২৩ জানুয়ারী—ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৮৩১ খৃঃ ৮ এপ্রিল—রামমোহনের লিভারপুলে অবতরণ।

—লণ্ডনে ১২৬ নং রিজেন্ট স্ট্রীট বাস করতেন।

—মে মাসে লণ্ডন ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন রামমোহনকে সম্বর্ধনা জানান।

—সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের রাজার সাক্ষাৎ লাভ।

—বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি লাভ।

১৮৩২ খৃঃ—ফ্রান্সে বেড়াতে যান।

—লণ্ডনে ফিরে যান।

—বিখ্যাত অভিনেত্রী ফ্যানী কেম্বলের সঙ্গে যোগাযোগ।

—জুলাই মাসে সিলেক্ট কমিটিতে বক্তব্য প্রেরণ।

—প্রিভি কাউন্সিলে আপিলের শুনানী আরম্ভ।

১৮৩৩ খৃঃ ১৩ ফেব্রুয়ারী—দিল্লীর বাদশাহের অতিরিক্ত তিন লক্ষ টাকা ভাতা মঞ্জুর।

—১২ সেপ্টেম্বর—স্টেপলটন গ্রোভ-এ সভা অনুষ্ঠান।

—১৯ সেপ্টেম্বর মিঃ এস্টলিন রামমোহনের সঙ্গে দেখা করেন।

—২১ সেপ্টেম্বর—অসুস্থতা বাড়ে।

—২৩ সেপ্টেম্বর—শরীর ক্রমশঃ খারাপ হোয়ে পড়ে।

—২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

১৮৩৪ খৃঃ ৫—এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্য দিন

দেবল দেববর্মা

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল নীরেন। চশমাটা খুলে প্রথমে মুখে-গালে, তারপর ধীরে ধীরে গলায় এবং সব শেষে জামার কলারের নীচে দিয়ে বাঁ-হাতটা চালিয়ে ঘাড়ের কাছের ঘামটাও মুছল।

...ভ্যাপসা গরম। ভাদ্রমাস ফুরিয়ে এল। মাসান্তে সংসার খরচের সামান্য টাকার মত আর অল্প কটি দিন বাকি। কিন্তু তবু গরম যেন কাটে না। মাথা তুলে একবার দেখল নীরেন। পূবে চৌরঙ্গী রোডের উপর সার সার অট্টালিকা তারই মাথায় ঠিক চাঁদোয়ার মত একখণ্ড কালো মেঘ। ভাসতে ভাসতে মেঘটা যেন এদিকেই আসছে। যা গুমোট,—বলা যায় না হয়তো এখনই তড়বড়িয়ে বিষ্টি নামবে। নীরেন ঘাড় ফিরিয়ে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করল।

চোখে চশমা। গরম বেশী বলে আজ গলায় টাই বাঁধেন নি নীরেন। একটা বিস্কুট রঙের বুশসার্ট পরেছে। পরনের প্যান্টটা বেশ উজ্জ্বল সবুজ।...ঠিক চোঙা না হলেও মোটেই ঢিলেঢালা নয়। পায়ে চকচকে কালো রঙের সু। বেশ চটপটে, ছিমছাম চেহারা। হঠাৎ দেখলে নীরেনকে একটু কম-বয়সী বলে মনে হতে পারে। বয়স সাতাশ-আটাশ, কিম্বা বড় জোর তিরিশ। অথচ নীরেন যে গত বছর মাঘ মাসে পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে ছত্রিশে পা দিয়েছে, একথা ওর মুখের দিকে এক-নজর তাকিয়ে কেউ বলতে পারবে না।

দূরবীণে চোখ রাখার মতো বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে নীরেন রাস্তার দিকে তাকাল। ডান হাতের আঙুলগুলি অনেকটা সেলামের ভঙ্গিতে কপালের কাছে ঠেকিয়ে ভাদুরে রোদ্দুরের আঁচটা সামান্য আড়াল করবার চেষ্টা করল। কিন্তু দীপার দেখা নেই। অথচ ঘণ্টা-খানেক আগে সে টেলিফোনে দীপার সঙ্গে কথা বলেছে। এসপ্ল্যানেডে স্বদেশী অফিসটার ঠিক উল্টোদিকে নীরেন তার জন্য অপেক্ষা করবে। দীপা ঠিক সওয়া তিনটের সময় অফিস থেকে বেরোবে। আর কতটুকুই বা পথ? পায়ে হেঁটে এলে বড়জোর মিনিট পনের লাগতে পারে।

রেলের অফিসটার উল্টোদিকে নীরেন দাঁড়িয়েছিল। বড় একটা গাছের কিছু ডাল-পালা পাড়াপড়শীর মত গলা বাড়িয়ে ফুট-পাতটার এপারে রাস্তার উপর কৌতূহলী দৃষ্টি বুলোচ্ছে। নীরেন একটু সরে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। চুপচাপ এমনি দাঁড়িয়ে থেকে তার কেমন একটা অস্বস্তি, ঈষৎ শীতের মত অল্প ভয় ভর করছিল। জায়গাটা বেখাপ্পা, ... চনচনে রোদ্দুর। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরা কেউ তাকে এমনি অসময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কি ভাববে? অবশ্য কেউ শুধোলেই যে সত্যি কথা বলতে হবে, তার কি মানে আছে? নীরেন অনায়াসে বলতে পারে, সে একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছে। বিশেষ দরকার। দেখা হলে দুজনে মিলে একটা কাজে যাবে। কিন্তু দীপা এত দেরি করছে কেন? সাড়ে তিনটে বাজল। তবে কি অফিসে কোনো জরুরী কাজে সে আটকা পড়েছে? বেরোতে পারেনি।

প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে নীরেন সিগারেট কেসটা বের করল। সৌখিন জিনিস। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেটের মুখে সে আগুন ছোঁয়াল। তারপর পা দুটো ঈষৎ ফাঁক এবং শরীরটা কিঞ্চিৎ আলগা করে বেশ লম্বা একটা টান দিল। নাক-মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে নীরেন ফের সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার হঠাৎ আইভির কথা মনে পড়ল। নীরেনের বউ আইভি। এই অবেলায় সে নিশ্চয় আর শুয়ে নেই। বিয়ের পর দুপুর বেলায় ভাতঘুম দেওয়ার অভ্যেস ছিল আইভির। খেয়ে উঠে মুখে একটা পান গুঁজে বিছানায় টান-টান। মিনিট পনের পরেই আইভি একেবারে অচেতন। কিন্তু রিন্টু কোলে আসার বছরখানেক পর থেকেই আইভি ঠিক একটা বর্ষার ঝোপের মত গোলগাল, পরন্ত হয়ে উঠল। ইদানীং বেশ ভারী আর মোটা। মেদবৃদ্ধির আশংকায় দুপুরের ঘুম ছেড়েছে আইভি। খেয়ে উঠে বিছানায় একটু গড়ায়। রিন্টু শুতে চায় না, দুষ্টুমী করে। তাকে জোর করে ঘুম পাড়ায়। সংসারের হাল্কা খুঁটিনাটি কাজকর্ম সারে। কোনো দিন নিজের জামা-টামা নিয়ে বসে। সেলাই-মেশিনে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকে।

রাস্তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নীরেন এবার দীপাকে দেখতে পেল। অনেকটা দূরে দিকচক্রবালে প্রথমে দৃশ্যমান জাহাজের মাস্তুলের মত, শুধু দীপার অবয়বটাই নজরে এল। তারপর ধীরে ধীরে ওর নাক মুখ চোখ এবং সবশেষে দীপার বাঁ গালের কালো তিলটিও নীরেন দেখতে পেল।

কাছে আসতেই নীরেন ছল করে ঈষৎ বিরস মুখ করল। বলল, 'এর নাম তোমার সাড়ে তিনটে?'

দীপা মুচকি হেসে শুধোল,—'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ বুঝি?'

'সেই তিনটে থেকে', পরিহাস করে নীরেন ফের বলল, 'কত সুন্দরী মেয়ে সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেল। আমি সেই তাদের কারোর মত একজনের অপেক্ষা করছি।'

দীপা ঠোঁট টিপে হাসল। সে জানে, নীরেন বাকপটু,—খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। কেমন সত্যি-সত্যি মনে হয়। ওর কথা চট করে মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। মন ভিজিয়ে দেয়। অমনি সুন্দর সুন্দর কথা শুনিয়ে নীরেন একদিন তার মন ভুলিয়েছে। আজও কি তাই বলতে চায়?

মুচকি হেসে দীপা বলল, 'অপেক্ষা করতে পারলে কই? আর একজনকে দেখেই তো সব ভুলে গেলে।'

কথার শেষে বোলতার হুলের মত জ্বালা ধরানো খোঁচা। নীরেন বুঝতে পারলেও সেটি নিঃশব্দে হজম করল। নইলে সেও বলতে পারে,—তোমার সীমন্তেও সিঁদুর দীপা। তুমিও আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকনি।' কিন্তু এসব কথা আলোচনা না করাই ভালো। বলতে গেলেই সব মাটি। শেষ বেলার এই সুন্দর অপসৃয়মাণ অপরাহ্ণ, দীপার ঠোঁটের মিষ্টি হাসিটুকু মুহূর্তে মেঘে-ঢাকা নীল আকাশের মত মলিন হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত দেখলে যেমন একটা আনন্দ হয়, দীপাকে তেমনি বিজয়িনী বলে মনে হল। ভুরু কুঁচকে সে বলল, 'বারে। কোথায় যাবে বলেছিলে না? এখানে সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?'

'হ্যাঁ, যাব বৈকি।' নীরেন তাড়াতাড়ি বলল।

সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। হাত বাড়াতেই সেটা শ্লথগতি হয়ে দাঁড়াল।

নীরেন বলল, 'চল, কোনো একটা রেস্তোরায় গিয়ে বসি।'

দীপা সজোরে মাথা নাড়ল। 'দূর! রেস্তোরায় নয়। এই গরমে বন্ধ ঘরের মধ্যে একটুও ভালো লাগবে না।'

তেরছা চোখে নীরেনের দিকে তাকিয়ে সে ফের বলল, 'তোমাকে বিশ্বাস কি মশায়? তার চেয়ে গঙ্গার ধারে চলো, বেশ ফুরফুরে হাওয়া। খুব ভালো লাগবে।'

নীরেন লজ্জা পেল। কতদিনকার কথা। তবু রেস্তোরার সেই ঘটনাটা দীপা আজও ভোলেনি। অবশ্য এমন একটা ব্যাপার কোন মেয়েই বা ভুলতে পারত? পর্দাঢাকা কেবিনে দীপাকে একা পেয়ে নীরেন হঠাৎ একটা কান্ড করে বসল। ব্যাপারটা প্রায় অতর্কিত এবং দ্রুত শেষ হতেই দীপা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। অবশ্য নীরেন একটু ভয় পেয়েছিল। মেয়েদের মন। বলা যায় না, কখন ফোঁস করে উঠবে। কিন্তু দীপা চটে নি। আড়ষ্ট, তারপর ঈষৎ আরক্ত মুখে শুধু বলল, 'যাও! তুমি ভারী ইয়ে, ভীষণ অসভ্য হয়ে উঠছ দিন দিন।'

সাত-আট বছর আগের দিনগুলি এক-খন্ড বর্ষার মেঘের মত স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে। আশ্চর্য! নীরেন কি ভাবতে পেরেছিল, কলকাতায় ফিরে দীপার সঙ্গে আবার এমনি লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা হবে?

ট্যাক্সিতে উঠে নীরেন কেমন অস্বস্তি বোধ করল। মনে হল দীপাকে সে মিছি-মিছি ফোন করে ডেকে এনেছে। এখন কথায় কথায় পুরানো সব প্রসঙ্গ উঠবে। আর দীপা যদি অভিযোগ করে, নীরেন তাকে ঠকিয়েছে। তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় আর চাতুরী করেছে এতদিন। তাহলে সে তা কেমন করে খন্ডন করবে? আর সত্যিই তো। নীরেন শুধু বিবাহিত নয়। সে একটি সন্তানের জনক।

দিন সাতেক আগে দীপার সঙ্গে তার দেখা। স্টেটসম্যান অফিসটার কাছে বাসস্টপে সে দাঁড়িয়েছিল। নীরেন হাঁটিতে হাঁটিতে নিউ-মার্কেটের দিকে যাচ্ছিল।

দেখা হতে দীপাই প্রথম কথা বলল, 'ওমা!, তুমি কবে কলকাতায় এলে? ছুটিতে আছ নিশ্চয়—'

নীরেন ভেবেছিল তাকে দেখে দীপা হয়তো ভুরু কোঁচকাবে। ভালো করে কথা বলবে না। বড়জোর একটু হাসবে। হুঁ-হাঁ উত্তর দিয়ে বক্তব্যকে সংক্ষেপ করবে। তার দীপার পক্ষে অভিমান করা স্বাভাবিক। নীরেন তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তাকে প্রবঞ্চনা ছাড়া অন্য কি বলা যায়?

কিন্তু না। দীপাকে সে ভুল বুঝেছিল। তার মুখের রঙ সকালের রোদের মতই প্রসন্ন। ঠোঁটের হাসি বাঁকা নয়,—ফুলের মত প্রফুল্ল:

'ছুটিতে নয়'। নীরেন হেসে জবাব দিল। 'কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছি।'

'তাই নাকি?' দীপা কেমন একটা ভঙ্গী করে তাকাল।

আলাপ দু-এক মিনিটের বেশী গড়ায় নি। কারণ দীপার বাস এসে গিয়েছিল। অফিস ছুটির পর সব বাসেই সমান ভিড়। ঠাস বোঝাই। তবু এটাতে ওঠা চলে। দীপা তাই বাসের পা-দানীর দিকে এগিয়ে গেল।

দীপা এখন কোথায় থাকে নীরেন ইচ্ছে করেই শুধোয়নি। অবশ্য মুখ ফুটে জানবার প্রয়োজন ছিল না। সীমন্তে সিঁদুর দেখে অনুমান করা যেতে পারে, সে এখন স্বামীর ঘর করছে। কতদিন বিয়ে হয়েছে তার, স্বামী কি করেন, এসব প্রশ্ন নীরেন অবশ্য করতে পারত। কিন্তু এককালের ভালবাসার মানুষকে এত কথা কি ফস করে জিজ্ঞেস করা যায়? তাই বলতে গিয়েও নীরেন পারেনি। কেমন বাধ বাধ মনে হয়েছে। জিভটা কিছুতেই সচল হয়নি। তবু ভাগ্যিস সে জানতে চেয়েছিল, দীপা কোন অফিসে কাজ করে। নইলে এত সহজে ওর সঙ্গে কি ফের যোগাযোগ করতে পারত?

কিন্তু আশ্চর্য। টেলিফোনে তার গলা শুনে দীপা তখুনি চিনতে পারল। হেসে বলল, 'কি ব্যাপার? সাতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল যে?'—

নীরেন অবশ্য অন্যরকম ভেবেছিল। টেলিফোনে দীপা হয়ত তাকে তেমন আমল দেবে না। কোনো রকমে দায়সারা গোছের হুঁ-হাঁ উত্তর দিয়ে লাইনটা ছেড়ে দেবে।

কিন্তু দীপার গলা ঠিক আগের মত,—কণ্ঠস্বরে পুরোনো দিনের অভি-মানের সুর। খুব খুশি হয়ে নীরেন তাড়াতাড়ি বলল,—'সত্যি। আরো আগেই তোমাকে টেলিফোন করা উচিত ছিল। সেদিন বাস-স্টপে হঠাৎ দেখা। তবু ভালো করে তো কথা বলা হ'ল না।'

'কি করব ব'ল?' টেলিফোনের তারে দীপার গলা ভেসে এল। 'মঙ্গলবার ভীষণ দরকার ছিল আমার। বাসটা আসতেই উঠে পড়লাম। আর অপেক্ষা করতে পারিনি।'

—'তা ঠিক।' নীরেন যেন দুঃখ করে বলল। 'কাজ থাকলে আর কেমন করে অপেক্ষা করবে?'

—'আহা। রাগ করছ কেন?' দীপা ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। বলল,—'আর একদিন তো ভালো করে কথা হতে পারে।''

—'আর একদিন নয়।' নীরেন অনাবশ্যকভাবে মুখটা টেলিফোনের কাছে নিয়ে গেল। 'তুমি আজ আসতে পার না?' সে সাগ্রহে শুধোল।

—'বেশ তো। আমি রাজি আছি।' দীপা একটুও চিন্তা না করে জবাব দিল।

বুকের ভিতর কেমন যেন শির-শিরাণ।...বিচিত্র সুখের অনুভূতি। ঠিক প্রথম প্রেমের মত রোমাঞ্চময়। আশ্চর্য! শরীরটা এমন হাল্কা লাগছে তার। অফিসের ঘরে চেয়ারের উপর যেন বসতেই ইচ্ছে করছে না। উঠে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল নীরেন। কত বয়স হয়েছে তার? পঁয়ত্রিশ? ছত্রিশ? সে বিবাহিত। একটি সন্তানের জনক। তার বউ আইভি মোটামুটি সুন্দরী। দীপার সিঁথিতে সিঁদুর, সেও একজনের স্ত্রী। তবু তারা কেন আবার অফিস থেকে পালিয়ে গোপনে দেখা করতে চাইছে? দীপা কেন তার প্রস্তাবে এত সহজে রাজি হল? তবে কি নীরেনকে সে ভুলতে পারেনি? আজও ভালবাসে—

* * *

গঙ্গার ধারে মোহময় অপরাহ্ন। নদীর জলে হেলে পড়া সূর্যের আলো চিকমিক করছে। একটা বড় স্টীমারের চিমনীর মুখ থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে অনর্গল।

নীরেন ভাবছিল কেমন করে শুরু করবে? সেই সাত-আট বছর আগের দিন-গুলোর কথা তুলবে নাকি? ভৈরব হালদার লেনের বাড়িতে থাকতে কিন্তু এমন সুবিধে ছিল না। টেলিফোনে দীপাকে পাবে কোথায়? নীরেন তখন এম-এ পড়ত। টু-বি বাসে ইউনিভার্সিটিতে যেত। আর দীপা সবে স্কটিশে ঢুকেছে। ছিলছিলে ধানচারার মত সতেজ, সজীব মেয়ে। ফর্সা রঙ—বেশ কমনীয় মুখশ্রী। বাস-স্টপে দুজনে প্রায় একই সময়ে দাঁড়াত।

কেমন করে যেন একদিন ভাব হয়ে গেল। একটা রাগিণীর আলাপের মত তাদের ঘনিষ্ঠতা, পরিচয় দ্রুত বাড়ল। এখানে-সেখানে দেখা,—পার্কে, রেস্তোরায় কিম্বা সিনেমা হলে। কতদিন এমনি পড়ন্তবেলায় দুজনে গঙ্গার ধারে এসে বসেছে।

তারপর যা হয় তাই। ব্যাপারটা একদিন বাড়ির লোকের কাছে ফাঁস হয়ে গেল। দুজনে হাতে-নাতে ধরা পড়ল। কি একটা ইংরেজী বই দেখতে লাইট-হাউসে ঢুকে-ছিল। দীপার এক কাকাও সেখানে উপস্থিত। ব্যাচিলর মানুষ। অবসর কাটে না। সময় পেলেই সিনেমা হলে ঢু মারে। দুজনে গল্পে মশগুল। কাকাকে কেউ লক্ষ্য করেনি। ব্যস, সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরার আগেই সমস্ত চাউর। বর্ষার তীব্র ঝাপ-টানির মত একরাশ ধমকানি আর তিরস্কার। বাবা তার দুই গালে, পিঠের উপর সশব্দে চড় বসিয়ে দিলেন। অপমানে, দুঃখে দীপা ডুকরে কেঁদে উঠল।

সব শুনে নীরেন বলল,—'ছিঃ! ওরা তোমাকে এমনি করে মারলেন?'

দীপার শুকনো মুখ, চোখের কোণে টলটলে অশ্রুবিন্দু। 'শুধু মেরেছে নাকি?' সে চোখ মুছে বলল, 'সেই সঙ্গে কি ধমক আর গালি-গালাজ। জানো, সেদিন রাত্তিরে আমি বিছানায় শুয়ে খালি কেঁদেছি। আর তোমার কথা ভেবেছি।'

—'লক্ষ্মীটি, আমার উপর বিশ্বাস রাখো।' নীরেন ওকে সান্ত্বনা জানাল। 'আমার পরীক্ষাটা চুকে যাক। একদিন তোমার বাবার কাছে গিয়ে সব বলব। ততদিনে নির্ঘাত একটা চাকরি জুটে যাবে, কি বল?'

* * *

মনের ভিতর কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভয় ভাব। নীরেন ভাবছিল দীপা এখনই সেই অতীতপ্রেম প্রসঙ্গটা তুলবে। বলবে,—'নিজের মোক্ষলাভ ভালো চাকরি পেয়ে দিব্যি দিল্লী পালিয়েছিলে? একটিবারও আমার কথা ভাবনি। সাত বছর পরে মিছিমিছি আবার কেন ডাকা বাপু? আমি এখন বিবাহিতা। আমার কাছে তুমি পর-পুরুষ ছাড়া আর কিছু নও। এই অবেলায় গঙ্গার ধারে বসে গুজগুজ, ফুসফুস করবার আর কি কোনো অর্থ আছে?

মখমলের মত নরম ঘাসের উপর বসে দীপা বলল,—'কি সুন্দর বিকেল! ওমা, মোটর লঞ্চটা কেমন রাজহাঁসের মত তরতর করে ছুটে চলেছে। এসব দেখলে বুবুন এমন খুশি হত না—'।

—'বুবুন?' নীরেন ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

—'আমার ছেলে।' দীপা তাড়াতাড়ি বলল। 'মোটে আড়াই বছর বয়েস। কিন্তু কি দস্যি জানো? ঘরের সমস্ত জিনিস, কেবল নাড়বে, ঘাটবে। ওর জন্যে কিছু রাখাই দায়। এখন বাড়ি গিয়ে দেখব, সব অগোছালো লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে।'

নীরেন চুপ করে শুনছিল।

দীপা ফের বলল,—'অথচ রোজ যখন অফিসে আসি, তখন ও ঠিক বুঝতে পারে। আমি বেরোলেই জানালায় এসে দাঁড়াবে। একটু দূরে গেলেই এমন করুণ মুখ করে তাকাবে জানো, তখন ভীষণ মায়া লাগবে। খালি মনে হয়, কখন ছুটির পর ছেলেটার কাছে ফিরব। কিছুই ভালো লাগে না।'

নীরেন শুধোল,—'তুমি অফিসে চলে এলে, বুবুন কার কাছে থাকে?'

—'বাড়িতে একটা সারাক্ষণের লোক রেখেছি। বুবুনকে সেই দেখে। অবশ্য লোকটা ভালো, বিশ্বাসী। বুবুনকে খুব ভালোবাসে।'

—'যাক, তবু ভালো,' নীরেন একটু হাসবার চেষ্টা করল।

—'কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?' দীপা যেন নিজেকেই শুধোল। 'এই তো দিন পনের আগে বাড়ি ফিরে

দেখি দস্যি ছেলে টেবিল থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়ে বসে আছে। ভাগ্যিস উনি তখন বাড়িতে ছিলেন। নইলে কি যে হত।' দুর্ভাবনায় দীপার চোখ দুটো ছোট হয়ে এল।

নীরেন চিন্তা করছিল, কি বলবে। এবার নিশ্চয় ওর স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করা উচিত। দীপার স্বামী,—যে ভদ্রলোকটিকে নীরেন কোনোদিন চোখে দেখেনি। কি প্রশ্ন করবে সে? তার স্বামী কেমন? কি কাজ করেন ভদ্রলোক? ইচ্ছে করলে আরো এক ধাপ এগোন যায়। বিয়ের পর কেমন লাগছে দীপার? ভদ্রলোককে নিশ্চয় তার পছন্দ হয়েছে?

অবশ্য দীপা নিজেই তাকে কথা বলার সুযোগ করে দিল। বলল,—'এই, তুমি আমাদের বাড়িতে একদিন এসো না—'

—'তোমাদের বাড়ি?'

—'হ্যাঁ। ত্রিশের দুই সুরেশ দত্ত লেন. বিজলী সিনেমার কাছে। যে কোনো একটা ছুটির দিনে চলে এস। বেশ গল্প করা যাবে। তবে আগের দিন আমায় একটা টেলিফোন ক'র কিন্তু। নইলে হয়তো গিয়ে দেখবে বুবুনকে নিয়ে আমরা দুজনে বেরিয়ে গেছি।'

ঠাট্টা করে নীরেন শুধোল,—'তোমার উনির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তো?'

—'নিশ্চয়।' দীপা এক চিলতে হাসল। 'দেখবে, মানুষটা খুব ভালো। তোমার মত অফিসার নয়। তবে প্রফেসর মানুষ,—বেশ শান্ত আর ধীর।'

সন্ধ্যে হয়নি। পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে আরো কিছুক্ষণ বসা যায়। কিন্তু দীপা খানিকক্ষণ উসখুস করে উঠে পড়ল। ওর মুখের প্রতিটি রেখায় অস্থির চঞ্চলভাব। সন্ধ্যার ক্লান্ত পাখির মত নীড়ে ফেরার অভিলাষ।

তবু নীরেন একবার অনুরোধ করল,— 'আর একটু বসবে না?'

দীপা ম্লান হাসল। বলল,—'উপায় নেই। সন্ধ্যেবেলায় আমাকে না হলে ওর চলবে না। সারাদিন একা একা থাকে। ঠিক জানে, সন্ধ্যে হলেই মা বাড়ি ফিরবে। আর তখন আমাকে না পেলে এমন কান্নাকাটি জুড়বে যে কেউ ওকে সামলাতে পারে না।'

নীরেন একটি কথাও বলতে পারল না। তার সাত বছর আগের কথা মনে পড়ছিল। তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে দীপা নিজে বলত,—'এত তাড়া কিসের বাপু? দাঁড়াও না, আগে আকাশের তারা ফুটুক। আমার এখনি উঠতে ইচ্ছে করছে না।'

ঘাড় তুলে নীরেন একবার দেখল। দিনের আলোয় তারাগুলো কোথায় লুকিয়েছে কে জানে।—

স্টপে দাঁড়াতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাস এল, ভীষণ ভিড়। ওঠা যায় না কিন্তু দীপা নাছোড়বান্দা, সে উঠবেই একরকম জোর করেই ভিতরে ঢুকল।

বাস ছেড়ে দিতেই নীরেন ফের একটা সিগারেট ধরাল। কি বিশ্রী ভিড়। দীপা কেমন করে উঠতে পারল? অথচ ক'বছর আগে সামান্য একটু চাপাচাপি দেখলে সে ঠোঁট উল্টিয়ে দূরে সরে দাঁড়াত। বাসের ধারে কাছে ঘেঁষত না।

সিগারেটের কেসটা পকেটে রাখতে গিয়ে নীরেন ভুরু কোঁচকাল। একটুকরো ছোট্ট কাগজ তার হাতে উঠে এসেছে। কাগজটার উপর দ্রুত চোখ বুলোল নীরেন। তার বউ আইভির লেখা একটি লাইন, 'কাশির ওষুধটা অবশ্য এনো। নইলে ছেলেটা রাত্তিরে খুব কষ্ট পাবে।'

নিজের উপর খুব রাগ হল নীরেনের। কি আশ্চর্য! এই কথাটা সে বেমালুম ভুলে বসেছিল? ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে আইভি কাগজে এইটুকু লিখেছে। নইলে আজও সারারাত্তির ছেলেটা কেশে মরত।

যাত্রী বোঝাই বাসে নয়। কিন্তু লম্বা পা ফেলে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হাঁটছিল নীরেন। এই মুহূর্তে দীপার কথা নয়, রিন্টুর জন্য দুর্ভাবনায় সেও অস্থির হয়ে উঠেছে।

গান গজল

[মিশ্র-ভৈরবী — কাহারবা]

ঐ ঘর-ভুলানো সুরে
কে গান গেয়ে যায় দূরে।
তার সুরের সাথে সাথে
মোর মন কেন যায় উড়ে॥
তার সহজে সবার তান
সে ফুল ফুটানো গান,
তার সুরে ভোরের চাঁদ
বন তোমার যাসে ঘুরে॥
তার সুরের অনুরাগে
বুকে প্রণয়-বেদন জাগে,
বনে ফুলের অন্তর মাঝে
ফুল সুরভি উঠে পুরে॥
তুমি সুর-সোহাগে তোরি
সাথ যৌবন কিশোরী,
হিয়া খুঁদ হ'লো গো বেলায়
তার পায়ে পায়ে ঘুরে॥

ভাটিয়ালী

স্থা/ কুঁচবরণ কন্যারে তার মেঘ বরণ কেশ।
আমায় লয়ে যাও রে নদী
সেই সে কন্যার দেশ॥
পরনে তার মেঘ-ডম্বুর উদয়-তারার শাড়ি,
রূপ নিয়ে তার চাঁদ সুরুযে করে কাড়াকাড়ি,
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই-
আমার চির-পথিক বেশ॥
পিছলে পড়ে চাঁদের কিরণ
বিজলি তারি গায়,
সন্ধ্যা সকাল আসে তারি
আলতা হ'য়ে পায়।
সে রয়না ঘরে, ঘুরে বেড়ায় মনমাঝির চরে,
তারে দেখলে ঘরে বেঁধে রাখে, ক্ষ্যাপা মানুষ ধরে।
তোর জল-তরঙ্গে বাজে রে তার
সোনার চুড়ির রেশ॥

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নজরুল সাহিত্যের প্রসার হোক

নজরুল ইসলাম। একটি চিরবিদ্রোহী মানুষের আলেখ্য। একটি যুগঅস্থিরতার প্রতিচ্ছবি। কুসংস্কার, অন্ধতা, জড়ত্ব, পরশ্রী-কাতরতা এবং তোষামোদের আবরণকে তিনি দুমড়ে মুচড়ে কায়াহীন করতে চেয়েছিলেন। কোন সাম্প্রদায়িকতা, কোন বিদ্বেষ তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তাঁর সজীব সৃষ্টিকাল জাতিকে শুনিয়েছে এক প্রলয়ের আহ্বান। এক আবেগময় উন্মাদনায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সবকিছু। নজরুল বলেছিলেন: 'বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী; তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যেই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য-হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।' —সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন বাঙালী সাহিত্যসাধক নিজের সম্পর্কে এমন স্পষ্ট করে সাহসের সঙ্গে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারেননি। নজরুল পেরেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন মানুষের জীবনের অংশীদার।

সত্য ও সুন্দরের পূজারী চিরবিদ্রোহী নজরুল। নজরুল ইসলাম কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এমন কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁর তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর সরব হয়ে উঠেছিল। তিনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন বাঙালীজাতিকে। সুপ্ত মূল্যবোধকে সজীব করে তুলেছিলেন। তাই বাংলাদেশের সুধীসমাজ তাঁর ললাটে 'বিদ্রোহী'র জয়তিলক এঁকে দিয়েছিল। সেদিন নজরুল বলেছিলেন: 'একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক বলে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিকেই দেখাইনি—এই তো আমার অপরাধ। এরই জন্য তো আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল মনে করেই।'

আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত

নজরুলের জীবন স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক ছিল না। রাজনৈতিক অস্থিরতায় তাঁর জীবনও ছিল ছিন্নভিন্ন। উত্তাল জীবন-সমুদ্রে যে তরণী তিনি ভাসিয়েছিলেন প্রকৃতির খেয়ালে হঠাৎ তার যাত্রা হয়েছে রুদ্ধ। কবি আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু সে থাকা এক যন্ত্রণার উৎসার মাত্র। কবিকে আমরা তো এভাবে চাইনি। আর তিনি বলেছিলেন একদিনঃ

'জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।'

নিজেকে সকলের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে নিঃশেষিত কবি আমাদের মনের মাঝে চিরন্তনে আসন পেয়েছেন। সার্থক হয়েছে তাঁর সাধনা।

জীবনধর্মী কবি নজরুল, একদিকে বিদ্রোহের জ্বালাধরা কবিতা লিখেছেন, আর একদিকে স্নিগ্ধ প্রেমের রূপময়তাকে ভাস্বর করেছেন। প্রেমভাবনার এক অনন্য চিত্রণ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। অনুপম এই কবিতাবলী নিয়ন্ত্রণবোধকে সজীব করে তোলে। নজরুল শিশু ও কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সব থেকে পরিতাপের বিষয়, নজরুলের বই প্রচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজও হোল না। তাঁর জীবন সম্পর্কে লেখা হয়েছে অনেক। কিন্তু বৈচিত্র্যময় নজরুল সাহিত্যের ব্যাপক বিশ্লেষণ হয়নি এখনও। সাময়িকতার উর্ধ্বে, তাঁর কাব্যে যে চির-কালীনতার স্পর্শ রয়েছে, সেই সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াস একেবারেই অনুপস্থিত। নজরুলের চিঠিপত্র বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। কবি সমকালীন খ্যাত-অখ্যাত বহু-জনের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন নানান সময়ে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে। তাঁর জীবন ও সাহিত্যকৃতির সম্পর্কে বহু মূল্যবান উপাদান রয়েছে এই সব চিঠিতে। অথচ এগুলি অবহেলিত থেকেছে এতকাল। নজরুলের চিঠিপত্র সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে পারলে নজরুলকে জানার পথ সুগম হবে।

নজরুল সঙ্গীত যখন জনপ্রিয়তার অসীম স্তরে, তখন কবি দুহাতে লিখতেন গান। বিশ্রাম ছিল না তাঁর। চারদিকের রাজনৈতিক সংকটে বিক্ষুব্ধ কবি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেন সঙ্গীতে। সঙ্গীতের ব্যবসাদাররা তাঁকে দিয়ে গান লিখিয়ে নিত সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে। পারিবারিক আসরে অথবা সভা-সমিতিতেও কবি গান করতেন। সেসব গান যে লেখা হয়ে আছে, অথবা সংগৃহীত হয়েছে এমন কথা নিশ্চয় করে বলা দুষ্কর। [illegible] গ্রন্থ প্রকাশকদের এ ব্যাপারে যত্ন[illegible] হওয়া উচিত।

দেশাত্মবোধক সংগীত র[illegible] নজরুলের সমকক্ষ সম্ভবত সমকালে [illegible] একজনও ছিলেন না। পরাধীনতার [illegible]লোকে তিনি দিয়েছিলেন অগ্নিময়ী বাঙরূপ। স্বদেশ-প্রেমের বন্যায় দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে-ছিলেন। বৈপ্লবিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল। ইংরেজ বিতাড়ন যজ্ঞে বিভিন্ন সভাসমিতি ও গণ-আন্দোলনে নজরুল সংগীতই ছিল প্রেরণা। জাতিকে স্থবিরত্ব থেকে প্রাণসত্তায় উদ্দীপ্ত করার অনন্যকৃতিত্ব নজরুলের। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেনঃ 'আমরা যখন যুদ্ধে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনো তার গান গাইব।'—এই ভবিষ্যৎবাণী আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতেও সত্য প্রমাণিত। একালের গণ-আন্দোলনে নজরুল সংগীত অন্যতম প্রেরণা। অথচ নজরুলের গানের স্বরলিপি পাওয়া যেত না দীর্ঘকাল। যার ফলে নজরুলের গান বহুপ্রচলিত হয়েও সঠিকভাবে গাওয়া যেত না। কয়েক বছর ধরে নজরুলের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হচ্ছে।

বিদ্রোহী বাংলা—নজরুল ইসলাম। সাহিত্যম্। ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

প্রেমের কবিতা—নজরুল ইসলাম। সাহিত্যম্। দাম তিন টাকা।

নজরুল পত্রাবলী—নজরুল ইসলাম। সাহিত্যম্। দাম ঃ পাঁচ টাকা।

নতুন বই

বাংলার বিপ্লবে ইন্দিরা। সুজিতকুমার নাগ। প্রকাশক—দীপায়ণ, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা—৯। মূল্য ছয় টাকা।

বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে পাকিস্থানী সরকার অকথ্য অত্যাচার করে জনগণকণ্ঠকে দাবিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু পারে নি। সেখানকার মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ প্রয়াস তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। সেই প্রয়াসে অন্তরঙ্গ বন্ধুভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে ভারত—যে ভারত ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন।

শ্রীমতী গান্ধীর মত, পথ ও কৌশলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ দুঃসাহসিক মুক্তিসংগ্রামের জয় ত্বরান্বিত হয়। লেখক শ্রীসুজিতকুমার নাগ সেই মুক্তিসংগ্রামে ভারতের হৃদ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ মানবিক ভূমিকার ইতিহাসকে সুচিন্তিতভাবে আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। বিষয়বস্তু আবেগে কেন্দ্রচ্যুত হয় নি, আবার তথ্যের অভাবে অবৈজ্ঞানিক হয় নি। লেখকের সুচিন্তিত মন্তব্য ও বিশ্লেষণ প্রশংসার যোগ্য। সর্বোপরি রচনার ভাষা সহৃদয় পাঠককে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব যে ভারতের গৌরব, বিশ্বমৈত্রীর সুমহান মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে।

কীর্তন ও সমাজ। কার্তিকচন্দ্র রায়। প্রকাশক—রকমারী বুক হাউস, ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। মূল্য চার টাকা।

বাংলাদেশে পালাবদ্ধ পদাবলী কীর্তনের সূত্রপাত সম্ভবত পনেরো শতকের শেষ দিকে, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে। অবশ্যই প্রাক-চৈতন্য পর্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণ সংক্রান্ত পদাবলী কীর্তনে গাওয়া হত। কিন্তু চৈতন্যদেব যেমন মধ্যাহ্ন সূর্যের মত বাংলাদেশ, জাতি, প্রাণ ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আলোকিত করেছেন, এবং নিজেই সোনার কাঠির মত স্পর্শ করে গতানুগতিক প্রাণপ্রবাহকে উজ্জীবিত ও উচ্চকিত করেছেন। তেমনি গানের যে ধারা কীর্তন-অনুসারী, তাতেও নবরস সঞ্চার করেছেন। শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায় লিখিত বর্তমান গ্রন্থটি সেই ধারায় একটি সুলিখিত ইতিহাস রচনা করেছেন।

সার্থক কীর্তন গানের কেন্দ্র নবদ্বীপ। সমস্ত রকম গানের শেষে কীর্তন গান হয় যেন না সমাপ্তি সঙ্গীত হিসেবে। কীর্তন গানের সুরে যেমন আলাপের আনন্দ আছে, তেমনি বৈষ্ণব ধর্মের রস-ভাষ্যের পরিচয়ও নিবিড়ভাবে অলংকৃত হয়ে আছে। লেখক সেই বিষয়টি সহজ সরল ভাষায় এখানে ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্বয়ং একজন কীর্তনীয়া। শুধুমাত্র গানের সুরের সঙ্গে নয়, গানের অন্তর্নিহিত বৈষ্ণবকথায় সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। ইতিহাস, তথ্য ও তত্ত্ব—তিন দিক থেকেই তাঁর বক্তব্য সুলিখিত। রচনার সাহিত্যগুণে প্রশংসনীয়। গ্রন্থটি রসিকমহলে স্থান লাভের যোগ্য।

সে সে (উপন্যাস) — অতীন্দ্রিয় পাঠক। প্রকাশক—অধ্যায়, ৪২, গড়পার রোড, কলকাতা—৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় পাঠক সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কথাকার। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে শ্রীযুক্ত পাঠক গতানুগতিক ধারায় গল্প, উপন্যাস লেখেন নি, অথচ রচনাগুলি তথাকথিত 'ইন্টেলেকচুয়্যালিজম'ও নয়। এঁর রচনায়, অন্যান্য বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরিক্ষার লেখকদের মতই কাহিনী সর্বস্বতা নেই। অবশ্যই এর ভাষা, প্রকাশ-ভঙ্গী ও মনন কাহিনীর ও মোট দাগের ঘটনার অপেক্ষা রাখে না। প্রখর বুদ্ধিকে সামনে রেখে মানব হৃদয়ের কথা বলে যাওয়ার মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ফাঁকি থেকে যায় শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় পাঠকের আলোচ্য গ্রন্থে তা আছে।

সাধারণ গল্প রসপিপাসু পাঠক নিশ্চয়ই ওভার ব্রীজের কালো ধোঁয়ার মধ্যে হঠাৎ-দেখা অন্যতম নায়িকা রীতার কথায় ওৎসুক্য বোধ করবেন না, কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল পাঠক এঁর রচনায় চিন্তার খোরাক পাবেন, নতুন কিছু ভাববার অবকাশ পাবেন। 'সে সে' উপন্যাসটির প্রকাশ রীতির বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। ভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম কবিত্ব, বিস্ময়বোধক ও প্রশ্নবোধক ছেদ-বিচ্ছেদের প্রয়োগ, ক্রিয়াহীন বাক্যাংশ ও অসমাপ্ত বাক্যের একটিমাত্র শব্দের অভিব্যক্তি সহৃদয় পাঠককে ধীর মন্থর করে, মননশীল হতে বাধ্য করায়।

জীবনের সুখ। মিহির পাল। প্রকাশক—রকমারী, ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪। মূল্য চার টাকা।

শ্রীমিহির পাল রচিত 'জীবনের সুখ' গ্রন্থটি নয়টি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলির অধিকাংশই শহরকেন্দ্রিক। অতি সাধারণ মানুষের প্রেম-ভালবাসা, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিবিধ বিচিত্র সুখ-দুঃখের অনুভূতির কতকগুলি খণ্ড মুহূর্ত এ গ্রন্থের গল্পগুলিতে চিত্রিত। গ্রন্থের প্রথম গল্পটির নাম 'পৃথিবীর প্রাণ'। এ গল্পের নায়ক মতিরাম পুত্র রতনকে হারাবার পর যে ধরনের মানসিক অস্থিরতার মধ্যে পৃথিবী সম্পর্কে বিচিত্র ভাবনায় ডুব দেয়, তা-ই এই গল্পের প্রধান বিষয়। 'শিল্পীভূত' গল্পের রীতি-কুশল-সুধীর, 'সূর্য তারার গল্পে'র দীপেন, উমা, বিকাশ গল্পের শ্রীপদ, মাণিক দাস ইত্যাদি চরিত্র অত্যন্ত পরিচিত সমাজ থেকে উঠে আসে বলে মনে হয়। 'রকরাজ' গল্পটি সুলিখিত। এখানে লেখক নিখিলেশ-সোমাকে যেভাবে এঁকেছেন, তা ক্ষমতার পরিচায়ক।

কত জন কত মন। প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—সাহিত্য ভবন, ৩০ কলেজ রো, কলকাতা—৯। মূল্য আট টাকা।

মোট চৌত্রিশটি ছোট, মাঝারী ও বড় সাইজে মেশানো গল্প নিয়ে বর্তমান গল্প সংকলন শ্রীপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কত জন কত মন'। লেখক ইতিপূর্বে একাধিক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। এমন সুদৃশ্য প্রচ্ছদে, সুন্দর ছাপায় পরিপাটি বৃহৎ গল্প সংকলন সাম্প্রতিক লেখকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এ ব্যাপারে প্রকাশকের প্রয়াস নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু প্রকাশক প্রকাশনায় যতটা রুচির পরিচয় দিয়েছেন, গল্প লেখক রচনায় সেই পরিমাণ গভীরতার স্বাক্ষর রাখতে অক্ষম হয়েছেন। শ্রীপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন ধরে লিখছেন। যদিও এঁর কোন গল্প বা উপন্যাস খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকায় ইতি-

সাহিত্যের খবর

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জন্মশতবর্ষ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ একটি স্মরণীয় নাম। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। ১৫ মে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে এই বরেণ্য লেখকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় ঢাকায়। একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি সৈয়দ মুর্তজা আলি সভাপতিত্ব করেন। আবদুল করিমের জীবন ও সাহিত্যকৃতির সম্পর্কে আলোচনা করেন ডঃ আহমদ শরীফ, অধ্যাপক ইদ্রিস আলী, অধ্যাপক আলী আহমেদ প্রমুখ। এই উপলক্ষে 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ' স্মরণী সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

পরলোকে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী : একদা বহুখ্যাত, সম্প্রতিকালে বিস্মৃত প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ১৪ মে, রবিবার মারা গেছেন কলকাতায়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যসাধনায় তিনি 'লীলা পুরস্কার', 'উল্টোরথ পুরস্কার' 'সরস্বতী' 'সাহিত্য ভারতী' প্রভৃতি পুরস্কার ও উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশুসাহিত্য, রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থসংখ্যা তিন শতাধিক। ১৯৩০ খৃঃ বেরোয় প্রথম বই 'বিজিতা'। তারপর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বহুপ্রচলিত হয় রক্তচারিণী, ভাঙাগড়া, দানের মর্যাদা, সাঁঝের প্রদীপ মহীয়সী নারী, ধুলোর ধরণী, বঞ্চিত ধরিত্রী, পথের শেষ, পাথেয়, চিরবান্ধবী, দুরাশায় প্রভৃতি।

চব্বিশ পরগণা জেলার খাঁটুরা গ্রামে ১৩০২ সালের ফাল্গুন মাসে প্রভাবতী দেবীর জন্ম। তাঁর পিতা গোপালচন্দ্র ব্যানার্জীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাত্র নয় বছর বয়সে বিবাহ হলেও, সংসারধর্ম পালন করেও নিরলসভাবে সাহিত্যসাধনা করতে থাকেন। ষোল বছর বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিছুকাল বাদে উত্তর কলকাতার সাবিত্রী শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা সুরু করেন। শিক্ষণ শিক্ষা বিষয়ে ডিপ্লোমাও লাভ করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে কলকাতা পৌর সংস্থার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত দীর্ঘকাল প্রভাবতী দেবী এখানেই শিক্ষকতা করেন।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বাংলাদেশে নজরুল জয়ন্তী : বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালন করার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এবং সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তাফা সারওয়ার। প্রদত্ত বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন কবি নজরুলের জন্মবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে সাম্য মৈত্রীর আদর্শ ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্প আরো দৃঢ় ও অটুট হবে।

পূর্বে দেখি নি। সব কিছুই নতুন অবস্থায় গ্রন্থাকারে পেয়েছি। লেখক আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলিতে সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, কিন্তু শিল্পের বেলায় ব্যর্থ হয়েছেন। ছোট গল্পের প্রচলিত রীতির কথা ছাড়াও কোন পরীক্ষাও এখানে নেই। কোন গল্পই শিল্পের মানে দাঁড়াতে পারে নি। গল্পে মনস্তত্ত্ব নেই, কাহিনী ও ঘটনা দিয়ে গল্প বলতে অভ্যস্ত হলেও কোন গল্পে সেই মূল্যবান ঘটনার চমক, পরিণতি, ব্যঞ্জনা কিছুই নেই। অতি সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, দাওয়া-পাওয়া কপটতা ইত্যাদি তাঁর গল্পের বিষয়, কিন্তু কোন গল্পেই তা শিল্পিত হয় নি। গল্প সংকলনটি আমাদের হতাশ করেছে।

পরিবার পরিকল্পনা সম্প্রসারণের তত্ত্ব ও কৌশল (প্রবন্ধ)—নারায়ণ চৌধুরী। রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা। ৬ রাসেল স্ট্রীট, কলকাতা—১৬।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমগ্র দেশের সার্বিক অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এই জনবিস্ফোরণ রোধ করবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার সমাজের সর্বস্তরে পরিবার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন। বিশেষভাবে শিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা একাজে নিয়োজিত। এ বিষয়ে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল ও 'শিক্ষিত' করে তোলার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত আলোচ্য বইখানি তাঁদেরই জন্যে বিশেষভাবে লিখিত। ইংরেজিতে যাকে বলে 'নো-হাউ'—এ বইটি সেই জাতের। পরিবার পরিকল্পনায় সম্প্রসারণের তত্ত্ব ও কৌশল সম্পর্কে স্বল্প কথায় সহজভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এতে। জনমানসে পৌঁছবার সঠিক রাস্তা কোনটা এবং কি করে ও কেমনভাবে সত্যকার জনসংযোগ সম্ভব বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নানা তথ্য তত্ত্ব, ছবি, উদাহরণ দিয়ে চমৎকারভাবে তার পথ নির্দেশ করেছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের জনশিক্ষা ও তথ্য আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জন্মশাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং এই আন্দোলনের বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আলোচ্য বইটি সম্প্রসারণ-কর্মীদের গাইড বুক-এর কাজ করবে। বাংলা ভাষায় লিখিত হওয়ায় বইটির উপযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অপ্রবাসী (স্মারক পত্রিকা)—প্রধান সম্পাদক : শঙ্করানন্দ পালিত। বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন, দ্বারভাঙা।

প্রবাসী বাঙালীদের সংগঠনগুলির মধ্যে বিহারের বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের বিবিধ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কোনরকম সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার চিন্তায় এদের সংগঠনটি গড়ে ওঠেনি। তার পরিচয় আমরা পেয়েছি নানান সময়ে। এবছর আয়োজিত চতুর্দশ বার্ষিক বিহার বাঙালী সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'অপ্রবাসী' সবধরনের পাঠককেই আকৃষ্ট করবে। অনন্তলাল ঠাকুরের 'মিথিলা ও বাংলাদেশের সারস্বত সম্বন্ধ', নন্দদুলাল রায়ের 'হিন্দু বিভাগ ও সেকালের বঙ্গ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য' এবং সুভাষচন্দ্র সরকারের 'বিদ্যাপতি ও আধুনিক পাঠক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা। আরো লিখেছেন বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সমথনাথ ঘোষ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবদাস মিত্র, গুরুচরণ সামন্ত, সন্তোষকুমার মজুমদার, দিনেশচন্দ্র পুরকায়স্থ, কেয়া নন্দী, মণিকা সিংহ, প্রিয়নাথ মিত্র, মিথিলেশ মৈত্র, শচীন সেন, শংকরকুমার ঝা, শৈলেন্দ্রমোহন ঝা, হরিহর ঝা, রমাকান্ত পাঠক। স্মারকগ্রন্থটি বাঙলা, ইংরেজি ও হিন্দী তিন ভাষার রচনায় সমৃদ্ধ।

সরণী (বর্ষশেষ সংখ্যা)—সম্পাদক তপনকুমার ভৌমিক। সাঁমচক, ধুরেখালী, হাওড়া।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকার বর্ষশেষ সংখ্যাটি গল্প কবিতা, ইত্যাদিতে ভরা। লিখেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কৃষ্ণ ধর, দক্ষিণারঞ্জন বসু, জগদীশ ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মায়া বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সম্রাট সেন, যোশবানা বিশ্বনাথন প্রমুখ সুখ্যাতরা।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ১৮ ॥

রাত্রে স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেল হেমন্ত কিন্তু ঘুমোল না। ঘুমের ভান করে পড়েই রইল—নিমাইয়ের পরামর্শমতো। আজ নিমাইয়ের কথা উপেক্ষা করার সাহস নেই তার—কেবলই মনে পড়ে এই দুঃখের মধ্যেও হাসি পেতে লাগল। একেই কি ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে। অদৃষ্টের পরিহাস?

অবশ্য এখনো খুব কষ্ট করতে হল না। ঘুম তার চোখের ধারে-কাছেও নেই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে সেই বিকেল থেকে। [illegible] বাবা অপমানের জ্বালাটাই বেশি। নিমাইয়ের কাছে অপমান, ঐ ঝিটার কাছেও। তাকে ঠকাচ্ছে এতদিন ধরে সেই চিন্তাটাই যেন অসহ্য।

না, ঘুমের জন্য কোন চিন্তা নেই। কেবল একটা ভয় ছিল—ইদানীং নাকি মধ্যে মধ্যে নাক ডাকে তার। এদের মুখেই শুনেছে—নিমাই-গোরাদের মুখেই—সে শব্দ না পেয়ে গোর না সন্দেহ করে, সাবধান হয়ে যায়। তবে মধ্যে মধ্যে ডাকে—সব সময় নয়, এই একটা রক্ষা। আর যদি নিমাইয়ের ইঙ্গিত সবটাই সত্য হয়, তরুণ বয়সের প্রথম কামোন্মত্ততা, অত সতর্ক হওয়ার, হিসেব করার, অত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার কথা নয়।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলও না। রাত বারোটা নাগাদ ওদিকে নিজের বিছানায় উঠে বসল গোর। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল—সম্ভবত ওদিকে তাকিয়ে। তারপর, হেমন্তকে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে বুঝে বিছানা থেকে নেমে এসে দরজার কাছেও দাঁড়াল অল্পক্ষণ—বোধহয় এদিকে কোন প্রতিক্রিয়া জাগে কিনা দেখার জন্যেই—তারপর সন্তর্পণে দোর খুলে বেরিয়ে গেল, কপাটটা আবার সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে।

দরজার বাঁদিকের কপাটটায় অনেকদিন ধরেই বন্ধ করার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছিল একটা—আজ দেখল বিনা শব্দেই বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবত এর ভেতর কেউ তেল দিয়ে মসৃণ করে রেখেছে—হেমন্তই অত লক্ষ্য করেনি।

একটা ভয় ছিল, বাইরে থেকে না শেকল দিয়ে যায়। হাওয়ার বেগে দড়াম করে কপাট পড়লে সে শব্দে ঘুম ভেঙে যাবে—এই ভেবে বন্ধ করে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষ গোর জানেই—হেমন্ত রাত সাড়ে দশটা নাগাদ যে শোয় একেবারে সাড়ে তিনটে চারটেয় উঠে পড়ে, মধ্যে ওঠা কি কলঘরে যাওয়ার অভ্যাস নেই তার। তবে ভয় যেমন ছিল, ভরসাও ছিল, শুধু সে-ই জেগে নেই, ওদিকে নিমাইচরণও জেগে আছে নিশ্চয়। দরজা বন্ধ করলে খোলার লোকের অভাব হবে না।

কিন্তু হাওয়ার তেমন জোর নেই বলেই সে-কথাটা বোধহয় মনে পড়ল না গোরের, অথবা তাড়া বেশী ছিল। সে অধীরতার মধ্যে এত কথা মনে পড়া সম্ভব নয়।...

গোর বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসল হেমন্ত, তবু তখনই নড়তে পারল না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা ওর, অবর্ণনীয় মনোভাব। কী দেখবে তা কতকটা জানে, অনুমান করতে পারছে। অনুমান যে সত্য হবে তাও নিজের মনেই বুঝছে। কিন্তু সেইজন্যেই যেন এই আড়ষ্টতা, একটা অপরাধবোধের সংকোচ। সে অপরাধী নয়—বিচারক, তবু তারই যেন লজ্জার অবধি নেই! লজ্জা আর ভয়। হ্যাঁ, ভয়ই বেশী বরং। এতদিনের আশা, এতদিনের স্নেহ ও আত্মীয়তার মৃত্যু ঘটবে—তবে তার জন্যেও ঠিক নয়। এ ভয়টা লজ্জারই। কি দেখবে সেই ভয়। যে অন্যায় করছে তার হয়ত লজ্জা নেই—ওর হাত-পা অনড় হয়ে যাচ্ছে সেই লজ্জাকর পরিস্থিতিটা কল্পনা করে। আশংকা সেই লজ্জাটা ভোগ করতে হবে ভেবেই। বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে তার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

একবার মনে হল কাজ নেই। এমনিই কাজ দূর করে দেবে বাড়ি থেকে—কোন কারণ না দেখিয়েই। এমন তো কোন লেখা-পড়া নেই যে পুষতেই হবে। দয়ার দান—না দিলে নালিশ-মকদ্দমা নেই। কোন কৈফিয়ৎই চাইতে পারবে না কেউ। মিছি-মিছি তার জন্যে এই কদর্যতা, এই ইতর-তার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই।...

কিন্তু শেষ অবধি মনকে শক্ত করল। অবিচার কারুর ওপরই করবে না। চোখে না দেখা পর্যন্ত এটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়।

অকারণ লজ্জার দুর্বলতা ও জড়তা কাটিয়ে আস্তে আস্তে সেও নেমে এল খাট থেকে। এর শেষ নিজেই দেখবে সে, নিজের চোখে দেখে এ-পর্বে ছেদ টানবে। নিজের হাতে আশার এই ক্ষীণতম মুকুলটুকুও ঘুচিয়ে দেবে।

এবং—আর অপেক্ষাও করা চলবে না, অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

গোরের মতোই নিঃশব্দে কপাট খুলে অন্ধকারে বেরিয়ে এল হেমন্ত। কোথায় যেতে হবে তা তো জানাই—সিঁড়ির পাশের ঐ খাঁজমতো জায়গাটা ঝি যেখানে শোয়।

একবার পিছন ফিরে দেখল, ওদিকের ঘরের জানলায় একটা সূক্ষ্ম অগ্নিবিন্দু, একবার করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আবার স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। তার হিসেবই ঠিক, নিমাইও জেগে আছে, দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

খালি পায়ে যাওয়া—পায়ের শব্দ অবশ্যই তেমন হল না—তবু সতর্ক থাকলে এদিকে খেয়াল থাকলে টের পেত বৈকি। নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতায় এটুকু শব্দও কানে যাবার কথা, বিশেষ যারা

মেঝেতেই শুয়ে আছে।...রাস্তার গ্যাসের আলো পিছনের তেতলা বাড়ির দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আলোর যে একটা আবছা আভা সৃষ্টি করেছে, তাতেও ছায়ামূর্তির আগমন লক্ষ্য করা চলত। বিশেষ সিঁড়ির নিচের দিকের জানলা দিয়ে সোজাসুজিই এক ফালি রাস্তার আলো উর্ধমুখে এসে পড়েছে এদিকের দেওয়ালে—সেখানে কেউ এলে তো ছায়াটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু যে-দুটি মানুষ দেখবে কি লক্ষ্য করবে তারা নিজেদের নিয়েই মশগুল। দৈহিক আনন্দের উগ্রতায় অবৈধ সংসর্গের নেশায় আচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত। একজন তো বালক মাত্র, তার এ-অভিজ্ঞতা এই প্রথম, সে উন্মত্ত হয়ে উঠবে এও স্বাভাবিক। আর একজনের আশার অতিরিক্ত পাওনা। এসব দিকে নজর রাখার মতো অবস্থা তাদের কারও নয়।

তাছাড়া এরকম কোন আশঙ্কাও করেনি তারা। এ-ব্যাপার ক'দিন ধরেই চলছে, তাতে সাহস বেড়েও গেছে খানিকটা।

তাও একটু অসুবিধা হত হয়ত—আলোর জন্যে। মাসখানেক আগে হলেও হত। এইমাত্র কুড়ি-পঁচিশ দিন আগেই ইলেকট্রিক এসেছে এ-বাড়িতে। এর জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে হেমন্তকে। গলির মোড় থেকে এপর্যন্ত তিনটে খুঁটি বসানোর বাড়তি টাকা ওকেই দিতে হয়েছে। তবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—আশপাশের বাড়িতে যেমন যেমন কনেকশন নিতে থাকবে, তেমনি তেমনি কিছু কিছু টাকা ফেরৎ পেতে থাকবে হেমন্ত।

ঠিক এখানটা কোন আলোর ব্যবস্থা নেই—কিন্তু বারান্দায় আছে। এমনভাবেই বসানো হয়েছে সেখানে যে, সে আলো জ্বললে এই খাঁজটায় পুরো সেই সঙ্গে সিঁড়ির মুখটা পর্যন্ত আলো এসে পড়বে।

সেই আলোর সুইচটা টিপতেই ওরা টের পেলে হেমন্ত জেগেছে ও জেনেছে—এবং একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তখন আর গোপন করার কি সামলে নেওয়ার কোন উপায় নেই। মিথ্যা কোন কাহিনী বয়ন করারও না। একেবারেই হাতে নাতে ধরা পড়া যাকে বলে।

কোনরকম সময়ও দিল না হেমন্ত। অনেকদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে একটা সরু লিকলিকে বেতের ছড়ি কে এনে দিয়েছিল পূর্ণবাবুকে, ভারী বাহারে ছড়ি, ঐটুকুর মধ্যেই নানারকম কাজ করা। সেটা হেমন্তকে দেখাতে এনে এখানেই রেখে গিয়েছিলেন। এপর্যন্ত সেটা কোন কাজে লাগেনি, আলনার খাঁজে ঝোলানো থাকে শুধু। দৈবাৎই বেরোবার সময় সেটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, হাতে করে নিয়ে বেরিয়েছিল হেমন্ত। গৌর চমকে, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করার আগেই সেই বেত এসে পড়ল ওর পিঠে।

তারপর সপাং সপাং বেতের বৃষ্টি হতে লাগল যেন। হরিমতী কোনমতে কাপড়টা টেনে জড়াতে জড়াতে গুঁড়ি মেরে পায়ের পাশ দিয়ে গলে নেমে গিয়েছিল। তার দিকে লক্ষ্যও ছিল না হেমন্তর। তার সম্বন্ধে অত ক্ষোভ নেই, সে যা—যে-ঘরের মেয়েছেলে—সেই ঘরের মতো কাজই করেছে। তার প্রবৃত্তির দোষ দেওয়া যায় না। আমার সাধ্যের অতীত কোন ভোগ্য-বস্তু হাতের কাছে যেচে এলে আমি হাত সরিয়ে নেব—এতটা আশা করা উচিত নয়। আসল অপরাধী গৌর। দিকদাহকারী প্রচণ্ড রোষ তার সম্বন্ধেই। সেই সঙ্গে একটা গা ঘিন ঘিন করা গ্লানি। ভদ্রলোকের ছেলে, ব্রাহ্মণের ছেলে—অন্তত ভদ্রলোকের ছেলের মতোই মানুষ হয়েছে যে বাল্যকাল থেকে—তার ওপর এখনও ছাত্র, শিক্ষার্থী—তার এ অপরাধ অমার্জনীয়।

উপর্যুপরি বেত এসে পড়ার মধ্যেই গৌর উঠে দাঁড়িয়েছিল কোনমতে কিন্তু কাপড়টা গুছিয়ে পরার কি পালাবার অবকাশ পেল না। অবিরল ধারে বেতের বর্ষণ চলতে লাগল ওর সেই প্রায়-উলঙ্গ দেহে—সূক্ষ্ম পাকা বেত চামড়ায় কেটে কেটে বসতে লাগল, দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল ওর সর্বাঙ্গে—কোথাও কোথাও, একাধিকবার একই জায়গায় পড়ার ফলে চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

প্রথমটা চুপ করেই ছিল গৌর—শেষে আর পারল না, চিৎকার করতে লাগল, 'ওগো আর মেরো না গো, ওগো আর করব না গো, ও মাগো, মরে গেলুম গো!' ইত্যাদি—। পাগলের মতো চিৎকার করে যাচ্ছে সে—কী বলছে তাও কোন হুঁশ নেই—কিন্তু যে মারছে তার কানে যেন কিছু ঢুকছে না। সেও যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—একটা আর্তনাদের শব্দ কানে যাচ্ছে মাত্র—তার মর্মার্থ মাথায় পৌঁচচ্ছে না।

বেগতিক দেখে নিমাইচরণই ছুটে এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে এদিকে সরিয়ে নিয়ে এল জ্যাঠাইকে।

'কী হচ্ছে কি! তুমিও কি জ্ঞান হারালে নাকি? ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতে লেগেছে—এখুনি পাড়ার লোক ছুটে আসবে যে, একটা খুনখারাপি হচ্ছে ভেবে। এই নিশুতি রাতে দুপুরে মাতন শুরু হয়ে গেল যেন।...তারপর? ঐ শোন জানলা-দরজা খোলার আওয়াজ চারদিকে। কী কৈফেৎ দেবে জানতে এলে?...লাও। ঢের হয়েছে, চলে এসো এখন। সাজাটাজা যা দিতে হয় কাল সকালে তখন দিও, মাথা ঠাণ্ডা হলে। আর মারলে ছেলেটা মরেও যাবে যে। হাতে দড়ি পড়ার কাণ্ড করবে নাকি! জ্যালা রে জ্যালা।... ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। নাই দিলে কুকুর মাথায় উঠবে এ তো জানা কথাই—তাখন দোষটা হয় কুকুরের, তাকে তখন আছড়ে মেরে ফেল।...তা সেই কাণ্ড তোমার। আমরা কুকুরের জাত জানো না। কী বংশে এসে পড়েছিলে!'

চাপা গলায় ধমক দিল সে।

সামলে নেওয়া শক্ত খুবই। তখনও অপমান ও আশাভঙ্গের দাহ কিছুমাত্র প্রশমিত হয়নি। অবাঁধিত প্রচণ্ড ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপছে থরথর করে, বহু-

ক্ষণের রুদ্ধ বিলম্বিত নিঃশ্বাসের বেগে ও উত্তেজনায় বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। ওকে সত্যিই খুন করতে পারলে হয়ত এ-জ্বালার কিছুটা কমত।

তৎসত্ত্বেও — নিমাইয়ের কথাগুলোর যাথার্থ না বোঝার মতো জ্ঞান হারায় নি সে। এ-কেলেঙ্কারী জানাজানি হলে কাল আর পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না। সে প্রাণপণ চেষ্টাতেই নিজেকে সামলে নিল কতকটা। আগে যেমন অনায়াসে উত্তেজনা আবেগ আবরিত করতে পারত, এখন আর পারে না। তাতেও কষ্ট হয় খুব, বুকে যেন লাগে। এতক্ষণের উন্মত্ত ক্রোধ ও তাকে সংযত করার আকস্মিক চেষ্টা—দুটোর প্রতিক্রিয়ায় কিছুক্ষণের জন্য মনে হল ওরই হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে। দুচোখের সামনে কয়েক মুহূর্ত যেন সব অন্ধকার হয়ে গেল। কোনমতে বারান্দার রেলিংটা চেপে ধরে সামলে নিল কতকটা। তারপর বেতটা ফেলে দিয়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'ওকে ঐ ঘরে চলে যেতে বল নিমাই; আর একটুও আওয়াজ না শুনি!'

আঙুল দিয়ে যে-ঘর দেখিয়ে দিল, সেটা গৌরেরই পড়বার ঘর, প্রয়োজন মতো বাইরের ঘর হিসেবেও ব্যবহার হয়। সেখানে শোওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, খানচারেক চেয়ার আছে শুধু, একটা টেবিল আর মেঝেয় বসে পড়বার জন্যে মাদুর একখানা।...তা হোক গৌর তখন ওর সামনে থেকে সরে যেখানে হোক পালাতে পারলে বাঁচে। সেও ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে কান্নাটা সামলে নিল। সমস্ত গা ঘামে-রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে, তারই মধ্যে কাপড়টা জড়িয়ে পরতে পরতে পাশ কাটিয়ে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। হেমন্ত নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে শেকল লাগিয়ে দিলে বাইরে থেকে কঠিন কণ্ঠে সাবধান করে দিলে নিমাইকে, 'কেউ যেন না আদিখ্যেতা করে দরজা খুলে দিতে যায়!...মরুক ও, ঐ ঘরে না খেতে পেয়ে। ওর বাঁচার কোন দরকার নেই, ও কালামুখ নিয়ে!'...

তারপর নিমাইকে নিচের সদর দরজাটা দেখে খোলা থাকলে বন্ধ করে আসতে বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তখন আর একটুও দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই, বুকের মধ্যে কে হাতুড়ি পিটছে, মাথা ঘুরছে—সেখানেও যেন কিসের একটা প্রবল শব্দ হচ্ছে ঝাঁ ঝাঁ করে। ওর মনে হল এটা সন্ন্যাস রোগের সূচনা—কিম্বা এখনই হয়ত হার্ট ফেল করবে। তা করুক মরতে কিছুমাত্র দুঃখ নেই—তবে ঐ অমানুষ বেইমানের ঝাড়ের জন্যে এ-দুর্গতি হবে—সেইটেই লজ্জার কথা।

সে-রাত্রে কারুরই ঘুম হল না। হওয়া সম্ভব নয়। নিমাই রাত চারটেয় উঠে বাড়ির ধোওয়ামোছা শেষ করে বাসনের গোছা নিয়ে মাজতে বসে গেল। হরিমতী সেই রাত্রে তখনই পালিয়েছে—প্রায় এক-বস্ত্রে। উঠোনে যে কাপড়টা আর সেমিজটা শুকোচ্ছিল, তাছাড়া আর কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। ভয়ে দিশেহারা হয়ে বেরিয়ে গেছে, ঐ বেত তার পিঠে পড়লে সে আর বাঁচবে না, জীবন থাকলে জিনিসের কথা ভাবার ঢের সময় পাবে—এই বোধহয় তার মনের ভাব তখন। সে যে এক মুহূর্তও আর এ-বাড়ি থাকবে না তা হেমন্তও বুঝেছিল, সেইজন্যেই দরজাটা দেখে বন্ধ করতে বলেছিল নিমাইকে।

ঘুম না হোক—ঘণ্টাচারেক চুপ করে শুয়ে থেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করল হেমন্ত। সেও ভোরে উঠে স্নান সেরে রান্না চড়াতে যাচ্ছিল, নিমাই বারণ করল। বলল, 'অত তাড়ার কিছু নেই, আমি আজও আপিস যাচ্ছি না।... সিক-রিপোর্ট যখন ঝাড়তেই হবে তখন যাহা একদিন তাহা দুদিন। তুমি পুজোআচ্ছা করে নাও, চা-টা খাও—আমি এর ভেতর বাজারটা সেরে আসি। আর দেখি আমাদের সেই পুরনো মতির মাকে পাওয়া যায় যদি; সেদিন তার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শুনলুম দেশ থেকে বেশ সেরেসুরে এসেছে। নেবুতলায় বাজারের পেছন দিকে থাকত তো—দেখি যদি খুঁজে বার করতে পারি।'

সকাল থেকে গৌরের প্রসঙ্গ কেউই তোলেনি। কিন্তু পুজো সেরে উঠে চা তৈরী করে অন্যদিনের মতো রান্নাঘরের সামনের বারান্দাতেই যখন খেতে বসল—পড়ার ঘর থেকে যাতে সোজা নজর চলে—তখন আর নিমাই থাকতে পারল না। একটু উশখুশ করে একবার একটু কেশে নিয়ে বললে, 'তা—ও-ছোঁড়াটাকেও—মানে, দোরটা তো একবার খুলে দেওয়া দরকার?'

হেমন্ত চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে শুধু বলল, 'না।'

সারারাত কেঁদেছে ছেলেটা, কান্না নয়—গোঙানি বলাই উচিত, মারের অবস্থা দেখেই যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পেরেছে নিমাই, রাতেই নরম হয়ে এসেছিল সে, তার ওপর তাকে একবিন্দু জলও না দিয়ে তার সামনেই বসে চা-খাবার খাওয়া—ও-ঘরে জলের কোন ব্যবস্থা নেই—এটা বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হল ওর। সে আরও একটু ইতস্ততঃ করে মাথাটায় চুলকে বলল, 'ওর নাম কি—মানে না খেতে না দাও, বাইরের কাজকম্মগুলো তো আছে, সকালের ব্যাপার।...শেষে ঘরদোর নোংরা করলে সেই তোমাকেই তো মোক্ত করতে হবে—'

'হোক। সেজন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না বাবা, সে আমি বুঝব। ওকে উপোসী রেখে তোমার খেতে যদি বাধে—সটান উঠে চলে যাও, কিছু বলব না। খাবার তুমি খেলেও যা না খেলেও তাই। খরচ যা হবার তা হয়েই গেছে, তুমি খেলে সে-পয়সাটা কিছু ফিরবে না।...সে তোমার খুশি, তবে ওর হয়ে সুপারিশ করতে এসো না—পরিষ্কার বলে দিচ্ছি!'

এর ওপর কথা বলতে যাবে, নিমাই একটা ঘাড়ে কিছু এমন দশটা মাথা নেই। অগত্যা নিঃশব্দে নিজের চাটুকু শেষ করে উঠে ঝিয়ের সন্ধানে চলে গেল।

গৌর ঠিক এতটা আশঙ্কা করেনি। সমস্ত গা তার বিষফোড়ার মতো টাটিয়ে আছে, শোবার উপকরণ বলতে তো একমাত্র মাদুর—তাতেই শোবার চেষ্টা করেছে কয়েকবার, পারেনি, এত ব্যথা সর্বাঙ্গে। কাটা জায়গাগুলোয় রক্ত জমাট বেঁধে এসেছে, তবু এখনও ঘাম লাগলেই জ্বালা করছে। আর ঘাম হয়েই যাচ্ছে। এ-ঘরে একটি মাত্র জানলা ভেতরের দিকে, দরজাটা খোলা থাকলে তবু একটু হাওয়া খেলে—এখন গুমোট হয়ে আছে এই প্রথম বসন্তের দিনেও। তাতেই আরও এত যন্ত্রণা। বার-বার কোঁচার কাপড়ে মুছছে, কিন্তু সামনের দিকটায় থুপে থুপে মোছা যায়, পিঠে তা চলে না। জল মোছার মতো করে কাপড় টানতে গেলে আরও জ্বালা করে উঠছে সেই ঘষটানিতে। কাপড়খানাও রক্তে ঘামে ভিজে উঠেছে প্রায়। গায়ে যদি

গঞ্জিটাও থাকত তো এত লাগত না। খালি গায়ে শুতে যায়, সেইভাবেই উঠে এসেছে, গেঞ্জি গায়ে দেবার কথা মনে হয় নি।

তার ওপর কন্ট তেষ্টার! গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। কান্নাতে যন্ত্রণাতে আরও বেশী তেষ্টা পায়। একটু জল দেবার কথাও কারও মনে পড়ল না। কাকা আবার ঐ ডাইনী-বুড়ির হুকুম নিতে গেল। কেন, এত যদি টান—বুড়ি যখন শুয়ে ছিল দরজাটা খুলে দিয়ে এক গ্লাস জল দিয়ে যেতে পারে নি। কে জানে কাকাটাও হয়ত ঐ দলে আছে! ওই হয়ত গিয়ে লাগিয়েছে বুড়িকে। নইলে এতদিন পরে টেরই বা পেল কি ক'রে। মহাশয়তান ঐ কাকাটা, চোরকে বলে চুরি করতে গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে। এখন আবার দরদ দেখাতে এসেছে। .

ছোট প্রাকৃতিক কাজটা সে ঘরেই সেরেছে একবার—জল নেই পেটে বসে এখনও আর সে চেষ্টা হয় নি। অন্য যা—তা হবেও না এখন এ অবস্থায়। সেদিকে কোন অসুবিধে নেই কিন্তু একটু জল না পেলে বা এর চেয়ে অন্তত একটু নরম বিছানায় শুতে না পারলে ম'রে যাবে যে। ঠায় এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় কাঁহাতক। ভাল করে বসতেও যে পারছে না।

চা খেতে না দিলেও—আশা ছিল দুপুর নাগাদ ছেড়ে দেবে, নিদেন একটু জলও দিয়ে যাবে। কিন্তু কাকা বাইরে থেকে ঘরে এসে ঝিয়ের খবর দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল—এতক্ষণে নিশ্চয় আরাম ক'রে বিড়ি ধরিয়েছে একটা—ঠাকুমাও দেখল দিব্যি এদিকের রান্না শেষ ক'রে ভাত চাপিয়ে ঘরে গিয়ে খবরের কাগজ খুলে বসল, বেশ যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন, যেন কোথাও কিছু ঘটে নি, যেন একটা লোক চোরের মার খেয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে টাঙিয়ে নেই কাল রাত থেকে।

এইবার সে ক্ষেপে উঠল যেন। প্রথমটা একটু অস্ফুট স্বরেই কী সব গজগজ করল, তার মধ্যে 'আক্কেল' 'বিবেচনা' প্রভৃতি শব্দগুলোই শুধু এঘর থেকে শোনা গেল, তারপর—তাতেও এদিক থেকে কোন সাড়া না আসতে সোজাসুজি গলা চড়িয়ে দিল, 'তাই বা কেন, ও আমার কে যে, ওর শাসন মানতে হবে। কিসের এমন সম্পক্ক আমার। সত্যিকারের কেউ তো নয়। বাপের জ্যাঠাই, ভারী রে! মাসীর মার কুটুম। তাও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। কেলেংকারী জানতে আমার বাকী আছে নাকি! বেশী ওস্তাদি করতে এলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দোব আমি —তা বলে দিচ্ছি। আমাকে চেনে না!... উঃ' ভারী আমার আপনার লোক এলেন শাসন করতে! কিসের জন্যে এমন চোরের মার মারবে শুনি!...বেশ করেছি খুব করেছি। আলবাৎ করব, যা খুশি আমার করব। ওকে মানি না। কী করবে আমার? আবার মারবে? আসুক না, এবার মারতে এলে আমিও আছি!...বন্ধ ক'রে রাখবে? এখনও চুপ ক'রে আছি তাই—এরপর এমন চেঁচাব যে পাড়ার লোককে ছুটে আসতে হবে তখন হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব। বলব আমাকে খুন করতে চেয়েছিল কাকাতে আর ঐ ডাইনীমাগীতে মিলে—আমার বিষয়ের লোভে!...হুঁ—এই বলে দিচ্ছি সাফ!'

স্তম্ভিত হয়ে যায় হেমন্ত। জীবনে বহু অকৃতজ্ঞতা সে দেখেছে—জীবনভোরই মানুষের পশুত্ব দেখে আসছে সে, নানাদিক দিয়েই—তবু এখনও যে দেখার বাকী ছিল তা ভাবে নি। এ ঐ বংশেরই ছেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হেমন্তর শাশুড়ির ও ভাশুরদের চেহারাই যেন আর একবার দেখতে পেল এর মধ্যে। মনে হচ্ছে তাদেরই প্রেতাত্মাগুলো মিলেমিশে এক হয়ে এই দেহটার মধ্যে ঢুকেছে। নইলে আঠারো বছরের ছেলের মুখ দিয়ে—এই কান্ড ধরা পড়ার পরও—এসব কথা বেরোয় না।

নির্বাক হয়ে গেল নিমাইও। যে যখন দরজা খুলে দেওয়ার সুপারিশ করতে গিছল তখন বালক ভেবেই দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল যথেষ্ট ভয় পেয়েছে, কাজও হয়েছে ঢের—ছেলেমানুষকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এসব কী শুনছে সে, সেই ছেলেমানুষটার মুখ দিয়েই কি বেরুচ্ছে এই কথাগুলো?

সে খানিকটা বোকার মতো চুপ করে বসে থাকার পর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ওকেই শাসন করবে কি হেমন্তকে বলবে দরজা খুলে এই দন্ডে ওকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে—কিছুই ভেবে পাচ্ছে না যেন, কিছুই মাথায় আসছে না। ছেলেটা ঐ ধরনের কুৎসিত কথা বলেই যাচ্ছে! একবার ভাবল ধমক দিয়ে ওঠে—'এই চুপ কর, কী হচ্ছে কি?' সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল —তাকেই হয়ত যা-তা বলে উঠবে এখনই। দাঁড়িয়েই রইল সে তেমনি—কিংকর্তব্য বিমূঢ়ভাবে, হাতে যে বিড়িটা ধরা আছে, জ্যাঠাইয়ের যে তা দেখতেও কোন অসুবিধা নেই—সে কথাটাও খেয়াল রইল না।

তবে ওকে দেখে বোধহয় হেমন্তর জড়বৎ অবস্থা কিছুটা কাটল।

একটা অপরিমাণ ঘেন্না গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে উপচে পড়ছে যেন। ঘেন্না নিজের ওপরও কম নয়, হয়ত বেশীই। ওই বংশের ছেলেকে সে মানুষ করতে চেয়েছিল! অপরাধ করেছে ভেবে শাস্তি দিতে গিয়েছিল! কাকে শাস্তি দেবে, রাগ করছে কার ওপর? ছাগলের কাজ ছাগল করেছে—তার ওপর আবার রাগ করার কি আছে শাস্তিই বা কিসের? সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হচ্ছে ছাগল যা-ই হোক—সে এমন সাপের মতো ছোবল দেয় না। দুধকলা দিয়ে সযত্নে সে সাপই পুষেছে এতকাল।

সে আস্তে আস্তে উঠে এসে দরজাটা খুলে দিল। কিন্তু একটা কথাও বলতে পারল না। অনেক ভেবেও ওকে বলার মতো কোন কথা খুঁজে পেল না। এতকাল মানুষের সঙ্গেই কথা বলে এসেছে, যে মানুষ নয়—তাকে কি বলবে বুঝতে পারল না।

অবশ্য ভাল ক'রে কিছু ভাবারও অবস্থা ছিল না। অপ্রত্যাশিত অকল্পিত আঘাতে মাথা ও মন দুইই যেন জড় পাথর হয়ে গেছে। কিছু বলার এমন কি কিছু ভাবারও অবস্থা ফিরে পায় নি এখনও। মাথায় কোন কঠিন আঘাত লাগলে নাকি সমস্ত চৈতন্য ও চিন্তাশক্তি এমনি আচ্ছন্ন হয়ে যায় কিছুকালের মধ্যে—একথা অনেকের মুখেই শুনেছে— কথার আঘাতেও যে এমন হয় তা জানত না। কালকের যে ঘৃণ্য অপরাধ ধরা পড়েছে—ঘৃণ্য রুচির দিক থেকে—পশুত্বের যে কুৎসিত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে, তারও আঘাত এত রূঢ়, এত মর্মান্তিক নয়।

(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধযুগে আয়ুর্বেদ চর্চা

অমিয়কুমার মজুমদার

অধ্যাপক রীজ ডেভিডের মতে বৌদ্ধ যুগ প্রায় আট শত বছর ব্যাপী ছিল। মহারাজ বিম্বিসার থেকে শুরু করে মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকাল পর্যন্ত বৌদ্ধযুগ বলা যেতে পারে। খুব সম্ভবতঃ মগধরাজ বিম্বিসারের সময়ে মহামতি 'জীবক' রাজ-চিকিৎসক ও শল্যবিদ্ ছিলেন। সেই সময়ে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ভারতজোড়া। বিশ্বের নানা দেশ থেকে পন্ডিত ও ছাত্র তক্ষশিলায় সমবেত হতেন। অনেকে বলেন মহামতি জীবক ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সমরকালে ভগবান বুদ্ধের ও ভিক্ষু সংঘের চিকিৎসক ছিলেন। যাই হোক তৎকালীন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, গান্ধর্বদেব, অর্থশাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। ভিষগাচার্য জীবক আয়ুর্বেদ শেখার জন্য তক্ষশিলায় যান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং মনোযোগ দ্বারা তিনি ১৪ বছরের পাঠক্রম ৭ বছরেই আয়ত্ব করেন। উদ্ভিদবিদ্যা এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জীবকের অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। সপ্তম বৎসরের শেষদিকে জীবক তাঁর আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁকে আর কতদিন পড়াশোনা করতে হবে। আচার্য বলেছিলেন, 'বৎস তোমাকে চারদিন সময় দিচ্ছি, তুমি এই নগরের চারদিকে দুই যোজনের মধ্যে যেসব গাছ-লতা, ফলমূল ইত্যাদি দেখতে পাবে তার সবগুলি পরীক্ষা করে বল কোনগুলি ওষুধ-রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।' চারদিন বাদে জীবক উত্তর দিলেন, 'ওষুধে না লাগে এমন কোন গাছ নেই'। আচার্য অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন 'বৎস, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, তোমাকে আর শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে নেই।'

গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে জীবক স্বদেশের পথে অগ্রসর হন। পথে সাকেত নগরে শুনতে পেলেন যে এক শ্রেষ্ঠীপত্নী মস্তিষ্কের পীড়ায় প্রায় ৭ বছর যাবৎ দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছেন। বিখ্যাত চিকিৎসকেরা কেবল দর্শনী নিয়েছেন কিন্তু রোগিণীর রোগের উপশম করাতে পারেন নি। জীবক তাঁর আবিষ্কৃত নস্য সেবন করিয়ে ঐ রোগকে আয়ত্বে আনেন।

মহারাজ বিম্বিসার ভগন্দর রোগে ভুগছিলেন। জীবক সামান্য প্রলেপের সাহায্যে তাঁর রোগ ভাল করবার পর থেকেই তিনি রাজবৈদ্য নিযুক্ত হন। রাজ অন্তঃপুরের একটি বালকের করোটি অস্ত্রোপচার করে দুটি পোকা বের করে তিনি সেই বালকের শিরঃপীড়া দূর করেন। তখন থেকেই তিনি প্রথম শল্য চিকিৎসক বলে খ্যাতি লাভ করলেন।

বারানসীর এক শ্রেষ্ঠীর ছেলে লাফ দেবার সময় তার অন্ত্রের একাংশ জড়িয়ে যায়। ফলে ছেলেটি কোন কঠিন দ্রব্য খেতে পারতো না। জীবক ঐ বালকের 'বস্তিদেশে' অস্ত্রোপচার করে অন্ত্রটিকে যথাস্থানে রাখেন। অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেটি ভাল হয়ে উঠলো।

উজ্জয়িনী রাজ চন্ড প্রদ্যোত পান্ডু রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। জীবক তাঁকে সুস্থ করেন। ভগবান বুদ্ধ একবার কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হন। জীবক তিনটি পদ্মের মধ্যে তাঁর আবিষ্কৃত 'মৃদু-বীর্য' ওষুধ রেখে ভগবান বুদ্ধকে বললেন ফুলের আঘ্রাণ নিতে। এতেই বুদ্ধদেব আরোগ্য লাভ করেন। একবার দেবদত্ত বুদ্ধদেবকে হত্যা করবার জন্য পাথর ছুঁড়ে মারেন। পাথরের এক টুকরো তাঁর পায়ে লেগে ক্ষতের সৃষ্টি করে। তখন ভিষগাচার্য জীবক তাঁকে আরোগ্য লাভ করতে সাহায্য করেন।

বৌদ্ধ চিকিৎসক মহামতি বাগভট তৃতীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ অন্ধরাজ চষ্টনের রাজত্বকালে 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' নামে একটি বড়ো আয়ুর্বেদ গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি সমগ্র আয়ুর্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করেন—শল্য শালক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারবিদ্যা, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরতন্ত্র। মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রক্রিয়া তাঁরা জানতেন। এ ছাড়া ধাতু শোধন, মারণ, জারণ জানতেন। বৌদ্ধ চিকিৎসক বাগভটের সময়ে শল্য চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি হয়। কিন্তু এসত্বেও আমাদের দেশে অস্ত্র চিকিৎসা লোপ পেল কেন? বিশেষতঃ আয়ুর্বেদাচার্যরা সমসাময়িক কালে অস্ত্র চিকিৎসা থেকে শত হাত দূরে থাকেন। এর কারণ সম্বন্ধে শ্রীধর বড়ুয়া বহুদিন আগে ১৩৩১ সালের কার্তিক সংখ্যার ভারতীতে একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন 'মনু একজন হিন্দু সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার সংহিতাতে তিনি আচার ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ধর্মগত মত বা সংহিতাই, অস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্র, হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষ হইতে আজ বিলুপ্ত হইবার কারণ। তিনি বলেন মৃতদেহ স্পর্শ করিলে দোষ বা পাপ হয়।' কথাটা ভেবে দেখার মতো।

বৌদ্ধ যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে শারীরবিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসার উন্নতিবিধান প্রায় বন্ধ হয়। তখন আরবে এই শাস্ত্রের সূচনা হয়। অবশ্য অনেক পরবর্তী কালে এইসব বিষয়ের চর্চা শুরু হয়।

বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাং-এর ভারত ভ্রমণকাহিনীতে নাগার্জুন নামে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। তাঁর লেখা নাগার্জুন তন্ত্র, নাগার্জুনীয় ধর্মশাস্ত্র, যোগরত্নাবলী, কৌতূহল চিন্তামণি, নাগার্জুন রস রত্নাকর, আরোগ্য মঞ্জরী, রসেন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ বিখ্যাত। এই নাগার্জুন ছাড়াও অন্য এক নাগার্জুনের নাম জানা যায়। অনেকে মনে করেন তিনি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে ছিলেন। তিনিও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বিদর্ভরাজ ভোজ ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রাচীন ভারতীয় রসায়নের জন্মদাতা 'নাগার্জুন'। তিনি নানা ধরনের তির্যক পাতন প্রক্রিয়া, ধাতুর জারণ, বিজারণ প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। মহাযান মত প্রবর্তক নাগার্জুন যে একজন রাসায়নিক ও চিকিৎসাবিদ ছিলেন পালি-তিব্বতী ও চৈনিক ভাষায় লেখা বহু বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

অনেকে মনে করেন নাগার্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। কেউ বলেন, নাগার্জুন হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ছিলেন, আবার অনেকে বলেন তিনি কনিষ্কের রাজত্বে বাস করতেন। সে যাই হোক তিনি যে একজন অসাধারণ রসায়নবিদ্ ছিলেন তাতে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। সুশ্রুতের সময় আয়ুর্বেদে ছ'টি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি হলো স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, সীসক ও লৌহ। শার্ঙ্গধর এবং তাঁর টীকাকার মোট ন'টি ধাতুর উল্লেখ করেছেন—তাম্র, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক, স্বর্ণ লৌহ, কাংস্য ও বৃত্ত লৌহ।

ভারতে নাগার্জুন ও পতঞ্জলি ধাতু প্রক্রিয়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নাগার্জুনের বিশেষ চেষ্টায় লোহা ও তামাকে সোনায় পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল।

বিখ্যাত ফরাসী পন্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি চীনের ত্রিপিটক গ্রন্থের মধ্যে 'চরক' নামে জনৈক চিকিৎসকের সন্ধান পান। তিনি সম্রাট কণিষ্কের দীক্ষাগুরু ছিলেন। কাজেই চরককে দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলা যেতে পারে।

মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের খুব উন্নতি হয়। তিনি স্থানে স্থানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, ভেষজাগার তৈরী করেন এবং ভেষজ লতাগুল্ম সংগ্রহ করার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। অশোকের পরেই চক্রপাণি, বৃন্দ, মাধবকর ও ভাবমিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। চক্রপাণি ও বৃন্দ উভয়েই নাগার্জুন প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

'ব্রহ্মজাল সূত্রে' চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে। যেমন—বমন, বিরেচন, ঊর্ধ্ব বিরেচন, কর্ণ তৈল, নেত্র তৈল, নস্য প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি। এর মধ্যে শালাক্য, অস্ত্র চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা ও বিষ চিকিৎসা প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে।

সুশ্রুত ও অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের বৌদ্ধযুগের আগেও অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু মনে হয় বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে বৌদ্ধযুগে। এই যুগে খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন চিকিৎসকের নামের একটা তালিকা পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে আছেন সুশ্রুত, হারীত, হরিশচন্দ্র, ভৃগু, ধন্বন্তরি, জাতুকর্ণ, ভেড, কাশ্যপ, কশ্যপ, অগস্ত্য, সনাতন, সনৎকুমার, স্বরেনাদি, আত্রেয়, প্রজাপতি, পরাশর, কপিল মহর্ষি, কণাদ, মহর্ষি অক্ষপাদ, ব্যাস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, নারদ, অগ্নিবেশ অরনেমি, নাগার্জুন, পাতঞ্জলি, বাগভট্ট ইত্যাদি।

নজরুল এবং ঝড়ের রাতের বন্ধুরা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সব ব্যাপারের মতই নজরুল ইসলামের কল্লোল দলে প্রবেশের মূলে আছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও তাঁর বাল্যসাথী শৈলজানন্দ ততদিনে কল্লোলে এসে গেছেন, তবু পবিত্র গংগোপাধ্যায় অগ্রণী। তিনি যখন 'সবুজপত্রে' কাজ করতেন তখন করাচী থেকে নজরুল ইসলাম 'সবুজপত্রে' একটি কবিতা প্রকাশার্থে পাঠান, এর আগে সেই ১৩২৬-এর আশ্বিন সংখ্যার 'সওগাতে' তাঁর 'সমাধি' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, সেই কবিতা সম্ভবতঃ পবিত্র গংগোপাধ্যায় দেখেন নি, কিন্তু করাচী থেকে পাঠানো কবিতাটি যখন সংপাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অপছন্দ হল তখন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই কবিতাটি পকেটে করে চললেন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে প্রবাসী অফিসে। সেখানে তখন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক। তিনি কবিতাটি পছন্দ করলেন এবং প্রবাসীর ১৩২৬-এর পৌষ সংখ্যায় সেই কবিতা প্রকাশিত হল। কবিতাটির নাম 'আশায়', তার নীচে ব্রাকেটে লেখা আছে 'হাফেজ' এবং কবিতাটির প্রথম কটি লাইন—

নাইবা পেল নাগাল,
    শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন
    জুঁই কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেমনি বিভোর
    থাকরে প্রিয়ার আশায়
তার অলকের একটু সুবাস
    পশ্‌বে তোর ও নাশায়—ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে কবিতাটি দুর্বল সেই কারণে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পছন্দ হয়নি, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তা ভালো লেগেছিল। তবে এটি হাফিজের একটি গজলের প্রথমাংশ। সেই ১৩২৬ (১৯১৯) থেকেই পবিত্র গংগোপাধ্যায় নজরুলের বন্ধু, তিনি এক নতুন কবিকে আবিষ্কার করলেন।

বাংলা ১৩৩০-এর বৈশাখ মাসে 'কল্লোল' প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং টিঁকেছিল মাত্র সাত বছর। এই সাত বছরে 'কল্লোলে'র সংগে এবং সেই সংগে 'কালি কলম' ও 'প্রগতির' সংগে নিবিড় বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছেন কবি নজরুল ইসলাম। 'বিদ্রোহী'র কবি নজরুলের জীবনে 'লাঙল' 'গণবাণী' ইত্যাদিকে যদি প্রথম পর্ব ধরা যায়, তাহলে 'কল্লোলের' কালের কবির জীবনকে দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। বৈপ্লবিক ভাবধারা মুক্ত কয়েকটি রক্ত-মাংসের সংগে বিজড়িত দেহ এবং দাহের কবিতা এই কালেই কবি লিখেছেন। সেকথা বিস্তারিতভাবে যথাস্থানে বলা যাবে। কিভাবে যোগাযোগ হয়েছিল তার বিবরণও অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

নজরুলের পান্ডুলিপি

বাংলার "আজীজ" +

পোহায়নি রাত, আজান তখন দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন, আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় ~~যখন~~ বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে, তুমি, গাইলে জাগার গান।
ফজর-বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার-চ'ড়
ঘুম-টুটানো আজান দিলে — "আল্লাহু আকবর।"
কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা
[illegible]র যত ইসলামী-জোশ তোমায় দিল দেখা।
খাপে রেখে অসি, ~~[illegible]~~ যখন খাচ্ছিল সব মার,
লোহায় ~~[illegible]~~ তোমার উঠল নেচে তোমার দু-ধারী তলোয়ার।
ডাকে সবাই উঠল জেগে, কচলে যেন চোখ,
[illegible]-জোয়ানীর খুন-জোশীতে মস্ত হ'ল সব লোক!
[illegible]বীর বাহুর যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
[illegible]মার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হ'তে সিংহ-শাবক দল —
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাংলা টলমল!
এলে নিশান-বরদার বীর দুশমনে পর্দার;
[illegible]য়েদা ছিঁড়ে আনলে নাহার — রাতের তারা-হার!
শীতের জরা দূর হয়েছে ফুটছে বাহার-গুল,
গুলশানে ফুটল যখন, নাই তুমি বুলবুল!

* বঙ্গ-প্রাণ স্কুল-ইন্সপেক্টর মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ বি-এ সাহেবের স্মরণে —

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম কাজীর সবুজপত্রের জন্য প্রেরিত কবিতাটিকে কেন পকেটে নিয়ে প্রবাসী অফিসে যেতে হল। এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন—আমার মনে কেমন একটা ব্যথা লাগল, কারণ একজন বাঙালী ছেলে আত্মীয়স্বজন ছাড়া হয়ে কোথায় পড়ে আছে জীবনমরণের আশা ছেড়ে তার মধ্যে খুব উঁচু দরের কিছু না থাকলেও প্রাণের কথা প্রকাশিত হয়েছে, সেই মিষ্টি সুরই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী সংখ্যার জন্য ফেলে না রেখে সেই মাসেই কবিতাটি ছাপতে দিলেন, পত্রিকা প্রকাশে তখন আর মাত্র আট দিন বাকী।

এ সবই এখন অনেক বছর পরে তুচ্ছ ঘটনা মনে হবে, কিন্তু কবি নজরুলের বিকাশে এ এক নিশ্চিত পথচিহ্ন। তিনি তাই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সেদিন লিখেছিলেন,

'ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যু-সমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক-মনের সমভাব আমি [illegible] করলাম আমার ভাষায়, আমার আপনার জন বাঙালীকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই টুকরো কবিতা হয়ে বেরিয়েছে। জানি না, জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ও দূর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কি না। তবু বাঙালীর সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একান্তবোধ যদি জাগাতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। অবশ্য বাঙালীর কাছে পেঁৗছে দেবার ও যোগ্য বাহনে পরিবেশন করবার কৃতিত্ব আপনার।..."

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ তিনি সেই এক নিদারুণ হতাশার মুহূর্তে অজ্ঞাত অখ্যাত কবি নজরুলের মনে এক অপূর্ব প্রেরণা দিয়েছিলেন। কারণ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে করাচী থেকে লেখা আরেকটি পত্রে নজরুল লিখছেন—

"...টুরুলিয়ার লেটুর দলের গান লিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কে-ই বা এক কানাকড়ি দাম দিয়েছে। স্কুল-পালানো, ম্যাট্রিক-পাশ-না-করা পল্টন-ফেরত বাঙালী ছেলে কী নিয়েই বা সমাজে প্রতিষ্ঠার আশা করবে! আমার একমাত্র ভরসা মানুষের হৃদয়।..."

মানুষের হৃদয়ের ওপর ভরসা রেখেই হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর কিছু পরেই কলিকাতায় ফিরে এলেন।

বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীট বাড়িতে ঠাঁই পাওয়ার পর নজরুল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্ধানে তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন, পাননি, এক টুকরো চিঠি লিখে রেখে এসেছিলেন আর সেই চিঠি হাতে পেয়েই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ছুটলেন কাজীর সন্ধানে। সেই প্রথম দর্শনেই প্রেম।

কলিকাতায় নজরুল এসে যে পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন এবং যে সব লেখা তাঁকে কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজে খ্যাতি ও সম্মান দিয়েছে তার প্রায় সবগুলিই প্রকাশিত হয় 'মোসলেম ভারত' নামক পত্রিকায়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩২৭ সালে (ইংরেজী ১৯২০)—এই পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বোধন' ও 'শাত্-ইল আরব', আষাঢ়ে 'বাদল প্রাতের শরাব' এবং শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'খেয়া পারের তরণী' এবং সেই সংখ্যায় একটি গল্প 'বাদল বরিষণে' প্রকাশিত হয়, তার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে হাফিজের গজল, স্বরচিত গান, কোরবাণী ও মহরম নামক কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে প্রতি সংখ্যাতেই তিনি লিখে চলেছেন।

'মোসলেম ভারতের' এই কবিতাবলী যে বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার পরিচয় পাওয়া যায় মোহিতলাল মজুমদার কর্তৃক লিখিত সুদীর্ঘ পত্রে। এই চিঠিখানি মোসলেম ভারত—১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। মোহিতলাল মজুমদার অনেক কথার মধ্যে লিখেছেন,—

"কাজী সাহেবের কবিতায় কি [illegible] বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধ[illegible] ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।... কবির লেখনী জয়যুক্ত হোক—" ইত্যাদি।

এর পর কাজীর সঙ্গে মোহিতলালের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তার পরবর্তী ইতিহাস তেমন প্রীতিকর নয়। এই বিষয়ে মোহিতলাল ও কাজী নজরুল দুই পক্ষের বক্তব্য দুজনের কাছ থেকে শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। অন্য কোনো সময় সে কথা আলোচনা করা যাবে।

।। দুই ।।

কাজীকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ে এলেন গজেনদার আড্ডায়। সেকালের এক বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডা। 'ভারতী' দলের সাহিত্যিকরাই এই আড্ডায় বেশী যাতায়াত করেন। গজেনবাবুর কানে কাজীর খবর পৌঁছে গিয়েছিল। একদিন সত্যেন্দ্র নথ দত্ত

বসে আছেন গজেনদার ঘরে এমন সময় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে গিয়ে বসে পড়েন। সত্যেন্দ্র দত্ত তখনই প্রশ্ন করলেন—কই পবিত্র, তোমার শ্যামল আরবের কবি কোথায়? আমি মোসলেম ভারতের পথ চেয়ে থাকি ওঁর কবিতা পড়বার আশায়।

পরদিন সন্ধ্যায় কাজীকে নিয়ে গজেন-দার ঘরে প্রবেশ করলেন পবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায়। ঘরে আর কেউ নেই। কাজী একটা বই-খাতা খবরের কাগজের জঞ্জালের ভিতর থেকে ভাঙা অর্গান আবিষ্কার করে 'অহল্যা-উদ্ধারে' লেগে গেলেন। এই কথাটিই নাকি তিনি সেদিন ব্যবহার করে-ছিলেন।

কিছু পরে লাঠিতে ভর করে ঘরে প্রবেশ করে গজেনদা প্রশ্ন করলেন—উনি কি করছেন ওখানে?

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বললেন—উনি সেই কবি।

আর পিছন না ফিরেই নজরুল বললেন, গুরুদেবের হুকুম, এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।

কিছু পরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এলেন তিনিও কান্ড দেখে অবাক। কাজী তখন গান ধরেছেন—'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে—'

ঠিক সেই সময় ধীর পদক্ষেপে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। গান থামতেই কাজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল আর কাজী তৎক্ষণাৎ কবির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চেষ্টা করতে কবি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি ভাই নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা ত নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।

কাজী ত' অবাক। সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ বললেন—গুরুদেবের মতে ভাবের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনায় এই এক নতুন অবদান এনেছে এই নতুন কবি।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি কাজীর অসীম শ্রদ্ধা ছিল তার পরিচয় পাওয়া গেছে বার বার। সত্যেন্দ্রনাথের চোখের সূক্ষ্ম স্নায়ু-গুলি শুকিয়ে আসছিল। ক্রমে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ছিলেন। এই অবস্থায় লেখা তাঁর কবিতা 'খাঁচার পাখী' মোসলেম ভারতের (ভাদ্র ১৩২৮) একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঐ কবিতায় নিজের আসন্ন দৃষ্টিহীনতার আশংকা প্রকাশ করে বলেন:

"চোখে আমি ঝাপসা দেখি
আফসে মরি আফসোসে
বল্‌গো তোরা বসন্ত কি
জাগল ধরার হৃদকোষে?"

এই কবিতাটি পাঠ করে কাজী বড়ই ব্যথিত হলেন। তিনি পরের মাসে 'মোসলেম ভারতে' 'দিল্‌দরদী' নামে একটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখলেন, তার শেষ দুটি লাইন—

বিষ্ণুপুরে দলমাদল কামানের পাশে কবি

'বাদশা-কবি! সালাম জানায় বনো তোমার
ছোট্ট ভাই!—
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর যায় ডুবে হায়
সব কথাই।'

এই কবিতা পাঠ করে সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং কাজীর তখনকার বাসা তালতলা লেনের ঘরে এলেন, কিন্তু সে সময় কাজী অনুপস্থিত।

১৯২১-এর এই ঘটনার পর ১৯২২-এর জুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেই রাতেই 'সেবক' নামক এক দৈনিকে নজরুল একটি ভাবাবেগপূর্ণ সম্পাদকীয় রচনা করেন। শরৎচন্দ্রের সভা-পতিত্বে মহাবোধি হলে যে শোকসভা হয়, সেই সভায় কাজী স্বরচিত নিম্নলিখিত গানটি গেয়েছিলেন—

'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে!'

পরে লিখেছিলেন 'সত্যকবি'—। এই প্রসঙ্গে বলা কর্তব্য যে, কাজীর এক সময়ের পৃষ্ঠপোষক মোহিতলাল সেই সময় সত্যেন্দ্র-বিরোধী ছিলেন, তাঁর মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কাজীকে এই দিক থেকে প্রভাবিত করতে পারেন নি মোহিতলাল।

।। তিন ।।

তালতলা লেনের বাড়িতেই 'বিদ্রোহী' কবিতা রচিত হয়। এই কবিতা 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিকে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুজফফর আহমেদ সাহেব লিখেছেন 'বিদ্রোহী' রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। তিনিই বিদ্রোহী কবিতার প্রথম শ্রোতা এবং কবিতাটি পেনসিলে লেখা। কিভাবে ঐ কবিতা 'বিজলী'তে প্রকাশিত হয়, তার বিস্তারিত বিবরণও পাওয়া যায় মুজফফর আহমেদের 'স্মৃতিকথায়'। মোসলেম ভারত নিয়মিত প্রকাশিত হত না। তথাপি কার্তিক সংখ্যার মোসলেম ভারত উল্লেখ করেই 'বিজলী' এই কবিতা প্রকাশ করেন। শোনা যায়, এই কবিতা রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনানোর পর তিনি নজরুলকে বুকে চেপে ধরেন।

ইতিপূর্বে 'মানসী' পত্রিকায় মোহিত-লালের গদ্য রচনা পৌষ ১৩২১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ হয়, এই নিয়েই দুই কবির মধ্যে মনান্তর ঘটে।

১৯২২ খৃস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে ধূমকেতু পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক নজরুলের একটি সুদীর্ঘ

কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি আনন্দবাজারের তৎকালীন কর্তৃপক্ষদের অন্যতম মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে রচিত হলেও কোনো কারণে সেখানে প্রকাশিত না হয়ে শেষ পর্যন্ত 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়। এই কবিতার মধ্যে ছিল—

'স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী
শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের
দিচ্ছে ফাঁসী
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন
সর্বনাশী?'

এর ফল ফললো হাতে হাতে, নজরুল রাজরোষে পড়লেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে ১৯২৩-এর ৮ই জানুয়ারী রায় বেরোল—এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড। এই আদালতে প্রদত্ত নজরুলের জবাব 'জবানবন্দী' নামে পরিচিত এবং ১৩ই মাঘ তারিখে ধূমকেতুতে প্রকাশিত হয়।

নজরুলকে হুগলী জেলে পাঠানো হল। সেখানে চরম অত্যাচার শুরু হল। নজরুল অনশন করলেন। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাঠালেন—

"Give up hunger strike, our literature claims you."

নজরুলকে এই তার দেওয়া হল না—নট ফাউণ্ড হয়ে ফেরৎ গেল কবির কাছে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' কাব্য-নাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ করেন—'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম, স্নেহভাজনেষু, ১০ই ফাল্গুন—১৩২৯' এই ছিল পাঠ। তাঁর নীচে কবি নিজের নাম স্বাক্ষর করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মারফত সেই গ্রন্থটি নজরুলকে পাঠালেন।

এই গ্রন্থটি নজরুলের হাতে উপহার হিসাবে পৌঁছে দিতে গিয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনুরোধ করলেন 'কল্লোলে'র জন্য কবিতা লেখার জন্য। কাজীর 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' নামক কবিতাটি ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। তার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল—

'বন্দী-কবি নজরুল 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' আত্মহারা হয়ে যে সুর-লহরী তুলেছেন, আপনাদের সেই সুখের ভাগ নেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করছি।'

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল কলিকাতায় নজরুলের সঙ্গে গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলার বিবাহ হয়। 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের লেখিকা মিসেস এম রহমান এই বিবাহে বিশেষ সাহায্য করেন। নজরুল তাঁর নামে উৎসর্গ করলেন তাঁর 'বিষের বাঁশী'। নজরুলের এক বিশেষ গ্রন্থ 'বিষের বাঁশী'। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে 'দোলন চাঁপা'। 'বিষের বাঁশী' প্রচ্ছদ চিত্র আঁকলেন কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ—নজরুলের কাছে 'প্রথিতযশা কবি-শিল্পী—এ'কেছিলেন একটি আদুড়গায়ে নিষ্পাপ কিশোর বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছে হাঁটু মুড়ে তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে বিষধর কাল ভুজঙ্গ। নজরুল এই গ্রন্থের পরিচয় লিখলেন—

'—এই বিষের বাঁশীর বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার উপর বিধাতার সকল রকম আঘাত অত্যাচার।' কবিতা ত' নয় যেন আগুনের ফুলকি। প্রবাসী সমালোচনায় লিখেছিলেন—'কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি—'

এই 'বিষের বাঁশী'র জন্য পুলিশ কল্লোল অফিস খানাতল্লাসি করল। বিষের বাঁশী ও সেই সঙ্গে প্রকাশিত 'ভাঙ্গার গান' নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হল।

নজরুল সেই সময় কৃষ্ণনগরে থাকেন। একবার কলিকাতায় এসেছিলেন, ফেরার পথে মুজফফর আহমেদ সাহেবকে 'দারিদ্র্যের পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে বলেছিলেন—'এটা ভাই তুমি কল্লোল অফিসে পৌঁছে দিও। আমি এবার সেখানে যাব না। দীনেশরঞ্জন দাশ মণিঅর্ডারযোগে দশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। একটি কবিতাও চেয়েছিলেন সেই সঙ্গে। এই কবিতাটি আমি বড় দুঃখে লিখেছি।' ('স্মৃতিকথা' : মুজফফর আহমেদ)।

এই কবিতা 'কল্লোলের' ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর প্রথম লাইন—'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান!'—ইত্যাদি।

কল্লোলের বন্ধুদের সঙ্গে নজরুলের একটা আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল—শৈলজানন্দ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুল নাগ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ সকলেই নজরুলের অন্তরঙ্গ—কেউ আগে এসেছেন কেউ পরে।

হুগলীতে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল কাজী নজরুলের, জন্মাষ্টমীর দিন জন্ম। তাই নাম কৃষ্ণ মহম্মদ।

এই ছেলের জন্মের একুশ দিনের 'আকিকা' উৎসবে নিমন্ত্রিত হলেন কল্লোলের সব বন্ধুরা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' নামক নজরুল জীবনকথায় লিখেছেন—

'নজরুল নিজেই এসেছে স্টেশনে আমাদের ডেকে নিতে। এই যে মনোনীত। আমাকে সম্ভাষণ করল নজরুল। শৈলজা আর নৃপেন তো তোমার মনোগত আর প্রেমেন, যার এমন সুন্দর নাম, সে মনোমত। কিন্তু পবিত্র?

সে আমার মনঃপূত।

আর বাকী সব? দীনেশদা, মুরলীদা, গোকুল, গোরা, ভূপতি, সুকুমার—?

সবাই সবাই আমার মনোরথের আরোহী। সবাই আমার দুঃসময়ের সাথী—'।

এই দিনটির বিশদ বিবরণ পড়লে জানা যায় নজরুলের মনের মানুষ ছিলেন কারা। [illegible]

যে সুবৃহৎ শোকগাথা প্রকাশিত হয় তাতে নজরুল লিখেছিলেন—

'আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুকে নাহি ডরে।'

কল্লোলের একমুঠো ঘরে নজরুল স্বস্তি পেয়েছিলেন, আনন্দ পেয়েছিলেন তাই আরেক দুঃখের দিনে তিনি ঝড়ের মতো এসেছিলেন; কল্লোল অফিসে মণীন্দ্র চাকীর ছোট্ট ঘরটিতে বসে আবেগভরে লিখেছিলেন—'সর্বনাশের ঘণ্টা'। ১৩৩১-এর কার্তিক সংখ্যায় কল্লোলে নজরুল শনিবারের চিঠির নিন্দার প্রতিবাদে এই কবিতা মোহিতলালকে উদ্দেশ করে রচনা করেন আর মোহিতলাল তার উত্তরে লেখেন 'দ্রোণগুরু'।

১৩৩২-এ দার্জিলিঙে দেশবন্ধু যখন দেহত্যাগ করলেন তখন নজরুল ছিলেন হুগলীতে। দেশবন্ধুর স্মরণে 'ইন্দ্রপতন' নামক বিখ্যাত কবিতাটি হুগলীতেই রচনা করেন এবং যতদূর মনে আছে তা 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়।

কল্লোলের সাত বছরে প্রকাশিত কত কবিতা, কত গান আর গজল।

কল্লোলের বন্ধুদের উদ্যোগে ১৯২৯-এর ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তখনকার এলবার্ট হলে (বর্তমানে কফি হাউস) কাজী নজরুলকে এক বিরাট সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তখনও রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র কাউকেই এভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়নি। এই সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি হলেন এস ওয়াজেদ আলি সাহেব আর সম্পাদক হলেন কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ ও সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেব। সম্বর্ধনার দিন সভাপতিত্ব করলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। সভায় উপস্থিত ছিলেন জলধর সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, অপূর্বকুমার চন্দ, [illegible] নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য প্রমুখ কল্লোলের সকলেই।

সভাপতির অভিভাষণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন—

—'নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন।'

সুভাষচন্দ্র এই সভায় বলেন—'তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হত। আমাদের প্রাণ নেই। তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

এই সভায় নজরুলের গান করেছিলেন নলিনীকান্ত সরকার আর উমাপদ ভট্টাচার্য আর স্বয়ং নজরুল গেয়েছিলেন—'টলমল টলমল পদ ভরে—' ও 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু—'।

নজরুলের বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়। নজরুলের ঝড়ের রাতের বন্ধুরাই তাই নজরুলকে প্রাণভরে ভালোবেসেছেন, তার প্রমাণ নজরুল ইসলামের অজস্র জীবনকথা, [illegible]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। পঁচিশ ।।
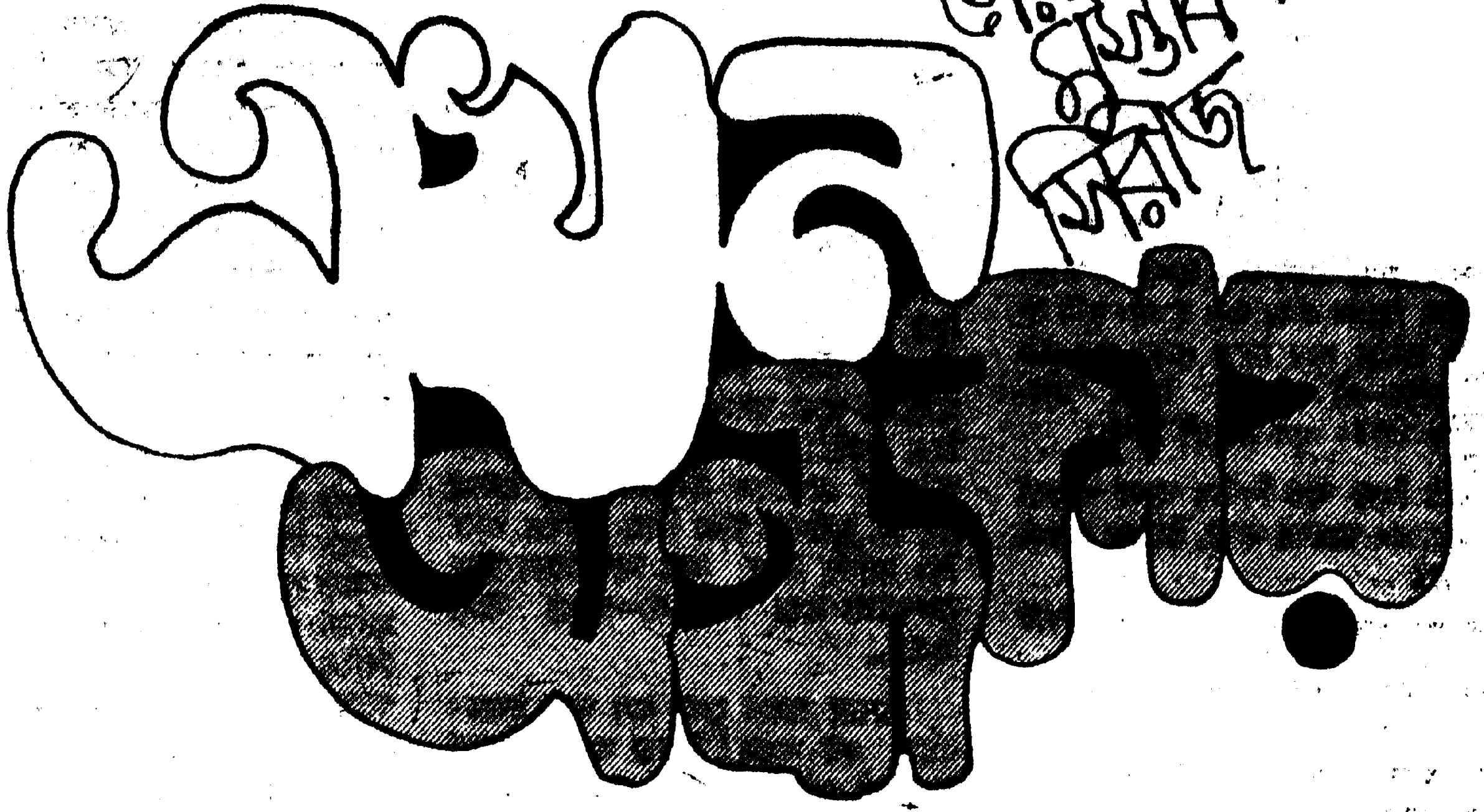
গঙ্গার ধারে আচার্যদের সেই বাড়িতে উঠে যাওয়ার কদিন পরে রূপপুর থেকে হৃদয় ঠাকুর এসে হাজির। তার ভোল-বদল দেখে অবাক লাগল চন্দনের। খাকি ঢোল-ঢোল হাফ প্যান্ট পরেছে হৃদয়, গায়ে চাড়িয়েছে চিত্রবিচিত্র রঙীন হাফ কুর্তা, কাঁধে কন্ডাকটারদের চামড়ার ব্যাগ ঝুলছে। সেলাম বাজিয়ে অ্যাটেনসান দাঁড়াল সে। ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগছিল চন্দনের।

হৃদয় যথারীতি আকাশে চোখ তুলে বলল, জয়েন করেছি স্যার। হুঁড, যেই বলা, অমনি লেট করি নি। আপনি তো ভালই জানেন, চুপচাপ বসে থাকা আমার ধাতে নেই।...সে এক মুখ হেসে আরও বলল, তবে আপনার দিক থেকে ভালই হল। বেজোকে তো বিশ্বাস নেই। অ্যাদ্দিন আপনার চোখের সামনে খুব লুটেছে, এবার? এবার পারবে এই শর্মা থাকতে? পাই পয়সা গুনে ভাড়া নিচ্ছি, পাই পয়সা হিসেব রাখছি। আর কারো সাধ্যি নেই যে বেজোর পেন্টুলের পকেটে দুটো ডিম গুঁজে দশ মাইল মেরে দেবে। হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ!

খুব হাসতে লাগল হৃদয়। চন্দন বলল, ব্রেজদা তোমাকে রেখেছে বুঝি? বাঃ।

হৃদয় খুশী হয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। বেজো বললে, ছোটবাবু তো বাড়ী গিয়ে রইলেন—ভদ্রলোকের ছেলে, শিক্ষিত ছেলে—এ ধকল কি সয় ওনাদের? তা ঠাকুর মশাই, তুমি তো একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার সন্তান, কপাল দোষেও বটে—আবার রাজরোষেও পড়ে বোনের উনুনে ফুঁ দিচ্ছ, এস—তোমার যোগ্য একটা কাজ দিই। কি? না—ভাড়ার পয়সা আদায় করবে, হিসেব রাখবে। ছোটবাবুকে হপ্তায় হপ্তায় সব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে কিনা... তারপর এ্যাপয়েনমেন পেয়ে গেলুম। ব্যস!

চন্দন এবার হেসে ফেলল।...ভালোই তো। এসো, ভেতরে এসে বসো।

হৃদয় সশব্যস্তে বলল, বসব না স্যার। এতক্ষণ ওদিকে সব লুটপাট হয়ে গেল। ও বাগদীকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। মালকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে এক্ষুনি দৌড়ব। শিশিরবাবুর ট্রাক ওয়েট করছে বহরমপুরে। শংকরাকে বলে এসেছি।

বলে সে ব্যাগ খুলে এক টুকরো কাগজ আর একগোছা নোট বের করতে থাকল। চন্দন বলল, সে কি হয় নাকি? বাড়ীতে তোমার কত গল্প করেছি। তোমাকে দেখলে খুসী হবে সবাই। এই দুপুরবেলাটা জিরিয়ে নাও।

হৃদয় আমল দিল না। বলল, না স্যার, বেজোর অসুবিধে হবে। তাছাড়া...হঠাৎ চোখে ঝিলিক তুলে সে চাপা গলায় বলল, বেজো কি কান্ড করেছে শোনেন নি? আপনি তো চলে এলেন, তারপর ব্যাটা কদিন ফাঁক পেয়ে জোর মদবাজী করতে লাগল আর বউ ঠ্যাঙাতে শুরু করল। সে কি ঠ্যাঙানী স্যার! প্রতি রাতে লোক জড়ো হচ্ছে বেজোকে ধরে সামলায়। আর বাগদীর মুখ—মুখ তো নয়, কুকুরের ইয়ে স্যার। ছেনাল বেশ্যা বলে খামাকা গালমন্দ দুবেলা—সতীলক্ষ্মী মেয়ে কতক্ষণ সইবে বলুন? আপনিও ছিলেন—হাতেনাতে দেখে-ছেন। খেরেস্তানের মেয়ে হলে কি হবে? অমন আর হয় না স্যার। শালা বাগদী তাকে বের করে এনে কি লাঞ্ছনাটা না করলে! এদিকে মেয়েও নাকি পোয়াতি। মনের জ্বালায় সে সোনাডাঙা দিদির কাছে পালাল। গত শুক্রবারে এই কান্ড।

চন্দন কাঠ হয়ে শুনছিল। এতক্ষণে অন্যমনস্কভাবেই বলে উঠল, হাসি পালিয়েছে?

হ্যাঁ। পালাবে না তো কি পুজো করবে ছোটলোককে — বলুন?...হৃদয় ফিশফিশ করে উঠল।...সবাই বলছে, বেজোর নাকি বাপ হবার সাধ্যি নেই — আলবাৎ বেজোর বউটা অসতী। কে জানে, সত্যি না মিথ্যে! তবে স্যার—হ্যাঁ ভালই করেছেন এক রকম। চলে এসে কালির ছিটে থেকে বেঁচে গেছেন। রূপপুর কি মানুষের জায়গা? ছা ছ্যা—ওয়াক থুঃ!

চন্দন চমকে উঠল। কি বলছে হৃদয়? সে স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার নামে কিছু রটেছে বুঝি?

হৃদয় ব্যস্তভাবে বলল, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—কান করতে নেই। স্যার, এবার বুঝে নিন। আমার দেরী হয়ে গেল।

চন্দন বলল, একটু অপেক্ষা করো, হৃদয়। আসছি।

বাড়ীর সামনে ছোট্ট এক ফালির রাস্তার ধারে একটা আদ্যিকালের বটগাছ। তার এক পাশের শেকড় গঙ্গার জল ছুঁতে নেমে গেছে। ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল হৃদয়। নীচে বামুনঘাট। যারা স্নান করতে যাচ্ছে, তারা ওর দিকে তাকিয়ে নির্ঘাৎ অবাক হচ্ছে। মুখ উঁচু করে ঘোড়ার মত এক জোড়া পুরনো বাতিল ধরনের মিলিটারী বুট ঠুকছে হৃদয়—বড় ব্যস্ততা তার। ব্যাগটা টানটান হাতে ধরে আছে। দেখতে দেখতে এক পাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরল ওকে। হৃদয় খেঁকিয়ে উঠল, এখমে—কি হচ্ছে? এ্যাঁ? ঠাকুর দেখছ, শিবঠাকুর?

তারপর তাড়া করল। দলটা সরে গিয়ে আবার ফিরল। এবার সে ক্ষেপে গিয়ে গালমন্দ শুরু করল।...বজ্জ পাজি জায়গা তো! ওরে ছুঁচোর পোনা, মা-বাবা নেই ঘরে? ওরে শকুনের পাল...

চন্দন ফিরে এসে তাকে বাঁচাল। হৃদয় সখেদে বলল, ছ্যা ছ্যা ছ্যা—ওয়াক থুঃ! আজকাল মা-বাবারা কি সব বিয়োচ্ছে ঘরে ঘরে!

চন্দন ধমক দিতেই সরে গেল বাচ্চা-গুলো। হই হই করে ঘাটের দিকে নেমে গেল। চন্দন হাসছিল না। মুখটা গম্ভীর। সে বলল, হিসেব এখন থাক হৃদয়। তুমি না থাকতে চাইলে আর জোর করব না। এক কাজ করো—এই চিঠিটা নাও। হক-সায়েবকে দেবে। খুব জরুরী কিন্তু।

চিঠি নিয়ে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পকেটে রাখল হৃদয়। তারপর বলল, হিসেব নেবেন না স্যার?

না। মাসের শেষে ব্রজদাকেই আসতে বলো। আর..

চন্দনকে থামতে দেখে হৃদয় বলল, আর কি স্যার?

থাক। তুমি ব্রজদাকেই একবার আসতে বলো।

হৃদয় আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। মাথা দুলিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে গেল। খরার দুপুরে গনগনে রোদে গঙ্গার বালি ঝিকমিক করছে। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চন্দন। বটের ছায়ায় অল্প ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। গুঁড়ির কাছে বাঁধানো ভাঙা চত্বরে বসে পড়ল সে। হাসি পালিয়ে গেছে! এই কথাটা তার মনের ভিতর বার বার ঝাঁপিয়ে আসছিল। বেচারা হাসি! হঠাৎ তাড়াতাড়ি সে নিজেও চলে এল রূপপুর ছেড়ে—আসবার সময় দেখা করা হয় নি। হাসি নিশ্চয় অবাক হয়েছিল। দুঃখ পেয়ে-ছিল। হয়তো দেহের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে এক সময় কোথাও পৌঁছন যায়। কোথাও শেষ প্রান্তে কিছু থাকে যা ভালবাসা অথবা ঘৃণা। হাসি কোথায় পৌঁছেছিল, ভালবাসায় কি? জানতে এত ইচ্ছে করে। আর চন্দন? সে হাসির দেহের ধাপ ডিঙিয়ে যেতে যেতে যেন উঠে এসে-ছিল যে চূড়োয়—তার নাম ঘৃণা। হাসিকে ক্রমশ অসহ্য লাগছিল তার। হাসির দেহ—খুব হিসেব করে দেখলে, যে কোন পুরুষের পক্ষে একটা চমৎকার কাম্য জিনিস এবং আনন্দ—অথচ চন্দন কেন যেন অতৃপ্তি আর অতৃপ্তির ক্রোধকেই আবিষ্কার করছিল বার বার। কেন এমন হয়? হয়তো দেহ জীবনের শেষ কথা নয় তাই। অথচ বেচারা হাসির গর্ভে হয়তো চন্দনই একটা অবাঞ্ছিত জীবন সৃষ্টি করে বসেছে!

যত একথা ভাবল চন্দন, একটা গভীর ভয় শিরশির করে উঠল তার মাথার ভিতর দিকে। সে মনে মনে অপ্রস্তুত বলল, না—আমার কোন দোষ নেই। কি করতে পারতুম আমি? হাসি নামে এক সুন্দরী মেয়ে আমার বুকের ওপর উঠে এসেছিল রাতের অন্ধকারে। তাকে সাপ ভেবে ছুঁড়ে ফেলতে পারি নি। কেউ কি পারে? কে এমন ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ? দেহের নিজস্ব ধর্ম আছে। তার ওপর মনের কোন জোর নেই—কোন জোর খাটে না, বিশেষ করে অন্ধকারে যখন কোথাও অন্য কোন মানুষ নেই। আর, একদিন এই বটগাছের ছায়াতেই এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। রুমা নামে এক বালিকা চন্দন নামে এক যুবকের পিঠে বুক ঘষে জড়িয়ে ধরেছিল।—'আমাকে ঘরে নিয়ে চলো', এবং ঠিক সেদিনও এটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘটেছিল। দেহে একটা অবাঞ্ছিত স্রোত—যার আসল নাম কাম হু হু করে বয়ে এসেছিল কয়েক মুহূর্তে। সে ত্বরিতে চকিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল রুমাকে। রুমা অবাক হয়েছিল। কেঁদে ছিল একটু। অথচ এটা হয়। এ একটা অনিবার্য প্রাকৃতিক উপদ্রব। শুধু তফাত এই যে, হাসিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারে নি। হাসির জন্যে তার মনে কোন রকম সংস্কারের বাধা ছিল না—রুমার জন্যে ছিল।...

আবার রুমার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। নীচে ওই দহের জলের এক আশ্চর্য শস্য সেই বালিকা। এই গ্রীষ্মে দহের কালো জল রুমাময় হয়ে উঠছে।...

রূপপুর থেকে চলে আসার পর ক্রমাগত সে চেষ্টা করেছে খুব হইচই করে দিন কাটাবে এখানে। একটা ইলেকট্রিক জিনিসপত্রের দোকান খুলবে। ব্যবসা করবে। টাকা-পয়সার হিসেবে ব্যস্ত হয়ে থাকবে। অথচ ভাবতে ভাবতে দিনগুলো কেটে গেল বৃথা। আশ্চর্য, আগে তো এমন ঘটে নি। সারা জিয়াগঞ্জ শহর জুড়ে, তার মাটি আর প্রকৃতির সবখানে, এখন শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি। আরো বেশী প্রবল হয়ে উঠছে রুমার অস্তিত্ব। প্রচণ্ড হার স্বীকারের লোভে ছটফট করছে ভিতরটা। না—এখানে থাকা ক্রমশ অসহ্য আর অসম্ভব হয়ে উঠছে। অন্য কোথাও পালাতে হবে তাকে। সকাল-বিকেল অন্যমনস্কভাবে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ায় সে। অবচেতনে কি যেন সন্ধানী দৃষ্টিপাত। টের পেতেই চমকে ওঠে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। আঃ, ভীষণ হার হয়ে গেছে তার। চন্দন, তুমি হেরে গেছ!...রাগে ধকধক করে জ্বলে ওঠে তার চোখ দুটো। অসহায় আক্রোশে হাত মুঠো হয়ে যায়। তারপর ভাবে মদ খাবে। কিন্তু শেষ অব্দি একটা অনুৎসাহ তাকে ক্লান্ত করে। মদ মদও কারো-কারো কাছে শুধু দেহের কষ্টই দিতে পারে। আর কিছু নয়। নাকি আবার ফিরে যাবে রূপপুরে? অনেক রাতে গঙ্গার ধারের বাড়ীটার দোতলায় বসে জানলার বাইরে অনেক দূরের আকাশ দেখে সে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা মোটা নক্ষত্র জ্বল জ্বল করে। ওখানে কোথাও পুণ্যসলিলা তার সুন্দর নদী মোরী আর গৌরী নামে এক অবোধ যুবতীকে নিয়ে অপেক্ষা করছে মনে হয়। অবচেতন যৌবনের বিহ্বলতায় গৌরী সেখানে বালির চরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভ্যান-গাড়ীর ছোটবাবুকে খুঁজছে। ভাবছে কোথায় গেল লোকটা? ব্রজকে কি সে জিগ্যেস করেছে তার কথা? সব শুনে কি কষ্ট পেয়েছে গৌরী?...চন্দন মনে মনে গৌরীকে আদর করে বলে, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি নিরাপদে থাকো। তোমাকে আমি ছোঁব না। কারণ, সত্যি তো তুমি আমার কেউ নও—তোমাকে চেষ্টা করেও আপন মনে করতে পারি নি।...

গঙ্গার ওপারে জৈন মন্দিরের প্রকাণ্ড পেতলের গম্বুজ রোদে ঝকমক করছে। রেল লাইনের ধারে এক দঙ্গল শুওর খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি মেয়ে। আজিম-গঞ্জ স্টেশনে দুপুরের ডাউন ট্রেনটা হুইসল দিয়ে ছাড়ল। ভার কাঁধে নিয়ে এক দল দেহাতি কালো কালো মানুষ চরের ওপর নেমে আসছে। দহের জলে অজস্র মানুষ সাঁতার কাটছে। হঠাৎ চলমান জীবনের সব কিছু উদ্দেশ্যহীন আর অকারণ লাগল। আবার হাসির কথা ভাবতে থাকল সে। হাসির পেটে একটা বাচ্চা এসেছে। তা সেদিন হাসিও বলেছিল বটে—একটা সুখবর আছে ছোটবাবু!...বিকৃত মুখে সিগ্রেট জ্বালাল চন্দন।

ব্রজ একটা হাড়ে হাড়ে বদমাস। বউকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল — অথচ চন্দনের গাড়ীটা তো ছাড়তে পারল না। সব [illegible] শুনেও! আরও অবাক লাগে, ব্রজটা [illegible] সে রাতে ছেলের বাবা হওয়ার কি [illegible] আনন্দ দেখাচ্ছিল রাধার [illegible]! বড় একটা ঘুঘু—[illegible] কোন সন্দেহ নেই। আবার হৃদয়টাকেও জুটিয়ে বসেছে সে। না জানি, রূপপুরে পুণ্যসলিলা নদীর মাটি-দের কি দুর্দশা হচ্ছে হৃদয়ের হাতে!

হোক। হকসায়েবকে চিঠি [illegible] গাড়ীর একটা খদ্দের দেখে দিন [illegible] মরুক গে। হকসায়েবের কাছ [illegible] চিঠি-র জবাব আশা করছে সে। এ ব্যাপারে ওঁর মতো কাজের লোক আর রূপপুরে দুটি নেই।

রমণীমোহনকে বাড়ীর দরজায় দেখা গেল। স্নান করতে যাচ্ছেন। চন্দনকে দেখে এগিয়ে এলেন।...রূপপুরের লোকটা চলে গেল? কি খবর এনেছিল?

চন্দন বলল, তেমন কিছু না।

তা—ওখানে বসে কি করছ? মাথা বেলা হয়েছে। চানটান করো।...রমণীমোহন গামছাটা মাথায় ঢাকলেন। অভ্যাস মতো পথ থেকে এক টুকরো ইঁট তুলে নর্দমার দিকে ফেলে দিলেন। আজকাল খুব বিষয়ী বিত্তবান লোকের মতো পা ফেলে হাঁটেন তিনি। অকারণে যাকে খুশী, ধমক লাগান। আশ্চর্য, সবাই আজকাল সেটা বরদাস্ত করে।...দেখ, ওখানটায় একটা বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হতচ্ছাড়া মেয়েগুলো সন্ধেবেলা ঘাটে যেতে যেতে পাঁচিলের নীচেটা ছ্যা ছ্যা...কি নরক করে রেখেছে! গন্ধে বাড়ীতে টেঁকা দায়। কই গো, ভেতরে যাও। ঘাটে নামবে, নাকি টিউবেলে?

বরং টিউবেলেই ভালো। অনেক দিন ঘাটে নামা অভ্যেস নেই। অসুখ-বিসুখ হয়ে যেতে পারে।

চন্দন উঠে দাঁড়াল। বলল, হ্যাঁ—টিউবেলেই চান করব।

রমণীমোহন নাকে গামছা ঢেকে পাঁচিলের ধারে আগাছার জঙ্গলটা দেখতে দেখতে ঘাটের দিকে চলে গেলেন।

চন্দন বাড়ী ঢুকতেই সর্বেশ্বরী এগিয়ে এলেন।...হ্যাঁ চাঁদু, রূপপুরের লোক এসেছিল শুনলুম। কে?

চন্দন জবাব দিল, তুমি চিনবে না। হৃদয় ঠাকুর।

সর্বেশ্বরী চাপা গলায় এবং চোখে ঝিলিক তুলে বললেন, খবর ভালো তো?

চন্দন কিছু টের পেয়ে বলল, ভালো।

পরেশের বউ কিছু বলে পাঠিয়েছে বুঝি?

চন্দন ভুরু কুঁচকে তাকাল।...কি বলে পাঠাবে? তোমাদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। আমার গাড়ীর কণ্ডাকটর এসেছিল।

ও।...বলে সর্বেশ্বরী নিরাশ মুখে সরে গেলেন।

চন্দন ওপরের ঘরে গেল। বাবা-মা এখনও স্নেহধারার কাছ থেকে খবর প্রত্যাশা করছেন! এ বাড়ীটাও যেন গোপনে একটা ব্যাকুল প্রতীক্ষা বুকে নিয়ে ছটফট করছে। এই সব মুহূর্তে বড় জ্বালা দেয়। কতটা চিড়বিড় করে জ্বলে ওঠে। একটা প্রচণ্ড হতাশা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই হার-স্বীকারে দুঃখটা খোঁচাতে থাকে অনবরত। মনে হয়, একটা কিছু করা দরকার।

কিন্তু কি করবে সে? কিই বা করতে পারে?...

হকসায়েবের চিঠি এল কদিন পরে। একটা পোস্টকার্ডে কয়েকটি লাইন মাত্র। পাণ্ডেজী গাড়ীটা কিনতে রাজী হয়েছেন। শিগগির চলে আসুন। অন্যান্য খবর ভালই। কিছু সাক্ষাতে বলব।...

শুধু এইটুকুর প্রতীক্ষায় যেন কয়েকটা দিন ফটফট করছিল সে। সকালের ডাকে চিঠিটা পেয়েই তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল। বাসে ওঠার পর একবারের জন্যে মন কেঁপে উঠেছিল, রূপপুরের সঙ্গে সব সম্পর্ক সে শেষ করতে চলেছে। পরক্ষণে সংযত হল। কি হবে সম্পর্ক রেখে! ওই টাকা দিয়ে বরং—জিয়াগঞ্জেও নয়, অন্য কোথায় ছোটখাট একটা ব্যবসা-টাবসা করবে। বেঁচে তো থাকতেই হবে—কারণ একটা পরিবার তার অপেক্ষায় বেঁচে রয়েছে। আর—শুধু কোনক্রমে আগের গরিবীচালে বাঁচা নয়, কিছুটা সচ্ছলতায় এনেও যাকে পোঁছে দিয়েছে, তার মান বজায় তাকে রাখতেই হবে। ভাবতে গেলে এ একটা বিশ্রী ব্যাপার —আগে দুবেলা শাকভাতেই চলে গেছে এখন প্রতিবার পাতে মাছ-মাংস চাই-ই অথচ এর জন্যে দায়ী তো চন্দন নিজে!

সুতরাং আমৃত্যু যেন প্রায়শ্চিত্ত করে যেতেই হবে। নিজের জীবনের কোন কিছুতে তার তাকানোর আর উপায় হয়তো সে নিজেই রাখে নি।

রূপপুরে পোঁছতে বিকেল হয়ে গেল। বাস স্ট্যাণ্ডে অনেক চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হল। সবাই বড্ড কৌতূহলী যেন—হঠাৎ ছোটবাবুর চলে যাওয়া, ব্রজর পারিবারিক বিবাদ, সব মিলিয়ে একটা অপরিচ্ছন্নতা ছিল এ কৌতূহলে। অল্প কথায় এবং একটু হেসে সে প্রথমে পাণ্ডেজীর গদীর দিকে এগোল। তারপর অবাক হয়ে টের পেল যে, তার মনে সেই জোরটা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সত্যি বেচে দেবে গাড়ীটা?

ফিরে এসে সীতাংশুর স্যাঙ্গুভ্যালীতে ঢুকল। সীতাংশু চেঁচিয়ে উঠল, হ্যালো ছোটবাবু! আরে, কি কাণ্ড!

চন্দন একটা খালি টেবিলের সামনে বসে বলল, আবার এলুম। একটু কাজ আছে। কেমন আছেন সীতাংশুবাবু?

সীতাংশু পাশে এসে বসল।...আপনি কত দিন বাঁচবেন—উঃ! এই একটু আগে আপনার নাম করছিলুম। কি অদ্ভুত লোক মশাই! হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—শুনলুম চলে গেছেন—আর আসবেন না।

চন্দন বলল, হ্যাঁ—ওই রকমই।

সীতাংশু চাপা গলায় বলল, হুঁ—জানি বইকি। অকারণে স্ক্যাণ্ডাল ছড়ালে ভদ্রলোকের পক্ষে সত্যি বড্ড মুশকিল হয়। কিন্তু এ স্যার, হচ্ছে কিনা মাটির দোষ। ছত্রিশ জাতের লোক উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—ছত্রিশ মুখে ছত্রিশ রকম কথা বলে মজা পায়। তা বলে ঘাবড়ে গেলে চলে? নাঃ, পরেশবাবুর অনেক পেয়েও অনেক পান নি মশাই!

হাসতে লাগল সীতাংশু। চন্দন বলল, হ্যাঁ—তা তো পাই-ই নি।

আরো জোরে হাসল সীতাংশু।...গ্র্যাণ্ড বলেছেন! তবে আমি বলি কি, একটু প্রুড হোন।

প্রুড হবো?...চন্দন একটু হাসল।

আলবাৎ। ওরে, ছোটবাবুকে ভালো করে চা দে। কিছু খান স্যার।

নাঃ। বড্ড গরম—চা খাবো না। একবার দেখা করতে এলুম। সম্ভবত সন্ধ্যার বাসেই ফিরে যাব।

সীতাংশু নিরাশ মুখে বলল, ফিরে যাবেন?

হ্যাঁ। গাড়ীটা বেচে দিতে এসেছি।

সীতাংশু ওর দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে উঠে গেল। একটু পরে অকারণ গলা চড়িয়ে বলল, চন্দনবাবু ভাল খদ্দের একজন চাই নাকি?

চন্দন জবাব দিল, না। খদ্দের ঠিক হয়ে গেছে।

লোকাল, না বাইরের লোক?

চন্দন টের পেল, দালাল লোকটি শিকারের গন্ধে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বলল, এখানেরই লোক। বাইরের কেউ নয়।

কে, বলতে আপত্তি আছে?

পাণ্ডেজী।

হেসে উঠল সীতাংশু।...পাণ্ডেজী আপনার গাড়ী কিনবেন—তাহলেই হয়েছে! কি করবেন ও দিয়ে? ভূষি খোল বইবেন বুঝি?

চন্দন গম্ভীর মুখে বলল, সে তিনিই দেখবেন।

সীতাংশু বলল, দেখুন। কিন্তু আমার অফার রইল—হাতে ভালো খদ্দের আছে। পাণ্ডেজীর সঙ্গে যদি দরাদরি হয়ে যায়, আমার অনুরোধ স্যার, ফাইনাল করে দেবেন না কিন্তু। কিছু বেশী পেয়ে যেতে পারেন।

বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দন। ব্রজ গাড়ী নিয়ে ফিরবে সেই রাত আটটা নাগাদ। নিশ্চয় অবাক হবে ব্রজ। অবশ্য হকসায়েবের কাছে যে চিঠিটা হৃদয়ের হাতে পাঠিয়েছিল, হৃদয় সেটা খুলে পড়েছে কি না কে জানে! খামের মুখ ভালো করে এঁটে দিয়েছিল। তাহলেও হৃদয়ের মতো নাকগলানো স্বভাবের লোককে বিশ্বাস নেই। আবার অন্যদিকে হকসায়েব যা খোলামেলা মানুষ—ইতিমধ্যে ব্রজকে বলেছেন কি না ঠিক নেই। সম্ভবত বলেন নি। কারণ, সীতাংশুর কানে এটা পোঁছয় নি দেখা যাচ্ছে। চন্দন আবার ভাবতে থাকল। গাড়ীটা কি বেচে দেওয়া ঠিক হবে?

জনা [illegible] লোক কেবিনে টেবিল [illegible] তারা একে এ

উঠে গেল। নতুন কেউ এল না। ঘরটা ফাঁকা এখন। সীতাংশু দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছিল। চন্দনের চোখে চোখ পড়তেই বলল, আমার মতে কাজটা ভুল করছেন চন্দনবাবু। এ রুট সহজে কেউ পেত না—আপনি পেয়েছিলেন। এমন একটা রুট পারমিট যার হাতে থাকবে, সে ক মাসেই রাজা হয়ে যাবে। কেন বেচতে যাচ্ছেন?

চন্দন বলল, অসুবিধে আছে আমার।

সীতাংশু একটু হাসল।...নাকি স্ক্যান্ডালের চাপে?

কিসের স্ক্যান্ডাল?

সীতাংশু দমে গেল।...না — মানে, আপনি যেমন ইয়ে ধরনের মানুষ। তবে কথা কি জানেন? রূপপুরে কোন ভদ্রলোক নেই। সমাজ নেই। এত দিন থেকে এটাও কি টের পান নি? যার যা খুশী করবে. থাকবে, পয়সা কামাবে। মানিমেকারদের জায়গা। এ জায়গা যে ছেড়ে যেতে চায়—তাকে দেখে মনে হয় খুব বোকা কিম্বা অন্ধ। না না চন্দনবাবু, প্লীজ স্যার, আমার কথায় রাগ করবেন না। যা ন্যায্য কথা তাই বলছি।

চন্দন চুপ করে থাকল।

সীতাংশু একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, ব্রজর বউকে নিয়েই তো যত স্ক্যান্ডাল। সে পালিয়েছে। এখন আর সমস্যা কিসের? আপনাকে মানুষ হিসেবে এত ভালো লাগে বলেই এসব বলছি। নৈলে আমার গরজ কিসের, বলুন?

চন্দন উঠে দাঁড়াল।...চলি সীতাংশুদা। পরে দেখা হবে।

সে হন হন করে পান্ডেজ্জীর গদীর দিকে চলতে থাকল। বিকেলের রোদে হাইওয়ের দু পাশের গাছের ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পীচের ওপর কালো কালো মোটা তুলির টানের মতো পড়ে আছে ছায়াগুলো। দূরে ধূ ধূ রুক্ষ মাঠ একটু হলদে দেখাচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল চন্দন। হঠাৎ মনে এসে গেল, আরে! এখানেই — এই রূপপুরেই তো রুমা আছে! অমনি থমকে দাঁড়াল। খুব অর্থপূর্ণ মনে হল রূপপুর চটিকে। প্রাণবন্ত উজ্জ্বল একটা অস্তিত্ব। বাইরে দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে আছে—দেখছে এই জনপদকে। একটা গভীর লোভ তাকে ভিতর থেকে স্পর্শ করল চুপি চুপি। আর তক্ষুনি তার মনে হল, এই মাটি ছেড়ে গেলে সে উন্মূল গাছের মতো শুকিয়ে মরে যাবে। এখানের বাতাসে রুমার প্রশ্বাসের গন্ধ আছে। এ মাটিতে রুমার পায়ের চিহ্ন আছে। এই বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে রুমা একদিন বলেছিল, আমি কিছু ভুলি নি চন্দনদা! বাড়িতে ঢুকতে রূপপুর চটি রুমার ওই ছোট্ট কথাটায় ভরে উঠল। ইচ্ছে হল, এক্ষুনি দৌড়ে চলে যায় রুমাদের বাড়ী। সেদিন রুমা তাকে আঘাত করেছিল, সে কোন দুঃখের কি যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া, এতক্ষণে যেন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

আর রুমার সেই ছোট্ট চিঠিটা। 'আমাকে ক্ষমা করো।' কি দুর্দান্ত ক্রোধে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সে! এখন আফশোস হচ্ছে পুরোটা পড়ে নি বলে।

আবার ফিরল চন্দন। একটা রিকসো ডাকল। রিকসোয় আপাতত রাধার হোটেলেই যাওয়া যায়। কিন্তু রিকসোটা কাছে আসতেই সে মত বদলাল। বলল, না—থাক।

কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না চন্দন। বাস স্ট্যান্ডে একটা বাস সদ্য ছেড়ে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে। ওই বাসে প্রতাপপুরের কাছে নেমে পুরুলিয়া চলে যাবে? দৌড়ে গিয়ে বাসটায় উঠে পড়ল সে। চেনা কন্ডাকটার সেলাম করে বলল, সামনে চলে যান স্যার। ও প্রমথদা, তোমার জিয়াগঞ্জের ছোটবাবু!

. প্রমথ ড্রাইভার এক সময় পরেশের ট্রাক চালাত। এখন বাস ড্রাইভার। চন্দনকে নমস্কার করে বলল, আসুন, আসুন। নিজের পাশে জায়গা দিল সে। খবরাখবর জিগ্যেস করতে লাগল। বেশীর ভাগ খবর বড়বাবুর স্ত্রী অর্থাৎ স্নেহধারার। সামনে মাসে বড়বাবুর ছোট শালীর বিয়ে। ছোটবাবু জানে না দেখে সে অবাক।

প্রতাপপুর মোড়ে নেমে সে হাঁটতে থাকল। একটা লরী অন্তত পেয়ে যাবেই। এখনও যথেষ্ট বেলা আছে। পায়ে হেঁটে গেলেও চলে—মোটে আট-ন' মাইল দূরে পুরুলিয়া। অনেকদূর হেঁটেও কোন গাড়ি পেল না। চেনা পথ। হাঁটতে অবশ্য ভালই লাগছিল। রোদের তাপ ফুরিয়ে গেছে অনেকটা। উদ্দাম হাওয়া দিচ্ছে। মনে একটা প্রশান্তি ঘনিয়ে আসছিল চন্দনের। সামনের ব্রীজটা দেখে হঠাৎ সে চমকে উঠল এক সময়। ওই গ্রামটা সোনাডাঙা না? হাঁটতে হাঁটতে এতদূর চলে এসেছে সে। সূর্য মাঠের শেষে দিগন্তে নেমে গেছে। রোদের রঙ তখন লালচে। ঘুটেকুড়ুনী মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। পাখিধরা সাঁওতাল কাঁধে ফাঁদ বয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে। একসার গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে এগিয়ে আসছে। সোনাডাঙা সামনে। কী করবে এখন? ভুলেই গিয়েছিল যে এ-পথে এই গ্রামটা রয়েছে। রাস্তার ধারেই তো হাসিদের বাড়ি। ব্রীজে এসে দাঁড়াল চন্দন। এখানে কি অপেক্ষা করবে যতক্ষণ ব্রজ গাড়ি নিয়ে না ফেরে?

চুপচাপ দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানতে থাকল সে। সূর্য ডুবে গেল। না-আলো না-অন্ধকার একটা আশ্চর্য সময় তাকে পেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে। মাথার ওপর শেষ পাখির ঝাঁক চলে গেল দূরের গাছপালার দিকে। তারপর অন্ধকার এল। তখন মনে হলে, যেন ব্রজর জন্যে নয়, সে আসলে পুরুলিয়া যেতে চেয়েছিল। মৌরী নদীর বালির চড়ায় দাঁড়িয়ে সম্ভবত গৌরীকে একবার কিছুক্ষণের জন্যে নির্জনে পেতে চেয়েছিল।

ব্রজর সঙ্গে রূপপুর সে আজ ফিরবে না। ওর গাড়ির আলো সে চেনে। গাড়ি এলে লুকিয়ে পড়বে গাছের আড়ালে। সকৌতুকে হাসল চন্দন। গোল্লায় যা ব্যাটা মাতাল! তোর মুখ যেন আর দেখতে না হয়।

সে হনহন করে এগোল। অন্ধকারে হাসিদের বাড়িটা পেরিয়ে যাবে। এও এক মজার লুকোচুরি। ফের হাসি পেল তার। হাসি—ব্রজর ছেনাল বউটাকেও একদফা গাল দিল। অবশ্য, সেও সকৌতুকে।

কিন্তু বাড়িটার সামনাসামনি এসে হঠাৎ কী হয়ে গেল যেন। মাথার ভিতর আচমকা একটা লোভ গরগর করে উঠল। সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বাড়িটা দেখতে থাকল কিছুক্ষণ। বাড়ির ভিতরে কোন সাড়া নেই—নিঃশব্দ নিঃঝুম। পাশের বাঁশবনটা ক্রমাগত উদ্দাম বাতাসে তোলপাড় হচ্ছে। তালগাছের পাতাগুলো খড়খড় করে দুলছে। নিমফুলের গন্ধ ভেসে আসছে কদাচিৎ। দূরে আলো দেখা গেল। অমনি সে দরজায় ধাক্কা দিল। কোন সাড়া পেল না প্রথমে। তখন ডাকল—হাসির নাম ধরেই ডাকল।

তারপর দরজা খুলে গেল। অবিকল হাসির মতো চেহারা—কিন্তু হাসির চেয়ে বয়স বেশি, একটু লম্বাটে গড়ন, হাতে হেরিকেন আছে—হাঁ করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।...কোত্থেকে আসছেন? কাকে চাই?

চন্দন একটু হেসে বলল, হাসিদি নেই এখানে? আপনি হাসিদির দিদি না?

হাসি!...কেমন যেন চমকে উঠল হাসির দিদি।...হাসি তো নেই। কেন, কী দরকার বলুন?

চন্দন বলল, হাসি নেই? কেন—আমি যে শুনলুম, রূপপুর থেকে চলে এসেছে এখানে!

হাসির দিদি গম্ভীর হয়ে বলল, এসেছিল। তারপর অন্য জায়গায় চলে গেছে। সেখানে ভালো চাকরী পেয়েছে গেছে।

চন্দন অস্থির হয়ে বলল, সে কী! কোথায় গেছে?

যেখানেই যাক, আপনার কী? আপনি কে?

আমি—মানে, ব্রজদা যে গাড়িটা চালায়, সেটা আমারই।

হাসির দিদি কঠোরমুখে বলল, বুঝেছি—আর বলতে হবে না। হাসির সঙ্গে আবার কী আপনাদের? তার যা সর্বনাশ করার, করে তো দিব্যি ভালমানুষ সেজে বেড়াচ্ছেন।...গজগজ করতে করতে সে দরজা বন্ধ করছিল।

সেই সময় ভিতর থেকে মাতাল গলায় কে বলল, অত ইয়ে কী বাবা! বলে দাও না যে হাসি দুমকা চলে গেছে। ওর লোকের কাছে গেছে, বলে দাও। ব্যস!

চন্দন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সরে গেল আস্তে আস্তে। রাস্তায় গিয়ে উঠল। আবার হাঁটতে লাগল। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন কী গভীর অন্ধকার! সেই অন্ধকারে সে এগিয়ে চলল পুরুলিয়ার দিকে।

(ক্রমশঃ)

দীর্ঘ আয়ুর কন্ঠ তোমার ॥

দিলওয়ার

সমস্ত ঐ আদিবাসী কলরবের শেষে
দাঁড়িও তুমি এসে
শুকনো আমার বুকের খাঁচায়
মাথায় রেখে হাত
হে রবীন্দ্রনাথ।

মনে রেখো, তোমার দেয়া
অগ্নিবিবেক কলি
একটি বালক নিয়েছিলো
ছিটিয়ে দুখের পলি
মধ্যমা কিংবা এই জীবনের
প্রান্তটাই তার
ভালোবাসার বাসর ঘরে
চাহন সুকুমার!

তোমার হাতেই তুলে দেয়া
পূর্ণ আকাশছায়া
আজো আমি ফিরছি বয়ে,
নেই কো মোহ-মায়া ঃ
কূয়োর জলে স্বরূপ দেখার
অলীক অভিলাষ,
বুকে আমার পায়নি কো ঠাঁই—
কোনোই নার্সিসাস।

হে রবীন্দ্রনাথ
দীর্ঘ আয়ুর কন্ঠ তোমার
ধানের বৃষ্টিপাত।

জনৈক মুক্তিযোদ্ধার প্রতি ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এইমাত্র তোমাকে দেখলাম।
তবু তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় যেন অনন্তকালের।
যেন এইমাত্র

তুমি সমুদ্রে নিহিত
আগ্নেয়গিরি থেকে উঠে এলে। আর,
ডান হাতে বাজালে যুদ্ধের দামামা,
কন্ঠে গাইলে ভাটিয়ালীর গান।
আমি তোমার মুখে দেখেছি ভালোবাসার ছবি।

কোথায় ছিলে তুমি এতকাল? কোন্ দ্বীপে বন্দী হয়ে
পুনর্জন্মের প্রার্থনা করছিলে?
আমি তোমার খোঁজে অভিযানের পর অভিযান করেছি,
আর তাল তাল তুলেছি খনিজ আকর।
উন্মাদের মত ছড়িয়ে দিয়েছি আমার সাত জন্মের স্মৃতি।

এইমাত্র তোমাকে দেখলাম।
আমার অনন্ত স্মৃতি আর স্বপ্নের আলো নিয়ে তুমি উঠে এলে।
আমি ধুয়ে দেব তোমার রক্তমাখা শরীর
ভালোবাসার অগাধ জলে।
তোমার চোখে দেখেছি বাঙলাদেশের ছবি।

এবার তুমি হাত বাড়াও, বন্ধু, পূবের পাহাড় থেকে পশ্চিমের
সমতলে।

গঙ্গায় পদ্মার ঢেউ জাগুক।
আমি তোমার মুখ দেখব নদীর আয়নায়,
তোমার মুখে আমার মুখ।

অন্বেষণ ॥

মনোরমা সিংহ রায়

তোমাকে কখনো দেখেছি কি? মনে
তাই ভাবি বার বার।
অথচ তোমাকে পারে না আঁকতে
চিত্রেও কোনো চিত্রকর। শুধুই আভাস তার
ধরা দেয় বুঝি একটু কখনো
তাই নিয়ে খুশি হৃদয় শুধুই
পেরিয়ে পেরিয়ে ব্যথার পাথার।।

কী চাই—তাই তো নিজেও জানি নে
শুধু ছুটে চলা হরিণীর মতো
উচ্ছল বেগে। কবে যে থামবো
কে বলতে পারে। তবুও জীবন
ছন্দ নিয়েছে। না হলে মিথ্যে
রঙ রূপ তার। স্বাদ নেই কোনো
দাম নেই আর।।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু — সুহৃদ গোপাল দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বন্দেমাতরম এবং যুগান্তর পত্রিকার মতবাদ প্রসঙ্গে যতদূর বুঝেছি তা বুঝিয়ে বলার জন্যে আমি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করবো—ঐ প্রবন্ধ অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী, বর্জন-নীতি, জাতীয় শিক্ষা, সালিসি আদালত, ইত্যাদির মাধ্যমেই স্বাধীনতার আদর্শে সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছানো সম্ভব। গ্ল্যাডস্টোনের সুবিদিত বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করে বলছি 'স্বায়ত্তশাসনের জন্য তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সরকারী শাসন যন্ত্রের কাজগুলির মধ্যে যা যা সম্ভব সুসম্পন্ন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।' জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব বলেই বন্দেমাতরম্ পত্রিকা অভিমত পোষণ করতেন। এই পত্রিকার মতে ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত স্বাধীন সরকার পরিচালনা করবার উপযুক্ততা আসতে পারে না। 'নিজেকে স্বাধীন-সরকারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলো'—পাশ্চাত্য দেশের রাজনীতির দার্শনিকগণের এই উপদেশের ভিত্তিতেই পত্রিকার মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদটি বন্দেমাতরম্ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর দ্বারা বিশ্লেষিত হওয়ার পর বেদান্তের সরল ও সহজ রূপটির সঙ্গে মিলিয়ে রচিত হয়েছিল। ইউরোপের প্রতিটি দার্শনিক গণতন্ত্রের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। হবসের সময় থেকে স্পেন্সর পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার ফরাসী বিপ্লব অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, জনগণের মৌন সম্মতি ব্যতীত কোনো শাসনতন্ত্র সচল থাকতে পারে না। কোনো শাসনতন্ত্র এবং শাসকগোষ্ঠী যতই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠুক বা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর দেশ শাসন করুক—যদি শাসনতন্ত্র সচল থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তার উপর জনগণের আস্থা রয়েছে। হবসের মতে, এমন একটি সময় ছিল যখন রাজা ও প্রজা একসঙ্গে মিলিত হোতো। কিন্তু কেন তারা মিলিত হোতো? জনগণের আস্থা [illegible] আছে কি-না — তা জানবার [illegible]। দার্শনিক লক মনীষী রুশোর কাছ থেকে তাঁর মতবাদটি গ্রহণ করেছিলেন। স্পেন্সরের 'জনগণ ও রাষ্ট্র' একই কথা বলেছে। প্রকৃতপক্ষে, শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক শর্তাধীন। ইতিহাসের পাতায় এর উল্লেখ না পাওয়া গেলেও যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র সচল রাখা যায় না। সর্বকালে শাসনতন্ত্র ততক্ষণই জীবিত যতক্ষণ পর্যন্ত দেশবাসী বা জনসাধারণ সেই শাসনতন্ত্রের প্রাণশক্তি যোগাতে পারে।

অরবিন্দ এই একই মতে বিশ্বাসী ছিল। অরবিন্দ এই মতটি সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে অভিনব রূপে উপস্থাপন করেছিল—ফলে অরবিন্দের নিজস্ব দার্শনিক চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটেছিল। 'জনসাধারণের মৌন সম্মতি' সম্পর্কীয় মতবাদটি এবং জনগণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী' সম্পর্কীয় মতবাদটি সাধারণত যার অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে—এই দুটি মতবাদই এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। অরবিন্দ জাতির ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ঐ একই মত পোষণ করতেন। সমাজ এবং মানুষ উভয়ের বিকাশের মধ্যেই সে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখতে পেতো। সে বিশ্বাস করতো যে, প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে বা ঈশ্বরের নির্দেশ মতোই জগতের সব কিছুই বিকশিত হবে। বেদান্ত এই কথাই বলে। 'জনগণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী'—কারণ জনগণ ঈশ্বরেরই প্রকাশ, সেই এক ঈশ্বর বহুর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছেন। আত্মসংযম ব্যতীত মুক্তি লাভ করা অসম্ভব। যদি কেউ ত্যাগ এবং সংযমের শিক্ষা না পায় তাহলে তার জীবনে মুক্তি দুরাশা মাত্র।

মহামান্য ধর্মাবতার যদি অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই দেশের জনগণের উপর ঐ নীতি প্রয়োগ করেন তাহলে কি ফল পাবেন? জনগণের মানসিক প্রস্তুতি আসবে, জনগণ স্বরাজ বা স্বাধীন-সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। আমি এই বিষয়ে প্রযোজ্য আমার যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। অরবিন্দ স্বরাজের কোন মূল্যায়ন করেননি। অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশী, বর্জন-নীতি এবং সালিসি-আদালতের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু যুগান্তর পত্রিকা 'সূচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্টভাবেই দাবি করেছে যে, স্বাধীনতা ব্যতীত দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। স্বদেশী প্রসঙ্গে যুগান্তর উপহাস করেছে। জাতীয় শিক্ষা, সালিসি-আদালত প্রসঙ্গে যুগান্তর মন্তব্য করেছে যে, ঐগুলি অবসর চিন্তার নামান্তর। যুগান্তর পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মতে—সম্পূর্ণ স্বাধীন না হলে দেশের কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। বন্দেমাতরমের সঙ্গে যুগান্তরের এইখানেই নীতিগত প্রধান পার্থক্য। অনুরূপভাবে আমি আপনাকে 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যগুলি দেখাবো। (চিত্তরঞ্জন ঐ সংবাদপত্র থেকে স্ব-নির্বাচিত উদ্ধৃতিগুলি পাঠ করেন ও সেগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিগুলি ব্যতীত চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের কিছু অপ্রকাশিত রচনাও পাঠ করেন।)
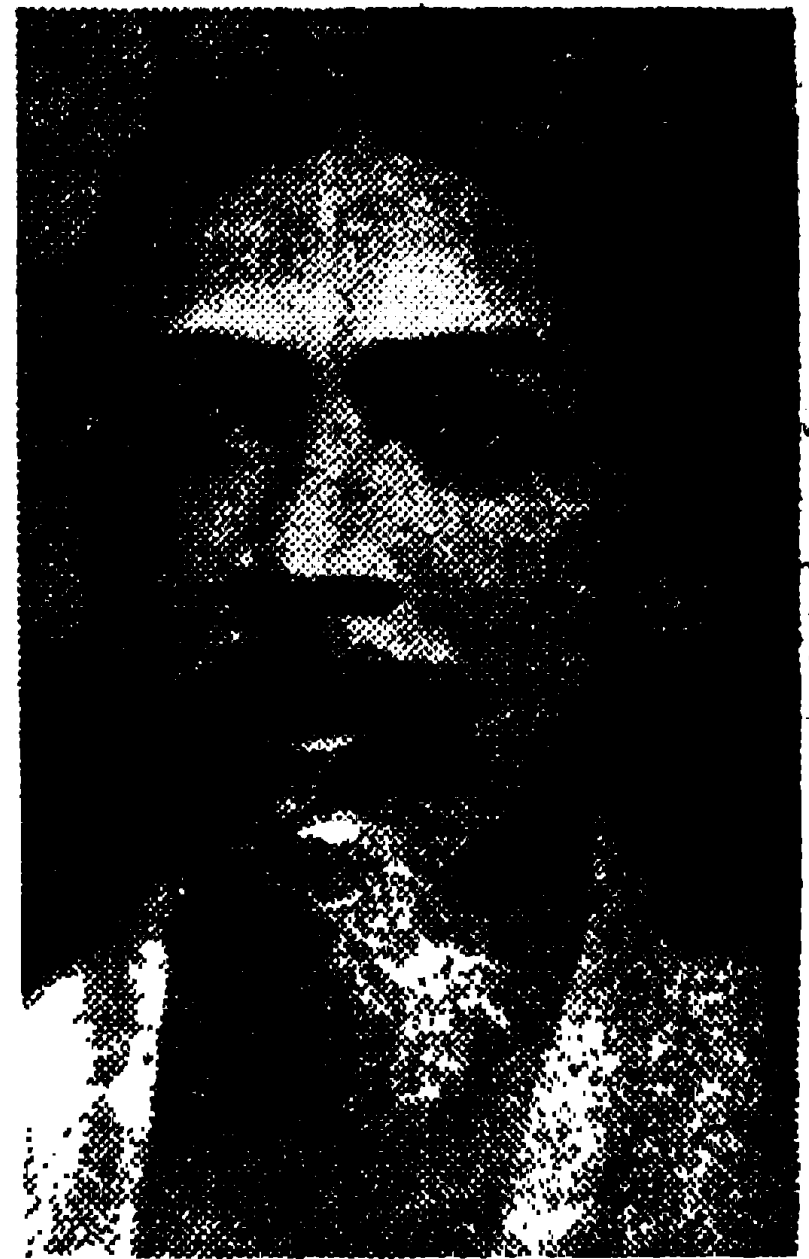
বন্ধুবর নর্টন সাহেবের যুক্তিতে ২১১৮ নম্বর নথিভুক্ত প্রবন্ধটি (একটি অপ্রকাশিত

প্রবন্ধ) লেখকের মতবাদের যন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়। চিঠিখানি বাংলা ভাষায় লিখিত কিন্তু চিঠিখানি যে অরবিন্দ ঘোষেরই হস্তাক্ষর সে কথা তিনি প্রমাণ করেন নি।

মিস্টার নর্টন : আমি মনে করি, ওটা (চিঠিখানির লেখা) সরোজিনীর হস্তাক্ষর।

চিত্তরঞ্জন : ঠিকই—হস্তাক্ষরটি কোনো মহিলার হস্তাক্ষরই বলে মনে হয়। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—চিঠির বক্তব্য সরোজিনীর মতবাদ প্রচারের (অর্থাৎ নর্টন সাহেবের কথামত 'লেখকের মতবাদ') যন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি না? কারণ, মহামান্য ধর্মাবতারের এজলাসে সরোজিনী ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত হয়নি! 'বর্জন-নীতি' সম্পর্কীয় ঐ প্রবন্ধটি যেহেতু লেখক প্রকাশ করেনি সেইহেতু আমি বলতে ভরসা পাচ্ছি—লেখক জানতো যে, ঐ প্রবন্ধটি লোকে ভুল বুঝবে। সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য, অপ্রকাশিত কোনো রচনার জন্য কি-যুক্তিতে অরবিন্দকে অভিযুক্ত করা যায়? জিজ্ঞাস্য, অপ্রকাশিত কোনো রচনার জন্য নিবেদন এই যে, আপনিই বলুন, কিভাবে এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি কারুর চিন্তাধারার পরিমাপক হিসাবে এক্ষেত্রে বিচার্য হোতে পারে? আমার মতে—বিচার্য হোতে পারে না। কারণ, প্রবন্ধের কথাগুলি সুস্পষ্টভাবে ঠিক অরবিন্দের আদর্শকে রূপায়িত করতে পারেনি। প্রবন্ধটির নির্ভুল পরিবেশন সম্পর্কে সন্দিহান হয়েই অরবিন্দ প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে দেয়নি। যে পর্যন্ত প্রমাণ না হয় যে, ঐগুলি গুপ্ত প্রচার-পত্র এবং গোপন জনমত সংগঠন করবার উদ্দেশ্যে ঐগুলি প্রচারিত হয়েছিল, সেই পর্যন্ত ঐগুলিকে কারুর মতবাদের যন্ত্র হিসাবে বিচার করা যায় না। আমি, মহামান্য ধর্মাবতারকে এই বিষয়টি বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। এই লেখা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অরবিন্দের ইচ্ছা থাকলে লেখাগুলি খুব সহজেই প্রকাশ করা সম্ভব হোতো। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটি নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে, জনমত বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতেই অরবিন্দ এই লেখাটি অপ্রকাশিত রেখেছিল—একটু সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। নর্টন সাহেব এই লেখাটিকে যেভাবে বিকৃত করতে চেয়েছিলেন, প্রকৃত পক্ষে লেখাটি সেই দোষে দুষ্ট নয়।

(এরপর চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের অন্য একটি অপ্রকাশিত রচনা 'হোয়াট ইজ একসট্রীমিজম' পাঠ করেন। এই সময় ঐ লেখার একটি বাক্য 'আইন মানুষের উপযোগী হবে, মানুষ আইনের উপযোগী হবে না', উদ্ধৃত করে জজসাহেব প্রশ্ন করেন, 'প্রত্যেকের আইন সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে কিনা?')

চিত্তরঞ্জন : নিশ্চয়ই আছে। করণ, প্রত্যেকের জীবনের নীতি স্বীয় বিবেকের নির্দেশাধীন হওয়া উচিত।

মিস্টার নর্টন : তাহলে সমাজের সত্তা কোথায়?

চিত্তরঞ্জন : অসহযোগ সম্পর্কে এই মামলায় জড়িত ব্যক্তিদের মতোই অন্যান্য দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় কি না? অন্যান্য দেশেও কি আইন-অমান্য আন্দোলন হয়নি? সেখনেও কি আইন অমান্য ক'রে লোকে কারাজীবন বরণ ক'রে নেয়নি?

মিস্টার নর্টন : করেছে। কিন্তু আইন উপযোগী নয়, এই যুক্তির ভিত্তিতে নয়।

চিত্তরঞ্জন : ঐ মতবাদ অরবিন্দের। কারণ অরবিন্দ মনে করে—আইন যারা প্রণয়ন করে করবে সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইন যাদের জন্যে প্রণয়ন করা হবে সেই জনগণের যদি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক (যেমন দেহযন্ত্রের মধ্যে বর্তমান) এবং ঐক্য না থাকে, তাহলে সেই আইনের ক্ষেত্রে 'ল ইজ রং' এই যুক্তিটি প্রযোজ্য। এই মামলার বিষয়বস্তু অনুযায়ী আদালত কারুর আদর্শকে বিচার করবে না। তবে কার্যতঃ যদি কেউ কোনো আইন অমান্য করে তাহলে অন্যান্য দেশের মতো এই দেশেও সেই অপরাধীর উপর দন্ডবিধি প্রযুক্ত হবে। শাসকগোষ্ঠী বা কর্তৃপক্ষ যে বিধিনিষেধ সৃষ্টি করেছেন, যারা সেইগুলিকে অন্যায় মনে করে অমান্য করবে তাদের আইন অনুযায়ী জরিমানা হবে বা শাস্তি হবে—আইন অমান্যকারীরা এর জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকে। অরবিন্দের ভাষায় এই দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বিজাতীয়, ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের অন্তরের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে কারুর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অরবিন্দ নির্দ্বিধায় এই একই কথা বার বার বলেছে। স্বৈরতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে বা অ-গণতান্ত্রিক সরকারের বেপরোয়া নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, প্রতিবাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে—এই দেশের শাসক দেশের জনগণের সঙ্গে বিযুক্ত, দেশবাসীর সঙ্গে বা জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার অন্তরের কোনো যোগাযোগ নেই। অরবিন্দের যুক্তি একান্তভাবেই উপযোগিতাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইংল্যান্ডের আইনের বুনিয়াদ ও উপযোগিতাবাদের—যা জাতির শ্রীবৃদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়ক। কর্তৃপক্ষও তাই চায়। আমরা সেই আইন সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি কারণ সেটি জনস্বার্থের সংরক্ষক এবং যা জনস্বার্থের সংরক্ষক তাকে নিশ্চয়ই জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির পরিপন্থী হিসাবে ভাবতে পারা যায় না।

[এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের লিখিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে অরবিন্দের পূর্ণ-স্বরাজের আদর্শ এবং কি ভাবে সেই ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যাবে তা প'ড়ে শোনান।]

চিত্তরঞ্জন : অরবিন্দের কাছে যদি কেউ বোমা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'সাহেব দেখলেই এই বোমাটি ছুঁড়বে কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে অরবিন্দ বলবে, 'এর দ্বারা কি সেই মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে?' এবং এর উত্তর একটি—না, এইভাবে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।

জজ সাহেব : যদি লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়, তাহলে কি বোমা ছুঁড়তে পারে?

চিত্তরঞ্জন : যদি নিপীড়নের মাত্রা সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার বলে যদি তারা উপযুক্তভাবে বলীয়ান হয়ে উঠে তবেই পারবে—নচেৎ নয়।

জজ সাহেব : অর্থাৎ এখানেও সেই উপযোগিতাবাদের যুক্তি—যুদ্ধ করবার উপযুক্ততা এলে তবেই যুদ্ধ করতে পারবে।

চিত্তরঞ্জন : যথার্থ, আমার যুক্তিগুলির সাহায্যে আমি ঐ কথাই বলতে চেয়েছি। অরবিন্দের মতে সহিংস পদ্ধতি সব সময়েই খারাপ এবং অহিংস পদ্ধতি সব সময়েই ভাল। অরবিন্দ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নিয়ে প্রবন্ধটির যে অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছে সেখানে সে প্রতিটি লক্ষ্যের মধ্যেই সত্যের অধিষ্ঠান আছে কি না তা পরীক্ষা করবার নির্দেশ দিয়েছে, অর্থাৎ তার নির্দেশিত পথে গেলে একমাত্র সত্যের সন্ধান পাওয়াই সম্ভব হবে। অরবিন্দ লিখেছে 'মুক্তির জন্য সংগ্রামের চিন্তা মহান ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় কি না?'—অরবিন্দের এই প্রশ্নটির উপর আমি মহামান্য ধর্মাবতারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যদি দন্ডবিধির এমন কোনো নির্দেশ থাকে—যা দুর্ভাগ্যবশতঃ নেই—যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার অর্থ রাজদ্রোহিতা, তাহলে অরবিন্দের উত্তর হবে—'তৎসত্ত্বেও আমাকে তা করতে হবেই। এ ক্ষেত্রে আমি নিরুপায়। এই উন্মাদনা আমার অন্তরের সম্পদ এবং আমার আত্মার কাছে এবং পরমাত্মার কাছে এই বিষয়ে আমি ঋণী—আমার জীবনের সব শক্তি দিয়ে ঐ ঋণ পরিশোধে আমি ...' আলোচনা প্রসঙ্গে অরবিন্দ এক জায়গায় বলেছে, 'ইহার ফলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে' এবং আমি অবাক হয়ে গেছি যে, ঐ উক্তিটিকে নর্টন সাহেবের মতো একজন ইংরাজী ভাষায় পান্ডিত ব্যক্তি কদর্থ ক'রে বললেন যে, অরবিন্দের ঐ উক্তি 'অরাজকতার পক্ষে উস্কানীমূলক'। 'অরাজকতা' শব্দটির ব্যবহারে অরবিন্দ সামাজিক বিশৃঙ্খলার আভাস দিতে চেয়েছিল—তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

অরবিন্দের লেখার মধ্যে কয়েকটি রূপকের ইঙ্গিত নর্টন সাহেব ঠিকমত ধরতে না পেরে ঐগুলির শব্দার্থের উল্লেখ করেছেন। যেমন, অরবিন্দ 'দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গ করতে হবে' এই শব্দগুলির সমন্বয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিল 'ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে এবং যে কোনো দুঃখ-কন্টকে হাসিমুখে মেনে নিতে'। অপর একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'দেশের মাটিকে রক্ত দিয়ে উর্বর করতে হবে'। কেবল শব্দার্থ ধরলে মনে হবে ব্যাপারটি ভয়ানক কিন্তু

ঐ কথাগুলির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুতির আমন্ত্রণ। যদি অসহযোগ আন্দোলন সুসংবদ্ধভাবে গড়ে ওঠার ফলে দেশের জনসাধারণ কর না দেয় তাহলে কি হবে? তাহলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে না করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ, খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, পরিণতিতে শাসকের বন্দুকের গুলি চলবে এবং ফলে দেশবাসীর রক্তে দেশের মাটি লাল হয়ে উঠবে।

আমি অসহযোগ আন্দোলনের যে পর্যায়টির উল্লেখ করলাম, যদিও সেই পর্যায়ে পৌঁছানো অসম্ভব কিন্তু, তবুও, আমাকে উল্লেখ করতে হোলো কারণ এই আলোচনাটির লেখক শেষ পর্যন্ত একটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—যা বিভ্রান্তি-মূলক। লেখকের একাগ্র দৃষ্টি ছিল 'লক্ষ্য' এবং 'লক্ষ্যে পৌঁছানোর পদ্ধতির উপর'। কিন্তু লেখার মধ্যে একটিই মাত্র জিজ্ঞাসা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, উক্ত লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর পদ্ধতি কতটা ফলপ্রসূ হবে এবং জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারবে কি না। আত্ম-নিগ্রহের প্রস্তুতি না থাকলে শাসিত প্রজা-বর্গের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আসবে না। লেখকের 'রক্ত', 'অন্ধকার', এবং 'মৃত্যু' শব্দগুলির ব্যবহার রূপকাশ্রয়ী! যদি আন্দোলন সমাজে ও জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তাহলে তা সানন্দে মেনে নিতে হবে অভিষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে। এইগুলি (নর্টন সাহেবের সিদ্ধান্ত মত)—বোমা, এবং অন্যান্য অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রের বা অন্যান্য হিংসাশ্রয়ী চিন্তার উপাদান যোগাবার জন্যে লিখিত হয়নি। আলোচনার মধ্যে 'বিপ্লব' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে—এই বিপ্লব শব্দটি সশস্ত্র বিপ্লবের (যেমন ফরাসী বিপ্লব) ইঙ্গিত দেয়নি। এই বিপ্লব —শান্ত, সংযত এবং সুসংবদ্ধ জনশক্তির অহিংসাশ্রয়ী প্রতিবাদ বা অসহযোগ।

মহামান্য ধর্মাবতার যদি ঐ অপ্রকাশিত রচনাটির মূল বক্তব্যগুলি পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে, অরবিন্দের বক্তব্যের সঙ্গে রচনাটির সঙ্গতির কোনো তারতম্য নেই। কিন্তু শব্দ বিশেষের বা অংশবিশেষের শব্দার্থের ভিত্তিতে ঐ রচনাটির বিচার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। সেই জন্য আমি আপনাকে প্রবন্ধগুলির আদ্যপ্রান্ত পড়তে অনুরোধ ক'রছি। মহামান্য ধর্মাবতার, অরবিন্দ আর একটি প্রবন্ধে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে। ঐ উক্তিতে 'স্ট্রাইক দি ব্লো' কথাগুলিকে নর্টন সাহেব বোমা ব্যবহারের নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ধর্মাবতার যদি সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন যে, এই প্রবন্ধটির কংগ্রেস অধিবেশনে রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতার সমর্থনে লিখিত হয়েছিল। অরবিন্দ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার ঐ অংশটি উদ্ধৃত ক'রে বলতে চেয়েছিলেন যে, রাসবিহারী ঘোষ জাতিকে স্বয়ংনির্ভর হতে বলেছেন।

এইবার, যে চিঠিখানিতে 'মিণ্টান্ন'-এর প্রসঙ্গ ছিল সেই চিঠিখানি সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করছি। ধর্মাবতার, এই প্রমাণটির উপর নির্ভর করে কোনোমতেই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, চিঠিখানি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের হাতে লেখা অথবা চিঠিখানি অরবিন্দের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত। তবে চিঠিখানি কি প্রমাণ করে? চিঠির ভিত্তিতে এইটুকু বলা যায় যে, সুরাট থেকে এক ভাই অপর ভাইকে একটি চিঠি লিখেছিল। যদি চিঠিখানিকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, এই দুই ভাই তখন সুরাটে ছিল। তাই যদি হয় তাহলে দুই ভাই-ই ষড়যন্ত্রকারী অনুমানে চিঠিখানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ, উভয়েই যখন সুরাটে রয়েছে তখন তারা সাক্ষাতে আলোচনা না ক'রে পত্রালাপ করবে কেন? চিঠিখানিতে লেখা ছিল,

We must have sweets all over India ready made for emergency I wait here for your answer".

সরকারী কৌঁসুলী সাহেবের জবানিতে স্বীকৃত হয়েছে যে, বারীন অরবিন্দকে 'মেজদা' বলে সম্বোধন করতো। বারীন এই চিঠি লেখার সময়ে কি এই সম্বোধন ভুলে গেছল? সে লিখেছে, 'ডিয়ার ব্রাদার'। এই দেশে কোনো ছোটভাই তার বড় ভাইকে ডিয়ার ব্রাদার বলে সম্বোধন করে না—অবশ্য বড় সব ভাইয়ের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ তাকে করলেও করতে পারে।

জজ সাহেব ঃ কেন করতে পারে?

চিত্তরঞ্জন ঃ কারণ মেজদা, সেজদা ইত্যাদি সম্বোধনের থেকে পৃথক করবার জন্য সবার বড় ভাইকে দাদা বলে সম্বোধন করার প্রচলন আছে. এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, দুই ভাই-ই যখন সুরাটে তখন বারীনের অরবিন্দের সঙ্গে পত্রালাপ খুবই বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছে। এই সম্পর্কে আর একটি তথ্য আমি মহামান্য ধর্মাবতারের নজরে আনতে চাই—দেখুন, বারীন চিঠিতে সই করেছে 'বারীন্দ্রকুমার ঘোষ', এবং এইভাবে নাম সই করবার কারণ দেখিয়ে নর্টন সাহেব বলেছেন যে, দুই ভাই-ই ইউরোপীয় আদব কায়দায় কেতাদুরস্ত হওয়ার জন্যেই বারীন পুরো নাম সই করেছিল। কিন্তু বারীন ইংলণ্ডে গিয়েছিল অনেকদিন আগে (যখন তার বয়স ছিল মাত্র এক বছর) এবং তার অনেক পরে আমি সেখানে ছিলাম। আমি ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে এসেছি প্রায় পনেরো বছর, তাই আমি ইংলণ্ডের বর্তমান আদব-কায়দায় কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা বলতে পারবো না। তবে আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন দেখেছি—ভাই ভাইকে চিঠি লেখার সময় পুরো নাম সই করতো না।

জজ সাহেব ঃ আমি আমার পুরো নাম সই করতাম না, আমার পদবী বাদ দিয়ে নাম সই করতাম।

চিত্তরঞ্জন ঃ সাধারণত কেউ পুরো নাম সই করে না—এই প্রথার ভিত্তিতেই আমি আপনাকে বলেছি যে, ভাইয়ের সঙ্গে পত্রালাপে ভাই, 'বারীন্দ্রকুমার ঘোষ'—এই রকম পুরো নাম সই করার মধ্যে যথেষ্ট অসাধারণত্ব রয়েছে।

আরো বিস্ময়কর হোলো যে, এই 'সুইট্‌স্ লেটার'টি অরবিন্দ সযত্নে রক্ষা করেছিল. কলকাতায় এনেছিল এবং বহুদিন ২৩ নম্বর স্কট্ লেনের বাড়িতে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু পুলিস ঐ চিঠিখানি সৌভাগ্যবশত সম্পূর্ণ ভিন্ন ঠিকানা (৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীট) থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিল। সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যেই বাস্তবতার অভাব লক্ষণীয় মাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছে। আমার সবিনয় নিবেদন, মহামান্য ধর্মাবতার এই চিঠিখানিকে অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ না করেন।

[এখন আমি মিস্টার গ্রীগানের সাক্ষ্য-বিবৃতিটি পড়ছি।]

মিস্টার গ্রীগানের বিবৃতি অনুযায়ী ২রা মে তারিখে ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীট ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ঠিকানায় অবস্থিত বাড়িগুলিতেও তল্লাসী চলেছিল। এই তল্লাসীর ফলে যে সমস্ত জিনিস সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলিকে পার্ক স্ট্রীট থানায় পাঠানো হয়। দেখা যাচ্ছে যে, ১৫ নম্বর গোপীমোহন দত্ত লেনের এবং মুরারীপুকুর বাগানবাড়ির সব জিনিসগুলি পার্ক স্ট্রীট থানায় পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে পাওয়া জিনিসগুলির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছিল। উক্ত চিঠিখানি (মিস্টার গ্রীগানের বিবৃতি অনুযায়ী) তল্লাসীর সময়ে তল্লাসকারীর নজরে পড়েনি। (তল্লাসীর পরে) থানায় গিয়ে চিঠিখানি পুলিসের নজরে পড়ে সুতরাং থানাতেই পরীক্ষা ক'রে অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারটি

সব দিক থেকেই ঘোরালো। মিস্টার গ্রীগান তাঁর সাক্ষ্যে জেরার উত্তরে) বলেছেন যে, তল্লাসীর সময়ে পাওয়া চিঠিগুলি খামের মধ্যে থেকেই বার করা হয়েছিল। তল্লাসীর সময়ে পাওয়া চিঠিগুলিকে একটি বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং যার মধ্যে ৬৪ খানি চিঠি এবং কুড়িখানি খাম পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ঐ বাণ্ডিলের মধ্যে কিছু চিঠি (যার খাম পাওয়া সম্ভব নয়) তল্লাসের পরেই রেখে দেওয়া হয়েছিল।

মাননীয় ধর্মাবতার এবং এ্যাসেসর মহোদয়গণ, এই মামলার মুখ্য আসামী অরবিন্দের পক্ষে আমার বক্তব্য আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনে যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আদালতের ঐতিহ্যমণ্ডিত বিচার কক্ষে আপনাদের সমীপে অন্য কেউ এই বক্তব্য পেশ করুক, কিন্তু যেহেতু এই গুরুদায়িত্ব আমার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে তাই আমার সাধ্য অনুযায়ী এই মামলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদির সমন্বয় আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করেছি। মামলার শুরু থেকেই একটি বিষয় আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করলেও আমি এখনও পর্যন্ত তা উল্লেখ করিনি, কারণ আমি মনস্থ করেছিলাম বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দী এবং নথিভুক্ত প্রমাণগুলির উপর আমার বক্তব্য পেশ করবার পর সুবিধামত উপযুক্ত সময়ে ঐ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

মহামান্য ধর্মাবতার জানেন যে, আমার বন্ধুবর নর্টন সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী অরবিন্দ এই ষড়যন্ত্র-মামলার প্রধান আসামী তাঁর মতে অসামান্য ধী-শক্তি এবং সংগঠন-শক্তির অধিকারী অরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই ষড়যন্ত্রের নির্দেশক বা পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে ধর্মাবতারের কাছে আমার বিনীত নিবেদন—যে ধরনের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আমার বন্ধুবর প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন সেই ধরনের ষড়যন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে অরবিন্দ সব সময়েই নৈরাশ্য পোষণ করতো। অরবিন্দের অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পর্কে আপনার স্বীকৃতি যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু আপনি সহৃদয়তাবশতঃ অরবিন্দকে যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তা নির্ভুল হলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যে ধরনের ষড়যন্ত্রের পুরোধা এবং নির্দেশক হিসাবে অরবিন্দকে দায়ী করা হয়েছে, সেই ধরনের ষড়যন্ত্রের সাফল্য অরবিন্দের বিচক্ষণ বিশ্লেষণে স্বীকৃতি পেতে পারে না অর্থাৎ এই পথে অভীষ্ট সিদ্ধির কথা অরবিন্দের মনে কখনো স্থান পায়নি। আমার বিজ্ঞ বন্ধু নর্টন সাহেব ঐ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হাজার রকমের ফিরিস্তি দিয়ে ব'লেছেন যে, ষড়যন্ত্রের জাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই বিরাট ষড়যন্ত্রের বাস্তবতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি এমন লোকেদের জড়িয়েছেন যাদের কোনো প্রকারেই ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে প্রমাণ করা যায় না। আমি এই সব উদ্ভট যুক্তিগুলিকে উপেক্ষা করবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি, এই ষড়যন্ত্র আমার বিজ্ঞ বন্ধুবরের কল্পনালোকের সম্পদ, আমি কখনই বলব না যে, উনি ব্যাপারটি সত্য বলে মনে করেন না; আমি একথাও বলছি না যে, তিনি যা যা বলেছেন সেগুলি সম্পর্কে তাঁর নিজের সংশয় রয়েছে অথবা তাঁর যুক্তির মধ্যে অনুমানের আশ্রয় মোটেই নেই। আমি মনে-প্রাণে ধরে নিয়েছি যে, তিনি ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত মনেই ধর্মাবতারের এজলাসে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন এবং আমার মতে তাঁর এই আত্মবিশ্বাসের এক এবং অদ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই সম্পর্কে দীর্ঘ দিন ধরে পুলিসের কাছে এই বিষয়ের পাঠ গ্রহণ। গত দশ মাস ধরে পুলিস তাঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছে এবং আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি যে তিনি মনে-প্রাণে ঐ শেখানো কথাগুলি বিশ্বাস করে আপনার এজলাসে পেশ ক'রেছেন

কিন্তু এই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রমাণগুলি অন্য কথা বলছে। আপনার সামনে যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—যেগুলি অভিশংসকের বিবেচনায় সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য—সেগুলি নিরীক্ষা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, সমগ্র ব্যাপারটি একটি চাপল্য—শিশুসুলভ ষড়যন্ত্র বা বিপ্লবের অভিনয়। অরবিন্দের মত লোকের পক্ষে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, একজন, দু'জন বা কয়েকজন ইংলণ্ডবাসীকে দেশের কয়েকটি স্থানে বোমার আঘাতে নিধন করলেই দেশ থেকে বৃটিশ সরকারকে অপসারণ করা সম্ভব হবে। আপনি যদি অরবিন্দকে বিচক্ষণ ও ধী-শক্তিসম্পন্ন বলে স্বীকার করেন তাহলে তাকে এই শিশুসুলভ ষড়যন্ত্র বা খেলাঘরের বিপ্লবের নায়ক হিসাবে বিচার করার কথা উঠতেই পারে না। এই কথাটি মামলার শুরুতেই ভাববার কথা ছিল বলে আমার মনে হয়েছে।

বিধিদত্ত অপরিসীম মানসশক্তির অধিকারী হওয়ার ভিত্তিতে অরবিন্দকে এই ষড়যন্ত্র-মামলার মূল নায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন করবার পক্ষে নর্টন সাহেবের জোরালো যুক্তিগুলিকে হয় নস্যাৎ করতে হবে নতুবা মেনে নিতে হবে যে, ঐ সব স্বীকৃত অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী অরবিন্দ, এই প্রমাণসাপেক্ষ খেলার বিপ্লবের পুরোধা। আমার এই ইঙ্গিতটি ছাড়া আপনি যদি অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি নিরীক্ষণ করেন তাহলেও (আমার মতে) দেখতে পাবেন যে, সাক্ষীদের বিবৃতিগুলি অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদি কেউ বলেন—অরবিন্দের গতিবিধি অনুসরণকারীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে অরবিন্দের যোগসূত্র প্রমাণিত হয় তাহলে আমি বলবো—এই প্রমাণগুলির উপর বিন্দুমাত্র আস্থা রাখা যায় না; তা ছাড়া পারিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের যোগাযোগ ঘটলেও ঘটতে পারে। যদি শাসক-গোষ্ঠীর সন্দেহ জন্মায় যে, তাঁদের বিরুদ্ধে এমন একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে যার ফলে তাঁরা গদিচ্যুত হতে পারেন তাহলে সাধারণ বুদ্ধির বিচারে এমনই কিছু গুপ্তচর পাওয়া যাবে যারা ঐ সন্দেহের যথার্থতা প্রমাণের জন্য বেশ কিছু মিথ্যা-প্রমাণ সংগ্রহ করতে দ্বিধা করবে না। এই প্রসঙ্গে আমি কোনো একজন প্রখ্যাত বিচারপতির লেখা বই থেকে একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করছি। 'সরকার এই রকম ক্ষেত্রে গুপ্তচর নিয়োগ করেন, যারা নানা ছলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ীতে যাতায়াত করে, আড়ি পাতে, নথিপত্রের চেহারা বদলে দেয়, চিঠি জাল করে'—সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার সামনেও যে সমস্ত প্রমাণগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে উক্ত উদ্ধৃতির ভিত্তিতেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, আমার বক্তব্যের মধ্যে যে-সব ইঙ্গিত আমি দিয়েছি সেইগুলি স্মরণে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই আপনি নিঃসন্দেহে ঐ সংগৃহীত প্রমাণ গুলিকে 'সাজানো-প্রমাণ' হিসাবে বাতিল করে দেবেন—এবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত চিঠি এখানে দাখিল করা হয়েছে সেগুলি প্রমাণ করে যে, অরবিন্দ একটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। এর উত্তরে আমি বলছি যে, ঐ চিঠিগুলি সে কথা প্রমাণ করে না। আমার বন্ধুবর নর্টন সাহেব চিঠিগুলি সম্পর্কে ঐ কথাই বলেছিলেন, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু যুবকের সঙ্গে অরবিন্দের সম্পর্ককে এমনিভাবে দেখানো হয়েছে যাতে কারুর পক্ষেই হাসি চেপে রাখা মুশকিল, মনে হয় ঠিক যেন মিস্টার পিকউইকের বিরুদ্ধে মিসেস্ বার্ডেল। আমার বন্ধুবর যখনই কোনো নথি-ভুক্ত প্রমাণ আদালতে পড়েছেন তখনই সেটির ব্যাখ্যা করেছেন সম্পূর্ণ নিজের কল্পনার ভিত্তিতে। ঐগুলিকে ঠিক যেমনটি ছিল সেইমত পড়লে—(অর্থাৎ যে কারণে লেখা হয়েছিল সেই কারণটির পরিপ্রেক্ষিতে পড়লে আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি যে) যে কথাই লেখা থাকুক না কেন সেগুলি অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে না।

(ক্রমশঃ)

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ১০ ॥

জ্বর গায়ে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সজল হাজরার মোড়ে এসে দেখল, আজ বাস চলছে। গতকাল সিপাহীজী ঠিকই বলেছিল। শহরের আবহাওয়া বদলে গেছে। প্রতি মোড়ে মিলিটারী, মেসিনগান নিয়ে তৈরি। পথে পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেও মিলিটারী। শহরটা যেন সামরিক বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ধর্মের জন্য ঠাণ্ডা মাথায় যাদের মানুষ খুন করতে হাত নিসপিস করে—সেই মহান ধর্মযোদ্ধারা, এখন অন্ধকার বিবরে ঢুকে পড়েছে। এখন শুধু বিভিন্ন স্কুলে, পার্কে রিফিউজীদের ভিড়।

দুধারে রাস্তাগুলোয় আজ রক্তের দাগ নেই। কদিন পরে আজ জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে। কাল রাত্রে নাকি পুলিশ সারা শহর থেকে সমস্ত মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেছে।

বাসের একজন বয়স্ক যাত্রী পাশের সঙ্গীকে বলল, 'শুনেছ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল আসছে। তাই রাস্তা সাফ'।

'আর এসে কি হবে?—উঃ কী নিষ্ঠুর! ভাবতে পারো, মানুষ কতো পশু হতে পারে!'

সজলের কানে টুকুরো টুকরো কথা ভেসে আসছিল। সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক। তার একমাত্র চিন্তা কতক্ষণে আব্বাসের বাসায় পৌঁছবে!

বাসটা এল্‌গিন রোড পেরিয়ে এলো। চৌরঙ্গী রোডের ওপর দাঙ্গার কোন চিহ্ন নেই।

সজল মনে মনে খুশি হোলো। আব্বাস নিশ্চয়ই ভালো আছে। গিয়ে দেখবে হয়ত সেতার নিয়ে বসে বসে জোনপুরী আলাপ করছে।

আব্বাসকে এইভাবে দেখতে পাওয়া যাবে—এই ছবিটা কল্পনা করে নিতে সজলের বেশ ভাল লাগছিল।

হ্যাঁ, এদিকটা অনেক স্বাভাবিক। দোকানপাট খোলা।

গড়ের মাঠের ঘাসের ওপর, গাছের ওপর, সকালের অজস্র রোদ। এ রোদের মধ্য দিয়ে, দূরের দিকে তাকালে, মনে হয় না যে এই কলকাতায় গত তিনদিন ধরে একটা নৃশংস, নিষ্ঠুর, রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়ে গেছে! এই তিনদিনে কেবল ধর্মের জন্য, জাতের জন্য, ভাইয়ের বুকে ভাই বুকে বিনা দ্বিধায়, বিনা লজ্জায়, বিনা অপরাধে আমূল ছুরি বসিয়ে দিয়েছে!

অথচ একথাটা কাউকে এই মুহূর্তে বলা যাবে না। কাউকে বলা যাবে না যে, ভেবে দেখ—তুমি একটা মানুষ, পশু নও! বলা যাবে না, ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়ো! কোন ধর্ম মানুষ হত্যা করার কথা বলে না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের রথ কি পেছনের দিকে, প্রাগৈতিহাসিকতার নিষ্ঠুর, বর্বর অন্ধকারের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছে!

বাসটা এসপ্লানেডে এসে দাঁড়াতে সজল নেমে পড়ল। সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে সোজা হেঁটে গেলে, ওয়েলেসলি পেরিয়ে মৌলালির কাছাকাছি, আব্বাসের বাসাটা পড়বে। বাসটা কলেজ স্ট্রীট হয়ে শ্যামবাজার যাচ্ছে।

সজল দ্রুত হাঁটছিল। ক্রমশঃ ভয় ভয় করছিল তার। এখন ভাঙা দোকানপাটও চোখে পড়ছিল। দু'এক জায়গায় আগুন লাগানোর চিহ্নও আছে। মনে হয় এ অঞ্চলে দু'দলেরই লড়াই হয়েছিল।

সজলের ছুটে চলতে ইচ্ছা করছিল, যেন একটু দেরি হলেই আব্বাস কোথাও বেরিয়ে যাবে, দেখা হবে না তার সঙ্গে। অথচ গত তিনদিন ধরে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই সজল কী গভীর উন্মুখ হয়ে আছে!

তিনদিন তো নয়—তিন যুগ!

আর মিনিট চার পাঁচেকের মধ্যে সজল আব্বাসের কাছে পৌঁছে যাবে। আব্বাসকে আজ সজল জড়িয়ে ধরবে। বলবে, দ্যাখ, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, আমরা নতুন যুগের মানুষ। এই নতুন যুগে, জাত ফাত মানি না আমরা, শুধু মানুষকে মানি।

সজল এসে পড়েছে প্রায়।

কিন্তু আজ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে কেমন অস্বাভাবিক লাগছে, সব অচেনা অচেনা লাগছে! এখন মনে হয়, আব্বাস কোনোকালে ছিল না এখানে! সজলও কখনো আসে নি!

ভাঙা খোলা দরজার সামনে এসে সজল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আব্বাস নেই! সারা ঘরে লড়াইর চিহ্ন। সেতারটা মেঝের এক ধারে খাটের পাশে পড়ে আছে। সজল চমকে উঠল, একি! এতো রক্তের দাগ কেন মেঝেতে! 'আব্বাস—আব্বাস—'

চিৎকারটা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর থেমে গেল এক সময়। কিন্তু কোন উত্তর এলো না।

সকালের রোদ শহরের গৃহশীর্ষে এখন কেমন বিষণ্ন মৃত্যুর মত বিছিয়ে পড়ে আছে।

সজল অনেকক্ষণ বোবা চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল। আব্বাস কি তবে নেই? তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আব্বাস!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছিল। ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, কেউ যেন উঠে আসছে।

বৃদ্ধ এ্যাংলোইণ্ডিয়ান বাড়ীওয়ালা ঘরে ঢুকল।

'আব্বাস? এডমিটেড ইন দ্য মেডিক্যাল কলেজ'।

সজলের মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না।

'নো, নো, পারহ্যাপস নট ইয়েট ডেড'।

সজল অবাক হয়ে বলল, 'কবে এ ঘটনা ঘটল?' আশ্চর্য! এই কথাটুকু বলতেও তার গলা ধরে আসছিল।

'অন সিক্সটিন্থ'।

সজল চলে যাচ্ছিল। বুড়ো আবার বলল 'এক লেডী ভি আয়ী থাঁ। উনকো ভি হসপিটাল যানে বোলা। ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড—ম্যান হ্যাজ বিকাম বীস্ট'—গড'।

বাড়ীওয়ালা মাথা নিচু করে তেমনি নেমে গেল।

একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে সজল দ্রুত আসছিল।

এনকোয়্যারির কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরতি শুকনো মুখে দাঁড়িয়েছিল।

সজল কাছে যেতেই চোখ তুলে তাকাল।

সজল দেখল, ওর দু'চোখে অশ্রু টলটল করছে। বুঝতে পারল, আরতি চরমভাবে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে এখন।

ব্যগ্র হয়ে সজল জিজ্ঞেস করল, কেমন আছে আব্বাস'?

আরতি কোন উত্তর দিল না। মুখ নিচু করে রইল শুধু। চোখ ছাপিয়ে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

ধরা গলায় সজল জিজ্ঞেস করল 'কখন'?

'শেষ রাত্রের দিকে'।

একটা পাষাণ মূর্তির মত সজল স্থির দাঁড়িয়ে রইল। পাশের বোবা দেয়ালটা এখন তার চোখে পড়ছে না। বাইরে সকালের আলো ছায়াচ্ছন্ন, পৃথিবী নিঃশব্দ।

ষোলো তারিখে বিকেলের দিকেও এ অঞ্চলে কিছু হয় নি। শুধু একটা চাপা উত্তেজনা. চাঞ্চল্য দেখা [illegible] আরতি বিকেলের দিকে আব্বাসের কাছে এসেছিল।

চেনা পথ, পরিচিত পাড়া বললেই হয়। আরতি তাই সাহস করে বাড়ীর কাউকে না বলেই চলে এসেছে।

না এসে সে কিছুতেই থাকতে পারছিল না। আব্বাসকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার।

ও যেমন মানুষ, হয়ত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল!

পথে আসতে আজ গা-টা ছম্‌ছম্‌ করছিল। একটা গলির কাছে এসে দেখল, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরতির মনে হোলো, পানবিড়ির দোকান আছে লোকটার। যেতে আসতে দেখত, লোকটা তার দিকে তাকিয়ে আছে! আরতি ভয়ে দ্রুত চলে আসছিল। লোকটাকে দেখে কেন যেন তার সন্দেহ হচ্ছে আজ।

আব্বাসের ঘরে এসে দেখে, সেতার বাঁধছে সে। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কলকাতায় এতো নৃশংস ঘটনার কোন ছায়া পড়ে নি এখানে।

আরতি চুপ করে দেখছিল। শুনছিল, ভীমপলশ্রীর পর্দায় আব্বাস সেতারটা বাঁধল। তারপর ধীরে ধীরে আলাপ করতে লাগল একটু।

কি ভেবে সেতার বাজানো বন্ধ করে বলল, 'আরে, বোসো'?

আরতি বলল, 'না বসার সময় নেই। কিছু শোনেন নি?'

আব্বাস অবাক হয়ে বলল 'কি শুনব?'

'বাঃ সে কি? দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে।'

আব্বাস হেসে বলল, 'ও'। 'তবে তুমি এলে কেন?'

আরতি কথা বাড়াতে চায় না। সময় নেই তার।

বলল, 'শুধু একটা কথা বলার জন্য এসেছি।'

আব্বাস সেতারটা তুলে নিয়ে বলল, 'বলবে, বলবে নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু সেতারটা ভারি সুন্দর বাঁধা হয়েছে।' বলেই একটু মীড় টানল। —'ভীমপলশ্রীর ঢিমে গৎ শুনেছ? শোনো নি? গৎটার ধরতাইটা কী সুন্দর।'

আব্বাস গৎটার ধরতাই বাজাল। নতুন ধরনের, সচরাচর এ গৎ শোনা যায় না।

আরতি অবাক হয়ে শিল্পীকে দেখছিল।

কতক্ষণ পরে আব্বাস আরতিকে এগিয়ে দেবার জন্য বেরিয়েছিল। ঠিক এগিয়ে নয়, আজ বাসার কাছ পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসবে। কলকাতা যে হিংস্র পশুর অরণ্য হয়ে উঠেছে, বাইরে বেরিয়ে আব্বাস তার কিছু আভাস পেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

এতক্ষণ দু'জন পাশাপাশি হাঁটছিল। দুটো গলির মোড় পেরিয়ে এল ওরা। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই হয়। তবে ক্রমশঃ নিরাপদ মনে হচ্ছে।

আব্বাস বলল, 'এক মিনিট একটু দাঁড়াও। আমি চট্ করে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনছি। কিছু ভয় নেই।'

আরতি অপেক্ষা করছিল। —হঠাৎ একটা লোহার মত শক্ত কর্কশ হাত পেছন থেকে খপ করে আরতির মুখটা চেপে ধরল। আর একটা হাত গলার কাছে।

আরতি চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু সামান্য একটু গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ হল না।

ডাকাতের মত সেই লোকটা আরতিকে গলির অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। আরতি মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রাণপণে হাতপা ছুঁড়ে বাধা দিচ্ছিল।

কিন্তু না, আর বোধহয় পারবে না। লোকটার গায়ে প্রচণ্ড জোর। একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত গুণ্ডাটা তার শরীরটাকে শূন্যে তুলে গলির মধ্যে প্রায় ঢুকে পড়েছে।

আরতি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছে ক্রমশঃ!

হঠাৎ কারুর দৌড়ে আসার শব্দ। একটা প্রচণ্ড চিৎকার—"খবর্দার"। বলার সঙ্গে সঙ্গেই আব্বাস কি করে আরতিকে ছিনিয়ে নিল! আরতি কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

আব্বাস লোকটার মুখোমুখি রুখে দাঁড়াল।

আরতি সেই অবচেতন অবস্থায় বলল, 'একি করছেন? চলুন'। আরতি কোনভাবে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে।

আব্বাস কোন বলছে না। চুপ করে দুটো লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা সাঁ করে কোমর থেকে একটা ছোরা বের করতেই আব্বাস বাঁ হাত দিয়ে তার কব্জিটা জোরে চেপে ধরল।

লোকটা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আব্বাসের মুঠিটা বজ্রের মত শক্ত। আরতি দেখল, হাতটা কী কায়দায় মুচড়ে ধরতেই ছোরাটা ঠক্ করে নিচে পড়ে গেল গুণ্ডার হাত থেকে আব্বাস চাকুতে পা দিয়ে বাঁটটা ধরল। লোকটা কিছু না বলে [illegible] অন্ধকারে ঢুকে পড়ল।

আব্বাস এতক্ষণে কথা বলল—'আকবর তোমকো হম পহচানতে হৈ'। তারপর পেছন ফিরে আরতিকে কাঁদতে দেখে রেগে বলে উঠল 'কাঁদছ? কেন নিজেকে বাঁচাতে পারো না? ঐ পশুগুলোকে—'

আরতি কাঁপা গলায় বলল, 'থাক্। চলুন, চলুন। এক্ষুনি আবার হয়ত দল বেঁধে এসে পড়বে।'

গলিটার শুরু থেকেই হিন্দুপাড়া শুরু হয়েছে। আরতি একাই যেতে পারবে।

আরতি দাঁড়ালো।

আব্বাস বলল, 'আমি আসি এবার'।

'না, দাঁড়ান'।

অনেকক্ষণ আরতি কিছু বলতে পারল না। কিছুক্ষণ আগে যে ঘটনা ঘটল, তাতে তার বুদ্ধি, চেতনা এখনো অবশ হয়ে আছে।

'কিছু বলবে?'

আরতির গলার স্বর কাঁপছিল। বলল, 'একটা অনুরোধ। আজ রাতে, এখান থেকে

গিয়েই আপনি চিৎপুরে চলে যান। কি? যাবেন তো?'

আব্বাস হাসল একটু।

আরতি অনুনয়ের সুরে আবার বলল, 'কথা দিন আমাকে। লোকটা আপনাকে ছাড়বে না। আপনি চলে যান। প্লীজ'।

আব্বাস বলল, 'আজ রাতটা দেখি। কাল সকালে তেমন বুঝলে যাব। তুমি কিছু ভেবো না। ওগুলো ছোটলোক। রুখে দাঁড়ালেই কুকুরের মত পালায়।— যাক, আমি আসি।'

আরতি বলল, 'আপনি গেছেন কিনা জানব কি করে?'

আব্বাস যেতে যেতে বলল, 'আমি জানাব। তাছাড়া এতো ভাবছ কেন? এ-গণ্ডগোল দুদিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দ্যাখো হয়ত কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আব্বাস চলে গেল। মোড়টা ফিরতেই তাকে আর দেখা গেল না।

সজল হাঁটতে হাঁটতে আরতির কাছে গতকালের ঘটনা শুনছিল। বেলা এখন দুপুর। আব্বাসকে বাগমারীর এক কবরখানায় সমাধিস্থ করার জন্য তার আত্মীয়েরা নিয়ে গেছে। ওরা দুজন পেছনে পেছনে গেছল। কবরখানার বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছে, আব্বাসকে তার কাকা কী স্নেহের সঙ্গে মাটির বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর মাটি চাপা দেওয়া হোলো।

আরতি নিঃশব্দে কাঁদছিল। সে-ই আব্বাস, গতকাল বিকেলেও যে সেতারে ভীমপলশ্রী আলাপ করছিল, যার সঙ্গে তার গত পাঁচ বছরের কতো পরিচয়, আলাপ মীড় তান— এমনি কতো সুরের অলংকার যার কাছে ফুল ফুটে ওঠার মতো সহজ সুন্দর ছিল, সে-ই আব্বাস এখন মাটির ধূসর শীতল ক্রোড়ে সমাহিত!

আব্বাস আরতির কে ছিল, কতখানি ছিল তা কেউ-ই জানবে না!

একটু শব্দ হতে সজল ফিরে তাকিয়ে দেখল, আরতি পাঁচিলটা ধরে আছে বটে, তবু টলে পড়ছে।

সজল তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল আরতিকে। কিন্তু একটু জল, একটু জল চাই! আরতি মূর্ছা গেছে।

সজল কি করবে, চিৎকার করে কাউকে ডাকবে কিনা বুঝতে পারছিল না। 'আরতি! আরতি'। নাঃ, কথা বলছে না।— কোথাও কেউ নেই। রাস্তা সম্পূর্ণ নির্জন। শুধু দুপুরের আকাশে সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ রোদ গৌড়সারঙ্গের মত করুণ বিষাদ হয়ে ছড়িয়ে আছে।

কেউ জানে না, আব্বাসের সঙ্গে আরতির সম্পর্কটা কোন অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল, সে-বাঁধনের গভীরতা কত, সে-বাঁধন ছিঁড়তে গেলে জীবনের শিরা-উপশিরা, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আসে কিনা!

আরতির বাসার বারান্দায় বসে বসে সজল কথাগুলো ভাবছিল। রিক্সায় আসতে আসতে আরতি আজ সব কথা বলেছিল সজলকে। কিছু আগে ওরা কবরখানা থেকে ফিরেছে। আরতি স্নান করতে গেছে।

সজল কতক্ষণ বসে বসে একমনে ভাবছিল।

আরতি এসে দাঁড়াল। চোখদুটো ফোলা ফোলা। বলল, 'আজ আর বাবা-মা-র সংগে আলাপ করিয়ে দিলাম না।'

সজল বলল, 'থাক'। আমি আসি এখন।'

'একটা কথা বলব বলে তোমাকে বসিয়ে রেখেছি। যাবার সময় ওর ঘরটা একবার দেখে যাও। আর কিছু নয়, শুধু সেতারটা নিয়ে যেও। রেখে দিও ওটা তোমার কাছে। তুমিও তো ওকে ভালোবাসতে!'

সজল দেখছিল, আরতি অন্যদিকে মুখ করে কথা বলছে। যাতে সজলের দিকে তাকাতে না হয়।

সজল বলল, 'আমি যাচ্ছি ওদিক দিয়েই। কিন্তু তুমি আর কেঁদো না। আমি জানি, তোমার এ-দুঃখ কোনদিন যাবে না। আমারও মা, বাবা, বোন মারা গেছে। আব্বাস আমার সবচেয়ে আপনার, সবচেয়ে বন্ধু ছিল। সেও চলে গেল!'

আরতি তেমনি করেই ওদিকে তাকিয়েছিল। এবার চোখ ফেরাল। ধীরে ধীরে বলল, 'ও কোনদিন আমাকে কিছু বলেনি। সেদিন হঠাৎ বলল, সজল বলেছিল, তুমি নাকি আমাকে ভালোবাস? সত্যি? একটু থেমে সেতারটা বাঁধতে বাঁধতে বলল, সেতার শিখতেই জীবন চলে যাবে! এর বেশি আর কিছু ভাবতে পারি না, আরতি। সজলদা, সেদিন আমার চোখে জল এসেছিল। না, দুঃখে নয়, আনন্দে। আমি যে ভালোবাসি, সেটা ও এতোদিনে বুঝেছে বলে, আমার কী যে আনন্দ হচ্ছিল!'

আরতি চুপ করল।

বেলা মাথার ওপর থেকে নেমেছে। সব, পথের ওপর বস্তীর দরিদ্র ছায়া পড়েছে এখন।

আরতি আবার বলল, 'বাড়ীটা দেখে গেলে! মাঝে মাঝে আসবে না? তুমি এলে ভালো লাগবে। আমাদের কথা ত কেউ জানত না, একা তুমি ছাড়া। বাবা, মা কেউ জানে না।'

সজল যেতে যেতে বলল, 'আসব, আরতি। সময় পেলেই আসব।'

'তোমার ঠিকানাটা কি সজলদা?'

সজল বাসের টিকিটটার ওপর ঠিকানাটা লিখে দিল।

একটু এগিয়ে এসে দেখল, আরতি তেমনি সেইখানেই সজলের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

ঘরটা তেমনি খোলা। ছাদের ওপর তেমনি প্রচুর রোদ। আজ কিন্তু দড়িটায় আব্বাসের সাদা সার্টটা হাওয়ায় উড়ছে না, যেটাকে প্রথম দিন একটা বলিষ্ঠ, সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রতীক বলে সজলের মনে হচ্ছিল।

সজল ঘরে ঢুকল। কিন্তু গা-টা শিউরে উঠল একবার। কে যেন পেছনে আসছে! সিঁড়িতে সজলের পায়ের শব্দের সংগে তারও পায়ের শব্দ মিশে যাচ্ছে! সজল পেছনে তাকালো। না, কেউ নয় তো! সে একা, ভীষণ একা!

শেষ দুপুরের তন্দ্রালস নিথর উদাসীন স্তব্ধতা এখন বাড়ীগুলোর ছাদে থিতিয়ে উঠছে। দূরে সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে লোক চলছে কিছু কিছু। সেই মোটা ভুঁড়িওয়ালা লোকটা তেমনি চৌকির ওপর বসে আছে। বাড়ীওয়ালা সাহেবের শোবার ঘরের জানালার খড়খড়িও বন্ধ।

এ মুহূর্তে সজলের মনে হোলো পৃথিবীতে কোথাও কিছু ঘটে নি। সব আগের মত চলছে। শুধু এই ঘরটা একটা নিষ্ঠুর শূন্যতায়, একটা নিষ্ঠুর নীরব করুণ যন্ত্রণায় আর্তস্বরে কেঁপে কেঁপে উঠছে!

সজল ঘরের মাঝখানে কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। যেন আব্বাস এক্ষুনি এসে পড়বে, কোথাও বাইরে গেছে।

শুধু অলস, শুধু অবাস্তব কল্পনা, শুধু স্বপ্ন দেখা।

ধীরে ধীরে সজল সেতারটার দিকে এগিয়ে গেল, মেঝে থেকে তুলে নিল। হঠাৎ একটা তারে হাত লাগতে একটা ভারি মিষ্টি সুর বেজে উঠল। নিখুঁত জোয়ারির জন্য অনেকক্ষণ ধরে সেই সুরটা ঘরের মধ্যে বাজল, তারপর কান্নার মত মিলিয়ে গেল কখন!
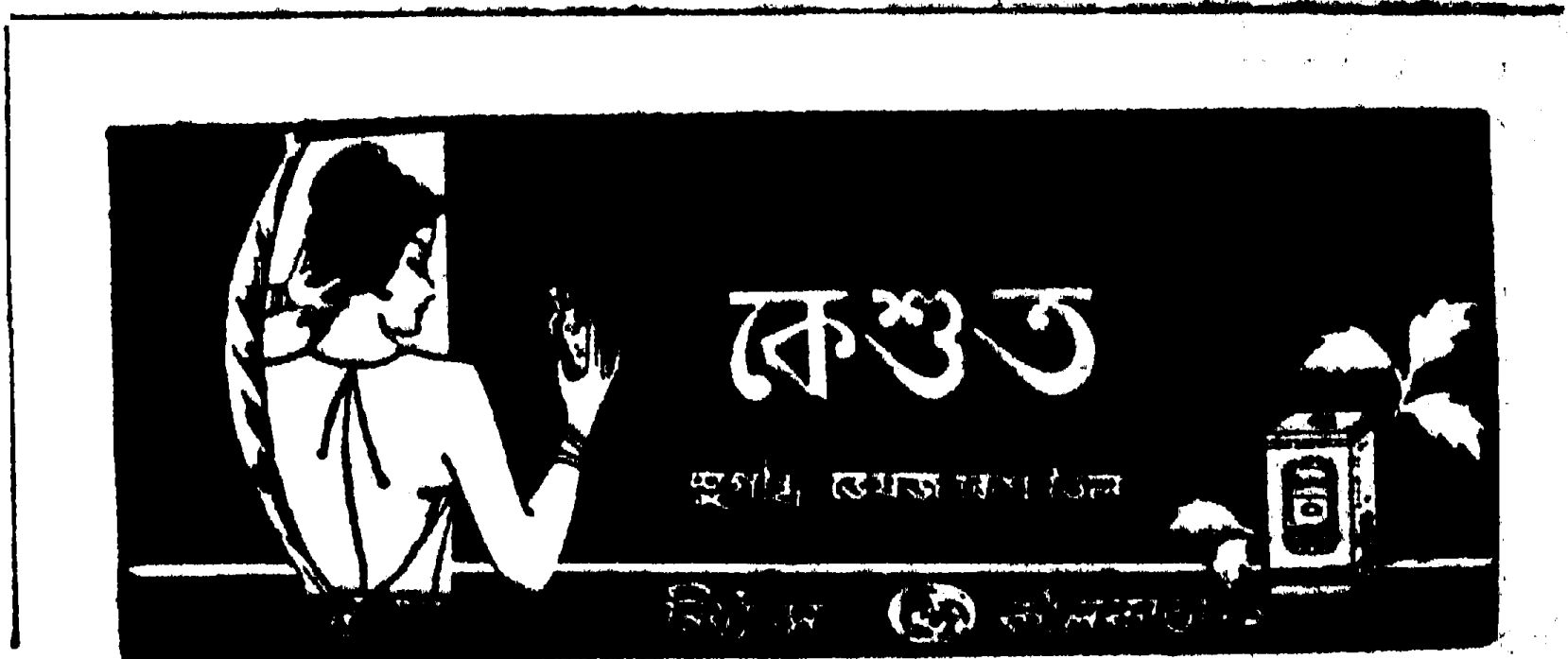
আব্বাস বোধ হয় সেতারটা গতকাল বেঁধেছিল।

কি রাগে বেঁধেছিল? ভৈরবীতে? প্রথম দিন সজলকে আব্বাস ভৈরবী আলাপ করে শুনিয়েছিল।

কিন্তু এখন ভীমপলশ্রীর সময়। বেলা পড়ে আসছে। আকাশে, রোদে এখন দিনের ছুটির করুণ সংলাপ বাজবে!

বড় আদরে, স্নেহে ভালোবেসে সজল সেতারটা নিজের রুমাল দিয়ে মুছতে লাগল। না, যন্ত্রটার তেমন ক্ষতি হয় নি। জুড়ির তার দু-একটা ছেঁড়া, একটা কান-ভাঙা।

সজল সেতারটা নিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎ দেয়ালের দুটো ছবির দিকে নজর পড়ল। ছবি দুটো তেমনি চেয়ে আছে। ওদের চোখে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা জড়ো হয়ে উঠেছে!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শেষবারের মত আব্বাসের ঘরটার দিকে সজল তাকাল। *এ-ঘরে সে আর কখনো আসবে না!*

—না কেউ কোথাও নেই, কেউ কখনো ছিল না! আব্বাস বলে কাউকে সজল কখনও চিনত না, এই নামে কেউ তাকে কখনো মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় নি! সব স্বপ্ন, সব মিথ্যা, সব ভুল।

তবু এই ঘরটার জানালাগুলো কেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না? কেন দেয়ালের ছবি দুটো এখন অস্পষ্ট? বাইরের এতো রোদ কেন এই মুহূর্তে শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর নির্জন হয়ে উঠছে?

।। ১১ ।।

সকালবেলা সজল খবরের কাগজ খুলেই গান্ধীজীর সোদপুরে পৌঁছবার সংবাদ জানল। বিকেলের প্রার্থনা সভায় তাঁকে দেখা যাবে।

অবশ্য গত কয়েক দিন ধরেই কথাটা শোনা যাচ্ছিল, গান্ধীজী কলকাতা আসছেন। রক্তস্নাত কলকাতা, গান্ধীজীর আসার কথা শুনেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এরা সকলেই যে, গান্ধীবাদী অ-সাম্প্রদায়িক, তা নয়। বরং তার সংখ্যা হাজারে একজনও নয়। তবু গান্ধীজী আসছেন, এইটিই একটা মন্ত্রের মত কাজ করছিল, একটা প্রশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

হ্যাঁ, গান্ধীজীকে দেখতেই হবে। সারাটা সকাল এই আনন্দে, উত্তেজনায় কাটার পর, দুপুরবেলায় সজল শিয়ালদা যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ল। কেন যেন তার মনে হচ্ছিল, খদ্দরের কাপড় জামা পড়ে গেলে ভাল হত। এ মনে হওয়ার কোন যুক্তি নাই। তবে পুজোর সময় যেমন পবিত্র পট্টবস্ত্র পরতে হয়, এও কিছুটা তেমনি। কিন্তু খদ্দরের কাপড়-জামা তৈরী করাবার মত তার পয়সা নেই। সজল মন থেকে ঝেড়ে ফেলল কথাটা।

শিয়ালদায় পৌঁছে অবাক! এ রকম প্রচণ্ড ভিড় সে জীবনে কখনো দেখে নি। সারা কলকাতা শহর, শিয়ালদা স্টেশনেই ভেঙে পড়েছে। চারদিকে কেবল মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে-মেয়ে। এতটুকু পা ফেলবার জায়গা নেই। রেল-কর্তৃপক্ষ এর আগেই কয়েকটা স্পেশ্যাল ট্রেন দিয়েছেন। এখনও দিচ্ছেন।

বহু কষ্টে ভিড় ঠেলে কোনক্রমে সজল টিকিট কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়াল।

'একটা সোদপুরের টিকিট দিন তো?'

পাশের একজন লোক উপেক্ষার হাসি হেসে বলল, 'টিকিট? আজ সোদপুরে যেতে আবার টিকিট লাগে নাকি মশায়?'

সজল বলল, 'টিকিট লাগবে না ট্রেনে উঠতে হলে?'

সজলের এই অজ্ঞতায় লোকটা এবার হো হো করে হেসে উঠল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সজল কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'একটা টিকিট দিন, ও মশায় শুনছেন?'

কয়েকবার ডাকার পর একজন লোক বিরক্ত হয়ে এগিয়ে এল, 'এত চিল্লাচ্ছেন কেন?'

'চিল্লাচ্ছি, টিকিটের জন্য। আর কেন চিল্লাব?' সজলের রাগ ধরে গেছল।

'কোথাকার টিকিট?'

'সোদপুরের।'

লোকটা বিরক্ত হয়ে পয়সা নিয়ে টিকিট দিতে দিতে নিজের মনে গজরাতে লাগল, হাজার হাজার লোক বিনা টিকিটে যাচ্ছে, আর উনি যুধিষ্ঠির এলেন!

স্তব্ধ সজল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ!

লোকটা তৎক্ষণে ফিরে গিয়ে একজন মহিলার সঙ্গে আবার খোশগল্প শুরু করল।

দরজার কাছে অনেক কষ্টে কোনভাবে এক পায়ে ভর দিয়ে সজল দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

বহু দিন পরে সজল একসারি নারিকেল গাছ, ছোট ছোট ঘর, ধানমাঠ দেখতে পেল। এখন ধান পাকার সময় নয়। তবে ধানে দুধ এসেছে। অমৃতপুরের মাঠ এখন সবুজের সমুদ্র হয়ে উঠে।

এই মাঠ, নারিকেল শ্রেণী, ছোট ছোট ঘর দেখলেই সজলের নিজের গ্রামের কথা মনে হয়। মনে হয় মিনুর কথা! এই ধান ক্ষেত, পুকুর, বাঁশবন, তার ছোট্ট খড়োঘর—ওরা ক্ষীণ ঘর—সব, সব যেন মিনুর করুণ চোখের দৃষ্টির আলোয় কেমন নীরব ম্লান হয়ে ওঠে! একটি ছোট ঘর—যে ঘরে মিনু আছে, একটু ছোট উঠোন,—যে উঠোনে সকাল দুপুর সন্ধ্যা মিনুর চঞ্চল পদশব্দ বাজে,—সেই ঘর সেই উঠোন, সেই দুষ্টু দাঁতনু, ক্ষুধাতুর বোনটাকে জীবনে কোনভাবে আর একবার ফিরে পাওয়া যায় না! শুধু আর একটিবার।

ট্রেনটা সোদপুরে স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

আবার সেই শিয়ালদা স্টেশনের দৃশ্য। যাত্রীরা কে আগে যাবে, তারই প্রতিযোগিতা। কোথাও শৃঙ্খলা নাই, শালীনতা নাই।

দূরে প্রার্থনামঞ্চের এক কোণে গান্ধীজী চুপ করে বসে আছেন। গায়ে সাদা খদ্দরের উত্তরীয়। সজলের মনে হচ্ছিল, এই নৈঃশব্দের মধ্যেই সারা ভারতবর্ষের পুঞ্জীভূত বেদনা, কান্না সঞ্চিত হয়ে আছে! কলকাতায় যে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে পঁচিশ হাজার, তাদের সকলের দীর্ঘশ্বাসের মেঘ, এই একটি মানুষের বুকের ভেতর জমে জমে পাথর হয়ে গেছে!

একটি ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল মাইকে। হাঁ গান্ধীজী ভাষণ দিচ্ছেন।

বিশ্বময়ের বাসাটা এমন কিছু দূরে নয়। পরের দিন সজল ভোর থেকে উঠেই হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে। কিন্তু বাড়ীর কাছে এসেই ভাবল, আর একটু দেরি করাই উচিত ছিল। এত সকালে কলকাতার মানুষ ওঠে না। ফিরে গিয়ে, সামনের পার্কে একটু কাটিয়ে আসবে কিনা ভাবল সজল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'কলিং বেল' টিপল।

একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ ঘরের মধ্যে কোথাও বেজে উঠল।

আওয়াজটা সজলের ভাল লাগছিল না। সুরেলা নয়। যন্ত্রের কাজই এই। মানুষের মনের কথা, সে বোঝে না। বুঝলে এই নিদ্রিত ঘরের মধ্যে সে আরও একটু আস্তে আরও একটু সুরেলা হয়ে বাজত। যাতে কারুর ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, অথবা কেউ ঘুম ভেঙে ক্ষুব্ধ না হয়।

'আসছি'— অনেক দূর থেকে যে গলার স্বর ভেসে এল, সে স্বর শুনে কলিং বেল এর রুক্ষতার অপরাধ বিনা দ্বিধায় ক্ষমা করা যায়।

একটা খট করে আওয়াজ শোনা গেল। তারপর কপাটের দুটো পাল্লা খুলে একটি সুন্দর মুখ বেরিয়ে এল।

না, সে মুখে অসময়ে ঘুম ভাঙার কোন বিরক্তি কোথাও নেই।

সজল জিজ্ঞেস করল, 'বিশ্বময় আছে বাড়ীতে?'

'দাদা ঘুমুচ্ছে, আপনি আসুন'

চেহারা দেখেই সজল বুঝতে পেরেছিল এ বিশ্বময়ের বোন। তেমনি সুন্দর চোখ মুখ। একটু রোগা বলে লম্বা দেখায়। বয়স আর কত হবে। দশ-বার বছর।

একটা সোফা দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি'।

সজল বসে বসে ঘরটা দেখছিল। সামনেই রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ছবি। তার পাশেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়। পূর্বদিকের দেয়ালে গান্ধীজীরও একটা ছবি আছে। আলমারি ভর্তি বই। সমস্ত ঘর জুড়ে একটা পরিচ্ছন্নতার ছাপ, মার্জিত রুচির পরিচয় সর্বত্র ছড়ানো।

সজল তার নিজের শ্রীহীন, লক্ষ্মীছাড়া ঘরটার কথা ভাবছিল।

চটি পায়ে শব্দ করতে করতে দ্রুত কেউ নেমে আসছিল।

বসার ঘরে ঢুকেই বিশ্বময় অবাক। 'আরে সজল যে, কী ব্যাপার?'

বিশ্বময় মনের আনন্দে চীৎকার করে কথা বলছিল।

মেয়েটি এই সময় আর একবার ঘরে এল।

বিশ্বময় বলল, 'এ হল আমার বোন, শুচিতা।'

শুচিতা হাতজোড় করে নমস্কার করল।

সজল বলল 'সে আমি দেখেই চিনেছি, তোমার বোন।'

'এসো, আমার ঘরে এসো।

শুচি শোন, এ হল, আমার বন্ধু, সজল ভট্টাচার্য। ভালো কবিতা লেখে। আর ভালো ছাত্র ছিল। নে, এবার বেশ করে চা-টা খাওয়া'।

পূর্ব দিকের জানালা খুলে দিতেই এক রাশ রোদ বিশ্বময়ের ঘরে এসে ঢুকল। সূর্য জানালার কাছাকাছি উঠেছে। পার্কের পূর্ব কোণের উঁচু দেবদারু গাছটার ঘন সবুজ শীর্ষ চোখে পড়ছে।

'মুখটা ধুয়ে আসি কেমন?'

বিশ্বময় মুখ ধোবার জন্য নিচে নেমে গেল। সজল দেখছিল, ওর ছোট্ট খাটটার মাথার কাছে একটা টেবিলের ওপর অনেক-গুলো বই ছড়ানো। ঘরের মেঝেতেও এখানে ওখানে বই, ম্যাগাজিন ছড়িয়ে পড়ে আছে। পড়ার টেবিলের ওপরও বই ভর্তি। কোনভাবে একটু জায়গা ফাঁক করে, একটা খাতা আর ফাউন্টেন পেনটা রাখা। ঘড়িটা বালিশের কাছে পড়ে আছে। বালিশের ও-পাশে একটা বাঁধানো 'গীতবিতান'।

সজলের খুব ভালো লাগছিল। বিশ্ব-ময়ের ঘরটা গোছানো নয়, শৃঙ্খলাও খুব নেই। তবু, এমন একটা সৌন্দর্য এর মধ্যে আছে যে, নিচের সেই বসার ঘরটা এর কাছে কিছু নয়। আসলে এই ঘরেই বিশ্বময়কে মানায় যেমন ওর উচ্ছৃঙ্খল চুলগুলোকে, আঁচড়ানো সিঁথিকরা চুলের চেয়ে বেশি ভালো লাগে সজলের।

স্বাভাবিকভাবে অগোছালো জিনিসের মধ্যেও সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্য মানেই সুশৃঙ্খল 'ডিসিপ্লিনড' কিছু নয়। হ্যাঁ, তাইত! পথের ধারের ঘাসে যে ফুল ফোটে, সে ফুল ত বাগানের ফুলের মত সাজানো নয়। তাই বলে কি, সে ফুল কম সুন্দর?

আরে, দেওয়ালে ঐ বড় ছবিটা কার আঁকা। চমৎকার ত! সজল উঠে গেল ছবি-টার কাছে, ভাল করে দেখবে বলে। একটা লোক বিস্তীর্ণ মাঠে লাঙল করছে। মাঠের ওপারে, দূরে নীল-নীল গ্রাম। সারা মাঠ জুড়ে বিকেলের শেষ রোদ্রের সমাধি। হ্যাঁ, পূব দিকটা অন্ধকার হয়ে আসছে। শুধু একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে মৃত রোদের স্পর্শ যেখানে পড়েছে, সেই জায়গাটুকু ছাড়া আর সারা ছবিটার রং মাটির রঙের মত।

ছবিটা সজলকে ভীষণভাবে টানছে। এ তার গ্রামের মানুষের ছবি। কিন্তু শিল্পী এই সাধারণ বিষয়টাকে একটা অসাধারণ জগতে নিয়ে গেছে। আশ্চর্য! নিশ্চয়ই কোন বিদেশী বড় আর্টিস্টের ছবি হবে!

শুচিতা ঘরে ঢুকল। একজন চাকরের হাতে একটা ট্রে।

সজল বলল, 'আচ্ছা, ঐ ছবিটা কার আঁকা?'

শুচিতা টি-পয়-এ চা, খাবার সাজাতে সাজাতে গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল 'ভ্যান-গগের।' ভ্যানগগের নাম শুনেছেন ত?' ও হরিহরদা তুমি বাজার চলে যাও।'

'না শুনিনি।'

বিশ্বময় তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল। সাদা খদ্দরের পাজামা, আর সেই চিরন্তন গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবিতে ওকে বেশ লাগছে দেখতে।

সজল শুচিতার দিকে তাকাল। ওর ফ্রকটাও সাদা খদ্দরের। হাতে কোন গহনা নেই। কিন্তু এই নিরাভরণ নিটোল দুটি হাতও কী আশ্চর্য সুন্দর!

ঈশ্বর যাদের দেন, তাদের সবাইকে বুঝি এমনি করেই দেন।

শুচিতা চা করতে করতে বলল, 'দাদা, ঐ ছবিটা ভ্যানগগের, না?'

বিশ্বময় হো হো করে হেসে উঠল। 'জীবনে ঐ একটাই ছবি এঁকেছিলাম। সেটাও অপরের নামে তুই চালিয়ে দিলি!'

সজল অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল।

শুচিতা মুখ টিপে টিপে হাসছে তখন।

শুধু চা নয়, তার সঙ্গে দুটো করে টোস্ট, অমলেট।

তিনজনেই বসে বসে খাচ্ছিল, গল্প করছিল।

শুচিতা বলল, 'সজলদা সেবার কি হল শুনুন না। পুলিশ ঘর সার্চ করে, বই-পত্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে যখন চলে যাচ্ছে, তখন ওমা দেখি, দাদার ঐ ছবিটা একজন পুলিশ ইন্সপেকটার হাতে করে নিয়ে পালাচ্ছে। সেই দেখে না, নিচে দৌড়ে গেলাম। বললাম, শুনুন, অন্য কিছু নিয়ে যান, কিন্তু প্লীজ, ঐ ছবিটা না। ইন্সপেকটার ভদ্রলোক, ফিরে তাকাল। হাসল একটু। বলল, এটা তোমার দাদার ছবি? তাই না? হ্যাঁ দাদার ছবি ত! খেয়াল হল ত আঁকল। সেবার যখন গ্রামে গেছল, তখন এঁকেছিল। ইন্সপেকটার ছবিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, তোমার দাদাকে বলো, আমাকে যেন একটা ছবি এঁকে দেয়। বোলো তার কোন ভয় নেই, আমি কাউকে তার কথা বলব না। আমি বললাম, বাঃ আপনি ত পুলিশ। দাদাকে ধরে নিয়ে যাবেন, বেত মারবেন। হুঁ, আর দাদা আপনাকে ছবি এঁকে দেবে? বয়ে গেছে আমার বলতে।'

হাসল ভদ্রলোক। তা ততক্ষণে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েছে।

শুচিতা থামল। বিশ্বময় বলল, 'তোকে আবার একবার ধন্যবাদ দিলাম। তুই কত কষ্ট করেছিস।'

শুচিতা দুষ্টুমি করে মুখ ভ্যাংচালো একবার।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

একটি উপেক্ষিত দিক

ভাই প্রমীলা,

'অঙ্গনায়' আপনি তো অনেক কথা লেখেন। কত বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু আমার মতো গৃহবধূর মনে হয়েছে সমস্যার যে প্রতিনিয়ত ওঠাপড়া তার কোনো হদিশ আপনার লেখায় আজো পাইনি। কথাটা সরাসরি বলে ফেললাম বলে কোন দোষ নেবেন না। কারণ, খুব সাজিয়েগুছিয়ে কথা বলার টেকনিক আমার মতো মেয়েদের আয়ত্তের বাইরে। তবে, যদি ঘরকন্নার প্রসঙ্গ আনেন অথবা ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে হয়, তাহলে আমি একেবারে পাকা গিন্নি। সেকথা শুনলে আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাববেন যে, এই ঘরের বউ এতো কথা জানলো কোথেকে? আপনি নির্ঘাত ধরে নেবেন যে, আমি অনেক লেখাপড়া জানা। আসলে কিন্তু তা নয়। লেখাপড়া আমার বেশি হয়ে ওঠেনি। এজন্য অযথা আমার স্বর্গগত মা-বাবাকে দায়ী করে লাভ নেই। পড়াশোনায় আমার আগ্রহের ছিল একান্ত অভাব। তাই এই বস্তুটির সঙ্গে আমার খুব তাড়াতাড়ি সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেয়েদের আসল পাঠশালা হলো সংসার। এখানে সারা জীবন দেখা আর শেখার শেষ নেই। আজ সে কথাই আপনাকে শোনাবো। দোষত্রুটির জন্য আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

লেখাপড়া জানি না বলে আমার বিয়েতে কোন অসুবিধা হয়নি। পড়াশোনায় মেয়ে যদি দড় না হয় তবে আজকাল মা-বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসেন। তখন তাঁদের একমাত্র চিন্তা যে, এই মেয়ের বিয়ে দেবেন কি করে? যতো চিন্তা কেবল মেয়েদের বেলায়। ছেলেরা লেখাপড়া না করলে কোন মা-বাবা কি এতো চিন্তিত হন? যাক সে কথা। সত্যি কথা বলতে কি, আমার জন্যও বাবা একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। আমার মা কিন্তু বাবার এই চিন্তা মোটেই আমল দিতেন না। মা বলতেন, মেয়ে আমার লেখাপড়া জানে না এমন তো নয়। শুধু স্কুলের ছাপ নেই। এমনিতে ওকে আমি যা শিখিয়েছি তার মূল্য নেহাত কম নয়। আর মেয়েদের লেখাপড়া শেখার আসল উদ্দেশ্য তো ভবিষ্যতে ছেলেপুলেদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়া। সে শিক্ষা আমি যেমন পেয়েছি, আমার মেয়েও তেমনি পেয়েছে। আর ভাগ্যফলে যদি আমার মতো শাশুড়ি পায় তাহলে তো কথা নেই। ওর শিক্ষা ষোলকলায় পূর্ণ হবে। মায়ের একথায় বাবার মুখে হাসি ফুটতো। সে দৃশ্য আমার আজো মনে আছে।

মায়ের কথা আমার জীবনে ঠিক খেটে গেছে। ভাগ্যফলে মায়ের মতো শাশুড়ি পেয়েছিলাম। আমার জানাশোনায় যা অপূর্ণতা ছিল, সেসব এখানে এসে জেনেছি, শুনেছি। সাজিয়েগুছিয়ে ঘরকন্না করা, অতিথিআপ্যায়ন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ব্যবহার সবই শিখেছি। এই সঙ্গে আরো শিখেছি, স্বামী-সন্তান এবং সংসারের কল্যাণে ব্রতপালন। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি যে, মেয়েরা হলো গৃহলক্ষ্মী, ঘরের শোভা। মা আমাকে সেভাবেই তালিম দিয়েছিলেন। মা চাইতেন, আমি সুগৃহিণী হই। বলতে বাধা নেই যে, শাশুড়ির শিক্ষায় মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছে। এত বড়ো একটা সার্টিফিকেট নিজের সম্বন্ধে নিজেই দিয়ে দিলাম। কিন্তু সত্যি কথা সহজ করে না বললে যে ঋণের বোঝা ভারী হয়ে যাবে, ভাই।

আজকাল দিন বদলেছে। এখন স্কুল-কলেজের তকমা না হলে মেয়ে অচল। শিষ্টাচার, রান্নাবান্না, হাতের কাজ এ-সবের কদর কেউ খুব-একটা করে না। আপনি হয়তো বলবেন, আজকের আর্থিক সংকটের দিনে একার উপার্জনে সংসার চলে না। তাই মেয়েদের ডিগ্রি থাকলে আপদে-বিপদে রোজগারের একটা সাপোর্ট পাওয়া যায়। একথা মানতে আমি একশোবার বাধ্য। তা বলে কিন্তু সব লেখাপড়া জানা মেয়েই চাকরি করেন এমন নয়। বরং এটাকে একটা ফ্যাশান বলা চলে। সেই যে একটা কথা আছে না, যে দিনের যা। তেমনি আজকের দিনে ডিগ্রিধারী মেয়ে বিয়ে করা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একথার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, আমি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার বিরোধী। বরং নারীপ্রগতির যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে তার সম্পূর্ণ সাফল্য আমারও কামনা। আমিও চাই যে মেয়েরা আরো বেশি করে এই প্রগতির অংশীদার হোক। তাই মেয়েদের নানা সাফল্যের খবর যখন জানতে পারি তখন গর্বে আমার বুক ভরে যায়।

মেয়েদের এই প্রগতির অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করার জন্য কিছু কিছু ব্যর্থ চেষ্টাও আমাদের দেশে হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের। আর সে-দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন একজন মহিলা। সারা বিশ্ব আজ তাঁর চিন্তাধারায় নতুন আলোক পাচ্ছে। অথচ সেদেশে এরকম স্পর্ধামূলক প্রচেষ্টার কথা ভাবতেও অবাক লাগে। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, কয়েক বছর আগে একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার বিরোধিতা করে খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর এ ধরনের কথায় মেয়েদের অবশ্য কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এরকম চিন্তাধারাই অবিবেচনাপ্রসূত। এই অবিবেচনার শেষ এখানেই নয়। কিছুদিন আগে আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করলেন সদম্ভে। অবশ্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহিলা হলেও তাঁকে তিনি রেয়াৎ করলেন। কিন্তু কাঁচের ঘরে বাস করে ঢিল ছুড়লে তার পরিণাম যেমন আত্মঘাতী হয়, এই বিবৃতিও তাঁর পক্ষে ঠিক সেই ধরনের। কারণ তাঁর স্ত্রী একজন সংসদ সদস্যা। এমনি ঘটনা কিন্তু ঘটেই চলেছে। এইতো [illegible] খবরের কাগজে একটি ঘটনা পড়ে রীতিমতো তাজ্জব হয়ে গেলাম। জনৈক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বেকার মেয়েরা তাঁদের কর্মসংস্থানের দাবী করেন। কিন্তু তিনি নাকি কর্মপ্রার্থী সেই মেয়েদের সরাসরি বলে দিয়েছেন যে, শিক্ষিত বেকার যুবকরাই কাজ পাচ্ছেন না, কাজেই তাঁদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, চাকরিটা কি মেয়েদের শখের ব্যাপার না তাঁরা চাকরি করেন প্রয়োজনের তাগিদে? ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা অপ্রয়োজনীয় এরকম ধারণার একমাত্র কারণ হলো মেয়েদের অগ্রগতি রুদ্ধ করা। এই ঘটনার দু একদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর এক ঐতিহাসিক ঘোষণায় আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। প্রধানমন্ত্রী সেই ঘোষণায় জানালেন যে, বিবাহিতা মহিলাদের সরকারী চাকরিতে নিয়োগ এবং বহাল থাকার ব্যাপারে প্রচলিত আইনে যে বাধা আছে তা দূরে করা হবে। এখন কয়েকটি ক্ষেত্রে চাকরিরতা অবিবাহিতা অথবা বিয়ে করলে তাঁদের চাকরি যেতে পারে। এই

বৈষম্য রহিত হবে। লোকসভা সদস্যরা বিপুল হর্ষধ্বনির দ্বারা তাঁর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান। এসব দেখেশুনে আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে নারীপ্রগতির আলো আর আঁধার পাশাপাশি চলেছে। কিন্তু নারীপ্রগতির যে দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তা দিনে দিনে আরো উজ্জ্বল হোক নারী হিসেবে এ তো আমার স্বাভাবিক কামনা।

আমি এই প্রগতির যথার্থ অনুরক্ত বলেই শিক্ষাকে ফ্যাশানদার হতে দিতে আমার মন সায় দেয় না। আমাদের বাড়ির নিচের তলায় এক নতুন ভাড়াটে এসেছে। স্বামী-স্ত্রীতে দুজনের সংসার। মেয়েটি বি-এ পাশ। তা বলে এতটুকু দেমাক নেই। যেমন আলাপী তেমনি মিষ্টি স্বভাবের। ওর কর্তা আপিসে চলে গেলে প্রায়ই এসে আমার সংগে আড্ডা জমায়। পাশকরা মেয়ে অথচ আমার মতো লেখাপড়া না-জানা গেরস্ত বউয়ের সংগে আড্ডা দিতে ওর এতটুকু সংকোচ নেই। সেদিন কথায় কথায় হঠাৎ বলে বসলো, আচ্ছা বলুন তো, ছেলেরা সবসময় পাশ করা মেয়ে খোঁজে কেন? বিয়ের পর সেই তো হেঁসেল ঠেলতে হয়। তবে এই বাতিক কেন? তারপর নিজেই হেসে জবাব দিল, লেখাপড়া জানা মেয়েদের রুটি বোধহয় বেশি গোল হয় আর লেখাপড়া না জানলে তাঁদের রুটি নিটোল গোলাকৃতি হয় না। উত্তর শুনে আমি হেসে মরে যাই।

কিন্তু রোগের প্রকৃত কারণ সন্ধান ওর সঠিক। আজকাল তো এবাড়ী ওবাড়ীতে দেখি যে নতুন বউরা প্রায়ই কমবেশি পাশ করা। কিন্তু এতে কাজের কাজ তেমন হচ্ছে না। প্রায় শ্বশুরবাড়িতেই মেয়েদের লেখা-পড়ার চর্চা আর এগোয় না। লেখাপড়া শেখার আসল উদ্দেশ্য এখানে মাটি হয়ে যায়। অব্যবহারের দরুন লোহায় মরচে ধরে। অনভ্যাসের জন্য লেখাপড়ার ধারও নষ্ট হয়ে যায়। তখন আর ছেলেপুলের প্রাথমিক পড়া-শোনার দায়িত্ব নিতেও তারা উৎসাহ বোধ করেন না। তাই ছেলেপুলের পড়াশোনা শুরুর সংগে সংগে প্রাইভেট মাস্টারমশাইয়ের দরকার হয়। এতো কষ্ট করে যে লেখাপড়া শেখা তার সবটাই প্রায় বৃথা গেল। অথচ লেখাপড়ার ব্যাঘাতের অজুহাতে ঘরকন্নার কাজেও মেয়েদের হাত পাকে না। এর ফলে একূল ওকুল দুই-ই যায়। একদিকে যেমন তাঁরা সংসারী হয়ে উঠতে পারেন না, তেমনি অন্যদিকে সযত্নে আরও লেখাপড়াও কাজে লাগাতে পারে না। আমার সেই পরিচিত বউটির কথায় বলি, এ বেদনা রাখার জায়গা নেই। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা যে, আর দশটা ঘর সাজানোর সামগ্রীর মতোই ঘরের শোভা বাড়ানোর জন্যই ছেলেরা পাশ করা মেয়ের খোঁজ করেন।

আমাদের মা-ঠাকুমা স্কুলে পড়ার সুযোগ পাননি। সে-যুগে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা মুখে আনাই ছিল গুরুতর অপরাধ। পুঁথিগত না হলেও ব্যবহারিক শিক্ষায় তাঁরা মোটেই দড় ছিলেন না। আমাদের সময়ে লেখাপড়ার অবাধ প্রসার না হলেও সুযোগ ছিল। সে সুযোগ আমি এবং আমার মতো অনেকেই নিইনি। কিন্তু আমরা বাপের বাড়িতে মায়ের কাছে আর স্বামীর ঘর করতে এসে শাশুড়ির কাছে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছি। তাই আমাদের জীবনে কোথাও আটকালো না। আজ এই শিক্ষার দিক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। স্কুল-কলেজী শিক্ষা এখন একমাত্র অবলম্বন। জীবন শুরু করতে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই এখন পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে। কারণ, ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়া তাত্ত্বিক শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। তাই নারীর স্বাভাবিকতাও আমাদের মধ্যে ক্রমেই লুপ্ত হচ্ছে। এর একমাত্র প্রতিকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার সুযোগকে আরো প্রসারিত করার সংগে সংগে মা-শাশুড়ির জীবনের অংগীভূত পাঠগ্রহণ। যাতে প্রতি মা-ই নিজের মেয়ের সম্বন্ধে বলতে পারেন, শিক্ষা আমি যেমন পেয়েছি আমার মেয়েও তেমনি পেয়েছে। তাহলে জীবনে চলার পথে কোন বাধাই দুরতিক্রম্য হবে না। ঘরকন্না, অতিথিআপ্যায়ন আর শিষ্টাচারে মেয়েদের শিক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল হবে। আজকের বিভ্রান্তি কাটিয়ে আমরা আবার নিজেদের মধ্যে ফিরে আসবো। সেই নারীপ্রকৃতি আবার নতুন কীর্তি রচনা করবে।

এদিকটা আপনার বাদ পড়ে গিয়েছিল। ধরিয়ে দিলাম। অপরাধ নেবেন না, ভাই।

জনৈকা গৃহস্থ বধূ

আদিনাথ মন্দির চট্টগ্রাম

সোনার বাঙলা

শিপ্রা আদিত্য
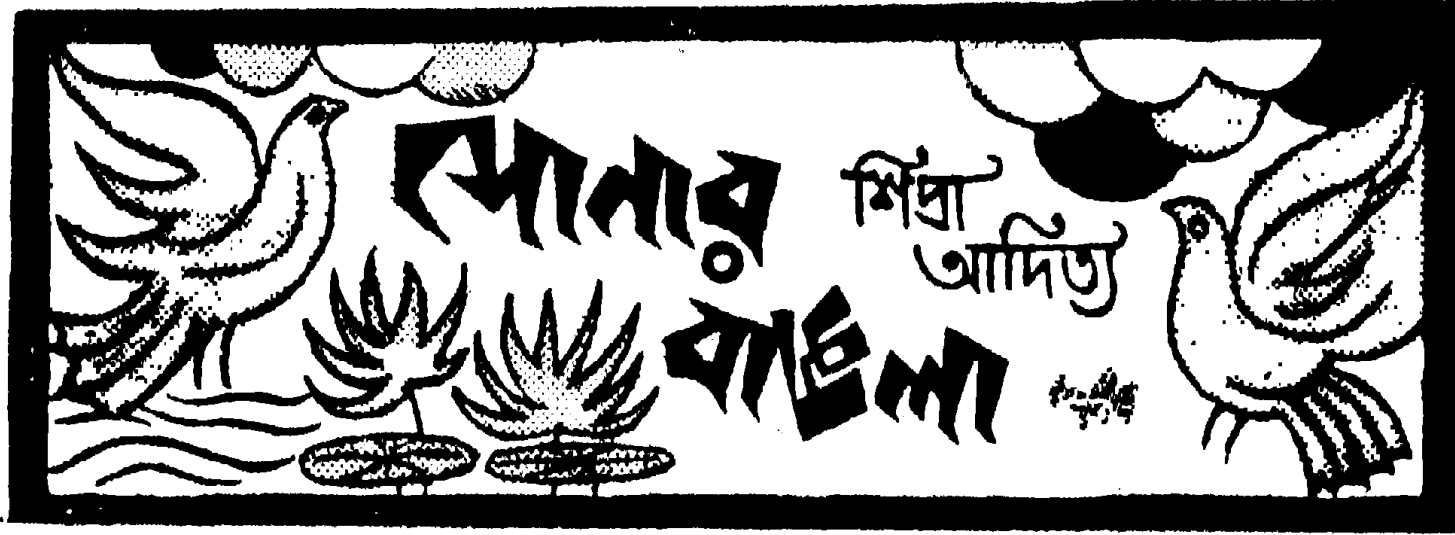
"শৈশব হইতে প্রকৃতির মহা-প্রদর্শনভূমি পার্বতীমাতার (চট্টগ্রাম) অঙ্কে যে বিরাজ করিয়াছে দার্জিলিং-এ তাহার পক্ষে দেখিবার অভিনব দৃশ্য তত কিছুই নাই।"

আপন জন্মভূমির বন্য শোভায় মোহিত হয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন জগৎখ্যাত দার্জিলিং-এর রূপমাধুর্য অক্লেশে অবহেলা করেছেন,—এমনি সুন্দর চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও নানা মতবাদ শোনা যায়। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে চট্টল নামের ব্যবহার দেখা যায়। কারো মতে চট্টভট্ট জাতি চট্টলের প্রাচীন অধিবাসী সেই জন্যই এই জায়গার নাম চট্টল বা চট্টগ্রাম! অনেকের ধারণা সপ্তগ্রামের লোকেরাই এ গ্রামে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করে। সেই নাম বিকৃত হতে হতে পরবর্তী কালে 'চট্টগ্রাম' নামেই রূপান্তরিত হয়। স্থানীয় বাঙালী ও বৌদ্ধদের অনেকের বিশ্বাস চৈত্তগ্রাম থেকেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। কারণস্বরূপ জানা যায়, এখানে বহু বৌদ্ধ-মঠ ও চৈত্ত পাওয়া গিয়েছিল, হয়তো সে কারণেই এমন ধারণা। আরাকানী ও মগেরা এটিকে চাটিগা বলতো। আরাকানী ইতিহাসে চাইতিগাঁও নামের উল্লেখ আছে। চাইতিগাঁও শব্দের মানে যুদ্ধলব্ধ নগরী। অনুমান এই চাইতিগাঁও থেকেই চাটিগাঁ। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত আরবী ভাষায় 'দূতের কাওনে'ও এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকশ্রুতিতে জানা যায়, প্রসিদ্ধ পীর বদর সাহেব এখানে এসে রাজার কাছে এক চাটি অর্থাৎ প্রদীপের শিখায় যতটুকু আলোকিত হয় সেটুকু স্থান প্রার্থনা করে পাহাড়ের ওপর প্রদীপ জ্বালান। সেই প্রদীপের আলোয় যতটুকু জায়গা আলোকিত হয়েছিল তার নামই চাঁটিগাঁ হয়। এখনও এই শহরে 'চেরাগী পাহাড়' প্রদীপের সেই স্থান নির্দেশ করে। এই চাটিগাঁ ক্রমে চাটি-গ্রাম ও চট্টগ্রামে পরিণত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে চট্টগ্রামের নাম চাটিগ্রাম। বৌদ্ধ শ্রমণরা বল-তেন রম্যাবতী। ১৬৬৮ খৃঃ চট্টগ্রাম আরাকান রাজের কাছ থেকে জয় করে মুসলমানরা এটির নাম রাখেন ইসলামাবাদ। ফকির দরবেশের কাছে 'বার আউলিয়ার দেশ'-ই প্রচলিত ছিল। পর্তুগীজরা এটির নাম রাখে পোর্টোগ্রাণ্ডো বা বড় বন্দর তারা সপ্তগ্রামকে বলতো—পোর্টোপিকুইনো বা ক্ষুদ্র বন্দর। মুসলমান জয়ের আগে চট্টগ্রাম বহু বছরই হিন্দু ত্রিপুরারাজ ও বৌদ্ধ আরাকান রাজের শাসনাধীন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও আরাকানের বৌদ্ধ রাজা মুসলমানদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নেন। কথিত আছে, আরাকানী বৌদ্ধরাজ মুসলমান রাজার উদ্দেশ্যেই এমন কথা বলেছিলেন—'চিৎ-ত-গং' অর্থাৎ যুদ্ধ করা অন্যায়। আরাকানি ও মগেরা এই কথা অনুসারেই এটির নাম দেন চিটাগং।

চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পাহাড়ের ওপর দেবী চট্টেশ্বরী কালীমন্দির, পীর বদরউদ্দীন সাহেবের দরগা। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রস[illegible] কুমার সেন মহাশয় নির্মিত নবগ্রহ ম[illegible] সুবিখ্যাত পীর সুলতান বায়েজিদ বস্তানী সাহেবের দরগা, এবং কিছু বৌদ্ধবিহার অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিক্রমশিলার মত বৌদ্ধ শিক্ষাপীঠচক্রশীলা ছিল শহর থেকে ১২।১৪ মাইল দূরে বর্মা ট্রাংক রোডের উপর। চট্টগ্রামের অন্তর্গত পঠিয়া-থানার এক ছোট গ্রামের নাম আজও চক্রশীলা। শহরের অন্দরকিল্লা পল্লীতে লাল-দীঘির তীরে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত 'জামেমসজিদ' অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ১০৭৮ খৃঃ হিজিরার নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র নবাব খাজা উমেদ খাঁ ঐ মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি দেখতে দুর্গ বা কেল্লার মত হওয়ায় সে স্থানের নাম অন্দরকিল্লা। এসব ছাড়া অগ্নিযুগে 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অনেক আগে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রায় সমভাবেই আর একবার ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহে ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা একটি রাজনৈতিক দলিল। ইতিহাসের পাতায় যা আজও উজ্জ্বল, আজও অম্লান।

কক্সবাজার সৈকত চট্টগ্রাম
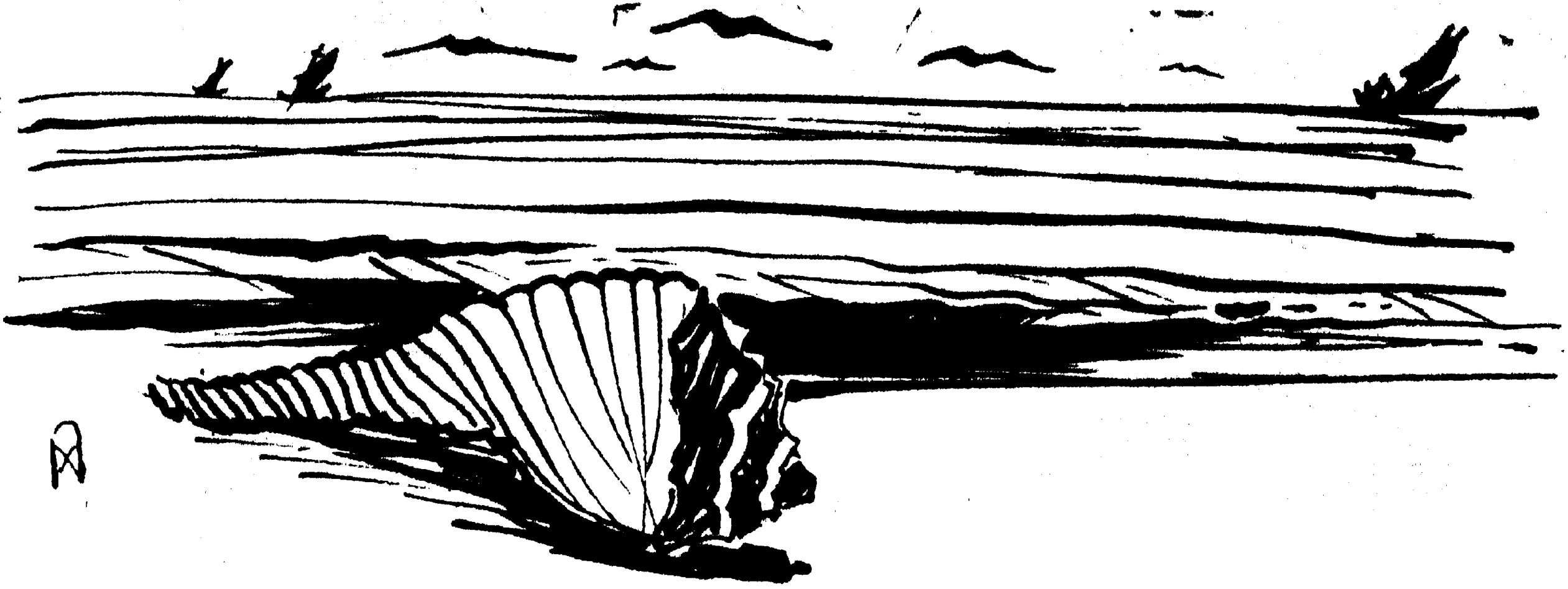
অন্যান্য জায়গার মত চট্টগ্রামেও বহু মেলা ও উৎসব হয়। সেখানের মুরগী, ষাঁড় ও মহিষের লড়াই উল্লেখযোগ্য।

আদিনাথ

চট্টগ্রাম থেকে ৭৫ মাইল দূরে মহেশখালি এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনায় মহেশখাল নামক দ্বীপে মৈনাক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। মৈনাক পাহাড়ের চূড়োয় ৬৭টি সোপান অতিক্রম করে আদিনাথ শিবের মন্দির। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব বড় মেলা বসে। আদিনাথের শিবমন্দিরে শিবমূর্তি ছাড়াও অষ্টভূজা দেবী দুর্গার মূর্তি দেখা যায়। আদিনাথে একটি বৌদ্ধ মন্দির এবং চেরাংঘরের তিন-চারটে সুন্দর শ্বেতপাথর এবং পেতলের বৌদ্ধমূর্তি দেখা যায়।

চন্দ্রনাথ

'চট্টগ্রামের পৌরাণিক নাম চট্টল। শৈলকিরীটিনী সাগর কুন্তলা সরিৎমালিনী চট্টলমাতার নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়। এজন্য সৌন্দর্য পিপাসু বৌদ্ধেরা জননীর নাম রম্যভূমি রাখিয়াছিলেন। আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও চমৎকারিত্বে চন্দ্রশেখর ও তার উভয় পার্শ্বস্থ অগ্নিপূর্ণ পবিত্র বাড়ব ও লবণাক্ষ প্রস্রবনের এবং মনোহর জলপ্রপাত সহস্রধারার তুলনা চট্টগ্রামে নেই।

ভারতের সমস্ত তীর্থদর্শন করিয়া যিনি একবার চন্দ্রশেখরের অভ্রভেদী সানুদেশে চন্দ্রনাথের শ্রীমন্দিরের ছায়ায় বসিয়া সম্মুখস্থ অনন্ত বারিধীর নীচে চঞ্চল শোভা, উভয় পার্শ্বেস্থ অনন্ত গিরিমালার স্থির শ্যাম তরঙ্গায়িত শোভা এবং পশ্চাতে অনন্ত বিস্তৃত শস্য শ্যামলা প্রান্তর নদনদীর বঙ্কিমগতির ব্যবচ্ছেদে পাদপসমাচ্ছন্ন অসংখ্য গ্রাম্যবলীর শোভাসন্দর্শন করিয়া যিনি বাড়ব ও লবণাক্ষকুন্ডের শীতল সলিলের সহিত তীব্র বৈশ্বয়নের ক্রীড়া দেখিবেন সর্বশেষে নির্জন উপত্যকায় গিরিপার্শ্ববাহী সহস্রধারার জলপ্রপাত ও কুমারীকুণ্ড দেখিবেন তাহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের বিচিত্র লীলা ও মহিমাব্যঞ্জক এমন তীর্থ আর কোথায়ও নাই।'

অংশটি কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখিত শ্রীহরকিশোর অধিকারীর 'চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য' গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র। বাস্তবিক চন্দ্রনাথ অতি সুন্দর অতি মনোরম।

চট্টলে দক্ষ বাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্র শেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী ত এ দেবতা।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসমি চন্দ্রশেখর'

(পীঠমালা—১৪)

এখানে বৃষেশ্বর শিব, গোপেশ্বর শিব, পঞ্চানন শিব, রুদ্রেশ্বর শিব, পাতালকালী, হরগৌরী, দ্বাদশ শালগ্রাম, পাতালগঙ্গা, মন্দাকিনী প্রভৃতি অনেক দেব-দেবীর মন্দির আছে। শিবরাত্রির সময় চন্দ্রনাথে মহামেলা হয়। চন্দ্রনাথ পাহাড় বৌদ্ধদেরও অতি পবিত্র স্থান। প্রবাদ আছে—বুদ্ধদেবের আঙুলের অস্থি নাকি এই পাহাড়েই সমাহিত আছে। চন্দ্রনাথ মন্দিরের পেছনে এক প্রস্তর খণ্ডে বুদ্ধদেবের পায়ের ছাপ দেখা যায়। অনেকের অনুমান বহু বছর পূর্বে এখানে বৌদ্ধমন্দির ছিল। চৈত্রসংক্রান্তিতে আজও বৌদ্ধদের একটি মেলা হয়। এছাড়া বৌদ্ধকূপ নামে একটি কূপের মধ্যে বৌদ্ধরা মৃত আত্মীয়-স্বজনের অস্থি নিক্ষেপ করবার জন্য এখানে এসে থাকে।

লাকসাম ও চট্টগ্রাম জংসন থেকে যথাক্রমে ৫৮ ও ২৩ মাইল দূর চন্দ্রনাথ পাহাড়। সুবিখ্যাত শৈব মহাপীঠ চন্দ্রনাথ পাহাড় উচ্চতায় ১,১৫৫ ফুট। আগে চন্দ্রনাথে যাওয়া বড়ই কষ্টকর ছিল। এখন সিঁড়ি হয়ে যাওয়ায় অনেক সহজ হয়েছে তীর্থযাত্রীদের পক্ষে। মোট ৭০০টি সিঁড়ি আছে। চন্দ্রনাথে উঠবার পথে অনেকগুলি তীর্থ আছে যেমন—ব্যাস কুণ্ড বা ব্যাস সরোবর। অক্ষয়বট নামে বিশাল এক বটবৃক্ষ অনুমান দ্বাপর যুগ থেকে এটি দণ্ডায়মান। এছাড়া হনুমান মন্দির, সীতাকুণ্ড, ভবানীদেবীর মন্দির, গয়াকুণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভবানীমন্দির থেকে কিছু দূরেই স্বয়ম্ভুনাথ মহাদেবের মন্দির। স্বয়ম্ভুনাথের অপর নাম ক্রমদীশ্বর। স্বয়ম্ভুনাথ প্রসঙ্গে অনেক প্রবাদ আছে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে। 'চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য'তে চন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখা হয়েছে ঃ—

'দেশেপ্রাক দক্ষিণে চাস্তি
সয়ম্ভূলিঙ্গামুম্ভতং।
পাষানম্বং স্বয়ং গম্বা
চন্দ্রশেখরমূর্ধানি।
বিরূপাক্ষাহাগ্নিকোণে চ
বারুণে বিশ্বকোঠরে।
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে
বত্ততে পার্বতীপতি।'

কাকসেস্‌বাজার

চট্টগ্রাম থেকে জলপথে আদিনাথের ঠিক পরের স্টীমার স্টেশন কাকসেস্‌বাজার। মহিষখালি নদীর ঠিক অপর পারে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় কাকসেস্‌বাজার অবস্থিত। কাকসেসবাজার চট্টগ্রাম জেলার অন্যতম মহকুমা চট্টগ্রাম শহর থেকে স্থলপথে এটির দূরত্ব মাত্র ৪৯ মাইল কিন্তু রাস্তা নাই। তাই স্টীমারে বা সামপানে নেমে প্রায় তিন মাইল বড় এক খালের মধ্য দিয়ে কাকসেসবাজারে যাওয়া যায়। শহরটি অতি সুন্দর বিশেষ করে বিস্তৃত সমুদ্রতটটি অতি মনোরম।

ব্রহ্ম-আরাকান যুদ্ধের পর বহু মগ এখানে বসবাস শুরু করে দেয়। ব্রহ্ম অভিযানের প্রধান নেতা ককস সাহেবের নাম থেকেই এই শহরের নাম কাকসেসবাজার। সামুদ্রিক মাছের বড় কারবার এখানে আছে।

সন্দ্বীপ

সন্দ্বীপ নোয়াখালি জেলায় অব[illegible] পাঠান আমলের শেষদিকে সন্দ্বীপ আরাকা[illegible] মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদ বা বোম্বেটেদের আড্ডা ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সিবাস্টিয়ান গঞ্জালিশ নামে জনৈক পোর্তুগীজ সর্দার সন্দ্বীপ অধিকার করে

চন্দ্রনাথ মন্দির চট্টগ্রাম
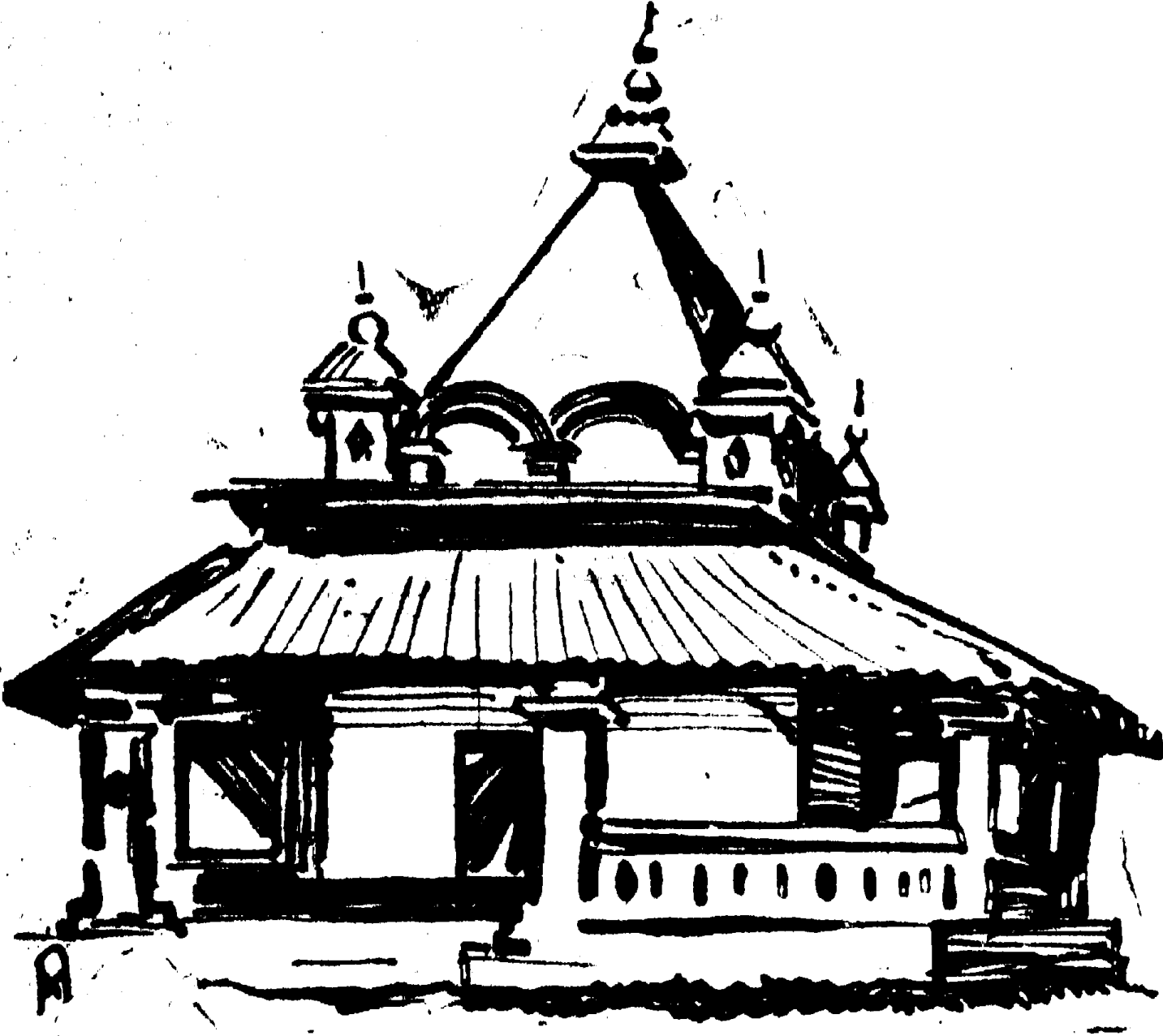
কিছুদিন রাজত্ব চালায় পরে আবার মোঘলরাই তা দখল করে। এক সময় এই স্থান জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এমন কি বহু লবণের কারখানাও ছিল। স্থানীয় শিল্পের মধ্যে হোগলার চাটাই-এর খ্যাতি আছে। চামড়ার ব্যবসা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। পৌষ সংক্রান্তি ও চৈত্র সংক্রান্তিতে সন্দীপে মেলা বসে। এ মেলার বৈশিষ্ট্য 'কুস্তির প্রতিযোগিতা।' সন্দীপ একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। জলপথে জাহাজ করে বঙ্গোপসাগর হয়ে সন্দীপে যাওয়া যায়।

রাঙামাটি

কর্ণফুলী নদী তীরে রঙ্গমতী বা রাঙামাটি পাহাড় পর্বত ও বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অধিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী চাকমা ও মগ এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী টিপরা জাতিই অধিক। পর্যটকদের জন্য এখানে একটি সুন্দর সার্কিট হাউস আছে। জলপথে চট্টগ্রাম থেকে ৬৫ মাইল, লঞ্চে একদিন এবং নৌকায় দুদিনে রাঙামাটি পৌঁছানো যায়।

দোহাজারি

চট্টগ্রাম থেকে রেলপথে (শাখা লাইনের) শেষ স্টেশন দোহাজারি। দোহাজারি স্টেশনের কাছে মিজারখীল গ্রামে হজরত জাহাঙ্গীরের জন্মস্থান। হজরত জাহাঙ্গীরের নামে বিরাট মসজিদ এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য-স্থান। প্রতি বছর তার মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিরাট উৎসব পালিত হয় ঐ মসজিদ চত্বরে।

দৌলতকান্দী—

টাঙ্গী জংশন থেকে ৩৭ মাইল দূরে রায়পুরা থানার অধীন অশ্রুফপুর গ্রাম। কথিত আছে বাঙলার পালবংশীয় রাজা দেবপাল দেবের রাজত্বের শেষ ভাগে খড়েগাদ্যম এই রাজ্য স্থাপন করেন। নমুনা স্বরূপ ঐ সময়কার অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর দুটি তাম্রশাসন, পিতল এবং অষ্টধাতু মেশানো ৪০টি চৈত্য আবিষ্কৃত হয়। চৈত্যগুলির চার পাশে বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি দেখা যায়। একটি চৈত্য কলকাতায় যাদু ঘরে আজও সুরক্ষিত আছে। ঐ তাম্রশাসন থেকে আরো জানা যায় যে রাজা দেব খড়েগরের সময় অশ্রুফপুরের কাছে বুদ্ধমুণ্ডা বা বিহার-বিহারিকা-চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

লাকসাম—

আখাউড়া থেকে ৪৭ মাইল দূর। লাকসাম জংশন থেকে ১২ মাইল দূরে মেহার কালীবাড়ী। স্টেশনের কাছেই সিদ্ধসাধক সচ্চানন্দ ঠাকুরের সাধনপীঠ মেহেরার কালীবাড়ী। এছাড়া 'সব্বানন্দ মঠ' একটি মঠও আছে। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে।

শায়েস্তাগঞ্জ—

আখাউড়া থেকে ৪৬ মাইল দূরে শায়েস্তাগঞ্জ। কথিত আছে—তরফ রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা হামিদ খাঁর পুত্র সৈয়দ শায়েস্তা এখানে একটি বাজার বসান। তার নামানুসারেই এই গ্রামের নাম শায়েস্তাগঞ্জ। অনেকে আবার বলেন বাঙলার নবাব শায়েস্তা খাঁ এই গঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। এখানের দাউদ দরগা বিশেষ জনপ্রিয় স্থানীয় লোকেদের কাছে। তাছাড়া খোয়াই নদী তীরে বৃহদাকৃত প্রস্তরখন্ড 'তুঙ্গেশ্বর' মহাদেব সুপ্রসিদ্ধ। এ-ছাড়া 'নবরত্ন উপপীঠ' মন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে সতী মায়ের নয়টি আঙ্গুল এখানে পতিত হওয়ায় এখানের নাম হয় নবরত্ন উপপীঠ।

জয়ন্তীয়া—

জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘাঞ্চ জয়ন্তি ক্রমদীশ্বর।
(পীঠমালা—২১)

পীঠমালাতন্ত্রে জানা যায় যে সতী-দেহের বামজঙ্ঘা শ্রীহট্ট শহর থেকে ৩৮ মাইল দূরে জয়ন্তীয়া রাজ্যের অন্তর্গত কালজোর বা বাউরভাগে গ্রামের এক পাহাড়ের নিচে পতিত হয়। সেই থেকেই জয়ন্তীয়ার কালজোরের কালীবাড়ী বা মহাপীঠ নামেই খ্যাত। এই মন্দিরে দেব-দেবীর মধ্যে জয়ন্তী, ভৈরব ক্রমদীশ্বরই প্রধান। ১৮৩৭ খৃঃ পর্যন্ত এখানে নরবলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজের আমলে এই ভয়াবহ নরবলি বন্ধ হয়। মহাপীঠ থেকে কিছু দূরে রূপনাথ গুহায় 'সাত হাত পানি' 'গুপ্ত গঙ্গা' এবং পাতালগঙ্গা নামের কয়েকটি তীর্থ আছে। এসব ছাড়া জয়ন্তীরাজ প্রতিষ্ঠিত জয়ন্তেশ্বরী কালীবাড়ী প্রসিদ্ধ।

শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তুদেবতা
ভৈরব ঃ শংকরানন্দ দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ।।
(পীঠমালা—২৭)

শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে গোটাটিকর জৈনপুর পল্লীতে গ্রীবাপীঠ নামে মন্দির অবস্থিত। এখানের দেব-দেবীর নাম—মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সর্বানন্দ। শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীতে এখানে বড় মেলা হয়। শ্রীহট্ট শহর থেকে জলপথে স্টীমারে কানাইয়ার ঘাট তারপর পাঁচ মাইল পথ পায়ে হেঁটে মহাপীঠ জয়ন্তী দেবীর পীঠে পৌঁছন যায়।

শ্রীহট্ট—

কুলাউড়া জংশন থেকে ৩০ মাইল দূরে সুরমা নদী তীরে শ্রীহট্ট বা সিলেট শহর অবস্থিত। তিনটি খন্ড রাজ্য গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়াকে ঘিরেই শ্রীহট্ট শহরের পরিধি। শহরের গড়দুয়ার এলাকায় গৌড়-গোবিন্দের দুর্গ এবং রাজবাড়ীর কিছু ভগ্নাংশ যেমন—'মনারায়ের টিলা' ও 'টিলাগড়েও' টিলা দুটি বিখ্যাত। শ্রীহট্টের প্রধান তীর্থ শাহজলালের দরগা। এখানে কিছু প্রস্তরলিপি আছে। এছাড়া এই দরগায় শাহজলালের ব্যবহৃত বহু জিনিস আজও দ্রষ্টব্য বস্তু। ঐ দরগায় প্রকান্ড বড় একটি তামার ডেগ বা গামলা আছে যাতে ১৫।২০ মণ চালের ভাত রাঁধা যায়। এমন বড় গামলাটির গায়ে ইরানী কবিতা লেখা আছে। দরগাটি আরঙ্গজেবের সময়ে তৈরী বলে অনুমান করা হয়। এছাড়া শহরের যুগল টিলার বৈষ্ণব আখড়া এবং দুর্গা-বাড়ী যথেষ্ট বিখ্যাত।

রেকর্ডে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করছেন শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর।

ডিস্কের জগতে গানের অর্ঘ্য সাজিয়ে এবার কবিগুরুকে সর্বপ্রথম প্রণাম জানিয়েছেন গ্রামোফোন কোম্পানী।

এবারের বিশেষ উপহার দুটি এল. পি ডিস্কে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় বারোখানি গান।

রবীন্দ্রসংগীতের এমন ব্যাপক ও বিপুল জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ অনস্বীকার্য। এবার সঙ্গে অফ্ রবীন্দ্রনাথের ৩য় খণ্ড প্রকাশ করে কোম্পানী যোগ্য ব্যক্তিকেই সমাদর দেখিয়েছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-গীত গানগুলি হোলো "মনে রবে কি না রবে আমারে", 'কাহারে গলায় পরাবে", "শুধু তোমার বাণী", "কাঁদালে তুমি মোরে", "নিশীথে কি কয়ে গেল", "সময় আমার নাই যে বাকী", "কেন যামিনী না যেতে" "মিলনরাতি পোহালো" "হে ক্ষণিকের অতিথি", "আমার এ পথ" "চলে যায়", "বিদায় করেছ যারে"।

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ডিস্কে আছে "মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে", "প্রেম এসেছিল", "আমার একটি কথা বাঁশী জানে", "বন্ধু মিছে রাগ কোরো না" "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে", ভালো যদি বাস সখী", "এবার উজাড় করে", "কেটেছে একেলা", "আমার মন কেমন", "যখন এসেছিলে", "সুন্দর বটে", "না যেয়ো না"। দুটি ডিস্কের সব গানগুলি ভাল লাগবেই। কিন্তু দুটিই পুরুষ কণ্ঠের গানের সংকলন না হয়ে একটি অন্ততঃ নারী-কণ্ঠের সংগীতচয়ন হোলে বৈচিত্র্য আরো বাড়ত। কণিকা সুচিত্রার সম্মিলিত একটি এল, পি ডিস্ক হলে কেমন হয়?

কোম্পানী আকর্ষণীয় সকল শিল্পীকেই উপহার দিয়েছেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি ই. পি ডিস্কে আটখানি গানের প্রত্যেকটিতেই নূপুর ঝংকৃত কণ্ঠের দোলা, কণ্ঠলাবণ্য ও ভাববিহ্বলতা মনকে স্পর্শ করে। এর মধ্যে তাঁর সুবিখ্যাত 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে", "রোদনভরা এ বসন্ত" ও "আমার মিলন লাগি তুমি" ও আছে। কিন্তু "যদি তারে নাই চিনিগো" গানটির কথা গ্রামোফোন কোম্পানী কেমন করে ভুললেন?

নীলিমা সেনের শান্ত আত্মলীনতায় পরিবেশিত চারখানি ভক্তি ভাবাশ্রিত গান স্তব্ধগাম্ভীর্যে সমাহিত।

সুচিত্রা মিত্র তাঁর সতেজ কণ্ঠের আবেগভরা স্বাক্ষর রেখেছেন চারখানি গানে।

'শক্তিরূপে হেরো'-র শৌর্যে, 'ওগো আমার শ্রাবণ মেঘে"র রমণীয়তার দুটি বিভিন্ন লোকের বৈপরীত্য রীতিমত উপভোগ্য।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সমাহিত প্রশান্তি ব্যাপ্ত তাঁর সবগুলি গানেই। শ্যামল মিত্রের চারখানি গান দিয়ে যথারীতি বৈচিত্র্যসৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা সফলও হয়েছে। তরুণের শিল্পীগোষ্ঠীর সাগর সেন ও সুমিত্রা সেন আপনাপন বৈশিষ্ট্যে সমাসীন তাঁদের যথানির্দিষ্ট চারখানি গানে।

এছাড়াও এক-একটি ই. পি ডিস্কের দুটি দিকে দুজন করে শিল্পীর গানে একাধারে শিল্পী-বৈশিষ্ট্যও গানের বৈচিত্র্যও আনন্দদায়ক।

এই সমন্বয়ে আছেন—যথাক্রমে পূরবী মুখোপাধ্যায় ও তাড়িৎ চৌধুরী, বাণী ঠাকুর ও পূর্বা দাস, শৈলেন দাস ও বাঁথিন বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন ও অর্ঘ্য সেন, বনানী সেন ও সুশীল মল্লিক এবং স্বপন গুপ্ত ও স্বপ্না ঘোষাল।

আর এক নতুন অবদান পাঁচটি শিশু-শিল্পীর কণ্ঠে ছোটদের ছ'খানি গান। রেকর্ডটির নাম "কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা"।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীসংস্থা সঞ্জীদা খাতুন, মাহমুদুর রহমান, মিল্লুয়া গণি, মিহির নন্দী, শীলা দাস ও আলোকময় নাহার কণ্ঠে দেশাত্মবোধক পাঁচখানি গান মন দিয়ে শোনবার মতই।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর রবীন্দ্রপ্রণাম

শুধুমাত্র হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীরই নয়, এবারের রবীন্দ্রজয়ন্তী রেকর্ডের সেরা আকর্ষণ কে এল সায়গল ও পংকজ মল্লিকের একখানি এল. পি ডিস্ক। কে এল সায়গল আজ নেই। কিন্তু রসিকচিত্তে চিরঅনপনেয় মধুর স্মৃতি হয়ে আছে তাঁর আবেগঢালা কণ্ঠমাধুর্য। কালজয়ী সেই গায়কী যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'আমি তোমায় যত', 'একটুকু ছোঁয়া লাগে', "তোমার বীণায় গান ছিল", "আজ খেলাভাঙার খেলা" আর "এদিন আজি কোন ঘরে গো"।

পংকজ মল্লিককে প্রায়ই শুনি গ্রামোফোন ও রেডিওর দাক্ষিণ্যে। কিন্তু তাঁর যৌবনলগ্নের উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি ধরে রেখেছে যেসব গান তারই সংকলন শিল্পীর

অম্লান কণ্ঠের "সহজ মাধুর্য" যেন মনে বিছিয়ে দেয় যখন শুনি—"দিনের শেষে ঘুমের দেশে", "আমি কান পেতে রই", "যৌবন সরসী নীরে", "গগনে গগনে আপনার মনে" "প্রলয় নাচন", "তোমার আসন শূন্য আজি"। এই রেকর্ডটি প্রকাশ করার জন্য হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ ধন্যবাদার্হ।

ই. পি ডিস্কে রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম গুরুস্থানীয় শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে "কঙ্কালি আমি তারেই বলি", "অধরা মাধুরী", "তুমি কি কেবলই ছবি"—এ-সংস্থানিবেদিত রেকর্ডগুচ্ছের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠের পৌরুষ-ব্যঞ্জক দীপ্তি কখনও অধীর মিনতির আবেগে উচ্ছল ("তুমি ত সেই যাবেই চলে") কখনও বা বেদনার্তরা উদাস গাম্ভীর্যে বিধুর ("ভেবেছিলেম আসবে ফিরে" ও "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়")। এ রেকর্ড শুনে শুনে যেন আশ মেটে না।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে হারিয়ে ফেলার আনন্দ ও বেদনায় গেয়েছেন আটখানি গান দুটি ডিস্কে। "আহা আজি এই বসন্তে", "আমার সকল রসের ধারা", "আপনহারা মাতোয়ারা" ও "তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে"... "মোর গানে", "আঁধার এলো বলে", "বাঁশি বেলা বয়ে যায়", "মরণ রে তুঁহু মম"।

গানগুলি শুনতে শুনতে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল জনপ্রিয় এই শিল্পী—এইসব গানগুলি গাওয়ার পর পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতাদের তুমুল হর্ষধ্বনি।

আতিশয্যবর্জিত মধুর কণ্ঠের গভীর আবেদন-সমৃদ্ধিতে রসিকচিত্তে আপনার বিশেষ একটি স্থান করে নিয়েছেন সুবিনয় রায়। সেই পরিচয়েরই উজ্জ্বল স্বাক্ষরবাহী তাঁর গানগুলি 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার', 'ঐ পোহাইল তিমির রাতি' 'জগতে আনন্দযজ্ঞে', 'রাখো, রাখো রে জীবনে', 'বহে নিরন্তর অনন্ত', 'নব আনন্দে জাগো' 'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে', 'একি সুধারসে আনে'।

অরবিন্দ বিশ্বাস আপন উচ্চমানে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন যেসব গানগুলিতে সেগুলি হোলো 'কতবার ভেবেছিনু' ও কেন চুরি করে চায়' 'সেদিন দুজনে', 'আসা যাওয়া পথের ধারে' 'বন্ধু তোমায় করব রাজা', 'ভালবাসিলে যদি সেই', 'তবু পারিনে সঁপিতে' 'কোথা হতে বাজে'।

চিত্রলেখা চৌধুরীর (সোম) দুটি ডিস্কের আটখানি গান পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। গানগুলি হোলো 'প্রেমের ফাঁদ পাতা', 'রাতে রাতে আলোর শিখা', 'হে সখা মম', 'কি গাবো আমি', 'ফুলে তুলিতে ভুল করেছি', 'না বুঝে কারে তুমি' 'মোরে বারে বারে', 'এই যে কালো মাটির বাসা'।

এ কোম্পানীর এক অবিস্মরণীয় শ্রদ্ধের অবদান হোলো শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কণ্ঠের দুটি আবৃত্তি। 'কাল মধু যামিনীতে' ও 'বহুদিন মনে ছিল আশা' অপরাজেয় শিল্পীর কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের বিশেষ এক যুগকে মনে করিয়ে দেয়।

ধীরেন বসুর কণ্ঠের দুটি গান 'ভুল কোরোনা' ও 'সখী সে গেল কোথায়' শিল্পীর দরদ ও নিষ্ঠার ছাপ মনকে স্পর্শ করে। অন্যান্য তিনজন শিল্পী হলেন কবি মজুমদার, সুমন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁদের গাওয়া গানগুলি হোলো 'ওহে সুন্দর' ও 'তিমির অবগুণ্ঠনে' 'হেলাফেলা সারা বেলা' ও 'ফিরবে না তা জানি' এবং 'আমার মোহনরূপে' ও 'মাধবী কোথা হতে'। প্রতিটি গানই সুগীত। তবে এক আকর্ষণ শ্রীকুমার চ্যাটার্জি। অশোকতরু, কবি মজুমদার ও অরবিন্দ বিশ্বাসের একখানি ই. পি. ডিস্ক। অভিজিৎ নাগের গীটারে বাজানো চারখানি রবীন্দ্রসংগীত সুশ্রাব্য। একটি হোলো 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে কোম্পানীর 'বাংলাদেশ' এর একটি বিশেষ ফিচারের একখানি এল. পি. ডিস্ক ও ১০ খানি ৪৫ আর. পি. এম আমাদের হাতে এসেছে। পরে সেগুলি আলোচিত হবে।

জলসা

রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব

রবীন্দ্র মেলায়

রবীন্দ্র মেলার উৎসব শুরু হয় ডকটর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মঙ্গলাচরণ দিয়ে। বেদসঙ্গীত গেয়ে শোনান অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীর্থশিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। একক সংগীতে অংশগ্রহণ করেন মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিদেব ঘোষ।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল নৃত্যম প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত নৃত্যনাট্য 'রূপকথা'।

'রূপকথা' নামটি যেন মনকে বাস্তব-জগৎ থেকে মুক্ত করে স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছে দেয়। রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রথম দর্শনে প্রেম, বিবাহ, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন-পরিণতির এক শিল্পশ্রীমণ্ডিত রঙিন কল্পলোকের এক একটি দ্বার খোলার সফল প্রয়াস অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে।

নৃত্যাংশে প্রথমেই মনে আসে পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়ের কথা। রাজকন্যার ভূমিকায় পূর্ণিমার অভিনয় ও নৃত্য আমরা আগেও দেখেছি। এবার যেন আরো পরিণত, ভাবপ্রকাশের অনবদ্য ভঙ্গীতে মধুর, আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত তাঁর শিল্পীমন। মণিপুরী লালিত্যের সঙ্গে কথাকলির নাটকীয়তা আঙ্গিক শৈলীর মধ্যে যেমন বলিষ্ঠতা এনেছে, প্রস্ফুটিত ফুলের মত কমনীয়রূপে ভাববিহ্বলতার ছায়া হয়েছে তেমনই গভীর। রাজপুত্রের ভূমিকায় প্রদীপ্ত নিয়োগী চরিত্রের বক্তব্যকে যথাযথরূপে তুলে ধরেছেন।

রাণীর ভূমিকায় সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষ করে ঈর্ষার জ্বালা অত্যন্ত বিশ্বস্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বোধিসত্ত্ব মজুমদার, কানাইলাল মজুমদার ও কস্তুরী সরকার।

সঙ্গীতাংশে রাজকন্যার গানগুলি অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়েছে। অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠসৌকর্য, ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশনার গুণে। সৌমেন্দ্র ঘোষ ও নমিতা ঘোষাল রাজপুত্র ও রাণীর ভূমিকায় ভালই গেয়েছেন। তবে টীমওয়ার্ক আরো জোরালো হওয়া প্রয়োজন।

নৃত্যপরিচালনা, নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা ও সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা মুখোপাধ্যায় ও প্রীতি চট্টোপাধ্যায়।

সৌরভে : ম্যাকসমুলার ভবনে 'সৌরভ' আয়োজিত রবীন্দ্র-বন্দনার সূচনা বন্দনা সিংহ পরিচালিত একটি উপভোগ্য সঙ্গীতালেখ্য দিয়ে। বৈশাখের ধূলায় ধূসর তাপসরূপকে প্রণতি জানানো হোলো এমন কয়েকটি গানে যেগুলির নির্বাচন পরিকল্পনার প্রশংসা না করে উপায় নেই। দেবু চট্টোপাধ্যায় রচিত ভাষ্য ভাবগ্রাহিতার সহায়ক হয়।

প্রধান অনুষ্ঠান ছিল বাণী ঠাকুরের একক সঙ্গীত। ভাষ্যরচয়িতা কল্যাণ রায় ও পরিবেশক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবদুলালের আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ যেন কথা বলে উঠেছিল।

বাণী ঠাকুর 'প্রথম আদি তব শক্তি' ধ্রুপদ গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। পরের গানগুলি হোলো 'হৃদয়-নন্দন-বনে', 'আজি যে রজনী', 'কাঁদালে তুমি মোরে' ও গান আর গাসনে', 'আমি জেনেশুনে' 'তবু মনে রেখো', 'বারে বারে পেয়েছি' বাজে করুণ সুরে', 'তোমরা যা বলো' আর শেষ হোলো 'খেলার সাথী' দিয়ে। প্রেম ও ভক্তির আবেগাশ্রিত প্রতিটি গানের মর্মবাণী শিল্পী শ্রোতাদের গোচরে আনতে পেরেছেন। পরিচ্ছন্ন সুর, লয় এবং সুচিত্রা মিত্রের গায়কীর এক বিশবস্ত রূপ পরিবেশনের কারণেই এ অনুষ্ঠান সকলের অকৃপণ অভিনন্দন পেয়েছে।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে উদীচী, মলয়-গীতবীথি, সাহিত্যতীর্থ, গান্ধর্বী, রবীন্দ্রানুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে।

সাগর পারে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'...কবির কথা ধার করে বলতে পারি হে কবিগুরু আমরা তোমায় ভালবাসি। সে কথাই ধ্বনিত হল গত ৭ই মে লণ্ডনের মহাত্মা গান্ধী হলে। লণ্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকা সাগর পারের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি পালন করা হয়।

প্রধান অতিথি হন ডেম সিবিল থর্নডাইক। তিনি সুললিত কণ্ঠে একাধিক কবিতা আবৃত্তি করেন।

ধূপের গন্ধ, শঙ্খধ্বনির মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীআপা ভাই পন্থ রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে দেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আবদুস সুলতান বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভিত্তিতে তাঁকে বাঁধা যায় না। তিনি সমগ্র বিশ্বের।

বিচিত্র অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনান তৃপ্তি দাস, গোপা বোস, স্বপ্না রায়চৌধুরী। নৃত্যের তালে তালে গানের সঙ্গে নাচ পরিবেশন করেন মনীষা স্মিথ। গীটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজান সুকান্ত রায় ও অমলেন্দু দাস। তবলা বাজান অরুণ মুখোপাধ্যায়। নীলাদ্রি ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি করেন। অরুণ চট্টোপাধ্যায় জলদগম্ভীর সুরে বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শোনান।

সাগরপারের সম্পাদক হিরণ্ময় ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানান রবীন্দ্রনাথের জীবনী থেকে নানান টুকরো ঘটনার উল্লেখ করে।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের গান অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করে তোলে। অনুষ্ঠান শেষ হয় শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর।

বাণিজ্যকর বিভাগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব : ২০ মে শনিবার বাণিজ্যকর বিভাগের কর্মীরা এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্যকর কমিশনার শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। নৃত্য, গান, আবৃত্তি এবং আলোচনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হোয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দাশগুপ্তা, দেবযানী রায়চৌধুরী, শিউলী রায়চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ শীল এবং আরো কয়েকজন পারদর্শিতার পরিচয় দেন। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হোলেও, সর্বত্র একটি রুচিশীল পরিচ্ছন্নতার ছাপ ছিল।

'গীতালির রবীন্দ্র-জয়ন্তী' : শ্যামবাজারের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন গীতালি পালন করলেন কবিগুরুর ১১১তম জন্ম-জয়ন্তী তাঁদের নিজস্ব ভবনে। সঙ্গীতায়নের অধ্যক্ষ শ্রীপঙ্কজ সাহার পরিচালনায় সংস্থার ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকমন্ডলী সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন শ্রীমতী শান্তা সাহা, কল্যাণী দাশগুপ্ত, গৌরী সরকার, জয়ন্তী সেন ও শিবনাথ সাহা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল—সমর চ্যাটার্জী মঞ্জরী রক্ষিত, উমা সরকার, রাণী মুখার্জি, দেবশ্রী মুখার্জী ও মৌসুমী চক্রবর্তী। এছাড়া আরো অনেকে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের সহযোগিতায় ছিলেন গোরাচাঁদ অধিকারী, অনিল রোজারিও ও সংস্থার অধ্যক্ষ শ্রীপঙ্কজ সাহা।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হচ্ছে যে পঞ্চমবর্ষ গীতালি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা জুন মাসে পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার পর আরম্ভ হচ্ছে। ইচ্ছুক মহিলা ও পুরুষ প্রতিযোগী ২৯ মে '৭২ এর মধ্যে ৩-বি, ললিত মিত্র লেন, কলি-৪ যোগাযোগ করুন।

নানান খবর

আলাউদ্দিন ঘরানার যন্ত্রীরা

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর হাতে 'দরবারী' রাগের আলাপ, জোড়, ঝালা ও কিরবাণী রাগের গৎ ভাবে, রসে, পাণ্ডিত্যে ও ঘরানার আভিজাত্যমণ্ডিত রূপায়ণে মন ভরিয়ে দিয়েছে।

বহুদিন বাদে শুনলাম আলি আকবর শিষ্যা শ্রীমতী শরণরানী মাথুরের সরোদ। শিল্পীজনোচিত রসমধুর মনেরই পরিচয় ছিল তাঁর রাগনির্বাচনে—'যোগিয়া-কালাংড়া' ও 'ভৈরবী'। প্রথম রাগের উদাস আর্তি ও দ্বিতীয় রাগে ভক্তি, প্রেম ও কারুণ্যের আবেদন মনকে নাড়া না দিয়ে পারে? বিশেষ অমন সুরেলা হাতে? অনেক মীড়ের ভঙ্গি, চৌকঝালার বোল ও তানে গুরু আলি আকবরের আদল শ্রোতাদের আনন্দমুখর করতালি পেয়েছে।

আলাউদ্দিন ঘরানারই আরো যে দুটি উজ্জ্বল রত্ন যন্ত্রসঙ্গীতাসর অলংকৃত করেছেন তাঁরা হলেন জয়া বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য।

জয়া বিশ্বাস (সেতার) প্রথমে বাজালেন 'মোহনকোষ'। আলাপের দক্ষতা ও গতের কারিগরী ছাড়াও রূপক তালের ঝালায় আলাউদ্দিন ঘরানার লয়দক্ষতা সু-পরিস্ফুট। শেষের 'মান্দ-খাম্বাজ'ও প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যর (সেতার) বাজনা জমে ওঠে রসসৃষ্টির নৈপুণ্য ও শ্রোতাদের চাহিদার সঙ্গে বোঝাপড়ার সামঞ্জস্যর কারণে। ইন্দ্রনীলের বাদননৈপুণ্য সমধিক বোধগম্য হোলো তাঁর ঠুংরীতে।

পণ্ডিত ভি জি যোগের বেহালায় 'জয়জয়ন্তী'র রূপসৃষ্টিতে কিছু চাঞ্চল্য ছিল। কিন্তু শিল্পীসৃষ্ট মাধুর্য ও মেজাজ এ ত্রুটিকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। পূরিয়া কল্যাণ রাগে আলি হোসেন ও আসগর হোসেনের সানাই শুধুমাত্র আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান-উন্মোচকই নয়—রাগবিশ্লেষণ ও রূপসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুষ্ঠানের শিল্পমূল্যও যথেষ্ট। বিশেষ করে 'পূরবী' ধুনের উতলা আবেগ যেন বসন্তকালের মিলনপিয়াসী বিকালের ভাষাকেই অনুরণিত করেছে।

অরবিন্দ গাদ্‌কার বাঁশীতে চন্দ্রকোষ, পূরবী ধুন ও ঠুংরী এবং স্বরমণ্ডলে মধুকোষ বাজিয়ে শোনালেন। স্বরমণ্ডল বাদনে বৈচিত্র্য থাকলেও রসোত্তীর্ণ হয়েছে তাঁর বাঁশী।

কণ্ঠসঙ্গীতে একমাত্র আকর্ষণ ছিলেন বাসবরাজ রাজগুরু। ছায়ানট ও ঠুংরীতে ইনি আপন ঘরানার এক সুষ্ঠু, সুন্দর রূপ মেলে ধরেন।

কণ্ঠসংগীতে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সাবদাদ চন্দ্র আপ্তেকার (ইমন-কল্যাণ টপ্পা, দাদরা), প্রভা আত্রে (আহির ভৈরব, বসন্ত ভজন), নারায়ণ রাও যোশী (গুণকেলী মিশ্রআঁক টোড়ী, ভৈরবী, ভজন), কানাইলাল ঘোষ (শুধ কল্যাণ)। এঁরা কেউই নিম্নমানের গায়ক-গায়িকা নন। তবু এঁদের একজনের অনুষ্ঠানও আসর জমিয়ে তুলতে পারেনি।

উদীয়মান শিল্পীরূপে আপন সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন অশ্রুকণা ঘোষ।

সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে ওস্তাদ নাসির আমীনুদ্দিন দাগরের ধ্রুপদ। রাগ দরবারী কানাড়া। রসের অভাব ছিল কিন্তু পাণ্ডিত্য ও ঘরানার ঐতিহ্যর শিক্ষামূল্য অনস্বীকার্য।

বার্ষিক মিলন উৎসব

ক্যালকাটা মিউজিক এন্ড আর্ট সেন্টারের বার্ষিক মিলন উৎসব হয়ে গেল সম্প্রতি। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা সাহারায়, সুতপা ভট্টাচার্য, দেবী দাস, ইন্দ্রানী চক্রবর্তী, মণিদীপা দাস, কল্পনা দাস ও গোপা পাল চৌধুরী। গীটার বাজিয়ে শোনান বাণী চট্টোপাধ্যায়, সান্ত্বনা বসু, রীণা দে, বীণা নায়েক ও স্বর্ণা চট্টোপাধ্যায়। হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের তবলা লহরা উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে গৌতম রায় 'মালকোষ' রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। শিল্পীর স্বরবৈচিত্র্যে রাগটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরে 'মিশ্র পাহাড়ী' রাগে ঠুংরী পরিবেশন করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

রৌদ্রছায়া / অঞ্জনা ভৌমিক এবং উত্তমকুমার। পরিচালনা : শচীন অধিকারী।
ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

কেন্দ্রে একটি সাংস্কৃতিক দপ্তর চাই

বহু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে একাধিক ভারতীয় ছবি সম্মানিত হয়েছে বলেই কথাটা বলছি। এই বছরে প্রথম তেহেরানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৬ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে ভারত প্রেরিত "বিলাপ" শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী চিত্র হিসেবে ভারত "যাঁরা পাত্থর মিলে" এবং "আনন্দ"—এই দু'খানি হিন্দী ছবির নাম পূর্বে থেকে পাঠালেও কোনো ছবিটিই শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সুযোগ পায়নি। কারণ, প্রথম ছবিটি অনেক দেরীতে গিয়ে পৌঁছেছিল—উৎসবের কর্তৃপক্ষ ছবিটিকে প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করবার আগ্রহে যোগদানের শেষ তারিখ থেকেও যে-ক'দিন অতিরিক্তভাবে মঞ্জুর করে ছলেন, তও বিফল গিয়েছিল, এমনই দেরী হয়েছিল ছবিটি পৌঁছুতে। আর দ্বিতীয় ছবি—"আনন্দ" আদৌ পাঠানোই হয়নি। এই না-পাঠানোর ব্যাপারে ছবির অন্যতম প্রযোজক এন সি সিপ্পির পুত্র রোমু সিপ্পি যে-কথা বলেছেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য যে, ভারত সরকারের একটি সাংস্কৃতিক দপ্তর না থাকার জন্যেই বর্তমানে বিপত্তির উৎপত্তি।

"আনন্দ" ছবিটি তেহেরান চলচ্চিত্রোৎসবে পাঠাতে রূপম চিত্র কেন উৎসাহিত বোধ করেনি, এর কারণ দর্শিয়ে রোমু সিপ্পি বলেছেন, ১৯৭০এর মে মাসে অনুষ্ঠিত কার্লোভিভেরী চলচ্চিত্রোৎসব এবং রুমানিয়ার চলচ্চিত্রোৎসবে যোগদানের জন্যে এই সংস্থা নির্মিত "আশীর্বাদ" ছবির দু'টি প্রিন্ট পাঠানো হয়েছিল। প্রিন্ট দু'টির মূল্য ন্যূনকল্পে ২২,০০০ টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু লেখালেখি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত প্রিন্ট দুটি ফেরত পাওয়া যায়নি। অথচ প্রিন্ট দুটি যে ভারতে পুনরায় আমদানী করা হয়েছে অর্থাৎ ফেরত নিয়ে আসা হয়েছে, এর প্রমাণাদি দাখিল করবার জন্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে থেকে চিঠির পর চিঠি আসছে সংস্থার কাছে এবং দাখিল করতে না পারলে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে' বলে ভয়ও দেখানো হচ্ছে।

এইসব ঘটনার কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের কাছে পত্র দেওয়া হয়েছে এই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারী। এছাড়া ১৯৭০ সাল থেকেই এই প্রিন্ট দু'টি ফেরত না পাওয়া সম্পর্কে বহু চিঠিপত্র পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই প্রিন্ট দু'টি কোথায় কি অবস্থায় আছে, এ-ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোনো জবাবই পাওয়া যায়নি ভারত সরকারের কাছ থেকে।

এরও ওপর কথা আছে! কার্লোভি-ভেরী চলচ্চিত্রোৎসবে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন "আশীর্বাদ" ছবির পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁকে মাত্র ১৫০ টাকার সমমূল্যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া

বাংলাদেশের ছবি ধীরে বহে মেঘনা। পরিচালক : আলমগীর কবির এবং শমিতা মুখোপাধ্যায়।
ফটো : অমৃত

ছায়ার মায়া ছবির মহরতে সুনীল দাশগুপ্ত, পারিজাত বসু, রথীন বসু, পিনাকী সেনগুপ্ত, পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এবং রূপা চৌধুরী। ফটো : অমৃত

হয়েছিল। এ অবস্থায় তেহেরান চলচ্চিত্রোৎসবে যোগদানে উৎসাহিত হওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে?

যেখানে ভারতের সুনাম নির্ভর করছে, প্রতিযোগিতা হোক আর নাই হোক, এমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত থেকে চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র প্রতিনিধি, নাট্যকে দল, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যসম্প্রদায় বা একক নর্তক, নর্তকী, লোকনাট্য, লোকনৃত্য বা লোকসঙ্গীতের দল প্রভৃতি মনোনয়ন করে পাঠানোর ভার যে-সংস্থার ওপর ন্যস্ত, তার সদস্যদের সে সাংস্কৃতিক বোধ ও জ্ঞান যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন, এ-সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না। এবং এও মনে রাখা উচিত যে, ভারতের সুনাম যে-ব্যাপারের ওপর নির্ভর করছে, সেখানে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই। কাজেই সাংস্কৃতিক বোধ থাকার সঙ্গে সঙ্গে সংস্থার সদস্যদের এ-ব্যাপারে জনসাধারণের আস্থাভাজন হতে হবে। অথচ আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক উৎসবাদিতে যোগদানের জন্যে বা সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে যাঁরা প্রতিনিধি ইত্যাদি মনোনয়ন করে থাকেন, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই নয়। বড়জোর তাঁদের মনোনয়নকে গতানুগতিকভাবে মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত করিয়ে নেওয়া হয়।

এবং দেখা যাচ্ছে, যাঁরা বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যিনি মনোনয়ন করেন, তাঁদের বা তাঁর দায়িত্ব ঐখানেই শেষ হয়ে যায়। প্রতিনিধি বা ছবি যে-দেশের যে-উৎসবের জন্যে মনোনীত হয়েছে, সেই দেশের সেই উৎসবে যথাসময়ে কি করে হাজির হবে, সেখানে ছবি বা লোকের ভার কার ওপর ন্যস্ত থাকবে, ঐ ছবি বা প্রতিনিধির যোগদানকে সম্ভব করবার জন্যে কত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করা আবশ্যক, মনোনীত ছবি বা প্রতিনিধি সম্পর্কে যথেষ্ট পূর্ব থেকেই কিভাবে পরিচিতির ব্যবস্থা করা হবে এবং উৎসব অন্তে ছবি বা প্রতিনিধিকে যথাসময়ে স্বদেশে ফেরত আনবার জন্যে কি কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে, এসম্পর্কে, মনে হয়, তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তা যদি থাকত, তাহলে ১৯৭০ সালে প্রেরিত "আশীর্বাদ" ছবির দু'খানি প্রিন্ট আজ পর্যন্ত কোথায়, কি অবস্থায় রয়েছে, তার জন্যে এর প্রযোজক-সংস্থা রূপম চিত্রের কর্তৃপক্ষকে হা-হুতাশ করতে হত না এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াও অন্যায়ভাবে তাঁদের পিছনে ধাওয়া করত না। আমরা

আশা করব, কেন্দ্রীয় সরকার অচিরেই বর্তমান হেঁয়ালী অবস্থার অবসান ঘটিয়ে একজন সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রীর অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক দপ্তর চালু করবেন, যে-দপ্তর আন্তর্জাতিক উৎসব এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ক-খ থেকে শুরু করে অনুস্বার-বিসর্গ-চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত সকল দায়িত্ব বহনে প্রস্তুত থাকবেন।

চিত্র-সমালোচনা

শেষ পর্ব : চিত্ত বসু পরিচালিত শুভায়ু পিকচার্সে'র শেষপর্ব (কাহিনী-চিত্রনাট্য মণি বর্মা) ঘটনার ঘনঘটায় এক ঘরোয়া কাহিনী। ছবির শুরু থেকে ঘটনা-গুলো যেভাবে সংঘটিত হচ্ছিল তা থেকে ছবির পরিণতি সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন ছিল না।

সংক্ষেপে কাহিনী হোল : বিবাহিত জীবনে হরিমোহন-দয়াবতী পরস্পরকে ছেড়ে কোনদিন আলাদা থাকেনি। ছেলেদের লেখা-পড়া আর মেয়েদের বিয়েতে দেনায় সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রামের বাড়ী-পুকুর-জমি বাধ্য হয়ে বিক্রী-কোবালা করে দিতে হয়েছে গ্রামেরই অনন্ত চাটুজ্যের কাছে। সুতরাং বুড়ো বাপ-মার ভরণপোষণের ভার নিতে হবে উপযুক্ত ছেলে-মেয়েদেরই। বড ছেলে রাজীব কলকাতায় সওদাগরী অফিসের মোটা মাইনের কর্মী—স্ত্রী সুজাতা ও একমাত্র মেয়ে নন্দিতাকে নিয়ে বালীগঞ্জের ফ্ল্যাটে থাকে। ছোটছেলে রজত বিয়ে করেনি, মোটর গ্যারেজে কাজ করে। বড় মেয়ে উষার শ্বশুরবাড়ী বর্ধমান। স্বামী, ছেলে-মেয়ে, শাশুড়ী নিয়ে ভরা সংসার। ছোট মেয়ে সন্ধ্যা আর তার স্বামী চারুকে নিয়ে সংসার।

হরিমোহন আর দয়াবতী থাকবেন কার কাছে? শেষবেশ ঠিক হল—মা বড় ছেলের কাছে, বাবা বড় মেয়ের কাছে থাকবেন কিছুদিনের জন্য।

এই প্রথম যেন হরিমোহন ধাক্কা খেলেন জীবনে—যখন দয়াবতীকে নিয়ে কলকাতায় যাত্রা করলো ট্রেনখানা। বর্ধমানে উষার বাড়ীতে আশ্রয় হোল হরিমোহনের। কিন্তু উষার শাশুড়ী হরিমোহনকে দেখে অপ্রসন্ন হলেন। এ নিয়ে উষার সংসারে অশান্তির ঝড় উঠলো।

ঐদিকে কলকাতায় রাজীবের সংসারে দয়াবতীকে নিয়ে চললো স্বামী-স্ত্রীতে বাক-বিতণ্ডা। রাজীবের মেয়ে নন্দিতা ভালোবাসে ধনী-শিক্ষিত, যুবক অরুণকে। দয়াবতীর চোখে একদিন তা ধরা পড়তেই সাগ্রহে তিনি সমর্থন জানাতে নন্দিতা খুশী হল। ছোট ছেলে রজতের আকাঙ্ক্ষা, যশ, আর অর্থ। মোটর গ্যারেজের মালিক রমাপদ ঘোষাল চায় তার একমাত্র কুৎসিত বোনকে ওর গলায় ঝুলিয়ে গ্যারেজের অংশীদার করে নিতে।

এদিকে বর্ধমানে হরিমোহন দয়াবতীর জন্য উতলা। হরিমোহন নিজের গরজে পত্রিকা বিক্রেতা অনুকূল মজুমদারের বন্ধু হলেন এবং গোপনে কাগজ ফেরীর কাজ নিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন উষার শাশুড়ীর নজরে পড়ায় হরিমোহনকে ঐ আশ্রয় ত্যাগ করে অতুলবাবুর বাগানবাড়ীতে চাকরী নিতে হল। ঘটনাচক্রে অতুলের ঐ বাগান-বাড়ীর এক পার্টিতে ছোট মেয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে হরিমোহনের। এ দৃশ্যে মর্মান্তিক আঘাতে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে আসেন তিনি পথে। রাস্তায় তার জ্ঞানহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ে। অনুকূল-বাবু তাকে সযত্নে আশ্রয় দেন। উষা-রবীনের কাছে খবরটা পৌঁছয়। ফোন করা হয় রাজীবকে কিন্তু সে তখন অফিসের তহবিল তছরুপের দায়ে জেলে। দয়াবতী ছেলের মুক্তির জন্য উপস্থিত হন অফিসের মালিক সুরজিতের কাছে। অনেক অনুনয় করে অব-শেষে স্থির হয় রাজীবের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে দয়াবতী অরুণ-নন্দিতার বিয়ের সম্মতিও আদায় করতে ভুললেন না। ইতিমধ্যে দয়াবতী জানতে পারেন হরিমোহন গুরুতর অসুস্থ। তিনি স্থির থাকতে না পেরে একাই ছুটে যান স্বামী-সন্দর্শনে। দীর্ঘদিন বাদে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়। কিন্তু হরিমোহন তখন চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন।

রজতের আত্মত্যাগে কিভাবে হরি-মোহন-দয়াবতী তাদের হারানো ঘর-বাড়ী, জমি ফিরে পেলেন এবং একদিকে আনন্দাশ্রু অন্যদিকে বেদনায়-বিদীর্ণ রজত জীবনের গান গেয়ে চলে তাই নিয়ে কাহিনীর যবনিকাপাত।

ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রতি দৃশ্যে মেলোড্রামার ছড়াছড়ি। তবুও পরিচালককে ধন্যবাদ—তিনি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে হরিমোহন-দয়াবতীর মানসিক যন্ত্রণা, বিচ্ছেদ-ব্যথার রূপটি বাস্তবসম্মত ভাবে চিত্রায়িত করেছেন। উষার গৃহে থাকাকালীন যন্ত্রণাদগ্ধ হরিমোহনের কণ্ঠে—'আমি বাতিল হয়ে গেছি'—এই সংলাপের মাধ্যমে নাটকের করুণ সুরটি প্রতিধ্বনিত।

ছবির প্রধান আকর্ষণ হরিমোহন-দয়া-বতীর চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল ও ছায়া দেবীর মর্মস্পর্শী অভিনয়। বাঙলার দর্শকরা হরিমোহন-দয়াবতীকে কোনদিন ভুলবে না।

স্ত্রীর বিচ্ছেদ-ব্যথা ও উৎকণ্ঠার ভাবটি শ্রীসান্যাল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ে মূর্ত করে তুলেছেন। পুত্রের মুক্তির জন্যে এক অসহায় মায়ের আকুল-আর্তির রূপটি ছায়া দেবী জীবন্ত করে তুলেছেন।

উষার চরিত্রে সাবিত্রী চ্যাটার্জি তাঁর স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে চরিত্রটির মর্যাদা আরোপ করেছেন। রজতের চরিত্রে অনুপকুমার অনবদ্য। অন্যান্য চরিত্রে অনুভা গুপ্তা, অজিতেশ ব্যানার্জি, শোভা সেন, লিলি চক্রবর্তী, জহর রায়, রবি ঘোষ চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। নবাগতা মিঠু মুখার্জি আধুনিক চটুল-চপল তরুণীর রূপটি তাঁর অভিনয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবিতে চারখানি গানের মধ্যে 'না-না-না, যাব না যাব না—' (সুরকার অনল বাগচী) গানটি সুরের বৈচিত্র্যে ও গাওয়ার গুণে সুন্দর। তাছাড়া নেপথ্য সংগীতে দু-এক জায়গায় সেতারের সুষ্ঠু ব্যবহার লক্ষ্য করবার মত।

কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগে শব্দ-গ্রহণ কিছু ত্রুটিপূর্ণ, কোথাও কোথাও সংলাপ কিছু কিছু অস্পষ্ট। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার কাজ যথাযথ।

স্টুডিও থেকে

বিশেষ দিনক্ষণ দেখে বিশিষ্ট অভ্যাগত-দের উপস্থিতিতে নতুন ছবির কাজে [illegible] দেওয়া সিনেমা জগতের একটা [illegible] রেওয়াজ। এরকম একটি ছবির আরম্ভক্ষণে নিমন্ত্রিত হয়ে ২৫শে বৈশাখ হাজির হলাম নিউথিয়েটার্সের দুনম্বর স্টুডিওতে। অনেকটা আগেই এসে গেছি। স্টুডিওর ভেতরে সটান ঢুকে পড়লাম। এদিক সেদিক তাকিয়ে পরিচিত মুখের সন্ধান করছি একটু এগুতেই প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মী বললেন, সাহেব ফ্লোরে আছেন। দু'পা এগুলেই ফ্লোর। ঢুকে পড়লাম। মনে হোল আমি যেন একটা ফটোগ্রাফিক স্টুডিওতে ঢুকে গেছি। ঘর ভর্তি নানারকম ফটোর সাজসরঞ্জাম দেওয়ালে একটা বড় বোর্ডে এনলার্জড কিছু ফটো ডিসপ্লে করা। সুতুলিতে ডেভেলাপ করা কিছু ফিল্ম ঝুলছে। এদিকে সেদিকে ছড়ানো ক্যামেরা, ক্যামেরা ব্যাগ, ফটোফ্লাড ফ্ল্যাশগান ইত্যাদি। বাঁদিকের দেওয়ালের কাছে একটা টুলের উপর ট্রেতে সবেমাত্র এনলার্জ করা কিছু ছবি। একদিকে ডার্ক রুমের দরজা আর তার উপর একটি

ফ্লেমের শোবোর্ড। ঘরে কার্পেট পাতা, মাঝখানে ট্রিপডের উপর একটি ক্যামেরা।

এক নজরে তাকিয়ে দেখছিলাম। প্রায় হুঁশ ছিল না। ফ্লোরে আলো পড়তেই সম্বিত ফিরে এল। চোখ মেলে দেখি ক্যামেরাম্যান বিমল মুখার্জীর নির্দেশে সহকারী ঝিন্টু দত্ত বীরেন মুখার্জী আলো করায় ব্যস্ত। ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে পরিচালক তপন সিংহ। চোখাচোখি হতেই তিনি সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, কেমন দেখছ? আমি মনের বিস্ময় গোপন করতে পারলাম না। তপনবাবু জানান এই নিখুঁত স্টুডিও রচনা করেছেন এছবির শিল্প-নির্দেশক সূর্য চ্যাটার্জি। আমি অকপটে স্বীকার করলাম যে ফ্লোরে এমন স্টুডিও রচনা ইতিপূর্বে আর চোখে পড়ে নি। কথায় কথায় তপনবাবু জানালেন যে, তিনি এবার একজন প্রেস-ফটোগ্রাফারের জীবনী নিয়ে ছবি করছেন। ইতিপূর্বে তিনি আমাদের চোখের সামনে দেখা বহু চরিত্র নিয়ে ছবি করেছেন। সেসব ছবি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেদিক থেকে এবারকার গল্প নির্বাচন নিঃসন্দেহে অভিনব এবং প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। ছবির গল্পকার হলেন শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি।

ইতিমধ্যে ছবির মহরত শিল্পী কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ফ্লোরে ঢুকলেন। তিনি এ ছবির এক বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা। তাঁকে নিয়ে ছবির মহরত দৃশ্য গৃহীত হলো। ক্ল্যাপস্টিক দিলেন শ্রীমতী কানন দেবী। এবার ছবির নাম জানিয়ে আপনাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাই। ছবির নাম হলো "আঁধার পেরিয়ে"। ছবির চিত্রনাট্য করেছেন শ্রীসিংহ নিজে। প্রযোজনা শ্রীকমল মুখার্জীর।

২৫শে বৈশাখ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে পঞ্চশীল আর্ট ইন্টারন্যাশনাল (১৯৭২)-এর প্রথম প্রয়াস "শেষ বিচার" ছবির শুভসূচনা পর্বের পর চিত্রগ্রহণ শুরু হয় এবং তা একটানা তিনদিন চলে। মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দেন চন্দ্রাবতী দেবী। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগতা রীতা দেববর্মনকে নিয়ে যে শটটি গৃহীত হয় তা নিম্নরূপঃ—

আইনজ্ঞ হারাধনবাবুর চেম্বারে চারিধারে আলমারিতে আইনের বইতে ঠাসা। তার মাঝে দেওয়ালে টাঙানো আছে রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণদেবের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

হারাধনবাবুর চোখে পুরোলেন্সের চশমা। তিনি চেয়ারে বসে। তাঁর বাঁ পাশে টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রীতা দেববর্মন।

রীতাকে উদ্দেশ্য করে হারাধনবাবুর সংলাপ :

—কি বলছো অনিতা, সংসার করবে না বলে একটা খুনী আসামীকে রেজিস্ট্রি করলে—আজ তাকে বাঁচাতে চাইছো?

রীতা : হ্যাঁ, কাকাবাবু, দেবাংশুবাবুকে তিনি খুন করেন নি—করতে পারেন না। পরিচালক জগন্নাথ চ্যাটার্জীর গলা শোনা গেল—দিস্ মাচ্—সুখেন দাসের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং।

সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন—সুধীন দাশগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—রীতা দেববর্মন, হারাধন বন্দ্যোঃ, শ্যামল ঘোষাল, সুখেন দাস প্রভৃতি। খুব সম্ভবতঃ উত্তমকুমারকে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে। ছবির চিত্রগ্রহণে আছেন—শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচালক শ্রীপিনাকী মুখোপাধ্যায় গত সপ্তাহে উড়িষ্যার ঐতিহ্যমণ্ডিত কোনারকে তাঁর 'মেম সাহেব' ছবির চার দিনের বহির্দৃশ্যগ্রহণ শেষ করে কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। এই পর্বে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেনকে নিয়ে ছবির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোমান্টিক দৃশ্যগ্রহণ করা হয়।

মেম সাহেব ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন—বিকাশ রায়, সুব্রতা চ্যাটার্জী, ললিতা চ্যাটার্জী, সুব্রত সেনশর্মা, গীতা দে, বাসন্তী চ্যাটার্জী, ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জী প্রভৃতি। এই মাসে কয়েক দিনের অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ শেষ হলেই ছবির চিত্রগ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবে।

পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তাঁর পরবর্তী ছবি 'এক যে ছিল বাঘ' ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণ পুরোদমে চলছে। কথা প্রসঙ্গে জানা গেছে—এই ছবির হিরো একটি বাঘ। সার্কাস থেকে পালিয়ে বাঘটি সমাজের সর্বস্তরে ঘুরে মানুষের রূপ বদলের দিকটি স্বচক্ষে দেখে এবং উপলব্ধি করে ভারাক্রান্ত মনে সে আবার ফিরে যাবে সেই সার্কাস পার্টিতে। ক্যালকাটা প্রোডাকসন্স-এর প্রযোজনায় ছবির শিল্পী তালিকায় অনেক নতুন মুখের সঙ্গে পুরনোদের মধ্যে আছেন—পার্থ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায় প্রভৃতি।

ধীরে বহে মেঘনা

সম্প্রতি টেকনিসিয়ানস স্টুডিওতে বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্টারন্যাশনাল-এর ছবি 'ধীরে বহে মেঘনা' ছবির একটানা দশ-বার দিন শুটিং হয়েছে। আলমগীর কবির এর পরিচালনায় এ ছবিতে দুই বাংলার শিল্পী এবং কলাকুশলীরা কাজ করছেন। এ পর্যায়ের শুটিং-এর পর বাংলাদেশে আবার ছবির কাজ শুরু হবে।

এ শুটিংয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন আজমল হুদা, সুমিতা মুখার্জী, শমিতা বিশ্বাস, হাসু ব্যানার্জী। কোলকাতার শুটিং-এর ক্যামেরাম্যান ছিলেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। সম্পাদনায় এবং শব্দ গ্রহণে আছেন যথাক্রমে দেবব্রত সেনগুপ্ত ও মণি বসু।

মেঘের পরে মেঘ বহির্দৃশ্য গ্রহণ : পরিচালক অজিত ব্যানার্জী প্রায় ৪০ জনের এক ইউনিট নিয়ে সদলবলে টেকনিসিয়ান্স ওম প্রডাকসনের 'মেঘের পরে মেঘ' ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ কার্শিয়াং-এ সেরে কলকাতায় ফিরেছেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অনিল চ্যাটার্জী, বুলাই ব্যানার্জী, কণিকা মজুমদার, জ্ঞানেশ মুখার্জী, অজয় ব্যানার্জী, রবি ঘোষ ও নবাগত কৌশিক চৌধুরী। ছবিটির অন্যান্য বিভাগীয় দায়িত্বে আছেন সুনীল চক্রবর্তী (চিত্রগ্রহণ), অভিজিৎ ব্যানার্জী (সংগীত পরিচালনায়), অনু বর্ধন (শিল্প নির্দেশনায়) ও অনিল সরকার (সম্পাদনায়)।

পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর **'জবান' ছবির** বম্বেতে সাতদিনের চিত্রগ্রহণ শেষ করে গত সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এই পর্যায়ে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বম্বের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অমিতাভ বচ্চন, শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনিয়া সাহনী, বিশ্বজিৎ এবং ধর্মেন্দ্র অন্যতম। পূর্বে ঘোষণা অনুযায়ী এ-ছবিতে রেখার অংশগ্রহণ করার কথা ছিল, কিন্তু পরিচালকের মুখে জানতে পারলাম কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও রেখা এ-ছবিতে কাজ করতে অসম্মত হন। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সোনিয়া সাহনীর শরণাপন্ন হন এবং তিনি সানন্দে এ-ছবিতে অভিনয় করতে সম্মত হন। বম্বের অতিথি শিল্পী ছাড়া এ-ছবিতে বাংলার শমিত ভঞ্জ, জয়া ভাদুড়ী, চিন্ময় রায় প্রভৃতিরা আছেন।

এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে চিত্রগ্রাহক-পরিচালক দীনেন গুপ্ত আমায় জানিয়েছেন, 'আবদাল্লা মর্জিনা' ছবির স্যুটিং তিনি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া তাঁর পূর্ববর্তী ছবি 'বসন্ত বিলাপ' ছবির কাজও প্রায় সমাপ্ত। ২২, ২৩, ২৪, ২৫শে মে এই চারদিন স্যুটিং শেষ হয়ে গেলেই ছবির চিত্রগ্রহণপর্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে।

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

গত ৩০শে বৈশাখ সেজ সিথি, বেদিয়াপাড়ার আঞ্চলিক যুব সঙ্ঘের প্রযোজনায় রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন দেবকুমার রায়। তাঁরা উভয়েই সংক্ষিপ্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিশ্বজনীনতার উল্লেখ করেন।

প্রখ্যাত বেতার শিল্পী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, গৌর ভাদুড়ী প্রমুখ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত করে তোলেন। সঙ্ঘের শিশু শিল্পীরা কবিগুরুর কবিতা আবৃত্তি করে। বাঁশীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর পরিবেশনায় প্রদীপ সেনগুপ্ত উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখেন। অনুষ্ঠানটির শেষে সঙ্ঘের কিশোর সভ্যগণ রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত ছোট গল্প 'গুপ্ত ধন' নাটকাকারে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুপরিচালনা করেন সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক বিভাগের সাধারণ সম্পাদক অতীপকুমার সরকার।

সংস্কৃতির মনোজ্ঞ বার্ষিক উৎসব

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী সংস্থা 'সংস্কৃতি' গত ১৩ই মে এক সারারাত্রিব্যাপী পরিচ্ছন্ন রুচিশীল ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের মাঝে সংস্থার ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব পালন করেন। শ্রীদীপান্বিতা মান্নার উদ্বোধন সঙ্গীতের সঙ্গে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি মহাশয় তেরটি রক্তপদ্মের কুঁড়ি ফুটিয়ে এবং প্রধান অতিথি তেরটি বিশেষ ধরনের ধূপবাতি জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বশ্রী প্রতিমা মান্না, শিখা মান্না, মহাদেব পাত্র, শুক্লা দত্ত, অমল বটব্যাল, সুধা মান্না, হারাধন খাঁ, দীপান্বিতা মান্না, দিলীপ মান্না, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই মান্না, কমলেশ বসু, শৈলেন পাল, বিশ্বজিৎ দত্ত, পরমেশ ঘটক, বঙ্কিম চক্রবর্তী, গোপাল রানা, কুঞ্জ মান্না, সুনির্মল বসুর 'পবিত্রর মাসিমা' নাটকে সুঅভিনয় করে প্রত্যেককে চমৎকৃত করেন কুঞ্জ মান্না, সুধা মান্না ও দীপান্বিতা মান্না। স্বপ্না দত্তের নজরুল নৃত্য, বেতারশিল্পী দিলীপ ব্রহ্মের প্রাচীন লোকগীতি ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী বিজয় রানার মূকাভিনয় শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখে। পরিশেষে সংস্থার সদস্য-সদস্যারা নিমাই মান্নার নির্দেশনায় রতনকুমার ঘোষের 'সকালের জন্য' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী ফেলু দোয়ারী, অসিত পাত্র, সমর পাত্র, রণজিৎ দোয়ারী, তপন কোলে, সমীর মান্না, দিলীপ মান্না, অশোক দে,

...কোলে, অরূপ মান্না, অসিত মান্না, ...সাধুখাঁ, গোবিন্দ মাজী, শ্রীকুমার ...অশোক কোলে, তারক কোলে, শিপ্রা

দুর্গাপুরে মিশ্র ইস্পাত সংগঠনীর রবীন্দ্র সন্ধ্যা

...তে ২৮শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ...পুরে মিশ্র ইস্পাত সংগঠনী রবীন্দ্র ...র আয়োজন করে। ...কণ্ঠে গ্রীষ্মের এই সন্ধ্যাটি রবীন্দ্র ...চনা, গান, আবৃত্তি এবং একটি ...ন সুন্দর পরিবেশ রচনা করতে ... হয়। এই সংগঠনীর প্রতিটি ...ানের মত এই অনুষ্ঠানটিও সকলকে ...করে।

...শ্রীকান্ত মজুমদারের সুকণ্ঠের প্রাণ-...না রবীন্দ্রসঙ্গীত ও শ্রীপ্রদীপ ঘোষের ...তি শ্রোতাদের মনে গভীর দাগ কাটে। ...শেষে সংগঠনীর সভ্যদের দ্বারা ঈশ্বরগুরুর ...ট প্রহসন 'আশ্রম পীড়া' বিশেষ ...সফলতার সংগে মঞ্চস্থ হয়ে দর্শক-...বৃন্দের সহর্ষ অভিনন্দন লাভ করে।

মঞ্চাভিনয়

'রাজা সাজা'র 'অভিনয় দর্পণ' ঃ মঞ্চের ...য়ার বিভিন্ন অনুভূতির তরঙ্গ তুলে ...র আনাগোনা, তাঁদেরই আমরা চিনি ...এই মনের নানা প্রহরের সঙ্গে আমাদের ...চয়, কিন্তু মঞ্চের নেপথ্যে অন্ধকারে ...নাটকের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রাণবেগে ...দৃপ্ত করে তোলবার জন্য অক্লান্ত পরি-...করেন, তাঁদের মনের সুক্ষ্মতম আন্দো-... আমাদের উপলব্ধির সীমায় ধরা পড়ে ... তাই তাঁরা অবজ্ঞা আর অপরিচিতের ...কারেই লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু ...ত্যের কথা, এঁদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ...থল হোলে নাটকের অগ্রগতির ছন্দ ...টি মুহূর্তে ব্যাহত হবে। এই অব-...নত নেপথ্যশিল্পীদের জীবন নিয়ে ...টি নাটক সেদিন পরিবেশিত হোল ...গ্রের মঞ্চে। প্রযোজনা করেছিলেন ...াসাজা'র শিল্পীরা। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ...বর্ষপূর্তির অ... কত মুহূর্তে মঞ্চের ...থ্যশিল্পীদের ... কাহিনী নিয়ে একটি ...ময় নাটক ... হয়তো একটি ঐতি-...হাসিক নজীর সৃষ্ট করলেন নাট্যকার ...র মুখোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে নাট্য-...কদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি তাঁর নিশ্চয়ই

...ঞ্চের অন্তরালের তিনটি মানুষকে ... মুখ্যত এ নাটকের কাহিনী ...ছে। এদের মধ্যে কালীনাথ আর ... হোচ্ছেন সিফটার আর রাধানাথ এক-...পম্টার। অতীত যুগের কোন এক মঞ্চে ...ারের কাজ করতো কালীনাথ ও ঈশ্বর। ...নাথ ছিল সৎ ও পরোপকারী। সেই ... জন্য একটি মেয়েকে নাচার জন্য নিয়ে ... ঈশ্বর। কিন্তু মঞ্চের অন্য কেউ তাকে ... চোখে দেখল না, সবাই তার নামে ... অপবাদ দেবার চেষ্টা করতে থাকলো।

একদিন সেই মেয়েটি টেঁপি যার নাম শো চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মূর্ছা যায়। পরে জানা যায় টেঁপি অন্তঃস্বত্ত্বা, সবাই বলতে থাকে টেঁপির এই চরমতম সর্বনাশ করেছে কালীনাথ। কিন্তু ঘটনাচক্রে জানা যায় এই ঘটনার জন্য দায়ী সেই থিয়েটারের ম্যানেজার। অপমানে লজ্জায় টেঁপি একদিন আত্মহত্যা করতে উদ্যত হোলে কালীনাথই তাকে বাঁচায় এবং পরে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু শেষে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে টেঁপির মৃত্যু হয়, পৃথিবীর আলোতে নিশ্বাস নেবার জন্য বেঁচে থাকে ছোট্ট একটি শিশু। কালীনাথ তাকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করতে থাকে। রাধানাথ বড় হয়ে আবার সেই মঞ্চেই যোগ দেয়। একজন বিখ্যাত অভিনেতার রূপ-সজ্জাকরের কাজ পায়। সেই অভিনেতার পাশে থেকে তাঁর গোপন মনের বাসনার কথা সে জানতে পারে। পরে এই অভিনেতা মঞ্চ ছেড়ে দিলেও রাধানাথ মঞ্চ ত্যাগ করেনি। জাতীয় নাট্যশালা তৈরীই ছিল ওঃ অভিনেতা জীবনের স্বপ্ন। রাধানাথের চোখে ও মনেও সেই স্বপ্নের দোলা, প্রয়াসে সফল করার নিষ্ঠা। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু হোল কি?

নাটকটির মধ্যে গতিবেগ ছিল প্রচন্ড, কোন মুহূর্তেই ঘটনা বা বক্তব্যের চাপে তা মন্থর হয়ে যায়নি। নাটকটির উপস্থাপনায় নির্দেশকের বিশিষ্ট শৈল্পিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় মেলে। নাট্যকার নিজেই নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

প্রতিটি চরিত্রের শিল্পীই সমান তালে অভিনয় করে দর্শকদের মন ছুঁয়েছে এবং তাতেই টিমওয়ার্ক হয়েছে সুসংবদ্ধ। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দুর্গাদাস মুখার্জি, শিশির দাস, পঙ্কজ ঘোষ, সাধন রায়, প্রবীর চক্রবর্তী, প্রভাত চক্রবর্তী, অতনু মিত্র, তাপস মুখার্জি, বুলা সেনগুপ্ত ও স্বপ্না মুখার্জি।

সম্বলপুরে 'গোরুর গাড়ীর হেডলাইট'

গত ১০ই মে, সম্বলপুর কালীবাড়ী নাট্য সংস্থা তরুণ সদস্যশিল্পীদের প্রযোজিত তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে সরোজ রায়ের 'গোরুর গাড়ীর হেডলাইট' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

সামগ্রিকভাবে নাটকটির উপস্থাপনা স্বচ্ছন্দ সপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল শিল্পীদের সাবলীল চরিত্রচিত্রণের ছোঁয়ায়। জগৎ মাইতির 'হঠাৎ', স্বপন লোধ-এর 'লটকা' জয়ন্ত ব্যানার্জির 'অতএব' ও সঞ্জীব ঘোষের 'জলপী' দর্শক মনে দাগ কাটে। সুবীর সেনগুপ্তর 'ইত্যাদি', জহর ব্যানার্জির 'চন্দ্রবদন', দিলীপকুমারের 'উত্তম বাগ, ভাস্কর মুখার্জির 'ফটিক, সুনীল রায়ের 'স্বাবলম্বী' ও সঞ্জয় দের 'আনন্দ' সুন্দর অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

রোমিও ও চুমকি চরিত্র দুটি প্রাণময় হয়ে ওঠে মনোরঞ্জন নাথ এবং প্রতিমা ব্যানার্জির অভিনয়ে।

জয়ন্ত বসু নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও মঞ্চ-পরিকল্পনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'গোরুর গাড়ীর হেডলাইট' নাটকটি নির্দেশনায় ছিলেন সুপ্রত্যয়কুমার গুহ।

পুতুলের বিয়ে ঃ বাণী বিদ্যাবীথি সঙ্গীতায়তনের ৩৬তম বার্ষিক সমাবর্তন এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৬ই এবং ৭ই মে রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে (লেক স্টেডিয়াম) উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীতায়তনের শিশু শিল্পীদের একটি মনোজ্ঞ নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানটি 'পুতুলের বিয়ে' নৃত্যনাট্য। শিশুসুলভ কল্পনা, অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা এই নৃত্যনাট্যটির মর্ম কথা। এই নাটিকাটির গ্রন্থনা করেছেন সঙ্গীতায়তনের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী ছায়া দত্ত এবং পরিচালনা করেছেন শ্রীমতী সুস্মিতা মিশ্র। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্রীমতী গীতালী সেনগুপ্ত।

'গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর' ঃ পি এন টি'র দমদম ইউনিট রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে পরিবেশন করলেন 'গভর্ণমেন্ট ইন্সপেকটর' নাটকটি। নাটকটির নির্দেশনায় কুসুম নাগ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন প্রচুর। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন তাঁরা হলেন ঃ শাশ্বতী রায়, দীপা রায়, পবিত্রকুমার চন্দ, সরোজ নন্দী, মনোরঞ্জন দাস, কেশবচন্দ্র বাকুলি, মিলন মল্লিক, নিখিলেন্দু সরকার, কমল চ্যাটার্জি, দিলীপ ভৌমিক।

খেলাধুলা

দর্শক

ডেভিস কাপ

পূর্বাঞ্চলের খেলা

বাঙ্গালোরের কুব্বন পার্ক কোর্টে আয়োজিত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে হারিয়ে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। ১৯৭০ সালে এইখানেই অস্ট্রেলিয়া পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষের কাছে ১—৩ খেলায় হেরেছিল। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া এবার নিয়ে মোট চারবার খেলে ইতিপূর্বে দুবার জিতেছে—১৯৫৯ সালে বোস্টনের (আমেরিকা) ইন্টার-জোন ফাইনালে ৪—১ খেলায় এবং ১৯৬৬ সালে মেলবোর্নের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে ৪—১ খেলায়।

১৯৭২ সালের এই পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলাটি বৃষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট দিনে আরম্ভ হয়নি। চারদিন পর খেলা আরম্ভ হয়।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম দিন

জিওফ মাস্টার্স (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৬—৩, ৩—৬, ১—৬ ও ৬—৩ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

রস এণ্ডারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৪, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে বিজয় অমৃতরাজকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিন

জিওফ মাস্টার্স এবং কলিন ডিবলে (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৬—৪, ৩—৬ ও ৮—২ গেমে প্রেমজিৎ লাল এবং জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

তৃতীয় দিন

রস কেস (অস্ট্রেলিয়া) ৬—১, ৮—৬ ও ৭—৫ গেমে আনন্দ অমৃতরাজকে পরাজিত করেন।

জিওফ মাস্টার্স ৭—৫, ৪—৬, ৬—৩ ও ৬—২ গেমে বিজয় অমৃতরাজকে পরাজিত করেন।

ইউরোপীয়ান সোকার চ্যাম্পিয়ানসীপ

১৯৭২ সালের ইউরোপীয়ান সোকার অর্থাৎ (ফুটবল) প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার মুখে এসে গেছে। একদিকের সেমি-ফাইনালে খেলবে বেলজিয়াম এবং পশ্চিম জার্মানী। কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়াম অপ্রত্যাশিতভাবে ২—১ গোলে গতবারের চ্যাম্পিয়ান ইতালীকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতা

ব্যাংককে আয়োজিত এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইরান ২—১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দলই একটি করে গোল দেয়। অতিরিক্ত সময়ের খেলার ৪র্থ মিনিটে ইরানের হোসেন কালানি জয়সূচক গোলটি দেন।

সেমি-ফাইনালে ইরান ২—১ গো[illegible] কম্বোডিয়াকে এবং দক্ষিণ কোরিয়া ২[illegible] গোলে থাইল্যাণ্ডকে পরাজিত [illegible] ফাইনালে উঠেছিল।

থাইল্যাণ্ড ৫—৪ গোলে কম্বোডিয়া[illegible] হারিয়ে প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান পায়।

ভারত সফরে এম সি সি

আগামী শীতকালে ইংল্যা[illegible] মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব (এম সি সি) [illegible] সপ্তাহের ভারত সফরে আসছে। ইতি[illegible] এম সি সি ৫-বার (১৯২৬ [illegible] ১৯৫১, ১৯৬১ ও ১৯৬৪ সালে) [illegible] সফরে এসেছিল। প্রথম আসে [illegible] সালে এ ই আর গিলিগানের নে[illegible] ভারতবর্ষের মাটিতে ইংল্যাণ্ড প্রথম [illegible] ম্যাচ খেলে ১৯৩৩-৩৪ সালের সফরে [illegible] আর জার্ডিনের নেতৃত্বে।

ভারত সফরে ইংল্যাণ্ড এপর্যন্ত ১৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে, তার ফলাফ[illegible] ইংল্যাণ্ডের জয় ৩, ভারতবর্ষের [illegible] খেলা ড্র ১২। ভারতের মাটিতে অনু[illegible] ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের চারটি [illegible] সিরিজের ফলাফলও সমান দাঁড়ি[illegible] ইংল্যাণ্ডের জয় ১ (১৯৩৩-৩৪), [illegible] বর্ষের জয় ১ (১৯৬১-৬২) এবং ড্র ২।

১৯৭২ সালে দশ সপ্তাহের [illegible] সফরে এম সি সি মোট ১১টি ম্যাচ [illegible] ৫টি সরকারী টেস্ট এবং ৬টি [illegible] খেলা (আঞ্চলিক দলের বিপক্ষে [illegible] বোর্ডের সভাপতি একাদশ অথবা সম্মি[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে ১)।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ভারত সফরে এম সি সি দলের শ্রেণীর খেলার ফলাফল :

বছর	খেলা	জয়	[illegible]
১৯২৬-২৭	৮	৬	
১৯৩৩-৩৪	১৬	৮	১
১৯৫১-৫২	১৭	৬	১
১৯৬১-৬২	১৫	৪	২
১৯৬৩-৬৪	১০	১	০
মোট :	৬৬	২৫	৪

এম সি সি-র পরাজয়

ভারত সফরে এম সি সি এপর্যন্ত খেলায় অংশ গ্রহণ করে যে ৪টি [illegible] হার স্বীকার করেছে তার ফলাফল : [illegible] ১৯৩৩-৩৪ সালে ভিজিয়ানাগ্রাম এ[illegible] দলের কাছে ১৪ রানে, (২) ১৯৫১ সালে মাদ্রাজের ৫ম টেস্টে এক ইনিং[illegible] ৮ রানে, (৩) ১৯৬১-৬২ সালে কলক[illegible] ৪র্থ টেস্টে ১৮৭ রানে এবং মাদ্রাজের টেস্টে ১২৮ রানে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাষিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

অমৃত

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

৫ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 2nd June, 1972 শুক্রবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ .52 Paise

এক নজরে

গুজরাতও সিক্ত হতে চায় : একদা মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতের শেষ দুর্গ গুজরাতেরও পতন আসন্ন বলে মনে হচ্ছে। সেখানেও সদ্যগঠিত বিধানসভায় দাবি উঠেছে, মাদকদ্রব্য বর্জন আইন বাতিল করে গুজরাতকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো 'সিক্ত' করা হক। এটা কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে করা হয়নি। কারণ গুজরাতের এবারের বাজেটে কোন নতুন কর ধার্যের প্রস্তাব না করেও ২৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে।

দাবিটি উঠেছে মুখ্যত দক্ষিণ গুজরাত, সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের সদস্যদের পক্ষ থেকে। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের এলাকার অধিবাসীরা মাদকদ্রব্য বর্জন আইন অবিলম্বে প্রত্যাহারের ব্যাপারে এতই আগ্রহী যে গত বিধানসভার নির্বাচনে বহু ব্যালটবাক্সে ঐ দাবি জানিয়ে তাঁরা অগুনতি লেখা ফেলে যায়। বিশেষ করে তাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সদস্যরা সর্বাধিক দাবি জানান। তাঁরা বলেন, সরকারি নিষেধাজ্ঞার ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিরা যারা গোপনে নিম্নমানের মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করে ও জনসাধারণের কাছে তা চড়া দামে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লুঠ করছে এবং সমাজের নৈতিক মানের অবনতি ঘটাচ্ছে। তাঁদের দাবি সমর্থন করে মোরারজি-ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ অমূল দেশাই বলেন, নিষেধাজ্ঞা মাদকাসক্তের সংখ্যা হ্রাস না করে দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছে। তাছাড়া একজন ডাক্তার হিসাবে তাঁর অভিমত, মাদকদ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে যতটা ক্ষতিকর বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা ততটা নয়। বরদা থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী সি পি পারিখ বলেন, নিষেধাজ্ঞার যা পরিণতি দেখা যাচ্ছে তাতে অতিবড় গান্ধীবাদীও এখন নিষেধাজ্ঞার কোন সার্থকতা খুঁজে পাবেন না। পুরাতন গান্ধীবাদী নেতা শ্রীমানেকলাল গান্ধী অবশ্য ঐ সোচ্চার গণদাবির মধ্যেও নিবেদন করেন যে, মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সংবিধান-ঘোষিত আদর্শেরই অংশ।

সহবাস কিন্তু বিবাহ নয় : সুইডেনের এই নতুন সমস্যা সেখানকার শাসক ও সমাজকর্তাদের রীতিমতো চিন্তিত করে তুলেছে। সে রাজ্যে আনুষ্ঠানিক বিবাহ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে এবং যুবকযুবতীরা আইন বা চার্চের কোন পরোয়া না করেই যে যার মনের মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধছে। ফলে অবৈধ শিশুর সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত হারে। সুইডেনের রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান আরল্যান্ড হফস্টেন বলেছেন, ইউরোপের আর কোন দেশে এ সমস্যা এত ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি।

১৯৬৬ সালে সুইডেনে বিবাহ হয়েছিল ৬১,১০১টি, আর গত বছরে বিবাহ হয় মাত্র ৩৯ হাজার। যার মানে হল, মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে ঐ রাজ্যে আনুষ্ঠানিক বিবাহের সংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। প্রায় শতাব্দীকাল আগে যখন সুইডেন থেকে দলে দলে লোক আমেরিকায় চলে যেতে থাকে, কেবলমাত্র সেই সময় সুইডেনে বিবাহের সংখ্যা বছরে চল্লিশ হাজারের নিচে নেমে আসে। হফস্টেন হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ২৩-২৪ বছর বয়সের মেয়েরা ও ২৫-২৬ বছর বয়সের ছেলেরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে সে রাজ্যে। আর এ সবের ফলে সুইডেনে এখন যত শিশু ভূমিষ্ঠ হয় প্রতি বছর তার ১৮ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় প্রতি পাঁচটির একটি হয় অবৈধ।

আনুষ্ঠানিক বিবাহে সুইডেনের ছেলেমেয়েদের এই অনীহা কেন? বিভিন্ন মহল থেকে এর নানা কারণ বাতলানো হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা নিজেরা অবশ্য বলছে যে, তাদের ভালবাসা এতই গভীর যে তা চার্চ বা আইনের স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ বা ধর্মযাজকরা সেকথা মানতে চান না। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, সাবেক বিবাহরীতি আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে অনাবশ্যক বন্ধন বলে মনে হয়। অর্থনীতি-বিদরা বলেন, এই সমস্যার মূলে রয়েছে নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও অনন্যনির্ভরতা; তারা পুরুষের সংস্পর্শে আসে যৌবনের আকর্ষণে কিন্তু তার জন্য অন্য কোন দায়দায়িত্বের বন্ধনে তারা যেতে চায় না। আর খৃষ্টীয় যাজকেরা বলেন, বর্তমান যুবসমাজের কাছে ধর্মের আবেদন দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে, তাই সমাজ জুড়ে এই অনাসৃষ্টি।

ভালবাসার বন্ধন, তাই ভালবাসার উত্তাপ কমে এলে বন্ধন-গ্রন্থি ছিন্ন হতেও সময় লাগে না। সে রাজ্যে এখন প্রতি তিনটি বিবাহের একটি দশ বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬০ সালে সে রাজ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় ৮,৯৫৮টি, ১৯৬৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২,২৩৮টি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অভিযোগ ব্যাভিচার, মাতলামি, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতি। অবিবাহিত দম্পতিগুলির বিচ্ছেদের হিসাব এর মধ্যে নেই, কারণ তা আদালতের এক্তিয়ার-বহির্ভূত। অবিবাহিত দাম্পত্যের বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য সুইডেনে এখন নানা প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সমাজতত্ত্ব-বিদদের অভিমত, সাবেক বিবাহরীতির বদলে এমন এক বিবাহ-রীতি প্রবর্তন করা হক যার বন্ধন হবে নামমাত্র এবং যা ছিন্ন করার জন্য কোন পক্ষকে মামলা মকর্দমা অথবা দীর্ঘ প্রতীক্ষার ঝুঁকি নিতে হবে না।

নেকড়ে-বিহীন রোম : সম্প্রতি রোমনগরী প্রতিষ্ঠার ২,৭২৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল। কিন্তু রোমবাসীদের ক্ষোভ, এই প্রথম কোন নেকড়ের উপস্থিতি ছাড়াই রোম তার [illegible]ঠা-বার্ষিকী পালন করল। নেকড়ে বাঘের উপস্থিতি ছাড়া [illegible]গরীর প্রতিষ্ঠা-কাহিনী স্মরণ রোমবাসীদের কাছে প্রায় [illegible]ল্পনাতীত ব্যাপার।

রোমনগরীর প্রতিষ্ঠাতা দুই যমজভাই রুমুলাস ও রেমাস ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পকাল পরে টাইবার পর্বতে একটি ঝুড়ির মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলে একটি নেকড়ে তাদের নিয়ে যায় ও স্বীয় স্তন্যে মানুষ করে তোলে। পরে নানা ঘটনাপরম্পরায় ঐ দুই নেকড়েপালিত মানবশিশু ৭৫৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে রোমনগরীর পত্তন করে; রোমের প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে রমুলাসের হাতে তার ভাইয়ের মৃত্যু হয়।

নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ভ্রাতৃদ্বয়ের শৈশব কাহিনীর স্মরণে রোমে দীর্ঘকাল ক্যাপিটোলাইন পর্বত শিখরে একটি খাঁচায় দুটি নেকড়ে বাঘ সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কিন্তু কিছুদিন আগে তার একটি মারা যায় এবং অপরটিকেও স্বাস্থ্যের কারণে রোমনগরী প্রতিষ্ঠা উৎসবের কদিন আগে পশুশালায় পাঠাতে হয়। তাই এবারের উৎসবে এত বড় বিচ্যুতি। কিন্তু রোমবাসীরা ব্যাপারটাকে এত সহজভাবে নিতে পারছেন না। তাঁরা এর মধ্যে কেউ কেউ অমঙ্গলের ইঙ্গিত দেখেছেন, কেউ বা মনে করেছেন, চিরন্তন রোমনগরীর দিন বুঝিবা শেষ হয়ে আসছে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

এই মৈত্রী অটুট থাকবে

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে মৈত্রী গড়ে উঠেছে তা কাগজেপত্রে সই-করা চুক্তির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নেই। দুই দেশের মানুষের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগসূত্রের ওপরেই তা প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে এদেশের বীর সৈনিকরাও প্রাণ দিয়েছেন। রক্তের বিনিময়ে গড়া এই মৈত্রী দুই দেশের জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। একে কোনোমতেই, কোনো কারণেই স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে আমরা ব্যর্থ হতে দিতে পারি না। এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ, সম্প্রতি বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর বিরুদ্ধে স্ফুট ও অস্ফুট গুঞ্জন শুরু করেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। অবশ্য এরা সংখ্যায় নগণ্য এবং নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এই ধরনের চাল তারা দিচ্ছে, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। শেখ মুজিবর রহমানের অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং তাঁর সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী বিধ্বস্ত বাংলা পুনর্গঠনে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, অন্ধকারের জীবেরা খুবই অসুবিধায় পড়েছে। পাকিস্তানের স্বপ্নে যারা এতদিন মশগুল হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যারা বাংলার বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাদের কাছে স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় শুধু অভাবনীয়ই নয়, রীতিমত দুঃসহ। তাই সুযোগ বুঝে সেই অপশক্তি তাদের পুরনো খেলা শুরু করেছে নতুন কায়দায়।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্প্রতি যে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাকে অছিলা করেই স্বার্থান্বেষীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাদের নাকি বাংলাদেশের দুঃখে রাত্রে ঘুম হয় না। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়েও তারা বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষায় বেশি আগ্রহী একথা প্রতিপন্ন করার জন্য এই স্বার্থান্বেষীদের এত মায়াকান্না। তারা বলতে চায় যে, ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য-চুক্তির ফলে বাংলাদেশের জিনিসপত্র সব ভারতে চলে যাবে, দেশের মানুষের আর্থিক দুর্দশা বাড়বে। বাণিজ্য-চুক্তির গুণাগুণ বিচার ও বিশ্লেষণের অধিকার উভয় দেশের মানুষেরই আছে। চুক্তি পুনর্বিবেচনার সময়ও পার হয়ে যায়নি। কিন্তু যেভাবে একে ভারত ও বাংলাদেশ মৈত্রীর বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে এক শ্রেণীর লোক তাতে আশংকা হয় এদের ষড়যন্ত্র আরও গভীর। উভয় দেশের সরকারকেই এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে।

প্রথমেই বলা দরকার যে, ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় স্তরেই বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। বে-সরকারী ব্যবসায়ীরা অবাধে গিয়ে সেখানে বাণিজ্য করবে, এ সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকার যতটুকু বে-সরকারী বাণিজ্য অনুমোদন করবেন তার বেশি একচুলও ভারত সরকার অনুমতি দেবেন না। বাংলাদেশের মানুষের কোনোরকম কষ্ট হোক ভারত সরকার তা চান না। বাংলাদেশ সরকার যা চাইবেন এবং তাঁদের দেশের মানুষের পক্ষে যা কল্যাণকর সেভাবেই এই চুক্তি কার্যকর হবে। এক বছরের জন্য এই চুক্তি। উভয় দেশের স্বার্থে, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে যে-কোনো সময়েই এই চুক্তি পর্যালোচনা করা যাবে। এর জন্য কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই।

আসলে ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব যাদের চক্ষুশূলে তারাই যে-কোনো অছিলায় ভারতবিরোধী প্রচারে লিপ্ত হয়। দীর্ঘকালের পাকিস্তানী অপশাসন এমন অনেক শক্তির জন্ম দিয়ে গেছে যারা সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোটনিরপেক্ষতা প্রভৃতি মানবিক নীতি বরদাস্ত করতে পারে না। এরাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকবাহিনীর দালাল সেজে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে হত্যা করেছে। তারা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে বাংলাদেশ তার সার্বভৌম সত্তা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তারা ভাবতেও পারেনি যে বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের সঙ্গে এমনিভাবে অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবে। আজ সেই সত্য বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখেই এই ষড়যন্ত্রকারীদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এই চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য দেশবাসীকে হুঁসিয়ারী দিয়েছেন। প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও জাতিবৈরিতা সম্বল করে এতকাল পাকিস্তানী শাসকরা বাংলাদেশকে শোষণ করে গেছে। আজ স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ। এতদিনের শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের নিগড় ভেঙে ফেলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে পা বাড়িয়েছে। এই মুহূর্তে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাকে আমরা কোনোমতেই চক্রান্তকারীদের হাতের শিকার হতে দিতে পারি না। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক। ভারত ও বাংলার মানুষে পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে তুলুক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ।

পটভূমি

পশ্চিমবাংলার নতুন সরকার রাজ্য যোজনা পর্ষদ গঠন করে অনেক দিনের একটি অভাব মিটিয়েছেন। এখন এই পর্ষদ যদি ঠিকমতো কাজ করে তবে তার দ্বারা এই রাজ্যের অনেক কল্যাণ হতে পারে।

যোজনা বা পরিকল্পনা ব্যাপারটা শুনতে যতোই কঠিন মনে হোক, খুব সরলভাবে বলতে গেলে এর দ্বারা দুটো জিনিস বোঝায়। এক—আমাদের সীমিত সংগতিকে কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়, এবং দুই—নানা প্রয়োজনের মধ্যে কোন প্রয়োজনটা আগে মেটাবার ব্যবস্থা করা হবে। কেন্দ্রীয় স্তরে অবশ্যই একটি যোজনা কমিশন আছে এবং গোটা দেশের সুষম উন্নয়নের জন্যে এই ধরনের একটি কমিশন দরকারও। গোটা দেশের যোজনা তৈরি ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের যোজনা তৈরির দায়িত্বও এই কমিশনের।

কোনো রাজ্যের যোজনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে যোজনা কমিশন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একটা খসড়া পেয়ে থাকেন ঠিকই। রাজ্য সরকার যে রাজ্যের স্বার্থরক্ষার কোনো চেষ্টাই করেন না তা নয়। রাজ্যের অনেক দাবি মেটাবার জন্যেই তাঁরা অনেক সময় যোজনা কমিশনের কাছে আর্জি পেশ করেন। কিন্তু রাজ্য স্তরে যোজনার যে খসড়া তৈরি হয় তা করেন আমলারা। তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী লোক কেউ নেই, এমন নয়। কিন্তু তাঁরা ব্যস্ত মানুষ। নিজেদের দপ্তরের হাজার ঝামেলা সামলে তার ফাঁকে তাঁরা যোজনার খসড়া তৈরি করেন। মন্ত্রিসভার কাছ থেকে তাঁরা অবশ্যই কিছু কিছু নির্দেশ পান। কিন্তু মন্ত্রী বা আমলারা কেউই রাজ্যের যোজনা সম্পর্কে একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে তাঁরা যে যোজনার খসড়া তৈরি করেন তাতে হয়ত কাজ চলে যায়, কিন্তু রাজ্যের প্রকৃত প্রয়োজন মেটে না।

পশ্চিমবঙ্গের কথা আলোচনা করলেই এই ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। এই রাজ্যের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনার কথাই ধরা যাক। এই যোজনার পাঁচ বছরে বিভিন্ন রাজ্য মাথাপিছু যতো টাকা খরচ করবে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবচেয়ে নিচে। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা প্রায়ই করা হয়ে থাকে। এই রাজ্যের চেয়ে মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু চতুর্থ যোজনায় মহারাষ্ট্র যেখানে খরচ করছে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গ সেখানে খরচ করবে মাত্র ৩২২ কোটি টাকা।

এর জন্যে আমরা সব সময়েই দিল্লীকে দোষ দিয়ে থাকি। অনেক ব্যাপারেই যে এই রাজ্যের প্রতি দিল্লী বৈষম্য করেছে, তা নতুন করে বলার দরকার নেই। চতুর্থ যোজনা রূপায়ণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে যে সাহায্য দিয়েছে জন-সংখ্যার মাথাপিছু হিসেব ধরলে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবার নিচে। ঠিক কথা। কিন্তু নানা ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মহারাষ্ট্রের প্রতি পক্ষপাত এবং পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি বৈষম্যের কথা যখন আমরা বলি তখন আমরা ভুলে যাই যে, চতুর্থ যোজনায় কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসেবে এই রাজ্য যতো টাকা পেয়েছে মহারাষ্ট্র তার চেয়ে এক পয়সা বেশি পায়নি (মাথাপিছু ৫৪ টাকা)।

তা হলে মহারাষ্ট্র কী করে পশ্চিম-বঙ্গের চেয়ে তিন গুণ বড়ো যোজনা রূপায়ণের ঝুঁকি নিল? কোথা থেকেই বা এত টাকা পেল? টাকাটা মহারাষ্ট্র সরকার জোগাড় করেছেন রাজ্যের মধ্যে থেকেই। অবশ্যই মহারাষ্ট্রের অবস্থার সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থার তফাৎ আছে। চতুর্থ যোজনা তৈরি হওয়ার মুখে এই রাজ্যে যে-ধরনের বৈষয়িক সংকট দেখা দিয়েছিল মহারাষ্ট্রে তা দেখা যায়নি। তার ওপর ছিল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। কিন্তু মনে হয়, ঐ সংকটের ফলে পশ্চিম বাংলার বৈষয়িক অবস্থার যে-সব ত্রুটি ধরা পড়ে-ছিল সেই সব ত্রুটি দূর করার জন্যেই চতুর্থ যোজনা তৈরির সময় আরো দূরদৃষ্টির দরকার ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনের কথা ভেবেই দরকার ছিল আরো বড় যোজনা তৈরি করা। দিল্লী থেকে বেশি টাকা যখন পাওয়া গেল না, তখন রাজ্যের মধ্যে থেকে কীভাবে আরো বেশি কিছু টাকা জোগাড় করা যায় তা ভালোভাবে দেখা দরকার ছিল। রাজ্যের মধ্যে থেকে কিছু বেশি টাকা জোগাড় করতে হলে হয়ত এই রাজ্যের মানুষকে আরো কিছুটা কৃচ্ছ্রসাধন করাতে হতো কিন্তু ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির কথা ভেবে অনেকে তা করতে হয়ত অরাজী হতেন না। তা ছাড়া সাধারণ মানুষের ওপর কর না বসিয়েও কীভাবে বাড়তি টাকা জোগাড় করা যায় সে-কথাটাও ভেবে দেখা যেত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা বা আমলাদের কেউই এভাবে চিন্তা করেননি। একটি রাজ্য যোজনা পর্ষদের হাতে রাজ্যের যোজনা তৈরির ভার থাকলে তাঁরা এই সব কথা চিন্তা করতেন, এমন আশা করা অন্যায় নয়।

•

রাজ্যের যোজনা নিয়ে যথাযথভাবে চিন্তার অভাবে শুধু যে যোজনার আকার নিয়েই অসুবিধে হয়েছে তা নয়, রাজ্যের ঠিক কী প্রয়োজন সে-বিষয়েও কোনো ধারণা গড়ে ওঠেনি। চাষবাসের কথাই ধরা যাক। স্বাধীনতার আগে থেকেই দেশের এই এলাকায় খাদ্যের অভাব ছিল। দেশভাগের পর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়। এই অবস্থায় সকলেই আশা করবেন যে, রাজ্যের যোজনায় যে সব বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে তার মধ্যে একটি হবে চাষবাসের উন্নতি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পশ্চিম-বঙ্গের জন্যে এযাবৎ যতো যোজনা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কোনোটিতেই চাষবাসকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে যোজনার একটা সামান্য অংশ। সেচের ব্যবস্থাও তেমন প্রসার লাভ করেনি। এর ফল হয়েছে এই যে, খাদ্যশস্যের ব্যাপারে এই রাজ্যে বরাবরই ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মোট উৎপাদনও বাড়েনি, একর প্রতি উৎপাদনও বাড়েনি। সবুজ বিপ্লব অন্যান্য রাজ্যে এসে পৌঁছলেও এরাজ্যে এসে পৌঁছয়নি। তাই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে বরা-বরই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অন্য রাজ্য থেকে খাদ্যশস্য আমদানির ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। আর শুধু চাল-গমই নয়, তেল-ডাল-আলুর জন্যেও পশ্চিমবঙ্গ পরমুখাপেক্ষী। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী সর্বশেষ যে-হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্যের ঘাটতি এখনও দশ লাখ টনের মতো। চাষবাসের অবহেলার ফলে ক্ষতি হয় দুভাবে। এক—বাইরে থেকে খাদ্য-শস্য আনতে হয় বলে অনেক টাকা রাজ্যের বাইরে চলে যায়। দুই—চাষবাসের উন্নতি না হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের বৈষয়িক ব্যবস্থার দৈন্যদশা ঘোচে না। নতুন যোজনা পর্ষদ তাঁদের প্রথম বৈঠকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তুলতে হবে। কৃষিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৭৪ সালের মধ্যেই খাদ্যের ঘাটতি মিটিয়ে ফেলা যাবে। এটা নিশ্চয়ই সুখবর। কিন্তু যেটা ভেবে অবাক লাগে, তা হলো পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার কর্মসূচী তৈরি করতে স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর পার হয়ে গেল।

•

কোন প্রয়োজন আগে মেটানো হবে সেটা ঠিক করা যেমন যোজনার লক্ষ্য, তেমনই সব এলাকায় সুষম উন্নয়নও তার একটা উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে এযাবৎ যে-ধারায় যোজনা তৈরি হয়ে এসেছে তার ফলে কিন্তু এই উদ্দেশ্য তেমন সাধিত হয়নি। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উন্নয়নের হারের তফাৎ তো রয়েই গেছে, তা ছাড়া একই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মধ্যেও উন্নয়নের কাজে বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এই বৈষম্য কমবেশি সব রাজ্যেরই সমস্যা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই বৈষম্য যতোটা চোখে পড়ে অন্যান্য রাজ্যে ততোটা নয়।

এর অনেক কুফলও দেখা দিয়েছে। উন্নয়নের পর্যায় হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলাকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা

হয়ে থাকে। গোটা দেশের হিসেবে দেখা যায় যে, সবচেয়ে উন্নত জেলাগুলিতে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ ভাগ লোক বাস করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেলায় দেখা যায়, রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি লোক সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের জেলা কটিতে এসে ভিড় করেছে। ফলে ঐসব জেলায় নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। উন্নয়নের চারটি পর্যায়ের কথা বলেছি। সবচেয়ে উন্নত যে-পর্যায় তার পরে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের কোনো অস্তিত্বই প্রায় নাই। গোটা দেশে এই পর্যায়ের জেলা-গুলিতে শতকরা প্রায় ২৫ জনের বাস, কিন্তু এই রাজ্যে এই পর্যায়ের জেলা-গুলিতে মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগও বাস করেন না।

এই যে রাজ্যের অধিকাংশ লোক মাত্র কয়েকটি জেলায় এসে ভিড় করেছেন সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যেখানে কাজ-কর্মের, জীবিকা উপার্জনের সুযোগ সেখানে মানুষের ভিড় বেশি হবেই। এই রাজ্যের বছরে যা মোট আয় হয় তার মধ্যে কোন জেলা থেকে কতো অংশ পাওয়া যায় একবার তার হিসেব করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল যে, মোট আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসে মাত্র তিনটি জেলা থেকে (কলকাতা, বর্ধমান ও ২৪ পরগণা), সিকি ভাগেরও বেশি আসে আর তিনটি জেলা (হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর) থেকে। এর পরে যে সামান্য কিছু বাকি থাকে সেটা আসে দশটি জেলা থেকে। এই হিসেব থেকেই বোঝা যায়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যে কতো বৈষম্য রয়েছে।

এই বৈষম্যের অবশ্য আরো নানা উদাহরণ আছে। এই রাজ্যে মোট যতো কল-কারখানা আছে তার শতকরা আশি ভাগই কলকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়ায়। ঐসব জেলায় ভিড়ের কারণও এই। আর অন্যদিকে, সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া যে সাতটি জেলা সেখানে মোট কল-কারখানা শতকরা একভাগও নেই। আগেই বলেছি, সব রাজ্যেই এই ধরনের বৈষম্য কম-বেশি দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট। বিভিন্ন জেলায় কল-কারখানার লাইসেন্স যেভাবে বন্টন করা হয়েছে তার হিসেব থেকেও এই বৈষম্যের প্রমাণ ভালো-ভাবে পাওয়া যায়।

খুব সাম্প্রতি এই সমস্যার প্রতি সরকারী কর্তাদের নজর পড়েছে। শিল্পো-ন্নয়নের জন্যে যে ১৬ দফা কর্মসূচী তৈরি হয়েছে তাতে অনগ্রসর এলাকার উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীরা বারবার পিছিয়ে-পড়া এলাকায় কল-কারখানা খোলার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন। রাজ্যের ১৩টি জেলাকে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করা হয়েছে—অর্থাৎ ঐসব জেলায় কল-কারখানা খুললে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত এই আহ্বানে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই সমস্যার প্রতি রাজ্য যোজনা বোর্ডকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে গোড়া থেকেই। কারণ, উন্নয়নের বৈষম্য শুধু বৈষয়িক সমস্যাই তো নয়, এর ফলে অনেক রাজ-নৈতিক সমস্যাও জন্ম নেয়।

২৭।৫।৭২ —দেবব্রত

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি-বাহিনীর বিজয়ী সৈন্যরা যুদ্ধশেষে শিবিরে ফিরে যাচ্ছেন।

দেশে বিদেশে

প্রেসিডেন্ট নিকসন মস্কো অভিমুখে যাত্রা করার আগে ওয়াশিংটনস্থিত রুশ রাষ্ট্রদূত ডব্রিনিন রুশ কম্যুনিস্ট নেতা ব্রেজনেভের একটি পত্র নিকসনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সে-সময়ে রাষ্ট্রদূত ডব্রিনিন প্রেসিডেন্ট নিকসনকে একটি মজার কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেটি নাকি ব্রেজনেভের প্রিয় কাহিনী। একজন ব্যবসায়ী রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আর একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করেন 'অমুক গ্রামটি কত দূরের পথ?' পথিক বললেন, 'আমি জানি না।' ব্যবসায়ী অতঃপর গ্রামের দিকে রওনা দিলেন। দুয়েক পা যেতেই তাঁকে ডেকে সেই পথিক বললেন, '১৫ মিনিটের পথ।' বিস্মিত ব্যবসায়ী শুধোলেন, 'আগেই সেকথা বললেন না কেন?' পথিক জবাব দিলেন, 'তখন তো আর জানতাম না, এক কদমে আপনি কতখানি রাস্তা যেতে পারেন।'

মস্কোতে আমেরিকা ও রাশিয়ার নেতারা ইতিমধ্যে প্রথম যে কয়েক কদম উঠিয়েছেন তা থেকে তাঁদের গতিবেগ কতকটা অন্দাজ করা যেতে পারে, যদিও এইসব পদক্ষেপ করে তাঁরা বিশ্বশান্তির কতটা কাছে এলেন তার আন্দাজ করার সময় এখনও আসেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার নেতারা মস্কোতে বসে ইতিমধ্যে গোটা ছয়েক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। একটি চুক্তিতে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিকারের সমস্যা যুক্তভাবে পর্যালোচনা করার ও তার প্রতিকারের উপায় সন্ধান করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আর একটি চুক্তিতে বলা হয়েছে, হৃদরোগ ও ক্যানসারজাতীয় রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দুই দেশ চিকিৎসা গবেষণা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা করবে। তৃতীয় ও চতুর্থ আরও দুটি চুক্তির মধ্য দিয়ে স্থির হয়েছে যে, অন্তরীক্ষ অভিযানের জন্য আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। পঞ্চম চুক্তিটিতে বলা হয়েছে যে, উন্মুক্ত সমুদ্রপথে দুই পক্ষের যুদ্ধজাহাজের ও সমুদ্রের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী উভয় পক্ষের সামরিক বিমান যাতে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে কোন দুর্ঘটনা না ঘটায় সেজন্য দুই পক্ষই কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলবে।

দুই পক্ষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে নিকসনের সফরের পঞ্চম দিনে। ঐ চুক্তির দ্বারা কার্যত দুটি দেশ নিজেদের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে। চুক্তির প্রধান প্রধান কয়েকটি ধারায় বলা হয়েছে, অপর পক্ষের দিকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাবার জন্য পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে উভয় দেশ একটা সীমা মেনে চলবে, আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের নতুন আর কোন ঘাঁটি তারা তৈরি করবে না, নতুন আর কোন আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র কোন পক্ষই তৈরি করবে না এবং ক্ষেপণাস্ত্রবাহী আর কোন নতুন সাবমেরিন উভয় দেশই তৈরি করবে না। আক্রমণ বা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দূর-পাল্লার বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ কিভাবে সীমিত করা যায় সেই বিষয়ে গত প্রায় দুই বছর যাবৎ বিশ্বের দুই বৃহত্তম শক্তির মধ্যে আলোচনা চলে আসছিল। ইংরেজিতে এই আলোচনা 'স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন টকস', সংক্ষেপে এস-এ-এল-টি বা 'সল্ট' নামে পরিচিত। মস্কোতে দুই দেশের নেতারা যে চুক্তিতে সই দিলেন তাতে ঐ দীর্ঘ 'সল্ট'-এরই সার্থক পরিণতি ঘটল।

'সল্ট' সফল হলেও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারিত করার আলোচনা কিন্তু সফল হয় নি। শুধু এইটুকুই স্থির হয়েছে যে, বাণিজ্য-সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি বিচার করার জন্য উভয় দেশের মিলিত একটি কমিশন গঠন করা হবে। স্পষ্টতই এ বিষয়ে কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে যেগুলির মীমাংসা মস্কোর শীর্ষ বৈঠকে

হয় নি। এই ধরনের একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন হল, গত যুদ্ধের সময় ঋণ ও ইজারা কর্মসূচী অনুযায়ী আমেরিকা সোভিয়েট রাশিয়াকে যে অর্থ দিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়া সেই ঋণ শোধ কিভাবে করবে।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের রাশিয়া সফরের মোট ফল কি দাঁড়াবে তা এখনও সঠিক-ভাবে অনুমান করা কঠিন। তবে, পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্পর্কিত চুক্তিটিই সম্ভবত এই সফরের বাস্তব ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়ে থাকবে। পারমাণবিক পরীক্ষা আংশিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তির পর দুই দেশের মধ্যে এত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তি আর হয় নি। পারমাণবিক অস্ত্রের সঞ্চয় বাড়াবার প্রতিযোগিতায় নেমে দুই দেশ যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছিল সেই অপচয় বন্ধ হবে এবং বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনা কতকটা হ্রাস পাবে। প্রেসিডেন্ট নিকসনের পরামর্শদাতা ডাঃ হেনরী কিসিংগার বলেছেন, দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্ক যে স্তরে রয়েছে সেই স্তর থেকে ঐ সম্পর্ককে উঠিয়ে নিয়ে আসতে এই চুক্তি সাহায্য করবে।

অন্য যেসব চুক্তি হয়েছে সেগুলির মূল্য খুব বেশী নয়। অন্তত এই সব চুক্তি সম্পাদন করার জন্য দুই দেশের সর্বোচ্চ নেতাদের সরাসরি আলোচনায় বসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ঐসব চুক্তির বিষয়গুলি নিয়ে নিম্নতর পর্যায়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎই আলোচনা চলছিল এবং আজ না হোক কাল এই সব চুক্তি সম্পাদিত হতই। বিভিন্ন পর্যায়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে এইটুকু ছাড়া এই সব চুক্তির আর কোন বড় তাৎপর্য নেই।

মস্কোর এই শীর্ষ সম্মেলনের সূচনা হয়েছে একটি সুলক্ষণের মধ্য দিয়ে। সম্মেলনের প্রাককালে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের অনাক্রমণ চুক্তি পশ্চিম জার্মানীর আইনসভার উভয় কক্ষের অনুমোদন লাভ করেছে। চ্যান্সেলর উইলি ব্রাণ্ট ঐ দুটি চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিতে পারবেন কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধী দল সি ডি ইউ-এর সঙ্গে আপস করে তিনি কোনরকমে চুক্তি দুটি পাস করিয়ে নিয়েছেন—যদিও বিরোধী পক্ষ চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির সময় কতকগুলি বিতর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার রেখে দিয়েছে। ব্রাণ্টের শান্তি মন্ত্র এভাবে আপাতত জয়লাভ করায় রুশ ও মার্কিন নেতারা ইউরোপে উত্তেজনা হ্রাসের সম্ভাবনা সম্পর্কে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বৈঠকে বসতে পেরেছেন। কিন্তু অন্য যে দুটি বৃহৎ প্রশ্ন দুই দেশের সহজতর সম্পর্কের পথের কাঁটা হয়েছে সেই দুটি প্রশ্নে এই শীর্ষ বৈঠক থেকে

এখনও কোন আশাজনক উত্তর পাওয়া যায় নি। মস্কোতে যখন এই বৈঠক চলছে তখনও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাটিতে লড়াই, এবং উত্তর ভিয়েতনামের আকাশ থেকে মার্কিন বিমানের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলছে। পশ্চিম এশিয়ার প্রসঙ্গেও কোন নতুন চিন্তার খবর পাওয়া যায় নি।

অথচ, সকলেই জানে, ভিয়েতনাম ও পশ্চিম এশিয়ায় বিরোধ মেটাবার কোন রাস্তা খুঁজে বের করতে না পারলে ওয়াশিংটন ও মস্কোর সম্পর্ক সম্পূর্ণ সহজ হতেই পারে না।

*

২২ মে মধ্যাহ্নের ঠিক ৪৩ মিনিট পরে জ্যোতিষীদের দ্বারা নির্দিষ্ট শুভক্ষণে ভারতের প্রতিবেশী সিংহল বৃটিশ রাজ-সিংহাসনের সঙ্গে ১৫৭ বছরের পুরানো বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করল। কলম্বোর পবরঙ্গশালা থিয়েটারে বৌদ্ধ রীতিসম্মত একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিংহল ডোমিনিয়ন অতঃপর শ্রীলঙ্কা সাধারণতন্ত্র নামে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল।

শ্রীলঙ্কার আবির্ভাব ঘটল জরুরী অবস্থার মধ্যে ও দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে তামিল সংখ্যালঘুদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। গত বৎসর সেখানে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তারই জের হিসাবে এখন সেখানে জরুরী অবস্থা চলছে। অন্য দিকে তামিলদের অভিযোগ হল তাঁরা জনসংখ্যার দিক দিয়ে দেশের এক-তৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও নতুন সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। এই সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য তামিল কংগ্রেস, তামিল ফেডারেশন প্রভৃতি দল একটি যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হরতাল করেছে ও কাল পতাকা উড়িয়েছে। কোন কোন জায়গায় সংবিধান পোড়ান হয়েছে। যারা 'সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে তুলতে চাইছে' এবং 'যাদের আনুগত্য দেশের বাইরে' তাদের সাবধান করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক বলেছেন, এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

প্রধান বিরোধী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিও প্রজাতন্ত্র ঘোষণার অনুষ্ঠান বর্জন করেছে। তাদের অভিযোগ, 'তাড়াহুড়ো' করে নতুন সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সব বিরোধিতা সত্ত্বেও বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েকের পক্ষে নতুন প্রজাতন্ত্রের শাসন চালিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। যদিও তাঁর সরকার একটি কোয়ালিশন সরকার, তাহলেও প্রতিনিধি সভায় (নতুন সংবিধানে এই সভা 'জাতীয় পরিষদে' পরিণত হল) তাঁর শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির একারই দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কোয়ালিশনের অন্য দুই শরিক ট্রটস্কিপন্থী সমসমাজ পার্টি ও মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থনের উপর তিনি যে নির্ভরশীল নন সেটা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েকজন সদস্যকে ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন থেকে বহিষ্কার করে।

নতুন সংবিধান অনুসারে সরকারের মেয়াদ হল ছয় বছর। কিন্তু প্রথম সরকারের মেয়াদ হবে সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর। শ্রীমাভো সরকারের কার্যকাল ইতিমধ্যে দু বছর পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর সরকার সবশুদ্ধ সাত বছর ক্ষমতায় থাকবেন। পরে মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়াও এই সরকারের পক্ষে কঠিন হবে না, কেননা, দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শ্রীমতী বন্দরনায়কের দল যে কোন সময়েই সংবিধান সংশোধন করে নিতে পারে।

●

দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় যে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন সেটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমতী গান্ধী খুব দৃঢ়ভাবে বলেছেন, কংগ্রেস দলের মধ্যে যাঁরা গণতন্ত্র ও নির্বাচনী ইস্তাহারের সীমার মধ্যে কাজ করতে পারবেন না তাঁরা স্বচ্ছন্দে দল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেন। তিনি বলেন, দলের সদস্যরা কত দূর যেতে পারেন তার একটা সীমা আছে। অবাধ আলোচনার জন্য ও অন্যের মতামতকে প্রস্তাবিত করার জন্য দলের আলোচনা ক্ষেত্রকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কোন কার্যসূচী গৃহীত হওয়ার পর তাকে বদলাবার কথা না বলে বাস্তবে রূপায়িত করার দিকেই সদস্যদের নজর দেওয়া উচিত। নির্বাচিত ইস্তাহার কার্যকর করতে পার্টি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতভেদ থাকলে তিক্ততা ও উত্তাপ বাদ দিয়ে সেই মতান্তর প্রকাশ করতে হবে।

শ্রীমতী গান্ধী এমন এক সময়ে এই সতর্কবাণী প্রকাশ করলেন যখন জমির ও নগর সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করার প্রশ্নে কংগ্রেস দলের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। দলের মধ্যে একটা অংশ জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে নির্বাচনী ইস্তাহারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে (সাধারণভাবে, পরিবারপিছু ১০ থেকে ১৮ একরের মধ্যে) পালন করতে চান এবং নগর সম্পত্তির উচ্চসীমা বেঁধে দেওয়ার প্রশ্নটিকে জমির প্রশ্নের সঙ্গে জড়াবার পক্ষপাতী নন। অন্য দল জমির উচ্চসীমা নির্ধারণের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দিতে চান এবং উভয়বিধ উচ্চসীমা একসঙ্গে বেঁধে দিতে চান। দলের প্রথম অংশটি দ্বিতীয় অংশটিকে 'কুলাক লাবি' আখ্যা দিচ্ছেন। এই লবীর একজন বড় মুখপাত্র হলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার জৈল সিং। পাঞ্জাবের বিধানসভায় যে বিল আনা হয়েছে তাতে এক একটি পরিবারকে ২৭-৫ একর ও ফলবাগানের নামে আরও ৫ একর অর্থাৎ মোট ৩২-৫ একর জমি রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ঐ বিলে নানা অজুহাতে অনেক রকম ছাড় দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বিদায়ী জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণকান্ত পার্টির সভায় ঐ বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে বলেছেন যে, এর দ্বারা কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে। পাঞ্জাবের একজন কংগ্রেস নেতা শ্রীকৃষ্ণকান্তকে পাল্টা আক্রমণ করে বলেছেন, পাঞ্জাবে কি হচ্ছে তার মধ্যে নাক গলাতে না এসে তিনি যেন তাঁর নিজের রাজ্য হরিয়ানা এই ব্যাপারে কি করছে সেদিকে নজর দেন। কৃষি কমিশনের সভাপতি রামনিবাস মিধার নেতৃত্বে এক দল কংগ্রেস এম-পি শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে এসেছেন যে, তাঁদের কুলাক লাবী বলে আখ্যা দিয়ে হেয় করা হচ্ছে। তাঁরা আরও বলে এসেছেন যে, জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে কমিটি গঠন করেছেন তার চারজন সদস্যের মধ্যে কারোরই কৃষি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তাঁরা চান যে, কমিটি তাঁদের রিপোর্ট দেওয়ার আগে অন্তত কৃষি সম্পর্কে অভিজ্ঞদের বক্তব্য শুনুন।

'কুলাক লাবি'র সঙ্গে কংগ্রেসের 'তরুণ তুর্কি' ও 'র‍্যাডিক্যাল'দের এই বিবাদ এবার কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির পদাধিকারী নির্বাচনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। উভয় পক্ষই নির্বাচিত পদগুলি দখল করার জন্য তোড়জোড় করেছিলেন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, পার্টির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনে 'র‍্যাডিক্যাল' বলে পরিচিত শশিভূষণ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত সাগীশঙ্কর মিশ্রের কাছে পরাজিত হয়েছেন। কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচনে যাঁরা পরাজিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আরও তিনজন যাঁরা দলের মধ্যে 'প্রগতিশীল' বলে পরিচিত—শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী, শ্রীপি কে উন্নিকৃষ্ণন ও শ্রীএন এন পাণ্ডে।

●

চম্বলের যেসব ডাকাত আত্মসমর্পণ করে ধরা দিয়েছে তারা ৫০ জন রক্ষিতাকে রেখে গেছে। এক সময়ে তারা রাণীর মত চলত, এখন তারা ভিখারিণী। মধ্যপ্রদেশের আইন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রপ্রতাপ তেওয়ারি বলেছেন, সরকার এ'দের উদ্ধার আশ্রমে নিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন।

২৭।৫।৭২ —দৃষ্টিপাতীক

সবারে আমি নমি

কানন দেবী

একদা জনচিত্তহারিণী অভিনেত্রীর এই স্মৃতিচিত্রে বাঙলা চলচ্চিত্র জগতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর ছবি ফুটে উঠেছে। বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর কিছু স্মৃতিচিত্রণ এর আগে বেরিয়েছে। এবার ধারাবাহিকভাবে তাঁর আত্মস্মৃতিকথা প্রকাশিত হোচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের যুগ থেকে।

নিউ থিয়েটার্সে যোগদানের প্রথম দিনের পর বাড়ীতে ফিরেই খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। এখানে কাজ করব কি করে? কেউ ত কারো দিকে তাকায় না। নিজেকে নিয়েই সবাই বলত। কোথায় যাব? কিভাবে কাজ করব? যাঁদের নির্দেশে কাজ করব তাঁরাই বা কেমন? এরকম উন্নাসিক আবহাওয়ার মানুষদের ত উন্নাসিক হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত খুব তাচ্ছিল্য করবেন, প্রতি পদে ত্রুটি ধরবেন। হয়ত বা নিজের আনাড়ীপনার জন্য সকলের চোখে হাসির পাত্রী হয়ে উঠব। নিজের সম্মান নিয়ে কাজ করতে পারব ত? চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম। এ যেন কোনো গাঁয়ের মেয়ের চটকদার নাগরিক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার অবস্থা।

নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে আমার প্রথম ছবি 'বিদ্যাপতি'। (যদিও প্রকাশ্যভাবে সাধারণ চিত্রমঞ্চে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হোলো 'মুক্তি'।) বিদ্যাপতি ছবিতে অনুরাধার ভূমিকা আমার শিল্পীজীবনেরই শুধু নয় সারাজীবনেরই এক দিকচিহ্ন হয়ে আছে। সারাজীবনের বলছি এইজন্য যে এতদিন অবধি অভিনয় করেছি অনেকটা বাস্তব জীবনের স্থূল তাগিদে। যেখানে বেঁচে থাকার প্রয়োজনটাই বড়, কোনো বড় কিছুর স্বপ্ন দেখাটা ক্ষণিকের বিলাস ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু অনুরাধার হাসি, অশ্রু, বেদনা, প্রেম ও সংযমের মধ্যে আমার এতদিনের রুদ্ধ হৃদয়াবেগ যেন আপনাকে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়ে সার্থক হোলো। এখানে আমার জীবন ও স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, আর নিজের সঙ্গে ঘটল নূতন করে পরিচয়—এ যেন অভাবনীয়ের সঙ্গে মালাবদল। 'বিদ্যাপতি'র হিন্দী চিত্ররূপও হয়, আর এই ছবির মাধ্যমেই সারা ভারতের রসিকসমাজের স্নেহ ও অভিনন্দন পাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। 'মানময়ী গার্লস স্কুল' আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, 'বিদ্যাপতি' এনেছে ভারতজোড়া মর্যাদা। বিদ্যাপতির অনুরাধা হওয়া আমার জীবনে এক বিস্ময়কর পালাবদলের যুগ।

এ ছবিতে আমার সফলতার মূলে যে দুটি ব্যক্তিত্বের কাছে আমি ঋণী তাঁরা হলেন—দেবকী বসু (পরিচালক) ও রাইচাঁদ বড়াল (সঙ্গীত পরিচালক)। শিল্পীর যথার্থ শিল্পী হয়ে ওঠার মূলে জন্মগত প্রতিভা ছাড়াও যে বস্তুর প্রয়োজন সেটি হোলো প্রকৃত শিক্ষাগুরুর শিক্ষাপদ্ধতি এবং এদিক দিয়ে দেবকীবাবুর সমতুল্য পরিচালক বিরল। কখনও আদর করে, কখনও শাসন করে, কখনও প্রশংসায়, কখনও তিরস্কার দিয়ে শিল্পীর কাছ থেকে কেমন করে কাজ আদায় করে নিতে হয় এবং শিল্পীকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করতে হয় সে বিদ্যায় তিনি যেন সিদ্ধ সাধক ছিলেন। অনুরাধার সীমাহীন প্রেমের উচ্ছল জোয়ারের মধ্যে কোথায় সংযমের বাঁধন প্রয়োজন, তার প্রসন্ন রূপদীপ্তিকে কখন কেমন করে বেদনার স্নিগ্ধ ছায়ায় ললিত মধুর করে তুলতে হবে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবকে ও নিগূঢ় অনুভূতিকে তিনি যেন নিপুণ চিত্রকরের মত

শিল্পীদের সামনে তুলে ধরতেন—আর তা করত না বর্ণবিন্যাসে। তাঁর মত শিক্ষাদাতা পেয়েছি বলেই এত সহজে এত কঠিন কাজ করতে পেরেছি একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই।

অভিনয় ও গানের তুলনামূলক বিচারে গানই অনুরাধার প্রাণ হয়ে উঠেছিলো। মৈথিলী ও বাংলা ভাষার মিলনে পদাবলীর গীতিকাব্যিক রস হাসি ও অশ্রুতে মিলে যেন সাতরঙা রামধনুকের রং ফুটিয়েছে। প্রতিটি গানের সুর ও কথার অপরূপ সুষমা আমায় আবিষ্ট করে তুলত। গান গাইতে গাইতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম বলেই বোধহয় এই সংগীত-প্রধান চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পেরেছি। 'বিদ্যাপতি'র সব গানগুলিই সুন্দর,—তবে **'অঙ্গনে আওব জব রসিয়া'** গানটি আমায় যেন খ্যাতির শীর্ষে তুলে দিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত আমার হিন্দী হিট সং-এর লং প্লেয়িং-এ এই গানটি যুক্ত করে গ্রামোফোন কোম্পানী আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গানের এই সাফল্যের জন্যে আমার কৃতিত্বের একটা বড় অংশ প্রাপ্য রাইচাঁদবাবুর। তাঁর প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলি এ ছবির হিরো 'দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি 'বিদ্যাপতি' নাটকে অনুরাধার চরিত্র কল্পনা কাজী সাহেবেরই অবদান।

কৃষ্ণ সুদামা চিত্রের একটি দৃশ্যে

দুর্গাবাবু ছিলেন যাকে বলা যায় একেবারে মহাকাব্যের নায়ক। 'বিশাল কপাট বক্ষ, শালপ্রাংশু ভুজ, প্রশস্ত ললাট, আয়তলোচন, তপ্ত কাঞ্চনাভ বর্ণ' ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে একেবারে যেন হুবহু মিলে যায় তাঁর রূপ। সত্যি, এমন রূপবান পুরুষ কচিৎ চোখে পড়ে। যেমন পুরুষোচিত চেহারা, তেমনই বিরাট অন্তঃকরণ—আনন্দোচ্ছল ব্যক্তিত্ব। দুর্গাবাবুর কথা মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ওর প্রাণখোলা উদার উচ্চকিত হাসি। সে হাসি দিয়েই যেন মানুষ চেনা যায়। অতবড় শক্তিমান অভিনেতার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে প্রথমটায় খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।

আমার চেয়ে উনি শুধু বয়সেই অনেক বড় ছিলেন না। আমি সবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছি—আর উনি খ্যাতির মধ্যগগনে। মনে মনে সবসময় একটা ভয় ছিল ও'র সম্বন্ধে।

মনে আছে অভিনয়ের আগের মানসিক দ্বন্দ্ব। গান না হয় গেয়ে গেলাম। কিন্তু রহস্যভরে ও'র দিকে তাকিয়ে পরিহাসে উজ্জ্বল হয়ে কথা বলা? না অসম্ভব। তাকাতে গিয়ে চোখই তুলতে পারি না। দুর্গাবাবু হঠাৎ ছুটে এসে দুহাতে আমার দু কাঁধ ধরে 'জোয়ারের জল—তাকাও ত একবার' (ও ছবিতে উনি আমায় আদর করে 'জোয়ারের জল' বলেই ডাকবেন—এটা ছিল অভিনয়ের একটা অঙ্গ)। আমি লজ্জায় জড়সড় হয়ে তাকাতেই উনি ও'র স্বভাব-জাত প্রাণখোলা উদার হাসিতে সারা স্টুডিও সচকিত করে তুললেন। আমিও হেসে ফেললাম। সকল সঙ্কোচ যেন সেই হাসির ঝড়ে উড়ে গেল। দু দণ্ডেই মনে হোলো মানুষটা যেন কত আপনার। আগেই বলেছি সে যুগে চলাফেরা, আসা-যাওয়া কঠিন নিয়মে বাঁধা ছিল। কিন্তু একদিন কাজ করার পর দেখা হতেই এত সহজে 'এই যে এস ভাই' বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন যে অজ্ঞাতেই চোখে জল এসে গেল। স্টুডিওর ছোটবড় প্রতিটি শিল্পী, কর্মী সবার প্রতি তাঁর দরদের সীমা ছিল না। দিলখোলা, উদার-প্রকৃতির দুর্গাবাবু যতবড় শিল্পী, ঠিক ততখানিই খামখেয়ালী ছিলেন।

মনে আছে একদিন কি একটা কারণে যেন শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছিলো। কিন্তু দুর্গাবাবুর রোখ চেপেছে শুটিং করতেই হবে। কেন হবে না? কেউ ওকে বোঝাতে পারে না। কি মনে হোলো, আমি গিয়ে 'দাদা আজ সত্যিই শুটিং সম্ভব নয়,' বলতেই যেন গলে জল হয়ে গেলেন। 'আমার দিদি যখন বলেছে সম্ভব নয়'—বলেই পিঠের ওপর খুব জোরে এক কিল মেরে সেই ঘর কাঁপানো হাসি হেসে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুর্গাবাবুর কথাবার্তা, হাঁটাচলা, সবই হয়ত একটু স্টেজঘেঁষা ছিল, কিন্তু ও'র চেহারার সঙ্গে সেটা বেশ মানিয়ে যেত। 'ম্যাজেস্টিক' কথাটার মানে বোঝা যেত ওঁকে দেখলে। শুনেছিলাম তিনি নাকি কোন স্টেশনে একবার বার্থ না সীট রিজার্ভেশন না করেও দখলের তর্কপ্রসঙ্গে মন্ত্রী ফজলুল হককে বলেছিলেন 'ফজলুল হক মরলে দ্বিতীয় ফজলুল হক আসবে—কিন্তু এই দুর্গা বাঁড়ুয্যে গেলে আর দ্বিতীয় দুর্গা বাঁড়ুয্যে হবে না।' কথাটার মধ্যে হয়ত কিছুটা নাটকীয়তা, কিছু অহঙ্কার থাকতেও পারে, তবে এ অহঙ্কার নায়ক দুর্গাদাসকে মানাত। সত্যিই, দুর্গা বাঁড়ুয্যে আর ত হোলো না। (চলবে)

অনুলিখন : সন্ধ্যা সেন

বাংলাদেশঃ ছাত্রদের ভূমিকা

উৎপল সেনগুপ্ত

পৃথিবীর মানচিত্রে আর এক দেশের নাম লিপিবদ্ধ হল—সেই দেশ বাঙলাদেশ। আজ যেখানে স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের বিপ্লবী ইতিহাসে আর একটি পৃষ্ঠা জুড়ে গেল, তা হল রক্তাক্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস। কিন্তু আজকের বাঙলাদেশের জন্মলগ্নের সাফল্য এক বা একাধিক দিনে সম্ভব হয়নি। বিশ বছর পূর্ব থেকেই এই সংগ্রামের জন্ম এবং এবার তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিস্ফোরিত। আর এটা হল বহুদিনের পুঞ্জীভূত নিপীড়ন ও অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে দুর্দম আঘাতমাত্র।

বিশ্বের সমস্ত সংগ্রামেই কৃষক, শ্রমিক, যুবক বা ছাত্রদলের সক্রিয় অংশ গ্রহণের নজীর বহু আছে। কারণ, তাঁরাই সংগ্রামের মূল হাতিয়ার। এবারের এই স্বাধীনতা সংগ্রামেও অন্যান্যের সঙ্গে মুখ্যভূমিকা নিয়েছে বাঙলাদেশের ছাত্রদল। শুধু আজকেই নয়, সেই বিশ বছর পূর্বেও অর্থাৎ পাকিস্থান নাম হওয়ার পরের থেকেই এই ছাত্রগোষ্ঠী জনসাধারণকে সংগ্রামের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। এর জন্য শতসহস্র যুবককে জঙ্গীশাহীর কারাগারে হয় নিপীড়ন, আর না হয় মর্মান্তিক মৃত্যু সহ্য করতে হয়েছে।

আজ বাঙলাদেশ জন্মলগ্নে ছাত্রদের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার পুরানো পৃষ্ঠার দিকে একটু মনোনিবেশ প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে ছাত্রবিক্ষোভের কিছু ঐতিহ্যময় ঘটনা তুলে ধরলাম।

প্রথম বিক্ষোভ : ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

পাকিস্থান জন্মের পর সে দেশে প্রথম প্রকাশ্য বিক্ষোভ ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭এ। ছাত্ররাই ছিলেন সেই সংগ্রামের মূল নায়ক। বিষয় ছিল উর্দু ভাষাকে বাঙালীর ওপর চাপিয়ে দেবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পূর্ব পাকিস্থানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন। তার কিছুদিন পূর্বেই করাচীর এক শিক্ষা সম্মেলনে উর্দু রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এবং গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া হয় ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর।

২১শে মার্চ, ১৯৪৮

পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার পর 'পাকিস্থানের জনক' কথিত কায়েদে আজম জিন্না এলেন পূর্ব পাকিস্থানে তাঁর প্রথম সফর করতে। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠেনি সেদিন। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কয়েকটি যুবক বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবীতে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের অবিলম্বেই গ্রেপ্তার করে। সেদিন সভা অনুষ্ঠিত হল বটে, কিন্তু ছাত্র-অসন্তোষের অগ্নি চাপা রইল না। সেই ঘৃতাহুতি ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব বাঙলার সমগ্র স্কুল-কলেজে। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে জিন্নার ফটো সরিয়ে ফেলল।

স্মরণীয়, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ৫২

ঠিক এদিনেই মায়ের ভাষা বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে ছাত্ররা উৎসর্গ করল নিজেদের জীবন। এবং ইতিহাস সৃষ্টি করল। একই দিনে বিকেলে ঠিক চারটের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে অহিংস ছাত্র মিছিলের ওপর চলল নির্বিচারে গুলী। সেদিনের হেমন্তের অন্তিম বিকেল ছাত্রদের রক্তে হল রক্তিম। লুটিয়ে পড়ল রফিক, বরকত, সালাম ও আরো অনেকে। শহীদ হলেন ২৬ জন এবং আহত ৪০০ জন। এই ভাষা আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপে নিল পরবর্তী অধ্যায়ে। ২১শে ফেব্রুয়ারী আজো শহীদ দিবসরূপে পালিত হয়ে আসছে বাঙলা-দেশে। ঢাকায় শহীদ স্মরণে নির্মিত হল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। অবশ্য এবার খানসেনারা তা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৫২

এইদিন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আদর্শ নিয়ে জন্ম নিল একটি ছাত্র সংগঠন —পাকিস্থান ছাত্র ইউনিয়ন। নবেম্বর মাসে সংগঠিত হল পূর্ব পাকিস্থান ছাত্র ইউনিয়ন।

আয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ

১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট হয়ে গদীতে বসার পর যেটুকু গণতন্ত্র ছিল, তারও অবসান ঘটল। 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র' চালু করে তিনি আসলে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করলেন। কিন্তু ছাত্ররাই সর্বপ্রধান আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে সংগঠিত মত প্রকাশ করল। ১৯৬২ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রায়ই ছাত্র শোভাযাত্রা বিক্ষোভ মিছিল গঠিত হতে লাগল। শ্রমিকরাও ধর্মঘট ও হরতাল করে ছাত্রদের সঙ্গে কাঁধ মেলাল।

ছাত্রদের বিক্ষোভকে স্তব্ধ করার জন্য আয়ুব খাঁ বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারী করল। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সে ছাত্রদের রাজনীতির অধিকার নিষিদ্ধ হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস ও সাধারণ ধর্মঘট পালন করল।

পূর্ব বাঙলার তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খাঁ শুধু ছাত্রদের ওপর দমন-

পীড়ন চাপিয়ে নিজেই ক্ষান্ত রইলেন না। ছাত্রদের আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য কয়েকজন তাঁবেদার ছাত্র নিয়ে একই সময়ে গড়ে তুললেন ন্যাশনাল ছাত্র ফেডারেশন। এদের নেতার নাম সায়দুর রহমান। এই তথাকথিত ছাত্রনেতাটি অন্যান্য ছাত্রদের ওপর অবাধ গুণ্ডামী চালাল। সেই সময় এই দলটি খুন-খারাপি, লুন্ঠন ও নারী-ধর্ষণ কোন অপকর্মই বাকী রাখেনি। চার বছর ধরে রহমান ও তার দলবল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। বাধ্য হয়েই অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলল। প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে নিহত হল এই তথাকথিত ছাত্রনেতা সায়দুর রহমান।
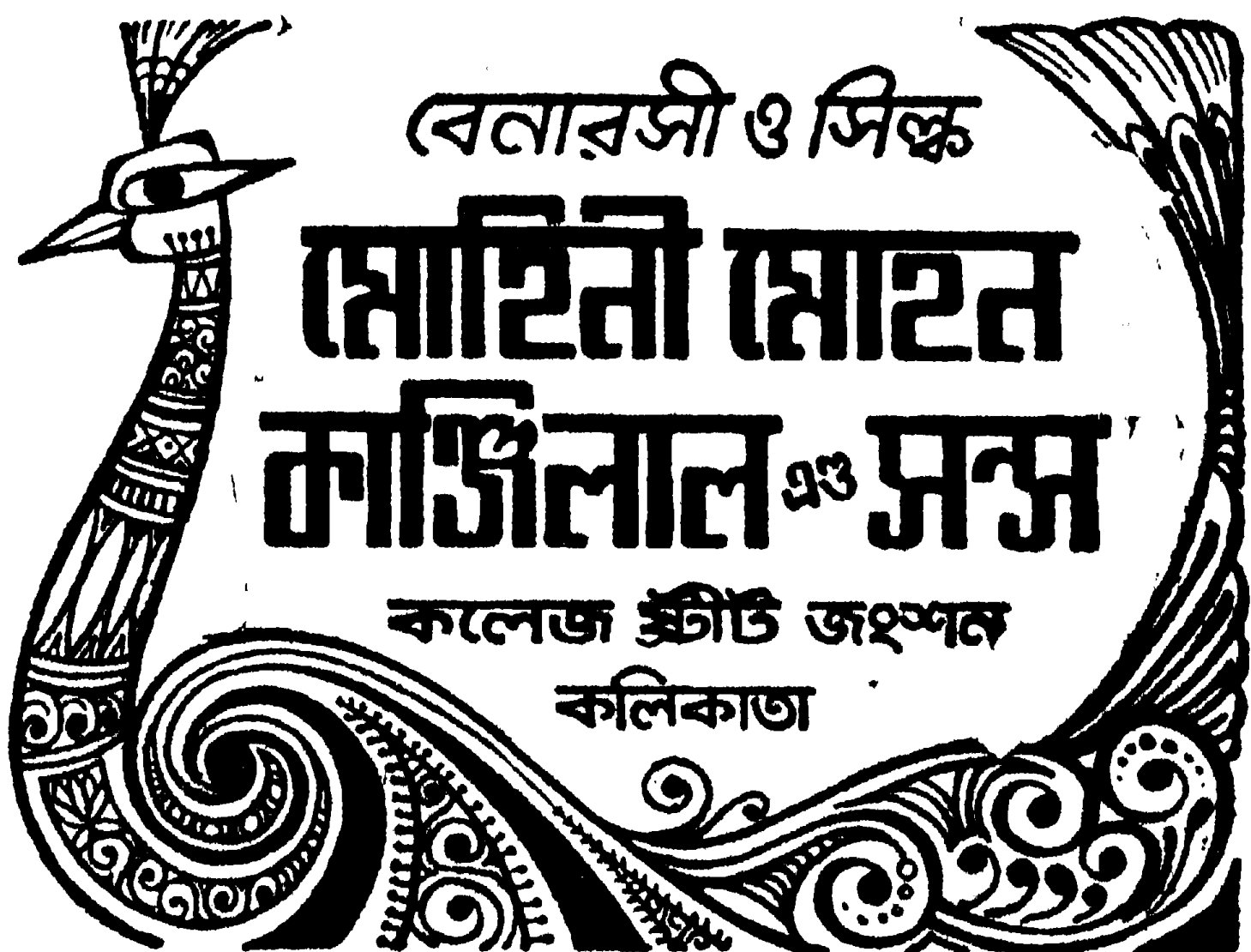
১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্র দিবস

চার বছর নির্বিবাদে দেশ শাসন করার পর আয়ুব খাঁ সামরিক শাসনের কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করলেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের যথারীতি আটকে রাখলেন। সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি ভাষণ দিতে এলেন।

যথাসময়ে কার্জন হলে অনুষ্ঠান শুরু হল। আয়ুব খাঁর বক্তৃতার গোড়াতেই সামনের সারির ছাত্ররা গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাঙালীর 'অটোনমীর' দাবীতে সোচ্চার-ধ্বনি তুলল। জঙ্গী নায়ক থমকে গেলেন। তিনি হল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবী পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর। চার দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল দ্রুতগতিতে। নানা অঞ্চল থেকে ছাত্ররা জমায়েৎ হলো কার্জন পার্কের সামনে। শুরু হল ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ। সশস্ত্র বন্দুকধারীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ছাত্রদের সংগ্রাম। যাতে বলি হল ১৩টি তাজা প্রাণ। নতুন সংগ্রামী ইতিহাস রচিত হল কার্জন হলের সম্মুখে। জঙ্গীনায়ক সেদিনই বুঝে গেলেন বাঙ্গালীর মানসিকতার প্রভাব কত দূরে প্রসারিত হয়েছে। সেই বছর থেকেই ১৭ই সেপ্টেম্বর চিহ্নিত হল ছাত্র দিবসরূপে—ছাত্রদের গণ-জাগরণের দিন হিসাবে।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভূমিকা

পাক শাসকরা চিরকালই গণতান্ত্রিক ও অটোনমির সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য ভারত বিদ্বেষ, আর না হয় সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। প্রথম দিকে তারা জনগণের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বাংলা-দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বিদ্বেষ পুরানো অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেল। ছাত্রদের একাংশ এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অবশ্য বরাবরই এই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রাম এক নতুন রূপ নিল ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে।

ছাত্র সংগ্রাম কমিটি

আয়ুব বিরোধী বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে যে ছাত্র-ঐক্য সূচিত হল ছাত্রসংগ্রাম কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে তা সাংগঠনিক রূপ লাভ করল। ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রসংসদ, রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রসংসদ ও অন্যান্য ছাত্রসংস্থা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। ২২ দফা দাবীর ভিত্তিতে তারা সংহত একটি সাধারণ সংগঠনে।

আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের পুরো ভাগে ছাত্ররা

১৯৬৬ সালের ২০শে এপ্রিল প্রকাশ্যে ছয় দফার দাবী ঘোষিত হল। ছয় দফা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী জঙ্গীশাহীর ব্যাপক উৎপীড়ন আরম্ভ হল। ৬ই জুন তারিখে তথাকথিত আগর-তলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দেশময় যখন এই অবস্থা, তখন বাম-পন্থী দলগুলির মধ্যে বিভেদ, বিভ্রান্তি ও নানা কোন্দলে পরিপূর্ণ। আয়ুব খাঁকে সমর্থনদানের প্রশ্নে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে বিরোধ দেখা দিল। এই দলের ভাসানী গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার 'অটোনমী'র দাবী সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুব খাঁকে তোয়াজ করে যেতে লাগল। দলের অপর অংশ অধ্যাপক মুজাফর আহমদের নেতৃত্বে আয়ুববিরোধী নতুন দল গঠন করলেন।

বামপন্থী দলগুলির মধ্যে কোন্দল উপস্থিত হওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষ যখন দিশেহারা তখন ছাত্র সমাজ এগিয়ে এল দিশেহারা জনগণকে নেতৃত্ব দিতে। আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯-এর মার্চ পর্যন্ত সমস্ত সংগ্রামই ছিল এর পুরোধা। সব দল ও মতের ছাত্ররা এগার দফা দাবী সনদের ভিত্তিতে যুক্ত ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তুলল।

২৫শে মার্চ ১৯৬৯ পাকিস্তানের রাজ-নীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে অবশেষে আয়ুব খাঁ বিদায় নিলেন। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে আর এক নব অধ্যায় সূচিত হল। এলেন কুখ্যাত জঙ্গীনায়ক ইয়াহিয়া খাঁ। এরও সমাধির মাটি খোঁড়া হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে রমনা রেস-কোর্সের ময়দানে।

বাংলাদেশ পতাকা তৈরী

পরবর্তী অধ্যায় সকলেরই জানা। কারণ, বাস্তব অধ্যায় এখনও সকলেরই কাছে জীবন্ত।

তবে, গত ২৫শে মার্চ তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক বক্তৃতার দিনে বাঙলা-দেশের যে মহান পতাকা উত্তোলিত হয়ে-ছিল, তা তৈরী করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাঁরাই সমস্ত নক্সা তৈরী করে মুক্তিকামী জনতার প্রতীক জাতীয় পতাকা উত্তোলনে সহযোগিতা করেন।

জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য জঙ্গীনায়ক ইয়াহিয়া খাঁয়ের খাঁ নীতির কিছুটা তুলে ধরলাম।

প্রথম থেকেই ইয়াহিয়া খাঁ নিজেকে গণতন্ত্রী বলে ধারণার সৃষ্টি করলেন। ১৯৭০ সালের ৫ই অকটোবর প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের দিন ও আইনগত কাঠামো ঘোষণা কর[illegible]ন। আইনগত কাঠামো অনুযায়ী সংবি[illegible] বিল চূড়ান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে রইল। আইনগত কাঠামো আদেশের কোন ধারা ব্যাখ্যার অধিকারও রইল প্রেসিডেন্টের হাতে। তখনও কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁর এই দুরভিসন্ধি অনেকেই বোঝেন নি যে, এই ফাঁক দিয়ে তিনি কেল্লা ফতে করবেন। না বোঝার কারণও ছিল। জনগণের দীর্ঘদিনের বিক্ষোভের ফলশ্রুতি এই আইনগত কাঠামো। তাছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে তিনি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন।

অবশেষে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় নির্বাচন করলেন। বিপুল ভোটাধিক্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল আওয়ামী লীগ। এতটা আশা করতে পারেন নি ইয়াহিয়া খাঁ। তারই পরিণতি আজকের অবস্থা এবং বাঙলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতালাভ।

সহোদর

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

কড়া নাড়তেই একটি ন-দশ বছরের ছেলে দরজা খুলে মুখ বার করল।

—কাকে চাই?

ছেলেটিকে চিনতে পারলাম না। মনে হল বাড়ীর কাজ করবার জন্য তাকে রাখা হয়েছে।

বললাম, এ বাড়ীতে সমরবাবু বলে কেউ থাকেন?

ছেলেটি হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি শুধোলাম তোমার বাবুর নাম কি?

ছেলেটি কি ভাবল কে জানে! 'দাঁড়ান, মা-কে ডেকে দিচ্ছি'—বলে সে ভিতরে চলে গেল।

আমি ভাবলাম, তাহলে আমারই ভুল হল নাকি? অথচ আমি যার কাছ থেকে সমরের ঠিকানা যোগাড় করেছি সে তো আমাকে ভুল ঠিকানা দেবে না। বাবলু আমাকে বলেছে যে সে সমরের এ-বাড়ীতে কয়েক বার এসেছে। আর বাবলু হচ্ছে সমরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।

একটু পরে একটি বছর আঠারো-উনিশের তরুণী দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রথম দর্শনে মেয়েটিকে অবিবাহিতা বলে ভুল হয়েছিল। তার পর সিঁথির দিকে নজর দিতেই একটি ক্ষীণ সিঁদুরের রেখা লক্ষ্য করা গেল।

—কাকে চান? মেয়েটি অনাড়ষ্ট কণ্ঠে শুধোল।

—এ বাড়ীতে সমর থাকে?

মেয়েটি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, থাকে। কিন্তু এখন তো বাড়ীতে নেই।

—কোথায় গেছে? আমি শুধোলাম।

—বাজারে। মেয়েটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। তারপর কি ভেবে শুধোল, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

এবার তাহলে পরিচয়টা দিতেই হয়। এতক্ষণ দিই নি কারণ মেয়েটি কিভাবে ব্যাপারটা নেবে বুঝতে পারছিলাম না। বললাম, আমি সমরের দাদা।

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটির মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সে তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা মাথায় তুলে দিল। তারপর দরজাটা পুরো মেলে দিয়ে বলল, আপনি ভিতরে আসুন।

আমি ঘরের ভিতরে ঢুকতেই মেয়েটি টিপ করে আমাকে প্রণাম করল। তারপর একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি বসুন।

কয়েক মিনিট কি বলব ভেবে পেলাম না। মেয়েটি সম্বন্ধে এত কথা শুনেছি কিন্তু পরিচয় তো হয় নি। অনেক দিন আগে ক্ষণিকের জন্য একবার দেখেছিলাম মাত্র। শুধু বললাম, তোমার নাম তো রুবি, না?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

আমি আর কোন কথা খুঁজে পেলাম না। রুবি আমার একমাত্র ভাইয়ের স্ত্রী। অথচ তাকে আমি এই প্রথম সামনা-সামনি দেখছি। সেও নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে।

রুবি বোধ হয় আমার অস্বস্তি অনুভব করতে পারছিল। সেই প্রথম কথা বলল, বাড়ীর সবাই কেমন আছেন?

আমি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, ভালো।

—বৌদির শরীরটা ভালো যাচ্ছে না শুনেছিলাম। উনি কি সোদপুর থেকে ফিরেছেন?

আমার স্ত্রী মায়াকে রুবি অনায়াসে বৌদি বলতে পারছে লক্ষ্য করে ভাল লাগল। মায়ার শরীরটা সত্যিই কিছুদিন ভালো যাচ্ছিল না বলে সোদপুরে ওর বাপের বাড়ীতে মাস দুয়েক ছিল। রুবিকে সমর সব কথাই বলেছে দেখতে পাচ্ছি।

বললাম, হ্যাঁ, এখন ভালোই আছে। দু-তিন দিন আগে ফিরেছে।

তারপর বাধ্য হয়ে আমাকেও প্রশ্ন করতে হল, তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?

—মা ভালোই আছেন। তবে বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তবু ঐ নিয়েই বেরোতে হয়। বাবা না বেরোলে কারবার অচল হয়ে পড়বে।

শুনেছিলাম রুবির বাবার কাপড়ের ব্যবসা আছে। ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো। কলকাতার বুকে নিজের দুখানা বাড়ী আছে। ছেলে-মেয়ে মাত্র দুটি। রুবিই নাকি তাদের মধ্যে বড়।

—তোমার ছোট ভাইটি কি করে?

—স্কুলে পড়ে। ক্লাস টেনে।

তারপর আর কি প্রশ্ন করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। অনেককিছু জানবার আছে ঠিকই। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের যে আড়ষ্টতা তা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। তাছাড়া এ কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না যে এই মেয়েটিই সমরকে আমাদের সকলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। একে ভালবেসে আমাদের সকলের অমতে বিয়ে করে, সমর আজ পর হয়ে গিয়েছে। সে তার বৌকে নিয়ে আলাদা সংসার পেতেছে। অথচ আমাদের সকলের কত আশা ছিল যে সমরের বিয়েটা আমরা খুব ঘটা করে দেব। আমার বোনেদের সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। আশা করেছিলাম যে সমরের বিয়ে উপলক্ষ্যে আবার সবাই মিলে কিছুটা আনন্দ করা যাবে। অথচ এই মেয়েটিই আমাদের সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে। এ কথাটা বার বার মনে পড়ায় আমি রুবির সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত রুবিই আমাকে অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাল। বলল, আপনাকে একটু চা করে দিই?

আপত্তি করলাম না। সকাল বেলা বাড়ী থেকে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছি। আজকে ছুটির দিন। আর এক কাপ চা হলে মন্দ হত না।

বললাম সমর এলেই এক সঙ্গে খাবো।

—আমি চায়ের জলটা চাপিয়ে দিই। ততক্ষণে ও এসে পড়বে।

রুবি আর এ-ঘরে দাঁড়াল না। পাশের ঘরে চলে গেল। লক্ষ্য করলাম যাবার সময় ও প্রথম-দেখা ছেলোটকে ডেকে নিয়ে গেল।

রুবি সামনে থেকে সরে যেতে সত্যি কথা বলতে কি আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। একটা সিগারেট ধরালাম। বুক-সেলফের উপর একটা নতুন ছাইদান দেখতে পেলাম। সমর সিগারেট খায় আমি জানতাম। কিন্তু বাড়ীতে সে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেত। এখানে তো আর লুকোবার কোন প্রয়োজন নেই। এ বাড়ীর কর্তাই তো সে।

ছাই-দানটা নিতে গিয়ে বুক-সেলফটার দিকে নজর পড়ল। বুক-সেলফটা নতুন। কাঠের উপর পালিশ চকচক করছে। কাচের ঢাকনার ভিতর দিয়ে নতুন নতুন বই দেখা যাচ্ছে। এ সবই বিয়েতে পাওয়া।

বুক-সেলফটার উপরে সমর এবং রুবির একটা ফটোও রয়েছে দেখতে পেলাম। সমরের মুখটা ফটোতে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছে। রুবির মাথায় ঘোমটা নেই। সমর পাশে না থাকলে বোঝার উপায় ছিল না তার বিয়ে হয়েছে কিনা।

আমি বুক-সেলফটার থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে ঘরের অন্যান্য আসবাবের দিকে নজর দিলাম। খাটটার দিকেই সবার আগে আমার নজর পড়ল। বেশ বড় খাট দিয়েছে সমরের শ্বশুর। দামী কাঠের খাট। খাটের পায়ার গায়ে বিচিত্র কারুকাজ। দু কোণ খোলা মশারীটা বিছানার অনেকখানিই ঢেকে রেখেছিল। তারই মধ্য থেকে কুঞ্চিত বেড কভার, তোষক, বালিশের স্থানচ্যুত ওয়াড় নজরে পড়ছিল। বোঝা যায় বেশীক্ষণ ঘুম থেকে ওঠে নি। ঘরের এক কোণে শূন্য চায়ের কাপ দেখে বোঝা যায় সমরের বেড-টি পাওয়া হয়ে গেছে। এটা ওর অনেক দিনের অভ্যাস। তবে এক-দিন বাজারে যাওয়ার অভ্যাস ছিল না। এখন নতুন সংসার পেতে বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে।

খাট থেকে আমার দৃষ্টি সরে গিয়ে স্টীলের আলমারীটার উপর গিয়ে পড়ল। নাম-করা কোম্পানীর আলমারী। ভাবলাম ভালই হয়েছে। কাঠের আলমারী থেকে স্টীলের আলমারী টিকবে বেশী। উই ধরবে না। পোকায় কাটবে না। ভিতরে আরশোলা ঢুকবে না।

খাট-আলমারী দেখে মনে হচ্ছে সমরের শ্বশুর তাঁর একমাত্র জামাইকে বিয়ের দান-সামগ্রী দিতে কোন কার্পণ্য করেন নি। আর দেবেনই বা না কেন? তাঁর এত পয়সা খাবে কে? তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর ছেলে মেয়েই তো পাবে।

একটা নতুন ড্রেসিং-টেবিলও দেখলাম। ড্রেসিং টেবিলটা বেশ বড়। আয়নার ভিতর থেকে আমারই মুখ আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। দুটো নতুন চামড়ার সুটকেস, একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক ঘরের এক কোণে সাজিয়ে রাখা আছে। একদিকে একটা কাঠের আলনায় সমর ও রুবির শাড়ী-ধুতি সাজান আছে। ড্রেসিং টেবিলের যেখানে রুবির সমস্ত প্রসাধনের জিনিস সাজানো আছে সেখানে দুটো ঘড়ি দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যায় ঘড়ি দুটের একটা রুবির আর একটা সমরের। দুটোই নতুন। অনেকদিন আগে যখন সমর প্রথম কলেজে ঢোকে তখন আমি ওকে একটা ঘড়ি কিনে দিই। সেই ঘড়িটা এখনও সমর পরে কিনা কে জানে! ঘড়ি দুটোর পাশে এক-জোড়া সোনার দুল দেখতে পেলাম। বোধ হয় রাতে শোবার আগে রুবি খুলে রেখেছিল। রুবির বাবা তাকে কি কি সোনার গয়না দিয়েছেন তা আমার জানার দরকার নেই। ওটা মেয়েদের ব্যাপার। তবে এটা অনুমান করতে পারি যে, রুবির বাবা তাঁর মেয়েকে গয়নায় মুড়ে না দিলেও নিশ্চয়ই কম দেন নি। এবং সেই সঙ্গে সমরকেও আংটি বোতামও নিশ্চয়ই দিয়েছেন।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো সুদৃশ্য ছবি টাঙানো আছে। একটি ছবিতে একটি পায়রা আর একটি পায়রার মাথা খুঁটে দিচ্ছে। আর একটি ছবিতে কৃষ্ণের গায়ে রাধা এবং তার সখীরা রং দিচ্ছে। দুটো ছবিই মনে হল বিয়ের উপহার হিসেবে পাওয়া।

সমস্ত ঘরেই একটা প্রাচুর্য, সুখের চিহ্ন স্পষ্ট। রুবিকে বিয়ে করে সমর যে সুখী হয়েছে এই ঘরের খাট, আলমারী, বুক-সেলফ, দেয়ালের ছবি থেকে প্রতিটি জিনিসই সে-কথা ঘোষণা করছে। সমর সুখী হলে আমার অসুখী হবার কোন কারণ নেই। বরং আমারও খুশী হবার কথা। কিন্তু আমি কি খুশী হতে পারছি? না পারছি না। কারণ সমরের সংসারের সুখের ছবিটার পাশাপাশি আমাদের সংসারের দুঃখের ছবিটা আমার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছে। যেদিন থেকে সমর আমাদের বাড়ী থেকে চলে এসেছে সেদিন থেকে সমস্ত বাড়ী নিরানন্দ হয়ে গেছে। মাকে আমি যখনই দেখি তখনই মনে হয় মা কাঁদছে। আমার সামনে যদি না কাঁদলেও আড়ালে কাঁদে। সব ভাই-বোনেদের মধ্যে সমরের উপর মায়ের টানটা খুবই বেশি। সমর মায়ের শেষ সন্তান। সেজন্যও বটে তাছাড়াও ও চিরকালই রুগ্ন বলে মাকে ওর জন্য অনেক ধকল সহ্য করতে হয়েছে। বাবার কোন ভাবান্তর বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও বোঝা যায় যে তাঁর কষ্টটাও মায়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে রিটায়ার করার পর থেকে বাবা সংসারের বিষয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চায় না। বোধ হয় আমার ওপর সংসারের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। তাই সংসারে থেকেও বাবা কিছুটা দূরে দূরে থাকতে চায়। তবু সেই বাবাও যেদিন খবরটা প্রথম শোনে সেদিন তাকেও বেশ বিচলিত মনে হয়েছে। আমাকে বাবা সুধিয়েছিল, 'হ্যাঁরে যা শুনছি তা কি সত্যি?' আমি বাবার করুণ শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলেছিলাম, 'বোধ হয়।' এর বেশি কিছু বলতে পারিনি। বোধ হয় বলে আমি একটা অনিশ্চিতের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি

নিশ্চিত জানতাম যে সমরের সঙ্গে বুবির বিয়ে হয়ে গেছে।

আমার স্ত্রী মায়াও কম আঘাত পায়নি। তার একমাত্র দেওরের বিয়ে বেশ ঘটা করে হবে এটা সে আশা করেছিল। এমন কি সে তার এক মাসতুতো বোনকে সমরের জন্য মনে মনে নির্বাচন করে রেখেছিল। একথা সে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বলেনি। আমি মেয়েটিকে দেখেছিলাম। পাতলা, ছিপছিপে গড়নের সুশ্রী মেয়েটিকে আমারও বেশ পছন্দ হয়েছিল। সমরের সঙ্গে বেশ মানাত। আমি ভেবেছিলাম এই তো সবে সমর চাকরিতে ঢুকল। আরও দু-একটা বছর যাক। ওর চাকরি পাকা হোক। তারপর ওর বিয়ের কথা ভাবা যাবে। এদিকে যে সমরের সঙ্গে বুবির ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গেছে তা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।

বুবির সঙ্গে সমরের ব্যাপারটা আমি জেনেছিও খুব আকস্মিকভাবে। সমর তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। একদিন কি একটা কাজে আমি অফিস থেকে কিছু আগে বেরিয়ে সোজা বাসায় না গিয়ে এসপ্ল্যানেডে গিয়েছিলাম। কি একটা কেনা-কাটার ব্যাপার ছিল। তখন বিকেল হয়ে গেছে। এসপ্ল্যানেডে অসংখ্য লোকের ভিড়। ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে আমি ওয়েলিংটনের দিকে এগোচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ উল্টো দিকে সমরকে একটা বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি ভেবে পেলাম না যে

সমরের হঠাৎ ধর্মতলায় সে সময় কী দরকার থাকতে পারে। ইচ্ছে করেই হাঁটার গতিটা কমিয়ে দিলাম। আমার নজর রইল সমরের দিকে। লক্ষ্য করলাম পর পর কয়েকটা ট্রাম-বাস সমর ছেড়ে দিল। তখন মনে হল সমর কারও জন্য অপেক্ষা করছে। কার জন্য সমর অপেক্ষা করছে তা জানবার জন্য আমার খুব কৌতূহল হল। আমি একটা পান-বিড়ির দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলাম। ইচ্ছে করেই দেরি করে একটা সিগারেট ধরালাম। একটু পরেই আর একটা বাস এসে দাঁড়াল। সেই বাস থেকে নেমে একটি মেয়ে সমরের দিকে এগিয়ে গেল। তখনই আমি চলতে সুরু করলাম। আমার মনে হল আর আমার দাঁড়ানো উচিত নয়। সমর যদি জেনে ফেলে যে তার দাদা তাকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে তাহলে সেটা আমার পক্ষে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। আমি বাড়ীতে কাউকে সেকথা বলিনি। এমন কি মায়াকেও না।

এর কয়েকদিন পরে রাতে আমাদের শোবার ঘরে মায়া আমাকে একটা চিঠি দেখাল!

আমি বললাম, কার চিঠি?

মায়া বলল, পড়োই না।

আমি বললাম, না জেনে পড়ি কী করে।

—আহা পড়োই না।

মায়া প্রায় জোর করেই আমার হাতে চিঠিটা গুঁজে দিল।

আমি চিঠিটার প্রথম কয়েক লাইন পড়েই বুঝতে পারলাম এটি একটি প্রেম-পত্র। সমস্তটা না পড়ে শেষের দিকে তাকিয়ে দেখি লেখা আছে 'ইতি—আপনার রুবি।'

আমি বিস্মিত হয়ে শুধোলাম, রুবি! রুবি কে?

—তোমার ভাইয়ের ছাত্রী।

আমার কাছে তখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। সমর একটা টিউশনি করছে আমি জানতাম। একটি বড়লোকের মেয়েকে ও পড়াচ্ছে জানতাম। কিন্তু ওর ছাত্রীর সংগে যে ওর এরকম একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা আমি জানতাম না। আমি সংগে সংগে চিঠিটা মায়ার হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম, এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?

—তা দিয়ে তোমার কী দরকার? মায়ার হাসি রহস্যময় হয়ে উঠল।

আমি বললাম, তাহলে তুমি চুরি করেছ?

মায়া বলল, তাও না। আমি আজ পড়ার টেবিলে বই গোছাচ্ছিলাম। এমন সময় বই-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঠাকুরপোর ছাত্রীর খাতাটা নজরে পড়ল। মেয়েটির হাতের লেখাটা এত ভালো যে আমার খাতাটা খুলে দেখার খুব লোভ হলো। তারপর খাতা খুলতেই—

আমি বললাম ছি! ছি! করেছ কী? সমর আসবার আগেই রেখে এস। ও যদি ব্যাপারটা জানতে পারে কী মনে করবে?

মায়া বলল, তোমার ভাইয়ের আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। সে এখন খুব মন দিয়ে ছাত্রী পড়াচ্ছে।

'খুব মন দিয়ে?' কথাটা বলেই মায়া হেসে ফেলল। আমিও মায়ার পরিহাসটা উপভোগ করলাম।

এর কয়েক মাস পরেই অবশ্য ব্যাপারটা বাড়ীতে জানাজানি হয়ে গেল। জানাল সমর নিজেই। সে একদিন মায়াকে ডেকে সমস্ত কথাই বলল এবং এও জানাল যে সে তার ছাত্রীকেই বিয়ে করতে চায়। সমর সরাসরি আমাকে বলতে না পেরে তার বৌদিকে সব কথা বলেছে। মায়াও আমাকে সব কথাই বলল। মেয়েটি অসবর্ণা। সে ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি ছিল না। আমার আপত্তি ছিল সমরের এখনই বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। কারণ সে সবে চাকরিতে ঢুকেছে। আর একটু গুছিয়ে বসুক। এখনই তার কাঁধে আমি সংসারের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইনি। কিন্তু মা বেঁকে বসল। বলল, 'না, ও মেয়েকে আমি ঘরে নেব না।' মায়ের আপত্তিটা বুঝলাম মেয়েটি অসবর্ণা বলেই। বাবা এ ব্যাপারে কোন কথাই বলল না। কিন্তু বোঝা গেল এ ব্যাপারে তার মায়ের মতে সায় আছে। মায়া তার মাসতুতো বোনের সংগে সমরের বিয়ে না হওয়ায় দুঃখ পেলেও কোন কথা বলেনি।

সেই থেকে আমাদের সংসারে অশান্তি সুরু হয়েছে। সমর যখন শুনল, মা-বাবার এ বিয়েতে মত নেই তখন থেকেই সে সেই যে মুখ ভার করে রইল আর তার মুখে হাসি দেখিনি। বাবা-মার সংগে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমার বা মায়ার সংগে সে কথা বলত, নেহাৎ যেটুকু না বললেই নয়। বুঝতে পারতাম আমার প্রতিও সে খুব প্রসন্ন নয়। আমি কেন বাবা-মার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তার বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছি না এই হল তার অভিযোগ। একথা সে মুখে না বললেও তার ভাব-ভঙ্গীতে বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমার পক্ষে তখনই বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে এরকম একটা ব্যাপারে উদ্যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আমার মনে এরকম একটা ক্ষীণ আশাও ছিল যে হয়তো বাড়ীর অমতে সমর আর এ বিষয়ে বেশি এগোবে না। হয়তো সে পিছিয়ে আসবে।

কিন্তু আমার এ আশা মিথ্যে হয়ে গেল যেদিন থেকে সমর বাসায় আসা বন্ধ করল। তার দিন সাতেক পর ওর বন্ধু বাবলুর মুখে আমি প্রথম ওর বিয়ের খবর পাই। খবরটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সমরটা চিরকালই একগুঁয়ে বলে জানতাম। কিন্তু সে যে এভাবে সংসারের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আলাদা সংসার পাতবে এ আমার কল্পনা-তীত ছিল।

তারপর মাস তিনেক পার হয়ে গেছে। আজ আবার সমরের সংগে আমি দেখা করতে এসেছি। আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে ওর বন্ধুর কাছ থেকে ঠিকানা যোগাড় করেছি। সমর এর মধ্যে আমাদের সংগে কোন যোগাযোগ করেনি।

একটু পরেই সমর হাতে থলি ঝুলিয়ে বাজার থেকে এসে হাজির হল। আমাকে দেখে তার মুখটা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল। তার মুখে একটা অপরাধীর হাসি ফুটে উঠল। মুহূর্তের জন্য তাকে খুব অপ্রস্তুত বলে মনে হল। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামনে নিয়ে বলল, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

আমি সহজভাবেই উত্তর দিলাম, এই কিছুক্ষণ আগে—

—বাড়ী চিনতে অসুবিধে হয়নি?

—না, কি আর এমন অসুবিধে—

—তোমার সংগে রুবির আলাপ হয়েছে?

বললাম, হয়েছে।

হঠাৎ সমর যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, তোমাকে এভাবে একলা বসিয়ে রেখেছে? ও কোথায় গেল?

আমি সমরকে শান্ত করার জন্য বললাম, তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। বৌমা বোধ হয় রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে।

আমার কথা শুনে সমর কী বলবে যেন ভেবে পেল না। তারপর হাতের থলিটা দেখিয়ে বলল, এটা রেখে আসছি—

সমর পাশের ঘরে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে ওর এখন কিছুক্ষণ আমার দৃষ্টির বাইরে থাকা দরকার। আমাকে হঠাৎ দেখার চমক ও এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এভাবে হঠাৎ আমি বিনা নোটিশে এসে হাজির হব তা বোধ হয় ও ভাবতে পারেনি।

পাশের ঘর থেকে সমর আর রুবির কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম। বোধ হয় সমর আমাকে একলা বসিয়ে রাখার জন্য রুবিকে ভর্ৎসনা করছিল। রুবিও বোধ হয় কিছু বলছিল। আমি তা শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুনবার চেষ্টাও করছিলাম না।

আমি আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। মনে মনে আমি কিছুটা কৌতুক অনুভব করছিলাম। সেই সমর, যাকে আমি কোলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, এই সেদিনও যাকে সিগারেট খেতে দেখলে কোথায় পালাবে ভেবে পায়নি, আজ সে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ। আজ সে বিবাহিত। সে সংসারী।

একটু পরেই রুবি দুটো প্লেটে নানা রকম খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসে হাজির হল। বোঝা গেল সমরের আসার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল।

রুবি দুটো প্লেটই আমার সামনে এনে রাখল। আমি প্লেট দুটোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। একটি প্লেটে ওমলেট আর টোস্ট। আর একটি প্লেটে প্রায় চার-পাঁচ রকমের মিষ্টি।

বললাম, এ করেছ কী! এ কে খাবে?

রবি কোন কথা না বলে পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরে এক গ্লাস জল এনে রাখল।

আমি বললাম, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। আমার কথার উত্তর দাও।

রবি বলল, এগুলো খেয়ে নিন। তারপর চা এনে দিচ্ছি।

বোঝা গেল রবি আমার কোন আপত্তি শুনতে নারাজ।

তখন বাধ্য হয়েই বললাম, শোনো, পাগলামি কোরো না। সকালে আমি কোন-দিনই এত খাই না। সমরকে জিজ্ঞেস কোরো। ও সবই জানে।

রবি আমার কথায় কান দিল বলে মনে হল না। বলল, এটুকু আপনাকে খেতেই হবে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি এটুকু বলছ! এতগুলো খাবার কি একজন লোক খেতে পারে?

—খুব পারে। এবার জেদী মেয়ের মতই রবি কথাটা বলল।

—আচ্ছা তোমার অনুরোধে আমি এই টোস্ট আর ওমলেটটা খাচ্ছি।

রবি মিষ্টির প্লেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আপনাকে ওগুলো সব খেতে হবে। তা নাইলে ছাড়ছি না।

এই সময় সমর এসে ঘরে ঢোকায় আমি কিছুটা ভরসা পেলাম। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখ তো, বৌমা কী পাগলামি সুরু করেছে—

সমর রবির দিকে একবার তাকাল বটে। তবে কিছু বলার সাহস পেল না। তারপর আমাকেই বলল, খেয়ে ফেল না। এই তো সামান্য খাবার—

আমি প্রায় ধমক দেবার ভঙ্গীতে বললাম, তোরা কী সুরু করেছিস? আমি কি পরের বাড়ীতে এসেছি যে আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে?

সমর এবং রবি কেউই আমার কথার উত্তর দিল না। তবে রবির ভাব-সাব দেখে মনে হল সে তার জেদ তখনও ছাড়েনি।

শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর একটা প্লেট নিয়ে এসো। দুজনে ভাগ করে খাওয়া যাবে।

রবি আমার কথা শুনে বলে উঠল, এই সামান্য খাবার ভাগ করলে কী থাকবে? এ ক'টা মিষ্টি আপনি খেতে পারতেন না দাদা?

আমি বললাম হয়তো পারতাম। কিন্তু তাতে ভাগ করে খাবার আনন্দ পেতাম না।

রবি নিতান্ত অনিচ্ছায় আর একটা প্লেট নিয়ে এল। আমি খাবারের প্রায় অর্ধেক আর একটা প্লেটে তুলে দিলাম। তারপর সমরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, নে, খা—

সমর ফিরিয়ে দেবার সাহস পেল না। আমি একটা সন্দেশ রবির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, নাও।

রবি নাও করতে পারল না। অথচ নেবার ইচ্ছেও নেই। বলল, তাহলে আপনি কী খেলেন দাদা?

আমি বললাম, আমার ভাগে যথেষ্ট আছে সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—তাহলে দিন। বলে রবি নিতান্ত অনিচ্ছায় হাত পেতে নিল। তারপর পাশের ঘরে চলে গেল। বুঝলাম আমি সমস্ত খাবারটা না খাওয়ায় সে অপ্রসন্ন।

রবি পাশের ঘরে চলে যেতেই সমর আমার মুখের দিকে তাকাল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম যে সে জানতে চাইছে আমার আসার কারণ কী? এটা সে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছিল যে আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।

আমিও এই সুযোগটা হাত-ছাড়া করতে চাইছিলাম না। যে কোন কারণেই হোক রবির সামনে আমি কথাটা পাড়তে পারছিলাম না। কিরকম একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমি বিনা ভূমিকাতেই বলে ফেললাম, আমি তোদের নিয়ে যেতে এসেছি—

সমর এরকম একটা কথা শুনবে আশা করেনি। সে তাই প্রথমে কী বলবে ভেবে পেল না।

আমি আগের কথার জের টেনেই বললাম, ভেবে দেখলাম এভাবে তোদের সংসার চলতে পারে না। তুই কখনও নিজের হাতে দোকান-বাজার পর্যন্ত করিস নি। সংসারে কি লাগে না লাগে তা তুই জানিস না। আমিও যে খুব ভালো জানি তা নয়। তবে আমাকে ঠেকে শিখতে হয়েছে। আর বৌমা ছেলেমানুষ। তার পক্ষেও একা একটা সংসার চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া সে আমাদের বাড়ীর ছোট-বৌ। সকলের আদরের পাত্রী—

—ওকে হেলপ করার জন্য তো একটা ছেলেকে রেখে দিয়েছি। সমর মুখ নীচু করে কথাটা বলল।

আমি বললাম, তাতে ওর পরিশ্রম কি খুব কমেছে? দু-বেলার রান্না তো ওকেই করতে হয়। এরকম করলে ওর স্বাস্থ্য দু দিনেই ভেঙে যাবে। তাছাড়া যতদূর শুনেছি বৌমার বাপের বাড়ীর অবস্থা ভালো। ছোট বেলা থেকেই বোধ হয় ওকে সংসারের কোন কাজ করতে হয়নি। এখন কি ও একা এ-সংসার সামাল দিতে পারবে?

—বাড়ীতে গেলেও তো ওর বসে থাকা চলবে না। সেখানেও তো কাজ করতে হবে।

—তা হয়তো হবে। কিন্তু সেখানে মা আছে, তোর বৌদি আছে। সবাই মিলে ঠিক চলে যাবে।

—কিন্তু মা-বাবা কি ওকে নিতে রাজী হবে?

সমর এবার সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকাল। সে জানত যে এবার সে যে প্রশ্ন করেছে তার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।

আমি আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। তারপর বললাম, প্রথমেই যে ওরা ব্যাপারটাকে সহজে নিতে পারবে তা মনে হয় না। তবে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

—ধরো সে চেষ্টা যদি সফল না হয়?

আমি সমরের তর্ক করার প্রবৃত্তি দেখে একটু অবাকই হচ্ছিলাম, সত্যি কথা বলতে কি ওর উপর একটু রাগও হচ্ছিল। কিন্তু বাধ্য হয়েই নিজেকে সংযত রেখে বললাম, সফল হবো না এটা ধরে নিয়ে এগোব কেন? আর তুই কি ভাবিস মানুষের মন চিরকাল এক রকম থাকে? কালে কালে সব ঠিক হয়ে যায়। তবে মা-বাবা তো আমাদের কালের মানুষ নয়। তাই তাদের পক্ষে ব্যাপারটা চট করে মেনে নেওয়া একটু কঠিন বৈকি।

সমর দু-এক মিনিট কি যেন ভাবল। তারপর বলল, তুমি যে আমাদের নিতে এসেছ এ-কথা মা-বাবা জানে?

—আমি মা-বাবাকে না জানিয়ে কি এ কাজ করতে পারি? আমি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই তোদের নিতে এসেছি।

—ওরা আপত্তি করে নি? সমর আবার শুধোল।

—একদম করেনি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু আমি তাদের বুঝিয়ে রাজী করিয়েছি।

সমরের মুখ দেখে ওকে খুব চিন্তিত বলে মনে হল।

রবি হঠাৎ এ ঘরে এসে পড়ায় আমাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

—দাদা, আপনি আজ খেয়ে যাবেন। রবি আমাকে আবদারের ভঙ্গীতে কথাটা বলল।

—আজ হবে না। আর একদিন।

—কেন আজ নয় কেন? রবি শুধোল।

আমি এবার খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়লাম। কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। আমার সব সময় আশঙ্কা হচ্ছিল যে রবি যেন আমার কোন কথায় আঘাত না পায়।

বললাম, আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ীতে কিছু কাজ আছে।

—আমি কেমন রাঁধতে পারি দেখবেন না? রবির মুখে সকৌতুক হাসি।

আমি বললাম, তোমার হাতের রান্না যাতে রোজ খেতে পাই তারই ব্যবস্থা করতে এসেছি।

রবি আমার কথা শুনে হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল। সে যেন বুঝেও ঠিক বুঝতে পারছিল না যে আমি ঠিক কি বলতে চাইছি। সে একবার আমার দিকে তাকাল। আর একবার সমরের দিকে। ।

—দাদা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে। সমর বলল।

এতক্ষণে রুবির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হল বলে মনে হল। কিন্তু সে কোন কথা বলল না। তবে তার মুখে একটা চাপা আনন্দের আভাস আমি লক্ষ্য করছিলাম।

রুবি কাপ-প্লেট নিয়ে চলে যেতেই আমি শুধোলাম তাহলে তোরা কবে আসছিস?

সমরকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সে কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না।

আমিই আবার আগের কথার জের টেনে বললাম, আমার মতে যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে আসাই ভালো। দেরী করে লাভ কি?

—হ্যাঁ, সে তো বটেই। সমর বলল। তার পর একটু থেমে আবার বলল, তবে ওরও তো একটা মতামত নেওয়া উচিত—

আমি সমরকে কথাটা শেষ না করতে দিয়েই বলে উঠলাম, নিশ্চয়ই। বৌমার মতামত নিবি বৈকি। তবে আমার মনে হয় ও আপত্তি করবে না।

—না, না, আপত্তি করবে কেন?

সমর যেন নিজেকেই কথাটা শোনাল। আমার মনে হল সমর কোন কারণে দ্বিধাগ্রস্ত। সে কি ভাবছে তা আমি জানি না। ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও ভাবতে পারে। বিয়ে করার পর থেকে সমর তো শুধু আমাদের বাড়ীর ছেলেই নয়, সে তার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ের স্বামীও বটে।

আমি বললাম, প্রয়োজন হলে তুই বৌমার বাবা-মা'র সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে পারিস।

—না, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে তাঁদের টেনে আনার কি দরকার?

সমরের কথাটা আমার ভালো লাগল। বিয়ে করার পর অনেক ছেলেই ধনী শ্বশুরের অনুগত হয়। সমর যে তা হয় নি সেটা সৌভাগ্যের কথা।

সমর মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছিল। আমি সমরের দ্বিধা কাটাবার জন্য বললাম, তোর বৌদি খুব পীড়াপীড়ি করছিল তোদের নিয়ে যাবার জন্য। সে তো আমার সঙ্গে আসতেই চেয়েছিল। আমিই নিয়ে আসি নি।

—কেন? নিয়ে এলেই পারতে।

—তাহলে রান্নাঘর সামলাবে কে? তুই তো সবই জানিস।

—টুনটুন আর বুবলাকে নিয়ে এলে পারতে।

টুনটুন এবং বুবলা আমার মেয়ে ও ছেলের নাম। সমর ওদের খুব ভালোবাসে। বুঝতে পারছিলাম ওদের এতদিন দেখতে না পেয়ে সমরের খুব কষ্ট হচ্ছিল।

বললাম, ওদের স্কুলের কি একটা ফাংশন আছে। তাই নিয়েই খুব ব্যস্ত।

সমরের আর কিছু বলার আছে কিনা তার জন্য আমি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ও কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, চলি। তুই যা করবার তাড়াতাড়ি করিস।

—এখনই চললেন?

রুবি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বোধ হয় দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

—হ্যাঁ অনেক কাজ আছে। বেলাও অনেক হয়েছে—

সমর আমার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

—তোরা তাড়াতাড়ি চলে এলেই ভালো হয়।

আমি সমরকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বললাম বটে। কিন্তু রুবিকে শোনানোও আমার উদ্দেশ্য ছিল।

—হ্যাঁ। দেখি—। সমর আর কিছু বলল না।

এবার আমি রুবিকে লক্ষ্য করেই বললাম, কি, যাবে তো?

রুবি পলকের জন্য সমরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আপনারা যা ঠিক করবেন তাই হবে।

—তবু তোমার মতটা—

—আমার আবার মতামত কি! রুবি বলল।

আমি বুঝলাম রুবি যে কোন কারণেই হোক আমার সামনে তার মতামত প্রকাশ করতে চাইছে না। হয়তো সমরের কাছে পরে বলবে।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই সমর বলল, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি—

সমর বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত আমার সঙ্গে হেঁটে এল এই পথটুকু আমরা প্রায় নিঃশব্দেই হেঁটে এলাম।

বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আমি লক্ষ্য করছিলাম যে সমর কিছু একটা বলার জন্য ছটফট করছে।

শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলল : আমার কি ভয় জানো দাদা? রুবির সাথে বাবা-মা'র এ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কিনা। বৌদির কথা আমি ভাবি না। বৌদি ঠিক মানিয়ে নেবে। কিন্তু মা-বাবার সঙ্গে রুবি কতটা মানিয়ে নিতে পারবে তাই আমার চিন্তা।

আমি বললাম, সেজন্য ভেবে কি করবি? দেখবি ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। জানিস তো যত দূরে দূরে থাকবি ততই ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে। তাছাড়া ওসব জাত-টাতের কথা দু দিন বাদে কারোরই মনে থাকবে না।

না, আমি বলছিলাম রুবি তো অন্য পরিবেশে বড় হয়েছে। আমাদের মত তো ওকে কষ্ট করে মানুষ হতে হয় নি।

আমার সমরের কথাটা ভাল লাগল না। রুবি তার ধনী বাবার একমাত্র মেয়ে হওয়ায় যে সচ্ছলতার মধ্যে মানুষ হয়েছে আমাদের সংসারে সমর তা আশা করে কি করে?

কিন্তু আমি সমরকে আমার মনোভাব বুঝতে না দিয়ে বললাম, সেকথা ঠিক। প্রথম প্রথম সেজন্য হয়তো রুবির কষ্ট হবে। তারপর দেখবি একদিন সব সয়ে গেছে। তাছাড়া রুবি তো আমাদের সকলের আদরের পাত্রী। দেখবি ওর কোন অযত্ন হবে না।

সমর আর কিছু বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দূরে একটা বাস দেখা যাচ্ছিল।

আমি বললাম, তোরা কি ঠিক করলি তাড়াতাড়ি জানাস।

সমর ঘাড় নাড়ল।

আমি আর কি বলব ভেবে পেলাম না।

বাস এসে দাঁড়াল। আমি উঠতে যাচ্ছি এমন সময় সমর আমাকে বলল, দাদা, তুমি আমাকে ভুল বোঝো নি তো?

আমি ওর ডান কাঁধে হাত রেখে বললাম, আরে, না-না—

বাস ছেড়ে দিল। আমি একটা ফাঁকা সিট পেয়ে তাতে বসে পড়লাম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সমর প্যান্টের দু-পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে মাথা নীচু করে বাসার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ওকে [illegible] খুব চিন্তিত মনে হল।

একটা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি বলে নিজেকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল। সমরের বিয়েকে কেন্দ্র করে আমাদের সংসারে যে ভাঙন ধরেছিল আবার যদি তাতে জোড়া লাগাতে পারি তাহলেই আমি সবচেয়ে সুখী হব। হয়তো সমরকে চিরকাল আমি ধরে রাখতে পারব না, হয়তো একদিন ওরা চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, কিন্তু যতদিন ওরা আমাদের সংসারে থাকে ততদিন আমি ওদের সংসারের দুঃখ-কষ্ট থেকে কিছুটা আড়াল করে রাখব। ওরা এখনও অবুঝ, ওরা এখনও পৃথিবীকে পুরোপুরি চেনে নি। তাই আমি ওদের আবার আমাদের সংসারে ফিরিয়ে আনতে চাই।

কিন্তু একটা প্রশ্ন বার বার আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল, সমর আবার আমাদের সংসারে ফিরে আসবে তো? সমর কিন্তু আমাকে বলে নি, 'হ্যাঁ, দাদা আমি ফিরে আসবো।' ওকে আমার খুব চিন্তিত বলে মনে হয়েছিল। আমি চাই সমর সব চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুক। কিন্তু সমর আসবে কি?

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

॥ কান্নাহাসির দোলা ॥

সুধীরঞ্জন দাস নামটি বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত। তিনি বঙ্গদেশের একটি বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান এবং স্বয়ং সেই মহান বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনি বরণীয় হয়েছেন নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার ফলে। এই মহান পুরুষের জীবনের কথা স্বাভাবিক কারণেই বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য।

ইতিপূর্বে সুধীরঞ্জন দাস তাঁর স্মৃতি-চিত্রণের প্রথমাংশ 'যা দেখেছি যা পেয়েছি' এই নামে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁদের আদি নিবাস ও বংশপরিচয়, বাল্য ও কৈশোরের বিভিন্ন পর্বের ইতিহাস বিধৃত করেছেন। সেই গ্রন্থটি সাহিত্য সমাজে মর্যাদা লাভ করেছে, বর্তমানে সম্ভবত এই প্রথম খন্ডের আত্মস্মৃতিচিত্রণ যা দেখেছি যা পেয়েছি' বাজারে পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি তিনি তাঁর সেই আত্মস্মৃতির দ্বিতীয়াংশ প্রকাশ করেছেন। এই খণ্ডে লেখক তাঁর বিচিত্র কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন ও বর্তমান অবসর জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরাতন দিনের স্মৃতিকথা যথাযথ ঘটনাপরম্পরা ব্যতিরেকে যেমন স্মরণে এসেছে সেইভাবে পরিবেশন করেছেন। এর ফলে গ্রন্থটির স্বাভাবিক স্বতোৎসারিত গতি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

এই খণ্ডের শুরু হয়েছে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী থেকে। লেখক তখন সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন। কয়েক বছর অনুপস্থিতির পর যে সব পারিবারিক পরিবর্তন ঘটে গেছে তা সবিস্ময়ে দেখছেন এবং মনে মনে চিন্তা করছেন কখন কোন অছিলায় ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে যাওয়া যায় সেখানে আছেন তাঁর ভাবী বধু। বিকালে বাড়ি থেকে চা খেয়ে গেলেন চেতলায় বৌঠানের (বাসন্তী দেবী) কাছে এবং সেইখান থেকে বৌঠানের দেওয়া দাদাবাবুর (দেশবন্ধু) একটি কাশ্মিরী শাল গায়ে জড়িয়ে গেলেন ৭৮ নম্বরে। বলা বাহুল্য সেদিনের যাত্রা সফল হয়েছিল। বাড়ি ফিরে মাকে জানাতে তিনিও আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপর হাইকোর্ট খুলতেই বার লাইব্রেরী সদস্য হলেন এবং প্রতিদিন আদালতে বসে কার কাছে ডেভিলিং (সহকারী শিক্ষানবিশী) করা যায় তার চিন্তা করেন। পরে একদিন স্যার নৃপেন সরকারের অনুমতি নিয়ে তাঁর চেম্বারের ডেভিলগিরি করার অনুমতি পেলেন। নবজীবনের পথে যাত্রা শুরু হল।

সুধীরঞ্জনের জীবন গঠনে তাঁর দাদা-বাবু (দেশবন্ধু) ও বৌঠানের (বাসন্তী দেবী) দান অসামান্য। তিনি আজো কোনো কথা তাই ভোলেন নি এবং সেই কারণে সকৃতজ্ঞচিত্তে কাশ্মিরী শাল বা বৌঠানের দেওয়া টেবল-চেয়ার ইত্যাদির কথা স্মরণ করেছেন।

কর্মজীবনের শুরুতে কিভাবে ল' কলেজের অধ্যাপনার কাজ পেলেন, সেই কাজটুকু বজায় রাখতে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে এ সবের বেশ সরস বিবরণ এবং শেষপর্যন্ত চণ্ডীপ্রসাদ খৈতানের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটুকু মনে বেদনা জাগায়।

প্রথমে স্যার নৃপেন ও পরে শরৎ বসুর কাছে ডেভিলিং করলেন সুধীরঞ্জন দাস, তখন তিনি একজন সংগ্রামশীল জুনিয়র ব্যারিস্টার। জীবনযুদ্ধে নেমে চারদিকে দেখছেন হতাশার আলো কিন্তু শরৎবাবুর কাছে ডেভিলিং শুরু করার পর তাঁর জীবনে এক নতুন ধারা প্রবাহিত হয়, এই সময় তাঁর মনোনীতার সঙ্গে বিবাহ ঘটে গেল। স্বামী ও স্ত্রী জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হলেন পরস্পরের হাত ধরে।

এর পর স্যার বিনোদের কাছে ডেভিলং-এর বিবরণ অতিশয় চিত্তাকর্ষক। এই সঙ্গে সেকালের বাঙালী বড়লোকদের উদারহৃদয়েরও একটা পরিচয় পাওয়া যায়। দু-এক লাইনের মধ্যে স্যার আশুতোষ, স্যার বিনোদ মিত্র বা শরৎ বসু প্রসঙ্গের যে ছবি এঁকেছেন সুধীরঞ্জন তা নিখুঁত হয়েছে বলা যায়।

এটর্নী প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার নাম আমরা শুনেছি। ফরোয়ার্ড পত্রিকায় তিনি বোধহয় অন্যতম ডিরেকটার ছিলেন এ ছাড়া সেকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান ছিল। কিন্তু মানুষ হিসাবে প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা বা পি, ডি, এচ যে কত মহৎ ছিলেন তা জানা গেল 'স্মরণের তুলিকায়' সুধীরঞ্জনের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে।

সুধীরঞ্জন তাঁর ব্যারিস্টারি পাশের কয়েকটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। সবকটি বেশ কৌতুকপ্রদ এবং উপভোগ্য। প্রকৃতপক্ষে বলতে কি আমরা যারা শুধু দূর থেকে হাইকোর্টের স্থাপত্যশিল্পটুকুই মাত্র দেখেছি তাঁদের কাছে এ গ্রন্থের মূল্য অসীম। কারণ সুধীরঞ্জন দাস যে কালের হাইকোর্টের কথা লিখেছেন সেই কালের হাইকোর্ট ছিল শুধু বাংলা নয় সারা ভারতবর্ষের গৌরব। ইংরাজ আমলে পর পর এই কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীগণ আইনমন্ত্রী বা ল' মেম্বার হয়েছিলেন। এই কলিকাতা হাইকোর্টের যে স্মরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলে যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়, সুধীরঞ্জন তাঁদের অধিকাংশকে দেখেছেন ঘনিষ্ঠভাবে এবং অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কথা বলেছেন।

বার লাইব্রেরী ক্লাব, সেকালের কয়েক-জন এটর্নি প্রভৃতি অংশগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সুধীরঞ্জন দাসের রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্যানুসারে বেশ সরস ভঙ্গীতে পরিবেশিত হওয়ায় সুমধুর কাহিনীর মত চিত্তাকর্ষক হয়েছে। লেখক শুধু ব্যারিস্টার, জজ এবং এটর্নিদের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি সেকালের কয়েকজন উকীলের কথাও বলেছেন—হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করতে এসে অনেক অজানাকে তিনি জেনেছেন, অনেক দূরের মানুষ সোদরের মত আদরণীয় হয়ে উঠেছেন।

এর পর শুরু হল হাইকোর্টে জজিয়তি। স্যার হ্যারল্ড ডার্বিসায়ার কিভাবে ১৯৪২-এ তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাইকোর্টের জজ পদে বসিয়েছিলেন সেই কাহিনীটুকুও মনোরম। জজিয়তি করার সময় কতরকমের বিচিত্র মামলা করতে হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। এই সময়েই তাঁর প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়ে গেল, তাঁরই 'ডেভিল' 'টল ডার্ক এ্যান্ড হ্যান্ডসম' ব্যারিস্টারের সঙ্গে, সেই ব্যারিস্টারের নাম অশোক সেন।

পারিবারিক জীবনের কাহিনীতে পেঁছে লেখক তাঁর প্রথম সন্তান সুরঞ্জনের কথা লিখেছেন। সুরঞ্জনের নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সুরঞ্জনের কথা বলেছেন লেখক সুরঞ্জনের জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনীর কথাও। সুরঞ্জন (খোকন) এবং কনিষ্ঠ পুত্র সুহৃদরঞ্জন দাস দুজনেই আকস্মিক মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। এই দুটি মৃত্যুর বিবরণ সুধীরঞ্জন এমন আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন যা পাঠকচিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। মানুষের জীবনে

হাসি আছে, আনন্দ আছে, উত্থানপতন আছে কিন্তু মানুষের জীবনের সবচেয়ে সংকটকাল হল তার বেদনার মুহূর্ত। সেই বেদনার মুহূর্তটিকে যে জয় করতে পারে তাকেই শাস্ত্রে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। সুধীরঞ্জন দাস কলিকাতা হাইকোর্ট, পাঞ্জাব হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ অলংকৃত করেছেন। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর কালে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। সেই কালের বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরাই স্বীকার করবেন বিশ্বভারতীর হাল ধরা কত কঠিন কাজ। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির পক্ষেও সেই কাজ কঠিন কাজ। সুধীরঞ্জন বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে সেই সংকটকালের বিশ্বভারতীর সংকটত্রাণ করেছেন। তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের গোড়ার দিকের ছাত্র, তাই যথোচিত শ্রদ্ধা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি থাকায় তাঁর পক্ষে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছিল।

সুধীরঞ্জন দাসের এই স্মৃতিচারণের সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে কারো সম্পর্কে তিনি একটুকু বিরূপ মন্তব্য বা বক্রোক্তি করেন নি। নিজের ঘরের কথা যখন বলেছেন তখন কোনো কিছু গোপন না করে সবরকম তাসই টেবলের ওপর রেখেছেন। জীবনে বহুমানব ও অতিমানবের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের স্মরণীয় দিকগুলি যেমন ছবির মত তুলে ধরেছেন সেই সঙ্গে নিজের ঘর সংসার, পিতা-মাতা, আত্মীয়পরিজন, দাস-দাসী, সন্তানসন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, পৃষ্ঠপোষক গুণগ্রাহী, বন্ধু প্রভৃতি কারো কথা তিনি উহ্য রাখেন নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি সুধীরঞ্জনের এই স্মৃতিচিত্রণ পাঠ করে উপকৃত হয়েছি। সে যুগের যেসব মনীষীদের আমরা দেখেছি বা যাঁদের কথা শুনেছি তাঁদের জীবনের টুকরো কথা এবং সেই সঙ্গে এ যুগের এক স্মরণীয় বাঙালীর কর্ম ও ব্যক্তিজীবনের পরিচয় লেখকের অসামান্য লিপিকুশলতায় সার্থক হয়ে উঠেছে।

'স্মরণের তুলিকায়' বর্তমানকালের এক অনন্যসাধারণ জীবনালেখ্য একথা বলতে দ্বিধা নেই।

গ্রন্থটিতে অনেকগুলি সুমুদ্রিত প্লেট আছে।

—অভয়ঙ্কর

স্মরণের তুলিকায় (স্মৃতিচিত্রণ)—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। মেসার্স এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা) লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। কুড়ি টাকা।

সাহিত্যের খবর • রামমোহন দ্বিশত জন্ম-জয়ন্তী

ভারত পথিক রামমোহন রায়ের দ্বিশত বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২২ মে। নব ভারতের জনক এবং হিন্দু মুসলমান মিলনের অগ্রদূত রামমোহনকে স্মরণ করে আয়োজিত সভাগুলিতে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

রাধানগর

রামমোহনের জন্মক্ষেত্র রাধানগরে রামমোহনের জন্মস্থানে বিশেষভাবে নির্মিত বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহন স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির পক্ষ থেকে বিচারপতি শ্রীএস এ মাসুদ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় বসু, বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পক্ষে শ্রীপূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক স্মরণ সভায় সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কলেজটিকে স্পনসর্ড কলেজে রূপান্তরিত করার কথা ঘোষণা করেন।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট

রাধানগর রামমোহন দ্বিশত বার্ষিক কমিটির উদ্যোগে ২২ মে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আয়োজিত স্মরণসভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র তাঁর ভাষণে বলেন যে, রামমোহন রায় হলেন নবভারতের জনক। রামমোহনের আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই আমরা পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবদের পেয়েছি।

রামমোহনের পরিবারের শ্রীশচীপতি রায় এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দু শত দীপ জ্বালিয়ে।

এই অনুষ্ঠানের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরাজ বসু প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ডঃ রমা চৌধুরীর পরিচালনায় রামমোহনের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'ভারত পথিক' সংস্কৃত নাটিকাটি পরিবেশিত হয়।

মহাজাতি সদন

মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

অধ্যাপক রফিকউদ্দীন আহমেদ রামমোহনকে হিন্দু মুসলমানের মিলন-দূত বলে উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ চন্দ্র রামমোহনের রচনা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেন। তিনি বলেন, আজ বিশ্বজোড়া মানব মুক্তির যে লড়াই সুরু হয়েছে রামমোহন তারই উদ্গাতা। অনুষ্ঠানে শ্রীনলিনী দাস, শ্রীদিলীপ বিশ্বাস, শ্রীযোগানন্দ দাস, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখও বক্তৃতা করেন।

রামমোহন পাঠচক্র

রামমোহন পাঠচক্রের উদ্যোগে উল্টোডাংগা তেলেংগাবাগান মোড়ে রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ভাষণ দেন সংস্থার সম্পাদক শ্রীপরিতোষ দত্ত ও শ্রীকমল সাহা।

এ ছাড়া এদিন ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দির, দক্ষিণ কলকাতা বিদ্যাসাগর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী কমিটি, কিশোর কল্যাণ পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন।

রাজ্যপালের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভারতপথিক রামমোহন রায়ের দ্বিশত বার্ষিকী উপলক্ষে দার্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত এক স্মরণ সভায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীএ এল ডায়াস বলেন, 'রামমোহন হলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক। ভারতীয় ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবধারার সমন্বয়ে তিনি এক নতুন জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন'। তিনি বলেন, রামমোহন

ছলেন সত্যদ্রষ্টা মহামানব। অন্তরের অনন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বরাট পরিবর্তন এনেছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

রাধানগর দ্বিশতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে ২৩ মে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমাদের সমাজ থেকে সব অন্ধতা সব কুসংস্কার দূর করে রামমোহন নতুন দিনের স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যেই প্রথম সার্থকভাবে দেখতে পাই।

অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ধীরাজ বসু, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখও বক্তৃতা করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২২ মে রামমোহন রায়ের দ্বিশত বর্ষ উপলক্ষে যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ আচার্য।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ভাষণে বলেন, 'রামমোহন যে শুধু ভারতকেই নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন তা নয়, ইউরোপকেও তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে স্বর্ণসেতু রচনা করেছিলেন।

রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের বিচিত্র ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'রামমোহনের আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া উচিত।'

সভাপতি শ্রীআচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, রামমোহন ধর্মের সঙ্গে মানবিকতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত ২৩ মের সভায় রামমোহনের ব্রাহ্মসংগীত নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীরাজেশ্বর মিত্র। তিনি বলেন রামমোহন বাংলা সংগীতেরও অগ্র-পথিক। ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাবগত দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ব্রহ্ম-সংগীত কোন সীমার মধ্যে গন্ডীবদ্ধ নয়। এর আবেদন বিশ্বজনীন।

অনুষ্ঠানে শ্রীগীতা রক্ষিতের পরিচালনায় রামমোহন রচিত কয়েকটি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

নতুন বই

শীতের বেলা (উপন্যাস)—বীরেন্দ্র দত্ত। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ। ৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। পাঁচ টাকা।

'শরীর মন্দিরের মত পবিত্র। শিশু সেই মন্দিরের ঈশ্বর।'

সামাজিক অনুমোদনের ছাড়পত্র না নিয়ে যদি সেই ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে স্বল্পশিক্ষিকা কঠিন রক্ষণশীল পরিবারের শত বঞ্চনা অভাব আর বিপত্তির মধ্যে বড় হওয়া যৌবনবতী কোন কুমারীর দেহ-মন্দিরে। তাহলে?

কাহিনীর শুরুতেই এই কঠিন স্থূল বাস্তবের একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন স্বল্পশিক্ষিতা মেয়ে রত্নাকে প্রতিশ্রুতিবান তরুণ লেখক শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত। এবং পাঠক-দৃষ্টিতে মোল প্রশ্নে একেবারে সংহত রেখে কুশলী শিল্পীর মতো ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত সংসারের সমস্যার ভারে ভেঙে-পড়া শ্বাসরুদ্ধকর বঞ্চিত ভাগ্যহত জীবনকে সমকালের প্রেক্ষাপটে বিধৃত করেছেন পরম মমতায়।

কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রত্না চমকে উঠেছে। রক্ত-তর্জনী উদ্যত ক্যালেন্ডারে সেঁটে-থাকা আতক্রান্ত একটি বিশেষ তারিখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভাবনায় ত্রাসে তার রক্ত হিম হয়ে গেছে। তা হলে কি হবে? মুখ দেখাবে কেমন করে? লজ্জা ঢাকবে যার বিস্তৃত বক্ষে মাথা রেখে সেই সুব্রতই তো এখন এখানে নেই। রত্নার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। বাঁচায় আনন্দ নেই। খাওয়া আর ঘুমও যেন চলে গেছে। মায়ের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতেই জীবন যেন আরো জটিল হয়ে এল। এলো আরো বিপর্যয় সংবাদ—দাদা সুনীল অন্য জাতে বিয়ে করে বসল। বাবা যেন আরো কঠিন আরো কঠোর হয়েছেন। সংসারের চাকা প্রায় অচল। ছোটভাই অজিত পড়া ছেড়ে পার্টি করে বেড়াচ্ছে। বাবার দিকে চাওয়া যায় না। আঘাতে আঘাতে তিনি যেন পাষাণ, খেটে খেটে ক্লান্ত। মার চোখ সজল। চারদিকে কেবল অবক্ষয় অভাব আর বঞ্চনা। রত্নার চোখ জ্বালা করে। সংসারের যখন এই হাল এমনি সময় এলো আর একটা আঘাত—তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। শুরু হল অক্ষম অসহায় মেয়ের কান্না—বিয়ে সে করবে না। কেন? শত প্রশ্নেও সে নিরুত্তর। কেমন করে মুখ ফুটে বলবে: সুব্রতর ভালবাসাকে সে নিজ দেহে ধারণ করেছে। এই দেহ নিয়ে কেমন করে অন্য আর একজনের শয্যাসঙ্গিনী হবে। চারদিকের এই অসহায়তার ভেতর তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন সুব্রতের আশ্বাসের কণ্ঠ বাজে—জ্বলে মনের মণিকোঠায় প্রত্যয়ের দীপ-শিখা। তাহলে এই লজ্জা এই অসহায়তা থেকে মুক্তির পথ কি। কি করবে সে? আত্মহনন?

কাহিনীকার এ প্রশ্নের জবাব রেখেছেন পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে। বিয়োগ নয়—সংযোগ। বিচ্ছেদ নয় মিলন। মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ নয়—প্রেম ভালবাসাময়, জীবনের উত্তাপই মানুষের অভিষ্ট। তারই আভাস রেখে সমাপ্তি রেখা টেনেছেন মুন্সিয়ানার সঙ্গে।

কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু অতি সাধারণ মেয়ে রত্না, তার প্রেমিক শান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টি সুব্রত, রত্নার বাবা রক্ষণশীলতার প্রতিভূ জেদী কমলাপতি, ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা সংসারের শত মারে নীল হয়ে যাওয়া রত্নার মা সাবিত্রীবালা, আর এক জগতের গন্ধ গায়ে মেখে আসা ফুরফুরে ঝকঝকে নন্দ-পিসির দেওর রবিদা, বিধবা প্রগতিশীলা তরুণী নন্দীপিস প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেন আমাদের চেনাজানার জগৎ ও জীবন থেকে কাহিনীর পাতায় উঠে এসেছে।

স্বীকার করতেই হবে, মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রকর বীরেন্দ্র দত্ত চরিত্র-চিত্রণে রক্ষণশীল মানসিকতার বিশ্লেষণে, কাহিনী বুননে এবং লিপিকুশলতার জীবনের আটপৌরে কাহিনীকে খুবই অন্তরঙ্গ এবং রীতিমত জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন: সুখ্যাত শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা উল্লেখ করবার মতো। উপন্যাসটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কৃষিশিল্প—শৈলেশ দাশগুপ্ত। প্রকাশস্থান: ২ বাগুইআটি রোড, কলকাতা-২৮। দাম পাঁচ টাকা।

যদিও দেশটি আমাদের কৃষিপ্রধান, তবু কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকা বিশেষ চোখে পড়ে না। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে কৃষি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ছাত্র উপযোগী কিছু বই লেখা হোতে থাকে। কিন্তু যারা মাঠে রোদ বৃষ্টিতে কাজ করছে, তাদের জন্য সহজবোধ্য গ্রন্থের একান্তই অভাব। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত-কালীন শাকসব্জীর পরিচর্যা করে কিভাবে ফলন বৃদ্ধি সম্ভব, সে সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে বিশেষ অবহিত করা হয়নি এতকাল। ভাল ফলনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হোয়ে ওঠে না শিক্ষার অভাবে। ভাল ফলনের জন্য দরকার উন্নত ধরনের বীজ, সার—তৈরির পদ্ধতি ও প্রয়োগ, জলসেচ ও রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

শ্রীশৈলেশ দাশগুপ্তের বইটিতে সরল ভাষায় জীবজন্তুর খাদ্য, ফুলের চাষ, মাটি

ও সার নিয়ে সুন্দর আলোচনা করা হোয়েছে। ফসলের নানাধরনের রোগ এবং সেই রোগ সারাবার যে ব্যবস্থাবলী দিয়েছেন গ্রন্থকার তাতে কৃষক এবং পুষ্প-প্রেমিক উভয়েই উপকৃত হবেন। উদ্ভিদের মধ্যে গম, সয়াবিন, ভুট্টা, কলা, পেঁপে, মিষ্টি আলু, ধান, আখ, ছোলা আলু, হলুদ ও আদা এবং ফুলের মধ্যে গাঁদা, ক্যালেনডুলা, প্যানসি, ফ্লক্স, হলিহক, দোপাটি, জিনিয়া, সুইট পি, সূর্যমুখী, পপি, কসমস, সুইট সুলতান, সুইট উইলিয়াম, অ্যামারেন্থ, পরটুলাকা, কর্ন ফ্লাওয়ার, নসটার টিয়াম, চন্দ্রমল্লিকা গোলাপ ও ডালিয়া সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি প্রচারিত এবং সমাদৃত হবে।

নিষিদ্ধ দরোজা (কাব্যগ্রন্থ)—রমলা বড়াল। গ্রন্থ প্রচার, ২০।এ গোবিন্দ সেন লেন, কলকাতা—১২। তিন টাকা।

কবিতার বিষয়বস্তু বদলে গেছে। আঙ্গিকও ঠিক আগের মত নেই। রমলা বড়াল এই উভয় ব্যাপারে যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দিতে না পারলেও, অনেক আয়ত ভঙ্গিতে এবং পরিচ্ছন্নতায় কুয়াশামুক্ত। এই কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতায় তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন একালের সঙ্গে অনিমেষ সময়ের ধারাকে সংযুক্ত রেখে। যখন তিনি লেখেন, 'দেহমাপ সীমানার অন্ধকারে স্তিমিত চেতনে/আকাশ অরণ্য জল ডুবে যাবে ছায়ার মিছিলে'—তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না বাস্তবের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এড়িয়েই জীবনকে উপভোগ করতে চান। 'ভিয়েতনামী সেই প্রেমিকের' উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন :

> অন্ধকার গাঢ় হলে যখন কৌতুকে ঢের
> ফানুস ভেসেছে
> কালো চোখ কামার্ত প্রেমিক
> নিজের কলিজা জেলে কাঁচা ধান ক্ষেতে
> সারারাত মহিলার মুখ দেখে ছিল।

বইটি ভালো লাগবে অনেকেরই। সত্যিকারের কবিত্বশক্তিকে তিনি পাঠককে সন্তুষ্ট, ভাবিত এবং চিন্তিত করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য, এজন্যে পাঠককে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

মনে মনে (কাব্যগ্রন্থ)—অবনী নাগ। মণিমালা প্রকাশনী, ১ নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলকাতা-১১। তিন টাকা।

স্মৃতি, ছায়া, রক্ত—এই তিনে মিলে অবনী নাগের কবিতা। প্রায়শ রোম্যান্টিক এবং বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে তিনি চমকে দেন দু' একটা স্মার্ট শব্দ ব্যবহার করে।

কিন্তু সর্বত্র তিনি সে রকম নন। উপলব্ধিতে যে জটিলতা এবং যন্ত্রণার অনুরণন তাঁর কবিতাকে অস্পষ্ট কুয়াশার উৎসে নিয়ে যায়, তাও উপযুক্ত ভাষার অভাবে কেমন যেন সরল মনে হয়। সাম্প্রতিক ঘটনা-তবু সম্পূর্ণ নাগরিক তিনি নন। 'চৈত্র সন্ধ্যার প্রথম তারাটি সাক্ষী রেখে রেখে' তিনি এখন পাথর বনে গেছেন।

আমরা তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করেছি অঙ্গীকারের ভাষা। হয়ত জীবনের মূল্যবোধ আস্থাশীলতার জন্যই তিনি ভবিষ্যতে অনেক প্রত্যয়ের কথা উচ্চারণ করতে পারবেন।

যা শুনেছি যা জেনেছি—(দিব্য জীবনকথা) দীপেন রাহা। বুক লিঙ্কস। ৩১ ডি। ৩১, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা-৯। চার টাকা মাত্র।

দীপেন রাহা একজন আদর্শবাদী সাহিত্যিক। তাঁর উপন্যাস 'কাঁচামাটি পাকা পথ' 'আদর্শ বেকার সঙ্ঘ' ও 'নতুন আলো' নামক নাটকের মধ্যে তাঁর এই আদর্শবাদী মনের ছাপ পাওয়া যায়। দীপেন রাহা একজন ভক্তসাধক। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-জীবনধারার সঙ্গে তিনি যুক্ত। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু। এই উভয়বিধ গুণের সংমিশ্রণে তিনি এক বিচিত্র মানসের অধিকারী হয়েছেন। ভক্ত দু প্রকার, এক ভক্তিবাদী অন্ধ ভক্ত, আর এক শ্রেণীর ভক্ত যুক্তিবাদী। দীপেন রাহা যুক্তিবাদী ভক্ত, তিনি সঙ্ঘনেতা আচার্যদেবের দিব্যজীবনের কাহিনী এবং সেবাশ্রম সঙ্ঘের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে শোনা ও জানা নানা প্রকার শিক্ষামূলক কাহিনী একত্রে গ্রথিত করে পরিবেশন করেছেন 'যা শুনেছি যা জেনেছি' এই নামে। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বলেছেন —'ছেলেবেলায় একটি ইংরাজী বই পড়েছিলাম। জর্জ বরোর 'বাইবেল ইন স্পেন'। বাইবেল প্রচার করতে গিয়ে একজন পাদ্রির কি কি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তারই রসোত্তীর্ণ ঘটনায় সমৃদ্ধ বইখানি। দীপেনবাবু এই বইটিতে বিস্তৃততর ভৌগোলিক পটভূমিকা আঁকবার চেষ্টা না করে ঘটনার গল্পগুলো বলেছেন। একজন নিপুণ রসিক কাহিনাকারের কলম দিয়ে বেরিয়েছে বলে গল্পগুলো সার্থক, মনোরম, রসোত্তীর্ণ হয়েছে।'

গত সংখ্যায় আলোচিত মিহির পালের বই-এর নাম পড়তে হবে **জীবনের মুখ।**

প্রবীণ সাহিত্যিক বনফুলের উক্তি আমরা সমর্থন করি। দীপেন রাহার গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করবে। ইদানীং সদগ্রন্থের বড়ই অভাব ঘটেছে—সেই কারণে 'যা শুনেছি যা জেনেছি'র মূল্য অসীম। আতিথেয়তা, অগ্নিশাসন, রাখে গুরু মারে কে, স্বামীজীদের ক্লান্ত নেই, গীতাজ্ঞান, অভিনব, তর্কযুদ্ধ, দুর্বলতা, ভক্তির নমুনা প্রসঙ্গ প্রভৃতি কাহিনীগুলি

সুর সাগরের তীরে—আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়। এস, চন্দ্র এ্যান্ড কোং, ৪নং রফি আহম্মদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা—১৩। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

বইটিতে গানের মাধ্যমে তিনশতের উপর রাগ-রাগিনীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি রাগের পরিচয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় মাত্র চার লাইনে লিখে লেখক সঙ্গে দিয়েছেন আরোহী ও অবরোহী। ফলে প্রত্যেকের বুঝবার কোন অসুবিধা হবে না। শেষ ভাগে আছে, গানের ব্যাকরণ এবং নানারকম তাল ও ঠেকা। তেষট্টি ভাগে ভাগ করে ছোট ছোট কবিতার মাধ্যমে সঙ্গীতের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লেখক সুন্দরভাবে লিখেছেন গানের ব্যাকরণ বিভাগে। গ্রন্থকার নিজে একজন প্রবীণ গায়ক ও গীতিকার বলেই কবিতার ভিতর দিয়ে রাগের পরিচয় লেখা সম্ভব হয়েছে। মোট পঁয়তাল্লিশটি তালের ঠেকাও এতে আছে। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত অনুরাগীদের সর্বসময়ের সঙ্গী হিসাবে বইটি ব্যবহারযোগ্য।

'সুর সাগরের তীরে' যে একটি অভিনব গ্রন্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের ধারণা প্রত্যেক গানের সঙ্গে যদি সেই রাগের পকড় দেওয়া হোত তা হলে আরো সুন্দর হত। পুস্তকের মধ্যে স্থানে স্থানে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে।

মণিকুমার ফুলকুমার—বীণা মিশ্র। ১২।১ সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, ওয়েস্ট ব্লক, কলকাতা-১৭। দু টাকা।

মূল রচনাটি ছিল অসমীয়া ভাষায়। অসমীয়া লোকসাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ : 'মালিতা' কাহিনীনির্ভর গীত। শ্রীপ্রফুল্ল মিশ্র সম্পাদিত সেই অসমীয়া রূপকথা : 'পখী ঘোরার সাধুর বাংলা অনুবাদ 'মণিকুমার ফুলকুমার'। ছোটদের উপযোগী ভাষায় ছড়া ও কাহিনী মিলিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক করে বাংলায় রূপান্তর ঘটিয়েছেন শ্রীবীণা মিশ্র। প্রশংসনীয় উদ্যম। রঙচঙে ছাপায় ও ছবিতে বইটি ছোটদের আনন্দ দেবে।

দ্বিতীয় পৃথিবী (উপন্যাস)—বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুক্তপত্র প্রকাশনী, বি-৪৮ রবীন্দ্রনগর, কলকাতা—১৮। ৪·০০ টাকা।

বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা থেকে দূরে নিবিড় নির্জনে সমুদ্র-পরিবেষ্টিত কোন এক দ্বীপে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজলাঞ্ছিত নিপীড়িত নরনারীদের নিয়ে 'নব্য ন্যায় আন্দোলনে'র মাধ্যমে 'দ্বিতীয় পৃথিবী' গড়ার কৌতূহলোদ্দীপক প্রচেষ্টা এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। গল্পাংশ ঢিলেঢালা। সংলাপ ঋজুবাক না হলেও লেখক তাঁর বক্তব্যকে বিশ্বাসজনকভাবে তুলে ধরতে

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কালি ও কলম (বৈশাখ ১৩৭৯) — শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। আড়াই টাকা।

'কালি ও কলম-এর প্রতিটি বিশেষ সংখ্যাই মূল্যবান। বিশেষ করে, প্রবন্ধগুলি। এ সংখ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের লেখক প্রবোধচন্দ্র সেন (বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ), সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী (সাংবাদিক মধুসূদন দত্ত), বিনয় ঘোষ (ইয়ং বেঙ্গল), আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (রবীন্দ্র সাহিত্য ও বাংলাদেশ), রত্নাকর চৌম (ওড়িশা নবনাট্য আন্দোলন), দেবব্রত রেজ (উপাখ্যান—তার স্বরূপ ও আমরা) এবং আরো কয়েকজন। মোট তেরটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। মাত্র একটি সংকলনে এতগুলো নির্বাচিত প্রবন্ধ পাওয়া যে-কোন পাঠকের পক্ষেই পরম লাভের বিষয় বলে গণ্য। তাছাড়া আছে গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটিকা। লেখেছেন মণীন্দ্র রায় শহীদুল্লাহ্ কায়সার, শামসুর রহমান, রত্নেশ্বর হাজরা, দিব্যেন্দু পালিত, চন্দন সেন, শুভ মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, চানক্য সেন, নমিতা চক্রবর্তী, আশিস সান্যাল এবং আরো অনেকে। সাধারণ পাঠকের কাছেও পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য মনে হবে।

সারবান—সম্পাদক : ভোলানাথ শীল। ৪১ পরাশর রোড। কলকাতা-২৯। দাম এক টাকা।

সারবানের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অসীমপ্রকাশ, প্রশান্ত দাস, লালমোহন বিশ্বাস, রমা ঘোষ, অজিত বাইরী, শ্যামা দে, অর্ণবজ্যোতি দেব, অনীতা ঘোষ, দিলীপকুমার হাজরা, রতনকুমার ঠাকুরতা, সুচেতা মিত্র, ভোলানাথ শীল, সমীর দে, পলাশ মিত্র, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, রোহিনীকুমার দাস, আহ্‌দুর রহমান, বিশ্বনাথ শীল, সুগত সেন, শিশির ভট্টাচার্য, শিবদাস দেবনাথ, শংকর মিত্র, শম্ভু রক্ষিত, প্রশান্ত রায় এবং ভোলানাথ শীল। কয়েকটি আলোচনাও আছে। মূল্যবান কাগজে ছাপা পত্রিকাটির মুদ্রণ পারিপাট্য আকর্ষণীয়।

এখন বিবাদ (প্রবন্ধ সংকলন) — সম্পাদক কমল বন্দোপাধ্যায়। ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম : ৩০ পয়সা।

পত্রিকাটি বেরিয়েছে পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে। মূলত কবিতা সংকলন হিসেবে। প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে একটি। পড়তে মন্দ লাগে না। লেখকদের মধ্যে আছেন আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, মনোজ নন্দী, সুকোমল রায়চৌধুরী, রাণা চট্টোপাধ্যায় এবং আরো

উত্তর অন্বেষা (মার্চ-মে ১৯৭২)—সম্পাদক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। ২।৯ই শহীদনগর, কলকাতা-৩১। এক টাকা।

এ সংখ্যার দুটো উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—'তান্ত্রিক আর্ট প্রসঙ্গে' ও 'প্রথম বাঙালী কার্টুনিস্ট' — লিখেছেন পৃথ্বীশ গুপ্ত ও কমল সরকার। বেশ ভাবিয়ে তোলার মত প্রবন্ধ। কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, অনন্ত দাশ, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, আশিস সান্যাল এবং আরো কয়েকজন। গল্পগুলি মোটামুটি সুনির্বাচিত। লিখেছেন অভ্র রায়, সুভাষ সিংহ, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। একটি কাব্য নাটিকা লিখেছেন কালাচাঁদ চৌধুরী। প্রচ্ছদ বহু বর্ণের। তুলনায় ভেতরের ছাপা ভাল হয় নি। বলা যায়, নিরেস।

কথা ও কবিতা (বৈশাখ ১৩৭৯)—সম্পাদক গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবেন্দ্র গ্রন্থালয়, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

সাধু গদ্যে বেশ জোরালো সম্পাদকীয় লিখেছেন সম্পাদক। 'বঙ্গদর্শন ও জ্ঞানাঙ্কুর' প্রসঙ্গে আলোচনাটি ভালোই লাগল। কবিতা লিখেছেন মূলত তরুণেরা। লুইজি পিরান্দেল্লোর একটি লেখার সুন্দর অনুবাদ করেছেন মঞ্জু দত্তগুপ্ত। মনে হয়, সম্পাদক বর্তমান সম্পর্কে যথাসম্ভব উদাসীন থাকতেই চান।

স্বপ্ন (বার্ষিক সংকলন) — সম্পাদক সরসী সরকার। পি-১৩২ সি আই টি রোড, কলকাতা-১০। এক টাকা।

এ সংখ্যার একটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ : 'ধর্ম ও নজরুল মানসিকতা'। লিখেছেন এস এম সিরাজুল ইসলাম। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক লিখেছেন : 'রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে না হারিয়ে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বাংলার স্বপ্নকে রূপ দিতে চাই 'স্বপ্ন'-এর মধ্য দিয়ে।' লেখকদের মধ্যে আছেন কালিদাস রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বার্ণিক রায়, জয়দেব রায়, গোসাইলাল দে, শিপ্রা মজুমদার এবং আরো কয়েকজন।

উর্ক (তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা)—পঞ্চমিত্র। করিমগঞ্জ, আসাম। এক টাকা।

পত্রিকাটির প্রত্যেক সংখ্যাতেই একটা করে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ থাকে। এ সংখ্যাতেও আছে। অনিলকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন 'হাস্যরস স্রষ্টা কেদারনাথ' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ। তাছাড়া গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন অনেকেই। লেখকদের মধ্যে আছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সনৎ দাঁ, পরেশ ভট্টাচার্য, নিখিল বসু, মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী, অতুলরঞ্জন দেব, দীননাথ সেন এবং আরো অনেকে। এ জাতীয় পত্রিকায় সম্পাদকীয় (প্রতিবেদন?)

অম্বিষ্ট—(বৈশাখ ১৩৭৮) সম্পাদক : কায়সুল হক এবং আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সাহিত্য ভবন। রংপুর। বাঙলাদেশ। দু'টাকা।

এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। বিপর্যস্ত জীবনধারায় স্বাভাবিকতা ফিরে আসা সময়সাপেক্ষ হলেও ইতিমধ্যে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি মননশীল সাহিত্য-পত্রিকা অম্বিষ্ট বেশ কিছু উৎকৃষ্ট গল্প, কবিতা প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হোয়েছে। অম্বিষ্ট ছাপার কাজ শুরু হোয়েছিল পাকিস্থানী প্রশাসনের কড়া প্রেস এ্যাক্টের মধ্যে। ছাপার পর দু' বছর পড়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে পত্রিকাটি প্রকাশ সম্ভব হোয়েছে। প্রবন্ধ লিখেছেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী,, মোতাহের হোসেন চৌধুরী মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, কাজী মোতাহার হোসেন, জহুরুল হক, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং রণেশ দাশগুপ্ত। গল্প লিখেছেন ফজলুল হক, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ এবং শওকত আলী। আবদুল কাদির, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলি আহসান, তালিম হোসেন, সানাউল হক, আবদুর রশীদ খান, শামসুর রহমান, আতাউর রহমান, আবদুস সাত্তার, কায়সুল হক, ফজল শাহাবুদ্দীন, প্রফুল্ল রায়, রেজাউল হক, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, জিয়া হায়দার, হায়াত মামুদ এবং আমানত আলী লিখেছেন কবিতা। সবগুলি রচনাই সমান উৎকৃষ্ট না হোলেও, রচনা নির্বাচনে বুদ্ধিদীপ্ত এবং সম্পাদকের রুচিশীল মনের পরিচায়ক।

অন্য মনে (চতুর্থ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশিসকুমার সান্যাল। ১৭-এম ইস্ট রোড। কলকাতা-৩২। দাম দুই টাকা।

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার জগতে 'অন্য মনে' স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন। এর প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। বর্তমান হস্তশিল্প ও কুটীরশিল্প সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করে রাখবার মতো। পশ্চিম বাংলার কারুশিল্পের ভবিষ্যৎ, বাঙলার পট, হস্তশিল্প ও হস্তশিল্পের সম্ভাবনা, বর্ধমানের স্বর্ণশিল্প, পাঁচমুড়া গ্রামের পোড়ামাটির কাজ, মেদিনীপুরের চিত্রকর ও মাটির পুতুল, বস্ত্রশিল্পের রঙ ও রেখা, উপকরণ শিল্পের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত—প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন প্রভাস সেন, দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণ দে, আশীষ বসু, তারাপদ সাঁতরা, কল্যাণ

বাঙলার লোকশিল্পে সমাজতত্ত্ব বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন বিনয় ঘোষ। হস্তশিল্প ও কুটীরশিল্পের কয়েকটি নিদর্শন ছাপা হোয়েছে আর্ট প্লেটে।

আত্মপ্রকাশ—সম্পাদক : সমরেন্দ্র দাস। ১২৮এ বকুলবাগান রোড, দাম : এক টাকা।

আত্মপ্রকাশের সপ্তম গল্প সংকলনে গল্প লিখেছেন অশোককুমার সেনগুপ্ত, জীবন সরকার, প্রলয় শূর, যীশু চৌধুরী এবং শংকর দাশগুপ্ত। নিজেদের গল্পের সম্পর্কে লিখেছেন অশোককুমার সেনগুপ্ত, কল্যাণ সেন, চণ্ডী মণ্ডল, জীবন সরকার, প্রলয় শূর, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাণীব্রত চক্রবর্তী সুনীল দাশ, সুব্রত সেনগুপ্ত, শংকর দাশ-গুপ্ত এবং যীশু চৌধুরী। এই পর্যায়ের আলোচনাগুলিতে লেখকের বিচিত্র মানসিক-তার সন্ধান মেলে। তাছাড়া, কয়েকজন সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে এমন কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছেন, নিঃসন্দেহে তা মূল্যবান।

শঙ্খ (ফাল্গুন ১৩৭৮)—সম্পাদক উৎপল চক্রবর্তী। ১ সীতারাম ঘোষ রোড, কলকাতা—২৬। দাম এক টাকা।

খুশি হবার মত কয়েকটা লেখা আছে এ সংখ্যায়। সাহিত্য, শিল্প, নাটক ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছুতে পারে—এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নবীন-প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকরা। পাবলো নেরুদার দুটো কবিতার চমৎকার অনুবাদ করেছেন দেবতোষ বসু। একটা প্রশ্নের জবাবে তরুণ সান্যাল লিখেছেন : 'শিল্পকর্ম গোড়ায় ছিল সার্ব-জনীন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে হয়েছে খণ্ডিত। অবার ভবিষ্যতে একটাই শ্রেণী থাকবে। সুতরাং সকল শ্রেণীর জন্য সাহিত্য রচনার প্রয়োজনই হবে না।' কিন্তু ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে বিমল কর লিখেছেন : 'সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য শিল্প সৃষ্টি করা কঠিন।'

চিত্রাঙ্গদা (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী)— সম্পাদক অজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

চিত্রাঙ্গদার বাংলাদেশ সংখ্যাগুলি প্রতিটি বাঙ্গালীর সংগ্রহযোগ্য। বর্তমান সংখ্যায় কর্ণেল রিখির সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা সম্পাদকের সাক্ষাৎকারটি আকর্ষণীয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখেছেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সুধাময় দাশগুপ্ত, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাদক রশিদ, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম হোসেন আলী, কস্তুরচাঁদ লালওয়ানী, আসহাবউল হক, জেবুন নাহার, আইভি, মেসবাহ আহমেদ। তাছাড়া আরও বহু মূল্যবান তথ্য ও রচনা সংকলিত হোয়েছে। অসংখ্য আলোকচিত্র ছাপা হোয়েছে। প্রচ্ছদে হানাদার বাহিনীর নির্মমতার পরিচয়

চারুবাক (জানুয়ারী '৭২)—সম্পাদক : অরুণ মুখোপাধ্যায়। ৪০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬। এক টাকা।

অফিস পাড়ার ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকাটি বর্তমান সংকলনে তার পূর্ব সুনামের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। সব রচনাগুলিই সুলিখিত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল : ন্যাস্তমানের 'অফিসপাড়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পর্যায়ক্রম' পশ্চিম-বঙ্গের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পটভূমির ওপর লেখা।

সীমান্ত (অষ্টাদশ সংকলন)—সম্পাদক তরুণ সান্যাল ও গণেশ বসু।। ৩১।২, হরিতকীবাগান লেন, কলকাতা-৬।। এক টাকা।।

এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধ : দু-একটি সংশয়' লিখেছেন জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। পাবলো নেরুদার একটি প্রবন্ধের অনুবাদ পত্রিকাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি বিতর্কমূলক। কবিতা ও গল্প লিখেছেন রত্নেশ্বর হাজরা, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, অনন্য রায়, অমিয় ধর, রবীন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্র ঘোষ, অসিত ঘোষ এবং আরো কয়েকজন। পত্রিকাটিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের সমালোচনা ছাপা হয়েছে। লিখেছেন তরুণ সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, ও দুলাল ঘোষ প্রতিটি লেখাই বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত। পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লাগবে।

সাতপুরা (তৃতীয় বর্ষ)—সম্পাদক : শ্যামল মুখোপাধ্যায়। ৩২১ ইস্ট ঘামাপুর, জব্বলপুর (এম-পি) পঞ্চাশ পয়সা।

প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-অনুরাগ-দীপ্ত ত্রৈমাসিক গল্প-কবিতা প্রবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। লিখেছেন : হেনা হালদার, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ পালিত, বিমল বেদজ্ঞ, সুকুমার মণ্ডল, বাসনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধেন্দু চন্দ, অশ্রু রায়, সম্পদ বসু, বঙ্কু সেন প্রমুখ। দূর-প্রবাসে নানান অসুবিধার মধ্যে সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের অতিক্রম অবশ্যই অভিনন্দনীয়।

দুই বাংলার কবিতা (ষষ্ঠ সংকলন)—সম্পাদক অঞ্জন সেন। পি-২৩৯ লেক রোড, কলকাতা-২৯। পঞ্চাশ পয়সা।

দেখে শুনে মনে হয় দারুণ ক্ষেপে গেছেন অভীক রায়। এ সংকলনের একমাত্র গদ্য লেখক। তরুণ কবিদের উৎসাহিত করেছেন তিনি, অক্ষম কবিদের শাস্তি দেবার জন্য। অবশ্য, সম্পাদক ততটা উগ্র নন। দুই বাংলার কবিদের কবিতা ছেপেছেন নির্বিচারে। ভালো কবিতা যেমন আছে, তেমনি খারাপ কবিতার সংখ্যাও কম নয়। লিখেছেন শামসুর রহমান, আল মামুন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়,

কায়সার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টো-পাধ্যায় এবং আরো অনেকে। ছাপা ভালো।

গুরুবার্তা (চৈত্র ১৩৭৮) সম্পাদক বীরেন্দ্র-কুমার ওঝা। শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রম, বানেশ্বর, হুগলী।

ধর্ম সম্পর্কীয় সাময়িক পত্রিকা শিরোনামেই তার পরিচয় মেলে। কবিতা ও প্রবন্ধও আছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা হল শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ধারা-বাহিক জীবনী।

সাধন-পথ (নববর্ষ) সংখ্যা '৭৯)—সম্পাদক : স্বামী প্রজ্ঞানচৈতন্য পুরী। ৪।১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯। এক টাকা।

ধর্ম সম্পকীয় সাময়িক পত্রিকা। ধর্মের নানান তত্ত্ব সম্পকীয় আলোচনা এতে আছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল : ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর উপনিষদ ভাবনা গৌরহরি নাথের শান্তির সন্ধানে গীতার অবদান। এছাড়া লিখেছেন কালিদাস রায়, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী প্রমুখ।

মুকুর (নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৭৯)—সম্পাদক : জয়দেব রায়, অজয় মালিক। বাওয়ালী (রথতলা), ২৪ পরগণা। এক টাকা।

সাহিত্য পত্রিকাটি গ্রাম-বাংলার সাহিত্য-পিপাসু তরুণ মনের প্রতিবিম্ব। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার পেয়েছেন তরুণরাই এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সুপ্রতিষ্ঠ কবিকুল : মণীন্দ্র রায়, কবিতা সিংহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস প্রমুখ।

প্রাপ্তি স্বীকার

সৈকত (নববর্ষ সংখ্যা ১৩৭৯)—সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য। ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া। পঞ্চাশ পয়সা।

বিশ্বপথিক (বৈশাখ, ১৩৭৯)—সম্পাদক : নলিনীকান্ত চক্রবর্তী। বিশ্বনিকেতন, হাওড়া—৫।

স্বাক্ষর (নববর্ষ সঙ্কলন) — সম্পাদক : শ্রীমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। ৪৭ রাজ-বল্লভ সাহা লেন, হাওড়া—১। পঁচিশ পয়সা।

পত্তর (নববর্ষ সঙ্কলন)—সম্পাদক : তপন-কুমার চৌধুরী, অমলকুমার দে। সুনীল সরণী, কোচবিহার। এক টাকা।

বৈজয়ন্তী—সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ৭ বৃন্দাবন পাল লেন, কুলটি, বর্ধমান। সত্তর পয়সা।

জঙ্গীপুর সংবাদ (বাসন্তী সংখ্যা ১৩৭৮) সম্পাদক : বিনয়কুমার পণ্ডিত। জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ। ত্রিশ পয়সা।

এবং নৈকট্য (এপ্রিল-জুন '৭২) সম্পাদক। অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা। ৭০, বসাক-বাগান, পাতিপুকুর, কলকাতা-৪৮। তিরিশ পয়সা।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

। ১৯ ।

এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলাই উচিত কিন্তু তাও বলতে পারল না।

চার বছর বয়স থেকে এই আঠারো পর্যন্ত—চোদ্দ বছর যাকে বুকে করে মানুষ করেছে—সে সাপ হ'লেও তাকে এ অবস্থায় রাস্তায় বার ক'রে দেওয়া যায় না। দরজা খোলার সংগে সংগেই সব আস্ফালন থেমে গিয়েছিল গোরার, কে জানে সে হয়ত ভাবল আবার শাসন করতেই আসছে—মাথা হেঁট করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই সময়...একবার এক চকিতে সেদিকে চেয়ে দেখেছিল এক পলক মাত্র। তবু তাতেই অনেক দেখা হয়ে গেছে। পিঠে, বাহুস্থলে—মায় গালেরও এক জায়গায় বেতের দাগগুলো লাল হয়ে ফুলে ফুলে আছে, কোথাও রক্ত বেরিয়েছিল সেই দাগে দাগে জমে গেছে, কোথাও বা ঘামেতে রক্তেতে মিশে গড়িয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থাতেই শুকিয়ে একটা ভয়াবহ চেহারা ধারণ করেছে; যন্ত্রণায় অনাহারে তৃষ্ণায় চোখ-মুখ বসে গিয়ে যেন সুগভীর কালি মেড়ে দিয়েছে চোখের কোলে; সমস্তটা জড়িয়ে একটা অসহায়, আর্ত চেহারা।

সব অনাচার অসদাচরণ, সব অকৃতজ্ঞতা, ভয়ংকর ক্রুরমনের জঘন্য নগ্ন প্রকাশ—সদ্যলব্ধ বিষাক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি—সব ছাপিয়ে এই দীনক্লিষ্ট অবস্থাটাই বড় হয়ে উঠল—বেদনায় টন টন ক'রে উঠল বুকের মধ্যে। যে মার খেয়েছে তার থেকে যে মেরেছে, আঘাত তাকেও যে কম বাজে নি, তার যন্ত্রণাও যে কিছুমাত্র কম নয়—এই মুহূর্তে সেই সত্যটাই স্পষ্ট ধরা পড়ল হেমন্তর কাছেও।...

কিছুই বলা হ'ল না, বলতে পারল না। 'চলে যাও' যেমন বলা গেল না তেমনি

ফিরে এসে নিজের ঘরেই শুয়ে পড়ল আবার। সারা রাত্রের চেষ্টায় সকালে যে মনের বল ফিরিয়ে এনেছিল—তা এই ক মিনিটে আবার হারিয়ে গেছে। মনে না দেহেও—কোন শক্তিই, আর নেই, বিন্দুমাত্রও।...

কী করা উচিত—নিমাইও ভেবে পায় না। ঘর থেকে বাইরে আসার জন্য যে অত লাফালাফি চেঁচামেচি করছিল এতক্ষণ, দরজা খুলে দেবার পর সে আর বাইরে আসার কোন চেষ্টাই করল না। হেমন্তর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন চুপসে গিয়েছিল সে-ও, তেমনি মাথা হেট করে ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। সেও বুঝতে পারছে না কী করা উচিত তার। এরা এখনই দূর ক'রে দেবে কিনা, পুলিশে দেবার মতলব আছে কিনা (এসব ব্যাপার পুলিশে দেওয়া যায় কিনা তাও তার জানা নেই, গর্হিত কাজ করলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যায় এমনি একটা আবছা ধারণা মাত্র আছে)—তাও বুঝতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একবার একটা পা, আর একবার অন্যটা তুলে অপর পাটা চুলকোতে লাগল।

মেঝেতে মাদুরের ওপরই শুয়ে পড়েছিল হেমন্ত চোখ বুজে। খানিকটা দেখে নিমাই পা-পা ক'রে সেখানেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তহালে ওকে কি বলা হবে এখন?'

তেমনি চোখ বুজেই ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'জানি না।'

এ-আবার কি কথা! হতভম্ব হয়ে যায় নিমাই। এ বাড়িতে চিরকাল সব ব্যাপারে হেমন্তই হুকুম দিয়ে আসছে, সিদ্ধান্ত যা কিছু নেওয়ার সে-ই একমাত্র লোক--নিমাইয়ের কাজ শুধু নির্বিচারে সেগুলো তামিল করা। এ ধরণের পরিস্থিতিতে

খানিকটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে এক ধরণের কাষ্ঠ-হাসি হেসে নিমাই আবার বলল, 'হেঁ হেঁ, বাবাজী হয়ত ভাবছে যে ওর তড়পানিতে ভয় পেয়েই তুমি দোর খুলে দিলে। নিজের কেরামতি ভেবে নিজে নিজেই খুব বাহবা নিচ্ছে হয়ত।...ঠিক যে তা নয়—এটা যে মনের ঘেন্নায় করলে—সেটা একটু বুঝিয়ে দিলে পারতে!'

তবু ও পক্ষ থেকে কোন সাড়া এল না। অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছে হেমন্ত, কথা বলারই আর কোন শক্তি নেই তার। মানুষ হ'লে তাকে কিছু বোঝানো যায় কোন কোন ক্ষেত্রে পশুকেও কথা বোঝার মতো করে তৈরী করা যায় কিন্তু যে পশুর অধম তাকে—কেন সে অধম তা বোঝানো যায় না। ছুঁচোকে মারলে নিজের হাতেই দুর্গন্ধ হয়—ছুঁচোর ছুঁচো যায় না তাতে।

কিন্তু, এসব কথা মনে এলেও বলতে পারল না, মনে হচ্ছে কথা বলার বড় পরিশ্রম, তার চেয়ে যা খুশি হোক, যার যা খুশি করুক—শুধু তাকে একটু চুপ করে শুয়ে থাকতে দিক। এ যে কী সুগভীর শ্রান্তিতে পেয়ে বসেছে তাকে—কাউকে সে অবস্থা বোঝাতে পারবে না। মনে হচ্ছে এমনিভাবে কোন অন্ধকারে নৈঃশব্দে ডুবে যাওয়াই সবচেয়ে আরামের, এই অবস্থায় এখনই মরে যেতে পারাই সবচেয়ে কাম্য।

কোন নির্দেশ না পেয়ে নিমাই আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ভাতটা বুঝি পুড়ে যাচ্ছে। একাপড়ে সে ছুঁলে হেমন্ত হয়ত খাবে না—কিন্তু কাপড় বদলাবার সময় নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাতে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে নামিয়ে ফেন গেলে ফেলল।

তারপর আবার এসে প্রশ্ন করল, 'পনে কয়লা হয়ে যাচ্ছিল, আমাকে তো এ

পেড়ে নিয়ে গামছা পরে কি তোমার মতো চাট্টি ভাত চাপিয়ে দোব আবার—না তুমিই উঠে চাপাবে? উনুনটা নিকিয়ে কয়লা দিয়ে রাখব—?'

এবার উত্তর এল। তেমনি চোখ বুজেই বলল, 'আমি এবেলা কিছু খাব না, ঐ ভাতটাতে যা পারো খেয়ে নাও গে—আর কিছু চাপাতে হবে না।'

'তোমার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে। ডাক্তার টাক্তার কাউকে ডাকব? যদি হোমিওপ্যাথী খেতে চাও তো—কাছেই দীপাত্তগী আছেন, তাঁকেও ডাকতে পারি। এখনও হয়ত বেরোয় নি কলে, বারোটার পর বেরোয়—।'

'না, না। কিচ্ছু দরকার নেই। তোমরা সবাই সব করেছ, এখন শুধু দয়া করে একটু শুয়ে থাকতে দাও শান্তিতে—তাহলেই ঢের উপকার হবে।'

আর ঘাটাতে সাহস হ'ল না নিমাইয়ের। আশ্বস্তও হ'ল খানিকটা। অসুখ বিসুখ-বুকের ব্যামো বা সেরকম কিছু নয়—অভিমান, রাগ, ঐ জাতীয় কিছু।

'মরুকগে, যাকে মাথায় ক'রে নেচেছিলে সে যদি মাথায় লাথি মেরে থাকে—তার আমি কি করব। আমার ওপর মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। আমাকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা করো নি কখনও, আমার কাছে কিছু পিত্যেশাও করো না। জ্বালাইনি পোড়াইনি এই ঢের।...আমি তোমার উপগার করব, কাজে লাগব, ছেলের মতো দেখব—তেমন ব্যাভার তো করো নি কোনদিন। এখন দুপক্ষ সমান করতে এলে চলবে কেন?

আপন মনেই গজগজ করে সে রান্না-ঘরে গিয়ে।

অবশ্যই অস্ফুট কণ্ঠে হেমন্তর কানে না যায়।...

আর কোন শাসন কি পুলিশ ডাকা

'ক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম কিছুই হ'ল না দেখে গৌরও কিছুটা ভরসা পেল।

সে এবার আস্তে আস্তে—যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে কলতলায় গিয়ে আগে পেট পুরে খানিকটা জল খেয়ে নিলে, তারপর মুখ ধুয়ে ওপর ওপর একটু জল ঢেলে স্নানের চেষ্টা করে—জল ঢাললেই কাটা জায়গাগুলো জ্বালা করে উঠছে—কাপড় ছেড়ে বারান্দার এক কোণে চুপ করে এসে বসল।

নিমাই আড়ে সবই দেখল। এখন কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করা দরকার কিনা—করলে গিন্নী খুশী হবেন না নারাজ হবেন—ভেবে ঠিক করতে পারল না। বিশেষ কিছু নেইও ঘরে—গোটা দুই সন্দেশ পড়ে আছে ঠাকুরের প্রসাদ। এ অবস্থায় সন্দেশ খেতে দেওয়াটা আবার বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে পড়বে, নাই পেয়ে যাবে—নিজেরই মনে হ'ল। তাই সে চেষ্টা আর করল না।

নিজেও স্নান সেরে এসে দুজায়গায় ভাত বেড়ে—এখন বাড়তে গিয়ে দেখল তিন জনের মতোই চাল নেওয়া ছিল, নিত্যকার অভ্যাস কাজ ক'রে গেছে না স্বেচ্ছাকৃত কে জানে—ভাতের থালাটা এনে গৌর যেখানে চুপ ক'রে বসেছিল নীরবে সেইখানে নামিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে খেতে বসল।...

বিকেলে মতির মা ঝি আসবে বলেছে। সুতরাং রান্নাঘর ধোওয়া কি বাসন মাজার দরকার নেই। সেগুলো রান্নাঘরেই গুছিয়ে রেখে দোরে তালা দিয়ে দিল। তারপর এক গেলাস শরবৎ তৈরী ক'রে হেমন্তর মাথার কাছে রেখে দিল ঢাকা দিয়ে, বলল, 'একটু মিছরির পানা রইল এখেনে যদি তেষ্টা পায় তো খেয়ে নিও। শুধু শুধু আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি বলো—পরের ওপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া বৈ তো নয়।'

বিকেলের দিকে হেমন্ত উঠে পড়ল। সংসারের কাজও করল কিছু কিছু অভ্যস্ত প্রতিদিনের কাজ। ঝি এসে গিয়েছিল পুরনো ঝি তবু একবার তাকে কাজকর্মগুলো ঝালিয়ে দিতে হ'ল তারপর যথারীতি গিয়ে রাঁধতেও বসল। শুধু নিমাইকে ডেকে বলল, 'পারো তো একটা রাঁধুনী বামুন কি বামনী ঠিক করো। আমার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলতে পারব না। ঠিকে লোক হলেও চলবে, রাতদিনের হ'লেও আপত্তি নেই। নেবুতলার বাজারের কাছে উড়ে ঠাকুরদের একটা আড্ডা আছে, সেখানে খোঁজ করলে পেতে পারবে। আমাদের বাড়ি কাজ করে গেছে পীতাম্বর, বনমালী—দুজনেই এখন হালুইকরের কাজ করে শুনেছি—তাদের বললে তারাই ঠিক করে দেবে।'

রাত্রে গৌরকে সে-ই রুটি তরকারি বেড়ে ধরে দিল। গৌরও মাথা হেঁট ক'রে এসে খেতে বসল। কথাবার্তা কোন তরফে নেই সেটা একরকম বাঁচোয়া, গৌরের পক্ষে তো ভগবানের আশীর্বাদ। বুড়ির মেজের চেয়ে কথা কিছু কম ধারালো নয়।...এমন কি রাত্রে যখন মতির মাকে দিয়ে ওর বিছানাটাও পড়ার ঘরে পাতিয়ে দিল তখনও সে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতকাল হেমন্তর ঘরে সামনাসামনি চৌকিতে শোওয়ার ব্যবস্থা ছিল—সেখান থেকে এ নির্বাসনে ক্ষুণ্ণ হবার কথা—কিন্তু গৌর খুশীই হ'ল। এইটেই সে চাইছিল। এবার এসে পর্যন্ত ঠাকুমার সঙ্গে—সে এতকাল মা বলত—দিনরাত এত কাছাকাছি থাকা পছন্দ হচ্ছিল না। মুখ ফুটে না বলতেই যে ব্যবস্থাটা হয়ে গেল এ একরকম শাপে বরই হ'ল বলা যেতে পারে।

এইভাবেই কাটল কটা দিন।

ইস্কুল যাওয়ার কথা কেউ বলে না আর—গৌরও যাওয়ার চেষ্টা করে না। দায়দায় বাড়িতেই বসে থাকে চুপ ক'রে। বই খাতা খুলে পড়বার ভানও করে না। দক্ষিণীবাবুকে আগেই বারণ ক'রে পাঠিয়েছে হেমন্ত, সেদায়েও নিশ্চিন্ত। কোথায় কিলবরণ না কি কোম্পানীর চুনের ভাটিতে একটা কাজের চেষ্টা দেখছে নিমাই আড়াল থেকে শুনেছে, কিন্তু তাকে বলে নি কোন কথা।

ছ'সাতদিন পরে একদিন বিকেলে মতির মা দোকানে গেছে কি কিনতে, হেমন্ত কলঘরে কাপড় কাচতে গা ধুতে ঢুকেছে—গোরা ছাদে বসে আছে দেখে কলঘরে ঢুকেছিল সে—এসে দেখল ওর শোবার ঘরের গা-আলমারীটা খোলা, কেউ কোথাও নেই। প্রথমটা ভেবেছিল ভুল, কারণ চাবিটা আলমারীর কপাটে ঝুলছে। তার পরই—বিদ্যুদ্বেগে সংসয়টা খেলে গেল মাথায়! সে দৌড়ে গিয়ে ছাদটা দেখে এল, নিচে ওপরের পাইখানা, নিচের কলঘর, নিমাইয়ের ঘর, গৌরের বর্তমান শোবার ঘর কোথাও গোরার কোন চিহ্ন নেই। সদর দরজাটা হা-হা করছে খোলা।

সেটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে আলমারীটা দেখল ভাল ক'রে। গহনাপত্র, মোটা টাকা, দলিল দস্তাবেজ এ আলমারীতে থাকে না কিছু থাকে য়্যাটর্ণীর কাছে, কিছু লোহার সিন্দুকে। সিন্দুকের চাবি ঠাকুরঘরে গুরু-দেবের ছবির সিংহাসনে ভেলভেটের আসনটা

চাপা—তার অস্তিত্ব কেউই জানে না। কারুও সামনে এমন কি নিমাইয়ের সামনেও আজ পর্যন্ত সেখান থেকে চাবি বার করে নি কি রাখে নি।

এখানে থাকে সংসার খরচের টাকা, ভাড়া ইত্যাদি যখন যা ওয়াশল হয়—কিছু বেশীই থাকে দরকারের চেয়ে আকস্মিক কোন বিপদ-আপদের জন্যে—আর থাকে দুচারটে সামান্য সোনার জিনিস। সেইখান থেকেই—ভাল করে গুণে হিসেব মিলিয়ে দেখল হেমন্ত—ছশ টাকা আর দুগাছা সোনার বালা অন্তর্হিত হয়েছে। কতক-গুলো খুচরো বাইরে দেবার টাকাও ছিল—নিমাই বলে 'পেমেন্টের টাকা'—বাড়ির নিকস, ইলেকট্রিক (এই এক আপদ নতুন বাড়ল), পাইখানায় কাজ করে গেছে 'পীতাম্বর' কদিন আগে তার মজুরী, বালি সিমেন্টের দোকানে কিছু খুচরো দেনা আছে সে সব টাকা আলাদা আলাদা কাগজের মোড়ক করে নাম লিখে রাখা ছিল ছেঁড়া কাপড়গুলোর নিচে—সেগুলো ঠিকই আছে, সম্ভবত চোখে পড়ে নি।

আসলে খুবই তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়েছে। হেমন্তরই বোকামি, অথবা কথাটা মাথায়ই যায়নি—চাবির গোছা আগেকার অভ্যাসমতো বালিশের তলায় রেখে কল-ঘরে গেছে। এইটুকু মাত্র অবসর। গা ধুতে পনেরো মিনিটের বেশী লাগে না কোন-মতেই, তাও তার মধ্যে ঝি এসে পড়তে পারে যে-কোন মুহূর্তে—সুতরাং মিনিট-তিন-চারের বেশী সময় দিতে পারেনি, ওর ভেতর যেটুকু যা পেয়েছে হাতের সামনে নিয়েছে। খরচের টাকা কোথায় থাকে তা সে জানে, সেইটেই নিতে গিয়েছিল—বালাটা উপরি লাভ। কোন ছুতোর নিতার কাছে পাঠাবে বলে সিন্দুক থেকে বার করে রেখেছিল কদিন আগে।

কাপড়-জামাগুলো দেখল, সেসব কিছুই নিয়ে যায়নি। যা গায়ে পরা ছিল, ধুতির ওপর শুধু কামিজটা চড়িয়ে নিয়েছে। বাড়তি কাপড় নিতে গেলে ব্যাগে করে নিতে হয়—ইস্কুলে যেত যাচীতে পোর্টম্যান্ট নিয়ে, সে অসম্ভব—কাপড় হাতে করে কি বগলে করে নিয়ে যেতে গেলে কোন চেনা লোক দেখে ফেলতে পারে। তাহলেই নানা কৈফিয়ৎ ডেকে জিগ্যেস করবে কোথায় যাচ্ছ কী বৃত্তান্ত—সেই ভয়েই নেয়নি। সময়ও পায়নি হয়ত।...

সব দেখে আলমারীটা আবার বন্ধ করে চাবির গোছাটা আঁচলে বেঁধে নিল। চেঁচামেচি করল না, বিলাপও করল না। অতিরিক্ত কোন দুঃখ পেল বলেও বোধ হল না। বরং যেন একটা স্বস্তির—মুক্তির ভাব বোধ করল। কোন একটা অবাঞ্ছিত দায় থেকে যেন অব্যাহতি পেল। কদিন ধরেই গোরার উপস্থিতিটা কণ্ঠ-নালীক বোঝার মতো বুকে চেপে বসেছিল, না পারছিল তাড়াতে না পারছিল আগের মতো সহজ হতে—দিনরাত একটা অশান্তি ভোগ করছিল। সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে আপনার লোক যখন পর হয় কি মনের বাইরে চলে যায়, তখন তার সান্নিধ্যটা অপরিচিত পরের চেয়েও অসহ বলে বোধ হয়।

ঝি এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কাকা কোথায় মা, তাকে দেখছি না যে?'

হেমন্ত মা সেই সুবাদে গোরা ভাই-পো। খাতির করে কাকা বলে।

হেমন্ত সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিল, 'এক জায়গায় গেছে।'

মতির মা আর কিছু জানতে চাইল না, হেমন্তকেও মিথ্যা বলতে হল না বেশী।

কিন্তু নিমাই আপিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে যখন প্রশ্ন করল, 'তোমার গুণধর পেয়ারের নাতি কোথায় গেলেন—তাকে দেখছি না যে! সটকালেন নাকি?' তখন তাকে কথাটা বলতে হল। মিথ্যে বলে লাভ নেই, কদিন আর চেপে রাখবে। চলে গেছে যে—সেটা তো বলতেই হবে।

নিমাই শুনে তখনই আবার জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে যাচ্ছিল।

'এই দ্যাখো। এ-কথাটা এখনও বলোনি। আসামাত্তরই বলবে তো! এখুনি তো থানায় যাওয়া দরকার তাহলে।...ওরা হুলিয়া বার করে দিক একটা। সহজে ছাড়ব না আমি।...যাবে কোথায়—ঠিক ধরা পড়বে। কী চেনে কলকাতার!...তুমি ভেবো না, টাকা হয়ত পাঁচ ভূতে লুটে নেবে ইরি ভেতরেই। তবে ওকে জব্দ করে দোব।...ইস! শেষে চুরিটাও করলে! ঐটেই বোধহয় বাকী ছিল আমাদের বংশে, চুরি করে জেল খাটা!'

হেমন্ত বাধা দিল, 'না না, এ নিয়ে থানা পুলিশ হাঙ্গামা আমি করতে পারব না। আকাশের দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়েই লাগে। তাকে জেলে দিয়ে কি আমার ইজ্জৎ বাড়বে। আমাদেরই বলবে লোকে তোমরা মানুষ করতে পারোনি। ও থাক। কাউকে কিছু বলতে হবে না।...তাছাড়া এ তো ভালই হল—অল্পের ওপর দিয়ে গেল। এত সহজে অব্যাহতি পাব ভাবিনি আমি। আপনা হতে ঘাড় থেকে নেমে গেল এই তো ভাল। নইলে ওকে নিয়ে কিই বা করতুম আমি!'

বলতে বলতে কি গলার আওয়াজটা গাঢ় হয়ে এল একটু?

কে জানে, ভাল করে তাকিয়েও কিন্তু চোখে জল দেখতে পেল না নিমাই।

অগত্যা সে জামাটা আবার হুকে টাঙিয়ে রেখে সংক্ষিপ্ত একটা মন্তব্য করল, 'ভাল!'

(ক্রমশঃ)

সোনার বাঙলা

শিপ্রা আদিত্য
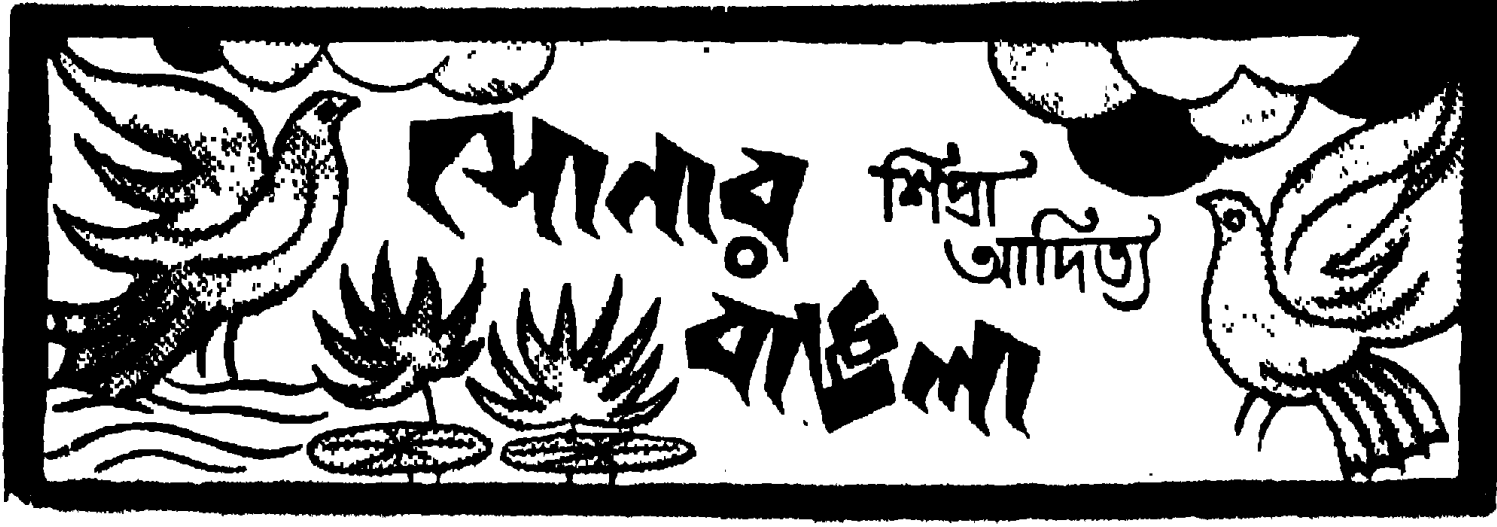
কুমিল্লা—

আখাউড়া জংশন থেকে ২৯ মাইল দূরে গোমতী নদী তীরে শহরটি অবস্থিত। কুমিল্লায় জগন্নাথ মন্দির, সপ্তরত্ন মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে রথের সময় বড় মেলা হয়। কুমিল্লা শীতল পাটি, হুঁকা, বাঁশ ও বেতের কাজের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া তাঁতের 'চারখানা' কাপড়ও বিখ্যাত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনী যুদ্ধের প্রয়োজনে ছাউনী বা ট্রেঞ্চ খননের সময় কুমিল্লা শহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে (পশ্চিমে) লালমাই-ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলে হঠাৎ করে আবিষ্কার করে বসে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাংশ। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগিতায় খনন কার্যের ফলে পরবর্তীকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধমূর্তি, তাম্রশাসন সোনা ও রূপোর মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। প্রায় বারো মাইল বিস্তৃত লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের গায়ে শালবন বিহারের প্রধান বেদী এবং প্রধান বেদীর চার পাশে ১২০টি ঘর স্থাপত্য শিল্পের কৌতুহল মেটাবে। এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটি ঘরে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয়েছে ১১×১০ ফুট প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে কুলঙ্গি দেখা যায়। কুলঙ্গিতে বুদ্ধের ব্রোঞ্জের মূর্তি প্রদীপ এবং নানা ধরনের মাটির তৈজসপত্র পাওয়া যায়। মূলবেদীর গায়ে সুন্দর পোড়ামাটির অলংকরণ স্থাপত্যশৈলীকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। বেদীর দেওয়ালের স্থাপত্যে—মানুষ, পাখী, পৌরাণিক মূর্তি, হরিণ, বানর, মাছ, ময়ূর, সাপ, ফুল, নর্তক-নর্তকী, শূয়র, হাতী, ষাঁড়, কুস্তিগীর প্রভৃতির মোট ৩২টি নিদর্শন দেখা যায়। এছাড়া তাম্রফলক, সোনা-রূপোর মুদ্রা, পোড়ামাটির খোদাই শীলমোহর, ৩২টি পোড়ামাটির নামমুদ্রায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের দুটি লাইন দু-পাশে ধর্মচক্র, ধর্মচক্রের সামনে হরিণ ও পদ্মফুল দেখা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমতে বেদীটি সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের দেববংশীয় রাজাদের তৈরী বলে অনুমান করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ডঃ এফ এ খানের অভিমতে জানা যায়—'ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধ নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে অন্ততপক্ষে চারি শতাব্দীকাল বর্তমান ছিল এবং সম্ভবত প্রাচীন নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই এখানে কোন বিখ্যাত বিদ্যানুশীলদের কেন্দ্র ছিল।'

পদ্মাসনে উপবিষ্ট চারটি বৌদ্ধ মূর্তিও পাওয়া গেছে। সেগুলি 'ভূমি স্পর্শ মুদ্রা'তে উপবিষ্ট। সোনা বা রূপোর মুদ্রাগুলি 'খন্ড ও ত্রিরত্ন' যন্ত্রের প্রতীক খোদিত। বুদ্ধ, বোধিসত্ব এবং তান্ত্রিক দেবী তারার বহু মূর্তিও দেখা যায়। আবিষ্কৃত ভাস্কর্য ও স্থাপত্যগুলি শিল্প-নৈপুণ্য ও নন্দনতাত্ত্বিক রুচির এবং দক্ষতার পরিচয় দেয়।

(যশোর-খুলনা)

'—যশোর নগর ধাম
প্রতাপ আদিত্য নাম
বরপুত্র ভবানীর
খ্যাত হইলা পৃথিবীর
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ
নাহি মানে পাটসাট
কেহ নাহি আঁটে তায়
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী
অযুতে তুরঙ্গ সাথী
ষোড়শ হলকাহাতী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।'

ভারতচন্দ্রের অমর কবিতায় যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের নাম আজও অম্লান। কথিত আছে—সুন্দরবনের বেশ খানিকটা অঞ্চল বেওয়ারিশ পড়ে থাকায় বিক্রমআদিত্য বসন্ত ও বাংলার শেষ পাঠান সুলতান দাউদ বা 'গৌড় পাশা'র সঙ্গে এক পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে গভীর অরণ্যে যমুনা নদী তীরে যশোর নামে এক গৃহের পত্তন করেন। প্রবাদ আছে গৌড় থেকে আনা বিপুল ধনরাশি দিয়ে নতুন শহরের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় পুরানো নাম পাল্টে যশোরের জায়গায় যশোহর অর্থাৎ যশ+হরণ হয় যশোরের আর এক নাম ঈশ্বরীপুর। সাতক্ষীরা থেকে জলপথে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে। যমুনা ও ইছামতী নদীতীরে অবস্থিত।

সেদিনের অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর আর আজকের যশোহর সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মুঘলরা মুড়লী কসবায় 'যশোর' নামে এক ফৌজদারী আদালত স্থাপ[illegible] করে। পরবর্তী কালে মুড়লী কসবা [illegible]শোর নামে প্রখ্যাত হয়ে ওঠে। এই বর্[illegible] যশোর
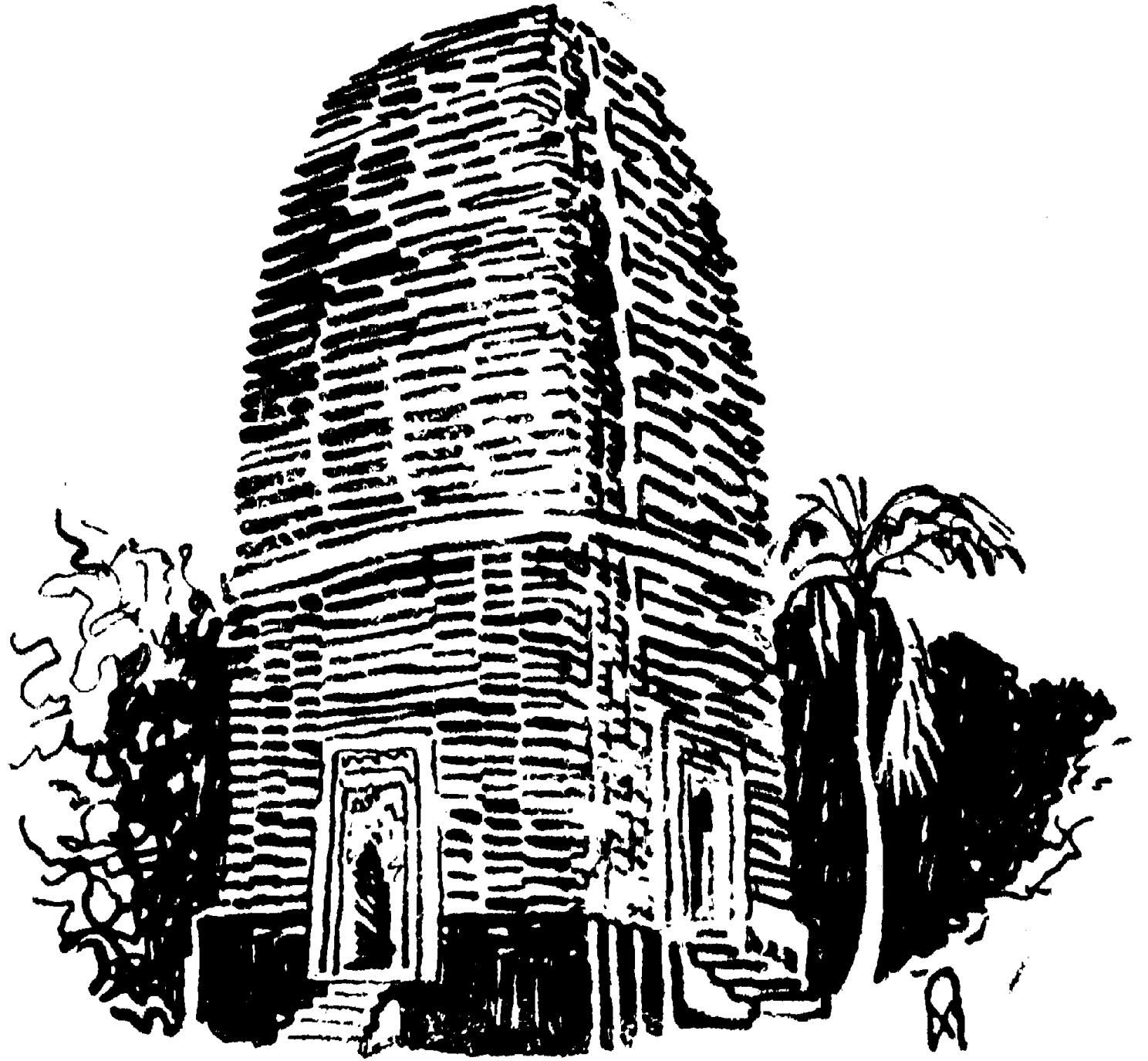
অযোধ্যার মঠ (খুলনা)

থেকে প্রায় ২৪ মাইল দূরে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত প্রতাপাদিত্যের যশোর।

প্রাচীন যশোর রাজ্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুর আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। আজ সেখানে জোর কদমে চাষ-আবাদ চলছে। প্রাচীন দুর্গের কিছু ভগ্নাবশেষ আজও মনে করিয়ে দেয় সেদিনের ইতিহাসকে। যেমন—দুর্গের প্রাকার বা পাঁচিল, বারদুয়ারী হামামখানা মসজিদ ও মন্দিরের বিভিন্ন ভগ্নাংশ। তার মধ্যে টেঙ্গা মসজিদের কিছু অংশ আর যশোরেশ্বরী মন্দিরের কষ্টি পাথরের কালী, গঙ্গা ও অন্নপূর্ণা মূর্তি আজও নিয়মিত পূজা হয়ে আসছে। টেঙ্গা মসজিদের কাছে গভীর জঙ্গলে পরিত্যক্ত এক ত্রিকোণ চন্ডভৈরবের মন্দির ও একটি গীর্জা দেখা যায়। স্পেনের জেসুইট ভ্রমণকারী ডুজারিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরীপুরের গীর্জাই বাংলার প্রথম গীর্জা।

ঈশ্বরীপুর থেকে কিছু দূরে—ধামাইল বা ডামরেলী পরগণার মুস্তাফাপুর গ্রামে সুন্দর কারুকার্যময় নবরত্ন মন্দিরের কিছু ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের নটি চূড়ো ভেঙ্গে গেছে মন্দির দেওয়ালে বা গর্ভ মন্দিরে— নানা দেবদেবী, দশ অবতার, যুদ্ধযাত্রা এমন কত কি ভিত্তিচিত্র আজও চোখে পড়ে।

প্রতাপাদিত্যের সময় রাজধানী ঈশ্বরীপুরকেও কাশী বলা হত। কাশী বা বেনারসের অনুরূপ মণিকর্ণিকা, ব্যাসকাশী, বেদকাশী প্রভৃতি ছিল। গোপালপুরের প্রকান্ড দীঘি সেদিন যার নাম মণিকর্ণিকা ছিল আজ সে দীঘির জল শুকিয়ে মজে আছে, ব্যাসকাশী ও বেদকাশীর অনুরূপ মন্দিরমালার কিছু স্তম্ভই আজ দ্রষ্টব্য।

যশোহর

কলকাতা থেকে ৭৫ মাইল দূরে ভৈরব নদী তীরে অবস্থিত। বর্তমান যশোর থেকে ২১ মাইল দূরে মির্জানগরে ফৌজদারদের এক ভগ্ন প্রাসাদ ও একটি মসজিদের কিছু নমুনা দেখা যায়। প্রাসাদ থেকে ২ মাইল দূরে এক দুর্গের ভগ্নাংশ ও দুটি কামান আজও আছে।

যশোর শহরের চাঁচড়া গ্রামে এত অতি প্রাচীন দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে। এছাড়া যশোহর তো চিরুনি আর বোতামের জন্যই বিখ্যাত।

বারবাজার

যশোহর থেকে দশ মাইল দূরে যশোহর ঝিনাইদা রাস্তার কাছেই বারবাজার এক অতি প্রাচীন জায়গা। এখানে প্রায় ৩।৪ মাইলব্যাপী ভগ্নাংশ ও দীঘি দেখা যায়। অনেকের ধারণা, প্রথম

স্বর্ণমুদ্রা
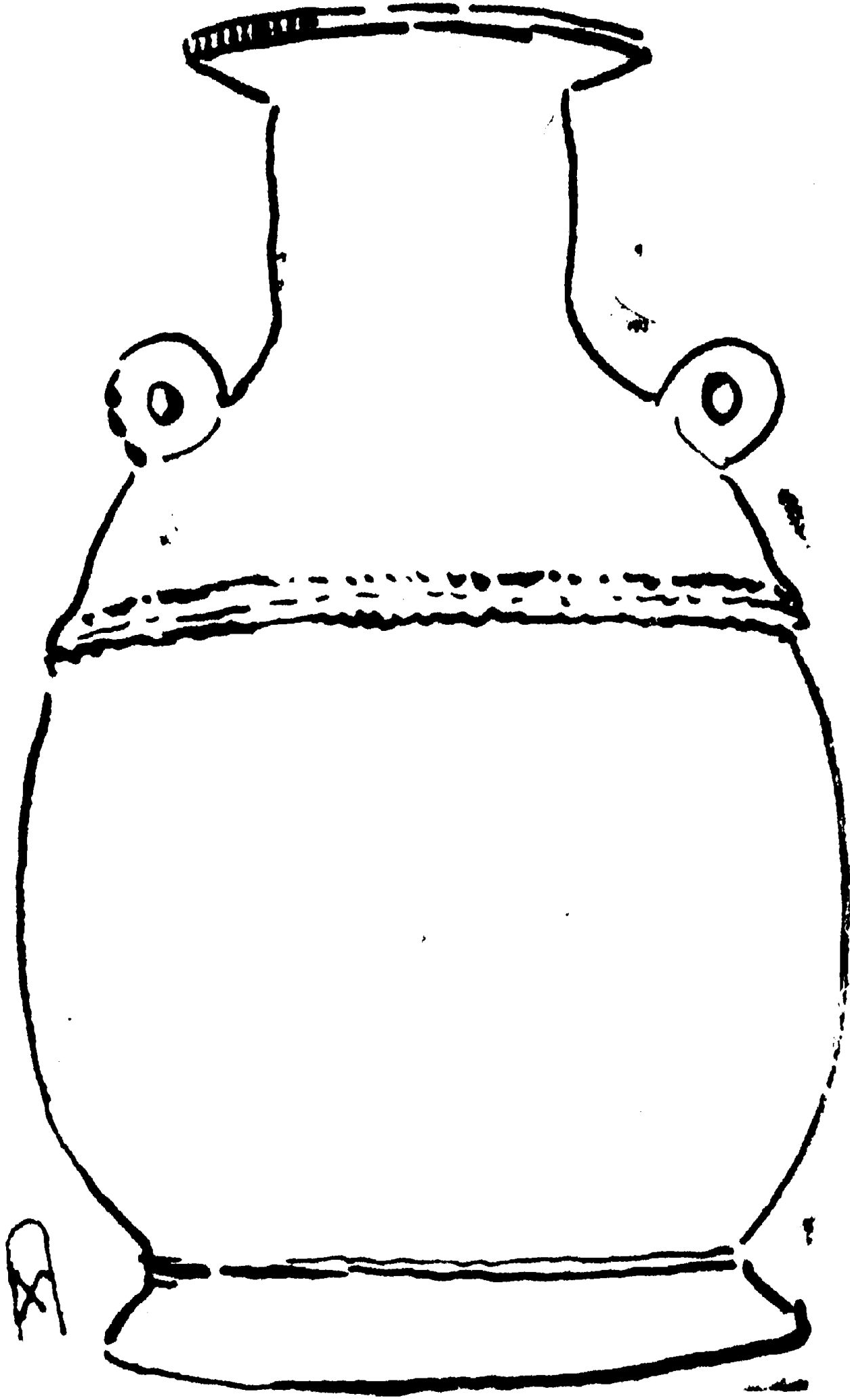
ব্রোঞ্জ-ভস্মাধার
(ময়নামতী কুমিল্লা)

শতাব্দীতে লেখা—পেরিপ্লাসের বর্ণনায় গংগারিডি রাজার রাজধানী এখানেই ছিল। এখানকার ভগ্নস্তূপগুলি প্রায় ১০।১২ ফুট থেকে ১৫।১৬ ফুট উঁচু। এইসব ভগ্নস্তূপের কিছু অংশ যেমন কারুকরা ইঁট প্রভৃতি ইতস্তত আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রস্তরের কারুকার্য দেখে অনুমান করা যায় সেগুলি বৌদ্ধ যুগের। কিছু স্তম্ভ ও মসজিদ ভাঙাও দেখা যায়। লোকমুখে শোনা এখানে ১২টা দীঘি ছিল। এখনও রাজমাতা দীঘি, সওদাগর দীঘি, চেরাগদানি দীঘি মনোহর পুকুর, কানাই দীঘি, বিশ্বাস দীঘি, মীরপুকুর, মীরের পুকুর, শ্রীরাম রাজার দীঘি, শ্রীরাম রাজার বাড়ীর গড়খাই আজও দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে এই প্রাচীন শহরে ১২টি বাজার আছে বলেই নাকি এ জায়গার নাম বারবাজার। মতান্তরে এখানে নাকি ১২ জন ফকিরের আস্তানা ছিল সে থেকেই এখানের নাম বারবাজার।

ষাটগম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তর (বাগেরহাট—খুলনা)

ভরতভরনা

কলকাতা থেকে ১১৮ মাইল দূরে খুলনা জেলার বুড়ীভদ্র নদী তীরে অবস্থিত এক অতি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রায় ৭০ ফুট উঁচু গোলাকার এক ইঁটের স্তূপ আছে। যার পরিধি ৯০০ ফুটের বেশী হবে। স্থানীয় লোকের মতে ভরত রাজার দেউল। কাছেই গোরীঘেনী গ্রামে আর একটি ইঁটের স্তূপকেও স্থানীয় লোকেরা ভরতবাজার রাজবাটি বলে থাকে। তবে ভরত রাজা কে সে বিষয়ে আজও কিছু জানা যায়নি। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ। এক সময় যশোর খুলনা সমতট রাজের আওতায় ছিল এবং সমতটে বৌদ্ধ প্রভাবের বিবরণ প্রাচীন পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনীতে আজও পাওয়া যায়। সে কারণেই এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহারই যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

যাত্রাপুর—

ভৈরব নদী তীরে, কলকাতা থেকে ১২৫ মাইল দূরে যাত্রাপুর। এই যাত্রাপুরে লাউপালা গ্রামে রথযাত্রা উৎসব খুবই সমারোহের সঙ্গে চলে। রথের মেলায় প্রচুর ভীড় হয়। স্থানীয় লোকশিল্প—খেলনা পুতুল প্রভৃতি কেনাবেচা হয়। এই যাত্রাপুরের থেকে মাত্র ২ মাইল দূরে ভৈরব তীরে কোদালা গ্রামে 'অযোধ্যার মঠ' নামে এক অতি প্রাচীন মঠ আছে। উচ্চতায় প্রায় ৬০ ফুট। মঠটির গায়ে খোদিত লিপিমালা আজ ক্ষয়প্রাপ্ত। সারা খুলনা জেলার মধ্যে এটি একটি দেখবার বস্তু। বর্তমানে এটি সরকারের 'রক্ষিত কীর্তি'র অন্তর্ভুক্ত।

ষাটগম্বুজ রোড

কলকাতা থেকে ১২৬ মাইল দূরে খুলনা জেলায় ইতিহাস বিশ্রুত খান জাহান আলির দরগা বা ষাটগম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। মসজিদটির ষাটগম্বুজ হলেও মসজিদের ছাদে ৭টি করে মোট ১১টা শ্রেণীতে ৭৭টা গম্বুজ আছে। মসজিদের চারপাশে প্রায় ৯ ফুট চওড়া পাঁচিল। দৈর্ঘ্যে মসজিদটি ১৬০ ফুট, প্রস্থে ১০৫ ফুট, লম্বায় ২২ ফুট। মসজিদটি ছোট ইঁট দিয়ে তৈরী, কারুকার্য নেই বললেই চলে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস গম্বুজের পীর খুব জাগ্রত, গাজী পীরের দরগায় মানত করলে নিঃসন্তান মায়েরা সন্তান লাভ করেন। সে কারণে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে দলে দলে নিঃসন্তান মায়েরা আসে এখানে মানত করতে। হিন্দু, মুসলমাননির্বিশেষে ষাটগম্বুজ অতি প[illegible] স্থান। গ্রামের ফকির বাউলদের মুখেও শোনা যায়—

পীর সায়েবের বান্দা
যত হিন্দু মোছলমান
পীরের দরগায় ছেরাজ করলে
মুস্কিল আসান।

গম্বুজের কাছে দুটি বড় বড় দীঘি আছে। খান জাহান নির্মিত খাঞ্জালি, অপরটি, ঠাকুর দীঘি, জনশ্রুতি দীঘিটি খননকালে এটির মধ্য থেকে দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায় সে কারণেই এটি ঠাকুর দীঘি খান জাহানের মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে এখানে খুব বড় মেলা হয়। ঠাকুর দীঘি তীরে ৪২ ফুট উঁচু ২৫ ফুট চওড়া এক গম্বুজ আছে সেটির গায়ে আরবী ভাষায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ লেখা আছে। এটি খান জাহানের উজির সমাধিসৌধ।

চন্ড ভৈরবের মন্দির : ঈশ্বরীপুর (যশোহর)

এমন অন্ধকার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।।ছাব্বিশ।।

দিদির ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রুমা সাজগোজ করছিল। সে একটু ঝুঁকে কপালে একচিলতে টিপ দিল কড়ে-আঙুলে। একটু হেসে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়মুহূর্ত। কী যেন খুঁজল। ঠোঁটের নিচে তিলটা খুঁটল একবার। অমিত বলে, তোমার চেহারায় দিনে দিনে দারুণ সর্বনাশের লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে। অমিত অত লাজুক ছিল। একটু ছোঁয়া লাগলে ওর মুখটা লাল হয়ে যেতে দেখেছে রুমা। সে আজকাল একটু ছোঁওয়া পেতে ভালোবাসে। যেন বা একটু শারীরিক ঘনিষ্ঠতা চায়। ভাবটা এ রকম যেন : খুব হয়েছে, এবার খেলা ছেড়ে এস ঘরে যাই। খেলা! উঁ? কথাটা কী যেন? খেলা।

সনতু, সনতু! দেখে যা—মাসি হাসছে আপন মনে।

রুমা চমকাল। লতু এর মধ্যেই পেকে লাল হয়ে গেছে তো! মায়ের গদীখাটে বসে একটা শিশুপাঠ্য প্রকাণ্ড মলাটের বই পড়ছিল আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে আকাশ দেখছিল। দুষ্টু মেয়ে! কখন আড়চোখে রুমাকে লক্ষ্যও করেছে। রুমা নিঃশব্দে হাসছিল এটা ঠিকই।... খুব ডেঁপোমি শিখেছ! রুমা ধমকাল।... এখন ঘরে বসে বই পড়ার সময় নয়। বলেছি না—বিকেলে পার্কে যাবে সন্তুদের নিয়ে?

লতু গম্ভীর হয়ে বলল, মেঘ উঠেছে—ওই দ্যাখো না মাসি!

রুমা উঁকি মারল। এই রে! দিলে সব ভেস্তে। আকাশ কী কালো, কী কালো! থমথম করছে গাছপালা। মধ্যে কয়েকটা দিন বেশ হাসিখুশি ফরসা গেল। এ কখনো সয়? আবার ধুন্ধুমার হুলুস্থুল বাধাবে। প্রতিটি বিকেলকে তছনছ করবে। অনেকখানি বিরক্তিতে রুমা ভুরু কুঁচকে আকাশ দেখতে লাগল।

লতু কী চোখে মাসিকে দেখছিল: ঠোঁটে বুড়ো আঙুল। বলল, হাসছিলে কেন মাসি?

উঁ?

বলছি—হাসছিলে কেন?

মার খাবি লতু। ভারি মজা পেয়ে গেছো তো! মা থাকে না, আমি থাকি নে—একা একা দিব্যি গোল্লায় যেতে বসেছ!... বলে রুমা আয়নার সামনে এল। সাড়িটা বুক থেকে তুলে আবার কোমর আর পাছার দিকটা ঠিক করে নিয়ে পরতে ব্যস্ত হল। তারপর ঘড়িটা কবজিতে পরল। সময় দেখল। অমিত এক্ষুনি এসে পড়বে। কিন্তু আকাশের লক্ষণ ভালো নয়। ফাংশানটা নির্ঘাৎ নষ্ট করে ছাড়বে।

লতুর সম্ভবত খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সে বলল, কোথায় যাবে মাসি? ফাংশানে? সেদিনকার মতো আমাকেও নিয়ে চলো না!

যায় না। পড়া কামাই হবে।... রুমা গারজেনের ভঙ্গীতে বলল। ...আর এখানে নাকি? সোনাডাঙা হাইস্কুলে—অনেক দূর।

লতু চুপ করে গেল। রুমা গলায় একটা সরু দানাওলা লাল পাথরের মালা পরে আবার নিজেকে দেখতে থাকল। মিনি ব্লাউস পরলে কি সত্যি কিছু অশ্লীল হয়ে ওঠে মেয়েদের চেহারা? জামাইবাবু থাকলে কী যাচ্ছেতাই সব বলত। স্নেহধারাও আগের মতো মিনমিনে গেরস্থ-টাইপ থাকলে দারুণ চ্যাঁচামেচি করত। আজকাল বলে—পরবে না কেন? যা আজকাল সবাই পরছে, সব পরবে। স্নেহধারা আরও আগু বাড়িয়ে বলে, সামনে আষাঢ়ে যাচ্ছে শ্বশুর ঘর করতে—তখন, যা গোঁড়া সেকেলে লোক ও'রা, বারোহাতি ঘোমটায় ঢেকে রাখবে একেবারে। তা ছেলে আবার যদি তেমন-তেমন হত, তা হলেও কথা ছিল। ছেলের তো সাতচড়ে রা নেই মুখে, বাপের সামনে মুখ তুলে কথাও বলতে পারে না।... স্নেহ-ধারার মনে সেই খুঁতখুঁতোমি ভাবটা আজও থেকে গেছে। কী আর করব? যে যুগ পড়েছে, কলেজে পড়া মেয়ে। তার ওপর লতুর বাপের আস্কারা পেয়েছে ছোটবেলা থেকে। সে বেঁচে থাকলে আকাশের চাঁদ চাইলে তাই এনে দিত শালীকে। তাই কিছু বলি নে বাবা। তুমি সুখী হলেই আমার সুখ।

স্নেহধারা যে এমন পাকা হিসেবী মেয়ে হবে, ভাবা যায় নি। তার এমন চোখ মুখ হবে, বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়বে—কে ভেবেছিল? পাম্পিং স্টেশনটা দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। মাস দুই আগে এজেন্সি তো প্রায় ক্যানসেল হতে বসেছিল। সেটা সামলে নিয়েছে। তেল কোম্পানীর ইংরেজি চিঠি-গুলো নিয়ে যা সমস্যা। রুমা বুঝিয়ে দেয় মাত্র। স্নেহধারা ভারিক্কি চালে হীরুবাবুকে বলে, দাদা, জবাব লিখে দিন। লিখুন যে...

হীরুবাবু টাইপ করে আনার পর ফের রুমাকে পড়িয়ে নেয়। বুঝে নেয়। দরকার হলে বদলাতে বলে।... তবে অমিত এসে

বসলেই আমার ছুটি। বুঝলেন হীরুদা? অমিত এসে কাচঘরে বসলেই আমি আবার হাঁড়ি ঠেলতে যাব।... স্নেহধারা হাসে। রুমা ভাবে, দিদির চোখে একটা চশমা হলেই এবার সব মানিয়ে যায়। বেশ দ্যাখায় দিদিকে! একেবারে হেডমিসট্রেস।

কিন্তু অমিত এসে বসবে ও কাচঘরে! তাহলেই হয়েছে। আশাটা বুঝি বাণীবাবু হেডমাস্টার দিয়েছেন? অমিতকে ওরা কেউ চেনে না—রুমা চেনে। ও একটা ভীতুর ভীতু, বোকার বোকা, গোবেচারা টাইপ ছেলে। গান ছাড়া কিছু ভাবে না। গান ছাড়া ওর জগত নেই। ওর স্বপ্নটা কী রুমা তাও জানে। ওর স্বপ্নের শেষে আছে একটা বড় শহর। লক্ষ লক্ষ শ্রোতা। রেডিও, রেকর্ড, ফিল্মের প্লেব্যাক আর মধ্যে মধ্যে সারারাত দরবারী কানাড়া চালিয়ে যাওয়া! বাপ্‌স। এক গাদা লোক ঘুমোচ্ছে, ঝিমোচ্ছে, স্টেজে পাখওয়াজ বাজছে, মাইকগুলো চক চক করছে আলোয়, হাতে একটা তানপুরা।...

ওর গান ভালবাসতে গিয়েই এই ভালবাসাবাসির বিপদ হয়েছে। হ্যাঁ—দারুণ বিপদ। বললে তো কেউ বিশ্বাস করবে না কথাটা। ওর গানে কী যেন আছে—একটা কিছু রয়ে গেছে ওর গলার স্বরে, হঠাৎ মনের গভীরতর দরজাটা খুলে যায়। ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতর ঘর। কী সব থরে-থরে সাজানো সেই ঘরে। দেখামাত্র চেনা হয়ে যায়। এই তো, এই তো! কী যেন গঙ্গার কাজল জল, কী যেন বৃষ্টির দিন, ট্রেনের হুইসিল, কী যেন জৈন মন্দিরের পেতলের গম্বুজ—মন্দিরে রামের মূর্তি... ঘুরে ফিরে বারবার ভেসে ওঠে এক স্বপ্নের ছোট্ট শহর। সুখ দুঃখের দিনগুলো নিয়ে অজস্র বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে কেঁপে ওঠে ছেলেবেলাটা।

লতু!

উঁ?

কী আজেবাজে পড়ছিস! রাখ্।

লতু বই বুজিয়ে তাকাল।

হ্যাঁ রে, তোর জিয়াগঞ্জের কথা মনে পড়ে না?

লতু জোরে মাথা দোলাল।... কী জিয়াগঞ্জ? না বাবা, কিচ্ছু মনে নেই।

জানিস লতু? আমি ছেলেবেলায় ট দিয়ে কথা বলতুম। কী না ভ্যাংচাত লোকেরা! আর বুঝলি লতু? জিয়াগঞ্জের রাজাদের রাসমন্দিরে একবার রাসের মেলা বসেছে। আমি ভিড়ে হারিয়ে গেছি। সে কী কান্না! যেখানে বাড়ি ছিল, সামনেই গঙ্গার ঘাট! ওপারে জৈনদের মন্দির। পেতলের গম্বুজ। ওখানে একটা ভারি চমৎকার বাগান আছে—'নলক্ষার বাগান' বলে লোকে। ফোয়ারা আছে। মন্দির আছে। তোদের রূপপুরে কী আর আছে দেখবার মতো! শুধু আজেবাজে লোক—ঠক-জোচ্চোর আর দালাল! তা বুঝলি লতু? সেবার নৌকো চেপে ওপারে চলে গেছি একা। ওপারে আজিমগঞ্জ স্টেশনের ওদিকে গোয়ালপাড়া বলে একটা পাড়া আছে। সেখানে একটা মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। কিন্তু বাড়ি চিনি নে। কী করব? নলাক্ষার বাগানটা চিনতুম। গেলুম সেখানে। দুপুর অব্দি টোটো ঘুরছি। এদিকে বাড়িতে খোঁজাখুজি পড়ে গেছে। আর এদিকে হয়েছে কী, পথ হারিয়ে ফেলেছি আমি।... খুব হাসতে লাগল রুমা। ...বিকেল হয়ে আসছে। গঙ্গার ধারে উল্টো দিকে হাঁটছি। সে এক মজা!

গম্ভীর লতু বলল, বাড়ি এলে কেমন করে?

এলুম তো।

বাবা খুঁজে আনল বুঝি?

তোর বাবা আনবে? ততক্ষণ তিনটে হারমোনিয়াম সারা হয়ে যাবে।

নিজে আসতে পারলে?

উঁহু। চাঁদুদা আনল। তরমুজের ক্ষেতে...

চাঁদুদা কে? ও! সেই লোকটা?

কী বললি?

সেই লোকটা তো? আমার টাকা চুরি করেছে যে?

রুমার শরীর মুহূর্তে ঝাঁকুনি খেল। সাদা মুখে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল লতুর দিকে। তারপর ছোট্ট করে বলল, হুঁ।

লোকটা আর আসে না কেন মাসি?

যে তোর বাবার টাকা চুরি করেছে, সে আসবে কেন? তাকে পুলিশে দেব না?

মাসি, মাসি! ঝড় আসছে, ঝড়! সন্তু লাফ দিয়ে খাট থেকে নামল। বাইরে গিয়ে চেঁচাল, বিষ্টি হবে, বিষ্টি হবে! কী মজা!

রুমা আকাশ দেখল। হ্যাঁ, সেই স্ফীতকায় চাপ চাপ কালো রঙটা নড়তে শুরু করেছে। দূরে পান্ডেজীর গদীর দিকের বটগাছ আর নারকোল গাছগুলোর মাথা দুলতে লেগেছে। সারা পশ্চিম দিগন্তে কালো রঙটা চিরে উজ্জ্বলতম হলুদ রেখা আর একটা বিস্তৃত রক্তাভা ফুলে উঠছে। দেখতে দেখতে এসে পড়ল ঝড়। শন শন হু-হু শব্দ ঝাঁপিয়ে এল। ধুলো, ধুলো! শুকনো পাতা ছেঁড়া ঘাস খড় কুটো কাগজের টুকরো আস্তাকুঁড়ের ছাই হুড়মুড় করে জানালা গলিয়ে এসে পড়ল। গাছপালা ঝোপঝাড় ভেঙে হুড়মুড় করে একটা গতিবান ব্যাপকতা রূপপুরকে নাড়া দিতে লাগল। দড়ি ছিঁড়ে একটা গাইগরু লেজ তুলে পালিয়ে গেল। কে কাকে ডাকল কোথায়। কারা সব দৌড়ে গেল। শন শন হু হু হা হা হা হা। নড়ে উঠল সমূলে যা কিছু আছে মাটিতে দাঁড়ানো। তারপর লতুদের চিৎকার : শিল পড়ছে, শিল পড়ছে। চড়বড় করে শিল পড়তে লাগল। জানালা গলিয়ে দু-চারটে এসে পড়ল রুমার পায়ের কাছে। রুমা • শুধু দেখল একবার। তারপর বৃষ্টি। প্রথমে ছোট ছোট ফোঁটা তারপর বড়ো-বড়ো। প্রচন্ড শব্দে মেঘ ডাকল। আবার ডাকল। বার বার ডাকতে লাগল। মাটির গন্ধ, ছেঁড়া পাতার গন্ধ, হয়তো বৃষ্টিরও গন্ধ। ঘন ছায়া এল ঘরের ভিতর। বৃষ্টির ছাঁটে এসে পড়ছে ঘরের মেঝের। সাড়ির নিচেটা ভিজে যাচ্ছে। রুমা তবু সরল না। ঝড় বৃষ্টি দেখছে।

মাসি, মাসি! কী করেছ কী! সব ভিজে গেল যে! ও সন্তু, ও গ্যাঁদা, দেখে যা—দেখে যা মাসী কী করেছে!

রুমা একটু হাসল ওর দিকে তাকিয়ে।

লতুও ভিজেছে। ফ্রক থেকে জল চোঁয়াচ্ছে। ...জানলা বন্ধ করে দাও! ও মাসি! দাঁড়াও—মা এসে বকবে। তখন আমার দোষ দিলে ভাল হবে না কিন্তু!

গ্যাঁদা দরজায় মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে গেল। তারপর বারান্দায় তার সোল্লাস চিৎকার শোনা গেল—হো হো হো, কী মজা! দাদাবাবু ভিজেছে, দাদাবাবু ভিজেছে!

বারান্দায় অস্পষ্ট কন্ঠস্বর। লতু এগিয়ে গিয়ে বলল, বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে! আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল না তো—সইস কেন?

রুমা নির্লিপ্ত স্বরে বলল, অমিত নাকি?

অমিত বারান্দার তক্তাপোষে বসে বলল, ভিজে একাকার হয়ে গেছি। রাস্তায় আসতে না আসতে পড়ে গেলুম সামনাসামনি। কোন মানে হয়!

রুমা বলল, তোমার ফাংশান আজ গেল। এখন ভালো ছেলের মতো আবার ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে যাও।

অমিত ঘরের দিকে উঁকি মেরে বলল, তাড়িয়ে দিচ্ছ বুঝি?

তা কেন? ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ করবে। গলা ধরে যাবে। এখানে তো ধুতির কারবার নেই, সব সাড়ি। পরবে নাকি?

পরব না তো কী করব? সত্যি, গলাটা যাবে নির্ঘাৎ।

যাঃ! সাড়ি পরে না। সোজা বাড়ি চলে যাও।

অমিত গম্ভীর হয়ে গেল। রুমার কথাগুলো কী রকম মনে হচ্ছে। আজকাল কিছুদিন থেকে রুমা যেন কেমন বদলে যাচ্ছে। আগের গায়ে-পড়া ভাবটা আর নেই। এ-বাড়ি গানটান করে রাত বাড়লে আগে টর্চ নিয়ে হাইওয়ে অব্দি এগিয়ে দিত—এখন আর দেয় না। এগোতে পাঠায় গ্যাঁদাকে। তাছাড়া পাশে বসতেও চায় না যেন। কী হয়েছে রুমার?

অমিত তবু হাসবার চেষ্টা করল।... সাড়িতে দোষ নেই। সেদিন পন্ডিত মশাইকে দেখলুম সাড়ি পরে মুড়ি খাচ্ছেন—রোয়াকে বসে।

রুমার কোন জবাব এল না। বৃষ্টির বেগ কমেছে। কিন্তু ঝিরঝির করে ঝরছে। বাজ ডাকছে বার বার। গলিরাস্তাটা এরই মধ্যে জলে ডুবে গেছে। ঘোলাটে মোটা জলের স্রোত বইছে।

অমিত আরও দু' মিনিট অপেক্ষা করে উঠল। ঘরের দরজার দিকে তাকাল। তারপর বলল, গলাটা গেল। কী নিষ্ঠুর বিপদ এসে পড়ে আচমকা! লতু, যাচ্ছি রে!

পরক্ষণে সে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে নেমে গেল। সন্তু গ্যাঁদা লতা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, দাদাবাবু ভিজছে, কাকুবাবু ভিজছে! কী মজা, কী মজা!

রুমা হয়তো উঁকি দিত না—কিন্তু ওদের চ্যাঁচামি শুনেই একটু ঝুঁকে দরজার বাইরেটা দেখে নিল। দেখল, অমিত লম্বা পায়ে উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার কাছে গেল। এক মুহূর্ত দাঁড়াল। এদিকে তাকাতেই রুমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। তারপর তাকে আর দেখা গেল না।

এবার রুমা উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় এসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, এই সন্তু! নৌকো বানাতে পারিস? কাগজ দে—বানিয়ে দিচ্ছি। লন্তু, জামা বদলাও শিগগির।...

কাগজের নৌকো বানাতে বানাতে রুমা ভাবল, যে যা ভাবে ভাবুক গে। ঝড়-বৃষ্টি এসে যেন খুব ভালো হয়ে গেল। আজ কিছু ভালো লাগছিল না। কপালের এক-চিলতে টিপটা হয়তো বাঁকা হয়ে গেছে। এই সাড়িটা কেন বাছতে গেলুম। কী বিচ্ছিরি রঙ! যাক্ গে, বেশ ভালো লাগছে বৃষ্টিটা। না এলে এতক্ষণ এক গাদা লোকের মধ্যে বসে থাকতে হত। একগাদা গেঁয়ো লোক, ফুলের মালা, সপ্তপদি মানেই একটা ওলড ফুল, ধূপকাঠি পোড়া গন্ধ, হারমোনিয়াম তবলা, কার বাড়ির গালিচা, কার বাড়ির কী...ড্যাট, ড্যাট্! সব ভালগার লাগে। তার চেয়ে চুপচাপ একলা থাকা কত ভালো।

যাচ্ছি, যাচ্ছি!

কী রে সন্তু?

সন্তু আঙুল তুলে দ্যাখাল, নৌকোটা তুলসী গাছের ঝাড়ে আটকে গেছে। যাক্। আবার একটা বানাচ্ছে রুমা: আকাশ, আকাশ! তুমি আজ প্রাণ ভরে বিষ্টি দাও।

আকাশ একটা ভিজে চোখের মতো এখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ চমকে উঠল রুমা। এইমাত্র যেন কী দারুণ ব্যাপার ঘটে গেছে! অমিত সত্যি সত্যি কি ভিজতে ভিজতে চলে গেল? কী দুর্মতি, কী নিষ্ঠুরতা। ওকে অমনিভাবে চলে যেতে দিল সে? কেন যেনু ওর অমন করে ভিজে কাপড়-জামা গায়ে এসে পড়াটা পছন্দ হচ্ছিল না। ওকে আজকাল এত হ্যাংলা লাগে! মনমরা হয়ে পড়ল রুমা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার মনে একটা স্যাঁতসেতে ভাব থেকে গেল। এবং আর কিছুদিন পরেই যে বাড়িতে শাঁখ বাজবে উলুধ্বনি দেওয়া হবে, ছাঁদনাতলা বাঁধবে লোকেরা, আগুনের সামনে মন্ত্র পড়া হবে, সেই বাড়িটা বিশ্রিভাবে ভিজে গিয়ে রুমার দিকে কাতর চোখে তাকাচ্ছে। রুমার মনে হচ্ছে, এর লেজ ধরে টান দিলেই ম্যাও করে কেঁদে ফেলবে।

লন্তু, আয় ক্যারাম খেলি।

লন্তু সোৎসাহে ক্যারাম বোর্ড আনতে গেল। পরক্ষণেই তার আর্তনাদ আর লাফা-লাফি শুনে রুমা কাগজের নৌকো ফেলে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলল, কী হয়েছে রে?

লন্তু একটা চেয়ারে উঠে বিশ্রিভাবে নাচছে। গলা দিখাদে তুলে বলল, সাপ ঢুকেছে, সাপ দিদি, সাপ!

রুমা সাপ শুনেই পিছিয়ে এল। ঘরের ভিতর এরই মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সে হতচকিত হয়ে বলল, সাপ? কোথায় সাপ?

ওই যে লেজ! ওই যে। ঠাকুরের ছবির পাশে! ওই যাঃ ঢুকে গেল।

ঠাকুর ঘরে?

স্নেহধারার ঘরের লাগোয়া-একটা ছোট্ট ঘর রয়েছে। ওটাই ঠাকুর ঘর। রামকৃষ্ণ-সারদামণি, বামাক্ষ্যাপা আর কালী মূর্তির গুটিকয় বাঁধানো ছবি একটা জলচৌকিতে সাজানো রয়েছে। সামনে ধূপদানি পঞ্চ-প্রদীপ আর একটা ফুলদানী। নকশা কাটা কাঁসার থালায় একটা শাঁখ, সিঁদুর কৌটো, গঙ্গা জলের ঘটি ইত্যাদি রয়েছে। একটা সুন্দর আসনও গোটানো আছে এক পাশে। ওঘরে স্নেহধারা ছাড়া কারো যাবার হুকুম নেই।

রুমা সুইচ টিপে আলো জেলে দিল। ঠাকুর ঘরের সুইচটা এক পা বাড়িয়ে কোন-ক্রমে টিপে দিল। তারপর বলল, কই রে সাপ?

লন্তু বলল, ঠাকুরের ফটোর পিছনে।

ইতিমধ্যে গ্যাঁদা একটা লাঠি হাতে এসে হাজির হয়েছে। সন্তু-মানতুরাও এসে গেছে। রুমা ধমক দিয়ে বলল, থামো সব! ভিড় করো না!

গ্যাঁদার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে দরজার কাছে যেতেই রুমার মনে হল, হঠাৎ খুব আশ্চর্যভাবে মনে হল, সত্যি তারা এত অসহায়, এত সামান্য মানুষ এ বিশাল পৃথিবীতে! বাইরে আকাশ ঢাকা ঘন মেঘ, উন্মাদ বাতাস, বৃষ্টি ঝরছে—এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে একটা ছোট্ট বাড়িতে কতকগুলো কমবয়সী মানুষ মাত্র। কী করতে পারে তারা—কতটুকু তাদের শক্তি? ওই সাপটা এসে যেন কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিল তাদের। ঠাকুর! ঠাকুর দিয়ে তুমি কী করতে পারো? থামাতে পারো ওই ঝড় বৃষ্টি? সাপটাকে আসা বারণ করতে পারো? কিছু করার সাধ্য তোমার নেই।... মনে হু-হু করে একটা প্রবল কষ্টের ঢেউ উঠে এল। সারা ছেলেবেলা চাঁদুদা ছিল মাথার ওপর, তারপর ছিল জামাইবাবু—এখন তো কেউ নেই। কাকেও মুখ ফিরিয়ে দেখতে পাচ্ছি নে! অমিত এসেছিল। অমিতকে তো ভারি চেনা গেছে! ও আমার চেয়েও ভীতু, আমার চেয়েও বোকা। সাপ কথাটা শুনলে সে এতক্ষণ কড়িকাঠে ঝুলত। গত আশ্বিনে ফরেস্ট বাংলোর পার্কে একটা সাপ দেখেছিল বলে বিকেলের পর আর অমিত কিছুতেই ওখানে বসে থাকতে চাইত না। আসলে অমিত নিজের জীবনটাকে খুব দামী মনে করে। তাই ও কেমন যেন স্বার্থপর। এই দ্যাখো না—একটু ঠান্ডা বাতাস বইলেই গলায় মাফলার জড়ায়। একটু রোদ্দুরে চড়লেই ছাঁকার নামতে গাঁইগুঁই করে। শরীর সম্বন্ধে ও এত সাবধানী, এত বাছবিচার করে চলে। বাস রিকসোয় চাপবার আগে চোখ বুজে কী বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে, আর কপালে ও বুকে হাত ঠেকায়।

গ্যাঁদা বলল, খোঁচাও, খুঁচিয়ে দাও। মারো খোঁচা শালাকে।

রুমা তার দিকে তাকাল। ...কই রে? দেখতে পাচ্ছিস?

গ্যাঁদা পা বাড়িয়ে বলল দাও, দাও—লাঠিগাছটা আমাকে দাও না!

এতক্ষণে দেখতে পেল রুমা। মাঝখানে কালী মূর্তির ছবির পাশ দিয়ে লেজটা দেখা যাচ্ছে। লেজটা নড়ছে না। মনে হয়, খুব আরামে বসে আছে সাপটা। কিন্তু এলই বা কোন পথে? মেঝের জল যাবার ঘুলঘুলিটার ঝাঁঝরি আছে। তাহলে? সম্ভবত বারান্দা দিয়ে সবার অজানতে উঠে এসেছে। সবাই তো তখন কাগজের নৌকো আর ধুন্তি নিয়ে ব্যস্ত ছিল—তাই দেখতে পায় নি।

কিন্তু সাপটা ওখানে গিয়েই বা ঢুকল কেন? ঘরে এত সব জিনিসপত্তর—তার ফাঁকে দিব্যি ভালো জায়গা ছিল। তা না করে একেবারে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। শুধু ঢুকল নয়, ঠাকুরের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল। ওকে তাড়ালে পাপ হবে না তো? কী সমস্যায় ফেলে দিলে সাপটা! রুমা বিপন্ন মুখে তাকিয়ে রইল। দিদি এসে শুনলে কী বলবে কে জানে! কিন্তু দিদিও কি আর ও-ঘরে ঢুকে পুজোয় বসতে পারবে—যদি সাপটাকে না তাড়ানো হয়?

সেই মুহূর্তে আচমকা আলো নিভে গেল। ঘন বিপুল অন্ধকারে ভরে গেল ঘর। বাইরে যে সামান্য আলো রয়েছে, তা বৃষ্টি-দিনের গোধূলিকালের আলো। আলো বলা ঠিক নয়—একটা মৃদু ধূসর আভা মাত্র।

কারেন্ট ফেল, কারেন্ট ফেল! ...এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেমেয়েরা। তারপর দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

রুমা চেঁচিয়ে উঠল, গ্যাঁদা! মোমবাতি জ্বাল শিগগির!

গ্যাঁদা রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে গেল।

রুমা দেখল, তার পা দুটো যেন নড়তে চাইছে না। মেঝের সঙ্গে গাছের মতো আটকে গেছে। উরু দুটো ভারী মনে হচ্ছে। মাথার ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। পরমুহূর্তে সে এক লাফে বাইরে গিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

গ্যাঁদা মোমবাতি জেলে আনলে রুমা বলল, গ্যাঁদা, সাবধান। যেন নিভে না যায়। আমার পাশে-পাশে থাকবি।

লাঠিটা নিয়ে আবার সে ঘরে ঢুকতে গিয়েই পিছিয়ে এল। পা দুটো ভীষণ কাঁপছে। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। থাক গে, কাজ নেই। আলো জ্বলুক, দিদি আসুক। ততক্ষণ—

রুমা বলল, এই লতু-সন্তু! তোরা সবাই তক্তাপোষে বসে থাক্‌। খবরদার, নামবি নে। গ্যাঁদা, তুই এখানে আলোটা রাখ্‌।

গ্যাঁদা তক্তাপোষে মোমবাতিটা আটকে দিয়ে বলল, সাপটাপে আমার ভয় নেই। কত দেখলুম। ...তারপর সে রান্নাঘরে চলে গেল।

বারান্দার তক্তাপোষে রুমা লতুদের নিয়ে বসে রইল। সেই অসহায়তার দুঃখটা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। আকাশভরা মেঘ-বৃষ্টি বাতাস, এই ছোট্ট বাড়িটাতে কয়েকজন কম বয়সী অনভিজ্ঞ মানুষ। সংসারের কীই বা জানে, বোঝে! জামাইবাবুর জন্যে তার চোখ দুটো ভিজে এল। টাকা! টাকা সব নয়, টাকা কিছু নয়!...

হাইওয়ের ধারে পেট্রোল পাম্পের কাচ-ঘরে গম্ভীর মুখে বসে স্নেহধারাও একই কথা ভাবছিল তখন। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। হীরুবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। স্নেহধারা ভাবছিল, রুমা অমিতের সঙ্গে সোনাডাঙার শ্মশানে চলে গেছে কতক্ষণ। এখন বাড়িতে ছোট-ছোট ক'টি ছেলেমেয়ে! এই আকাশভরা বৃষ্টি-বাতাস, ইলেকট্রিক বন্ধ, ওরা হয়তো ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে চুপচাপ বসে আছে। এত অসহায় ওরা, এত দুর্বল। না—টাকা কি নয়, টাকা দিয়ে সবখানে শক্তির আশা করা বৃথা। অস্থির হয়ে পড়ছিল স্নেহধারা। বৃষ্টিও তো থামতে চায় না! একবার নাকি ঠিক এমনি সময়ে জ্ঞানবাবুদের গদীতে ডাকাতি হয়েছিল। জীপে চেপে এসেছিল ডাকাতরা। ...বুক কেঁপে উঠল স্নেহধারার। আজকের ক্যাশে অনেক টাকা আছে। তোরাপ নামে একটা লোককে দারোয়ান রাখা হয়েছে। হকসায়েব তাকে এনে দিয়েছিলেন। মনে হয়, সে বিশ্বাসী লোক। শরীরে শক্তিও আছে। কিন্তু আজকাল ওই দিয়ে তো কিছু হয় না। হীরুবাবু বলছিল, একটা বন্দুকের দরখাস্ত করতে। রুমার নামে একবার পরেশ একটা দরখাস্ত দিয়েও ছিল। সাবালিকা না হওয়ার জন্যে সেটা পাওয়া যায় নি। এখন তো রুমা বোধ হয় সাবালিকা। নাকি নিজের নামে দরখাস্ত করবে? ...হাসি পেল একটু। বন্দুক দিয়ে কী ঠেকাবে? কে ছুঁড়বে বন্দুক? রুমার বিয়েটা চুকে যাক ভালয়-ভালয়। তারপর বরং অমিতের নামে—

হীরুদা, উঁকি মেরে দেখুন তো—সব লাইন গেছে, না এদিকটা শুধু?

হীরুবাবু দেখে বলল, সব—সব। ঘুর-ঘুট্টি হয়ে গেছে।

হীরুদা, এক কাজ করলে হত।

বলুন দিদি?

দেখুন তো, বিষ্টি কমেছে নাকি। একটা রিকসো ডেকে দেবেন।

বাইরে হাত বাড়িয়ে দৃষ্টি পরখ করে হীরুবাবু বলল, একটুখানি কমেছে। কিন্তু রিকসো পাওয়া যাবে না। সব এখন চৌমাথায় চলে গেছে।

তাহলে আপনার ছাতাটা দিন। বেরোই।

সে কী! টাকা পয়সা নিয়ে যাবেন কী করে?

তোরাপ সঙ্গে চলুক। তোরাপ, শোন।

আগে যে ঘরটায় চন্দন থাকত, তোরাপের আড্ডা সেই ঘরে। ভাবা যায় না, এই ঘরটা একসময় কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে। দেয়ালগুলো শূন্য, অকে কালি, হুকে একটা নোংরা ব্যাগ ঝুলছে, দড়িতে তোরাপের জামাকাপড় ঝুলছে, জানলার কাছে একটা দড়ির খাটিয়ায় কাঁথা তেলচিটে বালিশ মাদুরশুদ্ধ গুটোনো—ভাবা যায় না! আর সেই ঘরে এখন বৃষ্টির সন্ধ্যায় নিরুদ্বেগে বসে তোরাপ গাঁজা টানছে। স্নেহধারার কণ্ঠস্বর তার কানেই যায় নি হয়তো।

হীরুবাবু বলল, আজ আর ওর আশা করা বৃথা দিদি। নির্ঘাৎ নেশা করে পড়ে আছে। কী লোক না জুটিয়ে দিয়েছিল হকসাহেব!

স্নেহধারা রেগেমেগে বলল, কালই ওকে তাড়িয়ে দিন। নেশা করে পড়ে থাকবে, না পাহারা দেবে? কীজন্যে মাসে মাসে মাইনে গুনছি, শুনি! ইস, মজুমদার-বাবুর টাকা সবাই গাছের ফলের মতো পেড়ে খেল আর নবাবীর চূড়ান্ত করল।

হীরুবাবু গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগল। ...ও তোরাপ, তোরাপ! এ্যাই তোরাপ!

স্নেহধারা বলল, দেখছ কাণ্ড! এখন যদি কোনকিছু হয়ে যায়, লোকটা তো ভুলেও চোখ খুলে এদিকে তাকাবে না! হীরুদা, কালই ওকে জবাব দিন। আমার অমন লোকের দরকার নেই।

হীরুবাবু মুখে যাই বলুক, তোরাপকে সে ভয় করে। একে সেখের পো, তার ওপর একসময় নাকি লাঠিয়ালী পেশা ছিল। বলল, বসুন দিদি। আমি ব্যাটার ঘাড় ধরে ডেকে আনি। আজকের রাতটা তো যাক, তারপর দেখা যাবে।

টর্চটার ব্যাটারি কমে গেছে। হীরুবাবু টিপে দেখে নিয়ে পা বাড়াল। তোরাপের ঘরের দরজা খোলা। আলো ভিতর অব্দি পৌঁছল না। ভিজতে ভিজতে এক লাফে বারান্দায় উঠল সে। তারপর মিঠে গলায় ডাকল, তোরাপ আলি, কী করছ হে? সেই সময় হীরুবাবুর নাকে আচমকা একটা বিচ্ছিরি গন্ধ এসে লাগল। সে নাক ঢাকল। অন্ধকার ঘরে কজন লোক বসে আছে। কল্কের আগুন জ্বলজ্বল করে উঠছে। হীরুবাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। পরক্ষণে তোরাপের হুতুম প্যাঁচার মতো আওয়াজ এল—বাবু নাকি

হীরুবাবু ভিতরে ঢুকে বলল, হ্যাঁ—তোমাকে দিদি ডাকছেন কখন থেকে। এরা সব কারা?

হৃদয় ঠাকুর একলাফে দাঁড়িয়ে বলল, আমি বাবুদা।

হৃদয়ের পরণে যথারীতি হাফপ্যান্ট, চিত্রবিচিত্র হাওয়াই শার্ট, কাঁধে সেই কন্ডাকটরী চামড়ার ব্যাগ। হীরুবাবু হেসে ফেলল। ...তোমার আর মরণ হয় না ঠাকুর! এর মধ্যে তুমি কখন এসে জুটলে? এতক্ষণ তো তোমার পুশুলেতে থাকার কথা।

হৃদয় বলল, সে আর বলবেন না বাবুদা। বড্ড কেলেঙ্কারীর কথা। আমাদের ছোটবাবু আর বেজো ড্রাইভার মদটদ খেয়ে খুব মারামারি হওয়ার উপক্রম। প্রায় হাতাহাতি হয় আর কী! শেষে রাগ করে বেজো পালিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি

করা হল—পাত্তা পাওয়া গেল না। অগত্যা ছোটবাবু গাড়ি নিয়ে থেকে গেল পুশুলেতে। আমাকে বললে, তুমি রূপ-পুরে চলে যাও এক্ষুনি। একজন ড্রাইভার নিয়ে এস। এসে তো এই ঝড়জলে পড়ে গেলুম বাবুদা।

হীরুবাবু বলল, ভালো—খুব ভালো। আর ওটা কে?

শংকর সলজ্জ হাসল। ...আমি হীরুদা।

আজ রাধার হোটেল ছেড়ে এখানে যে?

তোরাপদা বলেছিল, তাই এলুম। আজ এবেলা মালিকের কাছে ছুটি নিয়েছিলুম।

তোরাপ ততক্ষণে জামা গায়ে চড়াচ্ছে—অন্ধকারেও লোকটা সব দেখতে পায় যেন। হীরুবাবুর টর্চ থেকে যা আলো আসছে, তাকে আলো বলা ভুল। ফরিদ খাটিয়ায় উঠে বসল। বলল, বাবু, কাল একবার গাঁয়ে যাব সক্কালবেলা। মাকে বলে রাখবেন।

হীরুবাবু দাঁত খিঁচিয়ে বলল, তুই নিজে বলগে না বাবা। আমার ওপর চাপাচ্ছিস কেন? একে তো আমার পায়ে পায়ে দোষের অন্ত নেই। শালা কী পাপ করেছিলুম পূর্বজন্মে। মেয়েমানুষের হাতে—তোরাপ, লণ্ঠনটা বের করে জেলে নাও। দিদিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। তা হ্যাঁ শংকর, বেজোর সঙ্গে চাঁদুবাবুর কিসের ঝগড়া?

শংকর হেসে বলল, সে হৃদে বলবে।

কাচঘর থেকে স্নেহধারা ডাকছিল—হীরুদা, হীরুদা।

হীরুবাবু মুচকি হেসে বলল, ভয় পেয়ে গেছে। তোরাপ, হেরিকেন পেলে? আমি এগোই। শালা মেয়েমানুষের হাতে—হৃদয়, কাল একবার এসো দিনের বেলা।

হৃদয় বলল, আসব বইকি। আমি কারো ধারি নাকি? ছোটবাবু আছে—নিজে আছে। আমার কী? তুমি ড্রাইভারের বউর সঙ্গে প্রেম করতে পারো, তার...(অশ্লীল বাক্য), আমি বললেই দোষ হবে? না কী হে শংকর?

শংকর বলল, আলবাৎ। ফরিদ আর মৌতাত চটে যাবে। তোরাপ এক্ষুণি এসে পড়বে।......

হীরুবাবু টর্চের বোতাম টিপতে টিপতে কাচঘরের দিকে এগিয়েছে। স্নেহধারা বলল, কী হচ্ছিল এতক্ষণ? কারা কথা বলছিল হীরুদা?

তোরাপের বন্ধুবান্ধব সব। এখানেরই। ওরা থাকা এখন ভালই।

তোরাপ সেলাম দিয়ে ঘরে ঢুকল। কোন কথা না বলে সে সাবধানে দেশলাই জেলে হেরিকেনটা ধরিয়ে নিল—বগলে একটা মোটা লাঠি। স্নেহধারা আঁতকে উঠেছিল। ...আচ্ছা, এখানে জবালাচ্ছ কেন? এরা কোনদিন লঙ্কাকাণ্ড না করে ছাড়বে না।

বিরক্ত মুখে সে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা এতক্ষণ কোলে ছিল। এবার বুকের কাছে কাপড়ের ভিতর সতর্কভাবে ধরে রাখল। তারপর বলল, কই, ছাতাটা দিন। তোরাপ, তোমার ছাতা নেই?

তোরাপ বলল, পানি কমে গেছে। গায়ে লাগবে না। আসুন, মা।

ছাতা নিয়ে স্নেহধারা বেরল। তোরাপ তার আগে-আগে চলেছে। বাতাসের বেগ কমে গেছে অনেকটা। চারদিক সুমসাম প্রগাঢ় অন্ধকার। হেরিকেনের আলোয় হাইওয়ের পাঁচে এখানেওখানে ব্যাং দেখা যাচ্ছিল। কেউ চুপচাপ বসে আছে, কেউ লাফ দিয়ে-দিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। বৃষ্টির ছাট খুব অল্প। কাপড় একটুখানি তুলে হাঁটছে স্নেহধারা। বাড়ি ঢোকার পথে কিছু কাদা হতে পারে—এদিকটা পাঁচের পথ। অন্ধকারে চলতে চলতে বারবার সে চারপাশে তাকাচ্ছিল। টাকা কাছে থাকলে মানুষের রক্ত শুকিয়ে যায়। অথচ এই টাকাই দেহে মেদ আনে। মুখের চামড়াকে মসৃণ আর উজ্জ্বল করে। চোখদুটো ভরাট হয়ে ওঠে—দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা নিরাপত্তার স্বাচ্ছন্দ। লতুর বাবা কী ছিল, আর কী হয়ে উঠেছিল। আর চাঁদু? চাঁদু যখন এল, পাঁজরের হাড় গোনা যায়। চোয়াল ঠেলে উঠেছিল। সেই চাঁদু গোলগাল হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

কিন্তু তবু টাকার সেই অভিশাপ আছে যে! একজন গায়ে চাকা গজিয়ে আত্মহত্যা করে বসল। অন্যজন—ছি ছি, ওকথা ভাবলেও পাপ হয়। মানুষ অত-খানি পাঁকে নেমে যেতে পারে, অমন সুন্দর সচ্চরিত্র ছেলে, অত ভদ্র আর শান্ত—না দেখলে বিশ্বাসই হত না। স্নেহধারা ডাকল, তোরাপ!

কী মা।

তোমাদের সেই ছোটবাবুর খবর কী?

তোরাপ এক ছিলিম টানলেও মাথা ঠিক রেখেছে। একটু হেসে বলল, আমাদের না আপনাদের গো? ...খুব হাসতে লাগল সে।

স্নেহধারাও একটু হেসে ফেলল। ...ওই হল। শুনেছিলুম, জিয়াগঞ্জে চলে গেছে আর আসবে না। আবার সেদিন শুনলুম, আবার এসেছে। না এসে যো আছে? একবার যে মধুর স্বাদ পেয়েছে, সে স্বর্গে গিয়েও ছটফট করবে।

তোরাপ বলল, একটু আগে হৃদে ঠাকুরের কাছে একটা মজার কথা শুনলুম মা। চাঁদুবাবুর সঙ্গে বেজোর খুব মারপিট হয়েছে আজ। বেজো রাগ করে পালিয়েছে।

স্নেহধারা দাঁড়িয়ে গেল। ...সে কী!

হ্যাঁ—হৃদে বলছিল। অবিশ্যি, ওর কথার তিনভাগ বাদ দিয়ে একভাগ খাঁটি।

আবার হাঁটল স্নেহধারা। ...তোরাপ, ব্রজর বউটাও তো পালিয়েছে।

জী, হ্যাঁ। বেজো কি মানুষ মা?

একটু ইতস্তত করে স্নেহধারা বলল আচ্ছা তোরাপ, চাঁদুবাবুর সঙ্গে ব্রজর বউকে জড়িয়ে যা রটেছে, তা কি সত্যি? তুমি তো এখানকার লোক—কতলোকের সঙ্গে চেনা।

তোরাপ হাসতে হাসতে বলল, সত্যি-মিথ্যে খোদা জানে। তবে কথা কী মা—বুঝলেন? যা রটে, তা কিছু-কিছু বটে। এ হল গে ডাকপুরুষের বচন। একজায়গায় ঘি-আগুন থাকলে যা হয়, হয়েছে।

ছেলেটা খুব ভালো ছিল তোরাপ, বুঝলে? খুব সচ্চরিত্র। এখানে এসেই ও খারাপ হয়ে গেল।...স্নেহধারা যেন একটু ছটফট করে কথা বলছে। ...মজুমদারবাবুর টাকা মেরে গাড়ি করেছে, তা করুক। মজুমদারবাবু যা রেখে গেছে, তা তার ছেলে-মেয়েদের জন্যে যথেষ্ট। আমি সেজন্যে একটুও গ্রাহ্য করিনে। কিন্তু...... যাক গে বাবা। আমার নিজের নিয়ে ব্যস্ত এদিকে। শুধু মনে কষ্ট হয়, এই যা। ছেলেবেলা থেকে মেলামেশা ছিল আমাদের সঙ্গে।

তোরাপ গলা ঝেড়ে বলল, আচ্ছা মা, একটা কথা শুধোই—রাগ করবেন না তো?

না-না। কী কথা?

আপনার বোনের সঙ্গে ছোটবাবুর বিয়ের কথা ছিল না?

হ্যাঁ ছিল।

যাক গে—দেননি, ভালই করেছেন। পরে পস্তানি হত।

স্নেহধারা ঘুরে বলল, উঁ? হ্যাঁ—হয়তো হত। ছেড়ে দাও। এখন তো আর কোন কথা বলার মুখও রাখে নি সে।......

বাড়ির সামনে গিয়ে স্নেহধারা চমকে উঠল। দেখছ কাণ্ড? সদর দরজা খোলা রেখে দিব্যি সব বসে আছে। সে হন্তদন্ত উঠোনে গিয়ে বলল, তোরা নির্ঘাৎ করে মারা পড়বি। সদর দরজাটা তো বন্ধ রাখতে হয়। রুমা, তুই যাস নি?

লতু বলল, বিষ্টি এল যে। অমিতকাকু এসেছিল ভিজে কাপড়ে। কাপড় চাইল—মাসি তাকে বললে, বাড়ি যাও। অমিত-কাকু রাগ করে চলে গেল।

রুমা হাসতে হাসতে বলল, অমিত-টমিত পরে হবে। এখন দ্যাখো গে, তোমার ঠাকুর ঘরে সাপ ঢুকে বসে আছে।

স্নেহধারা আঁতকে উঠল। ...এাঁ, সাপ! আর তোরা চুপচাপ বসে আছিবে! কই সাপ? কোথায় সাপ? কী সাপ? ......বলতে বলতে সে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

রণকপুরের জৈন মন্দির

সীমা সরকার

ভ্রমণরসিকদের মধ্যে অল্পলোকই আছেন, যাঁরা রাজস্থান একবার ঘুরে না এসেছেন—এবং তাঁদের 'অবশ্য দ্রষ্টব্য'র তালিকার শীর্ষ-স্থানে যে নাম শোভা পায় তা হল 'মাউন্ট আবু রোডে' অবস্থিত দিলওয়ারার বিশ্ব-বিখ্যাত জৈন মন্দিরগুলি।

কিন্তু এই অতি বিখ্যাত মন্দিরগুলির সৌন্দর্য ও শিল্পকীর্তিকে অতিক্রম করে যায় যে মন্দির তার অতুলনীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে, সেটির নাম ভ্রমণরসিকদের ভিতর বিশেষ পরিচিত নয়। মনে হয় যথাযথ প্রচার এবং যাতায়াতের পথের অসুবিধা এর প্রধানতম কারণ। বাস্তবিক উদয়পুর থেকে প্রায় ১৯৫ কিলোমিটার (৯৫ মাইল) দূরে 'রণকপুরে' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থিত 'চৌমুখ' জৈন মন্দিরটি না দেখলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায় না।

উদয়পুর থেকে বাস চলে—প্রাইভেট ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। কিন্তু এই রাস্তাটি খুবই অসুবিধেজনক। কয়েকটি জায়গায় জলস্রোতের ওপর দিয়ে গাড়ীকে যেতে হয়, সে জলের তলায় আবার বড় বড় গোলাকার পাথরের নুড়ি ভর্তি, কাজেই যে কোনও মোটরগাড়ীর পক্ষে পথ খুবই বিপজ্জনক। বর্ষাকালে তো পথ বন্ধই থাকে। ট্রেনে করে গেলেও—'ফালনা' জংশনে নেমে মোটর বাসের শরণ নিতে হয়।

মনে হয় এই পথের বাধাই অধিকাংশ যাত্রীকে নিরুৎসাহিত করে।

যে পরিবেশে 'রণকপুর' গ্রামটি অব-স্থিত তা অতি সুন্দর। স্থান নির্বাচন যিনি করেছিলেন—তাঁর যে একটি শিল্পীজনোচিত মন ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। দূরে আরাবল্লীর গম্ভীর শিখর চূড়াগুলি—মাঝে স্তব্ধ, নিবিড়, ধ্যানগম্ভীর প্রসারিত, উন্মুক্ত প্রান্তর দেবার্চনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। নির্মেঘ নীল আকাশের নীচে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'শিখর' বা 'দেব কুলিক'বেষ্টিত এই মন্দিরের পাঁচটি চূড়া আপন মহিমায় বিরাজ করছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'শিখরগুলির' মাথায় আবার পিতলের অসংখ্য ঘন্টা সংযোজিত। বাতাসের মৃদুমন্দ হিল্লোলে তারা টুংটাং ধ্বনি তুলে যেন এই অপরূপ রূপতীর্থের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার বন্দনা করছে। আবহাওয়া-স্নিগ্ধ মধুর—তাতে রৌদ্রের দাহ নেই। চতুষ্পার্শ্ব নির্জন নিস্তব্ধ, বিরল সংখ্যক যাত্রীদের আনাগোনায় দেবতার ধ্যানভঙ্গ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

মন্দির এখানে কতকগুলি আছে, কিন্তু মূলমন্দির যেটি 'চৌমুখ' মন্দির বা 'ত্রৈলোক্য-দীপক' নামে খ্যাত সেটিই দ্রষ্টব্য।

এখানকার এই মন্দিরগুলি নির্মাণের পিছনে আছেন এক ধর্মপ্রাণ জৈন—নাম তাঁর 'ধর্ণাশাহ'—মতান্তরে তিনি ছিলেন রাণা কুম্ভের মন্ত্রী।

'রাণাকুম্ভ' মেবারে রাজত্ব করেছিলেন—

কীর্তিস্তম্ভ
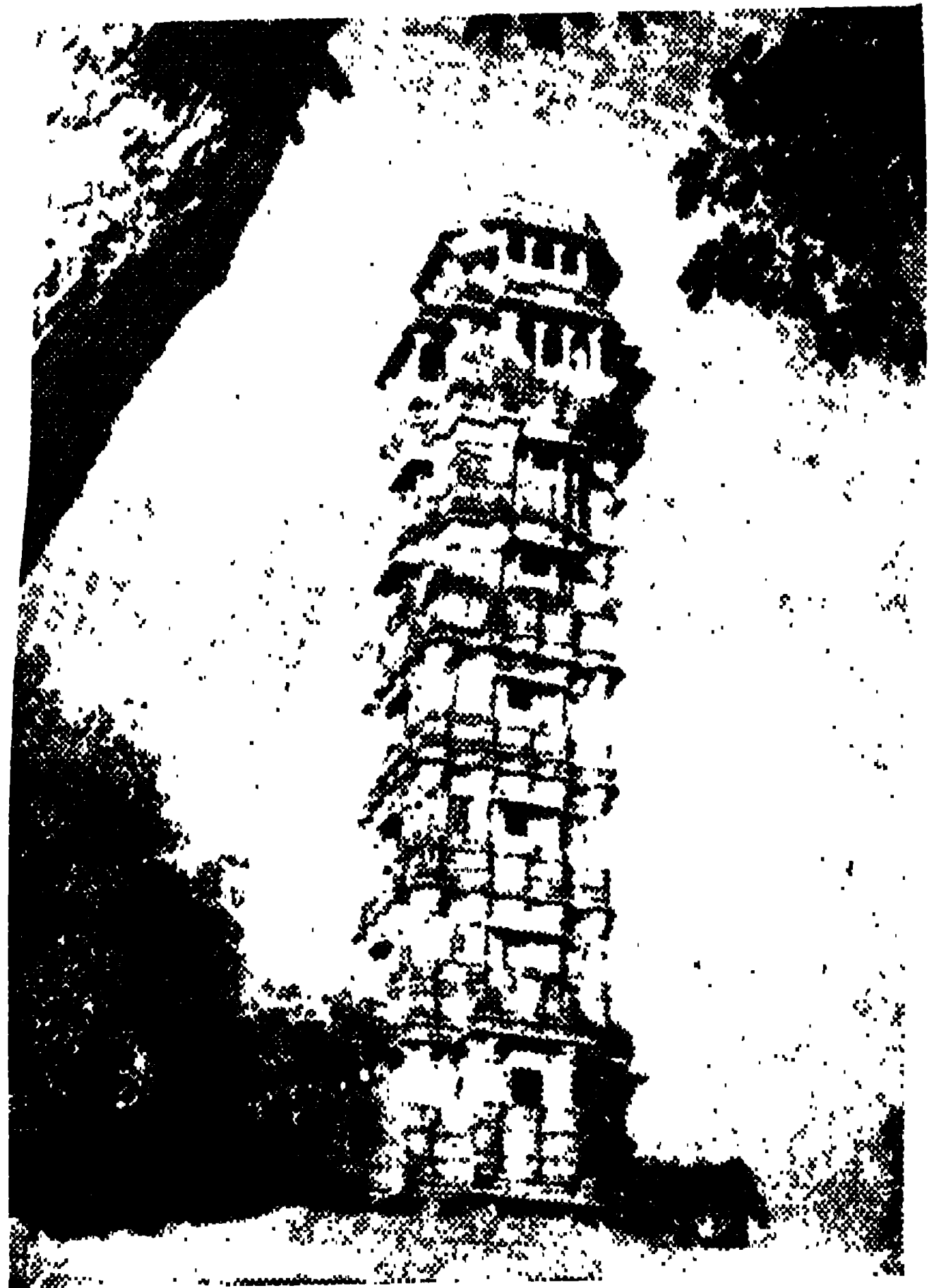
চৌমুখো মন্দিরের অভ্যন্তর
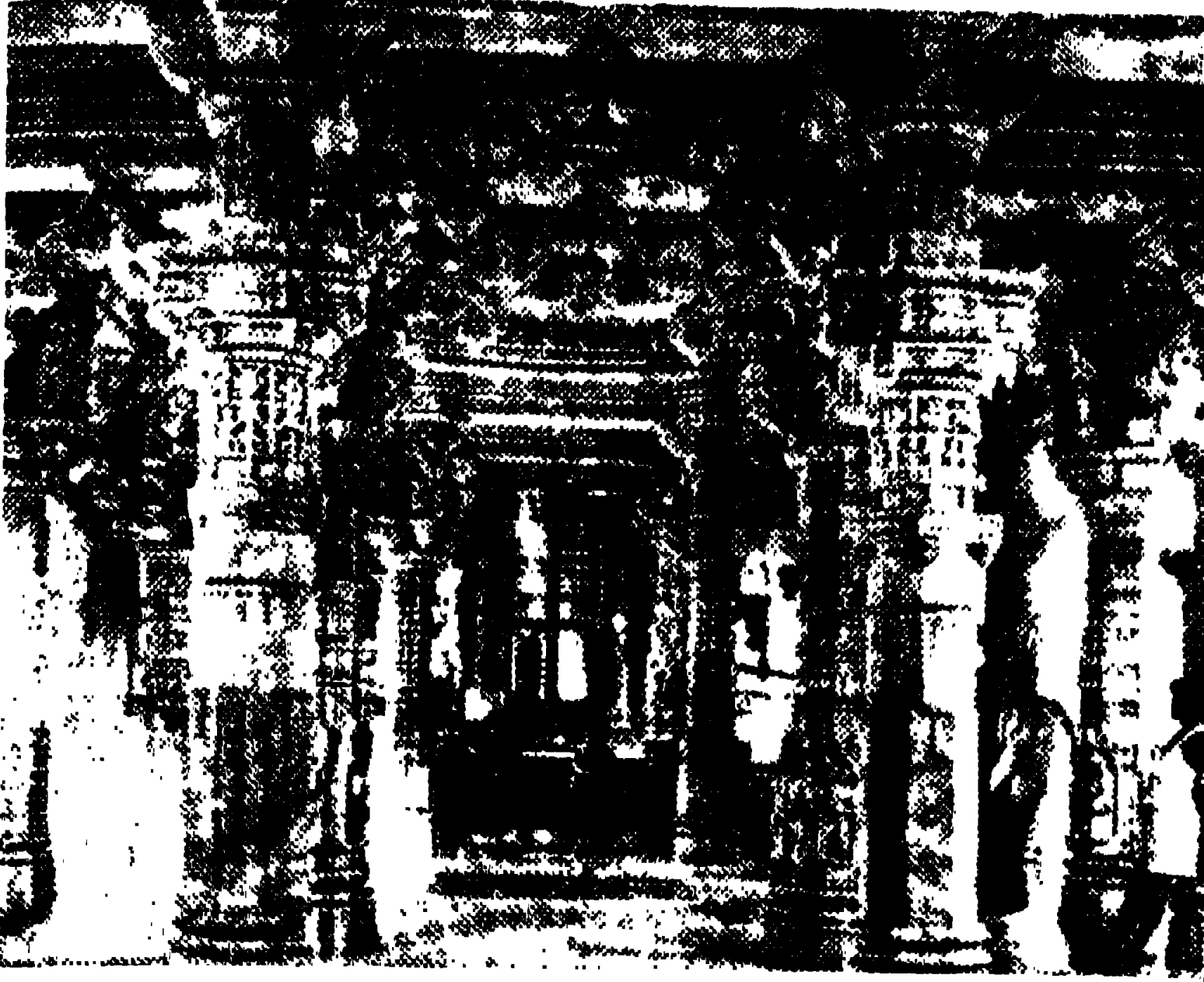
১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে। তিনিই নাকি এই ভূখন্ডটি দান করেছিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য। শুধু তাই নয় শিল্পের গুণগ্রাহী রাণা প্রচুর আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই স্থানটি 'রাণাপুর' বা রাণা কা-পুর নামে পরিচিত হত—যা এখন 'রণকপুর' নামে প্রচলিত।

মূল মন্দিরটি 'চৌমুখ' নামে খ্যাত, সম্ভবতঃ চারটি প্রবেশপথ আছে বলে। মন্দিরটি ত্রিতল—এর উচ্চ ও প্রশস্ত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করে—প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দাঁড়ালে প্রথমেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—সম্মুখস্থ দেবমূর্তির দুটি চোখের ওপর। চোখদুটি এমনকিছু দিয়ে তৈরী যা আলোর স্পর্শে দ্যুতিমান হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এর অগণিত স্তম্ভরাজির দিকে। একের পর এক চলে গেছে সুসংবদ্ধ কারুকার্যমন্ডিত স্তম্ভের শ্রেণী। পাদদেশ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত আগোগাড়া সূক্ষ্ম-সুনিপুণ কারুকার্য খচিত এই স্তম্ভশ্রেণী সত্যই বিশ্বের বিস্ময়।

মন্দিরে এই স্তম্ভশ্রেণীর সংখ্যা এক হাজার চারশো চল্লিশটি (১৪৪০) এবং এর কোনও দুটি স্তম্ভের কারুকার্য একরকম নয়। প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের। এই অপরূপ স্তম্ভশ্রেণী ধারণ করে আছে বিশাল মন্দিরের ভারকে। প্রতি দুটি থামকে যুক্ত করেছে শ্বেতমর্মরে নির্মিত সূক্ষ্ম জালি কাজে খচিত তোরণ—তার সৌন্দর্যই বা কি অলৌকিক। মনে হয় না কঠিন পাথরে তৈরী যেন শুভ্র লেশের ঝালর কেউ দুলিয়ে রেখে গেছে—এখনই বুঝি কেঁপে উঠবে হাওয়ার স্পর্শে। বাস্তবিক মন্দিরের অভ্যন্তরের সমস্তকিছু যেন কঠিন মর্মরে গঠিত নয় যেন শুভ্র মোমের তৈরী: এতই কমনীয় ও পেলব। মনে হয় আঙুল ছোঁয়ালেই বুঝি খসে পড়বে ঐ অপরূপ শিল্পকৃতী যা প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে ছাদ থেকে নেমে এসেছে—নীচে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকৃতি হয়ে। আর আশ্চর্য, তার কোনটি আরেকটির মত নয়—প্রত্যেকটি বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন নক্সার হয়েও কিন্তু তারা এক মহান সুষম সৌন্দর্যে বিধৃত—কোথাও এতটুকু ছন্দপতন হয়নি—রেখার অমিল হয়নি। এই বিশাল বৈচিত্র্যের মধ্যে যে অখন্ড শৈল্পিক সুষমা—তা ভারতবর্ষের অন্য কোনও মন্দিরে সহজলভ্য নয়: প্রত্যেকটি গম্বুজকে পরিবৃত করে আছে—বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সুর-সুন্দরীরা। অপূর্ব তাদের দেহ-ভঙ্গিমা। যেন অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গীতের প্রকাশ। নৃত্যপরা অপ্সরারা হঠাৎ বুঝি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে—ক্ষণিকের বিহ্বলতায়—এখনই আবার শিল্পের স্বর্গে বিলীন হয়ে যাবে। তাদের এ অলৌকিক সৌন্দর্য যে কোনও মানুষ রচনা করেছিল একদা—তা মনে হয় না। প্রণামযোগ্য সেইসব শিল্পীশ্রেষ্ঠরা যাদের হাত সৃষ্টি করেছে এমন অলৌকিক সুরাঙ্গনা থেকে লৌকিক শোভাযাত্রার দৃশ্য—গজযূথ, পশুরাজ সিংহের পাল, লতাপাতা ফুল, পাখী, কি নয়?

মূল দেবতা ঋষভনাথজী বা আদি-নাথজী বা আদি তীর্থংকর যিনি। তাঁর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে আরও দুটি বৃহদাকার তীর্থংকরের মূর্তি আছে। আরও আছে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অগণিত তীর্থংকরের মূর্তি।

অভিনব এই মন্দিরের আলোক প্রবেশের ব্যবস্থাও। এমনভাবে ভিতরে আলোকের প্রবেশপথ রাখা হয়েছে যে নিভৃততম কোণটিও আলোকিত। ভিতর বাহির সব মিলিয়ে এ মন্দির ভারতশিল্পের এক অদ্বিতীয় পথিকৃৎ। অজন্তা, খাজুরাহো, কোণারকের মতই এ মন্দির। তুলনারহিত এক অত্যাশ্চর্য শিল্পনিদর্শন। বাস্তবিক সেই বিস্মৃতপ্রায় ভারতীয় শিল্পীরা যে কি অবাস্তব শিল্পসৃষ্টি করতে পারতেন; তাঁদের কারিগরী নিপুণতা যে কোন সূক্ষ্মতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল—এ মন্দির দেখলে সেকথা আমরা আবার বিস্ময়াভিভূত চিত্তে স্মরণ করতে পারি।

চৌমুখো মন্দিরের অভ্যন্তরে কল্পতরুপাতায় একটি অলংকরণ

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু   সুহৃদ গোপাল দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার আর একটি বিনীত নিবেদন হচ্ছে—আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর স্বীয় যুক্তির অসারতা কিছুটা বুঝতে পেরেই হতাশার সঙ্গে বলেছিলেন, 'চিঠিগুলির বা নথিভুক্ত প্রমাণগুলির কথার উপর নির্ভর না করে তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অরবিন্দের চিন্তাধারার বিশ্লেষণই বিবেচ্য'। এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে আপনার দৃষ্টিগোচর করেছিলেন এবং দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি পড়ুন এবং অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি পড়ুন' —আমার বন্ধু বলতে চেয়েছিলেন যে, ঐ সব সংবাদপত্রগুলি পড়ুন কারণ সবগুলির মধ্যেই ষড়যন্ত্রের আভাস প্রচ্ছন্ন এবং ঐগুলির মধ্যে অরবিন্দের চিন্তাধারাকে আবিষ্কার করুন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, ঐ সব বক্তৃতার এবং প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলেই অরবিন্দ তার বক্তৃতার মাধ্যমে দেশবাসীকে কি ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল তা বুঝতে পারা যাবে এবং সেই সঙ্গে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাবে যে স্বাধীনতার আদর্শ বলতে কি বুঝায় ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, অরবিন্দ বোমার ব্যবহার, গুপ্ত সমিতির সংগঠন, এবং এই মামলার অভিযোগ সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের সমর্থক ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি আগেও বলেছি এবং আবার এখন বলছি—ঐ সব লেখা, প্রবন্ধ চিঠি এক্ষেত্রে কোনোমতেই আইনানুগ প্রমাণ বলে ধরা যায় না এবং যদি ধরেন তাহলেও ঐগুলির মধ্যে এমন অভ্রান্ত ইঙ্গিত পাবেন যার ভিত্তিতে বলা যাবে যে, অরবিন্দের মতবাদ যা-ই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি অনুযায়ী সে অভিযুক্ত হতে পারে না।

মহামান্য ধর্মাবতার আমি আপনাকে 'অরবিন্দের লেখা ১৯০৫ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের চিঠিখানি পড়ে শুনিয়েছি। সম্পূর্ণ চিঠিখানি পড়বার পর আমি চিঠির প্রতিটি অংশ ব্যাখ্যা করেছি এবং ঐগুলির সম্পর্কে আমার মন্তব্য আপনাকে জানিয়েছি। অরবিন্দ লিখিত জবানবন্দি মারফত জানিয়েছে : 'বরোদা থেকে কলকাতায় আসার পর আমি এক মুহূর্তের জন্যও আমার ১৩ আগস্ট, ১৯০৫-এর চিঠিতে বিবৃত নীতিগুলি অনুসরণে বিচ্যুত হইনি। আমি কখনো সক্রিয় রাজনীতি করিনি। আমার গতিবিধি, রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় যে ধরনের হোক না কেন, আমি কোনো সময়েই ১৩ই আগস্ট তারিখের চিঠিতে বিবৃত নীতিগুলি অনুসরণে ভ্রষ্ট হইনি। (আপনার সমীপে আমার এইটুকুই নিবেদন।) এর থেকে যদি বুঝতে হয় যে, আমার দেশের কাছে জাতীয় স্বাধীনতার যে আদর্শ আমি প্রচার করেছি তা আইনানুগ নয়, তাহলে আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। জাতীয় স্বাধীনতার বাণী-প্রচার যদি এদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়, তাহলে আমি বাণী প্রচার করেছি এবং সেই ভিত্তিতে আমি আপনাকে আমায় দণ্ডিত করতে অনুরোধ করছি। কিন্তু যে অপরাধ আমি করিনি তার বোঝা যেন আমার উপর চাপানো না হয়। যে সমস্ত কাজ আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং (আমার মানসিকতার প্রতি সুবিবেচনা করে) যা আমার মানসিকতার পরিপন্থী সেই সব কাজের জন্য আমায় যেন অভিযুক্ত না করা হয়। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি স্বীকার করছি, আমি তা করেছি—আমি কখনোই তা অস্বীকার করিনি। এই কাজের জন্যই আমি আমার জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছি। এই কাজের জন্যেই আমি কলকাতায় এসেছিলাম, এই কাজের মধ্যে দিয়েই বাঁচতে এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করতে। আমার স্বপ্নে এবং জাগরণে এই কাজই ছিল আমার ধ্যান জ্ঞান। এই কাজ যদি আমার অপরাধ হয়, তাহলে তা প্রমাণ করবার জন্য সাক্ষীদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি এখানে স্বীকৃতি করছি। আদালতে আমার আর কিছু বলবার নেই। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণ করবার সময় যে নাটকের অবতারণা করা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তির আর কোনো প্রয়োজন নেই। এবং বিচারের আদ্যপ্রান্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন। আমি যা বললাম সত্যিই তাই যদি আমার অপরাধ হয় তাহলে সেটি আমায় বলুন আমি হৃষ্টচিত্তে শাস্তি মাথা পেতে নোব। কিন্তু আমি এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছি যে, আমি যে ধরনের চিন্তাকে কখনো প্রশ্রয় দিইনি অথবা যে সমস্ত কাজ আমার প্রকৃতিবিরোধী সেগুলির দায়-দায়িত্ব আমার উপর আরোপ করা হচ্ছে কেবল মিথ্যা সাক্ষ্য বা প্রমাণের ভিত্তিতে নয়—আরোপ করা হচ্ছে আমারই লেখা এমন কতকগুলি আলোচনার ভিত্তিতে যেগুলির আদ্য-প্রান্ত সেই মহান আদর্শের নির্দেশক, যে আদর্শের প্রচারক হওয়ার জন্যই আমার জন্ম এবং কর্ম। আমি সেই কাজ করেছি এবং আমার এই স্বীকারোক্তির উপর কোনো প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। আমি পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনের মূল সূত্রগুলিকে বেদান্তের অমর বাণীর আলোকে সংস্কৃত ক'রে আমার প্রচার্য আদর্শকে রূপ দিয়েছিলাম। আমার উপলব্ধি হয়েছিল যে, বিশ্বের দরবারে জাতিপুঞ্জের সভায়, ভারতের মহান ভূমিকার কথা ভারতীয়দের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই বিধিনির্দেশে

...মার জন্ম ও কর্ম স্থির হয়েছে—আমি ...কাজ করতে বাধা। এটাই যদি আমার ...পরাধ হয় তাহলে আপনি আমায় বন্দী ...কারারুদ্ধ করে রাখুন যা যে ...দিন আমি অপরিবর্তিত থাকব। ...নিঃশংকচিত্তে নিবেদন করছি যে, ...ধীনতার আদর্শ প্রচার করার অভিযোগে ...রতীয় দন্ডবিধির কোন বিধান অনুযায়ী ...অভিযুক্ত হতে পারি না এবং যে ...দুষ্কার্যের অভিযোগে আমায় অভি-...করা হয়েছে সেগুলির পক্ষে কোনো ...নেই কারণ আদালতে আমার বিরুদ্ধে ...প্রমাণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ...বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে, ...লির মধ্যে আমি যা বলেছি, লিখেছি, ...শিখিয়েছি তার নাম-গন্ধ নেই।'

মহামান্য দন্ডসভাধীশ, অরবিন্দের ...ধারা ও ধ্যানজ্ঞান সম্পর্কে সবকিছু ...পনাকে বলবার পর তার পক্ষ থেকে ...পনার কাছে আমার প্রার্থনা হোলো— ...অনন্যসাধারণ চরিত্রবিশিষ্ট মানুষটি ...রতীয় দন্ডবিধির কয়েকটি ধারার পরি-...প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত হয়ে শুধুমাত্র কল্প-...নার জন্য আদালতের বিচারমঞ্চেই ...নীত হয়নি তাকে আনা হয়েছে ন্যায়-...চারের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসের সর্বোচ্চ ...আদালতে সুচিহ্নিত আদর্শ বিচারের ...আশায়। সেই ভরসায় মহামান্য দন্ডসভা-...ধীশের সমীপে আমার সর্বশেষ নিবেদন:

কালচক্রে এই বাদ-বিসম্বাদ ক্রমশঃ ...হয়ে যখন নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার ...মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে, এই বিশৃঙ্খলার ...আর চিহ্নমাত্র থাকবে না, এই উত্তেজনা ...প্রশমিত হয়ে যাবে, এই অভিযুক্ত ...ব্যক্তির দেহ যখন মৃত্যুর আশ্রয়ে ...বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তারও অনেক অনেক ...পরে আজকের এই অভিযুক্ত ব্যক্তিটি ...স্বদেশপ্রেমিকদের অনন্য কাব্যস্রষ্টা হিসাবে, ...জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ হিসাবে, এবং ...মানবতার পূজারী হিসাবে সর্বজন-...বরণীয় হয়ে উঠবে। কালের ...অমোঘ নির্দেশে তার দেহের বিলুপ্তি ...ঘটবে কিন্তু ভারতের আকাশে-বাতাসে, ...ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের দিকে-...দিগন্তে তার বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ...হবে। তাই আমি বলেছি যে, তাকে আনা ...হয়েছে ন্যায়বিচারের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতি-...হাসের সর্বোচ্চ আদালতে আদর্শ বিচারের ...আশায়। মহামান্য বিচারপতি, আপনার রায় ...দেবার সময় আসন্নপ্রায়, এবং শ্রদ্ধেয় ...এ্যাসেসর মহোদয়গণেরও বিচক্ষণ মতামত ...দেবার আর বিলম্ব নেই। ঐতিহ্যমণ্ডিত ইংলন্ডের বিচারালয়ের ঐতিহাসিক ...সুখ্যাতির কথা স্মরণ করে আমি আপনা-...দের কাছে আবেদন জানালাম। ইংলন্ডের ...হাজার বছরের বিচার-নীতির অন্তর্নিহিত ...মহত্ত্বের কথা স্মরণ করে ইংলন্ডের প্রখ্যাত ...বিচারপতিদের সুচিন্তিত দন্ডবিধি ...প্রয়োগের যে-ক্ষমতা আজও প্রজাবর্গকে ...ইংলন্ডের আইন-কানুনের প্রতি অবিচল ...আস্থা ও আনুগত্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে, সেই ক্ষমতার কথা স্মরণ করে আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানালাম। আমি আপনাদের সমীপে ইংলন্ডের ইতিহাসের সমুজ্জ্বল ঐতিহ্যের নামে আবেদন জানালাম এই কারণে যে লোকে না বলে যে—ইংলন্ডের একজন বিচারপতি ন্যায়-বিচারে ভুল করেছেন। অরবিন্দ কর্তৃক প্রচারিত মহান আদর্শের নামে এবং আমাদের দেশের মহান ঐতিহ্যের স্মরণে এ্যাসেসর মহোদয়গণের নিকট আবেদন করছি—যাতে লোকে না বলে যে, অরবিন্দের দুই স্বদেশভক্ত মোহবশে এবং পরাধীনতার আনুগত্যে অন্ধবিশ্বাসের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে অভিযোগকারীদের নালিশের বেড়া-জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন (২০)।

আলিপুর বোমা মামলায় চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক সওয়ালটির স্বীকৃতি দেন তীক্ষ্নধী, নির্ভীক এবং ন্যায়নিষ্ঠ বীচক্রফ্‌ট সাহেব। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-চেতনার প্রতি এই বিদেশী বিচারকের গোপন শ্রদ্ধা এই ঐতিহাসিক মামলার একটি অপরিহার্য আলোচ্য বিষয়। বীচক্রফ্‌ট এই মামলায় প্রধান আসামীর বিরুদ্ধে আনীত প্রতিটি অভিযোগ চিত্তরঞ্জনের সওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ থেকে বীচক্রফ্‌টের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বীচক্রফ্‌ট সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যঙ্গোক্তি উল্লেখযোগ্য—"যেমন মিল্‌টনের 'Paradise Lost'-এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের Plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী 'bold bad man' আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পালক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজি লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চস্বরে বলিতেন—অরবিন্দ ঘোষ।......বেরসিক বীচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন।" (২১)।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী সম্পর্কে যে কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের মত বীচক্রফ্‌টের ভূমিকাও চিরস্মরণীয়। চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক সওয়াল শেষ হওয়ার পর বীচক্রফ্‌ট অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

"আমি এইবার এই মামলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আসামী অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে আলোচনা করবো। অরবিন্দই সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি যাকে দোষী প্রতিপন্ন করবার জন্য সরকার-পক্ষ বিশেষ উদ্‌গ্রীব এবং যে অভিযুক্ত হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় না দাঁড়ালে এই মামলায় নিষ্পত্তি অনেক আগেই হয়ে যেতো। খানিকটা এই কারণে আমি সব শেষে অরবিন্দের বিষয় আলোচনা করছি এবং খানিকটা অপর কারণ হোলো অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার অভিযোগও অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত হয়েছিল।

অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সে যে আদর্শ জনগণের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিল বলে তার কৌসুলি বর্ণনা করেছেন, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। সরকার পক্ষের এবং তার স্বপক্ষের কৌসুলি দুজন একবাক্যে তার ধর্মভাবকে এই মামলার বিচার্য করে তুলেছেন। বস্তুতঃ সরকার পক্ষের কৌসুলির মতে অরবিন্দের ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গী তার দেশের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলেই সে নিজের মতবাদের একজন অন্ধ-বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

"তার পক্ষের কৌসুলি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অরবিন্দ একজন বৈদান্তিক ছিল এবং সে তার রাজনৈতিক মতবাদকে বেদান্ত-ভিত্তিক করে রচনা করেছিল। বেদান্ত বলে—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্তমান এবং মানুষের ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্য নিজের মধ্যে সেই ঐশী-অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে হবে। সেইরকম জাতির 'পূর্ণ-স্বরাজের' জন্য জাতির মধ্যেও সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতি আনতে হবে যার দ্বারা জাতির মধ্যে একাত্মবোধ আসবে এবং শুভবোধ জাগ্রত হবে—জাতির এই মুক্তি কোনো বিদেশীর সাহায্যে আসতে পারে না; এই জাতীয় মুক্তির জন্য প্রয়োজন দেশীয় পদ্ধতির অনুসরণ। অরবিন্দের নীতি বা মতবাদ কেবলমাত্র অসহযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না কারণ, তার মতে মুক্তির জন্য প্রয়োজন চরম ত্যাগ এবং আত্মনিগ্রহের সাধনা। যদি আইনের মধ্যে অনাচার প্রকাশ পায় তাহলে সেই আইনকে অমান্য করে শাস্তিভোগ করবে, কিন্তু কখনো হিংস্রতার আশ্রয় নেবে না। কারণ নীতিগতভাবে যখন তুমি আইন মানতে তখন (অনাচারের প্রতিবাদে) আইন অমান্য করে হাসিমুখে শাস্তি বরণ করে নেওয়াই উচিত। অরবিন্দ জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছে যে, 'তোমরা কাপুরুষ নও সুতরাং আত্ম-বিশ্বাসী হও এবং মোক্ষলাভ কর—অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ও স্বাধীন পদ্ধতিতে।' চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের মতে—এই কথাগুলিই ছিল অরবিন্দ ঘোষের মতবাদের সারমর্ম।

"অরবিন্দ তার লিখিত জবানবন্দীতে বলেছে বরোদায় থাকাকালে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং বাড়ীর কাজকর্মের জন্য অবিনাশকে নিযুক্ত করার আগে সে অবিনাশকে চিনতো না।

"অরবিন্দের মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণগুলিকে ...লিখিত সাতটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে

---

(20) Prof. J. C Ghose: Life work of Sri Aurobindo; Samabaya Press, Calcutta; Appendix B PP 1—68

(২১) শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙলা রচনা-বলী (দ্বিতীয় খন্ড) পৃঃ ৩০৯

আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করবো ঃ

(১) অরবিন্দ এবং তার স্ত্রীর চিঠিপত্র।

(২) অরবিন্দ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের লেখা চিঠিপত্র।

(৩) অরবিন্দের বক্তৃতা।

(৪) অরবিন্দের প্রবন্ধ।

(৫) অন্যান্য ব্যক্তিদের চিঠিপত্র।

(৬) নথিভুক্ত প্রমাণ।

(৭) জবানবন্দী, সাক্ষীর বিবৃতি এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি।

সবশেষে আমি এখন কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করবো যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে এই মামলায় স্বীকৃত হয়েছে।

"১৯০২ সালের যে তিনখানি চিঠি পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে আলোচ্য কিছুই নেই। ১৯০৫ সালের তিনখানি চিঠির মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু প্রচুর। এই চিঠিগুলি পড়লে জানা যায় যে, অরবিন্দের মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলি কি? চিঠিতে অরবিন্দ তার তিনটি আদর্শের উল্লেখ করেছিল ঃ 'এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক—অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধহয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। ... ...আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত।...... ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্মকার্যে ব্যয় করা।......আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোনো মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। দ্বিতীয় পাগলামীটা এই, যে-কোনো মতে ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিতে হইবে।...... ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনো-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। তৃতীয় পাগলামী এই যে,......

আমি জানি এই পতিতজাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল।'

"চিঠির শেষের দিকে অরবিন্দ লিখেছে—'জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি।......পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব, ঈশ্বরের উপাসনায় সেই জোর পাইবে।'

চিঠির শেষ পরিচ্ছেদের শুরুতে অরবিন্দ লিখেছে, 'এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা।'

"এই চিঠির বিষয়বস্তু ছিল স্ত্রীকে হিন্দুধর্মের পথ অনুসরণ করতে অনুরোধ করা। তার স্ত্রী ব্রাহ্ম-স্কুলে শিক্ষিত, সুতরাং তার কাছে অরবিন্দের জিজ্ঞাসা ছিল যে, সে বিদেশী চিন্তাধারার অনুসরণ করবে, না হিন্দুধর্মের পথ অনুসরণ করবে? এই সব আলোচনা গুহ্য-তত্ত্বের নির্দেশক সুতরাং অরবিন্দের ইচ্ছা ছিল এইগুলি গোপনীয় রাখা। এই চিঠিটি কোনোমতেই ষড়যন্ত্র-কারীর চিঠি হিসাবে ধরা যেতে পারে না, কারণ চিঠির মধ্যে ষড়যন্ত্রের নামগন্ধ নেই।

"অন্য কতকগুলি চিঠিপত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলি আমার আলোচ্য।

(ক) মাধব রাওকে বিশেষ কাজের ভার দিয়ে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছে, আমাকে তার জন্য কিছু অর্থ পাঠাতে হবে। আমাকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং এছাড়া আমার অপর একটি আন্দোলনের পরিকল্পনা আছে যেটির জন্য অগণিত অর্থের প্রয়োজন হবে।' অভিযোগে বলা হয়েছে এইগুলি সব বিপ্লবের নির্দেশ-সূচক। কিন্তু প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, মাধব রাও অরবিন্দের ছাত্র। তাকে অরবিন্দ ইংলণ্ডে পড়াশোনা করবার জন্য পাঠায়। তার মারফতে অরবিন্দ ইংলণ্ডে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রদের অর্থ সাহায্য করতো। এই পরিচ্ছেদে লিখিত—'অপর একটি আন্দোলনের পরিকল্পনা' অর্থে অরবিন্দের বিশ্বব্যাপী বেদান্ত-ধর্ম আন্দোলনের পরিকল্পনাকে বুঝায়। অরবিন্দের লিখিত জবানবন্দীতেও এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।

(খ) ১৯০৫ সালের ২২শে অকটোবর তারিখে লেখা একটি পত্রে অরবিন্দ বারীন্দ্রের অসুস্থতা এবং দেশসেবার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছিল। সে লিখেছিল যে, 'সরোজিনীকে বোলো না, বললে সে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাবে।' বারীনের জবানবন্দী থেকে বারীন সম্পর্কে অরবিন্দের কথাগুলি সমর্থিত হয় বটে, কিন্তু বারীন্দ্রের দেশ-সেবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অরবিন্দ কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন তা বুঝতে পারা যায় না। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত সরোজিনীর 'দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়া' একটা স্বাভাবিক ঘটনা কারণ ভাইয়ের ভগ্নস্বাস্থ্য বিষয়ে কোনো সংবাদ বোনকে স্বভাবতঃই বিচলিত বা দুশ্চিন্তা-

গ্রস্ত করতে পারে। এই চিঠিতে লিখিত— সাধ্য-প্রার্থনায় সময় আগত প্রায়'—কথাগুলি থেকে অরবিন্দের ধর্মভাব সম্পর্কে ও ধর্ম-পথ অনুসরণের অভ্যাস সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"১৯০৬ সালে লিখিত চিঠিগুলি থেকে কেবলমাত্র একটি প্রয়োজনীয় তথ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়—অরবিন্দ আমিষ আহার পরিত্যাগ করেছে। ১৯০৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে অরবিন্দকে লিখিত একটি চিঠিতে মৃণালিনী 'তোমার কাগজ' অর্থে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার কথা বলেছিল। ঐ সালে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে লেখা আর একটি চিঠিতে অরবিন্দের কলকাতা বাড়ির বাজার-সরকার অবিনাশ সম্পর্কে মৃণালিনী মন্তব্য করেছিল যে অবিনাশের বিয়ে হবার পর সে আর [illegible] তোমার কাজ করতে পারবে না'। এই [illegible]ব্যের উদ্দেশ্য ছিল অরবিন্দকে বাজার-সরকারের কাজের জন্য একটি উপযুক্ত লোকের সন্ধান করতে বলা: এছাড়া এই মন্তব্যের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আরো কিছুদিন পরে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে একটি কংগ্রেস সম্পর্কে অরবিন্দের ভাব গম্ভীর চিন্তার কথা বলতে গিয়ে চিঠির একটি অংশে সে লিখেছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে [illegible] জীবনের যথাসর্বস্ব বলে মনে করে না। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে মৃণালিনী দেবী লিখিত পত্রে মৃণালিনী দেবীর নিজস্ব একটি বাসস্থান অরবিন্দ ব্যবস্থা না-করে দেওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল- এই প্রসঙ্গে ১৯।৩ ছকু খানসামা লেনের বাড়ির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০[illegible] সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা অরবিন্দের একটি চিঠিতে সে তার স্ত্রীকে লিখেছিল, 'এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিও না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়। তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই—বলা নিষিদ্ধ।' এই কথাগুলি অরবিন্দের ধর্মজীবনের নীতির নির্দেশক এই চিঠি কখনই কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না।

"চিঠিগুলির বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, অরবিন্দ সত্য সত্যই ধর্মনিষ্ঠ ছিল এবং সে চেয়েছিল যে মৃণালিনী দেবী সবদিক থেকে অর প্রকৃত সহধর্মিণী হোক। এইসব চিঠিপত্রের কোনো কোনো বক্তব্য সন্দেহের উদ্রেক করলেও প্রতিটির মধ্যে সহজ নির্দোষ বক্তব্যের ভাব সুস্পষ্ট। ১৯০৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে দেশপাণ্ডে অরবিন্দকে বরোদার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যা লিখেছিল তার মধ্যেও আমি ক্ষতিকারক কিছুর সন্ধান পাই নি।

"আদালতের ২৯৩।৯ নথিভুক্ত প্রমাণ চিঠিটি অরবিন্দের লেখা বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কীয় এই চিঠির মধ্যে নির্দোষ উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর ভিত্তিতে বিপ্ল[illegible]

বা বিদ্রোহের কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না।

"বিষ্ণুগোবিন্দ লেলের সম্পর্কে অরবিন্দ তার জবানবন্দীতে বলেছে যে, লেলেকে সে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হিসাবে এবং একজন ধর্মপ্রাণ চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে জানতো। অরবিন্দ লেলের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। এই মন্তব্যের অনুকূলে চিঠির একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—'প্রেম ও শান্তি নিবেদনান্তে—আপনারই "অরবিন্দ ঘোষ"। আদালতের ২৯২।৬ নম্বর নথিভুক্ত প্রমাণ অপর একটি চিঠি যাতে অরবিন্দ বারীন্দ্রকে 'খামখেয়ালী, বিভ্রান্ত এবং পরিবারের চিন্তার কারণ' হিসাবে বর্ণনা করেছে। এই উক্তিটি অরবিন্দের আদালতের নিকট প্রদত্ত লিখিত-বিবৃতির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"অরবিন্দের বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যেও মামলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সাক্ষী (যারা ১৯০৮ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অরবিন্দের ভাষণগুলি শুনেছে এবং লিপিবদ্ধ করেছে) তাদের সাক্ষ্যে যা বলেছে তা থেকে ঐ সব অঞ্চলে অরবিন্দের অভাবনীয় জনপ্রিয়তার লক্ষণ ছাড়া অন্য কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সাক্ষ্যগুলি অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণ করা অপেক্ষা খণ্ডন করতেই বেশি সাহায্য করে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষার প্রচারক হিসাবে অরবিন্দের ভাষণগুলিতে মূল বক্তব্য ছিল ভারতের মুক্তি আসবে অন্তর্লোকের আবাহনে বহির্জগতের অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরের মাধ্যমে নয়। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দের উক্তি, 'স্বদেশীর জন্য জীবন এবং স্বদেশীর জন্য মরণ'—একটি অতিশয়োক্তি বিবেচনায় আদালতের নিকট উপেক্ষণীয়।

১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিল তিন্নেভেলীর বিপ্লবীদের সমর্থনে ভাষণ দেবার সময়ে অরবিন্দ তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের মাধ্যমে বলেছিল যে, 'মন-প্রাণ দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবার, কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করবার এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করবার সময় এসেছে—দেহ, মন, বুদ্ধিকে প্রস্তুত করবার এই হোলো মাহেন্দ্রক্ষণ'। অরবিন্দ জনগণকে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে আহ্বান জানিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের নথিভুক্ত ২৮৩ এবং ২৯১।৯ নম্বরের প্রমাণ দুটি অরবিন্দের বাড়ী তল্লাসীর সময়ে পাওয়া গেছল। এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় নি; সুতরাং সেগুলিকে কেবলমাত্র অরবিন্দের চিন্তার আলেখ্য হিসাবে ধরা যেতে পারে।

"বিদেশী পণ্য বর্জন নীতির পক্ষে অরবিন্দের মূল বক্তব্য ছিল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ করার যৌক্তিকতা। 'আমরা ইংরাজদের ঘৃণা করি না, কিন্তু ভারতের প্রতি ইংরাজদের শোষণ-নীতির বিরোধিতা করি। কারণ দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ সাধারণত এক হতে পারে না। সুতরাং তাদের দেশীয় পণ্য বর্জন করে আমরা তাদের শোষণ-নীতির প্রতিবাদ করতে পারি। বর্জন করা উদ্দেশ্য দেশের জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বলে নীতিগতভাবে বর্জন করা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে না। যা অন্যায় নয় সেই কাজের সফলতার জন্যে প্রয়োজন বোধে বলপ্রয়োগ করা যেতে পারে—অবশ্য বলপ্রয়োগ করার উপযুক্ত হোলে। কেবলমাত্র একটি নিছক দার্শনিক চিন্তার নিদর্শন ছাড়া এই লেখার মধ্যে ক্ষতিকারক কিছু পাওয়া যায় না। এই লেখাটি আদালতের ২৮৩ নম্বর নথিভুক্ত প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত।

"২৯১।৯ নম্বর নথিভুক্ত প্রমাণে যে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটি আরও অসাধারণ। এই প্রবন্ধটির সারমর্ম হোলো জাতীয়তাবাদীর একমাত্র লক্ষ্য জাতীয় অভ্যুত্থান। জাতীয়তাবাদীরা নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি সশ্রদ্ধ থাকবে কারণ নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যতীত জাতীয় অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। কিন্তু এই নিয়ম-শৃঙ্খলা জনগণের ইচ্ছার পরিপন্থী হোলে চলবে না। যদি পরিপন্থী হয় তাহলে তা জনগণের স্বার্থ-বিরোধী এবং জনগণের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠা পালনে অক্ষম। এই কারণে সেই অনুপযুক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলাকে অমান্য করা উচিত। জাতীয়তাবাদী চরম অত্যাচারের ভয়ে ভীত নয়। সে সব অত্যাচার, ধর্ম-যন্ত্রণা হাসিমুখে জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য সহ্য করতে সক্ষম।

"অরবিন্দের চিন্তার সঙ্গে ইউরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তার যথেষ্ট সংগতি লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের জাতীয় অভ্যুত্থানের যতগুলি ইতিহাস আছে সেগুলির মধ্যে জনগণের স্বার্থ-বিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকেই বিপ্লবের কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। তার পার্থক্য হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপের শাসক এবং শাসিত-জনগণ একই জাতিভুক্ত, কিন্তু এখানে তা নয়। রচনার মাধুর্য-বিচারে প্রবন্ধটি অপূর্ব বিশিষ্টতার অধিকারী। কিন্তু অপরিণত বা ভাবপ্রবণ মনের কাছে এই ধরনের প্রবন্ধ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে—আমার মতে, বোধহয় প্রবন্ধের লেখক সেই আশঙ্কাতেই প্রবন্ধটি প্রকাশ করে নি।

"উপরোক্ত দুটি প্রবন্ধই অপ্রকাশিত থাকায় এদের ভিত্তিতে অরবিন্দের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা যায় না অথবা অরবিন্দকে ষড়যন্ত্রকারী বলা চলে না।

"মিস্টার নর্টন তাঁর সওয়ালে 'যুগান্তর' 'সন্ধ্যা' এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি আলোচনার উপর অভিযোগ প্রমাণের উপাদান আছে বলে যে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলি আমার মতে ঠিক নয়। এই সব প্রবন্ধের লেখক আলোচনার মাধ্যমে একই আদর্শের জন্য বিভিন্ন মত ও পথের উল্লেখ করে বলেছেন, স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো কাজ করা দূষণীয় নয়। আমার মতে আদর্শের মধ্যে কোনো দোষ ছিল না তবে আদর্শলাভের কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে দুর্বলতার লক্ষ্য করা যায়।

"২৯২।৮ নম্বর নথিভুক্ত-প্রমাণটির মধ্যে একটি মারাত্মক হিংসাত্মক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। রচনাটি আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কীয় বলে মনে হয়। লেখাটির হস্তাক্ষর কোনো মহিলার—অরবিন্দের নয়।

"১৮২ নম্বরের প্রমাণটি হচ্ছে উপেন্দ্রকে ২৩, স্কট লেনের ঠিকানায় লিখিত রামচন্দ্র প্রভুর একটি চিঠি। ঐ চিঠিতে লেখক অরবিন্দকে সরল শিশুর মত নিষ্পাপ মহাত্মাপুরুষ অথচ জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছে। লেখকের মতে এমন চরিত্র-সংযোজনা পৃথিবীতে বিরল।

"৩৮৫।২ নম্বরের প্রমাণটির উপর সরকার পক্ষের কৌসুলি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই প্রমাণটি 'ভাই ডাক্তার' সম্বোধনে জনৈক গোবিনের লেখা একখানি চিঠি। চিঠির এক জায়গায় লেখা ছিল, 'এই রকম কর্তা পছন্দ করে দেওয়ার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি,' অভিযোগকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে 'কর্তা' অর্থে অরবিন্দ এবং 'ভাই ডাক্তার' সম্বোধনটি উপেনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অরবিন্দের কৌসুলি বলেছেন যে, চিঠিখানি অরবিন্দের প্রতিবেশী কোনো একজন ডাক্তারের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। চিঠিতে যে ২৩ নম্বর বাড়ির উল্লেখ রয়েছে সেটি ২৩ নম্বর স্কট লেন নয়—ঐ বাড়িটি ২৩ নম্বর সুরেন দাস লেনে অবস্থিত। আরও বলা হয়েছে যে, অরবিন্দকে 'কর্তা' সম্বোধন করা হোতো না 'কর্তা' বলতে বারীনকেই বোঝানো হোতো।

"১৯২ নম্বর প্রমাণটির ভিত্তিতে [illegible] জোর বলা যেতে পারে যে, অরবিন্দের [illegible] মেদিনীপুরের ছাত্র ভাণ্ডারের একটা যোগাযোগ ছিল।

"অরবিন্দ বন্দেমাতরম পত্রিকার অংশীদার ছিল এবং ঐ পত্রিকাতেই ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করা হয়েছিল সুতরাং অরবিন্দ ষড়যন্ত্রকারী—এই যুক্তিটি প্রমাণ করতে ১০৯৯ নম্বরের প্রমাণ-দলিলটি মোটেই সাহায্য করে না। কারণ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে এমন কোনো বন্দেমাতরম পত্রিকার সংখ্যা আমাকে দেখানো হয় নি। যদি এই ধরনের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহলে অপরাধীকে অর্থদণ্ডের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে—অন্য কোনো গুরুদণ্ডের অধিকারী সে হতে পারে না। সেই রকম ৯১০ নম্বরের প্রমাণ—যুগান্তর পত্রিকার পিওন-বুক। এই পিওন-বুক থেকে জানা যায়, অরবিন্দ কোনো একদিন ঐ পিওন-বুকে সই করে যুগান্তর পত্রিকার দুখানি চিঠি নিয়েছিল।

তার সঙ্গে যুগান্তরের সম্পর্ক প্রমাণের পক্ষে এই দলিলটির কোনো গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।

"২৩৯ নম্বরের নথিভুক্ত-প্রমাণটি অরবিন্দের বিরুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে দাবি করা হয়েছে। এই প্রমাণটি একটি সঙ্কেত-পত্র। এই পত্রে লেখা ছিল: জে, বি, কে, এ, জি'র গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করতে হবে। এ, জি, নিষ্কৃতি পেতে চাইছে। ডাক্তার ধুন্দেকে বাগানে রাখতে হবে এবং উল্লাস, এ, জি, বি, জি, কে জানানো হয়েছে'। এই সঙ্কেত-পত্রে এ, জি, বলতে যদি অরবিন্দকে বুঝতে হয় তাহলে প্রমাণটি অরবিন্দের বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় নি। একমাত্র নরেন গোঁসাই প্রমাণ দিতে পারতো কিন্তু সে এখন মৃত। অরবিন্দের পক্ষে বলা হয়েছে যে, এ, জি অর্থে অরবিন্দ বুঝতে হলে বলা যেতে পারে—বারীন অরবিন্দকে সব সময়েই বলে এসেছিল যে, তারা একটা ধর্মীয় সংস্থা (বাগানে) গঠন করেছে, কিন্তু ব্যাপারটি অন্যরকম প্রকাশ পাওয়ায় অরবিন্দ বিরূপ হয়েছিল। এই রকম ব্যাখ্যা করলে এ, জি-কে বোঝা গেলেও জে, বি এবং ডাক্তার ধুন্দে বলতে কারা সেটা বুঝতে পারা যায় না।

"বলা হয়েছে, অরবিন্দ ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি বরোদার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কলকাতায় চলে আসে। তারপর সে তার জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা শুরু করে ছাত্র ভাণ্ডার এবং বন্দেমাতরম্ সংস্থা দুটি স্থাপনার মাধ্যমে। অরবিন্দ স্বীকার করেছে যে, বন্দেমাতরম সংস্থার প্রথম পর্বে সে কিছুদিনের জন্য সংস্থার প্রধান ব্যবস্থাপক ছিল কিন্তু ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে তার সম্পর্ককে সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ছাত্র ভাণ্ডারের দলিল সই করার সময় সে সুবোধ মল্লিকের বাড়ি উপস্থিত থাকায় শুধুমাত্র সাক্ষী হিসাবে সে দলিলে সই করেছিল—সে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছিল। এই যুক্তি সত্য বলেই আমি মনে করি। সুবোধ মল্লিক, জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী, কলেজ তৈরি করবার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছিল সুতরাং অরবিন্দের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ থাকার মধ্যে দূষনীয় কিছু থাকতে পারে না।

"অরবিন্দ ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় ছিল কি না? অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে অরবিন্দ ১৭ই এপ্রিল কাঁরমগঞ্জে যায় নি এবং ১৮ই এপ্রিল তাকে কলকাতায় দেখা গেছে। ১১৪ নম্বরের সাক্ষী ১৫ নম্বর গোপীমোহন দত্ত লেন, যে অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে ডাকঘরের পিওন হিসাবে চিঠি বিলি করতো। সে তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, ১৮ই এপ্রিল চিঠি বিলি করবার সময় সে অরবিন্দের মতো একজনকে দেখেছিল। এই সাক্ষীর সাক্ষ্যকে আমি খুব নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না কারণ সাক্ষী যে অরবিন্দকেই দেখেছিল এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

"আমি এইবার অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করবো। এইগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হোলো ২৯৫ নম্বরের নথিভুক্ত প্রমাণটি—অরবিন্দ ঘোষের থাকবার ঘরে তল্লাসীর সময়ে সংগৃহীত ১৯০৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত 'মিষ্টান্নের চিঠি'। চিঠিখানি যে খামের ভিতর ছিল সেই খামের উপর লেখা ছিল—'অরবিন্দ ঘোষ। গোপনীয়'। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, চিঠিখানি বারীনের লেখা। অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন-কারী কৌঁসুলী বলেছেন যে, চিঠিটি জাল—যদি তাই হয় তাহলে চিঠিটি জালিয়াতির একটি সুন্দর নিদর্শন।

'অভিযোগে বলা হয়েছে 'মিষ্টান্ন' কথাটি 'বোমার' পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছিল। আরো বলা হয়েছে যে, চরমপন্থীরা কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিনে সাফল্য লাভ করবার পর এতই উৎফুল্ল হয়েছিল যে, বারীন অরবিন্দকে ঐ চিঠির মাধ্যমে তাদের 'বাগবাজার' এবং 'মুরারীপুকুর' ষড়যন্ত্র-ঘাঁটির পরিকল্পিত কার্যপ্রণালীকে সারা দেশে ছড়াতে অনুরোধ করেছিল। মিস্টার ডেনহামের সাক্ষ্যে জানা গেছে যে, ঐ চিঠিটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন মিস্টার ক্রেগ্যান। মিস্টার ক্রেগ্যান বলেছেন যে, তল্লাসীর সময় ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রীটে তিনি ঐ চিঠি-খানি পেয়েছিলেন এবং আইন অনুযায়ী চিঠির উপর নিজের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, কিন্তু স্বাক্ষরটি ২রা মে তারিখে অর্থাৎ তল্লাসীর সময়ে বা দিনে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন—স্বাক্ষরের তলায় তারিখটি অন্যলোকের হাতের লেখা বলে বুঝতে পারা গেছে।

"অরবিন্দের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে চিঠিটি জাল এবং জাল করেছে শরৎ দাস। যদিও শরৎ দাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

"আমি মনে করি চিঠিটি বারীন অরবিন্দকে লেখেনি। চিঠিটি পড়ে আমার এই সিদ্ধান্তটি মনে এসেছে। বারীন ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং অরবিন্দ তৃতীয়। এ্যাসেসারগণ বলেছেন যে, স্বাভাবিকভাবে অরবিন্দের উদ্দেশ্যে চিঠিতে বারীনের সম্বোধন করার কথা 'প্রিয় সেজদা' বলে। অরবিন্দ ভাইয়েদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হলে 'প্রিয় ভাই' বলে সম্বোধন করা সম্ভব হলেও হোতে পারে। আমার কাছে এই যুক্তি প্রশ্নাতীত।

"আমার একথাও মনে হয়েছে—যা আমার নিজস্ব মন্তব্য—যে বারীনকে যখন আত্মীয়-স্বজন মহলে 'বারী' নামেই ডাকা হয়, তখন সে তার দাদাকে লেখা চিঠিতে 'বারী' না লিখে 'বারীন্দ্রকুমার ঘোষ' লিখবে কেন? দুই ভাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। তা ছাড়া দুই ভাইই যখন সুরাটে ছিল তখন এইরকমভাবে চিঠি লেখার স্বপক্ষেও আমি কোনো যুক্তি দেখছি না।

যদিও আমি জানি যে, এই প্রমাণটি অরবিন্দের বাড়ী তল্লাস করবার সময়ে ২রা মে তারিখে পাওয়া গেছল, তবুও আমার কাছে প্রমাণটি নানা কারণে সন্দেহযুক্ত মনে হওয়ায় আমি প্রমাণটি গ্রাহ্য হিসাবে নিতে পারলাম না। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এই ধরনের কাজে যখন গুপ্তচর-দের লাগানো হয়ে থাকে তখন কিছু কিছু প্রমাণ স্বপ্নাতীতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করে থাকে—ব্যাপারটি এমনভাবে ঘটে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষেও কিভাবে ঘটলো তা বলা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে ২৯৯।৭ নম্বরের নথিভুক্ত প্রমাণটিও আমি অগ্রাহ্য করলাম। এটিও ঠিক আগের মত রহস্যজনকভাবে অরবিন্দের বইয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিল—যার অস্তিত্ব অরবিন্দের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এটি ছিল একটি নোটবুকের ছেঁড়া পাতায় লেখা নিরর্থক কতকগুলি কথা—এই লেখার সঙ্গে অরবিন্দের হাতের লেখার কোনো সাদৃশ্যও ছিল না এবং অরবিন্দ বলেছে যে, বইটি যতদিন অরবিন্দের কাছে ছিল ততদিন পর্যন্ত ঐ নোটবুকের ছেঁড়া পাতাটি বইয়ের মধ্যে ছিল না। সুতরাং 'মিষ্টান্নের চিঠি'র মতই এই প্রমাণটিও সৃষ্টি হয়েছিল।

"৩০০।২১ নম্বরের প্রমাণ সুধীরকুমার সরকারের নামে একটি চিঠি। এই চিঠির মধ্যে এমন কিছুই লেখা ছিল না যা অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রহণীয়। বাকী নথিভুক্ত প্রমাণগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি হোলো:

(১) একটি রহস্যাবৃত আন্দোলনের পরিকল্পনা যার জন্য অফুরন্ত অর্থের প্রয়োজন।

(২) অবিনাশ বাড়ির কাজ না-করে অন্য কিছু করেছে—এই সংবাদটি।

(৩) নানা অছিলায় মুরারিপুকুরের বাগান-বাড়ি বিক্রি না করা।

(৪) সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। লেলে এবং প্রভুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ষড়যন্ত্র-কারী অবিনাশকে চাকরি দিয়ে প্রতি-পালন করা। উপেন, বীরকুমার, হৃষী-কেশ, বীরেন সেন এবং সুধীরের সঙ্গে মেলামেশা করা। মেদিনীপুর ছাত্র-ভাণ্ডারের সঙ্গে জড়িত থাকা।

(৫) ২০৯ নম্বরের প্রমাণটি।

(৬) নোট বইয়ের ছেঁড়াপাতা এবং মিষ্টান্নের চিঠি।

"এই ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতে অর-বিন্দকে ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত করতে আমি যথেষ্ট দ্বিধাবোধ করছি। সুতরাং দেখা যাক—অরবিন্দের অভিযোগের বিরোধী প্রমাণ কি কি পাওয়া গেছে:

(১) বন্দেমাতরম পত্রিকায় আলোচনায় হিংসাত্মক কার্যকলাপকে বর্জন করতে অনুরোধ করা।

(২) স্বদেশী আন্দোলনকে গুপ্ত সমিতির কার্যক্রমে পরিণত করার বিরোধিতা করা।
(৩) অরবিন্দের রচনাগুলিতে প্রচারিত উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে অসামঞ্জস্য না থাকা।
(৪) অরবিন্দের প্রকাশিত রচনাগুলির বিষয়বস্তু জাতীয় অভ্যুত্থানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা।

আমার মতে এই ধরনের প্রমাণগুলি অরবিন্দের বিরুদ্ধে যে সমস্ত গুরুতর অভিযোগ আনীত হয়েছে, সেগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন করতে পারে না।

'এই মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে বারীন, উল্লাসকর এবং বিভূতিকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হোলো। এদের সংগে উপেন, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, সুধীর, ইন্দ্রনাথ, অবিনাশ, ইন্দুভূষণ, শৈলেন্দ্র, হেমচন্দ্র দাস, পরেশ, শিশির এবং নিরাপদ জনসংগ্রহ, অস্ত্রসংগ্রহ এবং রাজদ্রোহের প্রস্তুতির কাজে সাহায্যকারী হিসাবে অভিযুক্ত হোলো।

'উভয় এ্যাসেসর মহোদয়গণের সংগে সম্পূর্ণ একমত হয়ে আমি মনে করি যে, নরেন বক্সী, শৈলেন্দ্র সেন, নলিনী গুপ্ত, পূর্ণ সেন, বিজয় নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, হেমেন্দ্র ঘোষ, ধরণী গুপ্ত, বীরেন্দ্র ঘোষ, বিজয় ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র সেন, প্রভাসচন্দ্র দে, দীনদয়াল বোস, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, দেবব্রত বোস এবং অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১এ, ১২২ এবং ১২৩ ধারাযুক্ত অভিযোগ অনুযায়ী তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করা গেল না।

স্বাক্ষর : সি পি বীচক্রফট,
অতিরিক্ত দায়রা জজ
আলিপুর।

৬ই মে, ১৯০৯। (১৮)

'৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পর বৎসর ৬ই মে নিষ্কৃতি পাই।' (১৭)

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ৫ই মে তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট বার্লিজের আদালতে উপস্থিত হবার পর তাঁর এটর্নি ম্যানুয়েল সাহেবকে যা বলেছিলেন, সেই উক্তির পুনরাবৃত্তি করছি। ম্যানুয়েল সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুলিশে বলে আপনার বাড়িতে অনেক সন্দেহজনক কাগজ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ চিঠি কি কাগজ, ছিল কি?' আমি বলিলাম, 'নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ছিল না, থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।' অবশ্য তখন 'স্বিন্টার পত্র অথবা 'নোট বইয়ের ছেঁড়া পাতার দুর্বোধ্য লেখাগুলোর কথা' জানিতাম না। আমার আত্মীয়কে (কুমারকৃষ্ণ দত্তকে) বলিলাম, বাড়িতে বোলো কোনো ভয় যেন না করে, আমার নির্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবেই। আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছি [illegible] হইবেই। সুতরাং নিঃসন্দেহে ব[illegible] চলে যে, শ্রীঅরবিন্দের আত্মবিশ্বাস [illegible] ব্যক্তি বা ঘটনার প্রভাবে আসেনি, কারাজীবনের শুরুতেই তিনি জানতেন যে মিথ্যা অভিযোগে সত্যাশ্রয়ীর জয়যাত্রা ব্যাহত হবে না।

প্রাক-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।
—গীতা ৫/২

কারাবাসরূপ যোগাশ্রমে দিব্যজ্ঞান লাভের পর—তিনি সমস্ত কামনাবাসনা সমূলে উৎপাটিত করলেন। তাঁর আস্পৃহা চাইল সমস্ত জীবন ও জগতের মধ্যে একটা দিব্য সামঞ্জস্যকে অবতরণ করাতে এবং এই পৃথিবীর মধ্যে ভগবানকে প্রকাশ করাতে। তাঁর আত্মা ও তাঁর আধারের প্রতিটি অংশ পেল বিশ্বময় চেতনা এবং সেই বিশ্বজনীন চেতনায় সর্বজীব হল বিধৃত। সকলের

(18) Babu B. K. Bose : The Alipore Bomb Trial;
(১৭) শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙলা রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) : পৃঃ ২৮৭

সুখ-দুঃখ তাঁর সুখ-দুঃখ, সমস্ত বিশ্বের জন্য তাঁর প্রকৃতির মধ্যে জেগে উঠল একটা সহানুভূতি। তাঁর বিরাট সার্বজনীন সহানুভূতিতে তিনি যেন মহাসাগর বা পৃথিবীর মত বৃহৎ হয়ে উঠলেন। তিনি সর্বভূতের মধ্যে এক চেতনাকে অনুভব করলেন কিন্তু তাই বলে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব লোপ পেল না।' (৮)

শ্রীঅরবিন্দ ষড়যন্ত্রের ও রাজদ্রোহের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার পর তাঁর লীলা-সহচর শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত এবং শ্রীবিজয় নাগকে সঙ্গে নিয়ে আসাম পরিভ্রমণে গেলেন। আসাম থেকে ফিরে এসে বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' এবং ইংরাজী 'কর্মযোগিন্‌' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর মাসীমার বাড়িতে থাকতেন এবং পত্রিকার কার্যালয় করেছিলেন ৪ নম্বর শ্যামপুকুর লেনের একটি বাড়িতে। শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে পত্রিকার অফিসের সঙ্গে নলিনীবাবু এবং বিজয়বাবুর থাকবার ব্যবস্থাও উনি করেছিলেন।

"...কর্মযোগিন ও ধর্ম-এর লেখায় একটা গভীরতর সুর শোনা যায়। যেন রাজনীতিকে উপলক্ষ করে, ইংরেজদের বোধগম্য রাজনীতির বহিরঙ্গীয় অগভীর দৈনন্দিন আবরণ ভেদ করে ভারতবর্ষের আত্মকথা—তার চিরন্তনের আত্মার কাহিনী প্রকাশের আয়োজন। এ থেকে অরবিন্দের ভবিষ্যৎ-জীবনের ভ্রমণপথের নির্দেশ কতকটা ধরা যায়।... তিনি যেন ভারতের আত্মদ্রষ্টা ঋষিদের আশ্রম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন।' (২২) যে তপস্যার মাধ্যমে ভারত মহীয়ান হয়ে উঠেছিল, সেই তপোলব্ধ শক্তি অবলুপ্ত হওয়ায় ভারতীয়েরা তাদের দেব-ভাব হারিয়ে ফেলেছে। দিব্যভাবের অভাবে শুধুমাত্র সংস্কারগুলির বশবর্তী হয়ে ভারতের জনগণ মৃতবৎ জীবনযাপন করছে এবং তাদের সমাজজীবনে উত্তরণের পরিবর্তে উত্তরোত্তর অধোগতি দেখা দিয়েছে—এই পটভূমিকায় শ্রীঅরবিন্দের 'কর্মযোগিন' এবং ধর্ম দেশবাসীকে পুনরভ্যুত্থানের পথনির্দেশ দিতে শুরু করেছিল। আসন্ন ধ্বংসের গভীরে নিমজ্জমান জাতির পুনরভ্যুত্থানের জন্য অতীতের সেই সাধনপদ্ধতিকে জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে যাতে সমগ্র জাতির, প্রতিটি দেশবাসীর আত্মা অমৃতলোকের সন্ধান পায়।

সমগ্র জাতির কাণ্ডারী, জনকল্যাণের মূর্ত-চেতনা, শ্রীঅরবিন্দের দিব্যচিন্তা দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত প্রধান সমস্যাগুলিকে কখনও অবহেলা করেনি। তাই ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব দিতে সম্মত হন। এই সম্মেলনে তাঁর দিব্যশক্তিসমৃদ্ধ অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের সামনে মধ্যপন্থীরা জাতীয়তাবাদী দলের মত ও পথের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হোলো। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই সম্মেলন শেষ হওয়ায় প্রমাণিত হোলো—শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ছিলেন না। সুরাট কংগ্রেস অধিবেশন পণ্ড হওয়ার পর থেকে মধ্যপন্থীরা প্রচার করেছিলেন যে, 'সমস্ত হিংসাশ্রয়ী কাজ ও বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে অরবিন্দ।' হুগলীতে শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে অখণ্ডতা পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন শেষ হওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ পূর্ববঙ্গ সফরে যান।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীর স্ব স্ব শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে জাতীয় অভ্যুত্থানের কাজে আত্মদান করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ তিনি রাজনৈতিক নেতাদের উত্থান, পতন এবং মত ও পথ পরিবর্তনের আকস্মিক প্রভাবের ঘূর্ণাবর্তে দেশের ও দেশবাসীর ভাগ্যকে দিগভ্রান্ত করার বিরোধী ছিলেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত রহস্যের মূল সূত্রটি ধরা পড়েছিল। অতীতের কোনো এক শুভ লগ্নে দৈব-নির্দিষ্ট পথেই ভারতের জন্ম, ঐ একই পথে ভারতের মাটিতে বিধাতার প্রতিভূ বিশিষ্ট যোগীশ্বরদের সমন্বয় ঘটেছিল, যুগে যুগে। এঁদের পরা-চৈতন্যের তেজোদ্দীপ্ত প্রভাসমৃদ্ধ লেখনী থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল পরা-বিদ্যাশ্রয়ী এক অনন্য নিরপেক্ষ ধর্ম-নীতি বা সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্মের সার বস্তু বেদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল প্রতীকাশ্রয়ীভাবে; এই প্রতীকাশ্রয়ী ভাব ভাষ্যে পরিণত হয়েছিল উপনিষদে, এই সব ভাষ্য আলোচনা-সমালোচনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল দর্শনে, এই সব আলোচনা-সমালোচনা সাধারণের বোধগম্য করে পরিবেশিত হয়েছিল পুরাণে, এইগুলির অভ্যাসের পথ-নির্দেশ ছিল যোগশাস্ত্রে এবং লক্ষ্য বা আদর্শ ব্যক্ত হয়েছিল বেদান্তে। সনাতন ধর্মের উৎস পরা-চৈতন্য এবং সনাতন ধর্মের পুরোধা স্বয়ং পুরুষোত্তম। সুতরাং সনাতন ধর্মাশ্রয়ীদের বিপদকালে স্বয়ং পুরুষোত্তম বাসুদেব আবির্ভূত হন সনাতন ধর্ম সংরক্ষণের জন্য। সনাতন ধর্ম-স্রষ্টার নির্দেশে নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টিকে অভ্যর্থনা জানায়, রক্ষা করে, এবং স্রষ্টার কাছে প্রত্যাবর্তন সাহায্য করে। এই পথ-পরিক্রমা সৃষ্টির ইচ্ছায় হয় না, স্রষ্টার ইচ্ছাতেই হয়, সুতরাং সনাতন ধর্ম দৈব-নির্দিষ্ট পথেই চলে। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা বন্দী-জীবনযাপন করছেন। সুতরাং তিনি মুক্ত হবেন-ই—তাঁর নিজের ইচ্ছাতেই। দৈব-নির্দিষ্ট সনাতন ধর্মের প্রতিটি নীতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে সমর্পণের মন্ত্র—'তোমাকে মুক্তি দেবার যোগ্য করে নাও।' প্রচ্ছন্ন থাকে আবেদনের মন্ত্র—'আমাকে তোমার কাছ থেকে বিযুক্ত করে রেখো না, তোমার সঙ্গে যুক্ত হলেই তোমারও ছুটি এবং আমারও ছুটি, 'প্রচ্ছন্ন থাকে আর একটি নিবেদন বা প্রার্থনা—ছুটিতে অলস হয়ে থাকব না, তোমার কাজ করব; তুমি যাদের মধ্যে বা যেখানে-সেখানে বন্দী হয়ে কষ্ট পাচ্ছ, তাদের জাগাব, তাদের তোমার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে সাহায্য করব—যাতে তারা আমার মত মুক্ত হয়ে, আমার মতই তোমার কাজে (অর্থাৎ মুক্তি-আন্দোলনের কাজে) নিজেদের জীবন-উৎসর্গ করতে পারে।—জীবনের সব কাজে তুমিই নেতা, তুমিই কর্তা।'—সেই এক সুর, 'নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।'

শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় পূর্ব অঞ্চল সফর শেষ করে কলকাতায় ফিরে তাঁর মানস-সন্তান, দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম এবং স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহশীল এবং সক্রিয় করে তুলতে লাগলেন। এইভাবে পুরো একটি বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে দেশে মিণ্টো-মর্লি সংস্কার-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই প্রবর্তনে অনেকেই বেশ আশ্বস্ত হয়েছেন, এমনকি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও অনেকে তৃপ্ত হয়েছেন। যদিও জাতীয় আন্দোলন তখনও নিষ্প্রভ হয়নি, তবুও শ্রীঅরবিন্দ বুঝেছিলেন যে, আন্দোলনে ভাঁটা পড়তে শুরু হয়েছে এবং দেশবাসী তাঁর প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবার উৎসাহ এবং প্রস্তুতি হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু আন্দোলনের সাফল্য এবং দেশবাসীর আগ্রহের প্রতি তাঁর আস্থা তখনও অটুট ছিল। ১৯০৯ সনের ১৭ই মে ইংরেজ সরকার একটি গোপন সার্কুলার (নং ৮১০ পি-ডি) জারি করলেন তাতে রাজদ্রোহ ও বিপ্লব আন্দোলন বন্ধ করবার উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হোলো এবং এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের উপর গোয়েন্দা বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি অব্যাহত ছিল। তাঁর সম্পাদিত ধর্ম ও কর্মযোগিন পত্রিকার উপর পুলিশের কড়া নজর ছিল।

(ক্রমশঃ)

---

(৮) মণিবন্ধু চৌধুরী। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী উপাখ্যান। পৃঃ ৩।

(২২) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। স্মৃতিকথা।

সারস ।। শামসুর রাহমান

মাঝে মাঝে দেখতুম তাকে দূরবর্তী
বাড়ির চূড়ায় কিংবা শাদা মেঘভর্তি
আকাশের মাঠে, যেন স্বপ্নের নিঝুম বিল থেকে
এসেছে কী প্রকার গোপনতা নিয়ে। ওকে দেখে
সারস হওয়ার বড়ো সাধ
হতো কোনো কোনো দিন। রেশমি অবাধ
দু'টি ডানা মেলে, সাধ হতো, তীক্ষ্ণ চঞ্চুর ডগায় আনি ছেঁকে
অনন্তের ক্ষীর, যা অনেকে
চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়। অনেক সময়
কোনো কোনো সাধ বড়ো দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কখনো আঁতুড় ঘরে, কখনো-বা সমাধি ফলকে
পাখার ঝলকে
নেচে ওঠে রাঙা তালে কেমন ভুবন। পক্ষী গূঢ় প্রত্যাশায়
আমার ছায়ায় ঘোরে, কখনো ঘুমায়।
ছড়ায় পাণ্ডুর জ্যোৎস্না মাথার ভিতর
পাখার বিস্তারে আর হঠাৎ ইতর
বাসনার রোখে অগোচরে
মাংসী গোয়েন্দার মতো পথচারী হৃৎপিণ্ডের চরে।

এখন সে ছেঁড়া কাগজের মতো রূক্ষতায়
বিশ্ব কালো, অন্ধ কাঁটা তারে, নিরুপায়।

৪।৯।৭১

কালাপাহাড় ।। শান্তনু দাস

যখন পৃথিবী ছিলো আলস্য ঝোলানো কোনো জড়-মৃত্তিকায়,
তখনইতো জীবনের প্রথম সোপানে আমি দাঁড়িয়ে সটান।
অনন্ত ত্রিভুবনে
কার শব্দ কণ্ঠে বেজেছিলো—
মাভৈঃ।
জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি মুখের সামনে এনে ঝুলিয়ে রেখেই
আদিম আড়ালে ছিলে রাজা।
আমি সেই বিশ্বাস ভঙ্গের প্রথম স্বৈরাচারী পাপ,
আমি সেই বিস্ফোরণ পৃথিবীর সলাজ ঢাকনা খুলে
গোপন গোপনতম লজ্জা উরু স্তন আর অহঙ্কার মূলে
পবিত্র মুখোশ নিয়ে, উল্লাসে ছিঁড়েছি ফুল ললিত উদ্যানে।
স্বপ্নের পাহাড় ক্রমে গুঁড়িয়ে ধুলোয়,
হাতের তালুতে ভেঙে নিমগ্ন পাষাণ ছুঁড়ি ত্রিভুবন জুড়ে।

হা রাজা :
হায় পিতামহ :
অনন্ত জীবন ধরে—
স্থবির বৃদ্ধের মতো দেখে যাচ্ছো কোন্ বধ্যভূমি?
দ্যাখো, আমার বুকের মধ্যে গোটা এক পান্থপাদপ
সারাদিন এতোল বেতোল, অবশেষে রাত্রির আকাশ ছুঁয়ে
থোলো আঙুরের মতো অন্ধকার মুখে নেমে এলে......
কারা যেন বুক ফুঁড়ে পান করে উন্মত্ত শোণিত।

আমি আজও বেঁচে আছি, পিতা,
আমি সেই অনন্ত বিশ্বাসভঙ্গের এক যূথচারী পাপ
আমি সেই বিস্ফোরণ, পৃথিবীর গোপনতম লজ্জা,
সে কালাপাহাড়।।

নাচিকেতা ।। সঞ্জিতা দাশ

অবিন্যস্ত নিসর্গেও একটি বিন্যাস থাকে,
আমি এখনও শিখলাম না সেই মন্ত্রগুপ্তি
যা আমাকে পার করে নিয়ে যাবে আমাকেই।
হে পিতঃ, আমায় দান করো মৃত্যুর হাতে
এই যজ্ঞে,
আহরণ করে আনি আগ্নেয় জ্ঞান
অভাবে যার
আজও মানুষ
সুসংবদ্ধ নয়।
আমাকে পাঠিয়ে দাও মৃত্যুর বনে বনান্তরে
জীবনের সমিধ সংগ্রহে।।

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সজল বলল, 'তোমাকে পুলিশ খুঁজছিল কেন?'

'কেন আবার? এই এমনি?'

শুচিতা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'নেতা, নেতা হবেন উনি। আর আমরা ওর জ্বালায় মরি! এদিকে বাবাকে জেলে আটকে রেখেছে। ঘরে কেউ নেই। আর তখন ও'র কাজ হল বিপ্লব, বিপ্লব করতে হবে। বৃটিশ তাড়াতে হবে!'

বিশ্বময় শুচিতার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, 'এবার মিটিং-এ তোকে মাইকের সামনে এগিয়ে দেব। যেমন বক্তৃতা দিচ্ছিস।'

শুচিতা বলল, 'আচ্ছা সজলদা, আপনিই বলুন। কার না রাগ হয়। গেল ত গেলই। এক মাস কোন খবর নেই। আর ঝড়ের মত একদিন হঠাৎ এসে বলল, দে খেতে দে। লক্ষ্য রাখিস, পুলিশ এলে ডেকে দিবি। পেছনের দরজা দিয়ে পালাব। বললাম, 'কী এত তোমার কাজ?...সেই বাবাও ত দেশের কাজ করে। কই, তোমার মত নয়ত? উনি বলেন কিনা—বাবার কাজ? হুঁ, তুই একটা ইডিয়েট। বাবার মত কাজ করলে হাজার বছরেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না। ঐ কেবল জেলে গেলে কখ্খনো স্বাধীনতা আসবে না। বিপ্লব চাই, বিপ্লব। শুনেছিস, সেদিন গভীর রাত্রে জয়প্রকাশের আর অরুণা আসফআলীর সঙ্গে বিহারের এক গ্রামে দেখা হল। আমাদের প্ল্যান তৈরী। এই শেষ মার।

'আচ্ছা তুই চুপ করবি?' বিশ্বময় চায়ের প্লেট নামিয়ে রেখে বলল।

সজল কেবল বিশ্বময়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এই বিশ্বময় বিপ্লবী? এই বিশ্বময় থানা ভেঙেছে, রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে, সেতু উড়িয়ে দিয়েছে! এর মধ্যে এত আগুন? এতো উত্তাপ! এতো শক্তি! অথচ এই বিশ্বময় ছবি আঁকে, তন্ময় হয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শোনে। তার বিছানার একপাশে থাকে বাঁধানো গীতবিতান!

বিশ্বময় সজলের দিকে সরে এসে বলল, 'শুচিটা সব গোলমাল করে দিল। তুমি কি কাজে এসেছো—তাই জিজ্ঞেস করা হল না?'

সজলও কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু পরিবেশের সুরটা এতো চড়ায় বাঁধা ছিল যে, বলতে ইচ্ছা করছিল না।

তবু এক সময় বলল, 'সে অনেক কথা বিশ্বময়। একটা ঝড়ে জীবনের সব ওলট-পালট হয়ে গেল আমার।'

॥ ১২ ॥

সজল আর একবার জীবনের মোড়ে এসে দাঁড়াল। নোয়াখালিতে বিশ্বময়ের সঙ্গে চলে গেলে, তার পুরনো জীবনটার ওপর এবার ছেদ পড়ে যাবে। চাকরী নয়, অরুণা নয় আরতি নয়, এবার দেশের কাজ, পীড়িত দুর্গত মানুষের কাজ! সজল বুক ভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিল, সমুদ্রতীরের কোন নারকেল বীথি ঘেরা একটা ছোট্ট কুটির। কুটিরটা কিছুদিন আগে মুসলমানরা পুড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ীর সকলেই হয়ত দুর্বৃত্তদের নিষ্ঠুর ছোরার আঘাতে মারা গেছে, বা কোনভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। শুধু আছে, বাড়ীর পুরনো একটা দিশি কুকুর। সেই পরিত্যক্ত, বিধ্বস্ত কুটিরে সে আছে আর বিশ্বময় আছে। চারদিকে মুসলমানদের বাড়ী। রাত্রে দূরে থেকে 'আল্লা হো আকবর' চীৎকার ভেসে আসে। বা দূরে কোথাও গৃহদাহের আগুনে আকাশ লাল হয়। তবু সে আর বিশ্বময় নির্ভয়ে আছে! সমস্ত হিংস্রতার বিরুদ্ধে তারা একটা নীরব নম্র প্রতিবাদ। প্রতিবাদ, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের, হিংসার বিরুদ্ধে ভালোবাসার, আঘাতের বিরুদ্ধে আরোগ্যের? পশুত্বের বিরুদ্ধে মানবতার।

গান্ধীজীর শিবিরটা হয়ত একটু দূরে। গান্ধীজীকে প্রতিদিন সে দেখবে, তাঁর প্রার্থনা সভায় যে সব রবীন্দ্রনাথের গান হয়, তা সে প্রাণভরে শুনবে।

গান্ধীজী যেদিন শেষবারের মত সেবাগ্রাম ছেড়ে আসেন, তখন বলেছিলেন, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, অহিংসার উপদেশ বর্ষণ করা অর্থহীন। অতএব উদ্যত হিংস্রের সামনে দাঁড়িয়েই অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হোক। সারাজীবন ধরে যে কথা বলে এসেছেন, এবার বাস্তবতার কষ্টিপাথরে তার যাচাই হয়ে যাক।

সজল নিজের মনেই এমনি একটা ছবি আঁকছিল। এ ছবি আঁকা, স্বপ্ন দেখার মত। সজল আশৈশব এমনি ছবি দেখে এসেছে! এবং স্বপ্ন দেখতেই সে অভ্যস্ত। পঁচিশ বছরের জীবনে, সমস্ত রূঢ় বাস্তবতার মধ্যেও, এই স্বপ্ন দেখার অবসান কখনো ঘটল না তার। ছেলেবেলায় যখন সে দুপুরবেলা নির্জন খালপাড়ে বা শ্মশানের কাছ দিয়ে যে রাস্তাটা দূরে ললাটের দিকে চলে গেছে, সেই উঁচু বাবলাবন ঘেরা পথটায় একা একা অকারণে, অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়াত, তখন থেকেই সে মনে মনে স্বপ্ন দেখত, আকাশ কুসুম কল্পনা করত। সে স্বপ্নের সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে পরবর্তী জীবনের কোন যোগ নেই ঠিক একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু অধিকাংশই অবাস্তব। যেটুকু মিলেছে, তা শুধু কলকাতা আসা। কলেজ থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে—এ স্বপ্ন সে দেখত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তার হয়নি। তবু এই স্বপ্নই তাকে এই মহানগরীর বিচিত্র জীবনস্রোতের মধ্যে টেনে এনেছে! নইলে, কোথাও স্কুল শিক্ষকের নিরুপদ্রব জীবন, যা গ্রাম দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক করে থাকে, তা-ই সে করত। কিন্তু সে তো সেইখানেই থেমে

থাকেনি। বকুল, তার এই শহরে আসার উপলক্ষ্য মাত্র।

অর্থাৎ সজল যে, প্রচলিত জীবন-ধারাকে অস্বীকার করে, শহরে এসেছে। এ তার আশৈশব স্বপ্ন দেখার, এক ক্ষীণ পরিণতি। কিন্তু এইটুকু ছাড়া স্বপ্ন দেখার, আর ত বিশেষ কিছু মেলেনি! কোথায় তার সেই কবি হওয়ার সাধনা, কোথায় তার সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শান্ত নদীর ধারায় অবগাহন!

আজ হঠাৎ যখন একটা পালাবদলের আহ্বান শোনা যাচ্ছে, তখন সজল নিজেকে আর একবার বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছিল!

বাসাটা তাহলে তুলে দিতে হবে। ছোটমাকে আর সুলতাদিকেও লিখতে হবে। সুলতাদি নিশ্চয়ই বারণ করবে না। সুলতাদি তো তাকে খুশি মত চলার ছাড়পত্র দিয়েছে। কিন্তু সেইটাইত সব নয়। সুলতাদিকে নিশ্চয়ই জানাতে হবে। ছোটমাকে টাকা পাঠিয়েছে কদিন আগে। আর পাঠাতে পারবে কিনা কে জানে!

সজল হিসেব করে দেখল, না, বাসা তুলে দেবার কথাটা এখন বলা ঠিক হবে না। এ মাসের ভাড়া তার দেওয়া আছে। মাস শেষ হতে এখনও দশদিন বাকি। ছাড়তে হলে, দু একদিন আগে বললেই চলবে। হ্যাঁ, একটা সমস্যা সেতারটা নিয়ে। সেতারটা বয়ে নিয়ে বেড়ানো অসম্ভব এবং অর্থহীনও বটে। বাজাতে জানলে, সে না হয় কোনভাবে ব্যবস্থা করা যেত।

সজল সেতারটা দেয়ালের কোণ থেকে নিয়ে এসে বিছানায় বসল। 'কভার'টা খুলে ফেলল। তারগুলোয় হাত বুলালো একবার। কী রকম একটা মিষ্টি আওয়াজ বেরল। হ্যাঁ, এই পর্দাটাকে 'সা' বলে। বাঁধার সময় আব্বাস এই পর্দাটা টিপে রেখে, অন্য তার মেলাত। হ্যাঁ, এমনি করে বসত।

সজল পা মুড়ে বসল। ডান হাতের কনুইটা সেতারের নিচের দিকে মোটা অংশটার ওপর রাখল। সা পর্দাটায় হাত দিয়ে এমনি তারটা টানল। কি যেন একটা অভাব, অনুভব করছিল। হ্যাঁ, মিজরাব নেই। একটা কিনলে হত, ঐ বুড়োর দোকান থেকে।

আবার সজল ভাবল, সে তো নোয়াখালি চলে যাচ্ছে। কাজেই মিজরাব কিনে কি হবে! আব্বাস সেতারটাকে খুব ভালবাসত। যন্ত্রটা পুরনো। তার ওস্তাদের হাতের জিনিস। ওস্তাদের হাতের জিনিসের ওপর ছাত্রের খুব দরদ থাকে! আব্বাস দু একদিন গল্প করেছিল তার। একবার হঠাৎ একটা মীড় নিতে দেখে, ওস্তাদজী আনন্দে কেমন করে উঠেছিল! কোন ছাত্রকে সমকক্ষ হয়ে উঠতে দেখলে ওস্তাদের নাকি খুব ভালো লাগে। অবশ্য সকলের নয়। কোন কোন ওস্তাদ ঈর্ষাও করে। কিন্তু ভালো, হৃদয়-বান ওস্তাদ হলে, শিষ্যকে তার জন্য বেশি ভালোবাসে। —ইস, তা কেমন করে বাজাত। মাঝে মাঝে বাঁ হাতটা দেখাই যেত না। আব্বাস বলত,—দ্রুতলয়ে তান নিচ্ছিরে। তারপর তিনবার একই রকমের কয়েকটা পর্দা বাজিয়ে বাজিয়ে বলত, এই দেখ, তেহাই দিয়ে নেমে এলাম। সজলও কেমন একটা গতিবেগ, ঝোঁক আসছে বলে অনুভব করত।

অনেকদিন আগের একটি সন্ধ্যার কথা সজলের মনে পড়ছিল।

সেদিন এসে দ্যাখে, আব্বাস কোথায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। দামী ফিনফিনে সাদা পাজামা, পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির ওপরে কালোরঙের জরির কাজ করা জহর কোট জাতীয় কি একটা জামা। আব্বাসের সেই ফর্সা রঙ, লম্বা পাতলা চেহারা, একটু লম্বাটে ধরনের সুন্দর মুখ—কথা বলার সময় সুন্দর শুভ্র দাঁতগুলো দেখা যায়। আজকের এ আব্বাসকে সজল চেনে না, এ বেশে কখনো তাকে দেখেনি।

সজল অবাক হয়ে বলল, 'আমি এলাম, তুই আবার চললি কোথায়?'

আব্বাস ইস্ত্রিকরা সাদা রুমালটা পকেটে ঢোকাল। একটু পাউডার মাখল। চুলটা ঠিক করল একটু। বলল, 'যাবি আমার সঙ্গে?'

'কোথায় বলবি ত?'

'চল না, যেখানে যাই, সেইখানেই যাবি।'

আব্বাস সেতারটা নিল। 'চল গাড়ি এসে গেছে, হর্ন দিচ্ছে।'

আসরে খুব বেশি লোক ছিল না। বড়লোকের বাড়ীর ঘরোয়া আসর। দামী শাড়ী, গহনার একটা জীবন্ত প্রদর্শনী। সজল অবাক হয়ে দেখছিল। কীরকম অভ্যর্থনা! আব্বাস আজ এখানে বাদশা! অনেকক্ষণ চুপ করে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিল আব্বাস। তারপর সেতারটা তুলে নিল। বেঁধে রেখেছিল একটু আগে।

শুধু একবার মীড় দিয়ে 'সা'তে এসে দাঁড়াল।

কেটে গেল কয়েক সেকেন্ড। তারপর নিচের একটা পর্দায় এসে অনেকক্ষণ গমকের কাজ করল। সজল অবাক হয়ে দেখছিল। আব্বাস একটি একটি করে, পর্দা এগিয়ে যাচ্ছে। নিচে নামছে আর সুরগুলো জীবন্ত শিউলি ফুলের মত ভেজা মাটির ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে যেন।

প্রায় পৌনে একঘণ্টা আলাপের পরে আব্বাস গৎ ধরল। প্রথমে ঢিমে। তারপর একটু একটু করে বাড়ল। তবলাও বাড়ছিল। বাড়তে বাড়তে অনেকক্ষন পরে একসময় দ্রুত লয়ে ঝালা বাজিয়ে আব্বাস সেতার নামিয়ে রাখল। তখন ওর কপালে মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

সারা ঘরটা সুরে ভরে গেছে। এখন নিস্তব্ধ।

তবলচি তখনো তবলায় টকটক করছিল। বলল, 'আর একটু বাড়ুন।' অর্থাৎ তার হাতে এখনও অনেক লয় আছে। কথাটার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জের ভাব ছিল।

আব্বাসের কি মেজাজ হল কে জানে। ঝট্ করে সেতারটা তুলে নিয়ে, পলকের মধ্যে একটা দ্রুত তান নিয়ে নিল।

হ্যাঁ, আব্বাস চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়েছে।

তারপর কি যে আব্বাস বাজাচ্ছিল, সজলের কানে কিছু যাচ্ছিল না। হাত দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুতের মত সুরগুলো সারা ঘরে দ্রুত কাঁপছিল শুধু।

লয় রাখতে না পেরে তবলা থামল। কিন্তু আব্বাস তখনো থামেনি।

সেদিন সম্রাটের মত আব্বাস ফিরে এসেছিল। গাড়ীতে বলছিল, 'তবলচি বুঝতে পারেনি, আমি লয় হাতে রেখে বাজিয়েছিলাম। লোকটা বোকা। কার ভেতরে কি আছে না জেনে চ্যালেঞ্জ করতে নেই।'

প্রচুর খেয়ে সজলের পেটটা ভারি লাগছিল। এসব খাবার জীবনে সে কখনো চোখেও দেখেনি। আব্বাসের জন্য সেদিন তার কত গর্ব! সেইসব সুন্দরী তরুণীদের আব্বাসের জন্য কত আগ্রহ! আব্বাস কথা বললে ওরা ধন্য হয়ে যাবে!

সজল বলল, 'লয় হাতে রাখা কাকে বলেরে'।

ক্লান্ত আব্বাস গাড়ীর সিটে এলিয়ে পড়ে বলল, 'তোর মাথাকে। শিখতে বললাম, শিখবি না। খালি এটা কি ওটা কি? চুপ কর এখন?'

আব্বাস ধমক দিল সজলকে।

কিন্তু সজল আবার বলল, 'কি বাজালি? বাগেশ্রী?'

আব্বাস হেসে তাকাল। পিঠে একটা কিল মেরে বলল, 'বুঝলি কি করে?'

নামটা ঠিক হওয়ায় সজলের খুব ভাল লাগছিল। বলল 'তোর কাছে এদ্দিন যাওয়া-আসা করলাম তবে কি এমনি? এই, সুরটা শোন—মা ধা নি সা। কি হয়েছে?'

আব্বাস কী খুশি হয়েছিল সেদিন!

সজল সেতারটার গায় হাত বুলাচ্ছিল। সেতার নয়, যেন আহত মুমূর্ষু আব্বাস শুয়ে আছে।

আব্বাসের বাসায় যাওয়া আসার ফলে সুর সম্পর্কে কিছু প্রচলিত রাগরাগিণী সম্পর্কে সজলের আবছা ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন সে সব মৃত অতীতের কাহিনী।

সজল সেতারটায় কভার পরাল। তারপর ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সজলকে দেখে আরতি কি করবে, কোথায় বসাবে ঠিক করতে পারছিল না। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অত্যন্ত খুশি মনে হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল, আরতি তার মনের আনন্দকে প্রকাশ না করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

একটু পরেই ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এল।

'সাবধানে বসবে কিন্তু, মোড়াটা ভাঙা। কাপড় ছিঁড়ে যেতে পারে'।

সজল বসতে বসতে বলল, 'বসার আগেই ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ যে। তা তোমার মা, বাবা কোথায়? কাউকে দেখছি না?'

আরতি দেয়ালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে-ছিল। সজল লক্ষ্য করল, ও সেতারটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ও'রা কোথায়! বললে না?'

'ও, বাবা, মা সবাই কোন্নগর গেছে। ছোটমামার বিয়েতে।'

'শুধু তুমি যাওনি।'

'না যেতে পারলাম না। ছাত্রের পরীক্ষা সামনে।' আরতি চুপ করল।

সজলও যেন বলার কথা হারিয়ে ফেলেছিল। অথচ আরতিকে দেখার, তার সঙ্গে কথা বলার একটা অতি নিভৃত, গোপন ইচ্ছা, আনন্দ, আসতে আসতে তার মনে একটি সুন্দর মধুর গন্ধ ছড়াচ্ছিল। তার চেনা-শোনা জগতের মধ্যে আরতিই যেন করুণা, প্রীতি, ভালোবাসার একটি সলজ্জ স্নিগ্ধ প্রতিমূর্তি। তার মনে হত, হৃদয়ের ঐশ্বর্য, ছন্দ, এই শ্যামল, নম্র, নিরাভরণ আরতির মধ্যে অসীম, অতুলনীয়।

'হঠাৎ সেতারটা ফিরিয়ে দিতে এলে যে?' —আরতি আস্তে আস্তে বলল।

সজলের মনে হল, এ কথাটা প্রশ্ন নয়। একথাটা একটা উত্তর, যে উত্তর আরতির নিজের মনের মধ্যেই রয়েছে। অর্থাৎ সে চায়, সজল যেন সেতারটা তার নিজের কাছেই রাখে।

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'না, আরতি, ওটা ফিরিয়ে দিতে আসিনি। কদিন বাইরে যাব, তাই তোমার কাছে রাখতে এলাম। ফিরে এসে আবার নিয়ে যাব, তবে কবে ফিরব তা জানি না।'

আরতি একটু শান্ত হল, আশ্বস্ত হল, বলে সজলের মনে হচ্ছিল।

'কদিনের জন্য বাইরে যাবে?'

সজল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'এক বন্ধুর সঙ্গে নোয়াখালি যাচ্ছি।'

আরতি চমকে উঠল একটু! 'নোয়াখালি? ওখানে ভীষণ 'রায়ট' বেধেছে। এই আজকের কাগজেই বহুলোক মরার ঘরবাড়ী পোড়ার খবর আছে।' আরতি আজকের কাগজটা খুঁজতে লাগল। —'হ্যাঁ, এই দ্যাখো।'

সজল কাগজটা দেখল না। বলল, 'এ খবর জানি, আরতি। জেনেই যাচ্ছি।'

'জেনেই যাচ্ছ? কেন? কেন? একজন মারা গেছে, আর একজন জেনেশুনে মরতে যাচ্ছ! আমি কী অপরাধ করেছিলাম তোমাদের কাছে?'

আরতির মুখ থেকে একথা শুনবে বলে সজল স্বপ্নেও ভাবেনি। আরতি স্বল্পভাষী, আরতি অত্যন্ত শান্ত। তাই অবাক হয়ে তাকাল সজল। কিন্তু আরতি দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তার চোখ দুটো পৃথিবীর কেউ দেখতে না পায়, শুধু ঐ অন্ধ, কঠিন দেয়ালটাই দেখুক।

সজল একটা মৃত, নিশ্চল মূর্তির মত বসে রইল। কোথায় যেন তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একটা বিপ্লব ঘটে গেছে কোথাও। যেন বসন্তের অরণ্যে, এইমাত্র প্রথম একটা হিরণ্ময় উন্মত্ত ঝড় বয়ে গেল!

সজল ফিরে দেখে আরতি নেই।
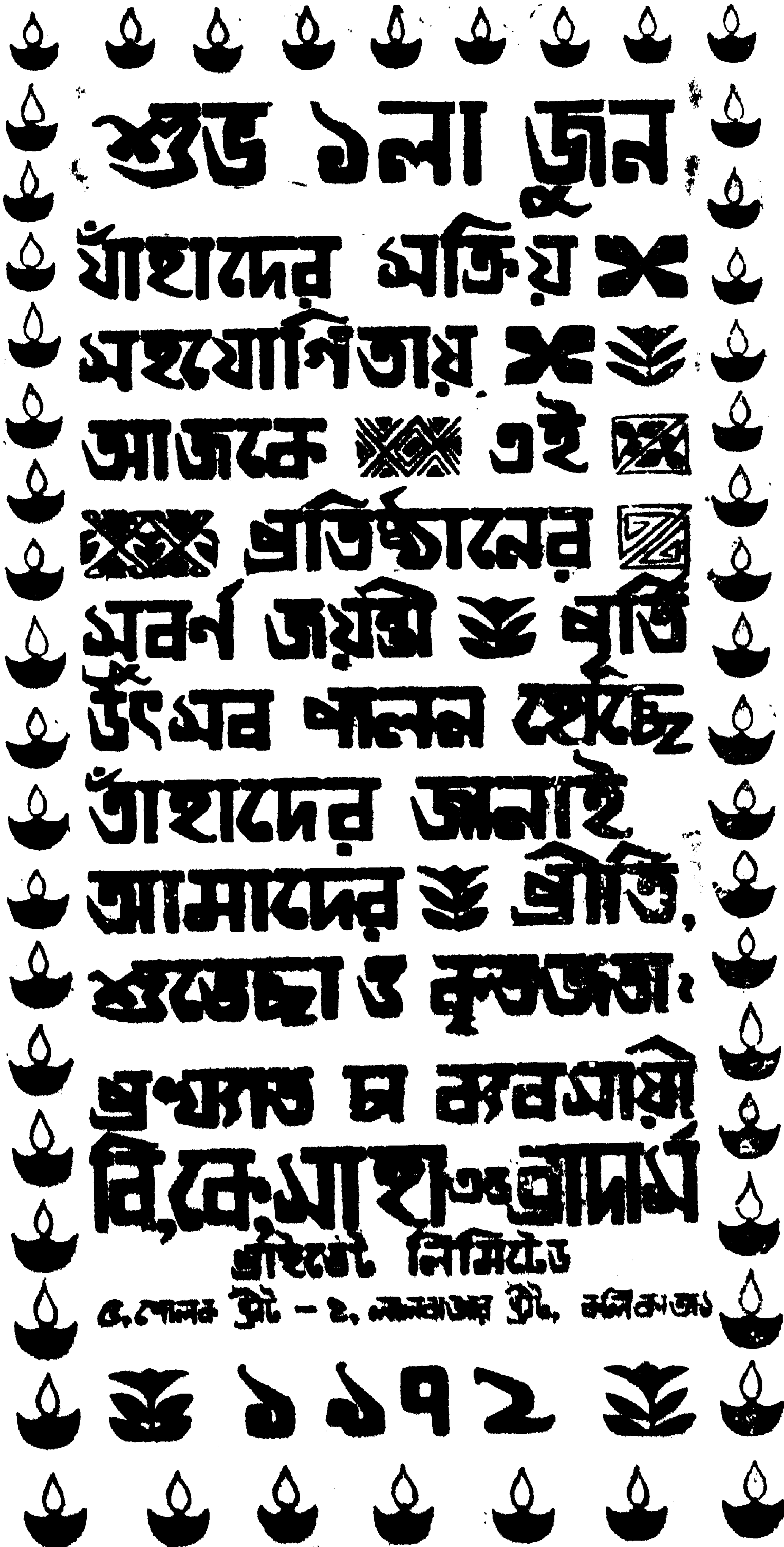
বাইরে হেমন্তের স্বর্ণাভ রৌদ্রে আকাশ ছেয়ে আছে, যে আকাশটা একটা সমুদ্রের মত শান্ত! অদূরের নিষ্পত্র গাছটাকে এখন একটা কোনো মহৎ শিল্পীর আঁকা বিস্ময়কর স্কেচ বলে মনে হচ্ছে। দূরে শূন্যতার পটভূমিকায় ওই স্কেচটাই যেন একমাত্র এমন কোনো বস্তুর প্রতীক, যা নিঃসঙ্গ, যা নির্জন, যা শব্দহীন অথচ গভীর অর্থবহ, গভীর বাঙ্ময়, গভীর ধ্বনিময়!

'কিছু মনে কোরো না সজলদা, তোমার কথাটা একটু ভালো করে বুঝিয়ে বল তো।'

সজল তাকিয়ে দেখে, আরতি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে এক কাপ চা।

চায়ের কাপটা নিতে নিতে সজল বলল,

'তুমি একটু স্থির হয়ে বোসো, আমার কথা শোনো।'

আরতি বলল, 'তা হলে দাঁড়াও, ভাতটা নামিয়ে আসি!'

কিন্তু দু মিনিট পরেই আরতি ফিরে এল। 'তুমি স্নান করেছ?'

সজল বলল, 'না, স্নান করে বেরইনি, ভুলে গেছি।'

আরতি হাসল একটু। 'রান্না করে এসেছ?' আরতি জানত, সজল নিজের হাতে রান্না করে খায়।

'সে সব হবে অখন। তুমি ভাত নামিয়ে এসে বোসো। আমি চলে যাব।'

'না, আমি বলছিলাম, ওটা আজ এ বেলা এইখানেই হোক।'

সজল লজ্জা পাচ্ছিল। বেলা হয়েছে সত্যি। কিন্তু ফেরার সময় কোন হোটেলে খেয়ে যেতে অসুবিধা কি? স্নান পরে করবে।

আরতি বলল, 'ওবেলা আর রান্না করব না। তাই দুবেলার মত সব কিছু করেছি। তা বলে, তোমাকে রাজভোগ খাওয়াব না। আমি যা খাই, তাই খাওয়াব। কি? কথা বলছ না কেন?'

আরতির বলার মধ্যে এতো আন্তরিকতা ছিল যে সজলের না বলতে কষ্ট হচ্ছিল। বলল, 'আমি জাতে বামুন। দক্ষিণা নেবার অভ্যেস।'

'বেশ ত, কি দক্ষিণা দিতে হবে বল?'
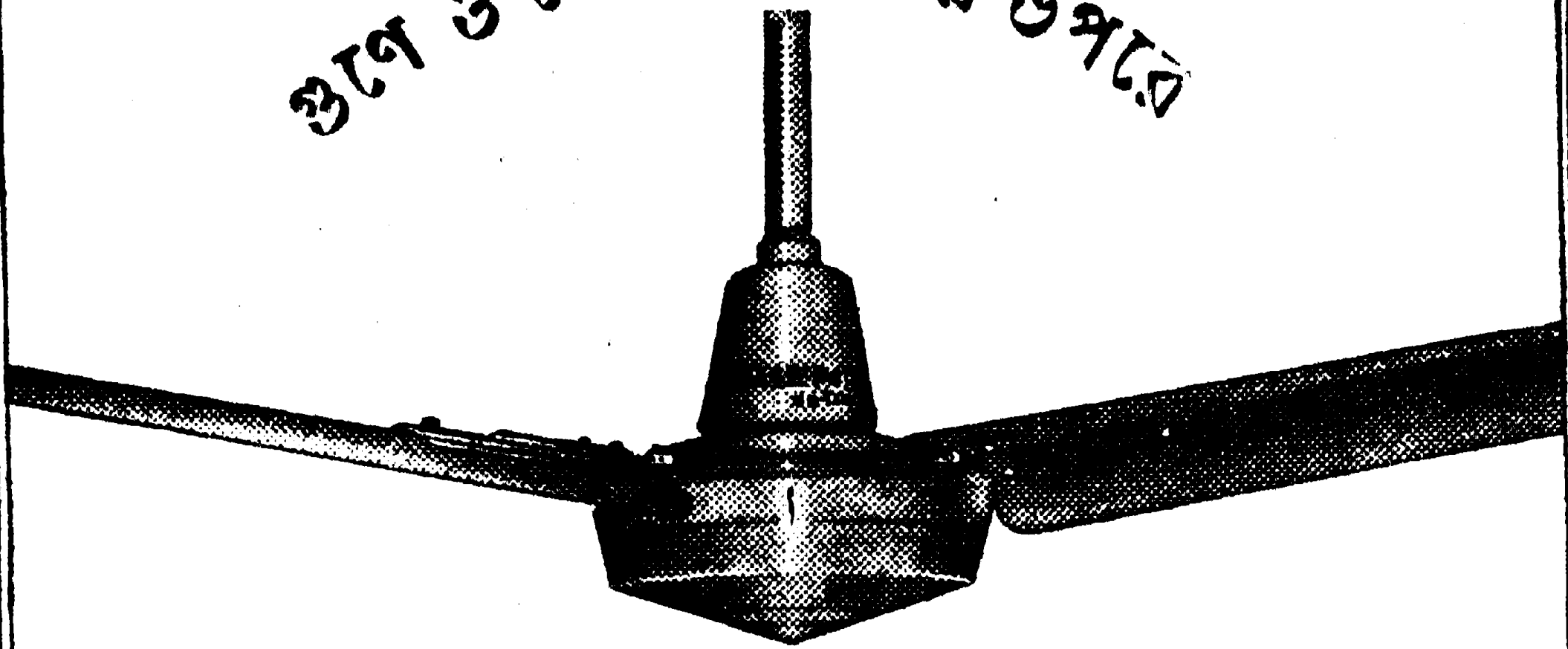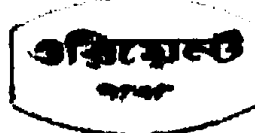
সজল চা-টা শেষ করল, 'পরে বলব।'

আরতি একটু পরে ফিরে এসে সামনে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। সজল বলতে শুরু করল।

আরতি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'দোকানটা তুলে দিলে? কেন? এ বুদ্ধি কে দিল তোমাকে? তুমি কি পাগল?'

সজল উত্তর দিতে পারছিল না। দোকানে বিক্রি হচ্ছে না এখন। দুদিন পরে হতে পারে। তাই কোন জোরালো যুক্তি তার নেই। এ এক চিরন্তন মনের খেলা। প্রশ্ন করে লাভ নেই। এ-জীবন গণিতের পথ বেয়ে চলে না, 'লজিক' এখানে অনাবশ্যক।

শুধু চলার আনন্দটুকু, দুঃখ-বেদনাটুকুই সত্য! এই তার সঞ্চয়, তার আগামী জীবনের বিশুদ্ধ পাথেয়! সজল চুপ করে বসে রইল!

আরতি বলল, 'একবারও ভাবলে না, কলকাতায় কি করে থাকবে, টাকা কোথায় পাবে?'

সজল ইতিমধ্যে কিছু সাহস সঞ্চয় করেছিল। তাই বলল, 'এই ত সেদিন একটা ইন্টারভ্যু দিয়ে এলাম। দ্যাখো, ঠিক লেগে যাবে।'

আরতি অবশ্য একথা বিশ্বাস না করে পারল না। সজলের ভাল রেজাল্ট। কাজেই চাকরী হতে পারে।

'ত নোয়াখালি যাবার খেয়াল হল কেন?'

সজল উৎসাহ পেল। বলল, 'তুমি আমার বন্ধু বিশ্বময়কে দেখনি। ওর মত বুদ্ধিমান, ওর মত পড়াশোনা আমি আর কারুর মধ্যে দেখিনি। সে বলছে, মানুষের মুক্তি এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্রত। সে যাচ্ছে দাঙ্গার জায়গায়। সবচেয়ে খারাপ অঞ্চলেই সে থাকবে। গান্ধীজীও যাচ্ছেন পরে। আমি বিশ্বময়ের সঙ্গে যেতে চাই।

আরতি গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোমার কথাটা খুব পরিষ্কার নয় সজলদা। বিশ্বময়বাবুর কথাটা তবু বুঝতে পারি। তিনি রাজনীতি করেন, তাঁর সাহস আছে, বোধহয় তাঁর মনের জোরও আছে। কিন্তু তুমি রাজনীতি কর না, তুমি দুর্বল মানুষ। তুমি কেন যাবে?'

সজল এ কথার কোন উত্তর দিতে পারল না।

আরতি আবার বলল, 'আব্বাসকে আমি বাসা ছেড়ে চাঁদপুরে কাকার কাছে যেতে বলেছিলাম। একবার নয়, বহুবার। কত অনুরোধ করেছিলাম, একদিন কেঁদে-ছিলাম। তবু, তবু সে শোনেনি। বলে, আমি সেতার বাজাই, আমি মুসলমানও না, হিন্দুও না, আমি মানুষ। ওরা আমায় মারবে কেন?' সজলদা, তার ফল কি হয়েছে মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সে মুখ তোমার মনে পড়ে না?'

আরতির চোখ জলে ভরে এসেছিল। মুখ নিচু করে বসেছিল সে। সজল নীরবে দেখল, এক ফোঁটা জল সিমেন্টের দাওয়ার ওপর ঝরে পড়ল। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ তেমনি করে অশ্রুর ফোঁটাটা একটা স্তব্ধ চোখের মত জেগে রইল!

আরতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলল, 'যাবে যাও। তোমাকে বাধা দেবার, আমার কতটুকু অধিকার? কি অধিকার? কিন্তু কেন যেন মনে হত, একটা গোপন দুঃখ তুমি আমি, দুজনে ভাগ করে নিয়েছি! আর কেউ না, কেউ না!'

সজল এ আলোচনা সহ্য করতে পারছিল না। বলল, 'আমি জানি আরতি। চিরদিন সে কথা মনে থাকবে। চিরদিনই সে দুঃখ ভাগ করে নেব আমরা। যতদিন বাঁচব।'

আরতি চলে গেছল। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'বাথরুমে তেল, সাবান, তোয়ালে আছে। স্নান করে এসো।'

সজল মোড়াটায় তখনও চুপ করে বসেছিল।

বস্তীর পাশের ঘর থেকে কে একটি মেয়ে সজলকে উঁকি মেরে দেখে গেল।

পিয়ন কড়া নেড়ে ডাকল, 'চিঠি আছে।'

আরতি চিঠিটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

সজল শুনেছিল, আরতি চিঠি পড়ে শুনিয়েছে ওদের। 'পুজনীয় বাবাজী শ্রীচরণেষু—' বলে সব কথা কে একজন রহস্য দিয়ে ঢেকে দিল।

সজলের উঠতে ইচ্ছা করছিল না।

আরতি ফিরে এসে বলল, 'কি স্নান করতে গেলে না?'

'ভালো লাগছে না।'

আরতি মিষ্টি করে হাসল। 'সজলদা, তুমি কেমন যেন ছোট ছেলের মত।'

সজলদের বাসায় এখনও নেই। ফাঁকা জায়গায় কলের নিচে স্নান করতে হয়। তাই এই ভাঙা বাথরুমটাও ভাল লাগছিল সজলের। সোপ কেসে একটা সাবান। সজল গন্ধটা শুঁকল একবার। আরতিও এই সাবানটা মাখে। কেন যেন এ কথাটা মনে হতে ভাল লাগল তার। তার মনে হচ্ছিল, আরতিরা ঠিক বস্তীতে থাকার মত লোক নয়। ওর বাবাকে প্রথম দিন দেখে ভালো লেগেছিল। পড়াশোনা নিয়ে থাকেন। তার বাবার মত। দারিদ্র্য তাদেরও ত চিরন্তন সঙ্গী। কিন্তু সেই দারিদ্র্য অপমানের কালি এদের জীবনে মাখায়নি। এখানে এই দারিদ্র্যও যেন সুন্দর!

স্নান শেষ করে এসে দ্যাখে আরতি তার বাবার ঘরের মেঝেতে পাটি পেতে একটা বিছানা করে রেখেছে। সাদা বেড কভার, সাদা বালিশ তোয়ালে, দেখতে বেশ

সজল বিছানায় বসল।

আরতি ঘন একরাশ দীর্ঘ খোলা চুল পিঠে ছড়িয়ে স্নান করার জন্য বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল। সজলের ডাক শুনে ফিরে এল।

সজল সেতারটার কভার খুলে ফেলে-ছিল। বলল, 'খাবার আগেই দক্ষিণা নেব। যদি শেষে না দাও।'

আরতি হেসে বলল, 'আচ্ছা, লোভী বামুন ত?'

'বোসো ওখানে।'

সজল সেতারটা আরতির হাতে তুলে দিল। 'একটু বাজাও, আমি দেখি।'

'বারে, আমি স্নান করতে যাব না?'

'তার জন্য অনন্ত সময় পড়ে আছে।'

•

'আচ্ছা পাগল। দাঁড়াও, মিজরাবটা নিয়ে আসি।'

সজল কেবল আরতির দিকে তাকিয়ে-ছিল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, ছন্দ, আজ এই দরিদ্র ঘরে, এই প্রায় দ্বিপ্রহরের উদাসীনতায় কে যেন এই মুহূর্তে সাজিয়ে রেখে গেছে। খোলা চুলগুলো শীর্ণ কোমর ছাপিয়ে নেমেছে। দুটি শান্ত চক্ষু, মুখ, আনত, অনাবৃত নিটোল দুটি শ্যামল বাহু, কী অসীম ক্ষমার আশ্বাসে পরিপূর্ণ, শরীরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পুষ্ট, পরিমিত বুক, দীর্ঘ গ্রীবায় গীতি-কবিতার মত শাণিত রেখার অলংকার!

সজল এ কাকে দেখছে? সজল এ কোন দেবীপ্রতিমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে এমন অপার্থিব সৌন্দর্যের অমৃত পান করছে? সজল এ মুহূর্তে কোথায় কোন দূরান্তে, সূর্যাস্তের শেষ আলোর ছবি যেখানে আঁকা হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর নিঃশব্দ প্রণাম দু চোখ ভরে দেখছে!

আরতি চোখ তুলে তাকাল। 'কোন জগতে আছ এখন? সুর কানে যাচ্ছে বলে ত মনে হয় না।'

সজল বলতে পারল না, আরতি, তোমাকে আজ নতুন করে আবিষ্কার করলাম। তোমাকে এতদিন দেখিনি, আজই প্রথম দেখলাম, প্রথম চিনলাম, আজই তোমাকে প্রথম ভালো লাগল!

'শোন, সজলদা—' আরতি আবার বাজাতে লাগল।

সজল একটা করুণ উদাসীন অনু-ভবের স্পর্শ পাচ্ছিল।

একটু পরেই আরতি থামল। 'নাও সেতারটা ধর, বেলা হয়ে গেল।'

সজল বলল, 'একটু শেখিয়ে দাও না আমাকে?'

'ওমা, তুমি বাজাবে নাকি? বেশ, বাজাও!'

সজল চমকে উঠল, বিদ্যুতের স্পর্শে শরীরটা কেঁপে উঠল একবার।

আরতি মিজরাবটা সজলের আঙুলে পরিয়ে দিয়েছে!

শিল্পী : মেজর জিতেন হাজারিকা

প্রদর্শনী

এপক্ষের কলকাতায় সংক্ষেপে উল্লেখ্য ঘটনা ইন্দ্র দুগারের প্রদর্শনী, এপ্রিলের শেষ দশদিন ধরে অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। নন্দলাল বসুর সর্বোত্তম ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম শ্রীইন্দ্র দুগার—একসঙ্গে তাঁর চল্লিশটি ছবি দেখে বেঙ্গল স্কুল বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। লীলায়িত রেখাবিন্যাসে, অনুজ্জ্বল পরস্পরসাপেক্ষ বর্ণলেপে, ও ব্রাশ-এর সুচিন্তিত প্রয়োগে প্রথিতযশা শিল্পীর প্রায় প্রতিটি ছবি মনোহর। শান্তিনিকেতন গোষ্ঠীর একজন সক্ষম শিল্পীর কাছে যা-যা আমাদের কাঙ্ক্ষনীয় তার সবই আছে তাঁর ছবিতে ঃ আছে স্মৃতি-জাগানিয়া হারানো-বাংলার পল্লীশ্রী, আছে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন, প্রকৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণন। অথচ, গুরুর পথ থেকে সরে এসে নাগরিকপ্রতিভূ শিষ্য নগরকেও তাঁর চিত্রের বিষয়ীভূত করেছেন। নগরীর উপরে ভোর, উদয়পুরের গলি, কাশীর ঘাট, কলকাতায় সান্ধ্য শোভা—সবই তাঁর মনোযোগের বিষয় সেই সঙ্গে গুরুর অনুসরণে অজন্তার প্রতিলিপি—বেঙ্গল স্কুলের মৌল প্রেরণা—তাও বাদ যায় নি।

তবু—কেমন যেন মন ভরে না। ইন্দ্র দুগারের ছবি আমাদের চোখ ভরায়, কিন্তু মন তাকে গ্রহণ করে না, হৃদয়ে ঘা দেয় না ছবি। এর কারণ ইন্দ্র দুগারের অক্ষমতা নয়, এর কারণ আমাদের মানসিকতা [illegible] রেখাবিন্যাস, ওই অনুপম বর্ণকাভঙ্গ-সমস্ত কারিগরি দক্ষতা সত্ত্বেও হৃদয়ে ঢেউ তোলে না। মনে হয় শান্তিনিকেতন শৈলীকে বেঁচে থাকতে গেলে অন্য পথ খুঁজতে হবে, আধুনিক মানসিকতার কাছাকাছি আসতে হবে। আরো আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে, ওই পদ্ধতি যে আমাদের মনে ঘা দেয় না, তার কারণ ওর মধ্যে পাপবোধ নেই, বিবেকচেতনা নেই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মৌল বিরোধ যে চেতনা ও জড়ের ক্ষমাহীন সংগ্রাম, একথার সোচ্চার প্রকাশ নেই। তাই আজকের শান্তিনিকেতন শৈলী নিছক ড্রয়িংরুমের শোভাবর্ধক, বুকের ভিতরে আলোড়নের জন্মদাতা নয়। ওর নিজের ভিতরে কোনো স্পন্দন নেই বলে ও শৈলী আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা সহচর হতে পারে না।

শান্তিনিকেতনী প্রথায় শিক্ষিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ছবি দেখে এই সব চিন্তা মনে এলো। শ্রীদুগারের অনুরাগীরা যেন ভুল না বোঝেন, তাঁর কুশলতা বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই। বরঞ্চ আমি বলতে চাচ্ছি, তাঁর মতো ক্ষমতাবান শিল্পী যখন দর্শকের মনে অভীষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম নন, তখন তাঁর পদ্ধতির প্রতি সন্দেহ সংদর্শকের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত।

*   *   *

আঠারো থেকে চব্বিশে এপ্রিল পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্টসে মেজর জিতেন হাজারিকার বাইশটি ছবির এক সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেলো। শ্রীহাজারিকা সম্পূর্ণভাবে স্বশিক্ষিত শিল্পী, দেশরক্ষার গুরুদায়িত্বের ফাঁকে বিরল অবসরে চিত্রচর্চা করেন নিতান্তই মনের তাগিদে। শিল্পের ব্যাকরণ সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণার অভাবের ফলে তাঁর যে-ছবি ভালো [illegible] ভালো নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা তাঁর নিজস্ব, সেগুলির মধ্যে আশ্চর্য এক সতেজ ঘ্রাণ পাওয়া যায়, যা শিক্ষিত শিল্পীর মধ্যেও দুর্লভ। যাকে প্রেরণা বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। তাঁর 'রাইডাল নাইট', 'ক্যাকটাস হ্যাজ ফ্লাওয়ার্ড', 'নেচার' ও 'আফটারম্যাথ' এমনি সব ছবি, এবং প্রদর্শিত বাইশটি ছবির মধ্যে এই ধরনের ছবির সংখ্যা কম নয়। সৈনিকের জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটে, বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, অসামরিক নাগরিকবৃন্দ যার কোনো সন্ধান রাখে না। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত হাজারিকা এমন অনেক অভিজ্ঞতাকে চিত্রোপযোগী বলে মনে করেছেন, এবং অনেকগুলির [illegible] প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। এবং অভিজ্ঞতার নিহিতস্তর [illegible] তাঁর বহু [illegible] অন্যত্র বিস্ময়ের এমনকি হাস্যকর বলেও মনে হতে পারতো, তা হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত।

দৃশ্যচিত্রণে শ্রীহাজারিকার হাত আশ্চর্যরকম ভালো ঃ তাঁর ফর্ম ভাঙার পদ্ধতি অনেক স্থলেই ভালো কিউবিক ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আমরা ভবিষ্যতে এই শিল্পীর আরো ছবি দেখতে পেলে খুশি হবো। প্রদর্শনীর মধ্যস্থলে তাঁর তৈরি একটি টেবিল অনেকেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো।

*   *   *

শিশুচিত্রীদের এক আশ্চর্য প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বিড়লা অ্যাকাডেমিতে।

গত ৯ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার পণ্ডিতিয়া সন্ধ্যা সংঘ ত্রিকোণ পার্কে শিশুদের এক তাৎক্ষণিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। চার থেকে ষোলো বছরের বালকবালিকারা বয়সোচিত তিনটি বিভাগে ভাগ হয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলো। বিচারক ছিলেন পাঁচজন

ছবির মধ্যে তাঁদের বিচারে, প্রশংসনীয় ছিয়াশিটি ছবি এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়।

আশ্চর্য সব ছবি। সর্বকনিষ্ঠ শিল্পীর বয়স চার পেরিয়েছে কি পেরোয় নি—সে এঁকেছে পেনসিলে ফুল, বাড়ি, মৌমাছি, মানুষ। এই প্রদর্শনী দেখে আরেকবার মনে পড়লো শিশুশিল্পীদের উদ্দেশ করে মহাশিল্পী পিকাসোর সেই উক্তি—'তোমাদের বয়সে আমি রাফায়েলের মতো আঁকতে পারতুম; তারপর থেকে বাকি জীবন আমি ব্যয় করেছি শিখতে, কী করে তোমাদের মতো আঁকা যায়।' কলাকৌশল-বর্জিত, অনুপুঙ্খ-বর্জিত, ঋজু, সত্যদৃষ্টি শিশুচিত্রের প্রধান গুণ—তাঁদের মতো রেখায় অনিশ্চিত সাবলীল বর্ণলেপ, শিশুচিত্র দর্শককে যেন মহাকালের দেশে নিয়ে যায়, যেখানে পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে মহাকাব্যর সরল, মৌল সত্যদৃষ্টি।

বিশেষ করে দ্বিতীয় বিভাগটি—আট থেকে বারো বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবিগুলি আশ্চর্য—প্রায় প্রতিটি ছবি সুন্দর। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শান্তনু সরকার, রঞ্জনকুমার দে, উজ্জ্বল চৌধুরী, পিউ বসু, তন্ময়কুমার বসু, [illegible] দাস, পলাশ দাস, বর্ণালী বসু ও মনীষা পালের ছবি। এদের অনেকেরই চিত্ররচনায় মেধা এমন পর্যায়ের, যে অভিভাবকদের অনুরোধ করতে লোভ হয়, এদের শিল্পচর্চার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে। কিন্তু জানি না, কোনো ক্ষেত্রে তা উপহাসের মতো শোনাবে কিনা। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো বাচ্চার লেখাপড়ার সুযোগেরই সংস্থান হওয়া কঠিন। তাই উপদেশ দিতে বিরত থেকে শুধু এই শুভেচ্ছা প্রকাশ করতে পারি, আহা, এরা সবাই যদি যথাযোগ্য সুযোগ পায় ভবিষ্যতে!

পরিশেষে বলি, এই ধরনের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে খরচ নেই কিছুই—পাড়ার ক্লাবের উৎসাহী ও পরিশ্রমী সদস্যারা সহজেই এর আয়োজন করতে পারেন। শীতকালে পার্কেই প্রতিযোগিতা চলতে পারে, গ্রীষ্ম-বর্ষায় যে-কোনো ছুটির দিনে পাড়ার ইশকুলঘর ব্যবহারের অনুমতি সংগ্রহ করা দুরূহ নয়। প্রয়োজন শুধু উদ্যমের। আমাদের এই শহরে শিশুদের জন্য আয়োজন বড়ো শীর্ণ, তাদের জন্য যথেষ্ট ইশকুল নেই, যথেষ্ট পার্ক নেই, যথেষ্ট খেলাধুলো নেই, যথেষ্ট সস্তায় যথেষ্ট সদ্‌গ্রন্থ নেই। এমন কি তাদের সম্বন্ধে বয়স্কদের যথেষ্ট উৎসাহ পর্যন্ত নেই। এই রকম একটি উদ্যোগের সফলতার সম্পর্কে বাক্‌নিষ্পত্তি নিষ্প্রয়োজন। এমন আয়োজন যত অধিক পরিমাণে হয় ততই ভালো। শিশুদের এটুকু অন্তত বুঝতে দেয়া উচিত, তাদের বিষয়ে বয়স্কদের উদ্যম শুধুমাত্র উপদেশবিতরণেই সমাপ্ত নয়, তদতিরিক্ত আরো কিছু কর্তব্যের তালিকায় রয়েছে।

শিল্পী : উজ্জ্বল দাস

শ্রীউজ্জ্বল দাশ ও শ্রীকাজল দাশগুপ্তের একটি যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেলো আকাডেমি অভ আর্টসে। এঁরা উভয়েই কলকাতার সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ে শিক্ষিত। শ্রীকাজল রঙের চতুর ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষ, কিন্তু রেখার প্রয়োগে তিনি এখনো সিদ্ধ নন। তাঁর ন্যূনতা বিষয়ে তিনি নিজেও যথেষ্ট সচেতন বলে মনে হলো। কারণ, তাঁর ছবিগুলি প্রধানত বর্ণলেপপ্রধান, রেখার ভূমিকা গৌণ। ছবির মধ্যে তান্ত্রিক বা তন্ত্রোপম মুদ্রাবিন্যাসের দ্বারা তিনি ঠিক কী করতে চান তা সম্যক প্রতিভাসিত হলো না—খানিকটা এফেক্ট আনার চেষ্টা, খানিকটা বা নীরদ মজুমদারের অকারণ প্রভাব বলে মনে হলো।

তুলনায় শ্রীউজ্জ্বল দাশ অনেক বেশি মার্জিত শিল্পী। তাঁরও রেখা তেমন জোরালো নয়, কিন্তু তার খুঁত ঢেকে যায় কিউবিক ধরনে বুদ্ধিমানের মতো ফর্মকে ভেঙে ভেঙে নেয়ায়। এবং সবচেয়ে বেশি তাঁর অসামান্য আলোছায়ার ব্যবহারে। তাঁর 'ডেথ অভ এ গ্রীন সোল' বা 'দি ডিভাইন

মানুষ ও জীবজন্তুর অ্যানাটমিতে আরো দক্ষতা অর্জন করতে পারলে শিল্পী হিসেবে এঁর যশ স্থায়িত্ব পাবে এমন আশা প্রকাশ করা যায়।

*　　*　　*

আকাডেমি অভ ফাইন আর্টসে দিলীপ রায়ের একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেলো। শ্রীরায়ও স্বশিক্ষিত শিল্পী, এর পূর্বেও তিনি একাধিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। চিত্রাঙ্কন ছাড়াও শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে বিশেষত কাব্যরচনায় ও নাটকে তাঁর উৎসাহ আছে। দেখে মনে হলো, ছবি আঁকা ব্যাপারটা বোধহয় তাঁর অনন্য মনোযোগ দাবি করতে পারে না। তাঁর দুয়েকটি কোলাজ (যথা পাখি : ২২) ভালোই। তবে মোটের উপর বলা যায়, চিত্রাঙ্কনের বিজ্ঞানের দিক, পদ্ধতির দিক, মৌলিকতার যথোচিত দৃষ্টি দিলে হয়তো তাঁর ছবি আরো ভালো হতো। অনেকগুলি কোলাজ-জাতীয় কাজ (যথা বকসার) তিনি কী কী কারণে ছবি বলে দাবি করছেন তা ঠিক বোঝা গেলো না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও পূর্ণজীবন

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

একবার ক্যালিফোর্নিয়ার কোন একটা জায়গায় রাসেলকে দেখানো হচ্ছিল ভবঘুরেদের একটি উপনিবেশ। প্রদর্শকরা ভেবেছিলেন সম্মানিত অতিথি এদের অদ্ভুত নৃত্যগীতবাদ্য দেখেশুনে খুব মজা পাবেন। আধুনিক সভ্যতার এই বর্জনীয় পুরোধা ব্যাপারটা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, একটু উদাসভাবে 'এরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সুখী।' উৎসাহী প্রদর্শকবৃন্দ একটু হকচকিয়ে গেলেন; কথাটা ঠাট্টা না খেদোক্তি ঠিক বোঝা গেল না। একটু লক্ষ্য করলেই অবশ্য তাঁরা বুঝতে পারতেন রাসেল ঠিক গম্ভীরভাবে মস্করা করছেন না, যদিও এ বিদ্যায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

রাসেল কিন্তু বন্য মানবের বন্দনা করেন নি রুসোর মতো, বরং এ-নিয়ে রুসোকে বারবার বিদ্রূপই করেছেন। আদিম আরণ্য মানব তাঁর কল্পনাকে কোনো দিন মুগ্ধ করেনি: তিনি জানতেন, সভ্যতা মানেই নাগরিক সভ্যতা। এমন কি এ কথাও তিনি বলেন নি, যা কিছু কৃত্রিম তাই নিন্দনীয়, যা কিছু স্বাভাবিক তাই শ্রেয়স্কর; শিল্পবিপ্লব—যা আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি—তিনি অনপলাপ্য বাস্তব বলেই মেনে নেননি, পরম উপকারক বলেই সানন্দে বরণ করেছেন। কিন্তু উপকারক হলেও এই প্রযুক্তিবিদ্যা উপায় মাত্র, এটা ভুলে গেলেই ঘটবে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। যাযাবরদের দেখে যে রাসেল হঠাৎ বিমনা হয়ে গেলেন তার কারণ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তাদের ঐ নৃত্যগীতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বেঁচে থাকার সহজ আনন্দ। সভ্য মানুষ যে আজ সর্বভোগের বিচিত্র এবং বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও সুখী নয় তার একটা প্রধান কারণ আধুনিক যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত জীবনে এই সহজ আনন্দের বিরলতা। আধুনিক নাগরিক জীবনের এই নীরসতার জন্য দায়ী অবশ্য যন্ত্র নয়, আমরাই।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই আশ্চর্য শিশু, পেমব্রোক লজের বিশাল উদ্যানে যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতো, আর স্তব্ধ হয়ে শুনতো বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছে পাতার মর্মর, মুগ্ধ হয়ে দেখতো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আলোছায়ার খেলা। একদিন এক প্রবীণ, পাঁচ বছরের এই শিশুটিকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, প্রকৃতির লীলায় এই নিবিড় আনন্দ চিরকাল থাকবে না, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে আসবে। এত বড়ো প্রচণ্ড আঘাত শৈশবে আর কিছুতে তিনি পাননি। কী ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী!

প্রবীণ শুভানুধ্যায়ীর ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য সত্য হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, নব্বই বছর পেরিয়ে গেলেও রাসেলের চিত্তে শৈশবের সেই আনন্দ ছিল অম্লান। তাই দীর্ঘ কর্মব্যাপৃত জীবনে অবকাশ পেলেই ছুটে গেছেন তাঁর প্রিয় কর্নওয়ালের সৈকতে, কিংবা অন্যত্র, শহর থেকে বহু দূরে, যেখানে দৃষ্টি আদিগন্ত অবারিত, সূর্যালোক প্রচুর এবং রাত্রির আকাশ তারায় ঝলমল।

শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সভ্য মানুষের এই সহজ আনন্দের যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। অবকাশরঞ্জনের জন্য আজ আমাদের প্রয়োজন সিনেমা, টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজ। এত কাণ্ডের পরেও আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য নেই; একঘেয়েমি আর কাটে না। (এই একঘেয়েমি

মিঃ এবং মিসেস রাসেল

জিনিসটা মানুষেই দৃশ্যমান, প্রাণিজগতে এটা নেই। এটা একটা মস্ত বড়ো সমস্যা, বিশেষ করে বর্তমান যুগে।) এই একঘেয়েমি তাড়াবার জন্য আজ প্রমোদের নিত্য নূতন আয়োজন, অথচ এটা যেন বেড়েই চলেছে।

কিন্তু এভাবে অব্যাহতি আমরা কোনো দিনই পাব না। একঘেয়েমি জিনিসটাকে ভয় পেলে তা আরো পেয়ে বসবে। তাই পূর্ণ জীবনে দরকার, একে এড়িয়ে যাওয়া নয়, শান্ত, অচঞ্চল চিত্তে সহ্য করে যাওয়া। ইতিহাসে দেখতে পাই, যথার্থ মহৎ যাঁরা তাঁদের জীবন প্রায়শই নিঃসঙ্গ এবং ঘটনা-বিরল।

হয়তো রাসেলের বাল্য এবং কৈশোরের এই একাকিত্বই প্রকৃতির সান্নিধ্যকে এমন নিবিড় করে তুলেছিল। অবশ্য এই একাকিত্বকে অবিমিশ্র সৌভাগ্য বলে তিনি মনে করেন নি; তার একটা কারণ, এর পরিণাম এক ধরনের আত্ম-নিমগ্নতা, যেটা ক্ষতিকর।

এইখানেই লক্ষ্য করি মিস্টিক সাধকের জীবনাদর্শের সঙ্গে রাসেলের জীবনাদর্শের একটা মৌল প্রভেদ। মিস্টিক চেতনার প্রধান চারিত্রলক্ষণ অন্তর্মুখীনতা, যেটা রাসেলের দৃষ্টিতে অসুস্থ মানসতা। সুস্থ মানসতার একটি প্রধান লক্ষণ নিজের অভ্যন্তরে অবগাহন নয়, নিজের বাইরে রয়েছে যে বিপুল, বিচিত্র জগৎ, তার মধ্যে নিজেকে ভুলে যাওয়া। এই নিজেকে ভুলে যাওয়ার মানেই, 'বহির্মুখ' হওয়া।

এই 'বহির্মুখ' কথাটা সাধারণত নিন্দিত অর্থেই ব্যবহৃত: অন্তঃসারশূন্য, লঘুচিত্ত, ভোগসর্বস্ব—'বহির্মুখ' বলতে এই সবই আমরা ধরে নিই। বলা বাহুল্য, রাসেল এ অর্থে কথাটা ব্যবহার করেননি। বস্তুত বহির্মুখ কথাটাই এখানে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর; 'বস্তুনিষ্ঠ' কথাটাই বোধ হয় ঠিক। নরনারী-অধ্যুষিত, বিচিত্র-জীবময় এই বাহ্য জগৎ আমার ব্যক্তিগত দুঃখসুখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, লাভ-ক্ষতির একটা অবলম্বন মাত্র নয়; তার একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে যা আমার এই ক্ষুদ্র অহং-এর চেয়ে ঢের ঢের বড়ো। একে 'প্রবৃত্তিমার্গ' বলে মনে করলে ভুল হবে, কারণ বহির্বিশ্ব (মানুষ এবং মানবসমাজ যার অন্তর্গত) আমাদের যে আনন্দের উৎস খুলে দেয়, তা ঠিক ভোগীর আনন্দ নয়, তপস্বীরও নয়; তা হল ধ্যানীর আনন্দ। বিশ্বের প্রতি কবি, দার্শনিক এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞানীর যে তীব্র আগ্রহ, তার মূলে এই ধ্যানীর আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা।

মিস্টিক দৃষ্টির সঙ্গে এখানে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই, কেন না, মিস্টিক সাধকের কাছে দৃশ্যমান জগৎ শয়তানের রাজ্য নয়, প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর দৃষ্টিতে মধুময়। সাধনার শুরুতে না হলেও, অন্তিমে এ অনুভব অবশ্যম্ভাবী। রাসেলের সঙ্গে এঁদের যেখানটায় অমিল সেটা হল ঐ 'অন্তর্মুখীনতা'। অন্তর্মুখীনতা মানেই অহংসর্বস্বতা—একথা মিস্টিক সাধকরা স্বীকার করেন না, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো 'ছোটো আমি' এবং 'বড়ো আমি'র পৃথক সত্তায় তাঁরা বিশ্বাস করেন।

'আদর্শ জীবন' রাসেলের মতে নিবৃত্তি-মার্গ নয়, নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া নয়, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি' যোগাসন' নয়; আবার ঠিক ভোগসর্বস্ব, প্রেয়োবাদী প্রবৃত্তিমার্গও নয়, কারণ, পূর্বেই বলেছি, বহির্জগৎ-এর প্রতি যে প্রবল আগ্রহ পূর্ণ জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ, তার কেন্দ্রিক প্রেরণা ভোগীর ইন্দ্রিয়লালসা নয়, ধ্যানীর নির্লিপ্ত আনন্দ।

অতএব প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে নয়, তাকে সৃষ্টির পথে প্রবর্তিত করাই পূর্ণ-জীবনের লক্ষ্য। 'সৃষ্টি' কথাটা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধেয়। আমাদের স্বভাবজ প্রবৃত্তি দু রকম : একটা ভোগোন্মুখ, আর একটা সৃষ্টি-উন্মুখ। দুটোর মধ্যে তফাৎ হল, প্রথমটা প্রায়শই চরিতার্থ হয় অন্যকে বঞ্চিত করে; দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে এটা ঘটে না, কেন না সৃষ্টির মধ্যে স্বার্থ এবং পরার্থের কোনো বিরোধ নেই। অপরকে রিক্ত করে নিজে বিত্তবান হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়; পক্ষান্তরে, আমি যদি কবিতা লিখে বা পড়ে আনন্দ পাই, তাতে আর একজনের অনুরূপ আনন্দ কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না, কারণ দুটো অন্যোন্যব্যাবর্তক নয়। সৃষ্টির আনন্দ তাই ভোগ-বৈভব-জাত আনন্দের চেয়ে বড়ো।

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রবৃত্তিকে এই সৃষ্টির খাতে প্রবাহিত করা। মনে রাখতে হবে, এই 'সৃষ্টি' কথাটা এখানে খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। কেবল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া কিংবা শিল্পরচনা নয়, জ্ঞান, এবং সৌন্দর্যের অনুধ্যান হতে যে আনন্দ আমরা লাভ করি তাও এই অর্থে সৃষ্টিশীল। কবিতা লিখে কিংবা সংগীত রচনা করে যেমন আনন্দ, কবিতা পাঠে কিংবা সংগীত শ্রবণেও তেমনি আনন্দ; দুটোর মধ্যে তীব্রতার তারতম্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রকৃতি সগোত্র।

এই আনন্দের প্রসঙ্গে আর একটা কথাও খুব জরুরি। সেটা হচ্ছে এই : যে আনন্দ অতি সহজেই, প্রায় ইচ্ছা করলেই আমরা পেতে পারি, পূর্ণজীবনের উন্মেষে তার মূল্য খুব বেশি। কথাটা স্পষ্ট হবে একটা উদাহরণ দিলে। ফুটবল ম্যাচ কিংবা সিনেমা দেখে আমরা আনন্দ পাই; আবার সেই আনন্দ বা তার চেয়ে তীব্র আনন্দ হয়তো আমরা কেউ কেউ পেয়ে থাকি বিশ্ব-প্রকৃতির অনাদ্যন্ত, অফুরন্ত লীলায়, সূর্যাস্তের আভায় কিংবা আকাশের নীলিমায়; কিংবা ঘরে বসে বই পড়ে অথবা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে (যেটা রাসেলের ছিল অত্যন্ত প্রিয় একটি প্রাত্যহিক অভ্যাস। কুড়ি মাইল হাঁটাটা, তাঁর যৌবনে ঠিক দৈনন্দিন না হলেও, খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল!)

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই শেষোক্ত শ্রেণীর আনন্দ রাসেলের দৃষ্টিতে উচ্চতর। ফুটবল ম্যাচ কিংবা সিনেমা দেখে যে আনন্দ, তা সকলের সর্বদা ইচ্ছামাত্র লভ্য নয়, এর জন্য আয়োজন চাই, অর্থ চাই; কিন্তু সূর্যাস্ত-দর্শন, গ্রন্থ-অধ্যয়ন কিংবা পদব্রজে যদৃচ্ছা ভ্রমণ—এ সবের জন্য কোনো বৃহৎ সংস্থার ব্যবস্থাপনা, কোন জটিল যন্ত্র, বিচিত্র, মহার্ঘ উপকরণ—কিছুই দরকার হয় না; খরচও কিছু নেই, থাকলেও যৎসামান্য, কারণ বই না কিনেও পড়া যায়।

এই বই পড়ার প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে উল্লেখ্য। যে আনন্দ আমরা

অনেকটা শিল্পের থেকে উপভোগ করি—যেমন ফুটবল ম্যাচ কিংবা সিনেমা দেখা—তার চেয়ে, যা উপভোগ করতে হলে দেহ অথবা চিত্তবৃত্তির চালনা আবশ্যক, তা শ্রেষ্ঠ। বই পড়তে হলে, অঙ্ক কষতে হলে, কোনো গভীর বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে চিন্তা করতে হলে, বুদ্ধিকে প্রবলভাবে সক্রিয় হতে হয়। এটা খুব দরকার। চিত্তবৃত্তির সক্রিয় চালনা না ঘটলে তাতে মর্চে ধরে যায়, বুদ্ধিকে গ্রাস করে তামসিক জড়তা; আর এই জড়তা যতই বাড়তে থাকে ততই চড়াতে হয় কৃত্রিম উত্তেজনার মাত্রা, যেটা আধুনিক সভ্যজগতে আজ সর্বত্র বেদনাদায়কভাবে দৃশ্যমান।

শিল্পের সম্ভোগ যেমন চিৎপ্রকর্ষের প্রতিকূল, তেমনি আরি এক দিকে, অতিরিক্ত সক্রিয়তারও বিপদ আছে, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। কারণ, এ যুগের শিক্ষিত সমাজে চিত্তের সক্রিয়তার সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ সৃষ্টির চেয়ে সমালোচনা, গ্রহণের চেয়ে বর্জন, শ্রদ্ধার চেয়ে বিদ্রোহের দিকেই আধুনিক বিদগ্ধ চিত্তের দুর্নিবার প্রবণতা। কথাটা শুনলে হয়তো অনেকেরই মনে হবে, এতো রাসেলেরই প্রাণের কথা। কে না জানে, বিদ্রোহই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, বিদ্রূপই তাঁর রচনার মূল সুর?

অস্বীকার করবার উপায় নেই, রাসেলের সম্পর্কে এইটাই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু রাসেলই কি আমাদের বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাননি যে, প্রচলিত ধারণা মাত্রই অভ্রান্ত নয়? কাজেই রাসেল সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণ সত্য না হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। বরং ধারণাটা আদৌ সৃষ্টি হল কি করে, সেটাই আশ্চর্য।

একথা অবশ্যই সত্য, বিদ্রোহের প্রয়োজন তাঁর জীবনে বারংবার ঘটেছে; কিন্তু তার কারণ বিদ্রোহের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক প্রীতি নয়, অসত্য এবং অন্যায়, মূঢ়তা, এবং সর্বোপরি, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁর দুর্মর বিতৃষ্ণা। বিদ্রোহ তাঁর চরিত্রে মজ্জাগত নয়, ঘটনাচক্রেই তা বারবার হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। কিন্তু অনিবার্য হলেও তাঁর পক্ষে বিদ্রোহ কোনো দিনই তৃপ্তিদায়ক ছিল না।

মনে রাখতে হবে পূর্ণজীবনের প্রধান লক্ষণ, বিদ্রোহ নয়, সামঞ্জস্য। যৌবনে রচিত একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে রাসেল লিখেছিলেন, নির্বিচার বিদ্রোহের চেয়ে খৃস্টদেবের প্রচারিত শান্ত সমর্পণ উচ্চতর প্রজ্ঞার পরিচায়ক, বিশেষ করে দুঃখ এবং অমঙ্গল যেখানে অনিবার্য, কিংবা অপ্রতিকার্য।

পূর্ণ জীবনের সারভূত এই সামঞ্জস্য দু' রকম : নিজের সঙ্গে সমাজের, এবং নিজের সঙ্গে নিজের। প্রথমটা থেকেই বোঝা যাবে, আদর্শ সমাজ না হলে আদর্শ জীবন প্রায় অসম্ভব। ('প্রায়', কারণ, ইতিহাসে দেখতে পাই, কোনো কোনো অসাধারণ পুরুষ সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও আদর্শভ্রষ্ট হননি। কিন্তু এটা ব্যতিক্রম মাত্র, অতএব বর্তমান আলোচনায় ধর্তব্য নয়।) সামাজিক প্রতিবেশ ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ উন্মেষের বাধক হলেই বিদ্রোহ হয়ে ওঠে অনিবার্য। অতএব আদর্শ সমাজে বিদ্রোহের প্রশ্নই ওঠে না, উঠলে সেটা অপরাধ বলেই গণ্য হওয়া উচিত। সমাজ-ব্যবস্থা যদি দোষযুক্ত হয়, এবং প্রতিকার যদি শান্তির পথে, যুক্তির সাহায্যে সম্ভব না হয়, বিদ্রোহ তখনই কর্তব্য, নচেৎ নয়; কারণ, বিদ্রোহ মানেই নিয়মভঙ্গ, আর নিয়মভঙ্গ মানেই বিশৃঙ্খলা, যেটা ইচ্ছা করে সৃষ্টি করা তখনই সঙ্গত যখন সামাজিক অন্যায়কে মেনে নিলে অমঙ্গল আরো বেশি।

বলা বাহুল্য, নিজের সঙ্গে সমাজের অসামঞ্জস্য দূরীকরণ কেবল নিজের চেষ্টায় অসম্ভব। কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজের যেখানে বিরোধ, সেখানে প্রতিকার নিজের হাতে। কিন্তু নিজের হাতে হলেও সহজ নয়।

আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নির্বিরোধ সামঞ্জস্যবিধান—রাসেল এর নাম দিয়েছেন মেন্টাল ইন্টিগ্রেশান; এর অর্থ : বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, চেতনার সঙ্গে অবচেতনার, প্রবৃত্তির সঙ্গে শ্রেয়োবোধের, বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির—অবিরোধ। অধিকাংশ মানুষের সত্তা অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা খণ্ডিত, যার পরিণাম, আদর্শের সঙ্গে আচরণের, কথার সঙ্গে কাজের নিরন্তর বিরোধ। এই অন্তর্ঘাতী, প্রাণক্ষয়কর বিরোধের অবসান ঘটাতে হবে এক অখণ্ডিত, পরিপূর্ণ সৌষম্য।

অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলে, নিজের বিরুদ্ধে নয়। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অর্থ সত্তার একাংশের দ্বারা অপর অংশের নিগ্রহ। তাতে প্রবলতর অংশের সাময়িক জয়লাভ ঘটলেও, অন্তিমে স্থায়ী কল্যাণ হয় না; জোর করে দাবিয়ে রাখা অংশ একদিন না একদিন, প্রথমে নিদ্রায়, পরে জাগ্রদবস্থায়, মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। দাবিয়ে রাখা মানেই অবচেতনায় জোর করে চেপে রাখা। মুশকিল হচ্ছে এই, অবচেতনায় সুপ্তি মানেই বিলুপ্তি নয়; প্রচ্ছন্ন অংশ একদিন চেতনার অতন্দ্র প্রহরী আশ্চর্য কৌশলে এড়িয়ে বেরিয়ে পড়বে, পরাজয়ের শোধ নিতে দ্বিগুণ করে।

রাসেলের একটি মৌল প্রত্যয়—কেবল সংকল্পের জোরে প্রবৃত্তিকে দমন করা যায় না। এইখানেই তাঁর আদর্শের সঙ্গে সনাতন, প্রথাগত নৈতিক আদর্শের দুরতিক্রম্য বিরোধ। সনাতন, ধর্মমূল নৈতিক আদর্শে সংকল্পেরই প্রাধান্য, রাসেল যার ঘোরতর বিরোধী। পূর্ণজীবনের যে চিত্র তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত, তার মধ্যে সংকল্পের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রধান হল—বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তি।

এইবার বুঝতে পারব আদর্শ জীবনের সেই প্রসিদ্ধ রাসেলীয় সংজ্ঞার্থ : 'আদর্শ জীবন জ্ঞানের দ্বারা চালিত, এবং প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত।'

আদর্শ জীবনের এই প্রসিদ্ধ সংজ্ঞার্থটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে আর একটা কথা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। আবার সেই বিদ্রোহের কথায় ফিরে যাই।

নিজের বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহের পরিণাম কেবল আত্মপীড়ন নয়, তার চেয়েও নিদারুণ, অপরের প্রতি নির্মম কঠোরতা। কারণ, মর্ষকাম এবং ধর্ষকামিতা একই টাকার এপিঠ ওপিঠ। নিজের প্রতি বিরক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা। খৃস্টধর্মের আদৃত পাপবোধ জিনিসটা যে রাসেলের কাছে শোচনীয় মনে হয়েছে তার একটা প্রধান কারণ এইটাই।

এই পাপবোধের একটি প্রধান উৎস—যৌন প্রবৃত্তি। এ সম্বন্ধে রাসেলের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। আমাদের অন্যান্য সহজ, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বেলায় যা বলেছেন, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অর্থাৎ যৌন প্রবৃত্তিকে আলাদা করে দেখবার কোন সংগত কারণ নেই; অন্য প্রবৃত্তিসমূহের সুস্থ, স্বাভাবিক পরিতর্পণে যদি লজ্জার কিছু না দেখি, তাহলে এখানেও দেখব না। কেবল দুটো জিনিস এখানে বিচার্য : কোনো মহত্তর আদর্শ এর দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে কিনা; দ্বিতীয়ত—যেটা আরো জরুরি—এর দ্বারা অপরের ক্ষতি হচ্ছে কি না। দুটোর কোনোটাই যদি না ঘটে, তাহলে, যাকে আমরা যৌন ব্যভিচার বলে থাকি, তার মধ্যে দোষের বা লজ্জার কিছু নেই, কেবল কৌমার্যেই নয়, বিবাহিত জীবনেও। তবে এখানেও একটা শর্ত আছে, যেটা খুব জরুরি। প্রেম যদি না থাকে, তাহলে ব্যভিচার অবশ্যই নিন্দনীয়, পাপ বলে নয়—'পাপ' কথাটা রাসেলের কাছে অর্থহীন—মনুষ্যত্বের বিরোধী বলে।

এই মনুষ্যত্ব জিনিসটা পাপপুণ্যের চেয়ে যে ঢের বড়ো এটা যৌন নীতির ক্ষেত্রে সনাতন সুনীতির পুরোধারা প্রায়ই ভুলে যান। এ বিষয়ে তাঁরা যে ভ্রান্ত, তার একটা প্রমাণ : পাপচেতনাশূন্য, যৌন ব্যভিচারে সম্পূর্ণ অলজ্জিত, তথাকথিত অধার্মিক

ব্যক্তির মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, অপরের দুর্বলতার প্রতি সমবেদনা যতটা বেশি, যৌন জীবনের রন্ধ্রসন্ধানে তৎপরতা ততটাই কম। পক্ষান্তরে, যৌন প্রবৃত্তির বলপূর্বক নিগ্রহে ব্যর্থকাম, পাপবোধ-জর্জরিত, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় অন্যের যৌন স্খলনের প্রতি ক্ষমাহীন কঠোরতা।

যৌন জীবনে অব্যভিচার যে নৈতিক দৃষ্টিতে আদর্শ চরিত্রের প্রধান—হয়তো একমাত্র—লক্ষণ, রাসেল তাকে কোনো দিনই শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। আবার প্রবৃত্তিকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করলেও জীবনে যৌন প্রবৃত্তিকে ঠিক অতটা গুরুত্ব দিতেও তিনি রাজি নন। এমন আরো প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান যার গুরুত্ব এবং প্রবলতা কিছুমাত্র কম নয়—যেমন, শক্তিলিপ্সা, সেটা যৌন লালসার চেয়ে ঢের, ঢের বেশী ক্ষতিকর। যে প্রশ্নটা এসব কিছুর চেয়ে আদর্শ জীবনে ঢের বেশি জরুরি সেটা হল হৃদয়ে প্রেম আছে কিনা। তা যদি থাকে, তাহলে প্রবৃত্তির স্বাভাবিক স্ফূর্তি কখনোই ব্যভিচার হয়ে উঠবে না, কতদূর পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেব, কিংবা কতটা গেলে বাধা দেব, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই হবে না। সংযমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আদর্শজীবনে এই সংযমের মূলে কেবল সংকল্পের শক্তি নয়, তার চেয়েও বড়ো প্রেমের সহজ অথচ প্রবল প্রেরণা। তাই সেখানে ত্যাগের মধ্যেও দুঃখ নেই, সংযমের মধ্যে নেই কৃচ্ছ্রসাধনের ক্লেশ। স্বভাবের এই পরিপূর্ণ স্বতোবৃত্তি—যা পূর্ণজীবনের একটি প্রধান চরিত্রলক্ষণ—একমাত্র প্রেমের দ্বারাই সম্ভব।

এই প্রেমের যথার্থ স্বরূপ কি সেটা এখনো বলা হয়নি। কিন্তু তার আগে পূর্ণ জীবনে জ্ঞানের মূল্য কতটা এবং কোথায় সেটা বিচার্য। 'জ্ঞান' কথাটার অর্থ এখানে মূলত বিজ্ঞান, কারণ এই বিজ্ঞানই রাসেলের মতে যথার্থ জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান কেবল ল্যাবরেটরির অভ্যন্তরে নয়, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অপরিহার্য। তবে জীবনে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের চেয়েও বেশি প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার মূলমন্ত্র হল, 'প্রমাণ ছাড়া কিছুই মেনে নেব না, তার জন্য যত বড় আঘাতই আসুক।' প্রশ্ন উঠবে: যেখানে কোনো বিশ্বাসের স্বপক্ষেও প্রমাণ নেই, বিপক্ষেও নেই, সেখানে? এর উত্তরে রাসেল বলবেন, সে ক্ষেত্রে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস—দুটোই অকর্তব্য। বলা বাহুল্য, এই রকম ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় চিত্তকে অবিচলিত অব্যাকুলিত রাখা সহজ নয়। সহজ নয় বলেই গোঁড়ামি জিনিসটা আমাদের এতো প্রিয়। গোঁড়ামির অর্থই হল অনুকূলে প্রমাণ অপ্রাপ্য হলেও বিশ্বাসকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা; আর এই আঁকড়ে ধরার কারণ, নিশ্চিত প্রতীতির জন্য আমাদের দুর্মর আগ্রহ।

এখানে হয়তো কেউ কেউ বলে উঠবেন, এইটাই তো যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনোভাব, কেন না নিশ্চিত নির্ভুল জ্ঞানই তো বিজ্ঞানীর লক্ষ্য। রাসেল বলছেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা; যথার্থ বিজ্ঞানী ভুলেও বলবেন না, তিনি যা জেনেছেন তা নিশ্চিত, নির্ভুল এবং চূড়ান্ত। তা যদি তিনি ভাবেন তাহলে তিনি যথার্থ বিজ্ঞানী নন। মনে রাখতে হবে পূর্ণ, চূড়ান্ত সত্য বিজ্ঞানীর অব্যবহিত লক্ষ্য নয়, অপ্রাপণীয় আদর্শ মাত্র, যে আদর্শে কোনো দিনই হয়ত মানুষ পৌঁছবে না, কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে যতটা সম্ভব তার কাছাকাছি।

পূর্বেই বলেছি, আদর্শ জীবন জ্ঞানের দ্বারা চালিত, এবং প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রেমের মহিমা রাসেলের কাছে কত বড়ো তার আভাস ইতিপূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু জ্ঞানহীন প্রেম হল কর্ণধারহীন তরণী। অর্থাৎ ভালোবাসা যতই খাঁটি হোক তা দিয়ে কারো যথার্থ ভালো করতে আমরা পারব না, যতক্ষণ না তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জ্ঞান। প্রেম যদি থাকে, লক্ষ্য স্বতই মহৎ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং জ্ঞান (জ্ঞান বুদ্ধিরই বৃত্তি বলে দুটো সম্পৃক্ত) যদি না থাকে, লক্ষ্যে পৌঁছতেই পারব না। অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য স্থির করবে হৃদয়, আর পথ দেখিয়ে দেবে বুদ্ধি; তাই পূর্ণ জীবনে দুটোই সমান প্রয়োজন।

সত্যের প্রতি ঐকান্তিক স্বার্থহীন অভীপ্সা যেমন বুদ্ধির মহত্তর প্রকাশ, তেমনি হৃদয়ের মহত্তম বৃত্তি হল প্রেম। লক্ষণীয়, 'প্রেম' কথাটা রাসেল ব্যবহার করেছেন খুব ব্যাপ্ত অর্থে। প্রেমের মধ্যে রয়েছে দুটো জিনিস, এবং দুটোই সমান প্রয়োজন: শুভেচ্ছা, এবং আনন্দ।

প্রকৃতির বিচিত্র লীলায়, শিল্পে, সঙ্গীতে, নৃত্যে আমাদের যে আনন্দ, অর্থাৎ যে আনন্দের মূলে সৌন্দর্যানুভূতি, তাও এই অর্থে প্রেম। আর প্রেমাস্পদ যেখানে বস্তু নয়, কোনো প্রাণময় সত্তা, সেখানে শুভেচ্ছাই হল প্রধান। কিন্তু এখানেও শুভেচ্ছার সঙ্গে আনন্দ থাকা চাই, নচেৎ প্রেম পূর্ণাঙ্গ হয় না। যে ভালোবাসায় আনন্দ নেই, যা শুধুই হিতৈষণা, তা ভালোবাসাই নয়। আবার উল্টোটাও ঘটতে পারে কখনো কখনো, যেখানে সম্ভোগের আনন্দ আছে, অথচ ঐকান্তিক, নিঃস্বার্থ শুভকামনা অত্যন্ত ক্ষীণ, যেটা যৌন প্রেমের ক্ষেত্রে বিরল নয়।

তার মানে এই নয় যে, যৌন প্রেম অপূর্ণ, বরং একথাটা রাসেল বার বার বলেছেন, জীবনে আনন্দের এত বড় উৎস অল্পই আছে, যদি দৈহিক আকর্ষণ এবং সৌন্দর্যানুভবের সঙ্গে যুক্ত হয় ঐকান্তিক শুভ কামনা। বারবনিতাদের প্রতি সভ্য পুরুষের আচরণ তাঁর কাছে বর্বরোচিত ঠিক এই কারণেই। হৃদয়ের দিক থেকে যেখানে সাড়া নেই, সম্ভোগেই যার আরম্ভ এবং পর্যবসান, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এত বড় অমানুষিকতা আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু নরনারীর প্রণয়ের এই অংশের মধুরিমা এবং মহিমাও প্রেমের পরোৎকর্ষ নয়। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এক অর্থে আরো বড়ো, এবং আরো বিশুদ্ধ, কারণ যৌন প্রণয়ের মতো প্রতিদানের প্রত্যাশা এখানে নেই, থাকলেও অনেক কম।

কিন্তু পূর্ণ জীবনের মোল প্রেরণা যে প্রেম তার চরম পরিণতি—সার্বভৌম প্রেম, যাকে নির্দেশ করতে গিয়ে রাসেল শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন খৃস্টধর্মের শরণাপন্ন হতে, বলেছেন এ হল সেই যীশু খৃস্টের প্রচারিত প্রেম যার লক্ষ্য কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়। সমগ্র মানব জাতি। বুদ্ধের করুণা এক অর্থে আরো বড়ো, কেন না তার লক্ষ্য শুধু মানব নয়, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বজীব।

তার সঙ্গে চাই আরো একটা জিনিস: বুদ্ধের মতো পুরুষের 'প্রজ্ঞা'। এই 'প্রজ্ঞা' বিজ্ঞানের চেয়েও বড়ো। কিন্তু 'প্রজ্ঞা' এমনই এক বস্তু, বার্ট্রান্ড রাসেলও যার যথাযথ সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে থেমে গেছেন। তাতে অবশ্য আমাদের ক্ষোভের কিছু নেই, কারণ যেখানে দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান সেখানে সংজ্ঞার্থ নিষ্প্রয়োজন। এই অত্যন্ত বিরল এবং আধুনিক যুগে দ্রুত বিলীয়মান অনির্দেশ্য গুণটি এ শতাব্দীর যে কয়েকজন অসাধারণ মানুষের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অন্ধকারে খদ্যোতের মতো, তাঁদের মধ্যেঅন্যতম—বার্ট্রান্ড রাসেল।

পূর্ণ জীবনে থাকবে এই অপার্থিব প্রজ্ঞার স্নিগ্ধ জ্যোতি, সব কিছু ব্যাপ্ত করে, আবার সব কিছু ছাপিয়ে। সংজ্ঞার্থ না

জানলেও প্রজ্ঞার লক্ষণগুলি আমাদের পরিচিত। কয়েকটি উল্লেখ করছি।

প্রথমেই বলা দরকার, উদ্ধত আধুনিকতা আর যাই হোক, প্রজ্ঞার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ নয়। অতীতকে কেবল জানা নয়, অতীতের যা কিছু মহৎ তাকে শ্রদ্ধা করতে শেখা খুব দরকার। আর এটাও মনে রাখা দরকার, বর্তমান আমাদের কাছে খুব জরুরী হলেও চিরন্তনের দৃষ্টিতে নয়, চিরন্তনের দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান এবং অনাগত—ত্রিকালই সমান সত্য। বর্তমান সম্বন্ধে আগ্রহ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, এবং অজ্ঞতা অমার্জনীয়। বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের যুগে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভুলে গেলে চলবে না, এই ত্রিকালের প্রতি সমদর্শী চিরন্তনের আলোতে সব কিছুকে দেখতে শেখাই হল যথার্থ প্রজ্ঞার মৌল লক্ষণ। আর এই সার্বকালিক দৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোত এক ধরনের প্রশান্ত নির্বেদ যার মূলে সংসারের দুঃখময়তা ততটা নয় যতটা বিশ্বের বিশালতা পৃথিবী নামক একটি গ্রহের ক্ষুদ্রতা এবং সেই ক্ষুদ্র গ্রহের এক সাম্প্রতিক অধিবাসী 'মানুষ' নামক জীবটির অকিঞ্চিৎকরত্বের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি থেকে আসবে নিজের সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ, প্রশান্ত এবং নম্র নিরাসক্তি, যা ধর্মচেতনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

পূর্ণ জীবনে ধর্মের স্থান না থাকলেও গভীরতম অর্থে ধর্মচেতনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কথাটা রাসেলের মুখে আশ্চর্য শোনালেও সত্য। তা যদি না হত তা হলে তিনি বলতেন না,

"What is of most value in human life is more analogous to what all the great religious teachers have spoken of". ("Power," p 204)

কথাটা হঠাৎ শুনলে অনেকে বিশেষ করে রাসেলের গোঁড়া ভক্তরা—হয় তো চমকে উঠবেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ রাসেল এঁদের দৃষ্টিতে মূলত আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক-জন দৃপ্ত প্রবক্তা, যিনি ধর্মের প্রতি কেবল বীতশ্রদ্ধ নন। ধর্মের, বিশেষ করে খৃস্টান-ধর্মের একজন জাতশত্রু।

ধারণাটা মিথ্যা নয়, যদি 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হয় ধর্মবিশ্বাস বা 'ধর্মতত্ত্ব'। কিন্তু ধর্ম বলতে আর একটা জিনিসও বোঝায়, যাকে বলতে পারি 'ধর্মচেতনা'। ধর্মের এই দুটো দিক—তত্ত্ব, এবং চেতনা বা অনুভূতি—ওতপ্রোত হলেও অবিচ্ছেদ্য নয়। প্রথমটা হল (বুদ্ধি এবং) জ্ঞান রাজ্যের ব্যাপার, যেখানে বিজ্ঞানের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য যেখানে ধর্ম তো দূরের কথা, দর্শনও প্রতিদ্বন্দ্বী হতে অক্ষম।

কিন্তু ধর্মচেতনার কথা সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ এটা বুদ্ধির নয়, হৃদয়ের এলাকা, যেখানে বিজ্ঞান এবং যুক্তির সঙ্গে বিরোধের প্রশ্নই ওঠে না। কঠোর, উগ্র যুক্তিবাদী হয়েও রাসেল একথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, হৃদয়বৃত্তি যুক্তির অধীন নয়, শুধু তাই নয়। অনেক ক্ষেত্রে যুক্তির বশ্যতা থেকে হৃদয়কে মুক্ত রাখাই আমাদের কর্তব্য। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, হৃদয়াবেগ মাত্রই আদরনীয়। ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ভয়—এরাও হৃদয়বৃত্তি। যারা শুষ্ক, হৃদয়হীন যুক্তির চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতিকর, এবং ঢের বেশী প্রবল। পক্ষান্তরে, হৃদয়ের যে সব বৃত্তি মহত্তর প্রেরণার দ্বারা আমাদের যথার্থ শ্রেয়োমার্গে প্রবর্তিত করে—যেমন প্রেম, করুণা, স্বার্থশূন্য হিতৈষণা — তারা দুর্ভাগ্যক্রমে ঢের বেশী দুর্লভ। এই উচ্চতর, শ্রেয়োবিধায়ক হৃদয়বৃত্তিসমূহের উজ্জীবন ধর্মচেতনার একটি মস্ত বড়ো দান।

পূর্ণ জীবনে এই কারণেই ধর্মবিশ্বাস না হলেও ধর্মচেতনার প্রয়োজন আছে. সেটা যে কত বড়ো তার একটি স্মরণীয় প্রমাণ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রচিত 'প্রিন্সিপেলস অফ সোস্যাল রিকনসট্রাকসন' নামক উপাদেয় গ্রন্থটির শেষাংশ, যেখানে রাসেল পূর্ণাঙ্গ জীবনের তিনটি মৌল বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। সেই তিনটি হল : সহজ প্রবৃত্তি (হৃদয়বৃত্তি যার অন্তর্ভুক্ত), বুদ্ধি এবং অধ্যাত্মচেতনা। এই তৃতীয়টির উল্লেখ রীতিমত অপ্রত্যাশিত। সকলেই জানেন ধর্মগন্ধী শব্দমাত্রের প্রতি রাসেলের কি প্রবল বিতৃষ্ণা; 'পাপ', 'পুণ্য' এমন কি 'আত্মা' শব্দটিও তাঁর রচনায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, এবং তখনো, উদ্দেশ্য কখনো শ্রদ্ধাপ্রণোদিত নয়, বরং উপহাসই প্রায়শ প্রকট। অথচ এখানে অধ্যাত্মজীবন কথাটা তিনি কেবল শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করেন নি, এটা যে বুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগ এর চেয়েও উচ্চতর এবং বিরলতর বৃত্তি — এটাও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। প্রচ্ছন্ন হলেও এই অধ্যাত্মচেতনা যে রাসেলের নিজের মধ্যেও ছিল এবং খুব গভীরভাবে ছিল, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ চক্ষুষ্মান পাঠকের দৃষ্টিতে দুর্লক্ষ্য নয়। যদিও ভক্তদের কাছে কথাটা অনেকটা কুৎসার মতো শোনাবে।

ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় এবং নির্মমভাবে বর্জন করলেও একটা অভাববোধ যে তাঁর সত্তার গভীরে প্রচ্ছন্ন ছিল একটি আশ্চর্য ঘটনায় তার আভাস পাওয়া যায়। বি বি সি বেতার কেন্দ্র থেকে একটি সাক্ষাৎকারের পর রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে বেরিয়ে আসছেন রাসেল। হঠাৎ রাধাকৃষ্ণনকে উদ্দেশ্য করে রাসেল বলে উঠলেন, 'আপনার সঙ্গে তুলনা করলে নিজেকে কেমন যেন অপূর্ণ বলে মনে হয়, তার কারণ আপনার মধ্যে রয়েছে ধর্মবিশ্বাস, যা থেকে আমি বঞ্চিত।' কথাটা তিনি রহস্য করে বলেন নি, কারণ কণ্ঠস্বরে ছিল নিগূঢ় কোন অতৃপ্ত কামনার উদাস বিষণ্নতা।

একটা প্রশ্ন এখানে দুর্নিবার হয়ে ওঠে। ধর্মবিশ্বাস যারা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছে ধর্মগ্রন্থে যাদের শ্রদ্ধা নেই, চার্চকে যারা সম্মান করতে অক্ষম তাদের পক্ষে এই ধর্মচেতনা কি অপ্রাপণীয়? রাসেল একথা মানতে রাজি নন, বলেছেন, ঈশ্বরে যাদের বিশ্বাস নেই, চার্চ যাদের প্রেরণা দিতে অসমর্থ, শাস্ত্রে যাদের আস্থা নেই, ধর্মচেতনা তাদেরও অনধিগম্য নয়। যাদের জন্য চার্চ নেই, শাস্ত্র নেই, এমন কি ঈশ্বরও নেই, তাদের জন্য রয়েছে কবিতা, রয়েছে সঙ্গীত রয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র অনাদ্যন্ত লীলা, সর্বোপরি, রাত্রির মহাকাশ আর অনন্ত নক্ষত্রলোক, যা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত করে কেবল নির্বাক বিস্ময় নয়, এক ধরনের শ্রদ্ধা এবং নম্রতা যা স্তব্ধ করে দেয় আমাদের মনুষ্যত্বের স্পর্ধা, আমাদের ক্ষুদ্র, মূঢ় অহমিকা, যে অহমিকা পূর্ণ জীবনের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

"When we reflect upon the size and antiquity of the stellar universe, the controversies on this rather insignificant planet lose some of their importance, and the acerbity of our disputes seems a trifle ridiculous". (Power, p. 203)

নদী দেখার আগে

সুস্মিতা রায়

ছোট্ট টিলাটার ওপর ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলো। সূর্যটা তখন সবুজ পাহাড়ের প্রায় মাথায় মাথায়। সৈকত একটা ক্যামেলিয়া ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো। রাহুল বেশীক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারে না, ও শুধু এদিক ওদিক করছিলো আর ঘন ঘন সিগারেট টানছিলো। সৈকত খুব আস্তে একবার বোললো, রাহুল অত ধোঁয়া শরীরের পক্ষে ভাল নয়।

কাঁচকলা, রাহুল ঠোঁট বেঁকালো। একবার সৈকতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা কোরলো, কথাটা সৈকত তার বন্ধু হিসাবে বোললো, না অভিভাবক...এই অবধি ভেবে রাহুলের মনে সৈকত সম্বন্ধে একটা বিশ্রী গালাগাল এসে গেল, মুখটা তিতো লাগলো। আরও জোরে সিগারেট টানতে লাগলো সে, কিন্তু সৈকতের নির্বিকার মুখে একটাও ঢেউ খেলাতে না দেখে বিরক্ত-ভাবে অন্য দিকে মুখ ফেরালো। তারপরই তার মুখের তিতো ভাবটা কেটে গেল, প্রায় চিয়ার্স করার মত মুখে রাহুল হাতের সিগারেটটা ফেলে দুহাত তুলে বলে উঠলো, এসে গেছে।

সৈকতের নির্বিকার মুখে একটা ছোট্ট ঢেউ খেলে গেল। আর হঠাৎই যেন সূর্যটা এক লাফে সবুজ পাহাড়টার নীচে নেমে গেল, আর সারা আকাশটায় কেমন রুপোলী আলো ঝিলমিলিয়ে উঠলো. কমলা শাড়ীটা আলতো করে ধরে টিলার ওপর উঠতে উঠতে সুচরিতা বোললো, ভীষণ দেরী হয়ে গেল। রাহুল প্রায় সংগে সংগেই বলে উঠলো, তাতে কী।

কিন্তু ওদিক দিয়ে সৈকত কোন কথা বোললো না।

সুচরিতা উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ছোট্ট রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো, তারপর মৃদুস্বরে বোললো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঠিক যেন আঁকা ছবি...রাহুল সুচরিতার পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছিলো, আজ কি সুন্দর লাগছে সুচরিতাকে। সুচরিতা যে কত সুন্দর তা বোধহয় ও নিজেও জানে না, ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার, তারপর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে একটু দূরে একা বসে থাকা সৈকতের দিকে তাকালো. এই যে কেমন ভালমানুষের মত মুখে বসে ক্যামেলিয়া দেখছে সৈকত, কিন্তু রাহুলের কি সর্বনাশ করেছে ও, দাঁত চেপে সে খুব আস্তে বোললো, ভিলেন...

কথাটা রাহুল খুব আস্তে বললেও সুচরিতা শুনতে পেয়ে গেল, সংগে সংগে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সুচরিতা বোললো, কাকে বলছেন, আমায়...ভ্রূ কুঞ্চিত হোলো তার।

আরে না, না রাহুল হেসে ফেললো. ঐ যে...দূরে একা বসে থাকা সৈকতের দিকে আঙুল তুললো সে।

সুচরিতা হাসিতে রামধনু এঁকে

বোললো, এমা ঃ তারপর বোললো, ও সৈকত একা ওখানে! কি হয়েছে!

ন্যাকামি করছে, মনে মনে বোললো রাহুল, তারপর হেসে বোললো, ও নায়ক হতে চায়।

তাই নাকি? সুচরিতার মুখে হাসি ঝলমল করছে, কার নায়ক!

কেন তোমার! রাহুল এতক্ষণে বন্ধুর সপক্ষে একটা কথা বোললো।

আপনি যে বললেন ও ভিলেন, সুচরিতা চাপা হেসে বোললো।

আরে রাহুল একটু অপ্রস্তুত হোল, এমনি বলেছিলাম।

তাই বলুন...সুচরিতা সৈকতের দিকে এগিয়ে গেল।

সৈকত মাথা নীচু করে একভাবে বসেছিলো, আর মনে মনে তার রাহুলের ওপর খুব রাগ হচ্ছিলো। প্রথমে রাহুল, তারপর সুচরিতা, কৈ সুচরিতা তো তার কাছে এলোনা, চ্যাংড়া রাহুলের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলো। অথচ রাহুলের ব্যাপারটা যদি সে এখনই সুচরিতাকে বলে দেয়, কেমন হয়, বেশ জব্দ হবে রাহুল। হাতের ক্যামেলিয়াটার দিকে তাকালো সৈকত, সুচরিতা যদি আজ কমলা শাড়ী না পরে ক্যামেলিয়া রঙের গোলাপী শাড়ী পরতো, দারুণ ম্যাচ কোরতো। সুচরিতা আজ কি সেজেছে, আর রাহুল কেমন হিরো হিরো ভাব নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলছে, সে এখন ওদের ডাকতে পারে, কিন্তু ডাকবে না। সে দেখতে চায় সুচরিতা কখন এসে তার সঙ্গে কথা বলে। আড়চোখে দেখলো সৈকত, রাহুল কি বলছে, আর সারা শরীরে ঢেউ ভেঙে সুচরিতা খুব হাসছে. মনের মধ্যে একটা খুব সূক্ষ্ম ব্যথার স্রোত বয়ে গেল তার, সুচরিতার মত একজন যদি...!

সুচরিতা এখন এদিকে আসছে, সৈকত মুখ নীচু কোরলো।

সুচরিতা এসে তার রিনরিনে নুপুরের মত গলায় বোললো, কি হয়েছে আপনার? সৈকত বিষণ্ণভাবে হাসলো, কিন্তু মুখ তুললো না।

সুচরিতা কোন কথা বোললো না, রাহুলও চুপ করে আছে।

ওরা বোধহয় বুঝতে পারছে সৈকত রাগ করেছে, বুঝতে পারাই ভাল, তাই চায় সৈকত।

সুচরিতা এবার তার হাতের ফুলটার দিকে তাকালো, কি সুন্দর ফুলটা!

রাহুল বোললো, ক্যামেলিয়া, আমাদের বাড়ী অনেক গাছ আছে। সৈকতের ইচ্ছে হচ্ছিলো সুচরিতাকে ফুলটা দেয়, আসলে ওকে দেবার জন্যই ফুলটা এনেছে ও, কিন্তু যেই রাহুল ফোড়ন কাটলো, খুব রাগ হয়ে গেল তার, আলতো করে একটা পাপড়ি ছিঁড়ে ফেললো ও।

ও কি করছেন, সুচরিতা খুব ব্যাকুল-ভাবে বোললো, অত সুন্দর ফুলটা ছিঁড়ছেন কেন, আমায় দিন...

সৈকত উঠে দাঁড়ালো, একবার ওদের দুজনের মুখের দিকে তাকালো, তারপর দুহাতে ফুলটা কুচিয়ে ফেলে বোললো, ফুলটা বাসী হয়ে গেছে।

সুচরিতা খুব দুঃখিতভাবে একবার মাথা নাড়লো, রাহুল কোন কথা বোললো না, শেওলারঙের অন্ধকারের আস্তরণটা ওদের মাথার ওপর নেমে এলো। সৈকত ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বোললো, কি যাবে না!

চল, রাহুল পা বাড়ালো।

সুচরিতা খুব অবাক চোখে ওদের দিকে তাকালো, তারপর টিলা থেকে নেমে ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলো।

আসলে সেদিন যে কী হয়েছিলো সৈকত নিজেও জানে না। তাছাড়া সুচরিতার থেকে রাহুলের ওপরই রাগ হচ্ছিলো বেশী। রাহুলকে তখন একটা নুড়ি ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করছিলো তার, নুড়িটা রাহুলের কপালে লেগে ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটতো, সুচরিতা নিশ্চয়ই কেঁদে ফেলতো, আর সৈকত খুব হাসতো।

এক এক সময় তার খুব ইচ্ছে হয় সবাইকে মারে, আঘাত করে, তারপর প্রাণ খুলে হাসে। অবশ্য কাউকে মেরে সত্যি সত্যি হাসি আসবে কিনা সৈকত নিজেও জানে না। বাড়ীর ছোট ছেলে সে, ছোট-বেলায় দাদা দিদিদের কাছে মাঝে মধ্যে চড় চাপটা খেলেও ও নিজে কাউকে মারে নি। অথচ মারার জন্য খুব ইচ্ছে কোরতো. শেষে একদিন কুসুম, তাদের বাড়ী কাজ কোরতো, তার ছোট ছেলেটাকে হঠাৎ মেরে দিলো।

কুসুম যাবার সময় বলে গেল, এ ছেলে বড় হলে ঠিক গোন্ডা হবে বলে রাখছি।।

এখন ভাবলে হাসি পায় সৈকতের, তারপর ছেলেটাকে মারার কারণ জিজ্ঞেস করতেও কোন উত্তর পেলোনা কেউ, সুতরাং আবার মারই খেতে হোল তাকে। বন্ধুদের সঙ্গেও কম মারামারি করেছে নাকি আগে! এখন অবশ্য অনেক শান্ত হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে খুন চাপে, হাত নিসপিস করে, এই এখন যেমন হচ্ছে।

এত সুন্দর নীলাভ ছায়া ঘেরা মিষ্টি গন্ধ রেস্টুরেন্টটায় বসে রাহুল সুচরিতার সঙ্গে ওর সেই বস্তাপচা ব্যর্থ প্রেমের গল্প ফেঁদে বসেছে। বাপরে, কি বকতে পারে রাহুলটা। সারা রাস্তা সহ্য করেছে সৈকত, এখন আবার আরম্ভ করেছে রাহুল। সুচরিতার ঠোঁটের ফাঁকে মাঝে মাঝেই বেলকুঁড়ি ঝিলিক দিয়ে উঠছে আর মাঝে মাঝে ইস্, আহা করেছে। করুক, সুচরিতাকে ওটুকু বেশ মানায়। কিন্তু রাহুল? ওর ঐ প্যানপানানি সমানে শুনিয়ে যাচ্ছে, শোনাক যত খুশী, কিন্তু বর্তমানটা চেপে যাচ্ছে কেন রাহুল, সেটা তো এখনো শূন্যের খাতায় ওঠে নি। যাকগে, সৈকত মেনুকার্ডটা দেখতে লাগলো, তারপর সুচরিতার দিকে তাকিয়ে বোললো, কি খাবে?

সুচরিতা ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে বোললো, কিছু না। রাহুল খুব আস্তে বোললো, কিস খাবে!

সুচরিতা ফিক করে হেসে ফেললো, কিন্তু বলতে পারলো না, অনেক আগেই খাওয়া হয়ে গেছে।

ওদিক থেকে সৈকতের ইচ্ছে হোল, রাহুলকে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেয়। রাহুল হঠাৎ ফস করে সৈকতের হাত থেকে মেনুকার্ডটা নিয়ে নিলো, তারপর খুব স্মার্টলি বয়কে ডেকে, তিন প্লেট চিকেন চাউ চাউ...আনতে বলে দিলো।

সৈকতের ইচ্ছে হোল বলে, খাবো না। তারপর ভেবে দেখলো বলা উচিত হবে না, সুচরিতা তাকে একটি অসভ্য গোঁয়ার ভাববে। মন থেকে যথাসম্ভব রাগকে তাড়াবার চেষ্টা করেও স্বাভাবিকভাবেই ওদের সঙ্গে গল্পে যোগ দিলো।

রাহুল ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বোললো, আমাদের মাইরি সুচরিতার মত বউ আসবে না।

তোর আর আসবে কি করে, সৈকত তিক্তভাবে বলে ফেললো, যা একটা মোটী জুটিয়েছিস।

সুচরিতা বড় বড় চোখে ওদের দুজনের দিকে তাকালো।

রাহুল একটু বিরক্তমুখে বোললো, কি যা-তা বলছিস।

সৈকত জোর দিয়ে বোললো, কেন তুই নিজেই তো পছন্দ করেছিস, হাড়িঁর মমজ বোন?—ঠোঁট বেঁকে গেল তার।

সুচরিতা একটু হেসে ফেললো। সৈকত বোললো, হ্যাঁ সত্যি, খা মোটা না, আমার খুড়তুতো বোন।

রাহুল ওর দিকে কড়া চোখে তাকালো, তারপর সুচরিতার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথাটা এমনভাবে নাড়লো, যার অর্থ, আরে যত্তো সব বাজে কথা।

যাকগে বাদ দিন...সুচরিতা দু'হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভংগী কোরলো। ওর তখন কলকাতার কথা মনে পড়ছিলো। কোথায় কলকাতার টর্পেডোর মত গতিময় জীবন, আর কোথায় সে, ওখানকার কেউ নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারছে না সে এখন কি করছে। হঠাৎ তার খুব মন খারাপ করতে লাগলো, মনে মনে ভাবলো বাবাকে আজই চিঠি লিখবে যেন শীগ্গিরী এসে তাকে নিয়ে যায়।

সৈকত রাহুলের দিকে তাকালো, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ায় রাহুলের মুখটা একটু ম্লান লাগছে। রাহুলের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারায় মনটা একটু হাল্কা হোল তার, তারপর একটু মায়াও হোল, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে রাহুলের দিকে মেলে ধরলো সে, নে...

রাহুল একবার সৈকতের দিকে তাকালো, সৈকত যে তার সংগে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে ভাবে নি। বিশেষ করে সুচরিতাকে ব্যাপার কথাটা না বললে কি হোত না! সুচরিতা এ.সপ্তাহ কলকাতা থেকে বেড়াতে, ক'দিনই বা থাকবে, তার মধ্যে এই কথাটা না বললে কি হোত না সুচরিতাকে। কি ভাবলো সুচরিতা? আর সৈকতই বা কি চায়? সুচরিতাকে...কিন্তু তা হয় না। তার সামনে সুচরিতা, রাহুলের হবে, এটা সহ্য করতে পারবে না রাহুল। সৈকতটা কেমন ড্যাবড্যাব করে তার দিকে তাকিয়ে আছে, একটা সিগারেট তুললো সে। ছেলেদের অত বড় চোখ ভাল লাগে নাকি, তবু সুচরিতা তাকে বলেছে, সৈকতের চোখ দুটো কিন্তু খুব সুন্দর, ঠিক সিঞ্চল লেকের মত। শুনে মনে মনে রেগে গেছে রাহুল। সিঞ্চল লেক, ভাঙাতে ইচ্ছে করছিলো তার। কিন্তু সুচরিতার মত মিষ্টি মেয়েকে মনে মনে যাই বলা যাক, মুখে কিছু বলা যায় না, তাই ও শুধু হেসেছিলো, তারপর ঠাট্টা করে বলেছিলো, আর আমি কিরকম সুন্দর!

কিচ্ছু না, সুচরিতা এক মুহূর্তে ডালিয়া হয়ে দুলে উঠেছিল।

শুনে রাহুল মনে মনে একটু আহত হলেও ও নিজে জানে সৈকতের মত তার চোখ ড্যাবড্যাবে না হতে পারে, কিন্তু তার চোখ যে তীক্ষ্ম, বুদ্ধিদীপ্ত, আকর্ষণকারী, একথাটা তো রাহুল তার কলেজের মেয়েদের কাছে অনেকবার শুনেছে। কিন্তু সে কথা ও সেই মুহূর্তে সুচরিতাকে বলতে পারেনি, ঠাট্টা করেও না, কারণ সুচরিতা তখন তার সুন্দর দু'চোখ মেলে নীল পাহাড়ে মেঘ আর রৌদ্রর লুকোচুরি খেলা দেখছিলো, তখন রাহুল মনে মনে বলছিলো, সুচরিতা তোমার চোখ সিঞ্চল লেকের থেকে অনেক সুন্দর। সিঞ্চল লেক তো কৃত্রিম, কিন্তু সবুজ ছায়ায় ঘেরা পাহাড়ী ঝোরার নীল জল যত সুন্দর, তার সংগে কি সিঞ্চল লেকের তুলনা চলে।

এখন এই মুহূর্তে ওরা সবাই চুপ। বয় এসে তিন প্লেট চিকেন চাউ চাউ রেখে গেল।

চামচ দিয়ে চাউ চাউ নাড়তে নাড়তে রাহুল বোললো, আমি একটা কথা ভাবছি...

শুনে সৈকত তার দিকে তাকালো, রাহুল মনে মনে ভাবলো, সৈকত যদি জানতো ওর ঐ ড্যাবড্যাবে চোখ সুচরিতার পছন্দ হয়েছে, তবে হয়তো সব সময়ই ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতো, তা হলে সুচরিতা সব সময়ই সিঞ্চল লেক দেখতে পেতো, কিন্তু...এসব ভাবতেই তার হাসি পেলো।

সুচরিতা অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বোললো, একা একা হাসছেন কেন, আমাদেরও বলুন, বলে সে একবার সৈকতের দিকে তাকালো।

সৈকতও সংগে সংগে কলের পুতুলের মত ঘাড় নাড়লো। তাই দেখে রাহুলের আরও হাসি পেলো, ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে ও থেমে থেমে বোললো, ভাবছি সুচরিতাকে নিয়ে আমরা একদিন নদী দেখতে যাবো।

দারুণ মজা হবে...সুচরিতা প্রায় হাত-তালি দিয়ে উঠলো।

ভালই তো, সৈকত একটু হেসে বোললো। আসলে ও মনে মনে ভাবছিলো রাহুলের মাথায় কি সুন্দর সুন্দর আইডিয়া আসে, যার জন্য সুচরিতা এখনই কেমন কাচের ওপর আছড়ে পড়া রোদের মত ঠিকরে উঠলো। কিন্তু সে...ঠিক আছে, এবার সেও এমন একটা প্রস্তাব দেবে...!

সুচরিতা আবার খুব হাসছিলো, মন থেকে কলকাতা আবার অনেক দূরে চলে গেছে। সুচরিতা এখন ভাবছে, এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে যাবো কেমন করে!

সৈকত মনে মনে আনন্দের বেলুন হয়ে উঠছিলো, এইবার সুচরিতা নিশ্চয়ই সূর্য-মুখীর মত খুশীতে দুলে উঠবে।

কথাটা বলতেই সুচরিতা আনন্দে সোনালী রোদ্দুর হয়ে গেল, তারপর ঝিল-মিলিয়ে বোললো, আমার ফটো ভাল ওঠে না।

আমি ভাল করে তুলে দেবো, রাহুল বোললো, আমাদের ক্যামেরাটায় দারুণ ফটো ওঠে, সৈকতের দিকে তাকালো সে, একদম ফরেন ইমপোর্টেড তো, সেই যে রে তোর মনে নেই...!

সৈকতের মুখটা কুয়াশাঢাকা হয়ে গেছে। কত কষ্ট করে দাদার কাছ থেকে ক্যামেরাটা ম্যানেজ কোরলো সে, ফরেনের না হলেই বা, দেশী কোম্পানীগুলো কি ভাল ক্যামেরা তৈরী করতে পারে না। রাহুল মনে মনে দারুণ খুশী হোল, আর এই একটা ব্যাপারে সে মনে মনে সৈকতকে ধন্যবাদ জানালো, সত্যি বন্ধুর পরিচয় দিয়েছে সৈকত, কিন্তু মুখে কিছু বোললো না। এতদিনের বন্ধু সৈকতকে শুধু একটা ব্যাপারে তার শত্রু মনে হয়, কি কুক্ষণে যে ওর ঐ মোটা বোনটার দিকে তাকালো রাহুল। সুচরিতারও খুব মজা লাগছিলো, কলকাতায় যখন সব ফটোগুলো দেখাবে... ভাবতেই মনটা খুশীতে ফানুস হয়ে উঠলো।

সুচরিতা চলে যাবার পর দু'জনে তেমন কোন কথা খুঁজে পায় না, আজ রাহুল বোললো, কবে তোলা যায় বলতো!

যেদিন নদী দেখতে যাবো...উদাস সুরে উত্তর দিলো সৈকত।

দূর, উসখুস কোরলো রাহুল, অনেক দেরী হয়ে যাবে, আর সে কবে যাবো না যাবো ঠিক নেই।

তুইই তো বললি, সৈকত বিস্মিতভাবে রাহুলের দিকে তাকালো।

ও এমনি বলেছিলাম, রাহুল একটু ঘন হয়ে এলো, এই তুইতো খুব ভাল ফটো তুলতে পারিস।

সৈকত খুব খুশী হোল এ কথা শুনে, কিন্তু মুখে কিছু বোললো না বরং আরও নির্বিকারভাবে বোললো, কোথায় আর তুলি, সেবার হোমসে গিয়ে...

ও থাকগে, রাহুল আরও অন্তরঙ্গ হোল, এটা লাক, কবে তোলা যায় বল না, তুইই তো প্রোপোজ করলি...

ও এমনি বলেছিলাম, সৈকত নির্বিকার উদাসীনতায় উত্তর দিলো।

তার মানে? হঠাৎ চমকে গেল রাহুল, একবার ধূসর অন্ধকারে সৈকতের মুখটা দেখার চেষ্টা কোরলো, বেশী ডাঁট! কিন্তু এখন মাথা গরম করা উচিত না, পরে এর শোধ নেবে রাহুল, নরমভাবে বোললো সে, তোর ক্যামেরাটাই আনিস।

সৈকত একটু চুপ করে থেকে বোললো, ক্যামেরা নিয়ে ছোড়দা দার্জিলিং চলে গেছে।

রাহুল সৈকতের গলার স্বরে বুঝলো না সৈকত সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে।

ঠিক আছে, আমারটাই আনবো, মৃদুস্বরে বোললো সে।

সৈকতের ইচ্ছে হোল বলে, না কিছুতেই তুলবো না। কিন্তু উচিত হবে না। সুচরিতার আনন্দ ঝলমল সকালবেলার চন্দ্রমল্লিকার মত মুখটা মনে পড়লো তার, ভরা গাল, নীল চোখ, মিষ্টি হাসি খুব সুন্দর ফটো উঠবে ওর।

কিরে কবে যাবি, রাহুল আস্তে আস্তে বোললো।

তোর যেদিন ইচ্ছে, সৈকত আবার সুচরিতার মুখ ভাবলো।

রাহুল তার বাড়ীর পথ ধরলো, আর শোন, সৈকতের পিঠে হাত রাখলো সে, বেশ ভাল দেখে ফটো তুলে দিস।

কোদোর ক্ষেতে পা দিয়েই ভলকে উঠলো সুচরিতা, এগুলো কি!

ওগুলো থেকে মদ তৈরী হয়, পরম নির্লিপ্ততায় উত্তর দিলো রাহুল।

এমা! নাক কুঁচকে ফেললো সুচরিতা, এখানে আমি ফটো তুলবো না। ওর ভঙ্গী দেখে সৈকতও হেসে ফেললো, আরে দেখো কি ফাইন উঠবে, ক্যামেরা ঠিক করতে করতে বোললো সে, মনে হবে ফুলের মধ্যে বসে আছো।

আর ফটোতে তো গন্ধ পাওয়া যাবে না, তরল গলায় বোললো রাহুল। পরপর অনেকগুলো স্ন্যাপ নিলো সৈকত। সুচরিতার, রাহুলের, অনেক জায়গায়, অনেক ভঙ্গীতে, ক্যামেরায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে সুচরিতাকে খুশী মনে ফটো তোলে সে।

সুচরিতা একবার বোললো, এখনই সব তুলছেন, যেদিন নদী দেখতে যাবো...?

সৈকত রাহুলের দিকে তাকালো। রাহুল আশ্বাস দিলো, সেদিন আবার তোলা হবে।

তুই আয় সৈকত, তোর ফটো আমি তুলি, রাহুল ডাকলো।

না, থাক, এগিয়ে যেতে যেতে বোললো সৈকত।

না কেন, আসুন না, সুচরিতাও ডাকলো।

সুচরিতার পাশে দাঁড়ালো সৈকত, বেশ লম্বা সুচরিতা, তার পাশে মানায় ভাল।

দাঁড়া সৈকত, রাহুল চেঁচিয়ে বোললো, এদিকে তাকা, আর্ট দে, বাঃ, দারুণ সুইট লাগছে তোকে...।

হেসে ফেললো সৈকত, আর সুচরিতা তো সব সময়ই হাসছে। আর একটা আছে সৈকত ক্যামেরা নিয়ে বোললো, একটা সুচরিতার সিঙ্গল তুলি, ওর নিজের জন্য।

না, রাহুল এগিয়ে এলো, এটা আমার আর ওর একসঙ্গে তোল, বেশ সুন্দর করে তোলা চাই।

সৈকত মুখ তুলে তাকালো, কি বলতে চায় রাহুল।

সুচরিতা একটু ইতস্ততঃ কোরলো, আরও...?

রাহুল মনে মনে ভাবলো সৈকতকে সে মজা দেখাবে।

এসো সুচরিতা, রাহুল ততক্ষণে একটা ঝাউগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে তোল, দারুণ রোমান্টিক হবে।

না, দূরে থেকে বোললো সৈকত, ছায়া পড়ে যাবে, বরং...এদিক ওদিক তাকালো সে, তোরা এই গোলাপ গাছটার পাশে দাঁড়া ভাল লাগবে।

রাহুল বোললো, খুব আর্ট দিয়ে তোলা চাই, সুচরিতা এসো, ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ টানলো সে, এমন পোজ দি আমি যেন গোলাপ তুলে তোমার চুলে পরিয়ে দিচ্ছি...!

না, না, সুচরিতা একটু বিব্রত হোল এমনিই দাঁড়াই।

অগত্যা! —রাহুল দুঃখী দুঃখী মুখ করে দাঁড়ালো।

রেডী! সৈকত চেঁচালো।

ইয়েস। একটা ছোট্ট মুহূর্ত। রাহুলের হাত সুচরিতার কাঁধে। সৈকত শাটার টিপে দিয়েছে।

যা উঠবে না, ফ্যান্টাস্টিক! রাহুল জোরে হেসে উঠলো।

সৈকত সুচরিতার দিকে তাকালো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ। অন্যদিন আরও সুন্দর মানিয়ে যেন ছায়া ... ঢাকা পড়েছে! সাতপাঁচ সৈকত বোধহয় না ভাবতে পারলো। হঠাৎ সেও ঠিক বুঝতে পারে নি। চোয়াল শক্ত করে রাহুলের দিকে তাকালো সে, তারপর খুব নরমসুরে সুচরিতাকে বোললো, কেউ দেখবে না ও ফটো।

সুচরিতা কোন কথা বোললো না। ... গলার কাছে ব্যথা করছিলো। ... মনে মনে শুধু বোললো, ক্যামেরায় ফটো তো সব নয়, আমার মনের ক্যামেরায় যার ফটো তোলা আছে হাত বাড়িয়ে কি সে খুঁজতে চেষ্টা কোরলো সে তা রাহুলেরও না, সৈকতেরও না, সে অন্য, তার কলকাতার প্রেমিক—তার কাছে গিয়ে আমি কি আর নদী দেখার আগে এই কাঁধে হাত রেখে ছবি তোলার গল্প তেমন সহজে করতে পারব!
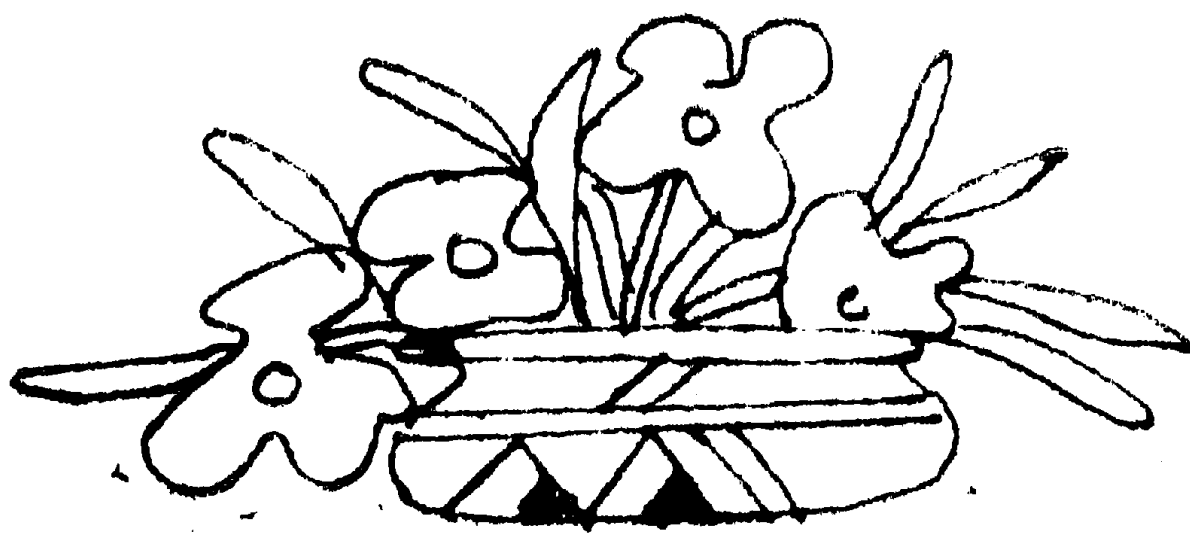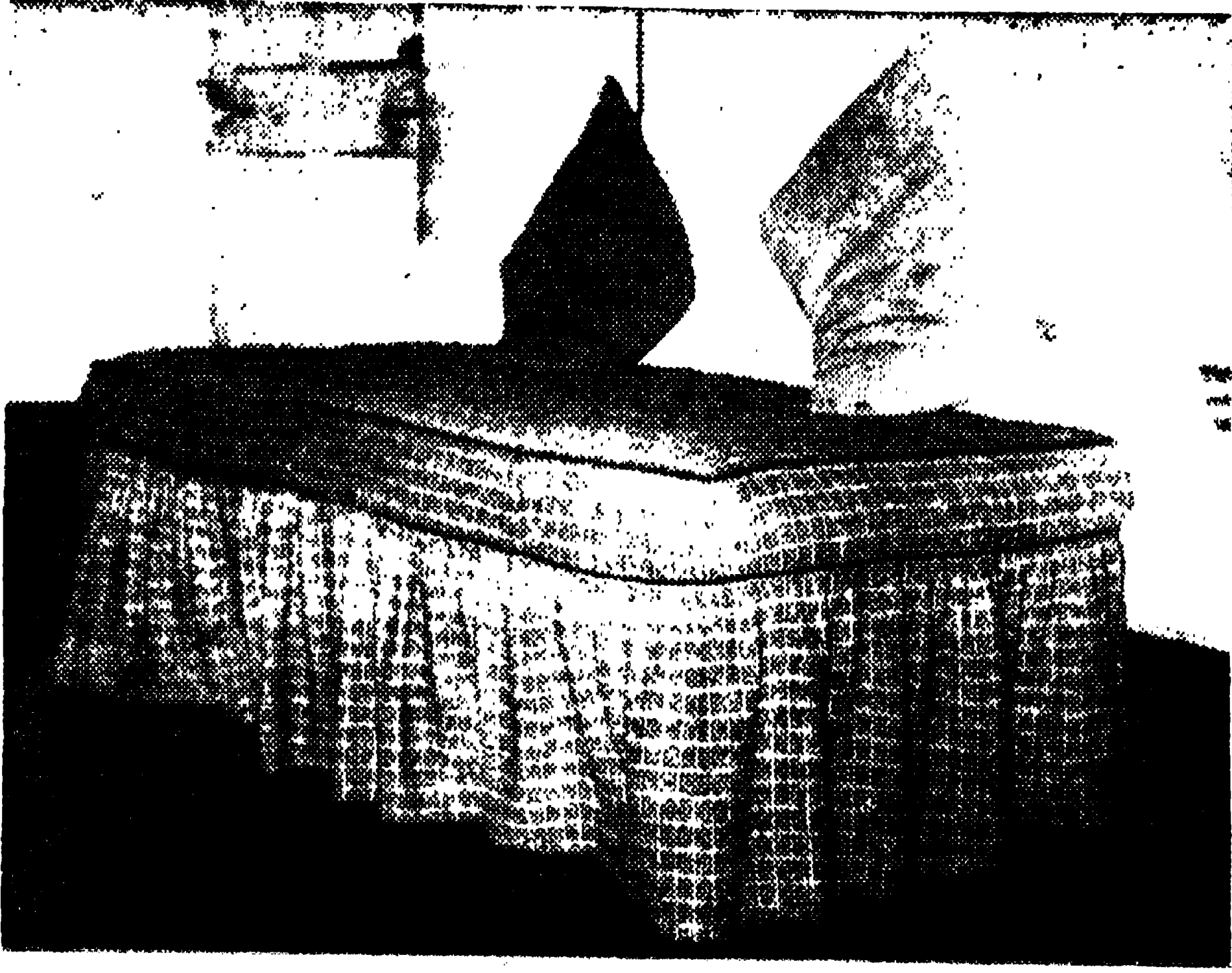
আপনার ঘরের চৌকিটা নিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছেন? সব সময়ই আসে লোকজন। কিন্তু কি সংকোচ! ঘরে ঢুকতে দিতেই যত লজ্জা যে আঁকড়ে ধরে যেন। ঐ চৌকি বড় একটা বেড়কভার দিয়ে এই ভাবে ঢেকে দিতে পারেন। বেড়কভারের নীচে চৌকির ওপর কাঁথা কম্বল তোষক বিছিয়ে দিন। চৌকির নীচে রাখুন দৈনন্দিন জিনিস। কেউ দেখতে পাবে না। আর ঐ অভিনব বিছানার ওপর দুটো বালিশ রাখুন। কেমন দেখতে হোলো?

অঙ্গনা

নিঃসঙ্গতা : সামাজিক ব্যাধি

সেই কবেকার কথা। আজ আবার মনে পড়ে গেল। নতুন বছরে স্কুল শুরু হয়েছে। ক্লাস বসেছে। কিন্তু পড়াশোনা তেমন হচ্ছে না। দিদিমণিরা এসে সকলের কুশল সংবাদ নিচ্ছেন, বইপত্র কেনা হলো কিনা সেকথা জিগ্যেস করছেন। আমরা খুশিমনে সব কথার উত্তর দিচ্ছি। এই খুশির পেছনে আসল কারণটি হলো যে, আজ পড়া ধরার পাট নেই আর এক্ষুনি ছুটির ঘণ্টা বাজলো বলে। এখন এরকমধারা কদিনই চলবে। আর সেকদিনই স্কুলে আসার মজা। এরপর তো আসতে হবে বাধ্য হয়ে। তাই নিশ্চিত ছুটির আনন্দে মশগুল হয়ে সবাই নোটিশ আসার অপেক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে আছি। আমাদের এই উসখুসে ভাব দিদিমণির নজর এড়ায়নি। সত্যি কথা বলতে কি সেদিন আমরা একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। রোজ তিন পিরিয়ডের মাথায় ছুটির নোটিশ আসতো অথবা ঘণ্টা বাজতো। কিন্তু আজ তিন পিরিয়ড পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ ছুটি হওয়ার নাম নেই। দিদিমণি আমাদের অস্থিরতা লক্ষ্য করে বললেন, ছুটি এক্ষুনি হবে। ইতিমধ্যে তোমরা আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। এই যে আজ তোমরা স্কুলে এসেছ শুধুই কি ছুটির জন্যে? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া তখন দুরূহ, ছুটির চিন্তা কেবল মাথায় জট পাকাচ্ছে। তাছাড়া চট করে উত্তর দেওয়ার মতো প্রশ্নও এটি নয়। কিন্তু একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললো, ছুটির জন্য নয়, স্কুলে এসেছি বন্ধুদের সংগে মেলামেশার উদ্দেশ্য নিয়ে। দিদিমণি যেন ওর মুখ থেকে কথাটা লুফে নিলেন ছুটি হয়ে যাবে জানা সত্ত্বেও স্কুলে আসার আসল কারণ নিহিত রয়েছে এই মেয়েটির কথায়। তারপর একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, মানুষ একা থাকলে খুব নিঃসংগ বোধ করে আর এই নিঃসংগতার বেদনা দূর করার জন্যই সে

সমাজ গড়েছে। তাই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি ছুটির আনন্দে মেলা-মেশার সুখটুকু উপভোগ করার জন্য। দিদিমণির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল। কালবিলম্ব না করে আমরা হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লাম।

সেদিন দিদিমণির কাছ থেকে শেখা এই কথাটা পরবর্তীকালে নানাভাবে মিলিয়ে নিয়েছি। সভ্যতার আদিম প্রভাতে মানুষ ছিল একান্ত একলা। এভাবে বেশিদিন চলে না। তাই সে নিজের পথ নিজে খুঁজে নিয়েছে। ঘর বেঁধেছে, সমাজ গড়ে তুলেছে। আর সেখান থেকেই তার জয়যাত্রার ইতিহাস অবিচ্ছিন্নধারায় নতুন কাহিনী রচনা করে চলেছে।

ইদানীং কিন্তু একটা কথা খুব শোনা যায় যে বিয়ে-থা করবো, স্বামী-স্ত্রীতে দুজনার সংসার হবে। আর আত্মীয়স্বজন থেকে একটু দূরে থাকাই ভাল। কেউ কেউ আবার একটু এগিয়ে এলেন। তাঁদের মতে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একদিন বিচ্ছেদ হবেই। তাই সেজন্য কোন অগ্রপশ্চাৎ ভাবনার দরকার নেই। একটু তাড়াতাড়ি এই আলাদা থাকার ব্যবস্থা করতে পারলেই ভালো হয়। ছেলে এবং মেয়ে দুয়ের মুখেই এধরনের কথা শোনা যায়। শুধু ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। অনেক মা-বাবাও এই মত পোষণ করেন। মেয়ের সম্বন্ধ খোঁজ করতে গিয়ে অনেকেই চান যে তাঁদের মেয়ে ছোট পরিবারে পড়ুক। অর্থাৎ সেই পরিবারে কোন অবিবাহিতা মেয়ে থাকবে না। মোটামুটি দু' ভায়ের সংসার হবে। এর একটা কারণ অবশ্য যে ননদিনীর যম-যন্ত্রণা থেকে তাঁরা মেয়েকে বাঁচাতে চান। সেই সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা তাঁদের মেয়ে-জামাই যেন স্বতন্ত্র থাকতে পারে। এমন কথাও শোনা যায় যে বড় পরিবারের সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধ হতে মা-বাবা মন্তব্য করেছেন এতো বড় পরিবারে আমার মেয়ে তো খেটেই মরে যাবে।

মানুষ একদিন নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য সমাজ গড়েছিল। আর আজ আমরা সেই সমাজ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে নতুন করে নিঃসঙ্গ হতে চাইছি। আজকের দিনে এই নিঃসঙ্গতা আমাদের মস্ত ব্যাধি। একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা আরো সহজ হয়ে যাবে। বড় বড় শহরে বিরাট বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ি এখন গড়ে উঠেছে। প্রতি ফ্ল্যাটে নানা লোকের বাস। এতো বড় বাড়িতে বাস করার পরও কিন্তু নিঃসঙ্গতার কথা শোনা যায়। স্বামী সকালে অফিসে যান। ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়। গিন্নি সারাদিন একলা। অবস্থা এমন যে পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার সঙ্গেও তাঁর কোন পরিচয় নেই। তাঁর দিন যে কেমনভাবে কাটে সে একমাত্র তিনিই জানেন। এভাবে দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে তাঁর মনোভঙ্গিতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেই সময়ের জন্য তাঁর সাগ্রহ প্রতীক্ষা। কিন্তু বেচারা স্বামী সারাদিন খাটুনির পর আর বেশিক্ষণ তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেন না। বিছানায় ঢলে পড়েন। একমাত্র ছুটির দিনই তাঁর ভরসা।

একান্নবর্তী পরিবারে এই সমস্যা ছিল না। সারাদিন স্বামীর সাহচর্যে কাটানো কোন স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, সংসার চালানোর জন্য স্বামীকে রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরে বসে রোজগার করার ভাগ্য অধিকাংশের নয়। তাই সারা-দিনের জন্য স্বামীকে ছাড়তেই হয়। একান্নবর্তী বা বড়ো পরিবারে গল্পগুজব করার জন্য অনেক সমবয়সী পাওয়া যায়। সময় এখানে সহজেই কেটে যায়। তারপর দিনের শেষে স্বামীসঙ্গ এক নতুন তৃপ্তি এনে দেয়। একঘেয়েমিতে মন খিঁচড়ে যায় না। কিন্তু জীবনের এমন সহজ সোপান আজ আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। আমরা নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু ফাঁদ তৈরি করেছি। প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতায় আজ তাই ডুকরে কাঁদছি।

দিনে দিনে জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিন বিবাহবিচ্ছেদ নামক বস্তুর সঙ্গে আমাদের খুব একটা দহরম-মহরম ছিল না। এখন সেদিন গেছে। আজ স্বামী-স্ত্রীর মনান্তরের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ডিভোর্স। তখন নিঃসঙ্গতা আরো বাড়ে। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই। তবে পুরুষ সত কাজে ব্যস্ত থাকায় নিঃসঙ্গতা অনেকটা ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে অনেক সময় তা হয় না। এরকম এক ভদ্রমহিলাকে আমি জানি। বিয়ের বছর সাতেক পর তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। দুটি ছেলে নিয়ে তিনি একলা চলার পথ নিলেন। এবার কিন্তু তাঁকে নিঃসঙ্গতা পেয়ে বসলো। সম্প্রতি তিনি চাকরি করছেন। এজন্য সারাদিন তাঁর অফিসে কাটে। সন্ধ্যেবেলা ঘরে তিনি দেখেন যে ছেলে দুটো ঘুমুচ্ছে। তখন তাঁর একমাত্র সাথী হলো রেডিও। তার সময় আর কাটতে চায় না। অথচ তিনি যখন স্বামীর ঘরে ছিলেন তখন সময় কাটানো তাঁর পক্ষে কোন সমস্যাই ছিল না। প্রায় সারাদিন তিনি স্বামীর সাহচর্য পেতেন। স্বামীর অফিস বাড়ির কাছে। সকালে অফিস যেতেন। দুপুরে খেতে আসতেন। এভাবে স্বামী তাঁকে সবসময় সঙ্গ দিতেন। এর ওপর ভদ্রমহিলার নিজেরও কিছু কাজ ছিল। বাচ্চাদের স্কুলের অভিভাবক পরিষদের তিনি ছিলেন সদস্যা। এতেও তাঁর নিঃসঙ্গতা অনেকখানি নিবারিত হয়েছিল। প্রায়ই অনেক সময় তাঁকে এখানে ব্যস্ত থাকতে হতো। ফলে তাঁর লাভও হয়েছিল। বাচ্চাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে যেমন তাঁর স্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল তেমনি সকল ছাত্রের মায়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সব সুযোগ নষ্ট হয়েছে। এখন তাঁর নিঃসঙ্গতা আর যেন কাটতেই চায় না।

এই নিঃসঙ্গতার প্রভাব শিশুমনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। স্বামী-স্ত্রী এখন ভিন্ন সংসার বাঁধতে চান। তাই শিশু জন্ম থেকেই প্রায় নিঃসঙ্গ। বাবাকে সে তেমন পায় না। মাকেও প্রয়োজনের তুলনায় নয়। কারণ, মা হয়তো চাকরি করেন। ফলে, শিশু বেড়ে ওঠে সম্পূর্ণ একা একা। তার মানসিক বিকাশের জন্য খেলার সাথী দরকার। কিন্তু ছেলেকে একা বাইরে ছাড়া যায় না। তাছাড়া সকলের সঙ্গে মেলামেশা আর খেলাধুলো করতে দেওয়াও নিরাপদ নয়। এর ফলে এক অবশ্যম্ভাবী নিঃসঙ্গতার শিকার হতে হয় এই শিশুকে।

শিশুর এই নিঃসঙ্গতা দূর করা আমাদের আজকের প্রধান কর্তব্য। শিশুরা যদি জাতির ভবিষ্যৎ হয় তবে তাদের এমনভাবে বাড়তে দেওয়া উচিত নয় যাতে জাতিরই সমূহ ক্ষতির আশংকা। বিদেশে শিশুদের এই নিঃসঙ্গতা দূর করার নানা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে আজো তেমনটি হয়ে ওঠেনি। তাই শিশুদের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য প্রতিবেশীদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। একটু বড়ো ছেলেমেয়েরা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে রাজি হয় না। সব মা-বাবা যদি ওদের সঙ্গে ডেকে কথা বলেন, গল্প করেন তবে সমস্যা অনেকটা হালকা হয়। এছাড়া শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের ক্লাব করা চলে। সেখানে তারা নিজেদের খুশিমতো খেলাধুলো করবে। এর ফলে শিশুমনের বিকাশে যেমন সাহায্য করা হবে তেমনি নিঃসঙ্গতাও কাটবে। ছেলেপুলে নিয়ে মা-বাবার ভাবনাও কমবে।

শিশুর নিঃসঙ্গতা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের নিঃসঙ্গতা দূর করার কথাও ভাবতে হবে। মায়ের এবং শিশুদের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে নানারকম সংস্থায় যুক্ত হয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনে সেরকম সংস্থা গড়ে নেওয়া। এরকম কয়েকজন গৃহবধূর কথা আমার জানা আছে যাঁরা একইরকম নিঃসঙ্গ অনুভব করতেন। আজ আর তাঁরা নিঃসঙ্গ নয় এবং আরো অনেকের নিঃসঙ্গতা দূর করার পথ দেখিয়েছেন। ওঁরা সবাই একা একা ছিলেন। স্বামী অফিস চলে যাবার পর আর কোন কাজ নেই। গল্প করারও তেমন কেউ নেই। একমাত্র রাস্তা হচ্ছে, টানা ঘুম। কিন্তু ঘুমেও অরুচি ধরে গেছে। ইতিমধ্যে একজনের সঙ্গে আর একজনের পরিচয় হলো। পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন দুজন। কেউ কাউকে চিনতেন না। দায়ে পড়ে পরিচয়। দুজনে দুজনের কথা শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকের কথা ওঁরা ভেবে নিলেন। দুজনে স্থির করলেন আরো অনেককে নিঃসঙ্গতার হাত থেকে মুক্তি দিতে ওঁরা একটি হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টার খুলবেন।

হাতের কাজ গৌণ, একত্রে মিলেমিশে গল্পগুজব করাই মুখ্য। যে কথা সেই কাজ। হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টারের সূচনা হলো। অনেক উৎসাহী এসে জড়ো হলেন। নিঃসঙ্গতা কাটলো। পানের কৌটোয় আড্ডা জমলো। হাতও থেমে থাকলো না। এখন এটি রীতিমতো বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। সূচনায় উদ্দেশ্য ছিল নিঃসঙ্গতা ঘোচানো। সেই উদ্দেশ্য পূরণ করে এখন অনেকেই কিছু কিছু রোজগার করেন।

নিঃসঙ্গতা থেকে যদি এরকম প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তবে তো আশার কথা। সেই সঙ্গে মেয়েদের ক্লাবও গড়ে তুলতে হবে যেখানে খেলাধুলোর মাধ্যমে চিত্তবিনোদন ঘটবে। এমনিভাবে অনেক কিছুই সম্ভব। দশজন একসঙ্গে হলে মেয়েদের একটা পত্রিকা বের করাও অসম্ভব নয়। অর্থাৎ যে কোন একটি দৃষ্টান্ত থেকে তার প্রসার ঘটবে।

নিঃসঙ্গতা সমাজজীবনের বড়ো শত্রু। সুতরাং একে পল্লবিত হতে দেওয়া যায় না। শিশু চায় সমবয়সীদের সঙ্গে মেলা-মেশা। মায়েরা চান অবসর অসার চিন্তায় নিজেকে দীর্ণ না করে সুমধুর সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক। সমগ্র জাতির আন্তরিকতাই একমাত্র সক্ষম এই সম্ভাবনার স্বর্ণ দুয়ার খুলে দিতে। নিঃসঙ্গতার অভিশাপ কাটুক, জীবন নতুন লাস্যে মুখরিত হোক।

—প্রমীলা

দুই দেশের এক মন

কিছুদিন পূর্বে 'ফেমিনা'তে প্রকাশিত পশ্চিম জার্মানীর মহিলাদের সম্বন্ধে আলোচনা থেকে জানা গেল যে, বহির্জগতের নানাবিধ কাজ সত্ত্বেও সংসারই হচ্ছে সেখানকার মেয়েদের সর্ববৃহৎ কর্মস্থল। সংসারের চাকার কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁদের বাইরের জগতের কাজ আবর্তিত হচ্ছে। ব্রিটেনে এবং আমেরিকায় যখন নারী স্বাধীনতা বিষয়ক আলোচনা অনেক মাসিক ও দৈনিক পত্রিকার শিরোনামা দখল করে বসেছে সে-ক্ষেত্রে জার্মানী বিশেষতঃ পশ্চিম জার্মানীর মেয়েরা ততটা স্বাধীন হয়ে ওঠেনি।

যে কোন সামাজিক অথবা দায়িত্বপূর্ণ যে কোন কাজে এদেশের মেয়েরা অনেকদূর এগিয়ে গেছেন আরও পাঁচটা পশ্চিমী দেশের মেয়েদের মত। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, অফিসে অথবা রাস্তায় এক ঝলক নজর বোলালেই দেখা যায় মেয়েদের কাজের সীমানা কতদূর প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া 'ম্যাক্সি', 'মিডি' 'মিনি', 'মাইক্রোমিনি' এবং 'হট প্যান্ট' প্রভৃতি নানাবিধ পোষাক পরে পশ্চিম জার্মানীর মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ইলেকট্রিক্যাল টেস্টার, টেকনিক্যাল ড্রাফটসম্যান, পেট্রল স্টেশন এ্যাসিসট্যান্ট, ট্যাক্সি ড্রাইভার সর্ব-ক্ষেত্রেই মেয়েদের আধিপত্যের কমতি নেই। মহিলা আইনজীবী, ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিসিয়ান্স কোন ক্ষেত্রেই মেয়েরা পিছিয়ে নেই।

বিশ শতকই এদেশে মেয়েদের এই প্রগতির দরজা খুলে দিয়েছে। এই শতকের গোড়াতেই বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ দিল। উনিশশো আট সালে বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দল ও অন্যান্য সংঘ মহিলা সদস্য গ্রহণ করতে তৎপর হলো। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে নারীরা যুদ্ধে নিজেদের ভূমিকা মূল্যবান বলে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হলেন। তাঁরা ভোটাধিকার পেলেন। সুতরাং সেই বিশ শতকের গোড়ার দিকের সুবিধাগুলির সঙ্গে যতদিন যেতে লাগলো আরও নানা-রকম সুবিধা যুক্ত হলো। অবশ্য মহিলারা অনেকেই মনে করেন যে, রাজনীতিতে পুরুষেরা থাকাই ভাল, মহিলাদের ক্রম-বর্ধমান সুযোগ-সুবিধা রক্ষার্থে বিশেষ করে শ্রমিক মহিলাদের, তাদের পরিবারের ও শিশুদের মঙ্গলার্থে নানারকম আইন প্রবর্তিত হতে থাকলো। বাইরের এই সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে মহিলাদের সংসারেও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

এই প্রগতির বিরুদ্ধে 'ন্যাশান্যাল সোসিয়ালিজম' মেয়েদের ক্ষমতা খর্ব করবার চেষ্টা করলো। এর মতে মেয়েদের স্থান শুধু বাড়ীতে এবং শিশু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বই মেয়েদের হাতে থাকবে। সম্ভবতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে 'কিণ্ডার', 'কিরচে' এবং 'কুচে' অর্থাৎ শিশু, গীর্জা এবং রান্নাঘর এই তিনটি শব্দই প্রযোজ্য।

যুদ্ধোত্তর যুগে নারীরা 'ন্যাশন্যাল সোসিয়ালিজম'-এর চিন্তাধারা অগ্রাহ্য করে আরও স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হলেন। তারপর পুরুষদের পাশাপাশি সম-অধিকার দখল করতে নারীরা অনেকটা কৃতকার্য হলেন।

বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হতে এবং কোনরকম ট্রেনিং নিতে বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। কিছুদিন আগের সমীক্ষাতে জানা গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যার চারভাগের একভাগ নারী। ডাক্তারী, শিক্ষকতা, রসায়ন ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণে মেয়েদের বেশীর ভাগই আগ্রহী। বৃত্তি বা পেশা হিসেবে ট্রেনিং নিতে শতকরা চুয়াল্লিশ জন মেয়ে বাণিজ্যবিষয়ক, শাসনবিষয়ক, গৃহ-কর্ম, শিশুপালন ও সৌন্দর্যচর্চা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে নির্বাচন করেন।

মহিলারাই দেশের শ্রমের মোটামুটি তিন ভাগের একভাগ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। দিনের পর দিন তাঁদের পেশার পথগুলি আরও প্রশস্ত হবে। জার্মানীর মহিলারা মোটামুটি আশা করেন তাঁরা তিয়াত্তর বছর বাঁচবেন। এই বছরগুলিকে তাঁরা সুন্দরভাবে কয়েকটি ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁরা কুড়ি থেকে তেইশ বছরের মধ্যেই বিয়ে করার পক্ষপাতী। পনেরো বছর তাঁরা সন্তান পালনের জন্য ধরে রাখেন। অবশ্য দুটি-তিনটির বেশী সন্তান তাঁদের কাম্য নয়। এছাড়া বছর পঁচিশেক বা তার বেশী কিছু সময় কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত থাকার জন্য হিসেব কষা থাকে। বয়স্কা মহিলারা শিক্ষাগ্রহণ করতেও বিশেষ ক্লাসে যোগদান করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাজগতে এত প্রসারতা বা অগ্রগতি সত্ত্বেও তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র কিন্তু গৃহ। যদিও বিবাহের বছর চারেকের মধ্যে তাঁদের অধিকাংশকেই বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আদালতের সম্মুখীন হতে হয়। তবু গৃহী হয়ে গৃহের কাজে উৎসাহ, উদ্দীপনা মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। এখানেই বোধহয় জার্মান মেয়েদের সঙ্গে আমাদের দেশের মেয়েদের বিরাট এক সাদৃশ্য। ভারতের শিশুদের এখন পর্যন্ত বাড়ীই প্রথম বিদ্যা-লয় এবং মা-ই তাদের প্রধান শিক্ষিকা।

ভারতের অনেক প্রদেশেই বাইরে কর্ম-লিপ্ত মহিলাকেই লক্ষ্য করেছি ছুটির পরেই তাঁরা বাড়ী ফেরার বিরাট এক তাগিদ অনুভব করেন। নির্ধারিত সময়ের অতি-রিক্ত তাঁদের যদি বিশেষ কোন কারণবশতঃ কর্মক্ষেত্রে থাকতে হয়, তবে তাঁরা বাড়ীর জন্য, বিশেষতঃ শিশুদের জন্য এত অধীরতা চঞ্চলতা প্রকাশ করেন যা ভারতীয় নারী-চরিত্রের বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য।

আমার পরিচিতা এক মহিলা দেড় বছরের এক বাচ্চার জন্য কর্মক্ষেত্র স্কুল ছাড়া সিনেমা, থিয়েটার, কোনরকম আমোদ-প্রমোদের স্থানে কখনই যান না। তিনি বলেন, 'বাচ্চাকে রেখে কোথাও গেলে মনে হয় মা হিসেবে আমি ছেলের প্রতি কর্তব্য ঠিকমতো করছি না। ও বড় হোক, বেড়াবার দিন তো পড়ে আছে।' জার্মানীর মেয়েদের গৃহদরদী মনোভাব আর ভারতীয় মেয়েদের গৃহের প্রতি আকর্ষণ শাশ্বত মানব মনের চিরন্তন প্রকাশের মিল কোন স্থান, কাল, দেশের অপেক্ষায় থাকে না।

—অঞ্জলি চৌধুরী

জবাব ছবির আউটডোর শ্যুটিং-এ রাধা সালুজা এবং শমিত ভঞ্জ। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

মোটর রেসের চমকসহ অপরাধ চিত্র

মোটর রেসের যে চমক আমরা সুখ্যাত ছবি 'গ্রাঁ প্রী'তে দেখেছি, তার সঙ্গে তুলনা না করেই বলব, এফ কে ইন্টারন্যাশনাল-এর নিবেদন ইস্টম্যানকলার রঞ্জিত ছবি 'অপরাধ' কৌশলী চিত্রগ্রহণের গুণে ছবির প্রথমার্ধের মোটর রেসের দৃশ্যাবলী দর্শককে প্রচুর রোমাঞ্চিত করে। সম্ভবত ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই প্রথম এ ধরণের আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ইয়োরোপীয় মোটর রেসের রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখা গেল। কিন্তু প্রযোজক-পরিচালক ও নায়ক ফিরোজ খাঁ তাঁর ছবির আরম্ভ ভাগে কাহিনীর অভিনবত্বের যে সম্ভাবনাময় আভাষ দেন, তাকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন নি। তাঁর কাহিনীর নায়ক রাম খান্না আন্তর্জাতিক মোটর রেসে দু দুবার নিজেকে অজেয় প্রতিপন্ন করেও এক আন্তর্জাতিক চোরা কারবারীর দলের পাল্লায় পড়ে বিভ্রান্ত হয়। তাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না করতেই নিজেরই দুর্বৃত্ত ভাই হরনামের খপ্পরে পড়ে নাজেহাল হয়। কাহিনীকারের অশেষ অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জট ছাড়িয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকাকেও কলঙ্কমুক্ত অবস্থায় নিজের করে নিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ রাম খান্নাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন মোটর-চালকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেও কাহিনীকার মোটর রেসিংয়ের জগতে তাঁর কাহিনীকে না রেখে গতানুগতিক আন্ত-র্জাতিক স্মাগলিং বা ঠক-চোরাকারবারীর জগতে নিয়ে গেছেন। শঠতার জাল থেকে নায়কের উদ্ধার লাভকেই তাঁর বক্তব্যে পরিণত করেছেন। এর ফলে একটি সম্ভাবনাময় অভিনব কাহিনী অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

চুরি, জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজী, বুদ্ধি ও দেহশক্তির কসরৎ প্রভৃতি যে কাহিনীতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, সে কাহিনীতে শিল্পীদের প্রকৃত নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ যে অল্প, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবু ওরই মধ্যে যিনি যেখানে যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তিনি তার যথোচিত সদ্ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন, মনে রাখবার মতো হয়েছে, নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি। নায়িকা রীতা ওরফে মীনা একটি জুয়াচুরি করে পাওয়া দামী নেকলেস সমেত পুলিশের চোখ এড়িয়ে কোনো রাজ্যের সীমানা অতি-ক্রম করে পালাতে পারলে বাঁচে। হঠাৎ সে দেখল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধুরন্ধর মোটর-চালক রাম খান্না মোটর হাঁকিয়ে চলেছে। সে তাকে থামাল; এবং ভাষা বোঝা এবং না বোঝার ভান করে শেষ পর্যন্ত নিজের উদ্দেশ্য সফল করল। হিন্দী ছবিতে সাধারণত যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটানো হয়ে থাকে, এ ছবিতে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। মীনা ও রামের প্রথম আলাপ তাই সুন্দর উপ-ভোগ্য রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। নায়িকা বেশে মমতাজ দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন বহু স্থানেই। ফিরোজ খাঁ নায়কের ভূমিকায় কাজ চালিয়ে গেছেন মাত্র। দুর্বৃত্ত দলভুক্ত সুশীর চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন ফরিয়াল তাঁর অভিনয় গুণে। সরু ঝোলা গোঁফওয়ালা দুর্বৃত্ত দল-পতিটিও চরিত্রচিত্রণে সাফল্য অর্জন করেছেন। এ ছাড়া প্রেম চোপরা (হরনাম), কে এন সিং (শেখ), কুলজীৎ সিং (রিকি), ইফ-তেকার (পুলিশ ইন্সপেক্টার), মুকরী (জহুরী), হেলেন (হরনামের প্রেয়সী) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে কমল বসু অসামান্য পার-দর্শিতা দেখিয়েছেন। মোটর রেসের দৃশ্য-সমেত বহু বহির্দৃশ্যে তাঁর ক্যামেরার কাজ মনে রাখবার মতো। সম্পাদনাগুণে ষোল রীলের ছবি কোথাও মন্থর হয়ে পড়ে নি; সব সময়েই ছবির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে। ছবির আর একটি সম্পদ হচ্ছে, কল্যাণজী আনন্দজীকৃত এর গানগুলি।

এফ কে ইন্টারন্যাশানাল নিবেদিত এবং ফিরোজ খাঁ প্রযোজিত-পরিচালিত-অভিনীত রঙগীন ছবি 'অপরাধ' দর্শক সাধারণকে এক অভিনবত্বের আস্বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুরি-হিংসা-ষড়যন্ত্র প্রভৃতির রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় উল্লসিত করে তুলবে।

স্টুডিও সংবাদ

অর্থ-যশ-খ্যাতির এই বিচিত্র সিনেমা জগতে যারা আসেন তারা নাকি ভবিষ্যতে কোন দিন এ লাইন ছেড়ে অন্য কোন লাইনে যেতে পারেন না। এই লাইনের নাকি এমনই নেশা যা অন্য কোন নেশার চাইতে জোরালো। অথচ এই লাইনের মত অন্য কোন লাইনে জনপ্রিয়তা নামক বস্তুটির ব্যারোমিটার এত দ্রুত ওঠা-নামা করে কিনা তা আমার জানা নেই। আজকের কোন ব্যস্ত নায়ক-নায়িকা কোন ছবিতে অংশ গ্রহণ করলেই সেই ছবি দেখতে আপনারা ভীড় করেন—শুধু তাই নয় তাঁদের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জয়োল্লাসে ফেটে পড়েন। অথচ দেখা যায় সেই নায়ক-নায়িকা জুটির ৪।৫খানা ছবি ফ্লপ করলেই তাঁদের এক কথায় বাতিল করে দিয়ে অন্য জনপ্রিয় কোন নায়ক-নায়িকার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। যেন এক নিমেষে গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা থেকে তাঁরা কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ঠিকরে ধুলায় লুটিয়ে গড়াগড়ি খান।

তাই যা বলছিলাম—এত কিছুর পরও অর্থ-যশ-খ্যাতি নামক আলেয়ার পেছনে ঘুরে ফিরেই তারা ছুটে বেড়ান, শত চেষ্টা করেও কেউ সিনেমা-লাইনের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন না।

তার মধ্যে কেউ কেউ আবার হঠাৎই আবির্ভূত হয়ে জনমানসে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে হঠাৎই আবার সকলের অগোচরে অন্তর্ধান হয়ে যান।

যেমন ধরুন এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে তিনজন নায়িকার কথা। তাঁদের মধ্যে—অলকানন্দা রায় (কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে আত্মপ্রকাশ'), লিলি চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাসের নাম অন্যতম।

অলকানন্দা রায়কে সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চন জংঘা' ছবির পর আর কোন ছবিতে দেখা যায় নি। পরে শুনেছিলাম তিনি আর কোন ছবিতে অভিনয় করবেন না। লিলি চক্রবর্তীর শেষ ছবি গত সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শেষ পর্ব' (যদিও ছবিটি বহু-দিন আগের তোলা) ছাড়া তাঁকে দেখা গেছে 'ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট' ছবিতে। তারপর আর কোন ছবিতে তাঁকে দেখা যায় নি। অথচ লিলি চক্রবর্তী যতগুলো ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন সব ছবিতেই তাঁর অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। চিত্রে এবং মঞ্চে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। জানি না কি কারণে তাঁর নাম ইদানীংকালে নির্মীয়মান কোন ছবির শিল্পী তালিকায় দেখা যাচ্ছে না।

জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে আমরা কয়েক মাস আগে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ছদ্মবেশী' ছবিতে দেখেছি। কিন্তু তারপরই বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন খবর শোনা যাচ্ছিল। কারো কারো মুখে শোনা যাচ্ছিল তিনি ছবির লাইন ছেড়ে দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে কোন ছবিতে অথবা মঞ্চে অভিনয় করবেন না। অবশেষে জ্যোৎস্না বিশ্বাসের শরণাপন্ন হয়েছিলাম।

আমার কৌতূহলের কারণ জানাতেই তিনি খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে মিটি-মিটি হাসছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ-চাপ থাকার পর তিনি আমায় জানিয়েছিলেন—না, ছবিতে অথবা মঞ্চে তিনি আর অভিনয় করছেন না। কারণ জিজ্ঞেস করায় লজ্জা জড়িত কণ্ঠে জ্যোৎস্না দেবী আমায় জানিয়েছেন—এবার তিনি সংসার পাতবার ব্যবস্থায় মগ্না। ছন্দোবদ্ধ ছোট্ট সুন্দর একটি সংসার গড়ে তোলার সংকল্পে তিনি অটল। খুঁটিনাটি বিবরণ জানতে চাওয়ায় তিনি শুধু সংক্ষেপে জানালেন—ক্রমশঃ তা প্রকাশ্য। তবে একটা কথা পরিষ্কার করেই তিনি আমায় জানিয়েছেন তা হোল—যে বিশেষ লোকটি তাঁর প্রাণে জোয়ার এনেছেন তিনি সিনেমা লাইনের সঙ্গে জড়িত নন।

ইতিমধ্যে বাজারে জোর গুজব—জ্যোৎস্না বিশ্বাসের বিয়ে হয়ে গেছে এবং তাঁর মনের মানুষটি এক বিখ্যাত অবাঙালী ব্যবসায়ীর পুত্র।

সত্যি মিথ্যে যাই হউক না কেন, জ্যোৎস্না বিশ্বাস যে আর ছবিতে বা মঞ্চে অভিনয় করছেন না একথা সুনিশ্চিত। অর্থাৎ বাংলা চিত্রশিল্প আর একজন প্রতিভাময়ী নায়িকাকে চিরতরে হারালো। তবে ভবিতব্যের কথা কেউ বলতে পারে না—এমনও বা হতে পারে এ মোহের লাইনে, অর্থ-যশ-প্রতিপত্তির জগতের হাত-ছানিকে ভবিষ্যতে তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন কিনা!

জ্যোৎস্না বিশ্বাস অভিনীত ছবিগুলোর নাম আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ঃ অশান্ত ঘূর্ণী, দুই পর্ব, তৃষ্ণা, অশ্রু দিয়ে লেখা, তাপসী, কলঙ্কিত নায়ক, মঞ্জরী অপেরা, ছদ্মবেশী এবং স্টারে অভিনীত নাটকের মধ্যে ঃ তাপসী, একক দশক শতক, দাবী এবং সীমা-র নাম অন্যতম।

পদি পিসীর বর্মি বাক্স ঃ অরুন্ধতী দেবী নিবেদিত অনিন্দ্য চিত্র-এর রঙীন ছবি 'পদিপিসীর বর্মি বাক্স' যে কোন দিন মুক্তি লাভ করবে বলে জানা গেল। বহির্দৃশ্যপ্রধান

বনগাঁ মহকুমা সরকারী চিকিৎসকদের প্রযোজনায় এবং শ্রীমতী মঞ্জুলিকা আঢ্যের পরিচালনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে মঞ্জুলিকা আঢ্য এবং কুমকুম ধর।

এই মজাদার ছবির কাহিনী শ্রীমতী লীলা মজুমদারের। কাহিনীটি বাংলা সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। অরুন্ধতী দেবী চিত্র-নাট্য রচনা, পরিচালনা ও সুর দিয়েছেন। ছবির প্রধান চরিত্রে অর্থাৎ পদিপিসীরূপে আছেন ছায়া দেবী। অন্যান্য চরিত্রলিপিতে দেখা যাবে—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, চিন্ময় রায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, নির্মলকুমার, পদ্ম দেবী, কেতকী দেবী, রাজলক্ষ্মী (বড়), খগেন পাঠক ও নায়ক চরিত্রে নবাগত বালক শিল্পী তপন ভট্টাচার্য ও আর শতাধিক শিল্পী। অনিন্দ্য চিত্র ছবিখানির একমাত্র পরিবেশক।

রাতের রজনীগন্ধা : *অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ আর সি প্রোডাকসন্সের 'রাতের রজনী গন্ধা'র চিত্রগ্রহণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। জানা গেছে আগামী ১ জুন থেকে একটানা আট* দিন চিত্রগ্রহণের জন নির্দিষ্ট হয়েছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর বহুপঠিত এই কাহিনীর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন—প্রশান্ত দেব। অজিত গাঙ্গুলী পরিচালনা করছেন। নায়ক-নায়িকারূপে আছেন বাংলার জনপ্রিয় জুটি উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—দিলীপ মুখার্জি, পাহাড়ী সান্যাল, শ্যামল ঘোষাল, সুব্রত সেনশর্মা, বঙ্কিম ঘোষ, অজয় ব্যানার্জি, অনিতা গুপ্তা, তরুণকুমার ও অনিতা মুখার্জি। চিত্রগ্রহণে আছেন—অনিল গুপ্ত। বিশ্ব পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এন এ ফিল্মস।

বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃতি সংহতির অনুষ্ঠান : গত ১৩ই ও ১৪ই মে, ৭২ সংস্কৃতি সংহতির একাদশ বার্ষিক উৎসব ১৬ দমদম রোড, সি, আই, টি, বিল্ডিংস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে এবং প্রখ্যাত চিত্র-শিল্পী অন্নদা মুন্সীর প্রধান আতিথ্যে এক ভাবময় পরিবেশে উৎসব শুরু হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে রবিদাস সাহারায় বিরচিত রূপকথার হাসির নাটক (ছোট ছেলেমেয়েদের) 'বোম্বাগড়ের রাজা', শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'দমকল' এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ঋতুরঙ্গ অভিনীত হয়। 'বোম্বাগড়ের রাজা' এবং দমকল নাটক দুটি পরিচালনায় ডাঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ঋতুরঙ্গের সঙ্গীত পরিচালনায় পিনাকী-রঞ্জন কর্মকার এবং নৃত্যপরিচালনায় ধীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'বোম্বাগড়ের রাজা' অভিনয়ে ছোট ছোট কিশোর-কিশোরীরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বিভিন্ন ভূমিকায় যারা অংশগ্রহণ করেছে : গৌরী সাহারায়, সারদা বিশ্বাস, সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় কুমকুম দাস, শিবানী সাহারায়, শংকরী সাহারায়, করুণা চক্রবর্তী, সীমা কুণ্ডু, গায়ত্রী সাহা, সিদ্ধার্থ মৈত্র, রিংকু গুহ, অনিমা দে, অমর কোলে, স্বপ্না রায়, দেবাশিস সাহারায়, অশোক ঘোষ গৌতম সাহা, লক্ষ্মী বাগ ও নৃত্যে শুক্লা মিত্র। সুরারোপ—হীরামণি পাল এবং সঙ্গীত পরিচালনায়—কাননবিহারী পাল।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'দমকল' অভিনীত হয়। শিল্পীরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় যে অপূর্ব অভিনয় করেছে তা সত্যিই অতুলনীয়। উপস্থিত দর্শকসাধারণ নাটকটির সামগ্রিক অভিনয় ও পরিচালনায় ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন : সর্বশ্রী জগবন্ধু সাধুখাঁ, সুবোধ বসু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, রণেন দাসগুপ্ত, জহরলাল ধর, নিতাইচাঁদ সাহা, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, অমিতাভ সাহারায়, শ্যামল দে, মানিক গোস্বামী, [illegible]মোহন মন্ডল। স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করে[illegible] সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় এবং মমতা চক্র[illegible]।

বারুইপুরে রবীন্দ্র[illegible] : বারুইপুর কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র জন্মোৎ[illegible] কমিটির উদ্যোগে বারুইপুরে রবীন্দ্রনা[illegible]ঠাকুরের ১১১তম জন্মজয়ন্তী বিশেষ [illegible]ড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। নিব[illegible] রবীন্দ্রসংগীত, গীতি আলেখ্য, নৃত্য, বাদ্য এবং নাটিকা

সংস্কৃতি সংহতির দমকল নাটকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা চক্রবর্তী

(পুরাতন নৃত্য) সবিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে অভিজ্ঞানপত্রসহ কবির রচনাবলী পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পৌরপ্রধান ও সি এম ডি এ'র সদস্য শ্রীললিতকুমার রায়চৌধুরী। তিনি বারুইপুরে প্রস্তাবিত 'রবীন্দ্রভবন তথা সাধারণ সভাগৃহ' প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকপত্রটি সাধারণের কাছে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে।

পরলোকে পৃথ্বিরাজ কাপুর

খ্যাতনামা প্রবীণ অভিনেতা শ্রীপৃথ্বীরাজ কাপুর ২৯ মে বোম্বাই-এ মারা গেছেন। রংগমঞ্চ ও ছায়াছবিতে অভিনয় করে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

চলচ্চিত্র শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য শ্রীকাপুরকে ১৯৭২ সালের দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে, এখন এই পুরস্কার হবে মরণোত্তর। এই পুরস্কার হচ্ছে নগদ ১১ হাজার টাকা, একটি স্মৃতিফলক ও একটি শাল। শ্রীকাপুরের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শোকবার্তায় শ্রীকাপুরকে সামাজিক বিবেকসম্পন্ন একজন শিল্পী বলে অভিহিত করে বলেছেন, দেশের নাট্যজগতে তিনি পিতৃতুল্য স্থানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শক্তিশালী নাটকগুলি আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য দেশের যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল উদার এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাহায্যদানে তৎপর। তিনি এবং তাঁর পরিবার নাটক এবং চলচ্চিত্রের ব্যাপারে দেশের মানুষকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

মৃত্যুকালে শ্রীকাপুরের বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

প্রশান্ত সান্যাল

ভারত আর্থমুভার্স লিঃ'র ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত

ক্ল্যারিয়ন - ম্যাকান অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীপ্রশান্ত সান্যাল ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সরকারী সংস্থা ভারত আর্থমুভার্স লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। সম্ভবতঃ এই প্রথম বিজ্ঞাপন দুনিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন একজন সরকারী সংস্থার ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হলেন।

শ্রীসান্যাল ভারতের একজন খ্যাতনামা জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞ। এছাড়া, সাংবাদিক দুনিয়ার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

শ্রীসান্যাল অন্যান্য অনেক সংগঠনের সঙ্গে অংগাঙ্গীভাবে জড়িত। এদের মধ্যে আছে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সীস এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া, কলকাতার অ্যাডভার্টাইজিং ক্লাব, পাবলিক রিলেসনস সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি।

উজবেকিস্তানে ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তা

সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত উজবেকিস্তানে ভারতীয় ছবি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে এখানে অন্ততঃ তিনবার ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং উজবেকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিতভাবে ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তাসকেন্দের চায়ের দোকানে, ক্লাবে, কনসার্ট হলে, সাধারণ প্রমোদস্থানে ভারতীয় ছবির গান বাজানো একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আওয়ারা, শ্রী৪২০ বা ফুল ঔর পাত্থর-এর গান তাসকেন্দের ছেলেদের মুখে মুখে ফেরে। এ বছরে দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব তাসকেন্দেই হচ্ছে ২৪শে মে থেকে। এই উৎসবের উদ্দেশ্যলিপি (মটো) হচ্ছে: 'জনগণের স্বাধীনতা, সামাজিক উন্নতি ও শান্তির জন্য'। মাত্র এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকেই নয়, ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশভুক্ত ৩৯টি রাজ্য থেকে এই উৎসবে যোগদানের জন্য আবেদনপত্র এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাসকেন্দবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের শিল্পীদের দেখবার জন্যে। তথ্য ও বেতার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দিনী সতপতির নেতৃত্বে ভারত থেকে ওখানে গেছেন শ্রীমতী নার্গিশ ও সুনীল দত্ত, খাজা আহমেদ আব্বাদ, মৃণাল সেন, সুখদেব ও প্রমোদ পতি। উৎসবে দেখানো হচ্ছে 'রেশমা আউর শেরা' এবং দশটি তথ্যচিত্র।

ভারতীয় ছবির রপ্তানী ব্যাপারে

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় ছবির রপ্তানী ব্যাপারে একটি স্বয়ংশাসিত সরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তা করছেন--৯ মে লোকসভায় বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী এল এন মিশ্র এই কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, সম্প্রতি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত মোশান পিকচার এক্সপোর্ট কর্পোরেশন যেভাবে এই রপ্তানী কাজ চালাচ্ছেন, তা সন্তোষজনক নয়।

পুরী ধামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: সম্প্রতি পুরী হোটেলের পঁচিশ বছর পূর্তির রজত-জয়ন্তী উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। এবারকার অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব হল, সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীতে মুখ্যত উড়িষ্যার মনীষা, এবং শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই বেশী করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। পুরী হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমাখনলাল হালদারের পরিচালনায় এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উড়িষ্যার বহু মনীষী ও সুধীর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও আলোচনা ছাড়া, নীতা বহিধর, কুকু মীনা ও বিজয়লক্ষ্মী দাশের ওড়িশী নৃত্য, ভুবনেশ্বরী মিশ্র, নাগমণি মহান্তি ও ঘনশ্যাম পান্ডা ও তাঁর সম্প্রদায়ের ওড়িশী সংগীত এবং ওড়িশার তিনটি নাট্য সংস্থা কর্তৃক অভিনীত তিনটি ওড়িশী নাটক। দর্শক ও শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। উৎসবের সমাপ্তি দিবসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীহালদারের পরিচালনায় 'অন্তরঙ্গ' নামে একটি গীতি-আলেখ্যর মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি প্রণাম জানানো হয়। এই গীতি-আলেখ্যটিতে সংগীতে ও নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন জ্যোৎস্না দাশ, বীণা মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, রেখা দত্ত, মল্লিকা চক্রবর্তী, মঞ্জু আচার্য, বাসন্তী ভট্টাচার্য, নন্দনা ভট্টাচার্য, বাণী মল্লিক, গিরিবালা সরকার, আলপনা সেন, দেববানী চট্টোপাধ্যায়,

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, কানাই দাস ও মাখনলাল হালদার। সংগতে ছিলেন কৃষ্ণ গুরু, পূর্ণচন্দ্র পটুনায়ক এবং নরসিংহ প্রতিহারী। গ্রন্থনায় ছিলেন সুধাংশু দাশ।

সর্বশেষে, গোপাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত ও পরিচালিত 'নেশা' নামে একটি বাংলা নাটকের অভিনয় হয়। তাতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন, পুরী হোটেলের কুমার হালদার এবং মীরা চট্টোপাধ্যায়, অশোক চক্রবর্তী, অনীতা দে ও গোপাল চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য দিনের কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : বাণী দেবনাথের কত্থক নৃত্য, ময়ূরভঞ্জের বিখ্যাত ছৌ নৃত্য, বাণী দত্ত ও অনুরাধা ধরের একক সংগীত, ভবানী মজুমদারের কৌতুকাভিনয় এবং বিভূতি গুহ, ডাঃ এন ঘোষ, বিনায়ক মিশ্র ও অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা।

এই উপলক্ষে একটি শোভন সচিত্র স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল।

তাসখন্দ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা দেশ : তাসখন্দে ২৪ মে থেকে শুরু হোয়েছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বাংলা দেশ এই উৎসবে যোগদান করেছে। ছয় সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল গণপরিষদ সদস্য এম এ খায়ের নেতৃত্বে উৎসবে যোগ দিয়েছে। সদস্যরা হোলেন বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রযোজক জনাব দাউদ খান মজলিশ, মোশারফ হোসেন চৌধুরী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি খান আতাউর রহমান, আনোয়ার হোসেন (জীবন থেকে নেয়ার—নায়ক) এবং সুচন্দা রায়হান। প্রেরিত ফিচার ছবি হলো 'জীবন থেকে নেয়া'। দুটো ডকুমেন্টারী ছবি হোল 'স্টপ জেনোসাইড' এবং 'বিদ্রোহী কবি'।

নাটোরে রবীন্দ্র জয়ন্তী : রাণেশ্বর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রখ্যাত নাট্যকার জনাব শফিউদ্দীনের সভাপতিত্বে নাটোর মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের ১১১তম জন্মোৎসব পালিত হয়। সভাপতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, বিশ্বকবির রচনাবলী বাঙালীর অস্তিত্বের সাথে আজ মিশে গিয়েছে।

রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন, গণ পরিষদ সদস্য শংকর গোবিন্দ চৌধুরী, অধ্যাপক জালালউদ্দিন, অধ্যাপক আবদুর রহমান আব্বাসী, গজেন্দ্রনাথ কর্মকার, রমজান আলী, পি কুমার লাহিড়ী, অধ্যাপক শেখর সান্যাল এবং ছাত্র লীগ সদস্য অনাদি বসাক।

সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন আনিমা চৌধুরী, রেবেকা আমিন, বাণী দত্ত, রিতা দত্ত, স্বর্ণা, রচনা দত্ত, পূর্ণিমা, শিশিরকুমার মজুমদার, দৌলতজ্জামান, আবদুস সালাম, মমতাজউদ্দিন, জিতেন সরকার, নিমাই, অরূপ ও প্রাণগোপাল। নৃত্য পরিবেশন করেন মিস লিলি।

মঞ্চাভিনয়

সংস্কৃতি পরিষদের 'রক্তকরবী' : রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের গভীরতম বক্তব্য ও উপস্থাপনার বিশিষ্ট রীতির সঙ্গে যে সব নাট্যানুরাগীর আন্তর পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে বাঁকুড়া জেলা সংস্কৃতি পরিষদ প্রযোজিত এই নাটকের প্রয়োগ-পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্রদীপ্ত সৃষ্টি বলে মনে হবে। এ নাটক মঞ্চের আলোয় তুলে ধরতে গেলে যে নিষ্ঠা ও শিল্পিক দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন হয় তা এ পরিষদের শিল্পীদের প্রত্যেকেরই মধ্যে নিহিত ছিল। নাট্যনির্দেশনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন ক্ষীরোদকুমার চ্যাটার্জি।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই শ্রীমতী প্রণতি সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করতে হয়। 'নন্দিনী' প্রাণবন্ত সত্তাকে আশ্চর্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে পরিস্ফুট করে তোলেন তিনি। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি সত্যি ভোলা যায় না। রাজার চরিত্রে রূপ দেন লালমোহন গাঙ্গুলী, তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ও জীবন-যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্টতা পায়। পাঁচকড়ি চক্রবর্তীর 'বিশু' একটি সপ্রতিভ সৃষ্টি। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন শংকর গুপ্ত, ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, তপন মুখোপাধ্যায়, প্রতাপ দত্ত।

রূপান্তরীর 'পদ্য-গদ্য-প্রবন্ধ' : রূপান্তরীর শিল্পীরা যে নাটকটি নিয়ে আগামী ৫ই জুন মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে উপস্থিত হোচ্ছেন, তার নাম হোল 'পদ্য-গদ্য-প্রবন্ধ'। জোছন দস্তিদার রচিত এই নাটকে ফুটে উঠেছে আজকের অস্থির যুবসমাজের যন্ত্রণা। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

ঝিন্দের বন্দী : ট্রাকটরস ইন্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝিন্দের বন্দী'র নাট্যরূপ পরিবেশন করলেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন কার্তিক মান্না। নাটকের উপস্থাপনা ও অভিনয় দুয়ে মিলে সামগ্রিক প্রযোজনাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে। পরিচালক ইন্দু রায়ের শিল্পিক স্বাতন্ত্র্যটি প্রযোজনার অনেক মুহূর্তেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন সুব্রত নন্দী, সুনীল মুখার্জি, নির্মল ঘোষ, অজিত মজুমদার, জয়ন্তকুমার রায়, বিপাশা গোস্বামী, রমা গুহ, বেবী সেনগুপ্তা।

'গান্ধারে'র 'অপার্থিব' : সহজ সাবলীল পূর্বপ্রচলিত নাটক আজকালকার আধুনিক নাট্যগোষ্ঠীরা সচরাচর করছেন না। সেই পটভূমিতে 'গান্ধার' পরিবেশিত ও সংগ্রাম কুমার ঘোষ রচিত 'অপার্থিব' নাটকের প্রথম অভিনয় ও পরীক্ষানিরীক্ষা। নাটকটিতে নামকরণের সঙ্গে [illegible] ও পার্থিব এ দুয়ের [illegible] প্রয়োজন [illegible] পার্থিবতার [illegible] প্রয়াস [illegible] আছে। তবে [illegible] প্রাকৃত বা [illegible] দেখাতে শোনাতে গেলেও দর্শক কিংবা শ্রোতা এটুকু অন্ততঃ আশা করবে যে সেটা মোটামুটি বোধগম্য হবে। 'অপার্থিব' নাটকটি মনে হয় সে আশা পূর্ণ করেনি। বক্তব্যের বেশ কিছু অংশ জটিল, তবু সাংকেতিকতার ছোঁয়া যেখানে সেখানে আছে তা ভালোই। নাট্যকার চেয়েছেন মানুষ মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে ছুটে যেতে পারলে কি হয়, তার সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলতে। সে ধারণা অবশ্য নাটকে সংলাপে ও সংঘাতে ভালোভাবে মূর্ত হয়ে ওঠেনি।

নাটকটির নায়ক অরুণ এক আলো-আঁধারি পরিবেশে উপস্থিত হয়ে ধীরে ধীরে তার ফেলে-আসা জীবনের পর্দা যেন তুলে ধরছে। নায়িকা শিপ্রা প্রথমে অদৃশ্য ও ছায়া, পরে কায়া ধরে নেমে আসে নায়কের সঙ্গে ভয়-সাহস, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি পার্থিব আচরণের উদ্দেশে। এর মধ্যে একজোড়া বুড়োবুড়ির আবির্ভাব ও সংলাপ ও পরে প্রস্থান। নবীন যুগলের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক তা বোঝা গেলো না।

'অরুণ'বেশী নাট্যপরিচালক অসিত মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন ভালোই, কিন্তু তাঁর সংলাপগুলো বহু ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ, ও দার্শনিক চিন্তায় ভারাক্রান্ত এবং তার ফলে ক্লান্তিকর। তবে একালের যুবকের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তীক্ষ্ণতম জীবন-সংঘাতকে শ্রী মুখোপাধ্যায় আন্তরিকতার সঙ্গেই মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। শিপ্রার ভূমিকায় গীতা চক্রবর্তী সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় অভিনয় করতে পারেননি। অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিয়েছেন ভবরূপ ভট্টাচার্য, বেলা রায়চৌধুরী, অচিন্ত্য চক্রবর্তী প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজিকার চরিত্রটির কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না এবং সেখানে রত্না মুখোপাধ্যায় ফলতঃ কিছুই দেখাতে পারেননি। আরো কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন উদয় ভট্টাচার্য, দিলীপ সরকার, গৌতম চক্রবর্তী, রাসবিহারী মান্না, স্বপন রায়চৌধুরী।

নাটকের প্রথম উন্মোচনপর্বে অন্ধকার নেপথ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ, সেই শব্দে উদ্ধারকল্পে কয়েকজনের ছুটে আসা, কিন্তু তারপর উদ্যত ছুরির সামনে ভয়ে কুঁকড়ে

[illegible] / পরিচালনা : পীযূষ গাঙ্গুলী। অনুপকুমার এবং সুখেন দাস।

ফিরে পালানোর অধ্যায়টি মূল নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন, তবু আধুনিককালের নৈতিক পঙ্গুতার নির্দেশক বলে এর উপস্থাপনা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জার প্রশংসা করতে হয় প্রতীক ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তা শিল্পসুষমায় ভাষা পেয়েছে। তবে আবহসঙ্গীত পরিচালনায় ভাস্কর মিত্র উচ্চাঙ্গের কিছু আমাদের দিতে পারেননি। সেদিক দিয়ে তাপস সেনের আলোকসম্পাত হয়েছে অনেক বেশী প্রাণময়।

কোচবিহার রঙ্গমঞ্চে দেবতার জন্ম

উত্তর বাংলার নাট্য আন্দোলনে এবং নাটকের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব একটি বিশেষ পরিচিত নাম। নাট্যকার নীরজ বিশ্বাস রূপক ধর্মী 'দেবতার গ্রাস' নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের বাস্তবধর্মিতায় দর্শকদের একাত্ম করতে পেরেছেন। বিগত ৮ এপ্রিল শনিবার কোচবিহার রাষ্ট্রীয় পরিবহণ মঞ্চে, রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কৃতী শিল্পীরা নীরজ বিশ্বাসের পরীক্ষামূলক ব্যঙ্গ নাটকটির সার্থক মঞ্চস্থ করেন।

নৃপতি—সম্রাটের ভূমিকায় অনুপ বসু ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। মৃত্যুঞ্জয় অবিনাশ-এর ভূমিকায় ষষ্ঠী ভৌমিক, কবি অনিরুদ্ধর ভূমিকায় নিখিল ভট্টাচার্য, মঞ্জরী-চন্দ্রার ভূমিকায় শিখা রায় নিজস্ব স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখে নাটক উত্তরণে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন। সুজাতা—রীণার ভূমিকায় শিপ্রা বাগচী, অনল—আলোক-এর ভূমিকায় সঞ্জীব দাস, লুব্ধক রমেশ-এর ভূমিকায় শৈলেন সেনগুপ্ত এবং কৃপণ ভূমিকায় সুনীল সরকার অভিনয়প্রতিভার পরিচয় দেন। ছন্দক-এর ভূমিকায় নাট্যকার নীরজ বিশ্বাস যথাযথ অভিনয় করলেও নির্দেশক হিসেবে তাঁর বহুবিধ পরিচয় এবং আন্তরিক নিষ্ঠা দর্শক সমক্ষে ধরা পড়ে।

আর সংগীতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন সুনীল দাশগুপ্ত, তপন চৌধুরী, এবং সুনীল দাস। আলোর কাজের কৃতিত্ব সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্প্রদায়ের।

তিনটি একাঙ্কিকা : দক্ষিণ ২৪-পরগণার কুলপীর প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'পথিক গোষ্ঠী' সম্প্রতি তিনটি একাঙ্কিকার সার্থক শিল্পসম্মত মঞ্চরূপ পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। এই তিনটি একাঙ্ক নাটক হোল বিমল রায়ের 'অভিনয়' শচীন ভট্টাচার্যের 'শিকার' ও শচীন হালদারের 'ওরা বন্দুক'।

সপ্রতিভ অভিনয়সমৃদ্ধ এই তিনটি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন সমীরণ চক্রবর্তী, দুলাল হালদার, শিশির চক্রবর্তী, আনন্দ মণ্ডল, প্রদীপ চক্রবর্তী, অপূর্ব ঘোষ, নির্মল প্রামাণিক, সুধীর দাস, দিলীপ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন দাস, রঞ্জন হালদার, রামচন্দ্র দাস। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কালীপ্রসাদ।

সাহেব বিবি গোলাম : বিমল মিত্রের প্রখ্যাত উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলামে'র নাট্যরূপ সম্প্রতি পরিবেশিত হোল 'রঙ্গনা'র মঞ্চে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাব। সামগ্রিক প্রযোজনার মধ্যে বিশেষ করে কয়েকটি দৃশ্যের অপূর্ব উপস্থাপনা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে।

'পটেশ্বরী'র কঠিন চরিত্রটি প্রাণময়তায় মূর্ত করে তোলেন বাসন্তী চ্যাটার্জি। এছাড়া আরো কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের রূপায়ণে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন বন্দনা মুখার্জি (মেজবৌ), রবীন্দ্রনাথ মুন্সী (ভূতনাথ), জীবনকুমার চন্দ্র (পদ্মরাকান্ত), ভবদেব মুখার্জি (বংশী), শ্যামচরণ ব্যানার্জি (ঘোড়বাবু) এবং প্রতিমা পাল (জবা)।

ফাঁস : সম্প্রতি হুকুমচাঁদ জুট মিলস স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সৌমেন গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটির সুষ্ঠু অভিনয় করলেন স্টার থিয়েটারে। রবীন সিংহের সুষ্ঠু পরিচালনায় সেদিনকার নাট্যানুষ্ঠান সত্যিই উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন রাসবিহারী বসু, গুরুদাস মণ্ডল, কল্যাণ রায়, রাম নন্দী ও অঞ্জলি বসু।

বিজয়নগর : কাশীপুর রোড রেলওয়ে (কমার্সিয়াল) ক্লাবের শিল্পীরা তাঁদের সপ্তম বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান উপলক্ষে কয়েকদিন আগে 'রঙ্গনা'র মঞ্চে পরিবেশন করলেন 'বিজয়নগর' নাটকটি। নাটকটির প্রয়োগ পরিকল্পনার দায়িত্ব নেন কামেশ্বর চক্রবর্তী।

প্রযোজনাটি সম্পর্কে প্রথমেই বক্তব্য হোল যে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন শিল্পীর চরিত্রচিত্রণ মনকে ছুঁয়েছিল, কিন্তু সবার প্রয়াস একটা অখণ্ড ঐক্যে গ্রথিত হোতে পারেনি। অর্থাৎ নাটকের ভাষায় যাকে বলে 'টিমওয়ার্ক' তার বেশ অভাব পরিলক্ষিত হয় সামগ্রিক নাটকের গতিছন্দে। নাটকটি আরো সুষ্ঠু সম্পাদনার অপেক্ষা রাখে। সঙ্গীতাংশ শিথিল হোলেও দৃশ্যসজ্জায় শৈল্পিক মেজাজের ছাপ আছে।

কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের সার্থক রূপ দেন নারায়ণ ব্যানার্জি (মালেক খসরু), অমর পাল (পীর বাহরাম), রানু রায় (উৎপলবর্ণা)।

ভেটারেন্স ক্লাব নির্বাচিত বছরের সেরা (১৯৭১) 'ফুটবল খেলোয়াড়' মহম্মদ হাবিব শ্রী... পালের হাত থেকে ট্রফি গ্রহণ করছেন। ছবির ডান দিকে পুরস্কার বিতরণী সভার প্রধান অতিথি ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ।

খেলাধূলা

দর্শক

১৯৭২ সালের ফুটবল মরশুম

কলকাতার ময়দান অঞ্চলে আই এফ এ পরিচালিত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা গত ১৫ই মে থেকে শুরু হয়েছে। এই চারটি বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার আকর্ষণই বেশী। প্রথম বিভাগের কুড়িটি দলের মধ্যে মাত্র তিনটি দল---মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং প্রধান দল হিসাবে গণ্য। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ১৮৯৮ সালে। এপর্যন্ত মাত্র এই ৪টি ভারতীয় দল প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে : মোহনবাগান ১৪-বার, মহমেডান স্পোর্টিং ১০ বার, ইস্টবেঙ্গল ১১ বার এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১ বার (১৯৫৮ সালে)।

ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ সালে। শুধু তাই নয়, মহমেডান স্পোর্টিং উপর্যুপরি ৫ বার (১৯৩৪-৩৮) লীগ বিজয়ী হয়ে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার লীগ জয়ের যে-রেকর্ড করেছিল, তা আজও কোন দল স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি। মোহনবাগান উপর্যুপরি ৪ বার (১৯৬২-৬৫) লীগ বিজয়ী হয়ে তাদের এই রেকর্ডের নিকট-দূরত্বে গিয়েছিল। ১৯৩৪ সাল থেকে ভারতীয় ফুটবল দলই প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে এবং তা মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে ১৯৫৮ সালে ইস্টার্ণ রেল দলের লীগ জয় একটা আকস্মিক ঘটনা।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় যোগদানকারী ২০টি দলের শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তিতে জোর দিয়ে বলা যায়, কলকাতার ফুটবল খেলার আসরের তিন প্রধান---ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলেরই একদল শেষ পর্যন্ত এবছরও প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে। গত ৩৮ বছরের ইতিহাসে (১৯৩৪-৭১) এই তিন দলের কোন দলই লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়নি এমন ঘটনা মাত্র এক বছর ঘটেছিল, ১৯৫৮ সালে সে-বছর লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছিল ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

এবছর থেকে ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে ওঠা-নামা পুনরায় চালু হল। ফলে খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উত্তেজনা শতগুণ বেড়ে গেল।

গত ২৭শে মে পর্যন্ত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার যে খেলা হয়েছে তাতে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ২টি খেলায় ৪ পয়েন্ট, গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ৩টি খেলায় ৬ পয়েন্ট এবং মোহনবাগান ৪টি খেলায় ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

ডেভিস কাপ

১৯৭২ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইউরোপীয়ান জোনের খেলা সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ইউরোপীয়ান জোনের সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা এই রকম হয়েছে :

গ্রুপ 'এ' :

(ক) রুমানিয়া বনাম ইতালী; (খ) সোভিয়েট ইউনিয়ন বনাম পোল্যান্ড;

গ্রুপ 'বি' :

(ক) পশ্চিম জার্মানী বনাম চেকোস্লোভাকিয়া

(খ) স্পেন বনাম মোনাকো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে মোনাকোর পক্ষে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ এই প্রথম। রুমানিয়ার ইউরোপীয়ান জোনের চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এখানে উল্লেখ্য, রুমানিয়া এ পর্যন্ত দুবার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলে রানার্স-আপ হয়েছে। এই দুবারই তারা হেরেছে আমেরিকার কাছে ---১৯৬৯ সালে ০---৫ খেলায় এবং ১৯৭১ সালে ২-৩ খেলায়।

আন্তঃ জেলা হকি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবাংলার আন্তঃজেলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে হুগলী ২—১ গোলে অতিরিক্ত সময়ের খেলায়) চন্দননগরকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ১০ বার এই খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতা

১৯৭২ সালে বোম্বাই গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স (দিল্লী) ১—০ ও ২—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী দিল্লীরই সার্ভিসেস একাদশ দলকে পরাজিত করে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স দলের পক্ষে এই প্রথম গোল্ড কাপ জয়।

সেমি ফাইনালে সার্ভিসেস দল ০—০ ও ১—০ গোলে এ বছরের বেটন কাপ বিজয়ী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে (জলন্ধর) এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ২—০ ও ০—১ গোলে বোম্বাইয়ের মহীন্দ্র অ্যাণ্ড মহীন্দ্র অফিস দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ইউরোপীয়ান উইনার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

স্পেনের বার্সেলোনায় ইউরোপীয়ান উইনার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো রেঞ্জার্স ৩—২ গোলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রখ্যাত মস্কো ডায়নামোকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করে। গ্লাসগো রেঞ্জার্স দলের এই প্রথম কাপ জয় উপলক্ষে মাঠে উপস্থিত তাদের ২৫,০০০ সমর্থক আনন্দের জোয়ারে আত্মহারা হয়েছিলেন। প্রথমার্ধের খেলার ২৩ এবং ৩৯ মিনিটের মাথায় দুটি গোল দিয়ে বিরতির সময় গ্লাসগো রেঞ্জার্স ২—০ গোলে এগিয়ে ছিল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৪র্থ মিনিটে আর একটি গোল দিয়ে তারা ৩—০ গোলে এগিয়ে যায়।

খেলার শেষে মস্কো ডায়নামো ফুটবল দলের কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে স্কটিশ দর্শকদের সম্পর্কে ঘোরতর মাতলামির অভিযোগ দায়ের করেন। মস্কো ডায়নামোর কোচ সাংবাদিকদের কাছে এইরকম অভিযোগ করেন যে, শতকরা ৭০জন স্কটিশ দর্শক মদে বুঁদ হয়ে রাশিয়ান খেলোয়াড়দের ভীতিপ্রদর্শন করেছিলেন। এই পরিবেশে মস্কো ডায়নামো তাদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেনি। খবরে প্রকাশ, স্কটিশ দর্শকরা দিশেহারা হয়ে পুলিশের সঙ্গেও খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ান বনাম সারেঃ ইংল্যাণ্ড সফররত অস্ট্রেলিয়ান দলের ১ম ইনিংসের খেলায় প্রখ্যাত খেলোয়াড় ডগ ওয়াল্টার্স কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান সারে দলের প্যাট পোককের বল খেলে উইকেট-কিপার আরনল্ড লংয়ের হাতে 'ক্যাচ' তুলে দিয়ে আউট হয়েছেন। খেলার ফলাফল ড্র যায়।

নেহরু ট্রফি

কোচিনে অনুষ্ঠিত নেহরু ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে জলন্ধরের লীডার্স ফুটবল ক্লাব ২-০ গোলে বোম্বাইয়ের মফতলাল স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে ট্রফি জয়ী হয়েছে।

চিঠিপত্র

'বাঙলার মন্দির' প্রসঙ্গে

অমৃতের গত কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীপঞ্চানন রায় মহাশয়ের 'বাঙলার মন্দির' সিরিজের লেখাগুলি প্রকাশের জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আজকাল এ জাতীয় প্রবন্ধ কলকাতার খ্যাতনামা পত্রপত্রিকায় বড় একটা চোখে পড়ে না। সেদিক থেকে শ্রীরায়ের এ প্রবন্ধগুলি পাঠকদের উপহার দিয়ে অমৃতের কর্তৃপক্ষ আমাদের যে বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। লেখক শ্রীপঞ্চানন রায় মহাশয় যে অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে প্রাচীন লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করে তা বাঙলার পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তার জন্যে তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর এ সিরিজের প্রথম লেখায় 'বাঙলার চালামন্দিরে' মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরে সিংহবাহিনীর মন্দিরের যে ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটির গঠনভঙ্গী লক্ষ্য করে এটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তাছাড়া মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি (যার আলোকচিত্র এ সিরিজের তৃতীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে) এ মন্দিরটির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িককালে নির্মিত প্রায় পাঁচশো বছরের প্রাচীন এই মন্দিরটি সংরক্ষণের জন্যে পুরাতত্ত্ব বিভাগ আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেননি বলে জানতে পেরেছি। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বর্ধমান জেলার ও নদীয়ার কোন কোন মন্দির যাদের মধ্যে অনেকগুলিই তেমন প্রাচীন নয় তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে কিছু কিছু করা হচ্ছে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ঘাটালের সিংহবাহিনীর মন্দিরটির বিষয়ে (অবশ্য এটি এত প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও) পুরাতত্ত্ব বিভাগ সে ধরনের কিছু ব্যবস্থা করেছেন বলে আজও জানি না। পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও জনসাধারণের সচেতনতার জন্যে লেখক এ প্রবন্ধের শেষে বলেছেন, '......উপযুক্ত রক্ষণ ও দৃষ্টির অভাবে প্রাচীন বাংলার এসব পুরাকীর্তি যে ক্রমশ বিলীন হয়ে আসছে তা নানাস্থানের মন্দির দেখলেই বুঝতে পারা যায়।' লেখকের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। এর একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হল বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় সুপ্রাচীন মজলিশ সাহেবের মসজিদটি। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে আজ এটি ভগ্নস্তূপে পরিণত। প্রায় পাঁচশো বছরেরও বেশী পুরনো এ মসজিদটির গায়ে আরবী হরফে শিলালিপি ছিল বলে জানি। বেশ কিছুদিন হল সেটি অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। মসজিদ গাত্র ও গম্বুজও আজ বিধ্বস্ত। লেখক শ্রীরায়ের এই সতর্কবাণী পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও পুরাতত্ত্বপ্রেমিকদের সচেতন করতে সহায়তা করবে বলে আশা করি।

—অনিমেষ সরকার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

'অঙ্গনা' প্রসঙ্গে

গত ১৭ই চৈত্র ৪৭ সংখ্যায় 'সেই চিরকেলে কলহ' (অঙ্গনা) প্রবন্ধে 'প্রমীলা' শাশুড়ী বউ অ-বনাবনি বিষয় যা লিখেছেন তা নিতান্ত সেকেলে বিশ্লেষণ। এখন অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর যুগে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা এই বউরা কোরে থাকে। তারা কখনই চাইবে না যে সংসারে স্বামী ছাড়া আর কেউ আত্মীয় বা স্বজন থাকুক। তখনকার দিনে শাশুড়ী বউর উপর নির্যাতন করতো, এখন বউ পাল্টা শোধ নিচ্ছে। অহরহ জানতে পারি যে বউর চরম অত্যাচারে বিধবা শাশুড়ী বাড়ীছাড়া এবং চরম দুর্দশাপন্ন। তার উপর বউ যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় তবে পরিণতি অনুমান করতে চোখে জল আসে। তার হিংস্রতা উগ্র হয়ে ওঠে যদি 'সম্পত্তি'র প্রশ্ন থাকে। নেহেরুর 'হিন্দু কোড বিল' এই সুবিধাটুকু দিয়েছে। যুক্তি সাম্যতা অথবা মানবতা বহু দূরে ছেড়ে চলে গেছে। এখন সংসার মানে নিজস্ব শাড়ী, গয়না এবং অর্থসম্পত্তি। অর্থাৎ এই অবস্থা চলছে এবং চলবে।

বীণা দাশ, কলকাতা-২৬ :

এভারেস্ট বিজয়ীদের গ্রাম

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার ৭ই এপ্রিল '৭২ সংখ্যায় 'এভারেস্ট বিজয়ীদের গ্রাম' রচনায় কার্শিয়াং-এর জনসংখ্যা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যার হার, শহরের আয়তন, পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা ইত্যাদি পরিসংখ্যানগুলি নেওয়া হয়েছে ১৯৬১ খৃস্টাব্দের সেনসাস থেকে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত '১৯৭১-এর সেনসাস থেকে' (পৃঃ ৭৩৭, ১ম কলম, ৭ম ছত্র) বাক্যাংশটি মুদ্রণ প্রমাদ। বস্তুত, ১৯৭১-এর সেনসাস ব্যবহারের জন্য এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

কার্শিয়াং সম্বন্ধে আরো দুয়েকটি কথা বলা যেতে পারে,—যা রচনাটিতে উল্লেখ করা হয়নি। প্রথমত—কার্শিয়াং রেলোয়ে স্টেশন থেকে ডাওহিলের রাস্তায় উঠতে একটু পরেই ডান দিকে চোখে পড়ে 'গোল কুঠি'। ১৯২৪ সালে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ কিছুদিন ছিলেন এখানে।

দ্বিতীয়ত, স্টেশন থেকে পাংখাবাড়ীর ঢালু রাস্তায় খানিক হাঁটলেই ডান দিকের সমতল ভূমিতে দেখা যাবে সুন্দর একটি বিল্ডিং। বর্তমানে এখানে আকাশবাণী কার্শিয়াং-এর স্টুডিয়ো এবং অফিস। মূলতঃ বর্ধমানের মহারাজেরঃ এই বাড়ীটার নাম মহাতাব বিল্ডিং। ইংরেজ রাজত্বে এই সুদৃশ্য কাঠের বাড়ীটিতে ছিল 'বার', নৃত্য-অঙ্গন, মঞ্চ, বিলিয়ার্ড রুম ইত্যাদি। পরবর্তী স্তরে এই বাড়ীটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ত্তে আসে এবং ১৯৬২ সালের ২রা জুন তারিখে এই বাড়ীটিতে আকাশবাণীর কার্শিয়াং কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়।

কিরণশঙ্কর মৈত্র
কার্শিয়াং

'সুবর্নসিরি' প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এবং তাঁর মারফৎ 'সুবর্নশিরির' লেখক মহাশয় শ্রীঅমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি আমরা। আপনাকে আরো ধন্যবাদ জানাই 'সুবর্নশিরির ন্যায় একটি উপন্যাস যাহা সাহিত্যজগতে একটি সম্পদ তার প্রকাশের জন্য। 'সুবর্নশিরি' উপন্যাসটির বহুমুখী ভাবরস ও সৌন্দর্য মনকে ভরে রাখে। সত্যি এই উপন্যাসটি মনকে এত স্পর্শ করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। বলতে পারি এটি একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর লেখা এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানকার পাঠকের মন সর্বদাই উদগ্রীব হয়ে আছে এ ধরনের লেখা পড়বার জন্য।

কল্যাণ ব্যানার্জি ও দেবী ব্যানার্জি
টোরোন্টো।

ভ্রম সংশোধন

রামমোহনের জন্মসন সম্পর্কে প্রবন্ধটিতে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। সেগুলি সংশোধন করে এইভাবে পড়তে হবে।

(১) ডঃ রমেশ মজুমদারের ইংরাজী বক্তব্যে ৩৫৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে—there seems to be adequate reasons to disbelieve it আসলে হবে there seems to be NO adequate reasons to disbelieve it. NO উহ্য থাকায় অর্থ বিভ্রান্তি ঘটেছে।

(২) শেষ লাইনের সংস্কৃত শ্লোকে 'সংসুনক্তু'র জায়গায় "সংযুনক্তু' হবে। (পৃঃ—৩৫৯)

(৩) ডঃ রমেশ মজুমদার 'জন্মমাস' সম্বন্ধে আলোচনা করেননি—'জন্মসাল' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। (পৃঃ—৩৫৯)

(৪) পৃঃ—৩৫৮ প্রথম কলমের ওপরের দিকে মিস কার্পেন্টারের বইয়ের উল্লেখ যেখানে আছে সেখানেও 'জন্মমাস'-এর স্থলে 'জন্মসাল' হবে। নতুবা অর্থ বিভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রবল।

—গোরাচাঁদ মিত্র
কলকাতা ৪

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মিত্র-ঘোষের ৭টি নূতন পকেট বই

প্রতিটি ২, যে কোন ৫টি একত্রে ৮·৫০

প্রমথনাথ বিশীর জীবনী-প্রবন্ধ
তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর পরলোকতত্ত্ব

জীবনের ওপার থেকে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

তারা ভৈরবী

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

রেল লাইন

বিভূতিভূষণের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা

আরো একটি

তারাশঙ্করের
গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত উপন্যাস

সখী ঠাকরুণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নীল লোহিতের চেনা-অচেনা

পকেট বইয়ের
সম্পূর্ণ তালিকার
জন্য পত্র লিখুন

প্রবোধকুমার সান্যালের অনন্যসাধারণ ভ্রমণকাহিনী
মহাপ্রস্থানের পথে (নূতন ১৭শ মুদ্রণ) ৬
উত্তর হিমালয় চরিত (৩য় মুদ্রণ) ১১
গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী ৩॥

অবধূতের ভ্রমণকাহিনী
মরুতীর্থ হিংলাজ (নূতন ২৫শ মুঃ) ৭·৫০
হিংলাজের পরে (৬ষ্ঠ মুঃ) ৫·৫০ **নীলকণ্ঠ হিমালয়** (৩য় মুঃ) ৯

কমলা মিশ্রের
কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ৭

জ্যোতি চৌধুরীর
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর ৪·৫০

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণ কাহিনী
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা (চিত্রমূর্তি আসন্ন) ৯
গহন গিরি কন্দরে ৬ **নীল দুর্গম** ৬·৫০
উত্তরস্যাং দিশি ১০ **পঞ্চপ্রয়াগ** ৫

জরাসন্ধের নূতন উপন্যাস
নিঃসঙ্গ পথিক ১০

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস
পূর্ণাবতার

সত্যজিৎ রায়ের
কাঞ্চনজঙ্ঘা ৪

বিভূতিভূষণের
পথের পাঁচালী ৮

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস
বহ্নিবন্যা (৬ষ্ঠ মুঃ) ১১

প্রত্যক্ষদর্শী জ্যোতির্ময় মৌলিকের
নরক থেকে ফিরে ৩॥

আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের **মণিমহেশ** তৃতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিতপ্রায়। চতুর্থ মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এই লেখকের—হিমালয়ের পথে পথে ৭ গঙ্গাবতরণ ৫ গুপ্তেশ্বর ২ কুমার গিরিপথে ৫·৫০ ও ত্রিলোকনাথের পথে ৪। সব বইগুলিই পাওয়া যাচ্ছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মহান জীবনের শ্রেষ্ঠ জীবনী কাব্য

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রথম খণ্ডের নূতন শোভন সংস্করণ—দাম ১০

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ● ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

৬ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 9th June, 1972 শুক্রবার ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

এক নজরে

দেড় শতাব্দীর নীরবতা : দুই দশকেরও অধিককাল নীরব থাকার পর বৃটেনের লর্ডসভার সদস্য পঞ্চম আর্ল অফ লিস্টার বহু দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সেদিন সভায় প্রথম ভাষণ দিলেন। ৬৩ বছর বয়স্ক আর্ল কল-কারখানার ধোঁয়ায় তেলে জল বাতাস দূষিত হওয়ার (পলিউশন) দুর্বিষহ সমস্যার উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন, পলিউশন সমস্যাকে আর কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না, কল-কারখানায় এমন নিরাপদ রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিত যা জল বাতাসের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে বৃটিশ পার্লামেন্টের উচ্চ সভার সদস্য হওয়ার বাইশ বছর পরে এই তাঁর প্রথম ভাষণ।

পরে আর্ল অফ লিস্টার সাংবাদিকদের বলেন যে, নীরবতাই তাঁর পরিবারের ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে এ ব্যাপারে যা আবিষ্কার করেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। তাঁরা বাবা চতুর্থ আর্ল ২৩ বছর লর্ডসভার সদস্য থাকাকালে একবারের জন্যও মুখ খোলেন নি, তাঁর পিতামহ সদস্য ছিলেন ৩২ বছর এবং প্রপিতামহ ৬৭ বছর। কিন্তু তাঁরাও কখনও কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করেন নি। সেদিক থেকে বলতে গেলে তিনি তাঁর পরিবারের প্রায় দেড়শ বছরের নীরবতা ভঙ্গ করেছেন। তিনি বলেন, লিস্টার পরিবারের মত হল—সেই বুদ্ধিমান যে কম কথা বলে।

অক্সফোর্ড আর হারতে রাজি নয় : বাচ প্রতিযোগিতায় কেমব্রিজের কাছে অক্সফোর্ডের হার এখন প্রায় প্রতি বছরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য আরও পাঁচটা ব্যাপারে কেমব্রিজ এখন অকসফোর্ডকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে আছে। যেমন, অকসফোর্ডে সহ-শিক্ষা চালু হওয়ার দু বছর আগেই এই বছর কেমব্রিজের তিনটি ছাত্র কলেজে ছাত্রী ভর্তি শুরু হচ্ছে, অকসফোর্ডে হলে '৭৪ সালে। তারপর লাতিন পড়ার যে বাধ্যবাধকতা এতদিন অকসফোর্ড ও কেমব্রিজে ছিল, কেমব্রিজই প্রথম তা বাতিল করে দিয়েছে, আবার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম একজন ছাত্রী স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে। এইভাবে বার বার হারমানা সাত শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয় অকসফোর্ড এবার এক জোর জবরদস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯৭৪ সাল থেকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কটি কলেজে সহশিক্ষা প্রবর্তিত হবে তখন থেকে একই হস্টেলে ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদেরও থাকার ব্যবস্থা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ—হেবডোমেডাল কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিচালক সংস্থা 'কংগ্রেগেশন'-এরও অনুমোদন লাভ করবে তা এক রকম সুনিশ্চিত।

অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত যে মেয়ে কলেজগুলি আছে তাদের নানা অভিযোগ। অর্থের অভাবে এবং অনেকে মেয়ে কলেজে পড়াতে চান না বলে তাদের পক্ষে ভাল অধ্যাপক পাওয়া সম্ভব হয় না। তারপর তাদের কলেজের লাইব্রেরীগুলি যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয় বলে মেয়েদের সাইকেলে চড়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পড়তে যেতে হয়। সবাই বলে পায়ের পেশী দেখে অকসফোর্ডের মেয়ে চেনা যায়—সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে সেগুলি এতই স্ফীত হয়ে যায়। তাই ছেলেদের কলেজগুলিতে মেয়েদের পড়ার সুযোগ দেওয়ার দাবী অকসফোর্ডবাসীরা অনেক আগে থেকেই করে আসছিলেন। সে দাবীতে সাড়া দিয়ে অকসফোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৯৭৪ সাল থেকে পাঁচটি ছাত্র কলেজে পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ বছরের জন্য মেয়েদের ভর্তি হওয়ার সুযোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কেমব্রিজ অকসফোর্ডের উপর টেক্কা মেরে দিয়েছে এই বছর থেকেই সহশিক্ষা প্রবর্তন করে। তাপ বেপরোয়া অকসফোর্ডের এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত তাঁরা শুধু সহশিক্ষা প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হবেন না, যে সব ছেলেমেয়ে একসঙ্গে কলেজে পড়বে তাদের এক হস্টেলে থাকবারও সুযোগ দেবেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুব বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন একথা ভাবার কোনই কারণ নেই, কারণ এবার্ডিনে এক দশক আগেই ছাত্রছাত্রীদের এক হস্টেলে বসবাস শুরু হয়েছে এবং তার ফল উৎসাহজনক ছাড়া আর কিছুই নয়।

কৃত্রিম প্রজনন : ব্যাপারটা এতদিন মোটামুটিভাবে গবাদি পশুর মধ্যেই সীমিত ছিল, কিন্তু আইন ও সমাজজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যেও এর চাহিদা বাড়তে আরম্ভ করেছে। বৃটেনের এক সংবাদে প্রকাশ, সে রাজ্যে গর্ভপাত আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকে কৃত্রিম প্রজননের জন্য ক্লিনিকগুলিতে ভিড় হতে আরম্ভ করেছে। কৃত্রিম প্রজনন আইনানুমোদিত ব্যাপার নয়, সে কারণে এ ব্যাপারে কোন সঠিক তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু হারলে স্ট্রীটের একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের অভিমত—আগে যেখানে বছরে দু-একজন মাত্র স্ত্রীলোকের কাছ থেকে কৃত্রিম প্রজননের অনুরোধ আসত, এখন আসছে শয়ে শয়ে। এর জন্য চিকিৎসকরা প্রথম ছ মাসের বৈঠকের জন্য ২০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় চার হাজার টাকা ফি আদায় করেন। আর নারী বন্ধ্যা না হলে প্রথম থেকে ষষ্ঠ বৈঠকের মধ্যে সাফল্য অনিবার্য।

যতদিন গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিল ততদিন নিঃসন্তান দম্পতিদের দত্তক নেওয়ার জন্য সন্তান পাওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা ছিল না। অবৈধ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই বিভিন্ন ক্লিনিক থেকে নিঃসন্তান দম্পতিদের তাকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হত এবং প্রায় নিঃশব্দেই সব লেনদেন সাঙ্গ হয়ে যেত। কিন্তু এখন বৃটেনে গর্ভপাত আইনানুমোদিত হওয়ায় কোন নারীই আর অবাঞ্ছিত সন্তানধারণের ঝক্কি পোহাতে চায় না, গর্ভসঞ্চার হওয়ামাত্র সরকারী হাসপাতালে গিয়ে ভ্রূণ বিনষ্ট করিয়ে আসে। ফলে নিঃসন্তান দম্পতিগুলিরই হয়েছে এখন সবচেয়ে বেশী অসুবিধা।

হারলে স্ট্রীটের এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞা ডঃ ব্রিজেট ম্যাসন 'ওয়ার্লড মেডিসিন' পত্রিকায় লিখেছেন, তিনি এ ব্যাপারে তাঁর ত্রিশ-চল্লিশজন ছাত্রের সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। ঐ ছাত্রদের যার সঙ্গে সন্তানকামী কোন নারীর স্বামীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য মেলে তাকেই কৃত্রিম প্রজননের জন্য সেক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। তিনি লিখেছেন, এক ইহুদী দম্পতির ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় সাদৃশ্যগুলি এত সুন্দরভাবে মিলে যায় যে, ঐ সন্তান তার পিতার নয় এটা তার পরিবারেরও কেউ বুঝতে পারে নি। 'ডোনার' হিসাবে ছাত্রদের বাছাইর কারণ হিসাবে ডঃ ম্যাসন বলেছেন, তারা যুবক, বুদ্ধিমান ও মাত্র দু ঘন্টার নোটিশে তাদের পাওয়া যায়, তাছাড়া তাদের চাহিদাও কম, তিন থেকে পাঁচ পাউণ্ড পেলেই খুশী। রোমান ক্যাথলিক দেশগুলিতে কৃত্রিম প্রজনন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐ সব দেশের ধর্মগুরুরা জানেন না যে, তাঁদের কাছে নিত্য যাওয়া-আসা করে এমন অনেক দম্পতিরই সন্তানের প্রকৃত পিতা বৃটেনের এক প্রোটেস্টাণ্ট যুবক।

ডঃ ম্যাসন লিখেছেন, ইতালীর এক মহিলা প্রতি বৈঠকের জন্য বিমানযোগে লণ্ডনে এসে পরের বিমানেই ফিরে যেতেন।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

উন্নয়ন বা সমৃদ্ধির কর্মসূচীই শুধু নয়, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক যোজনার মূল লক্ষ্য হল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ। পরিকল্পনার এই গুণগত ও কৌশলগত পরিবর্তন নিশ্চিতই খুব আশার কথা। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, ২২ কোটিরও বেশি মানুষ, ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের নিচে বাস করে। সরকারী হিসাবে বলা হয় যে, মাসিক কুড়ি টাকা আয় হলে একটা মানুষ কোনোরকমে খেয়ে বাঁচতে পারে। আজকের বাজারে তাও সম্ভব কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। কারণ, হিসেবটা ধরা হয়েছিল ১৯৬০-৬১ সালের দ্রব্যমূল্যের সূচকের ভিত্তিতে। এই ন্যূনতম আয় এই বিরাটসংখ্যক মানুষের পক্ষে নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনাই সার্থক হতে পারে না। একবার জওহরলাল নেহরুর আমলে সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে ভারতের মানুষের মাথাপিছু গড়পড়তা আয় ১৯ পয়সা কি ৩১ পয়সা এ নিয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিতর্কের কথা নিশ্চয়ই এখনও অনেকের মনে আছে আশা করি।

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। আমরা চারটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও ভারতের মানুষের দারিদ্র্যের অবসান ঘটেনি। গরীব তার অন্তহীন দারিদ্র্য নিয়ে কোনোরকমে দিনযাপন করছে। এটা কোনো দেশের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সে কারণে এবার স্পষ্ট ভাষায় আত্মসমালোচনা করেছেন। মিথ্যা স্তোকবাক্যে পরিকল্পনার সাফল্যকে ভূষিত করেননি। তিনি বলেছেন, পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি যে ভালভাবে বাঁচতে হলে ধীরমন্থর গতিতে এগোলে চলবে না। সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই অবিলম্বে। দেরি হলে কেউ তা সহ্য করবে না। গরীবরা তো নয়ই।

এটা খুবই আশার কথা যে, প্রধানমন্ত্রী কোনো মামুলি পরিকল্পনায় মূল্যবান সময় নষ্ট করতে রাজী নন। কারণ, এতদিনকার পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছিল শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর। কিন্তু দেখা গেল যে, উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টন না হওয়ায় দরিদ্র মানুষের ন্যূনতম চাহিদা যে পর্যায়ে ছিল দুই দশক আগে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার ফলে চারটি পরিকল্পনা শেষ করেও আমাদের দেশের বাইশ কোটি মানুষের অন্নসংস্থান নেই কার্যত। অর্থাৎ ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের নিচে অনশনে অর্ধাশনে তারা কোনোরকমে বেঁচে আছে। এই কারণেই পঞ্চম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল, বাইশ কোটি মানুষের বাঁচার সংস্থান করা। যদি একে অগ্রাধিকার না দিয়ে মামুলিভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হয় তাহলে আগামী পঞ্চাশ বছরেও দারিদ্র্য নিশ্চিহ্ন করা যাবে কিনা বলা শক্ত। পরিকল্পনায় এর জন্য এগারো হাজার কোটি টাকা লগ্নী করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

খাদ্যে আমরা প্রায় স্বয়ম্ভর হতে চলেছি। কৃষিক্ষেত্রে ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি উন্নততর চাষব্যবস্থারই পরিচায়ক। খাদ্য ঘাটতির জের কাটিয়ে উঠে এই সবুজ বিপ্লব জাতির মনে নতুন আশা সঞ্চার করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যতদিন না দেশের প্রতিটি মানুষ দুবেলা অন্তত পেটপুরে ডালভাত খেতে পারছে ততদিন এই সবুজ বিপ্লব অর্থহীন। তেমনি কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হলে চাই ভূমিসংস্কার। সবুজ বিপ্লবের লাভটুকু যদি সবটাই নতুন কুলাক শ্রেণীর পেটে চলে যায় তাহলে খেটে-খাওয়া চাষী বা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের জীবনের ভবিষ্যৎ কি? এই প্রশ্নগুলোই পরিকল্পনাবিদদের বিশেষভাবে ভাবতে হবে। প্রধানমন্ত্রী সেদিকেই বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া দলিলে জনগণের প্রতি যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তা আশা করি কার্যে রূপায়িত হবে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় অনেক স্থিতিশীল। রাজ্য সরকারসমূহের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক ও সহযোগিতাপূর্ণ। তাই আশা করা যায় এই পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণে কোনো বাধা হবে না। গোটা অর্থনীতিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলাই যে পরিকল্পনার লক্ষ্য তার সঙ্গে বিরোধের কোনো প্রশ্নই নেই। তবে কীভাবে তা কার্যকর করা হবে, সেটাই হল বিচার্য বিষয়। একেবারে নিচুতলা থেকে সহযোগিতার ভিত্তিতে বৃহত্তম প্রকল্প পর্যন্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের অনগ্রসর এলাকা এবং বঞ্চিত মানুষের উন্নতিই এর লক্ষ্য। আশা করি এই লক্ষ্যে আমরা উপনীত হতে পারব সকলের আন্তরিক সহযোগিতায়।

পটভূমি

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ভাবছেন, কলকাতাকে উদ্যান-নগরীতে পরিণত করবেন। এদিকে এই মহানগরীর উন্নয়নের জন্যে পাঁচ বছরে দেড়শ' কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। তাতে কলকাতা উদ্যান নগরী না হোক, আগের তুলনায় যে অনেক বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারও শোনা যায়, এই উন্নয়নে আগ্রহী। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, কেনই বা এইসব আয়োজন? একদিকে যদি কলকাতাকে মেরে ফেলার আয়োজন করা হয় তখন অন্যদিকে তার ফুসফুসে অক্সিজেন সঞ্চারের ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের ভণ্ডামি আছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের একটা ভণ্ডামিরই আশ্রয় নিচ্ছেন।

সাধারণ লোক যাকে বলে গঙ্গা, সরকারীভাবে যাকে বলা হয় হুগলি, সেই নদীই কলকাতার প্রাণ। প্রাণ শুধু এই জন্যেই নয় যে, এই নদী থেকে মহানগরীর মানুষ তাদের পানীয় জল পায়। প্রাণ এই জন্যে যে, এই নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে কলকাতা বন্দর। কলকাতার গুরুত্ব ও সমৃদ্ধির মূলে এই বন্দরই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই বন্দরেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৪০ ভাগ কাজ হতো। এখন আর কলকাতা বন্দরের সেই গুরুত্ব নেই। কারণ এখানে বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না। পলি পড়ে পড়ে নদীর বুক ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বড় জাহাজ ভিড়বে কি করে?

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ ড্রেজিং করে পলি পরিষ্কার করে গত কয়েক বছর ধরে কোনোরকমে জাহাজ চলাচল চালু রেখেছেন। কিন্তু ড্রেজিংয়ের খরচ অনেক। অন্ততঃ বছরে সাত কোটি টাকা। কলকাতা বন্দর দিয়ে মাল আমদানী বা রপ্তানীর খরচ যে বেড়ে গেছে তার একটা বড় কারণ হলো এই ড্রেজিংয়ের খরচ। কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব হ্রাসের জন্যে এমনিতেই নানা মহলে চেষ্টার অন্ত নেই। কলকাতার এত কাছে গৌহাটি। গৌহাটি থেকে চা রপ্তানির স্বাভাবিক পথ কলকাতা। এতদিন তাই-ই হয়ে এসেছে। এখন আবার গৌহাটির চা হাজার হাজার মাইলের বেশি পথ পাড়ি দিয়ে গুজরাটের কান্দলা বন্দর হয়ে বিদেশে যাচ্ছে। এই ধরনের চেষ্টা তো রয়েছেই, তার ওপর বন্দর চালু রাখার খরচ যদি বাড়তে থাকে তবে এই বন্দরকে বাতিল করার বাড়তি একটা অজুহাতও পাওয়া যায়। অথচ এখন যা অবস্থা, ড্রেজিং ছাড়া হুগলি নদীতে জাহাজ চলাচল সম্ভব নয়।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত লবণ হ্রদ এলাকা ভরাট করার কাজ চলছিল। হুগলীর পলি তুলেই সেই ভরাট করার কাজ চলছিল। কিছুদিন হলো সেই কাজও বন্ধ। ফলে অবস্থা আরো কাহিল।

তাহলে, ক্রমশঃ পলি পড়ে হুগলি নদী মজে যাবে, কলকাতা বন্দর অচল হবে, কলকাতা একটা পরিত্যক্ত জনপদ হয়ে দাঁড়াবে, —এই কি এই মহানগরীর অনিবার্য বিধিলিপি? তাই যদি হয়, তবে আর এই মহানগরীর উন্নয়নের জন্যে এত টাকা ঢালা কেন?

•

হুগলি নদী, সেই সঙ্গে কলকাতা বন্দরের ভাগ্যে যে এই ব্যাপার ঘটতে পারে, এই নিয়ে এখন রাজ্যের সরকারী মহল, রাজনৈতিক মহল, বন্দর কর্তৃপক্ষ, লোকসভার সদস্যরা—সকলেই উদ্বিগ্ন। কিন্তু এই উদ্বেগ নতুন কিছু নয়। আজ থেকে অন্ততঃ একশ' বছর আগে স্যার আর্থার কটন নামে এক বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার এমনই দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি তখনই অনুমান করেছিলেন যে, হুগলি নদীর চরিত্র এমনই যে সেখানে ক্রমাগত পলি জমবেই। গঙ্গা থেকে যদি ভাগীরথী-হুগলিতে বাড়তি জল নিয়ে আসা না-যায় তবে সেই পলি ধোওয়ার অন্য কোন স্বাভাবিক অবস্থা সম্ভব নয়। পরে অন্যান্য বিশেষজ্ঞও এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালীন বিদেশী শাসকেরা এই অভিমতের ওপর তেমন গুরুত্ব দেন নি।

ইতিমধ্যে হুগলির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। গঙ্গা থেকে ভাগীরথী-হুগলিতে বাড়তি জল টেনে আনার দাবীও ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে ওঠে। হুগলিকে বাঁচাবার যে আর কোনো পথ নেই, দেশভাগের রোয়েদাদ দেওয়ার সময় র‍্যাডক্লিফ সাহেবও সেই কথা স্বীকার করে নেন। তিনি এমনভাবে এই রোয়েদাদ দেন যাতে গঙ্গা থেকে ভাগীরথী-হুগলিতে জল টেনে আনার কোনো অসুবিধে দেখা না দেয়।

এইসব সত্ত্বেও কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নড়ে-চড়ে বসতে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পার হয়ে যায়। প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ হয় ১৯৫৩ সালে। তারপর ১৯৫৬ সাল নাগাদ কেন্দ্রীয় জল-বিদ্যুৎ কমিশনের একটি বিশেষ 'সেল' তৈরী হয়। হুগলি নদীকে বাঁচাতে হলে এবং কলকাতা বন্দরে অন্তত যাতে ২৬ ফুট ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারে তার জন্যে কতোটা বাড়তি জল দরকার, সেকথা বিবেচনার ভার দেওয়া হয় এই 'সেলের' ওপর। ইতিমধ্যে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষও কিছু সমীক্ষা করেন এবং সেই সমীক্ষার ফল ডঃ হ্যানসেন নামে এক জার্মান বিশেষজ্ঞের কাছে পেশ করা হয়। ডঃ হ্যানসেন তখন সুপারিশ করেন যে, ভাগীরথী-হুগলি নদী প্রবাহকে বাঁচাবার সেরা পথ হলো মুর্শিদাবাদে ফরাক্কার কাছে একটি ব্যারেজ তৈরি করে গঙ্গার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করা।

এই অভিমতের সূত্র ধরেই ফরাক্কা প্রকল্পের জন্ম। এই প্রকল্পের মোদ্দা কথা হলো—ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর একটি ব্যারেজ তৈরি এবং ফরাক্কা থেকে জঙ্গীপুর পর্যন্ত একটি ২৬ মাইল লম্বা খাল কাটা। ঐ খাল দিয়েই গংগা থেকে বাড়তি জল ভাগীরথী-হুগলিতে এসে পৌঁছবে।

গোড়ার কথা এখানে একটু বিশদভাবে বলতে হলো এই কথাটাকে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্যে যে, হুগলি নদীকে এবং সেই সংগে কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্যেই ফরাক্কা প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিশেষ মহলের চক্রান্তের ফলে সেই মূল উদ্দেশ্যটিই এখন বানচাল হতে চলেছে। সবচেয়ে যেটা পরিতাপের কথা, এইসব মহল সরাসরি প্রশ্রয় পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ কে এল রাওয়ের কাছ থেকে। অথচ ফরাক্কা প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে যে বিশেষ বোর্ড আছে সেই বোর্ডের কর্তা হলেন ডঃ রাও স্বয়ং।

ফরাক্কায় ব্যারেজের কাজ শেষ হয়ে গেছে। জংগীপুরের ব্যারেজের কাজও শেষ। তবু গংগা থেকে ভাগীরথীতে বাড়তি জল আসছে না কেন? আসছে না, তার কারণ ফরাক্কা-জঙ্গীপুর খাল কাটার কাজই এখনও শেষ হয় নি। এই খাল কাটার কাজ শেষ হতে এত দেরি হচ্ছে যে, লোকসভার এস্টিমেট কমিটি পর্যন্ত এই জন্যে কর্তৃপক্ষকে কড়া ধমক দিয়েছেন। অনেক পিছিয়ে পিছিয়ে শেষপর্যন্ত বলা হলো যে, এই বছর জুন মাস নাগাদ খালের কাজ শেষ হবে। এখন বলা হচ্ছে, আগামী বছরের আগে হবে না। কিন্তু তাও হবে কী? কারণ খাল কাটতে মোট ১৫৬ কোটি ঘনফুট মাটি কাটার দরকার হবে। এখনও প্রায় ৪০—৪৫ কোটি ঘনফুট মাটি কাটা বাকি। এখন বছরে ন' কোটি ঘনফুটের বেশি মাটি কাটা হচ্ছে না। এই হিসাবমতো কাজ শেষ হতে আরো চার-পাঁচ বছর লাগার কথা।

ডঃ রাও অবশ্য দেরির জন্যে সব দোষ শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। তারা ঠিকমতো কাজ করছে না বলেই নাকি কাজ ঠিকমতো এগোচ্ছে না। ফরাক্কায় শ্রমিকদের মধ্যে কিছু অসন্তোষ আছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর কাজের নিরাপত্তার জন্যে তারা উদ্বিগ্ন। তা নিয়ে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধও হয়েছে। কিন্তু শুধু এই কথা বলে খাল কাটার কাজের দেরীর ব্যাখ্যা করা যায় না। ডঃ রাও শ্রমিকদের ত্রুটির কথা বললেও ঠিকাদারদের গাফিলতির কথা একবারও বলেন নি। তাছাড়া বিশেষজ্ঞরা যে-পদ্ধতিতে খাল কাটার পরামর্শ দিয়েছিলেন তা উপেক্ষা করে নিজের বুদ্ধিমতো খাল কাটার ব্যবস্থা করেছেন ডঃ রাও।

এই বিলম্বের ফলটা দাঁড়াচ্ছে কী? বাড়তি জল না আসায় হুগলির অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ব্যয়সাধ্য ড্রেজিং ছাড়া পলি সরাবার আর কোনো ব্যবস্থাই হচ্ছে না। অন্যদিকে, ফরাক্কায়

খালের মুখে পলি জমতে শুরু হয়েছে। সেই পলি যদি সরাবার ব্যবস্থা না হয় তবে খাল দিয়ে যখন জল আসবে তখন তার সঙ্গে ঐ পলিও আসবে। এই পলি জমার জন্যে কিন্তু প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ডঃ রাওয়ের বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ফরাক্কার ব্যারেজটি কোথায় হবে তা নিয়ে গোড়ার দিকে মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষপর্যন্ত রিভার রিসার্চ ইন্সটিটিউট একটি স্থান নির্বাচন করেন সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে। কিন্তু ডঃ রাও সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করে নিজেই একটি স্থান নির্বাচন করেন। এই স্থান নির্বাচনের ফলেই পলি জমার বিপদ দেখা দিয়েছে।

•

এই সমস্যার যদি সমাধান হয় এবং খাল কাটার কাজ যদি কয়েক বছরের মধ্যে শেষও হয় তবু কি শেষপর্যন্ত কলকাতা বন্দরকে বাঁচানো যাবে? এই সন্দেহ দেখা দিয়েছে এই কারণে যে, হুগলির বুকে জমা পলি পরিষ্কার করার জন্যে সারা বছর কমপক্ষে যেটুকু জল ফরাক্কা থেকে পাওয়া দরকার তা পাওয়া যাবে কিনা সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নদী-বিশেষজ্ঞরা এ-বিষয়ে একমত যে, গঙ্গা থেকে ভাগীরথীতে সারা বছর কমপক্ষে চল্লিশ হাজার কিউসেক, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশ হাজার ঘনফুট বাড়তি জল আসা দরকার। আসলে, এই হিসেবও কিছুদিন আগের। যেহেতু ইতিমধ্যে কলকাতা বন্দরের অবস্থার অবনতি ঘটেছে তাই জলের পরিমাণ আরো বেশি হলেই ভালো হয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

কিন্তু কিছুদিন ধরেই এই সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল যে, চল্লিশ হাজার কিউসেক জল পাওয়া যাবে না। তার কারণ, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে গঙ্গার ওপর অনেক সেচ প্রকল্প তৈরি হয়েছে। একটি দুটি নয়, ৩৪টি বড় এবং ১৭০টি ছোট সেচ প্রকল্প। সব রাজ্যেই এখন গ্রীষ্মকালীন চাষের রেওয়াজ বেড়েছে। তাই গ্রীষ্মকালে সেচের জল দরকার। গঙ্গা থেকে সেচের জন্যে ঐ জল টেনে নেওয়া হচ্ছে। তাই গ্রীষ্মকালে গঙ্গা থেকে ভাগীরথী-হুগলির জন্যে চল্লিশ হাজার কিউসেক তো দূরের কথা, বিশ হাজার কিউসেক জল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এই সন্দেহ যে মিথ্যে নয়, লোকসভায় ডঃ রাওয়ের বিবৃতিই তার প্রমাণ।

অথচ কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্যে গ্রীষ্মকালেই বাড়তি জলের দরকার বেশি। ডঃ রাও উদার সাজার চেষ্টা করে বলেছেন, বর্ষাকালে চল্লিশ হাজার কিউসেক জল ঠিকই পাওয়া যাবে। সেটা যে পাওয়া যাবে তার জন্যে ডঃ রাওয়ের কোনো কৃতিত্ব থাকবে না। প্রকৃতির কৃপাতেই তা পাওয়া যাবে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন দরকার বেশি তখন ডঃ রাওয়ের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই মিলবে না। অথচ গ্রীষ্মেই হুগলির পলি পরিষ্কারের সমস্যা সবচেয়ে বেশি করে দেখা দেয়। হুগলিতে পলি জমার বড় কারণ এই নদীতে রোজ দুবার বান আসে। সেই বানের সঙ্গে আসে পলি। গ্রীষ্মে ঐ পলির পরিমাণ বাড়ে। তাই গ্রীষ্মে মাত্র বিশ হাজার কিউসেক জল পেলে কলকাতা বন্দর বাঁচতে পারে না। অনেক বিশেষজ্ঞ এমন আশঙ্কা পর্যন্ত করছেন যে, ঐ বিশ হাজার কিউসেক জলও হয়ত পাওয়া যাবে না।

এখন সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে গঙ্গার জলের ঠিকমতো ব্যবহারের। গঙ্গার জলের ওপর বিহার বা উত্তর প্রদেশের দাবী অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই দাবী এমনভাবে প্রয়োগ করা চলে না যাতে ভাগীরথী-হুগলি মজে যায়। মূল প্রশ্নটা হলো, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন। ডঃ রাওয়ের দপ্তরই সেটা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজেই ধরে নিয়েছেন যে, বিশ হাজার কিউসেক জলেই কলকাতা বন্দরের কাজ মিটে যাবে। সুতরাং তিনি আর এই কাজ করবেন কী করে? ২-৬-৭২

—দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

'অলৌকিক বলতে যদি সাধ্যায়ত্তকে বোঝায় তাহলে অলৌকিক ঘটনা রোজই ঘটান যায়।' — প্রেসিডেণ্ট নিকসনের সোভিয়েট সফরের শেষে মার্কিণ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন তাঁর সহকারী ডাঃ হেনরী কিসিংগার।

ডাঃ কিসিংগারের স্বদেশবাসী যেসব সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট নিকসনের সহযাত্রী হয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তাঁদেরকে ডাঃ কিসিংগার বোঝাতে চাইছিলেন, প্রেসিডেন্ট নিকসন সাধ্যায়ত্ত কিছু লক্ষ্য সামনে রেখে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন বলেই তিনি ঐ লক্ষ্যগুলিতে পেঁাছতে পেরেছেন।

নিজের বা নিজের সরকারের সাফল্যের জন্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার অভ্যাস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউস নিকসনের নেই এমন কথা কেউ বলবে না। মার্কিন চন্দ্রযান অ্যাপোলোর সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্বসৃষ্টির পর এত বৃহৎ ঘটনা আর কদাপি ঘটে নি।' চীন সফরের পর তিনি বলেছিলেন, 'এই এক সপ্তাহে দুনিয়াটা বদলে গেল'।

অতএব প্রেসিডেন্ট নিকসনের সহকারী মার্কিন রাষ্ট্রপতির সোভিয়েট সফরের সাফল্যকে একটি 'মিরাকল' বলে দেখাবার চেষ্টা করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। খোদ প্রেসিডেন্টও এ ব্যাপারে ডাঃ কিসিংগারের সঙ্গে গলা মেলান কিনা দেখার জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে স্বচ্ছন্দেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর সহকর্মী, সমর্থক ও অনুগামীরা নিজেদের দেশের ও সারা পৃথিবীর মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন, এই সফর দারুণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আগামী নভেম্বরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে, সেদিকে তাকিয়েই প্রচার চালান হবে যে, নিকসন টেক্কা মেরে দিয়ে এসেছেন।

এটাও অনুমান করা কিছু কঠিন নয় যে সোভিয়েট রাশিয়াও তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই শীর্ষ [illegible] সাফল্যগুলিকে তুলে ধরবে. [illegible] করে সে অবশ্যই এই কৃতিত্বের দাবী [illegible] যে, সোভিয়েট রাশিয়া শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা হ্রাসের যে নীতি অনুসরণ করে আসছিল সেই নীতিরই জয় হয়েছে এই সফরের সময়ে স্বাক্ষরিত সোভিয়েট-মার্কিন চুক্তি ও ইস্তাহারগুলির মধ্য দিয়ে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন যখন মস্কোতে গিয়ে পেঁাছলেন তখন সেখানে অল্পসল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। সফরের শেষে টেলিভিশনের সামনে ভাষণ দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সেকথার উল্লেখ করেছিলেন। উল্লেখ করে হয়ত ভাল করেন নি। রাশিয়ায় এই ধরনের বৃষ্টিকে 'ছত্রাক বৃষ্টি' বলা হয়, কারণ এই অল্প-রোদ অল্প-বৃষ্টিতেই ব্যাঙের ছাতা জন্মায়। একথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন ব্যাঙের ছাতার মত যা জন্মায় তার অসারতার কথাই তাঁর শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিলেন কিনা কে বলবে? তাছাড়া, পারমাণবিক যুদ্ধের প্রসঙ্গে এই 'ব্যাঙের ছাতা'র অন্য একটা ভাবানুষঙ্গ আছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি একটা বিরাট ব্যাঙের ছাতার আকারের মেঘ হয়ে আকাশে দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট নিকসন নিশ্চয়ই তাঁর শ্রোতাদের সেকথাও মনে করিয়ে দিতে চান নি।

এই সফর ও শীর্ষ বৈঠকের ভিতর দিয়ে দুই বৃহৎ শক্তির যেসব চুক্তি ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলিকে প্রেসিডেন্ট নিকসন 'ব্যাঙের ছাতার চেয়ে ভাল' বলে বর্ণনা করেছেন। মাত্র দিন সাতেকের সফরের পক্ষে এই সব দলিলের সংখ্যা বেশ বড়সড় — সাকুল্যে আট। একটি দ্বারা দুই দেশের পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জার উচ্চসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার, ক্যান্সার ও হৃদরোগের মত ভয়াবহ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে, মহাকাশযাত্রার ক্ষেত্রে এবং পরিবেশ বিকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে দুই দেশ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া, সমুদ্রবক্ষে দুই দেশের জাহাজে আকস্মিক ধাক্কা লেগে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য তারা কিছু আচরণবিধি গ্রহণ করেছে. দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের মূল নীতিগুলি কি হবে তা উভয় পক্ষের স্বীকৃত একটি দলিলের

মধ্যে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তাছাড়া, সমগ্র আলোচনা, মতৈক্য ও মতানৈক্যগুলি একটি যুক্ত ইস্তাহারের মধ্যে [illegible] হয়েছে।

তাছাড়া, আরও দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা অসমাপ্ত রয়েছে এবং ঐ দুটি বিষয়ে ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঐ দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি হল দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আর একটি দুই দেশের নৌচলাচল সংক্রান্ত। বাণিজ্য সম্পর্কের মধ্যে একটি আলোচ্য বিষয় হল, যুদ্ধের সময় সোভিয়েট রাশিয়া আমেরিকা থেকে যে কর্জ নিয়েছিল তার পরিশোধ করার পদ্ধতি। আর একটি বিষয় হল, সাইবেরিয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বেসরকারী আমেরিকান কোম্পানীর সহযোগিতা।

স্পষ্টতই এই সব চুক্তি ও ঘোষণা দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার ফল। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্রেজনেভের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন শীর্ষ বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচনায় সময় দিয়েছেন মোট ২০ ঘণ্টা ও ২২ মিনিট। আনুষঙ্গিক বৈঠকের বাইরে প্রেসিডেন্ট নিকসন সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে যেসময় কাটিয়েছেন সেটা হিসাবে ধরলে মোট আলোচনার সময় হবে ৪১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট। এছাড়া দুই দেশের সরকারের অন্যান্য পদাধিকারীরাও অনেকগুলি বৈঠকে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলেছেন।

কিন্তু, এটা স্পষ্ট যে, — এবং এটা স্বীকারও করা হয়েছে যে,—মস্কোতে এই সব চুক্তি ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই দুই দেশের প্রতিনিধিরা এই সব দলিলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণ সম্পর্কে মার্কিন-রুশ আলোচনা ত' দীর্ঘকাল ধরে চলছিলই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট এই প্রথম সোভিয়েট রাশিয়ার মাটিতে পা দিলেন ক্রেমলিনের প্রাচীন দুর্গ-প্রাকারে আমেরিকার জাতীয় পতাকা উড়ল, প্রায় সিকি শতাব্দীর ঠাণ্ডা যুদ্ধের তিক্ততা কাটিয়ে উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতারা আবার সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মিত্রতার কথা স্মরণ করলেন, দুই দেশ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রের সঞ্চয় বাড়াবার মারাত্মক পথ থেকে সরে আসার কথা ঘোষণা করল ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল, ইউরোপে উত্তেজনা হ্রাসের যে প্রবণতা কিছুকাল আগে থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল তাকে দুই দেশের নেতারা আরও জোরদার করে তুললেন, মধ্য ইউরোপে তাঁরা দুই শিবিরের সশস্ত্র শক্তি কমাবার কথা ঘোষণা করলেন ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বিশ্বের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তি একযোগে অনেক-গুলি ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার অঙ্গীকার দিল—বিশ্ব রাজনীতিতে এই সব [illegible] অবশ্যই খুবই গভীর।

তাহলেও সংশয়িত এই দুই দেশের বাইরে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি মার্কিন-রুশ শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে এখনই ডাঃ কিসিংগারের মত এতখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারবে কিনা সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

এই 'তৃতীয় বিশ্বকে' আশ্বস্ত করার জন্য উভয় পক্ষ অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। রুশ-সোভিয়েট সম্পর্কের বিকাশ তৃতীয় কোন দেশের ক্ষতির কারণ হবে না, একথাটা বিভিন্ন দলিলের মধ্যে ও রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতাদির মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার বলা হয়েছে। বিশেষ করে, দুই পক্ষের নিজের নিজের মিত্র দেশগুলিকে আশ্বস্ত করার জন্য পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, অন্যান্য দেশগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া আগে থেকেই যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

কিন্তু, তবু বোধ হয়, এই সব চুক্তি ও ঘোষণাপত্রে আক্ষরিকভাবে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে তার পিছনকার গভীরতর অথবা অনুচ্চারিত তাৎপর্যের সন্ধান করতেই 'তৃতীয় বিশ্ব' আপাতত অধিকতর আগ্রহী হবে। শীর্ষ বৈঠকের পরও ভিয়েতনাম অথবা পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্নের মীমাংসার কোন পথ খুঁজে পাওয়া গেল না বলে ঐসব দেশ যেমন হতাশা বোধ করবে, তেমনি এই সব বিষয়ে দুই দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন গোপন বোঝাপড়া হয়েছে কিনা সেটা তারা বুঝবার চেষ্টা করবে। যেমন, ফ্রান্সের সরকারী রেডিওর একজন ভাষ্যকার প্রশ্ন তুলেছেন, ১২-দফার ঘোষণাপত্রে যে সব সদিচ্ছার কথা বলা হয়েছে সেগুলিই কি সব, অথবা গোপন আরও কিছু আছে? সায়গনের থিউ সরকারও যে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না তার প্রমাণ পাওয়া গেল মস্কোয় কি ঘটেছে তা জানার জন্য একজন সায়গনী জেনারেলের ওয়াশিংটন অভিমুখে ছোটার মধ্য দিয়ে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন ও তাঁর সহকর্মী ডাঃ কিসিংগারও ইতিমধ্যে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যাতে মনে হতে পারে, দুটি দেশ গোপন কিছু বোঝাপড়া করে থাকতে পারে। যেমন, দেশে ফিরে আসার পর মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে এই সফরের রিপোর্ট দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে সেই সবই যদি আমরা এখানে আলোচনা করি, তাহলে আমাদের শান্তির প্রয়াস ব্যাহত হবে।'

২৯ মে মস্কোতে মার্কিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ডাঃ কিসিংগার এক জায়গায় বলেন ভিয়েতনাম সম্পর্কে 'ইস্তাহারের আনুষঙ্গিক বিবৃতিতে যেসব মত প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলির চেয়ে বরং ঘটনা যা ঘটবে তার দ্বারাই নির্ণীত হবে, আমরা কতখানি সাফল্য অর্জন করেছি বা করি নি।' এই মন্তব্যের অর্থ স্পষ্টতর করার জন্য একজন মার্কিন সাংবাদিক চেপে ধরলে ডাঃ কিসিংগার 'আমি এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার মধ্যে যেতে চাই না' বলে উত্তরটা অস্পষ্ট রেখে দেন।

পর্যবেক্ষকরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, স্বাক্ষরিত দলিলগুলিতে, বিশেষ করে দুই দেশের সম্পর্কে মূল নীতি ঘোষণায়, উভয়ের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা নিবারণের কথা থাকলেও অন্য দেশগুলিকে সমর্থন ও অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার নীতি চালিয়ে গিয়ে তারা যে আবার ভিয়েতনাম অথবা পশ্চিম এশিয়ার [illegible] মত পরোক্ষভাবে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে না, এমন কোন প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দলিলগুলিতে নেই। মস্কোতে বসেই প্রেসিডেন্ট নিকসন ঘোষণা করেছেন যে, কোন দেশ তার প্রতিবেশী দেশকে আক্রমণ করলে আমেরিকা তার সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে আক্রমণকারী দেশকে শাস্তি দেবে। অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া যদিও একে অপরের উপর টেক্কা দিয়ে কোন একতরফা সুবিধা করে নেওয়ার চেষ্টা করবে না বলে প্রতিশ্রুতি রেখেছে তা হলেও আক্রমণকারীকে শায়েস্তা করার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফা ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার নিজের হাতে রাখছে।

'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলি গভীর হতাশার সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করে থাকবে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দুটি দেশ বিশ্বব্যাপী বুভুক্ষার সমস্যার সমাধান করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি এই শীর্ষ সম্মেলন থেকে আসে নি। অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশের বুকে এই দুই দেশের মহাকাশযান পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে, এই পৃথিবীর বুকে নিজেদের স্বার্থে ও বিশ্বের স্বার্থে তারা একযোগে ক্যান্সার ও হৃদ্‌রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, পরিবেশ বিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন করবে কিন্তু আর একটি বিশ্বসমস্যা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টির সমস্যা, নিরসন করার জন্য তারা একযোগে কাজ করবে, এমন কোন কথাই দেওয়া হয় নি।

এমন কি যে চুক্তিটির তাৎপর্য সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী হবে বলে মনে করা হচ্ছে সেটিরও আশু তাৎপর্য এমন কিছু নেই, এটা পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন। এই চুক্তির ফলে শুধু পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা সীমিত হচ্ছে, এই সব অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বাড়াবার উপর কোন নিষেধই আরোপ করা হয় নি। মার্কিন সরকারের মুখপাত্ররা বলেছেন, এই চুক্তি তাঁদের প্রতিরক্ষার ব্যয় এখনই লাঘব করতে কোন রকম সাহায্য করবে না।

৩-৬-৭২ —পুণ্ডরীক

আমি বাংলার মুখ দেখিয়াছি

গীতা গুহ রায়

ময়মনসিং থেকে টাঙ্গাইল পেঁাছতে রাত প্রায় নটা বাজল। খোঁজখবর নিয়ে বাস এসে দাঁড়ালো মুক্তিবাহিনীর সদর কার্যালয়ে। অফিসে বসে কাজ করছিলেন জনাকয়েক মুক্তিসেনা। পরিচয় হল টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনীর—যার নাম 'কাদের বাহিনী'—অসামরিক প্রশাসনের উপ-প্রধান এনায়েত করিমের সঙ্গে। পুরো নাম আবুল ফজল মোহাম্মদ এনায়েত করিম। মোহাম্মদ আলি কলেজের তরুণ ছাত্র এনায়েত ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 'নাট্যবিতান' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন—অভিনেতা হিসেবেও নামডাক ছিল। সুন্দর সুঠাম দেহ, সুমিষ্ট ব্যবহার, আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর অভিনেতা হবারই যোগ্য। এনায়েত অমায়িক ব্যবহারে সকলের মন কেড়ে নিলেন। নিজের দেশ, নিজের সংস্কৃতিকে ভালবাসেন বলেই মায়ের ডাকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে রণাঙ্গনে নেমে এলেন, অভিনেতার রূপসজ্জা ছেড়ে পরলেন রণসাজ। প্রশ্ন করেছিলাম—'আপনারা কি নিজেদের হাতেই ক্ষমতা রাখবেন?' জবাব দিলেন—'না এখন আমাদের দায়িত্ব শেষ। আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু এসে গেছেন। জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছে। তাঁদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেই আমাদের ছুটি।' সুদীর্ঘ ন মাস ধরে পথে প্রান্তরে, পাহাড়ে জঙ্গলে শুধু যুদ্ধই করেনি, সেই সঙ্গে 'কাদের বাহিনী, ময়মনসিং, পাবনার কিছু অংশ এবং সমগ্র টাঙ্গাইলের প্রশাসন চালু রেখেছে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখেছে। অথচ এরা প্রায় সকলেই তরুণ, বিশেষজ্ঞ কেউ নয়। কাদের বাহিনীর প্রশাসনিক প্রধান জনাব আনোয়ার-উল-আলম শহীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় তার ছবি দেখেছি, পরিচয় জেনেছি। বয়স বর্তমানে পঁচিশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এর ছাত্র। ছাত্র লীগের সদস্য ছিলেন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। টাঙ্গাইল বয়েজ স্কাউট প্রতিনিধি হয়ে এথেন্সে 'ওয়ার্লড জাম্বুরিতে' যোগ দিয়েছিলেন, তারপরই এল দেশের ডাক। সব ছেড়ে যোগ দিলেন মুক্তিবাহিনীতে। হলেন অসামরিক প্রশাসনের প্রধান। যুদ্ধের সময় জনসাধারণকে সজাগ করে তোলবার জন্য 'রণাঙ্গন' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা চালিয়েছেন। জনগণের মধ্যে ধান, গম, টাকা পয়সা বিতরণ করেছেন। কিন্তু এর জন্য সাধারণ লোকের ওপর কর বসান হয় নি। সব টাকাই আদায় হয়েছে দালালদের কাছ থেকে।

আল-উলম শহীদের প্রশাসন দক্ষতার পরিচয় দিলেন তাঁরই সুযোগ্য সহকর্মী এনায়েত করিম। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবার হারিয়ে যাওয়া মা-বোন আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হবার পালা। সকলেই ছুটি চায়। এনায়েত ছুটির অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করছিলেন। হ্যাঁ, স্বাক্ষর করছিলেন বাংলায়। অনুমতিপত্রখানিও ছাপা হয়েছে বাংলায়, ঢাকাতেও দেখেছি, প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারী—স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব পর্যন্ত বাংলায়ই স্বাক্ষর করেন। ঠিকানা লেখায় c/o 'কে ওপার বাংলার অধিবাসীরা লেখেন 'প্রযত্নে'— To কে করেছেন 'অভিমুখি'। উচ্চশিক্ষিত যুবকেরাও ইংরেজি মেশানো বাংলায় কথা বলেন না। কথাবার্তার মধ্যেই আমাদের জন্য পোড়াবাড়ির সুস্বাদু চমচম আর চা এলো। নির্ভেজাল ছানায় তৈরী মিষ্টি আমাদের ভেজালে অভ্যস্ত রসনায় নতুন লাগল। ফোন করলেন ডাকবাংলোয়। অফিসঘর থেকে সামান্য ব্যবধানে 'বিন্দুবাসিনী' বিদ্যালয়ের মুখোমুখি ডাকবাংলো। বাংলো থেকে একটি ছেলে এলো। এনায়েতের প্রশ্নের জবাবে জানালো বাংলোর একটি ঘর স্যার—অর্থাৎ একজন জাতীয় পরিষদের সদস্য তালা দিয়ে গেছেন। চাবিও তাঁর কাছেই। এনায়েত হুকুম দিলেন তালা ভাঙতে। বন্ধু রাষ্ট্রের অতিথিরা থাকবেন। ছেলেটি ইতস্তত করছিল দেখে এনায়েত বললেন, স্যার এলে তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন, কাজেই ছেলেটিকে কিছু ভাবতে হবে না। অবাক কান্ড! কত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আমলাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরাঘুরি করে বেড়াতে হল না। জাতীয় পরিষদের মাননীয় সদস্যের তালা ভাঙতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হল না। থাকার ব্যবস্থা তো হল, কিন্তু খাওয়াও তো দরকার। রান্নার সমুদায় সরঞ্জাম সঙ্গেই আছে, জায়গা পেলেই চলে। কিন্তু মুক্তিবাহিনী অতিথিকে রান্না করে খেতে দেয় কি করে? সুতরাং, 'আপ্যায়ন' হোটেলে আমাদের নৈশভোজে আপ্যায়ন করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির ছাত্র 'রাজু' আমাদের পথ দেখিয়ে হোটেলে নিয়ে এলেন। রাজনীতির ছাত্র হলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগ ছিল না। কিন্তু পঁচিশে মার্চের পর টাঙ্গাইলের ছেলে রাজু ঘরে থাকতে পারে নি। বেরিয়ে এসেছে হাতিয়ার হাতে। বললেন—'জানেন, এখন মানুষ মরতে দেখলে আমাদের মনে কোনো অনুভূতি জাগে না। আমরা বোধহয় পাথর হয়ে গেছি।' শুধু কি রাজু? শ্যামল তরুলতা আর কোমল দূর্বাঘাসের গড়ে ওঠা অনেক নরম মনই পাথর হয়ে শাণিত অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। সবুর ছিল বড় মিস্ত্রি। মৌলানা ভাসানীর শিষ্য সবুর পঁচিশে মার্চের পর হয়ে উঠলো দুর্ধর্ষ গেরিলা। নমাস ধরে অধিনায়কের পাশে পাশে ছায়ার মত থেকে যুদ্ধ করেছে সবুর মিস্ত্রি। তাই সে হয়েছিল কোম্পানী কমান্ডার। ভালুকা থানার ছেলে আবদুল্লাহ। কাজিনকালে

বন্দুক হাতে নেয় নি। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সেলফ লোডেড রাইফেল দিয়ে পকুল্লা ব্রীজে পাহারারত রাজাকার চারজনকে খতম করতে হাত কাঁপে নি। অমিতবিক্রমে বাবুইখোলায় যুদ্ধ করেছে শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র দিয়ে। দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা ছিল ওর বিশেষত্ব। সেকটর অধিনায়ক বলেছেন—'ওকে আমি বেত দিয়েও শুইয়ে দিতে পারিনি। জীবনে ও বোধহয় একবারই শুতে চায়।' আবদুল্লাহও অধিনায়ক সিদ্দিকীর সহযোদ্ধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়ণের মেধাবী ছাত্র নুরুন্নবী—এখন অবিস্মরণীয় মুক্তিযোদ্ধা। ভারতীয় জেনারেল অরোরার সুবোধ বালক, জেনারেল নাগেরার স্নেহভাজন, জেনারেল গিলের ছোট্টবন্ধু, ব্রিগেডিয়ার সন সিং বাবাজীর 'বুদ্ধিমান বালক', সুদর্শন নুরুন্নবী বঙ্গমাতার সুযোগ্য সন্তান। মাতৃমুক্তির যুদ্ধ থেকে সব সন্তানই ফিরে আসে নি। এমনি এক নাম কুদ্দুস। ভুয়াপুরের কুদ্দুস। রোগশয্যায় শুয়ে একদিন সে বন্ধুদের কাছে বলেছিল—'দেখবি তোরা—ভুয়াপুরকে মুক্ত না করে আমি মরতে পারি না—যদি আমার মরণ আসে তবে ভুয়াপুর মুক্ত করার পরই আসবে।'

তার সাধ অপূর্ণ থাকে নি। সর্বাধিনায়ক ভুয়াপুর মুক্ত করার দায়িত্ব তার ওপরই সঁপে দিয়েছিলেন। জীবন দিয়ে ভুয়াপুর অধিকার করেছে কুদ্দুস। দিনের পর দিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর হাতবোমা আর গ্রেনেড ছুঁড়ে শত্রুকে নাজেহাল করেছে সালাহউদ্দীন ওরফে সালু। টাঙ্গাইল মুক্ত হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে বাংলা, কিন্তু সালাহউদ্দীন তা চোখে দেখে যেতে পারেনি। দেশী মিরজাফরদের চক্রান্তে শহীদ হয়েছে সালু। তার পবিত্র স্মৃতিরক্ষায় মুক্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছে 'সালাহউদ্দীন পাঠাগার'। এমনি কত ছবি, কত স্মৃতি টাঙ্গাইলের পথে পথে।

রাজুই আমাদের হোটেল থেকে বাংলোয় পৌঁছে দিলেন। চৌকিদার সেই রাত্রে এবং পরদিন ভোরে নানা কাজে আমাদের সাহায্য করেছিল। লোকটি হিন্দু। কথায় কথায় এনায়েত বলেছিলেন, টাঙ্গাইলে হিন্দুর সংখ্যা নেহাত কম নয়—কিন্তু মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে মাত্র দু একজন। এনায়েতের গলায় অভিমানের ছোঁওয়া ছিল কি? কিন্তু এর পেছনে কি কোন কারণ নেই? দেশবিভাগের পর থেকে এযাবৎ যতসংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করেছে, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই তাদের মধ্যে বেশি। রয়ে গেছে বেশির ভাগই অশিক্ষিত এবং ব্যবসায়ী। জাতীয়তার চেতনা তাদের তেমনভাবে নাড়া দেয় নি। তাছাড়া পাকিস্তান সরকারের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির ফলে ওখানকার হিন্দু জনসাধারণ তাদের মাতৃভূমিকে জননী না ভেবে বিমাতা বলেই মনে করে এসেছে। এইজন্যেই বোধহয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও সন্দেহ করে দূরে থেকে গিয়েছে।

পরদিন সকালে দেখা গেল সামনের বিন্দুবাসিনী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে নানা চেহারার, নানা মাপের, নানান বয়সী ছেলেদের ভিড়। উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রাণচঞ্চল তারুণ্যের উজ্জ্বল জোয়ার। রকমারি পোশাক পরনে, অনেকের হাতেই হালকা মেশিনগান, রাইফেল ইত্যাদি। খেলায় মেতেছে সবাই—যুদ্ধের খেলা। এইসব ছেলের দল—যাদের অনেকের মুখে এখনও গোঁফের রেখা পড়েনি—একটা রাষ্ট্রের সুশিক্ষিত সাহসী যোদ্ধাদের নাস্তানাবুদ করেছে—চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না।

'কাদের বাহিনী' কম করেও পাঁচ ছ' হাজার খান সেনা খতম করেছে। মীর্জাপুর ডাকবাংলোয় দেখেছিলাম এগারো বছরের মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর ওরফে জগদীশ সরকারকে। হাতবোমা ছুঁড়ে, মাইন পেতে, খবরাখবর সংগ্রহ করে নানাভাবে যুদ্ধের সহায়তা করেছে। ওর গর্ভধারিণী মা নাম রেখেছিলেন জগদীশ—স্কুলে পড়ত পঞ্চম শ্রেণীতে। মুক্তিসেনাদের সঙ্গে যোগাযোগ হল যুদ্ধের সময়। ওরই বয়সী জাহাঙ্গীর প্রাণ দিল স্বাধীনতার জন্যে। জাহাঙ্গীরের বাবা মায়ের খালি কোল ভরে দেবার জন্য এগিয়ে এলো জগদীশ। বললো—'কেঁদো না মা, জাহাঙ্গীর মরে নি, চেয়ে দেখ তোমাদের জাহাঙ্গীর এসেছে। আমায় কোলে নাও মা।' জাহাঙ্গীরের মায়ের চোখে অশ্রুর বন্যা। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন জগদীশকে তার শূন্য বুকে। সেই থেকে জগদীশ হল জাহাঙ্গীর।

সকাল সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ 'নাস্তা' নিয়ে হাজির মুক্তিসেনারা। রুটি, তরকারী, মিষ্টি চা-এর বিপুল আয়োজন। যুদ্ধের ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তবু বাঙালীর চিরন্তন আতিথেয়তায় কার্পণ্য নেই। এরপর 'কাদের বাহিনীর' সর্বাধিনায়ক স্বয়ং কাদেরের জন্য প্রতীক্ষা। বেলা বাড়ছে। পথও কম নেই। তাই কয়েকজন অভিমত দিলেন কাদেরের জন্য অপেক্ষা না করে রওনা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে সেদিন আমরা বুদ্ধিমানের মত কাজ করিনি। সেইজন্যই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়কের দেখা পেয়েছিলাম।

চব্বিশ বছরের তরুণ অধিনায়ক ফুলমালায় সজ্জিত একখানা মোটরে চড়ে এলেন। প্রথমে গেলেন স্কুলঘরে। সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে এলেন ডাকবাংলোয়। এনায়েত করিম পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে। 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'বাঘা' সিদ্দিকীর ছবি ছাপা হয়েছিল। কিউবার বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রোর মত চেহারার আদল। মাথায় ছ ফুট, লম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাটের নিচে দুটি আয়ত চক্ষু, শরীরে বাড়তি মেদ ছিঁটেফোঁটাও নেই। যেন ঝকঝকে একখানা ইস্পাত। বিনয়ে নম্র, সৌজন্যের হাসিটি মুখে লেগেই আছে।

প্রশ্ন:—'আপনার অধীনে তো শুনেছি ষোল হাজার সৈনিক আছে, এদের সুশৃংখল রাখা তো একটা সমস্যা?' জবাব দিলেন মৃদু হেসে—'সে কথা ঠিক। তবে আমাদের ঐ একটি সম্পদই আছে—নিয়মশৃংখলা। আমার ছেলেরা আমি বললে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন প্রশ্ন না করে। আবার আমি যখন আমার কমাণ্ডারের কাছ থেকে আদেশ পাব, বিনা দ্বিধায় পালন করে যাব। ডাইনে যাব না বাঁয়ে, সে চিন্তার ভার অধিনায়কের। সৈনিকেরা কেবল হুকুম তামিল করবে। সিনেমায় দেখা যায় সৈন্যরা কমাণ্ডারের কথায় নির্বিচারে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময়ই তা হয় না। কিন্তু আমার ছেলেরা কথা শোনে। কথা শোনে বলেই খুব কম ক্ষয়ক্ষতি করে আমরা লাভ করেছি অনেক বেশি। কথা না শুনলে অনেক প্রাণ বলি দিতে হত।' গত ন-মাস ধরে টাঙ্গাইলের চর, ভর, পাহাড়, জঙ্গলের প্রতিটি যুদ্ধে কাদের বাহিনীর ছেলেরা যে শৃংখলাবোধের পরিচয় দিয়েছে—যে কোন দেশের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর কাছে তা ঈর্ষার বস্তু। এই কাদের বাহিনীই পাক হানাদারদের একুশ কোটি টাকা মূল্যের মার্কিণী গোলাবারুদভরা জাহাজ ধ্বংস করে সমুদয় অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল। মুক্তিসেনা নুরুন্নবী সেই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন 'পূর্বদেশ' পত্রিকায়। তার মুখ থেকেই শোনা যাক।

'কাদের বাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ভুয়াপুর। ঐ ঘাঁটিই ছিল টাঙ্গাইল-মধুপুর সড়কের পশ্চিমাঞ্চল থেকে ধলেশ্বরী ও যমুনার তীর পর্যন্ত মুক্ত এলাকার কেন্দ্রস্থল। এখান থেকেই ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করে রাখা হয়েছিলো। আগস্টের নয়, একাত্তর সাল। ধলেশ্বরীর তীরে সিরাজকান্দিতে সাতটি জাহাজ দক্ষিণ থেকে এসে ভিড়লো। ঐ নদীপথ রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব ছিল কাদের বাহিনীর হাবিবের এক কোম্পানী দুর্ধর্ষ গেরিলাদের। ওরা হয়ে উঠলো তৎপর—কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল না সেদিনই। পরদিন হাবিব নিজে বেরুলো খোঁজ আনতে, সঙ্গে গেল জমসেদ। ছদ্মবেশী হাবিবের হাতে কাস্তে, পরনে ময়লা লুঙ্গি ও গেঞ্জি, মাথায় গামছা—জমসেদও তাই তবে কাস্তের বদলে কাঁধে মাছ ধরার জাল ও মাথায় খালুই। নদীর ধারে ওদের দেখে তিনজন খানসেনা ও একজন বাঙালী স্পীডবোটে নেমে এলো কাছে—জানতে চাইলো পোড়াবাড়ির চমচম আর খাসী মুরগীর খবর। হাবিব জমসেদ খবর সরবরাহ করলো সবই তবে সঙ্গে সঙ্গে ওদের খবরও জেনে নিলো। পরবর্তী কর্তব্যের চিন্তায় উত্তেজিত মনে আস্তে

আস্তে কেটে পড়লো ওরা। ঘাঁটিতে এসে আক্রমণের প্ল্যান করলো।

রাতের আঁধারে তৈরী হলো সুকঠিন এ্যামবুশ। এগারোর সকালে জাহাজের যাত্রা হলো শুরু—উত্তরের পথে। অধিনায়ক গেরিলাদের নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে সিরাজকান্দির উত্তরে মাটিকাটা চরে নদী ঘেঁষে ধান ও পাটক্ষেতের মাঝে দুটি বাড়িতে। একটি বাড়িতে পজিশন নিয়েছে অধিনায়ক নিজে তার হাতে একটি স্টেনগান, পাশে এল, এম, জি, ও দুই ইঞ্চি মর্টার নিয়ে গেরিলা। জাহাজগুলো নিশ্চিন্তে ভেসে যাচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে। গেরিলাদের নির্দেশ দেওয়া আছে অধিনায়কের ওপেনিং ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ শুরু করতে। সবাই হাতিয়ার তাক করে ট্রিগারে হাত রেখে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। একটি জাহজ এল আওতার মধ্যে অধিনায়কের নির্দেশ নেই—আরও দুটি চলে গেল প্রথমটির অনুসরণ করে। কোনো চাঞ্চল্য নেই অধিনায়কের। জোয়ানদের মধ্যে আশাভঙ্গের মৃদু গুঞ্জন—তবু মেজর হাবিব চুপ। এর একটু পরেই দৃষ্টিগোচরে এলো RSV Engineers, LS—3 অঙ্কিত একটি বড় জাহাজ। দুটি এম, জি বসানো জাহাজের দুদিকে—পাশে বসে আছে অসতর্ক কয়েকজন খান সেনা। অধিনায়কের হাতিয়ারের আওতায় জাহাজ—সময় ২-৩০ মিঃ। এক-দুই-তিন—গর্জে উঠলো অধিনায়কের স্টেনগান—সঙ্গে সঙ্গে এল, এম জি, এস, এল, আরও মর্টারের শেল ৩০৩ তো অবিরাম চলছেই। স্যারেং কামরা উড়ে গেলো মর্টারের শেলে। জাহাজ গতিভ্রষ্ট হয়ে আটকে গেল বালুচরে।' মাত্র আধঘণ্টায় এক প্ল্যাটুন খানসেনা খতম হয়েছিল ভেতো বাঙালীদের হাতে। সেদিন সেনাপতির কথা অমান্য করে উত্তেজনার বশে গেরিলারা যদি সময়ের আগেই গুলি ছুঁড়ে বসত, এই ইতিহাস অন্যরকম হত। খানসেনারা ধ্বংস হলে জাহাজের দুজন বাঙালী নাবিক সাদা কাপড় উড়িয়ে মুক্তিবাহিনীতে এসে যোগ দিলেন। এখন তাড়াতাড়ি মাল খালাস করা দরকার। লোক কোথায় পাওয়া যায়? দেখতে দেখতে হাজার হাজার গ্রামবাসী কয়েকশো নৌকো নিয়ে এসে হাজির। হাত লাগিয়ে উদ্ধার করা হল একুশ কোটি টাকার মূল্যবান আধুনিক সমরাস্ত্র। সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপরে যুদ্ধের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। অধিনায়ক সিদ্দিকীর অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য এই যুদ্ধে মাত্র তিনজন আহত আর একজন শহীদ হওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতিই হয় নি। এগারোই আগস্ট ঘা খেয়ে পালিয়ে গেলেও অস্ত্র উদ্ধারের আশায় পাক-বাহিনী পরদিন ভূয়াপুর আক্রমণ করল পুরো এক ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে খবর পেয়ে সর্বাধিনায়ক কাদের এসে যোগ দিয়েছেন বাহিনীর সঙ্গে। প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে ছেলেরা নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করে শত্রুকে ফেরত পাঠালো। জয়ের নেশায় মাতাল ছেলের দল। কিন্তু সেনাপতি হুঁশিয়ার। তিনি নির্দেশ দিলেন বিশ্রাম বা উল্লাসের সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছাউনি সরিয়ে নিতে হবে। কারণ আহত নেকড়েরা এবার আরো হিংস্র হয়ে আসবে। বিমান আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। নির্ভুল অনুমান।

এক ঘণ্টার মাথায় আকাশ থেকে শুরু হল বোমা বর্ষণ। কিন্তু বৃথাই, ততক্ষণে পাখি খাঁচা ছেড়ে উধাও। সেই সবার প্রিয়, বিচক্ষণ সেনাপতি, বাঘা কাদের সিদ্দিকীর সামনাসামনি আমরা। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরেছে। ছবি নিচ্ছে, স্বাক্ষর নিচ্ছে। এই সিদ্দিকীর মধ্যে কোথায় সেই ডানপিটে ছেলেটি—যে ন' বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলের ছায়া মাড়ায় নি, রাখালের কাছ থেকে গরু চেয়ে নিয়ে চরিয়েছে মাঠে মাঠে, পাড়ার ছেলেদের পিটিয়ে স্কুলের বেতনের টাকায় বাদাম ভাজা খেয়ে সে মা বাবার চিন্তার কারণ হয়েছিল? পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পরের বছর যে মাত্র সাতদিন ক্লাস করে রেকর্ড করেছিল। শেখ মুজিবের আহ্বানে হাতিয়ার হাতে নিয়ে প্রথম যুদ্ধ করেছিলেন উনিশে এপ্রিল, একাত্তর সালে কালিহাতিতে—নেতৃত্ব ছিল ই, পি, আর এর। এরপর সব ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু সিদ্দিকী হাল ছাড়লেন না। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে খোঁজ পান পাহাড়ে একটি ই, পি, আর এর প্ল্যাটুন আছে। তখন তার সঙ্গে মাত্র এগারোজন। এক রাতে ৪১ মাইল পথ হেঁটে আড়াইপাড়ার একটি মাদ্রাসায় আস্তানা গাড়লেন। সেখানে দেখা পাহাড়ের হামিদুল হকের সঙ্গে। ই, পি, আর-এর ফেলে-যাওয়া কিছু অস্ত্র পেলেন। ইতিমধ্যে দলের সদস্যসংখ্যা এগারো থেকে হয়েছে একশো। 'এখান থেকেই আমার সত্যিকারের সংগঠনের সূত্রপাত।'—বলেছেন কমান্ডার সিদ্দিকী। এই চব্বিশ বছরের তরুণকে ক্রমে সতেরো হাজার লোক নেতা বলে বরণ করে নিয়ে তারই ওপর সঁপে দিয়েছিল নিজেদের জীবন-মরণের ভার।

উচ্চপদ, খেতাব অথবা পুরস্কারের প্রত্যাশা সিদ্দিকীর নেই। মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই তার একমাত্র কাম্য। আদর্শের জন্য লড়েছেন, আদর্শ রূপায়ণের জন্য দরকার হলে কাজ করবেন, কিন্তু সুবিধাবাদী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। কমাণ্ডো রফিক আজাদের সঙ্গে সাক্ষাতকারে কাদের বলেছেন—'আমার নিজের রাজনীতির প্রতি মোহ নেই কোনো। ক্লিক পছন্দ করি না, কোনোদিন আমাকে তা করতেও হয় নি, যদি আবার রাজনীতিতে ক্লিক দেখতে পাই তবে আমি ওতে যোগ দেব না। ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আমি থাকব না। যে আদর্শের জন্য আমরা লড়াই করেছি তা বাস্তবায়ণের জন্য যদি আহ্বান আসে তবে আমি আছি। বঙ্গবন্ধুর ওয়াদাই আমাদের আদর্শ—তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—ক্ষুধা, অশিক্ষা আর ব্যাধি থেকে মুক্তি।' আমাদের প্রশ্নের জবাবে জানালেন—'এখনই তো আসল সংগ্রাম—সংগঠনের সংগ্রাম। দেশের প্রত্যেকটি লোক যদি খেতে না পায়, পরতে না পায়—তাহলে স্বাধীনতা অর্থহীন। সেজন্য সবাই আমরা কাজ করব।' বঙ্গবন্ধুর আদর্শই ঘোষিত হল 'বঙ্গবীর' কাদেরের কণ্ঠে। নেতাজী সুভাষের মতই প্রতিটি জওয়ানের জন্য সিদ্দিকীর মায়ের মত মমতা। নিজের কথা ভাববার সময় কোথায়? তাছাড়া যুদ্ধজয়ের পরও তিনি বেঁচে থাকবেন—এই আশা ছিল না। ভেবেছিলেন কোন না কোন যুদ্ধে তিনি মারা যাবেনই। ইচ্ছা থাকলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কোনো উচ্চপদে বহাল হতে পারতেন—শুনেছি প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আহবানও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি

তা চান না। অগণিত দেশবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসা পেয়েছেন, পেয়েছেন জাতির পিতার আশীর্বাদ ও স্নেহ আর কিছুই তাঁর পাওয়ার নেই। জওয়ানদের জন্যই এখন তার যত চিন্তা, 'এখন চিন্তা হলো আমার জওয়ানদের নিয়ে। তারা দেশের জন্য বহু ত্যাগস্বীকার করেছে। তাদের যা দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তারা তা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে। এখন আমার এই জওয়ানদের প্রতি সরকারের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তাই আমার সমস্ত পরিকল্পনা জওয়ানদের সুখী সমৃদ্ধিশালী জীবনকে কেন্দ্র করে। তাদের সুব্যবস্থা হয় যাতে তা আমাকে দেখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ওদের অনেকের ঘরবাড়ি হানাদার পাক বাহিনী পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। যাতে তারা যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। যারা সেনাবাহিনীতে অথবা স্কুল কলেজে অথবা চাকরিতে যেতে চায় তাদের সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। এবং দেশে দেশে মুক্তিযোদ্ধার প্রাপ্য যে সম্মান দেয়া হয় সে সম্মানও তারা যাতে পায় তা আমায় দেখতে হবে।'

ঢাকা আক্রমণের ছক তৈরীর সময় শত্রু ঘাঁটিগুলির অবস্থান সম্পর্কে ভারতীয় বাহিনীর জেনারেলদের ওয়াকিফহাল করেছিলেন এই কমান্ডার সিদ্দিকী। টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা পর্যন্ত সমস্ত সেতুগুলি ভেঙে দিয়ে কাদের বাহিনী রাজধানীতে শত্রুসৈন্য ঢুকতে বাধা দিয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন এই তরুণ যোদ্ধা আবদুল কাদের সিদ্দিকী। 'বাঘা' কাদেরকে সামনে দেখে সেদিন নিয়াজী ভূত দেখার মত আঁতকে উঠে তিন পা পেছিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু কাদের সিদ্দিকী খাঁটি সৈনিক। নেতা শেখ মুজিবের আহ্বানে একদিন যেমন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, জাতির নেতার নির্দেশে যে অস্ত্রসম্ভার নামিয়েও রাখলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈনিকের মত। সেনানীর কাছে অস্ত্র অতি প্রিয়। সেই অস্ত্র নামিয়ে রাখার সময় কাদের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক চোখের জল রোধ করতে পারেন নি, প্রধানমন্ত্রীর চোখ দুটিও সজল হয়ে উঠেছিল প্রিয় সন্তানের হাত থেকে সেই অস্ত্র নিতে। শোনা যায় অস্ত্রের ব্যবহার রক্তের স্বাদের মত—একবার পেলে আর ছাড়া যায় না। কিন্তু বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা প্রমাণ দিলেন হানাদার নরপশুদের খতম করার জন্য যে অস্ত্র তাঁরা ধারণ করেছিলেন, ভ্রাতৃরক্তে তা কলঙ্কিত করবেন না। অভিভূত কাদের সিদ্দিকীর আবেগকম্পিত স্বরে তাই ধ্বনিত হল—"আমি কাদের সিদ্দিকী নই, কাদের সিদ্দিকী ধলাপাড়ার যুদ্ধেই মারা গেছে। এখন আমি শুধু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ—তাঁর নির্দেশ।'

হাতে সময় ছিল না বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিতে হল। এরপর মীর্জাপুর। দেখলাম রণদা সা (সাহা) পরিচালিত 'কুমুদিনী হাসপাতাল'। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে বেশ বড় হাসপাতাল। বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়, যদিও সরকার সাহায্য করেন না। শুনলাম সঙ্গে নার্সদের বড় হোস্টেল ছাড়াও আছে একটি আবাসিক বিদ্যালয়। বিনামূল্যে থাকা খাওয়া পড়াশোনার সুবিধে পায় দরিদ্র জনসাধারণ। এই জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক রণদা সা'ও নিস্তার পান নি, বর্বর পাক-হানাদারের খয়ের খাঁ রাজাকারেরা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এখনও তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

মীর্জাপুর ছেড়ে বাস একটানা চলে মীড়পুর সেতু পেরিয়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ঢুকল। দলের কর্মকর্তারা 'পুরাণা পল্টনে' আওয়ামী লীগ অফিসে দেখা করে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন 'জহিরুল হক হলে'। আগে নাম ছিল 'ইকবাল হল'। মুক্তিযুদ্ধের পর তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শহীদ জহিরুল হকের নামে এটির নামকরণ হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ পাক শাসকদের সব চিহ্ন মুছে ফেলবে। তাই আরম্ভ হয়েছে নামবদলের পালা। 'জিন্না' হলের নাম হয়েছে 'সূর্য সেন' হল। ঢাকার মেয়ে সুরাইয়া বলেছিল, ওরা এখন থেকে আর সালোয়ার কামিজ পরবে না, কেননা ঐগুলো পশ্চিমী মেয়েদের পোশাক।

খবর পেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন পুরানা পল্টন অঞ্চলের আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ কালাম আলি খান আর তার ভাই আবেয়াল হোসেন খান। এ'রা এককালে বিলাসীপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। অভিভূত দুই ভাই প্রত্যেকের হাত জড়িয়ে ধরে কে'দে ফেললেন। বললেন—'কোনোদিন যে আবার বিলাসীপাড়ার লোক দেখব, ক'মাস আগেও ভাবতে পারি নি। নয় মাস যে কি বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটিয়েছি তা একমাত্র আল্লাই জানেন। পলে পলে দিন গুনেছি ভারতীয় সৈন্যের আগমনের। যেদিন আপনাদের সেনাবাহিনী এসে পৌঁছল, মনে হয়েছিল স্বয়ং আল্লার পয়গম্বরেরা এসেছেন আমাদের উদ্ধার করতে। আপনারা সাহায্য না করলে একটি লোকও প্রাণে বাঁচত না।" আবেগের বশে ও'রা অতিশয়োক্তি করেছেন হয়ত। কেননা মুক্তিকামী জনতাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার মত শক্তি কোথাও নেই। তবে ভারতবাসী ও ভারতীয় সৈন্যদের সম্বন্ধে বাংলাদেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মন সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। 'কুমুদিনী হাসপাতালে' একজন ডাক্তার বলছিলেন—'সেনাবাহিনী সম্বন্ধে ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের ধারণা পাল্টে দিয়েছে। আমরা জানতাম সৈন্য মানেই যণ্ড আর পাশবিকতা। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের পাশাপাশি হে'টেছে আমাদের মেয়েরা, তাদের আদর যত্ন করে আপন করে নিয়েছে। কোন অসম্মানের মুখে পড়তে হয় নি।' 'লালবাগ' দুর্গের যাদুঘরের পরিচালক বলছিলেন পাকবিমান আর ভারতীয় বিমানের যুদ্ধ দেখবার জন্যে সবাই ঘরের বাইরে এসে জড়ো হতেন। পাক-হানাদার বিমান কোণঠাসা হচ্ছে দেখে বাচ্চারাও হাততালি দিয়ে নাচতো। বাংলার পথেঘাটে সর্বত্র ভারতীয়ের সমাদর। ভারতীয় সৈনিকেরা এবার লড়েছে আদর্শের জন্যে, অত্যাচারের হাত থেকে একটা নিপীড়িত জাতিকে উদ্ধারের জন্যে। তাই তাদের মনে জেগেছে মানবতার চেতনা। ভারতের সীমান্তচৌকি কাচুয়াপাড়ার জওয়ান গারো নায়েক ফ্র্যাঙ্কলীনের কথায় ছিল তারই আভাষ। দলের একজন প্রশ্ন করেছিলেন—'খান সেনা দেখেছো?' 'দেখেছি কি, দশ-বারো জন মেরেছি। খুব মস্ত চেহারা—দস্যুর মত। ওদের প্যান্ট আমার মাথার ওপরে ওঠে। খুব সাহসী আর শক্তিশালী।' ভাঙগা ভাঙগা অসমীয়ায় জবাব দিয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্কলীন। 'তাহলে ওরা হারল কেন?' জবাব—'ওদের শরীরটা বড়, কিন্তু মগজ নেই, তাছাড়া ওরা খারাপ কাজ করেছিল, পাপ করেছিল, তাই খতম হয়ে গেল। আমরা লড়েছি ন্যায়ের জন্য, আদর্শের জন্য। তাই বুলেট সাঁ সাঁ করে আমাদের দু'পাশ দিয়ে ছুটে গেছে তবু আমাদের গায়ে লাগে নি।'

'জহুরুল হক হল' ছাত্রাবাসে তখনও ছাত্ররা ফিরে আসে নি। কিন্তু দোতলার ওপর ছাত্রলীগের 'এ্যাকশন রুমে' নিয়মিত ছাত্রনেতারা কাজ করতেন। এখানেই আলাপ হল ছাত্রীলীগের সভানেত্রী শ্রীমতী মমতাজ বেগমের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন—এ'দের প্রত্যেকের বলিষ্ঠ চেহারা, মধুর ব্যবহার, দেশের প্রতি [illegible] ভালবাসায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। আওয়ামী লীগের এই নেতার মুখে শুনেছি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের সংগ্রাম ঘোষণাকে আওয়ামী লীগের অনেকেই সুবিবেচনা বলে মনে করতে পারেন নি, কিন্তু শেখসাহেব নাকি ছাত্রদের কথা মনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ছাত্রসমাজ বাংলাদেশের মেরুদণ্ড। গত পঁচিশে মার্চের পর মুক্তিফৌজে সামিল হয়ে এরা যুদ্ধই করে নি, যুদ্ধের পর যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ গড়ে ওঠে সে জন্যেও এরা সচেষ্ট। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি ওদের প্রাণ। ছাত্রদের আন্দোলনের ফলেই 'বাংলা' পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পেরেছে। বাংলার ছাত্রী সুরাইয়া খাতুনের পড়ার টেবিলের ওপর হিন্দু কবি শ্রীমধুসূদনের ছবি টাঙ্গানো। অমুসলমান বলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্য থেকে বাদ দেবার হীন চক্রান্ত ছাত্রদের বিরোধিতার ফলেই ব্যর্থ হয়েছে। খ্যাতনামা সুরকার আলতাফ হোসেনের শ্যালক দেখিয়েছিল তার পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ। একুশে ফেব্রু-

য়ারীতে প্রকাশিত ছাত্রদের পত্রপত্রিকা ছাড়াও ওর সংগ্রহশালায় রয়েছে বাংলা সাহিত্যের স্মারক নামকরা লেখকের রচনা। রামায়ণ, মহাভারতও বাদ যায় নি। রাজাকর আল-বদরের ভয়ে যুদ্ধের সময় নিজেদের বাড়ি ছেড়ে আসতে হয়েছে, কিন্তু বইগুলো ফেলে আসতে পারে নি। ধরা পড়লে প্রাণের আশঙ্কা আছে জেনেও অমূল্য সম্পদ এই বইগুলো নষ্ট করতে পারে নি।

টাঙ্গাইলে যেমন 'কাদের বাহিনী' ঢাকায় তেমনি 'মুজিব বাহিনী'। ঢাকা নগরী এবং আশেপাশের অঞ্চলে এই বাহিনীর গেরিলা আক্রমণের মুখে খান-সেনারা চোখে সর্ষে ফুল দেখেছে। গ্রামের সাধারণ লোকেরাও এসে যোগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে। সুযোগ পেলেই যে যেভাবে পারে—দু-চারজন খান সেনা বা রাজাকরের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছে। ফলওয়ালা ফলের মধ্যে বিষ মিশিয়ে রেখেছে। পাকসৈন্য দেখে ঝুড়ি ফেলে দিয়েছে দৌড়—ভাবখানা যেন সৈন্য দেখে ভয় পেয়েছে। পাকবাহিনী বিনে পয়সার ভোজ পেয়ে আহ্লাদে আট-খানা। কিন্তু ব্যারাকে ফিরে যাবার পথে ঢলে পড়তে হয়েছে তাদের। এ নিয়ে মজার গল্পও রটেছে। মহাদেবের প্রিয় ফল নিরীহ বেল নাকি খান সেনাদের খুবই ভাবিয়েছে। ওরা কিছুতেই প্রথম প্রথম ধরতে পারে নি —এটা কোন ধরনের 'টাইম বোমা'। মুক্তিকে (মুক্তিফৌজ) পাকবাহিনী অলৌকিক শক্তিধর বলে ঠাউরেছিল। ওরা যেন হাওয়া থেকে আসে, হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আসলে মুক্তিফৌজ মিশে থাকত জনগণের সঙ্গে। প্রতিটি বাড়িই ছিল ওদের ব্যারাক। ছাত্রীলীগ সভানেত্রী—মমতাজ বেগম কয়েক মাস ভারতে কাটিয়েছিলেন। আমাদের দেশের ছাত্র সংগঠন সম্বন্ধে কি ভাবেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন—'আমার মনে হয়, আপনাদের দেশের ছাত্রদের সঙ্গে গ্রামের লোকেদের যোগাযোগ কম। আমাদের অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে দেখবেন—ছাত্র লীগের কথা সবাই জানে। আসলে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলেই গেরিলা যুদ্ধে আমাদের ছাত্ররা সাফল্য লাভ করেছে।'

উনিশ জানুয়ারী সকালে ধানমন্ডীর ভাড়াটে বাড়িতে বঙ্গমাতা বেগম মুজিবের সাক্ষাত লাভের আশায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটু অপেক্ষা করতেই একজন জাতীয় পরিষদের সদস্যার সঙ্গে এলেন বেগম মুজিব। আভিজাত্যের গরিমা নেই, মমতাময়ী জননীর মূর্তি। এম-এল-এ মহিলাও জানালেন উনি সকলের মায়ের মত। যখন তখন, যে খুশি এসে এখানে থাকে খায় ঠিক নিজের বাড়ির মতো। এই বিরাট সংসারের লোকের গোনা-গুনীত নেই। এই বিশাল পরিবারের হাল ধরে আছেন বেগম মুজিব। বাইরে গিয়ে 'সোস্যাল ওয়ার্ক' করবেন কখন? কথা-বার্তার মধ্যেই বঙ্গমাতার কানে গেল বাইরে একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। উনি ব্যস্ত হয়ে জেনে নিলেন তাকে শুশ্রূষা করা হয়েছে কিনা, গরম দুধ খানিকটা খাইয়ে দেওয়া দরকার ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর ছোট-ছেলে খেয়ালী রাসেল আর বড় মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হল। বিদেশী একটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে তার পরিবারের সঙ্গে এতক্ষণ কথাবার্তা বলেছি বলে মনেই হয় নি, যেন কোন নিকটআত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছি।

সুরকার আলতাফের শাশুড়ী এরপর আমাদের নিয়ে গেলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামালের বাড়ি। কবি গিয়েছিলেন হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে। কবির স্বামী কামালউদ্দীন আমাদের বসতে বললেন। স্ত্রীর কবিখ্যাতির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলেও উনি নিজেও একজন লেখক। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও 'দর্শন' ভালবাসেন। ইসলামিক ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় দর্শনশাস্ত্রের বেশ কয়েকখানি বই বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন। একটু পরেই কবি এসে পড়লেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু যুবতীর মত কর্মঠ। নানা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে জড়িত আছেন বলে বাইরেও কাজ কম নয়, তবু এই বয়সেও রান্নার ভার নিজের হাতে রেখে-ছেন। কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করলাম। বললেন—'এই নয় দশ মাসে হাতে কলম ওঠে নি। এখন মাথায় কোন কিছুই আসে না। কচি কচি ছেলেগুলোর উজ্জ্বল সম্ভাবনা, হাসিখুশি মেয়েগুলোর মুখের হাসি—এমন অকালে শেষ হয়ে গেল। প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবী—যাঁরা ছেলেদের নেতৃত্ব দিতে পারতেন তাঁদেরই কেন ওরা বেছে বেছে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় খুন করল?' অতি বেদনায় কবিদম্পতি বিমূঢ়, হতবাক! এক জালিওয়ানাবাগের নিষ্ঠুরতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গভীর বেদনায় অভিভূত হয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে, ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অত্যাচারী সরকারের দেওয়া খেতাব। পূর্ব বাংলায় হাজার হাজার জালিওয়ানাবাগ দেখে কবি-কণ্ঠ হয়ত এমনিই স্তব্ধ নির্বাক হয়ে যেত।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সাঁঝের মায়া' প্রথম কবি সুফিয়া কামালকে খ্যাতি এনে দেয়। তারপর ক্রমশঃ তাঁর লেখার সমাদর ছড়িয়ে পড়ে। সমালোচকদের মতে 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থখানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—জানালেন কবি। নিরাশ হব ভেবে অগো-ছালো মনেই কষ্ট করে কবি দু-ছত্র লিখেও দিলেন আমার নোটবইয়ে। কবি লিখলেন—

'দারুন দুঃখের দিনে,
ব্যথার পাথার পার হয়ে এলে
বন্ধুরা পথ চিনে'

স্বাক্ষর—সুফিয়া কামাল। ১৯-১-৭২
কবির স্বামী কামালউদ্দীন লিখলেন—'সকলকে ভালবেসে যেতে চাই'। পরিশ্রান্ত কবিকে আর বিরক্ত না করে বিদায় নিলাম।

পথে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর নিজের বাড়ি—যেখান থেকে ইয়াহিয়ার চরেরা তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। যে চেয়ারটিতে তিনি তখন বসেছিলেন—বারান্দায় সেই বেতের চেয়ারটি তেমনি রাখা ছিল। খানসেনারা বাড়িটির খুবই ক্ষতি করেছিল—আমরা দেখার সময় মেরামতির কাজ চলেছে পুরো-দমে।

'জহুরুল' হলেই আলাপ নরসিন্দি কলেজের দুই অধ্যাপক জনাব আলম আর ফজলুর রহমানের সঙ্গে। আলাপ হতেই একেবারে আপন। কে বলবে আমাদের পরি-চয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার, যেন কতকালের চেনা। তাঁদের সঙ্গেই বেরোনো হল ঢাকা শহর দেখতে। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়। সুপ্রাচীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনেছি অনেক। বেশ বড় এলাকা জুড়ে—ভাগ ভাগ করা সমস্ত বিভাগ, ছাত্রাবাস, অধ্যাপকদের আবাস ইত্যাদি। পাকবাহিনী নিজেদের কুকীর্তি ঢাকবার জন্য ধ্বংসের কাজ যথা-সম্ভব মেরামত করেছে রাতারাতি। তবে খানসেনারা আশ্রয় নিয়েছিল বলে ভারতীয় বাহিনী পরে রকেট আক্রমণ চালিয়ে কিছু কিছু ভেঙেগেছে। সেই সব তখনও সারাই হয়নি। জগন্নাথ হলে তখনও মিত্র-বাহিনীর ছাউনি রয়েছে। এই জগন্নাথ হলেই সর্বপ্রথম বুদ্ধিজীবীদের হত্যালীলা শুরু হয়। তারপর একে একে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রীআবাস রোকেয়া হলেও পাক সরকারের বীরপুঙ্গবেরা পরাক্রম দেখিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালী বুদ্ধি-জীবী আর তাদের হাতে গড়া ছাত্র তরুণ-দের ওপর পাক সরকারের বরাবরের জাত-ক্রোধ। ওরাই যত নষ্টের গোড়া। বাঙ্গালীকে দাবিয়ে রেখে শোষণ করার হীন চক্রান্ত ওরা সবার আগে ধরে ফেলে। অগণিত জন-গণকে শোষণ করার জন্য উনিশ শতক থেকেই তথাকথিত ইসলামের ধ্বজাধারী সুযোগ সন্ধানীরা এক জাতি তত্ত্ব আবিষ্কার করে। তারা প্রচার করতে লাগল যে সং বংশজাত মুসলমান মাত্রেরই পূর্বপুরুষ ইরান, আরব, তুর্কী থেকে আগত। ফলে সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানেরা সমাজে পদ-মর্যাদা লাভ করার জন্য নিজেদের বংশ-পরিচয় গোপন করে মিথ্যা বংশতালিকা রচনা করত। 'এভাবেই মুসলমানেরা আত্মিক দিক থেকে স্বদেশে থাকলেন পরবাসী হয়ে।' ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকেই কিন্তু বাঙ্গালীর মোহ ভঙ্গ হতে থাকে। ১৯৪৮ সালে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে ঘোষিত হল প্রথম জেহাদ। আজ যিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেদিন তিনিই ছাত্রনেতা শেখ মুজিব। পাকিস্তানের তৎকালীন সর্বময় কর্তা জিন্নার মুখের ওপর জোরালো প্রতিবাদ করলেন তিনি। সেই থেকে 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম রূপান্তরিত হতে শুরু করলো এবং সমস্ত

বাঙালী মুসলমান মুসলমান বাঙালীতে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো সমস্ত সংস্কার বর্জন করে উর্দুকে নিজের ভাষা হিসেবে বাতিল করে বাংলাকে স্বীকার করলো মাতৃভাষা রূপে।" (সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা —বদরউদ্দীন উমর)

কিন্তু স্বার্থান্বেষী চক্র সহজে হাল ছাড়ে না। ধর্মের জিগীর তুলে কাজ হাসিল হল না দেখে এবার তারা বিদেশী বর্জনের ধুয়ো ধরল। বিদেশী বর্জনের দোহাই দিয়ে পূর্ববাংলার বাঙালীকে তাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইল। ভাষা এবং সংস্কৃতিই জাতীয় একতার প্রধান ভিত্তি। সেই ভিৎ ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু হল। ওপার বাংলার লেখক বদরউদ্দীন উমর ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দেবার জন্য লিখেছেন—ধর্মশাস্ত্রে যাই থাক স্কটল্যান্ডীয় সোমরস, মার্কিনী সিনেমা এবং মার্কিন ম্যাগাজিনের ইন্দ্রিয়হর্ষক চিত্র তাদের এতই মজ্জাগত যে সেগুলিকে বিদেশী বা ধর্মবিরোধী বলে তাঁদের মনে হয় না।... ... আমাদের সংস্কৃতি তাহলে বিপন্ন হয় কিসে? এর উত্তরে তাঁরা বলবেন জ্যাজ ও চা-চা-চা'র বদলে কীর্তন, অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের গানে; শার্ট প্যান্টের পরিবর্তে ধুতি-চাদরে; লিপস্টিকের বদলে কপালের টিপে; লাইফের নগ্ন চিত্রের পরিবর্তে অবনী ঠাকুর যামিনী রায়ের ছবিতে; এবং ক্ল্যাসিক্যাল প্রকাশনীর 'সাহিত্য সম্পদের' পরিবর্তে ঊনিশ শতকের বাংলা দেশের সাহিত্যে।

উপরে অঙ্কিত বিপদের চিত্র থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে বিদেশী প্রভাব বলতে এইসব মুরুব্বীরা আসলে যে প্রভাবের কথা বলতে চান সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের আগে পর্যন্ত সমগ্র বাঙালী সমাজের সংস্কৃতি এবং তার প্রায় দেড়শো বছরের সাহিত্যসাধনার প্রভাব।' তাহলে দেখা যাচ্ছে আসলে তাদের মতে বিদেশীর অর্থ হিন্দু। কিন্তু সংস্কৃতি হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—তা সমগ্র বাঙালীর। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং মীর মোশারফ হোসেন—দুজনই অপরিহার্য। সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করার দুরভিসন্ধিই সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই একদিকে যেমন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথকে ওপার বাংলা থেকে নির্বাসন দেবার প্রয়াস তেমনি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী গণ-সাহিত্যের প্রতিনিধি নজরুল ইসলামকে মুসলমান কবি বলে প্রচারের অপচেষ্টা। কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত খানখান করে দিল বাংলার ছাত্রজনতা। আটচল্লিশের ভাষা-আন্দোলনের সীমিত ধারা বাহান্নতে পরিণত হল পারাপারহীন উত্তাল সমুদ্রে। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে দশজন দশজন করে ছাত্রজনতার মিছিল এগিয়ে চলেছে আইন অমান্য করে তৎকালীন 'এসেম্বলী হাউসের' দিকে। বুলেট দিয়ে হত্যা করতে চাইল ঘাতকেরা ঐ মিছিলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। রক্ত ঝরল। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের তরুণ তাজা রক্তে পবিত্র হল সেখানকার মাটি। রাতারাতি গড়ে উঠলো শহীদ মিনার। মাথা নোয়ালো শাসককুল, বাংলা পেলো রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। ঢাকার শহীদ মিনারের চত্বরে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলেছিলেন অধ্যাপক আলম আর রহমান। বাহান্ন সাল থেকে এই শহীদ মিনার হয়ে উঠলো অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর কেন্দ্র, ছাত্রদের সভাসমিতির স্থান, ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসন তা সইতে পারে নি। তাই মিনারটি ধ্বংস করে গায়ের ঝাল মিটিয়েছে।

রমনার মাঠ সামনে। রমনার নাম প্রথম শুনেছিলাম সুনন্দ ওরফে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। ঢাকার 'বাঙাল' শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক নারায়ণ গাঙ্গুলি এপার বাংলায় এসেও ভুলতে পারেন নি পদ্মার 'ইলশা', মেঘনার মাতন, রমনার কালীবাড়ী এমনি আরও কত কি। আজ ওপার বাংলায় যাবার কোন বাধা নেই, ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি কোলাকুলি, কিন্তু এমন আনন্দের দিনে সুনন্দের লেখনী নীরব। পরম সুখের দিনটিতে তিনি আমাদের মাঝে নেই। রমনার মাঠে বহু দিনের ঐতিহ্যবাহী কালীবাড়ীটি ধূলিসাৎ করেছে বীর খানসেনারা। এই সেই ঐতিহাসিক রমনার ঘোড়দৌড়ের মাঠ। কান পাতলে এখনও যেন শোনা যায় ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর বজ্রহুংকার—'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই রমনার মাঠেই হানাদার অত্যাচারীর নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের সাক্ষী। এই রমনা ময়দানেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে মৃত্যুঞ্জয়ী অভিনন্দন জানিয়েছে। পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত বাংলার স্বাধীনতাসূর্য নতুন প্রভাতে উদয় হল এই রমনার প্রান্তরে। মহাকালের সাক্ষী ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দান।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বহুকালের পুরোনো বট। শাখায় শাখায় তার বাসা বেঁধেছিল কত নাম-না-জানা পাখি আর ছায়ায় এসে বসতো কত না শ্রান্ত পথিক। ছাত্রদের সমাবেশ, মিটিং হত এই বটতলায়। তাই পাক সেনার আক্রোশ থেকে রেহাই পেলো না এই বুড়ো বট—সমূলে লুটিয়ে পড়তে হল ধূলিশয্যায়।

বিকেলে প্রেসিডেন্ট ভবনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার না হওয়ায় ঠিক হল পরের দিন সকালে তাঁর বাসভবনে যাওয়া হবে। এরপর বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র। ১৬ই ডিসেম্বর এই ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ওপর থেকে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে গিয়ে শহীদ হয়েছে ষোল বছরের তরুণ মুক্তিযোদ্ধা—সেই পতাকা সগৌরবে উড়ছে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ওপর।

'বাংলাদেশ বেতারের' অন্যতম প্রধান কামাল লোহানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের দলনেতা সাংবাদিক শিশির দাস। কামাল লোহানীও ছিলেন 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান শুনেছেন গত একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ পুরুষ কণ্ঠের এই জলদগম্ভীর ঘোষণা শুনে বিস্মিত হয়েছিল বিশ্ববাসী, কেঁপে উঠেছিল বাংলার জিন্দানখানার ঘাতকদের বুক। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সংগ্রামের আহ্বান চট্টগ্রামেও পৌঁছেছিল। তারপর পঁচিশে মার্চে রাত্রির অন্ধকারে নৃশংস জবাইয়ের খবরে ক্রোধে ফেটে পড়ল বিপ্লবী সূর্য সেনের চট্টগ্রাম। মুক্তিকামী জনতা প্রাণপণে অবরোধ সৃষ্টি করে ঠেকিয়ে রাখল হানাদার বাহিনীকে। যুদ্ধ জাহাজ থেকে মাল খালাস করতে দিল না প্রচণ্ড প্রতিরোধে। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কর্মীরাও চুপ করে বসে নেই। টিক্কা খানের ঘৃণ্য প্রস্তাব উপেক্ষা করে তারা সবাই বেতার কেন্দ্র ছেড়ে যে যার বাড়ি চলে গেছেন। কিন্তু চুপচাপ বাড়ি বসে থাকলে তো চলবে না। আধুনিক প্রচারযন্ত্র বেতারকে মুক্তিযুদ্ধের কাজে লাগাতে হবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের কুকীর্তির কাহিনী। গোপনে গোপনে যোগাযোগ করলেন কয়েকজন। বেতার ঘোষিকা কাজী হোসনে আরা কাকা ডঃ সৈয়দ আনোয়ার আলীর কাছে ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার একটি প্রতিলিপি। ডঃ মঞ্জুলা চটপট সেই ইংরেজী ঘোষণাপত্রের বাংলা তর্জমা করে ফেললেন। স্ক্রীপ্ট তৈরীর সময় নেই। কেননা আকাশবাণীর খবরের আগেই প্রচার করা না গেলে কেউ শুনবে না। সুতরাং সিগন্যাল টিউন ছাড়াই বেতার কেন্দ্র চালু করে দেওয়া। এই ভাবেই চট্টগ্রামের 'কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং' কেন্দ্রে জন্ম নিয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'।

ছাব্বিশে মার্চ সারাদিন অভুক্ত থেকে বেতারকর্মীরা রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি এসে পৌঁছলেন। সারাদিনের উত্তেজনায়, ক্ষুধায় শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত। কিন্তু তখন তাঁদের জন্য আর এক চমক অপেক্ষা করেছিল। রাত প্রায় দশটা হবে। আবার শোনা গেল—'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে বলছি জনাব মাহমুদ হোসেন। বিশ্বের মুক্তিকামী রাষ্ট্র ও জনগণকে আহ্বান জানান হল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সহায়তা করার জন্য।

আগের বেতার ঘোষণায় বিশ্ববাসীর প্রতি সাহায্যের আবেদন না থাকায় জনাব হোসেন কণ্ঠশিল্পী রঙ্গলাল দেব চৌধুরীর সহায়তায় টেকনিসিয়ানদের খুঁজে বার করে আবার বেতার কেন্দ্র চালু করে বিশ্বের দরবারে আবেদন জানালেন। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, সমস্ত পৃথিবীই প্রায় এগিয়ে এসেছে বাংলাকে সাহায্য

করতে। কিন্তু জনাব মাহম্মদ হোসেন তা চোখে দেখে যেতে পারলেন না।

কামান লোহানীও জড়িত ছিলেন 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের' সঙ্গে। ঐ সময় 'চরমপত্র' শুধু ভারতীয় বাঙ্গালীই নয়, অনেক অবাঙ্গালীকেই প্রভূত আনন্দ দিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছে প্রেরণা। স্যানাপতি ই-য়া-হি-য়া—শ্লেষ ব্যঙ্গে ভরা চরমপত্রের সেই কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আকাশবাণীর অনেক অনুষ্ঠান বাদ দিতে হয়েছিল। ঘোষক বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের উচ্চপদে বহাল হয়েছেন। কামান লোহানীর বুদ্ধি-দীপ্ত চেহারা, মার্জিত রুচিবোধ এবং সুমধুর ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ। পরদিন 'বাংলাদেশ বেতারে' সফর সমিতির সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হওয়ার পর বেতার-কেন্দ্র ঘুরে দেখে বেরিয়ে এলাম।

ঢাকার 'হোটেল কণ্টিনেণ্টাল'। আন্ত-র্জাতিক হোটেল। এ হেন খানদান হোটেলে পা দিতে সাহস হবার কথা নয়। কিন্তু এখন ব্যাপার আলাদা। বাংলাদেশের সর্বত্রই ভারতীয়দের অবারিত দ্বার। যুদ্ধের সময় এই হোটেলটি ছিল নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে আন্তর্জাতিক রেডক্রশের অধীনে। এখানেই প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়ে-ছিলেন পূর্ববাংলার গভর্নর মালেক। রিসেপশন কর্মী জানালেন—দালাল গভর্নর আর মন্ত্রীদের হোটেল-কর্মীরা কেউ সম্মান
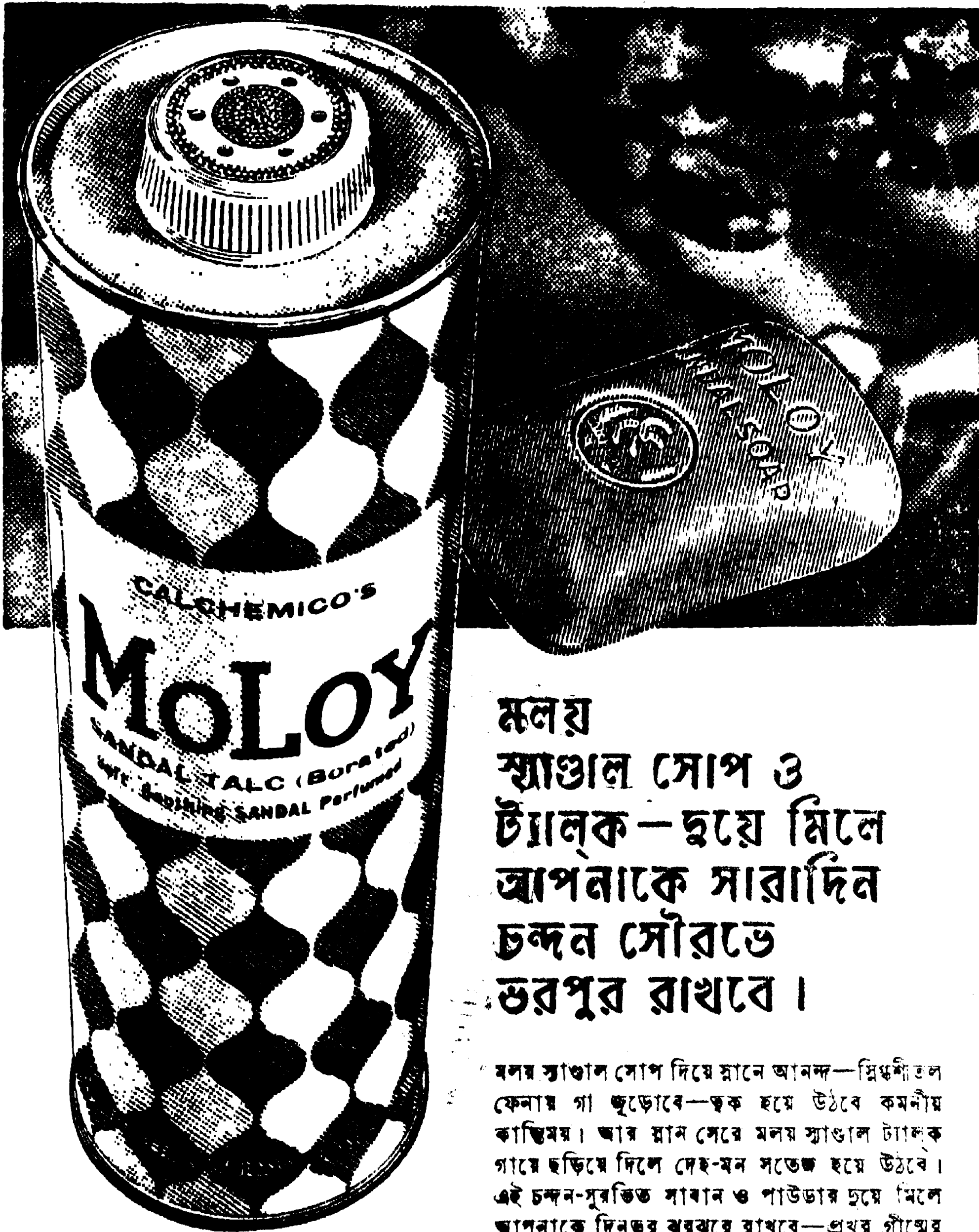
দেখায় নি তাদের মোট নিজেদেরই বইতে হয়েছে। এগারোতলা হোটেলটি ঘুরে ফিরে দেখলাম। বিলাসিতা এবং আরামের সবরকম আয়োজন রয়েছে।

পরদিন ভোরে, ২০শে জানুয়ারী, বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডীর অস্থায়ী বাসভবনে গিয়ে হাজির হল বেসরকারী ভারতীয় 'শুভেচ্ছা সফর সমিতি'। বসার ঘরে বেশ কিছুক্ষণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা। আমরা ছাড়াও দেশী বিদেশী নানা সাক্ষাৎপ্রার্থীর ভিড়। প্রায় নটার কাছাকাছি বঙ্গবন্ধু প্রবেশ করলেন ঘরে। আমাদের দলনেতা বাঁধান অভিনন্দন পত্রটি কোনক্রমে হাতে দিতে না দিতেই এক ঘর মানুষ বাঁধভাঙা বন্যার মত আছড়ে পড়ল। সকলেই চায় শেখ মুজিবের সবচেয়ে কাছে যেতে। ফলে ঠেলাঠেলি, বিশৃঙ্খলা। প্রধানমন্ত্রী আবেদন করলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার। কিন্তু কে কার কথা শোনে। এতক্ষণের প্রতীক্ষার পর একালের রূপকথার নায়ককে কাছে পেয়ে জনতা আবেগে উদ্বেল। ভিড়ের মাঝে জেগে আছে একখানা মুখ। বহুকালের চেনা মুখ, অন্ধকার কারাগারে থেকেও যে মুখের দীপ্তি মলিন হয়নি, ফাঁসির হুকুমেও যা বিন্দুমাত্র বিকৃত হয়নি। কবিগুরুর ভাষায় 'কী যেন পরমা শক্তি আছে ঐ মুখে!' আগের দিন গেটের কাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়া রমণীর কথা মনে হল। সর্বহারা লাঞ্ছিতা জননী এসেছিল একবার তার বাবার (শেখ মুজিব) কাছে নালিশ জানাতে। জানিনা রমণী তার বাবার কাছে আসতে পেরেছিল কিনা। কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ালে যে তার নিঃস্ব হৃদয় জুড়িয়ে যেত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক সুদীর্ঘ চেহারা। চশমার তলায় আয়ত চোখে প্রেমিক অন্তরের ছায়া, মুখের হাসিতে পরকে আপন করার যাদুমন্ত্র। বঙ্গভূমিকে তিনি ভালবাসেন, ভালবাসেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে আর বিশ্বের সমস্ত মেহনতি জনতাকে। এই ভালবাসায় কোন খাদ নেই। দেশবাসীর দুঃখ দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। দুঃখ ঘোচাতে না পারলে সমব্যথী হয়ে তাদের দুঃখের বোঝা হালকা করেন। যুদ্ধের আগে সত্তর সালের নভেম্বরে সর্বনাশা ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে নেমে এল মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেয়ালে অসহায় মানুষ দলে দলে মরছে। ভাসানী ও মুজিব গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের পাশে। দিনের পর দিন শুধু চিড়া খেয়ে জনতার দুর্দশার খোঁজ খবর নিয়ে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন তাদের দুর্ভোগের কথা। কলহন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—'একদিন ভোলার একটি ছোট্ট দ্বীপে গেলেন তিনি। লোকজনের দেখা নেই। শুধুই বাতাসের করুণ শনশনানি। এমন সময় শেখ সাহেব দেখলেন একটি নৌকোর বহুছিন্ন ব্যানার হাতে দশ বারোটি কঙ্কালসার ন্যাংটিপরা মানুষ এগিয়ে আসছে। শেখ সাহেব আর চোখের জল রাখতে পারলেন না। এই মানুষগুলো তাঁকে এত ভালও বাসে! নিজেদের চরম দুর্দিনেও নৌকোকে তারা ভোলেনি।... শেখ সাহেবকে কাঁদতে দেখে কঙ্কালসার মানুষগুলোর চোখেও নামল নোনা জলের ঢল' (যুগান্তর সাময়িকী—মুজিব সংখ্যা, ৬ই ফেব্রুয়ারী)

অন্ধকারার অন্তরালে থেকে নমাস পর ফিরে এলেন মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব আপন জনের মাঝে। তাঁর বড় সাধের সোনার বাংলার বিধ্বস্ত রূপ দেখে দু চোখে ধারা নামল। মা বোনের ওপর বর্বর পশুগুলোর অত্যাচারের কথা জেনে ছোট শিশুর মত কেঁদে আকুল। রমনা ময়দানে বক্তৃতামঞ্চে উঠে বক্তৃতা দেওয়া হল না—গলা বুজে আসে। এইজন্যই তিনি বাঙালীর নয়নের মণি, তাদের বড় প্রিয় 'মুজিবভাই'। 'ভাইরা আমার' বলে ডাক দিলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী হাসতে হাসতে মরতে পারে।

শেখ মুজিব খাঁটি বাঙালী। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষের উত্তর-সাধক। তাঁদের মতই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুদ্রতেজে জ্বলে ওঠেন, মানুষের দুঃখে গলে যান। বঙ্গবন্ধু বলেছেন বাংলার পলিমাটি খুবই নরম আবার চৈত্রের খর রৌদ্রে সেই নরম মাটিই হয় পাথরের মত শক্ত। কোমলতা ও কঠোরতা—বঙ্গপ্রকৃতির এই দুই ধাতুতে গড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা মুজিবরের 'যৌবনের স্বপ্ন, বার্ধক্যের বারাণসী'। বাংলার সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্য তাঁর আত্মার সঙ্গে মিশে আছে। কবি-গুরুর কবিতা তাঁর সংগ্রামের প্রেরণা, নজরুল বিপ্লবের মন্ত্র। লুঠেরারা শেখ সাহেবের বাড়ি লুঠ করে রবীন্দ্রচনাবলী নিয়ে গিয়েছিল। ঢাকার এক অধ্যাপিকা সদরঘাটের ফুটপাথে পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে মুজিবরের স্বাক্ষরিত বেশ কয়েক খণ্ড রচনাবলী উদ্ধার করে তাঁকে ফেরত দিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে বুলেট-বিদ্ধ কবিগুরুর ছবিখানি বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে পাক বর্বরতার নজির হিসেবে।

ছাত্রদের মধ্যে মুজিবভাইয়ের অন্য চেহারা। তিনিও যেন একজন চঞ্চল তরুণ ছাত্র। আদর করে হয়ত কান মলে দিলেন একজনের। [illegible] থেকে হয়ত সিরাজের চুল একটু টেনে দিয়েই কথা জুড়ে দিলেন মাখনের সঙ্গে। কথা [illegible] হয়ত সালামের সঙ্গে। জিভ ভেংচে দিলেন সাজাহানকে। [illegible] জনকের বিরাট ব্যক্তিত্ব তখন ছেলেদের তারুণ্যে কোথায় তলিয়ে যায়। তখন তিনি গোপালগঞ্জ সীতানাথ এ্যাকাডেমির সেই দলের পান্ডা খেলোয়াড় ছাত্র মুজিব, যে চীপ চীপ হুররে বলে শীল্ড কাঁধে বয়ে আনত, নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউয়ের দোলায় সাঁতারের নানা কসরৎ দেখাত।

সেই আশ্চর্য মানুষটিকে ঘিরে রেখেছে সবাই। একটু সান্নিধ্য, একটি স্বাক্ষর, একবার প্রণামের জন্য সবাই আগ্রহী। বাংলাদেশের সর্বময় কর্তা প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান কেতাদুরস্ত আদব কায়দার ধার ধারেন না। বিনাদ্বিধায় যে কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে। কলকাতায় রাজভবনে বঙ্গবন্ধু বলেছেন প্রোটোকলের কচকচি তাঁর ভাল লাগে না। এইজন্যেই জনতা তাঁকে অন্তর থেকে নেতা বলে মেনে নিয়েছে।

এতক্ষণ ভিড়ের পেছনে পড়ে বিভোর হয়ে দেখছিলাম। বঙ্গবন্ধু ঘর ছেড়ে যেতে খেয়াল হল আমার নোটবইয়ে একটি স্বাক্ষর অবধি নেওয়া হয় নি, চীফ সিকিউরিটির দয়ায় শেষ অবধি কাছে গিয়ে একটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলাম।

ফিরে আসার পথে আলাপ হল এম. এ ওয়াজ্জাবের সঙ্গে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিলর। ভারতে ন'মাস কাটিয়েছেন। রাশিয়া গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় লিখেছেন 'দেখে এলাম রাশিয়া' প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ছেলেকে পাঞ্জাবীরা হত্যা করেছে।

গুলিস্তানে টেলিভিশন কেন্দ্র দেখালেন অনুষ্ঠান সম্পাদক আলিমুজ্জামান। এরপর শায়েস্তা খাঁর আমলের লাল বাগ দুর্গ। দুর্গের মধ্যে একটি যাদুঘর আছে। মোগল যুগের স্মৃতি ধরে রেখেছে। পরিচালক বর্ণজিৎকুমার শর্মা বললেন, কেল্লার ইতিহাস আর ভারতীয় ন্যাটের সঙ্গে পাক জঙ্গী বিমানের লড়াইয়ের খবর। ঢাকার নবাববাড়ির অবস্থাও জরাজীর্ণ দুর্গের মতই। কোনরকমে দাঁড়িয়ে লাল দালানটি দিনবদলের সাক্ষী [illegible] আছে। দেখলাম 'বুলবুল এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' বা সংক্ষেপে বাফা। ক্লাস বন্ধ ছিল। শুধু স্থপতি [illegible] শিক্ষক এম. এ. লতিফ একমনে গড়ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্লাস্টারের প্রতিকৃতি। বাফায় নাচ, গান, ছবি আঁকা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য সবই শেখানো হয়। সকাল থেকে রাত অবধি ক্লাস চলে। প্রধানত চাকুরীজীবীরাই এখানকার ছাত্র।

পথে মরণচাঁদের দোকানে মূল্যের বিনিময়ে মিষ্টিমুখ করা গেল। যুদ্ধের সময় খান সেনারা নাকি তার দোকানে গোস্ত বেচেছে। প্রাণের মায়ায় গ্রামে পালানর সময় ভদ্রলোক অর্ধাঙ্গিনীকে ফেলে গিয়েছিলেন। গায়ে গতরে দশাসই মহিলা ছিপছিপে পতিদেবতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে পারেন নি। পরে অবশ্য পুনর্মিলন হয়েছে।

ঢাকার 'বায়তুল মোকাররম' নাকি এশিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদ। সাততলা মসজিদের সবটাই নমাজ পড়বার জন্যে

তৈরী। উজু অর্থাৎ হাত পা ধোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ভেতরে। বিরাট হলঘরে। অগুনতি জলের কল এবং প্রত্যেকটি কলের সঙ্গে বসবার সিমেন্ট বাঁধানো আসন। 'বায়তুল মোকাররমে'র নিচে দোকানের সারি—পথের ওধারে স্টেডিয়াম এবং তার মার্কেট। ঢাকার স্মৃতি হিসেবে কিছু কেনাকাটা করতে চাইলাম। সব জিনিসের বেজায় দাম। দোকানীরা জানাল ভারতীয় সৈনিক আর অসাধু ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ঢাকার বাজারের এই হাল। সেদিন ওদের বলতে পারিনি। 'কাচুয়াপাড়া' সীমান্তে আমাদের বাস থেকেই একজনকে নামিয়ে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাটারীর বাজার-দর ভাল বলে পাঁচ পেটি ব্যাটারি লুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন।

বিকেলে 'বেঙ্গল এ্যাকাডেমিতে' সভা ছিল আসাদ দিবস উপলক্ষে। এ্যাকাডেমির বটগাছতলায় সভা। সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি তরুণ হায়দার আনোয়ার খান জুনো। বক্তৃতা করলেন শ্রমিক নেতা সিরাজুল হোসেন। দেশের গণশক্তিকে সজাগ করে দিয়ে তিনি বললেন—'পশ্চিম পাকিস্তানী ইস্পাহানীর বদলে কোন বাঙালী ইস্পাহানী যেন বাংলাদেশকে শোষণ করতে না পারে। কোন টাটা বিড়লা এসে যদি আমাদের শোষণ করতে চায়—আমাদের দেশবাসী তা বরদাস্ত করবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ তার সুললিত ভাষণে আসাদ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে বললেন। সভাপতির ভাষণে আনোয়ার জুনো ঘোষণা করলেন—'আমাদের রক্তদান আমরা বৃথা যেতে দেব না।' ভাষণের পর গণসঙ্গীত পরিবেশিত হল।

একুশে ফেব্রুয়ারীর মত বিশে জানুয়ারীও বাংলাদেশের স্মরণীয় দিন। বাহান্ন সালের ছয় বছর পর উনষাঠ সালের জানুয়ারীর বিশ তারিখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে আয়ুবশাহীর যূপকাষ্ঠে আত্মবলী দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র আসাদুজ্জামান। গণ-আন্দোলনের পথপ্রদর্শক প্রথম শহীদ আসাদ। দেশবাসী তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আসাদকে।

ঢাকার নিউ-মার্কেটের দু চারটি বইয়ের দোকান দেখলাম। পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাংলা বই মলাট পাল্টে অন্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে মূল প্রকাশকের অজ্ঞাতে। পুস্তক প্রকাশনার আইনে কাজটা দণ্ডনীয়। কথাটা পাড়তেই 'বিশ্বকোষ গ্রন্থালয়ের ভদ্রলোক জানালেন এই চোরাকারবার করেই ওরা বাংলাদেশের পাঠকের কাছে বাংলা সাহিত্যের জোগান দিয়েছেন। দেশবিভাগের পর থেকেই পাক-সরকারের কূটকৌশলে ওপার বাংলার বই এখানে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি দেশের লেখকের লেখা বইও ইচ্ছেমত ছাপা যেত না। তাই বাধ্য হয়েই ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্য সদর দরজা ফেলে এই গলির দুয়ার দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে। সিনেমার ক্ষেত্রেও একই কথা 'বলাকা'য় দেখলাম নতুন বাংলা ছবি 'মানুষের মন'। কলকাতার ছবি 'কলঙ্কিত নায়কে'র কাহিনীই নামধাম পাল্টে বলা হয়েছে। এখন আর কোন বাধা নেই। এপার ওপার এখন একাকার। দুই দেশের ভাবের আদানপ্রদানে লাভবান হবে উভয় দেশই। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অঙ্গ, মীর মোশাররফ হোসেন, নজরুল, সৈয়দ মুজতবা আলীকে বাদ দিলে তেমনি বাংলা সাহিত্য অঙ্গহীন।

একুশে জানুয়ারী রাত্রে সুরকার আলতাফের শ্বশুরালয়ে শুনলাম তার গানের কয়েকখানি রেকর্ড। কিশোরী শিমুল আবেগ ভরে গাইল দুখানি গান তার দুলাভাই আলতাফের সুরে। 'কাঁদো বাংলা কাঁদো', আর আবদুল গফফর চৌধুরী রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী—আমি কি ভুলিতে পারি।' ওর দরদী গলার গানের রেশ এখনও কানে বাজে।

বাইশে জানুয়ারী আমাদের ঘরে ফেরার পালা। শুভেচ্ছা নিয়ে গিয়েছিলাম ভালবাসা নিয়ে ফিরে এলাম। আলাদা করে কার কথাই বা বলি। আবুয়াল হোসেন ও তার পরিবার, নুহেল আলম, তার মা আর ভাইবোনেরা, চাঁদ মিঞা, চলচ্চিত্র পত্রিকা ঝিনুক-মালঞ্চের সম্পাদক আসিরুদ্দিন আহমেদ। সোনার বাংলার সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা আমাদের যাদু করেছে। 'ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়' বাংলার ছোট ছোট গ্রামগুলির শান্তি ভেঙেছে নরঘাত-কেরা। অবারিত মাঠ গগন ললাট ভরে গেছে পুত্রহারা মায়ের বিলাপে, পতিহারা রমণীর ক্রন্দনে, ধর্ষিতা নারীর হাহাকারে। পদ্মা মেঘনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী, কপোতাক্ষের জল লাল হয়েছে মানুষের রক্তে।
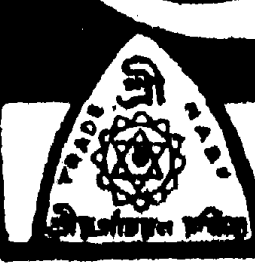
তবু এসব বাংলার দুঃস্বপ্ন মাত্র, সত্য নয়। সত্য শাশ্বত বাংলা—'ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' সত্য শাশ্বত বাঙালী যারা অন্তর উজাড় করে গাইতে পারে—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' 'মোদের গরব মোদের আশা, আমরি! বাংলা ভাষা—যাদের মুখে বেমানান শোনায় না। যারা পৃথিবীকে গর্বভরে শুনিয়ে দিতে পারে—'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।' ওরা আমাদের অবাক করে দিয়েছে, কবি কৃষ্ণ ধরের ভাষায় বলতে গেলে—'আমরা এই বাংলার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যতই নাচানাচি করি, রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম থেকে সযত্নে দূরে রেখেছি। ওপারের যে বাঙালীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো উজ্জ্বল চিন্তা ছিল না আমাদের, তারাই প্রথম দেখিয়ে দিল বাংলা ভাষা কাদের মাতৃভাষা, বঙ্গ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রক্ষায় কারা এগিয়ে আসছে সবার আগে। (রবীন্দ্রানুরাগী বঙ্গবন্ধু—যুগান্তর সাময়িকী, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)

বিদায়ক্ষণে আমাদের প্রার্থনা—আজকের এই প্রীতি ভালবাসা চিরকাল যেন অম্লান থাকে, সন্দেহের কালো মেঘে যেন মিলনের হাসি মিলিয়ে না যায়। অনেকদিন আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে মাকে ব্যথা দিয়েছি—এবার তার অবসান হোক। হাঁড়ি আলাদা হয়েছে কিন্তু মন যেন আর আলাদা না হয়। রক্তস্নানে শুচিশুভ্র হয়েছি আমরা—রক্তপাত সাঙ্গ হোক। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী ভাই, আমরা বিদায় নিচ্ছি—আমরা রইলাম তোমাদের পাশে। জয় বাংলা! অক্ষয় হোক ভারত বাংলা শাশ্বত মৈত্রী।

---

* নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াও বাংলা-দেশের সংবাদপত্র 'দৈনিক বাংলা, 'পূর্বদেশ এবং 'যুগান্তর পত্রিকা ও বদরউদ্দীন উমরের লেখা 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

—লেখিকা।

জীবনের উমেদার

চণ্ডী মণ্ডল

না, দেশ আবিষ্কারক নই—চাকরীর উমেদার!

চাকরীর উমেদারীতে চলেছি দেশ আবিষ্কারের আনন্দে!

চাকরী একটা আমার চেয়ে আর কার বেশী দরকার জানি না, তবু এই মুহূর্তে চাকরীর কথা ঠিক ভাবছি না। ভাবা সম্ভব নয়, তাই।

চলেছি আর চোখের সামনে জন্মভূমির রূপের এক একটা দুয়ার খুলে যাচ্ছে। স্বদেশের এই রূপ আগে কখনো চোখে দেখি নি। অন্তত এর সঙ্গে আমার এমন পরিচয় হয় নি আগে। আবেগে আনন্দে অবাক হয়ে অপলকে চেয়ে আছি।

রাস্তার পাশে ঢালু জমিতে মটর-শুঁটি লতার দাম। রাতের শিশিরের সোহাগ এই দুপুরেও লেগে আছে পাতায়, ডগে। মাচার ওপর শিমের বাসা। বেগুনী রঙের ফুলের ছাড়; থোকা থোকা শ্যামল শিম। সারি সারি বেগুন চারা। পাতার কোলে কোলে উঁকি দিচ্ছে বাহারী ফুল। ঘটের মতো সারবন্দী বাঁধাকপির চারা-গুলি। লাবণ্যে টলটল করছে। কোথাও বাগানজুড়ে সর্ষে গাছ। গুঁড়ি গুঁড়ি ফুল ফুটেছে মুষলধারে। এমন উদ্দাম হলুদ রূপে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পানের বরজ একটা। শুকনো নারিকেল পাতা দিয়ে চার-দিক ঘেরা। ভেতরে চোখে পড়ে, স্নিগ্ধ ছায়ায় সরু সরু পাটকাঠি বেয়ে চারপাশে অজস্র পাতা মেলে লতিয়ে উঠেছে পান লতা। বেড়ার বুক-জুড়ে কোথাও অপরা-জিতা লতা। নীল ফুলগুলি এক পলক দেখে নিল আমাকে। খেজুর গাছ একটা। মুখে ভাঁড় বাঁধা। ভাঁড়ের কাণ্টার ওপর একটা কাক বসে রস খাচ্ছে। মুখ তুলে আমাদের বাসটাকে একবার দেখে নিয়ে আবার রসে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল।

বাস চলেছে একটা খামারের গা ঘেঁষে। খামারে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের মতো ধানের গাদা। ভাঙা সানের ঘাট। ঘাটের কাছে কলমি লতায় ঘেরা নীল জলে ডুব দিয়েছে কাদের বৌ। ঢেউ খুলে দিল ঘোমটাখানা। দেখি ভিজে মুখখানা তার শ্যামলা। কলমি ফুলের সুবাস এল ভেসে।

সারি সারি ঘর। কারো চালের খড় অর্ধেক ঝরে গেছে, কারো দেয়াল ফেটে চৌচির। দেয়ালে দেয়ালে শ্রীদুর্গা টকীজের পোস্টার 'অন্নপূর্ণার মন্দির'—কে ... জঙ্গলে ঘেরা একটা মন্দির ... ইঁটের স্তূপ! এককালে দরজা ছিল—তার চিহ্নই কেবল আজ আছে। ভাঙা বেদীর ওপর দু-তিনটে ভাঙা মাটির ঘট গড়াগড়ি যাচ্ছে। রাস্তার ধারে একজন লোক ঝাঁকায় বেগুন ভরছে। আর একজন ঝুড়িতে শিম সাজাচ্ছে। কোন হাটের হাটবার আজ। পথ দিয়ে ঝাঁকা মাথায় ব্যাপারীরা চলেছে।

চলেছি ত চলেছিই। দু মাইল, তিন মাইল, চার মাইল, পাঁচ মাইল একটানা ছুটে বাসটা থামছে দু-চার সেকেণ্ডের জন্যে। দম নিয়ে আবার ছুট। পাঁড়া। বুড়ো শিবের মন্দির—শিবতলা ডান হাতে ফেলে, অজস্র ঝুরি-নামা কত কালের একটা বিশাল বটগাছ—বটতলা বাঁ হাতে রেখে, বকুলতলা পলকে পেরিয়ে বাস দাঁড়াল রথতলায়। সজ্জাহীন একটা রথ সসঙ্কোচে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিন গুনছে আগামী আষাঢ়ের শুভ দিনটির!

মোল্লার চকের স্টপে জিরিয়ে বাস আবার চলেছে। মাথায় পেঁপে গাছের মতো উঁচু চারটে মিনার—একটা মসজিদ।

একটা পুকুর। পুকুর পাড়ে একটা ফুলের বাগান। হলদে গাঁদা ফুটেছে অজস্র। রাস্তার ধারে চটে ধান শুকুতে দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা গোছা গোছা লাল নীল চুড়ি হাতে ধান নাড়ছে। খালি গায়ে রোদ পোয়াচ্ছে ছেলের দল। মুরগী চরে বেড়াচ্ছে।

ধুলো উড়িয়ে বাসটা চলেছে, যেন কোন অভিযানে চলেছি। চলেছি পোটো-পাড়ার পাশ দিয়ে। রাস্তার পাশে বীণা হাতে বিদ্যাদেবীগণ কেউ পদ্মের ওপর কেউ রাজহাঁসের ওপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে সারি সারি। সারি সারি ছবির সারি। মাঠের মধ্যে জলাশয়টার ওপর ভাসছে দুটো পানকৌড়ি। একটা গরুর গাড়ী চলেছে মাঠ ধরে। মাঠের শেষে ধু-ধু গ্রামটার মাথায় মিশেছে আকাশ। নির্মেঘ নীল আকাশটা ছুটে চলেছে সারা দুপুর। দুপুর গড়িয়ে গেল।

আর কত দূরে? দূরের হিসাবে কলকাতা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে এসেছি মাত্র। আজই সকালে শিয়ালদা থেকে তিরিশ পয়সার টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে কলকাতার উপকণ্ঠে একটা স্টেশনে নেমেছি। তারপর এই বাস ধরেছি। অথচ মনে হচ্ছে সে আজকের ঘটনা নয়। আজই সন্ধ্যায় আবার কলকাতা ফিরে যাব কিন্তু মনে হচ্ছে কলকাতায় আবার ফিরতে আমার অনেক দিন লেগে যাবে। কলকাতার এত কাছে এমন অপরিচিত জায়গা ছিল—এখানে পৌঁছে নিজেই যেন অপরিচিত হয়ে গেছি নিজের কাছে। অচেনা জায়গায় নিজের এত দিনের পরিচয়টা কি রকম বদলে যায় ভাবতে অবাক লাগছে। ভাবা যায় না সে কেমন লাগবে—এর চেয়ে অনেক বেশী নতুন পরিচয় আমার হবে চাকরীটা যদি আমি পেয়ে যাই।

গন্তব্যে এসে পৌঁছল বাসটা। নেমে পড়লাম। দেখি বেশ ক্লান্ত লাগছে। বাসটার সঙ্গে আমাকেও যেন ছুটতে হয়েছে। বুক ভরে শ্বাস নিতে লাগলাম জোরে জোরে। বেশ খিদে পেয়েছে! পাওয়া খুবই সঙ্গত: সেই সকালে চা রুটি খেয়েছিলাম! শীতকালের দিন, কিন্তু রাতে ত আর ঘুম হয় নি, ভোরেই উঠে পড়েছি। স্নানটান সেরে খুব সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। দুপুর গড়িয়ে গেছে কখন। খিদেয় এখন ভেতরটা খাঁ খাঁ করছে। সে জন্যে অবশ্য ভাবনা নেই—দুপুরে এখানে আমার খাওয়ার কথা আছে। কিন্তু ভাবছি, এ কোথায় এলাম আমি! এখানে আমার চাকরী হবে কথাটা বিশ্বাস করার মতো মনের জোর পাচ্ছি না। একেবারে অচেনা এই জায়গা! চেনা লোক আমার অবশ্য এখানে আছে! সুতরাং শহরটা অচেনা হলে কি আসে-যায়!

এটাকে শহর বলা যায় কি রকম! কয়েকটা দোকানপাট, একটা সিনেমা হল, একটা খেলার মাঠ, একটা স্কুল, বাস স্ট্যান্ড! শহর বলতে আমার অবশ্য আপত্তি নেই কেননা একটা কলেজ এখানে আছে। যে কলেজে পড়ানোর চাকরীর জন্যে আমি এসেছি। ক'দিন থেকেই মন বলছিল কাজটা আমি পেয়ে যাব। এবারে একটা গতি আমার আর না হয়ে যায় না। এমন নির্ভেজাল বিশ্বাস আগে আমার কখনো হয় নি। সরকারী চাকরীর বয়েস অনেক দিন পেরিয়ে এসে পৌঁছেছি, আগামী দু-এক বছর পরে কোন রকম চাকরী পাওয়া আর সম্ভব হবে না। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে কেউ চাকরী শুরু করে না। কেউ করে কিনা জানি না তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। এখনই যা অবস্থা আমার শরীরের! শরীরের কথা যদি ছেড়ে দিইও — গোটা যৌবন চলে গেল চাকরী একটা পাওয়া গেল না আর—! আর চাকরী শুরু না করলে জীবন শুরু হয় না। জন্মেছি অথচ জীবন শুরু হবে না কোনদিন, যথেষ্ট পড়াশোনা করে অনেকগুলো পরীক্ষায় পাস করা মন এটা বিশ্বাস করতে পারে? আমার মন বিশ্বাস করে নি।

এবারের সুযোগটা ব্যর্থ হবে না—তার আর একটা কারণ আছে। আমার এক বন্ধু—আমরা এক সঙ্গে কলেজে পড়েছি, একই বছর ইন্‌ভার্সিটির শেষ পরীক্ষায় পাস করেছি যদিও অবশ্য দুজনের বিষয় আলাদা ছিল।—মহিম আমার খুব বন্ধু ছিল এক সময়। এবং এখনও যে সে আমার বন্ধু আছে তার প্রমাণ হয়ে গেল গত রবিবার।

সপ্তায় ঐ একটা দিন—রবিবার আমি পথে বেরোই। কোন উদ্দেশ্য নেই তবু খুব ব্যস্ত মানুষের মতো হাঁটছিলাম। মহিমের সঙ্গে দেখা! প্রায় পাঁচ বছর পরে মহিমকে দেখলাম। দেখি সঙ্গে এক মহিলা। বেশ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ চেহারা ভদ্রমহিলার। মহিম আলাপ করিয়ে দিল। ইকনমিকসে এম-এ। ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। জিভ নাচিয়ে তারিফ করার মতো! বাঃ! তফা প্রেমিকাটি জোগাড় করেছে মহিমচন্দ্র! একটা সম্ভ্রান্ত চাকরীও জোগাড় করেছে মহিম। মফঃস্বলের একটা কলেজের লেকচারার। হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট হয়ে যাবে শিগ্গিই!

ঈর্ষা দমন করে উচ্ছ্বাস ভরে বললাম, 'বা বা! খুব ভাল! খুব ভাল!—খুব ভাল খবর!'

'তা তোর খবর কি বল?' মহিম জিজ্ঞাসা করল।

কারো ব্যর্থতার কাহিনী যে কোন সফল ব্যক্তির কাছে বিরক্তিকর — অভিজ্ঞতা অনেক দিন হয়েছে আমার। তবু কেউ শুনতে চাইলে কেমন দুর্বলতায় পেয়ে বসে। না বলে পারা যায় না। মহিমকে বললাম সব। সবাই যেমন হয় মহিমও তেমনি অবাক হল। বলল, 'কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না জানিস—তোর এত ভাল রেজাল্ট!'

হাসতে আমার খুব খারাপ লাগে। তবু কিন্তু হাসতে হয়। হেসে মহিমকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলাম। বললাম, 'তা বিয়ে করছিস কবে বল?' মহিমের প্রেমিকার মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'মিষ্টি খাচ্ছি কবে আমরা বন্ধু-বান্ধবরা?'

মহিম যে এতদিন পরেও আমার এমন বন্ধু আছে জানতাম না। একটা চাকরীর অফার দিল সে আমাকে। বলা উচিত অবশ্য খবর। মহিমের কলেজের আমার সাবজেকটের একজন ভদ্রলোক কলকাতার একটা কলেজে চলে আসছেন। মহিম বলল, 'তুই চলে আয় আসছে রোববার। প্রিন্সিপালকে আমি বলে রাখব। ভদ্রলোক আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন! কাজটা তোর হয়ে যাবে ঠিক।—ধরে নে চাকরীটা হয়েই গেছে!'

যাক! পায়ে পায়ে যতই এগোচ্ছি মনের সেই সংশয়ের মেঘটা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। যাক! একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম 'দাদা, কলেজে যাব কোন পথে?'

'কলেজে যাবেন?—আমিও যাব, আসুন আমার সঙ্গে।'

চলেছি একটা মেঠো পথ ধরে। দু পাশে বাঁকারীর বেড়া। বেড়ার গায়ে বুনো লতাপাতা। কোথাও বাকস গাছের ঝোপ। ফণীমনসার ঝাড়। অচেনা গাছ-গাছালীর জঙ্গল। খিরিস গাছ। খেজুর গাছ। দু-চারটে ঘরবাড়ী। সবগুলোই মাটির। রাস্তার মাটি কেমন ভিজে ভিজে। দুপুর গড়িয়েছে, পথটা ছায়ায় ছেয়ে গেছে। বেশ শীত করছে। সেই মেঘটার আনাগোনা শুরু হয়েছে আবার। হঠাৎ অনেক দূরে এসে পড়েছি ত, একেবারে অচেনা জায়গা! তাছাড়া খিদেও পেয়েছে খুব।

ভদ্রলোক আমার আগে আগে হাঁটছিলেন। লক্ষ্য করি নি কখন তিনি আমার পিছনে চলে এসেছেন। হঠাৎ পিছন থেকে সবিনয় জিজ্ঞাসা কানে এল, 'স্যার আপনি কি কলেজের নতুন—?'

দেখাচ্ছে নাকি আমাকে অধ্যাপকের মতো? মনে মনে বললাম, 'হ্যাঁ—ইতিহাসের!' মুখে বললাম, 'না, ঠিক তা নয়,—আমার এক বন্ধু এখানকার অধ্যাপক। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'কি নাম বলুন ত?'

'মহিম মিত্র।'

'ও, মহিমবাবু—ইংরিজীর স্যার!'

'চেনেন দেখছি। আপনিও কি এখানকার—?'

'—ছাত্র। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি।'

'ও আচ্ছা।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলেজের হোস্টেলে থাকা হয় নাকি?'

'আজ্ঞে না, আমার বাড়ী এই গ্রামে। হোস্টেলে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা আচ্ছা।—প্রফেসারদের মেসটা তাহলে একটু কষ্ট করে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে—।'

'এতে কষ্টের কি আছে!—স্যারদের মেস ত হোস্টেলের দোতলায়। রবিবার—

আজ মহিমবাবু কি আছেন—ছুটির দিনে থাকেন না শুনেছি।'

'আজ আমার আসার কথা ছিল।'

'ও তাহলে নিশ্চই আছেন!'

কলেজটা দেখা গেল। দেখবার মতো বটে! দু চোখ ভরে দেখছি। বাড়ীটাকে নয়, খুব সাধারণ—স্কুল-বিল্ডিং-এর মতো একটা বাড়ী। কিন্তু এটা একটা কলেজ যেখানে অধ্যাপনায় চাকরী করব আমি!

কলেজটাকে নয় — নিজেকে দেখছি। নিজেকে দেখায়, জীবনকে দেখায়, দুনিয়াকে দেখার এর পর কত দিক খুলে যাবে! কত দরজা জানালা খুলে যাবে!

হোস্টেলের সব জানালা খটখট খুলে যাচ্ছে! রীতিমতো লজ্জা লাগছে আমার।

একজন ছাত্র আমাকে মহিমের ঘরের সামনে পেঁছে দিল।

মহিমের ঘরের দরজা বন্ধ! তালা ঝুলছে!

চোখ আমার বিশ্বাস করছে না। মন আমার বিশ্বাস করছে না।

কিন্তু সত্যিই মহিমের ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

না না! মহিম নিশ্চই কোথাও যায় নি! এখানেই ধারে কাছে কোথাও আছে। না থেকে পারে না!

দেখি এক ভদ্রলোক বারান্দায় একটা ছোট তক্তপোষের ওপর বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে কি করছেন। বার দু-তিন চোখা-চোখি হতে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চান?'

'মহিমকে!—মহিম মিত্র, অধ্যাপক!'

'উনি ত নেই।'

'নেই! কোথায় গেছে?'

'কলকাতা।'

'কলকাতা!'

'হ্যাঁ, কলকাতা। আপনি আসছেন কোথা থেকে?'

'আমি? — আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও'র ফিরতে রাত হবে, কিছু বলতে হবে?'

অন্যমনস্কভাবে পায়ে পায়ে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। উনি ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। আমাকে কোন উত্তর করতে না দেখে বললেন, 'কিছু বলার থাকলে আমাকে বলে যেতে পারেন!'

'না, ভাবছি—মানে, আমার আজ আসার কথা ছিল কিনা!'

'সে রকম কিছু ত বলে যান নি। বলে গেলেন ফিরতে রাত হবে।'

'তাহলে বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল।'

'তাই হবে—ভুলে গিয়ে থাকবে।'

'কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না—ব্যাপারটা কি হল! — আচ্ছা, মহিম কিছুই বলে যায় নি?'

'বললাম ত না।'

'ও।'

কি মনে হল বলে ফেললাম, 'আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারি? মানে, যদি কিছু মনে না করেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'কি কথা বলুন ত?'

'না মানে—শুনেছিলাম আপনাদের এখানে ইতিহাসের একটা পোস্ট খালি হয়েছে বা হচ্ছে শিগ্গী—জানেন নাকি এ বিষয়ে কিছু?'

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত কি ভাবলেন তারপর বললেন, 'আপনাকে কি মহিম-বাবু খবরটা দিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মহিমবাবু কী বলেছিলেন—ইতিহাসের একটা পোস্ট শিগ্গী খালি হচ্ছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মহিমবাবু ঠিকই বলেছিলেন। ইতি-হাসের একজনের চলে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি চলে গেছেনও। — তাঁর জায়গায় নতুন একজন কাজ করছেন।

আমি আর কি বলব — বললাম, 'ও আচ্ছা। আমি জানতাম না!'

তখনি চলে যেতে পারছিলাম না—কি রকম দেখায় না! দেখলাম ভদ্রলোক খাতা দেখায় মনোনিবেশের চেষ্টা করছেন। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে আমারও খারাপ লাগছিল। 'আচ্ছা চলি—নমস্কার!—অনেক বিরক্ত করলাম!'

অনেকটা চলে গেছি, শুনতে পেলাম ভদ্রলোক ডাকছেন, 'শুনছেন — একটু শুনুন!'

কি বলেন শুনতে এলাম।

'শুনুন!' ভদ্রলোক বললেন, 'এতদূরে এলেন যখন কষ্ট করে—প্রিন্সিপালের সঙ্গে একবার দেখা করে যান না! কাছেই প্রিন্সিপালের বাসা।'

'কিন্তু তাতে কি কিছু হবে?'

'প্রিন্সিপাল ইচ্ছা করলে হতে পারে না এমন নয়। প্রিন্সিপাল লোক হিসেবে খুব ভাল। যে ভদ্রলোক নতুন এসেছেন তিনি ত মাত্র কদিন পড়াচ্ছেন—এখনো বোধ হয় এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পান নি। আপনি এক কাজ করুন—প্রিন্সিপালের সঙ্গে এক-বার দেখা করুন!'

'বলছেন? আচ্ছা—। ধন্যবাদ—নমস্কার!'

শরীরটা ভাল লাগছে না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। খিদেটা মরে গেছে কখন। মহিম বলেছিল, 'আমার এখানে খাবি। আপত্তি করেছিলাম। শোনে নি। বলেছিল, তোকে নিমন্ত্রণ করছি। বলেছিলাম, নিমন্ত্রণ করছিস—সেটা ভাল! ভেবেছিলাম মহিম খাওয়াবে ভাল। না খেয়ে দেয়ে মহিম কলকাতা চলে গেল। আমার যে আসার কথা ছিল বেমালুম চেপে গেল! পাশের ঘরের সহকর্মীর কাছে আমাকে একটা ভিখিরী প্রতিপন্ন করার ব্যবস্থা করে গেল! কেন—মহিমের সঙ্গে কোন দিন কোন খারাপ ব্যবহার ত করি নি আমি! না চাকরী পেয়ে গেছে বলে বেকার বন্ধুকে অপদস্থ করতে হয়! আসলে নিজের ক্ষমতা কিছু নেই তবু পুরোনো বন্ধুর কাছে নিজের মর্যাদা বাড়াবার লোভে ক্ষমতার বড়াই করেছিল—ভাবে নি যে সত্যি সত্যি আমি আসব। না আমি আসব জেনেই চলে গেছে! বন্ধুর কাছে এইভাবে নিজের মূল্য বাড়াতে হয়!

না, অভিমান করব না! প্রতিজ্ঞা করেছি আর অভিমান করব না। কত আর করব অভিমান—কার ওপর অভিমান করব!

আজ সেই সব দিনের কথা খুব মনে পড়ছে। একতলার অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একটা ঘরে মহিম থাকত। সকালে সন্ধ্যায় টিউশানী করত। মাঝে মাঝে একটাও টিউশানী থাকত না। হোটেলে দু-তিন মাসের টাকা বাকী পড়ে যেত। সেই সব দিনে মহিমকে কত খাইয়েছি। আমাদের অবস্থা তখন বেশ ভালই। বাবা অবশ্য রিটায়ার করেছেন, কিন্তু আমার দু দাদা আগেই চাকরী পেয়ে গেছে। তিন ভাইদের মধ্যে আমিই ছোট। দাদারা খুব ভালবাসত আমাকে। যখনই যার কাছে টাকা চেয়েছি দিয়েছে। মার কাছেও তখন টাকা থাকত। মার কাছ থেকেও যখন তখন টাকা নিয়েছি মহিমকে কত সিনেমা দেখিয়েছি, কতবার কত টাকা ধার দিয়েছি না চাইলেও দিয়েছি। টাকা শোধ দিতে পারে নি বলে মহিমকে কখনো কিছু বলি নি। মুখফুটে কোনদিন টাকা শোধ দিতে বলি নি। আজ চাকরী পেয়ে মহিম হয়ত সেই সব দিনের কথা ভুলে গেছে। না ভুলে এমন ব্যবহার সে করবে কেন! সে ত আমার সব কথা শুনেছিল।

বাবা তিন বছর হল মারা গেছেন। বড়দার বিয়ে হয়েছিল আগেই। মেজদারও বিয়ে হয়ে গেছে। মেজদা বৌ নিয়ে এখন আলাদা সংসার করেছে। মা আমি বড়দার সংসারে আছি। বড়দার [illegible] ভাল নয়। বৌদিও অফিসে চাকরী করে। বাড়ীতে কিন্তু সারাক্ষণের জন্যে একটা ঝি রাখা যায় নি। আমার বুড়ী মাকে সংসারের কাজ কর্ম সব করতে হয়। আমাকে বাজার হাট করতে হয়। দাদা বৌদির ফাইফরমাস খাটতে হয়। একটা ভাইপোকে স্কুলে পেঁছে দিয়ে আসতে হয় সকালে, দুপুরে তাকে বাড়ী আনতে হয়। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ছোট ভাইপোটাকে আগলাতে হয়। সন্ধ্যায় একটা টিউশানী করি। মার হাত খরচের টাকা আমিই দিই মাকে। বাকী দু-পাঁচ টাকা হাতে যা থাকে তাতে আমি নিজের হাতখরচ চালাই। মাঝে মধ্যে দাদা দু-পাঁচ টাকা দিতে চায়, আমি নিই না। বৌদিকে বলতে শুনেছি—ও ত টিউশানী করে টাকা রোজগার করে—তাছাড়া ও বাজার করে। গত মাস থেকে বৌদি দাদাকে বাজারে পাঠাচ্ছে। বৌদি কখনো কখনো বলেই ফেলে—চেষ্টা চরিত্র করলে কী আর একটা চাকরী হয় না! দেশে লোকের চাকরী হচ্ছে না! আসলে দিব্যি আছে দাদার ভাতে! কিন্তু আমাদের ত ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকতে

পারে। ছেলেমেয়েরা একদিন বড় হবে—ওদের নিয়ে আমাদের ত সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে, না নেই!

সাধ আহ্লাদ অনেক আমারও একদিন ছিল! আমারও ছিল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।—থাক।—কী হবে! কাকে দোষ দেব আমি? কার ওপর অভিমান করব?

আহা বেচারা মহিম! আমার বন্ধু সে-দিনের সেই দুঃখী মহিম! কত অভাব উপবাস দুঃখকষ্টের মধ্যেও স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছিল—বড় হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে! সাধনা ওর সফল হয়েছে। ওর দুঃখের রাত্রি ভোর হয়েছে। সাফল্যের শুভ সকাল এসেছে। সুখের দিন ওর আসছে উজ্জ্বল, সুন্দর! আসুক—আরো অনেক সাফল্য আসুক! জীবন ওর সমৃদ্ধে পূর্ণ হোক!

না, কোন দোষ নেই ওর। ওকে ভুল বোঝার কোন কারণ নেই। কলেজে চাকরী করে তাই বলে প্রিন্সিপালের সঙ্গে এমন কিছু আত্মীয়তা ওর নেই যে ওর কথা মতো প্রিন্সিপাল আমাকে চাকরী দিয়ে দেবেন। তবে বন্ধু হিসেবে ব্যর্থ বন্ধুকে সাফল্যের আশা দিয়ে অন্তত ক্ষণিকের আনন্দ দেওয়া—এটুকু কর্তব্য। ও ঠিকই জানত আমি আসব; কিন্তু একজন বন্ধুকে অক্ষমতার পরিচয় নিয়ে একজন বন্ধুর মুখোমুখি হতে হবে, সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে দুই বন্ধুই যাতে রেহাই পাই সেই কারণেই ও কলকাতা চলে গেছে! এটা যে করেছে সুহৃদের প্রতি সুহৃদের স্বাভাবিক সৌজন্যবোধেই করেছে! মহিম আমার মহান সুহৃদ! ওর যেন সত্যিই ভাল হয়। ওর প্রেমিকা যেন ওরই মতো ভাল হয়। ও যেমন ভালবাসে প্রেমিকাকে—ওর প্রেমিকাও তেমনি ভালবাসুক ওকে! আমার শুভেচ্ছা রইল, ভালবাসার মহৎ লক্ষ্যে ওরা পৌঁছে যাক।

কিন্তু আমি এখন কোথায় যাব?—কী করব?

কী করব, কোথায় যাব ভাবতে ভাবতে প্রিন্সিপালের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম।

দেখে মনে হল ভদ্রলোক ভাল লোক। প্রিন্সিপাল সম্পর্কে যে ধারণা ছিল সে রকম নয়। তাছাড়া চাকরীটা যখন একজন করছে তখন মনে মনে জানি সরাসরি চাকরীর জন্যে ত যাচ্ছি না; মনে এক ধরনের সৎসাহস ছিল!

ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় রোদ পোয়াচ্ছিলেন রেলিঙে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে। স্ত্রী বসে ছিলেন একটা সৌখিন মোড়ার ওপর; উল বুনছিলেন, স্বামীর মুখের দিকে মৃদু মৃদু হাসছিলেন মুখ তুলে। আনন্দসুন্দর সে মুখ লাবণ্যে ঢল-ঢল করছে। বিকেলের মধুর রোদে মুক্ত অঙ্গনে অনুপম সেই তনু যেন একটি ফুল হয়ে ফুটে আছে। অপরিচিতের আবির্ভাবে ঝটিকার বেগে নয়, স্নিগ্ধ সমীরণের মতো, সলজ্জ পায়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

ভদ্রলোক স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধোলেন, 'কী দরকার বলুন ত—কোথা থেকে আসছেন? বসুন।'

সসংকোচে বসলাম। সবিনয়ে নিবেদন করলাম বক্তব্য।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি ঠিকই শুনেছিলেন, ইতিহাসের একজন অধ্যাপক কলকাতার একটা কলেজে চাকরী পেয়ে চলে গেছেন হঠাৎ। সাত দিনের নোটিশও আমাকে দেন নি। অথচ তাঁর উচিত ছিল অন্তত এক মাস আগে আমাকে জানানো। পাস করে বসে ছিলেন প্রায় দু-বছর, আমিই তাঁকে ডেকে চাকরীটা দিয়েছিলাম—বড় কলেজে চান্স করে নিয়ে চলে গেলেন। একবার ভাবলেন না আমাকে অসুবিধায় পড়তে হবে। বেশ চিন্তায় পড়েছিলাম—দু-এক দিনের মধ্যে কোথায় পাব লোক! দিন তিনেক আগে এমনি বিকেলে আপনারই বয়সী একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, সঙ্গে একটা চিঠি! চিঠিটা দেখি জনৈক সরকারী কর্তাব্যক্তির লেখা! ছেলেটির কোয়ালিফিকেশন দেখলাম বেশ ভালই। থর্ব নির্ভিও বুঝলাম। একসঙ্গে এরকম যোগাযোগ হয়ে গেল, ভাবলাম, এই ছেলেটির জন্যেই পোস্টটা এমনভাবে তৈরী হয়েছে।

ছেলেটি দু'দিন ধরে পড়াচ্ছে।—ভালই পড়াচ্ছে শুনলাম।'

ভদ্রলোকের স্ত্রী দু-কাপ চা আর একটা প্লেটে কিছু বিস্কুট ট্রেতে করে সাজিয়ে, টেবিলে নামিয়ে দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

'নিন, একটু চা খান।'

কেমন সংকোচ হল। বললাম, 'এসবের কিছু দরকার ছিল না, শুধু শুধু—।'

'শুধু ত একটু চা। এত দূর থেকে আসছেন—।'

'না তাতে কী!' সলজ্জ হাতে চায়ের কাপ তুলে নিলাম।

'বিস্কুট নিন!'

একটা বিস্কুট নিতে হল।

চায়ে চুমুক দিয়েছি, নিজের পরিচয়ের আসল স্বাদটা অনুভব করলাম!

এত নিবিড়ভাবে নিজেকে আমি অনুভব করিনি আগে কোন দিন। বুকের ভেতরটা গুমরে উঠল কান্নায়। অনেক কেঁদেছি; অনেকবার অনেক অশ্রুপাত করেছি আমি। জানি বৃথা এই কান্না, বৃথা এই অশ্রু বিসর্জন! প্রাণপণে অশ্রু সংবরণ করতে করতে ভেতরে ভেতরে এমন কান্না আর কখনো কাঁদতে হয় নি আমাকে! হঠাৎ চোখ পড়ল জানালার দিকে, দেখি পর্দার পাশ দিয়ে দুটি গভীর চোখ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে! আমার সংযমের বাঁধ বুঝি ভেঙে গেল! অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আমার মায়ের মুখ ভেসে উঠল চোখের ওপর। দাদাবৌদি এতক্ষণে অফিস থেকে ফিরেছে। তাদের চা-জলখাবার খাইয়ে মা কলতলায় এঁটো কাপ ডিস ধুচ্ছে আর আমার দুখের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলছে।

'চলি এবার—নমস্কার!'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় দিলেন।

বাইরে এসে দেখি বিদায়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে চরাচরে।

গাছের পাতায় কাঁপছে মলিন রোদ। একদল বক সারি বেঁধে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। দূরে মাঠের প্রান্ত থেকে অদূরের একটা জলাশয় পেরিয়ে কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে। শীতের সূর্য ডুবতে না ডুবতেই সন্ধ্যা। শেষবারের মতো পাখিদের কাকলি শোনা গেল। তারপর সব স্তব্ধ। কেবল একটানা ঝিঁঝির রব।

আকাশজোড়া কালো ডানা মেলে মাথার ওপর কাঁপছিল সন্ধ্যা—চক্ষের পলকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! মাঠ পথঘাট তলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

শঙ্কিত পদক্ষেপে এক সময় এসে দাঁড়ালাম সেখানে—যেখান থেকে কলকাতা ফেরার বাস পাওয়া যাবে।

কয়েকটা হ্যাজাক আর গ্যাসের আলোর মধ্যে কিছু লোক ছায়ার মতো ঘোরাফেরা করছে। মনে হচ্ছে একটা ভৌতিক শহরে এসে পড়েছি। যেন যে কোন সময় আলোগুলো সব নিভে যাবে, দোকানপাট লোকজন সব হঠাৎ মিলিয়ে যাবে! বুকের মধ্যে একটা অশুভ সংশয় ডানা ঝাপটাচ্ছে। একটা বাস দাঁড়িয়েছিল, অন্ধকারে, মুখের দু-পাশে দুটো ছায়া-ছায়া আলো জ্বলছে মিটমিট করে। ভেতরে গিয়ে বসলাম—যেন নিজের ইচ্ছায় নয়, নিজে আমি যেন নয়!

তারপর কখন ছেড়েছে বাসটা। অন্ধকারের দেয়াল ভেদ করে ছুটে চলেছে। দু'পাশে প্রেতের মতো কালো কালো গাছগুলো ছিটকে পিছনে সরে যাচ্ছে। জোনাকিরা ঝাঁক ঝাঁক দিশাহারার মতো ছুটছে। এক জায়গায় রাস্তার পাশে চড়ায় মড়া পোড়ানো হচ্ছে। চুল্লি জ্বলছে দাউদাউ করে ছায়ার মতো মূর্তিগুলোর মুখ চুল্লির আলোয় জ্বল-জ্বল করছে।

আর কোন ছবি নেই! অন্ধকার ছাড়া আর কোন দৃশ্য নেই দু-পাশে, চরাচরে কোথাও। আমার সকালের জন্মভূমি এখন সারা দেহে কালো কাপড় ঢেকে দিয়েছে!

যন্ত্রণায় দপদপ্ করছে কপালটা। যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে! শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গে যেন অসংখ্য কাঁটা বিঁধে আছে। শ্রান্ত স্নায়ু সব ঝিমিয়ে পড়ছে।

যেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটা ভীষণ সঙ্কীর্ণ শ্যাওলা ধরা পিচ্ছিল পাথরের পথে হাঁটছি। হাঁটছি কিন্তু একটুও এগোতে পারছি না, পায়ে পায়ে জড়িয়ে

যাচ্ছে—আর পা দুটো দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে! আমার চৈতন্য হারিয়ে যাচ্ছে! শিউরে উঠে ত্রস্ত হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলছি।

বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার জীবনের আসল রূপটা আমাকে চমকে দিয়ে দিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

একটা চাকরী।

আর একটা জীবন!

জীবন-এর মতো একটা ঘটনা নির্ভর করছে একটা চাকরীর ওপর!

সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনায় যে সহজ জটিল স্বাভাবিক জীবন তার শরিক হওয়া যাবে না যত দিন না একটা চাকরী পাওয়া যাচ্ছে!

একটা চাকরীর জন্যে বসে থাকতে হবে!

কিন্তু বয়স বসে থাকে না! একটা বয়স থাকে, যে বয়স-এর পর আর চাকরী পাওয়ার কোন আশা থাকে না। চাকরীর দরজা একটা একটা করে বন্ধ হতে হতে শেষ দরজাটাও একদিন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সামনে কোন দরজাই আর থাকে না।

বাইরের অন্ধকারের মতোই অনিশ্চিত একটা সংশয়ে পীড়িত হচ্ছে মন। বাসটা ছুটে চলেছে নিঃশব্দে— যেন একটা কী কুটিল অভিসন্ধি আঁটছে আমার বিরুদ্ধে! মনে হচ্ছে, এ পথ আজ রাতে আর শেষ হবে না কখনো। এ রাত্রি, এই অন্ধকার আর শেষ হবে না কখনো। এমনি যেতে যেতে এক সময় বাসটা তলিয়ে যাবে অন্ধকারে!
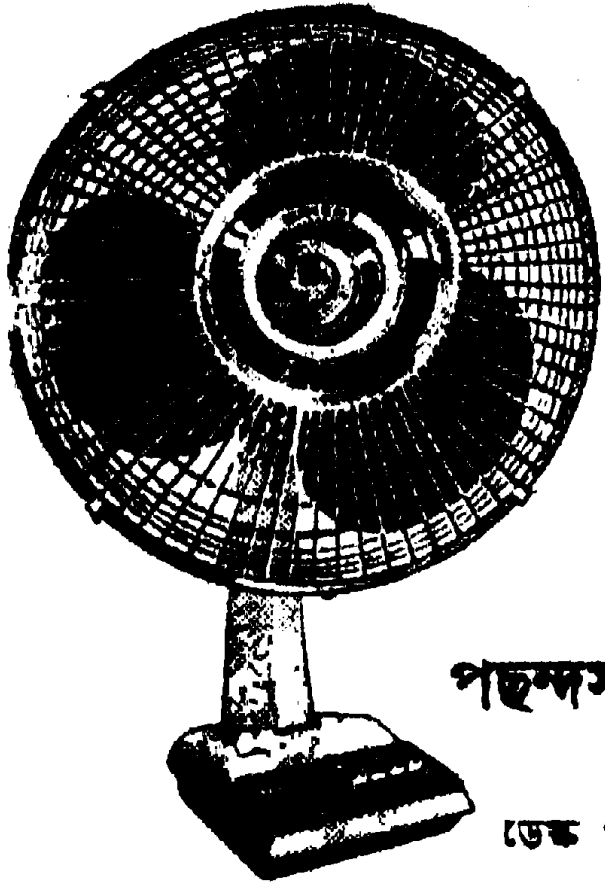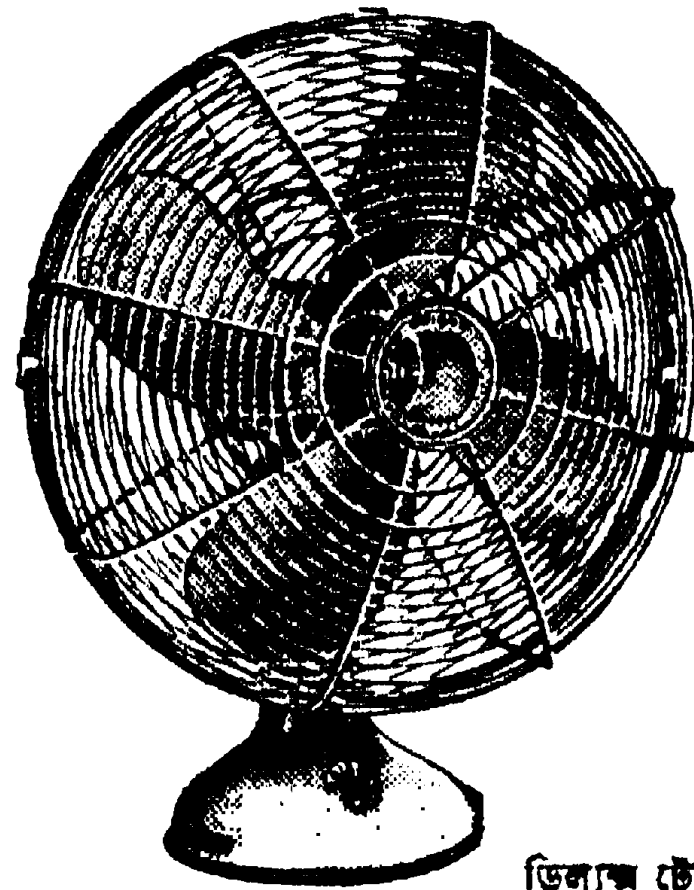
প্রবাসী বাঙলাভাষাভাষীদের সাময়িক পত্রিকা 'সাগর পাড়ে' নামক বাঙলা সাহিত্য পত্র শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য লণ্ডনের তন্দুর মহলে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ছবিতে প্রথম সারিতে বাঁ দিক থেকে ডানদিকে "সাগর পাড়ে"র সম্পাদক শ্রী হিরন্ময় ভট্টাচার্য, ডঃ কে সি ভট্টাচার্য ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে দেখা যাচ্ছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী এক অবিস্মরণীয় নাম। দুঃখের বিষয় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে অনেক কম। প্রমথ চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যে যে বিশিষ্ট ভূমিকা তা যেন সব সময় চোখ এড়িয়ে যায়। বিশেষ করে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য প্রমথ চৌধুরীর হাতে যে আকৃতি লাভ করেছে তার জন্য বাঙালীমাত্রেই তাঁর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন। প্রমথ চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে হাল্কা ভাষায় শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব পাঠযোগ্য গদ্য রচনায় পরিণত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ইদানীং প্রবন্ধের দুর্ভিক্ষ চলেছে তবু যে কজন বিরলসংখ্যক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার এখনও প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন তাঁরা প্রমথ অনুসারী সব দিক দিয়েই। এই শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হিসাবে—অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, নারায়ণ চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রমুখের নাম করা যায়।

আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, আর সবচেয়ে বড়ো দুঃখ যে মাত্র কিছুকাল পূর্বেও যাঁরা আমাদের মধ্যে ছিলেন তাঁদের কথা অতি সহজেই ভুলে যাই। প্রমথ চৌধুরী নীরবে সাহিত্য-সাধনা করেছেন। সাহিত্য-প্রীতির জন্য অনেক অর্থ ও সময় অপচয় করেছেন। বাংলা সাহিত্যের যে কোন ক্ষেত্রে কোন কিছু প্রশংসনীয় ঘটলে তার প্রশংসা করেছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা যে, যতদিন তাঁর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল ততদিন যে কেউ তাঁর কাছে রচনার জন্য হাত পাতলে তিনি তাঁকে বিমুখ করেন নি। বর্তমান কালে এসব সৌজন্যবোধ অবশ্য আশা করা যায় না।

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ তিনি ইংরেজী ভাষায় আধুনিক বাংলার এই প্রাণ-পুরুষের একটি মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়েছেন কিছুকাল পূর্বে সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রমথ চৌধুরী' নামক গ্রন্থে। ডঃ অরুণকুমার ইতিপূর্বে 'বীরবল ও বাংলা সাহিত্য' নামে বাংলা ভাষায় যে গ্রন্থটি লিখেছিলেন সুখের বিষয় তার একাধিক সংস্করণ হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে বাংলায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আরো দু-একজন করেছেন। কিন্তু মনে হয় এখনও অনেক কাজ বাকী।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি লাইনে সুন্দর রেখাচিত্র এঁকেছেন—

"Chaudhuri continued to be a respected figure among the younger intellectuals and his magazine (Sabuj Patra) — became a legend. He returned to his old easy-going way of talking brilliantly and writing rarely. The stories which he Published once or twice a year marked him out as a master of style, wit, language and form. Essays, always witty and learned ranging over all aspects of life, sustained his fame as modern Birbal."

আকবরের নবরত্ন সভার ন'টি রত্নের মত বাংলা সাহিত্যের নটি রত্নের অন্যতম হলেন বীরবল প্রমথ চৌধুরী, একথাও বলেছেন অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ভূমিকা সূত্রে। তাঁর মতে অপর আটজনের নাম—ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র ও কাজী নজরুল। বীরবল প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষার এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বীরবলী ভাষা দান করেছেন। আজ বাংলা সংবাদপত্রাদিও বীরবলী ভাষায়

রচিত হচ্ছে—এ এক অত্যাশ্চর্য প্রভাব—এক হিসাবে নিঃশব্দ বিপ্লব।

ডঃ অরুণকুমার অশেষ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়সহকারে সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যের সমস্ত দিকগুলি আলোচনা করেছেন এ কৃতিত্ব উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।

ডঃ অরুণকুমার প্রথমে 'এ সর্ট বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ' শীর্ষক অধ্যায়ে প্রমথ চৌধুরীর জীবনকথা বিধৃত করেছেন। কৃষ্ণ নাগরিক প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র প্রথমাংশ লিখে গেছেন। এই গ্রন্থের লেখককেও সেই আত্মস্মৃতি থেকে অনেকখানি গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী কিভাবে ভারতচন্দ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা এই আত্মস্মৃতিতে বলেছেন। চৌধুরী পরিবারের মট লেনের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যাওয়া-আসা করতেন, প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সহায়তায় 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাবলী নির্বাচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি প্রতিভা দেবীকে স্যার আশুতোষ বিবাহ করেন এবং পরে প্রমথনাথ বিবাহ করেন ইন্দিরা দেবীকে। এই-ভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আত্মস্মৃতিতে প্রমথনাথ লিখেছেন (চিঠিপত্রে তিনি সর্বদা প্রমথনাথ চৌধুরী বলে দস্তখত করতেন), — 'কবিতা আমার কাছে অর্থময় হয়ে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির জন্য আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।'

বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী প্রায় ত্রিশ বছর কাল বাংলা সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না একথা ঠিক, তাঁর প্রায় সব কটি গ্রন্থই (শেষের দুটি গল্পগ্রন্থ ব্যতীত) তিনি নিজের খরচে ছেপেছিলেন। তবু তিনি ছিলেন লেখকের লেখক, পাঠকের লেখক। বাংলা সাহিত্যে ছোট-বড় এমন কোন লেখক ছিলেন না যিনি প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করেন নি, একথা সকলের সম্পর্কে প্রযোজ্য হয় না।

প্রমথনাথের শেষ জীবন ছিল কষ্টের। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সঞ্চিত অর্থাদি নষ্ট হয় এবং জমিদারীগুলি ধীরে ধীরে হস্তান্তর হওয়ায় সবিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হয়, তাই শান্তিনিকেতনে তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ফেলেন।

এই গ্রন্থের সাতটি পরিচ্ছেদে আছে প্রমথ চৌধুরীর প্রথম দিকের রচনাবলী, সবুজপত্র, চার ইয়ারী কথা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ছোট গল্প, সাহিত্য-শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি, বাংলার নবজন্মে তাঁর অবদান—এ ছাড়া প্রথম পরিচ্ছেদে আছে সংক্ষিপ্ত জীবনী যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরিশেষে আছে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী।

দীর্ঘ আয়তনে এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা হয়ত সহজ কিন্তু স্বল্প পরিসরে এক বর্ণাঢ্য সাহিত্যিক জীবনের খুঁটিনাটি পরিবেশন করতে যথেষ্ট লিপিকুশলতা এবং সমঝদারের দৃষ্টিভঙ্গী থাকা আবশ্যক। এই গ্রন্থ লেখকের সেই সহজ দৃষ্টি থাকায় এই গ্রন্থটি এতখানি সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-জীবনের একটি মুখ্য অধ্যায় হল 'সবুজপত্র' সম্পাদনা। সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় নতুন রীতির গদ্য চর্চা করলেন এবং প্রবর্তন করলেন বীরবলী ভাষা। বীরবলী ভাষা চলতি ভাষা হলেও তার ভিতর গুরু-গম্ভীর বাক্য প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ নয়। শিষ্ট এবং মিষ্ট হবে ভাষা এই ছিল বীরবলের মনের কথা। সবুজপত্র এক উদার মুক্ত মানসিকতার পরিচায়ক। প্রমথ চৌধুরী সেইকালে বলেছিলেন—

'সাহিত্য মানব-জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখিরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সবচেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারি জ্ঞান।'

প্রমথ চৌধুরী নির্মম সত্যকে অতি-মনোহর ভঙ্গীতে বলতে পারতেন সেই কারণে সমকালীন সমাজে তাঁর আসন ছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রমুখের সমান সম্মানের আসন।

ডঃ অরুণকুমার এই মহামনীষীর জীবন ও সাহিত্যের এই সুন্দর আলোচনাটির জন্য অভিনন্দনযোগ্য। তিনি বলেছেন—

"He is undoubtedly one of the most influential makers of the Bengali language and literature in the twentieth century."

গ্রন্থটি সুমুদ্রিত। সত্যজিৎ রায় পরিকল্পিত প্রচ্ছদটি সুরুচিসম্মত। গ্রন্থটির পোস্তানিতে আছে নাগার্জুন কোণ্ডায় প্রাপ্ত ২য় শতাব্দীর এক শিলালিপির প্রতিলিপি। এই ভাস্কর্যে তিনজন ভবিষ্যৎ-বক্তা রাজা শুদ্ধোধনের কাছে রাণী মায়া-দেবীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করছেন। বুদ্ধ জন্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লিপিটি সম্ভবত ভারতবর্ষে লিপিদক্ষতার প্রথম দিকের নিদর্শন। 'মেকার্স অব দি ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' শীর্ষক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এই গ্রন্থটির যথেষ্ট সমাদর হবে আশা করি।

—অভয়ঙ্কর

PRAMATHA CHAUDHURI : (Life and Literature) . By Dr. ARUN KUMAR MUKHAPADHYAY Pubilshed by — SAHITYA AKADEMI - NEW DELHI : Price Rs. 2.50 only.

নজরুল ইসলামের কবিতা

রুশ ভাষায় 'নজরুল ইসলামের কবিতা' বইটি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। আমাদের আলোচ্য বইটি ওই বইটির দ্বিতীয় ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমীর উদ্যোগে প্রকাশিত নজরুল ইসলামের ৩৪টি নির্বাচিত কবিতার এই সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। সুপরিচিত সোভিয়েট কবি মিখাইল কুরগানত্সেভ কবিতাগুলির অনুবাদ করেছেন, বইটির ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত ভারতবিদ ডঃ ই পি চেলিশেভ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নজরুল ইসলাম কোন নতুন আবিষ্কার নয়। অতীতে রুশ ভাষার সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে তাঁর বহু কবিতার তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৩ সালে যে তাঁর প্রথম কাব্য-সংগ্রহের অনুবাদ সোভিয়েতে প্রকাশিত হয়েছিল একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া, মস্কো ও অন্যান্য সোভিয়েত শহরের সাহিত্যসভায় নজরুলের কবিতার আবৃত্তিও হয়েছে।

নজরুল ইসলামের কবিতার এই সাম্প্রতিক সংস্করণে নিম্নোক্ত অর্থে সমনোযোগ নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে : এতে কবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় কবিতাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিপ্লবী কবিতার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে গীতিকবিতাও, তদুপরি, কবিতাগুলি এমনভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে যাতে তারা কবির জীবনের বিভিন্ন সময়ের প্রতিনিধিমূলক হয়।

আলোচ্য সংস্করণে নজরুলের যে-সমস্ত কবিতা স্থান পেয়েছে এখানে তার সব কটির নামোল্লেখ সম্ভব নয়। তবে নীচে যে কটি নাম উদ্ধৃত করা হচ্ছে তা থেকে পাঠকরা কবিতা নির্বাচনের নীতি সম্পর্কে সম্ভবত খানিক আন্দাজ করতে পারবেন। কবিতাগুলি হল, বিদ্রোহী, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, কুলি-মজুর, হও আগুয়ান, 'আমার ইশ্তাহার, মানুষ, পাপ, অচেনার উদ্দেশে, আমার প্রিয়তমা, নির্জন বনপথ, ফুলের উৎসব, আশা, প্রেমই আমারে করিয়াছে কবি, ইত্যাদি।

সোভিয়েত সাহিত্য সমালোচকরা নজরুল ইসলামের কবিতার মূল্যায়ন করেছেন কিভাবে? মনে রাখতে হবে, সমা-

লোচকদের এই মতামত অনেক পরিমাণে সোভিয়েত পাঠকদের মতামত হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। আলোচ্য কবিতাগ্রন্থের ভূমিকায় এই মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে বিধৃত। আগেই বলা হয়েছে, ভূমিকাটি লিখেছেন অধ্যাপক এভগেনি চেলিশেভ, মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক ইনস্টিটুটের এশীয় সাহিত্য বিভাগের প্রধান।

এক দীর্ঘ ভূমিকায় অধ্যাপক চেলিশেভ নজরুল ইসলামের জীবন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় কবির কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন।

অধ্যাপক চেলিশেভের মতে, বাংলায় নজরুল ইসলামের মূল কবিতা ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যে উচ্চতম স্থানের অধিকারী। কবিতায় উচ্চ মান অর্জনের জন্যে কবিকে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান আহরণ করতে হয়। নজরুল অবশ্য স্কুল-কলেজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পান নি, তবে তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়।

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় নতুন অর্থের ব্যাপ্তি ঘটালেন। কবিতাকে করে তুললেন জঙ্গী, গণচরিত্রে বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনা বিকাশের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

নজরুলের কবিতা মানুষের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজ সমস্যা সমাধানে সংগ্রাম করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তা। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আস্থা গভীর বলে স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের জয়গানে তাঁর কাব্য মুখর।

অধ্যাপক চেলিশেভ নজরুল ইসলামের কবিতার অপর এক বৈশিষ্ট্যের দিকেও আলোকপাত করেছেন। তা হল, নজরুলের কবিতার গীতলতা, রোমান্টিকতা ও সূক্ষ্ম রুচিবোধ। গীতিকবিতায় কবির সাবেগ, সমুচ্চ, মহৎ অনুভবের প্রকাশ ঘটেছে। ভালোবাসাকে পাপ বলে গণ্য করে যে ভণ্ডামী, তিনি চিরকাল তার বিরুদ্ধে। মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন কবি পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের জন্যে। নজরুলের গীতিকবিতায় সোভিয়েতের এই সাহিত্য-আলোচক ধ্রুপদী ফারসি কবিতার—হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

অধ্যাপক চেলিশেভ বলেছেন, নজরুল এক নতুন ধরনের বাঙালী কবি। বাংলা কবিতার পূর্ববর্তী নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে সমকালকে কাব্যে প্রকাশের উপযোগী নতুন কাব্য-প্রকরণ উদ্ভাবন করেছেন তিনি। এবং (রুশ ভাষায় অনূদিত) নজরুলের কবিতার এই প্রকরণ রীতিমত আধুনিক ও য়ুরোপীয় কবিতার সমগোত্রীয়। তবে এতে আমাদের পাওনা আরও কিছু বেশী—এ কবিতায় পাওয়া যায় প্রাচী পৃথিবীর স্বাদ।

নবীন লেখক সম্মেলনে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্তোষকুমার ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়
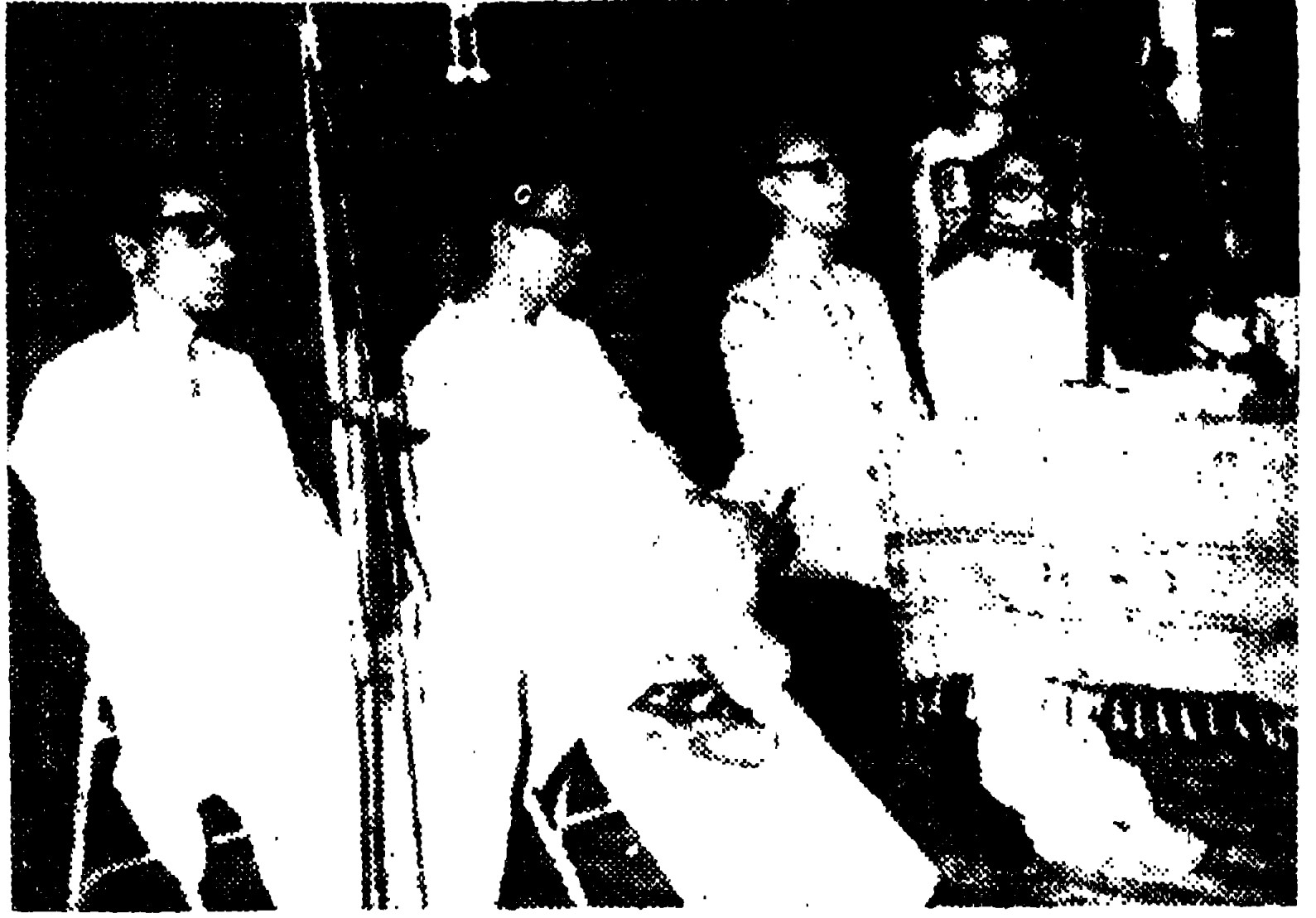
এই সোভিয়েত অধ্যাপকের ভূমিকা থেকে সোভিয়েতের পাঠকরা একটি নতুন কথা জানতে পেরেছেন। বাংলায় বিশ্বখ্যাত বিপ্লবী গান 'ইণ্টারন্যাশনাল' অনুবাদের বিশেষ সম্মান ও কৃতিত্ব নজরুলেরই প্রাপ্য।

নজরুল-কাব্যের অনুবাদক মিখাইল কুরগানতসেভ প্রভৃত ধন্যবাদের পাত্র। কুরগানতসেভের ঘনিষ্ঠ মহল জানেন, তিনি তাঁর সমগ্র জীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় নিয়োগ করেছেন। নজরুল ইসলামের কবিতার আলোচ্য নতুন সংস্করণটির প্রকাশ বাংলা ভাষার সোভিয়েত গবেষক হিসেবে তাঁর পারঙ্গমতার আরেকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সাহিত্যের খবর

নবীন লেখক সম্মেলন: রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ এবং সংলগ্ন মুক্তাঙ্গনে নবীন লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ মে। সম্মেলন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রমা রায় ও পরিমল গুপ্ত। সভানেত্রী ঐন্দ্রিলা চৌধুরী। সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন পরিচিতি, সেউতি এবং সুপর্ণ পত্রিকাগোষ্ঠী। এই অভিনব সাহিত্য সম্মেলন শুরু হয় মুক্ত-অঙ্গনে। সেখানে নবীন সাহিত্যসেবীরা রচনা পাঠ ও আলোচনা করেন। মঞ্চে অনুষ্ঠিত সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। নবীন সাহিত্যিকদের অনেকেই আলোচনায় যোগ দেন। কেউ গল্প কেউ বা প্রবন্ধ বা কবিতা পড়েন। স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিত সিংহ, শান্তি লাহিড়ী এবং আরো কয়েক জন। অনুষ্ঠান শেষে সঙ্গীত, নৃত্যগীতি এবং যন্ত্রসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছিল

একটি নতুন পত্রিকা জন্মলাভ করেছে কিন্তু পড়বার নয়। শোনবার। নামও সেজন্যে 'শ্রবণী'। আকাশবাণী কলকাতা কে থেকে সম্প্রচারিত হতে শুরু করেছে ২৩ মে থেকে। প্রথম দুটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ, বনফুল, সত্যজিৎ রায়, বিমল মি সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ অনেকের কবিত নিবন্ধ, গল্প কথিকা ইত্যাদি শোনা গেল অনুষ্ঠান দুটি রীতিমত রসোত্তীর্ণ হয়ে বলা চলে। পরিকল্পনাটি অভিনব, অ কোন বেতারে আগে কখনো এ ধরনে পত্রিকা প্রচারিত হয়েছে বলে শোনা য নি। আকাশবাণী এজন্যে গৌরব বো করতে পারেন।

নতুন বই

অপরাধ জগতের ভাষা—ডঃ ভক্তিপ্রস মল্লিক। মূল্য: পাঁচ টাকা। **অপর জগতের শব্দকোষ—ডঃ ভক্তিপ্রস** মল্লিক। মূল্য: পাঁচ টাকা। নবভার পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রো কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত।

ইদানীন্তনকালে বাংলা ভাষায় যে ব বিচিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে চলে 'অপরাধ জগতের ভাষা' ও 'অপরাধ জগতে শব্দকোষ' গ্রন্থ দুখানি তারই নিদর্শ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষ ইতিপূর্বে নানা ধরনের কোষগ্রন্থ প্রকাশি

হয়েছে বটে, কিন্তু অজ্ঞাত অপরাধ-জগৎ সম্বন্ধে এবংবিধ কোন কোষগ্রন্থ এযাবৎ প্রকাশিত হয়নি। ডঃ ভক্তিভূষণ মল্লিক উপযুক্ত দুখানি গ্রন্থের মধ্যে সে কার্য অত্যন্ত যত্নসহকারে ও দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেছেন।

ইংরেজী থেকে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, জীববিদ্যা, দর্শন বা রসায়ন সম্বন্ধে কোন পারিভাষিক শব্দকোষ প্রণয়ন এমন কিছু দুরূহ কার্য নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন আভিধানিক সহায়তা লাভ করা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানীয় উপভাষা, বিভাষা এবং রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর অ-বাঙালীদের 'স' ধন্যাত্মক ভাষার সংমিশ্রণে যে অপরাধ-জগতের ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন ব্যক্ত হয়েছে ডঃ মল্লিকের এই দুখানি মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে।

'অপরাধ-জগতের ভাষা' সূচনা থেকে সাতটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। এর প্রত্যেকটিই আলোচিত হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রণালীতে এবং বিষয়ানুগ তথ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে কি পরিমাণ অবহিত, তা অধ্যায়গুলি যত্নসহকারে পাঠ করলেই অনুভূত হয়। অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে—পশ্চিম বাংলার অপরাধ-জগৎ, নিষেধ ও কুসংস্কার, ইঙ্গিত ভাষার কারিকুরি, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও শব্দার্থ তত্ত্ব। মূলতঃ সমূহ বিষয়টিই ভাষাতত্ত্বের অঙ্গীভূত এবং বিভিন্ন প্রদেশের 'কগনি' বা 'ডায়লেক্টের মত, অপরাধ-জগতেরও এই নিজস্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষার পরিধি যে কি পরিমাণ বিস্তৃত তা সম্যকভাবে বিধৃত হয়েছে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ'-এর মধ্যে। এই কোষগ্রন্থের শেষাংশে শব্দের 'ভার প্রয়োগ' অংশটিও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আমরা বাংলা ভাষায় এরূপ দুখানি বিশিষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে সাধুবাদ দিই।

ওমর খৈয়াম—সুরেশচন্দ্র নন্দী। বসুমতী প্রাইভেট লিঃ, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: সাড়ে তিন টাকা।

আমরা ওমর খৈয়ামকে জানি কবি হিসাবে তাঁর রোবাইয়াৎ বা রুবাইগুলির অনুবাদের মাধ্যমে। কিন্তু কবির জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই অবহিত নই বললেও অত্যুক্তি হয় না। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার সুরেশচন্দ্র নন্দীর পূর্বে এভাবে বাংলায় ওমরের জীবন সম্পর্কে কেউ আলোকপাত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে কেন যে কেউ অগ্রসর হননি, তা কিছুটা অনুমান করা যায় এই গ্রন্থটি পাঠ করলে। আসলে ওমরের জীবন-কাহিনী রচনা করতে গেলে উপাদান সংগ্রহের জন্য আরব ও পারস্যের প্রাচীন এবং কবির সমকালীন ইতিহাস মন্থন করতে হয়, যা কঠোর শ্রম ও গভীর গবেষণা সাপেক্ষ।

কবির কবিতা ও কাব্যের মধ্যে তাঁর ভাবময় জীবনকে আমরা জ্ঞাত হই, কিন্তু কি প্রকারে কবির সেই কবি-জীবনের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে তা জানতে হলে তাঁর বাস্তব-জীবনের অনুসন্ধান প্রয়োজন। লেখক সেই শ্রমসাধ্য প্রয়াসের সার্থক নিদর্শন উপস্থিত করেছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। কবি ওমর খৈয়ামের জীবনীগ্রন্থ হিসাবে এটি একটি অমূল্য সম্পদ।

ওমর কেবলমাত্র কবি ছিলেন না একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ এবং দার্শনিকও ছিলেন। তাঁর রচনা থেকে অবশ্য দার্শনিক দিকের কিছুটা আমরা আবিষ্কার করতে পারলেও বাকী দিকগুলি অজানাই থেকে গেছে। লেখকের এই মহৎ প্রয়াস সম্বন্ধে ভূমিকায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন—'যাঁহারা ওমর বলিতে শুধু বুলবুল ও গোলাপ, সাকী ও মদিরার কথা ভাবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, লোকটি কবি ও ভোগী মাত্র ছিল না—কঠোর গণিতবিদ এবং গভীর দার্শনিকও। ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায়বিচার করিবার জন্য আমরা লেখকের নিকট ঋণী। আশা করি, এই গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওমর এবং মুসলমান জগৎ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস বঙ্গদেশ হইতে দূর হইবে।

অমর জীবন—রবিদাস সাহা রায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা-১২। ৩.২৫ টাকা।

ছোটদের উপযোগী করে গল্পের আকারে লেখা এপার বাংলার চোদ্দজন মহৎ মানুষের এবং ওপার বাংলার এক স্বনামধন্যের জীবনী 'অমর জীবন'-এ স্থান পেয়েছে। এই মহাপ্রাণদের মধ্যে আছেন: রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র, সরোজিনী, বিধানচন্দ্র, মেঘনাদ, সুভাষচন্দ্র, নজরুল এবং ওপার বাংলার শেখ মুজিবুর। লেখার গুণে সমস্ত জীবনীর মধ্যে লেখক প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছেন। বইটি ছোটদের খুশী করবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

পুরী হোটেল (রজতজয়ন্তী সংকলন)—সম্পাদক: অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক শ্রী এস দাস অ্যাসিস্ট্যান্ট সিলভার জুবিলি কমিটি, পুরী হোটেল, পুরী)। দাম উল্লেখ নেই।

পুরী হোটেল একটি বাঙালীর প্রতিষ্ঠান। এক ভাগ্যান্বেষী বিপ্লবী বাঙালী যুবক এবং একজন দুঃসাহসী বাঙালী তরুণী প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে সম্মুখীন হয়েছিলেন আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে। আজ তাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন। সামান্য একটি প্রতিষ্ঠান আজ একটি সুবৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত। এই রজতজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটিতে ডাঃ রমা চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকদের রচনাবলী সঞ্চয়িত হয়েছে। অজস্র চিত্রে সজ্জিত এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরিকল্পনা ও পরিবেশনার অভিনবত্বের জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

কবি ও কবিতা (কাব্য ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক: জগদীশ ভট্টাচার্য। কবি ও কবিতা ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দেড় টাকা।

কবি ও কবিতার ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির মতই মূল্যবান কবিতাসম্ভারে সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষায় যে সব কবি কবিতাদি লিখেছেন তাঁদের অনেকের কবিতা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে অমিয় চক্রবর্তী, জগদীশ ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শামসুর রহমান, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সুশীল গুপ্ত প্রমুখ কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই সংখ্যার পরম সম্পদ সম্পাদক রচিত প্রবন্ধ 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথ লিখিত বিখ্যাত শোক-গাথার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি। সর্বদলের কবিদের মিলন ক্ষেত্র 'কবি ও কবিতা' স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে একথা বলা যায়। পত্রিকাটি সুরুচিসম্পন্নভাবে মুদ্রিত।

প্রথম ভাগের দিনে (কাব্যসংকলন)—গীতা চৌধুরী। প্রকাশক: দীনেশ সান্যাল ৩৫ পঞ্চাননতলা লেন, কলকাতা-৩৬। দু টাকা।

কবিতাগুলি পড়তে মন্দ লাগে না। আধুনিক জীবনযন্ত্রণার ছাপ রয়েছে কয়েকটি কবিতায়। অন্যান্য কবি সাধারণ লিখনরীতিকে গ্রহণ নিলেও প্রকৃত কবিত্বশক্তির ফলে লেখাগুলি মোটামুটি উৎরে গেছে বলা চলে। অনুশীলনে ক্ষান্তি না দিলে ইনি আরো ভালো লিখবেন আশা করা যায়।

ধ্রুপদী কবিতা মাসিকপত্র। সম্পাদক: সুশীল রায়। ধ্রুপদী-৫৯বি কাঁকুলিয়া রোড কলিকাতা-১৯। পঞ্চাশ পয়সা।

একটানা সাড়ে আট বছর 'ধ্রুপদী' কবিতা মাসিক প্রকাশের পর ক্লান্ত কবি সম্পাদক একটু অবকাশ যাপন করেছেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত আরামও ক্লান্তিকর তাই সম্পাদক মহাশয় আবার 'ধ্রুপদী' প্রকাশ করতে মনস্থ করেছেন। কবিতাপ্রেমিক বাঙালী সাহিত্যপাঠক-সমাজে এ এক আনন্দ সংবাদ। দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৭৯)—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, শিশির ভট্টাচার্য, চিত্রিতা দেবী প্রমুখ কবিবৃন্দের অনেকগুলি কবিতা আছে। আনন্দ বাগচী লিখিত 'রূপসী দিনলিপি' এই সংখ্যার একটি মূল্যবান আকর্ষণ। পত্রিকাটি সুমুদ্রিত।

সবারে আমি নমি

কানন দেবী

বিদ্যাপতির গানে রাতারাতি গায়িকারূপে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁদের অবদানের কাছে আমি ঋণী তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে সংগীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়ালের নাম। দেবকীবাবুর কথা ত আগেই বলেছি। কাজী সাহেবের কথায় পরে আসছি।

দেবকীবাবু পদাবলী থেকে 'বিদ্যাপতি' চিত্রের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর গান সংগ্রহ করেছিলেন। সেই গানগুলিতে যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে রাইবাবু সুর দিয়েছিলেন, এবং সেগুলি শিখিয়েছিলেন এবং নাটরস জমিয়ে তোলবার উপযোগী করেছিলেন সে কথা জানি শুধু আমরা, যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। রাইবাবু সবসময় মন্ত্রের মত আমাদের কানের কাছে জপ করতেন ফিল্মে গাইবার সময় গানটাকে শুধু গান বলে ভাবলেই চলবে না। প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে, গানটাও একটা সংলাপ; গল্পের অংশবিশেষ। অতএব গানটা যেখানে গাইতে হবে, সেই সিচুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তার মুড স্টাডি করে নিয়ে সেই মুড এর উপযোগী সুর ও অলংকরণের কাজ চলত। মনে পড়ে একটা মীড়কেই উনি কতরকমভাবে কতবার পাল্টাতেন। যতক্ষণ না ওঁর মনে হোতো চরিত্রের বক্তব্যের সঙ্গে সুরের ছন্দ ঠিক মিলেছে ততক্ষণ উনি কাউকেই রেহাই দিতেন না, এবং এ বিষয়ে নিজের ওপরেও ও'র কঠোরতার সীমা ছিলো না। বিদ্যাপতির গানের কথার উচ্চারণে রাইবাবু মৈথিলী উচ্চারণ পদ্ধতির ওপরই জোর দিয়েছিলেন; এবং গান শেখাবার আগে কড়া পরীক্ষকের মত গানটি আবৃত্তি করিয়ে নিয়ে, প্রতিটি কথার উচ্চারণ চেক করে নিতেন। কথা ও সুরের ওপর যাতে সমান ওজন দেওয়া হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর মতে গতানুগতিকভাবে অস্থায়ী, অন্তরা ইত্যাদি ক্রমপর্যায়ে ফিল্ম-সং-এ চলতে পারে না। নাটকের গতির সঙ্গে তাল রেখে গান আরম্ভ না হলে ছবিতে গান দেওয়ার কোনোই মানে

'মা' চিত্রে বিনয় গোস্বামীর সঙ্গে

হয় না। ড্রামা যদি ক্লাইম্যাকস্‌ পিচ-এ থাকে তবে টপ পিচ থেকেই গান সুরু করতে হবে। যদি কোনো আত্মলীন ভাবনার মুহূর্তে গান দিতে হয়, তবে প্রয়োজন হলে চুপি চুপি কোনো বাজনার সংগত ছাড়াই গান সুরু করতে হবে। দেবকীবাবুর নির্দেশে ভাষা, ভাব, সুর সবই বৈষ্ণব রসানুসারী হয়েছিলো।

উদাহরণতঃ 'অংগনে আওব জব রসিয়া' কৌতুক ও মধুর রসাশ্রিত, গানটি অমর মল্লিকের সংগে ডায়ালগরূপে ব্যবহৃত হয়েছিলো। ঠিক নাটকের সংলাপের মতই কখনও ঠাট্টা কখনও কৃত্রিম দুঃখে নায়িকার হাসি ও রংগ গানের মধ্যে ফোটাতে হবে। এখানে নাটকীয়তাই প্রধান, তাই কখনও ঢিমা লয়ে, কখনও বা দ্রুত লয়ে পরিহাস মুখরতাকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছিলো। একেবারে শেষের চরণে খুব ওপরের দিকে সুর তুলে দিয়েই, একটু থেমে আস্তে আস্তে নীচের পর্দায় নেমে আসতে হবে। কত যত্ন করেই না এসব রাইবাবু শিখিয়েছেন। টেক হবার সময় দু' হাত তুলে রাইবাবু দাঁড়িয়ে থাকতেন। ও'র হাত নাড়া ও চোখের ভাষা দেখে বুঝে নিতে হোতো গাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা। প্রতি মুহূর্তে সে কি উৎকণ্ঠা! ও'র চোখে প্রসন্ন আলো জ্বলে উঠলেই বুঝতাম পরীক্ষায় পাশ। তখন সে কি আনন্দ! আজ মনে হয় কাজ করার মধ্যে যে কত আনন্দ, কত রোমাঞ্চকর উত্তেজনা থাকতে পারে, সে উপলব্ধি আমাদের যুগের শিল্পীদের যেমন হয়েছে, এখনকার যুগের শিল্পীরা কি তার ধারকাছ দিয়েও গেছেন? এখন বক্স-অফিসের গায়িকা দিয়ে 'মিউজিক টেক' হচ্ছে এক জায়গায়, সুটিং চলছে অন্য জায়গায়। টেকনিকের কত অভাবনীয় অগ্রগতি। সবার কাজকর্ম কত সহজ হয়ে গেছে, ভুলচুকের সম্ভাবনাও কম। এখান থেকে, ওখান থেকে টুকরো টুকরো ফিনিশড প্রোডাক্ট্‌ জোড়া দিয়ে এক নিমেষে মেশিনের মত নিখুঁতভাবে কাজ হয়ে যায়। কিন্তু আজকের কোনো সৃষ্টি পরিচালক থেকে, টেকনিশিয়ান থেকে শিল্পী এবং মেক-আপম্যান অবধি সবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিন্তাভাবনা, শিক্ষা, উৎকন্ঠা, নিষ্ঠা এবং সবার ওপর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের এক সু-সম্পূর্ণ মালা হয়ে দোলে না ত? আগেকার ছবিতে হয়ত ত্রুটি ছিল অসংখ্য। কিছুটা আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবজনিত, কিছু বা প্রথম যুগের কর্মীদের অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে। কিন্তু সকল অপূর্ণতা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠত যার প্রসাদে সে হোলো প্রতিটি কর্মীর প্রাণপ্রাচুর্যের ঐশ্বর্য। এই প্রাণবন্ততার ফলেই হয়ত সেদিনের ছবি আজকের দর্শকদেরও আনন্দ দিতে পারে। মনে আছে, বিদ্যাপতির ক্রেডিট টাইটেল থেকে সুরু করে প্রথম দৃশ্য অবধি একই সংগীতের ধারা চলছে কখনও বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করে, কখনও বসন্তোৎসব বর্ণনা করে। আর কত না সুরের বৈচিত্র্য! রাইবাবুর অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল বলেই এতরকম সুরের আনাগোনার এমন হার্মোনাইজেশন সম্ভব হয়েছিল! মনে আছে টেকিং-এ মাত্র ১২ মিনিট সময় লেগেছিলো। টেকিং-এর আগে রাইবাবু শাসিয়েছিলেন, '৪টে চান্স দেব। তার বেশী নয়।' কিন্তু তার দরকার হয়নি। দুটো শটেই হয়ে গিয়েছিলো। তার আগে অবশ্য রিহার্সাল চলেছিলো অন্ততপক্ষে দুশো বার। খোলা জায়গায় (স্টুডিওর ঘরে না) টেকিং-এর দৃশ্যটি এখনও চোখের সামনে ভাসে। চারদিকে মিঃ বি এন সরকার, মিঃ বড়ুয়া, পি এন রায় ইত্যাদি নিউ-থিয়েটার্সের সব হোমরা-চোমরারা সবাই সাগ্রহে বসে। বাইরে প্রচণ্ড ভীড়। সবার সামনে যেন এক মহাপরীক্ষা, আবার মহা-উৎসবও। এই উৎসবের আবহাওয়ার সপ্রাণতা আত্মপ্রকাশের প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত করেছিল বলেই কি বিদ্যাপতির অনুরাধাকে সকলে এত ভালবেসেছিলেন?

একটা কথা আগেই বলেছি, 'বিদ্যাপতি' ছবি 'মুক্তি'র আগে হলেও নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে আমার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল 'মুক্তি' (১৯৩৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর)। বিদ্যাপতি রিলিজড্‌ হয়েছিল তারও অনেক পরে ১৯৩৮ অব্দের ২২শে

ঐশ্রিক। আর কোলকাতার বাইরে বোম্বে ও করাচীতে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 'বিদ্যাপতি' দেখানো হয়, সেও কিন্তু হিন্দি 'মুক্তি' পর্দার বুকে মুক্ত হবার তিন মাস বাদে।

এবার 'মুক্তি'র অধ্যায়।

'মুক্তি' ও প্রমথেশ বড়ুয়া প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটু বেশী ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসতে ইচ্ছে করছে। এ হোলো একান্তই আমার অন্তরের অন্দর মহলের কথা।

আজ আমার অভিনেত্রী পরিচয়টাই সকলের কাছে বড়। কিন্তু আমার নিজের কাছে সবচেয়ে বেশী দামী আমার গানের মহল। ফিল্মের প্রয়োজনে যেটুকু গান গেয়েছি আমার গানের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় ঠিক ততটুকুই। কিন্তু আমার নিজের সঙ্গে গানের পরিচয়ের নিবিড় মুহূর্তটির যে মাধুর্য জীবনের অনেক তিক্ততাকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল সেই অনামা অনুভূতির কাছেও ত আমার ঋণ কম নয়। তার মধ্যেই যে আমার জীবন-বিধাতার স্নেহস্পর্শের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঘটেছে। নানা কাজে ছড়িয়ে পড়া জীবনটা যেন বাঁচার তাগিদেই সংকুচিত হয়ে গানের অতল রহস্যের মধ্যে আশ্রয় চাইত। ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই গানকে ভালবেসেছি, সে কথা আগেই বলেছি। যেখানেই গান হোতো মন্ত্রমুগ্ধের মত অজান্তেই কখন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনতে শুরু করেছি হুঁশই থাকত না। হুঁশ ফিরত যখন দিদি গিয়ে স্নান করা বা খাবার জন্য ধরে আনত। এই প্রসঙ্গে ভোলাদার কথা আগেই বলেছি (অমৃত পুজো সংখ্যায়)। ভোলাদা আদর করে যে কয়েকটি গান শিখিয়েছিলেন--সেই কয়েকটি গান মাত্রই আমার সম্বল ছিল। সময় পেলেই একান্তে বসে সেই গানগুলিই আপনমনে গাইতাম। দীন-দরিদ্র মানুষ সময় পেলেই লুকিয়ে রাখা সামান্য সম্পত্তি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে গোপনে নাড়াচাড়া করে যে ধরনের তৃপ্তি পায় অশিক্ষিত পটুত্ব নিয়ে গানগুলি গাওয়ার সময় ঠিক সেই ধরনেরই একটা আনন্দে যেন মেতে উঠতাম।
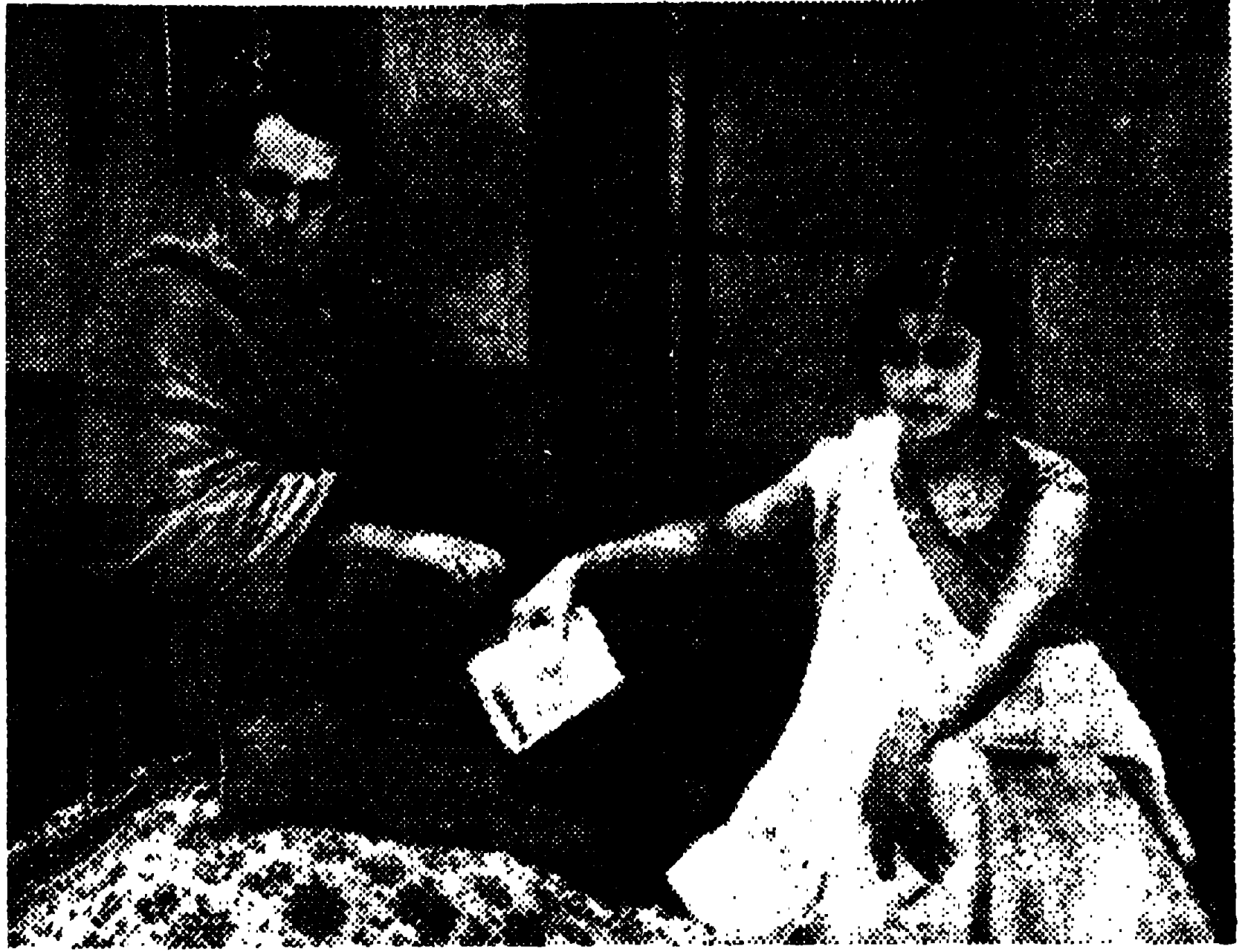
হিন্দী মা চিত্রে জাল মার্চেন্টের সংগে

হিন্দী কণ্ঠহার চিত্রে জহর গাঙ্গুলীর সংগে

ম্যাডান থিয়েটার্সে কাজ করার সময়ই অর্থকষ্ট একটু লাঘব হওয়ার সংগে সংগেই আল্লা রাক্কা নামে এক ওস্তাদের কাছে গান শিখতে শুরু করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে ইনি লক্ষ্ণৌ-এর এক ওস্তাদ। আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কত যত্ন করে যে নানারকম পাল্টা সার্গম শেখাতেন। রোজ ভোরে উঠে গলায় পাতলা চাদর জড়িয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে প্রথমে পনের, তারপর আধ ঘণ্টা পরে দু ঘণ্টা অবধি গলা সাধতে বলতেন। কত উৎসাহ দিতেন 'বেটি আচ্ছাসে রেওয়াজ কর। দেখবে সারা হিন্দুস্থান তোমার কত ইজ্জৎ হবে, নাম হবে। রাজা উজীর তোমার সেলাম করবে।' কল্পিত সেই যশোগৌরবের ছবি দেখে খুশিতে মন ভরে উঠত। এক-একটি রাগ শিখতাম আর মনে হোতো যেন স্বপ্ন-দিয়ে-ঘেরা ঘুমন্ত রাজপুরীর এক-একটি ঘরের দুয়ার খুলে যাচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলা গাইবার জন্য ইমন রাগের একটি গান শিখিয়েছিলেন—'সব গুণীজন ইমন গাওত'—এই ধরনের বোল্‌ ছিল।

মুক্তি চিত্রে প্রমথেশ বড়ুয়া এবং কানন দেবী

কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই 'ইমন' রাগটা তখন একেবারেই ভাল লাগেনি। 'ইমন'কে ভাল লেগেছে অনেক পরে। পরিণত বয়সে যখন সংগীত জীবনের সংগে দেনাপাওনা একরকম চুকে আসছে তখন 'ইমন' রাগটা শুনলেই যেন আবছা একটা মন কেমন করার ভাব জেগে উঠত। কিন্তু সে অনেক পরে। প্রথম শিখতে শুরু করার সময় কিন্তু অত্যন্ত নীরস লেগেছিল এ রাগ। ওস্তাদ সেকথা বুঝতে পেরে 'ইমন' পাল্টে 'পূবী'—রাগ দিলেন। 'পূবী'র উদাস করা সুর শুনতে না শুনতে মন লুফে নিল। 'পূবী' গাইবার সময় মনের মধ্যে একটা ছবি ভেসে উঠত। পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। দিনের আলোর বিদায়ী বিষণ্ণতা যেন আকাশের বুকের অস্ত আভায় স্থির হয়ে আছে। আর সেই আলোতেই যেন কোন্ ঘর-ছাড়া বৈরাগী আপনমনে গান গাইতে গাইতে চলেছে। সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার সুরই কি পূবী? সকালের দিকে 'ভৈরব' রাগ শোনা-মাত্রই যেন ভৈরবের চরণে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম। 'ভোঁরো'-র মধ্যেও উদাসী ভাব আছে। কিন্তু এ উদাসীনতার জাত আলাদা। পূরবীর মত নিজেকে গুটিয়ে নেবার বিষণ্ণতা এতে নেই। এ যেন জীবনকে ফুলের কুঁড়ির মত দল মেলে জেগে ওঠবার প্রেরণা দেয়। কিন্তু সংগে সংগে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় মনকে মুক্ত রাখতে না পারলেই মরণ। 'ভোঁরো' শেখাবার সময় ওস্তাদ বারবার এইসব কথা শোনাতেন বলেই হয়ত গাইবার সময় চেনা মহলের অতি-পরিচিত জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হোতো। আর এ মনে হওয়ার মধ্যে এমন এক আনন্দের স্বাদ পেতাম যা আগে কখনও পাইনি।

রাত্রের খুব বেশী রাগ শিখিনি। কিন্তু যে কটি রাগ শিখেছিলাম তার মধ্যে 'বেহাগ' রাগটিই আমার মনের মত। এ রাগের অন্তরে বিরহিনীর দুঃসহ বেদনা গুমরে মরছে! কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করতে নিজের সম্ভ্রমে বাধছে। তাই বাইরের গাম্ভীর্য দিয়ে রুদ্ধ বেদনার বাঁধ বেঁধে রাখা হয়েছে এমনই একটা অনুভব হোতো। ওস্তাদ হেসে বলতেন 'বেটী ভাল করে সাধলে এ রাগে তুমি সিদ্ধ হতে পারবে। কারণ তোমার স্বভাবের সঙ্গে এ রাগের বিলকুল মিল।' কিন্তু সিদ্ধ হওয়ায়ও ভাগ্য থাকা চাই ত; হয়ত সে ভাগ্য করে আসিনি বলেই সিদ্ধ হওয়া আর হোলো না।

ওস্তাদ যেভাবে চাইতেন ঠিক সেভাবে রেওয়াজ করার ইচ্ছে থাকলেও স্টুডিওর কাজের চাপে ঠিক সময় পেতাম না। তাই ক্ষুণ্ণ হয়ে উনি একদিন বিদায় নিলেন। যাবার আগে দুঃখ করে বলেছিলেন 'আজ যশ ও অর্থের মোহে তুমি কতবড় জিনিস হারালে সেকথা একদিন বুঝবে। খোদাতালা তোমাকে যে কণ্ঠ দিয়েছিলেন মানুষ বহু সাধনা করেও তা পায় না। তাকে বে-খাতির করে শুধু সস্তা নাম ও অর্থ উপার্জনের কাজে বাজে খরচ করলে। একদিন দেখবে নিজের বলতে তোমার কিছুই থাকবে না। সেদিন কিন্তু আফশোস করতে হবে।'

আজ আমার কর্মজীবনের মুখরতা [illegible] অনেক কমে গেছে। কিন্তু বাইরের [illegible] থেকে অনেকখানিই গুটিয়ে নেওয়া [illegible]নেই বা চুপ করে বসে ভাববার অবকাশ [illegible]টুকু পাওয়া যায়? তবু ওরই ফাঁকে ঘুম-না-হওয়া কোনো রাতে যখন বাগানের মধ্যে পায়চারী করি ফুটন্ত পরিপূর্ণতায় উপচে-পড়া ডালিয়া ফুলগুলো দেখে মনে হয় জীবনে এমন অনেক কিছুই পেয়েছি যা পাবার কল্পনাও কোনোদিন করিনি অথবা পাবার যোগ্যতা আছে বলে ভাবিনি।

নানা দিক দিয়ে আমার ওপর বিধাতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের অন্ত নেই। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক থেকে গেছে যা কোনোদিন পূর্ণ হবার নয়।

সারাদিনে জীবন যেন বড় বেশী ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যা তাকে গুছিয়ে আনে। অজানা রহস্যের ভূমিকায় যেন সে সংকুচিত হয়ে আসে। রাত্রির জমাট অন্ধকারই যেন জীবনরহস্যকে ঘন করে তোলে। তখন সৃষ্টির প্রতি কোণ থেকে বিষণ্ণ উদাস জিজ্ঞাসা জীবন হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ চায়। তাদের বোবা ভাষা শুনতে পাই, কিন্তু জবাব দিতে পারি না। কারণ এ জবাব নিজেই যে খুঁজে পাইনি। (চলবে)

অনুলিখন : সন্ধ্যা সেন

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥২০॥

দাদার মেজছেলে কলকাতায় থেকে চাকরি করে—এই খবরটুকু নিভার কাছ থেকে বার করতে পেরেছিল। ঐ একজনই কলকাতায় থাকে, ছোটটিকে কোন শিষ্য উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল, সেই-খানেই কলেজে পড়ে, সম্প্রতি কোন ইস্কুলে মাস্টারীতে ঢুকেছে।

কলকাতায় থাকে এই খবরটুকু মাত্র পেয়েছিল, ঠিকানা পায় নি। বোধহয় ইচ্ছে করেই দেয়নি তখন—পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে দুতিনখানা চিঠি লেখার পর নিভা ঠিকানা লিখে পাঠাল। কাছেই—সার্পেনটাইন লেনের ঠিকানা।

পরের শনিবার নিমাইকে পাঠাল হেমন্ত সুরেনের খোঁজে। ফিরে এসে নিমাই যা খবর দিল তাতে চোখ ফেটে জল আসার যোগাড়। মেসে থাকলে খরচ বেশী, তাছাড়া যে-কোন ঠাকুর-নামধারী লোকের হাতে খেতে হয়, তাদের অনেকেই বামুন নয়, চাকরির জন্যে একগাছা পৈতে গলায় ঝুলিয়ে মেসে হোটেলে রাঁধতে আসে। তাছাড়া সেও সত্যিক জাতের ছোঁয়া নেপা; বাসনপত্র ভাল করে মাজা হয় না—বলতে গেলে সকলকার এঁটো খাওয়া। সুরেন তাতে রাজী নয়। ওদের বাড়ির নিয়ম-সংস্কার অনেক ত্যাগ করেছে—গুরু বংশের নিষ্ঠা—এইটুকু এখনও ছাড়তে পারে নি।

এইসব কারণেই সে একটা ঘরভাড়া করে থাকে। সার্পেনটাইন লেন অনেকখানের গলি, চারদিকেই বড় বড় বাড়ি। কিন্তু ওদেরটা পাকা বাড়ি নয়। মাটকোঠা যাকে বলে তাই। দেওয়াল মাটির টিনের চাল। তবে তার মধ্যেও দোতলা, একতলার ছাদ বা দোতলার মেঝে, যা-ই বলুন, কাঠের ওপর আধা পাকা অর্থাৎ একটু চুনসুরকী খোয়া পেটা আছে তার ওপর মাটি লেপা। একতলায় ঘরের মেঝেগুলো বিলিতী মাটির—কিন্তু ওপরে অত খরচ করতে পারেন নি বাড়িওলা। এটুকু করেছেন, যাতে দৈবাৎ জলটল বেশী পরিমাণ পড়ে গেলেও নিচের ঘরে যাতে না পড়ে সেই জন্যে। দোতলার দেওয়াল অবিশ্যি মাটির নয়, করোগেট টিনের, কাঠের ফ্রেমে আটকানো।...এমন হাল্কা ফঙ্গবেনেভাবে তৈরী যে দোতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলে কি ঘরের মেঝেতে জোরে পা ফেললে সব মেঝেটা নাচতে থাকে।

এই মাটকোঠারই একটা ঘর নিয়ে থাকে সুরেন।

একটা ঘর নিয়েই থাকে, মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায়। অন্য অন্য ঘরে তিন চারজন পর্যন্ত আছেন, ঐ ভাড়াই ভাগ করে দেন। তবে তাঁরা বেশিরভাগই বাইরে, হোটেলে বা অন্য কারও মেসে খান। সুরেন নিজে রান্না করে—তোলা উনুন ধরিয়ে। ফলে ঐ ঘরের মধ্যেই কেরোসিন কাঠের বাক্সে কয়লা ঘুঁটে ইত্যাদি রাখতে হয়। বেশি পয়সা দিয়ে দোকান থেকেই কয়লা ভাঙিয়ে আনতে হয়। তাও স্থানাভাবে দশ-পনেরো সেরের বেশী একসঙ্গে আনা যায় না। যারা নিচের ঘরে থাকে তারা উঠোনটা পায়, বাঁধানো উঠোন। কিন্তু নিচেটা এত নোংরা করে রাখে সেই জন্যেই যে, সুরেন নিচের ঘর নেয়নি। নইলে ভাড়াও এক টাকা কম হত।

ঘুঁটে কয়লা ছাড়াও, ঐ এক ফালি ঘরের মধ্যেই মাটির হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভাঁড়ার থাকে। পেতলের বোগনো চাটু কড়া থালা বাসন সব। মায় কলসীতে জল—একটা খাওয়ার, দুটো রান্নার। এরই মধ্যে এক প্রান্তে একটি সংকীর্ণ, সামান্য বিছানা—সাতরঞ্জি কম্বল আর চাদর পাতা। শীতকালের কী একটা—লেপ বা কাঁথা—পুঁটুলি বাঁধা বাঁশের আড়াতে টাঙানো।

ব্যারাক মতো বাড়ি—নিচে ওপরে টানা দুহাত বারান্দার গায়ে সারবন্দী ঘর পাশাপাশি, চারখানা করে। নিজে রেঁধে খায় বলে একেবারে কোনের ঘরটা নিয়েছে সুরেন। ফলে সমস্ত জল নিচে থেকে টানতে হয়—দুটো টানা বারান্দা পেরিয়ে বালতি করে তোলা। রাত্রে যখন আসে তখন কলে জল থাকে না বেশিরভাগ দিনই, তাই ভোর চারটেয় উঠে এই জল বই করে প্রত্যহ। রাত চারটেয় না উঠলে অতক্ষণ কল কেউ ছেড়ে দেবে না। আর এত নোংরা করে রাখে কলতলা যে ভাল করে না ধুয়ে নিজের রান্না খাওয়ার জল নিতে ইচ্ছে করে না সেখান থেকে।

জল বওয়া ছাড়া বাসনও মাজতে হয় মধ্যে মধ্যে। একটা ঠিকে ঝি আছে বাসন মাজার জন্যে, মাসিক এক টাকা মাইনে নেয়। ভোরে এসে মেজে দিয়ে যাবে এই কথা—কিন্তু দেরি হয়ে গেলে, মানে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলে আর অপেক্ষা করতে পারে না। তখন মেজে না নিলে পড়েই থাকবে সারা-দিন। এমনিই একটু সময় হাতে রাখতে হয়, ঝি মেজে দিয়ে গেলে স্নানের আগে বাসনগুলো একবার ধুয়ে দেখে নেয় নিজে। এক একদিন ওর বাসন মাজা শেষ হবার পর ঝি এসে পড়ে।

'কিন্তু উপায় কি বলুন?' সুরেন বলেছে, 'এক টাকা মাইনে দিয়ে তো আর তার মাথা কিনে নিই নি, তার হাতেও কিছু ঘড়ি বাঁধা নেই। রোজ্ যদি ঠিক সময়ে তার ঘুম না ভাঙে তো দোষ দেওয়া যায় না। আমি কোম্পানীর চাকরি করি—ঠিক সময়ে হাজিরে দিতে বাধ্য, সে তো আমাদের মতো ফক্কিগড়ের নবাবের কাজ করে, তার অত কিসের বাধ্যবাধকতা বলুন?'

রান্নাটা একবেলাই করে সুরেন। ফলে খাওয়ার ধারাটা বড় বিচিত্র। আপিস থেকে

ফিরে এসে উনুনে আঁচ দিয়ে ভাত রুটি দুইই করে। রাত্রে ভাতটা খায়—রুটি আর তার সঙ্গে সামান্য কিছু ভাজাভুজি, শীতকালে তরকারিই থাকে—সকালে খেয়ে আপিসে চলে যায়। বাধ্য হয়েই নাকি এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাকে। পোর্ট কমিশনারের আপিসে কাজ করে, সকাল আটটার মধ্যে সেখানে পৌঁছানো যায় না। শীতকালে সাড়ে ছটাতেও ঘোর ঘোর থাকে, তখন তার মধ্যে রান্না করে খেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থা বদলায় শুধু রবিবারে। তবে সেদিন দিনের বেলায় রান্না হয় যেমন তেমনি সোমবার চিঁড়ে খেয়ে আপিসে যেতে হয়। সকালের রুটি পরের দিন সকালে খেয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে চিঁড়ে গুড় ঢের ভাল।

অবশ্য মাসে একটা রবিবার বাড়ি যায়, সেদিনটায় রান্নার ছুটি। ঐ একটা দিন মায়ের হাতে খেতে পাবে সেই আশায় মাসের বাকী উনত্রিশদিন দিন গোনে। তার জন্যে গাড়ির ধকল বড় কম সইতে হয় না, খরচও হয় বিস্তর, তবু মাসে অন্তত একদিনও মা বাবা ভাইদের দেখতে না পেলে যেন হাঁপ ধরে, শারীরিক কষ্ট অনুভব করে একটা।

নিমাই অনেক করে—কাকুতিমিনতি করে বলে এসেছিল—হাত জোড় করে বলেছিল, নইলে জ্যাঠাইমা নিজেই এসে হাজির হবেন বলে ভয়ও দেখিয়েছিল—হয়ত সেই কারণেই সুরেন পরের দিন দুপুর বেলা এসে দেখা করল।

এই প্রথম দেখল হেমন্ত। এতদিন পরে। সুন্দর দেখতে, সুপুরুষ যাকে বলে তাই। ওদের বংশের মতোই চেহারা পেয়েছে। বয়সে নিমাইয়ের থেকে কমই হবে, হয়ত সাতাশ আটাশ কি আরও কম।

দুজনেরই দুজনের সঙ্গে এই প্রথম দেখা। একটু আড়ষ্ট ভাব তো থাকবেই। সুরেনেরই বেশী। অনেক শুনেছে সে এই পিসীর সম্বন্ধে। অনেক খারাপ কথাও শুনেছে। বাপের মৃত্যুশয্যাতে খবর পেয়েও দেখতে আসে নি। দাদাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এমনি অনেক কথাই।

হেমন্তর লজ্জার চেয়ে কুণ্ঠাই বেশী। কতটা শুনেছে এ ছেলেটা কে জানে, সে হৃদয়হীন অমানুষ—শুধু এইটুকু, না আরও ঢের বেশী? সে দাইয়ের কাজ করেছে, স্বভাবচরিত্র খারাপ—এধরনের কথাও? সেইটে আঁচ করতে না পারার জন্যেই তার অস্বস্তি, কুণ্ঠা বেশী।

সহজ করে দিল নিমাইচরণই কতকটা। সুরেনের জীবনযাত্রার বিবরণী কালই ফিরে এসে যথেষ্ট দিয়েছে—সেইটেরই আবার আদ্যোপান্ত পুনরাবৃত্তি করতে বসল, কিছু বাড়তি রঙ টীকাটিপ্পনি সুদ্ধ। মানুষেরই স্বধর্ম এটা। কোন ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে প্রতিবারেই কিছু কিছু কাল্পনিক কথা যোগ হয়, ক্রমশ সেগুলো বক্তারও বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায়। অনেক সময় যেটা ভুলে যায় সেই ফাঁকটা কল্পনায় ভরায়—নিজেও সেটা সত্য ভাবে। এক্ষেত্রেই বা তার অন্যথা হবে কেন? ফলে লজ্জা পেয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল সুরেন, আর সেই প্রসঙ্গে হেমন্তও দুটো বলবার মতো কথা পেল। এইভাবেই প্রথম
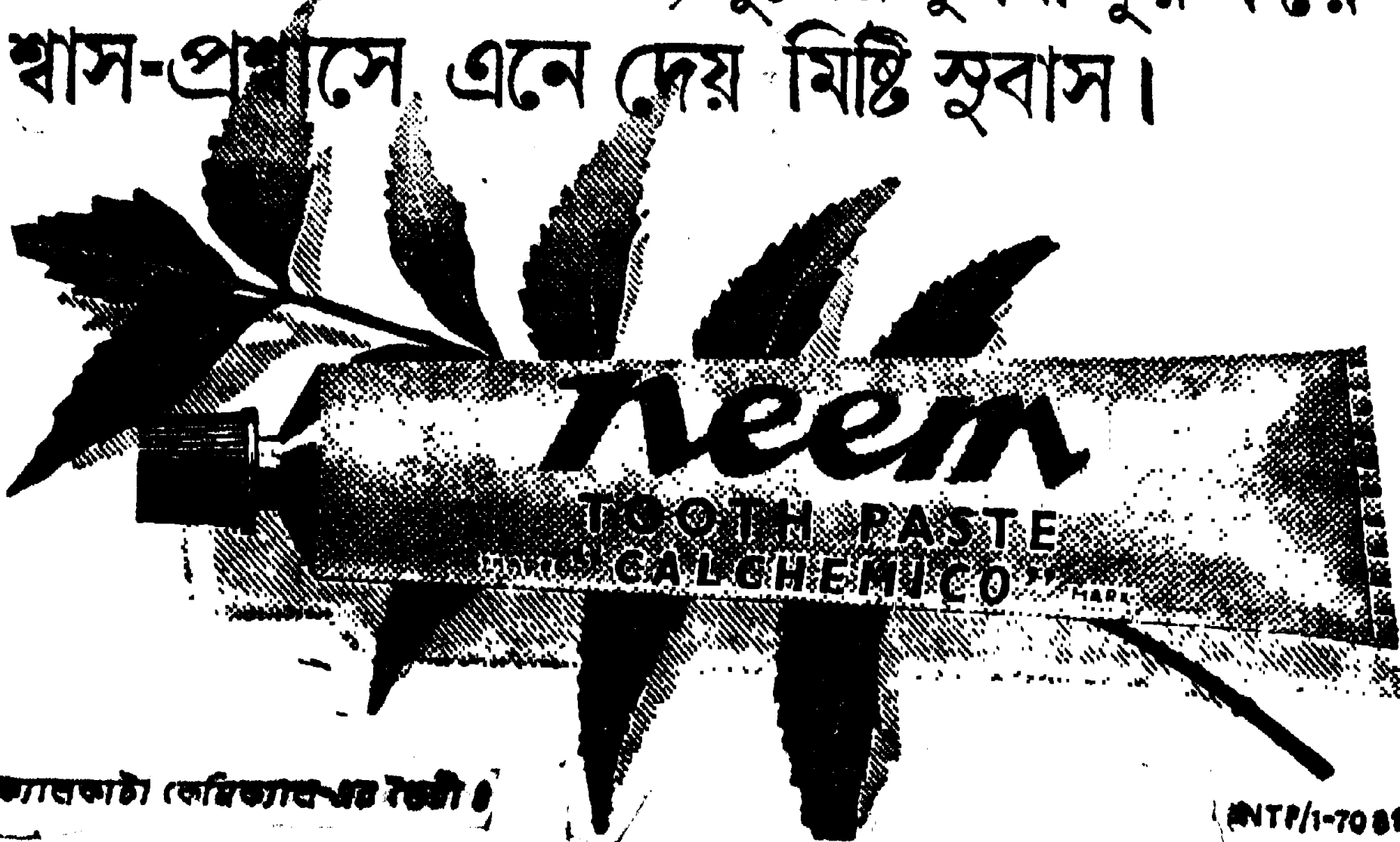
...কার আড়ষ্টতা কমে এল আস্তে ...স্তে।

এইবার জানা গেল নিভা সুরেনকেও ...সীর ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখেছে, দেখা ...রতে লিখেছে বারবার। পিসীর প্রশংসায় ...ন পঞ্চমুখ, অমন ভালমানুষ যে কেউ হয়, ...নুষকে অমন ভালবাসতে পারে—তা তার ...না ছিল না। পিসীর সম্বন্ধে ওদের যা ...রণা ছিল তা নাকি সব ভুল, নিশ্চয় ভুল ...বোঝাবুঝির ওপরই এতটা ছাড়াছাড়ি হয়ে ...গিয়েছিল। তাছাড়া পিসীর ওপর যে তাঁর ...বা অনেক অবিচার করেছিলেন সে তো ...রেন বাবার মুখেই শুনেছে। ইত্যাদি—

অনেকক্ষণ গল্প করার পর—যে কথাটা ...সই প্রথম থেকে বলার জন্য উশখুশ ...রছিল, সঙ্কোচে বলতে পারে নি—...সইটেই ভরসা করে বলে ফেলল হেমন্ত। ...যেরকম নিষ্ঠার কথা শুনেছে, বলতে সাহস ...য় না—বাজারের সন্দেশ রসগোল্লা খাবে ...তো সুরেন?

'খুব, খুব!' সুরেন লজ্জা পায়, ...নিমাইদার কথা শোনেন কেন!... ...কলকাতায় বাসা করে থাকি, আপিসে চাকরি ...করি—আমার আবার নিষ্ঠা! নেহাৎ ...সতেরো জাতের এঁটোটা খেতে একটু বাধে ...এখনও, তাই মেসে থাকি না। তাছাড়া ...খরচের কথাও তো আছে! এ আমি এক ...তরকারি ভাত খাই—মাছ ফাছের বালাই ...নেই—দশ টাকার মধ্যে হয়ে যায়। কয়লা ...ঘুঁটের খরচ ধরেও। মায় কেরোসিন তেল ...সুদ্ধ। মেসে থাকলে যেমন তেমন করে চোদ্দ ...পনেরো টাকা লাগবে। মাইনে পাই মোটে ...চুয়াল্লিশ টাকা, তার মধ্যে ট্রাম ভাড়াতেই ...তিন সাড়ে তিন বেরিয়ে যায়—বাকী টাকার ...মধ্যে কীই বা খাব আর কীই বা পাঠাব ...বলুন? সেখানে মা বাবা ভাইবোন বলতে ...গেলে উপোস করে কাটায় অর্ধেক দিন—...আমার মুখে এখানে মাছভাত আরামের ...খাওয়া রোচে? মনে হয় চারটে পয়সা ...বাঁচাতে পারলেও অনেকখানি সাশ্রয়। শুধু ...খাওয়াই তো নয়—আপিস করতে হয়, ...জামাকাপড় জুতো এসবও তো আছে! ...মাসে কটা টাকাই বা পাঠাতে পারি!'

আবারও যেন চোখ উপচে জল বেরিয়ে আসতে চায়। এখানে এই বেইমানের ঝাড়ের জন্যে কত টাকা খরচ করছে সে, বারবার। নিজের ভাই ভাইপো ভাইঝিরা উপোস করে দিন কাটাচ্ছে। এমন ভদ্র বিবেচক সোনার চাঁদ ছেলেমেয়েরা!...

একটু চুপ করে থেকে উদ্গত অশ্রু সামলে নিয়ে বলে, 'তা যখন বললে, একটা কথা জিজ্ঞেসা করছি বাবা, আমি খোলাখুলি জিজ্ঞেস করছি, তুমিও খোলাখুলি উত্তর দিও এইটুকু অনুরোধ—আমি যদি লুচি পরোটা ভেজে দিই, তুমি খাবে? আমার অবশ্য নিরামিষের বাসন সবই, ওরা মাছ খেলে নিমাই নিজেই রেঁধে নেয় আজকাল, সেসব কড়াখুন্তি আলাদা।'

এতখানি জিভ কেটে হাত জোড় করে সুরেন। বলে, 'আমাকে কি পেয়েছেন বলুন তো! ছিছি, এসব কথা বলে কেবল আমার অপরাধী করা! আমি কি গুরুদেব এসেছি আপনার? আপনিই তো গুরুজন বরং। আপনার হাতে খাব না কেন? কত বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি খেয়ে আসছি, ব্রাহ্মণ ছাড়াও, যাঁদের জানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আচার-বিচার আছে—তাঁদের বাড়িও লুচি পরোটা খেয়েছি। ভাত তাঁরা কোনদিন খেতে বলেন নি, আমিও খাইনি। তাছাড়া নিরামিষের কড়া কিসের? আমি মাছ মাংস খাই না এমন তো নয়। এখানে খাই না—পয়সার প্রশ্ন তো আছেই, তবে এক-আধদিন কি আর খেতে পারি না—অত কষ্ট করে কে? মাংস অবিশ্যি বৃথা মাংস কোনদিন বাড়িতে রান্না হয় না, তবে খাব না এমনও কোন প্রতিজ্ঞা নেই আমার!

মুগ্ধ হয়ে শোনে হেমন্ত। যেমন নিভার তেমনি এরও। কথা শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। এতদিন এইসব কাঞ্চন ফেলে কী সব ভাঙা কাঁচ বেঁধেই না জীবনের আঁচল ভারী করে রেখেছিল!

সন্দেশ আনানোই ছিল, সুরেন আসবে আশাই করেছিল ওরা, তখনকার মতো জল খেতে দিয়ে—চা বিশেষ খায় না সুরেন, মানে নিয়মিত খাওয়ার কোন অভ্যেস নেই তা আগেই বলে দিয়েছিল—উনুনে আঁচ দিয়ে দিল। তারপর নিমাইকে দিয়ে মাছ আনিয়ে লুচি তরকারি মাছের কালিয়া রেঁধে সামনে বসিয়ে পরিপাটি করে খাওয়াল।

সুরেনও বেশ তৃপ্তি করেই খেল। নিজেই স্বীকার করল বহুকাল এত সুখাদ্য পেটে পড়ে নি। নিজের হাতের সেদ্ধ পাঁচন খেয়ে খেয়ে মুখে চড়া পড়ে গেছে, আজ যেন জিভটা ছাড়ল। মাছের কালিয়া বিশেষ করে—খুবই ভাল হয়েছে, হালুইকরদের মতো।

'তুমি যদি রোজ এসো ভায়া, তুমিই বলছি কিছু মনে করো না।' নিমাই খেতে খেতে আরামে চোখ বুজিয়ে বলল, তাহলে আমাদেরও মুখে ছড়াঝাঁট পড়ে। অন্য রান্না অবিশ্যি উনিই করেন—কিন্তু মাছ তো আমাদের ভাগে—কী আর রাঁধবো বলো, ঐ এক ঝাল দিয়ে—কি রবিবারেই রাঁধা বরাদ্দ। জ্যোঠাই রেঁধে দিতে চায়, মিথ্যে বলব কেন—আমিই রাঁধতে দিই না। আজকাল আবার বাতিক হয়েছে, মাছ রান্না করলে চান না করে কিছু খায় না। কাঁহাতক আর কষ্ট দিই বুড়িকে।'

চমকে ওঠে সুরেন! এই রাত্তিরে এখন চান করবেন আবার। ইস, বড্ড অন্যায় হয়ে গেল তো। মাছের কথাটা না তুললেই হত। মাছ খাই না ধরে নিয়েছিলেন, সে ভুল না ভাঙালেই ভাল হত!'

'না ভাঙলে সেটাই অন্যায় হত বাবা। এখন গরমের দিনে একবার চান করব তাতে কষ্টটা কি? এমনিই তো দুবার তিনবার চান করি।'

খেয়ে উঠে আঁচিয়ে বাসায় ফেরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, হেমন্ত বলল, 'লুচি অনেক রয়েছে, নিরামিষ দিকেই তো সব, লুচি আর আলুপটল ভাজা একটা জায়গায় একটু বেঁধে দিই না? কাল সকালের তো কিছু নেই—খেয়ে যেতে? নিরামিষ ভাজা—রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলে কি দোষ হবে?'

'তা হবে না।' সুরেন অপ্রতিভভাবে হেসে বলে, 'কিন্তু রাত্রে অনাভ্যাসের পেটে গুরুপাক এইসব খাওয়া হল—রীতিমতো পাকা ফলার যাকে বলে—তার ওপর আবার কাল সকালে লুচি সহ্য হবে না, ভালও লাগবে না। ও আমার চিঁড়েই ভাল। যাবার সময় দু'পয়সার দই নিয়ে যাবো—ছাঁড়ি চাঁচাগুলো এক জায়গায় জড়ো করা থাকে, সে পেলে দু'পয়সায় এতখানি দই হবে—তোফা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চিঁড়ে দই দিয়ে দধিমঙ্গল করা যাবেখন ভোরবেলা।'

'তা দুপুরে টিফিন করো কি?'

'কী আর করব। ওখানে কি কিছু পাওয়া যায়? আর পাওয়া গেলেই বা পয়সা কোথায়? যেদিন শুখো ছোলাভাজাটাজা পাই—এক আধ পয়সায় সেদিন পেটে পড়ে, নইলে ঐ একেবারে ফিরে এসে।...ও আজ কাল অভ্যেস হয়ে গেছে, দরকারও হয় না। জলই মেলে না অর্ধেক দিন, একটু বাই আছে তো, গিয়ে যেদিন নিজে কল থেকে জল নিয়ে গেলাসে করে রাখতে পারি সেদিনই খেতে পাই, নইলে সে গুড়েও বালি।'

জুতো পরতে পরতেই বলে সে।

'তা কবে আবার—?' প্রশ্নটা শেষ করে না, উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে হেমন্ত।

'আবার কবে?...দেখি।'

'না না, দেখি টেখি নয়। সামনের রবিবারে অবশ্য আসবে। দুপুরে বরং এখানেই দুটি ঝোলভাত খেয়ো, কেমন? না আপত্তি হবে?'

'কিছু হবে না। কী যে বলেন—! আচ্ছা, তাই হবে, দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ আসব।'

'না, মনে যদি কোন খুঁৎ থাকে—'

'আবার ঐ সব কথা? তাহলে আর আসবই না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। দুবেলাই খেয়ে একেবারে রাত্তিরে ফিরবে। পরের দিনের সকালের খাবার নিয়ে।'

'না, ঐটে করবেন না। দোহাই। দুবেলা আপনার এখানে খাওয়া সেই তো রাজসূয় যজ্ঞ, তার ওপর আবার পরের দিন সকালে লুচি খাওয়া চলবে না। আর একটা কথা—যদি রবিবার রাত্রেও খেতে হয়, ভাত কি রুটি দেবেন। এত ঘি মরা পেটে সইবে না।'

সে হাসিমুখে প্রণাম করে চলে গেল। হেমন্ত ছলছল চোখে তার নিষ্ক্রমণ পথের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

নিমাই বললে, 'বেশ ছোকরা, না?'

হয়ত 'বেড়া-নেড়ে-গেরস্তর-মন-বোঝা'র মতো করেই বললে সে। হেমন্ত কোন জবাব দিলে না, চুপ করে রইল। কিন্তু তার মনও যেন চিৎকার করে এই কথাটাই বলতে চাইছিল। বেশ ছেলেটি, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কথাবার্তা শুনলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। এই ছেলেকে যে গর্ভে ধারণ করেছে, যে আপন করে পেয়েছে—তার তুল্য সৌভাগ্যবতী তার তুল্য ঐশ্বর্যশালিনী কে আছে! তারই তো জন্ম সার্থক। হোক সে গরিব, এত তো পয়সা হেমন্তর, একলা মেয়েছেলে হিসেবে অনেক পয়সা—তবু সে আজ সুরেনের মাকে ঈর্ষাই করছে। এমন ছেলে থাকলে জন্ম-জন্মান্তর পরের বাড়ি ঝাঁট দিয়ে বাসন মেজে খেতেও রাজী ছিল।

আসল কথাটা—যেটা ঠোঁটের ডগায় এসে আটকে আছে—প্রথম দিন বলি-বলি করেও বলা হয় নি। একেবারে প্রথম দিনই বলাটা অশোভনও হত।

পরের রবিবার দুপুরের খাওয়া শেষ করে মাদুরে শুয়ে গড়াচ্ছে সুরেন, কাছে বসে কথাটা পাড়ল।

'একটা কথা বলব বাবা? কিছু মনে করবে না তো?'

'সে কি কথা! আপনি সব ব্যাপারে অত "কিন্তু" হন কেন বলুন তো?...এতকাল পর হয়েছিলেন—তাই? কিন্তু সে তো বাবার মুখে শুনেছি—বাবা বিশেষ মিথ্যে কথা তো বলেন না—যে, সে তাঁদেরই অন্যায়, বাবা বলেন অপরাধ। পিতৃনিন্দা করবেন না বাবা কোন কারণেই—তবু আকারে-ইঙ্গিতে যা শুনেছি, ছোটকা তো স্পষ্টই বলেন, সবচেয়ে সে জন্যে দায়ী ছিলেন আমাদের ঠাকুর্দা মশাইই। সে অবস্থায় অন্য যে কোন লোক হলেই আত্মহত্যা করত, আপনি যে নিজের চেষ্টায় সৎপথের উপার্জনে দাঁড়িয়েছিলেন—সেই তো আপনার বাহাদুরী।'

কে জানে আরও কতটা শুনেছে, সবটা শুনেছে কিনা—বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে হেমন্তর—বিবেচক ছেলে ইচ্ছে করেই অন্ধকার দিকটা চেপে গেল কিনা!...

তবু অনেকটা ভরসা দেন বৈকি!

আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'তাই যদি মনে করো—এতদিন জানতুম না কে কোথায় আছ সেইজন্যেই খোঁজ করতে পারিনি—এত বড় বাড়ি খালি পড়ে, আমিও একা থাকি দেখছই তো, দেখার লোক বলতে তো ঐ এক নিমাই, তা ওরও মতিগতি কেমন হবে জানি না। ও বংশের কাউকেই আমার বিশ্বাস নেই—তাহলে তুমি ওখানে অত কষ্ট করে পড়ে থাকছ কেন আর? মিছিমিছি এই খাটুনি। একা ওপরে জল তুলে নিয়ে গিয়ে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া! শরীর কি টিকবে এতে? বারোমাস বাসি রুটি খেয়ে আপিস যাওয়া! এখানে তো নিমাইকেও আমার সাতটার মধ্যে ভাত দিতে হয়, মাঝে মাঝে একটা ঠিকে বামুনে কি বামনীও রাখি—তো সে নবাব বেগমের দল তো আসেন সাতটা সাড়ে সাতটায়—ততক্ষণে নিমাই খেয়ে বেরিয়ে যায়। আমার কিছু বেশী খাটুনিও হবে না। এখানেই থাকো না এখন থেকে?...আচ্ছা, কথা শেষ করতে দাও, তারপর উত্তর দিও—ভেবে দেখে ভাল করে। আমি তোমার সম্মান হানি করতে চাই না। 'তোমার ওখানে যে খরচ পড়ছে—বাড়ি ঘরভাড়া শুদ্ধ—আমাকে ধরে দিও, আমি হাসিমুখে হাত পেতে নেব তাহলেই হ'ল তো?'

'তা ঠিক হ'ল না পিসীমা।' উঠে বসে দু-হাত জোড় ক'রে বলে সুরেন, 'অনেক তফাৎ, অনেক ফাঁক থেকে যায়। ঐ হুকুমটি আমাকে করবেন না। একথা যে আপনি পাড়বেন তা আমি জানতুম। সত্যি কথা বলতে কি—এখানে আসার আগে আপনাকে দেখার আগেই ভেবেছি। নিভার চিঠিতে আপনার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, আর এই গরজ করে নিমাইদাকে পাঠানোতেই—তাতেই জানি—এ উত্তর আমাকে দিতে হবে।'

তারপর একটু থেমে, আস্তে আস্তে বলল, 'না পিসীমা, এ কোন রাগ কি অভিমানের কথা নয়, কিম্বা আমি ঐখানে থাকলে বাবা যে ক্ষুণ্ণ কি বিরক্ত হবেন তাও না। আমারই আপত্তি। যতই হোক—আমার যেটুকু দেবার ক্ষমতা, এখানে যে রাজভোগে থাকব, তার তুলনায় সে কিছুই নয়। ওটা মনকে স্তোক দেওয়া মাত্র। আর কি জানেন, আরাম একবার অভ্যেস হয়ে গেলে—না পেলে বড় কষ্ট। নিজের সাধ্যমতো চলাই উচিত নয় কি? চাল বিগড়ে গেলে হয়ত এই টাকা ভেঙেই বিলাসে খরচ করব, মা-বাবা, ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে। সেটা ভাল নয়। যতই হোক, আজ আমাকে ভাল লাগছে—একদিন মাত্র দেখেছেন, আমার স্বভাব আচার আচরণ কিছুই জানেন না—এর পর যদি ভাল না লাগে তখন আবার পুনর্মূষিক হ'তে হবে তো? না-না, আপনি বলেও বলছি না, আমার মতে বাপের পয়সা থাকলেও—বড় হলে নিজে রোজগার করতে শুরু করলে নিজের আয় মতোই চলা দরকার। বাবাও যে সব সম্পত্তি ছেলেকে দিয়ে যাবেন তার মানে কি? আর দিয়ে যাওয়াও তো মরবার সময়, নিশ্চিত পাবে তো বাপ মরার পর—। কত বড়লোকের ছেলেকে তো দেখছি, বিয়ে থা করার পর বৌয়ের সঙ্গে বাপ-মার বনিবনাও হয় না—আলাদা হয়ে তারপর ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে। বাপের কাছে টাকা চাইবার মুখ নেই। নিজেরও মুরোদ নেই। বুঝলেন না?'

হাসল হেমন্ত। ম্লান করুণ হাসি। বলল, 'বুঝলাম। খুব সুন্দর করেই বললে বাবা, আমার যাতে আঘাত না লাগে তার জন্যে অনেক গুছিয়ে সাজিয়ে বললে, তবু আসল কথাটা বুঝতে পারলুম বৈকি।... আমারই হয়ত ভুল হ'ল, একটু বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কথাটা পাড়া। আর কিছুদিন না গেলে আমাকে তোমার চেনার সুযোগ হবে না। তার আগে হুট্ করে এখানে এসে ওঠা সম্ভবও নয়।...যাক তাহলে আজই জোর-জবরদস্তি করব না। তবে রবিবারগুলোয় তোমার দেখা পাবো তো?'

'তা পাবেন, তবে সব রবিবারে তো হয়ে উঠবে না। মাস কাবারের পর একটা রবিবার ক'র বাড়ি যাই। তা-ছাড়াও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি—এদিক-ওদিক যেতে হয় মধ্যে মধ্যে। তবে তা হ'লেও—এখানে থাকলে যখন হোক একবার ঘুরে যাবো। দিনে না খাই, রাত্রে খেয়ে যাবো, কিম্বা উল্টোটা—সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাই হবে। তবে আর একটা অনুরোধ রইল বাবা, কোনদিন যদি আপিস থেকে বেরিয়ে শরীর খারাপ লাগে—এমনিও অনেক সময় ইচ্ছে করে না ফিরে গিয়ে রান্নাবান্না করতে—সে-সব দিনে অবিশ্যি এখানে চলে এসো। এখানেই চান সন্ধ্যে সেরে খেয়ে যেয়ো। পরেরদিনের খাবার না নিয়ে যেতে চাও নাই গেলে—রাতটা তো নিশ্চিন্ত!'

একটু হাসল সুরেন।

নানাদিক দিয়েই স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে চাইছে হেমন্ত—সেটা সে বুঝেছে, এ হাসিতে যেন সেইটেই জানিয়ে দিল। তারপর শুধু বলল, দেখা যাক। তবে তেমন খারাপ লাগলে অনেক সময় চান সন্ধ্যেও করতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় কোথাও গিয়ে এখুনি শুয়ে পড়ি। কিন্তু সেসব কথা আগে থেকে ভেবে লাভ নেই।'

(ক্রমশঃ)

মানব ইতিহাসের সমগ্র নারী চরিত্রে মিশর-রাণী ক্লিওপেট্রাই সবচেয়ে বিস্ময়-ময়ী। তাঁর জীবনকালে ক্ষমতায় ও খ্যাতিতে পৃথিবীর আর কোন নারী তাঁর সমতুল্য ছিলেন না। তারপর আজ দু হাজার বছর ধরে ঐতিহাসিক ও কবি, নাট্যকার ও কাহিনীকাররা সেই অনন্যা নারীর বিপুল ক্ষমতা, অমিত প্রতিপত্তি, অন্তহীন ঐশ্বর্য, তৃপ্তিবিহীন ভোগবিলাস, উদ্বেলিত হৃদয়াবেগ, ক্রুর-ষড়যন্ত্র, ভয়াল যুদ্ধ ও শেষ পর্যন্ত সকরুণ আত্মহত্যা নিয়ে কত কি লিখেছেন, অনুসন্ধান করেছেন, তবু সেই বিচিত্র জীবন চির প্রহেলিকাময়ীই থেকে গেছে। ক্লিওপেট্রা আজো অর্ধেক মানবী ও অর্ধেক কল্পনা।

খৃস্টপূর্ব ৪১ সালে এশিয়া মাইনরের সিডনাস নদীতে বিলাস তরণী করে মার্ক এন্টনীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন তাঁর বয়স ঊনত্রিশ। মার্ক এন্টনী মধ্য বয়সী। কিন্তু তখনই রোমান সাম্রাজ্যের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা। সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবার পথে তাঁর একমাত্র বাধা জুলিয়াস সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী অক্টেভিয়ান। রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্ধ তাঁর শাসনাধীন। ক্লিওপেটরার সঙ্গে এনটনীর মিলিত হবার উদ্দেশ্য ছিল বিবিধ। তার মধ্যে প্রধানতম ছিল তাঁর প্রভাবাধীন বিশাল এলাকার মধ্যে মিশরই ছিল সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী রাজ্য এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ঐ একটি মাত্র রাজ্যই সরাসরি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অপরপক্ষে মার্ক এনটনীর সঙ্গে ক্লিওপেটরার সাক্ষাৎ-কারের উদ্দেশ্যও ছিল মুখ্যত রাজনৈতিক। ঠিক যে কারণে তাঁর একদিন সীজারকে প্রয়োজন ছিল সেই কারণেই সেদিন তাঁর এনটনীকে প্রয়োজন। সর্বপ্রথমে তিনি চান তাঁর স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে।

মিকালেঞ্জেলোর কল্পনায় ক্লিওপেট্রা

ক্লিওপেট্রার প্রেম

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয়ত রোমান সাম্রাজ্যের মহিষী সম্রাজ্ঞী হতে।

এনটনীর সঙ্গে ক্লিওপেটরার সেইটাই প্রথম সাক্ষাৎকার নয়। ক্লিওপেটরা যখন উদ্ভিন্নযৌবনা চতুর্দশী তখন তাঁর ভ্রষ্ট ও অপদার্থ পিতার সিংহাসন উদ্ধারের জন্যে যে রোমান সৈন্যবাহিনী আসে এনটনী ছিলেন তারই আগুয়ান অশ্বারোহী বাহিনীর একজন তরুণ নায়ক। তারপর মহানায়ক সীজারের উপপত্নী হিসেবে ক্লিওপেটরা যে কমাস রোমে ছিলেন তখনো সীজারের বিশ্বস্ততম ও যোগ্যতম পার্শ্বচর হিসেবেও উভয়ের কখনো-সখনো সাক্ষাৎকার হয়েছে। সেদিনের মত তখনো এনটনী ভোগলিপ্সু। মুক্তহস্ত বারবিলাসী। ক্লিওপেটরা এনটনীর চরিত্রের দৃঢ়তা, দুর্বলতা, ঐশ্বর্য ও দীনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তাঁর স্বভাবসুলভ স্থির-ধীর ও কৌশলী পরিকল্পনায় তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

ব্যবস্থা ছিল সিডনাস নদীতীরে আরসাসে তাঁদের সাক্ষাৎকার হবে। তাঁরা এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতি পর্যালোচনা করবেন। নির্দিষ্ট দিনে ক্লিওপেটরার রাজকীয় তরণী এসে আরসাসের তীরে ভিড়লো। তারই পেছনে এল বিলাসপণ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীবাহী আরো বহু তরণী। ওদিকে মিশররাণীর সম্বর্ধনায় পার্শ্বচর ও রক্ষীবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে নগরীর বাজারকেন্দ্রে অপেক্ষা করতে লাগলেন মার্ক এনটনী। কিন্তু রোমান দুনিয়ার সেই সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিটির সাক্ষাৎকারের জন্যে ক্লিওপেটরা তীরে নামলেন না। শেষ পর্যন্ত হতধৈর্য ও নিরাশ মার্ক এনটনী রাণীকে নৈশ ভোজনের জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। ক্লিওপেটরা সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে এনটনীকেই তাঁর পোতে আমন্ত্রণ জানালেন। এনটনী যদিও দাবী করতেন যে, তিনি হারাকিউলিসের বংশধর এবং তখনো পর্যন্ত সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রোমান, তবুও ক্লিওপেটরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি নিজে রাণী এবং এনটনী একজন সেনাপতি মাত্র! এনটনী সচেতন হয়ে উঠলেন। ওদিকে সারাটা আরসাস ক্লিওপেটরার রাজতরণীর বিলাস বৈভবের গজবে গুলজার এবং বাতাসের ঢেউএ ভেসে আসা রাজতরণীর ধূপ-ধুনো, আতর ও ফুলের সৌরভে তার আকাশ মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। শোনা গেল রাজতরণীর দরবারে ক্লিওপেটা প্রেমের দেবীর মূর্তিতে স্বর্ণ চন্দ্রাতপের নীচে বসে আছেন। কিউপিড বেশধারী বালকেরা তাঁর পরিচর্যা করছে আর হাল-পাল দাঁড় ও দ্বারের সব দ্বারীও দাঁড়িরা কিন্নর-কিন্নরীর বেশে বিচরণ ও আজ্ঞাবহন করছে। প্রলুব্ধ এনটনী রাণীর আমন্ত্রণ রক্ষায় উদ্গ্রীব হলেন।

ভাসমান প্রাসাদের মত এমন বিলাস-পোত এনটনী তার আগে কখনো দেখেন নি। তার দেওয়ালে ঝুলছে অমূল্য টেপেসটারী। তার আসবাবপত্রের কারুকাজ মনোহারী, উপাদান মহার্ঘ। তার পানপাত্র মণিমুক্তা খচিত, স্বর্ণ নির্মিত। থালা-রেকাবী সবই নিরেট সোনার। ভোজ শেষ হলে ক্লিওপেটরা ভোজন কক্ষের সব কিছু তাঁর অতিথিকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে বারংবার এই বলে মার্জনা চাইতে লাগলেন যে, তাঁরা সবে সমুদ্রযাত্রা শেষে পৌঁছেছেন তাই সম্বর্ধনাটা যথোচিত হলো না। তবে মহামান্য অতিথি যদি আরেক সন্ধ্যায় আসেন তা হলে সেদিন আলেকজান্দ্রিয়ার মনে যথাসাধ্য আয়োজন হবে।

রাণী তাঁর কথা রাখলেন। কয়েক দিন পরে এনটনী এক সন্ধ্যায় পুনরায় রাজ-অতিথি হিসেবে সেই ভাসমান প্রাসাদে এলেন। প্রাসাদের মেঝেয় সেদিন সাত ফিট উঁচু গোলাপ আচ্ছাদন। দেওয়াল ও চন্দ্রাতপ সজ্জার আড়ম্বরে কল্পনাও পরাভূত হয়। তদুপরি রাণী বাজী ধরলেন যে, সেই সন্ধ্যার আহারে তিনি বর্তমান মুদ্রামূল্যে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন। স্বভাব জুয়াড়ী এনটনী তৎক্ষণাৎ উল্টো বাজি ধরে বললেন, তা অসম্ভব। ভোজ শেষ হলো। এনটনী পক্ষের খাজাঞ্চী হিসেব করে দিলেন যে, তখনো ঐ পরিমাণ ব্যয় হতে বহু বাকি। ইতিমধ্যে ক্রীতদাসেরা এসে টেবিল পালটে দিয়ে গেল। এবার পানের পালা। একটি অপরূপ কারুকাজ করা পানপাত্র এলো। তার মধ্যে কিঞ্চিৎ ভিনিগার। ভিনিগার বস্তুটি যে কি রোমানরা তখনো তা জানতো না। ক্লিওপেটরা তাঁর কর্ণমূল থেকে একটি বিশালাকৃতি মুক্তো খুলে পাত্রটির মধ্যে ফেলে দিলেন। সেটি ভিনিগারের অম্লে ধীরে ধীরে গলে গেল। তিনি তখন সেই মুক্ত-গলা ভিনিগারটুকু মন্দ মন্দ চুমুকে পান করলেন। তারপর অপর কান থেকে আরেকটি মুক্তো খুলে একইভাবে ভিনিগারে ফেলতে গেলে সবাই বাধা দিলেন। এনটনী পরাভব স্বীকার করে নিলেন।

—ক্লিওপেটরার এই [illegible]স, আড়ম্বর ও অপব্যয়ের ঘটা সবই কিন্তু ছিল রাজনৈতিক চাতুরী। সেই চাতুর্য সফল হলো। উচ্ছৃঙ্খল ব্যয়-বিলাসে এনটনী ছিলেন চিরঅভাবগ্রস্ত। ঐশ্বর্যের অকল্পনীয় প্রাচুর্য দেখিয়ে মিশররাণী তাঁকে অভিভূত ও বশীভূত করে ফেললেন। সেই সঙ্গে একথাও প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন যে যদি তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ হয় তবে এক সময় যেমন তিনি সীজারের বক্ষলগ্না ছিলেন তেমনিভাবেই তিনি এনটনীরও কামনার সঙ্গিনী হতে রাজি।

রক্তধারার কূটনীতি

খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে [illegible] আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর [illegible] সেনাপতিরা মধ্য এশিয়ায় এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী দখল করে নিল, তখন মেসিডোনিয়ার গ্রীকদের টলেমি বংশীয় এক সেনাপতি মিশরের ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করলেন। ক্লিওপেটরা সেই বংশের শেষ উত্তরাধিকারিণী। যদিও ঐতিহাসিকদের অনেকেরই মত যে, তাঁর দেহে একবিন্দুও মিশরী রক্ত ছিল না, তবু টলেমি বংশীয়দের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বতোঅর্থে মিশরী। তিনি মিশরী ভাষা খুব ভালভাবে জানতেন এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে সেই ভাষা ব্যবহার করতেন। অবশ্য আশ্চর্য প্রতিভাময়ী সেই নারী মিশরী ছাড়াও জানতেন ইথওপিয়ান, ট্রগলডেটিস, ইহুদী, আরব, সিরীয়ান, মেডেস ও পার্থিয়ানসদের ভাষা। তাঁর রাজত্বকালে চালু মুদ্রায় অঙ্কিত তাঁর মূর্তির বিচারে মুখের আদল ছিল ভূমধ্যসাগরীয়। ললাট উন্নত, ওষ্ঠ সুডৌল, নয়ন আয়ত, নাসিকা সেমিটিক জাতিসুলভ। গায়ের রং খুবই সম্ভব অলিভভিন্নিভ, চুল কালো। প্রাচীন লেখকেরা তাঁর সম্পর্কে লিখে গেছেন তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল 'লায়ার ব্যঞ্জনাসম।' একজন লিখেছেন, তার সঙ্গে পরিচয়ের অর্থ এক অপ্রতিরোধনীয় চমৎকারিত্বের সংস্পর্শে আসা। তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্যের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ বাক্যালাপ ও মনোহারী আচরণ মিলিত হয়ে এক ইন্দ্রজাল রচনা করতো।

মিশরের অতি প্রাচীন রাজবংশ ফারাওদের মত টলেমিরাও ছিলেন অজাচারী। অর্থাৎ নিজেদের অতি নিকট রক্ত-সম্পর্কের মধ্যে তাঁদের বিয়ে হতো, সেই অজাচারের পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল যদি রাজবংশীয়রা দেবতার বংশধরই হয় তবে তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মর-মানুষের বিয়ে হবে কি করে? তাই ক্লিওপেটরার বয়স যখন আঠারো বছর তখন তাঁর সঙ্গে দশ বছর বয়স্ক সহোদর ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সে বিয়ে কখনো পরিণতি লাভ করে ছিল বলে মনে হয় না। কারণ সহোদর স্বামীটির যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই তার ভগ্নী-স্ত্রীর সঙ্গে মারাত্মক বিরোধ বেঁধে গেল। সেটা ব্যতিক্রম নয়, ঐতিহ্য অনুগ। সিংহাসন ও ঐশ্বর্যের অধিকার নিয়ে টলেমিদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় ভায়ে ভায়ে, বোনে বোনে, ভাই-বোনে পিতায়-পুত্রে, মাতায়-কন্যায় নিষ্করুণ রক্তলোলুপ ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা ও হানাহানি হয়ে এসেছে। ক্লিওপেটরার দুর্ভাগ্যক্রমে বৃদ্ধের বেশির ভাগ শক্তিশালী অমাত্যরাই রাজকুমারকে সমর্থন জানালেন। ক্লিওপেটরা রাজ্য ছেড়ে পলায়নে বাধ্য হলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। কিন্তু দুঃসাহসে, কূটনীতিতে ও কৌশলে অনন্যা। পলায়নে তিনি আশ্রয় নিলেন সিরিয়ায়। মিশর আক্রমণ করে পিতৃসিংহাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প

হয়ে সেখানে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে লাগলেন।

সীজার ও ক্লিওপেট্রা

এই সময়েই ক্লিওপেট্রা তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ, রোমান সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক জুলিয়াস সীজারকে তাঁর ও তাঁর ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্যে ভূমধ্যসাগরের জলরাশি বিধৌত মিশরের শ্রেষ্ঠতম নগরী আলেকজান্দ্রীয়ায় আসবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। স্বয়ং তিনি তখন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর মিশরে এলুসিয়মে উপনীত। সীজার ক্লিওপেট্রার আহ্বানে সাড়া দিলেন।
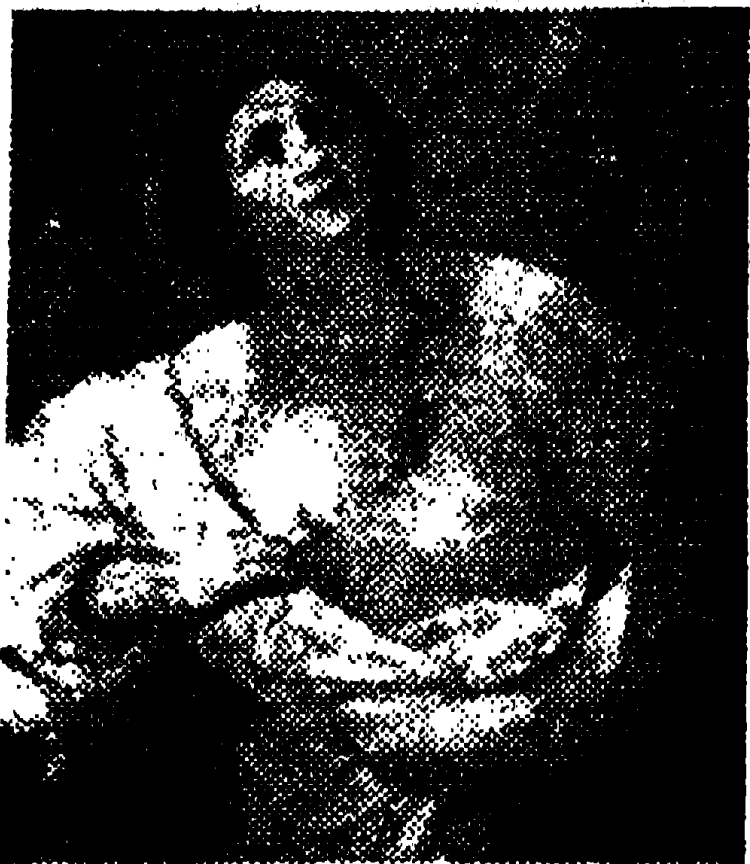
ক্লিওপেট্রার কয়েকটি বিভিন্ন ভঙ্গী
—শিল্পীর চোখে

ক্লিওপেট্রার তখন সমস্যা হলো কিভাবে তিনি সীজার সম্মুখে সশরীরে উপনীত হবেন। তিনি দেখলেন যদি তিনি স্থলপথে আলেকজেন্দ্রীয়া যেতে চান তাহলে তাঁর ভ্রাতার সমর্থকেরা তাঁকে মাঝপথে আক্রমণ করে হত্যা করবে। এমন কি শেষপর্যন্ত যদি বা তিনি আলেকজান্দ্রীয়ায় উপনীতও হন তবু প্রাসাদের চক্রীরা হয়তো সেখানেও গুপ্তহত্যা করতে পারে। অতএব তিনি গোপনে এলুসিয়াম থেকে একটি জাহাজযোগে আলেকজান্দ্রীয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। আলেকজান্দ্রীয়ার অদূরে এসে জাহাজ ত্যাগ করে একটি ছোট ডিঙিতে উঠলেন। ডিঙির মাঝি এক সিসিলিয়ান। সে তীরে এসে ডিঙি ভিড়িয়ে রাণীকে একটি কার্পেটে (হয়তো কোন খালাসীর বিছানায়) জড়িয়ে নিয়ে কাঁধে করে সোজা সীজার সমীপে উপনীত হলো। অনুগত মার্ক এনটনীর মতই সীজারেরও ছিল চির অর্থাভাব। তাই তিনি তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী মিশরী উপযাচকদের কাছ থেকে নানা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। সুতরাং সীজার সমীপবর্তী হতে সিসিলিয়ানটির কোন অসুবিধা হলো না।

এবারের উপঢৌকনটি কল্পনার অতীত। জড়ানো কার্পেটটি বিস্তৃত করে দিতেই তার মধ্যে থেকে ত্বরিতে উঠে দাঁড়ালেন বিস্রস্তবসন, বিপর্যস্ত কেশ এক নিরুপমা সুন্দরী রাজকন্যা। সেই প্রত্যুৎপন্নমতি, অচিন্তনীয় দুঃসাহস ও অপরূপ ভঙ্গী মুহূর্তে সীজারের হৃদয় হরণ করে নিল। সীজারের সাহায্যে তিনি তাঁর স্বামী ভ্রাতাকে পরাস্ত ও নিহত করলেন। পরে তাঁর ছোট ভাই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হলো। আরো পরে মার্ক এনটনীর সাহায্যে তিনি তাঁর ছোট বোন আরসিনয়কে এফিসাসের মন্দির আশ্রয় থেকে বের করে এনে হত্যা করেন।

জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর সীজার ও ক্লিওপেট্রা নাটকে ওই দুই অবিস্মরণীয় নরনারীর পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারের যে দৃশ্য বর্ণনা করেছেন তা চিত্ত চমৎকারকারী। কিন্তু ক্লিওপেট্রার চরিত্র বিশ্লেষণে তা ইতিহাস সম্মত নয়। তাঁর উদ্ভিন্নযৌবনা ক্লিওপেট্রা তরুণী মার্জারীসমা। সীজার তাঁকে পোষ মানালেন। রাজনীতি শেখালেন। কিন্তু রাজনীতির ছলাকলা, ক্রূরতা-কৌশল ক্ষমতালোভ ও নির্মমতা ছিল টলেমী রাজবংশীয়দের রক্তধারায়। তবে একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে সেই সাক্ষাৎকাল পর্যন্ত ক্লিওপেট্রা ছিলেন কুমারী। টলেমী বংশের পুরুষের যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তিহীন যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন। পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে তাঁরা কামনার সহচর ও সহচরী সংগ্রহ করতেন। কিন্তু রাজবংশের মেয়েদের রাখা হোত প্রায় প্রাচ্যদেশীয় রক্ষণশীলতার নিষেধের মধ্যে। সিংহাসন লাভের তাগিদে ক্লিওপেট্রা সেসব নিষেধ ও সংস্কার অবলীলায় বিসর্জন দিলেন। তিনি সীজারের উপপত্নীত্ব বরণ করলেন। অচিরে সীজারের ঔরসে ক্লিওপেট্রার একটি শিশুপুত্র হলো। আলেকজেন্দ্রাবাসীরা তার নাম দিল সীজারীয়ন বা ছোট সীজার। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সীজারকে এশিয়া মাইনর ও ইতালী চলে যেতে হয়।

যৌন জীবনে সীজার ছিলেন বিদঘুটে রকমের ব্যভিচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও অতৃপ্তকাম। তাঁর শত্রুরা বিদ্রূপ করে বলতেন যে তিনি ছিলেন পুরুষমাত্রেরই নারী এবং নারীমাত্রেরই পুরুষ। কয়েকবার বিয়ে করলেও তাঁর কোন পুত্রসন্তান জন্মায় নি। একবার তাঁর একটি মেয়ে জন্মায়। কিন্তু সেটিও স্বল্প দিনের মধ্যে মারা যায়। অথচ ক্ষমতা অপ্রতিহত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে একটি রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই চাই একটি প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ। তাই ক্লিওপেট্রার গর্ভে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে শুনেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর তদানীন্তন স্ত্রী কালপুর্নিয়ার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। তখন ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করে এক বিশাল সাম্রাজ্যে আফ্রিকার একটি গ্রীক রোমান রাজবংশের পত্তন তো প্রায় আয়ত্তাধীন। তিনি ক্লিওপেট্রাকে রোমে আসতে আহ্বান জানালেন।

তৎকালীন আড়ম্বরের সঙ্গে ক্লিওপেট্রা রোমে প্রবেশ করলেন। কিন্তু প্রথমেই সমস্ত রোমের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তিনি হতাশ হলেন। আলেকজেন্দ্রীয়া ছিল আধুনিক থেকেও পরিকল্পিত নগরী। ভূমধ্যসাগরের গাঢ় নীল জলরাশি তার কিনারায় লুটোপুটি করছে। তার রাজপথ প্রশস্ত সারিবদ্ধ বীথিকাশোভিত। সেখানে রয়েছে বৃহৎ পাঠাগার। বহু শিক্ষায়তন, বিশ্ববিদ্যালয়, নাট্যশালা, ব্যায়ামাগার। সেই তুলনায় রোম ছোট, ঘিঞ্জি ও অপরিচ্ছন্ন। তদুপরি রোমানরা ক্লিওপেট্রাকে পছন্দ করলো না। 'পরদেশী গণিকা' বলে বিদ্রূপ করতে লাগলো আর সীজারের শত্রু ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর উপস্থিতিতে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কারণ রোম তখন অভিজাততন্ত্র বা তথাকথিত গণতন্ত্রশাসিত। রাজতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা ছিল প্রচলিত তন্ত্রবিরোধী এবং ব্যক্তিগত শাসন নৈতিক অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। অথচ সীজার ও ক্লিওপেট্রার মতলবটা যে কি তা তাঁদের সহজ অনুমানসাধ্য। সকলেই জানেন যে শেষ পর্যন্ত 'ইডেস অব মার্চে' সীজারের শত্রুরা তাঁকে রাজা হবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার অপরাধে খুন করলেন। ঘাতকদের রক্তলোলুপ ছুরিতে ক্লিওপেট্রার স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ওদিকে রোমে ভয়ানক গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে এলো। মার্ক এনটনী তাঁকে মিশরে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। পরবর্তী কয়েকটি বছর তিনি উদ্দাম ঔৎসুক্যের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের আভ্যন্-

ন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই অনুধাবন করতে লাগলেন। কারণ তার পরিণতির ওপরই নির্ভর করছে তাঁর নিজের ও দেশের ভবিষ্যৎ।

এনটনী ও ক্লিওপেটরা

ক্লিওপেটরা যখন তারসাসে মার্ক এনটনীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন সীজারের মৃত্যুর পর এনটনীই রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় উদীয়মান পুরুষ। সুতরাং তাঁর জীবনে দ্বিতীয় বৃহৎ সিদ্ধান্তের জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। প্রতিপক্ষের দর্শন মাত্র মুহূর্ত থেকেই তিনি জানতেন যে তাঁর অনায়াস বিজয় অনিবার্য। সীজার-হৃদয় বিজয়িনীর কাছে সীজার অনুচর এনটনী যেন গোড়া থেকেই আসক্তির নাগপাশে বন্দী।

অথচ তাঁদের দুজনেই তখন আর কল্পনাবিলাসী রোমানটিক ছিলেন না। দুজনেই জানতেন যে তাঁদের মিলনের মধ্যে প্রেমের চেয়ে প্রয়োজনের তাগিদই বেশি। কয়েক বছর পরে এনটনী অকটেভিয়ানকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'তোমার ব্যাপার কি? আমি ক্লিওপেটরার সঙ্গে ঘুমোই এই অপরাধ? কিন্তু সে তো আমার স্ত্রী। তাতে নতুন কি হলো আবার? ব্যাপারটার শুরু তো ন' বছর আগে। তাছাড়া তুমিই কি শুধু লিভিয়ার সঙ্গে শোও নাকি? আমি নির্দ্বিধায় বাজি ফেলতে রাজি আছি যে যতক্ষণে তুমি এই চিঠিটি পড়বে ততক্ষণে তুমি টার্টুলা, টেরেনটিলা আর রুফিলার সঙ্গে ঘুমিয়েছো। এমন কি সকলের সঙ্গে একসঙ্গেই ঘুমিয়ে থাকতে পারো। তা ছাড়া কে কার সঙ্গে যৌনসম্ভোগ করছে তাতে কি এসে যায়?—এনটনী অকটেভিয়ানের বোনকে বিয়ে করেন এবং ক্লিওপেটরার জন্যে তাকে ত্যাগ করেন।

পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইয়ের কাছে ক্লিওপেটরার সঙ্গে সম্পর্কের যে কৈফিয়ৎই এনটনী দিন না কেন, তিনি যে ক্লিওপেটরার প্রেমে সম্মোহিত তা অস্বীকারের উপায় নেই। তারসাসের সাক্ষাতের কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ক্লিওপেটরার সঙ্গে সহবাসের অদম্য অভিলিপ্সায় আলেকজেন্দ্রীয়ায় চলে গেলেন। অথচ রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানে তখন এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ায় তাঁর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় ছিল। মিশরীদের চোখে তাঁরা ছিলেন বিবাহিত দম্পতী। এনটনীর ঔরসে ক্লিওপেটরার তিনটি সন্তান জন্মে। তারা সবাই সমাজ ও আইনের স্বীকৃতি পায়। তাদের প্রত্যেকের জন্যে রাষ্ট্রীয় উপাধি এবং জায়গীর নির্ধারিত হয়।

এনটনীর মনোরঞ্জনের জন্যে ক্লিওপেটরারও চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। এনটনী পানাসক্ত? তিনিও তাঁর পানের সঙ্গিনী হবেন। এনটনী পাশা খেলা ভালোবাসেন? তিনিও তাঁর সঙ্গে বসে যাবেন। এনটনী জমকালো পার্টি ভালবাসেন। তাই জমকালো পার্টি সহজ সংগঠনের জন্যে তিনি তৈরী করলেন, 'অননুকরণীয় ব্যক্তিদের ক্লাব'। তার সদস্যদের জীবনের উদ্দেশ্যটাই যেন অপরকে তাক লাগানো। ক্লিওপেটরার যদিও বিপুল সম্ভ্রম বোধ ছিল, তবু নিছক তামাশাতেও তিনি আনন্দ পেতেন। যদি কোন দিন এনটনীর মাতাল হয়ে রাস্তার গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করবার জন্যে জিদ চাপতো তাহলে ভৃত্যের বেশে ক্লিওপেটরা তাঁর সঙ্গী হতেন। সতর্ক পাহারা দিতেন।

ক্লিওপেটরা বরাবরই জানতেন যে, সীজার ছিলেন তাঁর উচ্চাশার উপযুক্ত ব্যক্তি। এনটনীর কাছে সীজারের তেজস্বীতা, কর্তব্যনিষ্ঠা দৃঢ়তা আশা না করাই ভালো। অধিকন্তু সুদীর্ঘকাল যৌন ব্যভিচার ও পানাসক্তিতে তিনি দেহমনে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তবু এনটনীকে দৃঢ় ও কর্তব্যনিষ্ঠ হবার জন্যে, তাঁর উৎসাহ এবং কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তিনি সদাসচেষ্ট ছিলেন। একবার একটি কৌতুকোদ্দীপক ঘটনার মধ্যে তিনি এনটনীকে লঘুচিত্ত প্রমোদ ও জাড্য ত্যাগ করে বৃহত্তর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।—এনটনী মাছ ধরতে খুব ভালোবাসতেন। একদিন তাঁর ছিপে কোন মাছই ধরা পড়লো না। অথচ খুব ওস্তাদ মেছেল হিসেবে তিনি ক্লিওপেটরার কাছে বড়াই করতে চান। সুতরাং তিনি একটা ডুবুরী দিয়ে একটা প্রকাণ্ড মাছকে তাঁর ছিপে গাঁথিয়ে নিলেন। তারপর বহু ভড়ং ও কসরৎ দেখিয়ে সেটিকে ডাঙগায় তুললেন। ক্লিওপেটরা প্রতারিত হলেন না। পরের দিন তিনিও একটি ডুবুরী দিয়ে আরো বড় একটি মাছ এনটনীর ছিপে গাঁথিয়ে দিলেন। এবার প্রতারিত এনটনী খুব হাঁক-ডাক করে মাছটিকে তুললেন দেখা গেল মাছটি কৃষ্ণ সাগরের অর্থাৎ নোনাজলের মাছ। গরীব মিশরীদের সাধারণ খাদ্য। এনটনী খুবই লজ্জা পেলেন। সেই সুযোগে ক্লিওপেটরা তাঁকে মৃদু অনুযোগ ও ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, 'সেনাপতি মাছ ধরার ছিপটা অন্য কাউকে—আমার মত যারা শুধু ফেলাহিন ও কানপসদের শাসন করে তাদের দিয়ে দিন না।' ক্লিওপেটরার প্রতি মাত্রাহীন অনুরক্তি এবং নির্ভরতাও তার পক্ষে মর্মান্তিক ক্ষতিকর হয়। তাঁর শত্রুরা তাঁর ঐ বিদেশী রাণীর বশীভূত হয়ে থাকা নিয়ে নানা বিরুদ্ধ মত প্রচার করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত এনটনীকে তার বৈরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমরে সম্মুখীন হতে হলো। একটিয়ামের নৌ-যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। ক্লিওপেটরা জিদ করে সেখানে উপস্থিত থাকলেন। তাঁর উপস্থিতির জন্যেই এনটনীর সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ দল ত্যাগ করে শত্রুপক্ষ অকটেভিয়ানের দলে যোগ দিল। পরাজয় সমাসন্ন দেখে মিশরী নৌবহর, খুবই সম্ভব পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী রণে ভঙ্গ দিল। ক্লিওপেটরা রণস্থল ত্যাগ করলেন। আরো পরে পরাজয় নিশ্চিত জেনে এনটনীও ক্লিওপেটরার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। একটিয়ামের লড়াইয়ের পর এনটনী দেহ ও মনে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু ক্লিওপেটরা শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব রক্ষায় লড়াই করে যান। একটা সময় তিনি অকটেভিয়ানের সঙ্গে গোপন পত্রালাপ করে তাঁর সন্তানদের উত্তরাধিকার বাঁচাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সফল হলো না।

এনটনী ও ক্লিওপেটরা পরস্পরের মধ্যে সহ আত্মহত্যার সন্ধি করেছিলেন। অবশেষে যখন অকটেভিয়ানের সৈন্যবাহিনী আলেকজেন্দ্রীয়া প্রবেশ করলো তখন তিনি এনটনীকে জানালেন যে সেই সন্ধি অনুযায়ী কাজ করবার সময় আসন্ন। সেই করাল বার্তা পেয়ে এনটনী তাঁর তরবারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হলো না। সেখান থেকে তাঁকে মসোলিয়াম বা রাণীর স্মৃতিসৌধে নিয়ে আসা হলো। মুমূর্ষু এনটনী ভেবে ছিলেন সেখানে গিয়ে তিনি মৃতা ক্লিওপেটরাকে শেষবারের মত দেখতে পাবেন। কিন্তু ক্লিওপেটরা তখনো তাঁর দিক থেকে মরণসন্ধি পালনের প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রয়াস করেন নি। তাঁরই কোলে মাথা রেখে এনটনী প্রাণ ত্যাগ করেন। সেই মরণমুহূর্তে ক্লিওপেটরার উদ্বেলিত শোক দেখে কারুরই সন্দেহ রইলো না যে তিনি এনটনীকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু তিনি মিশরকে ভালোবাসতেন তার চেয়েও বেশি। তাই এনটনীর মৃত্যুর পর তিনি আরেকবার অকটেভিয়ানের হৃদয় জয়ের চেষ্টা করেন। সে চেষ্টাও ফলবতী হলো না।

সুতরাং তিনি আত্মহত্যা করলেন। তিনি টলেমী বংশজাতা। তাই দেবতার [illegible] প্রতিভূ। জন্মান্তরে তিনি ঈসিস দেবী [illegible] সংশ্লিষ্টা হবেন। সুতরাং তার [illegible] হবে অমর্ত প্রক্রিয়া পবিত্র গোখুরো সাপের দংশনে। অনুচর সহচরী একটি কালসর্প সমন্বিত পাত্র তাঁকে এগিয়ে দিলেন। তিনি সেটি তাঁর বুকের কাছে ধরলেন। কাল ভুজঙ্গ সেই বুকে দংশন করলো। অবাক সহনশীলতার সঙ্গে সেই বিষদংশন জ্বালা সহ্য করে তিনি মৃত্যুর বুকে লুটিয়ে পড়লেন।

রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের আগেই তিনি তাঁর গর্ভজাত সীজার পুত্রকে দক্ষিণ মিশরের নিরাপদ অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। ক্লিওপেটরার মৃত্যুর পর সেই তরুণকে প্রলুব্ধ করে উত্তরে নিয়ে এসে হত্যা করা হয়। এনটনীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও হত্যা করা হয়। তিনি ক্লিওপেটরার সন্তান নন। এনটনীর ঔরসজাত তার অপর তিন সন্তানকে বিজয়ী ঔদার্য-প্রমাণের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুত্র সন্তান দুটির ইতিহাসে কোন হদিস পাওয়া যায় না। কন্যা ক্লিওপেটরার বিয়ে হয় মিউরিটানিয়ার রাজার সঙ্গে।

লেখক ERNLE BRADFORD এর Cleopetra র নিকট ঋণী।

ঐতিহাসিক হার্ডিঞ্জ ব্রীজ

সোনার বাঙলা

শিপ্রা আদিত্য
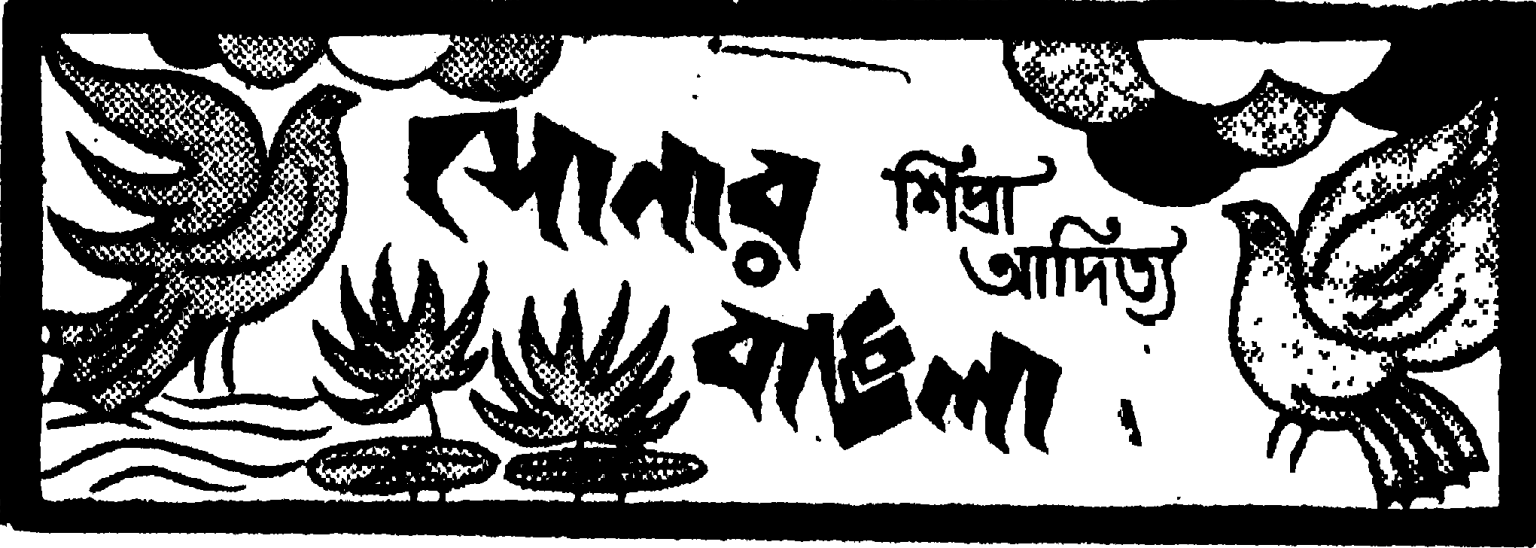
বাগেরহাট

কলকাতা থেকে ১২৯ মাইল দূরে। খুলনা জেলার এক মহকুমা শহর। এখানে একটি ছোট অতি প্রাচীন মসজিদ আছে। এছাড়া কিছুদিন আগে বঙ্গেশ্বর নসরৎ শাহের কয়েকটি মুদ্রা বাগেরহাট থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। বাগেরহাট থেকে মাইল ৪ দূরে শিববাড়ী গ্রামে অতি প্রাচীন এক বৌদ্ধমূর্তি দেখা যায়। সুন্দর কারুকার্যময় ধ্যানী বৌদ্ধমূর্তিটির গায়ে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সুন্দর-ভাবে খোদিত। বড় মূর্তিটি একটি চৈত্যের মধ্যে অবস্থিত। চৈত্যের উপর বৌদ্ধগয়ার অনুকরণে একটি মন্দির খোদিত ও তার আশপাশে ধ্যানী বুদ্ধের জীবনচরিত-মালা। প্রবাদ আছে এটি খান জাহান আলির দরগার পাশে প্রসিদ্ধ ঠাকুর দীঘি খননের সময় নাকি এই মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। বাগেরহাটের কাছেই ধোতখালি ও কুমারখালি নামক শাখানদী পরিবেষ্টিত চকশ্রী গ্রামে প্রতাপাদিত্য এক দুর্গ তৈরী করেন। বর্তমানে এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

'শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন
দেশ গারেতে যা হইল শুন দিয়া মন।।

রাজাদেশ হিন্দু বলে মুসলমান ভাই।
কাজে লড়াই কাটাকাটি
নাহিক বালাই।।
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন
মুসলমানে খায়।
মুসলমানের রস পাটালী
হিন্দুর বাড়ী যায়।।
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুই জন।
ভজন যাজন যেমন ইচ্ছে
করুকগে তেমন।।
মিলে মিশে থাকা সুখ
তাতে বাড়ে বল।
ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীরা খল।।
চুলে ধরে নারী লয়ে চড়তে নারে নায়।
সীতারামের নাম শুনিয়া
পলাইয়া যায়।।'

যদুনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'সীতারাম রায়' গ্রন্থে কবিতাটি পাওয়া যায়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নামক উপন্যাসেও রাজা সীতারামের শৌর্যবীর্যের কথা জানা যায়। যশোর জেলার মধুমতী নদী তীরে, মাগুরা মহকুমার মহম্মদপুর এক ঐতিহাসিক স্থান। এই মহম্মদপুরেই ছিল রাজা সীতারামের রাজধানী। মহম্মদপুরে সীতারামের বহু কীর্তি আজ দেখা যায়। তার মধ্যে দুর্গের ভগ্নাবশেষ। রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, সিংহদরজা মালখানা, তোষাখানা, রামসাগর, সুখসাগর, কৃষ্ণসাগর নামে দীঘি, (কৃষ্ণসাগর দীঘিটি ১০০০ ফুট×৩০০ ফুট)। দোলমঞ্চ, রাস-মঞ্চ, কৃষ্ণজীর মন্দির, দশভূজা মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। মন্দিরগুলির গায়ে সুন্দর কারুকার্য খচিত।

কুষ্টিয়া

মুজিবনগর কোথায়? এমন প্রশ্ন এই সেদিনও ছিল অনেকের মুখে মুখে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে মেহেরপুর ওরফে মুজিবনগর এক স্মরণীয় নাম। এখানেই তো পাক সরকারকে সম্পূর্ণ বাতিল করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে একাত্তরের ১৭ এপ্রিল। মেহেরপুরের নগণ্য সেই আম্রকুঞ্জ মুজিবনগরে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের কাছে আজ এ এক তীর্থভূমি।

মেহেরপুরে এক সময় চৌধুরী উপাধি-ধারী গোপ সম্প্রদায় জমিদারী করতো। তাদের তৈরী কালী ও শিব মন্দির অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। এছাড়া বলরামহাড়ীর আখড়াও অন্যতম একটি। মেহেরপুরের কাছেই উজিরপুর গ্রামে এক পুরানো দীঘি এবং কিছু প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সীতারামের দোল মঞ্চ (মহম্মদপুর) যশোহর

কুষ্ঠিয়ার মেহেরপুর বা মুজিবনগরে বাঙলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের দিন

শিলাইদহ

কুষ্ঠিয়া জেলার কুমারখালি স্টেশন থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে পদ্মা ও গড়াই নদীর সংযোগস্থলেই শিলাইদহ গ্রাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে, বাঙলা-সাহিত্যে শিলাইদহের কুঠিবাড়ী আজ এক পুণ্যভূমি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে যে আদিতে শিলাইদহের এই কুঠিবাড়ী ছিল নীলকর সাহেবদের। নীলকর সাহেবরা চলে গেলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ১৮৩৩ খৃঃ বাড়ীটি কিনে নেন। ঠাকুর-বাড়ীর এই কাছারি দেখাশুনার কাজে বহুবারই কবিকে এখানে আসতে হয়েছে। তাই তাঁর রচনায় যত্রতত্রই শিলাইদহের প্রকৃতিকে খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙলা-সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে এ গ্রাম তাই আজ তীর্থভূমি। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত এই শিলাইদহ গ্রামেই হবে অনুরূপ শান্তিনিকেতন। ফলে অদূর ভবিষ্যতে শিলাইদহ সারা বিশ্বের কাছে এক ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান হয়ে উঠবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এরই কিছু দূরে লালন শাহ ফকিরের মাজার। লালন ফকিরের মাজারের বিরাট চত্বরেই মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ঘাঁটি তৈরী করে পাক শত্রুর মোকাবিলা করেছিল এই সেদিন পর্যন্ত।

শুধু কুষ্ঠিয়ার কেন সারা বাংলাদেশে রেল কোম্পানীর তৈরী হার্ডিং ব্রীজ বা সারা সেতু অতি বিখ্যাত। ১৯০৯ খৃঃ আরম্ভ হয়ে ১৯১৫ খৃঃ এই সেতুর কাজ শেষ হয়েছিল বলে শোনা যায়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিং-র নামানুসারে এই সেতুটির নাম হয় হার্ডিং। দৈর্ঘ্য ৫৯০০ ফুট। এই বিরাট সেতুটি ১৫টা অংশে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে এটি পাক বর্বরতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। সেতুটি আজ বিধ্বস্তই শুধু নয় এর বহু অংশই আজ বিচ্ছিন্ন। পদ্মার এপারে ভেড়ামারার ওপর সেতুটির একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত এবং পাকশির দিকে একটি অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

পাবনা

পাবনা নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মতভেদ আছে। যেমন—অনেকে বলেন, 'পাবনা' নামে এক বিখ্যাত দস্যুর আড্ডা এখানে ছিল। পরবর্তীকালে তার নাম অনুসারেই এখানকার নাম পাবনা। অনেকে বলেন, গঙ্গার পূর্বগামিনী ধারা পাবনী থেকেই পাবনা নামের উৎপত্তি। এখানের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে 'জোড় বাংলা' মন্দির উল্লেখযোগ্য। শহরের উত্তর পূর্ব কোণে কালাচাঁদপাড়ায় লাল পাথরে তৈরী এই মন্দিরটি খুব সুন্দর। মন্দির দেওয়ালে বহু দেবদেবীর ছবি আজও দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের উপরের অংশ আধখানা চাঁদের অনুরূপে তৈরী।

এই পাবনা জেলার হাঁড়িয়াল গ্রামে শিব ও জগন্নাথের এক অতি সুন্দর প্রাচীন মন্দির আজও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমানে এটি পুরাতাত্ত্বিক জরিপ দপ্তরের আওতায়। হাঁড়িয়ালের কাছে তাড়াশ গ্রামেও কিছু প্রাচীন দেবদেবীর মন্দির দেখা যায়।

শাহজাদপুর—

ঈশ্বরদি হয়ে ফুলঝুর নদীর গা ঘেঁষে উল্লাপাড়ার ৮ মাইল দক্ষিণে হুরসাগরের তীরেই শাহজাদপুর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জমিদারী দেখাশুনাকালে শিলাইদহে থাকাকালীন বহুবারই শাহজাদপুরে এসেছিলেন।

এখানকার সতীবিবির থান, দ্বাদশ আউলিয়ার সমাধি, শাহজাদা মুখদুম শাহের তৈরী এক অতি প্রাচীন মসজিদই প্রধান আকর্ষণ। এই মসজিদ প্রাঙ্গণে বৈশাখ মাসে এক বড় মেলা হয়। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে এই মেলায় যোগ দেয়। এই মেলায় স্থানীয় লোকশিল্পের কিছু নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। এখানে অতি প্রাচীন এক নবরত্নের ভাঙা মন্দিরও আছে।

এই পাবনাতেই সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ইউসুফশাহী পরগণায় ১৮৭২-৭৩ খৃঃ জমিদারদের খাজনা বা কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঈশান রায়ের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক 'কর বিদ্রোহ' ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এখন

(সাতাশ)

সে রাতে চন্দন অস্থির হয়ে হ্দয়ের অপেক্ষা করছিল। একটা ট্রাক রুপপুর হয়ে সাঁইথিয়া যাবে—বিকেলে ওতেই হ্দয়কে রুপপুরে পাঠিয়েছে। ওখানে অফ-টাইমের ড্রাইভার অনেক পাবে। কিন্তু রাত অনেকটা হয়ে গেল, হ্দয় আর আসে না। ওখান থেকে ফিরতি ট্রাক না পাওয়ার কথা নয়। শিশিরবাবুরা পুশুলিয়ার একটা গদী খুলেছে। সেখানেই খোঁজ পাওয়া গেছে, ট্রাক একটা আসবেই। হ্দয়কে বলেও দিয়েছে ওই ট্রাকে আসতে। অবশ্য হঠাৎ ঝড়জল হয়ে গেল। কিছু দেরী হতে পারে সেজন্যে। চন্দন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বৃষ্টি থেমে গেল রাত ন'টা নাগাদ। তারপর আকাশ পরিষ্কার হল। নক্ষত্র ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে রাত বাড়ল। বাসস্ট্যান্ড বাজারের সব আলো একে একে নিভে গেল। সাধুপদ ডাকতে এল খাবার জন্যে। গাড়ির ভিতরে চুপচাপ বসে ছিল চন্দন। বলল, আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না সাধুদা। আপনি ঘুমোন গে।

সাধুপদ বলল, বেজোর ভাবনা করবেন না ছোটবাবু। ও কী মাল আমি জানিনে? ঠিক এসে যাবে, দেখবেন। আসবে—পায়ে ধরে কান্নাকাটিও করবে।

চন্দন গাড়ি থেকে নেমে বলল, ওর ধার আমি ধারিনে সাধুদা। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

সে তো একশো বার। ...সাধুপদ সমর্থন করল। আসলে হয়েছে কী জানেন? ছোটলোককে কক্ষনো বেশি আস্কারা দিতে নেই—মাথায় চড়ে বসে। সত্যি ছোটবাবু, মাইরি বলছি—আমি বড্ড অবাক হয়েছি ওর কান্ড দেখে। আরে বাবা, মদ তো সবাই খায়—তুইও খেয়েছিস বরাবর। কিন্তু এমন করতে তো কক্ষনো দেখিনি। হাটবাজার জায়গা—দিনদুপুরে হাজার লোকের সামনে আপনাকে অমন আকথা-কুকথা বলে বসবে, ভাবতেও পারিনি। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ।

সাধুপদ মিথ্যে বলেনি। ব্রজর এ আচরণ অভাবিত ছিল। বিকেলের ট্রিপে গাড়ি নিয়ে এসে কোথায় যথারীতি মদ খেতে গিয়েছিল সে। চন্দন শ্যামার পানের দোকানের সামনে বেঞ্চে বসেছিল। হঠাৎ টলতে টলতে এসে ব্রজ বলেছিল, স্যার এবেলার ট্রিপে সব প্যাসেঞ্জার ফ্রি—বিনি ভাড়া। আমি আজ বিনি পয়সায় মানুষ বইব। হুঁ—ব্রজগোপাল আজ খানিক পুণ্যি করবে ছোটবাবু স্যার।

চন্দন প্রথমে কোন কথা বলেনি। ব্রজ সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল আবোলতাবোল বকে যাচ্ছিল।...ব্রজগোপাল পাপীতাপী লোক—সে পুণ্যি করবে। আপনিও পুণ্যি করুন ছোটবাবু। সঙ্গে যাবেন। এই শ্যামা, আমাদের ছোটবাবুও পুণ্যি করবে—কী বলিস? কেন করবে পুণ্যি? এ্যাঁ? ওরে শ্যামা, জানিস—কেন করবে? হিঃ হিঃ হিঃ। মাইরি শ্যামা, ছোটবাবুর নজর আছে। শালা শতমাইলের তেঁতুলতলার ভূষণো কুনাই—তার একটা ছুঁড়ি আছে। আমাদের ছোটবাবু, মাইরি—চোখের দিব্যি, ...হিঃ হিঃ হিঃ...

শ্যামা ধমকেছিল—এ্যাই ব্রজা, থামবি?

নো—নেহী। ব্রজগোপাল কভী নেহী থামে গা। মেরা হাথমে স্টীয়ারিং। যতক্ষণ স্টীয়ারিং আছে হাতে, ব্রজ থামবে না।...

ব্রজ হাসছিল আবার। হাসতে হাসতে চন্দনের দিকে ঝুঁকে বলেছিল, গা-গাড়ি বেচবেন না স্যার? শ্যামা, স্যার গাড়ি বেচতে এয়েছিল। ওরে শালা! গাড়ি বেচলে তেঁতুলতলা যে কানা হয়ে যাবে। ভূষণের মেয়েটা ডুকরে কাঁদবে। (চোখ নাচিয়ে) জানিস শ্যামা, পুশুলেতেও ছোট-বাবু একটা জুটিয়ে ফেলেছে। কী কপাল রে! ওই যে ময়রা মেয়েটা......মাইরি—হিঃ হিঃ হিঃ......

আচমকা চন্দন উঠে চড় মেরে বসেছিল ব্রজর গালে। ব্রজ চড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর লাফিয়ে উঠে আস্তিন গোটাতে গোটাতে বলেছিল, চড় মারল আমাকে! এ্যাঁ! শ্যামা, তোর ছোটবাবুকে আজ আমি ঝাড়ব। শালা, ড্রাইভার বলে কি মানুষের রক্ত গায়ে নেই? গায়ে কি শুধু মদ আছে রে শালা—ভেরা (অশ্লীল বাক্য) ...আও, চলা আও ছুঁসাড়ুবালে।

চারপাশে লোক জমে গেছে। কেউ হাসছে, কেউ ব্রজকে সামলাচ্ছে। চন্দন আবার চড় তুলে এগোতেই হ্দয়ঠাকুর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। চন্দনকে ঠেলতে ঠেলতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।... ছেড়ে দিন স্যার, ছেড়ে দিন। বাগদীর ছেলে—ওর মুখের রাখ্-ঢাক্ নেই। মিছেমিছি ভদ্রসন্তান কেন ছোটলোকের গাল খাবেন!

সাধুপদ দৌড়ে এসে চন্দনকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। ব্রজ তখনও সমানে চ্যাঁচাচ্ছে।...চলা আও। বাপকা বেটা হলে চলা আও। ওরে শালা! মানব আছ তো

আছে। যতক্ষণ গাড়ি চালাব—তুমি মনিব। গাড়ি থেকে নামলে তুমি যা, আম্মো তাই। কই ফারাক নেহী হ্যায়। চলা আও!.....

সাধুপদর হোটেলে ঢুকে লাল চোখে চন্দন কতক্ষণ ধরে একটা ক্যালেন্ডার দেখছিল। ওখানে বাসস্ট্যান্ডে রীতিমতো ভিড়। নানান মন্তব্য কানে আসছিল। তারপর ঝড়বৃষ্টি এসে বাঁচাল। কে কোথায় মাথা বাঁচাতে সরে গেল। বৃষ্টির মধ্যে ফাঁকা বাসস্ট্যান্ডে দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বসেছিল চন্দন। আর বেরোয়নি।

সাধুপদ বলল, তাহলে সত্যি খাবেন না?

চন্দন ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল অন্ধকারে। তারপর বলল, চলুন আপনি—একটু পরে দেখছি।

সাধুপদ চলে গেল। চন্দন ভিজে মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে নিল। অন্ধকার নিঃঝুম হয়ে গেছে পুশুলিয়া। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে। চারদিক থেকে লক্ষকোটি পোকামাকড়ের ডাক ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে। এইসব ধ্বনিপুঞ্জ প্রচণ্ড চিৎকারের মতো তার মাথার ভিতর ঢুকে পড়ছে। অস্থির হয়ে সে ভিজে মাটিতে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। কাদায় জুতো নোংরা হয়ে গেল। সিগ্রেট জেবলে সে পীচের রাস্তায় চলে এল। ব্রজর কাছে গাড়ির চাবিটা রয়ে গেছে যে! হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। যাক্। ডুপ্লিকেট আছে—অসুবিধে হবে না। হৃদয়কে বলে দিয়েছে, কাকেও না পাওয়া গেলে পাণ্ডেজীর কাছে যেতে। হৃদয় এত দেরী করছে কেন?

অবশ্য শিশিরবাবুদের ট্রাকটা এখনও এল না।

খুব ক্লান্তি লাগছে। এমনি করে *সারারাত* অপেক্ষা করতে হবে নাকি? একসময় সে সাধুপদর হোটেলে যাওয়াই ঠিক করল। হৃদয় হয়তো গাড়ির অভাবে আসতে পারছে না।

সাধুপদ ঘুমোয়নি। দরজা খুলে বলল, আসুন, আসুন। মা আকালী, শুলি নাকি? একবার আয়দিকি রে! ছোটবাবু এয়েছেন। তখন বললুম স্যার, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন।

আকালী এল পাশের ঘর থেকে। একটু হেসে বলল, ভাত বেড়েই রেখেছি।

চন্দন বলল, কিছু খাবো না। খিদে নেই। শোব।

তাই হয়? ভাত বেড়ে রেখেছি যে!... আকালী দৌড়ে পাশের ঘরে গেল।

সাধুপদ আসন করে দিতে ব্যস্ত হল। ...খালিপেটে রাতকাটানো কাজের কথা নয়। ওর কথায় মন খারাপ করবেন না। ওদের মুখটাই অমনি। ও ইন্দি! ঘুমোলি? বাবুকে জলটল দিয়ে যা।

আকালী ভাতের থালা এনে রাখল। ...ওরা জেগে থাকবার লোক? দুজনে গলাগলি নাক ডাকছে। এখন কানের কাছে ঢাকঢোল বাজালেও ঘুম ভাঙবে না। যত জ্বালা তো আমার!

চন্দন হাতমুখে জল দিয়ে খেতে বসল। বেশ রাঁধে এরা! কিন্তু সত্যি, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। অথচ এরা বাবা মেয়ে যেভাবে সাধাসাধি করছে, পাতে না বসেও উপায় নেই।

সাধুপদ তার জলচৌকিতে বসে সিগ্রেট ধরিয়েছে। বলল, বর্ষা আসতে দেরী। মৌরী নদীতে যা মাছ হবে, দেখবেন। কী মধুর স্বাদ! ইয়া বড়ো সব পাবদা ওঠে জালে। গত কয়েক বছর থেকে ইলিশও উঠছে। এ এক তাজ্জব কাণ্ড স্যার। আকালী, গতবার ইলিশ উঠেছিল না?

আকালী বলল, হ্যাঁ। কোত্থেকে উজিয়ে আসে সব।

সাধুপদ বলল, তা বেজায় কথা বলছেন—লোকটা এমনিতে তো বড্ড ভালো ছিল। কখনো কোনরকম মন্দ দেখিনি। তাড়ি মদটা খায়, এই যা। আসলে ব্যাটার বউটা পালিয়ে মাথাখারাপ হয়ে গেছে।

বাবা-মেয়ে দুজনেই জোর হাসতে লাগল। আকালী বলল, কেরেস্তানের মেয়ে। ঘরে থাকবে কেন?

সাধুপদ বলল, কী বলে দ্যাখো! কেন থাকবে না? কেরেস্তানের মেয়েরা ঘর-সংসার করছে না স্বামীর? শোনাডাঙা গিয়ে দেখে আয় না।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। খুব চাপা গরগর শব্দ। তারপর শব্দটা বাড়ল। চন্দন চমকে উঠেছিল। এ'টো হাতেই সে দরজার কাছে উঠে গেল। বাসস্ট্যান্ডের দিকে আলো শিসিয়ে উঠছে। রূপপুর থেকে সেই ট্রাকটা এল নাকি?

সাধুপদ বলল, ব্যস্ত হবেন না। হৃদে ঠাকুর আসছে। আপনি খেয়ে নিন তো।

গাড়ির শব্দটা এত চেনা লাগছে কেন? চন্দন এক লাফে নিচে নামল। দৌড়ে গেল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। এ কী! তার স্টেশন-ওয়াগনটা নিয়ে চলে যাচ্ছে কে? চন্দন প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠল—এই, এই! কী হচ্ছে? রোখো, রোখো!

দৌড়তে থাকল সে। ব্রজকে দেখা যাচ্ছে আবছা। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে সে? চন্দন পিছন পিছন দৌড়ে চলল। ...ব্রজদা! এই ব্রজদা!

পীচের পথে পা পিছলে হোঁচট খেয়ে পড়ল চন্দন। হাঁটু দুটো হয়তো ছড়ে গেল। হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে আবার দৌড়ল সে। চেঁচাতে থাকল—ভালো হবে না বলছি! ব্রজদা, ব্রজদা! রোখকে—রোখকে।

তীব্র বেগে গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ধকার দিগন্তে কয়েক মুহূর্ত ধরে একটা আলোর ছটা শিসিয়ে উঠতে দেখা গেল। গুর গুর শব্দটা মিলিয়ে গেল। পোকামাকড়ের ডাক, ব্যাঙের ডাক তীব্রতর হয়ে উঠল। অন্ধকারে স্তম্ভিত হয়ে এ'টো হাতে দাঁড়িয়ে থাকল চন্দন।

সাধুপদকে লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে ডাকছিল—ছোট-বাবু, ছোটবাবু!

কাছে এসে সে বলল, কী ব্যাপার? কার গাড়ি?

চন্দন আড়ষ্ট স্বরে জবাব দিল, ব্রজ গাড়ি নিয়ে পালাল।

পালাবে কোথায়? মাতালের কাণ্ড। সকালে ট্রিপ নিয়ে হাজির হবে দেখবেন। ভাববেন না। আসুন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন।......

ব্রজ অমন করে গাড়ি নিয়ে গেল কেন? ঘুম আসছিল না চন্দনের। সাধুপদর হোটেলে এর আগেও কয়েকরাত শুয়েছে। বিছানাপত্র ভালই দিয়েছে সাধুপদ। সেজন্যে নয়, ব্রজর কথাগুলো মনে পড়ছিল—আর ক্ষেপে উঠছিল চন্দন। ওকে একটা

চড় মেরে তার রাগ পড়েনি। চাবকাতে ইচ্ছে করছে শুধু। তার ওপর এমনি করে রাত-দুপুরে না বলে-কয়ে গাড়িটা নিয়ে গেল! হয়তো সাধুপদর কথাই ঠিক। ব্রজ বড্ড বেহায়া। তাছাড়া গাড়িটাকে সে ভীষণ ভালবাসে। হয়তো কাল সকালের ট্রিপ নিয়ে এসে পড়বে। পাছে চন্দন তাকে গাড়ি চালাতে না দ্যায়, তাই এমনি করে গাড়ি নিয়ে রূপপুর চলে গেল। হয়তো কাল এসে ঠিকই পায়ে ধরে কান্নাকাটি করবে। বলবে, আপনি আমার মাবাপ স্যার—আমি আনএজুকেটেড অধম বান্দীসন্তান।.........

লোকটাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সত্যি তো চন্দন ওর সর্বস্বান্ত করেছে। হাসি দুমকায় মামাবাড়ি গিয়ে উঠেছে নাকি। ব্রজ বলছিল, শীগগির দুমকা গিয়ে ওকে নিয়ে আসবে। হাজার হোক, বউ তো বটে। পেটে বাচ্চা আছে। সেধে নিয়ে আসবে। হাসি ওইরকম মেয়ে। হঠাৎ রাগ উঠল তো কথা নেই। রাগ পড়ল তো পড়ল —তখন একেবারে মাটির মেয়ে। এত ভালো হাসি, এত চমৎকার মেয়ে! ব্রজ ওর ওপর রাগ করে থাকতে পারে—না, সে ব্রজর ওপর রাগ করে থাকতে পারে? মুখোমুখি দাঁড়ালেই গলে জল হয়ে যাবে। কেন যাবে না বলুন স্যার! আপনিই বলুন। জাত ছেড়ে বেজাতের সঙ্গে এসে জুটেছিল—এ কি কম কথা? হতভাগা ব্রজগোপাল তার মর্যাদা রাখতে পারেনি! আর—বুঝলেন স্যার? ওর বড্ড সাধ ছিল একটা পেটে কিছু আসুক। তা এল এ্যাদ্দিনে—ভগবান ওকে যেভাবেই হোক দিলেন তো বটে—

চন্দন আড়চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে। 'যেভাবে হোক' কথাটা খুব ভেতরে খোঁচামারার মতো না?

ব্রজ বলেছে—তবে আমি শালা ওই খবরটা শুনে মদ খাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছি। ...রে বাঃ! হাসি ছেলেপুলের মা হবে—তার আমার আনন্দ হবে না? স্ফূর্তি ...তে মন চাইবে না? আরে বাবা, হাসি ...হলে তার স্বামী যখন, তখন আমিও ...া একজন বাপ বটি! না কী? বলুন—...ার করে বলুন স্যার!......

হঠাৎ চন্দনের মনে হল, গাড়ি নিয়ে ... দুমকা চলে গেল না তো—হাসির ...ছে? ওকে কিছু বিশ্বাস নেই।

রাতটা কখন এইসব সাতপাঁচ ভাবনায় ...টে গেল। সাধুপদর হোটেলে শুলে ...নায় বেলা অব্দি পড়ে থাকা যায় না। ... বোন মিলে এখন ঘরটা ঝাড়পোঁছ ...ব। জল ঢেলে ধোবে। পিঁড়িগুলো ...মুছে সাজিয়ে রাখবে। দিনের জন্যে ...ী হওয়ার ব্যস্ততা এখন।

চন্দন উঠে দেখল সাধুপদ তার আসনে বসে গণেশ মূর্তিতে ধূপধুনো দিচ্ছে। এখন কয়েক মিনিট সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। বিড়বিড় করে মন্ত্রতন্ত্র আওড়ায়। চন্দন ভিতরে উঠোনের দিকে গেল। দেখল আকালী উঠোন ধুচ্ছে কোমরে আঁচল জড়িয়ে। পদ্ম রান্নাঘরে কী খুটখাট করছে। ইন্দি ঘাটের দিক থেকে আসছিল—হাতে একরাশ থালাবাসন। চন্দনকে দেখে একটু হাসল সে। চন্দনও হাসল।

খিড়কির দরজার বাইরে একচিলতে সবজীখেত আর আগাছার ঘন জঙ্গল। লেবু গাছ, আমড়া গাছ, পেঁপে গাছ। নিচে নদীর দহ। কালকের ঝড়জলে মাটি কিছু পিছল হয়ে গেছে। পা টিপে-টিপে নেমে গেল চন্দন। একটু তফাতে বাঁপাশে গৌরীদের ঘাট। সে ঘাটে গৌরীর মা বসে ঘটি ধুচ্ছে আর আপনমনে বকবক করছে। গৌরীর সঙ্গে আজকাল দেখাই হচ্ছে না। হয়তো খুব কড়াকড়ি করছে ওর মা। চোখে চোখে রাখছে। কিছু কানে যায়নি তো গৌরীর মায়ের?

চন্দনের কাসি শুনে গৌরীর মা এদিকে মুখ ফেরাল। নদীর ওপাড় ঘেঁষে সবে সূর্য উঠেছে। ভুরু কুঁচকে চন্দনকে দেখার চেষ্টা করে বলল, কে গো? ভূতনাথ নাকি? কখন এলে?

চন্দন হাসি চেপে বলল, না—আমি ভূতনাথ নই।

ময়রাগিন্নি ঠাহর করে দেখে একটু হাসল। ...আমার মরণ, বাবা। চোখে ভালো দেখতে পাইনে। অ—আপনি বুঝি 'ভ্যানগাড়ি'র ছোটবাবু?

চন্দনের গাড়ির নাম 'ভ্যানগাড়ি'। রাজকমলবাবুর আমল থেকেই এ নাম চালু। কেউ বলে 'ভ্যাংগাড়ি।' বেজোর ভ্যাংগাড়ি। চন্দন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, মা। ...মা কথাটা তার বলতে ইচ্ছে করল হঠাৎ।

ময়রাগিন্নি খুশি হয়ে বলল, বেশ বাবা, বেশ। আমার মেয়ে তোমার কথা বলে বটে—প্রায়ই বলে।

চন্দনের বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। মুখে হাসি রেখে সে বলল, কী বলে?

ময়রাগিন্নি একটা প্রকাণ্ড ঘটি উবুড় করে জলের ফোঁটা ঝরাতে থাকল। ...ওর কথা আর বলো না বাবা। ক বছর আগে টাইফয়েড হল—কী জ্বর, কী জ্বর! বড়ো ডাক্তার আনলুম সেই বহরমপুর থেকে—আট টাকা ভিজিট! একটিমাত্র পেটের পোকা—মেয়ে তো নয়, কথায় বলে—মাটির ঢিপি। এই যায়—ওই যায়, এ বেলা যায়—ওবেলা যায় অবস্থা। শেয়রে রাত্তির জাগি ঠায়—দুচোখের পাতাটি বুজিনে। সান্নিপাতিক বিকার—এ কি যা তা কথা? শেষঅব্দি প্রাণটা তো রইল—গেল না। কিন্তু এ মেয়ে আর সে-মেয়ে নেই। চাল-চলন কেমনধারা হয়ে গেল। মুখবাগে হাঁ করে চেয়ে থাকে—যেন কিছু বুঝতে পারে না। তখন, বুঝলে বাবা, তখন গেলুম অষ্টগ্রামের বাবার থানে। তারপর থেকে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি খুলেছে। তবে—সোমত্ত মেয়ে—ছাত্তিশজাতের জায়গা—...

চন্দনের মনটা ভারি হয়ে গেল। একটা প্রচ্ছন্ন কষ্টের ঢেউ এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকে আড়ষ্ট করল। হ্যাঁ—এটাই ভেবেছিল সে। গৌরী কেমন যেন একটু এ্যাবনরম্যাল—বয়সের তুলনায় তার মনটা কাঁচা মনে হয়েছিল। গৌরীর জন্যে মমতা বোধ করল সে। কিছু বলার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করল—কিন্তু ময়রাগিন্নি কথা থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সিঁড়ির ধাপে উঠে ময়রাগিন্নি মুখ ফেরাল হঠাৎ। ...কাল খুব চেঁচামেচি হট্টগোল হচ্ছিল আপনাদের। কী নিয়ে বাবা? আকালী বললে, বেজোর সঙ্গে আপনার মারামারি হয়েছে।

চন্দন হেসে উঠল। ...ও কিছু না। মাতাল লোক। বুঝতেই পারছেন।

ময়রাগিন্নি চলে গেলে চন্দন একটু অস্থির হয়ে পড়ল। গৌরীর আরও কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল তার। কিছু তো বলল না। গৌরী কি এখানেই আছে এখন —নাকি বাইরে আত্মীয়বাড়ি গেছে বেড়াতে?

জিয়াগঞ্জ থেকে আসার পর আর দেখতে পায়নি ওকে। বুথা কেটে গেছে গৌরী নদীর বালির চড়ায় অনেকগুলো নির্জন সন্ধ্যা! কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, প্রকৃতি গৌরীর সঙ্গে যেন একটা দারুণ শঠতার খেলা খেলছে। ওর মধ্যে যৌবনের ভালবাসার আকুতি যেমন দিয়েছে, তেমনি সেই ভালোবাসাকে ফলেফলে ভরিয়ে দেবার পথে কী যেন বাধাও সৃষ্টি করে রেখেছে! গৌরীর সঙ্গে এবার দেখা হলে তাকে আর অন্যভ্য হাতে ছোঁবে না চন্দন। নিবিড় মমতা দিয়ে শুধু অনুভব করবে তার অস্তিত্ব।

ইন্দি এসে গেল ঘাটে। একটা প্রকাণ্ড কালো কড়াই আর খুনতী ধুতে এল। ...বাব্বা! এতখন ধরে ঘাটে কী করছিলেন? চা জুড়িয়ে গেল ওদিকে।

চন্দন একহাঁটু জলে নেমে তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে থাকল। ...তোমরা যে আজ বেলায় খাতির করছ—ব্যাপার কী?

কিচ্ছু ব্যাপার নেই। ...বলে ইন্দি কাপড় ভিজিয়ে জলে নেমে গেল পাশে। ...রাত্রিবাস করলেন, কুটুম্বিতে করবেন না?

চন্দনের কাঁধে তোয়ালে ঝুলছিল। সে ঘাটে উঠে মুখ মুছতে মুছতে বলল, আচ্ছা ইন্দি—ওই বাড়িটা—মানে ওই ঘাটের ওপর বাড়িটা কাদের?

ইন্দি দেখে নিয়ে জবাব দিল, ময়রাদের। কেন?

এমনি জানতে ইচ্ছে হল।

ইন্দি হঠাৎ চাপা হাসল। ...বুঝেছি। ঘাটে গৌরী এসেছিল নাকি?

কে গৌরী?

যাকে দেখে আপনার মুণ্ডু উড়ে গেছে! ...ইন্দি খুব হাসতে লাগল।

চন্দন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, বাঃ!

বাঃ নয় বাবা। তাই এতক্ষণ ধরে ঘাটে বসে......হঠাৎ ইন্দি কণ্ঠস্বর চাপা করল। ...মেয়েটা হাবা, তা জানেন? আপনি এবার যেদিন প্রথম এলেন, সেই যে গো—অনেকটা রাত্তিরে—সেইদিন। নদীর চড়ায় একা গিয়েছিল—আর নাকি কারা ওকে জোর করে নষ্ট করে ফেলেছে। খুব ছোটাছুটি চ্যাঁচামেচি হল। লোক চিনতে না পারলে কী করবে? গৌরীর মা সব চেপে গেল। কিন্তু ঘাটের লোকে ছাড়বে কেন? এটা অন্যায় নয়? হাবাগোবা মেয়ে পেয়ে যা খুশি করবে নাকি? সবারই মামাসি রয়েছে ঘরে।

চন্দনের শরীর শক্ত হয়ে উঠেছিল। সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, একেবারে চিনতে পারেনি?

ইন্দি একখাবলা বালি তুলে কড়াইটা পা দিয়ে ডলতে ব্যস্ত হল। ...অতশত জানিনে বাবা। আপনার চা জুড়িয়ে গেল। বাবা ডাকছে—শিগগির যান।

চন্দনের মনটা আবার রাতের মতো তেতো হয়ে গেল। সে ভারী পা ফেলে ঘাটের ওপর উঠে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু থেমে গৌরীদের বাড়িটার দিকে তাকাল। ওদের একতলার ছাদে সকালের উজ্জ্বল রোদ পড়েছে। একটা কাক আর কয়েকটা পায়রা বসে আছে চুপচাপ। নারকোল গাছের পাতাগুলো দুলছে।

সাধুপদ জলচৌকিতে বসে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে, পায়ে পা তুলে চা খাচ্ছে পরম তৃপ্তিতে। একপাশে একটা বড় গেলাস ভরতি চা ঢাকা। ছোট্ট থালায় পেঁয়াজ ভাজা লঙ্কা ভাজা আর মুড়ি। সাধুপদ বলল, চা জুড়িয়ে গেল। খেয়ে নিন।......

একটু পরেই লুঙি ছেড়ে প্যান্টশার্ট পরে চন্দন বেরোল। বাসস্ট্যান্ডে যথারীতি ভিড় হয়েছে। ঘাট থেকে গরুর গাড়িগুলো খন্দ আর কুমড়ো বোঝাই হয়ে উঠে আসছে। চাকায় কাঁধ লাগিয়ে চ্যাঁচামেচি করে গাড়ি ঠেলছে গাড়োয়ানেরা। বাসস্ট্যান্ডের ওদিকে ভিজে মাটিতে পাকা আমের গাদা। কাঁঠালের গাদা। একটা বাস তৈরী হয়েছে—বহরমপুর যাবে। এ্যাসিস্ট্যান্টটা চেঁচাচ্ছে—চলল গাড়ি তুফান মেল! প্রতিদিনের চেহারা-গন্ধ-স্বাদ নিয়ে পুশুলে বাজার চনমন করছে ব্যস্ততায়। চন্দন শ্যামার পানের দোকানে গিয়ে বসল। শ্যামা নমস্কার করে বলল, গাড়ি দেখছিনে। ব্রজ রূপপুর গেছে বুঝি খেপ আনতে? আপনি যাননি?

চন্দন মাথা দোলাল মাত্র। তার মনে এখন গৌরী—লাঞ্ছিতা অপমানিতা একটি হাবাগোবা যুবতী। এই ব্যাপারটা কেন কেউ তাকে বলেনি? বললে অবশ্য কিছু করার ছিল না। কিন্তু তবু মনে একটা জেদ থেকে যাচ্ছে। কেন তার কানে যায়নি এটা? আসলে জিয়াগঞ্জ থেকে আসার পর সে গৌরীর কথা আগের মতো ভাবেই নি।

সামনে থেকে একটা ট্রাক আসছিল। ট্রাকটা চেনা মনে হল। বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে পৌঁছলে চন্দন দেখল, শংকর ড্রাইভারের পাশে হৃদয় বসে রয়েছে। চন্দন চমকে উঠল। হৃদয় ট্রাকে এল যে? তাহলে কি গাড়ি নিয়ে ব্রজ রূপপুর যায়নি? রাগে লাল হয়ে গেল চন্দন। থানায় গিয়ে শুওরের বাচ্চাকে রুদ্দাখাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেই হবে। নৈলে ওর বাতলামি শায়েস্তা করা যাবে না! রুট পারমিট এবার নির্ঘাৎ ক্যানসেল করে ছাড়বে স্কাউন্ড্রেলটা। কী মতলব ওর?

ট্রাকটা দাঁড়াতেই হৃদয় লাফিয়ে নামল। তারপর চন্দনের দিকে দৌড়ে এল। চন্দন বলল, ট্রাকে এলে যে?

হৃদয় হাঁফাতে হাঁফাতে চোখ কপালে তুলে বলল, সর্বনাশ স্যার, ভয়ানক কাণ্ড! শিগগির চলুন, শিগগির! কিছু নেই—সব শেষ স্যার। ...হাউমাউ করে সে কেঁদে উঠল।

চন্দন ক্ষেপে গিয়ে বলল, কী সর্বনাশ হয়েছে বলবে না, খালি লাফাবে! কী হয়েছে, কী?

হৃদয় কাঁদতে কাঁদতে বলল, ব্রজ মরেছে—গাড়ি পুড়ে গেছে! ছাই—সব ভস্ম!

শংকর এসে বলল, [illegible] কঠিন ব্যাপার ছোটবাবু। রূপপুর [illegible]ট বাংলোর কাছে বেজা গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে গাড়িটা—আর নিজে করেছে কী, রাস্তার ধারে শিরিস গাছে জিভ বের করে ঝুলছে!......

* * *

আজকাল সব গাড়িই ইনসিওর করা থাকে। তাই ইচ্ছে করলে আবার গাড়ি কিনতে পারে রূপপুর-পুশুলিয়া রুটের ছোটবাবু। কিন্তু আর এই ছায়াঢাকা সুন্দর পীচের পথে কোন ব্রজগোপালের সবুজ 'ভ্যাংগাড়ি' থামিয়ে কোন কাঠকুড়োনি বুড়ি কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে বলবে, আমার কুসুমকে বলিস বাবা—তোর মা পরশু গিয়ে তোকে নিয়ে আসবে। যেন বলিস বাপ, তোর দিব্যি রইল!...

পাঁচণ্ডীর বাঁকে মনোহারিওলা হেঁটে রুগী জোবেদালি চাচা আর কাকে আনা দেবে চুড়ি সাবান ফুলেল তেল—এক জন উজুনবাছা কাবুই?

ভাঙা সাঁকোর কাছে পাগলিতলায় তার অসুস্থ মেয়ের জন্যে ওষুধ আনতে গেছেন কাকে—কে শুনবে, গাড়ি থামিয়ে—এই অসংগত আবুদার কিংবা সুসংগত শ্লোক?

বট্তলার মাচা থেকে আত্মমগ্ন লোক-গুলো বিড়ির আগুন চাইবে কোন ভালবাসার ড্রাইভারকে?

আর কেউ বলবে না—আমাদের ভ্যাংগাড়ি, আমাদের ভ্যাংগাড়ি! ছায়ায় ঢাকা পীচের পথে হঠাৎ থেমে কোন ড্রাইভার বলে যাবে না ঘুঁটেকুড়ুনী ছোট-লোকের মেয়েটাকে—কেমন আছিস বোনটি? তোর দিদিকে দেখে এলুম—রাস্তার ধারে ধান শুকোচ্ছে।

কাস্তে হাতে চাষা, তার কাঁধে হাটুরে, মাটি কোপানো রোডকুলির দল—কেউ পথের মাঝে চেঁচিয়ে উঠবে না আনন্দে—ওই বেজোর ভ্যাংগাড়ি! বেজোদা, ভালো আছো হে? ও বেজো, কাল সীট দিও একখান—আমার জামাই আসবে। বেজা রে, এদ্দিন ক্যানে দেখিনি বাপ!

কত কথা, কত মানুষ, কতবার চাকার শব্দ, ভেঁপুর স্বর, রুটের নামতা—চিরচেনার খাতায় লেখা দীর্ঘ কবিতার মতো নানান ছন্দে লিখে রাখল এই পথ। এই পথে একজন পথের মানুষ ছিল, পথ তার ঘর। মাথায় বড় বড় চুল, এলোমেলো গোঁফদাড়ি, জ্বলজ্বলে দুটি কোটরগত অমায়িক আমুদে চোখ—হোক সে মাতাল, সবার বড়ো আপনজন। কাছের মানুষ। রূপপুর থেকে পুশুলিয়া আজ স্তব্ধ হতবাক—চোখ থেকে জল মুছছে হাতের চেটোয়। আজ এ পথে যে বাতাস বইছে, শিরিস বট অর্জুন আকাশিয়া গাছের পাতায় পাতায় যে কাঁপন উঠছে—তা প্রাণের মানুষটির জন্যে দীর্ঘশ্বাস আর প্রবহমান শোক।

গাছের ছায়ায় বসে গ্রামবুড়োরা বলাবলি করছে—কী ছিল এই রাস্তাটা, কী হল! কাঁচা মাটির এবড়োখেবড়ো গাগাড়ি চলা জেলাবোর্ডের রাস্তা। বর্ষায় হাঁটু অব্দি পাক জমে উঠত। তখন গাড়োয়ানদের সে কী কষ্ট, সে কী লাঞ্ছনা! চাকায় কাঁধ লাগিয়ে চ্যাঁচায় সবাই গাঁশুদ্ধ ঘুম ভেঙে যায় রাতদুপুরে। তারপর খোয়া পড়ল, পীচ পড়ল। বাস চলতে লাগল। তবু যেন মন ভরে না। কী যেন বাকি থেকে গেল, কী যেন নেই। তারপর এল একটা মজার ছোটখাটো সবুজ রঙের গাড়ি। এল এক তেমনি মজার ডেরাইভার। বাঃ রে বাঃ! লাগ ভেলকি লেগে যা দিনে-রাতে প্রহরে-প্রহরে। সব খুঁত ঢেকে গেল। রূপপুরে অপরূপা পথরূপসী যেন দূর নদীর ঘাটে জলকে যাচ্ছে বেলায়-বেলায়। প্যাঁক প্যাঁক ভঁক ভঁক 'ভ্যাংগাড়ি'র ভেঁপু বাজে। বুকের মধ্যেটা চনমন করে ওঠে। ওই শব্দ শুনে সময়ের হিসেব করে ক্ষেত-মজুরে। রোডকুলিরা, আড্ডাবাজ গেঁয়ো মানুষ। ওই শব্দে কান খাড়া করে চার-দেয়ালের ভিতর গেরস্থগিন্নি। কাঠকুড়োনি ঘুঁটেকুড়ুনির আকাশে তাকায়—সূর্য দেখে। এই লোকটা ছিল যেন গ্রামজীবনের চমৎকার একটা ঘণ্টাঘড়ি।

সেই ঘণ্টাঘড়িটা চিরকালের মতো বিকল হয়ে গেল যেন।

...তবে কথা কী, মানুষের সব সয়। আবার হবে, ভাবতে নেই—আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন না কোন ভাবে বিধাতা-পুরুষ ঠিক করে নেবেন সব।

রূপপুর ফরেস্ট বাংলোর কাছে মেলার ভিড় জমেছে। কতদূর গ্রামগ্রামান্তে খবর চলে গেছে এরই মধ্যে। চারদিকে ভালো রাস্তাঘাট। সবসময় বাসরিকসো লরী টেম্পো চলছে। খবর কয়েকঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কাতারে কাতারে লোকেরা এসে ভিড় করছে। সবার চোখে-মুখে ব্যাকুল প্রশ্ন: কেন আত্মঘাতী হল? কেনই বা গাড়িটাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে?

হ্যাঁ—নিজে একা যায় নি। প্রিয় গাড়িটাও নিয়ে পালিয়েছে ছোটবাবুর কাছ থেকে। রাস্তার ওপর একটা কালো পোড়া টাট কংকালের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাকা পোড়ার কুচ্ছিত গন্ধে ভরা চারদিক। এখনও ধুয়োচ্ছে গাড়িটা। পুলিশ এসে গেছে। লাসটা নামানো হয়েছে উঁচু ডাল থেকে। মাটিতে শুয়ে আছে ব্রজর লাস—ওপরে একটা চাদর ঢাকা দেওয়া হয়েছে। কান্দী থেকে এ্যামবুলান্স গাড়ি আসার অপেক্ষা শুধু। হকসায়েব এসে যথারীতি ভিড় সামলাচ্ছেন। সবার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।...

একটু তফাতে পার্কের কাছে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রজ ড্রাই-ভারের 'মালিক' রূপপুর পুশুলিয়া রুটের ছোটবাবু। পায়ের কাছে হৃদয় ঠাকুর বসে আছে করুণমুখে। পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে চিত্রবিচিত্র হাওয়াই শার্ট, পায়ে কেডস জুতো—কাঁধে কন্ডাকটারি ব্যাগ। অনবরত নাক মুছছে। গাঁজাখোর হৃদয়ঠাকুর আজ আর ছিলিম টানবে না—অন্তত একটা দিন।......

রাধা এসে ডাকল, ছোটবাবু।

চন্দন মুখ তুলে তাকাল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভেবে আর কী হবে! আসুন, চানখাওয়া করবেন। হতভাগার যাবার ইচ্ছে হয়েছিল—গেল। আপনি ভেবে কী করবেন, বলুন?

চন্দন বলল, হৃদয়—তুমি ওখানে গিয়ে থাকো। আমাকে দরকার হলে ডেকো। আমি যাচ্ছি।

হাইওয়েতে হাঁটছিল দুজনে। রাধা হঠাৎ বলল, একটু আগে পরেশবাবুর শালী এসে জিগ্যেসপত্তর করছিল।

চন্দন অন্যমনস্কভাবে বলল, কে—রুমা?

আজ্ঞে হ্যাঁ ছোটবাবু। রাধা যেন হাসল একটু।...পাম্পে এয়েছিল দিদির কাছে। ফেরার পথে এল। বললে, কী হয়েছিল—কেন ব্রজ ড্রাইভার মল। যেন আমি সব জেনে ঢেকে রেখেছি লোকের কাছে।

চন্দন কোন কথা বলল না। আর রাধা বলল, ওদিকে আমার বাবা এক-অনুরোধ এক কাণ্ড করেছেন। সোনাডাঙার হাসির দিদির কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। হাসি নাকি দুমকায় রয়েছে। পাগল,... না মাথাখারাপ! সেখানেও লোক পাঠালেন। ও আসবার মেয়ে হলে ঠিকই আসত। হাজার হলেও সোয়ামী—তার ওপর পেম করে বেজাতে জাত দিয়েছিল, টনক নড়বে না? আপনি জেনে রাখুন, ও মেয়ে কক্ষনো তার এ মুখো হচ্ছে না।......কণ্ঠস্বর চাপা করে রাধা আরও বলল, সেদিন নগেন ড্রাইভার রামপুরহাট হয়ে দুমকা গিয়েছিল। ওর মুখের কথা বিশ্বাস করা কঠিন। বললে, বেজোর বউর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি। আপনার কথা জিগ্যেস করছিল। নগেন আপনাকে বলবে বলছিল। বলে নি?

চন্দন বলল, না।

হয়তো সাহস পায়নি বলতে। হাসি ওখানের হাসপাতালে চাকরী পেয়েছে বললে। সত্যিমিথ্যে কে জানে বাপু। নগেনের একশো কথায় নিরানব্বুইটা ফালতু।...রাধা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।...অ সন্ধে, অ পোড়ারমুখি! যাঃ, দিলে—দিলে আচারগুলোয় হেগে। তখন বললুম খোলা ছাদে রাখিসনে—নিচে বারান্দায় দিব্যি রোদ পড়বে। ধুর, ধুর। যাঃ!

কাক তাড়াতে তাড়াতে দৌড়ল রাধা। চন্দন থমকে দাঁড়াল। চান-খাওয়ার জন্যে রাধার সঙ্গে সে আসেনি। কিছুক্ষণের জন্যে একলা হতে চেয়েছিল—একটা নির্জন ঘরে। পান্ডেজীর ওখানেই যাওয়া যাক বরং।

সে হাঁটতে লাগল। পিছনে রাধা ডাকছিল তাকে—ও ছোটবাবু! আবার ওদিকে কোথায় চললেন?

আসছি বলে চন্দন হনহন করে হাইওয়ে ধরে এগোল। 'স্যাঙ্গুভ্যালি'র সামনে দিয়ে যাবার সময় সীতাংশুবাবু বেরিয়ে এল। চন্দন আসছি বলে চলতে থাকল। পান্ডেজী গদীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বস্তায় খন্দ ওজন হচ্ছে। চন্দনকে দেখে এগিয়ে এলেন। আরে আসুন, আসুন। সব শুনলাম। একবার যাব ভাবলাম—কিন্তু এই দেখছেন ঝামেলা।

চন্দন বলল, আপনার ওপরের ঘরটা খোলা আছে? একটু বিশ্রাম করব।

(ক্রমশঃ)

রাহুমুক্ত রুদ্দুরে আমার প্রতিচ্ছাপ ॥

সত্য গুহ

বাঙলাদেশ কি আমি জানতাম না
আমি কেবল একটু একটু করে জানতে শুরু করেছি নিজেকে
ফাঁকফুরসুৎ পেলে নিজেকেই বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
হাজার বার করে দেখেছি
শ্যামশ্রী ও মুখে তখন সবে গর্জন তেল পড়েছে, স্তন উঠছে
গলার স্বর হয়ে উঠেছে সংগীত
আমার শরীর নদীর জোয়ার নিয়ে
চারদিকের খুশিখানাকেই করে তুলেছে ষড়ঙ্গ

বারুলের ব্রতর ফুল তুলতে গাছের দিকে তাকিয়েছি তো ভোর
তারার ব্রতর আলপনায় চুল ছাড়া দিয়ে
মাথা ঠেকিয়েছি তো সন্ধ্যা
আমার হাসিতে বকুল ঝরতো,
কান্নায় ঝরে পড়তো রোদমুখী শিশির
আমাকে ঘিরে রোয়া হচ্ছিলো ভাবভালোবাসার চারা
আমাকে নিয়ে চোখে চোখে টিয়ারঙের স্বপ্ন
আমার মুখ না-দেখলে বিকেলের দীঘির খুশি লাগতো না
শাওন আকাশের রামধনু না অভিমান ভাঙা আমার মুখ
এ নিয়ে যেমন তর্ক ছিলো, তেমনি সকলেরই ধারণা
আমার মুখ দেখার পর থেকেই চাঁদ তার মুখের জরুলটা নিয়ে
সচেতন হয়ে পড়েছিলো

একটু একটু করে আমি খুলে যাচ্ছিলাম, তেমন ফুল ফোটে
পুণ্যিপুকুরের পারে আমার রূপ ব্যথা করে উঠলে
মা বলেছিলেন
'এই হয়ে ওঠার সময়েই যা ভাবনা' আমার ভালো লাগতো না
পথে পথে পাথর ছড়ানো—কাঁটা ছড়ানো—
চোখে করে রাখার এই প্রচ্ছন্ন চাপ
আমার ভালো লাগতো না.
আমি ভুরুতে শর জুড়ে শুধু ভেবেছি 'ধ্যাঃ
আমার আবার কে শত্তুর থাকবে' এবং হায়, কিন্তু হায় রে......
আমি জানতাম না; আমার শরীরের মাংসের চেয়ে
বড় শত্তুর আর নেই
আমাকে রমণী হতে হোলো—
সহসা বালিকা কালে আমাকে রমণী করা হোলো
আমি দ্রুত বুঝেছিলাম,
আমার আখাল আর আগুন চড়াতে অক্ষম—
এর পর অনন্ত শীত

বাঙলাদেশ কি আমি জানতাম না
গায়ে হলুদ বা প্রজাপতি না,
একদা মিষ্টি গলায় দয়েল পাখি মাংস খেতে বসলে
দেহমনের যন্ত্রণার মধ্যে থেকে বুঝেছিলাম
হিংস্র পাথরের মতো বুকের তলায় ছিবড়ে হয়ে যাওয়া
আমরা দুই যমজ উচ্ছিষ্ট
একই বাংকারের কড়কড়ে উলঙ্গ ঠান্ডায় মুখোমুখি শুয়েছিলাম
আমি জানতাম না, রাহুমুক্ত রুদ্দুরে আমার প্রতিচ্ছাপ উঠেছিলো

এই বনের গহনে ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

এই বনের গহনে দ্রৌপদী প্রতীক্ষা করে
তার পাহারায় আছে সিংহ ঐরাবত বৃষ ঘোড়া
যাবতীয় পশুপাখি
রথের চূড়ায় স্বয়ং গরুড়
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ফিরে এলে
ভ্রমর বরণ চুল সে যে বাঁধবে পল্লব ছাঁদে
পরবে কুসুম
আপাতত আছে মন্দির সৈকতে
ঝাউ কুঞ্জে ওষধি বাতাস
বহু স্মৃতি তোলা সমুদ্রে লহরী।

গোধূলির গান ॥

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কথা ছিল কবে কোন গোধূলিবেলায়
কঙ্কবতী হে কন্যা আনন্দে তাথৈ তাথৈ
ময়ূর ওড়াবে
আঁধার ঘনায়ে এলে কালোচুল এলো করে
বসে রবে সেই নদীপারে
মাঝে মাঝে নাইয়ার ভাটিয়ালী গান
জলে ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ
সারারাত বসে বসে তারা-দেখা খেলা হবে।

রাত্রি ফুরালে
মায়াবতী সাঁকো বেয়ে
একা একা চলে যাবে দূরে পরপারে।

বিজ্ঞানের কথা

মরণে কিসের ভয়

মানুষ মরে কিসে? অসুখে? ক্যানসার আরো দু-একটা অসুখ বাদ দিয়ে এমন অসুখ আছে যা ওষুধে সারে না? বা পেটের অসুখ তো আজকাল অসুখের মধ্যেই ধর্তব্য নয়, এমনকি রা-টাইফয়েড বা প্লেগ-বসন্তের মতো সময়ের শহর-গ্রাম উজাড়-করা রোগও অনায়াসেই সুঁই বা টীকা নিয়ে য়ে রাখা চলে। ট্রিপল অ্যান্টিজেনের গে ডিপ্‌থিরিয়া টিটেনাস ও হুপিং চিরতরে নির্মূল হতে চলেছে। ধের কল্যাণে পোলিও রোগও। যৌন- তো আজকাল প্রায় টোকা দেবার করে সারিয়ে তোলা হচ্ছে। আমে- র পরিসংখ্যানে জানা যায়, একই একই যৌনব্যাধিতে বারবার আক্রান্ত —অর্থাৎ প্রতিবারে সেরে ওঠার পরে রণে যৌনব্যাধিটি বাধে তাই সে করছে র। তাহলে মানুষ মরবে কিসে? সার বা থ্রমবসিস বা এ-ধরনের া অসুখ না হলে বলা শক্ত।

বুও মানুষকে মরতেই হয়। কোনো যদি না হয় তো অন্ততপক্ষে হৃদ- র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। কিন্তু সবচেয়ে র্যের ব্যাপার মরবার আগের মুহূর্তে চায় বেঁচে থাকতে। হাত-পা কাটা আষ্টেপৃষ্ঠে প্লাস্টারে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে থাকতে হোক, সারা শরীর আড়ষ্ট পড়ুক—তবুও মানুষ ভাবতে পারে , এর চেয়ে মরা ভালো। চোখের নেই, শরীরের অনুভূতি নেই, একটা পিণ্ডের মতো জবুথবু হয়ে বিছানায় আছে, তবুও বেঁচে থাকা চাই। ী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করে- আশ্চর্য কী? যুধিষ্ঠিরের জবাবে আশ্চর্যের কথাই বলা হয়েছিল। নিয়তই মারা যাচ্ছে, তবুও যারা আছে তারা ভাবে চিরকাল তারা থাকবে!

বুও যখন মরতেই হবে তখন কে অন্যভাবে তোলাই ভালো। মরবে কিসে? তা না হয়ে বরং— মরবে কখন?

নেক দিন আগে দেখা একটি চলচ্চিত্রের দৃশ্য মনে পড়ছে। ক পদার্থে ভর্তি একটি লরি ভাবে সামনের একটি খাদে পড়বার মুখে—অর্থাৎ অবধারিত মৃত্যু। এমনি সময়ে ড্রাইভারের পাশের সীটের সঙ্গীটি সাজসরঞ্জাম বার করে দাড়ি কামাতে বসল। ড্রাইভার অবাক হয়ে বলে, ব্যাপার কি, তুমি তো আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মরতে চলেছ! সঙ্গীটি বলে, সেজন্যেই তো, আই ওআন্ট টু বি প্রেজেনটেব্‌ল। চলতি বাংলায়, পাতে দেওয়া চলে এমনিভাবে আমি মরতে চাই।

অধ্যাপক জে বি এস হলডেনও মরবার মাসকয়েক আগে জানতে পেরে- ছিলেন, একেবারে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট না করে হোক, মোটামুটি অমুক সময়ের মধ্যে তাঁকে যেতেই হচ্ছে। তিনি আয়োজন করে- ছিলেন আরো বিরাট। তাঁর শুধু আক্ষেপ ছিল তাঁর যে ক্যানসার হয়েছে সেটা অনেক আগে ধরা পড়া সত্ত্বেও তাঁকে কেন জানানো হয়নি। তাহলে তিনি হাতের কাজগুলো আরো ভালোভাবে শেষ করতে পারতেন। সব জানার পরেও ক্যানসার নিয়ে যিনি এমন মজার কবিতা লিখতে পারেন তাঁর চেয়ে প্রেজেনটেব্‌ল আর কে আছে! তাই অনায়াসেই ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন মরবার পরেও তাঁর শরীরটা নিয়ে যেন গবেষণা চলতে পারে। কলি- যুগের যুধিষ্ঠির বলতে পারেন, এই হচ্ছে আশ্চর্য, বাঁচা ও মরার সীমানা এমনিভাবে লোপ করতে পারা!

এতখানি সবাই হতে পারবেন না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রেজেনটেবল হতে বাধা কি? মরতে যখন হবেই।

তাহলে মানুষ মরবে কখন? এ-প্রশ্নের জবাবে এ কথাই বলতে হয়, মরণ যেখানে আসছেই মরণকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করার মতো প্রস্তুতি নিয়ে। কবির ভাষায়, মরণ হোক শ্যাম সমান। বয়সটা এখানে বড়ো কথা নয়। বাঁচব বেঁচে থাকার মতো করে। অর্থাৎ বাঁচাটা হবে সুন্দর। তেমনি মরতেও যেন পারি বাঁচার মতোই সুন্দর করে। জবুথবু মাংসপিণ্ড হয়ে দিন-যাপন কোনোক্রমেই নয়, তার আগেই সুন্দরভাবে মরণ আসুক।

কিন্তু আমরা তো আর ভীষ্ম নই যে ইচ্ছে করলেই মরণকে পেতে পারি। এ-যুগে মরণকে ইচ্ছে করলেই পাওয়া যেতে পারে একমাত্র চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে। আর তার জন্যে চাই আইনের অনুমোদন।

ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসক- মহলে কথাটা উঠেছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পৃথক একটি শাখাই গড়ে উঠেছে বিষয়টি নিয়ে। আমাদের দেশে এখনো ওঠে নি, কিন্তু আরো বেশি করে ওঠা উচিত।

আরো আলোচনায় যাবার আগে আমেরিকার একটি হাসপাতালের আলোড়ন-সৃষ্টিকারী একটি ঘটনা বলে নিতে চাই। জীবন মৃত্যু ও আইনের অনুমোদনের ব্যাপার নিয়ে ছোটখাটো একটি নাটকও বলা চলে।

নাটকের মুখ্য চরিত্র ৭৭ বছর বয়সের নিঃসন্তান এক বিধবা, নাম জেরট্রুড রাশ। ধমনী শক্ত হয়ে যাচ্ছিল বলে তাঁর শরীরে দু-বার অপারেশন করা হয়। দ্বিতীয় অপারেশনে বাঁ পা-টি হাঁটুর নিচ থেকে বাদ পড়ে। কিন্তু তারপরেও দেখা যায়, শ্রীমতী রাশের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে। ডাক্তাররা সুপারিশ করেন, আরো একবার অপারেশন করা দরকার, এবারের অপারেশনে বাঁ পা-টি হাঁটুর ওপর থেকে কেটে বাদ দিতে হবে। ডাক্তাররা বললেন, এই অপারেশনটি করা হলে শ্রীমতী রাশ আরো কয়েক মাস বেশি বাঁচবেন। অপা- রেশন না হলে তাঁর আয়ু আর কয়েকটি দিন মাত্র।

কিন্তু দু-দুটি অপারেশনের পরে শ্রীমতী রাশ এতবেশী মুষড়ে পড়েছিলেন যে তিনি আর কোনো কথা বলতেই রাজী নন। অথচ অপারেশন করতে হলে তাঁর মৌখিক সম্মতি অবশ্যই চাই। তখন হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ আইনগত অনুমোদন পাবার জন্যে শ্রীমতী রাশের পক্ষে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করলেন।

আদালত বসল শ্রীমতী রাশের বিছানার পাশে। বিচারক শ্রীমতী রাশের বক্তব্য শুনে বুঝতে পারলেন আরো একটি অপারেশনে শ্রীমতী রাশ অনিচ্ছুক। তখন তিনি রায় দিলেন, শ্রীমতী রাশকে ঈশ্বরের শান্তির আশ্রয়ে গমন করতে দেওয়া হোক।

এই ঘটনা আমেরিকার পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল। বিশেষ করে আমেরিকার চিকিৎসকরা [illegible]

করলেন। বিষয়টি মরণ ও মরা নিয়ে। একজন মানুষ মরছে, এই প্রক্রিয়া, এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সমস্ত প্রক্রিয়া নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন আরো আগে থেকেই চলে আসছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন এক শাখাও গড়ে উঠেছিল নতুন এক নামে—থানাটোলজি। গ্রীক শব্দ 'থানাটোস'-এর অর্থ মৃত্যু, তা থেকেই এই নাম। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ অস্টিন কুটশার হচ্ছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির অন্যতম প্রবর্তক। তাঁর ভাষায়, 'যে-পথে মানুষ তার যন্ত্রণাকে গ্রহণ ও জয় করতে পারে এবং যন্ত্রণাকে করে তুলতে পারে সৃজনশীল অভিজ্ঞতা, তার অধ্যয়ন হচ্ছে থানাটোলজি।

ডাঃ কুটশার নিজে এ-বিষয়ে আগ্রহী হন পাঁচ বছর আগে, দীর্ঘকাল ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে তাঁর প্রথম স্ত্রী যখন মারা যান। তাঁর যন্ত্রণার উপশম কি ভাবে হতে পারে, তাই নিয়ে তার কয়েকজন সহকর্মী সে-সময়ে পড়াশুনো করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে সাহায্য পাবার মতো উপকরণ তাঁরা প্রায় কিছুই পান নি। তখন ডাঃ কুটশার ও তাঁর তিনজন সহকর্মী নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠা করলেন 'থানাটোলজি ফাউন্ডেশন'। সংস্থার কাজ হল মৃত্যুকে নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করা।

দেখতে দেখতে আমেরিকার অন্যান্য শহরেও অনুরূপ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হল এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই নতুন শাখা সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হল। যারা নিশ্চিতভাবেই মরতে চলেছে তাদের চিকিৎসা কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে শুরু হল ব্যাপক আলোচনা। সেমিনার-গুলিতে ভিড় করে আসতে লাগল শুধু ছাত্ররাই নয়, অধ্যাপকরাও। শুধুমাত্র এই একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যেই বৈজ্ঞানিক সভা-সমিতি বেশ বড়ো আকারেই হতে শুরু করল।

এমন একটা জোয়ার আসার কারণ কী? কারণ আগেই বলেছি, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে দু একটি বাদে দুরারোগ্য ব্যাধি প্রায় কিছুই নেই। দু-একটি বাদ দিলে অসুখে ভুগে মানুষ আর মরছে না।

আর আমেরিকানরা ভুগছে এই দু-একটিতেই —হয় ক্যানসারে, নয়তো হার্টের অসুখে। ইউরোপেও তাই। আমাদের দেশের অবস্থাপন্নরা এই দলেই পড়ে। অন্যদের বাদ দিচ্ছি, তাদের আসল অসুখ অপুষ্টি।

ক্যানসারে বা হার্টের অসুখে যারা ভুগছে তারা অবধারিত মৃত্যুকে কিছুকালের জন্যে ঠেকিয়ে রাখছে মাত্র। কিন্তু সে জন্যে যে কতখানি ভুগতে হচ্ছে, কী দাম দিতে হচ্ছে!

আজকের দিনে আমেরিকার মানুষ অর্ধেকেরও বেশি মরে হাসপাতালে কিম্বা নার্সিং হোমে। জীবনের শেষ কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত রাখার জন্যে কী প্রাণান্তকর তাদের প্রয়াস, কী বিপুল তাদের ব্যয়। তারা যখন সত্যিকারের মরে তার অনেক আগেই কার্যত মারা যায়। শরীরে আর কোনো অনুভূতি নেই, টিউব লাগিয়ে শারীরিক প্রক্রিয়াগুলো চালু রাখা হয়েছে, বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে, এমনি আরো অনেক কিছু—সব মিলিয়ে প্রকান্ড একটা কুৎসিত ব্যাপার। থানাটোলজিবিদরা চান, এই কুৎসিত ব্যাপারটার অবসান হোক; যারা অবধারিত-ভাবে মরতে চলেছে, যাদের বলা হয় টার্মিনাল পেসেন্ট, তাদের সুযোগ দেওয়া হোক তারা যেন মর্যাদা ও মাধুর্যের সঙ্গে মরণের কাছে জীবনকে সঁপে দিতে পারে।

এখানেই আইনগত অনুমোদনের প্রশ্ন আসে। চিকিৎসককে শপথ নিতে হয় জীবনকে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখবেন। এটা বদলানো দরকার। যে রুগী মরবেই, সে নিজের ইচ্ছায় মরণের সঙ্গে মিলিত হোক মর্যাদার সঙ্গে, মাধুর্যের সঙ্গে—এ জন্যেও চিকিৎসক সাহায্য করুন।

সমস্যা যে কত জটিল তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে যে যে-রুগী মরবেই তাকে স্পষ্টভাবে সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়াও চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন কি রুগীর আত্মীয়-স্বজনদেরও নয়।

শিকাগোর হাসপাতালের এক ডাক্তার তাই এক সেমিনারের আয়োজন করেছেন। একজন রোগী—যে নিশ্চিতভাবেই জানে তার মরণ আসন্ন—প্রতি সপ্তাহে সেমিনারে এসে নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার কথা বলে যায়। জীবনের অভিজ্ঞতার মতো মরণেরও অভিজ্ঞতা আছে। তা এতদিন না-বলা থেকে গিয়েছে। দিনে দিনে মৃত্যুর আরো কাছে এসে সে-অভিজ্ঞতা যার হচ্ছে সে নিজের মুখেই তা বলুক। একজন মৃত্যুপথযাত্রীর হাত ধরে অন্যরাও মরণের ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকাটি পার হোক। মরণের অভিজ্ঞতা লাভ করে চিকিৎসকরা অবশ্যই আরো মনোযোগী হয়ে চলতে শিখুন।

বিষয়টির আরো একটি দিক আছে। যার মরণ অবধারিত ও আসন্ন তাকে ওষুধের সাহায্যে নেশা করিয়ে তার শেষ কয়েকটা দিন যদি আনন্দে ভরে তোলা যায় তাহলে চিকিৎসকের দিক থেকে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত কিনা? গাঁজা, ভাঙ, আফিং, এল এস ডি, হিরোইন, মারিজুয়ানা যা খুশি হোক। মহিমময় যেমন ফাঁসিতে যাবার আগে এক গ্লাস মদ খেতে চেয়েছিলেন। তার পরে ফাঁসির মঞ্চের দিকে তাঁর চলন দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি বা বাসর ঘরের দিকেই চলেছেন। ক্ষতি কি, নেশার ঘোরে হলেও মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে মরণ যদি শ্যাম সমান হয় তো হোক।

চিকিৎসকের ছুরি কাঁচি আর ওষুধের কেরামতিতে একটা শরীর বাড়তি কয়েকটা দিন টিকে যেতে পারে কিন্তু তার দরকারটা কী! মরণ কি এতই ভয়ের ব্যাপার? তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ের ব্যাপার জবুথবু মাংসপিন্ডের দীর্ঘায়িত অমর্যাদাকে মেনে নেওয়া। আসুন আমরা শপথ নিই—মরণে আমাদের ভয় নেই।

—[illegible]

করুণা মুখটা শুকনো করে নীরস গলায় বলল, 'কার্তিক, সুরটা কেমন কেমন লাগছে না?'

সজল বুঝতে পারছিল, যত ভুল হক এই আসরে তার গলাটা একেবারে 'ছি-ছি' করার মত নয়।

আসরটা ভেঙে আসছিল। রাতও হচ্ছিল। সজল উঠে পড়ল। নমস্কার জানিয়ে বলল, 'কার্তিকবাবু, গান সত্যি আমি জানি না। কখনো শিখিনি। নেহাৎ আপনারা পাছে বোবা ভাবেন, তাই দু-লাইন গেয়ে শোনালাম।'

কার্তিক আমতা আমতা করে বলল, 'সাধলে মশায় বেড়ে গলা হত আপনার।'

সজল হাসতে হাসতে বলল, 'আমি চিরকাল ঐ 'হোতো'র দলেই পড়ে রইলাম কার্তিকবাবু। ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। দুটো লেটারও ছিল। বি এ-তেও খুব খারাপ করিনি। ঐ পড়লে একটা কিছু হতাম। মোটামুটি ভালো ফুটবল খেলতাম। অভ্যেসটা রাখলে ভালো খেলোয়াড় হতাম। এক বন্ধু সেতার বাজাতো। শোনাতো, বলতো এই 'দেশ' শোন, এই শোন 'জয়জয়ন্তী' 'দরবারী কানাড়া'। কখনো 'ভৈরবী', 'আশাবরী'। একদিন গুনগুন করে এক লাইন গেয়ে শোনালাম। বলল, আরেঃ! এ যে 'মিঞা-মল্লার' মনে হচ্ছে! কার গান। বললাম, রবীন্দ্রনাথের। বন্ধুটি বলল, শেখ, শেখ। শিখলে বড় গায়ক হতে পারবি। কবিতা লিখতাম। এক সম্পাদক বললেন, লিখে যান মশায়, লিখে যান। নাম করা কবি হবেন। কিন্তু কার্তিকবাবু, এমন পোড়া কপাল, এ-জীবনে ঐ 'হোতো'র গন্ডীটা আদৌ ছাড়াতে পারলাম না। অবশ্য তার জন্য দুঃখ নেই। আমি যা আছি, তাতেই সন্তুষ্ট।—আসি এখন।'

আজকের সারা সন্ধ্যার অপমানটা সজলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এ তার প্রতিবাদ, এ তারই প্রতিশোধ।

করুণা চুপ করে রইল। কার্তিক এক-সঙ্গে অনেকগুলো চাবি টিপে হার-মোনিয়ামটা বন্ধ করল। একটা কর্কশ আওয়াজে ঘরটা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

সজল বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে গিয়ে, কি একটা শব্দে ফিরে তাকাল। অরুণার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য চোখা-চোখি হল তার।

সজল দেখল ঐ দৃষ্টির মধ্যে একটা গভীর তৃপ্তির আলো।

শান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরল সজল।

কিন্তু সারারাত ঘুমুতে পারল না। অরুণার সঙ্গে একান্তে একটু দেখা করা দরকার। নোয়াখালি চলে যাবার আগে, তার মনের দ্বন্দ্বের বোঝাগুলো হালকা করে যেতেই হবে। তার নতুন জীবনের জন্ম-মুহূর্ত, ভোরের আকাশের মত নিষ্পাপ হক, সজল তাই চাচ্ছিল। মনে মনে প্রার্থনা করছিল— 'হে ভগবান, আমাকে শান্তি দাও! শান্তি দাও!'

কি ভেবে আলো জ্বালাল সজল। মাথার কাছে মেঝেতে বাবার বইর দপ্তরটা পড়ে ছিল। দপ্তরটা ধীরে ধীরে খুলল। একের পর এক বইগুলো উল্টে উল্টে দেখল।

জীর্ণ, ধূসর গ্রন্থগুলি এক অপসৃয়-মান স্মৃতি। বাবা টোলের দাওয়ায় বসে হ্যারিকেনের আলোয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ পড়ছে। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে দূরে। ঘন অন্ধকার বাঁশবনে, পুকুরপাড়ের কলা-বাগানে ভীড় করে আছে। শিউলি ফুলের গাছটায়, তখন নববধূর মত সলজ্জ পুষ্প-গুলি একের পর এক পাপড়ি মেলছে, আর তার মৃদু গন্ধ, সারা টোলগৃহটিকে কেমন উদাস করে তুলছে! এই তার কৈশোরে দেখা ছবি। এ-ছবি বড় পুরাতন, এ-ছবি অতীতের পুনরাবৃত্তি!

সজল অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। উঠে আলোটা নেবাতেও তার ইচ্ছা করছিল না।

সেদিন দূর থেকে 'চিঠি'-র ডাক শুনেই সজল ঘর খুলে দৌড়ে গেছল। বাড়ীওয়ালা বৈকুণ্ঠ দাসের চিঠিটা পিয়ন ছুঁড়ে দিয়ে গেল।

সজল বলল, 'আমার চিঠি আছে?'

পিয়ন চিঠির তাড়া খুঁজে দেখল। 'না, সজল ভট্টাচার্য নামে কোন চিঠি নেই।'

'একটু ভালো করে দেখুন না?'

পিয়ন বিরক্ত হল—'আপনি ত মশায় সেই কবে থেকে চিঠি চিঠি করছেন। চিঠি এলে কি আমরা ধুয়ে খাব? আচ্ছা লোক বটে!'

সজল শুকনো মুখে ফিরে গেল। ঠিক। চিঠি এলে ওরা দেবে না কেন? কিন্তু অফিসে বলেছিল, এই সপ্তাহের মধ্যেই চিঠি যাবে। আর একবার কি সে অফিসে গিয়ে খোঁজ নেবে? আবার ভাবল, গেলে যদি বিরক্ত হয়, আর তার ফলে চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে যায়!

এদিকে টাকা ফুরিয়ে আসছে। ঘরে ফিরে এসে বালিশের নিচে হাত দিয়ে খামটা বের করে আনল। এতেই তার টাকা পয়সা থাকে। গুণে দেখল আটটা টাকা আর খুচরো কয়েক আনা। এটাকা থেকে বাড়ী ভাড়া পাঁচ টাকা যাবে। মাস শেষ হয়ে আসছে।

পরের দিন সকালবেলা সজল ঘর বন্ধ করে বেরল।

'বৈকুণ্ঠবাবু আছেন নাকি?'

বাড়ীওয়ালার ঘর পাশেই। তবু পরিচয় এমন একটা নেই। কথাবার্তা খুব হয় না। ঐ যা, ভাড়া দিতে গেলে।

বৈকুণ্ঠবাবু দোকানে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন বোধহয়। গায়ে ফতুয়া। গলার মালাটা দেখা যাচ্ছে। বললেন, 'কি ব্যাপার মশায়, এই সাত-সকালে?'

সজল বলল, 'দেখুন ভাড়াটা দিতে এলাম?'

বৈকুণ্ঠবাবু দুচোখ কপালে তুলল, 'ভাড়া ত ও-মাসে দিয়েছেন। দেননি?'

'দিয়েছি। এ-মাসেরটা দিয়ে দিচ্ছি।'

'মানে আগাম? দিন, তা দিন।' বৈকুণ্ঠ দাস হাত পাতল। 'তা সকালবেলা যাত্রাটা ভাল।'

[illegible] দিল।

ফতুয়ার পকেটে টাকাটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বৈকুণ্ঠ দাস বলল 'কি ব্যাপার বলুন ত? আগে ভাগে দিয়ে দিচ্ছেন? ঐ দেখুন না? ওদিকে যে দাশ-গুপ্ত আছে, কোন বিস্কুট কারখানায় কাজ করে—আজ চার-চারটা মাস ভাড়া বাকি। এই দিচ্ছি, ঐ দিচ্ছি—এই করেই মারছে।'

সজল বলল, 'ব্যাপার কিছু না। হাতে টাকা নেই। চাকরী একটা পাওয়ার কথা ছিল। দেখছি সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। ভাবলাম, ঋণ শোধ করি আগে। তারপর আর পেটে জুটুক না জুটুক। তাই ভাড়ার টাকা দিয়ে দিলাম।'

বৈকুণ্ঠবাবু কথাটা শুনে হাঁ হয়ে গেল। 'বলেন কি মশায়? টাকা না থাকলে লোকে বাড়ী ভাড়াটা আগে মেরে দেয়। আর আপনি বলেন, ওটা আগে দিয়ে দিই। না মশায় নিয়ে নিন আপনার টাকা।'

'না না, আপনি রেখে দিন।'

একটা পরম তৃপ্ত মন নিয়ে সজল ফিরে এল।

'সজল ভট্টাচার্য' [illegible] পিয়নের ডাক শুনে কপাট খুলে [illegible]শ্বাসে দৌড়ে গেল সজল।

কিন্তু একি! [illegible]কারী চিঠি ত লম্বা খামে আসে! [illegible] তাহলে কি? হাতে নিয়েই দেখল, বিশ্বময় লিখেছে। নেম[illegible] খালি যাওয়া হল না। সরকার রাজি নয়। একদিন এসো।'

সজল আবার হতাশ হল। তার [illegible] হল, প্রাণ খুলে কাঁদে একবার। ঘরে ফি[illegible] এল সজল। বড় ক্লান্ত মনে হল নিজেকে।

আশ্চর্য! শেষ রাত্রির অন্ধকারের [illegible] সজলের দুঃখের দিনগুলো ক্রমশঃ [illegible] হচ্ছে। নোয়াখালি যাওয়ার প্রথম সংক[illegible] আরতি বাধা দিয়েছিল। সে-বাধা [illegible] সূক্ষ্ম, এত শান্ত যে, তাকে অতিক্রম [illegible] যাওয়া, সজলের পক্ষে কষ্টকর ছি[illegible] কিন্তু একেবারে অনতিক্রম্য ছিল বললে [illegible] বলা হবে। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল, [illegible] চাকরীর চিঠিটা এসে যায়! তবে কি স[illegible] চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে নোয়াখালি [illegible] যাবে? যেতে পারবে?

বস্তুতঃ এ বাধা বড় জটিল, বড় কঠি[illegible] চাকরী করার জন্যই সে কলকাতায় এসে[illegible] এত কষ্ট করেছে, করছে। তাছাড়া রা[illegible] নৈতিক মানসিকতাসম্পন্ন নয়। সে সম্ভব[illegible] মূলতঃ ভাবপ্রবণ শিল্পী জাতের মানু[illegible] রাজনীতি করার মত মনের গঠন, [illegible] বুদ্ধি, বলিষ্ঠতা এবং জ্ঞান কোনটাই [illegible] নেই। তাছাড়া বিশ্বময়ের সঙ্গে [illegible] হওয়ার পর নোয়াখালি যাওয়ার সে সঙ্ক[illegible] করেছিল, তার উত্তাপ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

জগতে সজল সেই জাতের মানুষ, যাদের সকল কাজের পেছনে সব সময় ইন্ধন জুগিয়ে রাখতে হয়। পড়াশোনার পেছনে আত্মীয় স্বজন বা সুলতাদির মত কেউ ইন্ধন জাগিয়ে রাখলে, সজল নিশ্চয়ই আরো পড়াশোনা করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন সজল দেখত।

কিন্তু এই স্বাধীন, মুক্ত সজল, এখন সকলের প্রভাবের অতীত হ'তে চলেছে। এমন যে ভালোবাসা, জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য-ময় দিগন্ত, সেখানেও যদি অন্তত মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ না করে, মেলামেশা না করে, তবে সেই দিগন্তও এক সময় অন্ধ-কারে ঢেকে যাবে।

এই রোখহয় সজলের চরিত্র। ভালো হোক, মন্দ হোক, এই চরিত্র নিয়েই সে জন্মেছে, এই চরিত্র নিয়েই সে আমৃত্যু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সংসারের পথ বেয়ে চলবে।

ক'দিন পর সকালে উঠে সজল দাঁত মেজে মুড়ির কোটোটা খুলে অবাক: একেবারে তলায় মুঠোখানেক স্যাঁতসেঁতে মুড়ি পড়ে আছে। একটা কাগজের ওপর সেইগুলোই ঢেলে ফেলল। মুড়ির সঙ্গে সব রাজ্যের ধুলো। তবু খুঁটে খুঁটে সব খেল। খেয়ে কুঁজো থেকে ঢক-ঢক করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিল। ব্যস্। এবার বাজার যেতে হবে।

সেই খামটা বের করল সজল।

কিন্তু তিন টাকা কয়েক আনা পয়সা অক্ষয় সম্পদ নয়। চাল এক মুঠোও নেই। তবে আনাজ ঝুড়িতে এখনো দুটো ছোট ছোট আলু, আধখানা পেঁয়াজ রয়েছে। আর খামে পাঁচ আনা পয়সা।

সজল হাসল। আর একটা পয়সা থাকলে বড় ভালো হ'ত। সোয়া পাঁচ আনা পয়সা। শুনতে বেশ লাগে। শ্রাদ্ধের সময় এগুলো ধরে দিতে হয় বামুনকে।

সজল নিশ্চিন্ত। দোকানে মুড়ি আছে, কলে জল আছে।

বিছানায় শুয়ে কলেজস্ট্রীটের ফুটপাতে কেনা পোকা-কাটা 'গীতাঞ্জলি'টা খুলে ধরল সজল।

প্রথমেই চোখে পড়ল একটি আশ্চর্য স্তবক: 'মা চাহিতে মোরে যা করেছ দান, আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ, দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়, সে মহাদানের যোগ্য করে...'

চোখ বুজে সজল কথাগুলো ভাবতে লাগল। কী আশ্চর্য কবিতাটি! না চাইতেই আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি—এই আকাশ আলো, আমার এই শরীর মন প্রাণ। আচ্ছা, এতদিন একথাটা তো কখনো মনে হয়নি! মনে হয়নি কখনো, এ-সব কার দান! কে দিয়েছে?

সেই যে অমৃতপুরের পশ্চিমে মাঠের ওপারে শেষ বেলার সূর্যাস্ত, আর বিরাট স্থিতপ্রজ্ঞ আকাশ—অথবা আমার শরীর মন, প্রাণ যাঁর দান, তাঁর কথা কি কোনদিন অন্তর দিয়ে ভেবেছি? একদিনের জন্য তাঁর প্রতি জীবনের নীরব কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছি?

এতদিন তো কেটে গেল কেবল অর্থ চিন্তায়, সংসারের আর পাঁচটা চিন্তায়। কিন্তু যে চিন্তাটা জীবনের স্রোতকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে, তার কথাতো কই একদিনও ভেবে দেখিনি!

বইটা বন্ধ করে রাখল সজল। অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। এই মুহূর্তে বড়ো ভালো লাগছে। নির্ভার লাগছে।

একেই হয়ত ধ্যানের আগের মুহূর্ত বলে।

কলিং বেলটা আজো তেমনি তীব্র স্বরে বেজে উঠেছিল। কিন্তু শুচিতা আজ এল না। ব্যাগ হাতে বুড়ো চাকর হরিহরদা দরজা খুলে দিল।

সজলকে চেনে সে।

একটু পরেই শুচিতা দৌড়তে দৌড়তে এল। 'ও সজলদা, দাদা আপনার কথা বলছিল যে!

সজল হেসে বলল, 'কি বলছিল সেইটে বলনা?'

'আপনি এসেছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করেছিল'।

'তা হলে বল, আমি এসেছি।'

'দাদা কি বাড়ীতে নাকি এখন? ওমা! সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে। বলেছে ন'টায় আসবে।'

সজল দেয়ালঘড়িটা দেখল। এখনো প্রায় দু'ঘন্টা দেরী। চলে যাবে কিনা ভাবছিল। শুচিতা বলল, 'চলুন দাদার ঘরে বসবেন চলুন'।

বিস্ময়ের সেই ঘরটায় এসে সজলের আজো ভালো লাগছিল। ও যাওয়ার আগেই জানালাটা খুলে রেখে গেছে। ঘরে এখন সুন্দর রোদ। সেই ছবিটার ওপরও কিছু রোদ এসে পড়েছে। শুধু খাটের বালিশের কাছে গীতবিতানটা নেই।

'বইটা গেল কোথায়, শুচিতা।'

শুচিতা দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'কেন বইটা আবার?'

'গীতবিতান'।

'কেন? কি হবে গী... ...তান?'

সজল একটু হে... বলল, 'গাইতে ত আর পারি না। তাই গানগুলো পড়ব'।

শুচিতা অবাক। 'এমন কথা জীবনে কখখনো শুনিনি বাবা।'

'বসুন চা নিয়ে আসি। আজ কিন্তু শুধু চা। কিচ্ছু নেই বাড়ীতে। হরিহরদা এইমাত্র বাজার গেল।'

কিন্তু সজল কি হতাশ হল? মুড়ি আর জল খেয়ে চারদিন কেটেছে ঠিকই। কিন্তু মন তো তার দুর্বল হয়নি। তবে তার কি অবচেতন মনে এখানে কোন প্রত্যাশা ছিল? সে কি মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে? সে কি ভেবেছিল, এখানে চায়ের সঙ্গে মুড়ি ছাড়া অন্য কিছু মিলবে প্রথম দিনের মত।

সজল নিজেকে একবার বিশ্লেষণ করতে শুরু করল। বড় করুণ মনে হ... নিজেকে।

শুচিতা ফিরে এল মিনিট কয়েক পরেই।

(ক্রমশ

নবাবী আমলে বাঙালী অভিজাত

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশে নবাবী আমলের শুরু লতে গেলে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় থেকে। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের শাসন বাঙলার তিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। র্শিদকুলি যখন বাংলার শাসন-রিচালনভার গ্রহণ করেন তখন ভারতে মাগল সাম্রাজ্যের চরম মুমূর্ষু অবস্থা। দকে দিকে রাষ্ট্রবিপ্লব অশান্তি, তার উপর ধর্ষ মারাঠা আক্রমণের সদা ভীতি। এই রিস্থিতিতে মুর্শিদকুলির শাসন বাংলাকে সই যুগে যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা দান রেছিল তা ভারতের অন্যত্র ছিল অজ্ঞাত।

মুর্শিদকুলির শাসনব্যবস্থার সবচাইতে ল্লেখযোগ্য অবদান রাজস্ব সংক্রান্ত ংস্কার। মুর্শিদকুলির আগে বাংলায় মিরাজস্ব থেকে প্রায় কোন আয়ই হত না রকারের। সরকারের আদায় হত শুধু াণিজ্য শুল্ক। এতে রাজকোষের লোকসান ত বিস্তর।

তাই ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত উন্নতির দেশ্যে মুর্শিদকুলি দু'রকম ব্যবস্থার চলন করেন। মুর্শিদকুলির আমলেও রকারী কর্মচারীদের কাজের পারিশ্রমিক সাবে নিয়মিত আর্থিক বেতন দেবার রিবর্তে 'জাগির' জমি বন্দোবস্ত দেবার থা প্রচলিত ছিল। এতেও হত সরকারের াকসান। তাই প্রথমত তিনি 'জাগির' মিকে 'খালসা' জমিতে পরিণত করে, খান থেকে কর আদায়ের জন্য সরকারী মালা নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত তিনি জারাদার' বা ঠিকা রাজস্ব-আদায়কারীদের ামে ভূমিরাজস্ব আদায় ব্যবস্থার প্রবর্তন রেন। এই ব্যবস্থার নাম 'মাল জামিনি' বস্থা।

এর আগে সরকার থেকে ভূমিরাজস্ব দায়ের ভার ন্যস্ত করা হত রাজস্ব-দায়কারী মুশিলম আমলাদের উপর। সব মুশিলম আমলারা প্রায়ই হতেন াঙালী বিদেশী ও বহিরাগত শাসক প্রদায়ের লোক। এদের কার্যকলাপের র সরকারের তেমন নিয়ন্ত্রণ না থাকার রা প্রায়ই তাদের আদায়করা রাজস্ব তছরুপ করত ও তার কোন হিসাবনিকাশ দাখিল করত না। এদের শায়েস্তা করাও সরকারের পক্ষে কঠিন হত।

তাই মুর্শিদকুলি স্থির করেন, অতঃপর রাজস্ব আদায়ের কাজে যথাসম্ভব স্থানীয় যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করবেন। ফলে সুবিধা এই স্থানীয় হিন্দু কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সরকারের বেশী থাকবে; তারা অধিকতর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে আগ্রহী হবে সরকারের অনুগ্রহ লাভের আশায়। কাজে কাজেই, এর দরুন রাজস্বআদায়ের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে ও রাজকোষের সমৃদ্ধি ঘটবে।

মুর্শিদকুলির এই প্রত্যাশা বহুলাংশে পূরণ হয়েছিল। রাজপদের উচ্চপর্যায়ে বেশীসংখ্যক বাঙালী হিন্দু কর্মচারী নিয়োগের ফলে একদিকে যেমন নবাব সরকার হিন্দুদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে হিন্দুদের আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও কুশলতায় রাজকোষ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নবাব মুর্শিদকুলিকে বলা যায় বাংলায় এক নতুন বাঙালী অভিজাত-সম্প্রদায়ের স্রষ্টারূপে— যাদের একদল জমিদার অন্যদল ব্যবসায়ী ও পদস্থ রাজ-কর্মচারী।

রাজকর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও বাংলার এককালীন দেওয়ান ও উড়িষ্যার সুবাদার ও পরে কার্যত গোটা বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী নবাব মুর্শিদকুলি এক বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় দেন। ১৭১০ সালে বাংলার দেওয়ানীতে পাকাপাকি বহাল হবার পরই নবাব মুর্শিদকুলি' এই ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য নীতির প্রচলন করেন। ইতিপূর্বে বাংলার নবাব সরকারের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক পদগুলি পূরণ করা হত বিভিন্ন রাজবংশের শাসন-কালে বাংলার বাইরে থেকে আসা অবাঙালী ও বিদেশী মুসলিমদের দ্বারা। ফলত দেশ ও স্থানীয় জনগণের উন্নতির জন্য তাদের প্রায়ই বিশেষ কোন মাথাব্যথা থাকত না। তাদের লক্ষ্য হত শুধু নিজ নিজ ভাগ্যান্বেষণ।

মুর্শিদকুলি খাঁয়ের আমল থেকেই সূত্রপাত হয় রাজ্যের সুবাদার ও ফৌজদারের অধীনে উচ্চতম বেসামরিক ও বহু সামরিক পদে স্থানীয় দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগের প্রথায়। এর ফলে বাংলার সমাজজীবনে এক নতুন পরিবর্তনের সূচনা হয়। হিন্দুদের সরকারী রাজস্ব আদায়ের কাজে উচ্চপদে নিয়োগ করবার অপর কারণও ছিল যার ইঙ্গিত ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক সালিমুল্লাহ্ তার তারিখ-ই-বাঙ্গালাতে লিখেছেন 'মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব আদায়ের কাজে শুধু বাঙালী হিন্দুদেরই নিয়োগ করতেন, কারণ শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের অপকর্ম নিবারণ করা সহজসাধ্য ছিল, আর এছাড়া তাদের ভীরু ও দুর্বলচিত্ত বা দায়িত্বহীন ফাঁকীবাজ হবারও কোন আশঙ্কা ছিল না।'

পূর্বতন শাসকদের রাজস্ব ও কর আদায়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার ও একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটিয়ে, সুনির্দিষ্ট পরিমাণ রাজকর ধার্য করে ও বাণিজ্যশুল্কের হার উচিতমত নির্ধারণ করে দিয়ে তিনি বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে নজর দেন। ফলে বাংলায় সৃষ্টি হয় এক অভিজাত বনেদী বাঙালীবণিক সম্প্রদায়। হুগলী বন্দর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সেখানে যেসব বিত্তশালী বণিক বাস করতেন তাঁদের বেশীর ভাগের ছিল নিজস্ব বাণিজ্যজাহাজ যা দূরপ্রাচ্যে আরব, পারস্য ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত হত।

নবাব মুর্শিদকুলি প্রবর্তিত এই নীতি তার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নবাব শুজা-উদ্দিন ও আলিবর্দির আমলেও অনুসৃত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিদেশী বিশেষত ইউরোপীয় বণিকদের তিনি মোটেই সুনজরে দেখতেন না। কারণ তিনি এঁদের মনে করতেন বাংলার সমৃদ্ধির অন্তরায়রূপে। তাদের উত্তরোত্তর ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে ছিলেন তিনি সন্দিহান। তার এই নীতিই প্রভাবিত করেছিল নবাব শুজা-উদ্দিন, আলিবর্দি ও সিরাজুদ্দৌলাকে। ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন—বাঙলায় শেষ

স্বাধীন নবাব হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলাকে তার রাজত্ব ও প্রাণ খোয়াতে হয়েছিল ও সেইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতারবি অস্তমিত হয়েছিল এই বিদেশী বণিক ইংরেজদেরই চক্রান্তে......।

আগেই বলা হয়েছে, নবাবী আমলের আগে বাংলায় ভূমিরাজস্ব হিসাবে বিশেষ কোন আয়ই ছিল না। রাজকর্মচারীরা স্থায়ী চাকুরীর জন্য প্রায়ই কোন নগদ অর্থ বেতন হিসাবে পেতেন না। পরিবর্তে তাদের 'জাগির' হিসাবে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এতে সরকারের লোকসান হত প্রচুর। কারণ জমির রাজস্বের মোট পরিমাণ স্বভাবতই প্রদেয় বেতনের চাইতে হত বেশী। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় এইসব 'জাগির' জমি নবাব সরকারের অধীনে খালসা জমিতে পরিণত করা হয়, কিন্তু যে সব সরকারী কর্মচারীদের জাগির জমি নিয়ে নেওয়া হয় তাদের কিন্তু জমি থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হল না। পূর্ববর্তী জাগিরদারদের নতুন করে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় প্রধানত উড়িষ্যা প্রদেশের দুর্গম অনুর্বর জলাভূমি অঞ্চলে যা এযাবৎ ছিল প্রায় অনধিকৃত ও অনিয়ন্ত্রিত। ফলে উড়িষ্যা অঞ্চলেও কত অভিজাত বাঙালী জমিদারবংশের পত্তন হয়। আজও উড়িষ্যা অঞ্চলে বসবাসকারী বহু বাঙালী পরিবারের আদি পত্তন হয় নবাবী আমলে যা পরে মারাঠাদের আমলেও উড়িষ্যাতে বজায় ছিল। তাঁদের বহু জমি জিরাৎ ও সম্পত্তি সেখানে অর্জিত হয়েছিল।

ভূমিরাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে নবাবী আমলের প্রথমদিকে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ইজারা বা ঠিকা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। এর পূর্বে বাঙলায় ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভার ছিল শুধু জমিদার বা ভূসম্পত্তির অধিকারিক অভিজাত সম্প্রদায়ের ওপর। কিন্তু বাংলার তদানীন্তন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সম্প্রদায় রাজস্ব আদায় দিতে প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে আকবরের রাজস্ব সচিব রাণা টোডরমল্ল প্রবর্তিত ও ভারতের অন্যত্র প্রচলিত ভূমিরাজস্ব আদায় ব্যবস্থা বাংলায় কার্যকরী না হওয়াতে মুর্শিদকুলি এখানে ইজারাদার ধরনের নতুন ঠিকা রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। এদের তুলনা করা চলে 'বুরবন' রাজবংশের শাসনাধীন ফরাসী দেশের 'ফারমারস জেনারেল' বা কৃষক প্রধানদের সঙ্গে। পরবর্তীকালে এইসব রাজস্ব-সংগ্রাহকদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায় ও তাদের 'রাজা' ও 'মহারাজা' প্রভৃতি সম্মানসূচক খেতাব হত।

তবে নবাবী আমলে বিশেষ করে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের আমলে রাজস্বসংগ্রহের উপায় ছিল বড়ো কঠোর ও নির্মম। ঠিকা রাজস্বসংগ্রাহকরা নবাবকে সন্তুষ্ট করবার জন্য রাজস্বআদায়ের নামে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ ও শোষণ চালাত। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন—সর্বোচ্চ স্তরে নবাব রাজস্ব-আদায়ের জন্য যে চাপ সৃষ্টি করতেন তাই মধ্যবর্তী স্তরগুলি পেরিয়ে চাপত এসে আসল কৃষিজীবীদের উপর যাদের শেষ অবধি অবশিষ্ট থাকত শুধু গ্রাসাচ্ছদনের শেষ উপকরণটুকু। ন্যূনতমের বাইরে প্রতি বছর যা কিছু বাড়তি উৎপাদন হত তার সব উপস্বত্বই যেত সরকার আর সরকারী আমলাদের ভোগে।

শুধু কৃষক নয় জমিদার, পদস্থ কর্মচারী ও আমলারাও বহুক্ষেত্রে এই শোষণ ও উৎপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি পেত না। ঐতিহাসিক সালিমুল্লাহ তার তারিখ-ই-বাঙ্গলাতে নবাবী পাওনা-গণ্ডা কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় ও কেউ পাওনা ফাঁকী দিচ্ছে সন্দেহ হলে উৎপীড়নের সাহায্যে তার কাছ থেকে হিসাব ও বকেয়া পাওনা কবুলের উদ্দেশে প্রধান জমিদার ও মান্যগণ্য পদস্থ কর্মচারী নির্বিশেষে সকলের উপর নবাব দরবারের নিগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন। মুর্শিদকুলি নাকি ঠাট্টা করে এইসব নিগ্রহশালার নাম রেখেছিলেন 'বৈকুণ্ঠ' ও স্বর্গ।

তিনি বলেছেন 'জমির প্রকৃত মূল্য যাচাই ও নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মুর্শিদকুলি প্রধান প্রধান জমিদারদের কয়েদ করে রেখে রাজস্ব আদায়ের ভার দিতেন সুদক্ষ "আমিল" বা সংগ্রাহকদের উপর..." অপর এক জায়গায় সালিমুল্লাহ বলেছেন, 'মাসের শেষ দিনে তিনি (মুর্শিদকুলি খান) খালসা, জাগির ও অন্য বিভাগ থেকে প্রতিটি পাওনা কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করতেন... এই উদ্দেশ্যে তিনি মুৎসুদ্দি, আমিল, কানুনগো ও অন্য কর্মচারীদের ওপর কড়া আদেশ জারি করেছিলেন। দরকার মত তাদের মুর্শিদাবাদের পঁচিহিল্লা সেতুর বা দিওয়ানখানা বা কাছারিতে আটক করে খানাপিনা ও অন্য প্রাকৃতিক ক্রিয়া বন্ধ করবার নির্দেশ দিতেন। এমনি বীভৎস ও পাশবিক ছিল তার পাওনা অনাদায়ীদের ওপর অত্যাচারের নমুনা।" শোষক ও শোষিত শাসক ও শাসিতের এই পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমে তিক্ত থেকে তিক্ততর হতে হতে হয়ত শেষটা রূপ নেয় দেশীয় জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্রের প্রতি এক চরম বিতৃষ্ণা ও বিরক্তির যার ফলে বিদেশী বণিকদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় এদেশে আধিপত্য বিস্তার করা।

অপরদিকে বাঙলার শোষক ও উৎপীড়ক অভিজাত সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ পরবর্তী যুগে ক্রমে হয়ে ওঠেন পরম ভোগ-বিলাসী, অলস, নিষ্ঠুর, খামখেয়ালী, জাত্যাভিমানী ও ধর্মান্ধ। এদের অত্যাচার অনাচারে দেশের একদল লোক ছিল ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। এই ক্ষোভ অসন্তোষ, জাত্যাভিমান, অসহিষ্ণুতাকেই কাজে লাগায় পরবর্তী বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ও ভেদ ও বিদ্বেষসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের উদ্দেশ্য অনেক সফল হয়েছিল: ইতিহাসের সেই ভুলের জন্য জাতিকে আজ অবধি অনেক মাশুল দিতে হয়েছে...আরো কত দিতে হবে কে জানে।

নবাবী আমলে বাঙালী হিন্দুরা যেসব উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হতেন সেগুলির নিশানা আজ মেলে বহু বাঙালীর নামের পদবীর মধ্যে। যেমন বকসী (বেতনদাতা) সরকার, কানুনগো, শাহানী (পুলিশ প্রধান) চাকলাদার, তরফদার, মুনশী, লস্কর, খান প্রভৃতি। বাঙালী হিন্দুদের এসব পদবী স্মরণ করায় সেই তাঁদের পূর্বপুরুষদের নবাব সরকারের অধীনে পদমর্যাদার কথা।
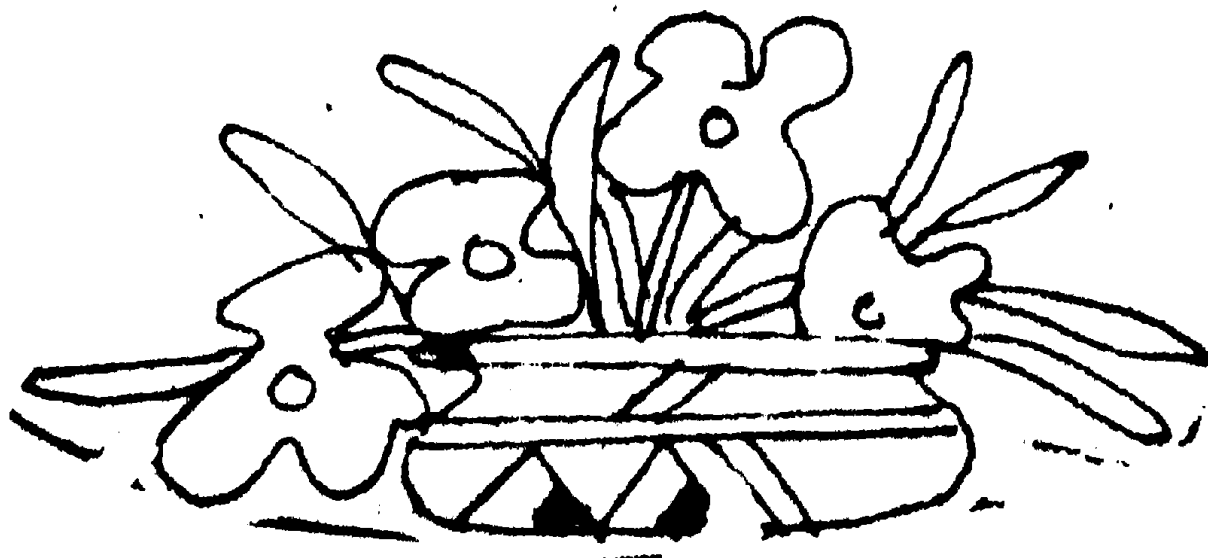
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু   সুহৃদ গোপাল দত্ত

প্রাক পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ
নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ
কর্মযোগবিশিষ্যতে।।

—গীতা ৫।২

সব অবস্থার সংমিশ্রণে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনে অশুভ মুহূর্তের ইঙ্গিত দিয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ মনে মনে এক অজ্ঞাতবাসের নির্দেশ পাচ্ছিলেন। সুতরাং ১৯০৯ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে কর্মযোগিন পত্রিকায় তিনি দেশবাসীর কাছে জাতীয় আন্দোলনের ভাবী পদক্ষেপ সম্পর্কে তাঁর সময়োচিত বক্তব্যটি প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই ঐ বক্তব্যটির নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছিলেন :

(১) আত্মনির্ভরশীল হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে সঞ্জীবিত করা।

(২) সরকারের নীতির প্রতি সংযতভাবে উদাসীন হওয়া।

(৩) মধ্যপন্থীদের সঙ্গে সম্ভাব্য আপসের মাধ্যমে অখণ্ড কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাস করা।

(৪) সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বর্জন-নীতিকে ফলপ্রসূ করা।

(৫) জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিক সংগঠন, এমন কি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলা।

এই বক্তব্য কর্মযোগিন পত্রিকায় 'আমার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা একটি খোলা চিঠি' শিরোনামায় প্রকাশিত হয় এবং অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ লিখেছেন যে, এইটি শ্রীঅরবিন্দের 'শেষ রাজনৈতিক দলিল ও উপদেশ'।

১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী বিকেল সাড়ে চারটার সময় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহায়তায় বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের গুলীতে আদালত প্রাঙ্গণে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সামসুল আলম নিহত হন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সখ্যতার সূত্র ধরে পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষকে লিপ্ত প্রমাণ করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। এই জটিল পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলা করতে শ্রীঅরবিন্দের মানসিক প্রস্তুতি তখন সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু পথ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত তখনও অপেক্ষামান। শ্রীঅরবিন্দ পরম নিশ্চিন্তে বাসুদেবের নির্দেশের অপেক্ষায় নিত্যকর্মে ব্যস্ত রয়েছেন।

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে সন্ধ্যার সময় ধর্ম ও কর্মযোগিন পত্রিকার কার্যালয়ে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর লীলাসহচর বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সৌরীন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কুমার নাগ, হেমচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী অবসর বিনোদনে ব্যস্ত ছিলেন। অটোমেটিক রাইটিং-এর সাহায্যে পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাব্যতা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছিল। এমনি সময়ে পত্রিকার কার্যালয়ের সহকারী এবং শ্যামপুকুরের সান্ধ্য মজলিসের নিয়মিত সভ্য রামচন্দ্র মজুমদার শ্রীঅরবিন্দকে জানালেন যে, তাঁদের নামে আবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত না হলেও উপস্থিত সকলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভাবলেন—কয়েক মুহূর্ত মাত্র — তারপর বললেন—'আমি চন্দননগর যাব'।...'এক্ষুনি এই মুহূর্তে'। সেই সময়কার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহচর শ্রীসুরেশচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় আরও বলেছেন, একটা শোভাযাত্রা নয়, বোবাযাত্রা তৈরী হল।... প্রায় পনের কি বিশ মিনিট আন্দাজ চলে, আমরা গঙ্গার এক ঘাটে এসে পৌঁছলাম। ...অরবিন্দ নৌকায় আরোহণ করলেন। তারপর বীরেন ও আমি তাতে উঠলাম। রামবাবু বিদায় নিলেন। নৌকা খুলে দিল। আমরা ভাগীরথী বক্ষে ভাসলাম।... খুব ভোরে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে পৌঁছলেন। ওখানকার খ্যাতনামা নাগরিক চারুচন্দ্র রায় শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হলেন। এমন সময় মতিলাল রায় সাগ্রহে এসে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে (২২)

যে বাংলাদেশকে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের উপযোগী মনে করে বরোদা ত্যাগ করে এসেছিলেন সেই বাংলাদেশকে চিরদিনের মত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে

---

(২২) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। স্মৃতিকথা।

হলে একটি বৃহত্তম ও মহত্তম লক্ষ্য নিয়ে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন :

'Any premature attempt at a large-scale collective spiritual life is exposed to vitiation by some incompleteness of the spiritual knowledge on its dynamic side, by the imperfections of the individual seekers and by the invasion of the ordinary mind and vital and physical consciousness taking hold of the truth and mechanising, obscuring or corrupting it......Spirituality liberates and illumines the inner being, it helps mind to communicate with what is higher than itself, to escape even from itself, it can purify and uplift by the inner influence the outward nature of individual human beings : but so long as it has to work in the human mass through mind as the instrument, it can exercise an influence on the earth-life but not bring about a transformation of that life. For this reason there has been a prevalent tendency in the spiritual mind to be satisfied with such an influence and in the main to seek fulfilment in other-life elsewhere or to abandon altogether any outward-going endeavour and concentrate solely on an individual spiritual salvation or perfection'. (23)

চন্দননগরে থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দ সুরেশচন্দ্রকে একটি নির্দেশ পাঠান, পণ্ডিচেরীতে গিয়ে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করতে। সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে ১৯১০ খৃস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ বিজয় নাগকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে পেঁছলেন। চন্দননগর ত্যাগ করবার পূর্বে তিনি সিস্টার নিবেদিতার উপর 'কর্ম-যোগিন' পত্রিকা সম্পাদনার ভার দিয়ে গেলেন। বাংলা কাগজ 'ধর্ম' পত্রিকা প্রকাশের ভার রইল অন্যান্য অনুরাগীদের উপর।

পণ্ডিচেরীতে উত্তর-যোগী শ্রীঅরবিন্দ

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং
সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্ম বেদ জাজলে।।
মহাভারত/শান্তিপর্ব

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের উত্তর অঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে এসে পেঁছলেন তাঁর 'পূর্ণ-যোগ' সাধনার তপোবন পণ্ডিচেরীতে।

তাঁর নিজের ভাষায় : 'পণ্ডিচেরীতে যখন এলাম, অন্তর থেকে একটি কার্য-সূচীর নির্দেশ পেলাম আমার সাধনার সম্পর্কে। আমার দিক থেকে তা পালন করে চললাম, কিন্তু তার সাহায্যে অন্যদের বিশেষ সাহায্য করতে পারছিলাম না, এমন সময়ে এলেন মীরা এবং তাঁরই সাহায্যে আমি বাঞ্ছিত পন্থাটি আবিষ্কার করলাম। ...তাঁকে যখন দেখি, তখনই প্রথম বুঝলাম যে, নিঃশেষে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া বাস্তবিকই সম্ভব এবং তাঁরই সাহায্যে আমার উদ্দিষ্ট যোগসাধনা সম্ভব হয়ে উঠল এই পৃথিবীতে।'(১৯)

ইতিহাস বলে, ঋষি অগস্ত্যও ঠিক এমনিভাবেই দক্ষিণে এসেছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা বলে, পণ্ডিচেরী এক সময়ে ছিল 'বেদপুরী' অর্থাৎ বেদচর্চার প্রাণকেন্দ্র। ইনি যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অতীতে যে স্থানে বেদ-বিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল সেই স্থান-টিতেই শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আসার প্রায় ত্রিশ বছর আগে বিখ্যাত তামিল-যোগী নাগাই জাপত্তা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সর্বজনবিদিত তিনটি বিশেষত্ব বা লক্ষণবিশিষ্ট কোন এক যোগী ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে এখানে আসবেন 'পূর্ণযোগ' সাধনার জন্যে এবং সেই যোগীর তপঃপ্রভাবেই ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব হবে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের তিনটিই ব্রত ছিল যা তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখে-ছিলেন—'আমার তিনটি পাগলামী আছে।'। সুতরাং যোগীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দকেই 'উত্তর যোগী' বলা যায়। 'পূর্ণযোগ' সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অনেক সারগর্ভ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগণের প্রত্যেকেই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে সুপণ্ডিত। 'পূর্ণযোগ' তত্ত্বটি শ্রীঅরবিন্দের একটি বিশেষ সারকথা। তিনি মনে করতেন—

"To discover the spiritual being in himself is the main business of the spiritual man and to help others towards the same evolution is his real service to the race, till that is done, an outward help can succour and alleviate, but nothing or very little more is possible.' (24)

'Satisfied in knowledge, having built up their spiritual being, the wise in the union with the spiritual self reach the Omnipresent everywhere and enter into the All'. (25)

মুণ্ডক উপনিষদের (৩/২, ৪, ৫) এই বাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন পূর্ণযোগের গূঢ় রহস্য শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধিতে প্রাণ পেয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দের ধর্মচিন্তা পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে ভারতবর্ষে ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব ঘটে-ছিল খৃস্টপূর্ব প্রায় ১৪০০ অব্দে অর্থাৎ বুদ্ধের প্রায় সাত-আটশো বৎসর পূর্বে। সেই সময়ে ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞান এবং কপিলের সাংখ্য শাস্ত্র প্রচলিত ছিল। যে সাত্বত জাতির মধ্যে ভাগবত ধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল সেই জাতির মধ্যে সাত্বতি ছিলেন আদি ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন [illegible] লোক-সংগ্রহপটু, মূল প্রবক্তা, এবং ভীষ্ম ও অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী পরম ভগবদ্ভক্ত। ভাগবত ধর্মের এই সব মূল নায়কগণের পদক্ষেপ এবং কর্মপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শুধু বাসুদেবভক্তি ভাগবত ধর্মের মুখ্য লক্ষণ ছিল না। এঁদের প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ অনুযায়ী প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তেরই উচিত বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিতে সমস্ত ব্যবহারিক কর্মে লিপ্ত থাকা। বিংশ শতাব্দীর ভাগবত ধর্মের প্রবক্তা ও পথিকৃৎ শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভক্তি এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পথে পরমেশ্বর-জ্ঞান সম্পূর্ণ হবার পর ভগবদ্ভক্তকে পরমেশ্বরের আদর্শযন্ত্র হিসাবে পরমেশ্বরের ন্যায় জগতের বা সৃষ্টির সংধারণের কাজে (ধর্মের প্রকৃত অর্থ সৃষ্টির সংধারণ) জীবনের অবশিষ্ট অংশকে উৎসর্গ করতে হবে। সুতরাং যোগীর মুক্তি বা নির্বাণ-মুক্তি যোগের শেষ কথা হতে পারে না। যোগের শেষ কথা নির্বাণ-মুক্তির সাধন পথে জীবন ক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত করা— এই হল যোগের পূর্ণতা বা পূর্ণযোগ। পূর্ণযোগে যোগী সব সময়ে সকলের হিত-কামনায় মগ্ন থাকেন।

পূর্ণযোগের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Yoga And Its Objects গ্রন্থে লিখেছেন :

"The Yoga we practise, is not for ourselves alone but for humanity. Its object is not personal MUKTI, although MUKTI is a necessary condition of the Yoga, but the liberation of the human race. It is not personal ananda, but the bringing down of the divine ananda upon the e a r t h. Of moksa we have no personal need; for the Soul is nityamukta and bondage is an illusion. We play at being bound, we are not really bound. We can be free when God wills, for He, our Supreme self, is the master of the game, and without this grace and permission no soul can leave the game.......—It is God's play. The wise man is he who recognises this truth and, knowing his freedom, yet plays out God's play, waiting for His command to change the method of the game.

'The command is now, God always keeps for Himself a chosen country in which the higher knowledge is through all chances and dangers, by the few or the many, continually preserved, and for the present, in this CHATURYUGA at least, that country is India............

---

(১৯) পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম-সাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। পৃঃ ৮৩।

(23)—Sri Aurobindo : Life Divine : Sri Aurobindo Ashram, Pondichery : PP. 787-88.

(24) Sri Aurobindo : Life Divine :Sri Aurobindo Ashram, Pondichary : PP. 787.

(25) Do. .. Do ....PP. 756

'In modern language SATYA-YUGA is a period of the world in which a harmony, stable and sufficient, is created and man realises for a time under certain conditions and limitations, the perfection of his being,......but afterwards it begins to break down and man upholds it, in the TRETA, by force of will,...... in the DVAPARA by intellectual regulation and common consent and rule; then in the KALI it finally coleapses and is destroyed But the KALI is not merely evil, in it the necessary conditions are progressively built up for a new SATYA another harmony, a more advanced perfection.' (26)

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদৃষ্টিতে উদঘাটিত হয়েছিল বর্তমানের সংকটময় যুগের মধ্যে লুক্কায়িত ভাবীকালের একটি নতুন সত্য যুগের সূচনা, এক অভিনব সমন্বয় যজ্ঞের ইঙ্গিতে, ভারতবর্ষের নায়কত্বে বিশ্বমানবের পরা চেতনার সঙ্গমে সম্মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অধ্যাত্মবাদের দীক্ষাগ্রহণ। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে এমনি এক ভাবীকালের রূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেদিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এই অধ্যাত্ম-স্নাতকের সঙ্ঘ প্রচেষ্টা—বিশ্বসাম্য, বিশ্বমৈত্রী এবং বিশ্ববাসীর পূর্ণ মুক্তির আন্দোলনের এক অভিনব রূপায়ণের মাধ্যমে। এই সময়ে আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে সাহায্য করবে অতীতের ঋষিদের যুগ যুগ ধরে অপেক্ষমান মুক্তি-আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অর্পিত তপস্যার ফল—তাঁদের আশীর্বাদরূপে। তাঁদেরই দিব্যপ্রভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর বুদ্ধি প্রভাবিত হবে। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যচিন্তা বলেছে এই বিশ্বমুক্তি আন্দোলনের পথ ভারতবর্ষই আবিষ্কার করতে পারবে। অর্থাৎ ভারতই হবে পথিকৃৎ।

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল বিকেল ৪টার সময় শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই মাহেন্দ্রক্ষণটি ছিল চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্নের চতুর্থ ঘণ্টা অতিক্রান্ত মুহূর্তে। প্রতিক্ষেত্রে এই চতুর্থ অংকটির উপস্থিতি এক দৈবনির্দেশের সংকেত দেয়। এই সংকেতের গূঢ় অর্থ—উন্মেষিত বোধির মধ্যে দিব্য বোধির আবির্ভাব। এই আবির্ভাব অর্থে যোগীর জীবদ্দশায় মুক্তি বা জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত যোগী নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধস্বরূপ উপলব্ধি করেন। জীবন্মুক্তের এমন স্বস্তি ও শান্তি, যা সাধারণ মানুষের ধারণার বহু ঊর্ধ্বে—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ' (তৈত্তিরীয় ২।৯)।

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আসবার আগেই এখানে যে কয়েকজন অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ তামিল-কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী, তামিল-সাহিত্যিক ভি রামস্বামী আয়েঙ্গার, শ্রীনিবাসাচারী নাগস্বামী আয়ার এবং চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত ভি এস আয়ার। এঁরা প্রত্যেকেই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ ব্রতের লীলাসহচর ছিলেন। ১৯১১ সালে চন্দননগর থেকে মতিলাল রায় এলেন পণ্ডিচেরীতে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন—...আমি তাঁহার চক্ষে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম।...দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।...বুঝিলাম, শ্রীঅরবিন্দ শুধু বিলাত-ফেরত, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নানা ভাষাবিদ, কূট রাজনীতি-জ্ঞানে পারঙ্গম বঙ্গের জাতীয় দলের নেতা নহেন, তিনি অহংজ্ঞান-শূন্য, বিশ্বহিতের জন্য বিশ্বপ্রেম সাধনারত মহাযোগী।'

১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দের চরণে প্রণাম জানালেন। 'সত্যবান সাবিত্রীকে দেখলেন তাঁর ভবিষ্যৎ আশার আলোরূপে। স্বর্ণপ্রতিমা সাবিত্রীর দ্বারাই তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং মনুষ্য হৃদয় অনন্ত সূর্যের কাছে উন্নীত হবে।...তাঁদের এই মিলনের সঙ্গে এক নবযুগের সূচনা হলো।' (৮)।

এই মহামিলন প্রসঙ্গে শ্রীমা লিখছেন, 'তোমাকে আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, হে পরাচেতনা, সনাতন ধর্ম!...শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তাতে কিছু যায় আসে না। যাঁকে কাল আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তমসালোকের অবসানে জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেই, যখন তোমার' (অর্থাৎ অমৃতময়ের) 'রাজত্ব পৃথিবীতে যথার্থই বিরাজ করবে।' (২৭)।

এই রাজত্বকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগ প্রসঙ্গে আখ্যা দিয়েছেন সত্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হিসাবে।

শ্রীমায়ের প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, 'অতিমানসকে নামিয়ে আনবার জন্যেই শ্রীমা নেমে এসেছেন, এবং এই অবতরণই ভগবানের পূর্ণ বিকাশ এখানে সম্ভব করে তুলেছে। শ্রীমা আজন্ম দিব্যপ্রভায় ঋদ্ধির পর্যায়ভুক্ত। শ্রীমায়ের চৈতন্য আমার দিব্য-চেতনা থেকে ভিন্ন নয়। যিনি তাঁর অনুগামী হবেন তিনি আমার পূর্ণযোগের দীক্ষায় দীক্ষিত হবেন। তাঁর পবিত্র আধারের অবলম্বনেই পৃথিবীতে অতিমানসের (বা পরাচেতনার) অবতরণের সুযোগ এসেছে এবং এই সুযোগ সেই অবতরণের উপযোগী একটা প্রাথমিক রূপান্তর ঘটাবে।' (২৮) শ্রীমা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দি আদার' গ্রন্থে লিখেছেন :

'The one whom we adore as the Mother is the divine conscious Force that dominates all existence, one and yet so many-sided that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and for freest and most vast intelligence'.

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-চেতনায় মাতৃমূর্তির যে অপরূপ রূপ পণ্ডিচেরীতে আসবার আগেই রূপায়িত হয়েছিল তাই দিয়েই শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমাকে বিভূষিত করেছিলেন; শ্রীমা শক্তির প্রতিমা, তিনি দেশমাতৃকার প্রতিমূর্তি। দেশবাসীকে শ্রীঅরবিন্দ খুব সহজভাবেই শেখাতে চেয়েছিলেন যে, 'মা' এই নামটি যুগে যুগে সনাতন পদ্ধতিতে 'মা'-এর ভাবটিই বয়ে বেড়াচ্ছে—যে 'মা' কখনো ধরিত্রী, কখনো পালয়িত্রী, কখনো প্রকৃতি আবার সব সময়েই সেই অনন্ত অক্ষয় আত্মাশক্তি। শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যে এবং শিক্ষা প্রণালীতে, অধ্যাত্মবিদ্যা রহস্যের কুঝটিকা কাটিয়ে তাই বিজ্ঞান ভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। তাঁর দিব্য-চেতনায় শ্রীমা ধরা পড়েছিলেন বাহ্ন হিসাবে, শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের ধারক, বাহক এবং প্রবক্তা হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত আধার হিসেবে। একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রম-জীবনের প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি নিত্য-সহচর। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'স্মৃতির পাতা' গ্রন্থে লিখেছেন : '...মা এসে শ্রীঅরবিন্দকে শ্রীগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন যোগেশ্বর রূপে।' আমরা তাঁকে বন্ধু হিসাবে, সখা হিসাবে দেখেছি—মনে-প্রাণে তিনি গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাও ঠিক; কিন্তু আচারে-ব্যবহারে আমরা তাঁকে প্রায় আমাদের সমগোত্রীয় করে রেখেছিলাম। ...শ্রীমা এসে শেখালেন, তাঁর কথায় ব্যবহারে কার্যতঃ দেখালেন শিষ্য-ভক্ত কাকে বলে—আপনি আচরে তিনি অপরে সেখান। শ্রীঅরবিন্দের সামনে বা সঙ্গে সমানে চেয়ারে না বসে, মাটিতে বসে তিনি দেখালেন গুরুকে কি রকমে সম্ভ্রম করতে হয়—আদর্শ শালীনতা কি বস্তু! শ্রীমাই আমাদের চোখ খুলে দিলেন এবং আমাদের দিলেন সেই অনুভব যাতে করে প্রগলভ হয়ে তোমাকে যা কিছু বলেছি.... রহস্য করতে গিয়ে তোমাক যা-কিছু অসম্মান দেখিয়েছি—হে অপ্রময়ে, সে সব ক্ষমা কর।' ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা সিঞ্চিত শ্রীমায়ের দিব্য-চেতনায় 'গুরু' শব্দটি ধ্বনিত হয়ে উঠল এক অপরূপভাব-শক্তির মহিমায়। পণ্ডিচেরী আশ্রমের আশ্রমবাসীদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোলো গুরুরূপী নারায়ণ। শুরু হোলো পূর্ণ যোগসাধনার নতুন পর্ব—সব কিছু শ্রীঅরবিন্দকে নিবেদন করে তাঁর মত ও পথ অনুসরণ।

শ্রীঅরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে ১৯১৪ সালের ১৪ই আগস্ট শ্রীমা এবং পল রিচার্ডের সহযোগিতায় শ্রীঅরবিন্দের

(26) Sri Aurobindo : The Yoga And Its Objects : Arya Publishing House : PP. 1—8.

(৮) মণিবিষ্ণু চৌধুরী : শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী উপাখ্যান। পৃঃ ১৩।

(27) Prayers And Meditation of the Mother : PP.80-88.

(28) Sri Aurobindo : Letters On The Mother : P :6.

সম্পাদনায় প্রকাশিত হোলো 'আর্য' মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম সংখ্যাটি। আর্য পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখছেনঃ

'১। জীবনের সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যাগুলির বিজ্ঞানসম্মত নিরীক্ষণ।

২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন স্রোতের সমন্বয়ে একটি সর্বগ্রাহী অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সৃজন। যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সর্বসাধারণের গ্রহণোপযোগী বা অভ্যাসের উপযোগী এবং যার পথ একান্তভাবে দর্শন বিজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে রচিত হবে।

'আর্যে'র গ্রাহকগণের কাছে যুক্তিবাদী-দর্শন, প্রাচীন শাস্ত্রের অনুবাদ ও ভাষ্য, প্রচলিত ধর্মমতগুলির বিষয়ে প্রবন্ধ এবং আত্মোন্নয়ন ও আত্মোপলব্ধির অভ্যাস পদ্ধতি পরিবেশিত হবে।' (২৯)

পত্রিকার বিষয়বস্তু সবই শ্রীঅরবিন্দের একক প্রচেষ্টা—দিব্য-শক্তির নির্দেশে লিখিত হোতো, শ্রীঅরবিন্দের সেই এক ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য নির্বাণ মুক্তির উদ্দেশ্য—সমগ্র বিশ্ববাসীকে দিব্য-চেতনার জাগরণে এক প্রাণ একতায় আবদ্ধ করা।

শ্রীঅরবিন্দ জীবন-কথিকা গ্রন্থের লেখক প্রমোদকুমার সেন লিখেছেন, 'পূর্ণ সাত বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস শ্রীঅরবিন্দ "আর্য" লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে একাই ইহার পাতাগুলি পূর্ণ করিয়াছেন...বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্য-জীবনের আদর্শ, যোগ সমন্বয়ের প্রণালী, ভারত সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের-আদর্শ, মানবসমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—ইহা ছাড়া সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে কত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা...সাধারণ রাজনৈতিক আলোচনা "আর্যে" স্থান পায় নাই। কিন্তু তাহাতে আন্তর্জাতিক সমস্যার যে বিশ্লেষণ আছে তাহার তুলনা নাই।... সেই ইঙ্গিতগুলি আজকালকার বাস্তব ঘটনা।' আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যেগুলি গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত, বহুল প্রচারিত ও সমাদৃত সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্যঃ

On Yoga, Vols—I and II; Secre's of the Veda; Hymns to the Mystic Fire; Essays on the Gita, The Life Divine, Eight Upanishads, The Doctrine of Passive Resistance, The Foundation of Indian Culture, The Future Poetry, The Hour of God, The Human Cycle, The Ideal of Human Unity, The Supramental Manifierstations on Earth.

আর্য পত্রিকা ১৯২১ সালে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রকাশ করা বন্ধ হোলো। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য ছিল, পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির গূহ্য তত্ত্বের অনুধাবন জনসাধারণের বা পাঠক-বর্গের গ্রহণ ক্ষমতার গণ্ডি অতিক্রম করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, দিব্য-শক্তির প্রভাবে তাঁর লেখনীতে যে অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার আশ্রয় নিয়েছিল সেই ভাণ্ডার প্রতি মাসে পত্রিকার সাতটি সংখ্যা তিরাত্তর বৎসর ধরে প্রকাশিত হলেও নিঃশেষ হোতো না।

১৯১৪ সালের মার্চ মাসে শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে এসেছিলেনঃ প্রায় এক বছর পণ্ডিচেরীতে থাকার পর ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ফ্রান্সে তাঁর পিতৃভবনে ফিরে গেলেন।

১৯১৫ সালে বাংলাদেশের তদানীন্তন রাজ্যপাল লর্ড কারমাইকেলের উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের দৌত্যে শ্রীঅরবিন্দকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব এলো। প্রস্তাবে জানানো হোলো যে, শ্রীঅরবিন্দ যদি ফিরে আসেন তাহলে তাঁর উপর প্রযুক্ত সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এই ঘটনার পর বৃটিশ সরকারের কোনো এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পণ্ডিচেরী স্টেশনে পাঠানো হোলো। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে রেল স্টেশনে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করলেন—এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হোলো। তখন সরাসরি ঐ রাজ-কর্মচারী শ্রীঅরবিন্দকে জানালেন যে, বাংলাদেশে ফিরে গেলে সরকারী উদ্যোগে দার্জিলিং শহরে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম-জীবনের উপযোগী সবকিছুই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা এই অনুরোধটিও যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হোলো। শ্রীঅরবিন্দকে বৃটিশ রাজত্বে নজরবন্দী করে রাখার প্রাথমিক কৌশলগুলি বিফল হবার পর বৃটিশ সরকার সরাসরি প্যারিসে ফরাসী সরকারকে অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরী থেকে বহিষ্কৃত করে দেন। এই অনুরোধ ফরাসী সরকার গ্রাহ্য না করায় বৃটিশ সরকার হতাশ হয়ে পড়লেন।

এই সব প্রতিকূলতা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সাধনপন্থা থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার গতি অপ্রতিহত রইল। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রম-জীবন পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সাদর আহ্বান জানালেন তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বালগঙ্গাধর তিলক। এই সময়ে তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে 'হোমরুল আন্দোলন' চলছিল। শ্রীঅরবিন্দ তিলকের আমন্ত্রণ গ্রহণে অক্ষমতা জানালেন।

১৯১৮ সালে তাঁর সঙ্গে বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ সঞ্জীব রাও এসে সাক্ষাৎ করেন। সঞ্জীব রাওয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় অন্যান্য কথাবার্তার মধ্যে

'I see two alternative plans for the world. The first is the plan of an Indo-British Commonwealth in which India will be a free and equal partner with Britain and other Dominions.'

শ্রীঅরবিন্দ একটি ভবিষ্যৎ বাণী করেন—এই বছরেই ডিসেম্বর মাসে অম্বুভাই পুরানী শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ নিয়ে গুজরাটে বিপ্লবের কাজ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি পুরানীকে বলেছিলেন, 'বিপ্লবের কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পথে আর কোনো বাধা আসবে না।' পুরানীর চোখে বিস্ময়ের আভাস ও জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেনঃ

'I give you the assurance that India will be free......you can take it from me, the freedom of India is as certain as the rising of the sun tomorrow.'

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। মৃণালিনী দেবীর পণ্ডিচেরী জীবনের সাধ ইহজীবনে পূর্ণ হয়নি। এই সম্পর্কে 'শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর স্মৃতিকথা'—গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেনঃ 'মৃত্যু দেহান্তর যখন অনিবার্য সেই বাহ্যচেতনা অবচেতনার কবলে থাকাকালীন অবস্থায় মৃণালিনীদি তাঁহার মা, বাবা, ও ভাইদের নির্দেশ দিলেন যে, তাঁহার বাক্স ভর্তি শ্রীঅরবিন্দ লিখিত সমুদয় পূর্বাপর চিঠিগুলিকে তালাবদ্ধ করিয়া যেন গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত করা হয়। তাঁহার সে অন্তিম ইচ্ছা পালিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি।... যোগীশ্বর শ্রীঅরবিন্দের সেই অনুপম তথ্য-সমৃদ্ধ পত্রগুলি আজ বিলুপ্ত হইয়া গেল—যিনি এই দুর্লভ বস্তুর অধিকারিণী ছিলেন একমাত্র তিনিই বলিতে পারিতেন, এ কাজ কেন তিনি করিয়া গেলেন।... দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই পাণ্ডিচেরীতে তিরোধানের সংবাদ বহন করিয়া [illegible]নগ্রাম রওনা হইল। পণ্ডিচেরী হইতে দাদা (সৌরীন বসু) এই ঘটনার ঠিক পরেই দেশে (মেহেরপুর, যশোর) তাঁহার মাকে চিঠি দিয়া জানাইলেন—আজ পৃথিবীর নবম আশ্চর্য সন্দর্শন করিলাম—পাষাণেও জল দেখিলাম। দেখিলাম মেনুর (মৃণালিনীর) মৃত্যু সংবাদ বহন করা টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বসিয়া আছেন আর তাঁহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল নির্গত হইতেছে।'...পরে দাদার মুখে শুনিয়াছি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পাঁচ-দশ মিনিট বাদেই মৃণালিনী দেবী পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দাদা বলিয়াছেন একথা শ্রীঅরবিন্দের মুখনিঃসৃত উক্তি। যোগীশ্বর শ্রীঅরবিন্দের এক ফোঁটা চোখের জল মৃণালিনী দেবীর জীবনের অক্ষয়পট সমুজ্জ্বল হইয়া রহিল।'

(ক্রমশঃ)

(29) Arya, Vol. II P.9

ট্যাংক কনট্যাংক

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

NITAI GHOSH

ইউনিয়নের প্রতিটি নির্দেশই যে ভাল লাগে হারাধনের, তা নয়, বরং কোন কোনটা মনে হয়েছে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। কিন্তু এবার সেক্রেটারী প্রতাপ বাঁড়ুয্যে যে প্রশ্নটা তুলেছে, তা একেবারে যাকে বলে, মৌলিক। ফাইল-গুলোতে কাজ করি আমরা। সে কি সহজ কাজ? এনক্লোজার দেখে, আগেকার নোট-গুলো পরীক্ষা করে, পাবলিক সার্ভিসের মধ্যে আদর্শ জনগণের সেবাকে সম্মুখে রেখে প্রতিবেদন ও সঙ্গে সঙ্গে সাজেসশন লিখতে হয়, আর সেক্রেটারীরা কি করেন? শুধু চোখ বোলান আর কলমের এক খোঁচা মেরে ইনি-শিয়েল করে দেন। ঐটুকু খাটনি!

অথচ ওঁদের স্টার্টিং মাইনে আমাদের অন্ততঃ তিন গুণ, ওঁরা বসেন ঘেরা ঘরে, ঘরের বাইরের বেয়ারা, হাতের পাশে ফোন এমন কি, ওঁদের ইউরিন্যালও আলাদা। ফাইল নিয়ে গেলে চেয়ারের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। অথচ আশ্চর্য, ভুলেও বলেন না, বসুন।

সুতরাং প্রতাপ বাঁড়ুয্যে বলছে, গভর্ণ-মেন্ট ওঁদের যে মাইনে বেঁধে দিয়েছেন, আন্দোলন করে আমরা তা আমাদের সমান করতে পারব না, তবে একটা কাজ করে অনা-য়াসেই আমরা বিক্ষোভ জানাতে পারি যে, ফাইল নিয়ে ওঁদের ঘরে গেলেই আগে আমরা চেয়ারে বসব, তারপর ফাইল এগিয়ে দোব, এমন কি, ফিতেটাও খুলব না। আর প্রশ্নের জবাব দেব বসে বসে।

সবাই তৎক্ষণাৎ সমর্থন জানাল, কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!

হারাধনও এই সংগ্রামের সামিল হয়েছে। হেড এ্যাসিস্টেন্ট সমরেশবাবুর সার্ভিস আছে আর মাত্র চার মাস। হলে কি হবে, তারপর আছে সলিল বসু, তারপর নিত্যানন্দ রায়, তার মানেই ঐ চেয়ারে হারাধন মিত্র কোন দিন বসতে পারবে না, তার আগেই সুপার-এ্যানুয়েশন হয়ে যাবে। ইউনিয়নই এই ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। আগে ছিল প্রমোশন অন এফিসিয়েন্সি, সিনিওরিটি ছিল গৌণ, তখন লাফ মেরে দুচার জনকে ডিঙিয়ে যাবার আশা থাকত। আর এখন ইউনিয়নের দাবী গভর্ণমেন্ট মেনে নিয়েছেন, প্রমোশন হবে একমাত্র সিনিওরিটির ভিত্তিতে।

ইউনিয়নের এ কাজটা আদপেই ভাল লাগেনি হারাধনের।

মাঝে মাঝে ত্যাঁদড় জুনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রশান্ত কর ঠাট্টা করে বলে, এক কাজ কর না কেন হারাধনদা, ওরা দুজনে এক সঙ্গে লাঞ্চ করতে যায় ক্যান্টিনে, একই টেবিলে বসে। তুমি যদি বয়-ছোকরাকে হাত করে ওদের আলুর দমের প্লেট দুটোতে একটুখানি করে পটাসিয়াম সাইওনাইড মিশিয়ে দেবার বন্দো-বস্ত করতে পার না, বাস, তাহলে আর দেখতে হবে না, দুটো ঐ টেবিলেই চিরনিদ্রায় ঢলে পড়বে। তাহলেই তোমার রাস্তা সাফ। বলেই খ্যাক খ্যাক করে শরীর দুলিয়ে হাসে।

আর হাসে ওর পাশের টেবিলের নতুন মেয়েটা এমিলি সেন। তিনি আবার খ্যাক খ্যাক নন, শুধু একটিবার মাত্র খিক, তার-পরই যেন হাসির তোড়টা চেপে দেয়, যদিও রংকরা ঠোঁটে তখনও হাসি লেপটে থাকে।

যতদূর মনে পড়ে হারাধনের, নেহেরু-সাহেবই পুরুষের সঙ্গে নারীর সমানাধিকার-বাদ প্রবর্তন করে গেছেন। তারপর থেকেই পিল পিল করে নারীরা বেরিয়ে পড়েছে। কোন কোন ডিপার্টমেন্টে ত একেবারে গিজ গিজ করছে। ওদের শুভানুধ্যায়ী মনস্তাত্ত্বি-কেরা বলে থাকেন, পুরুষের মধ্যে ওদের উপ-স্থিতি ইনসেন্টিভের কাজ করে থাকে।

অ্যাডমনদের সেক্রেটারীয়েটে এখন পর্যন্ত অবশ্য আছে মাত্র একজন, ঐ এমিলি সেন। চাকরীর করতে আসে, না সিনেমা দেখতে, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে হারাধনের। নিত্য-নতুন শাড়ী, ম্যাচকরা জামা আর ম্যাচকরা ভ্যানিটি ব্যাগ। তবে পরবার কায়দা সেই একই রকম, সেই ঘাড় দেখানো, বগলদেখানো, বুক-দেখানো, পেটদেখানো জামা আর কোমর-দেখানো নাভীদেখানো শাড়ী। সে শাড়ীর আঁচলও কি আর গায়ে থাকে? টৌবলে টৌবলে ঘুরে, চোখ মটকে কথা কয়, খিক করে হাসে আর আঁচল খুলে খুলে পড়ে যায়। খপ করে পড়লেই যে অমনি খপ করে তুলে দেয় তা নয়, যেন তুলতে হয় বলেই তোলে, বুকের ওপর টেনে দিয়ে, ঐ ওর স্বভাব, এক ঝলক দেখে নেয়। এটা কি ইনসেন্টিভ, না প্রোভোকেটিভ?

প্রশান্ত একদিন ফিসফিস করে বলল, আজকে লক্ষ্য করছ হারাধনদা, জামাটা যেমন দু ইঞ্চি উঠে গেছে, শাড়ীটাও তেমনি নেমে গেছে দু ইঞ্চি। এমনি চার ইঞ্চি করে যদি রোজ ওঠা-নামা করে, তাহলে সাত দিন পরে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে হারাধনদা? উরে ব্বাস। বলেই থ্যাক থ্যাক করে হাসতে লাগল।

হারাধনের কাছ বড় একটা ঘেঁসে না এমিলি সেন। হয়ত জেনেছে যে, তার বয়সটা চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে, আর কি জানি, হয়ত মেদবহুল শরীরকে পছন্দ করে না। তাই আঁচল উড়িয়ে সুবাস ছড়িয়ে সামনে দিয়েই অন্য টেবিলে গিয়ে ফাজলামি করে, হারাধনকে যেন দেখেও দেখে না।

নেহরুর নারী-প্রগতিবাদের ফলে আজ তাঁর কন্যাই এই পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসীর প্রধানমন্ত্রী আর এমিলি সেন এই সেক্রেটারী-য়েটে আপার ডিভিশন ক্লার্ক। অফিসের কাজে ইনসেন্টিভ ত জোগাচ্ছে তাই, বরং শরীর দেখিয়ে ও হাসি শুনিয়ে বারোটা বাজাচ্ছে কলিগদের!

সেদিন ছুটির পর হারাধন বাসস্টপে এসে দাঁড়াল চোদ্দ নম্বর বাসের আশায়। অপেক্ষায় নয়, আশায়। কারণ কখন যে সেই পুষ্পক-রথের আবির্ভাবের মর্জি হবে, তা জানেন ভগবান আর জানেন সেই রথের মাননীয় সারথীমহারাজ। তাই আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

ও কে? এমিলি না? হ্যাঁ, এমিলিই ত। এদিকেই আসছে।

জেল্লাটি কিন্তু মন্দ নয়। ভালই বলা চলে। ভ্যানিটি ব্যাগটাকে বাঁ বুকের সঙ্গে চেপে রেখেছে আদুরে বেড়াল ছানার মত আর ডান হাত নামিয়ে শাড়ীর কোঁচা তুলে ধরেছে। তা যে ধরতেই হবে, আধুনিকা সুন্দরী। নাভির নীচে নামিয়ে দিলে এদিকে যে মাটিতে লেগে যায়।

এই যে, হারাধনদা, বাসের জন্য নাকি?

হারাধন মনে মনে বলল, না, তোমার জন্য। মুখে বলল, হ্যাঁ, আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছি, কিন্তু বাস কোথায়?

কত নম্বর?

উনিশ। তুমি কি—ট্যাকসি?

ট্যাকসি! খিক করে হেসে উঠল এমিলি। আঁচল পড়ে গেল, তুলে দিয়ে বুক দেখল, তারপর বলল, যা পাই তা দিয়ে যদি ট্যাকসি হাঁকাই, তাহলে খাব কি, হাওয়া?

আবার মনে মনে বলল হারাধন, চল না যাই সন্তোষের দোকানে, পেট পুরে খাওয়াব খাইয়ে। মুখে জিজ্ঞেস করল, কত নম্বরে যাবে তুমি?

টু অথবা টুবি।

টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন, হঠাৎ রসিকতাটা হারাধনের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

এমন সময় এসে গেল উনিশ নম্বর। যাক, বাঁচা গেছে। আচ্ছা চলি বলে হারাধন কোনরকমে মোটা শরীরটা সেঁধিয়ে দিল, তারপর ঠেলতে ঠেলতে ওপরে উঠে দাঁড়াল। এই ত বাসের অবস্থা। বইয়ের পাতার মত এক-জনের সঙ্গে আরেকজন সেঁটে রয়েছে। এই ভিড়ের মধ্যেই ত ঐ আধুনিকাকে যেতে হবে। কোথায় থাকবে তখন ফিগারের গরব আর বেলবটমের বাহার। যাকে বলে একেবারে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যেতে হবে। নিজেকে সুবাস বিতরণ করে পুরুষের ঘামের গন্ধ শুঁকতে হবে।

বাড়ী ফেরার সময় রোজ হারাধন সন্তোষ ঠাকুরের দোকান হয়ে যায়। সাধারণের জন্য সেখানে শুধু চা, বিস্কুট আর সস্তা দামের কেক আর অ-সাধারণ গ্রাহকদের জন্য ভেতরে বসবার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে বসে ইসারা করলেই এসে যায় এক প্লেট পেঁয়াজী চপ আর এক গ্লাস তরল পানীয়। খাঁটি দেশী দ্রব্য। ঝাঁজ অবশ্য একটু বেশী। গন্ধটাও একটু কড়া। তা হোক। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এটাই হারাধনের অবসাদ অপ-নোদনের চমৎকার দাওয়াই। গলির মোড় থেকে জর্দা পানের ডবল খিলি মুখে দিয়ে গেলেই মিনতি আর ধরতে পারে না।

কড়া নাড়তেই শঙ্কর দরজা খুলে দিল। শঙ্কর দশ-এ পড়েছে। ক্লাশ ফাইভে পড়ে।

মা কোথায় রে?

রান্নাঘরে। বলেই শঙ্কর পড়তে চলে গেল।

টিনের বাড়ী। আরও ভাড়াটে আছে। বাঁধানো উঠান, মোজাইককরা মেঝে, ইঁটের দেয়াল আর চাটাইয়ের সিলিং। এপাশে সারি সারি শোবার ঘর, টানা বারান্দা আর উঠানের ওপাশে পাশাপাশি রান্নাঘর। একটু দূরে কল, দুটো বাথরুম।

উঠান পেরিয়ে রান্নাঘরে এল হারাধন।

যা রোজ দেখে, ঠিক তাই। মা আর মেয়ের চা পান চলছে। মিনতি যে কত বার খায়, তার ঠিক নেই। ওটা যে বিষপানের সমতুল্য, হাজার বার বলেছে হারাধন, কান দেয় না। কিন্তু ঐ ছোট মেয়েটাকে নেশা ধরিয়ে এই বয়সেই ওর বারোটা বাজানো কেন? ধমক দিল হারাধন, এই ছিপি, শঙ্কর পড়তে বসেছে আর তুই এখানে চা খাচ্ছিস? যা, পড়তে বসগে যা।

ছিপি, মানে ছায়া, আট বছর, কে জি স্কুলে পড়ে। বাপের ধমক খেয়ে ছুটে পালাল।

বারান্দার জলচৌকিখানা টেনে নিয়ে বসল হারাধন। আষাঢ়ের প্রায় মাঝামাঝি হয়ে গেছে, অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। অসহ্য গরম। দু পা ছড়িয়ে বসে চা খাচ্ছে মিনতি। কাপে নয়, কাপে তার কুলোয় না, তাই গেলাসে। গায়ে জামা-টামা নেই, শুধু ব্রেসিয়ার, বুকের ওপর শাড়ীটাও আলগা। দেখতে কিন্তু মন্দ লাগছে না।

হারাধন বলল, আজ দারুণ খবর মিনতি, মিনিস্টি বোধহয় রিজাইন করবে। যেভাবে রোজকে রোজ হাজার হাজার রিফিউজি এসে পশ্চিমবঙ্গ ছেয়ে যাচ্ছে, তাতে সরকারী প্রশা-সন বানচাল হবার উপক্রম।

সি পি এম ত পেছনে লেগেই ছিল, তার ওপর সুশীল ধাড়া বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে পড়তে জন তিনেক এম এল এ-সহ। ... মানের কোয়ালিশন দলের মেজরিটি কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র দুজন বা বড় জোর চার-জন। তাই অজয়বাবু, নাকি ইন্দিরা গান্ধীকে একখানা চিঠি লিখেছেন—

চা খাবে তুমি?

মাথায় যেন একটা লাঠির ঘা এসে পড়ল। ... পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া ... সেকেন্ডারী ক্লাশ পর্যন্তও নয়, খবরের কাগজ খুলে সিনেমা-থিয়েটারের পৃষ্ঠাগুলো ভাল করে দেখে, দেশের কোনো খবর পড়বার আগ্রহ নেই, খবর শোনাতে গেলেও এমনি শোনবার অনীহা। থাকগে, হারাধন বলল, না, মুখে পান আছে।

মিনতি হেসে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন দোকান থেকে রোজ রোজ পান খেয়ে আস গো, ভারী মিষ্টি গন্ধ ত!

সে এক উড়েদের দোকান, হারাধন জবাব দিল, গন্ধ পানের নয়, জর্দার। কিন্তু এই গরমে এত চা ভাল লাগে তোমার?

তোমার ভাল লাগে রোজ রোজ জর্দা গন্ডা পান? বলেই হেসে ফেলল মিনতি। শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল, নীচু হয়ে ঢাকনা খুলে ভাতটা নেড়ে দিল, হাতায় করে তুলে টিপে দেখতে লাগল সেদ্ধ হয়েছে কি না।

এতক্ষণ সামনেটা দেখা যাচ্ছিল, এবার দেখা যাচ্ছে পেছনটা। বেশ ভারী কিন্তু আ...

গড়নটাও সতিাই সুন্দর। কে বলবে ওর বয়স আঠাশ হল, দুটো ছেলেমেয়ের মা, এগারো বছর ধরে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী। মনে হয় এখনও যেন সেই সতেরো বছরের অনূঢ়া কুমারীটি। নেপালবাবুর স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, মিনতি লো, অখনও তর যা আছে না, আবারও তরে বিয়া দেওন যায়।

হারাধন ভাবল, সেদিক থেকে সে লাকি। কিন্তু সম্প্রতি মনে একটা দুশ্চিন্তার কাঁটা বিঁধতে শুরু করেছে। কি কুক্ষণে এক শনি-বার ছুটির পর প্রশান্তকে নিয়ে এসেছিল। ছোকরা সন্তোষ ঠাকুরের দোকানে হারাধনের সঙ্গে বসে বেমন বেশ রসিয়ে আধ গ্লাস মেরে ছিল, তেমনি মিনতির সঙ্গে পরিচয় হওয়া-মাত্রই বৌদি বৌদি করে একেবারে যেন গলে গেল। আর সেই থেকে মিনতির মুখেও খালি ঠাকুরপো ঠাকুরপো। এখন হারাধন বাড়ীতে না থাকলেও হুট করে এসে হাজির হয়।

হাঁড়িটা আবার ঢেকে দিয়ে মিনতি হারা-ধনের খুব কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল, ফিস ফিস করে বলল, শিপ্রার স্বামী আজও এসেছিল ওকে নিয়ে যেতে, ওর দাদা রাজী হলেও কমু-দিনী মাসী দেয়নি, যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। মেয়েটাই বা কি গো, স্বামীর কাছে যায় না কেন? তারপর কানের সঙ্গে প্রায় মুখ লাগিয়ে বলল, সত্যি বল, আমার মনে হয়, ভেতরে অন্য ব্যাপার আছে। স্বামী অত্যাচার করে, ওসব বাজে কথা। মাসীমার সঙ্গে সেজেগুজে শিপ্রা প্রায় সন্ধ্যা-বেলা কোথায় যায়, বল ত?

ওসব কথা কানেই যাচ্ছিল না হারাধনের। মিনতির পুরন্ত বুক কাঁধে ঠেকছিল। হঠাৎ রক্তকণিকাগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল, হাত বাড়াতেই মিনতি ধমক দিল, এই, যাঃ অসভ্য কোথাকার।

সাড়ে দশটায় অ্যাটেনডেন্স। অন্ততঃ একটি ঘণ্টা আগে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। কোন্ বাসটায় উঠতে পারা যাবে কে জানে। তার আগে বাজার করতে হবে, তারপর স্নান। মানে, বেশ ভোরেই উঠতে হয়। রোজ উঠতে উঠতে অভ্যাস হয়ে গেছে।

রবিবারেও ঘুম ভেঙ্গে গেল ভোরে। মিনতি তখনও আদুড় গায়ে আলগা কাপড়ে ঘুমে অচেতন। অসহ্য গরম, সিলিং থাকলেও টিনের চাল থেকে যেন আগুনের হলকা নেমে আসে। তাই মশারীর মধ্যে ঢুকেই মিনতি সব খুলে ফেলে শুধু শাড়ীখানা আলগা করে জড়িয়ে রাখে।

শাড়ীটা টেনে-টুনে ঢাকা-চাকি দিয়ে হারাধন বারান্দায় বসে দাঁতন করতে লাগল।

শঙ্কর আর ছিপি ওঘরে ঘুমুচ্ছে।

নেপালবাবুর স্ত্রী বারান্দায় বসে সবজি কাটছেন আর আপন মনেই গজগজ করছেন, নাঃ, আউজগাও সুখদার মা আইল না। বার বার কইয়া দিছি আমাগো বাড়ীতে আসতে দেরী করলে চলবো না। কই, আউজগাও আইল না। বাসি ঘরদুয়ারে অখন তার ঝাটা পড়লো না, সখরা বাসন পইরা রইলো। আর পারবে মাইনরে যদি একটু না কয়, আমি মাগী আর কত কমু।

তার ছেলে নরেন্দ্রর ঘরের বন্ধ জানালার ফাঁকে আলোর রেখা। একটু কান খাড়া করলেই শোনা যাচ্ছে খুটখাট আওয়াজ আর চাপা হাসির শব্দ। বৌটার লজ্জা-সরম কম। বাইরে শাশুড়ী কাজ করছে আর উনি এই ভোরেও চালাচ্ছেন কন্টিনেন্ট।

বাথরুম দুটোই বন্ধ। নিশ্চয়ই একটাতে শিপ্রা, আরেকটাতে হরতোষবাবুর ছেলে নিখিল। রোজ এতক্ষণে বাজারে বেরিয়ে যায় হারাধন, দেখতে পায় না। মিনতির কাছে শুনেছে, রোজ ভোরে একই সময়ে ওরা দুজন বাথরুমে ঢোকে। মাঝে অবশ্য টিনের পার্টিশন। তবু একই সময়ে কেন?

একটু পর একটা বাথরুমের দরজা খুলে শিপ্রা বেরিয়ে এল। পরনে শুধু সায়াটি আর বুকের ওপর একখানা তোয়ালে। বেশী বড় নয়, তাই পিঠ ঢাকা যায়নি; এক হাতে শ্যামপুর শিশি, আর এক হাতে সাবানের বাক্স। হারাধনের সামনে দিয়েই শুধু একটা দৃষ্টি আর এক মুঠো কড়া শ্যামপুর গন্ধ ছুঁড়ে দিয়ে দিব্যি থক থক করে চলে গেল ঘরের দিকে।

তার পরই বেরিয়ে এল নিখিল। সরু পায়জামা আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি। ছোকরার স্বাস্থ্যটা একেবারে ষাঁড়ের মতন। ভয় হয়, গুঁতিয়ে দেবে। কিন্তু ও বেরোতেই এ বেরুলো কেন? টিনে টোকা দিয়ে দিয়ে টেলিগ্রাফ চলে নাকি, কে জানে।

আর এক রবিবার।

ছুটির দিনে আসবেই আসবে প্রশান্ত রুদ্র। আজ সকাল নটার আগেই এসে হাজির।

হারাধন তখন কাগজ পড়ছিল। প্রশান্ত হারাধনের সঙ্গে দুচারটে আলু-দর-কচু-গোস্তের কথা বলেই বৌদি বৌদি করে গিয়ে হাজির হল রান্নাঘরে। যাকগে। হারাধন আবার কাগজে মন দিল।

দেশের পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠছে। মন্ত্রীরা নেই, চলছে প্রেসিডেন্টস রুল। গভর্ণর ডায়াস লোকটি নাকি ভারী কড়া। লক্ষ লক্ষ রিফিউজি আসছে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে। মুজিবরকে আটকে রেখেছে পশ্চিম পাকি-স্তানের জেলে। না কি মেরেই ফেলেছে, কে জানে। ইয়াহিয়াকে বিশ্বাস নেই। ইয়াহিয়া ভারতের সঙ্গে যুদ্ধই বাধিয়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে। 'টাস' ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, ইয়াহিয়া যুদ্ধের কিনারায় এসে গেছে। সাবাস ব্যাটা এডওয়ার্ড কেনেডি, দাদার মতই স্পষ্টবাদী, স্পেডকে চামচে বলে না, পরিষ্কার বলেছে, এতে সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তান গণহত্যার অপরাধে অপরাধী।

হঠাৎ রান্নাঘর থেকে মিনতির খিলখিল হাসি শোনা গেল, তারপরই শাসনের সুর, ভাল হচ্ছে না কিন্তু ঠাকুরপো, আবার জল ছিটোলে আমি কিন্তু ফ্যান ছিটিয়ে দোব।

নাঃ, মিনতির একটুও হায়া নেই। একেই ত গায়ের কাপড় ঠিক থাকে না, তারপর রান্নাঘরে বেশী নড়াচড়া করতে হয় বলে হয়ত খোলাই থাকে বুক, তাই দেখবার জন্যই ত ঐ বদমাসটা ওখানে গেছে। তা দেখুক গে। আইবুড়ো কালে ছোকরাদের ওগুলি অভ্যাস একটু-আধটু থাকে। কিন্তু ওখানে যদি জল আর ফ্যান ছোটাছুটি করে, অন্য ভাড়াটেরা কি ভাববে?

মরুক গে। হারাধন আবার কাগজে মন দিল।

মিনতির শরীরের গড়নটি কিন্তু চমৎকার! একবার রূপগর্বিনী ওয়াজি সুন্দরীকে দেখাতে পারলে হত। কোনো পালিশ নেই, কোন এনামেল নেই, ওর মত অত টানাটানি নেই, ব্লাউজের বোতাম সামনের দিকে আঁটা, আধেক খোলা, আধেক ঢাকা, কারচুপি নেই, যদি এই রাধুনির বেশেই একবারটি মিনতিকে দেখত না, তাহলে হাঁ হয়ে যেত।

আবার সেই হাসি। এবার একসঙ্গে দুজনের। পরক্ষণেই মিনতির প্রবেশ।

শুনছ গো, ঠাকুরপো আজ আমায় সিনেমায় নিয়ে যাবে বলছে।

কপাল কোঁচকাল হারাধন, কি ছবি?

ইংরেজি ছবি, হেসে জবাব দিল মিনতি, আজ পর্যন্ত একটিও ইংরেজী ছবি দেখিনি। তাই ঠাকুরপো বলল, চল আজই ম্যাটিনীতে যাব?

রাগ চেপে হারাধন শুধু বলল, যাবে যাও।

তারপর যেন নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল মিনতি, তারপরই শোনা গেল, যাব ঠাকুরপো। তাহলে আর তোমায় বাড়ী যেতে হবে না, এখানেই খাবে, তারপর দুজনে যাব।

হারাধন মনে মনে গজরাল, শুধু সিনেমায় কেন, ফেরার পথে সন্তোষ ঠাকুরের দোকানটাতেও একবার ঢুঁ মেরে এস প্রাণের ঠাকুরপোকে নিয়ে আর মেরে এস দু গ্লাস বাংলা সরুয়া।

ওদের ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কী খুশী মিনতি, ছলবল ছলবল করছে। বয়স যেন বিশে নেমে এসেছে। প্রশান্ত বলল, হারাধনদা, বৌদি পান খায় না, আজ ধরে-বেঁধে খাইয়ে দিলাম আর সামান্য কস্তুরী কিমাম।

সত্যি, কি ভাল লাগল পানটা। মিনতি বলল, তোমার মত আমিও রোজ পান খাব, কেমন?

উদাস কণ্ঠে বলল হারাধন, খেও। মনে মনে বলল, আমার মত মদও খেও।

এর্মিলি কিন্তু আজকাল হারাধনের টেবিলেও আসছে। কারণে, অকারণে।

মোটা শরীর আর বয়স বেশী বলেই যে এতদিন এড়িয়ে চলত, তা দেখা যাচ্ছে ঠিক নয়। আসল কথা, ভেবেছিল হারাধন বুঝি গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু সেও যে ছোকরাদের মত চুটকি কথা কইতে জানে, তা টের পেয়ে গেছে, ব্যস, অমনি আসা শুরু করেছে। এসে ঝুঁকে পড়ে ঠাট্টা করে, ডিপ্ কাটিং-এর ফাঁকে উপত্যকার গলিপথ দেখায়, আঁচল খসে পড়ে, তুলে নেয়, বুক দেখে আর মাঝে মাঝেই খিঁক করে হাসে।

একদিন এর্মিলি বাইরে যেতেই ভ্যাঁদড় প্রশান্ত ফিসফিস করে বলে গেল, হারাধনদা, তোমার চারে মাছ এসে গেছে যখন, তখন আর দেরী করছ কেন? গেঁথে ফেল।

সারাদিনের ম্যাজারিব মধ্যে এর্মিলি শুধু প্রোভোকেটিভ নয়, রীতিমত সিডাকটিভ। বেশ একটা শিউরে-দেয়া সুড়সুড়ির মতন। মনটা হালকা থাকে, কলমও চলে ফাইলের পর ফাইলে।

কিন্তু অকস্মাৎ বজ্রপাত। ১৩ সেপ্টেম্বর ডায়াসের হুকুমে চাকরি গেল বারোজনের। সংবিধানের ৩১১(২) ধারাটা একেবারে নৃশংস জল্লাদের মত। বলে দেয়া হল, কাল থেকে আর এসো না। কি অপরাধ, জানবার উপায় নেই। কোন আপীল চলবে না। এসো না ত এসোই না।

সাবধান হল হারাধন। বলা যায় না, জল্লাদের খাঁড়া আরও কারুর ওপর পড়তে পারে।

বরখাস্তের প্রতিবাদে ১৩ অকটোবর বাংলা বন্ধ ডাকা হল। বন্ধ ভেস্তে গেল। ট্রাম চলল, বাস চলল, বাজার চলল, বহুলোক অফিস করল। এমন কি, প্রতাপ বাঁড়ুয্যেও ছুটির দরখাস্ত করে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে, বন্ধ পালন করছি সাহস হল না বলতে।

কদিন পর বাসস্টপে আবার এর্মিলির সঙ্গে দেখা। ও আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ প্রশান্তর পরামর্শ মনে পড়ল হারাধনের, গেঁথে ফেল। জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ হারাধনদা। এর্মিলি বলল, চারখানা বাস ছেড়ে দিতে হয়েছে, ভিড়ের ওঠা গেল না। থামতে না থামতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আর কন্ডাকটারও থামতেই ঠন ঠন—ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। পরিস্থগুলো এমনি—বলেই হারাধনের দিকে তাকিয়ে খিঁক করে হেসে ফেলল, না না, আপনাকে মিন করছি না হারাধনদা—

হারাধনও হাসল, তোমার কি তাড়া আছে নাকি?

ভীষণ তাড়া—

চল, ট্যাক্সিতে যাই তাহলে।

আপনি কোন দিকে যাবেন?

যেদিকেই যাই না কেন, তুমি শ্যামবাজার যাবে ত?

ঠিক শ্যামবাজার নয়, এর্মিলি জবাব দিল, বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে—

বাঃ, ভালই হল তাহলে, হারাধন উৎসাহিত হল, আমি যাব বেংগল কেমিক্যালের কাছে, তোমায় নামিয়ে দিয়ে সোজা মানিকতলা পার হয়ে যাব।

কিন্তু আমার জন্য ট্যাক্সি—

হয়েছে, আর ঢং করতে হবে না, হারাধন ঠাট্টা করল, আমি যেন আর যাচ্ছি না।

ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে হারাধনের মনে হল যেন পুষ্পক রথে চলেছে। গায়ে গা ঠেসে না থাকলেও ব্যবধান একরকম নেই বললেই হয়। ওর শরীর থেকে এসেন্সের মাদকতাময় সুগন্ধ আসছে। হারাধন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে টানতে লাগল আর ক্রমেই হালকা হয়ে উঠতে লাগল। এর্মিলি ত হালকা হয়েই আছে। ঝাঁকুনি লাগতেই আঁচল খসে পড়ছে, তুলে নিচ্ছে ধীরে ধীরে, টান টান করে মেলে দিচ্ছে, তারপরই এক ঝলক দেখে নিচ্ছে। আর কথা আর কথা। প্রথমটা কলারলেস ওভারলেস হাইড্রোজেনের মত, হ্যাঁগো, আলুর দর কিছু কমেছে কি-গোছের, তারপর শহর কলকাতার জন্য দুশ্চিন্তা, বাস কি ইরেগুলার আর পথেঘাটে কি ভীষণ ভিড়, তারপর কেরানীজীবনের দৈনন্দিন একঘেয়েমির কথা উঠতেই এসে গেল রিলিফের কথা, সিনেমা দেখার কথা, বাংলা ছবি, হিন্দি ছবি, ইংরেজি ছবির কথা, কোন নায়িকার সেকস এ্যাপিল কতখানি, আবরণের বোঝা কমাবার সাহস হিন্দি নায়িকাদের মধ্যে কে কতখানি দেখিয়েছে—হারাধন যেই জানাল অনেক দিন সে সিনেমা দেখেনি, অমনি খিঁক করে হেসে ফেলল এর্মিলি, বলল, দেখবেন কি, সিনেমা হিরোইন যে আপনার বাড়ীতেই বাঁধা রয়েছেন

মানে?

মানে, স্বয়ং বৌদি, এর্মিলি চোখ মটকে বলল, ভেবেছেন কি, প্রশান্তদার কাছে সব শুনেছি। বৌদির যা ফিগার, যা স্ট্যাটিসটিকস, তা নাকি মিস ইণ্ডিয়াকেও হার মানিয়ে দেবে, তাই সর্বদাই বৌদিকে পাহারা দেন—খিঁক, পাছে কোনো অর্জুন ছোকরা সুভদ্রা হরণ করে বসে—খিঁক—

যাঃ, বাধা দিল হারাধন, যত সব বাজে কথা। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে হেসে বলতে লাগল, তার চাইতে বরং বলা যায়, আমাদের অফিসেই আছে একজন সিনেমার নায়িকা, যার রূপের তুলনা—

আ—হা, চোখ পাকাল এর্মিলি। আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গাড়ীর ঝাঁকুনি। এর্মিলি হারাধনের হাঁটু ধরে সামলে নিল, কিন্তু ঝপ করে আঁচল পড়ে গেল, অমনি হারাধনের চোখের কাছে, খুব কাছে উন্মোচিত হয়ে গেল গৌরীশংকর আর কাঞ্চনজঙ্ঘা, দেখা গেল অন্তর্বর্তী খাইবার পাস!

আঁচল তুলতে তুলতে এর্মিলি বলল, সারাদিন বসে বসে আপনি বুঝি তাই দেখেন?

দেখার জিনিস দেখব না? হারাধন এর্মিলির গায়ে ঠেস দিয়ে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হল না, নিষ্ঠুরের মত বিবেকানন্দ রোডের মোড় এসে গেছে।

এর্মিলি নেমে হাত বাড়িয়ে দিল, হারাধন হ্যান্ডসেক করে বলল, গুডবায়।

সন্তোষ ঠাকুরের দোকানে গ্লাস নিয়ে বসে হারাধনের মনে ... কি নরম এর্মিলির হাত, যেন পাখীর পালক, প্রশান্তর পরামর্শ মনে পড়ল, গেঁথে ফেল। উনি গাঁথছেন ওঁর প্রাণের বৌদিকে আর আমি লেগে রয়েছি এর্মিলির পেছনে। গেঁথে তুলবই, আর বেশী দেরী নেই। আজ আর এক গ্লাসে মন ভরল না। দ্বিতীয় গ্লাসে সোজা ঢালতে ঢালতে সন্তোষ হেসে বলল, হরতোষবাবু বলেন, গ্লাসের পর গ্লাস দিয়ে যাবে ঠাকুর, যতক্ষণ না এক পিপে হয়।

আমিও দেখব না কি একদিন কতটা পারি? হারাধন হেসে জিজ্ঞেস করল। তারপর নিজেই জবাব দিল, ওরে বাবা তাহলে আর দাঁড়াতে পারব না রে। হরতোষ-পিপে কেন, এক পুকুর খেলেও কিছু হয় না ওঁর।

দুজনেই হাসতে লাগল।

রাত নটার মধ্যেই শংকর, আর ছায়া খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হারাধন শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছে, মিনতি রান্নাঘরে কি করছে। সাড়ে দশটার আগে ওরা খায় না।

হঠাৎ তর তর করে মিনতি এল, হারাধনের মুখের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, আজও সেই সাহেবী পোশাকপরা লোকটা শিপ্রাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কুমুদিনী-মাসীর সঙ্গে ফিসফিস করে কি বলল, তারপর গটগট করে চলে গেল। প্রায়ই ও আসে কেন বল ত? কে ও লোকটা?

মরুক গে, হারাধন বিরক্তি প্রকাশ করল, অপরের ঘরের খবরে কি দরকার, নিজের ঘরই সামলাতে পারছি না—

মানে? সোজা হয়ে দাঁড়াল মিনতি, ও—বুঝেছি, কি বলতে চাইছ। ঠাকুরপো যে আমায় সিনেমায় নিয়ে যায়, তা তোমার পছন্দ নয়, তাই না? যাই বল বাপু, ঠাকুরপো আমায় ভীষণ ভালবাসে। আমার জন্য কত খরচ করে। ট্যাক্সি করে নিয়ে যায়, ট্যাক্সি করে দিয়ে যায়। সেদিন সিনেমার পর একটা বিরাট হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গেল। বিরাট হলঘর, কত টেবিল, কত মেয়ে-পুরুষ বসে খাচ্ছে আর দূরে একদিকে—বলতে বলতে হেসে ফেলল, আর এক দিকে স্টেজের ওপর বাজনা আর নাচ চলছে, মেম নাচছে। ওরে বাব্বা, কি তার ড্রেস—এবার খিলখিল করে হেসে ফেলল, খোলা দরজা দেখে খট্ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে হারাধনের বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কানে মুখ ঠেকিয়ে বলতে লাগল, শুধু একটা সরু জাঙ্গিয়া-পরা আর—দেখ, বুকের এইটুকু মাত্র—বলেই হঠাৎ থেমে গেল, বারকয়েক জোরে-জোরে শ্বাস টানল, তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমার মুখে কিসের গন্ধ?

হারাধন অনায়াসে জবাব দিল, ও কিছু নয়, সরবতের।

সরবতের! মিনতি মাথা তুলল, সরবৎ না ছাই। নিশ্চয়ই মদ খেয়ে এসেছ তুমি। তুমি তাহলে মদ খাও?

বিভ্রাটে পড়ল হারাধন। তবে অজ পাড়া-গাঁয়ের মেয়েকে বোঝানো কঠিন হবে না। বলল, কেন, কি হয়েছে তাতে?

রোজ খাও?

রোজ খাই। হারাধন শান্তগলায় বলল, তুমি ত জান না একটু করে খেলে স্বাস্থ্য কি ভাল থাকে। দেখ না, সাহেব-মেমদের কি সুন্দর স্বাস্থ্য? ওরা রোজ খায়। হারাধন মিনতির মাথাটা বুকের ওপর চেপে ধরল। তবে যে শুনি, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আবোলতাবোল বকতে থাকে, মিনতি বলতে লাগল, পাগলের মত খালি হাসতে থাকে—

আমি হাসি পাগলের মত? আবোল-তাবোল বকি কোন দিন? হারাধন চুমু খেল।

কিন্তু ও ঘরের মাসীমা যে রোজ নিখিলের বাবাকে বকাবকি করেন—

শুদুশুদি, হারাধন বাধা দিয়ে বলল, আমি জানি, হরতোষবাবু প্রায়ই এক পিপে খেয়ে আসেন, অথচ কিছু হয় না তাঁর—

পিপে! পিপে কি গো?

পিপে চেন না? মানে—মানে, একটু অসুবিধায় পড়ল হারাধন। তারপর ইংরেজীতেই বলল, মানে ব্যারেল। আমাদের গলির রাস্তাটা তৈরী করবার সময় পিচ-ভর্তি যেগুলো এনেছিল, ওকে বলে পিপে—

যাঃ ঐ এক পিপে মদ খেতে পারে কেউ?

পিপে কি বলছ মিনু, কেউ কেউ এক ট্যাংকভর্তি মদ খেয়ে ফেলতে পারে—

ট্যাংক—মানে, এক পুকুর?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

তুমি পার?

হারাধন বলল, তা—আমিও পারি, তবে তারপর হরতোষবাবুর মত হেঁটে আর বাড়ীতে আসতে পারব না, রিকসা লাগবে। একটু-আধটু খেলে নেশা হয় না। যেমন আমার। হারাধন মিনতির গাল টিপে দিল।

হেসে ফেলল মিনতি, তারপরই বলে উঠল, সেদিন দেখছিলাম সবার টেবিলেই কাঁচের গ্লাস, তাতে রঙীন কি যেন। ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করতে বলল, ওটা লিকার অর্থাৎ মদ—বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে ফেলল, জান ঠাকুরপোটা এমন দুষ্টু না, বলে কি, একটুখানি টেস্ট করে দেখবে নাকি বৌদি, কেমন লাগে?

খেলে তুমি? হারাধন চোখ বড় করল।

যাঃ।

আবার রান্নাঘরে চলে গেল মিনতি।

শালা প্রশান্ত, মনে মনে বলল হারাধন, আমায় এমিলিকে দেখিয়ে দিয়ে তুমি শালা বৌদিকে নিয়ে মেতেছ? যা, মাত গে, যা, করগে শুভদ্রাহরণ। শত হলেও আঠাশ বছরের বুড়ী আর এমিলি সেন তেইশ বছরের যুবতী। কোনরকমে ওকে একবার সন্তোষ ঠাকুরের দোকানে এনে ফেলতে পারলেই হয়। হরতোষবাবুর মত ব্যারেল কি, সেদিন শালা মদের ট্যাংকে সাঁতরাব এমিলি সুন্দরীকে নিয়ে।

তারপরের ঘটনাবলী অতি দ্রুত ক্লাই-মেক্সের দিকে এগিয়ে চলল।

ইয়াহিয়া ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার মতলবে আছে। ভুট্টো চু-এন-লাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছে।

পাক সেনারা ১২ নভেম্বর নদীয়া জেলায় ঢুকে পড়েছিল, মার খেয়ে হটে গেছে। ২২ নভেম্বর বয়ড়ার কাছে পাকিস্তানের স্যাবার জেট বিমান গুলী করে নামানো হয়েছে। ২৩ নভেম্বর সমগ্র পাকিস্তানে ইয়াহিয়া ইমার্জেন্সী ঘোষণা করেছে।

২৫ নভেম্বর বালুরঘাটে পাক-কামান থেকে গোলাবর্ষণ।

একদিন ট্যাক্সির নিরালায় এমিলির হাসিঠাট্টায় উত্তেজিত হয়ে হারাধন ওর যৌবন টলটল গায়ে হাত দিতেই এমিলি ক্রুদ্ধ ফণীনির মত ঠাস করে হারাধনের গালে এক চড় মেরে গর্জন করে উঠেছে, স্কাউন্ড্রেল! বদমাস কোথাকার!

সেদিন সন্তোষ ঠাকুরের দোকানে চার-চার গ্লাস খেয়ে ফেলল হারাধন, সন্তোষকে বলল, ব্যারেল খায় হরতোষ, আজ আমি শালা ট্যাংক সাবাড় করব।

বাড়ীতে এসেই শুনল শংকরের কাছে, মা নেই, কাকাবাবুর সঙ্গে নাইট শোতে সিনেমায় গেছে।

জামাশুদ্ধই বিছানায় শুয়ে পড়ল হারাধন, কাগজ তুলে নিল। পড়তে লাগল। পাক বাহিনী সাকে ট্যাংক লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, আমরা পি-৭৬ ট্যাংক লইয়া উহাদের অনেকগুলি ট্যাংক ধ্বংস করিয়াছি, তিনটি অক্ষত অবস্থায় লইয়া আসিয়াছি—

অকস্মাৎ কিসের শব্দ পেয়ে তাকিয়ে দেখল হারাধন, এই যে দাদা, বৌদি—বলেই চলে গেল প্রশান্ত।

মিনতি টলছে। চোখ দুটো লাল। উসকোখুসকো চুল। শাড়ী কুঁচকে গেছে। সরে গেছে বুক থেকে। ব্লাউজের শুধু নীচের বোতামটা লাগানো। হারাধনকে দেখে বলে উঠল, এই যে ডিয়ার! তারপর জড়িত কণ্ঠে অনাবশ্যকভাবে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, জান গো, আজ আমিও একটুখানি টেস্ট করলাম—এট্টুখানি, দুষ্টু ঠাকুরপোটা গলা জড়িয়ে ধরে এমন আবদার করল—হি-হি করে হেসে উঠল, পড়তে পড়তে আলনাটা ধরে সামলে নিল, তুমি বলেছিলে না এক ট্যাংক খেতে পার? আমি ট্যাংক খাইনি গো, ইট্টুখানি খেয়েছি। পরে খাব, তুমিও খাবে, আমিও খাব—তুমিও ট্যাংক, আমিও ট্যাংক—বেশ মজা হবে তাই না গো? তুমি বলেছিলে মদ খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, দেখবে? দেখবে একদিনেই আমার স্বাস্থ্য কি ভাল হয়েছে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমায়।

হারাধন ছুটে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল। বুঝতে পারল চার গ্লাস বাংলা মদের ফল। ফিরে আসবার সময় পা টলতে লাগল, মিনতির হাত ধরতে গেল, মিনতি ঝটকা মারতেই মেঝেয় পড়ে গেল হারাধন।

মাথা তুলতেই খাট থেকে গড়িয়ে পড়া কাগজখানার হেডলাইন চোখে পড়ল, ট্যাংকে ট্যাংকে ভীম পরিচয়।

অঙ্গনা

যে দিন স্বপ্নে মিলোচ্ছে

আলাদা থাকার একটা প্রবণতা এখন আমাদের পেয়ে বসেছে। একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকা আর আমাদের স্বভাব হয়ে উঠছে না। সবাই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে ভালবাসে। তাই প্রায় বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলাদা নীড় বাঁধার স্বপ্ন আমাদের ঘিরে থাকে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য সুখী জীবনযাপন। ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর সুখের স্বর্গ রচনা করা। এরকম একটি পরিবারের সঙ্গে সম্প্রতি আমার পরিচয় হলো। স্বামী-স্ত্রী আর একটি বাচ্চা। ছোট্ট পরিবার। বিয়ের মাস দুয়েক পরেই ওরা আলাদা সংসার পেতেছে। ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা। ভদ্রলোকের তো শিক্ষা-দীক্ষা বলতে গেলে ষোলকলায় পূর্ণ। কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিয়ের আগে থেকেই ওদের জানাশোনা ছিল। বর্ণ-ভেদ থাকলেও বিয়েতে দু'বাড়ির অমত হয়নি। পুরোপুরি সামাজিক শিষ্টাচারেই বিয়ে হয়েছে। ভদ্রলোকেরা বেশ কয়েক ভাই এবং বোন। বড়ো সংসার বলতে যা বোঝায়। বাবা নেই। মা হচ্ছেন সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। তিনি সর্বদিক গুছিয়ে সুন্দর সংসার চালান। তাঁর সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা আর প্রাজ্ঞতায় সংসার ছিল অনাবিল আনন্দকেন্দ্র। ভদ্রলোক বিধবা মায়ের সেজো ছেলে এবং সর্বোত্তমও বটে। এই ছেলেকে ঘিরে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখতেন। বিরাট সংসার আর তার গুরু দায়িত্ব রেখে স্বামী যখন চোখ বুজলেন তখন তিনি এতটুকু মুষড়ে না পড়ে সুদক্ষ কাণ্ডারীর মতো সংসারের হাল ধরেছিলেন। ছেলেদের মানুষ করেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। সর্বদিক দিয়ে ছেলেমেয়েদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সাধ্যমতো ত্রুটি তিনি রাখেননি। এই ছেলের বিয়ে হওয়ার আগে তিনি বড়ো আর মেজো ছেলের বউ ঘরে এনেছেন নিজের পছন্দ মতো। দুটি বউ-ই তাঁর খুব মনের মতো। গুছিয়ে সংসার করা এবং দেওর-ননদ আর শাশুড়িকে সুখী করায় তাঁদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। এবার তিনি সেজো ছেলের বিয়ের কথা ভাবছিলেন। আর স্বপ্ন দেখ-ছিলেন যে, সেজো বউ ঘরে এসে আর দুই জায়ের সঙ্গে মিলেমিশে সংসারে স্বর্গসুখ রচনা করবে। আর তাঁর এই স্বপ্ন দেখা তো স্বাভাবিক। সব ছেলের মধ্যে এই ছেলে হচ্ছে তাঁর বিরাট আশা। ছেলের বউও তিনি আনবেন উপযুক্ত ঘর থেকে। এজন্য তিনি মেয়ে দেখতেও শুরু করেছেন। এখন শুধু ছেলের মতামতের অপেক্ষা। কিন্তু তিনি এও জানেন যে ছেলে তাঁর কথা কখনো ফেলবে না। তবে তিনি এটুকু বোঝেন, বিয়ের ব্যাপারে জোর খাটানো উচিত নয়। কারণ, ছেলে যাকে নিয়ে সারাজীবন ঘর করবে তার সম্বন্ধে নিজের মতামত থাকা উচিত। প্রাথমিক কাজ সেরে ছেলের মতামত চাইবেন এরকম ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। আর ছেলেকে তো তাঁর চাইতে কেউ বেশি চেনে না।

এমন সময় বড় বউ দেওরের ইতিপূর্বেই হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার কথাটা শাশুড়ির কানে তুললেন এবং তার স্বপক্ষে কিছু বক্তব্যও রাখলেন। মা সব কথা শুনলেন।

তিনি যেন একটু খুশি হলেন। তারপর বললেন যে, বিয়েটা সামাজিক হওয়া চাই। এরপর তিনি নিজে মেয়ের বাড়ির সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। অপর পক্ষ থেকেও কোন আপত্তি হলো না। ভালয় ভালয় বিয়ে হয়ে গেল। সেজোর বউ বাপের বাড়ির পরিচিত গণ্ডী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির অপরিচিত পরিবেশে প্রবেশ করলেন।

প্রথম প্রথম কোন অসুবিধাই ছিল না। তিন জায়ে বেশ মিলেমিশে ছিলেন। শাশুড়ি দূরে থেকে দেখতেন আর ভাবতেন, ওরা যেন তিন বোন। কর্তা যে গুরুভার তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তা তিনি সফলভাবে পালন করতে পেরেছেন সব দিক থেকে। একথা ভেবে তাঁর গর্বে বুক ভরে উঠতো। আর মাঝে মাঝে একটা চাপা বেদনা তাঁকে খানিকটা আলোড়িত করে আবার তাঁর বুকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তো, আজ যদি কর্তা থাকতেন। তার-পর তিনি ভাবতেন, এবার ছোট ছেলেটার বিয়ে দিতে পারলে আমার ছুটি। ওরা চার বোনে সংসার করুক। ওদের আনন্দ আর হাসি কলরব দেখে আমার চোখ জুড়োবে।

কিন্তু মানুষের সব ভাবনা সত্যি হয় না। মাস কয়েক যেতে না যেতেই সেজো বউ যে আর দু জায়ের সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাওয়াতে পারছিল না সেটা প্রকট হয়ে উঠলো। একসঙ্গে থাকা তাঁর মনোমত নয়। এ নিয়ে স্বামীর কাছে তিনি প্রায়ই অনুযোগ করেন আর আলাদা সংসার পাতার বায়না ধরেন। প্রথম দু জায়ের সঙ্গে যে তৃতীয়জন আর খাপ খাইয়ে উঠতে পারছে না সেটা শাশুড়ির নজর এড়ায় না। তাই আরো তিক্ততার আগেই তিনি একদিন ছেলেকে সরাসরি বললেন যে, তোমার পক্ষে আলাদা থাকাই ভালো। কারণ, বৌমা একসঙ্গে থাকতে চায় না। ছেলে মায়ের মুখের দিকে তাকালো। একবার বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু আমি তো তোমার কাছ থেকে তেমন শিক্ষা পাই নি। তোমাকে আর দাদা-বৌদি-ভাই ছেড়ে আলাদা হওয়ার কথা তো আমি কোনদিন ভাবি নি। মায়ের কথায় ছেলের প্রতিবাদ চাপা পড়ে গেল। তিনি বললেন যে এভাবে লড়াই করে একসঙ্গে থাকা যায় না। তাতে তুমিও শান্তি পাবে না আর সকলের শান্তিও নষ্ট হবে।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরেই ও'রা আলাদা হয়ে গেলেন। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে ওদের একটি ছেলেও হয়েছে। ভদ্রমহিলার কোন অসুখ নেই। ছেলের হাত ধরে তিনি বিকেলবেলা দিব্যি ঘুরে বেড়ান। কিন্তু স্বামীর মনে সুখ নেই। সব সময় মায়ের জন্য আমার স্বামী কি রকম হয়ে থাকেন। দুই জা আর ছোট দেওরের জন্যও তিনি মাঝে মাঝেই মন খারাপ করেন। যদিও সবাই আমাদের এখানে আসেন। শাশুড়ি তো [illegible]ই এটা-সেটা ছেলেকে পাঠান। ত[illegible] তিনি স্বস্তি পান না। তিনি আমাকে বোঝান যে এক-সঙ্গে থাকলে কি এমন ক্ষতি হতো? একথার উত্তরে ভদ্রমহিলা আমাকে জানালেন যে, এই তো বেশ আছি। এক সময়ে তো আলাদা হতেই হতো। তার চেয়ে আগে-ভাগে আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। আর এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য এত ভাবনার কোন কারণ থাকতে পারে না। একথা আমি স্বামীকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না।

প্রায় এরকমই একটি ঘটনা আমার জানা আছে। সে হলো আমার এক অধ্যাপকের জীবনের ঘটনা। অধ্যাপক বিয়ে করেছেন বৌদির বোনকে। মা-বাবা নেই। শুধু দুটি মাত্র ভাই। দাদা-বৌদির হাতেই তিনি মানুষ। মা-বাবার মতোই দুজনকে মানেন। বিয়ের পর কিন্তু নিজে থেকেই আলাদা থাকেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, আমাদের সম্পর্কটা এতো মধুর যে কখন খিটির-মিটির হয়ে সব নষ্ট হয়ে যাবে সেই আশঙ্কা থেকেই আমরা আলাদা আছি। এমনিতেই আজকের দিনে মানুষের সহনশীলতা কমে গেছে। তারপর আগে

থেকে সাবধান থাকলে পরস্পরের সম্পর্ক বাভাবিক থাকে।

একান্নবর্তী পরিবার আমাদের দেশে ভাঙছে। নানা কারণে। আর্থিক কারণই র মধ্যে মুখ্য। সেটাকে আমরা বোঝা-পড়ার অভাব নাম দিয়ে চালাই। এক সময় বাই একসঙ্গে থাকতে ভালবাসতেন। সদিন ধারণা ছিল যে পরিবার যতো বড়ো বে সুখ-শান্তিও সেখানে ততো। খিটির-মিটির সেদিনও ছিল। জায়ে জায়ে মান্তর যে না হতো এমন নয়। কিন্তু সে ল সাময়িক। ও'রা বলতেন, এরকম য়েই থাকে। দশটা বাসন একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি হবেই। কিন্তু আজ আর এই দোহাই দিয়ে একান্নবর্তী পরিবার টি'কিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

এজন্য দায়ী শিল্পের প্রসার আর পাশ্চমী সভ্যতা। ওরা টুকরো টুকরো হতে ভালবাসে। তাই আমরাও টুকরো টুকরো হবো। কিন্তু এই টুকরো টুকরো হওয়ার পেছনে ওদেশের মায়ের মনে যে কতখানি সুখ আর অ-সুখ সেকথা জানার দরকার আমরা মনে করি না। এক পাশ্চমী ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার আমার পরিচয় হয়েছিল। একদিন তিনি আমাদের বাড়িও এসেন। বাড়িতে এসে সকলের সঙ্গে পরিচয় হতে তিনি খুব খুশী। সারা বাড়ি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। আমরা একান্নবর্তী শুনে তো তাঁর আনন্দের সীমা নেই। তারপর তিনি তুলে ধরলেন এক পাশ্চাত্যের চিত্র। দুটি ছেলে ভদ্রমহিলার। বিয়ে করে তারা যে যার আলাদা থাকে। এতে দুঃখ বা খেদের কিছু নেই। কারণ এই ওদের দেশের রীতি। বিয়ের পর বাবা আর ছেলে একসঙ্গে থাকে না। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলার মনোমত নয়। তিনি বললেন, তোমরা সকলে কি রকম একসঙ্গে আছ। আর ছেলেদের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগই থাকে না। উইক-এন্ডে একবার আসে। আমার সঙ্গে দু-পাঁচটা কথা বলে চলে যায়। তার বেশী আবদার করে কোনদিন চা খেতেও চায় না। নেমন্তন্ন ছাড়া কেউ আসবে না। তোমরা সত্যি সুখী। আমাদের দুঃখের শেষ নেই। মায়ের সঙ্গে ছেলের যেখানে যোগ নেই সেখানে সুখ কোথায়? ভদ্রমহিলা এর পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, তোমরা সব সময় এরকম থাকার চেষ্টা করো। এখানে সুখ-শান্তি আছে। আর আমরা সব সময় সুখের জন্য হাহাকার করি।

সেই সুখ-শান্তি থেকে আমরা কিন্তু অনেক দূরে সরে গেছি। এখন সবাই নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য উদগ্রীব। এজন্য আর পেছনে ফিরে তাকাতে রাজী নই। অথচ একান্নবর্তী পরিবারে সুবিধা অনেক। অসুবিধাও অসংখ্য। তবে মানিয়ে চলতে পারলে সুখের ভাগটাই বেশী। আমার এক বন্ধু তো একান্নবর্তী পরিবারের কথায় উচ্ছ্বসিত। সে বলে, একসঙ্গে আছি তাই কোন ঝামেলা নেই। শাশুড়ি আর জায়েরা আমার বাচ্চার জন্য যা করেন সেকথা বলে শেষ করা যায় না। আমি একা থাকলে চোখে-মুখে পথ খুঁজে পেতাম না। তারপর যখন যেখানে খুশী যাচ্ছি। বাচ্চার কথা আমি ভাবিও না। একা থাকলে এজন্য কম অসুবিধা পোয়াতে হতো না। আর একটা কথাও ভাববার মতো। একান্নবর্তী পরিবারে খরচ কম। একা একা থাকলে যা খরচ পড়ে তার চেয়ে এখানে অনেক অল্পে থাকা যায়। সবাই সমান আয় করে না। অথচ একসঙ্গে থাকলে কারো কোন অসুবিধা নেই। তবে কম আর বেশী আয়ের দিকটা স্ত্রীদের ভুলে থাকতে হয়। এ সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেই যতো অশান্তি। আর এটা এমন কোন স্বার্থত্যাগও নয়। সামান্য একটু উদারতা মাত্র। এটুকু তো আমাদের কাছে প্রত্যাশিতও। কারণ, আমরা লেখাপড়া শিখেছি। মনের প্রসার বেড়েছে। সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করবো কেন?

একান্নবর্তী পরিবার ভাঙছে। আমরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। কিন্তু অপবাদ থেকে আমরা রেহাই পাচ্ছি না। সবাই নাক উ'চিয়ে বলেন, মেয়েরাই হলো এর আসল কারণ। তাঁদের মতে স্ত্রী হলো 'ফরেন বডি'। ভিন্ন সংসার থেকে নতুন পরিবেশে এসে সব ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই দুর্নাম আমাদের কোনদিন কাটবে কিনা তাও জানি না। তবে দুর্নামের পাশাপাশি সুনামও আছে। সেই যে ভদ্রমহিলার দেওর যাঁকে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলে, বৌদি একা থাকার যে কি সুখ তা তুমি কোনদিন বুঝলে না। উত্তরে তিনি বলেন, একা থাকার সুখের কথা জানি না। তবে শ্বশুরবাড়ীতে এতো সুখ পাবো একথা স্বপ্নের অগোচর। একা থাকলে সংসার, স্বামী তো ছিলই কিন্তু তোমার মতো দেওর আর মায়ের মতো শাশুড়ি কোথায় পেতাম? আমার এই ভাল। এই ভদ্রমহিলা আমাদের সুনাম।

দিনে দিনে পরিবার আরো ভাঙবে। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা আমাদের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এজন্য দায়ী আজকের সভ্যতা। এরই মধ্যে একবার পিছু ফিরে তাকালে বোঝা যায় যে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ থেকে আমরা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছি। তখন বুকের ভেতরটা কেমন টনটনিয়ে ওঠে।

—প্রবীণা

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত হেতমপুর গ্রামের গুরুসদয় মিউজিয়মের বাছাই করা লোকশিল্প নিদর্শনের প্রদর্শনী হয় ৩-৯ জুন। নকশি কাঁথা পটচিত্র, কাঠ খোদাই খেলনা পুতুল, ঘোকরা—শিল্প, চিত্রিত মৃৎপাত্র, জলখাবারের ছাঁচ প্রভৃতি নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। ওপরের ছবিটি একটি নকশি কাঁথার।

মিশরীয় মুদ্রায় রূপসী ক্লিওপেট্রা

পৃথিবীর ইতিহাসে ক্লিওপেট্রা সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত। তাঁর অতুলনীয় রূপলাবণ্যের বর্ণনায় সর্বকালের শিল্পী, সাহিত্যিকরা মুখর। অদ্বিতীয় চিত্রশিল্পী গিডো ক্লিওপেট্রার চিত্র অঙ্কন ক'রে অমর হয়েছেন। এই ক্লিওপেট্রার উজ্জল রূপে মিশরের মুদ্রাও একসময় ঝলমলিয়ে উঠেছিল।

মিশরের মুদ্রাগুলি ভৌগোলিক নাম অনুসারে সাজানো যদিও মিশরের মুদ্রার সংখ্যা ইওরোপ ও এশিয়ার তুলনায় অনেক কম। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, খৃঃ পূঃ পাঁচ হাজার অব্দে মিশরে সর্বপ্রথম পাথরের মুদ্রার প্রচলন ছিল কিন্তু সে সময়ের কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি।

মিশরে রাজা বা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের পিরামিডের মধ্যে সমাধিস্থ করা হ'ত। এই পিরামিডের ভিতরে যাকে কবরস্থ করা হত তাঁর পছন্দমতো আসবাবপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার আরও নানাবিধ জিনিস সজ্জিত করে রাখা হ'ত। এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে পিরামিডের ভিতরে কিছু সোনা, রূপা, তামা, পিতল ইত্যাদি জিনিসের আংটির মত অনেকগুলি রিং পাওয়া গেছে। তাই দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এগুলিই মিশরের সর্বপ্রাচীন মুদ্রা। প্রথম দরায়ুসের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম ছাঁচে তৈরী মুদ্রার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর পূর্বে ছাঁচে তৈরী মুদ্রার কোনরকম ব্যবহার ছিল না বলেই অনুমান করা হয়। এর পরে আলেকজান্দারের রাজত্বকালে মুদ্রাতে আমরা গ্রীক দেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করি। প্রথম তলেমীর রাজত্বকালের মুদ্রা প্রায় তিনশ বছর মিশরে প্রচলিত ছিল। তলেমী প্রচলিত মুদ্রার নিজের ও রাজমহিষীর প্রতিমূর্তি মুদ্রার দুই পাশে দেখা যেত। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় অ্যাসিনো, চতুর্থ তলেমী ও প্রথম ক্লিওপেট্রার মুদ্রায় রাজা-রাণীর ছবি এবং উল্টোদিকে অভিষেকে নিযুক্ত রাজপুরোহিতের প্রতিকৃতি আছে। কোন কোন মুদ্রার পিছন দিকে ঈগল পাখী ও বল্লমমূর্তিও দেখা যায়। অনেকগুলি মুদ্রাতে আবার হাতির চামড়ার আবৃত বৃষশৃঙ্গমণ্ডিত আলেকজান্দারের মূর্তি আছে। কোন মুদ্রায় পতাকের (পেচকবাহিনী) প্রতিমূর্তি দেখা যায়।

তৃতীয় তলেমী ও তাঁর বন্ধে পারদর্শিনী মহিষী দ্বিতীয় বার্ণিস নানারকম সুন্দর সুন্দর মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। দ্বিতীয় বার্ণিস তৃতীয় তলেমীর মৃত্যুর পরেও বহুদিন রাজত্ব করেছিলেন। বার্ণিস প্রচলিত মুদ্রায় নিজের প্রতিকৃতি দেখা যায়। বার্ণিসও রূপবতী ছিলেন। বার্ণিসের সৌন্দর্যকে শিল্পী নিখুঁতভাবে মুদ্রার গায়ে রূপায়িত ক'রে একদিকে যেমন বার্ণিসের রূপকে অম্লান করে রেখেছেন অপরদিকে নিজের শিল্পপ্রতিভারও অমর স্বাক্ষর রেখেছেন। দ্বিতীয় বার্ণিসের পরে ফিলোমেটোরদের মুদ্রাও মিশরে দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল। এর পরে বিশ্ববন্দিতা রূপলাবণ্যে অনন্যা সপ্তম ক্লিওপেট্রা মুদ্রাতলে নিজ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়েছিলেন। এই সেই ক্লিওপেট্রা যার রূপে উন্মাদ হ'য়ে বিপুল পরাক্রম বীরপুঙ্গব আন্টোনিও রোম সাম্রাজ্যের বিশাল ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এই ক্লিওপেট্রার বিরহ-যাতনা সহ্য করতে না পেরে আন্টোনিও আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই অসীম সৌন্দর্যের অধিকারিণী ক্লিওপেট্রা নিজ মুদ্রায় নিজের রূপ অপেক্ষা বিভ্রম-বিলাসই অধিকতর অঙ্কিত করিয়েছেন, তাতে 'জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনীর প্রশান্ত সৌন্দর্যের ন্যায় কমনীয় ভাব নাই, এই বিলাস-বিভ্রমমণ্ডিতা ক্লিওপেট্রা মূর্তি মরীচিকার ন্যায় দর্শকের নয়ন ঝলসাইয়া দেয়।" (বিশ্বকোষ—পঞ্চদশ খণ্ড)।

এর পরে মিশরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, রোমানরা মিশরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এসময় মিশরের নানাবিধ উন্নতি হয়েছিল। বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর মুদ্রাশিল্প সৌন্দর্যে ও পুরাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশরের যেসব মুদ্রাতে গ্রীক ও স্থানীয় অর্থাৎ মিশরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাতে সবপ্রথমেই চোখে পড়ে পৌরাণিক ছবি। কোনটার মধ্যে হয়তো মিশরের সূর্যমন্দিরের প্রতিলিপি দেখা যায়। মিশরের মুদ্রাগুলির কোন-কোনগুলিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ উন্নত ধরণের নমুনা পাওয়া যায়। তাছাড়া নানা রকম পূজা-পার্বনের চিত্রও মুদ্রাতে অঙ্কিত করা হয়েছে।

সাইরেনেকা প্রদেশের মুদ্রা আফ্রিকার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে অনেক সহায়তা করে। এখানে যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শো সাতশো বছর পূর্বের অনেক গ্রীক মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাছাড়া রট্টাস বংশের রাজত্বকাল থেকে অগষ্টাসের রাজত্বকালের মধ্যের সুদীর্ঘ কয়েকশত বছরের নানাবিধ রকমারী মুদ্রা এখান হ'তে উদ্ধার করা হয়েছে। জিয়াসের মূর্তি ও অন্যদিকে 'সিলফিয়া' গাছের প্রবাল-পল্লবমালার সুন্দর মুদ্রাও বার্কা ও সাইরিন্ নগর হ'তে আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানেই রূপার মুদ্রার প্রচলন প্রথমে হয়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, সামিয়া ও ফিনিকিয়ার মুদ্রা লিদিয়া ও ইজাইনার চেয়েও অনেক প্রাচীন। সাইরিণের রাজবংশের স্বর্ণমুদ্রায় ওলিম্পিয়ার শিল্পের মত অনেকটা অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়।

এরপর জিওগিটানা প্রদেশের মুদ্রায় কার্থেজের মুদ্রাশিল্পে ফিনিকশিল্পের প্রভাব আছে। এছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির মধ্যে সিংহবাহিনী মূর্তি, ত্রিশূলধারিণী নারী দেবীর রণোন্মত্ত মূর্তিও দেখা যায়। কার্থেজের পিতলের মুদ্রাতে রোমান পুরাণের নানাবিধ চিত্রও দেখা যায়।

প্রথম জিউবার রাজত্বকালের মুদ্রার মধ্যে পুরাতত্ত্বের প্রভাবই বেশী ছিল। মিশরের ভুবনমোহিনী ক্লিওপেট্রা ও আন্টোনিওর কন্যা অষ্টম ক্লিওপেট্রার সঙ্গে দ্বিতীয় জিউবার বিয়ে হয়েছিল। এই অষ্টম ক্লিওপেট্রার মুদ্রাতলের ছবি বিষাদ-মলিন। মুদ্রার মূর্তি দেখলে মনে হয় মিশর রাজবংশের শেষ বংশধর অষ্টম ক্লিওপেট্রা ভবিষ্যৎ অধঃপতনের দুশ্চিন্তায় ম্লান, শান্ত, সংযত। সপ্তম ক্লিওপেট্রার মনোমোহিনী রূপ আর অষ্টম ক্লিওপেট্রার মুখমণ্ডলে প্রাপ্ত মুদ্রাতলের প্রতিচ্ছবিতে নেই।

(লেখাটির জন্য 'বিশ্বকোষ' পঞ্চদশ খণ্ডের কাছে ঋণী)।

—অঞ্জলি চৌধুরী

প্রেক্ষাগৃহ

ছন্দপতন / [illegible]
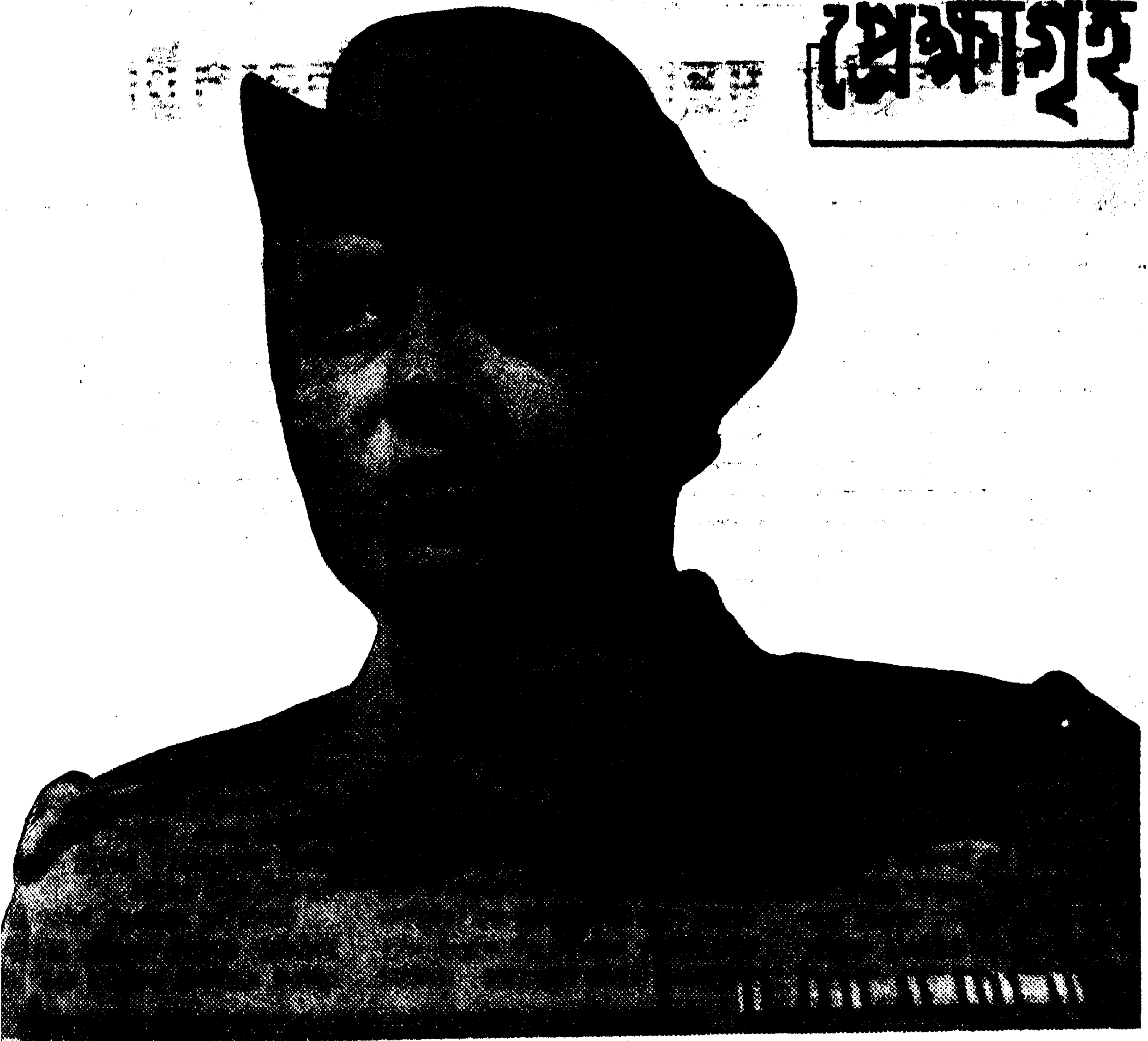
…তীয় চলচ্চিত্রশিল্পের হীরকজয়ন্তী

…ভারতবর্ষে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় …৯৬ সালের ৭ জুলাই তারিখে। স্থান …বাই শহরের ফোর্ট এলাকার কালা …ার কাছে অবস্থিত ওয়াটসন হোটেল। …াত্তা ফ্রান্সের লুমিয়ার ব্রাদার্সের ভ্রাম্য- …দল। কলকাতা প্রথম চলচ্চিত্র দেখে ঐ …রই, বোধ করি সেপ্টেম্বর মাসে, স্টার …াটারে স্টিফেনসাহেবের দৌলতে। …মিয়ার ব্রাদার্স প্রদর্শিত ঘোড়ার দৌড়, …ায় জল দেওয়া, দমকলের আগুন …ানো প্রভৃতি ঘটনার খণ্ড খণ্ড চলচ্চিত্র …নের ফলে বোম্বাইয়ের হরিশচন্দ্র সখা- …ভাটওয়াদেকর ছাড়া আর কেউ সেই …চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুপ্রাণিত হয়ে- …ন কিনা, আমাদের তা জানা নেই। …ই কলকাতায় স্টিফেনসাহেবের চলচ্চিত্র …নীর পরে হীরালাল সেন নামে জনৈক …যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবার জন্য রীতি- …মেতে উঠেছিলেন এবং ইংলণ্ড থেকে …রা প্রভৃতি আনিয়ে প্রথিতযশা অভি-নেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহায়তায় 'আলিবাবা' 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি নাটকের দৃশ্যাবলী তুলে তা প্রদর্শনও করে-ছিলেন, একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য। শোনা যায়, শ্রীসেন নাকি সম্পূর্ণ 'আলি-বাবা' নাটিকাটিকে চলচ্চিত্রাকারে গ্রথিত করেছিলেন ১৯০৫-৬ সালে। কিন্তু এ সম্পর্কে ছাপার হরফে কোনো অগ্নুজে প্রমাণ আজও পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। তাই বোম্বাই শহরের আর জি টোর্ণি পরিচালিত 'পুণ্ডালিক' ছবিটিই ভারতে প্রথম প্রদর্শিত ভারতীয় ছবি হবার গৌরবান্বিত আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত সন্তের জীবনী অব-লম্বনে রচিত এই ধর্মমূলক ছবিটি বোম্বাই শহরের গিরগাঁও অঞ্চলে স্যাণ্ডার্স্ট রোডে অবস্থিত 'করোনেশন সিনেমেটোগ্রাফ' হলে প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯১২ সালের ১৮ মে তারিখে। 'পুণ্ডালিক' ছবির দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই চার-পাঁচ হাজার ফুটের বেশী ছিল না। তাই ওর সঙ্গে দেখানো হয়েছিল 'এ ডেড ম্যানস চাইল্ড' নামে একটি বিদেশী ছবি। করোনেশনে 'পুণ্ডালিক' ছবিটি পর-পর দু-হপ্তা প্রদর্শিত হয়েছিল। টাইমস অব ইণ্ডিয়া (২৫ মে, ১৯১২) ছবিটির প্রশংসা করে বলেছিলেন : 'ধর্মমূলক নাটক হিসেবে এর জুড়ী নেই।'

গ্রীভস কটন কোম্পানীর সেলসম্যান আর জি টোর্নি ছিলেন একটি নাট্যসঙ্ঘের সভ্য। তাঁদের থিয়েটার ক্লাবে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছিল, তার মধ্যে মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সাধুর জীবনী অবলম্বনে রচিত 'পুণ্ডালিক' নাটকটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বোম্বাইয়ে সে-যুগে প্রদর্শিত বিদেশী ছবি 'আলাদিন', 'আলিবাবা' 'সিণ্ডারেলা', 'ওথেলো', 'ক্যামিল', 'ক্লিওপেট্রা' প্রভৃতি ছবি দেখে শ্রীটোর্নির মনে জাগে ছবি তৈরী করবার কথা। মনের কথা ক্লাবের বন্ধুদের কাছে ব্যক্ত করতে যে-দুজন তাঁকে নানা রকম সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করেন, তাঁদের মধ্যে এন জি চিত্রে ছিলেন তখনকার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'অ্যাড-

ধরকরা ছিলেন অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের জন্যে, তেমনই ছিলেন উৎসাহী তরুণেরা হাতে ক্যাটালগ নিয়ে প্রতিটি ছবির পরিচয় জানবার জন্যে।

কলকাতা বা মাদ্রাজে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালনের জন্যে কোনো-রকম আয়োজন হয়েছে বা হচ্ছে বলে শোনা যায় নি, যদিও এমন ধরনের অনুষ্ঠান যত-শীঘ্র সম্ভব হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

—নান্দীকর

চিত্র-সমালোচনা

।। নয়া মিছিল ।।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের ঘটনা ভিত্তি করে এর আগেও অনেক বাংলা ছবি নির্মিত হয়েছে কিন্তু মুনমুন ফিল্মস্ প্রযোজিত 'নয়া মিছিল' ছবির মধ্যে আপনি শুধু শ্রমিক-মালিক বিরোধই নয়—অনেক প্রমোদোপকরণ পাবেন।

ছবিটি দেখতে বসে যদি আপনি সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন তোলেন, তাহলে অবশ্য আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু একথা আমি হলফ করে বলতে পারি—এর কাহিনী যাই হোক না কেন, দীর্ঘ [illegible] আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। বহু অবাস্তব ঘটনা বা ক্রিয়া-কলাপই আপনার চোখের সামনে ঘটুক না কেন আপনি এক মুহূর্তের জন্যেও অন্য-মনস্ক হতে পারবেন না।

কাহিনীর শুরু ঃ রাঁচীর মানসিক হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে সন্দীপ ফিরে এসেছে কলকাতায়। তাকে নিয়ে যেতে এসেছেন নায়েবকাকা। এই নির্বাসিত দিনের মাঝখানে সে হারিয়েছে তার বাবাকে আর মা হয়েছেন পঙ্গু।

বাড়ী ফিরে সন্দীপ দেখতে পায় তার বাবার তৈরী কারখানা বি বি ইণ্ডাস্ট্রীজ—যেটি তার মাসতুতো ভাই বিজনের পরিচালনাধীনে ছিল, সেটি তারই চক্রান্তে লক-আউট। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার। শুধু তাই নয়, বিজনের ষড়যন্ত্রে লেবার কোয়ার্টার্স থেকে শ্রমিক-উচ্ছেদের ব্যবস্থা। [illegible] এ কারখানারই এক শ্রমিক নিতু [illegible] পাশ সত্ত্বেও সে বাঁদরখেলা দেখিয়ে সংসার চালায় তার মাথায়ও একদিন বিজনের ভাড়াটে গুণ্ডার লাঠি পড়ে। কেননা সে সম্মিলিতভাবে বাঁচতে চেয়েছিল।

বিজন ক্রমে ক্রমে সব পথের কাঁটা সরিয়ে কোম্পানীর মালিক হতে চায়। তার স্ত্রী [illegible] সন্দীপের দুধের গ্লাসে এল-এস-ডি মিশিয়ে দেয় স্বামীর পরামর্শে।

সন্দীপ আবার পাগল হয়ে যায়।

নিতুর বিধবা বোন সিতু অল্প বয়সে [illegible] মাতাল স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ভাইয়ের কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছে। [illegible] প্রয়োজনে সন্দীপের বাড়ীতে তার পরিচর্যার চাকরি নেয়। সিতু একদিন বিজনের কুটিল চক্রান্তের কথা জানতে পেরে সন্দীপকে রাতের অন্ধকারে তাদের বাড়ীতে এনে হাজির হয়। নিতু ও সিতু সন্দীপকে ভাল করে তোলার লড়াই চালায়। অবশেষে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং সেবায় কি-ভাবে সন্দীপ ভাল হয়ে বিজনের সব চক্রান্ত ভেঙ্গে দেয় এবং শ্রমিকদের কল্যাণে কারখানার দায়-দায়িত্ব ওদের হাতে তুলে দেয় তাই নিয়েই কাহিনীর যবনিকাপাত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কাহিনীর শেষ পরিণতিটুকু উদয়ের পথের শেষ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

আগেই বলেছি ছবির কাহিনী (কাহিনী-চিত্রনাট্য ঃ সুখেন দাস কৃত) যৌক্তিকতার দিক থেকে কতখানি গ্রহণ-যোগ্য তা ভাববার কথা। তথাপি ছবির শুরু থেকে শেষ অবধি এক মুহূর্তও নিশ্বাস ফেলতে দেয় না তাতেই বোধ করি চিত্রনাট্যকারের কৃতিত্ব। পরিচালক শ্রীপীযূষ গাঙ্গুলী একটি অবিশ্বাস্য কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ছোটখাটো কয়েকটি দৃশ্য-পরিকল্পনা বাদ দিলে তাঁর কাজ মোটামুটি প্রশংসনীয়। এখানে বিশেষ-ভাবে একটি দৃশ্যের কথা উল্লেখ না করে পারছি না যেমন সন্দীপকে ভালো করে তোলার প্রয়াসে নিতুর গান গেয়ে, বাঁদর খেলা দেখিয়ে রাত্রির অন্ধকারে চৌরঙ্গী অঞ্চলে এবং গড়ের মাঠের আশে পাশে অর্থোপার্জনের দৃশ্যটি নিতান্তই বাস্তব-বহির্ভূত। জনমানবশূন্য চৌরঙ্গী অঞ্চলে নিতুর মুখে 'দাও দাও সুর এনে দাও' গানটি যেন জোর করে ঢোকানো হয়েছে। বিশেষ করে নাটক যখন শেষ পরিণতিতে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে সেই সময় এই গানটি নিতান্তই ক্লান্তিকর।

ছবির প্রধান আকর্ষণ শিল্পীদের দল-গত অভিনয়। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন নবাগতা শাওলী মিত্র। সিতু চরিত্রে তাঁর সহজ-স্বাভাবিক অভিনয় সকলকে চমৎকৃত করবে। তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মানসিক রোগাক্রান্ত মুহূর্তে সুখেন দাসের অভিনয় মনে রাখবার মত। সন্দীপের চরিত্রটির যথাযথ মর্যাদা আরোপের অসামান্য কৃতিত্ব তাঁর অভিনয়ে পরিস্ফুট। নিতুর চরিত্রে অনুপকুমার এবং বিজনের চরিত্রে শ্যামল ঘোষালের অভিনয় মনে রেখাপাত করে। তাছাড়াও শমিতা বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী দেবী, বসরাজ চক্রবর্তী, পরিতোষ চৌধুরীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নবাগতা সোমা মুখার্জির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ।

ছবিতে চারখানা গানের মধ্যে 'দাও দাও সুর এনে দাও' গানটি সুরের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেও গানটি সুপ্রযুক্ত নয়। অন্যান্য গানের সুরে বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত।

ছবির টেকনিক্যাল দিকটি উন্নত মানের। তার মধ্যে ফটোগ্রাফী ও সম্পাদনার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

সবশেষে প্রমোদোপকরণের সম্ভারে এবং দলগত অভিনয়ের উৎকর্ষতায় 'নয়া মিছিল' ছবিটি জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে মনে হয়।

স্টুডিও সংবাদ

অনেকদিন পর সুচিত্রা সেনকে দেখলুম নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে। খাপ টুকটুকে বেনারসী শাড়ীতে চন্দনচর্চিত মুখে, মাথায় শোলার টোপরে তাঁকে অপরূপা দেখাচ্ছিল।

বিয়ে বাড়ীর সেট। বাড়ির আঙিনায় ছাদনাতলা করা হয়েছে। লাল-সাদা-হলুদ-নীল কাপড় দিয়ে প্যাণ্ডেল করা হয়েছে। বাড়ির বারান্দায় এবং দেওয়ালে দেওয়ালে ফুলের স্তবক ঝোলানো।

লোকজন, অতিথি-অভ্যাগতের সমারোহে বাড়িটিতে তিল ধরনের স্থান নেই। মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে রংচঙে শাড়ী পড়ে এক-একজন যেন উর্বশী সেজেছেন। এঁদের মধ্যে সবাই আমার অচেনা। ঐ ভিড়ের মাঝে একটা মুখ যেন আমার চেনা চেনা মনে হল। হ্যাঁ, চিনেছি ঠিকই—তিনি হলেন ললিতা চ্যাটার্জী। তাঁর পরনে গাঢ় বেগুনী রঙের ঢাকাই শাড়ী, খোঁপায় ফুল গুঁজে বসে আছেন নায়িকা কনেবেশী সুচিত্রার সংগে। একটু পরেই বিয়েটা শুরু হবে বোঝা গেল।

পরিচালক সলিল সেনের নির্দেশমত যে যার পজিশানে এসে দাঁড়ালেন। ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত শেষবারের মত লাইটগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলেন। কিন্তু বিয়ে আর হোল না শেষ পর্যন্ত। জানতে পারলাম—যার সঙ্গে নায়িকার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তিনি পূর্বেই বিবাহিত। তাঁর পূর্ব স্ত্রী একটা আধ ময়লা শাড়ী পড়ে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে বিয়ে বাড়িতে যথাসময়ে হাজির। গৃহকর্তা (তরুণকুমার) ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁর মতে এটা ব্ল্যাকমেইল ছাড়া কিছু নয়।

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নায়িকা সুচিত্রা রায় দিলেন—

—না, না—এ বিয়ে হতে পারে না, কিছুতেই না। বলতে বলতে ছাদনাতলা থেকে সোজা বেরিয়ে এসে ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন বারান্দা দিয়ে। তাঁর পেছনে অনুসরণ করে ছুটে গেলেন ললিতা চ্যাটার্জী।

দৃশ্যটি এই পর্যন্ত গৃহীত হল।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাশ্বেতা' অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে নতুন নামকরণেঃ 'হার মানা হার।' সবাক চিত্রশিল্প প্রাঃ লিঃ-এর পতাকাতলে এ ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ চলছে। সুচিত্রা সেনের বিপরীতে ছবির নায়ক উত্তমকুমার।

এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন—তরুণকুমার, ললিতা চ্যাটার্জী, অমরনাথ মুখার্জী, নিমু ভৌমিক, হিমানী বন্দোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায় আপাতত: 'একটি জীবন' ছবিটি করছেন না বলে জানা গেছে। এখন ঠিক হয়েছে তিনি তাঁর বহু প্রত্যাশিত বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত'-এর চিত্ররূপদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছবিটি ইস্টম্যান কলর-এ তোলা হবে। শ্রীরায় এ ছবিতে ওপার বাংলার ববিতা (সুচন্দ্রা রায়হানের বোন) এবং এখানকার সন্ধ্যা রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করেছেন। জুলাই মাস থেকে নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্টার ন্যাশনালের 'ধীরে বহে মেঘনা' ছবির কয়েকদিনের সুটিং কলকাতায় করে পরিচালক আলমগীর কবির ঢাকায় ফিরে গেছেন তার ইউনিট নিয়ে। ছবিটি ভারত ও বাংলাদেশের কয়েকজন প্রযোজকের মিলিত উদ্যোগে তোলা হচ্ছে। এজন্য উভয় সরকারের বিশেষ সম্মতি পাওয়া গেছে। ছবিতে দুই দেশের শিল্পীরাই অভিনয় করছেন। তাঁরা হলেন—হাঁসু বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিতা বিশ্বাস, রোজি, আজমল হুদা, গোলাম মোস্তাফা এবং ১৯৭১ সনের ভারত-সুন্দরী নবাগতা শর্মিতা মুখোপাধ্যায়। কলকাতা এবং ঢাকা দু জায়গাতেই ছবির সুটিং হবে।

গত ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধে স্বামী-সংসার সব ফেলে ইজ্জৎ বাঁচাতে এপার বাংলায় পালিয়ে আসে এক তরুণী। সেই বিবাহিতা তরুণীর এপার বাংলায় আসার পরবর্তী ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সাহা ফিল্মস প্রযোজিত ও পরিবেশিত 'অর্চনা।' পীযুষ গাঙ্গুলী পরিচালিত এবং অজয় দাস সুরারোপিত ছবির বিভিন্ন শিল্পী তালিকায় আছেন—মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল, তরুণকুমার, অনুভা ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, গীতা দে, শৈলেন মুখার্জী প্রভৃতি। রাধা, পূর্ণ, প্রাচীতে ছবিটির মুক্তি লগ্ন আসন্ন।

বোম্বাইয়ের অজন্তা স্টুডিওয় 'কলঙ্কিনী'র শুভ মহরতে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও পদ্মশ্রী শ্রীমতী নার্গিস।

কুশলের ঘর। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। ঘরের মধ্যে আসবাবের মধ্যে আছে দু'টো টিনের ট্রাঙ্ক একটা একজনের খাট—খাটের সামনে ছে একটা নড়বড়ে টেবিল। টেবিলকে ঘি ২।৩টা ভাঙ্গা স্টিলের চেয়ার। টেবিলে ওপর কয়েকটা দিশী মদের বোতল এ একটা হ্যারিক্যান লণ্ঠন, কুশল ঘরের দক্ষি দেওয়াল ঘেঁসে দণ্ডায়মান। হঠাৎ দক্ষি দরজা থেকে ফিস্-ফিস্ আওয়াজ ভে আসে ঃ

ঃ কুশল—

কুশল আস্তে আস্তে দরজার দিক এগিয়ে যায়। সে সময় অতর্কিতে ঘরে ঢো একজন সুন্দর-সুঠামদেহী যুবক। ম চাপ দাড়, পরনে ময়লা-জীর্ণ প্যান্ট স সার্ট। সে এসেই কুশলের কাঁধে হাত দিয় দাঁড়াতেই—কুশল বলে ওঠে

ঃ এঁকি সাহেববাবু

হঠাৎ বেরসিকের কার কণ্ঠস্ব ভেসে আসে—কাট্—ও.ডি ইজ সাউন্ড বাইরে থেকে ভেসে আসে ও—কে! সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে হাততালির শব্দ এবং প্রেস-ফটোগ্রাফারের ফ্লাশ লাইট জ্বলে ওঠে সমস্ত ফ্লোরটাকে সরগরম ক তোলে।

গত ১৫ মে সকালে অক্ষয় তৃতীয় শুভ লগ্নে এস, বি, এন্টারপ্রাইজের প্র প্রয়াস 'রৌদ্র-ছায়া' ছবিটির উপরিউক্ত দৃ গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয় ক্যালকা মুভিটোন স্টুডিওতে। বিমল কর 'পিয়ারীলাল বাজ' অবলম্বনে ছবি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পীযুষ বসু এ পরিচালনা করছেন শচীন অধিকার কুশল এবং সাহেববাবু চরিত্রে রূপদা করছেন—অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তমকুমা চিত্রজগতে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থা পর অঞ্জনা ভৌমিকের পুনরাবির্ভাব ব চিত্রজগতে নায়িকার অভাব কিছুটা ঘুচ

ছবিতে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন—তরুণকুম সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুলতা চৌধুরী, নি ঘোষ, রুদ্রনাজ চক্রবর্তী, মন্মথ মুখা

[প্র]ভৃতি। ছবির সুরারোপের দায়িত্বে আছেন [...]কুমার মিত্র।

ওই একই দিনে নিউ থিয়েটার্স এক [নম্]বর স্টুডিওতে পরিচালক অরবিন্দ [মু]খোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবি নিজস্ব [কা]হিনীর ভিত্তিতে 'ছায়ার মায়া-র' শুভ [মহ]ূর্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। [...]বক্তাত্রক প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে [নি]র্মিত ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অনেক নতুন [মু]খের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে খবরে [প্র]কাশ।

সোনালী প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে [নি]র্মিত "বসন্ত বিলাপ" ছবির চিত্রনাট্য [রচ]না করেছেন—শেখর চ্যাটার্জী এবং ছবিতে [সু]রারোপ করেছেন—সুধীন দাশগুপ্ত। [বি]ভিন্ন চরিত্রে আছেন—অপর্ণা সেন, [সৌ]মিত্র চাটার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, অনুপ[কু]মার, শিবানী বসু, কাজল গুপ্ত, চিন্ময় [রায়], রবি ঘোষ, কণিকা মজুমদার, বঙ্কিম [ঘো]ষ প্রভৃতি। পিয়ালী ফিল্মস-এর [পরি]বেশনায় ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনের [জ]টিলতা' অবলম্বনে "নির্জন সংলাপ" নামে [এ]কটি ছবি শুরু করেছেন নবাগত [প]রিচালক অর্চন চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য রচনা [ক]রেছেন—সুধীর হাজরা। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ[যো]গ্য ছবির সবটাই তোলা হবে স্টুডিওর [বা]ইরে।

শিল্পীদের মধ্যে যাদের নাম এপর্যন্ত [পা]ওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে আছেন—বিবেক [চট্]টোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায়, ঊর্মিলা দে, শ্যামল [ঘো]ষাল, গীতা দে প্রভৃতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনের [জ]টিলতা' উপন্যাসটি বর্তমান সমস্যা ও [য]ন্ত্রণার প্রতীক। তাঁর সৃষ্ট নায়কের পলায়নী [মনোবৃ]ত্তি নেই—সে সমস্যার মধ্যে, যন্ত্রণার [ম]ধ্যেই বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকতে হলে [সংগ্রা]ম করে বাঁচতে হবে। জীবনের সমস্যা[গুলো]কে যন্ত্রণা থেকে এইভাবে পালিয়ে যাওয়া [মা]নেই তো জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া।...

আশাকরি পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী [ক]থকের বক্তব্য সুন্দর এবং বাস্তবসম্মতভাবে [তাঁ]র "নির্জন সংলাপে" ফুটিয়ে তুলবেন।

নতুন দিনের আলো : বাদল পিক[চা]র্সের ৮ম নিবেদন অজিত গাঙ্গুলী [রচি]ত ও পরিচালিত সম্পূর্ণ নতুন ধরনের [সা]মাজিক ছবি 'নতুন দিনের আলো' [ভি] [...]র পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তির দিন [গু]নছে। শ্রীগাঙ্গুলী ছবির চিত্রনাট্যও রচনা [ক]রেছেন। গীত রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন [ম]জুমদার ও গানে সুর দিয়েছেন নচিকেতা [ঘো]ষ। প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন : [সৌ]মিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, [সন্]ধ্যারাণী, বিকাশ রায় (অতিথি), তরুণ [কুমা]র, প্রমোদ গাঙ্গুলী, বিদ্যা রাও, হাসু [ব্যা]নার্জি, দীপান্বিতা রায়, দেবরাজ, শমিতা [বি]শ্বাস বিনতা রায়, চিন্ময় রায়, অমরনাথ, [প]দ্মা দেবী, কল্যাণ রায়, নির্মল ঘোষ, শম্ভু [ভ]ট্টাচার্য, বঙ্কিম চৌধুরী ও অনুপকুমার [প্র]ভৃতি। **চিত্রগ্রহণে : অনিল গুপ্ত।**

'কলঙ্কিনী'র শুভ মহরৎ

খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের প্রধান আতিথ্যে 'রুপ-লাক'-এর প্রথম ছবি 'কলঙ্কিনী'র মহরৎ সম্পন্ন করলেন পদ্মশ্রী শ্রীমতী নার্গিস সম্প্রতি বোম্বাইয়ের অজন্তা স্টুডিওতে। মহরৎ দৃশ্যের শিল্পী ছিলেন ছবির নবাগতা, নায়িকা মালিকা সারাভাই।

'কলঙ্কিনী' ছবির উপজীব্য হলো অবাধ মেলামেশা এবং তার থেকে উদ্ভূত সমস্যা। কাহিনী প্রভাত মুখার্জি। ছবিটি পরিচালনাও করছেন শ্রীমুখার্জি স্বয়ং।

শ্রীমতী নার্গিস তাঁর ভাষণে 'কলঙ্কিনী'র মত একটি সদর্থক ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য নতুন কালের শিল্পীদের (অনেক নতুন মুখ দেখা যাবে এ-ছবির বিভিন্ন ভূমিকায়) উদ্দেশ্যে সাধুবাদ উচ্চারণ করেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের তিনি একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁরা যেন অধিক সংখ্যক ছবিতে অভিনয়ের চাইতে অভিনয়ের গুণগত উৎকর্ষতার উপর বেশী নজর দেন।

নায়িকা মালিকা সারাভাইসহ এক দল নতুন শিল্পী যথা—পংকজ, অম্বিকা জোহর, মৃণাল মুখার্জি, প্রভৃতি অংশ নেবেন ছবির বিভিন্ন চরিত্রে, এবং সেই সঙ্গে জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন হেলেন, বেলা বোস, সুলোচনা, রজনী গুপ্তা, জাগিরদার, ইফতিকার মদনপুরী প্রমুখ আরও অনেকে। রঙীন চিত্র 'কলঙ্কিনী'র সুর-রচনায় আছেন মান্না দে এবং চিত্র গ্রহণে অজয় মিত্র।

বোম্বাইয়ে নির্মীয়মান ছবি

প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা মনোজকুমার জয়া ভাদুড়ীকে নায়িকা করে 'শোর' নামে যে রঙ্গীন ছবিটি করছেন, ২০ মে তারিখে তার শ্যুটিং শেষ হয়ে গেল। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল দ্বারা সুর সংযোজিত এই ছবিটিকে খুব শিগগিরই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুক্তি দেবার আয়োজন চলছে পুরোদমে।

এ প্রযোজক ও পি রালহান এবার 'বন্ধে হাত' নামে যে ছবিটি শুরু করেছেন, তার নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন অমিতাভ বচ্চন ও মমতাজ। ছবিটির পরিচালনা, সংগীত-পরিচালনা ও গীত রচনা করছেন ও পি গোয়েল, রাহুল দেববর্মণ ও মজরু সুলতানপুরী।

ভি পিকচার্স-এর 'গরীবী হঠাও' নামে ছবির মহরতে পৌরোহিত্য করলেন বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্তা রজনী প্যাটেল। ছবিটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন আর কে মিধ। এর নায়ক-নায়িকা রূপে অবতীর্ণ হচ্ছেন রাজবংশ ও রচা। ছবিটিতে সুরযোজনা করছেন সারদা।

এ জি ফিল্ম নিবেদিত ও মনোমোহন দেশাই পরিচালিত 'রামপুরকা লক্ষ্মণ' ছবির শ্যুটিং পর্ব সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবির নায়ক-নায়িকা রণধীর কাপুর ও রেখার সঙ্গে আছেন শত্রুঘ্ন সিংহ ও রূপেশকুমার। এ ছবিতেও মজরু সুলতানপুরী রচিত গান-গুলিতে সুরযোজনা করেছেন রাহুল দেববর্মণ। চিত্রগ্রহণে আছেন সুধীন মজুমদার।

এম আর প্রোডাকসন্সের নিবেদন 'বৈরাগ' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে পরিচালক অসিত সেন ছবির নায়ক-নায়িকা দিলীপ-কুমার ও সায়রা বানু সহ শিল্পীগোষ্ঠী ও কলাকুশলীদের নিয়ে মানালিতে গেছেন মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এই ছবির চিত্র গ্রহণ করছেন কমল বসু। মুশীর ও রিয়াজ হচ্ছেন ছবিটির প্রযোজক।

'মর্যাদা'-খ্যাত অরবিন্দ সেন তাঁর নতুন ছবির শ্যুটিং আরম্ভ করেছেন গেল ১৫ মে থেকে। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন অমিতাভ বচ্চন ও হেমা মালিনী।

মঞ্চাভিনয়

বিদ্রোহী নজরুল : নাটকের নামেই যেন প্রচণ্ড চমক, যে মানুষটি একদিন তাঁর জ্বালাময়ী কবিতা ও গানে, নির্ভীক সাংবাদিকতায় বাংলাদেশে আনেন আলোড়ন নতুন প্রাণের স্পন্দন যে উজ্জ্বল-মুখর কবি আজ নীরব—সেই বিদ্রোহী নজরুলের জীবন নিয়ে নাটক। খবরটায় শঙ্কা ছিল—ছিল আনন্দ। নাটকীয়তায় ভরা নজরুলের জীবন নিয়ে রয়েছে যে বিতর্ক তার ছায়া যদি নাটকেও পড়ে! আর আনন্দ সেই মহৎপ্রাণ মানুষটির শ্রদ্ধা জানাবার এই বিরল প্রচেষ্টায়। একই কারণে এ নাটক মঞ্চায়নের দুঃসাহসের জন্য চারণ দলের প্রাপ্য অফুরন্ত অভিনন্দন।

নাটকারের কৃতিত্ব কোনরকম বিতর্কের (স্থান বা কালের কথা বাদে) মধ্যে না গিয়ে তিনি সুন্দরভাবে নজরুল জীবনের

ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটারের শেকসপীয়র নাটকে অপর্ণা সেন এবং অসিত বসু। —ফটো : অমৃত

ঘটনা পঞ্জীকে নিয়ে প্রসার হয়েছেন। বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগ্রামী জীবনের অনেক কিছুই এ নাটকে স্থান পায়নি পাওয়া সম্ভবও নয়। চারণদল তাঁদের বক্তব্যে বলেছেন, নজরুলকে তাঁরা ব্যক্তি হিসেবে নয়—বিপ্লবী যুগসত্তা হিসেবে দেখেছেন এবং সেইভাবেই এগিয়ে গেছেন। তবু কয়েকটি মানবিক ঘটনার উপস্থাপনা নাটকটিকে রসসমৃদ্ধই করত। প্রথমতঃ শিয়ারশোলে নিহত ফকিরকে কেন্দ্র করে নজরুলের রচনা ও দ্বিতীয়তঃ তাঁর অপত্য স্নেহ তথা বুলবুল কাহিনী অংশ। আর প্রয়োগের স্বার্থেই এতে আবৃত্তির অংশ বাড়ানোর অবকাশ ছিল যথেষ্ট। এগুলি বাদ দিলে ঘটনা বিন্যাস, সংলাপ নির্বাচন, চরিত্র গঠন ও নাটকীয়তা সৃষ্টিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তবে নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে খাপার ক্ষেত্রী অংশ নিষ্প্রাণ সংলাপে ভরা ও গতিহীন। পরবর্তীকালে গান শোনার জন্য আগত সৈনিকদের দৃশ্যটিও যেন বড়ো সাজান। এ দৃশ্যের মঞ্চ পরিকল্পনা কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব ঘেঁষা ও প্রায় নিখুঁত।

অভিনয়ে চারণ দলের শিল্পীরা বেশ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে নজরুলের ভূমিকার দুই শিল্পীর নাম উল্লেখ করতে হয়। কিশোর নজরুলরূপে রঞ্জন মুখার্জি গান ও অভিনয়ের দীপ্তিতে দর্শকদের মন ভরিয়েছেন—দাগ কেটেছেন—আর যুবক নজরুলের ভূমিকায় সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় গানে সুবিধা না করতে পারলেও আবৃত্তি বা নজরুল চরিত্রের উচ্ছ্বাস ও বলিষ্ঠতা প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। শৈলজানন্দের কিশোররূপে বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরীর অভিনয়ে যত উজ্জ্বল, হিমাংশু দাসের অভিনয়ে যুবারূপে তত নয়। খোকন ব্যানার্জি ছিনু মিঞা চরিত্রে ও প্রশান্ত রায় দুর্গা চরিত্রে অভিনয়ের সবটুকু সুযোগ গ্রহণ করে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। স্বপ্না মিত্র'র গিরিবালা দেবী আশ্চর্য সংযত ও সুন্দর, সংযত সুচেতা রায়ের প্রমীলা ইসলামও। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে নাটকের চাহিদা মিটিয়েছেন মিহির দাসগুপ্ত (মুজাফফর আমেদ), প্রমোদ দে (ফজলুল হক) সচ্চিদানন্দ মুখার্জি (শেকার), শক্তি সেনগুপ্ত (পবিত্র গাঙ্গুলী) প্রভৃতি। মোহিত লালের চরিত্রটিতে সুনীল চট্টোপাধ্যায় যে অভিনয়ের ধারা অনুসরণ করেছেন তাতে চরিত্রের প্রতি খুব বেশী সুবিচার করা হয়েছে বলে মনে হলো না।

তবে নাট্যকারের দৃশ্য নির্দেশনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সুব্রত কর। তাপস সেনের আলো বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

সবশেষে বলতে হয় নাট্যকার নির্দেশক ইন্দ্রজিত সেন নাট্য পরিকল্পনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিনবত্বের অনুসরণে সার্থক হয়েছেন।

শেকসপীয়র : নাট্যজগতে ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটার একটি নতুন সংযোজন। চেকভের একটি নাটকের অনুবাদ (আকাশ বিহঙ্গী) নিয়ে এ'রা পথ পরিক্রমায় নেমেছিলেন। সেই পথ পরিক্রমায় তাঁদের দ্বিতীয় সাফল্য এবারকার প্রযোজনা শেকসপীয়র। ইংরাজী সাহিত্যে এই সর্বাধিক আদৃত নাট্যকার ও কবিকে ঘিরে রয়েছে রহস্যঘন কুয়াশা জাল। ক্লেমেন্স ডেন সেই রহস্য ভেদ করে তাঁর ব্যক্তি জীবন এবং রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের এক কাহিনী পরিবেশন করেছেন শেকসপীয়ার নাটকে। ঐ নাটকেরই অনুবাদ (মোহিত চট্টোপাধ্যায় কৃত) নিয়ে সেদিন ও'রা দর্শকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন আকাদামি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে।

ব্যক্তিগত জীবন একদিকে মেরি ফিটনের প্রেম আর অন্যদিকে রাণীর চক্রান্ত কিভাবে শেকসপীয়রের বিকাশ উন্মুখ প্রতিভাকে প্রকাশ করেছিল তাই তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। নাটকীয় সূক্ষ্মতায় এই দ্বৈত ঘটনাকে ব্যঞ্জনাময় করাই ছিল এই নাটকের উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই অনুভূতি দর্শকচিত্তে অনুরণিত করাতে গিয়ে নাট্য পরিচালক এবং মূল চরিত্রাভিনেতা অসিত বসু তেমন সফল হতে পারেন নি। অথচ মূল নাটক রূপায়ণে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। সে প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি সংঘাতময় মুহূর্তে, আলোর সম্পাতে এবং আবহসঙ্গীতে।

নাটকের অন্যান্য চরিত্রচিত্রন এবং দলগত সংহতি প্রশংসার দাবি রাখে। রূপালী পর্দার একঘেয়েমি মুক্ত অপর্ণা সেনের মেরি ফিটনের চরিত্রে দর্শকদের নতুন আবিষ্কার বলে মনে হবে। সিনেমার তুলনায় মঞ্চে তাঁকে অনেক বেশী সাবলীল এবং সতেজ লাগল। আন হাথাওয়ে এবং রাণী এই দুই চরিত্রে রূপদান করেছেন সোমা সেন। তবে প্রথম চরিত্রটিতে তাঁর অভিনয়ের আরও সুযোগ ছিল। সে তুলনায় দ্বিতীয় চরিত্রটি সুঅভিনীত। মাকে ভূমিকায় জগন্নাথ গুহর অভিনয় ভালো লাগে। সরাইখানার মালিকের চরিত্রে রূপদান করেছেন অনাদি দাস। হাস্য কৌতুকময় এই ব্যঙ্গ চরিত্রটি দর্শকদের ভালো লাগবে। তবে বেমানান লেগেছে হেন্সলো চরিত্রে ইন্দ্র মুখার্জিকে। নাটকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এই চরিত্রটি আরো গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিত

[illegible] চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার

বিবিধ সংবাদ

আকাশবাণী কলকাতার স্টাফ আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রবীন্দ্র জয়ন্তী: বিগত ২২ মে কলকাতার 'রঙ্গনা' মঞ্চে আকাশবাণী কলকাতার স্টাফ আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন একটি মহার্ঘ্য সন্ধ্যা উপহার দিলেন কলকাতার দর্শকদের। অনুষ্ঠানটি ছিল দুই অংশে বিভক্ত। রবীন্দ্রসংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান। রবীন্দ্রসংগীতে অংশ নেন কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র এবং সুশীল মল্লিক। অসাধারণ এই অনুষ্ঠান। শিল্পীরা তাঁদের কণ্ঠমাধুর্যে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন।

তারপর নাট্যানুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'। নাট্যরূপ দেন অজিত বসু। তার কাজ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। রঙ্গমঞ্চে এ নাটক দেখা একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের এই গল্পের নাট্যরূপ এই প্রথম উপস্থাপিত। সামগ্রিকভাবে অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রযোজনা সার্থক। যেমন একক অভিনয় তেমনি দলগত। শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়ের বিন্দু, হিমানী গংগোপাধ্যায়ের মৃণাল, শেফালী বন্দোপাধ্যায়ের বড়জা অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি। মেনকা দেবীর শাশুড়ী মনে রাখার মতো। একটি ছোট্ট চরিত্রে রূপদান করেন নন্দা গংগোপাধ্যায়। পুরুষ চরিত্রের অভিনেতাদের সেই তুলনায় কিছুটা ম্লান মনে হয়েছে। তার মধ্যে ভাল অভিনয় করেছেন তরুণ চক্রবর্তী, দিলীপ ঘোষ ও ক্ষৌনিশ বাগচী। এ নাটকের একটি বিশেষ সম্পদ আবহসংগীত। কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ অসাধ্যসাধন করেছেন। আর ভাল কাজ করেছেন অশোক রায়। তাঁর আলোর কাজ নাটকের মেজাজকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে। অ্যাসোসিয়েশন কলকাতার দর্শকদের আবার এ নাটক দেখার সুযোগ দেবেন—এটাই প্রত্যাশা করবো। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অভ্যাগতদের স্বাগত জানান সংস্থার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীসত্যেন মিত্র।

গিরিশ স্মারক আলোচনা সভা: কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদের ব্যবস্থাপনায় গত ২১ মে শ্যামবাজার স্ট্রীটস্থ ভবনে গিরিশ স্মারক আলোচনার দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল—শতবর্ষে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। আলোচনার উদ্বোধন করেন ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত। প্রথমে সংসদ সচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করে শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংসদ যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তা সকলকে জানান। ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত বলেন যে, বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ১৮৭২ সালে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই ন্যাশানাল থিয়েটারকে কেন্দ্র করে সেদিন যে শিল্পীগোষ্ঠী নতুন সুর ও ভাবে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা সকলেই স্মরণে রাখবেন। ১৮৭২-এর আগে যে সব নাটক রচিত হয় তাদের মধ্যে অনেকগুলিই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি, কিন্তু পরোক্ষে এই নাটকগুলি পড়েই অনেক নাট্যকারই নাটক লিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন। কেমন করে বাংলার নাট্যকাররা নাটক লিখতে প্রেরণালাভ করেছিলেন তা আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ১৮৭২-এর আগে যাঁরা নাটক অভিনয়ের আয়োজন করতেন তাঁরা মুষ্টিমেয়জনের জন্যই করতেন বহুজনের দেখার জন্য নয়। এর ফলে সাধারণ লোক নাটক অভিনয় দেখা থেকে বঞ্চিত হতেন। এই অভাব দূর হয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। তারপর এই একশো বছরে অনেক কিছু ঘটে গেছে, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই সব পরিবর্তনের জন্যও নাট্য চিন্তায় স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য আনার জন্য অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীদের অবদান অনেক। আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলার নাট্যশালা মানুষের অনেক অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ডাঃ কবিতা রায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরে আশ্রমাচার্য নীরদবরণের পরিচালনায় করুণাময়ী আশ্রমের ভক্তগণ নামকীর্তন করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং ক্লাবের 'অশ্রু দিয়ে লেখা' নাট্যাভিনয়: গত ২৩ মে রামলীলাবাগান রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং ক্লাব কর্তৃক ভৈরব গাংগুলীর 'অশ্রু দিয়ে লেখা' নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন যথাক্রমে দিলীপ ঘোষ (গোরাচাঁদ), অনিল মণ্ডল (গফুরজান), নন্দ মল্লিক (তুলসীদাস), ধীরেন সামন্ত (মামুদ শা), কৃপা মান্না (দেবু) ও কুমার কালীকিঙ্কর (হোসেন শা)। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে মীরা রায় (নাদিরা বেগম), শংকর ঘোষ (শাশ্বতী), গৌর মল্লিক (মজাফর শা), বিশ্বনাথ দাস (চন্দ্রকান্ত), ক্ষুদিরাম মণ্ডল (সূর্যকান্ত), বাঁশরী জানা (মিরজাফজল) ও শংকর শর্মা (রক্ষী)। সুনীল দাস ও সমীর চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায় নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আবহসংগীত ও নির্দেশনায় ছিলেন যথাক্রমে রবি চ্যাটার্জি ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র জয়ন্তী: গত ২১ মে সন্ধ্যায় রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির সাংস্কৃতিক শাখার শিশু সভ্যারা এক সুচিশুভ্র পরিবেশে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। সুনীতি দাসের উদ্বোধন সংগীতের পর সংগঠন সম্পাদক শিবনাথ ভট্টাচার্য স্বাগত জানান কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভানেত্রী সরযূ দেবী রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্যের ওপর এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। এরপরে বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে—ঝুমা ঘোষাল (নৃত্য), টিংকু মিত্র (সংগীত), মেঘলাল ঘোষ (আবৃত্তি), দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায় (নৃত্য), রিংকু মিত্র (আবৃত্তি), সোনালী দাস (সংগীত) ও মৌসুমী ঘোষ (আবৃত্তি)। বিচিত্রানুষ্ঠানান্তে সমিতির শিশু সভ্যারা অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সুনীতি দাস, ঝুমা ঘোষাল, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, কৃষ্ণা দাস আলপনা ঘোষ, দিপালী দাস, জয় ঘোষ, ছায়া দাস, রিণা ঘোষ, মন্দিরা দাস, রুবী ঘোষ, বকুল ভট্টাচার্য।

নাটকটি প্রশান্ত রায়চৌধুরীর নির্দেশনায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তরুণ সেন, কার্তিক ঘোষ, ভূপেন ব্যানার্জী, আশীষ ভট্টাচার্য, বেলা চ্যাটার্জীর অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

রে ইলিংওয়ার্থ, অধিনায়ক : ইংল্যান্ড

আয়ান চ্যাপেল, অধিনায়ক : অস্ট্রেলিয়া

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭২ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ১ম টেস্ট খেলা আরম্ভের তারিখ ৮ই জুন। খেলার আসর ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠ। এই খেলাটি ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ২০৪তম টেস্ট খেলা, অপর দিকে ইংল্যান্ডের মাটিতে এই দুই দেশের ৯৭তম টেস্ট খেলা।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড ক্রিকেট মাঠের আন্তর্জাতিক নামডাক খুবই। ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার আসর এখানে বসে ১৮৮৪ সালের ১০ই জুলাই। ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর বসেছিল ওভাল মাঠে, ১৮৮০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। ওভালের পরই ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ২০টি টেস্ট খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল: ইংল্যান্ড-এর জয় ৪, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং খেলা ড্র ১২।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার বিবিধ রেকর্ড:

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান (দলগত)

ইংল্যান্ড : ৬২৭ (৯ উই: ডিক্লে:) ১৯৩৪
অস্ট্রেলিয়া : ৬৫৬ (৮ উই: ডিক্লে:), ১৯৬৪

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান
(ব্যক্তিগত)

ইংল্যান্ড : ২৫৬—কেন ব্যারিংটন, ১৯৬৪
অস্ট্রেলিয়া : ৩১১—আর বি সিম্পসন, ১৯৬৪

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

১০টি (৫৩ রানে) : জে সি লেকার (ইংল্যান্ড), ১৯৫৬। (বিশ্বরেকর্ড)

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

১৯টি (৯০ রানে) : জে সি লেকার, ১৯৫৬ (বিশ্বরেকর্ড)।

নক-আউট ক্রিকেট

স্পোর্টিং ইউনিয়ন সি এ বি পরিচালিত ১৯৭১-৭২ সালের নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টার্ন রেল দলকে হারিয়ে 'ডাবল খেতাব' লাভ করেছে। (একই বছরে লীগ এবং নক-আউট ট্রফি জয়)। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের পক্ষে সি এ বি-র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় 'ডাবল খেতাব' জয় এই প্রথম। এখানে উল্লেখ্য, সি এ বি-র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এই 'ডাবল' খেতাব ইতিপূর্বে জয়ী হয়েছে একমাত্র মোহনবাগান—মোট পাঁচবার (১৯৫৩-৫৪, ১৯৬০-৬১, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে)। স্পোর্টিং ইউনিয়ন এই নিয়ে মোট ৬-বার সি এ বি-র নক-আউট ট্রফি জয়ী হল। তারা ইতিপূর্বে এই ট্রফি পেয়েছে ১৯৫৫-৫৬ (মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী), ১৯৫৬-৫৭, ১৯৬১-৬২, ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে।

ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ১ম ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে ২৩২ রান সংগ্রহ করেছিল। কাঠ-ফাটা রোদে দুর্গাশংকর মুখার্জি ২৫ ওভার বল দিয়ে ৪৫ রানের বিনিময়ে ৫টা উইকেট পান। স্পোর্টিং ইউনিয়নের ৬ষ্ঠ উইকেট ১২৮ রানের মাথায় পড়ে যায়। এই সংকটকালে তপন সেনগুপ্ত (৩৬ রান) এবং রুসী জিজিবয় (৪২ নট-আউট) ৭ম উইকেটের জুটিতে দলের মূল্যবান ৫৩ রান তুলে দেন।

দ্বিতীয় দিনে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ১ম ইনিংস ২৩৮ রানের মাথায় শেষ হয়। বাকি সময়ে ইস্টার্ন রেল দল ১ম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ১৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষের মাত্র কয়েক মিনিট আগে রেল দলের অধিনায়ক অনন্তভূষণ রায় ৮৩ রান করে আউট হন। তাঁর এই ৮৩ রানই উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান।

খেলার শেষ তৃতীয় দিনে মাত্র ৭ রান যোগ হলে ইস্টার্ন রেল দলের ১ম ইনিংস ১৭০ রানের মাথায় শেষ হয়। স্পোর্টিং ইউনিয়নের ২৩৮ রানের থেকে রেলদল ৬৮ রানের পিছনে থাকায় তারা হার মেনে নেয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ২৩৮ রান (জিজিবয় নট-আউট ৪৮ এবং তপন সেনগুপ্ত ৩৬ রান। ডি এস মুখার্জি ৪৮ রানে ৫ এবং এস চক্রবর্তী ৯৩ রানে ৩ উইকেট)

ইস্টার্ন রেলওয়ে : ১৭০ রান (অনন্তভূষণ রায় ৮৩ রান। অম্বর রায় ৫৩ রানে ৫ উইকেট)

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (মে ২৯—জুন ৩) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যে ১৮টা খেলা হয়েছে তার ফলাফল: জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১৫, ড্র ২ খেলা বাতিল ১।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ৩—০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ৩—০ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে পরাজিত করে। বর্তমানে তারা চারটে খেলায় আট পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। মোহনবাগান ৪—০ গোলে বি এন আর দলকে হারিয়েছে। হাওড়া ইউনিয়ন গরহাজির হওয়াতে মোহনবাগান-হাওড়া ইউনিয়নের খেলা হয়নি। বর্তমানে মোহনবাগানের পাঁচটা খেলায় দশ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে। গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং দলও পাঁচটা খেলে দশ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

বর্তমানে লীগের খেলায় অপরাজিত আছে এই পাঁচটি দল—মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স এবং হাওড়া ইউনিয়ন।

ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭২ সালের ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে-

মার্চেন্টস কাপ সাইকেল পোলো ফাইনাল খেলা : ব্র্যাকাস দল ৮—১ গোলে ক্যারিট মোরান দলকে পরাজিত করে।
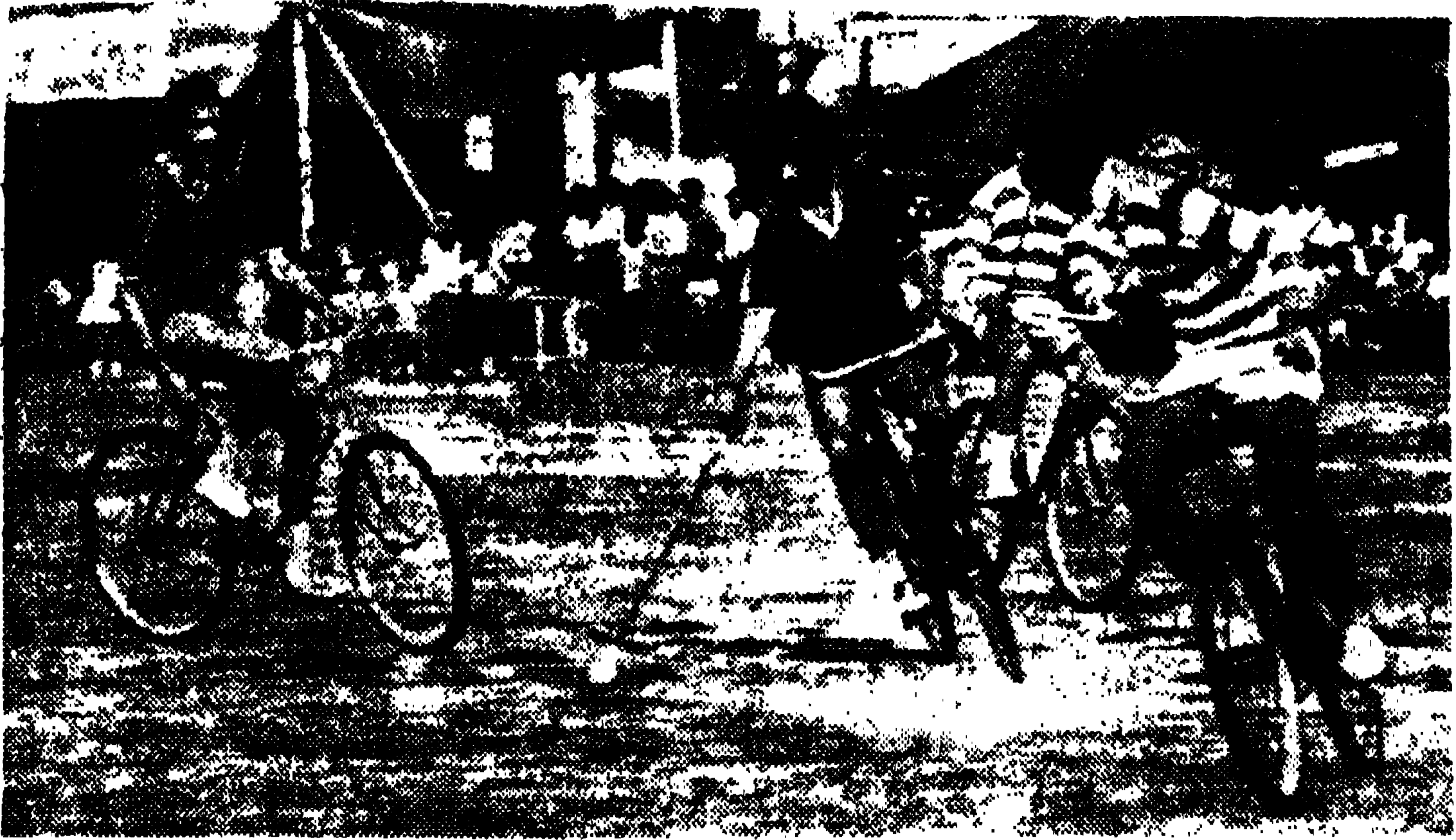
ছেন। ইতিপূর্বে শ্রীমতী কিং আটটি দেশের জাতীয় টেনিস খেলায় সিঙ্গলস খেতাব পেলেও ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁর এই প্রথম সিঙ্গলস খেতাব জয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি ১৫ বার ফাইনালে খেলে উপর্যুপরি ৩ বার সিঙ্গলস খেতাব পান। এ বছরের ফরাসী টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় তিনি ২য় স্থান পেয়ে ১নং বাছাই এবং গত বছরের ফ্রেঞ্চ এবং উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী কুমারী ইভন গুলাগংকে ফাইনাল খেলায় পরাজিত করেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে বাছাই তালিকার প্রথম পাঁচজনের কেউ ওঠেন নি। ফাইনালে ৬নং বাছাই স্পেনের আন্দ্রেস জিমেনো ১২নং বাছাই ফ্রান্সের প্যাট্রিক প্রোসিকে পরাজিত করেন। এখানে উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৮ বছর পর ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে একজন ফরাসী খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা গেল। প্যাট্রিক প্রোসি বাছাই তালিকায় ১২নং স্থান পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ১নং বাছাই কোডেসকে এবং সেমিফাইনালে ৪নং বাছাই ওরান্টেসকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন।

শ্রীমতী বিলি—জিন কিং

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৬নং বাছাই আন্দ্রেস জিমেনো (স্পেন) ৪-৬, ৬-৩, ৬-১ ও ৬-১ গেমে ১২নং বাছাই প্যাট্রিস প্রোসিকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ২নং বাছাই শ্রীমতী বিলি-জিন কিং (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে ১নং বাছাই ইভন গুলাগংকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

বছরের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়

ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাব আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগোষ্ঠ পাল এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিম বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ। এই অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের জন্য মনোনীত দুই ফুটবল খেলোয়াড়কে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। বছরের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে ট্রফি পান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মহম্মদ হাবিব। অপর দিকে হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তনের ছাত্র অজয় ব্যানার্জি পান সেরা স্কুল ফুটবল খেলোয়াড় পর্যায়ে।

সটপুটে বিশ্ব রেকর্ড

সম্প্রতি রাশিয়ার মহিলা অ্যাথলীট নাদেজদা চিজোভা সটপুটে ২০-৬৩ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন।

চিঠিপত্র

বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসি

২২শে বৈশাখের অমৃত পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীবারিদবরণ ঘোষ-এর চিঠিটি পড়লাম। চিঠির লেখক পূর্ব-প্রকাশিত একটি চিঠির ভিত্তিতে শ্রীসন্তোষ-কুমার অধিকারী লিখিত প্রবন্ধ 'বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসিতে উল্লিখিত গান্ধীজির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু। কারণ তিনি গান্ধীজীর ভূমিকাকে সমর্থন করে একটি প্রশস্তি রচনা করেছেন। গান্ধী প্রশস্তিতে আমরাও খুশি। তবে সেই সঙ্গে সামান্য কিছু বলার আছে বলে মনে করছি। কারণ মনে হলো, তিনি সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু বাদ দিয়েছেন; এবং সন্তোষবাবুর প্রবন্ধে ফোটোস্টাট কপিতে দেওয়া গান্ধীজীর চিঠিটির কথাও চেপে গিয়েছেন।

প্রথমত সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—

> "This resolution was on the same l nes as the 'Gopina h Saha resolution' adopted by the Bengal Provinc al Conference in 1924, of which the Mahatma had strongly disapproved.

অর্থাৎ আর একজন যুবক গোপীনাথ সাহার ফাঁসির পর যখন তাঁর নির্ভীকতার প্রশংসা করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তখন গান্ধী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এবং তাঁর জেদে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাবটি পাশ করানো যায়নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তারপরেই লিখছেন—

> "The circumstances at Karachi were such that th s resolution had to be swallowed by people who, under ordinary circumstances, would not have come Mahatma was concerned, he had within miles of it So far not to make h conscience somewhat elastic".

অর্থাৎ করাচীর অবস্থা এমনই প্রতিকূল হলো, যে, যেসব ব্যক্তিরা এমন একটি প্রস্তাব রচনার কথা ভাবতেই পারতেন না, তাঁদেরকে প্রস্তাবটি গিলতে হল। আর মহাত্মার কথায় বলা যায়, তাঁকে তাঁর বিবেককে কিছুটা নমনীয় করে নিতে হল।

অর্থাৎ আদর্শকে খর্ব করে গান্ধীজি জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়েই প্রস্তাবটি গিলতে বাধ্য হলেন।

তবু সুভাষচন্দ্রও জানতেন না একটি ঘটনা। জানতেন না যে ইতিপূর্বেই স্বরাষ্ট্রসচিব ইমার্সনের সঙ্গে গান্ধীজীর সব কিছু আলোচনা হয়েছে এবং গান্ধীজীকে জানানো হয়েছে যে ২৩শে রাত্রেই ভগৎ সিং শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। সন্তোষবাবু তাঁর প্রবন্ধে গান্ধী ও ইমার্সনের দুটি চিঠি উদ্ধৃত করে এ ব্যাপারে আমাদের নিঃসন্দেহ করেছেন। তাহলে গান্ধীজী ব্যাপারটি বেমালুম চেপে গিয়েই করাচী রওনা হওয়ার মুহূর্তে (২৩শে অপরাহ্নে) আশা প্রকাশ করলেন যে ভগৎ সিংদের মুক্তি দেওয়া হবে!

অর্থাৎ জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে গোপন আলোচনা ও অসত্য ভাষণেও গান্ধীজী দ্বিধা করেননি। তাই নয় কি?

—তপতী অধিকারী
কলকাতা—২৯।

(২)

অমৃতে ২৪শে চৈত্র প্রকাশিত আমার একটি চিঠির উপর বারিদবরণ ঘোষ গত ২২শে বৈশাখ চিঠিপত্র বিভাগে কিছু আলোকপাত করেছেন, সেই সম্পর্কে। আরও কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। আমার লেখাটির মূল বক্তব্য ছিল : জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের নির্মোহ আলোচনা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবীদের প্রতি মহাত্মাজীর অনীহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষের মৌল অধিকার বঞ্চিত হলে, মানবাত্মা অত্যাচারিত হলে তার হিংস্র আত্মা সোচ্চার হয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই, আর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হয় জীবনমরণ পণ। আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আমাদের এই কথা আরও বেশী করে মনে পড়ে। বারিদ-বরণ ঘোষ বলেছেন : গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে ভগৎ সিং প্রভৃতি জড়িত ছিলেন না। একথা ঠিক, কিন্তু এই জন্যই গান্ধীজী লাটসাহেবের সঙ্গে কথাবার্তায় ভগৎ সিংহের ফাঁসি রদ করার জন্য কোন আন্তরিকতা দেখাননি, পাছে আলোচনা ভেঙে যায়? সুভাষচন্দ্র বসু প্রস্তাব দিয়ে-ছিলেন : এই প্রশ্নটিতে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে যাওয়া উচিত কারণ এটা দিল্লী চুক্তির উদ্দেশ্যবিরোধী। ১৯৩১ সালে ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। গান্ধীজীর শর্ত অনুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত সমস্ত কংগ্রেসকর্মী মুক্তি পেল। হিংসাত্মক কার্যে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির দাবীতে গান্ধীজী আরউইনকে কোন অনুরোধ করেননি। এমন কি দেশবাসীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও ভগৎ সিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ড রোধের জন্য কোন দাবীও বড়লাটের কাছে পেশ করেননি। ১৯৩১ সালে ২৩শে মার্চ তাদের ফাঁসি হয়ে গেল। বৃটিশের বিভেদ নীতির জয় হল।' অগ্নিযুগের অধ্যায় : সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬৮)। তাই প্রশ্ন ছিল : তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের প্রতি গান্ধীজীর এই মনোভাব যুক্তিযুক্ত ছিল কিনা। আমরা জানি গান্ধীজী অসাধারণ পুরুষ, বিশেষ করে জাতির গণচেতনার মূলে তাঁর অবদান সব কিছু সমালোচনার ঊর্ধ্বে। 'চুক্তি সই করে গান্ধীজী সিমলা ছাড়ার আগে বিবৃতি দিয়ে যান যে, ঐ চুক্তি যদি দেশে সর্ববাদি-সম্মতভাবে গৃহীত হয় তাহলে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এমনকি সহিংস কাজের জন্য যাদের ফাঁসির হুকুম হয়েছে, তারাও মুক্তি পাবেন। বিবৃতি দিয়ে তিনি করাচী পৌঁছবার আগেই ভগৎ সিংহের ফাঁসি হয়ে যায়। (ইতিহাসের উপাদান : সাপ্তাহিক বসুমতী : ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।) আরউইন গান্ধীজীর চুক্তির ফলে কি ভারতবাসীর যৌবন শক্তিকে কি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়নি? বিপ্লবীদের সঙ্গে মহাত্মাজীর মত ও পথ হয়ত ভিন্ন ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য এক। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের অবদান কি তুচ্ছ করবার? একমাত্র গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আসেনি তার সাক্ষ্য দেবে ইতিহাস। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া'তে বলেছেন : ১৯[illegible] সাল থেকে কংগ্রেস বলতে কোন এক রাজনৈতিক দল বোঝাত না, বিপ্লবী [illegible] ও কর্মের পরিবেশ একে ঘিরে থাকত, যার ফলে একে অনেক সময় আইনের সীমার বাইরে গিয়ে পড়তে হয়েছে। (ভারত সন্ধানে : পৃঃ ৫৫২)। তাহলে দেখা যায় তৎকালীন কংগ্রেস এমন এক ভাবধারায় পুষ্ট যার ফলে বিপ্লবীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সহিংস বিপ্লবের ফলে কি বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয় নি? ইতিহাস কি বলে?

একজন মানুষকে যখন আমরা ভালবাসি তখন দোষগুণসহ আমরা তাকে অন্তরে স্থান দিই। শুধু গুণের বিচারে চরিত্র সৃষ্টি সার্থক হয় না—তার সমগ্র রূপটাই [illegible] পাই না। তাই বলছিলাম স্বাধীনতার ২৬ বছরের পরেও মহাত্মাজীর চরিত্রের নির্মোহ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না হওয়ার ক্ষোভ থেকে যাচ্ছে।

—শান্তিপদ নন্দ, মেদিনীপুর।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

৭ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 16th June, 1972 শুক্রবার ২ আষাঢ়, ১৩৭৯ .52 Paise

চিঠিপত্র

একটি প্রতিবাদ

আপনার বিখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজে ধারাবাহিক ভাবে স্বামী নিরালম্ব সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। বিপ্লবী দল যুগান্তরের সমস্ত কর্মীদের কাছে নিরালম্ব—বা পূর্ব নামে পরিচিত যতীন ব্যানার্জি একটি শ্রদ্ধেয় নাম। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে কোন আলোচনা স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিন্তু লেখাটি পড়ে আমরা খুসী হতে পারিনি। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে অনেক পুস্তক ও নিবন্ধ বের হয়েছে; কিন্তু তার অধিকাংশই ইতিহাস বা জীবনী হয়নি; হয়েছে কতকটা রম্যোপন্যাস; কারণ বিবরণকে সত্য ভিত্তিক না করে অনেক স্থলেই বিবরণকে করা হয়েছে চাঞ্চল্যকর বা দলীয় স্বার্থে বিকৃত।

নিরালম্বকে অনেকে বিপ্লবী আন্দোলনের ব্রহ্মা আখ্যাও দিয়েছেন, এই জীবনীর লেখকও তাঁকে 'অগ্নিযুগ স্রষ্টা' বলেছেন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করে যতটা বুঝেছি কোন একজনকে এর স্রষ্টা বলা যায় না; তবে এটা ঠিক এই আন্দোলনকে গড়ে তুলবার আদি যুগে যাদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁদের অন্যতম ছিলেন যতীন ব্যানার্জি বা নিরালম্ব স্বামী।

লেখক তাঁর লেখার মধ্যে অনেক ভুল সংবাদ পরিবেশন করছেন। তার ২।৪টা উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায়। 'বত্রিশ অধ্যায়ে' তিনি লিখেছেন—লালা লাজপৎকে নির্বাসিত করা হল, 'সঙ্গে সঙ্গে ভাই পরমানন্দ, রামভুজ দত্ত চৌধুরী, অজিত সিংও হলেন নির্বাসিত।' এটা সর্বজন বিদিত যে লালাজী ও অজিত সিংকে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন দ্বারা কারারুদ্ধ করা হয়, ভাই পরমানন্দ বা রামভুজ-এর মধ্যে ছিলেন না। যতীন পাঞ্জাব হতে যখন বাংলায় ফিরে এলেন— বিপিন পাল তখন দেশেই ছিলেন, যদিও লেখকের মতে তিনি তখন বিলাতে। লেখকের এ কথাও ঠিক নয় যে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর উপর দল চালাবার ভার ঐ সময় পড়েছিল। শ্যামবাবু ছিলেন লেখক—ইংরাজী ও বাংলায় সমান দক্ষতার সঙ্গে তিনি লিখতেন। অরবিন্দ পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—'একমাত্র শ্যামবাবুই আমার লেখার মতো অনুরূপ লিখতে পারেন।' কিন্তু দল চালাবার দক্ষতা তাঁর ছিল না। সে ভারও তাঁর উপর পড়েনি। আলিপুর মামলার বিষয়—লেখক যা লিখেছেন, তাতেও বহু ভুল তথ্য আছে। Alipore Bomb Trial নামক পুস্তক রচনা করেছিলেন অন্যতম আসামীপক্ষীয় উকিল—বিজয়কৃষ্ণ বসু। যে পুস্তকে আছে ৯ জন ব্যারিস্টার ও ৯ জন উকিল—আসামীদের সমর্থনে দাঁড়ান,—৫০ জন নয় যা লেখক লিখেছেন। ১৮ জনের মধ্যে ৩ জন অল্প সময়ের জন্য ছিলেন। ঐ ৩ জনের একজন ছিলেন বি চক্রবর্তী। কিন্তু এ কথা ঠিক নয় যে, দৈনিক ১০০০ টাকা করে নিয়ে ২১ দিন পর টাকা পাওয়ার সন্দেহ বশে তিনি ঐ মামলা ত্যাগ করেন। আজ ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নাম বিস্মৃতির গর্ভে; কিন্তু এমন অর্থ-গৃধ্নুতার অপরাধ তাঁর ছিল না। অন্য এক অধ্যায়ে (৪৮) লিখেছেন মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের উপর বোমা মারার জন্য নরেন গোঁসাইকে প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল। এটাও ঠিক নয়। নরেন ছিল বড়লোকের ছেলে—আরামে লালিত-পালিত। তাকে দলে এনেছিল—কতকটা ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে এবং কিছু অর্থ সাহায্য পাবে আশায়। ঐ রকম কাজের পক্ষে যে তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য, তা যে কোন বিপ্লবী বুঝতে পারত। আজ নরেন গোঁসাই সকলের কাছেই ধিক্কৃত এবং তিনি চরম দণ্ড পেয়েছেন। কিন্তু আজ বিচার করবার সময় এসেছে—কি অবস্থায় কি হয়েছিল। নরেন ত ধরা পড়তেন না; সে ধরা পড়ল বারীন ঘোষের স্বীকৃতি হতে। অন্য ২।১ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও স্বীকার উক্তি করেন। তার ফলে আরো লোক ধরা পড়ে। তখ নরেন রাজসাক্ষী হতে রাজী হয়।

লেখকের মতে কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরূপে যান; তা ঠিক নয় তিনি গিয়েছিলেন জেলা জজরূপে ফুলারের ট্রেন উল্টাবার জন্য উল্লাসকর পূর্ব বাংলায় যাননি। ট্রেন উল্টাবার চেষ্টা হয়েছিল পূর্ব বাংলা ও আসামে শাসন কর্তা ফুলারের নয়, বাংলার শাসনকর্তার গাড়ী উল্টাবার জন্য। উল্লাসকর প্রথমে যা চন্দননগরে, এবং পরে মেদিনীপুরে ডিনামাইট নিয়ে লাইন উল্টাবার জন্য। কুষ্ঠিয়া কোন পাদ্রীকে গুলী করে 'মারা' হয়নি।

এমনি প্রতি সংখ্যায় ও প্রতি অধ্যা বহু ভুল তথ্য লেখক পরিবেশন করেছেন তাছাড়া বহু সংলাপ বা তাঁর সঙ্গে নিরালম্বের আলাপের উল্লেখ করেছেন। ঐ সং সংলাপের সত্যতা কতটা তাও আমরা জানি না। আমার এ চিঠি শেষ করার পূর্বে একটি বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ না জানিয়ে পারছি না। লেখকের মতে বরিশাল কং গ্রেসের পর বাংলার রাজনীতি তিনটি ভ .. বিভক্ত হল : (১) নরম দলনেতা সুরেন্দ্রনাথ, উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন; (২) গরম দল নেতা বিপিনচন্দ্র, উদ্দেশ্য স্বাধীনতা লাভ উপায় নিরস্ত্র প্রতিরোধ এবং (৩) 'চরম দল —বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী দলও বলত একে নেতা অরবিন্দ; উদ্দেশ্য ইংরাজ বর্জিত নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ। উপায়—ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যা দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি।' এই শেষোক্ত চরম দলের উপায় সম্বন্ধে লেখক শ্রীত্রিভঙ্গ রায় যা লিখেছেন তারই প্রতিবাদ আমি করতে চাই। জানি না—কোথায় তিনি পেয়েছেন বিপ্লবী দল বলেছে—যে ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তারা স্বাধীনতা আনবে। লেখক দাবী করেছেন—নিরালম্ব ও অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যদি তাদের সাহচর্য হতে তিনি এই বুঝে থাকেন—তবে তাঁর ঐ দীর্ঘ সাহচর্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত দাবী সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে।

অরুণচন্দ্র গুহ কলিকাতা-৯

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে কা'র ষড়যন্ত্র

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে কঠোর সতর্কবাণী করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেই রক্তাক্ত দিনগুলোর ইতিহাস সহজে বিস্মৃত হবার নয়। সেই দুঃসময়ে এই ভারতই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সংগ্রামী বাংলার। তার এক কোটি নরনারী দস্যুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ভারতে। ভারত নিজের সবটুকু সাধ্য দিয়ে এই শরণার্থীদের সেবা ও সান্ত্বনা দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে পাকিস্তানী জেলখানা থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বের দরবারে নিজে গিয়ে আবেদন জানিয়েছেন। সে সবই আজ ইতিহাসে লিখিত আছে।

ভারত-বিরোধী একশ্রেণীর লোক বাংলাদেশে আজ এই প্রচার চালাচ্ছে যে, ভারত নাকি বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করতে চায়। ভারত-বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ-সোভিয়েট মৈত্রীর বিরুদ্ধে এই প্রচারের পিছনে কারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে তা বাংলাদেশ সরকার ভালভাবেই জানেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারের উদারতার সুযোগ নিয়ে এরা দিনের পর দিন এই প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান আবেগতপ্ত কণ্ঠে বলেছেন, যখন আমার দেশের জনগণ হাজারে হাজারে নিহত হচ্ছিল, তখন কোথায় ছিল এইসব নিন্দুকের দল? তারা তো পাকিস্তানী জল্লাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি, নিপীড়িত জনগণকে এক কণা সাহায্য পর্যন্ত করেনি। তারাই এখন স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে।

বুঝতে কষ্ট হয় না এই অপপ্রচারকারীরা কেন ভারতকেই বেছে নিয়েছে কুৎসার লক্ষ্যস্থলরূপে। পাকিস্তানী শাসনের সময়ে যারা তাদের সংগে যুক্ত হয়ে বাঙালী জনসাধারণের সর্বনাশ করেছে তারা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে, একদিন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের আবির্ভাব সত্য হবে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ তার রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য। ভারতের আদর্শের সংগে তার রয়েছে একাত্মতা। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সমূলে উচ্ছেদ করে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে এনেছেন এক নবযুগের আবহাওয়া। বিভেদপন্থী, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আজ বাংলাদেশদরদীর মুখোস পরে সমালোচনা করছে ভারতের। অথচ একটি প্রমাণও তারা দিতে পারেনি যে ভারত কোনোরকম সুযোগ নিয়েছে বাংলাদেশের ওপর। একটি মিত্র রাষ্ট্র যেভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে ভারত ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশকে দিয়ে যাচ্ছে সাহায্য ও সহযোগিতা। বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্য বন্ধু হিসেবে ভারত এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুমতি ছাড়া ভারত সেখানে কোনো কাজ করবে না। বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমেই যাচ্ছে সব সাহায্য। তা সত্ত্বেও কেন ষড়যন্ত্রকারীদের এই সমালোচনা? কারণ অতি স্পষ্ট। ভারত-বাংলা মৈত্রী অনেক বৃহৎ শক্তির চক্ষুশূলে। তারা আশা করেছিল খানসেনারাই বাঙালীদের গুলি করে শেষ করে দেবে। ভারতের সাহসই হবে না এই সংগ্রামে কোনোরূপ সক্রিয় সাহায্য করা। তারা আশা করেছিল, এক কোটি শরণার্থী নিয়ে ভারত শুধুই কাঁদুনি গাইবে। এই সুযোগে পাকিস্তানী সেনারা সব খতম করে দেবে। কার্যকালে দেখা গেল, ভারত সমস্ত বৃহৎ শক্তির চক্রান্ত ব্যর্থ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সামিল হল। ভারতের বীর সেনানীরা নিজেদের রক্ত দিয়ে মুক্ত করল বাংলাদেশ। এতদিন যারা বীরত্বের বড়াই করত সেই পাকিস্তানী সেনাপতি আর সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করল ভারতীয় বাহিনীর কাছে। জগতের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ভারতের এই বীরত্বপূর্ণ সহযোগিতা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। অথচ বঙ্গবন্ধু বলামাত্র ভারতীয় বাহিনী চলে এল বাংলাদেশ থেকে। এ সমস্তই ষড়যন্ত্রকারীদের সব অঙ্ক গুলিয়ে দিয়েছে। তাদের সমালোচনার কোনো মুখ রইল না। তাই এখন নানা কাল্পনিক অভিযোগ তুলে ভারত ও বাংলার বন্ধুত্বে চিড় ধরাবার চেষ্টা করছে।

বঙ্গবন্ধু এদের চরিত্র ভালভাবেই জানেন। ছ' বছর আগে স্বায়ত্তশাসনের ছ' দফা দাবিতে আন্দোলনের ডাক যখন তিনি দিয়েছিলেন তখন এই ষড়যন্ত্রকারীরা নানাভাবে এই আন্দোলনের বিরোধিতাই করেছে। বাংলার সাধারণ দুঃখী মানুষ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনই বঙ্গবন্ধুকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। তারাই বারবার পাকিস্তানীদের রাহুগ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তারাই আত্মদান করেছে অকাতরে। আজ বাংলাদেশের দুর্দিনে সেই সাধারণ মানুষই বঙ্গবন্ধুর রক্ষক সেনানী। চোরাকারবারী, মুনাফাবাজ, বন্দুকবাজ, মজুতদাররা বাংলাদেশকে এক গভীর সংকটের মধ্যে ফেলেছে। এই দুর্দিনে সরকারকে কঠোর হতে হবে। বঙ্গবন্ধু সেই হুঁসিয়ারি দিয়েছেন। বহু লক্ষ লোকের আত্মদানের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা এই ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে ব্যর্থ হতে পারে না। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।

পটভূমি

মালদার উপনির্বাচনে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যে জিতবেন, সে-সম্বন্ধে কোনো মহলেই কোনো সন্দেহ ছিল না। ঐ উপ-নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার আগে কোনো কোনো মহল থেকে এমন একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, সিদ্ধার্থবাবু হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-ও করতে পারেন। এই গুজবের একটাই মাত্র অর্থ হতে পারে—সিদ্ধার্থবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। আসলে যে-সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে এই রকম একটা গুজব ছড়ানো হচ্ছিল তা এই যে, তার কিছু দিন আগে সিদ্ধার্থবাবু দিল্লীতে থাকার সময় লোকসভার হাজিরা খাতায় সই করেছিলেন। এই থেকেই কেউ কেউ ধরে নিলেন, তিনি নিশ্চয়ই লোকসভার সদস্য পদটি খারিজ হতে দিতে চান না। আর ঐ সদস্য পদের দিকে নজর থাকা মানেই পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদের দিকে নজর না-থাকা। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধার্থবাবুকে ছ' মাসের মধ্যে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসতেই হবে। লোকসভার সদস্য থেকে তো আর তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হতে পারেন না।

আসলে এইসব জল্পনার কোনো অর্থ নেই। সিদ্ধার্থবাবু যে শুধু ছ' মাসের জন্যে মুখ্যমন্ত্রী হন নি তা অনেকেই জানেন। স্টপ গ্যাপ মুখ্যমন্ত্রীর দরকার থাকলে শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে দিল্লী থেকে কলকাতায় পাঠাতেন না। আর এখন অন্ততঃ মালদার উপনির্বাচনে সিদ্ধার্থবাবুর জয়লাভের পর এমন কোনো জল্পনার আর কোনো সুযোগই নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর সিদ্ধার্থবাবু কখনোই এমনভাবে কাজ করেন নি যাতে মনে হতে পারে তিনি 'স্টপ গ্যাপ' মুখ্যমন্ত্রী। তবু যদি কোথাও কোনো অনিশ্চয়তা থেকে থাকে তবে এখন তারও কোনো সুযোগ নেই। সিদ্ধার্থবাবু তাই জয়লাভের পর যে কথাটি বলেছেন তার বেশ তাৎপর্য রয়েছে—'দায়িত্ব এখন অনেক বেড়ে গেল।'

সিদ্ধার্থবাবুর মন্ত্রিসভা কাজের ভার নিয়েছেন এখনও তিন মাসও হয় নি। কোনো মন্ত্রিসভার কীর্তি যাচাইয়ের পক্ষে এই সময়টা যথেষ্ট নয়। বিদেশে একটা রেওয়াজ আছে, নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম একশ' দিনের কাজের হিসেব-নিকেশ করায়। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির আমলেই এই রেওয়াজের সুরু। পরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনও প্রথম এক শ' দিনের কাজের ওপর বিশেষ জোর দেন। শ্রীমতী গান্ধী ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও অনেক পর্যবেক্ষক তাঁর শাসনের প্রথম এক শ' দিনের কাজের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলেন। সিদ্ধার্থবাবুর ক্ষেত্রেও হয়ত অনেকে এই ধরনের মূল্যায়ন করবেন।

নতুন সরকার কাজের ভার নেওয়ার পর হরেক রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়, অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। বিশেষতঃ কংগ্রেস যে রকম বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে তাতে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কংগ্রেসের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশাও প্রচুর। সুতরাং বড় মাপের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে উপায়ই বা কী?

এক হিসেবে কিন্তু নতুন সরকারের কাজ বেশ খানিকটা সহজ। তার কারণ, গত পাঁচ বছরে পশ্চিম বাংলায় উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য কাজ তেমন কিছু হয় নি। যে ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার পালা গেছে এই রাজ্যে তাতে কাজ হবেই বা কী করে? সুতরাং এখন যদি সামান্য কিছু কাজও করা যায় তা হলেও লোকে অনেকটা আশ্বস্ত হবে। যেমন ধরুন, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে খোঁড়া রাস্তা বুজিয়ে আবার যানবাহন চলাচল সুরু করা। এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেশি দিন ব্যবহারের অযোগ্য করে রাখাও যেমন চলে না, তেমনি রাস্তা খোঁড়ার ছ' মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা যে শিবের অসাধ্য ব্যাপার তা-ও নয়। কিন্তু নতুন মন্ত্রিসভা ঠিক যে-তারিখে কথা দিয়েছিলেন সেই তারিখেই যে রাস্তা খুলে গেল, তাতে কিন্তু অনেকেই 'ইমপ্রেসড' হয়েছেন।

এ-থেকে একটা কথা বোঝা যায়—আমাদের সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কতো কমে গেছে। কোনো কাজই যে সরকার ঠিকমতো করতে পারবেন, এমন ভরসাই অনেকে আর করতে পারেন না। তবু এ-কথা বলতেই হবে যে, শুধু এই ধরনের ছোট প্রত্যাশা মেটালেই নতুন সরকারের চলবে না—অন্ততঃ বেশি দিন চলবে না। কারণ প্রথমতঃ, সরকার অনেক বড় প্রত্যাশা জাগিয়েছেন এবং দ্বিতীয়তঃ বড় রকমের [illegible] না করলে পশ্চিম বাংলার মতো [illegible]র প্রয়োজন মিটবে না।

বড় রকমের কাজ কী হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে মন্ত্রিসভা বেশ কিছুটা মনস্থির করেও ফেলেছেন। চাষ-বাসের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা, ভূমি সংস্কার, নতুন কল-কারখানা খোলা, বেকার সমস্যার সমাধান স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পেয়েছে। খাদ্য-শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্যে ৫৬ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। ভূমি সংস্কারের নতুন আইনও পাস হয়ে গেছে। নতুন কল-কারখানা খোলার জন্যে কিছু আবেদনও এসেছে।

এখন দরকার হলো এইসব কর্মসূচী বা আইন কাজে রূপায়িত করা। ইতিমধ্যে এসে গেছে খরা—যেটা নতুন সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাছে একটা অভাবিতপূর্ব সমস্যা হিসেবেই হাজির হয়েছে। কার্যভার নেওয়ার সময় নতুন মন্ত্রিসভা যেমন ভাবতে পারেন নি যে প্রকৃতির এই ধরনের কোপের মুখে রাজ্যকে পড়তে হবে, তেমনই এই ধরনের অনাবৃষ্টিজাত সমস্যার মোকাবিলাও প্রশাসনকে আগে কখনও করতে হয় নি। আর এই খরাই উন্নয়নের সমস্যার একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে নতুন সরকারের চোখ খুলে দিয়েছে।

উন্নয়নের কাজের জন্যে প্রথম দরকার হলো টাকার। টাকার অভাবে যে পশ্চিম বাংলায় অনেক কাজই হতে পারছে না, তা সকলেই জানেন। এই রাজ্যের নিজের সামর্থ্য কম, তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারও সব সময় ঠিক মতো হাত উপুড় করেন না।

তবে টাকা থাকলেই যে সব সমস্যা মিটে গেল তা নয়। টাকার পরে প্রধান চিন্তা হলো মাল-মশলার। এই চিন্তা যে কতো বড় দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়াতে পারে তার প্রধান উদাহরণ কলকাতার উন্নয়নের কাজ। এই কাজে এখন যে অভাবই থাক, অন্ততঃ টাকার অভাব নেই। চলতি আর্থিক বছরে সি এম ডি এ প্রায় ৬০ কোটি টাকা

খরচ করবে—অর্থাৎ গড়ে মাসে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। এই এত টাকা দামের মাল-মশলা জোগাড় করতে এখন রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে। ইঁট সিমেন্ট পাথর-কুচি যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা প্রথমেই সি এম ডি এ'র জন্যে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে এখন এইসব জিনিসের দরও ভীষণ আক্রা। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, সরকারী দপ্তরও বাড়ি-ঘর করার জন্যে ইমারতী মাল-মশলা পাচ্ছে না। কেন যে এই মাল-মশলার টানাটানি সেই সব কারণের মধ্যে এখানে আর গেলাম না। শুধু এইটুকুই জেনে রাখা ভালো যে, এইসব মাল-মশলার অনেকটাই আসে রাজ্যের বাইরে থেকে।

কিন্তু টাকাও যদি থাকে এবং মাল-মশলার যদি অভাব না-হয়, তবু কি কোনো কাজ, এমন কি কোনো জরুরী কাজ আটকে থাকতে পারে? খরার সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে সিদ্ধার্থবাবুকে এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন হতে হয়েছে।

অনাবৃষ্টির ফলে দুটো সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। এক, সেচের জল সরবরাহ করে ক্ষেতের ফসল বাঁচানো এবং দুই, পানীয় জল সরবরাহ। সেচের জলের সমস্যার বড় রকমের সমাধান রাতারাতি করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অভাবে যে-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ একদিনে তার সমাধান হবেই বা কী করে? নতুন নলকূপ বসিয়ে অথবা পুরানো নলকূপ মেরামত করে যে জল পাওয়া যাবে তাতে প্রথমে মেটাতে হবে তৃষ্ণার জলের অভাব, তারপর উদ্বৃত্ত থাকলে তার দ্বারা সেচের কাজ কিছুটা হলেও হতে পারে।

এই নলকূপের ব্যাপারে টাকার অভাব ঘটে নি। এমন কি মাল-মশলার অভাবও তেমন নেই। তবু সিদ্ধার্থবাবু নিজেই স্বীকার করছেন যে, পনের দিনের যে জরুরী কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছিল তার অর্ধেক কাজ মাত্র শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যর্থতার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন ব্যবস্থাকে দায়ী না-করে পারেন নি। মুখ্যমন্ত্রীকে দুটো কারণে বিশেষ করে সাধুবাদ দিতে হয়। প্রথমতঃ, তিনি সরকারী ব্যর্থতা ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন নি। সরকারী কর্মসূচী হামেশাই ব্যর্থ হয়, কিন্তু খুব অল্প রাজনীতিকেরই সৎসাহস থাকে সেই ব্যর্থতা স্বীকার করার। দ্বিতীয়তঃ, মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যর্থতার জন্যে প্রশাসনকে দায়ী করলেও মন্ত্রীদের দায়িত্ব লাঘব করতে চান নি। তিনি বলেছেন, প্রশাসন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে তার জন্যে মন্ত্রীরাও দায়ী, কারণ মন্ত্রীরাই প্রশাসন যন্ত্রকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারেন নি।

নীতি হিসেবে সিদ্ধার্থবাবুর কথার মধ্যে কোনো ভুল নেই। সব ব্যর্থতার দায়িত্ব অবশ্যই শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীদের, কারণ বিধানসভা বা সরাসরি জনসাধারণের কাছে জবাব দেওয়ার দায় আমলাদের নেই। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু এ-কথা বললেও তিনি নিজেও জানেন যে, প্রশাসনের মধ্যেই বড় রকমের গলদ রয়েছে। তা না হলে তিনি প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কথা বলতেন না। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে তিনি কয়েক বারই এই ধরনের কথা বলেছেন। কিন্তু খরার মোকাবিলায় প্রশাসনের ব্যর্থতা নতুন করে এই সমস্যার দিকে তাঁর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে। মনে রাখতে হবে, এই ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে কোনো একটা সাধারণ কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে নয়। খরার মতো একটা জীবন-মরণের সমস্যা, যার প্রতি গোটা মন্ত্রিসভার সর্বদা দৃষ্টি রয়েছে, সেই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেই এই ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে।

প্রশাসন যন্ত্রটা সত্যিই কিছু একটা যন্ত্র নয়। কিছু মানুষকে নিয়েই এই যন্ত্র তৈরি। গত পাঁচ বছরে এই রাজ্যে যে ধরনের ওলট-পালট ঘটেছে তাতে এই যন্ত্রে গুরুতর গলদ দেখা দেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অবস্থা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই কারণে যে, রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তনের সংগে সংগে কিছু আমলা সব কাজ ভুলে আগে নিজেদের কেরিয়ার বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার ওপর, প্রশাসন সংস্কার বলতে প্রায় সকলেই মনে করেছেন কিছু অফিসার বদলী। এর ফলে বড় জোর ওপর-ওপর একটা পরিবর্তন আসে, তার বেশি নয়।

এই প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই সিদ্ধার্থবাবু ঘোষণা করেছেন যে, প্রতি মাসে কী কাজ করা হবে তা তিনি সেই মাসের এক তারিখে জানিয়ে দেবেন। প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো বলতে কী বোঝায় সে-সম্বন্ধে সিদ্ধার্থবাবুর নিশ্চয়ই নিজস্ব কিছু ধারণা আছে। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, ওপর-ওপর কোনো পরিবর্তনের দ্বারা রোগ দূর হবে না। কথাটা অপ্রিয় হলেও বোধহয় মিথ্যে নয় যে, আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থাকে উন্নয়নের কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার তেমন কোনো চেষ্টাই আজ পর্যন্ত হয় নি।

৯-৬-৭২ —দেবদত্ত
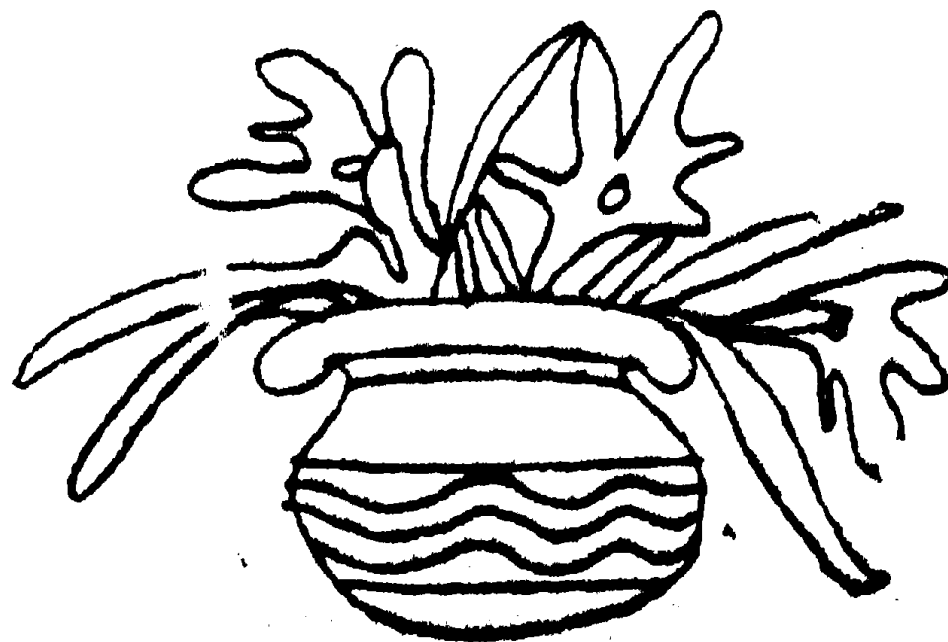
বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আহমদ নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দেশে বিদেশে

ওড়িশার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মাথার ওপর দুর্যোগের লক্ষণ কিছুকাল যাবতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস পদত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করায় গত মাসে যে সমূহ সংকট সৃষ্টি হয়েছিল সেটা অবশ্য দুশ্চিন্তা অল্পের ওপর দিয়েই মিটে গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের অনুরোধে শ্রীদাসই মুখ্যমন্ত্রী থেকে গেলেন এবং অপর পক্ষে বিজু পট্টনায়ক তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের আশায় বাধা পেয়ে ছুটি কাটাতে কাশ্মীরে চলে গেলেন।

যদিও সে সময়ে এইভাবেই সংকট-মোচন হল তা হলেও বোঝা গিয়েছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে এই সংকট নতুন চেহারা নিতে পারে। অনুমান করাই যাচ্ছিল যুক্তফ্রন্টের সংসার আর ঠিক সুখের সংসার নেই। ফ্রন্টের অন্যতম শরিক উৎকল কংগ্রেস প্রায় প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের সঙ্গে মাখামাখি করছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে উৎকল কংগ্রেসের সংযুক্তিরও কথাবার্তা হচ্ছিল—অবশ্য বিজু পট্টনায়ককে এইসব কথাবার্তার বাইরে রেখে। (কংগ্রেসে যে পট্টনায়কের স্থান হবে না সে কথা পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।) ফ্রন্টের বড় শরিক স্বতন্ত্র দলের মধ্যেও গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যেতে থাকল।

জুন মাসের গোড়াতেই বিশ্বনাথ দাসের মন্ত্রিসভার এই যায় এই যায় অবস্থা। লোকসভার স্বতন্ত্র সদস্য পি কে সিংদেও অভিযোগ করলেন, কংগ্রেস ওড়িশা মন্ত্রিসভার সমর্থকদের মধ্যে দলত্যাগ ঘটিয়ে ঐ মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করতে চাইছে। তিনি আরও বললেন, এই উদ্দেশ্যে দিল্লীর হরিয়ানা ভবনে ওড়িশা বিধানসভার তিনজন স্বতন্ত্র সদস্যকে আটকে রাখা হয়েছে। ২ জুন ভুবনেশ্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র নেতা ও ওড়িশার শিল্পমন্ত্রী আর এন সিংদেও স্বীকার করলেন যে তাঁর দলের মধ্যে কিছু ফাটল উঠেছে তবে তাতে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নষ্ট হবে না।

৪ জুন ভুবনেশ্বরে স্বতন্ত্র দলের সভাপতি এইচ এম প্যাটেলও অভিযোগ করলেন, ওড়িশার স্বতন্ত্র এম-এল-এদের ভাঙাবার চেষ্টা চলছে। দলত্যাগ ঠেকাবার চেষ্টায় পি কে দেও বললেন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙলে মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে, একথা সব সদস্যই জানেন।

স্বতন্ত্র দলের মধ্যে বিদ্রোহের কথাটা কিন্তু চেপে রাখা গেল না। ৪ জুন কেওনঝরে স্বতন্ত্র দলের রাজ্য সম্মেলন আরম্ভ হলে দেখা গেল, বিধানসভার নয়জন স্বতন্ত্র সদস্য এই সম্মেলন বর্জন করেছেন। এই নয়জনের মধ্যে একজন মন্ত্রী ও আর একজন উপমন্ত্রীও ছিলেন।

৫ জুন ওড়িশা বিধানসভার আটজন সদস্য ঘোষণা করলেন, তাঁরা যুক্তফ্রন্ট থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এই আটজন পদত্যাগকারীর মধ্যে স্বতন্ত্র দলের একজন মন্ত্রী ও একজন উপমন্ত্রী ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন যুক্তফ্রন্টের বিধানসভা দলের

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ (ডান দিকে) চারদিন ব্যাপী মালয়েশিয়া সফরে এলে কুয়ালা লামপুরে মালয়েশিয়ার জাতীয় এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী মিঃ গফর বাবা তাঁকে স্বাগত জানান।

সম্পাদক এবং উৎকল কংগ্রেসের দুজন সদস্য। মন্ত্রী গঙ্গাধর প্রধানের নেতৃত্বে এই আটজন দলত্যাগী সদস্য রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে এলেন। শ্রীপ্রধান ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোন বিকল্প সরকার গঠিত হলে তাঁরা সেই সরকারকে সমর্থন করবেন।

৬ জুন উৎকল কংগ্রেস দলভুক্ত আর একজন উপমন্ত্রী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এলেন।

এই নয়জন সদস্য সমর্থন তুলে নেওয়ায় বিধানসভায় ফ্রন্ট সংখ্যালঘু হয়ে গেল। ১৪০ জন সদস্যের বিধানসভায় ফ্রন্টের শক্তি ৭৭ থেকে কমে ৬৮-তে এসে দাঁড়াল।

প্রায় একই সময়ে কংগ্রেস মহল থেকে ঘোষণা করা হল, ঝাড়খণ্ড দলের যে তিনজন সদস্য ফ্রন্টে রয়েছেন তাঁরাও শাসক কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত করেছেন। ঝাড়খণ্ড পার্টির যে চতুর্থ এম এল এটি এতদিন সহযোগী সদস্য হিসেবে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ সদস্যরূপে কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্তও একই সময়ে ঘোষণা করা হল।

নয়জন সদস্যের সমর্থন প্রত্যাহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশার কংগ্রেস নেতারা দাবী করলেন যে, সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ায় ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আর ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই, তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত এবং রাজ্যপালের উচিত বিধানসভায় একক বৃহত্তম দল কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করা। পি এস পি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ও ঝাড়খণ্ড দলের একজন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় বিধানসভায় কংগ্রেস দলের শক্তি দাঁড়িয়েছে ৫৬। তাছাড়া সি পি আই-এর চারজন সদস্য কংগ্রেসকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার উপর কংগ্রেসের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে যে, শাসক কোয়ালিশনের আরও জন পাঁচের সদস্যের সমর্থন তাঁরা পাবেন। বিধানসভায় কংগ্রেস দলের ও বিরোধী পক্ষের নেতা বিনায়ক আচার্য ইতিমধ্যে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে এসেছেন, তিনি রাজ্যে একটি বিকল্প সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখেন।

অন্য দিকে ওড়িশা মন্ত্রিসভা তাঁদের শক্তি যাচাই করার উদ্দেশ্যে ২৩ জুন বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার জন্য রাজ্যপালের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন।

অতঃপর কি হবে সেটা নির্ভর করছে রাজ্যপাল সর্দার যোগেন্দ্র সিং এর উপর। ওড়িশার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের উপর এই বলে চাপ দেওয়া হচ্ছে যে, সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার পর দাস মন্ত্রিসভার সুপারিশ রাজ্যপালের মেনে নেওয়ার আর দরকার নেই। হয় মন্ত্রিসভা এখনই পদত্যাগ করুন অথবা বিধানসভার বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা না করে রাজ্যপাল এখনই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করুন। ওড়িশার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (অ্যাড হক) সভাপতি বজ্রমোহন মোহান্তি ও বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা বিনায়ক আচার্য রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে লিখিতভাবে এই দাবী জানিয়ে এসেছেন বলে প্রকাশ।

রাজ্যপাল এখন কি করবেন? তিনি কি বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার সুযোগ দেবেন? অথবা, মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবেন বা তাঁদের বরখাস্ত করবেন? কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মা বলেছেন, রাজ্যপাল নিজেই পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। তবে, রাজ্যপাল নিজে যদি বোঝেন যে, সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন তাহলে তাঁর দিক থেকে সেই সংখ্যালঘু সরকারের পরামর্শ মেনে নেওয়ার কোন দরকার নেই। কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, তাঁর নিজের বিশ্বাস, ওড়িশার মন্ত্রিসভাকে বাঁচাবার আর কোন উপায়ই এখন নেই। এই মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ কোন মাথাব্যথা নেই, কিন্তু এই সরকারের পতন ঘটলে জনসাধারণের আস্থাভাজন বৃহত্তম দল হিসেবে কংগ্রেসের 'নৈতিক দায়িত্ব' রয়েছে বিকল্প সরকার গঠন করার।

কংগ্রেস সভাপতি যখন এই 'নৈতিক দায়িত্ব'-এর কথা উল্লেখ করেছেন তখন আর একটি 'নৈতিক দায়িত্ব'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সংগঠন কংগ্রেসের নেতা শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্র। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, এই সেদিন পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, দলত্যাগীদের আইনসভার আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য করবার জন্য সরকার শিগগিরই আইন তৈরি করবেন, অথচ ঠিক তার পরই ওড়িশায় এইসব দলত্যাগের ঘটনা ঘটান হল। শ্রীমিশ্র বলেছেন যে, তিনি আশা করেছিলেন, পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর ঐ ঘোষণার পর শাসক দল তাদের দুয়ার দলত্যাগীদের জন্য রুদ্ধ করে দিতে নিজেদের নীতিগতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে করবে এবং ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে যত দলত্যাগ হয়েছে সে সব ক্ষেত্রেই প্রস্তাবিত আইনের ঐ নীতি প্রয়োগ করবে। কিন্তু শ্রীমিশ্র বলেন, ওড়িশার সাম্প্রতিক ঘটনায় দেখা গেল, দলত্যাগ বন্ধ করার ব্যাপারে শাসক দলের আদৌ আন্তরিকতা নেই। শ্রীমিশ্র মনে করেন, গণতন্ত্রের পক্ষে এটা বিপজ্জনক।

*

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয়ে গেল তার পর্যালোচনা করে পর্যবেক্ষকরা কেউ বলেছেন, এটা ছিল 'কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর সবচেয়ে আকর্ষণহীন অধিবেশন', কেউ বলেছেন এটা ছিল 'অনুষ্ঠানসর্বস্ব।'

যাঁরা এইভাবে সমালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চন্দ্রশেখরও অন্যতম। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার

তিনি লিখেছেন, অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যাদের দায়িত্ব তাঁরা তাঁদের কাজ ভালই করেছেন। কিন্তু পার্টির লক্ষ্যগুলি বাস্তবে পরিণত করার কোন ইচ্ছারই পরিচয় পাওয়া যায় নি। জোরালো অনমনীয় সিদ্ধান্ত থেকে সরে গিয়ে সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়ার সুবিধাজনক পথ খুঁজে বার করার ওপরই বেশি করে পড়েছে।'

কংগ্রেসের নেতারা এই অধিবেশনের জন্য যে আলোচ্য বিষয়সূচী স্থির করে রেখেছিলেন তাতে তাঁরা এই ব্যবস্থা আগে থেকে এক রকম নিশ্চিতই করে ফেলেছিলেন যে, এ আই সি সি'র এই বৈঠকে কাজের কাজ তেমন বিশেষ কিছু হবে না। যে একটি মাত্র সরকারী প্রস্তাব এই অধিবেশনের সামনে ছিল সেটি ছিল পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত। একে ত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর থেকে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা এ আই সি সিতে আর গুরুত্ব পায় না তার ওপর এই প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখিত অধিকাংশ বিষয়ে (যেমন ভারত-সোভিয়েট চুক্তির ব্যাপারে অথবা বাংলাদেশের ব্যাপারে) মতভেদের কোন অবকাশই ছিল না।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব ছাড়া এই অধিবেশনের আর একটি আলোচ্য বিষয় ছিল পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি দলিল। দলিলটি হচ্ছে, পরিকল্পনামন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যমের ভাষায়, পঞ্চম পরিকল্পনার 'নিশানার নিশানা' ('অ্যাপ্রোচ টু দি অ্যাপ্রোচ')। দলিলটি পরিকল্পনা কমিশনের রচনা, এর মধ্যে কংগ্রেসের কোন অবদান নেই। স্বভাবতই এটি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করা ছাড়া তার কোন কিছু করারই অধিকার এ আই সি সি'র ছিল না। প্রতিনিধিরা এই দলিল গ্রহণ, বর্জন বা সংশোধন কিছুই করতে পারতেন না। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। দলিলটি নিয়ে ১১ ঘণ্টা আলোচনা হল, ৬০ জন বক্তা তার ওপর বক্তৃতা করলেন এবং সবশেষে কংগ্রেস সভাপতি যবনিকা টেনে দিয়ে বললেন, সকলের সব মন্তব্য নোট করা হয়েছে এবং ওয়ার্কিং কমিটি যখন সিদ্ধান্ত নেবেন তখন এইসব মন্তব্যই বিবেচনা করে দেখা হবে।

প্রতিনিধিদের একাংশ এই ক্ষোভ নিয়ে ফিরেছেন যে, এই প্রথম অধিবেশন হল যেখানে বৈষয়িক নীতি সম্পর্কে কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নেওয়া হয় নি। তাঁদের ধারণা, উত্তপ্ত বিতর্ক এড়াবার জন্যই হাই-কম্যান্ড এবার অর্থনৈতিক বিষয়ে কোন প্রস্তাব না আনার এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, অধিবেশনের আগেই যে প্রশ্নটি নিয়ে কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছুটা আলোচনা হচ্ছিল সেই জমির মালিকানার উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত প্রশ্নটি এ আই সি সি সদস্যদের সামনে রাখা হয় নি। পরিকল্পনা সংক্রান্ত নিবন্ধটি অবলম্বন করে ঐ বিষয়ে আলোচনার যেটুকু সুযোগ ছিল সেটুকুও অনেকেই গ্রহণ করেন নি। তার অন্যতম কারণ এই হতে পারে যে, অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালেই কংগ্রেসের ভেতরকার ভিন্ন-মতাবলম্বীদের সতর্ক করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'এঁরা যদি মানিয়ে চলতে না পারেন তাহলে যেন দল ছেড়ে যান।' নেত্রীর এই হুঁশিয়ারির কথা মনে রেখেই অনেক স্পষ্টবক্তাও হয়ত মুখ খুলতে সাহস করেন নি।

তবু কিছু স্পষ্ট ভাষণ যে হয় নি তা নয়। বিভূতি মিশ্র বললেন যে, বিতর্কের মত বাস্তব অবস্থায় অথবা যে গুরুত্ব সহকারে সমস্যাগুলির মোকাবেলা করা দরকার সেই গুরুত্বের কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। যাঁরা বিদেশ থেকে আমদানী-করা 'ইম্পালা' গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ান সেই 'ইম্পালা সমাজতন্ত্রীরা' দলের লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে পারবেন এমন কোন ভুল ধারণা না রাখার জন্য শ্রীমিশ্র আবেদন জানালেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সভ্য ডাঃ ভি কে আর ভি রাও বললেন, পরিকল্পনা কমিশনের দলিলটি এভাবে রচনা করা হয়েছে যেন এর আগে পরিকল্পনার কোন কাজই হয় নি।

ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে বললেন, জমির রেকর্ডই যেখানে ঠিক নেই, কে কোন জমির মালিক সেটাই যেখানে ঠিক করে বলা যাচ্ছে না সেখানে ভূমি সংস্কার হবে কি করে? উদ্বৃত্ত জমি বন্টন করবে কে? মধ্যপ্রদেশের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠি বললেন, জমি বিলির ভার যদি শুধু গ্রামের পাটোয়ারিদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ভূমিহীনরা এক ছটাক জমিও পাবে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি বললেন, উদ্বৃত্ত জমি কিভাবে নিতে ও কিভাবে বিলি করতে হবে নেতারা স্পষ্টভাবে বলুন, আমরা যুবকরা ও ছাত্ররা সেই কাজ করে দেব। অপরপক্ষে অন্ধ্রের একজন প্রতিনিধি বললেন, জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির ৯৯ শতাংশ ইতিমধ্যে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির কব্জায় চলে গেছে এবং সেই কারণে তাঁরা 'ভূমি সংস্কারের নীতিকে কার্যে পরিণত করবেন বলে ভরসা রাখা যায় না।'

ছাড়া ছাড়া এই ধরনের অনেক কথাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উঠল। কিন্তু কোন স্পষ্ট বক্তব্য বা সিদ্ধান্তের মধ্যে এইসব আলোচনা দানা বেঁধে উঠল না। দিল্লীর বাতানুকূলিত মবলঙ্কর হলে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে নেতাদের মধ্যে প্রায় কাউকেই বেশি সময়ের জন্য উপস্থিত থাকতে দেখা গেল না। প্রধানমন্ত্রী নিজে অধিবেশনের দু' দিনই উপস্থিত ছিলেন, তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতির হার অনেক ভাল। কেউ কেউ বললেন, ঘরের বাইরে এখন বড় গরম।'

*

লোকসভার ১৯৭১ সালের নির্বাচনের পরই 'গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স'-এর আনুষ্ঠানিক সমাধি ঘটেছে, কিন্তু সংসদের যে অধিবেশন সদ্য সমাপ্ত হল সেখানে নতুন আর একটি 'গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স' গড়ে উঠেছে বলে বোধ হচ্ছে। এবারকার জোটের বিশেষত্ব এই যে, সি পি এমও এর মধ্যে যোগ দিয়েছে। সংসদের ভেতরে ও বাইরে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার জন্য এই জোটের দলগুলি (সি পি এম, সংগঠন কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র পার্টি) দুটি বিষয়কে বেছে নিয়েছে। একটি হল, কলকাতার একটি ছাপাখানায় কংগ্রেসের আট লাখ নির্বাচনী প্রাচীরপত্র ছাপাবার বিল শিল্পপতি আর পি গোয়েঙ্কা শোধ করেছিলেন কিনা এবং করে থাকলে তিনি সেটা কি হিসেবে করেছিলেন? দ্বিতীয় বিষয়টি হল, পরলোকগত রুস্তম নগরওয়ালা কর্তৃক ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে ৬০ লাখ টাকা উঠিয়ে নেওয়ার 'রহস্যজনক' ঘটনা।

এই দুই প্রসঙ্গই এবার সংসদের অধিবেশনে একাধিকবার উঠেছিল এবং তা নিয়ে উত্তেজিত বিতর্ক হয়েছিল। ডানকান ব্রাদার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর পি গোয়েঙ্কা কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রাচীরপত্র ছাপার জন্য কোম্পানীর টাকা খরচ করে আইন লঙ্ঘন করেছেন, এই অভিযোগ ভারত সরকার অস্বীকার করেছেন। রুস্তম নগরওয়ালা সরকারী গোয়েন্দা ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুতে ও তাঁর কেসের তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে কোন রহস্য আছে, বিরোধী পক্ষের এই সন্দেহও সরকারপক্ষ উড়িয়ে দিয়েছেন। এই দুটি বিষয়ে তদন্তের দাবীও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এই দুটি বিষয়ে সংসদের বিরোধী দল সংসদের ভেতরে সরকারের বিরুদ্ধে যে মিলিত বিরোধিতা চালিয়েছে সেই বিরোধিতা এবার তারা সংসদের বাইরেও প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত করেছে। সি পি এম, সংগঠন কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র দলের নেতারা দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের এই সংকল্প ঘোষণা করেছেন। নাগরওয়ালা সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য স্বতন্ত্র পার্টি ইতিমধ্যে একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছে।

•

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতি ও সম্পাদকরা তাঁদের সম্মেলনে স্থির করেছেন যে, এই বছর দলে দু কোটি সদস্য সংগ্রহ করা হবে। এর আগে অবিভক্ত কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭৩ লক্ষ। ঐ অঙ্ক ১৯৬৪-৬৫ সালের।

—পুণ্ডরীক

স্বাধীন বাংলা দেশে

রেণু চক্রবর্তী

বহু আকাঙ্ক্ষিত ঢাকা যাত্রার জন্য দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমরা ২০শে মার্চ তারিখের সকালে সকালে হাজির। সঙ্গে আছেন অরুণা আসফ আলী—আমাদের জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের সভানেত্রী এবং এই শুভেচ্ছা দলের নেত্রী। পাঞ্জাবের অসীমা রেখী উত্তরপ্রদেশের সমাজ-কল্যাণ উন্নয়নের মন্ত্রী বেগম হাবিবুল্লাহ্, ফেডারেশনের সম্পাদিকা বিমলা ফারুকী ও সহ-সম্পাদিকা বাণী দাশগুপ্তা। তাছাড়া রয়েছেন আমাদের দলে ইয়ং উইমেনস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শ্রীমতী আইভি খাঁ। নিমন্ত্রণ এসেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কাছ থেকে। নানান নিয়মকানুন পালন করে, পাসপোর্ট দেখিয়ে স্ট্যাম্প মেরে আমরা শেষ অবধি এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং-এ উঠে বসলাম। যথাসময়ে ডানা মেলে বোয়িং আকাশে উঠল। কলকাতা ও তার আশপাশের অতিপরিচিত গ্রামগুলি উপর থেকে চেনবার চেষ্টা করছি। 'এয়ার হোস্টেস' এসে সরবৎ দিয়ে গেলেন। মাত্র একটু গল্পগুজব শুরু করেছি। হঠাৎ রেডিও থেকে বলে উঠল, 'প্রস্তুত হন -ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছচ্ছি।' চমকে উঠলাম। ঘড়িতে দেখি মাত্র ২০ মিনিট আগে দমদম থেকে উড়েছি। এরই মধ্যে ঢাকা! কত নিকটে অথচ এই পঁচিশ বছর ধরে কত দূরে ঠেলে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত।

বোয়িং-এর জানলা থেকেই দেখতে পেলাম মেয়েরা হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে ভিড় করে রয়েছে সিঁড়ির চারিপাশে। ঐ ত মালিকা বেগমের মিষ্টি হাসিমাখা মুখখানি। সে মহিলা পরিষদের সম্পাদিকা। প্লেন থেকে নেমেই আলাপ হল তাজুদ্দিন সাহেব অর্থমন্ত্রীর স্ত্রী জোহরার সঙ্গে। নুরজাহান মুরশেদ এখন বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি গণ-পরিষদের। আমার অনেকদিনের চেনা প্রিয় পাত্রী শুধু নয়, ছাত্রীও বটে। কয়েকমাস আগে কলকাতার রাস্তায় হঠাৎ দেখা। কিভাবে পাক-হানাদারদের হাত থেকে পালিয়েছে, কত কষ্টে এসে পৌঁছিয়েছে সমস্ত স্মৃতি ভিড় করে মনে পড়ে গেল। আজ সে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরেছে বুকভরা আনন্দে। মহিলা পরিষদের কত চেনা কত অচেনা কর্মী। কেউ বা শ্রীহট্টের ৭২ বছরের জুবেদা খাতুন সাহেবার মতন যথেষ্ট বয়স্ক, আবার মিসেস নবি, ছাত্রী বেবী ওদুদের মতন অনেকেই নবীন। আমাদের প্লেন যখন নামছিল, তখন আমি উন্মুখ হয়ে দেখছিলাম ভারত-পাক যুদ্ধের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে কিনা। এয়ারপোর্টের ধারে দুটি প্লেনের ভগ্নাংশ দেখতে পেলাম আর রানওয়ে-তে নামতেই খুব উবড়োখাবড়া রাস্তার উপর পড়লে যেমন গাড়ী নাচতে থাকে, তেমনি প্লেনটিও খুব দুলছিল। আমার মনে পড়ে গেল যুদ্ধের সময় যে বিরাট শক্তিশালী বোমা দিয়ে রানওয়ে অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল—তারই ফলে এই অবস্থা। তাড়াহুড়োর মধ্যে এটিকে সম্পূর্ণ সারান তখনো যায়নি।

আরও মেয়েরা এগিয়ে আসছেন। আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার সম্পাদিকা বদরুন্নেছা আহ্‌মেদ গণ-পরিষদের সদস্যা, তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। আর আলাপ হল রাজিয়া বানুর সঙ্গে, তিনিও আর একজন গণ-পরিষদের সদস্যা। তাঁর আর একটি পরিচয়ে আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। তিনি ফজলুল হক সাহেবের নাতনী। আরও অনেকে আমাদের আদর অভ্যর্থনা করে এয়ারপোর্টে যেখানে মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপ্যায়নের বিশেষ ব্যবস্থা —সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা দিয়ে আর তার স্বাধীন মা-বোনদের সঙ্গে প্রথম আলিঙ্গনে যে রাখিবন্ধন হল তার আবেগ ভাষায় বোঝান যায় না। তারপরের চারদিন ধরে যা দেখেছি, যা শুনেছি, এই নৈকট্য ও আত্মীয়তার বন্ধন আমাদের পরস্পরকে আরও টেনে নিয়ে এসেছিল। আমরা যারা বাঙালী ছিলাম তারা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না কি করে এতদিন আমাদের এতদূরে সামরিক চক্র সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। এক ভাষা, এক ভাবাবেগ, এক ধরনের কাপড় পরার রীতি। চালচলন সবই এক। অথচ এতদিন দূরে রাখার জন্য কী রক্তপাত ও অকথ্য অত্যাচার।

এয়ারপোর্ট থেকে পূর্বাণী হোটেল। পথে যেতে যেতে দেখলাম ছোট ছোট বাঁশ দিয়ে তৈরী দোকানের সারি। এগুলি পুড়িয়ে দিয়েছিল রাজাকার ও পাক-হানাদাররা। তাছাড়া রাস্তায় শুধু সাইকেল রিক্‌সার ঢেউ। ঢাকার সাইকেল রিক্‌সার ছাউনীর উপর নানা রং-এর প্ল্যাস্টিকের নিখুঁত নক্‌সা! সত্যি তার মধ্যেও শিল্পীর হাতের ছোঁয়া পাওয়া যায়। কিন্তু অত বড় শহরে বাস নেই বললেই চলে। খুব মাঝে মাঝে যে বাসগুলি আসে, বাদুড়ঝোলা হয়ে লোক ঝুলছে, অনেকটা আমাদের এখানকার মতোই। পার্থক্য শুধু, ঢাকায় বাসের ছাদেও যাত্রী দেখা যায়। শুনলাম পাকিস্তানের হানাদাররা বাসগুলি সারি করে দাঁড় করে ভাঙা কালভার্ট বা উড়িয়ে দেওয়া ছোট সেতুগুলি পার হত এবং শেষে নাকি ঐগুলি বেধড়ক পুড়িয়ে দিয়ে তারা চলে গেছে। তাই ঢাকার যানবাহনের ব্যবস্থা সত্যি কাহিল!

হোটেলে আমাদের ঘরগুলি প্রায় পাশাপাশি। অতএব ঐ দিকটা আমরাই প্রায় গুলজার করে রাখতাম। দুপুরের খাওয়া হোটেলে সারলাম। তারপর আয়েষা নবী ও তাঁর স্বামী এবং ফিরোজা যার ডাক নাম জ্যোৎস্না আমাদের নিয়ে চললেন একটি বধ্যভূমি দেখাতে। জায়গাটির নামটাও সেই রকমেরই লোমহর্ষক—শিয়ালবাড়ী! মীরপুর-মহম্মদপুরের নাম আমরা এখানেই যথেষ্ট পড়েছিলাম। অবাঙালীরা এই জায়গায় বেশী সংখ্যায় বাস করত। মীরপুরের কাছে শিয়ালবাড়ী। এইসব জায়গায় এখন পারমিট ছাড়া যাওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষ করে জহীর রায়হানের নৃশংস মৃত্যুর পর আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। শিয়ালবাড়ীর অধিকাংশ বাড়ী ভাঙাচোরা। বধ্যভূমির দিকের ঘরগুলির চিহ্ন প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে একটি এনামেলের থালা, ওখানে একটা গেলাস বা জিনিস রাখার ভাঙা বাক্‌স এই সাক্ষ্যই দেয় যে, এখানে মানুষের বাস ছিল। নবি সাহেব আমাদের সঙ্গে করে দেখাচ্ছেন। পিছুন নিল দুটি ছোট্ট রাখাল বালক। চারিদিক ঝোপঝাড় হয়ে গেছে, তবু তারই মধ্যে বসন্তের স্পর্শে লতার সাদা ফুল চারিদিকের জঙ্গল ঢেকে রেখেছে।

হঠাৎ একটি বালক আমাদের হাতছানি দিয়ে একটা গর্তের দিকে আসার জন্য ডাকল। 'আইয়েন, এই ছিল আমাগো পানি খাবার কুয়ো।' নেমে দেখি উপর পর্যন্ত কঙ্কাল আর মানুষের হাড়গোড়—সে এক বীভৎস দৃশ্য। শুনলাম কুয়োটি পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি গভীর ছিল। এমন আরও তিন-চারটি গর্ত ভর্তি নরকঙ্কাল উপচে পড়ছে দেখলাম। এক জায়গায় দেখলাম একটি মেয়ের লম্বা চুল পড়ে আছে। শরীরের বাদবাকিটুকু বোধহয় শকুন আর শিয়ালের টানে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আর একটি গর্তে দেখলাম, হাত-দুটির আঙুলের কঙ্কাল জোড়হাত হয়ে রয়েছে আর এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, রশি দিয়ে তাদের হাত বাঁধা হয়েছিল তার শেষ চিহ্ন। অন্য একটি স্তূপে কঙ্কালের মধ্যে পড়ে রয়েছে ভাল জুতো, টেরিলিনের শার্ট। সেই শার্টের হাতা দিয়ে যে হাতগুলি শক্ত করে বাঁধা হয়েছিল, সেই হাতগুলি আর নাই। কোন অবস্থাপন্ন মানুষ, কোন বুদ্ধিজীবীর হয়ত শেষ চিহ্নটুকু। মন ভারাক্রান্ত। হঠাৎ পিছন থেকে শুনি কচি গলায় গান গাইছে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। সুরে কোন বেসুরো টান নেই। দেখলাম রাখাল-বালকের একজন গাইছে গানটি। এত বীভৎস হত্যাকাণ্ডের রেশ এখনও মাটিতে মিশে যায়নি—তবু বাংলার ঐ মাটিকে কী প্রচণ্ড ভালবাসলে এত ত্যাগ সম্ভব! সেই ভালবাসারই গান সে গাইছে। গ্রামের ঐ অক্ষরজ্ঞানহীন দরিদ্র রাখালবালক, হঠাৎ ছড়া কেটে নেচে নেচে বলতে লাগল :

'তিরিশ কাটার ইলসে মাছ
তিরিশ কাটার বোয়াল মাছ,
ইয়াহিয়া খাঁ ভিক্ষা করে
মুজিবের দ্বারে দ্বারে'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে হানাদাররা এলে কি করতিস?' বলল, 'যদি ওরা দেখতে পেত, এক লম্ফে চরে পলাইয়া যাইতাম'। সে-কথা শেষ হতে না হতে সব ছোটটা কুয়োর উপরের একটা বড় হাড় দেখিয়ে বলল 'এটা গরুর হাড় না, এটা মানুষের হাড়'। স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। জীবন-মৃত্যু এদের এত নিকট দিয়ে গিয়েছে যে, মৃত্যুর ভয় এদের মন থেকে মুছে গেছে। শিয়ালবাড়ী থেকে ফিরতে ফিরতে এই কথাটাই বার বার মনকে নাড়া দিচ্ছিল।

পরদিন ২১শে সকালে প্রাতঃরাশের জন্য নীচে এসেই দেখি সুন্দর ফুটফুটে রং ফেটে পড়ছে এমন একজন প্রৌঢ়া মহিলা আমাদের আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে এলেন। ইনিই মহিলা পরিষদের সভানেত্রী বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে প্রখ্যাতা বেগম সুফিয়া কামাল। কত নাম শুনেছি তাঁর। আর তাঁর কবিতা আমাদের কত অনুপ্রেরণা কত ভাবাবেগ জুগিয়েছে। বিমানবন্দরে যেতে পারেননি বলে কী আপশোষ! কথায় কথায় বললেন, আমার মায়ের সঙ্গে কলকাতায় প্রথম মহিলা সমিতির কাজে নেমেছিলেন। খুব ভাল লাগল শুনে। কারণ আমার মা বেগম সামসুন নাহার মাহমুদ, হামিদা মোমিন ইত্যাদিদের সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠভাবেই কাজ করেছিলেন। বেগম সুফিয়া কামালেরও যে তাঁরই সঙ্গে এই কাজে প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল তা জানতাম না।

সকালে প্রথমেই আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ বারকত, সামাদদের শহীদ মিনারে এক-গুচ্ছ রক্ত লিলির তোড়া দিয়ে তাঁদের স্মরণ করি। বর্বর পাক-বাহিনী মিনারটিকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মানুষের মন থেকে কি করে সেই ভাইয়েদের আত্মদান মুছে যেতে পারে? এখন ইঁট দিয়ে গাঁথা সাদাসিধে একটি বিরাট চত্বর রয়েছে। যতদিন না কোন শিল্পী ঐ ঐতিহাসিক রক্তরাঙা দিনটির উপযুক্ত একটি মিনার গড়ে তুলতে পারবে ততদিনের জন্যে এই ব্যবস্থা।

শহীদ চত্বর থেকে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। ছোটবেলা থেকে এই জগন্নাথ হলের সঙ্গে কত বিখ্যাত শিল্পী, সাহিত্যিকদের নাম শুনেছি। আমরা আসছি, কিন্তু কাউকেই বিশেষ খবর দিয়ে যাওয়া হয়নি। তবে আমরা ভারত থেকে এসেছি শুনে ক্রমে কিছু ছাত্র এসে জড় হল। তাদের মধ্যে একজন সেই ভয়ঙ্কর ২৫শে রাত্রে ঐখানে কিছুক্ষণ উপস্থিত ছিল। সামনে একটি পুকুর, তার পাড় দিয়ে অনেকগুলো টিনের ঘর ছিল। সেখানেও ছাত্ররা থাকত। দেখলাম সেগুলি ধুলিসাৎ—চিহ্ন মাত্র কিছু খোয়া। ২৫শে রাত্রেই ট্যাঙ্ক নিয়ে জগন্নাথ হলে টিক্কা খাঁর বর্বরবাহিনী আক্রমণ চালিয়েছিল। কিছু সংখ্যক ছেলেরা গণ্ডগোল হবে অনুমান করে বাড়ী চলে গিয়েছিল। [illegible] উপর মেশিনগান চালিয়ে তিনতলা পর্যন্ত যাকে সামনে পেয়েছে তাকে শেষ করেছে। দেয়ালে জায়গায় জায়গায় গুলির ক্ষত এখনো দেখা যায়। সকলেই কথা বলছে উত্তেজিতভাবে। কখন কয়েকটি মহিলা মলিন বস্ত্র পরনে, মুখে চোখে দুঃখের করুণ ছাপ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে শেষ সারিতে, আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। চোখে পড়তেই আমরা তাদের কাছে কথা বলতে গেলাম। তাদের মধ্যে কেউ অবাঙালী, কেউ বাঙালী,। তাদের স্বামীরা ছিল হোস্টেলের দফতরি, দরওয়ান, জমাদার। তাদের দিয়ে ছাত্র ও মাস্টারদের (শুনলাম যে প্রফেসর জি সি দে-কেও মাস্টারদের আবাসে ঢুকে মেরেছে) লাশ এনে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে কবর দিইয়ে তারপর স্ত্রী-পুত্র সকলের সামনে তাদের গুলি করে হত্যা করেছে। যখন মেয়েরা সেই ঘটনাগুলি বলছিল, তাদের চোখের জল আমাদেরও চোখ ভিজিয়ে তুলল।

এই ঘটনা যে কতটা সত্য এবং কতটা মর্মান্তিক তার নিদর্শন পেলাম পরদিনই। জগন্নাথ হলের ঠিক উল্টো দিকে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রফেসরদের আবাস। শুনলাম একজন প্রফেসর ডাঃ নাসরুল্লা সেই নারকীয় রাতের ঘটনার কিছু অংশ ছবিতে ধরে রেখেছেন। আমরা ডাঃ নবীকে বললাম ঐ ছবিটা দেখতে যাব। তিনি আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে ক্যামেরাটি জানলা থেকে সামান্য উপরে তুলে ডাঃ নাসরুল্লা সাহেব যে কী করে ঐ পাক-সৈনিকদের র‍্যাডার বাঁচিয়ে ছবি তুললেন জানি না। খুব ছোট আকার, কিছুটা ঝাপসাও বটে। কিন্তু ছবিতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম পাক-সৈন্যরা কয়েকজন লুঙ্গী ও গেঞ্জীপরা লোককে একটা চাদরের মতন কাপড় মাঠে বেছাবার অর্ডার দিচ্ছে এবং কয়েকটি মৃতদেহ একে একে তারা তার উপরে রাখার আদেশ দিচ্ছে। সেই কাজ শেষ হলে তাদের নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হল ঐখানেই। একজন তখনো মরেনি। কি করুণভাবে যে সে বাঁচার জন্য অনুনয় করছে কি বলব। কিন্তু দয়াহীন পাকিস্তানী সৈনিক একমুহূর্তও ইতস্ততঃ না করে তাকে গুলি করে নিঃশেষ করে দিল। এরাই যে ঐ জগন্নাথ হলে মলিন বস্ত্র-পরা দুঃখী মা-বোনের স্বামীরা—তার কোন সন্দেহই রইল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম বীজ বপন হয়েছিল, সেখানে গিয়ে দেখি সেই যে মাঠের কোলে বটবৃক্ষের তলে কত ছাত্র আন্দোলনের সভা-সমিতি হত—সেই কোণাতেই একটি ছোট্ট বটগাছের চারা আর তারই পাশে আবারও একটি ছাত্রদের সভা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের মধ্যে ঢুকে পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক, মেশিনগান দাগিয়েছিল—তার ক্ষত এখন মেরামত হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা ঠিক যেমন আমাদের যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন নির্বাচনের দিন মুখর হয়ে এ-'করিডোরে' সে-'করিডোরে' হৈ-হৈ করে বেড়ায়, ঠিক তেমনি দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও। সেদিন তাদের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন। সামনে ঢুকেই দেখি দেয়াল-পত্রিকা আটকানো। একটি পড়লাম। মেয়েরা লিখেছে ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে। অন্য কথা স্পষ্ট মনে নেই। শুধু একটি কথা মনে গাঁথা রইল—লেখিকা লিখেছে রবীন্দ্রনাথের চক্ষে পলাশ ফুলের সৌন্দর্য কত রূপে ধরা পড়েছিল। আর আমাদের কাছে এই বসন্তে শহীদের রক্ত পলাশ ভিড় করে বহন করে আনছে বরকত, আবদুস সালামের স্মৃতি। কী সুন্দর উপমা। চারিদিকেই দেখলাম বাংলা-ভাষা নতুন শোভায় প্রস্ফুটিত হয়ে গানে কবিতায় ছোট গল্পে ছড়িয়ে পড়েছে। এপার বাংলার ওপার বাংলার যে প্রচীর আমাদের ভাষাকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছিল সেই দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এক ঢাকা শহরেই প্রায় আঠার উনিশটি দৈনিক পত্রিকা। এবং অধিকাংশেরই মহিলা বিভাগ আছে। মহিলা সাংবাদিকও অনেকে এলেন। এত মহিলা সাংবাদিক আমি কলকাতায়ও দেখিইনি—দিল্লীতেও না। একজন এলেন। তিনি প্রেস ফটোগ্রাফার। নাম সায়েদা খানুম। বড় চমৎকার মেয়েটি। বার বার বলতে লাগলেন—'যেতে ইচ্ছে করছে না আপনাদের ছেড়ে। আরও আপনাদের কাছে শুনি এইটাই চাই।' তাঁরই সঙ্গে এসেছিলেন দৈনিক বাংলার মহিলা বিভাগের সাংবাদিক মাফরুহা চৌধুরী। আরও অনেকে—সকলের নাম মনে রাখতে পারিনি।

আমরা শাঁখারী পট্টিতে অল্পক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম। পুরোন ঢাকার অতি সরু গলি যেমনটি দেখা যায় আমাদের পশ্চিমা দেশের চৌকবাজারগুলিতে—তেমনি আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাস্তা আর ঘিঞ্জি লোকালয়। দুই দিকে গলির মুখ আটকিয়ে দিয়ে যে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত করেছিল পাকবাহিনী তার চিহ্ন প্রতিটি বাড়ীতে দেখলাম। ভেতরগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কি করে ইমারৎগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেইটাই আশ্চর্যের কথা। কী পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড! সেই সবেমাত্র দেখলাম লোকজন এলাকায় ফিরছে। এই অঞ্চলের অনেকেই ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

বিকেলে রোকেয়া হলে আমাদের সম্বর্ধনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের এইটিই একমাত্র 'হল'। তার আগে একটি ছোট্ট ঘটনা না বলে পারছি না। রোকেয়া হলে না গিয়ে ভুল করে গাড়ীর চালক আমাদের ইডেন হোস্টেলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কোন ব্যবস্থা নেই দেখে আমাদের সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি উপরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করছেন এমন সময় দেখি দু-জন বয়স্ক মহিলা—দেখে মনে হয় 'মেট্রন' ধরনের কেউ—তাঁরা এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কে?' আমরা থতমত খেয়ে বললাম যে, আমরা ভারত থেকে

এসেছি, রোকেয়া হলে যাব। ভারত থেকে এসেছি শুনেই দুজনেরই মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। আমাদের বার বার বলতে লাগলেন, 'ওঃ ভারত থেকে এসেছেন—একটু বসুন, আপনাদের কাছ থেকে কত গল্প শুনতে ইচ্ছে করে।' কথাগুলির মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। কারণ মানুষগুলোকে দেখলেই বোঝা যায় তারা বড়ই সরল সাদাসিদে। আমরা যে চারদিন ছিলাম, সর্বত্র ভারত সম্পর্কে ভালবাসা অপর্যাপ্ত ও কৃতজ্ঞতা দেখেছিলাম। এবং সেটার সাক্ষ্য পেয়েছিলাম বেশীর ভাগ সাধারণ সাদামাটা মানুষের কাছ থেকে।

রোকেয়া হলে পৌঁছে দেখি মেয়েরা সবই সাগ্রহে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। হলের প্রোভোস্ট মেহেরুন্নেসা চৌধুরী এবং আবাসিক শিক্ষিকারা—যেমন বেগম রওসনআরা সকলেই অপেক্ষমান। আমাদের পরিচয় করানর পর যথারীতি আদর-আপ্যায়ন হল। অরুণা আসফ আলি, 'ছল' ইউনিয়নের সম্পাদিকা—একটি খুব চটপটে বুদ্ধিদীপ্ত মেয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আমাদের কাছে যে-কথাটা বার বার ধরা পড়ল যে, এরা সকলেই দেশ ভাগ হবার পরের যুগের মেয়ে। '৫২ বা '৫৩-তে এরা জন্মেছে। তাই এদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ও বিভেদ সেটা সেইভাবে ঢোকে নি রক্তে যেমন করে ঢুকে গিয়েছিল আমাদের যুগের লোকেদের মধ্যে। এরা ত পাকিস্তানী বিভেদ ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়েছে জান-প্রাণ দিয়ে। তাই এই যে ছাত্রছাত্রী দেখলাম—তারা এক নতুন যুগের এবং নতুন পথের পথিক। বড় ভাল লাগল ওদের সঙ্গে কথা বলে। ওরাও আমাদের ছাড়তে চায় না, আমরাও না। রোকেয়া হলে ২৫শে রাতের আগেই অধিকাংশ মেয়েকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। বর্বর পাক সৈন্যরা এসে সর্বত্র নেকড়ে বাঘের মতন খুঁজেছে কিন্তু পায় নি কাউকে। প্রোভোস্টের স্নানের ঘরের অন্তরালে সাতটি মেয়েকে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। হানাদাররা এসে মেহেরুন্নেসা চৌধুরীকে যথেষ্ট অপমান করেছিল কিন্তু ভাগ্যি ভাল তাঁর আবাস তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করে নি। শেষ অবধি রোকেয়া হল ছেড়ে আমাদের প্রতিনিধি দল গেলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভিবাদন জানাতে। আমার শরীর খারাপ থাকায় যাওয়া হয় নি।

রাতে ছিল তাইজুদ্দিন আহমেদ সাহেবের বাড়ীতে খাওয়ার নেমন্তন্ন। তাঁর স্ত্রী জোহরা সুদক্ষ রাঁধিয়ে। বাংলা দেশে আসা অবধি আমরা যারা বাঙালী তারা প্রায়ই বলতাম 'ভাই ইলিশ মাছ আর কৈ মাছ খেলাম না—এ কি রকম বাংলাদেশে আসা'। আর হোটেলের লোকেরা মাথা নেড়ে বলত—'ও সব এখানে পাওয়া যাবে না'। বেচারা 'আইভি' পর্যন্ত মুখড়ে পড়ে চুপ করে যেত। কিন্তু জোহরা সে রাতে যা ইলিশ মাছ, কই মাছ, গলদা চিংড়ি, রুই মাছ আর সভার উপরে বিরাট আকারের 'প্রাণহরা' খাওয়ালেন তার স্মৃতি আর কোনদিন জিহবা থেকে মুছে যাবে না!

২২শে মার্চ সকালে আমরা বাংলাদেশ সরকার যে পুনর্বাসন বোর্ড তৈরী করেছেন তার অধীনে যে 'ক্লিনিক' স্থাপিত হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানটি দেখতে গেলাম। যে সব মেয়েদের পাক সৈন্যরা অত্যাচার করেছে তাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। সেখানে গিয়ে দেখি কি করুণ দৃশ্য! কল্পনা করা যায়—সেখানে এগার, বার, তের, চৌদ্দ বছরের মেয়েদের ধরে কি পাশবিক অত্যাচার করেছে ঐ পশুর দল। এদের করুণ চাহনীর পিছনেই তাদের মর্মান্তিক কাহিনী প্রকাশ পায়। আমি আর মুখ ফুটে তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম দেখলাম। যেখানে লাখের কোঠায় মেয়েদের উপর অত্যাচার হয়েছে সেখানে আরও বেশী সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল। তবে এই কাজ শুধুমাত্র শুরু হয়েছে। আর আমরা যারা নোয়াখালিতে বা অন্যান্য দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় কাজ করেছি তারা জানি যে মহিলা সমিতির স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীরা যদি গ্রামে বাড়ী বাড়ী না যান তাহলে কখনো এদের অভিভাবকদের বা এদের সমাজের ভ্রুকুটির ভয় কাটিয়ে এই সব প্রতিষ্ঠানে আনা যাবে না। শুধু সরকারী কর্মচারীর দ্বারা এই ভয় দূর করা ভয়ানক কঠিন। তাছাড়া এদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন আছে। তাদের শিক্ষা, তাদের উপার্জনের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া—এও এক মস্ত বড় কাজ। সমস্ত মহিলা প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাতেই এ কাজ সম্ভব—নয় ত নয়।

আরও একটি জটিল সামাজিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা। কোন একটি বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছিল যে, যে জারজের ধমনীতে পাঞ্জাবীর রক্ত বইছে তার বাংলাদেশে কোন স্থান থাকতে পারে না। আমাদের 'প্রেস কনফারেন্সে'ও এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সাংবাদিকরা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমরা এদের ভারতে স্থান করে দিতে পারি কি না। আমরা স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলাম যে, শিশু নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আর বিশেষ করে যেখানে পরিবার, সমাজ, সরকার মেয়েদের ইজ্জৎ রক্ষায় অপারগ হয়েছেন সেখানে মা ও শিশু উভয়কেই স্বাধীন বাংলাদেশ তার ক্ষত সারাবার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি কি করে পাবে? আমাদের বা বাংলাদেশের রক্ষণশীল চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই। তবে এ আশ্বাস দিয়ে এসেছি এই শিশুদের যদি তাদের নিজেদের দেশে স্থান না হয় নিশ্চয়ই আমরা তাদের জন্য নতুন অভিভাবক সংগ্রহ করে দেবার চেষ্টা করব।

রাষ্ট্রপতি আবু সইয়েদ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আমরা দেখা করে এসেছিলাম। আয়ুব খানের জামানায় সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের জন্য শ্রেষ্ঠ মার্বেল পাথরের একতলা রাজপ্রাসাদ সুন্দর বাগানের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার ঠিক আগে সমস্ত বাঙালী অফিসারদের এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের শেষ করে দেবার জন্য। ভারতীয় বিমানবাহিনী এই খবর পেয়ে ঠিক সেই দিন সকালে সেই বিরাট হল ঘরটি বোমা মেরে ধ্বংস করে দেয়। আবু সৈয়েদ চৌধুরী সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরটি দেখালেন, এবং বললেন যে, মাত্র কিছু দিন আগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসার প্রাক্কালে সেই হলটি মেরামত হয়েছে। এখন বোঝাও যায় না যে এত ক্ষতি হয়েছিল এখানে।

সেই দিনই বিকেলবেলা বাংলা একাডেমীর মাঠে আমাদের জন্য মহিলা পরিষদের সভা আহবান করা হয়েছে। সভার পরিবেশটি দেখে মন খুশিতে ভরে গেল। বিরাট একটি বটগাছ। তার তলাটি বাঁধান। সুন্দর অকৃত্রিম একটি স্টেজ। চারিপাশে বড় বড় গাছের ছায়া। তারই নীচে আমাদের সভার স্থান। পিছনে যে পুরোন যুগের বাড়ী সেইখানেই মোনেম খাঁ ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলীবর্ষণ করার আদেশ স্বাক্ষরিত করেছিলেন। আজ সেই বাড়ীতেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এমনই ইতিহাসের ফের।

মেয়েরা দলে দলে আসতে লাগলেন। বিকসাতেই বেশী। পায়ে হেঁটেও অনেকে। রবিবার নয়, তাই শ্রমিক মেয়েরা আসতে পারেন নি বলে তাদের কি দুঃখ। গাড়ী চড়েও অনেকে এসেছেন। সারা মাঠ ছেয়ে গেল আস্তে আস্তে। বোরখা-পরা মেয়ে হাতে গোনা যায়—চার বা পাঁচজন। আর সকলেই যেন ঠিক আমাদের একজন—আচারে, ভাষায়, পরিধানে। সকলেরই মুখে চোখে উৎসাহ আমাদের কথা শুনবার জন্য, জানবার জন্য। আওয়ামী লীগের বদরুন্নেসা, রোকেয়া, নুরজাহান এসেছেন। আরও কত মেয়ে। কিন্তু সকলের উপরে ছাপিয়ে একটি মুখই আমার চোখের সামনে ভেসে আসে। হয় ত সেই বেদনাভরা চোখ দুটি বাংলাদেশের হাজার লক্ষ মেয়েদের বুকভরা দুঃখের প্রতীক বলেই তাঁকে ভুলতে পারি না। আলাপ হল পাঁচ মিনিটের জন্য। তাঁর ঠিকানা নেই আমার কাছে। নাম সামসুদ্দিন বেগম। তাঁর প্রথম নামও জিজ্ঞাসা করার অবকাশ পাই নি। কি সুন্দর দেখতে। তিরিশের বেশী বয়স নয়। ফর্সা সুন্দর ছিমছাম চেহারা। শুধু চোখে সেই করুণ চাহনী। তাঁর স্বামী ছিলেন চাটগায় কাপটাই প্রোজেকটের ইঞ্জিনীয়ার। বললেন, ২৫শে মার্চের পর আমরা বাঙালী-অবাঙালী সকলে একসঙ্গে খাচ্ছি থাকছি। মনে একবারও ভয় পাই নি কারণ সকলের সঙ্গেই আমাদের সদ্ভাব। কিন্তু তখন ত সামরিক রাজ। একটি অবাঙালী মেয়ে সামরিক অফিসারের কাছে গিয়ে বলল, 'এই সাহেব আমাদের মেরেছেন'। বলতে না বলতে হুকুম হল সামসুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে এসো। সেই যে তাকে নিয়ে গেল আর

কোন দিন তাঁকে দেখতে পেলাম না। এক মুহূর্তের জন্য চোখে জল দেখলাম। ঐ কয় দিনে কত যে অত্যাচারের ঘটনা তাঁদের প্রিয়জনদের কাছে শুনেছি তার শেষ নেই। গা শিউরে ওঠে—মানুষ কি করে এমন পশুর মতন বর্বর ব্যবহার করতে পারে। আমাদের কাগজে অনেক পড়েছি যে রক্ত শুষে নিয়ে মানুষকে এই পশুরা নদীতে ফেলে দিত। বরিশালের মোইনুদ্দিন সাহেবের ভাইয়ের জামাইকে ও মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে সি'ড়ির উপর বসিয়ে রেখে জামাইকে ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে তার মৃতদেহ ফেলে দেবার কাহিনীও শুনলাম। সাহেদুল্লাহ্ কাইজার সাহেবের ও তার ভাই জহীর রাইহানের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা আজ প্রায় সকলেই জানেন। তেমনি বর্বরভাবে নাকি বিখ্যাত রেডিও গায়ক আলতাফ মাহমুদ সাহেবকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সংগে তাঁর আত্মীয়ও ধরা পড়ে। তিনি বলেছেন এক ঐ নরপিশাচের দল দরজা খুলল। তিনি দেখলেন আলতাফ মাহমুদ সাহেবকে উপরে পা বেঁধে মাথা ঝুলিয়ে কি অমানুষিকভাবে মারছে। আর তার পাশে আর একজনের মুখে পেরেখের মতন জিনিস ফুটিয়ে কি নির্যাতন করছে, সে কল্পনার অতীত।

মহিলা পরিষদের সভায় অরুণা আসফ আলী প্রথম বক্তৃতা দিলেন স্বাধীন বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। আমার বলার মধ্যে আমি সভাস্থলের পরিবেশের কথা উল্লেখ না করে পারি নি। দুইটি কথাই বলেছিলাম মনে পড়ে। যে দিন পাক হানাদারেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিখ্যাত বটগাছটি উপড়িয়ে ফেলেছিল, তারা ভুলে গিয়েছিল যে, বাংলার মাটিতে আরও কত শত শত বটগাছের ছায়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েৎ হবে এবং সেখান থেকে 'জয় বাংলা' ধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করবে বাংলাকে মুক্ত করবে। যেমন আজকের এই বটবৃক্ষের তলে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের মায়েদের সংগে মিলন হয়েছে স্বাধীন বাংলার মাটিতে। আরও একটি কথা মনে পড়ে যায় : যে কবিগুরু আপনাদের ও আমাদের উভয়ের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা তাঁর সেই প্রিয় শান্তিনিকেতনে এমনি খোলা আকাশের নীচে গাছের ছায়াতলে রয়েছে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। নয় মাসের বিভৎসতা থেকে রেহাই পেয়ে আমরা খোলা আকাশের নীচে মিলিত হয়েছি, আর প্রতিজ্ঞা করছি, 'হে শস্য শ্যামলা বাংলা—তোমায় আমরা আরও সমৃদ্ধ করব। এত দিনের রিক্ততা হাত থেকে রক্ষা করব'। দেখলাম স্বাধীন বাংলাদেশের মা-বোনেরা আমাদের মতই ভাবাবেগের মানুষ। কত লোক এসে পরে জড়িয়ে ধরে আমাকে, আমার ঐ কথাগুলির জন্য অভিনন্দন জানালেন। বহু জায়গায় মাঠে ঘাটে শহরে গ্রামে বক্তৃতা দিয়েছি—কিন্তু এমন সুন্দর পরিবেশে কখনো ভাষণ দেবার সুযোগ হয় নি।

বেশীক্ষণ সকলের সংগে কাটান গেল না। শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের সংগে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা হয়েছে শুনলাম। তাঁর অফিসে গেলাম। বাইরে লোকে লোকারণ্য। আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। শেখ সাহেবকে কলকাতার ময়দানে কাছ থেকেই দেখেছিলাম। তাঁর দীর্ঘ সুন্দর চেহারার মধ্যে যেন একটা দৃপ্ত ভাব বেশী করে সেদিন চোখে পড়েছিল। এই দিন এত নিকট থেকে দেখলাম সুপুরুষ চেহারার মধ্যে অতি নম্র ভাব। অরুণাদিকে ত চিনলেনই। আমাকেও বললেন, আপনাকে ত সকলে চেনে। বেগম হবিবুল্লাহ লক্ষ্ণৌ থেকে একটি চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবী ও টুপি উপহার দিলেন। তার নাম নাকি মুজিব ক্যাপ'।

শেখ সাহেবের ইনটারভিউয়ে আমরা তাঁকে বেশীক্ষণ আটকাই নি। বসতেই বললেন যে, মানুষ হাসি মুখে দেশে ফিরছে। মুখে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' কিন্তু আমার কি হাল—তাদের যে খেতে দেব এমন অবস্থাও নেই। পাক হানাদাররা যাবার সময় সমস্ত গোলায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। এমনি থোকা থোকা টাকা পুড়িয়েছে, সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। আমাদের এখানে পুনর্বাসনের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে একটি কথা বলেছিলাম 'ক্যাম্প করে রাখবেন না। বাঁশ আর খড় ও ঘরামীর সামান্য খরচ দিন। তাঁরা তাঁদের পোড়া ভিটে দখল করে বসুন। শেখ সাহেব বললেন, তাই করা হচ্ছে। তবে খাবার জন্য ত টাকা চাই। পরিবারপিছু হাজার বা হাজার দুই এককালীন দান দেবার কথা বললেন। 'বীরাঙ্গনাদে'র কথাও হল—অর্থাৎ যাদের ওপর পাক পশুরা অত্যাচার করেছে। শেখ সাহেব যে বোর্ড স্থাপন করেছেন এই কাজের জন্য এবং ক্লিনিক করার পরিকল্পনা নিয়েছেন তাতে এখনো এত কম মেয়েরা এসেছে কেন—এই প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম 'এ কাজ শুধু মাইনেকরা সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে হয় না। মহিলা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামের বাড়ী বাড়ী যাবে, অভিভাবকদের সন্দেহ দূর করবে, যে কেউ যেন না জানতে পারে। মেয়েটিকে সাহস দিতে হবে যে তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করান এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদের। শেখ সাহেব শুনলেন। বললেন, দেখি আলোচনা করে। বেগম সুফিয়া কামালের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, এত বেশী মহিলা সমিতি—সেই ত মুস্কিল! ইঙ্গিতটা আমরা বুঝলাম। তবে এটা যদি সত্য হয় যে, প্রায় লক্ষাধিক মেয়েরা দুর্দশাগ্রস্ত, তবে সব মহিলা সমিতির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

শেখ সাহেবের ওখান থেকে গেলাম বেগম মুজিবের সংগে দেখা করতে। অত্যন্ত সরল সুন্দর তাঁর ব্যবহার। ঐ নয় মাসের কাহিনী কিছু কিছু বললেন। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে চলে এলাম।

২৩শে মার্চ আমাদের সফরের শেষ দিন। কেউ ছুটেছেন ঢাকাই শাড়ী কিনতে। কেউ বন্ধুদের সংগে দেখা করতে। আমাদের একজন প্রতিনিধির সংগে তাঁর পরিচিত অবাঙ্গালী মুসলমান একটি পরিবার দেখা করতে এলো। এত কাণ্ডর পরও তাঁরা নির্বিবাদে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছেন এই চিত্রটা দেখেই মনে হল যে 'বেহারী মুসলমানদে'র উপর অত্যাচারের কাহিনী অতিরঞ্জিত!

এই দিন বিকেলে আওয়ামী লীগের মহিলা বিভাগ আমাদের একটি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নুরজাহন মুরশেদ সভানেত্রীত্ব করলেন এ'রা All Pakisthan Womens' Association -এর বাড়ীতেই সভাটি ডেকেছিলেন। আগে এই সমিতিতে বড় বড় নবাব গিন্নি ও পশ্চিম পাকিস্তানের ধনী পরিবারের মেয়েদের ছাড়া আর কারুর স্থান ছিল না। বাঙ্গালী সাধাণ মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত মেয়েরা এখানে প্রবেশ করতেন না। এইখানে হঠাৎ আলাপ হল আমাদের কত পরিচিত, কত প্রিয় প্রখ্যাত সামসুন নাহার মাহমুদের পুত্রবধূর সংগে। নাম মুসফিকা মাহমুদ। স্বামী ছিলেন রাজশাহী জেলার ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ। পাকিস্তানী নরপিশাচেরা তাঁকে প্রথম দিকেই ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলী করে হত্যা করেছিল যাতে বাঙ্গালী উচ্চপদের অফিসাররা আর না থাকে।

সেখান থেকে আমাদের শেষ অনুষ্ঠান বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির পক্ষ থেকে ভোজ। ইতিমধ্যেই আগের রাতে মহিলা পরিষদের ভোজ, আবার আজ বদরুন্নেছা আহমেদের দ্বারা আহূত এবং হাসনা হাজারীর বাড়ীতে কি আদর-আপ্যায়নের আয়োজন। এখানে কবীর চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর সংগে আলাপ। অনেকে বেথুন কলেজে, অনেকে ব্রেবোর্ণ কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্রী। তাই তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক বন্ধুদের কথা কতই না জিজ্ঞেস করলেন। আন্তরিক আবহাওয়ার মধ্যে তার মাঝে জ্যোৎস্নার বোনঝির সুললিত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীত—খুব ভালভাবে কাটল এই শেষ সন্ধ্যা।

পর দিন সকালে বিদায়ের পর্ব। যখন তেজগাঁও বিমান বন্দরে পৌঁছেছি, দেখি এ সকালে সংসারের সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন কত মেয়েরা। জবেদাখাতুন চৌধুরী তাঁর ৭২ বছর বয়স ভুলেছেন। রেবেকা ভুলেছে তার একটু পরেই ছুটতে হবে বরিশালের স্টিমার ধরতে, মহিলা পরিষদের সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে হবে তাকে।

সত্যি কি আন্তরিক হৃদ্যতা। তার মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। সাধারণ মানুষের চোখে মুখে কথার ব্যবহারে যে আদর আমরা পেয়েছি তার তুলনা নেই। মুক্ত বাংলাদেশে প্রথম মহিলা দলের একজন প্রতিনিধি হতে পেরে যে অভিজ্ঞতা আমি পাবার সুযোগ পেলাম, তা ভুলবার নয়। আরও হয় ত অনেকবার বাংলাদেশে যাবার সুযোগ পাব। কিন্তু এই প্রথম স্পর্শে স্বাধীন বাংলার প্রাণস্পন্দন পেলাম যেভাবে, সেটা ভুলতে পারব না।

গুনাহগার

মায়া বসু

'মনু রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ' গানের কলি গুণ গুণ করে ভাঁজতে ভাঁজতে হাকিম সাহেবের দাবাখানা থেকে 'অত্যাশ্চর্য দাকিমী দাওয়াই'-এর শিশিটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে বাড়ি মুখো কয়েক পা চলতে চলতেই হবিব আলীর গান থেমে গেল। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল। আজও রাস্তার আলোগুলো জ্বলেনি। পথের দু পাশে ঝোপঝাড় গাছ-গাছালির ফাঁকে-ফোকরে জোনাকিরা টিপ-টিপ করছে। জ্বলছে নিভছে। হিজল ডাহুক জলপাই গাছের আড়ালে চাঁদের টুকরোটাও অদৃশ্য। কীট-পতঙ্গের কি-র-র-র কট্টর কট্টর, ঝিঁঝিঁ, পাখির পাখার শব্দ, হাট্টিটি পাখির ট্রি-ট্রি-ট্রি ছাড়া আর কোন মানবিক অথবা যান্ত্রিক শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ আগে হাকিম সাহেবের দাবা-খানার সেই 'অত্যাশ্চর্য বলবর্ধক...' ইত্যাদি দাওয়াইটা নেবার সময় গোটা কতক

শেয়ালের হুক্কা-হুয়া কানে এসেছিল, কিন্তু তখনি তখনি নবাবগঞ্জের দিক থেকে এক ঝাঁক গুলি-গোলা ফায়ারিং-এর শব্দে তারাও চুপ হয়ে গেছে।

পথেঘাটে লোকজন দূরে থাক, একটা কুকুর বেড়াল কি গরু ছাগলও চোখে পড়ল না হবিব আলীর।

চোখে পড়বার কথাও নয়।

গত সপ্তাহে জঙ্গীশাহী ফৌজের বিমান থেকে বোমাবর্ষণের ফলে উত্তরবঙ্গের এই শহরটি প্রায় লোকশূন্য। ইস্কুল কলেজ দোকান পাট সব বন্ধ। জীবনযাত্রা প্রায় অচল। জঙ্গী সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচার আর এলোপাথাড়ি লুটপাটের পর সমস্ত শহরটা যেন একটা শবাগার হয়ে আছে। যারা বোমায়, গুলিগোলায় মরেছে, তারাতো মরেইছে এমন কি যারা এখনো মরেনি তারা যে কে কোথায় কোন ধানক্ষেতে পাটক্ষেতে লুকিয়ে আছে, অথবা দেশছাড়া হয়ে পালিয়ে গেছে, সে খবর বোধহয় খোদাতালাও জানেন না।

হবিব আলীর পাড়াটাতেই কি কম ধরপাকড় হয়েছে? কম মানুষজন খুন-জখম হয়েছে? হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা শুধু গৃহদাহ লুটপাটে আর খুন জখমেই ক্ষান্ত হয়নি, গৃহস্থ বধূদের, মেয়েদের ওপর ধর্ষণ পাশবিক অত্যাচার বলাৎকারও চালিয়েছে অমানুষিকভাবে নরপশুর মত।

অবশ্য তাতে হবিব আলীর ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। এই শহরের অর্ধেকের ওপর মানুষ খুন হয়ে গেলেও তিনি নিরাপদে থাকবেন। হবিব আলী আওয়ামী লীগের লোক নয়। ইয়াহিয়া পার্টির। অবশ্য এটা বাইরের লোকে জানে না।

মেজর রেজাউদ্দিন ক্যাপ্টেন সুলতা খানের পাঞ্জাব রেজিমেন্ট শহর দখল করেছে। বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে এই শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো। হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে। কিন্তু তবু একটা ভীষণ অসুবিধা আছে তাদের। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা উত্তর বাংলার এই সহরটি সম্বন্ধে তারা একেবারেই ওয়াকিবহাল নয়। ভালমন্দ লোক, শত্রু মিত্র আওয়ামী অথবা ইয়াহিয়া পার্টির মানুষদের তারা একেবারেই চেনে না। হবিব আলী তাদের এই বিপদে ও সমস্যায় বহুবিধভাবে সাহায্য করেছেন। ক্যাপ্টেন সুলতা খান, মেজর রেজাউদ্দিন তাঁকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর দেশভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যথা সময়ে তিনি তাঁর দেশসেবার সততার পুরস্কার পাবেন, এ প্রতিশ্রুতিও তাঁরা দিয়েছেন হবিব আলীকে। তাঁর বাড়িঘর, পরিবারবর্গের কোন বিপদ ঘটবে না, এ আশ্বাসও পেয়েছেন আলী সাহেব।

পলিটিক্স ইজ এ ডার্টি গেম। কিন্তু হবিব আলী তো আর ইচ্ছে করে এ গেমে নিজেকে জড়াননি। পাকে-প্রকারে জড়িয়ে গেছেন। বাংলাদেশের দেড় কোটি মানুষকে মেরে ফেললে নাকি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ হয়ে যাবে। তখন নতুন করে নির্বাচিত গণপরিষদ ডাকা হবে। আর তখন এখানকার নির্বাচনের ফলে হবিব আলী-জিন্নাসাহেবের, ইয়াহিয়া, টিক্কা খান সাহেবের একান্ত অনুগত সেবক হবিব আলী হোমরা-চোমরা একটা কিছু—আঃ! খোদা হাফেজ—আঃ—

অন্ধকারে একটা ইঁটের টুকরোয় হোঁচট খেয়ে থমকালেন। এদিক ওদিক তাকালেন। গা ছম ছম করতে লাগল। কেউ কোথাও নেই। কী ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা আর অন্ধকার!

হবিব আলীর মনে হল, দেহহীন প্রেতের মত কারা যেন তার অনুসরণ করছে। তিনি যেন একটা অন্ধকার কফিনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে, হাতড়ে হাতড়ে বাইরে আলোবাতাসের পৃথিবীতে বেরিয়ে আসবার জন্যে পথ খুঁজে মরছেন।

কিন্তু পারছেন না।

কতকগুলো চেনা-পরিচিত, অচেনা অপরিচিত মৃত মুখ রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তার সব কাটি বেরুবার পথ বন্ধ করে উদ্যত অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

হবিব আলী ভয় পেলেন। নিজের ওপর বিরক্তও হলেন। দিন দিন তিনি যেন একটা ভীরু কাপুরুষে পরিবর্তিত হচ্ছেন। কেন এত ভয়? কিসের এত ভয়? কাকে এত ভয়—

আর অতই যদি ভয়, তবে দিনের বেলা বাদ দিয়ে, সহরের এই বিপদজনক যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে সন্ধ্যা পেরুনো অন্ধকারে তার বাড়ি থেকে রাস্তায় না বেরুনোই উচিত ছিল।

কদিন থেকেই শরীরটা খারাপ মনে হচ্ছিল। বুক ধড়ফড়ানি। চমকে ওঠা। ভয় পাওয়া। দিনের বেলা বেরুতে ইচ্ছে হয়নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে হাকিম সাহেবের কাছে যেতে হয়েছিল। শরীর মন ভাল হবার একটা বলবর্ধক দাওয়াই এর জন্যে।

না হবিব আলীর শক্তিসামর্থ্য বা তাগদের অভাব নেই। প্রত্যেক দিন গোটা চারটি ডিম ভালমন্দ খাবার খেয়ে সেই শক্তিসামর্থ্য ও তাগদটাকে তিনি জিইয়ে রেখেছেন। টাটকা আপেলের মত সুন্দরী কচি বৌ নসীবনকে সুখী করছেন। নিজেও সুখী—

নিজেও সুখী হয়েছেন। হয়েছেন কি?

হবিব আলীর এককালের আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, তাঁর জমিজিরেতের মালিক এ অঞ্চলের জমিদার আজিমুল্লা সাহেবের একমাত্র মেয়ে ফরিদা বেঁচে থাকতে এ জীবনেও বোধহয় তিনি সুখী হতে পারবেন না, শান্তি পাবেন না। কেননা ফরিদা বেঁচে থাকতে, জীবন্ত থাকতে বোধহয় কোন দিনও তাঁর কাছে ধরা দেবে না।

ফরিদার কথা মনে পড়তেই হবিব আলীর সমস্ত শরীরটা চনমন করে উঠল। প্রতি রক্ত-কণিকায়, স্নায়ুকোষে এক দারুণ উত্তেজনা উন্মাদনা অনুভব করলেন।

ফরিদা! জীবনময়ী মোহময়ী বেহেশ্তের হুরী।

ওই অহংকারী আত্মগরিমাময়ী দাম্ভিক রূপসীর পর্বতপ্রমাণ দর্পচূর্ণ না করা পর্যন্ত হবিব আলীর মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। অর্থবিত্ত প্রতিপত্তি খ্যাতি, একদিন যার বিন্দুমাত্রও ছিল না, আজ তার চূড়ায় বসেও হবিব আলী একেবারে নিঃস্ব দরিদ্র।

আজিমুল্লা—সেই খানদানী, রইস অভিজাত জমিদারটির বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধে হবিব আলীর গা ঘিন ঘিন করে বমি উঠে এলো। অন্ধকারে অস্পষ্ট সেই পরিচিত জীবনের প্রথম দিককার বহু বছর যেখানে কেটেছে সেই পুরোনো সেকেলে বৃহৎ বাড়িটার দিকে তাকালেন। বাড়িটা যেন একটা পোড়ো কবরখানা হয়ে আছে। দখলদার জঙ্গী বাহিনীরা এ বাড়ির মানুষগুলোকেই শুধু মেরে ফেলেনি, সর্বস্ব লুণ্ঠন করে দরজা-জানালাগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। নফর-বাঁদীরা কতক পালিয়েছে কতক মরেছে। কে জানে হয়তো তাদের কারু গলিত বিকৃত পচা লাশের গন্ধে বাতাসকে বিষাক্ত দুর্গন্ধময় করে তুলেছে। আওয়ামী নেতা আজিমুল্লা সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে হেড কোয়ার্টারে। খোদাতালাই জানেন তার অদৃষ্টে কী আছে, গুলি না বেয়নেটের খোঁচা।

আর ফরিদা!

সেই অনমনীয়া উদ্ধত প্রকৃতির রূপসীটি এবারও, এই এত বড় বিপদের মুখে, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও হবিব আলীকে আরো একবার অপমান করল। তার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেবার জন্যে হবিব আলীর শত সহস্র অনুনয় বিনয় উপরোধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করে এই সহরের ক্রীশ্চান অ্যাসোসিয়েশনের মেয়েদের বোর্ডিং হাউসে চলে গেল।

হবিব আলীর চোখ দুটো দুখণ্ড অংগারের মত অন্ধকারে দপদপ করে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হল।

একবার দুবার নয়। বার বার। সুযোগ পেলেই ফরিদা তাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করেছে। সকলের চোখের সামনে তাকে উপহাসের বিদ্রূপের পাত্র করে তুলেছে। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ফরিদার রইস আব্বাজানের সাহায্য না পেলে তাঁর প্রতি দীনদরিদ্র দূর সম্পর্কের আত্মীয় সন্তান অসহায় অনাথ হবিব আজ লেখাপড়া শিখে মাথা তুলে দশজনের একজন হয়ে দাঁড়াতে পারত না। সেকথা হবিব আলী ভুলে যাননি। ফরিদা তাকে প্রতিপদে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

আজিমুল্লা সাহেবের অনেক জমিজমা। অনেক প্রজা। মস্ত বড় ইমারৎ। অনেক

নফর বান্দা বাঁদী দাসী। অনেক আত্মীয়-স্বজন—

কিন্তু এখন? হবিব তাঁর চেয়ে কিসে কম? কোন্ দিকে কম? প্রায় একশো বিঘে ধানজমি। প্রজা। মস্ত পোলট্রি। জমা নেয়া দুটো মাছভর্তি বিল। মস্তবড় প্রাসাদ না হলেও তাঁর গরীবখানা একেবারে ফেলনা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরিদা তাকে এতটুকু সমীহ করে না। বরং এই সেদিনও দেখা হতেই মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'হবিব সাহেব, শুনলাম গুণময়ের বাস্তুভিটের কবুলাখানা এখনো নাকি আপনি হাতছাড়া করেন নি? বেচারীর ওই জমিটুকুর ওপর আর অত লোভ করছেন কেন? একটা তো মেয়ে। সাদী দিলেই ঘর খালি। বাকী ওই একটা ছেলের জন্যে জালজোচ্চুরি করে আর সম্পত্তি নাই বা বাড়ালেন।'

গা জ্বলে যায় হবিব আলীর মেয়েটার কথা শুনলে।

কথা নয় যেন মিছরির ছুরি। আগুনের চাবুক। হবিবের বুকখানা কেটে কেটে ফালা ফালা করে দেয়।

অথচ ওই মেয়ের জন্যে তিনি কি না করেছেন? যখন ছোট ছিল, ওর প্রত্যেকটি হুকুম তামিল করেছেন। ওর কথায় ওঠবোস করেছেন। একদিন ওকে সাদী করবেন এই আশায় নিজের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। লেখাপড়া শিখেছেন মন দিয়ে।

কিন্তু ওর চোখে তিনি চিরকাল ছোট হয়ে রইলেন। ওর আব্বাজানের আশ্রিত অন্নদাস হবিব আলীর ওর কাছে ওই পরিচয় ছাড়া আর অন্য কোন স্বীকৃতি কখনো পেলেন না হবিব আলী।

বড়বিবিকে সাদী করার আগে ফরিদাকে সাদী করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু ফরিদা তার মুখের ওপরেই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। জমিদারের মেয়ে হয়ে একজন প্রজাকে সে সাদী করবে না।

অপমানিত হবিব আলী মুখ কালো করে মাথা নীচু করে ফিরে এসেছিলেন।

তারপরই তিনি নসীবপুরের সবচেয়ে বড় জোতদারের মেয়েকে সাদী করেছিলেন। তাঁর গর্ভে দুটি সন্তান। আনারকলি ও আনোয়ারউদ্দিন। তৃতীয়টি হতে গিয়ে বড়বিবি মারা গেল। তখন তাঁর অবস্থার আরো উন্নতি, আরও বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। আজিমুল্লা সাহেবের পড়তিদশা। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। ফরিদারও তখন বেওয়া অবস্থা। সাদীর বছর দুই বাদেই ও (খোদা জানেন, হবিবের প্রতিহিংসা স্পৃহার জন্যে অথবা তাঁর বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যেই কিনা) স্বামীকে হারিয়ে শ্বশুর-বাড়ি ঢাকা থেকে চিরদিনের মত বাপের কাছে ফিরে এসেছে ফরিদা নিঃসন্তান অবস্থায়।

নতুন করে আবার বাড়িতেই কলেজের পড়াশোনা সুরু করেছে, বাপের প্রশ্রয়ে। তার শিক্ষিত শাণিত ইস্পাতের মত অপূর্ব চেহারার দিকে তাকিয়ে হবিবের বুকের রক্ত আবার উত্তাল উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। সামান্য একটা ভিখারীর মত, অসহায় কৃপা-প্রার্থীর মত হবিব আলী বিগত দিনের সব অপমান ভুলে গিয়ে আজিমুল্লার স্বারস্থ হয়েছিলেন। ফরিদাকে তিনি নিকা করতে চান।

আজিমুল্লা সাহেব গম্ভীর মুখে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তাকে বলেছিলেন, তাঁর কোন আপত্তি নেই এ প্রস্তাবে। তবে ফরিদা চিরদিনই এক-গুঁয়ে জেদী মেয়ে। পাত্র হিসাবে হবিব সর্বাংশে ফরিদার যোগ্য। তার যদি আপত্তি না থাকে, তবে...'

ফরিদার কাছে দুরু দুরু বুকে কথাটা পাড়তেই ফরিদা তার নদীর মত ঢেউতোলা অপরূপ সুন্দর শরীরে হাসির তরঙ্গ তুলে বলেছিল, 'হবিব সাহেব, আপনার বয়স কত হল, হিসেব আছে?'

অপমান গায়ে না মেখে হবিব জবাব দিলেন, 'আছে। ছোট বেলা থেকে তোমার আব্বাজানের কাছে খেয়েপরে মানুষ হয়েছি। আমার কুড়ি বছর বয়সে তুমি জন্মেছিলে। তোমার এখন তেইশ, আমার তেতাল্লিশ। তবে আমাদের পবিত্র ইসলাম-ধর্মে তেইশ-তেতাল্লিশের নিকে সাদীতে কোন বাধা বা আপত্তি নেই।'

'নেই, সেটা আমিও জানি।'

'ছেলেমেয়ে দুটো নাবালক। তাদের দেখাশোনার জন্যে আমাকে নিকে করতেই হবে।'

'ওদের মুখ চেয়ে এত বয়সে আপনার নিকে না করাই উচিত।'

ফরিদার কাটা কাটা ঠাণ্ডা জবাবে হবিব আলীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। বার-বার ফরিদা বয়সের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। নিকে সাদী করার ব্যাপারে একটা পুরুষের তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছর বয়সটা কি খুব বেশী নাকি?

বেশ কঠিন গলাতেই জবাব দিলেন, 'আমার বয়সটাই কি তোমার আপত্তির কারণ ফরিদা?'

'আপত্তির কারণ আরো অনেক আছে।' তেমনই নিথর ঠাণ্ডা গলা ফরিদার। 'সব কারণগুলো মুখ ফুটে বলা যায় না। তবে আপনাকে নিকে করার ইচ্ছে থাকলে অনেক দিন আগে সাদীই করতে পারতাম। ঢাকায় আমার হিন্দু মেয়ে-বন্ধুদের দেখেছি, বিধবা হবার পরও তারা সহজে বিয়ে করতে চায় না। আমি আমার স্বামীকে খুব ভাল-বাসতাম হবিব সাহেব।'

'তুমি হিন্দুঘরের মেয়ে নও। ইসলাম-ধর্মই তোমার ধর্ম। নিঃসন্তান বেওয়া হয়ে চিরদিন কাটানো সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। এই বয়সে একজন সঙ্গী পুরুষের ভীষণ প্রয়োজন তোমার। তুমি এখন বুঝতে পারছো না ফরিদা, কিন্তু-'

'সে ভাবনা আমার থাক হবিব সাহেব। বেওয়া হয়ে বাকী জীবন কাটানো যদি গোনাহ হয়, আমার হবে। আপনার মত ফেরেশতার তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনাকে নিকে আমি কোন দিনও করব না।'

তারপর হবিব আলী অনেক খোঁজ করে, অনেক তালাস করে ফরিদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, আর অনেক বেশী সুন্দরী নসীবন বিবিকে নিকে করে এনে-ছিলেন। ফরিদার দর্পচূর্ণ করার বাসনাটা তাঁর মনের মধ্যে কাজ করেছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

ছোট বিবিকে দেখে পাড়ার সকলে ধন্য ধন্য করেছে। এমন রূপসী সুগঠনা মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। ফরিদাও বিয়েতে এসেছিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে যাবার সময় হবিব আলী একান্তে ওকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেমন বৌ দেখলে ফরিদা?'

হবিবের গর্বিত তৃপ্ত দৃপ্ত মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ফরিদা জবাব দিয়েছিল, 'আপনার মেয়ে আনারের চেয়ে দু তিন বছরের বড়ই হবে বলে মনে হল। আচ্ছা হবিব সাহেব, এত বয়সে ওর মত অমন সুন্দর একটা কচি মেয়ের সর্বনাশ করতে আপনার এতটুকু লজ্জা হল না? ছিঃ! আপনি না লেখাপড়া শিখেছিলেন?'

ফটাফট ফটাফট! দুম দুম—দূরে থেকে গুলি গোলা-বোমার আওয়াজ। মাথার ওপর দিয়ে একখানা জঙ্গী বিমান গর্জন করতে করতে চলে গেল। হবিব আলী তাড়াতাড়ি পা চালালেন। খোদা হাফেজ বাঁচাও। হবিব আলী এখনি মরতে চান না। এখনো তিনি অনেক বছর বেঁচে থাকতে চান, অনেক কিছু উপভোগ করার জন্যে।

বাড়ির গেটের কাছে আসতে না-আসতেই কয়েকজন পাঠান ফৌজ তাঁকে ঘিরে ধরল। লেফটেন্যান্ট সাহেব এগিয়ে এসে তাঁকে সেলাম করে বললেন, 'অনেক-ক্ষণ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি আলী সাহেব। মেজর সাহেব, ক্যাপ্টেন সাহেব, এখনি আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন। রাস্তার ওপর জীপ রেডি। চলুন আমাদের সঙ্গে।'

মেজর, ক্যাপ্টেন তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে-ছেন, হবিব আলী বিগলিত হলেন। বিনীতভাবে বললেন, 'আপনি কেন কষ্ট করে এতদূরে এলেন লেফটেনান্ট সাহেব? একজন সেপাইকে পাঠালেই হত।'

'আপনার বাড়ি এসে আমাদের লাভই হয়েছে আলীসাহেব।' পাঠান কমান্ডারের মুখে কেমন যেন লোলুপ কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল। 'আপনার বিবি, মেয়ে আমাদের খুব যত্ন করেছে।'

হবিব আলী এত বেশী চমকে উঠলেন যে, তাঁর হাতের ওষুধ প্যাকেটটা পড়ে যাবার উপক্রম হল।

'আপনার অনুপস্থিতিতে, বিনা অনু-মতিতে আপনার বাড়িতে ঢুকেছিলাম বলে ক্ষমা করবেন।' লেফটেন্যান্ট সাহেবের গলাটা কেমন নরম, ভিজে ভিজে। 'আপনার জন্যে অপেক্ষা করে করে ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছিল, তাই আপনার বিবির কাছে জল

খেতে গিয়েছিলাম। হাজার হোক বিদেশী অতিথি, আপনাদের দেশরক্ষার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে এসেছি এতদূরে. সেকথা শুনে ও'রা খুব যত্ন করে আতিথি সংকার করলেন।'

হবিব আলীর মুখ গম্ভীর হল। নীরস গলায় বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি পোষাকটা বদলে আসছি।'

ঘরে ঢুকতেই হবিব আলী দেখতে পেলেন দাসদাসীরা ভীতসন্ত্রস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। তাঁকে দেখতে পেয়েই তাঁর উদ্ভিন্নযৌবনা চোদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে আনার ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। 'আব্বাজান, ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল। আমার ভীষণ ভয় করছিল।'

নসুবিবিও ফিস্ ফিস্ করে স্বামীর কানে কানে বলল, 'ওদের রকম সকম ভাল মনে হচ্ছে না। লোকগুলো ভাল নয়। তুমি আমাদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও। আনোয়ার তার মামারবাড়ি চলে গেছে। আনার আর আমিও অন্য কোথাও চলে যাই।'

'কিচ্ছু ভয় নেই। আমরা আওয়ামী লীগের লোক নই। ওরা আমাদের বন্ধু।' হবিব ওদের ভাল ভাল কথা বলে আশ্বাস দিলেন। 'ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ওদের সঙ্গে এখন চলে যাচ্ছি। কাল যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

হবিব আলী ওদের সঙ্গে যখন ওদের 'হেড কোয়ার্টার'এ পৌছুলেন, তখন নরক-গুলজার। পাঞ্জাবী পাঠান বেলুচ সামরিক উচ্চপদস্থ অফিসাররা, ক্যাপ্টেন মেজর তখন তাঁদের 'পানভোজনে' রত ছিলেন। টেবিলের ওপর স্কচ-হুইস্কি সোডার বোতল গেলাসে গেলাসে শূন্য হচ্ছে আর পূর্ণ হচ্ছে। গোস্ত তন্দুরী ইত্যাদি বহুবিধ খাবারের ছড়াছড়ি। পানের মাত্রাধিক্যে প্রায় সকলেরই চোখ লাল। কণ্ঠস্বর জড়িত। প্রায় বেসামাল অবস্থা!

হবিব আলী ঢুকতেই সকলে উল্লসিত আনন্দে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। মেজর স্বহস্তে হবিব আলীকে হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে জানালেন, সিক্রেট ইনফরমেশনে তাঁদের যুদ্ধের খবর এসেছে। চট্টগ্রামে সৈন্য বোঝাই জাহাজ এসে পৌঁছেছে। ঢাকা বরিশাল খুলনা পার্বতীপুর লালমণিরহাট সব জায়গায় তাঁদের জয় হয়েছে। মুক্তিফৌজরা পিছু হটতে হটতে একেবারে পশ্চিম বাংলার সীমান্তে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সেই জয়ের জন্যেই তাঁরা আজ সন্ধ্যায় এই উৎসবের আয়োজন করেছেন।

হবিব আলী শিক্ষিত, আধুনিক মানুষ হলেও পানদোষ তাঁর ছিল না। কিন্তু আজ এই জয়োল্লাসে মেজরের স্বহস্তে দেয়া পানীয় তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। মেজর অসন্তুষ্ট হলে, তার ভবিষ্যত অন্ধকার। হবিব আলীর প্রত্যাশা অনেক। আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক।

বাধ্য হয়ে ও'দের দলে ভিড়তে হল। দু-চার পেগ পেটে পড়তেই আনাড়ী হবিব আলীর সমস্ত আড়ষ্টতা জড়তা সঙ্কোচ কেটে গেল। দারুন জমে গেলেন তিনি। একেবারে মাইডিয়ার ফ্রেন্ড!

নেশাটা জমে আসতেই ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমরা হয়তো কালই এ সহর ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মিঃ আলী, খুব নিরাশ হৃদয়েই চলে যেতে হবে।'

'কেন কেন?' হবিব আলী মুখ থেকে গ্লাস সরালেন।

'আপনার দেশে, এখানে আমাদের বীরত্বের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার মত সুন্দরী স্ত্রীলোকের একান্ত অভাব। আমরা এই যুদ্ধ আপনাদের ভালর জন্যেই করছি, নয় কি?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

মেজর ভ্রূকুটি করলেন। 'যে কটা মেয়ে দেখলাম সব কটাই অখাদ্য। আমাদের ওসব মাল চলে না।'

'ধানক্ষেত পাটক্ষেত থেকে টেনে টেনে বার করে ধরে আনা মেয়েরা আর কত ভাল হবে স্যার।'

ক্যাজার মুখে কথাটা বলে বিরাক্ত ভরে লেফটেন্যান্ট নিজের শূন্য গ্লাস আবার ভরে নিলেন।

'ভাল ভাল বড়ঘরের সুন্দরী মেয়েরা সব পালিয়ে গেছে।' হবিব আলী দুঃখের সঙ্গে জানালেন।

'খুব দুঃখের কথা মিঃ আলী। আমাদের যুদ্ধ জয়ের আনন্দটা কি শুধু গেলাসে চুমুক দিয়েই শেষ করতে হবে? আপনি, একজন এ সহরের গণ্যমান্য মানুষ হয়েও আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করবেন না? ভাল মালটালের খোঁজখবর দেবেন না?'

কমান্ডার এতক্ষণ চুপ করে গোগ্রাসে মাংস চিবোচ্ছিল। এবার মেজরের দিকে চোখ টিপে জড়িত গলায় বলে উঠল, 'দুটি বেহেশতের হুরীকে আলী সাহেবের বাড়িতেই দেখে এলাম স্যার। একটি ওর মেয়ে, আর একটি ওর নিকেকরা বিবি-সাহেবা।'

'ওসব কথা থাক।' হবিব আলীর মাথা টলমল করছিল, তবু তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে কঠিনকণ্ঠে থামিয়ে দিলেন কমান্ডারকে।

লেফটেন্যান্ট সাহেব হাসলেন, 'কমান্ডার সাহেব এখন টিপসি, ওর কথায় কান দিবেন না মিঃ আলী। জানেন তো কথায় বলে, ম্যান ইজ দি হান্টার, ওম্যান ইজ দি গেম। খোঁজ আমরা পেয়েছি, এ সহরের অল্পবয়সী সুন্দরী অভিজাত ঘরের মেয়েরা উইমেনস বোর্ডিংএ আটকা পড়ে ওখানেই থেকে গেছে। সহর ছেড়ে পালাতে পারেনি।'

হবিব আলীর হাতের পূর্ণ গ্লাস থেকে খানিকটা তরল পানীয় টেবিলে ছলকে পড়ল। 'কিন্তু স্যার ভুলে যাবেন না, ওটা এ দেশীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। ওটা

আমেরিকানদের প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত ক্রীশ্চান অ্যাসোসিয়েশন—'

'হ্যাঙ ইয়োর ক্রীশ্চান অ্যাসোসিয়েশন'। মেজর টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠলেন। 'মাইণ্ড মেক দি ওয়াইফ ওয়াইফ হুট। একথা ভুলে যাবেন না'।

সমবেত কণ্ঠস্বরের একটা বিকট উল্লাসধ্বনিতে ঘরখানা ফেটে পড়তে চাইল। চোখে চোখে ইঙ্গিত-ইশারা। মেজর সাহেব কমাণ্ডারের কানের কাছে মুখ এনে কি যেন ফিস ফিস করলেন। কমাণ্ডার তাঁকে স্যাল্যুট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হবিব আলীর তখন ছ পেগ শেষ। এই প্রথম গুনাহ তাঁর। খোদা হাফেজ, আজকের এই প্রথম পাপই যেন শেষ পাপ হয় তাঁর।

মাথার মধ্যে এখন আর কিছুই নেই। তিনি যেন এক শূন্যের জগতে এক স্বপ্নের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চোখের সামনে আনন্দাসুন্দর ফরিদার অহংকারী মুখ। ফরিদা। তাঁর বহু দিনের, শৈশব-কৈশোর-যৌবনের কামনাকুসুম। তাঁর নিগূঢ় বাসনার, একমাত্র আকাঙ্ক্ষার ধন, তাঁর ভালবাসা স্বপ্ন সাধ!

হবিব আলীর বুকের ভেতরকার জমকালো ভয়টা হঠাৎ যেন তাকে গ্রাস করতে চাইল। তিনি চোখ তুলে ষড়যন্ত্র-লিপ্ত নির্দয় যুদ্ধজীবী মানুষ কজনের মুখে কি যেন খুঁজতে চাইলেন। কিন্তু সব ঝাপসা। কিছু নেই। কিচ্ছু নেই। ওখানে দয়া নেই, মায়া নেই, বিবেক-বিবেচনা নেই। স্নেহ প্রেম ভালবাসার বিন্দু-বিসর্গও নেই। আছে শুধু উন্মত্ততা। হিংস্রতা নিষ্ঠুরতা।

হবিব আলীর কি ক্ষমতা ওদের সমবেত শক্তিকে প্রতিরোধ করেন? এত দূর এগিয়ে গিয়ে আর কি ফেরা যায়? যায় না। হবিব আলীর মৃতদেহটার ওপর দিয়েই ওরা তাহলে ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চলে যাবে।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ালেন। কুর্নিশের ভঙ্গীতে মেজরকে মাথা নুইয়ে জড়িত কণ্ঠস্বরে বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে স্যার। আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে'।

'হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট মি টু ডু'।

'আই ওয়াণ্ট ইউ টু ডু মী এ ফেভার স্যার'। হবিব আলীর স্খলিত কণ্ঠস্বরে যেন ক্রীতদাসের ভিক্ষা। 'উইমেনস হোস্টেলে আমার একটি পরিচিতা আত্মীয়া মানে বান্ধবী আছে...'

কথা শেষ হল না। মেজর সাহেব অট্ট-হাস্যে ফেটে পড়লেন। 'মাই গড। এই ব্যাপার। চলুন আমাদের সঙ্গে। আমাদের যুদ্ধজয়ের আনন্দে আপনিও অংশীদার হবেন। মিঃ আলী আমরা মিলিটারীম্যান বটে, কিন্তু আনগ্রেটফুল নই। উই ওয়াণ্ট টু ডু সামথিং ফর ইউ ইন রিটার্ণ ফর হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ফর আস।'

* * *

বোর্ডিং হাউসের কাছাকাছি মানুষজন-শূন্য একটা বাড়ীর বারান্দায় পড়ে থাকা হবিব আলীর যখন জ্ঞান ফিরল তখন রোদ্দুর উঠে গেছে। শবেবরাতের আতস-বাজীর আগুনের মত মেয়েদের হোস্টেল থেকে তখনো ধিকি ধিকি আগুনের শিখা হাওয়ায় কাঁপছিল। পোড়া মাংসের গন্ধও ভেসে আসছিল। তবে তখন আর কোন ভয়ার্ত কান্না-শিহরিত আর্তনাদ বাঁচবার জন্যে আপ্রাণ চিৎকার, সাহায্যের জন্যে আকুল আবেদন আর তাঁর কানে আসছিল না। অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রণ্ট।

গত রাত্রির নারকীয় স্মৃতি মনে পড়তেই ফরিদার ধর্ষিত ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত নগ্ন দেহটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হল হবিব আলীর। গোনাহ। গোনাহ। এত বড় পাপ কাজ কেমন করে করতে পারলেন তিনি।

হবিব আলী নতজানু হয়ে নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে উঠে বসলেন। খোদা মেহের বান! নাফারমান বান্দাকে দোয়া কর। এই মহাপাপই যেন আমার শেষ পাপ হয় খোদা!

হবিব আলী উঠে দাঁড়ালেন। তখনো মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে। চোখের পাতায় বালি কর কর করছে। মনেও পড়ে না কাল কত রাত্রে তাঁর অচেতন দেহটা জঙ্গী সেনারা এই বারান্দায় ফেলে রেখে চলে গেছে।

একটা রিকসাও চোখে পড়ল না। হাটতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু হবিব আলী তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়লেন। কাল সারা রাত বাড়ী ফেরেন নি। মানুষ মাতাল হলে তার কি দশাই না হয়! ওরা সবাই কি ভাবনাই না ভাবছে!

বাড়ীর কাছাকাছি এসে বুকের ভেতর শিউরে উঠল। কাল সারা রাত জঙ্গী-শাহীদের বিজয়োৎসব চলেছিল, পাড়ার মধ্যে তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। নওসাদ মিঞার বাড়ীটায় আগুন লাগিয়েছে। পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ। এদিক-ওদিক সব কটা বাড়ীর দরজা জানলা বন্ধ। বোধ হয় মানুষজন সব পালিয়ে গেছে পাড়া ছেড়ে।

দরজা খোলাই ছিল। বেশ শব্দ করেই বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন হবিব আলী। নফর দাসী কেউ কোথাও নেই। গোসলখানা খোলা পড়ে আছে। রসুইখানার উনুন জ্বলেনি, বাবুর্চির সাড়া নেই। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে হবিব আলী শোবার ঘরে ঢুকলেন।

বাইরে আলো রোদ। ঘরের ভেতর দরজা জানলা বন্ধ থাকার দরুন, তার ওপর ভারী ভারী পর্দার দরুন বেশ অন্ধকার। পা বাড়াতেই হোঁচট খেলেন। চমকে মেঝের দিকে তাকালেন। আধা অন্ধকারে পাথরে খোদাই করা এক অপরূপ নারীদেহ মেঝেতে শুয়ে আছে। অনাবৃত নগ্ন নারী দেহ। গায়ে একগাছা সুতোও নেই।

ফরিদা! হবিব আলী চেঁচিয়ে উঠলেন। দম আটকে গেল। কাল রাত্রের ফরিদা আজ এ ঘরে কেন? ফরিদা আমি একা দোষী নই—

না ফরিদা নয়। সে এতক্ষণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার চেয়েও অপরূপ—তার চেয়েও যৌবনময়ী নসীবন বিবি। হবিব আলীর অনেক দেশ ঘুরে অনেক পরিশ্রমে সংগ্রহ করা তাঁর আদরের আদরিণী নসু-বিবি।

পা কাঁপছে। ঘাড়ে গলায় বিষাক্ত কেউটের ছোবল। বিষ ঢালছে সাপটা—ভয়ংকর বিষ—চোখেও বিষের জ্বালা।

নসীবন, তোর কী এতটুকু লজ্জা নেই? উনিশ বছরের নবযুবতী তুই লজ্জার লজ্জাবতী, আজ তোর কী হয়েছে? মনে নেই, কতদিন কত সোহাগ রাতে হবিব আলীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও তুই একেবারে তাঁর সামনে সব পোষাক খুলে ফেলে এমনভাবে কোন দিনও দাঁড়াতে পারিসনি, তবে আজ তুই কী বলে—কেমন করে সব লজ্জাসরম বিসর্জন দিয়ে—ছিঃ ছিঃ!

হাটু ভেঙে বসে পড়লেন। অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি স্থির হল। পর্দাটা হাওয়ায় নড়েচড়ে বাইরের আলোর আভাস সারা ঘরময় ছড়িয়ে দিল এতক্ষণে। সেই আলোয় হবিব আলী আরো একবার চমকে উঠ-লেন। তাঁর কিশোরী কন্যা, রাজকন্যার মত সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা আনার। নসীবনের মতই নগ্ন দেহ। ছিন্নভিন্ন নখদন্তে ক্ষতবিক্ষত—সালোয়ার কামিজ টুকরো টুকরো। বিস্ফারিত স্থির চোখে ত্রাস। অবর্ণনীয় ভয়। যন্ত্রণা। আরো অনেক কিছু। ফর্সা উরু রক্তে লাল। সেই রক্তের ধারা গাড়িয়ে নীচে নেমে এসেছে। লাল রক্ত। ফরিদার রক্তের মত লাল। ঠোঁটে মুখে বুকে পেটে বাহুতে কালসিটে দাগ, নসীবনের মতই। ফরিদার মতই।

সাপটা আর একবার ছোবল মারল। সেই বিষের ক্রিয়া এবার সারা শরীরে ছড়িয়ে মাথায় উঠে গেল।

নির্লজ্জ বেহায়া বেসরম কোথাকার। লজ্জায় লাল হয়ে হবিব আলী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। দু হাত দিয়ে বিছানার চাদর টেনে, আলনা থেকে রাশীকৃত পোষাক আসাক টেনে টেনে তিনি তাঁর দুটি বুকের পাঁজরে—নসীবন আর আনারকলির উলঙ্গ দেহ দুটি ঢাকা দিতে লাগলেন। ঢাকা দিতে লাগলেন...ঢাকা দিতে লাগলেন।

কবির্মনিষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিমলচন্দ্র ঘোষ আজ প্রবীণ কবিদের দলে। তবে তিনি কোনো এক বিশেষ কালের গণ্ডীতে আপনাকে সীমিত রাখেননি, তিনি চিরকালের। এমার্সন এই জাতীয় কবিদের কথা মনে রেখেই বলেছেন—

> "The poet is not a contemporary but an eternal man".

বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্য সাধনার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। এই ঐতিহ্যসচেতন কবি শুধু অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেই—বর্তমান সম্পর্কে তিনি সদাসচেতন। ঐতিহ্যকে তিনি দূরে সরিয়েও রাখেননি। বর্তমানের ফ্রেমে তাকে মাপসই করে সাজানোর জন্য তাঁর সংগ্রাম দীর্ঘদিনের। কবি তাঁর 'উদাস্তু ভারতে' কাব্যদর্শনে কবিতার যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন তার মধ্যেই আছে তাঁর নিজের কাব্যাদর্শের ব্যাখ্যা—

> 'কবিতা বিপ্লবী-মনোবাসনার
> অগ্রগামী সুর
> অব্যাহত আবেগের আশ্চর্য
> বিস্ময় শালীনতা;
> আকাশ-কাঁপানো স্বচ্ছ চেতনার
> মূর্ত প্রতিধ্বনি
> খণ্ডকালে বন্দী এক অখণ্ডকালের
> অধীরতা।'

বিপ্লবী মনোবাসনার অগ্রগামী সুর বিমলচন্দ্রের কবিতায় ধ্বনিত—কিন্তু বাঙময় শালীনতায় সেখানেই কি আবদ্ধ হয়ে আছেন—বিমলচন্দ্র মানুষের কবি, যে মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের, আবার তিনি হৃদয়েরও কবি, যে হৃদয়কে পরিহার করে সংসার চলে না, যে হৃদয়টুকু না থাকলে মানুষকে মানুষ বলে চেনা যায় না সেই হৃদয়কে তিনি অস্বীকার করেননি। তাঁর কাছে মানুষও সত্য, হৃদয়ও সত্য।

এই কারণে কবির সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'গাঙ্গেয় সৈকত' আমাদের কাছে বিস্ময়ের পসরা নিয়ে আসেনি। কবিকে যাঁরা ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পেয়েছেন 'রক্ত গোলাপে' তাঁদের কাছে কিন্তু 'গাঙ্গেয় সৈকত' এক বিরাট বিস্ময়। কারণ ১৯৬৭-তে প্রকাশিত কবির 'উত্তর আকাশের তারা' তাঁর 'উদাস্তু ভারত' কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত সংকলন। কবি ভূমিকায় বলেছেন, 'এই গোধূলি ধূসর ঘাটের শেষে গাঙ্গেয় সৈকতের বাঁধা ঘাটে বিষণ্ণ ম্লান ফুটো নৌকা ভেড়ালুম।'

'গাঙ্গেয় সৈকতে' সঞ্চারিত কবিতাগুলির একটা ইতিহাস আছে। কবির অসংখ্য কবিতা উইপোকায় নষ্ট করে দেয়, সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে কিছু কবিতা উদ্ধার করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৬৮ এই বিভিন্নকালে রচিত বিভিন্ন ধারার কবিতা নিয়ে 'গাঙ্গেয় সৈকত'। ভূমিকায় লেখক সাহিত্যাচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনমহাশয়ের পত্রাংশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছেন, তার একটিতে তিনি লিখেছেন—

'আপন মানব দরদী, ভাবীকালের পূজারী, চিরসঞ্চরমান জীবনের পথিক।' কথাটি সুপ্রযুক্ত একথা বলা যায়। বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে তাঁর কবি ভাবনায় যে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যেই তাঁর চিত্ত ও চরিত্রের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি সত্যই এক অসামান্য কবি। আমরা এযুগে স্বভাবকবি কথাটি প্রায় ভুলতে বসেছি—বিমলচন্দ্র স্বভাব কবি। এমন বিষয়বস্তু নেই যে বিষয়ে তিনি কিছু না কিছু লিখেছেন এবং যা লিখেছেন তার মধ্যে এক চারণের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, সে আন্দোলন কখনও তীব্র কখনও তীক্ষ্ণ। বিমলচন্দ্র স্বধর্মচ্যুত হননি, তিনি নিজস্ব ধারাতেই কাব্য সাধনা করে গেছেন এবং সেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে তিনি একলা চলো রে নীতির সমর্থক। বিমলচন্দ্রের কাব্য-ভাবনায় যে আপোষহীন মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়—'গাঙ্গেয় সৈকত' তার ব্যতিক্রম নয়। তাই তিনি ক্ষোভ করে লিখতে পারেন—

> 'হে অখিল চৈতন্যধারার প্রাণ ভ্রমরী,
> তোমার এই শাশ্বত ক্রিয়মানতার
> ললিত ছন্দ,
> গিরীন্দ্রিয় ইতিহাসের মরা হৃদয়ে
> কবে সঞ্চারিত করবে
> বললে না,
> আজো বললে না।'

আবার বিশ্ব জাগতিক রহস্যের বিরাটত্বে তিনি মগ্নচৈতন্য তাই সহজেই 'লাখ লাখ নেবুলা কদম্ব পুষ্পিত/বিশ্ব রাসমণ্ডলের/অপরাভূত/অনন্ত প্রেম সমুদ্ভূত/বেণু-ঝঙ্কারের শব্দহীন সুরধ্বনি/শুনতে শুনতে/মরকতমঞ্জু মুকুরতনুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছি।' একথা তিনি লিখতে পারেন। বিশ্ব রাসমণ্ডলের মরকতমঞ্জু মুকুরতনুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছেন

কবি—এ এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। কোথাও স্থিতি নেই, সবেগে অনবেগে প্রকটে-অপ্রকটে স্থিতি নেই। আশ্রয় নেই, আশ্বাস নেই, নির্বাণ নেই, নিগ্রেস নেই— অস্থিরতার এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিমলচন্দ্র ঘোষের নিজস্ব।

একথা বলা প্রয়োজন সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে রচিত কবিতাবলীর সুর-সামঞ্জস্য নেই। পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভাবের সমাবেশ ঘটেছে বিভিন্ন কবিতার মধ্যে তথাপি কবির পরিশীলিত মনের পরিচয় সর্বত্র ছড়ানো। কিন্তু এই কবিতাবলী সমাজ-সত্যের বিরোধী নয় এবং তত্ত্বসচেতনও নয়। বিমলচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁকে অপর কবিদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিমলচন্দ্র সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যময় অনুভূতির ক্ষেত্রে অনন্য হয়ে আছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোড়ন কবির মনকে বার বার দোলা দিয়েছে তথাপি তিনি সমকালকে তুষ্ট করতে অনন্ত কালকে উপেক্ষা করতে পারেননি।

'উদাত্ত ভারতের' সেই আশ্চর্য লাইনটি তাই বার বার মনে জাগে—

'খন্ডকালে বন্দী এক অখন্ড কালের অধীরতা।'

এককথায় বিমলচন্দ্রের কবিতাবলীর এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট। বিমলচন্দ্রের কাব্য-ভাবনায় সেই অখন্ড কালের অধীরতাই তাঁকে আশ্রয় করে ছুটেছে। এই তাঁর বিদ্রোহ এই তাঁর বিচিত্র আবেগানুভূতি।

উজ্জ্বল নীল মণিতে আছে
'তে বয়ো রূপলাবণ্যে সৌন্দর্যমভিরূপ,
মাধুর্যং মার্দবং চাদ্যাশ্চ কায়িকাঃ
কথিতা গুণাঃ।।'

বিমলচন্দ্র ঘোষ 'অদ্বৈতে দ্বৈতে'—কবিতায় মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে—'আমাকে আমার মধ্যে যখন পাই না/এখন তোমার মধ্যে খুঁজি। তুমি আমি এক হবো কখনো চাই না। তুমিও চাও না কেন বুঝি।' অথচ—'আমাকে তোমার ছায়া যদি মনে করো। কায়া তুমি কোন মন্ত্রে হবে-। নিরিন্দ্রিয় নই আমি যদি বুকে ধরো। স্পর্শ পাবে শরীরী বৈভবে।'

তাই কবিকে 'আমার আমিতে তোমার তুমিতে' যার বার আরোপ করতে হয়। যেখানে আমি আর তুমি, তুমি আর আমি—সব এক, একাকার।

এই সঙ্গে মনে পড়ে বিমলচন্দ্রের 'রক্ত গোলাপ' কাব্যগ্রন্থের 'তুমি কোথায়' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র—

'তুমি আর আমি
অনন্তকাল পরস্পরের মধ্যে মিশে আছি
তুমি আর আমি
অনন্তকাল পরস্পরের জন্যে কেঁদেছি
তুমি আর আমি
কেউ কাউকে কখনো চাইনি।'

এই যে পরস্পরের মধ্যে মিশে থাকা এই যে অনন্তকাল পরস্পরের জন্য কান্না। সে কান্না যে কার জন্য সে যখন জানা যায় তখন আর তোমাতেও থাকে না। এই ভাবনাই 'রক্ত গোলাপের' অনন্তে দেখা যায়—'আকস্মিক বিস্ফোরণে বিদীর্ণ/আমার সেই আগ্নেয় সত্তার মধ্যে/চূর্ণ হলো তোমার শিলামূর্তি/আমার পরিপূর্ণতার ভীষণতায়।' এই আত্মবিলুপ্তিই-দ্বৈত-অদ্বৈতের সব প্রশ্নের সহজ সমাধান।

বিমলচন্দ্রের চিত্তে যন্ত্রণা আছে, অস্থিরতা আছে, জ্বালা আছে কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে আছে এক প্রগাঢ় অনুরাগ, সে অনুরাগ শুধু আত্মানুরাগ নয়, সব মানুষের প্রতি অনুরাগ।

বিমলচন্দ্রের 'গাঙ্গেয় সৈকত' তাই কাব্য-রসিকদের কাছে এক আনন্দ সংবাদ। বিমুগ্ধ আবেগ ও তীক্ষ্ণ মনস্বীতায় উজ্জ্বল এই কবিতার স্বাদ স্বতন্ত্র।

গাঙ্গেয় সৈকত (কবিতা)—বিমলচন্দ্র ঘোষ। সাহিত্যম, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পাঁচ টাকা মাত্র।

—অভয়ংকর

নতুন বই

চিত্রাঙ্কনে বাংলার মেয়ে (আলোচনা)—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ বিপ্লবী অনুকুলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। দাম : ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেয়ে-মহলেও পরিবর্তন এসেছে নানা দিক থেকে, নানাভাবে। জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক সে উদ্দেশ্যে না হলেও, বাংলার মেয়েরাও যে কোন ব্যাপারেই পিছিয়ে নেই, অন্তত চিত্রাঙ্কনে তাঁদেরও যে যথেষ্ট দান আছে, একথাই যেন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এ বইটি লিখে।

তিনি দেখিয়েছেন, পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেই একেকজন প্রতিভাশালিনী মহিলার আবির্ভাব হয়েছে অতীতে। কেশব সেনের মেয়ে সুচারু দেবী ময়ূরভঞ্জের মহারাজাকে বিয়ে করেও শিল্পচর্চা ত্যাগ করেন নি। বরং স্বামীপুত্র হারিয়েও শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি শিল্পের মধ্যে শোকের সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন। সুকুমার রায়ের দিদি সুখলতা রাও প্রথম জীবনে যেমন ছবি আঁকার প্রেরণা পেয়েছিলেন বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছ থেকে, তেমনি ডাক্তার স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বিয়ের পরেও।

জানকীবাবু বহু পরিশ্রম করে মহিলা শিল্পীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁদের পরিচয় ও শিল্পজিজ্ঞাসার মূলে রহস্য উদ্ধার করেছেন, কখনো উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে, কখনো কোন ছবির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

ঠিক এ ধরনের বই বাংলায় আর বেরিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আমরা জানকীবাবুকে অভিনন্দন জানাই, তাঁর প্রথম প্রয়াসের জন্য।

অভিযাত্রী তীর্থ-সুন্দরডুঙ্গা— (ভ্রমণ ও কাহিনী)— সুনীল চৌধুরী। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ, কলকাতা—১২। সাত টাকা মাত্র।

সুনীল চৌধুরী কলিকাতার সুবিখ্যাত অভিযাত্রী সঙ্ঘ মাউনটেনীয়াস' ক্লাবের প্রাণ-স্বরূপ। সারা ভারতের অনেকগুলি দুর্লংঘ পাহাড়ে তিনি অভিযান চালিয়েছেন এবং পাহাড় বিজয়ের নায়কত্ব করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। হিমালয়ের অজ্ঞাত রহস্য-সন্ধানে আত্মনিবেদিত এই তরুণ যখন প্রচন্ড সাহসে নির্ভর করে দুর্গম পথে পাড়ি দেন তখন তাঁর নির্ভীকত্ব এবং প্রচন্ড পৌরুষে পুলকিত হই বটে তবে মনে মনে শঙ্কাও থাকে। এ পর্যন্ত অনেকগুলি অভিযানে অংশ নিয়েছেন সুনীল চৌধুরী এবং হিমালয়ের মানুষদের কথা মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকায় যেভাবে পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে তাঁর সাহিত্য-রসিক মনের পরিচয় পাওয়া গেছে।

উনসত্তর সালে সেপ্টেম্বর মাসে সুনীল চৌধুরী এবং তাঁর সঙ্গীরা গিয়েছিলেন কুমায়ন পর্বতমালার দুর্গতম গিরিশৃঙ্গ সুন্দরডুঙ্গা বিজয়ে। সেইবারকার অভিযাত্রায় নায়কত্ব করেন সুনীল চৌধুরী এবং একটা নামহীন গিরিশৃঙ্গ জয় করে ফিরে এলেন।

সেই সব কথা নিয়ে রচিত হয়েছে সুন্দরডুঙ্গা, শুধু নীরস পথপরিক্রমা, আরোহ অবরোহের ইতিহাস নয় হিমালয়ের মানুষের কথা সুনীল চৌধুরী লিখেছেন সুগভীর মমতায়—তাদের ব্যথা ও বেদনার ইতিহাস যা সমতটের মানুষ আমরা খুব কমই জানি। সবচেয়ে বড় কথা এই কাহিনী এমনভাবে বিধৃত হয়েছে যার ফলে মনে হবে শুধু লেখক নয় স্বয়ং পাঠকও তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরীক। এখানেই

লেখকের অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আগাগোড়া একটি সুখপাঠ্য উপন্যাসের মত মনোমুগ্ধকর কাহিনী পাঠককে আকুল করে তোলে। গ্রন্থটিতে কয়েকটি ছবি থাকায় গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজা—শ্রীশংকর মিত্র। প্রকাশক—ডিলাইট, ১৭৩।৩ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীশংকর মিত্রের 'রাজা' গ্রন্থটি মোট নয়টি ছোটগল্পের সংকলন। লেখক যে বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে'র গল্পরচয়িতা, গ্রন্থারম্ভে সংকলনভুক্ত গল্পগুলির পূর্বে প্রকাশিত পত্রিকার নামোল্লেখে বোঝা যায়। ইতিপূর্বে লেখক 'চোখের আলোয়' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন। শ্রীমিত্র একজন কবি। গল্পগুলিতে সেই কবিমন দুর্লঙ্ঘ্য নয়। গল্পের ভাষা ও 'মুড' নির্বাচনে সেই কবিপ্রবণতার পরিচয় মেলে।

কিন্তু ছোটগল্পের বাঁধুনি রক্ষায় লেখক যে সচেতন নন, প্রথম গল্প 'রাজা' তার প্রমাণ। গল্পের নায়ক সত্যবাবু কলকাতায় মেয়ের বাড়িতে এসে বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। গল্প এখানে শুরু। কিন্তু গল্পের শেষ শুরুর সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ঘটেনি। 'একটি নায়কের জন্ম' গল্পেও নায়ক পরাশরের ব্যক্তিত্ব যুক্তিনিষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়নি। 'দুটি বেকার ও একটি মেয়ে' গল্পটি সুলিখিত। 'সেতু', 'বোবা আকাশ' ও 'ফেরারী' গল্পে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। তবে লেখকের গদ্য সম্পর্কে কিছু আপত্তি আছে। 'পেটাপেটি', 'ছুটোছুটি' জাতীয় শব্দ, 'কেমনতরো' শব্দের বহুল প্রয়োগ, 'ঘরময়', 'বাড়িময়' ইত্যাদির একাধিক ব্যবহার পাঠককে মাঝে মাঝে ক্লান্ত করতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও 'রাজা' গ্রন্থটিতে লেখকের শক্তির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

শুভলগ্ন—(উপন্যাস)—রমাদাস হালদার। রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দু টাকামাত্র।

এই উপন্যাসটি এক অবিস্মরণীয় পট-ভূমিকায় রচিত। বাংলার বিপ্লববাদের এক প্রায় বিস্মৃত অধ্যায়ের সঙ্গে রোমান্স যুক্ত করে শক্তিমান লেখক রমাদাস হালদার একটি সুখপাঠ্য কাহিনী রচনা করেছেন। নায়ক গোয়ালন্দগামী ট্রেনে চড়ে ঢাকা চলেছেন (দেশ বিভাগের আগের ঘটনা) একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল পথে। সহযাত্রিনীটিকে দিনের আলোয় দেখে মনে হল যেন ছাই-চাপা আগুন। মেয়েটি রহস্যময়ী। স্থির হল, মেয়েটি বলল কুলীর সর্দার ভুল করেই হোক আর যাই হোক যে সম্পর্ক স্থির করেছে সেই অভিনয়ই চলুক। আর স্টীমার থেকে নেমে দুজনে দুজনকে ভুলে যেতে হবে। মেয়েটির নাম সীতা। মেয়েটি বলে দিল রমনায় গিয়ে পিতৃবন্ধু রথীন মুখুজ্জের বাড়ি উঠবেন। নায়ক বলে—রথীন মুখুজ্জে কে, তাঁকে ত চিনি না। এরপর পুলিশ কর্মচারীকে ঘায়েল করে তার রিভলবার কেড়ে নেওয়া হল। সীতার কাণ্ড দেখে নায়ক অবাক। পুলিশের সঙ্গে এদের কিসের সংগ্রাম। সীতা প্রশ্ন করে—ভয় পেয়েছ? তারপর সে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এরপর পুলিশে ধরল নায়ককে। পুলিশের কম্বলধোলাই। আদালতে প্রচণ্ড কলরোল—সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী দাঁড়ালেন নায়কের পক্ষে। নায়ক আসামী। সেই রথীনবাবু স্বয়ং সওয়াল করছেন। আসামী নায়ক মুক্ত হল।। চারদিকে বন্দেমাতরম। তারপর ঘটনাসূত্রে জানা গেল রথীনবাবুকে, সীতা তাঁর কে! রথীনবাবুর পুত্রবধূ সীতা। রথীনবাবুর পুত্র বিপ্লবী ছিলেন. স্বদেশের জন্য তিনি আত্মবলিদান দিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে রথীনবাবুর অনুরোধে নায়ক ও সীতার মধ্যে মিলন হল।

কাহিনীটুকু এইরকম। কিন্তু এই সরল কাহিনীটির মধ্যে অতীত দিনের এক অবি-স্মরণীয় ইতিহাস লিখিত হয়েছে। লেখক দক্ষতার সঙ্গে কাহিনীটি বিধৃত করেছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদটি কিন্তু অরুচিকর।

নীলাঞ্জন ছায়া—শ্রীশঙ্কর মিত্র। প্রকাশক—গ্রন্থ-ভারতী, ১২৯, মাকড়দহ রোড, কদমতলা, হাওড়া। মূল্য দু' টাকা।

'নীলাঞ্জন ছায়া' লেখকের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'নীলাঞ্জন ছায়া' কাব্য সংকলন-টির প্রায় সমস্ত কবিতাই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে কবিমানসকে স্পষ্ট করেছে। মোট ছাব্বিশটি কবিতা এতে সংকলিত। কবি মূলত রোমান্টিক। তাঁর শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ-প্রকরণ, চিত্রকল্প রোমান্টিক অনু-ভাবনায় সিক্ত, মধুর আস্বাদী। 'আলোর ভেলায় ভেসে যাওয়া', 'অবশেষে আমার এই পরবাস', 'চোখের আলোয় সোনামন' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে যে চিত্রের আভাস, তা কবির সুদূর আকাঙ্ক্ষার কথা মনে করিয়ে দেয়। সমকালের যন্ত্রণা থেকে কবি অবসর নিয়ে স্মৃতি, প্রেম, বিষয়হীন দুঃখ, আলোক পিপাসা ইত্যাদির মধ্যে ডুব দিতে ভালবাসেন।

স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র—রথীন্দ্রনাথ ভট্টা-চার্য। বিবেকানন্দ পাঠাগার, ২৭ বসন্ত-লাল সাহা রোড, কলিকাতা-৫৩। মূল্য : পনরো টাকা।

'স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র' বহুবিধ রচনা ও কবিতার সমন্বয়ে গ্রথিত নেতাজী সম্পর্কে একটি মূল্যবান সংকলন গ্রন্থ। এর মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ আছে। সংস্কৃতে ডঃ রমা চৌধুরীর সুভাষচন্দ্র-বন্দনা কবিতা দিয়ে এই গ্রন্থের সূচনা। অতঃপর কিছু স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, স্মরণীয় সাক্ষাৎকার, স্মরণীয় ভাষণ, কবিতাঞ্জলি, সাধুসন্তদের দৃষ্টিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, জ্যোতিষীদের দৃষ্টিতে নেতাজী, আজাদ হিন্দ পর্যায়, একটি সংকলন, গ্রন্থপঞ্জী এবং সুভাষচন্দ্রের উপর মননধর্মী প্রবন্ধ দিয়ে ৪১২ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে।

নেতাজী সম্পর্কে একত্রে এই প্রকার বহুবিধ জ্ঞাতব্য মূল্যবান তথ্য সম্বলিত সংকলন গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নি। কেবলমাত্র এই রচনাগুলিই নয়, এতৎ-সহ বহু অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট চিত্রও গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। নেতাজী সম্পর্কীয় গ্রন্থ তালিকায় এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

আলেখ্য (ফাল্গুন-চৈত্র) — সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল। ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ। কলকাতা-৩২। দাম : দেড় টাকা।

মনীষী রামমোহন রায়ের দ্বিশত-জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে এ বছর। 'আলেখ্য'র বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ রাম-মোহন ও নববর্ষ সংখ্যা হিসাবে বেরিয়েছে। রামমোহনের রচনার পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রামমোহন সম্পর্কিত রচনার অংশ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের একটি রচনার অনুবাদ ছাড়াও রামমোহন সম্পর্কে লিখেছেন প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং সরোজেন্দ্রনাথ রায়। মেরী কার্পেন্টারের লাস্ট ডেজ অফ রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থে মুদ্রিত একটি চিঠির অনুবাদ করেছেন তীর্থরেণু দাশ। চিঠিতে রামমোহন নিজের জীবনের একটি রেখাচিত্র এঁকেছিলেন। সে হিসাবে চিঠিটির গুরুত্ব কম নয়। কবিতা লিখে-ছেন গোপাল ভৌমিক, হরপ্রসাদ মিত্র, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, অনুপম দত্ত, সুপ্রিয় গুপ্ত এবং আরো কয়েকজন। এছাড়া আছে আরও কয়েকটি আলোচনা। লিটল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে অল্প দিনে আলেখ্য একটি পরিচ্ছন্ন সম্পাদকীয় রুচির পরিচয় দিতে পেরেছেন।

সুর ও শিল্পী (এপ্রিল ৭২)—সম্পাদক : নিমাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বি-৪৬৭, ব্লক। কে, নিউ আলিপুর, কলকাতা—৫৩। দেড় টাকা।

কলাবিষয়ক মাসিক পত্রিকাটি প্রধান উপজীব্য সুর ও সঙ্গীত: সাক্ষাৎকার, জীবনী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, গীটার শিক্ষার আসর ইত্যাদি নানান বিভাগের মাধ্যমে পত্রিকাটি চিত্তাকর্ষী করে তোলার আন্তরিক চেষ্টা লক্ষ্য করবার মতো। বাংলা ও হিন্দী ছায়াচিত্রের জনপ্রিয় গানগুলির স্বরলিপি এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। স্বর-লিপি করেছেন প্রখ্যাত সুরকাররা। নজরুলের একটি গানের ('আমার দেশের মাটি') স্বরলিপি করেছেন জগৎ ঘটক। সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু আলোচনাও আছে। সঙ্গীত রসিকরা পত্রিকাটি তারিয়ে উপভোগ করবেন নিশ্চয়ই।

আমাকে এখন ॥ মৃগাঙ্গ রায়

তোমরা যারা যাচ্ছ যাও
আমার এখনো অনেক কাজ বাকি,
এখনো অনেক হিশেবনিকেশ বাকি,
অনেক বোঝাপড়া বাকি।
আমি এখনো হাওয়ার দিক্‌নির্ণয় করতে পারিনি,
বহু জরুরি কথার
যথাযথ রঙ ফুটিয়ে তুলতে পারিনি,
অনেক অভিজ্ঞতা থেকে
ফিরে আসতে পারিনি।

তোমরা যারা যাচ্ছ যাও
আমাকে এখন
অনেক বিপরীত কথার সূত্রপাত করতে হবে,
অনেক সহজ কথাকে সিকি-আধুলির মতো
নখের ডগায় বাজিয়ে দেখতে হবে;
অনেক ঘটনার শুরুতে ফিরে যেতে হবে,
পরিচিত অপরিচিত বৃদ্ধ বা যুবক
প্রতিটি মানুষের হাসির মোচড়ের ওপর
চোখ রাখতে হবে।

তোমরা যাও
যারা উৎসবে যাবে যাও

আমাকে এখন
বহু সুসজ্জিত সত্যের
শেকড় খুঁড়ে দেখতে হবে।।

আজ যখন তুমি বাড়ি নেই

কবিরুল ইসলাম

এক সময় খুব দূরে থেকে হাওয়ায় আমি বুঝতে পারতুম
তুমি বাড়ি আছো
তোমার পায়ের প্রতিশব্দ কণ্ঠস্বর দরজায় টোকা
আমি নির্ভুল চিনতুম
তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা রাগ বিরাগ শরীর খারাপ
—এ সবই আমার নখদর্পণে ছিলো।

আমার বাইরে-ভেতরে এখনও তোমার অঘ্রাণে
নবান্নের ঘ্রাণ লেগে আছে।

সেই একসময় হঠাৎ-ই একদিন আমার জন্যে
সব-সময় হয়ে গেলো :
কিছুদিনের রেখাচিত্রে চিরদিন যেন মুহূর্তে বন্দী হয়ে গেলো
আজ যখন তুমি বাড়ি নেই!

মানুষ !! অলোককুমার চট্টোপাধ্যায়

এ তোমার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয় যে
ভেঙে-চুরে অণু পরমাণু
একেবারে শেষ দেখে নেবে একটা পদার্থের
কিম্বা কোন বিষাক্ত ভয়ঙ্কর অম্ল—
নেড়েচেড়ে বলে দিলে তার স্বভাব,
এ তোমার ছন্দের ব্যাকরণ নয় যে
সংজ্ঞা মাত্রা ফেলে বলে দিলে
পয়ার, মহাপয়ার, লিমেরিক না ছড়া
এমন কি তিন চোখো বাতির সিগ্‌ন্যাল
নয় যে—যখন
লাল দেখাবে থামবে, সবুজে চলবে,
বরং এ একটা ম্যাজিক—
এই মুহূর্তে মুরগীর ডিম;
তারপরেই পিং পং এর বল,
তারপরেই বিষাক্ত একটা ট্যাবলেট
যেমন খুশি রূপ বদলাতে পারে,

বুঝলে হে,
এ যে একটা আস্ত মানুষ;
যার শেষ বোঝা যায় না
সংজ্ঞা দেওয়া যায় না
এমন কি সে কখন চলবে
কখন থামবে, কাঁদবে হাসবে
নিজেই জানে না।

সবারে আমি নমি

কানন দেবী
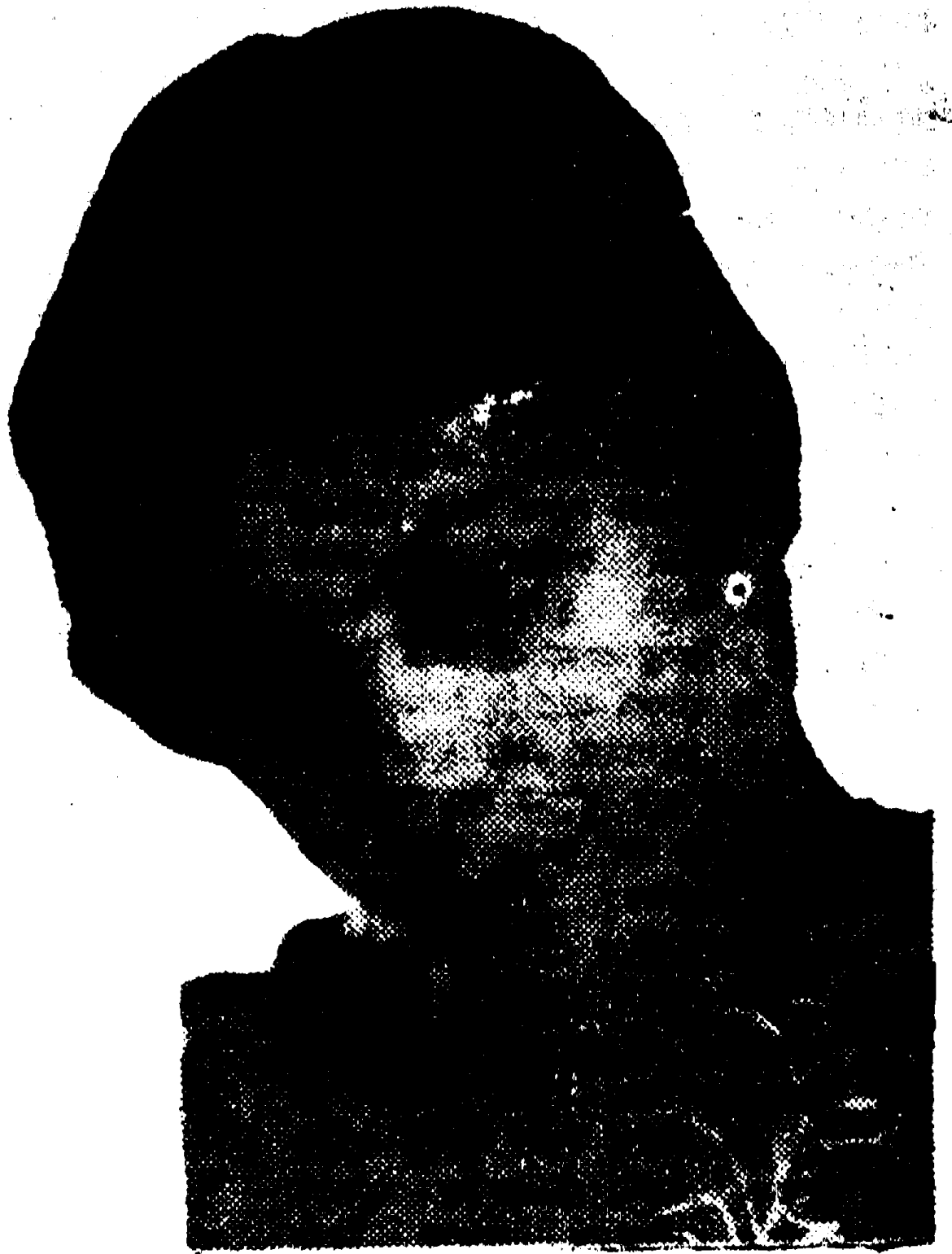
কাজী সাহেবের উল্লেখ না করলে 'বিদ্যাপতি'-র অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আগেই বলেছি 'বিদ্যাপতি' চিত্রে অনুরাধা চরিত্র যোজনা কাজী সাহেবেরই পরিকল্পনা।

বোধহয় 'বিদ্যাপতি'তে কাজ করারও আগে মেগাফোনের রিহার্সাল-রুমে জে এন ঘোষ আমার সঙ্গে নজরুলের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। এর আগে তাঁর খ্যাতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু মানুষটির সঙ্গে পরিচয় সেইদিনই। প্রথমটায় তাকাতেই ভয় করছিলো। উনি কত বড় কবি, আর আমি সামান্য একটি মেয়ে। কিন্তু ভয়ের যে সত্যিকার কোনো কারণ ছিলো না, সে-কথা বুঝতে পারলাম কয়েক মুহূর্তেই। চেয়ে দেখি পাঞ্জাবী-পরা, বাবরী-চুল এক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে হার্মোনিয়ম বাজাতে বাজাতে গুন-গুন করে সুর ভাঁজছেন। চোখদুটি বুজে। মাঝে মাঝে চোখ খুলে এদিক-ওদিক অন্যমনস্কভাবে তাকাচ্ছেন, কিন্তু মনটা যে অন্য জগতে, চাউনি দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এক সময় হার্মোনিয়ম থামিয়ে আমাদের দিকে যখন তাকালেন, বিরাট দুটি চোখের উজ্জ্বলতা যেন তাঁর অন্তরটি মেলে ধরল। আমায় সঙ্কুচিত দেখে পরিবেশ সহজ করে তোলবার জন্যই বোধহয় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার গান, গলা ও চেহারার প্রশংসা শুরু করে হাসির হুল্লোড়ে সারা ঘর মাতিয়ে দিলেন। অপরিচয়ের কুণ্ঠা মুহূর্তেই যেন উড়ে গেল। তারপরই জে. এন. ঘোষের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ত খিদে পেয়েইছে —মুখ দেখে মনে হচ্ছে কাননেরও খিদে পেয়েছে। দাদা এ-বিষয়ে একটু তৎপর হন।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই হাসি। জে, এন, ঘোষ ব্যস্ত-

জহর গাঙ্গুলীর সঙ্গে মানময়ী গার্লস স্কুলে

সমস্তভাবে উঠে গিয়ে মস্তবড় থালাভর্তি খাবার, মিষ্টি, আর একটা বড় প্লেটে পান-জর্দার স্তূপ এনে হাজির করতেই 'খাও' বলে আমার হাতে গোটা দশ-বারো তুলে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সব খাবার নিঃশেষ করে শুধু থালাটিই বাকী রাখলেন। আনন্দময় মানুষটি হৈ-চৈ করে যেমন বিস্ময়কর পরিমাণ খেতে পারতেন, ঠিক তেমনই বিস্ময়করভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাওয়া-খাওয়া ভুলে শুধুমাত্র গান রচনা নিয়েই মেতে থাকতে পারতেন। আর সে কি আশ্চর্যভাবে মেতে থাকা! কখনও যদি কোনো সুর মনে এল সংগে সংগে মিলিয়ে কথা-বসানো আবার কখনও বা কথার তাগিদে সুর। আমি রাগরাগিণীর কিছু বুঝতাম না। কিন্তু লক্ষ্য না করে উপায় ছিলো না, কি ব্যাকুল আবেগে তিনি কথার ভাবের সংগে মেলাবার জন্য হার্মোনিয়ম তোলপাড় করে সুর খুঁজে বেড়াতেন। এ যেন ঠিক রাগের মর্ম থেকে কথার উপযুক্ত দোসর অন্বেষণ।

আমায় অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে বলতেন, 'ডাগর চোখে দেখছ কি? আমি হলাম ঘটক, তা জানো? এক দেশে থাকে সুর, অন্য দেশে কথা। এই দুই দেশের বরকনেকে এক করতে হবে। কিন্তু দুটির জাত আলাদা হলেই বে-বনতি। বুঝলে কিছু?' বলে হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নেড়ে স্পষ্টই বলতাম, 'না, বুঝিনি।' বলতেন 'পরে বুঝবে।' পরে ঠিক বুঝেছি কিনা জানি না, তবে বারবার একটা অচেনা অনুভূতির ঝাপসা আলোয় এইটুকু উপলব্ধিই ঘটেছে যে কথার মত অতি-বাস্তব বস্তুর বুকেও অসীমে ব্যাপ্ত হবার দুরাশা জাগানো এবং সুরের মত অ-ধরাকেও কথার মাধুর্যে বন্দী করার মিলন উৎসবে যিনি আত্মহারা তাঁর কবিকৃতিকে উপভোগ করা যতখানি সহজ, ব্যক্তিত্বকে বোঝাটা ঠিক ততখানি সহজ নয়।

বিদ্যাপতি প্রসংগে আর একটি সাথী-শিল্পীর কথা মনে পড়ে যায়—পাহাড়ী সান্যাল, আজকের জনপ্রিয় 'পাহাড়ীদা': এই একটি মানুষকে দেখলাম বরাবরই একরকম রয়ে গেলেন। সপ্রতিভ, প্রাণচঞ্চল খুশীতে যেন টগবগ করে সব সময় ফুটছেন। সব সময় সকলকে উৎসাহ এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রীতে কম্‌প্লিমেণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে পাহাড়ীবাবুর জোড়া নেই। সুদর্শন, উদারহৃদয়, কল্পনাপ্রবণ নায়কের ভূমিকায় ও'কে ভারী সুন্দর মানাত। 'বিদ্যাপতি'র নাম-ভূমিকায় পাহাড়ীবাবু অভিনয় করেছিলেন। তাঁর সেই সুললিত মধুর হাসির তারুণ্য আজও যেন ঠিক তেমনই রয়ে গেল।

'বিদ্যাপতি'র পরই মুক্তি কথাচিত্রে অভিনয় করার পালা। সে রোমাঞ্চকর অনুভূতি কি ভোলার? একদিন যাঁর ছবিতে 'পার্বতী'র ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েও ফস্কে গিয়েছিলো, অবশেষে তাঁরই সংগে কাজ করবার স্বর্ণমুহূর্তটিতে বিনা আয়াসে পেশছলাম। মনে পড়ে গেল আমার গুরুদেবের গমগমে কণ্ঠের ভাগবৎ পাঠ 'পর্যায়যোগান্বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ'—বিধাতা মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমে সব সাজিয়ে রেখেছেন। মানুষ যথাসময়েই তা পাবে। অকারণ অস্থির হয়ে লাভ নেই। যে বস্তুর জন্য এত আক্ষেপ, মনস্তাপ, তা-ত অলভ্য রইল না? হঠাৎ যেন অনুভব করলাম ব্রহ্মরন্ধ্রে শীতল ধারামতন নামতে লাগল, সকল জ্বালা জুড়িয়ে। কৃতজ্ঞতার আলো যেন উপচে পড়ল মনের, প্রাণের দুকূল ছাপিয়ে। মনে হোলো ঈশ্বর যার চিরসহায়, ঈশ্বরদ্বেষ ত তাকে সাজে না।

'দেবদাস' ছবি করার সময় মিঃ বড়ুয়া আমার কাছে যখন পার্বতীর রোলের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে-সুযোগ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ রাধা ফিল্মের সংগে তখনও আমার কণ্ট্রাক্‌ট ছিল। ঠিক কণ্ট্রাক্‌ট ছিল বললে ভুল হবে, কণ্ট্রাক্‌ট একরকম শেষ হয়েই গিয়েছিলো। কিন্তু ও'রা ছাড়তে চাননি। আইনের বেড়াজালে আমায় আটকাতে চেয়েছিলেন। জোর করে আসা হয়ত যেত। কিন্তু ও'দের কাছে সব সময়ই আমি একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা অনুভব করতাম। শ্রীগৌরাঙ্গের 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর নীহারিকার ভূমিকায় অভিনয় করেই আমার নাম, যশ, খ্যাতির শুরু। তাই ও'দের সংগে কোনো-রকম মনোমালিন্য না ঘটে এবং একটা সৌহার্দ্যসম্পর্ক থাক, এইটেই চেয়েছিলাম। তার জন্য যদি কিছু ক্ষতির মূল্য দিতে হয় হোক। যাই হোক, সেই উপলক্ষ্যেই মিঃ বড়ুয়াকে প্রথম দেখি। ও'র সে-সময় খুব নাম-ডাক, সম্মান। প্রতিভার অনন্যতায় ত বটেই। তাছাড়াও 'রাজকুমার', 'স্কলার' ইত্যাদির সম্মানও এ-লাইনে প্রায় উপকথার মতই ছিল। কিন্তু মনে মনে তাঁর যে যমকালো, স্বপ্ন-রঙিন রূপ কল্পনা করে রেখেছিলাম, তার সংগে বাস্তবের বড়ুয়ার যেন মিল পেলাম না। ক্ষীণকায়, ছোটখাটো মানুষটি, অসাধারণ শুধু দুই চোখের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আলো। তাও ভাল করে লক্ষ্য করলে তবেই চোখে পড়ে।

যাই হোক, পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিতে হয়েছিলো বলে মনে খুবই কষ্ট ছিলো। কারণ নিউ থিয়েটার্স তখন সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান, যেমন 'হাতী মার্কা' ব্যানার, তেমনই আভিজাত্য। ওখানে কাজ করা তখন যে-কোনো শিল্পীর পক্ষেই অত্যন্ত সম্মানের। তার ওপর শরৎচন্দ্রের বই এবং প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনা। এমন দুর্লভ যোগাযোগ জীবনে কবারই বা আসে? মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মিঃ বড়ুয়াকে খুলে বলতেই উনি ব্যাপারটা বুঝলেন। স্বল্পভাষী মানুষটি সংগে সংগেই 'ঠিক আছে। দুঃখ করার কিছু নেই। ভবিষ্যতে আশা করি এরকম যোগাযোগ আবার ঘটবে।' বলেই চলে গেলেন। যোগাযোগ সত্যিই ঘটল। মুক্তি কথাচিত্রের সময়। সেই প্রথম ও'কে কর্মক্ষেত্রে দেখলাম।

যে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় কাজ করবার জন্য এত ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলাম, তাঁর সংগে কাজ শুরু করবার অভিজ্ঞতা কিন্তু ততখানি চমকপ্রদ ন[illegible] প্রথম দিন গিয়ে ত দেখাই হোলো না।

পরদিন যে টাইম দেওয়া ছিল, ঘড়ি দেখে ঠিক তার ১০ মিনিট আগে স্টুডিওতে পেশছলাম। সেদিন মিঃ বড়ুয়ার দেখা অবশ্য মিলেছিলো, কিন্তু ও'র কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মনে মনে যে উজ্জ্বল ছবি এ'কেছিলাম তা মিলল না। উনি অল্প দু-চার কথায় চিত্রা-র চরিত্রটি বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তবু ভরিল না চিত্ত। দ্বিতীয়বার হোঁচট খেলাম।

কথাটা বোধহয় আর একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। উনি সে-যুগের একজন প্রগতিশীল পরিচালক। কিভাবে অভিনয় করলে আমাদের মধ্যের সত্যিকারের শিল্পী সত্ত্বাটি পথ খুঁজে পাবে, কোথায়, কিভাবে টেনশান আনতে হবে এসব উনি নিজস্ব টেকনিকে রিহার্স্যাল দিয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন এইটেই আশা করেছিলাম। কিন্তু সে সৌভাগ্য হোলো না। পরের দিন মিঃ বড়ুয়ারই এক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ও'কে বললেন 'স্টোরিটা ও'কে শুনিয়ে দিন, তাহলে ও'র পক্ষে কাজ করার

সুবিধা হবে।' তখন উনি সংক্ষেপে মুক্তি-র কাহিনী বর্ণনা করলেন। মনে মনে বড় অসহায় বোধ করলাম। এর আগে যাঁদের কাছেই কাজ করেছি, সবাই খুব বিশদভাবে অভিনয়ের ধারা, ভাবভঙ্গী, অ্যাকশন, রি-অ্যাকশন সব বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু মিঃ বড়ুয়া সবই যেন আমার ওপর ছেড়ে দিলেন। শুধু ইঙ্গিত দিলেন 'চিত্রার মধ্যে একটা দারুণ দ্বন্দ্ব চলছিল। একদিকে সমাজ, বাইরের লো, অন্যের চোখে নিজের সুখ-সৌভাগ্যকে তুলে ধরার গৌরব,—অন্যদিকে প্রশান্তর প্রকাশহীন ভালবাসার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ।' সবই বুঝতাম। তবু কোথায় যেন একটা দ্বিধা ছিল। তখন অল্প বয়স। সবে নাম হচ্ছে। আর প্রমথেশ বড়ুয়ার মত অতবড় একজন নামী লোকের বিপরীতে অভিনয় করা। খুবই আড়ষ্ট বোধ করতাম। তারওপর আমার অভিনয়, ভাবপ্রকাশ ইত্যাদি ব্যাপারে ওঁর স্তব্ধতাকে একটু ঔদাসীন্য বলেই মনে হোতো। এক এক জায়গায় এসে মনে হোতো একটুর জন্য যেন ঠেকে যাচ্ছি। সামান্য সাজেশন পেলেই হয়ে যায়। কিন্তু তা পেতাম না। তখন অল্পবয়সের অভিমান বা যে-কোনো কারণেই হোক, মনে হোতো আমার যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ বোধহয় উনি চান না। মনের অতলে অভিযোগের ক্ষোভ সঞ্চিত হলেও মুখে কিছু বলতে না পারার কারণ ছিল অনেক। প্রথমত সে-যুগ এখনকার মত নায়িকা-প্রধান যুগ ছিল না। হিরোইন ইচ্ছে করলেই নিজের পছন্দ অথবা অপছন্দমত কোনো রোল সিলেক্ট অথবা রিজেক্ট করতে পারত না। ডিরেক্টরের আজ্ঞাই ছিল বেদবাক্যের সামিল। তখন এত স্ক্রিপ্ট পড়ানোর রেওয়াজও ছিল না। অভিনয়ের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী কিছু শোনানই হোতো না। তাছাড়া মিঃ বড়ুয়ার তখন অসাধারণ নামডাক, দাপট। ওঁর একটি কথা ফিল্ম-লাইনের যে-কোনো লোকের কাছেই ঈশ্বরের আদেশেরই মত। অন্য সবাইকে 'অমুকবাবু', 'তমুকবাবু' বলা হোতো। কিন্তু রাজকুমার হওয়ার দরুণ অথবা যে-কোনো কারণেই হোক বড়ুয়াকে প্রমথেশবাবু কেউ বলত না। বলা হোতো 'বড়ুয়াসাহেব'। বাবুদের কাছে যদি বা অভিযোগ করা যেত, সাহেবের কাছে অভিযোগের কল্পনাই করা যেত না।

যাই হোক, এর ফলে একটা কিন্তু মস্তবড় লাভ হয়েছিলো। এর আগে সম্পূর্ণভাবে ডিরেক্টরের ওপরই নির্ভরশীল ছিলাম। এই প্রথম নিজের মত চলে আপন শক্তির ওপর একটা আস্থা এল। এ-আত্মবিশ্বাস পরোক্ষভাবে মিঃ বড়ুয়ারই দান। তাই এদিক দিয়ে আমি নিজেকে তাঁর কাছে ঋণীই মনে করি। 'মুক্তি' বই বিপুল সমাদর লাভ করেছিল এবং ('মুক্তি' শীগ্‌গির আবার রিলিজ হবে শুনছি। এটা নিশ্চয় এ-চিত্রের কালজয়ী জনপ্রিয়তার নিদর্শন)। কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো এ-চিত্রে আমার অভিনয় তেমন ফ্রি হয়নি। বোধহয় গানের জন্যই অত নাম হয়েছিলো। অবশ্য এটা আমার ধারণা। এ-ধারণা নির্ভুল নাও হতে পারে।

এর অনেক পরে। 'শেষ উত্তর'-এ মিঃ বড়ুয়ার সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু 'মুক্তি'-র বড়ুয়ার সঙ্গে 'শেষ উত্তর'-এর বড়ুয়ার ফারাক অনেক। 'মুক্তি'-র বড়ুয়া খুব কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মানুষ—যাঁর সময়ের একচুল এদিক-ওদিক হোতো না। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মত কড়া নিয়মের বন্ধনে সকলের আসা-যাওয়া, চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত ছিল। 'শেষ উত্তর'-এ সেই দৃঢ়নিবদ্ধ নিয়মকানুন যেন অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে গেছে। কাজের উৎসাহও অনেক কম। আর একটা কথা। 'মুক্তি'-র সময় যে অভিযোগ মনের অতলে অস্ফুট ছিল, এখন যেন তা দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হোলো। সেটা হোলো এই যে ডিরেক্টর বড়ুয়া যতখানি বড়, শিল্পী বড়ুয়া ঠিক তত বড় নন। কথাটা অন্যভাবেও বলা যায় শিল্পী বড়ুয়া কোনোদিন ডিরেক্টর বড়ুয়াকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। কথাটা একটু হেঁয়ালী হয়ে যাচ্ছে কি? বিশ্লেষণ করলে কথাটা দাঁড়ায় এই, ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ বড়ুয়া সে-যুগেই অনেক কিছুরই প্রবর্তক, যে-ধারায় আজকের যুগের চিত্রজগৎ চলছে। যেমন স্টেজ-ঘেঁষা কথা বলার ধরণকে পরিহার করে ন্যাচারালভাবে কথা বলা, চালচলনকে দৈনন্দিন জীবনাভ্যস্ত চলাফেরার ঢঙে নিয়ে আসা, যার জন্য আজকের যুগেও বড়ুয়ার কোনো ছবিতে ওঁর কথাবার্তার স্টাইল এতটুকুও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তারপর ক্যামেরার কাজ এবং অন্যান্য টেকনিকে ওঁর একটা অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গী ত ছিলই। বাংলা ফিল্মের মোড় উনিই অনেকটা ঘুরিয়েছেন বলা চলে। কিন্তু শিল্পী হিসেবে ওঁর চিন্তা-ভাবনা আর পাঁচজন শিল্পীর মতই ছিল—তার চেয়ে বেশী কিছু অসাধারণও নয় বা সাধারণ নয়। ধরা যাক, কোনো একটি শট নেওয়া হচ্ছে। সেখানে হয়ত ঐ দৃশ্যের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য অন্য কোনো সহশিল্পীর ওপর ক্যামেরার ফোকাসটা বেশী হওয়া প্রয়োজন বা সেটা হলেই শোভন হোতো।

কিন্তু মিঃ বড়ুয়ার প্রবণতা ছিল ক্যামেরার প্রধান অংশটা নিজেই অধিকার করবার। যে-দৃশ্যে উনি আছেন, সে-দৃশ্যে উনিই একক এবং অদ্বিতীয়। ওঁকে ছাপিয়ে আর কেউ যেন বড় হয়ে না ওঠে এইদিকেই যেন লক্ষ্য থাকত। এই দুর্বলতা বা অসংযম শুধুমাত্র শিল্পী পদবাচ্য অন্য শিল্পীকে হয়ত বা সাজত, কিন্তু ডিরেক্টর বড়ুয়াকে সাজে না। ডিরেক্টর হিসাবে ওঁর আর একটু আত্মত্যাগের ঝোঁক থাকা উচিত ছিল। অন্তত আমার মতে। কারণ ডিরেক্টর চাইবেন সকল শিল্পীর অভিনয় সমান ভাল হয়ে একটা সুন্দর টিম-ওয়ার্ক গড়ে উঠুক। কিন্তু শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা থাকেই এবং সেইটেই স্বাভাবিক। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই। এক্ষেত্রে মিঃ বড়ুয়া শিল্পী হবার দরুণ অন্যান্য শিল্পীদের মত এই আকাঙ্ক্ষার তাড়না থেকে রেহাই পাননি। হয়ত সেইজন্যই অন্যান্য ডিরেক্টরদের মত শিল্পীদের অভিনয়কে আরো ব্রাশ আপ করে দেওয়া ওঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বলছিলাম, শুধুমাত্র ডিরেক্টর হলে যা সহজেই করা যেত, ডিরেক্টর-কাম-শিল্পী-প্লাস-হিরো হওয়ার দরুণ সে নিরপেক্ষ বিচার হত না।

শেষ উত্তর-এ আমার অনেক ছবি এমন অ্যাঙ্গেল থেকে এসেছে যা না আসাই বাঞ্ছনীয়। ওঁকে আমি বলেওছিলাম।

মুক্তি চিত্রে মেনকা দেবী, প্রমথেশ বড়ুয়া এবং কানন দেবী

[illegible] চিত্রে কে এল সায়গলের সঙ্গে

কিন্তু সে-ত্রুটি যে শোধরা[illegible] হয়নি তার মূলেও ছিল ঐ একই কারণ।

আবার ডিরেক্টর হিসাবে এমন কতকগুলি ফাইন টাচ্ ও'র কাজে দেখেছিলাম যা শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। উনি গানকে খুব বড় স্থান দিতেন। নিজে গান ভাল জানতেন কিনা জানি না। মাঝে মাঝে গুন গুন করতে শুনতাম। কিন্তু গান সম্বন্ধে খুব ভাল আইডিয়া ছিল এবং কোন্ গানের সুর কোথায় কিভাবে দিলে ড্রামাটিক টেনশন ঘনীভূত হবে সে সম্বন্ধে ও'র দিব্যদৃষ্টি ছিল বললেও এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয় না। 'শেষ উত্তর'এর দুই নায়িকা, রেবা ও মীনা। একজন উগ্র আধুনিকা, অপরজন ঘরোয়া মিষ্টি মেয়ে। একটা সিনে এক রেডিও টক না সভায় ঠিক মনে নেই, বক্তৃতা দেবার সময় রেবা বলছে 'বনানীর গাঢ় অন্ধকারে আমরা বনফুল হয়ে থাকতে চাই না'- ঠিক তার পরবর্তী সিনে মীনা গাইছে 'আমি বনফুল গো'। এখানে একটা গানের কলি দিয়ে উনি দুটি চরিত্রের কনট্রাস্ট যেভাবে দেখিয়েছেন, একরাশ ডায়ালগ দিয়েও তা সম্ভব হোতো না।'

(ক্রমশঃ)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ২১ ॥

হেমন্তর কথাটাই ঠিক। কিছুদিন পরে অনেকটা সহজ হয়ে এল সুরেন। এ-বাড়িতে এসে উঠল না বটে, তবে আসার মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেল। সপ্তাহের মধ্যেও এক-আধ দিন এসে পড়তে লাগল। রবিবারে তো—যে রবিবারে কলকাতায় থাকে—হয় সকালে নয় বিকেলে একবার করে আসেই। নিতান্ত আসবার মতো অবস্থা না থাকলে সে অন্য কথা। তাও, এক রবিবার কোন বন্ধুর বাড়ি কী কাজে সেওড়াফুলি যেতে হয়েছিল—তার আগের দিন শনিবার রাত্রে এসে দেখা করে বলে গিয়েছিল।

তবে আজকাল প্রায়ই কিছু না কিছু হাতে করে আনে, পিসিমা যা খেতে ভালবাসে এমনি সব—ডাঁসা পেয়ারা, যশোরের আতা, সিমলে থেকে একটু ভাল দই—এই ধরনের জিনিস। কুণ্ঠিত হয় হেমন্ত, বেচারীর অত দুঃখের হিসেব করা পয়সা এইভাবে খরচ করছে বলে, আবার আনন্দিতও হয়। কেউ তো এমন আনেনি কখনও পূর্ণবাবু যাবার পর। কুণ্ঠিতই বেশী হয় যখন ওর সামান্য আয়ের কথা ভাবে, তবু বারণও করতে পারে না পাছে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে ওর।

তবে এও সে জানে—হেমন্তকে চেনা ও জানার সুযোগ পাওয়ার পর তার আসাটা বেড়েছে বটে—কিন্তু কারণটা সে যা ভেবেছিল তা নয়—সম্পূর্ণ আলাদা। পিসীর প্রতি দয়া করে—দয়া কথাটা নিজের কানেই আঘাত করে—মমতাতেই আসে। পিসীটা যে কত দুঃখী, কত নিঃসঙ্গ, কী বিপুল শূন্যতা যে দিনরাত বহন করছে মনের মধ্যে—সংসার পাতার কত সাধ, অদৃষ্টের বিদ্রূপে ও বিরূপতায় সেই সাধই বার বার কী নিদারুণ পরিহাসে পরিণত হচ্ছে, কী নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক সে ভাগ্যের খেলা—এতদিনে সে নানা প্রসঙ্গে অতীত দিনের টুকরো টুকরো নানা কাহিনীতে ভাল করেই জেনেছে। সেইজন্যেই সে আসে, নিজের আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নয়, ভাল খেতে পাবে বলে আসে না। বরং এটা-ওটা, বলে বলে ফরমাশের ছলে নিজের বাড়ির মতো খাওয়ার জন্যে ওর মন কত ছটফট করে, সেই কথা শুনিয়ে—খাওয়াটা অনেক সাধারণ করে এনেছে। নিরামিষের দিকেই বেশী যায়—মোচার ঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, সুক্তো চচ্চড়ি ইত্যাদিতে। এইগুলোই ফরমাশ করে বেশী, খাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

এ-কৌশলটা যে হেমন্ত না বোঝে তা নয়। যাতে দুবার করে রান্নার বেশী ঝামেলা না থাকে, ওদের পাঁচ রকম মাছ মাংস রান্না করে খাইয়ে নিজেকে না ডালে ভাত খেতে হয়।

এ-ব্যবস্থায় নিমাইচরণ খুশী হয় না তা বলাই বাহুল্য। পরিহাস ছলে প্রকাশ্যেই অনুযোগ করে। বলে, 'তোমার দৌলতে বেশ খাওয়া-দাওয়াটা চলছিল, তুমি ঘোড়ার ডিম আবার সেই বিধবার খাওয়া ধরলে। থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়—সেই যে কী বলে না, তা এও তো সত্যি সত্যিই তাই। কী আছে এতে? এ তো চিরকালই খাচ্ছি। দেশে তো এ-ই। পুকুর কি বিলের ধারের শাক নয়তো সজনেশাক আছে বারোমাস গাছে, খাড়া, ডুমুর, থোড়, কাঁচকলা—বাগানে যা হয়, বাজার করার তো ক্ষমতা নেই—এর বেশী কিছু জোটে না। কোন বাবু পুকুরে ছিপ ফেললে তো মাছ। এই খেয়েই জন্ম কাটা বলতে গেলে।... অবিশ্যি নিরামিষও জেঠাই রাঁধে ভাল, তা মানছি, চচ্চড়ি তো বলতে পারি অমন কেউ রাঁধতে পারবে না বাজী। পঞ্চম জর্জকে খাওয়াতে পারলে বিলেতের চাটিবাটি তুলে এই কলকাতায় এসে বসত—তবু এ তো খাচ্ছিই চিরকাল। এখন এই পাঁচরকম মাছ পেলে আবার একটু নতুন হয় তবু ওরি মধ্যে—'

'আমার আবার ঐ পুরনো খাওয়াটাই যে হয় না দাদা। বারো মাসই তো হয় ডাল আলুভাতে, হয়ত একটা সেদ্ধপক্ক তরকারী, এই তো বরাদ্দ। বাটনা বাটতে পারি না—যা করে ঐ ফোড়ন ভরসা, তার সঙ্গে একটু নুন একটু মিষ্টি এই তো। মুখে যে সাতপুরু ছাতলা পড়ে গেল। বাড়ি যাই মাসে একদিন, তা ধরুন শনিবার রাত্তিরে গাড়ি চাপি, বাড়ি পৌঁছতে সকাল সাতটা বেজে যায়, আবার সন্ধ্যের মধ্যে না বেরোতে পারলে এখানে এসে সোমবার ভোরে পৌঁছতে পারি না। বাড়ির খাওয়া বলতে মার হাতের রান্না—মাসে ঐ একবেলা। এর বেশী তো নয়।'

'আহা বাছারে!' চোখের জল চাপার চেষ্টাও আর করে না হেমন্ত, 'এই কষ্ট করে ঐ কটা টাকা!'

'এই কটা টাকাই বা পাচ্ছি কোথায় পিসীমা? ম্যাট্রিকটাও তো পাস করিনি। বাবার অবস্থা শুনেছেনই—পড়ানোর ক্ষমতাই ছিল না। লোকজনকে ধরে-করে চেয়ে-চিন্তে পড়াবেন সে মানুষও নন, মুখচোরা লোক। নিজের চাড়ে যতটা [illegible] শিখেছি, তবু পাস করার সার্টিফিকেটখানা তো নেই। কাগজেকলমে তো মুখ্যু! নেহাৎ একটু সুপারিশ ধরা গিছল বলে, বাবারই এক শিষ্য এখানের বড়বাবু, তাই এইটুকু পেয়েছি। এ যদি যায়, এখন আর এ-মাইনের কাজও কোথাও পাব না বোধহয়।'

এই কটা টাকা কেন—এর বেশীই দিতে পারে। হেমন্তই পারে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এর মধ্যে একদিন কথাটা পাড়তে গিয়েছিল, ঠিক দেওয়ার কথা নয়,

সে সাহস হয়নি—একটু ঘুরিয়ে বলেছিল, আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবি বাবা, তুই যেদিন যাবি? দাদা বেঁচে থাকতে থাকতে মাপটা চেয়ে আসি?'

কথাটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল সুরেন। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে, নিমাই কাছাকাছি নেই দেখে বলেছিল, তা নিয়ে যেতে পারি, আপনাকে তো আর বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। কিন্তু আপনার সেখানে না যাওয়াই ভাল পিসীমা। না, আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হবে না, বাবা কোন কথা মনে করেও বসে নেই, দেখে খুশীই হবে বরঞ্চ—আপনিই দুঃখ পাবেন। যে কষ্টে তারা আছে, কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনটা চালাচ্ছে এই পর্যন্ত; দাদার আবার বিয়ে দিয়েছেন বাবা—খরচ বেড়েছে আয় বাড়েনি এক পয়সাও। অথচ না দিলেও চলে না, জমিজমাই বলুন, শিষ্য-যজমানই বলুন—সবই গেছে প্রায়, আজকাল কেউ ঘরোয়া গৃহী গুরুর কাছে মন্তর নিতে চায় না। তাছাড়া ঠাকুর্দা-মশাই-ই নষ্ট করে গেছেন বেশির ভাগ—যা আছে দু-এক ঘর—দাদাকেই তো দেখতে হয়, উদয়াস্ত খাটুনি, তাঁকে কে দেখে? সেইজন্যেই আরও বিয়ে দেওয়া—। মা অথর্ব হয়ে পড়েছেন, তিনিও তো এতকাল কম খাটেননি, ঝিকে ঝি, রাঁধুনীকে রাঁধুনী—আমি তো বলি তুমি আমাদের ঠাকুরঝি—এখন সংসারে একটা লোকও দরকার। কলকাতায় একরকম, ওসব জায়গায় গিয়ে বসা, কোন শিষ্যের হয়ত ছেলের অন্নপ্রাশন, আগের দিন বাঁকে করে সিধে তেল ঘি পাঠিয়ে দিলে, কী সমাচার, না আপনাদের প্রসাদ ছেলের মুখে দোব। সেসব তো মাকেই এক হাতে করতে হয়েছে. এখন আর পারেন না।'

খানিকটা চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে এবং বোধ করি পরের প্রশ্নটার জন্যে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বলে হেমন্ত, 'তা সে কষ্ট কি কিছু দূর করতে পারি না আমি?'

'সেই তো হয়েছে বিপদ। আপনি যে কেন যেতে চাইছেন তা কি আমি জানি না! তাদের কষ্ট দূর করতে চাইবেন সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু একটা বাধা আছে। বাবার দিকে বাধা। বাবা—বাবা! যেদিন আপনার ওখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, ঠাকুর্দামশাই জানতেন যে, বাবা আপনার সন্ধানেই এসেছিলেন, মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আশা ছিল কিছু টাকা দেবেন আপনি, একটু ভালরকম চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা হবে তাঁর, ঐ ধরনের মানুষ ছিলেন তো, নিজের কথাটাই শুধু চিন্তা করতেন—বাবা কিছু বলেননি কিন্তু তাঁর মুখ দেখেই ঠাকুর্দামশাই বুঝেছিলেন যে, বাবা অপমান হয়ে ফিরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি দিয়েছিলেন বাবাকে যে, এর-পর কোনদিন আপনি কোন সাহায্য করতে গেলে কি কিছু দিতে গেলেও তিনি যেন না নেন। কঠিন দিব্যি দিয়েছিলেন। এটা কেন করতে গেলেন, তা আমি বুঝি এখন, তবে গুরুনিন্দা আর করব না—গুরুর গুরু। পরে হয়ত মত বদলে ছিল, আপনার সঙ্গে দেখাও করতে চেয়েছিলেন—দেখা হলে হয়ত তিনিই হাতে পেতে নিতেন কিছু, সেই রকমই ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছিলেন এদান্তে—আর তাহলে সে দিব্যিরও কোন মানে থাকত না, কিন্তু তা তো হয়নি, সে সময় সে দিব্যির কথা কোন পক্ষের মনেও ছিল না—তাই সেটা কাটানোও হয়নি, থেকেই গিয়েছে।... নিছক ছেলেমানুষী, আমি ওসব মানি না, তবে বাবাকে তো চেনেনই। ঠাকুর্দা-মশাইয়ের আদেশ বেদবাক্যের থেকেও অলঙ্ঘ্য।'

এরপর নীরবে বসে চোখের জল ফেলা আর অনুতাপ ছাড়া পথ কি?

আর যেতে চায়নি সেখানে। সুরেনের কথাই ঠিক। শুধু শুধু দুঃখ বাড়াতে গিয়ে লাভ কি? কিছুই করতে পারবে না, মাঝখান থেকে তাদের আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে আসা!

বোধহয় বহুদিন ধরেই মনের মধ্যে মাথা কুটছিল কথাটা। মুখ ফুটে বলতে পারেনি হেমন্তকে। সাহসে কুলোয়নি। জানে—গালাগাল তো খাবেই। দু-চার ঘা মারধোরও এই বুড়ো বয়সে খাওয়া আশ্চর্য নয়। হয়ত তৎক্ষণাৎই দূর করে দেবেন। 'বেরোও আমার বাড়ি থেকে হারামজাদা, দূর হয়ে যা!' বললেই হল, সে মেয়াদের আপীল চলবে না আর।

প্রধানত এই ভয়েই বলতে পারেনি।

এতদিন পরে সুরেনের প্রতিপত্তি দেখে, তার প্রতি টান ভালবাসার 'আদিখ্যেতা' দেখে তাকেই পাকড়াও করে ধরল নিমাইচরণ। টান আরও একজনের ওপর ছিল—গোরা—কিন্তু থাকলে সে-ই করুণাপ্রার্থী হয়ে থাকত, সে আর তার হয়ে কি ওকালতী করবে। তাছাড়া তারও স্বার্থের সম্পর্ক। ভাগীদার বাড়ানোতে তারই অসুবিধা বরং। এসব কথা ছেলে-মানুষ ভাইপোকে দিয়ে বলানোও যায় না। বলতে গেলে শুধু সেইজন্যেই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত।

সেদিক দিয়ে সুরেন সম্পূর্ণ নিরাপদ। সে দয়ার প্রার্থী নয় জেঠাইয়ের। তাকে প্রার্থী করার জন্যে জেঠাই-ই তার করুণার প্রার্থী। সে বিষয়ের ভাগ চায় না, এই ঐশ্বর্যে তার লোভ নেই। এ-নিরাসক্তি যে ঢং নয়, ন্যাকামি নয়, তা ভাল করেই বাজিয়ে দেখেছে নিমাইচরণ। সত্যিই, নিজের খাটাখাটুনি ছাড়া কিছু চায় না—পড়ে পাওয়া টাকা-পয়সায় কোন লোভ নেই ছেলেটার। সুতরাং নিমাইচরণের বিয়ে দিয়ে ছেলে-বৌ নিয়ে সংসার পাতলে তার ঈর্ষার কোন কারণ হবে না বোধহয়—বাগড়া দেবার চেষ্টা করবে না।

তাই সুরেনকেই ধরল একদিন নিমাই—সটেপটে। এ-বাড়িতে ফাঁক পাওয়া শক্ত, তাই সেদিন আপিসের পর ওর সেই সার্পেনটাইন লেনের বাসাতে গিয়েই হাজির হল।

'এলুম ভাই তোমাকে একটু বিরক্ত করতে। তুমি বোধহয় রাগ করছ, রান্না-বান্নার দেরি হয়ে যাবে, কাজের সময় আগড়োম বাগড়োম বকতে এলুম বলে—তা ভাই আমি নাচার, আমারও ধরগে কথাটা না বললে নয়।'

'যা বল, সে কি কথা! রাগ করব কেন। এমনকি আর আমার বন্ধুবান্ধবরা আসে না। এই তো পাশের ঘরের বিশ্বনাথবাবুই—কোন কাজ নেই, কর্ম নেই, আপিস যান আর ফিরেন,—হঠাৎ কোন কোন দিন এসে হয় আমি একা আছি, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, এসে বিছানা জোড়া করে বসেন, আমাকে নানারকম সাংসারিক সদুপদেশ দেন—যদিও নিজে তেমন সৎ আদর্শ রাখেন নি—নিজের জীবনবৃত্তান্ত শোনান, রাত এগারোটার আগে নড়েন না। তাই বা কি করি বলুন? আপনি কিছু কুণ্ঠিত হবেন না। তবে দাদা, পাঁচটা মিনিট বসুন, এখনও দেখছি কলে জলটা আছে, দু-ঘটি মাথায় ঢেলে আসি চট করে। এ-ভাগ্য প্রায়ই হয় না, মানে হয়ে ওঠে না। চৌবাচ্চার জল যা বারোভূতে নোংরা করে রাখে—সকলকার চানের জল সাবান তেল তো পড়ছেই—কাক চিলের ময়লা তার ওপর ফাউ।'

বলতে বলতেই গামছাটা টেনে নিয়ে দৌড়য়। চান করে এসে বারান্দায় তোলা উনুনটা ধরিয়ে ঘরে এসে বসে, বলুন দাদা, কী হুকুম!...তবে চা-টা কিছু খাওয়াতে পারব না, ও-পাট নেই। বসেন একটু তো মোড়ের দোকান থেকে মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে আসি কিছু।'

'না না, ওসব কিচ্ছু করতে হবে না।... এমন সময়ে মিষ্টি খেলে অম্বল হয়ে যাবে। তুমি থির হয়ে বসো।...হেঁ হেঁ—হুকুমটুকুম কিছু নয়, তুমি বলো বেশ কিন্তু, মাইরি—তা নয়, আমি এসেছি তোমাকে একটু সুপারিশ ধরতে'

'আমি? সুপারিশ? বলেন কি দাদা, আমার হয়ে কে সুপারিশ করে তার ঠিক নেই। বলে যে টিকে ধরাতে জামিন লাগে—আমারও তো সেই অবস্থা, আমি আপনার কি কাজে লাগব?'

'আছে আছে, তাও আছে। তেমন পাত্তর না জেনে কি বলছি। তুমি ওকালতি করলে মামলা ফতে হবে—এমন আদালতও আছে বৈকি।...হেঁ হেঁ, বলছি কি তোমার এই পিসীর সব ভাল, কেবল আমার বিয়ের নামটি করে না। কেন বলো তো? এতদিকে এত বিবেচনা, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তো ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনবরত—আমার কথাটা মনে পড়ে না তো বৈ? অথচ আমি তো পায়ের তলার জুতো হয়ে, জুতোর সুখতলা হয়ে পড়ে আছি বলতে গেলে। আমার কথাটা একটু মনে করা উচিত ছিল না? এদিকে আমার যৌবন যে যেতে চলল। বয়েসটা কি আর কম হল? জোয়ানে না কেরে কি ভাটায় বাইব? সে যে ব্যাত্রম হতে হবে দেখবেন! বুদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বলে বলে!'

এই বলে একটু থেমে, সুরেনের দিকে খানিকটা অপ্রতিভভাবে চেয়ে থেকে, অকারণেই খানিকটা হেঁ হেঁ করে হেসে নেয়। তারপর আবার বলে, 'তাই একটু বলছিলুম কি—ভাল বুঝে, তুমি একবার কথাটা পাড়ো না একদিন। মনে করিয়ে দাও না। হয়ত মনেই নেই, দূরে দূরে থাকি তো, এত কাল আছি, আমার যে মানুষের শরীল। আর মানুষের শরীল হলেই শরীলের ধন্দও থাকবে—এইটেই হয়ত মনে পড়ে না।...আ, আমার যে মা দিলে আমার বংশ না থাকলে—ওর পয়সা খাবেই বা কে? বক দিয়ে যেতে হবে যে আমার সমস্ত। হেঁ-হেঁ!'

এসব কথা ভাল লাগে না সুরেনের। সে চুপ করে থাকে খানিকটা। তারপর বলে, 'এসব কথা আমার তোলা কি ভাল? আমার সঙ্গে সম্পর্ক যাই হোক—দুদিনের তো পরিচয়। আপনি এতকাল আছেন ছেলের মতো—আপনার জোর ঢের বেশী। দেখি তো, আপনার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেন।'

'না না ভায়া, বোঝ না। ঐ পর্যন্ত। নির্ভর করেন, কাজ থাকলে বলেন—তারপর আর মনে থাকে না। বলে কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলেই পাজী। তুমি এখন নতুন হাজার হোক, অনেক বেশী পেয়ারের। তুমি বললে সাতখুন মাপ! আমি বলতে গেলে হয়ত তেড়ে মারতেই আসবে। এদানেত যা মেজাজ হয়েছে। সেদিন, এই তো পুরী থেকে আসবার দিন —কুলিটা মাল নিয়ে আসতে আসতে বাসনের থলেটা ফেলে দিয়েছিল, ফেলে দিয়েছিল মানে তোরঙ্গের ওপর থেকে গইড়ে পড়ে গেছল, ছেঁড়া কাপড় পোরা ছেল সেটার—একটা বড় সাগরীর কানা ছাড়া কিছু ভাঙেনি—তা সে তো পরের কথা, খুলে দেখে তো বিচের—এমন টেনে এক চড় কষিয়ে দিলে সাহেবরাম হিন্দুস্থানী কুলী বাপ বলে বসে পড়ল। সে বড় কাণ্ড ইস্টিশানে—ভীড় জমে গেল রীতিমতো।'

আরও একটু চুপ করে থেকে সুরেন বললে, 'বলেন আমি বলতে পারি। তবে যেমনভাবে আপনি বললেন, ওভাবে বলতে পারব না।'

'তা সে ভাই তুমি যেমন ভাল বোঝো বলো। তুমি বেশ গুছিয়ে মিষ্টি করে বলতে পারো, সে আমি দেখিছি। হাজার হোক পণ্ডিতের বংশ তোমাদের, নিজেও ঢের বইটই পড়েছ, তোমাদের কাছে আমরা? হেঁ-হেঁ—

আরও কিছুক্ষণ সুরেনের সময় নষ্ট করে, রান্না সম্বন্ধে নানান জ্ঞান দিয়ে যখন বিদায় নিল নিতাই তখন উনুনের প্রথম আঁচটা পড়ে গেছে, আবার অতি দুঃখের কয়লা চাট্টি খরচ করে বাতাস দিয়ে তবে আঁচ তুলতে হল সুরেনকে।

পরের রবিবারেই কথাটা হেমন্তকে বলল সুরেন।

সবই বলল—যা যা বলেছিল নিতাই। ওরই মধ্যে একটু ঘষামাজা মোলায়েম করে নিয়ে। মায় তার বংশরক্ষা না হলে হেমন্তরও যে বিপদ—সে কথাটা সুদ্ধই বলল।

ওকে আসতে দেখেই নিমাইচরণ বাজারে বেরিয়ে পড়েছিল, বলার অবসর দিয়েই, সুতরাং সব কথা বলারও কোন অসুবিধা হল না।

কথাটা শুনে কিন্তু হেমন্ত রাগ করল না, খাঁ খাঁ করে উঠল না, গালিগালাজও করল না, বরং যেন চিন্তিতই হয়ে উঠল। কুটনো কুটতে কুটতেই শুনেছিল কথাগুলো, আরও খানিকটা নিঃশব্দে বসে কুমড়ো ডাঁটার আঁশের মতো খোসা ছাড়াবার পর—ঈষৎ একটু অপ্রতিভ ধরনের হাসি হেসে বললে, তা বটে। আমার না হয় সব ঘুচে পুচে গেছে তাই বলে ও-ও এই বয়সে মানব জীবনের সব সাধ আহ্লাদ ঘুচিয়ে বসে থাকবে, বিধবা হয়ে—তা তো আর সম্ভব নয়।...আমারই কথাটা ভেবে দেখা উচিত ছিল।...তবে কি জানিস, আমার এই সব ঝঞ্ঝাটে জড়াতে আর ভাল লাগে না, ভয় করে। হবে যা তা তো বুঝতেই পারছি, মিছিমিছি ওদের জীবনটাও হয়ত মাটি হয়ে যাবে আমার বরাতের সঙ্গে বরাত জড়িয়ে। ...এই তো একজনকে নিয়ে নতুন করে সংসার গড়তে গিছলুম, আমার তো প্যাজ পয়জার দুদোলার হলই—সে ছোঁড়াটার জীবনও নষ্ট হয়ে গেল। কোথায় হয়ত ভিক্ষে করে খাচ্ছে কিম্বা চুরি করে জেল খাটছে—কে জানে!...আজ যা কিছু করতে যাবো—শুধু অশান্তিই বাড়বে আর কোন লাভ হবে না।'

সুরেন আস্তে আস্তে বলে, হেমন্তর ব্যথাটা বুঝেই, কিন্তু জড়িয়েছেন যখন এতকাল কাছে রেখেছেন আশ্রয় দিয়ে, এখন এটুকু ঝুঁকিও নিতে হবে, নইলে কর্তব্যের হানি হবে না—কি?'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক। ভাবতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। আগেই হয়ত সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা যখন হই নি—তখন দুর্বুদ্ধির খেসারত দিতে হবে বৈকি! আমাদের সবাই অকালমৃত্যুর ধারা, আশা গিয়েও যেতে চায় না।...দেখি, আবার সমরাঙ্গনে নামি বিধাতার সঙ্গে, দেখি উনি জেতেন কি আমি জিতি।'

তারপর কুটনোগুলো রান্নাঘরে ঠাকুরের কাছে দিয়ে বলে, তুমি রান্না সব এগো করো, চচ্চড়িটা আমি রাঁধব। আমার হাতের চচ্চড়ি খেতে বড় ভালবাসে—তোমার এই দাদাবাবু।...তোমার হলে আমাকে ডেকো, আমি এসে সাঁতলে নিলে তুমি বাকিটা রেখে দেখে চলে যেয়ো। কেমন?'

তারপর ফিরে এসে বঁটি কুটনোর খুঁড় গুছিয়ে তুলে রাখতে রাখতে বলে, 'তা বাবা দ্যাখ, না একটা মেয়ে গরীবের ঘরেও টরের—ঐ তো যদির পাত্তর, কেইবা ভাল মেয়ে দেবে!...তোদের যদি জানাশুনো কেউ থাকে—। আমি এক পয়সা চাই না, নিইও না। শুধু এক গাছা কড় পরিয়ে যে দিলেও হোক। মেয়েটা একটু ভাল হয়, দেখতে-শুনতে যত না হোক, স্বভাবটা ভাল হয় এইটেই চাই। জানাশুনো ঘরের হলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে পারি। একটু ভেবে দ্যাখ তেমন কারও কথা মনে পড়ে কিনা।'

'দেখি। এই তো বললেন। মনেও দিশি না হয়।'

সুরেন নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল দুটোর দিকে চেয়ে উত্তর দেয়।

হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছিল, এতক্ষণ নিজের মনের মধ্যেই তোলাপাড়া করছিল কিছু। ভাবছিল কথাটা পাড়বে কিনা, মানে এই পাত্রের সঙ্গে। যে বংশের মেয়ে—তাদের বিবরণ তো কিছু কিছু শুনেছে—বাবার মুখে, কাকার মুখে—এই পিসীর মুখেও। তার পরও এ পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করা ঠিক হবে কিনা, চিরজীবনের মতো দায়ী অপরাধী হয়ে থাকতে হবে কিনা—বোধ হয় এই কথাটাই তোলাপাড়া করছিল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াও একটা।...

শেষে সন্ধ্যার পর, বলেই ফেলল কথাটা।

'একটি মেয়ে আছে পিসীমা, —বড় পিসীমার ভাগ্নী হয় সম্পর্কে। আপন নয়—মাসতুতো ননদের মেয়ে।...এরা হত চাটুজ্যে—না? তা হলে হবে মেয়েরা মুখুজ্যে।'

'কি রকম মেয়ে, তুই দেখেছিস? তারা একে দেবে—নিমেকে?'

'মেয়ে আমি চোখে দেখি নি, তবে যে দেখেছে সে-ই বলে খুব ভাল দেখতে। সাকায়া সুন্দরী নয় হয়ত—খুব চটক আছে। অনেকে সুন্দরীই বলে। শুধু তাই—মেয়ে এখানের ভাল ইস্কুলে থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল, একটু-আধটু গানও জানে নাকি। মানে তেমন—থাক লেখা

বলে তা দেখে নি—তবে ওদিকে খুব ঝোঁক আছে, একবার শুনলেই নাকি তুলে নিতে পারে, গান শেখেনি, সুরের জ্ঞান আছে।'

'দূর! সে মেয়ে কখনও এই রূপী বাঁদরের হাতে দেয়। মিছিমিছি ওকথা তুলে লাভ কি?' হেমন্ত হতাশা সুরে বলে।

'আছে, এর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড 'কিন্তু' আছে, নইলে কথাটা তুলতুম না। ভদ্রলোক, মানে পিসীমার নন্দাই, অবিনাশবাবু না কি যেন নাম, অবিনাশই বোধ হয়—কলকাতার বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন, কি এক বাঙ্গালী বাড়ী কাজ করতেন। বাঙ্গালী বাড়ীর চাকরী হলেও ভাল মাইনে ছিল নাকি—শতাবধি টাকা পেতেন মাসে। তা ছাড়া উপরিও ছিল কিছু, বিল পেমেন্ট নিতে আসত যারা, শতকরা এক টাকা দস্তুরি দিয়ে যেত, সেইটে জমে বছরের শেষে কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ হত। তাতেও শ' দুই টাকার মতো হত প্রায়, পুজোর সময় সেটা হাতে পেতেন। হঠাৎ মালিক মরে গিয়ে দুই তিন ভাইপো এসে গদীতে বসল, ভাইয়ে ভাইয়ে রেষারেষি করে দেদার চুরি শুরু করল নিজেরাই। যে কারবারে মাসে পাঁচ-ছ হাজার টাকা মুনাফা হত, সেই কারবার দেড় বছরের মধ্যে ফেল হয়ে দেউলে খাতায় নাম লেখাল, আদালতের লোক এসে চাবি দিলে—এক কথায় মেসো-মশাইয়ের চাকরীটা গেল। সেই থেকেই বেকার—তখনকার দিনে বড়বাবুকে ধরে চাকরীতে ঢোকা, ম্যাট্রিক পাসটাস কিছু নয়, বুড়ো বয়সে—এখন প্রায় পঞ্চাশ-একান্ন বছর বয়স হল—কে চাকরী দেবে? সরকারী চাকরী তো হবেই না, যেটা হতে পারত বাঙ্গালী বাড়ীর কাজ—তাও এখন সবাই সন্দেহ করে, মালিক পক্ষ নিজেরা চুরি করে ব্যবসা ফেল করেছে এ কেউ বিশ্বাস করে না। ভাবে ভাইপোরা নতুন লোক, বুড়ো গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর—মনিব মরতে না মরতে এই সব বুড়ো ঘুঘুর দল লুটেপুটে খেয়ে নিয়েছে।'

'মেসোমশাইয়েরও আহাম্মুকি' একটু থেমে হেসে বলে সুরেন, 'এইখানে এক বছর ধরে ভাড়া গুণে বাসা বজায় রেখে ঘুরে-ছেন চাকরীর জন্যে, এক বছরেরও ওপর—ফলে সর্বস্বান্ত। আর কত টাকাই বা থাকে দিন-আনা দিন-খাওয়া কেরানীর ঘরে? শেষে মাসীমার গায়ে সোনারত্তি বলতেও যখন কিছু রইল না তখন হুঁশ হল। ও'র আর এক ভায়রাভাই বলে-কয়ে এই রাজগঞ্জের কাছে এক চালের কলে একটা তিরিশ টাকা মাইনের খাতা-লেখার কাজ যোগাড় করে দিয়েছেন। তাতেও হত না, মালিক একটু জমিদার মতোও বটে, তাঁর ঠাকুরবাড়ীর এক পাশে, বোধ হয় এককালে পূজারীদের জন্যে তৈরী হয়েছিল, আসল পূজারী তো থাকেনই একটা অংশে, এ বাড়ীতে—সেইখানে দুটো ঘর দিয়ে রেখে-ছেন বিনা ভাড়ায়। এখন শুনছি ছেলে-মেয়েগুলোর ওপর একটু নজর পড়েছে—দেখতে ভাল সবাই নাকি, স্বভাবও খুব ঠান্ডা—তাছাড়া যদিও ছোট দুটোকে ওখানের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। বাবুরাও ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলী, তবু ব্রত-পার্বনের ছুতোয় বড় বড় সিধেও পাঠান প্রায়ই, কাপড়-চোপড় চাল-ডাল। তাইতেই এক রকমে যোগেযাগে চলছে ও'দের, বলতে গেলে পরের দয়ার ওপর—'

দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করে চুপ করল সুরেন। চোখ দুটো ওর কিন্তু এখনও নিজের সেই পায়ের নখ দুটোর ওপর নিবদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে একবারও পিসীর মুখের দিকে তাকায় নি।

হেমন্তও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর নত মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তুই এত কথা জানলি কি করে? দিদি তো নেই, এত ছিষ্টির কথা তোকে বললেই বা কে, আর কেনই বা বলতে গেল? নিশ্চয় তোর সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিল কেউ?'

যেন চমকে উঠল সুরেন, ঈষৎ ত্রস্ত-ভাবে চোখ তুলে পিসীর দিকে তাকাতেই তার দৃষ্টির তীক্ষ্মতা চোখে পড়ল, তার ফলে যেন আরও বিব্রত আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল—এই অন্তর্যামীর মতো কথা বলাতেই এত ভয় তার—তার পর আবার মুখ নীচু করে বললে, 'আপনি যা গণকঠাকুরের মতো বললেন, আপনার কাছে আর গোপন করব না। হাঁ, তাই'।

আবারও হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে হেমন্ত।

'তোর যেমন কথা! তোকে যে পাত্তর করতে এসেছিল সে কখনও নিয়েকে দেয় ঐ মেয়ে, বানরের গলায় মুক্তোর মালা!'

'কেন? বা রে!' এবার যেন গলায় একটু জোর পায় সুরেন 'নিমাইদা খারাপ পাত্তরটা কিসের? প্রায় সরকারী চাকরী করে, দেশেও যাই হোক গিয়ে পড়তে পারলে কিছু ধানচাল পাবে, — তারপর হয়ত আপনার এই বিষয়ও ওতেই অর্শাবে যদি বর্তিয়ে চলতে পারে। আমার চেয়ে তো ভাল পাত্র পিসীমা!'

'হ্যাঁ! কিসে আর কিসে। কোথায় চাঁদ আর খোড়ার ল্যাজ! অত মুখখু, ক-অক্ষর গোমাংস। মেয়ে বলছিস থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়া, গান জানে, সুন্দরী—'

'মুখখু তো আমিও পিসীমা। যতই যা পড়ে থাকি, পাসের ছাপ তো নেই, সেখানে দুজনেই সমান। চাকরীর বাজারে দু আনা এক আনার তফাৎ কেউ দেখে না। দরখাস্ত লিখতে গেলে দাদাও লিখবেন রেড আপ টু দি ম্যাট্রিক ক্লাস—আমিও তাই।'

'দেখতে শুনতেও তো একটা কথা আছে!' হেমন্ত তবুও বলে, 'তোর মতো রূপবান ভদ্র জামাই যে খুঁজতে এসে-ছিল—'

বাধা দিয়ে সুরেন বলে, 'সে যখন হবার জো নেই তখন আর সেকথা ভেবে লাভ কি বলুন। তাছাড়া রূপো যখন নেই ঘরে, জামাইয়ের রূপ খুঁজতে এলে চলবে কেন? এই, যদি আপনারা দয়া করে নেন—নইলে কি আর ঐ মেয়ের বিয়ে হবে ভাবেন? যতই ভাল মেয়ে হোক একেবারে ভোজের চুপড়ি ধুয়ে ঘরে তুলতে কেউ রাজী হবে না। ঐ যে বাবুরা অত ভালবাসেন, দয়া করেন—কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন তাই বলে?'

'তবে দ্যাখ—যদি দেয়। চিঠি লিখে দ্যাখ।...বিশ্বাস তো হয় না।'

হেমন্ত যেন মেয়ের রূপগুণের বিবরণে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে।

মনোরমার মতোই আর একটা জংলী বৌ আসবে হয়ত—এই তার মস্ত ভয়।

(ক্রমশঃ)

আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন

নারায়ণ চৌধুরী

অনেক প্রশ্নকারী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন : আপনার বিবেচনায় আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? রবীন্দ্রনাথ সংশয়রহিত কণ্ঠস্বরে ক্ষিপ্র উত্তর দিয়েছিলেন : রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহনের উপর কবির নির্দ্বিধ শ্রেষ্ঠত্বের আরোপ মোটেই সাময়িক আবেগের অভিপ্রকাশ ছিল না। দুইয়ের জীবনসাধনার পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাবো দুইয়ের ভিতর নানা দিক দিয়ে প্রভূত মৌলিক মিল ছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ভাবসাধনাকে রামমোহনেরই সাধনার পরিপূরক মনে করতে পারা যায়। যে সমন্বয়মূলক 'ভুক্তি-মুক্তি'র আদর্শ রামমোহনের সকল কাজের মূল প্রেরণা ছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় তা অতিশয় শিল্পসম্মত বাঙ্ময় রূপ লাভ করে। কবি ভোগ ও ত্যাগকে, জীবনপ্রীতি ও বৈরাগ্যকে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভরা ধরিত্রীর বিচিত্র সৌন্দর্যানুভূতি ও অতীন্দ্রিয়চেতনাকে এক সূত্রে বন্ধন করেন—কি কাব্যে কি জীবনাচরণে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, বিশেষতঃ পরিণত বয়সের চিন্তায় যে-সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিকতার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই, তারও উৎস নিহিত রয়েছে রামমোহনের সাধনায়। বিশ্ববীক্ষা বা 'ওয়ার্লড ভিসন' বলতে যে জিনিস বোঝায়, এ দেশে তার পথিকৃৎ হলেন রামমোহন রায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা কিছু নতুন বস্তু নয়, তিনি রামমোহনেরই আদর্শকে সম্প্রসারিত করেছিলেন মাত্র।

রামমোহন জীবনের নানা ক্ষেত্রে সমন্বয় বা সামঞ্জস্যকে তাঁর মুখ্য চালিকাশক্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মসাধনায় তিনি বেদান্ত, ইসলাম ও খৃস্টধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ঠিক তেমনিভাবে অতীত ও আধুনিকতার মধ্যে রাখীবন্ধন ঘটাতে, এদেশে তুলনামূলক ধর্মালোচনার প্রবর্তক তিনি। ভোগ ও ত্যাগের তিনি এককালীন উপাসক, আর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সেতু রচনার তিনিই যে প্রথম কারুকৃৎ, সে কথা তো সকলেই জানেন। এই আদর্শগুলির সবকটি না হলেও তিনটি আদর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছিল—প্রাচীন ও নবীনের মিলন, ভোগ ও ত্যাগের মিলন, এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে রামমোহনের পরিপোষিত এই ত্রয়ী মূল্যবোধকে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন বলা যেতে পারে। ভাবজীবনে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনেরই মানস-সন্তান, সার্থক উত্তরসাধক। রামমোহনের পৃষ্ঠপট বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথকে ভাবাই যায় না।

রামমোহনের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা বার বার টেনে আনার একটি কারণ আছে। রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ যে কী চোখে দেখতেন তার পরিচয় তো গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। এ বাদেও অন্য নজীর আছে। একবার মহাত্মা গান্ধী উড়িষ্যা ভ্রমণকালে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আমাদের দেশের সাধকদের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহনের কথা ওঠে। গান্ধীজী সখেদে বলেন, তুকারাম, নানক, কবীর, দাদু, তুলসীদাস প্রমুখ মধ্যযুগীয় সন্তসাধুদের তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্মসাধক রামমোহন 'বামন' (পিগমি') সদৃশ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। সংবাদপত্রে গান্ধীজীর এই বক্তব্যের রিপোর্ট পাঠ করে তিনি 'এতটাই' ক্ষুব্ধ হন যে, সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীকে চিঠি লিখে ওই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। গান্ধীজী কবির মনোভাবের তীব্রতা উপলব্ধি করে তাঁকে পত্রে জানান, তাঁর রামমোহন-সম্পর্কিত মন্তব্য সংবাদপত্রে কিছু অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তিনি ঠিক ও-ভাবের কথা বলেন নি। গুরুদেব যেন খবরের কাগজের ওই রিপোর্টকে গুরুত্ব না দেন। গান্ধীজীর ওই কৈফিয়তে কবির ক্ষোভ সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়েছিল বটে, তবে এই ব্যাপারে তাঁর মনে দীর্ঘদিন একটা ক্ষত থেকে গিয়েছিল। (নবজীবন-প্রকাশিত ট্যাগোর-গান্ধী কনট্রোভার্সি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

কবিগুরু কেন রামমোহনকে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করেন এবং কেন রামমোহনের ব্যক্তিত্বের অপহ্নবকারী মন্তব্যে অতিশয় মর্মপীড়িত হন সেটা আর একটু বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

রামমোহনের যে সময়ে ভারতে আবির্ভাব, (১৭৭২ সাল) সে সময়টা দেশের পক্ষে ঘোরতর দুর্দিন। ইংরেজের কোম্পানীর শাসন সবে মাত্র এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চারিদিকে হতাশা, দৈন্য, নির্জীবতা। একদিকে রাজপুরুষদের বাধাবন্ধহীন শোষণ ও অত্যাচার চলছে, অন্যদিকে দেশের মানুষ অজ্ঞতায় অশিক্ষায় কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ধর্মাচরণের নামে অন্ধ লোকাচার ও নিষ্ঠুর প্রথা সমগ্র সমাজের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। সতীদাহ, সাগরে সন্তান ভাসানো, ঘৃণিত কৌলীন্য প্রথা এবং ততোধিক ঘৃণ্য বহুবিবাহ প্রথা, মূর্তিপূজার নামে দেবদেবীদের দুর্দান্ত রকমের তামসিকতার চর্চা—এমন সর্বনাশা দেশাচার ও আনুষ্ঠানিকতা হিন্দু সমাজকে ভিতরে ভিতরে কুরে-কুরে খেয়ে তাকে প্রায় ধ্বংসের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে। দেশে এমন একজন কেউ নেই যিনি দেশবাসীকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারেন, যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ আর উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারত তথা বাংলার এই হলো চিত্র।

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে রামমোহনের অভ্যুদয়। তিনি যে কতো বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন তার ধারণা দেবার পক্ষে এই বললেই যথেষ্ট যে, বারো বছর বয়সেই তিনি আরবী ভাষায় কোরাণ, সুফী দার্শনিকদের রচনাবলী, ইউক্লিড আর অ্যারিস্টটল পড়ে শেষ করেন। বারো থেকে ষোলো বছরের মধ্যে কাশীতে হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কৃত কাব্য-দর্শন অধ্যয়ন করেন। যে বয়সের বালক সচরাচর প্রথাসিদ্ধ বিদ্যালয়ের লেখাপড়ায় আপনাকে আবদ্ধ রেখে অবশিষ্ট সময় খেলাধুলায় মত্ত থাকে, সেই সময়ে কিনা রামমোহনের মন সদাসর্বদা গভীর দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকত আর প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূল যাচাই করে দেখত! এই থেকেই বালকের অসাধারণত্বের একটি আন্দাজ পাওয়া যায়। ষোল বছর বয়সে পাঠ সমাধা করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী' নামে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি গৃহদেবতার বিগ্রহের সামনে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করেন। এই নিয়ে পিতা ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে, তিনি গৃহ থেকে বহিষ্কৃত ও সম্পত্তিচ্যুত হন। সন্তানগতপ্রাণা মা রামমোহনকে পিতার সঙ্গে আপস করবার জন্য কত সাধাসাধনা করেছিলেন, কিন্তু রামমোহন স্বীয় বিশ্বাসে অবিচলিত থেকে পিতার দণ্ড শিরোধার্য করে গৃহ-পরিত্যাগ করেন। এই পর্বে তিনি ভারতের নানা অঞ্চল পর্যটন করেন, এমন কি সুদূর তিব্বত পর্যন্ত যান। দেশ পর্যটনকালে বহু সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ, যোগী-অবধূত শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি রংপুরের কালেক্টর জন ডিগবির অধীনে সেরেস্তাদারের কর্ম গ্রহণ করেন ও পরে দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। ডিগবির সঙ্গে পরিচয় রামমোহনের জীবনে নানাভাবে ফলদায়ক হয়েছিল। ডিগবির সঙ্গে

প্রায়ই তিনি খৃস্টধর্মের মূলতত্ত্বগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। ইউরোপীয় রাজনীতি-বিজ্ঞানে আগ্রহেরও সৃষ্টি তিনাথির সূত্রে। রংপুরে থাকা কালেই ইংরেজী ভাষায় রামমোহনের অধিকার পাকা হয়।

১৮০৯-১৪ সাল এই ছয় বছর তিনি রংপুরে অবস্থান করেছিলেন। ১৮১৪ সালে তিনি কোম্পানীর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা চলে আসেন এবং ১৮৩০ সালের নভেম্বরে বিলাত যাত্রার আগে পর্যন্ত একটানা ষোল বছর কলকাতাতেই অতিবাহিত করেন। জ্ঞানে-গুণে ব্যক্তিত্বে রামমোহন অচিরেই কলকাতার সমাজের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। কলকাতায় আসার এক বছরের মধ্যে তিনি 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন, এই আত্মীয়সভাকে কেন্দ্র করে কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন ও সংস্কারমুক্ত প্রতিপত্তিশালী নাগরিকেরা তাঁকে ঘিরে সমবেত হন এবং তাঁর অবিসম্বাদী নেতৃত্ব মেনে নেন। আত্মীয়সভার মধ্য দিয়ে রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রচার করতে থাকেন। একদিকে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা অর্থহীন সংস্কার ও কুসংস্কার-এর বিরুদ্ধে প্রবল রকমের অভিযান পরিচালনা করেন, অন্যদিকে খৃস্টধর্মের 'ত্রিত্ববাদ'-এর বিরুদ্ধেও কঠোর সমালোচনা করতে থাকেন। ফলে তাঁর বহু শত্রুর সৃষ্টি হয়। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতারা রামমোহনের প্রভাব খর্ব করবার জন্য উঠেপড়ে লাগেন, এমনকি তাঁর প্রাণনাশেরও চক্রান্ত হয়েছিল, এই রকম শোনা যায়। এদিকে ত্রিত্ববাদের সমর্থক খৃস্টীয় পাদরীর দলও তাঁর সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। খৃস্টীয় পাদরীদের একজন ছিলেন অ্যাডাম সাহেব, যিনি প্রথমটায় রামমোহনের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, পরে রামমোহনের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করে তাঁর একজন অনুরাগী বন্ধুতে পরিণত হন ও নানাভাবে রামমোহনের আনুকূল্য করেন। রামমোহনের শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসে অ্যাডাম সাহেব তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হয়ে ওঠেন, রামমোহনও অ্যাডামের 'ইউনিটেরিয়ান মিশন' প্রতিষ্ঠায় তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

রামমোহনের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দু নেতাদের একটা প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে মুসলমানী ও খৃস্টীয় ভাবের আমদানী করে হিন্দুধর্মের সনাতন বিশুদ্ধিকে নষ্ট করছেন এবং ধর্মের ধারণার মধ্যে নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে ইংরেজী শিক্ষার খাত বেয়ে আসা আধুনিকতার প্রবর্তন করছেন। সত্য বটে রামমোহন ধর্মের গণতান্ত্রিকীকরণের প্রেরণা ইসলাম থেকে পেয়েছিলেন আর ব্রাহ্মসমাজের 'সামূহিক প্রার্থনা' (কনগ্রিগেশনাল প্রেয়ার) পদ্ধতিটি পেয়েছিলেন খৃস্টীয় উপাসনা-পদ্ধতি থেকে এবং এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, রামমোহন তদানীন্তন আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা প্রচলিত ধর্মের ধারণাকে প্রভূত পরিমাণে মার্জিত করেছিলেন। কিন্তু মূর্তিপূজা কিংবা বহুদেবতাবাদের বিরোধী চিন্তা তিনি ইসলাম কিংবা খৃস্টধর্ম থেকে গ্রহণ করেননি, প্রকৃতপক্ষে তার মূল খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি উপনিষদের মধ্যেই। উপনিষদ বা বেদান্তের একেশ্বরবাদকে তিনি ইসলামীয় কিংবা খৃস্টীয় সূত্রে আহৃত একেশ্বরবাদের দ্বারা আরও বেশী সমর্থনপুষ্ট, আরও বেশী জোরালো করে নিয়েছিলেন, এইমাত্র বলা যায়। রামমোহনের সমন্বয়ী প্রতিভা ছিল অসাধারণ—সেই প্রতিভাকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের যুগোচিত সংস্কারসাধন প্রচেষ্টায়।

কিন্তু রামমোহনের একেশ্বরবাদ শঙ্কর-বেদান্তের একেশ্বরবাদের অনুরূপ নয়। তিনি বৈদান্তিক কিন্তু অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক নন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে দ্বৈতবাদীর ধারণাই প্রবলতর ছিল। অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলে জানেন এবং এই জগৎ-সংসারকে 'মায়া' বা 'অধ্যাস' জ্ঞান করেন। রামমোহনের চিন্তায় এরকম একান্তিতার স্থান ছিল না। ব্রহ্মকে নিত্য সত্যস্বরূপ জ্ঞান করেও তিনি একই সঙ্গে এই জগৎ-সংসারের বিচিত্র লীলার অস্তিত্বও পুরোপুরি স্বীকার করতেন এবং তার কর্মপ্রবাহের গতিবেগও প্রবলভাবে অনুভব করতেন নিজের মধ্যে। পরবর্তীকালে রামমোহনের এই দ্বৈতবাদী মনোভাব তাঁরই ভাবশিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আরও বেশী পূর্ণতা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের দার্শনিক প্রত্যয় আর মহর্ষিদেবের ধর্মীয় অনুভূতিকে সুসংগতভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজ কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে। তাই তো রবীন্দ্রনাথে পাই আমরা এ প্রত্যয়সিদ্ধ ঘোষণা: 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়/লভিব মুক্তির স্বাদ।'

এই যে অসংখ্য বন্ধনঘেরা জগৎপ্রীতি, তারই উপাসক ছিলেন রামমোহন। তা যদি না হতো তো দিকে দিকে তাঁর কর্মের এমন স্ফুরণ ঘটতো না, সমাজ উন্নয়নের এত বিচিত্র ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিতেন না। তিনি এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে সচেষ্ট হতেন না, স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে উদ্যোগী হতেন না, সহমরণ ও বহুবিবাহ প্রথারূপ হিন্দু সমাজের একাধিক কুপ্রথার উচ্ছেদে মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত হতেন না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান পরিচালনা করতেন না, সেই কালেই সরকার পরিচালনার শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের দাবী জানাতেন না, পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জয়ে উল্লসিত হতেন না, সর্বোপরি ১৮২৮ সালে 'ব্রহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের যুগোচিত সংস্কার সাধনে ব্রতী হতেন না। এ সবই তিনি করেছিলেন দেশ ও সমাজ সেবার এক দুর্নিবার জগৎকেন্দ্রিক ঈশ্বরবিশ্বাসের মধ্যে। রাজনীতি ও সমাজনীতির চর্চাকে তিনি বেদান্ত চর্চার বিরোধী বলে মনে করতে পারেননি, বরঞ্চ দুইকে একই পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শের দুটি বিভিন্ন অভিব্যক্তিজ্ঞানে দুইয়েরই দাবি পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। এই কথাটাই মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁর 'চরিত্র চিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন এভাবে: 'জীবনকে সত্যের কর্মকে সার্থক এবং ধর্ম ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সত্য ও বস্তুগত করিবার জন্যই রাজা একদিকে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার আর অন্যদিকে এদেশে যাহাতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা-বিস্তার হয়, যুগপৎ তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।'

সমালোচকেরা অবশ্য বলেন রামমোহন হিন্দুধর্মের যুগোচিত সংস্কারসাধনে ব্রতী হলেও তাঁর মধ্যে মরমীসুলভ আধ্যাত্মিক অভীপ্সা তেমন ছিল না, 'ব্রহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রাথমিক সাংগঠনিক রূপকার হিসাবেই তাঁর যা-কিছু কৃতিত্ব। ধর্মসংস্কারের নেতা হিসাবে তিনি যতো বড়ো ঈশ্বরলিপ্সার উদগ্রতার ক্ষেত্রে তিনি ততো বড়ো নন।

এই সমালোচনা সত্যি হতেও পারে, না-ও হতে পারে, তবে তিনি যে একজন প্রচণ্ড রকমের জ্ঞানবাদী মানুষ ছিলেন, সে বিষয়ে মোটেই সন্দেহ করা চলে না। ধর্মের অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর অতি তীক্ষ্ণ, বিভিন্ন ধর্মের সারাৎসার নিয়ে ধর্মের যৌগিক মূর্তি নির্মাণপ্রচেষ্টার প্রথম পথিকৃৎ এদেশে তিনিই। পূর্বেই বলেছি তুলনামূলক ধর্মালোচনারও প্রবর্তক তিনি এদেশে। গভীর-গূঢ় ধর্মলিপ্সা, ঈশ্বরতন্ময়তা, ভগবৎসাধনায় তদ্গত ভাগবতী তনুতে ঐশী বিভূতির নিদর্শনস্বরূপ স্বেদকম্প্রপুলক শিহরণ ইত্যাদি আত্মহারা ভাবের প্রকাশ তাঁর মধ্যে কতটা কী পরিমাণ হতো বলতে পারব না, তবে এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, তিনি একজন উচ্চস্তরের ধর্মজিজ্ঞাসু ও ধর্মভাবুক ছিলেন। ধর্মজিজ্ঞাসায় তাঁর মন সর্বদা কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকত। আর ধর্মলিপ্সার যেটুকু যা অভাব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তা ষোলো আনার উপর আঠারো-আনা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাঁরই মানসসন্তান মহর্ষিদেবের সাধনার [illegible]। মহর্ষিদেব পরবর্তী কালের রাম... পরমহংসদেবের মতোই দুর্নিবার ধর্মলিপ্সার এক মূর্ত প্রতীক—তবে আত্মসমাহিত স্থির ধীর অনুদ্বেলিত। এই আত্মসমাহিত প্রশান্ত ধর্মানুভূতি রামমোহনেরই উত্তরাধিকারসূত্রে লিখো বর্তেছিল। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে ও প্রসারে দেবেন্দ্রনাথের দান অনেকখানি। প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মধর্মের আনুষ্ঠানিক স্থপয়িতা, রামমোহন 'ব্রহ্মসভার' পত্তন এবং ব্রাহ্মধর্মের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন মাত্র।

রামমোহনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই তৎকালের মানদণ্ডে রূপকথার মতো শোনায়। যেকালে এদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালন বলতে

গেলে অভাবনীয় ছিল, বস্তুতঃ দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অঙ্কুরমাত্রেরই যখন উন্মেষ হয়নি ; সেইকালে রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী স্বৈরাচারী সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধবজা উত্তোলন করেছিলেন, এটা কম কথা নয়। ১৮২১ সালে রামমোহন 'সম্বাদকৌমুদী' ও 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পর বৎসর প্রকাশ করেন 'মীরাৎ-উল-আখবার' নামক ফারসী পত্রিকা। এই তিনটি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারেরও নানাবিধ বিচ্যুতির সমালোচনা করে লেখনী চালনা করতে থাকেন। সরকার তাঁর সমালোচনায় প্রতিপত্তিহানির আশঙ্কায় এবং তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের এদেশীয় খুঁটি রক্ষণশীল সমাজের স্বার্থে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে রাতারাতি একটি অর্ডিনান্স জারী করলেন। রামমোহন এই অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং প্রতিবাদে 'মীরাৎ' পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেন। তিনি এই অন্যায্য অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরের কাছেও এক আর্জি পেশ করেন। কিন্তু রামমোহন তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর এই আন্দোলনের সুফল দেখে যেতে পারেন নি, তাঁর মৃত্যুর
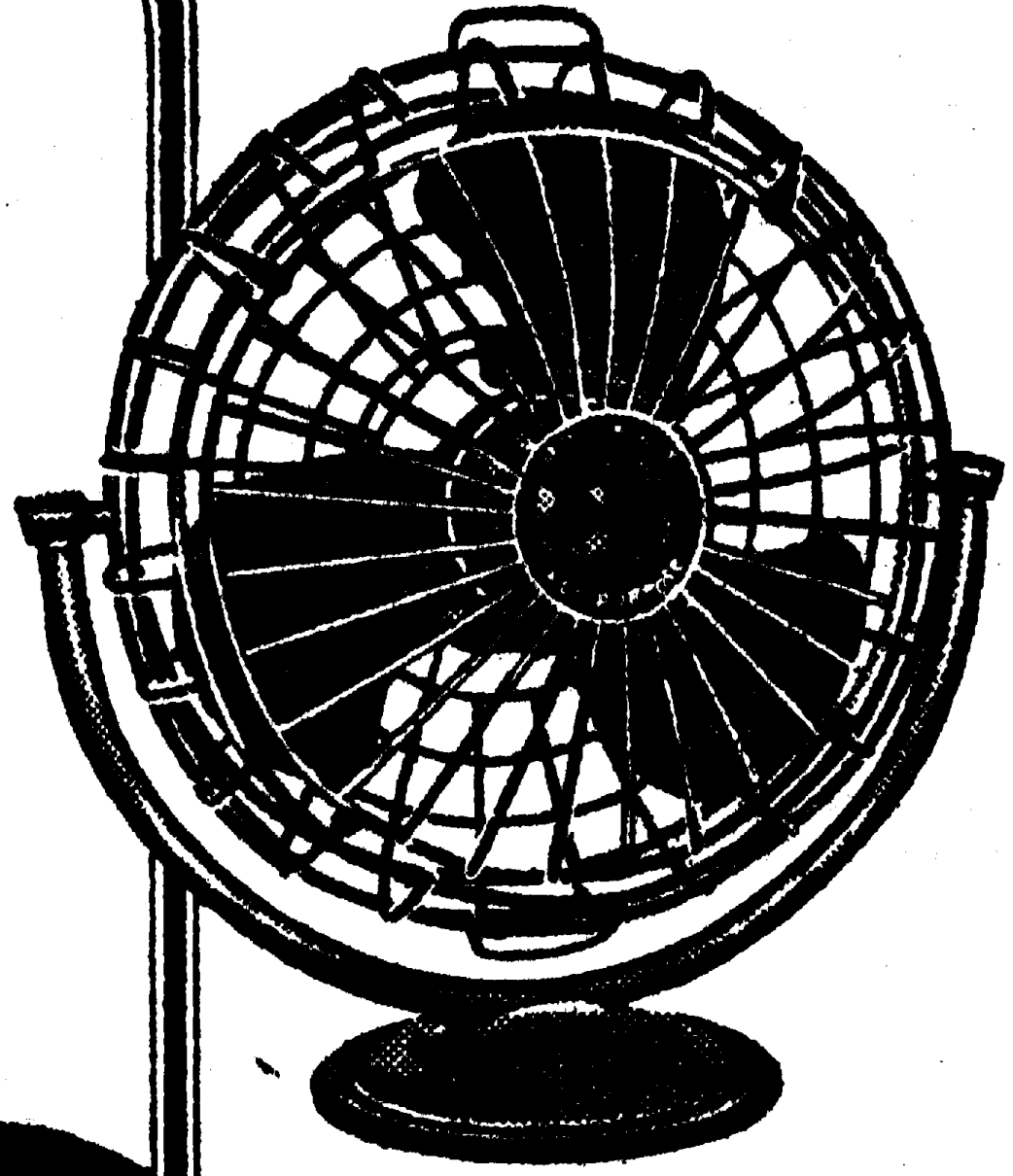
(১৮৩৩) দু বছর পরে লর্ড মেটকাফ এই 'কালা কানুন' উঠিয়ে দিয়ে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

ইউরোপে বিশ্ববীক্ষার প্রথম দ্রষ্টা মধ্যযুগের কবি দান্তে, তারপর দার্শনিক লাইবনিজ ও হিউম, তারপর কবি গ্যেটে। আমাদের দেশে বিশ্ববীক্ষার জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায়। তার আগে এ দেশবাসী কারও চিন্তায় এই ভাবনা ধরা পড়েনি। পরেও যে খুব বেশী ধরা পড়েছে এমন মনে করবার কারণ নেই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এ কথার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রে রামমোহনেরই সাধনাকে সম্প্রসারিত করেছিলেন মাত্র—স্বয়ং এ বস্তু উদ্ভাবন করেন নি। রামমোহনের বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধির অভিব্যক্তির একাধিক প্রমাণ মেলে। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনায় উৎসাহী, অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী, সমুদ্রযাত্রা করে, কূপমণ্ডুকতার বেড়া ভাঙতে তৎপর, ইংলণ্ডে গিয়ে সে-দেশের সেরা চিন্তানায়কদের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান, রাজনীতির স্তরে ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক, স্পেনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উল্লসিত এবং ওই ঘটনার সম্মানে টাউন হলে ভোজসভার আয়োজনকারী নেপলসে স্বেচ্ছাতন্ত্রের জয়ের সংবাদে বিমর্ষ, প্রভৃতি। এসব তথ্য আমাদের বিস্মিত করে এবং রামমোহন মানুষটি যে তাঁর নিজের কালের তুলনায় কতদূর এগিয়ে ছিলেন তার পরিচয় বহন করে। কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব হয়ে যাই যখন জানতে পাই তিনি ওই কালেই বীজাকারে হলেও 'ওয়ান ওয়ার্লড' বা 'এক পৃথিবীর' স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৮৩২ সালে ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তিনি ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে এক পত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিবাদের নিষ্পত্তিকল্পে এক বিশ্বকংগ্রেস গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। রামমোহনের সময়ের মানদণ্ডে এই প্রস্তাবের অভিনবত্ব কল্পনাতীত। এর মধ্যে আমরা বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর 'জাতিসংঘ' এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদ'-এর আদল পাই। আইনস্টাইন, ওয়েণ্ডেল উইলকি প্রমুখ ভাবুকদের 'ওয়ান ওয়ার্লড'-এর স্বপ্নও এর মধ্যে অস্ফুটে ফুটে উঠেছে। মানুষটা যে তাঁর কালের পক্ষে কতো বড়ো ছিলেন, এই একটি মাত্র নজীর থেকেই তাঁর অসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেউ কেউ রামমোহনের সমালোচনা করেন এই বলে যে, তিনি এদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনীতির স্তরে কোনো আন্দোলন পরিচালনা করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাসের জন্য সুপারিশ করেছেন, আরও নানাভাবে ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। এসব তাঁর মজ্জাগত ইংরেজপ্রীতির পরিচায়ক। এই সমালোচনার উত্তর এই যে, রামমোহন উচ্চস্তরের ভাবুক আর স্বপ্নদ্রষ্টা হলেও বাস্তবজ্ঞানরহিত ছিলেন না। তাঁর কালে তিনি বলতে গেলে বাংলায় তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের অধিকারী একক মানুষ। তাঁর যাঁরা পার্শ্বদ বা অনুগামী তাঁদের সবাই বিত্তবান শ্রেণীর মানুষ—হয় ভূম্যধিকারী নয় তো ধনাঢ্য বণিক। ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি কাদের নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করবেন? কাজেই যেটা অবাস্তব, অসম্ভব কল্পনা সে-পথে তিনি যাননি, বরং সমসাময়িক কালের পরিস্থিতি বিবেচনায় ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার পথই বেছে নিয়েছিলেন। ইংরেজের সদ্গুণ সমূহের তিনি অনুরাগী ছিলেন এ কথা বললে তাঁর ইংরেজ-তোষিণী বৃত্তি প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় তাঁর মনুষ্যত্বের মহিমার প্রতি আস্থা। আর রাজনৈতিক সচেতনতার কথাই যদি বলা যায় সে তো অনেক পরের কথা। বাংলাদেশে প্রথম রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটে রামমোহনের মৃত্যুর এক দশকও পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায়, তারপরের স্ফুরণ ষাটের দশকে হিন্দু মেলার পরিকল্পনায়, তারপর ১৮৭৬ সালে ভারতসভার উদ্যোগিতায় এবং সর্বশেষে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্থাপনায়। রামমোহন ইচ্ছা করলেই কি তাঁর কালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারতেন? কোথায় তার উপযোগী ক্ষেত্র, কোথায় তার উপযোগী পরিবেশ? লোকজনই বা কোথায়? বেশী কি কথা, রামমোহন তো দূরস্থান, যে-বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বলে বন্দিত এবং রামমোহনের জন্মের ৬৬ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনিও কি ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়ে লেখনী পরিচালনা করেন নি? এদেশ থেকে ইংরেজকে উৎখাত করবার জন্যে ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতার লড়াই তথাকথিত 'সিপাহী বিদ্রোহকে' প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র, এ কি তাঁর ইংরেজপ্রীতির নিদর্শন নয়? কালের প্রেক্ষিতে বাদ দিয়ে রামমোহনকে বিচার করলে ভুল করা হবে। আলোচনার মধ্যে তাঁর অগ্রবর্তিত্বের যেসব উদাহরণ উৎকলন করা হয়েছে, কালের প্রেক্ষিতে বিচার করেই তা করা হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা। প্রসঙ্গটি বিতর্কমূলক কিন্তু রামমোহনের দ্বিশত-জন্মবার্ষিকীর পৃষ্ঠপটে প্রসঙ্গটি উত্থাপন না করেও পারছি না। এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুধী ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কিছু দিন যাবৎ তাঁর ভাষণাদিতে রাজা রামমোহন সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করছেন যা স্বাক্ষমনে ওই মহান মানুষটির ভাবমূর্তি মলিন করবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত মনে হয়। প্রমাণ তাঁর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা, প্রমাণ কিছুকাল আগে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত তাঁর ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার স্মারক বক্তৃতা। দুই বক্তৃতাতেই তিনি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন অবদান ছিল না। এশিয়াটিক সোসাইটির বক্তৃতায় তাঁর আর একটি বক্তব্য হল, সতীদাহ প্রথা নিরসনের জন্য যে আন্দোলন হয় রামমোহন তার নেতা ছিলেন না, রাম-রামমোহন তার নেতা ছিলেন না, রামমোহন লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে সতীদাহের নিরোধক আইন প্রণয়নে সহায়তা তো করেনই নি, বরং বিরোধিতা করেছিলেন। তৃতীয়ত, রামমোহনের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিটিকেও তিনি খাটো করবার চেষ্টা করেছেন, বলেছেন, উনিশ শতকের বাংলার প্রধান বৈশিষ্ট্য জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা নয়, জাতীয় নেতাদের মহত্ত্বের কাছে রামমোহনের আন্তর্জাতিকতা নিষ্প্রভ ইত্যাদি (স্টেটসম্যান ৬।২।৭২)।

পরিষ্কার বোঝা যায় রামমোহন সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের মনে কিছু খোঁচ (কমপ্লেক্স) আছে যার প্রকাশ ঘটেছে উপরের ওই সব মন্তব্যাদিতে। শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা সর্বদাই দুঃখজনক, সেটা আরও দুঃখজনক হয় যদি দেখা যায় একজন স্বয়ং শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান পণ্ডিত এমনতরো কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমরা অকপটে বলব, আচার্য রমেশচন্দ্রের মতো অশীতিপর জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে এটা আমরা আশা করি নি। তাঁর উদ্ঘাটনগুলি তথ্য সমর্থিত বলেও মনে হয় না। সেগুলি সর্বজনবিদিত তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রামমোহন গোড়ার দিকে খুব সক্রিয়ভাবেই যুক্ত ছিলেন। বস্তুত তিনিই সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর হাইড ঈস্টকে এ কাজে উৎসাহিত করে তোলেন। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব এবং আরও কতিপয় বিত্তশালী কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু নেতা যখন সার হাইড ঈস্টকে জানালেন রামমোহন কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলে তাঁরা কলেজ প্রতিষ্ঠায় অর্থ সাহায্য করবেন না, তখন রামমোহন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কলেজের পরিচালক মণ্ডলী থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন এবং স্বতন্ত্র অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু কলেজের 'গভর্নরদের' তালিকায় রামমোহনের নাম নেই কিম্বা স্যার হাইড ঈস্টের সঙ্গে এতদ্‌ব্যাপারে যে 'ব্রাহ্মণ' দেখা করেছিলেন তাঁকে তিনি পূর্বে চিনতেন না—এই শিথিল ও ক্ষীণ নজীরের উপর এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, হিন্দু কলেজের প্রবর্তনায় রামমোহনের কোন ভূমিকা নেই। সতীদাহ সম্পর্কিত সর্বজনপরিজ্ঞাত তথ্যের বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্রের হাতে কি তথ্য আছে আর সেটা অকাট্য প্রমাণ কিনা জানতে পেলে জনসাধারণ উভয় তথ্যের তুলামূল্য বিচার করে দেখতে পারতেন। ঐতিহাসিক ঐতিহাসিকের পথেই চলবেন এটা প্রত্যাশিত, ভাবাবেগের রঙে ইতিহাসকে রঞ্জিত করা কি ঠিক?

বঙ্গনবাব বঙ্গনায়িকা
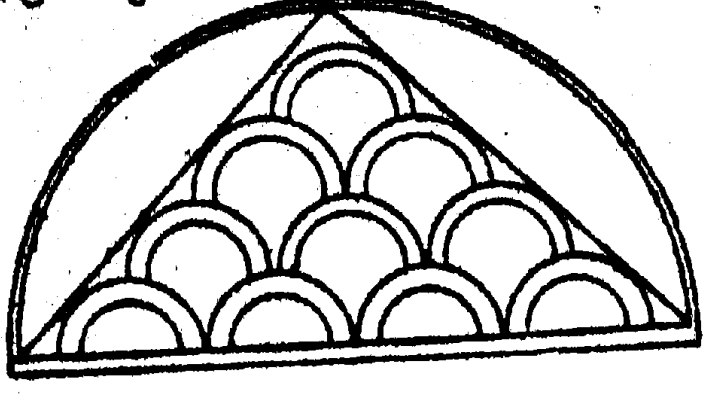
বেগম শরফুন্নিসা

অংশুরঞ্জন সেন

নবাবী হারেম। কত প্রমত্ত বিলাস, কত দুর্মদ কামনা, কত স্বপ্নিল বাসনার কথা ও কাহিনী সেখানে। যুগে যুগে সাধারণ মানুষ সে-সমস্ত কাহিনী নিয়ে কল্পনার জাল বোনে। রোমাঞ্চিত হয়। সৃষ্টি হয় অনেক কাল্পনিক, অলীক উপাখ্যানের। মনে তা নেশা আনে মোহ জাগায়। কিন্তু ইতিহাসের দর্পণে ধরা পড়ে তার অন্য রূপ। সে রূপ অনুভূতির উপলব্ধির, প্রেরণার। এর ছায়া আঠারো শতকের বাংলার নবাবী আমলেও প্রতিফলিত।

এই আমল বাংলার ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক। সেদিন রাজদণ্ড হাতে নবাবরা দাঁড়িয়েছিলেন নানা ঘাত-সংঘাতের মধ্যে। নানা উত্থানপতনের সম্মুখীন হয়েও তাঁরা রক্ষা করেছেন আপন সমুচ্চ মর্যাদা। এই রাজদণ্ডধারীরা আমাদের কাছে যত সুপরিচিত, ততখানি সুপরিচিত নয়—তাঁদের পেছনে হারেম-বাসিনী বেগমদের অলক্ষ্য অবস্থিতি। বেগমরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। স্বামীর ওপর তাঁদের যেমন প্রভাব ছিল তেমনি ছিল স্বামীর শাসনকর্মেও। কি শান্তিতে, কি যুদ্ধবিগ্রহে নবাবদের রাজকার্যে বেগমদের অলক্ষিত হাতের স্পর্শ লেগেছে। আর এই প্রভাব প্রায়ই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় আছে তার সাক্ষ্য।

নবাবী শাসনের এমনই এক নেপথ্য নায়িকা বেগম শরফুন্নিসা। তিনি বাংলা,

বিহার ও ওড়িশার নবাব আলিবর্দী খাঁর প্রিয়তমা পত্নী। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই তেজস্বিনী এই নারী। নবাবের পাশে থেকে সর্বদাই তিনি রাজ্যশাসন পরিচালনা করেছেন। এমন কি স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধেও যোগ দিতেন তিনি।

১৭৪০ সালে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন আলিবর্দী। সেদিন বাংলার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। দুর্ধর্ষ মারাঠা বর্গিরা 'চৌথ' বা প্রাদেশিক রাজস্বের এক চতুর্থাংশ আদায়ের উদ্দেশ্যে এদেশে হানা দেয়। অবশ্য এর জন্যে তারা আদায় করেছিল দিল্লির পতনোন্মুখ সম্রাটের অনুমোদন। এভাবে সূচনা হয় প্রথম মারাঠা অভিযানের। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত ছিলেন এর নেতা। এই আক্রমণকারীদের সঙ্গে আলিবর্দীর সেনাবাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল বর্ধমানের কাছে। বেগমও তাতে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু আলিবর্দীর সেনাদল তখন দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অত্যন্ত শ্রান্ত। তাই মারাঠাদের দারুণ আক্রমণে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সে-সময় বেগমেরও বন্দী হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। মারাঠারা তাঁর হাতি 'লন্ডা'র চারদিক ঘিরে ফেলে। কিন্তু হঠাৎ বাংলার সেনাপতি ওমর খাঁর ছেলে মুসাহিব খাঁ মুহম্মদ ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের ওপর। আর অমিত শৌর্যের জোরে তিনি সেদিন বেগমকে রক্ষা করেন তাদের কবল থেকে।

হারেমের বিলাসব্যসন শরফুন্নিসাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এক সুস্থ জীবনবোধে তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত। তিনি স্বতন্ত্র, সজীব, সচেতন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত ও সুষ্ঠু নির্দেশনা ছিল তাঁর চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যখন তাঁর স্বামী মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধকার্যে লিপ্ত হন, তখন তিনিই প্রধান কূটনীতিজ্ঞের ভূমিকায় নামেন। মারাঠা যুদ্ধের আগে বেগম তাঁর স্বামীর সঙ্গে বালেশ্বরের যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাতেও তিনি বিশেষ সাহসের পরিচয় দেন। এই অভিযান আলিবর্দী তাঁর পূর্বতন নবাব সরফরাজ খাঁর শালক ও ওড়িশার শাসনকর্তা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁর বিদ্রোহ দমনের জন্যে চালিয়েছিলেন। আর এভাবে সেই প্রদেশটি ছিনিয়ে নেন তাঁর কাছ থেকে।

মারাঠারা আলিবর্দীর আমলে যেন ভূতের মত চেপে বসেছিল গোটা বাংলা-বিহার-ওড়িশার বুকে। পরাস্ত হলেও তারা দেশ ছাড়ে না। গোপনে লুকিয়ে থাকে। নবাবের ঘুম নেই, বেগমেরও চিন্তার শেষ নেই। বেগম সর্বদাই তাঁকে পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। এবার আলিবর্দী নতুন চাল চাললেন। সন্ধির আলোচনার ছলনায় তিনি ভাস্কর পণ্ডিতকে ডেকে এনে হত্যা করালেন। সেই হত্যার প্রতিশোধ তোলার জন্যে রঘুজি ভোঁসলে এক বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করলেন। নবাব তাঁর চূড়ান্ত সামরিক নৈপুণ্যবলে সংকল্পের বাধা দিলেন। আর বেশ কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিনি রঘুজিকে হটিয়ে দিলেন। রঘুজি পালালেন বটে, কিন্তু বাংলা ছাড়লেন না।

শুধু বাইরের আঘাতই নয়, ভেতরেও ঘটল বিশ্বাসহানি। নবাবের আফগান সেনাপতি শামশের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুললেন। এ প্রসঙ্গে নবাবের নিকট আত্মীয় ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর 'সিয়র-উল-মুতাখ্খেরীন' গ্রন্থে লিখেছেন : 'আমার মনে পড়ে একদিন যখন আমি আলিবর্দী-বেগমের অন্দরমহলে বসেছিলুম সে-সময় নবাব সেখানে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করে তাঁর আসনে বসে পড়েন। তাঁকে ব্যথিত এবং চিন্তান্বিত মনে হচ্ছিল। বেগম তাঁকে তাঁর বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, কী যে ব্যাপার জানি না; কিন্তু আমার লোকেদের মধ্যে কাউকে কাউকে অচেনা ঠেকছে। বেগম স্বামীর উৎকণ্ঠায় চিন্তিত হয়ে দু'জন সুযোগ্য প্রতিনিধিকে তাঁর নিজের নামেই রঘুজির কাছে পাঠালেন। তাঁদের ওপর এই আদেশ ছিল, তাঁরা যদি সন্ধিস্থাপনের কোন প্রস্তাব পান তাহলে তা যেন সমতার ভিত্তিতে রূপায়িত করা হয়। এই দূতেরা রঘুজির যাবতীয় পরিকল্পনার প্রধান সমর্থক মীর হবিবের ঘাঁটিতে এসে নামলেন। তাঁর মাধ্যমে তাঁরা মারাঠা সেনাপতির কাছে তাঁদের বার্তা পেশ করলেন। রঘুজিকে প্রায়ই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, তিনি এখন এই শান্তির প্রস্তাবে খুশি হলেন; কিন্তু নবাবের মারাত্মক শত্রু মীর হবিব এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তিনি বরং শত্রুকে পালাতে বাধ্য করার জন্যে রঘুজির অশ্বচালনার পারংগমতাকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়ে তাঁর মন সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলেন। এতে করে তিনি (রঘুজি) নবাবের আগেই মুর্শিদাবাদে পৌঁছে যাবেন। সেখানে নবাবের বড় জামাই নোয়াজিশ মুহম্মদ খাঁ সেনাদল ছাড়াই প্রভুত্ব করছেন। আর সে-অবস্থায় সেখানে দুষ্কর্ম কিছু করা যেতে পারে। রঘুজি এই পরামর্শ ভাল মনে করে মুর্শিদাবাদের পথ ধরলেন।'

রঘুজি এভাবে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন দেখে বেগমের ক্রোধের আর সীমা রইল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেনাদলকে মারাঠা শিবির আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। তারা অবিলম্বেই রঘুজির বাহিনীকে অনুসরণ করল। তারপর কাটোয়ার কাছে এক যুদ্ধে রঘুজির বেশির ভাগ সৈন্যই প্রাণ হারাল, আর এভাবে তিনি তাঁর ব্যর্থ অভিযানে চূড়ান্ত অপদস্থ হয়ে বাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন।

এর পর আলিবর্দী তাঁর সেনাবাহিনী সংস্কারের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তিনি সেখান থেকে মারাঠা চর বলে সন্দেহভাজন আফগান সেনাপতিদের অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তারা নিল এর প্রতিশোধ। প্রথমে তারা পাটনার শাসনকর্তা ও নবাবের ছোট জামাই জৈনউদ্দীন আহম্মদকে ষড়যন্ত্রে ফেলে হত্যা করল। আর পরে তাঁর স্ত্রী আমিনা বেগমকে করল বন্দী। এই আকস্মিক বিপদে আলিবর্দী অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু ধীরপ্রকৃতি শরফুন্নিসা তাঁর মানসিক সাম্য হারালেন না। তিনি আমিনার উদ্ধারের জন্যে স্থিরচিত্তে অগ্রসর হলেন। এ ব্যাপারে দুর্বিনীত আফগানদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি অবিলম্বে সৈন্য-সামন্ত দিয়ে নবাবকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে যে প্রবল সংঘর্ষ হল তাতে আফগানরা প্রচুর সংখ্যায় হতাহত হয়ে পরাজিত হল। আর অপরদিকে আমিনা বেগমও পেলেন উদ্ধার।

এবার পাটনার শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে আলিবর্দী-বেগম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন। জৈনউদ্দীন আহম্মদের শোচনীয় মৃত্যুর পর নবাব তাঁর মেজো ভাইপো ও জামাই সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে পাটনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। সৈয়দ আহম্মদ তাঁর শাসনকাজে জৈনউদ্দীনের দরবারের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত ভাতা দিয়ে পুনর্নিয়োগ করলেন। এঁরা জৈনউদ্দীনের মৃত্যুর ফলেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু নবাবের এই বদান্যতা বেগমের মনঃপূত হল না। তিনি এই নতুন শাসক অর্থাৎ তাঁর জামাই সৈয়দ আহম্মদকে একজন আগন্তুক হিসেবেই বিচার করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন : 'আমার মতে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব ঐ মানুষটির হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ পাটনা বা আজিমাবাদ প্রদেশ হচ্ছে বাংলার প্রধান প্রবেশদ্বার এবং শাসনকর্তার সম্মতি ছাড়া কোন সেনাবাহিনী তাঁর অধীনস্থ দেশের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।'

বেগম এ-ও জানালেন :

—'আমার বড় জামাই নোয়াজিশ মুহম্মদ খাঁ একজন দুর্বলচেতা আর অদূরদর্শী মানুষ। ফলে এটা আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে, সৈয়দ আহম্মদ আমার একজন জামাই হওয়া সত্ত্বেও একদিন নবাবের মৃত্যুর পর ক্ষমতা ও অর্থের মোহে স্বভাবতই আমার অপর মেয়েদের এবং আমার দুই নাতি সিরাজ ও তার ছোট ভাই আক্রামউদ্দৌলার ভয়ানক শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।'

এভাবে যুক্তির পর যুক্তি দেখিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এরকম এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসনের দায়িত্ব এমন কারো হাতে দেওয়া উচিত যাকে তিনি সম্পূর্ণ

বিশ্বাস করতে পারেন। একজন রাজ-মহিষীর কাছ থেকে এমন কথা শুনে তাঁর বিজ্ঞতা সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা তাঁর স্বামীর হল, তা তাঁর মনে এক গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি না করে পারল না।

বেগম তাই এবার আরো জোরালো মাধ্যম প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হলেন। সে মাধ্যম হচ্ছে সিরাজ। তিনি সিরাজকে একথাই সর্বসমক্ষে বলতে শেখালেন যে, আজিমাবাদের শাসনভার যদি সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি (সিরাজ) নিজে এই প্রকাশ্য অপমান সহ্য করে বেশিদিন টিঁকে থাকবেন না, অর্থাৎ তিনি আত্মহত্যা করবেন। সিরাজ বলতে থাকেন যে, বিহার প্রদেশ ছিল তাঁর পিতার সম্পত্তি। পরে তা বংশগত স্বত্ব অনুযায়ী পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে তাঁর কাছে এসেছে, এবং তা অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সিরাজ ছিল বৃদ্ধের আনন্দের আশ্রয়, তাঁর হৃদয়-সর্বস্ব, সুতরাং তাঁর কথা সহজেই বৃদ্ধের মর্ম স্পর্শ করল। আবার অপরদিকে আলিবর্দী সর্বদাই তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর পরামর্শ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন, আর তাঁর সব ইচ্ছার প্রতি নবাবের থাকত সানুরাগ সম্মতি। তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, সিরাজ-উদ্দৌলাকে তাঁর সম্পত্তি এবং সমস্ত শাসিত এলাকার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করার ব্যাপারে বেগমের সম্মতি নিয়ে যে পরিকল্পনা তিনি খসড়া করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাই সম্পূর্ণ করার দিকে বেগম ঝুঁকেছেন। এখন যে তিনি প্রিয়তমা পত্নীর সানুনয় প্রার্থনায় বিগলিত হলেন এবং সিরাজের অসন্তোষ সইতে অক্ষম হয়ে তাঁর অপর নাতি ও জামাই সম্বন্ধে মত পালটে জামাইকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাতে সম্পূর্ণ অসম্মত হলেন—এসবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এভাবে তিনি সিরাজকে সকল ব্যাপারেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন।

সতী নারী শরফুন্নিসা তাঁর মেয়েদের নিয়ে সুখী ছিলেন না। তাঁদের চারিত্রিক শৈথিল্যের খবরই কুখ্যাতি ছিল। বড় মেয়ে ঘসিটি তাঁর স্বামী অর্থাৎ ঢাকার শাসনকর্তা নোয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর প্রিয় সহকারী হোসেন কুলী খাঁকে গোপনে প্রেম নিবেদন করেন। তাঁরই প্রভাবে হোসেন কুলী রাজ্যের একজন বিরাট গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে ওঠেন, আর তাঁর অনেক কুকর্মই চাপা পড়ে যায় বিস্মৃতির আড়ালে। কিন্তু কিছুদিন পর হোসেন কুলী ঘসিটির সঙ্গ ছেড়ে তাঁর ছোট বোন সিরাজের মা আমিনার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ফলে ঘসিটি হলেন আমিনার শত্রু। শরফুন্নিসা তাঁর মেয়েদের এই পরিণতির কথা শুনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তিনি নষ্টের গোড়া হোসেন কুলীকে দুজন থেকে পৃথক করে দিয়ে তাঁদের অধর্মের পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তিনি শেষ পন্থা হিসেবে নবাবের অনুমতি চাইলেন হোসেন কুলীকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে। আলিবর্দী শুধু এইটুকু বলে নিশ্চিন্ত হলেন যে নোয়াজিশ খাঁর সম্মতি ছাড়া তা হতে পারে না। তখন শরফুন্নিসা ঘসিটির মাধ্যমে তাঁর জামাই-এর কাছে আবেদন করলেন এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে। ঘসিটিও এবার তাঁর এই অস্থিরমতি প্রেমিকের ওপর প্রতিশোধ নেবার এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি নোয়াজিশ খাঁকে প্ররোচিত করার জন্য তাঁর মায়ের সঙ্গে হাত মেলালেন। নোয়াজিশ নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই এই প্রস্তাবে রাজী হলেন, আর সিরাজ ১৭৫৪ সনের শেষ দিকে হোসেন কুলীকে নৃশংসভাবে হত্যা করালেন। এভাবে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় মুছে দিলেন আলিবর্দী-বেগম।

এর কিছুকাল পর ১৭৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে মারা যান নোয়াজিশ মুহম্মদ। তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই ঘসিটি বেগমের ধনরত্নের দিকে সিরাজের লুব্ধ-দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু ঘসিটিও একথা জানতে পেরে, আগে থেকে সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে মতিঝিলে আশ্রয় নেন। আলিবর্দী যদ্দিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সিরাজের পক্ষে ঘসিটির বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব হয় নি। ১৭৫৬ সনে আলিবর্দীর মৃত্যুতে সে সুযোগ এল তাঁর সামনে। নবাবী ক্ষমতা পেয়ে বড় মেসোর ধনহরণের চেষ্টায় সিরাজ মতিঝিল অবরোধ করলেন। অবস্থা হল গুরুতর। বিপদ দেখে আলিবর্দী-বেগম নিজে এই বিবাদ মেটাবার জন্যে সেই অবরুদ্ধ দুর্গপ্রাসাদে ঢুকলেন। সেখানে তিনি এটাই ঠিক করে দিলেন, ঘসিটি সিরাজকে বাংলার নবাব বলে স্বীকার করবে আর তার পোষ্যপুত্র বাংলার মসনদে বসতে পারবে না। কিন্তু বিরোধ মেটার পরদিনই সিরাজ মতিঝিলের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করলেন। এসব কারণে ঘসিটি ইংরেজের আশ্রয় নিলেন। আর তারই ফলে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের অতি ভয়ঙ্কর কলহ শুরু হল। সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করলেন। কলকাতা দখল করে তিনি সেখানকার গভর্নর হলওয়েল সাহেব এবং তাঁর অনুচরদের বন্দী করে ১৭৫৬ সনের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেন।

এ ব্যাপারে বেগম শরফুন্নিসা নীরব রইলেন না। যুদ্ধ ও শাসনকাজে যেমন তিনি ছিলেন কঠোর, তেমনি অন্যের দুঃখ-কষ্টে তাঁর মনোভাব ছিল অতি উদার, স্নেহরসে পূর্ণ। হলওয়েল এবং তাঁর সঙ্গীদের বন্দীদশা তাঁর অন্তরকে নাড়া দিল। হলওয়েল তাঁর 'ইণ্ডিয়া ট্র্যাক্টস্' গ্রন্থে লিখেছেন যে মুর্শিদাবাদে যখন তিনি বন্দী ছিলেন তখন একদিন রাতে ভোজের সময় আলিবর্দী-বেগম সিরাজকে তাঁর মুক্তির জন্যে অনুরোধ করেন। এই খবর তিনি শুনেছিলেন আলিবর্দী-বেগমের প্রধান পরিচারিকা এবং কোন একজন খোজার কথাবার্তা থেকে। এর পর তিনি জানতে পারেন যে, তাঁকে কলকাতায় নির্বাসিত হতে হবে। কিন্তু সিরাজের সঙ্গে পরদিন দেখা হলে, তিনি তাঁকে মুক্তি দেন। এভাবে শরফুন্নিসার মধ্যস্থতায় মুক্তি পাওয়ার জন্য হলওয়েল সাহেব তাঁর প্রতি অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর বইতে।

কিন্তু শরফুন্নিসার শেষ জীবন ছিল দুর্ভাগ্যজড়িত। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের ভাগ্যবিপর্যয়ে দৃশ্যপটের হল পরিবর্তন। ইংরেজের সাহায্যে বাংলার মসনদে এলেন বিশ্বাসহন্তা মীরজাফর। তাঁরই মত নির্বোধ নীতিহীন তাঁর ছেলে মীরন নিষ্ঠুরভাবে শরফুন্নিসা, তাঁর দুই মেয়ে ঘসিটি ও আমিনা, সিরাজের বিধবা পত্নী লুৎফউন্নিসা আর তাঁর শিশুকন্যাকে বন্দী করে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। নৌকোয় করে যাবার সময় নদীর জলে ডুবে গিয়ে ঘসিটি ও আমিনা সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পান। আর শিশুকন্যা নিয়ে লুৎফউন্নিসা ও শরফুন্নিসা কোন রকমে সেই ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াতে সক্ষম হন। অবশেষে বাংলার গভর্নর ক্লাইভের চেষ্টায় মুক্তি পেয়ে তাঁরা ফিরে আসেন মুর্শিদাবাদে। শেষ পর্যন্ত এক জীবনধারণ ভাতা পান এবং যাপন করেন এক অখ্যাত ও অনাড়ম্বর জীবন।

আঠারো শতকের নারী শরফুন্নিসার এই বিপুল অবদান নবাবী শাসনকে এগিয়ে দিয়েছে এক সুনির্দিষ্ট গতিপথে। সেদিনের যুদ্ধ-বিগ্রহ আর আশঙ্কার মধ্যে তিনি স্থির অবিচলিত চিত্তে আপন কাজ করে গেছেন। এটা তাঁর প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ় সংকল্পের পরিচয়। তাই শত্রুবেষ্টিত ও বন্দিনী হয়েও তিনি দমেন নি এতটুকু, আর দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও তিনি স্বামীর সঙ্গ ছাড়া হননি কখনো। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও তাঁর আদর্শ চিরভাস্বর। একদিকে যেমন তিনি রাজকার্যের আড়ম্বর বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে গার্হস্থ্য জীবনেও তিনি ছিলেন একজন বিনীতা নারী, আর্ত-পীড়িতের নিপুণা সেবিকা, আর দুঃসময়ে নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাত্রী। এমনি বহু গুণের সমন্বয় তাঁর চরিত্রকে করেছে দুর্লভ। তাঁর সেই অনন্য জীবনাদর্শ, সেই তেজস্বিতা আজকের মানুষকে অভিভূত করে, প্রেরণা দেয়।

এখন অন্ধকার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। আটাশ ।।

লতু ভীতু মুখে খড়ি খড়ি শুকনো [illegible] যেভাবে বেরোল, রুমার বুকে টিপ টিপ করে উঠল। চাপা গলায় বলল সে, [illegible] কি বলল? আসছে?

লতু ফিসফিস করল।...আমার ভয় [illegible]! তুমি যাও, মাসি!

[illegible] কেটে রুমা বলল তুমি গ্যাও [illegible] থেকে পালালুম কেন তাহলে?

আমি তো গেলুম! উঁকি মেরে দেখি—[illegible] বাবা! সন্নেসীর মতো বসে আছে! কি [illegible] কটমটে চোখ মাসি!...লতু কাঁচুমাচু [illegible] বলল।...তুমি গিয়ে কথা বলো না! আমার ভয় করছে যে।

রুমা বলল হ্যাঁ রে, গায়ে সাপটাপ [illegible] আছে দেখলি?

এবার লতু মাসির অজ্ঞতায় ফিক করে [illegible] ফেলল।...যাঃ! গায়ে সাপ থাকে [illegible] কিচ্ছু নেই। স্পষ্ট দেখলুম—তোমার দিব্যি!

রুমা সেই রাত্রিবেলা থেকে সন্দিগ্ধ [illegible] পড়েছে পৃথিবী সম্পর্কেই। সব সময় মনে হচ্ছে আশে-পাশে কোথাও সাপ লুকিয়ে রয়েছে। নিজের অজান্তে ছুঁয়ে ফেললেই ফোঁস করবে। অবশ্য তা করুক, কিন্তু নির্ঘাৎ পায়ে জড়িয়ে যাবে যে! ইস [illegible]! হিলহিলে নরম কী জ্যান্ত প্রাণী... [illegible] রক্ত হিম হয়ে যায় ভাবতে। রুমা [illegible] বুজে ফেলেছে, যদি সত্যি ছোঁয়াছুঁয়ি [illegible] যায় এবং জড়িয়ে ধরে, বাঁচবেই না! [illegible] চলতে সাবধানে দেখেটেখে পা ফেলেছে [illegible]। সামনে আবার একটা রাত আসছে। [illegible] কী হবে সেই ভাবনায় সে নিরন্তর [illegible] হয়ে থেকেছে।

যখন ওরা নটুবাবুর গ্যারেজ ঘরে থাকত, কোন কোন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে এ্যাজবেস্টাস চালের ফাটল চুঁইয়ে জল পড়ত। নীচু মেঝেয় জল ঢুকে যেত। সে অনেক কষ্টের রাত জেগে জেগে পুইয়ে গেছে। পরেশ তো বাইরে তখন—কোথায় ট্রাক নিয়ে চলে গেছে। স্নেহধারাকে চুপি চুপি কাঁদতেও দেখেছে রুমা। তবু কখনও অসহায় মনে হয় নি নিজেদের—এবং নিজেকেও তো আলাদাভাবে অসহায় মনে করে নি রুমা। বরং উপভোগ করেছে। হেসেছে চুপি চুপি।

আর কালকের রাতটা! কী রাত, কী অদৃশ্য মারাত্মক দুর্যোগের কাল বয়ে গেল! একটা অবিশ্বাস্য ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে গেল রুমার। আর তো বৃষ্টিতে জল পড়ার ভয় ছিল না, জল ঢোকার সম্ভাবনাও ছিল না খাটের তলায়—শুধুমাত্র একটা সাপ তাদের কি অসহায় আর শঙ্কাক্রান্ত করে রাখল, ভাবা যায় না! স্নেহধারা প্রথমে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়েছিল বটে পরক্ষণে গ্যাঁদার বিকট চ্যাঁচানি দিদি, করছ কি, করছ কি, সাপ আছে, সাপ শুনেই সে এক লাফে পিছিয়ে এসে একেবারে তক্তপোষে রুমাদের কাছে হাজির! তারপর সব্বাইকে প্রচণ্ড গালমন্দ। 'সাপ' শব্দটার বাস্তবতা তৎক্ষণে টের পেয়ে গিয়েছিল স্নেহধারা।

এমন রাত সত্যি তাদের জীবনে আসে নি। বসবার ঘরে ছোট্ট খাটের পর গাদাগাদি লতু সন্তু-মান্তুরা ঘুমোচ্ছে। রুমা টেবিলে বসে ঢুলছে। স্নেহধারা লতুদের মাঝখানে জটাবুড়ির মতো বসে আছে। কেবল গ্যাঁদা রান্নাঘরের সামনে খাটিয়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তোরাপ সাপটা খুঁজে দেখতে চেয়েছিল—কিন্তু তা কি করে হয়! ঠাকুরঘরে তাকে ঢুকতে দেওয়া যায় না। তোরাপ অবশ্য রাতটা থাকতেও চেয়েছিল, সেও হয় না। পাশেপ হীরুবাবু একলা থাকবে। তাছাড়া যা দিনকাল পড়েছে, পাশেপ তোরাপের থাকাটা জরুরী। সে বলে গিয়েছিল নির্ভাবনায় ঘুমোন আপনারা। ও কারো ক্ষতি করতে ঢোকে নি। তাই যদি মতলব থাকবে, তাহলে দেখা দেবে কেন?

তা বললে কি মন মানে? অন্য কিছু নয়, সাপ। গভীরে যার থাকা—চোখের আড়ালে যার অবস্থান — অদৃশ্য পিছনের আততায়ীর মতো যার গতিবিধি? সত্যি বলতে কি, রুমার খুব অবাক লেগেছে। পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা বদলে দিয়েছে যেন এই বৃষ্টিসন্ধ্যার আগন্তুক প্রাণীটি। এ রাতের অসহায়তা পুরো ফ্যামিলির যৌথ অসহায়তা—তবু রুমা এই প্রথম নিজেরটা ভাগ করে নিয়ে আলাদা ভেবেছে আলাদাভাবে অস্থির আর উত্যক্ত হয়েছে। কি চমৎকার ছিল এতদিন এই সুরম্য পৃথিবী এবং নিশ্চিন্ত জীবনধারণ জীবনযাপন! একটা রাতেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে যেন। নিরন্তর সন্তর্পণ, চুপি চুপি আশা, [illegible] আর কিসের একটা সর্বাঙ্গব্যাপী — সারাক্ষণ রুমাকে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না আর।

আলাতারাপী মনোহারিওয়ালীর স্বামী [illegible] ফকির এ অঞ্চলের সেরা সর্পতত্ত্ববিদ। সে বেদে নয় সম্ভ্রান্ত ফকিরকুলের মানুষ। সৌখিন সাপুড়ে সে। সুযোগ পেলে সাপ ধরে বিষ সংগ্রহ করে বেচে [illegible] করে। সেখানে কানাই [illegible] আর [illegible]। তোরাপ তার কথা [illegible] গিয়েছিল। [illegible] লোক পাঠিয়েছিল স্নেহধারা। [illegible] কখন [illegible] গেছে। পাত্তা দেয় নি। [illegible] না [illegible]। পাগলাটে

চরিত্র, সব সময় গাঁজায় ঝিম মেরে থাকে। স্বয়ং তোরাপকেও সে গ্রাহ্য করে না।

তখন স্নেহধারা নিজে গিয়েছিল। পীরের দীঘির মাজারের লাগোয়া রুস্তম ফকিরের বাড়ী। একতলা ইঁটের বাড়ী। কত কালের পুরনো তা এলাকার বুড়োরাও বলতে পারে না। হকসায়েবের মতে কয়েক শো বছরের। মুর্শিদাবাদে তখন দেশের রাজধানী। নবাব আলীবর্দীর টাকায় রূপপুর চাটুজ্যে পীরের মাজার হয়েছিল। হকসায়েব এই সব গল্প নিয়েই তো আছেন!

স্নেহধারা দেখেছিল, রুস্তমের বাড়ী ফাঁকা। দরজায় তালা ঝুলছে। তারপর হীরুবাবু গেল রুস্তমের বউ আলতারাণীর দোকানে। হাইওয়ের ধারে থাকে সে। একা থাকে। কখনও ইচ্ছে হলে স্বামীর কাছে কোন-কোন রাত কাটিয়ে আসে নাকি, কখনও রুস্তম ফকিরও নাকি বউর কাছে এসে রাত কাটিয়ে যায়। তেঁতো মুখে আলতা বলেছিল, দোকান ফেলে কেমন করে যাই, বলুন, বাবু। আর গেলেও কি মিনসে আমার কথা শুনবে ভাবছেন?

হীরুবাবু বলেছিল... শুনবে... শুনবে। তুমি একবার যাও, মা। ওনাদের বড্ড বিপদ।

আলতা হেসেছিল।...ঘরে সাপ ঢুকেছে, তাই বিপদ? কখন বেরিয়ে গেছে, দেখুনগে। ওই সামান্য জিনিসের জন্যে দেখছি রূপপুর মাথায় করছেন ওনারা। সাপ যেন কারো ঘরে ঢোকে না!

হীরুবাবুর রাগ হয়েছিল।...তোমরা সাপ নিয়ে ঘর করো। তোমাদের কথা আলাদা।

আলতা পলকে বদলে গিয়েছিল।... সাপ নিয়ে ঘর করবার দায় পড়েছে আমার! আমি কি বেদে, না সাপধরাদের মেয়ে, বাবু? যে সখের সাপ নিয়ে কারবার করে, যান না তার কাছে! উদিকে বেজো-গোপালকে নিয়ে রূপপুরে হুলুস্থুলুস হচ্ছে, অমন একটা কাণ্ড—আর এনারা দৌড়চ্ছেন একটা তুচ্ছ সাপ নিয়ে। আমার সময় নেই অত!...

কি বদমাস এই মেয়েটা! হীরুবাবু রেগে চলে এসেছিল। আজ যদি পরেশ মজুমদার বেঁচে থাকত, তাহলে দেখা যেত এই আলতারাণী কি করে।...হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে এতদিনে মজুমদারবাবুর জন্যে মন কেমন করে উঠেছিল হীরুবাবুর। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল সে। হ্যাঁ,—বেজোগোপাল ড্রাইভার একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করেছে বটে। সেও ভাববার কথা নিশ্চয়। চাঁদুবাবুর গাড়ীটাও পুড়ে গেছে। এও ভাববার কথা। স্পষ্ট বোঝা গেল, পাপের পয়সা কারো-কারো হজম হয় না। পরেশের হয়েছিল, চাঁদুবাবুর হল না। চাঁদুবাবু বাটপারি করেছিল—তাই হয়তো হল না। শোনা যাচ্ছে, জিয়াগঞ্জে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ীও নাকি কিনেছে চাঁদুবাবু। সেও কি টিঁকবে? সামনে বর্ষায় নির্ঘাৎ মা গঙ্গা গিলে না নিয়ে ছাড়বেন না। বেচারা চাঁদুবাবু!...

ইতিমধ্যে ব্রজর লাসের ওদিক থেকে ফরিদ খবর নিয়ে এসেছিল, রুস্তম এখনও ওখানে রয়েছে। আসতে চাইছে না। বলছে, বেজোকে ছেড়ে যাব কোথায়? সুখের দিনের দোস্ত তার দুখের দিনে রুস্তম ফকির যাবে কোথায় কার বাড়ী সাপ ঢুঁড়তে? যা ব্যাটা, ভাগ্ ভাগ্!

স্নেহধারা তাই বলে ব্রজর লাসের ত্রিসীমানায় যেতে পারে না। ছিঃ, ওসব দেখা তো দূরের কথা, ভাবলেও পাপ হয়। আত্মহত্যা পাপ বটে, কিন্তু স্নেহধারা টের পেয়েছে—এ তো ব্রজর আত্মহত্যা নয়, হত্যা! চাঁদুটা ব্রজকে এমনি করে খুন করে ফেলল! তারপর? এবার কি করবে চাঁদু? গাড়ীখানাও তো সঙ্গে নিয়ে গেল চালক ব্রজ ড্রাইভার—এবার কি হবে?

আবার খবর এল রুস্তমের, হ্যাঁ—এবার সে বাড়ী ফিরেছে। স্নেহধারা বাড়ী গিয়ে খেয়ে এসেছে তক্ষণে। গুমোট গরম নিয়ে বিকেল নেমেছে। আজও আবার ঝড়জল হতে পারে মনে হচ্ছে। তোরাপকে রুস্তমের বাড়ী পাঠিয়েছিল স্নেহধারা। তোরাপ ফিরে এসে বলল, শালা আমাকে দেখলেই কেন ক্ষেপে যায়, জানি না মা! বাপ তুলে গালাগালি করল। কি বলব? পীরের খাদিম (সেবক), তার ওপর অল্পসল্প দোস্তালিও আছে—হাসি মুখে সইলুম। আর কেউ হলে, তার মুড়োটা তক্ষুনি মুচড়ে দিতুম।

স্নেহধারা করুণ মুখে বলেছিল, আর কোথায় বেদে বা সাপুড়ে আছে—সেখানেই যাও তোরাপ। ওর আশা ছেড়ে দাও।

বেদে—সে কাছাকাছির মধ্যে তো ঝাঁপুইহাটিতে। আর আছে হাটপাড়া-চণ্ডীতলায়।...তোরাপ আকাশ দেখে বলেছিল।...ইদিকে ঝড়পানির দিন। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। রাতে তো কাজ হবে না। সেই কাল সকাল ছাড়া আর উপায় নেই, মা।

সেই হবে। আরেকটা রাত তো।... স্নেহধারা উদ্বিগ্ন মুখে বলেছিল।...কোন রকমে কাটিয়ে দেব আগের রাতের মতো। কথায় বলে, বাঘের দেখা সাপের লেখা। কপালে লেখা থাকলে খণ্ডায় কার সাধ্য? তুমি তাই করো, তোরাপ। ফরিদই যাক বরং। বাসে যাওয়া যায়?

সেই সময় হঠাৎ চমকে উঠেছিল স্নেহধারা। রুমা লতুকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? দেখছ কাণ্ড! বাড়ীতে সন্তুরা আছে—গ্যাদা তো নাবালক বলতে গেলে—ঘরে সাঁপ, আর মেয়ে দিব্যি বেরিয়ে পড়েছে! এত বয়স হল, এখনও ওর ছেলেমী গেল না! কি বলবে স্নেহধারা—লতুর বাবা যে আস্কারা দিয়ে নাই বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তার ওপর, সেই বদমাস শত্তুরটা—চাঁদু, সারা ছেলেবেলা মাথায় তুলে নাচিয়ে ছেলেবেলাতেই রুমার মগজটি খেয়ে ফেলেছে। আর ও মানুষ হয়?

কাল সন্ধ্যায় অমিতকে ঝড়জলের মধ্যে নির্বিকার মুখে বাড়ী ফিরে যেতে বলেছিল রুমা। প্রথমে লতুর মুখে, পরে গ্যাদার কাছে খুঁটিয়ে শুনেছিল স্নেহধারা।

সাপটার জন্যে ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবে নি—শুধু মনে হয়েছিল, রুমা খুব অন্যায় করেছে। এখন রুমাকে যেতে দেখে স্নেহধারার সবটা চকিতে মনে পড়ে গেছে। অমিত তাই আজ এলই না। সাপের খবর শুনেও এল না!

স্নেহধারা রেগে গিয়েছিল।...ফরিদ, লতুদের ডাক তো বাবা!

ফরিদ ফিরে এসে বলল, আসবে না বলছে। ব্রজর মড়া দেখতে যাচ্ছে। তারপর...

এ্যাঁ।...আঁতকে উঠেছিল স্নেহধারা।... কি আক্কেল দেখছ মেয়ের! তোরাপ হীরুদা, ডাকুন তো ওদের! ছি, ছি, ছি!

ফরিদ হেসে বলল, যাক না। মড়া নামিয়ে নিয়ে কান্দী চলে গেছে কখন। কাটাকুটি করতে নিয়ে গেছে। গাছতলা ফাঁকা। পোড়া গাড়ীটাও পুলিশ কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে।

হীরুবাবু বলল, শংকরা বলছিল, সন্ধেবেলা বেজার লাস ফিরে আসবে। তখন মিছিল করে ওরা নাকি বহরমপুরে ঘাটে বেজাকে পোড়াতে যাবে। এখানকার ড্রাইভারগুলো খুব রেগে গেছে চাঁদুবাবুর ওপর—শংকরাই বলল। চাঁদুবাবু এবার মরবে!

স্নেহধারা ধমকে উঠল, ও কেচ্ছা আমার শুনে কি হবে! রাখুন তো হীরুদা! আমার মাথায় এখন সাপের ভাবনা—কে মল, কে মরবে, আমার ভাববার সময় নেই।

রুমা লতুর হাত ধরে ক্রমশ আবছা হয়ে উঠল চোখের ওপর। অসহায় আক্রোশে স্নেহধারা নিঃশব্দে ঠোঁট কামড়ে দেখতে থাকল। লতুটাকেও ও শেষ করে ফেলবে।

হীরুবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না—মানে, বলছিলুম—চাঁদুবাবুর মার খাওয়াটা প্রাপ্য, বুঝলেন দিদি? মারুক, চাঁদু হবে মারুক চাঁদুবাবুকে। চেনে না ... রূপপুর কি জায়গা!...অপ্রস্তুত ভাবটা এই মন্তব্য আর হাসিতে কাটিয়ে ফেলল হীরুবাবু। খুব হাসতে লাগল সে।

তোরাপ বলল, তাহলে ফরিদ ঝাঁপুই-হাটি যাক। ও ফরিদ!

ফরিদ বলল, আমার কথাটা শেষ করতেই দিলে না কেউ। লতুদিরা ব্রজর মড়া দেখে তারপর রুস্তমের বাড়ী যাবে বলল। রুমামাসি বলল, তোরা কেউ তো পারিস নি, দ্যাখ, আমি রুস্তমকে নিয়ে আসব। রুস্তমের সঙ্গে মাসির নাকি খুব ভাব আছে।

স্নেহধারা ঝাঁঝাল স্বরে বলল, রাজ্যের লোকের সঙ্গে ওর ভাব আছে! কি আপদ না ঘাড়ে জুটেছিল আমার! ফরিদ, ওর কথা ছেড়ে দে, বাবা। তুই যা ঝাঁপুইহাটি—এই নে বাসভাড়া। তোরাপ, এক টাকায় যাওয়া-আসা হবে না?

ফরিদ বলল, আমার যেতে আপত্তি নেই। তবে বলছিলুম কি একটুখানি দেখে গেলে ক্ষতি কি? আর আমি গেলে 'সার্বিস' দেবে কে গাড়ীফাড়ি এলে? বরং—

সর্দি আর ফ্লু'র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং এ রোগ দুটি প্রতিরোধের উপায় জেনে রাখুন

"অ্যানাসিন আমার মস্তবড় সহায়" বলেন; নার্স এঞ্জেলা ফার্নাণ্ডিস

সংক্রমণ : সর্দি আর ফ্লুতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি বাতাসে যে সংক্রামক-বীজাণু ছড়ায় তাই থেকে এ রোগ হয়। স্বভাবত আপনার শরীর এসব বীজাণু প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। তবে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বা পুষ্টির অভাবে আপনার শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে আর তার ফলে আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও কমে যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ : মাথা ভার ভার, মাথাধরা এবং নাক দিয়ে জল ঝরা—এসব উপসর্গ হোল সর্দির প্রথম লক্ষণ। এরপর ১৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নাক দিয়ে ঘন, হলদে শ্লেষ্মা বেরোনো শুরু হতে পারে।

অতিরিক্ত ঘাম বা কাঁপুনি সধারণত ফ্লু-র পূর্ব্বাভাস বলে জানবেন এরপর শুরু হতে পারে অবসাদ এবং দুর্ব্বলতা, সারা শরীরে যন্ত্রণা ও ব্যথা, ক্ষিদে ম'রে যাওয়া, সব সময় ঘুম ঘুম ভাব, মাথাধরা, ও ঠাণ্ডা লাগা। এছাড়া, শুকনো কাশি বা গলাব্যথাও শুরু হতে পারে।

নিরাময় : আপনার সেরে ওঠার পক্ষে সাধারণতঃ দুই বা তিন দিন-ই যথেষ্ট কখনো তার কিছু বেশী সময়ও লাগতে পারে।

কখন জটিল হ'য়ে ওঠে : ফ্লু যদি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না নিয়ে আসেন তবে নিউমোনিয়া এবং শ্বাস-যন্ত্রের ওপরের অংশ, কান এবং ফুসফুস সংক্রমিত হ'তে পারে। তাই ফ্লু হ'লে বা জবর সর্দি লাগলে দেরী না ক'রে ডাক্তার দেখান।

একবার হ'লেও আবার হ'তে পারে : উপযুক্ত যত্ন না নিলে সাবধান না হ'লে, আবার এই রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যাবে এবং পরবর্তী আক্রমণ হয়ত আগের চেয়ে আরও মারাত্মক হ'য়ে উঠতে পারে।

আপনাকে কি কি করতে হবে :

(১) আপনার বাড়ীতে কা'রো যদি ইতিমধ্যে জবর সর্দি বা ফ্লু হ'য়ে থাকে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে রেখে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন এবং তাঁকে বাড়ীর অন্যান্যদের থেকে যথাসম্ভব আলাদা ক'রে রাখুন। সেরে ওঠার পর ওঁর কাপড়-চোপড়,—বিশেষ ক'রে রুমাল এবং বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড়, বেশ ভাল করে ধুয়ে বীজাণুমুক্ত ক'রে নিন।

(২) ঘরে যা'তে ভাল আলো-বাতাস আসে তার ব্যবস্থা করুন।

(৩) এণ্টিসেপটিক কোনো ওষুধ, বা নুন জলে মিশিয়ে দিয়ে অন্তত দু' বার গার্গেল করুন।

(৪) শুধু ফোটানো জল খাবেন। অন্যান্য জলীয় জিনিষও প্রচুর পরিমাণে খান, বিশেষ ক'রে কমলালেবুর রস বা পাতিলেবুর রস। পুষ্টিকর খাবার খাবেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না। সম্ভব হলে একটু বেশী বিশ্রাম নিন।

নার্স এঞ্জেলা ফার্নাণ্ডিস নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন—অ্যানাসিন সর্দি আর ফ্লু-র অসুখে ব্যথা বেদনার উপশম ঘটিয়ে দ্রুত আরাম এনে দেয়। তিনি বলেন,—"এটি এমন কি বাচ্চাদের পক্ষেও একান্ত নির্ভরযোগ্য।"

অ্যানাসিন আপনাকে সাহায্য করতে পারে :

সর্দি আর ফ্লু-র সময় অ্যানাসিন গা-গতরে ব্যথা ও যন্ত্রণা দূর ক'রে আপনাকে দ্রুত আরাম এনে দেবে। অ্যানাসিন জোরালো ওষুধ,—কেননা, সারা বিশ্বের ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনার উপশমে যে ওষুধ সবচেয়ে বেশী করে সুপারিশ করেন তা'ই এতে দেওয়া আছে। অ্যানাসিন একান্ত নির্ভরযোগ্য। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের ব্যবস্থাপত্রের মতই অ্যানাসিনে বিভিন্ন ভেষজ দেওয়া আছে সবদিকে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে। তাই, সর্দি আর ফ্লু-র সংকেত-সূচক প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা দিলেই জল দিয়ে দিনে ৩ বার অ্যানাসিন খান।

জোরালো এবং নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন

ভারতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হচ্ছে

৪-ভাবে কাজ করে

Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co., Ltd. A-30

স্নেহধারা কড়া মুখে বলল, তুই চোরের সাক্ষী মাতাল! ও বলল, আর বিশ্বাস করতে হবে! রুস্তম ফকিরকে দেখেই নি চোখে।

তোরাপ একটু জোরে বলল, তবে কথাটা কি জানেন মা? পাঁচহাটির রমজান বেদে বলল, আর হাটখোলা-চণ্ডীতলার ইয়াকুবই বলুন—রুস্তম শা শোহ—খানদানী জমানার ফকিররা নিজেদের নামের আগে শাহ্ পদবী ব্যবহার করে) সবার উপরে। হাতে ডালায় মন্তরতন্তর পড়ে মা—গিয়ে ঠিক জায়গায় খোঁচা মারে। অমনি বেরিয়ে আসে চক্কর তুলে। আর সাপ যদি নাই না থাকে, রুস্তম শুঁকে রুস্তম শা বলে দেবে—নেই। ইদিকে ইয়াকুব বা রমজানের বিস্তর বায়না। আতপ চাল চাই, পাকা কলা চাই, দুধ চাই—হেন চাই তেন চাই, কাজের বেলা অশ্টরম্ভাটি। রমজানশালা তো চোর—কোমরে সাপ নিয়ে ঘরে ঢোকে। ওদের বিশ্বাস করা কঠিন। রুস্তম হলে চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারেন। ও একটা যাদুগীর মা—ওর দেহে পীরসায়েবের বাস যে। ফি রোববার ভর ওঠে—তখন গিয়ে দেখবেন, কি আজব কাণ্ড করে। সে-মানুষ আর থাকে না, মা।...

* * *

হ্যাঁ এই রুস্তমের সম্পর্কে এখানে বিচিত্র আর আশ্চর্য গল্প চালু আছে। স্নেহধারা জানে। এবং রুমাও শুনেছিল।

তাই রুমা মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রুস্তমের বাড়ী যাবে বলে। পথে এসে হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, ব্রজর লাসটা দেখে যাবে। সারা রূপপুর তোলপাড় হচ্ছে সকাল থেকে। শুধু ওরাই যায় নি—ওরাই সে-তোলপাড়ে কান দেয় নি। মন দেয় নি। এই একটি পরিবার কেবল সাপের কথাই ভেবেছে। তাই নিয়ে ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করেছে।

ফরিদের কাছে লাসটার খবর শুনে আর সেদিকে এগোয় নি রুমা। পীরের দীঘির কাছে গিয়ে বাঁদিকে মোড় নিয়েছিল। পূর্বপাড়ে মেলা বসে। সেদিকটা এখন ফাঁকা শুধু। রাজভাঙার মতো চটান জায়গা। কয়েকটা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে শুধু। বাকী তিন পাড়ে ঘন জঙ্গল। সরকারী উদ্যোগে জঙ্গলটা আরো বাড়ান ও ছড়ান হয়েছে। একটু গিয়েই দুধারে অগোছাল [illegible] ঝোপঝাড় ইঁটের টুকরো ছড়ানো। এক সময় কিছু বাড়ী ছিল সম্ভবত। [illegible] রয়েছে। [illegible] কবরের পাশে [illegible] থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে ঘাটে। কঙ্কালের এই সিঁড়িটা। চওড়া পাথরের ধাপে শ্যাওলা আর ঝোপ গজিয়েছে জোড়ের মুখে। নীচে বিশাল দীঘিটা [illegible] চারপাশে জলের রঙ কালচে—স্বচ্ছ। দাম আর শ্বেত-পদ্মে ভরা। পানকৌড়ি দলপিপি আর বালিহাঁস চরছে কোথাও। নির্জনতা ছমছম করছে চারপাশে। এখন বিকেল। গাছপালায় ছায়া হেলেছে দীর্ঘতর। গুমোট করছে চারদিক—বাতাস নেই, পাখির ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই। গুমোট গরম। ইঁটের স্তূপ দু পাশে সরিয়ে রুস্তমের বাড়ীর দরজার পৌঁছনোর পথ করা হয়েছে। স্তূপের ওপর আগাছার জঙ্গল। রুমা সারাক্ষণ চমকে উঠেছিল। একেবারে সাপের আস্তানায় এসে ঢুকেছে যে! অনবরত সে উদ্বিগ্ন মুখে পায়ের কাছটা লক্ষ্য করছিল। লোকটাকে শিগগির কোন রকমে ধরে নিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যায়।

আর এই ভীতি-অস্বস্তি-শিহরণের মধ্যে সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল, সত্যি তার বয়স খুব একটা বাড়ে নি। তার মধ্যে প্রকৃতই এক বালিকা এখনও বাস করছে। বরাবরই সে বাস করছিল, এতক্ষণে সেই সাপ আর এই দুর্গম দুর্বোধ্য পরিবেশ এবং রুস্তম ফকির নামক এক কিংবদন্তীর মায়াবী মানুষ মিলে চার দিক থেকে জোরাল আলো ফেলে সেই কোটরগত ভীরু অসহায় বালিকাটিকে খুঁজে বের করেছে। রুমাও অবাক হয়ে তাকে দেখছে। এর সঙ্গে জিয়াগঞ্জ শহরের সেই মেয়েটির আশ্চর্য মিল! মিল কেন—এ তো আসলে সেই!

ভাঙা দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত এক গভীরতর বোধে তলিয়ে গিয়েছিল রুমা। বড় অস্পষ্ট সেই বোধ। এই ধ্বংসস্তূপ, উদ্ভিদের আগ্রাসী বন্যা, সন্তর্পণে [illegible] চিত্র-বিচিত্র সুন্দর একটা সাপ—প্রকৃতির এইসব খেলা। খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক উদাসীন [illegible] ফকির! কোথায় চলে এসেছে না জেনে রুমা?

চরম মুহূর্তে সে লতুকেই ঠেলেঠুলে পাঠিয়েছিল। নিজের অস্বস্তি লাগছিল যেতে। পৃথিবীতে এখনও প্রচুর দুর্বোধ্য দুর্গমতা আছে, যা হঠাৎ-হঠাৎ কারো কারো চোখে পড়ে যায়। একদা গঙ্গাতীরের এক ছোট শহরে জলের ধারে, কিংবা অজস্র ঐতিহাসিক নবাবী আমলের ধ্বংসস্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে বালিকা রুমা টের পেত। হাইওয়ে, চলমান যন্ত্র, স্কুল-কলেজ, শিক্ষা-দীক্ষা, ঘরবাড়ি, জীবনধারণ জীবনযাত্রা পোষাক-আসাক, গান-বাজনা— সবকিছুর তলায় তলায় কী একটা আছে। কিছু আছে। সাপের মতো প্রচ্ছন্ন আর নিঃশব্দে সঞ্চরমান কোন সুন্দর ভয়ঙ্কর। চরাচরব্যাপী জীবজগতকে মাঝে মাঝে সে যন্ত্রণায় নীল করে ফেলতে পারে।

রুস্তম ফকির সেই নেপথ্য জগতের [illegible] কি? সেইরকম একটা বিশ্বাস না এসে পারে না রুমার। সারা গায়ে তাই সাপ নিয়ে সে বসে থাকতে পারে। তার কাছে প্রকৃতির অন্ধকার ঘর খুলেছে হয়তো। লতু ফিরে আসার পর ভাইনে স্তূপের ওপর একটা অজেনা বড়ো [illegible] বসে থাকা প্রজাপতিটা দেখছিল রুমা। সেটা উড়ে গেলে দুরুদুরু বুকে সে বাড়ি ঢুকল। লতুর একটা হাত ছাড়ল না অবশ্য।

উঠোনটার পাথর বসানো। জোড়ের মুখে শুকনো ঘাস রয়েছে। ফাটলধরা একটা দুকামরা ঘর সামনে। বারান্দায় চটের ওপর একটা অদ্ভুত লোক বসে রয়েছে। ছাল ছাড়ানো শুকনো গাছের মতো ফরসা আর কেমন খটখটে গায়ের চামড়া তার। মাথায় ঝাঁকড়া চুল—একটু লালচে। অল্প-স্বল্প কয়েকটা জটা আছে। পাতলা গোঁফ-দাড়ি। গলায় একটা মোচরদানাওলা পাথরের মালা ঝুলছে। হাতে তামার মোটা বালা। খালি গায়ে বসে আছে। পরনে লুঙ্গিমতো। চোখ দুটো বোজা। একটু একটু দুলছে।

কিন্তু কী সুন্দর চেহারা লোকটার! রুমার মনে পড়ল, বাজারের সেই মনোহারি-ওয়ালি মেয়েটি এরই বউ। বউটিও এমনি সুন্দর! ফুটফুটে গায়ের রঙ। সেজন্যেই নাকি ওর নাম আলতা। পাণ্ডেজী ওকে কীভাবে ঝড়ের রাতে পেয়ে মানুষ করেছিলেন, সে গল্পও রুমা শুনেছে। এই পাগলা ফকিরটার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে নাকি পাণ্ডেজীই খুব ধুমধাম করে দিয়েছিলেন।

"লম্বা সুন্দর নাক, কপালে ত্রিশূল-রেখা—এই রুস্তম ফকিরকে কয়েকমুহূর্ত অবাক চোখে দেখল রুমা। চোখ বুজে আছে—অথচ ঠোঁটে একটা হাসির মতো ভাব লেগে রয়েছে। নিশ্চুপ হয়ে থাকা যায় না। একবার গঙ্গার ধারে, জিয়াগঞ্জের বামুনঘাটের ওপর যে বটগাছটা রয়েছে, তার তলায় এমনি এক সাধু এসে বসেছিল। সে মুখ খুললে নাকি মানিক ঝরে। তাই খুলত না—ফলে বেচারার কথা বলাও হত না। ভারি বিপদের কথা নয়? অবশ্য সব গল্প তো চাঁদুদার। চাঁদুদা নাকি...ভ্যাট কী ভাবছে সে!

লতু মাসির পাঁজরে খুঁচিয়ে দিতেই মাসির চমক ভাঙল। ফিসফিস করে বলল, লতু, ডাক না।

তুমি ডাকো মাসি।

রুমা চাপা ভেংচি [illegible]...তুমি ম্যাকো মাছি!...পরক্ষণে [illegible] ফেলল সে। কেন, কে জানে হঠাৎ হাসি পেল তার। হয়তো নিজের এই সন্ত্রস্ত তোলপাড় ভাবটা লক্ষ্য করেই সে হাসল।

এবং হয়তো হাসি শুনতে পেয়েই রুস্তম ফকির চোখ খুলল। কী লাল কটমটে চোখ! এই নির্জন বাড়ি বসতী থেকে এতদূরে, স্তব্ধ ছমছমে বিকেলের বনঝোপ, আলো কমে আসছে দ্রুত, পিছনে পীরের কবর, আর সাপ নিয়ে দিন-রাত যার কেটে যায় সেইরকম একটা রহস্যময় লোক—রুমা তার সব স্মার্টনেস হারিয়ে ফেলল। তার শিক্ষাদীক্ষা আত্মসচেতনতা, তার বয়স, অহঙ্কার, অজমদার মশায়ের নাতনী, সব—সবকিছু হারিয়ে পুরো অবোধ বালিকা হয়ে উঠল। চঞ্চল চোখে সে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। গলা শুকিয়ে গেল রুমার। বুক ঢিপঢিপ করতে থাকল।

রুস্তম হাসছে। দুলতে দুলতে মিটি-মিটি হাসছে এবার।

হঠাৎ লতু দু পা বাড়িয়ে বলে উঠল, ওগো ফকিরবাবা, আমাদের ঘরে সাপ ঢুকেছে। তুমি শিগগির এসো—শিগগির।

লতুর সাহস আর জড়তাহীন কথাবার্তায় অবাক হয়ে গেল রুমা। আশ্চর্য, লতুটা আশ্চর্য! লতুটা পেয়ে বসেছে পেয়ে গেল। আর সে এতবড় ধিঙ্গি মেয়ে হয়ে ভয় পাচ্ছিল এতক্ষণ! রুমা একটু লজ্জা পেল মনে মনে। সে অকারণ কেসে গলা ঝেড়ে তারপর লতুর কথার সঙ্গে আরো কথা জুড়ে দিতে চাইল।...হ্যাঁ, মানে—সাপ। কী সাপ জানিনে। কাল রাতে ঝড়-জলের সময় ঢুকেছে।

রুস্তমের হাঁটুর কাছে কোথায় একটা ছোট্ট কলকে লুকনো ছিল, বের করে সে গম্ভীর গলায় বলল, আজ আমি সাপ ধরব না। আজ বেজো মরেছে। আজ সাপ ধরে? ছি ছি ছি!

লতু সটান কাছে চলে গেল।...তোমাকে সারাদিন ডাকছি আমরা। মা এসেছিল একবার। তারপর কতবার লোক পাঠাল।

রুস্তম রুমাকে দেখছিল ভ্রূ কুঁচকে। রুমা চোখ নামিয়ে ফেলেছে। কী যেন আছে লোকটার চোখে। রুস্তম বলল, আজ বেজো মরেছে। আজ রুস্তম সাপ ধরবে না।

লতু বলল, মাসি। তুমি একে বলো না! মাসি যেন কী! কথা বলছ না কেন? এই ফকিরবাবা, আমার মাসিও তোমাকে ডাকতে এসেছে।

রুমা বলল, আমরা ঘরে ঢুকতে পারছিনে কাল থেকে।

লতু ভেংচি কাটল।...ওই বললে কথা শোনে? ফকিরবাবা, তোমাকে টাকা দেবে মা। আমাদের পেট্রোল পাম্প আছে—আমার বাবাকে চেনো না? পরেশ মজুমদার! সেই যে গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট হয়ে মারা গেল।

রুস্তম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, যা যা ভাগ! বেজো মরেছে, সাপ ধরতে নেই।

রুমা এবার রেগে গেছে। দেখ তো, কী হৃদয়হীন লোকটা! এতটুকু মেয়ে এমন করে বলছে, আর ও গ্রাহ্যই করছে না! পাগল, না হাতি! জামাইবাবু থাকলে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যেত এতক্ষণ। গাঁজার নেশা কেটে যেত সঙ্গে সঙ্গে। রুমার রাগ এসে রুমাকে সাহস দিল। সে বলল, আশ্চর্য লোক তুমি তো! গেলে পয়সা পাবে—তাও যেতে চাইছ না?

রুস্তম নির্বিকার।...যা, যা, ভাগ্ বেটিরা। আজ বেজো মরেছে, আজ কি সাপ ধরে?

লতু বলল, বারে! কে মরেছে — তার জন্যে সাপ ধরবে না কেন? ও ফকির বাবা!

রুমা লতুর হাত ধরে টানল।...চলে আয় তো! একটা আজেবাজে লোকের সঙ্গে—ভ্যাট! চলে আয়। আমরা হাসপাতালে যাই বরং। কারবলিক এ্যাসিডের কথা আমার মনেই ছিল না—বুঝলি লতু? ও দিলে সাপ ত্রিসীমানায় মাড়াবে না। খুব মনে পড়ে গেছে এতক্ষণে। আয়, আয়!

লতুর হাত ধরে টেনে রুমা বেরিয়ে এল। পিছনে রুস্তম ফকির ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসছে।...যা, যা! ভাগ! আজকের দিনে এয়েছে সাপের খবর নিয়ে। বেজো মরেছে, আর আমি শালা যাব সাপ ধরতে!

লতু দরজার মুখে ঘুরে রুস্তমকে ভেংচি কেটে দিল। বাইরে বেরিয়ে আবার ভয় পেয়ে গেছে রুমা। এখন মোটামুটি ষাট-সত্তর গজের বেশী জঙ্গলে রাস্তা সামনে—তারপর হাইওয়ে। এই রাস্তাটা নিরাপদে পেরোন যাবে তো? রুমা থমকে দাঁড়িয়েছিল। ডাইনে পীরের মাজার। উঁচু ইঁটের স্তূপ—পাকা চত্বর। অজস্র মাটির ঘোড়া ছড়ান রয়েছে। কয়েকটা কাঁটা-মাদারের গাছের জটলা আছে। ফুল ফুটেছে লাল-লাল। পিছনে বিশাল বটগাছ। ছায়ায় এখন অন্ধকারের ওতপ্রোত ছাপ সবখানে। একটা লোককে আসতে দেখা গেল বটতলার দিক থেকে। চাষাভুষো লোক। হাতে একটা নিড়ানি। সম্ভবত দীঘির মজা জায়গায় চাষবাস করে। এখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। রুমা সাহস পেল ওকে দেখে। লোকটা আগে-আগে যাক, তারা দুটিতে পিছনে যাবে—ব্যস, তাহলেই নিশ্চিন্ত।

লোকটা এদের হাঁ করে দেখল। তারপর বলল, থানে এসেছিলেন নাকি দিদিমণিরা?

লতুর হঠাৎ অসম্ভব জোর এসে গেছে তখন থেকে। বলল, আমরা ফকিরবাবাকে ডাকতে এসেছিলুম। ঘরে সাপ ঢুকেছে।

লোকটা বলল, কি বললে ফকির?

যাবে না!...বলে লতু রুমাকে টানল।... চলো মাসি, হাসপাতালেই যাই।

লোকটা আগে-আগে হাঁটতে লাগল।... ও ব্যাটার খেয়াল। ভাল মনে থাকলে যাবে, নয়তো যাবে না। কাদের বাড়ীর আপনারা?

লতু জবাব দিল, আমি পরেশ মজুমদারের মেয়ে। মজুমদারমশাইকে চেনো? ওই যে পেট্রোল পাম্প আছে!

লোকটা বলল, খুব চিনি, খুব চিনি। আমার বাড়ী মাজারে না—গাঁয়ের দিকে। তাহলেও ওনাকে না চিনত, এমন কে আছে ইদিকে বলুন। ঘরে সাপ ঢুকেছে নাকি? দেখেছেন স্বচক্ষে?

লতুই জবাব দিয়ে গেল।...আমিই তো দেখেছি। কাল ঝড়বৃষ্টি হল, তখন ঢুকে পড়েছিল ঠাকুরঘরে।...একটু থেমে সে রুমার দিকে তাকিয়ে ফের বলল, মাসিও দেখেছে। একটু লেজ দেখেছে।

লোকটা দাঁড়িয়ে গেল। জিভের মুখে বলল, ঠাকুরঘরে! তাহলে আর ছোটাছুটি করবেন না দিদি। চুপচাপ বসে থাকুন গে! কতরূপে কে আসেন কখন। উঁহু—ওষুধপত্তর ও কম্ম করবেন না। ও ব্যাটা গেঁজেল—তার ওপর বেজাত। ওকে দিয়ে ঠাকুরঘরের সাপ ধরাবেন! কক্ষনো এ কম্ম করবেন না—অমঙ্গল হবে।

আবার চলতে থাকল সে। রুমা মুখ টিপে হাসছিল। সারা গায়ে ঘাম ধুলোকাদা, আধন্যাংটো এই চাষাভুষো লোকটির ধর্মাধর্ম জ্ঞান দেখে তার হাসি পেয়েছিল।

হঠাৎ লোকটা আবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে বলল, অবশ্যি পীরবাবার কথা আলাদা, তিনি যেমন হেঁদু—তেমনি মোছলমানের। সবাই তেনার সন্তান।

বলে তেমনি হঠাৎ উল্টোদিকে অর্থাৎ ফের থানের দিকে চলতে শুরু করল। এরা একটু সরে দাঁড়াল। পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করছিল। হঠাৎ কী মনে পড়ে গেছে হয়তো—কিছু ফেলে এসেছে জমিতে —আনতে যাচ্ছে।

লতু রুমার হাত ধরে টানল।...চলো মাসি, সেই এ্যাসিড আনতে যাই।
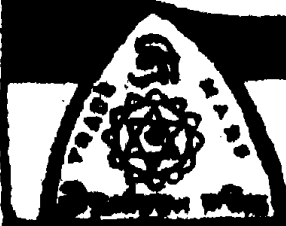
যেতে যেতে রুমা একবার পিছনে ঘুরল। লোকটা পীরের থানের সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে। হঠাৎ কেন ভক্তি উথলে উঠল ওর, কে জানে!

এরা হাইওয়েতে আসতেই সে দৌড়ে এসে সঙ্গ নিল। কাঁচুমাচু হেসে বলল, মানুষের মুখ। কখন ভালমন্দ বেরিয়ে যায়। যাই বলুন দিদি, পীরবাবার মাহাত্ম্যের শেষ নেই। আমার বড় মেয়েটার অমন অসুখ রুস্তম ফকিরের একটা কবচেই সেরে গেল।

এতক্ষণে বুঝল রুমা। লোকটা রুস্তম ফকিরের বদনাম করে ফেলেছিল—পাছে পীরবাবার কোপে পড়ে যায়, তাই তক্ষুনি মাথা ঠেকে ক্ষমা চেয়ে এল। অদ্ভুত মানুষের বিশ্বাস! রুমা হাসি চেপে মনে

মনে বলল, এই আমি আর লতু তো প্রণাম করে এলুম মা! আমাদের ভয়ে সাপ ঢোকা নিয়ে সারাটা দিন যা তোলপাড় যাচ্ছে। আমাদের ওপর রেগে যাবে নাকি পীরবাবা? পীরবাবা, তুমি রাগ করো না। আমরা সত্যি বিপন্ন।

লোকটা বাঁদিকে নামল হাইওয়ে ছেড়ে। গাঁয়ের দিকে একটা আলপথ চলে গেছে। বলে গেল, বরং পাণ্ডেজীকে গিয়ে ধরুন মা। ওঁর কথা ঠেলতে পারবে না রুস্তম। এখনও খানিকটা বেলা আছে। চেষ্টা করে দেখুন দিদি।...

দি আইডিয়া! রুমা ঠোঁট কামড়াল। অ্যাবলিক অ্যাসিড খুঁজে না পাওয়া যায় হাসপাতালে, আবার সারাটা রাত টৌবলে জড়োসড়ো হয়ে জাগতে হবে। বরং আগে পাণ্ডেজীকে গিয়ে বলা যাক। আঃ হক-সায়েব থাকলে কিছু ভাবতেই হত না এতক্ষণ! দিদিটা বড্ড ঝগড়াটে। সবাইকে চটিয়ে ফেলছে একে একে। হকসায়েব অত ভালমানুষ—অত ভদ্র, সৎ—অথচ তাকেও অবিশ্বাস করে চটিয়ে ফেলল দিদি!

পেট্রোল পাম্পের সামনে দিয়ে গেলেই স্নেহধারা আবার হন্তদন্ত হবে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিয়ে লোক পাঠাবে। একটু দাঁড়িয়ে রুমা বলল, লতু, চল্ আমরা শর্ট-কাট করি। ডাইনে হাসপাতালের পাশ দিয়ে ঘুরে মাঠে মাঠে চলে যাই চৌমাথায়।

লতু বলল, এ্যাসিড! চৌমাথায় এ্যাসিড আছে—না হাসপাতালে?

রুমা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, তর্ক করে না। চুপচাপ আয় তো সঙ্গে।

কিছুদূরে ছড়ানো রয়েছে ইটখোলার চিমনিভাটা। নয়নতারা বোন মিলস। ওদিকটায় মাঠের ওপর হাড়ের পাহাড় জমে থাকে। পচা চিমসে দুর্গন্ধ আসে। দু-আঙুলে নাক টিপে হাঁটছিল রুমা। দেখাদেখি কিছু টের না পেয়েও লতু মাসির ভঙ্গী নিল। বলল, এঃ, এদিকে কেন এলে মাসি?

রুমা বলল, বকে না। চুপচাপ আয় তো সঙ্গে।

হাসপাতাল পেরিয়ে স্কুল এলাকা। একবার থেমে কোয়ার্টারগুলোর দিকটা দেখে নিল রুমা। হঠাৎ লতু বলল, কাকুকে ডেকে আনব মাসি?

রুমা ভুরু কুঁচকে বলল, কাকে?

কাকু—আমাদের কাকাবাবুকে। লতু বিরক্ত।

কে কে?...প্রশ্নটা করেই পরক্ষণে রুমা অবাক হয়েছে। ব্যাপারটা তাকে ভীষণ অন্যমনস্ক করে রেখেছে যেন। কী বলবে, কী করবে, সব বড্ড অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে ক্রমশ। রুমা মনে মনে বলল যাকে বলে ইনস্যানিটি গ্রো করা, ঠিক সেইরকম। সকাল থেকে তার এই অপ্রস্তুত থতমত ভাবকেই প্যাঁদা বলছিল, রুমাদিদিমণি 'থতবড়' করছে। থ-ত-ব-ড়! প্যাঁদাটা মাঝে মাঝে যা দেহাতি ঝাড়ে, তাক লাগিয়ে দেয়। রুমা চুপিচুপি হাসতে থাকল।

এদিকে লতু মাসির মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

রুমা বলল, না—কাকেও ডাকতে হবে না। বলছি, চুপচাপ সঙ্গে আয়। তা নয়, একে ডাকি, ওকে ডাকি।

ডাইনে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড পুকুর। ধোপারা কাপড় মেলে দিয়েছে। হাঁস ডাকছে পুকুরের জলে। বিকেলের রেশমি ঝিল-মিলে রোদ গায়ে নিয়ে দিগন্তঅব্দি শস্য-শূন্য মাঠটা আরামে ঝিমোচ্ছে। বাঁদিকে হাইওয়ের সমান্তরালে রূপপুর বাজার থেকে আবছা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রুমা।

সামনে নটবাবুদের বাংলো বাড়ি। ঘন গাছপালার ফাঁকে বারান্দাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবং বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুনন্দিতা এদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এভাবে মুখোমুখি পড়ে যাবে ভাবতে পারেনি রুমা।

সে লতুর মুখটা দেখে নিল। আশ্চর্য, লতু—অত ছোট মেয়ে, সেও মুখ গম্ভীর করে ফেলেছে। তার মাকে এই মহিলা কীভাবে উত্যক্ত করেছে, লতুর জানা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু রুমা সুনন্দিতাকে এড়িয়ে যেতে চায়, তার পিছনে পারিবারিক কারণটা রুমার কাছে নিতান্ত গৌণ, সেটা আমল সে দেয়নি এখনও দেয় না। যে-সুনন্দিতার জন্যে একদা তার মন পড়ে থাকত সারাক্ষণ, তার সঙ্গে স্নেহধারার খুনোখুনি হলেও রুমার কিছু আসে-যায়নি, আজও আসে-যায় না। বরং জামাই-বাবুর ওভাবে 'আত্মহত্যার' পর সুনন্দিতা রুমার চোখে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল। সে নতুন চোখে দেখছিল তাকে। তারপর হঠাৎ রুমা একদিন আবিষ্কার করেছিল, অমিতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সুনন্দিতা ক্রমাগত রক্তমাংস অর্থাৎ স্পষ্ট করে বললে যেন যৌনতার দিকেই ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে। এত খারাপ লেগেছিল রুমার! চন্দনকেও একদিন কী কথায় এ-ব্যাপারটা বলেও ফেলেছিল সে।

তাহলেও এখন একা থাকলে সুনন্দিতার কাছে অন্তত একবার দাঁড়িয়ে যেতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু লতুর জন্যে সেটা সম্ভব নয়।

এবং সম্ভব নয় বলেই যেন পরক্ষণে খুশি হল রুমা। সে একটু হেসে ফিসফিস করে বলল, লতু, বুঝলি? তুই আমার বডিগার্ড। কেমন?

লতু বুঝতে পারল না। সে গম্ভীর-মুখে বলল, মাসি, দেখছ ডাইনিটা কেমন তাকাচ্ছে! চোখ গেলে দেব একেবারে।

রুমা বলল, চুপ। শুনবে।

সুনন্দিতা বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে আসছিল। সরু পথের কাছে রুমারা এলে সে বলল, কী রুমা, আসা যে ছেড়েই দিলে আজকাল! ওটি কে? তোমার দিদির মেয়েটা না? কতটুকু দেখেছি। বাঃ, বেশ বড়োসড়ো হয়েছে তো!

রুমা কাঁচুমাচু হাসল। লতু ফোঁস করে উঠল।...মাসি দেরী হয়ে যাচ্ছে। মা বকবে। সন্তুরা একলা আছে। চলে এস।

সুনন্দিতা হেসে বলল, ওরে বাবা! মেয়ে যে মায়ের চেয়েও কড়া।

লতু কটমট তাকিয়ে বলল, বেশ—কড়া আছি, আছি। কারো খেয়েপরে কড়া নাকি?

পলকে সুনন্দিতার মুখটা হিংস্র দেখাল। নিষ্ঠুর হেসে বলল, সেটা তোমার মাসিকেই জিগ্যেস করো না মেয়ে। কার খেয়ে পরে মুখে এ্যাদ্দিনে বুলি ফুটেছে। রুমা, ওকে বুঝিয়ে দাও তো!

স্তম্ভিত হয়ে গেল রুমা। সুনন্দিতা কী! এত ছোট, এত হীনমনা মেয়ে—ভাবতেও পারেনি রুমা। দিদির সঙ্গে অমন কাণ্ড করার পরও সুনন্দিতার সম্পর্কে একটা উঁচু আর রহস্যময় ধারণা ছিল তার। রুমা মুখ নামিয়ে চুপ চাপ চলতে থাকল। পিছনে ঘুরে সুনন্দিতাকে আর দেখতেও ইচ্ছে করছিল না তার। চৌ-মাথায় পৌঁছে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল সে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হল, সুনন্দিতা কি তাহলে পরেশের প্রতি কোন অচরিতার্থ কামনাবাসনার আক্রোশ এমনি করে পরেশের স্ত্রী আর সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হাল্কা হতে চাইছে? একদিন গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুমা স্পষ্ট জানতে চাইবে। সুনন্দিতাকে আর ভয় পাবে না সে। বলবে, বলুন—কী চেয়ে-ছিলেন জামাইবাবুর কাছে? কী পাননি!

চৌমাথায় প্রচণ্ড ভিড়। রজব লাসটা এসে গেছে মনে হচ্ছে। তিনটে ট্রাক সাজানো হয়েছে। হরিধ্বনি দিচ্ছে সবাই। একটা ট্রাকে খোলকরতাল বাজিয়ে কীর্তন হচ্ছে। একটা পাগলাটে ড্রাইভারের জন্যে এত কাণ্ড হতে পারে ভাবা যায় না। কাতারে কাতারে লোক এসে জমছে চারদিক থেকে। লতু বলল, দেরী হচ্ছে মাসি! কী দেখছ হাঁ করে?

রুমা ওর কাঁধ ধরে বলল, দাঁড়া না বাবা! একটু দেখে যাই।

সেই সময় পশ্চিম থেকে হু হু করে একটা বাতাস এল। কখন সবার অলক্ষ্যে ওদিকের আকাশ কালো হয়ে গেছে। বাতাসটা ভিড়ের ওপর এসে নাচতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠীবাড়ি

সোনার বাঙলা

শিপ্রা আদিত্য
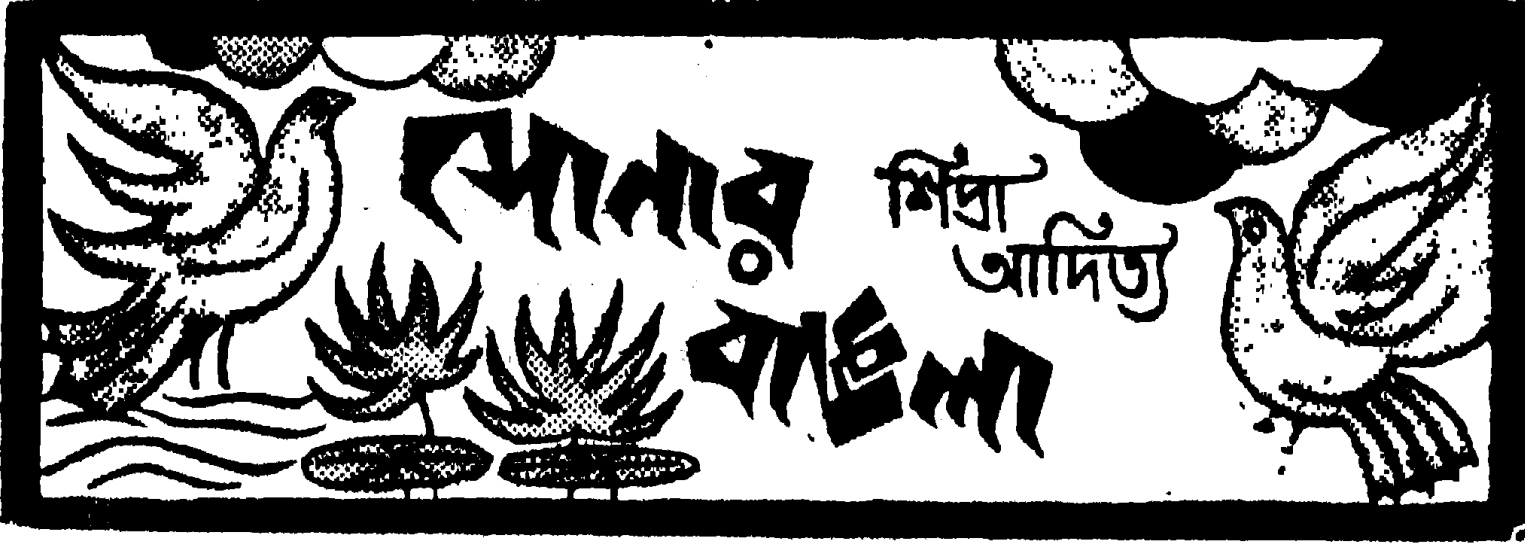
রাজসাহী—

আবদুলপুর জংসন থেকে ১৫ মাইল দূরে রাজসাহী জেলার 'বাঘা' গ্রামে বহু প্রাচীন অতি সুন্দর এক মসজিদ, মসজিদের গায়ের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে গৌড়রাজ নসরৎ শাহ ১৫২৩ খৃঃ এই মসজিদটি তৈরি করেন। মসজিদটি বর্তমানে সরকারী পুরাকীর্তি বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। মসজিদের কাছেই রয়েছে হজরৎ মৌলানা শাহ-দৌলা নামে এক বিখ্যাত সন্তের সমাধি।

আঠার শতকের মাঝামাঝি রাজশাহীর রাজপুরে রেশমের ব্যবসা খুব বেড়ে যাওয়ায় বহু বিদেশীর এখানে পদার্পণ ঘটে। তাদের তৈরী 'বড়কুঠি' সে কথাই বার-বার আজও মনে করিয়ে দেয়। সেকালের কয়েকটা কামান আজও রাজশাহী পুলিশ লাইনে দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের অর্থানুকূল্যে ও প্রসিদ্ধ উকিল ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের সি আই ই মহাশয়ের যত্নে যে সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত পুরা-বস্তুর বহু বিচিত্র নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই রাজশাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালাটি' আজ সমগ্র বাঙলাদেশের গৌরবের বস্তু।

দেবপাড়া—

রাজশাহী জেলার ৯ মাইল দূরে উত্তরে দেবপাড়ায় বিজয় সেনের সময়কার প্রস্তর-লিপি পাওয়া যায়। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কর্ণাট দেশের বিজয় সেনই রাঢ় দেশের অধিপতি হন। তিনি পাল রাজাদের কাছ থেকে গৌড়কে ছিনিয়ে নেন, পরে অবশ্য তার রাজ্যের পরিধি আরো বেড়ে যায়। এ-ছাড়া আছে একটি প্রাচীন শিবমন্দির (বিজয় সেন কর্তৃক নির্মিত) দীঘি, পালপুরের কাছে বিরাট আকারের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

মণ্ডয়েল—

রাজশাহীর কাছে শ্রীপাট খেতুর বা প্রেমতলীতে আগে প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজোর সময় বিরাট মেলা বসত। রাজশাহী জেলার খেতুর থেকে ৪ মাইল দূরে মণ্ডয়েল বা মাড়ইল গ্রামে চারটি ভগ্নস্তূপ থেকে বহু প্রাচীন মূর্তি—জৈন তীর্থংকর শান্তি-নাথের পাথুরে মূর্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে সেগুলি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির হেপাজতে।

পাহাড়পুর—

কলকাতা থেকে ১৭৫ মাইল দূরে সান্তাহার জংশন বা সুলতানগঞ্জ। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ বাঙলা-দেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি। প্রাচীন নাম ছিল সোমপুর। পাহাড়পুরের পাশের এক গ্রামের নাম ওমপুর সোমপুরকে আজও মনে করিয়ে দেয়। ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া একটি মুদ্রার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। লেখা আছে 'সোমপুর ধর্মপাল বিহার'। পাহাড়পুরের প্রধান স্তূপের মন্দির বা মহাবিহারটির গঠনরীতি খুবই আকর্ষণীয়। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে সাধারণত এই ধরনের গঠনরীতি চোখে পড়ে না। ব্রহ্ম, কাম্বোজ, যবদ্বীপের বিরাট মন্দিরগুলিতে যে পাহাড়পুরের গঠনরীতিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাম্বোজের আংকোরভাট, যব-দ্বীপের বরবদুর ও প্রামবাণন প্রভৃতি জগৎ-বিখ্যাত মন্দিরগুলির গঠনরীতির সঙ্গে পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের গঠন-রীতির সাদৃশ্য দেখে এই অনুমান করা যায়। পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারে বাঙলার দান অসামান্য। প্রথম পাল রাজত্বের সময়ে যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক লেনদেন ও ঘনিষ্ঠতার কথা নালন্দায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। অনেকের অনুমান পাহাড়পুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠার আগে ওখানে চতুর্মুখ জৈন মন্দির ছিল। তার আদর্শেই এই মহাবিহারটি পরে নির্মাণ করা হয়। পাহাড়পুরের সঙ্গে যে জৈনদের সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ এই স্তূপ থেকেই মেলে। চতুর্মুখ জৈন মন্দিরের সঙ্গে বিহারটি প্রাথমিক আকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও

বিহারটির তিনটি তল। প্রতি তলে বারান্দা ও পথ। প্রধান মন্দির এবং মহাবিহারটি ঘিরে বিরাট সঙ্ঘারামটি অবস্থিত। এর প্রতিটি ভুজ ৮২২ ফুট লম্বা। বৌদ্ধদের এত বড় সংঘারাম ভারতে কোথাও নেই। এর চারদিকে রয়েছে ১৮৯টি বড় ঘরবিশিষ্ট এক বিরাট দালান। এই ঘরগুলির মধ্যে আছে ৯২টি পুজোর বেদী: ঘরগুলির সামনের দিকে ৮।৯ ফুট লম্বা এক বড় বারান্দা। পাহাড়পুরে পাল যুগের আগের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও মহাবিহার সঙ্ঘারামটি বিশেষজ্ঞদের মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল যুগেই প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়পুরে বেশ কিছু পাথরে খোদাই করা মূর্তি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি রাজা মহেন্দ্র পালের সময়ের। পাহাড়পুর মহাবিহারের পাদদেশে পাথরের গায়ে যে ৬৩টি মূর্তি দেখা যায় তা সত্যই অপূর্ব। পাল যুগের বিস্ময়কর ভাস্কর্যপ্রতিভার এটি একটি বিচিত্র প্রমাণ। প্রসিদ্ধ ভাস্কর ধীমান বীটপাল পাল যুগেরই শিল্পী। জানি না এ বিহার-পরিকল্পনায় তাঁদের অবদান কতটুকু।

অনেক আগে এই বৌদ্ধ বিহারটির গা ঘেঁষে প্রবাহিত ছিল একটি নদী। বর্তমানে তার কোন চিহ্ন নেই তবে তার ঘাট ও সংলগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। নদীর পশ্চিম তীরে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা গড়ের মাঝে আছে মূল বেদীটি। উত্তরের দেওয়ালের মাঝখানেই রয়েছে বিরাট দরজা। দরজার সামনে দিয়ে বেশ চওড়া সিঁড়ি সোজাসুজি উপরে উঠে গেছে। পথের চারপাশে নক্সা করা টালির ওপর নানা রকম জীবজন্তুর ছবি, মানুষ, ফুল লতাপাতা পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ অবলম্বনে গল্পের অলংকরণ। তার মধ্যে—বানর-কীলক কথা, সিংহ-শশক কথা, বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। গ্রামের শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, কনৌজের গুর্জর প্রতিহার বংশের রাজা মহেন্দ্র পালদেব একসময় এই মন্দিরগুলির কিছু অংশ সংস্কার করেন। পাহাড়পুরে পাওয়া এক তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ১৫৯ খৃঃ গুপ্তবংশীয় সম্রাট বুধগুপ্তের সময়ে এখানে একটি জৈন-মন্দির ছিল। এ-ছাড়া পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত খুঁড়ে বহু পাথুরে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। যেমন—গিরি-গোবর্ধন, ধেনুকাসুর, কৃষ্ণলীলা, বালী-বধ, সুভদ্রা হরণ, শিবের বিষপান প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের দেওয়াল এবং বেদীর নীচে রাধা-কৃষ্ণের অনুরূপ যুগলমূর্তিটি প্রাচীন মূর্তি বলেই মনে হয়। তিব্বতীয় পুরাণ গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় খৃঃ ৯ম থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত সোমপুর তাঁদের বিশিষ্ট তীর্থ ছিল। সম্ভবত শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশ এক সময়ে এখানে বাস করতেন। এবং অতীশের গুরু মহাস্থবির রত্নাকর শান্তিও এখানে ছিলেন। সব পাথুরে মূর্তি ছাড়াও পাহাড়পুর পর্যটকদের আরো খোরাক জোগাবে তার পোড়ামাটির কাজ বা শিল্পকলা দিয়ে। এখনকার মন্দির দেওয়ালে পাওয়া অসাধারণ কারুকার্য বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করের এক গর্বের বস্তু। পোড়া মাটির কাজের মধ্যে মাছ, কুমীর, সাপ, শাঁখ, ঝিনুক, হাতি, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি জীবজন্তুই প্রধান। এইসব নানা কারণেই পাহাড়পুর আজ পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান।

গৌড়—

দেশবিভাগের ফলে প্রাচীন বাঙলার রাজধানী গৌড়ের এক ক্ষুদ্রাংশ বাঙলা-দেশের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। তবে এই অংশেই আছে গৌড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা-সম্পদ 'ছোট সোনা মসজিদ' বা 'খোজাকি মসজিদ'। তাছাড়া আরো আছে 'দারোশ-বাড়ী' মসজিদ ও মাদ্রাসা, 'ধানচক মসজিদ'। সুলতান হুসেন শাহের আমলে ১৪৯৩—১৫১৯ খৃঃ মধ্যে ওয়ালী মহম্মদ নামের এক সুলতান হারেমের খাজাঞ্চি ছোটসোনা মসজিদটি নির্মাণ করেন। স্থানীয় মানুষ-জনেদের বিশ্বাস ওয়ালী মহম্মদ খোজা ছিলেন সেই থেকেই এর আর এক নাম 'খোজাকি মসজিদ'। পাথরে তৈরী এই মসজিদটির গায়ে খোদাই করা যে সব অপূর্ব অলংকরণ রচিত হয়েছিল তা আজও অম্লান রয়েছে। ছোটসোনা মসজিদের প্রবেশদ্বারে যেসব সূক্ষ্ম ভাস্কর্য অলংকরণ রয়েছে সেগুলি ভাল করে দেখতে গেলে খুব কাছে যেতে হবে। কারণ এর রচনাশৈলী খুব সূক্ষ্ম এবং স্বল্প খোদিত। মসজিদটির মধ্য দুয়ারের ওপরের গম্বুজটি বাঙলার চারচালার ঢংয়ে স্থাপত্যে মণ্ডিত, এবং তার পাশের শ্রেণী-বদ্ধ গম্বুজগুলি একদিন সোনার তবকে মোড়া ছিল তাই এর নাম 'ছোটসোনা মসজিদ' কারণ গৌড়ের ভারতীয় অংশে একটি সোনার তবকে মোড়া আর একটি মসজিদ আছে যার নাম বড় সোনা মসজিদ। আয়তকার এই ছোট সোনা মসজিদটি লম্বায় ৮২ ফুট, চওড়ায় ৫২½ ফুট, এবং উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট।

দারশবাড়ী মসজিদ—

দারশবাড়ী মসজিদটিও আয়তাকারে রচিত। লম্বায় ১১১ ফুট ৬ ইঞ্চি, চওড়ায় ৬৭½ ফুট তবে এর ছাদের এক অংশ আজ ভেঙে যাওয়ায় এটির উচ্চতা অনুমান করা যায় না। মসজিদের ভেতরের দেওয়ালগুলি একদিন অপরূপ অলংকরণে অলংকৃত ছিল। আজ তার বেশীর ভাগই কালের কোলে হারিয়ে গেছে। মসজিদটি তিনটি অংশে বিভক্ত। মধ্যভাগের প্রধান অংশ ৫১ ফুট লম্বা ও ২৫½ ফুট চওড়া। ওপরের ছাদটি খিলান ঢঙে রচিত। পাশের ঘরদুটি ৪২ ফুট করে চওড়া। এটির পিছনে পূব দিকে ১৬½ ফুট চওড়া বারান্দা। উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে উঁচু ধাপ। 'ধাপ' বা ধাপটি বিশেষ ভাবে তৈরী হয়েছিল হারেমের মহিলাদের বসবার স্থান হিসেবে। এখনও উত্তরের এই বিশেষ বসার ব্যবস্থায় অর্থাৎ উঁচু ধাপে ১৮×১১ ফুট এক অংশে অপূর্ব এক পাথরে খোদাই সুন্দর অলংকরণ দেখা যায়। মহম্মদ ইউসুফ শাহের আমলে ১৪৭৯ খৃঃ সুলতান এই মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং সেই সঙ্গেই পাশে প্রতিষ্ঠ
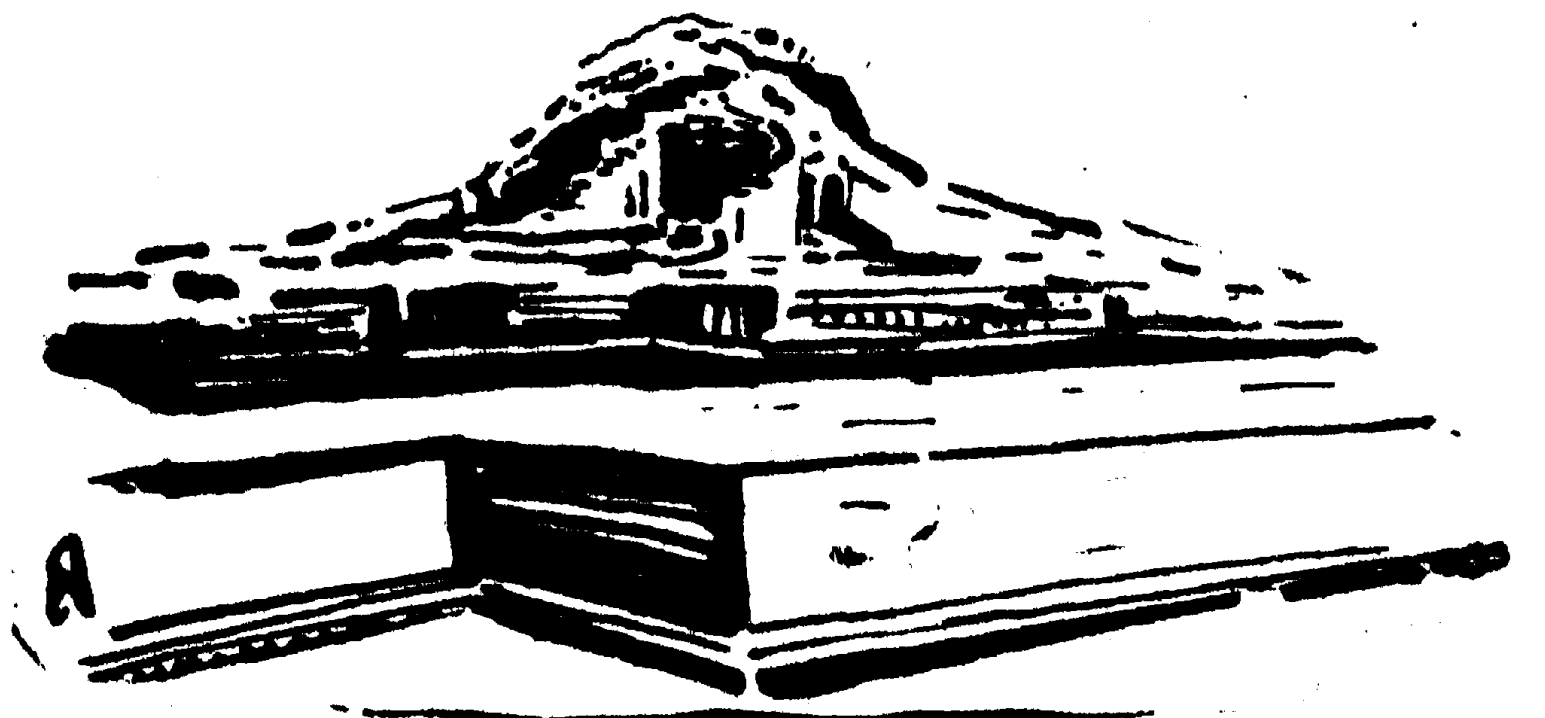
পাহাড়পুরে স্তূপ—রাজশাহী

করেন মাদ্রাসা। সেদিন এই মাদ্রাসার খ্যাতি ছিল দেশ-বিদেশে।

কাছেই আর একটি ছোট মসজিদ রয়েছে যেটির নাম 'ধানচক' বা 'রাজবিবি' মসজিদ। আয়তাকারে তৈরী মসজিদটি লম্বায় ৬২ ফুট, চওড়ায় ৪২ ফুট। গৌড়ের ভারতীয় অংশের 'লটন' মসজিদের পরিকল্পনায় এটি রচিত। এবং এর ছাদে রয়েছে এক বিরাট গম্বুজ আর তার পুব দিকে আছে তিনটি ছোট গম্বুজ।

এসব নানান কারণে ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক এবং পর্যটক ভ্রমণবিলাসীদের কাছে, গৌড় সহজেই আকর্ষণীয়।

দিনাজপুর—

রেল আমলা থেকে কিছু দূরে বগুড়ার সীমান্তে জয়পুরহাট স্টেশন। এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার মুকুন্দপুর গ্রামেই মঙ্গলবাড়ী। বাংলাদেশের কৈবর্ত-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ভীমের স্মৃতি বিজড়িত 'ভীমের পান্ঠী' বাদলস্তম্ভ এবং গরুড়স্তম্ভ দেখা যায়। এখানের হরগৌরীর মণ্ডপে ইট কাঠ-পাথরে তৈরী উঁচু ঢিপি আছে। এই ঢিপির ওপর হরগৌরীর মন্দির, সিংহবাহিনী জয়দুর্গার মন্দির, শিবমন্দির। হরগৌরী মন্দিরের কাছে 'অমৃতকুন্ড' ও 'কোদালাধোয়া' নামে দুটি পুকুর আছে।

গরুড়স্তম্ভ বা বাদলস্তম্ভটি হরগৌরী মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত। স্তম্ভটির কিছু অংশ বজ্রাঘাতে নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলি সব পালরাজত্বের সময়কার তৈরী। প্রায় হাজার বছর আগে নারায়ণ পালের রাজত্বকালে মন্ত্রী শ্রীভট্টগুরব মিশ্র এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় এস্থান পালরাজাদের কাছে তীর্থস্বরূপ ছিল, তাঁরা এখানে এসে শান্তিজল নিতেন। গুরব মিশ্রের স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে— মহারাজ ধর্মপালের পুত্র মহারাজ দেবপাল বিন্ধ্য পর্বত থেকে হিমালয় পর্যন্ত এবং এবং পূবে সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগ অধিকার করেছিলেন। দেবপালের প্রভূত দান-ধ্যানের কথা বিভিন্ন শিলালেখ থেকে জানা যায়। দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য বিহার, মুঙ্গের, পাটনা এমনকি নালন্দায় তীর্থকুটিরও বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পাঁচটি গ্রামও বৌদ্ধভিক্ষুদের দান করেছিলেন।

ধর্মপাল ও দেবপালের সময় গৌড় মগধ বাঙলায় শিল্পজগতে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। এ-সময়কার তৈরী ধাতু ও পাথরের বিভিন্ন বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়।

গরুড়স্তম্ভ থেকে তিন মাইল দূরে টিরী বা শ্রীনদীর ধারে প্রায় এক হাজার ফুট পরিধির এক বৃত্তের স্তূপ দেখা যায়। তার কাছেই ২২৫ ফুট লম্বা আরো একটি ধ্বংসস্তূপ এবং প্রকাণ্ড বিরাট এক জলাশয় আছে। আট কোণবিশিষ্ট এক পাথরের স্তম্ভ এখানে পাওয়া যায়। সম্ভবত এখানেই পাল রাজাদের সময়কার স্মৃতিবিজড়িত

ভরত ভায়নার স্তূপ (খুলনা)

মানস' বর্ণিত প্রসিদ্ধ জগদ্দল মহাবিহার বা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এর কিছু দূরের গ্রাম দেওয়ানবাড়ী ও ধুরইল গ্রামেও বহু পুরানো দীঘি ও অট্টালিকার বহু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানের মুকুন্দপুরের হরগৌরী মন্দিরের কয়েক মাইল দক্ষিণে সিদ্ধিপুর গ্রামে ভীমসাগর নামে এক দীঘি আছে। এছাড়া ভীমের চামুন্ডা মণ্ডপ এবং ভীমের জাঙ্গাল বা রাজপথ ক্ষৌণী নায়ক ভীমের স্মৃতি বহন করছে আজও।

পাঁচবিবি—

কলকাতা থেকে ২০১ মাইল দূরে। এর খুব কাছেই মহীপুর, আটাপুর, কলনা-উচাই প্রভৃতি গ্রামে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ। এখান থেকে পাওয়া বিভিন্ন পাথরের মূর্তি বা কারুকার্য করা পাথর পালবংশীয় রাজা মহীপাল দেবের কথা অচিরেই মনে করিয়ে দেয়। মহীপুর থেকে পাওয়া এক বিরাট আকারের বোধিসত্ত্ব বা লোকনাথের মূর্তি অষ্টধাতুর চতুর্ভুজ 'শ্রী মূর্তির' গঠনশৈলী খুবই সুন্দর। বর্তমানে এগুলি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রাখা আছে। এখানে নিমাই সাহ নামে এক ফকিরের দরগায় আজও প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে, দরগার পাশে তুলসীগঙ্গা নদীতীরে পুরাতাত্ত্বিকদের মতে নিমাই সাহার দরগায় আছে আগে নাকি এক বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপ ছিল। পাঁচবিবি থেকে প্রায় ছ' মাইল দূরে বলিগ্রামেতেও বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। কিংবদন্তী এখানে নাকি বলি রাজার প্রাসাদ ও রাজধানী ছিল।

বলিগ্রামের পূবে শিলিমপুর। এই গ্রামেও আছে বহু ধ্বংসাবশেষ। শিলিমপুর থেকে কিছু দূরে মাথরাই গ্রামেও রয়েছে রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। এখান থেকে পাওয়া বড় বড় ভিজিট পাথরের থাম রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত।

হিলি—

কলকাতা থেকে ২০৭ মাইল দূরে। দেশ বিভাগের ফলে হিলি আজ দ্বিধাবিভক্ত। হিলি থেকে মাইল দুই দূরে বৈগ্রাম বা বাইগ্রামে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সোজন্যে কিছু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়। এখানে পাওয়া 'শিবের গোত্তপ' নামে এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। স্তূপটি লম্বায় নয় ফুট, চওড়ায় ৬০ ফুট ও পরিধিতে ৫৬ ফুট। এক সময় এ স্থান বন জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত ছিল। শিবমন্দিরটির কিছু দূরে শুকিয়ে যাওয়া এক পুকুর থেকে পাওয়া ৪৪৭—৪৮ খৃঃ এক তাম্রশাসন থেকে জানা যায় শিবনন্দী নামের এক ব্যক্তি, এখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এর কিছু দূরে মোজাদিবর নামে এক গ্রামে বিরাট বড় অতি প্রাচীন প্রায় দশ হাজার বছরের এক জলাশয় আছে। এই দীঘির মধ্যে আছে ৪১ ফুট উঁচু এবং ১০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট আট কোণের এক পাথরের স্তম্ভ। স্তম্ভটির ওপরের দিকে কিছু কারুকার্য করা স্তম্ভটি কৈবর্ত বিদ্রোহে বিজয়ী মহারাজ দিব্যোর বিজয়স্তম্ভ।

হিলি থেকে ১৮ মাইল দূরে করতোয়া নদীতীরে ঘোড়াঘাট। কাটাদুয়ারের রাজা নীলাম্বর যখন ঘোড়াঘাটের অধিপতি, তাঁর সময়ের তৈরী অরণ্য পরিবেষ্টিত এক মহাদুর্গ ছিল এখানে। পরবর্তীকালে নসরত শাহের সেনাপতি এবং প্রসিদ্ধ ইসলাম ধর্ম-প্রচারক গাজী ইসমাইল নীলাম্বরকে পরাস্ত করে দুর্গটি অধিকার করে। তখন এটির নাম হয় 'অসরতাবাদ'। ঘোড়াঘাটের দুর্গবিজয়ী গাজী ইসমাইলের সমাধি এখানের দ্রষ্টব্য বস্তু।

পশ্চিম বাংলার বালুরঘাট সীমান্তের এপারে মহীসন্তোষ গ্রামে রয়েছে মহারাজ মহীপাল দেবের সন্তোষ সম্প্রদায়ের প্রমোদ উদ্যান এবং ধ্বংসাবশেষ। সেই থেকেই এ গ্রামের নাম মহীসন্তোষ। এই ধ্বংসস্তূপে ও স্থানীয় দু-একটি প্রাচীন মন্দিরের গায়ে এখনও বহু অপরূপ পোড়ামাটি কাজের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। মুসলমান যুগে এই সব পুরাকীর্তি ও মন্দির থেকে সংগৃহীত বহু প্রাচীন প্রতিমা ও মূর্তি খুলে নিয়ে অন্যত্র লাগানো হয়েছে। স্থানীয় এক পুরাকীর্তির সংগ্রহশালায় থেকে এমন এক অপরূপ প্রতিমা সংগ্রহ করে নরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি তাঁদের সংগ্রহশালায় রেখেছেন।

আগামী দিনের পরিবার

শিশির নিয়োগী

আমি একটি পরিকল্পনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেও, পরিবার পরিকল্পনাটা আমার আওতার বাইরে। পরিকল্পক হিসাবে পরিবার বলতে আমি বুঝি কয়েকটি সংখ্যা। ২০০১ খৃষ্টাব্দও যেমন একটি সংখ্যা তেমনিই আমার হিসাবপত্র, আসলে ঐ ২০০১ সালে বৃহত্তর কলকাতা শহরে কত লোক বাস করবে, তাদের জন্যে দৈনিক কত গ্যালন জল দিতে হবে, ক' হাজার ফুট রাস্তার দরকার হবে তাদের চলাফেরা করবার জন্যে এইসব আর কী!

ভবিষ্যতের জন্যে কার না ভাবনা হয়? যতদিন বাবা মা ভাইবোন নিয়ে মানুষ সংসার করে, অতীত আর বর্তমান নিয়ে সে থাকে বিভোর। অন্য বাড়ীর একটি মেয়ে এসে তাকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবায়। বাপ-মা দিনরাত বকাবকি করেও যে ছেলেকে ভবিষ্যতের চিন্তায় বাঁধতে পারেন না, একটি অপরিচিতা তরুণী এসে সেই ছেলেকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়।

ভবিষ্যৎ জিনিসটাকে দু-ভাবে ভাবা যায়। একটা হোল ফিজিক্যাল দিক। যে দিকটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কূল-কিনারা করতে না পেরে ভারত সরকার 'নিরোধ'ক পন্থা অবলম্বন করেছেন। যদি কেউ বলে পরিবার পরিকল্পনার নীতি হল প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে এঁটে না উঠতে পেরে নিজের নাক কেটে শত্রুর যাত্রা ভঙ্গ করার সামিল— তাহলে কি সে অন্যায় বলবে? আসলে 'বিজ্ঞান' 'বিজ্ঞান' চিৎকার করে যাই বলি না কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমরা কিন্তু হেরে গেছি।...জনসংখ্যা বিশারদদের একাংশ বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন আমরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে যতো অগ্রতাড়িই এগুই না কেন, প্রকৃতি তার থেকেও অনেক দ্রুতবেগে আমাদেরকে বিপদে ফেলবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। মানুষ তাই পরিবার-পরিকল্পনার নামে অন্য স্ট্র্যাটেজী ধরেছে। প্রকৃতিদেবীও কম চালাক নন। মানুষ-যুগ শুরু হবার আগে কম করে কয়েক লক্ষ প্রাণী নিয়ে প্রকৃতিদেবী জন্মপ্রলয়ের খেলা খেলেছেন। আর প্রতিবারই একই নিয়মে প্রাণীগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরদিনের মতো। মানুষ চিরজীবী হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। বুদ্ধির কৌশলে প্রকৃতিদেবীকে ফাঁকী দিতে চাইছে। জানি না কতদিন আর এই জারি-জুরী খাটবে।

তবে এটা যদি মেনে নেয়া যায় মানুষের জন্মের হার খুব একটা কমবে না আগামী একশো বছরেও, তাহলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর জনসংখ্যা এতো বেড়ে যাবে যে রাস্তাঘাটে যানবাহন চলবার জায়গা থাকবে না। অফিস টাইমে শিয়ালদা আর ডালহৌসী স্কোয়ারের মধ্যেকার রাস্তাটা যেমন দিনকে দিন ট্রাম বাস ট্যাক্সির ভিড়কে ছাড়িয়ে পদযাত্রীর ভিড়ে ভিড়ময় হয়ে উঠছে, তেমনি দশা হবে পৃথিবীর সব রাস্তাঘাটের। গাড়ী ঘোড়া চলতে পারবে না রাস্তায়। কেবল মানুষ আর মানুষ!

...আর আরও কিছুদিন বাদে, আমরা সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকবার জায়গাটুকু মাত্র পাবো। বসবার জায়গাটা পর্যন্ত পাবো না। অফিস টাইমে বাসে বা ট্রামে যেমন দশা হয়। সবাই উদ্বাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন গন্তব্যস্থলটি আসার অপেক্ষায়।

পকেট থেকে মানিব্যাগটি টুপ করে গলিয়ে পড়ে গেলেও মাথা নিচু করে খুঁজিয়ে দেখার উপায় নেই—গাড়াগাদের চোটে সভাধিনায়ী ভূত জাগিয়ে দেবে।...অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন দিনরাত দাঁড়িয়ে থাকবো কেমন করে? উত্তর খুব সহজ। অভ্যাসে সবই সম্ভব। পরম্পরাক্রমে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালোবাসে। কথায় বলে 'ঘোড়া শোয় একবার', অর্থাৎ মারা যাবার আগে। মানুষের পক্ষেও প্রযোজ্য হবে প্রবাদটি।

তবে প্রশ্ন সেদিনও কি আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবনা থাকবে? সেদিনও কি বোলব ভবিষ্যতে আরও খারাপ দিন আসছে যেমন আমরা এখন বলি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা সেদিনও কি পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে...সরকারকে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হবে পাবলিসিটির জন্য?

আমাদের দেশে মাত্র কিছুদিন আগেও ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে ট্যাক্সের তারতম্য ছিলো। অবিবাহিতদের খরচ খরচা কম—সুতরাং তাদেরকে বেশী আয়কর দিতে হবে। কিন্তু দেশ যতোই এগুতে শুরু কোরল দেখা গেল অবিবাহিতদের খরচ কম নয়—কোনও মতেই। আর আমরা যতোই ওয়েস্টার-নাইজড হতে শুরু করলাম বুঝতে লাগলাম, গোয়ালাবাড়ী গিয়ে রোজরোজ জলমেশানো দুধ কেনার থেকে গরু পোষার আলটিমেট কস্ট অনেক কম। তবে দেশী গাই কিনবেন না মুলতানী কিনবেন সেটা আপনার রুচি ও চাহিদার ওপর নির্ভর করবে।

মানুষ যখন অন্যান্য সব চিন্তা-ভাবনায় অনেক অনেক দূরে এগিয়ে গেছে তখন এই একটা বাসি পুরানো তত্ত্বকে জীবনের পরম সত্য বলে মেনে নেবার মতো ব্যাকগিয়ার দেবার ফলে গোটা জগৎটা যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। প্রাচীন যুগে মানুষেরা পরিবার বৎসল হতো। ক্রমে ক্রমে মানুষ বিশেষ করে পুরুষেরা পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পড়তে লাগলো। কাজকর্ম ও দৈনন্দিন রুজি-রোজগারের ধান্দা ছাড়াও, বিলাস-ব্যসনে ও বদমায়েশীতে মত্ত হবার ধান্দায় মানুষ পরিবারবর্গ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে লাগলো। নিজের ঘরের গৃহিণী যে 'কায়দা কানুন' জানতো না, বাইরের মেয়েরা জানতো—ফলে বাইরের মেয়েরা হোত নিশসঙ্গিনী।

আরও কতো ধাপ এগিয়ে যেতো মানুষ জানি না। কিন্তু হঠাৎ এলো বিশ্ব-বিপ্লবের ঢেউ। আর এই বিপ্লবটা মুখ্যত অর্থনৈতিক। মানুষ বুঝতে পারলো... মানুষের সব নীতির চেয়ে বড়ো হল অর্থ-নীতি। গোটা পৃথিবীর মানুষ হোল প্রতিটি মানুষের প্রতিবেশী। আর আত্মীয় পরিজন? তাঁরা রইলেন দিনের তারার মতো, মাত্র আইনের সংবেদী রইলো তাঁদের সঙ্গে... উৎসবে ব্যসনে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁদেরকে দেখতে পাবো এমন আশা আজ-কাল করি না। বিশেষ করে বর্তমান কালের রাজনৈতিক অরাজকতা আমাদেরকে আরও আত্মকেন্দ্রিক হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। ট্রাম বাসে প্রায়ই বলতে শুনি 'না ভাই তোমাকে আমার এখানে আসতে বলবো না। তোমার ওখানে আমি একদিনও যেতে পারি না, তোমাকে আসতে বোলব কোন্ মুখে?' আন্তরিকতার ধারা দেখুন একবার!

আমাদের ভবিষ্যতের দার্শনিক দিকটা কি তার কিছু আভাষ এর আগেই দেয়া হয়ে গেল। আসলে ভবিষ্যতের দার্শনিক দিকটা মানুষ ইচ্ছে করেই অদৃশ্য রেখেছে। তাছাড়া সরকার পক্ষ থেকেও নানান রকম স্কীম চালু করে ভবিষ্যৎটাকে আরও রহস্যময় করে তোলা হয়েছে। আমাদের ছোট-বেলায় এসেছিল বিশ্বযুদ্ধ। হিটলার জিতলে কি পেতাম জানি না—ইংরেজ যুদ্ধ জিতেও স্বাধীনতা দিলো না ভারতবাসীকে—দিলো সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেশ-ময়। আমরা সংখ্যালঘুরা বেরিয়ে আসতে চাইলাম সংখ্যাগুরুর গুরুভার থেকে। কিন্তু কিভাবে বেরিয়ে আসবো জানতাম না—যখন জানলাম ও উপলব্ধি করলাম তখন ইট ইজ টু লেট। আজও সরকার বলছেন সাধারণমানুষের ভাগ্যের মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্যে লাইফ ইন্সিওরেন্স খুলেছি—প্রতি রাজ্যে লটারীর টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করেছি। স্বল্পজীবী হলে ইনসিওরেন্সের মোটা টাকা পাবে, আর দীর্ঘজীবী হলে সারা জীবন লটারীর টিকিট কেটে যাও ভবিষ্যতের আশায়।

এককালে সমাজবিদেরা মনে করতেন মানুষ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞতার মোহে যেভাবে জড়িয়ে পড়ছে তাতে একদিন হয়তো এমন আসবে যে তার কাছে নিজের আপনজন বলতে কেউ থাকবে না— সবই মেকানাইজড রিলেশনে পরিণত হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য তা হল না। বরং উল্টোটা হয়ে এলো খুব তাড়াতাড়িতে।

আমরা ছোটবেলায় দেখেছি—বাড়ীতে ঠাকুর্দার কী প্রতাপ। ঠাকুর্দা একবার রেগে গেলে বাড়ীর সবাই চুপ। ঠাকুরমা পর্যন্ত মাথায় ঘোমটাটি টেনে দিয়ে চুপচাপ রান্না-ঘরের কজে মন দিতেন। কখনও বা কাকারা চটে গিয়ে অগ্নিবর্ষণ করতেন ঠাকুরমার ওপর। আড়ালে আবডালে ঠাকুরদার বিরুদ্ধেও তাঁদের নালিশ সোচ্চার হয়ে উঠতো। ঠাকুরমাকেও দেখেছি বহু দিন রেগে মেগে কান্নাকাটি করে বাড়ী মাথায় করে তুলতে। ঠাকুরদা সেদিন চুপ। বাজার থেকে বড়ো মাছ কিনে আনতেন। খাবার পাতে ফেলে যেতেন বড়ো মাছের ল্যাজার প্রায় গোটাটাই—উদ্দেশ্য ঠাকুরমার মান-ভঞ্জন।

এর পরবর্তী যুগে এলো মানভঞ্জনের পালা নয়, স্রেফ কাট অফ অর্থাৎ মতের অমিল হলে ডাইভোর্স করো। ডাইভোর্স আমল চললো কিছুদিন। কিন্তু দেখা গেল দাম্পত্য সুখ জিইয়ে রাখার ব্যাপারে ডাই-ভোর্সটা কোনও মেথডই নয়। নতুন জায়গায় বিয়ে করে তারা যে ফ্রাইং প্যান থেকে ফায়ারে পড়বেন না এই গ্যারান্টি কে দিতে পারে?

প্রতিটি মানুষেই তার মেজাজ দেখাবার জন্যে একটা জায়গা চায়। আগের দিনে অফিসে সাহেবের মেজাজ চড়া দেখলে সবাই বুঝে নিতো, বাড়ীতে গিন্নীর সঙ্গে নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে—দিনটা কেপচুরিয়াস হয়েই কাটবে সাহেবের। সুতরাং অফিসের সবাই এটা বুঝে নিয়ে মাথা নিচু করে থাকতো। সাহেব রাগের বশে যা তা কিছু বলে দিলেও ভেতরে এসে সবাই হাসাহাসি করত—গায়ে মাখতো না কথা।...কিন্তু আজকাল দিন পালটে গেছে। সবারই বক্তব্য 'বাড়ীতে তোমার কি হয়েছে না হয়েছে এ দিয়ে আমাদের কি? অফিসে এসেছো যখন মেজাজ ঠাণ্ডা করে চলতে তুমি বাধ্য। মেজাজ খারাপ করলে মেরাও হয়ে যাবে।'... এই ধরনের ঝাক্ত খেয়ে সবাই ক্রমে ক্রমে বুঝতে পেরেছে বাইরের দুনিয়াটা ক্রমেই কঠিন হয়ে আসছে।...কিন্তু মানুষের রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ এ সবকিছু প্রকাশের জায়গা চাই তো একটা! এতো গবেষণা করেও নিজের স্ত্রীপুত্র কন্যা পরিজনের চেয়ে আর সুটেবল জায়গা খুঁজে পায় নি মানুষ এতদিনেও। এখানে রাগ দেখালে সেই রাগ প্রতিহত হয়ে এলেও তার ঝাঁজ কম— প্রাণান্তকর নয় নিশ্চয়ই। কারণ পরিবারের সবারই যে একই অবস্থা—ঠেকে ঠেকে সবাই শিখেছে যে।

আগের দিনে আমাদের দেশে মহিলারা পরিবারের বাইরে কর্মক্ষেত্রে যেতেন না বেশী। ফলে পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে বহির্জগতের স্ট্রেস ও স্ট্রেন সম্বন্ধে পারস্পরিক অজ্ঞতা ছিল। বিশেষ করে মহিলারা বুঝতেন না অফিসে গিয়ে একজন কেরানী-বাবু বড়ো সাহেবের মুখ ঝামটা খেলে তাঁর সারা দিনটা কেমন ভাবে কাটে, আবার একজন অফিসার তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলে তাঁরও মনের দশা কি হয়। আজ আমাদের মহিলারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন। পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যেকার বোঝাপড়ার আন্তরিক অনুভূতিটা বাড়ছে। আর ঐ অনুভূতিটা বাড়ছে বলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে যে ছোট্ট পরিবার তার অপরিহার্যতাটাও দিন দিন বাড়ছে মানুষের কাছে। মানুষ যদি তার পরিবারটাকে নিজের মতবাদ বা ক্ষোভ প্রকাশের স্বেচ্ছাচারী আস্তানা মনে না করে পারস্পরিক সুখ-দুঃখ অনুভূতির মিলন-ক্ষেত্র মনে করতে পারে তবেই সত্যিকারের সুখী পরিবার গড়ে ওঠা সম্ভব। এক কথায় সবাইকে পরস্পরের ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। আন্তরিক বা 'ইনটিমেসি' কথাটার আদি অর্থ হল 'ভয়'। অর্থাৎ আমি তখনই তোমার সঙ্গে ইনটিমেট হতে পারবো যখন তোমার 'ভয়'কে আমি আমার বলে অনুভব করতে পারবো। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, মহা-মারীর কবলে কিংবা প্রাকৃতিক সময়ে চাকরী চলে যেতে পারে এই অবস্থায় পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাইবোন এদের জন্যে ছাড়া

আর কার জন্যে এতো উৎকণ্ঠা হয়? এই উৎকণ্ঠার সমভাগী হবার জন্যে নানান সময়ে নানান ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যুদ্ধের সময়ে মিলিটারীর লোক এসে আমাদেরকে পাহারা দেয়, মহামারীর সময়ে কর্পোরেশন বা স্বাস্থ্যবিভাগের লোকে ভ্যাকসিন দিতে আসে, স্ট্রাইকের সময়ে নেতারা চাঁদা তুলবার জন্যে কর্মীদের কাজে লাগান। কিন্তু আতঙ্কজনিত চিন্তাদুশ্চিন্তাব্যাপী যে দুর্ভাবনা এর অংশীদার হতে কি পারেন তাঁরা কেউ? কখনোই নয়।

এই দুনিয়ায় শিল্প বিপ্লবের যুগে সর্বত্রই সাম্যবাদী ছায়া। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস, ট্রাম বাস; সবখানেই ম্যাস প্রোডাকশনের ছাপ। সবকিছুকেই ক্রমে ক্রমে স্ট্যান্ডার্ড করে ফেলা হচ্ছে। ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ শুরু হলে জমির ছোট ছোট এবড়ো খেবড়ো আলগুলো সব ভেঙ্গে দিতে হবে। সব জমির চেহারা হবে একরকম। মানুষ সত্যিই একদিন বিরক্ত হয়ে উঠবে এই একই ধাঁচ দেখে দেখে। ...সে তখন বাড়ীতে যাবার জন্যে উদগ্রীব হবে। কারণ সে জায়গাটা একেবারে আলাদা। নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে তৈরী তার সংসারের জুড়ি নেই কোথাও। পুরোপুরি নিজস্বতা সেখানে। আমার পরিবারের কেউ অন্য এক পরিবারের লোকের মতো একই ধরনে কথা বলে না।...আমার এই বৈশিষ্ট্য আমায় অসীম তৃপ্তি দেয়।

আমার পরিবারের সবাই আমরা এক সূত্রে গাঁথা। আমাদের একজনের কিছু হলে অন্যকেও বিহ্বল করে। আমি জানি আমার মানসিক অশান্তির প্রকাশ আমার ছেলে-মেয়েকে ব্যথিত করে। আমি চুপ করে যাই। আমার এক বন্ধুর স্ত্রী সম্বন্ধে বন্ধুটির নানান অভিযোগ। জানি আসলে স্ত্রী সম্বন্ধে তার যে অভিযোগ সেটা সে পরিষ্কার ক'রে বলতে চায় না—সে ড্রিংক করে।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায়নি, এমন সব কৌশলও করেছে যাতে করে আমরা অন্যের ওপর নানান ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। আজকালকার ডাক্তারেরা চিকিৎসার পদ্ধতি পাল্টেছেন। আধুনিক হাসপাতালে তো সারা পরিবারের ইতিহাস কম্পিউটারের কার্ডে পাঞ্চ করা থাকে পরিবারের কারও শরীর খারাপ হলে বা তার দেহে কোনও রোগের প্রকাশ পেলে কম্পিউটার বলে দেবে এই অসুখের সঙ্গে পরিবারের অন্য কার কি সম্পর্ক। অর্থাৎ পরিবারের কারও শরীর খারাপ হলে অন্য সব সদস্যরাও রেহাই পাবেন না—তাঁদেরও পরীক্ষা হয়ে যাবে সাথে সাথে। ফলে পরিবারের একজন আর সবার ওপরেও নির্ভরশীল।

আধুনিক যুগে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জটিলতাকে কমাবার জন্যে সংসারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং অবসরপ্রাপ্ত মানুষদের আলাদাভাবে বসবাস করবার জন্যে 'অবসর-গৃহ' তৈরী করা হচ্ছে। ফলে বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের দেখাশোনার ভার সরকারের কাঁধে এসে পড়ছে। কিন্তু এতে সংসারের কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা কিন্তু পুরোপুরি কর্তব্যহীন হতে পারছে না—এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ব্যাপারে। বরং হাসপাতালে রোগী থাকলে যেমন তাকে দেখে আসবার দায়িত্ব পরিবারের সবার ওপর পড়ে তেমনি এই অবসর-গৃহের আত্মীয়দের মাঝে মাঝে দেখে আসবার ভার পড়ছে নিকট আত্মীয়দের ওপর। ফলে বিভিন্ন অবসর-গৃহে বসবাসকারী বৃদ্ধ পিতা বা শ্বশুরমশাই ও মাতা বা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখে আসতে ও তাদের অসুখবিসুখের সময়ে বাড়ীতে যত্ন নিতে যে সময় দিতে হয় সেটা মোটেই কম নয়। বিশেষ করে বড়ো বড়ো শহরের যানবাহনের যে অবস্থা তাতে 'অবসর গৃহে' বয়স্ক আত্মীয়দের পাঠিয়ে সমস্যা বেড়েছেই অনেকের পক্ষে। কিন্তু 'অবসর গৃহ' ব্যাপারটা চালু হয়ে যাবার সংগে সংগে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের মনে অবসর গৃহে বাস করাটা 'কাশীবাস' করার মতোই কাম্য হয়ে উঠছে অনেকের কাছে।

আরও একটা অপ্রিয় সত্য ব্যাপার বিজ্ঞানীরা ঘটিয়েছেন প্রতি পরিবারে সেটা হল, আগেকার দিনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁদের সন্তান সন্ততিদের সংগে এক ঘরে এক বাড়ীতে থাকতেন বটে, কিন্তু সব সময় যে সব রোগ তাঁদের চিকিৎসিত হ'ত তা নয়। বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ক্যানসার রোগ বহুদিন পর্যন্ত অন্য অসুখ ভেবে চালিয়ে দেওয়া হত, ডায়াবেটিসকে মারাত্মক রোগ বলে গণ্য হ'ত রোগী মারা যাবার পর—আর ব্লাড-প্রেসার ধরা পড়ত রোগী মাথা ঘুরে নদীর ঘাটে মটকে পড়লে। সুতরাং গুরুজনের গঞ্জনা আগেকার দিনে বেশী থাকলেও সইতে হোত না বেশীদিন কাউকেও। বরং চিকিৎসা শাস্ত্রের কল্যাণে অবসর-ভবনে গিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দীর্ঘজীবন যাপন করছেন এবং সময়মত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁদেরকে, অবসর-ভবনে রোগীসেবার ভালো ব্যবস্থা থাকে না বলেই। আর বৃদ্ধ বয়সে শরীর খারাপ হওয়াটা খানিকটা সংক্রামকও বটে।

আজকালকার দিনে বাবা-মাকে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অনেক বেশী গতর লাগাতে হচ্ছে। আগের দিনে শিক্ষা জিনিসটা ছিল স্কুলের মাষ্টারদের ব্যাপার—আর স্বাস্থ্য, সেটা পাড়ার ডাক্তারের দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ দিনের স্কুল ও কলেজে পড়াশুনার সাপ্তাহিক প্রগ্রেস-রিপোর্টের সঙ্গে থাকবে ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট। বাবা-মাকে ঐ নির্দেশমত বাচ্চাদের নিয়ে ছুটতে হবে বিভিন্ন স্পেশালিস্টদের কাছে এবং সেটা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই। আর মাঝে মধ্যে রয়েছে ভ্যাকসিনেশান দেবার প্রোগ্রাম—বছরে কম ক'রে ডজনখানেক। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ফরম আর আবেদনপত্র ভর্তি করতে করতে বাপ-মায়ের হাতের আঙুলে কড়া পড়বে। আর বাচ্চাদের কিছু হয়েছে বা খারাপ কিছু হতে পারে এই রিপোর্ট পেলে কোন্ বাপ-মা না ছুটে পারবে? আর এই ছোটাছুটি করতে করতে বাপ-মা ভুলে যাবেন তাঁদের গতদিনকার ঝগড়াঝাঁটি আর মনোমালিন্যের কারণগুলো—অন্য সুস্থ সময় হ'লে এগুলোই হয়তো ডাইভোর্স সুট ফাইল করার ব্যাপারে সাফিসিয়েন্ট ইন্ধন যোগাতো।

তাই বলছি ভবিষ্যৎ দিনের একটা পরিবারের কথা ভাবুন যাদের তিন সন্তান স্কুলে যায়, বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতা অবসর-নিকেতনে আছেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরীরত। ভোর থেকে সন্তানদের স্কুলের জন্য প্রস্তুতি, দুপুরে অফিস, বিকেলে মাঝে-মধ্যে অবসর নিকেতনে গিয়ে গুরুজনদের দেখে আসা, অন্য দিনগুলো বাচ্চাদের নিয়ে স্পেশালিস্ট দেখানো, রাত্রে বাচ্চাদের স্কুলের প্রোগ্রেস ও হেলথ রিপোর্ট দেখে দেখে তার উত্তর লেখা, নির্দেশ মতো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৈরী হওয়া। এর পরেও রয়েছে ইনকাম ট্যাক্স স্টেটমেন্ট তৈরী করে দেয়া—এটা স্বামী-স্ত্রী দুজনে ঠান্ডা মাথায় একসংগে না বসলে হবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে সরকারী সমাজ-সেবিকারা আসবেন উপদেশ দিতে, তাঁরাও স্বামী-স্ত্রীকে পাশাপাশি বসিয়ে প্রশ্ন করতে চান বিভিন্ন বিষয়ে—তাঁদের কাছেও মাথা গরম করবার উপায় নেই। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা আইসক্রিম খাওয়াতে হবে তাঁদেরকে। এর ফলে সকাল থেকে রাত অবধি স্বামী স্ত্রী দুজনকেই মাথায় বরফ চাপা দিয়ে কাজ করে যেতে হবে—উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। কিভাবে আরও কম সময়ে আরও বেশী কাজ করা যায়। ফলে অসুবিধা হবে তাঁদেরই যাঁরা অবসর সময়ে পরচর্চা করতেন। কিন্তু হায়, সে আর বা করবেন কার সংগে বসে—সবাই স্বামী-পুত্র-স্ত্রী-কন্যা নিয়ে নিজ... আগামী দিনের পরিবার একটা সনাতন পরিগ্রহ করবে......একদিকে তাদের পারিবারিক জাতীয় কর্তব্য, আর অন্যদিকে স্ব-স্বাতন্ত্র্যের সুদৃঢ় বন্ধন।

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'আচ্ছা, সজলদা, আপনি এত রোগা হয়ে গেছেন কেন?'

সজল ভয় পাচ্ছিল। হেসে বলল, 'রোগা? কোথায় আমাকে রোগা দেখছ?'

'কোথায় দেখছি? মুখ চোখ একেবারে বসে গেছে? চোখের কোলে কালো—'

'তুমি চশমা নাও। চোখ খারাপ হয়ে গেছে তোমার?' সজল ঠাট্টার সুরে বলল।

কিন্তু হাসিটা সজলের নিজের কানেই কেমন লাগছিল। কান্নার মত লাগছিল।

শুচিতা বলল, 'দেখি চায়ের জলটা বোধহয় ফুটে এল!'

চা খেতে খেতে দুজনে গল্প করছিল। সজল বলল, 'এটা কোন ক্লাশ তোমার?'

'ক্লাশ এইট।'

'সাংস্কৃট ভালো লাগে?'

শুচিতা বলল, 'না'।

'কেন লাগে না? মুখস্থ করতে হয় কেবল। দেখবে অনেক নম্বর পাবে।'

শুচিতা মুখ বেঁকিয়ে বলল—'মুখস্থ করতে পারব না, বাপু। ওসব হয় না আমার'।

সজল বলল, 'হওয়ালেই হবে।' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিশ্বময়ের আসতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা'।

শুচিতা সুন্দর করে বলল, 'কেন খারাপ লাগছে বুঝি?'

'না, না।' আচ্ছা, একটা গান শোনাও না গুণগুণ করে। সময়টা বেশ কেটে যাবে'।

'আমি গান জানি নাকি?' শুচিতা মুখ নিচু করে বলল।

'কেন, ঐ যে সেদিন ওঘর থেকে গাইছিলে।

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।—অনেক বলার পর শুচিতা গাইছিল।'

সজল কান পেতে শুনছিল, যেন কথার বা সুরের একটিও কোন ভগ্নাংশ শ্রুতির বাইরে চলে না যায়! কথা নয়, এ যে মন্ত্র!

শুচিতার মিষ্টি খোলা গলায় শুরু হয়ে পড়ছিল, 'নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ—সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে'।

সজল স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একি! এ যে তার মনের কথা! দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, বিরহ আছে, এবং এ-সত্ত্বেও আছে আনন্দ, আছে শান্তি। মনে তবু অনন্তের স্পর্শ বাজে! কথাগুলি মনে মনে আবৃত্তি করতেই চোখ ছলছল করে ওঠে কেন!

সজল বলল, 'আর একবার গোড়া থেকে গাও তো?'

শুচিতা কেবল অবাক হয়ে সজলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আর একটা গান। মিনু।'

শুচিতা অবাক হয়ে বলে উঠল, 'ওমা মিনু আবার কোত্থেকে এল? আমার নাম বুঝি মিনু?'

সজল বুঝতে পারেনি, কখন ও নামটা মুখ থেকে এতদিন পরে বেরিয়ে গেছে। বলল, 'ভুল হয়ে গেছে। তা হোক, আর একটা গাও।'

শুচিতা বলল, 'বেশি গান জানি না, সজলদা। এইতো সবে শিখছি।'

সজল শুনছে, কে যেন সন্ধ্যাবেলা দূরের কোন নির্জন মন্দিরে পুজো করছে। জীবনে অসীমের স্পর্শ পেলে মৃত্যু, বিচ্ছেদ কোথাও কোন বেদনার ছায়া ফেলে না। অসীম, অর্থাৎ ভূমা। উপনিষদ বলছেন 'আমি অধোভাগে, আমি ঊর্ধ্বে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, উত্তরে দক্ষিণে আমি সর্বত্র। ভূমার সঙ্গে আমি একাত্ম'।

অনেকক্ষণ সজল যেন এ ঘরের মধ্যে ছিল না। এ ঘরে যে সকালের এতো রোদ এসে পড়েছে, এ-ঘর থেকে যে আকাশের স্তব্ধ নীলিমার বেশ কিছুটা অংশ চোখে পড়ে সজল এসব কিছু দেখেনি। সে এক ধ্যানমগ্ন পূজারী, পূজার মন্ত্র নিবিড় একাগ্রতায় অন্তরে অন্তরে উচ্চারণ করে চলেছে।

শুচিতা এক সময় বলল, 'সজলদা, মিনু কে?'

সজলের এখন কোন দুঃখ নাই, বেদনা নাই। যেন সজল এক মুক্ত আত্মা, যেন সজল এক নির্বাণ-দীপ্ত পুরুষ! সুখ-দুঃখের অতীত এক মহৎ জীবনের অধিকারী।

'এই নামে আমার একটা ছোট বোন ছিল।'

'ছিল মানে?' শুচিতা দুটি স্তব্ধ চোখ মেলে সজলের মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে রইল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছিল। বোধহয় বিশ্বময় আসছে!

(১৪)

আজ শনিবার, দেড়টায় অফিস ছুটি হয়ে যাবে। তাই সজল বেয়ারাকে স্লিপটা নিয়ে যেতে বার বার অনুরোধ করছিল।

কিন্তু লোকটি সিমেন্টের বস্তার মত বসে রইল তো রইলই। এদিকে অফিস ছুটির আর বেশি দেরি নেই।

শেষ পর্যন্ত সজল বলল, 'সাহেবের এক পরিচিত ভদ্রলোক ওঁকে এই চিঠিটা দিয়েছেন। এইটা যদি দিয়ে এসো'।

চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেয়ারা চিঠিটা দিয়ে এল।

সজল বসে বসে অফিসটা দেখছিল। প্রকাণ্ড টিনের শেড। লোকজন প্রচুর। কিন্তু কাজকর্ম কেউই করছে না।

দু'এক মিনিটের মধ্যে কলিং বেলটা বেজে উঠল।

বেয়ারা ফিরে এসে বিগলিত হয়ে বলল, 'যান, সাব ডাকছেন।'

মিঃ সি এস মুখার্জির টেবিলে বিশ্বময়ের খোলা চিঠিটা পড়ে আছে। 'বোসো। ইন্টারভ্যু করে দিয়েছিলে?'

সজল বলল, 'মাস পাঁচেক হোলো। আমি স্যার সিলেক্টেড হয়েছিলাম বলে শুনেছি'।

'আচ্ছা'। আবার কলিং বেলটা বাজল।

একটু পরে বড়বাবু এসে হাজির। প্রায় হন্তদন্ত হয়ে। সজল অনেকদিন আগে এঁর কাছেই এসেছিল একবার।

মিঃ মুখার্জি বললেন, 'দেখুন তো সজল ভট্টাচার্য নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার যায় নি কেন। —আচ্ছা, ফাইলটা নিয়ে আসুন'।

বড়বাবু ফাইলটা নিয়ে এলেন।

মিঃ মুখার্জি ফাইলটা দেখছিলেন। একি! ইন্টারভ্যুতে এ যে 'টেনথ' হয়েছিল। অথচ ত্রিশজন পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে গেছে। কি ব্যাপার?'

বড়বাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন। মিঃ মুখার্জি ফাইলটা বন্ধ করে বললেন, 'আজই লেটার ইস্যু করে দিন। হাতে হাতে নিয়ে যাক। আমি 'অ্যাপয়েন্টফাই' করে দিচ্ছি।'

একটা প্রবল উত্তেজনায় সজলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছিল তার। তার চাকরী হয়ে গেল। সে কি স্বপ্ন দেখছে! সে কি কথাটা সত্যি শুনেছে! এতো বড় সৌভাগ্য তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সজল আর ভাবতে পারছে না। মিঃ মুখার্জিকে কি বলে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবে, সজল ভেবে পাচ্ছে না।

মিঃ মুখার্জি বললেন, 'বিশ্বময় কি করছে এখন?'

উত্তর দিতে গিয়ে সজলের গলাটা কেঁপে উঠল, 'রাজনীতি'।

'তাতো করবেই। আর কি করবে! একদিন দেখা করতে বলবে তো।' —হ্যাঁ আজ আর জয়েন করা হবে না। সোমবার থেকে এসো।'

সজল উঠে দাঁড়ালো। নমস্কার করে বলল, 'আমার কী যে উপকার হোলো, স্যার'।

গভীর কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে সজলের গলা ধরে এলো।

সজলের দিকে চেয়ে মিঃ মুখার্জি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে'।

ধমকটা বড়বাবুই দিলেন। 'যতসব ঝামেলা আপনাদের এই শনিবার দেখে দেখে'।

সজল বিনীতভাবে বলল, 'আমি তো এত খবর জানতাম না। উনিই চিঠিটা নিয়ে যেতে বললেন'।

একটি টাইপিস্ট মেয়ে চিঠিটা টাইপ করে এনে দিল। বড়বাবু নিয়ে ছুটলেন সই করিয়ে আনতে।

অফিস ছুটি হয়ে গেছে। হাজার হাজার লোক পিল পিল করে বাইরে যাচ্ছে। সজলও ওদের সঙ্গে যাচ্ছিল। এই ভীড়টাও তার কাছে আজ আনন্দের, গর্বের। সেও আজ থেকে এদের মত সরকারী কর্মচারী।

যেতে যেতে পিছন ফিরে একবার বাড়ীটার দিকে তাকাল।

দোতলার ওপরে 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়ছে।

বিশ্বময় বলেছে, এই ইউনিয়ন জ্যাকের দিন চলে যাচ্ছে। ওর জায়গায় স্বাধীন ভারতবর্ষের তিন রঙা পতাকা উড়বে। দু'শ বছরের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এই অবিশ্বাস্য কথাটা মনে এলেই সজলের কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়।

চাকরীর খবরটা অরুণাকে আজই দিতে হবে। কী খুশি হবে সে!

করুণা বোধহয় সেইমাত্র অফিস থেকে ফিরেছে। শাড়ীটা আলতোভাবে পরা। অতৃপ্ত জীবনের কালি-পড়া মুখে ঘন পাউডারের প্রলেপ। একগাল হেসে বলল, 'এদ্দিন কোথায় ডুব দিয়েছিলে? আরে বোসো বোসো।'

করুণা সজলের হাত ধরে তার বিছানায় বসাতে চাইল। এমন অতিরিক্ত অভ্যর্থনা পাবে—সজল ভাবতে পারছিল না।

'তারপর, কি ব্যাপার? অরুণার খোঁজে বোধহয়'?

সজল হাসল।

'অরুণাকে কেমন লাগে তোমার? সঙ্গে নিয়ে সিনেমা টিনেমা রেস্তোরাঁয় গেছ? —কি কথা বলছ না যে?'

সজল অবাক হয়ে করুণার কালো মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সাজগোজ নেই বলেই বোঝা যাচ্ছিল, করুণাদির বয়েস অনেক। আজকের তাকানোটাও কেমন বিশ্রী। গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

সজল যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অরুণা কখন ফিরবে?'

ও স্কুলে গান শিখতে গেছে। তা এর মধ্যেই উঠলে। কেন? ভালো লাগছে না?'

সজল দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কাজ আছে।'

ঘরে এখন অন্ধকার। করুণা আলো জ্বালেনি। ওকে এগিয়ে দিতে এসে, কিভাবে মুখটা সজলের মুখের খুব কাছে নিয়ে এল। যেন ছুঁয়ে যাবে। বাঁ হাতটা এখন সজলের কাঁধে। করুণার দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

সজলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি করুণাকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে কপাট খুলে বাইরে পথে নেমে এল।

এতক্ষণ সজল সহজ হল একটু। গায়ে কেন যেন ঘাম দিচ্ছিল।

কিন্তু স্কুলটা জনমানবহীন, অন্ধকার। তবে ওপরের তিনতলার একটা জানালা একটু খোলা।

অরুণা নিশ্চয়ই ক্লাশ শেষ করে চলে গেছে।

সজল ফুটপাত ধরে ধীরে ধীরে আজকের ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। বাসাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

পেছন থেকে একটা রিকসার টুং টুং শব্দ পেয়ে সজল ফিরে তাকাল।

কিন্তু একি! সজল চমকে উঠল! যে দৃশ্য দেখল, তার তার পক্ষে ধারণা করাও শক্ত। নিজের চোখকেই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

রিকসার সামনের পর্দাটাও নামানো। সামান্য ফাঁকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তার ভেতর অরুণা আর কার্তিক এবং কাত্তিক একটু বেশি ঘন, অন্তরঙ্গ। অরুণার মাথার চুল, বেশবাস কেমন এলোমেলো।

সজল থমকে দাঁড়াল। তার মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। ভয় হচ্ছে, পড়ে যাবে কিনা! পা দুটোয় আদৌ জোর নেই।

একটা লাইট পোস্টে হাত রেখে দূরে রিকসাটার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল সজল। না, সোজা রাস্তায় গেলে ওটা আবার চোখে পড়বে। তাই সজল একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। —হ্যাঁ, অন্ধকার স্কুল ঘরটায় ওরা এতক্ষণ দুজনে ছিল।

সজলের কাছে অরুণা আর কার্তিকের এই অন্ধকারে, নির্জনে অবস্থান, একান্ত ঘন হয়ে রিকসায় যাওয়া, অথবা বাড়ীতে সেই বার বার অরুণার হাতে চা খেতে চাওয়া—এইসব একটা গোপন ঘটনার আভাস ইঙ্গিত বয়ে আনছিল।

এ মুহূর্তে সজলের নিজেকে বড় ব্যর্থ মনে হল। পরাজিত সৈনিকের মত ধীরে ধীরে এই অপমানিত অন্ধকারে সজল বাসার দিকে হাঁটতে লাগল।

সজল একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমোয়নি!

থানার ঘড়িতে দুটো বাজল।

সজল সেই মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়েছিল। ঠোঙায় যে মুড়িগুলো ছিল তাও সে খায় নি। একটা অসহ্য বেদনা তাকে পাগল করে তুলছে। কোনভাবে আত্মহত্যা করতে পারলে, নিজের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হোতো!

অরুণা তাকে এতো বড় প্রতারণা করল! সে কি তবে কার্তিককেই ভালো বাসে? তবে তার সঙ্গে সে, এতোদিন কি শুধু ভালোবাসার খেলা খেলছিল! অথচ কত সুন্দর মুহূর্ত অরুণার সঙ্গে সে কাটিয়েছে। যেদিন মৃত্যুর হাত থেকে সামান্যের জন্য বেঁচে, আহত সজল এ ঘরে একান্ত অসহায় হয়ে শুয়েছিল, সেদিন ঈশ্বরের কৃপার মত অরুণা এসেছিল। খেতে দিয়েছিল, সেবা করেছিল। কার কাছ থেকে যেন ওষুধ এনে দিয়েছিল!

তার এতো আন্তরিক সেবা, ভালোবাসা সবই কি মিথ্যা? মিথ্যা : মিথ্যা?

সজল অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করল একটা। সমস্ত ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে, নিজেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে, অর্থাৎ নিজেকে ঘটনার মধ্যে না জড়িয়ে, বিচার করতে লাগল।

অরুণার ব্যবহার কোনদিন একথা প্রমাণ করে নি যে, সে সজলকে ভালোবাসে না। বরং এর বিপরীত কিছুই প্রমাণ করে।

অথবা হয়ত অরুণা এমন পরিবেশের মধ্যে পড়েছিল, কার্তিকের কাছে এমন কোন ব্যাপারে ঋণী, যাতে অরুণা এইভাবে কাছাকাছি আসা প্রতিরোধ করতে পারে নি।

অথবা সজল যা দেখেছে, তার মধ্যে কল্পনার পরিমাণ বেশি। তার সন্দেহ সে যা দেখেছে, যা ভেবেছে তা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়।

কিন্তু তাহলে সজল এত উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ হচ্ছে কেন। তার এতো অস্থিরতাই বা কিসের জন্য!

হ্যাঁ, সজলের মনে হয়, আসলে অরুণার ওপর সজলের গভীর আসক্তি এবং এই আসক্তিও দেহহীন বা দেহাতীত নয়। সজলের কি কোনদিন অরুণার দেহের প্রতি লোভ জন্মায় নি? একথা কি

সে অন্তর দিয়ে বলতে পারে? —না, পারে না, বরং সজল বলতে পারে অরুণার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মধ্যে কখনও কখনও যৌবনের ক্ষুধা তীব্রতর হয়।

তাহলে এই ক্রোধের কারণ—অরুণার ওপর আসক্তি থেকে যে কামনার জন্ম হয়েছিল, তা এতকাল কখনো পূরণ হয়নি, তৃপ্ত হয়নি বলেই এই ক্রোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে বুদ্ধিহীনতা। অর্থাৎ কোনটা কল্যাণ, কোনটা অকল্যাণ, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তার পার্থক্য উপলব্ধি না করার অক্ষমতা। এ থেকেই এসেছে স্মৃতিভ্রংশ। অর্থাৎ অরুণার এতোদিনের সুন্দর সেবা, সাহচর্যের প্রতি অবিশ্বাস, অবিচার, সন্দেহ।

আর এ থেকেই এসেছে আত্মহত্যার একটা দুর্বল, অন্যায়, অলৌকিক মানসিকতা। কিন্তু জীবন কি? জীবনের পূর্ণতা কোথায়? সৌন্দর্য কোথায়?

পূর্ণতা, সৌন্দর্য—সবই এই যৌবনের ইন্দ্রিয় চেতনার সংযমের মধ্যে!

সংযমটা কেমন? সংযমটা হল, উপবাসও নয়, অতিভোজন নয়—এ দুয়ের মাঝামাঝি স্তর।

সজল অনেকক্ষণ নিজের মনের মধ্যেই শান্ত হয়ে রইল নির্বাক হয়ে রইল। এতক্ষণ নিজের সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সে।

ধীরে ধীরে ভোরের দিগন্তে রোদের নব আবির্ভাবের মত চিন্তার কুয়াশাগুলো কেটে যাচ্ছিল। ভালো লাগছিল এখন। এখন সে অরুণাকে ক্ষমা করতে পারে, এমন কি আরো গভীর করে ভালোবাসতেও পারে। তার দীনতার, অসহায়তার ক্ষতস্থানটুকুতে তার নির্ভয় হাতের স্পর্শ রাখতে পারে।

সজল উঠে ট্রেতা থেকে নিয়ে খাবারগুলো খেল। এক গ্লাশ জল খেল। তারপর আবার আলোটা নিবিয়ে দিল।

কাল সকালে তার অনেক কাজ। বিশ্বময়কে খবর দিতে হবে, তার চাকরী হয়েছে। হারাধনদার কাছ থেকে একটা মাস-ভাড়ার মত গোটা পঁচিশ টাকা ধার করতে হবে এবং আরতির কাছ থেকে, সোয়েটারটা নিয়ে আসতে হবে।

সজল পাশ ফিরে একটু ঘুমতে চেষ্টা করল। থানার ঘড়িতে তখন চারটে।

সকাল বেলা বেরোতে গিয়েই মনে পড়ল, হারাধনদার কাছ পর্যন্ত যাবার পয়সা আছে। কিন্তু ফেরার পয়সা নেই। যদি হারাধনদাকে কোনভাবে না পাওয়া যায়, তবে সে ফিরবে কি করে? কি করা যায় এখন?

যে হিন্দুস্থানী বুড়ো মুড়ি-ছাতু বিক্রী করত, সজল তার দিকে কয়েকটা পোষ্টকার্ড এগিয়ে ধরল। লোকটি চেনা। সজল ওর নিয়মিত খরিদ্দার। "এই পাঁচটা কার্ড রেখে আমাকে পনেরটা পয়সা দাও, খুব দরকার"।

বুড়ো হেসে একটা সিকি বের করে দিল। 'লিজিয়ে বাবু। ওগুলো রাখার জরুরত নাই'।

'তবে কি এগুলো আবার ফিরে গিয়ে রেখে আসব? তারচেয়ে রেখে দাও। পরে নিয়ে নেব'।

আজ শুচিতাই কপাট খুলে দিল। আজো তেমনি একটি ফুলের মত সুন্দর অভ্যর্থনা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সজল বলল, 'দাদা আছে?'

শুচিতা ঘাড় নাড়ল। না নেই।

সজলের বড্ড খারাপ লাগল। বিশ্বময়কে পাবে বলে আশা ছিল তার। অবশ্য ঘুম থেকেই উঠতেই আজ দেরি হয়ে গেছে।

'দাদাকে বোলো, সজলদার চাকরী হয়েছে। মিঃ মুখার্জি অনেক করেছেন তার জন্য'।

শুচিতা বলল, 'তার মানে? পালাবার ফন্দী। ওসব চলবে না। চলুন ওপরে'।

'আজ আমার অনেক কাজ শুচি?'

শুচিতা দুষ্টুমি করে মাথা নেড়ে বলল, 'আমারও আজ অনেক কাজ সজলদা'।

সজল বসতেই শুচিতা তার সংস্কৃত খাতাটা নিয়ে এসে হাজির।

'দিন 'কারেকশান' করে দিন'।

'ও, এই কাজ? আমি ভাবছিলাম, কি না-কি বলবে। দাও, কলমটা দাও'।

সজল কয়েকটা ট্রানশ্লেশান সংশোধন করে দিয়ে খাতাটা ফেরত দিতে গিয়ে দ্যাখে, শুচিতা উধাও।

'কোথায় তুমি?'

'যাই......!' দূর থেকে সেই মিষ্টি সুরটা ভেসে এল।

শুচিতা প্লেটে করে কি একটা খাবার নিয়ে আসছিল। সজল হাতে নিয়ে অবাক। এক প্লেট ভর্তি পায়েস।

সজল আজ কদিন ভাতের মুখ দেখেনি!'

শুচিতা বলল, 'হরিহরদা, গতকাল পায়েস করেছিল। আমার, মনে হচ্ছিল, আপনি আসবেন। দাদাও রাতে বলল আসতে পারেন বলে। তাই রেখেছিলাম'।

সজল পরম আগ্রহে, তৃপ্তিতে চামচ দিয়ে পায়েসটুকু খুঁটে খুঁটে খেল। মিনুর জন্মদিনে একবার পায়েস হয়েছিল। তবে এতো ভাল নয়। সেখ তাতে খানিকটা দুধ আর গুড় ঢেলে!

মিনু, মিনুর জন্মদিন কবে ছিল?

গরীবের বাড়িতে ছেলেমেয়ের জন্মদিনের কেউ খোঁজ রাখে না। তাদের জন্মদিন সমারোহ দিয়ে চিহ্নিত নয়। সজল অবশ্য তার জন্মদিনটা মানে!

'আচ্ছা, সজলদা, আমি দেখছি, আমার বাড়ী এলে, আমার সামনে বসে আপনি কী সব যেন ভাবেন। কি ভাবেন এত?' শুচিতা জিজ্ঞেস করল।

'কোথায় কি ভাবছি?'

'এই যে খাচ্ছিলেন না?—আচ্ছা সত্য কথা বলব?'

'হুঁ, দ্বিতীয় ভাগের কথা—সদা সত্য বলিবে'

'আপনি রাগ করবেন না?'

'না, না, রাগ করব কেন?'

শুচিতা হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি খেতে খেতে এমন ভাবছিলেন প্লেটে যে পায়েস শেষ হয়ে গেছে সে খেয়ালই ছিল না'।

'তা ঠিক। আসলে এতো ভাল লাগছিল খেতে যে—।'

শুচিতা আবার মুগ্ধ করে হাসল, জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিল।

সজল বলল, 'ধাতুরূপ, শব্দরূপ ভাল করে মুখস্থ করবে। মাঝে মাঝে এসে দেখিয়ে দেব।'

'কবে আসবেন আবার?'

'ঠিক নেই, যে কোন দিন দাদাকে বলবে তাহলে?'

'আচ্ছা, সজলদা, একটা কথা বলব?'

'বলবে না কেন?'

'দাদা ত আপনার খুব বন্ধু। আপনাকে দাদা ভালোবাসে। আপনি ওর নোয়াখালি যাওয়াটা বন্ধ করে দিন না?

বিস্মিত সজল চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ!

মিনুও তার দাদাকে কি কম ভালোবাসত?

দাদারা কোনকালেই বোনেদের ভালোবাসার মূল্য দেয় না।

ওদের এই মূল্য না দেওয়াটাই ভাই-বোনের ভালোবাসার একটি গোপন যোগসূত্র।

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'আমি বলব, শুচিতা। কিন্তু তুমি ত তোমার দাদাকে জান?'

'জানি বলেই তো বড্ড ভয় ওকে নিয়ে, সজলদা। একবার কি হয়েছে জানেন? পুলিশের গুলীতে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। থানা ভাঙ্গার সময় পুলিশ গুলী করেছিল। আর দাদা চুপিচুপি আড়াল দিয়ে

গিয়ে খপ করে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়েছিল একজনের হাত থেকে। এমন করে হাসতে হাসতে বলছিল না, রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল।

সজল শ্মশানের মত বসে বসে দেখছিল শুচিতার চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে। কাজেই কতখানি রাগে গা জ্বলছিল সজল তা বেশ বুঝতে পারছিল:

'দেখুন না, মা নেই। সেই কবে মারা গেছে। যবে থেকে একটু বড় হয়েছি, এই দাদার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি।'

সজল আজ শুচিতাকে নতুন চোখে দেখছিল। পৃথিবীতে কি এর চেয়ে পবিত্রতা কিছু আছে? এর চেয়ে নিবিড় গভীর কোন সম্পর্ক?

হারাধনদার কাছে টাকা নিয়ে বাসে চেপে মৌলালী আসছিল সজল। বেলা এখন প্রায় এগারটা বাজে। হারাধনদার ওখানেও বেশ দেরী হয়ে গেল।

হারাধনদার মনটা কি ভাল? বলা মাত্র সেই ভাঙ্গা সুটকেসটা খুলে কুড়িটা টাকা বের করে দিল। কুড়ি টাকা অর্থাৎ দু মাসের মাইনে। বাড়ী পাঠাবে বলে জমিয়ে রেখেছিল। বলল, নে, নিয়ে যা। আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবো। বাড়ীতে বোধ হয়, জমিজমা কিছু আছে। নইলে এই টাকায় একজনের কি হয়?

জগতে কজন লোক নিজের টাকা অপরকে দিয়ে, পরে নিজে ধার করে? নাই বা শিখল লেখাপড়া, নাই বা জানল ইংরেজী, আসল মানুষ ত এরাই!

সজলের চাকরীর চিঠিটা দেখেই কি খুশী! মাইনের কথা শুনে বলল, 'আরে তোর এত টাকা মাইনে?' হারাধনদা বলছিল 'সে সব ত বুঝলাম। কিন্তু তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন রে?'

সজল কথাটা ঘুরাতে চাইল।
হারাধনদা ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই।

তাহলে মাইনে পেলে, হারাধনদার কুড়ি টাকা, ছোটমাকে অন্তত গোটা পঁচিশ টাকা পাঠাতে হবে। ক'মাস কিছু পাঠাতে পারে নি।

আজ মিনু বেঁচে থাকলে সজল নিশ্চয়ই তাকে কলকাতায় আনত, পড়াত। সুবিধাও হত, মিনু রান্নায় সাহায্য করতে পারত। রান্না করতে আর ভাল লাগে না? আচ্ছা, মেসে গেলে কেমন হয়? কালীঘাট রোডে দেশের লোকের একটা মেস আছে। একবার খোঁজ করবে সে?

অর্থাৎ এবার থেকে নতুন জীবন শুরু হল তার। গত রাত্রে অরুণাকে ক্ষমা করার যে দার্শনিক চিন্তাটা প্রায় স্থির সিদ্ধান্তের মত হয়ে উঠেছিল, সকালবেলা তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ রাত্রের চিন্তা, দিনের বেলার চিন্তা এক নয়। সজল ভেবে রেখেছে, এবার অরুণা নিজে থেকে না এলে, এই সম্পর্কের এইখানেই যবনিকা হয়ে যাবে!

পাঞ্জাবী কণ্ডাকটার চিৎকার করছিল মৌলালী, মৌলালী—সজল নেমে পড়ল। তবে একটা কথা তার মনে হচ্ছিল, এ সময় আরতির বাসায় যাওয়া উচিত হবে কিনা?

কিন্তু সে প্রায় এসে পড়েছে। আচ্ছা, সজল কি আরতিকে শুধু একবার চোখে দেখার জন্য এসেছে? সেতারটা নেওয়া অছিলা মাত্র? আরতির সেই ধ্যানমূর্তি কি এখনও সজলের মনে, অমৃতের স্বাদের মত অক্ষয় হয়ে আছে?

সজল নিজেকেই এই প্রশ্নগুলো করছিল।

একেই কি বলে অমৃত? যা তৃষ্ণা মেটায় না, ক্ষুধা মেটায় না, অথচ দুরন্তম আনন্দের আশ্চর্য সুন্দর আলোয়, জীবনকে আনন্দিত বেদনায় পরিপূর্ণ করে রাখে?

সজল বিনয়বাবুকে নমস্কার করে বলল, 'আরতি আছে?'

'এসো, ভেতরে এসো। আরতি রান্না করছে। ওর মার অসুখ।'

আরতিকে একা কাছে পাবে না বলে কি সজল একটু ক্ষুণ্ণ হল!

বিনয়বাবু ভাঙ্গা চশমাটা চোখে পরে বললেন, 'তোমার নাকি নোয়াখালি যাবার কথ?'

সজল বলল, 'কথা ছিল, কিন্তু হল না। হঠাৎ একটা চাকরী জুটে গেল?'

চাকরীর কথা শুনে, বিনয়বাবু উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন 'হ্যাঁ, চাকরী হল এ জগতের শেষ কথা। বুঝলে না? অন্ন মানেই ব্রহ্ম। আর চাকরী সেই অন্ন দেয়। কাজেই চাকরীকেই ব্রহ্ম বলতে পার'।

বিনয়বাবু নিজের রসিকতায় হো হো করে হাসলেন।

কিন্তু আনন্দটা ও'র আন্তরিক—সে কথা সজল বুঝতে পারছিল।

সজলের গলা শুনেই, আরতি এসে দাঁড়িয়েছিল। সজল বুঝতে পারল, ওকে দেখবে বলেই সত্যি সে এতো উন্মুখ হয়েছিল!

আরতির হাতে হলুদের দাগ। শাড়ীটা ছেঁড়া, কিন্তু ময়লা নয়। ব্লাউজের ওপর দিয়ে আঁচলটা হেলাফেলায় ছড়ানো। ঘাড়ের ওপরে, কানের কাছে, এক গুচ্ছ অবাধ্য চুল। খোঁপাটা নিটোল, পুষ্ট: ভারী বলে কিছুটা নেমে এসেছে। ঘন পল্লবের আড়ালে দুটি নত চোখ। কি শান্ত, সুন্দর শ্যামল মুখ। নগ্ন, মসৃণ, স্নিগ্ধ নিটোল দুটি দীর্ঘ বাহু!

সজল আরতির দিকে তাকাতে পারছিল না। অথচ ফিরে ফিরে দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছিল।

আরতি প্রথমে কথা বলল, 'নোয়াখালি যাও নি তা হলে?'

কথাটা পুনরাবৃত্তি, অথবা কোন কিছু বলার মত মন তৈরী নয় বলে শুধু একটু ভূমিকা!

সজল বলল, 'চাকরীটা পেয়ে গেলাম'।
'ওমা, তাই নাকি। কই চিঠিটা দেখি?'—
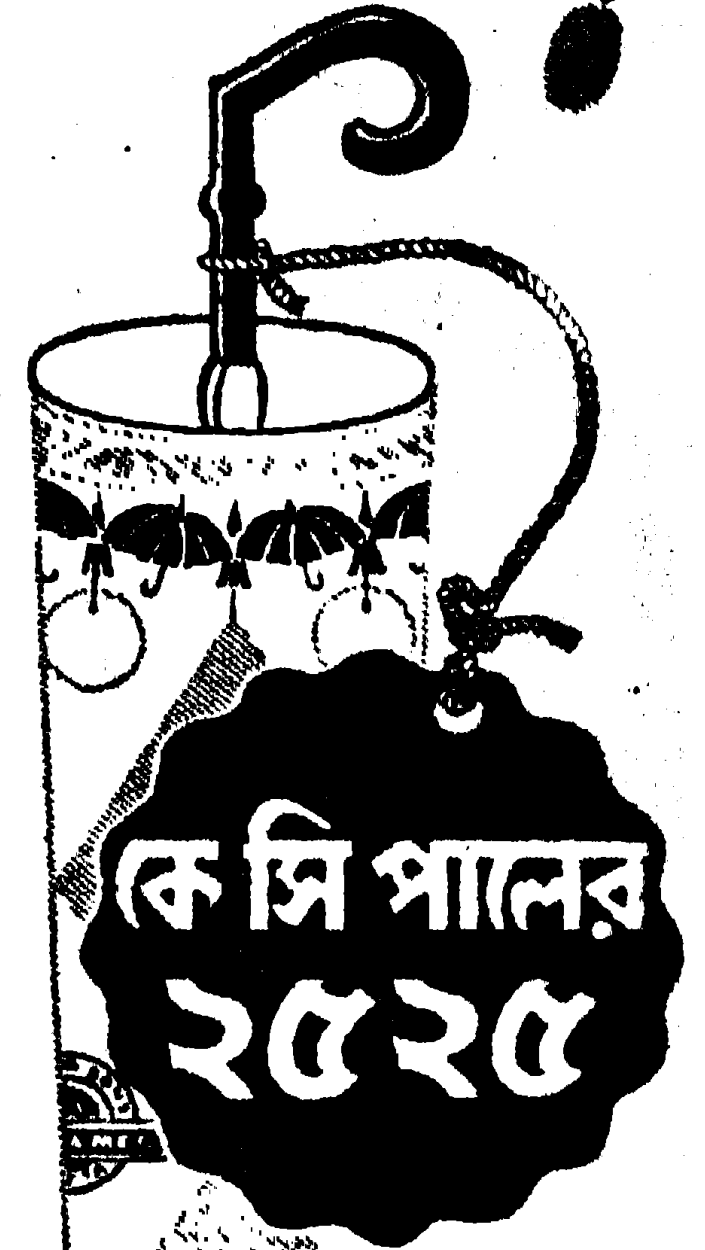
আরতি চিঠিটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পড়ল।

'কাদের কাছ থেকে আসছে?'

'আমিও জানি না। তবে একটা গানের-ক্লাব হবে?'

ঘর থেকে আরতির মা রুগ্ন গলায় বলে উঠল, 'ওকে একটু চাটা করে দে রে?'

সজল বলল, 'না, চা এখন খাব না। চলে যাব আমি।'

আরতি রান্নাঘর থেকেই বলল, 'এত তাড়া ত এলে কেন?'

'এলাম সেতারটা নিয়ে যেতে'।

আরতি রান্নাঘর থেকে প্লেটে করে কি যেন নিয়ে আসছিল। হঠাৎ প্লেটটা পড়ে গেল! ভেঙে চুরমার। খাবারটা ছড়িয়ে পড়েছে এখানে ওখানে।

'ভাঙলি? বলি, ভাঙলি ত? কাপ-প্লেটগুলো এমনি করেই তুই সব ভাঙ।' মা-ই ওঘর থেকে তিরস্কার করছিল।

বিনয়বাবু তাঁর সেই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন। আর দাঁড়িয়ে আরতি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

বিনয়বাবু হালকা গলায় বললেন, 'যাক, পাটা পুড়ে নি তা হলে।'

সজলের কেমন অস্বস্তি লাগছিল, নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল।

আরতি ফিরে গেল। খাবারটা তুলে ন্যাতা দিয়ে জায়গাটা মুছল।

সজল ভাবছিল, সে আসার জন্য আরতি এত অন্যমনস্ক হল কেন?

বিনয়বাবু আবহাওয়াটাকে সহজ করে দিলেন। 'নে, দু কাপ ভালো করে চা কর দিকি? মার কথায় অত কান দিস কেন? সজল, চা খাও এক কাপ।'

এতক্ষণে আরতি কথা বলল, 'সত্যি ত বাবা, কাপ-প্লেটগুলো আমার হাতেই বেশী ভাঙে। রাণু দীপুর হাতেও কই ভাঙে না এত?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ওরা কি তোর মত কাজ করে? কাজ না করলে ভাঙবে কেন? তোর মাকে বল, ওমাসে হাফ ডজন কাপ-প্লেট এনে দেব'। তারপর সজলের দিকে তাকিয়ে কি যেন তাঁর মনে পড়ে গেল।

'আচ্ছা সজল, তুমি ত পড়াশোনা কর। তিলকের গীতা একটা জোগাড় করে দিতে পার আমাকে?'

সজল তিলকের গীতার কথা শোনে নি। 'ও'র গীতা খুব ভাল বুঝি?'

'হ্যাঁ ভাল। দ্যাখো পাও কিনা ফুটপাতে পুরনো বইর দোকানে পেতে পার। আমি অবশ্য আজকাল কলেজ স্ট্রীটের দিকে যাই-টাই না'?

আরতি দু কাপ চা নিয়ে এল। কিন্তু কোনটাতেই প্লেট নেই। বিনয়বাবু পরম উৎসাহে চায়ে চুমুক দিলেন।

'সজল, আমার এই মেয়েটা সর্বংসহা বুঝলে না? সংসারের যত চাপ, তাপ, ওর ওপর দিয়েই যায়। নইলে এ বুড়ো বয়সে মাথায় একটাও চুল থাকত না'।

আরতি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। একটু হাসছিল শুধু।

'ও আর জন্মে আমার মা ছিল বুঝলে?'

বিনয়বাবুর গলা ধরে এসেছিল।

আরতি কাপ দুটো নিতে নিতে সজলের দিকে একবার তাকাল শুধু।

সজল ভাবছিল, তার আসা সার্থক হয়েছে!

সেতারটা নিয়ে সজল বলল, মাঝে মাঝে একটু দেখিয়ে দিও।

আরতি মাথা নাড়ল।

ওর মুখটা আবার করুণ হয়ে উঠছে! মুগ্ধ সজল স্নেহ-শান্ত করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মেজরাব টা-ই দাও। আশ্চর্য্য হয়েছিল সেদিন?

(ক্রমশঃ)

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু ● সুহৃদ গোপাল দত্ত

পণ্ডিচেরীতে উত্তরযোগী শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সর্বেষাম্ যঃ সুহৃন্নিত্যম্
সর্বেষাম চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা
স ধর্ম বেদ জাজলে।।

মহাভারত। শান্তিপর্ব

১৯২০ সালে মাদ্রাজ থেকে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম ভক্তশিষ্য ডোরাইস্বামী আয়ার পণ্ডিচেরীতে গুরুদর্শনে এলেন। তিনিও শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে শুনে গেলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা বিধিলিপি সুতরাং ভারত স্বাধীন হবেই। এই সময়ে অগ্নিযুগের নায়ক বারীন্দ্রকুমার আন্দামান জেল থেকে মুক্তি পান। তিনি এসেই তাঁর প্রাণপ্রিয় সেজদাকে পণ্ডিচেরীতে চিঠি লিখলেন, 'পূর্ণযোগের' দীক্ষা নেবেন বলে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পরম আদরের ছোট ভাইটিকে উত্তর দিলেন যা খুবই অপ্রত্যাশিত। 'এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটি আশ্চর্য কান্ড, কেন না আমার চিঠি লেখা হয় ক্ষুদে মঙ্গলবারে একবার; বিশেষ বাঙলায় লেখা, যা এই পাঁচ বৎসরে একবারও করিনি। শেষকরে যদি ডাকে দিতে পারি, তাহলেই অসাধ্য সাধনটা সম্পূর্ণ হয়।" (৩০)

১৯২০ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে বারীন্দ্রকুমারকে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের এই চিঠিখানিতে সেই সময়ের বাঙলা দেশ, বাঙালী, এবং এই দুইয়ের প্রতি তাঁর চিন্তা সম্পর্কে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠিটিতে শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে যোগের ব্যাপ্তি কতখানি এবং তাঁর সাধকজীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠির বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ঐগুলি বর্ণনা করা অর্বাচীনতা হবে বলে মূল চিঠিটির কয়েকটি অংশ সরাসরি উধৃত করছি।

'তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও নিতে রাজী।..... তাহারই দত্ত আমার যোগপন্থা—যাকে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চলতে হবে। ...যোগপন্থাটি কি, তা পরে লিখবো; অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল।......

'পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে......মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খন্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে; অনন্ত, অখন্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না।......কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান সেটি হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্তিমান করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত করা।......

'......বিজ্ঞানভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা মীমাংসা হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন—এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না, জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়, গীতায় যাকে বলে 'সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম'। অন্নময় দেহ; প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ এই হল আত্মার পাঁচটি ভূমি।......বিজ্ঞানে উঠার আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়।......পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue (মূল কথা)।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ঠিক এই সময়টিতে তাঁর নিজের উর্ধ্বগতি সম্পর্কে আগেই লিখেছেন (চিঠির তৃতীয় অনুচ্ছেদে), '......অন্তর্যামী জগদ্গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ তত্ত্বযোগ শরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তারই বিকাশ করাচ্ছেন, অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয়নি, আর দুই বৎসর লাগতে পারে।......

'বাঙলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতন রূপ, কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এরও দরকার ছিল।......এটি নবযুগের শৈশব, এমনকি ভ্রূণ অবস্থা। আভাস মাত্র, আরম্ভ নয়।......

'ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ—আত্মার ঐক্যের মুক্তি—প্রতিষ্ঠ চাই। ......দেব সংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহমের ছায়া যদি পড়ে, সংঘ দলে পরিণত হয়। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে।......রাজনীতি,

বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।......সংঘ হবে প্রথম চক্রান রূপ;...... পরে অধ্যাত্ম সংঘের মত রূপ দিয়ে সম্বন্ধ হয়ে সব কর্মকে আত্মানুরূপ, মূলানুরূপ আকৃতি দেবে। শক্ত বাঁধারূপ নয়......স্বাধীন রূপ... নানা ভঙ্গী লয়ে এটিকে ঘিরে, ওটিকে প্লাবিত করে সবকে আত্মসাৎ করবে; করতে করতে দেবজাতি দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্তমান ভাব, এখনও পুরো বিকশিত হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

'...আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধর্মের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

'বাঙলা দেশেই এই দুর্বলতার চরম অবস্থা। বাঙালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের সামর্থ্য আছে, অন্তর্জ্ঞান আছে;... এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তাহলে বাঙালী ভারতের কেন জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ, তারপর অবসাদ, তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি,......খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধন-দৌলত, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে।......প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি, এদেশে আছে, ভেদ-ক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্র-রূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরু-গিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎ-জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।'(৩০)

এই বছরেই কলকাতা থেকে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করবার জন্য সরলা দেবী চৌধুরানী পণ্ডিচেরীতে আসেন। মধ্যপ্রদেশ থেকে ডাক্তার মুঞ্জী এবং শ্রীহেজওয়ার শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে এলেন তাঁকে জাতীয় কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বপদে বরণ করবার আমন্ত্রণ জানাতে। বিমুখ হয়ে ফিরে গেলেন। বোধহয় এঁরাও শুনেছিলেন সেই একই যুক্তি যা শ্রীঅরবিন্দ বছরের গোড়ার দিকে জোসেফ ব্যাপটিস্টাকে লিখেছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মুখপত্রের সম্পাদক পদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে।

ঐ বছরের শেষের দিকে শান্তিনিকেতন থেকে কবিগুরুর সহকর্মী পিয়ারসন সাহেব পণ্ডিচেরীতে এলেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে অধ্যাত্ম জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হিসাবে। পিয়ারসন সাহেব শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কাছে সস্নেহ সাহচর্য পেয়েছিলেন। পিয়ারসন প্রসঙ্গে দর্শনাচার্য শিশিরকুমার মিত্র লিখেছেন যে, পিয়ারসন ছিলেন প্রকৃত ভারতপ্রেমিক, ভারতের মুক্তিসাধনার ব্রতী পুরুষ, এবং ভারতের মহান ঐতিহ্যের একজন দরদী সমর্থক। ১৯২০ সালে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম গুণমুগ্ধ সুহৃদ বালগঙ্গাধর তিলক দেহ রাখলেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি ছিলেন

'One of the mightiest prophets of Indian Nationalism.'

(৩০) শ্রীঅরবিন্দের মূল রচনাবলী। পৃঃ ২০৫-২২১

রাজনীতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। রাজনীতির আশ্রয় করে আত্মিকতা তাঁর মতে স্বধর্ম বিকৃতি। মানুষ একমাত্র ভগবানের শ্রীচর বশ্যতা স্বীকার করবে—এই সত্যকে উপেক্ষা করে কোনো নেতার মতবাদ বা কোনো রাজনীতি ভারতের সনাতন ধর্মের পরিপন্থী মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে উপেক্ষা কর যদি মানুষের উপর জোর করে কোনো মত বাদ চাপানো হয় তাহলে মানুষের স্ব স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতার চেতনা বিকাশ হবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় সংকীর্ণ রাজনীতির দিব্য প্রকৃতি আধার মানুষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্রে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা মানুষকে বন্দীজীবনের আস্বাদ দেয় মুক্তির দিব্য-আস্বাদে বঞ্চিত হ মানুষ অধোগতির পথে মুক্ত জীবনের পরিবর্তে উচ্ছৃংখলতার আবর্তে সমাজ দূষিত করে তোলে। শ্রীঅরবিন্দ-চি অনুযায়ী মানুষের হৃদয়ের অন্তঃপুর শৃঙ্খলিত ভগবানকে মুক্ত করতে পার মানুষের মধ্যে দিব্য-ভাব আসবে— দৈবী-ভাবাপন্ন মানুষ সমাজই গড়ুক বা রাজনীতিই করুক, তার মধ্যে মান মুক্তির অভিযান অব্যাহত থাকবে—অব্যা থাকবে স্বস্তি, শান্তি, নিরাপত্তা, আ অথবা সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা। ম মানুষ, মহান সমাজ-চেতনা যে নী প্রণয়ন করবে সেই নীতি আপন মহি মহান হবে।

১৯২১ সালের প্রথমের দিকে শ্রী বিন্দের চরণে প্রণাম জানাতে কলক থেকে এলেন অগ্নিযুগের অন জ্যোতিষ্ক অবিনাশ ভট্টাচার্য তাঁর ক শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন বাংলা দেশ উ জাগবে এবং বিশ্ববাসীর জয় সব বাংলার মনীষা অর্থাৎ বাঙালী হি বাঙালী মুসলমান এক হয়ে দিক-দিগ প্রতিষ্ঠা পাবে। এই বছরেই পণ্ডিচের শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে বৃটিশ পা মেন্টের সভ্য কর্নেল ওয়েজ এসে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে কিছু ছিলেন।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে শ্রী বিন্দ পণ্ডিচেরী থেকে দেশবন্ধু রঞ্জনকে একটি চিঠি লিখে তাঁর ঐ সময়ের ধ্যান ও ধারণাগুলি জানাতে চেষ্টা করেন। কারণ দেশবন্ধু এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে চিন্তা করছিলেন। চিত্তরঞ্জনকে শ্রীঅরবিন্দ পরম সুহৃদ হিসাবে ভালবাসতেন তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিজের সাধনপথে আত্মমগ্ন থাকার দৃঢ় সংকল্পের কথা চিত্তরঞ্জনকে জানিয়েছিলেন।

(৩০) শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙলা রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ২০৫-১২

পরের বছর ভগ্নস্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক সমস্যাপীড়িত মন নিয়ে চিত্তরঞ্জন নিজেই এসে উপস্থিত হলেন অন্তরের যোগসূত্রে যোগীশ্বরের পণ্ডিচেরী আশ্রমে। এঁদের দুজনের আলোচনা হয়েছিল নিভৃতে —১৯২৩ সালের ৫ই জুন বেলা সাড়ে তিনটের সময়। 'হৃষীকেশ' এবং 'গুড়াকেশ'-এর আলোচনায় মুখ্যই এই মতের আদান-প্রদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। চিত্তরঞ্জনের জিজ্ঞাস্য ছিল—অধ্যাত্ম-জীবন এবং দিব্য-লোকের পথ-সন্ধানের। কথা প্রসঙ্গে এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চিত্তরঞ্জনকে বলেন— "Knit them close together". হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অদ্বিতীয় পৃষ্ঠ-পোষক শ্রীঅরবিন্দ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে এই সংহতি অখণ্ড ভারতের জাতীয় সংহতির বুনিয়াদ। এই সংহতি আলাপ-আলোচনা বা আপসের ভিত্তিতে গড়তে গেলে ফল ক্ষণস্থায়ী হবে সুতরাং অন্তরের যোগসূত্রে দুই সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করতে হবে। কারণ শ্রীঅর-বিন্দের দিব্য-দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায় সেই পরম পিতার দুই প্রিয় সন্তান-সন্ততি গোষ্ঠী। উভয়েই নারায়ণের পবিত্র আধার, উভয়েই আদ্যাশক্তির সৃষ্ট ও পালিত। এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে সংকীর্ণ রাজনীতির আবর্ত থেকে মুক্ত করে জাতীয় সমৃদ্ধির পট-ভূমিকায় চিন্তা করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে যোগীবর ব্রহ্মশ্রী সুব্বারাও শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে পণ্ডিচেরীতে এসে-ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ প্রেমময়, মহিমামণ্ডিত, বিংশশতাব্দীর যোগীশ্বর।

১৯২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি তারিখের সকালবেলায় প্রেম-ভক্তি-সঙ্গীত-সুধাকর দিলীপকুমার রায় শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণ স্পর্শ করলেন। শ্রীগুরু তাঁর পরম আদরের দিলীপের দিকে চেয়ে রইলেন— 'স্থির প্রেক্ষণে'। ভাববিহ্বল দিলীপকুমারের প্রার্থনা ছিল—'জ্ঞান ও আনন্দের দীক্ষা'। দিলীপকুমারের প্রার্থনার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দীক্ষা পেতে পারো, যদি যোগের সর্তে তুমি রাজী থাকো এবং তোমার যোগতৃষ্ণা প্রবল হয়'। এর কয়েক বছর পরেই দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণে কেবলমাত্র আশ্রয়ই পেলেন না, পেলেন শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ স্নেহের সৌভাগ্য।

এই বছরে ২৮শে জুলাই জন্মনামধন্য পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রীজী পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিলেন। শাস্ত্রীজীর হৃদয়ের ভক্তি-কুসুম দিয়ে গাঁথা 'সপ্তাহসংভক্তম' গ্রন্থ তাঁর বেদোজ্জ্বলা প্রজ্ঞার একটি সার্থক নিদর্শন—গুরুবন্দনার আকৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে গুরু-শিষ্যের গুহ্য মিলনের নৈসর্গিক সুর।

১৯২৫ সালের ৫ই জানুয়ারি শ্রীঅরবিন্দের দর্শনাভিলাষী হয়ে ভারতের দুই দিকপাল—লালা লাজপৎ রায় এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন পণ্ডিচেরীতে এলেন। লালাজীও এসেছিলেন ভারতের রাজনৈতিক দুরূহ কয়েকটি সমস্যার সমাধানে। লালাজীরও সেই এক আবেদন— 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'......'মাং ত্বাং প্রপন্নং'। লালাজী পথনির্দেশ পেয়ে-ছিলেন। শ্রদ্ধামুগ্ধ লালাজীর ভাষায়, শ্রীঅরবিন্দ এক আশ্চর্য পুরুষ, ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু জ্ঞাতব্য তাঁর নখদর্পণে ছিল এক অনন্য-সাধারণ বোধশক্তি। —এই অসাধারণ ক্ষমতা যোগী মহাপুরুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন ভারতের আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হোলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের অপূরণীয় ক্ষতির কথা ভেবে চিত্তরঞ্জনের বিয়োগবেদনা স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর ভাষায়

"Chittaranjan's death is a supreme loss ... He was the one man after Tilak who could have led India to swaraj".

ক্রমশ ১৯২৬ সালের শেষ দিনটি পণ্ডিচেরীর বুকে রাত্রির শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়ে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। বছরের শেষ রাত্রির কোলে [illegible] অগোচরে লালিত হোতে [illegible] নতুন বছরের প্রথম দিনটির এক [illegible] ঊষা। সকলের অলক্ষ্যে [illegible] উপলক্ষে নীরব নিস্তব্ধ পণ্ডিচেরীর তপোবনে যোগীশ্বর [illegible] গতিতে এগিয়ে চলেছেন সেই [illegible] লোকে —যে অনন্তলোক থেকে কোনো এক শুভ-মুহূর্তে তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন মানবাত্মারূপে, এগিয়ে চলেছেন ঊর্ধ্বায়ণের পথে বিশ্বাতীত ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

(ক্রমশ)

ভ্রম সংশোধন

পৃঃ ৫৪৭, ২য় কলম :

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের পরিবর্তে বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত হবে।

পৃঃ ৫৪৮, ১ম কলম :

কর্মণা মনো-র পরিবর্তে কর্মণা মনসা হবে।

পৃঃ ৫৪৮, ৩য় কলম :

যোগের শেষ কথা নির্বাণ-মুক্তির সাধন-এর পরিবর্তে নির্বাণমুক্তির সাধন হবে।

পৃঃ ৫৫০, ১ম কলম :

শ্রীঅরবিন্দের [illegible] অদ্বিতীয় লক্ষ্য [illegible] উদ্দেশ্য-এর পরিবর্তে নির্বাণ-মুক্তির উদ্দেশ্য হবে।

মা-কালী

দিলীপ দাশগুপ্ত
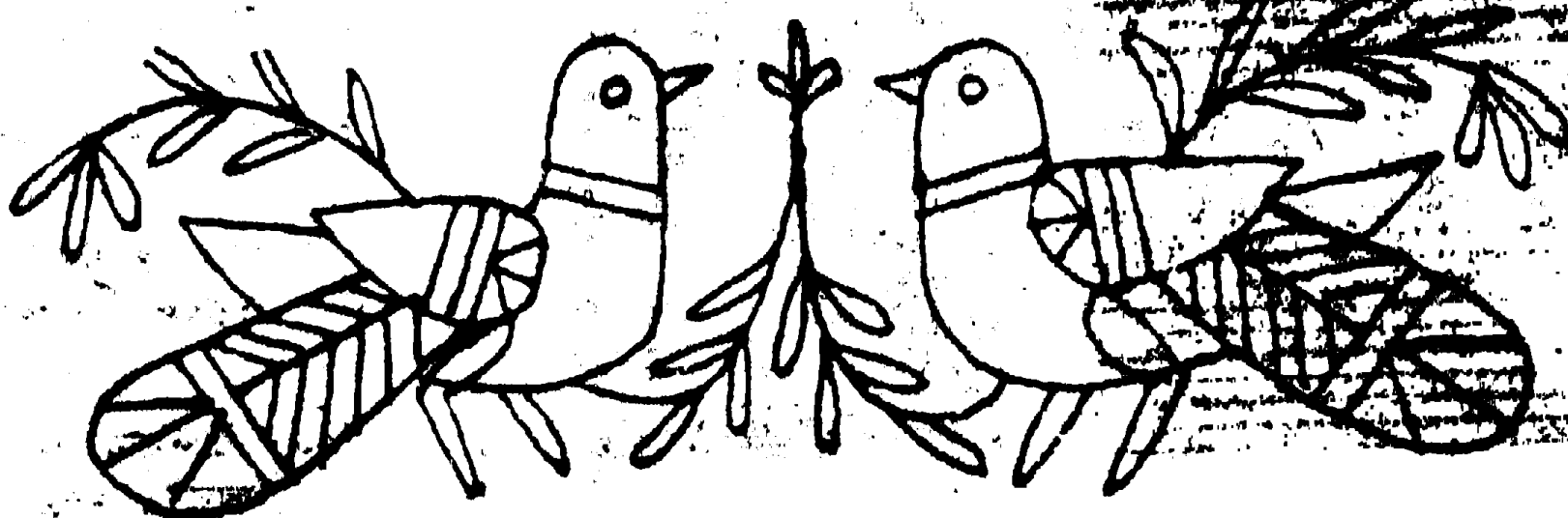
যার উদ্দেশ্যে অভিযোগ আর কটূক্তি বর্ষণ, সে কিন্তু একমনে পেতলের ঘটি ভরে মাথায় জল ঢালছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। কথাগুলো তার মাথাটাকে যেন গরম করেছে।

বেলাহাজ, একেবারে বেলাহাজ। দিদি,—মাইয়ারে লইয়া কান্দতে অইবে। সব্বোনাশ, চহারা দ্যাখছো? লাজ-লজ্জা নাই। ইহি, এ কেমন মাইয়া? ঘেন্না-পিত্ত নাই। ডাংগর বয়সে আমরা তোর মত কাউরে শরীল দেহাই নাই। এই সুমতি, কাপড় ঠিক করতে পারোস না?

সেই মুহূর্তে সুমতির চেহারাখানা দৃষ্টি-বিভ্রম। সতেরো বছরের যৌবনদীপ্ত সুগঠিত ঋজু-দেহের একমাত্র আবরণের সস্তা তন্তুগুলো জলে ভিজে রক্তমাংসের খাঁজে খাঁজে আত্মগোপন করেছে। মাথা থেকে জলস্রোত নামছে নিচে। স্থানচ্যুত শাড়ি অনেক জায়গায় জড়িয়ে-গুটিয়ে শরীরকে বে-আব্রু করেছে। অভিযোগে তার কান নেই।

দেহুক, দেহুক, চক্ষু সার্থক করুক। জ্বইল্যা-পুইর্যা মরুক।

আহারে দিদি, নালিস চলছে সমানে, মাইয়ারে রক্ষা করতে পারবি না। তোর মাইয়া গেল।

সুমতির মা মুক্তা বসেছিল আন্ডা-বাচ্চাদের সামলে নিয়ে। কলটার কাছেই তার অস্থায়ী বাসস্থান। কর্তা গেছে তদ্বির-তদারকে। শোনা যাচ্ছে, তাদের দণ্ড-কারণ্য নিয়ে যাওয়া হবে। সুমতির বাবা কার্তিক মণ্ডল কর্মঠ আর উদ্যোগী মানুষ। চাষবাস ভাল বোঝে। সুতরাং জায়গা পেলে আবার তার সংসার সোনার হবে। কিন্তু মানুষটা পৈতৃক ভিটে ছেড়ে এসে বড় ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে,—এই যা চিন্তার কথা। আসলে মুক্তাকেশীরও ভাবনা চিন্তা কম নয়। কিন্তু সেকথা প্রকাশ করে স্বামীর মনকে কমজোরী করতে চায় না।

দণ্ডকারণ্য কতদূর? কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল সুমতিকে। মেয়ে গ্রামের স্কুলে কিছুটা লেখাপড়া করেছিল। গড়-গড়িয়ে বই পড়তে পারে। ইংরেজীও। গাড়ীর ওপরে লেখা তামাম ইং[illegible] লেখাগুলো পড়ে। সে যা বলেছে তা মোটেই আশা-ব্যঞ্জক নয়। দণ্ডকারণ্য পাহাড়-জঙ্গল এলাকা। সাপ আর বাঘ। অনুর্বর জমি।

ক্যান,—সুমতি বলেছে, রামায়ণ শোন নাই কোনদিন? রাম-সীতার কথা। দণ্ড[illegible] বনে চোদ্দ বছরের বনবাসে গেছিল রাম সীতা?

বন-জংগলের কথাতে কার্তিক মণ্ডলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, [illegible] কইলি? বন-জঙ্গল? তাইলে নদীও আছে সুমতির মা, নদীনালা থাকলে তোমাগো লইয়া জাহান্নামে যাইতেও আমি ডরি না। নদীনালা আর গাছ-গাছালির লগে আমাগো জীবন এক হইয়া মিল্যা-মিস্যা গেছে। হেই নদীর যদি লাগোর পাই, অজন্মা জমিতেও সোনা ফলামু। জানো সুমতির মা, এই কদিন এদিক-ওদিক ঘুইরা কইলকাতা দেখলাম। জল নাই, জল নাই এ দ্যাশে। একটা পুস্কর্নীও দেখলাম না। আছেন মা-গঙ্গা। তোমারে একদিন নাইতে লইয়া যামু। নদীর উপরে এমন একটা পোল

আছে সুমতির মা—এলাহী কারবার। ...ক, সার্থক।

দিনের বেশী সময়ই কার্তিক টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

মুক্তা আকাশ-পাতাল ভাবছিল। তার পিসতুতো বোনের অভিযোগে মেয়ের দিকে তাকালো। সত্যই, মেয়েটা বড় বেলাহাজ। এত লোক-চলাচলের মধ্যে এমন কইরা কেউ স্নান করে? এই যে গাড়ীডা আইল, মানুষগুলা চাইয়া-চাইয়া যেন গিলা খাইতেছে সুমতিরে। এতবড় মাইয়ার এট্টু লজ্জ-লজ্জা নাই।

মায়ের ধমকে শাড়ি সামলালো সুমতি। ছোটো কাপড় ডাইনে আনলে বাঁয়ে কুলায় না। একদিক ঢাকলে অন্যদিকে বেরিয়ে যায়। আর ঢাকলেই বা কি! মানুষগুলোর যা চোখের চাহনি, ঢাকা থাকলেও যেন সব দেখতে পায়। সুতোর আবরণ ভেদ করে ওদের দৃষ্টি যেন গোপন অংশে গিয়ে লেহন করে।

মানুষগুলান ন্যাংটা মাইয়ামানুষ দ্যাহে।

দেখার সুযোগও অনেক। এই শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্ম জুড়ে অসংখ্য উদ্বাস্তু। পাকিস্থান থেকে প্রাণ আর ধর্মহানির ভয়ে সর্বস্ব খুইয়ে প্যালিয়ে আসা বেওয়ারিস মানুষ। মুসলিম রাষ্ট্রে স্থান নেই। অথচ হিন্দু রাষ্ট্রেরও ওদের জন্য মাথাব্যথা নেই। তবু আসতে হয়। এসে বসিরহাট আর হাসনাবাদের ক্যাম্পে সপ্তাহ দুয়েক বাস। তারপর এই শিয়ালদা স্টেশনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম। ঢাকনি নেই, আবরু নেই। শুধু মাথার ওপরে টিনের সেড। লজ্জা-সজ্জা শুধু কাপড় দিয়ে ঢাকা যায় না। অনেক কিছু আনুষঙ্গিকের প্রয়োজন। তা এই প্লাটফর্মে সম্ভব নয়। তাই আর চেষ্টা করে না সুমতি। শারীরিক প্রয়োজনের নিত্যকর্মগুলো সারতে হয় এখানে-সেখানে। প্লাটফর্ম আর গাড়ীর আড়ালে। কিন্তু আড়াল বলে কোন কথা এই শিয়ালদা স্টেশন আর তার চৌহদ্দিতে আছে নাকি? তামাম কলকাতা শহরেই নেই। যেখানেই যাও, মানুষের নজর পড়বেই। তাই সুমতি আর চেষ্টা করে না। তাই তো সে নির্লজ্জ হয়েছে।

কিন্তু দরকার ছিল কি এমন করে আসার? সুমতি বঙ্গ বিভাগ দেখেনি, তার অনেক পরে জন্ম। হিন্দু রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র সে বোঝে না। মোটামুটি-ভাবে পাকিস্থানে তারা ভালই ছিল গ্রামের মুসলমান পরিবারগুলোর সঙ্গে মিলে-মিশে। কিন্তু হঠাৎ কেমন করে যেন একটা হিড়িক এল দেশত্যাগের। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আগেই দেশ ছেড়ে এসেছে। এখন আরম্ভ হয়েছে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের।

কার্তিক মণ্ডলও পালালো গ্রামের অন্যান্য কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে। জলের দরে বিঘা-বারো জমি বিক্রী করে। তারপর দালালদের হাত ঘুরে ঘুরে বর্ডার পেরিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ। হিন্দুস্থান। সে প্রায় তিন সপ্তাহ আগের কথা।

এই তিন সপ্তাহ ধরে যা দেখেছে সুমতি, তাতে সে ক্রমাগতই নিরাশ হয়ে উঠেছে। বাবাকে বলেছে, কি দরকার আছিল দ্যাশ ছাড়ার? ধম্ম-ধম্ম কইরা গেলা, এহন তোমার ধম্ম কি দিতেছে তোমারে? এই যে হাজার হাজার মানুষ শিয়ালদা দিয়া যাওয়া-আসা করে কেউ আমাগো মানুষ বইল্যা মনে করে? আমরা নোমো-শূদ্দুররা তোমাগো হিন্দু-ধম্মের নিচের জাত। আমাগো লইগ্যা কারুর দরদ নাই। আমরা মরলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি? হিন্দু-ধম্মের খরচের খাতায় আমাগো নাম। তার থিক্যা মোছলমান হইয়া পাকিস্থানে থাকলে ভাল করতা বাবা। সবই থাকতো আমাগো। ইজ্জৎ প্রাণ জমি-জায়গা। মোছলমানের লগে আমারে নিকা দিলে সব ল্যাঠা চুইক্যা যাইত।

জবাব দিতে পারে না কার্তিক। মেয়ের মুখে বড় ধার। বুদ্ধিও অনেক। ওই বুদ্ধির জোরেই তো পৌঁছুতে পেরেছে হিন্দুস্থানের মাটিতে। মুসলমানদের খপ্পর থেকে বুদ্ধির খেলায় দু-দুবার জিতে এসেছে সুমতি।

বয়েসের দিক দিয়ে সুমতির শরীর একটু বাড়ন্তই। গায়ের রং কালো হলেও চেহারা ছাঁদ আর মুখশ্রী সুন্দর। তা ঘটনাটা পাকিস্থান ছাড়ার কয়েক মাস আগেকার কথা। কিছুদিন থেকে বিরক্ত করছিল মোয়াজ্জেল আর আখতার। কথাটা সে মাকে জানিয়েছিল। গ্রামের মোড়ল মনিরুদ্দিন কার্তিকের বন্ধু। কার্তিক নালিস করেছিল। সুমতি যতদূর জানে, মনিরুদ্দিন আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, কার্তিক, তোর মাইয়া, আমারও মাইয়া। মাইয়ার গায়ে কেউ হাত দিলে রক্ষা নাই। তুই বাড়ী যা।

কার্তিক তাতে নিশ্চিন্ত হয়নি। মেয়েকে পাঠিয়ে দিল গ্রামান্তরে তার বোনাই-এর বাড়ী। বোনাই-এর ব্যবসা আছে বাইরে। সেখানে মাস-দুয়েক থাকার পর সুমতি ফিরে এল। বোনাই হিন্দুস্থানে চলে যাবে। গ্রামে ফিরে আসার কয়েকদিন পর বিকেলে সই-এর বাড়ী থেকে সুমতি ফিরছিল সুপারী বাগানের পাশে ঢালা পথ ধরে। মোয়াজ্জেল আর আখতার হাজির হল দুধারি থেকে। মুহূর্তের মধ্যে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

সুমতি চেঁচায়নি। চেঁচিয়ে লাভ নেই। তার চীৎকার সুপারী নারকোল আর আম-জামের বাগানের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরে যেতে পারবে না।

সে বলেছিল, মোয়াজ্জেল, এত জোরে চাপলে ব্যথা পাই। ছাইড়া দেও, পলাইয়া যাই। পলামু না। আমি সব দিমু তোমাগো। এহন চাইপ্যো না।

সত্যই? উল্লসিত চোখে আখতার বলেছিল।

হ হ, দিমুই তো, সুমতি বলেছিল, আমার ইচ্ছা করে না সুখ পাইতে, সোহাগ খাইতে?

জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় সুমতিকে নামিয়ে দিল।

সুমতির কথা-বার্তায় ভয়ের লেশ মাত্র নেই। নেই লজ্জার আভাস। মুহূর্তের মধ্যে সে নিজের দেহে জড়ানো প্রথম নির্মোক ছেড়ে ফেলল। রইল মাত্র শেষ খোলস। তখন চক চক করছে মোয়াজ্জেল আর আখতারের দৃষ্টি।

এট্টা কথা কই কাপড়, সুমতি বললে, আমার মুখের কাছে মুখ আনবা না। আমার নিশ্বাস যেন তোমাগো গায়ে না

লাগে। আমার কিন্তু অসুখ আছে। সাবধান না হইলে তোমাগো হইতে পারে।

কী অসুখ? প্রশ্ন করল দুজনেই।

ছয় মাস বাড়ী আছিলাম না। কোথায় আছিলাম জানো? হাসপাতালে। নম্বইটা ইনজেকশন আর চাউলের খুদের মত ছোট-ছোট লাল অষুধ খাইয়া কেমন মোটা হইছি দ্যাহো না। অসুখ কিন্তু আমার আবার বাড়ছে।

কী রোগ?

সুমতি মুহূর্তের মধ্যে দাঁত দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে নিজের জিহ্বা। যন্ত্রণার অনুভূতিকে সে মোটেই প্রকাশ হতে দিল না। শুধু চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল।

রোগ? কাশতে আরম্ভ করল সুমতি। কাশির গমকে দুলে-দুলে উঠল শরীরটা। কেঁপে কেঁপে উঠল বুকের সমেরু।

হতচকিত আখতার আর মোয়াজ্জেল। বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে দেখল থুক-থুক করে গয়ার ফেলছে সুমতি। টাটকা তাজা রক্ত।

নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, অসুখটা খারাপ। যক্ষ্মা। আমার নিশ্বাসেও বিষ। তাই কই, মুখের লগে মুখ লাগাবা না।

তখন ওরা দুজনে পিছু হটছে পায়ে পায়ে।

ভীক! সুমতি বললে, দাইজনে কেন? একজন আড়ালে যাও। একজন-একজন কইর‍্যা।

আখতার মিনমিনে গলায় বলল, আমি কই কি সুমতি, আইজ থাউক। তোমার শরীল ভাল হউক আগে।

মোয়াজ্জেল সায় দিল সে কথাতে।

কেমন সব মরদ তোমরা যে ভয় পাও! তাড়াতাড়ি কাম সাইরা আমারে ছাইর‍্যা দাও। বাবায় কিন্তু খোঁজতে লাইব হইবে।

না, না, তুমি বাড়ী যাও সুমতি।

ওরা পালালো।

বাড়ী ফিরে সুমতি মাকে সব ঘটনা জানিয়েছিল। মুক্তা বলেছিল সোয়ামীকে। সেইদিনই তারা দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পথেও সুমতিকে নিয়ে বিপদ হয়েছে। সামনে ইছামতি। ওপারে হিন্দুস্থানের হিঙ্গলগঞ্জ। বর্ডার অতিক্রমের দিন সকালে মামুদগঞ্জের যুবক মোড়লটি দাবী জানালো, রেখে আসতে হবে সুমতিকে। কথাটা সবারই সামনে খোলাখুলিভাবে জানিয়েছিল।

তোমার মাইয়ারে আমি রাইখ্যা দিমু।

এগিয়ে এসে সুমতি বলল, মেঞা সাইব, তোমাম পাকিস্থানে এই প্রেথম এট্টা যুয়ান দেখলাম। আমার মত এটা ডাংগর যুবতীরে কেউ রাখতে চাইল না। চাইলা তুমি। মেঞা সাইব তোমারে সাবাস!

একটু থেমে কটাক্ষ করল সুমতি, আমারে কিন্তু নিকা করতে হইবে। তয়, মেঞা সাইব তোমাগো গ্রামে ভাল ডাক্তার আছে তো?

কেন, ডাক্তার দিয়া কি করবা তুমি?

আবার সেই অভিনয়। নিজের জিহ্বা এফোঁড়-ওফোঁড়।

মোড়ল সাহেবের সামনে থু-থু ফেলে বললে সুমতি, দ্যাহো না, কাশের লগে কত রক্ত ওঠে। আমার নিশ্বাসে যক্ষ্মার বিষ। তোমার বুক ঝাঁঝরা কইর‍্যা দিবে। ডাক্তার না থাকলে কয়দিন বাঁচাবা আমারে, নিজে বাঁচবা কয়দিন? আমারে ভোগ করবা কেমনে?

সুমতি দলা দলা রক্ত ফেলছে মোড়লের পায়ের সামনে।

মোড়ল সাহেব পিছু হটে বলল, না, তুমি হিন্দুস্থানেই যাও।

সেদিন রাতেই তারা বর্ডার পেরুল। আশ্রয় পেল হাসনাবাদের তাঁবুতে। দু সপ্তাহ পরে শিয়ালদা স্টেশনের আট নম্বর প্লাটফর্মে। তাও আজ ছ সাত দিন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস সুমতির অজানা। ১৯৪৭-এর কয়েক বছর পরে—পূর্ববঙ্গের নিম্ন-বর্ণের এক গ্রামীণ হিন্দু পরিবারে তার জন্ম। শিক্ষায় তাদের শ্রেণী বরাবরই অনুন্নত। কিন্তু সে শুনেছে লাঠি সড়কি নিয়ে হিন্দুধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত তাদের লড়ে যেতে হয়েছে বিধর্মীর সংগে।

পাকিস্থান হবার পরই নাকি তারা পড়াশুনার কিঞ্চিৎ সুযোগ পেয়েছে। খানিকটা সমাদর পেয়েছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে। কেন না, দেশত্যাগের পরে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি হিন্দু পরিবার ছিল, নিজেদের অসহায় বিবেচনায় নিরাপত্তার কারণে নিম্নবর্ণের এই শ্রেণীর সঙ্গে তারা হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

কলমের খোঁচায় দেশ ভাগ হল। কিন্তু অনাদৃত-অবহেলিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কথা কেউ ভাবল না। দাঙ্গার পর দাঙ্গায় যে হাজার হাজার হিন্দু মরল, তাদের জন্য দেশভাগ করনে-ওয়ালা নেতারা কি করেছেন তা সুমতির জানা নেই। জানা নেই, তাদের মেয়ে-বউরা বিধর্মী রুচিহীন পুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা হলে কি করতেন।

সুমতি শুনেছে, দেশভাগের পরে ইতিহাস শুধু ধর্ষণ আর নরহত্যার। জ্ঞান-গম্যি হবার পরে এসব ঘটনা কম্বর [illegible] পেয়েছে।

সুখের সন্ধানে, শান্তির [illegible] বর্ণের এই সব দারিদ্র হিন্দু [illegible] বিভাগের তেইশ বছর পরে [illegible] রাজনৈতিক দাবাখেলার খুঁটি [illegible] মাটি ছেড়ে কক্ষ পরিবর্তন করতে [illegible] করেছে। ভবিষ্যৎ সুখ স্বপ্নের [illegible] বহু দুঃখ কষ্ট আর সর্বস্বের [illegible] পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এসে পা [illegible]।

কার্তিক মণ্ডল আশাবাদী। এখনও [illegible] বাহুতে শক্তি আছে। লাঠি-লাঙ্গল ধরতে ওস্তাদ। কিছু জমির মালিকানা তার প্রত্যাশা। আর [illegible] চাষী [illegible] তা হলেই সে সুখী।

কিন্তু সুমতির সন্দেহ [illegible] শুনেছে, বহু উদ্বাস্তু নাকি [illegible] দণ্ডকারণ্য থেকে নানা ভাসবিধার [illegible] রোগে বহু প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। [illegible] দৃঢ় বিশ্বাস যা ফেলে এসেছে [illegible] কোনদিন ফিরে পাবে না।

এখানে, এই স্টেশনের প্লাটফর্মে [illegible] পর দিন থাকা যায় না। মেয়েদের [illegible] লুকোবার আব্রু নেই। [illegible] যাত্রীর দৃষ্টি প্রলোভিত [illegible] নারী-দেহকে। সুমতি লক্ষ্য করেছে [illegible] বসতে চলতে শুতে শত-সহ[illegible] দৃষ্টি। অনেকে টাকা দেখা[illegible] [illegible] কেউ-কেউ বিপদে [illegible] আর যায় বলেই তো উঁকি-ঝুঁকি। [illegible] দিনকে-দিন সুমতি বুঝতে পারে [illegible] গুলো সাংঘাতিকভাবে কামুক হয়ে উঠ[illegible] কম-বয়সী মেয়ে দেখলেই ওরা [illegible] হয়ে ওঠে।

কামনার এই বিকার, এও তো এক রোগ। সুমতি জানে, এ ব্যারাম কেউ সারাতে পারবে না। সে যদি সত্যই যক্ষ্মারোগী হত! লুব্ধ আর কাম-জর্জর মানুষগুলোর সম্প্রদানের অছিলায় ক্ষয়-রোগের [illegible] মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে সর্বনাশী [illegible] খিলখিল করে হেসে উঠত।

কিম্বা ইচ্ছা করে মা-কালী [illegible] দাঁড়িয়ে থাকতে খাঁড়া নিয়ে! দেখে [illegible] প্রাণ ভরে দেখে নে। শুধু মুণ্ডটা [illegible] মা খাঁড়ার ঘায়ে।

সেই কাটা মুণ্ডের খোলা চোখ [illegible] তোরা মেয়েমানুষের শরীরের গোপন অংশগুলো প্রাণ ভরে দেখে নে।

অঙ্গনা

ফিজিকাল ফিটনেস

অনেকদিন আগে কলকাতা ময়দানে একদল মেয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল যারা নিয়মিত ফুটবল চর্চা করতেন। শহরের নানা প্রান্ত থেকে তাঁরা এসে জড়ো হতেন প্র্যাকটিশের জন্য। ওঁরা সবাই কলেজের পড়ুয়া। এতোদিন পর্যন্ত আমরা ছেলেদেরই এই খেলায় একচেটিয়া অধিকার বলে জানতাম। অন্তত আমাদের দেশে। বিদেশে মেয়েরা ফুটবল খেলে। এ সংক্রান্ত নানা ট্রফিও ওদের আছে। কিন্তু আমাদের দেশেও যে তা সম্ভব হবে অতোখানি ভাববার মতো যথেষ্ট কারণ কোন সময়েই হাতের কাছে পাইনি। এটাকে নেহাত দুরাশা বলে মনে করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি যেদিন খবরটা পেলাম সেদিন যথেষ্ট কৌতূহল হয়েছিল। এবং সেই সঙ্গেই মেয়েদের খেলাধুলার ব্যাপারে নানা চিন্তা মনের কোণে দানা বেঁধেছিল। বিরাট উৎসাহ নিয়ে তাই একদিন ওদের প্র্যাকটিশ দেখতেও হাজির হলাম কলকাতা ময়দানে।

গোটা বার মেয়ে ফুটবল নিয়ে ছোটাছুটি করছিল। দেখে মনে হলো ওদের পায়ে খেলা আছে। আর সেই সঙ্গে রয়েছে গভীর আন্তরিকতা। সবাই যেমন খেলা শিখতে চান তেমনি খেলাধুলায় পিছিয়ে পড়া এই জাতটার দুর্নামও ঘোচাতে চান। কথায় কথায় জানতে পারলাম যে শিগগিরই ওরা ফুটবল ম্যাচ খেলতে কলকাতার বাইরে যাবেন। তখন আর কোন সন্দেহ রইলো না যে এই শহরের বাইরেও কোথাও কোথাও ফুটবল মাঠে মেয়েদের আগমন ঘটছে। সেদিন তাই ওঁদের সাফল্য কামনা করে ফুটবল খেলায় আরো বেশি মেয়ের অংশগ্রহণের আশা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। আর মনে মনে ভেবেছিলাম, এভাবে যদি খেলাধুলায় আমাদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ প্রকাশ পায় তবে আর কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে আমরা যোগ্যতার স্বীকৃতি পাব।

কিন্তু আমার এবং আরো অনেকের সেই স্বপ্ন দেখা সফল হয়নি। যে উৎসাহ নিয়ে মেয়েরা ফুটবল খেলতে শুরু করেছিলেন পরবর্তী সময়ে সেই উৎসাহের আর কোন প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করিনি। প্র্যাকটিশের আসরও এখন আর নিয়মিত বসে না। তাও অনিশ্চিত হয়ে গেছে সে খবরও সঠিক বলা দুষ্কর। অথচ সম্ভাবনা ছিল। আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। এক্ষুনি খুব বড়ো কিছু করা সম্ভব না হোক মেয়েদের খেলাধুলার দিগন্তের প্রসার ঘটানো যেতো তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

এমনিভাবে আমাদের অনেক সম্ভাবনাই অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। খেলাধুলায় মেয়েদের ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টা আমাদের দেশে আজো হয়নি। অথচ বিভিন্ন দেশের মেয়েরা যখন অলিম্পিকে দুটি বা তিনটি করে স্বর্ণ পদক আদায় করে নেন আর আমাদের দেশের ভাগ্যে কিছুই জোটে না তখন ভীষণ খারাপ লাগে। আমরা সর্বদিক দিয়ে এগিয়ে চলেছি শুধু এখানে এসেই মার খেয়ে যাচ্ছি। আমাদের পুরুষরা যেমন একক্ষেত্রে অকর্মার ধাড়ী তেমনি আমরাও নিষ্কর্মা বুড়ি। আমরা ধরেই নিয়েছি এর প্রতিকার আমাদের সাধ্যাতীত।

আমাদের দেশে মেয়েদের হকি, বাস্কেটবল, ভলিবলের টুর্নামেন্ট আছে। প্রতি বৎসর আন্তঃরাজ্য খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বেশ জাকজমকসহকারে। কিন্তু সে খেলা কজনকে টানে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এসব খেলার দর্শকদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা নগণ্য। কয়েক বছর আগে কলকাতায় হকি এবং বাস্কেটবলের সর্বভারতীয় আসর বসেছিল। প্রায় প্রতিটি খেলায় আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু দর্শকদের আসরে যাদের দেখেছি (সংখ্যায় তাঁরা খুবই কম) তাঁদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা হাতে গোনা চলে। যাঁরা খেলছেন তাঁরা যেন একমাত্র নিজেদের স্বার্থে খেলছেন। তাঁদের উৎসাহ দেওয়া বা তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কারো নেই। খেলার মাঠে হাজির থেকে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি তারপর আর এধরনের উক্তি করা ছাড়া উপায় নেই।

মাঝে মাঝে আবার কিছুটা আশ্বাসেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন কয়েক বছর ধরে পর্বতারোহণ নিয়ে মেয়েদের মধ্যে বেশ সাড়া জেগেছে। প্রতি বছরই মেয়েরা দলে দলে বেরিয়ে পড়ছেন পর্বত-অভিযানে। সবসময় যে সফল হওয়া যাবে এমন কোন কথা নেই কিন্তু এমন দুঃসাহসে ভর করে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়াই হচ্ছে আসল কথা। এই পরীক্ষায় আমাদের মেয়েরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অভিযাত্রী মেয়েদের দুঃসাহসে ক্ষুব্ধ পর্বত কেড়ে নিয়েছে অনিমা-সুজয়াকে। কিন্তু মেয়েদের মনোবল একোটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং তা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ঘরকাতুরে মেয়েদের দুর্নাম ঘোচানোর পক্ষে এই পর্বতারোহীর দল নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

যে দেশের মেয়েরা পর্বতের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করার সাহস রাখে মাঠে-ময়দানে তাঁদের তেমনভাবে নজরে পড়ে না কেন? এই উত্তর খুঁজতে খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। উত্তর রয়েছে আমাদেরই কাছে। সেদিন এক ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলছিলেন। তিনি জানালেন, 'রক্ষণশীল পরিবারের লোক আমরা। মেয়েদের বেশি বাইরে যাওয়া পছন্দ করি না। তাই স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে লেখাপড়া ওদের শেখাইনি। আর যতই লেখাপড়া শিখুক মেয়েদের তো হাঁড়ি ঠেলতেই হবে তাই ওদিকটায় আর তত নজর করিনি।' ভদ্রমহিলার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। মুখের ওপর প্রতিবাদ করা অশোভন তাই চুপ করে রইলাম। বিশেষত ভদ্রমহিলা বয়সে প্রাচীন। কিন্তু মনে মনে জ্বলে যাচ্ছিলাম। লেখাপড়া সম্বন্ধে যদি এই ধারণা হয় তবে এহেন মায়ের মেয়ে কিভাবে মাঠে-ময়দানে খেলাধুলো করতে আসবে? বুঝতে বাকি রইলো না যে খেলাধুলোর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এখনও একশ্রেণীর মেয়ের কাছে নিষিদ্ধ। কারণ, বাইরে বেরিয়ে তারা তো লেখাপড়াই শিখতে পারছে না। সুতরাং খেলাধুলোর কোন প্রশ্নই তার আসে না।

অথচ এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন মা-বাবার উৎসাহ। মা-বাবা যদি সন্তানের প্রতি বিমুখ হন তাহলে কপাল চাপড়ে মরা ছাড়া কোন পথ আছে বলে তো জানা নেই। অথচ সুযোগের অভাবে মেয়েরা খেলাধুলো করতে পারছে না এমন নজীরও আছে। এক বাড়ির গিন্নির সঙ্গে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'মেয়েরা এখন খেলাধুলোয় তেমন আগ্রহী নয়। তবে ভাই, আমাদের সময় এতো সুযোগ না থাকলেও খেলাধুলো করেছি। পাড়ার বন্ধুরা মিলে হাডু-ডু খেলেছি। আরো মেয়েদের কতো খেলা। যাতে রীতিমতো শারীরিক পরিশ্রম হয়। তখনকার দিনের নিয়ম অনুসারে মাঠে-ময়দানে নয় বাড়ির উঠোনে খেলতাম। আর পাড়াগাঁর মেয়ে আমি। খুব সাঁতার কাটতে পারি। সবাই মিলে যখন জলে নামতাম ঘণ্টা দুয়েক কেটে যেতো। বাপের বাড়ি গেলে এই সুযোগ আজো পাই। কিন্তু এখানে তো আর তেমন সুযোগ নেই। সারাদিন কাজকর্ম করে কিরকম একঘেয়ে লাগে। সেরকম ঘেরা পুকুর টুকুর পেলে একটু সাঁতার কাটতে পারলে শরীরটা ফিট থাকে। আর এ শুধু আমার একার আকাঙ্ক্ষা নয়। এই তল্লাটের অনেক গিন্নিই আমার মতো বিকেলবেলা জলে নেমে হুটোপাটি করতে চায়। কিন্তু চাইলে কি হবে সেরকম ব্যবস্থা তো নেই।'

আবার আর একজন ভদ্রমহিলাকে জানি যিনি কোন প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকার করে নেননি। খেলাধুলোয় তাঁর বরাবরের আগ্রহ। ছেলেবেলায় তিনি নিজে খেলাধুলো করতেন এবং এখনো ঘরসংসার করে নিয়মিত বাড়ির পাশের মাঠে একবার হাজিরা দেওয়া চাই। তিনি মেয়েদের মাঠে-ময়দানে পাঠিয়েছেন। এক একটি মেয়েকে এক এক দিকে। কেউ সাঁতার কাটে, কেউ সাইকেল চালায়। আশেপাশে জায়গা নেই। তাই মেয়েকে রেড রোডে অথবা রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে সাইকেল চালাতে নিয়ে যান। অবশ্য সঙ্গে কর্তাও থাকেন। খেলাধুলোয় দুজনেরই আগ্রহ খুব। ভদ্রমহিলা কাউকে দোষ দেন না। শুধু বলেন 'আগ্রহ থাকলে সব হয়। তবে সবকিছুর সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার।'

তারপর তিনি যেকথা বললেন তা আরো মূল্যবান। 'আসলে কি জানেন,

ফিজিকাল ফিটনেস সম্বন্ধে আমাদের কারো সম্যক জ্ঞান নেই। এদেশের পুরুষরাই এ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নন। আর মেয়েদের কথা তো না বলাই ভাল। আমাদের সকলের মুখে প্রায় একই কথা শুনতে পাবেন, শরীর ভাল নেই। কিন্তু কি করলে শরীর ভাল হবে সেকথা প্রায় অনেকেই ভাবেন না। শরীরের ভার ডাক্তারকে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত। অথচ খেলাধুলোয় শরীর শুধু সুস্থ থাকে তাই নয় শরীর গড়েও ওঠে। অনেক অহেতুক ঝামেলা থেকে শরীরকে বাঁচানো যায়। একথা সবাইকে বুঝতে হবে।'

কথাটা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে মেয়েরা খেলাধুলোয় নিতানতুন রেকর্ড করে চলেছে আর দীর্ঘশ্বাস আমাদের একমাত্র সম্বল। এর প্রতিকার উপযুক্ত শারীরিক মানদণ্ড গড়ে তোলা এবং এজন্য সবাইকে খেলাধুলো করতে হবে। আর খেলাধুলোর জন্য সুবন্দোবস্ত করতে হবে। সেজন্য গাঁয়ের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। শহরে আমরা তবু কিছু সুযোগ-সুবিধা পাই। কিন্তু গ্রাম আমাদের উপেক্ষিত। অথচ আসল প্রাণসম্পদ রয়েছে সেখানে। তাই গ্রামে গ্রামে স্পোর্টস সেণ্টার খুলে মেয়েদের আরো বেশি করে খেলাধুলোয় উৎসাহ দিতে হবে। তাহলেই আমাদের দীর্ঘশ্বাসের অবসান হবে।

রাজনীতিতে আমাদের ভূমিকা আজ খুব উজ্জ্বল এবং বলিষ্ঠ। এই উজ্জ্বলতা এবং বলিষ্ঠতা এবার জীবনের সকল দিকে [illegible] ছড়িয়ে দিতে হবে। তার জোয়ারে [illegible] উঠবে প্রাণ-বন্যা। মুখরিত হবে মাঠ-ময়দান। খেলাধুলোর নবীন জীবন লাভে আমরা ধন্য হব। পঞ্চাশ কোটি নরনারীর দেশ ভারতবর্ষ তখন বিশ্ব-ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নতুন মহিমায় অভিষিক্ত হবে। আর এজন্য প্রয়োজন আমাদেরই উদ্যোগ, সার্বিক আত্মবিকাশের আন্তরিক প্রচেষ্টা। তা যদি পারি তাহলে আমাদের নেতৃত্বে যেমন দেশ পরিচালিত হচ্ছে তেমনি খেলাধুলোর ময়দানে উড়বে আমাদেরই বিজয়কেতন।

—প্রমীলা

ঘটপুতুল

মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

আজকাল আমরা নিজেদের বিদেশীদের মত তৈরী করার চেষ্টা করছি। ঘরদোর আর ভারতীয় প্রথায় সাজাই না। বৈঠকখানাকে বলি ড্রয়িংরুম। ড্রয়িংরুম যে-ঘরকে বলা হবে, সেই ঘরকে ফরাস অথবা সতরঞ্চি, তাকিয়া দিয়ে সাজানো যায় না। ড্রয়িংরুমে চাই সোফাসেট টি-পয়, মেঝেয় কার্পেট, ভাসে ফুল, পেতলের ঝোলানো টবে মাণি-প্ল্যাণ্ট। ঘরের কোণে ইজিপ্ট থেকে আনা কোন রিলিফ। অথবা বিদেশী প্রিমিটিভ আর্টের কোন নিদর্শনের নকল ছাপ। ডাইনিং হলে চাই—লম্বা ডাইনিং টেবল, সারি বাঁধা চেয়ার, গ্যাসচুল্লি, ফ্রিজটর ইত্যাদি ইত্যাদি...। সব জিনিসের বিবরণ দিতে গেলে ঐ জিনিসের লিস্ট লিখতেই পাতা শেষ, আমি যা বলতে চাই তা আর বলা হবে না। ঐসব জিনিস দিয়ে ঘর সাজানোতে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। যা ভালো তা সব সময়েই গ্রহণীয়। কিন্তু ঐসব বিদেশী জিনিসের সঙ্গে দু-একটি দেশীয় মোটিভ রাখলে ক্ষতি কি? বরং সেটা হবে আরো মডার্ন। বিদেশীরাও ভারতের লোকশিল্প সংগ্রহের দিকে মন দিয়েছে।

পশ্চিমবাংলার একটি বিশিষ্ট লোকশিল্প হলো পোড়ামাটির পুতুল। যেমন ঘোড়া, পাল্কী, হাতী, বেনে-বৌ ইত্যাদি। এগুলির গঠন যাই হোক, এইগুলির ওপর লাল, কালো, সাদা রং দিয়ে নকসাগুলি দেখার মত।

এই পোড়ামাটির পুতুল আপনারা নিজের হাতে তৈরী করে ঘর সাজাতে পারেন। দেখবেন এতে আপনার ঘরের সৌন্দর্য কত বেড়ে গেছে। শুধু সৌন্দর্যই বাড়বে না নতুনত্বের দিক থেকেও প্রথম স্থান নেবে। পুতুলটি তৈরী করা খুব সহজ। আমি আপনাদের বলছি কেমন করে পুতুলটি তৈরী করতে হবে।

এই পুতুলটি তৈরী করতে লাগবে তিনটি ঘট। একটি ছোট গোল ঘট, আর দুটি লম্বা বড় ঘট। কেমন ধরনের ঘট লাগবে এক নম্বর ছবিতে দেখানো হল। কুমারটুলিতে গেলে আপনি পছন্দমত ঐ মাপের ঘট পাবেন। আর চাই দু-তিনটি তুলি এবং চারটি ফেব্রিক কালার। কালো, হলদে, কমলা, লাল। সাদাও নিতে পারেন একটি। প্রথমে ছোট গোল ঘটটির ওপর চোখ, নাক, কান, ঠোঁট আঁকুন। ২নং ছবি দেখুন। তারপর খ চিহ্নিত ঘটের দেহের ওপরের অংশ আঁকুন। গ ঘটে আঁকবেন দেহের নীচের অংশ। কেমন করে নকসাটি আঁকবেন—পাশের ছবিতে দেখানো হল। ঘট-তিনটি আঁকা হয়ে গেলে পর পর সাজিয়ে ফেলুন। নকসা মিলিয়ে বসাবেন। দেখুন কেমন সুন্দর একটি পুতুল তৈরী হয়ে গেলো। ফেবিকল দিয়ে অথবা একটু পুটিং দিয়ে ঘটগুলি জোড়া দিয়ে, ঘরের কোণে টিপয়ের ওপর সাজিয়ে রাখতে পারেন। কিম্বা আঠা দিয়ে না জুড়ে চায়ের টেবিলে রাখতে পারেন। চা পরিবেশন করার আগে ঘটের পুতুলের মধ্যে বিস্কিট রেখে দেবেন। চা পরিবেশন করার সময়ে আপনার অতিথিকে যদি পুতুলের পেটের ভিতর থেকে বিস্কিট বের করে দেন, ব্যাপারটি খুব মজার হবে। সুদৃশ্য বিস্কিটের টিন, পলিথিনের কৌটো, কাঁচের জার থেকে বের করার চেয়ে অনেক মডার্ন এবং সুরুচিপূর্ণ হবে।

খ
গ
এই ঘটটি উল্টো করে আঁকতে হবে
২নং
পুতুল
পুতুলের পুজো

কোন জীবিকাই উপেক্ষণীয় নয়

তখন পূবে আকাশে সূর্য ওঠে নি। আকাশটা সবে আবছা লালে ছেয়ে গেছে। শীতের হাড়কাঁপানো বাতাসটা পাতাল ফুড়ে হু-হু করে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। খানকয়েক ট্রাম ঘড়ঘড় শব্দ তুলে রাজপথের বাসিন্দাদের ভোর হয়েছে জানান দিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে গেল।

এমনি রোজ সকালে আমার প্রতিবেশিনী একটি কলেজের ছাত্রী শীতের সকল বাধাকে উপেক্ষা করে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যেত। মনে মনে ভাবতাম পড়শীরা যখন ঘুমের শেষ আমেজটাকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য চাদরটাকে আটসাঁট করে গায়ে ঢেকে নিচ্ছে সে সময় ঐ মেয়েটি হাড়কাঁপানো শীতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে?

আর একদিন বর্ষার ঘনবর্ষণ। বাড়ীঘর, গাছপালা, আকাশ পর্যন্ত ধোয়ামোছা করে তীরের ফলার মত পৃথিবীতে নেমেছিল। সেদিন মানুষ তো দূরের কথা কাকপক্ষীও বাসা ছেড়ে বাইরে বেরুতে সাহস করে নি। এমনি দুর্যোগময় এক সকালে রং-চটা একটা শাড়ীতে নিজেকে যথাসম্ভব জড়িয়ে জল-কাদা ভেঙে মেয়েটি এগিয়ে চলছিল রাজপথের দিকে, সেদিন বোধহয় ওর বেরুতে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল। হয়তো বর্ষাসিক্ত সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় অতিরিক্ত একটু তন্দ্রায় জড়িয়ে নিয়েছিল। ঈশ্বর জানেন ওর কপালের লিখন সেদিন কি ছিল। আমার মাঝে মাঝে কৌতূহল হতো—ওর এমন কি কাজ আছে যার কাছে গ্রীষ্ম-বর্ষা জল-ঝড় কাদা-মাটি সমস্তই তুচ্ছ! প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছিলাম মেয়েটি নাকি কোথায় একটা কাজ করে। অথচ এমন কি কাজ থাকতে পারে যার থেকে ওর একদিনও ছুটি নেই! আর একদিন ওকে দেখেছিলাম ক্লান্ত, বিমর্ষ মুখ নিয়ে জানলায় উঁকি দিতে। সেদিন সি. আর. পি পাড়া ঘেরাও করেছিল। বাধ্য হয়ে অন্য সবাইয়ের মতো তাকেও সেদিন আটকে থাকতে হয়েছিল খাঁচায় বন্দী পাখীর মত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে।

আমি মনে মনে কেমন যেন অধীর হয়ে উঠতে লাগলাম—মেয়েটি দিনের পর দিন কোথায়, কোন কাজে নিজেকে এভাবে ব্যস্ত রাখছে জানবার জন্যে ব্যস্ত হলাম। কিন্তু বহু ইচ্ছা সত্ত্বেও ওর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাই নি। ক'দিন আগে আমি খুব ভোরে হাওড়াগামী একটি বাস ধরবো বলে রাস্তার অপেক্ষা করেছিলাম—দেখি মেয়েটি আমার পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি পাবার এই সুযোগটাকে কোনরকমে হাতছাড়া করতে চাইলাম না। উপযাজক হয়ে সরাসরি নিজেই জিজ্ঞেস করলাম। এত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছেন?

আমার এই প্রশ্নে ও বেশ বিব্রত বোধ করলো। খানিক ইতস্তত করে বললো, 'আমাদের অভাবের সংসার হলেও মা আমাকে ঠিক কাজ করতে দিতে চান না। আমি কলেজে পড়ছি, উত্তরোত্তর অভাবে আমাদের দৈন্যদশা দিন দিন প্রকট হয়েছে। আমি তাই পরিবারের বাধাকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েছি। মেয়ে হয়েছি বলে উপার্জন করে মা-বাবাকে খাওয়াতে পারবো না, এ অধিকার আমাদের নেই এই সংস্কারকে নস্যাৎ করে দিতে চাই। অথচ আমি একজন কলেজের ছাত্রী—আমার ক্ষমতা যাই থাকুক, সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।'

রুদ্ধশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ও বোধহয় অনেকটা সহজ হয়েছিল। কিন্তু সেদিন বোধহয় ওর অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছিল তাই আমাকে হেঁয়ালির মধ্যে ফেলে রেখে ভবিষ্যতে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ত্বরতর করে এগিয়ে গেল। বুঝলাম উচ্ছ্বাসে সেদিন হয়তো খানিকটা আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে। অথচ কোথায়, কি কাজ করে তার বিন্দুমাত্র আভাস দেবার আগেই উধাও।

দিন দুই বাদে সেই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে মেয়েটি আমার বাড়ী এসে হাজির হয়েছিল। সেদিন কথায় কথায় ওর পরিবারের কথা ওদের দুঃখের কথা সব কিছুই বলেছিল, গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছিলাম ওর বাপের দৃষ্টিহীনতার কথা শুনে, দাদার বেকারত্বের জ্বালা শুনে, আরও শুনেছিলাম সংসারের হাড়ভাঙা খাটুনীর পরে মায়ের দিন-মজুরীতে জামা সেলাই-এর কথা। অত অভাব সত্ত্বেও মা মেয়েকে কোনরকম কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ভেবেছিলেন অভাব-অনটনের বোঝা একা নিজের মাথায় চাপিয়ে তার ভার বইবেন, ঘরে বসে কোন কাজ করে লড়াই করবেন। অথচ কলেজে পড়া মেয়ে মায়ের আয়ে আরও কিছু যোগান দিতে বদ্ধপরিকর। কথা বলতে বলতে ওর চোখে-মুখে দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল। সেই দৃঢ়তা নিয়ে জোর গলায় ও বললো 'জানেন বন্ধুদের চেষ্টায়, কত কষ্টে আমি হরিণঘাটার দুধের ডিপোতে একটা কাজ জোগাড় করেছি তা আমি কিছুতেই ছাড়বো না। অথচ এত অভাব সত্ত্বেও আমার বাইরে চাকুরীর কথা শুনে মা তো প্রথমদিন মারমুখী হয়ে উঠলেন। দিন চারেক মুখ ভার করে রইলেন—মনে হল আমি কত খারাপ কাজ করেছি। আসলে মায়েরা এখনও সেই সংস্কারে অন্ধ। মেয়েরা যে চাকুরী করতে পারে, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে—এটা কিছুতেই তাঁরা মানতে চাইছেন না।

আমিও সহানুভূতির স্বরে বললাম, 'আপনিও নিশ্চয়ই ঠিকমতো বোঝাতে পারেন নি মেয়েদের চাকুরী করার কত প্রয়োজন। অভাব অনটনের জন্য শুধু পুরুষেরা লড়াই করলে চলবে কেন, ঘরের মেয়েদেরও তাদের সহযোগিতা করতে হবে। প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশে স্বামী-স্ত্রীরা একসঙ্গে উপার্জন করে স্বচ্ছল জীবন-যাপন করতে চেষ্টা করছে, তবে আমাদের দেশের নারী-পুরুষেরাই বা কেন দুবেলার দু মুঠো সংগ্রহের জন্য এগিয়ে যাবে না!'

আমার কথার জের টেনেই মেয়েটি বলে উঠলো, ছাত্রী হয়ে এই কাজটি পাবার জন্য আমি কত উপকৃত। অল্পসময়ে সসম্মানে যা উপার্জন করছি তা আমার প্রয়োজনের তুলনায় যদিও কিছু নয় তবুও সামান্য সাহায্য তো হচ্ছে। অথচ আমার মায়ের ধারণা জনে জনে যে দুধের বোতল এগিয়ে ধরছি সেটা নাকি একটা বিরাট অসম্মানের কাজ।' মনে মনে ভাবলাম, হরিণঘাটার দুধের ডিপোর কাজ কখনই অসম্মানের নয় যেমন বিদেশের ছেলে-মেয়েরা তাদের অবসর সময়ে—ছুটিতে রেস্তোরার কাপডিশ ধোওয়া, বাড়ীর জানলা-দরজায় রং করা প্রভৃতি সাধারণ কাজগুলোকে সম্মানহানিকর বলে মনে করে না। আমরা কিন্তু ঠিক তার বিপরীত—বহুদূরে পিছিয়ে আছি! বিদেশে ছেলে-মেয়েদের এসব কাজে কোন কিন্তু বোধ, সংকোচ বা লজ্জা নেই। বিদেশের বাবা-মারা ছেলে-মেয়েদের রোজগার করতে উৎসাহিত করেন। আশা করি মেয়েটির মা-বাবাও একদিন এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবেন।

এতসব কথা জানার পরেও একটা কৌতূহল আমার মনকে ক্রমাগত আলোড়িত করছিল। তাই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কর্তব্যে আপনি এত সচেতন যে ঝড়-বৃষ্টিও কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে না। কেন বলুন তো?' ও সহাস্যে উত্তর দিল, 'জানেন এ কাজটাকে আমার বড় পছন্দ। নিয়মমতো ছোট ছোট শিশুদের বাবামায়ের হাতে দুধের বোতল তুলে দিয়ে আমি কত আনন্দ পাই। মনে হয় সমাজসেবার একটা অংশের কিছুটা অন্তত আমি ভালভাবে পালন করছি।'

ওর কর্তব্য-সমাপনের আনন্দ আর কথার আন্তরিকতার স্পর্শ ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও যেন সুখী করে তুললো।

অঞ্জলি চৌধুরী

জলসা

নজরুল-জয়ন্তী

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত নজরুল জয়ন্তীর সেই মধুর সকালটিতে আমরা যেন মুহূর্তের জন্য ফিরে পেয়েছিলাম— কবির যৌবনজলের 'হাসি-উজল, কান্না-সজল" দিনগুলি, যে দিনগুলি হারিয়ে গেছে বলেই তার আকর্ষণ এমন দুর্বার।

অতীতের প্রবীণ শিল্পীতালিকার ছিলেন সর্বশ্রী আঙ্গুরবালা দেবী, যূথিকা রায়, সুপ্রভা সরকার ও সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়। একালের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, অনুপ ঘোষাল, পূরবী দত্ত, সুমিত্রা রায় ও সুমিত্রা ঘোষ।

প্রবীণদের কাছে আমরা কেউ নবীনের সতেজ স্ফূর্তি অথবা কণ্ঠলাবণ্যের সুষমা আশা করি না। কিন্তু এ সবের ক্ষতিপূরণ স্বরূপে যা পাওয়া গেল তার দামও নেহাৎ কম নয়। রেওয়াজী গায়কীর বিলীয়মান দীপ্তিতে ক্ষণদ্যুতি বিকীরণ করেছে আঙ্গুরবালার "যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই" 'আজকে না হয় একটি কথা' ও 'এত জল ও কাজল চোখে'। নজরুলের বিশেষ আঙ্গিকটির প্রামাণ্য নজীর হিসেবেও এর বিশেষ মর্যাদা অনস্বীকার্য। সুপ্রভা সরকারের "কাবেরী নদীজলে"র কাব্যসুন্দর স্বপ্নময়তাও কি কম উপভোগ্য? যূথিকা রায় তাঁর কোমল ব্যঞ্জনাময় গায়কীকে মূর্ত করলেন "প্রভাত বেলায় বাজে" ও 'মনে পড়ে যায়' গানদুটিতে। সত্যেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবির ভক্তিভাব ও কারারুদ্ধ জীবনের অপরাজেয় বলিষ্ঠতাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন 'বজরে জবা' ও 'নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে' গানে।

সাম্প্রতিক কালের শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম। 'আমি চিরতরে দূরে সরে যাব', 'তুমি সুন্দর তাই' গানদুটিতে অভিমানাহত প্রণয়ীর আর্তি ও সৌন্দর্যপ্রয়াসী মনের দুরাবগাহ বেদনার ছবিতে নজরুলকে ত পেলামই, পেলাম সতীনাথকেও। তাঁর সূক্ষ্ম শ্রুতিসমৃদ্ধ কণ্ঠে ভাবুক মনটি যেন দুলে উঠেছিল। 'শাওন রাতে যদি' গানটি অনেকের কণ্ঠেই শুনেছি। ভালও লেগেছে। কিন্তু ঐ 'ঝরিবে পূবালী বায়'এর এক পলকের মীড়ের এমন বিষণ্ন আভাষ আর কারো গানে পেয়েছি কি? এইখানেই বুঝি তাঁর শিল্পীবৈশিষ্ট্য।

ধীরেন বসুর গানে সহর্ষ অভিনন্দন ও আরো গাইবার জন্য শ্রোতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ দেখে আনন্দ বোধ করেছি এইজন্য যে এই 'অমৃত' ও সহযোগী দুটি পত্রিকাই বোধহয় দু বছর আগে সর্বপ্রথম শ্রীবসুর প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনার দিকে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অনুপ ঘোষাল সুন্দর গেয়েছেন 'দিতে এলে ফুল' ও 'আজো নন্দদুলাল এল'—।

প্রদীপ ঘোষের কামালপাশা আবৃত্তি যুদ্ধক্ষেত্রের রণদামামা ও উদ্দীপনায় এক প্রাণদীপ্ত পরিবেশ রচনা করে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য আবৃত্তিকারদের মধ্যে ছিলেন নীলাদ্রিশেখর বসু ও রবীন মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু একটা কথা। নজরুল গীতির আসরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ সেনগুপ্তকে উদ্যোক্তারা ভুলে গেলেন কেমন করে? নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত ধনঞ্জয়বাবু ছাড়া কেই বা এমন করে গাইবেন? প্রতিমার কণ্ঠে গীত 'শুকনো পাতা' 'পথহারা', 'রুমঝুমঝুম' অন্য কারো কণ্ঠে শোনার কথা ভাবা যায়? যারে হাত দিয়ে মালা—'আমার নহে গো ভালবাসা মোর গান'—দিয়ে সন্তোষ সেনগুপ্ত একদা অগণিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন নি কি তাহলে?

অপূর্ব নৃত্য-সম্মেলনের চিত্তগ্রাহী অনুষ্ঠান

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে ওয়েস্টবেঙ্গল আর্ট সেন্টার নিবেদিত সঙ্গীত সম্মেলনে কত্থক নৃত্যের চিত্তগ্রাহী অনুষ্ঠানে ভারতখ্যাত নটরাজ গোপীকিষণ ও বাংলার দুই তরুণ শিল্পী সুমিত্রা মিত্র ও শর্মিষ্ঠা পালের বিভিন্ন মানে পরিবেশিত কত্থক নৃত্য দর্শক সমাজকে সত্যিকারের আনন্দ দিয়েছে।

বহুদিন বাদে গোপীকিষণের নৃত্যের আসরে উপস্থিত রসিকবৃন্দ বিমুগ্ধ হয়ে দেখেছেন গোপীকিষণের অনবদ্য চক্করীর, ইন্দ্রতাল, মণিতালের লয়বৈচিত্র্যে উপভোগ করেছেন রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে রাধা ও কৃষ্ণের যুগল চরিত্রে তাঁর অভিনয় চাতুর্য; বিদ্যুতগতি, লাস্য, রূপলাবণ্য সব মিলিয়ে এ অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব সারা প্রেক্ষাগৃহে চমক সৃষ্টি করেছে।

শ্রীমতী সুমিত্রা মিত্রকে আমরা দেখেছি বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে। কিন্তু উচ্চাঙ্গ নৃত্য তথা কত্থকনৃত্যে তাঁর দক্ষতা যে কতখানি তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়ে গেছে এই সম্মেলনের একক কত্থকনৃত্যে। লয় ও ভাব ছাড়াও তৎকারের গতিতেরও চরম মুহূর্তেও অভিব্যক্তির লাবণ্যে শিল্পীর নৃত্যের আনন্দই ব্যক্ত।

অবাক করেছেন আর একজন। ইনি শর্মিষ্ঠা পাল (মনু পাল)। বিভিন্ন সম্মেলনে কত্থকনৃত্য পরিবেশন করে শর্মিষ্ঠা ইতিমধ্যেই আপন পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এবার কত্থক ছাড়াও ইনি ভারতনাট্যমের একটি অনুষ্ঠান উপহার দিলেন। 'আলারিপু', 'জাতিস্বরম' 'শব্দম' 'তিল্লানা' ইত্যাদি ভারতনাট্যমের বিভিন্ন অঙ্গে ইনি পরিচ্ছন্ন আঙ্গিক এবং মধ্যলয়ে সংযতশ্রীর এক প্রশংসাযোগ্য নজীর উপহার দেন।

গৌর গোস্বামী পরিচালিত সঙ্গীত সংগতে, কল্যাণ বসাকের নৃত্য পরিচালনায় মীরাবাঈ নৃত্যনাট্যের নাম ভূমিকায় শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা ভিখারিনী রাজকন্যা মীরাবাঈয়ের ভক্তি, ত্যাগ ও সব বিলানো আত্মনিবেদনের এক মনোজ্ঞ চিত্র মেলে ধরেন শুধুমাত্র নৃত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে। একই শিল্পীকে এতগুলি বিভিন্ন ধরনের নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

অর্চনা। অনুভা ঘোষ, মাধবী চক্রবর্তী ও তরুণকুমার। পরিচালনা: পীযূষ গাঙ্গুলী।

ভালোবাসা—জীবনে মরণে

প্যারামাউন্ট পিকচার্স নিবেদিত হাওয়ার্ড জি মিনস্কি—আর্থার হিলার প্রোডাকসান লাভ স্টোরি'র তরুণ নায়ক-নায়িকা অলিভার ব্যারেট ও জেনী ক্যাভিলারি পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। অলিভার ধনীর সন্তান, প্রাচুর্যের মধ্যে তার জন্ম। কিন্তু আভিজাত্যকে সে ঘৃণা করত। সমস্ত সাধারণ লোক থেকে কেমন যেন তফাতে বাস-করা তার বাবাকে তাই সে কোনোমতে বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু জেনী এক আশ্চর্য মেয়ে। তার গায়ে আছে ইতালীয় রক্ত। লাইব্রেরীতে কথার পিঠে কথার মধ্যে অলিভার ওর বাক্-পটুতায় আকৃষ্ট হয়ে যখন ওকে কফি খেতে আহ্বান জানালো, তখন ও অনায়াসেই রাজী হয়ে গেল। তারপর ও মুগ্ধচিত্তে দেখল অলিভারের হকি খেলা। অলিভার দেখল জেনীর সঙ্গীতযন্ত্রী হিসেবে পারদর্শিতা। দুজনে যখন স্পোর্টস কারে চেপে এখানে-ওখানে যেতে যেতে অনুভব করল, ওরা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছে, তখন জেনী অলিভারকে জানাল তার ফ্রান্সে যাবার কথা সঙ্গীত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে।

'তার মানে?'

'মানে আবার কি? আমি ফ্রান্সে যাচ্ছি।'

'তা কি করে হয়? আমি যে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি।'

'তাতে হল কি?'

'আমি যে তোমায় বিয়ে করব'

'বল কি? আমি কোথাকার কে, আর তুমি, বেশ বুঝতেই পারছি, একজন বড়োলোকের ছেলে। তোমার আমার মধ্যে বিয়ে!'

'বাঃ রে, তুমি আমায় ভালোবাসো না?'

'ভালোবাসলেই যে তোমার আমার মধ্যে বিয়ে হবে, এমন দুরাশা পোষণ করি না।'

'পাগলামো ছাড়—চল' আমার বাড়ী'।

অলিভার তার স্পোর্টস গাড়ীটাকে ছুটিয়ে দেয় তার বাড়ীর অভিমুখে। গেটের মধ্যে দিয়ে যখন গাড়ীখানা ঢুকল প্রকাণ্ড লনে, তখন জেনী রীতিমতো বিস্মিত। সে দূরে অবস্থিত বিরাট প্রাসাদটার পানে তাকিয়ে বলে ফেলল, 'ওরে বাপ্‌রে, তুমি এতো বড়োলোক—এ আমার কল্পনার বাইরে।'

কিন্তু সেই অতো বড়োলোকের ছেলে অলিভার আভিজাত্যগর্বী পিতার 'এক কড়িও' না-দেবার ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে বিবাহ করল জেনীকে। জেনী হাসিমুখে উপার্জন করতে লাগল অলিভারের আইন পড়ার খরচ যোগাড় করবার জন্যে। গ্রীষ্মা-বকাশে দুজনেই একটি ক্যাম্পে কাজ করতে লাগল। কিন্তু এক মিনিটের জন্যেও অসুখী নয় ওরা।

অলিভার আইন পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে একটি আইন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিল। ওদের মনে হচ্ছে, ওদের সুখের দিন আগতপ্রায়। সহসা আবিষ্কৃত হল জেনী দুরারোগ্য রক্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। জেনী তার মনের আনন্দকে ধরে রাখতে চাইল প্রাণপণে। যখন তার দেহ আর চলতে চাইছে না, তখন তারই অনুরোধে অলিভার ওকে নিয়ে গেল মাউণ্ট সিনাই হাসপাতালে। ওরা অতীতের কথা কয়ে বর্তমানকে ভুলে থাকতে চায়। শেষ পর্যন্ত যখন জেনী বুঝল তার মৃত্যু আসন্ন, তখন সে অলিভারকে অনুরোধ করল, সে যেন ওকে শক্ত করে ধরে রাখে। অলিভার জেনীর পাশে শুয়ে ওকে প্রাণপণে জাপটে ধরল। এর কিছু পরে ওকে দেখা গেল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে। ও ধীরে ধীরে স্কেটিং রিংয়ের ধারে এসে বসল, যেখান থেকে ও জেনীকে নিয়ে গিয়েছিল তুষারপথ দিয়ে হাসপাতালে।

এরিক সেগ্যাল রচিত—

'লাভ স্টোরি'র এই কাহিনী চুম্বক থেকে কিন্তু কিছুতেই বোঝা যাবে না, ছবিটি কি অপরূপ সুষমায় ভরা। রিয়ান ও'নীল এবং অ্যালি ম্যাকগ্রো নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় কি মোহময় অভিনয় করেছেন! ডিক ক্রাটিনার রঙ্গীন ফোটোগ্রাফী দর্শকের চোখের সামনে কি ইন্দ্রজালই না বিস্তার করে! ফ্রান্সিস লাই-এর আবহ-সঙ্গীত দর্শকমনকে কি মূর্ছনাতেই না ভরিয়ে তোলে! না, 'লাভ স্টোরি'র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করবার মতো মনোবৃত্তি আমাদের নেই। মায়ের কবরের ওপর গজিয়ে ওঠা ফলগাছকে নিয়ে কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানী গবেষণা করে না। শুধু এই বলব, 'লাভ স্টোরি' এমন একখানি ছবি, যা বার বার দেখেও পুরোনো হবার নয়; যা অতি বড়ো শুকনো হাড়েও বসন্তের দোলা জাগাতে সক্ষম; যার প্রশংসায় উপযোগী বিশেষণ অভিধানে মেলে না। এই সঙ্গে আরও বলব জেনীর ভূমিকাভিনেত্রী অ্যালি ম্যাকগ্রোকে আপনি আমি সহজে ভুলতে পারব না, যেমন ভুলতে পারব না তার মুখের সেই একটি কথা—'প্রেম হচ্ছে সেই বস্তু যা কোনোদিনই তোমাকে এর জন্য দুঃখিত বল-বার অবকাশ দেবে না।'

প্যারামাউন্ট পিকচার্স নিবেদিত এই অসামান্য ছবিখানি শিগগিরই 'এলিট' সিনে-মায় দেখানো হবে।

স্টুডিও থেকে

'দিল দৌলত দুনিয়া'র শুভমুক্তি

পি এন অরোরার ২৭তম নিবেদন, অল ইণ্ডিয়া পিকচার্স-এর পতাকাতলে নির্মিত 'দিল দৌলত দুনিয়া' ছবিখানি আজ শুক্রবার, ১৬ জুন রকসি, গণেশ, শ্রী ছায়া ভবানী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ইস্টম্যান কলারে নির্মিত এই গার্হস্থ ছবিখানিতে আছেন অশোককুমার, রাজেশ খান্না, সাধনা, আগা, জগদীশ, বেলা বসু, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, ওমপ্রকাশ, ছোট মেহ-মুদ, হেলেন প্রমুখ শিল্পী। এ-ছাড়া আছে কুকুর-শিল্পী চিকু। শংকর জয়কিষেণের সুরে এতে গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে ও কিশোরকুমার। কলকাতায় বাসুকী ফিল্ম ছবিটির পরিবেশক।

দিল দৌলত দুনিয়া। রাজেশ খান্না ও সাধনা।

নতুন ফুলের গন্ধ

ভারতস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হাইকমিশনের দ্বিতীয় নিবেদন বাংলা-দেশের অন্যতম প্রথিতযশা পরিচালক মমতাজ আলি পরিচালিত একটি অন্ধ মেয়ের জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ে রচিত সার্বজনীন আবেদনপুষ্ট কাহিনী 'নতুন ফুলের গন্ধ'। ছবিখানি প্রান্তিক ডিস্ট্রিবিউটর্সে'র পরিবেশনায় আসন্ন মুক্তিপথে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেত্রী, এপার বাংলার বহু আলোচিত ও জনপ্রিয় শিল্পী কবরী চৌধুরী এই ছবির নায়িকা চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর দেবেন। সরকার কবীর নায়ক চরিত্রে আছেন। গোলাম মুস্তফা ও শ্রীমতী আনোয়ারাকে দুটি বিশেষ প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে। সুর দিয়েছেন আলি হোসেন। আব্বাসউদ্দিনের কন্যা গায়িকা ফিরদৌসী বেগমের গাওয়া গান ছবির আর এক বিশেষ আকর্ষণ।

'পরিবর্তন' ছবির গান গৃহীত

প্রযোজক-পরিচালক ডি এস সুলতানিয়া তাঁর রঙীন হিন্দী ছবি 'পরিবর্তন'এর জন্য নীরজ লিখিত একটি গান মান্না দের কণ্ঠে রেকর্ড করলেন বোম্বাইয়ের নবরং ল্যাবোরেটরীতে। আধুনিক সমাজের একটি বিশেষ দিককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'পরিবর্তন' ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে হিনা কৌসর, রঞ্জিত মল্লিক, মনীষা, সুধা শিবপুরী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, ভাস্কর চৌধুরী, চিন্ময় রায় প্রমুখ শিল্পীকে।

মঞ্চাভিনয়

গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ : রোমেন থিয়েটার সম্প্রতি মস্কোবাসীদের একটি নতুন নাটক উপহার দিয়েছে। এই নাটকের নাম 'গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ'। ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকের মধ্যে এটি হল তৃতীয়। 'আচি' (কৃষাণ চন্দরের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত) এবং 'জনি ও খিভাল'-এর আগে দেখানো হয়েছিল। এবং এইসব নাটক প্রদর্শনে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল।

'গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ' একটি রোমান্টিক নাটক। আজারবাইজানের মহিলা কবি দজাখান আফরুজ এই নাটকটি রচনা করেছেন। ভারতের জাতিভেদ সমস্যাকে কেন্দ্র করে এক করুণ কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। অবশ্য এই জাতিভেদ প্রথা এখন বিলুপ্তির মুখে। ডাক্তার দাগিস, ইঞ্জিনীয়ার চন্দ, বেদে নর্তকী দ্রফি এবং সরল বালক শিশুর চরিত্রের আত্মমর্যাদার দিক এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকগুলি আশ্চর্য অনুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মঞ্চ নির্দেশক বরিস তুশেকেভস্কি বলেছেন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নাটক তৈরি হল। তিনি কয়েকজন তরুণ অভিনেতা জোগাড় করলেন। তাঁরা তার দলে যোগ দিল। তিনি ছবি এঁকে তাদের শিক্ষা দান করতে লাগলেন, তারপর দজাখান আফরুজের নাটকের কতকগুলো দৃশ্যের রিহার্সেল হল, এবং থিয়েটারের প্রধান পরিচালককে ও তাদের প্রবীণ সহযোগীদের সেই রিহার্সেল দেখানো হয়। তরুণ অভিনেতারা তাঁদের অনুমোদন লাভ করে খুবই খুশী হল।

এভাবেই একটি নতুন নাটকের জন্ম। এই নাটকে অনেক গান ও নাচের দৃশ্য আছে। তার ফলে নাটকের আকর্ষণ বেড়ে গেছে।

বলশোয় থিয়েটারের বিখ্যাত ব্যালে নর্তকী ভেরা বোচারোভা নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

যে-সব অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দ্রফির ভূমিকায় জেমফিরা ঝেমচুঝনায়ার নাম। এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ও স্বভাবসিদ্ধ নর্তকী এই নাটকের প্রাণস্বরূপ। জেমফিরা একজন বিখ্যাত যাযাবর নর্তকীর মেয়ে।

এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের সময় প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পূর্ণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা

আগামী ১৯ জুন, সোমবার, সন্ধ্যা ৬টায় মাঙ্গলিক সংস্থা বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঠাকুরদা' মঞ্চস্থ করবে। নাটকটির সম্পাদনা, সঙ্গীত পরিচালনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন ভক্তি সাহা।

গৌহাটি ও শিলঙ সফরে নান্দীকার

আসছে ২১ জুন থেকে ২৩ জুন, 'ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস অ্যাসোসিয়েশনে'র আমন্ত্রণে গৌহাটিতে এবং ২৪ জুন থেকে ২৬ জুন 'সারথী'র আমন্ত্রণে শিলঙে নান্দীকারের তিনটি নাটক 'শের আফগান', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' ও 'তিন পয়সার পালা' অভিনীত হবে। নাটকগুলির নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত 'রঙ্গনা' হলে নান্দীকারের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ থাকবে। জুলাই থেকে পুনরায় 'রঙ্গনা'তে নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ হবে।

ক্ষুধা : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন স্টাফ

রিক্রিয়েশন ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি রঙ্গনায় পরিবেশিত হোল বিধায়ক ভট্টাচার্যের মঞ্চসফল নাটক 'ক্ষুধা'। শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়ের নিবিড়তায় প্রযোজনাটি যথেষ্ট গতিবেগসমৃদ্ধ হোতে পেরেছিল। সদা, রমা, ও গঙ্গা ভাগ্যবিড়ম্বিত এই তিনটি শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেন গোরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় দত্ত ও রঞ্জিত রায়। 'জগৎ চৌধুরী'র চরিত্রে বেশ দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেন রাজন মিত্র। মানবীকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মহাদেবপ্রসাদ গুহ, খাসনবিশ, মাস্টার রাজা, শ্যামল মজুমদার, গণপতি দত্ত, সুশীল রায়, কমলেশ ভট্টাচার্য, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, দেবরাজ ভট্টাচার্য, অনিল মিত্র, সৌমেন মুখোপাধ্যায়, সুকমল রায়, প্রদীপ সেন, তুষার রায়, নিতাই দাস, অজন্তা চৌধুরী, শিপ্রা চক্রবর্তী, বেবী সেনগুপ্ত।

সাহিত্যিক : সঞ্চারিণী শিল্পীগোষ্ঠী সম্প্রতি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে। নির্দেশক মধু দত্তের শৈল্পিক প্রয়োগপরিকল্পনা ও শিল্পীদের আন্তর অভিনয় দুয়ে মিলে প্রযোজনাটিকে নিঃসন্দেহে প্রাণবন্ত করে তোলে। 'সাহিত্যিক' চরিত্রে মধু দত্ত যথার্থই নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন শম্ভু দত্ত (সিদ্ধেশ্বর), সদানন্দ চক্রবর্তী (প্রকাশ), চিত্ত নন্দী (শিবশঙ্কর), মৃণাল দাস (অনুপম), রাজকুমার রাহা (অনিল), স্বপন রায় (রতিকান্ত) সমর ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য। শংকর চৌধুরী, শ্যামল দাস, নিতাই দে। স্ত্রী-চরিত্রে অনামিকা রায়ের অভিনয় প্রাণহীন মনে হয়েছে।

'সুখের পায়রা' : নির্মল হাস্যরসের নাটক আলো দাশগুপ্তার 'সুখের পায়রা' সেদিন সি কে সেন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় পরিবেশিত হোল 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন অসিত সান্যাল, রামভদ্র রায়, গোপাল গুঁই, তরুণকুমার দত্ত, বাসুদেব ঘোষ, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দেব, অসীম সেন, অমল মুখোপাধ্যায়, অসিত চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ দাস, দীপংকর সরকার, গীতা দে, গীতা কর্মকার ও দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : গত ২৬ মে সি এল সি আর সি অডিটোরিয়াম-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের 'সমাজ-অর্থনীতি ও মূল্যায়ন শাখা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ১ম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-অর্থনীতিবিদ সুধীরচন্দ্র নাগবিশ্বাস। প্রধান অতিথি শ্রীমতী নাগবিশ্বাস আন্তর্বিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। সুপ্রিয় রায়ের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর সংস্থার শিল্পীরা একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সজল দে, দেবদাস রায়, অরুণ ভৌমিক, শিশির ঘোষ, মিহিরলাল ধর, অমিত সরকার, সুপ্রিয় রায়, সুপ্রতিম রায়, পার্থপ্রতিম রায়, রঞ্জিত পাল, চঞ্চল বিশ্বাস, চিত্রা দেব, গঙ্গা গোস্বামী, শান্তা দত্ত রায়, পুবালী সরকার, [illegible] [illegible], [illegible] দাশগুপ্ত, মৌসুমী

সরস্বতীর সঙ্গতে ছিলেন সর্বশ্রী অভিজিত রায় ও তপন চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সর্বশ্রী শোভন সেনগুপ্ত, পিনাকী দত্ত রায় এবং বিশ্বজ্যোতি বাগচী।

'নেতাজীশ্রী' অঞ্জন মিত্র : রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির পরিচালনায় বাগবাজার বিল্ডিং লাইব্রেরী হলে 'নেতাজীশ্রী' দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি মোট ২৫ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ শ্রীকেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ ভূপেশচন্দ্র কর্মকার। শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী (ডি সি নর্থ) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। বিচারকের কাজ করেন শ্রীরামাচরণ কুণ্ডু, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারতশ্রী রবীন চক্রবর্তী, প্রধান বিচারকের কাজ করেন বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় প্রধান সম্পাদক শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য অভ্যাগতদের স্বাগত জানান।

ফলাফল :—১ম বিভাগ (উচ্চতা ৫'-৫") ১ম—শ্রীঅমরনাথ কর্মকার (গোবিন্দপুর ব্যায়াম সমিতি)। ২য়—শ্রীসোমনাথ (হাটখোলা ব্যায়াম সমিতি)। ৩য়—শ্রী[illegible] নাথ সিংহ (এপ্টার্ক ভারতী সমিতি)। ২য় বিভাগ—(উচ্চতা ৫'-৬' এর উর্দ্ধে) ১ম—অঞ্জন মিত্র (স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি সংঘ)। ২য়—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস (অগ্রগামী ব্যায়ামাগার)। ৩য়—শ্রীকিশলয় রায় (বীর সংঘ)। ৩য়, বিভাগ উচ্চতা ৫'-৬ এর উর্দ্ধে। ১ম—শ্রীতুষারকান্তি শীল (বিজয় ব্যায়াম সংঘ)। ২য়—শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্তী (চিত্তরঞ্জন ব্যায়ামাগার)। ৩য়—শ্রীসলিলকুমার বর্মন (ঘনশ্যাম ব্যায়াম সমিতি)। 'নেতাজীশ্রী'—শ্রীঅঞ্জন মিত্র রানার্স আপ—শ্রীতুষারকান্তি শীল।

উত্তরন-এর কবি প্রণাম

গত ২৮শে মে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর সংলগ্ন স্থলে এক উন্মুক্ত পরিবেশে উত্তরন গোষ্ঠী রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করেন। অনুষ্ঠানে কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতা ছিল, আর এই আন্তরিকতা সম্বল করেই সংস্থার সভ্যরা সব তরুণ শিল্পীদের শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে হাজির করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্রীসাগর সেনের সংগীত এবং শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সংগীতালেখ্য। তাছাড়া যে সমস্ত শিল্পী তাঁদের মধুর সুরেলা কণ্ঠে এই আনন্দ মধুর সুরেলা কণ্ঠে এই আনন্দ মধুর অনুষ্ঠানে মায়াজাল রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী দীপক ভট্টাচার্য, তপন গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা রায় ও সীমা বসু।

আবৃত্তিতে এক নতুন মেজাজ এনেছিলেন অমলেন্দু ভট্টাচার্য সোমনাথ রায় এবং প্রবীর ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী অতুলকৃষ্ণ বসু, নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে য়োজিত ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৭২ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ম টেস্ট খেলাটিকে নিঃসন্দেহে নবীন ও প্রবীণের খেলা বলা যায়। অস্ট্রেলিয়া যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের বয়স ৩০ বছরের ওপরে। ম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে নির্বাচিত লোয়াড়দের মধ্যে আটজন খেলোয়াড় কেট খেলা উপলক্ষে এই প্রথম ইংল্যান্ড রে এসেছেন। অপরদিকে ইংল্যান্ড দলে র্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে মাত্র তিন- নের বয়স ৩০ বছরের নীচে। তাদের লোয়াড়দের গড় বয়স ৩৫ বছর। মাইক থ দীর্ঘ ৬ বছর পর ইংল্যান্ড দলে নবার নির্বাচিত হয়ে যথেষ্ট বিস্ময়ের ষ্টি করেছেন। আগামী মাসে তিনি ৪০ রে পড়বেন। মাইক স্মিথ ১৯৫৮ সাল কে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ল্যান্ডের পক্ষে ৪৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলে- ন এবং ২৫টি টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের ত্ব করেছেন। টেস্ট খেলায় মাইক থের পরিসংখ্যান দাঁড়ায় : খেলা ৪৭, নংস ৭২, নট-আউট ৬ বার, মোট রান ৩৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২১, ঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৩২.৩৯।

ইংল্যান্ড দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়- মধ্যে মাত্র দুজন খেলোয়াড় জিওফ কট এবং জন এড্রিচ টেস্ট খেলায় টি ৩০০০ রান করেছেন। বর্তমান ১ম স্টের আগে বয়কটের টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪৯, মোট রান ৩৫৪৮, এক নিংসে সর্বোচ্চ রান ২৪৬ নট আউট ং সেঞ্চুরী ১০টি। অপরদিকে জন ড্রিচের টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৫৪, ট রান ৩৬৬৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ন নট আউট ৩১০ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড ডস, ১৯৬৫) এবং সেঞ্চুরী ১০টি। ল্যান্ডের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে ০০ উইকেট পেয়েছেন এমন খেলোয়াড় জন জন স্নো (১৩৬ উইকেট) এবং ধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ (১০৯ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়- র মধ্যে মোট ২০০০ রান করেছেন দু- ন অধিনায়ক আয়ান চ্যাপেল (মোট ২১৯ রান, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৬৫ এবং সেঞ্চুরী ৬) এবং ডগ ওয়াল- স (মোট রান ২৬২৩, এক ইনিংসে র্বোচ্চ রান ২৪২ এবং সেঞ্চুরী ৮টি)।

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১ম টেস্ট খেলার একটি দৃশ্য : ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের খেলায় টনি গ্রেগ তাঁর ব্যক্তিগত ৫৭ রানের মাথায় কোলির বলে এল-বি-ডবলিউ হয়েছেন।

টেস্ট খেলায় মোট ১০০টি উইকেট পেয়ে- ছেন এমন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়া দলে কেউ নেই। নিকট দূরত্বে আছেন জন গ্লীসন — ৯০টি উইকেট।

ওল্ড ট্রাফোর্ডের ১ম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ টসে জয়ী হয়ে তাঁর চল্লিশতম জন্মদিনকে গৌরবান্বিত করেন। কিন্তু ইংল্যান্ড খেলায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি— প্রথম ইনিংসের পাঁচটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৪৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

বৃষ্টির জন্যে নির্ধারিত সময়ে খেলা আরম্ভ হয়নি। লাঞ্চের আগে মাত্র আধ- ঘণ্টা খেলা হয়েছিল। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ১৩, কোন উইকেট না পড়ে। চা-পানের সময় ছিল ২ উইকেট পড়ে ৯০ রান।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের একঘণ্টা পর ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ২৪৯ রানের মাথায় শেষ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার টনি গ্রেগ তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১০৩ রান তুলে- ছিল।
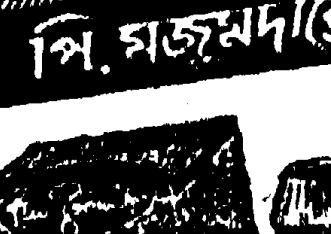
তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ১৪২ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ১০৭ রানে এগিয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেট খুইয়ে ১৩৬ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া যখন অসমাপ্ত ১ম ইনিংস খেলতে নামে, তখন তাদের রান ছিল ১০৩ (৪ উইকেটে)। কিন্তু ইংল্যান্ডের দুই পেস বোলার জন স্নো এবং জিওফ আরনোল্ডের মারাত্মক বোলিংয়ে অস্ট্রে- লিয়ার বাকি ৬টা উইকেট মাত্র ৩৯ রানের বিনিময়ে পড়ে যায়। স্নো ৪১ রানে ৪টে এবং আরনোল্ড ৬২ রানে ৪টে উইকেট পান। এই দিন স্নো ১১ ওভার বল দিয়ে মাত্র ১৭ রানের বিনিময়ে চারটে উইকেট পান। আরনোল্ড ২য় দিনে ২টো উইকেট পেয়েছিলেন ৪০ রানে।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ২৩৪ রানের মাথায় শেষ হয়। মাত্র ৬টা বলের খেলায় ইংল্যান্ডের শেষ চারটে উইকেট একই ২৩৪ রানের মাথায় পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার

নীহারকান্তি শীল্ড বিজয়ী সেন্ট্রাল ডেয়ারী এবং রানার্স-আপ বৌবাজার শীতলা স্পোর্টিংয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও উদ্যোক্তাবর্গ

ডেনিস লিলি তাঁর মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যান্ডকে মোক্ষম মার দিয়েছিলেন—৩০ ওভার বল দিয়ে ৬৬ রানের বিনিময়ে তিনি ৬টা উইকেট পান। এর মধ্যে ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন চারটে বল দিয়ে। খুব কান-ঘেঁষে তিনি দুর্লভ 'হ্যাটট্রিক' সম্মান হাত-ছাড়া করেন।

অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৪২ রান তুলতে ২য় ইনিংসে খেলতে নামে এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৫৭ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে এই অবস্থা দাঁড়ায় অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৪২ রান থেকে ২৮৫ রান দূরে। হাতে জমা ছিল ২য় ইনিংসের ৮টা উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ঃ ২৪৯ রান (গ্রেগ ৫৭ এবং এডরিচ ৪৯ রান। কোল্পে ৮৩ রানে ৩, লিলি ৪০ রানে ২ এবং গিলমসন ৪৫ রানে ২ উইকেট)

ও ২৩৪ রান (গ্রেগ ৬৭ রান। লিলি ৬৬ রানে ৬ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ১৪২ রান (স্টাকপোল ৫৩ রান। স্নো ৪১ রানে ৪ এবং আরনোল্ড ৬২ রানে ৪ উইকেট।)

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ৫ থেকে ১০) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের যে ১৮টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১৫ এবং ড্র ৩।

শেষ সংবাদ

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১ম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ২৫২ রানে শেষ হওয়াতে ইংল্যান্ড ৮৯ রানে জিতেছে।

বর্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে মোহনবাগান, ৮টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট। তারা ২৪টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছে। তাদের বিপক্ষে হাওড়া ইউনিয়ন গরহাজির হওয়াতে মোহনবাগানকে পুরো ২ পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য সপ্তাহে মোহনবাগান ৪-০ গোলে কালীঘাট ও ৩—১ গোলে বালী প্রতিভাকে হারিয়েছে। গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ৭টা খেলায় ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তালিকায় ২য় স্থানে আছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ৭টা খেলায় ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৩য় স্থানে আছে। লীগের খেলায় এই তিনটি দল এখনও অপরাজিত আছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এখনও একটাও গোল খায়নি। এখনও ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং লীগ তালিকার শেষেরদিকে আছে কালীঘাট ক্লাব এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন। এই দুটি দল ৭টা ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছে।

উবের কাপ

মহিলাদের আন্তর্জাতিক উবের কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে জাপান ৪—১ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৩ বার উবের কাপ জয়ের গৌরবলাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালের ফাইনালে জাপান ৫-২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে প্রথম উবের কাপ জয়ী হয়। ১৯৬৯ সালের ফাইনালে তারা ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়েছিল।

নীহারকান্তি ঘোষ স্মৃতি শীল্ড

দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠিত নীহারকান্তি ঘোষ স্মৃতি শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেন্ট্রাল ডেয়ারী আর-সি ৬—৫ গোলে বৌবাজার শীতলা স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে নীহারকান্তি ঘোষ স্মৃতি শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেলার নিষ্পত্তি না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি আইনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। খেলার শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরী পুরস্কার বিতরণ করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

৮ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 23rd June, 1972 শুক্রবার ৯ আষাঢ়, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

এক নজরে

একটি অমূল্য ডিম :

বন্যপ্রাণী সংস্থা ১৯৬২ সালে যে তেরটি পশুপাখির নাম সম্পূর্ণ অবলুপ্ত অথবা প্রায়-অবলুপ্ত প্রাণীর তালিকায় সংযোজিত করেছিল, তার মধ্যে হাঁস ছিল দু'জাতের। একটি গোলাপি মাথার ও অপরটি শাদা পাখার বুনো হাঁস। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত গোলাপি মাথার বুনো হাঁস কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি, এবং পক্ষীবিশেষজ্ঞদের আশংকা, ঐ জাতের পাখিটি চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হয়েছে। আসাম, মণিপুর, বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার জলজংগলে যে পাখি একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াত, ১৯৩৫ সালের পর তার আর কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু দু বছর আগে হঠাৎ ডিগবয়ের কাছে শাদা পাখার বুনো হাঁসের কটি বাচ্চা ধরা পড়ে। তারপর সেগুলিকে বাঁচানোর বেপরোয়া প্রয়াসে কয়েকটিকে গোহাটি চিড়িয়াখানায় ও কয়েকটিকে বৃটেনের স্লিমব্রিজ ওয়াইল্ড ফাউল ট্রাস্টের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেদেশে বাচ্চাগুলি বড় হয়েছে এবং ডিম পাড়ারও সময় হয়েছে। গোহাটিতে যে চারটি বাচ্চা বড় হচ্ছিল তার মধ্যে তিনটি মদ্দা ও একটি মাদি। গত ২১শে মে তারিখে ঐ মাদি হাঁসটি একটি ডিম পাড়াতে ঐ হরিতাভ পীতবর্ণের ডিমটিকে ঘিরে পক্ষীপ্রেমী মহলে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। হাঁসটি ডিমে তা দিচ্ছে এবং ত্রিশ দিন বাদে তা থেকে বাচ্ছা হওয়ার কথা। পক্ষীতত্ত্ববিদরা বলছেন, জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই বোঝা যাবে, শাদা পাখার বুনো হাঁস এ জগতে থাকবে, না তারও শেষ পর্যন্ত গোলাপি মাথার বুনো হাঁসের মতো জাদুঘরে স্থান হবে।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু : একটিমাত্র সন্তান, কিন্তু তাকে নিয়ে এমন কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়েছে তার বাবাকে, যা মা ষষ্ঠীর বৎসরান্তিক কৃপায় বিপর্যস্ত কোন বাবার পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব নয়। কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নয়, পুত্রের ভয়াবহ, দুর্নিবার, অপ্রতিরোধ্য স্বাস্থ্য সন্ত্রস্ত করে তুলেছে পিতাকে। মাত্র এগারো বছর বয়স, কিন্তু ওজন ১৬২ পাউন্ড, মানে সামান্য-কম দু মণ। উচ্চতা ৫০ ইঞ্চি, কিন্তু তার উদরের বেড় তা থেকে মাত্র দু ইঞ্চি কম; পেটের পরিধি ৪৮, বুক ৪৬, আর উচ্চতা ৫০-এ প্রায় সেই হ-য-ব-র-ল'র হিজবিজবিজের মাপের ব্যাপার।

যখন, ১৯৬২ সালের ৩০শে আগস্ট বাঙ্গালোরে জন্ম হয়েছিল সদানন্দ কুমারের, তখন আর পাঁচটি সদ্যজাত শিশুর চেয়ে ওজন কিছুটা কমই ছিল তার; মাত্র কিঞ্চিদধিক পাঁচ পাউন্ড। তার পরও ছয় মাস স্বাভাবিক গতিতে বাড়ছিল সে। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ এল তার স্বাস্থ্য ও প্রাণের জোয়ার। সে যে কি ভয়ংকর তা বোঝাতে ওর বাবা বলেছেন, প্রতি সপ্তাহে তার নতুন কেনা জামা ছোট হয়ে যেতে লাগলো। বাবা শ্রী বি এন থিমায়া বস্তিতে নরসুন্দর, একটি সামান্য সেলুনের মালিক। পুত্রের বৃদ্ধির সংগে পাল্লা দিয়ে চলার সামর্থ্য না থাকলেও তিনি হার মানেননি অনেকদিন। কিন্তু এখন যেন নিজেকে বড় বেশি অসহায় বলে মনে হচ্ছে তাঁর। কারণ ছেলের ক্লাস থ্রির বেশি লেখাপড়া হয়নি; সহপাঠীদের বিদ্রূপ ও পেছনে-লাগা সহ্যাতীত হয় বলেই সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। কোন অভিজাত স্কুলে ছেলেকে পাঠানোর সামর্থ্য নেই থিমায়ার, পাঠালেও ছেলে সেখানে সম্মান নিয়ে পড়াশুনো করতে পারত—এমন ভরসা নেই তাঁর। তাঁর সামর্থ্য মতো চিকিৎসাও করিয়েছেন, কিন্তু কোন ফলই হয়নি। তাই এখন শুধু ভাগ্যের ওপর ভরসা থিমায়ার, যে তারকার অশুভ প্রভাবে তাঁর ছেলের আজ এই দুর্দশা, তা অপসৃত হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—এই ভরসায় নিজেকে নিশ্চিন্ত করতে চাচ্ছেন তিনি। আর একটা সান্ত্বনার কথা, বিশাল বপু পুত্রের দৈনিক আহারের জন্য পিতাকে কোন বিড়ম্বনা সইতে হয় না। কারণ বালক প্রায় নিরাহারী বললেও চলে, দৈনিক একটি দোসা ও একমুঠো ভাত তার খাদ্য। পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পিতার আর একটি উদ্বেগ-আকুল চিন্তা, গণৎকার সদানন্দ কুমারের কোষ্ঠিবিচার করে বলেছেন, ও ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগী হবে। ঐ সামান্য আহার তারই ইংগিত বলে থিমায়ার ধারণা।

অক্ষমের ভালবাসার দাবি : দেহ ও মনের স্বাভাবিক গঠন নিয়ে যারা এ সংসারে জন্মায়নি, তারা ভালবাসার অথবা সুখের সংসার পাতার যোগ্যতা থেকেও বঞ্চিত এই কথাই প্রচারিত হয়ে এসেছে এতদিন, এবং তা নিয়ে স্বিমত আজ পর্যন্ত কোন দায়িত্বশীল মহল থেকে প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি যাঁরা মানসিক রোগের চিকিৎসক বা বিকলাংগ ও মানসিক বৈকল্যগ্রস্তদের শিক্ষক তাঁরাও দেহ ও মনের দিক থেকে কিছুটা অক্ষম ব্যক্তিদের দায়িত্বশীল যৌনজীবনযাপনের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত নন।

কিন্তু এ ব্যাপারে দীর্ঘ পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছেন বিকলাংগদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে—বিশেষ পারদর্শিনী শ্রীমতী এন শিয়ারার যাঁর বিস্তৃত প্রতিবেদন সম্প্রতি লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'ভালবাসার অধিকার'—এই শিরোনামায় লিখিত ঐ প্রতিবেদনে বিকলাংগদের শিক্ষায় যৌন বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় কিছু অতি সতর্কতার সংগে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটিকে সর্বাধিক নিন্দা করে বলা হয়েছে এ শিক্ষা-ব্যবস্থাই বিকৃত ও সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। দেহ ও মনের দিক থেকে কিছুটা বিকলাংগ বা ভারসাম্যহীন ব্যক্তিরা যৌন বিষয়ে দায়িত্বহীন ও অপরিণামদর্শী, এবং তাদের সন্তানরাও পিতামাতার বিকৃতি নিয়ে জন্মাতে পারে—এই দুটি সিদ্ধান্তকেই শ্রীমতী শিয়ারার সম্পূর্ণ ভুল ধারণাপ্রসূত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, যৌন ব্যাপারটি যাদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয় তারা যদি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় অতর্কিতে নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদন পেয়ে দিশাহারা হয় তবে তার জন্য নিশ্চয়ই তাদের অপরাধী করা যায় না। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে ও-ব্যাপারে তাদের মন গড়ে তুললে তাদের আচরণ স্বাভাবিক ব্যক্তিদের তুলনায় কোনরকম অস্বাভাবিক হবে না বলেই শ্রীমতী শিয়ারার দাবি জানিয়েছেন।

অপরিণত বুদ্ধি পিতামাতার সন্তানরা পিতামাতার ত্রুটি নিয়ে জন্মায় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে শ্রীমতী শিয়ারার তারও সম্পূর্ণ সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, মোট ১২৮০ জন জড়বুদ্ধি ব্যক্তির কাছে খোঁজখবর নিয়ে তিনি জেনেছেন, মোটামুটিভাবে তাদের এক-চতুর্থাংশ মানসিক রোগগ্রস্ত পিতা অথবা মাতার সন্তান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে কিছুটা ঝুঁকি থাকলেও শতকরা পঁচাত্তর জনের ক্ষেত্রে তা সত্য হয় না।

সম্প্রতি লণ্ডনে মেণ্টাল হেলথ ফিল্ম কাউন্সিলের পক্ষ থেকে 'লাইফ আদার পিপল' নামে যে ছবি প্রদর্শিত হয় তাতে দৃঢ়তার সংগে এই কথা বলা হয়, দেহ ও মনের দিক থেকে যারা কিছুটা অক্ষম তারা উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে আর পাঁচটা ব্যাপারের মতো যৌনজীবনেও স্বাভাবিক মানুষের মতো দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়
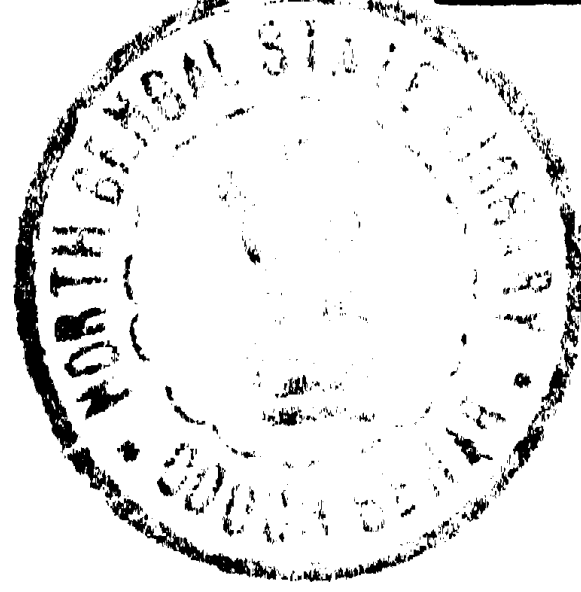
পরিবেশ পরিশুদ্ধি আন্দোলন

মানবিক পরিবেশ কলুষমুক্ত করার জন্য দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের উদ্বেগের অন্ত নেই। রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম শহরে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর প্রতিনিধিরা নানা প্রস্তাব নিয়ে এতে আলোচনা করছেন, কীভাবে পৃথিবীর পরিবেশকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে কলুষমুক্ত রাখা যায়। যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতি মানুষের জীবনে যেমন অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে তেমনি শিল্পকারখানার প্রসারের ফলে এবং নানা ধরণের শিল্পজাত আবর্জনা, পরিত্যক্ত গ্যাস রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি নদীর জল, পৃথিবীর মাটি ও বাতাসের সঙ্গে মিশে মানুষের জীবনকে বিপন্নও করে তুলছে। ইয়োরোপ, আমেরিকার মতো শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ তো বটেই, এশিয়া আফ্রিকার মতো উন্নতিশীল দেশগুলোর সামনেও আজ এই বিপদ দেখা দিয়েছে। উন্নত দেশগুলো নিজেদের চিন্তায় মগ্ন। তাদের জীবনযাত্রা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাবে, এতো জানা কথা। গরীব দেশগুলোর কী হ'ল, না হ'ল তার জন্য লোকদেখানো মাথাব্যথা দেখালেও কাজের বেলায় হতভাগ্য গরীব ও অনুন্নতদের কথা তারা কতটা আর মনে রাখে?

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক আহূত উক্ত সম্মেলনে গত সপ্তাহে যে-ভাষণ দিয়েছেন তাতে অনেক স্পষ্টোক্তি ও সত্য কথা আছে। মানবিক পরিমণ্ডল দূষিত হওয়ায় আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তার সমাধানের মূলসূত্র হল মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব মোচন। তা না করে উন্নত দেশগুলো যদি শুধু নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার অঙ্গ হিসেবে এই সমস্যাটিকে বিচার করে তা হলে মস্ত ভুল করবে তারা। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন অনশনক্লিষ্ট, অর্ধভুক্ত এবং রোগজর্জরিত তখন মানবিক পরিবেশ পরিশুদ্ধ করার সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, উন্নততর জীবনযাত্রার অধিকারী না হলে এ সম্পর্কে মানুষের চেতনাও জাগ্রত হবে না। ভারতের মতো অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের সামনে প্রধান সমস্যা হল লক্ষ কোটি মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত করা। তাদের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারলেই পরিবেশ সুস্থতর করার কাজে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই সহজ সত্য কথা উন্নত দেশগুলোকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দারিদ্র্য নিয়ে তাদের কপট করুণার অন্ত নেই। অথচ কে না জানে যে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মানুষের এই দারিদ্র্যের মূলে আছে উন্নত ঔপনিবেশিক দেশগুলোর দীর্ঘদিনের শোষণ। সুতরাং দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে এই পৃথিবীর মানবিক পরিমণ্ডল বিশুদ্ধ করার চেষ্টার মধ্যে এক ধরণের কপটতা আছে।

তবে এই সংকট সম্পর্কে অবহিত হবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। এই পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখা যে প্রয়োজন সেই চেতনা এসেছে আজ মানুষের মনে। সে জন্যই আজ তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা পৃথিবীর পরিমণ্ডল বিশুদ্ধ রাখার জন্য। কোন দেশ বা কোন জাতি আমাদের পরিবেশ দূষিতকরণের জন্য দায়ী, এ তর্ক আজ অবান্তর। এর জন্য কম বেশি সকল দেশই দায়ী। তবে উন্নত দেশগুলোর সামর্থ্য বেশি, তাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও প্রযুক্তি বিদ্যার পারদর্শিতাও স্বীকৃত। তাই পরিবেশ দূষিতকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদেরই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল সকল দেশই যাতে সমানভাবে পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। কারণ, অনুন্নত দেশগুলোর সামনেও এই সমস্যা আজ কম গুরুতর নয়।

শ্রীমতী গান্ধী আরও জানিয়েছেন যে, পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখতে হলে নারকীয় মারণাস্ত্র নির্মাণ ও তার পরীক্ষাও বন্ধ রাখতে হবে। বিগত দুই দশক ধরে বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার জন্য সমানে নানা ধরণের মারণাস্ত্র নির্মাণ ও তার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরীক্ষাকার্যের ফলে বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রের জল কম দূষিত হয়নি। শুধু বর্তমান কালের মানুষই নয়, আগামীকালের মানুষও এই পরীক্ষার ফলে তেজস্ক্রিয়তার শিকার হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য ও বিরোধের অবসান আজও হয়নি। এখনও চলছে শক্তিমান কর্তৃক দুর্বলকে দমন ও শোষণের লজ্জাহীন প্রতিযোগিতা। এর অবসান না করতে পারলে পৃথিবীর পরিবেশ কি সত্যি সত্যিই বিশুদ্ধ করা সম্ভব? এই প্রশ্নই আমাদের প্রধানমন্ত্রী রেখেছেন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমবেত মনীষী ও বিজ্ঞানীদের সামনে। প্রভুত্ব বিস্তার ও শোষণের চেষ্টা থেকে দেখা দেয় যুদ্ধ। সর্বনাশা যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে না পারলে অন্য সব প্রচেষ্টাই হবে অর্থহীন। সুতরাং বিশ্বশান্তিই সর্বাগ্রে কাম্য। যুদ্ধহীন পৃথিবীই মানুষের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ও নিশ্চিত করতে পারে।

পটভূমি

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের জন্যে যে-খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব রচিত হয়েছে সে-সম্পর্কে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটিতে আলোচনা শেষ হয়েছে। পার্টির সংবিধান অনুযায়ী ঐ খসড়া প্রস্তাব সব রাজ্য শাখায় আলোচিত হবে। কোনো শাখা যদি কোনো সংশোধনী প্রস্তাব আনে তবে সেই সংশোধনী প্রস্তাব পার্টি কংগ্রেসের কাছে পেশ করা হবে। সি পি এমের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি মূল প্রস্তাব সম্পর্কে তেমন কোনো সংশোধনী প্রস্তাব আনে নি। এ থেকে এ-কথাই মনে হবে যে, খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে যে 'ট্যাকটিকাল লাইনের' কথা বলা হয়েছে তার পিছনে পশ্চিমবঙ্গ কমিটিরও অনুমোদন রয়েছে।

ঐ খসড়া প্রস্তাবে যে পার্টি লাইনের কোনো বিশেষ পরিবর্তনের কথা বলা হয় নি তা এখন রাজনৈতিক মহলের সকলেই জানেন। গত নির্বাচনে বিপর্যয় ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে 'সি পি এম নেতারা এবার কী করবেন?' —এই প্রশ্ন নিয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল খসড়া প্রস্তাব প্রকাশের পর তা অনেকটাই ঝিমিয়ে যায়। অতি-বামপন্থা এবং চীনের লাইনের সোজাসুজি নিন্দে করার পর এ বিষয়ে জল্পনার সুযোগও কমে যায়। কয়েক মাস আগে সি পি এমের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্মেলনে পার্টির একটি গোপন শাখা গড়ে তোলার সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়েছিল, খসড়া প্রস্তাবে সে প্রসঙ্গও ঠাঁই পায় নি।

ঐ খসড়া প্রস্তাবটিই এখন সি পি এমের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির অনুমোদন পেল। সুতরাং পার্লামেণ্টারি পথ যে সি পি এম নেতারা আপাতত ছাড়ছেন না, এ-কথাটাও প্রমোদ দাশগুপ্ত স্পষ্ট করে না বললেও বুঝতে কোনো অসুবিধে ছিল না।

এই পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার। গোটা দেশে সি পি এমের লাইন বুঝতে কোনো অসুবিধে সত্যিই নেই। কিন্তু বিশেষ করে যখন এই রাজ্যের কথা ওঠে তখনই সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সি পি এম (আর তার সহযোগী দলগুলো) পার্লামেণ্টারি পথেই থাকবে, অথচ বিধানসভায় যোগ দেবে না। নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে 'জাল' বিধানসভাকে মানবে না অথচ ঐ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই যে সরকার গঠিত হয়েছে সেই সরকারকে মানবে। ঐ বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা সম্প্রতি রাজ্যসভায় চারজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিধানসভা যদি 'জোচ্চোরদের আড্ডা হয় (জ্যোতি বসুর ভাষায়) তবে সেই আড্ডার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যরাও নিশ্চয়ই 'সৎ' বা 'খাঁটি' হতে পারেন না। যেহেতু ঐ চারজন সদস্য রাজ্যসভায় বসছেন সুতরাং রাজ্যসভাও নিশ্চয়ই 'কলুষিত' হয়েছে। তবু কিন্তু সি পি এম রাজ্যসভা সম্পর্কে কোনোরকম ছুঁৎমার্গ দেখাচ্ছে না। সি পি এমের ট্রেড ইউনিয়ন শাখা, সিটুর নেতারাও দিব্যি মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন, বন্ধ কারখানা খোলা অথবা কোনো প্রস্তাবিত ধর্মঘটের ফয়সালা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছেন। প্রমোদবাবু এখন বলছেন যে, মন্ত্রিসভাকে তাঁরা মানেন, মন্ত্রিসভার সঙ্গেতো কাজকর্ম চালাতেই হবে। কিন্তু যখন সিদ্ধার্থবাবুর মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে তখন সি পি এমের সান্ধ্য দৈনিকে লেখা হয়েছিল যে, এই রাজ্যে একটি 'সাজানো মন্ত্রিসভা' শপথ গ্রহণ করেছে।

*

এই ধরনের বৈপরীত্য ও বিরোধিতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এই রাজ্যে পাঁচ-দফা আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। সে-ও আজ এক মাসের বেশি হয়ে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সি পি এম বিরাট কোনো আন্দোলন শুরু করতে পেরেছে, এমন প্রমাণ জনসাধারণ পান নি। শিক্ষা বাঁচাও বা চাকরি চাই শ্লোগান দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে অসুবিধে থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই আন্দোলন যে তেমন দানা বাঁধতে পারছে না, তা থেকে সি পি এমের সাংগঠনিক অপ্রস্তুতিটাই ধরা পড়ে। এই ক' মাসের মধ্যেই পার্টির সদস্য সংখ্যা কিছু কমে গেছে। প্রমোদবাবু তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ব্যাখ্যাটা হলো কংগ্রেসী সন্ত্রাস। সেই ব্যাখ্যা মেনে নিলেও একটি প্রশ্ন থাকে। গত মে মাসে রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত নেন যে পার্টির সদস্য সংখ্যা দ্রুত বাড়াবার চেষ্টা করা হবে। আসছে ডিসেম্বরের মধ্যেই মোট সদস্য সংখ্যা যাতে পঞ্চাশ হাজার দাঁড়ায় তার জন্যে চেষ্টা চালানো হবে। এই লক্ষ্য পূরণে কোনো অসুবিধে হবে বলে রাজ্য কমিটি মনে করেন নি। কারণ জনগণ নাকি ক্রমশ কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং তাদের দুর্দশাও বাড়ছে।

রাজ্য কমিটি যখন এই লক্ষ্য স্থির করেন তখন পশ্চিবঙ্গে সি. পি. এমের সদস্য সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো। সুতরাং ডিসেম্বরের মধ্যে আরো পনের হাজার সদস্য সংগ্রহ করতে হলে গড়ে মাসে প্রায় পৌনে দু' হাজার মতো সদস্য সংগ্রহ হওয়ার কথা। কিন্তু ঐ লক্ষ্য স্থির হওয়ার পর সদস্য সংখ্যা তো বাড়েই নি বরং হাজার দেড়েক মতো কমে গেছে। প্রস্তাবিত লক্ষ্যের কথা মনে রাখলে সি. পি. এম এই এক মাসেই তার সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য থেকে প্রায় তিন হাজার পিছিয়ে পড়েছে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যায়। সি পি এমের বিচারে পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে ১৯৭০ সালের মার্চ, অর্থাৎ দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের পতনের পর থেকে। সি পি এম নিজেই বলেছে যে, এই সন্ত্রাসের প্রথম প্রধান শিকার হয়েছে সি পি এম। [illegible] কিন্তু গত দু বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে পার্টির সদস্য সংখ্যা মোটেই কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। ১৯৬৯ সালে, অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট কায়েম হয়েছে এবং সি পি এমের শক্তি যখন সবচেয়ে বেশি তখনও পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল একুশ হাজার মতো। যুক্তফ্রণ্টের পতনের পর থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ত্রিশ হাজারে গিয়ে পেঁছয়। আর এই বছরের গোড়ায় সদস্য সংখ্যা আরো পাঁচ হাজার বেড়ে যায়। 'আধা-ফ্যাসিস্ত' সন্ত্রাসের রাজ্যে যদি সদস্য সংখ্যা এইভাবে বেড়ে যেতে পারে তবে মাত্র এই ক'মাসে দেড় হাজার সদস্য কমে গেল কী করে? এর ফলেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে —সি পি এম নেতাদের বর্তমান স্ববিরোধী নীতিই কি তার শক্তিক্ষয়ের প্রকৃত কারণ নয়?

*

একই সঙ্গে পার্লামেণ্টারি পথে থাকা এবং বিধানসভা বর্জনের মধ্যে যে একটা অসঙ্গতি আছে, এ নিয়ে সি পি এমের শরিকদের মধ্যেও ইদানিং গুঞ্জন দেখা দিয়েছে। অবশ্য বামপন্থী ফ্রণ্টের মধ্যে

বিধানসভায় আসন আছে এমন দলের সংখ্যা সি পি এমকে বাদ দিলে মাত্র দুই (আর এস পি এবং এস ইউ সি)। বিধানসভায় আর এস পির তিনজন সদস্য আছেন। এস ইউ সির মাত্র একজন। সুতরাং আর এস পিই বামপন্থী ফ্রন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক। আর এস পি বিধানসভা বয়কটের সিদ্ধান্ত সমর্থন করবে কিনা, এ নিয়ে এক সময় বেশ জল্পনা শুরু হয়েছিল। তার কারণ, ঐ দলের মধ্যে একটা অংশ এই ধরনের রাজনৈতিক কৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন না। আর এস পির মধ্যে এই ধরনের মতপার্থক্য অস্বাভাবিকও নয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে এই দল কোনো ফ্রন্টেই ছিল না। এ-বছরেও সি পি এম ফ্রন্টে আসার আগে এই দলের মধ্যে যে কোনো দ্বিধাই ছিল না তাও নয়। বামপন্থী ফ্রন্টের মধ্যে আর এস পিই একমাত্র দল বিধানসভায় যার সদস্য সংখ্যা দুটি নির্বাচনেই হুবহু এক থেকে গেছে। সুতরাং তার পক্ষে একটা স্বতন্ত্র লাইনের কথা ভাবা বিচিত্র নয়।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর এস পির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিধানসভা বর্জনের সিদ্ধান্তই অনুমোদিত হয়। কিন্তু তার মধ্যে একটা ফাঁক রেখে দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত যে অপরিবর্তনীয়, এমন কথা আর এস পি বলে নি। দরকার হলে এই সিদ্ধান্ত পাল্টানোও যেতে পারে। কিন্তু সত্যিই পাল্টানো হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে শাসক দলের মতিগতির ওপর। শাসক দল বিরোধী পক্ষকে গণতান্ত্রিক উপায়ে কাজ করতে দেবে কিনা—সেটাই হলো আর এস পির কাছে আসল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব আর এস পি এখনও পায় নি, কিন্তু তবু এই দলের মধ্যেও অবস্থার পর্যালোচনা নিয়মিতভাবেই চলছে এবং বয়কট সিদ্ধান্তের পরিবর্তন যে কোনো মতেই হবে না, এমন কথা বলা চলে না।

বিধানসভা বয়কটের পরিণতি হিসেবে উপ-নির্বাচন বয়কটের যে নীতি বামপন্থী ফ্রন্টের শরিকেরা গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কেও তাদের মধ্যে মতবিরোধের সংবাদ পাওয়া গেছে। উপনির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া হবে না, এই নীতিতে কোনো শরিকেরই আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেই সংগে নির্বাচন বয়কটের ধুয়া তুলতে অনেকেই রাজী ছিল না। তবু সি পি এমের মুখ চেয়েই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, উপনির্বাচনে এই বয়কটের আওয়াজ তেমন ফলপ্রসূ হলো না। ফলে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ আরো জোরালো হয়ে উঠেছে।

বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন বসছে এই মাসের ২৬ তারিখে। এটা হবে বাজেট অধিবেশন, তাই বেশ কিছুদিন ধরেই চলবে। খুব সম্ভবত আগস্ট মাস পর্যন্ত। বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী উপর্যুপরি ষাটটি অধিবেশনে হাজির না থাকলে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। সম্ভবত এই বাজেট অধিবেশনের মধ্যেই সেই মেয়াদ পেরিয়ে যাবে। সুতরাং যাঁরা বিধানসভা বয়কট করে চলেছেন তাঁরা এই অধিবেশন চলার মধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যেমন মুসলিম লীগের সদস্য এখনই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বাজেট অধিবেশনে যোগ দেবেন। গত অধিবেশনে তিনি হাজির ছিলেন না।

তবে সদস্যপদ আপনা থেকেই খারিজ হয়ে যায় না। সরকার পক্ষকে একটি বিশেষ প্রস্তাব এনে ঘোষণা করতে হয় যে, অনুপস্থিত সদস্যদের সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়া হলো। সিদ্ধার্থবাবুর মন্ত্রিসভা তা হয়ত করতে চাইবেন না। কারণ, এই-ভাবে সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেলে সি পি এম ও তার শরিকদের অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব সহজে মিটে যায়। বরং যতোদিন সদস্যপদ বহাল থাকবে ততোদিনই অনুপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দোটানার ভাব বজায় থাকবে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত সদস্যদের মত পরিবর্তনের সম্ভাবনাও থেকে যাবে। শেষ পর্যন্ত কিছু সদস্যেরও যদি মত বদলায় তবে সেটাই হবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক জয়।

১৫-৬-৭২ —দেবদত্ত

হেলসিংবার্গে সোফিয়েরো প্রাসাদ উদ্যানে সুইডেনের ৯০ বছর বয়স্ক রাজা গুস্তাভ অ্যাডলফের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

দেশে বিদেশে

আর একটি অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন ঘটল এবং একটি রাজ্য মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য দিল্লি থেকে আর একজন লোকসভার সদস্যকে পাঠান হল। এর আগে দিল্লির মন্ত্রিমণ্ডলী ছেড়ে পি সি শেঠী মধ্যপ্রদেশের, ঘনশ্যাম ওঝা গুজরাটের এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এবার কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী।

ওড়িশায় বিশ্বনাথ দাস মন্ত্রিসভার পতনের পর একমাত্র কেরলেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা টিকে থাকল। অনিবার্য ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও ওড়িশার এই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা দিন দুই তিন আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার জন্য তাঁরা রাজ্যপালকে ২৬ জুন বিধানসভার বৈঠক ডাকার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ২৬ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজনই থাকল না। তার ঢের আগেই কংগ্রেসের দিকে ঢল নামল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নীলমণি রাউত রায়ের নেতৃত্বে ফ্রন্টের অন্যতম শরিক উৎকল কংগ্রেস দল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত করল। তখনই অশীতিপর মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস হাল ছেড়ে দিলেন। রাজ্যপালের কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র লিখে দিয়ে এলেন।

ওড়িশার ১৪ মাসব্যাপী ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হতে থাকল যে, নতুন যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হবে তার নেতৃত্ব সেখানকার বিধানসভার কংগ্রেস দলের বর্তমান সদস্যদের মধ্যে কাউকে দেওয়া হবে না, ঐ নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য দিল্লি থেকে কাউকে পাঠান হবে। কলকাতায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী বললেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বললে তিনি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

এদিকে বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা বিনায়ক আচার্য দলের ভেতর নিজের সপক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করার চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু তিনি বেশিদূর এগোতে পারলেন না। কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব বুঝে বিধানসভার কংগ্রেস দল স্থির করল যে, শ্রীমতী গান্ধী যাঁকে বলবেন তাঁকেই দল নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেবে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের পর বৈঠক হল। সেখানেও আনুষ্ঠানিকভাবে কারও নাম বাছাই করে দেওয়া হল না। বলা হল যে, ওড়িশা বিধানসভার কংগ্রেস দলের ইচ্ছা অনুযায়ীই নেতা নির্বাচন করা হবে। এই ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিৎ যাদবকে ভুবনেশ্বরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করা হল। অবশ্য শ্রীযাদব ওড়িশায় এসে পৌঁছবার পর বিধানসভার কংগ্রেস দলের সদস্যদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় নি, ওড়িশার কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী পদে দলের নেতারা কাকে দেখতে চান। এর পর বিধানসভার কংগ্রেস দলের সভায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর নির্বাচন দলের নেতাদের সিদ্ধান্তের ওপর নিছক শিলমোহর মারার অনুষ্ঠানে পরিণত হল।

১৩ জুন বিধানসভার কংগ্রেস দলের অধিবেশনের পর সেই প্রত্যাশিত ঘোষণাই শোনা গেল: শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী 'সর্বসম্মতিক্রমে' দলের নেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। দলের ঐ সিদ্ধান্তের কথা যাঁরা রাজ্যপাল যোগেন্দ্র সিংকে জানিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে বিনায়ক আচার্যও ছিলেন। তাঁরা একথাও জানিয়ে এলেন যে, ১৪০ জন সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা এখন ৯৫ (আগেকার ৫৬ জন এবং তার সঙ্গে যুক্ত হলেন উৎকল কংগ্রেসের যে ২৮ জন, স্বতন্ত্র দলের যে নয়জন ও ঝাড়খণ্ড দলের যে দুজনকে দলে নেওয়া হয়েছে তাঁরা)। এছাড়া সি-পি-আই-

এর চারজন এবং জন কংগ্রেসের যে একজন মাত্র সদস্য বিধানসভায় আছেন তাঁদের সমর্থন পাওয়ার আশাও কংগ্রেস রাখে। শ্রীমতী শতপথীর নির্বাচিত হওয়ার এই সংবাদ পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ-ভবন থেকে তাঁর কাছে রাজ্যপালের আমন্ত্রণ গেল ওড়িশায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য।

যদিও প্রকাশ্য ঘোষণায় শ্রীমতী শতপথীর নির্বাচন 'সর্বসম্মতিক্রমে' হয়েছে, বলেই জানান হল তাহলেও ভেতরকার যে সংবাদ জানা গেল তাতে মনে হয়, এই নির্বাচন সম্পূর্ণ বিনা বাধায় বা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। বিশেষ করে বিনায়ক আচার্যকে রাজি করান সহজ হয় নি। তিনি যাতে শ্রীমতী শতপথীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং তাঁকে যাতে সেই মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী বলে গণ্য করা হয় তার ওপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ১৩ জুন বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি দিল্লি থেকে ভুবনেশ্বরে টেলিফোন করে এবিষয়ে নাকি চন্দ্রজিৎ যাদবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। শ্রীআচার্য নিজে টেলিফোন পেয়েছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উমাশংকর দীক্ষিতের কাছ থেকে। শ্রীদীক্ষিত শ্রীআচার্যকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যাতে তিনি শ্রীমতী শতপথীকে নেত্রী হিসেবে মেনে নেন।

বুধবার ১৪ জুন ভুবনেশ্বরের রাজ-ভবনে শ্রীমতী শতপথীর নেতৃত্বে সাতজন সদস্যের নতুন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলেন। এই মন্ত্রিসভায় শ্রীমতী শতপথী বাদে আর যে ছয়জন সদস্য থাকলেন তাঁরা হলেনঃ—বিধানসভার কংগ্রেস দলের বিদায়ী নেতা বিনায়ক আচার্য, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ব্রজমোহন মহান্তি, উৎকল কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা ও বিদায়ী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নীলমণি রাউত রায়, ভূতপূর্ব পি-এস-পি নেতা বাঁকাবিহারী দাস, বিদায়ী মন্ত্রিসভার স্বতন্ত্র দলভুক্ত সদস্য গঙ্গাধর প্রধান ও লক্ষ্মণ মল্লিক। অর্থাৎ বিশ্বনাথ দাস মন্ত্রিসভার দুজন সদস্য এই মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন। অন্য সদস্যরা নবাগত। নতুন মন্ত্রিভার একটি বৈশিষ্ট্য হল, সম্ভবত এই প্রথম ওড়িশার কোন মন্ত্রিসভায় সামন্ত রাজাদের কারোরই স্থান হল না।

বিধানসভায় যে বিপুল সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কার্যারম্ভ করলেন, ইদানীং ওড়িশায় আর কোন মন্ত্রিসভাই এত বিপুল সমর্থন পাননি। শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী শতপথী বলেন যে, তাঁর সরকার সামনের দিকে তাকিয়ে ওড়িশাকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রেরণাদায়ক ও গতিশীল নেতৃত্বে জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করবেন। তিনি বলেন যে, এই কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য প্রশাসনযন্ত্রকে 'গতিশীল, সংবেদনশীল, উদ্দেশ্যনিষ্ঠ ও দলীয় পক্ষপাতশূন্য' করতে হবে।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ করে শ্রীমতী শতপথী কংগ্রেসের ভেতর তাঁর স্বল্পকালের রাজনৈতিক জীবনের নতুন গৌরব অর্জন করলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি ছেড়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন মাত্র ১৪ বছর আগে—১৯৫৮ সালে। ১৯৬০ সালে তিনি যখন উৎকল কংগ্রেসের মহিলা শাখার আহবায়িকা ছিলেন, সেই সময়ে তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নজরে পড়েন। ১৯৬২ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। মন্ত্রিত্বে প্রথম দায়িত্ব পান ১৯৬৯ সালে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উপ-মন্ত্রী হিসাবে। পরের বছর পদোন্নতি হল, তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কার্যত তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ভার পান ১৯৭১ সালে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর। গত ৯ জুন তিনি ৪১ পার হয়ে ৪২ বছরে পা দিয়েছেন। এই বয়সে তিনি ভারতের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী-দের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ। আর মহিলা মুখ্য-মন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী শতপথী দ্বিতীয়—তাঁর আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে-ছিলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী।

শ্রীমতী শতপথীর স্বামী দেবেন্দ্র শত-পথী গত বছর লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

• • •

শ্রীমতী শতপথীর দিল্লি থেকে ভুবনে-শ্বরে বদলি হয়ে আসার মধ্যে কি শুধু তাঁর ওপর প্রধানমন্ত্রীর আস্থারই পরিচয় পাওয়া গেল? অথবা আরও কিছু বোঝা গেল?

যাঁরা এই ঘটনার নিগূঢ়তর তাৎপর্য বুঝতে চাইছেন, তাঁরা অনুমান করছেন, শ্রীমতী শতপথীকে সরিয়ে দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের ভেতরকার 'বামপন্থী লবি'কেই সংযত করতে চাইছেন। প্রাক্তন কম্যুনিস্ট শ্রীমতী শতপথী এই 'বামপন্থী লবি'র লোক হিসেবেই পরিচিত।

এই রকম একটা ধারণা নিতান্ত অকারণে ছড়িয়ে পড়েনি। কংগ্রেসের ভেতরকার র‍্যাডিক্যাল বা বামপন্থী মহলে বিভেদের যে সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে রাজনৈতিক মহল শ্রীমতী শতপথীর ভুবনেশ্বরে বদলি হওয়ার ঘটনাটি বুঝবার চেষ্টা করেছেন।

কংগ্রেসের ভেতরকার এই বামপন্থী মহল সম্প্রতি বেশ সরব হয়ে উঠেছিলেন জমির সিলিংয়ের প্রশ্নে। তাঁরা কংগ্রেসের ভেতর-

কার 'কুলাক লবি'র বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে অভিযোগ করতে থাকেন যে, ঐ লবির অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেসী ভূমিপতিরা আপন স্বার্থেই কংগ্রেসকে তার ভূমি-সংস্কার নীতি কার্যকর করতে দিচ্ছেন না। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন উপলক্ষ করে কংগ্রেসের 'র‍্যাডিক্যাল ও তার বাইরের অংশের মধ্যে শক্তি পরীক্ষাও হয়ে গেল। এর পরেই শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে, অথচ অস্পষ্টভাবে বললেন, 'কংগ্রেসের নীতি মেনে যাঁরা চলতে পারবেন না, তাঁরা বরং দল ছেড়ে যান।' দলের ঠিক কোন্ অংশের উদ্দেশে তিনি এই হুঁশিয়ারি দিলেন সেটা খুব পরিষ্কার বোঝা গেল না। তবে, দেখা গেল, র‍্যাডিক্যালরা একটু গলা নরম করলেন, 'কুলাক লবি'র সমালোচনাও কিঞ্চিৎ চাপা পড়ল।

এর পর এ আই সি সি-র সভার লক্ষ্য করা গেল, ইস্পাতমন্ত্রী ও প্রাক্তন কম্যুনিস্ট নেতা মোহন কুমারমঙ্গলম্ তাঁর বক্তৃতায় 'র‍্যাডিক্যালিজমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র নিন্দা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আব-হাওয়াবিশারদরা হাওয়া বোঝার চেষ্টা আরম্ভ করে দিলেন। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'নিউ এজ' পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য মোহন কুমারমঙ্গলম্ সম্পর্কে লিখলেন, তিনি 'অস্বস্তিকর স্তাবকতায় গা ভাসিয়েছেন।'

মৌচাকে ঢিল পড়ল যখন কংগ্রেসের অন্যতম 'তরুণ তুর্কি' প্রাক্তন পি-এস-পি সদস্য চন্দ্রশেখর তাঁর সম্পাদিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কংগ্রেসের ভেতরকার 'কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর' বিরুদ্ধে আক্রমণ করে লিখলেন। 'কংগ্রেসের বামপন্থী লবি' শিরোনামায় ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, 'সি-পি-আই থেকে এসে যাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন।...যেসব পদে ক্ষমতা আছে সেসব পদ লাভ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের কর্মকৌশল স্থির করার জন্য তাঁরা নিজেদের গোপন সভা করতে আরম্ভ করেছেন।...তাঁদের দ্বিতীয় কৌশল হল যেসব কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীর কম্যুনিস্ট অতীত নেই তাঁদের কুৎসা করা ও তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। তাঁদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার তৃতীয় আর একটি ধারা হল, শুধু যে তাঁরাই প্রধানমন্ত্রীর আস্থা-ভাজন এরকম একটা জনরব ছড়িয়ে দেওয়া।'

এই প্রাক্তন কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসের কিছু অংশকে দলে টানবার জন্য যেভাবে আফ্রো-এশিয়া সংহতি পরিষদ, পিস কাউন্সিল প্রভৃতির মারফৎ বিদেশ ভ্রমণের লোভ দেখিয়েছেন, চন্দ্রশেখর তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন।

কংগ্রেসের ভেতরকার বাম লবির এই বিরোধ কত গভীর সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে 'কংগ্রেস ফোরাম ফর সোস্যালিস্ট অ্যাকশনের' ওপর যে এই বিরোধের তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে সেটা বোঝা যাচ্ছে। সম্প্রতি ফোরামের সভায় শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীকৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি এই অভিযোগ করেছেন বলে জানা গেছে যে, ফোরামের অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন কম্যুনিস্টরা এই ফোরামকে নিজেদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং দলের ভেতর ও সরকারের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

বিরোধটা আরও কিছুদূর গড়াবে বলে মনে হচ্ছে।

* * *

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য ২৮ জুন ভারতে আসছেন। দিল্লি ও সিমলা, দু জায়গাতেই এই বৈঠকের জায়গা তৈরি করে রাখা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যেখানে চাইবেন সেখানেই এই বৈঠক হবে।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যে এই শীর্ষ বৈঠকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেকথা তিনি বেশ ভালভাবেই জানান দিচ্ছেন। এই শীর্ষ বৈঠকের আগে নিজের হাত শক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ১২ দিনে পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার ১৪টি দেশ সফর করে এলেন। এই দেশগুলি হল : আবু ধাবি, কুওয়াইট, লেবানন, ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, সুদান, নাই-জিরিয়া, গিনি, মরিটানিয়া, তুরস্ক ও ইরান। গত বছর ৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ-বিরতি ও অবিলম্বে উভয় পক্ষের সৈন্যাপসারণের আহ্বান জানিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে এই ১৪টি দেশের সকলেরই সায় ছিল। এই দেশগুলি কেউই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। যাত্রার প্রাক্কালে ভুট্টো এই দেশ-গুলিকে 'মুসলিম দেশ' বলে অভিহিত করেছিলেন, যদিও সেটা ঠিক নয়, কেননা, ওদের মধ্যে একটি দেশের (ইথিওপিয়ার) রাষ্ট্রপ্রধান খৃস্টান এবং অন্য দেশগুলিরও অধিকাংশই ইসলামী দেশ বলে আত্মপরিচয় দেয় না। ভুট্টো সাহেব বিদেশ সফর থেকে ঘরে আসার পর রেডিও পাকিস্তান থেকে ঘোষণা করা হল, এই সফর 'পাকিস্তানের মনোবল চাঙা করে তুলতে পেরেছে।'

শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হওয়ার আগে পাকিস্তানকে একটু চাঙা করে তোলাটাই যে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর উদ্দেশ্য ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর তাঁর সেই উদ্দেশ্য যে অন্তত আংশিকভাবে সফল হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। যেসব দেশে তিনি সফর করেছেন, তাদের অধিকাংশই পাকিস্তানের সঙ্গে সায় দিয়ে সৈন্যবাহিনীর অপসারণ ও যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যর্পণ দাবী করেছে। আবু ধাবি, কুওয়াইট, জর্ডান, সৌদি আরব, সুদান, গিনি, মরিটানিয়া, তুরস্ক ও ইরান আরও স্পষ্ট করে বলেছে যে, সৈন্যাপসারণ ও যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে রাষ্ট্র-সংঘের প্রস্তাব ও আন্তর্জাতিক প্রথা অনুযায়ী। সোমালিয়া পাকিস্তানের সমর্থনে আরও একটুখানি এগিয়ে 'পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি' সমর্থন জানিয়েছে। ইথিওপিয়া ও নাইজিরিয়া শুধু এই আশা প্রকাশ করেছে যে, ভারত-পাকিস্তান শীর্ষ সম্মেলন সফল হবে।

পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার এইসব দেশের সার্টিফিকেট দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো নিশ্চয়ই তাঁর নিজের দেশের লোককে, ভারতকে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে, পাকিস্তানও নির্বান্ধব নয়।

কিন্তু শুধু এই মনস্তাত্ত্বিক সান্ত্বনাই নয়, ভুট্টো সাহেব এই যাত্রায় হয়ত তাঁর দেশের জন্য কিছু বাস্তব সাহায্যও নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। 'সেণ্টো' বা কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থার সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগটা তিনি আবার ঝালিয়ে তুলেছেন। আশা এই যে, ভবিষ্যতে পাকিস্তানে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার জন্য 'সেণ্টো' হয়ত একটি গুপ্ত পক্ষ হিসেবে কাজে আসবে। অথচ, ভুট্টো অতীতে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সংস্থাগুলির সংযোগের বিরোধিতা করেছেন এবং তিনি ক্ষমতায় এলে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবার তাঁকে সেকথা মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেন, ভারত যতক্ষণ সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ পাকিস্তানেরও সেণ্টোর সঙ্গে সংযোগ রাখা দরকার হবে।

কিন্তু ভুট্টো সাহেবের দুর্ভাগ্য এমনই যে, পাকিস্তানের জন্য সুসংবাদ নিয়ে বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, ঘরে তাঁর জন্য দুঃসংবাদ অপেক্ষা করে আছে। সেখানে শ্রমিকরা ও ছাত্ররা উত্তেজিত, পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ চলছে। এইসব দেখে ভুট্টো সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, আর কিছু নয়, শীর্ষ সম্মেলনের আগে তাঁকে অপদস্থ করার জনাই এসব হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রুদের চক্রান্ত।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছেন, ২৮ জুনের শীর্ষ সম্মেলনে তিনি ভুট্টোর কাছে আবার যুদ্ধ বর্জনের প্রস্তাব তুলবেন। কিন্তু সে-প্রস্তাবে ভুট্টো সাহেব যে সাড়া দেবেন এমন মনে হয় না। কারণ, তাহলে তাঁকে 'লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর' জিগির ছাড়তে হবে।

—পুণ্ডরীক

ভ্রম সংশোধন

গত ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'মা-কালী' গল্প লেখকের নাম দিলীপ কুমার দাশগুপ্ত হবে।

বিপ্রলব্ধা

সুজাতা

এক ঝাঁক-মেয়ে হুড়োহুড়ি করে বাসে উঠেছিল।

ভর্তি বাস থেকে অনেকেই চেঁচিয়েছিল, কণ্ডাক্টারকে বলেছিল আর তুলবেন না, আর নয়। দাঁড়াবার জায়গা নেই। এগিয়ে চলুন।

আর, যাত্রী তোলবার ইচ্ছা হয়ত 'কণ্ডাকটারের'ও ছিল না, কিন্তু দাঁড়াতেই হবে, স্টপেজ যে।

নামল দু-চারজন, উঠল অনেক বেশী।

একদল মেয়ে, নানা বয়েসের মেয়ে।

ঠেলাঠেলি করেই উঠলো তারা, আর বছর দুয়েকের বাচ্চা কোলে নিয়ে অল্পবয়সী মেয়েটি কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে দাঁড়ানো যাত্রীদের পা মাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েও গেল।

ধাক্কা খেয়ে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। এ্যাই চুপ ? চুপ যা! বলে স্খলিত আঁচল কাঁধে তোলার ভঙ্গী করে সেই অল্পবয়সী মা ছেলেকে শাসন করল।

ছেলেটার বড় মাথা, সরু সরু হাত-পা।

যাত্রীদের অনেকেই ভিড়ের মধ্যেও চেয়ে চেয়ে মা-ছেলেকে দেখছিল।

মার এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, এমন চকচকে পালিশ করা কালো চামড়া, ছেলের দশা এমন কেন? বসে থাকা প্রৌঢ়া ফিসফিস করে বললেন, পুত্রবধূকে।

ফিসফিস করে বললেও কথা বোধহয় শুনতে পেয়েছিল মেয়ে, চেঁচিয়ে উঠল জোরে, আমার ছেলের দশা যাই হোক, তোমার তাতে কি বুড়ী?

ওমা! এ যে ঝগড়া করে গো। ভদ্রমহিলা অবাক হলেন। তারপর বেশ কড়া গলাতেই বললেন, ছোটলোক কিনা?

কি বল্লে? ছোটলোক। নাকের পাটা কাঁপিয়ে মেয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে এগিয়ে এলো, সংগে তার সঙ্গী দু-চারজনও।

ওমা। মারবি নাকি?

এই! এই! চুপ কর। চুপ কর। বাসের অনেকেই মেয়েটিকে শান্ত করার প্রয়াস পেলেন। উনি অত কিছু ভেবে বলেন নি। আরে উনি তোমার মায়ের মতন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওমন মা ঢের দেখিচি। বলে কিনা ছোটলোক?

ভদ্রমহিলা আবারও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, 'মা' বলে ডেকে পুত্রবধূ হাত চেপে ধরল। শাশুড়ী জানালা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসলেন। কিন্তু কালো মেয়ে ভিড়ের মধ্যেই মাথা গলিয়ে হাত নেড়ে বারবার বলতে লাগল, ক্যাহ্নো। ক্যাহ্নো ও আমাকে ছোটলোক বলবে।... ইঃ। কিসের আসপদ্দা।

ভদ্রমহিলা কোনও উত্তর করলেন না, পরের স্টপেজেই পুত্রবধূর হাত ধরে নেমে গেলেন।

কালো মেয়ে মাথা ঝুলিয়ে দেখল। ইঃ। আবার টেকচি চড়া হচ্ছে। বজ্জাত মাগী।

এই। এবার একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। কেন গালাগালি দিচ্ছ।

বেশ করিচি। আমায় কেন গাল দিল বুড়ী মাগী।

চুপ কর। চুপ কর। অনেকে বলে উঠলো একসঙ্গে। আর সরু সরু হাত-পা, বড় মাথা ছেলেটা কেঁদে উঠলো জোরে। মোড়ের কাছে বাস বাঁক নেবার জন্য টলে টলে এ'ওর গায়ে পড়লো, হঠাৎ একটা চেঁচামিচি সুরু হয়ে গেল। এই। পা মাড়াচ্ছ কেন? একজন বললো।

আরে। গায়ের ওপর দিয়ে চলেছ যে! দেখতে পাচ্ছ না নাকি।

যেতে হবেনি? বসবোনি? সদর্পে সেই কালো চকচকে চামড়ার মেয়ে বলল, তার দক্ষিণ বাংলার টানে। খোলা চুলের ঝাপট মেরে কালো মেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল, আর 'রড' ধরে ঝুলে থাকা যাত্রীদল কেউ কাত হয়ে, কেউ পাশ ফিরে, কেউ বা কালো মেয়ের গায়ে পিষ্ট হবার চেষ্টা করে ওকে পথ দিল।

কোথায় বসবে? জায়গা কই? অনেকের প্রশ্ন। তবু কালো মেয়ে আর আরও দু-চারজন ঠেলাঠেলি করেই ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলের অস্বস্তি, জমাট ভিড়ে যেন জোয়ারের জল ঢুকেছে।

বাস থামল। হেলে হেলে এ'ওর গায়ে পড়লো, অনেকের সঙ্গে দুজন ভদ্রমহিলাও নামলেন।

বাস থেমে আছে, অনেক যাত্রীর ওঠা-নামা হঠাৎ নেমে যাওয়া এক ভদ্রমহিলা ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন বাসের কাছে। আমার টাকা। আমার টাকা।

টাকা? সমস্বরে প্রশ্ন উঠলো বাস থেকে।

হ্যাঁ। দশটা টাকা ছিল এই ছোট পার্সে। ঐ বুড়ী...হ্যাঁ। নিশ্চয়। এই-ই আমার গায়ের ওপর পড়ছিল খালি...হ্যাঁ.- নিশ্চয়।

কিন্তু বাস ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। লম্বা সুট পরা ছেলেটির বুক ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কালো মেয়েটি রোগা ছেলের মাথা চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, আর ঘুম আর বলে।

সামনের দিকে আবার একটা গোলমাল, কারা যেন বলছে পকেট মার উঠেছে বাসে, পকেট মার।

এই, এই মেয়েগুলো—কে যেন বললো।

ধর, ধর ওদের। মেরে নাবিয়ে দাও। গাড়ীর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচামিচি বাড়ছে।

কন্ডাকটার হঠাৎ জোরে ধমকে উঠলো কালো মেয়ের কাছাকাছি দাঁড়ানো সিল্কের শাড়ী পরা বৃদ্ধাকে। ফের আমার গাড়ীতে উঠেছিস তোরা। নাম, নাম বলছি, এক্ষুনি নেমে যা। কন্ডাকটার দড়ি ধরে ঘন ঘন ঘন্টা বাজাল। বৃদ্ধা বোধহয় কিছু বলতো, বলতো হয়ত কালো মেয়েটিও, কিন্তু কন্ডাকটার আর তাদের কথা বলার অবসর দিল না। একরকম জোর করেই নামিয়ে দিল বৃদ্ধাকে, বার বার বলল, এক্ষুনি যদি না নামিস পুলিশে ধরিয়ে দেব তাহলে।

আর আশ্চর্য! কন্ডাকটারের কথায় কোনও প্রতিবাদ করল না বৃদ্ধা, নিঃশব্দে নেমে গেল। আরো চারজন মেয়েও নেমে গেল বৃদ্ধার সঙ্গে।

স্টপেজ তখনও আসেনি, একরকম জোর করেই কন্ডাকটার নামিয়ে দিল গোটা দলকে পথের মধ্যে।

বাসের দু-একজন অবাক হলেন। ক্ষীণ-কটি চুড়ো করা চুল মেয়েটি আঁকা ভ্রূ টান করে বলল, এ কিন্তু অন্যায়। ওরা গরীব নিম্নশ্রেণীর বলেই...কি প্রমাণ আছে যে ওরাই চোর?

স্বাস্থ্যবতী চওড়া সিঁদুর পরা মধ্য-বয়সী মহিলা হাসি হাসি মুখে বললেন, ওমা! দেখলেন না, কন্ডাকটার চেনে ওদের পকেটমার বলে। পুলিশে দেবে বলছিল যে তখন, শুনলেন না?

কিন্তু প্রমাণ কোথায়?

প্রমাণ আবার কি? গুঞ্জন সুরু হলো একটা। বাস স্টপেজে এল, রোগা ছেলে সামলাতে সামলাতে কালো মেয়েও নেমে গেল নিঃশব্দেই।

স্টপেজ ছাড়িয়ে উল্টোদিকে খানিকদূরে এগিয়ে গেল মেয়ে, দাঁড়াল থমকে মুখভরা হাসি নিয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রেশমী শাড়ী পরা বৃদ্ধা গোটা দল নিয়ে এসে দাঁড়াল কালো মেয়ের সামনে। রাগ-রাগ গলায় বললো, এ্যাই ছুঁড়ি। এত হাঁসতিচিস ক্যাহ্নে! এত হাঁসির কি হোল? গইড়ে পড়তিচিস যে একেবারে পতের মদ্দি। এ্যাঁ।

ক্যাহ্নো। হাঁসবো না ক্যাহ্নো। তুমি অমনতরা দিনরাত ছুঁড়ি ছুঁড়ি কোরনিতো। ক্যাহ্নো। নাম নেই আমার।

নাম নিয়ে ধুয়ে খাগে বসে বসে। এক আদলা ওজকার হোলনি। বাসে উঠতে না উঠতে ধরে ধরে নাইমে দিলে গা।

অ গো। তোমাদের হোলনি বলে কারোর হোলনি বলতিচ ক্যাহনো গো?

পেলি কিছু।

পাবোনি মানে? আমি কাজলি না? সগর্বে বুকের মধ্য থেকে চামড়ার থলি বার করতে করতে কাজল বলল, থলিটা কিন্তুন আমি নেবো বলতিচি আগু থাকতে। হ্যাঁ।

আগে দেকি? কত আচে। বৃদ্ধা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল কাজলের হাতে ধরা ব্যাগ। উপুড় করে দেখল। পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ পয়সা।

হুঁ। বৃদ্ধার চাপা ঠোঁটে সন্তোষের হাসি। দেকি আর কি আচে? একবার একটা সোনার আংটি পেনু আমি এমন ভরো ব্যাগের মদ্দি।

আঃ! বিরক্ত কাজল বৃদ্ধার হাত থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নিল। খুড়ীর যেন ঢং। উল্টে-পাল্টে দেকলিতো। দে আমার ব্যাগ।

বৃদ্ধা সন্দিগ্ধ চোখে চাইল কাজলের দিকে। আর কিছু নুইকে ফেল্লি না তো?

নুইকে ফেল্লি নাতো! ছোট মেয়ের মত জিভ ভেঙাল কাজল বৃদ্ধাকে। বুড়ী চোকখাগী। এতের বেলা নাকি, চোকে দেখিচস না?

বড় মাথা, সরু হাত-পা ছেলে কোলে দুলে দুলে এগিয়ে গেল কাজল।

ও কাজলি? এই বলি শোন।

নানুহা। কাজল রাগ-রাগ মুখ করে ফিরে তাকাল। ক্যাহ্নো। আমি ভাগ নুইকে ফেলি আমি খারাব লোক।

কবে আবার বলিচি তুই খারাব। হ্যাঁ লো। এই কাজলি। বৃদ্ধা অনুনয় করতে লাগল কাজলের রাগ ভাঙানোর জন্য, গতির বেগ বাড়ালো, প্রায় ছুটতে ছুটতে চললো দ্রুতগতি কাজলের সঙ্গে।

হঠাৎ থামল কাজল। বৃদ্ধা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাজলের গায়ে।

মাইরি বলতিচি খুড়ী তোকে, এক রত্তি মাল আমি নুইকে আকিনি। খোকার দিব্যি। রোগা ছেলেটার বিরল-কেশ বড় মাথায় হাত দিল কাজল।

ষাট ষাট। ছেলেপুলের দিব্যি মানষে দ্যায়, না তাই দিতে আচে? বুড়ী পিছন ফিরল, থেমে হঠাৎ সন্দিগ্ধ সুরে আবার বলল, তোর বুকের মদ্দি কি যেন আরো আয়েচে না?

আয়েচে তোর মাতা। হনহন করে ছেলে বুকে চেপে এগিয়ে গেল কাজল।

বৃদ্ধা যেতে যেতে আবার চেঁচিয়ে বলল, এই ওদের মদ্দি ওগা ছেলে নে না গেলি হোতনি?

নানুহা। খোকার অসুদ আনবুনি। কালো চুলের রাশি দুলিয়ে কালো মেয়ে মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হোল। আপন মনে বকতে বকতে বৃদ্ধা ফিরে এল তার দলের কাছে। চল গো তোরা।

কাজলি! অল্পবয়সী আর একটি মেয়ে বৃদ্ধার দিকে চাইল।

চুলোয় গেচে কাজলি। নে, নে, চ তোরা। বেলা পুইয়ে গেল একেবারে। যেন পালকের মত গোটা দলকে চালিয়ে নিয়ে চলে গেল খুড়ী।

রোগা ছেলের ওষুধ নিয়ে কাজলি ফিরল আরো অনেক পরে। এই মাড়োয়ারি হাসপাতালটায় বিনা পয়সায় ওষুধ পাওয়া

যায় বটে, কিন্তু বড় বসে থাকতে হয়। হাসপাতালে না গিয়ে যদি একটা ভাল ডাক্তার দেখানো যেত। সত্যি! নিজের চক-চকে টান টান চামড়ার দিকে চোখ পড়ল কাজলের। বুড়ী মাগী মিছে বলেনি কিন্তুন। কাজলের মাথা টিপটিপ পর্যন্ত করে না কখনও আর ওরই আপন ছেলে বারো মাস ভোগে। পুয়ে পাওয়া খুড়ী বলে। কে জানে কি পাওয়া, কিন্তু ছেলেটা বাড়ে না মোটে, হাত-পা মোটা হয় না, মাথাটা বড় হয়ে যাচ্ছে শুধু।

তবু ছেলের জন্য আধসের দুধ রাখে কাজল, একটা গোটা ঘর আদায় করেছে খুড়ীর কাছ থেকে ছেলে যাতে তক্তপোষের বিছানায় হাত-পা মেলে শুতে পারে। আর শান বাঁধানো মেজেয় উপুড় হয়ে শোয় কাজল। ঠান্ডা শানের সংগে ওর গরম শরীরটা চেপে ধরে কাজল, তবু 'শরীল ঠান্ডা হয়নি গা।'

হ্যাঁ, কাজলের বড় গরম। বুকের মধ্যে হু-হু করে জ্বলে যায় দিনরাত। খুড়ী হাসে, বলে বয়েসের গরম তোর।

বয়সের কিনা কে জানে, তবে গরম ঠিকই। আজও তাই ঘুম আসছে না কাজলের, শান বাঁধানো মেজের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কাজল, নিঃশ্বাসে ঘরের বাতাস ভারি।

শুয়ে শুয়েই কোমরের কাছে কাপড়ের ভাঁজ থেকে জিনিসটা বের করে চোখের সামনে ধরল কাজল। আতের বেলা ছাড়া পরাণভরে দেকারই যো আছে ছাই এমন জিনিসটো। রোজ রাতেই তাই একলা ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে কদিন আগের লুকিয়ে রাখা মালটা দেখে কাজল। সুন্দর সোনা বাঁধান চমৎকার একটা কলম।

আদর করে কলমটার গায়ে হাত বোলাল কাজল। সোনার কলম, সোনার মানব তোমার। সেই সোনার বাবুর বুকে নেগে ছিলে তুমি। সই সায়েব বাবুটা বেশ।

খুড়ীর শিখিয়ে দেওয়া কায়দায় উদ্ধত বুকের ধাক্কা দিয়ে যখন এগিয়ে গেল কাজল, সাহেবি পোশাক পরা বাবুর চওড়া বুকের ছাতি ঘেঁষে দাঁড়াল, বাবুটা ক্যামন কুইকড়ে গ্যালো গো। অতখানি নম্বা মানুষটা হেলে নুইয়ে পড়ে পথ করে দিল কাজলকে।

কাজল কিন্তু এগিয়ে গেল না। সেইখানে সেই সাহেবি পোশাক পরা বাবুর বুকের কাছেই দাঁড়িয়ে রইল, অনেক, অনেকক্ষণ। আর সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ভিড়ের আর এক ধাক্কায় বাবুর বুকে পড়ল, সোনার কলম আর টাকাভরা চামড়ার থলি বাবুর বুক পকেট থেকে কাজলের বুকে এসে জমা হোল। আর আশ্চর্য! হঠাৎ কেমন সর্বশরীরে শিউরে উঠল কাজল, গরম আরো বেড়ে গেল, আগুন আগুন কি যেন সব কান থেকে উঠে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল কাজলের। বাবুর পাশ থেকে তখনই সরে যেতেও পারল না কাজল পা যেন পাথর। ছেলেটাও ঝিমিয়ে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে থাকল, আর বাবুর গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কাজল চুপ করে। ভুলে গেল কাজল খুড়ীর উপদেশ। মাল হাতে এসে গেলেই আর সেকেনে মোটে দাঁড়াবিনি। যেমহ্‌ন করে হোক সেকেন তেকে পেইলে যাবি। খুড়ী বারবার সাবধান করেছে। আর সেদিন তখনই পালাবার কত সুযোগ সুবিধাই তো হোল। বাস হেলে পড়ে এ ওর গায়ে পড়ল, নতুন লোক উঠে ঠেলাঠেলি সুরু করল, উল্টোদিকের লেডিস খালি।

কিন্তু কি যে সেদিন হোল কাজলের কে জানে। বাসের ধাক্কায় গায়ে গা ঠেকে সর্বাঙ্গ অবশ করে আনছে, দুই চোখের পাতা যেন বুজে বুজে আসছে, কাজলের হু-হু করা মন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

হৈচৈ উঠল, কন্ডাকটার চেঁচাতে লাগল, খুড়ীকে বকাবকি সুরু করল, হঠাৎ যেন সুখের ঘুম থেকে জেগে উঠল কাজল। ও। বাস থেকে নামিয়ে দিচ্ছে খুড়ীকে দল সুদ্ধ। কাজল গায়ে কাপড় টেনে সরে দাঁড়াল, দলের সংগে নামবে না সে। বাবুর পাশ ছেড়ে উল্টোদিকের খালি লেডিসে বসল, তারপর আস্তে আস্তে দরজার মুখে, সামনের স্টপেজেই চট করে নেমে পড়ল।

খুড়ীরা কাছেই নেমেছিল, এসে মাল নিয়ে চলে গেল। তারপর পর পর কয়েক-দিনই ঐ সময়ে ঐখানেই সেই বাবুকে দেখল কাজল। তেমনি নম্বা সায়েবি পোশাক পরা। আর খুড়ীর নিষেধ ভুলে সেই একই সময় সেই একই রুটের বাসে উঠল পরপর কয়েকদিনই বাবুর সংগে সংগে।

তবে এ কদিন আর ছেলে ছিল না কাজলের কোলে, আর পোষাক ছিল পরি-পাটি। খুড়ী বলে দিয়েছে, যদি নেতান্ত যেতেই হয় একই আস্তায় তবে ভেন্ন ভেন্ন বেশ ধরে যাবি। তাই কোলে ছেলের বদলে হাতে এখন ব্যাগ থাকে কাজলের আর সেই ব্যাগ খুলে দস্তুরমত টিকিটের দাম দেয় কাজল। আর, আর ইচ্ছে করে কাজলের বাবুর টিকিটের দামটা দিয়ে দিতে। রোজ দিতে দিতে পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ পয়সা কি শোধ হবে না একদিন? বাবুর বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে খুব ইচ্ছে করে কাজলের একটা কিছু বলে, কথা কয় বাবুর সংগে।

কিন্তু বাবুর সংগে কথা বলবে কি, বাসের ঝাঁকুনিতে গায়ে গা ঠেকে, কাজলের বুকের মধ্যে তোলপাড় করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেক অনেক দূর চলে যায়।

মাঝে বাবুরই সংগে সে যেখানে থামে। মস্ত বড় একটা বাড়ির সামনে। গেটের দরোয়ানরা সেলাম করে বাবুকে। বাবু ভেতরে চলে যায়। আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে কাজল ফেরে, আবার বাসে ওঠে, কি ফুকুড়ে কান্ড, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ে দাঁড়িয়েও আর কোন পকেটে হাত ঢোকাতে পারে না কাজল।

ক্যাহ্‌নো। ক্যাহ্‌নো তোর এমন তরো দশা লা কাজলি? মাঝরাতে উঠে বারবার নিজেকেই প্রশ্ন করেছে কাজল। গরম যেন বেড়ে গেছে কাজলের, বুকের মধ্যে খালি খালি।

জোয়ান স্বামীটার কথা মনে করে দু' বছর বাদে আবার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে কাজলের। মারধোর করত বটে সে কাজলকে, কিন্তু লোহা-পেটানো শক্ত হাতে যখন কাজলকে চেপে ধরত বুকের সংগে, সোহাগ করত, ভালবাসার কথা বলত, তখন সব অংগ জুইড়ে জল হয়ে যেত কাজলের।

মানুষটা মরে গেল। সেদিন যত না কেঁদেছে কাজল, আজ কান্না পাচ্ছে তার চেয়েও বেশী। সকালে খুড়ীর হাতে মার খেয়েও কাজল কাঁদেনি। ওজ সকালে উঠেই তো বেইরে যাস, কিন্তুন মাল কই? বেইড়ে বেড়াবার জন্যি আমি এনেচি তোকে একেনে?

কাজলই কি কাজ না করে খামোকা ঘুরে বেড়াতে চায়? কিন্তু কদিন থেকেই আর হাত উঠছে না যে? কাজল কি করে। রাত্রে শুলেই কানের মধ্যে বাজে সেই টুকরো টুকরো শোনা কথা...টাকার জন্য অত নয়, কিন্তু কলমটা...। হ্যাঁ এই কলমটাই যত নষ্টের মূল। খুড়ীর কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখবেই বা আর কতদিন। ধরে ফেললে আর রক্ষে রাখবে না খুড়ী। খুন করে ফেলবে। আজ খুড়ীর হাতে মার খেয়ে ভেবেছিল বিকেলে এসে কলমটা দিয়ে বলবে, নাও গো খুড়ী জবর জিনিষ সইরেচি আজ। কিন্তু কই! পারল কই দিতে। নাঃ! এ যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিলেই মনে হয় ল্যাঠা চুকবে। কাজলেরও ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে। আবার ও খুশী মনে কাজ করে যেতে পারবে। খুড়ীর কাছে নাম পাবে, আদর যত্ন পাবে, টাকা পাবে, ছেলেটাকে ডাক্তার দেখাতে পারবে। ... কলম ফেরৎ দেবার জন্য এই তিনদিন ধরে 'বাস স্ট্যান্ডে' গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে কাজল, কিন্তু মজা দেখ! তিনদিন ধরেই দেখা নেই বাবুর।

আজ দেখল সকালে তিনজন বন্ধুর সংগে টের্কাচতে উঠতেছে বাবু। বলতেছে আবার, বড্ড পকেটমার ভাই বাসে। বড্ড চুরি। দু'পয়সা বেশী লাগলেও ট্যাকসিতে যাব। শোক ভুলতে পারছি না এখনও কলম চুরির।

ও বাবু। কাজলি তোমার কলম চুরি কইরেচে বটে, ফিইরে দিতে একুনি পস্তুত। কিন্তু তুমি যে মন চুরি করলে গো কাজলির, তার বেলা?

সব সময় আমার দেরি হয়ে যায় ॥

ঋর্ষিক রায়

হে প্রেম, সব সময় আমার দেরি হয়ে যায়;
কাকের কান্নায় স্থির দুপুর ঘুমোয়।
ঝিমোনো গাড়িরা ছুটে চলে দ্রুত বেগে, স্তব্ধ পায়ে হাঁটে
শ্রান্ত পথিকের দুরন্ত সময়।
রমণীর আগুনের মতো, ময়লা রাস্তার ধারে
ন্যাড়া ডালে উন্মাদ পলাশ জ্বলে ওঠে মাঠে
স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে।

উদাসীন অন্ধকারে
জলের আলোয় তোমার স্মৃতিরা স্নান করে।
আমি যাবো কখন তোমার কাছে?
তাকে তুলে নিতে গেলে আমার সকল শক্তি শেষ হয়;
রক্ত ঝরে।
তাই দেরি হয়ে যায়, বুকে জেগে থাকে নীল ভয়।

কিইবা দেখবো, পাবো—
চুম্বনের গন্ধ ধরে রাখে না স্বাদিষ্ট কোনো ঠোঁট,
মাংসের ভেতরে রক্তে কোনো রসায়ন ঘটে না জীবনে
আকাঙ্ক্ষার গন্ধের বেদনা রস
কতখানি ঢোকে আমাদের ধমনীর রক্তে।
জীবনের ঘর বাড়ি পাগল চোখের খ্যাতি
গভীর বিরাম পায় ধোঁয়াময় চেতনায়।
সকালে বিকেলে নানা কাজে অনবরত ঠোঁটের রঙ ধুতে হয়।
হে প্রেম
তাই আমার সর্বদা দেরি হয়ে যায়।।

ভালোবাসা অস্তিত্ব প্রলয় ॥

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরেকটু গভীরে যাও
পাবে আলো ভালোলাগা রঙ বিস্ময়ের
সত্য আমি মুগ্ধ প্রেমে বরং বালক
বলতে পারো নন্দিনী কিশোর

চোখ রাখো স্থির জলে
দেখো শান্ত সূর্যছায়া বহমান অনন্ত জীবন
বিপুল প্রাণের টান অন্তরে নদীর
প্রতায় নির্ঝর উৎসে
সমুদ্রে উধাও হতে তার নেই মানা
বাঁধা নীড়ে ভালোবাসা
মাটি ছুঁয়ে দেখো তাই পাখা মেলে পাখি

এই টানে মহালগ্নে বাজে তূর্য
রক্তে রুদ্র, ভাঙাগড়া অস্তিত্ব প্রলয়
এই টানে ফোটে ফুল
বৃক্ষ মূলে
প্রোথিত মাটির বুকে

আমি তাই
প্রবন্ধ সে মানুষের কাছে যাই
যার হাতে যাদু আছে ভ্রমে গড়ে মৃন্ময়ী প্রতিমা
ভালোবাসার সৃষ্টির উৎসব মেলায়
কিছু দিই কিছু নিই
সহজ সত্যের মুখ চেয়ে
শিখে নিই অর্থ জীবনের

তবু তুমি কি যে বলো
ভালোবাসা এই শব্দে মোহ
ভালোবাসা জেনো তুমি
অস্তিত্ব প্রলয়।

স্বপ্ন ভাঙ্গের পর ॥ কালীপদ কোঙার

সৌন্দর্য ভালোবাসি, তাই
আমি এক অস্ফুট গোলাপ
গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে
বুকে রাখি প্রশ্বাস আর নিঃশ্বাসের কলঙ্কলাঞ্ছিত।

সংগীত ভালোবাসি, তাই
আমি এক বনের ময়না
খাঁচায় বন্ধ করে শুনতে চেয়েছি তার
কণ্ঠভরা আরণ্য সংগীত।

প্রেম ছিলো কাঙ্ক্ষিত, তাই
ভালোবাসা দেব বলে
ফুলের মতোন আর পাখির মতোন রূপসীকে
তাপদগ্ধ জীবনের সংগিনী করেছি।

এখন স্বপ্নের মধ্যে
অশরীরী আত্মা যেন আমার বুকের পর বসে
দুহাতে কণ্ঠনালী চেপে ধরে বলে,
'খুনী তুমি, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ চাই,
মনে নেই তুমি কতো সুন্দরকে হনন করেছ,
মনে নেই কথা দিয়ে কতো কথা জীবনে রাখনি!'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞান চিন্তা

অমিয় কুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার অন্তরালে তাঁদের পরিবারেরই যে কজন প্রতিভাধর পুরুষ খ্যাতির শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জ্ঞানতপস্বী। নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান প্রীতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আজ সর্বজনবিদিত। তাঁর নিজস্ব প্রতিভা ছাড়াও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেও বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী—এঁরা সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে সমকালীন বিজ্ঞান নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তত্ত্ববোধিনী, সাধনা, বিচিত্রা, ভারতীর পৃষ্ঠায় এঁদের বিজ্ঞানপ্রীতির স্বাক্ষর রয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন গভীর জ্ঞানের মানুষ। আত্মভোলা, দার্শনিক মানুষটির রচনায় দার্শনিক তত্ত্বের মূল কথাটি যেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে তৎকালীন বিজ্ঞানের সারকথা।

শুধু তাই নয়, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আজ থেকে সাতাশী (৮৭) বছর আগে।। ১২৯১ সালে বহুবাজারের সাবিত্রী লাইব্রেরীর ২৭শে মাঘের অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন, 'ইংরেজরা তাঁহাদের দেশের বিদ্যার্থী জনসাধারণের উপকারার্থে স্বদেশীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন, তা' বই—বিশেষ কোনো গুরুতের কারণ উপস্থিত না হইলে অন্যদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন না—এইটি কেন আমরা ইংরেজদের নিকট হইতে না শিখি? আমরা তাঁহাদের এত এত বিদ্যা শিখিতেছি, কেবল এইটি শিখিলেই কি আমাদের জাতি যাইবে?'

ঐ বক্তৃতাতেই তিনি বলেছিলেন ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা বিদ্যা শিখছি বলেই যে তাদের ভাষার জোয়ালে আমাদের ঘাড় পেতে দিতে হবে এর কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। ইংরেজরাও আমাদের দেশের বীজগণিত পেয়েছে, কিন্তু তা বলে তারা তো আমাদের ভাষায় অনুশীলন করে না। প্রশ্ন করেছেন তিনি, 'কলিকাতায় নব-প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স এসোসিয়েশন (অধুনা ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স—লেখক) আমাদের না ইংরাজদের? যদি তাহা আমাদেরই হয়, তবে সেখানে অন্তত—কেন আমরা আমাদের নিজের ভাষার বিজ্ঞানের অনুশীলন না করি?'

১২৯৭ সালে চৈতন্য লাইব্রেরীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ইংরেজরা আমাদের দেশের জ্ঞানসম্পদ নিয়ে নিজেদের উপযুক্ত করে নেয়, আমরাই বা তাদের সম্পদ নিজেদের করে নেব না কেন—'আমরা যদি তাঁহাদের পুঁথি হইতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া সেই উপাদানগুলিকে স্বদেশীয় ভাষার ছাঁদে ঢালিয়া দেশোপযোগী করিয়া লইতে জো পাই তবে সে সুবিধাটি ছাড়িব কেন?'

[এক]

'বিদ্যা এবং অবিদ্যা' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮ কল্প, ২য় ভাগ, ১৮৩৪ শক) প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করেছেন। অবিদ্যা হলো অন্ধ সংস্কার, তা জ্ঞানের ছায়া মাত্র। বিদ্যা হলো প্রকৃত জ্ঞান। বিদ্যা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অপরা বিদ্যা এবং পরাবিদ্যা। অপরা বিদ্যা হলো বিজ্ঞান এবং পরাবিদ্যা হলো ব্রহ্মজ্ঞান।

বিজ্ঞানের গোড়ার কথা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঐ প্রবন্ধে বলেছেন, 'বিজ্ঞানের গোড়ার কথা আর কিছু না—অবিদ্যার বা জ্ঞানাভাসের বা অন্ধ সংস্কারের পাশচ্ছেদন। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম তো সামান্য অবিদ্যা, পৃথিবীর গোলাকারে চ্যাপ্টা-ভ্রম, সূর্যের স্থৈর্য্যে গতিভ্রম, পার্থিব ছায়াবগুণ্ঠনে রাহুভ্রম, এইরূপ আরো অনেক মাথালো মাথালো অবিদ্যার পাশচ্ছেদন করিয়া অধুনাতন কালের জ্যোতির্বিদ্যা আলোকে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশেও ভাস্করাচার্যের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাত্মারা অনেকানেক অবিদ্যার পাশচ্ছেদন করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যার এই যেমন দেখা গেল সকল বিদ্যারই গোড়ার কথা ঐ, কিনা অবিদ্যার পাশচ্ছেদন।'

এই কথাগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-প্রীতি পরিস্ফুট। বিজ্ঞানের কাজ হলো অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে সূর্যের আবাহন, কুসংস্কারের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত মনের অধিকার। আধুনিক সভ্যতা হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। অথচ এই সভ্যতার মূল কথা কি তা হয়তো অনেকে ভেবে দেখি না। দ্বিজেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়ার কথা বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞান বলতে তিনি বস্তুবিজ্ঞানকেই মাত্র বোঝাননি, ধর্মবিজ্ঞানও বিজ্ঞান, রসশাস্ত্রও বিজ্ঞান। যতদিন না পর্যন্ত পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের সূর্যোদয় না হয়েছে ততদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য সভ্যতা অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট ছিল না, বরং অপকৃষ্ট ছিল।

তিনি বলেছেন, 'নব্যতম পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়ার কথা কি যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তর এই যে, বিজ্ঞানতত্ত্বের নবতর আবিষ্কারের গোড়ার কথাই পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়ার কথা।' (বিদ্যা ও অবিদ্যা) 'গীতাপাঠ' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮ কল্প, ১ ভাগ, ১৮৩৩ শক) প্রবন্ধে সম্যক্ জ্ঞান বোঝাতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে বিজ্ঞানের উপমা গ্রহণ করেছিলেন, 'আতস পাথরের অর্থাৎ ম্যাগনিফাইং গ্লাস-এর মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মিকে কোনো দাহ্য পদার্থের উপরে কেন্দ্রীভূত করিলে সেই দাহ্য পদার্থের ভিতরে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তর বাহির অগ্নিময় করিয়া তোলে—তেমনি, আত্মশক্তি সহকারে মন লক্ষ্যবস্তুতে তদ্গতভাবে নিবিষ্ট হইলে সেই লক্ষ্যবস্তুতে জ্ঞানাগ্নি প্রবেশ করিয়া লক্ষ্যবস্তুকে জ্ঞানময় করিয়া তোলে।'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই দেকার্তের নাম আসে। এই সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীয় বিদ্যার আদিগুরু দেকর্তা বীজগণিতের সমীকরণপদ্ধতি জ্যামিতির অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গণিতের গৌরবমাহাত্ম্য কত যে উচ্চে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার পূর্বের আমলের বীজগণিত এবং জ্যামিতির মাঝখানে প্রাচীর একটা দাঁড় করানো ছিল বিপর্যয়-কঠিন। দেকর্তা সেই বিচ্ছেদের প্রাচীরটা ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার জায়গায় সৌহার্দ্য বিনিময়ের দিব্য একটা সুগম পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যার মধ্যে যোগের এইরূপ গোড়া পত্তন তাঁহার মতো জ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই কাজ। তিনি যদি ঐ ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ না করিতেন তাহা হইলে গণিতবিদ্যা আজিও ভূতলে হামাগুড়ি দিত।' ('বিদ্যা এবং জ্ঞান' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৬ কল্প, ৩য় ভাগ, ১৮২৭ শক, চৈত্র)

নিউটনের গবেষণাবস্তুর সারকথা তিনি উপরিউক্ত 'বিদ্যা এবং জ্ঞান' প্রবন্ধে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে (দ্বিজেন্দ্রনাথের) তাঁর বিজ্ঞানপ্রীতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানীকে ভালবাসা মানে

বিজ্ঞানকে ভালবাসা। যেখানে সামাজিক সম্বন্ধ বা সম্পর্কের অবকাশ নেই সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষভাবেই বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। এই নিদর্শন ফুটে উঠেছে তাঁর সুদীর্ঘ মন্তব্যে। সমগ্র বক্তব্যটি তুলে ধরছি একারণেই যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা জানি কবি ও দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাতারূপে, তাঁর প্রতিভার এদিকটা সাধারণের অজ্ঞাত ছিল বললেই চলে। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় তাঁর লেখনীর সাবলীলতা।

'জ্যোতিষের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্যার (মেকানিকস-এর) যে বিশেষ কোনোপ্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে, এরূপ একটা কথা নিউটনের পূর্বের আমলের পণ্ডিত সমাজে উত্থাপনেরই যোগ্য ছিল না। নিউটন নূতন এই একটা বিস্ময়জনক সমাচার পণ্ডিত-মণ্ডলীর মাঝখানে উপস্থিত করিলেন যে, যে কারণে বৃন্তচ্যুত ফল ভূতলে নিপতিত হয়, সেই কারণে গ্রহচন্দ্রাদি জ্যোতির্মণ্ডল স্ব স্ব পরিধিপথে চলাফেরা করে। এরূপ একটা বিশাল জগৎ-জোড়া কথা কে বলিতে পারে? ...নিউটনের এই যে একটি প্রাণের কথা, সত্যের নিকটে বড় ছোটো নাই—দূর-নিকট নাই, পরন্তু যে সত্য মহাকাশের মহা মহা জ্যোতির্মণ্ডলে বিরাজমান, সেই সত্যই ক্ষুদ্র একটা আপেল ফলে মাথা গুঁজিয়া রহিয়াছে, তাঁহার এই প্রাণের কথাটি যখন তাঁহার জ্ঞানের আলোকে

মাধ্যাকর্ষণবেশে সাজিয়া বাহির হইল, আর, তাহার পরে যখন নানাপ্রকার সুপরীক্ষিত বৃত্তান্তের প্রমাণবলে বলী হইয়া সেই কথাটি তাঁহার জ্ঞানের মধ্য হইতে পণ্ডিত সমাজে এবং পণ্ডিত সমাজের মধ্য হইতে সাধারণ লোকসমাজে উথলিয়া পড়িল, তখন জ্যোতিষ এবং যন্ত্রবিদ্যার মাঝখানে এতকাল ধরিয়া যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সেই দুর্নিবার বানের তোড়ে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল! তখন দেশবিদেশের পণ্ডিত-বর্গের চক্ষু ফুটিল, সকলেই তাঁহারা তখন জানিতে পারিলেন যে, জ্যোতিষ এবং যন্ত্রবিদ্যা হরিহরাত্মা। তার সাক্ষী নিউটনের উত্তরাধিকারী লাপ্লাস্ তাঁহার নবপ্রণীত জ্যোতিগ্রন্থের নাম দিলেন সিলেশ্চিয়াল মেকানিকস—নাভসিক যন্ত্রবিদ্যা।'

'মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব' দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৫ কল্প, ১ম ভাগ, চৈত্র, ১৮২১ শক) প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, 'বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জড়-পিণ্ড আপন আপন কলেবর-পুষ্টির সমপরিমাণে এবং দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত পরিমাণে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তটি বিজ্ঞানের একটি মহাসত্য।' তিনি বলেছেন, মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তটি প্রকৃত সত্য হোক বা না হোক তার সাহায্যে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহাদির গতি নিরূপণ করা যায়—এটাই তো বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন সূর্য পৃথিবীকে কোন সূক্ষ্ম রজ্জু দিয়ে আকর্ষণ করে অথবা বিনা রজ্জুতে মন্ত্রবলে আকর্ষণ করে, সূর্যের আকর্ষণ যে বস্তুটি কি তাহা বিজ্ঞানও জানে না, জানতে পারেও না এমনকি চায়ও না। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য হলো যে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে সময়ে এই কথাগুলি বলেছেন তখন আইনস্টাইন খ্যাতি অর্জন করেছেন। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আইনস্টাইন এবং সমসাময়িক গবেষকের বক্তব্য হয়তো দ্বিজেন্দ্রনাথ জানতেন না। তবে একথা সত্য তৎকালীন সময়ে ঐ সম্পর্কে আলোচনা খুব বেশী হতো না।

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছে বলা চলে। অবশ্য তার আগেও বস্তুজগতের অনেক বিষয় বিচ্ছিন্ন-ভাবে আমাদের জানা ছিল। আগেকার যুগে শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। গণিতের নিয়মকানুন যে জড়পদার্থের গতিবিধিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখান। দৃষ্টির সামনে যে সব বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখা যাচ্ছে তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে তার নির্দেশ করা যায় কিনা এই নিয়ে অনুসন্ধানের ফলে গড়ে উঠেছে গতিবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই নতুন দিক প্রত্যক্ষ করে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিউটন প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।

[দুই]

১৮৩৩ শকাব্দের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত **'গীতাপাঠ'** প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং এদেশীয় শাস্ত্রের বক্তব্যের সঙ্গে ডারউইন তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ডারউইনের মোট কথাটির ঘাটিস্থান তিনটি—তার প্রয়াণ-স্থান হচ্ছে ন্যাচুরাল সিলেকশন অর্থাৎ প্রাকৃতিক পাত্র নির্বাচন, গম্যস্থান—সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট—যোগ্যতমের উদ্বর্তন এবং মাঝ-পথ, স্ট্রাগল ফর একসিজটেন্স—সত্তা-রক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি।

জীবনসংগ্রাম অধ্যায়টিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ দুভাগে ভাগ করেছেন—'বিজাতীয় জীবন-সংগ্রাম' ও 'স্বজাতীয় জীবনসংগ্রাম'। মনুষ্যেতর প্রাণীর রাজ্যে জীবনসংগ্রাম চালানোর অধিনায়ক হলো কাম এবং ক্রোধ। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন ডারউইনের মোট মন্তব্য কথাটি আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় যে রজোগুণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রবর্তক। এই প্রসঙ্গে তিনি ডারউইনের সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের অনৈক্যও দেখিয়েছেন।

ডারউইনের জীবনের জন্য সংগ্রাম কথাটির মধ্যে আর একটি কথা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। সে কথাটি হলো প্রকৃতির পর্দার আড়ালের কথা, 'আর, সেইজন্য ডারউইন, প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে পথের পন্থী, সে পথে অন্তঃপুর-বাসিনী মর্মকথাটি মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইতে নিতান্তই পরাঙ্মুখ।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, ডারউইন কেবল জীবের বহিঃক্ষেত্রের জীবনসংগ্রামের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি বহির্জগতের ক্রমবিকাশের মূলে যেরূপ রাজসিক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড দেখিতে পাইয়া-ছিলেন মানুষের অন্তর্জগতে অবিকল তারই আর এক পৃষ্ঠা আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রভেদ হলো ডারউইনের ছিল প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বাহ্য পরীক্ষা, আর আমাদের হলো স্বানুভূতি, মহৎ চরিত্রের আলোচনা ও আত্মপরীক্ষা।

'জীবেরা যেমন তাহাদের বহিক্ষেত্রের বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করে, মনুষ্যের অন্ত-র্জগতে তেমনি রিপুগণের সহিত কঠোর সংগ্রামের পথের মধ্য দিয়াই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি হয়, আর, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যাওয়ার নামই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি। মনুষ্য কিন্তু পশ্বাদি জন্তু-দিগের ন্যায় শুধুই কেবল সত্ত্বগুণের বাধ্য-মাত্র অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, পরন্তু সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণের যে দুইটি অন্তরঙ্গ প্রকাশ এবং আনন্দ তাহাও অন্তঃকরণে উপলব্ধি করে।'

'অভিব্যক্তি' বা ইভলিউসন নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। **'অভিব্যক্তির ধারাক্রম'** (সাধনা,

৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ, ১৩০১, অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধে তিনি অভিব্যক্তি নিয়ে আলোচনার প্রায় প্রারম্ভেই বলেছেন, 'পৃথিবীর গতি-মার্গ শুধু যে কেবল চক্র তাহা নহে, তাহা প্রচক্র, অর্থাৎ প্যাঁচ। চক্রের উপর দিয়া চলিলে কিয়ৎকাল পরে আমরা স্বস্থানে আসিয়া পড়ি, কিন্তু প্রচক্রের উপর দিয়া চলিলে হয় আমরা ক্রমশই বাহির হইতে বাহিরে চলিতে থাকি (ইহাকে বলে ইভলুউসন অভিব্যক্তি), নয় আমরা ক্রমশই ভিতর হইতে ভিতর দিকে চলিতে থাকি (ইহাকে বলে ইনভলিউসন, লয়)।'

ক্রমবিবর্তন বা উদ্বর্তনের প্রকল্প এবং হিন্দু প্রকল্পের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এই—প্রথমটি যেন দ্বিতীয়টির তুলনায় সমগ্র সৌধের একটা অংশ মাত্র। বেদান্তবাদের মধ্যে যে সাময়িক নিবর্তন বা ইনভলিউসন রয়েছে, তা উদ্বর্তনবাদের পরিপূরক অংশ। সমস্ত হিন্দুতত্ত্বই তাদের প্রকৃতি অনুসারে চক্রতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অগ্রগতি সেখানে পর পর তরঙ্গপ্রবাহের মতো দেখা দেয়। প্রত্যেক তরঙ্গ ওঠে আবার নামে। প্রত্যেক তরঙ্গের পরে আবার নতুন করে তরঙ্গ আসে। সে তরঙ্গও ওঠে ও নামে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এমনকি আধুনিক গবেষণার ভিত্তিতেও মানুষ কেবল উদ্বর্তন মাত্র হইতে পারে না। প্রত্যেক উদ্বর্তনের জন্য চাই অনুবর্তনও। আধুনিক বিজ্ঞানী বলিয়া দিবেন যে, তুমি কোনো যন্ত্রের মধ্যে যতোখানি শক্তি দিবে, সে যন্ত্র হইতে ততোখানিই শক্তি তুমি পাইতে পারো।'

এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানী পিয়ের টেলহার্ড দ্য সার্ডিন বলেন,

> 'Thus whenever we look on earth, the growth of the 'w thin' only takes place thinks to a doubly related 'involution', the coiling up of the planet upon itself. The initial quantum of consciousness contained in our terrestrial world is not formed merely of an aggregate of particles caught fortuitously in the same net.'

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ সংকীর্ণ দৃষ্টি-প্রসূত। ডারউইন দেখলেন প্রাণের মধ্যে 'স্বধ্বংস-ভাবটাকে' বড় করে। জীব-জগতে নিজের স্বার্থ অতি বড়, আত্মরক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তার জন্যে আততায়ী হয়ে অপরের প্রাণবিনাশে তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একথা ডারউইন রায় দিয়েছেন স্বচ্ছন্দচিত্তে। তাঁর ভ্রান্তি এখানেই। জড়প্রকৃতি এবং ইতর জীবের মধ্যে প্রাণধর্মের যে দুটি বিভূতি প্রকাশিত, তার মাঝে অপ্রকাশিত আছে প্রাণের এক নতুন বিভূতি, যার বিকাশ চৈতন্যের পরিপূর্ণ প্রকাশিত আধারে। জীবের চিরস্থায়ী হয়ে টিকে থাকার স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস দূর হয়েছে মৃত্যুর কড়া শাসনে। তাই ব্যষ্টি জীব স্থায়িত্বের সন্ধান খোঁজে নিজের মধ্যে নয়, সমষ্টির মধ্যে।

'অভিব্যক্তি' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিজ্ঞানের মতে অভিব্যক্তির আরম্ভ একটি বিন্দু (প্রটোপ্লাজম্) থেকে। এই বিন্দু কেমন? এর মধ্যে একটা নড়াচড়ার ভাব আছে—যাকে আমরা বলতে পারি প্রাণ-বৃত্তি; দ্বিতীয়ত, তার মধ্যে একটা আত্মরক্ষার এবং আত্মসমর্থনের ভাব আছে যাকে আমরা বলতে পারি অহংবৃত্তি। 'এই বিন্দু যখন ক্রমশ অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তিতে পদনিক্ষেপ করে তখন দেখা যায় তিনটি মূল উপাদান একসঙ্গে অভিব্যক্ত হইতেছে, আর, দেখিতে পাই—তিনের মধ্যে একটির পদবী সর্বাপেক্ষা উচ্চ সেইটিকে আমরা বলিব জ্যেষ্ঠ উপাদান, তাহার অব্যবহিত নিচেরটিকে বলিব মধ্যম উপাদান, তৃতীয়টিকে বলিব কনিষ্ঠ উপাদান। জ্যেষ্ঠ উপাদানটি অহংবৃত্তি, মধ্যম উপাদানটি প্রাণ-বৃত্তি, কনিষ্ঠ উপাদানটি গঠন এবং আকৃতি। এইরূপে পাইতেছি যে, বিন্দুর অভিব্যক্তির তিনটি ধারা—। যদি অহংবৃত্তি না থাকে তবে আত্মরক্ষার কোনো অর্থ থাকে না—কে কাহার আত্মরক্ষা করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, যদি প্রাণবৃত্তি না থাকে তবে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' একথার কোনো অর্থ থাকে না—কেননা উদ্বর্তন শব্দের অর্থই হচ্ছে প্রাণধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকা। (অভিব্যক্তির ধারাক্রম, সাধনা, ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ) দ্বিজেন্দ্রনাথ অভিব্যক্তির তিনটি ধারার কথা বলেছেন—এক, অহংবৃত্তির অভিব্যক্তি, দুই, প্রাণের অথবা ক্রিয়াব্যূহের অভিব্যক্তি, তিন, আকৃতি এবং গঠনের অভিব্যক্তি। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যদিও বস্তুর নানা ধরনের আকৃতি এবং গঠন অভিব্যক্তি থেকে লয়ে এবং লয় থেকে অভিব্যক্তিতে পদক্ষেপ করছে, কিন্তু মূলদ্রব্য অবিনশ্বর। মূলবস্তু হয়ও না, যায়ও না—তা অবিনশ্বর। এই কথাটির সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের 'ম্যাটার ইজ নট ক্রিয়েটেড, ইট অ্যাপিয়ারস' স্মর্তব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর 'অভিব্যক্তির ভিত্তিমূল' (সাধনা, ৩য় বর্ষ, পৌষ) প্রবন্ধে বলেছেন, 'অভিব্যক্তি হইতে কেবল তাহার নাম, রূপ, গঠন প্রভৃতিই অভিব্যক্ত হয়—মূলবস্তু যাহা আছে তাহাই আছে—তাহাই ছিল এবং তাহাই থাকিবে।'

আংশিক বস্তুই, পরিচ্ছিন্ন বস্তুই, ভাঙন-গড়নের অধিকার মধ্যে থাকে, যেহেতু মূলবস্তুর একাংশে ভাঙা হলো অপর অংশের গড়া। কিন্তু জগতের সমগ্র অংশ ভেঙে জগতের বাইরে চলে যেতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, শরীরের পরমাণুরা শরীরকে ছেড়ে দেহের বাইরেকার অন্য সব বস্তুতে বিলীন হচ্ছে, কিন্তু সমগ্র জগতের একটি ধূলিকণাও জগতের বাইরে যেতে পারে না। 'ক্রমাভিব্যক্তি প্রভৃতি যতকিছু পরিবর্তনের ব্যাপার তাহা পরিচ্ছিন্ন বস্তুসকলের মধ্যেই আবদ্ধ—মূলবস্তুকে তাহা কোনক্রমেই নাগাল পায় না। এক্ষণে বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আকৃতি এবং গঠনের যেখানে যত কিছু অভিব্যক্তি, সেই এক অপরিচ্ছিন্ন মূলবস্তুই তত্তাবতের ভিত্তিমূল।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন অভি-ব্যক্তিশীল আকারাদির মূলে এক অপরি-বর্তনীয় মূলবস্তুর সত্তা বিরাজমান, তেমনি সমস্ত অভিব্যক্তিশীল ক্রিয়াশক্তির মূলে এক অপরিবর্তনীয় সমগ্র মূলশক্তির সত্তা আছে, আবার অভিব্যক্তিশীল অহং-বৃত্তির মূলে এক অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের সত্তা বিরাজিত।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন—যে শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের ভিতর দিয়ে পূর্ণ মানবরূপে পরিণত হয় তাহা কখনো শূন্য থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। তাহা কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল।

এবারে দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের একটি সূত্র মিলিয়ে নিচ্ছি। সাংখ্যদর্শনে আছে 'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ' অর্থাৎ অবস্তু থেকে বস্তুর, অভাব থেকে ভাবের অথবা নিরাকার ব্রহ্ম থেকে সাকার জগতের সৃষ্টি হতে পারে না। সাংখ্যকার কপিল বলেন, এই জগৎ সৃষ্ট হয়নি, তার স্রষ্টা কেউ নেই। জগতের ক্রমবিকাশ হয়েছে। তিনি বলেছেন, প্রকৃতিই এই জগতের কারণ। প্রকৃতির পরিণাম বা রূপান্তর হলো বিশ্ব। অথচ উপনিষদে সর্বশক্তিমান পুরুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে (২।১।৩) আছে, 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।' এর মানে হলো এই পুরুষ থেকে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।

ব্রহ্ম থেকে চ্যুত হয়ে আত্মা নানা উদ্ভিদ ও পশুর মধ্য দিয়ে অবশেষে মানব শরীরে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ক্রমবিকাশের মূলে রয়েছে এক পরমাশক্তি, উপনিষদের আবহাওয়াতে পরিপুষ্ট দ্বিজেন্দ্রনাথ একারণেই 'এক অপরিচ্ছিন্ন মূলবস্তুকেই ভিত্তিমূল বলে মেনে নিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্টিচক্রের মূলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আত্মৈষণার আকুতি অনুভব করেছেন। এ জগতে তাঁর অদ্বৈত ভাব সংবৃত হয়েছে বিভজ্যাবৃত্ত মনের লীলায়, আত্মবিস্মৃতির অতল গভীরে হারিয়ে গেছে তাঁর অবিকল্পিত একত্বের ধ্রুবা স্মৃতি, বিবিক্ত ভেদভাবনার লীলাই উদগ্র হয়ে ফুটে উঠেছে সকল বিভূতির পুরোভাগে—এই ভেদের লীলা চরমে উঠেছে মনঃকল্পিত খণ্ডতাবোধে, যখন বিভজ্যাবৃত্ত মন দেহকে আশ্রয় করে সহসা জেগে উঠছে বিবিক্ত-অহং এর চেতনা নিয়ে।'

(ক্রমশঃ)

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। ২২ ।।

দু-তিনদিনের মধ্যেই খবর এসে গেল। কন্যাপক্ষ খুব রাজী—তবে খরচ কিছুই করতে পারবেন না। বাপের বাসনটা দেবেন, সব সাজিয়ে দিতে পারবেন না হয়ত—লেটান্‌টি থালা বাটি গেলাস গাড়ু ঘড়া এগুলো দেওয়া যাবে, বরাসনের কাপড় একটিও হবে ভিক্ষে দুঃখু করে যোগাড় হবে—আর—কুড়ি পঁচিশটি বরযাত্রীও খাওয়াতে পারবেন কোনরকমে—তার বেশী একটি পয়সাও খরচ করতে পারবেন না। মেয়ের হাতে দুগাছা পৌঁটে আছে, কানে একজোড়া ক্ষয়াঘষা ফুল, সেগুলো অবশ্য খুলে নেবেন না, তবে ঐ পর্যন্তই 'হাঁত', ঐ দিয়েই সালঙ্কারা করবেন।

হেমন্ত এতেই হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পায়।

'খুব খুব। খুব রাজী আমি। যা শুনছি মেয়ে যদি সেরকম হয়—পৌনে বলন হলেও চলবে—আমি ওদের ঘরখরচা সুদ্ধ দিতে রাজী আছি। আমি আগেই বরং গয়না পাঠিয়ে দোব দু-একটা গয়না শাড়ি, যা বলে।'

'আরে, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আগে মেয়ে দেখুন। সবই তো শোনা কথা পিসীমা।'

'মেয়ে দেখা? তাই তো। সে আবার কে যাবে। তোকেই যেতে হয় তাহলে!'

'আমি—!' আঁৎকে ওঠে প্রায়, সুরেন, 'আমি যাব কি! না, না। সে আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন। এ ঝুঁকি আমি নিতে পারব না।'

'কী ব্যবস্থা করব বল? আমার কে আছে আর? এক যদি ডাক্তারবাবু থাকতেন তো কথাই ছিল না। আর যারা ছিল, কর্মসূত্রে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তারা একে একে অনেকেই চলে গেছে, যাওবা দুচারজন বেঁচে আছে, অন্তত সতেরো-আঠারো বছর কোন সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে। এখন তাদের কাকে গিয়ে বলব—আমার হয়ে মেয়ে দেখে এসো। এখন যাদের সঙ্গে কাজ—য়্যাটর্ণী রাজ-মিস্ত্রী চুনসুরকীওলা—তাদের তো আর একথা বলা যায় না।'

'তা—তাহলে যার বিয়ে সে-ই দেখে আসুক না।'

'না না, ছিঃ! ও কী দেখবে? তাছাড়া ওকে দেখলে কথাবার্তা শুনলে আর তারা মেয়ে দেবে না।...আর ওর আর দেখাদেখি কি? ওকে একটা বাঁদরী ধরে দিলেও পরমপদার্থ করবে—বাপের সঙ্গে বর্তে যাবে।'...

সুরেন বিরত বিপন্ন মুখে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ।

এমন প্রস্তাব আসতে পারে জানলে সে একথাই পাড়ত না বোধহয়।

হেমন্তই ওকে নীরব দেখে ওর একটা হাত চেপে ধরল। 'হেই বাবা, দোহাই তোর, একবারটি যা!'

সুরেন বলল, 'পিসীমা আপনি কথাটা বুঝছেন না। একে অল্পবয়সী ছোকরাদের কেউ মেয়ে দেখাতে চায় না, তায় প্রবীণ কেউ থাকলেও কথা ছিল—সঙ্গে দু-একজন ছেলেছোকরা গেলে তত দোষ হয় না—তার ওপর মানে আমার সঙ্গে একবার কথা উঠেছিল, সেই আমিই যাবো সে-মেয়ে দেখতে—না না, সে বড় বিশ্রী!'

'তাহলে কী করব বল? এক্ষেত্রে মেয়ে না দেখেই বিয়ে ঠিক করতে হয়!'

'তার চেয়ে আপনি কেন চলুন না? আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজী আছি।... আমি বাইরে থাকব, আপনি ভেতরে গিয়ে মেয়ে দেখে নেবেন— '

'না রে, সে বড় খারাপ দেখায়। একে-বারে কেউ কোথাও নেই, নিমুড়োনিছুড়ো—সেইটেই আরও ভাল করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়।...শুনেছে, জানতেও পারবে—তবু গোড়া থেকেই—। একটা মাগী যাবে ধ্যাং ধ্যাং করে মেয়ে দেখতে—না না, সে বড় লজ্জা আর অপমানের কথা।'

চুপ করে থাকে সুরেন।

কী বলবে কী করবে কিছুই ভেবে পায় না।

শেষে হেমন্তই প্রস্তাবটা দেয়, 'হ্যাঁ রে—তা তোর আপিসে এমন কোন প্রবীণ লোকটোক নেই, যাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারিস? বলবি যে আমার এক দাদার জন্যে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি—আর কেউ নেই তেমন যাবার মতো—আপনি দয়া করে চলুন একবার। আমি যাওয়া-আসার সব খরচ দেব। ট্যাক্‌সী করে নিয়ে যাস বরং। ...রাজগঞ্জ তো স্টীমারে যেতে হয়?—চাঁদপালঘাট থেকে ছাড়ে, না? সে ভাড়া, যাওয়া-আসা ট্যাক্‌সী, সেখানে হাঁটা পালকী লাগে—ওখানে এখনও পালকীর চল আছে শুনেছি—সব আমি দোব। যাতে কোন কষ্ট না হয় তাই করিস, খরচের জন্যে কোন ভাবনা করতে হবে না।'

'না, আপিস থেকে কাউকে নেওয়া যাবে না' চিন্তিত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় সুরেন। মনে হয় মুখে কথাগুলো বলতে বলতেই অন্য কোন কথা ভেবে নিচ্ছে, 'এমনিই আপিসে সবাই বিয়ের কথা বলে দিনরাত—অনেক বামুন আছে তো। তারা প্রায় সবাই—কেউ শালী, কেউ বোন, কেউ মেয়ের জন্যে নিত্যই ঘ্যান ঘ্যান করে। আমার বিয়ের অবস্থা নয় শুনলেও বিশ্বাস করে না। তার ওপর এই কথা তুললে আপিসময় জানাজানি হয়ে ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে। সবাই ভাববে দাদা-টাদা বাজে কথা—আমার নিজের দাদার বিয়ে হয়ে গেছে তাও সবাই জানে—নিজের জন্যেই মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। সবাই টিটকিরি দেবে, নানান কথা কইবে, যাঁরা নিজেদের ঘরের পাত্রীর জন্যে

দরবার করছিলেন, তাঁদের মুখ হাঁড়ি হবে। না পিসীমা, সে সম্ভব নয়।...তবে আমি আর একজনের কথা ভাবছিলুম—'

এই বলে একটু যেন অপ্রতিভের হাসি হেসে বলে, 'আমার পাশের ঘরে যে বিশ্বনাথবাবু আছে, এমনি ভদ্রলোক—খুব উঁচু ঘরের ছেলে তো—কথাবার্তায় খুব চোস্ত। সভায় বসিয়ে দিলে দরবার জিতে বেরিয়ে আসবে। দোষের মধ্যে কুঁড়ে—কাজে ভীষণ ভয়। ইচ্ছে করে করে চাকরি ছেড়েছে একটার পর একটা—ভাল ভাল চাকরি। আর প্রচণ্ড আপিঙের নেশা, রোজ গুলি-খেলার মার্বেলের মতো দু-ডেলা আপিঙ লাগে। ফলে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, কারুও ভালো বলে না, দিনরাত খটাখটি—এখানে আলাদা পড়ে থাকেন। একবেলা হোটেলে খান আর একবেলা বেগুনি ফুলুরির ভরসা। ছেলে ভাল কাজ করে, মাসে মাসে পঁচিশ টাকা করে দেয়—তাহলে কি হবে, সবটাই আপিঙ খেতেই চলে যায়, মাসের শেষের চার-পাঁচদিন বেগুনি আর চা খেয়েই কাটে, কারণ ও-দুটো ধারে পাওয়া যায়। ...এক-আধদিন আমি এক-আধখানা রুটি দিই, তাতেই জ্যাম প্ল্যাড—তা আমার আর কত ক্ষমতা বলুন?...জামা-কাপড় ভাই-ভাইপোদের কাছে চেয়েচিন্তে চলে। আগে তারা টাকাই দিত, সে-টাকাতেই আপিঙ খেয়ে শতচ্ছিন্ন জামা-কাপড় পরে বেড়ান দেখে এখন সেয়ানা হয়ে গেছে, কাপড়-জামাই দেয়—তাও নতুন আনকোরা নয়, নিজেরা এক-আধ ধোপ পরে দেয়, নইলে তাও হয়ত বেচে দেবে। কতকটা রেসের নেশার মতো ব্যাপার।...তাঁকে বললে এখুনি রাজী হয়ে যাবেন। একটা ভদ্র জামা-কাপড় পরিয়ে যদি নিয়ে যাওয়া যায়—ট্যাক্সী ভাড়া লাগবে না, ওঁকে ট্রামেই নিয়ে যেতে পারব—বরং আপিঙ খেতে একটা নগদ টাকা দোব বললে নাচতে নাচতে যাবেন ভদ্রলোক। এমনিও আমি বললে ঠিক যাবেন।'

'বেশ তো, তাহলে তো খুব ভাল হয়। যদি তেমন বুঝিস তো—আমি টাকা দিচ্ছি—ভাল জামা-কাপড় কিনে দে—? বড় বংশের ছেলে বলছিস, ঐ রকম লোকই তো এসব কাজে দরকার। তাই একটু বলে দ্যাখ বাবা।'

'দেখি। তবে নতুন জামা-কাপড় লাগবে না, এক প্রস্থ সম্প্রতি পেয়েছেন এক ভাইপোর কাছ থেকে, কাচানো ধোপদস্ত—আমি কালও দেখেছি, মাথার কাছে মাটিতে পড়ে আছে বিছানার পাশে। বাক্স-প্যাটরার তো বালাই নেই, যা করে ঐ মাথার কাছে খবরের কাগজ পেতে—ঘর-গেরস্থালী ওঁর।'

মেয়ে দেখতে যাওয়ার আগে যে কথাই মনে থাক, যত ঔদাসীন্য বা নির্লিপ্ততা, অথবা সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতদূর কল্পনা—দেখে যেন বুকে একটা ধাক্কা খেল সুরেন।

ঠিক এ মেয়ে দেখবে বলে প্রস্তুত ছিল না সে।

দেখে প্রথম যে-কথাটা মনে এল—ফুটন্ত ফুল একটি।

সাধারণ কোন ফুল নয়, পদ্ম কি উঁচু জাতের গোলাপ কিম্বা ম্যাগনোলিয়া—এই ধরনের রাজসিক ফুলের কথাই মনে পড়ে যায় একে দেখে।

কোন তথ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বাঁশীর মতো নাক, কি সপ্তমীর চাঁদের মতো কপাল কি পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ—এসব কিছুই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখার কথা মনে রইল না, লক্ষ্য করে দেখলে হয়ত নিশ্চয়ই কিছু খুঁৎ বেরোত—শুধু দেখার সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষণকালের জন্যে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর। ...সম্প্রতি একটা কি ইংরেজী বইতে পড়েছে breath-taking beauty—সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল—বুকে আঘাতটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর আর অনেকক্ষণ চাইতে পারল না সেদিকে।

না চাইতে পারার অনেক কারণ—কিন্তু সেও তখন হিসেব করে দেখার অবস্থা নয়। তবে একটা কারণ সুপ্রত্যক্ষ। পায়ের কথাটা ভেবে যেন শারীরিক একটা কষ্ট হতে লাগল তার।

একটা অনুশোচনা, গ্লানি বোধ করতে লাগল।

বানরের গলায় মুক্তোর মালা—না, তাও নয়, বানরের গলায় পদ্মফুলের মালা দোলাতে যাচ্ছে সে।...ঐ ছেলের হাতে এই মেয়ে দেওয়া—এ তো একটা সামাজিক অপরাধ।

কোন কথাও কইতে পারল না। সব চিন্তা যেন মনের মধ্যে মাথার মধ্যে গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কী প্রশ্ন করতে হবে, কোন প্রশ্ন করা উচিত কিনা—মেয়ের বাবার সঙ্গে হয়ত একটু কথা বলা উচিত—এসব কোন কথাই মনে রইল না তার। ভাগ্যে বিশ্বনাথবাবু এসেছিলেন। তিনি বহু পাত্রী দেখতে গেছেন জীবনে, কি বলা—কি কি প্রশ্ন করা উচিত সব জানেন, তিনিই কাজ চালিয়ে দিলেন, কোন অস্বাভাবিক অশোভনতা ঘটল না।

বহুক্ষণ পরে সুরেনের হুঁস হল—অবিনাশবাবু তাকেই কি জিজ্ঞাসা করছেন। এই মাথা হেঁট করে বসে থাকাটাকে স্বাভাবিক লজ্জা বলে মনে করে তিনি বলছেন, 'কী হল বাবা সুরেন, তুমি কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করো।...তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে—আত্মীয়। যদিও বলে মামার শালা পিসের ভাই তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই—তবে সে বে-র ব্যাপারে যাতে না আটকায় সেই জন্যে—নইলে আত্মীয় তো বটেই, সেটা না বলার জো নেই। তুমি অমন ঘাড় হেঁট করে বসে রইলে কেন?'

'না না, কী আর বলব? বিশ্বনাথ-কাকা তো বলছেনই। আমার তো কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, আমি তো সব জানিই।'

আস্তে আস্তে যেন বুকে বল এনে, চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

হাতদুটির দিকে প্রথম চোখ পড়ে। একেই বোধহয় চাঁপার কলির মতো আঙুল বলে। ঠিক তেমনিই দেখতে। চাঁপার কলি থেকে প্রথম পাপড়ি ছাড়লে সেটা যেমন অপরূপ ভঙ্গিমায় বেঁকে থাকে—তেমনিই আছে কড়ে আঙুলদুটো।...কনকচাঁপার মতোই রঙ—না, স্বর্ণচাঁপার মতো।...আরও খানিক চেষ্টায় পর আর একটু ওপরে চোখ পৌঁছতে চোখে পড়ে খাঁজ-কাটা সুডৌল গলা, সুন্দর দুটি চোখ। খুব বড় হয়ত নয়, যতটা বড় হলে মানানসই হয় ঠিক ততটাই। কিন্তু তারী সুন্দর কেমন একটা আবেশ আছে দৃষ্টিতে, চোখের টানটাও শিল্পীর হাতের কাজ বলে মনে হয়।...আর সবচেয়ে ঠোঁট-দুটি। দুর্গাপ্রতিমার ঠোঁটের মতোই গড়ন, ওপরেরটি যেন উপুড় করা ধনুক একটি।

আবারও সব গোলমাল হয়ে যায় বুঝি। চোখ ফিরিয়ে জোর করে সে অবিনাশ-বাবুর সঙ্গে কথা শুরু করে।

স্টিমারের সময় জিজ্ঞাসা করে, এবার উঠতে হবে—সে-কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হাঁ-হাঁ করে ওঠেন অবিনাশবাবু। সে হতেই পারে না। কখন কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছে ওরা—সেইটেই যথেষ্ট অন্যায় করেছে, এ-বেলা না খেয়ে যাওয়া হতেই পারে না।

'না না, সে কী করে হবে।' সুরেন প্রতিবাদ করে ওঠে, 'সাতটায় নাকি শেষ স্টিমার ছেড়ে যায়—'

অবিনাশবাবুর বর্তমান মনিব ও আশ্রয়দাতা ষোড়শীবাবু বসেছিলেন, তিনি এদের খুবই স্নেহ করেন—বিশেষ এই মেয়েটিকে—তিনি বললেন, 'সে [illegible] করছি। না হয় আমি পাল্কী করে সাঁকরেল ইস্টিশানে পাঠিয়ে দোব, ট্রেনে চলে যাবেন। রাত দশটা পর্যন্ত গাড়ি আছে।'

'না না, ইনি—বিশ্বনাথকাকা সন্ধ্যের পর অসুস্থ বোধ করেন, তার আগেই ফিরিয়ে নিয়ে যাব ওঁকে সেই কড়ারেই এনেছি—'

বিশ্বনাথবাবুও ক্ষীণকণ্ঠে সমর্থন করেন তা। আপিঙ খেয়ে সন্ধ্যের সময়টা ঝিমিয়ে পড়েন ঠিকই। তাই বলে একটা যাচা ভোজ ছেড়ে (ভাল খাওয়াদাওয়া হবে নিশ্চয়ই—তাতে সন্দেহ নেই) যেতেও ঠিক ইচ্ছে করছে না। তাই সমর্থনটা খুব প্রবল বা সরব নয়।

ষোড়শীবাবু হয়ত তা বুঝলেন। বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। সাতটার স্টীমারই আমি ধরিয়ে দেব। তা বলে না খেয়ে যাওয়া হবে না। ও ব্যবস্থাটা আমার ওখানে, আমিও ব্রাহ্মণ—আপত্তির কোন কারণ নেই। করলেও শুনব না, তালপুকুরে ঘটি ডোবে না—তবু নামে এখনও জমিদার, আমি না ছাড়লে যেতে পারবেন না।'

অগত্যা সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে যেতে হল। খুবই খারাপ লাগছিল সুরেনের। খেতে বসে সুখাদ্য সব গলায় ডেলা

পাকিয়ে যেতে লাগল—কিন্তু অন্য উপায়ও কিছু খুঁজে পেল না।...

বিদায়ের সময় অবিনাশবাবু রীতিমাফিক হাত কচলাতে কচলাতে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আমি—মানে কবে নাগাদ—ইয়ে খবর পেতে পারব?'

সুরেন যেন একটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ চমকে উঠল অবিনাশবাবুর কথায়, কতকটা বিহ্বলভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'কিসের খবর মেসোমশাই?'

'এই—ইয়ে মানে মেয়ে পছন্দ হল কিনা?'

হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, 'এ-মেয়ে আবার অপছন্দ হবার কি আছে মেসোমশাই।...এ তো লোক-দেখানো দেখতে আসা। এবার খবর দেওয়া-নেওয়া সবই আপনার ওপর নির্ভর করছে। আপনি একবার গিয়ে পিসীমার সঙ্গে বসে কথাবার্তা সব পাকা করে আসুন। দিন-টিন ঠিক করে—যা-কিছু বলার বা শোনার সব করে ফেলুন। আপনি কবে যাবেন খবর দিলে পুরুতমশাইকে সেই সময় থাকতে বলবেন তিনি।'

প্রায় অস্ফুটস্বরে অবিনাশবাবু যেন একবার বললেন, 'মেয়ে অপছন্দ হবার কিছু নেই, তবু তো তোমাকে রাজী করতে পারলাম না বাবা। মেয়ে যে ভাল—সে তো তুমিই স্বীকার করছ—'

এ-কথার কোন উত্তর দিল না সুরেন, কথাগুলো তার কানে গেছে কিনা তাও বোঝা গেল না। সে আধো অন্ধকারে তার মুখটাও ভাল করে দেখতে পেলেন না অবিনাশবাবু। ষোড়শীবাবু সঙ্গে লোক দিয়েছিলেন, তার পিছু পিছু বিশ্বনাথবাবুকে ধরে নিয়ে স্টীমার ঘাটের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল।

অদৃষ্টের পরিহাস কথাটা শোনাই ছিল এতকাল, এমনভাবে কখনও বোঝেনি—যেমন এবার বুঝল সুরেন। যে-কাজে তার সবচেয়ে অনিচ্ছা, সেই কাজেই জড়িয়ে পড়তে হল—অন্ত বন্ধনে বাঁধা পড়ল বলতে গেলে।

নিমাইয়ের এই বিয়েটা প্রাণপণেই এড়াতে চেয়েছিল সে, এড়াতে চেয়েছিল ঐ মেয়েটাকেও, সেই মেয়ের সঙ্গে সেই বিয়ের সমস্ত ভারটাই তার ওপর এসে পড়ল।

অবিনাশবাবু যেদিন কথা কইতে এলেন, সেদিন স্বভাবতই সুরেনের উপস্থিত থাকার কথা উঠল। সে-ই চেনে তাঁকে—আত্মীয়তারও—যত ক্ষীণই হোক—সূত্র একটু আছে।

পুরুতমশাইকে আগেই খবর দিয়ে আনিয়েছিল, তবু পাঁজিটা তাকেও দেখতে হল একবার। কারণ এটা পিসী বুঝেছিল ঐ ভটচাযমশাইয়ের চেয়ে এ-বিষয়েও তার ভাইপোর দখল অনেক বেশী। একেই গুরুবংশের ছেলে—এসব জ্ঞানের কিছুটা তার সহজাত, তার ওপর শখ করেও এসব চর্চা করেছে সে।

অবিনাশবাবুর ইচ্ছা বৈশাখের গোড়ার দিকে কি মাঝামাঝি দিন ধার্য হোক—হেমন্তর ইচ্ছা বিয়েটা ওই ফাল্গুনেই হয়ে যাক। তার তখন যেন একটা ঝোঁক চেপে গেছে, নেশার মতো পেয়ে বসেছে বিয়েটা। আগে যতটা অনিচ্ছা ছিল এখন ততটাই তাড়া।...মেয়েটা ফুটফুটে শুনেই আরও এই ঝোঁক। একটা সুশ্রী কচি মুখ সামনে ঘুরে বেড়াবে, হয়ত সামান্য একটু-আধটু সেবাও করল—না করলেও ক্ষতি নেই—কাছাকাছি থাকবে, গল্প করবে, তাতেই অনেক শান্তি। ইদানীং ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে তার।...

ফাল্গুনের শেষ লগ্নের আর তেরোটি দিন মাত্র বাকী, অবিনাশবাবুর মুখ শুকিয়ে উঠল।

'এর মধ্যে কি হয়ে উঠবে বেয়ান—ভিক্ষে দুঃখু করে মেয়ের বে দেওয়া আমার!'

'ভিক্ষে দুঃখুর ব্যাপার তো আপনার শুনেছি সামান্যই বেইমশাই! আপনি তো বলছেন দানের বাসন ঘরেই আছে, সোন দিয়ে নেবেন শুধু একবার। আর যা সামান্য কাপড় আংটি—সে যদি চাইতে হয়—যার কাছে চাইবেন, মানে দেবার মতো লোক যে, সে তখনও দেবে এখনও দেবে। বরং দেরি হলে ফ্যাকড়া তুলতে পারে। কিছু মনে করবেন না একথা বললুম বলে। আপনি সব কথা খুলে বললেন বলেই এত আস্পর্ধা আমার। বলেন তো, যদি অপরাধ না নেন—যা যা দরকার আমিও কদিন আগে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'না না,' প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েন অবিনাশবাবু, 'সেটি পারব না। আপনাদেরই আমার দেবার কথা দিতে পারছি না, সেই তো যথেষ্ট লজ্জা একে—তার ওপর আপনার কাছ থেকে হাত পেতে নেওয়া—সে পারব না। ছিঃ! আর গয়নাপত্তরও আপনাদের যা দিতে ইচ্ছে হয়—সম্প্রদানের পর পরিয়ে দেবেন দয়া করে, আগে কিছু পাঠাবেন না। আপনাদের দেওয়া জিনিস পরিয়ে, দান করা—সে তো একরকমের দস্তাপহারী হওয়া বলতে গেলে। আরও একটা নিবেদন, গায়ে হলুদও—তেল হলুদ শাড়ি ছাড়া কিছু পাঠাবেন না—কারণ আমরা যখন ফুলশয্যের তত্ত্ব করতে পারব না, তখন—না না, সে বড় লজ্জার কথা হবে।'

'তাই হবে, যা বলেন। তবে একটু মাছ মিষ্টি দইও তো ঐ সঙ্গে দিতে হবে—লক্ষণ একটা না হয় কম কমই দিলুম। কিন্তু বিয়েটা আপনি এর মধ্যেই সেরে ফেলুন, অন্যথা দেরি করবেন না।'

'অন্যথা ঠিক নয়—' চিন্তিত মুখে অবিনাশবাবু বললেন, 'মনে তো লাগছে এত তাড়াতাড়ি হবে নে। এর মধ্যে কি আর গুছিয়ে উঠতে পারব?'

কথাটা আপনিই বেরিয়ে গেল সুরেনের মুখ দিয়ে, নিয়তির বিধানেই বোধকরি, 'কিন্তু বোশেখে মেসোমশাই বাড়বাড়ন্তর ব্যাপার আছে একটা। আপনাদেরও যেমন অসুবিধে, আমাদেরও তেমনি। তার ওপর কালবৈশেখীর দিন জাহাজ করে ফেরা বরকনে নিয়ে—। সবটা ভেবে দেখুন ভাল করে।'

এই কথাটাতেই অবিনাশবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন।

এর ভেতর সুরেনও আর এক দিন খুঁজে বার করল। সংক্রান্তির আগের দিন—গোধূলি লগ্নে, অরক্ষণীয়া মতে দিন আছে একটা। কিছু না—তবু দুটো দিন বাড়তি সময় পাওয়া যাবে।

পাঁজির দাগ দেওয়া জায়গাটা পুরুতমশাইকে দেখিয়ে সুরেন বলল, 'আজকাল আর কোন মেয়ে অরক্ষণীয়া নয় বলুন?'

ঐদিনটাতেই রাজী হয়ে চলে গেলেন অবিনাশবাবু।...

এদিকে যতক্ষণ আপত্তির আশঙ্কা ছিল ততক্ষণ সেইটেকেই যা কিছু বাধা ভেবেছিস ওরা—এখন দেখা গেল, এ পক্ষেও প্রস্তুতির অনেক কিছু আছে। হাটবাজার করা, গয়না গড়ানো, লোক খাওয়ানোর ব্যাপার—বিবাহের হাজারো খুঁটিনাটি—অনুষ্ঠানিক তথ্য। সবগুলিই একে একে সুরেনের ঘাড়ে এসে পড়ল। সে যত সরে যেতে চায় তত কাকুতিমিনতি করে হেমন্ত, হাতে ধরে কাঁদে। কেবলই বলে, আমার আর কে আছে বল, এইটুকু দয়া কর। নিমেকে যা হুকুম করবি ও তাই করবে—কিন্তু ও কিছুতো জানে না—হুকুমতামিল করা ছাড়া ও কিছু করতে পারবে না।'

আস্তে আস্তে এমনি করে নাগপাশের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল। হেমন্তও ইতিপূর্বে কখনও কিছু করেনি—এধরনের কোন কাজ। বিয়ে দেখেছে, নেমন্তন্ন খেয়েছে কিন্তু তার জন্যে কতটা প্রস্তুতি দরকার তা

জানে না। নিত্যকিন্তুই অনেক জানে না, শ্বশুরবাড়ির কী সব নিয়ম আছে, হয়ত এক আধবার শুনেছে কিন্তু সেও বহু আগে, তখন সাধুচরণই জন্মায় নি, ওর বাবার বিয়েও হয়নি। কিছু কিছু নিমাই বলল, তার যা শোনা আছে বা দাদার বিয়ের সময় যা দেখেছে—যতটা মনে পড়ল—বাকীটা সুরেনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল। অর্থাৎ কিছুটা শ্বশুরবাড়ির মতে কিছুটা হেমন্তর বাপের বাড়ির মতে কাজটা হল।

বিয়ের চিঠি ছাপাবার খুব শখ। সুরেন বলল, 'কিন্তু এত কাকে নেমন্তন্ন করবেন পিসীমা? বাইরের লোক কি খুব বেশী একটা হবে?'

'না' একটু যেন লজ্জিতই হয়ে পড়ে, 'মানে তোদের বাড়ি, দিদির বাড়ি, অন্য আমার যা আত্মীয়স্বজন আছে; এখানে পূর্ণবাবুর বাড়ি—শরৎদিদি মারা গেছেন তারপর থেকে আর অবশ্য সম্পর্ক নেই নেই বিশেষ—তবু বলতে হবে।...অন্য দুচার জন আগেকার কর্মসূত্রে জানাশুনো—'

'এসব যে বলবেন আপনাকেই গিয়ে বলতে হবে। সে ছাপা চিঠিতে হবে না। আর আপনার নামে চিঠি ছাপানো সে বড় খারাপ দেখায়—ওর জ্যাঠারা, জাঠতুতো দাদারা বর্তমান থাকতে। এক তাহলে তাদের নামেই, সম্পর্কে বড় যে তার নামে চিঠি ছাপাতে হয়।'

'না না, তার দরকার নেই। মাগো!' প্রবল প্রতিবাদ করে ওঠে হেমন্ত, 'ও গুষ্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

'কে বরকর্তা হবে তাহলে পিসীমা?'

নিমাইদার জ্ঞাতগুষ্টির কেউ না এসে দাঁড়ালে খারাপ দেখাবে না? বরকর্তা তো একটা চাই!'

'বরকর্তা তুই, আমার কে।' ক্ষুব্ধ প্রশান্তির সঙ্গে উত্তর দেবার চেষ্টা করে হেমন্ত।

'ওমা, সে কি কথা। আমার সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই—পিসের ভাইয়ের ছেলে—তার ওপর আমি বয়সেও ছোট—আমি কখনও বরকর্তা হতে পারি।'

'হতেই হবে। বাবা কি বলো, যাদের কেউ নেই তাদের কি হয়?' আর এতো বলাই আছে তাঁদেরকে যে কেউ কোথাও নেই, দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ওর। সে সব জেনেই তো তাঁরা রাজী হয়েছেন!'

'তা হয়েছেন বটে। তবু তাঁদেরও তো আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের কাছে বরযাত্রী বার করতে হবে, দেখাতে হবে।'

'সে ওর আপিসের লোক আছে, আমার পাড়ার লোক আছে। ধমুবাবুর ছেলেকে বলব, আমার ম্যাটর্নী, খুব লম্বাচওড়া চেহারা তার। বিশ্বনাথবাবুকে বলিস, যদি তোর আপিসের কাউকে বলতে চাস—'

'না না, আমি কাকে বলব! বিয়েটা কার—বোঝাতেই তো এক ঘণ্টা লাগবে।'

অপ্রসন্ন মুখে বলে সুরেন। ভাল লাগে না, একেবারেই ভাল লাগে না তার। যেন হাঁফ ধরে। মনে হয় তাকে যেন একটা গবাক্ষহীন ঘরের মধ্যে দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে আর তার দেওয়ালগুলো ক্রমশ ভেতর দিকে সরে আসছে—ঘরের সীমিত বায়ুকে সীমিততর করে। খাঁচা কলে পড়ার অবস্থা হয়েছে ওর।

এক একবার ভাবে ক'দিনের ছুটি নিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়। ছুটি পাওনাও আছে, সেক্শ্যানের বড়বাবুকে খোশামোদ করলে পাওয়াও যাবে—কিন্তু কোথায় যাবে, যেখানেই যাবে খরচাও আছে। আর অসহায়া বৃদ্ধাকে ফেলেই বা যায় কোথায়?

এ কী বিপদে পড়ল সে! এই কথাই বারবার কেবল নিজেকে প্রশ্ন করে।

ছোট কাকাটাও যদি থাকত এখানে!... নিভা যা লিখেছে—তার আর কোথাও যাবার সামর্থ্য নেই। আস্তে আস্তে পিদীমের তেল ফুরিয়ে আসছে আর কি! ওদের নাকি দেখার ইচ্ছা খুব—কিন্তু এরা কোথায় যাওয়ার খরচা পাবে. সেই ভেবেই লেখে না। নিভার কাছ থেকেও নিতে রাজী নয়, বলেছে 'তুই যদি আমার অজান্তে পাঠিয়েছিস এক পয়সাও—তাহলে তোর ভাত এই পর্যন্ত। পথে গিয়ে মরে পড়ে থাকব সেও ভি আচ্ছা!'

সে চিঠি পাবার পর থেকে তার প্রাণের কথাটা ভেবেই সদা কণ্টকিত আছে—কোনদিন কি খবর আসে—সে লোকের কাছ থেকে কোন দৈহিক সহায়তা পাওয়ার আশা তো বাতুলতা। সুতরাং ক্ষীণ-খুণ্টের এই ক্লেশ তাকেই বইতে হবে।

আগে যতই যা বলুক—ক্রমশ নরম হয়ে আসে হেমন্ত।

ব্যাপারটা যে নিমাইচরণেরও ভাল লগছে না তা বুঝতে পারে। এও বোঝে যে ভাল লাগা সম্ভব নয়—সবাই থাকতে এমন অনাথার মতো বিয়ে করতে যাওয়াটা। শেষে দিন তিনেক থাকতে তাকে ডেকে বলে, 'দ্যাখো, তোমার জ্ঞাতগুষ্টি কাউকে যদি বলে আসতে চাও তো বলে এসো। ভাইয়েরা কেউ বরযাত্রী যেতে চায় তো কে কে আসবে আসতে বলো। বৌভাতেও যে ক'জন আসবে আসুক। তবে এখানে এসে বেশ গেড়ে বসে থাকবে এই ক্ষ্যেত্তোর—তা হবে না সেটাও বলে দিও। একদিনও না। আর যেন কেউ বরকর্তাও না সাজতে যায় কিম্বা সেখানে গিয়েও না ছল দেখায় কি আত্মীয়তা জাহির করে। সেটা ভাল করে সাবধান করে দিও, নইলে অপমান হতে হবে।'

নিমাই বোধহয় এই অনুমতিটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, সে সেইদিনই রওনা হয়ে গেল।...

রাত্রে ফিরে খবর দিলে, গোর নাকি কোথা থেকে কি খারাপ অসুখ বাঁধিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। কঙ্কালসার চেহারা হয়ে গেছে, চুলটুল উঠে বুড়োর মতো দেখাচ্ছে একেবারে।...

এক ধারের একটা ঘরে থাকতে দিয়েছে দাদারা, কেউ সেদিকে যায় না, ছেলেমেয়েদেরও যেতে দেয় না। আলগোছে ভাত ফেলে দিয়ে আসে কেউ গিয়ে, নিজের থালাবাসন নিজেকেই মাজতে হয়। কী অসুখ তা কেউ খুলে বলল না, তবে উঠোনের ধানসেদ্ধ উনুনে নিমপাতার জল ফুটিয়ে আড়ালে বাগানে গিয়ে স্নান করে দুবেলা আর যন্ত্রণায় কাতরায়—নিমাই দেখে এসেছে। খুব কাকুতিমিনতি করে কিছু পয়সা চেয়েছে ওর কাছে, হাতে নগদ পয়সা বলতে একটাও নেই, দাদারা কেউ দেয় না। পয়সার অভাবেই কোন চিকিৎসা হচ্ছে না, কে খরচ করবে? নিমাই সে কষ্ট দেখতে না পেরে নাকি দুটো টাকা দিয়ে এসেছে। অন্য কোন উপকার অবশ্য হবে না, ডাক্তার দেখানো যাবে না, তবু মাসখানেক বিড়ির খরচাটাও তো চলবে। এমনি কষ্ট তো আছেই—নেশা না করতে পেরে পেট ফুলে মরছে যে তার ওপর।

অনেক খবর দেয় নিমাই, অনেক কথা বলে যায়।

চোখ দুটো কি জ্বালা করে ওঠে হেমন্তর—শুনতে শুনতে?

বুকের মধ্যেটায় কি একটা বোধ করে? একটা দৈহিক যন্ত্রণা?

আর সেইটে কমাতেই কি অকস্মাৎ, নিমাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই, উঠে চলে যায় সেখান থেকে? কে জানে।

নিমাই অনেকক্ষণ তারপর গুম হয়ে বসে থাকে। হাজার হোক নিজের ভাইপো। তার এ দুর্দশা ভাল লাগে না। আগেকার ঈর্ষার ভাবটা চলে গেছে—এখন একটা উৎকণ্ঠা আর—অনুকম্পাই বোধ করে ছেলেটার জন্যে।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নির্বাসিতের ডায়েরী॥

অতলান্তিক সমুদ্রের ওপর ডাচ গায়না আর ব্রেজিলের মাঝখানে ফ্রেঞ্চ গায়না। এই ফ্রেঞ্চ গায়নার অপরাধী উপনিবেশটির কুখ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিল। পৃথিবীর যেখানে যত পেনাল সেটলমেণ্ট বা পত্তনী আছে সাইবেরিয়া থেকে আন্দামান—সবাই এমন কুখ্যাতি লাভ করেছে, তবে ফ্রেঞ্চ গায়না তুলনাহীন। এখানকার অধিবাসীদের পশুর অধম জীবন যাপন করতে হত এবং সেখানে ব্যাধি ও বুভুক্ষায় অজস্র মানুষ মরেছে। প্রায়ই অপরাধীরা পলায়নের চেষ্টা করেছে কিন্তু সাফল্যলাভ করেনি, হয় ধরা পড়েছে নয় মারা গেছে। একদিকে জঙ্গল অন্যদিকে সমুদ্র এরাই কারারক্ষী।

রেনি বেলবেনো এমনই একজন অপরাধী। তার বিচার এখনও সমাপ্ত হয়নি। দশ বছর ধরে তিনি পলাতক অবস্থায় স্বদেশহীন মানুষ হিসাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৯৪৭-এ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটা স্পেশ্যাল বিল পাশ করিয়ে তাঁকে বরাবরের মত যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দান করেন। পরে তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব পান। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে 'ড্রাই-গিলোটিন' প্রথার বিরুদ্ধে তিনি যে বিরামহীন একক আন্দোলন করেন তা সাফল্যলাভ করে এবং ফ্রেঞ্চ গায়নার এই কুখ্যাত অপরাধী পত্তনীটি শেষপর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রেনি বেলবেনো ডায়েরী রাখতেন এবং এই ডায়েরীতে সকল প্রকার ক্লেশের ইতিহাস সবিস্তারে লিখে রাখতেন। পলায়ন প্রচেষ্টায় বিপত্তির হৃদয়বিদারক বিবরণ তিনি লিখেছেন। পনের বছর ধরে নিয়মিত লেখার ফলে এই ডায়েরীর পাণ্ডুলিপির ওজন দাঁড়ায় ১৪ কিলোগ্রাম। অয়েলক্লথে আচ্ছাদিত এই পাণ্ডুলিপি বহির্জগতে এসে পৌঁছায়—এই ডায়েরীতে শুধু যে মানুষের অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী বর্ণিত আছে তা নয়, এই ডায়েরী একটি মানুষের দৃঢ়তা, সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ।

বেলবেনো ডায়েরীর শুরুতে লিখছেন : '১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমার বয়স যখন মাত্র একুশ বছর তখন আমাকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফ্রেঞ্চ গায়নার অপরাধী পত্তনীতে পাঠানো হয়, চুরি করার দায়ে আমি ধরা পড়েছিলাম।

যে অপরাধী বন্দী-জাহাজে আমাদের এই পত্তনীতে পাঠানো হয় তাতে ৬৮০ জন বন্দী ছিল এবং জাহাজের খোলের মধ্যে ইস্পাতের খাঁচায় তাদের রাখা হত। প্রতিটি খাঁচায় আশী থেকে নব্বই জন আসামী রাখা হত, প্রতিটি আসামীর জন্য এক স্কোয়ার মিটার জায়গা। পাছে গণ-বিদ্রোহ হয় সেই আশঙ্কায় খাঁচার ওপর দিকটা একটু খোলা রাখা হত এবং তার ভিতর দিয়ে বাষ্পপ্রবাহ ছড়ানো হত। যে সব আসামী একটু বেয়াড়া ধরনের তাদের গরম প্রকোষ্ঠে পাঠানো হত। এগুলি ঠিক বয়লারের পাশের জায়গা—এবং এতই ক্ষুদ্রপরিসর যে একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা বসতে পারতো না।

খাঁচার ভিতরকার কথাবার্তা সাধারণতঃ পালানোর পরামর্শ এবং গায়না বিষয়ক আলোচনা। কোনো আসামীর কাছে ভূচিত্রাবলী থেকে ছিঁড়ে আনা সাউথ আমেরিকার ক্ষুদ্র মানচিত্রও ছিল। এই মানচিত্র অনেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে সময় কাটাতো। গায়নার আশপাশে শহর এবং নদীর নামগুলি মুখস্ত করত! এমন সব কথা উচ্চারণ করার চেষ্টা করত যা কিছুদিন পূর্বেও তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল—যথা পারামারিবো, ভেনেজুয়েলা, ওরিনোকো, ওয়াপোক ইত্যাদি।

অচিরাৎ এক একটা চক্র গড়ে উঠল—এমনই একটা বিশিষ্ট গোষ্ঠীর 'ফর্টস-এ-রাস'—এরা বিশেষভাবে চিহ্নিত এক দল, অনেকদিন আফ্রিকার সামরিক বন্দীশালায় এদের জীবন কেটেছে এবং অনেক রকম কলা-কৌশল এদের জানা ছিল। গোড়া থেকেই তাদের কাছে তামাক এবং অন্য দু একরকম দ্রব্যাদিও ছিল। তারা একটা জুয়াখেলার দলও গড়ে ফেলল। পুরু ঠোঁটে দিনরাত খিস্তি-বিখিস্তি চলল এবং পেশীবহুল হাত আর এই খিস্তির উদ্গার ইত্যাদির জন্য তারা বন্দী-খাঁচার মস্তান হয়ে উঠল।

রাতের বেলায় তারা যা পেত চুরি করত। চোরাই মাল বেচে তারা তামাক কিনত।

একদিন দুই বন্দীতে ছুরি নিয়ে হাতাহাতি শুরু হল। তার পূর্বে সিমেণ্টের মেঝেতে দুজনে শানিয়ে নিয়েছিল দুজনের ছুরি। আমরা আতঙ্কে সব সরে দাঁড়ালাম! ভীষণ ব্যাপার। সহসা একজন মাটিতে পড়ে গেল, অপরজন তাকে সাবড়ে দেয় আর কি। আমরা ওদের আড়াল করেছিলাম—যাতে প্রহরীরা দেখতে না পায়—আর চেঁচামেচি ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য গান ধরেছিলাম। তথাপি একজন প্রহরী ঠিক সময়ে এসে পড়ে আহত লোকটাকে জাহাজী হাসপাতালে পাঠালো এবং অপর ব্যক্তিকে 'হট সেলে'—তার সন্দেহ হওয়ায় খাঁচায় ঢুকে পড়েছিল।

ট্রপিক অঞ্চলে পৌঁছে বায়ুহীন অবস্থায় বন্দী খাঁচার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠল। জল নষ্ট হয়ে গেল, নাবিকরা তাতে পারম্যানগনেট ঢেলে দিল, জলটা পানযোগ্য করার জন্য এই চেষ্টা। সবাইকে জড়ো করে জল ঢালা হত মাথায় দিনে দুবার।

এরপর বেলবেনো—তারা স্থলে পৌঁছনোর পর কি অবস্থা দাঁড়ায় তার বিবরণ দিয়েছেন। সেখানকার নিগ্রো অধিবাসীরা এমনকি তাদের মেয়েরাও এসে হাত-পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করতে থাকল এবং শ্বেতাঙ্গ আসামীদের শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হন। তাদের না আছে জামাকাপড়, না আছে পায়ে জুতো। এদের সবাইকে সাঁ লরে শিবিরে ৬০ জনের এক একটি দল করে রাখা হল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন সেই বন্ধ জানালার ধারে এসে দাঁড়াল—তারা বলল—তামাক চাই! কফি! কলা? এসব চাই?

তখন বন্দীরা প্রশ্ন করে—আমরা কিভাবে দাম দেব? আমাদের কাছে যে পয়সা কড়ি নেই!

—কেন জামাকাপড় তোমাদের জামাকাপড় বেচে দাম দাও, কি নেবে?

একজোড়া পাতলুন ৪০ সাউ, একটা সার্ট তিরিশ সাউ, একটা কম্বল পাঁচ ফ্রাঁ।

শুধু একজন পাতলুন বিক্রি করল, আরেকজন এক সার্ট।

সে রাত্রে সবাই একটা করে সিগারেট পেল—এবং কয়েকটা কলা।

পরদিন শিবির পরিচালক বা কম্যাণ্ডাণ্ট এসে আমাদের বললেন যে এটা গায় [illegible]। এখানে প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ কর। [illegible] পালাবার চেষ্টা কোরো না। আমরা [illegible] ফেলব। আমরা দিনরাত জঙ্গল এবং সমুদ্রের দিকে নজর রেখেছি। পনের দিনের মধ্যে অনেককে পালাতে দেখা যাবে কিন্তু সবাই আবার ফিরে আসবে। তখন কারো জায়গা হবে হাসপাতালে কারো বা জায়গা হবে সেলে—আর কিছু ব্যক্তির কঙ্কাল পিঁপড়ের ভুক্তাবশিষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে থাকবে।

ডাক্তারী পরীক্ষা হল সবায়ের এবং সুস্থ অসুস্থ সবাইকেই নানারকম কাজ দেওয়া হল। আমি আমার মিলিটারী পেনসনের কাগজ দেখাতে আমাকে একটু হালকা কাজ দেওয়া হল এবং এই ছাড়পত্র আমাকে পরে অনেক দুঃখযন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করেছে।'

এই বন্দী-পত্তনী বা অপরাধী শিবিরের রোমাঞ্চকর এবং দুঃখজনক বর্ণনা এই ডায়েরীর অপরাংশে ছড়ানো আছে, তার কিছু অংশ আগামী সংখ্যায় পরিবেশিত হবে।

—অভয়ঙ্কর

DRY GUILLOTINE :
By RENE BELBENOIT
Published by
SPHERE BOOKS : LONDON

সাহিত্যের খবর

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও শ্রীঅরবিন্দ জন্ম-শতবর্ষ কমিটির মিলিত উদ্যোগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

শ্রীঅরবিন্দ চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে নতুন পথের দিশারী। এই চিন্তানায়কের জন্মশতবর্ষ পূর্তি যোগ্য ও মর্যাদার সঙ্গে দেশের সর্বত্র পালনের জন্যে নানান সংঘ ও প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মুর্শিদাবাদ শাখা ও শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবর্ষ কমিটির মিলিত উদ্যোগে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। 'বর্তমান হিসেব শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার আছে সর্বসাধারণের। প্রবন্ধটি লিখতে হবে, দু' হাজার শব্দের মধ্যে। ১ম, ২য় ৩য় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেবেন শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবর্ষ কমিটি। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে নির্দিষ্ট বিষয় : 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের অবদান' (দু হাজার শব্দের মধ্যে প্রবন্ধটি রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথম তিনজন শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করবেন ভারত সরকারের ক্ষেত্র প্রচার বিভাগ, বহরমপুর। এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে প্রবন্ধের বিষয় হল : 'মহামানব শ্রীঅরবিন্দ'। এই প্রবন্ধটি এক হাজার শব্দের মধ্যে লিখতে হবে। স্কুলের প্রথম তিনজন শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, বহরমপুর। প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ হল ৩১শে জুলাই, ১৯৭২। প্রতিযোগিতার প্রবন্ধগুলি পাঠাতে হবে নিচের ঠিকানায় : সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—মুর্শিদাবাদ শাখা। ৭, রামবাবু লেন (নতুন বাজার). ডাকঘর : খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

নতুন বই

প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বাংলাদেশ (প্রবন্ধ)। সোমেন পাল সম্পাদিত। রিফেকটি পাবলিকেশন. ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

বাংলাদেশে যখন পাক-সামরিকবাহিনীর নির্যাতন চলছিল, তখনকার ঘটনাবলী নিয়ে দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকেরা যা লিখেছিলেন, এটি তারই সংকলন। বিদেশী সাংবাদিকেরা বিতাড়িত হয়ে বাইরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা যা বলেছেন বা লিখেছেন, তার অনেকখানি পাওয়া যাবে এই বইতে। উপরন্তু দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, চিত্রাঙ্গদা, জয়বাংলা ও বাংলার বাণী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বা লেখার কিছু কিছু অংশ এই বইতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে এগুলোর একটি সূচীপত্র দিলে শোভন হত। বইটিতে কয়েকখানি ছবি দেওয়া হয়েছে। বই-এর বিষয়বস্তু ও ছবিগুলো দেখলে পাক-সামরিকবাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের কথা সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দেবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগের ঘটনাগুলোই এতে রয়েছে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে যাঁরা জানতে উৎসুক, তাঁদের কাছে এই বই অনেক কাজে দেবে।

সোহাগ রাত (উপন্যাস)। সলিল সেন। দীপিকা, ৩০।১, কলেজ রো, কলকাতা-৯। চার টাকা।

সামাজিক সমস্যা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন শ্রীসলিল সেন। সমাজ-মানুষের দারিদ্র্য এবং সেই সূত্রে দারিদ্র্য থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি-পাওয়ার আশায় পুত্রের বিবাহদানে বরপণ গ্রহণ—এই বিষয়টিকে লেখক উপন্যাসের কাহিনী ও ঘটনায় জড়িয়েছেন। পিতা নটুবাবু, তরুণ, তপন ও আরও একটি সন্তান ও দুটি কন্যা—সব মিলিয়ে এই কয়জন একটি দরিদ্র সংসারে থাকে। সংসার সচ্ছল করার জন্যে নটুবাবু বেশ কিছু টাকা বরপণ নিয়ে তরুণের বিয়ে দিলেও তরুণ শ্বশুরের হাত থেকে টাকা নিয়ে আলাদা সংসার পাতে। এতে তপন

ক্ষুব্ধ হয়। সে বাবার অবস্থা ফেরাবার জন্যে দশ হাজার টাকার বরপণ নিয়ে বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের রাতে দেখে তার স্ত্রী অন্ধ। এরপর তপন ও তার স্ত্রী শোভনার মধ্যে যে সংঘর্ষ, পরিণাম, তারই সার্থক কাহিনী 'সোহাগ রাত' উপন্যাস। লেখক ভাল গল্প বলতে পারেন। গল্পরস জমাট, ভাষা সহজ, সরল। চরিত্রগুলি সুঅঙ্কিত।

সমীকরণ এবং সমীকরণের আগে ও পরে (গল্প সংকলন)। গোপাল সামন্ত। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। ছয় টাকা।

ব্যক্তিগত জীবনে বিবিধ বিচিত্র অসাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীগোপাল সামন্ত বাংলা ছোটগল্প রচনায় হাত দিয়েছেন। চল্লিশোত্তর বয়সী এই লেখকের ছোটগল্প রচনায় বাস্তবিকই যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আছে, তা বর্তমান গ্রন্থটি না পড়লে বোঝা যাবে না। লেখক কলকাতার বিখ্যাত কয়েকটি মাসিক ও সাপ্তাহিকের লেখক। বর্তমান সংকলনের গল্পগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত হওয়ায় লেখকের গাল্পিক সত্তাটির স্পষ্ট পরিচয় ধরা পড়ে।

মোট পনেরোটি ছোট-বড় গল্প নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থ। ব্যক্তিজীবনের দুঃসাহসিক নানাবিধ অভিজ্ঞতা প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই জড়িয়ে আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, সেই অভিজ্ঞতা কোথাও সংবাদ মাত্র নয়, তথ্য বা নীরস তত্ত্বে পর্যবসিত হয় নি, লেখকের সহৃদয় ও সংবেদনশীল মনোভাবনায় গল্পগুলির রস-সংবেদনা উচ্চ মানে উন্নীত করেছে গ্রন্থটিকে। বাঘের লেজ গল্পের অলোক, 'খাট' গল্পের চাঁপা, পিলু, 'মহুল' গল্পের জয়ন্ত-কেতকী, 'সমীকরণ' গল্পের উত্তমপুরুষ নায়কটি, — এরা সব আমাদের ভিতরের ভয়, বিস্ময়, ভালবাসা, চিৎকার, অনুকম্পা, আকর্ষণ সমস্ত নিয়ে আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। লেখকের ভাষা নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির অন্যতম সম্পদ। বলার ভঙ্গীতে কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। যে কোন গল্প একবার আরম্ভ করলে না শেষ করে নিস্তার নেই। এখানেই লেখকের ও গল্পগুলির প্রধান মূল্য স্বীকৃত।

আলো-ছায়া জানালায় (গল্প সংকলন)। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

মোট উনিশটি ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে 'আলো ছায়া জানালায়' গ্রন্থটিতে। লেখক শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক নানাবিধ সমস্যাকে সুনিপুণভাবে গল্পগুলিতে চিত্রিত করেছেন। নতুন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় গল্পগুলিতে নেই বটে, কিন্তু লেখক এমন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে গল্পের কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও প্রতিপাদ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন, যা গল্পগুলিকে মহৎ শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। 'সুস্মিতার জন্য' 'সর্বাণি সংবাদ', 'অনেক রাত্তিরের একটি', 'এই আচরণ', 'গণ্ডী', 'বন্দিনী', 'আশাবরী', 'অক্ষর পরিচয়' ও 'ছেলেটা' গল্পগুলি সুলিখিত। শ্যামলী, অজেয়, সরোজাক্ষ, বিলাস, তরুণিমা ইত্যাদি চরিত্র সু-অঙ্কিত। লেখকের বলার ভঙ্গী সহজ, সরল, সাবলীল। গল্পের শেষে চমক সৃষ্টিতে লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় গ্রন্থটি যথাযোগ্য স্থান পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

স্কাইলার্ক পাখী ও অন্যান্য রঙ (গল্প সংকলন)। সুজিতকুমার পালিত। অধুনা, ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

মোট দশটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ হল স্কাইলার্ক পাখী ও অন্যান্য রঙ। এর মধ্যে প্রথম গল্পটিই হল গ্রন্থের নাম গল্প। গল্পগুলিতে কোন না কোন অর্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে নেমেছেন লেখক। গল্পের ফর্ম সম্পর্কে এবং ভাষা ও শব্দপ্রয়োগ সম্পর্কে লেখক অতি-সচেতন। প্রেম-ভালবাসা থেকে সমাজ, অফিস, ব্যক্তিগত অনুচিন্তা, আত্মদর্শন, মনের গভীরের অনির্দেশ্য যন্ত্রণা তরুণ লেখক সুজিতকুমার পালিত নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। মন্দিরা, কবরী, গল্পের উৎসপুরুষ কথক নায়ক, আশিস, ঝুমুর, বিশাখা, অংশু ইত্যাদি চরিত্রগুলি যেন লেখকের ব্যক্তিমনের দর্পণে দেখা অজস্র আত্মপ্রতিবিম্ব। গল্প একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তায় গল্পকে কবিতার কাছে নিয়ে এসেছেন। গল্পের ভাষা অকারণ কবিত্বে সিক্ত নয়, জীবন যে অর্থে মহৎ কবিতা, সেই কাব্যই গল্পের বিষয়ে যেমন, গদ্যে ও রচনারীতিতে তেমনভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। স্বভাবী সচেতন এই লেখককে বর্তমান গ্রন্থের জন্য অভিনন্দিত করি। নতুন চিন্তার জন্য মনকে নাড়া দেয় বলেই বর্তমান গ্রন্থের লেখক বাংলা ছোটগল্পে স্বতন্ত্র স্থান তৈরী করে নিতে সক্ষম হবেন।

নাগকেশর (গল্প সংকলন)। সম্পাদকঃ দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর দাশগুপ্ত ও দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্ধধারা প্রকাশন, ৭৯।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। তিন টাকা।

গ্রন্থটির সম্পাদকসহ আরও নয়জনের নয়টি ছোট গল্প নিয়ে মোট বারোটি ছোট গল্পের সার্থক সংকলন গ্রন্থ 'নাগকেশর', লেখকদের সকলেই বাংলা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে নবাগত ও বয়সে তরুণ। এই তারুণ্য গল্পগুলিতে প্রকট। কিন্তু তারুণ্য কোথাও উচ্ছৃংখলতা বা তথাকথিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে রীতিবিভ্রম ঘটায় নি গল্পগুলিতে। প্রত্যেকটি লেখকই অত্যন্ত সচেতন, সচেতন বিষয়বস্তু, রচনার রীতি ও গদ্য ভাষার ক্ষেত্রে। তরুণ লেখকদের ক্ষেত্রে এ'দের স্বাতন্ত্র্য হল—এ'রা প্রত্যেকেই গল্পের অন্তস্থলে সূক্ষ্ম কবিত্বকে মেনে নিয়েছেন। কেউ প্রতীকে, কেউ ভাষায়, কেউ রূঢ় বাস্তব জীবন ভাবনায়, কেউ বা প্রেম-ভাবনা প্রকাশে। শংকর দাশগুপ্তের গল্পে 'ধবধবে সাদা একটা সিংহ' দিলীপ দাশগুপ্তের 'জননী'র হৃদয় কথার স্বরূপে, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোকা যাদুকরের দু চোখ জুড়ে ঘুম নেমে' আসার মধ্যে, আশিস সেনগুপ্তের সুশান্তর মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্রে, জীবন সরকারের 'আমার মৃত্যুর জন্য তোমরা কেউ দায়ী নও' এই স্বীকারোক্তিতে তরুণ লেখকরা যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন, তা গল্পের নতুন ভাবনার দিক স্পষ্ট করে। এ ছাড়া অন্যান্য গল্পকাররা যেভাবে গল্পের মধ্যে স্বভাবী অন্তরঙ্গতা ও জীবনকে স্পষ্ট করে দেখা ও দেখানোর জন্য প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের রচনাকে সে কারণ অভিনন্দিত করতে হয়। তরুণ লেখকদের এই প্রয়াস ছোটগল্প পাঠকদের উত্তেজিত করবে বলে মনে করি।

কার্নিভালে খুন (উপন্যাস)—বাসুদেব। লিপিকা,৩০।১ কলেজ রো, কলকাতা-৯। তিন টাকা।

একটি গোয়েন্দা কাহিনী 'কার্নিভালে খুন'। লেখক ডাঃ বাসুদেব অতিকৌশলে কাহিনী ও ঘটনা সাজিয়েছেন। এ কাহিনীর গোয়েন্দার নাম রণদেব ঘোষাল। তিনি কয়েক দিনের জন্য রাঁচী যান। সেখানে গিয়ে তাঁর এক বন্ধু অফিসার ইনচার্জের কাছে নারী হত্যার খবর পেয়ে তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। খুনটি সংঘটি[illegible] হয় কার্নিভালে। কার্নিভালে [illegible]। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে অভিনব [illegible]য়ে ইলেকট্রিক ট্রেন যাওয়ার পথ আছে। সেই ট্রেনেই খুন হয় করুণা মিশ্র। এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সরযূ দেবী, কাবেরী মাথুর, বাসুদেব শেঠ, পুরেণচাঁদ, অম্বরনাথ, সীতা, দীপনারায়ণ ইত্যাদি প্রধান-অপ্রধান চরিত্র। এদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন খুনী আছে। রণদেব ঘোষাল কিভাবে খুনীকে বের করল এবং খুনী কেন মেয়েটিকে খুন করেছে ও কিভাবে—তারই রুদ্ধশ্বাস ভয়ংকর কাহিনী হল এ গ্রন্থ। লেখক যে বৈজ্ঞানিক কৌশলে ও সতর্কতার সঙ্গে কাহিনী ও ঘটনা সাজিয়েছেন এবং চরিত্রের গভীরে ডুব দিয়েছেন, তা প্রশংসার্হ।

প্রাপ্তি-স্বীকার

আর্যাবর্ত (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক ঃ বিমল ঘোষ। সেভোক রোড, শিলিগুড়ি। পনেরো পয়সা।

এক সাথে (জ্যৈষ্ঠ '৭৯)—সম্পাদিকা ঃ কনক মুখোপাধ্যায়। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা—১২। আশী পয়সা।

কাল (২য় বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা)—সম্পাদক ঃ বিমল দেব। খোয়াই, ত্রিপুরা। পঞ্চাশ পয়সা।

সেকালের কলকাতায় সম্পাদক নিগ্রহ

নারায়ণ দত্ত

কলকাতার নাটভবনে সেদিন পর পর চারজন সম্পাদক ঢুকলেন লাটবাহাদুরের আমন্ত্রণে। 'ইন্ডিয়ান মিররে'র নরেন সেন, 'বেংগলী'র সুরেন বাড়ুজ্জে 'রেইস আর রায়তে'র শম্ভু মুখুজ্জে আর 'সঞ্জীবনী'র দ্বারকা গাংগুলী। আরও একজন গেলেন এঁদের সঙ্গে ইনি ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু। ভারতীয় কংগ্রেসের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে। দেশে জাতীয় ভাবের উন্মোধন হয়েছে। আঠারশ' সাতাশী। লাটবাড়ী আলো করে লর্ড ডাফরিন। উপলক্ষ ভারতসভা।

লাটবাহাদুর এলেন। এলেন গোমড়া মুখে। বিরস বদনে। কণ্ঠে লৌকিকতার অভাব হল না। মাননীয় অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে হঠাৎ বলেই উঠলেন আচ্ছা ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এসেছেন কি? সৌজন্যবশে উঠে দাঁড়িয়ে লাটবাহাদুরকে তাঁর পরিচয় দিয়ে থাকবেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু ভাইসরয় সেসব সৌজন্যের প্রত্যুত্তরই করলেন না। বরঞ্চ অত্যন্ত কাঠখোট্টার মত জিগ্যেস করে বসলেন, আচ্ছা ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে মহামান্য লাটবাহাদুর সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে যে গোপন 'সিক্রেট' চিঠি লিখেছেন, সে খবর আপনি জানলেন কি করে? লাটসাহেবের এ ধরনের অভদ্র প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন না নরেন্দ্রনাথ। তবু একবার বোধ হয় থমকে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তারপর সহজ কণ্ঠে বললেন, মহামান্য লাটবাহাদুরের এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। সেখানেই থামলেন না নরেন্দ্রনাথ। লাটসাহেবকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কোন সম্পাদককে এই ধরনের প্রশ্ন করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

ডাফরিন জাত ডিপ্লোমাট। এ ধরনের কঠিন প্রত্যাঘাতে সজাগ হয়ে উঠলেন। সম্পাদকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। অন্তত এই কাহিনী পরিবেশন করে সেই কথাই বলেছেন রামগোপাল সান্যাল। তবে সম্পাদকদের এই ধরনের অসম্মান শহর কলকাতার আদ্যিকালের ইতিহাসে কিছু নতুন কথা নয়। আজব শহর কলকেতা। রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।...হুতোম দাসে যাই স্বরূপ ভাষে না কেন, শহর কলকাতার আজব চরিত্র হুতোমেই শেষ হয়ে যায় নি। এখানে বারে বারে সম্পাদক সাংবাদিকদের ওপর নিগ্রহ হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে। এবং কেমন যেন এর ট্রাডিশনেই দাঁড়িয়ে গেছে। সেকালের বিবর্ণ পাতাগুলির ওপর থেকে বিস্মৃতির ধুলো সরালে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে, বহু নামী-অনামী সম্পাদক-সাংবাদিক তাঁদের সততা সত্য ভাষণের জন্যে বাজরোষে পড়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন ক্রোধান্ধ সামন্ততন্ত্রের হাতে, কেউ বা অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন, মৃত্যুর পরও রেহাই পান নি হরিশের অসহায় পরিবার। কাউকে কাগজকে কাগজই তুলে দিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। এই নিগ্রহের যেন শেষ নেই। ক্ষান্তি নেই।

এবং এ ব্যাপারে সাদা-কালোর তফাৎ নেই। সাহেব সম্পাদকরাও রেহাই পায় নি। তাদের গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। কেননা যে যাই বলুক সাহেব নিয়েই ত কলকাতা। তারাই আদি আর তারাই অন্ত। এখনও যাঁরা বুড়ো ঠাকুর্দারা কলকাতার পুরনো দিনের কথা পেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তাঁরাও সেই সাহেব-কলকাতার কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—সে রামও নেই, সে অযোধ্যা নেই। সেই লাল-নীল-সবুজে-বেগুনী কাগজের শিকলে কাটা, ছুঁচলো টুপিপড়া বুড়োর বড়দিনও নেই, কিংস বাথডে, সোনালী অক্ষরে লেখা আলোঝলমল 'ন্যু ইয়ারস ডে' নেই। সেই সাহেবদের শহর কলকাতা বলতে একালের চৌরঙ্গী-ডালহৌসী-লালবাজার মায় ধর্মতলার কিছু কিছু। সেকালের ম্যাপে তা লাইন টেনে দেখিয়ে দেওয়া হত। সেই সাদা কলকাতা ত নয়, ছবি। সাহেব-মেমেরা হাঁটে। লালদীঘির সামনে ছবির মত ছায়াঘেরা পথে রোদ পড়লে বেড়াতে বেরোয়। কেউ গঙ্গার বুকে বজরায় চাপে।

আলিনগর খালি করে নবাবী ফৌজ মুর্শিদাবাদ পালিয়েছে। পলাশীর আম্রবনে রক্তের আলপনা লেগেছে। রবার্ট ক্লাইভ মোটা পয়সা কামিয়ে স্বদেশে 'ব্যারা অফ প্লাসী' হয়ে বসেছেন। মাদ্রাজ থেকে এই সেদিন চাঁদপালঘাটে এসে নামলেন নতুন সাহেব বাদশা-ওয়ারেন হেস্টিংস। আর সে খবর কলকাতার সাহেব সুবোরাই নয়, কালা কলকাতাও জানতে পারলে কেল্লা থেকে বার বার একশটা তোপের শব্দে। আর মৌচাকে যেন কাঠি পড়ল। কালা নয় গোরা কলকাতায়। সাহেব মহলে। সেখানে নানা জল্পনা-কল্পনা। ফিস ফিস। চাপা আলোচনা। কিছু হাসি। কিছু ঠাট্টা। কিছু তীর্যক ইঙ্গিত। কিন্তু সে কাকে নিয়ে? ওয়ারেন হেস্টিংস? — সে ত পুরনো মানুষ। বাঙলাদেশের সাতঘাটের জল খেয়ে, কান্ত মুদির বাড়ী পান্তা খেয়ে—এবার একেবারে গভর্নর জেনারেল হয়ে ফিরেছেন। তাকে নিয়ে চোখ টাটাতে পারে। আঙুলে ফুলে কলাগাছ বলে কোন কোন সাহেবের মনে জ্বালা করতে পারে। কিন্তু আলোচনা? না। সে রসালো কেচ্ছা জার্মান দম্পতি ইমহফদের নিয়ে: কেননা বড় সুন্দরী এই মেয়েটি—শ্রীমতী ইমহফ। কিন্তু সেখানেই ত ব্যাপারটা শেষ নয়। জাহাজে এই মেয়েটিই না প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিলেন অসুস্থ হেস্টিংসকে? আর তার মনের সিংহাসনে চিরকালের জন্য আসন করে নিয়েছিলেন।

কশাইটোলা বা লালবাজারে হোটেল-টেভার্ণগুলি তখন গজিয়ে উঠেছে। হারমনিক বা লণ্ডন টেভার্ণ ত তাদের শিরোমণি। সেখানে হুল্লোড় করতে করতে সাহেব-মেমেরা এই সব কেচ্ছাকাহিনী রসিয়ে রসিয়ে শোনে আর হাসিতে ভেঙে পড়ে। কোন সুন্দরীর ঈর্ষা ভ্রুভঙ্গে বিরাজ করে। নৃত্যক্লান্ত তরুণ-তরুণীরা সেরিওনের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকায়, গ্রাণ্ডের কেচ্ছায় চটেচটে রসাল আঠার সৃষ্টি করে, তরুণী এমার নবীনতম প্রেমিককে নিয়ে করে জল্পনা-কল্পনা। আর এ সব কথার ফাঁকে ফাঁকে গভর্নরের বাড়ীর সার্শীর কাঁচ নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তাদের বেতের তৈরী জানলার ঢাকায় বোধ করি ঐ কাঁচের সুদিন আর আসবে না!

ওদিকে কৌন্সিলেও জোর ঘোঁট। হেস্টিংসের পিছু পিছু এসেছেন ক্লেভারিং, মনসন আর নাটের গুরু ফিলিপ ফ্রান্সিস। ওই হেদোর দক্ষিণ থেকে রাজা নন্দকুমার এসে সেই নাটকে যোগ দিয়েছেন। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পে ব্যস্ত। হেস্টিংস কিন্তু হালকা নাস্তা, মদাহীন লাঞ্চ-ডিনার আর ঘোড়ায় চেপে নিত্য প্রাতঃভ্রমণের দিনপঞ্জী নিয়ে শরীরটাকে সুস্থ রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। কলকাতার কলহ তাতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি।

আর এত সমস্তে ব্যত্যয় ঘটে নি 'ট্যাভার্ণ'-জীবনের। সেখানে দিন-রাত আড্ডা। কখনও অফিস-পালান রাইটার, কখনও সেলর, গোরা সৈন্য। আর রাত হলেই জোড়ে-বিজোড়ে সাহেব-মেম। সন্ধ্যার আকাশের তারার মত তাঁরাও উদয় হন ট্যাভার্ণে। সন্ধ্যা নামতেই। লালদীঘির কার্প, বাটা-খয়সোলার স্বাদ কেমন, মাতাল গোরা নাবিকরা সম্প্রতি শহরে সরকারী পিয়নদের সঙ্গে যে মারামারি করেছে, তাতে দোষী কে, তাই নিয়েও তর্কাতর্কির শেষ নেই। কেবল এক সময় রাত গভীর হয়। বসন্ত শেষে প্রণয়োন্মত্ত মধুপদের কুজন-গুঞ্জনের অবসানের মত কলকাতার

পাল্কীর মধ্যে ক্লান্ত প্রণয়িনীরা পায়ে পায়ে মিয়ানে চেপে বসে বাড়ী ফিরতে, প্রণয়ীরা পাল্কীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় দেয়, আর আকাশে পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ যেন নিঃশব্দ খিলখিল দেখেছে, এমনিভাবে অজস্র আলোক হাসিতে ভেঙে পড়ে। অদূরে জঙ্গলগুলি শেয়ালের ঐকতান রাত প্রহর ঘোষণা করে। বাঁশ আর হোগলা বনে কখনও কখনও বাঘের গর্জন শোনা যায় আর গড়ের সামনে গোরা শান্ত্রীর রোঁদ দেওয়ার ভারী বুটের শব্দ যেন রাত্রির নিশ্চিন্ত শাসনের ব্যাঘাত করে।

আর এই কলকাতার কাহিনী এক পাগল সাংবাদিক নিত্যনিয়ত লিখে রাখে। না, ডায়ারিতে নয়, ছাপার হরফে। বড় ঘরের কেচ্ছাই ত বেশী মুখরোচক, মুচমুচে, মজাদার। তার চাহিদাই ত সাহেব সমাজে সবচেয়ে বেশী। সাংবাদিক তাও খুঁজে পেতে লিখে। কাউকেই বাদ দেয় না। স্বয়ং গভর্নর, চীফ জাস্টিস থেকে শুরু করে ছোট-খাট রাইটার—তার কিসসায় কে নেই?

সাহেবের নাম হিকি—জেমস অগাস্টাস হিকি। ভদ্রলোক সম্বন্ধে সেকালে কেউই খুশী নয়। বাস্টীড ত বলেছেন, 'ইললিটারেট'। কেন বলেছেন কে জানে। তাঁর গেজেটে যে লেখা বেরোত, সেটা আর যাই হোক অশিক্ষিত লোকের নয়। তবে সাহেবদের এত গায়ের ঝাল কেন? বোধ করি, এই কারণে যে তাঁর কাগজে সেকালের সাহেব-সুবোদের জীবনচর্চার যে ছবি আঁকা হয়েছে, তা আর যাই হোক সুস্থ জীবনাদর্শের নয়। আর হিকির ত বাদবিচার নেই—ছোট মুখে বড় কথা, এ্যাঁ?

আর তাই নিয়েই বেধে গেল খটামটি। হেস্টিংসের চোখ সর্বত্র। তাঁকে নিয়ে মেরিয়নকে নিয়ে ব্যঙ্গ, তাঁর আঁতে ঘা লাগবে বৈকি। প্রথমেই তাকে ভাতে মারবার ব্যবস্থা করা হল। সমকালীন সরকার সমর্থিত আর একটা কাগজকে প্রাধান্য দেবার জন্যে হিকির কাগজের ডাকে পাঠাবার মাশুল সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু হিকির কাগজের তখন বিস্তর চাহিদা। ছেপে উঠতে পারে না। এতই বাড়বাড়ন্ত। হেস্টিংসের কায়দা মাঠেই মারা গেল। আর ক্রুদ্ধ হেস্টিংস তখন তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। সতের শ' একাশী। জুন মাস। কয়েকজন য়ুরোপীয় কোর্টের কর্মচারী, জনকয়েক সিপাই, আর তিন-চারজন পিয়নের একটা ভারী দল একটা সরকারী পরোয়ানা নিয়ে হাজির হিকির বাড়ী। কি ব্যাপার? না, গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মানহানির দাবী দিয়ে নালিশ করেছেন, আর তারই বিচারে চীফ জাস্টিস ইলাইজা ইম্পের এই সমন! বেঁধে নিয়ে যাবে হিকিকে। হিকি যোগেশ চৌধুরীর শম্বুকের মত বলতে পারত—অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ তার, বিচার হইয়া গেল!

হিকিও সহজ মানুষ নয়। দরজাই খুলল না। আর কোর্টের পাইক-পেয়াদা হাতুড়ী শাবল দিয়ে দুদ্দাড় পেটাতে লাগল তার বাড়ীর দরজা—প্রকাশ্য দিবালোকে, সাক্ষাৎ আইনানুসারে! দরজা ভেঙেই একদা তারা বাড়ীর ভেতরে ঢুকল দোর্দণ্ড-প্রতাপে। যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে সম্পাদক হিকি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এবং কোর্টের অফিসারকে অবলীলাক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ্যারেস্ট করতে এসেছেন? পরোয়ানা কই? ওয়ারেন্ট অফ এ্যারেস্ট?' আর ওয়ারেন্ট। হিকি যেন বিলেতে বাস করছেন। এটা কলকাতা? হেস্টিংস-ইম্পের হুকুমই এখানে আইন। সেসব প্রশ্নের কোন জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলে না কোর্টের লোক। অনেকটা পিছমোড়া করে বেঁধেই বোধ হয় কলকাতার প্রথম সাংবাদিক-সম্পাদককে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আদালতে। কিন্তু হিকির কপালে সেদিন ঘোরতর দুঃখ। সেই কোর্টের পেস্কার আমলা পরিবৃত অবস্থায় কোর্টে পৌঁছবার আগেই জজেরা সব সেদিনকার মত কোর্ট ভেঙে দিয়েছেন। সেকালে প্রধান বিচারপতি পুলবন্দী জজ সার ইলাইজা ইম্পে বেলা একটার পর আর বিশেষ কোর্ট করতেন না। আর বামনু গেল ঘর ত লাঙল কাঁধে কর। অন্যান্য সব জজরা ইম্পের মহাজন-পন্থা অনুসরণ করবেন, এ আর বিচিত্র কি? কাজেই জেমস অগাস্টাস হিকির কপালে সেই রাত্রের জন্য বিনা বিচারে হাজতবাস। পর দিন সকাল নয়টা কোর্ট বসলে সারা রাত বিনিদ্র রাঙা চোখ হিকিকে তাঁর বিরুদ্ধে রুজু করা দুটো মামলারই অভিযোগ শোনান হল। দাবী করা হল চল্লিশ হাজার টাকার জামিন। আজকের মত পার্সেন্টেজ নয়। একেবারে মবলগ চল্লিশ হাজার টাকা।

সবসাকুল্যে পাঁচ হাজার টাকার মত জোগাড় করতে পারলে হিকি। কিন্তু কোর্ট বললে, ওতে হবে না! হিকি ত আর হেঁজিপেঁজি নয়। সে একটা দারুন আপত্তি দিলে। বললে জুনিয়াসের চিঠি—যা অনেকেই মনে করেন ফিলিপ ফ্রান্সিস লিখতেন ছদ্মনামে রাজাদের ঘরের কেচ্ছা নিয়ে তার প্রকাশকের কাছে বিশ হাজার টাকার বেশী জামিন দাবী করা হয় নি। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

কিন্তু হেস্টিংস হিকির ওপর খেপেই বা গেলেন কেন? ঐ যে বলা হল, বড় ঘরের কেচ্ছা। হিকি তাঁর কাগজে একটা কল্পিত কথোপকথন লিখেছিলেন। এক চাকুরী-খোয়া সিবিলিয়ান তাঁর বন্ধুকে জিগেস করলে, হ্যাঁ হে, একটা মোটা মাইনে চাকরী পাবার উপায় কি বলত? বন্ধু জবাব দিলে, হয় মেরিএন আলিপুরীর শরণাপন্ন হও, না হয়ত পুলবন্দী জজের কাছে তোমার আত্মবিক্রয় করে দাও। বলা বাহুল্য, মেরিএন আলিপুরী হেস্টিংসের সেই জাহাজের প্রণয়িনী। আর পুলবন্দী জজ—ইলাইজা ইম্পে। হেস্টিংসের অনুকূল্যে তিনি সেকালের ব্রিজ বা পুল মেরামতের সব কয়টি কন্ট্রাক্ট জোগাড় করে টাকার আণ্ডিল কমিয়ে ছিলেন। এবং সেকালের খবর যতদূর জানা যায় হিকির অভিযোগ, আর যাই হোক মিথ্যা নয়! আর তাই বুঝি রাগটা এত প্রচণ্ড। শুধু হেস্টিংসেরই নয়, ইম্পেরও। এবং তাই এই সাক্রোশ আক্রমণ!

নয়ত হিকির উনিশ মাসের জেল আর আড়াই হাজার টাকার জরিমানা হয় কেন? অবশ্য এই সব মামলা দায়ের করার আসল উদ্দেশ্য, হিকির কাগজটা বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু অত সহজে হার মানবার বান্দা নন হিকি। জেলে বসেই তিনি কাগজ চালাতে লাগলেন। এবং তাঁর এই দুর্দমনীয় সাহস 'হিস বোল্ড ফ্রন্ট সীমস টু হ্যাভ এনলিস্টেড মাচ সিমপ্যাথি ইন দি কমিউনিটি—ইংরেজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিল। এবং এটাই বোধ হয় শাসক শ্রেণীকে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। নয়ত মার্চ মাসে কোর্টের আর এক রায়ে হিকির বেঙ্গল গেজেটের সব টাইপ এবং ছাপার যন্ত্রাদি সব বাজেয়াপ্ত করা হল কেন? মাত্র বছর তিনেক এই রকম দুর্দৈবের মধ্যে কলকাতার প্রথম সাপ্তাহিকের [illegible]নে যবনিকা নেমে এল!

কিন্তু সম্পাদকের কারাবাস তখনও চলছে। অসভ্য এক দঙ্গল চোর-ছ্যাঁচোর গাঁটকাটার মধ্যে বিশ্রী চিৎকার, নোংরা গালিগালাজ আরও জঘন্য পরিবেশের মধ্যে কাটতে লাগল হিকির কারাবাসের কাল। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল হিকির পরিবারের ভরনপোষণ। সে-ত বড় কম নয়—বারটি পেট। তাঁর সঞ্চয়ের তহবিল আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে গেল। বাড়তে লাগল পাওনাদারের ভিড়। অনাহারে অসহায় পরিবারের দুঃখ দেখে বাড়তে লাগল হিকির ক্ষোভ। কিন্তু তখনও আশা ছাড়েন নি তিনি। ভাবছেন : 'এখনও যদি ছাড়া পাই, আবার আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব। সব ঋণ শোধ করে ইংলণ্ডে ফিরে যাব হাজার ছয়েক পাউন্ড হাতে করে যাতে আমার বার্ধক্যের দিনগুলি স্বাধীন ও মুক্ত দেশে কাটে। সেখানে বাগানের মাঝে ছোট্ট একটা বাড়ীতে আমি থাকব—ভরত পাখির গানে আমার ঘুম ভাঙবে, নিজের হাতে বুনব মটর শুঁটি, বরবটি, মরসুম অনুযায়ী পুতব গাছ, কলম বানাব এবং সকল মানুষের সঙ্গে শান্তিতে কাটবে আমার দিনগুলি!'

সবই আশা। সাধারণ মানুষের চিরকালের আশা। সোনার স্বপ্নের সাধ। পৃথিবীতে কবে আর ঝরে। কিন্তু সে সাধ কি পূর্ণ হয়েছিল হিকির? কে বলতে পারে? বাস্টীড সাহেব লিখেছেন, 'বেঙ্গল অবিটুয়ারি' শোকগ্রন্থে তাঁর নাম নেই। কাজেই কলকাতার কবরের মাটি তাকে ঢাকা দেয় নি।

দিলেই কি সব শেষ হয়ে যেত? হেস্টিংস হিকির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত হিংস্র ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তবু হিকি মাথা নত করেন নি। তাঁর মত

শুভবিবাহে এই উপহার অনন্য অতুলনীয়...

সারা জীবনের সুখের জন্য উষা সেলাই মেশিন!

শুভ-বিবাহে অন্য কোন উপহারে এমন তৃপ্তি ও উপকার পাওয়া যায়না — সারা জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে একমাত্র উষা সেলাই মেশিন।

উষা সেলাই মেশিন যে কোন গৃহের সাজ-সজ্জার সঙ্গে মানান-সই নানা মনোরম রং ও মডেলে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি মেশিন হাতে, পায়ে কি বা ইলেকট্রিকে চলে এবং প্রত্যেকটি মেশিনের জন্য ভারতের সর্বত্র রয়েছে বিক্রয়োত্তর সার্ভিস ব্যবস্থা। উষা মেশিন চালানো খুব সহজ — এর সাহায্যে নব বধূকে বাড়ীতে সেলাইয়ের আনন্দ ও উপকারিতা উপলব্ধি করার সুযোগ দিন। আজই একটি উষা সেলাই মেশিন কিনে নিন।

কেনা ভাল সবার ভাল উষা

Grant. 242.72
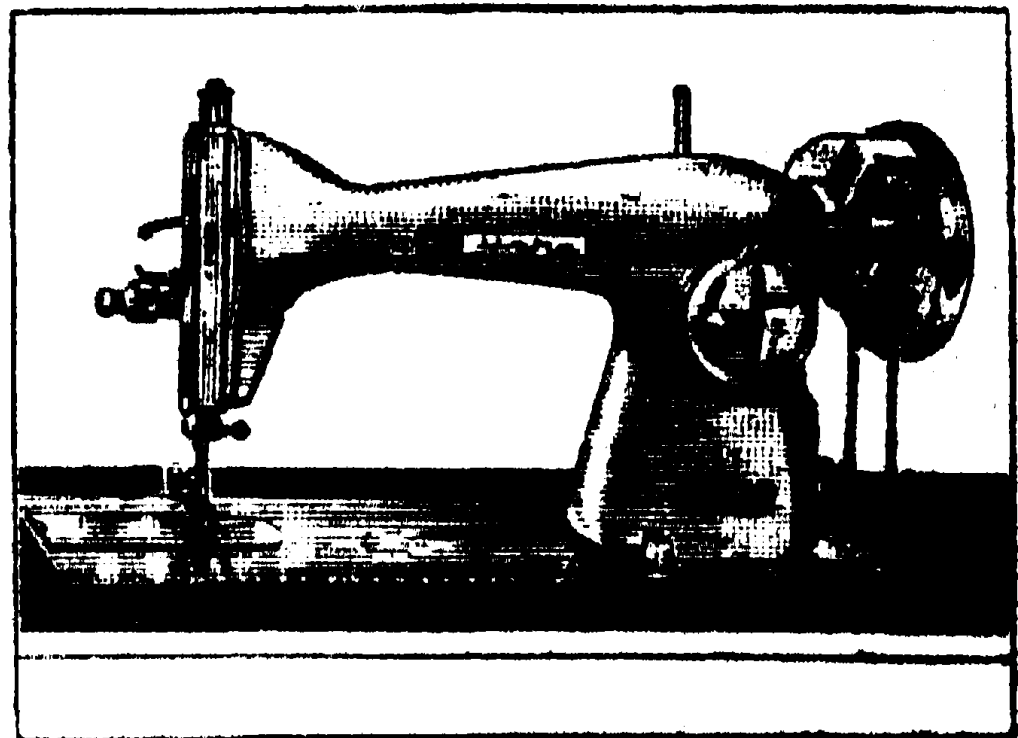
কল্পনাতেই থাক, তিনি স্বৈরাচারী রাজ-পুরুষদের সঙ্গে লড়ায়ে হার মানেন নি। তাঁর পক্ষে এদের আনুকূল্য কেনা অসম্ভব ছিল না, বরঞ্চ অত্যন্ত সহজই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই কাজ হিকি করেন নি।

সেই সহজ কাজ করেন নি উইলিঅম ডুয়েনও। তাঁর কাগজের নাম 'ইণ্ডিয়ান ওয়ারল্ড'' তিনিও ঠিক সরকারের মনোমত খবর পরিবেশন করার কাজটাকেই সাংবাদিক ধর্ম বলে মনে করতেন না কাজেই ঠোকা-ঠুকি লাগল। এই নিগ্রহের নায়ক ভারত-বর্ষের আর এক গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর। ভদ্রলোক নাকি কবি ছিলেন। তা থাকুন, কিন্তু সেদিন লাটবাড়ীতে যে কাণ্ডটা করলেন, কাঠখোট্টা গদ্যের লোকও সে কাজ করতে লজ্জা পেত!

কি ব্যাপার না লাটবাড়ীতে সেদিন এক অতিথি এলেন। কোন বাঙালী নয়। সাহেব। কাগজের সম্পাদক। যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আসা হয়েছিল। কিন্তু লাটবাড়ীর অতিথি ভবনে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এলেন, লাটবাহাদুর বা তাঁর এডিকং ত দূরের কথা—সিপাই। শোর তাঁর বিরুদ্ধে সিপাই লেলিয়ে দিলেন! খাস ইংলিস ভদ্রতা! তার পরই নিগৃহীত ডুয়েনের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেই বোধ হয় এলেন বড়লাটের দবীর খাস কাপ্তেন কলিনস। সে ভদ্রলোক ত যা-নয়-তাই গালিগালাজ করতে শুরু করলেন সম্পাদককে। এবং এক সময়ে লাট-বাড়ীর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল কোর্টের পেয়াদা পুলিশ। ডুয়েনকে জেলে নিয়ে গেল, অবশ্যই মারতে মারতে। অবশ্য আজকের মত বেটন দিয়ে না চড়চাপড়, সেকথা বলা শক্ত! অপরাধ—আসল অপরাধ কি? সরকারী কার্যকাণ্ডের অবাধ নিন্দা!

অবশ্য সেদিনের বিস্ফোরণের একটা প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। এবং তাতে ডুয়েন বাস্তবিকই অপরাধী। লর্ড কর্ণওয়ালিশের মৃত্যুর গুজব তাঁর কাগজেও ছাপা হয়েছিল। তবে ডুয়েন হিকির চেয়ে অনেক নরম ধাতের লোক। ভুলটা করে ফেলেই তিনি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বুঝতে কষ্ট হয় নি যে গতিক সুবিধের নয়। এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি কলকাতা থেকে কেটে পড়বার তাল খুঁজছিলেন। কি দরকার বাপু ঝামেলায়। এমন কি বিলেত যাবার জাহাজে টিকিট কেটেও ফেলেছিলেন। তবে পয়লা জানুআরির আগে আর টিকিট পাওয়া গেল না। সতেরশ' প'চানব্বই।

কিন্তু সরকারী মহল অত সহজে ছেড়ে দেবে নাকি? কবি বলেই কিনা জানি না, স্যার জন শোর একটি চমৎকার চক্রান্ত করলেন। শীতের সকাল। কলকাতায় বেশ মেজাজী শীত। লাটবাহাদুর উইলিঅম ডুয়েনকে একটু প্রাতর্ভোজনের নেমন্তন্ন করে ফেললেন। লাটভবনে একটা ইংরিজি কাগজের সম্পাদকের নেমতন্ন, এ ত আর ছাই নতুন কথা নয়। এতে সন্দেহের কি

তবে ডুয়েনের ভোগান্তি অনেক কম। কেননা, তাঁর জাহাজের টিকেটে ঠিকই রওনা হয়ে গেলেন তিনি। কেবল মাঝের কটা দিন হাজতের একটু, যা নরক যন্ত্রণা। সে ব্যাপারটায় হিকির আমল থেকে যে বড় একটা পরিবর্তন হয়েছিল, তা ত আর মনে হয় না।

কিন্তু এসব কাহিনীতে বাঙালী এখনও আসে নি। এগুলি সাহেব বনাম সাহেবের গল্প। সে সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প এবং সেখানেও রগড় বড় কম নয়। এই ইংলিশম্যান কাগজের ব্যাপারটাই বলা যাক। এই কাগজেরই প্রবর্তক-সম্পাদক জোয়াচিম হেওয়ার্ড স্টেকলার। ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল এ'রই অফিসে কাজ করেছিলেন। স্টোকলার দ্বারকানাথ আর রামমোহনের কল্যাণে কাগজ ত বার করলেন। কিন্তু সাংবাদিক দরকার। এই কাজটা অনেকটা একালের 'সাব-এডিটারে'র চাকরীর মত। খোঁজ-খোঁজ। অচিরে স্টোকলার এক ব্রিফলেস ব্যারিস্টারকে পাকড়াও করলেন। নাম চারলস থ্যাকারে। ভদ্রলোকের বেশ কলমের জোর। কিন্তু হলে হবে কি, জাগরণের সব কয়টি মুহূর্তেই তিনি দেবী সুরেশ্বরীর সেবায় মত্ত। ব্রিফের কচকচি তাঁর ভালো লাগবে কেন? 'হরকরা' তাঁর সম্বন্ধে লিখেছে, 'হি ডেস-পাইসড ব্রিফস এণ্ড এডোরড ব্র্যাণ্ডি'—মক্কেল মসুবিদা ঘৃণা আর ব্র্যাণ্ডিকে স্তুতি করতেন তিনি। সে যাই হোক—তাঁকেই পাকড়াও করলেন স্টোকলার। প্রাত্যহিক রচনার জন্য ঠিক হল এক বোতল ক্লারেট আর নগদ দশটা টাকা। প্রত্যহই এগারটা নাগাদ ইংলিশম্যান কাগজের অফিসে পা দিতেন। তখনই অবশ্য বেশ তরল অবস্থা। স্টোকলার তাঁকে কাগজ কলম আর মদের বোতল দিয়ে একটা ঘরে বসিয়ে দিতেন। একটা নাগাদ লেখা বেরিয়ে আসত, সাহেব বেরিয়ে আসত, কেবল শূন্য বোতল আর দোয়াত-কলমটা টেবিলের ওপরে পড়ে থাকত! স্টোকলার থ্যাকারের হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিতেন।

আর থ্যাকারের সেই সব রচনায় থাকত সেকালের বড় বড় সাহেব এজেন্সীদের হাঁড়ির খবর। হাটে হাঁড়ি ফাটিয়ে সাহেব তাঁর তীক্ষ্ণ কলমে সাহেবদের মুণ্ডপাত করতেন। হরকারুর মালিকদের প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা দেনা ছিল আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর কাছে। কাজেই আলেকজাণ্ডার-দের নানা নোংরামির খবর বলার সাহস কোথায় তাঁর? ম্যাকিনটোশ কোম্পানী চালাত 'ইণ্ডিয়া গেজেট'। কাজেই তারও মুখ বন্ধ। কোরিয়ারের সম্পাদক জরজ প্রিনসেপ ছিলেন পামার কোম্পানীর এক-কালের অংশীদার। কাজেই তাঁর কাগজেও নিমকহারামি করে পামারদের নিন্দা—নৈব, নৈবচ।

কিন্তু স্টোকলার কারও ভৃত্য নয়। মনের সুখে সুদে-আসলে সেই সব কেচ্ছা তাঁর কাগজে ছাপতে লাগলেন। থ্যাকারের

হয়ে উঠতে লাগল। তবে তিনি সেখানেই থামলেন না। তিনি ত আইনের লোক। কোর্ট-কাছারীর নানা 'ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টোরি' তাঁর অজানা নয়। কলকাতার স্মল কজেস কোর্টের জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের তিনি এক হাত নিতে লাগলেন। তাঁদের নানা রায়ের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি সাধারণের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। আক্রমণ করতে লাগলেন নির্মমভাবে। তিন-চারজন জজ ত এই সব খোঁচার ঠেলায় চাকরীই ছেড়ে দিয়েছিলেন নাকি শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এত একেবারে মৌচাকে ঢিল! এই নিয়ে নানা হৈ-চৈ। কোন পক্ষই বড় কম নয়, না কোধপানী, না জুডিসিয়ারি। তবে ভাগ্যি রক্ষে, স্টোকলার সাহেবই বেশী দিন রইলেন না। তিনি ইনসলভেন্সী ফাইল করে বেঁচে গেলেন। থ্যাকারের যে কি হল, তার কোন হদিশই মেলে না!

তবে সাহেব বনাম সাহেবের লড়াই-এর আর এক নায়ক বাকিংহাম সাহেব। চীফ সেক্রেটারী বেইলী লিখলেন—সাহেব, যদি এমনিভাবে চল, অর্থাৎ এমনি লেখা-লিখি কর তোমার 'ক্যালকাটা জারনালে', তোমার ভারতবর্ষে থাকার লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। বাকিংহামের কলমটা বড় বেয়াড়া। লাটসাহেবকে মান্য করে চলা তার ধাতে নেই। কাজেই সাদা চামড়া হয়েও রেহাই পেলে না সাহেব। 'পারসনা নন গ্রাটা' করে তাঁকে একদিন বিলেত যাবার জাহাজে তুলে দিয়ে কোম্পানীর কলকাতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে!

যে যাই বলুক তবে কিনা, এ[illegible] বীরত্ব হরিশ মুখুজ্জের কাছে কিছুই নয়। হরিশ মুখুজ্জে শুধু 'হিন্দু প্যাট্রিঅট' চালাতেন না, তিনিই একজন আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু প্যাট্রিঅট। নয়ত কোথায় কোন নদীয়া জেলার বাগদা থানার খাঁপুর গ্রামের আমির মল্লিক প্ল্যান্টার লারমুরের অত্যাচারে শেষ হয়ে গেল, ভবারপুরের গনি দফাদারকে কুঠির লেঠেলরা ধরে নিয়ে গিয়ে পেষাই করল তা নিয়ে মিলিটারী অডিটার জেনারেল অফিসের বাঙ্গালী কর্মচারীর মাথাব্যথা কেন? হরমনি দাসীকে নীলকর সাহেব বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসে বলাৎকার করেছিল। তার হয়ে কলম ধরেছিল হরিশ। সাহেব চব্বিশ পরগণার সদর আমীরের আদালতে দশ হাজার টাকার মানহানির মামলা আনল। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রমাণ করা গেল না হরিশের অভিযোগ। যদিও লং প্রমুখ মিশনারী সাহেবরাও এই অভিযোগ এনেছিলেন—অন্ততঃ 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ত তাই বলছেন।

এই দুর্যোগের দিনে, হরিশ মুখুজ্জের দেহান্ত হল। রোগ—ক্ষয়কাশ। রমাপ্রসাদ রায় তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে নিয়ে এসে রাখলেন। ডাকতার গুডিভ তাঁর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু না। 'অসময়ে হরিশ মল'। ইংরেজরাই বলে, মৃতের সঙ্গে

করেও। তাই নীলকর সাহেব ভবানীপুরের হরিশ মুখুজ্জের বাড়ী ক্রোক করে তার ডিক্রির টাকা আদায় করতে চাইলেন।

হরিশের লড়াই সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু বাঙ্গালী বনাম বাঙ্গালীর লড়াইও কম চমকপ্রদ নয়। দেখা যায় বাংলা কাগজের সম্পাদক-সাংবাদিকদেরও এই সব অত্যাচারের জ্বালা বড় কম সইতে হয় নি। তবে সে নাটকে কুশী-লবের পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজ ছেড়ে খাস বাঙালীরাই তখন বিরুদ্ধ পক্ষ। এবং সম্পাদকদের প্রভূত বিত্তশালী রাজা-রাজড়ার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হয়েছে সম্মুখ সমরে।

এবং সে কাহিনী শুনতে হলে প্রায় শ' দেড়েক বছর আগেকার কলকাতার বিস্তৃত রাজপথে চলে যাই আসুন। ছাতুবাবুর বাড়ী থেকে তখন একটা কাগজ বেরোত—নাম 'সম্বাদ ভাস্কর'। কাগজটা সাপ্তাহিক। বেরোত প্রতি মঙ্গলবার। ভাস্কর যন্ত্রে ছাপা। সবশুদ্ধ ছাপা হত আজকে শুনলে হাসবেন—একশ সত্তরখানা। সেকালের হিসেবে এটা কিন্তু কিছু কম নয়। কেননা, সেকালের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা—শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' ছাপা হত আড়াইশো কপি। ঈশ্বর গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকর'ও ছাপা হত একশ সত্তরখানার মত, রামগোপাল ঘোষের 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ঐ একশ সত্তর। ভবানীচরণের 'চন্দ্রিকা'—একশ কুড়ি। গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের 'রসরাজ' সে সময়ের বেশ মুখরোচক পত্রিকা 'পপুলার'ও। ছাপা হত দুশ কুড়ি খানা মাত্র।

এখন যে কথা হচ্ছিল। জানুআরি মাস। শীতের সকাল। সিমলের কার্যালয় থেকে যথানিয়মে বেরিয়ে বাড়ী যাচ্ছিলেন ভাস্করের সম্পাদক। হঠাৎ হৈহৈ করে এক দল সশস্ত্র লোক তাঁকে ঘিরে ফেললে। এবং হতবুদ্ধি সম্পাদকের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। সে কি বেধড়ক মার। এক সময়ে সম্পাদকের বেহুঁশ দেহটা রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল। এবং সেই গুণ্ডার দল তাঁর অজ্ঞান দেহটাকে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে কোন এক অনির্দিষ্ট আস্তানার উদ্দেশে রওনা করে দিলে। খবরটা দিয়ে 'সমাচার দর্পণ' তার আঠারই জানুআরির কাগজে লিখেছিল—'দিবা ভাগে কলকাতা শহরের রাস্তার মধ্যেই ঐ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহারপূর্বক ধৃতকরণার্থে ক একজন অস্ত্রধারী লোক পাঠাইলেন তাহাতে ঐ সকল লোক অতি নির্দয়তারূপে তাঁহাকে মারপিট করিয়া লইয়া যায়।'

ওয়েলেসলীর তৈরী কলকাতার লাটভবনে তখন এক ব্যাচেলর গভর্নর লর্ড অকল্যান্ড। যাঁর বোনেদের নাম আজও কলকাতা লোক জেনে-না-জেনে স্মরণ করে কালে-অকালে। ইডেন গার্ডেন যাঁর নামে সেই এমিলি ইডেন এই লর্ড অকল্যান্ডেরই বোন। তখন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের এন্তেকাল হয়েছে, কিন্তু দোস্ত মহম্মদ পর্বের শেষ হয় নি কলকাতায়। এহেন অবস্থায় কলকাতার রাস্তায় 'সম্বাদ ভাস্করে'র বরেণ্য সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের ওপর এই ধরনের জঘন্য অত্যাচার হয়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? হঠাৎ শ্রীনাথ রায়ের ওপর ক্রোধ ভেঙে পড়ল কেন? কারই বা পাকা ধানে মই দিয়েছিলেন তিনি? রাজার নাম রাজনারায়ণ রায়। এবং সে কাহিনীর ওপর থেকে যবনিকা উঠল কলকাতার সিমলের সম্বাদ ভাস্করের অফিসে। সম্পাদকের নামে আসা চিঠির বাণ্ডিলগুলি সেদিন তিনি খুলে পড়ে পড়ে দেখছিলেন। হঠাৎ একটা চিঠিতে তাঁর চোখ জোড়া আটকে গিয়ে থাকবে। সেটাতে রাজা নারায়ণের নানা কীর্তির অভিযোগ। নানা 'কুকর্মে'র কথা লেখা ত রয়েছেই, তাছাড়া লিপিবন্ধ করা তাঁর কয়েকটি অত্যাচারের কাহিনী। রামগোপাল সান্যাল 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র বিবরণ তুলে লিখেছেন যে রায় মশায় তাঁর কাগজে চিঠি ছেপেছিলেন—

> 'alleging that the Raja had brought about a marriage of two Brahmins with low caste women, and giving currency to a rumour that the Rajah's mother once threw him into the river so that there might not be any interruptions of her pleasures.

সমসাময়িক বাঙলা কাগজে অবশ্য রয়েছে, উক্ত রাজা দুইজন ব্রাহ্মণকে ধর্মসভা থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। এছাড়াও আন্দুল নিবাসি একজন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন জোর করে। রাজমাতার সম্বন্ধে অভিযোগের কথা নেই!

কপালের এমনই ফের, সম্পাদকমশাই চিঠিখানা ছেপে দিলেন। তবে কিছু রেখে-ঢেকে। রাজবংশের অতীতের কুকীর্তির কথা না বলে, বর্তমানের অন্যায় আচরণের বিবরণ ছেপে, নিজেও মন্তব্য করলেন:
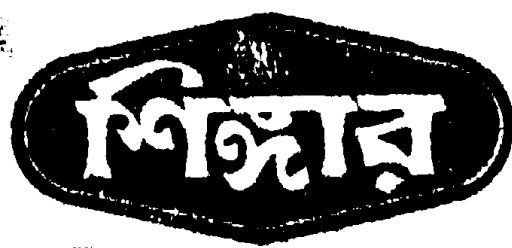
'রাজার এই সব করা অনুচিত।' আর যায় কোথা। রাজামশায় তাঁর একদল হিন্দুস্থানী লাঠিয়ালকে রক্তচক্ষু করে বুঝি বলে থাকবেন, শ্রীনাথকো সির লে আও!

তারপর ত শহর কলকাতার রাস্তায় সেই রুদ্ধশ্বাস নাটক। কিন্তু ধোলাই দেবার পর সেই রাজার লোকেরা কি করল সেই হতভাগ্য সম্পাদককে নিয়ে? কলকাতায় নানা ঝামেলা হতে পারেই বলে রাজপথ থেকে সোজা রাজবাড়ী। রাজামশায় বোধ হয় তখন পাত্রমিত্র সমভিব্যহারে বসে বসে খোস গল্প করছিলেন আর ভুড়ুক ভুড়ুক করে আলবোলা টানছিলেন। সেকালের জমিদার বাড়ীর সংগে সে ছবির বড় একটা তফাৎ নেই। পিছমোড়া করে বাঁধা কলকাতার সম্পাদককে দেখে বাবুর পারিষদগণ হৈ হৈ করে উঠে থাকবে। রাজার মুখখানা ভীমরুলের চাকের মত আরো কালো আরও গম্ভীর হয়ে উঠে থাকবে। রাজামশায় চিৎকার করে থাকবেন—বিছুটি নিয়ে আয়। জলবিছুটি লাগা।

বাবু যত কহে পারিষদগণ কহে তার শতগুণ। পৈশাচিক উল্লাসে রাজার সামনে কলকাতার অপহৃত সম্পাদকের গায়ে জলবিছুটি লাগাতে লাগল রাজার দারোয়ানরা আর যন্ত্রণাকাতর শ্রীনাথ রায় অনুনয় করতে লাগলেন দোহাই রাজামশায় দোহাই।

অন্ততঃ শ্রীনাথ রায়ের নিগ্রহের এমনি একটা বিবরণ দিয়েছিলেন ক্যালকাটা কুরিঅর।' আর সেই সংবাদের উপর ভিত্তি করে 'সমাচার দর্পণ' দীর্ঘতম এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তবে একালের সদাশয় নাগরিকদের মত সেইটুকু করেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেননি কলকাতার সেকালের মানুষেরা। সারা শহর এই নিয়ে বিষম বিক্ষুব্ধ! বিখ্যাত সাহেব ব্যারিস্টার টার্টন—যার সংগে কয়েক বছর পরে রামগোপাল ঘোষের ঘোরতর বাকযুদ্ধ হয়েছিল টাউন হলে হার্ডিঞ্জের মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে—সেই টার্টন শ্রীনাথ রায়ের হয়ে কলকাতার হাইকোর্টে হেবিয়াস কারপাসের আবেদন করলেন। সমাচার দর্পণ লিখলেন:

> 'কোন ব্যক্তি রাজাবাহাদুর খাতির ধারণ করিয়া এইরূপে কোন সম্পাদককে ধৃতকরণ পূর্বক আপন বাটীতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার!'

কিন্তু রাজাবাহাদুর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি। অত সহজে দমবার পাত্র তিনি নন। তাঁকে আদালত হাজির হবার হুকুম দিলে, তাঁর উকিল সওয়াল করলেন, তাঁর বাড়ী আন্দুল, কাজেই কলকাতার এক্তিয়ারের বাইরে। এবং একহাতে যেমন তিনি কোর্টকে রুখলেন, অপর হাতে শ্রীনাথ রায়কে নিয়ে পড়লেন। পরের সপ্তাহে দর্পণে দেখা যাচ্ছে, শ্রীনাথবাবুকে রাজা আন্দুলের বাড়ী থেকে সরিয়ে এনে কলকাতায় গুম করে রেখেছেন। সংবাদটিতে রয়েছে:

> 'কল্য রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়কে পূর্বকার কারাগার হইতে উঠাইয়া লইয়া শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের কলকাতার শহরতলিস্থ উদ্যানবাটীতে কএদ রাখিয়াছে, এবং অদ্য পর্যন্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন। ইহা মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথমে কএদ করেন এবং এইক্ষণে যাঁহার উদ্যানবাটীতে তাঁহার কারাগার হইয়াছে ইঁহারা উভয়েই ধর্মসভার অন্তঃপাতি মহাশয়।'

ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। কেননা কয়দিন পরেই কাগজে লেখা হল: "সীমলা নিবাসি সেই অতি ধনাঢ্য' বাবুর পক্ষ থেকে রাজনারায়ণের বিরুদ্ধে যে নালিশ করা হয়েছে কোর্টে তা' তুলে নেবার জন্যে 'অনেক টাকার লোভ দর্শাইয়া যত্ন করা যাইতেছে।' শুধু তাই নয়। দেখা গেল, শ্রীনাথ রায়ের কপালে অনেক দুঃখ। ছাতুবাবুর বাগানবাড়ীতে তাঁকে রাখার খবরটা বেরিয়ে পড়তেই তাঁকে রাজনারায়ণের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা হয়।

তবে শ্রীনাথের দুঃখের দিনের অবসান হল অবশেষে। কেননা কাগজে দেখা যাচ্ছে, 'সম্বাদপত্র পাঠে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজা রাজনারায়ণের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন।' 'জ্ঞানান্বেষণ'ও জানাচ্ছেন এই মামলার ভাস্করের জয় হয়। তবে একথাও সেকালের কাগজে রয়েছে যে শ্রীনাথ রায় যদিও ছাড়া পান তবুও লোকসমাজে আর দেখা দিতেন না। এটা সমাচার দর্পণের পছন্দ হয়নি। তবে স্টোকলার সাহেবের ইংলিশম্যান কাগজে লিখছেন যে রাজনারায়ণ আইনের প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলেন। শ্রীনাথ রায়কে আটক রাখার জন্যে তাঁর শাস্তি বা হাজার টাকা জরিমানা হয়নি। হয়েছিল আদালত অবমাননার দায়ে। কাজেই রাজার পরাজয় হলেও শ্রীনাথের জয়ের কথা বলা হয় কোনমুখে?

তাছাড়া শ্রীনাথের এই নিগ্রহের ব্যাপারটার মধ্যে বেশ কিছুটা রহস্য আছে। অনেকেই জানেন, সম্বাদ ভাস্করের সম্পাদক হিসেবে যদিও নাম থাকত শ্রীনাথ রায়ের আসলে কাগজ চালাতেন গৌরীশংকর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য। একথা সেকালেও যে জানা ছিল না তা ত নয়। কাজেই রাজার রাগ ত তারই ওপর পড়া উচিত ছিল। ছাড়া, ভাস্করের টাকার জোগান দিতেন আন্দুল নিবাসী ধনাঢ্য মথুরানাথ মল্লিকের ছোট ভাই শ্রীনাথ। রাজা রাজনারায়ণের বাড়ীর জামাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ে উলুখড় শ্রীনাথ নাহক প্রাণটা খোয়ালেন নাকি? দ্বিতীয় রহস্য—ধর্মসভা বনাম ব্রহ্মসভার সংঘর্ষ। রামমোহন বনাম ভবানীচরণ—সেই তোলাপাড়ের আবর্তে কি পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীনাথ? নয়ত ভাস্কর ত বেরোত ছাতুবাবুরই বাড়ী থেকে। তিনি শ্রীনাথের বিরুদ্ধে রাজনারায়ণের পক্ষ নিলেন কেন? নাকি আমোদের দিশে গেল, আঁটি খোসা বাদ গেল—এও সেই বৃত্তান্ত?

এসব প্রশ্নের জবাব পেলে সেকালের কলকাতার বাবুদের কোন্দলের চিত্র আরও উজ্জ্বল রঙে ধরা পড়ত। তবে ছাড়া পাবার পর শ্রীনাথ যে আর কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, অজ্ঞাতবাস করতেন, তার অন্য কারণও থাকতে পারে। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে শ্রীনাথ রায় মারা যান। রাজা রাজনারায়ণের হাতে তাঁর এই বর্বরোচিত নিগ্রহই কি তাঁর এই অপমৃত্যুর কারণ?

সে জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যায়নি। তবে কলকাতার সম্পাদক সাংবাদিক নিগ্রহের যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছিল তার প্রথম কাগজখানি থেকেই, এবং যার নানা কাহিনী সেকালের পীতবর্ণ কাগজের পাতাতেই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বিবর্ণ হরফে, শ্রীনাথ রায়ের অকালমৃত্যু সেই পর্বেরই এক বেদনান্তক অধ্যায়। তবে তার ফলশ্রুতি এই যে কলকাতার কোন সম্পাদক-সাংবাদিকই এই সব অত্যাচার-অনাচার আস্ফালন-হিংসার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, মাথা নত করেননি দুর্দম প্রতিজ্ঞায়, অসাধারণ সাহসে। সংবাদপত্র নিগ্রহের সেই শতাব্দীর কাহিনীর মধ্যে এই সত্যটিও বিস্মৃত হবার নয়।

সবারে আমি নমি

কানন দেবী
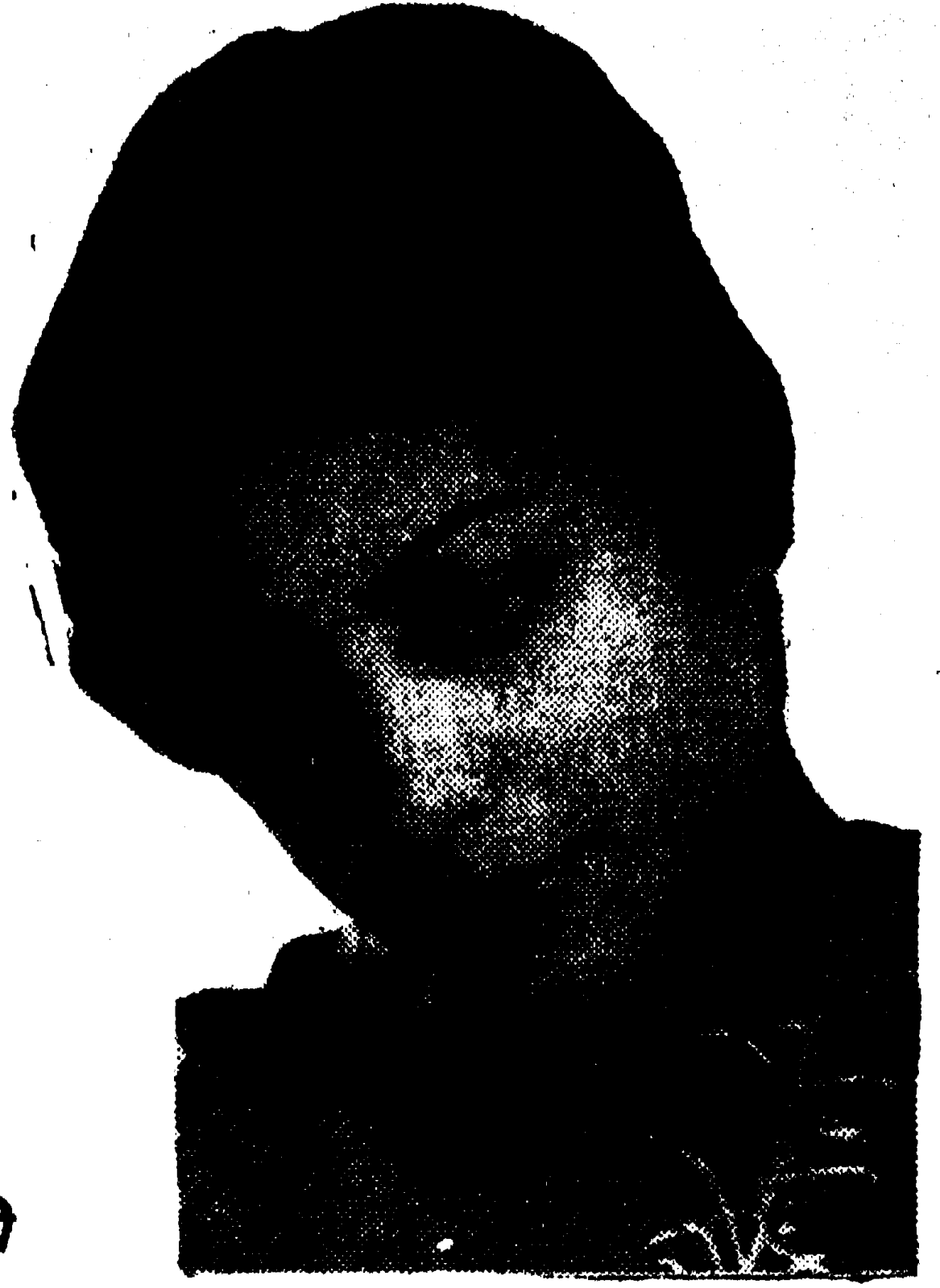
'মুক্তি' ছবিতে কাজ করার সময়ই পঙ্কজ মল্লিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। পঙ্কজবাবু তখন সঙ্গীত-জগতের একজন হিরোবিশেষ। আমি নিজেও ও'র অনুরাগী শ্রোতা ছিলাম। কিন্তু গান শিখতে গিয়ে রীতিমত ভক্ত হয়ে উঠলাম। শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ইনি শুধু শক্তিমান কন্ঠেরই অধিকারী নন। সঙ্গীত-শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করেছেন, তার গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং এ নিয়ে চিন্তাও করেছেন প্রচুর। তাই একাধারে বৈদগ্ধ্যের পরিশীলিত প্রকাশ ও অনুভবের সরসতায় তাঁর গান এমন করে মনকে দুলিয়ে দিতে পারত।

'মুক্তি'র গান শেখানোর জন্য অমর মল্লিক একদিন পঙ্কজবাবুর ঘরে নিয়ে গেলেন। সেইদিনই প্রথম দেখলাম ও'কে। একটা ফরাশের ওপর হার্মোনিয়মের সামনে বসা মানুষটি। পাশেই একরাশ বই এবং নানান রঙ ও সাইজের খাতা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। আমায় দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন 'তোমাকে এমন একখানি গান শেখাবো যা তোমার সারাজীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে।'

পঙ্কজবাবুর গান শেখানোর ভংগীটি ছিল বড় আকর্ষণীয়। সুর ও কথার ব্যঞ্জনা এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন যে মনের প্রতি পরতে যেন গাঁথা হয়ে থাকত। ও'র কাছে আমার প্রথম শেখা গান ছিল 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।' শেখাবার আগে কি দরদ দিয়েই না উনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের দর্শন বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেদিনের প্রত্যেকটি কথা আজও কানে বাজে। উনি বলেছিলেন গাইবার সময় একটা কথা সবসময় মনে রেখ 'সবার রঙ'এ গানটি হোলির গান নয়—পুজোর গান। এখানে এ-গান দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এইটেই বোঝানো যে প্রশান্ত তোমার স্বামী, তার আনন্দেই তোমার আনন্দ, তার কৃতিত্বেই তোমার গৌরব। 'সেই রাতের স্বপন ভাঙা, আমার হৃদয় হোকনা রাঙা' কেন রাঙা হবে? না, তোমার রঙেরই গৌরবে। এ রঙ ত' খেলার রঙ নয়, এ হোলো প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ভাল-বাসার রঙ! সাতটি রঙের কোন রঙটি গানকে রঞ্জিত করেছে, কোন রস গানটিতে প্রধান হয়ে উঠছে সে সম্বন্ধে ভাবতে হবে।'

এমনি করে নানাদিক থেকে নানা অনু-ভবের ছবি মেলে ধরে পঙ্কজবাবু মনকে যেন সুরে বেঁধে দিতেন। সেই মন নিয়ে যা গাইতাম তাই উতরে যেত। এ ছাড়াও উনি সব সময় কানের কাছে মন্ত্রপাঠ করার মতই যেন বলতেন 'মুক্তি' বইতে তোমার মুখেই প্রথম সবাই রবীন্দ্রসংগীত শুনবেন। দেখো কবির গানের মর্যাদা যেন এতটুকুও ম না হয়। দেবতার চরণে অঞ্জলি দেবার সময় যেমন একাগ্রচিত্ত হয়ে বিনত হয়ে মন্ত্রপাঠ করতে হয় ঠিক তেমনি করেই এ গান গাইতে হবে। রবীন্দ্রসংগীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলাম বোধহয় পঙ্কজবাবুর বারংবার উচ্চারিত সাবধানবাণীর দরুণই। আর এই জন্যই এ গান সবাই এমন করে নিতে পেরেছিলেন। নিখুঁত উচ্চারণ, সুরের প্রতিটি শ্রুতির স্পষ্টতা ছাড়াও গলার স্বরের বিভঙ্গ, কোন পর্দায় কি সেন্টিমেন্ট, এসব দিকেও ও'র সদা-সজাগ দৃষ্টি থাকত। পঙ্কজবাবুর শেখানোর পদ্ধতিটাই ছিল খুব গুছানো, নিয়মবদ্ধ। যে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষেই ও'র শিক্ষামতো গেয়ে সাফল্যলাভ করাটা সহজসাধ্য ছিল। পঙ্কজ-বাবু সত্যিকারের শিল্পী ছিলেন। কিন্তু শিল্পবোধ ছাড়াও শিল্পবোধ সম্বন্ধে যে বাস্তববোধ থাকলে একাধারে গান গাওয়া ও শিক্ষাদানের নিশ্চিত সার্থকতায় পৌঁছানো যায় সেই বাস্তববোধ ছিল বলেই পঙ্কজ-বাবুর গাওয়া এবং শেখানো প্রতিটি গানের আবেদন যুগের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। ও'র শেখানোর আন্তরিকতা যেমন গভীর ছিল প্রাণ খুলে শিক্ষার্থীকে প্রশংসার পুরস্কারদানও ছিল তেমনই অকৃপণ। শুনেছি উনি নাকি আমাকে ফার্স্ট সিংগিং স্টার অব নিউথিয়েটার্স" বলেছেন। ও'র মত গুণীর কাছে এতবড় সম্মান পাবার সৌভাগ্য কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। তবু এ প্রসংগে একটা কথা জানানো কর্তব্য বলেই মনে করি।

রাইবাবু বা পঙ্কজবাবু যখন যাঁর কাছেই শিখেছি, নিমেষের মধ্যে সুর তুলে নিয়ে ও'দের যে খুশী করতে পেরেছি তার কারণ আমার নিজের কোনো অসাধারণ প্রতিভা বা কৃতিত্ব নয়। এ ছিলো ওস্তাদ আলারাক্কার কাছে শেখা ও দু'তিন বছর ধরে নিয়মিত রেওয়াজ করা পাল্টা ও সরগমের ফলশ্রুতি। মূল কাঠামো গড়ে দিয়েছিলেন তিনিই। আর সেই কাঠামোর ওপর মাটি

হিন্দী মা চিত্রে জাল মার্চেন্টের সঙ্গে

ধরিয়ে, রঙ ফলিয়ে সুসম্পূর্ণ প্রতিমা গড়ে তুলেছিলেন এ'রা।

'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানটি 'মুক্তি' ছবি সুরু হবার সংগে সংগেই যেন সারা দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে পড়েছিলো। কিন্তু জনপ্রিয়তার বিচারে এ গান শ্রেষ্ঠ হলেও আমার মনের মত গান হয়েছিলো 'তার বিদায় বেলার মালাখানি'। ও গানটা যেন আমায় সব সময় 'হন্ট' করত। আর গাইবার সময় পঙ্কজবাবুর গাইবার ভঙ্গিটি অজ্ঞাতেই অনুসরণ করেছিলাম বলেই হয়ত এ গানের অভিব্যক্তি রসিক শ্রোতার এমন বিপুল অভিনন্দন পেয়েছিলো। এই সময়েই এ সত্যও অনুভব করতে পেরেছিলাম যে রাগ-সংগীতের ভিত্তিতে গলাসাধা থাকলে যে কোনোরকম গানকেই সুরের সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়। অ-শিক্ষিত গলায় গাইতে গেলে অন্ধকারে হাতড়ে কোনো জিনিস খোঁজার মতই লক্ষ্যহীন পরিশ্রমে বহু সময়ের অপচয় ঘটে। ওস্তাদজীর বিদায়বাণী মাঝে মাঝে মনে হ'ত 'বেটী কি জিনিস হারালে একদিন বুঝবে'।—কিন্তু ও-কথা মনে এলেই কোন এক অনামা ভয়ে বুক যেন কেঁপে উঠত। তাই ও চিন্তাটা সব সময় এড়িয়েই চলতে চাইতাম। 'মুক্তি'র পর মিঃ বড়ুয়ারই এক অ্যাসিস্টেন্ট ফণী মজুমদারের পরিচালনায় 'সাথী'-র নায়িকার রোলে অভিনয় করবার জন্য আমন্ত্রিত হলাম। এ ছবিতে আমার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন স্বর্গত কে এল সায়গল। 'সাথী'-ছবিতে কাজ করার দিনগুলি সবদিক থেকেই খুব আনন্দের হয়েছিল।

'সাথী'-র প্রথম অধ্যায়ে বন্যাবিধ্বস্ত গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা দুটি নিরাশ্রয় ছেলেমেয়ের একেবারে শৈশবের কলহ ও প্রীতি মেশানো বন্ধুত্ব—তারপর কৈশোরের মুকুলিত প্রেম এবং কৈশোর ও যৌবনের সন্ধি-লগ্নের অবুঝ মান-অভিমান, ভুল বোঝাবুঝির দ্বন্দ্বভরা অধ্যায় পেরিয়ে মিলনের আনন্দে মধুর পরিসমাপ্তি। নায়ক ভুলুয়ার ভূমিকায় ছিলেন সায়গল, নায়িকা মঞ্জুর ভূমিকায় আমি। কাহিনী, গান সবদিক থেকেই এ ছবির অভিনবত্ব মন টেনেছিল। অভিনয়ের ক্ষেত্রে ফণী মজুমদার মঞ্জুর চরিত্রটি আমায় খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সবকিছুই পুরোপুরি আমারই ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আনন্দ যে কি জিনিস সেই কথাটাই যেন উপলব্ধি করেছিলাম 'সাথী' ছবিতে কাজ করবার সময়। এতদিনের শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতাকে মনের মত করে ফেলে ছড়িয়ে কাজে লাগাতে পেরে কত যে স্বস্তি পেয়েছিলাম বলতে পারি না। সমালোচকবৃন্দ থেকে সুরু করে চেনা-অচেনা সকলে বলেছিলেন আমার 'সাথী'র অভিনয় খুব প্রাণবন্ত হয়েছিল। আর এর জন্য ফণীবাবুর কাছেই আমি সর্বতোভাবে ঋণী। অন্যের ওপর ক্ষমতা খাটাবার পুরোপুরি অধিকার পেয়েও কর্তৃত্ব ফলাবার লোভ সংবরণ করাটা যে কত বড় মহত্বের পরিচয়—আর এ মহত্ব শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কতখানি সহায়ক হতে পারে সে কথা এ ছবিতে কাজ করবার সময় প্রতি পদে পদেই অনুভব করেছি। পরিচালকের বিধি-নিষেধের চাপে সংকুচিত হয়ে থাকাটাই তখনকার দিনের নিত্য-নৈমিত্তক ব্যাপার ছিল। 'সাথী'-তে যেন এ শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচে-ছিলাম। এই বাঁচার আনন্দটাই যেন সারা ছবিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফণীবাবুর বন্ধুর মত সহযোগিতা তাঁর ভেতরের সহজ, সরল নিরহঙ্কার মানুষটির সংগে যেন পরিচয় করিয়ে দিল।

গানের ক্ষেত্রেও 'সাথী' যেন একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এ ছবিরও সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। 'সাথী'—ছবির গানের সুর রচনা নিয়ে রাইবাবু এক নূতন এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। প্রথমত সায়গল ও আমার কণ্ঠে সুবিখ্যাত "বাবুল মেরা" গানটি দিয়ে—রসিক সমাজকে এই সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন যে, প্রয়োগকৌশলের যাদুতে উচ্চাংগ সংগীতও জনপ্রিয় হতে পারে।

তাছাড়া কয়েকটি গানে অর্কেস্ট্রার ছন্দে ফার্স্ট মুভমেন্ট, সেকেন্ড মুভমেন্টের ধাঁচে সুর রচনা করেছেন। অথচ সুর লাগানোর কায়দায় বাঙালীয়ানাকেই এমন পুরো-পুরি ভাবে বজায় রেখেছিলেন যে—এ গানে অর্কেস্ট্রার ছোঁওয়া আছে বলে কারো মনেই হয়নি। শ্রোতারা শুধু মুগ্ধ হয়ে গেছেন সুর-বৈচিত্র্য দেখে। সুররচনার সময় আমরা যে কজন রিহার্শাল রুমে থাকতাম তারাই ফণীবাবুর সংগে তাঁর আলোচনা থেকে এ খবর জেনেছিলাম।

একটি গান ছিল 'তোমারে হারাতে পারি না'। ঐ গানটির সুর লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় সুরের গতি, তালফেরতা, অবশেষে উঁচু সুরের পর্দায় গানটি শেষ করে সুরের মধ্যে একটি অস্থিরতা ও নটাকীয় ঘাত-প্রতিঘাতকে কিভাবে জীবন্ত করে তোলা হয়েছিল। সায়গলের কণ্ঠের প্রতিটি গান ত অবাক হয়ে শোনবার মত হয়েছিল। আজও স্পষ্টই মনে পড়ে সায়-গলের গান 'টেক' করবার সময় আমি মেক-আপ' রুমে থাকলেও ছুটতে গিয়ে সব কাজ ফেলে মুগ্ধ হয়ে ও'র গান শুনতাম। মিষ্টি গলা বলতে যা বোঝায় সায়গলের গলা

সাথী চিত্রে অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী এবং কানন দেবী।

কিন্তু ঠিক তা ছিল না। ভরাট গলা দরদ-ভরা মীড়, অতুলনীয় গাইবার ভঙ্গী যেন চুম্বকের মতই মনকে টানত। মানুষটিও ছিলেন ভারী চমৎকার। অবসর সময়ে বসে, দাঁড়িয়ে থাকলেই এই আত্মভোলা মানুষটিকে গুণগুণ করে সব সময়ে সুর ভাঁজতে দেখা যেত।

সায়গল যেন নিরেট সিমেন্ট-বাঁধানো কঠিন প্রাচীরের বুকে কোথায় কোন ফাঁকে গজিয়ে-ওঠা একগুচ্ছো দুর্বাঘাস। প্রাণ-প্রাচুর্যের সরসতায় ভরপুর, নম্র সরলতার প্রতিমাতুল্য, এমন মধুর মানুষ বড় দুর্লভ।

ওঁর মধ্যেকার যে বস্তুটি ওঁর সংস্পর্শে-আসা যে কোনো মানুষকে একনিমেষেই মুগ্ধ করত সে হচ্ছে বড় থেকে ছোটো অবধি সবার ওপরই সমান দাক্ষিণ্যে ব্যাপ্ত ওঁর আপন-ভোলা অমায়িক উদারতা। স্টুডিওর দরোয়ান, বাগানের মালিকে পর্যন্ত দেখলেই একমুখ হেসে জিজ্ঞেস করতেন 'কেয়া খবর? তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায়?' অতবড় শিল্পী, অত নাম, কিন্তু তার জন্য অহমিকা দূরে থাক, সচেতনতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। উনি যে অত বিখ্যাত, দেখলে কে বলবে? এলোমেলো চুল, একমুখ পান, আধ ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা অতি সাধারণ মানুষটির সঙ্গে যখন মিঃ পি এন বার আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ইনিই কে এল সায়গল? যাঁর গান শুনে কত তন্ময় মুহূর্তে বিস্ময়-বিগলিত হয়েছি? চমক ভাঙে যখন সেই অতি-সাধারণ কিন্তু অসাধারণ মানুষটি শরীরটি সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে একগাল হেসে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। আমার গান ও অভিনয়ের তারিফ করলেন এমনভাবে যেন আমি কত বড় শিল্পী। এত লজ্জা পেয়েছিলাম যে প্রতি-বাদ পর্যন্ত করতে পারিনি।

সায়গলের সঙ্গে কাজ করার সময় লক্ষ্য করেছি, কত সহজে, কেমন হাসিমুখে নিজেকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে উনি অন্যকে প্রধান হয়ে ওঠবার সুযোগ দিতেন। আর নিজের গুণাবলী সম্বন্ধে কি এতটুকুও গোহিরীপনা ছিল?

অন্য সবার সঙ্গে অভিনয় করবার সময় আমার মনের অতলে প্রচ্ছন্ন অহংকার হয়ত না থাকত যে অভিনয়ে আমার চেয়ে বড়ও যদি কেউ থাকে গানে আমি সে শ্রেষ্ঠত্বকে ছাপিয়ে যাব। কিন্তু সায়গলের কাছে ত' আর সে গর্ব চলত না। গানের জন্য ওঁর ভারতজোড়া খ্যাতি। ওস্তাদমহলও গজল গায়ক সায়গলকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। তাই বড় নার্ভাস লেগেছিল 'সাথী'-তে গানের রোলে ওঁর সঙ্গে অভিনয় করবার সময়। কিন্তু কোড়ো হাওয়ার মতই এক ঝাপটায় যেন সকল সঙ্কোচকে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন 'আরে দূরে, ছেড়ে দিন ওসব কুট্, ঝামেলার বাত্। আপনি গান ত'।

গান শুরু হতে না হতেই 'বাহবা, কেয়া বাত'—বলে মাথা নেড়ে যেন উৎসাহের প্লাবন বইয়ে সব ভয়কে ভাসিয়ে দিতেন। নিমেষের মধ্যে যেন প্রেরণার চকিত বিদ্যুতে সারা মন ঝলমলিয়ে উঠত। হঠাৎ অনুভব করতাম গান গাইতে শুধু ভালই লাগছে না, মন চাইছে আরো ভালো, অনেক ভালো করে গাইতে। এ প্রেরণার দাম কি কম-? যে যুগে কঠিন শাসন ও নিয়মের শ্বাস-রোধী বন্ধনে শঙ্কিত, ভীরু মন আত্ম-প্রকাশে সংকুচিত, সে যুগে ভরসার আলোর সকল বাধাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য এই স্নেহমধুর মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় সারা মন নুয়ে থাকত। এ ঋণ কি কোনোদিন শোধ হবার?

তখনকার দিনে গান রেকর্ডিংয়ের সময় একটাই মাইক্রোফোন থাকত। সে কোরাসই হোক আর ডুয়েটই হোক। যাঁরা গাইতেন তাঁদের প্রত্যেকেই মাইকের প্রধান অংশটাই অধিকার করবার চেষ্টা করতেন। আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ও সায়গলের ডুয়েট গান টেকের সময় উনি চট্ করে সরে গিয়ে মাইক্রোফোনের দিকে আমাকেই ঠেলে দিতেন। আমি লজ্জিত হয়ে আপত্তি করলেই পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন 'কোই বাত নেহি, আপনি গান ত!' ক্যামেরার বেলাতেও তাই। 'কোনো শট্ নেবার সময় হয়ত এমনভাবেই দাঁড়াতেন যে কারো নজরেই এলেন না। এ নিয়ে আমি কিছু বলতে গেলেই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে

বিদ্যাপতি চিত্রে পাহাড়ী সান্যাল এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গে

'আরে দূর! দেখার মত জিনিষকে লোকে দেখতে পেলেই হোলো।' বলেই সারা স্টুডিও চমকানো ও'র সেই উচ্চহাসির গমক কি ভোলার? এমন আত্মভোলা মহত্ব আর কারো মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আবার দুরন্ত শিশুর মতন বেপরোয়া সায়গল সত্যিকারের অন্যায় করলেও কেউ ও'র ওপর রাগ করতে পারত না। হয়ত সেট রেডি, প্রধান শট তাঁকে নিয়েই, কিন্তু হিরোর দেখা নেই। অপেক্ষা ও ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন প্যাক-আপ করার কথা ভাবা হচ্ছে, কে একজন হঠাৎ আবিষ্কার করল একদম শেষের ছোট্ট ঘরটায় একটা ভাঙা হারমোনিয়াম নিয়ে সায়গল সাহেব বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ভুলে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন। সেখানে ধাওয়া করে ও'কে ধরে আনতেই 'ওঃহো এখখুনি আসছি'—বলেই এক ছুটে গিয়ে আধা-মেক-আপ সেরে এসে 'রাগ ক'রিস কেন ভাই, এই ত হয়ে গেল'—বলেই এর গালে একটা পান গুঁজে দিয়ে, ওর চিবুক ধরে গজল সুরু করে দিলেন 'মেরে দিলমে দিলকা পেয়ারা'—। তারপর আর এক ছুটে মেক-আপ শেষ করে পাগড়ী পরতে পরতে প্রবেশ। সেট শুধু দোক হেসেই অস্থির। রাগ করবে কার ওপর?

'সাথী'-তে কাজ করবার সময়ই অনেক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আগেই বলেছি বন্যার জলে ভেসে-আসা দু'টি ছোটো ছেলে-মেয়ের কাহিনী নিয়ে 'সাথী' চিত্রের সুরু। জলের ওপর দাঁড়িয়ে স্যুটিং হচ্ছে। হঠাৎ বান এলো। কে কোথায় স্রোতের তোড়ে ছিটকে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে হয়ত কোনো হদিশই মিলল না। তারপর সাঁতারপটু কেউ জলে নেমে ভিজে সপসপে মানুষটাকে তুলে আনল। এভাবে কাজ করার মধ্যে বিপদ [illegible]

ঐ 'সাথী'তেই ঝড়ের একটা সিনে প্রপেলার এনে কৃত্রিম ঝোড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করা হোলো। সেই হাওয়ায় সায়গলের পরচুল কোথায় উড়ে গেল। যখন নজরে পড়ল, সবার সে-কি হাসি। এমনই আনন্দের হাটে কাজ চলেছিল বলেই হয়ত 'সাথী' এত স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর ছবি হতে পেরেছে।

'সাথী' রিলিজড হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে খুব সাড়া পড়ে গেল। সায়গল ও আমার কম্বিনেশন লোকে খুব নিয়েছিল। ১৯৩৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর 'চিত্রা' ও 'নিউ সিনেমা'য় 'সাথী' সুরু হোলো। 'সাথী'রই হিন্দী সংস্করণ 'স্ট্রীট সিঙ্গার'ও সবাই সমান আগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু যে আনন্দ ও নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের পাল তুলে 'সাথী'র কাজ চলেছিল ঠিক তারই বিপরীত এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল 'সাপুড়ে' ছবিতে। 'সাপুড়ে' হোলো 'সাপুড়ে'র দলে পুরুষ-বেশী একটি কিশোরীর ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাজাত বিচিত্র অনুভূতির কাহিনী। ছবিটা অবশ্য আগের ছবিগুলির আশ্চর্য সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই উতরে গিয়েছিল অসম্ভব-ভাবে। কিন্তু তার অন্তরালের সংঘাতের কাহিনীর ভয়াবহতা আজো ভুলতে পারিনি।

সাপুড়ে হচ্ছে সাপ-খোপের ব্যাপার। সাপের ওপর ছোটোবেলা থেকেই আমার এমন একটা ঘৃণা, ভয় (এখনকার ভাষায় এলার্জি) ছিল যে সাপ দেখলেই মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হোতো! আমি প্রথম থেকেই আপত্তি করেছিলাম। এ-রোল অন্য কাউকে দিয়ে করানো হোক। কিন্তু দেবকীবাবুর প্রচণ্ড জেদ আমাকেই এ-রোল করতে হবে। নিউথিয়েটার্সে তখন আমি মাস-মাইনের শিল্পী। কর্তৃপক্ষকে অমান্য করবার জো-টি নেই। [illegible] নামতেই হোলো। 'সাপুড়ে'র বিশেষ করে হিন্দী ভার্সান যতদিন চলেছিল শরীর ও মনের ওপর দিয়ে যে কি অমানুষিক ধকল গেছে ভাবা যায় না।

আমার সাপের ভয় ভাঙাবার জন্য দেবকীবাবু কাঠের রবারের, কাগজের ইত্যাদি অনেক রকমের সাপ তৈরী করে আমার সামনে ধরতেন। কখনও বা গায়ের ওপর ছুঁড়ে দেবারও ভঙ্গি করতেন। কিন্তু সাপের কল্পনাও যে সহ্য করতে পারে না তার কাছে রবার অথবা কাগজে কিছুই সুবিধা হোতো না। সাপের আকৃতি দেখলেই আমি সারা স্টুডিওময় ভয়ে ছুটে বেড়াতাম, আর আমার পিছু পিছু ঐ ধরণের সাপ হাতে ছুটতেন দেবকীবাবু। কতবার আছাড় খেয়ে পড়ে যেতাম। হাত-পা, কেটে যেত, পা মচকে ফুলে যেত। তবু ছাড়ান নেই। আজো বেদনা বাজে এই ভেবে যে একটা অল্পবয়সী, নিরীহ মেয়ের ওপর এটা ত এক ধরনের অত্যাচারই। কিন্তু সারা স্টুডিওতে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার অথবা আমাকে বদলে অন্য কাউকে এ ভূমিকায় নামাবার জন্য প্রস্তাব অথবা অনুরোধ করার মতও কেউ ছিল না। এমনই অসহায় ছিলাম আমরা সে যুগের নায়িকারা।

হিন্দী সংস্করণের সময় বাংলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর ভূমিকায় ছিলেন এক অবাঙালী শিল্পী। যেমন তার দৈত্যের মত বিরাট চেহারা, তেমনই কদর্য অভ্যাস। আমার বুকাঁধ ধরে ঝাঁকুনী দিয়ে সাপের মন্ত্র পড়া তার অভিনয়েরই অঙ্গ ছিল। অতবড় মানুষটার এই ঝাঁকুনী সহ্য করাটা এক ক্ষীণকায়া কিশোরীর পক্ষে কতটা যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আর কাঁধ বা বাহু যেখানেই তাঁর শ্রীহস্তের স্পর্শ পড়ত সেখানেই কালসিটে হয়ে যেত। এতেও কি নিস্তার আছে? হিরোইনের কাছে এসে কথা বলার সময় তার মুখ থেকে কফপক্ক সেরখানেক থুথু ছিটকে এসে আমার মুখে পড়ত। টেকের পর বমি করে ফেলতাম। সারাদিন ধরে গা ঘিনঘিন করত। খেতে পারতাম না। এইরকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে করতে 'সাপুড়ে'র কাজ করতে হয়েছে।

আমি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভি-যোগের উদ্দেশ্যে এই ঘটনার অবতারণা করছি না। আগেকার দিনের শিল্পীদের কত অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হোতো, সেই কথাটা জানাবার জন্যই অতীতের পর্দাটা তুলে ধরলাম। আজকের চিত্রশিল্পীদের সম্মানে আমি আনন্দিত এই কারণে যে বাংলা সিনেমার প্রথম অধ্যায়ে আমাদের যে দুঃখ ও অসম্মানের মূল্য দিতে হয়েছে তা ব্যর্থ হয়নি। এবং এ সার্থকতা আমাদের জীবনেই দেখে যেতে পারলাম। আরো খুশী হব শিল্পীরা যদি নিজেদের জীবন, কাজ চিন্তা ও আচরণে শিল্পরসিকদের দেওয়া এই সম্মানের মর্যাদা রাখতে পারেন। আমি আশা করব তাঁরা তা রাখবেন। (চলবে)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। উনত্রিশ ।।
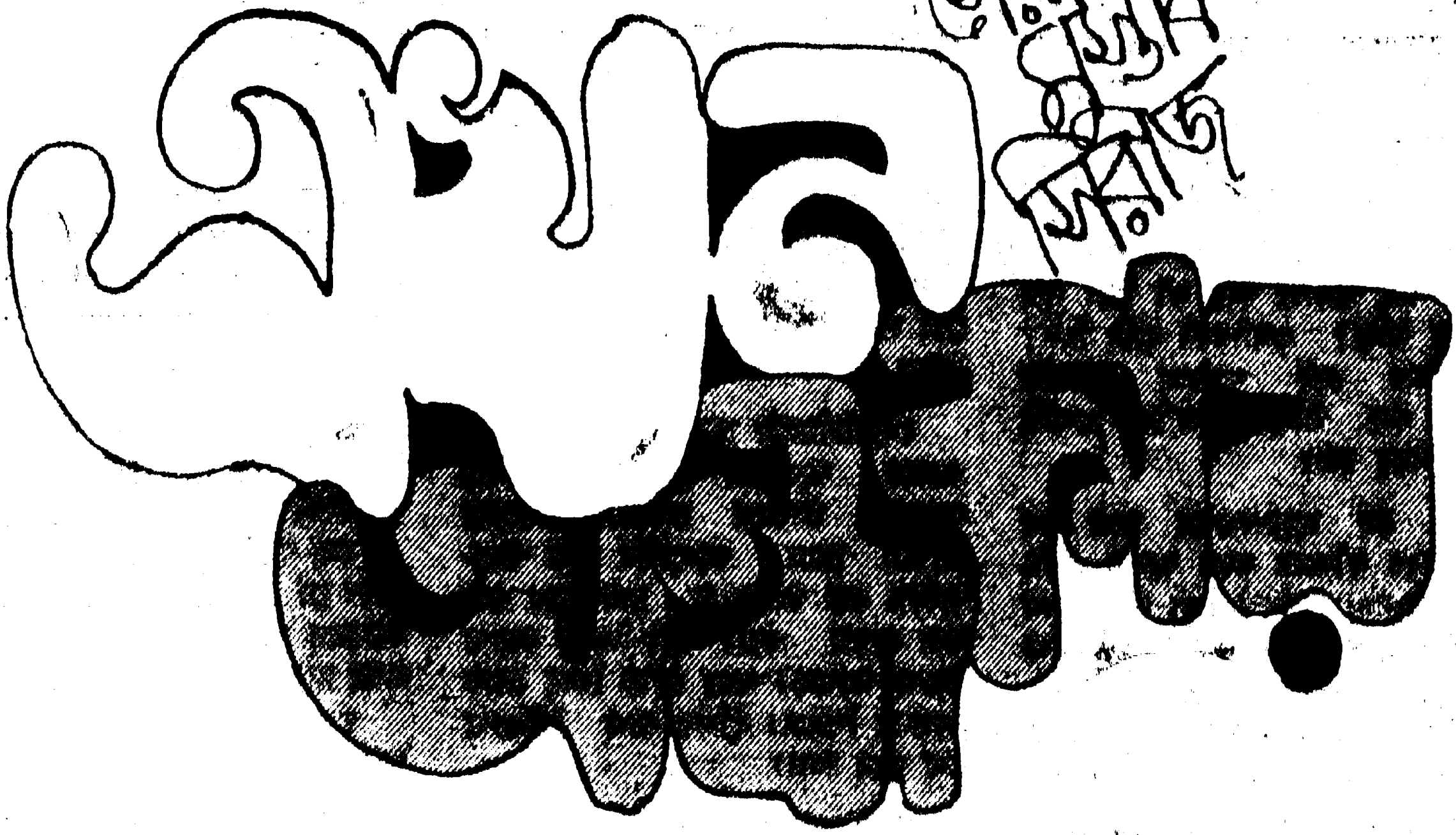
পাণ্ডেজীর ঘরে ঘুম ভেঙে গেল চন্দনের। একটা স্বপ্ন দেখছিল—অদ্ভুত। মানবেন্দ্র ব্যাপারীর শালার বিয়েতে শ্মশানের পথে তার গাড়ি চলেছে। কী ধুলো, কী ধুলো! টোপর পরে ব্রজগোপাল গাড়ি চালাচ্ছে। কী কাণ্ড! ব্রজই বর! তার গাড়ি চালাতে নেই। চন্দন স্টিয়ারিং ধরেছে কখন। আকাশপাতাল ধুলোর-ধুলোয় ঢাকা। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা কোথায় চলেছে তার মধ্যে, বোঝা যায় না। শ্বাসকষ্টে ছটফট করে চন্দন ভয়ার্ত স্বরে ব্রজকে ডাকতে চেষ্টা করছিল। ব্রজর মাথায় টোপর। ব্রজ নিষ্ঠুর মুখে তাকিয়ে আছে। চন্দন গোঙাচ্ছিল—ব্রজদা, ব্রজদা, ব্রজদা!

চোখ খুলে চন্দন দেখল, সে পাণ্ডেজীর বিছানায় শুয়ে আছে। ঘামে বালিশ ভিজে গেছে। তোয়ালেটা পড়ে গেছে নিচে। সে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ধবধবে সিলিংটার দিকে। মনে পড়ল, ব্রজ মরে গেছে। গাড়িটা পুড়ে গেছে। সবকিছু জুড়ে একটা বিকট শূন্যতা টের পেল সে। উদ্দেশ্যহীন মনে হল সবকিছু। বাইরের সব আলোও কখন ধূসরতম হয়ে উঠেছে। জানালার দিকে শূন্যদৃষ্টে তাকাল সে।

আজও কি আবার ঝড় উঠেছে? দরজাটা ভেজিয়ে রেখেছিল, খুলে গেছে। জানালাগুলো ঝাপটে বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলে যাচ্ছে। বাইরে আকাশটা কালো হয়ে গেছে। বটগাছের মাথা তোলপাড় হচ্ছে। দূরে নারকেল গাছগুলো প্রচণ্ড দুলছে। কালো আকাশের গায়ে দুলন্ত নারকেল গাছগুলো যেন ঝড়েরই প্রতীক হয়ে উঠেছে—ঝাকড়াঝাকড়া চুল নাড়া দিয়ে যেন জেগে-ওঠা পাগলের সন্ন্যাসী যেন।

আবছা শোনা গেল, বাইরে কোথায় খুব গোলমাল হচ্ছে। মিছিল নাকি? হঠাৎ মনে পড়ল ব্রজর লাসটা মর্গ থেকে ফিরে আসার কথা ছিল। এরই মধ্যে এসে গেল? শংকর বলছিল, সব ড্রাইভার আর স্থানীয় লোকেরা মিলে ব্রজকে বহরমপুর ঘাটে পোড়াতে যাবে। কয়েকটা ট্রাকও যোগাড় করেছে ওরা।

চন্দন উঠল। চটিটা পায়ে গলিয়ে খোলা ছাদে এসে দাঁড়াল। ঘন চাপ চাপ কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। ঝড় আসছে। তারই মধ্যে চৌমাথায় ভিড়ে গিজগিজ করছে। তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সামনেরটায় সম্ভবত ব্রজর লাসটা রয়েছে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। একটা ট্রাকে খোল-করতাল বাজিয়ে কারা ঝড়ের মধ্যেই কীর্তন গাইছে। এই ঝড়ের সন্ধ্যায় ব্রজকে নিয়ে ওরা গঙ্গা দিতে চলেছে। চারদিক থেকে মানুষ আসার বিরাম নেই এ-দুর্যোগেও। ব্রজকে এত ভালবাসত ওরা! একজন মাতাল সামান্য মানুষ, পাগলাটে একটা ড্রাইভার—তার জন্যে এত সব শোকের আয়োজন। চন্দনের চোখ ভিজে এল। মনে মনে অস্ফুট বলল, আমাকে তুমি ক্ষমা করো ব্রজদা। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

ধুলো খড়কুটো শুকনো পাতা নিয়ে ঝড় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্রজর শোকমিছিলের দিকে যেন টানল তাকে। কিন্তু পা ভারি হয়ে এল হঠাৎ। ও-মিছিলে যাবার অধিকার কি তার আছে? ব্রজর বন্ধুরা তার দিকে কী চোখে তাকাবে কে জানে। সে টের পেয়ে গেছে আজ সারাদিনে সবাই ভ্যান গাড়ির ছোটবাবুকে কী ঘৃণা করছে মনে মনে। সবাই ব্রজর মৃত্যুর জন্যে দায়ী করে ফেলেছে তাকে। ভাল করে কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনি। এমনকি হুকসায়েবও তাকে এড়িয়ে থেকেছেন।

এখন সে মিছিলে গিয়ে দাঁড়ালে চার-দিক থেকে আক্রান্ত হবে বোধ্য ক্রুদ্ধ ঘৃণায়। চন্দন একটু ভেবে দেখল। হ্যাঁ, ঘৃণাই বটে। সবার প্রিয় ব্রজগোপালের বউটাকে নষ্ট করেছিল চন্দন—তাই ব্রজ মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছে। চন্দন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার সরলচেতা ড্রাইভার তাকে বিশ্বাস করে বাড়িতে তুলেছিল, সম্মান দিয়েছিল—চন্দন সেই সরলতা আর সম্মানের সুযোগ নিয়েছে। স্বীকার করা যাক, ব্রজর বউটা খারাপ মেয়ে। কিন্তু চন্দনের মতো মানী শিক্ষিত 'ছোটবাবু' মানুষের পক্ষে সেই খারাপ মেয়ের সঙ্গে ঝট করে শুয়েপড়াটা কি উচিত হয়েছিল?

চন্দনের মনে হল, তার সামনে অদৃশ্য দাঁড়িয়ে ওই আয়োজিত শোকমিছিলের প্রতিনিধিরা একটা বোঝাপড়া করছে। সে আড়ষ্টভাবে নিজের দুটি স্বীকারোক্তি করে নিল। মনে মনে বারবার বলল, আমি খুব অন্যায় করেছি। পাপ করেছি। বুঝতে পারছি এ-পাপের কোন ক্ষমা নেই—কারণ, এর ফলেই একটি হাসিখুশি জনপ্রিয় মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সেই প্রথম রাতটার কথা ধরা যাক। যদি সে রানিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিত বিছানা থেকে, যদি তারপর ব্রজর বাড়ি ছেড়ে দিত এবং অন্য কোথাও বাসা নিত, তাহলে এমন করে ব্রজ মরত না। মরে যাওয়া তো খুব সহজ ব্যাপার, ব্রজ অনায়াসে মরে যেতে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে—কিন্তু ওইরকমভাবে মরে

যাওয়া! এক হাত জিভ বেরিয়ে পড়া, ফুলে ওঠা বিকট প্রকাণ্ড দুটো চোখ, ঝুলন্ত দেহ, প্যান্টভর্তি নোংরা পেচ্ছাপ-পায়খানা। কী কষ্ট পেয়ে না ব্রজ মারা গেছে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে যখন গাছের ডাল থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল ব্রজ, তখন সেই ভয়ংকরতম যন্ত্রণার মধ্যে আবার জীবনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠা নিশ্চয় স্বাভাবিক ছিল। গাড়িটা ধূ-ধূ জ্বলে তখন হয়তো পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, সেই ছাই তার শরীরে মেখেছে ব্রজ, তারপর আর কী ছিল তার জীবনের বাকি? কলঙ্কিনী হাসি ছিল? মৌরীগ্রামের সেই পাতানো মা-বাড়ি ছিল? কার জন্যে পুনর্জীবন প্রার্থনা করতে পারে ব্রজ?

না। ব্রজ মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে জৈব বৃত্তির বশে জীবনের জন্যে ব্যাকুল হয়নি সামান্য আলোও অবশিষ্ট ছিল না। সামনে ছিল শুধু অন্ধকার—বিশাল পরিব্যাপ্ত অগাধ অবাধ অন্ধকার।

আর সে অন্ধকারে তাকে ঠেলে ফেলেছিল তার প্রিয় মালিক ছোটবাবুই।

আকাশ তোলপাড় করে পুঞ্জ পুঞ্জ ভয়ঙ্কর মেঘ পৃথিবীর দিকে নেমে এসেছে এবার। হা হা হা হা...শাঁ শাঁ শন শন... ঝড় আছাড় খেয়েছে রূপপুর চটির ওপর। শোকমিছিল একটুও নড়ছে না তবু। ব্রজগোপালের জয়ধ্বনি উঠছে মত্তমাতাল বাতাসে জয়পতাকার মতো।...ব্রজগোপাল অমর রহে!...আমাদের ব্রজদা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!...বোল হরি হরি বোল!...রামনাম সৎ হ্যায়! প্রবল ধ্বনিপুঞ্জের বুদ্বুদ উড়ছে ঝড়ের আকাশে। ট্রাকের ওপর মাতাল ড্রাইভার আর অ্যাসিস্ট্যান্টরা শোক-নৃত্য নাচছে। খোলকরতাল বাজিয়ে কীর্তন চলেছে অন্য ট্রাকে। অদ্ভুত পোষাক-পরা টিঙটিঙে চেহারার কে একজন বুক চাপড়ে কী বলছে। হৃদয় ঠাকুর না? হৃদয়ও শোক করছে। চৌমাথার গোল পার্কটা ঘুরছে মিছিল। প্রথম গাড়িতে ব্রজর লাস সাদা কাপড়ে ঢাকা। এত ফুল ওরা পেল কোথায়? হঠাৎ চমকে উঠল চন্দন। ব্রজর মাথার কাছে ট্রাকের সামনের

ছাদটা ধরে রাধা দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে হকসায়েব।

এ-শোকমিছিলে রাধা আর তার হক-সায়েব বাবাও অনুগামী। চন্দন যাবে না? চন্দন, তুমি যাবে না?...নিজের দিকে তাকাল সে। দেখল, একটা খড়মাটির বিধ্বস্ত পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঝড়-খাওয়া বৃষ্টিভেজা ছেঁড়াখোঁড়া কাক-তাড়ুয়ার মতো চেহারা—যার কোন রক্ত-মাংস নেই, হৃদয় নেই, মগজ নেই। আর সেই সময় বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল।

শোকমিছিলটা চৌমাথা ঘুরে হাই-ওয়েতে পূর্বগামী হয়েছে। দুধারে বাজারের দোকানে দোকানে লোকেরা দাঁড়িয়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে 'ড্যাং-গাড়ি'র এক 'ছোটলোক' ড্রাইভারের শব-যাত্রা দেখছে ওরা। ট্রাক-তিনটে আস্তে আস্তে গড়াচ্ছে। পায়ে হেঁটে কিছু লোক এগোচ্ছে পিছনে। বৃষ্টির শব্দে মিছিলের শব্দ ডুবে গেল।

বৃষ্টি পড়তে লাগল। উদ্দাম বৃষ্টি। পশ্চিম থেকে পূর্বে আরও জোরে ছুটে এল পাগলা ঝড়। দূরে একটা নারকোল গাছের মাথায় আচমকা বাজ পড়ল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। চন্দন তখন সারা মনে ও শরীরের প্রকৃতি করজোড়গত। আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো। সে স্থির দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে। আবার কোথায় বাজ পড়ল। মেঘ ডাকতে লাগল। গাছের ডাল ভেঙে পড়ল।

পান্ডেজী খোলা সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে এলেন।...চন্দনবাবু, চন্দনবাবু!

চন্দন সরে আসছে না দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে, চলে আসুন, চলে আসুন! মেঘ ডাকছে—চন্দনবাবু! বাজ-বিজলী হচ্ছে, চলে আসুন।

চন্দনের চমক ভাঙল এতক্ষণে। সে আস্তে আস্তে এসে ঘরে ঢুকল। পান্ডেজী জানালাগুলো বন্ধ করতে ব্যস্ত হলেন। ঘরের মেঝে ভিজে গেছে। কিছু জিনিসপত্রও ভিজেছে। দরজাটা পূবে—তাই ঝড়জল ঢোকে না। পান্ডেজী হাসতে হাসতে বললেন, আঃ রে! কতো ভিজলেন চন্দনবাবু! অসুখ-বিসুখ হতে পারে। ব্রজগোপালকে ওরা লিয়ে গেল—তাই দেখছিলেন এতক্ষণ? আর বলবেন না চন্দনবাবু, মুল্লুককা যেতনা ড্রাইভার আছে, সব ব্রজর দোস্তইয়ার।...পর-ক্ষণে চাপা গলায় গম্ভীরমুখে বললেন, আমার মানা শুনে বহুৎ ভালো করেছেন। আপনি ইজ্জৎওয়ালা, ওরা সব মাতাল বদ-মাস আদমি—কতো গুন্ডা ভি আছে ওদের দলে—যাক গে, ভালো করেছেন। আমার তো ডর হল, যাই দেখি চন্দনবাবু আবার চলে গেলেন নাকি। আঃ হা! ভিজেছেন কতো! আমি কাপড় দিচ্ছি, বদলে লিন।

পান্ডেজী ব্যস্তভাবে তক্তাপোষের নিচে থেকে একটা সুটকেস টানতে লাগলেন। চন্দন দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ততক্ষণে। আবছা অন্ধকারে ডুবে গেছে রূপপুর চটি। ঘরের ভিতর সব অস্পষ্ট। একটা ধুতি [illegible] করে পান্ডেজী বললেন, বদলে লিন। আমি আলো জ্বেলে দিই। চা করি। বাসরে বাস! আজ সারাদিন যা গেল আমার—বলবেন না। সাইডিং থেকে দু ট্রাক মাল এল খালাস করলুম। তো ফিরতি এক লরী গুড়...হাঃ হাঃ হাঃ! নাহানার ফুরসৎ পাইনি আজ। আপনি নিদ যাচ্ছেন ভেবে এলুম না উপরে। যাকু, চন্দনবাবু শান্তিসে নিদ যাক। বহুৎ পেরেসানি গেছে। হাজার হাজার রূপেয়া আগুনে লোকসান ভি গেছে। তো চন্দনবাবু নিদ যাক। ইনসিওর তো ছিল গাড়িকা—ছিল না?

চন্দন মাথা দোলাল।

তো বাস, ভাববেন না। একটু আরাম হবে। সে কিছু না।...পান্ডেজী কুপির জ্বালাতে ব্যস্ত হলেন।...কাপড় বদলে লিন, ঠান্ডা লেগে যাবে।

চন্দন কাপড়টা হাতে নিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

...তো এক বাত। যেতক্ষন আমার ঘরে আছেন, মাথা খাড়া করে থাকুন। কুছু ডর নেই। আমি শিশিরবাবুকে [illegible] বলেছি, তখন দেখা হল। একটা ট্রাক দরকার [illegible]। তিনি বোম্বাই [illegible] পুশাকিয়া [illegible]। [illegible] আমি আড়ত খুলেছি, চন্দনবাবু। [illegible] হবে? আপনার তো খুব [illegible] জায়গা।

চন্দন পান্ডেজীর প্রথম কথাটায় চমকে উঠেছিল। সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

...তো হাঁ, শিশিরবাবু [illegible] বললেন—চন্দনবাবুর কুছু ডর নেই। [illegible] আমাকে খবর দেবেন।...পান্ডেজী [illegible] চাপিয়ে দিলেন কুকারে।

চন্দন অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, [illegible] ভয় পান্ডেজী?

পান্ডেজী উঠে এসে বিছানায় বসলেন।...যা বলছিলুম, তখন। শালালোক বহুত হারামী আছে তো! আরে, ব্রজগোপাল আপনা জান দিয়েছে, তো তার মালিক কী করবে? শুনলাম, তখনই ওরা আপনাকে খুঁজছিল। বলে কী, চলো—সবলোক আভি চলো, ছোটবাবুর সাথ মোকাবিলা করব। তো ওর মধ্যে ভালমন্দ আদমিও আছে—তারা সব সামাল ছিল। না, আপনি ভাববেন না, চন্দনবাবু। পান্ডের গদীর কাছে আসে তাকত কার?

চন্দন থরথর করে কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে। ওরা কি ব্রজর মৃত্যুর প্রতিশোধ চায়? নাকি ওরা শুধু কিছু কৈফিয়ৎ চায়—কিংবা ক্ষতিপূরণ চায়? ক্ষতিপূরণ কে নেবে? ব্রজর বউতো এখানে নেই। না—টাকা-পয়সা ওরা নেবে না। তাহলে ব্রজকে পোড়ানোর খরচ তখনই দাবী করত।

পান্ডেজী বলল, আঃ হা! কাপড়া বদলে লিন!

নিচ্ছি।...চন্দন শান্তভাবে বলল।...আচ্ছা পান্ডেজী, ওরা কী বলতে চায়?
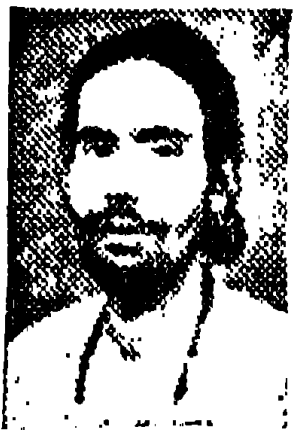
নিজে বুঝে নিন।...পান্ডেজী একটু হাসলেন।...তো বাত হল কী, যো কুছ ধা কার হোয়, তাড়াতাড়ি যো চিজ হোতা চন্দনবাবু। দেরীতে আর তো হোয় না। কেন হোয় না ? কী—আদমির মেজাজ এইরকম আছে। রাগে যা হল, রাগ জুড়িয়ে আর তো হল না। ঘাট থেকে ফিরে আসার পর যে-যার আপনা কামে চলে যাবে, তখন আর মজ কাহা কোথায় তার মালিক। হাঃ হাঃ হাঃ।...বলে সুইচ টিপে আলো জেবলে দিলেন পান্ডেজী।

চন্দন ঠোঁট কামড়ে বলল, আমাকে ওরা মারবে বলছিল ?

পান্ডেজী হন্তদন্ত বললেন, আঃ হা! আপনি ছেড়ে দিন তো ও বাত। ছোটা আদমির ছোটো কথায় কান দিতে নেই। কাপড়া বদলে লিন। হায় রাম !...হঠাৎ পান্ডেজী লাফিয়ে উঠলেন। চায় পাতা খতম! একদম ভুলে গেছি। বিকালে খতম হল। বললুম না, যা দিন গেছে আজ—নাহানের ফুরসুৎ ছিল না! এক মিনিট—নিচে থেকে আনি।...বলে পান্ডেজী মাথায় গামছা চাপিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। বাইরে খোলা সিঁড়িতে হয়তো একটু আছাড় খেলেন—তাই তাঁর কাতরোক্তি শোনা গেল বৃষ্টির মধ্যে।...হায় রাম ! এবং আরও কী সব অস্ফুট কথাবার্তা। বৃষ্টি আর ঝড়ের শব্দে স্পষ্ট বোঝা গেল না।

পরক্ষণে হুড়মুড় করে দুজনে এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে। বৃষ্টিভেজা দুটি মূর্তি একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে চন্দনের মুখোমুখি।

চন্দনের মনে হল, এক্ষুনি প্রচন্ড—ভীষণ চিৎকার করে পান্ডেজীর এই ছোট্ট ছাদের ঘরখানা, বাইরের ওই উত্তরঙ্গ আকাশ আর নূপেপুর চটিতে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ছড়িয়ে দেবে। এই বিস্ফোরণে যে উষ্ণতা থাকার কথা, এবং যে লাভাস্রোত—তা সুখ কিংবা দুঃখের, আনন্দ কিংবা শোকের, চন্দন নিজেও জানে না। এই বিস্ফোরক চিৎকার তার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়ে উঠে আসছিল পলকে-পলকে। কিন্তু তারপর আর শক্তিতে কুলোল না। সুখ কিংবা দুঃখের আগুনে আর পরিণত তাপের ইন্ধন যোগানোর মতো কিছু ছিল না হৃদয়ে কিংবা মনে। সে খুব আস্তে ভাঙা গলায় বলল, রুমা ! এস রুমা...তারপর লতুকে টেনে নিল কাছে। মাথায় হাত রেখে বলল, কেমন আছিস লতু ? চিনতে পারছিস তো ? রুমা, তুমি বসো।

রুমা প্রথম বিস্ময়ের চাপটা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে। বৃজ ড্রাইভারের শোক মিছিল দেখতে দেখতে কখন ঝড় এসে পড়েছিল। তবু মিছিলটা চলে যাওয়া অব্দি সে দাঁড়িয়ে ছিল। শেষে আচমকা টের পেয়েছিল, এই মিছিলের ভিড়ে সে কেবল একজনকেই খুঁজছিল এতক্ষণ। ঠিক তখনই বৃষ্টি এসে গেছে। লতুর হাত ধরে দৌড়ে সে পান্ডেজীর গদীতে চলে এসেছে। চৌমাথা থেকে সামান্য দূর বলে বেশ ভিজে গেছে ততক্ষণে। এসে শোনে, পান্ডেজী ওপরের ঘরে গেছেন। রুমাকে পান্ডেজীর লোকেরা চেনে। বললে

ওপরে আছেন পান্ডেজী। চলে যান না ওখানে। সিঁড়িটা খোলা। ওখানে পান্ডেজীর সংগে দেখা। পান্ডেজী অবাক। কিন্তু তিনিও বলে গেলেন না যে তাঁর ঘরে এখন কে আছে।

রুমা মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথা বলল না। লতু গড়গড় করে বলল, আমাদের ঘরে সাপ ঢুকেছে কাল। কাল এমনি ঝড়জল হচ্ছিল, তখন ঢুকেছে। তাই আমরা ফকিরবাবাকে ডাকতে গিয়েছিলুম—ফকিরবাবা এল না। তাই মাসি বললে, পান্ডেজী বলে দিলে আসবে। আমরা এলুম। তাই না মাসি ?

চন্দন বলল, ইস ! ভীষণ ভিজেছ যে তোমরা ! লতু, এই ধুতিটায় মাথাটা মুছে নাও।

লতু রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, ভ্যাট।

চন্দন একটু হাসল। ...রুমা, কথা বলছ না কেন ?

রুমা মুখ নামিয়ে বলল, কী বলব ?

চন্দন বলল, হঠাৎ তোমার আসা দেখে ভেবেছিলুম—বুঝি বা আমার প্রায়শ্চিত্ত দেখতে এসেছ—হ্যাঁ, আমার যেন মনে হল তুমি এসময় এমনি করে আমার কাছেই এসেছ! এখন জানলুম, তা নয়। পান্ডেজীর কাছে এসে আমার সামনে পড়ে গেছ। খুব খারাপ লাগছে, না রুমা? ঘেন্না হচ্ছে? ঘরের সাপ তাড়াতে এসে আবার একটা সাপের সামনে পড়ে যাওয়া। তোমার দুর্ভাগ্য রুমা !

রুমা বলল, দুর্ভাগ্য তোমারও হতে পারে, ছোটবাবু !

তুমিও আমাকে ছোটবাবু বলছ, রুমা

হ্যাঁ—সবাই বলে, আমি বললে দোষ হবে কেন ?

চন্দন বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, আজ কারোরই কোন দোষ হবে না রুমা। যে যা বলবে, যে যা করবে সব শুনতে হবে—সইতেও হব। এখন আমার প্রায়শ্চিত্তের দিন শুরু হয়ে গেছে।

রুমা মুখ তুলে এবার চোখে চোখে তাকাল।...কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?

পাপের। পাপ ছাড়া কি পুণ্যের প্রায়শ্চিত্ত আছে ?

রুমা আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, হয়তো আছে। আমি অন্তত জানি, কেউ কেউ পুণ্যের দায়েও প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়।

চন্দন আহতস্বরে বলল, তুমি কি তোমার জামাইবাবুর হয়ে খোঁটা দিচ্ছ রুমা ?

রুমার চোখদুটো চকিতে জ্বলে উঠল।...না। তুমি গোঁয়ার—তাই তুমি বোকা। জামাইবাবু কী পুণ্য করেছিল, কে তার প্রায়শ্চিত্ত করছে—সেকথা বলিইনি। তোমার নিজের ঘা থাকতে পারে সেখানে, তাই জ্বলে ওঠ। আমি অন্য কারো কথা বলছি।

কে—কে পুণ্য করেছিল, বলবে রুমা? কার কথা বলছ ?

আমি জানি না।

লতু এতক্ষণ পর্যায়ক্রমে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছিল। এবার একটা কিছু আঁচ করে বলে উঠল, মাসি ! এখানে এসে ঝগড়া করছ—মাকে বলে দেব, দেখবে।

চন্দন বলল, তোমার মাসি বড্ড ঝগড়াটে, তাই না লতু ?

লতুর কেন কে জানে চন্দনকে ইতিমধ্যে বেশ পছন্দ হয়ে গেছে। সে বলল, হ্যাঁ—ওই জন্যে তো মা ওকে খুব বকে। কারো সংগে ভাব থাকে না মাসির। কাল সন্ধেবেলা আমাদের ঘরে সাপ ঢুকল—তার আগে, একটু আগে, গানের কাকু এল—তাকেও...

রুমা লতুকে এক চড় মেরে বসল। লতু অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল। কেঁদে ফেলত নিশ্চয়—কিন্তু অন্যের ঘর, আধোচেনা একটা লোক, কাঁদতে দ্বিধা হল তার।

চন্দন বলল, আঃ, ওকে মারছ কেন? তুমি বলে যাও লতু। কাল সন্ধেবেলা গানের কাকু এল। তারপর? তোমার মাসির সংগে ঝগড়া হল বুঝি। মারামারি হয়নি ?

রুমা কী বলতে যাচ্ছিল, পান্ডেজী এসে গেলেন।...হা রাম! গিয়ে ফিরতি ঝামেলায় পড়েছিলুম। আর বলবেন না। গোডাউনের চাল করে ফুটো হয়ে গেছে—জল পড়ে। বাস, এক ট্যাক খন্দ বিলকুল ভিজে গেছে। বোস, বোস, রুমাদিদি। আরে! পরেশবাবুর মেয়ে না ? কী নাম তোমার ,

লতু ধরাগলায় বলল, শ্রীলতা মজুমদার।

বাঃ, বাঃ। বহত আচ্ছা নাম—শ্রীলতা মজুমদার। রুমাদিদি, আজ বহত দিন বাদ এসেছ। আমি এখন পেরেসান হয়ে বসল। বহত রোজ বাদ তোমার হাতের চায়

খাব আমরা। কী বলেন চন্দন-বাবু।...পাণ্ডেজী বিছানায় বসে পড়লেন।

...তো শ্রীলতা মজুমদার। এখন তো মজুমদার আছ। লেকিন, শ্বশুরবাড়ি যখন যাবে, তখন কী হবে—বোলো, কী পছন্দ? শ্রীলতা রায়, না ভট্টাচারিয়া, না চকরবরতি?

পাণ্ডেজী খুব হাসতে লাগলেন। লতু ক্রমাগত আঙুল কামড়াতে থাকল। রুমা পাণ্ডেজীর কথার ভঙ্গীতে না হেসে থাকতে পারেনি। কিন্তু ইচ্ছে করেই গম্ভীর হয়ে গেল ফের। বলল, পাণ্ডেজী একটা জরুরী কাজে এসেছিলুম।

পাণ্ডেজী বাধা দিয়ে বললেন, ঝড়বিষ্টির মধ্যেতে এমন জরুরী কাজ? তো শুনব—আগে চায় পিলাও রুমাদিদি। ঔর দেখছ তো, কেমন আঁধার হয়ে গেল এক্ষুনি। কয় বাজে চন্দনবাবু। ঘড়ি দেখুন তো?

চন্দন বলল, ছটা প্রায়।

লতু মিনমিনে স্বরে বলল বাড়ি চলো মাসি। মা বকবে।

পাণ্ডেজী লতুর কাঁধে হাত রাখলেন। রুমা বলল, আমি এসেছিলুম—আপনি একবার রুস্তম ফাকিরকে বলে দেবেন আমাদের ঠাকুরঘরে একটা সাপ ঢুকেছে। ওকে সারাদিন ধরে আমরা গিয়ে খোসামোদ করছি কানেই নিচ্ছে না। তাই ভাবলুম, আপনার কাছে যাই।

পাণ্ডেজী চোখ বড়ো করে শুনছিলেন। তারপর 'হায় রামজী' বলে কুকারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঢাকনা তুলে দেখে হাসলেন। জল তলায় বুজকুড়ি কাটছে। পাশের ছোট বালতি থেকে একমগ জল ঢেলে দিয়ে বললেন, সাঁপ ঢুকেছে? ঠাকুরঘরে?

লতু কথা বলতে যাচ্ছিল, রুমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ—কাল সন্ধেবেলা। এমনি ঝড়ের সময়। হঠাৎ কারেন্ট গেল, আপনি বলবেন রুস্তমকে?

পাণ্ডেজী একটু ভেবে বললেন, লেকিন এখন তো মুসকিল। আর রাতে সাঁপ রুস্তম তো ধরবে না রুমাদিদি। আমি জরুর বলব ওকে। বিষ্টি থামলেই লোক পাঠাব। লেকিন...

রুমা বলল বেশ—কাল দিনে এলেই চলবে। আপনি একটু বলে দেবেন, কেমন? আর লতু। সামনে আরেকটা রাত টেবিলে বসে জাগা আছে—সবই ভাগ্য! আয়।

পাণ্ডেজী হাঁ হাঁ করে উঠলেন।...আরে, আরে। এ বিষ্টিতে যাবে কেমন করে? সবুর, সবুর। বিষ্টি থামতে দাও রুমাদিদি। তারপরে সঙ্গে লোক দেব, আলো দেব। রেখে আসবে তোমাদের। আরে, এখন তো পথে রাস্তায় সাঁপ থাকবে।

রুমা জেদের বশে পা বাড়াল। চন্দন ডাকল, রুমা।

লতু উঠে গিয়ে রুমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি পরখ করে বিপন্নমুখে এদের দিকে তাকাল। রুমা দরজার দিকে তাকিয়েই জবাব দিল, বলো।

একটু অপেক্ষা করে যাও। ঘরটা তো আমার নয়, পাণ্ডেজীর।

পাণ্ডেজীর চোখেমুখে ঝিলিক খেলে গেল। মাথা দোলালেন। চকিতে চতুর পাণ্ডেজী একটা কিছু টের পেয়ে গেছেন এতক্ষণে। হাসতে হাসতে বললেন, রুমাদিদি, চন্দনবাবু ঠিক বলেছেন। ঘর আমার আছে। বোসো, বোসো। আমি আসছি, এক্ষুনি আসছি। এসে যেন চায় খেতে পাই। হাঁ? ...পাণ্ডেজী চতুর চোখে চন্দনের দিকে হেসে রুমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।...বোসো রুমাদিদি, চায় করো।

চন্দন সশব্যস্তে বলল, আপনি আবার কোথায় যাচ্ছেন?

এক কাম ভুল হয়ে গেছে। এক্ষুনি আসছি বলে এলুম ওদের—খদ্দের বসে সরাচ্ছে ওরা। আসছি।...বলে পাণ্ডেজী বৃষ্টির মধ্যে গামছা মাথায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়িতে অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল আবার। অদ্ভুত লোক এই পাণ্ডেজী তো।

চন্দন বলল, রুমা, পাণ্ডেজী তোমাকে চা করতে বলে গেলেন কিন্তু।

রুমা জবাব দিল, আমি চা করতে জানিনে।

আজ চেষ্টা করতে দোষ কী? এস—দেখিয়ে দিচ্ছি।...বলে হঠকারিতায় চন্দন লতুর সামনেই রুমার কাঁধ ধরে একটু টানল।

রুমা ঘুরে বলল, সরো—করছি।

কেটলিতে জল ফুটছিল। চায়ের পাতা ফেলে সে কুকারের দিকে ঘুরে বসে রইল। চন্দন তার উজ্জ্বল কাঁধ আর ভিজে চুলগুলো লক্ষ্য করতে থাকল। এই সেই রুমা! স্বপ্ন নয়—অথচ স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট আর ধরা ছোঁয়ার বাইরে শুধু স্মৃতি—সুখ-দুঃখ ছোটবড় অনেক স্মৃতির একটা রক্তমাংসের প্রতীক। বাস্তব—অথচ বাস্তব নয়। একটু আগে কাকে ছুঁল চন্দন, তার আঙুলে কার ভিজে দেহের স্পর্শ আর ঘ্রাণ এখনও লেগে রয়েছে? এ রুমা কি শীতাকার রুমা—যার আড়ালে বাস করছে এক বালিকা, যেন দ্যুলোকের গঙ্গার এক রুপোলী শাসা—উরুতে স্নিগ্ধ ক্ষতে ভালবাসার জলছবি, দুটি নতুন স্তনের মাঝে পরম নীলাভ তিল—জন্মজন্মান্তর ধরে ওকে চিনে রাখার জন্যে এক প্রাকৃতিক যত্ন করে দেগে দেওয়া শীলমোহর? আ, মানুষের জীবনটা কত সহজে বিষাক্ত করে ফেলা যায়। কত সহজে অন্ধকারে পা বাড়ানো যায় আলো ছেড়ে।

লতু কোণের মোড়াটায় বসে মাসির চা-করা দেখতে লাগল। রুমার কাজে হয়তো নিষ্ঠা ছিল না, কিন্তু অবহেলাও ছিল না। একটা কাপে চা ছেঁকে চিনি দুধ মিশিয়ে সে বিছানায় তুলে দিল। চন্দন বলল, তুমি খাবে না?

আমি খাইনে।

তাহলে লতুকে দাও। বেচারা ভিজে রয়েছে।

লতু চা খায় না।

একবার খেলে দোষ নেই—কী বলো লতু?

লতু সাহস পেয়ে বলল, হ্‌উঁ।

রুমা চোখ পাকিয়ে বলল, না।

চন্দন একটু হেসে বলল, পান্ডেজী হঠাৎ কেন চলে গেলেন—জানো রুমা?

রুমা মাথাটা দোলাল মাত্র। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল।

চন্দন বলল, পান্ডেজী হয়তো, একটু ভুল বুঝেছেন।

রুমা ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে ?

হ্যাঁ—আমার ধারণা, পান্ডেজী কিছু একটা ভেবে নিয়েছেন। তাই—

রুমা তাকাল।

তাই হয়তো সুযোগ দিয়ে গেলেন।

কিসের?

তোমার সঙ্গে নিভৃতে কিছু কথা বলার। অবশ্য লতু—লতু কিছু তো জানে না।

রুমা মুখে গাম্ভীর্য টেনে বলল, আমার বলার কোন কথা নেই। যা ছিল, তা লিখে পাঠিয়েছিলুম। আশা করি, তুমি তা পেয়েছিলে।

পেয়েছিলুম। কিন্তু আমারও তো কথা থাকতে পারে, রুমা!

লিখে পাঠিও। পড়ে দেখব।

রুমা, তুমি কি নিষ্ঠুর!
সিন ক্রিয়েট করো না সুযোগ পেয়ে।
আমার ভাগ্যের দান রুমা। এ সুযোগ আমার ভাগ্য আমাকে দিয়েছে।

ওসব এমোশনাল কথাবার্তা আমি অনেক শুনেছি। অজকাল সব অসহ্য লাগে।

কিন্তু আজ—এখন, রুমা, তুমি আসার পর থেকে মনে মনে এত চেষ্টা করছি, এমোশান আমি আটকাতে পারছি না। না—কিছুতেই পারছি না। তুমি তো ভাল জান রুমা আমি এত নির্লিপ্ত আর ঠান্ডা প্রকৃতির ছিলুম। আজ আমার ইচ্ছে করছে বাইরের ওই ঝড়বৃষ্টির মতো নিজেকে ভেঙেচুরে শেষ করে ফেলি।. চন্দন উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকল।

রুমা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্তব্ধ।

আমার অনেক পাপ আজ। কিন্তু কেন আমি পাপ ছুঁতে গেলুম? না রুমা, এ শুধু আমার চরিত্রের দুর্বলতা নয়। এ ছিল আমার আক্রোশ. প্রচন্ড প্রতিহিংসা। নিজের ওপর নিজের আক্রোশ আর প্রতিহিংসা। আমি নিজে নিজেকেই তিলেতিলে বিবাক্ত করে ফেলেছিলুম। আর সেই আগুন আমার অজানতে বাইরে ছড়িয়ে গেল। একটা ড্রাইভারের প্রাণ নষ্ট হল।

রুমা ঝাঁঝাল স্বরে বলল, এই কৈফিয়ৎ শুনে আমার কোন লাভ নেই।

রুমা, সেদিন তুমি আমাকে চড় মেরেছিলে। আমি জানি, কেন তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারোনি—এখনও পারছ না! কিন্তু নিজের দিকটাও কি তুমি দেখেছ একবারও ?

দেখেছি বলেই ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলুম।

তোমাকে ক্ষমা হয়তো মনে মনে করতে পারিনি—এখন বলতে আমার বাধা নেই। না—তোমাকে সত্যি ক্ষমা করিনি, রুমা। কেন করব ক্ষমা? যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন যে কিছুতেই ভুলতে পারব না—সেই ছেলেবেলা থেকে আমার নিজের একটা সুন্দর জগত ছিল, সে জগত তুমি রুমা—আমার অনেক যত্নে অনেক সুখেদুঃখে গড়া। এই জগতে অন্যের দখল আমার সইবে কেমন করে বল তো রুমা? এর অধিকার আমি ছাড়ব না। কোনদিন না। জিয়াগঞ্জ ছেড়ে চলে এসেছিলে তোমরা, অতগুলো বছর কেটে গেল—তবু মনে মনে সে-অধিকার আমি একদিনও ছাড়িনি। মনে মনে জানতুম, সে আছে। তারপর এলুম এখানে। দেখলুম, ফুলেফলে ভরে উঠেছে আমার সেই জগতটা—বিশ্বাস করো, এত ভাল লাগল। এত সুখে ভরে উঠল মন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম—

রুমা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, তুমি চুপ করো।

না রুমা, চুপ করব না। একদিন তুমি বলেছিলে, কেন আমি জোর করতে পারিনে—সত্যি পারছিলুম না। কিন্তু আজ আমার সামনে আর কোন অবলম্বন নেই। পুশুলিয়া রুটে গাড়ি চালাতুম—সারাক্ষণ, সারাদিন—সারারাত, মনের আড়ালে উঁকি মেরে দেখে নিতুম তুমি আছো কিনা। দেখতুম হ্যাঁ, আছো। যতদূরেই গেছি—যত কালামাছি খেলেছি, আজ অকপটে বলছি; তোমার দূরিকে কেন্দ্র করেই খেলেছি। আজ আর কোন খেলা সামনে নেই—কিছু নেই, আমার চারদিকে শুধু শূন্যতা। এই সাংঘাতিক ভ্যাকুয়ামটা দেখতে দেখতেই আমি এখন মরীয়া হয়েছি, রুমা।

রুমা মুখটা ফিরিয়ে আছে। এবার সে অস্ফুট হাসল—বাঁকা ঠোঁটের হাসি। বলল, হ্যাঁ—সামনে পেয়ে গিয়ে এখন যা আসছে মাথায় বলে যাচ্ছ।

হয়তো তাই, রুমা। ঠিকই বলেছ—সামনে হঠাৎ পেয়ে গেছি। কিন্তু যে বানের জলে জলে ভাসছে, সে হঠাৎ সামনে একটা নির্ভর করার মতো অবলম্বন পেলে কী করে বল তো ?

না—আমি কোন নির্ভরযোগ্য অবলম্বন নই কারো।

কিন্তু আজ আমি এবার সত্যিসত্যি জোর করতে চাই, রুমা।

রুমা ঘুরে দাঁড়াল।

লতু হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল। মাসি আর এই লোকটা হঠাৎ কেন ঝগড়া করছে, সে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ তার একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। মাসি তো একেই চড় মেরেছিল—জামা খামচে ছিঁড়ে দিয়েছিল! সে উদ্বিগ্নমুখে কাঁদোকাঁদো স্বরে বলল, মাসি, বাড়ি চলো—মা বকবে।

চন্দন বলল, আজ আর আমি চড় খাবো না রুমা। আজ আমি সম্পূর্ণ তৈরী।

রুমা স্থির দাঁড়িয়ে বলল, কী চাও আমার কাছে?

তোমার নিষ্ঠুরতাকে এখন আমার ভয় নেই। কাজেই ও প্রশ্ন করো না।

রুমা ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর হঠাৎ লতুর হাত ধরে টান দিল। তারপর বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপ দেবার মতো বেরিয়ে গেল লতুকে নিয়ে। চন্দন একটু ইতস্তত করে তার পিছনেই বেরিয়ে গেল। সে সিঁড়িতে নামতে-নামতে দেখল রুমা গেট পেরিয়ে যাচ্ছে।

রুমা লতুকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। সামনে ঝুঁকে হাঁটছে ওরা। বৃষ্টির ঝাপটায় রাস্তার আলোগুলো দুলছে। ঝড় কমে গেছে। বৃষ্টি বেড়েছে। মাঝে মাঝে ডাকছে। চন্দন দৌড়ে গিয়ে ওদের সঙ্গ নিল। রুমা একবার মুখ তুলে দেখল মাত্র। তার সারা শরীরে এখন যা সিক্ততা, তা অন্য এক বৃষ্টিপাতের।

দরজা খোলা ছিল। স্নেহধারা উদ্বিগ্নমুখে অপেক্ষা করছিল। রুমা আর লতুকে দেখে চেঁচিয়ে কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। আগে চন্দন একলাফে বারান্দায় উঠে বলল, তোমাদের ঘরে নাকি সাপ ঢুকেছে, বউদি? সাপুড়ে খুঁজছ শুনলাম—তাই চলে এলুম। জানো তো, সেবার বর্ষায় কী বিশাল পাহাড়ে চিতি মেরেছিলুম নোহালিজাবাবুদের বাগানে? আমি ভীষণ সাপ মারতে পারি!... সে খুব হাসতে লাগল।

স্নেহধারা মুহূর্তে আশ্বস্ত হয়ে বলল, ইস! কী ভিজেছ তোমরা! শাদা এদিকে আয়। (আগামী সংখ্যায় শেষ)

শ্রুতির পরীক্ষায় শ্রবণ বৈচিত্র্য

অনুভূতি বসু

(লেখিকা ১৯৫৪ সাল থেকে কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বধির শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে যোগ দেন। শিক্ষান্তে ফিরে এসে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অন দি এডুকেশন অফ দি ডেফ' ওয়াশিংটনে যে সম্মিলনটি আয়োজিত করেন, তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য তিনি সেখানে যান যুক্তরাষ্ট্রের অতিথি হয়ে। ঐ সম্মিলনে তিনি একটি নিবন্ধ পাঠ করেন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যালয়টিকে স্পনসরড করার পর থেকে তিনি বালিকা বিভাগের প্রধানারূপে কর্মরতা। বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সরকারী স্পনসরড কলেজ—'ট্রেনিং কলেজ ফর দি টিচারস অফ দি ডেফ'-এ তিনি শিক্ষকতা করেন।)

শ্রোতার শ্রুতির বিচার করা আমাদের প্রকৃতিগত একটা ধর্ম বললে বোধ হয় অসংগত হবে না। শ্রোতা ঠিকমত শুনছে কিনা, তা না জানা পর্যন্ত আমরা বক্তব্যকে প্রকাশ করতে নিরুৎসাহিত বোধ করি, তাই কথা বলার সংগে সংগে আমাদের অলক্ষ্যেই আমরা নানা উপায় অবলম্বন করে শ্রোতার শ্রুতি বিচার করে নিই। মনে পড়ে ছোটবেলায় বড়দের কাছে গল্প শোনার সময় হ্যাঁ, হুঁ তারপর ইত্যাদি না বললে বা মাথা নেড়ে সাই না দিলে তারা হঠাৎ মাঝ পথে থেমে গিয়ে বলতেন—'কি বলছিলাম বল তো? শুনছ না ছাই'... ইত্যাদি। বক্তামাত্রই শ্রোতার কাছ থেকে নানা ধরনের বহিঃপ্রকাশ প্রত্যাশা করে এবং সেইগুলি দিয়ে শ্রুতির যাচাই করে নেয়। শ্রুতির ব্যাপারটি অন্তর্মুখী হলেও শ্রোতার বহির্মুখী আচরণের সাহায্যে আমাদের বিচার করতে হয় তার শ্রুতি এবং সেই জন্যেই সব সময় নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভবপর নয়। যন্ত্রের মাধ্যমে শ্রুতির পরীক্ষা নিলেও কিন্তু এই চিরন্তনী সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বার বার পরীক্ষামূলক-ভাবে শ্রুতি পরীক্ষা নিয়ে সন্দেহের অবসান ঘটাতে হয়।

কোন একটি শব্দ শুনলেই আমাদের মনে কতগুলি সাধারণ প্রশ্ন জাগে যেমন—শব্দটি কি সুরে বাজছে—চড়ায় না খাদে, শব্দটি শুনতে কেমন—মধুর না কর্কশ। প্রথম প্রশ্নটিতে বোঝায় শব্দের প্রাবল্য, দ্বিতীয়টিতে শব্দের তীক্ষ্ণতা ও তৃতীয়-টিতে শব্দের গুণগত বৈশিষ্ট্য। শব্দের প্রাবল্য বা শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে শ্রোতার অবস্থান, উৎসের আকার ও তরঙ্গ কম্পনের বিস্তারের উপর। পদার্থবিদরা এই শব্দ প্রাবল্যকে পরিমাণ করেন ডেসিবেল স্কেলে। আমরা সকলেই রেডিওর একটা বিশেষ চাবি ঘুরিয়ে শব্দ প্রাবল্য বাড়াই আর অন্য দিকে সেটি ঘুরিয়ে শব্দ-প্রাবল্য কমাই। এটি কিন্তু বাড়া কমা করে ডেসিবেল স্কেলের তারতম্যেই।

শব্দের তীক্ষ্ণতা বা চড়া সুরের পরি-মাপক—গ্রাম বা তরঙ্গাঙ্ক। মাধ্যমের ভেতর এক সেকেণ্ডে যে কয়টি পূর্ণ তরঙ্গাঙ্ক সৃষ্টি হয়, সেই সংখ্যাকে বলে তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক। সুর চড়া করার সংগে সংগে যেমন কম্পনাঙ্কের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তেমনি এই সংখ্যা কমতে থাকে যখন সুরটি ক্রমশ খাদে নামান হয়। সুরের তীক্ষ্ণতা কম্পনাঙ্কের সমানুপাতিক হবার জন্যেই কম্পনাঙ্ক দিয়েই তীক্ষ্ণতাকে প্রকাশ করা হয়।

ধ্বনির গুণগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে উৎসের আকার, বায়ুর চাপ, বিভিন্ন সুরের সহাবস্থান ইত্যাদির ওপর।

শ্রুতি বিচারের জন্যে ধ্বনির শব্দ প্রাবল্য ও কম্পনাঙ্ক—এই দুটি পরিসর মাত্রাকে একই যোগে পরীক্ষা করা দরকার। টিউনিং ফর্ক-এর সাহায্যে এককালে মাত্র একটি কম্পনাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব কিন্তু 'অডিওমিটার' নামক যন্ত্রে একই সময়ে শব্দের দুটি পরিসরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। সেই জন্য শ্রুতি পরীক্ষার প্রয়োজনে এই যন্ত্রটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শ্রুতি পরীক্ষা গ্রহণ করার সময় পরীক্ষক কোন একটি বিশেষ তরঙ্গাঙ্কে যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রিত করে প্রাবল্যের মাত্রা বাড়াতে থাকেন। যে প্রাবল্য অংকে শ্রোতা শব্দটি ক্ষীণতমভাবে শুনতে পাবে, সেই অংকটি হবে ঐ নির্দিষ্ট তরঙ্গাঙ্কের প্রারম্ভিক শ্রুতিবোধের স্থান। অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট শব্দপ্রাবল্যকে কিছু মাত্রও হ্রাস করলে শ্রোতার শ্রুতি পর্যবসিত হবে শ্রুতিহীনতায়। শব্দের সেই ন্যূনতম স্তরে যেখানে শ্রুতির অনুভূতি সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়, সেই স্থানটিকে ইংরাজীতে বলে 'থ্রেস হোল্ড অফ হিয়ারিং' অর্থাৎ শ্রুতির প্রাথমিক স্থল। শ্রুতির পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষক যন্ত্রটিকে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গাঙ্কে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলির প্রথম শ্রুতি-বোধের স্থানগুলি চিহ্নিত করে নেন 'অডিওগ্রাম' নামক বিশেষ তালিকাতে।

১৪০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ০

৬২.৫ ১২৫ ২৫০ ৫০০ ১০০০ ২০০০ ৪০০০ ৮০০০ ১৬০০০

নিম্নগ্রাম ↓ মধ্যগ্রাম ↓ উচ্চগ্রাম

কথা বার্তা শোনার ক্ষেত্র

শ্রুতিমাপক তালিকা (অডিওগ্রাম)

ঐ আয়তক্ষেত্র তালিকাটির পারস্পরিক বাহু দুটির একটিতে শব্দ প্রাবল্য ও অপরটিতে তরঙ্গাঙ্ক নির্দেশিত করা হয়েছে।

শব্দ প্রাবল্য বাড়ানোর সংগে সংগে যেখানে শ্রোতার শ্রুতিবোধ প্রথম জাগ্রত হয়েছে, সেই স্থানগুলি তালিকাতে

চিহ্নিত করার পর একটি রেখাঙ্কনের সাহায্যে সমস্ত চিহ্নগুলি যুক্ত করে অঙ্কিত করা হয়েছে একটি আদর্শ সার্বজনীন শ্রুতিবোধরেখা। বহু ব্যক্তির শ্রুতি পরীক্ষার পরে এই যে রেখাটি গৃহীত হয়েছে এরই আশে-পাশে থাকে সাধারণ মানুষের প্রাথমিক শ্রুতিবোধ রেখাটি। কিন্তু রেখাটির অবস্থানে ব্যতিক্রম থাকলেই তার দ্বারা ব্যক্তির শ্রবণহীনতা বা মানসিক অসুস্থতাই সূচিত হয়।

সার্বজনীন শ্রুতিবোধ রেখাটির অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আরম্ভে এবং সমাপ্তিতে এই রেখা ক্রমেই ঊর্ধে উঠতে থাকছে আর তাদের নীচের সমস্ত পরিসরটুকু রয়ে যাচ্ছে শ্রবণের অগোচরে। আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়টি এমনিই বিচিত্রভাবে রচিত যে নিম্ন ও উচ্চ গ্রামের তরঙ্গাঙ্ক প্রাবল্যের সঙ্গে ধ্বনিত না হলে তা আমাদের শ্রবণগোচর হয় না অথচ মধ্য গ্রামের স্তর যা সাধারণ কথাবার্তা শোনার ক্ষেত্র, সেখানে শ্রুতি বিশেষভাবেই সংবেদনশীল অর্থাৎ সামান্য শব্দ প্রাবল্য ধ্বনিকে শ্রবণীয় করে তোলে। শ্রুতিমাপক তালিকাটিকে সর্বজনবোধ্য করার জন্যে বৈজ্ঞানিকরা সমগ্র তরঙ্গ কম্পনাঙ্ককে মোটামুটি ৩টি স্তরে ভাগ করেছেন—প্রথমটি নিম্নগ্রামের ক্ষেত্র যা ২৫০ তরঙ্গাঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত, দ্বিতীয়টি মধ্যগ্রামের ক্ষেত্র যার বিস্তৃতি ২৫০—৪০০০ তরঙ্গাঙ্ক পর্যন্ত এবং এর পরের স্তরটি হোল উচ্চ গ্রামের ক্ষেত্র। ২০ তরঙ্গাঙ্কের আগে আর ২০,০০০ তরঙ্গাঙ্কের পরে শব্দ মানুষের শ্রবণগোচর হয় না এমন কি শব্দ প্রাবল্য সাধ্যমত বৃদ্ধি করলেও তা থেকে যাবে শ্রুতির অগোচরেই।

মানুষের শ্রবণশক্তির বৈষম্য লক্ষ্য করলে এ কথাই স্বীকার করতে হয় যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ ও সচল করার জন্যেই যেন সৃষ্টিকর্তা মধ্য গ্রামের স্তরটি বিশেষ সংবেদনশীল করেই রচনা করেছেন যাতে কথাবার্তার আদান-প্রদান স্বাভাবিক শব্দ প্রাবল্যেই সম্ভব হতে পারে। শ্রুতি যে সকল সময় শব্দ প্রাবল্যের উপর নির্ভরশীল তা সকল ক্ষেত্রে সত্য নয়। শব্দ প্রাবল্য ১২০ ডেসিবেলের ঊর্ধে উঠলে শ্রবণ ইন্দ্রিয়টি প্রায়ই অসহ্য যন্ত্রণায় বিকল হয়ে ওঠে। তাই কারখানার তীব্র শব্দে ও যুদ্ধকালীন সাইরেন ও বোমার আওয়াজে অনেকেই আংশিক বা সামগ্রিকভাবে হারিয়ে ফেলেন তাদের শ্রুতি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে প্রাণীজগতে শ্রুতির পারদর্শিতায় মানুষকে হার মানতে হয়েছে মনুষ্যেতর প্রাণীদের কাছে। কত সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাড়ীতে পোষা জীব যেমন গরু, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি অনাগত ঘটনার পূর্বাভাস জানাবার জন্যে হাঁকডাক করছে। ঘটনাগুলি ঘটার পর আমরা এদের কর্ণ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়ি। কিন্তু মনে হয় যে মনুষ্যেতর প্রাণীদের শ্রুতির ক্ষেত্র সুদূর প্রসারিত বলেই বহু অশ্রুত তরঙ্গাঙ্কও তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যা মানুষের শ্রবণে এসে পৌঁছাতে পারে না। শ্রুতির ব্যাপারে বাদুড় যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তা বহু গবেষণার পর প্রকৃতি-বিশারদরা আবিষ্কার করেছেন। এরা একরকম শ্রুতাতীত শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে ও তার প্রতিধ্বনি অনুসরণ করে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। শুনেছি যে সর্বাধুনিক বিস্ময়কর 'র‍্যাডার' যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছে বাদুড়েরই শ্রবণশক্তির অনুকরণে।

আমরা ধ্বনিময় জগতে বাস করি—সেখানে অফুরন্ত প্রাণধারা প্রতিনিয়তই চলার বেগে মুখরিত হয়ে উঠছে। শ্রুতির হাত থেকে রেহাই পাবার আমাদের কোন উপায় নেই, তাই ঘুমন্ত অবস্থা ছাড়া আমরা সবসময়েই শুনি কখনো স্বেচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায়, কখনো সচেতনভাবে কখনো বা অসচেতন হয়ে। জীবনের সঙ্গে শ্রবণের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে বলেই শোনার কাজটিও হয় অভিনবভাবে তাই তো আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়টি শব্দ নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় শব্দগুলি সহজভাবেই আমাদের কানে এনে পৌঁছে দেয়—আর আমরা চোখ বন্ধ করেও জানতে পারি আমাদের পরিবেশকে যাকে না চিনলে আমাদের জীবনের নিরাপত্তা বা আত্মরক্ষা করা দুটোই দুরূহ হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যে খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

• মিনতি মিত্র •

যীশুর ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধর্মের বার্তাবাহী বহু পত্র-পত্রিকা অনুবাদ, সংকলন, গ্রন্থ ইত্যাদি রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল। এর কারণ হিসাবে মনে হয় জন টমাসের বিজ্ঞাপনের কথা। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জন টমাস 'ইন্ডিয়া গেজেটে' এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন দেন যে, তখন থেকে বাংলা দেশে আরও বেশি করে খৃষ্টের সুসমাচার প্রচারের পরিকল্পনা চলছে। এই বিজ্ঞাপনের ফলে সাড়া সত্যিই কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলে। এতদিন যে পরিমাণে ট্র্যাক্ট রচনা চলছিল তার চেয়ে বহু গুণে বেশী পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল। শুধু তাই নয়, নানাদিক থেকে খৃষ্টের বাণী-বাহকেরা এদেশে নানাভাবে খৃষ্টের রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। এর ফলে ঠিক এই সময়ে খৃষ্ট বিষয়ক বিভিন্নজাতীয় রচনার সঙ্গে কয়েকটি গীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

খৃষ্টীয় রচনার আলোচনার ক্ষেত্রে এই গীতের ধারাটি নিঃসন্দেহে একটি নতুন ধারা। এর কারণ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। এক হল সংগীতের আবেদন সর্বজনীন। যে কথা তত্ত্বের আকারে মনকে আকৃষ্ট করে না, যে তত্ত্ব বক্তৃতার আকারে চেতনাকে পীড়িত করে সে কথাও গানের সুরে, ছন্দে, লয়ে প্রকাশ করলে হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে এক মুহূর্তও সময় লাগে না। কিন্তু এ ছাড়াও এই গীতগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবার আরও একটি কারণ ছিল। সেটি হল এই যে প্রধানতঃ ধর্মপ্রচার এবং গৌণতঃ বাংলা চর্চা দুটি বিষয়েই মিশনারীদের লক্ষ্য ছিল বাংলা চর্চার ক্ষেত্রে ঐ খৃষ্টীয় রচনাকারেরা বাংলা-সাহিত্যে প্রচলিত রচনারীতি-গুলিকেই একের পর এক গ্রহণ করেছিলেন। সেই সূত্রেই সঙ্গীতের ধারাটিকেও তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন।

খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল একমাত্র খৃষ্টমাহাত্ম্যেই সেবকের অন্তঃকরণ নির্মল ও সেবা-পরায়ণ হয়ে ওঠে। আর নির্মল হৃদয় ব্যতীত পূর্ণ নিষ্ঠায় ঈশ্বর সেবা করা অসম্ভব। কেবলমাত্র পবিত্র হৃদয়েই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই সুন্দরভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িক কালে রচিত ঐ গীত গ্রন্থগুলি তাই নিশ্চিতভাবে পবিত্র হৃদয়কে আকৃষ্ট করার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ঐ গীতগুলিতে গীতের আবেদন সর্বত্র পাওয়া যায় কিনা তা বিচার্য।

এই জাতীয় সংগীতের জন্মক্ষণটি নির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণা করা না গেলেও ঊনবিংশ শতকের তিনের দশক থেকে এই-প্রকার বহু গীত বা কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারা চলেওছিল বহু বৎসর ধরে। আর খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই গীতের ধারায় যীশু-জীবনের বিভিন্ন

জীবনলেখা, তাঁর জন্মবৃত্তান্ত, ত্রাণের বিষয়, উপদেশ ও বাণীর নানা খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ যে একই যীশু-মাহাত্ম্য প্রচার সে-কথা বলাই বহুল্য। প্রচারকদের লক্ষ্য যাই থাক, অথবা যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এই কাব্য বা গীতগ্রন্থ প্রণীত করা হোক না কেন, সাধারণ পাঠক, রসিক শ্রোতা, যীশুর জীবনালেখ্য, মহিমময় চিত্র, ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে এই গানগুলির মাধ্যমে।

'গীত' নামক কাব্যগ্রন্থ ১৮৩৫ খৃঃ আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। ৪৯টি গীতের এই সংকলন গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল এখানে দেওয়া হল। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এতে 'খৃষ্টের প্রতি প্রার্থনা', 'খৃষ্টেতে মনের ধারণ', 'যীশুর প্রতি প্রার্থনা', ও 'খৃষ্ট পরিত্রাণ করিতে সাবধান' এই চার শিরোনামে মোট প্রায় একশত গান সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় শিরোনামের অর্থাৎ 'খৃষ্টেতে মনের ধারণ' বিষয়ের একটি গীতে আছে :

যেজন আপন প্রাণ দিয়া পাপি উদ্ধারে
　　ও মন ভুলনা তাঁরে।
১। না ভুলিও আর কর সেই সার
　যীশু ব্রহ্ম নাম ত্রাণের তরে।
২। আর সব কার্য দূরে কর ত্যাজ্য
　খৃষ্ট প্রেম-ধন রাখ অন্তরে।
৩। সত্য দয়া ক্ষমা সকলই অসীমা
　যীশু আপন রক্ত দিয়া পাপি নিস্তারে।
৪। সাধু বন্ধু তাঁরে বলি বারে বারে
　যীশুনামে পার করে আমারে।

সেই সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যেমন পাঁচালী, স্তব, গীত, কবিতা গল্প, উপন্যাস নাটক প্রচলিত ছিল, যীশু-জীবনের শিক্ষামূলক ঘটনাও তেমনই এই সমস্ত বিভিন্ন আধারে পরিবেশিত হয়েছিল। অর্থাৎ যীশু বিষয়ক মিশনরী বাংলা সাহিত্যের রূপ ও রীতি ছিল বাংলা কাব্য-সাহিত্য ধারার রূপ ও রীতি থেকে অভিন্ন। তাই খৃষ্টীয় বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছিল অজস্র কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও গানে। এইভাবে বাংলা রচনার সংগে খৃষ্টীয় রচনার মিশ্রণের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যেতো না—সবই একাকার হয়ে যেতো। খৃষ্টীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিদেশী হাতের অপটুতা বা অনবধানতা অনেক সময়ই ধরা পড়ত না। বরং মনে হত আমাদের দেশের কৃষ্ণকথাই পরিবেশিত হয়েছে কোন দেশী কবির লেখনীতে। তা ছাড়া ভাববস্তুর যে কোন পার্থক্য ছিল না তা বলাই বাহুল্য। এই প্রতিক্রিয়া ধর্ম-প্রচারকদের ক্ষেত্রে শুভ ফলই প্রসব করেছিল। এবং একথা ভাবতেও কোন বাধা নেই যে এটা হয়ত ধর্মপ্রচারকদের অবলম্বিত একটা কৌশলই ছিল।

এই ধারার আর একখানি গীত-পুস্তকের নাম 'খৃষ্টসাধন' Select Christian Hymns এটিও একই সময়ে Baptist Mission Press থেকে প্রকাশিত হয়। 'ঈশ্বরের বিষয়', 'মনুষ্যের দুর্দশার বিষয়' ও 'খৃষ্টের বিষয়' গান এতে সংকলিত হয়েছে। 'সংসারের অবস্তুতা' অর্থাৎ সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে একটি গান এই পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করা হল :

জগতে কিছু নাহি আর
ও ভাই কেবল যীশুর প্রেম সার।
যে কিছু দেখি সকল ফাঁকি
　　　চক্ষু মুদিলে অন্ধকার
১ দারা পুত্র বন্ধু আপন ২
　　　　　বল্যা কান্দি
মায়াজালে বন্ধ আছে তেঁই-সে
　　　　বলি আমার ২।
২ যে দেহেতে আত্মা রয় সেই দেহ
　　　　ফেল্যা চল্যা যায়
দেখ কার প্রাণে নাই সম্বন্ধ
　　　তবে হেথা আছে কে আর
৩ অট্টালিকা ধন কড়ি দারা পুত্র
　　　　　বাগানবাড়ী
সকল রবে হেথায় পড়ি কিছুই নহে
　　　　সংগে নিবার।

যীশুখৃষ্টের ধর্মের এই উপদেশগুলি ভারতীয় ধারারই অনুবর্তন। আসক্তি নয় অনাসক্তিই এই গীতটির মূল কথা। সহজ এবং সরল বাংলা ভাষায় ভারতীয় দর্শনের ভাবগুলি এদেশের লোকে অতি সহজেই যে গ্রহণ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নানাভাবে। গানগুলি তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত কোন বার্তা নিয়েও আসেনি বরং তাদের অন্তরে লালিত চিরাচরিত ভাবনারই প্রকাশ তারা দেখতে পেয়েছিল এই নীতি-কথাগুলির মধ্যে। এর মধ্যে কয়েকটি স্থানের 'যীশু' অথবা 'খৃষ্ট' শব্দের ব্যতিরেকে গানগুলি যে খৃষ্ট প্রাসঙ্গিক অথবা কৃষ্ণ প্রাসঙ্গিক তা বুঝবার কোন উপায়ই নেই। অর ধর্ম বিষয়ে সাধারণ ভারতীয়ের এতখানি সহিষ্ণুতা ছিল যে কৃষ্ণ অথবা খৃষ্ট নামের সংগীতের কীর্তনে অথবা ভজনে তাদের আপত্তি তত তীব্র ছিল না; কারণ ভিন্ন নামে যে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য খর্ব হয় না এবং ঈশ্বর যে এক এ বিশ্বাস তাদের অন্তরে ছিল।

যাই হোক এপ্রকার গীত ও গীত-পুস্তকের প্রচার ছিল অসংখ্য। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আর একখানি গীত পুস্তক প্রকাশিত হয়, তার নাম 'সদ্ধর্মপ্রকাশ' বা Chatec hism of the True Religion এতে 'শরীরাত্মার বিষয়' 'ধর্মপুস্তকের বিষয়', 'যীশু খৃষ্টের বিষয়', 'মন ফিরাওনের বিষয়', 'খৃষ্টীয় ধর্ম বিষয়', 'মৃত্যুর বিষয়', 'বিচার দিনের বিষয়' 'নরকের বিষয়' ও 'স্বর্গের বিষয়', ইত্যাদি প্রসংগের গান আছে। মন ফিরাওনের বিষয়' গানটিতে আছে হিন্দুধর্মের পালনীয় আচার-নিয়মাদি মানুষকে মুক্ত করতে বা রক্ষা করতে পারে না, ত্রাণ করতে পারে একমাত্র সত্য ধর্ম অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্ম। গানটি এইরকম :

মন ফিরাওনের বিষয়

হিংস্রক বঞ্চক আর বিগ্রহপূজক।
মিথ্যাপ্রিয় বেশ্যাগামী মায়াবী ঘাতক।।
ইহারা সকলে থাকে স্বর্গের বাহিরে।
এইজন্যে ওরে ভাই করে পুণ্যাচারে।।
হও সৎস্বভাব কর দুঃখিগণে দয়া।
শীঘ্র ছাড় প্রবঞ্চনা চৌর্যাদি কুক্রিয়া।।
মিথ্যা কথা কহা ছাড় পরস্ত্রী হরণ।
আর মিথ্যাশ্রয় ছাড় দেবতা পূজন।।
জপ যজ্ঞ তীর্থযাত্রা তপ বলিদান।
সহমরণাদি কর্ম শ্রাদ্ধ গংগাস্নান।।
পনর দয়া ক্ষান্তি কর সহিষ্ণু হইয়া।
সত্য ধর্ম পথ ধর মন ফিরাইয়া।।

খৃষ্টীয় ট্র্যাক্টের ধারায় এই জাতীয় অজস্র গীত নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকলেও বর্তমানে এই সব খৃষ্টীয় গীত সুলভ নয়। সুনির্বাচিত কোন গীত সংকলনও দুর্লভ। উনবিংশ শতকের আদিপর্বের এই রকম একখানি গীতগ্রন্থের ভাষা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ঐ গ্রন্থের নামপত্রেই দেখা যায়—যীশু খৃষ্টের মন্ডলীতে গেয় গীত—তার তিন ভাগ—প্রথম স্বর ইংলণ্ডীয়, দ্বিতীয় চাম্বার্লিন কৃত এবং তৃতীয় বাঙ্গালী। এই নামপত্রে গ্রন্থের উদ্দেশ্যবোধ জটিলতরই হয়। তাই তার ভূমিকা অংশ দেখতে হয়। ভূমিকা হল এই গানেরই উপদেশ অথবা গ্রন্থসার। তাতে লেখা আছে—

'ঈশ্বরের আশ্চর্য মাহাত্ম্য ও দয়া ও নির্মলতা প্রত্যেক সেবকের অন্তঃকরণে বড় শক্ত ও আশ্চর্যরূপে না লাগিলে ও নির্মলান্তঃকরণ না হইলে তাঁহার সেবা

সত্যরূপে বলা যায় না এবং সে সেবার মনও নির্বাপিতকরণ।'......

তারপর এল গানের নমুনা—
...প্রাণ জীবনদায়ক শব্দ যাউক
সর্ব পৃথিবীতে।
স্বর্গীয় লোকও যেন সব
উন্মত্ত গান করে
হাজিলুয়াসুতের ঈশ্বরে। ১ম গীত

সেকালের এই গানগুলির সঙ্গে জার্মান মিশনারী বমওয়েচ সাহেবের রচিত গানগুলির তুলনা করলে ভাবপ্রকৃতির একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বমওয়েচের জীবনী থেকে জানা যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন একজন বঙ্গরমণী। তাঁর রচিত একটি গানের সঙ্গে সে যুগের একটি গানের তুলনা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

বমওয়েচ সাহেবের গান—
স্বর্গের প্রতি মোদের পথ
যেন নিত্য যায়,
সাধুলোকদের মনোরথ
তথায় পূর্ণ হয়।......

পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গীত—
মোর মনে অতি বড় লাজ।
তাঁর ক্রুশের দর্শনে
মোর অন্তর স্তবে গলিত হউক
মোর নেত্র জলেতে।

ঐ সকল গানের বহিরঙ্গের অলংকরণ এক হলেও সব ক্ষেত্রে অন্তরের কথাটি সমান সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হয়নি। যেমন দ্বিতীয় গানটি বমওয়েচ সাহেবের গানটির চেয়ে ভাবের দিক থেকে যথার্থ। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি যে কোন সাধকের চোখে জল এনে দেয় এমন মহিমময় ভাবনা গানটির মূল্য অনস্বীকার্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

উপরিউক্ত প্রসঙ্গগুলি ছাড়াও গীত-সংহিতাগুলির অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত। বিভিন্ন গ্রন্থে, গীতে, প্রবন্ধে, নাটকে, কথাসাহিত্যে বর্ণিত এই জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য। এই প্রকার বিচিত্র বিষয়ক এই গীত সংকলনগুলি যে প্রাচ্য ভাষায় প্রচারিত এদেশীয় দেব-দেবীর স্তবের অনুরূপ সে কথা অবিদিত নয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গানগুলিও রামায়ণ ও মহাভারতের মত সুর করে গাওয়া হত। কোন গান কি সুরে বা কি ছন্দে গাওয়া হবে তার নির্দেশ অনেক সময় দেওয়া থাকত। 'দাউদের গীত' (১৯১৬) গ্রন্থে এই রকম স্পষ্ট পয়ার ছন্দের উল্লেখ আছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'লূক-লিখিত সুসমাচার' নামক গ্রন্থে পদ্যাবন্ধে খৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে এইভাবে:

নাসরৎ নামে তথা আছিল নগর।
মরিয়ম কুমারীর ছিল যথা ঘর।।
বাগদত্তা সে কুমারী আছিল তখনে।
দায়ূদকুলের যুবা যোষেফের সনে।।
ভিতরে পশিয়া দূত করে সম্ভাষণ।
ধন্য নারী ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন।।
সহায় তোমার প্রভু হউক কল্যাণ।
শুনি বাণী মরিয়ম বড় ভয় পান।।
চমকিয়া করে সতী মনে আন্দোলন।
কেন মোরে দূত করে হেন সম্ভাষণ।।
দূত কহে মরিয়ম ভয় নাহি কর।
প্রসন্ন হলেন প্রভু তোমার উপর।।
গর্ভবতী হয়ে তুমি প্রসবিবে সুত।
যীশু নাম হবে তার ভুবন বিদিত।।

* পুনরায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী .(Holy cross Hymnal) যীশুর জন্মবিবরণ ভিন্নপ্রকার।

১। ধন্য যোসেফ তুমি সদা কুমারীর বর,
অমলত্বের গৌরব তোমার চারুভূষণ
আমরা গাব সুখে তব গুণ নিরন্তর
প্রেম এবং ভক্তিতে মগন।

২। যখন তুমি ধন্যা কুমারীর বিষয়ে
অতিচিন্তিত হলে না জানি বিবরণ,
তখন প্রভুর দূত সমাচার লয়ে
স্বপ্নে তোমায় দিলা দর্শন।

৩। কোলে নিয়ে তুমি আপন স্রষ্টারে,
করি তাঁরে যত্নে মিশরে আনয়ন,
আবার পেয়ে তাঁকে ঈশ্বরের আগারে
তুমি হলে হর্ষে মগন।

এই প্রকার দৃষ্টান্ত রয়েছে প্রচুর। এই দুটি দৃষ্টান্তে ভাষার যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনই ছন্দেরও পার্থক্য রয়েছে। বিষয়েরও কিছু হেরফের করা হয়েছে। যেমন প্রথম গানটিতে আছে মরিয়ম নিজেই চিন্তিত আর দ্বিতীয়টিতে আছে যোষেফ ধন্যা কুমারীর বিষয়ে চিন্তিত হচ্ছেন। এইভাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ পরিবর্তন করে অজস্র গীত গ্রথিত হয়েছে। 'পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী'র এই সংকলনটি এর তৃতীয় সংস্করণ এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত। উদ্ধৃত সঙ্গীতটির ক্রমিক সংখ্যা ১৩ এবং শিরোনাম পবিত্র যোষেফ। কোন কোন গানের উপরে একটি পংক্তিতে গান সম্বন্ধীয় একটি নীতি উপদেশও দেওয়া আছে। তা ছাড়া গানটি কোন সুরে গেয় এ সম্বন্ধে যে নির্দেশের কথা বলা হয়েছে তার আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল।

৬৮ সংখ্যক সঙ্গীত খাম্বাজ : ঠুংরি
উঠ হেসে অগ্রে এসেছে বরিতে মোদের রাজারে।
অনাদি অনন্ত ভূতলে আগন্তুক, মোদের
দুয়ারে
দীনহীন মানবাকারে।

এই প্রকার কিছু কিছু গানে সহজ বাংলা ভাষার সাবলীলতা তো আছেই তা ছাড়া কতকগুলি ছত্র যেন নিধুবাবু, রাম বসু, গোপাল উড়ে প্রভৃতি বাংলার প্রিয় গীতরচয়িতাদেরই প্রতিধ্বনি। ভক্তি ভাবের চিরন্তন সত্যই এই সকল অংশে ধ্বনিত হয়েছে। ভাবুক ভক্ত বাংলার শাক্ত-বৈষ্ণব সর্ব সম্প্রদায়ের ভক্তি ভাবের সাধারণ ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। তেমন একজন কবির গান থেকে উদ্ধৃত করা হল :

১। তারে রাজপুরে পাবিনারে জোকোরি
যতনেতে,
সেথা রুদ্র তাপে ক্ষুদ্র কলি
বাহিরেতে টুটে।
২। যারা অহংকারী অভিমানী রহে
চক্ষু মুদে,
হেথা তত্ত্ব জেনে মত্ত হল
রাখালেরা জুটে।
৩। তারে বিলাসীরা কোনমতে
চাহিল না ছুঁতে
পেয়ে কৃপাধন হৃষ্টমন হেরে চাষা মুটে।

বৈষ্ণব সঙ্গীতেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সকলেই নিরহংকার এবং নিরভিমান। তাই তারা না চাইতেই স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপা-লাভ করেছেন। শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম প্রভৃতি সখাগণ খেলাচ্ছলে কৃষ্ণের বিভূতি কতই না প্রত্যক্ষ করেছেন! মহাভারতেও দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ নিরভিমান এবং নিরহংকার পাণ্ডবদেরই সহায়তা করেছিলেন। উদ্ধত অহংকারী কৌরবদের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না। উপরিউক্ত গানেও ঠিক অনুরূপ ভাবটি ফুটে উঠেছে।

কতকগুলি সঙ্গীতগ্রন্থ অন্যান্য ভাষা থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যে অনূদিত হয়েছে। এবং অনুবাদ করেই অনুবাদক ক্ষান্ত হননি, দু একটি ক্ষেত্রে ইংরাজি স্বরলিপির নিয়ম অনুসারে গানগুলির স্বরলিপি করে দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে এই মিশনারী সম্প্রদায়ের অপরিসীম শ্রমের কথা ভুলবার নয়। কোন কোন পুস্তক-শেষের নামপত্রে সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া আছে। যেমন কোন একটি যীশুর জীবনী-মূলক সঙ্গীত পুস্তকের শেষের নামপত্রে একটি ছবির নীচে লেখা আছে—'নিদ্রিত যীশু উঠিয়া ঝড় থামান। লূক— ৮, ২২-২৫।

এই সকল গীত বা গীতসংহিতার সাহিত্যিক মূল্য যৎসামান্য বটে, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ভক্তি-মূলক কবিতা ও গীতের রীতিটি অনুকরণ করে এই সঙ্গীতরচয়িতা এবং অনুবাদকেরা যে আগ্রহ ও পরিশ্রমের নিদর্শন রেখে গেছেন, তাকে কখনই তুচ্ছ বলা চলে না। দেশের প্রচলিত সাহিত্যরূপগুলি অবলম্বন করে খৃষ্ট ধর্মের গুণগান করবার উদ্দেশ্য-বোধই ছিল এই রচনাগুলির প্রেরণা। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই রচনাগুলির সাহিত্যিক পর্যায়ে বা মানে উন্নীত হওয়া ত দূরের কথা, এগুলিতে ভাষার সামঞ্জস্য-বোধের অভাবও লক্ষ্য করা যায় অনেক জায়গায়। একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে ত বটেই একই রচনাতেও দু তিন রকমের বানানে ব্যবহৃত হয়েছে। আদর এবং মহিমা বোঝাতে 'কৃপাকে 'কৃপাধন' বলা হয়েছে। এরকম আরও বিচিত্র নিদর্শন শব্দ নির্বাচন ও বাক্য গঠন বিষয়ে দেখা গেছে। লেখকের বক্তব্যও অনেক ক্ষেত্রে প্রাঞ্জলতা পায় নি।

যাই হোক আমাদের বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে, রচনা-প্রয়াসের সার্থকতা-ব্যর্থতার কথা বাদ দিলে খৃষ্টীয় সঙ্গীত রচয়িতা-অনুবাদক-সংকলন-কারীদের আগ্রহ, অধ্যবসায়, সাহস এবং শ্রমের প্রশংসা করতে হয়।

থিওক্রিটাস

আশিস সেনগুপ্ত

শুভংকর সারা দিনের কাজের শেষে নদীর চরাভূমির ক্যাম্পঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। রেলের বড় কালভার্টটা যেখানে শীতের দিনেও জল জমে, চেনা-অচেনা নানা জাতের মাছ খেলা করে, ঢেউ তোলা বালুর উপর শুকনো হাওয়া এবং তোরষার শীর্ণ-ধারা বয়ে যায় শুভংকর সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারে মাছেদের চলাফেরা ও তাদের রূপ নিয়ে শুভংকরের কৌতূহল। গভীর বর্ষায় মধ্য রাতে তিন সেলের টর্চ হাতে সদাসমাপ্ত সেতুপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। পাহাড় প্রবাহিত জলধারায় তোরষার উত্তালতা ওকে অধীর করে। ও সেতুর উপরে নদীর মাঝখানে এসে দাঁড়াত। বৃষ্টির তোড় ছাতা ভেদ করে ওর চোখ-মুখ সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দেয়। নিশ্চুপ শুভংকর বৃষ্টিমাখা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

একদিন শোনা গেল জলদাপাড়ার বীট-বাবুর মাচাকরা বাড়ীর সামনে, যেখানে পোষা হাতীগুলো বাঁধা থাকে, গত রাতে এক বন্য হাতী এসে তার সুতীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কোন একটি পোষা হাতীকে বিদ্ধ করেছে, হত্যা করেছে। স্থানীয় বৈদারা যে দাবী করে তার বয়স পাঁচ কুড়ির বেশী, সে বলে—পূর্বে এমনটি আর ঘটে নি। যে ঘটনা বিগত শত বছরের মধ্যে ঘটে নি এবং তার পূর্বেও, সে ঘটনা এমন সহজভাবে ঘটে যেতে সমস্ত বনাঞ্চল, ভারী পাতারা কেঁপে ওঠে।

সাইট থেকে পালাল শুভংকর এবং বীটবাবুর বাড়ীর সামনে যখন হাজির দিনের শেষ ভাগ তখন। অঞ্চলটাতে আবাল-বৃদ্ধবনিতার চাপা গুঞ্জন। হাতীর মৃত্যুতে কিম্বা হাতীর সমাধি দেখবার জন্য।

চারদিকে একটা গন্ধ রা-রা ডাক ছেড়ে দস্যুর মত ছড়িয়ে পড়েছে। বৈদারের বড় ছেলে বিসরা দূরে থেকে দেখা কালো মেঘ পর্বতের মতো, হাতীর দেহ বেয়ে হিমালয়ে চড়বার ভঙ্গী, এক হাতে খুকরি অন্য হাতে কুড়ুল, তলপেটের ঢাল বেয়ে বিশাল বুক বুকের অস্থি তারপর ধীরে লেগে থাকা মুন্ড। বিসরা কুড়ুল তুলে শাল গাছের গুঁড়ি কাটার ভঙ্গীতে কোপ মারল হাতীর বুকে। লাফিয়ে ছিটকে এলো কুড়ুল। বিসরা কুড়ুল কাঁধে নিয়ে চার দিকে তাকাল। এবার নেমে এসে পেটের ঢালে দ্বিগুণ জোরে কুড়ুল চালাল এবং লক্ষ্য-ভেদ—সাফল্য। তারপর ক্রমাগত এইভাবে সে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো কর্দম পিচ্ছিল রক্তরস ছিন্ন ছিন্ন হাতীর শরীরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সকলে এক সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে শাবাশ বাহাদুর! শাবাশ!

শুভংকর এই মহাযজ্ঞের সবটা দেখার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তপতীর সঙ্গে হাসি বিনিময় করল তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে অনেকটা হেঁটে এসে হাতলহীন কাঠের পুলটার উপর দাঁড়ালো। নীচে জল তত স্পষ্ট দেখা যায় না। স্রোতের খরতায় অনুভবে আসে শুধু। শুভংকর তপতীর হাত দুখানা দুলিয়ে দিয়ে বলল—বাব্বা, মনে হয় কত দিন দেখি না। তুমি যেন... শুভংকরের কথা শেষ হলো না—তুমি তো বলেছিলে আসবে। তোমার আসার পথে স্থির তাকিয়ে থেকে আমার চোখ টনটন করে...। ওরা হোলং নদীর পাশ দিয়ে যে রাস্তা তপতীদের বাড়ীর দিকে চলে গেছে সেদিকে হাঁটছিল। পথের দু পাশে শাখাচ্যুত শিমুল পলাশ। ভুটানের গাড়ী-গুলি এসবের উপর দিয়ে চলাচল করায় রাস্তার প্রকৃত রঙ খুঁজে পাওয়া যায় না।

মনে হয় রক্তাক্ত বিবর্ণ পথ। ওরা অগ্রসর হচ্ছিল। অন্ধকারে তপতী থেমে গিয়েছে। শুভঙ্করের বুকে মাথা রেখে স্ফুট অধর-ওষ্ঠ সমর্পিত করে আবার বলল—তোমার আসার পথ চেয়ে চেয়ে আমার চোখ টনটন করে, ব্যথা করে। তারপর বইপত্র বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবি। ভাবি আমি বুঝি কোন দিন সন্ন্যাসী হয়ে যাব...। হঠাৎ, এরকম অদ্ভুত ভাবনা কেন? বলে শুভঙ্কর হো-হো হেসে ওঠে। ঘরের গাছের স্তব্ধ পাতাগুলি বুঝিবা কেঁপে ওঠে।

পরের ঘটনাবলী কিঞ্চিৎ দ্রুত এবং নাটকীয়ও বটে। কাজে অবহেলা ও অন্য-মনস্কতার অভিযোগে সাইট থেকে শুভঙ্করকে সদর অফিসে বদলি করা হলো। শুভংকর মনে মনে বলেছে—এই বদলির খুবই প্রয়োজন ছিল। সাইকেল চালাতে গেলে পায়ের পেশী ও জানুর যে শক্তি দরকার ক্রমশই ও যেন তা হারিয়ে ফেলছিল।

তপতী হস্টেল থেকে শুভঙ্করকে চিঠি লিখল, রেজিস্টার্ড চিঠি। লিখল : তুমি চলে আসার পর আমি আকাশের মতো একা হয়ে গেছি। সন্ন্যাসী হয়ে যাব ভেবে মাঝে মাঝে নিজেকে হাল্কা করে তুলি। সরস্বতী পুজোর সময় বাড়ী যাব। ভাল লাগবে না আমার। একটুও ভাল লাগবে না। তবে মুন্দু লিখেছে সরস্বতী পুজোর সময় রবিদা আসবে। রবিদাকে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। সেই যে মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করে। এডেন আর ডাবলিন থেকে চিঠি লিখেছিল। তোমাকে তো দেখিয়েছিলাম। আমাকে আবার দিদি বলে সম্বোধন করেছে, তারি তো ছোট আমার চেয়ে। ছোট না হাতী। ভাল কথা রবিদা এলে সেই হাতীর সমাধিদৃশ্য বর্ণনা করবো—ঠিক তোমার মতো করে এবং বীটবাবুর বাড়ীর সামনে নিয়ে যাব—রবিদাটা ভীষণ পাজি—সেই যে গত শীতে এসেছিল ভূতের গল্প বলে ভীষণ ভয় দেখায়—আর কেরাম খেলায় যা চোট্টামি করে না। রবিদা জাপানের নাইট ক্লাবের গল্প বলেছে—মুখে কিছু আটকায় না—ভীষণ অসভ্য। তার একটা টেপ রেকর্ড এনেছিল। ইংরেজীতে গান গাইল রবিদা—আমি আধুনিক গেয়েছিলাম; রবিদা বলে—আধুনিকে আমার গলা ভাল। তুমি তো বলেছ — রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার হয় না আদৌ। তুমি রবিদা সম্পর্কে ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট দিয়েছ — আমার কিন্তু ওর গল্পসল্প শুনলে গা ছমছম করে। সরস্বতী পুজোর সময় এসো কিন্তু। হোলং নদীর জল অনেক নেমে যাবে—স্নান করবার সখ ছিল তোমার। ওফেলিয়ার গল্প বলেছিলে। হোলং-এর কাছে গেলেই আমার ওফেলিয়ার কথা মনে পড়ে। সরস্বতী পুজোর সময় অবশ্যই এসো। জার্মানী ক্যামেরায় রবিদা যে সব ছবি তুলেছে দেখাব তোমাকে আর আমাদের খামার বাড়ীতে বেড়াতে যাব—তোমার খুব সখ ছিল।

আর একটা কাণ্ড হয়েছে—ফালাকাটায় তোমার সঙ্গে চারুলতা দেখতে গিয়ে-ছিলাম—তারপর প্রথম শোতে টিকিট না পেয়ে নাইট শোতে সিনেমা দেখে পর দিন সকালে বাড়ী ফেরা—রবিদার কানে গেছে—। টুনাটা আমাদের নিয়ে লাগিয়েছে। লাগাক গে। আমি অত ভয় পাই না!

তাছাড়া সরস্বতী পুজোর সময় তুমি তো আসবেই। তোমাদের তো ফায়ারিং রয়েছে বেগুনটারীতে। দেখো বাবা, সাব-ধান। তোমাকে বিশ্বাস নেই। সিকিউরিটি অফিসার নাকি বাবাকে বলেছে—তুমি তাদের ভরসা। দশ রাউন্ডের পুরো পয়েন্ট তোমাকে পেতেই হবে।

হস্টেলের সব মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার। নাইট গার্ডটা মাঝে মাঝে চিৎকার করছে—কোই হায়—খবরদার!

তারপর শুভংকর সরস্বতী পুজোর সময় ফায়ারিং-এ গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল তপতী একা। বেগুনটারী পাহাড়ের পাদ-দেশে বিস্তৃত সমতল ভূমি। অল্প ব্যবধানে তপতী বসেছিল একখানা ফোল্ডিং চেয়ারে। চোখে সান গ্লাস। গায় নীল রঙের পিওর মুর্শিদাবাদী সিল্ক। অল্প হাওয়াতেও ফুর ফুর করে উড়ছে। ফায়ারিং শুরু হবার আগে শুভঙ্কর তপতীর কাছে গিয়ে নীচু হয়ে কানে কানে বলল—দূরে থেকে তোমাকে আমার ভীষণ একা অবস্থায় দেখতে ইচ্ছে করে।

সেকেন্ড ব্যাচে শুভংকরদের ফায়ারিং শুরু হয়। প্রথম ব্যাচে একটা মদেশিয় মেয়ের উলঙ্গ কাঁধ রাইফেলের বাটের ধাক্কায় কেটে গিয়েছিল। ঐ মেয়েটি যেখানে শুয়ে ফায়ারিং করেছিল—সেখানকার মাটি ভিজে আছে রক্তে। শুভঙ্কর কাছে এসে জায়গা দেখল একবার।

ফায়ারিং শুরু হবে। শেষবারের মতো হুইসল বাজাল। শুভঙ্কর একেবারে দক্ষিণে। ওখানে থেকে তপতীকে দেখা যায়। পিঠ সোজা করে জানুর উপর জানু তুলে স্থির বসে আছে। ওস্তাদ শুভংকরের পাশে শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে বলল—পুরো পয়েন্ট চাই। ট্রিগার প্রথম দাবার পর নিশ্বাস বন্ধ করে ফায়ার। প্রথম পাঁচ রাউণ্ডে শুভংকর ওস্তাদের মন জয় করল। ওস্তাদ ওর কাঁধে হাত রেখে বলল—সাবাস! শুভংকর ভাবল—আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। ওস্তাদ টার্গেট বোর্ডটা তুলে নিয়ে এসে ওকে দেখাল—ঠিক মাঝখানে মাত্র একটি ছিদ্র হাঁ হয়ে আছে। আত্মবিশ্বাস এলো শুভংকরের। কনুই-এর নীচে তুলো দিল এবার। রাইফেলের বেল্টটা খুলে রেখেছে। নাকের সামনে সগন্ধ বারুদের ধোঁয়া। ও হাত উড়িয়ে তপতীকে উইশ করল। তপতীর গায় নীল আঁচল উড়ছে। চার দিকে ফুরফুরে হাওয়া। তপতীর দিকে আবার তাকাল শুভংকর। তপতীকে পরীর মত দেখাচ্ছে। সুন্দর অবিশ্বাস্য।

দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হবে। হাবিলদার সাহেব টার্গেটের সছিদ্র চোখগুলিকে কাগজ সাঁটিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এলো। দূর থেকে অবশ্যি বোঝা যায় না। ম্যাগাজিনে বুলেট ভর্তি হলো। শুভংকর কনুই তুলোর উপর রেখে বোল্টটা আকাশের দিকে মুখ করে রাইফেলটাকে কাত করে মাটিতে শুইয়ে রাখলো। অর্ডার হয়েছে। শুভঙ্কর এখন বাঁ-চোখ বন্ধ করে রাইফেলের বাট কাঁধে ঠেকাল এবং নোজের সঙ্গে বুল এক সরল রেখায় গেঁথে সেফটি ফেস ডাউন করল। চোখ খুলে একবার তপতীকে দেখল। তপতীকে অবিশ্বাস্য পরীর মতো লাগছে। শুভংকর পুনরায় বাঁ-চোখ বন্ধ করে কাঁধের সঙ্গে বাট যোজনা করে ট্রিগারে হাত রাখল। ট্রিগারের প্রথম দাবা আঙুলে চেপে দম বন্ধ করল। কিন্তু হৃদপিণ্ডের ধুকধুক শব্দে ওর শরীর নড়ছে। দেহের এই আন্দোলন শুভঙ্কর কিছুতেই থামাতে পারল না। ও ট্রিগার থেকে আঙুল তুলে তপতীকে দেখল। তপতী ওর দিকে ছুটে আসছে। গাঢ় নীল শাড়ি আকাশে লেপ্টে গেছে। নিরাভরণ দেহ। পরীর মত। রাইফেল হাতে শুভংকর তার লেটেবর অবস্থা চুরমার করে উঠে দাঁড়াল এবং কাঁধের সঙ্গে রাইফেল যোজনা করে বাঁ চোখ বন্ধ, ট্রিগারের প্রথম দাবা চেপে দম বন্ধ করে খারেবর অবস্থায় ফায়ার করল—পর পর পাঁচবার তপতীকে লক্ষ্য করে।

বিজ্ঞানের কথা

*পরিবেশ চাই মনুষ্য বাসের উপযোগী

*আবার নীলাকণ্ঠ

আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহের পরিবেশ ক্রমেই দূষিত ও মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। সেটা এতদূর পর্যন্ত যে জাতিসংঘের আওতায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে হয়েছে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে তখন এগারোদিনব্যাপী এই স্টকহল্‌ম পরিবেশ সম্মেলনের দুটি দিন মাত্র পার হয়েছে এবং কয়েকটি বক্তৃতার বিবরণ মাত্র আমরা পেয়েছি। তবে দুঃখের বিষয়, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বা জি ডি আরকে পূর্ণ অধিকার সহ এই সম্মেলনে যোগ দিতে না দেওয়ার প্রতিবাদে চীন রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া বাদে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কোনো দেশ এই সম্মেলনে যোগ দেয় নি। বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দেশগুলি ও বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ না দেবার ফলে সম্মেলন পূর্ণাঙ্গ হতে পারল না, সাফল্যমণ্ডিত হবে কিনা তাও বলা শক্ত। কেননা, ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এখনো পৃথিবীর যে-দুটি দেশ—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা—তারা একটি এই সম্মেলনে অনুপস্থিত থেকে গেল। তবে বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে এখনো পৃথিবীর অন্য যে-দুটি দেশ—চীন ও ফ্রান্স—তারা দুজনেই এই সম্মেলনে উপস্থিত। এই দুটি দেশের উপস্থিতিতে সম্মেলন যদি অন্তত পক্ষে বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করতে পারে তাহলে সেটা সম্মেলনের বড়ো রকমের সাফল্য হিসেবে গণ্য হবে। পরিবেশ দূষিত হওয়ার বিষয়টি এত গুরুতর যে সম্মেলন যাতে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় সেদিকেই সবিশেষ প্রয়াস থাকা উচিত ছিল। রাজনৈতিক কারণে (জি ডি আরকে পূর্ণ অধিকার সহ যোগ দিতে না দেওয়া) সম্মেলনের অংগহানি ঘটানো কোনোক্রমেই উচিত হয় নি। নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকা পর্যন্ত খেদের সংগে মন্তব্য করেছেন, সম্মেলনটি যদি হত পশ্চিমজার্মানীর টেনিস-দলের দলত্যাগীর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য তাহলে জি ডি আর যোগ না দিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু পরিবেশ-সংক্রান্ত সম্মেলন থেকে পৃথিবীর অষ্টম শিল্পোন্নত রাষ্ট্রকে (অর্থাৎ জি ডি আরকে) বাদ দেবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

আজকের পৃথিবীতে জলবায়ু দূষিত হচ্ছে কেন? প্রধানত কলকারখানার ধোঁয়ায় ও কলকারখানা থেকে বর্জিত পদার্থে। ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে জাপানে কয়েকটি কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়েছে জলবায়ু মারাত্মক রকমের দূষিত হওয়া বন্ধ করার জন্য। দূষিত জলবায়ুর দরুন জাপানে মানুষ মরছে, এমনও শোনা যায়। জাপানের মতো আমেরিকাতেও এই সমস্যাটি সমান কিংবা আরও বেশি তীব্র। এই দুটি দেশে কলকারখানার ধোঁয়া ও বর্জিত পদার্থ এত বেশি যে জলবায়ু বিশুদ্ধ রাখা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যার তীব্রতা কম-বেশি অন্য প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কল-কারখানা স্থাপন করাটা সামগ্রিক একটা পরিকল্পনার অংগ। ফলে গোড়া থেকেই, কলকারখানা স্থাপন করার ফলে জলবায়ু যাতে দূষিত না হয় সেদিকে খানিকটা নজর এসে যায়। এ-কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জলবায়ু দূষিত হওয়ার সমস্যাটা পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো এতটা তীব্র নয়। স্টকহল্‌ম সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ দিলে গোটা সম্মেলনের পক্ষেই সেটা লাভের ব্যাপার হত।

আমাদের মতো দেশ—যাদের সোজাসুজি ভাষায় বলা হয় 'উন্নতিশীল'—সেখানে কলকারখানার বিস্তার অবশ্য ততোটা ব্যাপক নয়, কাজেই সমস্যাটিও তেমন তীব্র হওয়া উচিত নয়। তা সত্ত্বেও, কম তীব্র—একথাও বলা চলে না। আমাদের দেশে এই সমস্যার মূলে রয়েছে প্রধানত অবিবেচনা ও অদূরদৃষ্টি। একটি দৃষ্টান্ত দিই। বারাউনির তৈল শোধনাগারের বর্জিত পদার্থ নির্বিচারে গংগার জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বারাউনি থেকে নিচের দিকে এই নদীর জল দূষিত হবেই এবং দূষিত হওয়ার মাত্রা বাড়তে বাড়তে এক সময়ে নিম্নগাংগেয় অঞ্চলের স্বাস্থ্য অবশ্যই বিপন্ন করে তুলবে।

আসল সমস্যা শুধু কলকারখানার ধোঁয়া ও বর্জিত পদার্থই নয়। পৃথিবীর তাবৎ দেশের—কি শিল্পোন্নত, কি শিল্পানুন্নত—একটি বড়ো সমস্যা, আবর্জনা অপসারণ। সমস্যাটি যে কত বড়ো তা বোঝা যায় আমেরিকার একজন নাগরিককে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরলে। পৃথিবীর এই সবচেয়ে ধনী দেশের এই নাগরিকটি তার মোটরগাড়ি ও তার ঘরগৃহস্থালির যন্ত্রপাতির মধ্যে নিদেনপক্ষে ১১ টন ইস্পাত নিজের চারপাশে খাড়া করে রেখেছে। এই ইস্পাত কোনো না কোনো সময়ে আবর্জনা হয়ে যায় ও এমনিভাবে সে সারা বছরে টনখানেক আবর্জনা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে থাকে। এ-প্রসংগে উল্লেখ করা চলে, আমেরিকার এই নাগরিকটি তার যান্ত্রিক আয়োজনের সাহায্যে যতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, মানুষের দ্বারা তা সম্পন্ন করতে হলে ৪০০ দাসের প্রয়োজন হত। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম যেসব দেশে বাস করে তারা বিশ্বের মোট আয়ের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি ভোগ করে থাকে।

অবশ্যই আমাদের মতো 'উন্নতশীল' দেশে মাথাপিছু আবর্জনার পরিমাণ আমেরিকার মতো এত বেশি নয়। কিন্তু তাও যে কতখানি তা কলকাতা শহরের যে-কোনো রাস্তার দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়। অন্য আবর্জনার কথা ছেড়ে দিলেও, কলকাতার রাস্তায় (আস্তাকুঁড়ে বা ডাস্টবিনে খুবই কম) যতো শালপাতার ঠোঙা ও ডাবের খোলা পড়ে তা জড়ো করলে সারা বছরের হিসাবের না হোক খুদে একটি পর্বত হতে পারে।

'উন্নতিশীল' দেশের শহর হওয়া সত্ত্বেও কলকাতায় আবর্জনা অপসারণের সমস্যা একটু বেশি মাত্রায় প্রকট। কিন্তু কি উন্নতিশীল কি উন্নত, কোনো দেশের শহরই এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। কাজেই সমস্যাটির একটি সাধারণ সমাধান হওয়া দরকার। এমন একটি সমাধান যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিশেষ ভাবনাচিন্তা করছেন, বিশেষ করে
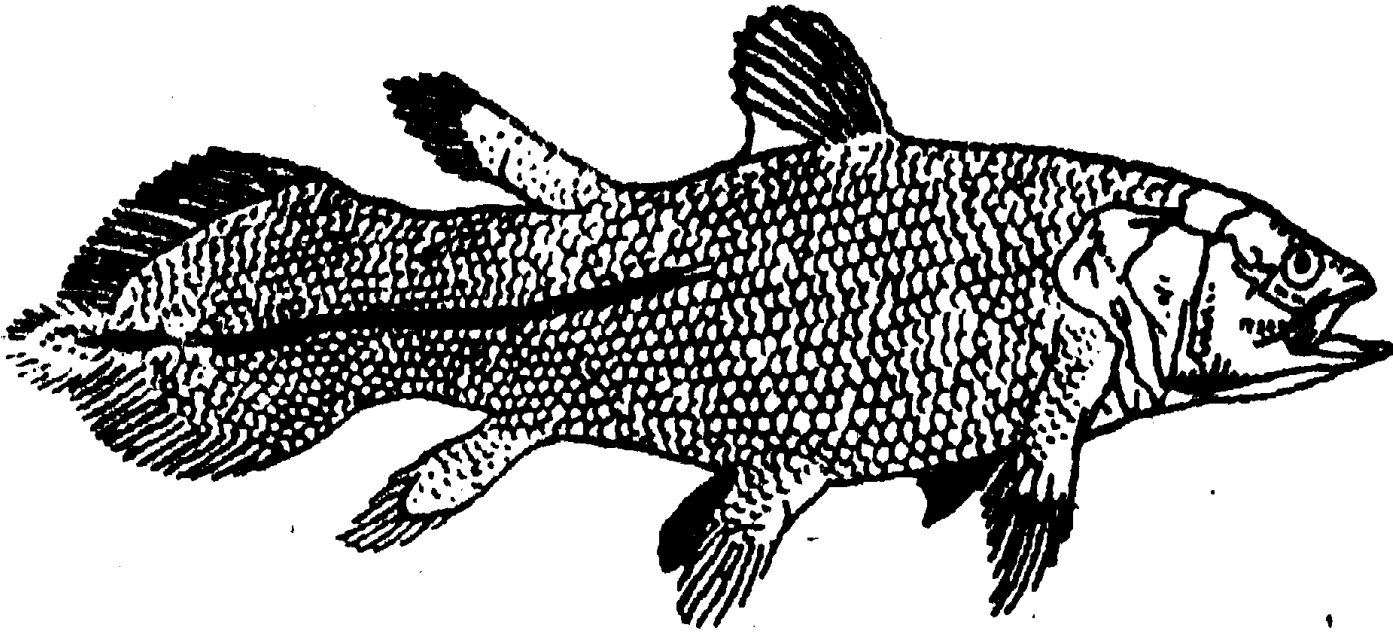
আমেরিকার বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের মতে, আবর্জনা সরিয়ে ফেলাটাই কোনো কাজের কথা নয়, চাই তার ব্যবহার। অর্থাৎ এমন কোনো একটা টেকনিক যার সাহায্যে আবর্জনাকে কাজে লাগানো যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। আবর্জনা ব্যবহারের টেকনিক নিয়ে যে ৫৫টি প্রকল্পে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন, দৃষ্টান্তটি তারই একটি।

পরীক্ষামূলক এই ইউনিটটির নাম সি-পি-ইউ ৪০০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনকল্যাণ বিভাগের মঞ্জুরীকৃত অর্থে তৈরী। ইউনিটটি কাজ করে এইভাবে : ময়লা, টিনের কৌটো ও শিশিবোতল, কাগজ ইত্যাদির যে স্তূপটিকে বলা হচ্ছে আবর্জনা তাকে প্রথমে এই যন্ত্রের সাহায্যে ফালি-ফালি করে চিরে ফেলা হয়, তারপরে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে পৃথক করা হয়, আবর্জনার মধ্যে থেকে এইভাবে ধাতু ও কাচের টুকরোগুলোকে আলাদা করে নিয়ে আবার ব্যবহার করা হয় কাঁচামাল হিসেবে, বাদবাকি যে অংশ পড়ে থাকে সেগুলো জৈব পদার্থ—সেগুলোকে তখন পোড়ানো হয়, তা থেকে যে উত্তপ্ত গ্যাস পাওয়া যায় তার সাহায্যে চালিত হয় একটি গ্যাস-টারবাইন জেনারেটর (বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য) ও বাড়তি উত্তাপ ব্যবহার করা হয় জলকে বাষ্প করার জন্য (যার সাহায্যে আরো একটি জেনারেটর চালিত হতে পারে)।

এমনি আরো চুয়াত্তরটি প্রকল্প নিয়ে আমেরিকায় কাজ হচ্ছে। আসল কথা, কোনো কিছুই ফেলে দেওয়া নয়, কোনো কিছুই বর্জন করা নয়—আবার ঘুরিয়ে ব্যবহার করা। কলকারখানার বর্জিত পদার্থ সম্পর্কেও একই কথা।

আমাদের এই গ্রহের পরিবেশ মনুষ্য-বাসের অনুপযোগী হয়ে ওঠার আরো অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে একটিকে বিজ্ঞানীরা বড়ো রকমের আশঙ্কার কারণ বলে মনে করে থাকেন। তা হচ্ছে ট্যাঙ্কার থেকে সমুদ্রের জলে তেল পড়া। এর ফলে সমুদ্রের জলে ভাসমান উদ্ভিজ্জ (ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন) মারা পড়ে। অথচ আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস নিই তার এক-চতুর্থাংশই তৈরি করে সমুদ্রের জলে ভাসমান এই উদ্ভিজ্জরা, যারা রয়েছে সমুদ্র ও বাতাস যেখানে মিশছে সেই-খানটিতে। সমুদ্রের জলে তেল পড়ার ফলে আরো অনেকরকম ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু তুলনায় এইটিই সবচেয়ে মারাত্মক।

পরিবেশ ব্যাহত হতে পারে আরো নানা কারণে, এমনকি জেট-বিমান চলাচলের জন্যেও। শুধু শব্দ হওয়াটাও কম ক্ষতিকর নয়। সুপারসোনিক জেট-বিমান যখন শব্দের গতিবেগ অতিক্রম করে তখন প্রচণ্ড একটি আওয়াজ হয়ে থাকে, যা অত্যন্ত বিরক্তিকর। সুপারসোনিক জেট-বিমান ওঠানামা করে এমন বিমান-ঘাঁটির কাছাকাছি যাঁরা থাকেন তাঁরা অনেকে অনবরত এই আওয়াজ শুনতে শুনতে প্রায় পাগলের মতো হয়ে যান।

রাজা-মহারাজাদের আমলে নাকি জলের শব্দ ও ফুলের সুবাস ছাড়া পথ হত না। পথ দিয়ে হাঁটলে এখন আর ফোয়ারা ও বাগান চোখে পড়ে না। তার বদলে থাকে আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, কংক্রিটের দেওয়াল, ধোঁয়াটে আকাশ, গর্জমান যানবাহন, সুতীব্র গোলমাল, দূষিত জল ও স্তূপীকৃত আবর্জনা। আর আছে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা। এই গ্রহের মানুষের ভবিষ্যৎ কী?

তার ওপরে আছে একদল জঘন্য অপরাধী যারা গায়ের জোরে অপর দেশের পরিবেশ পাল্টে দিতে চায়। আমেরিকানরা ভিয়েতনামে রাসায়নিক বোমা ফেলে ভিয়েতনামের জমি নিষ্ফলা করে দিয়েছে, গাছপালা নিশ্চিহ্ন করেছে, গোটা দেশকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে। ফলে ভিয়েতনামের পরিবেশ ও প্রাণিজগৎ প্রকাণ্ড একটা সর্বনাশের মুখে। যুদ্ধের নামে পরিবেশ ও প্রাণিজগতের সর্বনাশ ঘটানো অবিলম্বে বন্ধ হোক, স্টকহল্‌ম পরিবেশ সম্মেলনে এই দাবিও উঠেছে।

বোঝাই যাচ্ছে স্টকহল্‌ম পরিবেশ সম্মেলনের দায়িত্ব অনেক এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বের সকল দেশের সহযোগিতা চাই। স্টকহল্‌মে পরিবেশ সম্মেলনকে এই দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতির দিকে অগ্রসর হতে হবে।

সীলাকন্থ—জীবন্ত ফসিল

দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূল থেকে প্রথমটি পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে। দ্বিতীয়টি চোদ্দ বছর পরে—১৯৫২ সালে। তারপরে আরো কয়েকটি। সবক'টিই ছিল মৃত। আর শেষেরটি পাওয়া গিয়েছে ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ—জীবন্ত।

আবার সীলাকন্থ এবারে জীবন্ত

গত ২২শে মার্চ রাত দুটোর সময়ে কোমোরো দ্বীপের আইকনি গ্রামের একজন জেলে উপকূল থেকে প্রায় ৬০০ মিটার দূরে সমুদ্রে মাছ ধরছিল। তার নাম মেদি ইউসুফ কার, বয়স ৬৩। স্থানীয় জেলেরা যে-ধরনের ডিঙি নৌকো ব্যবহার করে তেমনি একটা নৌকোতে সে এসেছে আর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ফেলেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই বঁড়শিতে ঠোকর টের পায়। টেনে তুলতেই, কী কাণ্ড, আবার সেই সীলাকন্থ। মাছটি তার পরিচিত, আগেও ধরেছে, আর মাছটির বদলে কী মোটা পুরস্কার পাওয়া যাবে তাও সে জানে। সঙ্গে সঙ্গে সে তীরে ফিরে আসে, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী-দের শিবিরে খবর পাঠায়। হ্যাঁ, একদল বিজ্ঞানী ১লা জানুয়ারি থেকে সমুদ্র-তীরে শিবির গেড়ে বসে আছেন। তাঁরা এই বিশেষ মাছটি জীবন্ত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করতে চান। ৪ঠা জানুয়ারি তারিখেও একটি সীলাকন্থ ধরা পড়েছিল, কিন্তু সেটি জীবিত থাকে নি: বিজ্ঞানীরা তাই অপেক্ষা করছিলেন, অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে যে যার দেশে ফিরে যাবেন স্থির করেছিলেন—এমন সময়ে এই কাণ্ড! একটি জীবন্ত সীলাকন্থ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন তাঁরা।

বিজ্ঞানীদের যে দলটি জীবন্ত সীলাকন্থ পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোমোরো দ্বীপে হাজির হয়েছিলেন (কোমোরো দ্বীপের অবস্থান মোজাম্বিক প্রণালীতে, মাদাগাস্কারের উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলের মধ্যবর্তী এলাকায়), তাঁরা বিশেষ কোনো একটি দেশের নন—নানা দেশের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান ব্রিটিশ ও ফরাসী। অর্থাৎ একটি আন্তর্জাতিক দল। বিজ্ঞানীরা নিজেরাই তৎপর হয়ে এই আন্তর্জাতিক দলটি গড়ে তুলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, আর কিছু নয়, শুধু একটি সীলাকন্থকে জীবন্ত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করা।

সীলাকন্থ নিয়ে বিজ্ঞানীদের তৎপরতা অবশ্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। সেই ১৯৩৮ সাল থেকেই চলে আসছে, যখন

সমুদ্রের এই এলাকা থেকে প্রথম সীলাকান্থটি পাওয়া গিয়েছিল।

ব্যাপারটা কী, সীলাকান্থ নিয়ে বিজ্ঞানীদের এত মাথাব্যথা কেন? সীলাকান্থ হচ্ছে, সঠিকভাবে বলতে হলে, জীবন্ত ফসিল। ফসিল আবার জীবন্ত হয় নাকি? এক্ষেত্রে তাই। আজ থেকে ৩৫ কোটি বছর আগে পুরাজীবীয় যুগের ডেভোনিয়ান কালে এই প্রাণীটি বেঁচে ছিল এবং ধরে নেওয়া হয়েছিল যে আজ থেকে ৭ কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে এই প্রাণীটি লোপ পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা এতদিন এই প্রাণীটি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে এসেছেন ফসিল থেকে, যেমন তাঁরা খবর সংগ্রহ করেছেন আরো আগের ও আরো পরের অন্যান্য বহু প্রাণী সম্পর্কে। মোটামুটি ফসিলের খবর থেকেই তাঁরা খাড়া করেছেন ক্যাম্ব্রিয়ান থেকে হোলোসিন পর্যন্ত ৫০ কোটি বছরে জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাসটি। চোখের সামনে জীবন্ত অবস্থায় সামান্য কয়েকটিকেই মাত্র তাঁরা দেখেছেন। যদি দেখতে পেতেন তাহলে ইতিহাসটি নিশ্চয়ই আরো পূর্ণাঙ্গভাবে খাড়া করতে পারতেন। দেখতে পাবেন, এমন কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

কিন্তু কী আশ্চর্য, দেখতে পেয়ে গেলেন এবং এমন এক সময়ের যখন সমুদ্রের জীব ডাঙায় উঠে আসতে চাইছে। সমুদ্রের জীব চাইলেই ডাঙায় উঠে আসতে পারে না, সেজন্য তার শরীরে উপযুক্ত আয়োজন চাই। সীলাকান্থ এমন একটি জীব যার শরীরে এই আয়োজনটির লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে।

তাহলে এই একটি জীব—এই সীলাকান্থ—যে নাকি ডাইনোসরদেরও চেয়েও বেশ কয়েক কোটি বছর আগেকার কালের, যে নাকি চতুষ্পদীদের পূর্বপুরুষ রিপিডিস্টিয়ানদের সমগোত্রীয়—অর্থাৎ মানুষেরও—তাকেই এবার জীবন্ত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞানীরা তাই সীলাকান্থ নিয়ে এতখানি তৎপর, এতখানি আগ্রহী। জীবজগতের বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের একজন প্রতিনিধিকে জীবন্ত অবস্থায় দেখার সুযোগ তাঁরা পাবেন—ঘটনাটি সত্যি সত্যিই না ঘটলে কিছুতেই তাঁরা বিশ্বাস করতে পারতেন না।

১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন অগ্রগণ্য মৎস্যবিদ জে এল বি স্মিথও বিশ্বাস করতে পারেন নি।

খৃস্টমাস শুরু হতে তখনো কয়েকদিন বাকি। দক্ষিণ-আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলের জেলেরা একদিন একটা অদ্ভুত মাছ তুলে আনল। সমুদ্রের তলা থেকে অদ্ভুত চেহারার মাছ উঠে আসাটা জেলেদের কাছে নতুন কোনো ঘটনা নয়, এমনকি তারাও এবারের মাছটা দেখে অবাক হল। এমনটি তারা আগে কখনো দেখে নি। মাছটি তারা দিয়ে এল স্থানীয় যাদুঘরের কিপারের কাছে। কিপার চিঠি লিখে জানালেন জে এল বি স্মিথকে।

অধ্যাপক স্মিথ মাছটি দেখতে এলেন খৃস্টমাসের পরে। মাছটির তখন পচা-গলা অবস্থা। কিন্তু সেই অবস্থাতে দেখেও অধ্যাপকের মুখে আর কথা সরে না। সত্যিই কি একটি সীলাকান্থ দেখছেন তিনি! এই জীবটির তো আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে লোপ পাবার কথা। অথচ এই মাছটি কিনা দশদিন আগেও সমুদ্রের জলে জীবন্ত অবস্থায় চলাফেরা করেছে!

একটি যখন পাওয়া গিয়েছে, আরেকটি নয় কেন? অধ্যাপক স্মিথ উঠে-পড়ে লাগলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, তিনি দমলেন না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, সমুদ্রে পাড়ি দিলেন, সীলাকান্থের ছবি সহ ইস্তাহার বিলি করলেন—যে কেউ দ্বিতীয় আরেকটি সীলাকান্থ ধরে এনে দেবে তাকে তিনি মোটা পুরস্কার দেবেন।

কিন্তু মনে হতে লাগল, বৃথা চেষ্টা। একটি একটি করে বছর ঘুরতে লাগল, কিন্তু কোথায় সীলাকান্থ, একটি দেখা দিরেই একেবারে বেপাত্তা।

দ্বিতীয়টি ধরা পড়ল প্রথমটি ধরা পড়ার চোদ্দ বছর পরে, ১৯৫২ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে। একই এলাকায়, একই সময়ে—খৃস্টমাস শুরু হবার দিনকয়েক আগে। তবে অধ্যাপক স্মিথ যখন দেখতে পেলেন ততোদিনে সীলাকান্থ দশদিনের পুরনো হয়ে গিয়েছে।

তৃতীয়টি ধরা পড়ল ১৯৫৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। চতুর্থটি ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে, পঞ্চমটি ফেব্রুয়ারিতে।

কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় একটিও নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের যৌথ তৎপরতায় অবশেষে তাও সম্ভব হল।

সীলাকান্থের বৈশিষ্ট্য কী?

সাধারণ মাছের মতো সীলাকান্থেরও পাখনা আছে, কিন্তু পিঠের দিকে একটি পাখনা বাদ দিলে সীলাকান্থের অন্য কোনো পাখনাই সাধারণ মাছের মতো নয়। সীলাকান্থের এই অন্য পাখনাগুলোতে শরীর থেকে প্রথমে বেরিয়েছে এক ঢিবি মাংস আর মাংসের ঢিবি থেকে কতকগুলো কাঁটা—সাধারণ মাছের পাখনায় কাঁটাগুলো সরাসরি শরীর থেকে নির্গত।

সীলাকান্থের এই ঢিবি-পাখনার আছে তিনটি হাড়, যেমন আছে মানুষের হাতে; কতকগুলো ছোট ছোট চ্যাপ্টা হাড়, যেমন আছে মানুষের কব্জিতে।

অর্থাৎ, সীলাকান্থের পাখনা পুরোপুরি পাখনা নয়, অনেকখানি পা-ও। এই পাখনার সাহায্যে সীলাকান্থের পক্ষে মাটিতে চলাফেরা করাটাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

সীলাকান্থের নাকের ফুটোর সঙ্গে গলার যোগ আছে, সাধারণ মাছের বেলায় যা নেই। অর্থাৎ ডাঙার নিশ্বাস নেবার একটা আয়োজন সীলাকান্থের শরীরে গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

অর্থাৎ, জলের জীব যখন ডাঙার উঠে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছে, সীলাকান্থ সেই সময়কার জীব।

এমন একটি জীব নিয়ে বিজ্ঞানীরা হৈ-চৈ করবেন বৈকি, বিশেষ করে জীবটি যেখানে ফসিল নয়—জীবন্ত।

এই জীবন্ত ফসিলটিকে পর্যবেক্ষণ করে কী কী খবর জানতে পেরেছেন তা এখনো জানা যায় নি। শুধু খানিকটা বিবরণ পাওয়া গিয়েছে সীলাকান্থ কি-ভাবে চলাফেরা করে। জীবন্ত অবস্থায় সীলাকান্থটিকে খুব বেশিক্ষণ রাখা যায় নি—মাত্র রাত্তিরটুকু।

বেশ কিছু পরীক্ষাকার্য শেষ হলে তবেই পর্যবেক্ষণের ফলাফল জানা যাবে। সেটা সময়ের ব্যাপার।

মঙ্গলগ্রহের তুষার-কিরীটে জলের সন্ধান

মেরিনার-৯ থেকে মঙ্গলগ্রহের যেসব ছবি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণমেরুর ছবিগুলো সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। দক্ষিণের পুরো গ্রীষ্মটা পার হবার পরেও দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ মেরুর সাদা টুপিটি সম্পূর্ণ উঠে যায় নি, কিছুটা থেকে গিয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই স্থায়ী সাদা টুপি সম্ভবত জল-জমা বরফের অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। সাদা টুপির সবটাই যদি হত কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুষার তাহলে গ্রীষ্মের উত্তাপ সেটিকে সম্পূর্ণ লোপ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এই উত্তাপ এমন প্রচণ্ড নয় যে জল-জমা বরফকে গলিয়ে দিতে পারে। অতএব ধরে নিতে হয়, সাদা টুপির যেটুকু অংশ থেকে গিয়েছে সেটুকু হচ্ছে জল-জমা বরফ। এক সময়ে মঙ্গলগ্রহে যদি প্রচুর জল থেকেও থাকে তাহলেও এখন তার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দক্ষিণমেরুর দিকে-থাকা টুপির অংশটুকু মাত্র। পেঁয়াজের খোসার মতো পাতলা কার্বন ডাই-অক্সাইডের আবরণ গ্রীষ্মের উত্তাপে লোপ পাবার পরে জল-জমা বরফের এই টুপি বেরিয়ে পড়েছে।

—অরুণকান্ত

বঙ্গনবাব' বঙ্গনায়িকা

দুর্দানা বেগম
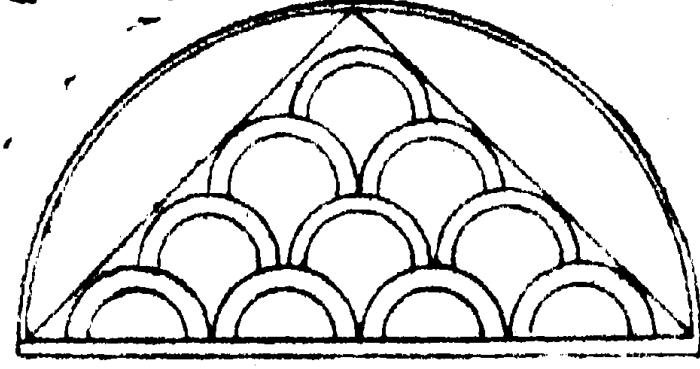
অংশুরঞ্জন সেন

সতেরো শ' চল্লিশ সনের নই এপ্রিল। একটা চাঞ্চল্যকর খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁর পতন ঘটেছে। মুর্শিদাবাদের একটু দূরে গিরিয়ার যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত। আর সেই বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক হচ্ছেন বিহারের ডেপুটি গভর্নর আলিবর্দী খাঁ। এক অস্বাভাবিক নিয়মে ইতিহাসের পট পরিবর্তন হল।

এমন একটা খবর অপ্রত্যাশিত ছিল না অনেকের কাছেই। নারী ও সুরাসক্ত সরফরাজের কোন সদ্‌গুণ ছিল না শুজাউদ্দীনের মত। বড় বড় সামন্তসর্দার প্রভৃতি সকলেই ছিলেন তাঁর ওপর রুষ্ট। এঁরা সবাই মিলে শক্তিমান পুরুষ আলিবর্দীর শরণাপন্ন হন। ওদিকে আলিবর্দীর মনেও ছিল বাংলার নবাব-মসনদ পাবার দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষা। এদের সকলের সমর্থন পেয়ে তিনি তাঁর প্রাক্তন প্রভু নবাব শুজাউদ্দীনের পুত্রকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করলেন না। তাই সেদিনের ঐ খবর বাংলার বাতাসে তেমন উত্তেজনা ছড়ায় নি।

কিন্তু তা আলোড়ন আনল বাংলার অধীন ওড়িশা রাজ্যে। এর শাসনকর্তা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন নবাব শুজাউদ্দীনের জামাই, আর তাঁর পত্নী দুর্দানা বেগম হলেন সরফরাজের বৈমাত্রী বোন। দুর্দানার ব্যক্তিত্বের কাছে মুর্শিদকুলী ছিলেন নিষ্প্রভ। বেগমের দৃঢ়তা, তেজস্বিতা এবং প্রবল উচ্চাশার কাছে হার মেনেছিলেন তিনি। সেদিনের বাংলার রাজনীতির ওপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেন এই নারী। দেশে তার স্বামীর চেয়েও বেশি মর্যাদার অধিকারী হন তিনি। সরফরাজের হত্যাকাণ্ড মুর্শিদকুলীর চেতনার ওপর কোন রেখাপাত করে নি। কিন্তু তা আগুন জ্বেলে দিল দুর্দানার মনে। প্রতিশোধের স্পৃহায় তিনি অস্থির হলেন, চঞ্চল হলেন।

দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর নিষ্প্রভতার মূলে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বহীনতা এবং নিজের অপ্রসন্ন মনোভাবও। নবাব শুজাউদ্দীনের অনুগ্রহে তিনি ওড়িশার শাসনভার পান। আর তাঁরই সুপারিশে দিল্লির সম্রাট তাঁকে রুস্তম জঙ্গ উপাধি দেন। কিন্তু শুজাউদ্দীনের ছেলে সরফরাজ ছিলেন অন্য প্রকৃতির মানুষ। তিনি আশঙ্কা করলেন যে তাঁর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পর রুস্তম জঙ্গ তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে পারেন। তাই তিনি রুস্তম জঙ্গের ছেলে ইয়াহিয়া খাঁ এবং তাঁর স্ত্রী দুর্দানা বেগমকে মুর্শিদাবাদে আটকে রাখেন। যদিও এই ঘটনা মুর্শিদকুলীর মনে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি করল তবু তা নীরবে সহ্য করা ছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য কোন উপায় রইল না। তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে ওড়িশায় পৌঁছে মীর হাবিবুল্লা খাঁকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করলেন। মুর্শিদকুলী জাহাঙ্গীরনগর অর্থাৎ ঢাকার শাসনকর্তা থাকাকালীন ইনি এই একই সহকারী পদে বহাল ছিলেন। কূটনীতির সাহায্যে এবং রাজনীতি ও শৌর্যবলে মীর হাবিব ওড়িশার সমস্ত অবাধ্য জমিদারদের কঠোরভাবে দমন করেন। আর তা করে তিনি তাঁদের শৃঙ্খলাপাশে আনতে সফল হন। ওড়িশার সুসম্পূর্ণ সংগঠন ও ব্যবস্থার রূপায়ণে তিনি কোন উপায় তুচ্ছ করেন নি, আর তার বাজেয় উন্নতির সৃষ্টি করলেন।

১৭৩৯ সনের শেষদিকে নাদির শা যখন মহারাজধানী আক্রমণ করেন তখন নবাব শুজাউদ্দীন অসুখে শয্যাগত। সে সময় তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর স্ত্রী দুর্দানা বেগম ও তাঁর ছেলে ইয়াহিয়া খাঁকে ওড়িশায় যাবার অনুমতি দেন, আর সরফরাজ খাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। সে বছরই শুজাউদ্দীন মারা যান আর তাঁর জায়গায় বাংলার মসনদে বসেন পুত্র সরফরাজ খাঁ।

কিন্তু রাজ্যশাসনে অমনোযোগ সরফরাজ চারদিকে এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন। তিনি তাঁর অন্তঃপুরের কয়েক-শো কামিনী নিয়ে আনন্দে মত্ত থাকতেন। তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিলেন আলিবর্দী খাঁ। বেইমানী করে তিনি তাঁর প্রভুপুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এই বিদ্রোহের প্রারম্ভে নবাব সরফরাজ তাঁর শ্যালক মুর্শিদকুলীর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠান। কিন্তু মুর্শিদকুলী ব্যক্তিগত আক্রোশের দরুন তাঁর সাহায্যে এগোতে দেরি করেন। পরে যখন সেনাপতির নেতৃত্বে একটি দল পাঠাতে ব্যস্ত ছিলেন তখন হঠাৎ তিনি সরফরাজ খাঁর পতন এবং সুবে বাংলার ওপর আলিবর্দীর প্রভুত্ব কায়েম হওয়ার সংবাদ পেলেন। আর তখনই তাঁর ঘুম ভাঙল এবং লজ্জায় ও দুঃখে ডুবে গেলেন তিনি।

এবার আলিবর্দী দৃঢ়ভাবে তাঁর রাজগদিতে বসে শাসনের প্রতিটি বিভাগ শ্রেণীবদ্ধ করে সাজালেন। এখন ঐ মূল ব্যাপার সহজ করে নেওয়ার পর তিনি সবদাই তাঁর অভীষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর বাহুশক্তি এবং মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান সঞ্চয় করতে লেগে গেলেন। আর তা করে তিনি গড়ে তোলেন বিজয়ী সেনাদলের একটি বাহিনী এবং জয়লাভের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি পরিপূর্ণ অস্ত্রবহর। কিন্তু দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী নিজেকে এরকম একজন শত্রুর সমকক্ষ হওয়ার কথা ভাবেন নি। তাই তিনি সুরাটের অধিবাসী আগা মুহম্মদ তকী নামে একজন অনুচরকে পাঠালেন আলিবর্দী খাঁর অভিপ্রায় পরখ করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। আর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল দুটি পথে। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে একদা যে প্রত্যক্ষ পরিচয় বর্তমান ছিল তার প্রতি সম্মান দেখান হল। দ্বিতীয়তঃ এই দূতের অসাধারণ নিপুণ আচরণে তাঁর মেধার প্রশংসা করে বিশেষ উপাধি এবং মর্যাদায় ভূষিত করা হল তাঁকে। এভাবে একটা তৃপ্তির মধ্যে তিনি বিদায় নিলেন।

কিন্তু এইসব শুভ সূচনা অচিরেই নষ্ট হয়ে গেল দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর জামাই মির্জা বাকের আলি খাঁর ষড়যন্ত্রে। ইনি ইরানের সেফী রাজবংশজাত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। এবার মুর্শিদকুলী খাঁর বেগমও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। বেগম বাংলার মূল্যবান উপহারসামগ্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আর তারই সঙ্গে তাঁকে সরফরাজ খাঁর ঘাতকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষোভ দেখানর ঔচিত্য সম্পর্কে বোঝালেন। এই দুজন উত্তেজিত মানুষ একসঙ্গে মিলে এমন সুচারুভাবে কাজ সম্পন্ন করার উপায় বার করলেন যে অধুনা সমাপ্তপ্রায় সন্ধির ইতি ঘটল। অথচ মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে এ সন্ধির ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ছিলেন।

আলিবর্দী খাঁ তাঁর এই মানসিক পরিবর্তনের কথা শুনে লিখলেন যে ঐ মহান শাসকের অনিষ্ট করা কিংবা তাঁকে কোনরকম ক্ষতির মধ্যে ফেলার কোন ইচ্ছা তাঁর অন্তরে নেই। কিন্তু যাই হোক কটকে তাঁর দীর্ঘতর অবস্থান দুদলের পক্ষেই শান্তি গড়ে তোলার কাজ দুঃসাধ্য করে তুলবে। তাই তিনি এই আশা করলেন যদি না মুর্শিদকুলী প্রকৃতই কটক থেকে এখনই দাক্ষিণাত্যের প্রতিবেশী দেশে যাওয়া আরো বাঞ্ছনীয় মনে করেন তাহলে তাঁর পক্ষে যাবতীয় সম্পদ সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে আত্মীয় মুর্শিদাবাদের ভেতর দিয়ে হিন্দুস্তানে যাওয়া সুবিধাজনক হবে। আর কেউ এরকম খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটত। কিন্তু কটকের শাসনকর্তা তাঁর বিপক্ষের রণপ্রতিভা এবং দক্ষতর বাহিনীকে ভয় করতেন বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ ছেড়ে তাঁর সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাতে চাইলেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর উদ্দেশ্য কার্যকরী করে তুলতেন যদি না তাঁর জামাইয়ের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবগুলি তাঁর মনে সাহস এবং আত্মপ্রীতি জাগিয়ে তুলত। তাঁর এই অতি তেজস্বী জামাই এরকম উদ্ধত ভাষা সহ্য করতে পারেন নি, আর তা ছাড়া বাংলার মত এমন একটি দেশে একবার কর্তৃত্ব করার আশায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বিদ্বেষ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই ভাবগুলি দুর্দানা জোরালোভাবে সমর্থন করলেন। এই তেজস্বিনী বেগম আর স্থির থাকতে পারলেন না। এবার তিনি আরো কঠোর, আরো দৃঢ়চেতা হলেন। তিনি স্বামীর সামনে তুলে ধরলেন সরফরাজের মর্মান্তিক পরিণতির চিত্র। আর তাঁর এই ভাইয়ের ঘাতক কেমন নিরুপদ্রবে স্বচ্ছন্দ আধিপত্য ভোগ করে চলেছেন—সেই অপযশের কথা শুনিয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে কখনো অনুনয় কখনো তীব্র ভর্ৎসনা করে নিয়ত উত্ত্যক্ত করে তুললেন। তাতেও যখন কোন ফল হল না, তখন তিনি অনুনয়ের পথ ছেড়ে ভয় দেখাতে শুরু করলেন। এমন কি একথাও বললেন যে তিনি এরকম একজন ভীরু স্বামীকে পরিত্যাগ করে তাঁর

জামাইকে এই রাজাসনেতে নিজের যা কিছু সব ঐশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে দেবেন এবং তাঁর দাবি-দাওয়াগুলি তাঁকেই জানাবেন। এই যুবার মেজাজ ছিল যেমন উগ্র তেমনই ছিলেন তিনি একজন চক্রান্তকারী। দুর্দান্ত আলিবর্দী খাঁর প্রতি তাঁর ঘৃণাকে জোরদার করাবার পক্ষে এই যুবককে স্বভাববৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ যোগ্য বলে মনে করলেন। এই দুজন মানুষের প্রবল প্ররোচনায় পরাভূত হয়ে মুর্শিদকুলী তাঁর মন পাল্টালেন। তিনি তাঁর বাংলার প্রতিবেশীকে প্রতিনিধি মারফত লিখে পাঠালেন যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেসব প্রাথমিক আলাপ-আলোচনায় তিনি মত দিয়েছিলেন তা তিনি এখন তুলে নিচ্ছেন। আর কেবল তরবারিই তাঁদের নিজ নিজ দাবিগুলি নির্ধারণ করবে। আলিবর্দী পুরোমাত্রায় সচেতন হলেন যে এখন যুদ্ধ না করে আর কিছুই পাওয়া যাবে না। আর তিনি সেই অনুযায়ী উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি বাংলার শাসনকাজ এবং নগরীর তত্ত্বাবধানের ভার তাঁর দাদা হাজী আহমেদ আর তাঁর ভাইপোর হেফাজতে দিলেন। এরপর তাঁর বাছাই-করা দশ-বারো হাজারের বাহিনী পুনরীক্ষণ করে এবং নগর ছাড়ার একটি শুভ মুহূর্ত দেখতে পেয়ে ওড়িশার দিকে যাত্রা করলেন।

এমন এক টুকরো সংবাদ শিগগির-ই কটকের রাজসভাকে জানানো হল। যুদ্ধে অটল মুর্শিদকুলী এখন তাঁর সম্পর্কে নিজের মানুষদের মন বাজিয়ে দেখা উপযুক্ত মনে করলেন। তিনি তাঁর বন্ধু এবং সেনাবাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাদের জড় করে হলঘরে এলেন আর কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর কোমরবন্ধ থেকে বাঁকা তলোয়ার বার করে সভার মাঝখানে রেখে তিনি আলিবর্দী খাঁর অপরাধের কথা প্রাণবন্ত ভাষায় বর্ণনা করলেন। আর তা করে তিনি তাঁর সেই অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর আলোকপাত করলেন, যার প্রভাবে পড়ে তিনি শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েও পরিতৃপ্ত না হয়ে নিহত নবাবের বোনের সামান্য যা কিছু সম্পত্তিও হরণ করে নিতে উচ্চাভিলাষী হয়েছেন। অপরদিকে আলিবর্দী যুদ্ধ আর তাঁর অভিমত অনুযায়ী সকলকে ত্যাগ করার কথা ছাড়া অন্য কিছুই বলছেন না। এই ভাষণ যেন অনুমোদনের সঙ্গেই গ্রহণ করে তাঁর সেনাবাহিনীর মুখ্য কর্তা আবিদ আলি খাঁ সভার নামে তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি তাঁদের আনুগত্য এবং ঘাতকের প্রতি তাঁদের অতিবিরূপ মনোভাবের ওপর আস্থা রাখতে পারেন। এরকম একটি পরিবেশে শাসনকর্তার মন শান্ত স্থির হলে, তিনি নিজে কেবল লড়াইয়ের প্রস্তুতির কথাই চিন্তা করতে লাগলেন।

তারপর একদিন তাঁর সেনাদল সমাবেশ করে আর জামাই মির্জা বাকের আলি খাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কটক ছেড়ে তাঁর দেশের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বালেশ্বর ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন আর সেই শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত বুড়াবলঙ নদী পেরোলেন। তারপর তাকে ছাড়িয়ে কয়েক মাইল অগ্রসর হয়ে তিনি একটা নির্দিষ্ট স্থানে শিবির ফেললেন। এই জায়গাটির প্রায় সবটুকুই একটা ছোট নদী দিয়ে ঘেরা ছিল। খাড়া এবং উঁচু ছিল এর তীর। নদীটির নাম ফুলওয়ার। মুর্শিদকুলী তাঁর দলের স্বাভাবিক শক্তিতে তুষ্ট না হয়ে সামান্য দুর্বল অংশগুলিতেও কয়েকটি পরিখা খনন করলেন। তারপর তিনি সমস্ত জায়গাটাই বড় এবং ছোট তিনশো কামান দিয়ে সারিবদ্ধ করে সাজালেন। এভাবে তিনি তাঁর শিবিরকে এমন এক ভয়াবহ রূপ দিলেন যার ফলে তাঁকে স্বস্থান থেকে সরানো অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল।

আলিবর্দী খাঁ যখন মেদিনীপুর ছাড়ালেন তখন এমনই ছিল অবস্থা। বালেশ্বরের দিকে এগিয়ে তিনি একটি ভয়ঙ্কর শক্তির [illegible] চেহারা দেখতে পেলেন, যার সম্বন্ধে সংবাদ যোগাড় করে কিছুমাত্র ধারণা তাঁর হয়েছিল। তিনি তাঁর স্বাভাবিক সাহসটুকু হারিয়ে ফেললেন। বাংলার সীমান্তবর্তী জমিদাররা তাঁর শিবিরে সামরিক যান পাঠাতে অবহেলা করতে লাগলেন। এদিকে খাদ্যবিক্রেতারাও সরবরাহের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ফলে খাদ্যদ্রব্য খুবই মহার্ঘ হয়ে গেল, আর অবশেষে দুর্লভ ও মন্দা হয়ে পড়ল। এরকম এক অবস্থায় মুর্শিদকুলী শুধু ধৈর্য ধরতে চাইলেন, আর এটা তাঁর ইচ্ছে ছিল যে আলিবর্দী নিজেকে ক্ষয়ে ফেলুন। কিন্তু এমন বিলম্ব তাঁর জামাইয়ের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনি আলিবর্দীর দর্শনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আর তাঁর চরম দুর্দশার কথা জানতে পেরে একেবারে অকস্মাৎ রেগে বাইরে গিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। মুর্শিদকুলী অনেক আপত্তি করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মির্জা বাকেরের প্রচণ্ডতায় দমে গেলেন। আর একই বছরে 'জিলকাদ' বা হিজরী সনের একাদশ

মাসের প্রায় শেষাশেষি তিনি তাঁর শক্তি-শালী ঘাঁটি ছেড়ে প্রতিপক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।

সংঘর্ষের সূচনায় মির্জা বাকের অন্ধভাবে সামনে এগোতে গিয়ে তাঁর সেই পরিত্যক্ত অংশটি খালি রেখে যান। প্রতিপক্ষ তা বুঝতে পেরে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে এর সমস্তটাই দখল করে নিল। লড়াই পূর্ণবেগে শুরু হল। উভয়পক্ষে অগণিত সাহসী যোদ্ধা মরতে লাগল, কিন্তু তবুও ব্যাপরটা একটা অনিশ্চিতভাবের মধ্যে ছিল। আর অপরদিকে মুর্শিদকুলী সাহসের সংগেই তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে-ছিলেন। এই সংকটজনক মুহূর্তে সেই আবিদ খাঁ—যিনি একদিন ওড়িশার রাজ-সভায় মুর্শিদকুলীর কাছে আনুগত্যের শপথ করেছিলেন, তাঁকে তাঁর সেনাদলসমেত আলিবর্দীর আফগান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেল। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর সংগে চুক্তি করেছিলেন।

কিন্তু এমন কতব্যচ্যুতিও মুর্শিদকুলীর মনকে নাড়া দিল না। তাঁর সেনারা যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। শুধু তাঁর একদল সৈয়দ সেনা (এরা দিল্লির উত্তর-পূবে অবস্থিত বরহা জেলার অধিবাসী) প্রবল বীরত্বের সংগে এগিয়ে এমন সবলে এক আঘাত হানল যার ফলে বিপক্ষ দল তাদের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে অক্ষম হয়ে হটে যেতে শুরু করল, আর এমন কি বাংলার সেনাদলের কেউ কেউ প্রকাশ্যে পালিয়ে গেল। মুর্শিদকুলীর জামাই মির্জা বাকের এতক্ষণ ডানদিকে যুদ্ধ করছিলেন। এবার তিনি ঐ ঘাঁটি ছেড়ে গিয়ে শত্রুপক্ষের বাঁদিক আক্রমণ করলেন। আর তা করে তিনি তাদের এমন ভীষণ বিশৃংখলার মধ্যে ফেলে দিলেন যে সেনারা প্রকৃতই হটে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁর আক্রমণে তিনি নিজেই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন। বিপক্ষ বাহিনীর এই অংশটি পরিচালনা করছিলেন সেনাপতি মীরজাফর খাঁ। তিনি সেই চরম মুহূর্তে দারুণ তেজস্বিতায় আত্মপ্রকাশ করে যুদ্ধের মোড় দিলেন ঘুরিয়ে।

লড়াই ঘোরালো এবং রক্তাক্ত হয়ে উঠল। মীর মুহব্বৎ আলি আর মীর আকবর নামে সৈয়দদের দুজন সেনাপতি অনেকগুলো মারাত্মক আঘাত খেয়ে একেবারে লুটিয়ে পড়লেন, আর অন্য দিকে মির্জা বাকের নিজে গলায়, মাথায় এবং বুকে কয়েকটি ভীষণ ঘা খাওয়ার ফলে তাঁদের সেনারা আতঙ্কিত হয়ে সরে পড়তে লাগল। মির্জা বাকের নিজেকে তুলে ধরতে অক্ষম হলে তাঁকে রণক্ষেত্রের বাইরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মুর্শিদকুলী এখন তাঁর ওপর ভাগ্য অপ্রসন্ন দেখে, কি করে পশ্চাদপসরণ করা যায় সে-কথাই শুধু চিন্তা করতে লাগলেন। এরপর তিনি তাঁর আহত জামাইকে একটা পালকিতে তুলে বালেশ্বরের দিকে ফিরলেন আর সেখানে প্রায় তিন হাজার মানুষ নিয়ে আশ্রয় নিলেন। এখন তিনি তাঁদের ছেড়ে পালানোর জন্য নানা ছলের আশ্রয় নিলেন। তিনি তাঁর সেনাদের কুচকাওয়াজ করিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন আর এক প্রান্তে কিছু মাটি ফেলে বোঝাই করলেন। একই সময়ে নদীর দিকে ঘুরে তিনি যেন কিছু জলযোগ গ্রহণ করার ইচ্ছায় তাঁর হাতি থেকে নেমে পড়লেন। তখন নদীতীরে তাঁর এক অতি পুরনো বন্ধুর জাহাজ যাত্রার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। মুর্শিদকুলী তাঁর পার্শ্বস্থিত কারো সংগেই পরামর্শ না করে শুধু যেন জাহাজ দর্শন আর প্রমোদ উপভোগের জন্যে ডেকের ওপর যাবার অভিপ্রায় জানালেন। আর সংগে কিছুই না নিয়ে তিনি তাঁর জামাই এবং অল্প কয়েকজন অতি উপযোগী ভৃত্য-সমেত জাহাজে পৌঁছুলেন। জাহাজটি তৎক্ষণাৎ নোঙর তুলে যাত্রা করল। ছদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এটি মসলিপত্তমে পৌঁছল।

কিন্তু মুর্শিদকুলীর মনে শিগ্‌গির-ই উৎকণ্ঠা ফিরে আসে। বালেশ্বরের দিকে এগোনর সময় তিনি তাঁর পত্নী দুর্দানা বেগম এবং পুত্র এহিয়া খাঁকে বিশাল ধন-দৌলতসমেত কটকের বরাবাটির দুর্গে রেখে এসেছিলেন। বিশেষ করে বেগম এবং শিশুদের চিন্তায় তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হল। তিনি তাই তাঁর জামাইকে ওড়িশার সীমান্তবর্তী শহর সিকাকুল এবং গঞ্জামের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এই শহরগুলির সংগে কটকের এক বিরাট আদান-প্রদান ছিল। ভগবানের করুণায় ইতিমধ্যেই তাঁর পরিত্যক্ত পরিবারের জন্যে একজন রক্ষা-কর্তার [illegible] ঘটে [illegible]। [illegible] হলেন রাতিপুরের দুর্গাধিকারীর রাজা এবং মুর্শিদকুলীর একজন [illegible] বন্ধু। [illegible] [illegible]রের জন্যে তি[illegible] [illegible], এক শক্তি-শালী রক্ষ[illegible] [illegible] মুরাদ নামে তাঁর রাজসংসারের [illegible] বিশ্বস্ত উচ্চ পদাধিকারীর অধীনে।

শাহ্‌ মুরাদ ঠিক সময়ে পৌঁছে মুর্শিদকুলীর পরিত্যক্ত পরিবার এবং ধন-দৌলতের সংগে তাঁর সমস্ত আসবাবপত্র, তাঁর প্রতিটি মানুষ এবং চাকরকেও নিলেন। আর সময় নষ্ট না করে তিনি যাত্রা করলেন এবং সমস্ত ওড়িশা পার হয়ে তাঁর পরিচালনাধীন সব মানুষ ও জিনিসপত্র নিয়ে নিরাপদে ইচ্ছাপুরে গিয়ে পৌঁছুলেন। এটি সিকাকল এবং গঞ্জামের অধীন একটি শহর ও জেলা। সেখানে কিছুদিন বাদে মির্জা বাকের এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখান থেকে বেগমকুল এবং তাঁদের ধনসম্পদ নিয়ে মসলিপত্তমের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে মুর্শিদকুলীর সংগে মিলিত হয়ে তাঁরা দাক্ষিণাত্যে এগিয়ে এর শাসক আসফ জাহ্‌-র অধীনে আশ্রয় নিলেন।

এভাবে ঘটল একটি উচ্চাশার অপমৃত্যু। নবাবী শাসনের অন্তরালে এর যে বীজ একদিন অংকুরিত হয়েছিল, পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই তা ঝরে পড়ল সহসা। আর তারই সংগে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তেজীয়সী নারী দুর্দানার সব আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা। যে প্রবল আবেগে একদা তিনি তাঁর স্বামীর ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়েছিলেন, ভ্রাতৃহত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁকে ঠেলে দিয়েছিলেন যুদ্ধের পথে, আঠারো শতকের একজন পর্দানশিন নারীর পক্ষে তা কল্পনাতীত। হয়তো সুষ্ঠু সুযোগের অভাবে তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এর জন্যে শক্তিমান আলিবর্দীকে যে দুঃসহবেগ পেতে হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিয়েছে।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু সুহৃদ গোপাল দত্ত

বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব
একীভবন্তি।
—(মুণ্ডক, ৩।২।৭)

ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে,
পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে।
—(প্রশ্ন ঃ ৬।৫)

১৯২৬ সালের সোনালী উষা ভাগবতী শক্তির আবাহন বার্তা সংকেতে পণ্ডিচেরীর আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিলে। পরা-চৈতন্যের আবাহনে ধ্যানমগ্ন শ্রীঅরবিন্দের দেহমনের প্রতিটি অণু-পরমাণু জ্যোতির্লোকের অদৃশ্য তরঙ্গের ক্রমাগত আসা-যাওয়ার উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। তিনি ক্রমশ আশ্রমের বাস্তব-জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করলেন। বছরের প্রথম থেকেই আশ্রমের এবং আশ্রমবাসীদের সমস্ত কিছুর ভার শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার হাতে সমর্পণ করে দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যা গড়েছেন এবং যা গড়বেন সেই সৃষ্টিকে সংধারণ এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধনের দায়-দায়িত্ব নেবেন বলেই তো আদ্যাশক্তির প্রতিমা শ্রীমা এসেছেন পণ্ডিচেরীতে। দেখতে দেখতে বছরের ছটি মাস কেটে গেল।

সেই সময় তাঁর আলাপ-আলোচনা থেকে আশ্রমবাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, উচ্চতম অতিমানস আর মনের স্তরের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টাই তিনি করছেন। তিনি এই মধ্যবর্তী স্তরের নাম দিয়েছিলেন অধিমানস। ১৯২০ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত এই ছ' বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দ যে ঊর্ধ্বচেতনাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার সাধনা করছিলেন সেই অবতরণই সংঘটিত হল ২৪শে নভেম্বর, ১৯২৬ সালে।

১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন সাধন-পথের মহান সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হল। মানুষের মনে দিব্য-বিবর্তন ক্রিয়া স্বীয় সাধন-প্রতিভায় ত্বরান্বিত করে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করলেন যে, বিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে জীবদ্দশায় ব্রহ্মবিজ্ঞানী হয়ে অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব। এই চিরস্মরণীয় দিনে তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দময়ের অমৃত স্পর্শ উপলব্ধি করে জীবন্মুক্ত হলেন। তাঁর নির্মাণমুক্তি যজ্ঞের সাফল্যের একান্ত প্রয়োজনীয় সেই পরা-চেতনা বা অতিমানসের পৃথিবীতে অবরোহণের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হলো। দৃশ্য এবং অদৃশ্য সমস্ত লোকে ঘোষিত হলো—পৃথিবীর বুকে এই নতুন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাববার্তা—মুখরিত হলো আগতপ্রায় দেবজাতির জনক শ্রীঅরবিন্দের জয়গানে।

১৯২০ সালের ৭ই এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ নিজের সাধনার ঊর্ধ্বগতি সম্বন্ধে বারীন্দ্রকে লিখেছিলেন—"যত উঁচুতে উঠি, মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের (স্পিরিচুয়াল ইভোলুশান) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠার আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চেতনা, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার মূল কথা। এরূপ হওয়া সহজ কথা নয়। ঐ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা সম্পর্কেও মন্তব্য করেছিলেন—'এই পনেরো বৎসরের পরে' (অর্থাৎ ১৯০৫ সালে মারাঠী যোগী লেলের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পরে) 'আমি এইমাত্র বিজ্ঞানের তিনটি স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার মধ্য দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দেবেন, এর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে।(১৭)

১৯২০ সালের ৭ই এপ্রিল তিনি যে 'বিজ্ঞান সিদ্ধি'র সাফল্যের কথা লিখেছিলেন, ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর তিনি সেই সিদ্ধি লাভ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিজ্ঞানময় পুরুষ হলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—শুরু (তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে')। এই স্মরণীয় দিনটিকে তিনি 'বিজয়ের দিন' বলেছিলেন। তাঁর কথায়—

> "November 24, 1926, was the descent of Krishna into the physical. Krishna is not the supramental Light. The descent of Krishna would mean the descent of the Overmind Godhead preparing, though not itself actually the descent of supermind and Ananda. Krishna is the Anandamaya, he supports the evolution through the overmind leading it towards the Ananda."

---

(১৭) শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাবলী পৃঃ ২০৬৮ (প্রথম খণ্ড)

আজান-দেব (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩৩) শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনের ব্রহ্মচর্য পর্যায়ে বৈদিক ঋষিদের উচ্চারিত — 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।' (ঋগ্বেদ ১০।১৩।১) — বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এক চিরন্তন প্রার্থনা নিয়ে জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন নিজেকে—'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'। তাঁর জীবনের নিরন্তর কামনা—'তত্র মাম্ অমৃতম কৃধি'—জীবদ্দশায় সফল হয়ে উঠেছিল ২৪শে নভেম্বরে। তিনি অনুভব করেছিলেন সেই পরমজ্যোতিঃ এবং তাঁর অন্তঃস্থ জ্যোতিঃ অভিন্ন। তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী হলেন। কারাজীবনে শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছিলেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য—৩।১৪।১) অথবা 'বাসুদেবঃ সর্বম ইতি' (গীতা, ৭।১৯)। এখন তিনি জ্ঞানের গুহ্যতম তত্ত্ব উপলব্ধি করলেন: 'একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ (বৃহ, ৪।৪।২০) অর্থাৎ নানাত্ব তাঁর নিকট নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়—তিনি সুস্থিত থাকেন। স্ফুলিঙ্গ-বিন্দু বিবর্তিত হয়ে যেমন অলাত-চক্র রচনা করে ঠিক সেইভাবে এই বিশাল বিশ্বের নানাত্ব তাঁহারই মায়ার বিবর্ত—এর নিবৃত্তি তাঁহাতেই।

নমঃ পরম ঋষয়ে। পরম-ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ২৪শে নভেম্বর জ্যোতিস্নান করে জীবন্মুক্ত হলেন। ঐ সময়ে তাঁর সন্নিকটে অম্বুভাই পুরাণী, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ যে ২৪ জন লীলাসহচর উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেই স্মরণীয় দিনে পণ্ডিচেরীর আশ্রমবাসীদের মধ্যে এক বর্ণনাতীত নৈসর্গিক সংবেদনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

ব্রহ্মে যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, জীবে তাহা বীজভাবে স্থিত। সেই অর্ধব্যক্ত বা অঙ্কুরিত সম্ভাবনাকে সাধনার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করবার জন্যেই জীব-বীজকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়। সাধক তপস্যার পথে এই ক্রমাভিব্যক্তি—অব্যক্তের ব্যক্তিভবন — বা ক্রমবিবর্তনকে সম্পূর্ণ করে তোলেন। এই সম্পূর্ণতাই যোগ। যোগে যোগী ব্রহ্মবিজ্ঞানী হয়ে পরাগতিপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা তাঁর মধ্যে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি ঘটিয়েছিল—তিনি সচ্চিদানন্দের ভাবে মহোজ্জ্বল হয়ে জীবন্মুক্তি লাভ করেছিলেন। জীবন্মুক্তের সামনে দুটি পথ দুই ভিন্ন মুখে প্রবাহিত—একটি নির্বাণ-মুক্তির পথ, অন্যটি নির্মাণমুক্তির পথ। শ্রীঅরবিন্দের সামনে এই পথ নির্বাচনের প্রশ্ন আসবার আগেই তিনি মনস্থ করেছিলেন যে, তিনি নির্বাণ-

শ্রীমা

মুক্তি বরণ করে বিশ্বের মুক্তিকামী জীবগণকে পরিত্যাগ করবেন না। প্রহ্লাদের মতোই তিনি স্ববিমুক্তিকামী না হয়ে বললেন, 'নৈতান বিহায় কৃপণান বিমুমুক্ষ একো। নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে'। (ভাগবত, ৭।৯।৪৩)। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বের মুক্তিকল্পে নির্মাণমুক্তি বরণ করে নিলেন। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে ঐরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষকে 'আধিকারিক' আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ অধিকারী পুরুষ অধিকার-সমাপ্তি পর্যন্ত স্বীয় অধিকারের ভার বহন করবেন। শঙ্করাচার্য বলেছেন, জীবন্মুক্ত পুরুষ সাধনবলে ভগবানের জগদ্ব্যাপার কার্যে সাহায্য করছেন এবং যিনি যে কার্যের অধিকারে নিযুক্ত তিনি সেই অধিকারের সমাপ্তি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবেন। যেমন বর্তমান কল্পে যে জীবন্মুক্ত পুরুষ বিশ্বমণ্ডলে উত্তাপ ও আলোকদানের গুরুভারের আধিকারিক হয়েছেন, তিনি কল্প পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সূর্যের জীবনী শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখবার ভার বহন করবেন।

জীবন্মুক্ত পুরুষদের মধ্যে যাঁরা পরার্থনিষ্ঠ হয়ে নির্বাণের চরম সুখকেও অবহেলা করে জগতের হিতার্থে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের তালিকা বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। দেবগণও মুক্ত পুরুষ। পূর্বকল্পের সাধনায় তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা নির্বাণ তুচ্ছ করে জগতের হিতার্থে বিভিন্ন ভার বহন করছেন। অধিকার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তাঁরা ভার বহন করে যাবেন। তারপর অপর সিদ্ধপুরুষ সেই ভার বহনে ব্রতী হবেন। তবে এ'দের কোন প্রত্যাশা নেই। যেমন ভগবান গীতাতে নিজের কর্ম সম্পর্কে বলেছেন—*ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।' (গীতা, ৩।২২)। কারণ তিনি যদি কর্ম না* করেন তবে সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে—'উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্যাং কর্ম চেদহং।' (গীতা, ৩।২৪)। বুদ্ধদেব পরিনির্বাণের অধিকারী হয়ে নির্বাণমুক্তির পথে যাবার উপক্রম করার সময়ে নিখিল বিশ্বের মর্মভেদী আর্তস্বর শুনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতদিন একটি জীবও অমুক্ত থাকবে ততদিন তিনি জীবকল্যাণে রত থাকবেন। তিনি আজও আছেন এবং অধিকার-পরিসমাপ্তি পর্যন্ত থাকবেন।

আদ্যাশক্তির প্রতিমা শ্রীমা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ কল্প পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বিশ্বের পূর্ণমুক্তির অধিকার নিয়ে প্রয়োজনমত পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করছেন এবং করবেন। তাঁর আবির্ভাব সেই পরম পুরুষের অবতরণ — যা ইতিহাস রচনা করবে এবং যার কীর্তি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই অবতরণ দিব্যলীলার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যে পরিণামের মধ্যে সনাতন ধর্মের সংরক্ষণ রক্ষাকবচ অনন্ত-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
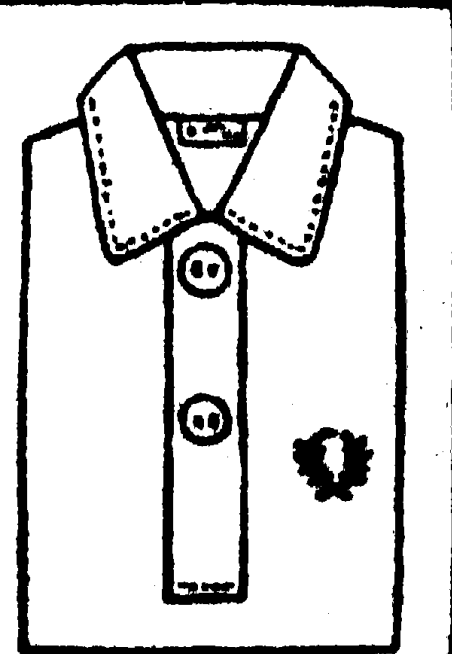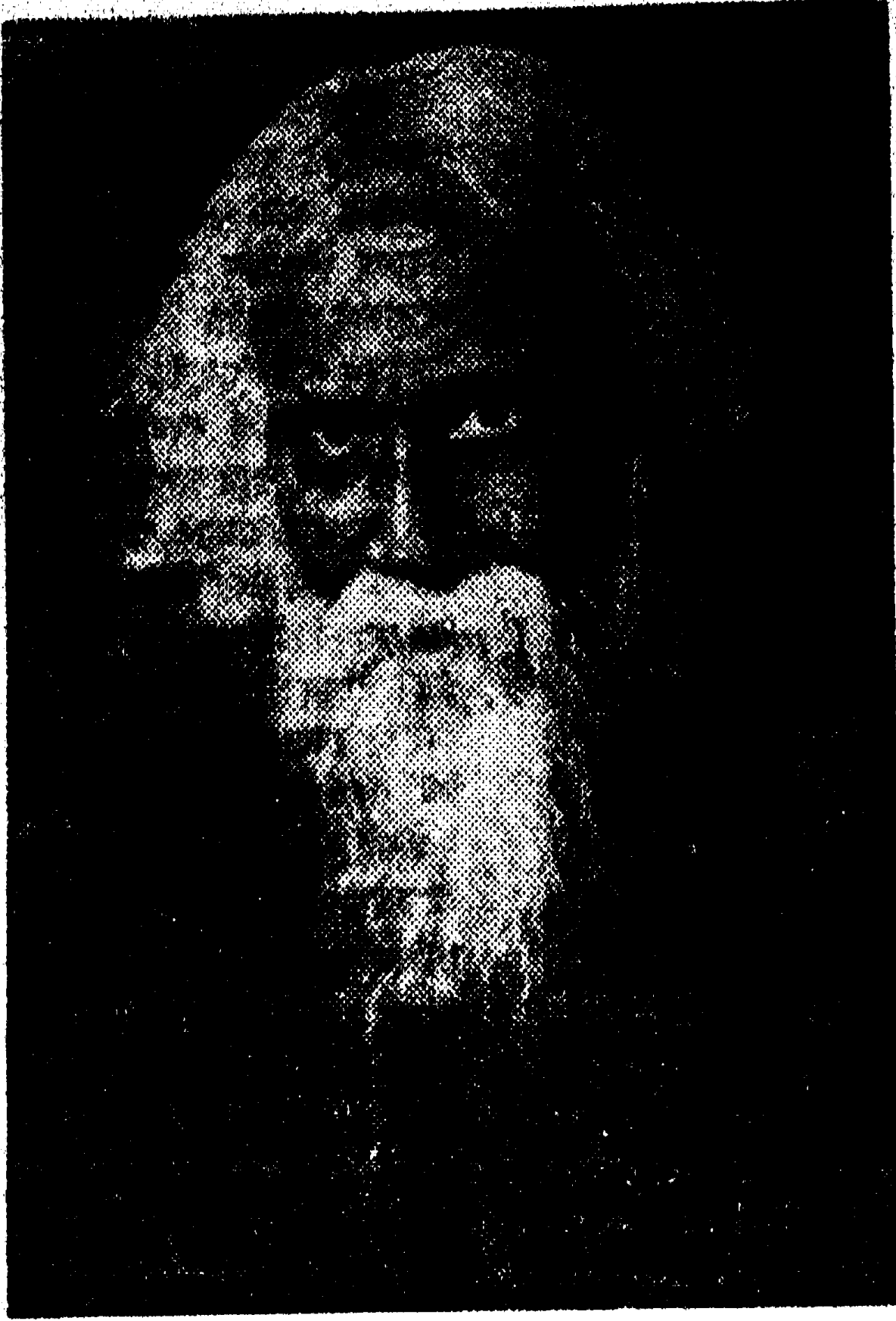
কাল ধরে আছে এবং থাকবে। তাঁর আবির্ভাব যুগে যুগে ঘটবেই কারণ এই ঘটনা পরা-চেতনা বা সচ্চিদানন্দময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত — এই ঘটনা তাই অপ্রতিরোধ্য।

প্রবীণ সাধক পবিত্রের ভাষায়, অনেকের ধারণা হতে পারে যে, শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন ব্রহ্মে অথবা নির্বাণে। কিন্তু শ্রীমা আমাদের বলেছেন, এবং আমাদের উপলব্ধিতেও তার সাড়া পাই যে, শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সঙ্গেই আছেন, থাকবেন, কেবলমাত্র প্রেরণার উৎসরূপে নয়, জীবন্ত সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে, আলো এবং শক্তির জনকরূপে—যত দিন না তাঁর অধিকার-পরিসমাপ্তি হচ্ছে 'অর্থাৎ যতদিন না অতিমানস চেতনা সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করছে এবং প্রকট হচ্ছে। শ্রীমা আমাদের বলেন নি কত বছর বা শতাব্দী লাগবে...এবং তা নিয়ে মাথা ঘামানও অনর্থক যদি আমরা সব-কিছু বিশ্বজনীন অথবা মানব-বিবর্তনের মাপকাঠি দিয়ে দেখতে শিখি।'

অজ্ঞান-দেব শ্রীঅরবিন্দ দিব্য-মহিমায় যে একজন 'আধিকারিক বা অধিকারপ্রাপ্ত পুরুষ' ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'কারাকাহিনী'তে। তাঁর জন্ম বিশ্ব-কল্যাণের জন্য, বিশ্বমুক্তির জন্য, নির্বাণ লাভের জন্য নয়—এই সত্য তিনি কারা-জীবনের শুরুতে না বুঝলেও পরে বুঝেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আমি তখন লোকের সঙ্গে মিশিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, সেই সময়ে আমার সাধনা খুব জোরে চলিতেছিল। সমতা, নিষ্কামতা ও শান্তির কতক কতক আস্বাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও সেই ভাব দৃঢ় হয় নাই। লোকের সঙ্গে মিশিলে, পরের চিন্তা স্রোতের আঘাত আমার অপক্ক নবীন চিন্তের উপর পড়িলেই এই নব ভাব হ্রাস পাইতে পারে। বাস্তবিক তাহাই হইল। তখন বুঝিতাম না যে, আমার সাধনার পূর্ণতার জন্য বিপরীত ভাবের উদ্রেক আবশ্যক ছিল, সেইজন্য অন্তর্যামী আমাকে হঠাৎ আমার প্রিয় নির্জনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া উদ্দাম রজোগুণের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন।'(৩১)

মহাসিদ্ধির পর বিশ্বমুক্তিকল্পে পরা-চেতনার আবাহনে নিভৃতবাসে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় মগ্ন পরাজ্যোতি-স্নিগ্ধ 'ব্রাহ্মণ' শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ—১৯২৮ সালের ২৯শে মে—পণ্ডিচেরী আশ্রমে। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের নিভৃতবাসে এই সাক্ষাৎকার একটি ব্যতিক্রম। সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ একা যান শ্রীঅরবিন্দের কক্ষে। শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন মহান দুই বন্ধুর সাক্ষাৎকারের সময়। বেশ কিছুক্ষণ রবীন্দ্রনাথ কথাবার্তা চালান। তারপর জাহাজে ফিরে যান।

কবিগুরু লিখেছেন, 'প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা ওঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরের আলো জ্বালবেন।...আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী তিনি অনুভব করেছেন : যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে : শৃণ্বন্তু বিশ্বে।... অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগল্ভ স্তব্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।'(৩২)

এই সাক্ষাৎকারের পর কবিগুরু 'শ্যাম্টিলি' জাহাজে পাড়ি দিলেন ইউরোপ। শ্রীঅরবিন্দ আবার আত্মস্থ হলেন পরা-চিন্তায়—অমৃতময়ের আবাহনে, বিশ্বমুক্তি যজ্ঞের অনলে আত্মাহুতির কাজে। অনেক কঠোর এক সংগ্রামের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে। ক্ষত্রতেজের বিলুপ্তি সাধনে পরশুরামের চেয়েও অনেক শক্ত এক অনন্য প্রতিজ্ঞা জেগে রইল শ্রীঅরবিন্দের চেতনায়।

"I am a deputy of the aspiring world. My spirit's liberty I ask for all'.

---

(৩১) শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাবলী। পৃঃ ৩১৭

(৩২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসী। শ্রাবণ, ১৩৩৫।

(ক্রমশঃ)

মিথিলার বিবাহ প্রথা

সুবল গঙ্গোপাধ্যায়
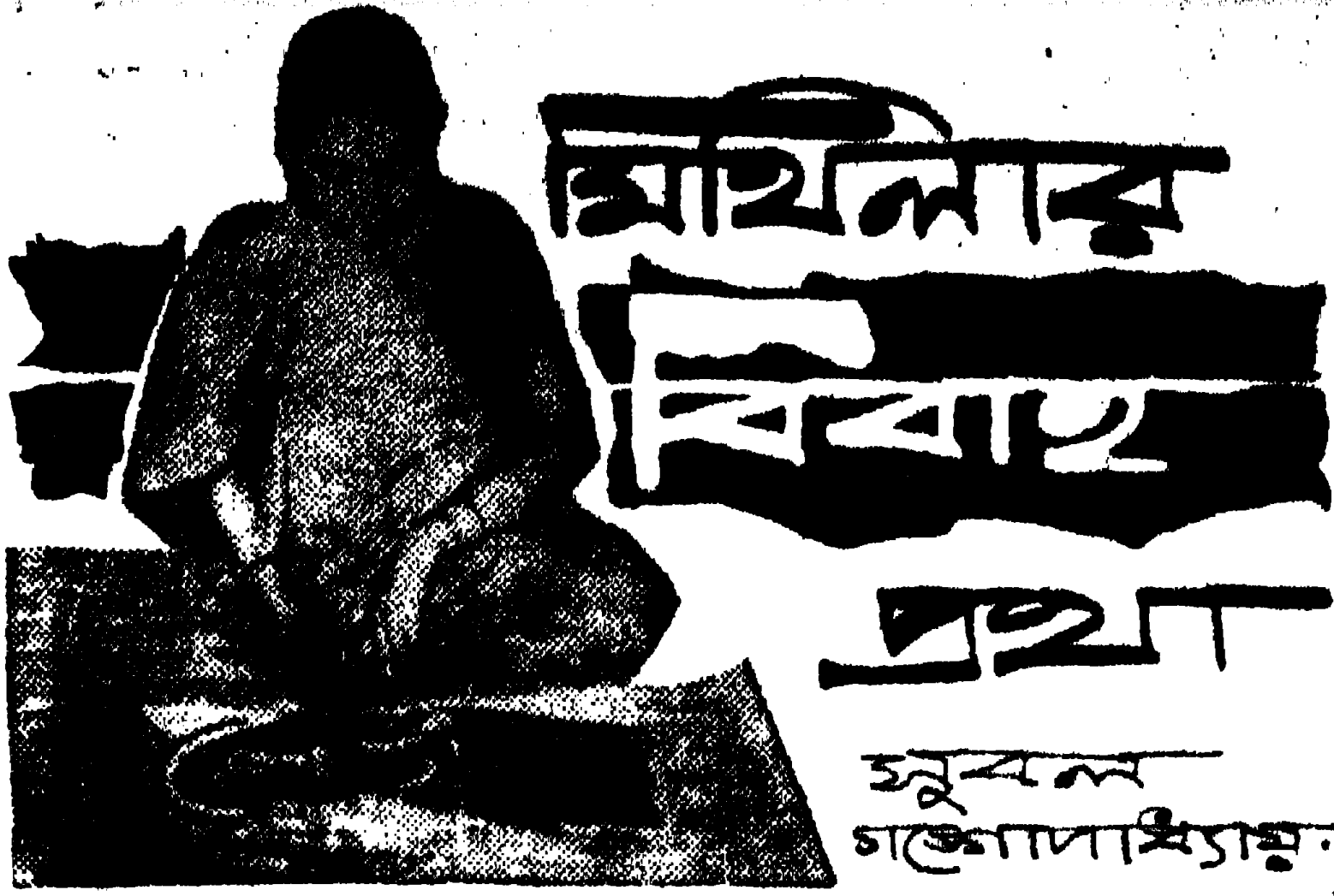
বিবাহ জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও স্মরণীয় অনুষ্ঠান। ব্যক্তি জীবনে এর যেমন প্রভাব, সামাজিক জীবনেও বিবাহের গুরুত্ব রয়েছে। উত্তর বিহারের মিথিলা অঞ্চলে বিবাহ-প্রথা সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে।

মৈথিল সমাজে বিবাহ 'পঞ্জী' ব্যবস্থার সংগে জড়িত। ১৪শ শতাব্দীতে মিথিলায় রাজা হরিসিংদেব তাঁর মন্ত্রী দেবাদিত্য ঠাকুরের সহায়তায় কুলীন প্রথার প্রবর্তন করেন। এই প্রথা অনুযায়ী মৈথিল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের তিনি সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করেন। ব্রাহ্মণরা চারভাগে বিভক্ত হয়, 'শ্রোত্রীয়' 'যোগ্য', 'পঞ্জীবদ্ধ' এবং 'যইযার'। অপরদিকে কায়স্থরা বত্রিশভাগে বিভক্ত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে রক্তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আলাদা আলাদা পারিবারিক রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা আছে।

এই পারিবারিক ইতিহাসের রক্ষকদের নাম হলো পঞ্জীকার। এবং এই ইতিহাস রক্ষার ব্যবস্থাকে বলা হল 'পঞ্জীপ্রথা'। আনুমানিক খৃষ্টপর্ব ১৩১৩ সময়ে এই পঞ্জীব্যবস্থা চালু হয়, এবং প্রতিটি মৈথিলের 'পঞ্জী' রক্ষা শুরু হয়। অতঃপর পঞ্জীকাররা হয়ে পড়লো বিবাহ রেজিস্ট্রার; এবং আজও মিথিলার সর্বত্র এই পঞ্জীকারের প্রবল প্রতাপ।

সভাগাছি

মিথিলায় বিবাহ প্রথা পৃথিবীর এক আশ্চর্য ব্যাপার। প্রতি বছর আষাঢ়-শ্রাবণের প্রথমার্ধে দ্বারভাঙ্গার মধুবনী মহকুমা অন্তর্গত সৌরাঠ গ্রামে এক সভাগাছি অর্থাৎ বিবাহ-মেলা বসে। এই মেলায় দ্বারভাঙ্গা, সাহারসা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলা থেকে শত শত মৈথিলের সমাগম হয়। এই মেলায় পাত্র-নির্বাচন হয়।

সৌরাঠ নামটি বলা হয় সৌরাষ্ট্রের অপভ্রংশ। অনেকে বলেন সোমনাথ মন্দিরের পূজারী ছিলেন এক মৈথিল ব্রাহ্মণ। যখন মহম্মদ ঘোরী এই মন্দির ধ্বংস করেন, ঐ মৈথিল পূজারী মন্দিরের এক টুকরো পাথর এনে দ্বারভাঙ্গার এই গ্রামে মন্দির নির্মাণ করেন। সেই থেকে এই গ্রামের নাম সৌরাঠ। এই বিবাহ-মেলা ছাড়াও মিথিলা অঞ্চলে প্রতাপপুর, সজৌর প্রভৃতি গ্রামে ছোট-খাটো মেলা বসে; কিন্তু সৌরাঠে সর্ববৃহৎ সভাগাছি।

পঞ্জীকার

সৌরাঠ বিবাহ-সভার দূরে-দূরান্ত থেকে বিবাহযোগ্য পাত্রদের আনা হয়। সারি সারি হবু-জামাইদের মেলা, এরই মধ্যে পাত্র নির্বাচন চলে। কন্যার পিতাদের মেলার মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। পাত্র-নির্বাচনের জন্য ঘটক থাকে। বিশাল কাঠের সিন্দুকে পঞ্জী বোঝাই করে আসে পঞ্জীকারের দল। কাগজে লেখা ৫০০/৬০০ বছরের পুরোনো পঞ্জী এই সিন্দুকে থাকে। পাত্র নির্বাচনের পর পঞ্জীকারের কাছে যাওয়া হয়; দক্ষিণা দেওয়ার পর হয় পঞ্জী নিরীক্ষণ। দুই পরি-পরিবারের ঊর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের মধ্যে প্রাচীন কোন সম্পর্ক না থাকলে পঞ্জীকার পঞ্জী পরীক্ষার পর 'অশুর্জন পত্র' দান করেন। অর্থাৎ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট। 'শ্রোত্রীয়' ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যবস্থা আরও কড়াকড়ি। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ভারতের সকল 'শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের নেতা। সুতরাং 'অশুজন পত্র' পাওয়ার পর শেষ ধাপে কন্যার পিতাকে মহারাজার হুজুরনবীশের কাছে হাজির হতে হয়। তিনি সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে মহারাজার সইকরা অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে দেন। তারপর বিবাহ।

পণপ্রথা

প্রাচীনকালে মৈথিলদের মধ্যে পণপ্রথা ছিল না। বিবাহ স্থির হতো পান, সুপারী ও পৈতার বিনিময়ে। আজও অল্পসংখ্যক কর্ণকায়স্থদের মধ্যে এই প্রাচীন নিয়ম আছে —যদিও তা নগণ্য। বিবাহ নির্ধারণকে এ'রা বলেন 'সিদ্ধান্ত'। কিন্তু আজ পণপ্রথা মৈথিল সমাজকে চরমভাবে গ্রাস করেছে। সৌরাঠ সভায় পাত্র নির্বাচনের পর সংগে সংগে বিবাহ-পণ স্থির করে দেওয়া হয়। সভাগাছিতে বর-পণ অথবা বিবাহের সময় বর-মূল্য দান করতে হয়।

পাত্র-নির্বাচন, পঞ্জীকারের সার্টিফিকেট ইত্যাদির পর কন্যার পিতা হবু-জামাইকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হয়ে যায়। মৈথিল-দের মধ্যে যে পাঁজী চলে, তাকে বলা হয় 'পঞ্চাঙ্গ', বেনারস পাঁজী এরা মেনে চলেন না। বিবাহ হয় 'শুদ্ধাবন্দে' অর্থাৎ বছরের যে কোন শুভ মাসে। 'পঞ্চাঙ্গ'কে অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে মেনে চলা হয়, মৈথিল ব্রাহ্মণ-দের মধ্যে বিবাহ-লগ্ন বলে কিছু নেই, যে কোন শুভ-তিথিতে বিবাহ সম্পন্ন হবে।

যখন বিবাহ-মেলা থেকে পাত্র আসে, সংগে আসে ২/৪ জনের ছোট এক দল। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া অবধি পাত্রপক্ষ লবণ গ্রহণ করে না। (অবশ্য আজ-কাল এ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত) বিয়ের পরদিন বরযাত্রীদের প্রচুর পরিমাণে দই, চিঁড়ে ও অন্যান্য খাদ্য পরিবেশন করা হয়। মৈথিলরা দই, চিঁড়ে ও পানের ভক্ত। এরা ভোজন-বিলাসী বলে পরিচিত। তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিত মানস' গ্রন্থে রাজা জনকের পাঠানো বিবাহ যৌতুক বর্ণনা করে বলেছেন—

> 'দহি, চিউড়া, উপহার অপারা,
> ভরি, ভরি কমরি চলে কাহারা।'

(দই চিঁড়ে উৎকৃষ্ট উপহার, বাঁক ভরে এই উপহার নিয়ে চলেছে কাহারের দল)

বিবাহের পরদিন বরযাত্রীদের 'বিদায়ী' দেওয়া হয়—একজোড়া রঙীন ধুতি, পৈতে, এক মুঠো পান-সুপারী এবং আগের রাতে প্রত্যেক বরযাত্রী যতো টাকা দিয়ে কন্যা আশীর্বাদ করেছিল, তার দ্বিগুণ অর্থ ফেরত দেওয়া হয়। টাকা গ্রহণ না করা নিয়ম, এবং বরযাত্রীরা রঙীন ধুতি, পান-সুপারি ও পৈতে গ্রহণ করে।

এরপর বরযাত্রীদল নেয় বিদায়। কিন্তু পাত্র থেকে যায়। চতুর্থী অনুষ্ঠান পর্যন্ত বরকে শ্বশুরবাড়ী থাকতে হয়। চতুর্থীর দিন আগের সব বিবাহ অনুষ্ঠান-এর পুনরাবৃত্তি হয়। চতুর্থী পর্যন্ত বরকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়: সে নুন খাবে না, চুলে তেল দেবে না—এইসব নিয়ম, রাতে কিন্তু বর-বধূ একসংগে থাকবে। অবশ্য 'চতুর্থী' পর্যন্ত ঘরে থাকে এক বৃদ্ধা যাতে কিনা উভয়ে দৈহিক সংস্পর্শে না আসে। চতুর্থী শেষে এক বিশাল ভোজসভার আয়োজন করা হয়। নিমন্ত্রিত-অতিথিতে ঘর ভরে যায়। এরপর জামাই একা ফিরে যায় নিজের বাড়ী। যাওয়ার সময় তার ধুতি অথবা চাদরে স্ত্রীর হাতের ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়—স্মৃতিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা'র কথা আমাদের স্মরণে আসে।

স্ত্রী কিন্তু স্বামীর সংগে শ্বশুরবাড়ী যায় অনেক পরে। তাকে বলা হয়

বিবাহমন্ডপে মাটির তৈরি হাতীর মূর্তি। দেবী লক্ষ্মীর বাহন হাতী। এইরকম হাতীর যতগুলি মূর্তি বাড়ীর ছাদের ওপর থাকে, ততগুলি বিবাহ হোয়েছে বুঝতে হবে।

'দ্বিরাগমন।' হিন্দীতে বলে 'রুকসাদী।' দ্বিরাগমন হয় সাধারণতঃ বিয়ের ষোল দিনের মধ্যে অথবা অসমান বৎসরে। 'দ্বিরাগমনে'র সময় আবার বরযাত্রীদল নিয়ে আসে বর' তারপর ঘটা করে বধূকে নিয়ে নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

মধু শ্রাবনী

বিবাহের পর স্ত্রী নিয়মিত গৌরী পূজায় বসে। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যহ এই পূজা করা হয়।

মৈথিলরা খুবই ধার্মিক ও গোঁড়া, আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি কোন মৈথিল নিজের সম্প্রদায়ের বাইরে বিয়ে করেছে, কখনই না। বাল্য-বিবাহে মৈথিলরা বিশ্বাস করে—'অষ্ট বর্ষাত ভবেত গৌরী'। অত্যধিক গোঁড়ামী, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি মৈথিল চরিত্রের বিশেষত্ব।

মহিলা আচার অনুষ্ঠান

মৈথিল বিবাহ অনুষ্ঠানে এক বিবাহিতা নারী 'বিঠকরী'র কাজ করে। সাধারণতঃ বিবাহিতা বোন অথবা কন্যা-পক্ষের কোন নিকট আত্মীয়; বর-বধূর মধ্যে দূত হিসেবে 'বিঠকরী'র কাজ করে। 'বিঠকরী'র উদ্দেশ্য ছিল যৌন-উপদেষ্টা। বর্তমানে অবশ্য সখী হিসেবেই তার পরিচয়।

বিবাহের সময় যখন বর কন্যাপক্ষের বাড়ী এসে পৌঁছয়, তখন জামাইবরণ করা হয়। একে বলা হয় 'পরিছন।' এরপর পাত্র কাপড়-জামা বদল করে। মাথায় পরে 'পাগ।' মৈথিলদের শিরোভূষণ। পরিছনের সময় হাসি-আমোদের গান গাওয়া হয়, আর প্রতি পদক্ষেপে গানের মাত্রাধিক্য। সব মহিলা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে চলে গান এবং বিশেষ করে বিদ্যাপতির গান। বিনা বিদ্যাপতির গানে বিবাহ অনুষ্ঠান অচল। আরেকটি গান শুনুন।

শ্বাশুড়ী নারদ-ব্রাহ্মণের উপর কপট ক্রোধ প্রকাশ করছেন বুড়ো জামাই বেছে দেওয়ার জন্য।

হম নাহী আজ রহব এহি আঙ্গন,
যোও বুড় হোয় তো জামায়।
ধোতী, লোটা, পোথী, পতরা,
সেও সব দিক ছিনবায়।
জো কে বজতা নারদ বাম্মণ,
দাড়ি দেও ঘিষিয়ায়।

(এই বুড়ো জামাইয়ের মুখ দেখার চেয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া অনেক ভালো। ধুতি, ঘটি, পুঁথিপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে দেবো। আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো। আর যদি নারদ ব্রাহ্মণ বেশি চেঁচামেচি করে, তাহলে তার দাড়ি ছিঁড়ে নেবো)।

মহিলা রীতি-নীতি, শিল্প-কলাপের প্রধান কেন্দ্র হল 'কোহবর।' (বাসরঘর) 'কোহবরে'র দেওয়াল গ্রামের হাতে-আঁকা চিত্রশিল্পের (মধুবনী চিত্র হিসেবে সুপরিচিত) নমুনায় ভরা থাকে। দেব-দেবী, কচ্ছপ, টিয়া পাখী, মাছ প্রভৃতির ছবি দেওয়ালের সর্বত্র আঁকা হয়। বাসর-ঘরের মধ্যে 'নয়না যোগীন' ছবি আঁকা থাকে; এইসব ভূত-প্রেতের ছবি আঁকার উদ্দেশ্য যাতে অশুভ প্রভাব দূরে হয়।

আর একটি মধুর অনুষ্ঠান হলো কন্যা-নিরীক্ষণ। বিবাহের আগে মৈথিলীদের মধ্যে কন্যা নিরীক্ষণের প্রথা একেবারে নেই। তাই কোহবরের মধ্যে কয়েকটি ঘোমটা ঢাকা মেয়েদের একসঙ্গে রেখে বরকে বলা হয় নিজের বধূকে খুঁজে নাও।

সিঁদুর দানের আগে পর্যন্ত বর-বধূর মুখ দর্শন করতে পারবে না। পিতা কন্যা-দান করেন, এরপর হয় সিঁদুর দান। বধূ ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় সব সময় থাকে। সিঁদুর দানের সময় ঘোমটা প্রথম সরানো হয়। এরপর হয় 'লাভা ছিরইয়ানি।' বর-বধূ উভয়ে বেদীর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কুলো থেকে খই ছিটাতে থাকে। 'বর লাভা ছিরিয়াও, কন্যা বিচি বিচি খাও' চলতে থাকে সঙ্গীত। এইসব অনুষ্ঠান শেষে বর-বধূকে নিয়ে যাওয়া হয় কোহবরে। মেয়েরা চায় 'দ্বারছিকাই' (শয্যাতুলুনী) এর মিটমাট হয়ে গেলে পর জামাই বাসর-ঘরের বাইরে আসতে পারে। প্রতি পদক্ষেপে মহিলা আচার-অনুষ্ঠান।

যখন বধূ 'দ্বিরাগমনে'র সময় প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করে স্বামীর সঙ্গে, তখন সকলের চোখ হয় সজল। কান্নায় ভাঙ্গা কণ্ঠে শোনা যায়—

বররে যতন সে সীয়াজীকে পোষল,
সেও রঘুবর লেল যায়।

(বড়ই যত্নে সীতাকে লালন-পালন করেছিলাম, আজ তাকেও রামচন্দ্র নিয়ে চলে যাচ্ছে)

অনন্তপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

॥ ১৫ ॥

ভালোবাসা একটি সুন্দর বিরহ অনুভব।

ভালোবাসা একটি অমৃত যন্ত্রণা। এই অনুভব, এই যন্ত্রণা না থাকলে জীবন পূর্ণ হয় না, সুন্দর হয় না।

সজল ভাবছিল, অরুণাকে যদি সে ভালোবাসে তবে আরতির সঙ্গে পরিচয়ের, সম্পর্কের সংজ্ঞাটা কি?

আরতির কথা মনে হলে সজলের সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়, অন্য সব কথা, সব কিছু, চাপা পড়ে যায়। রোদ উঠলে যেমন নদীতীরে, মাঠে মাঠে ছড়িয়ে-থাকা ভোরের অন্ধকারের ভালোবাসাগুলি অদৃশ্য হয়ে ওঠে। সারা পৃথিবীতে তখন এক শুভ্র, মত অর্চনার আয়োজন।

অরুণা এখন ম্লান স্মৃতিমাত্র।

কিন্তু সজল তা চায় না, তা হতে দিতে পারে না। অরুণার কাছে সজল ঋণী, অরুণা তাকে যৌবনের যৌবরাজ্যে উত্তীর্ণ করেছে, অরুণা তাকে ভালোবাসে।

চিঠিটা পেয়েই সজল আজ হাজরার মোড়ে এসে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

সজল জীবনে কাউকে প্রতারণা করতে চায় না। সে চায় সৎ থাকতে, আন্তরিক থাকতে, একাগ্র থাকতে। অরুণার কাছে এই শপথ, সে ভালোবাসায় একনিষ্ঠ হবে।

কিন্তু জীবন কি গণিতের সমীকরণ? জীবন কি কয়েকটা সংখ্যার নির্ভুল যোগফল? জীবন কি গণিতের হিসাবের পথ বেয়ে চলে? অরুণার সঙ্গে তার ভালোবাসা কিছুটা দেওয়া-নেওয়ার। এখানে অবশ্য হিসেবটা প্রায় মিলে যায়।

কিন্তু আরতি? আরতির সঙ্গে সজলের পরিচয়, সম্পর্ক কেমন যেন গণিতের বাইরের ব্যাপার বলে মনে হয়। হিসেব এখানে মেলে না। আরতির অংশে যোগফলই সবচেয়ে বেশি। খুব সকালবেলা উঠে দেখা গেল, বাগানের গন্ধরাজ গাছটার ঘন সবুজ পাতার আড়ালে একটি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত শুভ্র ফুল, চারদিকে ভোরের নির্জন আলোর সমুদ্রে একটি নিঃশব্দ প্রার্থনার মত তখন জেগে আছে। এই যে দেখা, এই যে পাওয়া, এই যে অনুভব—এর সংজ্ঞা কি?

হঠাৎ হাতে একটা মৃদু টান পড়তে সজল ফিরে দেখল, অরুণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

অরুণা মুখ টিপে বলল, 'স্বপন দেখছিলে বোধ হয়? বাব্বাঃ পুরো এক মিনিট তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাওনি!'

সজল হাসতে হাসতে বলল, 'আমিও ত সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি!'

'আমার দেরি হয়নি ত?' অরুণা ঘড়িটা দেখল। 'জানো কী ভালো লাগছে' দুজনে অফিস যাচ্ছি। বাব্বা, চাকরীর খবরটা দেবে তো!'

আর সজল দেখছিল ঘড়ি দেখতে গিয়ে অরুণার হাতের সরু সরু আঙুলগুলোয় পুজোর সময়ের মত একটা সুন্দর মুদ্রা গড়ে উঠেছিল।

অরুণা ব্যাগটা খুলে একটা কৌটো থেকে একটু মসলা বের করল। সজলকে দিয়ে নিজেও মুখে ফেলল খানিকটা। বলল, 'আমি ঠিক সময় এসেছি। এই দেখ ঘড়িতে সাড়ে দশটা।—কী রাগ ছিলের। সেই যে গেলে আর টিকির দেখা নেই।'

সজল বুঝতে পারল, সে নিজেই বেশ আগে এসেছে এবং এইটিই তার স্বভাব। পাছে দেরি হয়ে যায়, এই ভেবে সে যখন আসে, তখন দেখা গেল, হয়ত, সময় অনেক বাকি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে অরুণা বলল, 'অনেক দিন যোগাযোগ করিনি। রাগ করোনি ত?'

আজ অরুণাকে সজলের খুব ভালো লাগছিল এবং দুজনেই অফিস চলেছে একথাটা ভাবতেও বেশ লাগছে। অফিসে অরুণা বেশ সেজেগুজে যায়। ছিমছাম, সুন্দর।

'ঐ ট্রাম আসছে। দেখ, লেডীজ সিটের কাছে দাঁড়াবে। তুমি যা বোকা হয়ত কোথায় পালাবে, দেখাই পেল না তোমাকে। আচ্ছা, তোমার সাপ্লাই অফিস তো। বেশ টু-পাইস আছে।—আরেঃ মুখ গোমরা করে আছো কেন?'

সজল কোন উত্তর দিল না।

অরুণা আবার বলল, 'আর শোনো? পরে হয়ত বলতে ভুলে যাব। পরশুদিন হল বৃহস্পতিবার। ওদিন মেট্রোর কাছে থেকো। এ-ই ধরো সাড়ে পাঁচটায়। পারবে না?'

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'আচ্ছা'।

ট্রাম আসতে অরুণা আগে উঠল, একটা লেডীজ সিটে বসল। সজল কাছেই দাঁড়িয়েছিল।

পেছন থেকে যাত্রীরা বলে উঠল, 'এগোন মশায়, এগিয়ে চলুন!' সজল ইতস্ততঃ করছিল।

'লেডীজ সিট-এর কাছে এতো ভীড় করেন কেন মশায়?'—একজন বৃদ্ধগোছের মানুষ সজলকে ধমকে উঠল।

সজল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার ফিরে তাকাল। অরুণা তখন মুখ টিপে হাসছে।

সারাদিন সজল আচ্ছন্নের মত কাটাল। সামান্য বেসুর সত্ত্বেও অরুণার সান্নিধ্যটুকু তাকে নতুন জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছে। জোর করে কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চেষ্টা করল সজল। সিমেন্টের অনেকগুলো দরখাস্ত 'এন্ট্রি' করতে হবে। সাব-ইনস্পেকটারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য অফিসারের কাছে পেশ করতে হবে। কাজটা সোজা। কিন্তু চাপ ভীষণ।

এস্টাব্লিশমেন্টের রেণুদি বলে, ঐ কাজটা পাওয়ার জন্য কত লোক হাঁ করে আছে। কেন হাঁ করে আছে, সজল অ বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করলে রেণুদি শুধু হাসে।

আজ এর মধ্যে অনেকে এসে কোন বিশেষ সাব ইন্সপেকটারের কাছে বিশেষ দরখাস্তটা যাতে যায়, তার জন্যে অনুরোধ করে গেল। সিগারেট দিতে চাইল কেউ, কেউ টিফিন খাওয়াতে চাইল। সজল কিছু না ভেবেই তা করে দিল। এতে কোন অন্যায় আছে বলেও মনে হল না তার।

সজল দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল। অফিস শেষ হতে এখনও আধ ঘণ্টা বাকি। কাজও পড়ে আছে অনেক। এক কাপ চা খেয়ে এলে মন্দ হয় না।

সজল ক্যান্টিনে বসে চা খেয়ে যখন ফিরল তখন অফিস প্রায় ফাঁকা। রেণুদি যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। সজল খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছিল।

এটা কি! শেষের কাগজটা উল্টাতে একটা খাম চোখে পড়ল সজলের, না কোন নাম লেখা নেই। কিন্তু এটা এল কোত্থেকে? সজল ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে খুলে ফেলল। একি! এযে দশ টাকার দুটো নোট! সঙ্গে একটা দরখাস্তের নম্বর, সাব-ইনস্পেকটারের নাম।

সজল অবাক! কি করে এল খামটা? কেউ ফেলে গেছে? যারা যারা এসেছিল, সজল তাদের নামগুলো মনে করতে চেষ্টা করল। কিন্তু সজলের নাম মনে পড়ল না। সে যাই হোক, এ টাকাটা নিয়ে সে এখন কি করে?

সজল গেট-এর দিকে গেল, যদি রেণুদিকে দেখতে পায়, তবে একটা যুক্তি-পরামর্শ চাইবে।

না, রেণুদিকে দেখা গেল না। সজল বোকার মত অনেকক্ষণ বসে রইল চেয়ারে।

কিছুক্ষণ পরে সুয়িংডোর ঠেলে সজল ভেতরে ঢুকল। চাকরীতে যোগ দেবার পর সেই যে মিঃ মুখার্জির সঙ্গে একবার দেখা করেছিল, আর আসে নি।

মিঃ মুখার্জি চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। একটু হেসে বললেন, 'এসো। বিশ্বময়ের খবর কি?'

সজল সামনের চেয়ারটায় বসে বলল, 'কয়েক দিন হল নোয়াখালি থেকে ফিরেছে'।

'নোয়াখালি? নোয়াখালিতে কেন?'

'রিলিফের কাজ করতে'।

মিঃ মুখার্জী কি একটু ভাবলেন। বললেন, 'কলেজে ছেলেটি আমাকে খুব 'ইমপ্রেস' করেছিল। অনেক আশা ছিল। কিন্তু এখন দেখছি, পড়াশোনাটা ছেড়েই দিল'।

সজল একটু সাহস নিয়ে বলল, 'ও স্যার, নিজের খুশি মত পড়াশোনা করে। তবে ক্লাশে পড়ে না হয়ত, কিন্তু বাড়ীতে পড়ে। খুব ভাল ছবি আঁকে।'

মিঃ মুখার্জী বললেন, 'একদিক থেকে অবশ্য বিশ্বময় সত্য। আসলে নিজের পড়াটাই ঠিক পড়া। পরীক্ষার জন্য পড়াটা ঠিক নয়। কিন্তু সজল, সব ছেলের পক্ষে এই ফর্মুলা ঠিক নয়।'

ওঁকে সজলের এখন খুব ঘরোয়া বলে মনে হচ্ছিল, ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, উনি ডেপুটি ডাইরেকটার নন। উনি এখনো সেই ইংরেজীর অধ্যাপক।

সজল বলল, 'একটা কাজে এসেছি, স্যার। এই খামটা আমার টেবিলের ফাইলের তলায় পড়েছিল। এতে টাকা আছে।'

'ও তাই নাকি!' মিঃ মুখার্জি খামটা হাতে নিয়ে দেখলেন। খুললেন। সজলের মুখের দিকে চেয়ে একটু সময় চুপ করে রইলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়েছেন, এমন মনে হল না। বরং হাসলেন একটু। তারপর বললেন, 'এই অফিসে, শুধু এই অফিসে কেন, সব সরকারি অফিসেই ওটা সাধারণ ঘটনা। তুমি নতুন এবং 'অনেস্ট' ছেলে বলে, এটা তোমার চোখে লাগছে, মর‍্যালিটিতে লাগছে। এতে আমি খুশি হয়েছি সজল। টাকাটা তোমাকে ঘুষ হিসেবেই কেউ দিয়েছিল।'

সজল শিউরে উঠল, 'ঘুষ? আমাকে ঘুষ দেবে কেন স্যার?'

মিঃ মুখার্জী হাসলেন একটু। খামটা ড্রয়ারের এক জায়গায় রেখে দিয়ে বললেন, 'থাক। কোনো চ্যারিটেবল ফাণ্ড-এ দিয়ে দেব।'

সে হাসিতে স্নেহ ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ বললেন, 'তোমার বাবা কি করতেন? বাড়ীতে কেউ কখনও চাকরী করেছেন?'

'না স্যার। বাবার টোল ছিল। সংস্কৃত পড়াতেন।'

'তুমি সাংস্কৃট পড়েছ?'

'হাঁ, স্যার। ম্যাট্রিকে একটা লেটারও ছিল। বি-এতেও সাংস্কৃট নিয়েছিলাম।'

মিঃ মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ উপনিষদ তোমার বেশি ভালো লাগে?'

সজল একটু ভেবে বলল, 'সবগুলি ভালো লাগে। তবে তার মধ্যে 'ছান্দোগ্য' 'বৃহদারণ্যক' বেশি ভালো লাগে'।

মিঃ মুখার্জি চুপ করে রইলেন একটু সময়। তারপর বললেন, 'অমৃত শব্দটা উপনিষদে বহুবার বলা হয়েছে। 'অমৃত' বলতে কি বোঝ তুমি?'

সজল বলল, 'উপনিষদে 'অমৃত' শব্দটিকে স্যার, নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে।' সাধারণভাবে মৃত্যুর অতীত হওয়াকেই 'অমৃত' বলে। কিন্তু স্যার, আমার ভালো লাগে, 'অমৃত' বলতে যখন বোঝায়, সংসারের অনিত্য বস্তু সম্পর্কে উদাসীন হতে, 'ডিসইন্টারেস্টেড' হতে। এই অর্থটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয় স্যার।'

মিঃ মুখার্জী কোন কথা বললেন না। একটা স্তব্ধ বৃদ্ধ বনস্পতির মত বসে রইলেন। কিছুক্ষণ।

ঘরের জানালা বেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ভীড় করে আসছিল। সারা অফিস এখন থমথমে নির্জন। কচিৎ দোয়ারিদের রাস্তায় দু-একজনের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। দূরে কোন মোটরের গীয়ার পাল্টাবার শব্দ শোনা গেল একবার।

মিঃ মুখার্জী ধীরে ধীরে উঠলেন। চশমাটা কালো খাপে ঢোকালেন। তাঁকে কেন যেন বড় গম্ভীর মনে হচ্ছিল।

'তুমি কোন্ দিকে যাবে?'

সজল বলল, 'আমি স্যার ... পার্কের কাছে থাকি।'

'চল তোমাকে পৌঁছে দিই একটু।'

'আপনি স্যার কোন্ দিকে যাবেন?'

'আমি বাগবাজার যাব।'

সজল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না স্যার। আমি হেঁটেই যাই। ওতে কষ্ট হয় না। আপনার উল্টোদিক হবে। আপনি চলে যান।'

মিঃ মুখার্জী বললেন, 'একটা কথা সজল। তুমি ত আমার ছেলের মত বলতে গেলে। তাই বলছি, কোন সুযোগ থাকলে, এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এম-এটা দিয়ে দাও। তুমি ভাল অধ্যাপক হবে। এডুকেশনই তোমার জীবনের ধর্ম'।

মিঃ মুখার্জির গলার এ স্বর অচেনা।

'কোন উপায় নেই, স্যার। সংসারের অবস্থা আদৌ ভাল নয়। এ চাকরি পাওয়ার আগে কদিন শুধু মুড়ি চিবিয়েই কেটেছে।'

মিঃ মুখার্জী সজলের করুণ মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন।

একটা পরিতৃপ্ত, সুন্দর মন নিয়ে সজল বাসার দিকে হাঁটছিল। কেন যে এতো ভালো লাগছিল, তা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। টাকাটা প্রত্যাখ্যান করার মত মনের জোর হয়েছিল বলে এই আনন্দ, না মিঃ মুখার্জির এই আন্তরিক স্নেহটুকু পেয়েছিল বলে এই আনন্দ, তা সে ঠিক নির্ণয় করতে এ-মুহূর্তে অক্ষম। কিন্তু প্রকৃত আনন্দের অনুভব, সজলের জীবনে আলোকিত আকাশের মত উদার হয়ে আবির্ভূত হয়। এমন আনন্দ সে অনেক দিন পায় নি। আজ সুশান্তদিকে মনে পড়ছে। তার গত চিঠির উত্তর সজল এখনও দেয় নি। নীলাম্বরবাবুর অসুস্থতা বাড়ছে। ইস, নীলাম্বরবাবুর একটা কবিতাও কেউ ছাপল না।

সজল এলগিন রোড পেরিয়ে এল। জগুবাজারের মোড়। রাম অবতার গামছা দোকান নিয়ে আজো বসেছে। সজল দ্রুত চলতে লাগল। হ্যাঁ, অরুণ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেখা করতে বলেছে। কিন্তু সজল আজকের ঘটনাটা বলার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। আজ আর একবার দেখা হলে ভাল হত!

বাসায় এসে সজল জামা-কাপড় ছাড়ল। কলতলায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এল। ও-বেলাকার নিভন্ত আঁচটা দেখে এখন ভীষণ বিরক্ত লাগছিল তার। প্রতিদিন দু-বেলা এই কাজটা তার আর ভালো লাগে না। কপাটের ফাঁক দিয়ে পিয়ন চিঠি ফেলে দিয়ে গেছে। সজল দেখল, ছোটমার কাছে যে মণিঅর্ডার পাঠিয়েছিল তার রসিদটা ফিরে এসেছে। আরও একটা খামের চিঠি। হাতের লেখাটা চেনা চেনা লাগছে।

সজল চিঠিটা খুলল। ছোটমা ওর বন্ধু কানাইকে দিয়ে লিখিয়েছে। পড়তে পড়তে সজল হাসছিল। তার জন্য একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছোটমা দেখে এসেছে। বয়স দশ-বার বছর হবে। মেয়েটি নাকি সুলক্ষণা। সজল চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। না, মেস একটা জোগাড় করতেই হবে। মেসে কি সেতার রেওয়াজ করার সুযোগ মিলবে?

পাতা বিছানায় একটু সময় গড়িয়ে নিল সজল। টিন থেকে মুড়ি বের করে কলা দিয়ে খেল। হ্যাঁ, বেশ ভালো লাগছে এখন। আর ক্লান্তি নাই। সেই গানটা, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু'। ইস, সেতারে গানগুলো বাজাতে আর কতদিন লাগবে তার!

সজল সেতারটা নিয়ে বসল। এখন হাতের লয়, একটু বেড়েছে। তাছাড়া মাত্রা ঠিক রেখে উজল করে বাজাতে পারে।

সজল একমনে হাত সাধতে লাগল।

কতক্ষণ বাজাচ্ছিল মনে নাই। বাইরে কে যেন কড়া নাড়ল। সজল উঠল না। দরজা খোলা আছে। আর এখন এলে, কে আবার আসবে। পাশের বাড়ীর সেই যুবতী বা ওধারের ঘরের সেই দুষ্টু মেয়েটা। কি-যেন ডাকনাম? দীপা?

আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

সজল দ্রুত হাত সাধতে সাধতে বিরক্ত মুখে বলল, 'খোলা আছে ত'।

কিন্তু যে ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে সজল অবাক। নিজের চোখ দুটোকেই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দীপার হাত ধরে দরজার কপাটের কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন এখন এই শেষ সন্ধ্যার একটি পবিত্র প্রতীক।

আরতি ঘরে ঢুকল।

শিক্ষার্থীকে হাত সাধতে বা বাজাতে দেখলে সব শিক্ষকই খুশি হয়। না জানিয়ে এসে দেখলে, আরও ভাল লাগে।

সেতারটা রেখে সজল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

'তুমি? তুমি আসবে, আমি কক্ষনো ভাবিনি, আরতি?'

আরতি শান্তগলায় বলল, 'না এলে ত তোমাকে এভাবে দেখতে পেতাম না।'

দীপা বলল, 'আমি যাই তাহলে?'

সজল বিছানার একটা ধার হাত দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে আরতির জন্য একটু ভদ্র করতে চাইল।

আরতি ততক্ষণে সজলের সামনে একটা পুরনো খবর কাগজ পেতে বসে পড়ে বলল, 'দাও ত দেখি।'

সজল হাসতে হাসতে বলল, 'হাত সাধা ঠিক হচ্ছে?'

'ভালো হচ্ছে।'

সজল বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশান দিচ্ছ না ত?'

আরতি মৃদু হেসে শান্তগলায় বলল, 'না, সার্টিফিকেট। আচ্ছা বাজাও ত আমাকে শুনে শুনে। ডা রা ডা রা—'

সজল বলল, 'ডা রা ডা রা দিয়ে বাজাতে পারব না। সা রে গা মা দিয়ে বল না?'

'ও, আচ্ছা। বাজাও, ন ধা ন রা সা নি ধন সা—'

সজল এক-একটা পর্দা শুনে নিয়ে বাজাচ্ছিল। বলল, 'কি রাগ এটা? ইমন?' আরতি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ইমন। বাজাও। হাতে উঠে গেলে ভালো লাগবে। এখন একটু আনইজি লাগছে।'

সজল বলল, 'ও মনে থাকবে না, লিখে দাও তুমি'।

সজল হাতের কাছে যে খাতাটা পেল সেইটাই এগিয়ে দিল।

আরতি খাতাটা উল্টে যাচ্ছিল। 'একি! এযে কবিতা লেখা আছে দেখছি। ছাপা কাজিতাও আছে।'

আরতি সজলের মুখের দিকে তাকাল। 'তুমি কবিতাও লেখ, সজলদা?'

'ওসব দ্যাখে না। তুমি গৎটা লিখে দাও তো।'

আরতি লিখতে লিখতে বলল, 'মাত্রা বুঝতে পারবে? এই দ্যাখ, গৎটা ফাঁক থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই সমে এল।'

সজল আরতির সুন্দর হাতের লেখাটা দেখছিল। এ হাতের লেখার কাছে, সজলের অক্ষরও ম্লান হয়ে যাবে।

সজল বলল, 'এবার বাজিয়ে দেখাও একটু।'

আরতি হেসে বলল 'দাঁড়াও একটু বেঁধে নি।'

আরতি পুরো গৎটা ধীরে ধীরে বাজাল।

কিন্তু একটু পরে নিজের খেয়াল মতই বাজাতে লাগল, আলাপ করতে লাগল।

সজল বুঝতে পারছিল না। অবাক হয়ে আরতিকে দেখছিল। দেখতে দেখতে সেই-দিনের কথা মনে পড়ছিল তার, যেদিন প্রথম আরতিকে সজল আবিষ্কার করে। প্রতিদিনের দেখাটাই সত্য দেখা নয়। কখনও কখনও এক মুহূর্তের দেখাই সত্য হয়ে ওঠে। সে-দিনও তার বস্তীর বাসায় আরতি এমনি করে সেতারটা নিয়ে একমনে তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছিল। খোলা দীর্ঘ চুল, প্রায় মেঝেতে এসে পড়েছে। সেই মুগ্ধ, মগ্ন, নম্র দুটি চোখ, সারা শরীরে পরি-পূর্ণ যৌবনের নিপুণ কারুকার্য। কোন ঋষির চোখে সরস্বতীর প্রতিমূর্তি হয়ত এমনি করেই একদিন ভেসে উঠেছিল! অস্বীকার করে লাভ নেই, সজল বহুদিন পর্যন্ত আরতির এই দেবী মূর্তির ধ্যানে আচ্ছন্ন হয়েছিল। নিদ্রায়, জাগরণে, সব কাজের মধ্যে আরতির ঐ দেবীমূর্তি চোখের সামনে ভাসত।

এই অনুভব, এই ভালোলাগা এই যন্ত্রণা কি অমৃতের স্পর্শ?

আরতি সেতার থামিয়ে বলল, 'এ-সেতারটা বাজাতে গেলে সব মনে পড়ে যায় সজলদা! ছবির মত সব মনে ভেসে ওঠে।'

আরতির গলার স্বর ভারী হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সজল এই মুহূর্তে আব্বাসকে কেন যেন ঈর্ষা করছে।

আরতি আবার তেমনি মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে বলল, 'জানো, একদিন খুঁজে খুঁজে কবরটা দেখতে গেছলাম। ভারী
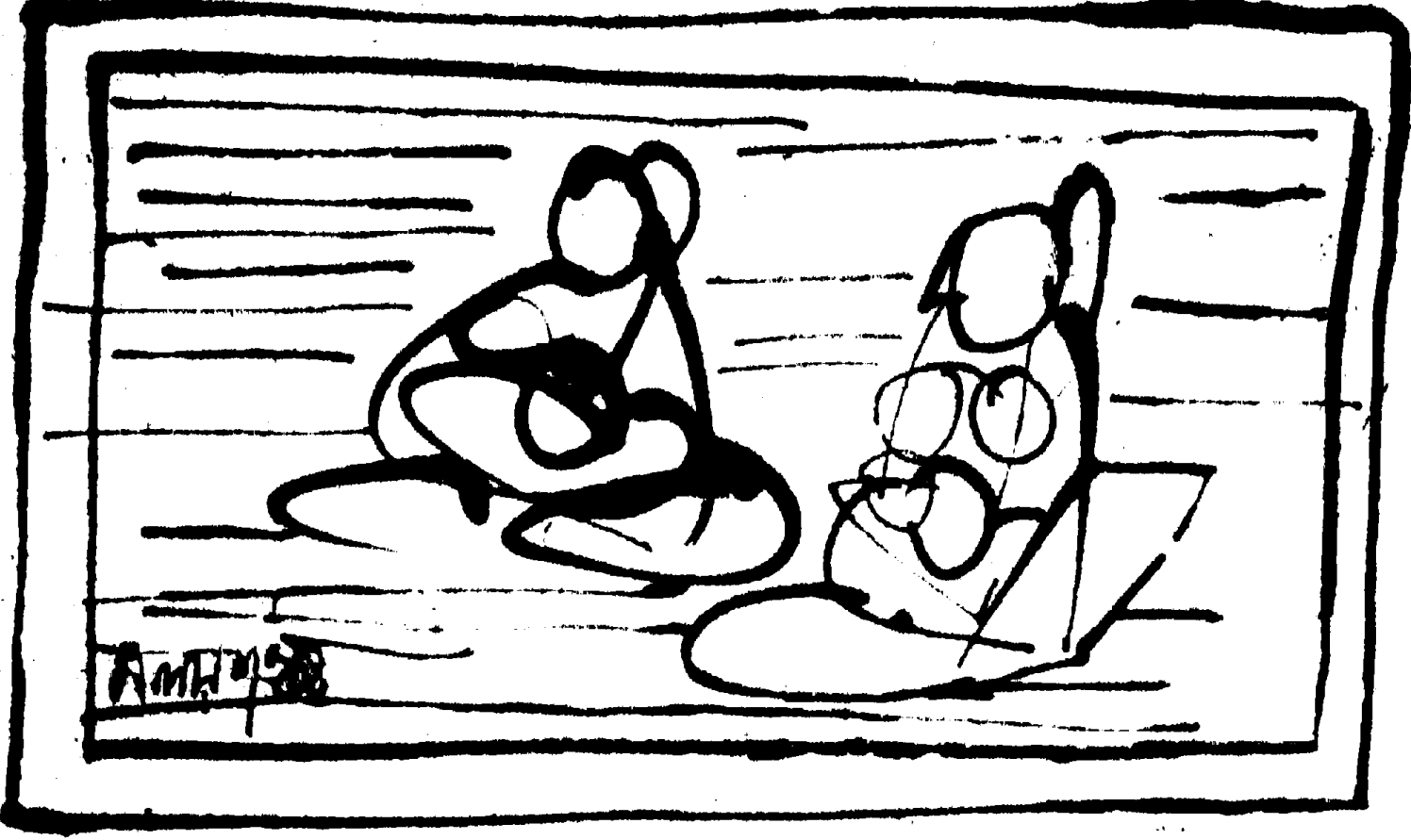
সুন্দর করে, শ্বেতপাথর দিয়ে কবরের ওপরটা বাঁধানো। তাতে উর্দুতে কি যেন লেখা আছে।' আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। সব ঘটনা এখন যেন একটা গল্প! সজলদা আমি কি ওকে ভুলে যাচ্ছি?'

কিন্তু সজল নিজেকে অপরাধী মনে করছিল। আব্বাসকে ঈর্ষা করা তার অন্যায়, তার পাপ। আব্বাস তার প্রথম বন্ধু। আব্বাস তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল একদিন।

কিন্তু তবু, জীবন যেন এই হিসেব মেনে চলতে চায় না!

অথচ সজলের শপথ, সে অরুণার প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে। তার ভালোবাসার অসম্মান করার অধিকার তার নেই। অরুণাই তার জীবনে সত্য হোক।

আরতি একটু হেসে বলল, 'কি ভাবছিলে এত? তুমি, এক পাগল! এই ত কথা বলছিলাম, এর মধ্যে নিজের মনে কি সব ভাবতে লেগে গেছ?' তোমাকে অরুণা ম্যানেজ করে কি করে? আমি হলে ত পাগল হয়ে যেতাম?'

আরতি এমন করে কথাগুলো বলছিল, যেন তার এই পাগল হওয়ার মধ্যে একটি নিবিড় আনন্দের সাম্রাজ্য ঘুমিয়ে আছে!

সজল দ্রুত কথাটার মোড়টা ফিরিয়ে নিল। বলল, 'আজ অফিসে কি হয়েছে জানো?'

আরতি চুপ করে ঘটনাটা শুনল।

সজল অপেক্ষা করছিল, আরতি কি বলে।

আরতি একটু পরে বলল, 'খুব ভালো লাগল শুনে। প্রথম থেকেই তোমাকে চিনেছি। তুমি 'কমন' নও। আজ সেটা ঠিক বলে জানলাম। বাবা কি বলে জানো? বাবা বলে, সারা দেশটা ঘুষে, জাল-জোচ্চুরিতে ডুবে গেল। এ দুশ বছরের পরাধীনতার পাপ। এর পরে দেশে আর মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না রে। সব কুকুর, শেয়াল থাকবে।'

সজল বলল, 'তুমি খুশী হয়েছ, আরতি? জানো, ডেপুটি ডাইরেক্টার মিঃ মুখার্জি কি বললেন আমাকে? বললেন, চাকরি ছেড়ে এম-এতে ভর্তি হয়ে যাও আসছে সেসন থেকে। পড়াশোনা কর। আমি বললাম, স্যার তা হলে খেতে পাব না?'

আরতি কথাটা লুফে নিল। বলল, 'এম-এ পড়ার কথাটা আমিও বলেছিলাম তোমাকে। কিন্তু তুমি শোন নি। কখনও কখনও ছোটোর কথাও শুনতে হয়!'

সজল হেসে বলল, 'দাঁড়াও আসছে সেসনে ভর্তি হয়ে যাব। ঠিক বলছি।'

'কথা দিচ্ছ আমাকে? কই আমার গা ছুঁয়ে বল তো!' আরতি হাতটা বাড়িয়ে দিল।

সজল আরতিকে স্পর্শ করল না। এ রকম শপথ সে করতে পারে না। জীবনের বহু শপথ কোথায় হারিয়ে গেছে। বহু শপথ সে রাখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আরতিকে স্পর্শ করে যদি সে শপথ রাখতে না পারে?

আরতি বলল 'কি যে সংসারে টানাটানি চলছে! বাবার শরীর ত দেখেছ। অবশ্য আগে এত খারাপ ছিল না। কয়েক বছর আগে স্বাস্থ্য ভালই ছিল বলতে গেলে। চাকরীতে কিন্তু একসটেনশান পেল না। কারণ, বাবা, সেক্রেটারীর গবেট ছেলেকে ইংরেজীতে পাশ করিয়ে দেয় নি। আচ্ছা ভাল কথা, সজলদা, আমি যে কেন এসেছি, জিজ্ঞেসও করলে না একবার।'

সজল বলল, 'তুমি এসেছ, এতে কি যে খুশী হয়েছি! জিজ্ঞেস করব কেন?'

'আমি কিন্তু একটু বিপদে পড়ে এসেছি?'

'বিপদ? কি বিপদ? এতক্ষণ বল নি কেন?'

আরতি হেসে বলল, 'বাবার অসুখ। কয়েকটা টাকা দরকার। তা ভাবলাম তুমি ত চাকরী কর। তোমার কাছে চাইতে লজ্জা নেই। আমার টিউসন-এর টাকা পেতে দেরী আছে। ছাত্রীরা কলকাতার বাইরে।'

সজল নিজেকে ধন্য মনে করছিল। আরতি অভাবের দিনে তার কথা যে মনে রেখেছে, এতেই সজল কৃতার্থ! সজল বালিশের নীচে খাম থেকে যা ছিল, সব বের করে দিল।

আরতি গুনে গুনে দেখল ন টাকা বারো আনা। আরতি পাঁচটা টাকা নিয়ে বাকীটা ফিরিয়ে দিল।

সজল বলল, 'এতেই হবে? আরও নাও না, আমি রেণুদির কাছ থেকে চেয়ে নেব।'

আরতি বলল, 'রেণুদি কে?'

'অফিসে এক সঙ্গে কাজ করি। খুব হেল্প করেন আমাকে? খুব ভাল মেয়ে।'

আরতি বলল, 'না, এতেই হয়ে যাবে। একটা ওষুধ কেনা দরকার। বাবার জন্য।'

আরতি উঠতে যাচ্ছিল। সজল বলল 'বাঃ উঠলে যে!' আরতি হেসে বলল 'কতক্ষণ এসেছি জানো?'

অনেকক্ষণ পরে আরতিকে সজল এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। পাশাপাশি হাঁটছিল দুজন। সজল দেখছিল আরতির শাড়ীটা ছেঁড়া। হাতে সেলাই করা। আরও ব্লাউজটাও দু এক জায়গায় রিপু করা। তবু কোথায় একটা আভিজাত্য আছে, এমন একটা সূক্ষ্ম নিবিড় সৌন্দর্য আছে যে আরতিকে এই দারিদ্র পোশাকে সুন্দর লাগছে। আরতি বাঁ হাত দিয়ে চুলগুলো সরালো। নিটোল হাতের দীর্ঘ আঙুলগুলো সজল আবার দেখল। আরতির চোখের পাতা কেমন ঘন কালো আকাশের মত শান্ত। আরতি চুলগুলো খোঁপা করে বাঁধল।

এই নির্বাক শান্ত আরতির কাছে এলে সজল তার সকল অস্তিত্ব ভুলে যায়। এ এক মধুর, সুন্দর, পবিত্র পরম বিস্মৃতি!

আরতি ধীরে ধীরে বলল, 'হাতটা এবে ভাল হচ্ছে সজলদা। টাকা ফিরৎ দিতে যেদিন আসব, সেদিন গোটা গৎটাই লিখে দিয়ে যাব। গৎ বাজাতে ভালো লাগবে কিন্তু আনন্দ হল আলাপে। ধ্যানের আনন্দ।'

আরতি বাসে উঠল। সজল তবু দাঁড়িয়ে ছিল। যেন এইমাত্র এমন কিছু হারিয়ে গেল যা সে সারা জীবনে আর ফিরে পাবে না!

আরতি জানালার ধারের আসনটায় বসে হাত নেড়ে সজলকে ডাকল।

সজল কাছে যেতে হেসে বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে, বাসায় যাও।'

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

বাংলার লোকশিল্প

কোন এক সম্রাট-পুত্র একদা বাংলার লোকশিল্পের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দিল্লীর সিংহাসন পর্যন্ত তুচ্ছ করতে চেয়েছিলেন। এমনি ছিল সেদিন বাংলার লোকশিল্পের মাহাত্ম্য। কিন্তু সেই শিল্প এবং মাহাত্ম্য দুই-ই আজ আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। কোন এক সময়ে যে আমরা এদিক থেকে খুবই সমৃদ্ধশালী ছিলাম কোন বিদেশীকে সেকথা প্রমাণ করা বড়োই দুঃসাধ্য। অথবা এজন্য ইতিহাসের পাতায় ডুব দিতে হবে। তার চেয়েও ভালো যদি আমরা এরকম শিল্পকর্মের সামনাসামনি দাঁড়াতে পারি। তাহলে একদিকে যেমন আত্মসন্তোষ অনুভব করা যায় তেমনি অন্যদিকে সহজ উপলব্ধি ঘটে যে আমাদেরই অবহেলায় লোকশিল্পের এই মহান ঐতিহ্য থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেছি। অন্তত আমার তো সেরকমই মনে হয়েছিল কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে গুরুসদয় মিউজিয়াম আয়োজিত বাংলার লোকশিল্প প্রদর্শনীতে হাজির হয়ে। নকশীকাঁথা, পট, লক্ষ্মীসরা, কুলো, পিঁড়ি, হাঁড়ি প্রভৃতি সামগ্রীতে ভরা এই প্রদর্শনী যেন সেদিন কোন এক রূপকথার জগতে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল। এই সম্পদ আমাদেরই অথচ আজ আর আমরা এর প্রত্যক্ষ অংশীদার নয়—এরকম একটি ভাবনা একদিকে যেমন আনন্দ অন্যদিকে তেমনি বিষাদের ছায়া ফেলেছিল।

প্রদর্শনীর অন্যতম বৃহৎ আকর্ষণ ছিল নকশীকাঁথা। এর সঙ্গে আজ আর আমাদের তেমন সম্পর্ক নেই। তাই এই শিল্পটি যে কেমন এবং কতটা উচ্চমানের সে সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। এই প্রদর্শনী থেকে সে ধারণা অনেকটা সঞ্চয় করা যায়। কাঁথার কত রকমফের সুজনী, বেতন, আরশিলতা, দুর্জনী, বালিশের ওয়াড়। আর এসবই হলো ১৯ অথবা ২০ শতকের নিদর্শন। কাঁথার নকশায় প্রকৃতি এবং সমসাময়িক ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্পীরা অপূর্ব নিষ্ঠা এবং শিল্পচাতুর্যে উড়ন্ত পাখি, শিকার-দৃশ্য, গাছ, লতা, হাতি, ঘোড়া, মাছ, ময়ূর, বাঘ, ষাঁড় প্রভৃতির যেমন সুষমা-মণ্ডিত রূপ দিয়েছেন তেমনি বৃটিশ ও পর্তুগীজ সৈন্য এবং রেলগাড়িও এঁকেছেন সূচীশিল্পে নিপুণ সূক্ষ্মতায়। নকশী-কাঁথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বৃত্তায়িত কেন্দ্রস্থল। সাধারণতঃ পদ্ম-ফুলেরই এখানে প্রাধান্য। এই নিপুণ বস্তুচেতনতা শিল্পীদের অন্তর্মুখী চেতনাকে সৌরভমণ্ডিত করেছে। এসব কাঁথা সংগৃহীত হয়েছে খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর এবং ঢাকা থেকে।

আবার প্রদর্শনীর কথায় আসা যাক। গৃহশিল্পসামগ্রী আর পুতুল-খেলনায় প্রদর্শনী ছিল জমজমাট। লক্ষ্মীসরা, বিয়ের পিঁড়ি, কুলো, সরা প্রভৃতি নানা জিনিসের ভিড়। বিয়ের পিঁড়ি আর কুলোর কথায় মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগে দেখা একটি প্রদর্শনীর কথা। বিয়ের তত্ত্ব ছিল সেই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু। বিচিত্র পিঁড়ি আর কুলো ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। দর্শকদের অনেকেই এসম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করছিলেন। কেউ কেউ আবার শিল্পীর নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে গেলেন। জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তে যখন আমরা শিল্পচাতুর্যে মায়াজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখতাম আজ তাও আমরা হারিয়ে বসে আছি। সেদিন আমার নিজের কাছে নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়েছিল। আজ আবার সেই বেদনাটা চিনচিন করে উঠলো চিত্রিত বিয়ের পিঁড়ি আর কুলোর সামনে দাঁড়িয়ে।

সে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। ভাবনা দূরে সরিয়ে আবার প্রদর্শনীতে মনোনিবেশ করি। লক্ষ্মীসরা আর সরায় তন্ময় হয়ে যাই। যেমন নিখুঁত শিল্পজ্ঞান তেমনি সজীব তুলির পরশ। এসব জিনিস এখনো একেবারে উধাও হয়ে যায় নি। তবে যা পাওয়া যায় না তা হলো শিল্পীর আত্মদান অনুভূতি। সে জগৎ থেকে আমরা নির্বাসিত। যন্ত্রের যুগে এখন আমরা পুরোপুরি যান্ত্রিক।

আমরা অনেকেই পুতুল সংগ্রহ করতে ভালবাসি। এজন্য কোন শিল্পবোধ বা এজাতীয় কোন কিছুর দরকার নেই। নেহাত ভাল লাগার জন্যই পুতুল কেনা। এক বাড়িতে আমি দেখেছিলাম, আলমারি-ভর্তি সুন্দর সুন্দর পুতুল। তা নাকি ওদের তিন-পুরুষের সংগ্রহ। বাড়ির কর্তা বা গিন্নির তেমন শিল্পীমন নেই। তবু ওঁরা বলেন, যখন খুব খারাপ লাগে আর দুনিয়ার সকলের উপর ঘেন্না ধরে যায় তখন একবার এখানে এসে দাঁড়াই। মনের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়। আজো তাই ওঁরা পুতুল কেনেন। এই প্রদর্শনীতে পুতুল-খেলনার সমারোহে আমার সেই কথা মনে পড়ে গেল। অনেক পুতুল আর সবই সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মা ও ছেলে এই পুতুলই বেশি। এমন লালিত্যময় মা ও ছেলের পুতুল এখন আর বড়ো একটা নজরে পড়ে না। এই সঙ্গে আছে অভ্র মেশানো পোড়ামাটির পুতুল আর রোদে শুকানো মাটির নাকটেপা পুতুল। আজকাল বাজারে আর মেলায় যে পুতুল পাওয়া যায় শিল্পসৌন্দর্যে এর সঙ্গে সেসবের কোন তুলনা চলে না। খেদের কথা যে এমন শিল্পও দিনে দিনে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। অথচ পুতুলের ওপর মানুষের আগ্রহ চিরন্তন। এই তো কিছুদিন আগে এক ভদ্রমহিলা একটি প্রদর্শনী করলেন পুতুলের। তবে সেসব পুতুল ছিল কাপড়ের ছেঁড়া ন্যাকড়া আর অনেক ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে তিনি পুতুল তৈরি করেন। এক একটি পুতুল যেন সৌন্দর্যের খনি। তিনি আবার এই শিল্পগুণ নিজের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে শেখানও অনেককে। এছাড়া বিদেশেও পুতুলের চাহিদা খুব। অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশে শুধু পুতুলের ব্যবসা করে বাজারে চমক সৃষ্টি করে। আমাদের এখানেও পুতুলের খুব চাহিদা। কিন্তু মনের মতন পুতুল আমরা পাই না। এক সময়ে ধারণা ছিল যে পুতুল শুধু শিশুদের মনোরঞ্জন করে। অভিজ্ঞতায় আমরা জেনেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। এবার সেই ভ্রান্তি নিরসনের ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। মাটির পুতুলের ব্যাপক চর্চার উৎসাহদান প্রয়োজন। উৎসাহ পেলে মাটির আর ন্যাকড়ার পুতুলের চর্চা পাশাপাশি চলতে পারে। এতে কাজের সুযোগও বাড়ে। আমাদের লোকশিল্পের মধ্যেই কাজের এমন সুযোগ তবু আমরা বেকার থাকবো কেন?

এছাড়া প্রদর্শনীতে আরো আছে পট, কাঠখোদাই, মূর্তিভাস্কর্য, পোড়ামাটির কাজ, ক্ষুদ্র লোকচিত্রশিল্প, মুখোশ আর ডোকরা শিল্প। এক সময়ে পটে আমাদের খুব খ্যাতি ছিল। এসব পট সেই খ্যাতির নিদর্শন বহন করে চলেছে। বিবাহদৃশ্য আর ভাইফোঁটার পটে আমাদের সংস্কার চিরজাগ্রত। কাঠখোদাইয়ে জমিদারবাড়ির সদর এবং অন্দরমহল যুগ থেকে যুগান্তরে আমাদের সদা-বিস্মৃত অতীতকে ধরিয়ে দেবে। আর নাপিত-বউ যেখানে গিন্নির পায়ে আলতা পরাচ্ছে সেও তো আমাদের বিস্মৃতপ্রায় অতীত। মূর্তিভাস্কর্যে সন্তান জন্ম, চুল আঁচড়ানো, পোড়ামাটির কাজে ধাবমান হরিণযূথ, হাতি-ঘোড়া-উটের পিঠে শিকার দৃশ্য, মানুষের মুখাবয়ব সমন্বিত সিংহ এবং ডোকরা শিল্পের নিদর্শন একপ্রস্থ কুনকে আমাদের সামগ্রিক লোকশিল্পকে এক সঙ্গে উপহার দিয়েছে।

লোকশিল্পের এই প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে নয়নাভিরাম। এরই মধ্যে কোথায় যেন এক নিঃশব্দ বেদনা খচখচ করে, এই শিল্পের জগৎ থেকে আমরা স্বেচ্ছানির্বাসিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা। তাই এই দপ্তরের কাছে আমাদের সবিনয় অনুরোধ যে শুধু প্রদর্শনী নয় লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনে এগিয়ে আসুন। এমন অনেক লোকশিল্পী এখনও আছেন যাঁদের অনেক কিছু দেবার আছে। কিন্তু সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাঁরা শুকিয়ে মরছেন। এখনও ব্যবস্থা করলে তাঁদের উত্তরাধিকার পরবর্তী পুরুষে বর্তাবে। সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে সুদৃঢ় গ্রামীণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ। আর অন্যথায় অরণ্যে রোদনই সার হবে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে লোকশিল্পের মহিমায় গৌরব অনুভব করা যাবে কিন্তু কোনদিনই সে মহিমা আত্মগত হবে না।

—প্রমীলা

ফ্যাসানের নেশা

আমাদের টুলুমাসী—চল্লিশের ওপরে বয়স, ছেলেমেয়েরা সব ডাগর ডাগর। শুনেছি বড় ছেলেটি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। মেয়েটি এবার পার্ট টু দেবে। ছোট মেয়েটি কোন একটা ইংরেজী স্কুলের ছাত্রী। টুলুমাসীর আবার ইংরেজীর ওপর বেজায় ঝোঁক। তাঁর ধারণা ইংরেজী স্কুলে না পড়লে মেয়েরা ঠিকমতো হাঁটা-চলায়, কথাবার্তায় চৌকশ হতে পারে না। টুলুমাসীর পরিচিতরা অনেকে আড়ালে হাসেন, ঠাট্টা করে বলেন, 'ভাগ্যিস টুলুমাসীর মা-বাবা তাঁকে বাঙালী স্কুলে পড়িয়েছিলেন নয়তো টুলুমাসী এতদিনে খাঁটি মেমসাহেব হয়ে যেতেন।' অবশ্য আত্মীয়স্বজন একবাক্যে স্বীকার করেন টুলুমাসীর ছেলেমেয়েরা যেন এক-একটি রত্ন। যেমন চেহারায়, তেমনি চালচলনে। ওদের চলনবলন ঠিক টুলুমাসীর বিপরীত।

এবার একটু টুলুমেসোর পর্বে আসা যাক। টুলুমাসী থেকেই মেসোকে আমরা সোহাগ করেই টুলুমেসো ডাকতাম। তাতে টুলুমেসো মহাখুশী। ভাবখানা এমন মেসো আর মাসী তো একাত্মা—ভিন্ননামের আর প্রয়োজন কি। এই টুলুমাসীর সঙ্গে আলাপের একটা ফিরিস্তি দিচ্ছি। শ্যামবাজারে যেখানে আমরা দু'ঘরের বাসিন্দারা এক বাড়ীতে বাস করতাম সেখানে টুলুমাসী প্রায়ই আসতেন। তখনও টুলুমাসীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়নি, এমনকি চাক্ষুষ দেখিনি। নিচের বাসিন্দাদের কাছে টুলুমাসীর গল্প প্রায়ই শুনতাম। ওদের নাকি কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। ওরা গল্প করে বলতো 'যেমন টুলুমাসীর বিরাট চেহারা তেমনি উৎকট সাজপোষাকের ঘটা। এরকম মহিলা বাঙালী ঘরে বিরল।' স্বভাবতঃ এহেন টুলুমাসীর গল্প শুনে তাঁকে দেখার জন্য আমরা লালায়িত হবো এ আর বেশী কথা কি। নিচের বাসিন্দাদের বিশেষ অনুরোধ করলাম টুলুমাসী এলে যেন খবর দেয়। একবার দেখে অন্ততঃ চক্ষুকর্ণের তৃষ্ণা মিটাবো। সত্যি সত্যিই দিনকয়েক বাদে টুলুমাসী মেসোকে নিয়ে ঝড়ের মতো হাজির হলেন। আমরাও খবর পেয়ে যথারীতি রেলিং দিয়ে ঝুঁকে পড়লাম। ভাড়িংগতিতে টুলুমাসী ঠোঁট নাড়ছেন, ওপরে শব্দছাড়া কোন বাক্য এসে পৌঁছচ্ছে না। আকার-ইঙ্গিতে বুঝলাম টুলুমাসী খুব ব্যস্ত, [illegible] বলার সময় নেই। মেসো তো [illegible] দাঁড়িয়ে। মোটামুটি মানুষটি, [illegible] টুলুমাসীর [illegible] উজ্জ্বল, পোষাকে-[illegible] চলনের ভঙ্গিতে ভালভাবেই [illegible]। টুলুমাসীর বক্তব্য শেষ হলে [illegible] হয়তো কোন কথার পরি-[illegible] জ্বলে উঠলেন, তারপর চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন। এবার টুলুমাসী হাত নাড়িয়ে কি বোঝাতে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে কানের দুলোটা ঝলমলিয়ে নড়েচড়ে উঠলো। টুলুমাসীর বড় গলা, হাতকাটা, পিঠকাটা ব্লাউজের শরীরটাও দুলে উঠলো। আর নড়ে উঠলো বৈদ্যুতিক আলোটা নাক-মুখ-চোখের খাঁজে খাঁজে। এতক্ষণে টুলুমাসীর রং-চংয়ে শাড়ীর সঙ্গে মুখের প্রলেপ, ঠোঁটের রং প্রকট হয়ে চোখে পড়লো। টুলুমাসীর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেলে, ডিগ্রী-কোর্সের মেয়ে টুলুমাসীর এরকম রংদার শাড়ীর ঘোর বিপক্ষে। শুনেছি তারা সাধারণ জামা-কাপড় ব্যবহার করতে ভালবাসে উপরন্তু মায়ের এরকম চটকদার সাজের জৌলুষে লজ্জিত। অথচ টুলুমেসো মাসীর এরকম সাজ না দেখলে অসন্তুষ্ট, মনে মনে নিজেদের ব্যাক-ডেটেড ভাবেন।

সেই টুলুমেসো একটা বিদেশী নামী ফার্মের অফিসার, শুনেছি দু'বছরে একবার বিদেশ সফরে যান অফিসের কাজে। এবারও মাসচারেক আগে প্রায় শীতের শেষাশেষি মেসো বাইরের কোন দেশে গেছেন বোম্বে হ'য়ে। মেসো যাবার সময় বোম্বের পথে-ঘাটে সব মেয়েদের, মহিলাদের গো-গো চশমায় সাজতে দেখেছেন। অবশ্য প্রাক্‌গরমে গো-গোর চলন কলকাতায় ততটা ছিল না। বিদেশে গিয়েও টুলুমেসোর সেই একই চিন্তা। মাসীর তো এখনও গো-গো কেনা হয়নি। এব্যাপারে মাসী পিছিয়ে থাকবেন এটা কেমন কথা—তাতে টুলুমেসোর সম্মান নিয়ে টানাটানি। যদিও ছেলেমেয়েদের মায়ের প্রতি অনুরোধ এত আধুনিক সাজে নিজেকে না সাজাবার জন্য। ওদিকে টুলুমেসোর ঘন ঘন তাগাদার চিঠি, 'আর দেরি না করে একটা গো-গো কিনে ফেলো। গতবারের পুরনো মডেলটা এবার আর চালিও না—লক্ষ্মীটি, আমার প্রেস্‌টিজ থাকবে না।'

মেসোর প্রেসটিজ বলে কথা। টুলুমাসী ছেলেমেয়েদের সব অনুরোধ নস্যাৎ করে দিয়ে হঠাৎ একদিন দুপুরে আমার কাছে ছুটে এলেন। হাতে বাহারী ছাতা, ঠোঁটে আবির রং, মুখে ঘন প্রলেপ। টুলুমাসী একটা গো-গো কিনবেন, আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে হবে। প্রস্তাব শুনে চিন্তিত হলাম, টুলুমাসীর মতো বয়স্ক একজন মহিলাকে আমি কোন্ চত্বর থেকে গো-গো কিনে দেবো, বিশেষ করে এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা কম।

যথারীতি দুজনে বেরিয়ে গলির মোড়ে গিয়েছি অমনি আমার ভাই টুলুমাসীকে দেখে হাসি মিলিয়ে করে যেমনি তাঁর গো-গো কেনার শখের কথা জানলো অমনি যেন বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ার মতো লাফিয়ে উঠে বললো, মাসি ও জিনিসটি আর কিনবেন না। সেদিন মিনিবাসে একটি মেয়ে গো-গো পরে এমন ভঙ্গীতে বসেছিল যে ও আধুনিকা সাজতে গিয়ে বড্ড আপনজোর মতো সামান্য নাকটাকে একেবারে অফ করে দিয়েছে, বড্ড বাজে লাগছিল। আসলে সব জিনিস তো আর সকলের জন্য নয়। বিরত থাকুন মাসি ও সখে আর কাজ নেই।' মাসী একগাল হেসে কথাটা ঠাট্টা হিসেবে দিব্যি উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আর রসিকতা করিস না। আমাকে মানায় না এমন জিনিস আছে তোদের টুলুমেসো তো কস্মিনকালেও স্বীকার করেন না।

খুশীমনেই টুলুমাসী আমাকে শ্যামবাজারে একটা চশমার দোকানে নিয়ে গেলেন। শো-কেস দেখিয়ে দোকানদার টুলুমাসীর পছন্দের অপেক্ষায় রইলেন। খানিক নীরব থেকে টুলুমাসী বিরক্তিসূচক মন্তব্য করলেন, 'মডার্ন', মডার্ন বলে এত বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন অথচ সেই অষ্টাদশ শতকের মডেলে দোকান সাজিয়েছেন।' দোকানদার স্তব্ধ হয়ে রইলেন। 'উত্তর কলকাতায় কোন জিনিসেরই একটা মনমতো দোকান নেই' স্বগতোক্তি করে টুলুমাসী দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

এবার টুলুমাসীর বায়না তাঁকে নিয়ে যেতে হবে চৌরঙ্গীপাড়ায়। সেখানে হরেক-রকমের চশমার দোকান। লিণ্ডসে স্ট্রীটের দোকানেই আগে হাজির হলাম। তারপর এপাড়ায়-সেপাড়ায়, কোথাও টুলুমাসীর পছন্দমতো চশমা নেই। আমি মনে মনে বিরক্তিবোধ করলাম। তবুও ভদ্রতায় ভুরু কোঁচকান ছাড়া আর কোন বহিঃপ্রকাশ হলো না। অগত্যা টুলুমাসীকে চৌরঙ্গী ওপরে একটা বড় দোকানের সামনে হ[illegible] করিয়ে বললাম, 'একটা পছন্দ করে নিন।' ভাবলাম কলকাতায় টাকা দিলে বাঘের দুধ মেলে, আর টুলুমাসীর একটা গো-গো কিনতে এত নাজেহাল। টুলুমাসী এটা দেখি, ওটা দেখি বলে অনেক নাড়াচাড়া ক'রে ঠোঁট উল্টালেন। 'কিসসু পছন্দ হচ্ছে না। তোদের মেসোকেই লিখবো ফেরার সময় যেন নিজের পছন্দমতো একটা গো-গো বোম্বে থেকে কিনে আনেন। টুলুমাসীর এ উক্তিতে দোকানদার দারুণ চটে গেলেন রেগে গিয়ে বললেন, 'আপনার পছন্দ-মতো জিনিস দিল্লি-হিল্লি, বোম্বেতেই মিলবে।' কাছাকাছি সকলেই এই মন্তব্য শুনে মুচকে হাসতে লাগলেন আর বিশাল বপু টুলুমাসীকে আরও ভাল করে লক্ষ্য করলেন। টুলুমাসীর এতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু আক্ষেপ 'এ গরমে বোধহয় আর গো-গো পরা হল না।' মেসোর ফিরতে এখনও কিছু দেরি। ওদের মুচকি হাসি আমাকে যেন চপেটাঘাত করতে লাগলো। মনে মনে সেই কথাটা ভাবলাম—কোন পোষাক পরলে কেউ যেন না বলে তোমার পোষাকটি তো বেশ, বলে যেন তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে। অধিক বয়স্কা, অত্যাধুনিকা টুলুমাসীকে একথাটা কে বোঝাবে!

—অঞ্জলি চৌধুরী

জলসা

অভ্যুদয়ের রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন বাণী ঠাকুর

নজরুল সংগীতের একক আসর

রবীন্দ্রসদনে 'পুনশ্চ' আয়োজিত নজরুল সংগীতের সান্ধ্যআসরের একক শিল্পী ছিলেন অনুপ ঘোষাল। 'গুপী গায়েন' খ্যাত অনুপ ঘোষাল তরুণ শ্রোতৃ মহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি এঁর নজরুলগীতির বিশিষ্ট শিল্পী হয়ে ওঠবার সংকল্প (এই একই সংস্থা আয়োজিত আসরে) সম্বন্ধে আমরা অবহিত হয়েছি।

সেদিন অনুপবাবু সর্বসমেত কুড়িখানি গান শুনিয়েছেন। এঁর গাওয়া 'অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে', 'আজি নন্দদুলালের সাথে', 'সাজিয়াছ যোগী বল'—ভাল লেগেছে সুর-শুদ্ধতা, সংযত প্রকাশভঙ্গী এবং গাওয়ার আন্তরিকতার কারণে। যেসব নজরুলগীতি শচীনদেব বর্মনের কন্ঠে আজও অমর হয়ে আছে ('পদ্মার ঢেউ রে', 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া') এবং তিনি ছাড়া আর কারো কন্ঠে শোনবার কথা ভাবাও যায় না—সেইসব গান গাইবার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দনীয়—কিন্তু এ বিষয়েও তাঁর শিল্পীজনোচিত পরিমিতিবোধে সজাগ থাকা উচিত ছিল। শচীন দেববর্মনের গায়কীর এমন কতকগুলি ম্যানারিজম আছে যা তাঁর প্রকাশবৈশিষ্ট্য এবং শিল্পীব্যক্তিত্বের সংগে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর এ 'ম্যানারিজম' তাঁকেই মানায়। তাঁর শিল্প-চিন্তাকে অধ্যয়ন না করে শুধুমাত্র জনপ্রিয় গায়নভঙ্গী (যেমন কুহু, কুহুকে কুঁহু কুঁহু অথবা জায়গা বিশেষে গলাভাঙ্গা) নকল করলে রসসৃষ্টি ব্যাহত হয়—রসহানি ঘটে। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তারপর 'রুমাঝুমা' গানটিতে 'ফুলদলমুরতায়'-এর শ্রুতি পরিবর্তনের জন্য গানটির সুরের ভূমিকায় যে বিশেষ বক্তব্য ছিল তাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য প্রাক্তনা ইন্দুবালা এবং উত্তরসূরী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়েরও 'রুমাঝুমা' গানটির রেকর্ড আছে। প্রথমার সুর ও পরি-বেশন পদ্ধতি অক্ষুন্ন রেখেও সতীনাথ-বাবু ঐ গানটিতে যথেষ্ট মাধুর্যসৃষ্টি করতে পেরেছেন তাঁর প্রতিভার কারণেই। এছাড়া গানগুলি পরিবেশনায় ক্রমপর্যায় আরো সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত হতে পারত।

নজরুলের গানের একটা নিজস্ব 'কন-ভেনশন' আছে—তাকে আয়ত্ত না করে তার-পর স্বকীয়তার সরস করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলির দিকে নজর দিলে শ্রীঘোষাল নজরুলগীতির একজন বিশিষ্ট গায়ক হয়ে উঠতে পারেন। কারণ তাঁর নিষ্ঠা আছে। আছে সুরেলা সতেজ কন্ঠস্বর ও আন্তরিকতা।

যন্ত্রসংগীতে নির্মল বিশ্বাসের সেতার ও দিলরুবা সঙ্গত—এ অনুষ্ঠানের এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। 'মোরা ছিনু একেলা', 'সাজিয়াছ যোগী' আরম্ভ হওয়ার আগেই 'দেশ' ও 'যোগিয়া' রাগের রূপাভাস গান-গুলির রাগভিত্তির পথচিহ্নিদেশক হয়ে ওঠে। কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণের বাঁশী সঙ্গতও ভাল—কিন্তু মাঝে মাঝে লয়ের অসংগতির জন্য দায়ী কে? শিল্পী না যুগল তবলচি?

অভ্যুদয় সঙ্ঘের রবীন্দ্রজয়ন্তী

মুক্ত প্রাঙ্গণে এক অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিকতাস্নিগ্ধ পরিবেশে দমদমের এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অভ্যুদয় সঙ্ঘ উদ্‌যাপন করলেন তাঁদের রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব।

রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সান্ধ্য সভার উদ্বোধন করলেন সভাপতি মণীন্দ্র রায় ও প্রধান অতিথি প্রফুল্ল রায়।

এর পর এক সাহিত্যবাসরের পরই শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান।

অনুষ্ঠান শুরু হোলো মায়া সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। পরিণতমানা জনপ্রিয় শিল্পীর প্রথম গান ছিল 'মহাবিশ্বে মহাকাশে'। খোলা আকাশের নীচে 'ইমন' রাগাশ্রিত এই গান যেন সন্ধ্যা বন্দনার পরিবেশ রচনা করে। তারপর 'না সজনী', 'আমি হৃদয়ের কথা' দিয়ে পরিবেশ জমিয়ে তুলে শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠানের ব্যঞ্জনা-গভীর সমাপ্তি ঘটালেন 'তবু মনে রেখ' দিয়ে।

বাণী ঠাকুর, বনানী ঘোষ, সুশীল মল্লিক, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, পূরবী মুখোপাধ্যায়, আপনাপন বৈশিষ্ট্য, শিল্পীমান ও গায়ন-শৈলীর দীপ্তিতে সেদিনের উৎসবকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। যোগদানকারী অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অসীম ভট্টাচার্য, মনীষা চৌধুরী, প্রণব ঘোষ. আবৃত্তিতে ছিলেন গৌতম বসু (আকাশ-বাণী) ও দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

কল্যাণী ই-এস-টি ক্লাবের রবীন্দ্রজয়ন্তী

কয়েকদিন আগে কল্যাণী ই-এস-টি ক্লাব রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করেন। 'আগুনের পরশমণি' সম্মেলক সঙ্গীত দিয়ে। এ সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক বি এম আচার্য, প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)।

ক্লাবের সভ্যবৃন্দের রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির পর 'ডাকঘর' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। সঙ্ঘের অন্যতম সুহৃদ এই উপলক্ষ্যে স্বর্গত নির্মল সরকারের স্মৃতিরক্ষার্থে 'নির্মল স্মৃতি পাঠাগার' গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানটিতে বিপুল জনসমাগম ঘটে।

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাকসন্সের দেশাত্মবোধক গান

দেশাত্মবোধক গানের সিরিজে হিন্দু-স্থান মিউজিক্যাল প্রোডাকট্সের বিশেষ অবদান হোলো 'বিক্ষুব্ধ বাংলা'-র সঙ্গীত আলেখ্য পরিবেশিত একটি এল পি ডিস্ক। ১৯৪৭ অব্দে ভারত বিভাগের ফলশ্রুতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।

তারপরই স্বাধীনতাকামী পূর্ব পাকি-স্তানের (আগে যা ছিল পূর্ব বাংলা) ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরতার নৃশংস কাহিনী এবং নানান ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার অভ্যুত্থান।

সংগ্রামের নানা অধ্যায়েরই এক সঙ্গীতমুখর রূপ 'বিক্ষুব্ধ বাংলা'। প্রথমেই 'ডি এল রায়ের' 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলার রূপাঙ্কন তারপর 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো', 'ও আমার জন্মভূমি জননীরে', 'সারা বাংলা জেলখানা', হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার' 'এবার উঠেছে মহাঝড় আলোড়ন', 'এ ঘর দুর্গ ও ঘর দুর্গ', 'সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের', 'আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা' 'রক্তের প্রতিশোধ রক্তেই নেবো' ও 'তীরহারা এই

ঢেউএর সাগর'—১০ খানি গানে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সুন্দর আলেখ্য রচনায় ডি এল রায় ছাড়া যেসব সঙ্গীত রচয়িতার অবদান রয়েছে তাঁরা হলেন আপেল মেহমুদ। গোবিন্দ হালদার শামিসুল ইসলাম, মাকসুদ আলি খান, আব্দুল গফফর চৌধুরী, প্রণোদাই বড়ুয়া ও সেওয়াজীস। গ্রন্থনায় আছেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (এ ডিস্কের এক বিশেষ আকর্ষণ)। সংলাপে—দিলীপ ঘোষ। সুষ্ঠু সঙ্গীত পরিচালনায় কৃতিত্ব প্রাপ্য মহম্মদ আব্দুল জব্বার ও আপেল মেহমুদে।

সঙ্গীত রূপায়ণকারী শিল্পীরা হলেন মহম্মদ আব্দুল জব্বার, আপেল মেহমুদ, স্বপ্না রায়, তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব বকসী, শিখা দে, জয়া গোয়েঙ্কা, অমিতবন্ধু ঘোষ, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর রায়। স্বাধীন বাংলার—স্বপ্ন ও বিপ্লবের এক বিশ্বাসযোগ্য দলিল হিসাবেও এ রেকর্ডটির মূল্য যথেষ্ট।

৪৫ আর পি এম রেকর্ডগুচ্ছের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। অংশুমান রায়ের কণ্ঠে 'শোনো একটি মুজিবের কণ্ঠে'।—এ গান মনে করিয়ে দেয় অবরুদ্ধ মুজিবের জন্য উৎকণ্ঠিত মুহূর্তের সেই উদ্বেগব্যাকুল দিনগুলি—যখন এপার বাংলা ওপার বাংলার প্রতিটি মানুষ বীর মুজিবের মুক্তি প্রহর গণনায় ব্যাকুল, আর তাদের প্রতি মুহূর্তের প্রার্থনা "মুজিবকে যেন ফিরে পাই"— ঠিক সেই মুহূর্তের আশ্বাসবাহী এই গানখানার জনপ্রিয়তা ভোলার নয়। এ ডিস্কে উপরি পাওনা রূপে পাওয়া গেল একই গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন রচিত ইংরাজী অনুবাদ 'এ মিলিয়ন মুজিবারস সিঙ্গিং' দিনেন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় গেয়েছেন করবীনাথ ও অংশুমান রায়। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া "ঐ তারা চলে দলে দলে" ও "শোনো বাংলার জনসমুদ্রে"—এক বিশেষ আকর্ষণ। দেশপ্রীতিরই নানা ভাবকে রূপ দিয়েছেন অমর পাল (পল্লীগীতি), আপেল মাহমুদ ও স্বপ্না রায় (২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি)। এপারের শিল্পী দীপেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ও-পারের দুটি গান, আব্দুল জব্বর (পল্লীগীতি ও দেশাত্মবোধক বাণী লাহিড়ীর পরিচালনায় অমর পাল (ব্যঙ্গাত্মক পল্লীগীতি—ইয়াহিয়ার পাঁচালী) এবং আবদুল জব্বরের কণ্ঠে মাতৃবন্দনা "বাংলা মোদের মা" ও দুই বাংলার মিলনগীতি 'এই বাংলায় একই রক্তে'। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আবেগের দোলা "যদি একটি শিশুকেই বাঁচাতে পারি"।

দুই বাংলায় এই মিলিত সৃষ্টি নিঃসন্দেহে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস-এর এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক অবদান।

নটরাজের "ফাল্গুনী"

নটরাজের এক চরণের আঘাতে ধ্বংসলীলা অপর চরণস্পর্শে সৃষ্টির শতদল ফোটানোরই প্রস্তুতি। শীতের রিক্ততা বসন্ত প্রাচুর্যের পূর্বাভাষ।—জরার অপর পিঠ তারুণ্য—এই তারুণ্যেরই জয়গান কবি গুরুর "ফাল্গুনী"।

"ফাল্গুনী" নৃত্যনাট্যের এক সুন্দর রূপ কল্পনা পাওয়া গেল সম্প্রতি একাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বজিৎ রায় পরিবেশিত অনুষ্ঠানে।

শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারার এক লাবণ্যপূজিত নিদর্শন রাখলেন নন্দিতা মজুমদার, নন্দিতা মুখুটি, নির্মলা নাথ, মৈত্রেয়ী চৌধুরী দেবযানী সেনগুপ্ত ও সুভদ্রা ভট্টাচার্য। নৃত্যনির্দেশনায় ছিলেন সুকৃতি চক্রবর্তী, শিবশঙ্করম, শান্তি বসু এবং সুপ্রিয়া ঘোষ।

রবীন্দ্রসংগীতের কথা ও সুরের যথাযোগ্য মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন প্রতিমা রায়, রীতা ঘোষ, পূর্ণিমা বসু, দীপ সেন ও বিশ্বজিৎ রায়। সমবেত সঙ্গীতগুলি সুষ্ঠু পরিবেশনা নৃত্যশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

টীম ওয়ার্কের সুষ্ঠু সমন্বয় নিপুণতা ছাড়াও সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্বজিৎ রায়ের দক্ষতা একাধারে আবৃত্তি, একক সঙ্গীত এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায়।

গ্রামোফোন কোম্পানীর নতুন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

গ্রামোফোন কোম্পানীর মূল প্রতিষ্ঠান ইংলন্ডের ঈ-এম-আই কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি মিঃ এ কে সুদকে দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করেছেন।

মিঃ সুদের বয়স মাত্র আটত্রিশ বৎসর। তিনি ভারতে নিযুক্ত তরুণ ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের অন্যতম। ঈ-এম-আই গ্রুপে যোগদান করার আগে তিনি বোম্বাই-এ ভারত সরকার পরিচালিত ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মিঃ সুদ দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে অর্থনীতিতে এম-এ পাশ করে ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ইণ্ডিয়ান একাউন্টস এণ্ড অডিট সার্ভিসে যোগ দেন এবং বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নানা উচ্চপদ অলঙ্কৃত করেন। ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় তাঁকে ওয়ার্ক স্টাডি, অরগানাইজেশন এবং মেথড টেকনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ও উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকায় প্রেরণ করেন।

মিঃ সুদের মত একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ণধাররূপে পেয়ে আশা করা যায় গ্রামোফোন কোম্পানী আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

'ভারতী' রেকর্ড কোম্পানীর রবীন্দ্রার্ঘ্য

'রবীন্দ্র জয়ন্তী' তিথিকে 'ভারতী' রেকর্ড কোম্পানী প্রণাম জানিয়েছেন তিনখানি ডিস্কে। গায়করা নতুন কিন্তু গানগুলি সুগীত এবং সুনির্বাচিত। সমীপেন্দ্র লাহিড়ীর কণ্ঠে শোনা গেল 'এ আচরণ কম হবে গো' ও 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' এ দুটি গানের শ্রুতিমাধুর্য অনস্বীকার্য। কণ্ঠলাবণ্য ছাড়াও যে বস্তুটি মনকে স্পর্শ করে তা হোলো তরুণ শিল্পীর নিষ্ঠা ও আবেগ।

বিপুল ঘোষ পরিবেশিত 'যে ছায়ারে ধরব বলে' ও 'ঝরা বেলা বয়ে যায়' এক পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা।

উপরোক্ত দুটি গানই পরিচালনা করেছেন সমর গুপ্ত।

আর একটি গান হোলো সলিল বসুর পরিচালনায় প্রবীর মুখোপাধ্যায় গীত 'পুষ্প দিয়ে মারো যারে' ও 'ফেরায়নি না মুখখানি'—।

দমদমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সম্প্রতি দমদমের যুবকবৃন্দ এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন : সর্বশ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, মাঃ তিলক, হীরক চৌধুরী, প্রেমেন দাস (কৌতুক গীতি), প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় (যন্ত্রসংগীত), হৈমন্তী শুক্লা, গায়ত্রী সেনগুপ্ত, বাবলু সেনগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়া অন্যান্য শিল্পীরাও ছিলেন। গায়ত্রী সেনগুপ্তর কণ্ঠসংগীত শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দেয়। এছাড়া প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের যন্ত্রসংগীতও প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগীত চক্রের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

অভিযাত্রীর উদ্যোগে সংগীত চক্রের শিল্পীরা তাঁদের বিদ্যায়তনে সম্প্রতি রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন।

শ্রীদেবব্রত দত্তর পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন দেবু চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণকান্তি দাস, লীলা দেবী, অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ সিংহ, অসীমা পাল, দেবযানী চক্রবর্তী শম্পা পাল, বাসন্তী দে, সীমা ঘোষ, লীলা দাস, কাবেরী ভট্টাচার্য, সুনন্দা দত্ত, লিপ্তা মুখোপাধ্যায়, শেখর বসু, মোহন মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রী দত্ত।

[illegible] দত্ত পরিচালিত [illegible] চিত্রে সুব্রতা চ্যাটার্জি এবং [illegible]

প্রেক্ষাগৃহ

পুণা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশান ইনস্টিটিউট-এর ছাত্রছাত্রীদের তৈরী ফিল্ম

পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী ফিল্মের প্রদর্শনী কলকাতায় একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্যে প্রথম প্রথম মনের মধ্যে যে-রকম উৎসাহ উদ্দীপনা জাগত, বর্তমানে তাতে ক্রমেই ভাটা পড়ে আসছে। এবং এর একমাত্র কারণ এই যে, ওখানকার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই আজকাল যে-সব স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরী করছেন, তার দু'একখানি বাদে বাকী সবগুলিতেই হয় অনুকরণপ্রিয়তা, আর না হয়ত কল্পনা-শক্তির অদ্ভুত দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। যাঁরা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা বা পরিচালনায় ব্রতী হওয়ার জন্যে শিক্ষালাভ করছেন, তাঁদের থাকা চাই চিন্তাশক্তির প্রসারতা, যা তাঁদের সৃষ্টিকে দেবে অভিনবত্ব। নন্দনতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বে তাঁদের সম্যক জ্ঞান থাকা চাই, যার ফলে তাঁরা হয়ে উঠবেন মহৎ স্রষ্টা। কিন্তু পুণা ইনস্টিটিউটের ছবি দেখে আমরা মনে করতে বাধ্য হচ্ছি, এই প্রতিষ্ঠানটিতে যতখানি ব্যবহারিক প্রযুক্তিবিদ্যা (ক্র্যাফট্ বা টেকনিক) শেখানো হয়ে থাকে, কলাজ্ঞান বা সুকুমার শিল্পবুদ্ধি (আর্ট) জাগ্রত করবার প্রতি ততখানি ঝোঁক দেওয়া হয় না। দেখতে পাচ্ছি, চিত্রগ্রহণ বা শব্দানুলেখন বিদ্যায় পুণার ছেলেমেয়েরা যতখানি পারদর্শিতা লাভ করছেন, চিত্রনাট্য রচনা বা পরিচালনা বিষয়ে ওঁরা ঠিক ততখানি ব্যুৎপত্তিলাভের পরিচয় দিতে পারছেন না। যেখানেই শিল্পবুদ্ধি প্রয়োগের প্রশ্ন, সেখানেই তাঁদের কেমন যেন অনিশ্চয়তা বা দৈন্যের আভাস ফুটে ওঠে। এমন কি, চিত্র-সম্পাদনা সম্পর্কেও এ-কথা বলা যায়। বলাই বাহুল্য, সম্পাদনার কাজেও সূক্ষ্ম রস-বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে পুণা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা যে আশ্চর্য কুশলতার পরিচয় দিচ্ছেন, তা একদিকে যেমনই বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনই ওখানকার অভিনয় বিষয়ক শিক্ষকদের কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ। ব্যবসায়িক ফিল্ম জগৎও যে এ-ব্যাপারে উপলব্ধি করেছে, তার প্রমাণ হচ্ছেন রেহানা সুলতান, জয়া ভাদুড়ী, রাধা সালুজা, নবীন নিশ্চল, শত্রুঘ্ন সিংহ, অনিল ধাওয়ান, পেন্টাল, জালাল আগা প্রভৃতি শিল্পী।

এ বছরে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার ছাত্রছাত্রী নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে প্রিয়া সিনেমাতে (আগের দু' বছরও এখানেই দেখানো হয়েছিল) গেল ১১ ও ১২ জুন তারিখে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে এসে পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যো-পাধ্যায় চলচ্চিত্রশিল্পের স্থান ভারতের জাতীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত উচ্চে, এই মত প্রকাশ করে বলেন যে, ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে বেরোবার পরে ব্যবসায়িক চলচ্চিত্রজগতে সহজেই নিজেদের স্থান করে নিতে পারছেন, এ-কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং যে-প্রতিষ্ঠান আজকের দিনে তার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎকে এমন-ভাবে সুনিশ্চিত করতে পারে, তার একটি শাখা-সংস্থা যাতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে

স্থাপিত হয়, তার জন্যে তিনি ভারত সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব রাখছেন এবং তাঁর এই প্রস্তাব যাতে কার্যকরী হয়, সেজন্যে তাঁর সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

এ-বছরে ছাত্রছাত্রীদের কৃত বারোখানি ছবি এবং ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জগৎ মুরারীর নেতৃত্বে তোলা একটি চার রীলের ছবি দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই প্রদর্শিত ১৯ মিনিট স্থায়ী চিত্র, সুরেন্দর চৌধুরী পরিচালিত **'বিলাপ'** গেল এপ্রিল মাসে তেহেরাণে অনুষ্ঠিত প্রথম আফ্রো-এশীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বল্পদীর্ঘ ছবিগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 'গ্রাঁপ্রী' লাভ করেছে। বন-মধ্যে একটি কাঠুরিয়া বহুক্ষণব্যাপী কুঠারের নির্মম আঘাতে একটি বনস্পতিকে ভূপাতিত করল, এই ব্যাপারটিকে চলচ্চিত্রকার পক্ষী বা শশক হত্যা এবং নারী-ধর্ষণের মতোই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলে দেখাতে চেয়েছেন। ভূপাতিত হবার পরে গাছটির পাতার স্পন্দন এবং ক্রমে স্থির হয়ে যাওয়া অবশ্যই লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু ঐ অরণ্য পরিবেশে একটি প্রেমের ঘটনা বা একটি চলন্ত সাপ দেখানো কি 'বিলাপ'-এর বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত? অসহায় বনস্পতির পতনকে দৃশ্য ও শব্দের মাধ্যমে আরও মর্মন্তুদ করে তোলবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল; বিশেষ করে সুরকার চন্দ্রভারকর এ-ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করতে পারতেন।

পুণ্ডলিক হরিশ্চন্দ্র মাজগাভকর পরিচালিত **'জীবন'** (২০ মিনিট স্থায়ী) ছবিটিতে একটি পথে-পথে-ঘুরে-খেলা-দেখিয়ে-রোজগার-করা পরিবারের দৈনন্দিন জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে বলা হয়েছে, ওদের জীবনে যত বিপত্তিই আসুক না কেন, 'খেলা দেখানো' কোনোদিনই বন্ধ হতে পারে না; কারণ, বেঁচে থাকতে গেলে খেতেই হবে এবং খেলা না দেখালে খাওয়া জুটবে না। ছবিটিতে জীবনধারণের ট্রাজেডি যথেষ্ট ফুটে উঠলেও আরও অনুভূতিপ্রবণ চিত্রগ্রহণ এবং আবহসঙ্গীতের সাহায্যে বক্তব্যকে তীব্রতর করবার সুযোগ ছিল।

জোন্স মাহালিয়াকৃত **"দূরে চলে"** (২১ মিনিট স্থায়ী) ছবিটিতে একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক তার সহকর্মীদের দ্বারা অকারণে উপহাসিত হবার ফলে কি রকম হীনমন্যতার দ্বারা আচ্ছন্ন হল এবং সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে একটি হত্যা করে বসার পরে যতই আইনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল, ততই নিজের বিবেক দ্বারা কিভাবে বিদ্ধ হতে থাকল, তারই একটি চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। ছবিটির কার্য-কারণ যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ না হলেও এই মনস্তত্ত্বমূলক চিত্রায়ণের প্রয়াসটি যে প্রশংসনীয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নীরোদনারায়ণ মহাপাত্র রচিত ও পরিচালিত **'সানমাইকা'** (১৯ মিনিট স্থায়ী) ছবিটিও মনস্তত্ত্বধর্মী। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্মব্যস্ত পরিচালক তাঁর ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে মনোবীক্ষণে প্রবৃত্ত হন এবং চিন্তা করেন, কেন এই ব্যস্ততা? কেন এই মানসিক চাপ সৃষ্টি? কেন এই কৃত্রিমতার মাঝে আমি? মনে মনে তিনি শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে চলে চান। কিন্তু সেখানেও তিনি স্বস্তি পান না; তাই আবার ফিরে আসেন প্রচণ্ড ব্যস্ততার কৃত্রিম জীবনযাত্রায়।

এ, স্বামীনাথনকৃত **'হিউজ অ্যাণ্ড রুজ'** ছবিটির বক্তব্য ভালো। আজকের কর্মব্যস্ত জীবনে কেউ কারুর খবর রাখে না। একটি ফ্ল্যাট-বাড়ীতে এক সঙ্গীহীন বৃদ্ধা মারা গেলেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তাঁর মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়ে অন্যান্য ফ্ল্যাটবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলল, ততদিন কেউ সে সংবাদ রাখেনি। এবং তাঁর মৃত্যু যে বিশেষ কাউকে স্পর্শ করেছে, তাও অন্যান্যদের আচরণ থেকে মনে হল না। চিত্রকারের প্রশ্ন, নাগরিক জীবন কি আমাদের মনুষ্যত্ববোধ হরণ করে নিয়েছে? কিন্তু বৃদ্ধার ভূমিকায় যাঁকে অভিনয় করানো হয়েছে এবং তাঁর বিভিন্ন দৃশ্য যেভাবে তোলা হয়েছে, তা আদৌ বক্তব্যকে সার্থক করবার উপযোগী নয়।

এ ছাড়া বাকী সাতখানি ছবির মধ্যে যতই পরীক্ষানিরীক্ষার চিহ্ন ফুটে উঠুক না, চিন্তাশক্তির পরিচ্ছন্নতা এবং অভিনব[illegible] নেই কোথাও। শ্যামল ঘোষ তাঁর '[illegible] **মোমেন্ট'** ছবিটিতে জীবনের একঘেয়েমি দ্বারা পীড়িত একটি চরিত্রকে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে তার মানসিক যন্ত্রণাকে তিনি পরিস্ফুটিত করতে পেরেছেন কৈ? দর্শককে তার মানসিকতার সামিল করতে পেরেছেন কোথায়? **'লিটল জুড'** ছবিতে ঘানা থেকে আগত ছাত্র টি, এ, ডানিয়েলস্ একটি বছর দশেকের বেওয়ারিশ ছেলের নিঃসঙ্গ জীবনকে চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা অত্যন্ত মামুলীভাবে; বিষয়বস্তুর গভীরে তিনি যেতে পারেননি। পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী বিনয় শুক্লার **'এ ডিপ্লোমা ফিল্ম'** ছবির নাম নির্বাচনেই যেমন দীনতার পরিচয় দিয়েছে, গিরিগুহায় বৌদ্ধ স্থাপত্য দর্শনরত ছাত্রদের চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে 'অনুসন্ধিৎসাই বড়ো কথা' এই বক্তব্য উপস্থাপনেও ততোধিক কল্পনা-শক্তির অভাবের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। বলবীর শর্মা পরিচালিত **'অনুভূতি'** একটি কিশোরীর আকর্ষণহীন বোধের গতানুগতিক প্রসঙ্গকে চিত্রায়িত করেছে, যেমন করেছে বিমলকুমারের **'নানকু'** মা ও দুষ্টু ছেলের সম্পর্ক এবং দেশ গৌতম পরিচালিত **'বাৎসল্য'** অতৃপ্তযৌবনা বিমাতার সৎছেলের প্রতি আসক্তিকে রূপায়িত

অঞ্জনা ভৌমিককে আবার দেখা যাবে নতুন নতুন ছবিতে
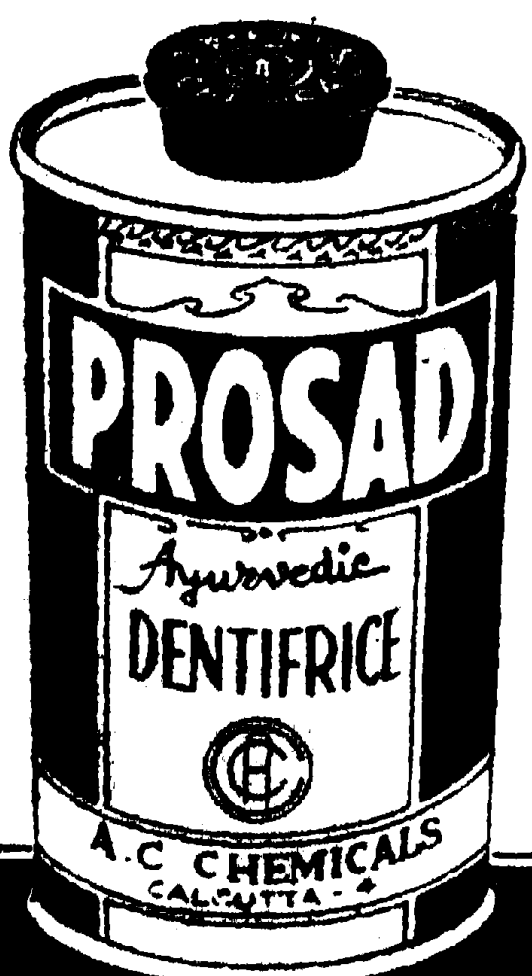
শেষেরটিতে অন্তর্দাহের ফলে মেয়েটির আত্মহত্যা অযথা ফিল্মটিকে ট্রাজিক পরিণতি দিয়েছে। সবচেয়ে ব্যর্থ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' অবলম্বনে চিত্তরঞ্জন জেনাকৃত 'দশ লাল মহলে'। ১৪ মিনিট স্থায়ী এই ছবিটি তার সামান্য দৈর্ঘ্যের মধ্যে মূল কাহিনীটির প্রতি সামান্যই সুবিচার করতে সক্ষম হয়েছে।

জগৎ মুরারীর নেতৃত্বে গঠিত ৩৬ মিনিট স্থায়ী চার রীলের ছবি 'পরীক্ষাতে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় টোকাটুকি প্রভৃতি অসাধু উপায় অবলম্বনের চেষ্টায় কুফল-স্বরূপ হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো ছাত্রের মানসিক বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়েছে বটে, কিন্তু সম্ভবত দ্বিধাচ্ছন্ন চিত্র-পরিচালক পরিষ্কার বক্তব্য স্থাপনে কার্পণ্য করেছেন।

চিত্র-সমালোচনা

আধুনিক নারীর সতীত্বের কাহিনী

দেশবিভাগের পরে দাঙ্গাবিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন দলে দলে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, তখনকারই একটি কল্পিত ঘটনা হচ্ছে সাহা ফিল্মস প্রযোজিত ও পরিবেশিত, সুধীর সাহা নিবেদিত এবং পীযূষকান্তি গাঙ্গুলী পরিচালিত 'অর্চনা' ছবির কাহিনী। অর্চনাও দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল কলকাতায়—প্রাণ বাঁচাতে নয়, মানইজ্জৎ বাঁচাতে। আসবার সময়ে তার স্বামী দেবাশীষ বাড়ীতে ছিল না। তবে যে মুসলমান ভাই তাকে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল, সে ওকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, 'দিদি, তুমি কিছু ভেবো না, আমি দেবাশীষদাকে ঠিক পাঠিয়ে দেব।' কথা সে রেখেছিল; কিন্তু যে দেবাশীষ ইন্দ্রাণীর তার বাপের হাত ধরে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল, সে দেবাশীষ জড়বুদ্ধি, বাকহারা, স্মৃতিভ্রষ্ট। দাঙ্গার অগ্নিকাণ্ড ও পৈশাচিকতা তাকে কেমন যেন জড়ে পরিণত করেছিল। তাই বহুপ্রতীক্ষার পরে অর্চনা যখন একান্তই আকস্মিকভাবে দেবাশীষের দেখা পেল ডুয়ার্সের এক ছোট্ট হাসপাতালে, তখন তার প্রশ্নের জবাবে একটি কথাও বলতে পারল না দেবাশীষ। অর্চনা দেখল, ইন্দ্রাণী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে একান্ত হয়ে কথা কইছে। অর্চনা দেবাশীষকে ভুল বুঝল এবং এর পরে সে হয়ে পড়ল হতাশ্বাস। যার পথ চেয়ে সে এতদিন ধরে প্রতিটি ক্ষণ গুনেছে, সে আজ তার জন্যে একটি মুখের কথাও ব্যয় করতে পারল না। অগত্যা নিরুদ্দেশের পথযাত্রী হওয়া ছাড়া তার আর গতি কি?—কিন্তু বিধাতা কি এমনই অবিচার করেন? হাসপাতালের ডাক্তার পার্থ রায় কি বিচিত্র উপায়ে অর্চনার সকল সমস্যার সমাধান করলেন, তাই নিয়েই ছবিটির শেষ রোমাঞ্চকর দৃশ্য কটি রচিত।

বহুরূপী / অনিল চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : মিঠু চট্টোপাধ্যায়।

ফটো : অমৃত

হিরণ্ময় সেনগুপ্ত রচিত মূল কাহিনীটি কেমন ছিল, তা জানি না। কিন্তু সুখেন দাসের চিত্রনাট্য ও সংলাপকে দর্শকরা যে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বরণ করে নিয়েছে, তার সোচ্চার প্রমাণ আমরা পেয়েছি বারে বারে। ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও হৃদয়গ্রাহী চরিত্রচিত্রণ ও ভাবপ্রবণ নাটকীয় পরিস্থিতি রচনাগুণে ছবিটি যে মোটের উপর অন্তরস্পর্শী হয়েছে সকলেরই, একথা অনস্বীকার্য।

ছবিটির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে ছোট বড়ো সকল চরিত্রেই শিল্পীদের আশ্চর্য সু-অভিনয়। বিশেষ করে, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (ডাঃ পার্থ রায়), মাধবী চক্রবর্তী (অর্চনা), সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় (ইন্দ্রাণী), তরুণকুমার (ভাবনীদা), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (দেবাশীষ), বিজন ভট্টাচার্য (ইন্দ্রাণীর বাবা), অনুভা ঘোষ (ছন্দা বৌদি), শ্যামল ঘোষাল (ডাঃ ঘোষ), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (দেবাশীষের মুসলমান বন্ধু) প্রভৃতি শিল্পী গৃহীত ভূমিকাগুলিতে এমন আশ্চর্য মার্টনিপুণতা দেখিয়েছেন, যা সচরাচর দেশী ছবিতে দেখা যায় না। হাসপাতালের নেপালী ওয়ার্ডবয় গুরুং-বেশী সুখেন দাস যদি অতি-অভিনয়ের লোভ সংবরণ করতে পারতেন, তাহলে তাঁকেও আমরা চমৎকার বলতে পারতুম।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ছবির বহির্দৃশ্যগুলি ছাড়াও ডুয়ার্সের হাসপাতালের অন্তর্দৃশ্যগুলি ফ্লোরে সেটে গৃহীত না হয়ে ঐ অঞ্চলের বাস্তবপরিবেশে তোলা হয়েছে। কাহিনী-চিত্রে এই প্রথম [illegible] কাজ করে কে, এ, রেজা এ-ব্যাপারে যথেষ্ট গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। রবি চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পনির্দেশনা ও রমেশ যোশীর সম্পাদনা ছবিটির সাফল্যে অল্প সাহায্য করে নি। ছবির চারখানি গানই সুরসমৃদ্ধ ও সুগীত। 'দূরে আকাশে তোমার সুরে খুঁজে পেলাম' গানখানি দৃশ্যায়ন মনোমুগ্ধ। চটুল ছন্দে গুরুং-এর মুখে 'আহা লো হে লো লো হে রে' শ্রোতার মনে দোলা জাগায়। মনের গভীরে কিছু স্পর্শ করে 'জনম মরণ জীবনের দুই তীরে' এবং 'সূর্য আমার কোথায় হারিয়ে গেছে'—গান দুখানি। অজয় দাস সৃষ্ট আবহ-সংগীত বহুস্থলেই ঘটনা উপযোগী।

সাহা ফিল্মস প্রযোজিত ও পরিবেশিত 'অর্চনা' অসাধারণ জনপ্রিয়তালাভে সমর্থ হলে বিস্মিত হব না।

স্টুডিও থেকে

বর্তমানে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস নিয়ে অনেকগুলো ছবি তৈরী হচ্ছে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা চলছে। যাঁদের অনেকগুলো গল্প-উপন্যাস চিত্রায়িত হচ্ছে বা হতে চলেছে বর্ণানুক্রমিক তাঁদের একটি তালিকা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি :—

ঐ তালিকায় প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন—সমরেশ বসু। তাঁর মোট ৪ খানা উপন্যাস চিত্রায়িত হচ্ছে। তারমধ্যে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এপার ওপার (সৌমিত্র-অপর্ণা অভিনীত) এবং 'বিষের স্বাদ' (সৌমিত্র-তনুজাকে

[illegible] ছবির একটি দৃশ্যে কানন দেবী এবং কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : তপন সিংহ। ফটো : অমৃত

নিয়ে ছবির চিত্রগ্রহণ শীঘ্র শুরু হচ্ছে) পরিচালক পীযূষ বসু তুলছেন—'বিকেলে ভোরের ফুল' (খুব সম্ভবত এ ছবির নায়ক উত্তমকুমার) এবং সমরেশবাবুর বহু বিতর্কিত উপন্যাস 'প্রজাপতি'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন—পরিচালক শরণ দে। তাছাড়া সমরেশবাবুর 'অলিন্দ' উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব ক্রয় করার জন্য সাহা ফিল্মস আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন।

তারপরেই যার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন তিনি হলেন—প্রফুল্ল রায়। প্রফুল্লবাবুর 'জন্মভূমি'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন সাহা ফিল্মস (অর্চনা-ছবির প্রযোজক ও পরিবেশক) এবং পরিচালনা করবেন পীযূষ গাঙ্গুলী। তাঁর দ্বিতীয় সাড়া জাগানো উপন্যাস—'আমার নাম বকুল'-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক বিজয় বসু (খুব সম্ভব এ ছবির নায়ক উত্তমকুমার), প্রফুল্লবাবুর তৃতীয় উপন্যাস (অপ্রকাশিত এবং যার নামকরণ এখনও হয়নি) তার চিত্ররূপ দেবেন প্রযোজিকা—সংগীতপরিচালিকা অসীমা ভট্টাচার্য। এই ছবির নায়ক খুব সম্ভব উত্তমকুমার। তাঁর চতুর্থ কাহিনীর (যা আগামী কোন এক মাসিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হবে) চিত্ররূপ দেওয়ার কথাবার্তা চলছে বলে জানা গেছে।

সু-সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর দুখানি উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি ইন্দর সেন পরিচালিত ইকান্স ফিল্মস প্রযোজিত 'পিকনিক'। ছবিটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায়। তাঁর দ্বিতীয় কাহিনী 'বন পলাশীর পদাবলী'। উত্তমকুমারের পরিচালনাধীনে ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। শিল্পী সংসদের প্রযোজনায় ছবিটি নির্মিত হচ্ছে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল করের দুখানি উপন্যাস চিত্রায়িত হচ্ছে। প্রথমটির নাম—'যদুবংশ'। পার্থপ্রতিম চৌধুরীর পরিচালনাধীনে ছবির স্যুটিং দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ছবির ভূমিকালিপিতে—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, শর্মিলা ঠাকুর, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিটি প্রযোজনা করছেন সঞ্জয় সেন ও পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—দাওয়ার পিকচার্স এন্ড ডিস্ট্রিবউটার্স।

বিমল করের দ্বিতীয় উপন্যাস 'পিয়ারীলাল বাস্ক' অবলম্বনে 'রৌদ্রছায়া'র চিত্রগ্রহণ শচীন অধিকারীর পরিচালনায় অগ্রসর হচ্ছে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন—এস. বি. এন্টারপ্রাইজ এবং ভূমিকালিপিতে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিককে দেখা যাবে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল মিত্রের উপন্যাস 'স্ত্রী' সলিল দত্তের পরিচালনায় শেষ হয়ে বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায়। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও আরতি ভট্টাচার্যকে প্রধান তিনটি চরিত্রে দেখা যাবে।

বিমলবাবুর দ্বিতীয় উপন্যাস 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন'-ও চিত্রায়িত হতে চলেছে সলিল দত্তের পরিচালনায়। প্রধান দুটি চরিত্রে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও অপর্ণা সেনকে দেখা যাবে।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের দুটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। প্রথমটি অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'রাতের রজনীগন্ধা'। প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী—উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন।

নীহারবাবুর দ্বিতীয় উপন্যাস—'কলকাতা'র চিত্রস্বত্ব বিক্রী হয়েছে। ছবিটি খুব সম্ভবত বিকাশ রায়ের পরিচালনাধীনে চিত্রায়িত হবে এবং এ ছবিরও নায়ক খুব সম্ভব উত্তমকুমার।

মঞ্চাভিনয়

'লোকরঞ্জনে'র 'গণদেবতা' : বিশাল উপন্যাসকে নাট্যরূপে দেওয়া যেমন কঠিন, তেমনি দুরূহ সেই নাটককে মঞ্চে সুপ্রযোজনায় উপস্থিত করা। এই দুই অগ্নিপরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার দাবী নাট্যরূপদাতা রতনকুমার ঘোষ এবং তাঁর নাট্য সম্প্রদায় 'লোকরঞ্জন'। সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' নাটকের অভিনয় দেখে সেই প্রতীতিই মনে দৃঢ়তার ভাষা পেয়েছে।

'গণদেবতা' তারাশঙ্করের এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। গ্রাম বাংলার পটভূমিতে জীবনের জন্য সাধারণ মানুষের অবিরাম সংগ্রামের চিরায়ত কাহিনী এবং উপন্যাসটি বলতে দ্বিধা নেই কৃতিত্বের সঙ্গে এই উপন্যাসের শিল্পসমৃদ্ধ নাট্যরূপ দিয়ে শ্রীঘোষ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এ উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের ভীড়। তার ভিতর থেকে মূল চরিত্রগুলো বেছে নিয়ে উপন্যাসের মূল সুর নাটকে বজায় রাখা হয়েছে। গণদেবতা তাই দৃশ্যকাব্য হয়ে উঠেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

লোকরঞ্জন সম্প্রদায় ইতিপূর্বে একাধিক নাটক প্রযোজনায় যে খ্যাতি অর্জন করেছেন সেই খ্যাতি যথাযথভাবে বজায় রেখেছেন পূর্ণাঙ্গ নাটক 'গণদেবতা'য়। সাবলীল অভিনয়, সহজ অভিব্যক্তি, নিখুঁত কম্পোজিশন এবং যথার্থ চরিত্র-চিত্রণে 'লোকরঞ্জনের' প্রতিটি শিল্পীই ব্যক্তি থেকে দলগত অভিনয়ঐক্যে উত্তীর্ণ হোতে পেরেছেন। মঞ্চের সজ্জা, অতি সাধারণ শিল্পীদের কাছ কোন প্রকার উপকরণের বাহুল্যও ছিল না। কৃত্রিম মেক-আপের সাহায্য তারা গ্রহণ করেননি কখনো। অথচ প্যান্টোমাইম-এ অভিনয় করে তারা মঞ্চের উপকরণের অভাব মিটিয়েছেন। আজকের দিনে গ্রুপ থিয়েটারের কাছে এটা একটা বিরাট আদর্শ হীত হিসেবে স্বীকৃত হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

সামগ্রিক অভিনয় সৌন্দর্যের মধ্যে বিশেষভাবে মনে রেখাপাত করেছে ন্যায়রত্ন পণ্ডিত (হারাধন চক্রবর্তী), ন্যায়রত্ন (অনিল দত্ত), জগন ডাক্তার (রণজিৎ রায়), ছিরু পাল (পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়), যতীন (সুশান্ত চৌধুরী), অনি কামার (অরুণ ঘোষ), তুপাল (প্রশান্ত চৌধুরী)। মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গা' চরিত্র একটি অভিনব সৃষ্টি। স্বৈরিণী থেকে মহিমময়ী নারীতে রূপান্তর প্রেক্ষাগৃহের দর্শককে বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখে। তাঁর চটুলতা, গ্রাম্যতা এবং জীবনদেবতার কাছে আত্মসমর্পণ সবই নিখুঁত ও শিল্পসম্মত রূপ পেয়েছে।

দু-একটি ত্রুটি যা দেখা গেছে সেটা বলা প্রয়োজন। ছিরু পালের চোখের চাউনি

ব্যাপী শিশু চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। রং ও রেখায় বিচিত্র চিত্রগুলি বিপুল জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। জনসাধারণের মধ্যে এই বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

আঠারো বছরে। চতুরঙ্গ : ১৯৫৫ সালের জুন মাসে বনফুলের 'কঞ্চি' নাটিকা দিয়ে শুরু করে চতুরঙ্গ গোষ্ঠী এই জুনে আঠারো বছর পদার্পণ করল। ইতিমধ্যে এই গোষ্ঠী ছ'টি নাটিকা ও একাঙ্ক এবং চোদ্দটি পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় করেছেন। আসছে ২৬ জুন রবীন্দ্রসদনে এঁদের সতেরো বছর পূর্তি উৎসবে বরুণ দাশগুপ্তের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের 'সে' নাটকটি পরিবেশিত হবে।

শিশু-উৎসব

প্রতি বছরে শতাধিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় 'ভাই-বোনেদের আসরে'র উদ্যোগে 'শিশু-উৎসব' হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানে শতাধিক শিশু ও কিশোর-কিশোরী সহস্রাধিক ছেলে-মেয়ে দর্শকদের দেশাত্মবোধক সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য-নাট্য, শিশু-নাট্য, ব্রতচারী-নৃত্য' যেমন পরিবেশন করে ছোটবড় সবাইকে মুগ্ধ করে। প্রতি বছরই ছোটদের পক্ষ থেকে শিক্ষক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫১ বছর শিক্ষকতা করেছেন এমন একজন ৭১ বছর বয়স্ক শিক্ষক শ্রীরজনীকান্ত হালদারকে গরম-আলোয়ান দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমবেত-কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীতের আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে "খগেন্দ্র-স্মৃতি ফলক" ও স্মৃতি পুরস্কার লাভ করে হোটর-মর্যাদা জাতীয় বিদ্যালয়। এছাড়া এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের খগেন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ" রঙিন চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থাও করা হয় অন্নপূর্ণা সিনেমায়।

এই শিশু-উৎসবে প্রধান অতিথির আসন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন লেঃ কর্ণেল প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পৌরোহিত্য করেন আসরের সভাপতি প্রোঃ ভাইস চ্যান্সেলার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু।

পরলোকে পঞ্চু সেন

যাত্রাজগতের অভিনয় যাদুকর শ্রীপঞ্চু সেন ১২ই জুন সকাল ৮-৪৫ মিঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। যাত্রাজগতে পঞ্চু সেন একটি নাম ও একটি ইতিহাস। সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর ধরে যাত্রাজগতে বিবিধ চরিত্রে অবতীর্ণ হন। প্রবীরার্জুনে লীলাবসান, চাঁদের মেয়েতে ঈশ খাঁ, জয়দেবে 'জয়দেব' চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু, বাঙালীতে দায়ুদ খাঁ, ভাগের বলিতে গর্গ, রাইফেল নাটকে রহমৎ, বিনয় বাদল দীনেশে 'হরিদাস' সংগ্রামী মুজিবে ভাসানী ১১ জুন ও মহাজাতি সদনে সোনাই দীঘি নাটকে 'ভাটক' চরিত্রে অবতীর্ণ হন। বহু শিল্পী তাঁর শবাধারে মাল্যদান করে—তার মধ্যে সর্বশ্রী উৎপল দত্ত, স্বপনকুমার, বিজন মুখোপাধ্যায়, শান্তিগোপাল, শিব ভট্টাচার্য, শৈলেন মহান্ত, নীলমণি দে, শম্ভু ঘোষ, জানকী মেদ্দা, নরেশ চক্রবর্তী, শম্ভু বাগ, মোহিত বিশ্বাস, জ্যোৎস্না দত্ত, জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বৎসর। মৃত্যুকালে বিধবা স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

বার্ষিক উৎসব

বিরাটিস্থ শ্রীনগর স্পোর্টিং ক্লাবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে শ্রীদেবব্রত পরিচালনায় সংগীতচক্রের শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে বর্ষবরণ গীতি-আলেখ্যটি পরিবেশন করেন। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী গীতশ্রী দত্ত, কাবেরী ভট্টাচার্য, শীলা দাস, লীলা দেবী, অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকেশ দাস, শঙ্কর সরকার, দেবু চট্টোপাধ্যায়। লোকগীতি পরিবেশন করেন শ্রীবুদ্ধদেব রায় ও শ্রীকেশব রায়। সবশেষে ক্লাবের সভ্য-সভ্যাগণ কর্তৃক 'বেকার' নাটকটি অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য।

১৮৭২

একশো বছর আগে ছিল এই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজী এই সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক ঘটনা ঘটেছিল, যা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐদিন সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো সান্যাল ভবনে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে আমাদের সাধারণ নাট্যশালা তার পথ শুরু করে। আসচে ৭ ডিসেম্বর তার শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করবার জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কোন রকম কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন কিনা, আজও পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু বর্তমানের প্রবীণতম নাট্যকার সেদিনের এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে [illegible] করে সম্প্রতি '১৮৭২' নামে [illegible] নাটকখানি সম্পূর্ণ করেছেন [illegible] কিছু শুনে আমরা [illegible] না হয়ে পারি বাস্তবের সঙ্গে [illegible] কল্পনা [illegible] তিনি যে নাট্যপ্র[illegible] সৃষ্টি করেছেন [illegible] অবগাহন করে নাট্যামোদীমাত্রই [illegible] হবেন। আমরা আশা করছি [illegible] ৭ ডিসেম্বর এই নাটকখানি [illegible] আত্মপ্রকাশ করবে পাদপ্রদীপের [illegible]

গায়ক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

মেডিক্যাল কলেজের [illegible] শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সসম্মানে [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর [illegible] চলচ্চিত্রের নায়করূপে আত্মপ্রকাশ [illegible] ছিলেন, সেদিন ছিল তাঁর [illegible] আত্মীয়স্বজনের অবাক হবার পালা। আজ জনসাধারণ যখন হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে (নং ৮৩৪৭৪) কবি [illegible] ভট্টাচার্য রচিত 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতাটিকে অজয় দাসের দেওয়া [illegible] সুরে তাঁকে প্রাণস্পর্শীভাবে [illegible] শুনবেন, তখন অবাক হওয়ার পালা বোধকরি, সকলেরই। রেকর্ডের [illegible] সম্পূর্ণ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটি শুনে আমাদের মতো [illegible] শ্রোতাই মুগ্ধচিত্তে ভাববেন, চলচ্চিত্রের নায়কটি কি জন্মাবধিই গাইয়ে, নইলে [illegible] প্রাণমাতানো দরদী গান তিনি [illegible] কি করে!

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা : [illegible] দমদম নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট আয়োজিত [illegible] একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৭ই জুলাই। যোগাযোগের ঠিকানা : সাধারণ সম্পাদক [illegible] ফোন : ৩৫-৩১৯[illegible]

খেলাধুলা

দর্শক

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ১২ থেকে ১৮) ম বিভাগের ফুটবল লীগের যে ১৬টা া হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : -পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১০ এবং খেলা ড্র

বর্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে ছে মোহনবাগান—১০টা খেলায় ১৯ য়েন্ট। আলোচ্য সপ্তাহে তারা খিদির-রকে ১-০ গোলে পরাজিত করে াড়ীর সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা ড্র করায় াবান ১ পয়েন্ট নষ্ট করেছে। গত রের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছে লীগ তালিকার ২য় স্থানে—৮টা ায় ১৬ পয়েন্ট। তারা আলোচ্য সপ্তাহে -০ গোলে টালীগঞ্জ অগ্রগামী এবং -০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে াজিত করে মূল্যবান পয়েন্ট সংগ্রহ রছে। গত বছরের আই এফ এ শীল্ড জয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ৯টা খেলায় পয়েন্ট সংগ্রহের সুবাদে লীগ তালিকার স্থানে আছে। লীগের খেলায় এখনও রাজিত আছে মোহনবাগান এবং ইস্ট-গল। একমাত্র ইস্টবেঙ্গলই এখনও টা গোলও খায়নি, অপরদিকে ২৩টা ল দিয়েছে। বর্তমানে লীগ তালিকার শেষ স্থানে আছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন— খেলায় মাত্র ২ পয়েন্ট—১৩টা গোল য় একটা গোলও দিতে পারেনি।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১ম টেস্টের চারদিনের ার বিবরণের সঙ্গে ইংল্যান্ডের জয়লাভের টুকু গত সংখ্যার অমৃতে দেওয়া সম্ভব ছিল। ইংল্যান্ডের এই জয়লাভ একদিক ক খুবই উল্লেখ্য এই কারণে যে, অস্ট্রে-ার বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ১ম খেলায় ইংল্যান্ড শেষ জয়ী হয়েছিল ৩৬ সালে—ব্রিসবেনের ১ম টেস্টে ৩২২ ন।

আলোচ্য ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের ১ম ট ইংল্যান্ডের ৮৯ রানে জয়লাভে ্যান্ডের দুই বোলার স্নো এবং গ্রিগের দান উল্লেখ করার মত। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের খেলায় জন স্নো ৮৭ রানে এবং টনি গ্রিগ ৫৩ রানে ৪টে উইকেট য়েছিলেন। দুই ইনিংসের খেলায় স্নো ৮ রানে ৮টা উইকেট পান।

মোহনবাগান বনাম খিদিরপুর দলের প্রথম বিভাগের ফুটবল খেলার একটি দৃশ্য : খেলায় মোহনবাগান ১-০ গোলে জয়ী হয়।

ইংল্যান্ড আরও বেশী রানের ব্যবধানে জয়ী হত যদি না ২য় ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ৯ম উইকেটের জুটি রডনি মার্শ এবং জনি গ্লিসন ১০৪ রান তুলতেন। অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১৪৭ রানের মাথায় তাদের ৮ম উইকেট পড়ে গেলে ইংল্যান্ডের জয়লাভ হাতের নাগালে এসে যায়। কিন্তু ৯ম উইকেট জুটি মার্শ এবং গ্লিসন সহজে হাল ছাড়লেন না। মার্শ ১২৪ মিনিট খেলে ৯১ রান সংগ্রহ করলেন। অপরদিকে বোলার গ্লিসন দৃঢ়তার সংগে মাটি কামড়ে ৩০ রান তুললেন। তাদের এই অনমনীয় দৃঢ়তার জন্যেই ইংল্যান্ডকে জিততে প্রায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

ওল্ড ট্রাফোর্ডের প্রথম টেস্টের শেষে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : মোট খেলা ২১১, ইংল্যান্ডের জয় ৬৯, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০ এবং ড্র ৬২।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ২৪৯ রান (গ্রেগ ৫৭ এবং এডরিচ ৪৯ রান। কোলে ৮৩ রানে ৩, লিলি ৪০ রানে ২ এবং গ্লিসন ৪৫ রানে ২ উইকেট)
ও ৩৪ রান (গ্রেগ ৬২ রান। লিলি ৬৬ রানে ৬ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ১৪২ রান (স্ট্যাকপোল ৫৩ রান। স্নো ৪১ রানে ৪ এবং আরনল্ড ৬২ রানে ৪ উইকেট)
ও ২৫২ রান (স্ট্যাকপোল ৬৭ এবং মার্শ ৯১ রান। স্নো ৪৭ রানে ৪ এবং গ্রিগ ৫৩ রানে ৪ উইকেট)।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭২ সালের মারদেকা ফুটবল প্রতি-যোগিতায় (জুলাই ১২-২৯) ভারতবর্ষ যোগদান করবে না স্থির করেছে। এই বাৎসরিক প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫৭ সালে। ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত দশবার প্রতি-যোগিতায় অংশগ্রহণ করে মাত্র একবার (১৯৬৪ সালে) ফাইনালে খেলেছে। ১৯৬৪ সালের ফাইনালে ভারতবর্ষ ০-১ গোলে ব্রহ্মদেশের কাছে হেরে গিয়ে রানার্স-আপ হয়। গত কয়েক বছর এশিয়ার আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার আসরে নেমে ভারতবর্ষের যে

ছাড়ির হাল দাঁড়িয়েছে তাতে ভারতবর্ষের এই যোগদান না করার সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী মাত্রেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। গত কয়েক বছরে ভারতীয় ফুটবল খেলার মান যথেষ্ট নেমে গেলেও ভারতীয় ফুটবল মহলের ওপরতলার কর্মকর্তাদের বিদেশ-সফরকারী ভারতীয় ফুটবল দলের সংগে বিদেশ ভ্রমণে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার আসরে ভারতবর্ষের শোচনীয় ব্যর্থতায় তাঁদের মান-অপমান বা চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। কায়েমী স্বার্থে তাঁরা এক একজন 'ডিকটেটর' হয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে গদী আঁকড়ে বসে আছেন।

উইম্বলেডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ

আগামী ২৬শে জুন ১৯৭২ সালের আন্তর্জাতিক উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হবে। জানা গেছে, 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস' সংস্থার সংগে চুক্তিবদ্ধ ২৬জন বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় এ বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন না। এ বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় মোট ২২৪ জন খেলোয়াড় যোগদান করবেন— বাছাই পর্যায়ের খেলায় ৯৬ জন এবং প্রথম রাউন্ডের খেলায় ১২৮ জন। ভারতবর্ষের এই তিনজন খেলোয়াড় পুরুষদের সিঙ্গলস খেলবেন—জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎলাল এবং আনন্দ অমৃতরাজ। এই তিনজনের মধ্যে অমৃতরাজ নবাগত, মাত্র গত বছর খেলেছেন।

অলিম্পিক ফুটবল

১৯৭২ সালের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ লীগ পর্যায়ে নীচের ১৬টি দল খেলবে। এই ১৬টি দল চারটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ পর্যায়ে খেলবে। পরে প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল নিয়ে নক-আউট প্রথায় খেলা হবে।

কুমারী রুথ ফুচস্ (পূর্ব জার্মানী): বুলগেরিয়া-পূর্ব জার্মানীর দ্বৈত অ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে ২১৩ ফিট ৬ ইঞ্চি দূরত্বে বর্শা নিক্ষেপ করে মেয়েদের পক্ষে জ্যাভেলিন নিক্ষেপে বিশ্বরেকর্ড করেন।

গ্রুপ ১: পশ্চিম জার্মানী, মালয়েশিয়া, মরোক্কো এবং আমেরিকা

গ্রুপ ২: সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ, সুদান এবং মেক্সিকো

গ্রুপ ৩: হাঙ্গেরী, ইরাণ, ব্রেজিল এবং ডেনমার্ক

গ্রুপ ৪: পূর্ব জার্মানী, ঘানা, কলোম্বিয়া এবং পোল্যান্ড

... ভারত সফরে এম সি সি

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলার প্রতিভূ এম সি সি (মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব) দল সপ্তাহে ভারত সফরে আসছে। এই ভারত সফরে এম সি সি ১১টি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে—পাঁচদিনব্যাপী ৫টি টেস্ট খেলা এবং তিনদিনব্যাপী ৬টি সাধারণ খেলায়।

সফরের তালিকা

টেস্ট খেলা

১ম টেস্ট (দিল্লী):
ডিসেম্বর ২০, ২১, ২৩, ২৪ ও ২৫

২য় টেস্ট (কলকাতা):
ডিসেম্বর ৩০, ৩১ ও
জানুয়ারী ১, ৩ ও ৪

৩য় টেস্ট (মাদ্রাজ):
জানুয়ারী ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১

৪র্থ টেস্ট (কানপুর):
জানুয়ারী ২৫, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩

৫ম টেস্ট (বোম্বাই):
ফেব্রুয়ারী ৬, ৭, ৯, ১০ ও ১১

তিনদিনব্যাপী খেলা

(১) বিপক্ষে প্রেসিডেণ্ট একাদশ, হায়দরাবাদ। ডিসেম্বর ৫, ৬ ও ৭
(২) বিপক্ষে সেণ্ট্রাল জোন, ইন্দোর ডিসেম্বর ৯, ১০ ও ১১
(৩) বিপক্ষে নর্থ জোন, জলন্ধর ডিসেম্বর ১৫, ১৬ ও ১৭
(৪) বিপক্ষে ইস্ট জোন, জামসেদপুর জানুয়ারী ৬, ৭ ও ৮
(৫) বিপক্ষে সাউথ জোন, বাঙ্গালোর জানুয়ারী ২০, ২১ ও ২২
(৬) বিপক্ষে ওয়েস্ট জোন, আমেদাবাদ ফেব্রুয়ারী ২, ৩ ও ৪

ইউরোপীয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতা

ব্রাসেলসে ইউরোপীয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৩—০ গোলে রাশিয়াকে হারিয়ে ইউরোপ ফুটবল চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে। সেমি-ফাইনালে ১৯৬০ সালের চ্যাম্পিয়ন রাশিয়া ১—০ গোলে হাঙ্গেরী এবং পশ্চিম জার্মানী ২—১ গোলে বেলজিয়ামকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। ফাইনাল খেলায় বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে জা মুল্লার একাই দুটি গোল দিয়েছিলেন। দলের দ্বিতীয় গোলটি দিয়েছিলেন হার্বার্ট উইমার। ১৯৬০ সালের ইউরোপীয় ফুটবল কাপ বিজয়ী রাশিয়া কোন সময়ে দলের সুনাম অনুযায়ী খেলেনি। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের জুন মাস থেকে পশ্চিম জার্মানী আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার আসরে অপরাজিত থেকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল হিসেবে সম্মান লাভ করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ ১ম খণ্ড

অমৃত

৯ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 30th June, 1972 শুক্রবার ১৬ই আষাঢ়, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

এক নজরে

বিষাক্ত পরিমণ্ডল : সারা পৃথিবীর মানুষ আশু প্রয়োজনকে বড় করে দেখে এতদিন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে একতরফা অভিযান চালিয়ে এসেছে, রিক্ত, নিঃস্ব পৃথিবী সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্যের মতো, এবার তার প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অমোঘ অস্ত্রে সজ্জিত মানুষ প্রকৃতির প্রতিশোধকে গুরুত্বসহকারে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন স্বীকার করে নি, অথবা ভেবেছিল যে, এক বিষ দিয়ে অপর বিষের বিষ-দাঁত ভাঙার খেলা তার বরাবরই সফল হবে। কিন্তু বড় দেরীতে হলেও, আজ তার সে ভুল ভেঙেছে। বিষাক্ত বাতাস, ক্লিন্ন জলরাশি ও অবক্ষয়িত রুক্ষ মাটি যেন একসঙ্গে মহাকালের এক ভয়াল ভয়ংকর রূপ ধরে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে আসছে মানুষ ও তার সৃষ্ট সভ্যতাকে সর্বাত্মক ধ্বংসের কালো আবরণে ঢেকে দিতে। যেসব আত্মরক্ষার অস্ত্রকে মানুষ অমোঘ ও অব্যর্থ বলে জেনেছিল এতদিন, ঐ ধ্বংসের অগ্রগতির মুখে সবই নিষ্ফল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

ফসল বাড়াতে জাপানের জমিতে যে ব্যাপক হারে রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয় তাতে জমির উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়ে যায় আর খাদ্যশস্যের সমাধানে বিপুল সাফল্যে উৎফুল্ল হয় জাপান। কিন্তু আজ জানা যাচ্ছে যে, খাদ্যের সঙ্গে উদরে অনুপ্রবিষ্ট ঐ বিপুল পরিমাণ রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়ায় সারা জাপানের জনগণের প্রজনন শক্তি লোপ পাওয়ার আশঙ্কা ঘটেছে। মেক্সিকো শহরে ১৯৩০ সালে এক আজটেক রেড ইণ্ডিয়ানকে কাঠ কয়লা জ্বালিয়ে বাতাস কলুষিত করার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, আর আজ সে শহরের কল-কারখানা আর বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট গাড়ীর পোড়া পেট্রোল থেকে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তাতে অঙ্গারের পরিমাণ থাকে দৈনিক চল্লিশ টন। যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হাডসন নদীর জল এখন কারখানার ক্লেদে এত বিষাক্ত যে তাতে স্নান করাও নিরাপদ নয়। তার অধিকাংশ মাছই মরে গেছে এবং যে কয়েকটি জাতের মাছ ঐসব রাসায়নিক ক্লেদ ধাতস্থ করে টিঁকে আছে তা আর মানুষের খাদ্যের উপযোগী নয়। কিছু দিন আগে পাটনার কাছে গঙ্গার বুকে আগুন জ্বলে উঠে জানিয়ে দিয়েছে, আমরাও কিভাবে আগুন নিয়ে খেলার নেশায় মেতেছি। আজ যে এই খরার দাবদাহ তারও মূলে রয়েছে সবগ্রাসী নগর-সভ্যতার দাবীতে প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান নিঃস্বতা।

প্রখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী জ্যাক পিকার্ড সম্প্রতি বলেছেন, সমুদ্রে ব্যাপকভাবে কারখানার ময়লা তেল-কালি, ভাঙা টিন-শিশি-বোতল ও জাহাজের আবর্জনা ফেলার ফলে ইতিমধ্যেই ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সমীপবর্তী সমুদ্রের কয়েকটি অঞ্চল সম্পূর্ণ প্রাণহীন হয়ে গেছে, এবং এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সারা পৃথিবীর সমুদ্রের সব প্রাণী নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে পরিমণ্ডল বিশুদ্ধ রাখার উপায় উদ্ভাবনকল্পে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে তা মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্টকহোম-সম্মেলন সেই উদ্যোগের সার্থক সূচনা।

সামুদ্রিক মাছের জন্মনিরোধ : প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেমন বহুক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি অব্যাহত রাখা দরকার, তেমনই কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের নিরলস প্রয়াস ছাড়া প্রকৃতির স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। মানুষ উদ্যোগী না হলে বহু প্রাণীকুল আজ এ জগতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো, বহু নদী যেতো শুষ্ক হয়ে আর মরুর গ্রাস হত অপ্রতিহত।

সম্প্রতি সমুদ্রের নীচের প্রবাল-প্রাচীরগুলিকে সামুদ্রিক মাছ স্টার ফিসের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য একটি বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছে ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন। প্রবাল-প্রাচীরগুলি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে এক একটি দ্বীপে পরিণত হয়, তার আগে ঐ প্রাচীরগুলির গা ঘেঁষে বড় বড় মাছের ঝাঁকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্টার ফিস ঐ মাছ এবং প্রবাল-প্রাচীর উভয়েরই শত্রু। তারা প্রবাল--প্রাচীরের অপরিণত অংশগুলি কুরে কুরে খায় যার ফলে অনেক সময় প্রাচীরগুলির গোড়া দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ে এবং ঐ প্রাচীর-আশ্রিত দ্বীপগুলিও সেই সঙ্গে বিপন্ন হয়। কিন্তু এর প্রতিকারে ত সমুদ্রের অতলে লক্ষ লক্ষ স্টার ফিসকে মেরে ফেলা সম্ভব নয়। তাই ঐ আন্তর্জাতিক সমুদ্র প্রশাসক সংস্থা স্থির করেছে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের জন্ম-নিরোধক ওষুধ স্টার ফিসের প্রিয় খাদ্য, প্রবাল-প্রাচীরগুলির কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। পাঁচ বছর ধরে লোহিত সাগর অঞ্চলে বিজ্ঞানী ও ডুবুরিদের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ঐ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন ইংরেজ বিজ্ঞানী ডঃ সি এইচ রোডস। তিনি স্টার ফিসের জন্ম-মৃত্যু হার, দল বেঁধে চলার গতিবিধি, কোন কোন খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে ঐ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। ঐ পরিকল্পনায় ওষুধের সাহায্যে স্টার ফিসের প্রজনন শক্তি নাশ করা ছাড়াও, রাস, চিংড়ি প্রভৃতি যেসব মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী স্টার ফিসের শত্রু, স্টার ফিস অধ্যুষিত অঞ্চলে তাদের বংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত : ভারত যে প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তা '৭১ সালের জনগণনার সদ্য-প্রকাশিত চূড়ান্ত হিসাবে [illegible] একবার প্রমাণ হল। দেখা যাচ্ছে যে, এক দশকের ব্যবধানে ভারতে সব সম্প্রদায়েরই লোক অবাধে বৃদ্ধি পেয়েছে। '৬১ সালের লোকগণনার হিসাবের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, হিন্দুর বৃদ্ধির হার শতকরা হিসাবে ২০-২৯ থেকে ২৩-৬৯, মুসলমানের ২৫-৬১ থেকে ৩০-৮৫, খৃষ্টানের ২৭-৩৮ থেকে ৩২-৬০, শিখের বৃদ্ধির হার ২৫-১৩ থেকে ৩২-২৮, জৈনের ১৫-১৭ থেকে ২৮-৪৮। একমাত্র বৌদ্ধের বৃদ্ধির হার পূর্ব দশকের তুলনায় কম এবং তার কারণও অজানা নয়। ১৯৫১—৬১ সালে ডঃ আম্বেদকরের অনুগামী অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের নেতার আহ্বানে লাখে লাখে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করায় এদেশে বৌদ্ধের সংখ্যা হঠাৎ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার পর সে নয়া বৌদ্ধ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বিগত '৬১—'৭১ দশকে যে বৌদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সেটা স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারমাত্র। এবারের হিসাবে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল ভরতের বৃহত্তম সম্প্রদায় হিন্দুর আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস। '৬১ সালের লোকগণনা অনুসারে ভারতে হিন্দু ছিল মোট জনসংখ্যার ৮৩-৫১ শতাংশ, এবার তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৮২-৭২ শতাংশ। অপর দিকে মুশ্লিম সম্প্রদায়ের আনুপাতিক হার উল্লিখিত দশকের ব্যবধানে ১০-৭০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১-২১ শতাংশ।

কিন্তু যে বৃদ্ধির হার সত্যই উদ্বেগজনক তা হল জনসংখ্যার সার্বিক বৃদ্ধির হার। দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে বিগত দশকে প্রতি বছর লোক বেড়েছে ২-৫ শতাংশ হারে। ঐ হারে লোকবৃদ্ধি হলে একটি দেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হতে আটাশ বছর লাগে। ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা ৫৪ কোটি দ্বিগুণিত হয়ে ১০৮ কোটি হবে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

জনসংখ্যার সমস্যা

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাষ্ট্রনিয়ামকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দেয় স্বাভাবিকভাবেই। পৃথিবীতে জনসংখ্যার বন্টন যেমন সমান নয়, সম্পদের বন্টনও তেমনি বৈষম্যমূলক। ইয়োরোপ, আমেরিকার মতো দেশে কাজের তুলনায় লোক এখনও যথেষ্ট কম। তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্পোৎপাদন এত বেশি যে দারিদ্র্য, ক্ষুধা বা অপুষ্টির কোনো প্রশ্নই তেমনভাবে দেখা দেবে না সে সমাজে যদি না কোনো অভাবিত বিপর্যয়, যুদ্ধ বা অন্যান্য অঘটন না ঘটে। তারই পাশাপাশি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার চিত্র কিন্তু অন্যরূপ। এই মহাদেশগুলোতেই পৃথিবীর অধিকাংশ জনসমষ্টির বাস। এদের প্রাকৃতিক সম্পদও কম নয়। কিন্তু সামাজিক ও বৈষয়িক অনগ্রসরতা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে এরা সবচেয়ে দুঃখী, বঞ্চিত ও দারিদ্র্যপীড়িত। জনসংখ্যাও, স্বচ্ছল ও সুখী দেশগুলোর তুলনায়, এই দেশগুলোতেই বেশি বাড়ে। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রজনন বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অনুমান যে মিথ্যা নয়, দরিদ্র দেশগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারই তার সাক্ষ্য বহন করে।

এই যুগটাকেই বলা হয় জনসংখ্যা বিস্ফোরণের যুগ। মানুষের হাতে এমন অনেক ক্ষমতা এসেছে যার সাহায্যে সে অনেক কাল ব্যাধিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। ক্যান্সার, হৃদরোগ প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাধি ছাড়া অন্য অনেক রোগই মানুষের ভেষজবিজ্ঞানের কাছে নতি স্বীকার করেছে। মানুষের পরমায়ু বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র দেশগুলো ছিটেফোটা সাহায্যও পাচ্ছে। তার ফলে সর্বত্রই মানুষের জীবনের মেয়াদ বেড়েছে। এতে কিন্তু উদ্বেগ এবং সম্ভাবনা দুইই দেখা দিয়েছে একালের মানুষের মনে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোতে। ভারতে ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৫ কোটির মতো। দশ বছরে এই বৃদ্ধির হার ২৪ শতাংশের কিছু বেশি। এই হারে যদি আমাদের জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই, অর্থাৎ বাকী ২৮ বছরে একমাত্র ভারতেই জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১০০ কোটি।

জনবল একটা মস্ত শক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি মানবজীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন সে হারে না হয় তাহলে এই বাড়তি জনসংখ্যা বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধ্য। যদি আমরা ধরে নিই যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা এই বাড়তি জনসংখ্যার উপযোগী খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হলাম, তাতেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, শুধু খাদ্যই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। মানুষের প্রয়োজন বাসস্থান, পোযাক-আশাক, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল এবং নিত্য নূতন কর্মসংস্থান। অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করতে না পারলে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ সহ্য করা কোনো সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের চিন্তা সেখানেই। ভারতে অবশ্য অনেক আগে থেকেই জনসংখ্যা সীমিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং প্রচারকার্যও চালানো হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, জনশিক্ষার প্রসার না হলে আধুনিক পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা কঠিন। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে আনুপাতিক হারে জন্মনিয়ন্ত্রণ সাফল্যমন্ডিত হলেও গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত চাষী, শ্রমিকদের মধ্যে এর প্রচার ততটা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। যদি তাই হত, গত দশ বছরে তাহলে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো সম্ভব হত। তবে লক্ষ্যণীয় যে, ভারতের বৃহত্তম জনসমষ্টি হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারই বরং এক শতাংশ কমেছে। এতে মনে হয়, শিক্ষিত হিন্দুরা যতটা জন্মনিয়ন্ত্রণে আগ্রহী, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ততটা নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই এর প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেবেন।

আমাদের দেশ পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সব কিছুই আমাদের হিসেব করে চলতে হবে। বাড়তি মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি জোগানোর পরিকল্পনাও আমাদের করে নিতে হবে। কিন্তু অনগ্রসর দেশে সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য যদি না জনসংখ্যা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে। এই কারণেই জনশক্তির বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখাই হচ্ছে একালের সাফল্যের ও নিরাপত্তার মূলমন্ত্র। সেদিকে লক্ষ্য রেখে, আমরা আশা করব, ভারতবর্ষের পরিকল্পনাবিদরা পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও প্রসারের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

পটভূমি

কিলোমিটারের হিসেবে পশ্চিম বাংলা থেকে কেরলের দূরত্ব ঠিক কতোটা তা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কিন্তু এই দুই রাজ্যের রাজনৈতিক ওঠা-পড়ার মধ্যে মাঝে মাঝেই যে বেশ মিল ধরা পড়ে সেটা নিশ্চয়ই অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন। এই রাজ্যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের পতনের পূর্বগামী ছিল কেরলে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন। ঐ রাজ্যে ১৯৭০ সালের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে কংগ্রেস-সি পি আই মিতালি পশ্চিমবাংলায় যে এই দুটি দলের সমঝোতার পথ প্রশস্ত করেছে তাতে আর সন্দেহ কী? এই দুটি উদাহরণের সূত্র ধরেই তৃতীয় সাদৃশ্যটির কথা মনে আসছে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস এবং সি পি আইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। কেরলেও দুদলের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব বেশ কিছুদিন ধরেই চোখে পড়ছে।

অবশ্যই কেরলের সংগে পশ্চিমবাংলার অবস্থার বেশ কিছু তফাৎও আছে। কেরলের শাসনপাট চালাচ্ছে কংগ্রেস এবং সি পি আই যুক্তভাবে। যদিও সি পি আই এখানে 'জুনিয়র পার্টনার' তবু বোঝাপড়া অনুযায়ী ঐ দলের অচ্যুত মেননই মুখ্যমন্ত্রীর পদে রয়েছেন। আর কেরলে দুদলের সম্পর্কের জটিলতার একটা বড় কারণও লুকিয়ে রয়েছে এই ব্যাপারটার মধ্যেই। সত্যি কথা বলতে কী, কেরলের সব কংগ্রেস কোনো দিনই চায়নি যে সি পি আইয়ের নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশনে কংগ্রেস যোগ দেয়। এখন তারা এই কোয়ালিশনের আরো বিরোধী এই কারণে যে, তাদের ধারণা ঐ কোয়ালিশন ভেংগে দিয়ে এই মুহূর্তে যদি আবার নির্বাচন করা যায় তবে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোনো অসুবিধেই হবে না। সি পি আই-এর (এবং কোয়ালিশনের অন্যান্য শরিকদেরও) অভিযোগ, কংগ্রেস যেভাবে মাতব্বরি সুরু করেছে তাতে কোয়ালিশন চালানো মুস্কিল।

পশ্চিমবাংলায় অবশ্য এই ধরনের জটিলতা দেখা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এখানে শাসনপাঠ একা কংগ্রেসেরই দখলে। তা হলেও এটা তো ঠিকই, কংগ্রেস এবং সি পি আই একই মোর্চার (প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা) পতাকাতলে নিবাচন লড়েছিল। নির্বাচনের পর সেই মোর্চা যে ভেংগে গেছে তাও নয়। সুতরাং দু দলের কদম মিলিয়ে চলার দরকার আছে বৈকি? এই কদম মিলিয়ে চলা বিশেষতঃ এই কারণে দরকার যে, এই মাসের শেষ সপ্তাহেই বিধানসভার অধিবেশন সুরু হচ্ছে।

* * *

১৭-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচন লড়লেও প্রতি ব্যাপারেই যে দুদলের দৃষ্টিভংগী এক নয় তা নতুন বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই বেশ বোঝা গিয়েছিল। যেমন ধরা যাক কলকাতা কর্পোরেশন বাতিল করার প্রস্তাব। অনির্দিষ্টকাল ধরে পৌরসভা বাতিলের প্রস্তাবে সি পি আইয়ের সায় ছিল না। শুধু সায় ছিল না বললেই অবশ্য সব বলা হয় না, এই প্রস্তাব সম্পর্কে সি পি আই সদস্যরা ভোটাভুটি পর্যন্ত দাবি করেছিলেন। ভোটাভুটির ফল কী হতে পারে সে-সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই ছিল না, তবু তাঁরা ঐ দাবি করেছিলেন তাঁদের মতপার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে। অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তা আইন সম্পর্কেও তাঁদের ভিন্ন মতের কথা তাঁরা গোপন রাখেননি। সি পি আইয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এই ধরনের প্রয়াসে কংগ্রেসের সকলেই যে খুব খুশি হয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা আর খুব বেশি দূর গড়ায়নি।

কংগ্রেস সি পি আই সম্পর্কের ক্ষেত্রে একদা বড় ব্যাপার ঘটে যায় এই মাসেরই গোড়ার দিকে। সি পি আইয়ের পরিষদের কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে সরাসরি অভিযোগ করা হলো যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা এবং কংগ্রেসের বিপুল নির্বাচনী বিজয়ের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদল কংগ্রেসের এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন গণসংগঠনের নামে ইউনিয়ন দখল, পাল্টা ইউনিয়ন গঠন ও শ্রমিকদের ঐক্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করছে। এই কাজে তারা পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের একাংশের সহযোগিতাও পাচ্ছে।

সি পি এম বা তার সহযোগীরা যদি কংগ্রেস সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ তোলে তবে সেটা এক কথা, কিন্তু প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার অপর শরিক যদি রীতিমতো সরকারী প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে এই অভিযোগ তোলে তবে সেটা নিশ্চয়ই অন্য প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তার ওপর যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার জন্যেই সি পি আই ঐ প্রস্তাবে আরও বললো যে, সাম্প্রতিক অতীতে সি পি এম তাদের পার্টির প্রভাব ও [illegible] বিস্তারের জন্যে এই ধরনের পন্থা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই পদ্ধতিকে কোনো গণতান্ত্রিক পার্টি বা ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থন করতে পারে না।

ঐ প্রস্তাবে সরকারের আরো সমালোচনা ছিল। যেমন, গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় কৃষকদের উচ্ছেদের হুমকী দেওয়া হচ্ছে, 'কায়েমী স্বার্থের' হয়ে পুলিশী হস্তক্ষেপ ও গ্রেপ্তার এখনও অব্যাহত রয়েছে, কৃষকদের বিরুদ্ধে নতুন করে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হচ্ছে ইত্যাদি।

এরই কিছু দিন পরে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন। মন্তব্যটা ছিল সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতি করা সম্পর্কে। মালদার উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ফেরার পরই সিদ্ধার্থবাবু ঘোষণা করেন, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা এখনও সরাসরি রাজনীতি করছেন দু মাসের মধ্যে তাঁদের ঐ পথ ছাড়তে হবে, না হলে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সকলেই জানেন, এই সতর্কবাণীটা ছিল প্রধানত সি পি এমের হয়ে যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই। কিন্তু সি পি আই এই ধরনের কথাবার্তাকে মোটেই ভাল চোখে দেখতে পারে নি।

সি পি আইয়ের পক্ষ থেকে স্পষ্টই বলা হয় যে, সিদ্ধার্থবাবুর উক্তি তাঁদের 'বিস্মিত' করেছে। ঐ উক্তিকে তাঁরা শুধু অবাঞ্ছিত নয়, অগণতান্ত্রিক বলেও আখ্যা দেন। কারণ সরকারী কর্মচারীরা রাজনীতি করলে বরখাস্ত হবে, এই ধরনের ধ্যান-ধারণা সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশে চলে না। এই প্রসঙ্গেই সি পি আইয়ের পক্ষ থেকে একথাও জানান হয় যে, সি পি আই কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সি পি আই কংগ্রেসের 'অগণতান্ত্রিক কাজ ও উক্তিকে' সমর্থন করে।

এই ধরনের সমালোচনায় যে কংগ্রেস মহল খুব খুশী হবে, এটা আশা করা যায় না। সি পি আইয়ের প্রতি কংগ্রেসের সকলেই প্রসন্ন, এমন কথাও বলা যায় না। কংগ্রেসের একটি অংশ তো মনে করেন সি পি আইয়ের বেশ কিছু লোক তাঁদের দলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে সি পি এম বা নকসালপন্থী কিছু লোক ভিড়ে গেছে, এমন কথা আগেই শোনা গেছে। এখন কংগ্রেস সভাপতি নিজেই বলছেন যে, দলের মধ্যে সি পি আইয়ের লোকজনও অনেক ঢুকে গেছে এবং তাদের বাছাই করার দরকার হয়ে পড়েছে।

* * *

এই পটভূমিতেই এই সপ্তাহে কংগ্রেস ও সি পি আই নেতাদের একটা বৈঠক হয়ে গেল। মতপার্থক্য পরিহার করে বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাওয়াই ছিল এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। আগেই বলেছি, এই ধরনের বোঝাপড়ার সবচেয়ে বড় দরকার বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে। তাই দু দলের নেতাদের নিয়ে যে সমন্বয় কমিটি তৈরী হয়েছে তার প্রধান দায়িত্ব হবে বিধানসভায় দু দলের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। তাছাড়া, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্যে একটি করে বিশেষ পরামর্শদাতা কমিটিও গঠন করা হবে। সেই কমিটিতে দু দলের সদস্যই থাকবেন। এর ফলে সি পি আই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের ওপর আরো বেশী নজর রাখতে পারবে।

মনে হয় দু দলের নেতাদের মধ্যে এই যে বোঝাপড়া হল এতে সি পি আই মোটের ওপর খুশীই হয়েছে। এই বোঝাপড়াকে সি পি আই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার ঐক্যের জয় হিসেবেই চিহ্নিত করতে চাইছে। ছোটখাট মতবিরোধ সত্ত্বেও মোর্চার ঐক্য যে অটুট, এই বোঝাপড়া তারই প্রমাণ। সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতি চর্চা সম্পর্কে আলোচনার সময় সি পি আইয়ের মুখপাত্রের গুরুত্বটা ছিল মোর্চার দুই শরিকের মধ্যে মতপার্থক্যের ওপর। আর এই সপ্তাহের বোঝাপড়ার পর গুরুত্বটা গিয়ে পড়েছে মোর্চার ঐক্যের ওপর। মোর্চা শুধু যে টিঁকে থাকছে তাই নয়, সি পি আইয়ের বিচারে মোর্চার গণভিত্তি প্রসারিতও হচ্ছে। সুতরাং মোর্চার বিলুপ্তির সম্ভাবনায় যাঁরা দিন গুণছিলেন সি পি আই তাঁদের প্রতি কিছুটা করুণাই প্রকাশ করেছে।

সি পি আই মাঝে মাঝে কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চাকে টিঁকিয়ে রাখার প্রধান দায়টা ঐ দলেরই। কংগ্রেস যে মোর্চার বিলুপ্তি চায় তা নয়, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই মোর্চার স্থায়িত্বে বা অস্থায়িত্বে তার ঝুঁকি কম। ধরাই যাক যে, কোন গুরুতর রকম মতবিরোধের ফলে মোর্চার সত্যিই বিলুপ্তি ঘটলো। তাতে সরকারী দল হিসেবে কংগ্রেসের কিছুই এসে যাবে না। তার ফলে কংগ্রেসের শাসন ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। 'সিনিয়র পার্টনারের' এই ধরনের সুবিধে থাকেই।

কিন্তু প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা ভেঙে গেলে সি পি আইকে বেশ বড় সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। সেই সংকট সরকার গঠন বা সরকার টিঁকিয়ে রাখার প্রশ্নে নয়—যেমন কেরলে দেখা দিয়েছে। এখানে প্রশ্নটা হবে প্রধানত সি পি আইয়ের রাজনৈতিক কৌশল সংক্রান্ত। কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল অংশের সন্ধান পেয়ে সি পি আই তার দলের জাতীয় নীতি অনুযায়ী কংগ্রেসের সংগে মোর্চা গড়েছে। সেই মোর্চা ভেঙে যাওয়া মানে সি পি আইয়ের রাজনৈতিক কৌশল বা মূল্যায়ণেই ভুল আছে, এটাই স্বীকার করে নেওয়া। ১৯৭১ সালের নির্বাচনের মুখে কেন্দ্রীয় স্তরে সি পি আইয়ের সংগে কংগ্রেসের যে-সম্পর্ক ছিল এখনও ঠিক তাই-ই আছে তা বলা চলে না। তবু সি পি আই এখনও এমন কথা বলে নি যে, তার কৌশলের মধ্যে কোন ভুল ধরা পড়েছে। সেই কৌশলের সাফল্য প্রমাণ করার জন্যেই পশ্চিম বাংলা (এবং কেরলে) মোর্চা টিঁকিয়ে রাখা দরকার।

২৩।৬।৭২ —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু এই সম্মেলনের প্রাক্কালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর কাছ থেকে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যাতে মনে করা যেতে পারে যে, এই সম্মেলনের আলোচনার মধ্য দিয়ে দুই দেশের ভেতর স্থায়ী শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে আসছেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মূলগত বিরোধ অমীমাংসিত রেখে শুধু সৈন্য সরিয়ে নিয়ে এলে এবং যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দিলে স্থায়ী শান্তি আসবে না, ভারতের এই বক্তব্যে পাকিস্তানের সাড়া দেওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অথচ, আলোচনার এই পূর্বসর্তে সমঝোতা না হলে শীর্ষ বৈঠক কি করে সফল হবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ বৈঠকের গোড়াতেই খটকা বাধার সম্ভাবনা সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্ন। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা যাবে না; কারণ, যুদ্ধবন্দীরা ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত কমান্ডের হাতে আটক হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে এই দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হবে কি করে? স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে ভুট্টো সাহেব অবশ্য আগের তুলনায় সুর নরম করেছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সর্বশেষ যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন। তিনি নাকি এখন বুঝতে পেরেছেন যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দেরি করলে সে দেশ সম্পূর্ণভাবে ভারতের খপ্পরে পড়ে যাবে। কিন্তু ভুট্টো সাহেব এখনও [illegible] যে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে তিনি একবার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করবেন। [illegible] স্বীকৃতি [illegible] সম্পাদকদের [illegible] না [illegible] করবে না এবং [illegible] বাংলাদেশ [illegible] স্বীকৃতি [illegible] দেশের মধ্যে কোন আলোচনাই হতে পারে না।

[illegible] হিমাচল [illegible] শৈলশহর সিমলায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর এই শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। স্থির হয়েছে যে, সিমলা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার দূরে 'রিট্রিট' নামে ১২৫ বছরের পুরানো একটি বাড়িতে দুই নেতার এই বৈঠক হবে। একজন বৃটিশ মেডিক্যাল অফিসার এই বাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন এবং বৃটিশ আমলে বড় লাটেরা এখানে ছুটি কাটাতে আসতেন। সেই আমলেও এই বাড়িতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বৈঠক হয়েছে এবং সেইসব বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। সেকালে যাঁরা এই সুরম্য গৃহে বাস করেছেন তাঁদের মধ্যে লর্ড কার্জন, প্রধান সেনাপতি স্যার উইলিয়াম ম্যানসফিল্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বহু বছর বাদে আর একটি ঐতিহাসিক বৈঠকের জন্য এখন 'রিট্রিট'-এর সংস্কার করা হচ্ছে।

সিমলার আরও একটি ঐতিহাসিক গৃহকে এই সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। শতখানেক বছর আগে তৈরি ঐ গৃহ একদা 'বার্নেস কোর্ট' নামে পরিচিত ছিল। এই আমলে তার নতুন নামকরণ হয়েছে 'হিমাচল ভবন।' স্থির হয়েছে যে, এই সম্মেলনের জন্য ভুট্টো যখন সিমলায় আসবেন তখন তিনি এই 'হিমাচল ভবন'-এ থাকবেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষে অন্যান্য যেসব আয়োজন হচ্ছে সেগুলির মধ্যে আছে— সম্মেলন যে কয়দিন চলবে সেই কয়দিনের জন্য সিমলার সঙ্গে একদিকে ইসলামাবাদের ও অন্যদিকে ঢাকার সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৬ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে এই সিমলা শহরে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতাদের আলোচনা হয়েছিল। ২৬ বছর পরে এই দ্বিতীয়বার উত্তর ভারতের এই সুপরিচিত শৈলশহর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আতিথ্য দিল। আর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন হচ্ছে গত সাড়ে ছয় বছরের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার। সর্বশেষ পাক-ভারত শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাসখন্দ শহরে।

•

এই শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া দূষিত করে এদেশকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলার একটা চেষ্টা হয়েছে। উপলক্ষটা ছিল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংসদের নতুন আইন।

•

এই সংশোধন আইন নিয়ে যে বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে তার মূলে নিহিত রয়েছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় মুসলমানরা যে পিছিয়ে রয়েছে তার প্রতিবিধান করার জন্য ১৮৭৫ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বছর পনেরর মধ্যে এই স্কুল বড় হয়ে কলেজে পরিণত হল। মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ নাম ধারণ করে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করল। ১৯২০ সালে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে গৃহীত এক আইনের বলে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ঐ মূল আইনেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, কার্যনির্বাহক পরিষদ প্রভৃতি প্রশাসনিক সংস্থায় শুধু মাত্র মুসলমানরাই সদস্য হতে পারবেন। মূল আইনের ঐ ধারাটিই এখন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি প্রধান বিতর্কের হেতু হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় ও বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত আর একটি বিতর্ক দেখা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুমোদিত কলেজ থাকবে কিনা অর্থাৎ এটি অ্যাফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি হবে কিনা সেই প্রশ্নে। ১৯২০ সালের মূল আইনটিতে কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কলেজ অনুমোদন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। মূল আইন সংশোধন করে ১৯৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ক্ষমতা অবশ্য কখনও প্রয়োগ করা হয়নি। আলিগড় শহরের তিনটি কলেজ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত।

সম্প্রতি সংসদে যে সংশোধন আইন গৃহীত হল তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাফিলিয়েশন' দেওয়ার ঐ ক্ষমতা বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে একদল লোক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরা আশা করছিলেন যে, শহরের হিন্দু-প্রধান কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর মুসলমান প্রাধান্য খর্ব করা যাবে। (এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ও ছাত্রদের ৭০ শতাংশ মুসলমান)।

হাঙ্গেরী সফর শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ২৩শে জুন বুদাপেস্ট ত্যাগ করেন। ছবিতে শ্রীমতী গান্ধীকে জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে, আর একদলের অভিযোগ, সর্বশেষ সংশোধনী আইনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। এই অভিযোগের কারণ হল, কোন অমুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিচালনা সংস্থার সদস্য হতে পারবেন না বলে মূল আইনে যে নির্দেশ ছিল (১৯৫১ সালের সংশোধনের পর যদিও অমুসলমানদের ঐসব সংস্থার সদস্য হতে বাধা নেই তাহলেও মুসলমান প্রাধান্য বজায় রাখতেই হবে) সেই নির্দেশ এবারকার আইন সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেকার আইনের ঐ বিশেষ নির্দেশ বাতিল করে দেওয়ার একটি সংবিধানগত কারণ আছে। ১৯৬৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিনান্স জারি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সাময়িকভাবে রদ করে দেন। এর অল্প কিছুকাল পরেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্রের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ রায়ের তাৎপর্য হল, কেন্দ্রীয় আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যার আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সেটি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকতে পারে না। সুপ্রীম কোর্টের এই রায় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই একদল লোক এই বলে আন্দোলন করতে থাকেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্র সুনিশ্চিত করার জন্য, প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করে, নতুন আইন করা হোক। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি এই আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করেছিল। প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছিল যে, সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা হবে। এবারকার আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর ঐ আন্দোলনকারীরা মনে করছেন, তাঁদের প্রতীক্ষা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি কাসিম মাহমুদ বলেছেন, 'দেশের ৭৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিকে যদি সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয় বলে ঘোষণা করা হয় এবং সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সংখ্যাগুরু অংশ যদি মুসলমান হন তাতে ক্ষতি কি? আমরা শুধু এইটুকু চাইছি যে, অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে ভর্তি ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয় আমাদেরও তাই দেওয়া হবে। আর তা যদি না করা হয় তাহলে দেশের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ যেকালে মুসলমান তখন সরকার দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ শতাংশ আসন আমাদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখুন। কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে, সে জায়গায় একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের জন্য নিশ্চয়তা বিধানের দাবী করাটা কি মানবিক নয়?'

অধ্যাপক ইউনিয়নও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্র অব্যাহত রাখার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

অপরদিকে, জনসংঘপন্থী ছাত্র ও অধ্যাপকরা বলছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকৃতি দিতে হয় তাহলে শিক্ষায় অনগ্রসর অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়কেও অনুরূপ সুবিধা দিতে হবে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রপিছু কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ করেন। আর সেই জায়গায় আলিগড় শহরে আগ্রা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদিত তিনটি কলেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন খরচ করেন গড়ে মাত্র ১২৫ টাকা। সব ছাত্রের জন্যই ঐ পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা হবে না কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংখ্যালঘু চরিত্র' রক্ষার জন্য যাঁরা আন্দোলন চালাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন আলিগড মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর অধ্যাপক কে নিজামিঃ 'একমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চরিত্র ছাড়া অন্য কোন চরিত্রই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকতে পারে না। একথা সত্য যে, স্যার সৈয়দ মুসলমানদের শিক্ষাদান করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং মুসলমানদের শিক্ষাদান করার ব্যাপারে তার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু এই আইনে এমন কিছু আছে বলে মনে করি না যে, এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক চরিত্র ক্ষুন্ন হতে পারে।'

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে রাজনীতি বেশ কিছুকাল ধরেই চলছে। পঞ্চাশের দশকে ডাঃ জাকির হোসেন বিরক্ত হয়ে সেখানকার ভাইস চ্যান্সেলরের পদ ত্যাগ করে এসেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার চেয়ে রাজনীতির ঘোঁট পাকানোটাই বেশি করে চলেছে অনুভব করে নবাব আলি জবর জংগও ১৯৬৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করে-ছিলেন।

এবার আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন আইন উপলক্ষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভিতরকার রাজনীতি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য মুসলিম লীগ, মুসলিম মজলিস প্রভৃতি সংস্থা গত ১৬ জুন দেশব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' উদ-যাপনের আহ্বান জানিয়েছিল। এই 'প্রতিবাদ দিবস'-এর কার্যক্রম বিশেষ করে ফিরোজাবাদ ও বারাণসী শহরে দাংগা-হাংগামার আকার নিয়েছিল। ঐ দুটি শহরে মোট ২৫ জন মারা গেছেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, উত্তরপ্রদেশের ঐ দুটি শহরের বাইরে আর কোথাও এই দাংগা-হাংগামা ছড়ায়নি।

●

আলিগড বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এই আন্দোলন উপলক্ষে সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের কথা উঠছে। ঐ অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার অধিকারের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেরলেও এই অনুচ্ছেদের কথা উঠেছে। এবং সেখানে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে, সেখানকার সরকারের স্থায়িত্বের ওপর টান পড়েছে। ব্যাপারটা ঘটেছে এইভাবেঃ— কেরলের যুব কংগ্রেস সেখানকার বেসরকারী কলেজগুলিকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনার জন্য রাজ্য সরকারের ওপর খুব চাপ দিচ্ছে। ঐ বেসরকারী কলেজগুলির অধ্যাপকদের কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে—যেমন, কম মাইনে নিয়ে অধ্যাপকদের খাতাপত্রে বেশি মাইনে পেয়েছেন বলে সই করতে হয়, অধ্যাপকদের কাজ পাওয়ার জন্য তাঁদের মোটা দক্ষিণা গুণতে হয় ইত্যাদি। ঐ কলেজগুলির টিউশন ফির হারও অত্যন্ত চড়া।

যুব কংগ্রেসের চাপে কেরল রাজ্য সরকার সম্প্রতি বেসরকারি কলেজগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের ছাত্রদের ফি-এর হার কমিয়ে সরকারি কলেজের ফি-এর সমান করতে হবে। বেসরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষরা বলছেন, ফি কমালে তাঁদের আয়ের যে ঘাটতি হবে সেটা পূরণ করার জন্য তাঁদের সরকারী অর্থসাহায্য দিতে হবে। সরকারী অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পেলে গ্রীষ্মের ছুটির পর তাঁরা আর কলেজ খুলবেনই না।

যদিও যুব কংগ্রেসের চাপে কেরলের সরকার এই নির্দেশ দিয়েছেন তাহলেও রাজ্য সরকারের কোন শরিকই এই ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উৎসাহী নয়। কেরলের শিক্ষাব্যবস্থার একটা বিশেষত্ব এই যে, সেখানকার বহু সংখ্যক বেসরকারি কলেজ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়। কিছু কলেজ চালায় ক্রিশ্চিয়ান, কিছু চালায় নায়ারদের সংস্থা 'নায়ার সার্ভিস সোসাইটি' এবং আরও কিছু চালায় এড়ভা সম্প্রদায়ের 'শ্রীগুরুনারায়ণ ধর্ম পরিপালন ট্রাস্ট, সংক্ষেপে 'এস এন ডি পি ট্রাষ্ট।' কেরলে ক্ষমতাসীন জোটের শরিক দলগুলির প্রধান প্রধান নেতা ও সমর্থকরা অনেকেই এই সব ধর্মীয় সংস্থার সংগে যুক্ত আছেন। যেমন, এড়ভা সম্প্রদায়ের ও কংগ্রেসের নেতা আর শংকর এস এন ডি পি ট্রাষ্টের একজন সদস্য। কেরলের নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা শিক্ষা বিল এনে যে প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার কথা ভুলে যাওয়াও কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব নয়। কেরলের যুক্ত ফ্রন্টের শরিক দলগুলি বুঝতে পারছে যে, ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া করা সুবিধাজনক নয় কংগ্রেসও যে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী তা নয়। তবে তাদের পক্ষে যুব কংগ্রেসের চাপ এড়ান সহজ নয়। বিষয়টি এখন যেখানে পৌঁছেছে তাতে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যে টান ধরতে পারে বলে মনে হচ্ছে। ফ্রন্টের লিয়াজোঁ কমিটিতে বিষয়টি আলো-চনা হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু কংগ্রেসের অনুরোধে আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছে।

ফ্রন্টের অন্যতম শরিক মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে বলেছে যে, কেরলে ও অন্যত্র সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদ লংঘন করে যেভাবে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার অধিকার নষ্ট করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করবে।

●

মানব পরিবেশ সম্পর্কে সম্প্রতি স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পরিবেশবিচারের সমস্যা নিয়ে যেসব কথাবর্তা হল সেগুলিকে ভেংচি কাটার জন্যই যেন ফ্রান্স এই মাসের শেষে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট প্রবালদ্বীপ মুরুরোয়াতে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করছে।

এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আপত্তি উঠেছে। বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরের দেশগুলি এই ভেবে উদ্বেগ বোধ করছে যে, এই বিস্ফোরণের ফলে তাদের বায়ুমণ্ডলও তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা দূষিত হতে পারে। পেরু জানিয়েছে যে, এই বিস্ফোরণ ঘটলে সে ফ্রান্সের সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ফিজি জানিয়ে দিয়েছে, এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সংগে যুক্ত কোন ফরাসী জাহাজকে সে তার পোতাশ্রয় ব্যবহার করতে দেবে না।

'পিটকেয়ার্ন' নামক যে দ্বীপে একদা 'বাউন্টি' নামক বৃটিশ জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকরা আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই দ্বীপটি এই মুরুরোয়া দ্বীপ থেকে ৬০০ কিলো-মিটার দূরে। সংবাদে প্রকাশ যে, ঐ দ্বীপের অধিবাসীরা হাইড্রোজেন বোমার আতংকে এখন ঐ দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই অঞ্চলে এর আগে ফ্রান্স যেসব পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করেছে তার ফলে নিকটবর্তী টুয়ামোটু দ্বীপের কয়েকজন অধিবাসী তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণাদায়ক রোগে ভুগছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁদের নাকি গোপনে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ফ্রান্স জানিয়ে দিয়েছে যে, সে এই পরীক্ষা-মূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেই। এই নিয়ে ফ্রান্স ৩২টি পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে। এর মধ্যে ২৫টি বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছে ১৯৬১ সালের পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ আংশিক নিষিদ্ধ-করণ চুক্তির পর। ফ্রান্স এই চুক্তির অংশীদার নয়।

২২।৬।৭২ পুণ্ডরীক

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞান চিন্তা

অমিয় কুমার মজুমদার

'হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরকার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করবার জন্য যেভাবে বারে বারে বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। জীবের বিজ্ঞানময় কোষের অর্থাৎ মস্তিষ্কে যেমন জীবের বুদ্ধি নিয়ত জাগছে—প্রকৃতির শীর্ষস্থানে, তেমনি সমস্ত জীবজগতের পৃথক পৃথক বুদ্ধিকে একসূত্রে গ্রথিত করে এক মহতী বুদ্ধি নিয়ত জাগরিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধে যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতির প্রশ্নটি এসেছে। ব্যাখ্যা করছেন বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে—'ইন্ধন কাষ্ঠে পার্থিব পরমাণু বেশীর ভাগ রহিয়াছে—ঘৃতে জলীয় পরমাণু বেশীর ভাগ রহিয়াছে, অগ্নিদ্বারা এই ঘৃত ও কাষ্ঠ বাষ্পীভূত হইয়া ক্রমশ কত যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইতে থাকে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন, এমনকি, পরিশেষে উহার একটি পরমাণু এরূপ মাত্রাতিরিক্ত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে যে, তাহাকে সূচের আগা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী সূক্ষ্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন যে ঘি, কাঠ ইত্যাদি মহাশূন্যে আকাশে বিলীন হয়েই কি থেমে থাকে না তার আরো কোন সূক্ষ্মতর পরিণাম আছে? এর উত্তরদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, অনেক যুগ যুগান্তর পরে পৃথিবী যখন জলে গুলে যাবে এবং সেই জলীভূত পৃথিবী যখন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে এবং—একা শুধু পৃথিবী না—সূর্য শুদ্ধ ধরিয়া সমস্ত সৌরজগৎ অতীব সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন কোথাও আর উত্তাপের তারতম্য থাকিবে না—সমস্ত আকাশ একই রূপ শীতল অবস্থায় পরিণত হইবে।'

সৃষ্টির মূলে এক চৈতন্যসত্তা বর্তমান সেকথা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে চান না। 'পূর্বতন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা জলকে Oxygen এবং Hydrogen এই দুই রূপ পদার্থে বিভাগ করিয়াছিলেন—খুব পাকাপোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা। কিন্তু তাহার পরে সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহাদের সংযোগ হইতে পুনর্বার জল উৎপাদন করিতে কিছুতেই পারিয়া উঠিতেন না—তাঁহারা জানিতেন না যে, Oxygen এবং হাইড্রোজেন ছাড়া তৃতীয় আরেকটি পদার্থ জলের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে যাহার নাম তড়িত পদার্থ। তেমনি এই পৃথিবীর মধ্যে—এই মৃত্তিকা জল-বায়ু-অগ্নির মধ্যে—যে একটি চেতন পদার্থ জাগিতেছে, তাহা তাঁহারা আদবেই না দেখিয়া কল্পনাযোগে সমস্ত সৃষ্টিকে এক মূল ভৌতিক উপাদানে নিঃশেষে পরিসমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন।'

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ সুন্দর কথা বলেছেন। প্র—উপসর্গের অর্থ হলো সম্মুখ-প্রবণতা, বি—উপসর্গের পরিচয় লক্ষণ পার্শ্ব-প্রবণতা, এবং সং—উপসর্গের মানে হলো কেন্দ্রাভিমুখীতা।

প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ হলো প্রজ্ঞাতব্য বিবেক। খোসা ছাড়িয়ে শাঁস গ্রহণ করা হলো প্রজ্ঞা। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান—সমগ্র জ্ঞানবৃক্ষের বিশেষ বিশেষ শাখা-প্রশাখা, এই জন্য সমগ্র জ্ঞানের তুলনায় বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞান হলো বিশেস বিশেষ শাখায় পরিসমাপ্ত বিশিষ্ট রূপজ্ঞান। 'প্রজ্ঞা' কি করে? নানা বিজ্ঞান-প্রবাহিনীর সাগরসঙ্গম থেকে সার মন্থন করে মানুষের পরমপুরুষার্থ এবং জগতের চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে যথাসম্ভব তত্ত্ব নির্ধারণ করে। এজন্য বলা যেতে পারে যে, প্রজ্ঞা হলো ফলজ্ঞান বা wisdom.

প্রশ্ন উঠতে পারে প্রজ্ঞান আগে, না বিজ্ঞান আগে? এর উত্তর হলো এক হিসেবে ফল আগে এবং আর এক হিসেবে ডাল বা শাখা আগে। 'জ্ঞান শব্দের উপরে উপসর্গের প্রয়োগ' (তত্ত্ববোধিনী ১৪ কল্প ৩য় ভাগ, চৈত্র ১৮১৯ শক) প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভাবিয়া দেখিলে প্রজ্ঞা বিজ্ঞানের মূলও বটে—ফলও বটে; তাহার সাক্ষী—বেকন্ এবং দেকর্তার প্রজ্ঞা বাণীগুলি আরিস্ততেলিক এবং আরবিক বিজ্ঞানের ফল, কিন্তু নিউটনিক বিজ্ঞানের মূল। তেমনি বেদোপনিষদের প্রজ্ঞাবাণীগুলি প্রাচীনতর বিজ্ঞানালোচনার ফল এবং ভারতবর্ষের মধ্যমাব্দীয় বিজ্ঞানের মূল।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ও প্রজ্ঞানের আরও একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞান হলো 'সমগ্র সত্যের আশপাশ দিয়া পরিস্ফুটিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি নানা-প্রকার শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধীয় বৈশেষিক জ্ঞান, তাই তাহার আদিতে বি। প্রজ্ঞান হলো জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-বৎ অপরোক্ষতত্ত্বের উপলব্ধি, তাই তাহার আদিতে প্র।

এতক্ষণ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তব্যের আলোচনা করা হলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের সম্বন্ধে ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। এক বক্তৃতায় (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৪ কল্প, ৩য় ভাগ, অগ্রহায়ণ, ১৮১৯ শক) তিনি বলেছিলেন, জ্ঞানের আদান-প্রদানে সকলেরই সমান অধিকার। অতএব 'বিজ্ঞান আর সেই সঙ্গে টাকা করিবার উপায় বিদেশীয়দিগের নিকট শিক্ষা করা হউক। বিজ্ঞানকে কার্যে খাটাইতে গেলেই তাহা কলকারখানার আকার ধারণ করে। এইজন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রীকরণের (organisation) প্রণালী পদ্ধতি শিক্ষা করা হউক। দেশী প্রাণীয় ভাব রক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে বিলাতী কলীয় ভাব জুড়িয়া দেওয়া হউক।'

এই বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে দেশে কলকারখানা স্থাপনে তাঁর আগ্রহ ছিল যদিও সেই সঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, 'কলকারখানায় বিধিমতে লিপ্ত হইলে প্রাণীয় ভাবের অনেকটা বিচ্যুতি আশঙ্কণীয়।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ এই রোগের ওষুধও বাতলে দিয়েছেন। জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানোপযোগী ধর্মের সাহায্য গ্রহণ করলে আশঙ্কার অবলুপ্তি ঘটবে। বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোককণা দূর করে দেয় অজানার অন্ধকার, তেমনি ধর্ম চেতনার আলোক-তরঙ্গ স্পর্শে অপসারিত হয় অজ্ঞানতার অন্ধকার। ধর্মচেতনা মানুষকে দেবে শুভ-বুদ্ধি। সেই চৈতন্যের স্পর্শ আমাদের প্রাণের বিচ্যুতিকে দূর করে এনে দেবে হার্মনি। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই পরমসত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন।

(চার)

জীববিজ্ঞান ও জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ডারউইনের কৃত্রিম নির্বাচন বা Artificial selection নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের পড়া-

শোনা যথেষ্ট ছিল একথা মনে করার কারণ ঘটেছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৬ কল্প, চতুর্থ ভাগ, বৈশাখ, ১৮২৮ শক) 'বিদ্যা ও জ্ঞান' প্রবন্ধ পাঠের পর। ডারউইন অনেক বছর ধরে অসামান্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে দেশ-বিদেশের নানাশ্রেণীর জীবজন্তুর জাতি-বৈচিত্র্যের গোড়ার বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন।

'তিনি (ডারউইন) নিজে যেরূপ প্রণালীতে পায়রার বংশে ময়ূরাবতার সমুদ্ভাবন করিয়া তুলিয়াছেন, প্রকৃতিমাতা স্বয়ং সেইরূপ প্রণালীতে নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর জীবের বংশে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর জীব সমুদ্ভাবন করিয়া আসিয়াছেন। সে প্রণালী আর কিছু না—সুপাত্র বাছিয়া বাছিয়া জোড়মিলানো। ডার্বিন (ডারউইন) তাহার নিজের কৃত পাত্র নির্বাচনের নাম দিয়াছেন Artificial selection —কৃত্রিম পাত্র নির্বাচন; আর প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্ত পাত্র নির্বাচনের নাম দিয়াছেন Natural selection —নৈসর্গিক পাত্র নির্বাচন।'

নৈসর্গিক পাত্র নির্বাচনের গোড়ার সূত্র কি আর চরমগতিই বা কেমন হবে? ডারউইন বলেন যে, জীবমাত্রেই নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চারদিকের প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, আর যারা সংগ্রামে জয়ী হয়, সেই যোগ্যতম জীবেরাই উদ্বৃত্ত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'প্রকৃতি' হলো যোগ্যতম পাত্রের নির্বাচনকর্ত্রী। 'এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, নৈসর্গিক পাত্র নির্বাচনের গোড়ার সূত্র হচ্চে সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, আর তাহার চরমগতি হচ্চে যোগ্যতমের উদ্বর্তন! অতএব জীবশ্রেণীর ক্রমবিকাশ অলঙ্ঘনীয়, কেননা, পূর্ব পূর্ব যুগের জীবদিগের মধ্যে যে যে শ্রেণীর জীব যোগ্যতম, সেই সেই শ্রেণীর জীবেরাই পরবর্তী যুগে উদ্বৃত্ত হয়।'

ডারউইনের এই তত্ত্ব সহজভাবে বোঝানোর জন্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ অপূর্ব মুন্সিয়ানার সঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করেছেন এই প্রবন্ধে। পাঠকসাধারণের কাছে গল্পটি ভাল লাগবে একথা মনে করে সংক্ষেপে বলছি।

ছয় সমুদ্রপারে সপ্তম সমুদ্রের মাঝখানে একটা ছোট উপদ্বীপ আছে, সেখানে মানুষ বা অন্য কোন জীবজন্তুর উপদ্রব নেই, কেবল শিংবিহীন একদল গরু চরে বেড়ায় স্বাধীনভাবে। এই উপদ্বীপের মধ্যস্থলে ক্রোশখানেক বিস্তৃত একটি মাঠ আছে। একমাত্র সেখানেই তৃণ জন্মে। অতএব সমস্ত গরুগুলি সেখানেই জড়ো হয়। তারা সুখে খাওয়াদাওয়া করছে, কোন বিষাদ-বিসম্বাদ নেই। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রাণের অপূর্ব হৃদ্যতা। মাঠটি হলো শান্তির আলয়। এইভাবে কিছুদিন কাটলো। এই পর্যায়ের সময়কে বলা যাক 'শৃঙ্গহীন গোজাতির সত্যযুগ'। এরপরের যুগের আরম্ভে গরুদের বংশবৃদ্ধি প্রচণ্ড হয়েছে দেখা গেল। ঘাসে ভরা মাঠে এখন নিত্য ঠোকাঠুকি। এদের মধ্যে দু'-একটি গরু ও ষাঁড়ের কপালের গ্রন্থিস্থলপ্রদেশ অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল বলে তাদের অসুবিধে হলো না, কারণ অন্যদের হটিয়ে দিয়ে তারা খেতে পারত। কঠিনমৌলি গরুর বংশবৃদ্ধি যত হতে লাগলো, কোমল-মৌলি গরুগুলি তত হটে যেতে লাগল এবং অনাহারে অস্থিচর্মসার হয়ে জীবিকা-নির্বাহে অপটু হয়ে উঠলো। আরো কিছু-দিন বাদে কঠিন-মৌলি গরুর দল মাঠের বারো আনা অংশ জুড়ে চরতে আরম্ভ করলো, সারা উপদ্বীপে কোমল-মৌলি গরু একটাও রইল না।

এই গল্প বলার শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'অযোগ্য হইতে যোগ্যের পার্থক্যসংঘটন তাহারই নাম Natural selection —নৈসর্গিক পাত্রনির্বাচন। আর, সেই নৈসগিক পাত্রনির্বাচনের অনিবার্য ফল যাহা পরিশেষে ফলিত হইল—কিনা কোমলমৌলি গোবংশের উচ্ছেদ এবং কঠিনমৌলি গোবংশের উদ্বর্তন, তাহারই নাম Natural selection —যোগ্যতমের উদ্বর্তন।'

ডারউইনের এই সিদ্ধান্তটিকে জীব-জগতের গভীর অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন তৎকালীন ক্রমবিকাশবাদীরা। তৎকালে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর জীব একই প্রোটোপ্লাজমের ভিন্নধা বিকাশ, আর সেই ভিন্নধা বিকাশের মূলে প্রবর্তক জীবন-ধারণের জন্য সংগ্রাম অর্থাৎ সত্তা বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ডারউইনের তত্ত্ব পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, ডারউইনের বক্তব্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে খুবই নতুন সন্দেহ নেই, তবে আমাদের দেশে এটি পুরাতন কথা। সাংখ্যদর্শনের একটি গোড়ার কথা হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই মূল প্রকৃতির ভিন্নধা বিকাশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন 'সেই ভিন্নধা বিকাশের মূলে প্রবর্তক রজোগুণ'।

রজোগুণের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, এই গুণ হলো 'দুঃখ এবং তন্নিবন্ধন কর্ম-চেষ্টা'। দুঃখ এবং কর্মপ্রচেষ্টাকে একসঙ্গে জোড়া দিলেই দুয়ে মিলে হবে Survival of the fittest. অর্থাৎ সত্তা বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যা এবং জ্ঞান' (তত্ত্ববোধিনী, ১৬ কল্প ৪ ভাগ, আষাঢ় ১৮২৮ শক) প্রবন্ধে বলেছেন যে, ডারউইনের জীবরাজ্যে রজো-গুণের আধিক্য বর্তমান একথা সত্য, কারণ পশ্বাদি জীব প্রকৃতপক্ষে রজোগুণ প্রধান। কিন্তু তাছাড়া সেই রজোগুণের পর্দার আড়ালে যে সত্ত্বগুণ লুকিয়ে কাজ করছে এবং মানুষের মনের মণিকোঠায় তা যে রীতিমত আসর জাঁকিয়ে বসে আছে, এদিকটাতে ডারউইন দৃষ্টি দেননি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, একটু গভীর-ভাবে চিন্তা করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে, জীবজগতে লড়াই করে বেঁচে থাকার কথা বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন হলো জীব-প্রকৃতির একটা মাত্র দিক, আরও একটা দিক আছে তা হলো সত্ত্বগুণের দিক।

ব্যাখ্যাতারা বলেন, যদি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে সহজেই অনুভব করা যাবে যে, প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় জীবনের প্রারম্ভ থেকেই এবং তা নিঃসন্দেহে কঠোর সংগ্রাম। শিশু জন্মাবার আগেই ভ্রূণ বা বীজ অবস্থায় অনেকটা নির্বাচন হয়ে যায়। তারপরে দেখা যায় একদিকে বংশ-বৃদ্ধির জন্যে যেমনি প্রচুর আয়োজন, তেমনি অপরদিকে জীবনধারণের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা। প্রাণধারণের জন্য জাতিগত ও ব্যক্তি-গত যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে তাকেই ডারউইন বলেছেন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবনসংগ্রাম।

ডারউইনের 'সংগ্রাম' কথাটি বেশ জটিল। সংগ্রাম কথাতে বোঝায়—প্রত্যক্ষ ও সজ্ঞান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সংগ্রাম প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত। স্ব-শ্রেণীর মধ্যে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে থাকে এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে তা সমগ্র প্রজাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক। বিশ্ব-খ্যাত পরলোকগত বিজ্ঞানী [illegible]ডনও একথা স্বীকার করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এমনকি স্ব-শ্রেণীর মধ্যে 'নির্বাচনের' ক্ষেত্রেও সংগ্রাম বা প্রতি-দ্বন্দ্বিতা আবশ্যক নয়। বরং সহ-অবস্থানের নীতি দেখতে পাওয়া যায়—

'....Selection in favour of harmonious or Co-operative group association, is certainly common'.

ডারউইনের ত্রুটি এই যে, তিনি মানুষ ও মনুষ্যেতর জীব-জন্তুদের বিবর্তনকে একইভাবে লক্ষ্য করেছেন। যদিও তিনি অন্যান্য প্রজাতি থেকে মানুষের বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন, তিনি স্বীকার করেছেন, বিবর্তন প্রক্রিয়ার সর্বোত্তম ফল মানুষ, তাহলেও তিনি ঐ মৌল দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দও বিশ্বাস করতেন যে, ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের মধ্যে ত্রুটি বর্তমান। তিনি মনে করতেন ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা। বিগত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার চিড়িয়াখানাতে সেখানকার তদানীন্তন অধ্যক্ষের (রায়-বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল) বাড়ীতে আলো-চনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

'নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে জীবনসংগ্রাম, যোগ্য-

তমের উদ্বর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতি ...নিয়ম কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনে কিন্তু এ-সকলের একটিও তার কারণ বলে সমর্থিত হয়নি।' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড পৃ ১১৯—১২০) পতঞ্জলি বলেন এক জাতি (Species) থেকে আর এক জাতিতে পরিণত হয় প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা। প্রতিবন্ধক বা বাধার সংগে দিবারাত্র সংগ্রাম করে যে তা সাধিত হয় তা নয়। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং লড়াই জীবের পূর্ণতা লাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'নিম্নপ্রাণিজগতে আমরা সত্য-সত্যই জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারউইনের theory কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু মনুষ্যজগতে যেখানে rationality -র বিকাশ, সেখানে এ-নিয়মের উল্টোই দেখা যায়। '...মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution একমাত্র sacrifice দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান জানোয়ার হয়। সুতরাং struggle theory -এ উভয় রাজ্যে equally applicable হতে পারে না। মানুষের struggle হচ্ছে মনে।'

আবার শ্রীঅরবিন্দ ক্রমবিকাশতত্ত্ব বা অভিব্যক্তিবাদকে সংকীর্ণ দৃষ্টিযুক্ত বলে অভিহিত করলেও তিনি বলেছেন তাঁর 'দিব্যজীবন' গ্রন্থে 'মৃত্যু ও অন্যান্য কবলনের লীলা, আছে বুভুক্ষা ও সদ্যোজাগ্রত কামনার প্রবেগ, সংকীর্ণ প্রসর ও সামর্থ্যের একটা পীড়িত অনুভব, আপনাকে ছড়িয়ে দেবার, বাড়িয়ে তোলবার একটা ক্ষুব্ধ আয়াস, বিজিগীষা ও বিশ্লেষণার একটা প্রমত্ততা। একে আমরা বলি মৃত্যু-কামনা ও সংঘাতের ত্রয়ী। ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্বের ভিত্তি হলো এটি।

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে একটা বিক্ষোভ। মরণের মধ্যেও মরণকে উত্তীর্ণ হবার বিক্ষুব্ধ প্রয়াস। যেহেতু মৃত্যু তো প্রাণেরই নেতিরূপ। এরই আড়ালে থেকে প্রাণ ইতিরূপের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চাইছে অমৃতত্ব লাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। একইভাবে বলা যেতে পারে, বুভুক্ষা ও কামনার মধ্যেও তেমনি অকুণ্ঠ 'আত্মতর্পণের নিরাপদভূমিতে' পৌঁছবার উদগ্র বাসনা। যেহেতু কামনার ফেনিলতার ভিতর দিয়ে প্রাণ চায় অতৃপ্ত বুভুক্ষার নেতিরূপ থেকে তার ইতিরূপকে নিরঙ্কুশ সম্ভোগের দিকে নিয়ে যেতে। তাই জাগে পরিবেশকে পরাজিত করবার দুর্দমনীয় আগ্রহ। সংগ্রামে টি'কে থাকার প্রশ্ন শুধু নয়। তার মধ্যে আছে সর্বাসিদ্ধির আত্যন্তিক তপস্যা। যেহেতু যখনই পরিবেশ নিজের করায়ত্ত তখনই বে'চে থাকার সম্ভাবনা সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত। ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'বাদের ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। ডারউইন দেখলেন প্রাণের মধ্যে 'যুযুৎসুভাবটাকে' বড় করে। জীবজগতে নিজের স্বার্থ অতি বড়। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তার জন্যে আততায়ী হয়ে অপরের প্রাণবিনাশে তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একথা ডারউইন রায় দিয়েছেন স্বচ্ছন্দচিত্তে। তাঁর ভ্রান্তি এখানেই। দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছিল ডারউইন তত্ত্বের এই ত্রুটিগুলি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ডার্বিন কিছু আর বৈদান্তিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভেদদৃষ্টিতে দেখিতেছেন না—জীবে জীবে প্রভেদ আছে, একথা তিনি মানেন। এটা যখন তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় প্রভেদ আছে, তখন সেই সংগে এটাও তাঁহার স্বীকার করা উচিত যে, মাতা-পুত্রে প্রভেদ আছে। প্রকৃতি হচ্ছেন মাতা, আর, জীবগণ হচ্ছে প্রকৃতি মাতার পুত্র, এবং পরস্পরের ভ্রাতা। সময়ে-সময়ে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিতেও দেখা যায়, আর সেই গতিকে যোগ্যতম ভ্রাতার উদ্বর্তন ঘটিতেও দেখা দেখা যায়। কিন্তু তা বলিয়া মাতার মনোগত অভিপ্রায় এরূপ হইতে পারে না যে, যোগ্যতম ভ্রাতা অযোগ্য ভ্রাতাদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া আপনি একাকী উদ্বৃত্ত হউক। উল্টা বরং মাতার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, যোগ্যতম ভ্রাতা অযোগ্য ভ্রাতাদিগের অভাব পূরণ করিয়া তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া গাড়িয়া লউক। নিম্নশ্রেণীর জীবের মতো ছোটো ছেলেরা মাতার মর্মগত অভিপ্রায় বাঝিতে না পারুক, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় বড় ছেলেদের তাহা বুঝিতে না পারার কোন কারণ নাই।' (বিদ্যা এবং জ্ঞান, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৬ কল্প, ৪ ভাগ, আষাঢ়, ১৮২৮ শক)

দ্বিজেন্দ্রনাথ কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীতে ১৮১৮ শকাব্দের ২৮শে অগ্রহায়ণের বিশেষ অধিবেশনে 'অদ্বৈত মতের সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠকালে ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সেই বক্তৃতাতে তিনি বলেন, জীবজন্তুতে জ্ঞানালোকের প্রকাশ, আর, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক, দুরেরই অপেক্ষা প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা সর্বাপেক্ষা বলবতী। সেচেষ্টার ভীষণ মূর্তি যদি দেখতে হয়, তাহলে ডারউইনকে অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু সেখানেও তিনি মন্তব্য করেছেন, মানুষ নিতান্ত অসভ্য না হইলে জীবিকানির্বাহ করাই জীবনের একমাত্র সার কার্য মনে করে না—সভ্যলোক মাত্রই জ্ঞানধর্ম সম্ভাব এবং সদালাপের চর্চা করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করাকেই জীবনের প্রধানতম কার্য মনে করেন।' আগেই বলা হয়েছে ব্যষ্টি জীব স্থায়িত্বের সন্ধান খোঁজে নিজের মধ্যে নয়, সমষ্টির মধ্যে। তার জন্য প্রয়োজন সম্ভাব, সহযোগিতা, অন্যোন্যনির্ভরতা। নিজের প্রয়োজনেই তার চাই অপরকে।

[পাঁচ]

দেশের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করবার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের এবং মোহজ্ঞান দূর করবার জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞান। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন এই দুয়ের অধিকার বিভিন্ন, কোনটিই আমাদের অবহেলার সামগ্রী নয়। 'চতুঃষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে'র ১১ই মাঘের, ১৮১৫ শকাব্দ অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত 'বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান' শীর্ষক উপদেশ পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'উভয়ের (বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান) প্রত্যেকে যদি আপন অধিকারানুসায়ী এবং আপন প্রণালী অনুযায়ী কার্য করে তবে উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সমাবেশ হয় এবং দুই-পক্ষের যোগ হইতে অশেষ প্রকার মঙ্গল সমুৎপন্ন হয়।'

তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান অনেক সময় তার অধিকারের সীমা ভুলে যায়— এ কথাটি একেবারেই বিস্মৃত হয় যে তার গগনভেদী দূরবীক্ষণ জগতের মূল কেন্দ্র ভেদ ক'রে তার ওপিঠে যেতে পারে না এবং তার সূচ্যগ্রভেদী অনুবীক্ষণ পরমাণুর অন্তস্তল ভেদ করে তার ওপিঠে যেতে পারে না— অণু এবং মহান দুয়েরই পরস্পরের দ্বার তার কাছে অবরুদ্ধ (বর্তমানে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ বিষয় বিজ্ঞানের সাহায্যে জানা সম্ভব হয়েছে— —লেখক)।

আধুনিক কালের দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা তো বটেই, দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থাতেই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ বিজ্ঞানের সংগে ধর্মের মিলনের উপযোগিতা অনুভব করেছিলেন। স্বয়ং আইনস্টাইন এ সম্বন্ধে প্রায় একই রকম মনোভাব প্রকাশ করেছেন, বলেছেন বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া উভয়েই অচল।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথ সুদূর বিস্তৃত, তথাপি তা সীমিত। আর প্রজ্ঞানের দৃষ্টি অনন্তপ্রসারী। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী সীমিত হবার ফলে অনিবার্যভাবেই এনে দিয়েছে আবিলতা, এসেছে নানা কুসংস্কার, লোলিহান হয়ে উঠেছে মানুষের পাশবিকতা। এর ফলশ্রুতি সভ্যতার বিলুপ্তি। এই শোচনীয় অবস্থার হাত থেকে মুক্ত হতে পারা যায় প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে। পরা ও অপরা বিদ্যার শুভমিলনে বিশ্ব হবে শান্তির আধার, সৃষ্টি হবে মহত্তর প্রজাতির। দ্বিজেন্দ্রনাথের মানসাকাশে এই ছবি নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছিল।

আষাঢ়ে কল্পনা ।।

বনফুল

কল্পনা করছিলাম—
সমস্ত আকাশ সমাচ্ছন্ন করে'
এসেছে আষাঢ়।
মনে হচ্ছিল
পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও বেদনা
মূর্ত হয়েছে যেন অন্তরীক্ষে।
সহসা প্রশ্ন উদ্বেলিত হয়ে উঠল মনে—
জিজ্ঞাসা করলাম
আষাঢ়—তুমি কে?
দিগদিগন্ত-ব্যাপী তোমার কৃষ্ণ-মেঘ-বাহিনী
তোমার বিদ্যুতের ভ্রূকুটি
বজ্রের টঙ্কার
তোমার ঘন-ঘোর আয়োজন,
এ কি সমর-সজ্জা?
তুমি কি আক্রমণকারী আততায়ী?
কিন্তু তোমাকে দেখে ভয় করছে না তো,
আনন্দ হচ্ছে।
শুধু আমার নয়, চরাচরের।
ম্রিয়মাণ তৃণদলে
তৃষ্ণার্ত অধরে,
বিশুষ্ক প্রান্তরে,
জলহীন পুষ্করিণীতে,
বিশীর্ণ নদী ধারায়,
প্রণয়ীর ভগ্ন-হৃদয়ে
কেতকী-কাননে
কদম্ব-বনে
মালতী-কুঞ্জে
মণ্ডূকের মত্ত কলরবে
ডাহুকের উচ্চ-কণ্ঠে
ময়ূরের নৃত্যে
—সর্বত্র।
কিন্তু তোমার এই ভয়ঙ্কর যোদ্ধার বেশ কেন?
তোমার ওই কোমল জলদ-কান্তির সঙ্গে
বজ্রের গর্জন মানাচ্ছে না তো?
কে তুমি আষাঢ়
কোথা থেকে এলে?
অত দূরে কেন, কাছে এস।'
বিস্মিত উৎসুক দৃষ্টি মেলে
চেয়ে রইলাম আকাশের দিকে।
কল্পনায় শুনলাম মেঘের গুরু গুরু রবে
আষাঢ় উত্তর দিচ্ছে।
'সমুদ্রের সন্তান আমি।
সূর্যের শোষণের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ বহন করে এনেছি,
তাই আমার যোদ্ধৃ বেশ।
এ প্রতিবাদ বৃহৎ প্রতিবাদ
তাই আকাশ তার ধারক।
শুষ্ককে সরস করব
পাণ্ডুরকে শ্যামল করব এই আমার শপথ।
দূরে থাকব না।
কাছে যাব বলেই তো এসেছি।
যাচ্ছি।'

কল্পনা করলাম
বৃষ্টি নামল ঝম ঝম করে'।
রেনকোটে-সর্বাঙ্গ-আবৃত
চলে' গেল একজন আধুনিক।
মনের নিভৃত কোণে
আর একটি প্রত্যাশা ছিল কিন্তু।
ভাবছিলাম এযুগে তা কি হবে?
কিন্তু কি আশ্চর্য,
হ'ল,
তা-ও হল।
সামনের গলি থেকে
ভিজতে ভিজতে বেরুল গৌরী একটি কিশোরী।
তার পরণের নীল শাড়িটি ভিজে গেছে একেবারে
আমাকে দেখেই দ্রুত পদে এগিয়ে গেল সে।
তারপর দেখলাম
আর একটু দূরে গিয়ে
শাড়ি নিঙড়ে নিঙড়ে জল বার করছে।
ভারি আনন্দ হল
আধুনিক আষাঢ়
পুরাতনকে একেবারে বর্জন করেনি তাহলে।

প্রথমেই বলেছি, কল্পনা করছিলাম।
কিন্তু বাস্তবে যা হল—তা নিদারুণ।
হতাশ হয়ে গেলাম।
আজ পয়লা আষাঢ়
কিন্তু এখনও আষাঢ় আসে নি।
তবে কি তাকে ঘেরাও করেছে কেউ?
সে কি ধর্ম-ঘটে যোগ দিয়েছে?
'ধীরে কাজ কর'
এই বুলি তাকেও কি কর্মবিমুখ করেছে?
কারণ যাই হোক
আষাঢ় আসে নি—আসে নি—আসে নি।
শোষণ সমানে চলেছে।
হে আমার কল্পনার আষাঢ়
তোমার আকাশ-ভরা প্রতিবাদ নিয়ে
তুমি কবে আসবে
কবে—কবে—কবে—?

চিড়িয়াখানা

অজিত দে

ভোরের দিকে ঘুমটা ফের জমে আসছিল। সাড়ে চারটে পাঁচটা নাগাদ অবশ্য নিয়মমাফিক সুধাংশুর ঘুমটা বারেকের জন্য ভেঙে যায়। অন্যান্য দিনের মতো সে প্রায় বিছানা ছেড়ে ওঠবারও উপক্রম করেছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চমকের মত তার মাথায় চকিতে খেলে যায়, আজ তার অফ-ডে। সুতরাং সে যতক্ষণ খুশি ঘুমোতে পারে। বলতে গেলে আজকের সারাটি দিনই তার মুঠোর মধ্যে। তার যেমন মর্জি সেইভাবে সে সময়গুলো আজ খরচ করতে পারে। এই কথা মনে আসার পর সুধাংশুর চোখ দুটো আপনিই ফের বুজে আসে এবং গোটা শরীরটা অলস শিথিল ভঙ্গিতে ছড়িয়ে বালিশে মুখ গুঁজে সে একটা নিটোল নিবিড় ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতে চেষ্টা করে।

ছুটির দিনে বেলা সাড়ে আটটা কি ন'টা অব্দি সুধাংশু অঘোরে ঘুমোয়। এর ব্যতিক্রম বড় একটা হয় না। কিন্তু আজ আর বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকার সুযোগ পেল না সুধাংশু। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে ধড়ফড় করে জেগে উঠল সে। গলায় কেমন একটা জ্বালা জ্বালা অনুভূতি নিয়ে চোখ খুলতেই সে দেখতে পেল মশারির ভেতরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার। নাক-মুখ দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ঢুকছিল। সুধাংশু নিঃশ্বাস নেওয়া প্রায় বন্ধ করল, তবু কয়লার ধোঁয়ার তীব্র কটু গন্ধ ও স্বাদে তার নাক এবং গলা জ্বলে যাচ্ছিল।

সুধাংশু একরকম লাফিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় নামল। বারান্দার একপাশে রান্নাঘর, দর্মার বেড়া দিয়ে ঘেরা। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার আড়ালে রেবাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রান্নাঘরে উনুনের সামনে উবু হয়ে সমানে হাতপাখা চালাচ্ছে সে। পাখার হাওয়ায় উনুনের নিচের দিকের ধোঁয়া কখনো কখনো সরে যাচ্ছিল, সেই ফাঁকে রেবার নরম সুডোল হাতখানা সুধাংশুর চোখে পড়ছিল।

অবশ্য রেবার হাতের গড়নের শোভা দেখবার জন্য আপাতত সুধাংশুর কোন

মাথাব্যথা ছিল না। সপ্তাহের ছটা দিন ডিউটির তাড়া থাকায় সুধাংশুকে সকাল সকাল উঠতে হয়। বস্তুত সারা সপ্তাহটা সে ওই ছুটির দিনটার আশায় থাকে। ঘুমের ওপর সুধাংশুর বরাবরের লোভ। ছুটির দিন সপ্তাহের বকেয়া ঘুমটা সুদে আসলে উশুল করে নেয় সে। অমন সাধের ঘুমটা নষ্ট হওয়ায় সুধাংশুর মাথায় আগুন জ্বলছিল। চোয়াল শক্ত করে সে রান্নাঘরের দিকে এগোয়।

প্রায় ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে সুধাংশু বলল, ছুটির দিনটাও একটু ঘুমোতে দেবে না, পেয়েছ কি? এত সকাল সকাল উনুন ধরাতে কে বলেছে? দুবেলা গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলেও আশ মিটছে না, গেলবার এত সখ, অ্যাঁ?

খাওয়া-পরার খোঁটা দিয়ে কথা বললে রেবার দিক থেকে সচরাচর উত্তপ্ত প্রত্যুত্তর আসে। কিন্তু আজ কেন যেন রেবা খোঁচাটা বেমালুম হজম করে যায়। এরপর ধোঁয়ার আড়াল থেকে রেবা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলে সুধাংশু রীতিমতো অবাক হয়। রেবা বলল, কি ভুলো মন তোমার বলো তো? আজ না আমাদের চিড়িয়াখানা যাবার কথা?

সাতসকালে উনুন ধরাবার ব্যাপারটা এতক্ষণে মাথায় ঢোকে সুধাংশুর। হুঁ, ক'দিন ধরেই এমন একটা কথা সে শুনেছে বটে। ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত আজকের দিনটাই যে চিড়িয়াখানায় যাবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাও এখন তার মনে পড়ল।

ধোঁয়ার গন্ধটা বিশ্রী লাগছিল। সুধাংশু বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে পড়ল। কিন্তু উঠোনের খোলা হাওয়ায় তার মাথা একটুও ঠাণ্ডা হল না। বরং তার সমস্ত মেজাজটাই উত্তরোত্তর অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল। আজ দক্ষিণেশ্বর, কাল চিড়িয়াখানা, এসব বায়নাক্কা কি এখন আর তার পোষায়? বাসে-ট্রামে সেই আলিপুর অব্দি যাওয়ার ঝামেলা—তারপর সারাটা দিন রোদে তেতেপুড়ে টো টো করা এসব কি তার সাজে? সুধাংশুর কি আর সেই বয়েস আছে, না মন আছে? তাছাড়া কিছুদিন যাবত শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না সুধাংশুর। মাঝে মাঝে প্রায়ই মাথা ঘোরে, বুক ধড়ফড় করে। এক একদিন তো এমন মনে হয়, সে বুঝি রাস্তায় পড়ে যাবে। ডাক্তার বলেছে, লো ব্লাড-প্রেসার। ভয়ের কিছু নেই। একটু ভালোমন্দ খান, বিশ্রাম করুন সেরে যাবে। সুধাংশু অল্প আয়ের মানুষ, খুব একটা ভালোমন্দ খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। যদিও সংসার বলতে রেবা, সে নিজে এবং তার প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান সাত বছরের মেয়ে রুমকি, তবু দিনকে দিন জিনিসপত্তরের দাম যেমন হু হু করে বাড়ছে তাতে এই ছোট্ট সংসার-টুকু চালাতেও সুধাংশুকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। এর ওপর আবার ইদানীং এক বাড়তি উৎপাত এসে জুটেছে রেবার পিসিমা ননীবালা। প্রায়ই এখানে এসে বেশ কিছুদিন করে কাটিয়ে যায়। ভাইঝিকে না দেখে বেশিদিন থাকতে পারে না নাকি! ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায় সুধাংশুর। অথচ কিছু বলবার জো নেই। ননীবালার খাওয়াদাওয়া অথবা আদর-যত্নের ব্যাপারে সুধাংশুর দিক থেকে একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কি, রেবা অমনি বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার ভয় দেখায়। নিজের জন্য ঠিক না, রুমকির অসুবিধে হবে চিন্তা করেই সুধাংশু রেবাকে বড় একটা ঘাঁটায় না। তা খাওয়াদাওয়ার ঘাটতিটুকু বিশ্রাম দিয়ে পুষিয়ে নেবে সুধাংশু এমন ভেবেছিল।

কিন্তু বিশ্রামও কি তার কপালে আছে? একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলল সুধাংশু। আজ চিড়িয়াখানা অব্দি যাওয়া-আসা, তারপর রোদ্দুরে রোদ্দুরে সারাদিন ঘোরার পর সে কি আর কাল ডিউটিতে যেতে পারবে? শুধু কাল একদিন কেন, এই ধকল সামলাতে শেষ পর্যন্ত ক'দিন লাগবে কে জানে!

সাত-পাঁচ ভেবে একেবারে গোড়াতেই চিড়িয়াখানায় যাওয়ার প্রস্তাবটা বাতিল করতে চেয়েছিল সুধাংশু। একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে সে রেবাকে বলেছিল, হ্যাঃ, চিড়িয়াখানা! শহরের মানুষ আবার যায় নাকি ওসব জায়গায়, যত্তো গেঁইয়া ভূতগুলো ভিড় করে ওখানে। চিড়িয়াখানায় আছেটা কি?

চোখেমুখে উৎসাহ ফুটিয়ে রেবা বলেছে, কেন, সাদা বাঘ! ওইটেই তো এক মস্ত দেখার জিনিস।

—ধুর। আমল না দেওয়ার ভঙ্গিতে সুধাংশু বলেছে।

—তোমার তো সবেতেই ধুর। আছে কেবল খাওয়া আর ঘুমোনো। কিন্তু আমার তো বয়েস যায়নি। আমার সখ আছে, আহ্লাদও—

—আঃ হাঃ, চটছ কেন, রেবাকে থামিয়ে দিয়ে সুধাংশু শশব্যস্তে বলেছে, আমি কি যাব না বলেছি নাকি? আমিও যাব, আমারও অনেকদিন ধরে সাদা বাঘ দেখার ইচ্ছে।

রেবা সখ আহ্লাদের কথা তুললেই সুধাংশু ভয় পেয়ে যায়। বুড়ো দোজবর স্বামীদের যে কোনো রসকষ থাকে না, এর চেয়ে বাপ-মা রেবাকে জলে ভাসিয়ে দিল না কেন, রেবার গলায় এরপর এইসব আক্ষেপ ও হা-হুতাশ শোনবার ভয়েই চিড়িয়াখানায় যাওয়ার প্রস্তাবে চটপট রাজী না হয়ে পারে না। রেবার সঙ্গে দেড় বছরের বিবাহিত জীবনে এমন সে মাঝে মাঝে শুনেছে। সুধাংশু রেবার এই আক্ষেপগুলো বরদাস্ত করতে পারে না, কেমন যেন তার নিজেরই ওপর ঘেন্না ধরে যায় তখন। অবশ্য এই একটা ব্যাপার ছাড়া রেবাকে মোটামুটি ভালোই বলতে হয়। বন্ধুরা শুভাকাঙ্ক্ষীরা দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী সম্বন্ধে যেমন বলেছে, রেবা ততখানি দজ্জাল না। যদিও ইদানীং রেবার কেমন একটা বারমুখো ঝোঁক দেখা দিয়েছে। তবে ওটা হয়তো এমন কিছু না, সখ সাধ মেটাবার জন্য সব মেয়েমানুষেরই অমন একটু-আধটু বারমুখো ভাব বোধহয় থাকে। প্রথম স্ত্রী গীতাও কি অমনি ছিল না? গীতার আচরণগুলো ঠিকঠিক মনে আসে না সুধাংশুর। এরি মধ্যে স্মৃতি কেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে যেন।

—বাবা, চা নাও।

সুধাংশুর চমক ভাঙল। দু'হাতে কাপ ডিস সামলাতে সামলাতে চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে রুমকি। উঠোন পর্যন্ত আসতে গিয়ে খানিকটা চা চলকে পড়েছে প্লেটের ওপর।

সুধাংশু হাত বাড়িয়ে চা নিল। চোখ তুলে হাসিমুখে রুমকি জিজ্ঞেস করল, আমরা কখন যাব বাবা?

—এইতো, রান্না হলেই চান করে খেয়ে দেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

রুমকির চোখমুখ আনন্দে চকচক করছে। মেয়েকে খুশি দেখে সুধাংশুর মনটা একটু হাল্কা হয়। তার একটু কষ্ট হয় হোক, তবু মেয়েটা তো আনন্দ পাবে। চিড়িয়াখানায় যাওয়ার একটা সার্থকতা এতক্ষণে খুঁজে পায় সুধাংশু। কিন্তু তার এই প্রসন্ন ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। উঠোনের এক কোণে টিন দিয়ে ঘেরা বাথ-রুমের পাশে বলাইকে দেখেই মেজাজটা ফের গরম হয়ে যায় সুধাংশুর।

যত নষ্টের গোড়া ওই বলাই দত্তটা। আজ দক্ষিণেশ্বর, কাল বালীগঞ্জ লেক ইত্যাকার যাবতীয় হুজুগ তুলে সারা বাড়িটাকে মাতিয়ে বেড়াচ্ছে। মাস দেড়েক হল বিয়ে করেছে বলাই। তারপরই যেন ক্ষেপে গেছে লোকটা। অহর্নিশি কেবল ফুর্তির ফিকির খুঁজছে। তা, তোর প্রাণে যদি অত ফুর্তি, তো তোর বৌকে [illegible] যত খুশি আমোদ আহ্লাদ করগে যা না বাপু, কে মানা করছে? বাড়িশুদ্ধু পাঁচঘর ভাড়াটের বৌ-ঝিদের কানে ফুসমন্তর দিয়ে দিয়ে তাদের নাচানো কেন?

ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজছিস, মাজ। ওটা দরকার। মুখে গন্ধ-টন্ধ থাকলে নতুন বৌ কাছে ঘেঁষতে দেবে না। কিন্তু তা বলে কোমরে অমন দামী টার্কিশ তোয়ালে জড়িয়েছিস কেন? তুই ব্যাটা ফ্যাকটরীর লেবার, না ম্যানেজার? হুঃ। হোক একটা দুটো কাচ্চা-বাচ্চা, এত রস কোথায় থাকে তখন দেখব।

আপনমনে গজগজ করতে করতে সুধাংশু বারান্দায় উঠে এল। রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় রেবাকে তাগাদা দিচ্ছিল, কি বউদি, রান্নার কদ্দুর? এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

রান্নাঘর থেকে রেবার গলা শুনল সুধাংশু, ডাল নামিয়েছি। এইবার শুধু ভাতটা হয়ে গেলেই হয়।

সুধাংশুকে দেখে তন্ময় বলল ইস, আপনি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুধাংশুদা? কখন চান-ফান করবেন বলুন তো? এরপর আপনি কি আর টাইমলি রেডি হতে পারবেন? এমনিতেই যা একখানা লেট-লতিফ আপনি!

কথার ঢঙ দ্যাখো ছোঁড়ার। শুনলেই হাড় পিত্তি জ্বলে যায়। যেমনি কথাবার্তা, তেমনি উদ্ধত বে-পরোয়া চালচলন। গত বছর চাকরিটা পাওয়ার পর থেকেই ছোঁড়া যেন ধরাকে সরা দেখছে। ফিটবাবুটি সেজে আছেন চব্বিশঘণ্টা। একরকম ফি মাসেই নতুন প্যাণ্ট নতুন জামা কেনা হচ্ছে। বুট জুতো আছে একজোড়া কিন্তু তাতে বাবুর হয় না, হালে আবার একজোড়া স্যাম্পসনও কিনেছে। আর পছন্দের ছিরিও তেমনি। আঁটোসাটো সরু চোঙা প্যাণ্ট, নানারঙের চিত্তির বিচিত্তির করা জামা। মাথায় গাড়িবারান্দা মার্কা চুল, ইয়া বড়ো গালপাট্টা জুলপি। অথচ বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান ও, কত কষ্ট করে ওর মা ওকে মানুষ করেছে। অবশ্য তন্ময় যে বখে যাচ্ছে সেটা ওর মা বিমলা বোঝে না। দিনের মধ্যে একবার না একবার ওর প্রশংসা করতে না পারলে বিমলার যেন ভাতই হজম হয় না। আর শুধু বিমলা কেন, তার ঘরের মানুষ রেবা পর্যন্ত তন্ময় ঠাকুরপো বলতে অজ্ঞান। তার কাছেও তন্ময়ের খুঁত ধরে কথাটি বলবার জো নেই।

– আর দেরী করবেন না সুধাংশুদা, চান করতে যান এবার। আমিও চট করে সেলুন থেকে ঘুরে আসি।

একখানা হিন্দী ফিল্মের চলতি গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তন্ময় বাইরের দিকে এগোয়।

একটু পরে চান সেরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ননীবালা বারান্দায় উঠে আসে। রান্নাঘরের ভেতর থেকেই রেবা বলে, ওমা, এর মধ্যে তোমার চান হয়ে গেল পিসি?

– হ্যাঁ সেরে ফেললুম। বুড়ো মানুষ, পরে তোদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতে পারব না।

ননীবালা ভীষণ শীত-কাতুরে। দুপুরের আগে গায়ে জল দেওয়া তার ধাতে নেই। তাকে এই অসময়ে চান করে আসতে দেখে সুধাংশুর মনে কেমন খটকা লাগে। সে একটু অবাক হয়ে শুধোয়, পিসিও যাবে নাকি?

কথাটা রেবাকে জিজ্ঞেস করলেও উত্তরটা ননীবালাই দেয়। মাড়ি বের করে হেসে বলে, হ্যাঁ বাবা। শুনলুম, কি না কি শাদা বাঘ এয়েচে। তা ভাবলুম বয়েস হয়েছে, কবে আছি কবে নেই। তবু ভগমানের সৃষ্টিটা দেখে যাই।

ননীবালার মাড়ি বের-করা দন্তহীন হাসিটা সুধাংশুর অসহ্য লাগে। কিন্তু পিসিকে কিছু বলবার জো নেই, সোহাগের ভাইঝি রেবা অমনি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠবে। অগত্যা বিরক্তি চাপবার জন্যে ঘরের ভেতর ঢুকে যায় সুধাংশু। খানিক পরে গায়ের গেঞ্জিটা ছেড়ে গামছা কাঁধে ফেলে স্নানের জন্য তৈরী হয় সে।

বাথরুমে ঢুকে চান করবার সময় পশ্চিমের ঘরের ভাড়াটে সুনীতি মাসির গলার ঝংকার শুনতে পেল সুধাংশু।—হেঁপো রুগীর সখ কত! বারান্দা থেকে কলতলা অব্দি যাওয়ার মুরোদ নেই, বলে কিনা আমিও চিড়িয়াখানায় যাবো। বুঝলি লীলা, তোর বাপ ভাবে আমি কিছু বুঝি না। আসলে নিজে তো যেতে পারবে না জানে, তাই আমার যাওয়ায় বাগড়া দিচ্ছে। কেন জানিস? সেরেফ হিংসে। আমি কোথাও যাচ্ছি দেখলে হিংসেয় ওর গা চিড়বিড় করে।

উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় কি বললেন সুধাংশু শুনতে পেল না। শোনবার আশাও অবশ্য করা যায় না। দীর্ঘকাল হাঁপানীতে ভুগে ভুগে দেহের সঙ্গে সঙ্গে গলার জোরও কমে গেছে মৃত্যুঞ্জয়ের। বেশির ভাগ সময়েই ওঁর গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না, একটা ফ্যাসফেসে আওয়াজ হয় শুধু। গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে ফের সুনীতির চাপা শাসানি কানে এল সুধাংশুর, পবিত্রর ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে যাচ্ছি। খুব সাবধান, মটকা মেরে বিছানায় পড়ে থেকো না আবার। লক্ষ্য রাখবে যেন বেড়াল-টেড়াল না ঢোকে। ছুটির দিন ওভারটাইম খেটে এসে ছেলেটা যদি দেখে ভাত বেড়ালের পেটে গেছে, তাহলে আর উপায় রাখব না কিন্তু।

সাজগোজ করতে রেবা আজ অনেকক্ষণ সময় নেয়। সুধাংশু রীতিমতো বিরক্ত বোধ করছিল, কিন্তু প্রসাধন শেষ করে রেবা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন সুধাংশুরও কেমন ঘোর লেগে যায় যেন। রেবার গায়ের রঙ এমনিতেই ফর্সা, ফিরোজা নীল রঙের শাড়ি-ব্লাউজে সেই রঙ এখন ফেটে পড়ছে। ধবধবে সাদা নিটোল ঘাড় ছুঁয়ে থাকা কালো চুলের খোঁপা, কাজল-টানা চোখের বাহার, পাতলা শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে রেবার উচ্ছল যৌবনের স্পষ্ট আভাস সুধাংশুকে ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ চঞ্চল করে তুলছিল।

ঘরে ঢুকে রেবাকে দেখে তন্ময়ও থ। সুধাংশুর ঘোর যেন ওর চোখেও লেগে যায়। চোখ বড় বড় করে তন্ময় সুধাংশুকে বলে, বৌদিকে একবার ভাল করে দেখুন সুধাংশুদা। ঠিক যেন একেবারে ফিল্মের হিরোইন। তন্ময়ের তারিফ শুনে রেবার ফর্সা মুখটা চকিতে লাল হয়ে ওঠে।

রাস্তায় বেরোবার পর সমস্ত দলটার প্রত্যেকটি মানুষের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে সুধাংশু বলল, তপু, মানা, লালমোহনবাবু এরা কই?

রেবা বলল, ওরা যাবে না।

—কেন? সবাই যাচ্ছে আর—

—আঃ কি মুস্কিল। বিরক্ত গলায় রেবা বলল, ওরা যাবে কি করে? লালমোহনবাবুদের কোম্পানীতে লক আউট না?

বাসে সারাটা পথ সুধাংশু ঠায় দাঁড়িয়ে। মাছি গলাতে পায় না বাসে এমন ভিড়। তবু ওরই মধ্যে বলাই কোন এক ফাঁকে টুপ করে বসার জায়গা ম্যানেজ করে ফেলেছে। আশেপাশে কদাচিৎ দু-একটা সীট যে খালি না হয়েছে এমন না, কিন্তু সুধাংশু উদ্যোগ করবার আগেই অন্য কর্মিৎকর্মা যাত্রীরা চট করে সেগুলো দখল করে ফেলেছে। একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সুধাংশুর পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল এবং চিড়িয়াখানায় ঢোকবার সময় সুধাংশু রীতিমতো ক্লান্তি বোধ করছিল। এখনো সারাটা দিন পড়ে আছে সামনে, চিড়িয়াখানার তাবৎ জীবজন্তু দেখতে কত দীর্ঘ সময় যে এখনো হেঁটে বেড়াতে হবে অথচ এখুনি এত তাড়াতাড়িই যেন সুধাংশুর দেহের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। আসন্ন শারীরিক কষ্টের কথা ভেবে সুধাংশু বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

চিড়িয়াখানার ভেতরে পা দিয়েই সুনীতি ছেলেকে সাবধান করল, সব সময় দিদিদের হাত ধরে থাকিস বাচ্চু, না হলে হারিয়ে যাবি কিন্তু।

কষ্টের মধ্যেও সুধাংশুর হাসি পেল। বাচ্চুর জন্যে না, সুনীতির ভয়টা আসলে তার মেয়েদের জন্যে। লীলার বয়েস সাতাশ —ছবির পঁচিশ। কারোরই বিয়ে হয়নি। দু বোনের রঙই কালোর দিকে, ছিরি-ছাঁদও আহা মরি কিছু নয়। তার ওপর টাকা-পয়সারও যোগাড় নেই। একা পবিত্রর রোজগারে অতবড় সংসারটা চলছে। কাজেই মেয়েদের বিয়ে-থার কোন ব্যবস্থা হয়ে উঠছে না। অগত্যা বাধ্য হয়েই সুনীতি যুবতী মেয়েদুটোকে চোখে চোখে রাখে। অসাবধান হলে পাছে মেয়েরা কোন কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে বসে সেই ভয়ে সুনীতি সর্বদাই তটস্থ।

ইদানীং বিয়ের পর থেকেই বলাই বেশ দিলদরিয়া হয়ে উঠেছে। আজ এক প্যাকেট দামী সিগারেট কিনেছে সে। প্রসন্ন মেজাজে প্যাকেটটা খুলে একটা সিগারেট সুধাংশুকে দিতে দিতে বলাই বলল, আগে কোন্‌দিকে যাবেন?

সুধাংশু বা অন্য কেউ কিছু বলবার আগে তন্ময় বলে উঠল, একদিকে গেলেই হল। তবে সাদা বাঘ আগে নয়, একদম পরে। ওটা হবে আমাদের লাস্ট আইটেম।

অতঃপর দলটা এগোতে থাকল। সামান্য অগোছালভাবে। কেউ সামনে, কেউ পিছনে।

এক সময় জাল দিয়ে ঘেরা ময়ূরের দলের সামনে এসে পৌঁছল ওরা। পেখম তোলা ময়ূর দেখে রুমকি ছুটে এগিয়ে যায় সেদিকে।

– এখানে জাল দিয়ে রেখেছে কেন বাবা? রুমকি অনুযোগ করল। রুমকির ছেলেমানুষি প্রশ্নের উত্তরে অল্প হেসে সুধাংশু বলল, জাল না দিয়ে কি ওদের রাখা যায়? যদি ওরা চলে যায় বা কেউ নিয়ে যায় ওদের?

রুমকি আর কিছু বলল না। যেন সুধাংশুর কথাগুলোর তাৎপর্য ও বুঝতে পেরেছে সেইভাবে মাথাটা একটু নেড়ে ও ময়ূর দেখতে নিবিষ্ট হয়ে পড়ল।

তন্ময় আর রেবা সামান্য পিছিয়ে পড়েছিল। কী একটা দেখছে যেন ওরা। দলের বাকি সবাই অবশ্য জাল-ঘেরা ময়ূরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

আসতে আসতে থেমে পড়ে তন্ময় আঙুল দিয়ে কিছু একটার দিকে রেবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কী সেটা, এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ওদের দিকে দেখতে দেখতে ছবি হঠাৎ বলে উঠল, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে রেবা বউদিকে! তন্ময়কেও বেশ লাগছে। যাই বলিস দিদি, পাশাপাশি দুজনকে খুব ম্যাচ করেছে কিন্তু।

এই সময় সুধাংশুর দিকে চোখ পড়তে ছবি ফের বলল, আপনি রাগ করুন আর যাই করুন সুধাংশুদা, রেবা বউদির সঙ্গে আপনাকে একদম মানাচ্ছে না। তার ওপর যা বিচ্ছিরি একগাল দাড়ি রেখেছেন আপনি!

বোনের কথায় লীলা রীতিমতো অপ্রস্তুত বোধ করে। ছবিকে ধমক দেয় সে, তুই থামতো ছবি, ভীষণ বাচাল হয়েছিস তুই আজকাল। তারপর সুধাংশুর দিকে চেয়ে মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না সুধাংশুদা। ও ওইরকমই। ওকে তো আপনি জানেন।

জানে বৈকি। ছবি যে রীতিমতো প্রগলভা সুধাংশুর তা অজানা নয়। একই মায়ের পেটের সন্তান অথচ দু বোনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। লীলা একটু ধীর-স্থির-চাপা স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু ছবি একেবারে বিপরীত। চপলতায় প্রগলভতায় ছবির জুড়ি মেলা ভার। কথায় কোন রাখ-ঢাক নেই। কোনো কথা মনে এলে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করেই দুম করে বলে ফেলে। ছবির স্বভাবটা জানা থাকার দরুণই ভেতরে ভেতরে আহত বোধ করলেও সুধাংশু রেগে উঠতে পারে না। লীলার কথা শুনে অপ্রতিভ হেসে সামান্য অন্যমনস্কতার সঙ্গে দাড়িভর্তি গালে হাত বুলোয়।

জলহস্তী দেখবার সময় সুনীতি একটা বড়ো রকমের ঝামেলা বাধিয়ে ফেলেছিল প্রায়। জলহস্তী দেখার ছুতোয় পাঁচিলের ধারে লীলা ও ছবির গা-ঘেঁষে গোটাচারেক তরুণ বয়সী ছেলে হুড়োহুড়ি করছিল। ব্যাপারটা নজরে পড়তে রাগে সুনীতির আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, একটি ছেলের জামার পিঠের দিকটা খামচে ধরে সে চেঁচিয়ে ওঠে, অসভ্য বদমাইস, সরো শিগগির, সরে যাও এখান থেকে।

চোখমুখ লাল করে ছেলেটি গম্ভীর গলায় বলে, গায়ে হাত দেবেন না। ভালো চান তো জামা ছেড়ে দিন।

সঙ্গী অন্য ছেলেরাও ঘুরে দাঁড়ায়। একজন বলে, আপনি ওকে গালাগাল দিচ্ছেন কেন?

—একশোবার দেব, হাজারবার দেব, সুনীতির গলা চড়তে লাগল, তোমরা আমার মেয়েদের গায়ে হাত দেবে আর আমি চুপ করে থাকব? যতসব ইতর ছোটলোক—

—মুখ সামলে কথা বলবেন। ছেলেটিও মারমুখো হয়ে উঠল। সুধাংশু একপাশে হতভম্বের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত তার গা কাঁপছিল। তার স্নায়ু ইদানীং সামান্য উত্তেজনার চাপও সহ্য করতে পারে না। এই সময় বলাই এসে পড়েছিল তাই বাঁচোয়া, না হলে শেষ-পর্যন্ত কী যে হোত বলা যায় না। বলাই যে মাথায় এত বুদ্ধি ধরে, এই ব্যাপারে তার পরিচয় পেয়ে সুধাংশু অবাক হয়ে যায়। অমন রুদ্র মূর্তিধারী চার-চারটে ছেলে-ছোকরাকে এককথায় বশ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ছেলেদের মধ্যে এক-জনের হাত ধরে এবং আরেকজনের পিঠে হাত রেখে সুনীতির কাছ থেকে খানিকটা সরিয়ে এনে বলাই যেভাবে ফিসফিস করে ওদের বোঝাল যে, ভদ্রমহিলার মাথায় একটু গোলমাল আছে এবং ওর কথায় তারা যেন কিছু মনে না করে, তাতে সুধাংশু মনে মনে বলাইর বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না। অবশ্য বলাইর কথাগুলো সুনীতির কানে যায়নি তাই রক্ষে। সে তখনো উত্তেজিতভাবে সমানে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বলাইর কৌশলটা এমন মোক্ষম যে ছেলেগুলো আর কিছু বলে না, সুনীতির মুখের দিকে কেমন একরকম করুণার চোখে তাকাতে তাকাতে অন্য দিকে চলে যায়।

আজ যে কী হয়েছে সকলের, রেবার রূপের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। ঝুঁকে কুমীর দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে বলাইও সুধাংশুকে বলল, দেখুন সুধাংশুদা, মানুষের চোখগুলো দেখুন, সব রেবাবৌদির দিকে। লোকের অবিশ্যি দোষ নেই, যা একখানা দেখাচ্ছে আজ বৌদিকে!

রেবার রূপের এত তারিফ বলাইর বৌ সন্ধ্যার ঠিক মনঃপূত হল না। অন্য পাশ থেকে সে ফস করে বলে উঠল, রংটা ফর্সা তো, যা পরে তাই মানিয়ে যায়। কটা রঙের ওই এক মস্ত সুবিধে, খুঁত থাকলেও লোকের চোখে পড়ে না।

বলাই সন্ধ্যাকে ঠাট্টা করে বলল, তোমার কিন্তু মুখ চোখ সুন্দর, শুধু রংটাই যা একটু ইয়ে।

বলাইর ঠাট্টার উত্তরে সন্ধ্যার দিক থেকে কিছু শোনা গেল না। সুধাংশু আড়চোখে চেয়ে দেখল সন্ধ্যার মুখ ভার।

রত্নাকি হাতীর পিঠে চড়বার আবদার করলে সুধাংশু রাজী হতে চায় না। মা-মরা মেয়েকে সে একটু বেশি সামলে-সুমলে রাখে। মেয়েসন্তান বলেই সুধাংশু রত্নাকির ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক। পড়ে গিয়ে দৈবাৎ হাত-পায়ের হাড়গোড় ভেঙে গেলে শেষে এই খুঁতো মেয়েকে নিয়ে সারা-জীবন দুর্ভোগ পোয়াতে হবে এই আশংকায় সুধাংশু রত্নাকির হাতী চড়বার ইচ্ছেটাকে আমল না দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু রত্নাকি নাছোড়বান্দা। বায়না জোরদার করায় জন্যে শেষপর্যন্ত সে কান্না জুড়ে দিল। রেবা বলল, তোমার সব তাতেই ভীষণ বাড়াবাড়ি। এত ছেলেমেয়ে চড়ছে, কেউ তো পড়ছে না। শুদ্ধ শুদ্ধ ওকে আটকাচ্ছ কেন?

এরপর কথা না বাড়িয়ে সুধাংশু রাজী হয়ে যায়। কান্না থামিয়ে রত্নাকিরও হেসে উঠতে দেরী হয় না।

হাতীর পিঠে চড়ার পর্বটা শেষ হতে বেশ কিছু সময় লাগে। এরপর দলটা ফের ভিন্ন দিকে চলতে শুরু করলে সুধাংশু হঠাৎ ভীষণ দুর্বল বোধ করতে থাকে। অনেকক্ষণ আগে থেকেই তার পা-দুটো টনটন করছিল, এখন সে টের পায় তার মাথাও ঘুরতে শুরু করেছে। বুকের মধ্যেও কেমন যেন ধড়ফড় করছে।

কাছেই প্রকান্ড একটা পাকুড় গাছ। সেই গাছের ছায়ার দিকে লোভীর মত তাকিয়ে সুধাংশু বলে, আমি আর চলতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে। একটু বসতে না পারলে এখুনি পড়ে যাব আমি।

ভুরু কুঁচকে বিরক্ত গলায় রেবা বলল, তখুনি জানতাম আমার কপালে সুখ সইবে না। কত কিছু দেখা বাকি, দিলে তো সব মাটি করে?

ক্লান্ত গলায় সুধাংশু বলল, আঃ হা, মাটি করবার কি আছে! তোমাদের তো মানা করছি না। তোমরা ঘুরেটুরে সব দেখ। আমি বরং গাছতলায় বসি।

জিভে চুকচুক আওয়াজ করে তন্ময় বলল, ইস, কত কিছু আপনি দেখতে পারলেন না সুধাংশুদা এমনকি সাদা বাঘও না।

সুধাংশু ততক্ষণে পাকুড় গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। সেইদিকে যেতে যেতে কষ্টে মুখ বিকৃত করে ননীবালা বলল, আমিও বসব। আর পারছিনে, কোমর ব্যথা করছে।

মেদবহুল ভারী শরীর সুনীতির। তারও রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। হাঁসফাঁস করতে করতে সে বলল, আমারও বড় বসতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমার কপালে কি আর বসা আছে? সোমত্ত মেয়ে-দুটোকে তো আর একা ছেড়ে দিতে পারিনে!

দলটার সঙ্গে সঙ্গে ছবি ও লীলাও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ভারী দেহটা নিয়ে থপথপ করতে করতে যতটা সম্ভব দ্রুত সুনীতি সেদিকে এগোয়।

পাকুড় গাছের ঠান্ডা ছায়ায় দুটি প্রাণী চুপচাপ বসে ঝিমোয়। অনেকক্ষণ।

মাঝে মাঝে অল্প বাতাস বইছিল। বারকয়েক হাই তুলে সুধাংশু আধশোয়া হয়ে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজল। গত রাতে ভাল ঘুম হয়নি, এখন গাছের ছায়ায় বাতাসের স্পর্শে ঘুমে তার চেতনা অবশ হয়ে আসছিল।

ননীবালা উসখুস করছিল। তার কথা বলার বাতিক, চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে সে ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠছিল। কিন্তু কথা বলে সুধাংশুর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে সাহস পাচ্ছিল না।

হঠাৎ রত্নাকির কান্নার আওয়াজ কানে আসতে সুধাংশুর ঘুমের ঘোরটা কেটে যায়। সোজা হয়ে বসে চোখ খুলতে সুধাংশু রত্নাকিকে একা একা কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়।

ঘুম-জড়ানো গলায় সুধাংশু জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, কাঁদছিস কেন?

কিছু না বলে রুমকি কাঁদতে থাকল।

—আঃ, কি হয়েছে বলবি তো? ফিরেই বা এলি কেন একা একা?

কান্না-জড়ানো গলায় থেমে থেমে রুমকি বলল, কি করব? মা নিল না যে!

—কেন? নিল না কেন, ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি? উত্তেজনায় বেশ খানিকটা গলা চড়ে যায় সুধাংশুর।

সুধাংশুর জিজ্ঞাসার জবাবে রুমকি কিছু বলতে পারে না, কাঁদতেই থাকে শুধু। কী ভেবে সুধাংশু আবার বলল, ও সুনীতি মাসি ছিল, বলাইরা ছিল, ওদের সঙ্গে থাকলি না কেন?

ঠোঁট ফুলিয়ে রুমকি বলল, বারে, ওদের পাব কোথায়? আমরা তো আলাদা ছিলুম। আমি মা আর তন্ময়কাকু।

সুধাংশুর কেমন খটকা লাগে। তন্ময়কে নিয়ে আলাদা ঘুরে বেড়ানোর পেছনে রেবার আসল মতলবটা কী? গোটা ব্যাপারটাই সুধাংশুর কী রকম যেন সন্দেহজনক মনে হয়। অনেক চেষ্টা করেও সে ঘটনাটাকে সহজভাবে নিতে পারে না।

সামান্য দূরে গাছপালার একটা ঘন সন্নিবেশের দিকে আঙুল দেখিয়ে রুমকি বলে, ঐ পর্যন্ত এসে মা আমাকে বলল, দ্যাখ ওইখানে তোর বাবা বসে আছে, এখন চলে যা ওর কাছে। তুই ছেলেমানুষ, আমাদের সঙ্গে অত হাঁটতে পারবি না।

কথা বলতে না পেরে ননীবালার পেট ফুলে উঠছিল। এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে সে বলল, কত বুঝিয়েছি, অমন করিসনি, ঘর সংসারের দিকে মন দে। তুই এয়োতি মেয়েমানুষ—তোর কি এখন আর অমন ধেই ধেই করে বেড়ানো ভালো দেখায়!

সুধাংশু চোখেমুখে বিরক্তি ফুটিয়ে ননীবালার দিকে তাকায়। কিন্তু ননীবালা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার বলে, যত নষ্টের গোড়া ওই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা, তোমাদের ওই তন্ময়। খালি রেবার সঙ্গে চব্বিশঘণ্টা গুজগুজ ফুসফুস।

ননীবালার কথাগুলো বিষাক্ত হুলের মত সুধাংশুর গায়ে ফুটছিল, আর সহ্য করতে না পেরে সে এবার ধমক লাগাল, আপনি থামুন তো, কান ঝালাপালা করে দিলেন একেবারে।

ধমক খেয়ে ননীবালা চুপসে যায়।

সূর্য পশ্চিমদিকে অনেকটা হেলে যাওয়ার পর সুনীতি লীলা ছবি সন্ধ্যাসহ গোটা দলটা ফিরে আসে। শুধু রেবা আর তন্ময়কে দেখা যায় না।

এসেই সুনীতি বলল, ওমা, রেবা ওরা এখনো আসেনি? কোথায় গেল বল দিকি লীলা? সাদা বাঘ দেখবার সময় ভিড়ের ভেতর কোথায় যে চলে গেল ওরা বুঝতেই পারলুম না।

সুধাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছবি বলল, সুধাংশুদার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে দ্যাখ দিদি।

লীলা কিছু বলবার আগে উদ্বিগ্ন গলায় সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, শুকোবারই কথা। হারিয়ে-ফারিয়ে গেল না তো শেষপর্যন্ত? আমার তো বাপু কেমন ভয় করছে।

—মা যে কী বলে না দিদি, খিলখিল করে হেসে উঠল ছবি, হারিয়ে যাবে কী, সঙ্গে তন্ময় রয়েছে না?

সুধাংশু চিন্তিতমুখে প্রত্যেকের দিকে তাকাচ্ছিল। প্রায় সকলেরই মুখে অল্প-বিস্তর চিন্তার ছায়া, কিন্তু ছবি ব্যাপারটায় আদৌ তেমন গুরুত্ব দিল না। সে বরং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফাজিল গলায় হাসতে হাসতে বলল, হারানো-ফারানো নয়, পালিয়ে গেল কিনা তাই দ্যাখো। কিছু বলা যায় না, বুঝলে? হয়তো সুধাংশুদার মতো বুড়ো বর পছন্দ না রেবা বউদির। আর তন্ময়ের সঙ্গে যা ভাব আজকাল!

সুনীতি চোখ পাকিয়ে ধমকায়, কী হচ্ছে ছবি? অসভ্য মেয়ে কোথাকার! এই কী তোর রঙ্গ-রসিকতার সময়? ছি-ছি।

মেয়েকে শাসন করলেও ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসিটা যে গোপন করতে পারে না সুনীতি, সুধাংশু তা লক্ষ্য করে। রাগে অপমানে তার মুখটা আরো কালো হয়ে যায়। ছবির কথাগুলো কি নিছকই একটা নির্দোষ রসিকতা? নাকি তন্ময়ের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে রেবা সত্যি সত্যিই বেশ বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে এবং বাড়িসুদ্ধ প্রায় সকলেই সেটা জেনে এখন শুধু একটা দুঃসাহসিক পরিণতি দেখবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে?

ননীবালা কিছু বলবার উদ্যোগ করছিল কিন্তু এই সময় রেবা ও তন্ময় এসে পড়তে সে থেমে যায়।

ছবি এগিয়ে গিয়ে রেবার একখানা হাত ধরে বলল, বাব্বাঃ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে বলো তো? এদিকে বেচারা সুধাংশুদা তোমার জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির। তুমি আসতে আর একটু দেরী করলে সুধাংশুদা বোধহয় ফেন্ট হয়ে যেত।

কুপিত কটাক্ষ হেনে সুধাংশুদাকে বিদ্ধ করতে করতে ঠোঁট বেঁকিয়ে রেবা বলল, আহা, ঢঙ!

ফেরার পথে কেউ বিশেষ কথা বলছিল না। সকলকেই বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। শুধু রেবার মুখে কষ্ট বা ক্লান্তির কোন ছাপ ছিল না। বেলা শেষের আলোয় তাকে বরং কেমন উৎসাহিত ও সজীব মনে হচ্ছিল।

রেবার তৃপ্ত ও প্রফুল্ল মুখ দেখতে দেখতে সুধাংশুর মাথায় আগুন চড়ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে সে নিজেকে সামলাল। রাস্তায় পাঁচজনের মধ্যে কিছু বলতে চায় না সুধাংশু। কিন্তু বাড়ি ফিরে একটা হেস্তনেস্ত না করে কিছুতেই সে ছাড়বে না আজ। রুমকিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে কী এমন অসুবিধে ছিল রেবার? তন্ময়কে নিয়ে আলাদা ঘোরবারই বা কি দরকার ছিল? একটা হাড়হাভাতে ছোঁড়ার সঙ্গে রোজ রোজ অত ঢলাঢলি কিসের, আজ তারও কৈফিয়ৎ চাইবে সুধাংশু।

এক সময় বলাই বলল, আপনার আসাটাই আজ নিষ্ফল হল সুধাংশুদা। শেষপর্যন্ত সাদা বাঘও দেখা হলো না আপনার। ক্লান্ত গলায় সুধাংশু বলল, যা বলেছ। এজন্যে আমারও একটা আপসোস রয়ে গেল।

বাড়ী পৌঁছতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। পরিশ্রান্ত ননীবালার যেন ঘরে ঢোকবারও তর সইছিল না, সে বারান্দার ওপরই বসে পড়ল। ননীবালার দেখাদেখি রুমকিও তার পাশে গিয়ে বসল।

চাবি রেবার কাছে ছিল। চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে সে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল তারপর কাপড় বদলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সুধাংশু ঘরে ঢুকে সটান একেবারে বিছানায়। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়বার পর কীভাবে সে রেবার কাছে রুমকির প্রসঙ্গটা তুলবে সেই কথা চিন্তা করছিল।

রেবা ইতিমধ্যে কাপড় বদলে একখানা আটপৌরে শাড়ি পরে নিয়েছে। দামী শাড়িটা সযত্নে ভাঁজ করতে করতে সে বলল, একখানা মোটে ভালো শাড়ি, কি মুস্কিল বলতো? সামনের রোববার বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাওয়ার কথা হচ্ছে, সেদিনও এই কাপড়টাই পরতে হবে। বিচ্ছিরি লাগে বাপু রোজ রোজ এক কাপড় পরতে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসল সুধাংশু। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, না, বোটানিক্যাল গার্ডেনে-ফার্ডেনে আমাদের যাওয়া হবে না।

—ইস্, হবে না বললেই হল? আমাদের বলে কথা হয়ে গেছে।

—অন্যের কথার নিকুচি করেছে, সুধাংশু গলা চড়িয়ে বলল, আমি যা বলব তাই হবে। আর কোথাও যাওয়া চলবে না। আমার হুকুম, ব্যস।

—তাহলে তুমিও শুনে রাখো, রেবার গলা দিয়ে যেন বিষ ঝরে পড়ল, তোমার হুকুম আমি মানব না, আমি যাবই। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

তীব্র উত্তেজনায় রেবা হাঁফাচ্ছিল। নিঃশ্বাসের তালে তালে তার বুকের দ্রুত ওঠানামায়, তার স্ফীত নাসারন্ধ্রে, তার ক্রুর ক্ষিপ্ত চাহনিতে ভীষণ এক হিংস্রতা ফুটে উঠছিল। রেবার বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল সুধাংশু। রীতিমতো ফুঁসছে রেবা। বাঘিনী যেন।

আজ সাদা বাঘ না দেখার জন্যে সুধাংশুর সামান্য আপসোস ছিল যেন। কিন্তু সুধাংশুর কেমন মনে হল, চৌত্রিশের একের বি পশুপতি হালদার ফার্স্ট বাই লেনের বাড়ীতে নয়, সে এখনো চিড়িয়াখানাতেই এক ক্রুদ্ধ বাঘিনীকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। এই চিড়িয়াখানাতেই আজীবন তাকে কাটাতে হবে ভেবে ভিতরে ভিতরে অসহায় ও বিষণ্ণ বোধ করতে করতে সুধাংশু এক অবোধ ও দুর্বল জন্তুর মতো শূন্য বোবা চোখে রেবার দিকে তাকিয়ে রইল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নির্বাসিতের ডায়েরী (২)

এই সব নির্বাসিত কয়েদীরা ফরাসী গায়নার এই বন্দী উপনিবেশে, আগমনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পশুরও অধম জীবন যাপনে বাধ্য হয়। তাদের পায়ে জুতো থাকে না, জামা, মোজা প্রভৃতি ইতি-মধ্যেই বিক্রি করা হয়ে গেছে। যা দু'চার ফ্রাঁ রোজকার হয়েছে তা একটি ছোট্ট এলু-মিনিয়ম নলের মধ্যে রেখে গুহ্যাভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখে কয়েদীরা। বাড়িতে চিঠি-পত্র খবে কমই দিতে পারা যায়। চারমাস লাগে চিঠির জবাব আসতে। কয়েদীদের জন্য কোনোরকম ধর্মীয় আচরণ পালন করার ব্যবস্থা নেই। যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাতে কয়েদীর অন্ততঃ শক্ত শরীর না হলে তার পক্ষে এ ধাক্কা সামলানো সহজ নয়। বেলবেনোর শরীর তেমন শক্ত নয়, তিনি দুর্বল কাজেই কদিন যে এই নির্বাসনী অত্যাচার সইবে তাই মনে মনে ভাবেন। এর পর বেলবেনেকে আরো অনেকের সঙ্গে ন্যুভো ক্যাম্পে পাঠানো হলো।

এইখানে পৌঁছানোর আট দিন পরে একটা জংগলের পথ দেখিয়ে দিয়ে একেবারে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল— সঙ্গে কেউ রইল না। পথে একদল অর্ধ-নগ্ন মানুষের সংগে দেখা হল, তাদের হাতে কুঠার। বেল-বেনোরা নতুন, এটা বুঝতে পেরে ওরা একটু থমকে দাঁড়ায়। তারপর জানা গেল ওরাও কয়েদী। গাছ কাটার কাজ শেষ হয়েছে এখন শিবিরে ফিরছে। তারপর ওরা আবার জংগলে ফিরে এসে প্রজাপতি ধরবে। প্রজাপতির বহুবর্ণ পাখা বাজারে বিক্রী করে কিছু পয়সা পাওয়া যায়।

বেলবেনো বলেছেন তাঁকে একরকম তালপাতা থেকে মাথার টুপির উপযুক্ত ১৯ মিটার তালপাতার চেটাইজাতীয় বস্তু বুনতে হত। ভোর হওয়ার আগে কাজ সুরু করে বেলা দশটা বাজার পূর্বেই কাজ শেষ করে জংগলের ভিতর গিয়ে নানারকম চিন্তা করতেন। ন্যুভো শিবিরে অনেক কয়েদী পালানোর বৃথা চেষ্টা করেছে ওলন্দাজ উপনিবেশের মধ্য দিয়ে নদী পার হয়ে—তাদের কাছ থেকে পথের কথা জানতেন বেলবেনো। তবে তারা সকলেই বলত পালানোর চেষ্টা নিছক মূর্খামি কারণ ধরা পড়তেই হবে।

বেলবেনোর সংগে জনৈক তরুণ কয়েদীর পরিচয় হয়, উভয়ের উদ্দেশ্য এক, দুজনের যা টাকাকড়ি ছিল তাই নিয়ে এবং যে সব তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন তার ওপর নির্ভর করে দুজনে একত্রে পালাবার ব্যবস্থা করলেন। একটি ভেলা বানানো হয়েছিল সেটি একটি জংগলের ভিতর লুকিয়ে রাখা ছিল। স্রোতের টানে ভেসে চলল সেই ভেলা। কয়েক ঘন্টা বিশ্বাস-ঘাতক স্রোতের ওপর ভরসা করে ভেসে ওলন্দাজ তীরে ভেলায় এসে পৌঁছালেন, সেখান থেকে আলবিনা মাত্র কয়েক মিটার দূরে। কিন্তু ভুল করে তাঁরা এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়লেন সেখানে একদল ক্যারিব-ইন্ডিয়ান তাঁদের ওপর চড়াও হল। ধরে নিয়ে গেল ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষর কাছে আর তারা ওঁদের ফরাসীদের হাতে সমর্পণ করল। ফরাসীরা আবার বদ্ধ-কুঠুরিতে আটক করে রাখল।

সাঁ লরে-তে চারটি এইরকম দন্ডশালা আছে—যেখানে শাস্তিদানের ব্যবস্থা উত্তম। প্রায় ৪৫০জন কয়েদীকে এখানে আটক রাখা হয়। আমাদের শিবিরের চল্লিশজন কয়েদীর মধ্যে বেশীর ভাগই পলায়নের অপরাধে ডাচ গায়েনা বা বৃটিশ গায়েনা থেকে পাকড়াও করে এখানে আনা হয়েছে। মাত্র কয়েকজনের কোমরে লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত এক টুকরো কাপড় আছে। প্রচন্ড গরম আবহাওয়া। রাতের বেলায় হাত-পা লোহার বেড়িতে আঁটা থাকে। মাথা উঁচু করে বসে ঘুমাতে হয়। অসহ্য দুর্গন্ধ, নোংরা পরিবেশ, দুঃসহ গরম, কর্মহীন জীবন এবং বাড়তি খাদ্য বা নেশা করার জন্য তামাক ইত্যাদির অভাবে এইসব মানুষ-গুলির মেজাজ অতিশয় রুক্ষ এবং কর্কশ। কোনো নতুন কয়েদী এলে তার কাছে কিছু পয়সাকড়ি আছে জানলে তাকে মেরে ধরে সেই পয়সা কেড়ে নেওয়া হয়। বেলবেনোর শাস্তি হয়েছিল মাত্র ষাট দিনের, তারপর তাঁকে আবার ন্যুভো শিবিরে পাঠানো হল। এরপর আরও একবার দন্ডভোগের পর সাঁ লরে-তে এক হাসপাতাল কর্মী হিসেবে কাজ করতে দেওয়া হল বেলবেনোকে। সেখানে প্রথম কিছু পয়সা রোজগার করার সুবিধা পাওয়া গেল। একটা বাদাম গাছ ছিল হাসপাতালের উঠানে, সেই বাদাম পেড়ে নিয়ে একটি টিনের পাত্রে সেঁকে নিয়ে ২ সাউ-এর (ফরাসী পয়সা) বিনিময়ে কুড়িটি বাদাম বিক্রি হতে লাগল। এই জাতীয় নানারকম উপায় উদ্ভাবন করে যেসব কয়েদী হাসপাতালে কাজ পেত তারা কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারতো। এর নাম 'দেবরাইল' বা উপরি। এই ভাবে কিছু জমিয়ে জামা কাপড় কেনার মত অর্থ সঞ্চয় করে বেলবেনো আবার পালাবার উদ্যোগ করলেন।

এইবার তার বিবরণ অতিশয় চমকপ্রদ।

ইতিমধ্যে বড়দিন এসে গেল। খ্রিস-মাসের আগের রাত্রে সবাই হট্টগোলে মত্ত, পাহারাদার সবাই খ্রিসমাসের উৎসব নিয়ে গোলমাল হৈ চৈ করছে সেই সময়ে ন জনের একটি দল জংগলের এক নিঃশব্দ খাঁড়িতে স্বহস্তে প্রস্তুত নৌকায় পলায়নের উদ্দেশ্যে চেপে বসল। পুরাতন পাজামার ছিন্ন অংশ জোড়াতালি দিয়ে নৌকার পাল বানানো হয়েছিল। নৌকায় কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য আগেভাগে রাখা ছিল, পাইখানার একটা পিপা চুরি করে এনে তাতে পানীয় জল রাখা হয়েছিল, দুর্গন্ধ নষ্ট করার জন্য সেটা চারদিন জলে ভিজানো ছিল। তাতে আলকাতরা মাখিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া সত্ত্বেও নোংরা গন্ধ যায় নি। অতি অল্প সময়েই অতলান্তিকের মোহানায় গিয়ে তারা পড়ল—নৌকা সামলানো দায়। সবাই তখন বাসুক-কে চেপে ধরল, সে বলেছিল আমি নৌ-চালনার কাজ জানি। এখন সে বলল আমি কিছুই জানি না—বলল আমায় ক্ষমা করো। আমি লোভে পড়ে মিথ্যা বলেছি। শিবির ত্যাগের ন'ঘন্টার মধ্যে সব খাবার-দাবার নষ্ট হয়ে গেল। নৌকাটাও ডুবিয়ে যায়-যায় এমন সময় ভাগ্যক্রমে একটা চড়ায় গিয়ে নৌকা ঠেকল। মাটিতে পা দিতেই দলের একজন নাম তার মার্সাই, বাসককে বলল—এই বেলা চোখের সামনে থেকে দূর হও, নইলে খুন করবো। ছোরা বার করল—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে। আর সবাই হয়ত বাসককে ক্ষমা করত। কিন্তু তখন সকলেরই অবস্থা কাহিল। বাসক সেই উন্মুক্ত ছুরির দিকে তাকিয়ে ম্লান মুখে মাথা হেঁট করে চলে গেল। পরের দিন সকালে বাসক কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল—চারদিক জলে ভাসছে, কোথায় যাবো? মার্সাই ওর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল তারপর নিঃশব্দে ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দিল—বাসকের মৃতদেহটা মাটিতে পড়ে রইল।

তিনদিন এলোমেলোভাবে জলে-কাদায় ঘোরার পর সবাই স্থির করল না এইবার না হয় ফ্রেঞ্চ গায়নায় ফিরে যাওয়া যাক। সেই জলকাদা ভেঙে অতি কষ্টে সবাই চলছে। হঠাৎ দেখা গেল রবার্ট দলে নেই। মার্সাই প্রশ্ন করে রবার্ট কই? জিপসি বলল—বোধহয় পিছিয়ে পড়েছে। জিপসির একটা পা আবার কাঠের—সে স্বভাবতই গম্ভীর। রবার্ট তবু এলো না, তখন মার্সাই নিজেই

গেল দেখতে। মাসাঁই অনেক দূরে গিয়ে রবার্ট-এর মৃতদেহ দেখতে গেল— দেহটা তখনও গরম। জঙ্গলের গাছ-পালার নীচে চাপা দেওয়া। মাসাঁই ফিরে এসে বলল —রবার্ট-এর দেখা পাওয়া গেল না। জিপ্সি বলল—আহা, লোকটা আমার বন্ধু ছিল। মাসাঁই জবাব দিল না। সহসা জিপসির পিছনে পৌঁছে তার গলায় সজোরে একটা ধারালো কুড়ুল বসিয়ে দিল। জিপ্সি হতভম্বের দৃষ্টিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বেলবেনো লিখেছেন এই ঘটনার প্রতিটি খুঁটিনাটি আজো আমার স্মরণে আছে।

মাসাঁই-এর ভাই দেদে বলল—ওর একটাই ত ঠাণ্ডা, ওটা রোস্ট করলে কি হয়? মাসাঁই তৎক্ষণাৎ বলল—বেটা পশু। পশুর মাংস খেতে আর বাধা কি!

সবাই তাই অনুমোদন করল এবং তৎক্ষণাৎ জিপসির পা-খানা কেটে রোস্ট চাপানো হল, তার আধ ঘণ্টা পরে জিপসির লিভার—সব চেয়ে যে কথা উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে জিপসির কাঠের পা-টা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হল।

বেলবেনো লিখেছেন—এর পর সবাই সেই রাঁধা মাংস পরমানন্দে খেতে বসল, আমিও খেলাম—কারণ তাদের বিরূপতা অর্জন করে আমি একঘরে হয়ে থাকতে চাই না।

সেই রাতে কারো মুখে কোনো কথা নেই। বোধহয় বীভৎস ঘটনাবলীর স্মৃতির দংশনে সবাই জর্জরিত হয়ে পড়েছিল।

বেলবেনো এইভাবে আরো সব বীভৎস ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি সাঁ যোশেফে নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন যাপন করেছেন—কয়েদীরা এর নাম দিয়েছে 'লা গিলোটিন সেসে'—শুখনো গিলোটিন, এখানে চব্বিশ ঘণ্টা দিনের মধ্যে তেইশ ঘণ্টা থাকতে হয়—সেই সময় কিছু করার নেই শুধু বসে সাগর গর্জন শোনো, নয়ত আশ-পাশের কুঠুরির উন্মাদের প্রকাশ।

গভর্ণর সিয়াড়ুস খুব চেষ্টা করেছিলেন অবস্থার উন্নতি সাধনে। তিনি চলে যাওয়ার পর আবার নির্জন কারাবাস, আবার কয়েদীজীবন। তিন বছর পরে মুক্তি দেওয়া হল বেলবেনোকে। মুক্তি অর্থাৎ মুক্ত কয়েদী, খানিকটা বেওয়ারিশ কুকুরের মত। আশ্রয়হীন অন্নহীন পথকুকুরের জীবন। কোনোরকমে প্রজাপতি ধরে তার পালক বিক্রি করে অন্ন সংস্থান করতে হয়েছে। এর পরবর্তী কাল অবশ্য কিছু ভালো এবং নানা বিপর্যয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বেলবেনো পালাতে পেরেছিলেন।

নির্বাসিত জীবনের এমন বীভৎস কাহিনী আর চোখে পড়ে নি। ফরাসী শাস্তি দানের বিচিত্র রীতিও চমকপ্রদ। সম্প্রতি নাকি এই অমানুষিক অত্যাচারের কিছু সংস্কার হয়েছে। —অভয়ঙ্কর

DRY GUILLOTINE : By RENE BELBENOIT : Published by : SPHERE BOOKS : LONDON.

সাহিত্যের খবর

বিরল সৌভাগ্য

সাহিত্যে দর্শনে অথবা বিজ্ঞানে আজকাল ডকটরেট ডিগ্রি পাওয়া বিশেষ ধরনের বৃহৎ ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু দূর বিদেশ থেকে তা একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে পাওয়া এবং সেই ডিগ্রি পাঁচ হাজারেরও অধিক গুণী জ্ঞানী সুধী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে বিশেষ সম্মানিত জনের হাত থেকে পাওয়া সত্যিই বিরল ঘটনা।

এই অতিবিরল সম্মানের অধিকারী হয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রিডার ডকটর নিমাইসাধন বসু। এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে সম্প্রতি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ব্রিটেনের রাণীমাতা স্বয়ং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেট (সাহিত্য) ডিগ্রিতে ডকটর বসুকে বিভূষিত করেছেন।

ডকটর বসু এখন লন্ডনে। তিনি ইতিমধ্যেই লন্ডন ও সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারগুলিতে ভাষণ দান করেছেন। হ্যাডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশীয় ইনস্টিটিউটের সেমিনারে ভাষণ দানের জন্য এবং আধুনিক এশীয় চর্চা সম্পর্কীয় আসন্ন তৃতীয় ইউরোপীয় কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্যেও ডকটর বসু আমন্ত্রিত হয়েছেন।

রাণীমাতা ডক্টর বসুকে ডকটরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করছেন।

রামমোহন দ্বিশতজন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান

রাজা রামমোহন রায়-এর জন্ম দিবস ২২শে মে তারিখে রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরে দ্বিশতবার্ষিকী কমিটি এবং রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ের যুগ্ম উদ্যোগে মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভানুষ্ঠানের প্রারম্ভে সকালে কয়েক শত বালিকার শঙ্খধ্বনিসহ প্রভাত ফেরী বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। সকালের অনুষ্ঠানে এক বিরাট সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। বৈকালীন সভায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-উপাচার্য শ্রীশশীভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-রেজিস্ট্রার শ্রীসত্যেন্দ্র-মোহন চট্টোপাধ্যায়, কলেজসমূহের পরি-দর্শক শ্রীআর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ-রায়, ইতিহাস বিভাগ-এর রীডার শ্রীঅমূল্য ভূষণ সেন। রামমোহন জাতীয় কমিটির সদস্য শ্রীশান্তিমোহন রায় স্বাগত ভাষণ দান করেন এবং দ্বিশতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক শ্রীবাসুদেব বসু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শোভাযাত্রায় যোগদান করে নিবেদিতা আদর্শ সমিতি, রাধানগর ব্যায়াম সমিতি, আনন্দময়ী স্পোর্টিং ক্লাব।

ঐদিন কলিকাতায় সকাল ৭টায় প্রভাত ফেরী সহকারে জাতীয় যুব সঙ্ঘের ব্যাণ্ড-বাদ্য, শ্রীবিদ্যানিকেতনের ছাত্রীদের শঙ্খধ্বনি সহ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বালক-বালিকা ও মহিলাদের একটি শোভাযাত্রা গোয়াবাগান সি আই টি পার্কে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথে আমহার্স্ট স্ট্রীট, রামমোহন বাসভবন, বিবেকানন্দ বাসভবন, বিদ্যাসাগর বাসভবন, জগদীশচন্দ্র বাসভবন, ফেডারেশন হল পরি-ক্রমা অন্তে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডস্থ রামমোহনের আদি বসত বাটীতে উপস্থিত হলে বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র রাম-মোহনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীধীরাজ বসু, শ্রীবিভূতি চক্রবর্তী রাম-মোহনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীভাস্কর ভট্টাচার্য ও অভ্যুদয় সঙ্ঘ। এইদিন সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় ইনস্টিটিউট হলে বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক সভা উদ্বোধনের পর রামমোহনের একমাত্র বংশধর শ্রীশচীপতি রায় দুইশত প্রদীপ প্রজ্বালনের পর রামমোহনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ সত্যেন্দ্র-নাথ বসু, সর্বশ্রী ধীরাজ বসু, বাসুদেব বসু, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। অভিযাত্রী সঙ্ঘ, ২য় কলিঃ বয়েজ স্কাউটস এসোঃ শোভাযাত্রায় যোগদান করেন।

২৩শে মে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতায় পরিষদ ভবনে সভায় সভা-পতিত্ব করেন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রামমোহনের সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্লেষণমূলক ভাষণ দেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীধীরাজ বসু, স্বাগত জানান অধ্যাপক মদনমোহন কুমার। অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন, 'বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বেদান্তের মাধ্যমে মানুষের মনে গতিবেগ সঞ্চারের জন্য, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রামমোহন চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব তিনিই প্রথম সংস্কৃত উপনিষদ সরল ভাষায় রচনা করে অপূর্ব চিন্তাশীল মননকে [illegible] ডঃ [illegible]

বলেন, তিনি প্রেম ও ক্ষেমঃ এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন, বৈরাগ্যের পথে না গিয়েও যে ব্রহ্মচিন্তা করা যায় তা দেখিয়ে-ছেন। সর্বশ্রী বলদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীভাস্কর ভট্টাচার্য ও মিতা দত্তের সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

২৪শে মে বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন। শ্রীধীরাজ বসুর স্বাগত জ্ঞাপনের পর ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী শ্রীসমর সরকার রাম-মোহন এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন, রামমোহন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, বর্তমান ভারতের চিন্তাধারা রামমোহনের প্রভাবিত। প্রধান অতিথি বলেন, রামমোহন ছিলেন বেদান্তবাদী, তিনি চেয়েছিলেন হিন্দুরা বেদান্তে ফিরে যাক।

২৫শে মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাম-মোহন লাইব্রেরীর সহযোগিতায় লাইব্রেরী হলে শ্রীধীরাজ বসুর পৌরোহিত্যে শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন এবং 'রামমোহনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা' এই বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রীঅমিয় দত্ত। স্বাগত জানান শ্রীমনীন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীভাস্কর ভট্টাচার্য এবং ভারত সরকারের সৌজন্যে শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। ধন্যবাদ প্রদান করেন শ্রীরঘুনাথ বসু।

২৬শে মে শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতা প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ময়দান টেন্টে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ। প্রধান অতিথি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু প্রস্তাব করেন যে, প্রফুল্লচন্দ্র রোড এবং আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ রামমোহনের বসতবাড়ী দুটি পঃ বঃ সরকার গ্রহণ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা বিষয়ের পঠনের ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করার জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে সরকারের নিকট প্রেরণ করা হোক। কমিটির সভাপতি শ্রীধীরাজ বসু উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সংবাদপত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে রামমোহনের অবদানের বিষয় স্মরণ করেন। ডঃ সরোজেন্দ্র রায় সাংবাদিক রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী অলোকা সেন, শ্রীমতী শান্তি চট্টোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ। স্বাগত ভাষণ দান করেন প্রেস ক্লাব সম্পাদক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী। এই সাথে তিনি সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার কথা বিশদরূপে আলোচনা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ।

২৭শে মে শনিবার বৌবাজার শান্তি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য বিষয় থাকে 'বাংলা সাহিত্যের উপর রাম-মোহনের প্রভাব।' ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। বহুবাজার মিলন চক্রের বেদগান হয়। ডঃ চন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন, রামমোহনের বৈশিষ্ট্য ছিল— বাংলাভাষার মধ্যে ধ্রুপদী ভাবের অবতারণা। সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে তিনি নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। শ্রীরঘুনাথ বসু বলেন, রামমোহন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। রামমোহন ভাষায় ও সাহিত্যে এনেছিলেন লালিত্য, ছড়িয়ে দিয়েছিলেন উদারভাব। ডঃ সরোজেন্দ্র রায় বলেন, রামমোহন সৃষ্টি করলেন প্রকাশের উপযোগী মহামূল্য ভাব-সম্পদ, গভীর তত্ত্বকে বোধগম্য করলেন সাধারণ পাঠকের, তিনি নতুন কাজে বাংলা-ভাষাকে নতুন রূপ দিয়ে ব্যবহার করলেন।

২৮শে মে মহাজাতি সদনে বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীভাস্কর ভট্টাচার্যের রামমোহন প্রশস্তি সংগীতের পর 'সমাজ সংস্কার ও নারী প্রগতিতে রামমোহন' এই আলোচনায় ডঃ মুখোপাধ্যায় সে যুগের নারী সমাজের অসহায় ও নির্যাতিত অবস্থা এবং নারীজাতির উন্নতিকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, সমাজকে গ্লানিমুক্ত করার প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা বড় অবদান। সভাপতি শ্রীমিত্র বলেন, সতীদাহ প্রথা, কুলীনদের বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাগুলি নিবারণ-কল্পে তিনি আজীবন সংগ্রামরত ছিলেন। বিধবাদের সাহায্যকল্পে অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, জাতিভেদ কলঙ্কের অবসান, অসবর্ণ বিবাহে সমর্থন বিষয়ে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। তাঁর মত প্রগতিবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তি পৃথিবীতে বেশী জন্মগ্রহণ করেন না। সর্বশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার রামমোহন নাটকের হৃদয়গ্রাহী অভিনয়সহ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

জিগীষা (৮ম সংকলন)—সম্পাদক ঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় ও স্বজিত ভাদুড়ী। ৩৭/এ, ডাঃ দেওদার রাহমান রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫। পঞ্চাশ পয়সা।

ইদানীং পত্রিকা খুললেই, একটা করে আক্রমণাত্মক লেখা পড়ার সুযোগ মেলে। তরুণ কবিরা পূর্বজদের বোধহয় সইতে পারছেন না। জিগীষার এই সংকলনেও অনুরূপ একটি লেখা চোখে পড়ল। ভালোই লাগছে। কবিতা লিখেছেন অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অলোক সরকার, রাণা চট্টোপাধ্যায়, মানিক চক্রবর্তী, কৃষ্ণেন্দু হাজরা, সুনীল মজুমদার এবং আরো অনেকে। একটি নিবন্ধে তপন রায় যাটের কবিদের সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে মনে হয়, লেখক খুবই বিজ্ঞ।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। ২৩ ।।

সুরেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা ক্ষীণ আশা ধরে ছিল যে, হয়ত এমন একটা কিছু ঘটবে, যাতে এই বিয়ের ভারটা তার কাঁধ থেকে নেমে গিয়ে অন্যের ওপর পড়ে। এর মধ্যে হয়ত তেমন কোন আত্মীয়স্বজন এসে যাবে নিমাইদার। চাই কি পিসীরও সুবুদ্ধি হতে পারে কিছু।

কিন্তু কিছুই ঘটল না সে রকম। নিজের একটা অসুখ বিসুখও করল না। সে-ই শুকনো মুখে ওকেই সব যোগাড়যন্ত্র করে সবাইকে গুছিয়ে ডেকে বর নিয়ে রওনা হতে হল এক সময়। যত দিন এগিয়ে আসছিল তত সেই চাপা-দেওয়ালের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা ভাবটা বেড়েই যাচ্ছিল, তত অসহায়বোধ বাড়ছিল—কিন্তু তাতে শরীরটা এমন ভাঙল না যাতে এধার থেকে অব্যাহতি পায়।

শুধু এই ঝঞ্ঝাট বা পরিশ্রমই নয়, আরও কিছু।

যেন একটা অজ্ঞাত আশংকা কী একটা বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। অকারণ, অবর্ণনীয় অস্বস্তিবোধ। অথচ এসব কথা কাউকে বলা যায় না, বললেও কেউ এটাকে অব্যাহতি দেবার মতো যথেষ্ট কারণ বলে মনে করবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে।

যাই হোক, শেষ অবধি অবশ্য অত দারিদ্র্যের বিয়ে হল না, বিয়েটা বিয়ের মতোই মনে হল। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী—সব মিলিয়ে ষাটজনের বেশী নয় অবশ্য—খাওয়াবার ভার অবিনাশবাবুর মনিব সেই ষোড়শীবাবুই নিয়েছিলেন। তিনি একটা হারও দিয়েছিলেন কনেকে, তাঁর বাড়ি থেকেও আর কারা মিলে ব্রোঞ্জের ওপর সোনা বাঁধানো চুড়িও দিয়েছিল ছগাছা। এছাড়া, কম দামের হলেও একটা বেনারসীর ব্যবস্থাও হয়েছিল কোথা থেকে, হয়ত অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কোন আত্মীয় দিয়ে থাকবেন। সুতরাং বিয়ে করতে বসে খুব একটা ভিক্ষে দুঃখুর বিয়ে বলে মনে হয়নি নিমাইয়ের।

ষোড়শীবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গেই দেখাশুনো তদ্বির তদারক করলেন কিন্তু এমনই ভাগ্য ঠিক সম্প্রদানের সময়টা থাকতে পারলেন না; তাঁর নাকি শরীর খারাপ হয়ে পড়ল হঠাৎ। কি রকম খারাপ, কি হয়েছে কেউ ভাল রকম বলতে পারল না। একজন বলল জ্বর, আর একজন বলল মাথা ধরেছে। আর এক ভদ্রলোক চুপি চুপি বললেন—কন্যা যাত্রীদের একজন কি ষোড়শীবাবুদের আত্মীয় তা ভাল বোঝা গেল না—'আরে মশাই আসল কথা ভোচকানির মতো কিছু হয়েছে। সকাল থেকে কিছু মুখে দেয়নি, ঠায় উপোস দিয়ে এইসব করছে তো! আজ তো দু'তিন দিন থেকেই বলতে গেলে উপোস চলেছে। ...শরীর খারাপ হবে না! তার আর অপরাধ কি বলুন!'

এই বলে তিনি ডান চোখটার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী করলেন।

'উপোস কেন?' সুরেন বুঝতে পারে না কথাটা। চোখের এই বিশেষ ভঙ্গীটাও না, 'ও'র তো আর নান্দীমুখ করার কথা নয়।'

ভদ্রলোক গলাটা আরও নামান, 'আপনি তো মশাই জোয়ান আজকালকার ছেলে, বুঝতে পারলেন না?... মেয়েটার ওপর যে বড্ড টান ছেল। বলি তার জন্যেই তো চাকরির নাম করে বাড়িতে এনে রাখা আর গুষ্টিবগ্‌গে পোষা। বয়স এখনও পঞ্চাশও হয়নি, আর ঐ তো সাড্‌ডোল সাজোয়ান চেহারা, এতটুকু কোথাও টসকায়নি—ঘি দুধ খেয়ে স্বাস্থ্য যা রেখেছে, দেখলে চাল্লিশও মনে হয় না। বলি সে একটা অল্প-বয়সী ফুটফুটে ছুঁড়িকে নিজের মেয়ের মতো দেখবে—তা তো আর হয় না, বললে কি হবে! সে কথা ও'র গিন্নীও বিশ্বেস করে না। ...কৈ, তাকে দেখছেন? তার বাড়িই তো কাজ বলতে গেলে। সেই প্রথমেই একবার মাত্তর এসে দাঁইড়েছিল—ধম্মডাক দেবার মতো করে—তারপর সেই যে উবে গেছে—আর কেউ টিকি দেখেছে তার? বলি, তার ভয়েই তো, গিন্নী যে একেবারে দশভুজো চন্ডী, খান্ডারণী—নইলে বাবুটি আমার সোনায় মুড়ে দিত এক গা গয়না দিয়ে। আর তাই বা কেন, তাকে বাঘের মতো ভয় করে বলেই না—নইলে হাতছাড়া করবে কেন? আপনাদের কি সাধ্যি তার গর্তে ঢুকে ওকে নিয়ে যান। ...বৌটোরও যে হয়েছে বয়েস অল্প, মরবার মতো কোন রোগ অসুখও নেই, নইলে কিছুদিন পরে জিইয়ে রাখত এমন করে দানপত্তর লিখে দিত না। ...হরিবোল, হরিবোল। ...যাক গে যাক দাদা, অনেক কথা বলে ফেললুম, কারুক্কে বলবেন না এসব কথা, কে কি ভাববে। আমার পাগলের খ্যাল, যা মনে এল তাই বললুম। এর কি দাম বলুন? বলি কজে মানবে? ...হরিবোল, হরিবোল, মা তারা, তুমিই রক্ষা করো মা। ...আমরা মশাই খাইদাই কাঁসি বাজাই—রগড়ের কি ধার ধারি?... এসেছি, একপাত খেয়ে চলে যাবো। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকারটা কি?

এই বলে আবারও এক চোখ টিপে একটা কদর্য ইঙ্গিত করে সেখান থেকে চলে গেলেন লোকটি।

এত অল্প লোকের মধ্যে বরপক্ষীয় কে কে—চেনার কোন অসুবিধা নেই; বিশেষ সুরেশই বরকর্তা। তার সঙ্গেই অবিনাশবাবু কথাবার্তা কইছেন, অনুমতি নিচ্ছেন, এখানে কুশণ্ডিকা হবে, সে ব্যবস্থাও

সুরেনই করল—কী আনতে হবে তার জন্যে টাকা ধরে দিল—সুতরাং বরপক্ষের লোক বিশেষ বরকর্তা জেনেই লোকটি বিষ উদ্গার করে গেলেন। হয় এ'দের কোন আত্মীয় নয় ষোড়শীবাবুদের। ভাবে মনে হয় অবিনাশবাবুদেরই কেউ হবেন, আগে ভাংচি দেবার সুযোগ পাননি, সেই অবশ্য করণীয় কাজটা এখন সেরে নিলেন।

মনটা দমে গেল সুরেনের। কথাটার মধ্যে কতটা সত্যি আছে তা কে জানে। তবে অসম্ভব কিছুই নয়। ষোড়শীবাবুর আকর্ষণের যথেষ্টই কারণ আছে। মেয়েটার দিক থেকে তার কোন প্রশ্রয় আছে কিনা? ...একবার নিমাইয়ের দিকে চেয়ে দেখল : কালো রোগাটে চেহারা, চোয়াড়ে চোয়াড়ে; গাল চড়ানো, দুটো রগের কাছেও ভেতরে ঢুকে-যাওয়া, টেপা মতো। একেবারেই শ্রীহীন। শুধু এ মেয়ে কেন—কোন ভদ্র ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে এর জীবনসঙ্গিনী হচ্ছে, ভাবতেও কষ্ট লাগে।...

যাকগে, এসব চিন্তা এখন করে কোন লাভ নেই। ...লোকটাই বিষম বদ। ...জেনে-শুনে এই অনিষ্টটি করে গেল। বিশ্বাস করুক বা না করুক—কাঁটার মতো কথাটা মনে গেঁথে রইলই।... অশান্তি আর অস্বস্তি।

তবে আর কারও কোন অসুবিধা নেই। খাওয়া দাওয়া ভাল হয়েছে, বরযাত্রীরা খুশী। একটা বড় ঘরে ঢালাও ফরাশ পেতে বিছানার ব্যবস্থাও হয়েছে, বালিশও এসেছে কতকগুলো—খুব সম্ভব বিভিন্ন বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে, কারণ কোন বালিশের ওয়াড় ধবধব করছে ফরসা, কোনটা আধময়লা, কোনটা একেবারেই তেলচিটচিটে—মশারি অবশ্য এত লোককে দেওয়া সম্ভব নয়, তবু বরযাত্রীরা অপ্রসন্ন নন। কেবল নিমাইয়ের দেশ থেকে দুই জ্ঞাতিভাই এসেছিল—তারা কিছু কিছু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে লাগল। সুরেনের মনে হল তারা একটা ঝগড়া বাধাবারই চেষ্টা করছে, তবে সে দলে আর কেউ যোগ না দেওয়ায় মজাটা তেমন জমল না।

এটা স্বাভাবিক। ঐ রকমই শিক্ষাদীক্ষা ওদের। বরযাত্রী হয়ে এলে কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে হয়, ঝগড়া বাধাতে হয়—এই ওরা জানে। এটা একটা নিয়মের মতো হয়ে গেছে। তা ছাড়াও, এখানে ঈর্ষারও পর্যাপ্ত কারণ আছে। নিমাইয়ের এমন সাড়ম্বরে বিয়ে হবে—সুন্দরী বৌ—এ ওরা কল্পনাও করেনি কখনও। জ্যাঠাইয়ের বাড়ি অন্নদাস হয়ে পড়ে আছে, চাকরের মতো খাটিয়ে নেয়, তারও বেশী—'উঠতে লাথি বসতে ঝাঁটা' মেলে সেখানে মজুরী—এই শুনে এসেছে। বিশেষ গোর গিয়ে আরও বেশী করে বাড়িয়ে রঙ ফলিয়ে বলেছে, নইলে তার চলে আসার কারণটা দেখানো যায় না।... সেই নিমাইয়ের এমন বৌ।

তার ওপর, সম্প্রদায়ের পালা চুকে গেলে যখন সুরেন পকেট থেকে চুড়ি বালা নেকলেস বার করে অবিনাশবাবুর হাতে দিয়ে বলল কনেকে পরিয়ে দিতে তখন তো ক্ষেপে যাবার অবস্থা হবেই।

খুশী নিমাইও। খুশী বললে কিছু বলা হয় না। সুন্দরী শুনেছিল বটে কিন্তু সত্যিই তার বৌ যে এত সুন্দরী হবে, হতে পারে তা কখনও কল্পনাও করেনি। তার ওপর যে রকম গরীব লোক, ভিক্ষে দুঃখু করে বিয়ে দিচ্ছে শুনেছিল—তাতে বর-যাত্রীদের আদর আপ্যায়ন সম্বন্ধেও দুশ্চিন্তা ছিল একটা। এর পর না জানি কত টিটকিরি শুনতে হবে। এখন দেখল যেমন আর পাঁচজনের বিয়ে হয়—ওদের মতো ঘরে, তেমনিই হচ্ছে। বেনারসী শাড়িও দিয়েছে, গহনাও চলনসই—একেবারে 'নেড়াবুঁচো' নয়—দানসামগ্রী, ওর আংটি, জোড়—রেশমের জোড় দিতে পারেনি, ভাল সুতীরই ধুতি চাদর দিয়েছে—বরযাত্রীদের খাওয়া দাওয় সবই সাধারণ আর পাঁচটা বিয়ের মতোই হয়েছে। এ আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না—নিমাইয়ের এমন অবস্থা। এক ফাঁকে আড়ালে পেয়ে সুরেনকে বলেই ফেলল, 'ভাইরে, কী বলব তুই বয়সে অনেক ছোট, নইলে পায়ের ধুলো নিতুম। ...তুই আমার বাবার কাজ করলি। অবিশ্যি তাও আমার বাবা বেঁচে থাকলেও এ বে দিতে পারত না, ঐ পাড়া-ঘর থেকে একটা খেঁদীবুঁচিকেলটি এনে গছিয়ে দিত!'

পরের দিন সকালে অবশ্য ষোড়শীবাবু দেখা দিলেন আবার। শরীর খারাপের জন্যে থাকতে পারেন নি, সে জন্যে এরা কিছু মনে করলেন কিনা জানতে চাইলেন। তবে সুরেনের মনে হল মুখটা গম্ভীর তাঁর, দৃষ্টিও বিষণ্ণ। কিম্বা সবটাই কালকের কথাটা শোনার ফল—কে জানে।

কুশণ্ডিকা কাল রাত্রেই সারা হয়ে গিয়েছিল, সুরেন সকালে জলযোগের পরই চলে যেতে চাইল। ষোড়শীবাবুই ছাড়লেন না। বললেন, 'সব আয়োজন প্রস্তুত, একটু ঝোলভাত খেয়ে যান, নইলে আমাদের খুব দুঃখ হবে।'

বরযাত্রীরা অবশ্য বেশির ভাগই ভোর পাঁচটায় উঠে ছটার স্টীমার ধরে চলে গেছে। তাদের আপিস আছে। তারা একটু চাও পায়নি। সুরেন বলতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়েছে। অবিনাশবাবু খিঁচিয়ে উঠেছেন, 'এত রাত্তির চা কে করে দেবে? একি মামার বাড়ির আবদার নাকি?' অপ্রিয় পরি-স্থিতির ভয়ে সে কথা এদের আর বলল না সুরেন বলল, 'ও'রা বলছেন কিছুই তো যোগাড় নেই, অনেক দেরি হবে। উনুন না ধরলে—'

সে পয়সা দিয়ে দিল হিসেব করে, জাহাজ-ঘাটায় যদি পাওয়া যায় তো যেন কিনে খেয়ে নেয় তারা। আসলে—এই প্রথম, এ'দের অন্তঃপুরে ঢুকে দেখল সুরেন—অবিনাশবাবুদের ওখানে কিছুই হচ্ছে না, কোন যোগাড়ই নেই। সমস্ত ব্যবস্থাই—হয় ষোড়শীবাবু যেচে নিজের হাতে নিয়েছেন, নয়তো এ'রাই তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।...

তাড়া লাগানো সত্ত্বেও খাওয়া দাওয়া আশীর্বাদ সেরে রওনা হতে হতে তিনটে হয়ে গেল। তাও, পরে বারবেলা পড়বে তাই—এ'রা তাড়া করলেন একটু। সাড়ে তিনটের স্টীমার। বরকনের পাল্কী ঠিক ছিল, মালপত্র মুটের মাথায় গেল। মাল আর কি, কনের তোরংগতেই বাসনপত্র সব, মায় হেমন্তরা যা সামান্য, গায়ে-হলুদের তত্ত্ব করেছিল, কাপড়জামা, একপ্রস্থ বাসন ইত্যাদি তাও ধরে গেল। এ ছাড়া গাড়ু ঘড়া আসন প্রভৃতির একটা পুঁটুলি।

বিদায়ের আগে যখন হাতে হাতে সঁপে দেওয়া অর্থাৎ কান্নাকাটির পালা, তখনও আর ষোড়শীবাবুকে দেখা গেল না। তবে তিনি আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, দুপুর নাগাদ এক সময় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট কাগজের মোড়ক সুরেনের পকেটে ফেলে দিলেন। বললেন, 'মনে কিছু করবেন না ভাই—আমার হয়ে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। আমার বোধহয় কাল বৌভাতে যাওয়া ঘটে উঠবে না। আপনি আমার হয়ে এইটে যৌতুক করবেন—প্লীজ! এখন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, তাহলেই এরা চেঁচামেচি করবে—আপনি কাল কথাটা বলে দিয়ে দেবেন? কেমন?'

সৌজন্য প্রকাশের জন্য যতটুকু পীড়া-পীড়ি করা দরকার তা করল সুরেন—যাওয়ার জন্যে বিশেষ করে অনুরোধ করল, বলল, 'আমি কিন্তু আগে দেব না, আপনার জন্যে অপেক্ষা করব, আপনি গিয়ে নিজে হাতে দেবেন সেইটেই তো শোভন হবে। কনেও খুশী হবে তাতে। ...এ যেন একটা দায়-ঠেলা গোছের হচ্ছে না?'

'না না, কনে ঠিক বুঝবে যে—যেতে পারলে যেতুম। আচ্ছা, চেষ্টা করব।' এই বলে প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে গেলেন।

আর একটু আড়ালে এসে মোড়কটা খুলে দেখল খুব সরু একটা চেনে পাথর-বসানো লকেট, বেশির ভাগই লাল পাথর আর কুচো মুক্তো, লকেটের ভেতর দিকে, যেখানটা গায়ে লেগে থাকে তাতে খোদাই-করে নাম লেখা—'ষোড়শী'।

ফেরার সময় বরযাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। ধনুবাবুর ছেলে শেষরাত্রেই জাহাজ-ঘাটায় চলে এসেছিল, পূর্ণবাবুর ছেলেও তাই। তাদের ঐ মশায় ঐ রকম শয্যায় এইসব সঙ্গীদের সঙ্গে শোওয়া অভ্যেস নেই—বাইরে বসে বসে সিগারেট খেয়েই রাত কাটিয়েছে তারা, চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে—কেউ ওঠার আগেই—সুরেনকে বলে চলে এসেছে। আর যারা, বেশির ভাগই ছটায় স্টীমার ধরেছে। বাকী বরকনে, নিমাইয়ের জ্ঞাতিভাই দুজন, বিশ্বনাথবাবু, হেমন্তদের ভাড়াটেদের ছেলে একটি, পাশের বাড়ির একটি চোদ্দ পনেরো বছরের গোলগাল বোকা বোকা ছেলে আর সুরেন। পুরুত-নাপিত দশটার সময় চলে এসেছে। সুরেনের বড় পিসীর ছেলেরা এসেছিল

ওদের সঙ্গে—কিন্তু তারা থেকে গেল, পরের দিন কন্যাপক্ষর সঙ্গে আসবে।

কনের ভাইবোন কাউকে সঙ্গে দেবার কথা বলেছিল সুরেন কি ঝি একটি—যেমন দস্তুর—তাতেও অবিনাশবাবু ঝেঁঝে উঠেছেন, 'আমাদের কি ঝি রাখার অবস্থা যে ঝি দোব? বাবুদের ঝি দোব—সে বড়-লোকের ঝি কি বলবে এসে না বলবে—মাঝখান থেকে শতেক কথা উঠবে। আর ভাইবোন কাকে দোব বলুন—সে যাবার মতো কেউ নয়। আপনাদের মধ্যে গিয়ে কথাবার্তা ভাল বলতে পারবে না, ভয় পাবে। কাল বৌভাতে যাবে তারই কাপড়-জামা নেই—হয়ত কারও যাওয়াই হবে না।'

স্টীমারে উঠে বরকনেকে এক জায়গা-তেই বসিয়েছিল সুরেন, নিমাই খানিকটা পরে ওদিকে উঠে গেল। সম্ভবত বিড়ি খেতে। আর যারা—তারা সম্ভবত লজ্জাতেই দূরে দূরে রইল। বেচারী কনে-বৌ একা বসে—শুকনো মুখে। স্বভাবতই আসবার আগে যথেষ্ট কান্নাকাটি করেছে। সকাল থেকেই কাঁদছে তাও লক্ষ্য করেছে সুরেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, উদ্বেগে এবং বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার বেদনায়—চোখমুখ বসে গিয়েছে বেচারীর। আসবার সময় বমি করেছে একবার। যেটুকু যা সকালে ওরা খাইয়েছিল জোর করে, সবই উঠে গেছে। এখন এইভাবে সর্বপরিত্যক্ত গোছের একা পড়ে গিয়ে আরও যেন ভয় পেয়ে কেমন হয়ে পড়েছে বেচারী।

সুরেন এদিক ওদিক খুঁজে দেখল ওদিকের রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে নিমাই বিড়ি খাচ্ছে আর জাঠতুতো ভাই নিতাই-চরণের সঙ্গে গল্প করছে। কাছে গিয়ে বলল, 'এ কী করছেন নিমাইদা, বৌদি একা বসে রয়েছে। একটু কাছে থাকুন, গল্পগুজব করুন—'

'তুমি যাওনা ভাই, একটু কথাবার্তা বলো না! ...ওসব লেখাপড়া জানা মেয়ে, শহরে ছিল, তায় গান জানে—খাসা গাইলে কাল বাসরঘরে, আবার বড়লোক জমিদারের আওতায় গিয়ে পড়েছে—আমরা পাড়াগেঁয়ে ভূত, তায় মিস্তিরীর কাজ করি—কী বলব না বলব প্রথম থেকেই বিগড়ে যাবে। আমার তাই ভয়ই করছে একটু, সত্যি বলছি। তুমি যাও, একটু কথাবার্তা বলোগে। সত্যিই তো, একা পড়ে গেছে—আবার হয়ত কান্নাকাটি লাগাবে।'

তারপর আরও একটু গলা নিচু করে বললে, 'নামটা শুনেছ তো? একেবারে হাল ফ্যাসানের বিবি-বিবি নাম, মণিকা। আগে নাকি রেণুকা ছিল, কী নাকি পরশুরামের মায়ের নাম অপয়া বলে ষোড়শীবাবুরা পালটে মণিকা করে দিয়েছেন। নাম শুনেই তো পিলে চমকে গেছে। ...আমাদের বাড়ির যত বৌ এসেছে—এই জ্যাঠাইয়ের নামই যা শহুরে, আলফ্যাসানের। নইলে সবই ঠাকুর দেবতাদের নাম, কেবল বৌদির নামটাই যা—'

শেষ অবধি শোনার আর ধৈর্য রইল না, সেখান থেকে চলে এল সুরেন। যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। সে যত ঘনিষ্ঠতা এড়াতে চাইছে এদের সংসারের সঙ্গে, ততই যেন ভগবান ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন ঐ দিকে।

কিন্তু তবু, বৌটির মুখের দিকে চেয়ে—করুণ অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ে দূরে থাকতেও পারল না, কাছে গিয়ে বসতেই হল।

কী কথা কইবে খুঁজেই পায় না। কখনও এ ধরনের আলাপ শুরু করতে হয়নি ওকে। অনেক ভেবে, ইতস্তত করে বলল, 'আপনার শরীর এখন কেমন লাগছে বৌদি?'

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, মাথা নিচু করল শুধু। তবু সুরেনের মনে হল যে ওর সাহচর্যটা ভালই লাগল তার।

'খুব একা একা লাগছে, না? ভয় ভয় করছে একটু? —কোথায় যাবেন, কাদের মধ্যে—ভাবনা হচ্ছে?'

এবার ঈষৎ একটু ঘাড় নাড়ল মণিকা, সমর্থনসূচক।

'ঐ জন্যেই বলেছিলুম আবুইমশাইকে যে আপনার ভাইবোন কাউকে সঙ্গে দিতে, একেবারে সব অপরিচিত লোকদের সঙ্গে যাওয়া—'

'সে রকম কেউ নেই যে!' আস্তে আস্তে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ভাই বড্ড ভীতু, আর দুই বোনের পর ভাইতো, বিষম আবদেরে আর জেদী, ওকে কুটুমবাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। ছোট বোন খুকী এখনও বিছানায় ইয়ে করে ফেলে। সঙ্গে যাবার মতো এক আমার পরের যে বোন বাসন্তী—তাকে বলেছিলাম, সে আসতে চাইল না, সে একটু ময়লা তো, বলে, 'হ্যাঁ, তুমি সুন্দর—তার সঙ্গে আমি এই কুচ্ছিত গিয়ে দাঁড়াই আর সকলে টিটকিরি দিক!' কোথাও যেতে চায় না ও আমার সঙ্গে! মাও পাঠাতে চাইলেন না, বড় হয়ে গেছে তো? চোদ্দ পনেরো হবে তা।'

সুরেন হেসে একটু তামাশার সুরে বলল, 'ও, আপনি যে সুন্দর দেখতে তা আপনি বেশ জানেন, অহঙ্কারও একটু আছে!'

'না না, তা কেন? বারে!' অপ্রতিভ হয়ে ওঠে মণিকা, একটু সহজও হয়, 'ও বলে তাই বলছি। আমি কি বলেছি আমি সুন্দর!'

'আপনার কি সে বিশ্বাস একটু নেই, সত্যি করে বলুন তো?'

দেখা গেল মেয়েটি বোকা নয় আদৌ। অনায়াসে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি আপনি করে কথা বলছেন কেন? বৌদিকে কেউ আপনি বলে?'

'বৌদিই বা দেওরকে আপনি বলছে কেন?' সুরেন হেসে জবাব দেয়।

'দেওর যে বয়সে বড়, সে তুমি বলতে শুরু না করলে বৌদি বলে কোন সাহসে!'

'ঠিক আছে। দুজনেই বলব এবার। কেমন তো?'

হেসে ঘাড় নাড়ে মণিকা।

'খুব মন কেমন করছে না? ভাই-বোনদের জন্যে?'

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ম্লান হয়ে ওঠে আবার। মাথা নিচু করে বলে, 'খুকীটা বড্ড ন্যাওটো আমার। মা তো সংসারের কাজ করে ওকে দেখতেই পারে না। আমিই মানুষ করেছি বলতে গেলে! কী যে করবে—! আসার সময় আছাড়ি পিছাড়ি করে কাঁদছিল, দেখলেন তো!'

'আবার!' ভুলটা বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটা পালটাবার পথ খুঁজছিল, এখন মণিকার এই ভুল পেয়ে বেঁচে গেল।

মণিকা তার মধ্যেই একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলল, 'এক-আধবার ভুল হবে বৈকি!'

'আচ্ছা, ষোড়শীবাবু আপনাকে খুব ভালবাসেন, না?'

একবার যেন, সুরেনের মনে হল, চকিতে একটা রক্তাভা খেলে গেল মণিকার সুগৌর কপোলের ওপর দিয়ে, একবার যেন একটু প্রস্ত দৃষ্টিতে এক লহমা দেখে নিল সুরেনের মুখটা—কথাটা কোন দিকে

যাচ্ছে বুঝতে চাইল—তারপর মাথা হেঁট করে সদ্যপ্রাপ্ত চুড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ষোড়শীবাবু আমাদের খুবই ভালবাসেন। খুব ভাল লোক উনি। উনি না থাকলে আমাদের বোধহয় উপোস করে মরতে হত।'

এরপর দুজনেই চুপ করে গেল কিছুক্ষণ। খুব আস্তে আস্তে চলছে স্টীমারটা। এতক্ষণে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাটে গিয়ে ভেড়বার কথা। ইঞ্জিনে কোন গোলমাল হয়েছে না গঙ্গায় কোথাও চড়ার ভয়,—এমনি কোন কারণেই গতি মন্থর হয়েছে। হু-হু করে দক্ষিণা বাতাস বইছে। একটু গরম হয়ে এসেছে বাতাস এরই মধ্যে—গঙ্গার ওপারে বাতাস দিলে শীত করার কথা, কিন্তু এখন আরাম লাগছে। দূরে কলকাতার বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে, হাইকোর্টের চুড়োটা, খিদিরপুরের ডকে জাহাজ বাঁধা। এদিকে ছোট ছোট গ্রাম, নিবিড় নারিকেল বন, মধ্যে মধ্যে ইটখোলার কাঁচা ইট শুকোচ্ছে নদীর পারে। চারিদিকে একটা শান্ত নিশ্চিন্ততার ভাব।

হঠাৎ নিমাই এসে পিছন দিকে দাঁড়াল।

'কী হল তোমরা সব চুপচাপ যে। ...তোমার বৌদি খাসা গান গায় হে সুরেন। শোন না একটা। কাল আমি তো শুনে—হাঁ। আমার হাতে পড়ে কি আর এসব—। শোন শোন। আমি থাকলে লজ্জা পাবে, আমি চলে যাচ্ছি। এই খোকা, তুমি এসে বসো না বৌদির কাছে। গাইতে টাইতে বলো না একটু।'

অভাবনীয় মূল্যবান জিনিস হাতে পেলে ছেলেরা যেমন সবাইকে তার সব গুণগুলো দেখাতে চায়—নিমাইয়েরও তেমনি মনের ভাব কতকটা।

'শুনেছি তো আপ—না মানে তুমি গান জানো, গাও না একটা।' অগত্যা সুরেন অনুরোধ করে।

লজ্জায় মাথাটা আরও ঝুঁকে আসে মণিকার। বলে, পরে শোনাব এখন, ওখানে গিয়ে।'

'সে তো শুনবই। এখন একটা হোক না।'

'এই সকলের সামনে—? অনেক লোক যে চারদিকে!'

'কাছাকাছি তো কেউ নেই। এমনিই এ সময়ে ভীড় থাকে না বিশেষ। এই স্টীমার গিয়ে যখন আবার ফিরবে তখন দেখবে ভীড়।'

নিমাইদের পাশের বাড়ির যে মোটা-সোটা ছেলেটি এসেছিল সে এবার কাছ ঘেঁষে বসে বললে, 'করো না বৌদি একটা গান। গুনগুন করেই গাও না।'

'কার কাছে গান শিখলে?' সুরেন আবার প্রশ্ন করে।

'কারও কাছেই না। কলকাতায় যে বাড়িতে ভাড়া থাকতুম, সেই বাড়িওলার মেয়ে গান শিখত মাস্টারের কাছে, আমি তাই শুনে শুনে শিখেছি—এক আধখানা। এখানে এসে ষোড়শীবাবুর গ্রামোফোন আছে—তা থেকেও তুলেছি দু চারটে গান। ঐ গোটা দশ বারো সব জড়িয়ে। শেখার মতো কিছু নয়। হার্মোনিয়মও বাজাতে জানি না।'

সেই ছেলেটি অসহিষ্ণু হয়ে উঠে তাগাদা করল, 'আবার সব বাজে কথা হচ্ছে। ও বৌদি, ধরো না একটা গান।'

'গাও না ভাই বৌদি' সুরেনও বলে, 'জাহাজ তো থেমে গেল দেখছি। কখন পৌঁছবে তার ঠিক নেই। ওখানে অনেক কাজ, সকাল করে ফেরা উচিত ছিল।'

সে চুপ করতে একটু চুপ করে থেকে গুন গুন করে গান ধরল একটা মণিকা,

'জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি,
ওকে নিল হরি, মরি মরি!

যার লাগি ফিরি একা একা
চাহি পিপাসিত, নাহি দেখা
তারি বাঁশী ওগো তারি বাঁশী
তারি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি—'

সাধারণ মিষ্টি গলা, তবে সুরজ্ঞান আছে—গান শুনলে সেটা বোঝা যায়। যত্ন করে শেখালে ভাল গাইয়ে হ'ত। ওখানেই কি হবে? পিসী হয়ত শেখাতে চাইবেন কিন্তু ছেলেপুলে হয়ে গেলে সংসার ঠেলে কি আর গান শেখা হবে?

গান কখন শেষ হয়ে গেছে তা হুঁশও ছিল না সুরেনের। গানটার সুর মনের মধ্যে কোথায় একটা যেন বিশেষ তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছে, গঙ্গার জলে অপরাহ্নের আলো, উদাস করা বাতাস আর এই বিরহ-করুণ সুর—সব মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা, গুমরে উঠছে, যার কোন অর্থ নেই, প্রত্যক্ষ কারণও নেই। কী পাওয়া হ'ল না জীবনে কি এল না, আসবেও না কখনও—এমনি অজ্ঞাত একটা অভাব বোধ!

একটু পরে মণিকাই প্রশ্ন করল, 'ভাল লাগল না, না?'

চমক ভেঙে উত্তর দিল সুরেন, না না, খুব ভাল লেগেছে—ভাল লেগেছে বলে তো সুরের মধ্যে অমন তলিয়ে গিয়েছিলুম। খুব ভাল লেগেছে।...আর একটা গাইবে?'

'এখন থাক ঠাকুরপো।' মিনতির সুরে বলে, 'মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

'তবে থাক থাক। ইস, আমারই ভাবা উচিত ছিল। যা ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, আর যা কান্নাকাটি।'

সেই ছেলেটি উঠে গেল ওদিকে, বিলম্বের কারণ জানতে। জাহাজটা প্রায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এখন আবার চলতে শুরু করেছে। তবে এখনও আস্তে আস্তে যাচ্ছে খুব।

একটু পরে অকারণেই খাপছাড়াভাবে মণিকা বলল 'এই গানটা ষোড়শীবাবু খুব শুনতে ভালবাসেন— আমার গলায়।'

বলেই যেন বুঝল যে কথাটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক—হঠাৎই অপ্রতিভভাবে চুপ করে গেল।

'ষোড়শীবাবু একটা জিনিস দিয়েছেন তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে? কি জিনিস?' নিমেষে যেন উদগ্রীব, কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে মণিকা।

'সেটা কাল দিতে বলেছেন, কনে সেজে যখন বসবে। কালই দেখো।'

সুরেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো বলে।

মণিকা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। অবসন্ন ক্লান্ত মুখটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে কিনা তা ঠিক বোঝা যায় না। খানিকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলে, 'তার মানে কাল আসবে না। আমাকে মিছে করে বললে, নিশ্চয় যাব।'

বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাটে স্টীমার এসে দাঁড়ায়। বহু লোক নেমে যায়—ওঠেও কিছু। এবার যাত্রা ওপারে—সামনে চাঁদপাল ঘাট। সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নামার জন্যে। নিমাইও এগিয়ে আসে, তবে তখনও পাশে বসে না।

(ক্রমশঃ)

আবার আসিব ফিরে

শঙ্কর সেনগুপ্ত

চক্রবৎ পরিবর্তনের পথে ঋতুগণ আসেন ও যান। ছয় ঋতু ও বারো মাসের আবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি কেবলই রূপ বদলায়, মানুষও। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে, অন্তরের ঘনিষ্ঠতায়। বাঙালী জীবনে ঋতুর ও প্রকৃতির প্রভাব অতি গভীর ও প্রচণ্ড। বাঙালী ঋতুবৈচিত্র্যকে জীবন প্রবাহের ধারা বলে মেনে নিয়েছে।

জনজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও ঋতুবলয়ের বিশেষ বিশেষ তিথি স্মরণ করার জন্য নানা উৎসব আচার ও অনুষ্ঠানের জন্ম। পুরাতন ও বিগতকে বিস্মৃত হয়ে নতুনকে বরণ, উৎসবের আনন্দে ক্ষয়-ক্ষতি লাভ লোকসানের হিসাব ভুলে গিয়ে নবীন সিদ্ধির হালখাতা মারফৎ নেওয়া হয় নতুনের ডাক। বৎসরের যাত্রাশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনটাকে ক্ষণিক বিশ্রাম দিতেই শুধু পরিকল্পিত নয় নববর্ষ, এতে মানের আরও একটা দিক প্রসারিত হয়, সে-দিকটি হচ্ছে অতীতের গ্লানি, ব্যর্থতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ধুয়ে মুছে ফেলে নতুন করে জীবন সুরু করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

উৎসবের সময় বেছে নেবার মধ্যে আছে মস্তিষ্কের ব্যবহার। শস্যসম্ভারে ফুলফলের প্রাচুর্যে প্রকৃতির রাজ্যে যখন উৎসাহের সমারোহ শুরু হয়ে যায় তখন থেকেই মানুষ একের পর এক উৎসবে মেতে ওঠে। বসন্ত ঋতুর শেষ আমেজ গায়ে মেখে শেষ ফোটা বকুলের গন্ধে বাঙালী নতুন বর্ষের বৈচিত্র্য উপভোগ করতে প্রতিবৎসর তৈরী হয় পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখের ফেলে আসা দিনটি মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তি। এই দিনে সূর্যের মেষ রাশিতে সংক্রমণ হয়। বর্ষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ পায়। প্রাত্যাহিক প্রয়োজনের বাইরে প্রমোদানুষ্ঠানে জাগ্রত হয় মৈত্রীভাবনা। মানুষ মানুষের আত্মার আত্মীয়ে পরিণত হয়ে সকলে সকলের তৃপ্তি বিধান করতে চেষ্টা করে। বৎসরের আরম্ভেই সুখশান্তি ও তৃপ্তিতে সম্বৎসর দিনাতিপাতের ইচ্ছায় প্রার্থনা জানানো হয়, প্রতিজ্ঞা নেওয়া হয়।

১।।

গ্রীষ্মের আগমনে একদিকে আমরা তাপাহত অন্যদিকে রসাপ্লুত। নতুন বৎসরে নতুন ধ্যানের সুরু। সমস্ত দ্বেষ-রেষারেষি পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করে সৌহার্দ ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির উজ্জ্বলতায় মেতে ওঠে বাঙালী বৈশাখের সূচনাতে। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে। গ্রীষ্ম ঋতুর দেবতা রুদ্র, অগ্নিময় তাঁর রূপ, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ধরিত্রী আকাশ একেবারে রিক্ত অঞ্জলি পেতে। পিপাসা আমার তৃষ্ণাতুর প্রায়, বিষণ্ণ মুখে রুদ্রদেবতার উপাসিকারা তারা তপস্যা করেন বর্ষা মঙ্গলের জন্য। তপস্যায় প্রীত রুদ্রের বরে রৌদ্রদীপ্ত আকাশ ছেয়ে ঝড় নেমে আসে মর্ত্যে। এই ঝড়ের প্রাক-মুহূর্তের রৌদ্রে পোড়া থমথমে দুপুরের কাঁচ সবুজ বৃক্ষপত্রের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। গ্রীষ্মের কাঠিন্যে মধ্য দিনে বন্ধ হয় পাখির গান, সূর্যতাপে গা পুড়ে যায়, বাতাস আতঙ্কের সৃষ্টি করে। খামারের গরু বৃক্ষছায়ায় গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়, কাজের ফাঁকে ছায়ায় বসে চাষী তামাক খায়। এরই মধ্যে ঈশান কোণ থেকে হাওয়া ঝড় ওঠে। বালির ঝড়, ধুলোর পাগলা ঢেউ মিলিয়ে যায় দিক থেকে দিগন্তরে। লোক-কবি গান গায়—'শিব তোর একি প্যাখম, বাতাস ভাকম ব্যালতলাতে', অঙ্গনে ললনা বিলাপ করে—'আইলেরে দারুন বৈশাখ ক্ষেতে পাকনা ধান, আমার সাধু নাই রে দ্যাশে কে কাটিব ধান।' তপোমগ্ন সন্ন্যাসীর সঙ্গে, রুদ্র-ভৈরবের সঙ্গে তুলনীয় গ্রীষ্ম। পৃথিবী হারায় তার কোমলতা, অবিরত স্বেদ-নিঃস্বরণ, স্নিগ্ধ ছায়াই তখন একমাত্র কাম্য। প্রকৃতি ক্রমে উদাসী হয়ে পড়ে। রুক্ষ উদাসী প্রকৃতির তাপ উত্তাপকে সহজেই উপেক্ষা করে লোকসমাজ তাদের কৃত্য করে যায়। গ্রীষ্মের আলো তীব্র মূর্তি নিয়ে জ্যৈষ্ঠের আবির্ভাব হয়। এ জ্যৈষ্ঠ কখনও রক্তচক্ষু ভীমাকার দৈত্য, কখনও কামার-শালার শত হাপরের আগুনে, কখনও মেঘ, কখনও মানিনী নায়িকার মত আকাশের মুখভার। কিন্তু লিচু আম জাম কাঁঠালের রসে ভরপুর, বেলা মল্লিকা গাঁদা চাঁপা ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা। মনব্যথী ললনা তখন মনবেদনা প্রকাশ করে—জ্যাট মাসে ডালিম গাছে হয় দ্যাকো কলি, তখন ক্যানো যান তিনি বাণিজ্যেতে চলি। গাছে ত অইল অসের ডালিম কাঁদবেন ধরে তারে, পাচিয়া পইরবে ডালিম তিনি না থাইকাল ঘরে, অনেক সময় শোনা যায়—'নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন, পন পোড়ে খরতর রবির কিরণ, শীতল চন্দন দিবো চামরের বায়, বিনোদ মন্দিরে থাকো না চলিহ রায়। নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাস নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে, পূরিল উদরনাথ পাকা আম্ররসে।। আকাশে গর্জায় মেঘ নাচায় ময়ূর, নবজলে মদমত্ত ডাকায় দাদুর।' কখনও বর্ষা আসে ভেঙে। নদী উত্তাল হয়। বাঁধ মাঠ খাল নালা বিল পুকুর একাকার হয়। তখনও বিরহিনীর করুণ স্বর—'সেই বা নারীর পতি আছে ঘরে রে খায় উদর ভইরে, আমার পতি নাই গো দ্যাশে আমার অঙ্গ তিতা রে'। প্রায়ই বর্ষা হয় না। দারুণ গ্রীষ্মের হাত থেকে উদ্ধার পেতে চাষের জমিতে জল জোগাতে তখন কৃষাণ মেয়েরা—বৌরা নাচে গান গায়—হ্যাসে লো হইল মল্লমালী, হাত পাও ধুইয়া কান্দাও পানি, ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি, বড় ভুঁইতে আছু পানি। মাঘমাসীর ঘরখানি পাথরের মাঝে, হেই বৃষ্টি আমলো ঝাঁকে ঝাঁকে।' এই ঋতুতে শুরু হয় বাঙালীর নববর্ষ। বৎসরের সর্বাধিক ব্রত-পার্বণাদিও অনুষ্ঠিত হয় এই ঋতুতে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বুদ্ধ পূর্ণিমা, মুসলমানদের ফতেয়াদোহাজ দাহাম, বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল, জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা, শিবের ব্রত, জল-পুতুল ব্রত, অরণ্যষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী প্রভৃতি অনুষ্ঠান সবই এ ঋতুর। কুমারী মেয়েরা শিবঠাকুরকে স্নান করাবার সময় বলে—'শিল শিলাটন শিলে বাটন শিল অঝুঝর ঝরে, স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব, 'গৌরী ওরা কী ব্রত করে?' নড়ে আশ নড়ে পাশ নড়ে সিংহাসন হরগৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন।' বলে—'এ ব্রত করলে কি হয়?' উত্তর—নির্ধনীর ধন হয়। সাবিত্রী-সমান স্বামী আদরিণী হয়।' অরণ্য ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠীতে একে একে ছেলে মেয়ে জামাই ও বাড়িশুদ্ধ সকলের গায়ে দুধার আঁটির জল ও পাখার বাতাস দিতে দিতে বলা হয়—'জ্যেষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পুজো বাট বাট বাট। ষষ্ঠীর বাটের আমেজ যেতে না যেতেই বর্ষা উঁকি দেয়।

২।।

নৈসর্গিক নিয়মে বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি হয়। শ্রাবনও আনে বর্ষণের দেবতা। বিদ্যুৎ হানে, বজ্র হানে, সকল অপূর্ণতার উপরে নামে বারি পরিপূর্ণ ধারায়। নবনীরদশ্যামশোভার প্লাবন ভাঙে বানে, ভাসায় বন্যায়। খাল বিল নদী নালা কানায় কানায় ভরে ওঠে। নদীতে নদীতে পণ্যসম্ভার নিয়ে নৌকা ছোটে। ধরিত্রীর বুকে নবতৃণদলে উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। ময়ূর নেচে ওঠে। সর্বত্র প্রাণের চাঞ্চল্য তাই 'জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্র কম্পন রাখিয়া, সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী। স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি। অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল, বন্দী হয়ে আছে; তারি শিখরে শিখরে পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে, অধরে, উরু পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়, বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায় ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ, নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ, যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত, সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার, সেবকের মত সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে, সযতনে; ছায়াখানি রক্তপদতলে, চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া; অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া' (রবীন্দ্রনাথ)। এই সময় নানা পালা-পার্বণও অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী নাগপঞ্চমী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ষা একদিকে আনে শান্তির পেলবতা, অন্য দিকে সে করে লণ্ডভণ্ড। এই বর্ষার সমাগমে 'পেলব দেবতা একটু ধারণ কর না বলে কত লোক আবেদন জানায়। গালাগালিও দেয় অনেকে যেমন দরিদ্র চাষী তার ফুটো ঘরে জল পড়ছে বলে, গ্রামের কাদা পথে ব্যাপারী হাঁটতে

পারছে না বলে সেও গালি দিচ্ছে, গালি দিচ্ছে তারা যারা বর্ষা চায় না। কিন্তু তবু সে তো পথ্যান করে হেসে হেসে নেচে নেচে ভূতলে নামে, তৃণ গাছপালা মাথা নেড়ে স্বাগত জানায় বর্ষাকে, নদী দোলে, ধান মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। চাষা বর্ষায় ভিজে কাক হয়, বেনে বউ আমসী ও আমসত্ব নিয়ে পালায়, যে পথে সুন্দরী বউ কলসী কাঁখে জল নিয়ে আসবে সে পথ পিছল করে রাখে, দম্পতির গৃহের ছাদ ফুটো করে টুঁ দেয় বর্ষা, ভরযুবতী হাঁটুর উপর কাপড় তুলে থপথপ করে জলে হাঁটে, কাপড় সামলাতে দিশেহারা বধূও ছেলের হাত ধরে জল ছিটিয়ে এগুচ্ছে প্যাচ প্যাচ কাদায় ডুবে হাঁপাচ্ছে কাজীসাহেব, ললনাস্পর্শে উদ্বেল হবার চেষ্টায় জলফিকরবাবুরা হি-হি করতে করতে গায়ে গা লাগাচ্ছে, পশুপক্ষী-রাও বরুণাহত। অন্ধকারে বর্ষার বিদ্যুৎ যখন পলকে পলকে ঝলসাতে থাকে তখন স্থাবর জঙ্গম উড়ে যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেঁপে ওঠে। আবার এই বর্ষা যখন লোহিত ভাস্করালোক বিহার করে এবং স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করে, জ্যোৎস্না পরিপ্লুত আকাশে মন্দ মন্দ পবনে আরোহণ করে, তখন সে মনোরম, সে সুন্দর। এই সুন্দরের আহ্বান জানায় পৃথিবীর মানুষ। 'হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ। কুর্বন কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য। ধুন্বন কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈর্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্‌মেঘ! এবার তুমি পুণ্যক্ষেত্রে এসেছ—ব্রহ্মার মন থেকে মেঘের সৃষ্টি, বৃষ্টির জল শুধু পবিত্র নয়, অনন্ত বিস্ময়ের আধার। ওগো ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাত মেঘ! তোমার বাতাস উৎপাদন দিয়ে দুলিয়ে দিও কল্পবৃক্ষের নবোদ্গত পল্লবগুলোকে। এই মেঘ কৈলাসের কোলে অলকাসুন্দরী। তার পরনে ধবধবে সাদা শাড়ী, উভয়ে বিগলিতবাস, অঙ্গের বসন গঙ্গাদুকূলে বিস্রস্ত, বিশ্লিষ্ট। হাওয়ার জোড়ে উড়ে যেতে গিয়ে দেহের চাপে একটু লেগে আছে মাত্র। অলোকাসুন্দরীর মাথায় কালো কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ রাশি রাশি কুঞ্চিত কেশদাম। মুক্তাসরে তার কবরী জড়ানো। শরতের প্রভাতে, বসন্তের সন্ধ্যায়, বর্ষার নিশীথে এই মেঘকে আমরা ভালবাসি, ভাবনার একাগ্রতায়, ধ্যানের প্রসন্নতায়, দুঃখের গভীরতায় সেই ভালবাসা সেই স্নেহ প্রেমরাশিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে গ্রহণের উগ্রতা নেই, দেহ সম্ভোগের কোন প্রশ্ন নেই, তুমি নেমে এসো, এসে শিথিল-বৃন্ত কুন্দ ফুলটিকে বাঁচিয়ে তোলো, তুমি করুণাময়, তুমি চুপ করে কাজ করে যাও, তোমার আশায় চাতক দীর্ঘ প্রতীক্ষায়, তোমার স্নিগ্ধ রূপে সবাই মুগ্ধ। তাই 'ওগো রুদ্র আকাশ নিথর বাতাস অনল হুতাশ ভরে, আজ বরষণলোভে বিনম্রধরণী সদা কামনা করে...ওগো বক্ষের মাঝে অক্ষ তোমার হান একবার বেগে, এই ক্ষীণ বাষ্পের দীন উচ্ছ্বাস পরিণত হোক মেঘে; ওগো বজ্র দেবতা বজ্র তো শুধু বক্ষের যন্ত্র নয়, ওযে বন্ধ্যাজনের সন্তাপ-হারী বন্ধনে করে ক্ষয়, ওযে মিলন ঘটায় কাঞ্চনডোরে ধরণী ও অম্বরে। তাই বন্ধ্যা ধরণী মরণ দোসর বজ্র কামনা করে। বর্ষা ব্যতীত কিছুই বাঁচতে পারে না। মানুষ, পশুপক্ষী, শাকসবজি বৃক্ষলতার জীবন দেবতা বর্ষা। এই বর্ষার দিনে বিরহিনী কাঁদে—'আষাঢ় গেল শাঙন আইল ম্যাঘের আঁরবাঁর, বিলের সাথে খেলা করে কোড়া আর কোঁড়ি। শাওনে সংক্রান্তি পূজা দ্যাশের লোকে পূজে, অভাগিনীর দুঃখের কথা কেহ নাহি বুঝে' অথবা 'আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস আইল আমার না ফুরাইল আশ, ভরা যৌবন লইয়া অভাগিনী করে হা-হুতাশ রে', শরতের সঙ্গে সঙ্গে হয় বর্ষার অবসান। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়ি ছাড়ি করেও ছাড়ে না। এই সময় আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। থাকে ঘন অন্ধকার।

৩।।

রাতির ঘন অন্ধকার রূপ। আকাশে চন্দ্র নেই তারকা নেই, প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্যন্ত নেই, আছে শব্দায়মান মেঘের গর্জন, জোনাকি আলো, 'একটু মৃদু আলো, ওসে দেখতে ভারি নূতন, ওরে কেমন লাগে ভাল, আয় জোনাকি বুকটি ভরে একটু নিয়ে আলো...আজ আঁধার রাতি বাদল সাথী চাঁদের ভাতি কালো। যেটুকু তোর দেবার আছে দিয়ে দে তুই আজ, ওসে তারার মত নাই বা হল তাতেই বা কি লাজ? ...থাক না তারা তপন শশী থাক না যত আলো, তাদের মোরা করবো পূজা তোরেই বাসবো ভাল'. (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) শরৎ মিলনের ঋতু। আনন্দময়ীর আগমন বার্তায় সোচ্চারিত শরৎ। শরতে যিনি আবির্ভূতা হন তিনি শারদীয় দুর্গা। তিনি আলোর আশীর্বাদ ভরে আনেন নীল আঁচলে—অন্নপূর্ণা তিনি তাঁর আশীর্বাদের ভারে সোনার ধানে ভরা সোনার তরীর গতি মন্থর। কি ধনী কি দরিদ্র সকলের কাছেই শরৎ আনন্দময়। 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুভার। জননী গো গাঁথবো তোমার গলায় মুক্তাহার। চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে, মালা হয়ে জড়িয়ে আছে তোমার বুকে শোভা পাবে দুখের অলংকার। ধনধান্য তোমার ধন কী করবে তা কও, দিতে চাও তো দিও আমায়, নিতে চাও তো লও।' এই শরৎ-এর রানী উমাকে উপলক্ষ করে বলা হয় আসবে আসবে ভালই ছিল এসেই যেন চলে গেল, সকল কথা বলাই হল না। যাওয়ার কথা শুনেই দেখো, ভাসছে যে দেশ চোখের জলে, উমার পানে চাইতে পারি না। বুক ফেটে যায় বিদায় দিতে, ছাড়তে কি মন চায় যে বল, মানেই জানি তবু মন মানে না।'

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজার কাল এই শরৎ। এই ঋতুকে পূজার ঋতুও বলা যায়। শরতের নির্মল মেঘশূন্য আকাশে বিহঙ্গের কলকূজনে শরৎলক্ষ্মীর সঙ্গে বঙ্গবাসী আনন্দে ফেটে পড়ে। বাড়ীতে বাড়ীতে বাজনা, ঢাক, ঢোল, শাঁখের মঙ্গলধ্বনি। জলে নৌকা বাইচ আকাশে ঘুড়ি, স্থলে নানাবিধ খেলা। সারা বাংলাদেশ জুড়ে আনন্দ, বাঙালীর প্রাণের উৎসব। অঙ্গনে ও প্রাঙ্গণে সর্বত্র আমোদ আহ্লাদ। অবশ্য, অঙ্গনে যখন আচারানুষ্ঠানের ছড়াছড়ি তখন ভাদ্রের রৌদ্র মাথায় করে কেটেছে কৃষকের দিন। তৃষ্ণায় তার ছাতি ফাটছে। তৃষ্ণা নিবারণে জলের বদলে অঞ্জলি ভরে পান করছে মাঠের কাদা-মাটি জল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় কৃষক বাড়ী ফিরতে সময় পাচ্ছে না। এটা চাষের সময়। সন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে মোটা লাল চালের বড় বড় ভাল নুন লংকা পিঁয়াজ দিয়ে খাবে। ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে দিন কাটাবে হয়ত গোয়াল ঘরের পাশেই। মশা লাগে না তার, যদিও অপরে এই মশা, ক্ষুদে মশার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নানা প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়। মশার কামড়ে আহত কবি মশাকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন 'মশা ক্ষুদে মশা, মশার কামড় খেয়ে আমার স্বর্গে যাবার দশা, মশারি তো মশার অরি, শুনেছি কাহিনী। দুসমনকে দোর খুলে দেয় পঞ্চম বাহিনী। একাই জনযুদ্ধ করি, এ-হাতে ও-হাতে, দুই হাতেরি চাপড় বাজে নাকের ডগাতে।' এ মশা লাগে না কৃষকের। পর প্রভাতেই তাকে চলে যেতে হবে মাঠে। ফসল ফলাতে, আমাদের খাবার জোগান দিতে। সারা বর্ষাকাল সে ধার করে খেয়েছে। এবার ফসল তুলে ধার শোধ দেবে। ফলন ভাল না হলে হয়ত আবার তাকে ভরসা করতে হবে 'রিলিফ' বা জগদীশ্বরের উপর। এঋতুতে নানা উৎসব, নানা অনুষ্ঠান। ভাদু উৎসব উপলক্ষে গান গাওয়া হয় 'ভাদু নামল দেশে, মুছাইব রাঙাচরণ মাথার কেশে। ভাদুমণি জননি গো, সলাতে ধূমো আলোতে জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল ভাদু মায়ের বাঙলাতে।' দুর্গা পূজার অষ্টমী দিবসের পর দুর্গা বিদায়ের প্রাক-মুহূর্তের গান—'নবমীর নিশি গো তুমি আর যেও না, তুমি গেলে আমার উমা যাবে, নয়নজল আর শুকাবে না। সপ্তমী আর অষ্টমীতে আমি সুখে ছিলাম দিনে রাতে। আজি আমার ক্ষণে ক্ষণে নয়নজল কেন বাধা মানে না।' তবুও উমা চলে যায়, দশহরা, বিজয়ার আমেজ কাটতে না কাটতেই আসে লক্ষ্মীপূজা, আসে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা, কালীপূজা। কার্তিক অমাবস্যায় দেওয়ালী সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্মীপূজাও অনুষ্ঠিত হয়। ভাঙ্গা আদারে কুলার কনসার্ট বাজিয়ে বলা হয়—'অলক্ষ্মী কইটো আলাম, মালক্ষ্মী মাথায় থাকুন।'

৪।।

শরৎ চলে গেলে আসে হেমন্ত। প্রত্যেক দরজায় 'আগ' লাগাবার চিহ্ন। সর্বত্র হাসি হাসি ভাব। কৃষাণ মেয়েরা ধান কোটার গান গায় 'ধান কুটি পরিপাটি, ধান আমাদের লক্ষ্মীমাটি, ধান কুটি ধান কুটি ধান কুটি। ধান ঝাড়িলে থাকে খড়। সেই খড়েতে ছাই ঘর। গোয়াল ভরে সে খড়-দিব গরুে। সেই খড়ে মড়াই বাঁধব, সে ধান ঢেঁকি ঘরে যায়, বোঝাই করে সোনার নায়। তিন গেরামে যায় রে সে ধান কুঁটি। যাম উড়ে যায় ধান নিয়া, চড়াই পাখি বনের

টিয়া, রাত জেগে তাই ভাঙিতে আমাদের এত খাটাখাটি। লক্ষ্মী এলো লক্ষ্মী এলো লক্ষ্মী চিড়া পিঠা খেলো। এমনি যেন সারা কাল, দেশেতে না হয় আকাল, থাকে যেন এমনি পরিপাটি। ধান কুটি ধান কুটি ধান কুটি।' এই আনন্দ উদ্বেল দিনেই হয় ভাই-ফোঁটা কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায়। বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে বলে—প্রতিপদে দিয়া ফোঁটা দ্বিতীয়ায় দিয়া নিতা, আজ হতে ভাই আমার যমের দ্বারে নিমের অধিক তিতা। যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা, ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমদুয়ারে পড়লো কাঁটা।'

শাঁখা শাড়ী অলঙ্কারে ঝলমল গ্রাম্য রমণীর মূর্তি মধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জনী, কপালে কলাবউর মত সিঁদুরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ, মস্তকে পর্বতশৃঙ্গের মত কুঞ্চ কবরীশিখর, ফাটা পায়ে আলতা, ঠোঁটে শিশিরের বিন্দু মেখে সে শীতের আরাধনায় মাতে। শীত এসে তাদের কর্ম-চাঞ্চল্য নষ্ট করে দেয়। ঝিঁঝির গানের মত অলস শব্দে সকালের রোদ্দুর আনে কুড়েমির ডাক। শরতেও গ্রামের পথে ঘাটে কাদা শরৎ চলে গেলে মাঠ-ঘাটের জল শুকোতে শুরু করে। এরই মধ্যে আসে কলেরা। জায়গায় জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় শীতলা পূজা, শীতলার গান। তার সঙ্গে ঐকতান বাজিয়ে ডেকে ওঠে রাতচোরা পাখি। গাছ কাটার শব্দ হয় খট খট খটাস। 'শরৎকালের পূর্ণ শশী বড়ই মধুর বটে। তারায় যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে। দেখতে মধুর শৈবালেতে ঘেরা শতদলে। একটি যখন ফুটে থাকে সুনীলস্বচ্ছ জলে। নাইক কিন্তু বিশ্বে এমন মনোলোভা। শ্যামল বনের মাঝে যেমন আমার বাহার শোভা।' এর মধ্যে পাঠে মন বসে না তবুও 'বড়ুজেদের বাড়ীর পাশে বোসেদের ওই আটচালায় পাঠিয়ে দিলে বাবা আমায় মেরে-ধোরে পাঠশালায়। হাতেখড়ি নয় সে আমার পড়ল হাতে দাঁড় গো, সকাল বিকাল ঘানি টানা, দিয়ে ঘরের কড়ি গো—মর্মান্তিক। এরই মধ্যে সন্ধ্যা নামে — 'নামল সন্ধ্যা, সূর্যদেব। এখানে নামল সন্ধ্যা। কবিতার সন্ধ্যা, পিলু বারোয়ার সন্ধ্যা। একাকার এই ম্লান মায়ায়, জাগর হৃদয়ের গোধূলি লগ্নে। শুধু নীলাভ একটু আলো এল, তোমার পোস্টকার্ড, আর এল তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।' কেউ গায় ময়ূরের জয় গান—'ওরে ময়ূর বল গো মোরে, কেবা তোরে এমন করে সাজায়েছে, মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ, প্যাকম ধরে বেড়াও নেচে। একে অপূর্ব পাখা পালক ঢাকা, চাঁদের রেখা তায় শোভিছে, যে তোরে এমন করে চিত্র করে সে চিত্রকর কোথা আছে। ময়ূরে তোরে সর্বরঞ্জন করে যেজন দুটি পা কুৎসিত করেছে। সে তোরে একাধারে রঞ্জনকারী, দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে।' রবীন্দ্রনাথ হেমন্তলক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করে সম্বোধন করছেন হেমন্ত লক্ষ্মী ধরার অঞ্জলি পক্ব ধানে, দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে। শীত-রিক্ত অরণ্যের শূন্য পথে, বলেছিল ডাকি—কোথায় গো অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্তের অন্ন দেবে নাকি? শান্ত কর ধরার ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়নে, ধরার ভাণ্ডার পানে।' পরিপূর্ণতার ভারে কাঁপে হেমন্ত। শীতল তার চাহনি। সকলকে আশীর্বাদ, শিশিরে ধোয়া নির্মাল্য দিতে হেমন্ত ব্যস্ত। এই সময় 'গৃহস্থ বধূ দেয় তুলসীর গোড়ে বাতি, ঘুরে আসি তোমার সাথে কাঁধে লইয়া ছাতি। অঘ্রাণ মাসে নয়া হেউতি ধান। কেউ কাটে, কেউ মাড়ে, কেউ করে নবান্ন।'

হেমন্তের পূর্ণিমা নিশীথের মাঝে বিশ্ব যখন নিথর দাঁড়িয়ে থাকে, একটিও পাতা যখন কাঁপে না, তখন প্রতিবিম্বিত করে মানুষ যে মাধুরী দিয়ে মণ্ডিত তার অবিমিশ্রত রূপ। সেই নীরবতা ও আঁধার যেন একটা ভঙ্গুর মায়া রচনা করে।

হেমন্ত চলে গেলে আসে শীত। শীত দেবতার শুভ্র শান্ত রূপ। ক্লান্তিহর তিনি। শীতে ধান পাকে। কৃষক সমাজে পড়ে চাঞ্চল্যের সাড়া। জনজীবনে আসে প্রাচুর্যের ডাক।

শীতে ভোজ্য দ্রব্যাদির ছড়াছড়ি। এই সময় খেয়ে ও খাইয়ে সুখ। এসে যায় পৌষ আগলান, কৃষিজীবী মানুষের আচার-অনুষ্ঠান। পৌষকে বিদায় দিতে চায় না মন—'এসো পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না।' ঘরের দরজা থেকে পুকুরঘাট অবধি সারিবদ্ধ আলপনা। আলপনার পথ ধরে অনূঢ়া মেয়েরা হাঁড়ি ভর্তি পিঠা সকলকে খেতে দেয়। শুরু হয় পিঠের হুরর লুঠ। খেজুর গাছে ঝোলে রসের হাঁড়ি। নলেন গুড়ের সন্দেশ, জয়-নগরের মোয়া, রসের পিঠে, পায়েসের হাপুস হুপুস শব্দ। তবুও শীতকে গালাগালি দেয় বুড়ী। অনাচ্ছাদিত আগুন জেলে হিমের আঘাত থেকে বাঁচাতে চায় সকলে। শীতের টান বা শুষ্কতার হাত থেকে উদ্ধার পেতে প্রসাধনের ব্যবহার বেড়ে যায়। সাহেবদের শীতের উৎসব বড়-দিন। 'খৃস্টের জন্মদিন, বড়দিন নাম, মহাসুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা ধাম।' এ ধুমধাম ধনীর জন্য, দুঃখীর জন্য নয়। তাই 'ধনীর শরীরে শাল, গরীবের পেছনে শাল, সম্বল কম্বল করি রয়। বেনের পুঁটুলী হয়ে, শুয়ে থাকে শীত হয়ে, উমু বিনা ঘুম নাহি হয়।' শরতের শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালী জীবনে যে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে সারা শীত ধরে তা একই খাতে প্রবাহিত।

৬।।

শীত চলে গেলে আসে বসন্ত। বসন্তকে কালিদাস যোদ্ধা বলেছেন। ফুটে-ওঠা আমের মুকুল তার বাণ ভ্রমরের সার তার ধনুকের ছিলা। বসন্তে সবাই সুন্দর। গাছে ফুল ফুল্ল পদ্ম আমের মুকুল খেয়ে মাতোয়ারা কোকিল কোকিলার মুখচুম্বন করছেন, ভ্রমর পদ্মের মধু খেয়ে মাতোয়ারা হয়ে ভ্রমরীর মন ভোলাবার চেষ্টা করছে, ঘরে যুবতীর মন উদাস। কুসুমিত বনরাজিতে কোকিল কুহু ডাকছে। নায়িকা কোকিলার রবে দ্বিগুণ বিরহকাতর হয়ে পড়ছে। 'ফাল্গুন মাসে ফাগুয়ার রঙ দোলে কার খেলা, ঘরতান না বাইরায় কন্যা থাকয়ে একেলা। চৈত্র মাসে চৈতী হাওয়া কুকিলায় ধরে তান। ঘরে বইস্যা গায় কন্যা গুণগুণাইয়া গান।'

প্রীতির পরিবেশে মানুষ জন্মলাভ করে, শৈশবে সে পুষ্টি পায়। প্রাণধারণের জন্য এই প্রীতি অতীব প্রয়োজনীয়। মানুষ যে পরিমাণ প্রীতি দেবার ক্ষমতা রাখে সে হয় সে পরিমাণ ঐশ্বর্যবান। যে পরিমাণ প্রীতি গ্রহণ করতে চায় সে হয় সেই পরিমাণ হীন। সেই জন্য যাঁরা ভাল-বাসতে জানেন তাঁরা সে ভালবাসার বিনিময়ে কোন মূল্য দাবী করেন না। এ ভালবাসার জন্য কোন দিনক্ষণের দরকার হয় না। আচার আচরণের প্রয়োজন হয় না। যদিও প্রত্যেক আচার ও গৃহস্থালী কর্মের মূলে আছে বিদ্যা। সে বিদ্যা অধ্যয়ন করতে ধৈর্যের প্রয়োজন। অধ্যয়নের জ্ঞান থেকেই মানুষ জানতে পেরেছে যে মাস ও ঋতুর আবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি কেবলই রূপ বদলায়। মানুষও। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে। অন্তরের ঘনিষ্ঠতায়। সভ্যতার বিবর্তনে সামাজিক শৃঙ্খলা ও আচার-অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলার জন্য তাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষ সৃষ্টি করেছে পঞ্জিকা। 'মেষাদায়া দ্বাদশেতে মাসাস্তৈরেব বৎসরঃ' অনুযায়ী বাঙালী হিন্দু তার পঞ্জিকা বানিয়েছে। সূর্যের মেষরাশিতে অবস্থানকালীন সময় থেকে মীনরাশি পর্যন্ত দ্বাদশ মাসে পূর্ণ হয় একটি বৎসর। এই অতিক্রমণে একটি একটি রাশি প্রতি মাসে সূর্যবলয়ে আসেন ও যান। হিন্দু গণৎকার সৌরমান গ্রহণ করেছেন পঞ্জিকা সৃষ্টিতে, যদিও মাসের নাম হয়েছে চান্দ্রমাসের নক্ষত্রের নামানু-সারে। ইসলামী পঞ্জিকা সৃষ্টি হয়েছে চান্দ মাসানুযায়ী। আমাদের, হিন্দু ও মুসলমানের লোক-উৎসব, ব্রত, অনুষ্ঠানাদি সবই চান্দ্রমাসকে ভিত্তি করে। আমাদের অনেক ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানও চান্দ্রমাস বা ঋতুভিত্তিক যেমন শারদীয় উৎসব, দোল পূর্ণিমা, শ্রীপঞ্চমী প্রভৃতি। উভয়বিধ মান প্রচলিত থাকার দরুণ অনেক সময় নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে গণৎকারদের মত-পার্থক্যহেতু বিভিন্ন মত দেখা যায়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ভারত সরকার নতুন পঞ্জিকা নির্মিত করেছেন। কিন্তু এখনও বাংলার লোকসমাজ কর্তৃক তা আদৃত হয় নি। একইভাবে ঋতুগণ আসেন ও যান। এক একটি ঋতু প্রস্থান কালের সময় ডাক দিয়ে বলে যান যে এ-যাওয়া শেষ যাওয়া নয়, ঠিক ঠিক সময়ে আবার তাঁরা একে একে ফিরে আসবেন, কোন দিনই এ আসা-যাওয়ার শেষ হবে না।

ফটো : মসউদ আর রহমান

একটি ধ্বংসোন্মুখ দেউল

শ্যামাপদ কর্মকার
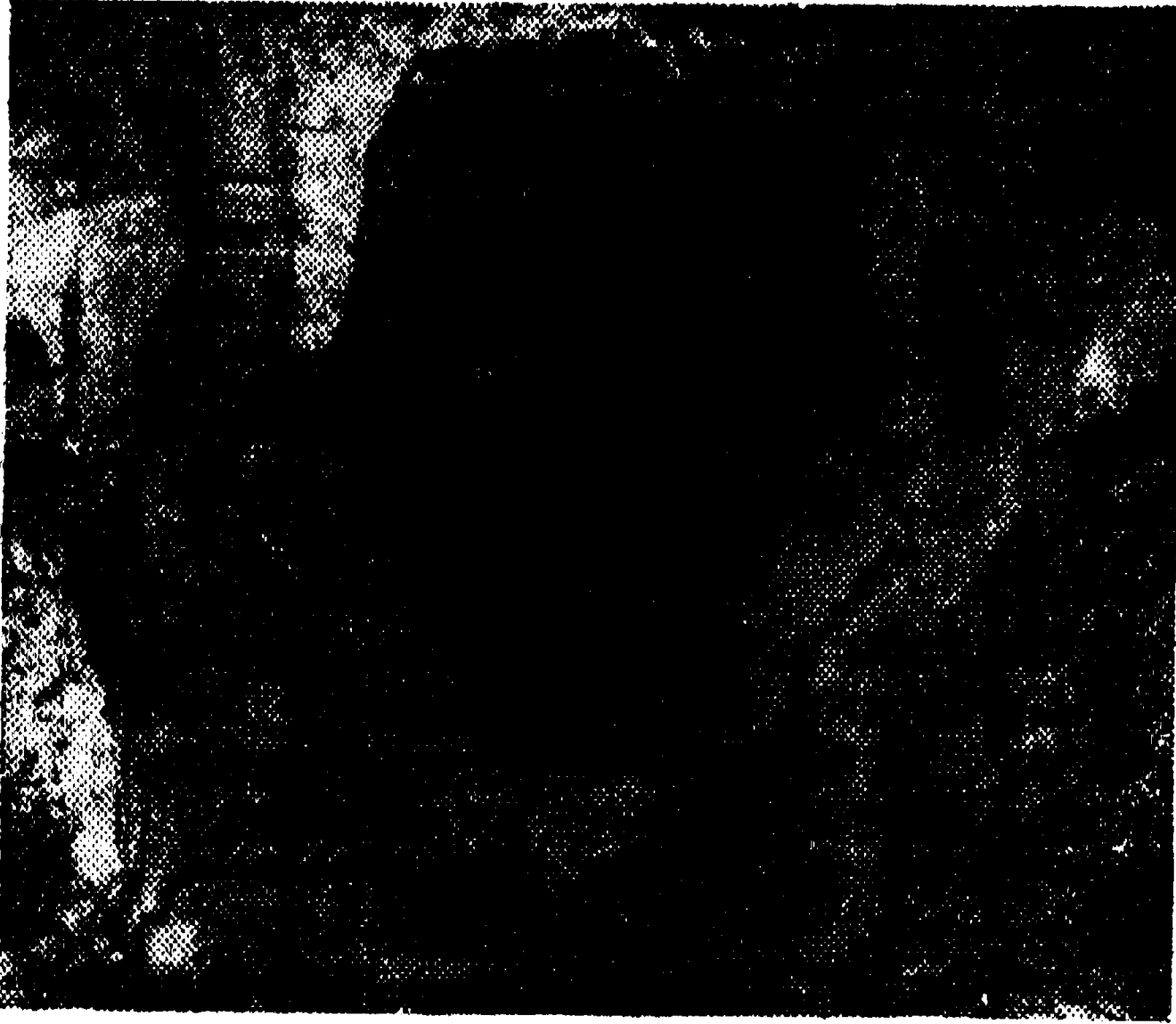
পশ্চিম বাংলায় এখনও যেসব ভগ্ন সৌধগুলি রয়েছে তার অধিকাংশই মুসলমান আমলের। ঐসব প্রাচীন কীর্তিগুলি সংরক্ষণের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। হিন্দু যুগের অধিকাংশ নিদর্শনই আজ অবলুপ্ত। সেই সকল নিদর্শনের অনেক অংশ নিয়ে মুসলমান আমলের সৌধগুলি গঠিত হয়েছিল। তাই ঐ সকল প্রাচীন সৌধগুলিতে হিন্দু ভাস্কর্য-স্থাপত্য শিল্পের কিছু কিছু ভগ্নাংশ এখনও অবশিষ্ট আছে।

বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট : দি অ্যান্টিকুইটিস অফ কালনা (খন্ড ১৪ জানুয়ারী—জুন ১৯১৭) গ্রন্থ থেকে জানা যায় বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা অঞ্চল ভ্রমণ করে ১৯১৬ সালে মৌলবী আব্দুল ওয়ালী খাঁও ঠিক ঐ ধরণের মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, হিন্দু যুগের বিশেষ কিছুই আর এখন পাওয়া যাবে না। যে সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও আছে তা হিন্দুদের নির্মিত ধ্বংসাবশেষের ওপর মুসলমানদের সৃষ্টি মাত্র।

বর্ধমান জেলার এই কালনা শহরের আশপাশে মুসলমান আমলের তিনটি বিখ্যাত মসজিদ ছিল। ওখান থেকে তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ব্লকম্যান সাহেব ঐ শিলালিপিগুলি কলিকাতার যাদুঘরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। শিলালিপি পাঠ করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, ওগুলি হাবসী রাজাদের আমলের।

মসজিদ তিনটির মধ্যে সবচেয়ে বড় মসজিদটি খুব সম্ভব ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর ফিরোজ শাহের আমলে তৈরী। এটির নাম ছিল 'মসজিদ-ই জামিয়া' অর্থাৎ শহরের প্রধান মসজিদ। বর্তমানে এটি দাঁতনকাটিতলার মসজিদ নামে পরিচিত। আমাদের আলোচ্য মসজিদটি এই মসজিদ থেকে অল্প কিছু দূরে অবস্থিত। শহর থেকে মাইল দুই দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম 'শাসপুর'। বর্তমানে এখানে কয়েক ঘর দরিদ্র লোকের বাস। গ্রামের শেষে মাঠের পারে একটা বড় পুকুরকে লোকে বলে মজলিস সাহেবের দীঘি। এক আফগান অমাত্য দীঘিটি খনন করিয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন তাঁরই নাম ছিল মজলিস সাহেব। আবার কেউ বলেন পরবর্তী কালে এই পুকুরের পাড়ে কোন এক মুসলমান ফকির নাকি আস্তানা করে বসেছিলেন। সন্ধ্যায় মক্‌রেবের নামাজের পর স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিরা এসে ফকিরের কাছে মজলিস (বৈঠক) বসাতেন। সেই থেকে ফকিরকে বলা হয় মজলিস সাহেব আর দীঘিটির নাম হয়ে যায় 'মজলিস সাহেবের দীঘি'। আবার কেউ কেউ বলেন, মোহর্‌রমের সময় ইমাম হোসেন সম্পর্কে শিয়াদের যে শোক-বৈঠক হত তাকেই বলা হয় মজলিস। সেই থেকেই দীঘির নাম 'মজলিসের দীঘি'। আর যে ফকির সাহেব এখানে এসে আস্তানা করে বসেছিলেন তাঁর নাম হয়ে যায় মজলিস সাহেব। বর্তমানে দুয়ে মিলে হয়ে গেছে 'মজলিস সাহেবের দীঘি'। এখানের মসজিদটির পাশেই মজলিস সাহেবের আস্তানা বলে একটা জায়গা আছে। এখনও সেখানে পোড়ামাটির ঘোড়া পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ঐ দীঘির পাড়ে একটা বড় মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। চারদিক ঘন জঙ্গলে ঢাকা। কেউ যদি হঠাৎ গিয়ে পড়েন তাহলে কাছাকাছি কোন বাড়ী থেকে একটা কাটারি চেয়ে নিয়ে বুনো গাছপালা কেটে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন মসজিদটির মাথার গম্বুজ বা মিনারের এখন আর কোন চিহ্ন নেই। অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সুলতান দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ ১৪৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে মাত্র এক বছর রাজত্ব করেছিলেন। অনেকের অনুমান তাঁর আমলেই দীঘির পাড়ের মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এটি দৈর্ঘ্যে ৪৪ ফুট ও প্রস্থে ৩৪ ফুটের মত। এর সামনের দিকে তিনটি ও দুপাশে দুটি করে প্রবেশ দ্বার ছিল। সামনের মূল প্রবেশ-দ্বারের বিপরীত দিকের দেওয়ালে খোৎবাপাঠের স্থানটি পাথরের কারুকার্যমন্ডিত, তার দুপাশে দুদিকে দুটি খিলানে পোড়ামাটির কাজ। দেওয়ালের ইঁট খসে পড়লেও খোৎবাপাঠের স্থানটির বেলে পাথরে তৈরী নক্‌সাগুলি খোদাই করে দু' পাশের দুটি ছোট থামের উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফুল-লতা-পাতা সমন্বিত নক্‌সাগুলো। উপরের দিকে দু পাশে দুটি ফুল খোদাই করা আছে, চাল-চিত্রাকৃত মূল নক্‌সাটি চিড়িতনের উপরের অর্ধাংশের মত। উপরে মধ্যস্থলে হরতন আকৃতির একটি নক্‌সা।

কেবলমাত্র ঐ অংশটুকুও কি কোথাও সংরক্ষণ করা যায় না। নিকটেই মহকুমা শহর কালনা। ওখানের কলেজ লাইব্রেরীতেও যদি ঐ ঐতিহাসিক বস্তুটি সংগ্রহ করে রাখা যায় তাহলে লাইব্রেরীর মর্যাদা বাড়ে বই কমে না।

প্রতি বছর মাঘ মাসের ১লা ঐ মসজিদের কাছে এক মেলা বসে। একে বলে দীঘির মেলা। বহুলোক সমাগম হয়। কিংবদন্তি আছে, প্রাচীন কালে মেলার দিন নাকি ঐ দীঘির জল থেকে ভেসে উঠত একটা সোনালি মসজিদ, একটা চৌকি আর মেলায় সমাগত লোকদের খাওয়ানোর জন্যে রান্নার বাসনপত্র। ঐ কিংবদন্তীর মধ্যে যে হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট তা সহজেই বোঝা যায়। তবে এ গল্প সত্যি না হলেও অনেক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিজড়িত এই সৌধটির ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, শোনা যায় এই মসজিদটির পাশেও নাকি এককালে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাইনবোর্ড ছিল।

সবারে আমি নমি

কানন দেবী

সাপুড়েতে কাজ করার দুঃখবহ অভিজ্ঞতার কথা আগের অধ্যায়ে বলেছি। কর্মক্ষেত্রে ত এই বিপত্তি। আবার কাজের অবসরে আমার বয়সী অন্যান্য সাথী-শিল্পীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে হাসি-গল্প করে যে মনটাকে একটু তাজা করে নেব তারও কোন উপায় ছিল না। নিউ থিয়েটার্সে আমার আগমন এবং এতগুলি হিট পিকচার্সের নায়িকা হওয়াটা অনেকেই তেমন প্রীতির চোখে দেখেন নি। হয়ত-বা সেই জন্যই তাদের সখীত্বের অন্দরমহল আমার জন্য বন্ধ। সকলের হাসি, বিদ্রুপের আঘাতে একাকীত্বের দ্বীপান্তরেই নিষ্ঠুরভাবে আমায় ঠেলে দেওয়াটাই হয়ত আমার প্রতি তাঁরা যোগ্য ব্যবহার হবে বলে মনে করেছিলেন। আমারও জেদ চেপে গিয়েছিল নিজে থেকে না ডাকলে আমিও কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাব না। মনে আছে—ফিরপো হোটেলে সতীর্থ এক শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করলাম। কিন্তু আমার সে নমস্কারকে উপেক্ষা করে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। কারণ? তিনি অভিজাত বংশীয়া। তাই আমার মত সাধারণ এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সাধারণ সৌজন্য মেনে চলাটাও তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়েছিল। চার দিক থেকে এই রকম ঘা খেতে খেতে মনটাকে বাইরে থেকে একেবারেই গুটিয়ে নিয়েছিলাম। নিজের ভাবকল্পনা ও উচ্চাশার ভাবরাজ্যেই যেন ব্যথাদগ্ধ, স্পর্শকাতর মনটা আশ্রয় পেতে চাইত। সব সময় ভয় ছিল বাইরের কারো সংস্পর্শে এলেই দুঃখ পেতে হবে। বন্ধু, স্নেহ, ভালবাসা এসব ত আমার জন্য নয়।

এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও যার সহজ সখিত্ব ভারাক্রান্ত মনকে স্নেহের আশ্বাস দিয়েছিল সে হল মলিনা। তখনকার দিনে মলিনাও যথেষ্ট নাম-করা নায়িকা। কমিক, সিরিয়াস সব রকম চরিত্রেই ও সমান দক্ষতায় অভিনয় করে গেছে। কিন্তু ওর মধ্যে কখনও যাকে বলে 'দেমাক' তা দেখিনি। হাসি, হুল্লোড় হৈ-চৈ এও মলিনার জোড়া ছিল না।

আমার ও মলিনার একটা জয়েন্ট স্যুটকেস ছিল। তার মধ্যে মুড়ি, চিড়ে-ভাজা, ছোট বঁটি, স্টোভ, পাঁউরুটি, মাখন এই সব নানান টুকিটাকি খাবার ও রাঁধবার জিনিস থাকত।

নিউ থিয়েটার্সের বিরাট চত্বরের পুকুর পাড়ে কখনও-বা আমগাছতলায় বসে মুড়ি বাদাম খেতে খেতে আমরা কত গল্প করতাম। মনের কথা বলাবলি করতাম।

তখনকার দিনের মস্ত বড় অভিনেত্রী ছিলেন উমাশশী, চন্দ্রাবতী। নায়িকার খ্যাতিতে পুরো ভাগেই এঁদের নাম ছিল। আমি যখন এন-টিতে যোগ দিই, ঠিক তখনই উমাশশী চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। 'চণ্ডীদাস' কথাচিত্রে ওঁর রামীর ভূমিকার খ্যাতি প্রায় উপকথারই সামিল হয়ে উঠেছিল। 'দিদি' ছবিতে চন্দ্রার প্রেসিডেন্টের অভিনয় এখনও যেন চোখের সামনে ভাসে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং ডিগনিফায়েড রোলে ওকে দারুণ মানাত। আর, সব মিলিয়ে ওর জোড়া রূপসীও এ লাইনে খুব কমই ছিল।

বন্ধু বা শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা বিরল হওয়ার দরুণ অথবা যে কোন কারণেই হোক মনটা ছোটবেলা থেকেই খুব অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিল। গুরুবলও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। অবসর সময়ে গান ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত আর বলতে লজ্জা নেই ঠাকুরমার ঝুলিও পড়তাম। আমার একটা প্রিয় বই ছিল—নানান জাপানী উপকথার সংকলন।

সব সময় স্বপ্ন দেখতাম ধূলিমলিন জীবন ও জগতের থেকে অনেক অনেক দূরে ছবির মত এক সুন্দর বাড়ীতে আমি থাকব। চারিদিকে থাকবে শুধু ফুল কিম্বা ফুলের মত সুন্দর ছবি ও আসবাব। যদি সামান্য এতটুকু জিনিসও থাকে, বাড়ীর সামগ্রিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে তাও ছবি হয়ে উঠবে। যেখানে আমি থাকব, চলব, ফিরব, কথা বলব, ভাবব, তার প্রতিটি আনাচে-কানাচে থাকবে মধ্যযুগীয় জমকালো পরিবেশ। শুধু কি তাই? চলার মাটি, দরজা-জানালা সবই তাদের বাস্তবতা হারিয়ে স্বপ্নচ্ছায়া হয়ে উঠবে।

মানময়ী গার্লস স্কুলে

ছোটবেলা থেকেই বাস্তবের এত নির্লজ্জ নীচ রূপ দেখেছি যে 'বাস্তবতা' নামটা শুনলেই যেন গা শিউরে উঠত। সব সময় বাস্তব জীবন ও জগৎ থেকে মনটা ছুটে পালাতে চাইত। নানা রকম বিদেশী ম্যাগাজিন কিনে ঘর সাজানোর নানান আর্ট, কতরকমভাবে কত সুন্দর করে ফুল সাজান যায় তারই মধ্যে ডুবে যেতাম। ইংরাজী সিনেমা দেখবার সময় অভিনয় ছাড়াও ওদেশের সিঁড়ির নানান প্যাটার্ণ, ঘরের আসবাবপত্র রাখার ঢং, মন দিয়ে লক্ষ্য করতাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ছক কাটতাম, আমার যখন বাড়ী হবে, সেই কল্পিত বাড়ীর গেট থেকে শুরু করে বেড-রুম অবধি কেমন করে সাজাব। কারু-কার্যকরা বিরাট বিরাট দরজার কোন দিকে কি ধরনের ফুলদানী রাখার ষ্ট্যান্ড থাকবে, আলমারী খোলার হ্যান্ডেলকে রামায়ণ-মহাভারতের যুগের নূপুরের ছাদে গড়ব, দেহাতী ঝালর মত না রুপোলী পদ্ম-ফুলের গড়নে? একটা ঘরের দেওয়াল হবে গোলাপ ফুলের মত। সেখানের আলো শেড—সবেরই হবে গোলাপ-ঘেঁষা রঙ। অন্য ঘরটি হবে চোখ-জুড়ানো হাল্কা সবুজ রংয়ের আর সেই রংয়ের সঙ্গেই রুল-মেলানো অন্য সব কিছু। শোবার ঘরটি কিন্তু হবে নীলঘেঁষা, মাথার কাছে থাকবে। আমার গোপাল। মন্দিরে রাখলে উনি আচার-অনুষ্ঠানের আড়ালে চলে যাবেন। বড্ড দূরে হয়ে যাবে। অন্তপুরে গোপালকে রাখলে সকাল, সন্ধ্যা চলতে, ফিরতে দুষ্টু, দুষ্টু মুখখানি দেখতে পাব না ত। এই রকম নানান আজগুবী কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতাম। শুধু কি বাড়ীরই কল্পনা? আরও নানা রকম চিন্তা। সে সব কথা বলব যথাস্থানে।

এবার নিউ থিয়েটার্সের প্রসঙ্গে আসি। অন্য কোম্পানীতে কাজ করার পর নিউ থিয়েটার্সে এসে এখানের কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অন্যান্য জায়গায় স্যুটিং, টেক ও রিহার্সাল সবই একটা পরিমিত সময় এবং অর্থব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে এসে দেখি সারাদিন ধরে স্যুটিং চলছে ত চলছেই। টেক হচ্ছে ত হচ্ছেই। রিহার্সালের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এককথায় অকারণ অর্থব্যয় ও অপব্যয়ের চূড়ান্ত। ওখানে কারো কাছে এ নিয়ে কোনো বিস্ময় প্রকাশ করলেই মুচকি হেসে যা বলত তার মানে হোলো এই—এ হচ্ছে হাতীমার্কা নিউ থিয়েটার্সের ব্যাপার। এখানেও যদি অত হিসেবনিকেশ করেই খরচপত্র হবে তাহলে আর অন্য কোম্পানীর সঙ্গে এন, টির তফাৎটা কি হোলো? এইটেই ত এন, টির আভিজাত্য।

এন, টির কর্মীরা যাই বলুক, আমি কিন্তু বেদনার্তচিত্তে লক্ষ্য করতাম অত বিরাট প্রতিষ্ঠানও যেন অপব্যয়ের চাপে ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসছে। বিরাট গ্ল্যামারের বাইরের জৌলুষ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বলেই

সাপুড়ে চিত্রে কানন দেবী, মেনকা এবং পাহাড়ী সান্যাল

এ দিকটা কারো চোখে পড়েনি। অথবা এ নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করেননি। কিন্তু জীবনে দুঃখ ও দুর্দশার দিকটির সঙ্গে ছোটোবেলা থেকেই বড্ড বেশীরকমের পরিচয় হয়ে গিয়েছিলো বলেই কিনা জানি না, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম বাংলাদেশের অতবড় ঐশ্বর্যভাণ্ডারের কোথায় যেন ভাঙ্গন ধরেছে এবং তার বিপুল সম্পদও নিঃশেষ হওয়ার পথে। আর সকলের সব ধারণা ও কল্পনাকে ছাপিয়ে ঐ হাতীমার্কা ব্যানারের এন, টি-ও হঠাৎই একদিন ধ্বসে পড়বে। সেদিন যে বাংলাদেশের কত যে অপূরণীয় ক্ষতি তা ভাবা যায় না।

নিউ থিয়েটার্সে মাঝে মাঝে প্যাণ্ডেল বেঁধে গানবাজনার আসর বসত, অভিনয়ও হোতো। মনে আছে একবার 'আলিবাবা' নৃত্যাভিনয়ে আমি ও লীলা দেশাই মর্জিনা আবদাল্লা হয়েছিলাম। এইসব উৎসবে তখনকার 'ছোটলাট' আরও কত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসতেন। আমিও অনেকবার গান গেয়েছি। মাঝে মাঝে রেডিওতে রিলেও হোতো। তখন ঘরে ঘরে এত রেডিও ছিল না। যাঁদের বাড়ী রেডিও থাকত লোক তাঁদের রীতিমত সম্ভ্রমের চোখে দেখত। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে রেডিও থাকা বাড়ীর চারপাশে বহুলোকের ভীড় জমে যেত। অতএব রেডিওতে রিলে-হওয়া-উৎসবের শিল্পীদের যে বিশেষ সম্মান ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

একবার বন্যার জন্য একটা চ্যারিটি শো হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে নানান ঘটনার মধ্যে পঙ্কজবাবুর একটি কথা আজও আমার মনের অতলে মূল্যবান রত্নের মতই

পরাজয় চিত্রে কাননদেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু এবং রাজলক্ষ্মী দেবী

সঞ্চিত আছে। অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য পঙ্কজবাবু সবাইকে গান শেখাচ্ছিলেন। আমায় বললেন, 'তোমার পছন্দমত কয়েকটা গান ঠিক করে নাও।' আমি ত ভয়ে সঙ্কোচে দিশেহারা। বললাম, 'সে, কি? এখানে আমি কি গাইব? এসব আসরে গাইবার মত গান ত আমি জানি না।' পঙ্কজবাবু উঠে দাঁড়িয়ে 'সাবাস' বলে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। তারপর উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার ঐ একটি কথাতেই যথার্থ শিল্পী মনটি প্রকাশ পেয়েছে।' আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। এতবড় আসরে এবং এই উপলক্ষে গাইবার উপযুক্ত গান আমি জানি না এইটুকুই ছিল আমার বক্তব্য। এর মধ্যে এতবড় সম্মানের কথা আসে কি করে? আমার মতই অন্য সবাইও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। উনি বললেন, 'বুঝতে পারলে না?' তারপর অন্য সবাই-এর দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ, ফিল্মের এমন নাম-করা গাইয়ে মেয়ে। এ ত অনায়াসেই কোনো হিট্ পিকচারের পপুলার গান গেয়ে হাততালি নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু ওর চিন্তা সেদিক দিয়ে গেলই না। ওর ভাবনা হোলো এই সময়ের উপযুক্ত গান ও জানে না। এই একটি কথার মধ্যেই ওর শিল্পী সত্তাটি উঁকি দিয়েছে। তাই বলছি, কানন আমাদের সত্যিকারের শিল্পী হয়ে উঠেছে। ওর সাধনা সার্থক।' এতবড় গুণীর মুখে এই প্রশংসা শুনে সেদিন চোখের জলকে

হিন্দী কণ্ঠহার

বিদ্যাপতি চিত্রে কাননদেবী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাহাড়ী সান্যাল
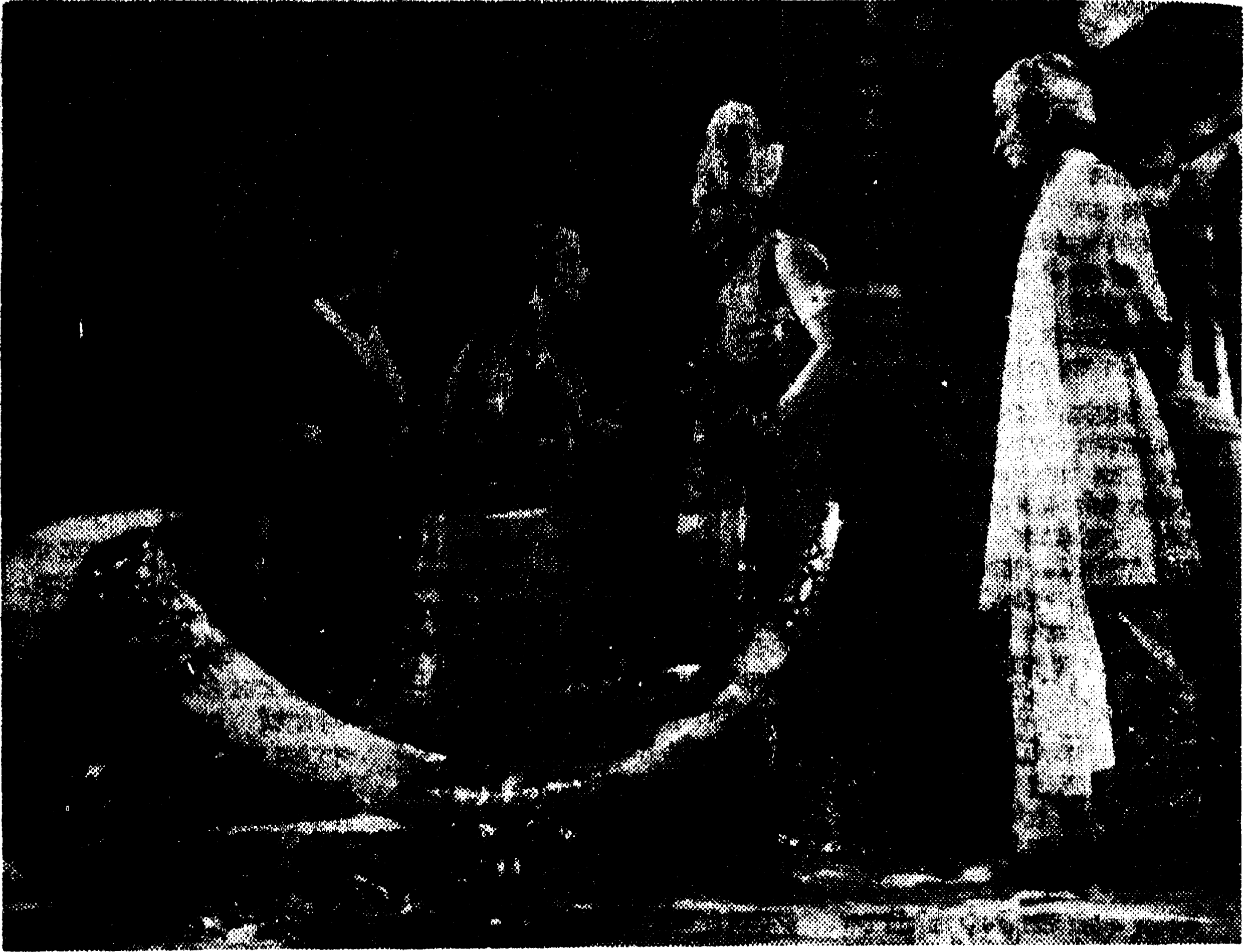
আর রুখতে পারিনি। সবার সামনেই এই প্রথম অঝোর ধারায় আমার চোখের ধারা গড়িয়ে পড়েছিল।

আজ বুঝতে পারি সেদিন কেন এত সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই চারিদিক থেকে দুর্দশায় পীড়নে মনটা বড় স্পর্শকাতর আর ভীতু হয়ে পড়েছিল। কারো সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে এমন কি নিজের কোনো মতামত প্রকাশ করতেও ভয় পেতাম। কাজে নামতে না নামতে আশাতীত নাম, যশ পেয়েছি। আবার এরই কারণে অপযশও কম পাইনি।

আমার ব্যথাদগ্ধ অন্তরের এই নীরবতাকে সবাই 'অহঙ্কার' বলেই ভাবত। আর তাদের কল্পিত এ অহঙ্কারকে আঘাত করবার জন্যই আমার ত্রুটি-খোঁজা ও বিরূপ সমালোচনায় মেতে ওঠাতেই তারা যেন নিষ্ঠুর আনন্দ পেত। নিজের সম্বন্ধে সেইসব অপবাদ ও নিন্দার অত্যন্ত অন্তরাই বোধহয় পঙ্কজবাবুর এতবড় অপ্রত্যাশিত কমপ্লিমেন্টে এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

১৯৩৬ থেকে ৪০ অবধি আমার কর্ম-জীবনের এক অবিচ্ছিন্ন গৌরবোজ্জ্বল যুগ। 'সাপুড়ে'র পরই হিন্দী চিত্র 'জওয়ানি কি রাত' সারা ভারতে আমার শিল্পখ্যাতিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছবিতে আমার বিপরীতে ছিলেন নাজাম—যাঁর অসামান্য সৌন্দর্য খ্যাতিও ছিল ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

এ ছবিরই বাংলা সংস্করণ 'পরাজয়'। নামে 'পরাজয়' হলেও এ ছবির স্থান কিন্তু আমার জয়ের তালিকায় প্রথম সারিতেই। তার প্রথম ও প্রধান কারণ অভিনীত চরিত্রটি আমার খুব পছন্দসই ছিল। একদিকে যৌবনদৃপ্ত রমণীর চিত্তবিভ্রান্তকারী সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের আত্মহারা আবেদন নিবেদনের এক কৌতুকী প্রকাশ, অন্যদিকে প্রতি পুরুষের কামনায় মুকুরে প্রতিফলিত আপনার রমণীলাবণ্যের নানা-রঙা সুষমা ও মাদকতাকে প্রত্যক্ষ করার রোমাঞ্চে নায়িকাচিত্তের বিস্মিত জাগরণ। জয়ের নেশায় মাতোয়ারা নারীর নিত্যনূতন সজ্জা ও নিত্যনূতন প্রেমিকের সঙ্গে পথচলায় উন্মাদনা এ ছবির একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। হেমচন্দ্র পরি-চালিত 'পরাজয়' ছবির হিন্দী সংস্করণ দিল্লীতে মুক্তিলাভ করে ১৯৩৯ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর। কোলকাতায় হিন্দী বাংলা দুটি সংস্করণই মুক্তি পায় মার্চ মাসে।

শুধু যদি পুরুষচিত্তে রূপজাল বিস্তারের সর্বনাশা মোহই এ ছবির শেষ কথা হোতো, তাহলে হয়ত অনীতা চরিত্রটি আমায় এমন করে টানত না। কিন্তু বাইরের চটুলতার উদ্দাম কল্লোল শান্ত হয়ে এলে ক্লান্ত রমণীচিত্তে প্রণয়তৃষ্ণার উন্মেষে যে বিষাদ-গম্ভীর আলো জ্বলে ওঠে, তারই মধ্যে শুধু নায়িকার নয় নিজেরই অন্তরতম সত্তারই এক অজানা স্পন্দনকে যেন অনুভব করলাম। কৌতুকের সঙ্গে অশ্রু না মিশলে বুঝি মনের আকাশে নানান অনুভবের এমন রামধনুর রঙ ফোটে না। আমার অনুভবের এই রঙিন আলো যে দর্শকচিত্তকে অনুরঞ্জিত করতে পেরেছিল, প্রতিদিন অসংখ্য টেলিফোন ও চিঠির স্তূপই তার প্রমাণ। সকলের অভিনন্দনই আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপেই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে স্মরণীয় হয়েছিল ইউরোপ থেকে এ দেশে সাংস্কৃতিক সফরে আসা অক্সফোর্ডের এক ছাত্রের মুগ্ধচিত্তের সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমজ্ঞাপন। মনে আছে নিউ থিয়েটার্সে, একদিন পি এন রায় আমার মেকাপঘরের কাছে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন এক বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে। দীর্ঘদেহী, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি স্বপ্নময় ঘন নীল চোখ, একমাথা সোনালী কোঁকড়া চুল। খুব মিষ্টি হেসে করমর্দন করে আমায় বললেন,

"I have never experienced before such enthralling voice and aulluring beauty".

আমার হাতে দিলেন ওদেশেরই এক কবির বাণী লেখা একটি সুন্দর, রঙিন কার্ড।

বিদেশী বন্ধুর নামটি মনে নেই। কারণ কার্ডটি হারিয়ে গেছে। কিন্তু লেখাটি ভুলিনি—

"Charm is a sort of bloom on a woman. If you have it you do not need to have anything else — and if you do not have it it does not matter what else you have".

কথাগুলি ভাল লাগার কারণ আত্ম-স্তুতির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগই শুধু নয়। এর আগেও অভিনয়, রূপ অথবা গানের জন্যও স্তুতিবাদ কিছু কম পাইনি। কিন্তু সেসব স্তুতির মধ্যে থাকত কেমন যেন একটা স্থূলতার স্পর্শ যাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে মনের কোথায় একটা দ্বিধা জাগত। কিন্তু এই বিদেশীর মুগ্ধদৃষ্টির মধ্যে একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল, আর লিখে-দেওয়া ঐ কথাটির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার মধ্যে ছিল বিদগ্ধ শিল্পরসিকের মার্জিত রুচির স্বাক্ষর। বোধহয় সেইজন্যই মনে এমন গভীর দাগ কেটেছিল।

'পরাজয়ে'র গানগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, বিশেষ করে 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গানটি।

'পরাজয়' আমার জয় ঘোষণা করলেও অমর মল্লিক পরিচালিত 'অভিনেত্রী' আমার অভিনেত্রী জীবনের পরাজয় হয়ে দাঁড়ালো। 'অভিনেত্রী' হোলো ভাগ্যলাঞ্ছিত হৃতগৌরব অসহায়া রমণীর, প্রেমিকের কাছে আশ্রয়প্রাপ্তি। রোগের আক্রমণে কণ্ঠলাবণ্যহারা নায়িকা ও গায়িকার নায়কের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া বাঁচার উপায় ছিল না। দর্পিতা রমণীর এ হেন আত্মসমর্পণকে পরাজয় না বলে পতনই বলা যায়। এ চরিত্রে অভিনয় করবার আমার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেই এক সমস্যা। আমি তখন নিউ থিয়েটার্সের মাসমাইনের শিল্পী। সুতরাং নিজের স্বাধীন মতামতের কোনোই দাম নেই। অতএব অভিনয় করতেই হোলো এবং অনিচ্ছাকৃত কাজে স্বাভাবিক ত্রুটির কারণেই এ অভিনয় আগের ছবিগুলির উজ্জ্বল দীপ্তির কাছে যেন ম্লান হয়ে গেল। আমার বিপরীতে ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। এন, টির প্রথম ছবি 'বিদ্যাপতি'র পর এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ ছবি। ছবিটি ফ্লপ করলেও গানগুলি কিন্তু ভাল হয়েছিল। বিশেষ করে একটি গানের কথা ও মাধুর্যে মন আবিষ্ট না হয়ে পারেনি। গানটি হোলো 'প্রিয় তোমার তুলনা নাই'। ঐ গানেরই একটি চরণ ছিল 'তুমি অসীম আকাশ আমি চিরনদী' কথাগুলি প্রায়ই মনে এক বিচিত্র অনুরণন তুলত। সত্যি-কারের পুরুষ যিনি তার ত আকাশের মতই উদার হওয়া চাই। আর সেই আকাশ তার নিজের রূপ দেখবে নদীর স্বচ্ছ বুকে। এইরকম নানা কল্পনায় মনটা উদ্বেলিত হয়ে থাকত।

১৯৪০ সালের ২০শে নভেম্বর কোলকাতায় এ ছবি মুক্ত হোলো। আগেই বলেছি এ ছবি আমার কর্মজীবনে কোনো আশাপ্রদ অধ্যায় রচনা করতে পারেনি বলেই মনস্তাপের কারণ ঘটেছিল। অভিনেত্রীরই হিন্দী ভার্সন 'হারজিৎ'।

তবে এ ক্ষতিপূরণ ঘটেছিল নিউ থিয়েটার্সের সর্বশেষ ছবি 'পরিচয়'এ। একটি নায়িকা ও তার দুই প্রণয়ীর সেই চিরন্তন ট্র্যাজিডী। একদিকে স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, অন্যদিকে প্রণয়ীর প্রত্যাশা উদ্বেল প্রেম। এই দুইএর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয়ের অজ্ঞাত অন্তর্জ্বালার এক করুণ কাহিনী হোলো 'পরিচয়'। ঐশ্বর্যের মধ্যেও রিক্ততা, প্রাচুর্যের মধ্যেও নিঃসঙ্গতার সীমাহীন অন্ধকার। প্রতিকূল পরিবেশের নির্মম কাঠিন্যে হৃদয়াবেগের আছড়ে পড়ার কাহিনীকে জীবন্ত করে তোলার মত কঠিন কাজেও অতি সহজে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলাম শুধুমাত্র অভিনয়দক্ষতার কারণেই নয়। জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র চিরদিনই আমায় টানে। তাই এইসব চরিত্র রূপায়ণে কখনও মনে হয়নি আমি অভিনয় করছি। সবসময় এই অনুভবই হয়েছে যেন অন্তরের সব রুদ্ধ বেদনাই উপযুক্ত প্রকাশ মাধ্যম পেয়ে আপনাকে মেলে ধরেছে।

যত কঠিন চরিত্র পেতাম আমার কাজের উৎসাহও ঠিক ততখানিই বেড়ে যেত। এ ছবিতেও আমার বিপরীতে ছিলেন সায়গল। আর আমাদের দুজনের গান 'পরিচয়'এর এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। 'আমার হৃদের তোমার আপন হাতের 'দোলে', 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে' এইসব রবীন্দ্রসঙ্গীত 'পরিচয়' ছবির পরই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আর ঐ দুটি গান আমিই সর্বপ্রথম রেকর্ড করি। একই সঙ্গে 'পরিচয়'-এর হিন্দী সংস্করণ হয় 'লগন'। ১৯৪০ সালেই এ ছবির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের এপ্রিলের আগে রিলিজড হতে পারেনি। 'পরিচয়'এর পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু, সঙ্গীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। নীতিন বসুর পরিচালনায় এই আমার প্রথম ছবি। নীতীনবাবু অভিনয়, চলাফেরার ব্যাপার আমাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন। ও'র সমস্ত লক্ষ্যটাই ছিল ফোটোগ্রাফির দিকে। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কোন বিশেষ ভঙ্গিতে ছবি নিলে অভিনীত চরিত্রগুলির বক্তব্য সেই কম্পোজিশনের মধ্য দিয়ে প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে তাই ছিল যেন ও'র বিশেষ অভিনিবেশের বিষয়। ক্যামেরা দিয়েই উনি চরিত্রকে কথা বলাবার প্রয়াসী ছিলেন। 'অন্যমনস্ক মুহূর্তের কোনো একটি ভঙ্গীতে মানুষ যেভাবে ধরা পড়ে কথাবার্তায় অতটা নয়। কারণ অসতর্ক মুহূর্তে নিজেদের ভাব ও ভাবনাকে সাজাবার অবকাশ থাকে না।' এটা ছিল ও'র প্রায়োক্তি। Art is never an exhibition but re-vealation, এই নীতিতেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

এ ছবিতে অভিনয় করেই আমি ১৯৪১ অব্দে বি. এফ. জে, এর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পাই।

(চলবে)

অনুলেখন—সন্ধ্যা সেন

প্যারডিরাজ রসরাজ

চিত্তরঞ্জন লাহা

অমৃতলাল বসু রসের রাজা, তাই তাঁর 'রসরাজ' উপাধিটি সার্থক। প্রহসনের সিদ্ধ সাধক অমৃতলাল প্যারডি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

প্যারডি পরাশ্রয়ী রচনা। মূলের ছাঁদটিকে বজায় রেখে ভাবটিকে লঘু করাই এর উদ্দেশ্য এবং টেকনিক। Barbara Hardy -র ভাষায় প্যারডি হল 'faithful to form and treacherous to matter' গুরু কথাকে লঘু কথায় নামিয়ে আনতে প্যারডি যেমন পটু তেমনি পারংগম। প্যারডির কাছে কেউ পার পায় না। প্যারডিরাজ রসরাজও কাউকে বাদ দেননি—জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ- সবাই তাঁর প্যারডি-প্র্যাকটিশের টার্গেট।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে প্যারডিরাজ প্যারডি রচনা করেছেন নিছক 'মজামারা'র জনাই, কাউকে সাজা দেবার জন্য নয়। আর প্যারডির আসল উদ্দেশ্যও তাই। প্যারডির উৎসে রাগ নেই, আছে অনুরাগ। প্যারডি তাই রাগিয়ে দেয় না, রগড় করে মাত্র। 'ভাবের ঘরে চুরি' করতে প্যারডি ওস্তাদ। প্যারডি তাই ভাবায় না, শুধু হাসায়।

অমৃতলাল তাঁর একটি প্রহসনের সমাপ্তিতে অনুরোধ জানিয়েছেন—

"(শুধু) একটুখানি তামাসা।
সং সাজায়ে রং বাজায়ে,
পাঁচজনেরে নিয়ে আসা।

———

হাসির কথা উড়িও হেসে,
বুঝবো কেমন মেজাজ খানা।।"

প্যারডিরচয়িতারও এটাই শেষ কথা, 'সবিনয় নিবেদন'।

শুধু বাংলায় নয়, সংস্কৃত শ্লোকের প্যারডি রচনাতেও অমৃতলাল সিদ্ধহস্ত। মুরগীমাংস-আহার লোলুপ ছকড়ির মুখে গীতার শ্লোক প্যারডির পাতে পরমান্ন (সব অর্থেই) পরিবেশন করেছে।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতিস্থাপক
যথা নিযুক্ত তথা কোর্মা নি।

জয়দেবের 'দেহি পদপল্লবম্'-এর এই প্যারডিটি পাঠ ক'রে পাঠকমাত্রেই পুলকিত হবেন :

"প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি
মান কর লো দান।
অহং আহাম্মখং বেরসিকং—
কিসে বুঝবো তোমার টান।।
বদসি যদি কিঞ্চিদপি—
তবু দেখতে পাই হে দাঁতের পাতি।
হরতি দম তিমির মতি—
দেখ বুকের ভিতর আঁধার রাতি।।
ত্বমসি মম শ্যামলং ত্বমসি মম মামলং,
ত্বমসি মম মক্কেল মহারত্নং।
বোয়েনীয়া ফুল-গঞ্জনং, মম হৃদয়-রঞ্জনং।।
তুমিই ভাল জান ময়ি দীনপতি যত্নং।
ভণ মধুর ভণিতা, জীবন্ত কবিতা,
আমি চরণ সাজাই আলতা দিয়ে।
উক্তি আপত্তি খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং,
দেহি পদপল্লব মুদারম্।।"

'রাই জাগো'র সুরে হিল্লোলার এই গানটি প্যারডি সাহিত্যের নব পদাবলী।

'বাবু জাগো জাগো যামিনী যে যায়।
যুবতী জেগেছে কবে আর কেন গো
বিছানায়।
এই বুঝি ভাই ভালবাসা,
মজা ক'রে ঘুমাও খাসা,
পাশেতে প্রেয়সী নাই,
খেয়াল কি হ'ল না হায়?
কালিদাসের কোকিল ডাকে
থাকিয়া থাকিয়া,
পিউ পিউ উঠলো ডেকে
রবিবাবুর পাপিয়া,
কোঁকর কোঁকর কুঁকড়ো ডাকে
তোমার রসনায়।
আর বকম বকম পায়রা ডাকে
আমার কবিতায়।।
ওঠ বাবু মুখ ধোও পর নিজ বেশ,
চায়ের বাটিতে মন করহ নিবেশ,
নইলে কলকল-ফোটা গরম জল
জুড়িয়ে বুঝি যায়।'

ব্রজধামের রাধা মান করে বলেছিলেন তিনি শ্যাম নাম আর শ্রবণ করবেন না। অমৃতলালের মরধামের নায়িকা মান করে পদাবলীবাসরে পার্থিব ভাষায় সেই কথারই তর্জমা করেছেন এইভাবে—

'বাবু নাম আর শুনাস্ নে কানে।
যাব না আর বাবুর কাছে,
শোব না তার উপাধানে।।
বাবু নাম নেব না মুখে,
বাবুরামকে দেব ঠুকে,
চেয়ে বাবু-পতির মুখে
কোন বাঁদী আর ঘোমটা টানে।।
বাবুর ছবি রাখবো ঢাকি,
পুষবো না আর বাবুই পাখি,
বাবুর্চিরে বলব ডাকি
চাকরি নিতে অন্যস্থানে।'

'শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখবো বলে হে......'—পদাবলীর এই পরিচিত পদটি নিশ্চয়ই শুনেছেন। এবার অমৃতলাল রচিত এই পদটির প্যারডি শুনুন (মানে পড়ুন; আর যদি পারেন তো নিজে সুর দিয়ে গুন-গুনিয়ে শুনুন)।

শ্রীমুখ-পঙ্কজ দেখবো বলে হে!
আজ এসেছি হেলে দুলে,
স্থান দিও ভাই চরণ তলে।
তাই এসেছি চশমা পরে,
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে,
যখন চশমা দেখে তোমার ছবি
তখন কবি ভাসে নয়নজলে।।
মানের রঙ্গে তুমি রঙ্গি,
তাই সেজেছি এ ফিরিঙ্গি,
এখন বাঁচাও প্রিয়ে চরণ দিয়ে,
পায়ে পড়ি হে পাপস হয়ে।
যদি তুমি না চাও চোখে,
(তবে) হুইস্কি খাব বেজায় রোখে,
ফেলব কেঁদে নেশার ঝোঁকে।

প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর পরিপাটি প্যারডি, অমৃতলালের রচনা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। 'গোপালে উড়ের মাথুর কীর্তনটা ছকড়ি এইভাবে গেয়েছে—

'এসেছে এসেছে আহা এসেছে আশায়।
পরে তামাচূড়া, প্রেমের কুঁকুড়া,
রাই, তোমারি বাসায়।।
রাই রাই রাই হে, ওহে সদা দাদা রাই!
গজেন্দ্রগামিনী মোরগিনী নন্দিনী,
বাবুজন-বন্দিনী পাখী পাখায়।
প্রভাতী ললিত গায় সুললিত
শুনে জাগরিত কুম্ভকর্ণ আপনি
যে হয়।'

মাইকেল রীতি এবং গৈরিশছন্দের নিম্নে উদ্ধৃত প্যারডিটি সত্যই চমৎকার—

'নব বধূ বেশে আমি দাঁড়ায়ে প্রাঙ্গণে,
দুধে-আলতায় পা-দুখানি দিয়া;
ভস্ম হল ঘরদ্বার দেখিতে দেখিতে,
তুমি মাগো সে আগুনে যাইলে জ্বলিয়া,
বেগুন ঝলসে যথা উনুন-মাঝারে।'

অমৃতলাল বাংলা সাহিত্যে সার্থক গদ্য-প্যারডির প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা। যেহেতু প্যারডি পরাশ্রয়ী রচনা, তাই আশ্রয় বা আলম্বন রচনা যত প্রিয় ও পরিচিত হবে আশ্রয়ী প্যারডিটিও ততখানিই মধুর ও মনোহর হয়ে উঠবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রীতির একটা বিশিষ্ট ছাঁদ বা প্যাটার্ন আছে—এবং সেই ছাঁদটি অননাসুলভ বলেই তার প্যারডি অমৃতলালের হাতে এতখানি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। 'বৌমা' নাটকের কিশোরীর একটি উক্তি তুলে ধরলেই বক্তব্যটি আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না। বৌমা বলেছেন,

'ধীরে প্রাঙ্গণ পার হইলাম, ধীরে চৌবাচ্চার পুলিনে গিয়া বসিলাম। চৌবাচ্চা তখন বসুমতী-জল-বাহিনী, কল-জল-বিহারিণী জলরাশিতে পরিপূর্ণ—টলটলায়-মান। সলিলরাশি স্থির ধীর প্রশান্ত; বীচি-শূন্য আটীহীন বেদানা।'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। তিরিশ ।।
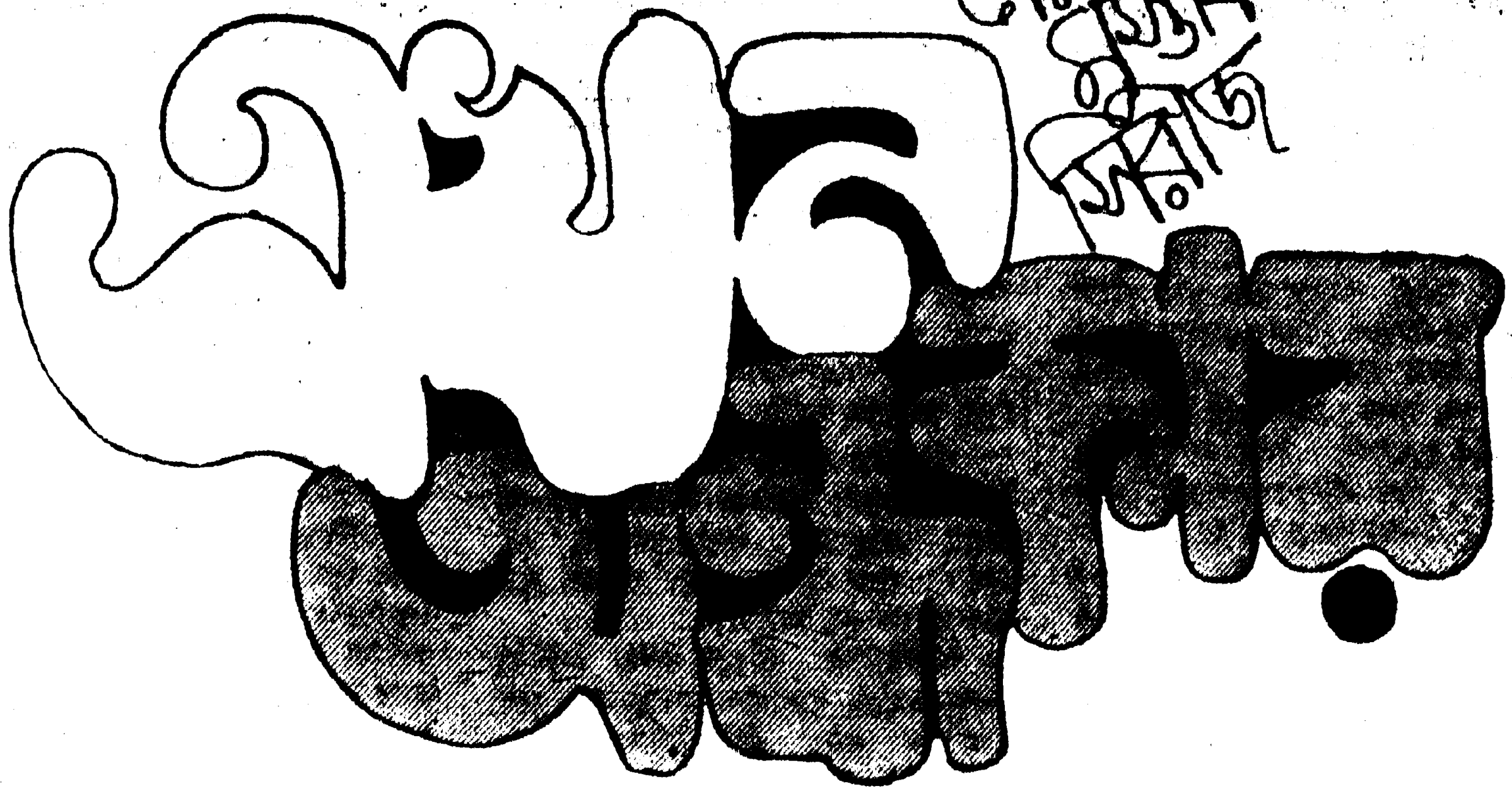
মুহূর্তে আশ্বস্ত হয়েছিল স্নেহধারা। চন্দনকে দেখামাত্র চকিতে যথারীতি আগের মতই সে মনে একটা অসম্ভব জোর পেয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এই চেহারা সেই জিরাগঞ্জের চাঁদুর। এমনি বর্ষার সন্ধ্যায় ভিজে গায়ে দৌড়ে বাড়ি ঢুকে সে চেঁচিয়ে উঠেছে, বউদি, বউদি! সেদিন দুঃখের সংসারে দারিদ্রের ঘরকন্নায় এই চাঁদু ছিল স্নেহধারার কাছে একটা সুন্দর মুক্তি। ওকে দেখামাত্র, ওর কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে বল পেত সেদিন। খেয়ালী মানুষ পরেশের চেয়ে কত নির্ভরযোগ্য ছিল এই যুবকটি! ওর হাতে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ঘর-দোরের চাবি দিয়ে স্নেহধারা যাত্রা শুনতে গেছে। সিনেমা গেছে। কত জায়গায় না নিরুদ্বেগে যেতে পেরেছে সে।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটক হল একবার। ওতে চন্দন মীরজাফরের পার্ট নিয়েছে সে রাতে। ক্লাইভ সেজেছিল সেজচৌধুরীদের নিমাই। ক্লাইভ পলাশীযুদ্ধ জিতে মীরজাফরকে বলবে—'লুক হেয়ার মিঃ জাফর আলি খাম, আর কেহ আপনাকে ক্লাইভের গাধা বলিবে না।' নিমাই করল কী, মুখ ফসকে স্টেজের মধ্যেই বলে বসল, লুক হেয়ার মিঃ জাফর আলি খাম, আর কেহ আপনাকে পরেশের গাধা বলিবে না!'...পরমুহূর্তে দর্শকরা হেসে তোলপাড়। নিমাইও অপ্রস্তুত। কী বদঅভ্যাস!

স্নেহধারা তখন বুঝতে পারেনি, কেন তারপর হঠাৎ চাঁদু নাটক পণ্ড করে অদৃশ্য হয়েছিল। সে পরে বুঝেছিল। পরেশ হেসে বলে তা শুনেই...তোকে সবাই পরেশের গাধা বলে নাকি রে চাঁদু? বলুক না—আমিও তো গাধা। আমি কার গাধা জানিস তো? তোর বউদির!

বন্ধুরা চন্দনকে 'পরেশের গাধা' বলে কি কম উত্যক্ত করত? রুমা—রুমাও কম যায় না। সেও কতদিন বলত, এই জামাই-বাবুর গাধা! চন্দন ওকে দুহাতে শূন্যে তুলে আছাড় দেবার ভয় দেখাত। সেইসব কথা হুড়মুড় করে মনে পড়ে গিয়েছিল স্নেহধারার।

ছোটখাট পরিবারটা বারান্দার তক্তা-পোষে বসে তখন বৃষ্টির রাতে পুরনো দিনের গল্প শুনছে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাছে। গ্যাঁদা নির্ভয়ে বারান্দার মেঝেয় বসে হাঁ করে চন্দনকে দেখছে। তার লালাভেজা জিভটা গলার ভিতর অব্দি দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পোকা উড়ে এলে সে হাত তুলে তাড়াচ্ছে। তার অন্য হাতে কয়েকটা মোমবাতি আর দেশলাই। বলা যায় না, কারেন্ট যেকোন মুহূর্তে চলে যেতে পারে।

...হ্যাঁ, সবাই রাগাত চাঁদুকে। আমি বলতুম, বেশ তো—তাই। গাধা গাধাই। মুখে বললেই তো সত্যি তুমি তাই হচ্ছ না ভাই।...স্নেহধারা হেসে উঠল।

মায়ের হাসি শুনে ছেলেমেয়েরা খিক-খিক করে হাসতে লাগল। হঠাৎ স্নেহধারা এদিক-ওদিক খুঁজে বলল, রুমা! রুমা কোথায় গেলি?

স্নেহধারার ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। বিছানা ফাঁকা। দরজা আজ একটু আগে খোলা হয়েছে। সারাদিন প্রায় বন্ধই ছিল। স্নেহধারা আবার ডাকল, রুমা!

রুমা পাশের ঘর থেকে জবাব দিল, কেন?

স্নেহধারা উঁকি মেরে দেখে বলল, অন্ধকারে কী করছিস? দেখছ কাণ্ড মেয়ের। চলে আয় এখানে, চলে আয় বলছি।

আমার শীত করছে বাইরে।...রুমার জবাব এল।

করবেই তো? বৃষ্টি থামলে তারপর এলেই পারতিস। চাঁদু সঙ্গে ছিল—ভয় কিসের? তারপর চন্দনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, এইজন্যেই সবাই বলে মজুমদারের শালী নয়, মজুমদারের বোন। হুবহু একই স্বভাব, এক অভ্যাস। নতুর বাবাকে বলতুম, বালিশে তুলো কম হয়েছে—তা প্রতাপপুর হয়ে আসার সময় খানিক তুলো এনো তো। ওখানে অনেক শিমুলের গাছ আছে—খুব তুলো হয়। আমার কপাল। নতুর বাবা বহরমপুর নয়তো একেবারে কলকাতা থেকে একগাদা আস্ত বালিশ এনে হাজির। আমি থ। তখন বলত কী জানো? বলত—বারে, তুলো আর বালিশ তো প্রায় একই জিনিস। বালিশভর্তি তুলো রয়েছে না?... সেই কাণ্ড করল আজ ওর শালী। গেল সাপুড়ে আনতে, নিয়ে এল চাঁদুকে। চাঁদু নাকি খুব সাপ মারতে পারে। কবে কোথায় সাপ মেরেছিলুম...স্নেহধারা প্রাণভরে হাসতে লাগল আবার। নতু-সনতু-মানতু-নানতু আর গ্যাঁদাও হাসতে লাগল।

এই হাসির মধ্যে পরিবারটির নিরাপত্তা-বোধও কাজ করছিল। আড়ালের ভয়ঙ্করতার কথা ভুলে গিয়ে ওরা বৃষ্টিপাতের স্বাদ নিচ্ছিল স্বচ্ছন্দ সুখে।

অবশ্য ওরা রুমার কথা কেউ ভাবছিল না। রুমার মনে এখন কী, জানতে পারাও তো সহজ নয়।

স্নেহধারা আরো কিছু ছোটখাটো গল্প শোনাল জিরাগঞ্জের বাসার। প্রায় সবই হাসির গল্প। এমনি বৃষ্টি-বাদলার সময় একবার ঘাটে পা পিছলে স্নেহধারা ভেসে যায় আর কী। না—চাঁদু তখন ছিল না

কাছাকাছি। ঘাটের নিচে একটা আকন্দ ঝাড় ছিল। ভাগ্যিস হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে ফেলেছিল!...তবে পরে চাঁদু যখন ব্যাপারটা শুনল, কী বলল জানিস গ্যাঁদা? চাঁদু বলল, ওই দ্যাখো—আজই রাসু সাহা ঘাটে জঙ্গল হচ্ছে বলে ঝাড়টা কাটতে এসেছিল—আমি দিইনি কাটতে। ঘাটটা দিনে দিনে ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে না? আকন্দ ঝাড়, তার নাকি চমৎকার ফল হয়! শোন কথা চাঁদুর! হ্যাঁ, বৃষ্টিমাসে গঙ্গা ওখানে যা হয়, কী রূপ কী চেহারা. উঃ, তার তুলনা নেই রে। গ্যাঁদা, তোরা তো খাঁটি রাঢ়ের মাটি—খটখটে মাটিতে থাকিস তোরা। ভাবতে পারিস, দুপারে দুটো শহর, রেলস্টেশন, মাঝখানে ভরা গঙ্গা? ট্রেন গেলে জল গুম-গুম করে। হুইসিল দিলে বন্দরে চলে যায় শিসের শব্দ কাঁপতে-কাঁপতে। আর তার ওপর ইলিশ! আহা হা হা...

স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছে স্নেহধারা। ওকে কেমন অস্পষ্ট আর দূরের মানুষ মনে হচ্ছে। অদ্ভুত মানুষ এই স্নেহধারা! এখন স্মৃতির মধ্যে থেকে ছোট ছোট সুখগুলো কুড়িয়ে সবাইকে দেখাচ্ছে। অথচ এখানে নিরাপদ জীবনে স্থিত হবার পর থেকে সারাক্ষণ পিছনের সেই জীবনকে অভি-সম্পাত দিয়েছে। ঘৃণা করেছে। জিয়াগঞ্জের কথা তুললে বিকৃত মুখে বলেছে, ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো! স্নেহধারার দোষ নেই। দুঃখ-দারিদ্র্যসঙ্কুল জীবনের স্মৃতি কে খুঁড়ে দেখতে চায়! ভয় করে। নিজেদের বড় ছোট মনে হয় সংসারে। ও তো পিছনের কলঙ্ক। কে চায় নিজের জামা তুলে পৃষ্ঠক্ষতের চিহ্ন দেখাতে।

স্নেহধারা এখন বলছে, যাই বলো ভাই চাঁদু—তখন আর কিছু না থাক, মনে সুখ-শান্তি ছিল। সবসময় মনে ধুকপুকুনি ছিল না এখনকার মতো। আঃ পয়সাকড়ি না থেকেও স্বস্তি নেই—থেকেও স্বস্তি নেই। আমাদের চেয়ে হাঘরেরা—ওই যারা পথে পথে গাছতলায় এসে থাকে, আবার চলে যায়—খুব ভালো থাকে।

গ্যাঁদা বলল, এবারও এয়েছিল দিদি। জ্ঞানবাবুদের ওখানে। খুব ঝগড়াঝাঁটি হল। ছুরি বের করেছিল একটা হাঘরে। তা'পরে...

লতু বলল, অনেক গাধা এনেছিল ওরা।

মানতু বলল, না দিদি—ঘোড়া, ঘোড়া!

গল্প অন্যদিকে চলে যাচ্ছে দেখে স্নেহ-ধারা ধমকাল।...চুপ কর তো তোরা। আচ্ছা চাঁদু, সেই যে নাদু মিত্তির ছিল, খুঁড়িয়ে হাঁটত, রাস্তায় ময়লা দেখলেই চেঁচিয়ে গাল দিত— সে বেঁচে আছে? একবার রুমা করেছে কী—তখন বছর পাঁচের মেয়ে, বুঝলি লতু, রাস্তার ধারে জেনে বসে... হাসিতে ভেঙে পড়ল স্নেহধারা।

লতুরা চেঁচিয়ে উঠল কোরাসে—কী, কী মা? কী করেছিল মাসি?

স্নেহধারা বলল, ওকেই শুধো কী করেছিল মুখপুড়ী মেয়ে। নাদু মিত্তির কখন আচমকা এসে চুল ধরেছে খামচে! সে কী কান্না মেয়ের! লোক জড়ো হয়ে গেল। লতুর বাবা নেই ঘরে। আমি রুমাকে ছাড়িয়ে এনে যা মার দিলুম! তারপর কখন মেয়ের পাত্তা নেই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, রুমা আর আসে না। রাত হল, রুমা আর আসে না। লতুর বাবা বলল, চাঁদুদের বাড়ি খুঁজেছ?

লতু চন্দনের দিকে তাকিয়ে বলল, তারপরে? পেলে মাসিকে?

স্নেহধারা বলল, পেলুম। তোমার মাসি তখন দিব্যি খেয়েদেয়ে পেটটি মোটা করে চাঁদুবাবুর বিছানায় ঘুমোচ্ছে। চাঁদু দেয়ালে হেলান দিয়ে স্কুলের পড়া করছে। আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখে চলে এলুম।

চন্দন অনুচ্চস্বরে বলল, সেবারই আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। মনে পড়ছে।

স্নেহধারা হাসতে হাসতে বলল, ওই মেয়ে হাগলে জলশৌচ করাবে কে—না চাঁদু! ওকে চান করাবে কে—না, ওই চাঁদু। ওকে ভূতের গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াবে কে—না, চাঁদু।

বৃষ্টিরাতের বাড়িতে একটা গভীর আবহসঙ্গীত বাজাচ্ছিল স্নেহধারা। সেই সঙ্গীতের সুরে জেগে উঠেছিল একটা অতীতকাল—যা এখন অন্ধকার। নিপুণ কথকের মতো স্নেহধারা স্মৃতির রামায়ণ পাঠ করছিল। আবিষ্ট মুখে তাকিয়ে ছিল সবাই।

শুধু একজন—রুমা. রুমা তার ঘরে। তার খবর কেউ জানে না।

হঠাৎ খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্নেহধারা। গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইল বৃষ্টির দিকে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বলল, আজ সবাই বলছে—চাঁদু মজুমদারের টাকা মেরে বড়লোক হয়েছে। চাঁদু গাড়ি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে। কত বদনাম সবাই দিচ্ছে চাঁদুর নামে—সত্যি-মিথ্যে সাত-পাঁচ যা নয়, তাই রটাচ্ছে। রটাক, বলুক। ওই তো মানুষের অভ্যেস। কারো সুখ সহ্য হয় না—কারো না। প্রথম প্রথম লতুর বাবার নামে কি কম বলেছে সবাই? বলে কীই বা করতে পেরেছিল? বাংলোবাড়ির সেই ছেনাল মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে কত কথা বলেছিল। এখনও বলে। বলে, মজুমদার নাকি ওই বেশ্যার জন্যেই নিজের প্রাণ দিয়েছে!...বিকৃত মুখে স্নেহ-ধারা বলতে লাগল।...মুখে সব কুষ্ঠ হবে। খসে যাবে। আজ যারা চাঁদুকে সাত-পাঁচ বলছে, তাদেরও মুখে কুষ্ঠ হবে—খসে যাবে। গলে-গলে পড়বে। হ্যাঁ, তুমি দেখে নিও।

গ্যাঁদা হাই তুলে বলল, খাবে না গো সব? রাত হয়েছে যে।

স্নেহধারা ধমকাল।...থাম ছোঁড়া!... পরক্ষণে হঠাৎ গলা চড়িয়ে দিল। যেন সারা রূপপুরকে শোনাতে চাইল সে।...চাঁদু মজুমদারের টাকা মেরেছে, গাড়ি বাড়ি কিনেছে—বেশ করেছে। চাঁদু মজুমদারের কে, তা তোরা জানিস ছোটলোকরা? সে বেঁচে থাকলে আজ চাঁদু যে আরও কত কিছুর মালিক হত. কত টাকাকড়ি জিনিস-পত্র যৌতুক পেত—হিসেব করেছিস কেউ?

চন্দন উঠে দাঁড়াল।...বউদি, বেজায় এলুম—তা কিন্তু বলা হয়নি এখনও। রাত নটা বাজে।

স্নেহধারা তার দিকে ঘুরে বলল, কী?

সাপ!

ওমা! ভুলেই গেছি।...স্নেহধারা হন্তদন্ত উঠল।...সন্তু নান্তু, ঘুমোস না। কাকু সাপ মারবে দেখবি—ওঠ, ওঠ। গ্যাঁদা, টর্চটা কই?

গ্যাঁদা বলল, ওই তো তোমার পাশে।

লতুরা ঘুম ঝেড়ে ফেলে উত্তেজিত মুখে সোজা হল। স্নেহধারা বলল, গ্যাঁদা, লাঠিগাছটা কই?

গ্যাঁদা পিঠের ছায়া থেকে একটা ছোট মোটা লাঠি বের করে বলল, এই নিন বাবুদাদা।

স্নেহধারার ঘরে রডলাইট জ্বলছে। চন্দন টর্চ আর লাঠিটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঠাকুরঘরেও আলো আছে—তবে চাঁদের ওয়াটের বালব, আলো অনুজ্জ্বল। সতর্ক ভাবে ঠাকুরঘরে ঢুকল সে। বাইরে দরজার মুখে বারান্দায় সবাই ভিড় করে দেখছে রুমা পাশের ঘরে রয়েছে। এঘর থেকে ওঘরে যাবার দরজাটা খোলা। পর্দা একপাশে গোটানো রয়েছে। তবু তাকে দেখা যাচ্ছে না—ঘরটার আলো জ্বলেনি।

চন্দন বলল, ঠাকুরের ছবিটির কিন্তু সরাতে হবে বউদি।

স্নেহধারা বলল, সরাও ভাই। উপায় তো নেই। তুমি তো আর বেদে মুসলমান বেজাত নও যে মনে কিন্তু করে বলব।

গ্যাঁদা ফোড়ন দিল।...রুস্তম কাকার এলে ছুঁয়েটুয়ে বারোটা বাজাত।

সবাই হাসতে লাগল। চন্দন সাবধানে টর্চের আলোর একটা করে জিনিস তুলে তাকে রাখতে লাগল। সবগুলো সরানো হল। ধুপচি, গঙ্গাজলের ঘটি, থালা—সবকিছু। কিন্তু কোথাও কোন সাপ নেই।

চন্দন ভালভাবে ছোট্ট ঘরটা পরীক্ষা করে এসে বলল, নাঃ—সাপটাপ নেই। কী দেখতে কী দেখেছে সব।

লতু প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, না না। আমি দেখেছি, মাসি দেখেছে। মাসি, ও মাসি! এসে বলে যাও না!

রুমার জবাব এল না।

চন্দন বলল, তাহলে চলে গেছে কখন। নেই।

স্নেহধারা বলল, যাবে কোন পথে? দরজা তো বন্ধ ছিল। তুমি এ ঘরটাও দেখ ভাই।

এঘরে অনেক আসবাব। খাট আলমারি বাকসো—ঠাসাঠাসি জিনিসপত্র। একটা করে সরাতে থাকল চন্দন। গ্যাঁদাও গিয়ে হাত লাগাল। কোথাও সাপটা নেই।

এবার পাশের ঘর—যেঘরে রুমা আছে। স্নেহধারা কড়াস্বরে বলল, রুমা! আলো জেলে দে। ওঘর দেখবে।

জবাব এল, এঘরে কিছু নেই।

তুই জেনে বসে আছিস, সেই!...স্নেহ-ধারা পরক্ষণে হেসে ফেলল।...যত ভয় তো রুমারই! তা জানো চাঁদু? সবজান্তা পাশের

দিকে চোখ করে ঘুরছে ও। কাল রাতে বাইরের ঘরে গিয়ে শুলুম সবাই। ও শুল টেবিলে। আমার তো ঘুম কখন গেছে। দেখি রুমা চলতে চলতে চমকে উঠছে।

চন্দন হাসল।...হ্যাঁ, ঘরে সাপ দেখা গেছে—কথাটা শুনতে সহজ, কিন্তু এ যে কী মারাত্মক ব্যাপার, তা তো কেউ জানে না! কেন—সেবার বোসদের বাড়ি কী হয়েছিল?

স্নেহধারা ব্যস্ত হয়ে বলল, তুমি ওঘরটা দেখে দাও, চাঁদু।

টর্চের আলো ইচ্ছে করেই বিছানার দিকে ফেলল চন্দন। রুমা চিত হয়ে শুয়ে ছিল। আলো পড়তেই দুহাতে মুখ ঢেকে 'আঃ' বলে পাশ ফিরল। চন্দন গম্ভীর মুখে সুইচ টিপে বাতি জেলে দিল। উজ্জ্বল সাদা আলোয় রুমাকে কী অলৌকিক মনে হয় এখন।

গ্যাদা বলল, কই বাবুদা, টেবিলটা।

হ্যাঁ। বলে চন্দন টেবিলটা সরিয়ে কোণে টর্চের আলো ফেলল। এঘরে আসবাব কম। খাটের নিচে সাপ নেই। আলনার তলায় নেই। সাপটা ঢোকেনি এঘরে।

চন্দন বলল, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার অবাক লাগছে। এত পিছল সিমেন্টের মেঝে। সাপ এর ওপর একটুও এগোতে পারবে না। অসম্ভব। পুরনো চটে যাওয়া খসখসে মেঝে হলে কথা ছিল। তেলতেলে জিনিসের ওপর সাপ এল কেমন করে? এ কিছুতেই হতে পারে না বউদি। ওরা ভুল দেখেছে।

লতু বলল, কিন্তু আমি যে দেখলুম!

তোমার চোখের ভুল, লতু।...চন্দন হাসতে লাগল।

মাসিও যে দেখল!

তোমার মাসিরও চোখের ভুল!

লতু রুমার কাছে গিয়ে বলল, ও মাসি, বলো না এবার।

রুমা বলল, আঃ, চাঁচাসনে কানের কাছে।

স্নেহধারা বাঁকা ঠোঁটে বলল, ওর ওই মেজাজই ওকে খাবে। তোমরা দেখে নিও, বলে দিলুম। ভাগ্যিস সঙ্গে করে এনেছিলুম ন্যাকড়ার এইটুকুন পিণ্ডিটা—আজ মুখ ফুটেছে। সবাই একদিকে তো, উনি আরেকদিকে।

স্নেহধারা চটে উঠেছে, বোঝা যায়। আসলে হয়েছে কী, আজ বৃষ্টিঝরা রাতের জমজমাট ঐকতানে কোথায় যেন একটা যন্ত্র বেসুরো বাজছিল। সেটা রুমা। তাই স্নেহধারার ক্ষোভ।

রুমা বলল, এনেছিলে কেন? রাত্তিদিন এমনি করে খোঁটা দেবে বলে? ...পরক্ষণে সে উঠে বসল। সবাই অবাক হয়ে গেল ওর মূর্তি দেখে। ...কতদিন—কতকাল এমনি করে খোঁটা খেতে হবে দিদি? তোমার সংসারে উড়ে এসে জুড়ে বসেছি—একথাটা একমুহূর্তও তো ভুলতে দেখিনে কখনও। তাছাড়া, আমি তো জানিই—তোমার সংসার তোমার। তাই তো আমি বাইরে-বাইরে থাকি বরাবর। বলো তুমি, থাকি কী না।

তারপর সে উঠে দাঁড়াল। কান্না চাপতে চাপতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। বারান্দায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃষ্টির ছাট এসে পড়ছিল তার গায়ে।

হঠাৎ এমন একটা অনাছিষ্টি অভাবিত ব্যাপার ঘটবে, কেউ আশা করেনি। সবাই হাঁ করে পরস্পর মুখতাকাতাকি করছে। চন্দন বেরিয়ে এল। রুমার একটা ব্যাপার এতদিনে তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। রুমার এই সংসারের সঙ্গে যেন গভীরে কোন যোগ নেই। রুমা নিজেকে উন্মূল মনে করে। ভেবে দেখলে, রুমার এই বোধের মধ্যে সত্য আছে বইকি। তাকে অনাথ মেয়ে হিসেবে সঙ্গে এনেছিল স্নেহধারা। জামাইবাবু পরেশ মজুমদার যে চোখেই দেখুক, আসলে তো রুমা সামাজিক রীতি অনুসারে একজন আগন্তুক, একজন বহিরাগত। অত ছেলেবেলা থেকে রুমা তাহলে এই বোধটা মনে মনে পালন করে আসছে!

হ্যাঁ, তাই। স্মৃতি খুঁজে দেখলে এই সত্য বেরিয়ে আসে। চন্দনের সঙ্গে রুমার সব সম্পর্কের মূল ভিত্তিটা তো রুমার এই উন্মূলতার বোধটাই। পরেশের স্নেহ যত খাঁটি হোক, রুমার কাছে তা সৌখিনতা বলে গণ্য হতে বাধ্য। রুমা এ বাড়ির বাগানে একটা সখের তরুণ গাছ—এবং সেই গাছটা সামাজিক রীতি অনুসারে অন্যখানে দ্বিতীয়বার রোপিত হয়ে থাকে, এবং মহীরুহ হয়। রুমা কেন, সব মেয়েই—এদিক থেকে ভাবলে বড় গাছের চারার মত একটা সংসারের মাটিতে আর জলেরোদে-বাতাসে অঙ্কুরিত হয়ে মাথা তোলে—তারপর একদিন তাকে দ্বিতীয়বার অন্য সংসারের মাটিতে পুঁততে হয়। এটাই নিয়ম পৃথিবীতে।

স্নেহধারা ভাবপ্রবণ মেয়ে। ওর আবেগগুলো অদ্ভুতভাবে আসে আর চলে যায়। কখন কোনদিকে সে আবেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—তা অনিশ্চিত। চন্দন তাকে হাড়েহাড়ে চেনে। আজ এখন স্নেহধারা তাকে নিয়ে উৎসাহে আনন্দে মেতে উঠেছে—কালই যদি গোমড়ামুখে ঠাণ্ডা স্বরে উল্টো কথা বলে বসে, অবাক হবার কিছু নেই। পরেশ বলত, লতুর মা বড্ড আনপ্রেডিকটেবল মেয়ে, বুঝলি চাঁদু? ও ঘড়ির পেণ্ডুলাম একটা দিক থেকে আরেকটা দিকে শুধু দোলে না—দশদিকে চক্কর খায়। আমাকে হেলে করে ছাড়লে রে।.....

স্নেহধারা ততক্ষণে আরও চটে গেছে। হয়তো চন্দনের সামনে রুমা ওইসব কথা বলে বসেছে বলেই তার রাগ হয়েছে। সে তেতোমুখে বলে উঠল, কী বলল শুনলে তোমরা? আমি ওকে পর ভাবি—পর করে রেখেছি? আশ্চর্য চাঁদু, আশ্চর্য! এমনি করে ও সবার সামনে বলবে, আর লোকে ভাববে—আমি ওকে কী অত্যাচার না করি! ওকে পর করে রাখি! এত নেমকহারাম স্বার্থপর মেয়ে তুই!

রুমা কোন জবাব দিল না। চন্দনের মনে হল, রুমা নামে একটি মেয়ের ওপর পৃথিবীর সবাই মিলে—এমনকি নিজেও যেন, নিরন্তর উৎপীড়ন চালিয়ে আসছে। এত কাঁদতে হয় ওকে—এখনও। সারা ছেলেবেলাও এমনি করে বারবার কাঁদতে হয়েছে রুমাকে। চন্দন নিজেও কতবার কষ্ট দিয়ে কাঁদিয়েছে বেচারাকে। এটা ঠিক নয়, এটা ঠিক হচ্ছে না। কেন ওর মুখের সবটুকু সুখ আনন্দ আরামের আলোয় উজ্জ্বল থাকবে না, জমে থাকবে কোথাও-কোথায় কিছু কালোছায়া! কী পাপ করে পৃথিবীতে আবার জন্ম নিয়েছে সে?

চন্দনের ইচ্ছে হল, পুরনো দিনের মতোই, এক্ষুনি রুমাকে দুহাতে শূন্যে তুলে নিয়ে চলে যায়। চন্দনের ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে, আমি আছি রুমা—আমি আছি! কিন্তু কিছু করা গেল না। একটা আমেজ তাকে মনে মনে কাতর করে রাখল শুধু। চন্দনের দেহমনে অনেক পাপের ময়লা লেগে রয়েছে—আর ওই একটা শুদ্ধ নিষ্পাপ ফুলের মতো মেয়ে, তাকে ছুঁতে বড় দ্বিধা জেগে উঠল এতক্ষণে। যে মরীয়াপনা, যে চরম বোঝা-পড়ার আবেগ তাকে বৃষ্টির মধ্যে রুমার পিছনে দৌড়ে আসতে বাধ্য করেছিল তাকে, তারা এখন যেন পরস্পর মুখতাকাতাকি করতে লাগল। সে সাপের কথা তুলে দুই বোনের সংঘর্ষ শান্ত করতে চাইল।...... বউদি, বর্ষাবাদলার রাতে চ্যাঁচামেচি ভালো নয়। এখন সাপের ব্যাপারটা ভাবা যাক,

এল। সাপ আসলে আসেইনি—এই পিছল তেলতেলে জায়গায় আসা তার পক্ষে অসম্ভব। অতএব, সাপটা চোখের ভুল।

লতু কী বলতে যাচ্ছিল, গ্যাঁদা বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু ধাঁধা যাবে না যে বাবুদাদা!

হ্যাঁ—ধাঁধা। ...চন্দন একটু হাসল।... বুঝলে বউদি, সাপটা মনের সাপ।

লতুরা হেসে উঠল। কী বুঝল, তারা নিজেরাও জানে না অবশ্য। হাসল না স্নেহধারা। বিকৃত মুখে সে বলে উঠল, ঠিক বলেছ—চমৎকার কথা বলেছ। মনের সাপ! ওর মনে যে সাপের বাসা, সাপ ঢুকে আছে, ও সাপ দেখবে না তো কে দেখবে? ...তারপর অকারণে লতুর মাথায় একটা ঠেলা দিয়ে সে বলল, এই হতচ্ছাড়ীটাও এরই মধ্যে চোখে ভুল দেখতে লেগেছে। ওর পাল্লায় পড়ে এও এরই মধ্যে পাকতে লেগেছে। আজ ওবেলা দুদুবার লোক পাঠালুম—কোথায় যাচ্ছিস ওর সঙ্গে, তা এক বাঁদরমুখী মেয়ে? ওর চোখ ফুটেছে, বাড় বেড়েছে—ও বনজঙ্গল চষে বেড়াক, যেখানে খুশি যাক, তুই গেলি কেন ওর সঙ্গে? এ্যাঁ? বল, কেন গিয়েছিলি? সারাবেলা যে ভিজলি, অসুখ হলে কী হবে?

লতুর চুল খামচে ধরল স্নেহধারা। লতু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। চন্দন বাধা দিয়ে বলল, আঃ, ওকে মারছ কেন? ছাড়ো, ছাড়ো বউদি।

আসলে হয়েছে কি, সারা বিকেল ঝড়-জলে বাইরে কাটিয়েছে লতু আর রুমা, নাবালক সন্তুরা বাড়ীতে অসহায় হয়ে মনমরা বসে থেকেছে—সেই জমে-ওঠা রাগটা এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছিল স্নেহধারার। সে ঠাস করে লতুকে একটা চড় মেরে বলল, বল, আর কখনও যাবি? যাবি, বল?

চন্দন দু হাতে ওকে টেনে তফাতে নিয়ে গেল। রুমা একবার ঘুরে দেখল শুধু।

স্নেহধারা সগর্জনে বলল, সব্বাইকে খারাপ করে ছাড়বে ও। ভেবেছে কি? সে মাথার ওপর ছিল, যা খুশি করেছে—এড়িয়ে থেকেছি। সংসারের মালিক যখন আছে, সেই দেখুক সব। কিন্তু এখন তো আমি সইতে পারব না। ইচ্ছেমত যা খুশি করবে, তাই বসে-বসে দেখব ভেবেছ তোমরা? আমার গায়ে কি মাছের রক্ত?

রুমা শান্ত চাপা স্বরে বলল, কি করেছি দিদি? যা-খুশিটা কি, বলবে?

নিজে বুঝে দেখ বোন—কি করেছ না-করেছ। আমি কি বলব?...স্নেহধারা রান্নাঘরের দিকে এগোল।...সন্তু মানতু, আয়। খেতে দিই। গ্যাঁদা, নানতুকে ওঠা।

যেতে যেতে আবার ঘুরল স্নেহধারা। চন্দনের কাছে এসে চাপা গলায় বলল, পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে লাগল। রূপপুর কি জায়গা—তা তো দেখছ, ভাই। ভেবে দেখলুম যেখানে ওর মন মিলেছে সেখানেই চলে যাক কাজটা। বাবা-মা নেই মাথার ওপর কেউ পুরুষমানুষ নেই—একদিন না একদিন দিতেই হবে কোথাও — তাই সব ঠিকঠাক করে ফেললুম। দিনক্ষণ সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল। এদিকে কলেজও যাওয়া ছেড়েছে। যা সেকেলে গোঁড়া ফ্যামিলি ওরা—নিজে হেড মাস্টার হলে কি হবে, হাড়ে হাড়ে অন্য রকম। নৈলে আজকালকার দিনে কারো বাড়ীর গিন্নি মাথায় এক হাত ঘোমটা দিয়ে বেরোয়? আমার মন ছিল না ভাই—সত্যি বলছি। যখন বললে, না-না—তা কি করে হয়! আমার বাড়ীর বউ সবার ভিড়ে দুবেলা বাসে চেপে কান্দী কলেজ করতে যাবে? শুনে আমার তো খুব খারাপ লাগল। লতুর বাবা বলেছিল, এম-এ পড়াবে — কলকাতায় হোস্টেলে রাখবে!...হ্যাঁ, যাচ্ছি। গ্যাঁদা, নিয়ে চল এদের।...তা শেষঅব্দি ভেবে দেখলুম, মেয়ের ইচ্ছে যখন, তখন তাই হোক। আর ছেলের কথা আর বলো না—কথায় বলে 'গেনে-গুনে-কেত্তনে এই তিনে উচ্ছন্ন'—একেবারে বাউণ্ডুলে!...হ্যাঁ যা বলছিলুম। সামনের মাসের একুশে তারিখ বিয়ের দিন। এদিকে পাত্রীর মূর্তি অন্য রকম। যেন সব কিছু আমার করা, ও কিছু জানে না! হ্যাঁ গো, তাই বলল সোজাসুজি। আমি তো শুনে থ। তার ওপর কাল বিকেলের কাণ্ড শোন। ঝড়জলে ছেলেটা ভিজতে ভিজতে এসে বাড়ী ঢুকেছে—তাকে সেই মুখেই তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, এমনি করলে কে তোকে উদ্ধার করবে বোন? কেউ তো মুখে...

অশ্লীল বাক্যটা আর উচ্চারণ না করে স্নেহধারা চলে গেল গেল রান্নাঘরের দিকে।

চন্দন ডাকল, রুমা!

কি?

তোমাদের ঘরে সাপ নেই বলছিলুম—কথাটা উইথড্র করছি।

রুমা কোন জবাব দিল না।

কিন্তু এ সাপ তো চন্দন বের করে ধরতে পারবে না রুমা। বুস্তম ফকিরও না। চন্দন একটু হাসল।...এ সাপ তোমাদের বাস্তুসাপ।

রুমা একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি জিয়াগঞ্জ কবে যাবে?

একটা হাওয়া এল জোরে। বৃষ্টি ছড়িয়ে এল বারান্দায় অনেক দূরে। চন্দন বলল, কি বললে, রুমা?

বলছি, কবে জিয়াগঞ্জ যাবে?

চন্দন এক পা বাড়িয়ে বলল, কেন রুমা?

এমনি বলছি। তোমার গাড়ীটাড়ী তো পুড়ে গেছে। রূপপুরের ড্রাইভাররাও তোমাকে নাকি মারবে শুনেছিলাম। জিয়া-গঞ্জ পালানো ছাড়া তোমার তো উপায় নেই।

চন্দন শুকনো হাসল।...হ্যাঁ, তা তো নেই। কিন্তু ধরো, আমি যদি গায়ের জোরে থেকে যাই? তোমার বুঝি খুব ক্ষতি হবে?

হবে বইকি।

তোমার ক্ষতি করতেই তো বৃষ্টির মধ্যে তোমার পিছনে-পিছনে ছুটে এসেছি!

তাহলে জিয়াগঞ্জ ফিরে যাবে না তুমি?

ইচ্ছে করছে না।

রুমা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। রুমার চুলে বৃষ্টির ফোঁটা, কপালে, নাকের ডগায় বৃষ্টির ফোঁটা। কিন্তু চোখের নীচে গালের ওপরও কি তাই? সে পা বাড়াল হঠাৎ।...শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।...বলে সে ঘরে ঢুকে গেল।

কিন্তু চন্দন ঘরে ঢুকতেই রুমা সুইচ টিপে ঘরটা অন্ধকার করে দিল তক্ষুনি। তারপর আচমকা একটা গোড়াকাটা গাছের মতো সশব্দে চন্দনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। হু হু করে কেঁদে উঠল।...তোমার পায়ে পড়ি চাঁদুদা, আমাকে জিয়াগঞ্জ নিয়ে চলো। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না—আমি মরে যাব, চাঁদুদা!

অন্ধকার ঘরে তখন পুরনো সময়ের এক বহতা গঙ্গা তার কালো জলের স্রোত এনে ফেলেছে। চন্দন দু হাতে তুলে ধরেছে সেই বহতা জলের অলৌকিক শস্য—রূপোলী শরীর যে বালিকার, উরুতে স্নিগ্ধ ক্ষতের জলছবি আর দুটি নতুন স্তনের মাঝে পরম নীলাভ তিল! এই শস্যে পৃথিবীর একজনেরই অধিকার। শৈশব দিয়ে সে যৌবনকেও শাসন করতে পারে।

কখন রান্নাঘর থেকে স্নেহধারা এসে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে। একটু পরে গলা ঝেড়ে সে বলল, কি হয়েছে চাঁদু?

চন্দন অন্ধকার থেকে জবাব দিল, রুমা আমার সঙ্গে জিয়াগঞ্জ যাবে বলছে।

একটু চুপ করে থেকে স্নেহধারা বলল, তাই যাক। মনটা ভালো হবে, [illegible]

রুমা অন্ধকার থেকে [illegible] গলায় বলল, যাবো না তো তোমার সংসারে সবাইকে জ্বালাতে পড়ে থাকব নাকি? আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই?

স্নেহধারা এবার রাগ করল না। চোখ মুছে বলল, কেউ কাকেও বোঝে না—সবাই সবাইকে শত্রুর ভাবে। আমার দিকটা তো কেউ দেখল না।

চন্দন বলল, তুমি ওকে নিয়ে যেতে অনুমতি দিচ্ছ তো বউদি?

স্নেহধারা জবাব দিল, এতটুকুন থেকে হাতে গড়ে মানুষ করেছিলে—আজ না হয় বড় হয়েছে। ও তোমার সেদিনকার ছায়া, ভাই। তোমাকে না বলতে পারি? শুধু একটা কথা এখন মনে পড়ছে—যদি সেই লোকটা আজ বেঁচে থাকত!...এস, তোমরা খেয়ে যাও।

বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। খুব তাড়াতাড়ি বর্ষা এসে গেল এবার। এবং অনেক-অনেক দূরে জেলার মফঃস্বলে একটা ছোট্ট শহরের ধারে বহতা নদীটা এখন অন্ধকারে ফুলে উঠছে—দুলে উঠছে, এ বাড়ীর অন্তত তিনটি মানুষ তা জানতে পারছিল।

— শেষ —

নিমাই শাহের দরগার সামনে পাওয়া প্রস্তর স্তম্ভ (দিনাজপুর)

সোনার বাঙলা

শিপ্রা আদিত্য
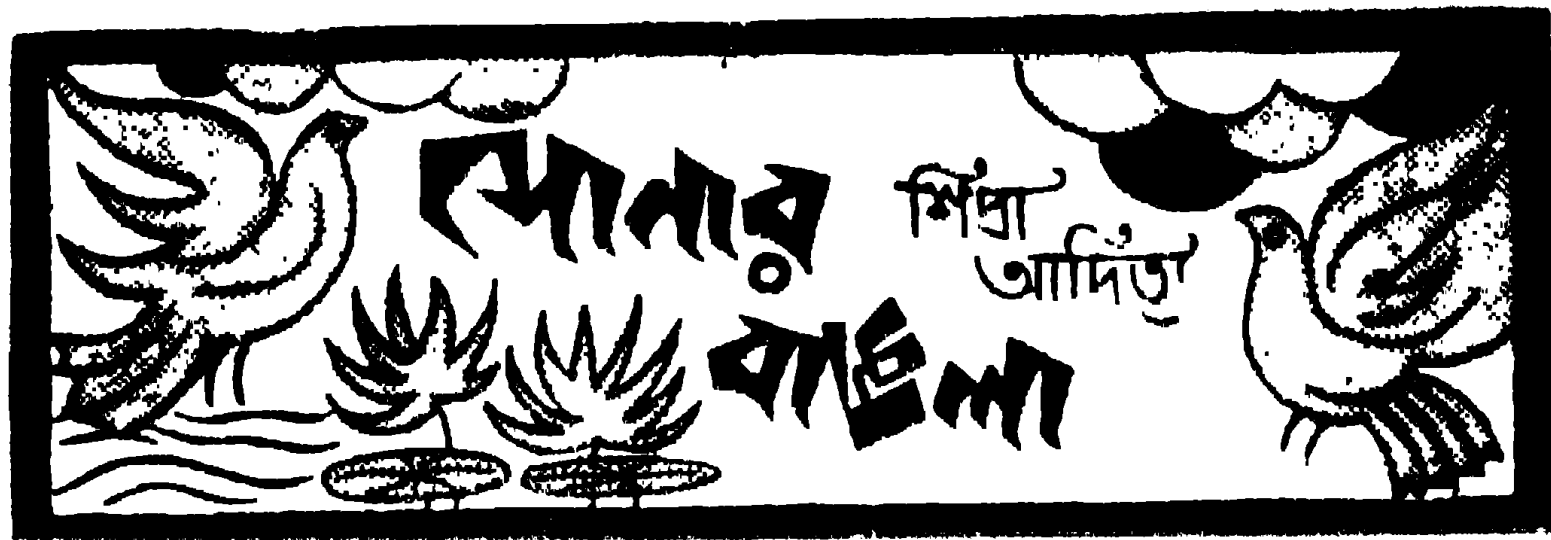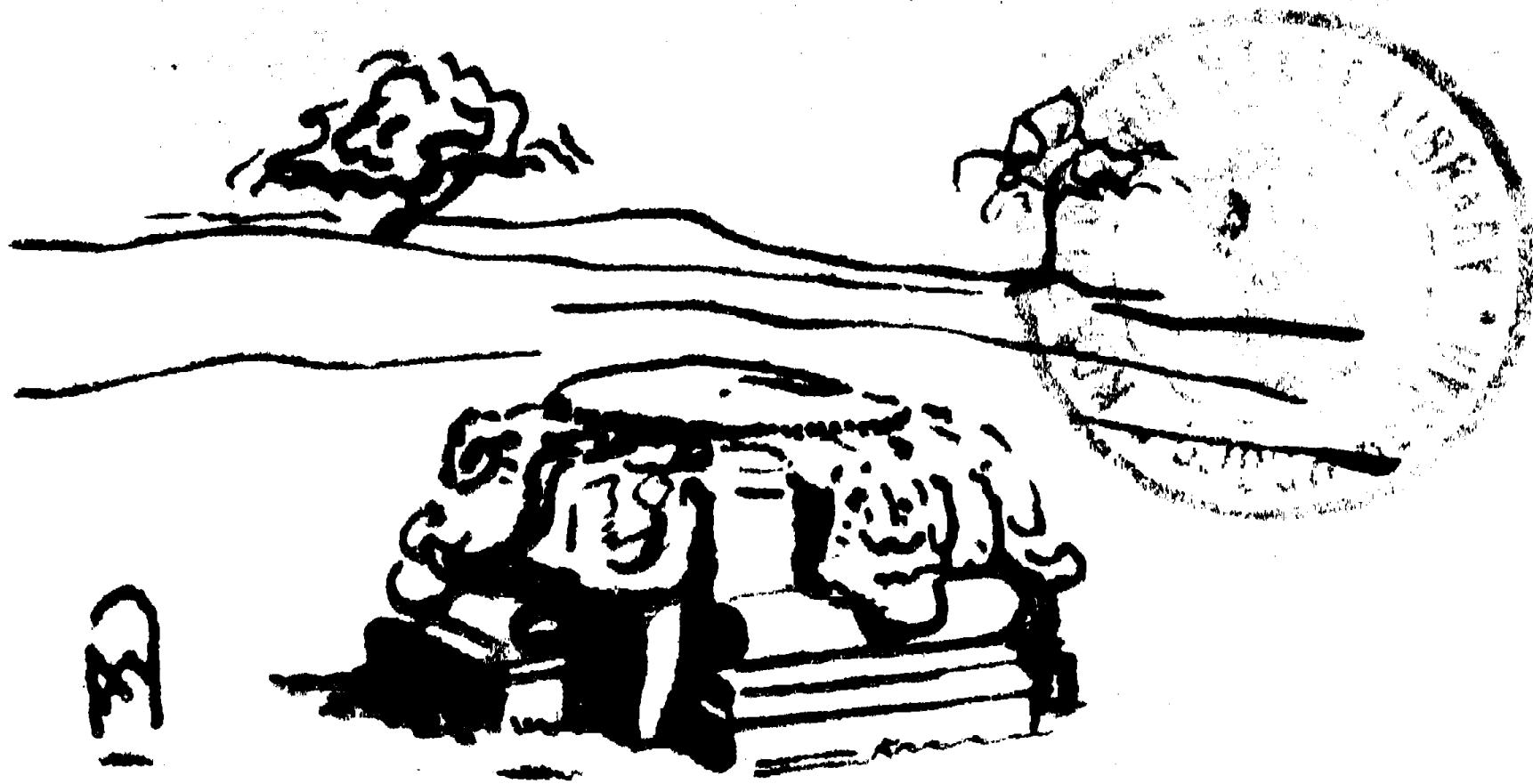
কান্তনগর : দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁ যাওয়ার পথে শহর থেকে বার মাইল দূরে কান্তনগর। এখানে এক অতি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রবাদ আছে মহাভারতের মৎস্যরাজ বিরাট-এর দুর্গ, দুর্গটি প্রায় এক মাইল স্থান জুড়ে। এর মধ্যে তিনটে উঁচু ঢিপি এখনও আছে। দুর্গের প্রাকার এবং জলাশয়গুলি জঙ্গলাচ্ছন্ন। এখান থেকে বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরটি এক বিশেষ দ্রষ্টব্য। মন্দিরটি 'নবরত্ন' মন্দির নামেই খ্যাত। ১৭০৪ খৃঃ দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ রায় দিল্লী থেকে কান্তজীর বিগ্রহটি এনে এই মন্দিরে স্থাপন করেন। অতএব ১৭০৪ খৃঃ মন্দিরটি তৈরী হয়। মন্দির স্থাপত্যটির গঠনশৈলী বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মন্দিরের সমতুল্য। কিছুদিন পরে ১৮৯৭ খৃঃ ভূমিকম্পে এটির বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। মন্দিরের গায়ে সুন্দর পোড়ামাটির কাজের (রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত) কিছু নিদর্শন আজো মেলে। পণ্ডিত মহলের ধারণা এগুলি কৃষ্ণনগরের কারিগরেরই করা। কান্তনগরের মাটির খেলনা আজও প্রসিদ্ধ। রাসের সময় এখনও মেলা হয়। মেলায় খুঁজে পাওয়া যায় হারিয়ে যাওয়া বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্পকে।

এসব ছাড়া দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে পুনর্ভবা নদীতীরে অসুররাজ বাণ-এর দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। দিনাজপুর থেকে ৫০ মাইল দূরে রুহিয়ার করম খাঁর গড় নামে এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মহারাজ প্রথম মহীপাল দেবের মহীপাল দীঘি নামে এক প্রকাণ্ড সরোবর আছে যেটি লম্বায় ৩,৮০০ ফুট, চওড়ায় ১,১০০ ফুট। জলাশয়ের ধারে বহু দেব-দেবীর মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আজো আছে। আঠার শতকের শেষদিকে টমাস নামে এক পাদ্রী সাহেব মহীপাল দীঘির পাশে এক কুঠি স্থাপন করেন।

বাসুদেব মূর্তি (একাআলা) দিনাজপুর

সুপ্রসিদ্ধ কেরী সাহেবও এই স্থানে এক নীলকুঠি স্থাপন করেন। শুধু তাই নয় এখানে এক ছাপাখানা তিনিই স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি এক ধর্ম-পুস্তক এবং এক সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে যান। সম্ভবত এটিই বাংলার সব প্রথম ছাপাখানা।

এসব ছাড়াও দিনাজপুরের গোরঘাট পুলিশ স্টেশনের কাছে সুরা মসজিদটি এক প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি।

অগ্রদ্বিগুণে এবং জগদ্দলে অনেক স্তূপের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যা আজো খোঁড়া হয়নি। তাহলে কতই না ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হবে।

নবাবগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের কাছে বাই-গ্রামে একটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে শিবমণ্ডপ। এছাড়া সাপাহারে মহারাজ দিব্যের এক জলাশয় জরাজীর্ণ অবস্থায় আজো আছে।

বগুড়া—

কলকাতা থেকে ১১৯ মাইল দূরে করতোয়া নদীতীরে বগুড়া শহর। ১৮২১ খৃঃ ইংরেজরা বগুড়াকে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত করে। সেকারণেই শহরের পথ-ঘাট সুন্দর ও খোলামেলা। বগুড়ার নবাব-বাড়ী এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য। শহরের 'সাতসড়ক'-ই বগুড়ার প্রাণকেন্দ্র। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭টি রাস্তা একত্রে মিলিত হয়েই এই সাতসড়ক।

বগুড়ার করতোয়া নদী এককালে প্রবল-স্রোতা ছিল এবং প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমি ও কামরূপ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। অনেক আগে করতোয়ার খাত দিয়েই তিস্তার জল পদ্মায় পড়তো। ১৭৬৭ খৃঃ ভীষণ বন্যায় তিস্তার গতি পাল্টে গিয়ে পূর্বদিক দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়ে। তখন থেকেই করতোয়ার পতন আরম্ভ হয়। অমরকোষে করতোয়ার অপর নাম 'সদানীরা'। গঙ্গা-যমুনার মত এটিও পুণ্যতোয়া। স্কন্দপুরাণে 'করতোয়া মাহাত্ম্য' নামে এক আলাদা অধ্যায় আছে। স্কন্দপুরাণে করতোয়াকে 'পৌণ্ড্র-গণের প্লাবনকারিণী' বলা হত। এই সব নানা কারণেই গঙ্গাস্নানের পুণ্যের মতই করতোয়া স্নানেরযোগ পঞ্জিকাগুলিতেও দেখা যেত।

বগুড়ার কাছেই বৃন্দাবনপাড়া নামে এক গ্রামে ক্ষৌণী নায়ক ভীমের জাঙ্গালের কিছু অংশ দেখা যায়। ভীমের জাঙ্গাল বগুড়া শহরের উত্তর-পূর্ব দিকের বৃন্দাবন-পাড়া, মহাস্থান গড়, চাঁদমুয়া, কীচক, শালদহ, ঘোড়াঘাট প্রভৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত। লালমাটিতে ঘেরা জাঙ্গালের মধ্যে মধ্যে এখনও প্রায় ২০ ফুটের মত উচ্চাবচ দেখা যায়। পর্যটক হান্টার সাহেবের লেখনী থেকে জানা যায়, তিনি বগুড়ার এই অঞ্চলটিকে অর্থাৎ ভীমের জাঙ্গালটিকে চীনের 'গ্রেট ওয়াল'-এর মত ইতালীর 'রিং ফোর্ট'-এর 'অঙ্গুরীয়ক দুর্গের' সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

দিনাজপুর রাজপ্রাসাদের একটি স্তম্ভ
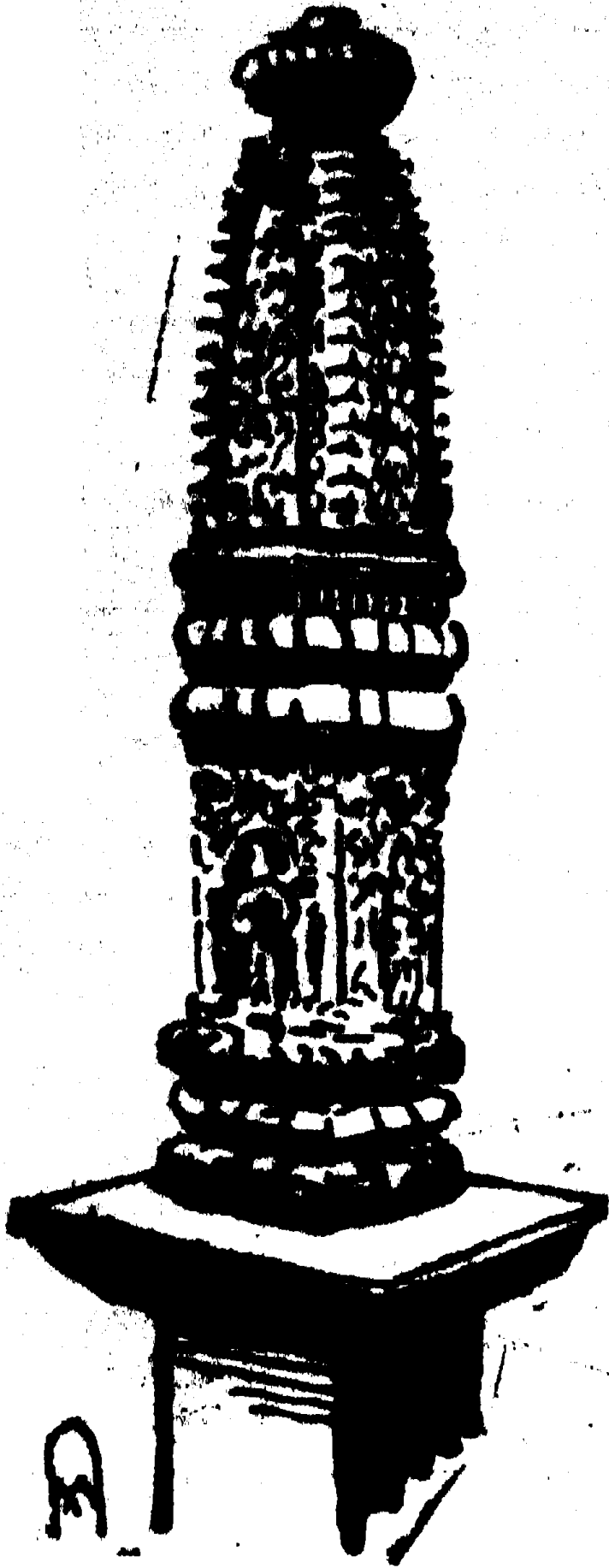
বগুড়া থেকে ৭ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে যোগীরভবন নামক গ্রামে নাথপন্থী কানফট যোগীদের এক দেবপুরী আছে। এই দেবপুরীটির মধ্যে এক অগ্নিকুণ্ড সর্বদাই জ্বালানো থাকে। দেবপুরীর বাইরে ভৈরব, দুর্গা, সর্বমঙ্গলা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি দেব-দেবীর মন্দির আছে। শিব-রাত্রি ও জন্মাষ্টমীর সময়ে এখানে উৎসব ও মেলা হয়।

বগুড়া থেকে ৬ মাইল পূবে দুর্গা-হাটা গ্রামে মুসলমান যুগের অতি প্রাচীন এক গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজো আছে।

জয়পুরহাট: বগুড়া স্টেশন থেকে মাত্র দেড় মাইল পশ্চিমে বেলআমলা গ্রাম। সে গ্রামের বিখ্যাত ধনী রাজীবলোচন মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিবমন্দির এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির বিচিত্র কারুকার্য সহজেই মন কেড়ে নেয়। এখান থেকে পাওয়া 'কাজীশ্রীগীতা' লিপিতে লেখা পাথরের চণ্ডীমূর্তি, সূর্যমূর্তি, বাসুদেব-মূর্তি, বুদ্ধমূর্তিগুলিও সুন্দর। বর্তমানে এগুলি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্র-শালায় রাখা আছে।

শেরপুর: বগুড়া থেকে শেরপুর দক্ষিণে ১০ মাইল দূর। শেরপুর বগুড়া জেলার দ্বিতীয় শহর ও প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান। মোগলযুগে এখানে এক দুর্গ ছিল। তখন এখানকার নাম ছিল শেরপুর মুরচা'। প্রাচীন দুর্গের কিছু কিছু চিহ্ন এখনো আছে। আইন-ই-আকবরী ও আকবর-নামাতেও এ ধরনের উল্লেখ আছে। বাংলার ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ দমন করতে এসে মোঘল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ কিছুকাল শেরপুরে বসবাস করে যান। তখন তিনি এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন তার ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। এছাড়া খানরা মসজিদ, বন্দেগী সদর জাহান মসজিদ নামেও একটি অতি প্রাচীন মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। শেষেরটি ১৫৭১ খৃঃ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নবাব মির্জা মুরাদ খাঁ কর্তৃক নির্মিত। শহরের বাইরে খেরুয়া মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থা হলেও এর শিলালেখটি অতি সুন্দর। শেরপুর শহরে তুরকান শহিদের শিরে-মোকাম এবং শহরের বাইরে ধড়-মোকাম নামে দুটি দরগা আজো আছে। প্রবাদ আছে—রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধে পীর তুরকান সাহেব নিহত হন। যেস্থানে তার ধড় এবং শির পড়েছিল পরবর্তীকালে সেস্থান দুটিতে তার ভক্তরা দুটি দরগা স্থাপন করে দেন। প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজী পীরের উৎসব মহাধুমধামের সঙ্গেই হয়ে থাকে।

শেরপুরের ৪।৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মুকুন্দ নামক এক জায়গায় রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। রাজপ্রাসাদে সামনে ও পিছনের অংশে বড় বড় কতকগুলি জলাশয় দেখা যায় যেমন চণ্ডীপুকুর, কাজীপুকুর প্রভৃতি। স্থানীয় লোকমত—বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে নিচু জাতের একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন পরে মেয়েটিকে বিবাহ করেন। এরূপ ঘটনা ঘটায় পুত্র (যুবরাজ) লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে বল্লাল সেনের মনো-মালিন্য হয়। তখন তিনি এক রাজপ্রাসাদ, নতুন এক নগরী করে বাকী জীবন এখানে বসবাস করে যান।

ভবানীপুর: শেরপুর থেকে প্রায় দক্ষিণে ১০ মাইল দূরে ভবানীপুর এক তীর্থস্থান। শেরপুর থেকে রাণীর জাঙ্গাল নামে এক উঁচু পথ ভবানীপুর পর্যন্ত গেছে। সাঁতৈলের রাণী সত্যবতী এটি নির্মাণ করেন বলে কথিত। একসময় এটির নাম ছিল 'ভাবড়া'। করতোয়া নদীতীরে এই গ্রামটিতে সতীর 'তল্প' পড়েছিল বলে জানা যায়। সেকারণেই শেরপুর মহাশক্তি মহাপীঠের ৫১-অংশের এক অংশ বলে খ্যাত। কথিত আছে মহাপীঠের অংশ গভীর অরণ্যে গুপ্ত অবস্থায় ছিল। মনোহর নামে এক উদাসীন পথিক ব্রাহ্মণ এটি আবিষ্কার করে পর্ণ কুটীরে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে জনৈক মুঘল রাজ-পুরুষ দেবীমূর্তিকে স্থানান্তরিত করেন সুন্দর এক মন্দিরে। দেবীর নাম অপর্ণা হলেও সাধারণের কাছে দেবী ভবানী নামে খ্যাত। এই দেবীর নাম থেকেই পরবর্তী-কালে ভাবড়ার গ্রাম ভবানীপুর হয়। ভবানীপুর নাটোরের রাজবাড়ীর সম্পত্তি।

মহারাজ দিব্যোর জয়স্তম্ভ (দিনাজপুর)
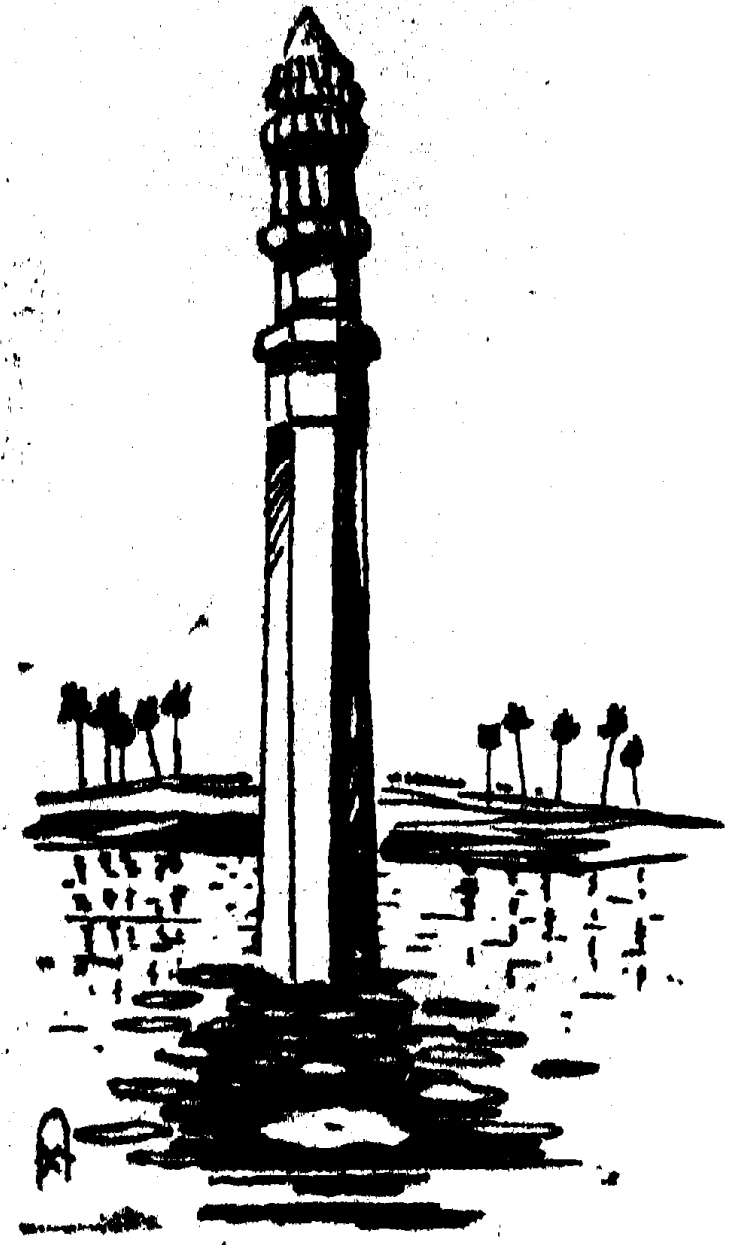
নাটোরের রাণী, ভবানী দেবীমন্দিরের পাশে বারদুয়ারী মন্দির নির্মাণ করেন এবং ভবানীশ্বর নামে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাণীর দত্তকপুত্র ম[illegible] রামকৃষ্ণ একজন উচ্চাঙ্গের সাধক [illegible]ন। তার সাধনার পঞ্চমুণ্ডী আসন আজও দেখতে পাওয়া যায়। এখানে পাঠাখেয়া নামে প্রকাণ্ড এক দীঘি ও জলটুঙ্গির ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। ভবানী দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে বহু কথকতা বা লোককাহিনী প্রচলিত আছে। এখানে শেরপুরের ভবানীপুরে প্রতি শ্যামাপূজায় ও রামনবমীতে মেলা বসে। সেকারণেই এটি একটি তীর্থস্থান।

শেরপুর থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে কাশীপাড়া এবং ৬ মাইল পশ্চিমে ক্ষিপ্রলক্ষ্মী গ্রাম থেকে বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। কাশীপাড়া থেকে পাওয়া অষ্টভুজ চামুণ্ডামূর্তি, ক্ষিপ্রলক্ষ্মী থেকে পাওয়া চতুর্ভুজা, মনসা, বৌদ্ধ স্ত্রীমূর্তি ও সূর্যমূর্তিগুলি সুন্দর।

সোনাতলা: কলকাতা থেকে ২১৬ মাইল। এটি একটি বড় গঞ্জ। স্টেশনের কাছেই গড় ফতেপুর নামে এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গটি কামতাপুরের রাজা নীলাম্বরের দুর্গ ছিল বলে জানা যায়। গৌড়ের হুসেন শা কর্তৃক রাজা নীলাম্বর পরাজিত হলে গড়-ফতেপুর মুসলমানদের অধিকারে আসে।

মহিমাগঞ্জ: মহিমাগঞ্জ স্টেশন থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে বর্ধনকোট এক প্রাচীন জায়গা। এই গ্রামের কাছে সর্বমঙ্গলা ও শ্যামসুন্দর নামে দুটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। মন্দির দুটির শিলালেখ থেকে জানা যায় যে ১৬০৯ খৃঃ রাজা ভগবান এই মন্দির দুটি প্রতিষ্ঠা করেন। ৮ মাইল পশ্চিমে 'বিরাট' নামক গ্রামে এক মাস ধরে মেলা বসে। এই মেলায় গবাদি পশুও বিক্রী হয়।

বঙ্গনবাব রঙ্গনায়িকা

ছোটি বেগম

অংশুরঞ্জন সেন
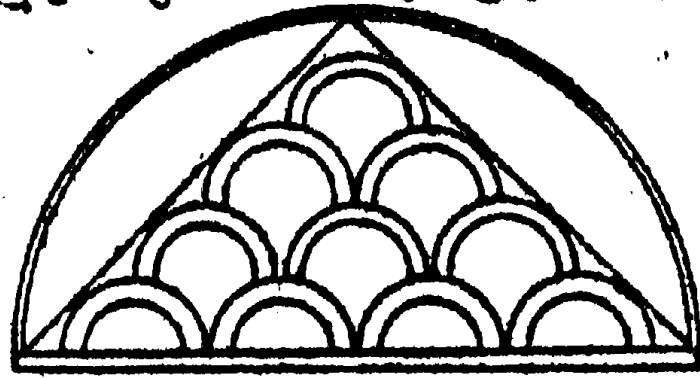
(তিন)

ছোটি বেগম

একদিকে কারুণ্য, অন্য দিকে ঈর্ষার অনল। এই দুয়ে মিলে গড়া আঠারো শতকের সেই নায়িকা। আসলনাম ছিল তাঁর মেহেরউন্নিসা। কিন্তু বাংলার সবাইয়ের কাছেই তিনি ছিলেন 'ছোটি বেগম', কারণ তাঁর স্বামীর পরিচিতি ছিল ছোট নবাব বলে। ইনিই বাংলার ইতিহাসের পাতায় ঘসিটি বেগম নামে এক বিশিষ্ট স্থান নিয়েছেন। পরে মতিঝিলে এসে থাকার দরুণ তাঁর নাম হয় 'মতিঝিলের বেগম'। এখানে বসেই তিনি শেষ পর্যন্ত ভাঙনের কলকাঠি নেড়েছেন। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যেমন করুণা বিলিয়েছেন, তেমনি স্বার্থ-সিদ্ধির কপাট উদ্ঘাটনে প্রিয়জনকেও ঠেলে-ছেন পতনের পথে। তাঁর জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কয়েকটি ঘটনা ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। এই বিচ্ছেদ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে পলাশীর যুদ্ধে। পতন ঘটে নবাবের আর ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের হয় প্রতিষ্ঠা।

নবাব আলিবর্দী তাঁর ভাইপো নোয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর সংগে বড় মেয়ে ঘসিটির বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সাহায্যে নোয়াজিশ ঢাকার শাসনকর্তা হন। ইনিই ছোট নবাব নামে পরিচিত। যৌবনে অসংযত ছিলেন তিনি। পরে বয়স বাড়ার সংগেই তিনি শান্ত হয়ে যান। অপুত্রক নোয়াজিশ সিরাজের ছোট ভাই আকরামউ-দ্দৌলাকে পুষ্যি নিয়েছিলেন। সে-ই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা।

সিরাজউদ্দৌলার বাবা জৈনউদ্দিন আহম্মদ কয়েকজন বিদ্রোহপ্রবণ ভাড়াটে আফগান সৈনিকের দ্বারা হত হন ১৭৪০

যান। আর তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবা হাজী আহম্মদও মারা যান। নবাব আলিবর্দী তাঁর জীবিত দুই ভাইপো, পূর্ণিয়ার নবাব সৈয়দ আহম্মদ এবং নোয়াজিশ মুহম্মদের দাবী-গুলি সরিয়ে দিয়ে সিরাজউদ্দৌলাকে ১৭৫২ সনে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। সেই সময় থেকে নোয়াজিশ প্রধানত মুর্শিদাবাদে তাঁর পত্নীকে নিয়ে বাস করতে শুরু করেন। ঘসিটি সিরাজকে ঘৃণা করতেন। এই উদ্দেশ্যে নোয়াজিশের দেওয়ান হোসেন কুলী খাঁ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী রাজবল্লভ সিরাজের উচ্চা-কাঙ্ক্ষার পথে তাঁদের প্রভুকে কন্টক হিসেবে দাঁড় করিয়ে বেগমের সহায়ক হলেন। কাকাকে আশঙ্কা করার মত সিরাজের যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। নোয়াজিশের ছিল বিশাল ধন-সম্পদ, এবং তাঁর তাঁর শান্ত ক্ষমাশীল স্বভাব আর দরিদ্র ও নিঃসহায় মানুষকে ব্যাপক দান-খয়রাতি করার দরুণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে-ছিলেন। কিন্তু নোয়াজিশ [illegible] বিধানে আর বেশী দিন টিঁকে রইলেন না। আক্রাম-উদ্দৌলা ছেলে বয়সেই [illegible] বসন্ত রোগে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে ক্রমাগত চিন্তার ফলে তিনি [illegible] পীড়িত হয়ে পড়েন, আর তাঁর জীবন [illegible] ডুবে।

আলিবর্দীর মনোকষ্টের শেষ ছিল না। ইতিপূর্বেই তিনি তাঁর ভাইপোদের এক-জনকে হারিয়েছিলেন। এখন নোয়াজিশের অবস্থার কথা জেনে তিনি নিদারুণ দুঃখ পেলেন। তিনি তাঁকে তাঁর বেগমসমেত অবিলম্বে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। বিশিষ্ট সব চিকিৎসকদের ডাকলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। ঘসিটি যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতৃগৃহে ছিলেন তবু তিনি এই আশঙ্কায় কম্পিত হলেন যে, তাঁর চির-শত্রু সিরাজ তাঁকে সেখানে আটক করাবেন। তাই তিনি পালাবার বন্দোবস্ত করলেন। তারপর একটা ঢাকা কেদারায় তিনি তাঁর সঙ্গে স্বামীকে একত্রে বসিয়ে নিজের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলেন। এখানে রুগী শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন (ডিসেম্বর, ১৭৫৫)। তাঁর দেহ মুর্শিদাবাদ নগরীর ঠিক বাইরে মতিঝিল নামে একটা অভিজাত পল্লীভবনে নিয়ে যাওয়া হল। এটি তিনিই তৈরী করে সাজিয়েছিলেন, আর এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হল।

আলিবর্দীর দিনও ফুরিয়ে আসতে লাগল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি শোথ রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে দুই নির্জীব হয়ে পড়তে লাগলেন। শাসনভার কর্তৃত সিরাজউদ্দৌলার হাতেই পড়ল। নোয়াজিশ ছিলেন তাঁর প্রকাশ্যে স্বীকৃত শত্রু। ঘসিটি তাঁর স্বামীর ধনদৌলত নিয়ে মতিঝিলে সরে গেলেন। সিরাজের জরুরী প্রয়োজন হয়েছিল অর্থের। এই অর্থই হল যুদ্ধের অত্যন্ত শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে একটি। তাই তিনি তাঁর ধনবতী মাসীর সম্পত্তির ওপর লুব্ধদৃষ্টি ফেলেছিলেন। ঝগড়ার একটা ছুতো-র অভাব হল না। তিনি তাঁর মাসীকে মীর নাজির আলি নামে তাঁর প্রিয় রাজকর্মচারীর [illegible] তাঁর কাছে পাঠাবার আদেশ দিলেন। "এই মানুষটি প্রায় রাতেই তাঁর বিলাসকক্ষে যাতায়াত করে নবাব বংশের সম্মানহানি করেছে।" ঘসিটি মীর নাজির আলিকে দাগবাজি ভেবে আর তাঁর পক্ষে এই অমানুষিক হুকুম পালন আশা করা যেতে পারে না। সিরাজ এবং তাঁর মধ্যে কলহ এখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী তাঁদের এক মত করানোর জন্যে সকল উপায় প্রয়োগ করলেন, কিন্তু বৃথাই হল সে প্রচেষ্টা।

ঘসিটি একটা কারণে ভয় পেলেন। তাঁর মতে, সিরাজ একবার মুর্শিদাবাদের মসনদে বসলে শুধু তাঁর ওপর দুর্ব্যবহারই করবেন না, অন্যায়ভাবে আর গায়ের জোরে তাঁকে তাঁর সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করবেন। তাই তিনি আক্রামউদ্দৌলার শিশুপুত্র মুরাদ-উদ্দৌলার পক্ষে দাঁড়ালেন। তাকে তিনি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে পুষ্যি নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই প্রতিপাল্যকে মসনদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। তাই তিনি অসংখ্য হাতী এবং লাখ লাখ টাকা তাঁর সম্প্রতি মৃত স্বামীর সেনাদের বিলোলেন আর এভাবে গড়ে তুললেন এক বিরাট বাহিনী। তারপর তিনি নাজির আলির সঙ্গে মতিঝিল প্রাসাদ দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করে নিজেকে শক্তিশালী করলেন। এই সব প্রস্তুতিতে তাঁকে উপাদান যুগিয়ে সাহায্য করলেন রাজা রাজবল্লভ নামে তাঁর এক অতিবিচক্ষণ দেওয়ান।

নোয়াজিশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সিরাজ রাজবল্লভকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন কি-কাজে ঢাকা থেকে মুর্শিদা-বাদে এসেছিলেন। সিরাজ তাঁর কাছ থেকে ঢাকার রাজস্ব বাবদ সরকারের কাজে কাকার ভূসম্পত্তির ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্যে হিসেবপত্তর দাবী করলেন। কিন্তু বিশ্বস্ত দেওয়ান তাঁর মণিবানীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কিছুই প্রকাশ করলেন না। আর এই আচরণের জন্যে তাঁকে কড়া নজরে রাখা হল। অবশ্য কিছু দিন বাদে নবাবের মা আমিনা বেগমের অনুরোধে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। রাজ-বল্লভ পুরো মাত্রায় সচেতন হলেন যে, তাঁর কর্ত্রীর স্বার্থের প্রতি তাঁর গভীর অনুরক্তি সিরাজকে চিরদিনের জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিকূলে ধারণাগ্রস্ত করেছে, আর মসনদে বসলে তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন।" তাই তিনি নিজেকে ঘসিটি বেগমের একজন অনুগামী হিসেবে ঘোষণা করলেন।

এদিকে বৃদ্ধ আলিবর্দীর শেষ দশা ঘনিয়ে আসছিল। রাজবল্লভ ঢাকায় তাঁর পরিবার এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার খুব বেশী প্রয়োজনবোধ করলেন। তিনি অবিলম্বে কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠির সর্দার উইলিয়ম ওয়াটসকে একথা লিখে পাঠালেন যে, তাঁর পরিবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে তাঁদের অভীষ্ট তীর্থযাত্রার পথে কলকাতা দর্শন করবেন। আর সেখানে তাঁদের কয়েক মাস থাকতে দেওয়ার জন্যে তিনি তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করলেন।

রাজবল্লভ নামে দেওয়ান হলেও আসলে তিনিই ছিলেন ঢাকার ডেপুটি গভর্নর। ঘসিটির ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে-ছিলেন তিনি। কোম্পানী দেখলেন যে, ঢাকায় তাঁর ক্ষমতার ফলে সেখানে তাঁদের কাজ-কারবারের চরম পরিণতি ঘটতে পারে। অধিকন্তু, সিরাজ ছিলেন তাঁদের শত্রু এবং ঘসিটি তাঁর মসনদে আরোহণ ব্যর্থ করার চক্রান্ত করছিলেন। আর অতএব যদি তিনি সাফল্যলাভ করেন তাহলে ইংরেজদের কাছে এটা মস্ত লাভের হবে। যেহেতু রাজবল্লভ ছিলেন ঘসিটির সবচেয়ে বেশী আস্থা-ভাজন, ইংরেজ কোম্পানী তাই তাঁর প্রস্তাবে মত দিলেন। আর তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাসশুদ্ধ তাঁর পরিবার কলকাতায় এসে পৌঁছলে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় দিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার মসনদে আরোহণের পথ সুগম করল দীর্ঘ এবং ধারাবাহিক কতগুলি মৃত্যু। তিনি এখন তাঁর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে [illegible] পেলেন। শুধু সে-পথে রইল ঘসিটি বেগমের প্রতি-পাল্য মুরাদউদ্দৌলা এবং সিরাজের মেজো কাকার ছেলে পূর্ণিয়ার নবাব শৌকত জঙ্গ। যদিও এই সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের মৈত্রী বিপজ্জনক হতে পারে, তবু তাঁদের কেউই ভয়ঙ্কর ছিলেন না। শৌকত জঙ্গ সিরাজের প্রতি ঈর্ষালু হয়ে ওঠেন আর এটা সন্দেহ করা হল যে, তিনি ঘসিটি মাসির সঙ্গে একটা গুপ্ত চিঠিপত্রের আদান-প্রদানে রত। ইংরেজরা ভেবেছিলেন যে সিরাজের দুর্নামের দরুণ তাঁর পক্ষে নবাবী-গদী পাওয়া অসম্ভব হবে। এরকম একটা বিতর্কমূলক উত্তরাধিকারের প্রশ্ন আগেই কয়েকটা মহলে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু নবাব আলিবর্দী তা ব্যর্থ করতে নিজেকে নিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর প্রিয় নাতির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর জ্ঞাতি মীরজাফরসমেত রাজসভার সমস্ত প্রভাবশালী মানুষদের একত্রে সিরাজের পাশে উপস্থিত করালেন। এঁরা কোরাণ ছুঁয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর শপথ করলেন। কিন্তু সিরাজকে তাঁর মাসি ঘসিটির সঙ্গে একমত করানোর নিষ্ফল কাজটির জন্যে পরিশ্রম করতে করতে বৃদ্ধ নবাব ১৭৫৬ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখে চোখ দুটি বুজলেন চিরদিনের মত।

আলিবর্দী যখন সবেমাত্র সমাধিস্থ হয়েছেন তখনই সিরাজউদ্দৌলা নিজেকে বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করলেন। পর দিন তাঁর মাসির হাত থেকে নিজেকে নিরাপদ করার জন্যে তিনি মতিঝিল প্রাসাদ এমন সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেললেন যে, বাইরে থেকে কেউ তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারল না। যদিও প্রাসাদটি প্রতিরক্ষার পক্ষে শক্তিশালী ছিল তবু বেগমের বেশীর ভাগ সেনাই পূর্ণিয়ার নবাবের প্রতিশ্রুত সাহায্যের ব্যাপারে হতাশ হয়ে তা তৃতীয় রাতে ত্যাগ করল। এই সময়ে আলিবর্দীর

বিধবা পত্নী শরফুন্নিসা প্রাসাদে প্রবেশ করে তাঁর মেয়েকে তাঁর জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্যে রাজী করাতে চেষ্টা করলেন। ঘসিটি এসব শর্ত মেনে নিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে এটা দাবী করলেন যে, তাঁর প্রেমিক নাজির আলিকে নিরাপদ পরিচালনায় বাংলা ছেড়ে যেতে অনুমতি দেওয়া হবে। তরুণ নবাব তাতে তৎপরতার সঙ্গে সম্মত হলেন।

ঘসিটিকে তাঁর সেনাদল ভেঙ্গে পরিচারক-পরিচারিকাসমেত নবাবের হারেমে ফেরার জন্যে যুক্তি পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে রাজী করানো হল। কিন্তু তিনি পৌঁছানর সঙ্গে তাঁকে অবিলম্বে বন্দী করা হল। তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সেনাদের ক্ষমা করে সিরাজের চাকরীতে নেওয়া হয়। আর তাঁর প্রাসাদ ও সম্পত্তি সব দখল করে রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এভাবে সিরাজ তাঁর পুরো সন্তুষ্টি অনুযায়ী বেগমের সঙ্গে হিসাব মেটালেন। এদিকে অযোধ্যার উজির বাংলা আক্রমণের ভয় দেখাচ্ছিলেন। সিরাজ এখন তাঁকে মাসির ধনদৌলতের একটা অংশ দিয়ে তাঁর উষ্মা এড়ালেন। সর্বসম্মত রিপোর্টে এই অংকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩২ কোটি টাকায়।

এবার সিরাজ ঘসিটির মিত্রদের নিয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন পূর্ণিয়ার নবাব শৌকত জঙ্গ এবং ইংরেজ কোম্পানী। আলিবর্দী অসুস্থ থাকার সময় ইংরেজরা দেশের প্রচলিত আইন অমান্য করে কলকাতার চারদিকে যেসব কেল্লা বানিয়েছিলেন সেগুলো এখনো পর্যন্ত তাঁরা ভাঙেননি। তাঁরা কলকাতায় কৃষ্ণদাসকেও আশ্রয় দিয়েছেন। ইনি প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন যার আংশিক ভাগ ছিল ঘসিটির সম্পত্তি। আর তাঁকে তাঁরা নবাবের দাবি অনুসারে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেছেন। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সিরাজকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করে তুলল। তিনি তাঁদের কাশিমবাজারের কুঠি দখল করে নিলেন, দুর্বারভাবে কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেন, আর ১৭৫৬ সনের জুন মাসে ফোর্ট উইলিয়মের কর্তা হয়ে বসলেন। এরপর উদ্বাস্তু ইংরেজ বণিকরা গঙ্গার ওপরে ফলতা নামে এক ছোট্ট গ্রামে আশ্রয় নিলেন। সাহায্যের জন্যে তাঁরা মাদ্রাজ থেকে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী চেয়ে পাঠালেন। এভাবে তাঁরা প্রতিহিংসা গ্রহণের একটা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

ওদিকে শৌকত জঙ্গ বাংলার নবাব হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। সিরাজ তাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে এগোলেন। শৌকত জঙ্গ সিরাজকে নবাব বলে স্বীকারই করেননি বরং বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন। রাজমহলের কাছে সিরাজ তাঁর সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এখানে [illegible] তাতে পূর্ণিয়ার নবাব মারা [illegible] আঘাত পেয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে গেলেন (১৬ই অক্টোবর, ১৭৫৬)।

এখন সিরাজের মনে হল যেন তাঁর বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর পথ থেকে প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বীর অপসারণের মধ্য দিয়ে তাঁর অবসানই শুধু ত্বরান্বিত হচ্ছিল। তিনি নিজেকে তাঁর দেশ এবং রাজসভার একমাত্র প্রভু করে তুলেছিলেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি বিশিষ্ট মানুষ মীরজাফর সমেত তাঁর দরবারের অনেক সম্ভ্রান্ত অমাত্যকে বিরোধী করে তুললেন। আর তাঁরা এখন তাঁকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার জন্যে অবিরাম চেষ্টার নিজেদের কাজে লাগালেন। পূর্ণিয়ার নবাবের মৃত্যুতে তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত একমাত্র শক্তি হচ্ছে ইংরেজেরা। তাঁরা নবাবের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে এইসব বিদেশী বণিকদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য

শোনালেন তাঁর বহু পুরনো অনুরাগের একজন,—তিনি ঘসিটি বেগম।

ঘসিটি এখন মোগলে মীরজাফর খাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন। আর তিনি এখন সাহায্য করলেন তাঁকে। এ ব্যাপারে তাঁর আগের যাঁরা তাঁর স্বার্থের প্রশ্নে কিছু সম্পর্ক করতে রেখেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে মীরজাফরের সমর্থনে নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটালেন তিনি। এঁদের কাছে তিনি বিশ্বস্ত সমর্থনের মাধ্যমে যেসব অন্যায় তাঁকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে তার এক দীর্ঘ বিবরণ তুলে ধরলেন। তাঁদের কাছে তিনি গোপন সব বার্তা পাঠিয়ে এই দাবি করলেন যে, তাঁদের কৃতজ্ঞতার ওপরে আলিবর্দী খাঁর কন্যা ও নোয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর বেগম অবশ্যই যেসব অধিকার লাভ করেছিলেন সেগুলো তাঁদের সাহায্যেই উদ্ধার হোক। তাঁর পরিবারের কাছ থেকে যেসব উপকার তাঁরা পেয়েছিলেন, তিনি সেসবের কথাই আবার তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। যে যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে তা পুনরাবৃত্তি করলেন, আর মীরজাফরের পক্ষে যোগ দেবার জন্যে তাঁদের সনির্বন্ধ মিনতি জানালেন। মতি-ঝিল দখলের পূর্ব মুহূর্তে যেমন কিছু সোনা তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত বৃদ্ধা পরিচারিকা এবং খোজাদের সাহায্যে গোপনে সরিয়েছিলেন, এখন তিনি তা দক্ষভাবে বন্টন করে দেওয়ার ভার নিলেন। আর তিনি মীরজাফরের কাছেও তার কিছু পাঠালেন। এই সেনাপতি তাঁর দিক থেকে যেখানে অর্থ বিলনো সার্থক মনে করলেন, সেখানেই হাত দিলেন। আর তিনি প্রতিটি দলভাঙা সৈনিক এবং তাঁর জ্ঞাত প্রতিটি প্রবল আকাঙ্ক্ষী দুঃসাহসিক মানুষকে মজুরি দিয়ে এমন ভালভাবে নিজের ক্ষমতা কাজে লাগালেন যার ফলে শিগগির-ই তিনি গোপনে তাঁর বাড়িতে এবং শিবিরে একটা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বাহিনীর সমাবেশ ঘটালেন।

এখন সব ব্যাপার সেই লক্ষ্যে উপনীত হল। আর বিশিষ্ট মানুষদের প্রত্যেকেই তাঁদের অভিপ্রেত একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকলেন; তা হচ্ছে সিরাজউদ্দৌলার অপসারণ। প্রত্যেকটি মানুষ সে-পথে তাঁর কঠোর প্রচেষ্টা চালালেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেকের মনে জন্মাল যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা-গুলো পরিপূর্ণ হওয়ার পক্ষে ইংরেজদের সঙ্গে ঐকমত্য হচ্ছে একটা প্রয়োজনীয় পথ। তাই তাঁরা ঐ নবাবের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ইংরেজদের পরামর্শ দিলেন। তাঁদের প্রধানদের মধ্যে একজন হলেন জগৎ শেঠ, আর তাঁর সুযোগ-সুবিধেও ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি তাঁর বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এবং কলকাতার প্রধান ব্যাঙ্কার-দের অন্যতম উমিচাঁদের মাধ্যমে সম্বন্ধচ্যুতির জন্যে ইংরেজদের অবিরাম উত্তেজিত করে তুলছিলেন।

এইসব চক্রান্তকারীদের কার্যকলাপের পরিণামে এল পলাশীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ইংরেজদের আনুকূল্যে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত করল। এঁরা দেরা বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিলেন।

মীরজাফরের বর্বর ছেলে মীরন সিরাজকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতক মানুষটি অতীতে আলিবর্দী-পরিবার থেকে যেসব অনুগ্রহ লাভ করে-ছিলেন সেই কৃতজ্ঞতাজনিত ঋণের কথা আর স্মরণ করলেন না। তিনি আলিবর্দী—বেগম এবং তাঁর দুই মেয়ের সঙ্গে সিরাজের বিধবা পত্নী লুতফউন্নিসা বেগম আর তাঁর শিশুকন্যাকেও একটা গারদে আটক করে রাখলেন। কয়েক মাস বন্দীজীবনের কঠোর ব্যবস্থা ভোগ করার পর তাঁদের ১৭৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কয়েকটা অত্যন্ত জঘন্য নৌকোয় পুরে তাড়াতাড়ি ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

মীরন স্পষ্টভাবে তাঁর পথ থেকে প্রতিটি বাধা সরিয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকে-ছিলেন। এটা দারুণ অদ্ভুত যে তিনি বর্তমানে সেই নির্বাসিতা, বিস্মৃতা, এবং দারিদ্র্য ও দুর্দশায় জর্জরিতা ঘসিটি আর আমিনাকে পর্যন্ত শত্রু বলে সন্দেহ করলেন। তিনি বারবার ঢাকার শাসনকর্তা জেসারৎ খাঁকে ঐসব বয়স্থা এবং দুর্ভাগিনী নারী-দের হত্যা করার জন্যে লিখে পাঠালেন। কিন্তু জেসারৎ ছিলেন একজন উদার মানুষ। তিনি এইসব নারী এবং তাঁদের মৃত স্বামীদের অন্নে লালিত-পালিত হয়েছেন আর তাঁদেরই কৃপায় উন্নতির চরম সীমায় উঠেছেন। তিনি এই মিনতি করে জবাব দিলেন যে তাঁর জায়গায় একজন উত্তরাধি-কারী নিযুক্ত করা হোক, কারণ তিনি এরকম একটা জঘন্য কর্তব্য পালন করার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চান। মীরন তখন মীরজাফরের ভাগনে খাদিম হোসেন খাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতির ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। এই মানুষটি সে সময়ে পাটনার অপর পাশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর এক বন্ধুকে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ঢাকায় পাঠালেন। তাঁকে এইসব নির্দেশ দেওয়া হল যেন তাঁর অভীপ্সিত শিকারদের প্রতারণার সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তাঁদের মুর্শিদাবাদে পাঠানো হবে আর সেভাবে প্ররোচিত করে তাঁদের নৌকোয় তোলা হয়। তারপর মাঝনদীতে গিয়ে নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

এই দুর্বৃত্তির দুর্ভোগ ঘসিটি এবং আমিনাকে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু মীরনের আসল উদ্দেশ্য তাঁর প্রতিনিধির আবেগ আর অশ্রুপাতে ফাঁস হয়ে গেল। ঘসিটিকে সে বলল, 'মা, আপনি সারাদিন কিছুই খাননি; কিছু খেয়ে নিন, কারণ আপনারা এক দীর্ঘ ভ্রমণে চলেছেন. আর—' এখানে তার কথা বাধা পেল নিজের অশ্রু আর কোঁপানির চাপে।

তা দেখলেন ঘসিটি। তাঁর চোখ থেকে ঝরল অশ্রুধারা। কিন্তু ছোট বোন আমিনা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। এরপর তাঁরা পবিত্র জায়নামাজ পেতে এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরে খোদার কাছে তাঁদের সব অপরাধ মার্জনা করার জন্যে বিনীত প্রার্থনা জানালেন। আর তারপর মীরনের লোকটিকে তার প্রভুর হুকুম সম্পাদন করার আহ্বান জানালেন। ঐ মানুষটি ইতস্ততঃ করার ভাব দেখালে তাঁরা দুজনেই হাত তুললেন, আর আমিনা চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'হে সর্বশক্তি-মান আল্লা, আমরা উভয়েই অপরাধিনী এবং পাপিষ্ঠা, কিন্তু মীরনের কোন ক্ষতি আমরা করিনি। বিপরীত দিকে, মীরন এই দুনিয়ার সব কিছুর জন্যে আমাদের কাছে ঋণী, কিন্তু তার কাছ থেকে আমাদের হত্যা করার এই অন্যায় হুকুম অপেক্ষা আর অন্য কোন প্রতিদান আমরা পাইনি। আমরা তাই আশা করি যে আমাদের মৃত্যুর পর তুমি তোমার বজ্রনিক্ষেপ করে তার কলুষিত মস্তক চূর্ণ করবে, আর আমাদের নিজেদের এবং আমাদের সন্তানদের দরুন এক পূর্ণ প্রতিশোধ তার কাছ থেকে শক্তিপ্রয়োগে আদায় করবে'। তাঁদের এই আবেদন উদ্ধৃত হয়েছে গোলাম হোসেনের 'সিয়র-উল-মুতাখ্‌খরীন' এবং হলওয়েলের An Address to the Proprietors of East India Stock' নামে গ্রন্থগুলিতে। এই অল্প কয়েকটি কথার পর তাঁরা তাঁদের হাত একত্র করে সলিল সমাধির আশ্রয় নিলেন (জুন, ১৭৬০)।

খোদা তাঁদের শেষ প্রার্থনা শুনে-ছিলেন। এই দুঃখদায়ক ঘটনার অল্প কয়েকদিন পর মীরন যখন পরাজিত বিদ্রোহী খাদিম হোসেনের অনুসরণরত ছিলেন তখন একদিন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একটি বজ্রাঘাতে তিনি মারা পড়লেন। এটি ঘটেছিল ১৭৬০ সনের ১লা জুলাই তারিখে।

আঠারো শতকের এক নিরবচ্ছিন্ন অধ্যায় এভাবে শেষ হল। নিয়তির মেঘ চাপা দিল একটি দুরন্ত কামনাকে। ছড়িয়ে দিল ভাঙনের বীজ বাংলার ইতিহাসের প্রবাহপথে। ফলে এক স্বাধীন শক্তির মাত্র তার পাতা থেকে গেল মুছে। এপথে নবাবী—হারেমের বিশেষ ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারই প্রধান অংশে অবতীর্ণা হয়েছেন মহলালা নারী ঘসিটি ওরফে ছোটি বেগম। কুটিল কূটনীতির আবরণে তিনি হাত মিলিয়েছেন অন্য স্বার্থান্বেষীদের সঙ্গে। সেই হাতের স্পর্শে টলে উঠল নবাবি-মসনদ। ধ্বসে পড়ল একটা গোটা শাসন ব্যবস্থা। বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ালেন কতিপয় কিছু বিদেশী বণিক। ঘসিটি এভাবে সফল হলেন তাঁর পরি-কল্পনাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করে দিতে। কিন্তু তা ছিল নৈতিক মান ও সুস্থ নীতির বাইরে। তাই তার জন্যে তিনিও তলিয়ে গেলেন চিরতরে।

ভারতরত্ন পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানে

গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের প্রাণপণ পরিশ্রমে প্রাচীন কাল থেকে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু জাতির ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা সম্পন্ন করেছিলেন মহারাষ্ট্রের সন্তান ভারতরত্ন মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরংগ বামন কানে। গত ১৮ই এপ্রিল বোম্বাই শহরে ৯২ বর্ষ বয়সে আধুনিক যুগের এই ঋষি পরলোকগমন করেছেন।

কানে রচিত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব ধর্মশাস্ত্র) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ খৃস্টাব্দে, শেষ বা পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ধর্ম-শাস্ত্র বিষয়ক ৫০০০টি প্রাচীন পুস্তক, এবং এই বিষয়ে লিখিত ইংরেজী জার্মান ও ফরাসী ভাষার কয়েক শত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পর এই মহাগ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। বৈদিক কাল থেকে বর্তমান হিন্দু জাতির ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস এই গ্রন্থের উপজীব্য হলেও সাধারণভাবে বইটিকে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে একটি 'এনসাইক্লোপিডিয়া' বা বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থে কানে দেখিয়েছেন যে জনকল্যাণের জন্য ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ জীবন যাপনে সহায়তা করা। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে সমাজ যাতে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় একটা উন্নত আদর্শের পথে অগ্রসর হতে পারে তার ব্যবস্থা করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলিও তাই যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দু-সমাজ 'অচলায়তন' হয়ে থাকুক মনু-যাজ্ঞবল্ক্যও তা চান নি। ভারতীয় তথা হিন্দুজাতির পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতা ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস উদ্ঘাটিত করেই কানে ক্ষান্ত হন নি। হিন্দু জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি জাতির সামনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রশ্ন এই যে, সংখ্যালঘু বিদেশী আক্রমণ-কারীদের কাছে শৌর্যবীর্যশালী হিন্দুজাতি কেন বার বার পরাজিত হয়েছে? প্রাচীন ভারতে কেন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে নি? প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও ভারতবাসী কেন শিল্প ও ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে নি? কানে নিজেই এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এমন সময় বহুবার এসেছে যখন ভারতীয়েরা শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই মগ্ন থেকে পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বকে অবহেলা করেছে। সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান তত্ত্বরূপে একথা স্বীকার করেও ব্যবহারিক জীবনে তারা ছোট বড় ভেদাভেদ দেখিয়েছে, নিম্নবর্ণ বা অস্পৃশ্য এদেরই সৃষ্টি, প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র কখনই অস্পৃশ্যতাকে প্রশ্রয় দেয় নি। তিনি আরও লিখেছেন যে, ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে দেশের এক বিশাল জনসমষ্টিকে শিক্ষা ও উচ্চ চিন্তা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল এরই ফলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতের অধঃপতন সামাজিক অবিচার ও নীতি-ভ্রষ্টতার ফলেই এসেছিল।

ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা কানে এখানেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি, তিনি বলেছেন স্বাধীন ভারতে ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার সাহায্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, লোক-কল্যাণই হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য। কানে জাতিকে বিবেকানন্দের এই বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। ...আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'র এই প্রার্থনাটি উদ্ধৃত করে তাঁরই সংগে একাত্ম হয়ে নব-ভারতের ঋষি কানে তাঁর নব-মহাভারত গ্রন্থটি শেষ করেছেন :

> "Where the mind is without fear| And the head is held high|Where knowledge is free; |........| Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit| Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and actions, into that heaven of freedom, my father| Let my country awake".

ভারতরত্ন কানে
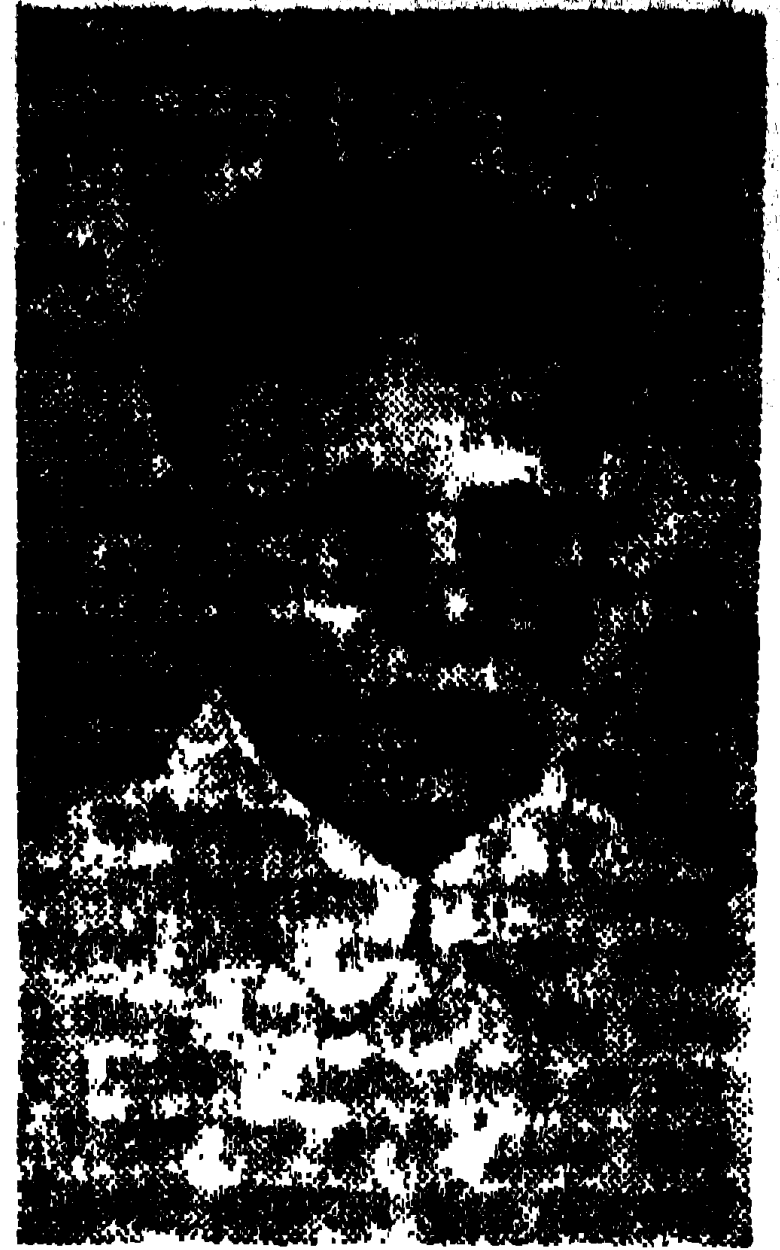
১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার পেডগাম (পরশুরাম) গ্রামে এক নিষ্ঠাবান সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারে কানের জন্ম হয়েছিল। বাল্যকালেই তাঁর বিশেষ মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিটি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কয়েক বছর সরকারী শিক্ষা-বিভাগে স্কুলশিক্ষকের পদে কাজ করে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কানে বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বেই তিনি এল এল বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আইন ব্যবসায়ে রত থেকেই তিনি আইনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী 'এল এল এম' অর্জন করেছিলেন। আইন ব্যবসায়ের সংগে সংগে ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বোম্বাই-এর সরকারী ল কলেজে 'হিন্দু-আইনের' অধ্যাপনা করেন। সংস্কৃত ভাষা তথা হিন্দু আইনে প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই কানে বোম্বাই হাই-কোর্টের আপীল বিভাগে আইনজীবী রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। হাই-কোর্টের বিচারপতি ও ব্যবহারজীবীগণ হিন্দু আইন সম্বন্ধে কানের অভিমতকে চূড়ান্ত বলেই মেনে নিতেন।

ছাত্ররূপে এবং শিক্ষক জীবনে বিদেশীয় ভারততত্ত্বজ্ঞদের রচনা পাঠ করে সংস্কৃতজ্ঞ কানের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, এঁরা এঁদের রচনায় হিন্দুজাতির প্রতি সুবিচার করেন নি, এঁদের রচনায় হিন্দু-সংস্কৃতিকে বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ প্রয়োজন। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে কানে তাঁর ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইতিপূর্বেই বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত ও কাদম্বরী এবং বিশ্বনাথ কবি-

রাজ রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' ইংরাজী টিকা ও ভূমিকাসহ সম্পাদন করে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-রূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কানে-রচিত সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সংস্কৃত পোয়েটিক্স) ও নীলকণ্ঠের প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ ব্যবহার মধুসূদনের টীকাসহ ইংরেজী অনুবাদও পণ্ডিত সমাজে ইতিমধ্যে প্রচুর সমাদর লাভ করেছিল।

ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থের দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৪২ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে এলাহাবাদ ও পুণা বিশ্ববিদ্যালয় কানেকে ডি-লিট উপাধি দানে সম্মানিত করেন। আরও কিছুকাল পর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডি-এল (ডকটর অব ল) উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত কানে বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদ তখন অবৈতনিক ছিল। তাঁর কার্যকাল শেষ হলে বোম্বাই গভর্ণমেন্ট মাসিক ২,০০০ টাকা বেতনে তাঁকে ঐ পদে থেকে যেতে অনুরোধ করেন কিন্তু তাঁর গবেষণার ক্ষতি হবে বলে তিনি আর ঐ পদ গ্রহণ করেননি। লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইন-জীবী হয়েও কানে চিরকাল বোম্বাই-এর গিরগাঁও অঞ্চলে একটি দু'কামরার ভাড়ার বাড়ীতে বাস করতেন। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত কানে প্রতিদিন ট্রামে চড়ে হাইকোর্টে যেতেন। ভাইস চ্যান্সেলার-রূপেও তিনি ট্রামে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত ছয় বৎসর কালের জন্য কানে ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য ছিলেন। সংসদ সদস্যরূপে হিন্দুর সমাজ সংস্কারে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। পার্লামেন্টে তাঁরই কার্যকালে হিন্দু বিবাহ, উত্তরাধিকার ও দত্তক আইন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইগুলি বিধিবদ্ধ হওয়ার আগে সংসদ নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটিগুলিতে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ কানের পরামর্শ-গুলি সাদরে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে কানের সংসদ সদস্যরূপে কার্য-কাল শেষ হয়ে গেলে, তাঁকে রাষ্ট্রপতি পুনরায় রাজ্যসভায় সদস্য মনোনীত করেন। ইতিমধ্যে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক ভারততত্ত্ব গবেষণার জন্য জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সরকারী আর্থিক সাহায্যভোগী হয়ে রাজ্যসভার সদস্যরূপে কার্য করা অনৈতিক মনে করে তিনি রাষ্ট্র-পতির এই মনোনয়ন আর গ্রহণ করেননি। ইতিপূর্বেই তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের লাভজনক আইন ব্যবসায়ও পরিত্যাগ করে-ছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক রূপে নিযুক্তির পর কানে একান্তভাবে নিজেকে গবেষণার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য অথবা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রলোভন তাঁকে তপস্যাভ্রষ্ট করতে পারেনি। কানে প্রতিদিন ১৭।১৮ ঘন্টা পরিশ্রম করতেন।

শেষ জীবনে তিনি ১২।১৪ ঘন্টার বেশী পরিশ্রম করতে পারতেন না এটা তাঁর বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। এক মুহূর্ত সময়ও তিনি বৃথা নষ্ট হতে দিতেন না। বিদ্যাচর্চায় মগ্ন থেকেও কানে বহু জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ও এই প্রতিষ্ঠানের মহাভারত প্রকাশের ব্যাপারে তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই তাঁর ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে তিনি বোম্বাই-এর এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি ও সোসাইটির জার্ণালের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় ৪।৫ ঘন্টা তাঁকে এই সোসাইটির পাঠগৃহে অধ্যয়ন রত দেখা যেত। সমাজ সংস্কারের জন্য কানে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় বোম্বাই-এ ব্রাহ্মণসভা ও ধর্ম নির্ণয় মহামণ্ডল নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্মণসভার সভাপতিরূপে তিনি এই সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণপতি উৎসবে অস্পৃশ্যদের যোগদানের অধিকার দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তথাকথিত অস্পৃশ্যরা এই উৎসবে যোগদান করতে পেত না। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে বাধা দেবার জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু আদালতের বিচারে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সমাজ সংস্কারক কানে নিজের এক পুত্রের বিধবা বিবাহ অনুমোদন করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের পাণ্ডারপুরের বিঠোবা মন্দিরের এক পুরোহিত একবার এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিগ্রহ স্পর্শ করতে দেননি, কারণ এই বিধবার দীর্ঘ কেশ ছিল। পুরোহিতের যুক্তি এই ছিল যে অমুণ্ডিত কেশা ব্রাহ্মণ বিধবা ভ্রষ্টচারিণী বলে গণ্য, বিগ্রহ স্পর্শ করার অধিকার তার নেই। কানে এই ঘটনা জানতে পেরে নিজ ব্যয়ে পাণ্ডারপুরে গিয়ে পুরোহিতের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেন। কোর্টে তিনি প্রমাণ করেন যে ধর্মশাস্ত্রের কোথাও এমন নিষেধের কথা লেখা নেই। বিপক্ষের উকিল স্কন্দপুরাণের একটি শ্লোক পুরোহিতের মতের সমর্থনে উপস্থিত করায় কানে উত্তর দেন যে স্কন্দপুরাণ চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা, সেটি প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র নয়, তাছাড়াও উদ্ধৃত শ্লোকটি পরবর্তীকালে এই বইয়ে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। স্কন্দপুরাণের প্রাচীন পুঁথিতে এই শ্লোকটি নেই। ধর্মাধিকরণ কানের যুক্তির অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন। ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণ বিধবাটি অতঃপর বিঠোবার পাদস্পর্শ করে নিজের জীবন ধন্য হয়েছে বলে মনে করতে পেরেছিল। কানে নিজের ক্ষতি স্বীকার করে নিজ ব্যয়ে এই মামলা চালিয়ে ছিলেন।

১৯৪৬ ও ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে কানে যথাক্রমে অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস ও ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল সভাপতির আসনে বৃত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক প্রাচ্য কংগ্রেস (ইন্টার ন্যাশনেল কংগ্রেস অফ ওরিয়েন্টেলিস্টস) এর প্যারী, ইস্তাম্বুল ও কেম্ব্রিজ অধিবেশনে কানে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করতে তিনবার বিদেশে যান। ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা ও প্রাচ্য-বিদ্যামূলক নানা গ্রন্থ ও নিবন্ধ লেখক রূপে কানে বহির্বিশ্বের বিদ্বৎমণ্ডলীর নিকটও সুপরিচিত ছিলেন।

১৯৬৩ খৃস্টাব্দে ভারত সরকার কানেকে 'ভারতরত্ন' উপাধি দান করে সম্মানিত করেন। পরমজ্ঞানী, নিরভিমান, নির্লোভ, সদাশয়, কর্মযোগী, সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কানে মহারাষ্ট্রে 'ঋষি' রূপে খ্যাত ও সম্মানিত ছিলেন। ঋষি কানের মৃত্যুতে ভারতের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ণ হওয়ার নয়।

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

॥১৬ ॥

অফিস ছুটির পর সজল ধর্মতলার মোড়ের দিকে যেতে যেতে দূর থেকে দেখতে পেল, অরুণা আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। পথচারীদের মধ্যে কেউ কেউ ওকে আড়চোখে দেখেও নিচ্ছিল একটু।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে পারছিল, সেজেগুজে যে মেয়েটি এখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে নিশ্চয়ই কারুর জন্য অপেক্ষা করছে।

এই অভিসারের মধ্যে বোধহয় কোন সৌন্দর্য আছে। নইলে যুবকদের কথা ছেড়ে দিলেও, প্রায় বৃদ্ধ লোকরা, তাকিয়ে তাকিয়ে যাবে কেন?

সজল নিজেকে প্রশ্ন করল, অরুণাকে যে সকলে দেখে দেখে যাচ্ছে, এতে কি সজল মনে মনে একটা তৃপ্তি পাচ্ছে? অর্থাৎ অরুণা যে দেখার মত, একথাটা ভাবার মধ্যে কোন আনন্দ আছে কিনা!

অফিস ছুটির পরের চৌরঙ্গী। মানুষের ভিড়ে হাঁটাই দায়।

কাছে আসতেই অরুণা শুকনো মুখে বলল, 'সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, তোমার আর দেখা নেই। এখানে দাঁড়ানো কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার!'

দূরে একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সজল বলল, 'খুব কি দেরি হয়ে গেছে, আমার?'

অরুণা পাশের গলিটা দিয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'পরে তর্ক করবে। এখন এসো।'

সজল অরুণার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। কিন্তু কোথায় যে অরুণা যাচ্ছে, সজল তা জানে না, বুঝতেও পারছিল না।

অরুণা আবার একটা মোড় ফিরল। জায়গাটায় লোক চলাচল কম। কেমন ছায়া-ছায়া থমথমে।

সজল একটু অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

অরুণা ঠাট্টা করে বলল, 'কেন যেখানে যাবো আমার সঙ্গে যেতে পারবে না?'

'না?'

অরুণা মুখ টিপে হেসে বলল, 'এই এই তোমার ভালোবাসা?'

'ভালোবাসার সঙ্গে সবখানে যাওয়ার সম্পর্ক কি?'

'সম্পর্ক কি জানো না? ন্যাকা?'

শব্দটা শুনে সজলের কান লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সজল ধৈর্য ধরল, এ মুহূর্তে অরুণার সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছা নেই।'

'কি হল? এসো?'

সজল দেখল, অরুণা একটা সস্তা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্বস্ত হল। অরুণার ওপর ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বলে, একটু অনুশোচনাও হল তার।

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল। অরুণা ফিসফিস করে বলল, 'কি ভয় করছে?'

'কেন? ভয় কিসের?'

'না, রেস্তোরাঁটা কেমন চুপচাপ কিনা!'

সজল সহজ গলায় বলল, 'তুমি ত আছ?'

'এই ত বেশ এডজাস্ট করে নিয়েছ। জানো, এ সব রেস্তোরাঁয় যারা জোড় বেঁধে আসে, তারা সবাই—বুঝলে?'

সজল হেসে মাথা নাড়ল।

সিঁড়িটায় তীব্র আলো নেই। কোথায় কোন অলক্ষ্য থেকে একটু মৃদু আলো এসে পড়ছে, শুধু ধাপগুলো দেখার জন্য।

সজল অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে, দু' একবার মোড় নিল।

অরুণা যেন ঠিক নির্দিষ্ট একটা কেবিন খুঁজছিল। অন্যগুলো পছন্দ হচ্ছিল না তার।

কেবিনটা পাওয়া যেতে ভারি পর্দা সরিয়ে দুজনে ঢুকে পড়ল।

উর্দিআঁটা বেয়ারা পর্দাটা ভালো করে টেনে দিয়ে চলে গেল বাইরে।

কেবিনটার বাইরের কোন শব্দ আসছে না, আলো বড় নরম। সব মিলে যেন একটা স্বতন্ত্র জগৎ।

অরুণা সজলের ঠিক পাশের চেয়ারে উঠে এসে বসে একটা ডিগবাজি কাটল। 'কই কেমন লাগছে?' সজলের যে খুব ভালো লাগছে তা বলা যায় না। কিন্তু পাছে অরুণা তাকে গেঁয়ো ভাবে, এজন্য বলল, 'ভালোই। এটা আবিষ্কার করলে কবে?'

'দিদির সঙ্গে এসেছি।'

সজল মনে মনে ভাবল, কার্তিকও তা হলে সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু কার্তিক আর করুণার সঙ্গে, অরুণা মূর্তিমতী রসভঙ্গের মত আসবে কেন? অথচ অরুণা বলেছিল এখানে যারা আসে তারা সবাই—'।

অরুণা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট আয়না বের করে সংক্ষেপে একটু প্রসাধন সেরে নিতে নিতে মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'সারাদিন যা ভ্যাপসা গরম গেছে।'

সজল একটু সরে এসে বলল, 'অফিসে খুব খাটতে হয় বোধহয়?'

তা মার্চেন্ট অফিস, খাটতে ত হয়ই। তবে স্টেনোগ্রাফারের খাটুনি কম।'

সজল বলল, 'তেমনি বেতন বেশী'।

অরুণা হেসে উঠল, 'সেই জন্যই ত আমি তোমাকে 'ইনভাইট' করলাম।'

সজল দাড়িটায় হাত বুলোল। সকাল-বেলা সেতার বাজাতে বাজাতে দেরি হয়ে গেছে। নইলে, দাড়িটা কামানো উচিত ছিল।

অরুণা সজলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি খাবে? আগেই বলেছি, আজ আমি 'পে' করব কিন্তু।'

অরুণা কলিং টেপ বাজাল। বেয়ারা এসে দাঁড়াতে বলল, 'দুটো মাটন কাটলেট! দু' কাপ কফি।'

একটু চুপচাপ কাটল। অরুণা কি যেন ভাবছে।

পাশের কোন কেবিন থেকে ফিস্‌ফাস্‌ শব্দ ভেসে আসছিল।

অরুণা ওদিকে ইঙ্গিত করল।

বাইরে মৃদু শব্দ হতে অরুণা চমকে নিজেই হাতটা সজলের কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে নিল। বেয়ারা দুটো প্লেট নামাল। অভ্যস্ত হাতে কাঁটা চামচ ঠিক করে রাখল।

অরুণা ভারিক্কি চালে বলল, 'কফিটা পরে দিও।'

পর্দা টেনে দিয়ে বেয়ারা চলে গেছে।

পাশের কেবিনের কোন নায়কের প্রেম-নিবেদনের অনুচ্চ কথা, শব্দ ভেসে আসছিল। আস্তে আস্তে অরুণা চেয়ারটা সজলের আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে এল।

সজল নিজেকে প্রস্তুত করছিল, মনে মনে ভাবছিল, সেও একজন নায়ক। এবং অরুণার সঙ্গে তার এ সম্পর্ক অভিনয়ের নয়, সত্যকার সম্পর্কই এটা। অতএব কেন সে এই প্রায়ান্ধকার ঘরে, সমস্ত বাধাহীন অবসরে এমন নিষ্ক্রিয় পুতুলের ভূমিকা গ্রহণ করবে! অরুণা জানে, এখানে কেন ছেলেমেয়েরা আসে। এবং সব জেনেও সে সজলকে নিজে থেকেই নিয়ে এসেছে।

সজল অরুণার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল। কিন্তু তার নিজের হাতটা বড্ড কাঁপছে, বড্ড দুর্বল মনে হচ্ছে, বড্ড ঘেমে উঠেছে সে।

অথচ আর কখনো, এতদিনের মধ্যে সজল অরুণাকে স্পর্শ করেনি, সে কথা ত সত্য নয়। কিন্তু আজকের এই আয়োজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পরিবেশ সম্পূর্ণ অপরিচিত।

অরুণা সজলের হাতটা নিজের কোলের ওপর রাখল।

সজল একটু আকর্ষণ করল অরুণাকে। অরুণা যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। নিঃশব্দে মুখটা সজলের মুখের খুব কাছে তুলে ধরল। সজল অরুণার প্রসাধনের সুমিষ্ট গন্ধ পাচ্ছিল। ওর চোখ দুটো আধবোজা, ঠোঁটদুটো যেন পিপাসার্ত, সারা শরীরটা কোন এক কাঙ্খিত আনন্দের জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছে।

সজল লোভী হয়ে উঠছে, সজল উচ্ছল, উচ্ছৃংখল হয়ে উঠছে।

অরুণা এখনও মুখটা সরিয়ে নেয়নি, আরও কিছু যেন চাইছে। তারও দেবার আছে। এই উৎসবে সেও এক সমান অংশীদার।

সজল মৃদু হেসে নিজের মুখটা সরিয়ে নিল। বুঝতে পারল না, মুখে অরুণার প্রসাধনের ছাপ লাগল কিনা।

অরুণা ছুরি দিয়ে কাটলেটটা কাটতে কাটতে মুখ টিপে হেসে বলল, 'তুমি বড্ড 'কাওয়ার্ড'।

'কেন?'

অরুণা সুন্দর করে তাকিয়ে বলল, 'ভেবে দেখ। ইউ আর ইনটেলিজেন্ট এনাফ'। বকুল একদিন বলেছিল, 'গেঁয়ো গেঁয়ো। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে জান না।' সজলের সে কথা মনে আসছিল। তার একথাও মনে হচ্ছিল যে, সে কোনো একটা খেলায় হেরে যাচ্ছে। কোথাও তার পরাজয় ঘটছে।

অরুণা কাটলেটের টুকরো চামচ দিয়ে তুলতে যাচ্ছিল। সজল হাতটা ধরে ফেলে হাসতে হাসতে মৃদু গলায় বলল, 'কেন কাওয়ার্ড বললে?'

অরুণা জিভ বের করে ভেংচি কাটল।

'আমি কাওয়ার্ড নই, কখখনো ছিলাম না? তবে কারুর কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিতে ভালো লাগে না।'

অরুণা খেতে খেতে হালকা সুরে বলল, 'তবে জগৎ শুদ্ধ লোক তোমাকে ঢেলে দেবার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রইবে। মরে যাই আর কি?'

সজল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কারণ অরুণার কথাটাও বোধহয় সত্য। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে, কারুর দানের ওপর সর্বদা নির্ভর করে নিশ্চিত থাকা যায় না। অর্জন করতে হয়। অফেনসিভ গেম তাকে কখনো কখনো খেলতে হবেই। যুদ্ধে জিততে হলেই আক্রমণকারীর ভূমিকাই নিতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা দু' কাপ কফি রেখে গেল।

সজল কফিটা চুমুক দিয়ে দেখল, অত্যন্ত গরম আছে।

কিন্তু এই কেবিনে কাছে বসে থাকা অরুণার হাতটা যেন এর চেয়েও গরম।

অরুণা সজলকে দেখছিল। এ সজলকে সে কখনও দেখেনি। অন্তত সজলের তাই মনে হচ্ছিল। নইলে অরুণা, একটা বিধ্বস্ত ক্লান্ত শীর্ণ লতার মত তার ওপর এমন নির্ভরশীল হয়ে উঠবে কেন!

সিঁড়ি দিয়ে দুজনে ধীরে ধীরে নামছিল। অরুণা কোন কথা বলছিল না। তাই বলে, সজলের কোন আচরণে সে যে ক্ষুব্ধ, অপমানিত, একথাও সজলের মনে হচ্ছিল না। তবে অরুণা এমন চুপচাপ কেন?

বাস-এর জন্য দুজনে স্টপেজে দাঁড়িয়ে ছিল। সজল একটু কাছে সরে এসে বলল, 'এক্ষুনি ফিরতে হবে তোমাকে?'

অরুণা হেসে বলল, 'না, দিদি আজ বাড়ী ফিরবে রাত করে। সিনেমায় গেছে।'

সজল উত্তরটা শুনে খুশি হল। বুঝতে পারল, অরুণা সেইজন্যই এই দিনটা বেছে নিয়েছিল। কাজেই অরুণা আরও দু'তিন ঘণ্টা দেরি করেও বাড়ী ফিরতে পারে। ইভনিং শো শেষ হতে অনেক দেরি।

অরুণা ফিসফিস করে বলল, 'এসো এইখানেই নামি।'

জায়গাটা সজল দেখল, জগুবাজারের কাছাকাছি। অর্থাৎ এখান থেকে হাজরার মোড় বেশ দূরে।

কিন্তু অরুণার বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা সজল উপেক্ষা করতে পারল না।

এগলি ওগলি পেরিয়ে অরুণা যখন যাচ্ছিল, সজল তখন বুঝতে পারল, অরুণা তাকে তার বাসায় নিয়ে যাচ্ছে।

সজল না বলতে পারল না। কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মত, অরুণার সঙ্গে সঙ্গে সজল হেঁটে যাচ্ছিল। এ যেন নিশির ডাক। নির্জন, গভীর রাত্রে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে, আর সেই অলক্ষ্য ডাক শুনে একা নীরবে ভরপুর গভীর অরণ্যের দিকে চলে যাচ্ছে সে।

কিন্তু নিশির ডাক মৃত্যুর হাতছানি!

সজল শিউরে উঠল একবার। কিন্তু মনে মনে হাসল। একটা বড় রাস্তায় এসে পড়েছে দুজন। আলো জ্বলছে, লোকজন চলছে।

ঐ রাস্তাটা পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই আদি গঙ্গার ধারে অরুণাদের সেই বাসাটা পড়বে। ঘরটা বেশ গোছানো। পশ্চিমদিকে একটা বড় তক্তপোষ। ওপরে সুন্দর বেডকভার পাতা। একটা সেলফে কিছু বই। তার মধ্যে কবিতার বইও আছে।

সজলের মনে ঘরটার ছবি ভেসে উঠেছিল।

অরুণা আস্তে আস্তে বলল, 'কি হল তোমার? এত্তো চুপচাপ?'

সজল কোন উত্তর দিল না।

অরুণা ফিরে দাঁড়াল, 'মন খারাপ লাগছে? ভয় পাচ্ছ?'

সজল হাসল। 'ভয়টা তোমারই পাওয়ার কথা। বাড়ীতে কেউ নেই, আমাকে নিয়ে যাচ্ছ।'

'তোমার মত ছেলেকে মেয়েরা ভয় করে না।'

'তবু ভয় করে'!
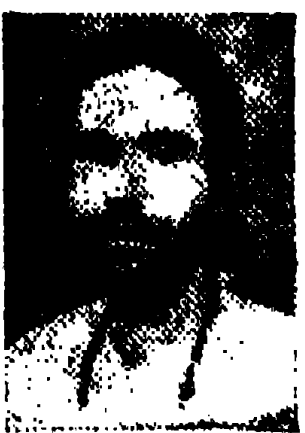
অরুণা সুন্দর করে হাসল। 'এই ত 'ফর্ম'এ এসেছ দেখছি। আচ্ছা, সজল, মাঝে মাঝে তোমার কি যেন হয়!'

'আরতিও সেই কথা বলে?'

অরুণা আকাশ থেকে পড়ল। 'মাই গড, ওটিকে আবার কোত্থেকে জোটালে?'

সজলের রাগ হচ্ছিল। কিন্তু তবু এ কথার উত্তর দিল না।

অরুণা আবার বলল, 'তুমি বেশ আছ, মাইরি। ডুবে ডুবে জল খাও। সেই যে সুলতাদি, ম্যাডোনার মত যার নাকি রূপ! তার ওপর আবার আরতি? এদিকে ত আমি আছি-ই। তা, এটি কেমন দেখতে? বয়স কত?'

সজল এবারও চুপ করে রইল।

পাড়াটা কি কারণে অন্ধকার। সব ঘরেই আলো নেবানো। বোধহয় কারেণ্ট ফেল হয়েছে এদিকে। মোমবাতি জ্বলছে কোন কোন বাড়ীতে।

অরুণা নিঃশব্দে দরজার তালা খুলল। চাপা গলায় বলল, 'এসো।'

সজল ভেতরে ঢুকল। কিন্তু সারা ঘরটা একটা অপরিচিত অন্ধকারের রাজ্য।

অরুণা নিঃসংকোচে সজলের হাত ধরে তক্তপোষের ওপর বসাল। সজল ভয়ে ভয়ে বলল, 'আলো একটার ব্যবস্থা কর।'

অরুণা আন্দাজে হাতড়াতে হাতড়াতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বুঝতে পাচ্ছিল, অরুণা বাথরুমের কপাট বন্ধ করল। হাত-মুখ ধোবার শব্দ আসছিল।

অরুণা ফিরে এল। মনে হয় কাপড় ছাড়ল। পাউডার মাখল।

এই অন্ধকার ঘরটাও রেস্তোরাঁর সেই কেবিনের মত। সজল সেই অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসেছিল।

অরুণা এখানে এক অশরীরী সত্তা। কোন রহস্যপুরী থেকে তার আস্তে আস্তে কথা বলার স্বর ভেসে আসছিল।

সজল এখন বুঝতে পারছিল, অরুণা কাছে এসে বসেছে।

'হাঁ, বললে না ত এই আরতিটি কেমন?'

সজল হেসে বলতে চেষ্টা করল, 'ভালো।'

'না, একটু 'ডিটেলস'এ বল?'

'জানি না।'

'তুমি জান না? আমাকে বোকা পেয়েছ? তুমি সব দেখেশুনে, তারপর ভাব কর। যাই বল, তোমার টেস্ট আছে। চোখটা তৈরি।'

সজল চুপ করে রইল। সে অনুভব করছিল, অরুণা তার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছে।

'বল না সত্যি করে? আরতি আমার চেয়ে দেখতে ভাল?'

অরুণার মুখটা এবার খুব কাছে।

অন্ধকারের সমস্ত দূরত্ব পার হওয়া এখন এমন কিছু কঠিন নয়।

সজলের সেই রেস্তোরাঁর কথা মনে হচ্ছিল। সে এক নায়ক। জীবনের কোন খেলায় সে পরাজিত হতে চায় না। এবং জেতবার প্রথম কথা ঠিক মুহূর্তে, ঠিক লগ্নে চলতে শুরু করা।'

অরুণা ফিসফিস করে বলল, 'তা আরতিকে কেমন লাগে?'

সজল নিজের মধ্যে সাহস ফিরে পেতে চাইল। বলল, 'খুব ভালো।'

'কি করে বুঝলে?'

'যেমন করে তোমাকে বুঝছি?'

'আমাকে আর কতটুকু বুঝেছ?'

'তোমাকে বোঝার আরো বাকি আছে নাকি?'

অরুণা খিল খিল করে হেসে উঠল, 'শুরুই হয়নি, এর মধ্যে শেষ? মাই গড? আচ্ছা সজল, সত্যি করে বল ত, তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

সজল বলল, 'বোধহয়।'

'বড় বুদ্ধিমান তুমি। বড্ড হিসেবী। ধরা দিতে চাও না। কেবল এড়িয়ে যাও।'

'কেন?'

'ভালোবাসলে তুমি পাগল হতে, সব কিছু তছনছ করে ফেলতে।'

অন্ধকার ঘরে অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসেছিল। সজল অনুভব করছিল, অরুণা আরো কাছে এসেছে, ওর বুকে অরুণার মাথা, ঘন চুল থেকে একটা গন্ধ উঠে সজলের সমস্ত সচেতনতাকে, বুদ্ধিকে বিচারবোধকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করে তুলছে। একটা দুর্বার শক্তি সজলের সমস্ত সত্তাকে, গভীরতম অন্ধকারতম, ভয়ঙ্করতম প্রদেশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মাঝখানে চেতনাহীন সময়ের কিছু ব্যবধান। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত আনন্দের ভীরু, শঙ্কিত পদসঞ্চার। অরুণা সজলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

সজল উঠে বসল। অরুণা তখনও বালিশে মাথা রেখে ক্লান্তিতে, তৃপ্তিতে শুয়েছিল। তার নিঃশ্বাসের শব্দ সজলের কানে আসছে।

অরুণা খুঁজে খুঁজে সজলের ডান হাতটা টেনে নিয়ে নিজের কপালের ওপর রাখল, ঠোঁটের ওপর রাখল। রেখে, নিবিড় তৃপ্তিতে তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল।

সজল নিজের জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতায় কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ছিল। একটা অপরাধবোধ, ভয়, তাকে বিভ্রান্ত করছিল। কিন্তু এই অন্ধকার ঘরে, অরুণা এখন যেভাবে সজলের স্পর্শ নিচ্ছে তার মধ্যে একটা প্রকৃত ভালোবাসার সুর, ভালোবাসার স্পর্শও সে পাচ্ছিল, যা একটা সুন্দর সান্ত্বনার মত।

এবং এই সুর এই স্পর্শ তাকে একটা পাপবোধ থেকে ক্রমশ অন্য কোন আলোকে নিয়ে যাচ্ছিল।

ভালোবাসাই সত্য, ভালোবাসাই আনন্দ, ভালোবাসাই জীবন! ভালোবাসার মূলধন এত বিরাট যে, এইসব ছোটখাট স্খলন, পতন, ত্রুটি তার কাছে কিছু নয়। অকিঞ্চিৎকর ঘটনামাত্র, স্বাভাবিক ঘটনামাত্র।

সজল সহজ হল, নির্ভয় হল, অরুণাকে এবার আরো নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল, তার মনে হচ্ছিল, অরুণাকে সে এত ভালো কোনোদিন বাসেনি। এই মিলনের মধ্য দিয়েই তার ভালোবাসা আজ সম্পূর্ণ হল। আজ থেকেই অরুণার সঙ্গে সজলের জীবনের বন্ধন, সত্য রূপ পেল, পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল, পরিপূর্ণ রূপ পেল। এই অদৃশ্য বন্ধন আমৃত্যু অক্ষয় হয়ে থাক্!

অরুণার বুকে মুখ রেখে সজল, কতক্ষণ চুপ করে পড়েছিল। জীবনের এই পরম অনুভূতি, এই আনন্দময় আশ্চর্য অনুভব, যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সজল এক মৃত্যুহীন প্রাণের প্রবাহের মত সারা পৃথিবী জয় করতে পারে।

অরুণা আস্তে আস্তে সজলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘুমভাঙা গলায় বলল, 'কি ভাবছ, সজল? খারাপ লাগছে?'

(ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন

গত ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'মানুষ' কবিতাটির লেখকের নাম অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় হবে।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু · সুহৃদ গোপাল দত্ত

জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের প্রারব্ধ কর্মজীবন

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম
কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।
গীতা—৪।২১

জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ (আশ্লেষ) হয় না। জীবন্মুক্তকে ভোগের দ্বারা তাহার ক্ষয় করিতে হয়—'ভোগেন ত্বি ইতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে' (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৯)। শঙ্করাচার্যের মতে, ইহজন্মের সব কিছু কর্মফল বিনষ্ট হলেও যে প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা এই জন্মের শরীর নির্মিত হয়েছে, ভোগ ভিন্ন সেই শরীরের ক্ষয় হয় না। এই প্রসঙ্গে সাংখ্যসূত্রে (৩।৮২-৩) বলে, 'চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ। সংস্কারলেশতঃ তৎসিদ্ধিঃ।' — অর্থাৎ ঘট প্রস্তুত হয়ে যাবার পরও কুম্ভকারের চক্র যেমন (বেগাখ্য) সংস্কারের বশে ঘুরতে থাকে তেমনি জীবন্মুক্ত হবার পর জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ এবং শরীরকর্ম প্রারব্ধ কর্মের সংস্কারের বশে চলে—এই কারণেই তিনি জীবিত থেকে দেহ-ভোগের মাধ্যমে ঐ প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় করেন। প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখন মুক্ত পুরুষের অন্তিম দেহের পতন হয় তখন তিনি যদি নির্মাণমুক্তি-কল্পে 'স্বারাজ্য-সিদ্ধি'র অভিপ্রায় করেন তাহলে তিনি ইচ্ছাগতি প্রাপ্ত হন। ইনি ইচ্ছা করলে সেই ইচ্ছা সফল করার জন্য দেবতারা নিমিত্ত কারণ হন। ব্রহ্মসূত্র বলে—'সঙ্কল্পাৎ এব তু তৎ শ্রুতেঃ' (৪।৪।৮)। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলে—সর্বে অস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি' 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' (তৈত্তি, ১।৪-৫)। ছান্দোগ্যের ঋষিও জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের এই 'ইচ্ছাগতি'র কথা স্বীকার করেছেন—'ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' (ছা. ৮।১।৬) এবং 'স যং যম্ অন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে' (ছা. ৮।২।১০)। তথাগতের দর্শনে বলে ইচ্ছাগতিপ্রাপ্ত পুরুষ হলেন 'সম্ভোগকায়'। সম্ভোগকায় পুরুষ নির্বাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভোগকায় যদি নির্মাণমুক্তির ব্রত গ্রহণ করেন তবেই তিনি শ্রেষ্ঠতম। এই শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ব্রহ্মের মতই সর্বাধিকারসম্পন্ন, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, কেবলমাত্র জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তার কোন কর্তৃত্ব হয় না—এই কর্তৃত্ব সেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের। জীবন্মুক্ত পুরুষ নির্মাণমুক্তির ব্রতে বিধিলিপি অনুযায়ী 'অধিকার' পাবার পর 'অধিকার পরিসমাপ্তি' পর্যন্ত 'অধিকৃত-মণ্ডল'-এর সীমারেখায় ঈশ্বরের মতই সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। এই সময়ে তাঁর কোন কর্মফলের সঞ্চয় হয় না এবং অধিকার পরিসমাপ্তি হলে সেই সত্তাবান পুরুষ গুণাতীত সত্তা বা সচ্চিদানন্দময়ের মধ্যেই লীন হয়ে যান। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ব্রাহ্মণ যখন বিশ্বকল্যাণের অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে দেবতা হন তখন তাঁর দেহধারী হয়ে থাকা অথবা না-থাকা সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছাধীন। ব্রহ্মসূত্রের বাদরায়ণ ভাষ্য বলে—'শরীরের থাকা না-থাকা জীবন্মুক্ত পুরুষের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রদবৎ ভোগ হয়, যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।' সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং স্বরাজ্যের অধীশ্বরযুক্ত পুরুষ ইচ্ছাবশে কায়ব্যূহ রচনা করে ঐ কায়ায় অনুপ্রবেশ করতে পারেন।

১৯২৭ সাল। প্রারব্ধ কর্মের ফলে প্রাপ্ত দেহমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের প্রজ্ঞা পরা-চেতনার আবাহনে নিযুক্ত। শ্রীমার দিব্য-শক্তির প্রভাবে বিশ্বমুক্তির প্রাণকেন্দ্র পণ্ডিচেরীর আশ্রম-জীবন স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ গতিতে নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আশ্রমবাসীরা সাধনার মাধ্যমে অতিমানসের অবরোহণের বুনিয়াদ গঠনে আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই নৈসর্গিক আশ্রম-জীবনের একটি নিখুঁত বর্ণনার উল্লেখ করছি।

'দৈনন্দিন কর্মের মধ্য দিয়ে বাসনা-ত্যাগ ও আত্মনিবেদন সাধনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য হত। প্রত্যেকের কর্ম শ্রীমা নিজে ঠিক করে দিতেন। কর্মের মধ্যে উঁচু-নীচু, শ্লাঘ্য-হেয় বলে কিছু ছিল না। বাড়ি-ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, সেলাই করা থেকে আরম্ভ করে পঠন-পাঠন, গান-বাজনা, ছবি আঁকা প্রভৃতি সব রকমের কাজ ভগবানের সেবারূপে করবার দিকে সকলেরই একান্ত চেষ্টা ছিল। কর্ম বাদ দিয়ে ধ্যান-ধারণা স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ে থাকলে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-যোগের যা লক্ষ্য—মানুষের স্থূলে প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর তা কখনই সম্ভব হবে না, এ-তথ্য কারো অবিদিত ছিল না। কিন্তু এ-বিষয়েও কোন নিয়ম, কোন বাহ্যবিধানের অনড় বাধা-বাধকতা বা কঠোর শাসন ছিল না। সবাই স্বেচ্ছায় শ্রীমায়ের কাছে কাজ চেয়ে নিত ও আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁর সেবারূপে, 'যদ্যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্' এই ভাব নিয়ে নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত। লক্ষ্য ছি

পরম্পরাগত ধ্যান-ধারণায় সমাধিতে আসক্ত না থেকে গীতোক্ত ব্রহ্মকর্মসমাধিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা, কারণ জীবনের সমস্ত কর্ম নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে ভগবদুদ্দেশে করতে না পারলে কর্মের মধ্যে মুক্তি ও ভগবানের সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ সম্ভব নয়। এই নিয়মশৃংখলাহীন সাবলীল জীবন-প্রবাহের পেছনে দেখতে পেলাম এক অমোঘ ঐশ নিয়ন্ত্রণ, মাতৃশক্তির প্রেমাপ্লুত, জ্যোতির্জ্জ্বল, অদৃশ্য পরিচালন — সাধারণ মানুষের অগোচরে, কিন্তু মানবাত্মার উল্লসিত সহযোগে এই বহু-ভঙ্গিম সংঘজীবনকে সুষম সুবিন্যস্ত করে পুরুষোত্তমের পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে।' (১৯)।

পণ্ডিচেরীর আশ্রমবাসীদের প্রত্যেকের কাছেই শ্রীমা-ই সেই সাধনার গুরু ছিলেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-সত্তার এক অপূর্ব প্রতিমা শ্রীমা অহর্নিশি দেব-সংঘের সংঘনায়কদের মধ্যে জ্যোতিষ্মানের উপযুক্ততা আনবার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন।

'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি' (গীতা, ৩।২০)। কর্মযোগের সম্বন্ধে অর্জুনকে ভগবান শিষ্য ও গুরুরূপে এই কথাটি বলেছিলেন। সমস্ত জগতের পালন-পোষণ করে লোকসংগ্রহের এই যে অধিকার, সেটি জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রাপ্ত হন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন যে, 'লোক-সংগ্রহকারক সূক্ষ্ম ধর্মার্থনিরত সাধুদিগের উত্তম চরিত্র, বিধাতারই বিধান'। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব রামকে বলেছেন — যে পর্যন্ত লোকের পরামর্শ নেবার কাজ এতটুকুও বাকী থাকে অর্থাৎ শেষ না হয়, সে পর্যন্ত যোগারূঢ় পুরুষের অবস্থা নির্দোষ বলা চলে না। ভগবান নিজে (সাধুদের সংরক্ষণ, দুষ্টদের নাশ ও ধর্ম সংস্থাপন) লোকসংগ্রহের কাজে অবতীর্ণ হন সুতরাং মমত্বশূন্যরহিত জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষেই লোকসংগ্রহের কাজ সাজে। "গীতাকালে চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা জারী ছিল এবং উহা গোড়ায় লোকসংগ্রহ করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হয়, ইহা নির্বিবাদ। এই চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা অনুসারে নিজ নিজ প্রাপ্ত কর্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে যেরূপ করিতে হইবে তাহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা নির্দেশ করাই গীতার এই লোকসংগ্রহ পদের অর্থ, ইহাই এখানে মুখ্য বক্তব্য। জ্ঞানীপুরুষ সমাজের শুধু চক্ষু নহেন, সমাজের গুরুও বটে। তাই ইহা স্বতঃই সিদ্ধ হয় যে, উক্ত প্রকার লোকসংগ্রহ করিবার জন্য তিনি আপন কালের সমাজব্যবস্থায় যদি কোনো ত্রুটি দেখেন, তবে তিনি তাহা শ্বেতকেতুর ন্যায় দেশকালানুরূপ পরিমার্জিত করিবেন এবং সমাজের ধারণ পোষণ শক্তিকে হ্রাস হইতে না দিয়া, তাহা যাহাতে বর্ধিত হইতে পারে এইরূপ উদ্যোগ করিবেন।... পরমেশ্বরের জ্ঞান অর্জন করাই এই জগতে মানুষের ইতিকর্তব্য — ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরে গীতার বিশেষ উক্তি এই যে, নিজের আত্মার কল্যাণেই সমষ্টিরূপ আত্মার কল্যাণার্থে যথাশক্তি চেষ্টারও সমাবেশ হয় বলিয়া লোকসংগ্রহ করাই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের প্রকৃত পর্যবসান।... প্রত্যেক মানুষে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকৃতি, স্বভাব ও গুণের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাকেই অধিকার বলা হয়। 'ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ' এই অধিকার অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া যাইবে, কর্মত্যাগ করিবে না এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ লোকসংগ্রহ না করিলে সম্পূর্ণতা কমিয়া যায় নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নরের অবতার অর্জুনকে এইরূপ উপদেশই দান করিয়াছিলেন।' (৩৩)।

১৯৩০ সাল। বিশ্ববাসীর কল্যাণ এবং মুক্তির ব্রতে ব্রতীপুরুষদের সঙ্ঘ কেন্দ্র পণ্ডিচেরী থেকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আদর্শ রশ্মি বিকীরিত হয়ে চলেছে। সঙ্ঘ-কেন্দ্রের প্রাণ-পুরুষের এবং প্রাণ-প্রকৃতির দিব্য-শক্তির আশিসে 'লোকসংগ্রহের' কাজ বিধি-নির্দিষ্ট সমষ্টির পদ্ধতিতে সম্পাদিত হচ্ছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত সাধনের সংকল্প নিয়ে এলেন পরম ভক্ত ও সেবক (ডাক্তার) নীরদবরণ। শ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে ১৯৩৩ সালে তিনি পাকাপাকি চলে আসেন পণ্ডিচেরীতে। শ্রীঅরবিন্দ তখন খুলে দিয়েছিলেন কাব্যপ্রেরণার নির্ঝর : দিলীপ রায়, অমলকিরণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ সাহানা দেবী, নিশিকান্ত, কবি হারীন চট্টোপাধ্যায়, (সরোজিনী নাইডুর ভাই), অর্থব, জ্যোতির্মালা প্রভৃতি এই প্রেরণারই মুক্তধারায় অবগাহন করে ইংরাজি ও বাংলা কাব্যজগতে শ্রীঅরবিন্দ-প্রদর্শিত নতুন পন্থার পথিক হন। ডাঃ নীরদবরণও বাদ গেলেন না। বহুসাধনা অধিবাস্তবপন্থী কবিতায় তিনি কাব্যজগতে শ্রীঅরবিন্দ প্রদর্শিত নতুন পন্থার দেখালেন সহজ দখল।" (১৯)। ঐ সময়ে বিখ্যাত ফরাসী কবি মোরিস মাগ্রু দিব্য-জীবনের জিজ্ঞাসা নিয়ে পণ্ডিচেরীতে আসেন। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কাছে তিনি যা পেয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি ফরাসী ভাষায় 'মহাপুরুষ প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

১৯৩৪ সাল। পরাচেতনার আবাহনে যোগস্থ মহাপুরুষ বললেন, "সৎ, শুভ ও মঙ্গলময় শক্তির আগমন যতই সম্ভাবনায় ভরে উঠছে, অশুভ ও অমঙ্গলময় শক্তি সরোষে ততই পুঞ্জীভূত হচ্ছে। পরা চেতনা যে নির্গুণ এবং প্রকৃতি-চেতনা যে সগুণ। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে ঈশ্বরের লীলা অভিব্যক্ত হচ্ছে, সুতরাং লীলার গতি অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রণীত হয় — মানুষের স্বার্থান্ধ প্রয়োজনে সেই পরিকল্পনার পরিবর্তন হয় না"।

> "The supramental Force", he said in 1934, 'is descending but it has not yet taken possession of the body or of matter—there is still much resistance to that. I know this Descent is inevitable —I have faith in view of my experience that the time can be and should be now and not in a later age.' (Sri Aurobindo on Himself).

এর পরের বছর তিনি একটি চিঠিতে ইঙ্গিত দিলেন — "হার মেনে নিলে যদি জয়ের ভবিষ্যৎ পথ প্রশস্ত হয় তবে সেই হার মেনে নেওয়াই বিধি-নির্দেশ বলে বুঝতে হবে"। শুভ-শক্তির দিগ্বিজয়ের সেনাপতির মনে সেই সময়ে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করবার এই বিচিত্র রণ-কৌশল ভবিষ্যকালের একটি মহান পরিণতির আভাস দিয়েছিল। "সব দিক বিচার করে

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা মন্দির (পণ্ডিচেরী)

---

(১৯) পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ। পৃঃ ১১৬।

(৩৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিলকের কর্মযোগশাস্ত্র (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ৩৭৭-৩৯।

দেখলে মনে হয়, শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ব্যাধিকে [illegible] একটা [illegible] আরও [illegible] ও'র এক [illegible] ... আমি স্বর্গ নিয়ে ব্যস্ত নই...এ বরং ঠিক উল্টোপ্রান্ত নিয়ে রয়েছি, আমাকে নামতে হবে পাতালে, যাতে গড়তে পারি দুয়ের মধ্যে সেতু। আমার কাজের জন্য এরও প্রয়োজন আছে, এর সম্মুখীন হতেই হবে।"

শ্রীঅরবিন্দ-চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী—'এই নিমজ্জনের পথে নিগূঢ় নিশ্চেতনা স্তরের পর স্তর যেমন দীর্ঘ করে ধরা হয় আর তার মধ্যে নামিয়ে আনা হয় অতিমানসের আলো, তেমনি সেই সঙ্গে আবার ভয়ংকর সম্ভাবনা—আসতে পারে ভিতরে আঘাত এবং শরীরের উপর দারুণ নির্যাতন'। পরের বছরে, ১৯৩৭ সালে, এক শিষ্যের পত্রোত্তরে শ্রীঅরবিন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় জানালেন,

> 'here there are any number of people who have had experiences which could be highly prized outside. There are even one or two who have had the Brahman realisation in a single year'. (34)

প্রবন্ধ কর্মে জীবন্মুক্ত পুরুষের একটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। 'ইচ্ছাশক্তি'-র অধিকারী জগতের কল্যাণে নিষ্কামভাবে একটির পর একটি প্রয়োজনীয় সংকল্প নিয়ে চলেছেন। দেবসংঘের 'সংঘনায়কত্বের যোগ্য হবার প্রস্তুতি চলেছে আশ্রমবাসীদের মধ্যে। শুভময়ের আবির্ভাব আসন্ন। এমন সময় অশুভ-শক্তির পুঞ্জীভূত রোষ প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠলো। অশুভ-শক্তি সার্থকভাবে রূপ পরিগ্রহ করলো হিটলারের বিশ্বগ্রাসের সর্বংসহা ক্ষুধাকে অবলম্বন করে। নির্মাণমর্মনিষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ বললেন,

> 'the peril of black servitude and a revived barbarism threatening India and the world'.

(১৯) পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ। পৃঃ ২২৬।

(34) Nirode baran : Correspondence with Sri Aurobindo : 2nd series : P. 50

পশুশক্তির পতন ঘটাবার সংকল্প করলেন শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্টির সংরক্ষণে, বিশ্বের কল্যাণে—[illegible] প্রবৃত্ত হল [illegible] বলীয়ান [illegible]। এর পরিণাম [illegible] রূপায়িত হয়েছে দর্শনাচার্য [illegible]কুমার মিত্রের লেখনীতে :

> 'those forces of Darkness which were out not only to destroy human civilisation with all its higher values but also to frustrate the Divine work of Sri Aurobindo and the Mother—the work of liberating man from his bondage to these forces into the freedom and power of a New Light from above that would transform man into his destined divine perfection. When these hostile forces found that their sovereignty over the earth was challanged they attempted, said Sri Aurobindo, an attack on the Mother's body. But as he concentrated exclusively on repelling it without even allowing a shade of the black force to fall on the Mother, the attack came on him.

যেমনটি আভাস দিয়েছিলেন ১৯৩৬ সালে—"আসতে পারে ভিতরে আঘাত এবং শরীরের উপর দারুণ নির্যাতন"।

১৯৩৮ সালের ২৩শে নভেম্বর অরিখে সেই অশুভশক্তির পুঞ্জীভূত রোষ আঘাত হানলো শ্রীঅরবিন্দের দেহে—ডান পায়ের উপরের দিকের হাড় ভেঙে গেল। ঠিক বারো বছর আগে যে পরা-চেতনার সঙ্গে তিনি নিজে সংযুক্ত হয়েছিলেন সেই পরা-চেতনার জ্যোতিঃস্নান আরও ব্যাপকভাবে হওয়ার পথে অশুভশক্তি প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করলেও সর্বাংশে করতে পারলে না—বিংশ শতাব্দীর নীলকণ্ঠ নিজে সেই বিষ টেনে নিলেন। অন্ধকারের প্রভাবে আলো নিষ্প্রভ হলো না বরং আলোর মাঝে হলো অন্ধকারের মৃত্যু। এইভাবে হিটলারের মদোন্মত্ততার যূপকাষ্ঠে দেশমাতৃকার অকালমৃত্যুকে প্রতিরোধ করলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের সেই অশুভ-শক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করার নিয়তিকেও নির্ধারিত করলেন। এই নিয়তির সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা। এই ঘটনার পরের বছরই হিটলারের বীভৎস রূপ প্রকাশ পেল, ক্রমশঃ বিশ্বকে বিপর্যস্ত করলো কিন্তু নিয়তির অমোঘ নির্দেশে হিটলার নিশ্চিহ্ন হলেন। এই ঘটনাচক্রে বৃটিশের প্রভুত্বের উন্মাদনায় ভাঁটা পড়লো, ফলে ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা আকস্মিকভাবে ত্বরান্বিত হলো।

১৯৩৯ সালে পণ্ডিচেরীতে এলেন বিশ্বভারতীর চীনা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধ্যাপক তান্ য়ুন্ শান্। দর্শন করলেন দিব্য-পুরুষকে এবং আদ্যাশক্তিকে। উপলব্ধি করলেন এবং বললেন, "জীবনের দুঃসাধ্য এক দর্শনের বিবর্তন করেছেন [illegible] আধ্যাত্মিক [illegible]

ইতিহাসে যা অদ্বিতীয় এবং তাঁর চরম লক্ষ্যের...সিদ্ধিও অবধারিত।"

১৯৪০ সাল। শ্রীঅরবিন্দের দেহে দেখা দিল শেষ-ব্যাধির প্রথম লক্ষণ। কলকাতার বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক প্রভাত সান্যাল গুরুদেবের দেহ-বৈকল্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে সব সময়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিলেন। কিছুদিন পর আবার ডাক্তার সান্যাল এলেন গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনে। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তাঁকে বলেছিলেন, 'অসুখ আর নেই, আমি রোগ সারিয়ে ফেলেছি'।

এই সময়ে 'সাবিত্রী' মহাকাব্য লেখার কাজ পূর্ণ-উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। এই লেখা ছাড়া আশ্রম-সম্পর্কিত পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক কাগজের (বিভিন্ন ভাষায় লিখিত) প্রবন্ধ শোনা, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখা, ভক্ত-শিষ্যদের উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কাজ ছিল তাঁর দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য এবং একান্ত সচিব ডাক্তার নীরদবরণ লিখেছেন : "এ সমস্ত ভারী বোঝা বইবার সময় ছিল মাত্র দেড় কি দু'ঘণ্টা।...অনেকে অবাক হয়ে ভাবত এত অল্প সময়ের মধ্যে কলের মত দ্রুতগতিতে কাজের স্তূপ নিঃশেষ হতো কি করে। কলের মতই বটে, শ্রীকৃষ্ণের যাদুশক্তির মতও বটে। কারণ এ সময় তাঁর কার্যক্ষমতার একটা অদ্ভুত নিদর্শন চোখে পড়ে।...এ সব কর্মকৌশল—যোগঃ কর্মসু কৌশলং—আমরা দেখতে পাই, বুঝতেও পারি কিছু, কিন্তু অদৃশ্য জগতে তাঁর মহাশক্তির লীলাখেলা বুঝবার ক্ষমতা কোথায় আমাদের?"

ঠিক এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব পরোক্ষভাবে ভারতকে প্রভাবিত করেছে। রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করেছেন—'ইহাই স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের উপযুক্ত সময়'। ১৯৪০ সালের প্রথমভাগে সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আবার কারারুদ্ধ হবেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন, যে ভাবেই হোক ভারতের বাইরে যাবেন। সেই পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করলেন ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি, আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এলগিন রোডের বাড়ীতে অন্তরীণ থাকার সময়ে ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি রাত্রি ১-২৫ মিনিটে সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে এলগিন রোডের গৃহত্যাগ করেন। ১৯৪[illegible] সালের অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের প্রধান দফতরে

উদ্‌বোধন করেন। নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের দফতর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। ডিসেম্বর মাসের ৭ই ভারতবাসী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনলেন; "আমি সুভাষ,... আমি যেভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছি, ঠিক তেমনি করেই উপযুক্ত সময়ে আপনাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হবো।...নিজেরা জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হোন—চাই ঐক্য ও একাগ্রতা'। 'জয় হিন্দ' সম্ভাষণ প্রচারিত হলো। সুভাষচন্দ্র হলেন 'নেতাজী'। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি পেল কবিগুরুর লেখা 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য-বিধাতা'।

১৯৪২ সাল। শ্রীমা আশ্রমের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। দিব্যশক্তির প্রভাবে আশ্রমের জীবন এগিয়ে চলেছে স্বতঃ-স্ফূর্ত গতিতে বিধিনির্দিষ্ট পথে। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্নেল হাণ্ট ৪০,০০০ ভারতীয় সৈন্য জাপান গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ফুজিহারার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন।...এদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে চাইল তাদের নিয়ে আই. এন. এ গঠনের চেষ্টা চললো। প্রায় চার হাজার যুদ্ধবন্দী ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আগস্ট মাসের মধ্যে আই. এন. এ ভুক্ত হয়ে গেল।... ব্যাঙ্কক অধিবেশনে একটি কর্ম-পরিষদ গঠন করে শ্রীরাসবিহারী বসু তার সভাপতি ও মোহন সিং সভা সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।... ১৯৪২ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি অফ স্টেটস ভারতের বর্তমান অবস্থায় করণীয় কি হতে পারে এই মর্মে এক স্মারকলিপি পাঠালেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি চিয়াং কাইশেক প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানালেন আসন্ন জাপ অভিযানের মুখে ভারতের সংকটময় অবস্থা। ...আমেরিকা ও ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্যে ভারতের নেতাদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের একটা মীমাংসা করা একান্ত প্রয়োজন। ১লা মার্চ লক্ষ্ণৌয়ে বীর সাভারকার...বললেন যে, ভারত চায় পূর্ণ স্বাধীনতা এবং...উদারনৈতিক দলের পক্ষে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু মিস্টার চার্চিলের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠালেন।...চার্চিল তখন কোন কিছু শুনতে রাজী নন। ১৯৪২ সনের ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হলো।...রেঙ্গুনের পতনের পর বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক ও সোস্যালিস্ট সদস্যেরা মিঃ চার্চিলের উপর চাপ দিতে লাগলেন। একদিকে রুজভেল্ট অন্যদিকে চিয়াং কাইশেক ও রাশিয়া সমানে মিস্টার চার্চিলকে জানাতে লাগলেন যে, ভারতবাসীর সহযোগিতা না পেলে জাপানের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষা করা অসম্ভব। কাজেই ভারতের নেতাদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। মিঃ চার্চিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত ১১ই মার্চ ঘোষণা করলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্বিরোধ অবসানের জন্যে ক্যাবিনেট সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে যাবেন। ...১৯৪২ সনের ২৩শে মার্চ এলেন স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস—নিয়ে এলেন draft declaration বললেন তাঁর প্রস্তাবের অর্থ পূর্ণ নিরঙ্কুশ স্বায়ত্ত শাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। তবে সব কিছুই যুদ্ধের শেষে, আগে নয়।...ক্রীপস-প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করতে পারল না। ...গান্ধীজী ক্রীপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন...

......a post dated cheque on a crashing bank. কংগ্রেস বললো—'Cripps is an agent of British re-action. পণ্ডিত নেহরু বললেন, 'It is sad beyond measure that a man like Sir Stafford Cripps should allow himself to be come a Devil's Advocate'. (35)

ক্রীপসের প্রস্তাব ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায় সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিল। ভারতের উত্থান-পতনের নিয়তির সঙ্গে জড়িত এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তিনি উদাসীন না থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্রীপসকে তাঁর মত লিখে জানালেন:

'I welcome it as an opportunity given to India to determine for herself, and organise in all liberty of choice, her freedom and unity and take an effective place among the world's free nations I hope that it will be accepted, and right use made of it, putting aside all discords and divisions. I hope too that friendly relations between Britain and India replacing the past struggles, will be a step towards a greater world union in which, as a free nation, her spiritual force will contribute to build for mankind a better and happier life.'

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

তিনি স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতাদের পত্র লিখলেন এবং দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে তাঁর শিষ্য ডোরাইস্বামী আয়ারকে দূত হিসাবে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিগুলি পেশ করবার জন্য পাঠালেন। শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ক্রীপসের প্রস্তাব মেনে নিলে ভারতের শিল্প ও অর্থনৈতিক কাঠামো সুঠাম হয়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় যুবকেরা সামরিক শিক্ষা গ্রহণের অভূতপূর্ব সুযোগ পাবেন। এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে ভারতের অখণ্ডতাও বজায় থাকবে—এই গূঢ় তত্ত্বটিও শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। প্রস্তাবটি এসেছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসের কাছে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের অন্ধ-আবেগ সেই সময়ে তাদের দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাই ক্রীপসের দৌত্য ফলপ্রসূ হল না। এই প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

'I have done a bit of Nishkama Karma (disinterested work) was his smiling reply.'

(ক্রমশঃ)

(৩৫) গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। অবিস্মরণীয়। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৫৮—৬৫।

বহুবিবাহ যখন আমেরিকায় প্রচলিত ছিল

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসের এক বরফ-ঝরা সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করলেন সেই ঐতিহাসিক রায়: দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল যুক্তি-তর্কের পালা, বিজ্ঞ ও সুধীজনের মতামত শোনা হয়েছিল দিনের-পর-দিন। তবুও রায়দান সর্বসম্মত হয় নি। বিচারকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল মতভেদ। শেষ পর্যন্ত ৬—৩ ভোটে সংখ্যাধিক্যের মতামত অনুসারে ঘোষিত হল রায় : একজন আমেরিকানের পক্ষে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে একাধিক পত্নী রাখাটা অবৈধ, তা সে যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন।

একাধিক পত্নী রাখার দাবীদার ছিলেন ছ'জন—যাঁরা নিজেদের 'মর্মোন' সম্প্রদায়ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিষয়টি প্রথমে হাইকোর্টে উত্থাপিত হয় — কিন্তু প্রচলিত আইনের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকার ফলে এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট রায়দান সহজ ছিল না। যদিও সুপ্রীম কোর্ট এ ব্যাপারে সংখ্যাধিক্যের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং সুস্পষ্ট অর্থ-বাহক রায় ঘোষণা করেছিলেন, তবু কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি কোন আইনানুগ পথের হদিস তাঁরা দিতে পারেন নি।

'মর্মোন' সম্প্রদায়ের জনক হলেন জোসেফ স্মিথ—যিনি নিজে ব্যক্তিগত জীবনে আটাশটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' এক নতুন ভাষ্য প্রচার করে জোসেফ একদিন এই নূতন মহাদেশে এক নূতন ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করেন, যার 'অভ্রান্ত' নির্দেশই ছিল 'বহু বিবাহের' মধ্যে জীবনের পূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। যদিও 'মর্মোন' চার্চ ১৮৯০ সালে বহু বিবাহের প্রথাকে নাকচ করে দেন, তবুও উক্ত ছ'জন যুবক নিজেদের 'মর্মোন' পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করে পুনরায় সেই 'বহু বিবাহের' স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন : এটা ঈশ্বরের সৃষ্ট আইন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এমন কোন অধিকার বা ক্ষমতা নেই, যা দিয়ে 'বিবাহের' অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

সমস্যা দেখা দিল প্রচলিত আইনের এক্তিয়ার এবং প্রয়োগ সম্পর্কে। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে এমন কোন বিধি বা নির্দেশ নেই, যেটা সরাসরি 'বহু বিবাহের' প্রথাকে বন্ধ করতে পারে। অগত্যা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন 'মান এ্যাক্টের' শরণাপন্ন হতে হল। সমস্যা সেখানেও। জটিলতা সেখানেও। কারণ, মার্কিন সংস্কারক হোরেস মান এই নূতন মহাদেশে 'গণিকাবৃত্তি' রদ করার জন্য যে আইন রচনা করেছিলেন, তা 'বহু বিবাহের' প্রথাকে কেমন করে বন্ধ করবে? 'মান এ্যাক্টে' বলা হয়েছে, দেহ-ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারীকে যদি ব্যবহার করা হয় তবে সেটা হবে মারাত্মক নৈতিক অপরাধ এবং এই অপরাধের জন্য ২০ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে। মামলায় এই আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছিল : যেহেতু 'বহু-স্ত্রী' রাষ্ট্র-সীমানার বাইরে পাচার করা হচ্ছে, তাই 'মর্মোনরা' 'মান-এ্যাক্টের' নির্দেশ অনুসারে আইন-ভঙ্গের দায়ে অপরাধী।

প্রণবেশ চক্রবর্তী

সরকার পক্ষের এই যুক্তিকে সরাসরি অস্বীকার করে অভিযুক্ত পক্ষ বললেন : ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গণিকাবৃত্তি রোধ করাই হল 'মান এ্যাক্টের' উদ্দেশ্য। এ আইন 'বহু বিবাহ' রদ করতে পারে না, কারণ এই প্রথার মধ্যে কোন ব্যবসায়িক মনোভাব নেই।

তবুও মাননীয় বিচারপতি মিঃ ডগলাস উৎসুক শ্রোতাদের সামনে সংখ্যাধিক্যের মতামত অনুসারে ঘোষণা করলেন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'বহু বিবাহের' প্রথাকে অনুমোদন করে না। এটা আইনত দণ্ডনীয়।

এভাবেই শতবর্ষব্যাপী মার্কিনী জগতে এক বিশেষ সম্প্রদায় 'বহু বিবাহের' যে প্রথাকে ধারণ ও বহন করে চলেছিল, তার অবসান ঘোষিত হল। অবশ্য, শতবর্ষের মধ্যে ষাট বছর ধরে এই প্রথাকে ধর্মীয় অনুশাসনের মোড়ক দিয়ে বিশেষ চার্চও অনুমোদন দিয়ে এসেছেন। নিউ ইয়র্কের সেই কৃষক বালক জোসেফ স্মিথ ধর্মগুরুতে উত্তীর্ণ হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এক নূতন সম্প্রদায়, এক নূতন চার্চ এবং নূতন সামাজিক-পরিমণ্ডল তার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই চার্চ বহু বিবাহের প্রথাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন, তবুও স্মিথের চিন্তাধারা একেবারে যে বিলুপ্ত হয় নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল উক্ত ছজন যুবকের মধ্যে।

ব্রিগহ্যাম ইয়ং

মর্মোন সম্প্রদায়ের জন্ম

নূতন মহাদেশে নূতন সমাজ ব্যবস্থা বিবর্তনের ইতিহাসে মর্মোন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় এবং বিকাশ এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে গৃহীত। মধ্যভাগের পাশ্চিমাঞ্চলে এবং পরবর্তীকালে উটার সমতলে মর্মোনরা নিজেদের অসীম পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন বড় বড় নগর ও জনপদ। ১৮১২ সালের যুদ্ধশেষে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ইউরোপ থেকে আগত এই জনস্রোতের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। নানাজন নানাভাবে ঈশ্বরের নামে বিভিন্ন অনুশাসন

"THIS SHOP TO LET." —

BRIGHAM YOUNG'S BEDSTEAD
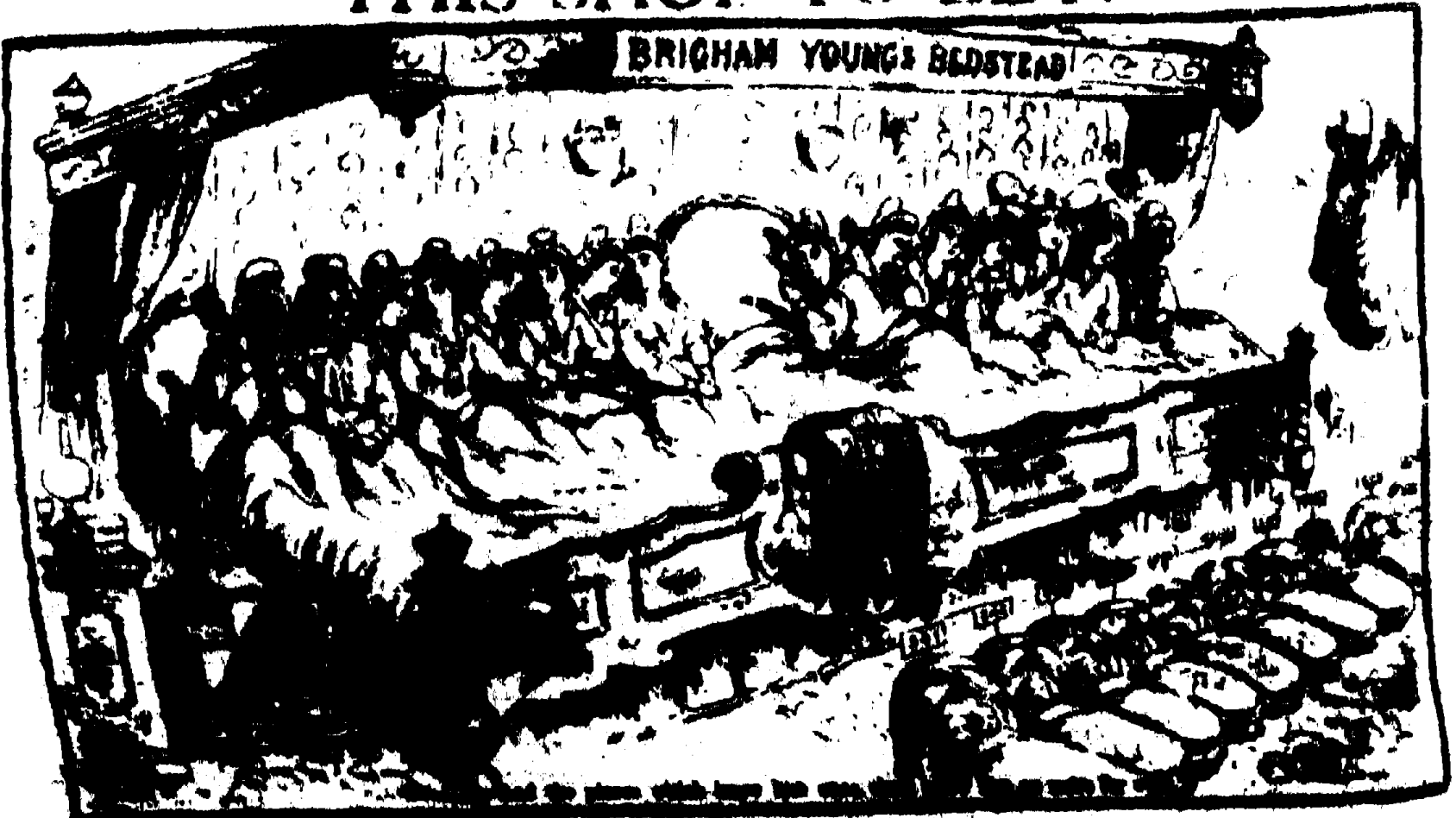
প্রচলিত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। মাত্র ১৫ বছরের বালক জোসেফ স্মিথ ১৯২০ সালে ঘোষণা করলেন : স্বয়ং ঈশ্বর এবং যীশুখৃীস্ট তাঁকে নিউইয়র্ক প্রদেশের পালমাইরা অঞ্চলে 'স্বর্গরাজ্য' স্থাপনের নির্দেশ ও দায়িত্ব দিয়েছেন। সেদিন তাঁর কথায় বিশেষ কেউ কর্ণপাত করে নি। সাত বছর পরে নাকি তিনি দেবদূত মোরোনির কাছ থেকে স্বর্ণপাত্র লাভ করেন এবং মর্মোনদের জন্য অনুশাসন গ্রন্থ রচনায় হাত দেন।

সুদর্শন ও সুদেহী স্মিথের স্ত্রী এমা এই গ্রন্থ রচনায় স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন। স্মিথ দাবী করলেন : খৃীস্টজন্মের ছয় শতাব্দী আগেই জেরুজালেম এবং বাবেল থেকে মর্মোনরা মার্কিন মুলুকে এসে বসবাস করতে থাকেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত নানাপ্রকার রোমাঞ্চকর অভিযানের শেষে তাঁরা 'আমেরিকান ভারতীয়' বলে বংশধরদের পরিচিত করেন।

এই অনুশাসন গ্রন্থই স্মিথকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষিরূপে বর্ণনা করেছে। অবশ্য সে সময় এই মর্মোন-বাইবেল বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। ১৮৩১ সালে জোসেফ স্মিথ তাঁর অনুগামীদের মধ্যে 'বহুবিবাহ' চালু করার কথা চিন্তা করেন এবং ঘোষণা করেন : এই প্রথা ওল্ড টেস্টামেন্টের নির্দেশিত এবং 'মর্মোন-বাইবেল' কর্তৃক স্বীকৃত। ধর্মীয় আরক সংযোগ করে 'বহুবিবাহ' প্রথাকে সমাজে চালাতে গিয়ে স্মিথ দেখলেন, বিষয়টি খুব সহজ নয়। কারণ, অধিকাংশ মানুষই এই মতবাদকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত ছিল না, সেই সঙ্গে নানাপ্রকার সমালোচনার গুঞ্জনও সোচ্চার হয়ে উঠল। তখন তিনি একান্ত অনুগত অনুগামীদের এ-সম্পর্কে উৎসাহিত করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন এবং সেই সঙ্গে নিজে ব্যক্তিগত জীবনে এই প্রথাকে কার্যকরী করতে এগিয়ে এলেন।

'বহুবিবাহ' প্রথা

স্মিথের এই মনোভাব এমা কিছুতেই মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৩ সালের ১২ই জুলাই ইলিনয়সের হ্যাংকক কাউন্টির চার্চ এমাকে বহুবিবাহ প্রথা স্বীকার করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ইসলাম ধর্মে বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকলেও সেটা সংখ্যা-গণনার অতীত নয়, বরং ঊনবিংশ শতকে বাঙালী হিন্দু সমাজে যে কৌলিন্য-প্রথা চালু ছিল, সেখানে 'বহুবিবাহে' কোন নির্দিষ্ট 'পত্নী-সংখ্যা' সীমিত ছিল না। স্মিথ যে প্রথা প্রবর্তন করেন, তাতেও যতসংখ্যক খুশী 'পত্নী-ধারণের' অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত এমা এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে স্মিথকে একাধিক রমণীর পাণিগ্রহণের অনুমতি দেন। মৃত্যু পর্যন্ত স্মিথ একের পর এক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকেন এবং এই নূতন মর্মোন গোষ্ঠীকে নিয়ে ইলিনয়সে পত্তন করেন এক নূতন জনপদ, নাম দেন 'নর্ভু' অর্থাৎ 'অপরূপ'। মর্মোনদের এই 'বহু বিবাহ' ব্যবস্থাকে স্থানীয় রক্ষণশীল সমাজ কিন্তু সুনজরে গ্রহণ করেনি। সেখানকার জনমতকে স্মিথ-বিরোধী করে তোলার জন্য প্রকাশিত হল এক নূতন পত্রিকা, নাম 'এক্সপোজিটর'।

ব্রিগহ্যাম ইয়ং-এর কুড়িজন স্ত্রী

কিন্তু মর্মোনরা এই পত্রিকা-প্রেসের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেন। পত্রিকার মালিকরা প্রাণ নিয়ে কার্থেজে পালিয়ে যান এবং কোর্টের আশ্রয় নিয়ে স্মিথের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করান। স্মিথ ও তাঁর ভাই এবং অন্য ছ'জন মর্মোনের বিরুদ্ধে সম্পত্তি ধ্বংস করার অভিযোগ ছিল। বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় সদলবলে যখন তাঁরা কার্থেজের জেলখানায় আটক ছিলেন, সে সময় এক কাপুরুষ উন্মত্ত জনতা জেলের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এতেই কিন্তু মর্মোনদের ইতিহাস শেষ হয়ে যায়নি। জোসেফ স্মিথের হত্যাকাণ্ডের পর মর্মোনদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ব্রিগহাম ইয়ং। ইয়ং এই সম্প্রদায়কে নূতন জীবন দান করার উদ্দেশ্যে তিন বছর ধরে পশ্চিমাঞ্চলের বনভূমিতে ঘুরে বেড়ান এবং অবশেষে উটা অঞ্চলের লবণ হ্রদ এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানে এক শান্তিপূর্ণ মরুভূমি-পরিবেশে মর্মোনরা নিশ্চিন্ত জীবনের সন্ধান পান এবং 'বহু বিবাহ' প্রথাকে অবলম্বন করে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সমালোচনা যতই হোক না কেন, একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই সম্প্রদায় কঠোর পরিশ্রম এবং অনমনীয় অধ্যবসায়কে সম্বল করে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। 'এক বিবাহ' বিশিষ্ট ব্যাধি, 'বহুবিবাহ' সম্বলিত মর্মোন সমাজে গণিকাবৃত্তির কোন অস্তিত্ব ছিল না। পিতৃতান্ত্রিক এই সামাজিক কাঠামোতে বহুবিবাহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অধিক সন্তান উৎপাদন এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি—তাঁদের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিবাহের আগে কোনপ্রকার যৌন-সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল এবং এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

প্রথাগত আচরণ

পত্নীর সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন, স্বামী প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন এবং প্রতি স্ত্রীর জন্য আলাদা ঘর তৈরী করে দিতেন। মর্মোনদের মধ্যেও আবার কেউ কেউ এই 'বহু বিবাহ' ব্যবস্থাকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ'দের মধ্যে জন হাইড (১৮৫৭) বলেছেন: সারিবদ্ধ ঘরে এক-একটিতে একজন করে স্ত্রী রাখার এই প্রথা নিন্দনীয়। নূতন স্ত্রী বরণ করার পরই নূতন একটি ঘর লাইনে যোগ করা হোত—যেন একটার পর একটা গরুর গোয়াল নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে কোন সৌন্দর্য ছিল না, ছিল না কোন হৃদয়ের সম্পর্ক।

এরকম সমালোচনা সত্ত্বেও অধিকাংশ মর্মোনই কিন্তু মনে করতেন, এই প্রথার মাধ্যমেই আত্মার মুক্তি এবং সমাজের ...

ইতিহাসই প্রমাণ করে দিয়েছে, মর্মোনদের এই বিশ্বাস ও কর্মশক্তির ফলে উটা অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ জনপদ সহজেই গড়ে উঠেছিল। ব্রিগহাম ইয়ং কঠোর প্রকৃতির ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং সম্প্রদায়গত শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তৎকালীন ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে, ইয়ং এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গভীর প্রভাব ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধুমাত্র মর্মোনদের মধ্যেই নয়, এর প্রভাব যে তার বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল সেকথা প্রমাণিত হয় ইংরেজ তরুণী এলিজার আত্মসমর্পণের ঘটনায়। ইয়ং-এর যে ২৯জন পত্নী আছে, তা' জানা সত্ত্বেও এলিজা তাঁকেই স্বামীত্বে বরণ করতে এগিয়ে আসেন। এলিজা সোজা গিয়ে উপস্থিত হন ইয়ং-এর প্রথম স্ত্রীর কাছে এবং প্রতিশ্রুতি দেন পুরো সাত বছর সেবা করার পরই কেবলমাত্র তিনি পত্নীত্বের অধিকার চান, তার আগে নয়। তারপর এই ইংরেজ তরুণী সাত বছরের কৃচ্ছ্রসাধন শেষ করে ঈপ্সিত স্বামীর ত্রিশতম পত্নীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এরকম অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

মর্মোনদের বিরুদ্ধে সমালোচকরা বলেন, এটা একটা বর্বর প্রথা এবং স্ত্রীর নামে ক্রীতদাসী সৃষ্টি করার ব্যবস্থা ছিল মাত্র। উটাতে যখন 'বহুবিবাহ' নিষিদ্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়, ... কিন্তু অসংখ্য মর্মোন রমণীই ... বিবাহের স্বপক্ষে প্রচার কার্য চালান—এ'দের মধ্যে অনেকে আবার উচ্চশিক্ষিতও ছিলেন।

তবুও 'বহু বিবাহ' রদ করার জন্য ১৮৪২ সালে এডমণ্ড এ্যাক্ট গৃহীত হয়ে মার্কিন কংগ্রেসে এবং মর্মোনদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। কংগ্রেসের এই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সেদিন মর্মোন রমণীরা লবণ হ্রদ এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বলেন: আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার মার্কিন কংগ্রেসের নেই। এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জোসেফ স্মিথের পত্নী এবং এলিজা। তাঁরা বলেন, ঈশ্বরের নির্দেশেই তাঁরা বহু-বিবাহের প্রথাকে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছেন।

তবু এই প্রথাকে টিকিয়ে রাখা যায়নি। জনমতের বিরুদ্ধ-গতি শেষ পর্যন্ত এত বেশী তীব্র হয়ে ওঠে যে, ১৮৯০ সালের ৬ই অক্টোবর মর্মোন চার্চের পক্ষ থেকে 'বহু বিবাহ' প্রথাকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

এভাবেই একদিন এই নূতন মহাদেশে যে বিস্ময়কর সামাজিক কাঠামোর ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, তার শেষ অঙ্কের শেষ ...

জানকীদা লুসি আর এই দামী শাড়িটা

মানবেন্দ্র পাল

অনেক দিন পর সুনন্দাবৌদির সঙ্গে দেখা। চেহারাটা এবার বেশ টসকেছে, মুখে-চোখে বয়েসের ছাপ পড়ছে, চুলেও পাক ধরেছে। তবু বৌদির সেই নাটুকে-নাটুকে কথা, সেই চোখের ভঙ্গি, সেই ঝংকার তুলে হাসি। কিন্তু বয়েসের চাপটা কিছুতেই ঢাকা পড়ছে না বলে মাঝে মাঝে যেন হতাশায় ভেঙে পড়ছেন। কথায় কথায় প্রায়ই বলেন, তুই বেশ আছিস—ওরে আমার সবুজ—ওরে আমার কাঁচা।

আমি হেসে বলি, ভাবনা নেই, আপনার বয়েসে আমারও ওই দশা হবে।

ওই দশা! বৌদি যেন চমকে ওঠেন।—হ্যাঁ রে, সত্যিই আমি খুব বুড়িয়ে গেছি না? তা শরীরেরই বা দোষ কী? চার-চারটি সন্তানের জননী। হাসছিস? আমাদের সময় তো আর ওসব জিনিস বেরোয় নি। কী করব বল্?

বৌদির এই ধরনের নিরাবরণ কথায় বড়ো লজ্জা পাই। তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ আনি।

—ওর কথা! ও যে কখন কোথায় থাকে তা ও নিজেই জানে না। নতুন বাড়িতে কোনো রকমে সিফট্ করিয়ে দিয়েই দেশ-ছাড়া হয়ে গেছে। কবে ফিরবে তা ঈশ্বরই জানেন। আর এদিকে আমি একা চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এই দেড়খানা ঘরে কী করে যে ম্যানেজ করি ভাবতে ভাবতে মাথার চুল কটা পাকিয়ে ফেললাম।

আমি বললাম, সোমেনদা আপনাকে ভালোভাবে চেনেন বলেই অত সহজে আপনার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে কাজে ডুবে থাকতে পারেন।

—কাজে ডুবে থাকা না ছাই! বৌদি হঠাৎ ফুঁসে ওঠেন। আসলে তোর দাদাটি একটি দায়িত্বহীন, ভীতু লোক। আমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে সরে পড়তে পারলে বাঁচে। একটু থেমে বললেন, দায়িত্বহীন না হলে এ বাজারে কেউ চার-চারটে ছেলের

পাশের ঘরে এই সময়ে খুটখাট শব্দ। সুনন্দাবৌদি থেমে গেলেন। আমি উৎকর্ণ।

বৌদি ভুরু কুঁচকে বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বললেন, আড়ি পাতা আরম্ভ হল।

জিজ্ঞাসু হয়ে তাকালাম। বৌদি বেজার মুখে বললেন, ওই বাড়িওলা—বুড়ো ঘাটের মড়া—কিন্তু কান পেতে আছে আমার এখানে কে এল কে গেল কী কথা বলল শোনার জন্যে।

আমি হেসে ফেললাম।

বৌদি তাতে আরো বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি জান না, বুড়োটার ভয়ানক সন্দেহ-বাতিক। হয় সন্দেহ করে আমার এখানে বুঝি সবাই ফুর্তি করতে আসছে, নইলে ভাবে বুঝি কেউ তার 'সুন্দরী বৌটির' ওপর লক্ষ্য রাখছে।

—বৌটি বুঝি তরুণী ভাবী?

—তরুণী না ছাই! আমার চেয়েও

স্বাস্থ্য ভালো রেখেছে। আমার মতো এমন অকালবয়সে হয়ে যায়নি।

একটু থেমে বললেন, তা শরীর রাখতে পারবে না কেন? আমার মতো তো কলকাতা-সর্বস্ব নয়। চিরকাল নাকি কাটিয়েছে পশ্চিমের জল-বাতাসে। তার ওপর নাচগান করত। নাচও তো একটা ব্যায়াম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, উনি পেশাদারী নাচিয়ে নাকি?

—এক সময়ে তাই ছিল বলে শুনেছি। বড়ো বড়ো আসরে নেচে বাবুদের মনোরঞ্জন করে টাকা উপায় করত।

—তারপর?

—তারপরের কথা আর কে জানে। এই তো এক মাসও হয়নি এখানে এসেছি। ভালো করে আলাপ হয়নি। তা তুই আলাপ করবি? বাঈজি, অভিনেত্রী এসব তো সাহিত্যের প্রেরণা!

আমি চমকে উঠে বললাম, তারপর 'খাটের মড়া' আমার ঘাড় মটকাক আর কি!

বৌদি হেসে বললেন, তোকে কিছু সন্দেহ করবে না। মিষ্টি-মিষ্টি ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ চেহারা আছে. সোজা 'বৌদি' বলে ডাকবি, ভদ্রলোককে ডাকবি 'জানকীদা' বলে—ব্যাস গলে যাবে। তা ছাড়া নিশ্চয়ই তুই মন্দ মতলব নিয়ে যাবি না?

বলে কৌতুকময়ী বৌদি ঠোঁট টিপে একটু হাসলেন।

সেই দিনই সুনন্দাবৌদি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। যিনি দরজা খুলে দিলেন তিনি বৌদিকে দেখে খুব খুশী হলেন, কিন্তু অপরিচিত মানুষটিকে দেখে কেমন হকচকিয়ে গেলেন। বড়ো বড়ো চোখ দুটিতে একটি নির্বোধ বালিকার মতো সকৌতূহল সসম্ভ্রম চাউনি।

বৌদি আলাপ করিয়ে দিলেন, ইনি আমার এক দেওর। অভিজিৎ সরকার। তরুণ সাহিত্যিক। চমৎকার গল্প লেখে। দুখানা বই আছে। আর ইনি-ইনিও শিল্পী। নৃত্যশিল্পী।

আমি নমস্কার করলাম। সবিতা দেবী এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভালো করে প্রতি-নমস্কার করতে পারলেন না। শুধু তার কৃতার্থতা তিনি নির্মল নিঃশব্দ হাসির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন।

—ভেতরে আসুন। না-না- জুতো খুলতে হবে না। নিজেই একটা চেয়ার আর একটা মোড়া টেনে এনে ঘরের দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে যে প্রকাণ্ড খাটটা ছিল তার সামনে রাখলেন।

এতক্ষণে লক্ষ্য পড়ল খাটের মধ্যে চাদর ঢাকা দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। শীর্ণ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল প্রায় সবই পেকে [illegible] খাঁচার মতো উঁচু

একেবারে খাটের সামনে দেখে তিনি পিট-পিট করে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। এমনি সময়ে সবিতা দেবীই পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি মিসেস ব্যানার্জির দেওর+ খুব বড়ো সাহিত্যিক। দুখানা বই আছে।

ভদ্রলোক ওঠবার চেষ্টা করতেই সবিতা দেবী ব্যস্ত হয়ে বললেন, উঠছ কেন? শুয়েই থাকো না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঁর হাঁপের কষ্ট। তাই—

ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে বসেছেন। দু হাত জোড় করে বললেন, আপনি সাহিত্যিক। আপনাকে নমস্কার। আমার গুরুদেব বলতেন, কবি সাহিত্যিক, শিল্পীরাই পৃথিবীটাকে মরুভূমি হতে দেয়নি। আমি নিজেও এ মতে বিশ্বাসী। লিখতে পারি না বটে কিন্তু শিল্পকর্ম কিছু জানি। ওই দেখুন।

পিছন ফিরে দেওয়ালের দিকে তাকাই। হরপার্বতীর একটি বিশেষ নৃত্যভঙ্গিমায় একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ে আর একটি যুবক। ছবিটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ধুলো জমেছে তবু মেয়েটি যে সবিতা দেবী তা বোঝা যায় কিন্তু জুটিটি?

জানকীবাবু অতি কষ্টে হাসলেন একটু। —চিনতে পারলেন না তো?

—না, সত্যিই চেনা কষ্টকর। ওই চেহারা আজ এই হয়েছে? জানকীবাবুর বয়েস আজ কতই বা বড়ো জোর পঞ্চান্ন?

—মেরে দিয়েছে ভাই. মেরে দিয়েছে। অভাবে আর রোগে। কিন্তু সেন্সটা ভোঁতা হয়ে যায়নি। সেটা গেলেই ল্যাঠা চুকে যেত, বাঁচতাম; কী ছিল আর কী আছে—কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এ হিসেব আর করতে হত না।

সবিতা দেবী এই সময়ে বললেন, আপনারা কথা বলুন আমি আসছি। দিদি, আপনিও বসুন।

বৌদি বললেন, না, আমার বসলে চলবে না।

সবিতা দেবী মিনতি করে বললেন, একটু বসতেই হবে। কখনো তো আসেন না। চা না খাইয়ে ছাড়ব না।

বৌদি বিরস মুখে, বসলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন। আর মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে সেই বিবর্ণ ছবিটা দেখতে লাগলেন।

বৌদির আচরণটা আমার ভালো লাগে না, যদিও জানতাম এদের ওপর তাঁর একটা বিরাগের ভাব আছেই। কিন্তু সবিতা দেবীর তো কোনো অপরাধ নেই।

জানকীবাবু গল্প করতে পারেন। কথা বলতে যদিও কষ্ট হচ্ছিল, তবু অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। যেহেতু আমি সাহি-

গল্প করছিলেন। কিন্তু বেছে বেছে এমন সব সাহিত্যিকের লেখা জিজ্ঞেস করছিলেন যাদের নাম যদিও শুনেছি কিন্তু লেখার সঙ্গে মোটেও পরিচিত নই। যেমন জিজ্ঞেস করলেন ত্রৈলোক্যনাথ-এর স্টাইল সম্বন্ধে। জিজ্ঞেস করলেন পঞ্চানন্দের স্যাটায়ার কি শরৎ-রামের চেয়েও তীক্ষ্ণ? কথায় কথায় তিনি আরো পেছিয়ে গেলেন—একেবারে রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলোর বিষয়ে। বললেন, আপনি নিশ্চয় এগুলো ভালো করে পড়েছেন। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, রমেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের যথার্থ পূর্বসূরী।

বলেই বললেন, আমি অবশ্য সাহিত্যের লাইনের লোক নই। আমি চিরদিন নাচগান করে এসেছি। এই নাচের দৌলতেই সবিতাকে পেয়েছি। কী অসাধারণ ফিগার ছিল। আমি ওকে জোর করে নাচ শেখাই। নইলে একটা প্রতিভাই নষ্ট হয়ে যেত।

এমনি সময়ে 'প্রতিভাময়ী' ট্রের অভাবে একটা কাঁসার থালায় দু কাপ চা আর চারখানা সস্তা নোনতা বিস্কুট সাজিয়ে নিয়ে প্রবেশ করলেন। প্লেট ছিল না। সে ত্রুটি ভদ্রমহিলা সলজ্জভাবে স্বীকার করলেন। এবং লোকের অভাবে সামান্য বিস্কুট দিয়ে যে লৌকিকতা সারতে হল অকপটে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বৌদি তো কিছুক্ষণ কাপটা ছুঁলেনই না। তারপর কোনো রকমে অর্ধেক খেয়ে রুমালে মুখ মুছলেন। বিস্কুট পড়েই রইল। খাবার প্রবৃত্তি আমারও ছিল না। কিন্তু পাছে ভদ্রমহিলা বা তাঁর স্বামী দুঃখ পান সেইজন্য কোনো রকমে দুখানি বিস্কুটই চিবোতে হল, আর নিতান্তই গলা ভিজোবার জন্যে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে হল। পেয়ালা নিঃশেষ করে শূন্য কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে এই কথাটাই আর একবার মনে হল—যে 'প্রতিভা' জানকীবাবু নষ্ট হতে দেননি, হয়তো সর্বস্বপণ করেছিলেন—সেই প্রতিভার শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি! দারিদ্র্যের ওপরে সামান্য সচ্ছলতার স্বাক্ষরও রেখে যেতে পারেনি।

বৌদি কোনোরকমে চা স্পর্শ করেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু জানকীবাবু আমায় ছাড়েননি। অনেকক্ষণ তাঁদের অতীত জীবনের গল্প করলেন। সবিতা দেবীও অ্যালবাম খুলে তাঁর নৃত্যপ্রতিভার অনেক ছবি দেখালেন। উপসংহারে দীর্ঘশ্বাস—কিছুই হল না। না টাকা, না স্থায়ী নাম।

দুঃখ আমারও হয়েছিল কিন্তু এ সত্য আমার জানা আছে যে, স্থায়ী নাম প্রায়ই সঙ্গীতশিল্পী নৃত্যশিল্পী বা ক্রীড়াশিল্পীরা রাখতে পারেন না। গায়কের গলার কাজ বড়ো সূক্ষ্ম ব্যাপার। তা ছাড়া সুর নিয়তই বদলাচ্ছে—রুচি বদলাচ্ছে। যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একজন শিল্পী সারা জীবন ছুটতে পারেন না। নৃত্যশিল্পী বা খেলোয়াড়দের

গেলে আর মানায় না বুক বড়ো শিল্পীই তিনি হন।

অ্যালবামে সবিতা দেবীর যে কর্ম আর আজকের কর্মে আকাশ পাতাল তফাৎ। আজ তাঁর বয়েস চল্লিশের কাছে। এ-বয়সেও কী স্বাস্থ্য—কী সুঠাম দেহ! বৌদি তো প্রায় সমবয়সী। অথচ সবিতা দেবীর পাশে যেন তাঁকে লাগছিল রংচং করা পুরোনো একটা কাঠের পুতুল।

শরীরে এত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও সবিতা দেবী নাচের কর্ম হারিয়ে ফেলেছিলেন অনেক দিন। ছবির সেই তন্বী ভাবটি আর নেই।

জানকীবাবুর আরো একটা দুঃখ ছিল, টাকা হল না বলে। কেন হল না—প্রচুর অর্থ তো সে সময়ে স্বামী স্ত্রীতে উপার্জন করেছিলেন তার অনেক ইতিহাস তিনি রাত দশটা পর্যন্ত গল্প করলেন। কিন্তু দারিদ্র্য যে কতখানি তা স্বচক্ষেই দেখলাম। পাড়ার মধ্যে এই ছোট্ট পুরনো বাড়িখানা। তারই একটিতে স্বামী স্ত্রী আর একটি মেয়ে—মেয়েটিকে একটু আগে দেখলাম প্রৌঢ় বয়সের মেয়ে ছ সাত বছরের, মায়ের মতো নয়—মায়ের চেয়েও বেশি সুন্দরী, পাশের বাড়ির ঝি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল—কোনোরকম মাথা গুঁজে থাকে। বাকি দুটো ঘর ভাড়া দেওয়া। সম্ভবত সেই ভাড়ার টাকাতেই সংসার চালাতে হয়। তাই, যদিও সে আমলের দামী খাট কিন্তু বিছানার চাদর খানি বহু ব্যবহারে বিবর্ণ, সেলাইয়ে সেলাইয়ে জীর্ণ; বাইরের পর্দাখানি লোকের চোখ ভোলানোর জন্যে প্রায় নতুন, কিন্তু ঘরের ভেতরে যে পর্দা খানি তা ছেঁড়া রঙ্গীন কাপড় ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি সবিতা দেবী বাড়িতে যে শাড়িখানি পরে ছিলেন তার দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি এত দূর সচেতন ছিলেন যে এই বিপরীত ঋতুতেও তাঁকে একটি চাদর ব্যবহার করতে হচ্ছিল। আর মূর্তিমান দারিদ্র্য—শুধু দারিদ্র্য কেন মূর্তিমান ব্যর্থতাও তো চোখের সামনেই শুয়ে ছিলেন। কেবল ব্যাক-ব্রাশ চুল। তার সাজপোশাক রীতিমতো অভিজাত ঘরের মেয়ের মতো। মা বাপের বুড়ো বয়েসের সন্তান। বড়ো আদরের—বড়ো যত্নের। সবিতা দেবী বোধহয় তাঁর সব সাধটুকু দিয়ে মেয়েটিকে যুগোপযোগী করে তোলবার চেষ্টা করছেন।

সুনন্দা বৌদি ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করে হেসে বললেন, বাবাঃ এত রাত!

আমি বললাম, ভদ্রলোক ছাড়তেই চাইছিলেন না।

—ভদ্রলোক, না ভদ্রমহিলা? বলেই সুর পাল্টে বললেন, লেখার প্রেরণা কিছু জুটল?

আমি বললাম, দেখা যাক। সবিতা দেবী তাঁর জীবনের কথা বলবেন।

বৌদি বিস্ময় জানাতে বললেন, তবে তো ভালোই।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, পবিত্র দিক দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছি কোনো কথা লুকোতে পারবেন না।

সবিতাদি বলায় বৌদি চোখ টিপে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন। মুখে অন্য কথা বললেন, সে শর্তে তিনি রাজি হয়েছেন?

—হ্যাঁ।

বৌদি যেন বিশ্বাস করলেন না। মুখ-ভঙ্গি করে বললেন, দেখা যাবে। অবশ্য তুমি যা শুনবে সব যদি আমায় কিছু গোপন না করে বল।

বৌদির কথাগুলোই কেমন বাঁকা বাঁকা। তাঁর সূত্র ধরেই সবিতা দেবীর সঙ্গে আলাপ। আর তাঁর কাছেই আমি গোপন করতে যাব? সবিতা দেবী কি সুনন্দা বৌদির চেয়ে হঠাৎ একদিন বেশি আপন হয়ে উঠবে?

সবিতা দেবীর সঙ্গে একটা সময় ঠিক করে নিয়েছিলাম। সপ্তাহে একদিন—শনিবার সন্ধ্যায় যাব। প্রথমে অবশ্য তিনি কিছুতেই নিজের কথা বলতে রাজি হন নি। প্রথমত তিনি বললেন, তাঁর জীবনে এমন কোনো ঘটনা নেই যা দিয়ে একটা উপন্যাস তো দূরের কথা একটা গল্পও লেখা যেতে পারে। আবার একই সঙ্গে তিনি আশংকার কথা বললেন—কী জানি বাবা সাহিত্যিকদের বিশ্বাস নেই, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে শেষে হয়তো সাপ বের করে বসবে।

এমন স্ববিরোধী কথা নিতান্ত নির্বুদ্ধি মানুষ ছাড়া কেউ বলে না। কিন্তু সবিতা-দেবীকে নির্বুদ্ধি বলতে সংকোচ হয়। বরঞ্চ বলি—বড্ড বেশি সরল।

কিন্তু কোনটা ঠিক? সত্যিই কি তাঁর জীবনে তেমন কোনো রোমাঞ্চকর কাহিনী নেই? নাকি তাঁর আশংকাটাই সত্য? কেঁচোর আড়ালে সাপ আছে। কৌতূহল বেড়ে গেল। আমি বার বার বলতে লাগলাম, তা হলে কবে আসব বলুন?

সবিতা দেবী স্বামীর দিকে তাকালেন—যেন অনুমতি প্রার্থনা করলেন। জানকীবাবু বললেন, তোমাকে নিয়ে উনি যদি কিছু লিখতে পারেন তা হলে সে তো তোমার সৌভাগ্য।

বলেই আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি যেদিন খুশী যখন খুশী আসবেন। আপনার জন্যে গরিবের দরজা সব সময়ে খোলা। তবে শনিবার এলেই আপনাদের সুবিধে—আমি থাকি না। ও একলা মুখ বুজে থাকে। একজন সঙ্গী পেলে বেঁচে যাবে।

এক মাস কেটে গেল। তিনটে শনিবার সবিতাদির কাছে এসেছি। জানকীবাবু নেই। বাড়িতে একা সবিতাদি। মেয়েটা খেলতে যায় পাশের বাড়ি।

—জানকীদা বুঝি প্রতি শনিবার বাইরে যান? এ কথা জিজ্ঞেস করতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। জানকীদা পুরোনো অভ্যাস নাকি পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। তাই সপ্তাহে একদিন স্থাই ডে কোনোরকমে উপবাস করে শনিবার সন্ধ্যেতে গলা ভিজোতে যান। ফেরেন গভীর রাতে। তখনো পর্যন্ত সবিতাদি না খেয়ে জেগে বসে থাকেন।

প্রথম আলাপেই তেমন কোনো জেরা না করতেই কী করে যে একজন ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে এমন কথা আমার মতো বাইরের লোকের কাছে অকপটে প্রকাশ করলেন ভেবে আশ্চর্য হলাম। বিস্ময় চেপে রেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাত্রে যখন ফেরেন তখন দরজা খুলে দেন কে?

সবিতাদি বললেন, আমি। আমি ছাড়া আর কে আছে?

—ভয় করে না?

সবিতাদি মাথা নাড়লেন।—না, ভয় করে না। অনেক দিনের অভ্যেস। এখন তো অনেক কমিয়েছে। পয়সা নেই। তা ছাড়া আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে সপ্তাহে একদিনের বেশি খাবে না।

একটু থেমে বললেন, তবে ভয় করে পাছে মেয়েটা টের পায়। এক একদিন জেগে বসে থাকে। বলে, বাবা এলে তবে ঘুমোবে। তখনই ভয় করে। কেন না উনি সে সময়ে মোটেই স্বাভাবিক থাকেন না।

আবার একটু থেমে বললেন, একদিন হয়েছে কি তাঁকে ধরে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিতেই খুকীর ঘুম ভেঙে গেছে। ও ভেবেছে বুঝি বাবা পড়ে গেছে। কাঁচা ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে—বাবা—বাবা। বলে এমন কেঁদে উঠেছে যে আমি লজ্জায় মরি! সে রাত্রে মেয়ে সমস্তক্ষণ ওর বাবাকে জড়িয়ে পড়ে রইল। সারা রাত আর ঘুমল না।

সবিতাদি থামলেন। তারপর আবার বললেন, মেয়েটা এই অল্প বয়েসে এত বুঝতে শিখেছে যে, ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন বলছে, আচ্ছা মা, আমার বাবা এত বুড়ো কেন? দেখুন দিকি হতচ্ছাড়ীর কী প্রশ্ন! বলতে বলতে এই বয়েসেও সবিতাদির মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

—কিন্তু চুপ করে গেলে হবে না। বড়ো সেয়ানা মেয়ে। যতক্ষণ না উত্তর পাবে—উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হবে ততক্ষণ কেবল 'বল না' 'বল না' করে জ্বালিয়ে মারবে। আমিও কম জ্বালাতন হচ্ছিলাম না। কেবল এক মেয়ে মেয়ের কথাই শুনে কী হবে! আসল তোমার কাহিনী বলো—যে জন্যে আমার আসা। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারি কই? অগত্যা স্নেহ! দুটি তিনটি নয়—ওই একটি মাত্র সন্তান। তাও প্রৌঢ় বয়সের। তার সম্বন্ধে একটু বলতে চাইবে বৈকি।

সবিতাদি আগের কথার জের ধরে নিজেই কখনো মেয়ের ভূমিকায় কখনো আদের ভূমিকায় উত্তর-প্রত্যুত্তর করে যাচ্ছেন।

—তখন আর কী বলি। বললাম, তোমার বাবা বুড়ো হতে যাবেন কেন, অসুখে হলে

ঐরকম লাগে। নইলে তাঁর আসল চেহারা তো দেখেছ। বলে অ্যালবামের পুরনো ছবিগুলো দেখাই।

ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন? এ-বাড়ি ও-বাড়ি যায়। ওর বন্ধুদের বাবাদের দেখে। তারা তো সব ইয়ং। দিব্যি দামী দামী শার্ট ট্রাউজার পরে ফিটফাট থাকে।

তারপর ক্ষোভের সুরে বললেন, আমি তো ওর বাবাকে এখনো বলি—কী আর এমন বলেছে। অন্তত মেয়েটার দিকে তাকিয়ে একটু ফিটফাট থাকতে পার না? (এতক্ষণ মেয়ে নিয়ে হল, এবার বুঝি স্বামীপর্ব।) তা উনি বিরক্ত হয়ে বলেন, মেয়ের তাগিদ না তোমার তাগিদ? কথা শুনুন। আমার কি আর সে বয়েস আছে যে স্বামীর রূপে ভুলব? ভুলেছিলাম সেই একবার।

বলেই গম্ভীরভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সবিতাদির সঙ্গে এক মাসে তিনটি মাত্র সিটিং দিয়েছিলাম। তাতে তাঁর জীবনের যেটুকু জানতে পেরেছিলাম তা এই।—

ছোটবেলা থেকেই তিনি কাশীতে মানুষ। চেহারাটা খুব সুন্দর ছিল (এটুকু কিছুতেই তিনি সঙ্কোচে বলতে পারছিলেন না। বারে বারে অ্যালবাম খুলে সে সময়ের ছবি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন)। জানকীবাবু ছিলেন তাঁদের যাকে বলে ফ্যামিলিফ্রেন্ড। তিনি ছিলেন নৃত্যশিল্পী। ওই বয়সেই তিনি তাঁর ট্রেনারের ট্রুপের সঙ্গে শুধু ভারতের নানা জায়গাই নয় বিদেশেও ঘুরে এসেছিলেন—যেমন জাভায়, বলিদ্বীপে। কলকাতা থেকে রেঙ্গুন হয়ে জাহাজে করে জাভা গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ও দেশের নাচ দেখা আর সুবিধে পেলে নাচ শিখে আসা।

জাভা আর বলিদ্বীপের নাচ শিখে তবে দেশে ফিরেছিলেন। কারণ মানুষটা চিরদিনই জেদী। যা ধরবে তা না করে ছাড়বে না।

কাশীতে ফিরেই তিনি এই নতুন শেখা নাচ চালু করে দিলেন। অদ্ভুত পোশাক—

বিচিত্র ঢঙ—অদ্ভুত ভঙ্গী। এই সময়ে তিনি সবিতা দেবীকে ডেকে নিলেন। সবিতা দেবীর কাছে এ এক অসম্ভব ব্যাপার। তিনি নাচবেন কি! তাঁর পরিবারে কেউ কখনো নাচ দেখেছে? কিন্তু জানকীবাবুর নজর একবার যার ওপর পড়বে তার আর নিস্তার নেই। তিনি পরিষ্কার বললেন, তোমার সব দায়িত্ব আমার। তুমি চলে এসো। জীবনটাকে তিল তিল করে রান্নাঘরে নষ্ট করবার জন্যে তুমি জন্মাও নি।

সে এমন ডাক যে তা উপেক্ষা করা যায় না। সবিতা দেবীকে নাচে যোগ দিতে হল।

উনি নাচ শেখাতে গিয়ে প্রথমেই বললেন, নাচের সময়ে মনের সব রকম চাঞ্চল্য দূর করে ফেলতে হবে। মনকে নাচের রসে ডুবিয়ে রাখতে হবে। নাচের সময়ে মুখ দেখে মনে হবে না যে নিজের জন্যেই নাচা হচ্ছে। নাচার সময়ে দৃষ্টি থাকবে মাটির দিকে—দর্শকের দিকে নয়।

নাচের শিক্ষা চলল। ভালোই লাগছিল। এই শরীরটা যে যেমন খুশী খেলানো যায় এ কল্পনাই চলে না। শরীরের ভার কমে গেল — নিজেকে যেন আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সবিতা দেবী তাঁর প্রথম পাবলিক ফাংশানের কথাও বললেন। কাশীতেই এক বিরাট ধনীর বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে তিনি নেচেছিলেন। নাচের বিষয়বস্তু পৌরাণিক।

গল্প আরম্ভ হল রামায়ণের পঞ্চবটী বন থেকে। রাম সীতা লক্ষ্মণ মনের আনন্দে বনে বনে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। এমনি সময়ে কুটীরের সামনে স্বর্ণমৃগের আবির্ভাব। সীতা ভঙ্গী করে রামকে জানালেন—ওটা ধরে দিতে হবে। রাম ছুটলেন তীর-ধনুক নিয়ে। দূরে হঠাৎ মিলিয়ে একটা আর্তস্বর বেজে উঠল। সীতা চমকে উঠলেন। লক্ষ্মণকে ভয়-ভঙ্গীতে জানালেন প্রাণনাথের বিপদ তুমি যাও। কিন্তু লক্ষ্মণ যাবে না। সীতা শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন। দু হাতে ঠেলে ফেলার ভঙ্গীতে লক্ষ্মণকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু চোখের জল আর থামে না।

সবিতা দেবী বললেন, জীবনে এর পর অনেকবার অনেক নাচ নেচেছি, কত নতুন নতুন ভঙ্গী, কত ছন্দ—কিন্তু সীতার ভূমিকায় সেদিনের সেই নাচ—সেই চোখের জল বোধহয় আর দেখাতে পারব না। দেখুন না—ছবিটাই দেখুন না।

বলে পুরনো অ্যালবাম হাতড়াতে লাগলেন।

—এর জন্যে সেদিন আমি প্রাপ্য টাকা ছাড়াও পাঁচটা মোহর পুরস্কার পেয়েছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, জানকীদা নিশ্চয় লক্ষ্মণের পার্ট করছিলেন?

উনি হেসে মাথা নাড়লেন।

—না। রাবণের। কি অপূর্ব অভিনয়। যেন সত্যিকারের রাবণ। এই রাম আর রাবণের নাচের মধ্যেও কত তফাত তা ওঁর কাছ থেকেই দেখে শিখেছিলাম। উনি বলতেন, দেবতাদের চাল-চলন আর রাক্ষস-দানবদের চাল-চলন তফাত রাখতে হবে। তাই রাবণকে যতখানি সম্ভব পা সোজা করে উঁচু করে তুলে তার পরে পা নামাতে হবে আর দু হাত যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ তার নাচের মধ্যে থাকবে শক্তি। আর রামের নাচে থাকবে একটা শান্তশ্রী।

সবিতা দেবী তিন দিন ধরে কেবল এই সব কথাই বলে গেলেন। কেমন করে নাচ শিখলেন, কোথায় কোথায় নাচতে গেলেন, কত টাকা পেলেন আর সেই টাকা কিভাবে উড়ে গেল! আর এই কথার প্রসঙ্গে কেবলই স্বামীর কথা। যেমন গুরু হিসেবে তেমনি স্বামী হিসেবে। কেবল একটা দোষ—বড্ড মদ খেত।

কিন্তু আমার এই একঘেয়ে স্বামী-স্তুতি শুনতে শুনতে বিরক্তি লাগছিল। কোন রোমাঞ্চ নেই, দুঃসাহসিকতা নেই—শাসন সন্দেহ নেই।

শেষে বললাম, সবিতাদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবেন না। আপনাদের ট্রুপে তো অনেক ছেলে ছিল। অন্য কোন পুরুষের ওপর আপনার কোন আকর্ষণ জন্মায় নি?

সবিতা দেবী মুখ লাল করে জিব কেটে, দু হাত দিয়ে কান চেপে ধরে বললেন, ছি ছি ভাই, ও কথা শুনতে নেই। শুনলেও পাপ।

এ কথায় আমার যেন কেমন রাগ হল। আমি বেপরোয়া হয়ে নির্লজ্জের মত জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, সত্যি করে বলুন, কেউ আপনাকে আপনার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করে নি?

আমার জিজ্ঞাসাটা অনেকটা ফৌজদারী মামলার উকিলের মত হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। সবিতা দেবী খুব থতমত খেয়ে গেলেন। মুখটা মুহূর্তের জন্যে বিবর্ণ হয়ে গেল। ঢোক গিলে বললেন, না-না। ওরকম লম্পট প্রকৃতির কেউ আমাদের ট্রুপে ছিল না।

—ট্রুপের বাইরে? ধরুন যেসব বড় বড় খানদানী লোকের বাড়িতে নাচতে যেতেন? তাদের কেউ কখনো আপনাকে প্রলোভন দেখিয়েছে? আমার কাছে লুকোবেন না দিদি।

সবিতা দেবী খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। তারপর কি ভেবে এদিক-ওদিকে চেয়ে বললেন, দেখুন সেসব একটু-আধটু চেষ্টা যে একেবারে হয় নি তা নয়। পৃথিবীতে ইতর লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম তো নয়। তবে তেমন তেমন ব্যবহার পেলেই আমি ওঁকে বলে দিতাম। উনি হাসতেন। বলতেন, তুমি ঠিক থাকলেই সব

একটু থেমে বললেন, জানেন, আমার নাচের একটা আইটেমই ছিল ঘোড়া নাচ। মার্জারের মতো। আসলে ওটা আত্মরক্ষার ব্যাপার। সে ছবিও আছে। দেখবেন?

এমনি সময়ে লুসি বেড়িয়ে ফিরল। দেখছি এই বয়েস থেকেই মেয়ে একটু বেশী আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছে। নইলে রাত্তির সাড়ে আটটা পর্যন্ত বাইরে থাকা! তবে শনিবার বলে যদি ছাড়পত্র থাকে তাহলে আলাদা কথা।

এই মেয়েটিকে দেখলেই আর চোখ ফেরাতে পারি না। ঠিক যেন একটি কাঁচের পুতুল। এক-এক দিন এক-এক রকমের পোশাক। আজ পরেছিল গাঢ় নীল রঙের সিল্কের লুঙ্গি পরণে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী। ভারী সুন্দর লাগছিল। লুসি এসেই মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাও অমনি মেয়েকে বুকে চেপে ধরে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে দিল—যেন কতকাল পর দেখা!

আদরের পালা শেষ হলে সবিতাদি বললেন লুসি, তোমার কাকুকে সেই ইংরিজি কবিতাটি শুনিয়ে দাও তো।

কিন্তু লুসি মায়ের মুখ রক্ষা করল না। বোধ হয় 'কাকুর' ওপর তেমন প্রসন্ন নয়। বললে, ঘুমোব। তুমি চলো।

সবিতাদি আমার দিকে নিরুপায়ভাবে তাকালেন।

আমি বললাম, আজ থাক। আবার এক-দিন আসব।

ভেবেছিলাম, আর যাব না। কারণ, সবিতাদির যে জীবন-কথা আগ্রহ করে শুনতে গিয়েছিলাম তার ভেতর অন্তত সাহিত্যের খোরাক নেই। কেবল স্বামী আর কন্যার কথা শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায়। স্বামী কি ছিলেন—আর আজ কি হয়েছেন। উনিই তার জন্যে দায়ী। তবু ওঁকে সাধ্বী স্ত্রী একটু কটু কথাও বলেন না। 'আহা বেচারী' কি করে যে সারা দিন মুখ বুজে কাটায়—কি করে জানেন? পাড়া-পড়শির কাছ থেকে বই চেয়ে আনেন—ওঁর আবার, কিছু মনে করবেন না, সেকেলে লেখকদের ওপর একটু বেশী টান। এখন মাথায় খেয়াল চেপেছে, টাকা জমিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র এমনি সব লেখকদের বই কিনবেন। মনে মনে হাসি। ভাবি—পরণের কাপড় কিনতে গেলে যাকে দশ বার পেছুতে হয় তিনি কিনবেন বই! মুখে কিছু বলি না। বলে শুধু শুধু মানুষটাকে কষ্ট দেওয়া কেন?

মেয়ের সম্বন্ধে সবিতাদির কত যে আশা! কখনো বলেন, মেয়েকে খুব দেখে-শুনে বিয়ে দেব। আবার বলেন না, বিয়ে দেব না। ওকে ছেড়ে আমি এক দণ্ডও থাকতে পারি না—শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে থাকব কি করে? উনি বলেন, আমাদের ছেলেপুলে নেই—ওই ছেলের কাজ করবে। চাকরী করে এনে খাওয়াবে। [illegible]

পারবে না। আর মুখের রক্ত তুলে যে আনবে পয়সা আমরা তা-ই খাব?

আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, একে নাচ শেখাচ্ছেন না?

সবিতাদি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, না। ওকে এ পথে আর আনব না। উনিও চান না।

—কেন?

সবিতাদি তার স্পষ্ট উত্তর দেন নি। শুধু মাথা নেড়েছিলেন।

হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করে দেব? তার চেয়ে আর-এক দিন গিয়ে 'কিছু দিন আসতে পারব না' বলে চলে আসব — এই ভেবে পরের শনিবারে গেলাম। দরজা খোলাই ছিল। ঢুকে দেখি ঘর অন্ধকার।

—সবিতাদি!

—অভিজিৎবাবু! আসুন আসুন।

আলো জ্বলে উঠল। মুহূর্তের জন্যে মুখটা দেখলাম। চোখের জলে ভেজা মুখ।—সবিতাদি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, আপনি বসুন। আমি আসছি।

বলেই ভেতরে চলে গেলেন।

আমি কিছু অবাক হয়ে গেলাম। সবিতাদি সরল সহজ মানুষ। অতি দুঃখের মধ্যেও মুখের হাসি মিলোয় নি। স্বামী আর ঐ একটি মাত্র কন্যাকে নিয়েই তার যা কিছু আনন্দ—যা কিছু স্বপ্ন রচনা। তবে কেন চোখে জল?

এত দিনে কিছু যেন উপাদানের ইঙ্গিত পেলাম। কৌতূহল বেড়ে গেল। ঠিক করলাম, আসা বন্ধ করলে চলবে না। অতীত জীবন নয়—বর্তমানের মধ্যেই কোথাও কিছু জট আছে।

সবিতাদি এলেন একটু পরে। কিন্তু সেদিন আর গল্প জমল না।

বৌদি বললেন, কি গো সাহিত্যিক, খুব তো জমিয়েছ দেখছি। কোন শনিবার বাদ যাবার উপায় নেই। কিছু খোরাক পাচ্ছটাচ্ছ?

—কিছু না। একেবারে সাদা-মাটা জীবন। কেবল প্রতি কথায় স্বামী-স্বামী আর মেয়ে-মেয়ে।

—বৈচিত্র্য পাও নি বলছ? না কি পেয়েও আমার কাছে লুকচ্ছ?

—আপনার কাছে লুকিয়ে আমার লাভ?

বৌদি ঠোঁটের ওপর হাসির আভাস ফুটিয়ে বললেন, মানুষের মন বড় জটিল সাহিত্যিক। আরো বড় হও তখন বুঝবে।

বৌদির সন্দেহ যে আংশিক সত্য তা তখনই বুঝলাম। কেন না, সবিতাদির সব কথা তোর [illegible]

নি। করলেই হত—কিন্তু কেন যে করিনি তা নিজেও বুঝে উঠতে পারলাম কই? শুধু একটা কথাই বারে বারে মনে হয়েছে—আহা বেচারি সবিতাদি—ওর দুঃখের কেউ সমব্যথী নেই। কী দুঃখ তা অবশ্য জানি না, কোন সমব্যথী নেই তাও আমার জানের বাইরে। তবু এত দিনের পরিচয়ে ঐ একটি কথাই আমাকে দুঃখ করেছে—বিব্রত করেছে। তার ওপর এই সরল নিষ্পাপ মহিলাটির প্রতি সুনন্দা বৌদির কটাক্ষ আমার যেন বড্ড বেশি বাজে। বোধ হয় সেই জন্যেই সবিতাদির সব কথা সুনন্দা-বৌদির কাছে বলতে পারি না।

সেদিন সবিতাদির বাড়ি যেতেই সবিতাদি কেমন গম্ভীরভাবে বললেন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। এমন-ভাবে কোন দিন তাকে কথা বলতে শুনি নি। আজ মুখটাও কেমন যেন ম্লান দেখ-লাম। বিনা ভূমিকায় বললেন, আপনি জানেন আপনার বৌদি কাশী গেছেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো! হঠাৎ কাশী কেন?

—ওখানে ওঁর নাকি দিদিমা থাকেন। তাঁর অবস্থা খারাপ। দেখতে গেছেন।

সুনন্দাবৌদির যে দিদিমা আছেন বা ছিলেন এ খবর আমি জানতাম না। তাই চুপ করে রইলাম।

সবিতাদি বললেন, কিন্তু আমায় তিনি কিছুই জানান নি। তবু বলে গেলেন, একটু বাইরে যাচ্ছি। ভাড়াটা এসে দেব।

আমি বললাম ভাড়া আপনি ঠিকই পাবেন। সবিতাদি আহত স্বরে বললেন, সে কথা নয়। ভাড়া তাঁর মত লোকের কাছ থেকে মার যাবে না তা আমি জানি। কিন্তু একটা বিষয়ে খুব আশ্চর্য হলাম। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমার এক মাসতুতো বোন কাছেই থাকে। সে অনেক দিন ধরে শয্যাশায়ী। আপনার বৌদি তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা করে কাশী যাবার কথা তাঁকে বলে গেছেন। শুধু বলেই নয়, রমার কাছ থেকে কাশীতে যেখানে আমরা থাক-তাম সেখানকার ঠিকানা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। এর মানে কি? আর যদি নিতেই হয় আমার কাছ থেকে নিলেন না কেন?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু বললাম, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এত বড়ো অন্যায় কেন উনি করলেন?

একটু থেমে বললাম, যাই হোক এর জন্যে আমায় কিন্তু অপরাধী করবেন না সবিতাদি—।

এই বলে ক্ষমা প্রার্থনার মতো দু-হাত জোড় করতেই সবিতাদি হঠাৎ আমার হাত দুখানা টেনে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধস্বরে বললেন, একটা কথা দিন, আমায় কিন্তু আপনি কোনো দিন ভুল বুঝবেন না। আর—আর [illegible]

ভাবে লিখবেন—সত্য-অসত্যের দায় আপনার থাকবে না।

কথাগুলো আমার ঠিক বোধগম্য হল না।

এমনি সময়ে দরজার শব্দ হল। সবিতাদি নিজেকে সংযত করে নিলেন। পাশের কোন বাড়ির ঝিয়ের হাত ধরে লুসি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। বোধ হয় বেড়িয়ে ফিরল। সবিতাদি সব ভুলে লুসিকে কোলে তুলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে মুখ ভরিয়ে দিল।—যেন কত দিন পর দেখা! আশ্চর্য মাতৃস্নেহ। আমার মনে হল সবিতাদির সবকিছুর মতোই মাতৃস্নেহেও একটু যেন বাড়াবাড়ি।

সবিতাদির বাড়ি যাওয়া আর হয় না। সুনন্দাবৌদি মনে মনে যাই ভাবুন বা যতই ঠাট্টা করুন সবিতাদির কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য আমার একটি মাত্রই ছিল। সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই এতদূর থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে যেতে আর ইচ্ছে করেনি। তাছাড়া সুনন্দাবৌদি—যার সূত্রে আলাপ তাঁর সঙ্গেই সবিতাদির একটা মনোমালিন্য শুরু হতে চলেছে। কাজেই আমার এখন সরে আসাই উচিত।

সুনন্দাবৌদির কাছেও আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। কাশী থেকে কবে ফিরলেন তাও জানি না। জানার আগ্রহও নেই। এই সুযোগে কাজের মধ্যে সুনন্দাবৌদিকেও জানা হয়ে গেল। বলা বাহুল্য সে অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখের নয়।

প্রায় মাস দেড়েক পর হঠাৎ একটা নেমন্তন্নর কার্ডের সঙ্গে সুনন্দা বৌদির লেখা একটা চিঠি পেলাম। তাঁর কি রকম এক ননদের বিয়ে। আমি যেন অতি অবশ্য যাই।

যে বাড়িতে সুনন্দাবৌদি ভাড়া আছেন অর্থাৎ সবিতাদির বাড়ি—সেই বাড়ির কাছেই একটা বড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিয়ে হচ্ছে।

সুনন্দাবৌদি—যাকে বলে কড়া মাঞ্জা দিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করছিলেন, হঠাৎ তাদের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে এমনভাবে ছুটে এলেন, এমন আন্তরিকতা দেখাতে লাগলেন যে আমি মহালজ্জায় পড়লাম।

তিনি বেশ চটুল নায়িকার মতো (এইসব উৎসবের দিনে দামী-দামী শাড়ি গহনা আর ফুলের গন্ধে অনেক বর্ষীয়সী-দেরই এমনি আত্মহারা হতে অনেকবার দেখেছি) আমার হাত ধরে লোকের ভিড়ের বাইরে এনে ফেললেন।

—কী ব্যাপার? একেবারে যে ডুব?

—সময় পাই না।

—আগে তো পেতে। নাকি তখন মধু

এই ধরনের অরুচির কথার কোনো উত্তর দিতে রুচি হয় না বলে অন্য দিকে মুখ ফেরালাম।

—কাশী গিয়েছিলাম, শুনেছ বোধ হয়। কাশীই যখন যেতে হল তখন তোমার সবিতাদির ঠিকানাটা খুঁজে বের করলাম। খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। একটু খোঁজ করতেই ওর বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সব পেয়ে গেলাম। দেখলাম ও তল্লাটের লোক ওর কথা এখনও ভোলে নি। 'বাঈজী' বলে ওর বেশ খ্যাতি। কিন্তু গোপন তথ্যও উদ্ধার করেছি, যা সে তোমার কাছে বেমালুম চেপে গিয়েছিল। দুটো গোপন ব্যাপার আছে। একটা গ্রামজীবনে—সেটা ঘটেছিল কাশীতে আর দ্বিতীয়টা বর্তমান জীবনে সেটা ঘটছে কলকাতায়। ওর এক মাসতুতো বোন আছে। নাম রমা। সে মৃত্যুশয্যায়। বহুদিন থেকে ভুগছে। টাকা পয়সা কিছু আছে। আর আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। দুরারোগ্য ব্যাধি বলে স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। দেখার কেউ নেই। রমার একমাত্র চিন্তা ঐ মেয়েকে নিয়ে। ওর মৃত্যুর পর কে ওকে দেখবে। তাই—

বৌদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক নিঃশ্বাসে দুটি ব্যাপার আমায় বলে গেলেন। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

বৌদি আমায় নাড়া দিয়ে বললেন, কী হল? অমন বোবা হয়ে গেলে যে? আঘাত পেলে?

আমি মাথা নাড়লাম।

—তবে কি খুব আশ্চর্য হলে?

—না।

—তাহলে?

আপনি যে ও'র সব রহস্য জেনে এসেছেন একথা ও'কে বলেছেন?

সুনন্দাদি মাথা নাড়লেন। বললেন, বলব-বলব করে এখনো বলিনি। বলতে কেমন কষ্ট হচ্ছে। নাচ নিয়েই স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হল না। বাধ্য হয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে দিব্যি সারাটা জীবন পরপুরুষকে স্বামী বলে চালিয়ে দিল। আজ হঠাৎ যদি সে কথা ফাঁস করে দিই তাহলে হয়তো ওকে বিষ খেয়ে মরতে হবে। একে অভাবের তাড়না। তার ওপর—

আমি বললাম, বৌদি, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

—কী বলো।

—আমার দিব্যি রইল যা জেনেছেন তা আর কাউকে জানাবেন না—সবিতাদিকেও নয়।

বৌদি প্রথমটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর সুন্দর ম্লান একটু হাসলেন। বললেন আচ্ছা।

একি, চললে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, শরীরটা ভালো নেই। খাব না।

—কিছু না খাও, একটু দই মিষ্টি

আর—আর একজন যে ভাই তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে কখন থেকে বসে আছে, দেখা করবে না?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

—এসো আমার সঙ্গে।

মেয়েদের ঘরের একপাশে একটা চেয়ারে মস্ত একটা পিচবোর্ডের বাকস (উপহার) কোলে নিয়ে সবিতাদি বসে ছিলেন। ভারী সুন্দর সেজেছিলেন। এই বয়েসেও তাকাতে দেখতে ইচ্ছে করে। সবচেয়ে মানিয়েছিল শাড়িখানি। একেবারে হাল-ফ্যাশানের দামী শাড়ি। এমন শাড়ি সবিতাদি কিনতে পারলেন কি করে?

সুনন্দাবৌদি একটু উচ্চকণ্ঠেই ডাকলেন, এই যে সবিতা দেখো কাকে এনেছি।

সবিতাদি সেই পিচবোর্ডের বাকসর ওপর পেয়ালা রেখে ডিসে ঢেলে ঢেলে চা খাচ্ছিলেন, হঠাৎ কেন যে আমায় দেখে হাসিমুখে একেবারে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বুঝতে পারলাম না। আর দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল সেই মুহূর্তেই। সুনন্দাবৌদি একেবারে ছেলেমানুষের মতো আর্তনাদ করে উঠলেন—গেল, গেল, আমার অমন শাড়িখানা গেল!

সামান্য একটা কথা—মুহূর্তের অসাবধানতার দণ্ড। সবিতাদির মুখটা লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে গেল। তিনি চা-টা জল দিয়ে তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলবার চেষ্টাও করলেন না। সেইভাবে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বৌদির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কাউকে কিছু না বলে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে উৎসব-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আশ্চর্য! কেউ তাকে একটিবার ডাকল না।

বিয়েবাড়ি—সবাই ব্যস্ত। সুনন্দাবৌদি মহাউৎসাহে পরিবেশনে নেমেছেন। সেই ফাঁকে চুপি চুপি আমি সবিতাদির বাড়ি চলে এলাম। রাস্তার জানলা দিয়ে ভেতরে দৃষ্টি ফেললাম। ঘর অন্ধকার। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আজ শনিবার জানকীদা এখনও বাড়ি ফেরেনি। লুসি বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। (সেকি সত্যিই মায়ের চেয়ে মাসিকে ভালবাসতে পেরেছে? পেরেছে নিশ্চয়ই। নইলে—) সবিতাদিও বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদছে। কাঁদবেই তো। কম অপমান? নিজের ভালো একখানা শাড়ি নেই বলেই-না বিয়েবাড়ি যাবার জন্যে শাড়ি ধার চাইতে হয়েছিল। সুনন্দাদির সেই দামী শাড়িখানা নষ্ট করে ফেলল। পরের জিনিস তাই নিতে নেই। ওতে অনেক কষ্ট। কিন্তু—

কিন্তু পরের জিনিস কি শুধু শাড়িটাই? সারা জীবনটাই তো পরকে নিয়ে ভুলে থাকতে হল। এ লজ্জা এ বেদনা ধরে ফেলার জন্যে এমনি আরো কত রাত্রি হতভাগ্য সবিতাদিকে নিঃশব্দে কাঁদতে

অঙ্গনা

উত্থানে-পতনে

জাঁড়দার, বাঁটদার আর হিম্মতদার এই তিন নিয়ে ফ্যাশান। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত এখানে কোন সমস্যাই নয়। কার ভাগ্য যে কখন প্রসন্ন আর কার ভাগ্য যে অপ্রসন্ন সেকথা বলা কঠিন। তবে উত্থান-পতন যাই থাকুক না কেন প্রথম দু'জনকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় কারো পক্ষেই। কারণ, ফ্যাশানের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে আটকে গেছে এই জাঁড়দার আর বাঁটদারে। এতো গেল ফ্যাশানের কথা। এবার আসা যাক ফ্যাশানদারের কথায়। যে হিম্মতদার সেই তো আসল ফ্যাশানদার। এ যেন অনেকটা নিজের বুকের রক্ত ঢেলে আগন্তুক পৃথিবীর জন্য প্রশস্ত রাজপথ তৈরী করে দেওয়া। একজন দু'জন এমনি দুর্জয় সাহসে ভর করে এগিয়ে আসেন। নতুন দিনের ফ্যাশান অংগে ধারণ করেন। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে দুরন্ত জলস্রোতের মতো। তাই ফ্যাশানের সংগে হিম্মতের সম্পর্ক এত নিবিড়।

ফ্যাশানের প্রশ্নে আজ আর তেমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় না। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য আমরা একটু পেছনে নজর ফেরালেই দেখতে পাবো যে সেদিন এ রাস্তা এত সহজ ছিল না। শাড়ি আর গয়না ছাড়া তখন মেয়েদের আর অন্য কোন ফ্যাশান ছিল না। দিনে দিনে সেমিজ আর ব্লাউজের আবির্ভাব ঘটলো। সেমিজ ছেড়ে ব্লাউজে হাত বাড়ানো নিঃসন্দেহে খুবই দুঃসাহসের ব্যাপার। ফ্যাশানের আকর্ষণ দুর্বার। কিন্তু আগুনের প্রতি পতংগের আকর্ষণের মতোই তা ছিল ভয়াবহ। একে সামাজিক পরিবেশ তায় বেদান্তবাগীশ শিরোমণিদের তীক্ষ্ণধার আক্রমণ। এ দ্বিমুখী আক্রমণের মোকাবিলায় অসমর্থ অনেকেই মনের শখ মনেই চেপে রাখতেন। আবার সবকিছু জেনেশুনেও অনেকটা উপেক্ষার ভাব নিয়ে দু'একজন এগিয়ে আসতেন নতুনকে বরণ করে নেবার জন্যে। তাঁরা সকলের জন্য অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতেন। ভয় জয় হওয়ার সংগে সংগে এবার তার অবাধ প্রচলন।

সেদিন ফ্যাশানের রাজ্যে আজকের মতো তোলপাড় ছিল না। পরিবর্তন ছিল একান্ত নিঃশব্দ। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতো আর ক্রমে ক্রমে সকলের মধ্যে মিশে যেত। আজকের মতো এমন ঢক্কানিনাদে মুখর ছিল না। সেদিনের মতো এখন আর ফ্যাশানের তেমন নিঃশব্দ পদসঞ্চার নেই। এখন বেশ জানান দিয়ে আসে। দেশ জুড়ে তোলপাড় পড়ে যায়। কার আগে কে আধুনিকা বলে নিজেকে জাহির করতে পারবে সে নিয়ে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আগমনে যেমন আড়ম্বর সরগরম, প্রস্থান আবার তেমনি নীরব। কোনসময়ে যে বাজার-চলতি ফ্যাশান পুরনো হয়ে যায় সেকথা বলা বড় শক্ত। সংগে সংগে তা বাতিলের খাতায় জমা হয়ে যায়। তবে ইতিমধ্যে আবার চোখধাঁধানো আর মন-মাতানো ফ্যাশান বাজার জাঁকিয়ে বসে। বিনে বাতাসে যেমন জল নড়ে না তেমনি নতুন ছাড়া পুরনোকে খরচের খাতায় বসিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু মজা এমনি যে ফ্যাশানের জল সব সময় নড়ছে—কদাচ স্থির নয়।

আঁটোসাঁটো শার্প বডিলাইনের পোশাকে বরাংগনা ছন্দের হিল্লোল তুলে পথ চলতেন। শীত গ্রীষ্ম ঋতুভেদ নেই। বারোমাস একই-রকম। কেউ কেউ আবার দুরন্ত শীতকে তুচ্ছ করে গরম জামাকাপড় পর্যন্ত ব্যবহার করেন না। তাতে দেহসৌন্দর্য প্রকাশে ব্যাঘাত হয়। আবার প্রচন্ড গরমে যখন দর-দর করে ঘামছেন তখনো পোশাক-আশাক সেরকমই। কোন পরিবর্তন নেই। এটাই চল হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে একদল আবার ফ্যাশানের অনুরক্ত হয়েও গরমে একটু ঢিলে-ঢালা পোশাক পছন্দ করতেন। তাঁদের মতে অতো আঁটোসাঁটো পোশাকে গরমে আর ঘামে বড় অস্বস্তি হয়। তাই এ সময়ে পোশাক দেহের খাঁজে খাঁজে না বসিয়ে একটু আলগা রাখলেই বরং স্বস্তিতে থাকা যায়। কিন্তু এ মতের অনুগামীরা ছিলেন সংখ্যালঘু। তবে এখন জোয়ারের গতি এঁদের অনুকূলে। দেহআঁটা পোশাকের অনুরাগীরা এবার কিঞ্চিৎ বেকায়দায় পড়ে গেছেন। কলকাতায় এবার গরমে ঢিলেঢালা পোশাকেরই জয়-জয়কার দেখা গেল। কিছুদিন থেকেই এরকম একটা বিপরীতমুখী ঘটনার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু স্রোত যে পুরোপুরি এদিকে বইবে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। কেউ কেউ অনুমান করছিলেন যে পোশাকে এবার একটা নতুন কিছু ঘটতে চলেছে। গতানু-গতিকতার বন্ধনমুক্ত হয়ে এবার অন্যকিছু। তাই হলো। তাঁদের ভাবনাই জয়যুক্ত হলো। সংখ্যালঘুরা এখন সংখ্যাগুরুর পর্যায়ে।

কিছুদিন হলো আমার এক বন্ধু বিদেশ থেকে ফিরেছেন। ও'র কাছে গিয়েছিলাম। বিদেশই এখন ও'র ঠিকানা আর স্বদেশ হলো প্রবাস। দিন পনেরোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন। কথাবার্তা হচ্ছিলো নানা প্রসংগে। পোশাক-আশাকের কথা এসে পড়লো স্বভাবিকভাবেই। বন্ধু জানালো যে ওদেশে এখন গা-আঁটার বদলে সবাই গা আলগা পোশাক পরেন। ফ্যাশানের এই উল্টো স্রোত ইদানীং ওদেশের পুরুষদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। ট্রাউজার্স যথাসম্ভব ঢিলে পরেন সবাই। কলকাতায় যেমন ছেলেদের মধ্যে বেলবটম জনপ্রিয় হচ্ছে এটা ওখানে অনেক আগেই চালু হয়েছিল। এই তো এখন চলছে তবে কতদিন থাকবে বলা শক্ত। ঝড় উঠলেই সবকিছু উড়ে যাবে। আবার ঝড় থামলেই দেখা যাবে যে নতুন ফ্যাশানের ছত্রছায়াতলে আমরা আশ্রয় নিয়েছি। নতুন আমেজে আমোদিত হচ্ছি।

ফ্যাশানে আমরা সবাই এক, বন্ধুর কথা শুনে তাই মনে হলো। ঢেউ ওঠে কোন সুদূর প্রান্তে এবং তা ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে। কেউ এর ছোঁয়া থেকে বাদ যায় না। তবে ফ্যাশানে কনসেসন মেয়ে-দেরই বেশি। আজকের ফ্যাশানের দিকে তাকালেই একথা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কুর্তা, কামিজ, সার্ট, ব্লাউজ, চোলি সব-কিছুর সংগেই চলে। মিনি থেকে শুরু করে পাজামা, বেলবটম আর লুংগি পর্যন্ত। শুধু শাড়ির সংগেই চলে না। আর একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ইদানীংকার ফ্যাশানে শাড়ি একটু পিছিয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে নতুন কোন ফ্যাশান পরিকল্পনা তার বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। তবু ম্যাচ-মেকিং'এ শাড়ির কদর বাড়ে। পাড়ের সংগে চোলি মিলিয়ে পরার সুযোগ অন্যত্র তেমন অবারিত নয় আর খুব একটা নজরেও পড়ে না। অন্য যেসব ফ্যাশানের কথা বললাম সেখানে শুধু কলারে আর হাতায় ম্যাচিং-এর সুযোগ কিন্তু শাড়ির মতো ম্যাচিং-এর এমন ব্যাপক সুবিধে আর নেই। তবু ফ্যাশানবিলাসীরা শাড়ি ব্যবহার করেন তোলা পোশাকের মতো।

ফ্যাশান কখন যে কি হবে আর কোন রূপ নেবে বলা শক্ত। এ সম্বন্ধে আসলে মানুষের নিজস্ব রুচি নেই। জাঁকজমক আর নতুনত্ব থাকা চাই পোশাকে। সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে এখন অনেককিছুই আমাদের ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ায়। এইতো কিছুদিন আগে দেখা গেল চটের জামা দিব্যি মেয়েদের গায়ে শোভা পাচ্ছে। অথচ একদিন তো চটের বস্তারূপেই আমাদের কল্পনার সীমাবদ্ধ ছিল। পাটের ব্যবহার পোশাকে আরো আছে। পাটের প্যান্ট আজকাল মেয়েদের মধ্যে বেশ চল হয়েছে। আর তার সংগে মানানসই কামিজ তা সে স্লীভলেসই হোক আর মিডি স্লীভই হোক। তবে মনের মতো পোশাক হচ্ছে মিহি চটের স্লীভলেস শার্ট ব্লাউজ আর মিনি স্কার্ট। বিশেষ সামনেই দুরন্ত বর্ষার আশ্বাস। তাই এসময়ে আজানু-লম্বিত পোশাক অনেকেরই পছন্দ হবে না।

এক কথায় ম্যাক্সি পোশাক এখন আর চলবে না। সে ফতোয়া জারী হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু ম্যাক্সি যাই যাই করেও পুরোপুরি যেতে পারছে না। একদিন অভিজাত মহলে রাত্রিবাস হিসেবেই এর প্রচলন ছিল। আবার এমনি ফ্যাশান হিসেবেও চালু ছিল। আমরা অনেকেই ধরে নিয়ে-ছিলাম এই পোশাক এখন অতীত ইতিহাস। আবার এই ম্যাক্সি ঘুরেফিরে আসছে শুধু রাত্রিবাসে নয়, এমনি পোশাকেও। তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে! আর কেউ কেউ এক কাটের আজানুলম্বিত পোশাক পছন্দ করতে শুরু করেছেন। তাঁরা চান, পোশাকে একক সৌন্দর্য থাকবে, ব্যবহারে থাকবে পরম স্বাভাবিকতা। বৈচিত্র্য থাকবে অথচ জট থাকবে না। কারণ সময় বড় কম। সাজগোজে পোশাকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এখানেই তো তার শেষ নয়। প্রসাধন আছে, কেশের শোভা আছে। সবই একসংগে

সাজিয়েগুছিয়ে নিতে হবে। তাই ফ্যাশান হবে সহজ অথচ উর্বাচ্যময়। তাই তাঁরা এদিকে ঝুঁকেছেন। তবেঁথিয়ের সবাই কিন্তু সেই ম্যাক্সিকে গপাছে ছাড়েন। কেউ কেউ এব্যাপারে আবার লুকোচুরি [illegible] বাগড়ের জিজাইনের দিকে ঝুঁকেছেন। মধ্যমহলে এই পোশাকে তাঁরা দিব্যি চলাফেরা করছেন। তাই কোনটা যে কখন ফ্যাশান আর কোনটা যে অপাংক্তেয় তা বলা বড় শক্ত।

এই তো এতদিন মিনির রবরবা ছিল। এই ফ্যাশনের চক্রান্তিমাঝে আর কেউ পাত্তা পেতো না। সবাই ছিল যেমন ম্রিয়মান। কিন্তু এখন সেই মিনির দিন গতপ্রায়। যে লেডিজেল ব্লাউজ নিয়ে তুমুল আলোড়ন তাও এখন বিগত মহিমা। এখন আবার ফলে শনীজ ট্রান্সপারেন্ট ব্লাউজ বাজার জাঁকিয়েছে। আর কোনকিছু এখন এর কাছে দাঁড়াতে পারছে না। এবারকার শীতে যেমন কার্ডিগানের মহিমা ম্লান হয়ে গিয়েছিল স্টোলের কাছে তেমনি এই ব্লাউজ এখন ফ্যাশানে একক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ঢিলে-ঢালা পোশাক আর ম্যাক্সির পুনরাবির্ভাবের মধ্যে এই ব্লাউজের আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যময় যা অনুধাবন করা যায় আগামী দিনের ফ্যাশানের গতিবিধিতে।

—প্রমীলা

সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্য যেন না আসে

আচ্ছা, আপনার ভবিষ্যৎ জানতে ইচ্ছে করে না? ভবিষ্যৎ—কি হবে না হবে সেটাতে আপনার নিশ্চয়ই কৌতূহল আছে; নেই আবার কার? মুখে যতই বড়াই করুন না কেন সময়টা কোনরকম বেকায়দা হলেই অনেকেই ছোটেন এখানে-ওখানে, জ্যোতিষী বা রাজজ্যোতিষীর দ্বারস্থ হন। বিত্তবানের জ্বালা তো বড় বেশী—টাকা-পয়সা বিত্ত-বেসাদ নিয়ে যখনই ঝামেলায় পড়েন অমনি জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। ভেজালে লাভ, [illegible] মিলন, সংসারে শান্তি-অশান্তি সবেরই ঝক্কি-ঝামেলা ফাঁড়া কাটিয়ে দেবার গুরু-দায়িত্বও তো জ্যোতিষীদের। এছাড়া আরও যে কত গোপন জিজ্ঞাসা আছে তার কি ইয়ত্তা আছে। যেন আমাদের আদরের ছোট্ ঠাকমা। আশী বছরের দাদুর আটাত্তর বছরের দ্বিতীয় পক্ষের গোলগাল সৌখীন, সুশ্রী সহধর্মিনী। বয়সের তুলনায় বার্ধক্যের ছাপ শরীরে কম। তাঁরও একটা গোপন জিজ্ঞাসা আছে। সেই গোপন জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য খরচাপাতির কমতি নেই।

দুপুরবেলা দাদু যখন গড়গড়ার নল টানতে টানতে পাশবালিশটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দিবানিদ্রায় অচেতন তখন ঠাকমা ছোটেন জ্যোতিষীদের কাছে সেই গোপন জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য। প্রতিবারই ঠাকমা আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে সংগে করে নিয়ে যান। আমাদেরও মনে তাই গভীর একটা কৌতূহল ছিল ঠাকমার একান্ত সংগোপনের প্রশ্নটার স্বরূপটা জানবার।

এমনি একবার ঠাকমার সংগী হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল: ভরদুপুরে গোটা দুই বাস বদল করে আমাকে নিয়ে এক জ্যোতিষীর কাছে হাজির। একটা ঘর আধাআধি ভাগ করে জ্যোতিষীমহাশয় উচ্চনাসিকা আরও উঁচু তুলে চেয়ারে বসেছিলেন। ঠাকমা বলা নেই, কওয়া নেই একেবারে [illegible] গিয়ে হাজির হলেন। চোখের ইশারায়

আপনার সিঁদুর অক্ষয় হবে

আমাকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন যাতে তাঁর গোপন প্রশ্নটা শুনতে না পাই। কিন্তু আমার কৌতূহলটাও তো কম নয় তাই ঠাকমার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও সে ঘরের এপাশে এসে দাঁড়ালাম। ঠাকমা জানতেই পারলেন না। ঠাকমা ঢুকতেই জ্যোতিষীমহাশয় জয়! কালী, করালী, রক্ষাকালী ব'লে ভীম রবে করজোড়ে মা-কালীকে প্রণাম জানাতে লাগলেন। ঠাকমাও এ ডাক শুনে যেন গলে গেলেন।

বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে ঠাকমাকে খানিক নিরীক্ষণ করেই জ্যোতিষী হাত বাড়ালেন দক্ষিণার জন্য। ঠাকমা রুমালের বাঁধন খুলে কড়কড়ে পাঁচিশটি টাকা এগিয়ে দিলেন। জ্যোতিষীকে এতগুলো টাকা দিতে দেখে আমার তো বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগলো। ঠাকুর্দার বালিশের তলা থেকে টাকা হাওয়া হয়ে যাবার রহস্যটা এতক্ষণে বোঝা গেল।

মনে মনে ভাবলাম বুড়ো বয়সে ঠাকমার টাকা-পয়সা ওড়ানোর একি রোগ!

জ্যোতিষী একগাল হেসে বললেন, 'মা, আপনার তো বেশ বয়স হয়েছে। এলেন কিসে?'

ঠাকমাও অত্যন্ত খুশী হ'য়ে বললেন, তা আর বয়স কম হল কি। ষাটের কাছা-কাছি তো পৌঁছে গেলাম। ভগবানের কৃপায় হাঁটতে-চলতে আমার কোন কষ্ট নেই। তা বাবা খবরের কাগজের ঠিকানা দেখেই বাসে সোজা আপনার এখানে চলে এসেছি।

জ্যোতিষী ঠাকমার কপাল একদৃষ্টিতে খানিক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'আপনার ভাগ্য তো খুবই ভাল। এত বয়সে স্বামী নিয়ে সুখে ঘর করছেন হঠাৎ আমার কাছে ছুটে এলেন কেন?'

আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। ঠাকমা কেন এত উতলা হয়ে জ্যোতিষীর কাছে ছুটে এসেছেন সেটা তো কপাল দেখে, রেখা বিচার ক'রে জ্যোতিষীমশাই তো বলবেন। আর তিনি [illegible] আমার মতই কৌতূহল নিয়ে সব [illegible] নিতে চাইছেন।

আসলে ঠাকমার কোনদিকেই মন ছিল না, শুধু সেই গোপন চিন্তায়ই মগ্ন ছিলেন। তাই ফিসফিস ক'রে বললেন, 'দেখুন তো আমি কতার আগে মরবো কিনা? সধবা থাকতে থাকতেই মরতে চাই। বিধবা হয়ে সবকিছু সুখ-ভোগ বিসর্জন দিয়ে বাঁচতে চাই না। তার চেয়ে আগেভাগে মরে যাওয়াই ভাল।'

এতক্ষণে বুঝলাম সৌখিন ঠাকমার জ্যোতিষীদের ওপর এত আকর্ষণ কেন।

জ্যোতিষী তো নিমেষে সব বুঝে ফেললেন। তারপর কপালের লিখন পড়েই বলে দিলেন? 'আপনার সিঁদুর অক্ষয় হবে।'

ঠাকমা আহ্লাদে আটখানা। আরও প্রণামী দশ টাকা দিয়ে গদগদ ভক্তিতে ওঠে এলেন। জ্যোতিষীমশাইও টাকা হাতে 'জয়-তারা' রবে ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। কিন্তু নিয়তির এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে সেই ভবিষ্যৎবাণীর ছ'মাসের মধ্যেই ঠাকমার সব সুখ স্বাচ্ছন্দ মাটি ক'রে দিয়ে ঠাকুর্দা বিদায় নিলেন। মাঝখান থেকে ঠাকমা দীর্ঘদিন এ জ্যোতিষী সে জ্যোতিষী ও নানা মাদুলি কবচ ধারণ করে লুকিয়ে লুকিয়ে দাদুর বহু টাকা নষ্ট করলেন। দাদুর মৃত্যু বা বৈধব্য শোকের চেয়ে সেই শোকই তাঁর সবচেয়ে বেশী।

মানব সভ্যতার এবং বিজ্ঞানের

অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যান্বেষী একদল মানুষের এই যে আত্মপ্রবঞ্চনার কাহিনী তা বোধহয় বর্তমান কালের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। আমরা মানুষেরা তো নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে থাকি। তবে কেন আমরা এত উতলা হয়ে আমাদের ভাগ্য জানতে ছুটোছুটি করি? এ বোধহয় আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনার চরম উদাহরণ। যার কাছে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বিচার-বিবেচনা সব অন্ধ।

আমি কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্বেষী নই। সত্যিকার জ্ঞানীগুণী জ্যোতিষী এদেশে কম নেই। এঁদের কাছ থেকে অনেকেই নানারকম সুফল পেয়েছেন। তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। অনেক সময়ই দেখা যায় মেয়েরা, বিশেষ করে ঘরের গৃহিণীরা তাঁদের দুঃসময়ের ফাঁড়া কাটানোর জন্য পাগলের মত জ্যোতিষীদের দোরে দোরে ঘোরেন ও পাঁচ-জনের পাঁচরকম উপদেশ শুনে সংসারের আর্থিক অনটনকে আরও বাড়িয়ে তোলেন। স্বামীর রক্ত জল-করা টাকার ওপর তখন এঁদের দরদ থাকে না। এই ধরনের মায়েদের ও বোনেদের জন্যই দুঃখ হয়, হয় চিন্তা। এ লাইনে আসল নকল চেনা খুব শক্ত। দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রেকটিস পাল্লায় পড়ে অযথা অপচয় করে নিজেদের দুর্ভাগ্যকে আরো অনাবৃত না করেন সেজন্যেই আমার এই হুঁশিয়ারি।

—অঞ্জলি চৌধুরী

জলসা

নৃত্যশিল্পী পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়   সুশৃঙ্খলে সমাধায় সাহায্য করতেন।

শিক্ষামন্ত্রীর সম্মানার্থে বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ১২ই জুন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীর সম্মানার্থে রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিচিত্র স্বাদের অনুষ্ঠান ও উপযুক্ত মানের শিল্পীবৃন্দকে সম্মানিত অতিথি এবং নিমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের সামনে উপহার দেওয়া অবশ্যই কৃতিত্বের পরিচয়।

কিন্তু সুসম্পূর্ণ কবিতার মতই একটি পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যরূপ সৃষ্ট হতে পারত যদি শিল্পীরা সকলেই নির্ধারিত সময়নির্দেশ মেনে সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান-সূচী সুশৃঙ্খলে সমাধায় সাহায্য করতেন।

প্রতি শিল্পীর দুটির বেশী গান গাওয়ার কথা ছিল না। তাঁরা দুটির বেশি গান করেন নি। কিন্তু প্রতিটি গান অনেকেই একাধিকবার ত বটেই তারও বেশীবার পুনরাবৃত্তি করায় দুটি গান চারটি বা ছটি গানেরই সমান হয়ে গেছে। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনানী ঘোষ ছাড়া আর কোন শিল্পীই সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করেননি ফলে ব্যবস্থাপনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে।

নৃত্যনাট্যগুলির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। একমাত্র 'নৃত্যন' গোষ্ঠী এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু হয় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' ও 'উতল হাওয়া' দিয়ে। সূচনাটি নিঃসন্দেহে সুন্দর। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গীতা ঘটক, দীপংকর চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, সাগর সেন, চিত্রলেখা চৌধুরী ও বনানী ঘোষ। বনানী ঘোষের পূর্ণ কণ্ঠের গান ত অন্তর পূর্ণ করেইছে, অন্যান্য শিল্পীরাও আপনাপন মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নজরুল-গীতি পরিবেশন করেন অনুপ ঘোষাল ও অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়।

'মল্লার'—প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে নবীনের কিছু অংশ প্রদর্শিত হয়। অশোকতরুর গান, এবং পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের গ্রন্থনা সঙ্গত রুবী দত্তর নৃত্য এয়ীর রুচিস্নিগ্ধ মেল বন্ধনে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

নৃত্য ও সঙ্গীত সহযোগে 'সাগরিকা' থেকে কিছু অংশ উপস্থাপিত করলেন—সুরসপ্তয়ন। সাধন গুহর নৃত্যও রূপলাবণ্যের সমন্বয়ে উপভোগ্য। পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়ের নৃত্যাভিনয় তারিফ করার মতো। গানে ছিলেন অশোকতরু, বেণু রায় ও সৌরেন রায়। গ্রন্থনায় পার্থ ঘোষ।

মিতি জাগোই—প্রতিষ্ঠানের মণিপুরী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন দেবযানী চালিহা ও টি নদীয়া সিং।

মাত্র পাঁচ মিনিটের নৃত্যে 'এস শ্যামল সুন্দর'—গানটির রূপায়ণে সারা প্রেক্ষাগৃহকে এক স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দের আনন্দে উচ্ছল করে তোলেন পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত-সংগতে এ অনুষ্ঠানকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন স্বপন গুপ্ত ও অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়। প্রথমজন প্রতিষ্ঠিত তরুণ শিল্পী। কিন্তু নবাগতা অপর্ণাও আশ্চর্য করে দিয়েছেন সপ্রতিভ ও সাবলীল কণ্ঠ-সহযোগিতায়।

নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন নীলাদ্রিশেখর বসু।

প্রথমের দিকে শিল্পীদের সময়-নিষ্ঠার অভাবে ও অবিবেচনার জন্য রাত হয়ে যাওয়ায় শ্রেষ্ঠ নৃত্যানুষ্ঠান সুমিত্রা মিত্রের কথক-নৃত্য দেখার সুযোগ থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। এঁর সঙ্গে সারেঙ্গী ও তবলা সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে অশোক মিশ্র ও রামগোপাল মিশ্র।

রেকর্ড সমালোচনা

বৈশাখে রবীন্দ্রজয়ন্তীর পরই জ্যৈষ্ঠ এল অনুজ কবি নজরুল-জয়ন্তীর বার্তা নিয়ে। ছখানি ই পি রেকর্ড। বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহবহ্নির শিখা জ্বলতে দেখলাম প্রদীপ ঘোষের 'ফরিয়াদ' ও 'কামাল পাশা' আবৃত্তিতে। বিশেষ করে কামাল পাশাতে যুদ্ধক্ষেত্রের দামামা, তেজ শৌর্য্য ও হুহুংকার যেন জীবন্ত-রূপ পরিগ্রহ করেছে শ্রীঘোষের আবেগতপ্ত কণ্ঠে।

ডক্টর অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় নজরুলের গানের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। এঁর শিক্ষিত দরাজ কণ্ঠে 'ফুলের জলসায়' 'দক্ষিণা সমীরণ সাথে', 'কে নিবি ফুল' এবং 'ঐ ঘর ভোলানো সুরে'—উচ্চাঙ্গী কবির অনুভবের তীব্রতাকে শুধু হৃদয়ঙ্গমই নয়, উপভোগও করা যায়। একটু পুরুষালী কণ্ঠ হয়ত কিন্তু তাঁর গায়নশৈলীর সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে যায়।

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ছাড়াও কবির গানের রোমান্টিক দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অনুপ ঘোষালের গানে।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বভাবানুগ তন্ময়তায় গেয়েছেন 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'এ নহে বিলাস ব[illegible] বেণুকা ও কে বাজায়' ও 'কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও'। মানববাবুর কণ্ঠে দরদ আছে, অনুশীলিত কণ্ঠ এবং নজরুল গান তিনি কবছর ধরে বিশেষভাবে চর্চাও করছেন। তবু বলব তাঁর কাছে যা পেতে চাই পরিপূর্ণভাবেই পাওয়া যেত যদি শিল্পী আর একটু আত্মলীন হতেন।

তরুণতম শিল্পী অনুপ ঘোষাল তাঁর তরুণের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'দিতে এলে ফুল', 'নন্দনবন হতে কেগো' 'চোখের নেশা ভালবাসা' ও 'এ আঁখিজল মোছো প্রিয়'—গানগুলিতে। একখানি ই পি ডিস্কে দুটি করে গান গেয়েছেন—পিন্টু ভট্টাচার্য ও মাধুরী চট্টোপাধ্যায়। গানগুলি হোলো—'আজো কাঁদে কাননে' ও 'এল শ্যামল কিশোর' (পিন্টু ভট্টাচার্য)। 'গুঞ্জমালা গলে' ও 'গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদা'। গানগুলিতে নতুনত্ব আছে। শিল্পীরা গেয়েছেনও উচ্চমানে।

কাজী অনিরুদ্ধর প্রাণকাড়া গীটারে শোনা যায় চারখানি বিভিন্ন ধরনের গান 'নমো, নমো বাংলাদেশ মম', 'চোখ গেলে' 'জনম জনম গেল' ও 'নূরজাহান'।

কোনো শিল্পীর গানই অপছন্দের নয়—কিন্তু তবু ভরিল না চিত্ত। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্তোষ সেনগুপ্ত, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া নজরুলের গান যেন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না—বলেই আমাদের বিশ্বাস। বেস্ট লাভড্ সঙ্গ

অফ্ নজরুল-এর এল পি ডিস্কে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্রও শোনবার মত গানই গেয়েছেন। এমনই নানারঙা ফুলে যদি নজরুলগীতির ডালিটি সাজানো হোতো তবেই এ গানের উৎসব সৌন্দর্যময় হয়ে উঠত।

ডাউন মেমোরি লেন—সারাশিক্ত এল পি ডিস্কে অতীতের খ্যাতনামা শিল্পী-দের কণ্ঠের বারোখানি জনপ্রিয় গান শোনা গেল বর্তমান যুগের শিল্পীদের কণ্ঠে।

শোনামাত্রই মন দুলে ওঠে যে দুটি গানে সে দুটি গানই গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ঘরে তুলসী তলায়' ও 'শ্যাম তুমি যদি রাধা হোতে'। প্রথম গানটির কথা ও সুর নজরুলের। বহুকাল আগে টুইন রেকর্ডে গেয়েছিলেন পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় গানটির রচয়িতাও নজরুল। সুরকার—কমল দাসগুপ্ত।

প্রতিমার কারুকাজকরা মধুর কণ্ঠ ডাক্ ও প্রণয় উভয়ভাবই সমুদ্রাবীরস্বরূপ সৃষ্টি করেছে।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'কৃষ্ণচন্দ্র দের সুবিখ্যাত গান 'বঁধু চরণ ধরে বারণ করি' ও 'ঐ মহা-সিন্ধুর ওপার হতে'। মানববাবু ভালই গেয়েছেন। প্রথমটির গীতিকার ও সুরকার হেমেন্দ্রলাল রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে, দ্বিতীয়টির ডি এল রায়। প্রথম গানটি 'কৃষ্ণচন্দ্র দে দ্বিতীয়টি 'কৃষ্ণচন্দ্র দে ও দিলীপকুমার রায় উভয়েরই রেকর্ড আছে।

পুরনো দিনের শিল্পী শীলা সরকারের হৃদয়-কাড়া দুটি গান : 'মাধবী রাতে' ও 'আলো ঝলমল' নতুন করে গেয়েছেন বনশ্রী সেনগুপ্ত। উপভোগ্যতার দিক থেকে শ্রীমতী সেনগুপ্ত শ্রীমতী সরকারের ধারেকাছেও যেতে পারেন নি। গান দুটির সুরকার-রচয়িতা 'অনিল ভট্টাচার্য'।

এ ডিস্কের অন্যান্য গান ও শিল্পী—স্বপন যদি মধুর এমন' 'পৃথিবী আমার চায়' (তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) সুরকার ও গীতিকার—কৃষ্ণচন্দ্র দে ও কমল দাসগুপ্ত, জলধর চট্টোপাধ্যায় ও মোহিনী চৌধুরী।

অনুপ ঘোষাল গীত 'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি' (কথা ও সুর রজনীকান্ত সেন) উপভোগ্য। কিন্তু 'জীবনে যারে তুমি' (কথা ও সুর প্রণব রায় ও শৈলেন দত্তগুপ্ত) পূর্ববর্তী শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্তকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।

নির্মলা মিশ্র গেয়েছেন 'জানি বাহিরে আমার তুমি' (কথা ও সুর প্রণব রায় ও কমল দাশগুপ্ত) ও 'নিশিথে চলে হিমেল বায়' (রচয়িতা ও সুরকার মমতা মিত্র ও হিমাংশু দত্ত সুরসাগর)।

অতীতের কল্পনাসমৃদ্ধ আধুনিক গানের নজীর হিসাবে ডিস্কটির বিশেষ মূল্য আছে।

উত্তর কলিকাতা জেলা যুব কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক শাখার 'রবীন্দ্র বন্দনা'

গেল ৩০ মে সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা মঞ্চে উত্তর কলিকাতা জেলা যুব কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র বন্দনা ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন প্রসঙ্গে উপমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র ভাবনা, সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী-দের দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত অভি-মত প্রকাশ করেন। শ্রীনিবাস বসু, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় ও পঞ্চানন দত্তের বক্তৃতার পরে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে রবীন্দ্রবন্দনা করা হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা অবলম্বনে 'ঋতু বিচিত্রা' পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া'র সন্তোষ সেন প্রদত্ত নাট্যরূপের অভিনয়। দীনেন রায়ের পরিচালনা এবং শ্যামলেন্দু পান, দীনেন রায়, মলি মুখোপাধ্যায় প্রমুখের অভিনয়-গুণে নাট্যাভিনয়টি দর্শকদের তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হয়েছিল।

'নজরুল সন্ধ্যা': সম্প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের 'মিলন মন্দিরে' নজরুল সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবির সুহৃদ ও জীবনীকার শ্রীপ্রাণতোষ চট্টো-পাধ্যায়। প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী ভাষণের পর কবির রচনা পাঠের মাধ্যমে আলোচনা করেন শ্রীরণজিৎ চক্রবর্তী। শ্রীমতী সুমিলিতা ভট্টাচার্য ও স্বর্ণ-সীতার আবৃত্তির পর সভাপতি শ্রীচট্টোপাধ্যায় অনবদ্য ভঙ্গীতে নজরুলের 'ঝড়' কবিতাটি আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করেন। গঠাতিচারণ সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় অতঃপর কাজী নজরুলের বিভিন্ন পর্যায়ের সংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করেন। পরিশেষে অধ্যাপক মিহিরকুমার সেনের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অবনীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক অনুষ্ঠান : বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী আয়োজিত এক মনোজ্ঞ পরিবেশে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত 'মাটির প্রদীপখানি' দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। প্রধান অতিথি সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর সুন্দর আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান সভাপতি আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ চিন্তামণি কর অতি মনোজ্ঞ একটি আলো-চনায় ভারতীয় শিল্পে অবনীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় তা বর্ণনা করেন। পরিশেষে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় রবীন্দ্রসংগীত পরিষদের শিল্পীরা সেদিন যে সংগীত পরিবেশন করেন বিশুদ্ধতায় ও ভাবব্যঞ্জনার দিক দিয়ে তা বহুদিন শ্রোতাদের স্মরণে থাকবে। পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা যে এগারোটি গান পরিবেশন করেন, তার মধ্যে গৌরী মিত্র ও [illegible] সর্বাধিকারীর গাওয়া দুটি গান [illegible] প্রশংসার দাবী রাখে। [illegible] একটি রাগাশ্রিত গান গেয়েছেন 'নব নব পল্লব-রাজি'। পরিষদের সম্মেলক শিল্পীরা পাঁচখানি গান গেয়েছেন। তার মধ্যে 'কী গাব আমি' ও 'দিয়ে গেনু বসন্তের এই' গান দুটি খুবই উচ্চমানের। শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও নির্মল দে এস্রাজ বাজান। খোল ও তবলা সঙ্গত করেন শ্যামচাঁদ মিত্র। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অনীতা দে, মধুমাধবী ভট্টাচার্য, মদীব ভট্টাচার্য, ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য, মঞ্জুলিকা দাস, অপর্ণা দত্ত ভারতী সরকার, মণীন্দ্র ঠাকুর ও অরুণ ভট্টাচার্য।

একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ২৭ মে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে সুন্দর পরিবেশে বার্ষিক নাচ, গান ও নাটকের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন নিউ আলিপুরের সুপরিচিত নার্সারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল সেন্ট জোসেফ এ্যান্ড মোরিস প্রাইমারী স্কুল ও তার সাংস্কৃতিক শাখা সাগ্নিক। এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনও যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুলেখা রায় ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের এবং আধুনিক ভাষা-তত্ত্বের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ সুহাস চ্যাটার্জি।

রবিতীর্থের তাসের দেশ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে গত ২০শে মে রবীন্দ্রসদনে রবিতীর্থের শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নৃত্য-নাট্যটি মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থিত দর্শকমন্ডলীর বিপুল অভিনন্দন লাভ করে। নৃত্যনাট্যটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন সুচিত্রা মিত্র এবং দ্বিজেন চৌধুরী। নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন রামগোপাল ভট্টাচার্য। নৃত্যে জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, শান্তা বসু রায়, শকুন্তলা বসু রায়, মধুরিমা বসু, মীনাক্ষী গোস্বামী, চন্দনা বসু, শিবশঙ্করণ, শান্তি বসু, শম্ভু ভট্টাচার্য এবং সংগীতে সুচিত্রা মিত্র, রুণা চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা বসু, অজয় রায়, তুষার ভঞ্জ, কাশীনাথ রায়, রবীন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ আগ্রহ সহকারে দেখেন। অনুষ্ঠানের পর তিনি ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় মঞ্চের উপর এসে রবিতীর্থের শিল্পীদের অভিনন্দন জানান এবং সানন্দে শিল্পীদের সঙ্গে একত্রে ছবি তোলেন।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

নয়না চ্যাটার্জি। আগামী কয়েকটি ছবিতে দেখা যাবে। ফটোঃ অমৃত

স্টুডিও থেকে

রাজনৈতিক পটভূমিকায় সামাজিক চেতনার ওপর ছবি করবার যে প্রবণতা ইদানীং দেখা যাচ্ছে সেটা চলচ্চিত্র আন্দোলনের আর একটি নিয়মবহির্ভূত ধারা। কিন্তু এই ধারা বিশিষ্ট কোন রীতি অথবা নীতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। যেমন ছিল নতুন বাস্তববাদ বা নিও রিয়ালিজম।

এটা এমন একটি ধারা যা স্বতঃপ্রণোদিত এবং স্বাধীন। ছবি করতে হলে পরিচালককে এই রীতিতে ছবি করতে হবে নইলে সে ছবি ফিল্ম পণ্ডিতদের মতে শিল্পরসোত্তীর্ণ হবে না, অথবা তাকে এই নীতি মেনে চলতে হবে নইলে সে ছবি অধর্মে পতিত হবে—এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। সবাই নিজের বৈশিষ্ট্যে, নিজের চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত। এই ধারায় নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সত্যজিৎ রায় তাঁর পবরর্তী ছবি 'অশনি সংকেত' করছেন, মৃণাল সেন করছেন—'কলকাতা একাত্তর', পার্থপ্রতিম চৌধুরী করছেন 'যদুবংশ', ঋত্বিক ঘটক করছেন 'যুক্তি-তর্ক এবং গল্প', অর্পণ চক্রবর্তী করছেন—'নির্জন সংলাপ', চিদানন্দ দাশগুপ্ত করছেন—'ষাঁড়, রক্ত, গাধা', শরণ দে করছেন—'প্রজাপতি' ইত্যাদি।

শিল্প এবং কৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের অভিভাবকেরা শিল্পে স্বাধীনতা পছন্দ করেন না। অতএব স্বাধীনতাকামী পরিচালকরা বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু বিভ্রান্ত নন। এ'রা আপন আপন লক্ষ্যে স্থির। অকম্পিত পদক্ষেপে এ'রা এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের লক্ষ্য হল রাজনৈতিক পটভূমিকায় সমাজচেতনার ওপর ছবি করা এবং তাতে কোন আপোষরফা থাকবে না।

স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে সচেতন থাকলে কাউকে কোন রীতিনীতির বাধ্য-বাধ্যকতার মধ্যে থাকতে হয় না। সামাজিক, সমসাময়িক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ফ্যান্টাসী, মিউজিক্যাল—যে ধরনের ছবিই হোক না কেন—স্থান-কাল-পাত্র বোধ থাকা চাই। মোগল দরবারকে ঠিক মোগল দরবারই দেখাবে, দেখলে যেন মনে না হয় এটা স্টুডিও ফ্লোরে তৈরী সেট। জাহাঙ্গীরকে দেখতে জাহাঙ্গীরের মত হবে—দেখলে যেন একথা মনে না হয় জাহাঙ্গীরের মেক-আপে হিন্দু অভিনেতা উত্তমকুমার অথবা রাজেশ খান্না; কৈলাস-ধাম অথবা বৈকুণ্ঠধাম যেন দর্শকের মনে বিস্ময়মিশ্রিত একটা শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। নন্দী-ভৃঙ্গী ইত্যাদিকে দেখে যেন কৌতুক-মিশ্রিত হাসির উদ্রেক না হয়। স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে সচেতন থাকলে এসব হওয়ার সম্ভাবনা কম। সচেতনতার জন্যই 'মেরী ওয়ালেস্কা' ছবিতে আমরা চার্লস বয়ারকে দেখি নি—দেখেছি নেপোলিয়নকে 'দি স্টোরী অব ডকটর লুই পাস্তুর' ছবিতে পল মুনিকে না দেখে লুই পাস্তুরকে দেখেছি।

'রোমান্স-সিভ্যালরী'র দিন আজ আর নেই। শরৎচন্দ্রের পার্বতীর জন্য দেবদাসের আত্মহত্যাকে আজ আর কেউ শ্রদ্ধা করে না, সহানুভূতি দেখায় না—বরং দেবদাসকে বলে ভীরু, কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন এক হাস্যকর প্রতীক। আজ জীবনের চাইতে বড় কিংবা মহৎ কিছু নেই। জীবনই রাজনৈতিক পটভূমিকায় সমাজচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সম্বন্ধে মনোযোগী করে, প্রশ্ন করায়—এখন আমাদের কর্তব্য কি? সমাজে মানুষের স্থান কোথায়? সমসাময়িক সমস্যার সমাধানে মানুষের করণীয় কি? তাকে জানতে হবে নৈতিক পদস্খলনের চাইতে বিজ্ঞানের পদস্খলন অনেক বেশী মারাত্মক। নৈতিক পদস্খলন হয়তো সমাজের একাংশ নাড়া দেয় কিন্তু

জ্ঞানের পদস্খলন সমস্ত মানব সমাজকে ধ্বংস করে দেবে। এটম বোমার আঘাতে পৃথিবীটাই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, নীতি-দুর্নীতির লড়াই হবে কি পৃথিবীর মৃত-দেহের ওপর? এই সব সমস্যা এই সব প্রশ্নের দিকে পরিচালকদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কোন্ মেয়ে কোন্ ছেলের জন্য আত্মহত্যা করল, কোন্ ছেলে কোন্ মেয়ের জন্য দেবদাস হল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দিন গেছে। এখন নজর দেওয়ার দিন এসেছে মানুষ—মানবতাবোধ, জীবন এবং জীবনবোধের ওপর।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর স্যুটিং চলছে সীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত ও সুরারোপিত নিমাই ভট্টাচার্যের রোমান্টিক উপন্যাস 'মেমসাহেব' ছবির। ফ্লোরে ঢুকেই দেখলাম একটা সুন্দর-সুসজ্জিত ড্রইংরুম। কাশ্মীরী কার্পেটের ওপর সোফাসেট, এক পাশে একটা ছোট্ট রাইটিং টেবিল—টেবিলের ওপর একটা একসটেনশান টেলিফোন। টেবিলে কিছু ইংরেজী বই—ঘরের দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর তৈলচিত্র। দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম এটি দিল্লীর ওয়েস্টার্ণ কোর্টের একটি ফ্ল্যাট বাড়ী। এখন যে দৃশ্যটা গৃহীত হবে তার কিছুটা পূর্বানুবৃত্তি আপনাদের বোঝবার সুবিধার্থে ধরিয়ে দিই। সাংবাদিক অমিত জীবনে বড় হবে, প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তার জীবনে মেমসাহেব আসার পর মেম-সাহেবের অকৃত্রিম ভালবাসা, অনুপ্রেরণায় অমিত ধীরে ধীরে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছে। আজ সে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই মেমসাহেব সুদূর কোলকাতা থেকে হঠাৎ দিল্লী চলে এসেছে অমিতকে অভিনন্দন জানাতে।

এখন যে দৃশ্যটা গৃহীত হল তা নিম্ন-রূপ : ড্রইংরুমে বসে আছে অমিত ও কাজল (মেমসাহেব)।

কাজল—তুমি যে এমন করে আমাকে চমকে দেবে—আমি ভাবতেই পারি নি।

অমিত—কি ভেবেছিলে?

কাজল — ভেবেছিলাম ঘুরে-ফিরে চাকরী একটা যোগাড় করবে কিন্তু এত অল্প সময়ে তুমি যে দিল্লী শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে—এ আমি কল্পনাই করতে পারি নি।

অমিত—মেমসাহেব, তোমাকে খুশী করতে পেরেছি—এই আমার আনন্দ। আচ্ছা ভাল রেজাল্ট করলে তো লোক পুরস্কার পায়—

কাজল—হ্যাঁ—তা পায়।

অমিত—তুমি আমার পুরস্কার দেবে না?

কাজল—দেবো।

অমিত—কি?

কাজল—যা চাইবে তাই।

অমিত—আপত্তি করবে না?

কাজল—আপত্তি করলে তুমি শুনবে?

অমিত ধীরে ধীরে কাজলের দিকে ঘনিষ্ঠ হবার উপক্রম করতেই দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। কাজল ও অমিত ফিরে তাকায়। দেখে অমিতের ভৃত্য গজানন কাজলের লাগেজ নিয়ে হাজির।

অমিত—এই যে বাবা গজানন—এসো এসো।

শটটা এই পর্যন্ত গৃহীত হল। কাজল ও অমিতের চরিত্রে অভিনয় করলেন—অপর্ণা সেন ও উত্তমকুমার। ভৃত্য গজাননের চরিত্রে—জহর রায়।

এছাড়া ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে আছেন —সুব্রতা চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, সুমিত্রা মুখার্জি, ললিতা চ্যাটার্জি, সুব্রত সেন, গীতা দে, বাসন্তী চ্যাটার্জি, মাস্টার ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি। স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন—পিনাকী মুখার্জি। খবরে প্রকাশ এই পর্যায়ের স্যুটিং শেষ হলেই ছবির চিত্রগ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবে। এবারে এখানেই শেষ করছি।

বসন্তবিলাপ সমাপ্তি পথে : সোনালী প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মাণ হাসির ছবি 'বসন্তবিলাপ'-এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্তিপথে। বিমল করের কাহিনী অবলম্বনে দীনেন গুপ্ত পরিচালিত ছবিটির সম্পাদনার কাজ রমেশ যোশীর তত্ত্বাবধানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অনুপকুমার, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় রবি ঘোষ, কাজল গুপ্ত, চিন্ময় রায়, শিবানী বসু, তরুণকুমার, কণিকা মজুম-দার, অমরনাথ মুখোপাধ্যায় অভিনীত এ ছবির সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত। পরি-বেশনার দায়িত্ব পিয়ালী পিকচার্সের।

কবিগুরুর 'বিসর্জন' : সবিতা চিত্রমের প্রথম নিবেদন : সবিতা চিত্রম রবীন্দ্রনাথের বহু পঠিত নাটক 'বিসর্জন'কে চলচ্চিত্ররূপে দিতে ব্রতী হয়েছেন। 'অহিংসা'—এই বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করে শ্রীবীরেশ্বর বসু, স্ব-রচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে ছবিটি পরি-চালনা করছেন। রবীন্দ্রসংগীতের সংযোজন—ছবিটিকে আরো আকর্ষণীয় করবে বলে আশা করা যায়। আবহসংগীত পরিচালনা করছেন শ্রীকালিপদ সেন। রঘুপতি গোবিন্দ মাণিক্য, জয় সিংহ, নক্ষত্র রায় ও অপর্ণার চরিত্রে যথাক্রমে উৎপল দত্ত, অজিতেশ

অভিনয়ে: অনিল সান্যাল। পরিচালনা: অজিত লাহিড়ী

বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ, ভোলা বসু ও নন্দিনী মালিয়া রূপদান করছেন। গুণবতীর চরিত্রে এক বিশিষ্ট শিল্পী রূপ দেবেন বলে সংবাদে প্রকাশ। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে কানাই দে, বটু সেন, অজিত দাস, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন দেবু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলাই বসাক। ছবিটির নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ দ্রুতগতিতে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে।

'স্ত্রী' মুক্তি প্রতীক্ষায় ...সলিল দত্ত পরিচালিত বেবী জুন প্রোডাকসন্সের 'স্ত্রী' ছবিটি খুব শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীদত্ত স্বয়ং। সুরসৃষ্টিতে আছেন—নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে ও হেমন্তকুমার। গানগুলি ছবিটির একটি বিরাট আকর্ষণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। চরিত্র চিত্রণে আছেন—উত্তমকুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, আরতি ভট্টাচার্য, ভানু ব্যানার্জী, জহর রায়, তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুলতা চৌধুরী, শংকর ঘোষ, পারিজাত বসু, কল্যাণী ঘোষ মাঃ অরিন্দম, তুষার ব্যানার্জী, সাধন সেনগুপ্ত, মীরা পলিন, অমরনাথ মুখার্জী ও নবাগতা কাকলি রায়। এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'চিঠি'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত: ডাঃ আর এল গুপ্ত প্রযোজিত মনীষা আর্ট ইণ্টার ন্যাশনালের হাসির ছবি 'চিঠি'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবিটা বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন—নবেন্দু চ্যাটার্জী। শ্যামল মিত্র ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী, শ্যামল মিত্র ও তরুণ ব্যানার্জী। চরিত্র চিত্রণে আছেন—সন্ধ্যা রায়, শমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, অজিতেশ ব্যানার্জী, অসীম চক্রবর্তী, সুব্রতা চ্যাটার্জী, লোলিতা চ্যাটার্জী, শিউলি মুখার্জী, শিবানী বসু, নীলোৎপল দে, নিভাননী দেবী, জহর রায় ও অনুভা ঘোষ।

'জজির'-এর মহরৎ

গেল ২০ জুন, আর কে স্টুডিওতে প্রকাশ মেহেরা প্রোডাকসন্স-এর নতুন রঙীন ছবি 'জজির'-এর মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। ছবিখানিতে অংশ গ্রহণ করছেন অমিতাভ বচ্চন, জয়া ভাদুড়ী, প্রাণ, অজিত, ভট্টাচার্য, মনোমোহন কৃষ্ণ, ইফতেকার, ভেভিড ও বিন্দু। প্রকাশ মেহেরা প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবিতে গুলসান বাওরা রচিত গানে সুর যোজনা করছেন কল্যাণজী আনন্দজী।

'আমি সিরাজের বেগম'-এর চিত্ররূপ

মাণিক রায় প্রযোজিত এম আর প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন শ্রীপারাবত রচিত ও সুশীল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'আমি সিরাজের বেগম' ছবিখানির চিত্রগ্রহণ ২৮ জুন নিউ থিয়েটার্স ১নং স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী দেবী, দিলীপ রায় ও বাসবী নন্দী বর্তমান চিত্রগ্রহণে থাকছেন। সুর—অনিল বাগচী। ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন—এম আর ফিল্মস।

মুক্তি প্রতীক্ষায়: নতুন দিনের আলো

বাদল পিকচার্সের অন্যতম নিবেদন অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সামাজিক ছবি 'নতুন দিনের আলো' জি আর পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তির দিন গুনছে। শ্রীগাঙ্গুলী ছবির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। গীত রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও গানে সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, নিমাই রায় (অতিথি), তরুণ রায়, প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যা রাও, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপান্বিতা রায়, দেবা রায়, শমিতা বিশ্বাস, বিনতা রায়, চিন্ময় রায়, অমরনাথ, পদ্মাদেবী ও অনুপকুমার প্রমুখ। চিত্রগ্রহণে আছেন অনিল গুপ্ত।

মুক্তি প্রতীক্ষায়: পদি পিসীর বর্মি বাক্স

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত আনন্দ চিত্রের রঙীন ছবি 'পদি পিসীর বর্মি বাক্স' মুক্তিপ্রতীক্ষায়। বহিদৃশ্য প্রধান মজাদার এই

রম্যানি পরিবেশিত সুবর্ণগোলক নাটকে একটি দৃশ্য। নির্দেশনা: প্রতাপ মুখোপাধ্যায়।

ছবির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার। চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা ও সুর যোজনা করেছেন অরুন্ধতী দেবী। চরিত্রগুলির রূপারোপ করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, চিন্ময় রায়, রবি ঘোষ, শেখর রায়, কেতকী দেবী, রাজলক্ষ্মী (বড়), ও নায়ক চরিত্রে নবাগত বালক শিল্পী তপন ভট্টাচার্য এবং আরও শতাধিক শিল্পী। ছবিখানি বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন আস্বাদ এনে দেবে। অনিন্দ্য চিত্র ছবিখানির একমাত্র পরিবেশক।

আসন্ন মুক্তিপথে : নতুন ফসলের গন্ধ

ভারতবন্ধু গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হাই কমিশনের দ্বিতীয় নিবেদন বাংলাদেশের [illegible] তরুণ পরিচালক মমতাজ আলীর [illegible] একটি অন্ধ মেয়ের জীবনের বৈচিত্র্য[illegible] নিয়ে রচিত সবাক [illegible] কাহিনী 'নতুন ফসলের গন্ধ' ছবিখানি [illegible] ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় আসন্ন মুক্তিপথে। তপন রায়ের [illegible] কলকাতার [illegible] ছবির [illegible] বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ [illegible] এপার বাংলায় বহু পরিচিত ও জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীমতী কবরী চৌধুরী [illegible] নায়িকা চরিত্রে। তাঁর [illegible] গোলাম [illegible] ও [illegible] দুটি [illegible] চরিত্রে [illegible] আব্বাসউদ্দিনের কন্যা [illegible] গায়িকা ফেরদৌসী বেগমের গাওয়া [illegible] ছবির আর এক বিশেষ আকর্ষণ।

গ্রামোফোন হেড অফিস ক্লাব প্রযোজিত কাঞ্চনরঙ্গ নাটকের একটি মুহূর্তে।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি বিখ্যাত উপন্যাস চিত্রায়িত হচ্ছে। প্রথমটি 'মহাশ্বেতা' অবলম্বনে 'হার মানা হার'—সলিল দত্তের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী—উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কবি' পুনরায় চিত্রায়িত হতে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'কবি' কয়েক যুগ আগে দেবকী বসুর পরিচালনায় গৃহীত হয়ে ছবিটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এবারে 'কবি'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন বি. এন. রায় ও এম. মাতালিয়া এবং পরিচালনা করছেন—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান তিনটি চরিত্রে—শর্মিলা ঠাকুর (বসন), অঞ্জনা ভৌমিক (ঠাকুরঝি) এবং অসীমকুমার (নামভূমিকায়) থাকবেন বলে জানা গেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। তার মধ্যে তাঁর ক্লাসিক উপন্যাস 'আরণ্যক'এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন ভাইগ্রেস প্রোডাকসন্স এবং পরিচালনা করছেন—অজিত লাহিড়ী। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—শমিত ভঞ্জ, সুব্রতা চ্যাটার্জি, প্রসাদ চক্রবর্তী, রবি দাভে, চেতনা তেওয়ারী, বিনা রাও, রাসবিহারী সিংহ এবং বম্বের সোনিয়া সাহনী। ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—সীমা ফিল্মস।

বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় উপন্যাস—'অশনি সংকেত'-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন বিশ্ব-বন্দিত পরিচালক—সত্যজিৎ রায়। প্রধান তিনটি চরিত্রে—সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সন্ধ্যা রায় এবং বাঙলাদেশের অভিনেত্রী ববিতাকে (সুচন্দ্রা রায়হানের বোন) দেখা যাবে।

দুটি শরৎ কাহিনী পুনরায় চিত্রায়িত হতে চলেছে। প্রথমটি 'পথের দাবী'—প্রযোজনা করবেন অসীম সরকার। এর চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন পীযূষ বসু। এবং দ্বিতীয়টি 'বিন্দুর ছেলে',

লাভ স্টোরি চিত্রে অ্যালি ম্যাকগ্রো ও রিয়ান ও'নীল

মঞ্চাভিনয়

গত [illegible] গড়িয়াহাটে [illegible] সান্ধ্য [illegible] রবীন্দ্র [illegible] ইসলামের [illegible]। [illegible] সভাপতি [illegible] সাহিত্যিক [illegible] সাহিত্যিক [illegible] নীহাররঞ্জন [illegible] অন্যতম [illegible] ছিলেন [illegible]।

এই অনুষ্ঠানে [illegible] পরিবেশন করেন সর্বশ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী-প্রসাদ চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ রায় ও ঢাকুরিয়া সঞ্জীব কোচিং কোরের সভ্যবৃন্দ সর্বশ্রী অসিত অধিকারী, অলোক মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ ঘোষ ও তরুণ দেব। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন চঞ্চল চক্রবর্তী, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। বাঁশীতে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে শোনান বীরেন্দ্রনাথ সাহু। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ছাত্র-বৃন্দের পরিবেশিত গীতিআলেখ্য 'সুন্দরের কবি নজরুল', রচনা শৈলেন সাহা ও পরি-চালনা প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবশেষে অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্রনাথের নাটক 'আশ্রম পীড়া' ও 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' পরিচালনায় ছিলেন শ্রীশৈলেন সাহা ও শ্রীমনোজ বসু। অংশগ্রহণে সর্বশ্রী অমিতা মুখোপাধ্যায়, অসিত দাশগুপ্ত, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ দাস, কুমারজিৎ লাহিড়ী, মানিকলাল নন্দী, অমর গুহ, নন্দলাল ঘোষ, দিলীপ মজুমদার, অমিতাভ রায়, অমল চক্রবর্তী, রঞ্জিত বসু ও অপূর্ব মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষে অধ্যক্ষ শ্রীবিধুভূষণ মিত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

•

বীরভূম জেলার রামপুরহাটের কাছে আটলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সাধক বামাক্ষ্যাপা। সংসারাশ্রমে তাঁর নাম ছিল বামাচরণ বা বামদেব চট্টোপাধ্যায়; ওঁর পিতার নাম সর্বানন্দ, মাতার নাম রাজ-কুমারী। বাল্যকাল থেকেই বামাচরণের ধর্মসংগীত, ধর্মালোচনা, ভক্তিমূলক যাত্রা প্রভৃতির ওপর যেমন আশ্চর্য আসক্তি দেখা যেত, পড়াশুনার প্রতি ছিল তেমনই বিরূপ ভাব। খুব শিগগিরই তিনি নিকটবর্তী মন্দিরে স্থাপিত তারামূর্তির ভক্ত হয়ে পড়েন। ক্রমে এমনই হয় যে, ঐ মূর্তিকে তিনি সাক্ষাৎজননী জ্ঞান করতে থাকেন। তিনি তাঁকে বলতে থাকেন, বড়োমা এবং নিজের মাকে ছোটোমা বলে সম্বোধন করা শুরু করেন। সাধকে ঠাকুরে যেখানে মা-ছেলের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়, সেখানে কত অলৌকিক ঘটনারই না সমাবেশ হয়ে থাকে। সাধক বামাক্ষ্যাপার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

মণ্ডলীলা নিবেদিত 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' নাটকে বালক বামার পড়াশুনার প্রতি অবহেলা এবং ধর্ম ও ধর্মসংগীতের প্রতি আসক্তি থেকে তারামায়ের ভক্ত হয়ে পড়ার দৃশ্যাদি থেকে শুরু করে বামার ক্রমে সাধকের স্তরে উন্নীত হওয়া এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করে তারাপীঠে অবস্থান করার মধ্যেই তাঁর ছোটো মায়ের মৃত্যুতে চরম বন্ধনমুক্তির আনন্দ উপভোগ করার দৃশ্য পর্যন্ত বিধৃত হয়েছে।

কিন্তু মৃন্ময়ী যেখানে চিন্ময়ী রূপ ধারণ করেন, ভক্তের দেহের ব্যথা উপশমের জন্যে তার জননীর বেশে তাঁর পৃষ্ঠে মৃদু হস্তচালনা করেন, সাধকের অনাবশ্যকতা- [illegible]

অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি, সেখানে যাই হোক কোনো সৎ নাটক গড়ে উ[illegible] পারে না। সেই হিসাবে 'সাধক ব[illegible] ক্ষ্যাপা'কেও একটি সৎ-নাটক বলে অভি[illegible] করা কঠিন।

কিন্তু অন্য হিসাবও আছে। ক[illegible] রাজধানী কলিকাতাতে আজও এমন ধর্ম[illegible] বাঙালীর সংখ্যা অগণন, যাঁরা ভক্তি[illegible] আপ্লুত হতে ভালোবাসেন, সাধু স[illegible] জীবন কথা যাঁরা গদগদ চিত্তে পাঠ ক[illegible] তাঁদের জীবনের মঞ্চ বা চিত্ররূপ য[illegible] চিত্তকে রসের সাগরে নিমজ্জিত [illegible] বিশেষ করে সেই মঞ্চ বা চিত্ররূপ সুকণ্ঠ নিঃসৃত সুললিত ভক্তিসংগীতস[illegible] হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য অভিনয়[illegible] সাধকচরিত্রকে জীবন্তরূপে প্রতিফলিত [illegible] তাহলে তা মুগ্ধচিত্তে হৃদয়ঙ্গম ক[illegible] লোকের অভাব শত আধুনিকতা স[illegible] আজও ঘটেনি এবং পুণ্যভূমি ভারতভূ[illegible] কোনোও দিন ঘটবেও না।

কাজেই 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র অলৌ[illegible] জীবনালেখ্য আমাদের রীতিমত [illegible] করেছে। কম-বেশী কুড়িটি দৃশ্যে স[illegible] এই চরিতালিপি প্রথম গুটিচারেক [illegible] বালক বামা বেশী মাস্টার শংকরের আন্ত[illegible] অভিনয় ও গান দর্শকচিত্তকে যখন [illegible] বিজয়ী আর্দ্র করে তোলে, ঠিক সেই [illegible]

রুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিজেদের মধ্যেই
কে তিনি এমন একটি ভাবজগতে
য়ে যান, যেখান থেকে সে আবার কঠিন
স্তবে ফিরতে পারে মাত্র অভিনয় অন্তে
বং তার আগে নয়। আজ থেকে প্রায়
চিশ বছর আগে কালিকা থিয়েটার মঞ্চে
গদেবতা' নাটকে ভগবান রামকৃষ্ণের চরিত্রে
বতীর্ণ হয়ে ভক্তভাবরসের অভিনয়ে
রুদাস যে যশ লাভ করেন, পরবর্তীকালে
ণী রাসমণি' চিত্রে ঐ একই ভূমিকায়
ভিনয় করে তাঁর সেই যশ ব্যাপকতর হয়।
রপর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধক-
ন্ত্রের (রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী,
মলাকান্ত প্রমুখ) চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে
রুদাস অভিনয় ক্ষেত্রে একটি ঐতিহ্যের
ধিকারী হয়েছেন। সাজ-সজ্জায়, সংলাপে,
গ ও গীতভঙ্গীর মাধ্যমে তিনি মঞ্চের
পর আটলা গাঁয়ের হাউড়ে ক্ষ্যাপার যে
প তুলে ধরেন, তা একমাত্র বোধ করি
রই দ্বারা সম্ভব, এমনই অসামান্য
দকতায় ভরা সে-রূপ। গুরুদাস সম্পর্কে
ত বিস্তৃতভাবে বলার কারণ এই যে, মঞ্চে
াধক বামাক্ষ্যাপা' নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের
লে রয়েছে তাঁরই অভিনয়কৃতিত্ব। এ'র
ভিনয়ের পরেই প্রশংসা করতে হয় সাধক-
পী বিষাদবরণ মুখোপাধ্যায়ের মুখনিঃসৃত
বং নেপথ্য হতে গাওয়া ভক্তিমূলক গান-
লির। এই গানগুলি যেন গুরুদাসের
ভিনয়ের পরিপূরক অলঙ্কার।

এছাড়া এই নাটকে যাঁরা উল্লেখ্যভাবে
অভিনয় করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন মলিনা
বী (বামার মা রাজকুমারী), শিশির মিত্র
ামার বাপ সর্বানন্দ), হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
চক্রী নরহরি), ননী চট্টোপাধ্যায় (জ্যেঠা-
বু), সমর চট্টোপাধ্যায় (শ্রীগুরু-বাবা), শিব
চার্য (বামার ছোট ভাই রামচরণ), আশা
(তারাসুন্দরী), অমল বিশ্বাস (লোগেন-
কা), রুণু বড়াল (সুধা) ও বিষাদবরণ
খোপাধ্যায় (সাধক)।

রবীন্দ্রসদন মঞ্চে ২১ জুনের অভিনয়ে
াড়ম্বর মঞ্চে আলোকসম্পাতের দক্ষতা
ভিনয়ের বিভিন্ন মুহূর্তকে সার্থক করে
লেছিল। বামার সাধনার দৃশ্যে মোহিনীর
ত আরও লাস্যময়ী, আরও চিত্তবিভ্রমকারী
ওয়া উচিত ছিল। একজন সাধকের সাধনাকে
র্থ করতে মোহিনী যে প্রেরিত হয়েছে
ই কথা চিন্তা করে তার নয়ন ও অঙ্গভঙ্গী
তখানি আকর্ষক হওয়া প্রয়োজন তা মনে
খা দরকার।

মণ্ডলীলা নিবেদিত 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'
কে অভিভূত করেছে।

—নান্দীকর

সাহেব বিবি গোলাম : বিমল মিত্রের
খ্যাত উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলামে'র
কটি সফল নাট্যরূপ সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গ-
ঞ্চ পরিবেশিত হোল। এই অসাধারণ
হিত্য সৃষ্টিকে নাটকের সংলাপ ও
ঘাতে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন বৈদ্যনাথ
ষ। নাটকটি প্রযোজনা করেন চার্টার্ড
ক বিকিরণ...

মর্জিনা আবদাল্লা । কাজল গুপ্ত ও পরিচালক : দীনেন গুপ্ত।
ফটো : অমৃত

চিরন্তন আবেদনসমৃদ্ধ এই নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখেন ভানু চট্টোপাধ্যায়। প্রায় প্রতিটি চরিত্রচিত্রণেই শিল্পীদের নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ করে 'পটেশ্বরী'র ভূমিকায় বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় হয়েছে অসাধারণ। কয়েকটি মরমী মুহূর্তে তাঁর প্রাণময় অভিব্যক্তি সত্যি ভোলা যায় না। ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'কৌস্তুভমণি' ও সন্তোষ রাহার 'ভুতনাথ' ও দুটি বৈশিষ্ট্যদীপ্ত চরিত্রচিত্রণ হোতে পেরেছে।

অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন কালী মুখোপাধ্যায় (হিরণ্যমণি), শিবরাম ধর (সুবিনয়বাবু), রঘুনাথ চক্রবর্তী (বদরিকা), প্রশান্ত ঘোষ (বংশী), কল্যাণ দাস, অজয় দাস, দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ রায়, সুধাংশু গুপ্ত, অধীর সাধু, দেবনারায়ণ ধর, বিশু পাল, কল্পনা ভট্টাচার্য (জবা), অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় (চুণীদাসী)।

সঙ্গীত পরিচালনায় প্রণব দেও বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখেন।

ফরিয়াদ : দীপক চৌধুরীর 'ফরিয়াদ' নাটকটি কয়েকদিন আগে 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করলেন ন্যাশনাল এন্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কের শিল্পীরা। সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনায় এমন বেশ কিছু মুহূর্ত ছিল যা সত্যি অনুভবকে নাড়া দেয়।

চরিত্র-চিত্রণে যাঁরা নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হোলেন অনিল মুখোপাধ্যায় (ব্যারিস্টার), কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় (গৃহভৃত্য), কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীত চট্টোপাধ্যায়, বেলা রায়, শঙ্কর ঘোষ, অনিমেষ দে, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় রাধাবল্লভ রায়, কবিতা গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল

[illegible]/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মিঠু মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

কাঞ্চনরঙ্গ : গ্রামোফোন হেড অফিস ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্প্রতি 'স্টার' রংগমঞ্চে 'কাঞ্চন-রঙ্গ' নাটকটি অভিনীত হয়। শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকটির প্রযোজনা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার দাস, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকৃষ্ণ দত্ত, দিগবিজয় হালদার, অনিল বিশ্বাস, দিলীপ চৌধুরী, মলয় দে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা ভট্টাচার্য, নমিতা দত্ত, মন্দিরা ঘোষ।

নাটকের আগে বিচিত্রানুষ্ঠানে নৃত্য ও আবৃত্তি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল আরতি মুখোপাধ্যায় ও অনুপ ঘোষালের গান। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ক্লাবের সভাপতি অমিয়কুমার মিত্র। বিশিষ্ট দর্শকের মধ্যে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ও ডাইরেকটর শ্রীঅঘোরাম ও ম্যানেজিং ডাই-রেকটর শ্রীএ কে সুদ উপস্থিত ছিলেন।

মোরসে'র 'মঞ্জরী অপেরা' : বলিষ্ঠ ও মানবিক গুণসমৃদ্ধ পরিচিত উপন্যাসের প্রাণবেগকে মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তোলার প্রয়াস প্রায়ই আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন দলের নাট্যচর্চায়। সম্প্রতি 'মোরসে' নাট্যসংস্থার পরিচালনায় তারাশঙ্করের বিখ্যাত সাহিত্য সৃষ্টি 'মঞ্জরী অপেরা'র নাট্যরূপ পরিবেশিত হোল বিশ্বরূপার মঞ্চে। মূল উপন্যাসের চরিত্র ও অন্তর্সংঘাতের সঙ্গে সমান ছন্দে তাল রেখে এর সাবলীল নাট্যরূপ দিয়েছেন রতনকুমার ঘোষ। সংলাপ ও কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টিতে শ্রীঘোষের গভীরতম নাট্যবোধ প্রোজ্জ্বলতার ভাষা পেয়েছে।

'মঞ্জরী অপেরা'র দীপ্তিকে মঞ্চে উজ্জ্বলতর করে তুলতে হোলে প্রযোজনার যে নিখুঁত টিমওয়ার্কের প্রয়োজন তার উপস্থিতি সেদিন মোটামুটি লক্ষ্য করা গিয়েছিল মোরসে'র শিল্পীদের প্রয়াসে। নির্দেশক অনিল রায়। কয়েকটি মুখর মুহূর্তে তাঁর মুন্সিয়ানা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি হোলেন গীতশ্রী দেবী। তার 'মঞ্জরী'র চরিত্র ছিল সমগ্র নাট্য-প্রযোজনার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। [...] স্মরণের কয়েকটি নিবিড় মুহূর্তে [...] অভিব্যক্তি সত্যি ভোলা যায় না। অমর [...] মল্লিকের 'রাঙাবাবু' মোটামুটিভাবে [...] হয়েছে, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণটি আরো [...] স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত হোতে পারতো। রাজকু[...] বসু গোরাবাবু'র ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব [...] সুন্দরভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। অজি[...] মল্লিকের 'বাবলু ঘোস' আরো বেশী প্রাণ[...] ও সপ্রতিভ হওয়া উচিত ছিল। সত্য[...] 'গোপাল মামা' ও অমিত [...] 'যোগানন্দ' দুটি স্বাভাবিক [...] হোতে পেরেছে। রমা দাস 'অলো[...] ভূমিকায় সব জায়গায় স্বাচ্ছ[...] ছন্দ বজায় রাখতে পারেননি, মাঝে [...] অনুশীলনের অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট [...] উঠেছে।

অন্যান্য চরিত্রে চলনসই অভিনয় করেছেন তাঁরা হোলেন অরুন গা[...] (বংশী), বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ([...] গোপাল চট্টোপাধ্যায় (শিউনন্দন), [...] মুখোপাধ্যায় (শোভা) ও অলকা গা[...]পাধ্যায় (আশা)। বন্দনা বিশ্বাসের নৃ[...] মনোগ্রাহী হয়।

নাটকটির গতিবেগে দ্বিগুণ [...] সুষ্ঠু আবহসংগীত ও গীতশ্রী [...]

লিপত নৃত্যের ছন্দোময় ভঙ্গিমা
টিভাবে সাহায্য করেছিল। আলোর
কাজও মন্দ হয়নি।

র বাঁশি : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ
বড়বাজার শাখার শিল্পীরা সম্প্রতি
অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিতীশ সেনের
াঁশি' নাটকটি সার্থকভাবে পরিবেশন
'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। 'বহুরূপী' কর্তৃক
অভিনীত এই মঞ্চসফল সামাজিক
লক নাটকটিকে সেদিন বেশ প্রাণময়-
ঙ্গেই মঞ্চস্থ করা হয়। এ ব্যাপারে
প্রশংসার দাবী রাখেন নাট্যনির্দেশক
দত্ত।

প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রপযোগী
করে সামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনাটিকে
বিশিষ্টতা দান করেন। 'অচিনে'র
পরমেশ গুপ্তের সহজ সাবলীল
হঠাৎ বড়লোক হওয়া মানুষের
চহারা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছে।
ঘোষের 'অনসূয়া' একটি সপ্রতিভ
সৃষ্টি হোতে পেরেছে। 'প্রতিমা'
অনবদ্য অভিনয় করেছেন ছন্দা
ায়। সমাজের একশ্রেণীর পথভ্রষ্টা,
হীন নারীর চরিত্রে তিনি সার্থক
দান করেছেন। বৃদ্ধ নিঃস্ব পিতা
র চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে প্রাণের
তে পেরেছেন পরশুরাম মুখো-
ভাস্কর ঘোষ, প্রদীপ চক্রবর্তী, কমলেশ
মুখোপাধ্যায় ও নির্মল ভট্টাচার্য।

কটির অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন
সাহা, মানিক ভট্টাচার্য, পরমেশ
রমেন রায়, শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

ী বিদ্যাবিথীর পুতুলের বিয়ে নৃত্য-নাট্যের একটি দৃশ্য।

পরিচালক আলী কওসার : বাঙলা দেশের ছবি বধূ মাতা কন্যা। একটি দৃশ্যে উজ্জ্বল ও শাবানা। কাহিনী ও চিত্রনাট্য : আলী মনসুর।

এম বি থিয়েটার ইউনিটের 'অচেনা মন' : এম বি থিয়েটার ইউনিটের শিল্পীরা তাঁদের মঞ্চসফল সামাজিক নাটক 'অচেনা মনে'র পুনরাভিনয়ের আয়োজন করেছেন 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে। গত ১৪ জুন সন্ধ্যা ৬টায় এই নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে।

'অচেনা মনে'র নাট্যসংঘাত উঠেছে লিও টলস্টয়ের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'আনা কারিনিনা' অবলম্বন করে। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নির্দেশনার দায়িত্বও নিয়েছেন তিনি।

ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর 'স্কিন গেম'

ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর সার্থসহস্রতম চিত্র 'স্কিন গেম' স্থানীয় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের পরবর্তী আকর্ষণ। ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন জেমস গার্ণার ও লুই গসেট এবং এঁদের সঙ্গে আছেন দুই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা — সুসান ক্লার্ক ও ব্রেন্ডা সাইক্স।

বিবিধ সংবাদ

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণোৎসব

এবারে কলকাতার ভাগ্যে সত্যিই শিকে ছিঁড়ল। ১৯৭১ সালের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণোৎসব এবারে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে আসছে মঙ্গলবার ৪ জুলাই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে বলে সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়।

আবার শঙ্করস্কোপ

বহুদিন পরে ২৭ জুন থেকে মহাজাতি সদনে আবার শঙ্করস্কোপের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, মঞ্চ ও পর্দার মধ্যে আশ্চর্য সমন্বয় ঘটানোর এই জাদু প্রদর্শনীতে বহু নতুন বিষয়বস্তুর অবতারণা

ভি আই পি রোড ও লেক টাউন রোডের সংযোগস্থলে যাত্রী ছাউনির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণদানরত লেকটাউন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি শ্রীঅধীরকুমার বসু (ডান দিকে) এবং শ্রীমতী সবিতা ঘোষ (অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষের সহধর্মিণী) আনুষ্ঠানিক ভাবে ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন (বাঁ দিকে)।

ঘোষ উদ্যমের কল্যাণমূর্তি : একটি অর্ঘ্য

কলকাতাকে উন্নত এবং শ্রীময়ী করে তোলবার জন্যে সরকারী আয়োজনের যেন শেষ নেই। বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে তারই দীপ্ত স্বাক্ষর সোচ্চার হয়ে উঠছে। এই সরকারী আয়োজনে সামিল হয়ে 'কল্লোলিনী কলকাতা'কে ছন্দিত সুষমায় ও সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলার জন্যে রায় মন্ত্রিসভা জনসাধারণের কাছে একাধিকবার আবেদন রেখেছেন। সে ডাকে সাড়া দিয়ে জনসাধারণ এগিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি এক রবিবারের বিকেলে ভি আই পি রোড ও লেক টাউনের সংযোগস্থলে দুটি বাস-যাত্রী ছাউনির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মধ্যে তারই দীপ্ত নিদর্শন মেলে। এ কাজকে বাস্তবায়িত করার জন্যে দক্ষিণদাড়ির ইস্টার্ন পেপার মিলের কর্তৃপক্ষ দশ হাজার টাকা দান করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অর্থ-মন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে শ্রীমতী ঘোষ ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে লেক টাউন ওয়েল-ফেয়ার অরগ্যানাইজেসনের সভাপতি শ্রীঅধীরকুমার বসুর স্বাগত ভাষণে। এই আয়োজনের প্রশংসা করে সাধুবাদ জানান শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। সভান্তে ধন্যবাদ জানান শ্রীরথীন ঘোষ। কুমারী মঞ্জুশ্রী বসু

শান্তিপুরে পাঠচক্রের রামমোহন জয়ন্তী

সম্প্রতি প্রগতিশীল ছাত্র-যুব সংস্থা শান্তিপুর পাঠচক্র তিনদিন ব্যাপী 'রাম-মোহন জন্ম-জয়ন্তী' পালন করেন শান্তি-পুর পাব্লিক লাইব্রেরী হলে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান প্রদর্শনী ও উৎসবের উদ্বোধন করেন নদীয়ার জেলাশাসক দীপক ঘোষ। অনুষ্ঠানে সংগীত, আলোচনা ছাড়াও 'সুভাষ চন্দ্র' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। এইদিন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্থানীয় উদীয়মান শিল্পীরা সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে আগ্রহী শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে আনন্দ দেন। অনুষ্ঠানের শেষে লোকরঞ্জন শাখা 'রাজা রামমোহন' নাটকটি দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে জনসাধারণের সহর্ষ অভিনন্দন কুড়ান। অনুষ্ঠানে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। শ্রীমৈত্র রামমোহনকে যুগ-বিপ্লবী আখ্যা দেন। তৃতীয় দিনে লোক-রঞ্জন শাখা 'অলীকবাবু' মঞ্চস্থ করেন। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কালীপদ মুখোপাধ্যায়। সর্বশ্রী অশোক লাহিড়ী, সদয় প্রামানিক, শিব-প্রসাদ দে ও অন্যান্য উদ্যোগী সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠান সুপরিচালিত এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়।

... ... বারাণসীতে কবি জসিমুদ্দিন

বারাণসীর বঙ্গীয় সমাজের উদ্যোগে বাঙালীটোলা ইন্টার কলেজ প্রাঙ্গণে শুভ নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই [illegible]

মুদ্দিন সাহেব। বাংলাদেশের জা[তীয়] সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গ[ান] গেয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রী[...] নাথ ঘোষাল ও সহশিল্পী। এর পর ক[...] স্বাগত জানিয়ে মেয়র শ্রীপূরণচন্দ্র [...] বলেন : বাংলাদেশের কবিকে [...] বারাণসী ধন্য। এর পর হিন্দী ও বা[ংলা] রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসু[...] চট্টোপাধ্যায়। কুমারী ব্রততী চক্রবর্তী [...] কবিতা পাঠ করে শোনান। পল্লী[গীতি] গেয়ে শোনান শ্রীযুক্ত ভাটিয়া। 'তুমি [...] করে গান কর হে গুণী' গানটি [...] শোনান শ্রী এল ভি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রধান অতিথির ভাষণে কবি [...] মুদ্দিন প্রথমে সমবেত বারাণসীর প্র[বাসী] বাঙালীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানা[ন।] পরে পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামের [...] বর্ণনা করেন। তারপর কবি বাংলা[র] সংস্কৃতির কথা সুন্দরভাবে আ[লোচনা] করেন। 'মহুয়া', চড়ক পুজোর [...] ভাটিয়ালী গান, বাউল গান ইত্যাদি [...] লোকসংগীতের গুরুত্ব আলোচনা ক[রে] বিভিন্ন লোকগীতি আবৃত্তি করে [...] মর্মকথা বুঝিয়ে দেন।

সবশেষে তিনি জাতি-ধর্ম [...] সবাইকে এক হতে আহ্বান জানান। [...] বলেন, বাংলাদেশে এখন কেবলমাত্র [এক] জাতি—সে জাতির নাম 'বাঙালী'। সে[খানে] হিন্দু নেই, মুশলিম নেই, জৈন-বৌদ্ধ-খ[ৃস্টান] কিছুই নেই—রক্তের [...] দিয়ে সব [...] মুছে এক হয়ে গে[ছে।] তিনি ভারত[বাসী]দেরকেও জাতি-[ধর্ম] নির্বিশেষে এক [হতে] আহ্বান জানান এবং মুক্তিযুদ্ধে সহা[য়তার] জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্[ধী ও] ভারতবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা [প্রকাশ] করেন।

রবীন্দ্রভারতী বিদ্যালয়ের পক্ষ [থেকে] কবিকে কিছু উপহার দেওয়া হয়। স[ভায়] অধ্যাপক সুবোধ দাশগুপ্ত প্রধান অ[তিথি] ও সমবেত সুধিবৃন্দকে ধন্যবাদ [জ্ঞাপন] করেন। শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সভার পরিচালনা করেন। ভারতের জ[াতীয়] সংগীতের মধ্য দিয়ে উৎসবটি সমাপ্ত [হয়।]

আসচে মাসে 'ছায়াতীর'-এর শুভমুক্তি

রমেশ সাইগল প্রোডাক[সন্সের] 'ছায়াতীর' ছবিটি আসচে মাসের [...] দিকে মুক্তি পাবে। জরাসন্ধের 'ছায়া[তীর'] একটি বাস্তব সত্য জীবনকাহিনী। [...] কাহিনীর চিত্রনাট্য ও পরিচালনার [...] সম্পাদন করেছেন সুশীল বি[...] গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত [...] সুরারোপ করেছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপা[ধ্যায়।] নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত ম[ুখো]পাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মান্না [দে।] কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় র[ূপদান] করেছেন বিকাশ রায়, বিনতা রায়, ম[...] চক্রবর্তী, গীতাঞ্জলী রায়, অজিতেশ ব[ন্দ্যো]পাধ্যায়, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, [...] [illegible] সুশীল মজুমদার

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

র্ডসে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ছে। পাঁচ দিনের বরাদ্দ এই দ্বিতীয় খেলাটি চতুর্থ দিনের লাঞ্চের পর ২০ মিনিট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ন্ট্রেলিয়ার এই জয়লাভে ১৯৭২ সালের সিরিজের ফলাফল উপস্থিত সমান দাঁড়িয়েছে। ইংল্যান্ড ওল্ডট্র্যাফোর্ডের টেস্ট খেলায় ৮৯ রানে জিতে ১-০ এগিয়েছিল। ১৯৭২ সালের টেস্ট জের এখনও তিনটি টেস্ট খেলা বাকি। তিহাসিক লর্ডস মাঠে আয়োজিত ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭২ সালের টেস্ট জের ২য় টেস্ট খেলাটি নিঃসন্দেহে লিয়ার নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় বব নামে উৎসর্গ করা যায়। লিয়ার মিডিয়াম-পেস বোলার ম্যাসি খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে এই খেলায় রানে ১৬টি উইকেট পান—প্রথম স ৮৪ রানে ৮টি এবং দ্বিতীয় স ৫৩ রানে ৮টি। খেলোয়াড়-নের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে ১৬টি উইকেট পাওয়ার নজির জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার সে এই প্রথম। এবিষয়ে পূর্বের ছেন ইংল্যান্ডের ফ্রেড মার্টিনের— ০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১২টি টি। এই বিশ্বরেকর্ড করা ছাড়াও ম্যাসি ১৬টি উইকেট পাওয়ার সূত্রে লিয়ার পক্ষে একটি টেস্ট খেলায় ধক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড ছেন। পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে একটি য় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড দুজনের—এফ আর স্পোফোর্থের টি উইকেট ৯০ রানে (বিপক্ষে ভ ওভাল, ১৮৮২) এবং ক্লারি টের ১৪টি উইকেট ১৯৯ রানে পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, এডিলেড, ১৯৩২)।

আলোচ্য লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে য় ইংল্যান্ডের অধিনায়ক রে ওয়ার্থ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার নেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নিয়ে ওয়ার্থ উপর্যুপরি ৭বার টসে জয়ী ন।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ড ১ম সের ৭টা উইকেট খুইয়ে ২৪৯ রান ছিল। অস্ট্রেলিয়ার দুই ফাস্ট বোলার ম্যাসী ৭৫ রানে ৫টা এবং ডেনিস ৭৬ রানে ২টো উইকেট নিয়ে ন্ডের মেরুদণ্ড [illegible] এই দুজনের দুর্ধর্ষ বোলিংয়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের নামকরা ব্যাটসম্যানরা চোখে সর্ষে ফুল দেখেছিলেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৫৪ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৩৯ রান (৫ উইকেটে)। দক্ষিণ আফ্রিকার চৌখস খেলোয়াড় টনি গ্রেগ ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেন—বর্তমান টেস্ট সিরিজে তাঁর এই ৫৪ রান উপর্যুপরি ৩য় অর্ধ-সেঞ্চুরী। ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে টনি গ্রেগ এবং উইকেট-কিপার এ্যালেন নট দলের ৯৬ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডকে শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ২৭২ রানের মাথায় শেষ হয়।

অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের সূচনা মোটেই সুবিধার হয় নি। ৭ রানের মাথায় ২য়, ৮২ রানের মাথায় ৩য় এবং ৮৪ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। ৫ম উইকেটের জুটিতে রস এডওয়ার্ডস (২৮ রান) এবং গ্রেগ চ্যাপেল (১০৫ নট-আউট) দলের ১০৬ রান তুলে অবস্থা ফিরিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রেগ চ্যাপেল দলের পক্ষে কাণ্ডারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ২৯৮ মিনিটে তাঁর নট-আউট ১০৫ রান সংগ্রহ করেন—টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই ২য় সেঞ্চুরী। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট পড়ে ২০১ রান দাঁড়ায়। গ্রেগ চ্যাপেল ১০৫ রান করে নটআউট থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার লাঞ্চের সময় ৪৩ রান (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১২০ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়িয়েছিল। ৩য় উইকেটের জুটিতে দুই ভাই—আয়ান চ্যাপেল এবং গ্রেগ চ্যাপেল দলের ৭৫ রান তুলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ২০ মিনিট পর অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩০৮ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ২৭২ রানের থেকে ৩৬ রানে এগিয়ে যায়।

তৃতীয় দিনের লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৯৮ (৯ উইকেটে)। এই সময় অস্ট্রেলিয়া ২৬ রানে এগিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে [illegible] ২য় ইনিংসের খেলায় অবস্থা [illegible] শোচনীয় দাঁড়ায়—৯টা উইকেট পড়ে [illegible] রানে। এবারও ম্যাসী এবং লিলি ইংল্যান্ডকে কাবু করেন। ম্যাসী ৩৯ রানে ৫টা এবং লিলি ৪৫ রানে ২টো উইকেট পান। ইংল্যান্ড দলের [illegible] একটু [illegible] খেলেছিলেন। তিনি ১৫৭ মিনিটে দলের সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন।

৪র্থ দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ১১৬ রানের মাথায় শেষ হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে ইংল্যান্ডের শেষ ১০ম উইকেট জুটি ইংল্যান্ডের [illegible] বোলার গিফোর্ড এবং প্রাইস দলের ৩৫ রান যোগ করেন।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮১ রান তুলতে অস্ট্রেলিয়া লাঞ্চের ৮০ মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ৫৫ (২ উইকেটে) জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮১ রান থেকে মাত্র ২৬ রান কম, হাতে জমা ৮টা উইকেট। লাঞ্চের পরবর্তী খেলার এক সময় লাক-হার্স্টের বলে কিথ স্ট্যাকপোল তিন রান সংগ্রহ করলে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮১ রান পূর্ণ হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ২৭২ রান (টনি গ্রেগ ৫৪ এবং নট ৭৩ রান। ম্যাসী ৮৪ রানে ৮ এবং লিলি ৯০ রানে ২ উইকেট)

ও ১১৬ রান (মাইক স্মিথ ৩০ রান। ম্যাসী ৫৩ রানে ৮ এবং লিলি ৫০ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৩০৮ রান (গ্রেগ চ্যাপেল ১৩১, আয়ান চ্যাপেল ৫৮ এবং মার্শ ৫০ রান। স্নো ৫৭ রানে ৫ উইকেট)

ও ৮১ রান (২ উইকেটে। কিথ স্ট্যাকপোল ৫৭ নটআউট।)

সাবাস ম্যাসি!

লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বব্ ম্যাসির এক ইনিংসে ৮ উইকেট পাওয়ার ঘটনা ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রথম নজির এই কারণে যে, ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় ম্যাসির আগে কোন খেলোয়াড় তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে এক ইনিংসের খেলায় ৮টি উইকেট পাননি। অপরদিকে আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলার ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় নজির। খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে এক ইনিংসের খেলায় ৮ উইকেট পাওয়ার প্রথম নজির গড়ে-ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এ এল ভ্যালেনটাইন (১০৪ রানে ৮ উইকেট, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫০)।

লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় বব্ ম্যাসী ১৬টি উইকেট নিয়ে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। এ বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের ফ্রেড মার্টিনের—১২টি উইকেট (১০২ রানে, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ওভাল ১৮৯০)।

বব্ ম্যাসি লর্ডস মাঠে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে মোট ১৬টি উইকেট (১৩৭ রানে পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে তাঁর থেকে একটি খেলায় বেশী উইকেট পেয়েছেন মাত্র এই দু'জন ইংলিশ বোলার—জিম লেকার ১৯টি উইকেট (৯০ রানে, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬) এবং সিডনি বার্নেস ১৭টি উই-কেট (১৫৯ রানে, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯১৩-১৪)

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠ

ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট মাঠ সারা দুনিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের এক মহান তীর্থস্থান। ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের পরম ধ্যানই হল লর্ডস মাঠে খেলতে পাওয়া। লর্ডস মাঠে টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূচনা ১৮৮৪ সালের ২১শে জুলাই। এই দিন ১৮৮৪ সালের টেস্ট সিরিজের ২য় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলতে নেমে ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত এক ইনিংস ও ৫ রানে জয়ী হয়। লর্ডস মাঠে এপর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে ২৩টি টেস্ট খেলা হয়েছে, তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৯, ইংল্যান্ডের জয় ৫ এবং খেলা ড্র ৯। লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের শেষ জয় ১৯৩৪ সালে, এক ইনিংস ও ৩৮ রানে। তারপর ১৯৩৮ সাল থেকে লর্ডস মাঠে এই দুই দেশের মধ্যে যে ৭টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং খেলা ড্র ৩।

লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় প্রতিষ্ঠিত বিবিধ রেকর্ড :

এক ইনিংসে সর্বাধিক রান

(দলগত)

অস্ট্রেলিয়া : ৭২৯ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেঃ), ১৯৩০

ইংল্যান্ড : ৪৯৪ রান, ১৯৩৮

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলা)

ইংল্যান্ড : ৫৩ রান, ১৮৮৮

অস্ট্রেলিয়া : ৫৩ রান, ১৮৯৬

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়া : ২৫৪—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

ইংল্যান্ড : ২৪০—ওয়াল্টার হ্যামন্ড, ১৯৩৮

একটি খেলায় ১৫টি উইকেট

১৫টি (১০৪ রানে) : এইচ ভেরিটি (ইংল্যান্ড), ১৯৩৪

১৬টি (১৩৭ রানে) : বব্ ম্যাসি (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৭২

একটি খেলায় সর্বাধিক 'ডিসমিস্যাল'

৯টি (কট ৮ ও স্টাম্পড ১) : জি আর ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৫৬ (বিশ্বরেকর্ড)

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ১৯ থেকে ২৪) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের যে ১৮টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১৩ এবং খেলা ড্র ৫।

লীগ তালিকায় মোহনবাগান তার শীর্ষস্থান ঠিক রেখেছে—১২টা খেলায় ২৩ পয়েন্ট। আলোচ্য সপ্তাহে মোহন-বাগান ৩-০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ২-০ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফকে হারিয়েছে।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল আছে লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে—১০টা খেলায় ২০ পয়েন্ট। আলোচ্য সপ্তাহে তারা ১-০ গোলে বালী প্রতিভাকে এবং ৩-০ গোলে কালীঘাটকে পরাজিত করেছে। লীগের খেলায় একমাত্র ইস্টবেঙ্গল এখনও একটা পয়েন্ট নষ্ট করেনি এবং কোন গোল খায়নি।

গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব দু'টো খেলায় হেরে গিয়ে বেশ পিছিয়ে পড়েছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা—১১টা খেলায় ১৮ পয়েন্ট। আলোচ্য সপ্তাহে তারা ১-০ গোলে বাটাকে হারিয়ে পরবর্তী খেলায় ১-২ গোলে রাজ-স্থানের কাছে হেরে গেছে।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

লণ্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উইম্বলেডন শহরতলীতে অল ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাব আয়োজিত ৮০তম উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা গত সোমবার সুরু হয়েছে। ১৮৭৭ সালের সূচনা থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত ছিল। অনেক দিনের সাধ্য-সাধনায় ১৯৬৮ সালে প্রতিযোগিতার সিংহদ্বার পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্য প্রথম উন্মুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদান আবার বন্ধ হয়ে গেছে। ইন্টারন্যাশনাল লন টেনিস ফেডারেশন এবং ওয়ার্লড টেনিস চ্যাম্পিয়ন-সিপ পেশাদার সংস্থার মধ্যে দেনাপাওনা নিয়ে বর্তমানের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ফলে গত বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্বকে নিয়ে ৩২জন বিশ্বখ্যাত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় ১৯৭২ সালের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারলেন না। গত দু' বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান জন নিউ-কম্বের খুবই দুর্ভাগ্য যে, তিনি উপর্যুপরি তিনবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হারালেন। এখানে উল্লেখ্য, উইম্বলে-ডন টেনিস প্রতিযোগিতায় শেষবারের মত পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব উপর্যুপরি তিন বছর পেয়েছেন ইংল্যান্ডের ফ্রেড পেরী ১৯৩৬ সালে। গত পাঁচ বছরে [illegible] দু'জন খেলোয়াড়—রড লেভার [illegible] নিউকম্ব পুরুষদের সিঙ্গলস [illegible] এক-চেটে করে নিয়েছিলেন। [illegible] দু'জনের অনুপস্থিতিতে ১৯৭২ সালের প্রতি-যোগিতার জৌলুষ অনেক কমে গেল।

১৯৭২ সালের প্রতিযোগিতায় যোগ-দানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতার বাছাই তালিকায় পুরুষদের সিঙ্গলসে গত বছরের রাণার-আপ স্ট্যান স্মিথ (আমেরিকা) এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার আদ্ধা-উপজাতি মহিলা কুমারী ইভন গুলাগং প্রথম স্থান লাভ করেছেন। এবছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার তালিকায় যে আটজন স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী আমে-রিকার স্মিথ এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রুমানিয়ার নাসটাসে গত বছরের তালিকায় যথাক্রমে ৪র্থ এবং ৭ম স্থান পেয়েছিলেন। বাকি ৬জন খেলোয়াড় গত বছরের তালিকায় কোন স্থানই পাননি। এবছরের তালিকায় আলেক্স মেট্রেভেলীর ৮ম স্থান লাভ বিশেষ উল্লেখ্য এই কারণে যে, পুরুষদের সিঙ্গলসের বাছাই তালিকায় সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন খেলোয়াড়ের স্থান পাওয়ার নজির এই প্রথম।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার সংবাদ দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। রচনার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষান্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১০ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 7th July 1972 শুক্রবার, ২৩ আষাঢ়, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

এক নজরে

পাখির দল কোথায় যায়? : মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাতে ডোডোর মতো কতো পাখী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবীতে। আবার বহু পশুপাখী যারা একদিন ভারত বা এশিয়ার কোন দেশের বনে-জঙ্গলে বিচরণ করত তারা আজ তাদের আদি বাসভূমিতে নিশ্চিহ্ন বন্যপ্রাণীর তালিকায় স্থান-লাভ করলেও হয়ত অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড বা আমেরিকার মুক্ত প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক সময় অবশ্য সুপরিকল্পিত-ভাবেই এই অভিবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন নিউজিল্যান্ডকে ঠিক ইংলণ্ডের মতো করে গড়ে তুলতে সেখানকার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীরা ইংলণ্ড থেকে গরু, ভেড়া, খরগোস, পাখী, এমন কি ঘাস পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের যুগে নানা ফল-ফুলও এইভাবে এক দেশের গণ্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতা লাভ করে। যেমন আমরা পেয়েছি আলু, কফি, টমাটো, তামাক ও আরও কত কি। এ আদান-প্রদান, তা যে সূত্রেই হোক, নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত নয়। কিন্তু ব্যাপারটি আপত্তিকর তখনই হয় যখন দরিদ্র এক দেশের অমূল্য সম্পদ চোরাপথে কোন ঐশ্বর্যের দেশে গিয়ে তাদেরই সম্পদে পরিণত হয়। আজ যে এ দেশের দেব-দেউলের বিগ্রহ থেকে শুরু করে ইউরোপের নানা দেশের অমূল্য চিত্রাবলী অপহৃত হওয়ার সংবাদ প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাদের সকলেরই প্রায় গন্তব্যস্থল ধনকুবেরের দেশ আমেরিকা।

কদিন আগে এদেশের এক জাতের ক্ষুদ্র গায়ক পাখী 'ফিঞ্চ' সম্বন্ধে অদ্ভুত একটি সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 'প্যান আমেরিকান' বিমান কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য প্রায় দু হাজার ফিঞ্চ বার দুয়েক অতলান্তিক মহাসাগর এপার-ওপার করে শেষ পর্যন্ত লণ্ডন বিমান বন্দরে খাঁচার মধ্যে অভুক্ত অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছে। বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, নিউ-ইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টকে আগে থেকে না জানানোর জন্যই খাঁচাভর্তি দু হাজার ফিঞ্চকে আবার লণ্ডনে ফিরে আসতে হয় এবং লণ্ডন বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারেই ঐ পাখী-গুলির শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটে। 'প্যান অ্যাম' কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন যে, মিয়ামির এক পাখী ব্যবসায়ীর কাছে সাত হাজার ভারতীয় ফিঞ্চ পাঠানোর বায়না তাঁরা নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, এইভাবে এক এক দফায় যদি সাত হাজার এক জাতের পাখী ভারত থেকে স্থানান্তরিত হয় তবে নানা কারণে ক্ষয়িষ্ণু ঐ সব পক্ষীকুল ভারতের বনজঙ্গলে আর কত দিন থাকবে?

নেকড়েরা রক্ষা পেল : পেণ্টাগনের হস্তক্ষেপের ফলে উত্তর আমেরিকার দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু বুনো নেকড়েরা প্রায় সুনিশ্চিত লয় থেকে রক্ষা পেল। টিম্বার উলফ নামে ঐ বিশেষ শ্রেণীর নেকড়েদের দুর্ভাগ্য, তাদের লোমশ চামড়া নাকি তুষার আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য বর্মবিশেষ। তাই উত্তর আমেরিকাবাসী এত-দিন শ্বেতাঙ্গ-রেড ইণ্ডিয়ান-এস্কিমোনির্বিশেষে শীতের দিনে ঘাড়-পর্যন্ত-ঢাকা টিম্বার উলফের চামড়ার টুপি পরিধান করে এসেছে। কিন্তু তার ফলে ঐ লোমশ নেকড়ের দল যে আমেরিকার বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল সেকথা এতদিন কারও মনে হয় নি।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক দপ্তর থেকে যে ২,৭৭,৫০২টি উলফের চামড়ার টুপির অর্ডার দেওয়া হয় তা বাতিলের জন্য পেণ্টাগনের কাছে আবেদন জানান মার্কিন প্রতি-নিধিসভার পশুপ্রেমী সদস্য শ্রীউইলিয়ম হোয়াইট-হার্স্ট। শ্রীহোয়াইট-হার্স্টের ঐ দাবীর সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসে মার্কিন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা 'ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ফেডারেশন'। ঐ সংস্থার পক্ষ থেকে হিসাব করে দেখান হয় যে, আড়াই লক্ষেরও বেশী নেকড়ের চামড়ার টুপি করতে অন্তত পঁচিশ হাজার টিম্বার উলফের প্রাণ হননের প্রয়োজন হবে যা উত্তর আমেরিকায় ঐ জাতের নেকড়ের বর্তমান সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। সুতরাং সামরিক দপ্তরের ঐ অর্ডার যদি বাতিল না হয় তবে টিম্বার উলফ প্রাণীকুলের বিলোপ অনিবার্য হবে।

মার্কিন পশুপ্রেমীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে পেণ্টাগন সামরিক দপ্তরকে কৃত্রিম পশম দিয়ে সৈনদের টুপি নির্মাণ করতে বলেছে। কৃত্রিম পশম ব্যবহার করলে শুধু যে পঁচিশ হাজার নেকড়ের প্রাণ রক্ষা পাবে তাই নয়, প্রতি টুপিপিছু চার ডলার খরচ কম পড়বে এবং সামরিক বিভাগের মোট খরচ বাঁচবে এগারো লক্ষ ডলার।

একটি জাতীয় বাজেট : গত ২৪শে জুন, রাওয়াল-পিণ্ডিতে যখন গরম ১১৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট, সেই সময় তাপদগ্ধ শহরবাসীরা শুনতে পায় যে জাতির জরুরী বাজেটের প্রয়োজন মেটাতে সব রকম শীতল পানীয়র উপর কর কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাক অর্থমন্ত্রী জনাব মুবাসির হাসান সেদিন যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী জাতির সম্মুখে পেশ করেন তার সঙ্গে বোধহয় একমাত্র মধ্যবিত্ত বাঙালীর দৈনিক বাজারের হিসাব তুলনীয়, যার পাঁচ টাকার মধ্যে সাড়ে তিন টাকা বেরিয়ে যায় মাছে এবং অবশিষ্ট শ'দেড়েক নয়া পয়সায় অন্যান্য পণ্যের প্রয়োজন নম নম করে সারতে হয়। পাক বাজেটে মোট ৭৪৮ কোটি টাকার বরাদ্দের মধ্যে সামরিক খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অথচ মাত্র ২২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে স্বল্প খরচের গৃহ নির্মাণ ও পরিমণ্ডল পরিশুদ্ধী-করণের এক 'ঢালাও পরিকল্পনায়' ও ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে সারাদেশের কয়েক নিযুক্ত বেকারের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এক 'জাতীয় কর্মসূচীতে'। দেশের কৃষক ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দিতে, সাড়ে ছয় কোটি মানুষের দেশ পাকিস্তানে (যার মধ্যে চার কোটিরও বেশী নিরক্ষর) মোট এক হাজারটি বৃত্তি বরাদ্দ করা হয়েছে। ওদিকে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৯৬০ কোটি টাকা যা তার পাঁচ বছরের জাতীয় বাজেটের সব টাকা দিয়েও পরিশোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পাকিস্তানের কর্মকর্তারা যে তা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন নন, সেটা বোঝা যাবে এবারের বাজেটে পাক রাষ্ট্র-প্রধানের সরকারী বাসভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ দেখলে। 'পিণ্ডির' ঐ প্রাসাদ নির্মাণে ব্যয় হবে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িক : হঠাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িক পড়ে গেছে সারা দেশে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশে এখন সব মামলা ছাপিয়ে উঠেছে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন এবং সে-আবেদন আসছে মুখ্যত কৃষিজীবী-দের কাছ থেকে, যাদের দাম্পত্য জীবনের সুস্থিরতা এতদিন সুবিদিত ছিল সর্বত্র। হায়দরাবাদের খবর, শুধু সেই শহরের আদালতেই গত ২রা মে থেকে ২০শে জুনের মধ্যে চার শতেরও বেশী বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা দায়ের হয়েছে। রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানেন এসব মামলা সাজানো, একটি পরিবারকে দুটি পরিবারে রূপান্তরিত করে পরিবারপিছু নির্দিষ্ট জমি দ্বিগুণিত করার আইনানুসারী চেষ্টা ছাড়া এসব মামলার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু তাই বলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সব ব্যক্তিগত আবেদনকে ঢালাওভাবে বাতিল করা যায় না। তাই দাম্পত্যজীবন অবিচ্ছিন্ন রেখে কি করে ভূমি সংস্কার আইন বলবৎ করা যায়, সরকার তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন। —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

উপমহাদেশে শান্তি

১৯৪৭ সালে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ ও রক্তারক্তির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে যায়। ঘৃণা ও পারস্পরিক বিদ্বেষই ছিল এই মর্মান্তিক ঘটনার মূলে। ভারতীয়রা যখন স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিল তখন একথা কেউ কল্পনা করে নি যে একদিন স্বাধীনতা আসবে রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে খণ্ডিত মাতৃভূমিতে। ইতিহাসের সেই কুটিল গতি রোধ করা যায় নি। পারেন নি মহাত্মা গান্ধীর মতো জনগণের অধিনায়ক, পারেন নি তাঁর মন্ত্রশিষ্য জওহরলাল নেহরু। অথচ এ'দের জীবনের স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষের মুক্তি যার জন্য কত স্বাধীনতা-সংগ্রামী সন্তান আত্মদান করে গেছেন। তবু আশা ছিল দেশ ভাগের মধ্য দিয়েই অবসান হবে সব বিরোধের, সব তিক্ততার। শান্তির নবদিগন্ত হবে উন্মোচিত এই উপমহাদেশের বঞ্চিত, শোষিত এবং ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত মানুষের জীবনের সামনে। কিন্তু সে আশাও সফল হয় নি। যে-অপশক্তি সোনার ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল তাই গিয়ে বাসা বাঁধল প্রতিবেশী পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে। তারা সেখানে প্রতিষ্ঠা করল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, বিদায় দিল গণতন্ত্র, বিতাড়িত করল সংখ্যালঘুদের।

একটি দেশ ভেঙে দুটি হল। ভারত চেয়েছিল তার নিকটতম প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করতে। যে দেশ কিছুদিন আগেও ছিল আমাদেরই অঙ্গ তাকে শত্রু ভাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দুই দেশের অনেক সমস্যাই এক ধরনের। পারস্পরিক সহযোগিতা থাকলে বহু বিষয় আমরা যৌথ প্রচেষ্টায় সমাধান করতে পারতাম। কিন্তু পাকিস্তানের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মেলাল বিদেশী জঙ্গীবাদীরা। তারা ভারতের গণতান্ত্রিক জোটনিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বরদাস্ত করতে পারল না। পাকিস্তানকে সামরিক জোটের লৌহ বেষ্টনীতে বেঁধে তারা ক্রমাগত উস্কানি দিতে লাগল ভারতের বিরুদ্ধে। গত পঁচিশ বছর ধরে এই কাণ্ড চলেছে পাকিস্তানে। বার বার ভারতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের কাছে যুদ্ধবর্জন চুক্তির। প্রতিবারই পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কাশ্মীর দখল করার জন্য বার বার হানা দিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ জিইয়ে রেখে চেয়েছে নিজেদের কার্য হাসিল করতে। জন্মলগ্নের এই অভিশাপ থেকে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা কোনোদিন পাকিস্তানের জনগণকে মুক্তি দেয় নি।

বিরোধ ছিল তাদের নিজেদের মধ্যেও। যার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল পাকিস্তানের পূর্ব শাখায় যাকে ও'রা বলতেন পূর্ব পাকিস্তানরূপে। ইসলামের নামে এই শাখাকে ওরা বন্দী করে রাখতে চেয়েছিল। জাতির চেয়ে ধর্ম বড়, ভাষার চেয়ে ধর্ম বড় ইত্যাদি শ্লোগানে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পরিণামে ব্যর্থ হল। পাকিস্তানের শিকল ছিঁড়ে ত্রিশ লক্ষ নরনারীর রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করল বাঙালী জাতি, জন্ম নিল বাংলাদেশ। নব্বুই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করল বিনাশর্তে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমাণ্ডের হাতে। পাকিস্তানের উন্মত্ত জঙ্গীশাহীর রণপিপাসা ক্ষান্ত হল ভারতের ও বাংলাদেশের জনগণের দুর্জয় প্রতিরোধের সামনে।

এই বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতিতেই পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে ভারতের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন সিমলায়। ভারতবর্ষ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল পাক প্রেসিডেণ্টকে। কারণ, পাকিস্তান বারবার ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও ভারত তার প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। এই শান্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছে সিমলা বৈঠকের সিদ্ধান্তে। তৃতীয় পক্ষের অবাঞ্ছনীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে উভয় দেশের সমস্ত সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সমাধানের এই ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ হল প্রথম পদক্ষেপ।

পটভূমি

পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রীর বাজেট-বক্তৃতায় অনেকেই তেমন নতুনত্ব খুঁজে পান নি। গরিবি হটানো, সমাজতন্ত্র, বেকার সমস্যা সমাধান ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব এই বাজেটে দেওয়া হয়েছে কিনা, এখানে সেই আলোচনার মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। বিধানসভায় এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হবে। কিন্তু নতুন কর, আয়-ব্যয়ে ঘাটতি এই সব প্রশ্ন ছাড়া শ্রীশংকর ঘোষের বাজেট-বক্তৃতার মধ্যে আর একটি বিষয় বেশ বড় চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের কথাই বলছি।

পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রের কলোনি, এই ধুয়োর মধ্যে অতিরঞ্জন এতই যে তার ফলে আসল সত্যটাই চাপা পড়ে যায়। ঐ ধুয়ো যারা তুলেছিল তাদের রাজনৈতিক বানপ্রস্থে পাঠিয়ে এই রাজ্যের মানুষ সোজাসুজিই জানিয়ে দিয়েছেন এই ধরনের রাজনীতিতে তাঁদের কোনো আস্থা নেই। কিন্তু তাই বলে এ-কথা মিথ্যে নয় যে, দিল্লীর কাছ থেকে পাওনার ব্যাপারে এই রাজ্যের বেশ কিছু ক্ষোভ আছে। সেই ক্ষোভ প্রকাশ করা অথবা রাজ্যের ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবি তুললেই যে সেটা প্রাদেশিকতা হয়ে যাবে তা মনে করা ভুল। আসলে এই সব প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের মধ্যে যদি ভুল-বোঝাবুঝি বা ঝগড়া-বিবাদ চলতে থাকে তবে তাতে গোটা দেশেরই ক্ষতি। এই ধরনের মতপার্থক্যকে ধামাচাপা না-দিয়ে সে-বিষয়ে মন খুলে আলোচনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ককে ঠিকমতো গড়ে তোলার জন্যে দরকার হলে সংবিধান সংশোধনের পথেও কোনো বাধা নেই। কতো বিষয় নিয়েই তো হামেশা সংবিধানের সংশোধন চলছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সুস্থির করে তুলতেও সংবিধান সংশোধন করা চলতে পারে। কারণ দেশের প্রকৃত ঐক্য এই সুস্থির সম্পর্কের ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল।

শ্রীঘোষ যেসব প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলি আরো গুরুত্ব পেয়েছে ষষ্ঠ অর্থ কমিশন গঠনের কথা ঘোষিত হওয়ার ফলে। পশ্চিম বাংলার বাজেট পেশ করার দু-দিন পরেই অর্থ কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই অর্থ কমিশন প্রতি পাঁচ বছরে একবার গঠন করা হবে, এই হলো সংবিধানের নির্দেশ। পরবর্তী পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটা অংশ কীভাবে রাজ্যগুলির মধ্যে বাঁটোয়ারা করা হবে, সে-বিষয়ে সুপারিশ করাই এই কমিশনের কাজ। নিয়ম অনুযায়ী ১৯৭৩ সালেই ষষ্ঠ অর্থ কমিশন গঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু এক বছর আগেই যে তা করা হলো তার কারণ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে। সেই জট যতো তাড়াতাড়ি খোলা যায়, ততোই মঙ্গল। তার ওপর পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরির তাগাদাও রয়েছে।

পশ্চিম বাংলা চায় ষষ্ঠ অর্থ কমিশন এই রাজ্যের প্রতি সুবিচার করুক। পঞ্চম অর্থ কমিশনের কাছ থেকে সেই সুবিচার পাওয়া যায়নি। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যগুলির আয়ের পথ সীমিত। যেসব সূত্র থেকে আয় বেশি হতে পারে, তার অধিকাংশই পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে। এদিকে রাজ্যগুলিরও কতকগুলি দায়দায়িত্ব রয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের অনেক দায়িত্বই রাজ্যের ওপর। এই সব কাজের জন্যে খরচ ক্রমশঃ বাড়ছে। বাড়ছে না রাজ্যগুলির আয়। তাই কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটা ন্যায্য ভাগ যদি রাজ্যগুলি না-পায়, তবে তাদের কাজ চালানোই মুস্কিল। এই টাকাকড়ির টানাটানি দেখা দেয় বলেই মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাজ্যের তরফ থেকে আরো ক্ষমতা, এমন কি স্বাধিকারের দাবি পর্যন্ত ওঠে। পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রের কলোনি, এই ধুয়োর বীজও লুকিয়ে আছে ঐ কারণের মধ্যেই।

চতুর্থ অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির হাতে পাঁচ বছরে ৪৮৮৫ কোটি টাকা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। সেই তুলনায় পঞ্চম অর্থ কমিশন ৪২৬৬ কোটি টাকা রাজ্যগুলির মধ্যে বাঁটোয়ারা করার সুপারিশ করে। সুতরাং, মোট টাকার অঙ্কটা দেখলে মনে হবে পঞ্চম অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির প্রতি সুবিচারই করেছে।

পশ্চিম বাংলাও তো মোট টাকার অঙ্কে পঞ্চম অর্থ কমিশনের কাছ থেকে আগের তুলনায় বেশি টাকাই পেয়েছে। চতুর্থ অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছিল পশ্চিম বাংলাকে ১৯৭ কোটি ৪১ লাখ টাকা দিতে। পঞ্চম অর্থ কমিশন ঐ টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে ৩৬৯ কোটি ২৬ লাখ টাকা করে দেয়। প্রশ্ন উঠবে, তবু পশ্চিম বাংলার ক্ষোভের কারণ কী?

কারণ আছে বৈকি? কয়েকটি রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছে সেটা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। আবার কয়েকটি রাজ্য পেয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় কম। পশ্চিম বাংলা পড়ে গেছে ঐ শেষোক্ত দলে। এত দিন পর্যন্ত অর্থ কমিশন শুধু পরিকল্পনার খরচের বাইরে রাজস্ব খাতে ঘাটতির প্রশ্নটিই বিবেচনা করে এসেছে। একটি রাজ্যের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থাটা কী রকম তা খুঁটিয়ে দেখেনি। তাই পশ্চিম বাংলার মতো রাজ্যের রাজস্ব খাতে ঘাটতি তো মেটেই নি, সামগ্রিক আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠছে।

•

পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ যখন প্রকাশিত হয় (১৯৬৯, আগস্ট) তখন অজয় মুখার্জি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অর্থ দপ্তরও তাঁর অধীনেই ছিল। কমিশনের সুপারিশ জানতে পারার পর রাজ্যের সরকারী মহলে রীতিমতো হতাশা দেখা দিয়েছিল। অজয়বাবু বলেছিলেন যে, ১৯৬৯-৭৪ সালের জন্যে অর্থ কমিশন যে ৩৬৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ঐ পাঁচ বছরে মোট ঘাটতি দাঁড়াবে ঐ অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি। রাজ্য সরকার নতুন কর বসিয়ে ৭০ থেকে ৭৫ কোটি টাকা তুলতে পারেন। কিন্তু তাতেও ঘাটতি থেকেই যাবে। নতুন কর বসানোর রাস্তাও বিশেষ খোলা নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার আমলে অনেক নতুন কর বসানো হয়েছিল। মাথা পিছু আয়ের তুলনায় মাথা পিছু করের পরিমাণ এই রাজ্যে খুবই বেশি।

পঞ্চম অর্থ কমিশন কেন পশ্চিম বাংলার আশা পূরণ করতে পারেনি? পারেনি, তার কারণ ঐ কমিশন টাকা বন্টনের নীতির বড় রকমের রদবদল করেছিল। সেই রদবদলে কোনো কোনো রাজ্যের লাভ হলেও এই রাজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। আয় করের অংশ বাঁটোয়ারার ব্যাপারে তৃতীয় ও চতুর্থ অর্থ কমিশন শতকরা ৮০ ভাগ গুরুত্ব দিয়ে-

ছিলেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যার ওপর। বাকি কুড়ি ভাগ কোন্ রাজ্য থেকে কতো টাকা আয়কর বাবদ আদায় হয়েছে তার ভিত্তিতেই বণ্টন করা হয়। কিন্তু পঞ্চম অর্থ কমিশন এই অনুপাত বদল করে যথাক্রমে ৯০ ও ১০ করেন। এতে পশ্চিমবঙ্গের লোকসান হয়। কারণ অনেক রাজ্যের চেয়ে এই রাজ্যের জনসংখ্যা কম, অথচ অধিকাংশ রাজ্যের চেয়েই পশ্চিম বাংলা থেকে আয়কর বাবদ অনেক বেশি টাকা আদায় হয়। এর ফলে এই রাজ্যের পাওনা গেল কমে। আয়কর বাবদ চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শতকরা প্রায় ১১ ভাগ পশ্চিম বাংলার বরাতে জুটেছিল। পঞ্চম অর্থ কমিশনের নতুন নীতির ফলে ঐ পরিমাণ কমে দাঁড়ালো শতকরা ন' ভাগের সামান্য কিছু বেশি। আবগারি শুল্ক বণ্টনের ব্যাপারেও নীতির কিছু রদবদল করা হলো। তাতেও এই রাজ্যের বখরা শতকরা সাড়ে সাত ভাগ থেকে কমে দাঁড়ালো পৌনে সাত ভাগ মতো।

•

পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশে পশ্চিম বাংলা এবং আরো কয়েকটি রাজ্যের প্রতি যে সুবিচার করা হয়নি, তা কেন্দ্রীয় সরকারও পরোক্ষ স্বীকার করে নিয়েছেন। ঐসব রাজ্যের ঘাটতি মেটাবার জন্যে তাই বিশেষ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। কিন্তু ঋণ তো ঋণই, তা সুদে-আসলে শোধ করতে হয়। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলি দেনার দায়ে প্রায় বিকিয়ে আছে। পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রীই হিসেব দিয়েছেন যে, গত মার্চ মাস পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশ বাদে অন্যান্য রাজ্যের দেনার দায় দাঁড়িয়েছে ৮,৭৫৮ কোটি টাকা। পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রেও এই দেনার দায় কম নয়। আর এই দেনা মেটাতে গিয়ে এক আজব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই রাজ্য সহায়তা বাবত দিল্লীর কাছ থেকে পাবে ২২১ কোটি টাকা। অথচ ঐ পাঁচ বছরে দিল্লীর দেনা শোধ করতে লাগবে ২৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ নীট হিসেবে কিছু পাওয়ার চেয়ে দিল্লীকে উল্টে আরো ৩৪ কোটি টাকা এই রাজ্যকে দিতে হবে!

সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের ওভারড্রাফট্ সমস্যা নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়ে গেছে। ওভারড্রাফট্ মানে, রাজ্যগুলি রিজার্ভ ব্যাংক থেকে তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি টাকা তুলেছে। গত ১লা এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রিজার্ভ ব্যাংক এই ওভারড্রাফট্ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। দেনা করে সংসার চালানো নীতি হিসেবে অবশ্যই খারাপ। কিন্তু ওভারড্রাফটের সমস্যা দেখা দিয়েছে এই কারণেই যে, রাজ্যগুলির প্রয়োজনের তুলনায় আয় কম। ষষ্ঠ অর্থ কমিশনকে রাজ্যগুলির দেনার মূলধন বিবেচনার ভার দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার খুবই উচিত কাজ করেছেন। দেনার দায় থেকে কিছুটা অব্যাহতি, অন্ততঃ দেনা শোধের তারিখ কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার জন্যে পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী গত মার্চ মাসেই দাবি জানিয়েছিলেন।

পঞ্চম অর্থ কমিশন যে টাকা বণ্টনের নীতির রদবদল করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের দিক দিয়ে অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে বেশী টাকা দেওয়ার পথ প্রশস্ত করা। যদিও পশ্চিম বাংলায় শিল্পের অবস্থা এখন কাহিল, তবু এক হিসেবে এই রাজ্য শিল্প-সমৃদ্ধ তো বটেই! তাই পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশের নীতিতে এই রাজ্যের কপাল পুড়েছিল। আসলে শুধু অর্থ কমিশন কেন, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই এই যে অনগ্রসর এলাকাকে সাহায্যের নীতি গ্রহণ করেছেন, পশ্চিম বাংলার অনেক দুর্গতির মূলেই রয়েছে সেই নীতি। সব এলাকার সুষম উন্নয়ন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোনো রাজ্যের ক্ষতি করে তা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নতুন কল-কারখানা কোথায় স্থাপন করা হবে তা স্থির করার আগে দেখতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে কোন্ রাজ্যে সেই কল-কারখানা স্থাপন করা উচিত। শিল্পোন্নয়নের সেটাই সেরা পথ। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে এই কথাটি মনে রাখার জন্যে শ্রীশংকর ঘোষ অনুরোধ জানিয়েছেন। যোজনা ভবন নিশ্চয়ই এই অনুরোধের ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেবেন।

৩০-৬-৭২ —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

সিমলা বৈঠকের এক অবসর মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো

"আমরা আশা রাখি, কিন্তু হতাশ হওয়ার জন্যও প্রস্তুত আছি" এই মনোভাব নিয়ে ভারত সিমলার শৈলশিখরে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কের ২৫ বছরের ইতিহাসে এই একাদশবার ভারত ও পাকিস্তানের নেতারা মিলিত হয়েছেন একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার মধ্যে। শীর্ষ থেকে শীর্ষান্তরে দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে যে জমাট বিরোধের অবসান খোঁজা হয়েছে এবার সেই বিরোধের বরফ কি গলবে পার্বত্য শহর সিমলায়। যে সিমলায় একদা ভারতের কিছু মুসলমান নেতা তৎকালীন বড়লাটের কাছ থেকে তাঁদের নিজ সম্প্রদায়ের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা আদায় করে নিয়ে বলতে গেলে দেশ-বিভাগের বীজ বপন করে-ছিলেন, সেই সিমলাতেই কি অবশেষে দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্কের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে!

এই সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে খুব উচ্চাশা পোষণ না করার অনেক লক্ষণ আগেই প্রকট ছিল। যেমন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যেসব উল্টোপাল্টা কথা বলছিলেন তাতে তাঁর মতিগতি বোঝা যাচ্ছিল না। ভারতের পক্ষে কখনই ভোলা সম্ভব নয় যে, এই শীর্ষ সম্মেলনে তাকে বসতে হচ্ছে এমন একজন রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে যিনি অতীতে ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, যিনি বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়ে যাওয়া ব্যাপারে কথায় ও কাজে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর দোসর ছিলেন। শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে ভুট্টোর কথা-বার্তায় ও আচরণে এমন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না, যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে যে নতুন বাস্তব পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাকে তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি এই সেদিন ঘুরে এলেন যাতে 'সেণ্টো' সংস্থাটিকে চাঙা করে তুলে তার মারফৎ পাকিস্তানের জন্য বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করা যায়। শীর্ষ সম্মেলনের আগের দিনও পাকিস্তান রেডিও থেকে বক্তৃতা দিয়ে তিনি কাশ্মীরের জনগণের 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের' কথা বললেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা না বলে বাংলাদেশকে তিনি স্বীকৃতি দেবেন না, এই প্রতিজ্ঞায় ভুট্টো সাহেব এখনও অটল।

দুর্লক্ষণ আরও ছিল। গোড়া থেকেই বোঝা যাচ্ছিল :—শীর্ষ সম্মেলনের বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। ভারত চায় স্থায়ী শান্তি এবং তার জন্য দুই দেশের মধ্যে পাকা সীমান্ত নির্ধারণ ও পাকিস্তানের ... ভারতের সঙ্গে বিরোধের রাজনীতি বর্জনের প্রতিশ্রুতি। ভারত বিশ্বাস করে যে, কাশ্মীর প্রশ্নটির একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে, উভয় দেশের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা সুচিহ্নিত করে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে নিকট সম্পর্ক গড়ে তুলে উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ এসেছে অতীতে আর কখনও সেই সুযোগ আসেনি। দুই দেশের নেতা শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে যদি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন তাহলে একেবারে হাতের সামনে যেসব সমস্যা এসে পড়েছে সেগুলির মীমাংসা কঠিন হবে না। কিন্তু ভুট্টো সাহেব সমস্যার মূলে যেতে উৎসাহী নন। তাঁর গলার কাঁটা তুলে নিতেই তিনি বেশি আগ্রহী। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই পাকিস্তানী যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন, পাকিস্তানের অধি-কৃত অঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রশ্ন, কাশ্মীরের পুরান যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখায় ফিরে আসার প্রশ্ন। এ সবের সঙ্গে তিনি যেটুকু সুবিধা দিতে প্রস্তুত তা হল—ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন এবং সম্ভবত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান (যাতে বাংলা-

দেশ পরোপুরির আয়ত্তের খপ্পরে গিয়ে না পড়ে।')

খতিয়ে দেখতে গেলে, লক্ষণগুলি সিমলা সম্মেলনের সাফল্যের অনুকূল ছিল না।

তবুও, একেবারে আশা ছাড়া হয়নি। হয়ত ভুট্টোকে নিজের দেশের লড়াকুদের খুশি রাখার জন্য এসব কথা বলতে হচ্ছে, হয়ত মুখোমুখি বসে দেখা যাবে, শান্তির জন্য তাঁর আগ্রহ আন্তরিক। আর যদি তাই হয় তাহলে হাতে একটা মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

এইটুকু আশার উপর নির্ভর করেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এবং দুই দেশের উচ্চপদস্থ অফিসাররা পরস্পরের মধ্যে সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শহর, বহু ইতিহাসের সাক্ষী, সিমলায়।

এই পর্যালোচনা লেখার সময় পর্যন্ত যতটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে, শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনা বিশেষ এগোচ্ছে না। যদিও উভয় পক্ষই বলছেন, আলোচনায় যেসব অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সেগুলি অনতিক্রমণীয় নয়, তাহলেও হাবেভাবে বোধ হচ্ছে, এই সম্মেলন থেকে বৃহৎ কোন ফল লাভ হবে না।

●

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মত ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মেরামতির দরকার রয়েছে। সিমলার সম্মেলনে প্রথম কাজটি চলছে, দ্বিতীয় কাজটি শুরু হওয়ার কথা আছে ঐ সম্মেলন শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই। জন কোনালি আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিশেষ ব্যক্তিগত দূত হিসাবে। তিনি কি নিয়ে আলোচনা করবেন, ভারত সরকার তা জানেন না। তবে, সিঙ্গাপুরে পৌঁছে তিনি কিছু মিঠা কথা বলেছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে একজন 'মহামানবী' ও 'মহতী নেত্রী' বলে অভিহিত করে কোনালি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার ফলে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের প্রতিবন্ধকগুলি দূর হবে।

একথা ঠিক যে, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কটা এখন যতখানি খারাপ হয়েছে অতীতে আর কখনও ততখানি হয়নি। ওয়াশিংটনের সরকারি মহলে একটা চক্র যে সর্বদাই পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন সেটা ভারতবর্ষস্থিত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলজ তাঁর বইয়ে ভালভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসনের আমলে এই পক্ষপাতিত্ব যতখানি নিলর্জ্জ আকার ধারণ করেছিল, এতখানি আর কখনও হয়নি। গোপনে গোপনে আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দিয়ে গেছে, সপ্তম নৌবাহিনীর রণতরী পাঠিয়ে পাকিস্তানকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে, ওয়াশিংটনস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে যৎপরোনাস্তি অপমান করেছে। এখনও আমেরিকার দিক থেকে এমন ইঙ্গিত নেই যে, সে অস্ত্র-সাহায্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাল চালবার চেষ্টা ছেড়েছে অথবা বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সেটাকে সে ভারত-বাংলা সম্পর্ক বিষিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করবে না। এখনও আমেরিকা ভারতকে বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে।

কোনালির সঙ্গে আলোচনা করে এখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বুঝতে হবে, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নিকসন সরকার ঠিক কতখানি শিক্ষা লাভ করেছেন এবং ভারতের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা কতটা উৎসুক।

৩০-৬-৭২ পুণ্ডরীক

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

চিরজীবী হয়ে থাকুন

আর একদিন বেঁচে থাকলে আমাদের কালের এই তরুণতম মানুষটি আশি বছরে পা দিতেন। তিনি ক্রমশ সেরে উঠছিলেন। কথা হয়েছিল রোগমুক্ত হয়ে ফিরে এসে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের আম্রপালীতে তাঁর ৭৯তম জন্মদিবসটি সমারোহের সঙ্গে পালন করা হবে। এই আম্রপালী থেকে একই দিনে তিনি অন্তিম যাত্রা করলেন। তবে জীবনব্যাপী সাধনা ও প্রয়াসের কেন্দ্রীভূত ফল হিসেবে যে বিরাট সংস্থাটি তিনি রেখে গেলেন, আপন কৃতিত্বের অন্য যে বহুবিধ নিদর্শন—তার মধ্যে তাঁকে সব সময়েই পাওয়া যাবে। এই মানুষটি কিছুতেই হারিয়ে যাবার নন।

কাছ থেকে দেখার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা জানেন, সত্তর পেরিয়েও অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এমনকি চেহারার দিক থেকেও কী অসাধারণ তরুণ ছিলেন। সুপুরুষ তো বটেই। ছ'ফুট লম্বা ছিপছিপে ঋজু শরীরটি তলোয়ারের মতো ঝকঝক করত। চোখের দৃষ্টিতে ও পাতলা ঠোঁটের ভঙ্গিমায় এমন একটা হাসিমাখা কোমলতা ছিল যে তাঁর মুখে কঠোর কথাও কখনো কর্কশ শোনাত না। গলার স্বর ছিল মৃদু, সরুর দিকে, সেই স্বরে নীরস পরিসংখ্যানের কথাও সরস শোনাত। পরিসংখ্যানের কথাই বেশির ভাগ তাঁকে বলতে হত, কিন্তু তার বাইরে যখন কথা বলতেন তখন বোঝা যেত—শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, গোটা বিশ্বের কাব্য ও সাহিত্যের জগতে তিনি বিচরণ করেন। এমনকি রাজনীতির জগতের সঙ্গেও সম্পর্ক কম অন্তরঙ্গ নয়। স্পষ্টই বোঝা যেত, তাঁর অন্বেষণ ও গবেষণার ক্ষেত্র পরিসংখ্যান না হয়ে অন্য কিছু যদি হত তাহলেও তিনি সমান কৃতিত্বের অধিকারী হতেন, এমনকি শুধু রবীন্দ্রনাথ হলেও। শেষোক্ত ব্যাপারটি ঘটলে রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ হিসেবে আমরা কম লাভবান হতাম না, তবে গোটা দেশ সম্ভবত আরো দরিদ্র হত। কেননা আমাদের দেশে তিনি এমন এক সময়ে পরিসংখ্যানকে উপস্থিত করেছিলেন যখন সেটি না থাকলে অন্য কোনো কিছুই হতে পারত না—না কোনো বাঁধ, না এমনকি কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনাও।

কথাটা শুনে মনে হতে পারে বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। কিন্তু ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের কামরায় প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের হাতে একটি পরিসংখ্যান সংস্থা পত্তনের পর থেকে পরিসংখ্যানগত যতো কাজ হয়েছে, যার অজস্র নথিপত্র ইনস্টিটিউটের মিউজিয়মে সযত্নে সংরক্ষিত তা থেকে ধারণা করা যায় আজকের দিনের ডি-

জন্ম : ২৯শে জুন, ১৮৯৩
মৃত্যু : ২৮শে জুন, ১৯৭২

ভি সি ও অন্য অনেক কিছুর মূলে সেই একজন অধ্যাপক ও তার কয়েকজন অনুগামী ছাত্রের অবদান কতখানি।

এই লেখকের একবার সুযোগ হয়েছিল অধ্যাপক মহলানবিশের নিজের মুখ থেকে গোড়ার পর্বের কর্মতৎপরতার কিছু বিবরণ শোনার ও অধ্যাপক মহলানবিশের নিজের হাত থেকে তার কিছু নিদর্শন দেখার। সেটা ১৯৫৬ কিংবা ১৯৫৭ সাল— অর্থাৎ অধ্যাপক মহলানবিশের বয়স তখন তেষট্টি কিংবা চৌষট্টি। ছাই-রঙের ট্রাউজার ও গলাবন্ধ কোট পরে দোতলার কাজের ঘর থেকে একতলায় নেমে এসে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মাঝখানে এসে যখন দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল—শুধু তাঁর দিব্যকান্তির জন্যে নয় শুধু তাঁর সুঠাম মুখাবয়বের জন্য নয়, সৃজনশীল কর্মে তন্নিবদ্ধ অভিনিবেশের ফলে সৃষ্ট দ্যুতির জন্যও অনেকখানি। এই লেখক বিদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শুধু, এবং সেই সুযোগে থেকে গিয়েছিল। তখনই তার উপলব্ধি হয় যে অধ্যাপক মহলানবিশকে সামনে থেকে দেখা কতো বড়ো একটা অভিজ্ঞতা। হলঘরে মস্ত একটা টেবিলে সাজানো ছিল অজস্র ছবি, গ্রাফ, রিপোর্ট ও অন্যান্য বিবরণ-- ফাইলবন্দী। অধ্যাপক মহলানবিশ পরের পর ফাইল তুলে নিচ্ছিলেন ও প্রায় মাস্টারী করার মতো একটা ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছিলেন কখন, কোন অবস্থায়, কি-ভাবে কোন কাজটি সমাধা হয়েছিল। বৃষ্টিপাত নদীর জলের পরিমাণ ও প্রবাহ, বন্যা ও খরা-- ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রচুর তথ্যের সমাবেশ এক-একটি ফাইলে, কিছুটা পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে বার করা কিছুটা হাতে-কলমে মাপজোক করে নেয়া। আর মিউজিয়মের কিউরেটর (বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক সুবিনয় রায়) রোবোটসদৃশ নৈপুণ্যের সঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশের কথামতো আরো অনেক ফাইল ও বই পলকের মধ্যে টেনে নামিয়ে আনছিলেন। ছোটখাটো একটা নদীর বাঁধ তুলতে হলেও কী পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, কী পরিমাণ অন্বেষণ ও গবেষণা—সে বিষয়ে এই লেখকের মতো অ-বিশেষজ্ঞও কিছুটা ধারণা করতে পেরেছিল যেন। একটি তুলনাও মনে হয়েছিল : ভগীরথের শঙ্খধ্বনি। ঠিক ঠিক পথটি দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ফলাফলের দিকে তাকালে পরিসংখ্যানকে অবশ্যই শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা চলে।

রোবোটসদৃশ কথাটা এই লেখক সচেতন ভাবেই ব্যবহার করেছে। অধ্যাপক মহলানবিশ বিরাট পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন, তা ছাড়াও আরো অনেক কিছু (খবরের কাগজের শোকবার্তায় শুধু তার একটা ফিরিস্তি দিতেই পুরো একটি কলম খরচ হয়েছে), নিজের চারপাশে তিনি বহু জ্ঞানী গুণী ও গবেষককে জড়ো করতে পারতেন, কিন্তু যে-খবরটি বাইরের জগতে প্রচারিত হত না তা হচ্ছে তাঁর একদল অসম্ভব কুশলী নীরব কর্মী সৃষ্টি করার ক্ষমতা, যাঁরা সদর্থেই রোবোট সদৃশ। অধ্যাপক মহলানবীশ যে ঘরটিতে বসে কাজ করতেন তার সামনেই একাধিক টেলিফোন ও প্রচুর ফাইলপত্র পরিবৃত অবস্থায় যাঁকে দেখা যেতে পারত তিনি অনীকেন্দ্র মহলানবীশ। প্রায় নিঃশব্দ একটি মানুষ, কিন্তু কর্মনৈপুণ্য যদি কোনো মানুষের চেহারা নেয় তাহলে সেই মানুষটির এই নাম। এই লেখকের সত্যি সত্যিই মনে হত, মানুষ নয় একটি রোবোট যেন—সদর্থেই। অধ্যাপক মহলানবীশ ছ-মাসের বেশি কলকাতায় থাকতেন না, এই সময়টায় দিবারাত্রির কোনো সময়েই তিনি অপ্রস্তুত বা অন্যমনস্ক ছিলেন এমন শোনা যায়নি। আবার অধ্যাপক মহলানবিশের অনুপস্থিতির সময়টা কাজে এমন ঠাসা থাকত যে তিনি কখনো দুই সময়ের মধ্যে তফাৎ করতে পারেন নি। জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, এমন কোনো ধারণাও তাঁর ছিল না। অকৃতদার মানুষটি মগ্নতার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারতেন।

একা অনীকেন্দ্র নন, এমনি আরো অনেকে ছিলেন। কুটীরশিল্পের সংগঠন কল্যাণশ্রী থেকে শুরু করে গণকযন্ত্রের সংগঠন ইলেকট্রনিকস পর্যন্ত ছড়ানো বহুবিধ বিভাগে এমনি সব তন্নিষ্ঠ কর্মীর দেখা পাওয়া যেত। বিজ্ঞানী অধ্যাপক মহলানবিশ

অবশ্যই স্মরণীয়, কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ নিরলস বিপুল এক কর্মীদলের স্রষ্টা অধ্যাপক মহলানবিশও আমাদের এই দেশে আরও বেশি মর্যাদার সঙ্গে স্মর্তব্য।

সেদিনকার সেই সমাবেশে তেষট্টি কিংবা চৌষট্টি বছর বয়সের অধ্যাপক মহলানবিশ দেড় ঘন্টা ধরে কথা বলেছিলেন ও ব্যাখ্যা করেছিলেন—পুরো সময় দাঁড়িয়ে থেকে, একটিবারও পা না বদলিয়ে। অথচ তাঁর অর্ধেক বয়সের এই লেখকের পা ভেঙে পড়েছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, অভ্যাগতদের মধ্যেও কারও কারও। কোনো একটি বিষয়ে মন নিবন্ধ থাকলে স্থির হওয়া চলে, মুনি-ঋষিরা যে ধ্যান করতে করতে উইয়ের ঢিবি হয়ে যেতেন, তাঁদের সেই পরম স্থিরতার মূলেও সম্ভবত এই তন্নিবন্ধতা। এদিক থেকে অধ্যাপক মহলানবিশ ঋষি ছিলেন বলা চলে। লেখকের অভিজ্ঞতায় অধ্যাপক মহলানবিশ সম্পর্কে এমনি ঘটনার দৃষ্টান্ত অজস্র। যেমন, একবার হঠাৎ রওনা হবার মাত্র চব্বিশ ঘন্টা আগে—ঠিক হয়েছিল জাপানের একটি সেমিনারে অধ্যাপক মহলানবিশ যোগ দেবেন। সেমিনারে শারীরিক উপস্থিতিটাই যথেষ্ট নয়, আরও চাই অন্ততপক্ষে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ ও কিছুটা প্রস্তুতি। ইনস্টিটিউট ছুটি হবার পরে, ইনস্টিটিউট সম্পর্কিত অজস্র কাজের নির্দেশ দেওয়া শেষ হলে তিনি নিজের কাজের ঘরটিতে এসে বসলেন। তারপরে সারাটি রাত তাঁর ঘরে আলো জ্বলল। পরদিন একা প্রেসের কালীবাবু বেশ খানিকটা সকাল করেই দপ্তরে এলেন। নির্ভুল নিয়মে প্রফেসারের পাণ্ডুলিপি তৈরী। একদিনের মধ্যেই অনতিক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপিটি ছাপা শেষ। সারারাত জেগে থাকার পরেও অধ্যাপক মহলানবিশ যথানিয়মে সেই পাণ্ডুলিপির প্রুফও সংশোধন করেছিলেন।

শ্রীহিরণ্ময় সান্যাল সে-সময়ে অধ্যাপক মহলানবিশ সম্পর্কে বলেছিলেন, হ্যামলেট সম্পর্কে বলা হয় যে হ্যামলেটের পাগলামির মধ্যে একটা পদ্ধতি রয়েছে, আর প্রফেসর সম্পর্কে বলা চলে প্রফেসরের পদ্ধতির মধ্যে একটা পাগলামি।

অধ্যাপক মহলানবিশের পড়ার ঘরটি দেখেও তাই মনে হত। নিচু একটি তক্তপোষ, বই ও কাগজপত্র ছড়ানো। পাশে একটি আরাম কেদারা। পাশে টেলিফোন। দেওয়াল বরাবর বেঞ্চি। ভুবন-বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী, সারা বিশ্বের সঙ্গে যাঁর যোগাযোগ, এই ছিল তাঁর কাজের ঘর। আরামকেদারায় বসে পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়ে একই সঙ্গে লিখে চলেছেন, টেলিফোন নির্দেশ পাঠাচ্ছেন. সামনে উপবিষ্ট কোনো গবেষক ছাত্রের সঙ্গে কোনো দুরূহ বিষয়ে আলোচনা করছেন। পোষা একটা বেড়াল হয়তো তাঁর কোল জুড়ে বসে আছে—তাতেও তাঁর কোনো অস্বস্তি নেই। এমন একজন সব্যসাচী হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয়তো ছিল না, কিন্তু এটা তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত। কিম্বা পাগলামি। এমনি পাগলামি দেখা যেত অধ্যাপক জে বি এস হলডেনের মধ্যেও, যিনি ১৯৫৭ সালে স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিভাবানরা সব সময়েই অসাধারণ হয়ে থাকেন।

•

অধ্যাপক জে বি এস হলডেন ১৯৫৭ সালের বাৎসরিক কনভোকেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট সম্পর্কে বলেছিলেন—শুধু এই পৃথিবীতে নয়, এমনটি এই সৌরমন্ডলেও নেই। স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট দেখে অধ্যাপক জে বি এস হলডেনের মতো বহুদর্শী গবেষক অধ্যাপকও যে কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন তা এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। মানুষকে যদি তার কাজ দিয়ে বিচার করতে হয়, যেটা ঠিক বিচার, তাহলে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট হচ্ছে অধ্যাপক মহলানবিশের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো অভিজ্ঞান-পত্র। বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যানবিদ স্যার রোনাল্ড ফিশার আটবার ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে গিয়েছেন এবং অধ্যাপক জে বি এস হলডেনের মতো অতটা বাহুল্যের সঙ্গে না হলেও ইউস্টিটিউট সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। অধ্যাপক মহলানবিশ যদি এই একটিমাত্র কীর্তি রেখে যেতেন তাহলেও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল।

কুড়ির দশকে অধ্যাপক মহলানবিশ ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। তাঁকে ঘিরে জড়ো হয়েছিলেন একদল উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু তরুণ। তাঁরা চেয়েছিলেন বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির প্রয়োগ। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক মহলানবিশের কামরাতেই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন স্ট্যাটিসটিকাল ল্যাবরেটরি। এইভাবে শুরু। তার পরে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে স্যার আর এন মুখার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের পত্তন. ১৯৩২ সালে যথাবিহিত রেজিস্ট্রীকৃত। প্রথম বছরে মোট খরচ ছিল ২৩৮ টাকা আর কর্মী বলতে ছিল একজন আংশিক সময়ের কম্পিউটর। আর পঁয়ত্রিশ বছর পরে বাৎসরিক বিবরণে দেখা যাচ্ছে. পূর্ণ সময়ের জন্যে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ২,৩০৩ আর বাৎসরিক খরচ ১৭২-৬১ লক্ষ টাকা। ১৯৫৯ সাল থেকেই ইনস্টিটিউট জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ও পরিসংখ্যানে ডিগ্রী দেবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ অ-মুনাফাভোগী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত। ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউটের গবেষণার পরিধি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে—ভারতের বিভিন্ন এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে ডাইনোসর ও অতীতের অন্যান্য লুপ্ত প্রাণীর ফসিল সংগ্রহ করা পর্যন্ত। আধুনিক অর্থে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি বলতে যা বোঝায় তাই—অর্থাৎ, শুধু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ নয়, শুধু মানবসমাজ সম্পর্কিত সমস্যার বিশ্লেষণ নয়, জ্ঞানের ও গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিসন্ধিৎসু বিচরণ। তাই স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে যেমন আছে কুটির শিল্পের (প্রধানত তাঁতের) বিভাগ কল্যাণশ্রী, তেমনি গণকযন্ত্রের বিভাগ ('হল্যারিথ' ও 'উর‍্যাল' গণকযন্ত্র সহ) এবং তারই সঙ্গে গবেষণার একই সূত্রে বাঁধা হয়ে সাইকোমেট্রি, সোসিওমেট্রি, বায়োমেট্রি, ডেমোগ্রাফি, জিওলজিকাল স্টাডি ও অনুরূপ আরো অনেক কিছু। প্ল্যানিং, ইকনমিক রিসার্চ, কোয়ালিটি কনট্রোল ও ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে তো আছেই। আর আছে রিসার্চ ও ট্রেনিং স্কুল (বি স্ট্যাট, এম স্ট্যাট ও পি-এইচ ডি ডিগ্রী দেবার জন্যে))। এবং 'সংখ্যা' নামক একটি পত্রিকা, 'ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ' নামে একটি কারখানা ও 'একা প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা। গবেষণা ও অনুসংধানের এই বিপুল কর্মকান্ডে প্রতিটি পর্বে যার হাতের ছোঁয়া রয়েছে তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সমস্তটাই তাঁর পরিকল্পনা, সমস্ত কিছুতেই তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শ, সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ। কেউ যদি বলেন, অধ্যাপক মহলানবিশকেই খন্ড খন্ডরূপে ইনস্টিটিউটের প্রতিটি বিভাগের প্রধানরূপে দেখা যাচ্ছে, ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত প্রতিটি নিবন্ধের লেখক হচ্ছেন তিনি, প্রতিটি গবেষণার নায়ক হচ্ছেন তিনি—তাহলে খুব একটা ভুল বলা হয় না। মানুষ হিসেবে তিনি হতে চেয়েছিলেন গোটা মানুষ, বিজ্ঞানী হিসেবেও গোটা বিজ্ঞানী।

ইনস্টিটিউটের তিনি যে কতখানি ও কী, তা তাঁরই মুখের ছোট্ট একটি কথা থেকে এই লেখক ধারণা করতে পেরেছিল। একবার একজন বিশিষ্ট অতিথিকে নিয়ে তিনি ইনস্টিটিউটে ঘুরছিলেন। যেখানেই যান আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে বলেন. অমুক জায়গায় অমুকে বসেন, অমুক জায়গায় অমুকে ইত্যাদি ইত্যাদি. শেষকালে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে একটু হেসে—'ইনস্টিটিউটে আমার নিজের কিন্তু কোনো বসার জায়গা নেই।' কোথায় বসবেন তিনি? ইনস্টিটিউটের কোনো একটি অংশকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে কি বলা চলে যে এই হচ্ছে তাঁর স্থান? ইনস্টিটিউটের কোথায় নেই তিনি?

বিজ্ঞানকে তিনি কী চোখে দেখতেন? ইনস্টিটিউটের কোন রূপটি তাঁর কল্পনায় ছিল? ১৯৬৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ বাৎসরিক কনভোকেশনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলছেন:

'এই উপলক্ষে এই ইনস্টিটিউটের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। কথাটা অনেক আগের কালের যখন ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ

করে নি। এই ঐতিহ্যই পরবর্তীকালে রূপ পেয়েছে আমাদের লক্ষ্যবাণীতে : 'বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য'। ভারতে 'বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য'-ই হতে পারে জাতীয় অস্তিত্বের পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর নীতিসূত্র। আমাদের দেশের ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, সংকটের পর সংকটের মধ্যে, এই কথাটিই প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এবং আমাদের জাতীয় সংগীতেও, বারে বারেই এই কথাটি ব্যবহার করেছেন—বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য।

আমাদের প্রতীক চিহ্নে (ক্রেস্ট) যে বটগাছটি রয়েছে তার সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। এই শতাব্দীর এবং সম্ভবত চিরকালের শ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যানবিদ রোনাল্ড ফিশার এই ইনস্টিটিউটে এসেছেন বিভিন্ন উপলক্ষে আটবার। একবার যখন তিনি ইনস্টিটিউটের কয়েকটি শাখা পরিদর্শন করে ইংলন্ডে ফিরে যাচ্ছিলেন, আমার কাছে পোস্ট-কার্ডে এক লাইনের একটি চিঠি লিখে পাঠান : বটগাছটা বড়ো হচ্ছে তো?'

বটগাছে রয়েছে অসংখ্য শাখা—প্রত্যেকটি শাখা পৃথক এবং এমন কি স্বতন্ত্র। কিন্তু খোদ গাছটির মধ্যেই রয়েছে সকল শাখার ঐক্য। বলা বাহুল্য, খোদ পরিসংখ্যানের মধ্যেও রয়েছে এমনি বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য। প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণ বা প্রত্যেকটি নমুনা স্বতন্ত্র, আবার এক সঙ্গে হলে তাদের নিয়েই একটি ঐক্য। পরিসংখ্যানের প্রত্যেকটি দিক স্বতন্ত্র, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারাই গড়ে তোলে ঐক্য। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য—আমাদের এই লক্ষ্যবাণী নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি।

এই লক্ষ্যবাণীর তাৎপর্য আরো অনেক গভীর। প্রায় চল্লিশ বছর বা তারও বেশি কাল ধরে আমাদের এই ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যে ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে বা বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা ব্যক্তি এখানে এসে মিলিত হন। একথা স্মরণ করতে আমি গর্ববোধ করি যে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে আমাদের এখানে, সাময়িক পরিদর্শক নয়, অতিথি এসেছিলেন আমেরিকা, ইংলন্ড ও ফ্রান্স থেকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশ থেকেও। কয়েক মাস তাঁরা এখানে ছিলেন, একই ছাদের নিচে। প্রতিষ্ঠা-দিবসে আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই মঞ্চের ওপরেই রুশ, ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাসী ও অন্যান্যরা একযোগে একটি সংগীতের আসর বসিয়েছিলেন। আমার আরো মনে পড়ছে, ১৯৫৪ সালে জওহরলাল নেহরু এখানে এসেছিলেন ও সারা বিশ্বের অতিথিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কোনো এক স্থানে, সম্ভবত লক্ষ্ণৌ-এ প্রদত্ত একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ভারতে ইনস্টিটিউট-ই একমাত্র স্থান যেখানে এ-ব্যাপারটি ঘটতে পারে।

বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য—কথাটার তাৎপর্য আরো অনেক গভীর। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ছাড়া ভারত টিকে থাকতে পারে না এবং আমি সাহস করে বলতে পারি—মানব সভ্যতাও নয়।...

তারপরে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন : ইনস্টিটিউট থেকে যাঁরা স্নাতক হচ্ছেন বা ডিপ্লোমা পাচ্ছেন, ইনস্টিটিউটে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা যেন বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের লক্ষ্যবাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন—ধর্মগত, সংস্কৃতিগত ও সমাজগত, সকল স্তরে। তাঁরা যেন অন্যদের সঙ্গে এমন আচরণ করেন যেমন আচরণ তাঁরা প্রত্যাশা করেন। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যই হবে তাঁদের বেঁচে থাকার মন্ত্র।

●

অধ্যাপক মহলানবিশ নিজে ছিলেন বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পরিব্রাজক দূত। বিশ্বভারতীর গোড়া থেকেই (১৯২১) দশ বছরের জন্যে তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর সাধারণ সম্পাদক, কিছু সময় বিশ্বভারতী পত্রিকারও সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশে ঘুরেছেন। কাজেই বিশ্বের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সূত্রপাত পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে আবির্ভূত হবার আগে থেকেই। পরবর্তী জীবনে তিনি সারা বিশ্বে ছড়ানো বহু সোসাইটি ও আকাদেমির ফেলো বা সদস্য হয়েছিলেন (রয়েল সোসাইটি, আন্তর্জাতিক ইকোনোমেট্রিক সোসাইটি, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি, আমেরিকান স্ট্যাটিসটিকাল সমিতি, আন্তর্জাতিক স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, জাতি সংঘ স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশন ইত্যাদি ইত্যাদি), বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন, প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ছিলেন। কর্মসূত্রে সঠিক অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের নাগরিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতিনিধি এবং এক্ষেত্রে তাঁর জীবন বিপুল এক সার্থকতার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য—তিনি ছিলেন এই লক্ষ্যবাণীর মূর্ত রূপ।

তাই গোটা জীবনভোর তাঁকে সারা বিশ্বে পরিক্রমা করতে হয়েছিল। সেটা যে কতখানি ব্যাপক সে-সম্পর্কে ধারণা হতে পারে যে-কোনো একটি বছরের সফর-সূচীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে। যেমন ১৯৬৫-৬৬ সালে শুরু হয়েছিল এপ্রিলের ২০শে এপ্রিল থেকে, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে। অতঃপর ৩০শে এপ্রিল ওয়াশিংটনে, ৫ই মে মস্কোয়, ১৮ই মে প্যারিসে। ২৭শে মে ফিরে আসার পরে ২৩শে ডিসেম্বর আবার মস্কোয়, ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৬৬) প্যারিসে, ১৩ই জানুয়ারী ফিরে আসার আগে আরো একবার লন্ডনে। তৃতীয় দফায় ৭ই ফেব্রুয়ারী শিকাগোয়, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটনে, ২০শে ফেব্রুয়ারী পেনসিলভ্যানিয়ায়, ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কে, ৪ঠা এপ্রিল ফিরে আসার আগে আরো একবার লন্ডনে। কোথাও সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন, কোথাও গবেষণা-সংস্থায় ভাষণ দিচ্ছেন ও আলোচনা করছেন।

এই বিশ্ব-নাগরিক সকল দেশকেই আপন দেশ বলে গ্রহণ করতে পারতেন, বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য খুঁজে পেতেন। তাই কখনো ক্লান্ত হন নি। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অতন্দ্র ভাবনায় স্থির থাকতে পেরেছিলেন।

পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের দান কতখানি, সে-বিচার বিশেষজ্ঞরা করবেন। তবে সে অবদান যে বিশেষভাবেই মৌলিক তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরিসংখ্যানের যে-কোনো মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা ওলটালে। পি সি মহলানবিশ সেখানে একটি অবধারিত নাম, বিশেষ করে ডি-২ স্ট্যাটিসটিক্স প্রসঙ্গে। আর জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ও জাতীয় সমীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দান যে কতখানি তা আমরা নিজেদের জীবনের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি। কুড়ির দশকে একদল তরুণ প্রেসিডেন্সি কলেজের এক অধ্যাপকের কামরায় দুটি মাত্র সমস্যা সামনে রেখে কাজ শুরু করেছিল। একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে বাংলায় ও ওড়িশায়, অপরটি কৃষিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত। প্রথম কাজের আশু ফল পাওয়া গিয়েছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বনে ও দীর্ঘমেয়াদী ফল পাওয়া গিয়েছিল ডি-ভি-সি ও হিরাকুদ বাঁধের প্রকল্পের রূপায়ণে। দ্বিতীয় কাজটি অনুসরণ করতে গিয়ে সেই ১৯২৫ সালেই স্যার রোনাল্ড ফিশারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল এবং তাঁর পরীক্ষা কার্যগুলো ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল। তারপর নৃবিদ্যা ও আবহবিদ্যা নিয়ে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ তারপরে জাতীয় সমীক্ষা গড়ে তোলার জন্যে তত্ত্বগত ও ক্ষেত্রগত পর্যবেক্ষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ভিত্তিতে ডেমোগ্রাফি, পঞ্চাশের দশকে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে ও স্ট্যাটিসটিকাল কোয়ালিটি কনট্রোল। একই সঙ্গে আরো অনেক অনেক কিছু—ডি-এন-এ আর-এন-এ থেকে ওয়াইল্ড লাইফ পর্যন্ত, অডিও-ভিসুয়াল যন্ত্র থেকে ডাইনোসরের ফসিল পর্যন্ত, তাঁত থেকে ইলেকট্রনিক কম্পিউটর পর্যন্ত। যেন মস্ত এক বটগাছ অজস্র শাখা মেলে দিয়েছে।

বটগাছটি বড়ো হচ্ছে তো? অনেক অনেক বড়ো, অনেক অনেক তার শাখা—পৃথক ও স্বতন্ত্র। তবুও এই গাছেই তার ঐক্য। গাছটি আরো বড়ো হবে আর ঘোষণা করে চলবে সেই মানুষটির কথা যিনি এই গাছের স্রষ্টা আর সেই বাণী : ভিন্নৈষ্বৈক্যস্য দর্শনম—বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য।

এই বটের ছায়া আমাদেরও আশ্রয়, এই কথাটি যেন না ভুলি। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ চিরজীবী হয়ে থাকুন।

—অরুণকান্ত

লাইল্যাক

নির্মল সরকার

সুপ্রীতি জানলার পর্দা তুলে নিজেদের ফ্ল্যাট বাড়ীটা দেখতে লাগল। এতদিন সে তাদের ফ্ল্যাট থেকে এই নার্সিং হোমটা দেখতে পেত। প্রণবেশকে নিয়ে যে তাকে লাইল্যাক নার্সিং হোমেই উঠতে হবে একথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এখান থেকে ফ্ল্যাটটা দেখতে অদ্ভূত লাগছে। সামনের ঘরের জানলার ভাঙ্গা কাঁচটাও বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কাঁচটা কি করে ভেঙ্গেছিল মনে পড়ল সুপ্রীতির।

সুপ্রীতি চুপ করে বসেছিল অন্ধকার ড্রয়িং রুমের মধ্যে। প্রণবেশের ছ'টার মধ্যেই ফিরে আসার কথা। রোজই তাই করে কিন্তু যেহেতু আজ তার দরকার তাই প্রণবেশ ইচ্ছে করেই দেরী করছে। তার বাপের বাড়ীর সম্পর্কে কোন নিমন্ত্রণ বা খাবার কথা থাকলেই প্রণবেশের দেখা পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। এ ঘটনা নতুন নয়, সুতরাং আশ্চর্য হয়নি সুপ্রীতি। সাজ সজ্জা করে অপেক্ষা করছিল সে প্রণবেশের জন্যে। যাওয়ার ইচ্ছে আর তার নেই।

প্রণবেশ ঘরে ঢুকে বলল—কি, তুমি বসে আছ যে। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে একবার তাকাল সুপ্রীতি তারপর হিস হিস করে বলল—কার বাড়ী আজ আড্ডা দিয়ে এলে। মিসেস শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা হল?

—তার মানে যুদ্ধের গন্ধ পেল প্রণবেশ। এতক্ষণ পরে তার মনে পড়ল আজ একটা নিমন্ত্রণ ছিল যেন।

আজ নিমন্ত্রণের কথা মনে ছিল না?

কেন— থাকবে না-? কিন্তু পবিত্রর তো তোমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। পবিত্র প্রণবেশের ছেলে এবার এম-এ পাশ করে চাকরীর সন্ধানে আছে।

—তুমি জান না পবিত্রর আজ মিটিং আছে?

—কিসের মিটিং? একটু অবাক হওয়ার চেষ্টা করে প্রণবেশ। প্রণবেশের ন্যাকামী দেখে বিস্মিত হয়নি সুপ্রীতি। তবে ক্রোধের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। টেবিলের ওপর থেকে অ্যাসট্রে নিয়ে সে সোজা প্রণবেশকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা কাঁচটায় লেগেছিল। সুপ্রীতি একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল তারপর ঘুরে একবার প্রণবেশের দিকে তাকাল।

প্রণবেশ শুয়ে আছে বেডের ওপর। চোখ দুটো বন্ধ। হাত, পা, শীর্ণ আর ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে পাশের টুলটায় বসল সুপ্রীতি।

ধীরে সুস্থে কাজ করা সুপ্রীতির কুষ্ঠিতে লেখেনি। চীৎকার করে কাজ করা সুপ্রীতির অভ্যাস। কতদিন এই নিয়ে স্বামী এমন কি সন্তানের সঙ্গেও তার
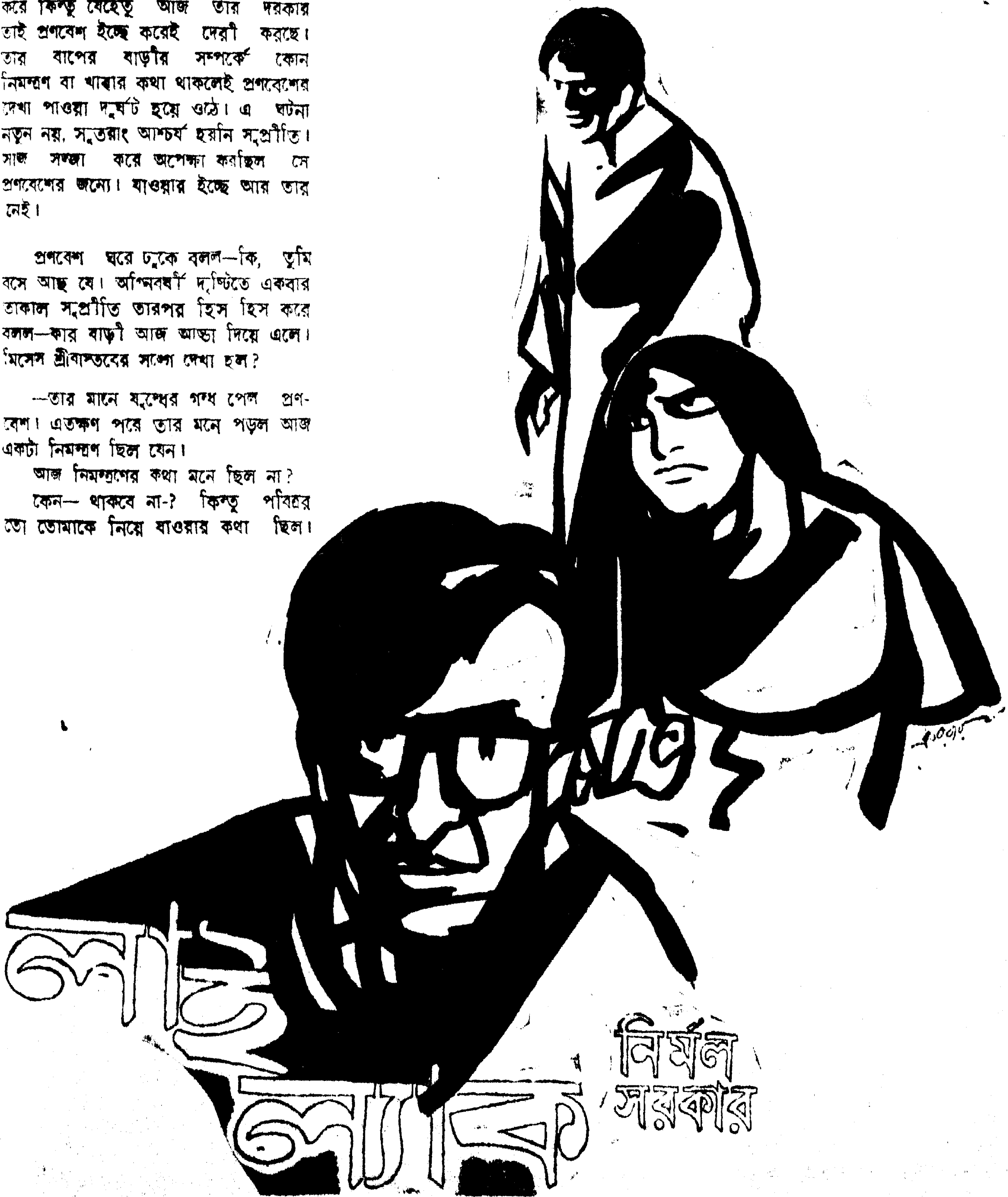
ঝগড়া লেগেছে। আজ কিন্তু হঠাৎ তার অভ্যাসটা আপনা হতেই পাল্টে গিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে প্রণবেশ আরও একটু ঘুমুক, আর একটু স্নিগ্ধ হোক তার স্নায়ু আর মন। স্নায়ু মানে কি? নার্ভ? বেশ, নার্ভই হল, সেটা ঠান্ডা করার জন্যে এত চেষ্টা কেন? তাকে উত্তেজিত করেই বা এত আনন্দ কেন? ওই যে লোকটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, ওর স্নায়ু স্নিগ্ধ হচ্ছে? প্রণবেশ আজ এত ক্লান্তই বা হল কেন—রোগের জন্যে? পৃথিবীতে কত রোগ যে আছে।...

—না, মিসেস দে আপনার স্বামীর রোগ একদিনে হয়নি ধীরে ধীরে রোগটা বেড়েছে—ডাক্তার সেন বললেন সুপ্রীতিকে।

—কিন্তু ডাঃ সেন আমরা তার কোন চিহ্নই পাইনি কেন?

—উনি কোন উপসর্গের কথা বলেন নি? পাল্টা প্রশ্ন করলেন ডাঃ সেন।

—না কিছুই বলেন নি। (গোমড়া মুখ মানেই অসুখ নাকি)

—মানে মাথার যন্ত্রণা বা ওই ধরনের কিছু? ডাক্তার সেন আরও কিছু জানতে চান।

—না—(আমার সঙ্গে দেখা হলেই তো রেগে উঠতাম, একথা জানবো কি করে)

—দেখেও বুঝতে পারেননি?

—দেখে বোঝবার মতো বিদ্যে কি আমার আছে (ডাক্তারী করতে হবে না, টাকা নেবার কথা নিয়ে কেটে পড়)।

—ব্লাডপ্রেসার চেক করা হয়নি?

—(কি যন্ত্রণা—ডাক্তার যে আমাকেই জেরা শুরু করল!) হয়তো অফিসে করিয়েছেন, আমায় কিছু বলেননি)।

—ওঁদের চিকিৎসার খরচ অফিসই দেয়?

—হ্যাঁ, (শুনে ডাক্তারবাবুর মুখটা শুকিয়ে গেল কেন?) অবশ্য আমাদের পছন্দমতো ডাক্তারও আমরা দেখাতে পারি—

—খুব সাবধানে রাখতে হবে এখন থেকে—

—ছেলেমানুষ তো নন, নিজে না সাবধান হলে—

—তাহলেও ওয়াচ করতে হবে—মানে খাওয়াদাওয়া এবং রেস্ট যাতে পান—

—হ্যাঁ, উনি তো সকাল সকালই শুয়ে পড়েন (আমরা তিনজনে তিন ঘরে শুই তা জান?)

—ঘুমোন?

—তা বলা শক্ত—মানে চোখ বুজে শুয়ে থাকলে কে আর বুঝবে বলুন—হাসল সুপ্রীতি।

—কিছু মনে করবেন না মিসেস দে, দু-একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি—শুনেছি আপনাদের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য আছে, একথা কি সত্যি?

—সংসার করতে গেলে মনোমালিন্য তো থাকবেই ডাক্তারবাবু—(তুমি কি গিন্নীর পাদোদক খাও, না ঝাঁটা খাও?)

—মানে যাতে অশান্তি বেশী না হয়—

—বুঝেছি ডাক্তারবাবু, আমার দিক দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করব (ব্লাডপ্রেসার হলেই কি মরে যাবে নাকি? আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে আমি কি চুপ করে থাকব? নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবো।)

—নার্স, জল—প্রণবেশের গলা।

—হাঁ কর—আমি দিচ্ছি, নার্স বাইরে গেছে। সুপ্রীতি জল দেয়।

—ক'টা বেজেছে? জিজ্ঞেস করল প্রণবেশ।

—বেলা এগারোটা—সুপ্রীতি ফিডিং কাপের নলটা প্রণবেশের মুখের মধ্যে দিল আবার একটু পরেই মুখটা সরিয়ে নিল প্রণবেশ।...

—ওকি ভাই, মুখটা সরিয়ে নিচ্ছ কেন। দেখ আমি তোমার দিদিশাশুড়ী হই...সম্পর্কটা তোমার পছন্দ নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওরে বাবা, এ যে আবার আজ্ঞে-বিজ্ঞে করে। হাসির রোল উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

—এটা খেয়ে নাও ভাই—

—এ'টো খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

—না ভাই সুপ্রীতি তুই যেন আবার রাগ করিস না—নে, আর একটু খা—

উলু উলু উলু...

সুপ্রীতির বিয়ের রাতের কথা মনে পড়ল। সেই প্রকান্ড থামওয়ালা বাড়ী—চারিদিকে আলো, ফুলের গন্ধ আর সানাই-এর করুণ সুর। সেই বর আসার সময় আর সানাই-এর করুণ সুর। সেই বর আসার সময় তুমুল করে কলরোল আর শঙ্খধ্বনি। না, প্রণবেশকে আর চেনা যায় না। মুখটা শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। গালের মধ্যে একটা গর্ত চোখের তলায় কালি, মাথার চুল প্রায় নিঃশেষ।

স্বামীকে সে ভালবেসেছিল? এখন সুপ্রীতি ওসব ভাবতে পারছে না তবে প্রণবেশকে সে সহ্য করেছে যেমন প্রণবেশও তাকে করেছে। বাক্যবাণে প্রণবেশকে জর্জরিত করতে তার ভারী ভাল লাগত। ভয় পেয়ে অনেক সময় কাপুরুষের মতো প্রণবেশ পালিয়ে যেত। চোখা চোখা কথার বাণগুলো বি'ধে কতখানি ক্ষত তৈরী করতে পারতো—বিষ ক্রিয়াটা কিভাবে তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলত সেটা সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করতে চেষ্টা করত সুপ্রীতি। ভাল লাগতো তার অত বড় এক-জন পুরুষ মানুষ তার কথায় ছটফট করছে দেখে, আনন্দ পেতো সে প্রচুর। পবিত্র তাদের একমাত্র সন্তান। তাকে মানুষ করার দায়িত্ব প্রণবেশই নিয়েছিল। শিশুকাল থেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে সে নানা জায়গায় ঘুরেছে। ছেলেকে শিক্ষিত করে তুলতে প্রণবেশ যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে।

—সুপ্রীতি তাতে বাধা দেয় নি। কিন্তু ফল কি হয়েছে? ছেলেকে মানুষ করেছে বলে বড় বড়াই করে বেড়ায়—শেষ অব্দি কি হল? একটা চাকরী পর্যন্ত যোগাড় করতে পারলো না। ছেলেটা চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে দেখেও প্রণবেশ কিছু করতে পারছে না। এখন অসুখ বাধিয়ে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে আছে। ভারী মজা! মুখ বিকৃত করল সুপ্রীতি।

প্রণবেশ ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে এক-বার দেখল। অজানা অচেনা জায়গা। নার্সিং হোমে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে বা হচ্ছে এটা সে কোন অবসরে যেন শুনেছিল। সামনের টুলে বসা সুপ্রীতিকে দেখল একবার। মুখটা অস্পষ্ট লাগছে। চশমাটা একবার হাত দিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করল সে। না, সেটা নেই। টুলের ওপর নার্সকেও দেখতে পেল না সে। নার্সের পোশাকে সুপ্রীতিকে কেমন দেখাবে? হেভেন ফরবিড্‌। সকালের নার্সের মতোই গায়ের রং সুপ্রীতির আর তেমনিই বপুর বহর। বয়স হলে মেয়েরা মোটা হয়ে যায় কেন? অবশ্য সব ক্ষেত্রে নয়। মিসেস শ্রীবাস্তবকে দেখলে মনে হবে বিয়েই হয়নি অথচ তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে বছর পাঁচেক। মিসেস শ্রীবাস্তবের নাম করে সুপ্রীতি তাকে অনেক গঞ্জনা দেয়। পুওর গার্ল—ওকে হিংসে করে কি করবে আর তাছাড়া রীণা শ্রীবাস্তব তাকে বড় ভাইয়ের মতোই সম্মান করে। আসল কথা সুপ্রীতির ছোটবেলার শিক্ষাই এর জন্যে দায়ী। শুধু শাড়ি-গাড়ি আর হীরের গয়নার কথাই তার ভাল লাগে। ওর বাবার বাড়ির ঐশ্বর্য আর গুণগান শুনতে শুনতেই তার সারাজীবন অতিষ্ঠ হয়েছে। আর তেমনি অকর্মণ্য তা না হলে তিনজনের সংসারে তাকে পাঁচ-জন লোক পুষতে হয় কেন? মিসেস রীণা শ্রীবাস্তব শুধু একটা আয়ার ভরসায় সংসার চালায় কি করে? সে-দৃষ্টান্তর কথা একবার উত্থাপন করেই তা[illegible] যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে। অত বড় ছে[illegible] পবিত্রর সামনে তাকে চরিত্রহীন সাজিয়ে ছেড়েছে সুপ্রীতি। শুধু এই একবার নয়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সুপ্রীতি তাকে ছোট করতে চেষ্টা করেছে সকলের সামনে। অথচ সুপ্রীতি এমন ছিল না। আশ্চর্য! কত পরিবর্তনই যে হয়েছে! সে নিজেও কিছু কম পালটায়নি। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। অনেক জিনিসই তো সহ্য করে নিতে হয়—না, প্রণবেশের দিক দিয়ে সহ্য করার কার্পণ্য এপর্যন্ত কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ আশ্চর্যের কথা সুপ্রীতি বা ছেলে পবিত্র তার ঘাড়েই সব দোষ চাপায়। এটা কেন হল? সুপ্রীতির কথা-মতই সে পৈত্রিক বাড়ির অংশ ছেড়ে দিয়ে ফ্ল্যাটে চলে এসেছিল। কিন্তু তাতে লাভটা কি হল? এর থেকে বরঞ্চ সে বাড়িটায় তারা সুখে ছিল। মনটা অনেক দিকে দিতে পারতো—আপনার জনকে বাঁচাতে চেষ্টা করত শরিকের বাক্যবাণ আর দুর্ব্যবহারের আঘাত থেকে। এতগুলো লোক পুষে কলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া করে থেকে কোন-দিক দিয়েই সুবিধে হয়নি তার। সুপ্রীতির অজুহাত ছিল, পৈত্রিক বাড়িতে ছেলেকে মানুষ করতে পারা গেছে? সুপ্রীতি সব-দিক রক্ষা করতে গিয়ে পবিত্রকে অমানুষ করে দিয়েছে। সন্তানের সামনে যদি স্বামীকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দেওয়া

হয়, পদে পদে তাকে ছোট করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সে সন্তান বাবাকে মানবে কেন? প্রণবেশ অবশ্য কোনদিনই চায়নি যে, ছেলে তার আজ্ঞাবহ হয়ে থাক। কিন্তু চোখের সামনে যদি একটা আদর্শ না থাকে, আর সেটাকে যদি ভাল বলে মেনে নিতে না পারে, তাহলে কি ধরে সে উঠে দাঁড়াবে!

প্রণবেশ জানলার দিকে একবার তাকাল। জানলার ওপরে একটা চড়ুই পাখী বসে আছে। বিবর্ণ জানলার পাল্লার ওপর ওকে কেমন যেন বেমানান লাগছে। চড়ুই পাখীটাও স্পষ্টভাবে দেখতে পারছে না প্রণবেশ। অস্পষ্টতার মধ্যে কিন্তু রহস্যের ইঙ্গিত আছে।

—প্রীতি, ডাকল প্রণবেশ।

—হ্যাঁ, এই যে আমি, কি চাই বল? একটু ঝুঁকে সুপ্রীতি তার দিকে এগিয়ে এল।

—অফিসের কেউ এসেছিল?

—(কেউ বলতে তো শ্রীবাস্তব) না, কেউ আসেনি। আর এলেও কারও সঙ্গে তোমার দেখা করা চলবে না।

—কেন, বিরক্ত হয় প্রণবেশ।

—ডাঃ সেন বারণ করেছেন। (অত্যাচার করে রোগ বাধিয়েছ জান না? এখন ভুগে মর) একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর না।

—হুঁ—(এখন ঘুমুতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। দিনের পর দিন শুধু চীৎকার আর ঝগড়া করে যখন অস্থির করে এই রোগ জুটিয়ে দিয়েছ তখন মনে ছিল না)

—(মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টিও কেমন অদ্ভুত লাগছে—তাহলে কি) একটু দুধ খাবে?

—না (দরদ বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে—সুস্থ থাকতে একদিনও খেতে দিয়েছ? প্রত্যেকদিন কানের কাছে হাজার রকমের ঝামেলা নিয়ে জ্বালিয়েছ—এখন সেসব আর মনে নেই)

—একটু খাও (লাইফ ইন্সিওর করেছে জানি, কিন্তু কত টাকা কে জানে! কার নামে করেছে—আমার না পবিত্রর?)

—পবিত্র কোথায়?

—বোধহয় ফ্ল্যাটেই আছে।

—সকাল থেকে এখানে আসেইনি! অবাক হয় প্রণবেশ।

—বোধহয় কোন কাজে আটকে গেছে (আর এলেই তো কপাল কুঁচকে যাবে, মুখে বিরক্তি ফুটে উঠবে। অত বড় ছেলের নিমর্যাদার উপদেশ শুনতে নিশ্চয় ভাল লাগে না)

—কি কাজ আবার? (কাজ মানে সেই কালো মুটকী মেয়েটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোন করা আর তাকে নিয়ে অভিনয় করার নামে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান)

—বড় হয়েছে, চাকরী বাকরী নেই—চেষ্টা করতে হবে তো? (তুমি তো বাবা হয়ে সবই করলে—শুধু বড় বড় অফিসার আর তাদের সুন্দরী বৌদের তাঁবেদারী করেই বেড়ালে সারাজীবন। নিজের একমাত্র ছেলের একটা হিল্লেও করতে পারলে না—মুরোদ যে কত তা আর জানতে বাকী নেই।)

প্রণবেশ সুপ্রীতির কথার জবাব দিল না—কথার পর কথায় আরও ঝামেলা বাড়ে একথা সে জানে। সে অসুস্থ বলে সুপ্রীতি যে তাকে রেহাই দেবে এমন কোন কথা নয়। পবিত্রকে নিয়ে সুপ্রীতি তাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করে থাকে। পবিত্র ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম-এ। আজকালকার দিনে সেটা যে একটা খুব গৌরবজনক ব্যাপার তা কেউ ভাববে না। পরীক্ষায় পাশ করতে হলে শুধু কয়েকটা টাকার ওয়াস্তা। প্রণবেশের মনে পড়ল তাদের অফিসের একটি পরীক্ষায় এম-এ পাশ পরীক্ষার্থীরা কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। লিউকিমিয়া কি উত্তর দিতে গিয়ে একজন লিখেছিল, লিউকিমিয়া রুমানিয়ার রাজধানী। নীল আর্মস্ট্রং কে, তার উত্তরে আর একজন লিখেছিল ইনি মধ্যযুগের একজন মহাশক্তিশালী রাজা ছিলেন। এর গায়ের রং ছিল নীল বর্ণের আর হাতে অসম্ভব জোর ছিল। অবশ্য তার ছেলে পবিত্রও যে ওইরকম বুদ্ধিমান তা নয়, তবে ছেলেটাকে সুপ্রীতি যদি একটু সাহায্য করত, তাহলে সে এভাবে উচ্ছন্নে যেত না। পবিত্র যখন ওই মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল, তখন সুপ্রীতি প্রত্যক্ষ না হলেও, পরোক্ষভাবে তাকে উৎসাহ দিয়েছিল, এমনকি এ নিয়ে হাল্কা রসিকতাও করেছিল। অভিনয়ের ব্যাপারেও পবিত্রকে উৎসাহ তার মা-ই দিয়েছিল সে নয়। বরঞ্চ সে আপত্তি জানিয়েছিল যে সে এটা অপছন্দ করে—স্পষ্টভাবে পবিত্রকে জানিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হয়নি। পবিত্র চিরদিন যেমন সুযোগ নিয়েছে, এবারও তাই নিল। বাবা আর মায়ের মনোমালিন্য তাকে সবদিক দিয়েই সাহসী করেছে। সুপ্রীতিই বা কি ভাবছে এখন? সে মরে গেলে ইন্সিওর আর অফিসের টাকাগুলো নিয়ে কি করবে তাই ভাবছে হয়ত। তার মৃত্যুর পর সুপ্রীতি বা পবিত্র যাই করুক তাতে তার কিছু এসে যাবে না। সুপ্রীতি খুব সম্ভব ফ্ল্যাট ছেড়ে বাবার বাড়িতেই উঠবে আর উকিলদাদার পরামর্শেই চলবে। প্রথম প্রথম আদরযত্নই পাবে, তারপর যখন টাকার অঙ্ক কমতে শুরু করবে তখনই সুপ্রীতির দুর্দিন শুরু হবে। এ-কথা সুপ্রীতিকে কে বোঝাবে? উকিলদাদার ওপর তার প্রগাঢ় বিশ্বাস। পবিত্র কি করবে? সেই টালীগঞ্জের কালো-কুচ্ছিৎ মেয়েটার সঙ্গে কি সারাজীবন ঘুরে বেড়াবে—না অভিনেতা হিসেবে নাম করবে? এরকম তো আজকাল আকছার হচ্ছে, টাকাও পিটছে প্রচুর। নামজাদা লোকের বাবা হতে কেমন লাগবে কে জানে? তবে পবিত্রর বাবা হিসেবে পরিচিত হওয়া কি খুব আনন্দদায়ক হবে? আর সে নিজেই বা কম কি? অফিসার হিসেবে তার নাম শুধু কলকাতাতেই

দীর্ঘায়ত্ত নয়। এখনও মদ্যের হেড অফিস তার পরামর্শ বিশেষভাবে সমাদর করে।

—কি বলছ, জিজ্ঞেস করল সুপ্রীতি।

—কই কিছু নয়তো।

—হ্যাঁ, পবিত্রর নাম করে কি বলছিলে যেন। স্বপ্ন দেখছিলে?

—তা হবে।

সুপ্রীতি দেখল প্রণবেশ আবার চোখ বন্ধ করেছে। আচ্ছা, প্রণবেশের রাত্রে যদি কিছু হয়, তাহলে কি করা উচিত? দাদাকে খবর দিলে কেমন হয়? কিন্তু দাদাই বা আসবে কি করে? ড্রাইভার না থাকলে গাড়ি চালাবে কে? পবিত্র কি সব ব্যবস্থা করতে পারবে? টাকার কি হবে? কাছে যা আছে তাতে কুলিয়ে ওঠা মুশকিল। চাবিবন্ধ ড্রয়ারে হাত দিতে দেয় না কাউকে, তাতে নগদ টাকা আছে? ইন্সিওরের টাকা কিভাবে তুলতে হবে? দাদা সব জানে। কিন্তু সাদা কাগজে সই করতে ও বার বার বারণ করেছে। দাদা যদি তাই চায় তাহলে কি করব? দাদা কি আমায় ঠকাতে পারে? ইন্সিওরের কত টাকা তাও কিছু বলেনি, তবে প্রিমিয়াম বেশ মোটা দেয়। যদি ষাট হাজার টাকা হয়? তাহলে টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে সুদেই চালাতে হবে। তাতে কি কুলোবে? বাড়ি ভাড়াই তো কম করে দুশো টাকা হবে। তাহলে...

প্রণবেশ চোখ মেলে দেখল জানলার ওপর চড়ুই পাখীটা কোন্ ফাঁকে যেন উড়ে গিয়েছে।

অতুলনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

সহধর্মিণীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র প্রতিভা প্রস্ফুটিত করতে যাঁর দান সবচেয়ে বেশি সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত অবদানও অসামান্য। প্রতিভার বরপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের যে যে শাখাটিকে স্পর্শ করেছেন সেখানেই রেখে গেছেন চিরস্থায়ী অবদান।

১২৫৫ বংগাব্দের ২২শে বৈশাখ (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম। ১৮৬৪ খৃঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অতঃপর ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। অসাধারণ রূপবান ছিলেন তিনি। এই সময়কার একটি সুন্দর স্মৃতিচিত্র পাচ্ছি নাট্যাচার্য রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের লেখায়। সময়টা তখন ১৮৬৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ও অমৃতলাল পাশের বাড়ী হিন্দু স্কুলের ক্লাশ সেভেনের ছাত্র—বয়স তেরো।

কলেজ ছুটির পর এক-একদিন ঘোড়ার গাড়ি আসতে দেরি হলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। অমৃতলাল আড়াল থেকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন হাঁ করে। রসরাজ অমৃতলাল পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিলেন, 'তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য যে কোন গ্রীক ভাস্করের আদর্শ হইতে পারিত। তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়

সে সব কি দিনই না গেছে! জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী কাব্য সঙ্গীত ও প্রতিভার সম্মেলনে জম-জমাট! কত বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের লোকের আনাগোনা। এরই ফাঁকে একটি নিরালা ঘরের কোণে পিয়ানোর অপূর্ব সুর তুলেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাশে বসে কাগজ পেন্সিল নিয়ে সেই সুরের তানে কথা বসিয়ে গান রচনায় ব্যস্ত। উৎফুল্ল ও সস্নেহ নয়নে তাঁদের দিকে চেয়ে রয়েছেন বাড়ীর 'কনিষ্ঠা বধূ' কাদম্বরী দেবী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের এই মধুরতম দিনগুলিকে ভুলে যাননি কখনও। তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৩১ খৃঃ যে জয়ন্তী উৎসব বিপুল সমারোহে উদযাপিত হয়, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে।

'পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়ীতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোন বাঁধন পরাননি। তার সংগে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত-বিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার উপর কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন, তাহলে ভেঙেচুড়ে তেড়ে বেঁকে যা হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্র সমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।'**

** প্রসঙ্গত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবিত থাকাকালেই ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে—

'তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।

...কোন বিধিবিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।'

১৯২০ খৃঃ স্বর্ণকুমারী দেবী ভাইফোঁটায় চন্দন পাঠান জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখে পাঠান ছোট্ট কবিতাটি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বালক ছিলাম তাহাই রক্ষা, নতুবা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা হইলে কি করিতাম বলা যায় না।'

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হল শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি রচনা করলেন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ।' এটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এই প্রহসনটিকে কেন্দ্র ক'রে সে যুগের সাময়িক পত্রগুলিতে তুমুল বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। কেশবচন্দ্র সেনমহাশয়ের 'ইন্ডিয়ান মিরর' দিনের পর দিন এই প্রহসনটির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকে। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই প্রহসনটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উৎসাহী ব্রাহ্মদের 'অতি অশ্লীল, অতি অন্যায়' কটাক্ষ করেছেন-- এমন কি নাকি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধেও এই প্রহসন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনের' খ্যাতি আকাশচুম্বী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে এক কপি 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' বঙ্গদর্শন কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন সমালোচনার জন্য।

সমালোচনা করলেন সাহিত্য সম্রাট। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই নবীন গ্রন্থাকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বঙ্গ সাহিত্যের আঙিনায় বরণ করে ছিলেন। সাহিত্য সম্রাটের সেই অপরূপ সমালোচনা এযুগের পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

'একেই কি বলে সভ্যতার' জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে, হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জিত--একেই 'কি বলে সভ্যতা এবং সধবার একাদশী। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ঐ দুই প্রহসনের তুল্য নয় বটে কিন্তু ইহাকেও বর্জিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এই প্রহসনের একটি গুণ এই যে, তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক। এ প্রহসন, প্রহসন মাত্র কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য্য না থাকুক নিতান্ত অভাবও নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে, তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুক্ত, তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে।...

...পরন্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর। ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাংলা প্রহসনে প্রায়ই তাহা অসহ্য কষ্টকর।... মুক্তকণ্ঠে ইহা বলিতে পারা যায় 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে কদর্য ভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমন কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।'

এরপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'পুরুবিক্রম নাটক।' এই নাটকটি পাঠে প্রসন্ন হয়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্গদর্শনে মন্তব্য করলেন,

'এই নাটকে বৈচিত্র্য আছে, লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতি[illegible] বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পাঠ[illegible] বোধ হয়। এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জিত[illegible]চি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার [illegible] করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

তাহা হইলে বাংলা নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্যতা থাকিবে না।'

পুরুবিক্রম নাটকটি সাধারণ রঙ্গালয়ে (ন্যাশনাল থিয়েটারে) অভিনীত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরে এটি গুজরাটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।**

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অতঃপর 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'—এই দুখানি নাটক লিখে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করলেন। এই দুটি নাটকই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে অকল্পনীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করে, তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার আর সেযুগে কেউ ছিলেন না। প্রত্যেকটি নাটকের কাটতি হয়েছিল যথেষ্ট—এক-একটির পাঁচটি করে সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এই পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ নাটক 'স্বপ্নময়ী।' নাটকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর চমৎকার সংলাপ ও অপরূপ সুন্দর গানগুলি। বলা বাহুল্য এ নাটকটিও মঞ্চ সফল ও নাটকাকারে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আশ্চর্যের কথা নাট্যজগতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন এই রকম জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, তাঁর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পেনসিল স্কেচ

**প্রসঙ্গত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অশ্রুমতী নাটক (১৮৭৯ খৃঃ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন ১৮ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলন্ডে। উৎসর্গ-পত্র বড় চমৎকার।

ভাই রবি,

তুমি অশ্রুমতীকে দ্যাখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতী কে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলন্ড প্রবাসে তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও ঘোচে, তাহলে আমি সুখী হব। তোমার

জ্যোতি দাদা।
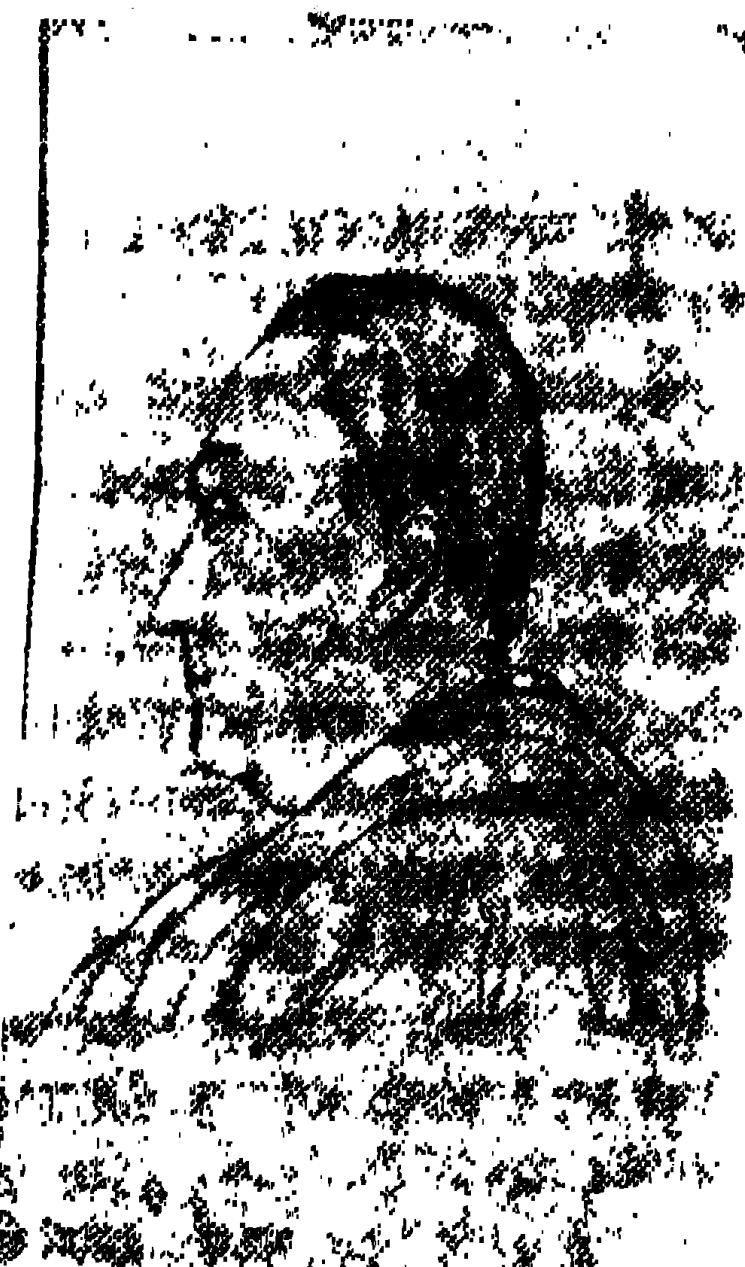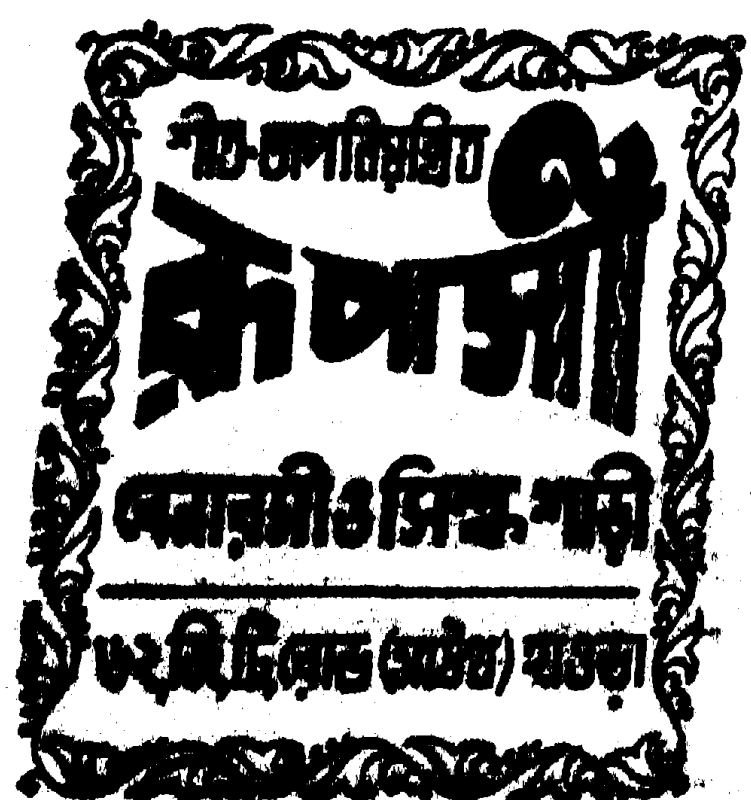
কলম হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। শত অনুরোধেও নাটক আর লিখলেন না তিনি। বাংলাদেশের সুদূরতম পল্লীতেও যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক যাত্রাকারে অভিনীত হচ্ছে—শহরের রঙ্গালয়গুলি দর্শকের আনন্দ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে খ্যাতিকে ছেঁড়া জুতোর মত অবহেলায় ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।**

তাবৎ সাহিত্যরসিকেরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যজগত থেকে এই অপ্রত্যাশিত বিদায়ের সঠিক কারণ অনুসন্ধানে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। অনেকেই বলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনে কখনও যশোলাভকে সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন নি। তাঁর অপূর্ব প্রতিভা তিনি সর্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে চাইতেন। সম্বর্ধনা ও প্রশংসার উচ্ছ্বাসে তিনি হাঁফিয়ে উঠতেন।

কেউ বলেছেন পত্নী কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে (১৮৮৫) তিনি নাটক লেখার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পরবর্তীকালে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে এক আশ্চর্য উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। এ উত্তর তাঁর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব—মানসিক ঔদার্য কত উঁচু হলে এ উত্তর দিতে পারা যায়—জানি না। তিনি বললেন, 'ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক-রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্যসেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।'

নাট্যাচার্য রসরাজ অমৃতলাল বসুও একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। এবারও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন তৎক্ষণাৎ 'নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই।'

দারুণ বিস্মিত অমৃতলাল বলেছিলেন, 'আমার এই দীর্ঘজীবনে কাহারও মুখে 'লিখিবার প্রয়োজন নাই'—এইরূপ উত্তর শুনি নাই।' এরই ফাঁকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত প্রহসন 'এমন কর্ম আর করবো না' পরবর্তীকালে যা 'অলীকবাবু' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী থেকে সুবিখ্যাত মাসিকপত্র 'ভারতী'র সূচনা হয়। সম্পাদকরূপে নাম ছাপা হল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের। কিন্তু আসলে এই মাসিক পত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয়া শরৎকুমারী চৌধুরাণী বলছেন, 'যদিও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহা-

---

** অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী বিনোদিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক সম্বন্ধে এক অপরূপ স্মৃতি চিত্র তুলে ধরেছেন 'রূপ ও রঙ্গ' সাময়িকপত্রে—'সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জমত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখতেন সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হয়ে যেতেন। যে কোন একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। সরোজিনী নাটকের একটি দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সেই দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তখন তো বিদ্যুতের আলো ছিল না, স্টেজের উপর ৪।৫ হাত লম্বা টিন পেতে তার ওপর কাঠ জেলে দেওয়া হত। সকলে গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরাসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে—তবু কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।...'

ভারতী পত্রিকার প্রচ্ছদ

মাসিক সমালোচনী পত্রিকা

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত

দ্বিতীয় খণ্ড

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
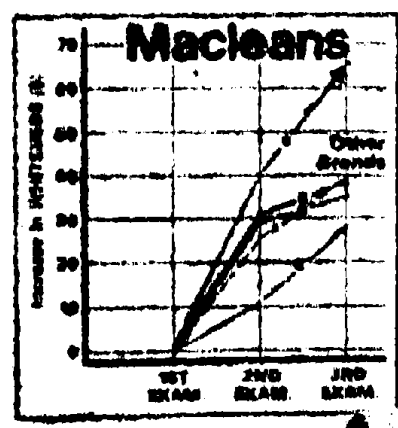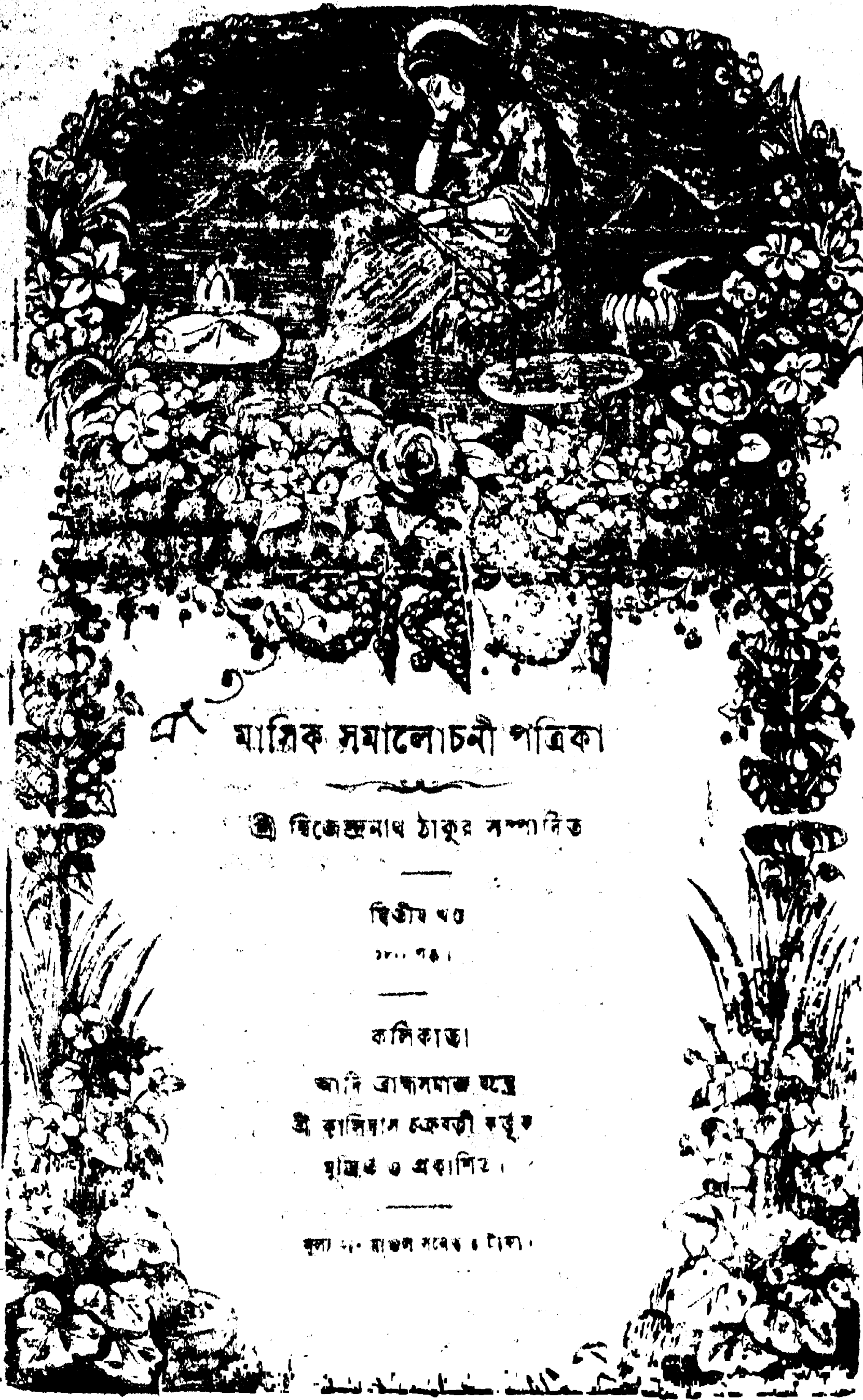
শয়ের নামটি কখনও 'ভারতীর' সম্পাদকীয়-স্তম্ভে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতী জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই মানস কন্যা।' স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনের' মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল...।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনলস প্রচেষ্টা ও অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে 'ভারতী' সে যুগের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কাদম্বরী দেবীর অকস্মাৎ মৃত্যু সমস্ত কিছুই যেন ওলট-পালট করে দিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উভয়েই 'ভারতী' থেকে সরে গেলেন। 'ভারতী'কে বন্ধই করে দিতে চেয়েছিলেন চিরতরে, কিন্তু শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করায় তখনকার মতো 'ভারতী' রক্ষা পেয়ে যায়।

এই শোকাবহ ঘটনার বেশ কিছুকাল পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে (১) সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠা (যেখানে সর্বপ্রথম পরিভাষা বেঁধে দেওয়া ও নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হয়), (২) বিদ্বজ্জন সমাগম (যেখানে মধ্যে মধ্যে তৎকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্য অনুরাগীদের প্রীতি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হত) (৩) সঞ্জীবনী সভা (যেখানে স্বাদেশিকতার জন্য উন্মুখ হয়ে সভ্যগণ সম্ভব অসম্ভব পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করতেন) অনুষ্ঠানের কথা রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী মারফৎ আমরা সকলেই জানি।

এই সময়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বরিশালে স্টীমারের কারবার আরম্ভ করলেন। রয়াল একসচেঞ্জের নীলামে সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা জাহাজের খোল কিনে এ ব্যবসায়ের সূচনা। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে প্রথম স্টীমার 'সরোজিনী' জলে ভাসল। একে একে তাঁর আরও চারটি স্টীমার 'ভারত, লর্ড রিপন, বঙ্গলক্ষ্মী ও স্বদেশী' কাজ সুরু করে। অন্যদিকে একটি বিলাতি জাহাজ কোম্পানীও ... কোম্পানী। সেখানে ঐ একই কারবার শুরু করেছিল। আরম্ভ হ... নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ... দুঃখজনক। সেই ... কোম্পানীও উঠে গেল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কারবারও একেবারে গেল ধ্বংস হয়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন।

এত দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনী ... মৌলিক ও রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বটে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা-উপশাখাকে কিন্তু সমৃদ্ধ করে তুলছিলেন অবিশ্রাম। বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদিতে কত বিচিত্র ধরনের লেখায়, ফরাসী সাহিত্যের বাংলা রূপান্তরে ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকগুলির অনুবাদে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বিখ্যাত পুস্তক 'স্বরলিপি-গীতিমালা' ও মাসিক পত্রিকা 'বীণাবাদিনী'র সম্পাদনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

স্বরলিপি-গীতি-মালা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপিসমন্বিত ১৬৮টি বাংলা গানের সংগ্রহ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আবিষ্কৃত এই বিজ্ঞানসম্মত 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপি-পদ্ধতি সঙ্গীত ও বাজনা শেখা সহজতর করেছে নিঃসন্দেহে। 'বীণাবাদিনী'র পর পর ৯৪টি সংখ্যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে সঙ্গীত রসিক জনসমাজকে চমৎকৃত করেছিল। এরপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কালীপ্রসন্ন

সিংহের বাড়ীতে সঙ্গীত বিদ্যা যাতে সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করে, সেই জন্য 'সঙ্গীত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের শত শত সঙ্গীত অনুরাগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই 'সঙ্গীত সমাজে' যোগ দিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ থেকে 'সঙ্গীত সমাজের' মুখপাত্রস্বরূপ একটি বৃহৎ সঙ্গীতসম্বন্ধীয় মাসিক 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, এই মাসিক পত্রটিরও সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। দীর্ঘদিন এই মাসিক পত্রটি প্রকাশিত হয়ে সঙ্গীত জগতের একটা বড় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছিল।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৭টি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকের সম্পূর্ণ ও অতি সাবলীল বঙ্গানুবাদ করেন। নাটকগুলি হল, অভিজ্ঞান শকুন্তলম, উত্তর রামচরিত, রত্নাবলী, মালতীমাধব, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, মহাবীর চরিত, চণ্ডকৌশিক, বেণীসংহার, প্রবোধচন্দ্রোদয়, নাগানন্দ, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, ধনঞ্জয় বিজয়, প্রিয়দর্শিকা, কর্পূর মঞ্জরী।

ফরাসী ভাষা থেকে অনূদিত প্রহসন 'হঠাৎ নবাব' (মলিয়রের 'ল-বুর্জোয়া-জাঁতিয়ম) দায়ে পড়ে দারগ্রহ (মলিয়রের 'মারিয়াজ ফোর্সে') ও শোণিত সোপান উপন্যাস এবং 'ইংরাজ বর্জিত ভারতবর্ষ' ও 'মিলিতোনা' অনুবাদ সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিশ্চয় চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৌজন্যবোধের কোন তুলনা আছে কিনা বলা বড় শক্ত। একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সহজেই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের কথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স ৬৩। একদিন সকালে এক অখ্যাত সাহিত্যরসিক তাঁর কাছে উপস্থিত। উদ্দেশ্য উপহার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা। আগন্তুকের উদ্দেশ্য শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শান্ত কণ্ঠে বলেন, যে, বই উপহার দিতে তাঁর বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর রচিত বইগুলি উপহার দেওয়ার ব্যাপারে তিনি একটি নীতি মেনে চলেন। নীতিটি হল এই, বই ছাপাতে যত খরচ হয়, বই বিক্রি করে যতদিন পর্যন্ত না সেই খরচটা উঠে আসে, ততদিন সেই বই তিনি কাউকেই উপহার দেন না। এই কথাটি জানিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশখানি গ্রন্থ সেই আগন্তুকের হাতে তুলে দিলেন। কৃতজ্ঞ অন্তরে যখন সেই সাহিত্যরসিক বিদায় নিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে রাখলেন তাঁর ডায়েরীতে। ঘটনাচক্রে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেটাই ছিল প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও ১৪ বছর জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু সেই সাহিত্যরসিক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আর কোন দিন দেখা হয়নি। কিন্তু অতি আশ্চর্যের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কথা রাখতে ভোলেন নি। বছরখানেক পরেই ডাকযোগে আরও কয়েকখানি বই সেই ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছোল। আরও কিছুদিন পরে আরও কয়েকখানি বই ঠিক একইভাবে ভদ্রলোকের ঠিকানায় পৌঁছোয়। পার্শেলগুলির সঙ্গে ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা কুশলকামনা করা চিঠি। সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অখ্যাত এক ব্যক্তির প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই মধুর স্নেহের নিদর্শনে সেই ভদ্রলোকটি চোখের জল সামলাতে পারেননি।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহে, ইয়োরোপের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রুদেনস্টাইনের চেষ্টায় ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুযোগ্য সন্তান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে (কারণ বলাই বাহুল্য যে, এ সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অংকিত অনেকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি ইয়োরোপে মুদ্রিত হয়ে চিত্র সমালোচক ও রসিক মহলে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাই জ্যোতিদাদা, ২৯ ভাদ্র, ১৩১৯

আপনার ছবির খাতা আমি রোদেনস্টাইনকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত আর্টিস্ট। তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রইং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে আমাদের দেশে এ ছবির কোন সমাদর হয়নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। Most marvellous Most magnificent —এই ত তাঁর মত।... আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। এঁদের মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত। একথা চাপা রাখলে চলবে না।

আপনার স্নেহের রবি

শেষ জীবনের অনেকগুলি বছর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচির মোরাবাদি পাহাড়ের 'শান্তিধামে' কাটিয়েছিলেন। নির্জন পাহাড়ের নিভৃত পরিবেশে এই প্রচারবিমুখ সরস্বতীর বরপুত্র নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু একথা আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতে হবে, এ তাঁর কঠোর শুষ্ক সন্ন্যাস জীবন নয়। মানব প্রেমে এই মহাপুরুষের হৃদয়খানি সর্বদাই চির-আনন্দ সলিলে অবগাহন করেছে। পত্র মারফৎ সকলের সংবাদ জানতে চাইতেন, কুশল কামনা করতেন ঐকান্তিকভাবে। মানব সমাজ থেকে তিনি দূরে সরে যাননি কখনও, তাঁর সমগ্র মনপ্রাণকে তিনি মানুষের কাছেই গচ্ছিত রেখেছিলেন।

স্বদেশ প্রেমে যাঁর জীবন পূর্ণ*, মানব প্রেমে যিনি তাঁর হৃদয়খানি উন্মুক্ত রেখেছিলেন সারাজীবন, বাংলা সাহিত্যে যাঁর এত অবদান, তিনি কি কখনও বিস্মৃত হতে পারেন!' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপরূপ সুন্দর কোমল আয়ত নয়নের দিকে তাকিয়ে কত মানুষই তো নিজেদের ব্যক্তিগত বেদনা ভুলেছেন, তাঁদের মন প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২০শে ফাল্গুন (১৯২৫ খৃস্টাব্দ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ-জগত ছেড়ে চলে গেলেন। 'শান্তিধামে' তাঁর শেষ শয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। মৃত্যুকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর। পরিণত বয়সের মৃত্যু—কিন্তু সাহিত্যরসিক মাত্রেই এ দিনটিকে পরম দুঃখের দিন ও অপূরণীয় ক্ষতি বলে গণ্য করবেন সন্দেহ নেই।

---

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত একটি অপূর্ব জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এককালে এই সঙ্গীতটি লোকের মুখে মুখে ফিরেছে।

চলরে চল্ সবে ভারত সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান
পত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ জাগ সবে বল মাগো,
তব পদে সঁপিনু পরাণ।

লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়,
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু-মুসলমান
একপথে একসাথে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

বিদেশী চারা স্বদেশী কলম

বর্তমান কালে ছন্দোবন্ধ কবিতা প্রায় অচল হয়ে এসেছে। যাঁরা ছন্দানুসারী কবি তাঁদের প্রতি একালের কবিতা-পাঠকের দৃষ্টি যেন অনুকম্পায় ভরা। অবস্থা দেখে মনে হয় ছন্দ মিল ও শব্দপ্রয়োগের যে রীতি দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আধুনিকতার মোহে আমরা এমন আচ্ছন্ন যে বৈচিত্র্যহীনতাকেই আমরা আজ বিচিত্র বলে স্বীকৃতিদান করেছি। পদ্য নাটক, গাথা-কাব্য, গীতি-নাট্য এ যুগে যেন প্রাগৈতিহাসিক বস্তুবিশেষ। কবিতার মধ্যে ছন্দের প্রয়োজন সকল সভ্যদেশে স্বীকৃত। শ্রুতি বলেছেন—ছাদনাং ছন্দঃ—যা আচ্ছাদন করে তাই ছন্দ। কবিতার ভাষাগত ত্রুটী ছন্দ ঢেকে রাখে তাই কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা এত প্রবল।

ইদানীং ছন্দোহীন মিলহীন গদ্য কবিতার লেখকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু পাঠকসংখ্যা কি বেড়েছে। গীত-গোবিন্দ বা চর্যাগীতির ছন্দ থেকে বাংলা মাত্রাবৃত্তের বা অক্ষরবৃত্তের উদ্ভব হয় নি অপভ্রংশ ছন্দের কিছু রূপ এই গীতি-কাব্যের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল—জন-প্রিয়তার প্রয়োজনে, এবং কালক্রমে অপভ্রংশের কিছু ছন্দোরূপ থেকে বাংলা মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি। অক্ষরস্থাপনের নানা রীতির জন্য প্রাচীন-কালের গীতিকাব্যের ছন্দোবৈচিত্র্য ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ছন্দের ব্যবহার নানাভাবে হয়েছে এবং এই ছন্দো-বৈচিত্র্যের জনই বাংলা কবিতা এতখানি জন-প্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলা মাত্রাবৃত্ত, ছন্দ অপভ্রংশের মাত্রাবৃত্তেরই প্রসারিত রূপ। প্রবোধচন্দ্র সেন ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বাংলা ছন্দের প্রকরণ ও পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আগ্রহশীল পাঠক তাঁদের গ্রন্থাবলী পাঠ করলে লাভবান হবেন।

বিদেশী ছন্দের পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে তেমন বিস্তারিত আলোচনা বাংলা সাহিত্যে হয়নি। প্রখ্যাত কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ধরে নানা ধরণের বিদেশী লিরিক ফর্মগুলির প্রতিরূপ বাংলায় আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি বুদ্ধ-দেব বসুর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'কবিতা' ত্রৈমাসিকে বিদেশী ছন্দের কবিতাবলীর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় সেইকালে 'কবিতা' পত্রে

Sestina, Triolet, Terza Rima, Rondel, Villanelle, Rondeau, Pantoum Spenserian Sonnet —

প্রভৃতি কবিতাবন্ধের কবিতাবলী প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে 'উত্তরসূরী' পত্রিকায়

Chant Royal, Canzone, Rondeau Redouble, Ballade a double refrain, Villanelle, Rispetto, Limerick, Rondlet, Rondeau —

ইত্যাদি শ্রেণীর কাব্যবন্ধের কবিতা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি 'ভিন্ন দেশের রঙ মেশাই' নামক এক বিচিত্র কাব্যগ্রন্থে তিনি ওই জাতীয় কবিতার সঞ্চয়ন করেছেন, কিন্তু শুধু সেইখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, এক এক সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে কাব্যে লিরিক ফর্মগুলির পরিচিতি দান করেছেন। বাংলাভাষায় এই জাতীয় কাজ এই প্রথম বলেই আমার বিশ্বাস, সেই কারণে আমি গ্রন্থ-কর্তাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। দীর্ঘ-দিনের অনুশীলনের ফলেই এমন একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ রচনা সম্ভব—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নীরস আলোচনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি তিনি স্বয়ং অজস্র কবিতা রচনা করে বাংলাভাষায় বিদেশী ছন্দাদির ব্যবহার কি অনায়াসভঙ্গীতে সম্ভব তার দৃষ্টান্ত দান করেছেন।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন বাংলা-দেশের কবিরা এইসব বিদেশী ফর্ম ও ছন্দ প্রকরণ বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই জাতীয় কবিতা বিভিন্ন সময়ে শক্তিশালী কবিবৃন্দ রচনা করে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে-ছেন। তিনি ভূমিকায় বলেছেন—

'প্রাক-রবীন্দ্র যুগে যেমন মাইকেল মধুসূদন বাংলা কাব্যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও সনেটের প্রবর্তন করেন তেমনি রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রমথ চৌধুরী ট্রিওলেট, টেরজা রিমা, বাংলায় আনেন। সত্যেন দত্তই প্রথম বাংলাতে মালাই পানতুমের আমদানী করলেন। বাংলায় বালাদ-এর প্রথম প্রবর্তক হিসাবে কবি মোহিতলাল মজুম-দারই স্মরণীয়। তা ছাড়া মোহিতলালই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সনেটে মাইকেলী ঢঙের রূপান্তর ঘটালেন এবং সব চেয়ে দীর্ঘ তেরজা রিমা বাংলায় লিখে গেলেন। কবি মোহিতলালের তেরজা রিমাই আজো পর্যন্ত বাংলা কাব্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মোহিতলালের 'গদ্য ও পদ্য' শীর্ষক বালাদ-ই বোধহয় বালাদের আদিতম নমুনা। এছাড়া মোহিতলালের পানতুম-ও আছে। এরপর আধুনিক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে মহাশয়ই বাংলায় ভিলানেলের প্রবর্তনার জন্য বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। তাছাড়া বিষ্ণুবাবুর রচনায় ট্রিওলেট, বালাদ, লিমেরিক ও সনেটের নমুনা বেশ কিছু পাওয়া যায়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের লিমেরিকগুলিও বিশেষভাবে স্মরণীয়।'

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে বাংলাকাব্য সাহিত্যে বিদেশী ফর্মগুলির আমদানির ইতিহাস সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রথমা-ংশে ২৫টি বিভিন্ন ফর্মের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ট্রিয়োলেট ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম প্রবর্তিত হয় এবং ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আঁরি দ্য ক্রোয়া যে গ্রন্থে ট্রিওলেট রচনার নিয়মকানুন দেওয়া আছে তিনি তার উল্লেখ করেছেন। ইংলন্ডে প্রথম ট্রিওলেট লিখিত হয় ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে, লিখেছিলেন প্যাট্রিক কেরী নামক একজন যাজক সন্ন্যাসী, তিনি তখন ফ্রান্সে প্রবাস-জীবন যাপন করছিলেন। ভ্যালত্যের ট্রিও-লেটকে ফ্যাশনে পরিণত করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রিজেস প্রথম ট্রিওলেট রচনা করেন। বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে এই শতকের গোড়ায়, প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এর বাংলা নামকরণ করেন 'ত্রেপাটি'। এ ত গেল ইতিহাস। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় এর পর গঠনপ্রকৃতি বিষয়ে বলেছেন। ট্রিওলেটের পর রদেল, রঁদো, রুদেল, ভিলানেল, রঁদো রি-ডাবল, বানট রয়্যাল, বালাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। বলাবাহুল্য তাঁর আলোচনা পূর্ণাঙ্গ এবং তথ্যবহুল।

এই আলোচনা এবং বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মৌলিক নমুনাগুলি পর্যালোচনা করলে রসজ্ঞ পাঠকের অন্তর ভরে ওঠে। কোথাও কবিতার প্রথম চারটি লাইন কিভাবে সমগ্র কবিতায় আবার ঘুরে ফিরে এসেছে, কোথায় ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে ওপরে। আসলে এর নাম কাব্য-কৌশল। এই কৌশল কিন্তু কষ্টকল্পিত নয়, এমনই ভঙ্গীতে তা ব্যবহৃত যে পাঠকের চিত্তকে তা সহজে জয়

করে। যেমন পানতুম ভঙ্গীর দ্বন্দ্ব বাঙালী কবিকে আকৃষ্ট করেছিল, এ আকর্ষণ সনেট বা ট্রিওলেটের মতই গভীর। পানতুম চতুষ্পদী, তার ছন্দের বুননভঙ্গী এইরূপঃ কখ কখ, খগ খগ, গঘ গঘ ইত্যাদি কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি পানতুমের প্রথম চারটি লাইন—

আকাশ-তলে হাওয়ার হাটে
ঘাসের মাঠে শুয়ে (ক)
হঠাৎ মনে ঘা-দিল
এক বেদনভরা বাণী (খ)
বললো ছোটে ঘাসের শীষ
গালের কাছে নুয়ে (গ)
সখা হে শোনো,
তোমাকে বড়ো আপন বলে মানি (ঘ)

পরবর্তী প্যারাগ্রাফে খ এবং ঘ এই দুটি লাইনের প্রথম ও তৃতীয় লাইন হিসাবে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অনুরূপ ভঙ্গীতে প্রতি প্যারাগ্রাফে আগের প্যারার প্রথম ও তৃতীয় লাইনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। অন্য ভঙ্গীও আছে।

ভিলানেল্লের প্রথম লাইনটি দ্বিতীয় প্যারার তৃতীয় লাইনে, চতুর্থ প্যারার তৃতীয় লাইনে এবং ষষ্ঠ প্যারার তৃতীয় লাইনে পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সব কটি প্যারা তিন লাইনে গঠিত, কিন্তু শেষের স্তবকটি চার লাইনের। এ ছাড়া প্রথম প্যারার তৃতীয় লাইনটি ছটি প্যারাগ্রাফের মধ্যে তিনটি প্যারার শেষ লাইন হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় বালাদ ভঙ্গীতে রচিত 'ভিন দেশের রং মেশাই' নামক কবিতাটিতে বলেছেন—

'বিদেশী চারা দেশের গাছে
কলম করে রাখছি আজ
ফলবে ফল যদিই বাঁচে
গ্রহণ করে জনসমাজ।'

কথাটি সত্য, বিদেশী চারা তিনি দেশের গাছের সঙ্গে কলম করার প্রয়াস করেছেন, তাঁর এই প্রচেষ্টা যে নিছক কারিগরির কাজ তা তিনি স্বীকার করেছেন। এই কাজে তিনি প্রতিটি খাঁজ ভরিয়ে তুলেছেন, কোথাও ফাঁক রাখেন নি।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই গ্রন্থটির যথাযোগ্য সমাদর হয়েছে বলে মনে হয় না। হয়ত রসিকজনের নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে যদি অকস্মাৎ কোনো মননশীল পাঠকের হাতে এই গ্রন্থ পড়ে তাহলে তিনি লেখকের অধ্যবসায়, অনুশীলন ও নিষ্ঠায় চমৎকৃত না হয়ে পারবেন না।

—অভয়ঙ্কর

ভিন দেশের রঙ মেশাই (ছন্দ ও কবিতা)—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

বঙ্কিমস্মরণ সভা : বারাসাত মহকুমার সদরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মহকুমা শাসকের বাংলো বাড়ীতে পূর্ণিমা সম্মেলনীর উদ্যোগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন হয় রবিবার ২৫ জুন। সভায় পৌরোহিত্য করেন মহকুমা শাসক শ্রীকালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খৃঃ এবং ১৮৮৪ খৃঃ ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে এই বাড়ীতেই বাস করতেন। তার আগে এই বাড়ীতে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বাংলো বাড়ীতে আয়োজিত বঙ্কিমস্মরণোৎসব সেক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বঙ্কিম সাহিত্য সম্পর্কে বিদগ্ধজন ভাষণ দেন। সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ নারায়ণচন্দ্র চন্দ বঙ্কিম প্রতিভা বিশ্লেষণে বঙ্কিমদর্শন ও সাহিত্য আলোচনা করেন। বাঙালী জাতীয় সত্তা বিকাশে বঙ্কিমের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। শ্রীচন্দ বাঙালী জাতীয়তা উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতি জানান। বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চায় বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্বময় ভূমিকার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন অধ্যাপক অমল্যভূষণ গুপ্ত। বাঙলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে রামমোহন যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বিকশিত করেছিলেন সুদৃঢ় জাতীয়তার মন্ত্রে। বঙ্কিমের কাছে বাঙালীর ঋণ অপ্রতিশোধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে আলোচনা করেন প্রমীল বসু।

সভাপতি মহকুমা শাসক শ্রীকালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত ভাষণে রবীন্দ্রআলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত শুভেচ্ছাবাণী পাঠান। সভায় সে দুটি পাঠ করা হয়। হরিপদ বিশ্বাস, বিভাবতী দেবী, বিনয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রমদাকান্ত আচার্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবি প্রণবকুমার মজুমদার স্বরচিত কবিতা পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন। সভায় কয়েকটি অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

নতুন বই

মনামী (উপন্যাস)—নারায়ণ সান্যাল। ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ২৮, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। সাত টাকা।

শ্রীনারায়ণ সান্যাল বাংলা-সাহিত্যে নতুন লেখক নন। ইনি ইতিপূর্বে প্রকাশিত বেশ কিছু উপন্যাসের লেখক। এবং উপন্যাসগুলি নানা কারণে সহৃদয় পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে। 'মনামী' তাঁর পূর্বে প্রকাশিত সার্থক উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম। যতদূর মনে পড়ে, গ্রন্থটি প্রায় আজ থেকে বছর চৌদ্দ-পনেরো আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি নতুন আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাসটি উত্তমপুরুষে লিখিত এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের মাথায় কিছু না বলা থাকলেও পরিচ্ছেদগুলি পড়ে বোঝা যায় প্রধান চারটি চরিত্র মনামী, রাধারাণী, অবনীমোহন, সুবিমল—তাদের স্বাতন্ত্র্য রেখেই নিজ নিজ বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছে উপন্যাসে। অধ্যাপক অবনীমোহনের স্ত্রী রাধারাণী ছিল অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে। মনামী রাধারাণীর দূর সম্পর্কের বোন। একদিন এই মনামী ওদের সংসারে এসে সুখের জীবন ভাঙলো। অবনীমোহন ধীরে ধীরে ভালবাসতে লাগল মনামীকে। মনামী শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রগলভা। রাধারাণীর দেবর সুবিমলও আকৃষ্ট হয় মনামীর প্রতি; কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া বৌদি রাধারাণীর কথা ভেবে, অবনীমোহনের সঙ্গে মনামীর গোপন সম্পর্ক বুঝতে পেরে ঘৃণা করতে থাকে মনামীকে। উপন্যাসের শেষে রাধারাণীর চাপা অভিমানে কৃচ্ছ্রসাধন ও মৃত্যু, অবনীমোহনের মনামীকে বিবাহ, পরে অবনীমোহনের মৃত্যু, মনামীর মিথ্যে অন্তঃসত্ত্বা ধরা পড়া, সুবিমলের অনুশোচনা ইত্যাদি রুদ্ধশ্বাস কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক পরিভ্রমণের মধ্যে কাহিনীর যতি পড়ে।

লেখক অসাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে চারটি চরিত্র এঁকেছেন। মনোবিশ্লেষণ ও চরিত্রগুলির নিজ নিজ কথা বলার মধ্যে ব্যক্তিত্বের

স্বতন্ত্র পরিচয় স্পষ্ট করা—লেখকের শিল্প-ক্ষমতার পরিচায়ক। বস্তুত 'মনামী'র লেখক তাঁর রচনার ভাষাবৈশিষ্ট্য ও চরিত্র সৃষ্টির জন্য বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্মরণীয় থাকবেন।

ঢেউয়ের পর ঢেউ (উপন্যাস)—অচিনকুমার চক্রবর্তী। ছাত্রশিক্ষা নিকেতনম ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। আট টাকা।

'ঢেউয়ের পর ঢেউ' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস, পটভূমি সম্প্রতিকালে সৃষ্ট বাংলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। মুজিবর রহমানের কারাবরণ, পূর্ববঙ্গের আন্দোলন, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর অত্যাচার, ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে সাহায্য করা, পাকিস্থানী চক্রান্ত থেকে বাংলাদেশের মুক্তি, মুজিবের বন্দী-জীবন শেষ হওয়া ও দেশে ফিরে আসা এবং সবশেষে দুই বাংলার মানুষের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে স্বস্তির জগতে ফিরে আসা ইত্যাদির মধ্যে উপন্যাসটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। লেখক ঐতিহাসিক কাহিনী, ঘটনার মধ্যে অনৈতিহাসিক চরিত্র এনে উপন্যাসটির বাস্তবতা রক্ষা করেছেন। লেখকের ভাষা সহজ, সরল। অসিত, চঞ্চলা, পুতুল, কাজীসাহেব, জাহানারা ইত্যাদি চরিত্র যেন খুব পরিচিত জগতের মনে হয়। গ্রন্থটি একটানা পড়ে শেষ করার মত জমাট কাহিনীরসে পূর্ণ। লেখকের চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতাও প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থটি পাঠক-মহলে সমাদৃত হবে বলে মনে করি।

নাচের পুতুল (রঙ্গব্যঙ্গ শ্লেষ কাহিনী)—ত্রিলোচন কলমচী। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড কলঃ-১। আট টাকা।

সংসারে বেশ কিছু মানুষ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির লোভে ও লালসায় কখনো বা অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে সরকারী বে-সরকারী প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের বহু সংস্থার আর প্রতিষ্ঠানের পুরোধায় থাকতে থাকতে ঘুণপোকায় রূপান্তরিত হয়ে যায় নিঃশব্দে সকলের দৃষ্টির অগোচরে। ব্যক্তির ব্যাধি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে সংক্রামিত হয়ে তাকে কমজোরী বা প্রায়-অকর্মণ্য করে দেয়। কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না যদি না এদের অন্তর-অঙ্গে প্রবেশ করা যায়—ঘুণপোকাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে না আসা যায়। মানুষ মূলত সৎ ও সত্যাশ্রয়ী হয়েও অবস্থার চাপে পড়ে যায় নয় তাই হতে বাধ্য হয়—জীবনের চরম ট্র্যাজেডি এই-ই।

ত্রিলোচন কলমচী ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের এই ট্র্যাজেডিকে লঘু কথনভঙ্গিতে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-শ্লেষ-পরিহাস-কুশলতায় আশ্চর্যভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন। শিল্পীর নির্মোহ দৃষ্টি-পাত, সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসা ও সাহিত্যিকের রসস্নিগ্ধতা—ত্রয়ীর মেলবন্ধনে নাচের পুতুল স্বাদবৈচিত্র্যে তীর্যক দৃষ্টি-পাতের তীক্ষ্ণতায় ও বাকভঙ্গির ললিত-লাবণ্যে এক পৃথকধর্মী সাহিত্যে পরিণত হয়েছে যাকে সঠিকভাবে কোন শ্রেণীভুক্ত করে চিহ্নিত করা যায় না।

সাতাশটি শিরোনামে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এই অন্তরঙ্গ 'বিশ্বরূপ-দর্শন'-কাহিনী বিধৃত হয়েছে প্রায় আড়াইশো পাতার রঙ্গ-ব্যঙ্গ শ্লেষ-কৌতুক-আশ্রিত বিদগ্ধ বিবরণে। বাইরের তথাকথিত বৈভব-জৌলুস ও কৌতুকরঙ্গের আধিক্য সত্ত্বেও অন্তর-অঙ্গের বিষাদকরুণ তমসাবৃত কাহিনী যুগপৎ বিস্ময়ে বিষাদে পাঠক-মনকে আচ্ছন্ন করবে।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়। বলা বাহুল্য, বাংলা-সাহিত্যে 'নাচের পুতুল' উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

লেনিনের মা (জীবনী)—মিহির সেন। নবপত্র প্রকাশন। ৫১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। চার টাকা।

সোভিয়েত রাশিয়ার নবরূপকার লেনিন। লেনিনের জীবনের রূপকার তাঁর জননী—মারিয়া আলেক্সাণ্ড্রভনা উলিয়ানোভা—রুশ-বিপ্লবের বিশ্বস্ত ধাত্রী। বস্তুত বিপ্লবের অগ্রনায়ক লেনিন দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। মায়ের মুখেই শুনেছিলেন সেই অগ্নিবাণীঃ 'মার চেয়েও বড় মাতৃভূমি, পরিবারের চেয়েও বড় দেশ'।

বিচিত্র জীবনের আধার ছিলেন লেনিন-জননী। অসীম ধৈর্য, দৃঢ়তা, সাহস এবং প্রচণ্ড প্রাণশক্তি দিয়ে ছেলে-মেয়েদের যেন আগলে রাখতেন—ছেলে-মেয়েদের বিপ্লব-ভাবনার ও কর্মের তিনি সহযোগী হয়েছিলেন সেই সঙ্গে। পরোক্ষ-ভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন তার সহযোগী এবং বন্ধু। মা এবং মাটি যেন এক এবং অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমিহির সেন লেনিন-জননীর নাটকীয় সংঘাতময় জীবনে প্রাণময় প্রতিকৃতি এঁকেছেন লেনিন-জীবন ও জারশাসিত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাশিয়ার বিশাল প্রেক্ষাপটে। ঘটনা-সংস্থাপন এবং কাহিনী গ্রন্থনের গুণে জীবনী-গ্রন্থটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

মুজিবের রচনা সংগ্রহ (প্রবন্ধ)—শেখ মুজিবুর রহমান। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বহু বছর আগে থেকে মুজিবুর কি ভাবতেন, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাই বা কি ছিল, এসবই জানতে হলে শেখ মুজিবের রচনা-সংগ্রহ পড়তেই হবে। ১৯৬৬-৬৭ সালের ছয় দফা দাবিতে ছিল ফেডারেশনের কথা। তখন মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলেননি। তিনি প্রথম দিকে পাক সরকারের সঙ্গে একটা রফা করতে চেয়েছিলেন, তা যখন সম্ভব হল না, তখন মুক্তি-সংগ্রামের ডাক দেন মুজিব। তাঁর বক্তৃতা ও রচনা 'মুক্তির লড়াই' ও '৭ই মার্চের আহ্বান' স্বাধীনতাসংগ্রামের উৎপ্রেরণা দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের।

এই বইতে শেখ মুজিবরের সর্বসমেত সতেরটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতার অনুলিপি মুদ্রিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এসব কটিই '৭১ সালের এপ্রিলের আগের। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরের লেখা বা বক্তৃতার সংগ্রহ নয়। বাংলাদেশে কেন মুক্তিসংগ্রাম শুরু হল তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এই বইটি পাঠকদের বুঝতে সাহায্য করবে। সেদিক থেকে প্রকাশক সার্থক হয়েছেন।

কামধেনু (নাটক) নবকুমার গড়াই। নবমিত্র প্রকাশন, ২৭ ভূপেন্দ্রনাথ রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী। সাড়ে তিন টাকা।

যে নাটক আজকের সমাজজীবনের মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারে নিত্যই অলিখিতভাবে অভিনীত হচ্ছে, তারই বাণীরূপ 'কামধেনু'। একদিকে সাংসারিক, সামাজিক দায় আর একদিকে ব্যক্তিজীবনের সুখস্বপ্ন—এই দ্বৈত বিপরীতমুখী আবর্তে চাকুরীজীবী বাঙালী মেয়েরা নাজেহাল। সংসারের সার্বিক উন্নতির যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-সাধ সবকিছুই বলি দিয়ে দেয় অনায়াসে হাসিমুখে।—চাকুরীজীবী এমনি একটি মেয়েকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এ নাটকের ঘটনাপ্রবাহ। চরিত্র-চিত্রণের স্বাভাবিকতায় ও নাটকীয় ঘটনার টানাপোড়েনে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

কোন পথে বাঙ্গালী (প্রবন্ধ)—হরিদাস মুখোপাধ্যায়। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। ৬।১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলকাতা-১২। এক টাকা।

কিছুকাল ধরেই বাঙ্গালী জীবনের গতিপথ সূচিত হয়েছে নৈরাজ্যের দিকে—চারদিকে নেমেছে অবক্ষয়ের আঁধার। তার কার্যকারণ নির্ণয় ও নির্দেশ নিয়েই এই প্রবন্ধ পুস্তিকা। প্রবন্ধগুলিতে বিতর্কের অবকাশ আছে। তা হলেও প্রবন্ধগুলি সুলিখিত এবং জানবার মতো বহু তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ।

অন্ধ বিহঙ্গ (নাটক)—ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। হিন্দোল প্রকাশনী, ১৩ হরিশ মুখার্জি রোড, ভদ্রকালী, হুগলী। তিন টাকা।

মানুষ আজ পথভ্রান্ত। জীবনের সঠিক ঠিকানা জানা নেই। জীবন থেকে আদর্শ উধাও। রাজনীতির কুটিল রঙিন স্রোত, অর্থনৈতিক সংকট, ভারসাম্যহীনতা ও জীবন-ধারণে অনিশ্চয়তা মানুষকে যেন অন্ধকার প্রাচীরের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। রূঢ় রুক্ষ দয়ামায়াহীন পটভূমিকায় আজকের যুগের অসহায় ছবি বাস্তব হয়ে উঠেছে এই নাটকে।

বাংলা আমার বাংলা (উপন্যাস)—নির্মল গুপ্ত। প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ২৯।১ চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-২৭। পাঁচ টাকা।

বিভাগপূর্ব ও বিভাগ পরবর্তী বাঙালী জীবনের ট্রাজিক পটভূমি কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের মূল কাহিনী। সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলার সার্বিক ছবি মেলে ধরেছেন লেখক মুন্সিয়ানার সঙ্গে। নানা নাটকীয় ঘটনার টানাপোড়েনে মাটি ও মানুষের গল্প জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। সেজন্যে লেখক শ্রীনির্মল গুপ্ত পাঠকবর্গের সাধুবাদ পাবেন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

প্রজন্ম দর্পণ (জীবনী)—কলাস সিন্ডিকেট, ১৭০।এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৪। এক টাকা।

বছরে মধ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া অবশ্যই আনন্দের ও গর্বের। ১৯৭২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিউম্যানিটিজ এবং বিজ্ঞানে যারা প্রথম দশের মধ্যে সাফল্যের গুণগত পরিচয় নিজেদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ পরীক্ষা সম্পর্কীয় নানা তথ্য ও তত্ত্বের সন্নিবেশ ঘটেছে গ্রন্থ দুটিতে। তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে প্রেরণা জাগাবার এই আন্তরিক চেষ্টা প্রশংসনীয়।

জনমানুষ (গল্প সংকলন)—রবীন্দ্র গুহ। শঙ্কসারী প্রকাশন, ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৪। চার টাকা।।

সমাজের অতিসাধারণ মানুষে জনেদের ছবি। ছবি নয় জলছবি। স্পষ্ট জীবন্ত—জীবনের রঙে আঁকা যেন। আর জীবনের গাঢ় রঙ তো নষ্টসুখের আশাভঙ্গের অচরিতার্থ বেদনায় নীল। 'জনমানুষ'-এ সেই জীবনের রূঢ় বাস্তব নিমর্ম ছবি। সেই নটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। ছোট গল্প পাঠকদের কাছে বইখানি সমাদৃত হবে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

আলোক (ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা)—সম্পাদক : শিপ্রা ঘোষ, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা এবং কাব্যভাবনাই এ ত্রৈমাসিক পত্রিকার মূল উপজীব্য। ভিনদেশী কবিদের কাব্যভাবনার ওপর আছে দুটি প্রবন্ধ। কিছু অনুবাদ কবিতা ছাড়াও আছে নবীন ও পরিচিত কবিদের কবিতা। জঁক সেন্ডেরিদের কাব্যচিন্তার ওপর লিখেছেন অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় 'পারলো নেরুদার' ওপর। পাবলোর কবিতা অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণধর, গণেশ বসু ও স্বাতি চক্রবর্তী। তিন প্রদেশবাসী কবিদের কবিতা অনুবাদ করেছেন সুজাতা প্রিয়ম্বদা। এছাড়া কবিতা লিখেছেন সুশীলকুমার গুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রুদ্রেন্দু সরকার, মৃণাল দত্ত প্রমুখ।

সমকালীন (বৈশাখ ১৩৭৯)—সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩। ৫০ পয়সা।

'সমকালীন' প্রবন্ধের মাসিকপত্র। ভাল বাংলার বিগত বিশ বছর ধরে শুধুমাত্র প্রবন্ধকে সম্বল করে এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে—একথা ভাবতে অবাক লাগে। ভালো লেখা, ভালো ছাপা এবং নিয়মিত প্রকাশ—এই তিনের সমন্বয় ঘটলে সৎ সাহিত্য পাঠকের সম্বর্ধনা লাভ অসম্ভব নয়—সমকালীন তার শ্রেষ্ঠ নজির। আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন অশোককুমার দাশ (মুঘল চিত্রকলা : কয়েকটি গোড়ার কথা), অক্ষয়কুমার কয়াল (পুঁথি পাঠ সহজ নয়), সন্তোষকুমার বসু (ভারতীয় শিল্প : সংগ্রহ ও সংরক্ষণ), ভোলানাথ ভট্টাচার্য (একজন পটুয়া ও একটি পট), অমিয়কুমার মজুমদার (রবীন্দ্রচিন্তায় বঙ্গসভ্যতা), সীতানাথ গোস্বামী (বৈদান্ত অদ্বৈতবাদ ও অমলানন্দ স্বামী), পূর্ণচন্দ্র দাস (কাঁথি মণ্ডলের ঝুঁটি বা আলপনা) ও সুখরঞ্জন চক্রবর্তী (পদসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ)।

রাজজ্যোতিষী (মে ১৯৭২)—সম্পাদক : বীরেশ্বর চক্রবর্তী। জ্যোতিষ বার্তালয়, ১।২এ, নীলাম্বর মুখার্জি রোড, কলকাতা-৪। দেড় টাকা।

প্রথম প্রকাশের পর থেকেই আলোচ্য মাসিক পত্রিকাটি জনসাধারণের সাদর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ধরণের মাসিক পত্রিকা এদেশে আর নেই। জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ নানান আলোচনা ছাড়াও চিত্তাকর্ষী বিভাগগুলির সুষ্ঠু সন্নিবেশ পত্রিকাটিকে পাঠকমহলে আদরণীয় করে তুলেছে। এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ শ্রীম লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং বাংলা-সাহিত্যের এক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের রাশিফল পাঠকবর্গকে আরো কৌতূহলাক্রান্ত করে তুলবে।

সুবর্ণালী (সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণী, ১৯৭২)—সম্পাদক : শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। রবীন্দ্রসভা, বি এম কলেজ, পাটনা-৪।

অধ্যাপক রণধীর হালদার বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্মরণীয় নাম। দূরপ্রবাসে বাস করেও তিনি নানাভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করে আসছেন। বস্তুত প্রবাসে বঙ্গ-সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান প্রবক্তা এবং রবীন্দ্র-অনুরাগী হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। পঞ্চাশ বছর আগে পাটনায় 'রবীন্দ্র-সভার' প্রতিষ্ঠা তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম কীর্তি। এই সভার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তীর স্মারক হিসেবে প্রকাশিত 'সুবর্ণালী'তে রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের ওপর চিন্তাসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্র-অনুরাগী প্রবাসী বিশ্বজ্জনেরা। কবিগুরুর স্বহস্তলিখিত অপ্রকাশিত কবিতার প্রতিলিপি সংকলনটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

নির্ণয় (দ্বিতীয় সংখ্যা)—মুখ্য সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী। ১৮।৩২বি বালিগঞ্জ প্লেস ইস্ট, কলকাতা ১৯। এক টাকা।

পত্রিকাটি দ্বিভাষিক। আজকের ছোট গল্প সম্পর্কে লিখেছেন জগন্নাথ শর্মা। আফ্রিকার কবিতা বিষয়ে লিখেছেন বিষ্ণু দেব। গল্প, কবিতা, চলচ্চিত্র বিষয়ে আলোচনা—সবই ছাপা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কমল চক্রবর্তী, তরুণ সেন, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন রায়, সমিত ঘোষ, সুধাংশুর মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। ইংরেজী লেখাগুলো মন্দ নয়।

নবাঙ্কুর (বৈশাখ '৭৯) সম্পাদক : বিকাশচন্দ্র দাস। ৩০, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪। পঞ্চাশ পয়সা।

ভালো জাতের প্রবন্ধ লিখেছেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন ভারতীয় সমাজের কয়েকটি মূল্যবোধ। জিতেন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ : ক্রিকেট খেলা অপরাধ কৌতূহলোদ্দীপক। এছাড়া লিখেছেন : নচিকেতা ভরদ্বাজ, শেফালি বসু, শমিতা রায়, বিকাশচন্দ্র দাস প্রমুখ।

প্রাপ্তি স্বীকার

আলোর ঝোঁকার (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : ফাল্গুনীচরণ মান্না। গড়বেতা, মেদিনীপুর। ষাট পয়সা।

আবর্তন (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বিমল ঘোষ। সেভাক রোড, শিলিগুড়ি। পনেরো পয়সা।

সম্প্রতি (বৈশাখ '৭৯)—সম্পাদক : প্রণব মাইতি। 'অস্তাচল', কাঁথি, মেদিনীপুর। পঞ্চাশ পয়সা।

মাটির প্রদীপ (নববর্ষ সংখ্যা)—সম্পাদক : ভোলানাথ হাজরা। মোবারক বিল্ডিং বর্ধমান। পঞ্চাশ পয়সা।

খেয়ালী—সম্পাদক : শ্যামলেন্দুশেখর দত্ত বি-টাইপ এল-টি ১৮।২, খড়্গপুর-৪। তিরিশ পয়সা।

দৃশ্য—সম্পাদক : অমর বসু, দীলিপ পাল ৬, প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা-৬। পঁচিশ পয়সা।

আজ (ত্রৈমাসিক)—সৈকত সাহিত্য সংস্থা কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পঁয়ত্রিশ পয়সা।

ওরা রঙ-ছুট ॥

পরমানন্দ সরস্বতী

ওরা রঙ-ছুট এপথে ওপথে ঘুরে।
কালের থালায় কচু কলা দেয় ছুড়ে।
দিনের উনুনে কী আগুন আছে জ্বলে,
সৃষ্টির যত খড়-কুটো খুটে তুলে।

কী চায় রঙে, শুধু সুখ গুণে-গুণে?
শাদা-কালো ছকে মায়াজাল যায় বুনে।
ওরা রোদ ফুল ভরসা ভূষণ নয়,
খেলনারা হয় খেলে-খেলে নয়ছয়।।

মহীপাল ॥

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ দেখলাম
ও কারা আসছে,
রাতের খড়োঘরে
আর্ত চিৎকার!
এখন মোনাজাতে
আজো যে কংকাল :
আপন প্রিয় লাগি
স্বতঃই ব্যথাতুর!
শিবিরে অশরীর
অলাত ধিক্কার,
কান্না চিরাগত
যে মায় বুক চুর!

মুক্তি পেয়েছে যে
মহান মহীপাল,
সবুজ পটে লাল
সূর্য হাসছে!

নিয়ত একাকী।।

শুভ মুখোপাধ্যায়

এখন দু হাত দিগন্ত করে দাঁড়ালেই,
প্রতীক্ষার দীর্ঘরাত পড়ে আছে
আমার নিশীথিনী মায়ের মুখ:
নিকানো উঠোন ছেড়ে
গুহের কাঁধে হাত ঝুলিয়ে
আমি আমার সহোদর অশ্বত্থ
জন্মদাত্রীর যন্ত্রণাকে ঘিরে রয়েছি,
প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত পড়ে আছে,
আমার নিশীথিনী মায়ের মুখ।

কেন আমাকেই নিরন্ধ একাকী
জন্ম-যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়,
কেউ তেমন উৎসব করে বিদায় দেবে না জেনেও
কার উন্মাদনায়
আমার অপেক্ষা দীর্ঘতর হয়—

যেন আজীবন কাউকে পিছনে হারিয়ে আসছি,
যে আমাকে মৃত্যুহীন আহ্বান করে যেত—
যে আমাকে সমাহিত প্রতীক্ষায়
হাতে তুলে দিত নির্মাণের মাটি।

এখন তোমার প্রসন্ন নয়ান চেয়ে
আমি ঋণী রইলাম
দুরাভাস দৃশ্য হয়ে থাক তুই পরবাসী।

দুঃখে সুখে বাঁচো

নিখিলচন্দ্র সরকার

(এক)

সকালের রোদে গাছপালা বারান্দা সব ভেসে যাচ্ছিল। বারান্দা ডিঙিয়ে রোদ অনেকক্ষণ হল ঘরেও ঢুকে পড়েছে। নীলিমা দেবী উনুনে চায়ের কেটলি চাপিয়ে বড় ঘরে এসে দেখেন, অনীশ তখনও লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বরাবরই ও একটু ঘুমকাতুরে, বলে বলেও সকালে উঠানো যায় না। এখানে আসার পরও তিনি কতবার যে বলেছেন, একটু সকালে উঠতে, ভোরের হাওয়া, 'একটু হিম, রোদ্দুর গায়ে মাখতে, গ্রাম ম্যাটিতে হাটা-হাটি করতে! কিন্তু আলসেমিই কাটে না ওর। অনীশ চেষ্টা করেও পারে না, দীর্ঘ-দিনের অভ্যেস কি অত সহজে ছাড়া যায়! নীলিমা দেবী এবার এক এক করে ঘরের সব জানলাগুলো খুলে দিলেন। রোদ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, সঙ্গে বাগানের ফুলের, গাছগাছালির এক সৌরভও ছিল।

অনীশ মা-র মুখের দিকে তাকাল এক-বার, হাসি হাসি চোখ মুখ। 'আহা, উঠছিস কেন, আরো একটু ঘুমিয়ে নে।' নীলিমা দেবীও বলতে বলতে হাসলেন, তারপর মশারিটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, 'এত বেলা অব্দি যে কি করে বিছানায় পড়ে থাকিস, বুঝি না।'

'সবই অভ্যেস।' অনীশ হাসল একটু, 'আমিও তো বুঝি না, তুমিই বা রাত থাকতে উঠ কি করে।'

'কথার ওস্তাদি থাক।'

'ঠিক আছে, কাল থেকে খুব ভোরে উঠবো, তুমি আমাকে ডেকে দিও তো।'

'সে আমার জানা আছে।' বিছানা গোছগাছ করতে করতে তিনি বললেন, 'এখানে এসেও যদি এত ঘুম, তবে আর এলি কেন। শরীর স্বাস্থ্যটা এই বেলা একটু সারিয়ে নিবি, তা না, পড়ে পড়ে শুধু কুম্ভকর্ণের ঘুম।'

'শরীরটা ভাল লাগছে না। এখানে এসে হুট করে ঠাণ্ডাটা লেগে গেল আবার।'

'এখন ঠাণ্ডার কিছু হয় না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'সকালের চা জল-খাবার মানুষ কখন খায় রে, কটা বাজে খেয়াল আছে?'

অনীশ হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে ঘড়িটা তুলে নিল, 'ওরে বাপস, সাড়ে নটা।'

'তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে আয়।' নীলিমা দেবী অন্য ঘরে চলে গেলেন।

'সানুরা কি এখনও টো-টো করছে?' অনীশ কলতলায় যেতে যেতে জোরে জোরে বলল।

চায়ের জল ফুটে গেছে, কেটলিটা নামিয়ে রেখে রান্নাঘর থেকেই নীলিমা দেবী বললেন, 'এমন খোলামেলা জায়গা পেয়ে ওরা যে কি করবে বুঝতে পারছে না। ওদের মত তুই-ও টো-টো করলে পারিস একটু।'

অনীশ মুখে জল দিয়ে, গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে বারান্দায় এসে বসল। দু দিন ধরে যেন আরো ভারী ঘন হয়ে শীত পড়েছে। তখনো লেবু গাছের ছায়ায় অল্প হিম জমে আছে, মাটিতে ঘাসে গাছের পাতায় সারা রাত ধরে যে হিম পড়েছে, এখন তা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া বইছিল। এতেই যেন শীতটা আরো বেশী করে ছড়াচ্ছে। চাদরটা আরো একটু ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে। আজ একটু বেলাই হয়ে গেছে উঠতে। আসলে শরীরটা একটু ম্যাজ ম্যাজ করছিল। অন্য দিন বারান্দায় বসে শীতের একটা আমেজ পায়, আজ যেন রোদ্দুরের ঝাঁজটা একটু বেশী। কুয়াশা আর হিমের ভেজা ভেজা পুরু আচ্ছাদনটা এখন আর দেখা গেল না আগের মতন। গাছ-পাতার বুনো গন্ধটাও শুকিয়ে গেছে এর মধ্যে। একটা দোয়েল এসে বসেছে লেবু গাছের ডালে। কটা ফড়িং উড়ছিল মাধবীলতার আশপাশে। অনীশ একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে গাছ-গাছালির এই ঐশ্বর্য দেখছিল। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল অনীশ।

নীলিমা দেবী জলখাবার নিয়ে এলেন লুচি বেগুন ভাজা।

অনীশ মা-র মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছে, বলল, 'তুমি আমার স্বাস্থ্য ভাল না করে ছাড়বে না দেখছি।'

'এ কটা খেতে পারবি। এখানকার জলে সব হজম হয়ে যাবে দেখিস।'

'এখনও তো টের পাচ্ছি না কিছু। তুমি বরং দুটো তুলে নাও।'

'ঢঙ, না খেয়ে খেয়েই তো এ[illegible] চেহারা।' নীলিমা দেবী লুচি তুলে নিয়ে চা আনতে গেলেন।

অনীশ কিছু না বলে হাসল সামান্য খেতে খেতে সে বাগানের গাছপালা দেখ[illegible] ছিল। বাড়িটা খুব ভালই পেয়েছে। বড় ব[illegible] ঘর, গাছপালা বাগান আলো-হাওয়া প্রচুর ওর বন্ধু মহীতোষই ঠিক করে দিয়ে[illegible] ওরই কোন আত্মীয়ের বাড়ি। এখানে আস[illegible] পরও অনীশ দেখেছে, বাড়িটার এখানে ওখা[illegible] ঝোপঝাড় আগাছা কাঁটালতা ছড়ানে[illegible] দু দিনেই বাড়ির চেহারা বদলে গেছে[illegible] মালীর সঙ্গে একটু-আধটু সেও হ[illegible] লাগিয়েছে। সানু মানুও এটা-ওটা পরিষ্ক[illegible] করেছে। বাগানটি মনের মতন। মরশু[illegible] ফুলের বাহার, বাড়ির সামনেই বড় বড় দু[illegible] ইউক্যালিপটাস গাছ সোজা ঋজু ভঙ্গী[illegible] উঠে গেছে। পাতা কচলালেই মৃদু মি[illegible] মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়ায়। [illegible] লাগোয়া একটা কামিনী ফুলের গাছ, [illegible] ভর্তি এখন ফুল আর ফুল। বাড়িময় [illegible] সুঘ্রাণ ছড়ান। কিছু ভোমরা ভোম[illegible] ফড়িং আর প্রজাপতি উড়ে উড়ে ঘু[illegible] বাগান ভর্তি গোলাপ, মাঝে মাঝে ঝা[illegible] ঝাউ গাছ। বেশ লাগে দেখতে। মাধবীলত[illegible] গাছটা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত [illegible] গেছে, থোকা থোকা ফুল ধরেছে। শুধু[illegible] ফুলের বাগান তা নয়, বাড়িটায় [illegible] গাছও প্রচুর। আতা গাছই বেশী। বড় [illegible] আতা ফলেছে গাছে। পেয়ারা, বাতা[illegible] লেবু, আম কাঁঠাল জাম আর সবে[illegible] কুয়োতলার কাছে দুটো হরিতকী [illegible] তার পাশেই একটা আমলকী এবং জা[illegible] গাছ। এক কোণায় তিনটি নারকেল [illegible] কত বিভিন্ন ধরনের সব পাখি দেখেছে কদিনে। আশপাশের বাড়িগুলোয়ও

বেড়েছে কাদনের ভেতর। শীত পড়েছে, রোজই আসছে লোকজন। প্রতিটি বাড়ির সামনেই ফুলের বাগান, ফলের গাছ। মালীরা গাছের বাড়তি পাতা ছেঁটে দিয়েছে, পথের দু পাশে বর্ষার জলে যে আগাছা, জঙ্গলের মতন হয়েছিল এখন আর তা নেই। ফুলের গাছগুলোকে জল দিয়ে দিয়ে তাজা করে তুলেছে, গাছে গাছে এখন রকমারী বাহার, প্রাচুর্য। শুকনো পাতা খড়-কুটো জঞ্জাল এক পাশে সব ডাঁই করা। এ সৌন্দর্য এখানকার প্রতিটি বাড়িরই। এ ছোট শহরের সর্বত্রই এখন লোকজন। ভিড় গাড়ী ধুলো হই হই সব মিলেমিশে কেমন যেন চঞ্চল নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে জায়গাটা। অনীশের ভাল লেগেছে জায়গাটা। বারান্দায় বসে বসেই সে এখান-কার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে। আকাশ, সাদা মেঘের ভেসে বেড়ানো, ছোট ছোট টিলা, সাল বন, ক্ষেত, লাল মাটিতে মুলো কপির চাষ, দল বেঁধে সাঁওতালী মেয়ের ফসল কাটা, ছোট ঝিল, নানান রকমের পাখিদের আনাগোনা, আরো কত কি! অনীশ অবাক হয়ে গেছে একটু। ঘরের বাইরে যে এত আয়োজন, বিস্ময় এর আগে সে বুঝতে পারে নি। এসে ভালই করেছে।

অনীশের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। নীলিমা দেবী চা নিয়ে এলেন। 'ওরা এখনও যে আসছে না, খাবেটাবে না নাকি?' নীলিমা দেবী সামনের দিকে চাইলেন একবার।

'ঘুরে ঘুরেই পেট ভরে গেছে হয়তো।'

'নিশ্চয়ই অতসী ধরে নিয়ে গেছে।'

অনীশ চায়ে চুমুক দিল। এখানে এসেই অতসীদের সঙ্গে পরিচয়। ওরা রায় লজে এসে উঠেছে। রাস্তায় নামলেই ওদের বাড়িটা দেখা যায়। যাবার সময় সানুরা ওকে ডেকে নিয়ে যায়, কোন কোন দিন অতসীও এসে ওদের ডাকে। মেয়েটা বড় শান্ত, একটু দুর্বল, সামান্য হাঁটাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে নাকি, দম পায় না। অনীশও যে যাওয়া-আসার সময় কখনো না দেখেছে এমন নয়, মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয়েছে, গতকালই তো যখন বাজার থেকে সে ফিরছিল, ওদের বাড়ির কাছে এসে চোখ দুটো এমনিতেই একবার ঘুরে গেল, দেখল রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে, পিঠময় চুল ছড়ানো। মনে হলো তার, সবে চান করে এসে রোদে দাঁড়িয়েছে। অতসীও তাকাল একবার। কি ভেবে সলজ্জ পায়ে এগিয়ে এলো খানিকটা, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'মানু এদের একবার আসতে বলবেন না!'

অনীশ মাথা নেড়ে চলে এসেছিল। ওদের সঙ্গে কদিনেই বেশ ভাবসাব জমে গেছে।

'জায়গাটা কিন্তু বেশ, তাই না মা?' অনীশ মুখ তুলে মার দিকে তাকাল।

'এসব জায়গা সব সময়ই ভাল। ক্ষিধে হয়, জল হাওয়াটা খুব ভাল।'

'আমারও এখন মনে হচ্ছে, ক্ষিধে বেড়েছে।'

'আর বকিস না।'

'হ্যাঁ গো, দু দিন ধরে তো চোঁয়া ঢেকুর আর উঠছে না।'

'তবে খেতে আর অত ভয় পাস কেন?' একটু থেমে আবার বললেন, 'মধুপুরের জলটাও খুব ভাল।'

অনীশ মার দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে আনল। মনে মনে হাসল একটু। যখনই কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠেছে, মা মধুপুরের কথা বলেছে। এ জায়গাটার কথা মার মুখে তারা বহুবার শুনেছে। অনেক কাল আগে বাবা তখন বেঁচে, ওঁর সঙ্গে একবার বেড়াতে গিয়েছিল অনীশরা। বয়েস তার খুবই কম তখন। মানু তখনো হয় নি। পুরো কিছুই মনে পড়ে না, আবছাভাবে সামান্য মনে আছে। খুব ভোরে টাঙায় চড়ে একদিন পাত্রেইল কালীবাড়ি দেখতে গিয়েছিল ওরা। সারা দিন হই হই করে কেটেছে, আরো বহু লোক এসেছিল, একটা মেলার মতন ভিড়, সন্ধ্যের মুখে মুখেই আবার ফিরে এসেছিল সবাই। ফাঁকা, উঁচু-নীচু লাল মাটির পথ, দু পাশে ক্ষেত, ধানের গন্ধ, সূর্য তখন ডুবছে, আকাশটা গনগনে লাল দেখাচ্ছিল, দূরে শাল-মহুয়ার বনে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে, ধুলো উড়ছিল। সেই অসমান পথের ওপর দিয়ে আসতে আসতে তারাও টাল খাচ্ছিল। ওদের টাঙ্গাটাই সবার পেছনে। আসলে, অনীশের আজো মনে আছে ওদের ঘোড়াটা বড় নির্জীব ও অসুস্থ ছিল। ঘোড়াটা যেন আর টানতে পারছিল না, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছিল অনবরত। লোকটা কি নিষ্ঠুর, সমানে চাবুক মেরেছে ঘোড়াটাকে। অনীশ বাড়ির কাছে এসে দেখেছিল, ঘোড়াটার চোখে জল। এ ছবিটা এখনও যেন ওর মনে গেঁথে আছে।

অনীশ ধীরে ধীরে কিছুটা চা খেয়ে চোখ তুলল একবার। মাকে বলল, 'টাঙ্গা-অলাটা কিন্তু ভারী পাজী ছিল মা।'

'তোর এখনও তা মনে আছে?'

'থাকবে না, ঘোড়াটাকে কি মেরেছিল লোকটা!'

'আমি উঠি, তোর সঙ্গে বকবক করলে চলবে না, ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে এখনও।'

'তুমি আর কত করবে, ওরা আসুক।'

'ওরাই তো করে সব, একটু ঘোরাফেরা করছে করুক।'

'তার একটা নিয়ম থাকবে তো।'

'এক্ষুনি এসে পড়বে।'

'ঠিক আছে, আমার জন্যে পরে আর এক গ্লাস চা পাঠিয়ে দিও।'

'না, অত চা খেতে হবে না।' সস্নেহ ভর্ৎসনার গলায় নীলিমা দেবী কথাটা বললেন, কি ভেবে হাসলেন একটু।

'এইবারটি দিও মা, তা না হলে আর মাথাধরা ছাড়বে না।'

'খালি চালাকি!' নীলিমা দেবী চলে গেলেন হাসতে হাসতে।

'না না, সত্যি বলছি, পাঠিয়ে দিও কিন্তু।' অনীশ চিৎকার করে কথাগুলো বলল। কাপের বাকী চাটুকু শেষ করল। একটা সিগারেট ধরায় এবার। এখানে অঢেল সময়, খাওয়া-দাওয়া, যেখানে খুশী ঘুরে বেড়ানো, আর ঘুম। এত বড় বাড়িটা পেয়েছে মহীতোষেরই জন্যে। বাড়ির তুলনায় ভাড়া খুবই সস্তা। এখানে এসে ভালই লাগছে অনীশের। সাবালক হওয়ার পর এই প্রথম কলকাতা ছেড়ে তার বাইরে আসা। না এসেও কোন উপায় ছিল না। প্রথমত তার নিজের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। সারা মাসেই অনীশের একটা-না-একটা ঝামেলা লেগে আছে। বড় কোন অসুখ-বিসুখ নয়। একবারে শুধু অল্প বয়েসে টাইফয়েড হয়েছিল তার। সর্দি-কাশি সামান্য জ্বরজারী খুচখাচ অসুখ সব সময়ই রয়েছে। খুব ছেলেবেলা থেকেই সর্দির ধাত তার। একটু অনিয়ম হলো কি, ব্যাস, উপদ্রব শুরু হলো। গা ম্যাজ ম্যাজ করা, নাক গলায় সুড়সুড়ি, কপাল টিপটিপ করা, কাশতে কাশতে গলায় যন্ত্রণা। হয়ত কোন ছুটিছাটায় অবেলায় এসে ঝপাঝপ জল ঢেলে চান করেছে অনীশ বা বৃষ্টির জলে ছাড়াছাড়াভাবে ভিজেছে, মাথায় চড়া রোদ লাগিয়েছে, অমনি সর্দি-জ্বর, বুকে সর্দি বসে যায়, ঘড় ঘড় একটা আওয়াজ, কোন কোন সময় সর্দি বসে গিয়ে রক্তও পড়ে কফের সঙ্গে। শীত পড়ার মুখে মুখে একটু ঠান্ডা লাগলেই সারা শীতে কষ্ট পায় সে। এসব কারণে আগে থাকতেই যতটা সম্ভব সাবধান হয় অনীশ। গরম জামা-কাপড় পরা অনেক আগেই শুরু হয়ে যায় তার; কার্তিক মাসের গোড়াতেই লেপ গায়ে দেয় সে। শীতটা তার বরাবরই একটু বেশী। শুধু এই জন্যেই ঠান্ডা ঘরে খুব একটা সিনেমা দেখে না অনীশ, দেখলেও কদাচিত। কিন্তু এত সাবধানেও রেহাই পায় না সে। ইদানীং সর্দি-কাশি হলে অনীশ লক্ষ্য করেছে, একটু শ্বাস কষ্ট হয় তার। বড় তাড়াতাড়ি দম ফুরিয়ে যায় যেন।

এসব ছাড়াও আজকাল পেটের নানান উপসর্গ দেখা দিয়েছে অনীশের। ভাল করে কিছু খেতে পারে না, খেলেই পরমুহূর্তে অ্যাসিড হয়ে যায়, হজম হয় না, চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। মুখে রুচি নেই, কেমন বিস্বাদ, তেতো লাগে সব। মুখ টক জলে ভরে যায়। পেটের ডান পাশে আজ কমাস ধরে চিনচিন একটা ব্যথা। কি বাড়িতে, কি রেস্টুরেন্টে ভাজাভুজি পেঁয়াজ-রসুন তেল-ঘি মসলার মোগলাই খানা খাওয়া তার একে-বারেই নিষেধ। এখন শুধু সেদ্ধ, আর মসলা ছাড়া সামান্য আদার রস, জিরে বাটার রান্না খাচ্ছে অনীশ। বহু ডাক্তার দেখিয়েছে সে। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী কিছুই বাদ রাখে নি, সাধ্যমত ওষুধপত্র খেয়েছে, টোটকা ব্যবহার করেছে অনীশ। কিছুতেই কিছু হলো না। দিন দিনই তার শরীর ভেঙে পড়ছিল। কিছুই ভাল লাগত না। এ সময়, এক ধরনের অস্বস্তি উদ্বেগ হতাশা ওকে ক্রমশ কেমন নির্জীব, ক্লান্ত করে তুলছিল। এ অবস্থায় অতিরিক্ত চা খাওয়া, সিগারেট তার পক্ষে ক্ষতিকর। ছ সিগারেট

মাধ্যমত কমিয়েছে অনীশ। একেবারে ছেড়ে দেওয়া কখনো সম্ভব নয়। কলকাতার জলটাই নাকি খারাপ।

অনবরত ভুগতে ভুগতে চেহারা খারাপ হয়ে গেছে তার। চোখের কোণে দীর্ঘ এক ক্লান্তি, অপ্রশান্তি। চোখ দুটো আরো যেন ডুবে গেছে। হাত-পা রু সরু, পাকানো দড়ির মতন। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। চোয়ালের হাড় অনেকটা বেরোনো। গাল ভাঙ্গা। ওপরের মাড়ি খানিকটা উঁচু। দুটো দাঁত সব সময় বেরিয়ে আছে। নীচের ঠোঁট বেশ পুরু। থুতনীর কাছে বড় একটা আঁচিল। গলাটা সামান্য লম্বা। আগে গোঁফ রাখত অনীশ, এখন আর রাখে না। গায়ের চামড়া কেমন খসখসে। হাত-পায়ের নীল নীল শিরা-উপশিরাগুলো পর্যন্ত ফুলে ফুলে রয়েছে। এজন্যে তাকে আজকাল একটু বুড়োটে মনে হয়।

অনেকেই অনীশকে পরামর্শ দিয়েছে, কিছু দিনের জন্যে বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসতে। জায়গা বদলালেই কিছুটা উন্নতি হবে। বিহার সাঁওতাল পরগণার জল-হাওয়া এই শীতের সময়টা খুব ভাল, অনেকেই ওসব এলাকায় বেড়াতে যায় এ সময়। মধুপুর গিরিডি দেওঘর শিমুলতলা হাজারীবাগ রাঁচী ঘাটশিলা এর যে কোন একটা জায়গায় কিছুদিন থেকে আসতে পারলে শরীর মন দুই-ই ভাল হবে, পরিবর্তনটা চোখে পড়বে।

একদিন দেখা দিল। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না, হাসে। ও চলে যাওয়ার পর এক-দিন পুলিস এসেছিল, ঘরের সব জিনিস, আসবাবপত্র ঘেটেঘুটে চলে গেল। কি খুঁজেছে কে জানে। মা এ দুঃখ আর সইতে পারছিল না। অনীশ এটুকু জেনেছে পুলিস ওর খোঁজাখুঁজি করছে। ওরা নাকি মানুষের কাছে মহত্তর মুক্তির স্বাদ নিয়ে আসছে। অথচ ওকে নিয়ে মার কত না স্বপ্ন। এরপর তিন মাস আর খোঁজ নেই দীপেন্দুর। মার অস্থিরতা অশান্তি আরও বেড়েছে। একটা কোন খবর না পেলে মা বুঝি আর বাঁচেই না। অনেক কষ্টে অনীশ একটা খবর এনে দিয়েছে মাকে, দীপেন্দু বেঁচে আছে, অনেক দূরে পাড়াগাঁয়ে কিসব কাজ করছে যেন। শুনে মার বুকটা আরো ভারী হয়ে উঠেছে। কান্না সামলাতে পারে নি। হাউ হাউ করে কেঁদেছে তার মা। দেখতে দেখতে আবহাওয়াটা কেমন বদলে গেল। নিষ্ঠুর অমানুষিক সব হত্যা, খুনো-খুনি। স্কুল কলেজ পুড়ছে, ভাঙছে, রক্তের নেশায় কেমন যেন বেহুঁস, মাতাল সব। মার বুকে কেবল তড়াস তড়াস ভাব। এ অবস্থায় নীলিমাদেবী যে কি করবেন বুঝতে পারেন না। অনীশেরও কিছু করার ছিল না। অবশেষে একদিন খবর এল, দীপেন্দু ধরা পড়েছে, জেলে আছে। ওর কাছ থেকে একটা চিঠিও পেয়েছিল অনীশ। এসব কারণে মন-মেজাজ কারো ভাল ছিল না। আপাতত কোথাও বেরিয়ে পড়া চাই। এই ঝিমিয়ে একঘেয়েমি জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শেষ পর্যন্ত অনীশের বাইরে আসা। সবারই ভাল লেগেছে জায়গাটা। এখানেও এখন অনেক ভিড়। এর মধ্যেও মদনলাল মল্লিক রোডের সেই বাড়িটা কখনো কখনো দুঃস্বপ্নের মতন মনে পড়ত।

গেট খোলার শব্দ হলো। অনীশ শব্দ শুনে চোখ তুলে ফিরে তাকাল, দেখে সানুরা আসছে। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। সানু চাদরটা এখন মাথায় জড়িয়ে নিয়েছে। আসতে আসতে মাটি থেকে ইউক্যালিপটাসের কয়েকটা পাতা কুড়িয়ে নিল। টেনে টেনে গন্ধ নিল বার কয়েক, কাছাকাছি এসে অনীশের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে শুধালো, 'সোনাদার বুঝি এতক্ষণে ঘুম ভাঙল?'

'মোটেই না, তোরা বেরোবার পর পরই উঠেছি।'

'সে কি?' সানু একটু অবাক হয়েছে যেন।

'বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞেস কর।' একটু চুপ করে থেকে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'কিন্তু তোরা এতক্ষণ ধরে টো টো করলি কোথায় শুনি?'

'টো টো করবো আবার কোথায়, কখন ফিরে এসেছি, অতসীদের ওখানে ছিলাম। ওর মা আসতে দিল না।' একটু থেমে আবার বলল, 'ওসব আমার ভালও লাগে না।'

কথা শুনে নীলিমাদেবীও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সানুর চোখের দিকে চেয়ে সহাস্যমুখে বললেন, 'ওটাকে আবার রেখে এলি কোথায়?'

'আসছে, অতসী সঙ্গে আছে তো, গল্প আর ফুরোয়ই না ওদের, কি যে অত বকবক করে না, আমার বাপু মাথা ধরে যায়!'

'এতক্ষণ তাহলে ওখানেই ছিলি?'

সানু আস্তে করে মাথা নাড়ল। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'এত হাঁটাহাঁটি আমার ভাল লাগে না।' একটু থেমে কি ভেবে হেসে ফেলেছে, মাকে জড়িয়ে ধরে হাসি হাসি মুখে বলল, 'কাল থেকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে, যদি যাই তোমাকেও যেতে হবে, এই বলে রাখছি।'

'তোরা দেখছি আমায় মেরে ফেলবি।' নীলিমাদেবী হাসছিলেন।

'ঠিক বলেছিস রে সানু, কাল থেকে মাকেও ধরে নিয়ে যাবি।'

'অত হাঁটতেই পারবো না আমি।' নীলিমাদেবী ছেলেকে দেখতে দেখতে আবার বললেন, 'এটা বুঝিস না কেন, তোরা যা পারিস আমি তা পারি না, আমার তো বয়েস হয়েছে রে।' বলতে বলতে সানুকে এক পলক দেখে নিলেন তিনি; পরক্ষণেই সামান্য যেন অন্যমনস্ক হলেন, দৃষ্টি এখন সামনের গাছপালা পেরিয়ে দূরে ঢালু জমি, টিলার ওপর দিয়ে শাল হরিতকী ইউক্যালিপটাসের মাথা ডিঙিয়ে আরো বহুদূরে প্রসারিত। ঈষৎ ক্লান্তি ও বিষণ্ণতায় ভেজা সে দৃষ্টি। মার এই উদাসীন ভাবটা ভাল লাগে না অনীশের। আবার কি কলকাতার কথা মনে পড়ে গেল! দীপেন্দুর মুখটা এখানে এসে অনীশেরও মনে পড়েছে কয়েকবার। বুকের ভেতরটা তারও মোচড় দিয়ে উঠেছে। দীপেন্দু কি ওদের দিকটা কখনো ভেবেছে? ভাবে নি, ভাবে নি। সেও তো ওর জন্যে কত গর্ব বোধ করেছে, এখনও মনে করে। আজ দীপেন্দু থাকলে কী আনন্দই না হতো। ওর অভাবটা এখানে আসার পর যেন আরো বেশি করে অনুভব করছে সে। অনীশও অন্যদিকে চেয়ে মনে মনে কি ভাবছে যেন গম্ভীরভাবে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সানুই বলল, 'উঁহু, ওকথা বলো না মা, গিরি কুঠির ওই বুড়িকে দেখলে তো সেদিন, বয়েস তোমার চেয়ে ঢের বেশি, তবু গট-গট করে কেমন হেঁটে গেল।'

নীলিমাদেবী কোন জবাব দিলেন না। সানু আরো জোরে জড়িয়ে ধরেছে মাকে, বলল, 'কাল থেকে তুমি না গেলে আমিও আর যাবো না। আমারও এত হুই হুই, ঘোরাঘুরি ভাল লাগে না।'

নীলিমাদেবী মেয়েকে দেখলেন একবার, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বললেন, 'ঘোরাফেরার এই তো তোদের বয়েস। এখনই তো হেসে-খেলে দু-চোখ ভরে দেখবি, আমার মতন বুড়ী হলে এসবে আর রুচি থাকবে না দেখিস।'

সানু মাকে ছেড়ে দিয়েছে এবার, একটু সরে দাঁড়াল, ওকে এই মুহূর্তে বেদনার্ত ও করুণ দেখাচ্ছে। যে কথাটা এতদিন ধরে সে ভুলতে চেয়েছে, ভুলবার চেষ্টা করেছে দুঃসহ যাতনা নিয়ে মা যেন তাই আবার মনে করিয়ে দিল। এ জীবনে সাধ-আহ্লাদ সবই তো বিধাতা অকালে কেড়ে নিয়েছেন তার। এভাবে হুই হুই করে ঘোরাফেরা কি তারই সাজে? ঈশ্বর তো করুণাময়, তিনি নাকি সবারই মঙ্গল করেন। কিন্তু এতে তার কি মঙ্গল হয়েছে? সানু কিছুতেই কিছু মেলাতে পারে না। এইটুকু জীবনে সে যে অভিজ্ঞতা আজ পর্যন্ত সঞ্চয় করেছে, তাতে বিশ্বাস করার মতন আর তো কিছু অবশিষ্ট নেই। বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠল। মনটা হঠাৎ কেন যেন বড় ফাঁকা মনে হলো, আর দাঁড়াতে পারছিল না সে, চোখের কোণ দুটো কেমন ছল ছল করে উঠছে, বলল, 'আমি যাই, বাসি বিছানাপত্তরগুলো এখনও রোদ্দুরে দেওয়া হয়নি।' বলে ভেতরে চলে গেল সানু।

অনীশ কি ভেবে মার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছে, হেসে হেসেই বলল, 'কলকাতায় না হেঁটে হেঁটে তো তোমার বাত ধরে গেছে, এবার শক্ত করে নাও শরীরটা।'

'আমার জন্যে অত ভাবতে হবে না তোদের, তোর চেহারাটা আগে ভাল কর তো।'

সানু বাসি বিছানাপত্তর বারান্দার রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে ততক্ষণে। সে মাকে উদ্দেশ করে শান্ত গলায় বলল, 'অনেক বেলা হয়েছে মা।'

'আমার চা-টা কিন্তু এখনো দিলে না মা।'

গেটের ওখানটায় মানুর গলা শোনা গেল।

'এতক্ষণে আসার সময় হলো মেয়ের।' বলতে বলতে আবার ভেতরে চলে গেলেন নীলিমাদেবী. ঘর থেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'আর কিন্তু চাইতে পারবি না, এই শেষ চা। এই করে করেই তো চেহারাটার এই দশা হয়েছে।'

বাতাবীলেবুর ডাল থেকে এই মুহূর্তে একটা বাঁশপাতি পাখি উড়ে গিয়ে করঞ্জা গাছে বসেছে। মানুর পেছনে অতসী। ওরা কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিল। অতসী দাঁড়িয়ে পড়েছে হঠাৎ। মানু ক পা পিছিয়ে এসে অতসীর হাত ধরল আবার, 'উঁহু, কিছুতেই তুমি এখন যেতে পারবে না, দুপুরে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে।'

'বলছি তো, পরে আবার আসবো।' অতসী সলজ্জ চোখে বারান্দার দিকে তাকাল একবার, পরমুহূর্তেই দৃষ্টি সরিয়ে এনেছে।

'না না ওসব চালাকি হবেই না, আগে ভেতরে এসো।' বলে মানু [illegible]

মতন জোরজার করে টানতে টানতে আরো খানিকটা নিয়ে এলো।

'আসছি, আসছি, ছাড়ো, হাতটা ছাড়ো।' অতসী মৃদু ভঙ্গিতে এক ফাঁকে আবার অনীশকে দেখে নিয়েছে একবার, আস্তে আস্তে বলল, 'এ-ই, কি হচ্ছে, তোমার দাদা সব দেখছে।'

'দেখুক না।' মানু এবার ওর হাত ছেড়ে দিয়েছে। তারপর দাদার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'ওরে বাপস্, ভীষণ টায়ার্ড।' বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির একটা ধাপে বসে পড়েছে মানু। কার্ডিগানটা খুলে এক পাশে রেখে দিল। রোদের তেজ বাড়ছে, গরম লাগছিল মানুর। ওর হাতে টাটকা বড় বড় অনেকগুলো গোলাপ, আর একগুচ্ছ কামিনী ফুল।

অনীশ গোল করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। একদৃষ্টে মানুকে দেখল খানিকক্ষণ, পরে সামান্য হেসে বলল, 'কোথায় টো টো করছিলি যে এত টায়ার্ড?' অনীশ তখনও স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

'দেখ না, অতসীদিদের বাড়ি গেলে কিছুতেই আর ছাড়তে চায় না।'

অনীশ হাসছিল মৃদু মৃদু, সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'তবে আর এলি কেন, চান-খাওয়া ওখানেই সারলে পারতিস।'

'বলেছিলাম তো, শুনল না।' অতসী হাসি হাসি চোখে একবার চেয়েই দৃষ্টি আনত করেছে।

'তা ও এই সকালেই খা খাইয়েছে, দুপুরে আমার না খেলেও চলবে।' মানু হাসতে হাসতে বলল। ঘাড় বেঁকিয়ে ভেতরে একবার উঁকি দিল।

'মোটেই না, একেবারে মিথ্যে কথা। তুমি যে কি বল না।' অতসী বড় বড় চোখ করে হাসল।

শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল অনীশ। মুখে হাসি হাসি ভাব, বলল, 'কি ব্যাপার রে, আমাদের খুব ফাঁকি দিয়ে শুধু তোকেই এত খাওয়ালে-টাওয়ালে —আমরা বুঝি কিছুই নয়।'

'তার আমি কি জানি, অতসীদিকে জিজ্ঞেস কর না, সামনেই তো আছে।'

'বুঝেছি, লিস্ট থেকে বাদ পড়ে গেছি।' অনীশ জোরে জোরে হেসে উঠেছে।

'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না তো, মানুটা ভীষণ বানিয়ে বানিয়ে বলে।'

'সে কি, আগে তো এই বদগুণ ছিল না ওর।' অনীশের মুখে চাপা হাসি।

'আগে ছিল না, এখন হয়েছে।' অতসী চোখের এক ভঙ্গি করল।

'না গো সোনাদা, আমি ঠিকই বলছি।'

অনীশ সোজাসুজি অতসীর মুখের দিকে তাকাল, সে তখনও মুখ টিপে হাসছে, বলল, 'মিথ্যে তো মানুষ কিছু একটা লাভের জন্যেই বলে, এখানে কিন্তু ওর পুরোপুরি ঠকা।'

'আমি অত বুঝিসুঝি না।' অতসী যেন এখনো ওর এই আড়ষ্ট সলাজ ভঙ্গিটি সম্পূর্ণ সরাতে পারছে না। চোখ আনত রেখে মধুর এক ভঙ্গিতে হাসল, কি ভেবে মুখ তুলে তাকিয়েছে, আবার, কোমল গলায় পরে বলল, 'লিস্ট করলে বাদ দেওয়ার তো কথাই আসে না, বরং প্রথম নামটাই আপনার, বুঝেছেন?' অতসী ঘাড় কাত করে অনীশকে দেখছিল। আবার মুখ নীচু করেছে ও, একটু অন্যমনস্ক হয়ে গোলাপ-ফুলের পাঁপড়িগুলো ছিঁড়ছিল।

'ফুলটাকে যে শেষই করে দিলে।'

অতসী লজ্জা পেল। একটু সময় চুপ করে থেকে একসময় মাথা তুলল, আস্তে করে বলল, 'এখানে এসে অনেক রকমের গোলাপফুল দেখলাম।'

'অনেক রকমের!'

'হ্যাঁ, আগে আমার ধারণা ছিল একটাই রঙ হয় গোলাপের, এখানে এসে আমার ধারণাটা ভেঙে গেছে।'

'আমি দু-তিন রঙের দেখেছি।'

অতসী যেন কি ভাবছে মনে মনে, একটু পরে বলল, 'এই ফুলটা যে কী ভাল লাগে না আমার, আপনার লাগে না?' অতসী অপলকে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল এবার।

অনীশ ওর কথা শুনে হাসছিল, বলল, 'লাগবে না মানে, ফুলের রানীই তো গোলাপ, আমি আবার রানীটানী খুব পছন্দ করি।' তারপর মানুর দিকে চেয়ে বলল, কি করেছিস রে, তুই যে একেবারে বাগান খালি করে নিয়ে এলি!'

'তার আমি কি জানি, অতসীদি দিল, নিয়ে এলাম।'

'ওদেরগুলো আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জাতের।'

'আমাদের আবার কি!' অতসী তাকাল, এক মুহূর্ত গাঢ় চোখে দেখল অনীশকে। ওকে অনেক সহজ অনাড়ষ্ট দেখাচ্ছিল এখন। মুচকি মুচকি হাসছিল ও।

'ওই হলো, এখন তো তোমরাই আছ।'

'আজ আছি, কাল নেই। তবে মালীটা খুব ভাল, ফুলটুল তুললেও কিছু বলে না।'

'বলবে আবার কি, না তুললে এমনিতেই তো একদিন ঝরে যেতো।'

'তবু তো বাগানের শোভা।' অতসী টান টান করে কথাটা বলে অনীশের মুখের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল খানিকটা সময়।

'সব সময় কিন্তু নয়।' হাসল অনীশ।

'জান, সোনাদা, ফুলগুলো আসলে তোমারই জন্যে তোলা।'

'আমার জন্যে!'

'হ্যাঁ, অতসীদি তোমাকেই দিতে বলেছে।' মানু হাসতে হাসতে বড় বড় কটা ফুল ওর দিকে এগিয়ে দিল।

'মানুটা না ভয়ানক মিথ্যুক। ও নিজে তুলে আনল, আর এখন কিনা আমার নাম দিচ্ছে।' এক মুঠো লজ্জা যেন মুহূর্তে অতসীর রক্তিম কে আবার ওর চোখেমুখে মাখিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আর কোন কথা বলতে পারল না সে।

অনীশ হাসি হাসি চোখে অতসীকে দেখল অপলকে, সামান্য একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দেখলে তো, ফুল যে সব সময়ই বাগানের শোভা তা নয়, কখনো কখনো দাতারও শোভা বাড়ায়।'

মানু আগের কথার সুতো ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই...এই..., আমি মিথ্যুক না তুমি, এগুলো তুমি সোনাদাকে দেওয়ার জন্যে দাওনি আমায়, বল, বল এটাও মিথ্যে কথা।'

'না—না—, বাজিল।' বলেই ঠোঁট কামড়ে ধরে চোখ বড় বড় করে অতসী মানুর দিকে চাইল। ইশারায় কি যেন বোঝালো, পরক্ষণেই লজ্জা লজ্জা মুখ তোলে পলকে অনীশকে দেখে নিল অতসী। মানুটার যদি বুদ্ধি থাকে!

'দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি।' হাসতে হাসতে বিজয় কেতন মানু।

'কি আর আছে, বলেই ফেল না। হ্যাঁ বলেছি।' অনীশ অতসীকে দেখতে দেখতে হাসল।

'আহা, মোটেই নয়।'

'আরে, ফুল, গান আর শিশু এই তিনকে সবাই ভালবাসে।'

'আপনার ধারণাটা ঠিক নয়।' একটু নীরব থেকে কি ভেবে নিল অতসী, পরে সামান্য জোরের সঙ্গে বলল, 'আমার ছোট-মামাকে আমি জানি, টাকা আনা পয়সার হিসেব ছাড়া ছোটমামা আর কিছু বোঝে না সংসারে, বুঝতে চায়ও না।'

'সংখ্যায় তারা খুবই কম।'

'আজ্ঞে না, বরং উল্টোটাই ঠিক।' অতসীর স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টি অনীশের দৃষ্টির সঙ্গে মিশে থাকল খানিকক্ষণ।

মানু হঠাৎ অতসীর দিকে চেয়ে এবার চেঁচিয়ে উঠেছে, 'তোমার গায়ে প্রজাপতি অতসীদি!' বিস্ময়ে আনন্দে হাততালি দিল মানু।

'যাঃ, কি হচ্ছে মানু!' অতসীর মুখ লজ্জায় অপ্রতিভ হয়ে উঠেছে।

'বিশ্বাস করছো না তো, এই দেখ।' বলে উঠে এলো মানু। তার আগেই প্রজাপতিটা উড়ে গিয়ে আমার বসল। একটু আফসোসের সুরে বলল, 'যাঃ, চলে গেল।'

'খালি ইয়ার্কি, আমি বাবা এখান থেকে চলে যাই।' অতসী তাড়াতাড়ি করে ভেতরে চলে গেল। মানুও পেছনে পেছনে গেল।

অনীশ মানুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এই, মাকে বলিস তো এখনও আমি চা পাইনি।' বলে আবার একটা সিগারেট ধরায় সে।

সামনের আতাগাছের ডালে একটা কাক এসে বসেছে। বাদুড়ে খাওয়া পাকা একটা আতা মগডালে ঝুলছিল। কাকটা ঠোকরাচ্ছে পাকা আতা। অনীশ একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থেকে একসময় অন্যমনস্ক হলো।

মানু চায়ের কাপটা এনে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, যা বলেছি তাই

দেবে না, এই শেষ, তুমিও আর চেয়ো না কিন্তু।'

'চানের আগে যে আর একবার লাগবে! ঠিক আছে, মাকে বলিস না, তুই লুকিয়ে করে দিস।' সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে আবার ও বলল, 'কী জব্বর শীতটা পড়েছে বল!' বলে চায়ে চুমুক দিল অনীশ। মানু কিছু না বলে চলে গেল।

চা খেতে খেতে অনীশ অলস ভঙ্গিতে সামনের বাগান মাঠ ঢালু জমি টিলা শাল-বন দেখছিল। অতসীর কথাও মনে পড়ছিল তার। ভাবতে ভাল লাগছিল। প্রথম দিন মানুর সঙ্গেই এ বাড়িতে এসেছিল। অনীশ ওর টলটলে মুখের দিকে চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে আনতে পারেনি। অতসীও লজ্জা পেয়েছিল। কেমন চমকে উঠেছিল অনীশ। চোখ দুটো ওর কী এক ক্লান্তিতে ভেজা ছিল যেন। অনীশের ওরকমই মনে হয়েছিল।

অতসী বাইরে এলো। ওকে এখন বেশ সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল।

অনীশ হাসতে হাসতে শুধলো, 'চললে নাকি?'

'হ্যাঁ, যাবো এবার।'

'আরে বসো।' অনীশ চায়ে চুমুক দিল আবার। কয়েক ঢোক খেয়ে হাসি চোখে অতসীকে দেখল কিছুক্ষণ, বলল, 'আমি যে এই ফুলটাই বেশি ভালবাসি, তুমি জানলে কি করে?'

'কেউ বলে নি, কি করে যেন মনে হলো!' অতসী হাসছিল।

'বুঝলে একসময় আরো অনেক কিছুই ভালবাসতাম আমি। সব এখন ভুলে গেছি।' অনীশ জোরে জোরে হেসে উঠেছে। খুব অন্তরঙ্গ শোনালো তার কণ্ঠস্বর।

'আমার তো মনে হচ্ছে, সব পারেননি ভুলতে।' অতসী তখনো তার চোখে চোখে চেয়ে হাসছে।

'বাঃ, তুমি দেখছি মনের লেখাও পড়তে পার!'

'আমি সবই টের পাই!' অতসী মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে বলল।

এমন সময় নীলিমাদেবী বাইরে এলেন, অতসীকে দেখে বললেন, 'আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি চলে গেছ।'

'না, অনেক বেলা হলো, আর দাঁড়াবো না।'

'যাওয়ারই বা কি দরকার? এখানেই চানটান করে খেয়ে নাও।' নীলিমাদেবী সস্নেহ গলায় বললেন।

'না মাসীমা আজ যাই, আর একদিন এসে খাবো।'

'আজ খেলে কি, আর একদিন হবে না নাকি!' নীলিমাদেবী হাসলেন ওর কথা শুনে।

অনীশ সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়েছে। হাসতে হাসতে বলল, 'খেয়ে গেলে কিন্তু ঠকতে না।'

অতসী মুচকি হেসে অনীশের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে এনে নীলিমাদেবীকে দেখল, বলল, 'যাচ্ছি মাসীমা।'

'যাই বলতে নেই, এসো মা।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমার মাকে নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা।' অতসী চলে গেল।

নীলিমাদেবী ওর যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে কি ভেবে বললেন, 'মেয়েটাকে বড় ভাল লাগে আমার।' নীলিমাদেবী একটা চেয়ারে বসলেন এবার, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থামলেন একটু সময়। অল্প অল্প হেসে বললেন, 'বারান্দায় বসে বসেই তো সকালটা কাটালি, একটুও বেরোলি না, বাজার টাজারও হলো না আজ।'

'তবে যে ওকে খেতে বলছিলে?'

'যা হয়েছে তাই খেতো।'

'এখন দেখছি না খেয়ে ও ভালই করেছে, খেলেই বরং ঠকে যেতো।'

'ঘরের মেয়ের মতন আসে যায়, এতে আর ঠকাঠকির কি আছে!'

একটু চুপ করে থেকে অনীশ বলল, 'কাল যে লোকটার কাছ থেকে কপি কড়াই-শুঁটি আলু বেগুনটেগুন রাখলে, সব শেষ হয়ে গেছে?'

'তোরাও কি আমাদের মতন খালি নিরামিষ খাবি নাকি!'

'একটা হলেই হলো।' অনীশ হেসে ফেলেছে মার মুখের দিকে চেয়ে।

'মানুটা তো মাছটাছ বা ডিম না হলে খেতেই পারে না।'

'লোকটারও দুদিন ধরে কোন পাত্তা নেই আর।'

'আনতে আনতেই দেখ আবার পথে নিয়ে নেয় কারা!'

মাঝে মাঝে বাড়ি বসেই বাজার সারে। শাক সব্জি ডিম মাছ বিক্রী করতে বাড়ি বাড়ি লোক আসে। দাম একটু বেশি নেয় এরা, তবু জিনিসগুলো খুব টাটকা। হয়তো নিজের সামান্য ক্ষেতিতে কিছু কপি সিম বেগুন লাউ কুমড়ো ফলিয়েছে, ছোট ডালায় করে বা গামছায় পেঁচিয়ে একটু বেশি দামের লোভে এখানকার গরীব দেহাতী লোকগুলো বাড়ি বাড়ি ঘুরে যায়। খুব স্বাদ তরিতরকারীর। মাছও খুব টাটকা, নদী থেকে ধরে নিয়ে আসে। কুচো মাছই বেশি। ওদের কাছ থেকেই অনীশ নদীটার নাম, কিভাবে যেতে হয় সব জেনে নিয়েছে। মাইল চার পাঁচ পথ, একদিন হাঁটতে হাঁটতে বরাকর নদী দেখতে চলে যাবে সে। নদীটার নাম সে অনেক আগেই বই-এ পড়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ যাওয়ার পথে এই নদীটাই পড়েছিল। সেই থেকে নামটা মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। তার কেমন লোভ হচ্ছিল।

নীলিমাদেবী তখনও বসে আছেন। দৃষ্টি গেটের কাছে। একটু পরে বললেন, 'না ঃ, আজ আর এলো না বোধ হয়, ভাবলাম মাছ নিয়ে আসবে কেউ।' নীলিমাদেবী উঠে পড়লেন। অনীশ কাকে যেন দেখতে পেয়েছে হঠাৎ, চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে মাছঅলা।'

নীলিমাদেবীও ফিরে তাকালেন।

একটা লোক তখন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে মাছের একটা ডালা। সরপুঁটি ট্যাংরা পাবদা বাটা সব মেশানো। গা হাত পা এখনও ভেজা রয়েছে লোকটার, মাছগুলো তখনও ছটফটকরছে।

'এদিকে এসো।' নীলিমাদেবী ডাকলেন লোকটাকে। ও সিঁড়ির কাছে এলো।

' কত দাম?' বেশি নেইও তো!' অনীশ ডালাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখল।

'দেড় টাকা।' লোকটার এতক্ষণ জলে থেকে শীত করছিল। রোদে এসে যেন শীতটা আরো বেড়ে গেছে। কাঁপছিল ও।

নীলিমাদেবী মানুকে একটা থালা নিয়ে আসতে বললেন। মানু এসে এতগুলো মাছ দেখে আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল, 'ওমা, কিরকম লাফাচ্ছে দেখ!'

'হবে না, ঝিল থেকে সবে তুলে এনেছে।'

'দামও সস্তা।'

অনীশ মানুকে একবার দেখল। এখানে এসে মানু যেন কদিনের ভেতরই তার স্বাভাবিক সজীবতা ফিরে পেয়েছে। নীলিমাদেবী মাছ নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় অনীশকে ভাল করে তেল মেখে চান করতে বলে গেলেন।

অনীশ মানুকে বলল, 'দাড়ি কাটবো, জল আর বাকসটা নিয়ে আয়।'

রোদটা এখন আরো ঘন হয়েছে, পাকা রঙ ধরেছে। ঝাউয়ের পাতা কাঁপছিল, নারকেল গাছের পাতায় দুটো টিয়াপাখি এসে বসেছে। পাতার ঝোপে বসে একটা কাক ডাকছিল। মাঝে মাঝে ধুলো উড়ছিল বাতাসে। গুন গুন করে অনীশ গাইছিল, 'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে।...'

সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে পিয়ন চলে গেল। গান থামিয়ে ওদিকে চেয়ে থেকে অনীশ কি যেন ভাবল মনে মনে। আজ যদি দীপেন্দুটা থাকতো এখানে! এজন্যে সেও যে এক নিদারুণ যন্ত্রণাকে বয়ে বেড়াচ্ছে! হঠাৎ কী একটা দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠেছে বুকটা। (ক্রমশঃ)

বাংলার লোকনৃত্য

ছৌ

সুদেব সানা

শ্রীকৃষ্ণের একক নৃত্য

নৃত্যের আদিগুরু শিব। শিব রুদ্র বা প্রলয়ের দেবতা। প্রাচীন কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে, দক্ষকন্যা সতী পতি-অপমানে যজ্ঞস্থলীতে দেহত্যাগ করার পর শিব প্রলয়মূর্তি ধারণ করেন এবং সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে নৃত্য করতে থাকেন। আলংকারিকদের মতে, এর নাম তাণ্ডবনৃত্য।

বাংলার লোকজীবনের প্রধান দেবতা শিব। কৃষিকেন্দ্রিক লোকজীবনের সংস্কৃতির সঙ্গে তাই শিবের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। মেয়েদের ব্রতকথা থেকে শুরু করে পুরুষদের প্রমোদ-উৎসব পর্যন্ত সর্বত্রই শিবঠাকুরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অতএব বাংলার লোকনৃত্যেরও প্রধান বিষয় যে শৈবানুষ্ঠান হবে, এতে আর আশ্চর্য কি!

বাঙালীর লোকজীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের যে সম্পর্ক, নৃত্যের সঙ্গেও তাই। লোকসঙ্গীতের যেমন বিষয়-বৈচিত্র্য রয়েছে, নৃত্যেরও অবলম্বন তেমনি বিচিত্র ভাব ও বিষয়। বস্তুত বাংলার লোকসঙ্গীতের সঙ্গে লোকনৃত্যের অংগাংগী সম্পর্ক। গম্ভীরা-গাজন-নীল, জারি-সারি, বাউল, টুসু-ভাদু প্রভৃতি সমস্ত লোকউৎসবের মধ্যেই নৃত্য ও গীতের এই সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

মূলত গীতের বিষয়টি বাস্তব রূপ দানের জন্যই নৃত্যের পরিকল্পনা। গীতের অমূর্ত ভাবকে মূর্তি বা রূপের মধ্যে ধরে রাখার ইচ্ছা থেকেই নৃত্যের বিষয়টি পরিকল্পিত হয়। বাংলার পালাগানের পুতুল-নাচ তার প্রমাণ।

লোকজীবনচর্যার অঙ্গ এই যে নৃত্য—স্থূল বিষয় ভাগে তার মধ্যে কতকগুলি পুরুষদের এবং কতকগুলি মেয়েদের। কিন্তু কিছুটা সূক্ষ্ম বিষয় ভাগে দেখলে লোকনৃত্যকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ফেলতে পারি। (ক) একক নৃত্য, (খ) দ্বৈত নৃত্য ও (গ) সমবেত নৃত্য।

বাউল, ধোনাচ প্রভৃতি একক-নৃত্য। গম্ভীরা দ্বৈত এবং আদিবাসীদের সাঁওতালী নাচ ও ঝুমুর নাচ প্রভৃতি অবশিষ্ট সমস্তই সমবেতনৃত্য। বাউল একতারা হাতে দীর্ঘ গৈরিক আলখাল্লা পরিহিত হয়ে জগৎ, জীবন ও পরমাত্মার সম্পর্ক নিয়ে আপন মনে নৃত্যের সঙ্গে গান গেয়ে থাকেন। কিন্তু গম্ভীরাতে একজন ত্রিশূল-রুদ্রাক্ষ-গৈরিক ধারণ করে শিব সাজে এবং অন্যজন ছিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদে অর্ধাবৃত থেকে জনগণের প্রতি... নিধিত্ব করে। নিরক্ষর পল্লী মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার কথা নিয়ে ...বের ...চ্ছে তা প্রতিকারের জন্য নিবেদন করে নৃত্যের সঙ্গে। আর জারি-সারি-ঝুমুর প্রভৃতি গানের সঙ্গে যে নাচ তা সমবেত নৃত্য।

লোকনৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ মুখোশ। পূর্ববঙ্গে ঢাকার কালীকাচ, পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার গম্ভীরা এবং পুরুলিয়া ও মানভূমের ছৌনাচ মুখোশ-নৃত্য ভিন্ন অন্য কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গের গাজন, পূর্ববঙ্গের নীলপূজা ও জলপাই-গুড়ির গমীরা মূলত গম্ভীরারই বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম হলেও গাজন, নীলপূজা ও গম্ভীরার মধ্যে মুখোশনৃত্যের ব্যাপকতা দেখা যায় না।

গম্ভীরা ও ছৌ মূলত পুরুষালী নাচ। পুরুষেরা মুখে মুখোশ পরে বাজনার তালে তালে নৃত্য করে। গম্ভীরার নরসিংহ, পেরী, চামুণ্ডা প্রভৃতি নাচগুলি উল্লেখযোগ্য। আর ছৌ নাচের মুখোশ-গুলোর মধ্যে গণেশ, শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, রাবণ, অভিমন্যু প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু মুখোশের গড়নের দিক থেকে গম্ভীরার সঙ্গে ছৌ নাচের মুখোশগুলোর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সূক্ষ্ম কারুকলা ছৌ নাচের মুখোশগুলোর বৈশিষ্ট্য। মাটির ছাঁচ থেকে তুলে ছেঁড়া কাপড় আর কাগজ দিয়ে এই

হরধনু ভঙ্গের জন্য রাক্ষসরাজের উদ্যোগ

মুখোশগুলো তৈরী হয়। পুরুলিয়া জেলার চড়িদা গ্রামের মুখোশ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

শুধু মুখোশের গঠনের দিক থেকেই নয় নাচের ভঙ্গির মধ্যেও উভয় নৃত্যের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য হলো, নৃত্যাংশে সূক্ষ্ম মুদ্রার বড়ই অভাব। গম্ভীরা তার উদাহরণ। সেই দিক থেকে ছো-নাচ একটু উন্নত। ক্লাসিক নৃত্যের অত্যতিসূক্ষ্ম মুদ্রা হয়ত এই নাচে দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু ক্লাসিক নৃত্যের লৌকিক সংস্করণ দেখতে পাওয়া যায় এই নাচে।

লোকনৃত্যগুলোর মধ্যে রায়বেঁশে ও ঢালী নাচ মুখ্যত যুদ্ধের নাচ। এই নাচগুলোর মধ্যে যুদ্ধের অভিনয়টাই বড় কথা। ছোনাচের বিষয়বস্তুগুলোও প্রধানত যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে পরিকল্পিত হয়। কিন্তু এই নাচ রায়বেঁশে ও ঢালীনাচের মত অবিমিশ্র যুদ্ধের নাচ নয়। এই নাচের মধ্যে কাহিনীর প্রথমাংশে নানা রকমের ভাবের আদান-প্রদান থাকে, তারপর শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ঘটনায় এর সমাপ্তি। ছোনাচের অধিকাংশই যেহেতু যুদ্ধের নাচ, তাই এর বাদ্যযন্ত্রগুলোও তদনুরূপ। প্রধানত ঢোল, দুন্দুভি, সানাই, মন্দিরা, ভেরী, সিঙ্গা, করতাল উল্লেখযোগ্য।

ছো শব্দটির উৎপত্তি ছবি শব্দ থেকে। ছবি নির্বাক। তাই পুরুলিয়ার মানুষ মনে করে, যে নাচের ভেতর দিয়ে
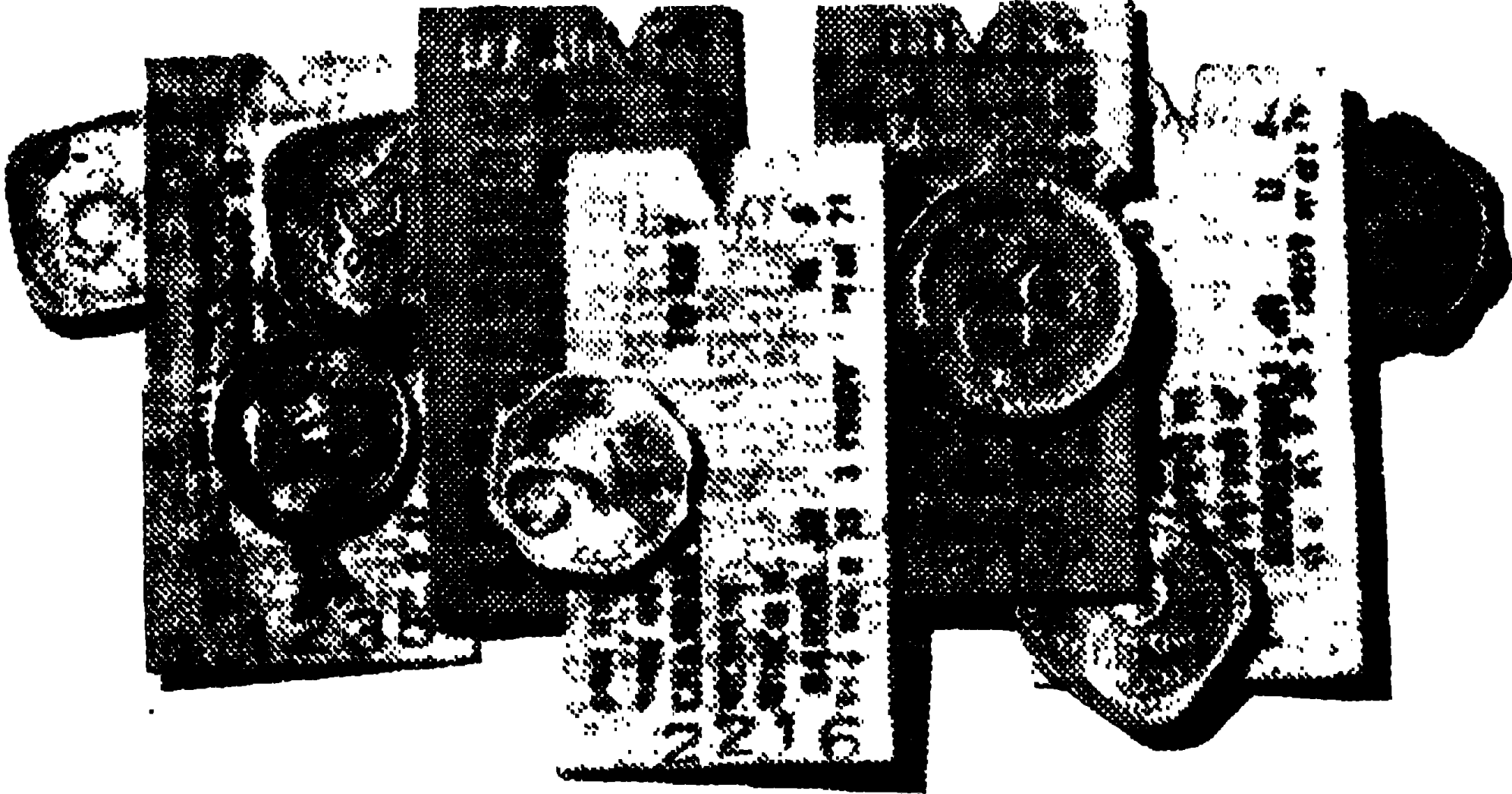
সমস্ত কিছুই ছবির মত ফুটে ওঠে, কিন্তু কথা দিয়ে সমস্ত প্রকাশ করে দেওয়া হয় না, তা-ই ছো-নাচ। গ্রামবাংলার অপেশাদার যাত্রা পার্টির মতই মানভূম-পুরুলিয়ার জনজীবনে ছো-নাচের প্রভাব অপরিসীম। সারা বছর ধরেই কোন সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে বা বারোয়ারীতলায় সামিয়ানা টাঙিয়ে, কখনো বা উন্মুক্ত আকাশের নীচে চাঁদোয়া টেনে ছো-নাচের আয়োজন করা হয়। তবে মূলত চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আষাঢ় সংক্রান্তি পর্যন্ত ছো-নাচের কাল-সীমা। এবং ছো-নাচেরও মূল দেবতা শিব। সুতরাং শিব পূজা উপলক্ষেই ছো-নাচের আয়োজন মানভূম-পুরুলিয়ার জনজীবনে উৎসবের সাড়া জাগায়।

ছো-নাচ প্রধানত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত হয়। প্রথমে গণেশ বন্দনা দিয়ে নাচ শুরু হয়। একজন সূত্রধার গান গেয়ে পরবর্তী নাচের বিষয়বস্তুর কিছুটা আভাস দিয়ে যায়। সংস্কৃত নাটকের ভটঃ চরিত্র এবং ইংরেজী নাটকের ক্লাসিকাল চরিত্রের মত এই সূত্রধার চরিত্রটি।

গণেশ-বন্দনার পর পরশুরাম-উপাখ্যান, কৃষ্ণলীলা, অভিমন্যু বধ, রামের হরধনু ভঙ্গ, রাবণ বধ, মহিষাসুর বধ প্রভৃতি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে ছো-নাচের বিষয়বস্তু পরিকল্পিত হয়। ফলে, সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব না ঘটলেও ঐক্যবদ্ধ নাট্যরসের অভাব অনুভূত হয়। পুরুলিয়ার ছো-নাচ পার্টির দলপতিদের মতে, উপযুক্ত নৃত্যশিল্পীর অভাবই এর কারণ। একটি পালা দীর্ঘ সময় ধরে কাহিনীবদ্ধ রূপদান করার সময় অনেক শিল্পীর প্রয়োজন হয় একই সঙ্গে, কিন্তু তা প্রায়শঃই পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই ছোট ছোট ঘটনার আশ্রয় নিতে হয়। ঘটনাগুলো যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যখন পরিসমাপ্ত হয়, তখন বেজে ওঠে ভেরী। তারপর প্রায় সমস্ত বাদ্যযন্ত্র মুহূর্তে থেমে যায়। পরক্ষণেই সানাইয়ের সুরের মধ্য দিয়ে নতুন ঘটনার সূত্রপাত করা হয়।

ছো-নাচের মধ্যে অনেক একক নৃত্যও দেখা যায়। কৃষ্ণের কদম্বলীলা, কিরাতের শিকার-প্রচেষ্টা, বলরামের নাচ প্রভৃতি অন্যতম একক নৃত্য। ছো-নাচের কলা-কৌশল এই একক নৃত্যের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে। এবং এর সঙ্গে ঢুলিদের নাচ ও ঢোল বাজনা উল্লেখযোগ্য। একক নৃত্যের এই কলাকৌশলের জন্য এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নৃত্যের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কথাকলিও মুখোশ-নৃত্য। অমূর্ত ভাবকে এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রমূর্ত করে তোলা হয় রাগ-রাগিণী-সহযোগে। এই কথাকলিতেও কখনো কখনো পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করা হয়। তবে মূলত ছো-নাচ লৌকিক নৃত্য, আর কথাকলি ক্লাসিক।

বাংলার লোকনৃত্যের ভিতর দিয়ে উৎসব-প্রাণ বাঙালীর পরিচয় বিধৃত হয়।

অভিমন্যু বধ

গ্রামবাংলার জনজীবনের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্য জড়িয়ে আছে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে, তার সঠিক সময়সূচী [illegible]। সমাজ-মানসে যে দৈনন্দিন জীবন[illegible] ছায়া পড়ে, বাঙালীর উৎসবের ভি[illegible] দিয়ে তারও কিছুটা আভাস ফুটে ওঠে। মানভূম-পুরুলিয়ার ছো-নাচের কথা এ প্রসঙ্গেও স্মরণীয়। যদিও ছো-নাচের আশ্রয় পৌরাণিক কাহিনীগুলো, তবু তার ভিতর দিয়েই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা স্পন্দিত জীবনের কথাও একেবারে উপেক্ষিত হয় নি। রূপকের বাতাবরণে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-অপ্রেমের ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে। হরধনু ভঙ্গ, কিরাতের শিকার প্রচেষ্টা প্রভৃতি এর উদাহরণ। প্রথমটিতে সীতা লাভের জন্য বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরাজয়, রামের সাফল্য এবং তাঁর বিরুদ্ধে রাজাদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ এবং পরাজয় আর দ্বিতীয় ঘটনাটিতে বনান্তরালবাসী কিরাতদের জীবনধারণ প্রচেষ্টা, তাদের শিকার প্রভৃতির ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

বাংলার জনজীবনে তথা লোকনৃত্যের ইতিহাসে ছোনাচের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঝুমুর, গম্ভীরা, জারি, সারি, বাউল প্রভৃতির মত ছো-নাচও লোক-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অংগ। ছো-নাচ মূলত একটি আঞ্চলিক লোকনৃত্য।

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মহাজাতি সদনে আয়োজিত ছো-নাচ অনুষ্ঠানে পুরুলিয়ার মনোরঞ্জন ছো-নাচ পার্টি ও চোড়িদা ছোনাচ পার্টি অংশ নিয়েছিল। শিল্পনির্দেশনা: সিরেলা মলডেনী (প্যারিস), সমগ্র পরি-চালনা : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বর্তমান প্রবন্ধটি প্রধান দলপতি কলেবর কুমারের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে রচিত)।

[illegible] পরশুরামের [illegible]

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। ২৪ ।।

বৌ দেখে হেমন্ত খুব খুশী। আনন্দে যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল সে। সুরেনের গলা ধরে মাথাটা নামিয়ে চুমোই খেয়ে ফেলল একটা তার গালে। বললে, 'তুই লজ্জা পাবি তাই, নইলে কোলে তুলে নাচতুম!'

সুন্দর শুনেছিল কিন্তু এতটা সুন্দর হবে ধারণা করতে পারে নি। গান শুনে আরও মুগ্ধ। এই ধরনের মার্জিত রুচির গান জানে তা সুরেনও আশা করে নি। যা গাইল—রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্তর গান। দু-একজন প্রবীণার অনুরোধে একটা পুরনো দেহতত্ত্বর গানও গাইল। তবে বেশী গান জানে না—সেটা বার বারই বলল ও'দের মোট পুঁজি ওর বারো-চোদ্দখানার বেশী নয়। সুরেন যা বলেছিল—হেমন্ত তখনই বলে দিল, 'তুই একটা ভাল মাষ্টার দ্যাখ সুরেন, আমি ওকে গান শেখাব ভাল করে।...এ একটা আলাদা শান্তি।'

তবু স্বভাবটা কি রকম দাঁড়াবে—সে সম্বন্ধে একটা আশংকা ছিলই। তাতেও 'পাস' হয়ে গেল মণিকা। ঠাণ্ডা মেজাজ, আস্তে কথা বলে। নতুন অভ্যাস শুরু—তবু মাথার কাপড়ও সরে না। শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, রাত্রে প্রত্যহ পা-কোমর টিপে দেয়। শুতে যাবার সময় হলে হেমন্তর কোলে মুখটা গুঁজে বলে, 'আপনার কাছেই শুই না মা—কি হয়েছে?' হেমন্ত হেসে মুখটা তুলে আদর করে বলে, 'না মা, তা কি হয়? সে জন্যে কি আর নিয়ে বিয়ে করেছে?...না কি তোমারই ভাল লাগবে? যাও মা, শুয়ে পড়ো গে, আমিও কপাট বন্ধ করি।'

ষোড়শীবাবুকে কেন্দ্র করে সুরেনের মনে যে একটা সূক্ষ্ম সংশয়ের কাঁটা ছিল, সেটাও উঠে যায় আস্তে আস্তে। এ পক্ষ থেকে যে কোন আকর্ষণ আছে—তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিয়ের পর বাপের বাড়ী গিয়ে মাত্র আট-দশ দিন ছিল, আরও বেশী দিন থাকার জন্যে কোন বায়না তোলে নি, বা ফিরে এসেও ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্যে আবদার করে না। বরং বাপের কোন ভাল চাকরী হয় কিনা—হওয়া সম্ভব কিনা—সেই কথাটাই বলে বার বার। হেমন্তকেও ধরে মধ্যে মধ্যে, 'আপনার তো শুনেছি অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে জানা-শুনো—দিন না মা একটা কিছু করে। ওখানে বলতে গেলে পেটভাতায় থাকা—একটুও ভাল লাগে না। বাবা চিরদিন ভাল চাকরী করেছেন, খরচের হাত—অভাব-অনটনে যেন কেমন হয়ে গেছেন — কথায় কথায় চটে যান, ক্ষেপে ওঠেন একেবারে।'

সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেমন হওয়া উচিত তেমনিই। চেষ্টা করেও কোন অসঙ্গতির সুর বার করা যায় না তা থেকে।

ষোড়শীবাবুর কথা উঠলেও সহজ-ভাবেই আলোচনা করে। তিনি ওকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁদের অন্তঃপুরে ওর যাতায়াত ছিল। ইদানীং এমন কি কোন কোন দিন লোহার সিন্দুকের বা আল-মারীর চাবি ওকে দিয়ে বলতেন টাকাকড়ি বা কাগজপত্র বার করে আনতে; কখনও কখনও গুছিয়ে তুলে রাখতেও বলতেন। আদর করে বলতেন, 'সেক্রেটারী'।...সে জন্যে যে ওবাড়ীর কেউ কেউ ঈর্ষার চোখে দেখত বা এখনও দেখে—সে কথাও সরল-ভাবেই স্বীকার করে। কৌতুকের হাসি হাসে।

সহজভাবে আলোচনা করে বলেই দুশ্চিন্তাটা কেটে যায় সুরেনের—অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

নিশ্চিন্ত হতে পারে না নিজেকে নিয়েই।

যেটা সে প্রথম থেকে ভেবেছিল, সেটাই হয়ে ওঠে না।

মনে মনে অনেকবার নিজেকে শাসিয়ে ছিল সে, নিমাইয়ের বিয়ের পর—অনুষ্ঠানগুলো চুকে গেলেই সে এ বাড়ী আসা কমিয়ে দেবে, ফি রবিবারেও আর আসবে না।...যেমন ছিল সে তেমনিই থাকবে। এ মায়ায় আর জড়াবে না—এ ঝঞ্ঝাটে থাকবে না।

সেটা আর হয় না কিছুতে। বরং ক্রমশই যেন আরও জড়িয়ে পড়ে। ছুটির দিন ছাড়াও প্রায়ই আসতে হয়। না এলে এমন করুণ মুখে অনুযোগ করে মণিকা, এত দুঃখ করে—আসবার সময় এত কাকুতি-মিনতি করে পরের দিনই আসবার জন্যে। এমন ছোটখাট ফরমাশ চাপিয়ে দেয় যে, না এসে থাকতে পারে না সুরেন।

অনুরোধ অবশ্য নিমাইও করে। বলে, 'আমি তো জানোই একে মুখখু তায় পাড়াগেঁয়ে ভূত, তায় মিস্তিরির কাজ করি যত রাজ্যের খোট্টাদের দলে—আমার সঙ্গে কথা কয়ে কি ওর সুখ হয়, সেটা আমি বুঝি। প্রথম প্রথম দুটো-চারটে কথার পরই বলা ফুরিয়ে যায়।...তুমি এলে একটু আনন্দে থাকে তবু।...অল্প বয়সী বলতে তো আর বাড়ীতে কেউ নেই। দুপুরে তবু এবাড়ী-ওবাড়ীর বৌঝিরা আসে এক-আধজন বেড়াতে—সন্ধ্যেটা কাটে না। একেবারে। জ্যেঠাই হয় পুজোয় নয় রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকে—বেচারা একেবারে একা পড়ে যায়।'

বলেন পিসীমাও, 'আসিস না বাবা একটু। বলি যে এখানেই রাত্তিরটা নিদেন খাওয়ার ব্যবস্থা কর—তা তো করবি না,

কি যে তোর গো বুঝি না—অন্তত এমনিই আয়।’

এতেই আরও অস্বস্তি লাগে সুরেনের। অসুবিধাও হয় — তা এঁরা বোঝেন না। খাওয়া রাত্রে এক রকম হয়েই যায়—জল-খাবার যা দেন তাতেই। সেও, পিসীমা খানিকটা পীড়াপীড়ি করেন, সেটা যদি বা এড়ানো যায় — মণিকা এমন জেদ ধরে আবদার করে যে—‘না’ বলতে পারে না।’ এটা আমি করেছি ঠাকুরপো, এই তরকারিটা আমি রেঁধেছি—ও কি, উঠছেন কি. এই পরোটাখানা আমি নিজে হাতে বেলে ভেজে নিয়ে এলুম যে. বা রে—এ কে খাবে?’ ইত্যাদি। ফলে বাড়ী গিয়ে আর রাঁধতে ইচ্ছা করে না অত রাত্রে। সেদিনও পর্যাপ্ত খাওয়া হয় না, পরের দিনেরও কোন ব্যবস্থা থাকে না। কোন কোন দিন রাত চারটেয় উঠে ভাতে ভাত চাপিয়ে দেয়—সেও রোজ অত ভোরে উঠতে ইচ্ছে করে না।

এটা অসুবিধার দিক। অস্বস্তির কারণ অন্য, এ ছাড়াও। মেয়েটি তাকে যেন ক্রমশই বেশী করে আঁকড়ে ধরছে। বিকেলে ছাদের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দূরে থেকে আসতে দেখলেই দুড় দুড় করে নেমে এসে দরজা খুলে দেয়—‘প্রথম দেখা হল আমার সঙ্গেই’ বলে ছেলেমানুষের মতো খুশী হয়ে ওঠে। যত মনের কথাও যেন সারা দিন ধরে জমিয়ে রাখে—ওর জন্যেই। না এলে যে ম্লান হয়ে যায় আউতে পড়া ফুলের মতো—তা এক-আধ দিন আসার অভ্যস্ত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এসে পড়ে—লক্ষ্য করেছে সুরেন। যেদিন আসা হয় না তার পরের দিন তো কাঁদো কাঁদো হয়ে থাকে একেবারে।

নিমাইও আজকাল প্রায়ই সকাল সকাল ফেরে কিন্তু তার সঙ্গে গল্প জমে না। বিশ্বব্যাপী ‘ডিপ্রেসন’ চলেছে, কাজ-কারবার সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বেকার, কোথায় কোন দেশে কত হাজার ছোকরা (না কি এক লাখ?) কাজকর্ম না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে, গান্ধী যে কত বড় ভুল করছে, সি আর দাসের চালটা ধরতে পারছে না—এই সব আলোচনাতেই তার উৎসাহ। নিজে কাগজ পড়ে না, অথবা পড়ে মানে বুঝতে পারে না, এসব তথ্য বা সংবাদ আপিসের ‘বাবু’দের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনে নিজের পাণ্ডিত্য এবং রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। লেখাপড়া জানে না বলেই বোধ হয় এই ঝোঁক তার এত বেশী। এ বাড়ীতে ‘বসুমতী’ কাগজ আসে এক-খানা করে. গত ক বছর ধরেই নিচ্ছে হেমন্ত. দুপুরে মণিকাও একটু-আধটু পড়ে বসে। নিমাই ভুলভাল বললেই টপ করে ধরে ফেলে—এবং তখন তার কণ্ঠস্বর অকারণেই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সেটা সুরেনের ভাল লাগে না, তার কানে বাজে। অকারণ—মানে বাইরের খবর শুনে এসে একটু ভুল বললে এতটা বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। এ যেন বড় বেশী। একটা অশোভন জ্বালাই প্রকাশ পায়। নিমাই অবশ্য অত বোঝে না, রাগও করে না। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে খানিকটা আমতা আমতা করে সরে পড়ে।

অবশ্য বেশীক্ষণ বসা তার হয়েও ওঠে না—দোকান-বাজার বাইরের যত কাজ বিকেলের জন্যেই তোলা থাকে, চা-জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ে। ফেরে যখন—সুরেনের ওঠার সময় হয়ে যায়। অন্তত ওঠার চেষ্টা করে সে তখন থেকেই।

স্বামী সম্বন্ধে মণিকার মনোভাবটা যে সশ্রদ্ধ নয়—সেটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই শঙ্কিত বোধ করে সুরেন। শ্রদ্ধা না থাকলে প্রেম থাকা সম্ভব কি? — এইটেই প্রশ্ন করে নিজেকে বার বার। ঘর করে—এমন অনেকেই করে, বিবাহটা অচ্ছেদ্য বন্ধন মেনে নিয়ে, এরকম অনেককে দেখেছে—কিন্তু দাম্পত্য প্রেমটা গড়ে ওঠে না। পুরুষ বা স্ত্রী একজনের দৈহিক কামনা থাকে, হয়ত দুজনেরই থাকে, ছেলে-পুলেও হয়—তবু, ভালবাসা যাকে বলে, একাত্মতা, তা খুব কম দম্পতির মধ্যেই গড়ে ওঠে।

তা হোক—মানিয়ে নিয়ে চলতে পারলেই হল।

মণিকা সেটুকুও পারছে কি?

দু-চার মাস যেতে সেই সন্দেহটাই বদ্ধমূল হয় সুরেনের মনে। এক-আধটা কথায় অবজ্ঞা—হয়ত-বা বিতৃষ্ণাও-ফুটে ওঠে, মণিকার অজ্ঞাতসারেই।

‘ঠাকুরপো, তোমার দাদা বিড়ি খায় কেন ভাই? বলে-কয়ে বকে-ঝকে বন্ধ করাতে পারো না? মা গো, কি বিচ্ছিরি গন্ধ, বমি আসে কাছে এলে।...কোন দিন ঐ গন্ধটা আমি সইতে পারিনে। বাবা মধ্যে ধরেছিলেন—তা-ই আমি কাছে যেতুম না. শেষে আমার জন্যেই ছেড়ে দিলেন, এখন এক-আধটা সিগারেট খান, মানে পেলে—নইলে কিছুই খান না। সেই আমার কপালেই বিড়িখোর জুটল!’

সুরেন হাসে—যদিও মনের মধ্যে সে হাসির সমর্থন পায় না। বলে, পারলে তুমিই ছাড়াতে পারবে বৌদি, ওকি আমাদের কাজ।...পিসীমা কত গালমন্দ দেন গন্ধ নাকে গেলে—সে তো তুমিও শুনেছ, তা-ই বন্ধ হয় না, আমি আর কত বকাঝকা করতে পারব যে বন্ধ হবে।’

আবার হয়ত কোনদিন বলে, ‘বড্ড বাজে বকে ভাই তোমার দাদা। আমার যেন বিরক্তি লাগে। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকবে—এটা ওটা বকেই যাচ্ছে অনবরত!’

কোন কোন দিন, হেমন্তর আড়ালে, নিজেই ধমক দেয় নিমাইকে, ‘আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। একটু চুপ করো তো। উঃ, সেই এসে পর্যন্ত সমানে বকছে। মুখও ব্যথা করে না। আমাদের তো শুনতে শুনতেই মাথা ধরে গেল!’

নিমাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে. চুপ করে যায়। মাথা চুলকোতে চুলকোতে সেখান থেকে সরে পড়ে একটু পরেই।

এইগুলোই ভাল লাগে না সুরেনের। এর বহুদূরপ্রসারী ফল দেখতে পায় সে মনে মনে।

আর সেই সঙ্গেই বোঝে যে, এখানে এমনভাবে দিনে দিনে জড়িয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না। তার এ বাড়ীতে আর না আসাই উচিত, অন্তত খুব কমিয়ে দেওয়া উচিত যাওয়া-আসাটা।

তবু সেটাই হয়ে ওঠে না। বার বার সংকল্প করা সত্ত্বেও।

দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গ স্নেহবঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবন — আশা . . ., আনন্দহীন, অবলম্বনহীন—এই আকুলতা ও পথ চাওয়ার অনুযোগ ও অনুরোধের আকর্ষণ এড়াতে পারে না। বুদ্ধি বিবেচনার সতর্কবাণী, হিসেব-নিকেশ সব এক প্রবল অনাস্বাদিতপূর্ব আবেগের টানে কোথায় ভেসে চলে যায়।

শেষে বুঝি দৈবই বাঁচিয়ে দেয় সুরেনকে। অথবা ওর গুরুবল।

ছোট্ট ঘটনা, শুনলে হাস্যকর, ছেলে-মানুষীই মনে হয়—তবু তাতেই চৈতন্য হয়।

ওরও, হেমন্তরও।

যত দিন কেটেছে, সংযত হওয়া, দূরে সরে থাকা দূরের কথা—সুরেন যেন বেশী করে জড়িয়ে পড়েছে। সেটা হেমন্তও যে লক্ষ্য করে নি তা নয়, তবে তার মধ্যে দূষ্য কিছু আছে ভাবে নি। মা-বাবা-ভাইবোন থেকে দূরে একা পড়ে আছে একটা টিনের ঘরে, নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়—না পায় কারও স্নেহভালবাসা, না পায় কোন মধুর সাহচর্য। এখন যৌবন কাল, স্ত্রীসঙ্গ তো এক রকম প্রয়োজনই—অথবা সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কোন ভাল চাকরী

পেয়েছে হয়তো, না পিসিমাকে, না মণিকা, কারও বাড়ুজ্জতা। মেয়েদেরকে নিয়ে নিয়ে নিজে ফিরে আসবে, তখনকার আমার ভাইঝিরা বড় হয়ে উঠবে। আমাদের নিজেও মেয়ে বড়িয়ে যাবে। বিয়ের ব্যাপার কি থাকবে।

না, সে আশা নিজের নেই। সুতরাং সুরো নিজে এখানে যদি একটু শান্তি পায়—পাক না। ছোট বোনের মতো—আমাদের অনুযোগ করে, আবদার করে—সেটা ভাল লাগা স্বাভাবিক। আর তাতে দোষই বা কি। থাকে তো বড়জোর মেরে-কেটে দু ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা। আরও, আজকাল প্রায়ই ফিরতে দেরী হয়ে যায় বলে এখানে খেয়েই যায় মেশীর ভাগ দিন, সেও একটা শান্তি হেমন্তর। সে রাত্রে ভাত খাইয়ে পরের দিনের রুটিও এখান থেকেই করে দিতে চেয়েছিল—সুরেন কিছুতে রাজী হয় নি। তবু রাত্রের খাওয়াটা চোখের সামনে বসিয়ে খাওয়াতে পারে সেও কম তৃপ্তি নয়।

সুরেনও যে বুঝতে পারত না তা নয়। কিন্তু ক্রমশ, জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা-হিসাববোধের ওপর আবেগের এই প্রাধান্যর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল। আজকাল আর অতটা ভাবতও না। ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতের জন্যেই তোলা থাক, কতকটা এইরকম হয়ে উঠেছিল মনের ভাব। এখানের হাসা-পরিহাস, দু-একখানা গান, কিছুটা আবদার, কিছুটা প্রীতির প্রকাশ—জোর করে এটা-ওটা খাওয়ানো, জোর করেই বাতাস করা, ময়লা গেঞ্জি ছাড়িয়ে নিয়ে জোর করে সাবান দিয়ে কেচে দেওয়া—এই ধরনের ছোটখাট সেবার চেষ্টা—সব জড়িয়ে যে মধুর স্মৃতি—বাসায় ফিরে গিয়ে সেটারই রোমন্থন চলত—তার মধ্যে বিবেক বা পণ্ডিত বুদ্ধি প্রবেশের পথ খুঁজে পেত না ওর মস্তিষ্কে। সুখস্মৃতির এই পুনরাস্বাদনের মধ্যে মন যেন কোথায় একটা মুক্তি, একটা অবকাশের আস্বাদন লাভ করত।

এক-আধ দিন বিশ্বনাথবাবু মৃদু ঠাট্টা করতেন, 'কি হে, ভুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে!...নাঃ, যা দেখছি ক'দিন পরে ওখানে গিয়েই বাসা বাঁধবে।...আমার আড্ডাটাই দেখছি ভেঙে গেল। বাসাবাড়ী চুলোয় যাক—রাত্রে কখন ফেরো তাই টের পাই না।...আর যা সব লোক, দুটো কথা কইব সে মানুষ নেই।...তা সোজাসুজি পিসীর বাড়ীই গিয়ে উঠলে পারো, আপন পিসী তো—পর তো আর নয়?'

এ ঠাট্টার মধ্যে কোন খোঁচা বা জ্বালা ছিল না বলেই অত গায়ে লাগত না সুরেন।

চৈতন্য হল অন্য ঘটনায়। অন্য আঘাতে।

হেমন্তর বাড়ীর ছাদে অনেক ফুল গাছ ছিল—টবে-টিনে-ডাবায়। ফুল কেন, একটা পেয়ারা গাছ একটা লেবু গাছও ছিল। ছোটখাট বাগান বলা যায়। যোগো জলের ট্যাঙ্ক আছে ছাদে আগে ঝিরা জল দিত, এখন মণিকাই দেয়। তারও গাছের শখ খুব, ক বছর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে সেটা আরও বেড়েছে—নিজের গরজেই যত্ন করে পরিচর্যা করে। আগে এখানেই—এই ফুল গাছের মধ্যে ওদের সান্ধ্য আড্ডা বসত, মাস খানেক হল হেমন্ত মণিকাকে সন্ধ্যার পর ছাদে যেতে বারণ করেছে; খোঁপাতে থলকে কাঁটি গুঁজে দিয়েছে। অর্থাৎ সন্তান-সম্ভাবনার লক্ষণ। এখনও ঠিক নিশ্চিন্ত নয় হয়ত—তবে সাবধানের মার নেই বলেই এখন থেকে এত সতর্কতা।

সুরেন কিন্তু এই গাছগুলির আকর্ষণেই একবার করে ছাদে ওঠে রোজ। তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে পাড়াগাঁয়ে, গাছপালার মধ্যেই মানুষ বলতে গেলে। এখানে এই সার্পেন্টাইন লেনের অন্ধ গলির মধ্যে মাঠকোঠার জীবন যেন এক-এক সময় অসহ্য বোধ হয়। সত্যি-সত্যিই হাঁফ ধরে সেসব সময়গুলোয়, মনে হয় দুটো-একটা গাছপালার মুখ দেখা [illegible] কিছুটা স্বস্তি পেতে পারত। পড়লা না নজর থাকলে ওখানেই ঠিক সুন্দরী পাড় মলাত। ও ঘরের একমাত্র জানলা (জানলা নয়—ঘুলঘুলি বলাই উচিত, একটা ফুটো সে) থেকে পেছনের বাড়ীর এক টুকরো ছাদ দেখা যায়, সেই কোণটায় আলসের ওপর একটা টবে তুলসী গাছের সঙ্গে একটা হাড়জোড়ার গাছ লাগানো আছে। রোজ রোজ দিন দশ বন্ধ হয়ে আসার মতো হলে খানিকটা সেই দিকেই চেয়ে থাকে।

এই জন্যেই তার পিসীমার বাড়ীর ছাদ এত ভাল লাগে। উনতিরিশটা টব আছে—টব আর কেরোসিনের টিন মিলিয়ে। এ ছাড়া একটা কাঠের ডাবা। তাতে একটা হাস্নুহানার ঝাড় হয়েছে। এটা এসেছে মণিকা আসার পর, তারই শখে। টবে দুটোতে আছে লেবু আর পেয়ারা গাছ, এত টুকু-টুকু ফলও হয় মধ্যে মধ্যে।

তাতেই যথেষ্ট আনন্দ এদের। এছাড়া সবই ফুলের গাছ—বেল যুঁই রজনীগন্ধা গন্ধরাজ গোলাপ জুঁই ও মল্লী—এই সব গাছই বেশী। একপেটে টগরও আছে একটা। জোরে উঠে হেমন্ত কিছু ফুল পুজো করতে তুলে নিয়ে যায়, বেশীর ভাগই টবে থাকে।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় এমনিই ছাদে উঠে বেড়াচ্ছিল সুরেন। তখন হেমন্ত ঠাকুরঘরে—মণিকা ওর জনোই কি একটা খাবার করতে রান্নাঘরে গেছে। এবেলা হেমন্ত এটা-ওটা দেখিয়ে দেওয়া বা যোগাড় দেওয়া ছাড়া রান্না বিশেষ করে না, মাছ থাকে বলে। যা পারে ঠাকুরই করে, ঠাকুর না এলে মণিকা। তবে ঠাকুর থাকলেও, সুরেনের জলখাবার তার হাতে ছেড়ে দিতে চায় না মণিকা, ঠাকুরপোর জন্যে নিজে হাতে একটা কিছু করে না দিলে ওর মন ওঠে না। তা হোক, চারি দিকে এই ফুলের রাশির মধ্যে কিছুক্ষণ একা থাকতে ভালই লাগে তার। বরং এই অবসরটাই চায় সে।

ফুলের গাছগুলোর সামনে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করল, অনেক দিন পরে মতিয়া বেলের গাছটায় ফুল এসেছে, এক বোঁটায় একসঙ্গে দুটি ফুল ফুটেছে। বেশ বড়, মাঝারী আকারের গাঁদা ফুলের মতো এক-একটা ফুল। দেখে এত লোভ হল যে, কেন তুলছে তা ভাল করে ভাবার আগেই, বোঁটাসুদ্ধ জোড়া ফুল তুলে নিল। তুলে একটু ভয়ও হল অবশ্য—পিসীমা যদি কিছু মনে করেন? তিনি হয়ত দেখে গেছেন, পরের দিন সকালে ঠাকুরকে দেবেন বলে চিহ্নিতও করে রেখেছেন।...তবে তার পরই মনে হল, সব ফুল তো পিসীমাও তোলেন না, বলেন গাছ একেবারে ন্যাড়া করে ফুল তুললে বিশ্রী লাগে, গাছ আলো করে থাকে সে-ই ভাল। আর ফুলও তো ফুটেছে অজস্র, তাঁর পুজোর মতো ঢের আছে।

তোলার পর অতর্কিতে আপনিই একবার মনে হল, এটা মণিকার খোঁপায় গুঁজে দিয়ে আসে সে।

তারপর, এই আকস্মিকভাবে মনোভাবটা নিজের কাছেই ধরা পড়ে যাওয়ায়—নিজের মনের দিকে ভাল করে তাকিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল, আসলে এটা মণিকার জন্যেই তুলেছে সে। ফুল তার সাধারণত গাছ থেকে তুলতে ইচ্ছে করে না, আজকে এটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাত এগিয়ে গেছে এবং কী করছে তা বোঝার আগেই তুলে নিয়েছে—তার পেছনে এই ইচ্ছাটাই কাজ করেছে, নিজের অজ্ঞাতসারেই। সে সময় ওর মানসচক্ষুর সামনে যে সুগৌর সুডোল গ্রীবা ও কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়া বিপুল কালো খোঁপার ছবিটা ছিল, সেটা মণিকারই। এ-ফুল ঐ খোঁপাতেই, ওকেই মানায়, ও খুশী হবে—এ-চিন্তাটা আপনা থেকেই মনে এসেছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হবার অনেক আগেই হয়ত।

এবার এই ধরা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল লজ্জাবোধ করল সে। একটা অবচেতন অপরাধবোধের লজ্জা। সেইজন্যেই হাতে করে নিয়ে এসে, খোঁপায় পরিয়ে না হোক, হাতে দেবার প্রবল ইচ্ছা হলেও শেষ অবধি দিতে পারল না। অনেকবার ইতস্তত করল, কয়েকবার চেষ্টাও করল—কিন্তু একটা প্রবল সংকোচ এসে যেন হাত চেপে ধরল, মনের মধ্যে আকুলতা আকুলিবিকুলি করা সত্ত্বেও পারল না। পিসীমা কি নিমাইদা কি মনে করবেন, এ-আশঙ্কার থেকেও তার নিজের কুণ্ঠাটাই বেশী।

একবার ভাবল মণিকাদের ঘরে রেখে আসে অন্তত—তাও পারল না। ওর মাথায় পরিয়ে দেবার জন্যে যা তুলেছিল, তা হাতে দিলেও কিছু তৃপ্তি পেত—শুধু শুধু ঘরে রেখে আসার কোন মানে হয় না। হয়ত নিমাইদাই নিয়ে কানে গুঁজবে কি হাতে করে চটকাবে। তার চেয়ে পথে ফেলে দেওয়াও ভাল। সুতরাং কিছুই করা হল না, শেষপর্যন্ত নিজেরই বুকপকেটে রেখে দিল ফুলজোড়াটা।

হেমন্ত দেখেছিল ফুলটা, 'বাঃ বেশ বড় হয়েছে তো! বৌমার সার দেওয়াতেই এত বড় হয়েছে এবার!' এছাড়া কোন মন্তব্য করেনি। একটা ফুল তোলা নিয়ে এত বলারই বা কি আছে!

খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি যাবার সময়ও ভাবল একবার—বৌদিকে ডেকে দিয়ে যায়, তখনও পারল না। সেই একই সংকোচ। অতকটা নিজের ওপর বিরক্ত হয়েই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

অন্যদিন যাওয়ার সময় নিচের সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়েই চলে যায় সে, ঝি একেবারে রাত্রে ভালভাবে বন্ধ করে দেয়। আজ নিচে নেমে দরজা খুলতে গিয়ে দেখল দরজার ঠিক পাশে ছায়ামূর্তির মতো কে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বিস্মিত হবার, ... আগেই

যে দাঁড়িয়েছিল সে সটান ওর বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে ফুলদুটো বার করে নিয়ে চকিতেই সিঁড়ির নিচের ঘনতর ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল।...

বাইরে বেরিয়ে এসে বহুক্ষণ সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুরেন। হঠাৎ যেন পা-দুটো বড় দুর্বল, অনড় হয়ে গেছে। একটা অসহ সুখে, দুরাশার সংশয়-কণ্টকিত বেদনায় এবং অভাবনীয় চরিতার্থতাতেও—বুকের মধ্যেটা রিনরিন করছে। এ-ধরনের সমস্ত-ইন্দ্রিয়-অবশকরা অনুভূতি এই প্রথম তার জীবনে। এ শুধু সুখ নয়, অধিকতর দুঃখেরই ভূমিকা—এ-কথা তার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। তবু এই মুহূর্তে সমস্ত দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কাকে আচ্ছন্ন করে একটা চিন্তাই মনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল, মনে হল—এই মুহূর্তটারই জয় হোক জীবনে। বিবেচনা হিসেব—এ পরে রইলই।

এর মাস-দুই-আড়াই পরে হেমন্তই একদিন শেষ-বিকেলে সুরেনকে 'এই একবার শোন'—বলে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল।

তখনও অপরাহ্নের আলো একেবারে বিদায় নেয়নি, আলো না জ্বাললেও কিছুটা নজর চলে। ছাদে উঠে মুঠোর মধ্যে থেকে একটা কি বার করে দেখাল হেমন্ত, 'এটা চিনতে পারিস?'

হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে ... সুরেন শুকনো ফুলের মতো কি। আর একটু ভাল করে দেখে চিনল, শুকনো মতিয়া বেলদুটো। এখনও, এত শুকিয়ে গেলেও এক বোঁটাতেই আছে।

মুখটা শুকিয়ে গেল ওর, বুকের মধ্যে অকস্মাৎ যেন মৃদু যন্ত্রণা বোধ করল একটা। বুঝি রক্ত উত্তাল হয়ে এমনই বেদনা এটা—কিন্তু শুধুই কোন অজ্ঞাত আশঙ্কায় নয়, বোধ করি একটা অনির্বচনীয় আনন্দেও—ঘটনার অভাবনীয়তায়।

তবু সে মিছে কথাও বলল না। বলার চেষ্টা করাও মূর্খতা সে জানে—হেমন্তর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও শাণিত সহজ বুদ্ধির বহু পরিচয় সে পেয়েছে এর মধ্যে। শুধু বলল, 'পারি।'

হেমন্ত মিনিট-দুই চুপ করে রইল। ও-পাশের মিত্তিরদের বাড়ির ছাদে কে একটি মেয়ে ছেলে কোলে করে বেড়াচ্ছে। গাঙ্গুলীদের ছাদ থেকে একটা বেড়াল লাফিয়ে ওদের ছাদে যাবার চেষ্টা করছে—মেয়েটি থাকার জন্যে যেতে পারছে না, দূরে বড় রাস্তায় ট্রাম-বাসের শব্দ হচ্ছে, মোটরের হর্ণ, আকাশে একটি তারা উঠে

পড়ল, হঠাৎই, অকূল চিন্তার মধ্যেও হেমন্তর সংস্কার কাজ করে গেল, মধুর কণ্ঠে 'কপিল' 'কপিলা' নাম উঠল একবার; নিজের কল্পনার জল পড়ার শব্দ; পাশের বাড়িতে কোথায় একটা শিশু কেঁদে যাচ্ছে; একটি শ্রাবণ জলো বৃষ্টি ও মন দেবার চেষ্টা করল সুরেন। কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে একটা অকারণ অপরাধবোধ ও অকারণ আনন্দের সংঘাতই মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে—কিছুতে কোনদিকে যেন মন দেওয়া আর সম্ভব নয়।

হেমন্তই নীরবতা ভঙ্গ করল একটু পরে। ধীর গম্ভীর—ঈষৎ বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, 'বৌমার পোটমান্টো গুছিয়ে দিতে বসেছিলুম আজ। পেটে ছেলে আসার পর অনেকেরই শরীর খারাপ হয়—এর আবার বড্ড বেশী, কিছু মুখে তুলতে পারছে না। যা খাচ্ছে, বমি হয়ে যাচ্ছে—তা তো দেখছিসই। ওর দ্বারা কিছু হবে না। অথচ কাপড় বার করতে গিয়েই দেখি সব এলোমেলো হয়ে রয়েছে, হাপুল-মাপুল করা। সেইজন্যেই আজ দুপুরে ওটা নিয়ে বসেছিলাম। বৌমা ঘুমোচ্ছিল তখন আমার ঘরে টের পায়নিও না। চোরকুঠুরির ডালার দিকে নেকলেসের বাক্সর মধ্যে এটা ছিল। এমনি পড়ে থাকা নয়, বাক্সের মধ্যে যখন ছিল, তখন কেউ যত্ন করেই রেখেছে নিশ্চয়।'

এই বলে আবারও চুপ করল হেমন্ত।

সুরেনেরও কিছু বলার কথা নয়। দণ্ডাদেশ শোনার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে সে। সেও চুপ করে রইল।

হেমন্তই আবার বলল, 'তোর দোষ নেই, তুই তো আসতে চাইছিলি না, আসা কমিয়ে দিতেই চেয়েছিলি। আমরাই জোর করেছি।...কিন্তু তুই এবার সত্যিই আসা-যাওয়া কমিয়ে দে বাবা। নিয়ে যাই হোক ওর ঘরই করতে হবে মেয়েটাকে। এ তো আর খেলবার জিনিস নয়, জন্মান্তরের সম্পর্ক বলে—তা না হলেও আমরণ স্থায়ী তো বটেই। মিছিমিছি মনে একটা মতভেদ ভাঙন ধরলে দুটো জীবনই নষ্ট হবে।...এতো বদলে নেওয়াও সম্ভব নয়।...আর তুই সামনে থাকলে জোনাকীতে কার মন ভরে বল?'

তবুও সুরেন কিছু বলল না। কত কী পরস্পরবিরোধী ভাব সংঘাত হচ্ছে তার মনে—সে প্রবল বিপ্লবে বা সংঘর্ষে কিছু গুছিয়ে ভাবা কি বলার শক্তি নেই তার।

একটা প্রবল অভিমান, অধিকারবোধ মাথা তুলতে চাইছে, ইচ্ছে করছে চিৎকার করে প্রতিবাদ করে। কেন, কেন এই মণিকার মতো মেয়ের জীবন ঐ নিমাইয়ের মতো অর্দ্ধ বর্বরের সঙ্গে জন্মান্তরের মতো গাঁথা হয়ে থাকবে, আর থাকলেও কেন তার একটু উপরি পাওনা—একটু স্নেহ, একটি পূজাবনত নীরব হৃদয়ের প্রীতির অর্ঘ্য—নেওয়াও নিষিদ্ধ হবে! এতো কোন কলুষিত সম্পর্ক নয়।

আবার সেই ক্ষোভের মধ্যেই কোথায় একটা পরিণত বিচারবুদ্ধি যুক্তি প্রয়োগ করে—হেমন্ত যা বলছে তা ষোল আনাই সত্য। আকর্ষণটা যে এইখানেই থেমে থাকবে তার কোন অর্থ নেই। পূজারী যে পূজো করেই তৃপ্ত থাকবে চিরদিন তারই বা নিশ্চয়তা কি? দুজনে দুজনের দিকে আর একটু বেশী এগিয়ে এলে—তারপর? সুরেন কি করতে পারবে, কতটুকু সাধ্য তার? সে কি পারবে ওকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে, জীবনের ভার নিতে—জীবনসঙ্গিনী করতে?...না, তা সম্ভব নয়। আর সম্ভব যখন নয়—তখন অকারণ মেয়েটার মনে একটা প্রবল তৃষ্ণা সেই সঙ্গে বর্তমান ভাগ্যে অতৃপ্তির ভাব বাড়িয়ে লাভ কি?...

কিন্তু এসমস্ত ছাপিয়ে একটা আনন্দেও বুক ভরে যায় যেন।

এমন কখনও ভাবেনি, এমন আশাও করেনি। অন্তরবাসিনী দেবী যেদিন পূজার্থীর কাছ থেকে নিজে পুষ্পার্ঘ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনও সে-অর্ঘ্যের এ-পরিণতি ছিল স্বপ্নের অগোচর। পূজার্থীই পূজিত হবে—ভক্তের নিবেদিত উপহার দেবীই পূজার আসনে বসবেন—এর চেয়ে বড় কোন বর কোন পুরস্কার ভক্ত আশা করতে পারে।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে—বুঝি বা নিজের বুকেরই তুফান ঝড়ের দিকে কান পেতে থাকতে থাকতেই—উদ্বেলিত আবেগ সংযত কিছুটা সামলে নিয়ে শুধু বলল, 'আচ্ছা।...আমি, আমি তাহলে এখন যাই?' সে সত্যিই ছাদের দোরের দিকে পা বাড়াল।

হেমন্ত সজোরে ওর একটা হাত চেপে ধরে, 'ছি, এখনই যাবি কি? পাগল হয়েছিস নাকি? না না, রাগ-অভিমান করে তুই বলিনি। তোকে দিন-রাতই চোখের সামনে রাখতে ইচ্ছে করে আমার, সেই তোকে আসা কমিয়ে দিতে বলতে হল—বিধাতার বিড়ম্বনা ছাড়া কি বল! দশচক্রে ভগবান ভূত হয়—এও তাই।...তাই বলে একেবারে আসা-যাওয়া বন্ধও করিসনি। টেপেটোপে মেয়েটা মন গুমরে গুমরে থাকলে বাচ্চাটা শেষপর্যন্ত হয়ত হাবা-কালা হয়ে যেতে পারে। এই তাই—তুই এসেছিস শুনে মরে মরেও রান্নাঘরে গেছে তোর জন্যে চা-হালুয়া করতে। তোর খাবার আর কাউকে দিয়ে করালে শান্তি হয় না ওর।'

আবার একটা হল একটু। চা-হালুয়াও খেতে হল। সে হালুয়া গলার মধ্যে ডেলা পাকিয়ে কণ্ঠরোধ করতে চায়—তবুও খেল, জোর করেই। তবে সেদিন মণিকার কোন অনুরোধ-উপরোধই শুনল না, একটু পরেই বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে।...

কিন্তু তখনই সেই নিরানন্দ অন্ধকূপেও ফিরতে পারল না। সেন্ট জেমস্ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল। বসেও রইল বহুক্ষণ।

দুঃখ? বেদনা?

না, বোধহয় শুধু তাও না। কী যে, নিজেই বুঝতে পারছে না যেন।

এইমাত্র নির্বাসনের দণ্ডাদেশ শুনে এল, বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিয়েও এল সে দণ্ড। একটি মাত্র যে দীপশিখা তার সামনে অসীম অন্ধকার জীবনপথে জ্বলে উঠেছিল ক্ষণকালের জন্য—তা চিরকালের মতোই নিভে গেল। আশা কিছু ছিলই না—সাময়িক আনন্দের যে উৎসটুকু ছিল—এইমাত্র বোধ করি নিজ হাতেই—স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে এল।

তবু, সব দুঃখ, জীবনব্যাপী—ভবিষ্যতে যতটা দৃষ্টি চলে—দিকদিগন্ত অন্ধকারের মধ্যেও একটা তৃপ্তি একটা পরিপূর্ণতার আনন্দও যে বোধ করছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নিজের মনোভাবের সুরটি অপর একটি ঈপ্সিত হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়েছে—এই তো যথেষ্ট, এই তো অনেক পাওয়া। তার মতো ছন্নছাড়া জীবনে এর বেশী আর কি পেতে পারত সে?...

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই একভাবে বসে কেটে গেল সুরেনের। ক্রমশ জনবিরল হয়ে এল পার্ক, যে দু-চারজন পার্কেই শুয়ে থাকে রাত্রে—তারা একে একে আসতে শুরু করল আবার, দূরে চাঁপাতলার গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও আর পাওয়া যাচ্ছে না। আশপাশের বাড়িতে আলো নিভতে লাগল একটির পর একটি, শুয়ে পড়ছে সবাই দিনের কাজ শেষ করে শ্রান্তি ও চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেয়ে—সুরেন কিন্তু উঠতে পারল না। তার লাভ বেশী হল কি ক্ষতি—সেই হিসেবটাই মিলছে না তার কিছুতে—অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করেও।

(ক্রমশঃ)

নতুন রাজ্য মিজোরাম

• উৎপল সেনগুপ্ত •

ভারতবর্ষকে দেখে একদা বীর আলেকজান্ডার মন্তব্য করেছিলেন, 'সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ!'

শুধু বিচিত্র এই দেশ নয়, বিচিত্র এই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের নর-নারী, তাদের ধর্ম আচার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন নদী-নালা ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, যা মিলে হয়েছে সুন্দর এক অখন্ড ভারতবর্ষ। তাই রবীন্দ্রনাথ সর্ব জাতি ও ধর্মসমন্বয়ে গড়া এই দেশকে 'ভারততীর্থ'রূপে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং সকল জাতির মাঝে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন পার্বত্য বাসিন্দাদেরও। তাঁর ভাষায়, 'ভেদি মরুপথ, গিরি পর্বত, যারা এসেছিল সবে, তারা মোর মাঝে, সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূরে।'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।'

সত্য! সমস্ত জাতি ও ধর্মসমন্বয়পূর্ণ এইরূপ দেশ পৃথিবীতে কটি আছে? ভারতবর্ষ নিজেই নিজের উদাহরণ।

সম্প্রতি আমাদের পার্বত্য জেলা 'মিজো' নতুন এক রাজ্য হিসেবে ভারতবর্ষের মান-চিত্রে স্থান করে নিয়েছে। রাজ্যের কৌলিন্য পাওয়ায় 'মিজো জেলা' এখন সর্বসমক্ষে 'মিজোরাম' হিসেবে পরিচিত। এই শিশু রাজ্যের জন্মদিনের এক শুভলগ্নে আমাদের রাজ্যপাল শ্রীবি কে নেহরু এক শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন, 'এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমি নতুন রাজ্য মিজোরামের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই আশা প্রকাশ করছি যে, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সরকার দিয়ে পারস্পারিক শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বসবাস করবেন। 'মিজোরাম' আসাম থেকে আলাদা হলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আগের মত দুটি রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখবে।'

এই উদ্বোধনকালে আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী (প্রাক্তন) বলেন, 'আসামের জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে আমি 'মিজোরামে'র ভাই-বোনদের আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসাম ও মিজোরামের জনগণ শতাধিক বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করেছে, তাই শাসন-ব্যবস্থার দিক থেকে মিজোরাম আলাদা হলেও আমাদের ভবিষ্যত অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নির্ভর করবে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মাঝে। আমি নিশ্চিত যে, এই নতুন রাজ্যের উদ্বোধনে প্রত্যেকের সুখ ও শান্তি ফিরে আসবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বহুদিন ধরে এই ক্ষুদ্র পার্বত্য এলাকাটিতে অশান্তি বিরাজ করছিল। বিশেষ করে বিদ্রোহী মিজো নেতা মিঃ লালডেংগার নেতৃত্বাধীন জাতীয় মিজো ফ্রন্টের নাশকতামূলক কার্যকলাপে। এই ফ্রন্ট ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি মিজোরাজ্য গঠনের আশা-পোষণ করত। তাঁদের এই কাজে মদৎ দিচ্ছিল চীন ও পাকিস্থান। কিন্তু মিজো ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে যুক্ত থেকে মিজো জেলাকে আলাদা রাজ্য হিসেবে পেতে চায়। এরপর মিজো ইউনিয়ন কর্তৃক মিজো জেলা পরিষদ এবং মিঃ ভ্যাংথুসা নেতৃত্বাধীনে মিজোরাম কংগ্রেস গঠিত হয়। পরে তা ইউনাইটেড মিজো পার্লামেন্টারী পার্টি (ইউ এম পি পি) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এক অধি-বেশনে সরকারীভাবে (স্বশাসিত রাজ্যের) এই বিষয়ে এক প্রস্তাব পাশ করে।

পরে এই পার্বত্য জেলার অখণ্ডতা ও শান্তি রক্ষার কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার (১৭ই জুলাই, '৭১) মিজো জেলাকে কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী হন। অবশ্য এ ব্যবস্থা কয়েক বছরের মেয়াদে চলবে।
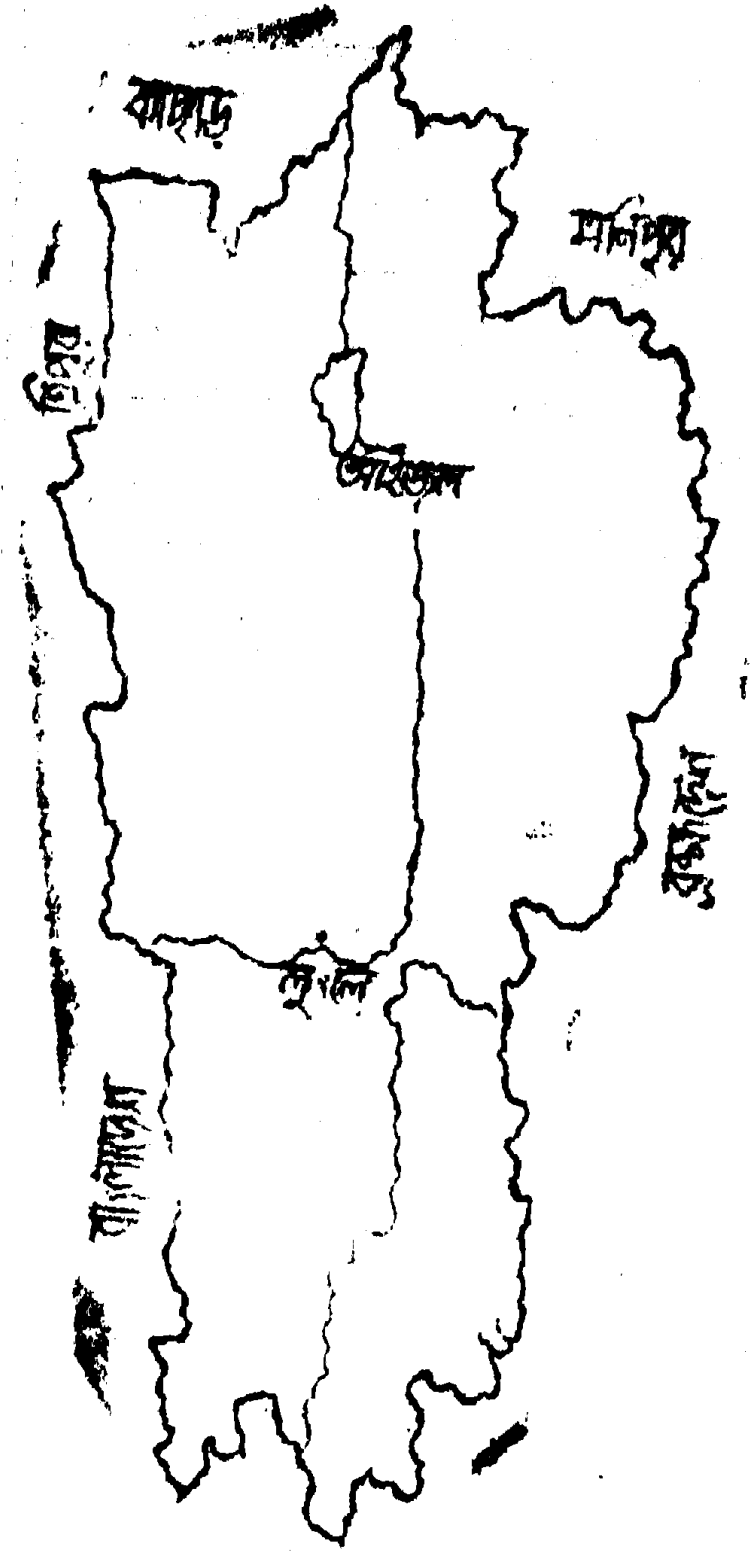
বৃহত্তম জেলা মিজো

আসামের বৃহত্তম জেলা হল এই মিজো পাহাড় এবং এটাকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা হিসেবেও পরিগণিত করা হয়ে থাকে। সর্বসমেত ২১ হাজার ৬৭ বর্গ কিলো-মিটারব্যাপী বিস্তৃত এই নব রাজ্যটিতে বর্তমান লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের কাছাকাছি। এই রাজ্যের উত্তরে কাছাড় ও ত্রিপুরা, পূর্বে ও কাছাড় ও মণিপুর, দক্ষিণে বর্মা এবং পশ্চিমে বাংলা-দেশ ও ত্রিপুরা।
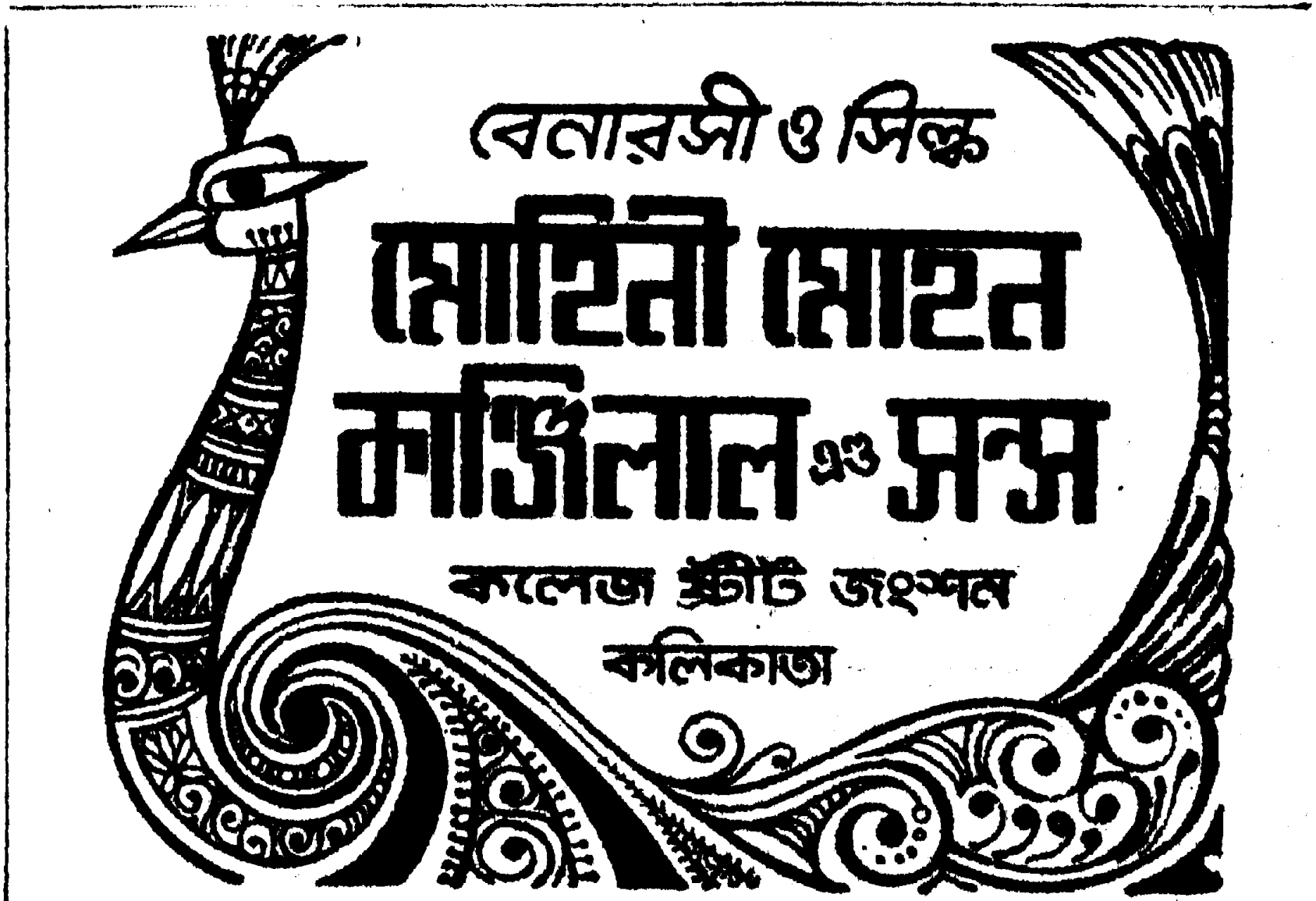
বর্তমানে এখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব হল ১৫ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে শিক্ষার বিস্তার। বিগত কয়েক বছর আগেও সেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছুতে পারেনি, আজ সেখানে তা সম্ভব হয়েছে [illegible]। বহু স্কুল ও কলেজ গড়ে উঠেছে। এখন এখানে লিখতে-পড়তে জানে এমন পুরুষের সংখ্যা হল ৫৯.৫ শতাংশ। আর মহিলাদের সংখ্যা হল শতকরা ৪২.৫ ভাগ। সারিবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে গ্রামগুলোকে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই ধরনের গ্রামের সংখ্যা হল ১০২টি। আর এলোমেলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো গ্রামের সংখ্যা ৪০০।

সারা মিজো রাজ্যে ৪০০ মাইল জুড়ে রয়েছে জীপ চলাচলের উপযোগী সুন্দর রাস্তা।

এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে জনপ্রিয় ও জনবহুল শহর হল দুটি। আইজল ও লুংলে। এখানে [illegible] দুটি। আমাদের [illegible] থেকে 'আইজলে' যাওয়ার সহজতম পথ খোলা আছে। অথবা [illegible] থেকে [illegible] ঘোড়ার পিঠে চড়ে ১১৬ মাইল [illegible] করে নির্ধারিত [illegible] পৌঁছানো যায়। অবশ্য এই [illegible] রাত্রে বিশ্রামের প্রয়োজন [illegible] নির্দিষ্ট বাংলোতে তা করা যায়।

দেশবিভাগের আগে লুংলে শহরে সরাসরি যাবার পথ ছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এখান থেকে মোটরলঞ্চ ও নৌকা করে সকলে যাতায়াত করত। এখন ডিমাগিরি থেকে 'লুংলে' যাওয়ার পথ মাত্র চার দিনের। আবার 'আইজল' থেকে আট ক্রোশ লুংলে যেতে আটদিন সময় লাগে।

লুসাই পাহাড়ের মধ্যে কোন সড়ক নেই। সেজন্য অশ্বারোহণে চলাচল উপযোগী রাস্তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ডাওয়ারব্যান্ড থেকে আইজল এবং আইজল থেকে লুংলে যাওয়ার জন্য জীপগাড়ী চলাচল উপযোগী রাস্তা তৈরী হয়। এই জেলায় অনেকগুলো নদী রয়েছে, কিন্তু সেগুলো নৌযান চলাচলের উপযোগী নয়।

এই এলাকার জনসাধারণ লুসাইস নামে পরিচিত বলে এর লুসাই পাহাড় নামকরণ হয়েছে। এই লুসাইরা এখন নিজেদের মিজো নামে পরিচয় দিতে আগ্রহী। এরা তিব্বত-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর মোঙ্গোলজাতির দলভুক্ত।

অধুনা 'মিজো পাহাড়' হিসেবে পরিচিত এই লুসাই পাহাড়ের ইতিহাস খুব কম লোকেরই জানা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই পাহাড় জয়ের পরেই এখানকার ইতিহাস সংকলিত হয়। [illegible] সময় মিজোরা চীনা পাহাড় থেকে বিতাড়িত হলে এরা [illegible] ছাড়িয়ে দিয়ে উত্তর কাছাড়ের পাহাড়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বৃটিশ শাসন গ্রহণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মিজো জনসাধারণ শৈল শাসনাধীন ছিল।

মিজো কৃষি ব্যবস্থা

এই রাজ্যের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের সমস্ত জমিতে সমবায়িক ভিত্তিতে কৃষিখামার গড়ে উঠেছে। পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকা [illegible], ডেমাগিরি, বরাপাসুরি, [illegible] ও বেদসুরীতে আরো [illegible] এই ধরনের সমবায়িক খামার গড়ে তোলা হচ্ছে। এমনকি দক্ষিণের [illegible] এই ধরনের খামার তৈরী করার [illegible] হচ্ছে। প্রতি বছরই পাহাড়ী- [illegible] জন্য উন্নত ধরনের বীজ [illegible] বিতরণ করা হয়। কৃষিকাজ [illegible] করার জন্য সমস্ত জেলায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সার দেওয়া হয়ে থাকে। মিজোরামের কৃষকরা এখন আধুনিক উন্নত প্রক্রিয়ায় কৃষিব্যবস্থা অনুশীলনের জন্য অধীর আগ্রহী এবং তারা সাজসরঞ্জাম ও কৃষি-যন্ত্রপাতি পেলে তা ব্যবহার করতে [illegible] সচেষ্ট।

এখানে সাধারণতঃ অর্থকরী শস্য (ইক্ষু-চিনি উৎপাদনের ন্যায়) কমলালেবু ও [illegible] উদ্যানের ব্যাপক চাষের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কমলালেবুর চাষ এখানকার এক আকর্ষণীয় প্রচেষ্টা। তবে ভূমি সংরক্ষণ নীতিটি মিজোরামের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

মিজো আচার ও লোকনৃত্য

স্বভাবতই মিজোরা দেহের গঠনে দেখতে সুন্দর। সর্বদা হাসিখুসী। বেঁচে থাকার জন্য তাদের রয়েছে অসীম আগ্রহ। মিজো লোকনৃত্যের দর্পণে তাদের স্বভাব যেন প্রতিফলিত। এই ধরনের কয়েকটি লোকনৃত্যের নাম চের, খুয়াল্লাম, সোলাকিয়া ও চ্যাংলাম।

চের নৃত্য একটি অন্যতম সর্বাধিক জনপ্রিয় নৃত্য। কারো অকালে মৃত্যু হচ্ছে তারই সম্মানে এই নৃত্য। প্রেতাত্মা যাতে পরলোকগত আত্মার কোন ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য প্রেতাত্মার সন্তোষবিধান এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। এই নৃত্য এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হয়ে থাকে, তা হল, দুটি বাঁশ আড়াআড়িভাবে রাখা হয় এবং বাঁশ দুটির দুই মাথায় দুজন বসে থাকে। নর্তক দুটি বাঁশের এক-একটিতে এক-একবার পা ফেলে বাঁশের শেষ প্রান্তে উপবিষ্ট লোক দুটি তখন অবিরামে একবার বাঁশটি ফাঁক করে আবার বন্ধ করে।

খুয়াল্লাম নৃত্য

'খুয়াংচা-উই' নামক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব উপলক্ষ এই নৃত্যানুষ্ঠান [illegible] থাকে। '[illegible]' লাভের জন্য এই সপ্তম এবং শেষ আচারক্রিয়াকর্ম (খুয়াংচা-উই) অনুষ্ঠিত হয়। মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে মিজোদের এই যে ধারণা তার থেকেই এই পদবীর (ব্যাংছুয়া) সৃষ্টি। এই বিশ্বাস মতে কোন ব্যক্তি সপরিবারে স্বর্গবাস করতে পারে, যদি সে তার জীবৎকালে সাতবার খুয়াংচা-উই ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান করে। মিজো সমাজে যে ব্যক্তি সাতবার এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করে তাকে বলা হয় 'ব্যাংছুয়া' লাভ।

খুয়াংচা-উই উৎসবের অনুষ্ঠান বর্তমানে উৎসবকালে ভোজের উদ্দেশ্যে দুটি পূর্ণবয়স্ক মিথুন (এক প্রকার ষাঁড়), দুটি পূর্ণবয়স্ক গৃহপালিত গয়াল (একপ্রকার বৃষ) এবং একটি শূকর হত্যা করতে হবে এবং তার শ্বশুরকে বিশেষ দূত মারফৎ এই বার্তা পাঠাতে হবে। শ্বশুরকে তখন বাধ্যতামূলক যুবক-যুবতীদের এক নৃত্যানুষ্ঠান আয়োজন করতে হয়। শ্বশুরের গ্রাম থেকে নর্তক-নর্তকীদল নাচতে নাচতে জামাই এর গ্রামের দিকে রওনা হবে। যেদিন পশুবলি হবে, সেদিনই যুবক-যুবতীরা গ্রামের পথে নাচবে এবং গ্রামের সবলোক তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবে।

বাইরের গ্রামের এই নর্তক-নর্তকীদের 'থ্যাংচুয়ার' বাড়ীর দিকে নাচতে নাচতে এগিয়ে যাওয়াকে 'খুয়াল্লাম' নৃত্য বলা হয়ে থাকে। এর মানে হচ্ছে বাইরের লোকনৃত্য।

খুয়াল্লাম নৃত্যের পাঁচটি মূল গতি আছে (১) [illegible] (পদক্ষেপ), (২) [illegible] (সুরধ্বনিতে পা দোলানো) (৩) [illegible] (আড়াআড়িভাবে নৃত্য) (৪) [illegible], এবং (৫) [illegible] (হাত চড়ানো)।

খুয়াং-উই উৎসবের উদ্যোক্তারা বাড়ী ফেরার পথে 'গং' (একপ্রকার ধাতু নির্মিত ডঙ্কের বাজনা) ও ঢাক বাজায় এবং নর্তক-নর্তকীরা তাদের নানা রংবেরংয়ের পোষাক মেলে ধরে সুরধ্বনির ঝঙ্কারের সংগে পা মিলিয়ে নাচতে নাচতে স্বস্থানে যাত্রা করে।

সোলাকিয়া নৃত্য

এই নাচ সাধারণতঃ মিজো জেলার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরাই করে থাকে। এই নাচের আবার পাঁচটি গতি-প্রকৃতি আছে। এবং পশু শিকার ও নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের বিজয়ীদের তুষ্টির জন্য এই নাচ হয়ে থাকে। পুরুষ ও মহিলারা বৃত্তের আকার নিয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের নেতা তারপর 'গং' বাজালে নর্তক-নর্তকীরা অপূর্বভঙ্গিমায় ডান পা বাম দিকে নিয়ে হাঁটুর দিকে বেঁকে যায়। এরপর তারা সামনে তিন পা এগিয়ে গিয়ে বাম ও ডান পা আস্তে আস্তে এক-একটি করে তুলে ধরে। এইভাবেই জনপ্রিয় 'সোলাকিয়া' নৃত্যকে নয়নাভিরাম করে তোলে।

সবারে আমি নমি

কানন দেবী

১৯৪০-৪১ সাল একাধারে আমার জীবনের উজ্জ্বলতম সাফল্য ও সীমাহীন বেদনা-চিহ্নিত অধ্যায়। এই সময়েই কবীর রোডে আমার বহুদিনের স্বপ্ন-দিয়ে গড়া নিজস্ব বাসগৃহ সমাপ্ত হয়। তবে বাড়ী সম্বন্ধে যে রঙিন কল্পনা মনের মধ্যে ছিল তার সবটাই পুরোপুরি সফল হয়নি। আত্মীয়, বন্ধু সব্বাই বাড়ী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি খুশী হতে পারিনি। আমার মনের মত বাড়ী হোলো আমার এখনকার রিজেন্ট গ্রোভের বাড়ী। নানান বিপত্তি সত্ত্বেও এ বাড়ী আমি ছাড়তে পারিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি জীবনের শেষদিন অবধি যেন এই বাড়ীতেই থাকতে পাই।

থাক যা বলছিলাম। কবীর রোডের বাড়ী তৈরীর অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক দিক সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিই শুধু খুলে দেয়নি। জীবনের নানান ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা আমার কাজে লেগেছে।

একটি ঘটনার কথাই বলি। বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে যাঁদের ওপর নির্ভর করেছিলাম, আমার নিঃসহায় অবস্থা ও অল্পবয়সের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নাজেহাল করতে তাঁরা কেউ-ই ছাড়েননি। কর্তাব্যক্তিরাও গম্ভীর চালে নানান ফিরিস্তি দিতেন, এ কাজ করায় অসংখ্য অসুবিধার কথা সবিস্তারে জানাতেন, এবং মোটা দক্ষিণায় আমার কাজ করেও এই ভাবই প্রকাশ করতেন যে আমার প্রতি তাঁরা বিশেষ অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন।

আর মিস্ত্রীরা? এ বেলা আসে ত ওবেলা অনুপস্থিত। উদ্দেশ্য সাধু—দিনের সংখ্যা বাড়িয়ে মজুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা।

একদিন আমি সমস্ত কাজ বাতিল করে দিয়ে মিস্ত্রীদের দিয়ে কাজ করাবার জন্য বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে গেল, তবু মিস্ত্রীদের দেখা নেই। নিজের ওপর সেদিন ধিক্কার এসে গেল। সেইদিনই প্রথম অনুভব করলাম, মানুষের ওপর নির্ভর করলেই নিজেকে অসহায় হয়ে পড়তে হয়। আর অসহায় মানুষকে খাতির করবার মত উদার হৃদয় পৃথিবীতে খুব বেশী নেই। তখনই প্রশ্ন জাগল, এসব নিজে শিখে নিলে কেমন হয়? তখন বসে বসে সিমেন্টের সঙ্গে নানারকম মশলা মিশিয়ে নিজেই মোজাইকের কাজ করবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালাম এবং কিছুক্ষণ চেষ্টা করবার পর দেখলাম মিস্ত্রী-দের চেয়ে আমার কাজ কিছু খারাপ নয় বরং কোনো অংশে আরো ভালই। নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করার একটা আনন্দের আলো যেন মনের মধ্যে জ্বলে উঠল। অনুভব করলাম, শেখবার আগ্রহে যদি আন্তরিকতার অভাব না থাকে তবে মানুষের অসাধ্য কোনো কাজই নেই। খোঁজার ঐকান্তিকতা থাকলে দুয়ার খুলতে দেরী হয় না।

আর একটি কথা। সামান্য প্রাপ্তির জন্যও মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা নিশ্চয় উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও সমান সত্যি, যে কোনো মানুষকে (জীবনে সে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন), কখনও একথা বুঝতে দেওয়া উচিত নয় যে তাকে নইলে আমার চলবে না। মানুষমাত্রেরই সবসময় এইটুকু আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত যে কোনো ব্যাপারেই সে পরমুখাপেক্ষী নয়। এই নীতি অনুসরণ করার পর থেকে আমার জীবনের অনেক সমস্যাই সহজ হয়ে গেছে।

তবে ব্যতিক্রমও নেই কি? আমার এক মালী চল্লিশ বছর আমার বাড়ীতে কাজ করেছে। একমাত্র তার কাছেই আমি নির্বাধে স্বীকার করি যে, সে ছাড়া আমার চলবে না।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কবীর রোডের বাড়ীর একটা দিকের মোজাইক সম্পূর্ণই আমার হাতে তৈরী। ভাবতে ভাল লাগে না?

এই সময়েই এল জীবনের পরম লগ্ন। যৌবনের উজ্জ্বল আবেগের জোয়ার আমার বাইরের কাঠিন্যের বাঁধ ভেঙে অন্তরের অতলে যে মাতন তুলেছিল, তার দুর্নিবার আকর্ষণ আমিও এড়াতে পারিনি। এড়াতে চাইওনি। মন বাঁধা পড়েছিল একটি জায়গায়। এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না, সেদিন মনে হয়েছিল যৌবনের রাজটীকা ললাটে পরে

পরাজয় চিত্রে ইন্দু মুখার্জি, জীবেন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী এবং কানন দেবী

ঠিক যেন রাজার মতই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন যৌবনের দেবতা। দুচোখ ভরে দেখতাম তার রূপ। দেখে দেখে যেন আশ মিটত না।

সে যেন হৃদয়ের এক নূতন জাগরণ। রবীন্দ্রনাথের দুটি গানের কলিতে প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমার এই সময়ের অনুভূতির প্রতিধ্বনি—

'মনে হোলো আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে
মনে হোলো সকল দেহ
পূর্ণ হোলো গানে গানে'

সে সময় মনে হোতো এই ধূলিধূসরিত বাস্তব জীবনের সকল মালিন্যকে অতিক্রম করে এমন একটা রাজ্যে পৌঁছে গেছি যেখানে অন্তহীন রঙের অফুরান উৎসব-বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে, গন্ধে যেন হিল্লোলিত। সে-মুহূর্তের অন্তহীন সৌন্দর্য সারা মনকে আবিষ্ট করে তুলল। নিজেকে দেওয়ার আনন্দ, অপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা, শিহরণের নানান আবেগ মেশানো চাঞ্চল্য দেখে বিস্মিত হতাম। হৃদয় যখন ঘুমিয়ে থাকে সেখানে ভালবাসার কিরণেও তার নানা পাপড়ি চোখ বুজেও থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে সে প্রেমের পূর্ণতা-স্পর্শে জাগ্রত, সেখানে প্রতিটি ছোটো স্পন্দনেও বুকের তার নানান ব্যঞ্জনায় যেন বেজে ওঠে। এই বিস্ময়লোকে আপনাকে হারিয়ে ফেলার একটা তীব্র আনন্দ অনু-ভব করার সঙ্গে সঙ্গে, বিপরীতমুখী শঙ্কার আঘাতে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মনে হোলো এ-আনন্দ বোধহয় আমার জন্য নয়। কেন মনে হোলো?

এর জন্য দায়ী হয়ত আমার প্রথমের দিকের সংঘাতমুখর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। আগেই বলেছি ছোটোবেলা থেকে ক্রমাগত আঘাত পেয়ে সযত্নলালিত বহু সুকুমার কল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার দরুণ বা যে-কোনো কারণেই হোক পূর্বরাগের চড়ারঙের আবেশলাগানো উন্মা-দনার মুহূর্তেও মনের অতলে যেন থেকে থেকে অন্তরদেবতার সাবধানবাণী বেজে উঠত—পারিপার্শ্বিকের চাপে বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক মানুষ ছোটো হতেও পারে কিন্তু তার নিভৃত অন্তরের প্রেম 'বিকশিত হেম'-এর মতই পবিত্র। সেই প্রেমকে পাঁকে নামানোর অধিকার আমার নেই।

সময়ের ব্যবধানের থিতিয়ে-যাওয়া আলোতেই আজ যেন স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, প্রেমের বিকাশ যেখানে যত বেশী সূক্ষ্ম, তার সমস্যা ও দায়িত্বজ্ঞানও সেখানে তত বেশী। আর তার ছোটোবড় তৃষ্ণা না মেটার বেদনাও ততই দুঃসহ। তাই হয়ত সব-দেওয়ার কূলে দাঁড়িয়েও মনে হয়েছিল মায়াসরসীর মতই ছুঁতে না ছুঁতে সে-প্রেম যাবে মিলিয়ে যদি না তাকে সমাজ-স্বীকৃতির সম্মানে প্রতিষ্ঠিত না করা যায়। সবসময়ই সজাগ থাকতাম—আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না। জীবনের এতবড় সম্পদ, ঈশ্বরের এতবড় দান এ যেন তামাশা হয়ে না দাঁড়ায়। সেইখান থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু। তবে কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্তেও আপন সিদ্ধান্তে ছিলাম দৃঢ়। অবেলায় হাট যদি ভাঙে ভাঙুক, কিন্তু হৃদয়ের এই স্বতোৎসারিত প্রেমের আঘাটায় ভরাডুবি হতে দেব না। লক্ষ্যহীন গতির দৃশ্য আমায় কি জানি কেন, বড় ক্লান্ত করে তোলে। কেমন একটা অনির্দেশ্য বিষাদে ভরে দেয়। জীবনের কাছে আমি যে চেয়েছি শান্তি, কল্যাণময় অজস্র কর্মের মাঝে মাঝে বিশ্রামনিলয়।

যাই হোক, সামাজিক মর্যাদাদানে অপর পক্ষেরও আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা, রাতের স্বপ্ন-ভূষিতের সামনে জলটলমলে সরোবরের

মতই যখন বাস্তবরূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়ালো, সেই পরম লগ্নটাই বা আনন্দে গৌরবে বরণ করে নিতে পারলাম কই?

দোলায়িত দ্বিধান্বিত চিত্তে সংশয় জেগেছিল, এতবড় দায়িত্ব যোগ্যতার সংগে বহন করতে পারব ত? সমাজ-স্বীকৃতির দলিল ছাড়া নরনারীর প্রেম মঙ্গলময় পরিণতিতে পৌঁছতে পারে না।—কিন্তু যে মূল্য দিয়ে এ-স্বীকৃতি আজ সে দিতে প্রস্তুত, পরে যদি সেটা তারই কাছে নিরানন্দ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়? সে-গ্লানি তখন কেমন করে সহ্য করব?

এইরকম নানান বিপরীত চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে মনটা যত বেশী ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত, তত প্রাণপণ শক্তিতে যেন কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইতাম। নিউ থিয়েটার্সের প্রতিটি ছবি সার্থক হয়ে ওঠার কারণ বোধহয় এটাই। বেদনার পথ বেয়েই বুঝি সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাই জীবনের বড় সার্থকতার সোপান আনন্দ নয়, বেদনাই। অন্তত আমার জীবনে তাই হয়েছে।

গভীর দুঃখলগ্নে যখন চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তখন বিধাতার অস্তিত্বেও সন্দেহ জাগে। আবার যখন অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোভরা সকাল ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন ভেবে দেখলে একটি সত্যই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—নানান আঘাত ও বেদনার মাঝ দিয়েই বিধাতা জীবনকে তার আকাঙ্ক্ষিত পরিণতির মধ্যে নিয়ে যান। নানা বিরূপ উপাদানকে আত্মসাৎ করেই না হৃদয়ের মন্থনদণ্ডে ওঠে অমৃত? আমাদের দুঃখটা হয়ত দুঃখ বলে মনেই হয় না যদি তখন ধৈর্য ধরে তার ওপর বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একথাও মানি, সীমাহীন যন্ত্রণার মুহূর্তে এসব ফিলসফি শুষ্কই মনে হয়। কারণ, মনটা তখন এসব কোনো কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। দুঃখের ফিলসফিটা মধুর লাগে দুঃখনিশার শেষেই। তবু বলব বড় ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে না গেলে জীবন কখনও কোনো বড় কিছু লাভ করতে পারে না।

কিন্তু—থাক। এসব অবান্তর জীবন-দর্শন ছেড়ে এবার আসি সেই প্রসঙ্গে যাকে অবলম্বন করে এই জীবনদর্শনের অবতারণা। সমাজ-স্বীকৃতির সম্মানে আমার প্রেমকে অভিষিক্ত করতে চেয়েছি এবং আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা হোলো যে, তা পেয়েছি। যা অসম্ভব, অকল্পিত, আমার জীবনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় তাও ত সম্ভব হোলো? কিন্তু এতবড় পাওয়ার অনন্দসুধা কি মুহূর্তের জন্যও অঞ্জলি ভরে পান করতে পেরেছি? জীবনের পরম গৌরবের মুহূর্তেই উঠল অশান্তির ঝড়। সন্দেহের আঁধিতে আত্মপ্রত্যয়ও যেন কেঁপে ওঠে তবে কি আমি ভুল করলাম?

মানুষের সত্যিকারের বড় চাওয়াকে মানুষই কত ছোটো করতে পারে, হৃদয়ের মহৎ আকূতিকে কতবড় অপমান করতে পারে, গভীর মর্যাদাবোধকে কি নির্মম উপহাসে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারে তারই রক্তরাঙা অধ্যায় ১৯৩৯ সালের জীবন।

জীবনকে শুভ্র, সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ-পথেও পেয়েছি কি প্রচণ্ড আঘাত। রক্তচক্ষু প্রতিবাদের ঝড় উঠল সমাজের ওপরমহল থেকে নীচেরমহল অবধি। সমাজ আমাদের মিলনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সম্ভ্রমের বরণডালা দিয়ে বরণ করেনি। গ্রহণের দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছে, কিন্তু অভ্যর্থনার মঙ্গলশঙ্খ বাজায়নি, আমাদের দুঃসাহসের সাক্ষী হয়েছে, কিন্তু উৎসবের আলো জ্বালিয়ে একে অভিনন্দিত করতে নারাজ। কি হীন সমালোচনা সকলের মুখে, কি নির্দয় লাঞ্ছনার মাঝ দিয়ে ব্যথামৌন দিনগুলি কেটেছে তা বোঝানোর ভাষা নেই। আজও মনে পড়ে বারান্দায় দাঁড়াতে সাহস করতাম না, পাছে কারো কোনো বিরূপ মন্তব্য কানে আসে। বাইরের আঘাত, অন্তরের দ্বন্দ্ব মিলে প্রতি মুহূর্তের সে দুর্বিষহ যন্ত্রণার জ্বালাময় অনুভূতি আজ এত বছর বাদেও ভুলতে পারিনি। নিঃসম্বল অসহায় একটি মেয়ে। কত ঝড়, তুফান পেরিয়ে ছুটেছে আর ছুটেছে। পাথরের ঘায়ে পা কেটে রক্ত ঝরেছে, বাধার প্রাচীরে মাথা ঠুকেছে,—

সাথী চিত্রে অম্বর মল্লিক, সায়গল, শৈলেন চৌধুরী এবং কানন দেবী

সাপুড়ে চিত্রে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে

তারু থামেনি। কিন্তু তার সেই বিরামহীন চলা গ্রন্থিহীন তপস্যার এতটুকু মূল্য কেউ কোনোদিন দেয়নি। চেয়েছে তাকে বর্বতার সমাধিতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। একটা মহৎ স্বপ্নকে চুরমার করে দেবার নির্লজ্জ উত্তেজনার মধ্যেই পেয়েছে নিষ্ঠুর আনন্দ।

সেদিন মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করেছিলাম সংসারের যেখানে যা-কিছু অত্যাচার বা উৎপীড়ন হয়, স্বীকার করি বা নাই করি আমরা প্রত্যেকেই তার জন্য দায়ী।

আজ যখন নানান পত্র ও পত্রিকা থেকে আমার ইণ্টারভ্যু দেবার তাগিদ আসে, অজান্তে 'করুণ হাসি' কথাটাই বারবার মনে হয়। আজ, এতদিন বাদে, জীবনের গোধূলি লগ্নে, তাঁদের দেওয়া সম্মানের জন্য আমি নিশ্চয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেদিন যদি এর সহস্রাংশের একাংশও পেতাম আমার প্রতি এত নির্মম ও অসম্মানের বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদও যদি কোনো কাগজে প্রকাশিত হোত, তবে সেই মনে আশ্বাসেই আমার জ্বালাভরা মুহূর্তগুলি কত স্নিগ্ধ, সজল—কত সহনীয় হয়ে উঠতে পারত। একাকীত্বের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সহানুভূতির বাষ্পটুকুও যেন প্রবেশ নিষেধ ছিল।

মনে পড়ে বিবাহলগ্নের সেই বিশেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের নাম সই-করা একখানি ছবি উপহার পেয়েছিলাম কোনো এক শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে। এ-সংবাদই কেমন করে যেন পৌঁছেছিল কোলকাতার উঁচুমহলের কানে। ব্যস, আর রক্ষে আছে? এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ও অসন্তোষের কোনো সীমা-পরিসীমা রইল না। শুনেছিলাম, এখান থেকে কতবার ট্রাঙ্ক কল করে, চিঠি লিখে, টেলিগ্রাম করে কবিকে উদ্ব্যস্ত করে তোলা হয়েছিল—কেন এ ছবি আমায় দেওয়া হয়েছিল? অভিনেত্রীর ত কবির নাম-স্বাক্ষরিত ছবি রাখার অধিকার নেই।

মাঝে মাঝে ভাবি, এই মানুষই মানুষকে কত আনন্দ দিতে পারে, আবার এই মানুষই তাকে কত আঘাত করতে পারে। কিন্তু আনন্দের স্বর্গলোক রচনা করবার ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও নিরানন্দের মরূদ্যান সৃষ্টি করার দিকেই আমাদের মনের প্রবণতা বেশী।

গুরুদেবের কাছে শুনেছিলাম 'অমৃতের চেয়ে বিষের দিকেই আমাদের মনের সহজ টান বেশী।' কিন্তু এই কঠিন বাস্তবকে মানব না। মাথা নত করব না ঈর্ষার গ্লানি, নীচতার বিদ্রোহ আর মিথ্যার দাপটের কাছে। এই ছিল আমার পণ। আমার এই স্বপ্নকে আকাশকুসুম বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন অতি আপনজন। কিন্তু শুধু আপনার জনকেই বা দুষি কেন? কত বিরাটপ্রাণ, আদর্শবান মানুষ—যাঁদের ওপর আমার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না, তাঁরাও কি অকল্পনীয়—কি হিমশীতল কাঠিন্যে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। একটি আশীর্বাদ অথবা অভিনন্দনের বাণী মুখ দিয়ে আর বেরোল না কেন? বিস্মিত বেদনায় বারবার শুধু এই কথাই ভেবেছিলাম। সমাজের গ্রহণ করাটা যে কতবড় শক্তি সে-কথা সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছি। তবু আজ-এ আমার পরাজয় নয়। বহুদিনের অন্যায় সংস্কারের বিরুদ্ধে আমিই প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছি বলেই এ-অধিকার সম্বন্ধে সবাই সচেতন হয়েছেন। আমিই প্রথম দরজা ভেঙেছি বলেই সেই খোলা দরজা দিয়ে সুন্দর জীবনের পথ-প্রবেশ অন্য সকলের কাছে সহজ হয়েছে।

জীবন পদে পদে বাস্তবের দাবীতে রেত্তলে হয়ে যায় বলেই না যুগে যুগে কল্পনাকে তার নিতে হয়েছে তাকে উর্ধ্বে তোলবার? ইতরতার প্রকোপলি থেকে মুক্ত রাখবে? পাঁকের মধ্যে জন্মায় বলেই কি পদ্মের পুষ্পগৌরব? না, পাঁককে অস্বীকার করে উর্ধ্বে? তাকে সে তা

বঙ্গনবাব রঙ্গনায়িকা

লুৎফউন্নিসা

অংশুরঞ্জন সেন

অকৃতী অনাচারী পুরুষ আর করুণাময়ী স্নেহশীলা এক নারী। ভিন্ন এই দুই চরিত্রের মিলনে রচিত আঠারো শতকের এক বেদনাক্লিষ্ট ইতিহাস। যদি নারীর আজীবন অনুরক্তি কোন অসৎ পুরুষের স্মৃতিকে স্মরণযোগ্য করে থাকে, বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার অদৃষ্টেও এমনই ঘটেছে। রক্ত আর অশ্রুতে পরিপূর্ণ তাঁর নিজের এবং তাঁর ক্ষতিগ্রস্তদের দুঃখময় জীবন ঐ এক অতি বিশ্বস্তা পত্নীর সঙ্গে ছিল জড়িত। বিষণ্ণলাবণ্য সেই নারী। নাম লুৎফউন্নিসা বেগম। এঁর জীবন-কাহিনীতে গাঁথা রয়েছে কবির ভাষার কয়েক টুকরো কথা। সেই কথায় মূর্ত হয়ে উদ্ভাসিত তাঁর জীবনের ছবি। তাঁর মাধ্য যেন 'সৌন্দর্য এবং বিষাদ চলেছে হাত ধরাধরি করে।'

ইতিহাসের এই নায়িকার জীবনের শুরু ক্রীতদাসী হিসেবে। সিরাজউদ্দৌলার মায়ের পরিবারে তাঁর প্রথম প্রবেশ ঘটে। জন্মে তিনি ছিলেন হিন্দু। তখন তাঁর নাম ছিল রাজ কুনওয়ার। এই কুমারীর তাজা সৌন্দর্য এবং মার্জিত গুণাবলী তরুণ সিরাজের হৃদয় করল জয়। তাঁর মা মেয়েটির অধিকার তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন। সিরাজ তাকে লুৎফউন্নিসা বেগম নাম দিয়ে সম্মানিত করলেন, আর তাঁর একটি কন্যা হল তার গর্ভে। গোলাম হোসেনের 'সিয়র-উল-মুতাখখরীন' গ্রন্থ থেকেও জানা যায় যে, লুৎফউন্নিসা [illegible] ক্রীতদাসী

—এই হল সিরাজের শেষ কথা। তারপর মুর্শিদাবাদের সেই অন্ধ কারাগারে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে এই রকম করেই বাংলার নবাবের জীবনাবসান হল।

সকলের কাছে যিনি শুধু পেয়েছিলেন ঘৃণা আর অবহেলা, সেই সিরাজের জন্যে কিন্তু লুৎফউন্নিসার অন্তরে ছিল একনিষ্ঠ শোক। ১৭৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসে মীরজাফর লুৎফউন্নিসা ও তাঁর চার বছরের শিশু কন্যার সঙ্গে মৃত নবাবের রাজ অন্তঃপুরের অন্য বেগমদেরও ঢাকায় নির্বাসিত করেছিলেন। সেখানে তাঁরা সাত বছরের মত বন্দিনী ছিলেন। এমন কি তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট সামান্য ভাতাও নিয়মিতভাবে দেওয়া হত না। খাদ্য আর জীবন ধারণের অন্য সব প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যাপারে তাঁদের কষ্ট এবং চরম দুর্দশা তাঁদের জীবনকে দারুণ দুর্বিষহ করে তুলল। তারপর যখন মৈনুদ্দৌলা মুজফফর জঙ্গ (মুহম্মদ রেজা খাঁ) ঢাকার শাসনকর্তা হয়ে এলেন তখন থেকেই কেবল তাঁদের সামান্য ভাতা নিয়মিতভাবে মাসে মাসে দেওয়া হতে লাগল। পরে বাংলার গভর্ণর লর্ড ক্লাইভের সৌজন্য এবং দয়ায় তাঁদের কারাগার থেকে মুক্ত করে মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠানো হল।

মুর্শিদাবাদে পৌঁছে বেগমরা ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁদের মুক্তির জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁদের বাকি দিনগুলির জন্যে একটা জীবনধারণ-ভাতা মঞ্জুরের প্রার্থনা করে এক 'আরজি' পেশ করলেন ১৭৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে। এই দলিলে অন্যদের মধ্যে নবাব আলিবর্দী খাঁর পত্নী শরফুন্নিসা, লুৎফউন্নিসা এবং তাঁর মেয়ের সইগুলি অঙ্কিত ছিল।

একদিন যে নারী কত অসংখ্য বিত্ত বিলিয়েছেন বিপন্ন মানুষের মাঝে, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই লুৎফউন্নিসা নিজেই ভিক্ষার ঝুলি বাড়িয়েছেন কতকগুলো লুব্ধ বিদেশী শাসকের কাছে। কোম্পানী লুৎফা এবং তাঁর মেয়ের ভরণ-পোষণের জন্যে মাসিক ছ'শ টাকার এক ভাতা ধার্য করলেন। এর পর বেগমের জীবনে প্রথম প্রচণ্ড আঘাত এল যখন তাঁর একমাত্র মেয়ে তাঁর স্বামী মীর আসাদ আলি খাঁকে হারালেন। কিন্তু আরো অনেক দুর্ভাগ্য তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। তাঁর জীবনের একমাত্র আশ্রয় এই বিধবা কন্যাটিও ১৭৭৪ সনের শুরুতে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। আর তিনি রেখে গেলেন সুকুমার বয়সের চারটি কন্যা — শরফউন্নিসা, আসমাতউন্নিসা, সাকিনা এবং আমাতুল-উল-মাহদী বেগম। টাকা ভাতা উত্তরাধিকারে দিয়ে যেতে লাগলেন। এর মধ্যে তাঁর নিজের জন্যে একশ টাকা এবং তাঁর নাতনীদের জন্যে পাঁচশ টাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। এই সব মাতৃপিতৃহীন মেয়েদের বিবাহের বন্দোবস্ত হলে লুৎফউন্নিসার আর্থিক দুর্দশা গেল বেড়ে। তাই তিনি ১৭৮৭ সনে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে এক আবেদন করলেন যে, তাঁর জীবনের বাকী দিনগুলো যেন আত্মসম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে কাটানোর জন্যে এক পর্যাপ্ত ভাতা দেওয়া হয় তাঁকে।

কিন্তু এই আবেদন তাঁর দুর্দশার কোন নিবৃত্তি আনতে ব্যর্থ হল। আর যিনি একদা বাংলা, বিহার এবং ওড়িশার নবাবের প্রিয়তমা পত্নীর জীবন উপভোগ করেছেন, তাঁকে বাকী দিনগুলি মাসিক একশ টাকার সামান্য ভাতায় কাটিয়ে যেতে হল। অথচ তাঁরই দয়ায় একদিন এই ইংরেজ কোম্পানীর একজন পদস্থ কর্মচারী এবং তাঁর পরিবার সিরাজের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই কাহিনী জানা যায় H.B. Hyde -এর Parochial Annals of Bengal গ্রন্থ থেকে। সেই কথাই বলছি।

ইংরেজদের সঙ্গে তখন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার ঝগড়া চলছিল। তারই পরিণতি-স্বরূপ ১৭৫৬ সনে সিরাজ কলকাতা জয় করেন। সে-সময়ে কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেব তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েশুদ্ধ বন্দী হন। তাঁরা বিশেষত সিরাজের মা আমিনা বেগমের দয়ায় জীবনলাভ করেছিলেন। আর তাঁকে এ ব্যাপারে পুরোমাত্রায় সাহায্য করেছিলেন লুৎফউন্নিসা। আমিনা বেগম গোপনে ওয়াটস সাহেবের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিজের মহলের মধ্যে সাঁইত্রিশ দিন সযত্নে রেখেছিলেন। পরে লুৎফার সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের জলপথে চন্দননগরে ফরাসী গভর্নরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা যদি নবাবের কানে যেত তাহলে যে দুজনেরই দারুণ অনিষ্ট ঘটত তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ওয়াটস-পত্নী আর তাঁর সন্তানদের দুঃখে যে তাঁরা শুধু কাতর হয়েছিলেন, তা নয়। একদিন লুৎফা নবাবের কাছে ওয়াটস সাহেবের মুক্তিভিক্ষা চাইলেন। তিনি নবাবকে বললেন,—'কুঠিয়াল সাহেব তো আপনার প্রজা—আপনার সন্তান, সন্তানকে কেন ব্যথা দিচ্ছেন? বাংলা মুলুকের মালিকের পক্ষে একজন সামান্য ইংরেজ প্রজাকে বন্দী করে রাখা কখনো উচিত নয়।' তিনি নবাবের পায়ের তলায় পড়ে দয়াভিক্ষা করলেন। নবাব লুৎফার পরদুঃখ কাতরভাব দেখে স্মিতহাস্য ভরে বোঝালেন যে, ওয়াটসকে বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আটক করা হয়েছে [illegible]। লুৎফার অনুরোধে নবাবের মন গলে গেল [illegible]। অবশেষে তিনি ওয়াটসকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নিষ্পাপ, সোহাগী এবং কোমল প্রকৃতি লুৎফউন্নিসা তাঁর স্বামীর স্মৃতিকে চিরকাল লালন করে গেছেন। সিরাজের মৃত্যুর পর তাঁর কাছে যে কয়েকটি বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল সেগুলো তিনি নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একটা ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পাণিপ্রার্থীকে এই জবাব দিয়েছিলেন যে, যে-মানুষ চিরকাল হাতীর পিঠে চড়ে বেড়িয়েছে, সে আজ গাধার পিঠে চড়বে কি করে? এই তথ্য পাওয়া যায় [illegible] আলির 'মুজফফরনামা' গ্রন্থে।

লুৎফউন্নিসার শেষ জীবন কেটেছিল খুশবাগ কবরখানার তত্ত্বাবধান করে। এটি মুর্শিদাবাদে মতিঝিলের বিপরীতে ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে নবাব আলিবর্দী আর তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা পাশাপাশি শায়িত আছেন। লুৎফউন্নিসা প্রতি মাসে এখানকার 'কারী'বৃন্দ বা কোরাণ-পাঠকদের প্রতি-পালন এবং 'লঙ্গর' (দাতব্য রন্ধনশালা) ও সমাধি-সংক্রান্ত অন্যান্য খরচপত্র চালাবার জন্যে তিনশ পাঁচ টাকা করে পেতেন। তিনি তাঁর স্বামীর সমাধির কাছে বাস করতেন এবং সেখানে প্রার্থনাদি করার জন্যে মসজিদ ... যাজক বা 'মোল্লা'দের অনেক বছর ধরে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তিনি সবসময় ... কবরের মাটির ওপর ফুল ছড়িয়ে দিতেন আর এটা বলা হয়ে থাকে যে স্বামীর সমাধি পুজো করতে করতে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেন (নভেম্বর, ১৭৯০)। এভাবে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরেও তিনি চৌত্রিশ বছর টিঁকে ছিলেন আর খুশবাগে (সুখোদ্যান) তাঁরই পাশে সমাধিস্থ হন। সেই স্মৃতিচিহ্ন আজও বর্তমান আর লুৎফউন্নিসার অটল আনুগত্যের কথা পৌঁছে দেয় মানুষের অন্তরে।

ইতিহাসের এই করুণ অধ্যায় পেছনে রেখে গেছে একটি সুমহান সত্য। ... কোন অযোগ্য অক্ষম পুরুষের ওপর নারীর অপার করুণা, একনিষ্ঠ ... যুগে যুগে এই আদর্শ ছায়াবিস্তার করে মানুষের সমাজে। সিরাজ-লুৎফউন্নিসার কাহিনীও তার কোন ব্যতিক্রম নয়। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বরকে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেই একে একে ত্যাগ করে গেছেন তখন একমাত্র লুৎফউন্নিসাই সারাক্ষণ ছায়ার মত অনুসরণ করে শুধু অক্লেয়া জীবনেই নয়, স্বামীর কার্যেও তাঁর স্পর্শ লেগেছে। কোন ... তিনি বিভ্রান্ত হন নি, বিচলিত হন ... বরং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সি... প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের গীতি ন্যায়ের প... তাঁর অসামান্য অনুরাগ অটুট ...

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

॥ ১৭ ॥

সজল রাসবিহারীর মোড়ে নেমে একজন বৃদ্ধ লোককে ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। লোকটি বলল, 'চণ্ডী ঘোষ রোড? সে এখানে কোথায়। অনেক দূরে।'

সজল ট্রামের ঝুলন্ত যাত্রীদের দিকে করুণ চোখে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছান যাবে?'

লোকটি যেতে যেতে বলল, 'ত পৌঁছতে পারবেন। সোজা ট্রাম লাইন ধরে চলে যান। এই বয়সে হাঁটবেন না কেন? ...ই দেখুন না, সারাজীবন চাকরী করতে ...ায়ে গাড়ীতে গাড়ীতে থেকেছি। এখন ...কে হাঁটতে ইচ্ছা হয়। বুঝলেন না? ...রীরকে 'ফিট' রাখতে হলে হাঁটবেন মশায়, ...াঁটবেন।'

লাঠি ঠুকে ঠুকে লোকটি লেক-এর ...কে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। বোধহয় ...রীর 'ফিট' রাখতে।

ট্রাম লাইন ধরে সোজা চলতে শুরু ...বল সজল। বৃদ্ধের কথা শুনে তার হাসি ...াচ্ছিল। বয়স বেশি হলে মানুষ একটু ...শি কথা বলে।

দূর ছাই। 'লাইন জ্যাম' হয়ে গেছে।

সজল রাস্তার ধার দিয়ে এগাড়ীর গাড়ীর মাঝ দিয়ে কোনভাবে পেরিয়ে ...টা ফাঁকা জায়গায় এল।

ধীরে ধীরে হাঁটছিল সজল। গত দেড় ...সের মধ্যে তার জীবনে সত্যিই অনেক ...রিবর্তন এসেছে। রেণুদির এ মন্তব্যটা ...ই সত্য। অরুণার বাসায় সেই রাত্রির ...ার পর সজল মনে করে, তার বয়স ... বছর এগিয়ে গেছে। এক নতুন অভিজ্ঞতা—যেখানে আনন্দ, ভয় আছে, একটা ক্ষীণ অপরাধবোধও আছে। এই অভিজ্ঞতা, এই চিন্তা কাজের মাঝখানে তাকে বড় অন্যমনস্ক করে তোলে।

দিন সাতেক আগে, অফিস ছুটির সময় রেণুদি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সজল ভয় পেয়েছিল। রেণুদি চোখ মেলে বই পড়ার মত কি দেখছে তার মুখে। রেণুদি কি বুঝতে পারে? বিবাহিত জীবনের চোখে কি সব ধরা পড়ে যায়? সজল ওর দিকে তাকাতে পারছিল না।

রেণুদি হাসতে হাসতে বলল, 'কি হল তোমার বলত? এত গম্ভীর ত তোমাকে আগে দেখিনি।'

সজল সহজ হতে চেষ্টা করল। বলল, 'তবে কি হালকা দেখছিলেন?'

'না ভাই, সে কথা বলব না। তুমি গম্ভীর টাইপের ছেলে ঠিকই। কিন্তু আগে তবু কথাবার্তা বলতে। এখন একেবারে চুপচাপ। সব সময় কি যেন ভাব?'

'কই, কিছু ভাবি না ত!'

রেণুদি হেসে বলল, 'ও আমি বুঝতে পারি। বান্ধবীর কথা!'

সজল অবাক হবার ভান করে বলল, 'বান্ধবী? বান্ধবী কোথায় পাব?'

'কোথায় পেয়েছ, কেমনটি পেয়েছ সে সব কি করে বলব ভাই? তবে টেলিফোনে গলা ত বেশ ভালই লাগল।'

সজল ক্রমশঃ ঘাবড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু ঠিক ঘটনাটা জানার জন্য বলল, 'আমার টেলিফোন? কবে?'

'এই ত একটু আগে।'

'আমি কোথায় ছিলাম?'

'ক্যান্টিনে এক কাপ চা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলে। কি, আফশোস হচ্ছে? না, ভাই দুঃখ করো না। উনি কাল আবার ফোন করবেন। যেমন 'ইগার' দেখলাম, না করে যান না।'

সজল চুপ করে রইল। অরুণাই কি তবে ফোন করেছিল?

রেণুদি সজলের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছিল বোধহয়। হেসে বলল, 'নাও ভাই সই করে এই চিঠিটা রাখ। বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কি হবে! তারচেয়ে চলে যাও। দেখে দুঃখ মেটাও, কিন্তু চোখে দুঃখ মেটাতে যেও না। ওতে 'রিস্ক' আছে। ছেলেমানুষ তাই সাবধান করে দিলাম!'

সজল আরো ভয় পেয়ে গেল। এই ফাজিল রেণুদি কি অন্তর্যামী!

রেণুদি তাড়া দিল, 'সই কর তো বাপু। বাড়ী যেতে হবে না আমাকে?'

চিঠিটা খুলতে সজলের হাত কাঁপছিল। পড়তে গিয়ে, সব অর্থও বোঝা যাচ্ছিল না।

রেণুদি তখনও অপেক্ষা করছিল। বলল, 'তুমি মুখার্জী সাহেবের কনফিডেন-সিয়েল এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছ। আসতে না আসতেই প্রমোশন। আর আমাদের ত তোমাকে এখন 'স্যার' 'স্যার' বলতে হবে!'

সজলের খুব ভাল লাগছিল। সেদিনের খামের টাকার কথাটাও অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে রেণুদিকে একদিন বলেছিল সজল।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূরে এসে পড়েছে। দুটো রাস্তার মোড়ে এসে সজল

...কুল কেন ডেকেছে, সে ...কিছুটা আন্দাজ করতে ...সে ভাবছিল, এরপর যখন ... হবে তখন সজল কি

...রে আসি বলে বকুল ভেতরে ...একটু পরে ফিরে এল প্লেট ...াকও ফিরে এসেছেন।

...বাক হয়ে বলল, 'এত খাবার! ...কস নাকি?'

...প্লেটটা রাখতে রাখতে বলল, ...য় দেখলে? বিকেল বেলা ভাব- ...স থেকেই ত আসবে। তাই বসে ...টু খাবার তৈরী করলাম।'

...লের খেতে ইচ্ছে করছিল না। তাই ...এসব খাব না। তুমি এক কাপ চা ...দু।'

... ধমক দিয়ে উঠল, 'খাবে না

...লোকও বসলেন সঙ্গে।

...স যে আজ বিশেষ অতিথি, এ- ...টা বার বার কথাবার্তায়, আচরণে মনে ...রিয়ে দিচ্ছিল।

খাওয়ার সময় বকুল কথাটা পাড়ল। ...কোন ভূমিকা না করেই বলল, 'তোমার হাতে ত ফাইল। একটা কিছু করে দাও। চাকরী গেলে আমরা না খেয়ে মরব নাকি?'

এই মুহূর্তে ফাইলের কথা উঠবে সজল বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তবু বকুলের এই চালাকি সজল সহ্য করতে পারছিল না। তার ঘৃণা ধরে যাচ্ছিল। অথচ তার বাড়ীতে অতিথি হয়ে, এইভাবে প্রচুর লুচি মাংস এবং মিষ্টান্নের আয়োজনের মধ্যে, কিছু অপ্রিয় কথা বলা সজলের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছিল। তাছাড়া অরুণার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন থাকায়, পাছে বড় কিছু কথা বলে ফেলে, এই জন্য সজল আগে স্থির করে নিয়েছে, বকুলকে সে আঘাত করবে না।

এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সজল কখনও পড়েনি। শান্তভাবে সে বলল, 'দেখ বকুল, ফাইল গায়েব করে দেওয়া, ফাইলের গোপন কথা বলা, ফাইল পাল্টান এসব আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা কথা। মিঃ মুখার্জীকে আমি বলব, যাতে ওঁর চাকরিটা কোনভাবে থাকে। সেটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত 'রিকোয়েস্ট' হবে।'

বকুল কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ওতেই হবে, ওতেই হবে। মিঃ মুখার্জি ত মশায় আপনার হাতের মুঠোয়। অফিসে সকলে সেই কথা বলে।

সজল স্থির হয়ে বলল, 'ভুল বলে কিছুটা। আমি এপর্যন্ত কখনও ওঁকে কোন অন্যায় অনুরোধ করিনি। এবং করিনি বলেই উনি দু-একটা অনুরোধ আমার রেখেছেন শুধু।'

সজলের মনে হল, বকুল আশা করেছিল সজল এখনও অমৃতপুরের সেই সরল, নির্বোধ ছেলে। কাজেই কাজ হাসিল করা কঠিন নয়।

খাওয়া শেষ হলে, বকুল, সজলকে ঘরের আসবাবপত্র দেখাচ্ছিল। আর সজল দেখছিল, কোথাও একটা ভাল বইয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সারা ঘরে সেই ঘুষের টাকার একটা উদ্ধত অহংকার।

সজল চলে যাওয়ার জন্য বলল, 'কটা বাজে বলুন ত?'

বকুল বলল, 'ঘড়ি ত তোমার হাতে, দেখ না।'

সজল ঠাট্টা করে জামার হাতাটা তুলে দেখাল, ঘড়ি তার নাই।

বকুল সজলের মোটা সুন্দর কব্জির দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন, 'ঘড়ি কিনবেন? আমার চেনাশোনা একজন দোকানদার আছে। এখন ভালো ঘড়ি পাওয়াই দায়, মশায়?'

সজল হেসে বলল, 'ঘড়ি কিনব? টাকা কোথায়?'

'আহা-হা টাকার কথা কি আমি আপনাকে বলেছি?'

সজল কঠিন গলায় বলল, 'টাকা হলে আমি নিজেই কিনব।'

বকুল দরজার কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ যেতে হলে, বকুলের গায়ে লাগার সম্ভাবনা। তাই সজল অপেক্ষা করল একটু। ধীরে ধীরে বলল, 'আসি, এখন, বকুল।'

বকুল স্থির দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। কথাটা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। কেন যেন সজলের মনে হচ্ছিল, বকুল মোটেই সুখী নয়। বকুল ব্যর্থ হয়ে গেছে। বকুল পরাজিত। এইসব ঘরকন্না, স্বামী, সবখানেই তার অভিনয়ের হালকা প্রলেপ মাখানো। তার সঙ্গেও একদিন সে এমনি অভিনয় করেছিল!

বকুল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আবার কবে আসবে?'

'বলতে পারছি না?'

'বিয়ে করনি, নিশ্চয়ই।'

'না।'

'এখনও কবিতা লেখ?'

সজল বলল, 'লিখি, তবে কেউ ছাপে না।'

বকুল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব আস্তে আস্তে বলল, 'এবার এলে আমার জন্য দুটো পদ্মফুল নিয়ে আসতে পারবে?'

সজল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বকুলের গলাটা ভারি, সত্যিকারের কান্না-মেশানো, ভেজা চোখের পাতার মত আর্দ্র।

সজলের সকল ঔদ্ধত্য, সকল রুক্ষতা, প্রতিশোধের সকল ইচ্ছা, এই মুহূর্তে নম্র হয়ে আসছিল, নত হয়ে আসছিল।

কোন উত্তর না দিয়ে সে ধীরে ধীরে প্রায়-অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

(ক্রমশঃ)

ফজলি আম

বিজয়গোপাল বসু

মালদহ আমের দেশ। এখানকার মাটিতে আম যেমন ভাল হয়, বাঙ্গালার অন্য কোন যায়গায় তেমন ভাল আম হয় না। তাই মালদহের আমের খ্যাতি জগৎ জুড়ে। মালদহে নানান রকম আম জন্মে—রাজভোগ, রাণীভোগ, কিষাণভোগ, ফজলি প্রভৃতি। এদের ভেতর ফজলির নামটাই ছাপিয়ে উঠেছে অন্য সকল আমের ওপরে।

বাঙলা দেশ এককালে একটা পৃথক স্বাধীন রাজ্য ছিল। দিল্লীর সঙ্গে এর কোন সংশ্রবই ছিল না। তখন এর রাজধানী ছিল গৌড়। গৌড় নগরী মালদহের মধ্যেই ছিল। গৌড়ের সিংহাসনে বসে হিন্দুও রাজ্যশাসন ও প্রজা পালন করেছেন, মুসলমানও করেছেন। সম্রাট আকবর-এর সময় বাঙলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। সেই সঙ্গে গৌড়ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। মালদহে গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে।

প্রায় পাঁচশত বছরেরও ওপর হতে চলল, গৌড়ের পাঠান সুলতান হুসেন শাহ রাজত্ব করে গেছেন। তাঁর সময় বিহার প্রদেশের গাজিপুর জেলা থেকে রামতঙ্কার নামে একটা পশ্চিমা গৌড়ে এসে রাজসরকারে পাকের কাজ করত। তখন রাজকর্মচারীদের আদর ছিল, কদর ছিল এবং সম্মান ছিল সাধারণের কাছে। কাজে পয়সাও ছিল। তাই একটা কথা আছে—

যেমন তেমন চাকরি
ঘি-ভাত।

কিছুকাল চাকরি করবার পর রামতঙ্কার গৌড়ে একখানা ছোটোখাটো বাড়ি করতে পারে। ঐ সময় সে দেশ থেকে স্ত্রী কুমারি এবং বালবিধবা মেয়ে ফজলিকে নিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে একটুকরি আমও এনেছিল। রামতঙ্কারের আর কোন ছেলে বা মেয়ে ছিল না।

বাগান বিষয়ে রামতঙ্কারের রুচিও ছিল, জ্ঞানও ছিল। দেশ থেকে আনা আমগুলির আঁটিগুলি রোদে শুকিয়ে রাখে সে প্রথমটা। তারপর ভদ্রাসন সংলগ্ন যে ফাঁকা জায়গাটুকু ছিল, সেখানে কয়েক হাত লম্বা করে এবং হাত-দেড়েক খাই করে আঁটিগুলি পুঁতে দেয়।

হল হাপর। বর্ষার জলে মাটি ভিজে গিয়ে চারা গজিয়ে ওঠে। এক বৎসর পরে বর্ষাকালে রামতঙ্কার চারাগুলি তুলে বাড়ির চারপাশে লাগিয়ে দেয় এবং সেগুলির যত্ন করতে থাকে। চারার সংখ্যা মোট তেরোটা। পরিচর্যার গুণে চারাগুলি বেশ ঝোকালো হয়ে ওঠে। এর বছর দুই পরে সান্নিপাতিক বিকারে কুমারি মারা যায়। তার মাস-দুই পরে রামতঙ্কারেরও কাল হয় ঐ রোগে। ফজলি হল বাড়িখানার ওয়ারেশ। সে ছিল নিঃসন্তান। সন্তানের মমতা দিয়ে গাছগুলি পালন করত। পরিচর্যা কিরূপে করতে হয় তা সে তার বাপের কাছ থেকে শিখেছে। ক্রমে সেগুলি ডালপালা মেলতে থাকে। বছর পাঁচেক বয়সেই কয়েকটা গাছে কিছু কিছু বোল দেখা দেয়। প্রথম প্রথম এইরকমই হয়। আবার সব বোল থাকে না, কতক ঝরে যায়। ফজলির গাছের বোলের বেলায়ও সেই রকমই হলো। থেকে যাওয়া বোল সময় মত গুটি ধরে। গরমের তাপে কতক গুটি পড়ে যায়। ফজলি গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে যখনই সময় পায়। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষের দিকে ফজলি একদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় একটা আম তলায় পড়ে আছে। উল্লাসের সঙ্গে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে আনে। আমটা আকারে বেশ বড়। ওজনে এক সেরের বেশি হবে। ওপরের রঙটা হলদে হয়ে গেছে। গন্ধও তার চমৎকার। ফজলির সুপ্রভাত হল। ফজলি কিন্তু ধর্মপ্রাণ ছিল। গাছের প্রথম ফলটা দিয়ে এল ঠাকুরবাড়িতে ভোগের জন্য। পুজা শেষে ভোগের প্রসাদ উপস্থিত সকল ভক্তই পেয়ে থাকেন। ফজলির দেওয়া আমের ভোগ যাঁরা পেলেন তাঁরা প্রত্যেকেই আমের তারিফ করতে লাগলেন। মালদহের মাটিতে এমন সুন্দর আম আগে কখনও তো দেখা যায়নি। পুরুতঠাকুরের কাছে খোঁজ হল আমটি কার দেওয়া। আমের আঁটিটাও কেউ কেউ চাইলেন গাছ করবার জন্য। পুরুতঠাকুর তা দেননি, মন্দির সীমানায় লাগাবেন বলে। তবে তিনি বলে দেন যে ঐ আমটা ফজলির দেওয়া। তার কাছে গেলে আমের বিষয় ভালভাবে জানা যাবে।

তখন থেকে অনেকে আমের খোঁজে ফজলির বাড়িতে যেতে লাগলেন। ফজলি তাদের বলে দেয় যে, তার বাবা গাজিপুর থেকে আম এনেছিল। আম কোথাকার এবং তার নামই বা কি তা সে জানে না। গাছে ফলনও অনেক হয়েছে। কাঁচা আম ঝুলছিল। খাঁটি পাকা আমই অমৃত। এ থেকে আঁটি লাগ হয়। পাকবার বাড়ে। কাঁচা ফুল আর দিয়ে আচার বানায়। অপকার কিছু উপকার হয় না। নিজের গাছের আম চার-পাঁচটা করে ফজলি খেয়েছিল। বাকি সব খদ্দেররা কিনে নেয়। খাওয়া আমের আঁটিগুলি ফজলি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় গাছ করবার জন্য। ফজলির বাড়িতে আর গাছ লাগাবার জায়গা ছিল না। গাছ ঘন হলে ফলনও ভাল হয় না আবার আমের জাতও নষ্ট হয়।

পর বৎসর গাছগুলোও একটু বেশ বড় হলো, ডালপালাও বেশি হলো আমও অনেক ধরল। আগের বৎসর যেসব গাছে আম ধরেনি, সেবার সেগুলোতেও আম ধরে। ফজলির আমের কথা লোকের মুখে মুখে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। ভাল জিনিসের এরূপই হয়। লোকে আমের জন্য আগাম পয়সা দিয়ে যেতে লাগল। ফজলি বাজার বুঝে ফেলে। চারটের বেশি কারো কাছে বেচবে না স্থির করে। কারণ যে না পাবে সেই চটে যাবে। সকলেরই মন রাখবার ইচ্ছা তার। তার মনও যেমন বাড়তে লাগল তেমনি ... ও পোঁতা হতে লাগল অনেকেরই বাগানে। গাছ বড় এবং পুরোনো হতে থাকলে শিল্পীরা পয়সা দিয়ে ফজলির গাছে কলম বাঁধতে লাগল। যাদের টাকা-পয়সা আছে তারা ফজলির আমের আঁটির চারা দিয়ে কলমের চারা দিয়ে নতুন বাগান করতে থাকে। প্রথম প্রথম সাধারণ লোকে বলত ফজলির আম। তারপর রটে উঠে গিয়ে ফজলি আম নামে একটা স্বতন্ত্র জাতের আম মালদহের সম্পদ হয়ে পড়ে। ফজলির কিন্তু বাপের লাগানো সেই বারো-তেরোটা আম গাছ ছিল সংখ্যা বাড়েনি। বছরের পর বছর যেতে লাগল ফজলি আমের আমদানি হাটে-বাজারে বাড়তে লাগল। ব্যবসায়ীরা নানা জায়গা থেকে এসে মালদহের নানা রকমের বেশ আম কিনে নৌকা বোঝাই করত তাদের মধ্যে ফজলি আমও থাকত। এইভাবে ফজলির নাম মালদহের বাইরে যেতে থাকে।

যে আমের সঙ্গে ফজলির নাম জড়িয়ে আছে সে আমগাছের চারা তার বাপের লাগান। ফল ধরবার আগেই সে মারা যায় বলে গাছগুলি ফজলির হয়ে পড়ে। সেগুলির ফলও ফজলির হয়। ফজলি প্রথম আম নিজে না খেয়ে দিয়েছিল ঠাকুরের ভোগে। তাতেই লাভ হল দেবতার আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদেই ফজলির নাম অক্ষয় হয়ে আছে এই পৃথিবীতে।

মহাস্থানগড় থেকে পাওয়া পাঁথির মালা (বগুড়া)

সোনার বাঙলা

শিপ্রা আদিত্য
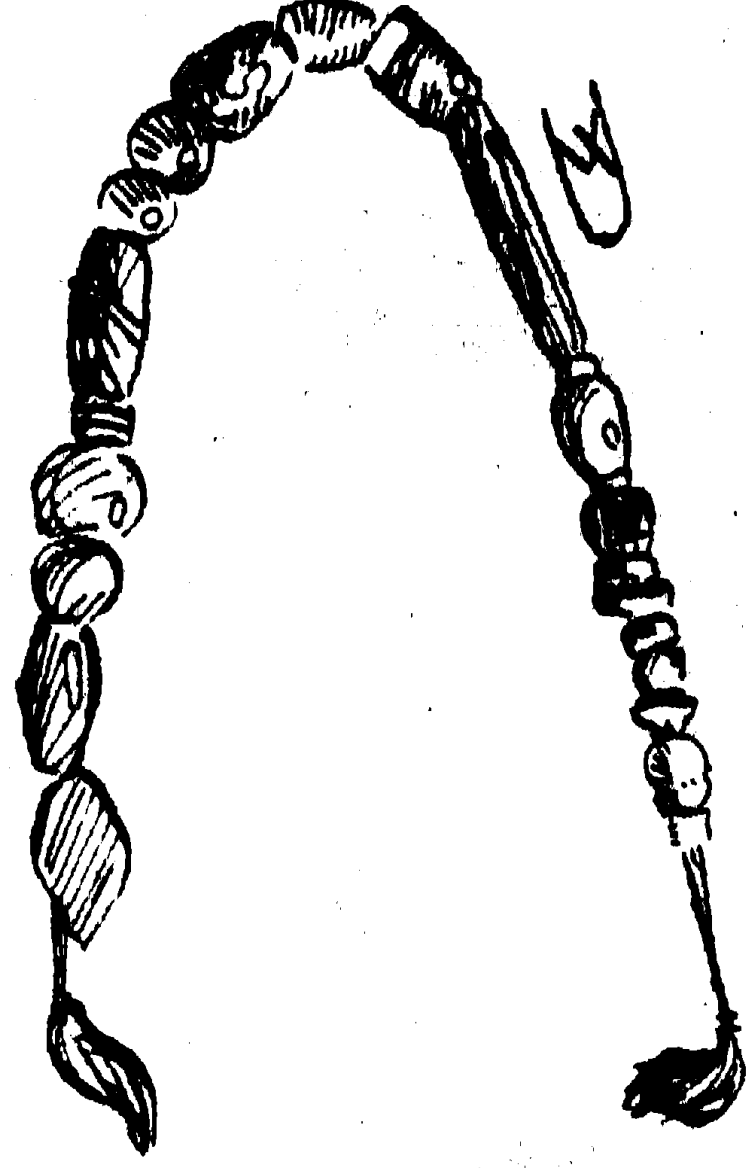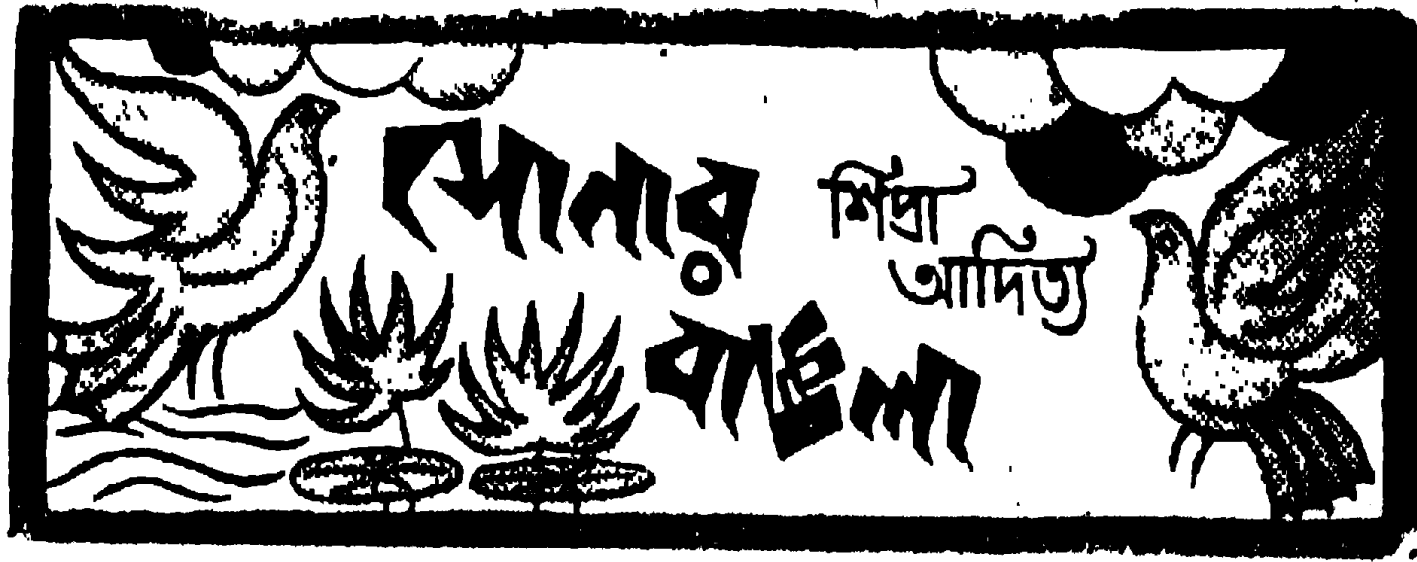
মহাস্থানের অন্তর্গত গোবিন্দ ভিটায় আবিষ্কৃত চন্ডীমূর্তির অংশ (বগুড়া)

মহাস্থান গড়

বগুড়া শহর থেকে সাত মাইল দূরে, করতোয়া নদীর পশ্চিমে প্রাচীন বাংলার রাজধানী মহাস্থান গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ঐতিহাসিকদের মতে মহাস্থান গড় প্রাচীন পুন্ড্র বা পৌন্ড্ররাজ্যের রাজধানী।

প্রাচীন মানচিত্রে মহাস্থান গড়ের নাম 'মস্তানগড়' ছিল। মহাস্থান—নামকরণে স্কন্ধপুরাণে এক সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যার জন্য শাস্ত্রানুসারে, তপস্যার উপযুক্ত স্থান খুঁজে পান করতোয়া নদীতীরে। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেই তিনি জায়গাটির নাম দেন মহান + স্থান = মহাস্থান।

বগুড়া থেকে মহাস্থানে মোটর বা স্কুটারেই যাওয়া যায়। আগে গরুরগাড়ী, ঘোড়ারগাড়ী এবং এক্কায় যাওয়া যেত। সুখানপুকুর স্টেশন থেকেও মহাস্থানে যাওয়া যায়।

উত্তরকালে যখন এই স্থান পুণ্ড্র-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তখন এটি পুণ্ড্র-নগর, পুণ্ড্রবর্ধন, পৌণ্ড্রবর্ধন নামেই জনপ্রিয় ছিল। এই পুণ্ড্রবর্ধন একসময় ছিল অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী। সম্প্রতি মহাস্থানে আবিষ্কৃত মৌর্যযুগের এক শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটির শাসনকর্তাকে 'মহামাত্য' বলা হত। ৬৪০ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান চোয়াং কামরূপ হয়ে পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন। তার বিবরণ থেকে জানা যায় যে—'তৎকালে করতোয়া অতি প্রবাহমান নদী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরো জানা গেছে যে—পুণ্ডবর্ধন থেকে ৯০০ লী (অর্থাৎ ১৫০ মাইল) উত্তর-পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। য়ুয়ান চোয়াং এখানে কুড়িটি বৌদ্ধ-সংঘারাম, একশতটি হিন্দুমন্দির এবং ছয় হাজার বৌদ্ধশ্রমণকে দেখেছিলেন। তিনি বেশীর ভাগ সন্ন্যাসীদের দিগম্বর জৈন নিগন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় আরো জানা যায় এই নগরী এবং তার নাগরিকরা শিক্ষিত এবং বিত্তবান ছিল। নগরের সর্বত্র সুবৃহৎ অট্টালিকা, জলাশয়, ফুলের বাগান প্রভৃতি ছিল। অধিবাসীরা সাধারণত শৈব, বৈষ্ণব, স্কন্দ বা কার্তিকের উপাসক এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরুষরা টুপী ব্যবহার করতো, মেয়েরা কাঁধ অবধি ঢাকা এক ধরনের পোশাক পরতো। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দুধ-ঘি-দৈ প্রধান ছিল। সমীক্ষার রিপোর্টে জানা গেছে, সেখানের 'জনস্বাস্থ্য'ও ভাল ছিল, অসুখ ছিল না বললেই হয়। মন্দিরগুলোর মধ্যে বিষ্ণু এবং স্কন্দের মন্দিরই সবচেয়ে বড় ছিল। আরো জানা গেছে—বুদ্ধদেব ছাড়াও জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামীও ধর্মপ্রচারের জন্য পুণ্ডবর্ধন নগরে এসেছিলেন।'

প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থ থেকে জানা যায়—অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় পুণ্ডবর্ধনের ঐশ্বর্যের খ্যাতি এবং প্রশংসা শুনে পরখ করবার জন্য ছদ্মবেশে এই পুণ্ড্রবর্ধনে এসে হাজির হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তারপর পুণ্ড্ররাজ জয়ন্তর কন্যাকে বিয়ে করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। সে এক ঘটনা। জয়াপীড় তো ছদ্মবেশে রাজ্যময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর যা দেখছেন তাতেই মোহিত হয়ে যাচ্ছেন। একদিন স্কন্ধ মন্দিরে নাচ-গানের আসরে, জয়পীড় তো গিয়ে হাজির। প্রধান নর্তকী কমলার নাচ চলছে, আসর জমে উঠেছে, এক সময়ে সুন্দরী কমলার সঙ্গে জয়পীড়ের দৃষ্টি বিনিময়, তারপর কমলার আতিথ্যে বসবাস। দিন কয়েকের মধ্যে ঘটলো এক ঘটনা। রাজধানীর কাছে শুরু হল এক হিংস্র সিংহের উৎপাত। সাহসী লোকের অভাব—কে সিংহকে বধ করে? চার দিকেই আতঙ্ক। খবরটা শোনা-মাত্র জয়াপীড় তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর সিংহ বধ। পরদিন মৃত সিংহের গায়ে বেঁধানো তীরে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের নাম দেখে রাজ্যের লোক জয়াপীড়কে

মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত কয়েকটি মৃৎপাত্র (বগুড়া)

খুঁজে বেড়াতে লাগলো, অবশেষে একদিন কমলার বাড়ীতে জয়পীড়ের সন্ধান পেয়ে পৌণ্ডরাজ জয়ন্ত তাঁর সুন্দরী কন্যা কল্যাণ দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। পরিশেষে জয়পীড়ের দু-দুটি পত্নীসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ঘটে।

আরেক ঘটনা আছে—শাহ সুলতান হজরত আউলিয়া নামে বাল্ক প্রদেশের (বাহলীক) জনৈক মুসলমান সাধু মহাস্থানের রাজা পরশুরামকে যুদ্ধে হারিয়ে এটি অধিকার করেন। তার আগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্তই মহাস্থান হিন্দু রাজাদের পরিচালিত ছিল বা শাসিত ছিল। আরো শোনা যায় শাহ সুলতান প্রসঙ্গে যে, তিনি নাকি এক বিরাট মাছের পিঠে করে করতোয়া নদী পারাপার করতেন, লোকে বলত 'মাহী-সাওয়ার' বা মৎস্যারোহী। রাজা পরশুরামও তন্ত্রসিদ্ধ অদ্ভূত ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। তিনি নাকি জীয়ৎকুণ্ডু নামে এক মন্ত্রপূত কুয়ার জলে তাঁর মৃত সৈন্যদের একবার পুনর্জীবন দিয়েছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য শাহ-সুলতানও অদ্ভুত ক্ষমতাবলে বাজ-পাখির রূপ নিয়ে আকাশ পথে গো-মাংস ছড়াতে ছড়াতে জীয়ত কুণ্ডের পবিত্র জল নষ্ট করে দেন। অবশেষে তিনি হার মানলেন শুধু নয়। মারাও গেলেন। পরশুরামের সুন্দরী কন্যা শীলাদেবী বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য কঙ্কন ছুঁড়ে মারলে শাহ-সুলতান ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে শীলা দেবী করতোয়ার জলে ডুবে মারা যান। সে জলাশয়টি আজও 'শীলা দেবীর ঘাট' নামে বিখ্যাত। অনেকে এ ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলেই মনে করেন, শীলা দেবীর আত্মবিসর্জনের করুণ ব্যথাতুর কাহিনী নিয়ে এক পশ্চিমী পর্যটক এইচ এস টেলর— Lay of Mahasthangarh নামে এক সুন্দর রচনা করে ফেলেন। অনেক দিন আগে মহাস্থানে শিলাদ্বীপ বা শিলদ্বীপের ঘাট অতি জনপ্রিয় ছিল।
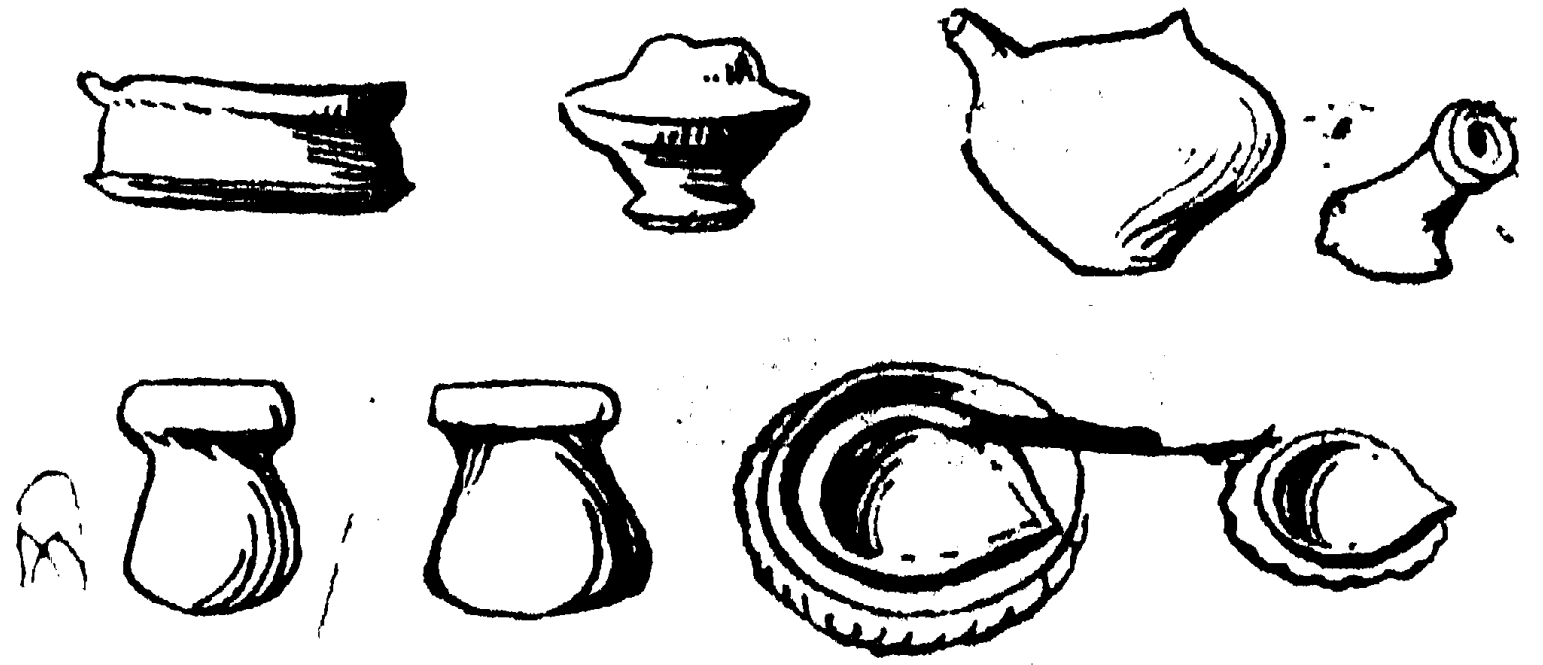
বিশাল জায়গা জুড়ে মহাস্থানের বিস্তৃতি। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪৫০০ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০০ ফুট, জমি থেকে উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাই মহাস্থানের ভগ্নাবশেষ। মহাস্থানের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে প্রাচীন দুর্গটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটির পূব দিকের প্রাকার এখনও অনেক অংশে অক্ষত অবস্থায় আছে। দক্ষিণ-পূবে ধাপ-ধাপ ইঁটের সিঁড়ি পেরিয়ে মহাস্থান বিজয়ী পীর শাহ সুলতানের দরগা বা সমাধি। অনেকের অনুমান এটি বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দির ভেঙ্গেই তৈরী। প্রমাণ স্বরূপ দেখা গেছে দরগাটির চৌকাঠে (পাথরে তৈরী) খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত পরিষ্কার বাংলায় লেখা 'শ্রীনরসিংহ দাসস্য'। এই নরসিংহ দাস কে ছিলেন বা কি বৃত্তান্ত তাও জানা যায় নি। অনেকের অনুমান শিল্পীর নামই নরসিংহ দাস। এই দরগাটির কাছে সম্পূর্ণ ইঁট দিয়ে তৈরী এক ছোট মসজিদ আছে, মসজিদটি মোঘল বাদশা ফর-রুখ-শিয়রের রাজত্বকালে ১৭১২ খৃঃ সামনের জমিতে (উঠোনে) ছোট বড় বেশ কিছু কবর আছে। দরগার প্রবেশ দ্বারের কাছে পুরোহিতের বসবার উপযুক্ত দুটি আসন বা বেদী দেখা যায়।

দরগার পেছনে এক বড় ইঁদারা আছে লোকে এটিকে বলে থাকে পরশুরামের জীয়ত কুণ্ডু। প্রাচীন দুর্গের প্রকাণ্ড প্রাকারটি করতোয়া নদীর তিন দিকে পরিবেষ্টিত। প্রাকারটি মাটি এবং ইঁট দিয়েই গাঁথা। চিহ্নগুলি এখনও সুস্পষ্ট। করতোয়ার তিন দিকে তিনটি খাল যেমন—বারাণসী খাল, গিলাতলা খাল, কালীদহ সাগর নামেই পরিচিত। কালীদহ সাগর মহাস্থানের উত্তর দিকের এক বিল বিশেষ। বর্তমানে দুর্গের পূব দিকে দোয়ার সাহেব দরজা এবং শীলা দেবী ঘাটের দরজা, উত্তরে ঘাঘর দরজা, পশ্চিমে তাম্র দরজা ছাড়াও নামহীন আরো একটি দরজা দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরের দরজা থেকে 'সনাতন সাহেবের গলি' নামে এক চওড়া বাঁধান রাস্তা গড়ের মধ্য দিয়ে গোবিন্দের দ্বীপ পর্যন্ত গিয়েছে। দুর্গের মধ্যে শাহ-সুলতানের দরগার কাছে 'খোদার পাথর' এবং 'মানকালীর কুণ্ডু' নামে আলাদা আলাদা দুটি স্তূপ আছে। এখানে এক সময় দুটি মন্দির ছিল বলে অনুমান করা হয়। এখনও এই স্তূপটির চারপাশে ইতস্তত ইঁট এবং মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। খোদার পাথর নামের প্রস্তর খণ্ডটি যে এক সময় কোন দেব মন্দিরের চৌকাঠ ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। প্রস্তর খণ্ডটির গায়ে ধ্যানী চার বৌদ্ধ মূর্তি এবং এক ভক্তের ছবি খোদিত। প্রস্তর খণ্ডটি লম্বায় এগার ফুট এবং চওড়ায় তিন ফুট। এছাড়া ওখান থেকে আরো কিছু অলংকৃত পাথরের মেঝেও (সম্ভবত কোন মন্দিরের) পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিত মহলের ধারণা—এটি একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

উত্তর দিকের পথ সনাতন সাহেবের গলি দিয়ে কিছুটা এগুলেই বৈরাগীর ভিটা ও গোবিন্দের ভিটা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খোঁড়াখুঁড়ির ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন মন্দিরের ভিতসহ কয়েকটি ঘর, দেয়ালের ইঁটে—পাহাড়পুরের মতই সুন্দর। বিভিন্ন দেবদেবী, জীবজন্তু, লতাপাতার কারুকার্য দেখা যায়। 'গোবিন্দের ভিটা' নামের স্তূপটির প্রাচীন নাম গোবিন্দ দ্বীপ। এক সময় এটি করতোয়া নদীর ঠিক উপরেই অবস্থিত ছিল। এখনও

মহাস্থানগড় থেকে পাওয়া কারুকার্যময় ইঁট (বগুড়া)।   পোড়ামাটির কাজ
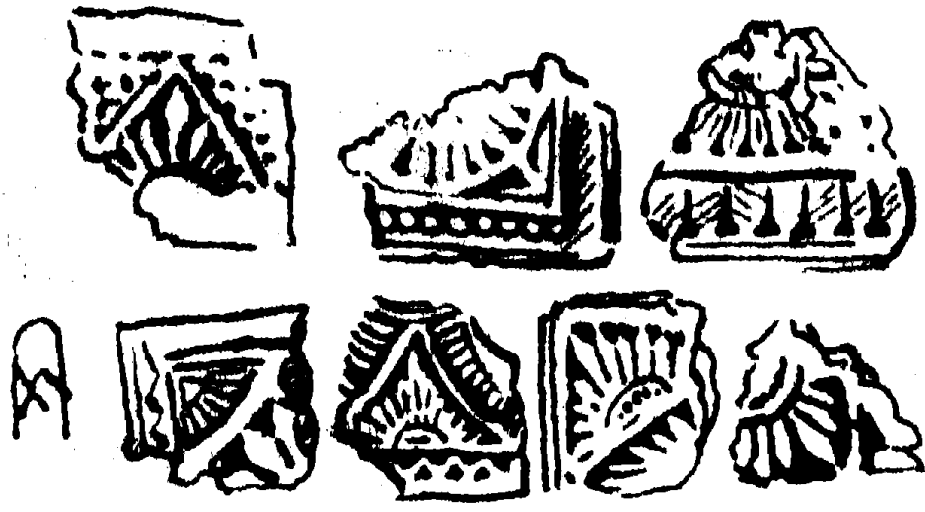
এর চার পাশের ঘাটের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। অনুমান এখানেই মহাস্থানের প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মন্দির এবং গোবিন্দ মন্দির ছিল। এর পাশ দিয়েই এক সরু খাল বয়ে গিয়ে করতোয়া নদীতে পড়তো। গোবিন্দ ভিটের কাছে এই ঘাটটি নানাবিধ কারণেই পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। এখনও প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে পুণ্যার্থীরা শীলা দেবীর ঘাট ও গোবিন্দ দ্বীপের ঘাট করতোয়ায় স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করে থাকে। প্রতি ১২ বছর অন্তর 'নারায়ণীর যোগ' হয় ও সময় তীর্থযাত্রীর দল বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে এসে জড়ো হয় অনেকটা আমাদের 'কুম্ভমেলার' মতই।

মহাস্থান দুর্গের পশ্চিমে তাম্র দরজা দিয়েই রাজা পরশুরামের প্রাসাদ এবং সভা-বাটি। এখানেও খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বহু গৃহ ভিত্তি, প্রাচীর ও অনেক ঘর আবিষ্কৃত হয়েছে। এখান থেকে এক রাস্তা মথুরা এবং ভাসুবিহারের দিকে চলে গেছে। সুবিখ্যাত কাব্য-রচয়িতা 'রামচরিত' লেখক কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এই মহাস্থানেরই অধিবাসী ছিলেন। মহাস্থানের কাছেই ব্রাহ্মণপাড়ায় ১৮৬২ খৃঃ গুপ্তযুগের কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। পালরাজ কর্মচারীদের অর্থাৎ নন্দীদের এক শিলা-লেখের ভগ্নাংশও এখান থেকে পাওয়া গেছে।

মহাস্থান থেকে চার মাইল পশ্চিমে—বিহার গ্রামে ভাসোয়া বিহার বা ভাসুবিহার গ্রামে পুরানো বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে পর্যটক হুয়েন-চোয়াং যখন পুণ্ড্রবর্ধনে আসেন, তিনি দেখেছিলেন — সুউচ্চ মিনারাবিশিষ্ট এক বৌদ্ধবিহার। এই সংঘারামে মহাযান সম্প্রদায়ের ৭০০ ভিক্ষু এবং বহু শ্রমণ এখান থেকে পড়াশুনা করতো। তাঁর দেখা--সংঘারামটির কাছে মহারাজা অশোক নির্মিত এক স্তূপ। এই স্তূপটির কাছেই এক সময় তথাগত তিন মাস অবস্থান করে ধর্ম বিষয়ক আলোচনা করেন। এই স্তূপটির কিছু দূরেই আছে 'অবলোকিতেশ্বরের মন্দির'। এক সময় এখানে দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রীরা প্রার্থনা করতে আসতো। সে সময় ভাসুবিহার বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার খ্যাতি সারা ভারতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই ভাসোয়াবিহার গ্রামে 'সুমঙ্গাদীঘি' নামে এক প্রাচীন দীঘি আছে। প্রবাদ আছে—রাজা সুমঙ্গ এটির নির্মাতা। কে সুমঙ্গ তা এখনও জানা যায় নি। এখানেই মহারাজ বল্লাল সেনের গুরু অণিরুদ্ধ ভট্ট বিহার গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁর 'হাবলতা স্মৃতি সংগ্রহ' এখনও আছে।

মহাস্থানের কাছে 'গোকুল' নামে এক গ্রাম আছে। এখানেও আবিষ্কৃত হয়েছে প্রকান্ড এক ধ্বংসস্তূপ। এটিকে 'গোকুলের মেড়' বলে, এখানে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে পাওয়া গেছে ১৭০টি ঘর, পরস্পর লাগা-লাগিভাবে, অনেকটা মৌমাছির চাকের মতই খোপ-খোপ। স্তূপটি গোলাকার, স্তূপটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সাড়ে ৪ ফুট বিস্তৃত লম্বায় প্রায় ২৫ ফুটের মত, সোপানশ্রেণী বাইরের দিকে অবস্থিত। এই স্তূপটি এক সময় বৌদ্ধ দেবস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়। স্তূপটির দেওয়ালের টালিতে জীবজন্তু, লতাপাতা, মানুষ প্রভৃতির সুন্দর কারুকার্য দেখা যায়। অনুমান স্তূপটি সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত যুগে নির্মিত। এই স্তূপটির কাছা-কাছিই 'নেতা ধোপানীর পাট' নামে আরেকটি স্তূপ দেখা যায়। এখনও এই গ্রামে বহু গোপের বাস আছে।

মহাস্থান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে উত্তরে চাঁদনীয়া বা চাঁদমুয়া একটি পুরাতন স্থান। অনেক আগে এটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। অনেকের অনুমান এখানেই প্রাচীন চম্পানগর ছিল। এখানেই চাঁদ-সদাগর (মনসার ভাসান-খ্যাত) বাস করতেন। এই গ্রামটির দু-দিকে গৌরী এবং সোনারাই নামে দুটি নদীর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। সোনারাই নদীর মধ্যে উঁচু ঢিপি, অনেকের অনুমান এখানেই পদ্মা ও মনসার মন্দির ছিল। নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধের মত এক পাড় দেখা যায়। চাঁদনীয়া গ্রামের দক্ষিণে কালীদহ সাগর নামে এক প্রকান্ড বিল আছে।

মহাস্থান থেকে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে শালদহ গ্রামেও অনেক উঁচু ঢিপি, প্রস্তর খন্ড, লুপ্তপ্রায় প্রাচীন দীঘির চিহ্ন দেখা যায়। অনুমান ক্ষৌনীনায়ক ভীম এখানেরই অধিবাসী ছিলেন।

মহাস্থানের কাছে করতোয়া নদীতীরে আরোড়া গ্রামে 'রসকদম্ব' রচয়িতা কবি বল্লভের জন্মস্থান। বৈষ্ণবতত্ত্ব অবলম্বনে আদি, সত্ত্ব, বৈভব, হাস্য, প্রেম ও রস অবলম্বনে মোট ২২টি অধ্যায় নিয়ে রচিত। গ্রন্থটির রচনা সমাপ্তি ঘটে ১৫৯৯ খৃস্টাব্দে।

মহাস্থানের কাছের গ্রামগুলি গোকুল, বৃন্দাবন এবং মথুরা প্রভৃতি গ্রামের নাম ভ্রমণকারী মাত্রেরই বিস্ময় ঘটায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী পুন্ড্ররাজ বাসুদেব সব সময়ই এ সকল স্থানের এরূপ নামকরণ করেন।

চাঁদনীয়ার পাশে করতোয়া নদী তীরে শিবগঞ্জ মুসলমান যুগে এক সামরিক ঘাটিই ছিল না, বাণিজ্য বন্দরও বটে। শিব-গঞ্জ থানার অন্তর্গতই কীচক বন্দর। কথিত আছে মহাভারতের কীচক এখানেই বাস করতেন। মাইল ছয় দূরে রংপুর জেলায় গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত 'বিরাট নামক স্থানে বিরাট রাজের রাজবাড়ী ছিল। এখন এগুলির ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই নেই।

সেদিনের মহাযান বৌদ্ধরা ধর্ম ও শিক্ষার প্রচারকে সম্বল করে বাংলা-মগধ-নেপাল-তিব্বতে এক বিরাট ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। মাঝে মাঝে রাজা ও রাজ-ধানীর হাত বদল হত না তা নয়। কখনো হিন্দু কখনো মুসলমান। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতিরও লেনদেন বলতে গেলে মিলে-মিশে একাকার হয়েছিল। তন্ত্রকথা, বৌদ্ধ-কথার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় বাংলাভাষায় দোহা বা বৌদ্ধ গান চর্যাগীতি এবং বাউল সংগীত। দাতিনির্বিশেষে ফকির, দরবেশ, আউল, বাউলরা আজো সেই প্রবাহমান লোকসংস্কৃতিটিকে জিইয়ে রেখেছে।
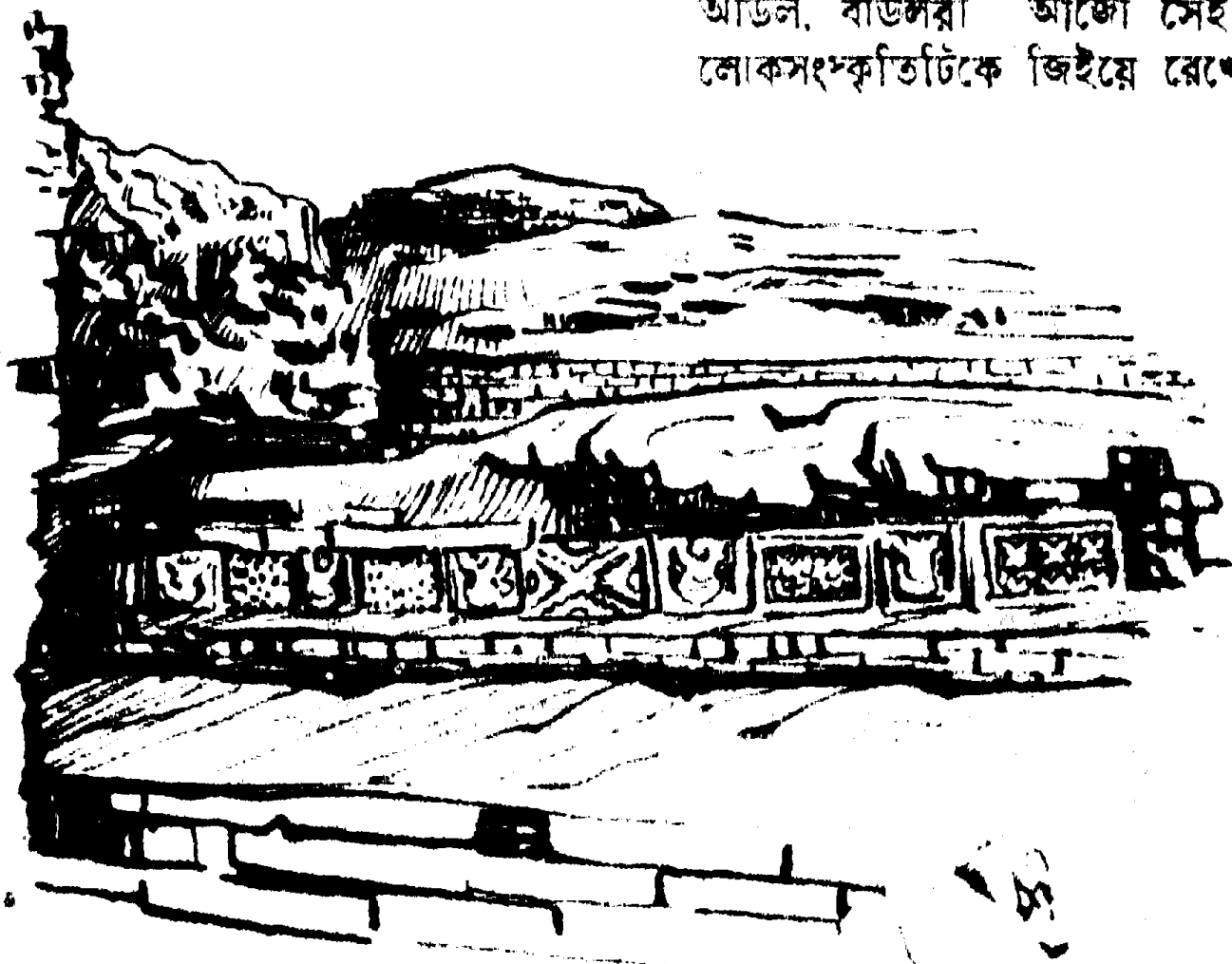
মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ (বগুড়া)

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু   সুহৃদ গোপাল দত্ত

জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের প্রারব্ধ কর্মজীবন

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম
কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।

গীতা—৪।২১

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেশবাসীর বিমূঢ়তায় নির্মাণমুক্তির ঋত্বিক বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ভারতের তথা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত অগণিত মানুষের কল্যাণে তাঁর তপোবল প্রয়োগ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা না গেলেও বিধাতার করুণায় অনেক অঘটন ঘটে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দিব্য-গতিতে প্রভাবিত করলো 'বিশ্বের বৃহত্তর শক্তিগোষ্ঠীর শুভবুদ্ধিকে এবং বিভ্রান্ত করল অসুর শক্তিতে বলীয়ান যুদ্ধোন্মত্ত জাতির কর্ণধারদের। শুভবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার ফলে রণনীতি পরিবর্তিত হলো এবং অসুর-শক্তির কর্ণধারদের বিভ্রান্তির ফলে লালসার বহ্নি তাদের বিচক্ষণতাকে তমসাবৃত করে দিল। এই প্রসঙ্গে দর্শনাচার্য শিশিরকুমার মিত্রের বিশ্লেষণ সর্বাঙ্গসুন্দর মনে হওয়ায় উল্লেখ করছি :

> What force worked in them? The leader of the people, the chosen instrument of the Divine, in one of his famous speeches on that occasion, had to admit—'I feel an unseen hand guiding me' The British king also expressed a similar experience in a thanks giving speech. The result? The tide of Hitler's uninterrupted victories, taken at its full flood, was now turned back on himself and his forces to the complete ruin of Nazism and to the decisive victory of the allied powers. So sure was Hitler of his victory over England that he had actually fixed August 15 as the day when he would celebrate it with a dinner at the Buckingham Palace. Little did the mad denizen of the underworld know that August 15 is God's day, the day of celebration of God's Truth, over which no dark Force could ever cast even a shadow. As regards Japan, when her intention to conquer India became clear, Sri Aurobindo directed his spiritual force against her and she too shared a similar fate'. (36)

প্রজ্ঞাসুন্দর শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-শক্তি সম্ভবত জার্মানীতে ক্ষাত্রতেজাধিপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেতনায় এনে দিয়েছিল অপূর্ব দূরদৃষ্টি। নেতাজী বুঝতে পারলেন অসুর-নাশিনী শক্তির হাতে অসুর-শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি জার্মান

> Admiral Canaric কে বললেন, 'You know as well as I do that Germany cannot win this war. But this time Victorious Britain will lose India'.

"......১৯৪৩ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি নেতাজী ও তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী আবিদ হাসান একটি জার্মান সাবমেরিনে গোপনে কিয়েল ত্যাগ করলেন......মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছলেন...সেখান থেকে ২৮শে এপ্রিল রবারের ডিঙিতে চড়ে তাঁরা গিয়ে উঠলেন জাপানী আই-২৯ নম্বর ডুবো জাহাজে। ভারত মহাসাগর পার হয়ে সুমাত্রার উত্তর প্রান্তে সবং থেকে কর্ণেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে বিমান পথে ১৩ই জুন পৌঁছুলেন টোকিও।...পরদিন জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ তোজোর সঙ্গে দেখা করলেন। প্রধানমন্ত্রী তোজো, নেতাজীকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিলেন। জাপানীদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় এলাকা অস্থায়ী সরকারের অধীনে আসবে বলে জানালেন তিনি। জাপ পার্লামেন্টে মিঃ তোজো ঘোষণা করলেন, 'ভারতীয় জনগণের শত্রু প্রভুত্বমদোদ্ধত অ্যাংলো-স্যাকসনদের দুঃসহ দর্প ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যে জাপান সকল রকমে সাহায্য করবার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছে'।......১৯৪৩ সনের ২৪শে জুন নেতাজী বেতার ভাষণে বললেন, ভারতের স্বাধীনতা লাভের আর দেরি নেই'।...২রা জুলাই এলেন সিঙ্গাপুরে।...২৫শে আগস্ট বললেন, '...স্বাধীনতা সকলেরই জন্মগত অধিকার। পৃথিবীতে আজ এমন আর কোনো শক্তি নেই, যে সেই অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে'।...৩১শে ডিসেম্বর পোর্টব্লেয়ারের স্বাধীনতা সহস্তে গ্রহণ করে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যথাক্রমে নাম দিলেন 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ......।
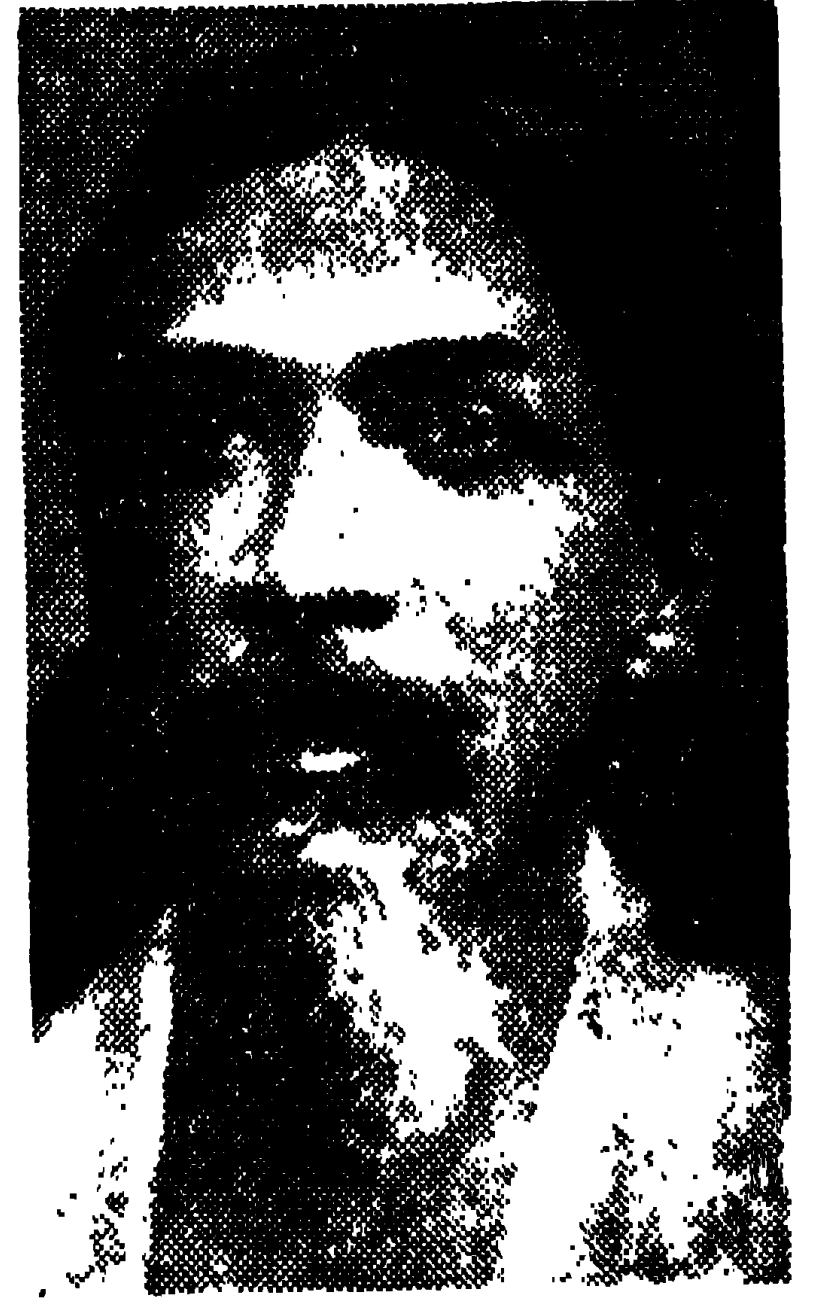
১৯৪৪ সনের ৪ঠা জানুয়ারি তাঁর সদর দপ্তর ও মন্ত্রিসভার প্রধানদের নিয়ে রেঙ্গুন পৌঁছুলেন। ভবিষ্যৎ রণনীতি

---

(36) S. K. Mitra : The Liberator Sri Aurobindo : India and the world. C 330.

নিয়ে জাপ প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে আলোচনার সময় নেতাজী কলকাতার অসামরিক অধিবাসীদের উপর বোমাবর্ষণের ঝুঁকি বাতিল করে দিলেন। নেতাজী চাইলেন আই-এন-এ-র স্বতন্ত্র বাহিনীকে এবং শক্তি পরীক্ষার উপযোগী রণক্ষেত্র। স্থির হলো আই-এন-এ স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করবে আর ভারতের যতটুকু জায়গা অধিকার হবে ততটুকু শাসনের ভার ছেড়ে দিতে হবে আই-এন-এ-র হাতে। অধিকৃত জায়গায় উড়বে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ভারতের স্বাধীনতার পতাকা।...তর্কার্জিত রণাঙ্গনে যাবার সময় নেতাজী বললেন, "......শত্রুপক্ষের ব্যূহ দীর্ণ করে আমরা আমাদের জয়ের পথ করে নেবো। আর যদি ভগবান চান যে আমরা মৃত্যুবরণ করে শহীদ হবো তবে আমাদের সৈন্যেরা যে-পথে দিল্লী যাবে মরণের কোলে শায়ে আমরা সেই পথ চুম্বন করবো। দিল্লী চলো।"...অসামান্য সাফল্যের খবর এসে গেল,...মার্চ মাসে মওডোকের পতন হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সেনাদের প্রথম পদচিহ্ন পড়লো ভারতের বুকে—সগৌরবে আকাশে উড়লো ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা—শত কণ্ঠে গাওয়া হলো জাতীয় সঙ্গীত। নেতাজী তাঁর ভাষণে বললেন, যতদিন না ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ একেবারে উৎখাত হয় ততদিন এ যুদ্ধ চলবে।'......মে মাসের শেষে আই-এন-এ-র সৈন্যেরা পৌঁছলো কোহিমায়।...কোহিমার উন্নত গিরিচূড়ায় উড়লো ভারতের স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা।...স্থানীয় নাগা সর্দারেরা বললেন...শত্রু ইংরেজকে চাই না, বন্ধু জাপানীও আমাদের কাম্য নয়......আমরা চাই সেই আমাদের একান্ত আপনার জন পরমাত্মীয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে।...৬ই জুলাই নেতাজী সৈন্যদের বললেন, 'রক্তদানই স্বাধীনতার উপযুক্ত মূল্য। আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।'.....

২৬শে জুলাই, বাস্তববাদী যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ মিঃ তোজো মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন। ...১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।...৪ঠা মে ইংরেজ রেঙ্গুন পুনরুদ্ধার করলো। নেতাজী বর্মা ছাড়লেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'বীরের মত পরাজয় মানো, পরম সম্মান ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যর্থতা বরণ কর। তোমাদের জীবনাদর্শ আত্মত্যাগের অপার্থিব মহিমায় উদ্ভূত—এর ক্ষয় নেই।'...৬ই আগস্ট অ্যাটম বোমা পড়ার ফলে সেই মাসের মাঝ-বরাবর জাপান বশ্যতা স্বীকার করলো। নেতাজী সাইগন থেকে একটি দু-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বোমারু বিমানে কয়েকজন জাপ অফিসারের সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন হয়ে চললেন টোকিও। ফরমোজার তাইহোকু বিমানবন্দরে ১৮ই আগস্ট নামলেন বেলা দুটোর সময়। সেখান থেকে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তাইহোকু ত্যাগ করলেন। তারপরের সঠিক সংবাদ আজও অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।...ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায়। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৪২ সনের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। তার আগে বিপ্লব আন্দোলনও ব্যর্থ হয়ে যায়। কংগ্রেস তখন দলাদলি, ঈর্ষা ও ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ, কর্মে মুমূর্ষু।...যুদ্ধে জিতলেও ইংরেজের শক্তি তখন অবনমিত সূর্যাস্তের মত।...

'১৯৪৫ সনের ২১শে আগস্ট ইংলণ্ডের সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে আর তার জন্য ভোট নির্বাচন শীতকালের মধ্যে শেষ করতে হবে।...সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী ভারতের বিভিন্ন দলের ঐক্য কামনা করে বেতার ভাষণ দিলেন।...ভোট নির্বা-নির্বাচনের আগে হিন্দু ও মুসলমান দুই দলই সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো।...আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বিচারের ব্যবস্থা করতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৫ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লাগলো। ...কংগ্রেস...শ্রীভুলাভাই দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি ডিফেন্স কমিটি গড়ে তুললো।...বিচারে শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হলো।...ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল অকিনলেকের চেষ্টায় এঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মকুব হলো। ...এটাই হয়ে দাঁড়ালো কংগ্রেসের পক্ষে মোক্ষম রাজ-নৈতিক অস্ত্র, আর, এ-অস্ত্র কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে দিল। ইতিমধ্যে নির্বাচনের ফলে দেখা গেল কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে জয়লাভ করেছে...কেবল-মাত্র বাংলা ও সিন্ধুতে হয়েছে মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য।

'১৯৪৬ সালের ২৮শে জানুয়ারী বড়লাট ঘোষণা করলেন যে, তিনি নতুন কর্মসংসদ স্থির করবেন আর শীঘ্র গড়ে তুলবেন একটি সংবিধান রচনাকারী প্রতিষ্ঠান।...পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের আগমনে মিঃ জিন্না পাকিস্তানের দাবি তুলে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে, পাকিস্তান বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের অধীনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের তাঁবেদার হয়েই থাকবে।...স্থির হলো সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালীন সরকারে দেশের শাসন পরিচালনা করবেন।...বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারত বিভাগের পক্ষপাতী না হলেও মিঃ জিন্নার প্রস্তাবমত বললেন যে, মধ্যবর্তী-কালীন সরকারে বারোজন সদস্য থাকবেন, কংগ্রেস ৫, লীগ ৫, শিখ ১ এবং দেশী খৃষ্টান ১।...বড়লাটের মুসলিমদের প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্বের নিদর্শনের লিখিত প্রমাণ পেয়ে ২৫শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিলেন।...১৯৪৬ সনের ৬ই জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান (কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট) গ্রহণযোগ্য বলে প্রস্তাব গৃহীত হলো। ...মিঃ জিন্না একরকম নিরুপায় হয়েই

বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান স্বীকার করেছিলেন।...২৯শে জুলাই মিঃ জিন্না (কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্যের ভিত্তিতে) বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে পাস করালেন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যানের প্রস্তাব। ধার্য হলো ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন।...এমনি করেই পাকিস্তান সৃষ্টির উপক্রমণিকা রচিত হলো।

'১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু হলো।...অনেক জীবন পড়লো বলি, সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে গেল বহু হিন্দু নারীর। আরম্ভ হয়ে গেল হিংসার অন্তহীন উন্মত্ততা—আর্ত নরনারীর মর্মন্তুদ হাহাকার উঠলো অভ্র ভেদ করে। ...ইংরেজ গভর্নর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন।...তিন দিনে ৬০০০ লোক নিহত, ২০,০০০ আহত ও প্রায় এক লক্ষ লোক গৃহহীন হলো বাংলায়।...মৌলানা আজাদ বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে অবস্থা জানালেন। তিনি শুনলেন সব, বুঝলেন সব, তবুও তখনকার মত কাজে থাকলেন নিষ্ক্রিয়। বাংলার রাজধানী নরকে পরিণত হলো।...বড়লাট কলকাতায় এলেন...দেখেশুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন... ২৭শে আগস্ট দিল্লী ফিরে গিয়ে গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরুকে ডাকলেন।...মধ্যবর্তীকালীন সরকারের সদস্যদের ২রা সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হলো। মধ্যবর্তীকালীন সরকার কিছুদিন জোড়াতালি দিয়ে চলবার পর ১৯৪৬ সনের অক্টোবরের মাঝামাঝি নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিন্দুদের উপর আবার লীগ গভর্নমেন্টের সুপরিকল্পিত অত্যাচার আরম্ভ হয়ে গেল।...কংগ্রেস কিছু করতে পারলে না।...লর্ড ওয়াভেল কোন কথাই বললেন...। গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে সফর করলেন...মানুষের বেদনার বহ্নিশিখায় তিনি দিতে চাইলেন অমৃত প্রলেপ।...

'১৯৪৮ সনের ২রা মার্চ তিনি চার মাস সফর শেষ করে ফিরে এলেন।...আবার অশান্তি আরম্ভ হলো...ঐক্যের আবেদন বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে ওয়াভেল চলে গেছেন। ১৯৪৭ সনের ২৭শে মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কাজের লোক। তিনি ৩১শে মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করলেন। গান্ধীজী ঠিকই বুঝেছিলেন যে, বড়লাট ভারত বিভাগের পক্ষপাতী।... কংগ্রেসের সেই চরম দুর্দিনে তিনি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এমন কথা বললেন, যা সারা ভারত তার প্রকৃত অর্থ না বুঝে, বিস্ময়ে চমকে উঠলো। তিনি ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে বললেন, 'মিস্টার জিন্নার হাতে গভর্নমেন্ট গঠনের ভার দেওয়া হোক। তিনি ইচ্ছা করলে সবকয়জন মুসলমান বা কিছু হিন্দু কিছু মুসলমান মন্ত্রিসভায় নিতে পারবেন—তার বড়লাটের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।'...তারপর বড়লাট মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলাপ করলেন। বুঝলেন গান্ধীজীর মতই মিঃ জিন্না কঠিন লোক। বড়লাট সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করলেন। সর্দার প্যাটেল স্বীকার করলেন যে, পাঞ্জাব ভাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।...পণ্ডিত নেহরু প্রথম থেকেই দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন—সর্দার প্যাটেলের অনুরোধে পণ্ডিত নেহরু শেষপর্যন্ত গান্ধীজীর সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ না করে দেশ বিভাগে সম্মতি দিয়েছিলেন।...গান্ধীজী বললেন, 'যতক্ষণ আমি জীবিত ততক্ষণ আমি কিছুতেই সম্মতি দেবো না—যদি পারি ত কংগ্রেসকেও দিতে দেবো না।'...গান্ধীজী প্রতিদিন তাঁর প্রার্থনাসভায় দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন।...

'১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুন বড়লাট গান্ধীজীকে তাঁর প্রার্থনাসভায় যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করলেন।...সেদিন থেকে প্রার্থনাসভার সুর বইতে লাগল অন্য খাতে। তিনি বললেন, '...আমরা হিন্দু-মুসলমান একমত হতে না পারি ত বড়লাটের অন্য কোনো উপায়

নেই।'...গোপনে যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে দেশের লোক তা মোটেই জানতো না। তাদের ধারণা যে, কংগ্রেস তার আদর্শ থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হবে না এবং দেশ বিভাগের পক্ষে কিছুতেই মত দেবে না—গান্ধীজী ত নয়ই।...সংহতি রক্ষা তাঁদের গেল সর্বনাশের অতলে। তাঁরা বাধ্য হয়ে করে বসলেন সংহতি সংহারের এক দুঃসাহসিক সূচনা। সেদিনের নেতারা গোপনে ভারত বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হলেন।...গান্ধীজীও কোনো প্রতিবাদ করলেন না।...খান আবদুল গাফফার খান সীমান্ত গান্ধী কোনো ভরসা পেলেন না।...মিঃ জিন্না তাঁর আকাঙ্খিত পাকিস্তান, দ্বিজাতিতত্ত্ব ও আলাদা দাবি প্রতিষ্ঠিত করে জয় করলেন মুসলমানদের হৃদয়-সিংহাসন। কংগ্রেস দেশ বিভাগে সম্মত আছে জেনে মিঃ জিন্না পাঞ্জাব ও বাংলার সবটাই পাকিস্তানের জন্য চেয়ে বসলেন। ...সেদিন হিন্দু মহাসভা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু (নেতাজীর অগ্রজ) চেষ্টা না করলে হয়ত সমগ্র পাঞ্জাব ও বাংলা বা তার অধিকাংশ অংশটাই পাকিস্তানে চলে যেত।...শেষ-পর্যন্ত পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা ভারতে এল।...

'১৯৪৭ সনের ৪ঠা জুলাই ভারতের স্বাধীনতা বিল হাউস অফ কমন্সে উত্থাপিত হলো।...১৮ই জুলাই সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে ১৯৪৭ সনের ভারতের স্বাধীনতা আইন বলবৎ হয়ে গেল।...ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে বড়লাট জানিয়েছিলেন যে, তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব শেষ করবেন।...দেশ বিভাগ মেনে নেবার পর দেখা দিল দু-দেশের সীমারেখা নির্ধারণ কমিটির সভাপতি হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের (বর্তমানে লর্ড র‍্যাডক্লিফ) নাম প্রস্তাব করলেন।...তিনি ১৯৪৭ সনের ৮ই জুলাই দিল্লী এলেন।... সেদিন সন্ধ্যায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বুঝলেন, দেশ বিভাগ হলে কি করতে হবে এবং দেশকে বাঁচাতে গেলে কি কি প্রয়োজন তার কোন সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা এদেশের নেতাদের নেই। এঁদের কাছে কর্তৃত্বই বড়, দেশ বা দেশবাসীর সুখ-সুবিধা নগণ্য।...তিনি কাজ শেষ করে ১৫ই আগস্ট ইংলণ্ড রওনা হলেন—পরে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'অদ্ভুত দেশের লোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন—

'Strange chaps. Just didn't do their home work'.

ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্ত কলুষিত বীভৎসতার মধ্যে ১৫ আগস্ট হলো ভারতের স্বাধীনতার সূর্যোদয়। যুদ্ধোত্তর যুগের সভ্যতাভিমানী ইংরেজের কলঙ্ক-পসরা মাথায় নিয়ে রয়ে গেল খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ। নির্বিকার মহাকাল শুধু চেয়ে রইল অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

...অহল্যার মত—শাপমোচনের নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।'(৩৫)।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ত্রিকালজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দ বললেন, আঞ্চলিক ব্যবচ্ছেদে বিভক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ড বাইরের এবং ভিতরের বহু বিপদের মুখে পড়ে রইল। তাঁর তপোবন অখণ্ড ভারতের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত থাকবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তাঁর সংকল্প

in a great and united future as the destiny of this nation and its people" সাধিত হচ্ছে এবং যতদিন না "a free and united India is there and the Mother gathers around her her sons and welds them into a single national strength in the life of a great and united people". (37)

বিশ্বের প্রয়োজনে সমগ্র মানবজাতির কর্ণধার হিসাবে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে অভ্যুত্থানের বাণী শোনালেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে আগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় সেই বাণী প্রকাশিত হলো। দেশবাসী জেনে আশ্বস্ত হলো যে, 'স্বীয় বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি ব্যতিরেকে ভারত জেগে উঠেছে—পরস্বাপহরণ না করে অথচ জাতীয় সম্প্রসারণ, শক্তি, সমৃদ্ধি এবং প্রাধান্য বজায় রেখে—ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা পাবে তার অধ্যাত্ম সম্পদ নিয়ে, বিশ্বের প্রয়োজনে সমগ্র মানবজাতির কর্ণধার হিসাবে'। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'ভারত সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্যের জয়মাল্য অর্জন করবার জন্য সাধনা করছে এবং যতদিন না অখণ্ড ভারত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন ধরে করছে কারণ ভারতবর্ষের সত্তারূপ অবিভাজ্য।' ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শুভ লগ্নে সত্যদ্রষ্টা পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন :

'১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এই দিন ভারতের ইতিহাসে একটি বিগত যুগের অবসান এবং একটি নতুন যুগের সূচনা চিহ্নিত করে। কেবল আমাদের কাছে নয়, সারা এশিয়া তথা বিশ্বের কাছে এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই দিনটিতে অব্যক্ত সম্ভাবনায় ভরা এমনি একটি শক্তি বিশ্বের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হোলো যাহা মানব-সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করবে। এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিনটি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবেও স্মরণীয়, কারণ ১৫ই আগস্ট আমার জন্মদিন, যারা আমার দর্শনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে, তারা বৎসরের এই দিনটি উৎসবের মাধ্যমে বিশেষভাবে পালন করে। আমার অধ্যাত্ম-চেতনায় এই দুটি ঘটনার একত্র সমাবেশ নিছক ঘটনাচক্র নয়, যে দৈবশক্তি আমার জীবনের গতি নির্দিষ্ট করেছিল, সেই শক্তির অমোঘ বিধানে এই সমাবেশ সংঘটিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্ন বা অবাস্তব মনে হলেও, আমার জীবদ্দশায় যে সমস্ত সার্বজনীন আন্দোলনগুলি সফল হবে বলে আশা করেছিলাম, আজ অনুভব করছি সেগুলি বাস্তবের স্পর্শ পেয়েছে অথবা সার্থক রূপায়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই পরমক্ষণে আমার বাণী আমন্ত্রণ পেয়েছে কিন্তু আমি কি বাণী শোনাব। তবে আমার শৈশবে এবং যৌবনে যে লক্ষ্য এবং আদর্শকে উপলব্ধি করেছি, আজ সেগুলি রূপায়ণের পথে অপেক্ষমান, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পটভূমিকায় সেগুলি প্রতিফলিত হবে, ঐ সমস্ত লক্ষ্য এবং আদর্শের মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মসংকল্পের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এই বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং বিকাশ ভারতকে বিশ্ব-নেতৃত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ, সব সময়েই আমার মনে হয়েছে, ভারত জেগে উঠছে স্বীয় বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি ব্যতিরেকে—পরস্বাপহরণ না করে অথচ জাতীয় সম্প্রসারণ, শক্তি, সমৃদ্ধি এবং প্রাধান্য বজায় রেখে—ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা পাবে তার অধ্যাত্ম সম্পদ নিয়ে বিশ্বের প্রয়োজনে সমগ্র মানবজাতির কর্ণধার হিসাবে।

অতীতের উপলব্ধি সেই লক্ষ্য এবং আদর্শ তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত :

একটি বিপ্লবের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা লাভ পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত এশিয়ার নবজাগরণ এবং মানব-সভ্যতার অগ্রগতির জয়যাত্রায় একটি বিরাট ভূমিকা-সহ ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মানবজীবনের একটি বৃহত্তর, উজ্জ্বল, মহিমময় অধ্যায়ের উন্মেষিত ভিত্তিতে গড়ে উঠবে একটি সার্বভৌম ঐক্য—ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জাতি তাদের স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে—একের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠবে বহুর প্রকাশ। অধ্যাত্ম-চেতনা এবং জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ-পদ্ধতি বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের অবদান হবে। এই অবদান, অভ্যুত্থানের একটি নতুন সোপান হিসাবে বিশ্বমানবের চেতনাকে উন্নততর স্তরে উন্নীত করে জীবনের যে সমস্যাগুলি মানবতাকে সংকটগ্রস্ত, বিপর্যস্ত করে তুলেছে, সেগুলির সমাধান করবে, ফলে মানুষের ধ্যানে, জ্ঞানে আত্মশুদ্ধি এবং সমাজ-শুদ্ধির চেতনা বা সৎ-চেতনার স্ফুরণ হবে।

(৩৫) গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। অবিস্মরণীয়। ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৬—২২১।

(37) Messages of Sri Aurobindo and the mother: P—11.

খণ্ডিত ভারত স্বাধীন হয়েছে কিন্তু অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা এখনো অসম্পূর্ণ। এক সময় প্রতীয়মান হয়েছিল বুঝিবা ভারতবর্ষের মাটিতে আবার প্রাক্-বৃটিশ যুগের মত—অন্তঃ রাজ্য কলহের সূচনা হবে। সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমান শুভ-লগ্নের উত্তরকাল ঐ কলহের পুনরাবৃত্তির পরিপন্থী হবে। সংসদীয় বিধানসভার বুদ্ধিপূর্ণ নীতির মাধ্যমে দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলিকে পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে রেখে সমাধান করা সম্ভব হবে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক সীমারেখায় বিভক্ত ভারতবর্ষের চিরন্তন জাতীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমানের সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িক বিরোধকে ক্রমশঃ সুদৃঢ় করে তুলছে। আশা করা যায় যে, কংগ্রেস এবং দেশবাসী এই দেশ-বিভাগকে চিরস্থায়ী হিসাবে গ্রহণ না করে একটি অস্থায়ী সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করবেন। কারণ, ইহা চিরস্থায়ী হলে ভারবতষর্ব শুধু দুর্বল নয়, পঙ্গু হয়ে পড়বে, গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা সব সময়েই থাকবে, এমনকি বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা বিদেশী শক্তির নিকট পরাজয়ের সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকবে।

সমবেত চেষ্টার নিয়ত চিন্তা এবং শান্তি ও সহাবস্থানের উন্নত-সম্পর্কের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা প্রশমিত করে খণ্ডিত ভারতের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে হবে। এই পথেই অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা মূর্ত হবে। লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই মুখ্যতঃ প্রয়োজন, সুতরাং মত বা পথের ব্যবহারিক মূল্য বিচার্য হলেও, এগুলির মৌলিক গুরুত্ব কিছুই নেই। যে-কোনো উপায়েই হোক, একটি ভূখণ্ডের এই চিত্রিত বিচ্ছেদ দূর হবেই হবে। কারণ, ইহার ব্যতিক্রম ঘটলে ভারত পথভ্রষ্ট হবে, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হবে। কিন্তু ইহা বিধিলিপি নয় বা হতে পারে না।

এশিয়ার জাগরণ হয়েছে এবং এই মহাদেশের অধিকাংশ আজ পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত এবং কিছু অংশে এখনো চলেছে স্বাধীনতার সংগ্রাম। কর্তব্যকর্মের অল্পই বাকী আছে এবং সেই কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগ যে মুহূর্তে আসবে সেই মুহূর্তেই শেষ করতে হবে। এই কর্তব্য সম্পাদনে ভারত বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে—বিপুল প্রাণশক্তি এবং সামর্থ্য নিয়ে সে তার পারদর্শিতার পরিচয় দেবে 'জাতি সংঘের' অন্যতম সদস্য হিসাবে।

মানব জাতির একাত্মবোধ স্ফুরণের পথে, যদিও ইহা একটি সংস্কার-সাপেক্ষ প্রস্তুতিমাত্র, সুসংবদ্ধ হলেও ইহা পর্বত-প্রমাণ বাধাবিপত্তির কবলিত। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, শক্তির স্ফুরণ হয়েছে, জোয়ার এসেছে। ইতিহাসের অতীত ঘটনা ইঙ্গিত দেয় শক্তি পুঞ্জীভূতা হবে—অভিষ্টসাধনে। এই আন্দোলনেও ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং যদি সে দিব্য-দৃষ্টি প্রভাবে ভবিষ্যৎ বুঝে, বর্তমান ঘটনাস্রোতে বিহ্বল না হয়ে, বৃহত্তর নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হয় তবেই তার স্বাবা শৈথিল্য এবং দৌর্বল্যকে সরিয়ে দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। হয়তো কোনো দুর্যোগ বা সংকট ঐ সম্ভাবনাকে ব্যাহত বা বিনষ্ট করতে পারে—তা করুক—কিন্তু এই জন্য অভিষ্টসাধন বিঘ্নিত হবে না। কারণ একাত্মবোধের আন্দোলন প্রাকৃতিক লীলার নিরবচ্ছিন্নতার পক্ষে প্রয়োজন, এই আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী, ইহার নিশ্চিত সাফল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎবাণী করা চলে। বিভিন্ন জাতির পক্ষে এই একাত্মবোধের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট কারণ ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে বৃহৎ এবং শক্তিশালী গোষ্ঠী নিরাপদ হতে পারে না। ভারতবর্ষ যদি সাম্প্রদায়িকতার চক্রান্তে খণ্ডিত থাকে তবে তার নিরাপত্তাও রাহুমুক্ত হবে না। সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের জনাই অখণ্ডতা প্রয়োজন। মানুষের নির্বুদ্ধিতা এবং স্বার্থান্ধতা কেবলমাত্র ইহার বিরোধিতা করতে পারে। বিধাতার অনভিপ্রেত কোনো পরিণতি ঘটাবার সম্ভাবনা থাকলেও প্রকৃতির প্রয়োজনে এবং দিব্য-ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অবাঞ্ছনীয় পরিণতি স্থায়ী হতে পারে না।

জাতীয়তাবাদ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু আন্তর্জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। এমন কি দুইটি বা ততোধিক নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করতে হবে যাহার মাধ্যমে ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ স্বাভাবিক উপায়ে সম্ভব হতে পারে। জাতীয়তাবাদের উগ্রতা হ্রাস পেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহাবস্থান সম্ভব হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে একাত্মবোধ জাগ্রত হবে।

ভারত ইতিমধ্যে তার আধ্যাত্মিক সম্পদ বিশ্বের সর্বত্র বিতরণ শুরু করেছে। আধ্যাত্মিক পথে সে ইউরোপ এবং আমেরিকার গভীরে প্রবেশ করেছে। এই আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। কালচক্রের অশান্ত ঘূর্ণিপাকে ক্লিষ্ট, নিপীড়িতের দল ক্রমশঃ ভারতের দিকে অনেক আশা নিয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে, কেবলমাত্র ভারতের দর্শন এবং দিব্য-বাণীর আশ্রয়ে নয়, তার মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার উপর ক্রমেই এদের আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অবশেষে, আমার ব্যক্তিগত আশা, ধারণা এবং আদর্শ অনুযায়ী ভারত এবং পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল মানুষ সংবদ্ধ হতে শুরু করেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এক্ষেত্রে অসুবিধা দুস্তর হলেও সেগুলিকে অতিক্রম করতে হবে এবং সেই 'পরাৎপর-ঈক্ষা' প্রভাবে ঐ সমস্ত অসুবিধা অতিক্রান্ত হবে। এক্ষেত্রেও, যদি অভ্যুদয় ঘটে আত্মিক এবং চৈতন্যময় কোষের স্ফুরণের ফলে—তবে সেই উদ্দীপনা আসবে ভারতবর্ষ থেকেই; যদিও এই সনাতন শক্তি কাহারো কুক্ষিগত নয় তবুও এই আন্দোলনের সূত্রপাত ভারতবর্ষেই হবে।

ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার দিনে আমার এইটুকুই বক্তব্য। আমার বক্তব্য কবে মূর্ত হয়ে উঠবে অথবা আদৌ হবে কিনা—তার সবটুকু নির্ভর করছে এই নতুন এবং স্বাধীন ভারতের উপর।' (৩৮)।

ইতিমধ্যে প্রজ্ঞাসুন্দর শ্রীঅরবিন্দের শ্রীহস্তপ্রসূত বেদান্ত ভাষ্য দিব্য জীবন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ বিশ্বের সর্বত্র বিতরণ শুরু করেছে। পাশ্চাত্যের বহু জ্ঞানতপস্বী সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক রাজসূয় যজ্ঞের দিব্যশক্তিস্নাত যজ্ঞাশ্ব দিব্য জীবনকে। আধ্যাত্মিক পথে ভারত প্রবেশ করেছে দিগ্বিজয়ীর মতো ইউরোপ ও আমেরিকার হৃদয়ের গভীরে, এক অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে, যেখানে তাদের আত্মার পরমাত্মীয়কে তারা অজ্ঞানবশত বন্দী করে রেখেছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পরাগতির দূত অবধ্য সুতরাং বিনা বাধায় সে প্রবেশ করছে বিশ্বমুক্তির বার্তা নিয়ে তাদের হৃদয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সংস্কৃত করতে। দিব্যজীবন সেই পথেই এগিয়ে চলেছে যে পথের নক্সা সর্বপ্রথম এঁকে গিয়েছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের তপোবলের ধারক ও বাহক স্বামী বিবেকানন্দ। যাঁর উদাত্ত কণ্ঠে পশ্চিমের আকাশে-বাতাসে ভরে উঠেছিল ভারতের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সার্বভৌমত্ব। তাঁর কাছে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যের জ্ঞানতপস্বীরা শুনেছিল যে, ভারতীয়েরা তাদের সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই জানে যে সমগ্র বিশ্ববাসী তাদের আত্মার আত্মীয়, তাদের ভাই। তারা জানে বিশ্বের প্রত্যেকেই সেই অমৃতময়ের সন্তান হিসাবে মুক্তিপথ-যাত্রী। সেই মুক্তিপথের পথপ্রদর্শক ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষই বিশ্বমুক্তি যজ্ঞের পুরোহিত।

(38) Amrita Bazar Patrika. 20th August, 1947.

(ক্রমশঃ)

দিবস রজনী

পরিতোষ মজুমদার

রেণু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এতো-দিন এ-বাড়ীতে আছে। কিন্তু অমন করে সামনের শিমুলগাছটাকে এর আগে আর দেখেনি। আসলে ফুরসুৎ পায়নি। সংসারের চাকায় নিজেকে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে শত ইচ্ছে হলেও একটু ফাঁক-ফোকর পাওয়ার উপায় নেই। আর জোর করে নেবে? ভাবতে গেলেও হাসি পায় রেণুর। নিজের অলক্ষ্যেই সংসার-অক্টোপাসটা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে যে সে নাগপাশ ছেঁড়া তো দূরে থাক, পুরো একটা বেলার জন্যও এড়াবার সাধ্য নেই। এক-এক সময় ইচ্ছে যায়, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যেতে। বাস্তব এ-পৃথিবীটার সব ভিড় এড়িয়ে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়।

শীতের শেষ। সূর্যটা সবেমাত্র দিন-কয়েক আগে থেকে তেতে উঠতে আরম্ভ করেছে। বাতাসে গরমের ছুড় পড়ছে। প্রখর গ্রীষ্ম-দুপুরের শেষে যেমন একটা ক্লান্তি আসে, তেমনি একটা ঝিমুনী ভেতরে ভেতরে অনুভব করে রেণু। গলার কাছটায় জ্বর জ্বর লাগছে। শরীরটা সকাল থেকেই জুৎ নেই। কেমন যেন একটা অলসও শরীর মনে ছড়িয়ে রয়েছে। রেণু ভেবেছিলো, খেয়েদেয়ে একটু ঘুমোলে এই আলসাভাব কেটে যাবে। কিন্তু না। ঘুমোতেই পারেনি। এপাশ-ওপাশ করে কিছুক্ষণ বাদেই উঠে পড়েছে। চা খেতে ইচ্ছে যায়। ইচ্ছে করলেও একার জন্য চা করতে আলিস্যি লাগে। একটু পরেই সবার জন্য চা করতে হবে। বারবার রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। সপ্তাহে ছুটি বলতে তো এই একটা দিনই। গা হাত পা নাড়াতেই যেন ভারী ঠেকে। কাল অফিস থেকে ফিরে

দেখেছে, ছোট বোন তনু এসেছে। সঙ্গে অধীর। কয়েকদিন আগেই অবশ্য চিঠি এসেছে। মা বলেছিলো ওকে। তবু খুব একটা গা করেনি রেণু। আসলে একে মাসের শেষ, চারদিকের খরচ-খরচা করে আর ক'টা টাকাই বা হাতে থাকে! সুতরাং মাসের শেষে শাকের আঁটিও বোঝাবিশেষ। তবু মুখ ফুটে তো বলা যায় না। শুধু নিজের ওপরে রাগ করা ছাড়া। নিকট আত্মীয়-স্বজনকেও অতিরিক্ত মনে হয়। সংসারে সচ্ছলতা থাকলে হয়তো এতো মনে হতো না। জীবনটা যেন অভিমন্যুর ব্যূহ, ঢুকতে সবাই পারে কিন্তু বেরোবার পথ বন্ধ। মাথা কুটলেও সহ্য করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সামনের পুকুরের ওপারের শিমুল-গাছটাকে খুঁটিয়ে দেখে রেণু। সারাটা বছর গাছটা ন্যাড়া থাকে। তাই বোধহয়

নজরে পড়ে না। এখন শিমুল ফুল ফুটেছে। কিছু ফুল ঝরে পড়েছে পুকুরটার ঢালু পাড়ে। কী সুন্দর ফুল-গুলো। ফুলন্ত গাছটা—কচি-কচি সবুজ পাতাগুলো ওর মনটাকে কিছুক্ষণের জন্য আনমনা করে দেয়।

—দিদি চা খাবি?

তনুর ডাকে পেছন ফিরে দেখে, তনু এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে মুখে ঘুমের ভাব। ফোলা-ফোলা। কপালের সিঁদুরের টিপটা লেপ্টে গেছে। ছোট্ট করে নিস্পৃহ গলাতেই রেণু বলে,—অধীর ওঠেনি।—নারে দিদি, এখনই উঠবে কি? বেলা পড়ুক। যেমন রাত্রে তেমনি দিনে। একবার শুতে পারলেই হলো।

তনুর পরের কথাগুলো যেন কানে ঢোকে না রেণুর। বলে,—চা করবি তো কর।

তনু চা করতে রান্নাঘরে যায়।

পেছন থেকে তনুর রান্নাঘরে যাওয়া দেখে রেণু। ওর বিয়ে হয়েছে প্রায় বছর ঘুরে এলো। বোধহয় পেটে বাচ্চাকাচ্চা এসেছে। শরীরটা পুরুষ্ট লাগছে। অধীর তনুকে বোধহয় এখানে কিছুদিনের জন্য রেখে যাবে। অন্ততঃ মার কথাবার্তায় তাই মনে হয়েছে। চিঠিটা রেণু পড়েনি। পড়ার ইচ্ছেও করেনি। আসলে মা তো বোঝে না যে কী করে রেণু সংসারটাকে চলমান রেখেছে। বুঝিয়ে বলারও উপায় নেই। মা সেই বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুয়িটির টাকা ক'টা ধরে রেখেছে। কিন্তু ওই দোতলার ঘরটা করতেই যে সেই টাকার শেষ তলানীটুকুও শেষ হয়ে গেছে, সেটা আর মাকে কে বোঝায়!

দিনগুলো কতো তাড়াতাড়ি বদলে যায়। আজ যেন বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয় যে, তনু মা হতে চলেছে। ভাবলে মনে হয় এই তো সেদিন! কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সূর্যটা কতোবার পৃথিবীটাকে প্রদক্ষিণ করা সেরে ফেলেছে, তার হিসেব কে রাখে!

খুব ছোটবেলায় রেণুরা থাকতো দাস-পুরে। তারকেশ্বর লাইনে। তারকেশ্বর স্টেশনে নেমে বাস অথবা পায়ে হেঁটে আসতে হতো চৌতারার মোড়ে। সেই চৌতারার মোড় থেকে কুর্মখালি পেরিয়ে একনাগাড়ে মাইল-তিনেক হাঁটলে পরে মিলতো ওদের গ্রাম, দাসপুর। ছোট্ট গ্রাম—দু' পাশে সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। একদিকে আরো কয়েকটা গ্রাম, শেষে দামোদর। ছোটবেলায় রেণুরা দাসপুরেই থাকতো। রেণুর বয়েস তখন আট-নয় বছর, আর তনু সবেমাত্র পৃথিবীতে এসেছে। স্পষ্ট মনে না পড়লেও এটুকু মনে আছে, ওরা গ্রামের বাড়ীতে থাকাকালীন বাবা থাকতেন কোলকাতায়। কলেজ স্ট্রীটে। চাকরী করতেন বিদেশী এক চায়ের কোম্পানীতে। সেই ফার্মেরই কয়েকজন কম খরচায় মিলে-মিশে মেসবাড়ী করে একসঙ্গে থাকতো।

শনিবার সকাল থেকেই অপেক্ষা করতো রেণু। বাবা আসবেন। অফিস থেকে আর মেসবাড়ীতে ফিরে যেতেন না। হয়তো দেরী হয়ে যাবে ভেবেই। একটা ব্যাগ খবরের কাগজে মুড়িয়ে সঙ্গে করে নিয়েই অফিসে যেতেন। আর অফিসপাড়ার থেকে বেরিয়ে বড়োবাজারের সামনের ফুটপাথের থেকে টুকিটাকি সারা সপ্তাহের যা বাজারহাট করার করে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে হাওড়া স্টেশনে এসে দুটো পঞ্চান্নর তারকেশ্বর লোক্যাল ধরতেন। বাবার সেই সপ্তাহান্তিক বাজারের মধ্যে থাকতো, মার জন্য কেনা তাঁতের শাড়ী, ব্লাউজ, চুলের কাঁটা, ফিতে অথবা আলতা-সিঁদুর। আর রেণুর জন্য মাঝেমধ্যে ইজের বা ফ্রক। একেবারে কিছু না নিয়ে বাবা বাড়ী আসতেন না। নিদেন চকলেট অথবা লজেন্স। এই পুরো একটা সপ্তাহ বাদে বাবার আসা, ওর জন্য উপহারের প্রত্যাশা—সব মিলিয়ে মিশিয়ে শনিবার বিকেলটা বড়ো সুন্দর লাগতো। দুপুরের পর থেকেই রেণু মনের ভেতরে একটা ছটফটানি অনু-ভব করতো। বাবার জন্য। মাকে ও দেখতো বিকেলের মুখোমুখি পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে ধোয়া শাড়ী পরতে। আলতো হাতে প্রসাধন করতে। বিকেল পড়ে গেলে ধৈর্য ধরে আর রেণু ঘরে থাকতে পারতো না। এসে দাঁড়াতো রাস্তায়। বাঁ পাশে প্রাচীন একটা মন্দির, ডান পাশে ডোবা। রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে গ্রামে ঢুকেছে। দূর থেকে জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যেতো। এক সময় সূর্যটা পশ্চিমে ঢলে পড়তো। রোদের রেখাগুলো প্রলম্ব হয়ে শুয়ে পড়তো ধানের ক্ষেতে—দুটো পঞ্চান্নর তারকেশ্বর লোক্যাল থেকে নেমে, চৌতারা পর্যন্ত বাসে এসে, তারপর হেঁটে বাড়ী ফিরতেন বাবা। বাঁকটা ঘুরতে দেখলেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতো রেণু। বাবাকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ী ফিরতো। সারাটা সপ্তাহ চুপচাপ মুখ বুঁজে হালটানা মার মুখ-চোখের চেহারাও যেন সেই মুহূর্তে ক'টায় বদলে যেতো। সদ্য গা ধুয়ে পাট-ভাঙা শাড়ী পরা মার মুখে চোখে হাসির ছটা ফুটে উঠতো। বাবাকে দাওয়ার ওপর একটা পিঁড়ে টেনে বসতে দিয়ে রান্নাঘরে যেতো। চা করতে। বাবা দাওয়ায় বসে গলার স্বর উঁচু করেই মাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন—হ্যাগো শুনছো?

মা চা করতে করতেই উত্তর দিতো, কী বলছো?—তোমাকে বলেছিলাম না যে ইভানস সাহেব চাকরী ছেড়ে দেবে? ঠিক তাই হয়েছে। ইভানস পুণায় চলে গেছে। আর শুনেছো? মিত্রসাহেব নতুন কোম্পানিতে যাচ্ছে। কোলকাতাতেই। আমাকেও যেতে বলছে। যাবো?

মা চা করতে করতেই উত্তর দিতো,—কী দরকার আবার চাকরী-বাকরী বদলানোর! এই তো আমাদের বেশ চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে বাবা আর কথা বাড়াতেন না। চা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে মা বাবার আনা জিনিসপত্রগুলো যার যার করে সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরে তুলে রাখতো। চা খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পড়ন্ত বেলায় বাবা জমিতে বেরোতেন। রেণুকে সঙ্গে নিয়ে। কোথায় নটবর আল সেরেনি, কোন্ আলটা ভেঙে গিয়ে পাশের জমিতে জল গড়িয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। জমিটমি ঘোরা শেষ হলে সন্ধের মুখে ফিরে এসে দাওয়ায় বসতো। গ্রামের নিতাই ঠাকুর, ননী আইচ, মধু শীল, গাজীসাহেব প্রায় সবাই এসে ভিড় জমাতো। বাবার কোলকাতা থেকে আনা চারমিনার সিগারেট পুড়তো আর সঙ্গে গল্প। গাঁয়ের অবস্থা, ভোটাভুটি, শহর কোলকাতা, আটপাড়ার হাট। মা তো রান্নাঘরে ব্যস্ত। পরদিন দুপুরের পর থেকেই মনটা খারাপ লাগতো। সন্ধেটা তো রীতিমতো বিষণ্ণ কাটতো। পরদিন ভোর না হতেই বাবা যখন রওনা হতো, রেণু তখন অঘোর ঘুমে অচেতন।

সেই সময়ে বাবা একবার একনাগাড়ে প্রায় দিন-সাতেক গ্রামে ছিলেন। ছুটি নিয়ে। গ্রামের কোণের দিকে যে পূর্ব-পুরুষের ভিটে ছিলো, সেটাই সংস্কার করার জন্য। দোতলা পাকা বাড়ী, সংলগ্ন পুকুর। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। শরিকে শরিকে সংঘর্ষ হওয়ায় আদি ভিটে ছেড়ে দিয়ে যে-যার চারদিকে ছিটকে পড়েছিলো। আর সেই কারণেই ভিটেটাও পরিত্যক্ত এবং জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। বাবার মুখে শুনেছিলো, ওদেরই এক পূর্বপুরুষ অনেক বছর আগে হাওড়ার বালী অঞ্চল থেকে এ-গাঁয়ে এসেছিলো। হেস্টিংস গঙ্গা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কিছুদিন আত্ম-গোপন করেছিলো সেই পরিবারে। পর-বর্তীকালে গবর্নর হওয়ার পর সেই লর্ড হেস্টিংসের পরচা দেখিয়ে সূর্যকান্ত দত্ত ঝাঁসির রানীর দেওয়ান হয়েছিলেন। দেওয়ানের কাজের থেকে অবসর নেওয়ার পর বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কিনে এ-গ্রামেই ব[illegible] বাস শুরু করেন। তারপরেই যা [illegible] কিছুদিন যেতে না যেতেই শরিকে [illegible]কে ভাগাভাগি। সেই সময়েই বাবা ওকে সঙ্গে করে একদিন আটপাড়ার হাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। সপ্তাহে দু'দিন হাটবার। দাসপুর থেকে মাইল-পাঁচেক দূর। আলের ওপর দিয়ে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলো রেণু বাবার সঙ্গে। তখন শীত শেষ হয়ে গিয়ে গরম পড়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। মাঠের ধান গোলায় উঠেছে। শুকনো মাঠের মাঝে মাঝে শিমুল। ফুলে ফুলে ভরা। সেই শস্যবিহীন দিগন্তবিস্তৃত মাঠে, নীল আকাশের পটভূমিকায় ফুলন্ত শিমুল-গাছগুলোকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিলো। আজো ভুলতে পারেনি ছবিটাকে রেণু। সেই আটপাড়ার হাটের চেয়েও বেশী আকৃষ্ট করেছিলো এই দৃশ্যটা। মনের ভেতরে গেঁথে গিয়েছিলো।

তনু ইতিমধ্যে চা করে নিয়ে এসেছে। রেণুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে, —দিদি চা নে।

চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে নেয় রেণু। —কি এতো ভাবছিলি রে?

রেণু ওর জিজ্ঞাসায় একটু হেসে বলে, —কই কিছু না তো?

—আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না দিদি!

—বারে, তোকে ফাঁকি দিতে যাবো কেন? একটু অফিসের কথা ভাবছিলাম। ইয়ার এণ্ডিং আসছে তো! চারদিক কি করে সামলাবো!

চায়ের কাপে চুমুক দেয় রেণু।

—আমি ভাবলাম আমরা এসেছি বলে!

রেণু তনুর কথার খোঁচাটা নিঃশব্দেই হজম করে। হেসে বলে.—তোরা এলি বলে আমার ভাবনা হবে কেন? বরং বেঁচে গেলাম। অফিস থেকে ফিরে এসে মার সংগে আর কতোক্ষণ গল্প করা যায় বল!

তনু আর কথা বাড়ায় না। চায়ের কাপটা নিয়ে চলে যায়। বোধহয় অধীর ঘুম থেকে উঠেছে কিনা দেখতে।

রেণুও স্বস্তি পায়। এ-ধরনের পরিবেশটা রেণু সব সময়েই এড়াতে চায়। ভালো লাগে না। এর মুখোমুখি বাধ্য হয়ে হতে হলে জীবনের সব বিতৃষ্ণা যেন ওকে ঘিরে ধরে।

—হতে পারে। তনুর সীমন্তভরা সিঁদুরের রেখাটাই রেণুর বুকের ভেতরে তিরতিরে একটা ব্যথা জাগায়। কিছুদিন আগে থেকেই মা প্যান্ প্যান্ শুরু করেছিলেন। তনুর জন্য। প্রথমদিকে রেণু খুব একটা গা করেনি। দেশের সম্পত্তি নিয়ে শরিকে শরিকে ঝগড়া লাগায় বাবা একরকম তিতিবিরক্ত হয়েই দেশের জমিজমা বিক্রি-বাট্টা করে দক্ষিণদাড়িতে এই জমিটুকু নিয়েছিলেন। শহর কোলকাতার কাছাকাছি,
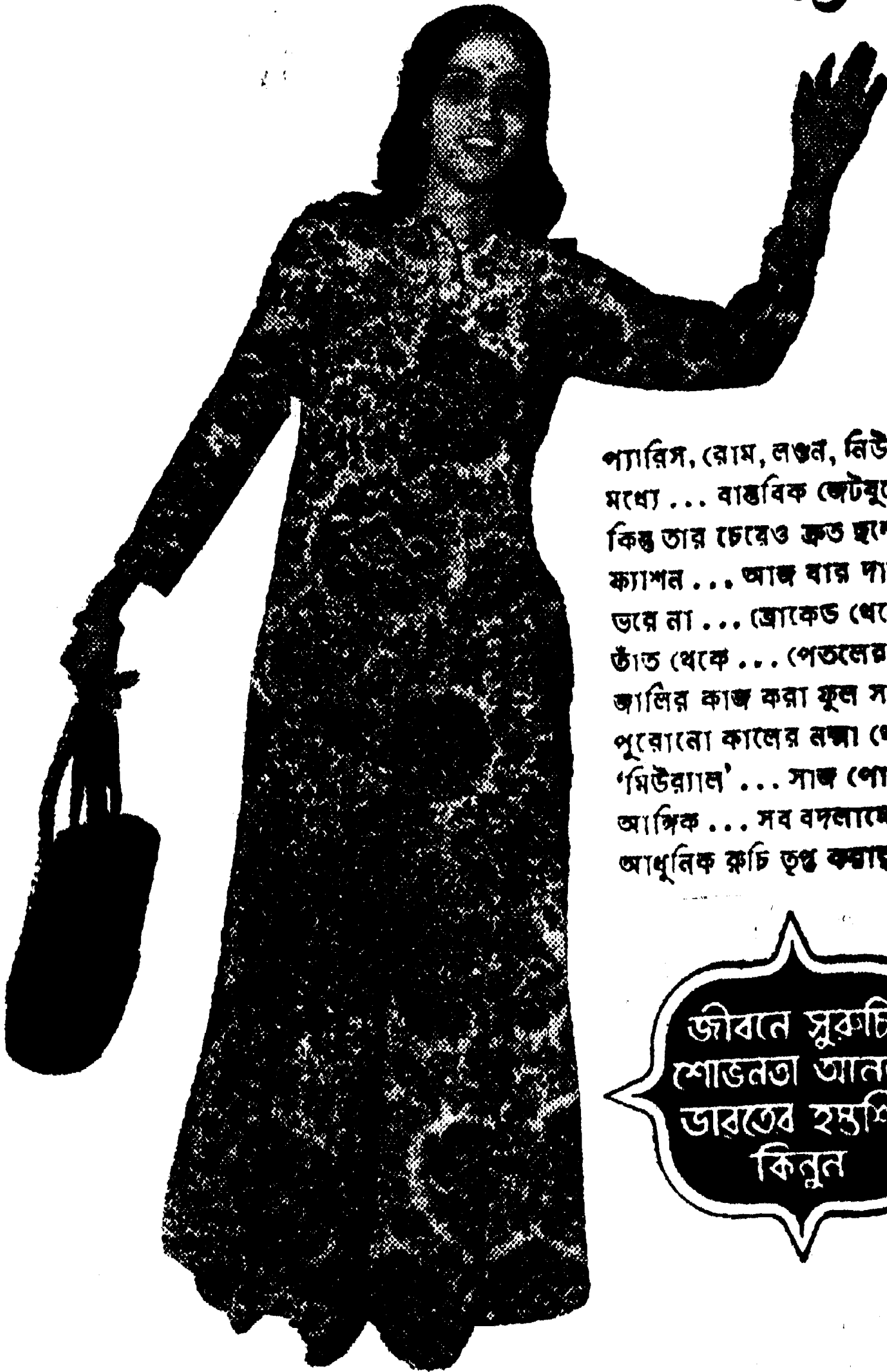
সুতরাং ডেইলী প্যাসেন্‌জারী করার অসুবিধে হবে না। আর জায়গাটাতে গ্রামের আভাস থাকায় স্বস্তিও পাওয়া যাবে। মোটামুটি এই চিন্তাভাবনাতেই জায়গাটা কিনেছিলো বাবা। তারপর এদিক ওদিক থেকে ধারকর্জ করে কোনোমতে নীচের তলাটা শেষ করে গেছেন। বাড়ী করে আর ভোগ করার অবকাশ পাননি। সত্যি বলতে নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংসারে আর কি থাকতে পারে! তখনই কলেজের পড়াশোনা শিকেয় তুলে দিয়ে চাকরীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো রেণু। মা আর বোনটাকে তো বাঁচাতে হবে। উঃ, কী ভীষণ দিনগুলো গেছে। চাকরী চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। ওর মতো হাজার হাজার মেয়ে তখন চাকরীর ধান্ধায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। তবু একে-ওকে ধরে অতিকষ্টে এ-চাকরীটা জুটিয়েছিলো রেণু। ভেবেছিলো হালভাঙা সংসারটাকে ধীরে ধীরে গুছিয়ে নেবে। কিন্তু তা আর পারলো কই? চাকরী পাওয়ার বছর-কয়েকের মধ্যেই তনুর মতিগতি দেখে মা অস্থির হয়ে পড়লো। তনু নাকি স্কুলের বদলে ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে রেস্তোরায় ঘুরে বেড়ায়। উঠতি বয়েস, একটা কিছু ঘটে যেতে কতোক্ষণ! ক'দিন রেণুরও নজরে পড়েছে। ধর্মতলায় ঘুরে বেড়াতে। নিত্য-নূতন ছেলেদের সঙ্গে। মেয়েটা যদি এতোটুকু বুঝতো যে দিদি কী করে সংসারটাকে ঠেকা দিয়ে রেখেছে! ছোটবেলার থেকেই তনুটা স্বার্থপর। সব দায়-দায়িত্ব যেন অন্যের। ওর কোনকিছু করার নেই। তবু রেণু কী করবে! অনেক খুঁজেপেতে অধীরকে বের করেছিলো। ওর অফিসের এক বান্ধবীর পরিচিত। তারপর তনুর বিয়ের টাকা যে কি করে যোগাড় করেছে, রেণু-ই জানে। অন্যকে বলে ত লাভ নেই। বুঝবে তো না। বরং হাসবে। বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা তো বাড়ী করতেই শেষ হয়ে গেছে। শেষমেষ অফিসের দরোয়ানের কাছেও বাধ্য হয়েই হাত পাততে হয়েছে রেণুকে। এখনো তার আসল দিতে পারেনি। সুদটা দিয়ে কোনরকমে ঠেকিয়ে রেখেছে। তা ও টুয়েণ্টি পার্সেণ্ট সুদ, আসল ফেরত দেবে কোথা থেকে? তবু দারোয়ানটা ভদ্র হওয়াতে বাঁচোয়া। সবার সামনে চায় না। মাহিনের দিন ওর সঙ্গে বেশ কিছুটা হেঁটে আসে। রেণু সুদটা দিয়ে দিলে হেসে ওকে নমস্কার করে অফিসে ফিরে যায়। অফিসের সবাই মাস-পয়লার দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে। মাহিনের জন্য। কিন্তু রেণু বোধহয় একমাত্র ব্যতি-ক্রম। ওর বুক কাঁপে। মাস-পয়লা মানেই পাওনাদারদের হামলা। তারপর? সারাটা মাস চলবে কি করে? যতো অসুবিধাই থাক, মার পীড়াপীড়ি আর নিজে চোখে ব্যাপার-স্যাপার দেখে রেণুও শংকিত হয়ে পড়েছিলো। একে তো তনু ছোটবেলা থেকে জেদী, একরোখা ধরনের মেয়ে। একটা কিছু করে বসতে এতোটুকু দ্বিধা করবে না। তখন তো সামলাতে হলে রেণু হালে পানি পাবে না। চরিত্র জিনিসটা বড়ো-লোকদের কাছে বিলাসিতা হলেও, রেণু-দের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্তদের কাছে সেই চরিত্রটাই একমাত্র মূলধন। যাকে সম্বল করে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। ওর বড়ো কোন দাদা থাকলেও না হয় হতো। সব ঝক্কি রেণুর ঘাড়ে এসে একলা পড়তো না। তবু কি করা যাবে! যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে মাথা পেতে বরণ করে নেওয়া ছাড়া তো গত্যন্তর নেই। মার যা পুরোন গয়নাগাটি ছিলো, তা ভেঙেই তনু বিয়ের গয়না গড়িয়েছে। আর এদিক-ওদিক থেকে যোগাড় করেছে বিয়ের অন্যান্য খরচ। শাড়ী, ব্লাউজ, জিনিসপত্র, প্যাণ্ডেল ইত্যাদি। সেটাও খুব কম অংকের টাকা নয়। প্রাণান্তকর চেষ্টাতেই সবকিছু যোগাড় করতে হয়েছে রেণুকে। ছেলে যোগাড় থেকে শুরু করে বর-কনেকে গাড়ীতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত সবই একহাতে করেছে রেণু। দূর সম্পর্কের দেশের এক জ্ঞাতি কাকা তুলসীকাকা শুধু এসে তনুকে সম্প্রদান করে গেছে। আত্মীয়-স্বজন কাউকে ইচ্ছে করেই বলেনি। একে তো বাবা মারা যাবার পর টাকা-পয়সা চাইতে পারে ভয়ে কেউ-ই ওদের খোঁজখবর করেনি। সম্পর্কও রাখেনি। দ্বিতীয়তঃ লোকজন বেশী বলা মানেই খরচা। হাত বাড়িয়ে তো আর কেউ একমুঠো উপকার করবে না। বরং আড়ালে সমালোচনা। কি দরকার! তনুর বিয়ের প্রথম থেকে শেষ-পর্যন্ত হাসিমুখে করলেও বুকের ভেতরে একটা বোবাকান্না তির-তির করে গলা বেয়ে ওপরে উঠে আসতে চেয়েছে। অনেক কষ্টে জোর করে তাকে দমন করেছে রেণু। ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে বলে নয়, আসলে এতোটুকু আনন্দ অনুভব করেনি রেণু। নিজেকে এই পটভূমিকায় আরো অসহায়, করুণ মনে হয়েছে। যে সংসারের জোয়াল ওর কাঁধে চেপেছে, সেটা কি কখনো আর থামবে? আর যদিবা থামে, তখন কারো হাত-ধরা বা না-ধরা সমান। তনুর বিয়ের পাশাপাশি আরেকটা বিয়ের ছবি ওর মনের পটে ফুটে উঠেছে। ওরা দেশ ছেড়ে চলে আসার সময় বাবা সঙ্গে করে আট-দশ বছরের একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছিলো। জাতে বাগ্‌দী। কাজ করতো ভাগচাষীর। আগে বাগ্‌দীরা লেঠেলের কাজ করতো। জমিদারী চলে যাওয়ায় ঘরের কড়ি গুণে কে আর লেঠেল পুষবে! রেণুদের যা ছিটেফোঁটা জমিজমা ছিলো তাই লোকটা চাষবাস করতো। হঠাৎ ওলাওঠায় চোখ বুজলো। বৌটা বছর না ঘুরতে ধনুস্টং-কারে গত হলে পরে বাবাই বলেছিলো,—থাক আমাদের কাছে মেয়েটা। কোথায় আর যাবে! একা ঘরে ফেলে রাখলে তো কুকুর শেয়ালে টানাটানি করবে। ওরা যখন চলে আসে তখন লতিকেও সঙ্গে এনেছিলো বাবা। মেজাজ ভালো থাকলে মাকে ঠাট্টা করে বলতো,—কী ভাগ্য করে সংসারে যে এসেছিলাম?

মা বলতো,—কেন বলোত?

—নিজের কপালে তো দু' দুটোই মেয়ে; কুড়িয়ে বাড়িয়ে যেটাকে পেলাম সেটা গিয়েও ওদের দলেই ভিড়লো। মা বাবার এসব কথায় হেসে উত্তর দিতো,—তাতে কি হয়েছে। মেয়েদের চেষ্টা করে মানুষ করো; দেখো, ছেলের আর দরকার হবে না।

কিছুদিন পরে মেয়েটা একটু ডাগর হলে বাবাই উদ্‌যোগ করে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলো। তারপর অফিসে দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে রেণু, তনু, মা লতি সবাইকে সঙ্গে করে দেশে গিয়েছিলেন। তখন রেণু স্কুলের শেষের দিকে পড়ে। সমস্ত ব্যাপারটাতেই বেশ মজা পেয়েছিলো। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে সবাই মিলে গিয়ে নেমেছিলো তারকেশ্বর স্টেশনে। সেখান থেকে ছ' টাকা রিকসাভাড়া দিয়ে তিনটে রিকসায় সোজা গিয়েছিলো দাসপুরে। বিয়ে-সাদীর জন্য যা প্রয়োজন, সেসব জিনিষপত্র বাবা কোলকাতার থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন। দাসপুরের মতো গণ্ড-গাঁয়ে আর কী-ই বা পাওয়া যাবে। তুলসী-কাকাদের বাড়ীর উঠোনে রিকসা থামতেই হৈ চৈ করে গাঁয়ের লোকজন এসে জড়ো হয়েছিলো। এতোদিন পরে ওদের দেশে আসতে দেখে সবাই খুসী হয়েছিলো। উপরন্তু গাঁয়ের একটা অনাথা মেয়েকে ওরা টাকাপয়সা দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে এটা দাসপুর ছাড়া আশেপাশের গ্রামগুলোতেও চাউর হয়ে গিয়েছিলো। এরপরের কটা দিন রেণুর বেশ আনন্দেই কেটেছিলো। পরদিন সকালে শরিকি পুকুর থেকে মাছধরা, আটপা[illegible]র হাটের থেকে কাঁচা আনাজ আনানো [illegible], সকাল থেকে মেয়েটার এয়োতির [illegible] কর্ম করা, সন্ধ্যেবেলা তুলসীকাকাদের উঠোনে ভেয়ান চড়ানো—বাবা পর্যন্ত লুচি বেলতে বসে গিয়েছিলেন। গাঁয়ের নিতাই ঠাকুরই রান্নাবান্না করেছিলো। সন্ধ্যের পর হুম হুম শব্দে বাগদীপাড়া থেকে ধানক্ষেতের আল ধরে পালকী আসা, বধূবরণ—প্রভৃতি বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো যেন রেণুর কাছে স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ঘটে গিয়েছিলো। একে অল্প বয়েস, তায় জিনিষটা নতুন—রেণুকে সেই তিনটে দিন আলাদা এক জগতে নিয়ে গিয়েছিলো।

যে ঘরে চাষ উঠলে তুলসীকাকাদের আলু থাকে, সেটাই পরিষ্কার করে বাসর পাতার ব্যবস্থা হয়েছিলো। একসময় বিয়ে শেষ হয়ে গেছে। হ্যাজাক দুটোরও আলো দেওয়ায় ক্লান্তি এসেছে। বাড়ীর পেছনের পুকুরে হাতমুখ ধুতে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিলো রেণু; হাতে লণ্ঠন নিয়ে আল ধরে লোকজন ফিরে চলেছে। অন্ধকারের একটা ঘেরাটোপ গ্রামটাকে ঘিরে ধরেছে। পুরো গ্রামটাই সুশান্তিতে মগ্ন। মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুর ডাকছে। হঠাৎ একদল ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝাঁঝাঁ করে উঠছে। মুহূর্তকটাকে অপূর্ব লেগেছিলো রেণুর। তারপরের দিন বাসী বিয়ের পর আবার বর-কনে গিয়ে বসেছিলো পাল্কীতে। দু-

জনকে গড়ে পুরে নিয়ে হুম হাম শব্দে পালকীটা গাঁয়ের শিবমন্দির, কালীমন্দির, মনসাতলায় নমস্কার করিয়ে ফিরে গিয়েছিলো। এরপর খাওয়া দাওয়া সেরে সূর্যটা ঢললে পরে ওরাও কোলকাতার দিকে রওনা হয়েছিলো। রিকসায় বাগদীপাড়া পেরোতে গিয়ে দেখে, লতি এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছে। সজল চোখে একদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো রেণুর। অবাকও কম হয়নি। কয়েকটা দিনেই সামান্য একটা বালিকা কিভাবে নারীতে রূপান্তর হয়ে গেলো। গ্রাম যখন পার হয়, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। রাস্তার পাশের পচাইয়ের দোকানে হাড়িয়া খাওয়ার ভীড় জমেছে। এখানে সেখানে বসে ছোট ছোট জটলা করে হাড়িয়া খাচ্ছে। গজল্লা করছে। রেণুর মনে লতির ভবিষ্যতের একটা ছবি ফুটে উঠেছে। লতি নিজেকে নিজেদের সংসারের পটভূমিকায় গুটিয়ে নিয়ে কয়েক সন্তানের মা হবে; আর সারাটা দিনমান জমিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যের পর ওর বর আসবে এই গাঁয়ের শেষের হাঁড়িয়ার দোকানে।

সূর্যটা ঢলে পড়েছে। শিমুলগাছের ছায়াটা পুকুরের স্থির জলে প্রলম্ব হয়ে পড়েছে। পুকুরের ওপারে কিছুটা জমি ছাড়ান দিয়ে বড়ো রাস্তাটা। এয়ারপোর্টের সঙ্গে সহর কোলকাতার যোগাযোগ রেখেছে। দুপুরের গলা পিচে, রোদ পড়ে যেরকম চিকচিক করছিলো, এখন অনেকটা কমেছে। এই গরমে পুকুরের জলে টান দিয়েছে। সেই জলের ধারে ধারে কয়েকটা কাদা-খোঁচা লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে ধরে বেড়াচ্ছে। অলস একটা পরিবেশ। গা হাতমুখ ধুতে হবে। সারাটা দুপুর ঘেমে ঘেমে শরীরটা চটচট করছে। রোববারে অফিস ছুটি থাকলেও পুরোপুরি বিশ্রাম কোনো সময়েই পায় না রেণু। ঘুম থেকে উঠেই বাজারের ব্যাগ হাতে বাজারে ছুটেছে। তনুরা এসেছে বলে বাজার থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছুই আনতে হয়েছে। নইলে এমনিতে তো ওরা প্রাণী বলতে দুজন; মা আর রেণু। ছোট্ট সংসার। তাও মার আজ একাদশী, কাল সে পুজো তো লেগেই আছে। উপবাস-ব্রতো তো পায়ে পায়ে। বাজার থেকে ফিরে শাড়ী ব্লাউজ, জামা-কাপড় কাচতে হয়েছে। পুরোটা সপ্তাহ তো অফিস করতে হবে। আর শাড়ী-ব্লাউজও এমন একটা বেশী নেই যে চালিয়ে নিতে পারবে। বর্ষার দিনে এজন্যই কষ্ট হয়। তারপর সংসারের টুকিটাকি সারতে সারতেই বেলা বেড়ে গেছে। তবু মা রান্নাঘরটা দেখায় বাঁচোয়া। সন্ধ্যের পর আবার নীচের ভাড়াটিয়ার কাছে যেতে হবে। আজ ছ' মাসের ওপর ভাড়া বাকী। এই ভাড়ার টাকা কটা নিয়মিত পেলেও কিছুটা সুরাহা হয়। কিন্তু তাই বা পায় কোথায়? সোজাসুজি তো চাওয়া যায় না। গল্প করার ফাঁকে ভাড়ার কথাটা পাড়তে হয়। আর ওদের নিজেরই যা অবস্থা তাতে চাইতেও লজ্জা করে। ভদ্রলোক যে স্কুলে মাস্টারী করে, তারাও নিয়মিত মাইনে দেয় না। তার ওপর সদ্য বিয়ে করেছে। নিজেদের খরচাই কোন রকমে টেনেটুনে চালায়। যা দিনকাল। তবু উপায় তো নেই। লজ্জা ভেঙ্গে চাইতেই হবে। তনুর এই অবস্থাতে ভালো খাবার-দাবার আর ডাক্তারের খরচাও ওরই ঘাড়ে এসে পড়বে। চোখে মুখে পথ পায় না রেণু। ভাবলে মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে।

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। গাটা ধুয়ে নিতে হবে: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তেতে ওঠা দুপুরের পর বিকেলের গা ধোওয়ায় শরীরে যে স্নিগ্ধতার আমেজ আসে, তাতে মনটাও অনেকটা পরিপূর্ণ হয়। বারান্দা থেকে ঘরে আসে রেণু। চায়ের কাপগুলো নেওয়ার জন্য ঘরে ঢুকে দেখে, অধীর খাটের ওপর এখনো শুয়ে। তনু ওর গা ঘেঁষে বসে গল্প করছে। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে, হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটাকে আড়াল করে উঠে বসে অধীর। তারপর বলে,—আসুন দিদি। কাল থেকে যে একেবারে দেখা পাইনি?

মৃদু একটু হেসে রেণু বলে, দু-দণ্ড বসে গল্পগুজব করবো, সে সময় আর পেলাম কোথায় বলো? তোমার আর উঠতে হবে না। আমি গাটা ধুয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর তনুর দিকে ফিরে বলে,—তুই গা ধুবি না?

—ধোবো। তুই আগে যা দিদি। আমি সন্ধ্যেটা হলে যাবো। নইলে আবার ঘামে চটচট করবে। চায়ের কাপ-ডিসগুলো তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে রেণু। পাড়ার নসুচক্কোত্তির বাড়ীতে অষ্টপ্রহর সংকীর্তন হচ্ছে। মা তো বেলা পড়তে না পড়তেই পাশের বাড়ীর নিস্তারিণী মাসীর সঙ্গে সেই সংকীর্তন সভায় গিয়ে বসেছে। কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। কাপডিসগুলো কলতলার থেকে ধুয়ে রান্নাঘরে রেখে এসে বাথরুমে ঢোকে রেণু। কলটাকে পুরো খুলে দেয়। ঝর ঝর করে এক নাগাড়ে জল পড়ছে। শরীরটাকে পেতে দেয় কলের নীচে। আরামে চোখ বুজে আসতে চায়। নিজের মনেই গুন গুন করে একটা রবীন্দ্রসংগীতের কলি ভাঁজে রেণু। এই মুহূর্তে নিজেকে অনেকটা হালকা লাগে। সারাটা দিন যে চিন্তাটা মনের শিরায় শিরায় পাক খেয়ে মনকে বিষাক্ত করে তুলেছিলো, তার হাত থেকে যেন অনেকটা রেহাই পায় রেণু। তনুর ওপরের রাগটা পড়ে গিয়ে সহানুভূতি জেগে ওঠে। অধীর কাল সকালের ট্রেনেই কাঁচড়াপাড়া ফিরে যাবে। লোকোশেডে চাকরী করে। এখান থেকে গিয়ে ডিউটি করবে। সুতরাং ভোর সকালেই ওকে বেরোতে হবে। তনুটারই বা দোষ কি? লেখাপড়া এমন একটা শেখে নি যে বিচার-বিবেচনা করে সবকিছু বলতে পারবে। আর এমন কিছু বড়ো একটা গণ্ডীতে ও মেলামেশার সুযোগ পায়নি যে হৃদয়টাকে উদার করতে পারে। সারাদিন অফিসে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয় সত্যি, কিন্তু তার বিনিময়ে এই যে হাজারো মুখ-মিছিলের সঙ্গে নিত্য পরিচয়—তা যদি রেণুর হৃদয়টাকে গণ্ডীমুক্ত করতে না পারে, তবে জীবনের মূল্যায়নে এর মূল্য আর কতোটুকু!

পাটভাঙ্গা শাড়ী পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে রেণু। রান্নাঘরে এসে চা করে। অধীর আর তনুকে দেয়। নিজেও নেয়। এতোক্ষণ পর বেশ হাওয়া ছেড়েছে। সারা দিনের ভ্যাপসা গরমের পর, এই হাওয়াটা বেশ ভালো লাগে রেণুর। মনে মনে হিসেব করে। বয়েস তিরিশের বন্দর পেছনে ফেলে এসেছে। হিসেব মতো বিয়ের বয়েস আট-দশ বছর আগেই পার হয়ে এসেছে। ওর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট হয়েও তনু আজ মা হতে চলেছে। অনেক দিন আগে, তখন রেণু চাকরীতে সবেমাত্র ঢুকেছে, বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে অফিসে যাওয়ার সময় ও আর একটি ছেলে নিয়মিত একই বাস ধরতো। পরিচয়ও হয়েছিলো কিছুটা। ছেলেটা কিছুটা এগিয়েও এসেছিলো। কিন্তু যেদিন মনের আয়নায় রেণু নিজের দুর্বলতা দেখতে পেয়েছে—সেদিন থেকে বাসের সময় বদলে দিয়েছে। ওর এসব চিন্তা করা মানে, একটা চলমান সংসারের রথের চাকা হঠাৎ বসে যাওয়া। ভেসে উঠেছে তনু আর মার মুখ। কিছুদিন পরে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিলো। সেই ছেলেটা পাশে বিয়ে করা নতুন বৌ নিয়ে সিনেমা বা থিয়েটারে যাচ্ছে। জোর করে সেদিক থেকে দৃষ্টিটাকে সরিয়ে নিয়েছে রেণু।

হালকা অন্ধকার নামছে। পুকুরটা অন্ধকার। শিমুল গাছটাকে আর এতো সুন্দর দেখাচ্ছে না। আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট গাছটা। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু এতোদূর থেকে আলোগুলো উজ্জ্বল নয়; কেমন যেন ঘোলাটে দেখাচ্ছে। রেণুর মনে হয়, ওর আগামী জীবনটার সঙ্গে এই শুয়ে থাকা আলো-আঁধারি মেশানো রাস্তাটার কোথায় যেন একটা মিল আছে।

অঙ্গনা

বিজয়কেতন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি ইউরোপের কয়েকটি দেশে শুভেচ্ছা সফর করে দেশে ফিরেছেন। এই সফর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতার প্রসার এবং ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যেই চলতি রেওয়াজের অঙ্গ। সব দেশের রাষ্ট্র-প্রধানরাই এ ধরনের সফরে অভ্যস্ত। সুতরাং এ নিয়ে বিশেষ কৌতূহলের কোন অবকাশ নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মিত্রতা কি যাত্রাও হয়ত নেহাৎ ক্যাকডালীয় ব্যাপারেই পর্যবসিত হত যদি না বর্তমান ধনযোর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সফর অনুষ্ঠিত হত। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর সফরের রাজনৈতিক সাফল্য অসাফল্য আমাদের এখনকার আলোচ্য নয়। আমাদের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রধানমন্ত্রীর এবারকার বিদেশ সফর সম্বন্ধে সমগ্র জাতির সঙ্গে আমরাও খুবই উৎসুক ছিলাম। তাই এ সম্বন্ধে প্রতিটি খবর আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করেছি। এবং এই প্রতিটি খবরের বিশেষ কয়েকটি খবর নিয়েই আমাদের এবারকার আলোচনা। শ্রীমতী গান্ধী তখন হাঙ্গেরীতে। এ সময় খবরে প্রকাশ পেল যে, তাঁর এই সফর স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে এক অপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাভিলাষও জাগিয়ে তুলেছে। সেদেশের নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন স্বয়ং হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী। হাঙ্গেরীর নারীপ্রগতির জন্য সরকার যা করেছেন তা যথেষ্ট নয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন যে, নারীজাতির উন্নয়নে তাঁর সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কিন্তু এতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি এবং সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে জিগ্যেস করেছেন, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, কবে একজন মহিলা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন?' এ প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এবং প্রায় কোন ইউরোপীয় দেশের পক্ষেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবু সৌভাগ্য মানতে হবে যে, এ ধরনের চিন্তা সেদেশের নারীসমাজের ভাবনায় ইদানীং স্থান পেয়েছে।

এই তো কয়েক দিন আগে 'প্যারিসে প্রথম মহিলা মেয়র' শিরোনামের একটি খবর আমাদের অনেকেরই নজরে এসেছে। শিরোনামার মধ্যেই খবরের আসল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তৃত বক্তব্যে যা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো এই যে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দু হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলা মেয়র হলেন। এই সৌভাগ্যবতীর নাম মাদাম দ্য হাটক্লক। তাঁর বয়স ৫৯ বৎসর। তিনি কাউন্সিলার হিসেবে কাজ করেছেন ২৫ বছর। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বহু দিন। নাতির বয়স ১৩। এই হলো পুরো সংবাদ। সবটাই উদ্ধৃত করা হলো। সেদেশের নারী-সমাজের সঙ্গে আমাদের ফারাকটা ধরিয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। আমরা ২৫ বছরেরও কম সময়ে যে জায়গায় এসে পৌঁচেছি ওরা দু হাজার বছরেও তার সিকি পথ অতিক্রম করতে পারে নি। মহিলা মেয়র … আর আমাদের দেশে কোন নতুন ঘটনা নয়। দিল্লী, মাদ্রাজ এবং আমেদাবাদের মত বড় বড় শহরে মহিলারা প্রধান নাগরিকের এই পদে আসীন হয়েছেন। তাই নারীজাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে মেয়র বা সমগোত্রীয় পদকে আজ আর আমরা তেমন গুরুত্ব-সহকারে বিবেচনা করি না।

কারণ, ইতিমধ্যে একাধিক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল পদে মহিলার বৃত হয়েছেন। প্রথম উত্তরপ্রদেশ এবং তার পর ওড়িশা মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে মহিলার হাতে। শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর মত এত অল্পবয়সে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ঘটনা আমাদের দেশেও বিরল পৃথিবীর আর কোন দেশে এ নজীর খুঁজতে না যাওয়াই ভাল। কিন্তু আমাদের দেশের নারীসমাজ এই সাফল্যের সোপান আরো আগেই অতিক্রম করেছেন যেদিন উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। আর সত্যি কথা বলতে কি, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আমাদের রাজনৈতিক সাফল্য আশাতীত

...নৈতিক জীবনের যে সিঁড়িকোঠায় ...কে আমরা উপনীত, বছর দশেক ...ও সেখানে পৌঁছুবার চিন্তা তো ...র কথা স্বপ্ন দেখারও সাহস ছিল না। ...য় আমাদের অগ্রগামিতাকে ত্বরান্বিত ...র জন্য সবাই অকাতরে সাহায্য ...ছেন।

স্বাধীনতালাভের পর বিশ্বে ভারতীয় সমাজের আত্মপ্রকাশ পরম বিস্ময়কর। ...তী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত কূটনৈতিক ...ত্ব নিয়ে গেলেন বিদেশে আর উত্তর-...শের রাজ্যপাল হলেন শ্রীমতী ...জিনী নাইডু। শ্রীমতী পন্ডিত কূট-...ক দক্ষতার বলিষ্ঠ পরিচয় দিলেন ...সংঘে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে। তাঁর ...তার আরো স্বীকৃত এলো যখন তিনি ...সংঘ সাধারণ পরিষদের সভানেত্রী ...র দুর্লভ সম্মান অর্জন করলেন। তাই ...যাচ্ছে যে, সাফল্য দিয়েই আমাদের ...শুরু হয়েছিল। অথচ বিদেশের দিকে ...কয়ে এই সাফল্য সহজে অনুভব করা ...না। কিছু দিন আগে জানা গিয়েছিল ...কেনিয়া ব্রটেনে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ...লা নিয়োগ করেছেন। কিন্তু বিশ্বের ...ৎ নারীপ্রগতির ধ্বজাধারীরা এহেন ...তিশীল মানসিকতার পরিচয় দিতে ...রা সময় নিয়েছেন। তাছাড়া হোয়াইট ...উস বা ডাউনিং স্ট্রীটের পথে আজো ...ন মহিলার পদধ্বনি শোনা যায় নি। ...র ভবিষ্যতেও সেরকম সম্ভাবনা আছে ...মনে হয় না। তবুও স্বাধীনতা এবং ...ীপ্রগতির ক্ষেত্রে এ'দেরই আমরা আদর্শ ...মেনে নিয়েছি বার বার। এখনো ...সংক্রান্ত কথা উঠলে আমরা তাঁদের উদা-...ণ দিয়ে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করি। ...হলো এক ধরনের হীনমন্যতা। যত ...তাড়াতাড়ি এই মানসিকতার অবসান হয় ...তই মঙ্গল।

এবারকার সফরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ...ন্দিরা গান্ধী বুদাপেস্তে জনৈক বিদেশী ...ংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, ...রতের নারীসমাজ স্বাধীনতাসংগ্রামে ...র অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বুলেট এবং ...রাদণ্ড কিছুই তাঁদের হতোদ্যম করতে ...রে নি। বিপদ ও বিপর্যয়ের সামনে ...ড়িয়ে তাঁরা সমানভাবে সংগ্রাম করেছেন। ...খানে নারী-পুরুষের কোন প্রভেদ ছিল ...। তাঁরা পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে কষ্ট ...হ্য করেছিলেন। অতীতেও ভারতীয় নারী প্রতিভাই তাঁর যোগ্য মর্যাদা পেয়ে-ছেন। আমাদের দেশে কোন-না-কোন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকেন মহিলা এবং প্রশাসনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদেই মহিলারা আছেন। তাই আমাদের দেশ নারীসম্প্রদায়কে বিশেষ একটি প্রজাতিহিসেবে গণ্য করে না। আমরা চাই প্রতিভাসম্পন্ন প্রতিটি নারী এবং পুরুষ সমাজে নিজেকে সর্বাধিক কাজে লাগাবার যোগ্যতা অর্জন করুক। আর স্বাধীনতা-লাভের পর নারী-সম্প্রদায় আমাদের দেশে প্রতিটি উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন।

পরিশেষে তিনি আমাদের অধিকার-বঞ্চিত অংশ সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছেন, একথা সত্য যে মহিলাদের এক বিরাট অংশ এখনো অনগ্রসর। এর প্রধান কারণ হল যে তাঁরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নন। যাঁরা এখনো পিছিয়ে আছেন আমি তাঁদের সম্বন্ধে শুধু একথাই বলতে পারি যে, সেটা তাঁদের নিজেদের ত্রুটি। তাঁদের জানা উচিত সংবিধানে তাঁদের কি অধিকার দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিকের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কোন আত্মগোপনের মনোভাব নেই। আবার আত্মসন্তোষের অহমিকাও নেই। দুটি চিত্রই তিনি তুলে ধরেছেন পাশাপাশি। আমাদের দেশে নারীপ্রগতির পাশাপাশি আর একটি অংশ দুর্গতিতে ভুগছেন। এবং খুবই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হলেও এ সত্য স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় নেই দেশে এ'দেরই সংখ্যাধিক্য। অথচ সুযোগ এবং সুবিধা পেলে তাঁরাও যে যোগ্যতার মাপকাঠিতে একইভাবে উত্তীর্ণ হবেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হাজারীবাগের সেই নারীশ্রমিকের কথা নিশ্চয়ই আজো আমাদের স্মরণে আছে। সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে তিনি আজ একটি সংস্থার সম্মানিত পদ অলংকৃত করেছেন। সুতরাং প্রয়োজন সুযোগের এবং সুযোগ পেলেই অধিকার সম্বন্ধে তাঁরা ঠিক ঠিক ওয়াকিবহাল হয়ে যাবেন। আসলে এর পেছনে রয়েছে এক ধরনের কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মনোভাবের পরিচয়। তাঁরা মেয়েদের দুর্বল হিসেবে দেখতেই ভালবাসেন। পাছে মেয়েদের সবলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তাঁদের পৌরুষ অপদস্থ হয়, এই ভয়ে তাঁরা তটস্থ। মধ্যযুগীয় মানসিকতার শিকার হয়ে এখনো তাঁরা মেয়েদের উপর খবরদারি করে চলেছেন। এ'রাই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় সামাজিক শত্রু। নারীপ্রগতিকে এ'রা বারবার ব্যাহত করতে চেয়েছেন। সেই স্ত্রীশিক্ষার উদ্বোধনে স্লেচ্ছ শিক্ষার প্রভাবে জাতিধর্ম সবকিছু বিনষ্ট হওয়ার সতর্কবাণী এ'রাই শুনিয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সময় এ'রাই বিদ্যাসাগরকে নানাভাবে হেয় করার চেষ্টা করেছিলেন। আর আজ তাঁরাই নারীপ্রগতিকে ব্যাহত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। এ'রাই হচ্ছেন নারীজাতির নানা লাঞ্ছনার মূল কুগ্রহ।

তাই আজ আমাদের সকলকে শপথ নিতে হবে অবহেলিত এবং পিছিয়ে-পড়া নারীসমাজকে প্রগতির আলোকে উদ্বুদ্ধ করা এবং অধিকার সচেতন করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দান। এটুকু যদি আমরা করতে ব্যর্থ হই, তবে আমাদের আজকের ইমারতে ফাটল ধরবে এবং তা অনিবার্য ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়বে। কিন্তু ইন্দিরাজীর সফরে দেশে দেশে নারীসমাজে যে উচ্চাভিলাষ জাগরিত হয়েছে এবং যার অংশীদার আমরাও সেই সাফল্যকে আরো শীর্ষ-মুখী করার জন্য নারীসমাজের অনগ্রসরতার কলংকিত অধ্যায় ইতিহাস থেকে মুছে দেবার জন্য অচিরেই আমাদের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

—প্রমীলা

প্রেক্ষাগৃহ

অপর্ণা সেন : রাতের রজনীগন্ধা
পরিচালনা : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্র-সমালোচনা

অব্যক্ত প্রেমের যন্ত্রণা

'হ্যাঁ, আমি অশোককে ভালোবাসি। ওর একখানি ছবিকে আমি গোপনে পুজো করি। আমার এ ভালোবাসা আমার একান্ত নিজস্ব। কিন্তু এর জন্যে পৃথিবীর কারুর তো কোনো ক্ষতি করছি না আমি। আমি তো ইচ্ছে করলেই অশোককে আমার নিজের করে পেতে পারতুম, তা না করে যেইমাত্র আমি জেনেছি যে, অশোক এবং আমার বন্ধু রাধা পরস্পরকে ভালোবাসে, সেই মুহূর্তে আমি আমার গোপন প্রেমকে মনের নিভৃতে রেখে ওদের মিলনের পথ সুগম করে দিয়েছি—নিজের চেষ্টায় ওদের মধ্যে বিবাহ ঘটিয়েছি—স্বামীস্ত্রী-রূপে ওরা যাতে সুখী হয়, তারই জন্যে অহরহ আমি পরিশ্রম করে চলেছি। আমার নিজের কাছে ওর একখানি ছবি লুকিয়ে রেখে দেওয়া তবুও অপরাধ, পাপ বলে গণ্য হবে?'

—পৃথ্বী পিকচার্স নিবেদিত, এন-এন-শিল্পি প্রযোজিত **ইস্টম্যানকলারে রঞ্জিত ছবি 'হারজিৎ'**-এর নায়িকা কমলের এই স্বীকৃতি ও প্রশ্ন দর্শকচিত্তকে বেদনাবিধুর করে তোলে। কমল বারংবার অশোক-রাধার দাম্পত্যজীবন থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু অশোকের স্নেহপ্রবণ, হৃদয়বান দাদা মধুসূদন গুপ্তের সনির্বন্ধ অনুরোধকে সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে যখন আবিষ্কার করে, তার বান্ধবী রাধার বাপের বাড়ীর ভাড়াটে নারদমুনির স্বভাববিশিষ্ট নারায়ণের আছে একটি মহৎ, শিল্পীমন এবং তার তৃষিত অন্তরে আছে তারই জন্যে প্রেমের আসন পাতা, তখন সে মনে মনে স্থির করে, সকল সমস্যার সমাধান করবার জন্যে ও সকলকে সুখী করবার জন্যে সে নারায়ণকেই বিবাহ করবে। কিন্তু নারায়ণ নিজেই করে দিল সব ভণ্ডুল। নারায়ণের প্রশ্নের উত্তরে কমল যখন জানাল, তার ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসের নায়িকা পঙ্কজ—যে তার বান্ধবী নীলুর জন্যে চরম স্বার্থ-ত্যাগ করেছে—শেষ পর্যন্ত একজন হৃদয়বান পুরুষকে বিবাহ করে সকল অশান্তির শেষ করবে বলে ভেবেছে, তখন নারায়ণ এ সম্পর্কে দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে অভিমত প্রকাশ করে যে, পঙ্কজের মতো আদর্শ চরিত্র এই ধরনের বিবাহ করে নিজেকে ভ্রষ্টা করতে পারে না এবং এর পরিবর্তে তার যোগ্য কাজ হবে নিজের আত্মবিসর্জন দেওয়া। কমল নারায়ণের অভিমতকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও শিল্প-

অন্ধ অতীত/উত্তম-সুপ্রি

সম্ভত বলে মেনে নিল এবং আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাসটি শেষ করার সংগে সংগে নিজের জীবনকেও শেষ করল একটির পর একটি করে এগারোটি ঘুমের বড়ি গলাধঃকরণ করে।

ভারতীয় ছায়াচিত্রে এই ধরনের পরিণতি-বাঞ্ছিত কাহিনীর রূপদান নিশ্চয়ই দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক এবং সেই কারণে অভিনব। এর ওপর ছবিটিতে নেই কোনো ভিলেন, নেই কোনো খুনোখুনি, মারামারি বা বুলেটের আঘাতে রক্তারক্তির উত্তেজক লোমহর্ষক দৃশ্য। বরং ভাব-প্রবণতার মাত্রাধিক্য হলেও এতে আছে চমৎকার সংলাপে ভরা একাধিক হৃদয়-সংবেদনশীল নাটকীয় দৃশ্য, যা সকল পর্যায়ের দর্শককেই করবে খুশীতে ভরপুর। কে. বালচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে গুলজার যে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, তাতে কমলকে গুপ্তবাড়ী ত্যাগ থেকে বিরত করবার জন্যে জগুদিকে ছেলেমেয়েকে আমদানী না করলে এবং শেষের আত্মহত্যামূলক দৃশ্যটিকে অযথা ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘায়িত না করলে আমরাই যে অকুণ্ঠ প্রশংসা করবার সুযোগ পেতুম, শুধু তাই নয়, ছবিটিরও ঢের বেশী শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকত।

অতিশয্য এবং অবাস্তবতার ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা 'হুরজিৎ' ছবিটিকে এবং সেই সংগে এর প্রযোজক, পরিচালক ও সংগঠনকারীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে, সস্তা নাচগান ও প্রতিহিংসার উত্তেজক দৃশ্যসংবলিত আধুনিক হিন্দী ছবির রাজ্যে যে-প্রেম প্রতিদান চায় না, এমন একটি স্বর্গীয় প্রেম ছবিটির মাধ্যমে রূপলাভ করেছে।

হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে নবাগতাদের মধ্যে 'উর্বশী' পুরস্কারপ্রাপ্তা রেহানা সুলতান যে নাট্যনৈপুণ্যগুণে নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা, তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন হচ্ছে এই ছবিতে নায়িকা কমলের ভূমিকায় তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত অভিনয়। দুই বিরুদ্ধ ভাবাবেগের যে সংঘাত অভিব্যক্তি তিনি বারংবার প্রকাশ করেছেন, তার তুলনা নেই। চোখে জল, মুখে হাসির রেখা, কম্পমান ওষ্ঠাধর কমলের হৃদয়কে যে কি আশ্চর্যভাবে দর্শকদের সামনে উদ্ঘাটিত করে, তা মুখের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, স্বচক্ষে দেখে উপলব্ধি করতে হয়। শ্রীমতী রেহানার প্রায় পুরুগম্ভীর অভিনয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছেন মেহমুদ, আধুনিক নারদরূপী নারায়ণের ভূমিকায়। রাধার বাবা 'হাউজ-ওনার' বেশী ধুমলকে যখন নারায়ণ সম্পর্কে অশোকের জন্যে রাধা গৃহত্যাগ করতে পারে, এই হৃদয়বিদারক সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করছিলেন, তখন তাঁর মুখের সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে ট্রেনের আওয়াজ, বন্দুকের গুবড়ীর আওয়াজ প্রভৃতি এবং ব্যানরক্ষিক অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁরই দ্বারা সম্ভব। আবার ছবির শেষভাগে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যায় উন্মুখ কমলের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনযোগে কথাবার্তার ঐকান্তিকতাও মেহমুদের সর্বাত্মক নাট্যপ্রতিভার পরিচায়ক।

আর একজন শিল্পী আমাদের বিস্মিত করেছেন এই ছবিতে। তিনি হচ্ছেন মুদক্ক পুরী। সাধারণত কুট ও খল চরিত্রের অভিনয়কারী এই শিল্পীটি নায়কের স্নেহময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা মধুসূদন গুপ্তের সহানুভূতিপ্রবণ ও হৃদয়বান রূপটিকে এমন স্বচ্ছন্দ ও হৃদয়গ্রাহীভাবে পরিস্ফুট করেছেন, যাকে আমরা বাহবা না দিয়ে পারি না। বিশেষ করে যেখানে রাত্রির অন্ধকারে গৃহত্যাগোদ্যত কমলকে তিনি ছোট বোনরূপে সম্বোধন করে তার পালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার অসারতাকে প্রতিপন্ন করছেন, সেখানে তাঁর সংলাপ বলার ভঙ্গী স্মরণীয়। নায়ক অশোক এবং তার প্রেমাস্পদা-স্ত্রীর ভূমিকায় যথাক্রমে অনিল ধাওয়ান ও রাধা সালুজা অসাধারণ কোনো অভিনয়নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পাননি বলেই চরিত্র দুটি সাধারণ পর্যায়ের ওপরে উঠতে পারেনি। 'হাউজ-ওনার'-বেশে ধুমল তাঁর চরিত্রোচিত উপভোগ্যতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। মাসিকপত্র-সম্পাদিকা অরুণা দেবীর চরিত্রে কামিনী কৌশল একটি মিষ্ট ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চপ্রশংসনীয়। বিশেষ করে চিত্রগ্রহণে ক্যামেরা মুভমেণ্ট ছবিকে করেছে গতিশীল। এ বিষয়ে সম্পাদকের সাহায্যও কম নয়। শব্দানুলেখনের কাজ যেমন নিখুঁত, তেমনই গোলাব সিনেমার শব্দ-প্রক্ষেপ। ছবিতে চারখানি গান আছে। আনন্দ বক্সী রচিত প্রতিটি গানই ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে সুন্দর। আর তেমনই আশ্চর্য সুরযোজনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। 'ইয়ে সচ হায়, নহী স্বপ্না হায়', 'উত্তনে দিন তুম কহাঁ রহে' এবং 'তু বড়ী কিস্মৎওয়ালী হায়'—গান তিনখানি বারংবার শোনবার মতো।

পৃথ্বী পিকচার্স নিবেদিত, এন-এন-সিপ্পি প্রযোজিত, সি-পি-দীক্ষিত পরিচালিত এবং রেহানা সুলতানের অভিনয়-সমৃদ্ধ 'হারজিৎ' হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় সংযোজন।

ভারত সরকারের সঙ্গীত ও নাটক এবং পশ্চিমবঙ্গ

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীনে 'সংগীত ও নাটক' বিভাগ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী এর জন্ম হয় ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের লোকের সামনে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প ও যোজনাগুলির সার্থকতা তুলে ধরাই এই বিভাগের প্রধান কর্তব্য। এ-ছাড়াও আমাদের জওয়ানদের মধ্যে প্রমোদ বিতরণ করা, ভারতীয় সীমান্তবাসীদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে মতবাদ গড়ে তোলা, ভারতের মঞ্চশিল্পীদের উৎসাহিত করা, বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্যপুষ্ট করা প্রভৃতি অপরাপর কর্তব্যও এর আছে।

এই সংগীত ও নাটক বিভাগ-এর প্রধান কেন্দ্র দিল্লীতে অবস্থিত। এখানে আছে তিনটি নাটকে দল ও ন'টি এ-এফ-ই-ডবল্যু (দৈনিক প্রমোদ বিভাগীয় দল)। সমগ্র ভারতের ন'টি জায়গায় এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়েছে :

(১) নৈনিতাল, (২) পুনা, (৩) দ্বারভাংগা, (৪) হায়দ্রাবাদ, (৫) শ্রীনগর, (৬) ভুবনেশ্বর, (৭) গোহাটি, (৮) ইম্ফল ও (৯) যোধপুর।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যে-রাজ্যে সবচেয়ে বেশী নাটকের ও নাট্য-আন্দোলনের প্রসার, সেই পশ্চিমবঙ্গেই এই প্রতিষ্ঠানের কোনও শাখা নেই। কলকাতায় একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে বটে, কিন্তু এই বিভাগের অধীনে একটিও নাটকে দল বা সৈনিক প্রমোদ বিভাগীয় দল নেই। এ-ছাড়া কোনো কোনো রাজ্যে যখন ন' লক্ষ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ আছে, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে মঞ্জুরীকৃত অর্থ মাত্র এক লক্ষ বা তারও কম।

আমাদের জিজ্ঞাসা, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এমন বিমাতৃসুলভ আচরণ কেন? প্রতিষ্ঠানের ডিরেকটার কর্নেল এইচ, ডি, গুপ্ত এ-সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করবেন কি?

দুর্বার যৌবন

যৌবন বাধা মানে না, সে নায়েগ্রা জল-প্রপাতের মতোই সামনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে দুর্বারগতিতে ধাবিত হয় অভীষ্ট সিদ্ধির পথে—এই বক্তব্যই ধ্বনিত হয়েছে রাজেন্দ্রকুমার নিবেদিত, রমেশ বেহেল প্রযোজিত ও [illegible]

দৃশ্যাংশ/অনিল ধাওয়ান ও রাধা সলুজা

চালিত রোজ মুভী-এর 'জওয়ানী দিওয়ানী' ছবির মাধ্যমে।

যে-ঠাকুরসাহেবের ছোট বোন মধুকে তাঁর অমতে বিবাহ করার দরুণ রবি আনন্দ তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিল, কুড়ি বছর পরে তাঁরই আদরিণী কন্যা নীতাকে ভালোবেসে ফেলল রবির ছোটভাই বিজয়। দুজনেই একই কলেজের একই ক্লাশে পড়ে। বিজয়ের দুর্বার প্রেমে নীতা রীতিমত অভিভূত। সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অন্যমনস্কতার জন্যে বিজয় প্রতি পদে লাঞ্ছিত হয়। সে দোষ স্বীকার করে এক কথাতেই। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার অন্যায় করে বসে। সত্য গোপন করবার জন্যে সে ঠাকুর সাহেবের সামনে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে। তিন তিনজন লোক তার বাবা সেজে তাঁর সম্মুখীন হয় কয়েক মিনিটের ব্যবধানে। মেয়েকে বন্দী করেন ঠাকুর সাহেব, ভাইকে বন্দী করেন রবি আনন্দ। কিন্তু উভয়েই নিজেদের পালাবার পথ করে নেয়। এবং দুজনে এক নির্জন স্থানে প্রেমের স্বর্গ সৃষ্টি করে। কিন্তু নিস্তার নেই। একদিকে ছেলের দাদা ও মেয়ের বাবা, অপরদিকে ছেলের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী, তারই ক্লাশের সহপাঠী—ওদের জীবনকে করে তুলল অতিষ্ঠ। বিজয় হল আহত। এর পরেই অনুশোচনার পালা। ঠাকুর সাহেব অনুতপ্ত, বিজয়ের দাদা বোম্বে হাই-কোর্টের অ্যাডভোকেট রবি আনন্দও কম অনুতপ্ত নয়। অতএব প্রেমের পথকে ছেড়ে দিতে হল—বিজয় ও নীতার হল মিলন উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে।

প্রেম, বিরোধ, প্রতিহিংসা এবং হানা-হানির অধুনা অনুসৃত বোম্বাইয়া ধারার ছবি হচ্ছে 'জওয়ানী দিওয়ানী' এবং এরই নায়ক-নায়িকা, বিজয় ও নীতার চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন, রণধীর কাপুর ও জয়া ভাদুড়ী। রণধীর কাপুর, সকলেই জানেন, রাজ কাপুরের বড়ো ছেলে এবং সদ্য-পরলোকগত পৃথ্বীরাজ কাপুরের নাতি। স্বপ্নালু চোখ দুটি নিয়ে শ্রীমান রণধীর যে-ভঙ্গিমার সঙ্গে ক্যামেরার সামনে নিজেকে প্রকট করেন, তা তাঁর একান্ত নিজস্ব এবং তাকে অভিনয় বললে ভুল হবে। কিন্তু জয়া ভাদুড়ী নীতার চরিত্রে তাঁর স্বাভাবিক নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশের কোনোই সুযোগ পাননি। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন চরিত্রটিতে প্রাণের সঞ্চার করতে। নায়কের দাদা রবি আনন্দর ভূমিকায় বলরাজ সাহনী স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন, যেমন করেছেন ইফতেকার ঠাকুর সাহেব চরিত্রটিতে। নিরুপা রায়ের মধু বৌদি অল্পের মধ্যে সুন্দর। বিজয়ের ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অপরাপর চরিত্রের অভিনয় যথাযথ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। আনন্দ বকসী লিখিত গানগুলিতে রাহুল দেববর্মণকৃত সুর-যোজনা উপভোগ্যতা সৃষ্টি করতে কার্পণ্য করেনি।

রোজ মুভীজ-এর কুজিকলায় রঞ্জিত ছবি 'জওয়ানী দিওয়ানী' সাধারণ দর্শক-দের কাছে উপভোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

স্টুডিও থেকে

ঘাটশীলার প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশে এবং সুবর্ণরেখা নদীর আশে-পাশে কয়েকদিন বহির্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করে নবাগত তরুণ পরিচালক নীতিশ মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি 'একদিন সূর্য'-র কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ছবির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ স্টুডিওর বাইরে গৃহীত হচ্ছে। আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী রচনা করেছেন সুনীল দাস। গল্পের শুরু : ছবির নায়ক একজন কমার্সিয়াল আর্টিস্ট এবং ফাইন আর্টের প্রতি একান্ত অনুরাগী। সে তার শিল্পের মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণতাকে অর্জন করতে চায়। পূর্ণতার প্রতিরূপ প্রেম যা জীবনের প্রতীক। নবাগত সৌম্য ভট্টাচার্য রূপদান করছেন ছবির নায়ক চরিত্রটি। নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন জয়শ্রী রায়।

ছবির অন্যান্য চরিত্রে নবাগত ও নবাগতাদের ভীড়। যেমন নন্দন মুখোপাধ্যায়, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, প্রবীর রায় ও তনুশ্রী বসু। চিত্রগ্রহণে আছেন—দীপক দাস এবং সম্পাদনায় গোবর্ধন অধিকারী।

গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর স্কোরিং থিয়েটারে এস. বি. এণ্টারপ্রাইজের 'রৌদ্রছায়া' ছবির সংগীত গ্রহণ করা হয় সংগীত পরিচালক সুকুমার মিত্রের সুরারোপে। সন্ধ্যা মুখার্জির কণ্ঠে প্রথম গানটি গৃহীত হয়। গানের প্রথম কটি লাইন—

না—যাবো—না
যাবো না ঘরে—মিছে আর পিছু ডাকিস না
যা যা মন রঙিলা পাখী
যা উড়ে ঐ দূরে
'আলোকে দু' চোখ ঢাকিস না—

দ্বিতীয় গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বনশ্রী সেনগুপ্ত। গানের প্রথম লাইন কটি: ছুম্ ছুম্ ছুম্ চমকে জিয়া
বিগারি সাজন পিয়া
নিরালা রাত একেলা পথ
আছি যে চাহিয়া—

অমিতাভ নাহা রচিত গানগুলি অপূর্ব সুরারোপ করেছেন সুকুমার মিত্র এবং শিল্পীদ্বয় গান দুটো গেয়েছেন একান্ত দরদ দিয়ে।

বিমল করের 'পিয়ারীলাল বাড়ি' অবলম্বনে রৌদ্রছায়া-র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—পীযূষ বসু এবং পরিচালনায় আছেন শচীন অধিকারী। গত মাসে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে ছবির চারদিনের চিত্রগ্রহণে উত্তমকুমার, অরুন্ধতী ভৌমিক, নির্মল ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, মন্মথ মুখার্জি প্রভৃতি শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন অনুপকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি, রসরাজ

চক্রবর্তী প্রভৃতি। এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে দ্বিতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হবে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত সংখ্যায় আপনাদের জানিয়েছি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীঋত্বিক ঘটক তাঁর পরবর্তী ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। ছবির নামকরণ করেছেন—'যুক্তি-তক্ক-আ-র গপ্প'।—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত যুক্তি-তর্ক-আর গল্প-নয়। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে পরিচালনা ও সংগীত পরিচালনা ছাড়াও ছবির প্রধান ভূমিকায় শ্রীঘটক অভিনয় করেছেন। অভিনেতা ও সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় শ্রীঘটকের কাছে বাঙলার চিত্ররসিকরা নতুন কিছু পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন। তাছাড়া ছবির অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা থাকবেন তাঁদের মধ্যে—তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য ও 'নয়া মিছিল'খ্যাত শাওলী মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের সাহায্যে ছবিটি নির্মিত হবে।

শেষ সংবাদ : প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু এক সাক্ষাৎকারে আমায় জানিয়েছেন : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু-বিতর্কিত উপন্যাস 'প্রজাপতি'র চিত্ররূপ জনৈক পরিচালকের পরিচালনাধীনে গৃহীত হবে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঐ উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব কাউকে বিক্রী করা হয়নি—খবরটা নিতান্তই আজগুবী।

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'ছায়ার মায়া' ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স' এক নম্বর স্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ছায়াছবির সঙ্গে যুক্ত ও কলাকুশলীদের নেপথ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের ওপর ভিত্তি করে কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। ছবিতে বাঙলা ছবির সঙ্গে যুক্ত অনেক শিল্পী ও কলা-কুশলীদের স্ব-স্ব ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। ছবির আসল নায়ক পিনাকী সেনগুপ্ত এবং তার বিপরীতে তিনজন নায়িকাকে দেখা যাবে। তাঁদের মধ্যে—জয়শ্রী রায়, উর্মিলা দে ও নবাগতা রূপা চৌধুরী অন্যতমা। পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় এ ছবিতে পরিচালকের ভূমিকাটি রূপায়িত করছেন। ছবির অতিথি শিল্পীদের তালিকাটি বিরাট। তার মধ্যে—উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নবজাত প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে নির্মিত ছবির সুরারোপের দায়িত্ব বহন করছেন—ডাঃ নচিকেতা ঘোষ।

মুক্তি প্রতীক্ষায় : চিঠি : ডাঃ আর, এল, গুপ্ত প্রযোজিত মণীষা আর্ট ইণ্টার-ন্যাশনাল নিবেদিত 'চিঠি' ছবির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে বর্তমানে এডিটিং টেবিলে।

নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিটিতে সুর-সংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কণ্ঠসংগীত শিল্পী—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র।

বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান সন্ধ্যা রায়, শমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, নীলোৎপল দে, শিউলি মুখোপাধ্যায়, জহর রায় ও অনুভা ঘোষ।

শেষ বিচার : পঞ্চশীল আর্ট ইণ্টার-ন্যাশনাল-এর প্রথম নিবেদন 'শেষ বিচার' ছবির কাজ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরি-চালনায় এগিয়ে চলেছে। সুখেন দাসের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির সংগীত-পরিচালক ও গীতিকাররূপে আছেন সুধীন দাশগুপ্ত। আলোকচিত্র, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর খাঁ ও অমিয় সরকার। কণ্ঠসংগীতে আরতি মুখো-পাধ্যায়। নায়িকা চরিত্রে রূপদান করছেন নবাগতা রীতা রায়। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে শ্যামল ঘোষাল, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার।

ডি, এস, সুলতানিয়ার পরবর্তীতে অগ্রদূত এবং উত্তমকুমার

প্রযোজক ডি, এস, সুলতানিয়া তাঁর পরবর্তী বাঙলা ছবির জন্যে পরিচালক-রূপে বিভূতি লাহা (অগ্রদূত) এবং নায়কের ভূমিকার জন্যে উত্তমকুমারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন।

মৃণাল সেন পরিচালিত 'কলিকাতা, ৭১' আসছে পূজোর সময়ে মুক্তিলাভ করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

অমৃতের স্বাদ/মাধবী চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও সমিত ভঞ্জ। পরিচালনা : পরিমল ভট্টাচার্য। ফটো : অমৃত

মঞ্চাভিনয়

আনন্দমের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' : অমৃতের সন্তান মানুষের চিরকালীন পূর্ণতার ছবি আঁকতে এক শিল্পী এসে আশ্রয় নিলেন একটি নির্জন পার্কের কোণে। চেনাজানা মানুষের কলকোলাহল থেকে দূরে সরে এসে এই সাধনাতেই তিনি ডুব দিলেন নিবিষ্ট মনে। ছবি আঁকা অনেকদূর হোল, কিন্তু শেষ ছোঁয়া দেওয়া গেল না. আচমকা ঝড়ের আঘাতে দীপ নিভে গেলো। প্রয়াস অসম্পূর্ণ হয়ে থাকলো। কিন্তু সমাপ্তির মুখে ধ্বনিত হোল তরুণকণ্ঠে 'শিল্পীর অমৃতস্য পুত্রাঃ সমাপ্ত করবো আমি।' চারদিকে আবার নতুন করে ধ্বনিত হয়ে উঠলো প্রাচীন ঋষির উদাত্ত সেই বাণী 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

এই গভীরতম বক্তব্যটি আশ্চর্য শৈল্পিক প্রাণময়তায় ভাষা পেয়েছে রতনকুমার ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নাটকে। সম্প্রতি বাকুড়ার সাংস্কৃতিক সংস্থা আনন্দম এই নাটকটিকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এই তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু যাত্রা শুরুতেই তাঁদের প্রয়াসে অনেক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি চিহ্নিত হয়েছে। নাটকটিকে মনোগ্রাহী করে তুলতে নির্দেশক বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা প্রশংসার দাবী নিশ্চয়ই রাখে।

শিল্পী 'সনাতনের' ভূমিকায় সন্তোষ কুণ্ডু চমৎকার অভিনয় করেছেন, তাঁর দৃঢ় একটি অভিব্যক্তি পরিণত মননের ছাপ বহন করে। পার্থ কুণ্ডুর 'সমন' ও সমর দত্তের তরুণও দুটি বৈশিষ্ট্যদীপ্ত চরিত্রচিত্রণ। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন কাবেরী বিশ্বাস, আশীষ সরকার, শান্তনু আইচ ভৌমিক, ইন্দুলাল রায়, অরুণাংশু কুণ্ডু, দীপক ঘোষ, স্বপন রায়, মিহির সরকার, অমিত মুখোপাধ্যায়, বকুল দাস, শম্পা আইচ ভৌমিক।

সকালের জন্য : রাতের অন্ধকার যতই বিষণ্ণ হোক, দুর্বিষহ হোক পরের দিন সকালে ঝলমল আলোর লাবণ্যে নতুন ছবি আঁকা হবেই। অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ—এ তো চিরন্তন সত্য, আর এই সত্যের প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে 'সকালের জন্য' নাটকের সংঘাত। অপূর্ব সংলাপসমৃদ্ধ এই নাটকটিকে কয়েকদিন আগে একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে পরিবেশন করলেন জে কে স্টীলের ফ্রেণ্ডস লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সন্তোষ সাঁপের নাম। শিল্পপতি 'রমণী সেনের' চরিত্রে অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শিপ্রা চক্রবর্তী, পান্নালাল নন্দী, খোকন মজুমদার, সনৎ লাহিড়ী, অলোকময় ঘোষ, অসিতবরণ স্যান্যাল, তন্ময় সেন।

নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দেন খোকন মজুমদার।

'জয়ানি'র 'সূর্যসন্ধান' : আজকের প্রশ্নমথিত সমাজের বহুবিধ সমস্যার পটভূমিকায় একটি বলিষ্ঠ বক্তব্যকে কেন্দ্র করে একটি স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত নাটক সেদিন মুক্ত অঙ্গনের মঞ্চে পরিবেশিত হোল। নাটকটির নাম, 'সূর্যসন্ধান'। প্রতাপ মুখোপাধ্যায় রচিত এই নাটকের বিভিন্ন মুখর মুহূর্তে বাস্তব জীবনের প্রতি একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণই ভাষা পেয়েছে। নাট্যকার স্বয়ং নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনার দায়িত্ব নেন, তাঁর প্রয়াসে শৈল্পিক নিষ্ঠার খুব একটা অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

তবে একটি কথা। সামগ্রিক অভিনয়ের গতিছন্দে মাঝে মাঝে শৈথিল্য চোখে পড়ায় নাটকটির প্রযোজনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। গতিহীনতাও মাঝে মাঝে হয়েছে প্রকট। ব্যক্তিগত অভিনয়ের ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন প্রখর মুখোপাধ্যায় (মাস্টারমশাই), শিলক চাকলানবীশ (শিশির) ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (সুদেষ্ণা)।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অধীর মুখোপাধ্যায়, বুলো সেনগুপ্ত, চিন্ময় কুমারী, নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অমরেশ দাস, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন সাহা, কমল ঘোষ, শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় দাশগুপ্ত, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জায় নাটকটির মেজাজটি ফুটে উঠেছে, কিন্তু ধ্বনিপ্রক্ষেপন হয়েছে যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ।

'অন্ধকারের বৃত্ত' : গংগাপদ বসুর 'অন্ধকারের বৃত্ত' নাটকটি কয়েকদিন আগে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। নাট্যনির্দেশনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখেন সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন হীরেন্দ্রকুমার বসু, অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ রায়, জয়ন্ত বসু, অজিত ঘোষ, রণজিৎ দাশ, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় চক্রবর্তী, সত্যেন রায়চৌধুরী, মণিমোহন দাস, রাধাশ্যাম সেন, রাধাবল্লভ দাস, জয়দেব সাহা, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, চিত্রিতা মণ্ডল, মেনকা দাস।

পাদপ্রদীপের নাট্যার্ঘ্য : বিগত ১০ জুন ১৯৭২ ম্যাকসমুলার ভবনে মধ্য কলিকাতার নাট্য সংস্থা 'পাদপ্রদীপ এর প্রযোজনায় দুটি একাংক নাটক—রতনকুমার ঘোষের 'পাপ-পুণ্য' এবং রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত হয়। 'পাপ-পুণ্য' নাটকে সর্বশ্রী চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য (অমল), জগদীশ দাস (বন্ধু), বিশ্বনাথ সান্তারা (গুবেল), সন্তু ঘোষ (দারোয়ান) এবং রত্না ভট্টাচার্য (শীলা) অভিনয় করেন। 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' নাটকটিতে সর্বশ্রী সন্তোষ ধরগুপ্ত (চাটুজ্যে), দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাঁড়ুজ্যে) এবং রত্না ভট্টাচার্য (ভবতারিণী) অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নাটকদুটি পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়। দুটি নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্যবর্তী সময়ে দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থ একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

মাঙ্গলিকের 'ঠাকুরদা' : সম্প্রতি মাঙ্গলিক শিশুশিল্পী গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' মঞ্চস্থ করেন বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে। অভিনয় গুণে নাটকটি সর্বজন প্রশংসিত। অভিনয়ের কথা বলতে

গেলে যে তিনজনের কথা সর্বপ্রথম মনে পড়ে তারা হল—ঠাকুরদাবেশী উদয়শংকর ব্যানার্জি, প্রজাপতি (ঘটক) বেশী শান্তিরঞ্জন সাহা ও শৈবালরূপী সুবীর রক্ষিত। এছাড়াও চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য—তাপস ব্যানার্জি, অশোক দাস, গৌতম কুণ্ডু, রবীন্দ্রনাথ বাকুলী, সমীর ঘোষ, বিবেকানন্দ রায়চৌধুরী, শংকর ঘোষ ও রীণা ভট্টাচার্য। নাটকটির সম্পাদনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্বেও ছিলেন পরিচালক স্বয়ং।

অস্থি দিয়ে অস্ত্র : তীর্থম নাট্যগোষ্ঠীর সংগীতসমৃদ্ধ নাটক 'অস্থি দিয়ে অস্ত্র' কয়েকদিন আগে অভিনীত হোল বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে। যাত্রাভিনয়ের রীতিতে পরিবেশিত এই নাটকে কয়েকটি চমকের সৃষ্টি করা হয়েছে। নাটকের বন্দনা হয়েছে যাত্রার ঢংএ গান দিয়ে। তারপর প্রযোজক এসেছেন মঞ্চের আলোয়। বলেছেন নায়ক অসুস্থ, সুতরাং অভিনয় বন্ধ থাকুক। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের দর্শক নাটক না দেখে ফিরে যেতে নারাজ। তাই নায়কের অনুপস্থিতিতেই নাটকের যাত্রা শুরু করতে হোল।

দুরন্ত বন্যায় জর্জরিত একটি পরিবারের মা ও মেয়ের বাঁচবার সংগ্রামের ভিত্তিতেই এ নাটক অগ্রগতির ভাষা পেয়েছে। বাঁচবার আশায় তারা এসে আশ্রয় নিলো এক ব্যবসায়ী পরিচালিত অসৎ আড্ডায়। সেখানে ছেলেমেয়েরা নানা অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু কেউই এ জীবনে সুখী নয়, সবাই চায় এই কপট জীবন থেকে মুক্তি। সমাপ্তির মুখে এই জীবনের শৃংখল মোচনও একদিন হোল।

সংঘাতসমৃদ্ধ এই নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় যারা মোটামুটি আকর্ষণীয় অভিনয় করেন, তাঁরা হোলেন বিজয় মুখোপাধ্যায়, দুর্লভ মুখোপাধ্যায়, বটা ভট্টাচার্য, গোবিন্দ মিত্র, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, রীণা ভট্টাচার্য, রণেন্দু ঘোষ। নাট্যনির্দেশনা ও সংগীতপরিচালনায় ছিলেন বটা ভট্টাচার্য ও তারকদাস রায়।

পাদপ্রদীপের দুটি একাংক : দুটি ভিন্নস্বাদের একাঙ্কিকা সম্প্রতি বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে মঞ্চস্থ হোল। নাটক দুটির নাম হোল 'সভ্যতার দূত' ও 'অনির্বাণ'। প্রযোজনা করলেন 'পাদপ্রদীপ' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা। প্রথম নাটকটি গড়ে উঠেছে ভিয়েৎনামের পটভূমিকায়, আর দ্বিতীয়টিতে ভাষা পেয়েছে সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা। সুজিত গুপ্তের স্বচ্ছন্দ নির্দেশনায় একাঙ্কিকা দুটি মঞ্চের আলোয় প্রাণবন্তই হয়ে ওঠে। এই প্রাণময়তায় শিল্পী হিসেবে যাঁরা ছন্দ মেলান তাঁরা হোলেন সুজিত গুপ্ত, স্বরূপ দত্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অসিত ভট্টাচার্য, প্রতিমা চন্দ, আরতি ঘোষ, মানস দত্তগুপ্ত ও হীরেন সোম।

মঞ্চপরিকল্পনা ও আবহসঙ্গীতেও বৈশিষ্ট্যের নজীর মেলে।

বিবিধ সংবাদ

নাট্যকারের স্মরণে নাট্যনিবেদন

গেল ২৭শে জুন তুলসী লাহিড়ীর ত্রয়োদশ তিরোধান দিবস পালন করলেন আর্ট থিয়েটারের সভাবৃন্দ স্থানীয় ক্ষুদিরাম মঞ্চে দুটি একাঙ্ক নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে। নাটক দুটি হল জতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবর থেকে বলছি' ও তুলসী লাহিড়ীর বহু অভিনীত নাটক 'মণিকাঞ্চন'। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন অনিল মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি দত্ত, মলিন রায়, স্নেহলতা ঘোষ, নিধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভজন দাশগুপ্ত; অনবদ্য অভিনয় করেছেন অমল ভট্টাচার্য ও মহুয়া দত্ত। পরিচালনায় ছিলেন সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বার্ষিক উৎসব

যাদবপুর নট-নৃত্য নিকেতন সম্প্রতি এক পরিচ্ছন্ন রম্য পরিবেশের মাঝে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে তাদের বার্ষিক উৎসব পালন করেন। অনুষ্ঠানে ঋতুরঙ্গ, শ্যামা, মণিপুরী, ভরতনাট্যম, কিসানম্যান, ঘোয়ান, তামাসা ইত্যাদি উপস্থিত দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। শিল্পীদের মধ্যে আরতি সেনগুপ্ত, অঞ্জু দাশগুপ্ত, শুক্লা সাহা, অঙ্কিতা বকসী, প্রীতিকণা ধর, সিপ্রা মিত্র, নেলী রায়চৌধুরী, ধূর্জটি সেন প্রমুখ দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন।

নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন অনিমেষ বকসী ও কবিতা বকসী।

বাৎসরিক উৎসব

২৫শে জুন 'আমরা কজন' নাট্যসংস্থার বাৎসরিক উৎসব এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব শ্রীরামপুরের দত্তপাড়াস্থিত 'মাতৃকুটীর'-এ বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশ্বনাথ দে-র 'প্রকাশকের সন্ধানে ছ'টি নাট্যকার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঘাড়োভূতে' এবং রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'আমায় বাঁচতে দাও' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হল। দলগত অভি-

নয়ের নিপুণতার জন্য নাটকগুলি দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। তপন গুপ্ত, সৌমেন মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ চক্রবর্তী, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ গুপ্ত এবং নিমাই প্রামাণিকের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নির্দেশনায় ছিলেন নিতাইচন্দ্র গুপ্ত। মঞ্জু ঘোষ, অজয় রক্ষিত, বঙ্কিম মারিক ও বিজয় দাস, গোপী চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব

পি এন্ড টি রিক্রিয়েশন ক্লাব ৫৭' ইউনিট 'রংগনা' মঞ্চে তাদের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অভিনেতা শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায়। মনোজ্ঞ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের আনন্দ দান করেন কণ্ঠশিল্পী সাগর সেন। আন্তঃ ইউনিট ক্রীড়া ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরিত হয় এই অনুষ্ঠানে। সর্বশেষে এই ইউনিট মঞ্চস্থ করেন পুষ্পল রচিত নাটক 'ধোঁয়া'। অভিনয়ের আগে প্রধান অতিথি নাটক সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ও তথ্যবহুল ভাষণ দেন। প্রথম প্রয়াস হিসেবে এই ইউনিটের নাটক প্রশংসার দাবী রাখে। সামগ্রিক অভিনয় সুন্দর। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মণি গঙ্গোপাধ্যায়।

চেকোশ্লোভাক জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান

একাডেমী অফ ফাইন আর্টস হলে চেকোশ্লোভাক জাতীয় দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ভারত-চেকোশ্লোভাক সংস্কৃতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ উভয় দেশের সাংস্কৃতিক গতি ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ যে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রতি ভারতের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। এমনকি সমাজতান্ত্রিক প্রগতির পথে আজও উভয়দেশ পরস্পরের সহযোগী।

পূর্ত ও গৃহনির্মাণ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ সারোগী তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি ভারতের জনগণের গভীর আগ্রহ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী ডেপুটি হাই-কমিশনার আব্দুল মোমিন চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ ও সরকারের আন্তরিক সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সোভিয়েট কনসাল জেনারেল ইজভ এবং ডঃ এ এম ও গনি, এম-এল-এ ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জি ডি আর-এর কনসাল রুনো মাই, অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল, কবি মণীন্দ্র রায় প্রভৃতি। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সুনীল কর বিশিষ্ট অতিথি ও অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে শ্রীমতী বন্দনা সেনের কত্থক নাচ ও বাণী ঠাকুরের রবীন্দ্র সংগীত শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দেয়।

ছায়াতীর/মাধবী চক্রবর্তী

আর এম এস রিক্রিয়েশন ক্লাব: ২৫শে মে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে ভানু চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'আজকাল' নাটকটি অভিনয় করলেন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। দলগত অভিনয়ের গুণে নাটকটি বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন শঙ্কর সরকার ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। পরিতোষ গুহ, রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা দাস ও নীলমাধব কর্মকার অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। পরিচালনায় ছিলেন বিভূতি চট্টোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যা দূরীকরণ এবং উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কতদূর কি করতে পারেন, সে-সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল কলকাতায় আসছেন ৪ জুলাই। তারা ৫ ও ৬ জুলাই সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ করবেন এবং এই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁদের সুপারিশসম্বলিত রিপোর্ট পেশ করবেন। এই সমীক্ষক দলের তিনজন সদস্য হচ্ছেন: কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের সচিব শ্রী আর. সি. দত্ত (চেয়ারম্যান), ওই মন্ত্রকেরই যুগ্মসচিব শ্রী এম. এ. এস. রাজন (সদস্য) এবং ফিল্মস ডিভিসনের কন্ট্রোলার-কাম-চীফ প্রডিউসার শ্রী কে. এল. খান্ডপুর (সদস্য)।

কৃষ্টি গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা

কৃষ্টি গোষ্ঠী (শেওড়াফুলি, হুগলী) কর্তৃক প্রথম বার্ষিকী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (ক) সর্বসাধারণ বিভাগঃ প্রবন্ধ, গল্প বা ছোটগল্প, কবিতা বা মিনি কবিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, একক অভিনয়। (খ) কৈশোর বিভাগঃ (১৮ বৎসর পর্যন্ত) আবৃত্তি। (গ) শিশু বিভাগ। (১২ বৎসর পর্যন্ত) আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, রবীন্দ্রসংগীত। লেখা পাঠানো যোগাযোগের জন্য—সাংস্কৃতিক সম্পাদক—২৯নং এ পি আঢ্য লেন। শেওড়াফুলি। হুগলী। লেখা পাঠাবার ও যোগাযোগের শেষ তারিখ—১লা আগস্ট, ১৯৭২।

।।'সংস্কৃতি'র নজরুল জন্ম-জয়ন্তী।।

ঢাকাপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতি-এর পরিচ্ছন্ন-রুচিশীল ও ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মাঝে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালন করেন। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন নিমাই মান্না। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বশ্রী দীপান্বিতা মান্না, কুহু মান্না, সমর পাত্র, সুধা মান্না, শিখা মান্না, রণজিৎ দোয়ারী, দিলীপ মান্না, অশোক কোলে, অরূপ মান্না ও আরও অনেকে। সভাপতির ভাষণে শ্রীমান্না নজরুলের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেন।

কল্যাণী ই-এস-আই ক্লাব পরিচালিত রবীন্দ্রজয়ন্তী: কল্যাণী ই-এস-আই ইলেভেন ক্লাবের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এক বিচিত্রানুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই আসরে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক বীরেন্দ্রমোহন আচার্য ও প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক মৌমাছি (বিমল ঘোষ)। রবীন্দ্রসংগীত ও আবৃত্তি ছাড়াও ক্লাবের সভ্যদের 'ডাকঘর' নাটকাভিনয় সুধীদের প্রশংসা অর্জন করে। এই দিনটিতেই শ্রীবিমল ঘোষ উক্ত ক্লাব পরিচালিত নির্মল স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করেন।

খেলাধুলা

দর্শক

নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রিজ

নটিংহামের ট্রেন্টব্রিজ মাঠে আগামী ১২ই জুলাই থেকে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭২ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ৩য় টেস্ট খেলা শুরু হবে। বর্তমান টেস্ট সিরিজের ১ম টেস্টে ইংল্যান্ড এবং ২য় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়ে সমান অবস্থায় এখন তারা টেন্টব্রিজের ৩য় টেস্টের আসরে খেলতে নামবে। সুতরাং এই ৩য় টেস্ট উভয় দলেরই কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূত্রেই ট্রেন্টব্রিজ মাঠে টেস্ট খেলার উদ্বোধন হয় ১৮৯৯ সালের ১লা জুন। এই মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার এপর্যন্ত যে এগারটি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৩, ইংল্যান্ডের জয় ২ এবং ড্র ৬। ১৯২৬ সালের টেস্ট খেলা বৃষ্টির জন্যে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। মাত্র ৫০ মিনিট খেলা সম্ভব হয়েছিল। ইংল্যান্ড এই সময়ে কোন উইকেট না খুইয়ে ৩২ রান তুলেছিল।

নটিংহামের ট্রেন্টব্রিজ মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে এগারটি খেলা হয়েছে তার মধ্যে ১৯৩৮ সালের টেস্ট খেলাটি বিবিধ বিশ্ব রেকর্ড এবং নানা ঘটনাবৈচিত্র্যে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

নটিংহামের টেন্টব্রিজ মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এপর্যন্ত যে ১১টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে তারই উল্লেখযোগ্য রেকর্ড নীচে দেওয়া হল :

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ৬৫৮ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে:), ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া : ৫০৯ রান, ১৯৪৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ইংল্যান্ড : ১১২ রান, ১৯২১

অস্ট্রেলিয়া : ১৪৪ রান, ১৯৩০

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ২১৬ রান*—এডওয়ার্ড পেন্টার, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া : ২৩২ রান— স্ট্যানলি ম্যাককেব ১৯৩৮

* নট আউট

মোট রান

ইংল্যান্ড : ৪৫৮৪ রান (১৫৯ উই:)

অস্ট্রেলিয়া : ৪৫৭২ রান (১৫৯ উই:)

সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া ৭টি : ইংল্যান্ড ৬টি

নটিংহামের টেন্টব্রিজ মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় প্রথম সেঞ্চুরী করেন ইংল্যান্ডের আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল ম্যাকলারেন—(১৪০ রান, ১৯০৫ সালে)। এই মাঠে এই দুই দেশের টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে শেষ সেঞ্চুরী করেছেন ডেনিস কম্পটন (১৮৪ রান, ১৯৪৮ সালে)।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী করেন ডন ব্র্যাডম্যান (১৩১ রান, ১৯৩০ সালে)। এবং শেষ সেঞ্চুরী করেছেন লিন্ডসে হ্যাসেট (১১৫ রান, ১৯৫৩ সালে)।

ইংল্যান্ড (৬টি সেঞ্চুরী)—

ডেনিস কম্পটন (২টি) : ১০২ রান (১৯৩৮ সালে) এবং ১৮৪ রান (১৯৪৮ সালে); এ সি ম্যাকলারেন ১৪০ রান (১৯০৫ সালে); লেন হাটন ১০০ রান (১৯৩৮ সালে); ই পেন্টার নট আউট ২১৬ রান (১৯৩৮ সালে); সি জে বার্নেট ১২৬ রান (১৯৩৮ সালে)।

অস্ট্রেলিয়া (৭টি সেঞ্চুরী)

ডন ব্র্যাডম্যান (৩টি) : ১৩১ রান (১৯৩০ সালে), নট আউট ১৪৪ রান (১৯৩৮ সালে) ও ১৩৮ রান (১৯৪৮ সালে)।

লিন্ডসে হ্যাসেট (২টি) : ১৩৭ রান (১৯৪৮) ও ১১৫ রান (১৯৫৩ সালে)।

এস জে ম্যাককেব ২৩২ রান (১৯৩৮ সালে) এবং ডবলিউ ব্রাউন ১৩৩ রান (১৯৩৮ সালে)

টেস্টের প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ড : ১০২ রান ডেনিস কম্পটন (১৯৩৮ সালে) এবং ১০০ রান লেন হাটন (১৯৩৮ সালে)

দ্রষ্টব্য : ১৯৩৮ সালের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের খেলায় কম্পটন এবং হাটন তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেন।

টেস্ট খেলার ফলাফল

ইংল্যান্ডের জয় (২টি) :

১৯০৫ সালে ২১৩ রানে

১৯৩০ সালে ৯৩ রানে

অস্ট্রেলিয়ার জয় (৩টি) :

১৯২১ সালে ১০ উইকেটে

১৯৩৪ সালে ২৩৮ রানে

১৯৪৮ সালে ৮ উইকেটে

খেলা ড্র (৬টি) :

১৮৯৯, ১৯২৬, ১৯৩৮, ১৯৫৩, ১৯৫৬ ও ১৯৬৪ সালে।

১৯৩৮ সালের খেলা

১৯৩৮ সালের ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠের অমীমাংসিত প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে ৬৫৮ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে:) এবং অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে ৪১১ রান ও ২য় ইনিংসে ৪২৭ রান (৬ উইকেটে ডিক্লে:)—এইভাবে একটি টেস্ট খেলায় প্রতি ইনিংসে চারশতের বেশী রান হওয়ার নজির ইংল্যান্ডের মাটিতে এই প্রথম। এই খেলায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে চারজনের ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রথম নজির (এই বিশ্বরেকর্ড ১৯৫৫ সালে ভেঙেছে)। এই টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী ছিল মোট ৭টা—ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে ৪টে এবং অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে ১টা ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২টো সেঞ্চুরী। একটা টেস্ট খেলায় ৭টা ব্যক্তিগত সেঞ্চুরীর নজিরও আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম এবং মাত্র দ্বিতীয়বার হয়েছে ১৯৫৫ সালের কিংস্টনে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলায় (অস্ট্রেলিয়া ৫টা সেঞ্চুরী এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২টো সেঞ্চুরী)। ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে ১ম উইকেটের জুটিতে বার্নেট ও হাটনের ২১৯ রান এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে পেন্টার ও কম্পটনের ২০৬ রান আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক ইনিংসে ২০০ রানের জুটির দুটি নজির এই প্রথম।

অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে ম্যাককেব ২২৫ মিনিটে যে 'ডাবল সেঞ্চুরী' করেন তা আজও আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরীর বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার ইতিহাসে প্রথম নজির হিসাবে গণ্য—(১) একই ইনিংসে দুজন খেলোয়াড়ের টেস্ট খেলায় প্রথম আবির্ভাবে লগ্নে সেঞ্চুরী (ইংল্যান্ডের হাটন ১০০ এবং কম্পটন ১০২ রান), (২) দুই দলেরই একজন করে খেলোয়াড়ের এক ইনিংসের খেলায় 'ডবল সেঞ্চুরী'—ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে পেন্টার (নট আউট ২১৬ রান) এবং অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে ম্যাককেব (২৩২ রান) এবং (৩) ৫ম উইকেটের জুটিতে পেন্টার এবং কম্পটনের ২০৬ রান (ইংল্যান্ডের পক্ষে ৫ম উইকেট জুটির রেকর্ড রান)।

১৯৩৮ সালে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে সি জে বার্নেট মাত্র এক রানের জন্যে লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। লাঞ্চের পর খেলার প্রথম বলেই তাঁর একশত রান পূর্ণ হয়।

৬৫৮ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে:), ১৯৩৮ : ইংল্যান্ডের এই ৬৫৮ রান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিণত হয়। অবিশ্যি ১৯৩৮ সালের ওভাল

সিরিজেরই ৪র্থ টেস্ট (ওভাল) ইংল্যাণ্ড ১ম ইনিংসে ৯০৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ) তুলে এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রানের যে বিশ্ব-রেকর্ড করে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এক ইনিংসে ৪টি সেঞ্চুরী : ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসে এই ৪টি সেঞ্চুরী করেন হাটন (১০০ রান), বার্নেট (১২৬ রান), পেণ্টার (নট-আউট ২১৬ রান) এবং কম্পটন (১০২ রান), ১৯৩৮ সাল (তৎকালীন বিশ্ব-রেকর্ড)। বর্তমানের বিশ্ব-রেকর্ড ৫টি (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৫৫।

একটি খেলায় ৭টি সেঞ্চুরী : ইংল্যাণ্ড ৪টি এবং অস্ট্রেলিয়া ৩টি সেঞ্চুরী, ১৯৩৮ সাল (বিশ্ব-রেকর্ড)। এই বিশ্ব-রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি হয়েছে ১৯৫৫ সালের কিংস্টনে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলায়—অস্ট্রেলিয়া ৫টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২টি সেঞ্চুরী।

একটি খেলায় দুটি ডবল সেঞ্চুরী (প্রতি দলের একটি করে) : ২১৬ নট আউট—ই পেণ্টার (ইংল্যাণ্ড) এবং ২৩২ রান—এস জে ম্যাককেব (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৩৮ সাল।

এক ইনিংসের খেলায় দুটি ২০০ রানের জুটি : ইংল্যাণ্ডের ১ম উইকেটের জুটিতে ২১৯ রান (বার্নেট এবং হাটন) এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে ২০৬ রান (পেণ্টার এবং কম্পটন), ১৯৩৮ সাল।

প্রথম আবির্ভাবে এক ইনিংসে দুজনের সেঞ্চুরী : ইংল্যাণ্ডের লেন হাটন (১০০ রান) এবং ডেনিস কম্পটন (১০২ রান) তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে ১৯৩৮ সালের ১ম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭২ সালের আন্তর্জাতিক উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার বরাদ্দ দু' সপ্তাহের খেলার মধ্যে প্রথম সপ্তাহের খেলা শেষ হয়েছে। এ-বছরে বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার খেলোয়াড়রা যোগদান না করায় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কমেনি, বরং গত বছরের তুলনায় দর্শক-সংখ্যা বেড়েছে। এ-বছরের প্রথম সপ্তাহে ১৬৮,১৫০ জন দর্শক টিকিট কিনে খেলা দেখেছেন—গত বছরের প্রথম সপ্তাহের তুলনায় ৪৫০ জন বেশী।

বর্তমানে পুরুষ এবং মহিলাদের সিংগলস খেলা কোয়ার্টার-ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পুরুষদের সিংগলসের ৮ জন বাছাই খেলোয়াড়ের মধ্যে এই পাঁচজন খেলোয়াড় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন—১নং বাছাই স্টান স্মিথ (আমেরিকা), ২নং বাছাই ইলি নাসতাসে (রুমানিয়া), ৩নং বাছাই ম্যানুয়েল ওরানতেস (স্পেন), ৫নং বাছাই কোডেস (চেকোশ্লোভাকিয়া) এবং ৮নং বাছাই মেট্রেভেলি (রাশিয়া)। অপরদিকে মহিলাদের সিংগলসের ৮ জন বাছাই খেলোয়াড়দের মধ্যে ৭জন বাছাই খেলোয়াড় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন ১নং বাছাই গুলাগং (অস্ট্রেলিয়া), ২নং বাছাই বিলি জিন কিং (আমেরিকা), ৩নং বাছাই গার্টার (আমেরিকা), ৪নং বাছাই এভার্ট (আমেরিকা), ৬নং বাছাই ক্যাসলস (আমেরিকা), ৭নং ওয়েড (বৃটেন) এবং ৮নং বাছাই দুর (ফ্রান্স)। মেয়েদের সিংগলসের কোয়ার্টার ফাইনালে ৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আমেরিকার ৫জন এবং অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্সের একজন করে খেলোয়াড় উঠেছেন।

এ বছরের প্রতিযোগিতায় যে চারজন ভারতীয় খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় হেরেছেন জয়দীপ মুখার্জি এবং আনন্দ অমৃতরাজ। অপরদিকে প্রেমজিৎ লাল এবং বিজয় অমৃতরাজ ২য় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন। পুরুষদের ডাবলসের খেলায় প্রেমজিৎলাল এবং জয়দীপ মুখার্জি জুটী ৩য় রাউণ্ডে খেলে পরাজিত হন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ২৬—১লা জুলাই) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের যে ১৫টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ৯ এবং খেলা ড্র ৬।

আলোচ্য সপ্তাহে মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রদর্শনী খেলা ১-১ গোলে ড্র যাওয়াতে মোহনবাগান একটি অতি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করে লীগ তালিকায় এক ধাপ নীচে নেমে গেছে। ইতিপূর্বে তারা উয়াড়ীর সংগে খেলা ড্র করে এক পয়েন্ট নষ্ট করেছিল। বর্তমানে মোহনবাগানের অবস্থা—১৩টা খেলায় ২৩ পয়েন্ট। অপরদিকে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ১২টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সঙ্গে বর্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষদেশে উঠে গেছে। গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা তেরটা খেলায় ২১ পয়েন্ট।

ডেভিস কাপ

১৯৭২ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন জোনের খেলা ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে খেলবে রুমানিয়া এবং রাশিয়া। সেমি-ফাইনালে রুমানিয়া ৪—১ খেলায় ইতালী এবং রাশিয়া ৪—১ খেলায় পোল্যাণ্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। এই জোনের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে উঠেছে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং স্পেন। সেমি-ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ৩—২ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে ফাইনালে স্পেনের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

আমেরিকান জোনের ফাইনালে উঠেছে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকা এবং চিলি। সেমি-ফাইনালে আমেরিকা ৫—০ খেলায় মেক্সিকোকে হারিয়েছে।

এম,ও পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১১ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 14th July, 1972 শুক্রবার, ৩০ আষাঢ়, ১৩৭৯ .52 Paise

'এক নজরে'

রানীর জাহাজ : ইংলণ্ডেশ্বরী রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁর প্রপিতামহী মহারানী ভিকটোরিয়ার মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সার্বভৌমত্বের মর্যাদা ত সে কারণে হ্রাস পেয়ে যায়নি। তাই প্রজাপুঞ্জ তাঁর বিরুদ্ধে বারবার অবস্থা বুঝে না চলার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলেও রানী সেসব ছোট কথা কানে তোলেননি। সম্প্রতি রানীর ব্যক্তিগত প্রমোদতরণী 'বৃটানিয়া'র মেরামত ও আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে যাতে ব্যয় হবে ৪৪ লক্ষ ২০ হাজার ডলার, অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি বারো লক্ষ টাকা। পাঁচ হাজার টনের ঐ জাহাজটি ১৮ বছর আগে যখন নির্মিত হয় তখন মোট খরচ পড়েছিল তিন কোটি ৬৪ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৮ বছর আগের দুনিয়ায় আজকের বিজ্ঞান ও গবেষণালব্ধ সুখসাচ্ছন্দ্য ও বিলাস প্রায় সম্পূর্ণই অজ্ঞাত ছিল। সে কারণে ঐ প্রমোদতরণীটি, যাতে চেপে রানী প্রায়ই সপরিবারে বিশ্ব পরিক্রমায় যান তাকে প্রায় সেকেলেই বলা যায়। তাই আরও কিঞ্চিদধিক তিন কোটি টাকা ব্যয় করে বৃটানিয়াকে সুসজ্জিত ও আধুনিক করা হচ্ছে। এতে জাহাজটির আয়ুও অন্তত ১৮ বছর বাড়বে বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু একদা বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যমণি এবং অধুনা ক্ষুদ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জনগণ এখন পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে চাইছে। তাই বৃটেনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ব্যাপারটার মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, রানীর শুধু প্রমোদবিহারের জন্য একটি ত্রিশ কোটি টাকা দামের জাহাজ থাকার দরকার কি?

সম্রাটের জয়যাত্রা : দু হাজার বছর ধরে যে সূর্যবংশীয় রাজ পরিবারের সন্তানেরা অবিচ্ছিন্ন ধারায় জাপানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আসছেন তার সর্বশেষ ও বর্তমান সম্রাট হিরোহিতো গত ২৩শে জুন একটানা ১৬,৬১৯ দিন রাজ্য চালিয়ে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন। এই ৭১ বছর বয়স্ক সম্রাট ১৯২৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। জাপানের মতে, সেই দিন থেকে ঐ সূর্যোদয়ের দেশে শান্তির (শোয়া) যুগ সুরু হয়। ঐ শান্তির যুগ গত ২২শে জুন সম্রাটের পিতামহের মেইজি (আলো) যুগকে অতিক্রম করে। অর্থাৎ বর্তমান সম্রাটের পিতামহ যে একটানা ৪৫ বছর ১৯৩ দিন জাপানের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত থেকে সে দেশের সর্বাধিক স্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, পৌত্র হিরোহিতো গত ২৩শে জুন সে রেকর্ড ভঙ্গ করলেন। কিন্তু তাতে ১৮৬৭ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী জাপানের মেইজি যুগের ইতিহাস ম্লান হয়ে গেছে, একথা মনে করার অবশ্যই কোন কারণ নেই। কারণ মেইজি যুগ সত্যই ছিল জাপানের অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের যুগ। ঐ সময়েই জাপান সামন্তযুগীয় অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে বহির্বিশ্বের সংস্পর্শে আসে এবং কয়েক দশকের মধ্যেই জাপান বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

অবশ্য ঘটনাবৈচিত্র্যে ও জাপানের ভাগ্যের পতন অভ্যুত্থানের বিচারে সম্রাট হিরোহিতোর বিগত পঞ্চাশ বছরের শাসনও কম উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও স্বয়ং জাপ সম্রাটের ভূমিকা তাতে খুব প্রত্যক্ষ ছিল না। আর সে কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ভাগ্য বিপর্যয়ের পর সম্রাট হিরোহিতোকে প্রধানমন্ত্রী তোজোর মতো প্রাণ দিয়ে পরাজয়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি। এবং তিনি সত্যই ভাগ্যবান এই কারণে যে, সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানকে আবার তিনি বিশ্বের প্রথম চারটি দেশের অন্যতমরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলেন। সম্রাট হিরোহিতোর স্বাস্থ্য এখনও খুব ভাল এবং সম্রাট হওয়ার পর গত বছরই তিনি প্রথম জাপানের বাইরে গিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপের ছয়টি দেশ সফর করে আসেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সামনের বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবেন।

রাষ্ট্রদূতের বিপত্তি : ভূমধ্যসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস ১৯৬০ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই জেনন জি রোসাইডিজ রাষ্ট্রসংঘে ঐ রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে নিউইয়র্কে বাস করছেন। সম্প্রতি নিউইয়র্ক শহরে চুরি ছিনতাই মারামারি ইত্যাদি অবাঞ্ছিত ঘটনা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও মাঝে মাঝে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে বিপন্ন হওয়ায়, ঐ অবস্থার প্রতিকার করতে বিদেশি কূটনীতিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে তদারকির জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং প্রবীণতম কূটনীতিক রোসাইডিজ হন ঐ কমিটির চেয়ারম্যান। কিন্তু কদিন আগে ঐ রোসাইডিজই সস্ত্রীক সেন্ট্রাল পার্কে প্রাতঃভ্রমণকালে দুর্বৃত্তের কবলে পড়েন। দুর্বৃত্তরা ঐ ৭৭ বছরের বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ঘড়ি আংটি ও টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেয় এবং রোসাইডিজ দম্পতির পায়ের সব জুতো খুলে সেন্ট্রাল পার্কের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয়। ধস্তাধস্তির সময় শ্রীমতী রোসাইডিজের একটি আঙুল কেটে যায়। রাষ্ট্রসংঘে অবস্থানকারী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের অসুবিধা ও অস্বস্তির কথা অতিথিরাষ্ট্র আমেরিকাকে জানানোর কথা রাষ্ট্রদূত রোসাইডিজের, কিন্তু তিনি নিজের বিপত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। নিউইয়র্ক পুলিশের কাছেও তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে কোন বিবৃতি দেন নি। শুধু পুলিশ থেকে এইটুকু জানানো হয় যে, ঐ দম্পতির যেসব সামগ্রী খোয়া গেছে তার মধ্যে রাষ্ট্রদূতের ঘড়িটির দাম প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা এবং শ্রীমতী রোসাইডিজের বিয়ের আংটিটির দাম প্রায় হাজার টাকা। আর জুতোগুলো খুলে পুকুরে ফেলে দেওয়া সম্পর্কে পুলিশের ভাষ্য, আক্রান্ত ব্যক্তিরা যাতে সাহায্যের প্রত্যাশায় ছুটতে না পারেন তারই জন্য তাঁদের খালি পা করে দেওয়া হয়।

পদচিহ্ন : গয়ার মন্দিরে বিষ্ণুর পদচিহ্নের মতো প্রায় লক্ষ বছরের পুরানো একটি পায়ের ছাপ তানজানিয়ার ওলডুভাই পর্বতগুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তানজানিয়া সরকারের পক্ষ থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, কেনিয়ার খ্যাতনাম্নী নৃতত্ত্ববিদ শ্রীমতী মেরী লীকি ও তাঁর স্বামী লুই লীকি তানজানিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিন নানা নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পর গত জুন মাসের শেষে ঐ পদচিহ্নের সন্ধান পান। শ্রীমতী লীকি অপর এক বিবৃতিতে বলেছেন, পদচিহ্নটি একটি অল্প বয়সের বালকের এবং বাঁ পায়ের। অন্তত পক্ষে পাঁচ লক্ষ বছর আগের কোন মানবসন্তান, ঐ পায়ের ছাপটি ফেলে গেলেও তার আঙুলের দাগগুলি পর্যন্ত এখনও স্পষ্ট আছে। তিনি দাবি করেছেন, ঐ এলাকায় ব্যাপকভাবে উৎখনন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে অন্তত অর্ধ নিযুত বছর আগের মানুষের বহু রহস্যাবৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

আসামে ভাষার প্রশ্ন

মাতৃভাষা সকলেরই প্রিয়। ভাষার জন্য মানুষ কী করতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের জনসাধারণ। ভারতবর্ষেও ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবির পেছনে ছিল নিজ ভাষাভাষী জনসমষ্টির একসঙ্গে থাকবার এবং একইভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ লাভের আকাঙ্ক্ষা। মোটামুটিভাবে ভাষার ভিত্তিতে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলো পুনর্বিন্যস্ত হলেও, প্রত্যেক রাজ্যেই কিছু না কিছু ভাষাগত সংখ্যালঘু থেকে গেছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরুর অধিকার যেমন স্বীকৃত, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণও তেমনি তার পবিত্র কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পশ্চিমবাংলা মুখ্যত বঙ্গভাষী হলেও, দার্জিলিং জেলায় নেপালী ভাষীদের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। এই কারণে দার্জিলিং জেলায় নেপালীভাষা স্বীকৃত। সেখানকার নেপালী অধিবাসীরা নেপালী ভাষায় পড়াশোনা এবং কাজকর্ম চালাবার অধিকার নিয়েছেন। এটাই গণতন্ত্রের নিয়ম এবং এই নীতি অনুসরণ করলেই জাতীয় সংহতি এবং ভাষাগত মৈত্রী স্থাপন সম্ভব।

আমাদের প্রতিবেশী আসাম মুখ্যত অসমীয়াভাষী রাজ্য হলেও সেখানে কাছাড়, গোয়ালপাড়া জেলায় বাংলাভাষীদের সংখ্যা যথেষ্ট। এরা আসামের অধিবাসী, আসামই এদের জন্মভূমি, কর্মভূমি এবং সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল। আসামের ভাগ্যের সঙ্গে এদের ভাগ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অসমীয়াভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বা আনুগত্য এদের অন্য কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু মাতৃভাষার অধিকার তো কেউ ছাড়ে না, কোনো দেশেই ছাড়ে না। সুতরাং আসামের বাংলাভাষীরা যদি নিজেদের ভাষার দাবিতে বক্তব্য উপস্থিত করেন, তাকে অসমীয়া বিরোধী মনোভাব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি আসামের গৌহাটি ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার অস্বীকৃতির প্রতিবাদে কাছাড় জেলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মাতৃভাষার দাবিই ছিল এই ধর্মঘটের প্রেরণা। এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

এতকাল আসামের বাংলাভাষীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও পরীক্ষা দেবার যে সুযোগ ভোগ করে আসছিল, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সে অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আসাম সরকার অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পরামর্শ দেন। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সেই পরামর্শ মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু বাইরের চাপে সে সিদ্ধান্ত আবার তাঁদের পরিবর্তন করতে হয়। তার ফলে অসমীয়া অথবা ইংরেজি ছাড়া বাংলাভাষীরা নিজেদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে না। স্বভাবতই এতে বিক্ষোভ জাগবে এবং আসামের, বিশেষ করে কাছাড়ের বাংলাভাষীরা গণতান্ত্রিক উপায়ে তাঁদের বিক্ষোভ জানিয়েছেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, এই কাছাড়ের বাংলাভাষীরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৬১ সালে প্রাণ দিয়েছিল। সেই আত্মত্যাগ বাংলাভাষীরা ভুলতে পারেন না, ভোলা উচিত নয়। আসামে অসমীয়া ভাষার অগ্রাধিকার নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলছেন না। আসামের বাংলাভাষীরা অসমীয়া ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অনেকেই এই ভাষা জানেন। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠি তাঁদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করবার অধিকার কেন পাবেন না? যদি দু-একজন ছাত্র থাকত তাহলে এ প্রশ্ন উঠতই না। বিপুলসংখ্যক ভাষাগত সংখ্যালঘু পরীক্ষার্থীদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা অযৌক্তিক এবং অন্যায়।

বাংলা ও আসাম পরস্পরের নিকটতম প্রতিবেশী। আসামের উন্নয়নে বাংলাভাষীদের দান কম নয়। অসমীয়াভাষী এবং বাংলাভাষীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই রাজ্য উন্নতির পথে অগ্রসরমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাভাষীদের অধিকারহরণ খুবই দুঃখের। এর দ্বারা সার্বিক প্রগতি ও জাতীয় সংহতির প্রয়াস রুদ্ধ হবার আশঙ্কা। আসামের কল্যাণকামী হিসাবে আমরা আসাম সরকার ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুরোধ করব আসামের বাংলাভাষীদের এই ন্যায্য দাবি স্বীকার করে নিতে। এর দ্বারা অসমীয়া ভাষার ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা তো নেই-ই, বরং বাংলা ও অসমীয়া দুই সহোদরার মত পরস্পরের সঙ্গে প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন আসাম গড়ে তোলার কাজে সাংস্কৃতিক জগতে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করবে।

পটভূমি

যতোই আমরা গালমন্দ করি না কেন, রাজনীতি থেকে সুবিধাবাদকে সত্যিই কি বাদ দেওয়া যায়? ছোট দলের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, বড় বড় কত দলকেও তো আমরা দেখি সুবিধে বুঝে রং বদলাতে, জোট বাঁধতে—ইংরিজিতে যাকে বলে 'ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স'। তবে মুশকিল এই যে, সুবিধাবাদের মধ্যে একটা ঝুঁকি থাকেই। যে-অঙ্ক কষে সুবিধে হবে বলে মনে করা হয়, সেই অঙ্ক অনেক সময় মেলে না। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে ফরওয়ার্ড ব্লকও ঐ ধরনের কাঁচা কাজই করে ফেলেছিল। হাওয়া যে ঠিক কোন দিকে বইছে সেটা ঠিকমতো আন্দাজ করতে পারেনি। তাই যে-হাওয়ার ওপর ভরসা করে পাল তুলেছিল, সেই হাওয়া দলকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে অকূল সমুদ্রে।

মাদ্রাজে সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় কমিটির যে বৈঠক হয়ে গেল সেখানে দলের ভাগ্য ফেরাবার জন্যে নতুন নীতি গৃহীত হয়েছে। যদিও ঐ সিদ্ধান্তটি গোটা দেশের জন্যেই, তবু ওটা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে জরুরী। ফরওয়ার্ড ব্লক যে ভবিষ্যতে সি. পি. এমের সঙ্গে জোট বাঁধবে না, এই নীতির প্রভাব শুধু এই রাজ্যের রাজনীতিতেই পড়বে, কারণ আর কোনো রাজ্যে এই দুই দলের মধ্যে কোনো আঁতাত নেই। দ্বিতীয় কথা হলো, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত নতুন বলে মনে হলেও আসলে এই নীতি গত বছর ফরওয়ার্ড ব্লকের পশ্চিমবঙ্গ শাখার চুঁচুড়া অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবেরই রকমফের। কারণ, কংগ্রেস এবং সি পি এম, উভয়কেই শত হস্তেন দূরে রাখার নীতি ঐ অধিবেশনেই গৃহীত হয়েছিল। সেই নীতিতে অবশ্য নেতারা শেষপর্যন্ত অটল থাকতে পারেননি। তা যদি পারতেন তবে গত নির্বাচনে দলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতো কিনা তা ঠিক বলা যায় না, তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লকের চেহারাটা এত মলিন হয়ে উঠত না, এবং দলের মধ্যে ভাঙনও দেখা দিত না।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে যে-সব দল সি পি এম-এর স্বৈরাচারের প্রতিবাদে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল তাদের পুরোভাগে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর বামপন্থীরা যখন দুভাগে ভাগ হয়ে গেল তখন ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল সি পি এম-বিরোধী শিবিরে। আট-পার্টি জোটের কোনো শরিকই পরবর্তী নির্বাচনে (১৯৭১) সুবিধে করতে পারেনি। ফরওয়ার্ড ব্লকের বরাতেও জুটেছিল মাত্র তিনটি আসন। কিন্তু ঐ বিপর্যয় সত্ত্বেও এ-কথা বলতেই হবে যে, দলের রাজনৈতিক লাইনের মধ্যে একটা সঙ্গতি ছিল। নির্বাচনের পর কংগ্রেস প্রভাবাধীন যে কোয়ালিশন সরকার তৈরি হলো, সেই সরকারের প্রতি সমর্থন জানাতেও ফরওয়ার্ড ব্লক এগিয়ে এসেছিল।

অবশ্য এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এই সি পি এম-বিরোধিতা দলের সব অংশেরই মনঃপূত ছিল। ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কিছু গোপন কথা নয়। তার একটি যদি কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে চান, তবে আর একটি সি পি এম-এর দিকে ঝোঁকার পক্ষপাতী। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে টানা-পোড়েনে প্রথম গোষ্ঠীটি যে কিছুদিন প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন, তার কারণ, সি পি এম-এর দাপট তখন দলের অস্তিত্বের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে সি পি এম-এর সর্বাঙ্গীণ বিরোধিতা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তবু দলের মধ্যে দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি সি পি এম-এর প্রতি সব আকর্ষণ হারাননি। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন পর্যন্ত তাঁরা কোনোরকমে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু ঐ সরকারের পতনের পর যখন কথা উঠল, ঐ কোয়ালিশনের শরিকদের নিয়ে একটা পাকাপাকি সি পি এম-বিরোধী জোট গড়ে তোলা হোক, তখন তাঁরা আবার চাপ সৃষ্টি করলেন। ফলে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা এই কথা বলতে বাধ্য হলেন যে, গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করলেও তাঁরা প্রস্তাবিত জোটে থাকবেন কিনা তা বলতে পারছেন না। ঐ সময়ে তাঁরা বেশ দোটানার মধ্যেই পড়ে যান। কংগ্রেসকে তাঁরা গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী দলের মর্যাদা দিতে রাজী ছিলেন। সি পি এম-কে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনক বলতেও তাঁদের আপত্তি ছিল না। তবু কিন্তু তাঁরা সি পি এম-বিরোধী কংগ্রেসী জোটে নাম লেখাতে পারছিলেন না।

এই রকম যখন অবস্থা তখনই দলের বৈঠক বসে চুঁচুড়ায়। সেই বৈঠকে কিন্তু দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বোঝাপড়া সম্ভব হলো না। তাই দল কোন দিকে যাবে তা ঠিক করতে না-পেরে নেতারা বললেন, তাঁরা কোনো দিকেই যাবেন না। কংগ্রেসও যেমন অস্পৃশ্য, সি পি এম-ও তাই। এমন সম-দূরত্বের পথ অনেক দলই নেয়। নতুন সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হওয়ার পর তাঁরাও এই পথ নিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে এটা যতোটা ছিল নীতির প্রশ্ন, তার চেয়ে বড় ছিল দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আপসের প্রশ্ন। কারণ ঐ ধরনের আপস না-হলে দলের ভাঙন ঠেকানো যাবে না, এমন একটা আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

*

সে-ভাঙন অবশ্য শেষপর্যন্ত ঠেকানোও গেল না। সম-দূরত্বের নীতির এক বিচিত্র ব্যাখ্যা হাজির করলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা। সম-দূরত্ব আর সম-নিকটত্বকে অভিন্ন মনে করে তাঁরা এই বছরের নির্বাচনের মুখে কংগ্রেস এবং সি পি এম—উভয়ের সঙ্গেই সমঝোতার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। নীতি-আদর্শ সব চুলোয় গেল, বড় হয়ে দাঁড়ালো ক'টা আসন ভাগে পাওয়া যায় সেই প্রশ্ন। কিন্তু বেশি আসনের লোভে সি পি এম-এর সঙ্গে গিয়ে কোনো আসনই জুটলো না, ওদিকে দলও দু'-টুকরো হয়ে গেল। বিভূতি ঘোষ (নানুবাবু) বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিলেন, এমন কি নির্বাচনে পৃথক প্রার্থী পর্যন্ত দিলেন। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন নির্বাচনে জয়লাভ করে বিধানসভায় যোগ দিচ্ছেন এবং কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা অবশ্য খুব কড়া মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং নানুবাবুসহ অনেক সদস্যকেই সাসপেন্ড করেছিলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দলের মধ্যে কড়া সমালোচনা ঠেকানো যায়নি। নির্বাচনের পরেই দলের রাজ্য কমিটিতে এই কথা স্বীকৃত হয় যে, সি পি এম-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেতারা ঠিক কাজ করেননি। ভবিষ্যতে সি পি এম-এর সঙ্গে যে থাকা হবে না, এই নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ নির্দেশ সত্ত্বেও নেতারা এক বিচিত্র পথ গ্রহণ করলেন। সি পি এম-এর সঙ্গে সংস্রব তাঁরা ছাড়লেনই না, বরং বামপন্থী ফ্রন্টের বৈঠকে যোগ দিতে থাকলেন। অবশ্য এই ধরনের পথ গ্রহণ করা বেশি দিন নেতাদের পক্ষেও সম্ভব হলো না, কারণ, ইতিমধ্যে এসে গেল দলের রাজ্য সম্মেলন। কোচবিহারের দিনহাটায় ঐ সম্মেলনে রাজ্য কমিটিকে পদত্যাগ করতে হলো। রাজ্য কমিটি স্বীকার করলেন, গত দু' বছরের মধ্যে তাঁরা দলকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেননি।

দিনহাটায় ঐ সম্মেলনের আগে অবশ্য অনেক জল ঘোলা হয়। যে-সব সদস্যকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, তাঁরা কলকাতায় একটা পাল্টা সম্মেলনের জন্যে চেষ্টা করেন। তাঁরা এই দাবিও তোলেন যে, ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন কলকাতাতেই হওয়া উচিত, কারণ, তাহলে বোঝা যাবে দু' পক্ষের শক্তি কতো। কিন্তু নেতারা সেই শক্তিপরীক্ষার

কাগুজে বাঘ !

ভিয়েতনাম
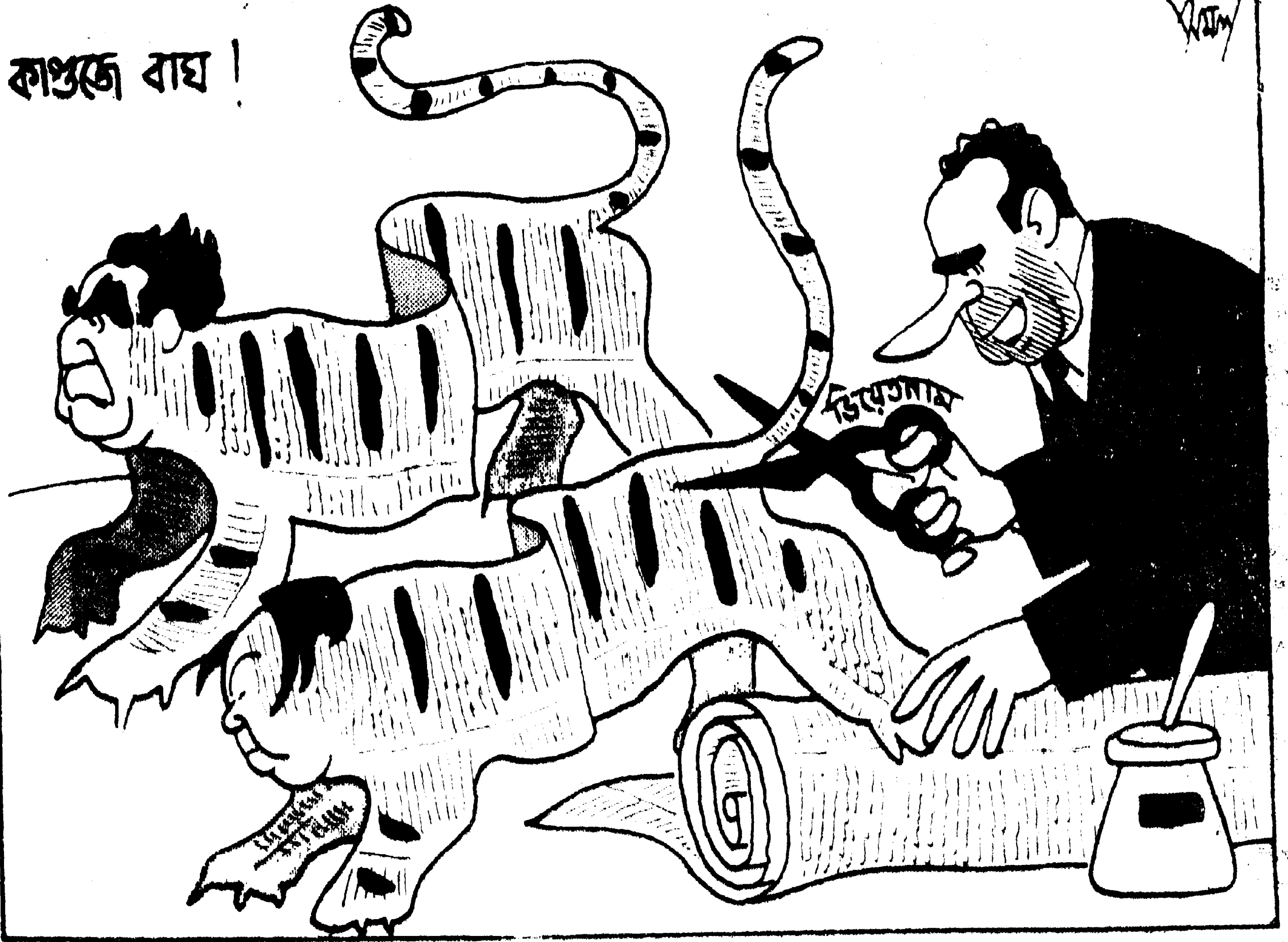
রাজী নন বলেই তাঁরা দিনহাটায় সম্মেলন করছেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রকাশ্য বিরোধ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদেরও উদ্বিগ্ন করে তোলে। দলের চেয়ারম্যান শ্রীমুখিয়া থেবর অবস্থা খারাপ বলে এক টেলিগ্রাম পাঠান যে, সম্মেলন আপাতত স্থগিত রাখা হোক। সম্মেলন অবশ্য শেষপর্যন্ত বন্ধ থাকেনি। কারণ, ঐ টেলিগ্রামের পর চেয়ারম্যান নাকি টেলিফোন মারফৎ রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, তাই সম্মেলনও বন্ধ থাকেনি।

রাজ্য পরিষদের বৈঠকে অবশ্য অধিকাংশ সদস্যই অনুপস্থিত ছিলেন। এটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিদ্রোহীদের পরোক্ষ জয়। রাজ্য পরিষদের কাছে রাজ্য কমিটি যে পর্যালোচনা পেশ করেন, তাতে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেতারা এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার ফলে এই দল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। এই ধরনের আত্মগ্লানি দেখা দেওয়ার পর রাজ্য কমিটির পদত্যাগ না-করে আর কী-ই বা উপায় থাকতে পারে? রাজ্য পরিষদ সেই পদত্যাগ মেনেও নেন।

যতোই আত্মগ্লানি দেখা দিয়ে থাকুক না কেন, রাজ্য পরিষদের প্রস্তাবে কিন্তু শুধু নেতাদের ভ্রান্ত নীতিকেই নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে দেখানো হয়নি। নির্বাচনী নিয়মকানুনের মধ্যে নাকি নানান গলদ আছে, ফরওয়ার্ড ব্লক তার সংশোধন চায়। এর জন্যে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার কথাও হয়। সেই সঙ্গে সি পি এম-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে এ-কথাও বলা হয় যে, দেশে ফ্যাসিস্ত ভাবধারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আর সেই ভাবধারাকে রুখতে হলে চাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন। কিন্তু সেই আন্দোলনের পথে বড় বাধা দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ এবং বামপন্থী সংকীর্ণতা।

ভবিষ্যতের বিচারে কিন্তু অপর একটি প্রস্তাবই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের নামে জোট বাঁধতে গিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক যে বড় দলের লেজুড়ে পরিণত হচ্ছে, এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের সর্বশেষ নির্দেশের সাদৃশ্য রয়েছে রীতিমতো। কারণ সেই নির্দেশেরও মর্মার্থ হলো—একদিকে কংগ্রেস-সি পি আই এবং অপরদিকে সি পি এম-কে বর্জন করে দলের স্বতন্ত্র সত্তা গড়ে তোলা।

গত নির্বাচনে সি পি এম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্টের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে ধমক খেয়েছেন তাতে বিদ্রোহী গোষ্ঠী খুবই খুশি। শুধু তাই নয়, বিদ্রোহীদের নেতা মানুষাবুর ওপর থেকে দণ্ডাদেশ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। অন্যান্য সাসপেন্ডেড সদস্যদের প্রশ্ন বিবেচনার জন্যেও তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন। সমগ্র রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেই কেন্দ্রীয় কমিটি এইসব সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁদের একথা বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, দলের রাজ্য নেতৃত্বের নীতির মধ্যেই গলদ ছিল। সি পি এম বিরোধিতার নীতিতে অভ্যস্ত একটি দলের হঠাৎ ডিগবাজি যদি এক শ্রেণীর সদস্যকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলে থাকে, তবে কেন্দ্রীয় কমিটি তার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখতে পায়নি।

পশ্চিমবাংলায় ফরওয়ার্ড ব্লক এখন সত্যিই 'একলা চলো' নীতি মেনে নেবে কিনা, সেটা দেখার বিষয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি যে-সময়ে এই নতুন নীতি গ্রহণ করলেন, সেই সময়টা একদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় কমিটি যখন এই 'একলা চলো' নীতি রচনা করছিলেন, তখন ঐ শহর থেকে কিছু দূরে মাদুরাইয়ে সি পি এম-এর নবম কংগ্রেসে আবার যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছিল। সেই আহ্বানের প্রথম উত্তর ফরওয়ার্ড ব্লকের কাছ থেকে যেভাবে এলো তাতে মার্কসবাদীরা নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হবেন না।

৭।৭।৭২ —[illegible]

দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস ডি শর্মা, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম

দেশে বিদেশে

মধ্য নিশীথের নাটকীয় বৈঠকের ভেতর দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের দুই নেতা সিমলার শীর্ষ সম্মেলনকে প্রায় অনিবার্য ব্যর্থতার কিনারা থেকে উদ্ধার করে যে জায়গায় পৌঁছে দিলেন সেখানে যে সব সমস্যার হদিশ রয়েছে তা অবশ্যই নয়। বেশি খুঁটিয়ে দেখার দরকার নেই, খুব ভাসাভাসাভাবে দেখলেও নজরে পড়বে, সিমলা চুক্তির মধ্যে নেই-এর তালিকায় এমন কিছুই নেই। যেমনঃ—

কাশ্মীর প্রসঙ্গের মীমাংসা কিভাবে হবে তার কোন ইঙ্গিত নেই। বাংলাদেশের স্বীকৃতির কোন কথা নেই। যেসব সামরিক জোটের সদস্য হয়ে পাকিস্থান অতীতে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার রসদ সংগ্রহ করেছে সেসব জোট সে ছাড়বে কিনা তার কোন কথা নেই। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে পাকিস্থান নতুন করে আঁতাত গড়ার যে চেষ্টা করছে সেই চেষ্টা সে ছাড়বে, এমন কোন ইঙ্গিত নেই। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির কোন কথা নেই।

কিন্তু, তবু, অস্বীকার করা যায় না যে, জনসংঘ, কয়েকজন সমাজতন্ত্রী ও রাজাজীর মত কিছু নেতাকে বাদ দিলে, ভারতবর্ষের মানুষ সাধারণভাবে সিমলা চুক্তিতে খুশি হয়েছে। তারা এই চুক্তির মধ্যে একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে যেসব প্রতিক্রিয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে অনুমান করা যায় যে, সেখানেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

সিমলা চুক্তির একেবারে গোড়ার দিকেই বলা হয়েছে :—

উভয় দেশ স্থির করেছে যে, তারা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে অথবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোন শান্তিপূর্ণ পন্থায় তাদের নিজেদের বিরোধগুলির মীমাংসা করবে। দুই দেশের সমস্যাগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষই একতরফাভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাবে না এবং যে কাজের ফলে শান্তিপূর্ণ ও সুসংযত সম্পর্ক রক্ষায় অসুবিধা হয় তেমন কোন কাজের সংশোধন সহায়তা ও উৎসাহ দানে উভয় দেশ বাধা দেবে।'

এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আরও দুটি অঙ্গীকারে বলা হয়েছে যে, কাশ্মীর সহ কোথাও এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে না, বলপ্রয়োগের হুমকিও দেবে না।

এই অঙ্গীকারগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবারকার সিমলা চুক্তির তাৎপর্য। এটা ভারতের জয়। ভারত চেয়েছিল, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুই দেশ যুদ্ধ বর্জন করে নিজেদের বিরোধগুলি আলাপ-আলোচনার দ্বারা মিটিয়ে নিক। পাকিস্থানের কোন নেতার পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সোজা ছিল না, যে জুলফিকার আলি ভুট্টো একদা ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন তাঁর পক্ষে ত নয়ই। পাকিস্তানের অস্তিত্বের গভীরে জড়িয়ে আছে ভারত-বিদ্বেষ। পাকিস্তানের ভেতরকার সমস্যা চাপা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়েছে এই বিদ্বেষ জীইয়ে রাখা। পাকিস্থান জানে যে, তার পক্ষে যুক্তির জোর তত নেই যে, অস্ত্রবল বাদ দিয়ে এবং তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বাদ দিয়ে (এই

'তৃতীয় পক্ষের' মধ্যে রাষ্ট্রসংঘও পড়বে) সে কাশ্মীর উদ্ধার করতে পারবে।

কিন্তু তবু পাকিস্তান বলপ্রয়োগ ও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের ভরসা ছাড়তে বাধ্য হল। তাতে বোঝা যাচ্ছে, গত ডিসেম্বরের যুদ্ধের পর ভারত পাকিস্থান উপমহাদেশের রাজনীতির যে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই বাস্তব সত্যটা সিমলা চুক্তির মধ্যে অন্তত কতক পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে।

পাকিস্তানের দিক থেকে একটা বড় লাভ এই হল যে, গত বছরের যুদ্ধের সময় সে ভারতের যে প্রায় ৬৯ বর্গ মাইল এলাকা দখল করেছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে সে তার বিনিময়ে ভারত কর্তৃক অধিকৃত তার প্রায় পাঁচ হাজার বর্গ মাইলের বেশি এলাকা ফিরে পাবে। কাশ্মীরে অবশ্য ভিন্ন ব্যবস্থা। সেখানে গত ১৭ ডিসেম্বর যে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর মূল লক্ষ্যটাই অবশ্য অপূর্ণ থেকে গেছে। সেটা হচ্ছে পাকিস্থানের যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সংবাদে প্রকাশ যে এই যুদ্ধবন্দীদের দুঃখে ভুট্টো সাহেব নাকি সিমলায় ভূমিশয্যায় রাত কাটিয়েছেন। সিমলায় তিনি একাধিকবার এই বীর সেনাদের কথা বলেছেন এবং যুদ্ধপরাধী বলে তাদের বিচার করার ফল ভাল হবে না বলে হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু ভারত তার কথা রেখেছে। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে সে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কথা বলেনি। এবং বাংলাদেশও তার জেদ বজায় রেখেছে। পাকিস্তান তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হতে পারে না।

পাকিস্থানের যে প্রায় হাজার তিনেক সৈনিক পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের হাতে বন্দী হয়েছিল তাদের ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন। সিমলা চুক্তির পর এখন ঐ বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হতে পারে এবং সেই সঙ্গে ভারতের যেসব সৈন্য পাকিস্থানে বন্দী হয়ে আছে তাদেরও মুক্তি দেওয়া হতে পারে, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যেমন তাঁর মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি, তেমনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও সিমলা সম্মেলনে তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করে আসতে পারেননি। শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে, স্থায়ী শান্তির ভিত্তি তৈরি করার জন্য যেটা দরকার তা হল, ছোটখাট ও সাময়িক সমস্যাগুলির উপর জোর না দিয়ে দুই দেশের মূল বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করতে হবে— যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কাশ্মীর বিরোধ। এই কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তি দূরের কথা, এই প্রসঙ্গ সিমলা বৈঠকে আদৌ আলোচিত হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে না।

তবে, আমার কথা শুধু এইটুকু যে, এই প্রথম দুই দেশ কোন তৃতীয় পক্ষের সাহায্য না নিয়ে কাশ্মীর সহ বিভিন্ন বিরোধ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে সম্মত হয়েছে।

সিমলা চুক্তি একটা পরিণতি নয়, একটা সূচনা মাত্র। নিঃসন্দেহে সূচনাটি শুভ। তবে এই শুভ সূচনা শেষ পর্যন্ত সার্থক পরিণতি লাভ করবে কিনা সেটা নির্ভর করবে অনেক রকম যদির ওপর।

তামিলনাড়ুতে বিজলী কর বাড়াবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কৃষকদের যে আন্দোলন শুরু করা হয়েছে সেটা এক রকম খোলাখুলিভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলন। ওড়িশার মন্ত্রিসভার পতনের পর তামিলনাড়ুই একমাত্র বড় রাজ্য যেখানে কংগ্রেস শাসনক্ষমতার বাইরে রয়েছে। তামিলনাড়ুর ডি এম-কে সরকারকেও ক্ষমতাচ্যুত করতে কংগ্রেস যে উৎসুক সেকথা তারা গোপন করেনি। তামিলনাড়ুর কৃষক সংগ্রাম কমিটির সংগঠকদের মধ্যে অবশ্য শুধু কংগ্রেস নব, সংগঠন কংগ্রেস, সি পি আই, জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টিও আছে। ('এটা বড় চাষীদের আন্দোলন', এই অজুহাতে সি পি এম আন্দোলনের বাইরে আছে।) আন্দোলনকারী দলগুলি এখনই যে ডি এম কে সরকারকে হটাতে পারবে অথবা হটাতে পারলেও তারা যে নিজেদের মধ্যে হাত মিলিয়ে বিকল্প সরকার গঠন করতে পারবে, এমন সম্ভাবনা আদৌ দেখা যাচ্ছে না। তবে, এই ধরনের একটা সর্বদলীয় আন্দোলনের দ্বারা শ্রীকরুণানিধির সরকারকে বিব্রত করা খুবই সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকরুণানিধির সরকার ইতিমধ্যেই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আন্দোলনের প্রথম দিনে রাজ্যব্যাপী বন্ধ ডাকা হয়েছিল। সেদিন পুলিশের গুলিতে ও লাঠিতে রাজ্যের চারটি জেলায় সরকারি হিসেবেই ১৪ জন (বেসরকারী হিসাবে আরও অনেক বেশি) মারা গেছেন। হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করেও তামিলনাড়ু সরকার পরিস্থিতি সামলাতে পারছেন না।

৮।৭।৭২　　—পুণ্ডরীক

রথযাত্রা

সাবিত্রী সেনগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' উপন্যাসে মাহেশের রথযাত্রার কথা আছে। রথযাত্রা বাংলাদেশের এক জনপ্রিয় উৎসব।

রথ গতির প্রতীক। তাই জীবনের প্রতীকও রথ।

রথযাত্রার প্রচলন কবে প্রথম হয়েছিল তার সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে মনে হয়, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই ভারতের আদি রথযাত্রা।

কেউ কেউ বলেন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে মথুরা গমনের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াস। আবার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থে রথযাত্রায় বৌদ্ধ প্রভাবের উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধদেবের জন্ম উৎসবে বৌদ্ধরা নাকি রথযাত্রা উৎসব করতেন।

হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে রথযাত্রার কথা আছে। সংহিতা পুরানে, বেদ ও উপনিষদে রথযাত্রার উল্লেখ দেখে মনে হয় যে রথযাত্রা হিন্দুদের একটি প্রাচীনতম ধর্মীয় উৎসব। তবে ধর্মের তত্ত্ব এবং প্রাচীনত্বের কথা ছেড়ে দিলেও একটি বিষয় সম্বন্ধে কারুর কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেটা হচ্ছে মন্দিরের গণ্ডিতে আবদ্ধ দেবতাকে বাইরে এনে জনসমাবেশে প্রতিষ্ঠিত করা। মন্দিরের দেবতাকে গণদেবতার আসন দেওয়া। এটাই হলো রথযাত্রা উৎসবের পরম সার্থকতা।

সেকালে অবন্তীর অধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। তাঁর ইচ্ছা হলো, নীলাচলে গিয়ে নীলমাধব দর্শন করবেন। কিন্তু যাত্রা করবার কয়েকদিন আগেই স্বপ্ন দেখলেন, ভগবান বিষ্ণু তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ করবার জন্য। মহারাজ সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারে মন্দির নির্মাণ শুরু করলেন। নির্মাণ শেষ হবার পর শুরু করলেন সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ। নবনির্মিত মন্দিরের মণ্ডপে সেই যজ্ঞের উদ্বোধন হলো।

যজ্ঞের হোমাগ্নিতে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, হোম মন্ত্রে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস। এমন সময় সংবাদ এলো চক্রতীর্থের ঘাটে ভেসে এসেছে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড—তাতে চিহ্নিত রয়েছে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।

সপারিষদ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ছুটে এলেন মন্দিরের উত্তর দিকে সমুদ্রতীরে চক্রতীর্থে। সকলেই অবাক হয়ে দেখলেন—কাষ্ঠখণ্ড থেকে এক দিব্য জ্যোতি বেরিয়ে আসছে, আর সুগন্ধে ভরে উঠেছে চারদিক। বিষ্ণুভক্ত মহারাজ কল্পনানেত্রে দেখলেন—এ শুধু বৃক্ষকাণ্ড নয়, ভগবান বিষ্ণুদেহস্থ রোম ভেসে এসেছে দারুবৃক্ষরূপে।

মহারাজ আদেশ দিলেন, মর্যাদা সহকারে পবিত্র বৃক্ষকাণ্ড তুলে আনবার জন্য। শত সহস্র ব্রাহ্মণ ছুটে গেলেন। কিন্তু বহু আকর্ষণেও তাঁরা বৃক্ষকাণ্ডকে তুলে আনতে সমর্থ হলেন না। তখন আনা হলো শত শত শক্তিমান হস্তী। কিন্তু সেই বৃক্ষকে তুলতে তারাও সমর্থ হলো না।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। দু' চোখে নেমে এলো জলের ধারা। হায়, বাঞ্ছিত প্রভু এসেও এলেন না।

এমন সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন দৈববাণী শুনতে পেলেন। এ বৃক্ষকাণ্ড দারুময় নয়, প্রেমময়, জগতের সকল মানুষের মাঝে প্রেম বিতরণ করতেই তিনি এসেছেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ। স্পর্শভেদ ভুলে আচণ্ডাল সকলে স্পর্শ না করলে জগন্নাথ উঠবেন না।

মহারাজের আদেশে তখন দলে দলে লোক ছুটলো বৃক্ষকাণ্ডকে তুলে আনবার জন্য। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের মিলিত স্পর্শে সেই দারুখণ্ড উপরে উঠে এলো।

সেই দারুখণ্ডকে বহন করে আনবার জন্য তৈরী হলো রথ। সেই রথে বহন করে পবিত্র দারুখন্ডকে চক্রতীর্থ থেকে নবনির্মিত মন্দিরে আনা হলো। এটাই হলো ভারতের প্রথম রথ।

এরপর বিষ্ণুভক্ত মহারাজ স্থির করলেন সেই দারুখণ্ড থেকে তৈরী করবেন ইষ্টমূর্তি। তখন সহসা আকাশবাণী হল—মূর্তির রূপ স্থির করে ভগবান নিজেই মহাবেদীতে আবির্ভূত হবেন। রাজা যেন একপক্ষকাল বেদীগৃহ আবৃত করে রাখেন।

দৈবাদেশ অনুসারে কাজ হলো। দীর্ঘকায় এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ এসে বেদীগৃহের দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন মূর্তি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত কেউ ভেতরে যাবে না।

পক্ষকাল পরে বেদীগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হলো। দেখা গেল, বেদীর উপরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা প্রকাশিত হয়েছেন। তখন জগন্নাথদেবকে নীলবর্ণে, বলরামকে শুভ্রবর্ণে এবং সুভদ্রাকে কুমকুমবর্ণে রঞ্জিত করে পট্টবস্ত্রে শোভিত করা হলো।

কথিত আছে, অবন্তীনগর ছেড়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থায়ীভাবে পুরীধামে বসবাস করতে থাকেন। তিনিই পুরীর মন্দিরের নির্মাণকর্তা এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা।

ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজত্বকাল ইতিহাসের শতাব্দীতে হয়তো সঠিকভাবে নিরূপণ করা যাবে না। তবু সেই যুগ থেকেই রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। স্বর্গের দেবতা নেমে এসেছেন পথের ধূলিতে। শ্রীচৈতন্যদেব রথের দড়ি শিরে ধারণ করে একদিন রথ টেনেছিলেন। আজও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের প্রতি প্রান্তের মানুষ সেই রথ টেনে আসছে।

ভারতের রথযাত্রা উৎসবের মধ্যে পুরীর রথযাত্রাই প্রধান এবং ঐতিহ্যপূর্ণ। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন দেবতাকে তিনটি রথে অধিষ্ঠিত করে রথ টানা হয়। তিনটি রথই ত্রিতল। জগন্নাথের রথের নাম নন্দী ঘোষ। এর উপরিভাগ থাকে পীতবর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত। উচ্চতা চৌত্রিশ হাত। চাকা আঠারটি। অশ্ব চারটি।

বলরামের রথখানি উচ্চতায় তেত্রিশ হাত, এর উপরিভাগের আচ্ছাদন নীলবর্ণ। সুভদ্রার রথের উচ্চতা বত্রিশ হাত—শীর্ষদেশ কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আচ্ছাদিত। বলরামের রথের চাকা ষোলটি এবং সুভদ্রার রথের চাকা চোদ্দটি।

প্রতি বছর রথ তিনটি নূতন করে বিশেষ ধরনের এক হাল্কা ও শক্ত গাছ দিয়ে তৈরী হয়। নির্দিষ্ট বন থেকে নিয়ে আসা হয় এই গাছ। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অর্থাৎ রথযাত্রার প্রায় তিন মাস আগে রথ তৈরীর কাজ শুরু হয়। মন্দিরের নিকটে প্রশস্ত রাজপথের পাশে রাজবাড়ির সামনে রথ তৈরী হয়। বহু লোক একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে। যেন এক কারখানা সেখানে বসে যায়। ছোট বড় গাছ জুড়ে রথগুলি দাঁড় করান হয়। তৈরীতে তেমন কোন নৈপুণ্য নেই। কাঠামোতে কোন কারুকার্য নেই। ইচ্ছা করেই হয়তো সব করা হয় না। কারণ উৎসব হয়ে গেলে ঐ রথগুলি ভেঙে কাঠগুলি জ্বালানী কাঠ হিসাবে বিক্রী করে দেওয়া হয়।

রথ তৈরীতে বিশেষ নৈপুণ্য না থাকলেও, তাতে কোন কারুকার্য না থাকলেও তার ধ্বজা সাজসজ্জা এবং বিরাট আকার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতের দূরদূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতি বছর এই উৎসবে যোগদান করে নিজেদের ধন্য মনে করে।

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাহেশের রথযাত্রাও খুবই ঐতিহ্যপূর্ণ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞান চিন্তা

অমিয় কুমার মজুমদার

দ্বিতীয় পর্যায়

(ছয়)

'প্রকৃতির অভিব্যক্তি' (সাধনা, চৈত্র, ১৩০১, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ) প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশ্ন তুলেছেন, প্রকৃতির অভিব্যক্তির প্রবর্তক কে এবং তার উদ্দেশ্যই বা কি? এর উত্তরদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রথমেই মীমাংসা করে নিতে হবে প্রকৃতি থেকে কোন্ কোন্ সামগ্রী অভিব্যক্ত হয় এবং কোন্ প্রণালীতে তা হয় সে বিষয়েও সম্যক জানা প্রয়োজন।

তিনি বলেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গোড়ার কথা দুটি—মূল উপাদানের অবিনশ্বরতা এবং মূল ক্রিয়ার চিরস্থিতি। কিন্তু এর সঙ্গে আরো একটি কথাকে তিনি জুড়ে দিতে চেয়েছেন—তা হলো মনোবীজ বা অন্তঃকরণ বীজ। 'আদিম জীবপঙ্ক যদিচ জড়-পিন্ড মাত্র কিন্তু তাহারও ভিতরে মনোবীজ জাগিতেছে; সে মনোবীজ সুদূর ভবিষ্যতে এক না এক সময়ে অঙ্কুরিত বর্ধিত পুষ্পিত এবং ফলিত হইয়া উঠিবে—তাহা যখন হইবে তখন তাহাকে মনোবীজ না বলিয়া বলিব—মন বা অন্তঃকরণ।'

তাহলে দেখা গেল প্রকৃতির মূল অবয়ব তিনটি—মূল উপাদান, মূলশক্তি এবং মনোবীজ। প্রকৃতির এই তিনটি মূল অবয়ব সাংখ্য দর্শনে তম, রজ এবং সত্ত্ব বলা হয়েছে।

প্রকৃতি জড় থেকে মনের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। আগে জীব—পরে জড় নয়, কিন্তু আগে জড় পরে জীব, প্রকৃতির বীজ? মন্ত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকৃতি জড় হইতে মনের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, এই কথাটিকে রূপকের পরিচ্ছদে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে প্রকৃতি অন্ধকার হইতে আলোকে ক্রমশই পদানিক্ষেপ করিতেছে। আর, জড় হইতে জীবে পৌঁছিবার যে চেষ্টা সেইটি লাল রঙ।

অতঃপর রূপক বাদ দিয়া সত্ত্বরজস্তমোগুণের মধ্যে ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

(১) প্রকৃতির চেষ্টা অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার দিকে।

(২) যে কোনো চেষ্টা হউক না কেন, যতক্ষণ তাহা চেষ্টা-মাত্র থাকে ততক্ষণ তাহা দুঃখেরই নামান্তর—চেষ্টা ফলবতী হইলেই তাহা সুখে পরিণত হয়।

(৩) প্রকৃতির চেষ্টা যেহেতু ব্যক্ত হইবার দিকে, এইজন্য ব্যক্ত হইতে পারিলেই তাহার চেষ্টা ফলবতী হয়।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন, অভিব্যক্তির গোড়ায় জগতের মূল উপাদান, মূল ক্রিয়া এবং মনোবীজ প্রভৃতি অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভাবে ভিন্ন আকারে, বিভিন্ন রূপে পর্যবসিত হচ্ছে। 'বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে উপাদান এবং শক্তি উভয়ে গোড়ায় এক—আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ "Evolution" কথাটির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, সুতোর পুঁটলি থেকে সুতো ক্রমে ক্রমে নির্মুক্ত হওয়া হলো ইভোলিউশান: এতে সম্বৃত সামগ্রী ক্রমে ক্রমে বিবৃত হয়। স্বভাবের উত্তেজনায় একের পর এক প্রকৃতির পর্দা খুলে যেতে থাকে, তার ভেতরের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

'বিবর্তবাদের স্থূল মর্ম এই যে, অবিদ্যা, যাহা বাহিরের কোন বস্তু নয়—কেবল মনের একটা ভ্রমাচ্ছন্ন ভাব, তাহারই প্রভাবে সংসার-চক্র চলিতেছে, পরিণামবাদের স্থূল মর্ম এই যে, প্রকৃতি, যাহা মনের ভাবমাত্র নহে কিন্তু বাস্তবিক, তাহারই ক্রিয়া-প্রভাবে জগৎ চক্র চলিতেছে, পরিণামবাদের সহিত ইভোলিউশান মতের কিয়দংশ সাদৃশ্য আছে কিন্তু সর্বাংশে নহে।' দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, পরিণামবাদের দুটি অবয়ব—একটি হলো অব্যক্ত থেকে ব্যক্তে পরিণতি এবং অপরটি হলো ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে পরিণতি। প্রথমটি হলো ইভোলিউশান উদ্বর্তন এবং দ্বিতীয়টি হলো ইনভোলিউশান বা অনুবর্তন। থিওরি অফ ইভোলিউশান-এর বাংলা প্রতিশব্দ তিনি দিয়েছেন অভিব্যক্তিবাদ। 'মনে কর যে, চক্ষুহীন জীবের ক্রমে ক্রমে চক্ষু পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, পিন্ডবৎ জীবের ক্রমে ক্রমে হস্তপদ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল,—এইরূপ পরিস্ফুটনকে ক্রমাভিব্যক্তি কহে। অভিব্যক্তি মাত্রই কালের ক্রমকে অপেক্ষা করে, এজন্য অভিব্যক্তি মাত্রই ক্রমাভিব্যক্তি।'

এবারে উদ্বর্তন এবং অনুবর্তন নিয়ে আলোচনা করা যাক। ক্রমবিবর্তন বা উদ্বর্তনের প্রকল্প এবং প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের প্রকল্পের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এই—প্রথমটি যেন দ্বিতীয়টির তুলনায় সমগ্র সৌধের একটা অংশ মাত্র। বেদান্তবাদের মধ্যে যে সামগ্রিক অনুবর্তন বা ইনভোলিউশানে রয়েছে তা উদ্বর্তনবাদের পরিপূরক অংশ।

সমস্ত তত্ত্বই তাদের প্রকৃতি অনুসারে চক্রতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অগ্রগতি সেখানে পর পর তরঙ্গপ্রবাহের মতো দেখা দেয়। প্রত্যেক তরঙ্গ ওঠে আবার নামে। প্রতিটি তরঙ্গের পরে আবার নতুন তরঙ্গ আসে।

এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্ঞানযোগ' থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি—'এমনকি আধুনিক গবেষণার ভিত্তিতেও মানুষ কেবল উদ্বর্তন মাত্র হইতে পারে না। প্রত্যেক উদ্বর্তনের জন্য চাই অনুবর্তনও। আধুনিক বিজ্ঞানী বলিয়া দিবেন যে, তুমি কোনো যন্ত্রের মধ্যে যতোখানি শক্তি দিবে, সে যন্ত্র হইতে ততোখানিই শক্তি তুমি পাইতে পারো। কিছু-না হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না।'

গণিতবিদেরা বলেন, কোন সরলরেখাকে যদি ক্রমাগতভাবে বাড়ানো যেতে থাকে তাহলে তা একটি বৃত্তে পরিণত হবে। ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদে সরলরেখার উন্নতিতত্ত্ব বলা হয়েছিল। এখানেই তাঁর ত্রুটি। ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রমসংকোচ হবেই।

উদ্বর্তন-অনুবর্তন বা ক্রমবিকাশ-ক্রমসংকোচ তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডীয় ক্ষেত্রেই শুধু নয়, দৈহিক ও মানসিক বিবর্তন ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

আধুনিককালের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী পিয়ের টেলহার্ড দা সার্ডিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Phenomenon of Man" গ্রন্থে বলেছেন অনুবর্তনের কথা—

> "It is impossible to deny that, deep within ourselves an 'interior' appears at the heart of beings, as it were seen through a rent. This is enough to ensure that in one degree or another, this 'interior' should obtrude itself as existing everywhere in nature from all time".

ডারউইনের ত্রুটি হলো তিনি মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবকে এই দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাদের ক্রমবিবর্তনকে সমদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, অথচ তা হওয়া উচিত নয়। বিশ্বখ্যাত বায়োলজিস্ট স্যার জুলিয়ান হাক্সলি এক বক্তৃতায় (ইভোলিউশান আফটার ডারউইন খন্ড ৩ পৃঃ ২৫১-২) বলেছেন, মানুষের ক্রমবিকাশ বায়োলজিক্যাল নয়, একে বরং মনস্তাত্ত্বিক বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়া সভ্যতা বা সংস্কৃতির অনুযায়ী হয়। তার ফলে আত্মবোধ, মানসিক বিকাশ প্রভৃতি ঘটে থাকে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, মানসিক বিকাশ হলো আধ্যাত্মিক বিকাশ। চিত্ত শতদলের সমস্ত পাপড়িগুলি একে একে উন্মোচিত হতে থাকে।

(সাত)

'ভারতী'র কার্তিক, ১৩৩১ সংখ্যাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরকার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের সংগে বিজ্ঞানের মতবাদের আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের পরিণাম সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র বলে সুদূর ভবিষ্যৎকালে সমস্ত জগৎ মহাপ্রলয়ে পর্যবসিত হবে। বিজ্ঞানীরাও অনুরূপ কথা বলেন। প্রভেদ হলো এই—'প্রলয়-কালের সেই পরাকাষ্ঠা হইতে অব্যক্ত জগৎ ঘনীভূত হইয়া পুনর্বার কিরূপে যে তাহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার উদ্ভূত হইবে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পান না, তাঁহারা বলেন যে, সেরূপ সূক্ষ্মতম অবস্থায় জগতের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতদূর শীতল হইতে পারে হইয়া—তাহার কোন স্থানেই উত্তাপের তারতম্য না-থাকা প্রযুক্ত তাহা একেবারেই নিশ্চেষ্ট এবং নিস্পন্দ হইয়া যাইবে; সুতরাং তাহা ঘনীভূত হইয়া আবার যে কোন প্রকার স্থূল পদার্থে পরিণত হইবে তাহার সুদূর সম্ভাবনাও লোপ পাইয়া যাইবে।'

এই প্রসঙ্গে বক্তব্য হলো দ্বিজেন্দ্রনাথের সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষতঃ ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়তো ঐরূপ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিগ ব্যাং পালসেটিং এবং স্টেডি-স্টেট তত্ত্ব অনুসারে দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত কথার অনুমোদন মেলে না। যাই হোক হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তব্য আছে দ্বিজেন্দ্রনাথ সুন্দর ভাবে সেটি তুলে ধরেছেন। 'প্রতিলোম ক্রমে বিশ্ব সংসার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম এবং সূক্ষ্মতম হইতে অব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হইলেও অনুলোম ক্রমে পুনর্বার সৃষ্টির আরম্ভ হইবে।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন—বিজ্ঞানীরা একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে জগতের নানা প্রকার স্থূল সূক্ষ্ম অবস্থার আষ্টে পৃষ্ঠে নানা প্রকার শক্তির সূত্রজাল যেরূপ সঞ্চারিত রয়েছে তার একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুও কোন কালে ছিন্ন হতে পারে না। সূক্ষ্মতম পরমাণুদের মধ্যেও আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুই-ই ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্তমান। শক্তির সংগে যোগ ছেড়ে স্থূলপিণ্ডও থাকতে পারে না—সূক্ষ্ম পরমাণুও থাকতে পারে না।

'যদি ভৌতিক বস্তুসমূহ শুধু কেবল পরমাণু সমষ্টি হইত তা বই তাহাদের সংগে শক্তির কোন সংস্রব না থাকিত, তাহা হইলে সূক্ষ্ম পরমাণুগণের স্থূলে পরিণত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকিত না—স্থূলপিণ্ড সকলের সূক্ষ্মে পরিণত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকিত না। প্রকৃত বিজ্ঞানের কথা এই যে, কোনো একটা স্থূলপিণ্ড যখন অগ্নিযোগে সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে পরিণত হয় তখন সেই আগ্নেয় পিণ্ডের দাহিকা শক্তি উৎসারিত বাষ্পের গতি শক্তিতে পরিণত হয়, তা বই লোপ পায় না। ট্রান্সফরমেশন অফ ফোর্সেস বলিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে একটি মন্ত্রবচন আছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জগতের প্রলয় অবস্থায়—তাহার পরমাণুগণও যেমন লোপ পায় না—সেই পরমাণুগণের অন্তর্ভূত শক্তিজালও তেমনি লোপ পায় না।'

বিজ্ঞানের এই উপমা দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাদের শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শক্তিতে বিলীন হয়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলছেন জড়পিণ্ড সকলের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র যেমন আকাশ, শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র তেমনি কাল। কালেতেই শক্তি জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং কালেতেই তা অব্যক্ত মূল প্রকৃতির অন্তর্ভূত হয়ে যায়।

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিজেন্দ্রনাথ আবার বিজ্ঞানীদের মন্তব্য টেনে এনেছেন। একটা দোলক পিণ্ড বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এবং ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে বারে বারে আবর্তন করতে থাকলে মধ্যপথ থেকে ডান দিকে বা বাঁ-দিকে প্রধাবিত হবার সময় তার বেগ ক্রমে মন্দীভূত হতে হতে শেষে তার একতম গতিপথের চরম প্রান্তে যখন সে হাজির হয় তখন তার গতি একেবারেই লোপ পেয়ে গতিশূন্য স্থিতিমাত্রে পর্যবসিত হয়। সেই মাত্রাতীত ক্ষুদ্র মুহূর্তব্যাপী গতিশূন্য তমসাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও শক্তির কার্যকারিতা যেমন তেমনি বর্তমান থাকে। পরে দোলকপিণ্ডটিকে প্রথমে মাত্রাতীত মন্দবেগ থেকে ঈষৎ দ্রুতবেগে এবং শেষে দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে স্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

জ্যোতির্বিদদের যাঁরা সৃষ্টির পুনরাবর্তনে সন্দিহান ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন, দোলক পিণ্ডটি তার গতিপথের চরম প্রান্তস্থানে পৌঁছামাত্র যখন সে একেবারে বেগশূন্য হয়ে গিয়ে সেখান থেকে ক্রমবর্ধমান বেগে পুনরাবর্তন করতে উদ্যত হয়, তখন পুনরাবর্তনের প্রথম উদ্যমে কত বেগে সে যাত্রারম্ভ করে?

এর উত্তরদান প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে গাণিতিক কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তাতে সহজেই মনে হয় তিনি বিজ্ঞান শুধু পড়েন-ই নি, নিজস্ব করে নিয়েছিলেন। এবারে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতিটি তুলে ধরবো তা দীর্ঘ হলেও একান্তভাবে বিজ্ঞান-নিষ্ঠ।

'......অবশ্য যাত্রারম্ভ করে সে—শূন্য বেগ অপেক্ষা যৎপরোনাস্তি অল্প দ্রুতবেগে, এক কথায়—শূন্য বেগের নিকটতম বেগে। তাঁদের মধ্যেকার কোনো একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত যদি বলেন যে তাহা যাত্রারম্ভ করে (১/১০)২ক (কিনা কক্ষপ) বেগে, অর্থাৎ কক্ষপ গতিবেগের শতাংশের একাংশ বেগে তবে আমি বলিব যে, তাহা হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু (১/১০)৩ক-বেগ শূন্য বেগের নিকটতর। যদি বলেন—তাই সই, তাহা (১/১০)৩ক-বেগে যাত্রারম্ভ করে, তাহা হইলে বলিব যে, তাহাও হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু (১/১০) অপেক্ষা ও (১/১০)৪-ক বেগ শূন্যের নিকটতর। তেমনি (১/১০)৪ অপেক্ষা (১/১০)৫ শূন্যের নিকটতর (১/১০)৫ অপেক্ষা (১/১০)৬ শূন্যের নিকটতর...। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে শূন্য-বেগের নিকটতম বেগ বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় ন-ভূতো ন ভবিষ্যতিগোছের অসম্ভব পদার্থ। তবেই হইতেছে যে, দোলক পিণ্ডটা তাহার গতিপথের চরম প্রান্তস্থান হইতে কেমন করিয়া ক্রমবর্ধমান বেগে পুনরাবর্তন করিবে তাহা কোনো বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরই সাধ্য নাই যে তাহার একটা যুক্তিমূলক সম্ভবপরতা তিনি আমাকে দেখাইতে পারেন; তাহা যখন পারেন না তখন সে বিষয়ে অপর কেহ সংশয় প্রকাশ করিলে, তাহার সেই সংশয় বাণীটাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেন কোন্ লজ্জায়?'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, বিজ্ঞানের প্রদীপ ধরে আকাশতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারা গেছে যে আকাশ এবং আকাশব্যাপী জড়পিণ্ডসকল বাইরে যত বড় হোক না কেন, ভিতরে তার আপাদ-মস্তক শূন্যেরই মতো।

(আট)

বিজ্ঞানকে দ্বিজেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন কিন্তু তার অপব্যবহার তাঁর সংবেদনশীল মনকে বারে বারে নাড়া দিয়ে গেছে। তিনি ছিলেন দার্শনিক। তত্ত্বজ্ঞান তাঁর প্রিয়, কিন্তু তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো—কোন্‌টি ভাল, বিজ্ঞান না তত্ত্বজ্ঞান? তার উত্তরে তিনি বলতেন দুটিই ভাল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভালো এবং মন্দের দিক আছে তা তিনি বিচার করেছেন নিরপেক্ষ-দৃষ্টিতে। বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ তা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের হাতে এসে কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত হচ্ছে, আনাড়ি মাঝির হাতে পড়লেই বিপদ। আজ বিংশ শতাব্দীর এই ক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা বিজ্ঞানের যে দানবিক মূর্তি প্রত্যক্ষ করছি তা সম্ভবপর হয়েছে কেবলমাত্র ক্ষমতালোভী মানুষের হাতে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের জন্য। এই সত্য দ্বিজেন্দ্রনাথ এই শতকের প্রথম দিকেই উপলব্ধি করে বলেছিলেন—

'তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে; বিজ্ঞানের অপব্যবহার ইউরোপ আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ ভয়ানক—আগে সে কথাটা বলি তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকদিগের ঘটিয়াছে...।' (নানা চিন্তা, পৃ. ২২৩—২৪)

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন ইউরোপ - আমেরিকায় মহা মহা বিজ্ঞানপ্রসূত কলকারখানার

ঘূর্ণাচক্রের টানে পড়ে সহস্র সহস্র দীন-দরিদ্র শ্রমজীবী লোকের ইহকাল পরকাল ক্রমেই রসাতলের কিকটবর্তী হচ্ছে—

দ্বিজেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক অংশেই নিবদ্ধ ছিল না, ব্যবহারিক দিকেও তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি বলেছেন —সাহিত্যের পরিভাষার জন্য উদ্বেগের বিশেষ কোন কারণ নেই, বিজ্ঞানের পরিভাষাই শক্ত সমস্যা।

'জ্যোতিষ, দেহতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের অধিকারভুক্ত অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত পুঁথি খুঁটিয়া বাহির করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু তেমনি আবার অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃতশাস্ত্রের কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। শেষোক্ত স্থলে একেবারেই হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রয়োজনীয় পরিভাষা যথাসম্ভব সংস্কৃতানুযায়ী করিয়া লওয়াই পরামর্শ সিদ্ধ।' (সভাপতির অভিভাষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ. নানাচিন্তা, পৃ ১৯১)।

তিনি নার্ভ শব্দের পরিভাষা বলেছেন তৈজস তন্তু, কারণ স্নায়ু= টেনড্যান; গ্যাংগ্লিঅ্যানকে বলেছেন তৈজস-পিণ্ড। এ সম্বন্ধে আধুনিক পরিভাষা হলো নার্ভ স্নায়ু এবং টেনড্যান কণ্ডরা।

তিনি বলেছেন যন্ত্রবিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরী করবার আগে দেশীয় তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগরদের ব্যবসায়ী ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার।

'যন্ত্র এবং যন্ত্রাঙ্গগুলোর দিশী প্রতিশব্দ যেখানে যত পাওয়া যায় সেগুলো আগে ত খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করা হোক; তাহার পরে এ তো জানাই আছে যে, অবশিষ্টগুলোর প্রতিশব্দ দেশীয় ভাষার চতুঃসীমার মধ্যে সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যাইবে না। কাজেই, শেষোক্ত স্থলে নূতন প্রতিশব্দ সংগঠন করা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই।' (নানাচিন্তা, ১৯২ পৃ)

দ্বিজেন্দ্রনাথকৃত বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষার কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি।

Lever—	= তোলক
Pendulum—	= দোলক
Screw—	= আবর্তক
Spring—	= প্রস্থাপক
Centripetal—	= কেন্দ্রানুগা
Centrifugal—	= কেন্দ্রাতিগা
Organic Chemistry—	= শারীরিক রসায়ন
Inorganic Chemistry—	= ভৌতিক রসায়ন
Theoretical—	= সাংসিদ্ধিক
Theory—	= সিদ্ধান্ত
Practical Science—	= ব্যবহারিক বিজ্ঞানশাস্ত্র

রসায়নশাস্ত্রের শব্দগুলির বৈজ্ঞানিক নাম যতদূর সম্ভব কম পরিবর্তনের কথা তিনি বলেছেন. 'কেননা রসায়নের অধিকারভুক্ত পদার্থ সকলের সাংকেতিক নামের সঙ্গে সমগ্র রসায়নবিজ্ঞান এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জড়িত রহিয়াছে যে পূর্বোক্তের এক চুল ইতস্তত হইলেই শেষোক্তের প্রাণে আঘাত লাগে। তাই আমি বলি যে, কার্বনকে কার্বন বলাই ভাল।' (নানাচিন্তা, পৃ ১৯৩)

রসায়নের পরিভাষা কেমন হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন— 'দেশীয় লোকেরা অবাধে উচ্চারণ করিতে পারে অথচ মূলের সহিত হয় অর্থের না হয় শব্দের, সর্বাঙ্গীণ না হোক অন্ততঃ আংশিক সাদৃশ্য থাকে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রসায়নের পরিভাষা বিরচিত হইলেই ঠিক হয়।' (ঐ)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি বড় অবদানের কথা। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম 'রেখাক্ষর বর্ণমালা বা বাংলা সর্টহ্যাণ্ড প্রবর্তন করেন।

(নয়)

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন (১৩০৮) পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। সেটি হলো 'নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন।'

নিউটন বলেছেন, চলমান বস্তু চলতে চলতে যদি পথের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তবে সে বস্তু বাইরের শক্তি কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হয়েই স্থির হয়ে দাঁড়ায় এবং যে বস্তু যে স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, সে বস্তু যদি সে স্থান থেকে আবার চলতে শুরু করে, তবে বাইরের শক্তি কর্তৃক চালিত হয়ে চলতে আরম্ভ করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্ত দুটি থেকে নতুন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সেটি হলো, 'চলমান বস্তু যে মুহূর্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তটির 'প্রমাণও এই প্রবন্ধে দিয়েছেন। এর পরে আর একটি সিদ্ধান্তের হদিস এখানে মেলে— 'চলমান বস্তুমাত্রই দুই দুই মুহূর্তে পর্যায়ক্রমে প্রতিরুদ্ধ এবং চালিত হয়,— দুই-ই হয় বাহিরের 'শক্তি দ্বারা।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তটির প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন, চলমান বস্তু যে মুহূর্তে যে স্থানে উপস্থিত হয় সে মুহূর্তে সেই স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, চলমান বস্তু দুই মুহূর্ত কোন একটি স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। অতএব একথা স্থির যে চলমান বস্তু যে মুহূর্তে যেখানে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্তে সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, এবং তার পর মুহূর্তে সেখান থেকে স্থানান্তরে প্রধাবিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, নিউটনের সিদ্ধান্ত অনুসারে, চলমান বস্তু যে মুহূর্তে যেখানে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্তে সেখানে বাইরের শক্তি দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তার পর মুহূর্তে বাইরের শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে স্থানান্তরে ধাবিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'চলমান বস্তুমাত্রই দুই দুই পর্যায়ক্রমে (অর্থাৎ পালাক্রমে, অলটারনেটলি) প্রতিরুদ্ধ এবং চালিত হয়।'

নিউটনের আবিষ্কৃত কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রাভিগ সেন্ট্রিপেটাল এবং সেন্ট্রিফিউগাল বলের সঙ্গে এখানকার প্রতিরোধক শক্তি এবং চালক-শক্তির সৌসাদৃশ্যের আভাস দ্বিজেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, মনে করা যাক একগাছি দড়ির এক প্রান্তে একখণ্ড সীসা বেঁধে তার দ্বিতীয় প্রান্ত ধরে সীসাটাকে দ্রুতবেগে ঘোরানো হচ্ছে। এস্থলে চালক-শক্তির প্রভাবে সীসাটি ঘূর্ণায়কের হাত থেকে দূরে ধাবিত হয়ে দড়িটিকে বাইরের দিকে টানছে এবং ঘূর্ণায়কের হাতের রোধক-শক্তি দড়িটিকে এর বিপরীত দিকে টানছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে দড়িটি দুই-দুই মুহূর্তে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত এবং প্রতিরুদ্ধ হয়। একথা মনে হবার কারণ তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রকাশ করেছেন।

'সীসাটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে দড়িটা যদি কোনো মুহূর্তে বেশীমাত্রা প্রসারিত হইয়া হস্ত হইতে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহার অব্যবহিত পরমুহূর্তে ঘূর্ণায়ক দড়িটার ধৃতস্থান বেশীমাত্রা বলের সহিত আঁটিয়া ধরে। দড়ি বেশীমাত্রা প্রসারিত হইলে, পরে ঘূর্ণায়ক বেশীমাত্রা বলের সহিত ধৃতস্থান আঁটিয়া ধরে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, ওরূপ স্থলে চালক-শক্তি ও রোধক-শক্তি পূর্বাপর দুই মুহূর্তে পর্যায়ক্রমে কার্য করে। এখানে চালক-শক্তি অতিকেন্দ্রিক সেণ্ট্রিফিউগাল —অর্থাৎ কেন্দ্রের বন্ধন অতিক্রম করিয়া সীসাটাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে এবং রোধক-শক্তি অনুকেন্দ্রিক সেন্ট্রিপেটাল অর্থাৎ সীসাটাকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফল কথা এই যে, কবিতার ছন্দে যেমন লঘু-গুরু মাত্রা পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত হয়, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র রোধক-চালক, অনুকেন্দ্রিক-অতিকেন্দ্রিক, রাত্রি-দিবা কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন প্রভৃতি যুগলগণ পর্যায়ক্রমে তরঙ্গায়িত হইতেছে...'।

দ্বিজেন্দ্রনাথের আরো একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি 'জ্যামিতির নূতন সংস্করণ' সৃষ্টি। ১২৮৬ সালের অগ্রহায়ণ পৌষ এবং ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায়

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলেছেন—সকলেরই জানা আছে যে, ভারতবর্ষই গণিতশাস্ত্রের জন্মভূমি, কিন্তু অনেকের এখনো এমন সংস্কার আছে যে, জ্যামিতি-বিদ্যার জন্মভূমি আমাদের এদেশ নয়—গ্রীস দেশ।

'কথাটাই শুনিতে কেমন ঠেকে যে, যে-দেশ—গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ণ, তত্ত্ববিদ্যা, প্রভৃতি সকল বিদ্যারই আদিম বাসস্থান, সে দেশে ভূমিমান বিদ্যা একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল; কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের অধ্যবসায়কে ধন্য—তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগেও আমাদের দেশে জ্যামিতির অনুশীলন ছিল, জ্যামিতিক প্রণালী অনুসারে যজ্ঞকুণ্ডের ইষ্টক সাজাইবার ব্যবস্থা বৈদিক শাস্ত্রেও স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।'

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে বেদী নির্মাণ একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বেদী নির্মাণ প্রক্রিয়া থেকে শুধু যে জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছে তা নয়, বীজগণিতেরও উদ্ভব হয়েছে এখান থেকে। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে 'মহাবেদী'র উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হলো একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম।

বৈদিক যুগে জ্যামিতিকে বলা হতো 'শুল্ব'। শুল্বকারেরা ঋজুরেখ ক্ষেত্র রচনায়, ক্ষেত্রফল, ঘনফল নিরূপণে, বৃত্তকে বর্গে পরিণত করতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, 'গ্রীক দেশীয় আদি তত্ত্ববিৎ পিথাগোরাস আমাদের এদেশ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের বীজ লইয়া গিয়া তাঁহার নিজ দেশে তিনিই সর্বপ্রথমে তাহার চাষ আরম্ভ করেন, এই পিথাগোরাসই ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম সর্গের ৪৭ সিদ্ধান্তের প্রথম আবিষ্কর্তা বলিয়া বিখ্যাত; এদিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ ৪৭ সিদ্ধান্তটিই বৈদিক কালীন যজ্ঞীয় ইষ্টক সাজাইবার সময় বিশেষরূপে প্রয়োজন হইত।'

শুল্বশাস্ত্রে বৈদিক হিন্দুদের পারদর্শিতা ও বোধায়ন, আপস্তম্ব ইত্যাদি শুল্বকারদের নানা মন্তব্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তথাকথিত পিথাগোরীয় উপপাদ্য হিন্দুদের আবিষ্কার। হ্যাঙ্কেল, ইয়ুঙ্গে প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, পিথাগোরাস তাঁর নামে প্রচলিত উপপাদ্যের প্রথম আবিষ্কর্তা নন। স্যার টমাস হীথ এই উপপাদ্য সম্পর্কে ভারতের কৃতিত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত কালচারাল হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া-তে প্রকাশিত তাঁর বৈদিক ম্যাথেমেটিকস শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে এসম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

........The Hindu Baudhayana (800 B C) in whose Sulva we now meet with the general enunciation of the theorem, was much anterior to the Greek and Satapatha Brahmana (2000 B.C.). There are reasons to believe it to be as old as the Taittiriya and other samhitas'.

একথা সত্য যে, তত্ত্বজ্ঞান, গণিত, জ্যামিতি ইত্যাদির বীজ আমাদের দেশ থেকে গ্রীসে যায়, তাহলেও একথা দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন 'গ্রীস দেশে তাহার অনুশীলনের যেমন একটি অপূর্ব প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তেমনটি আমাদের দেশে কস্মিনকালেও হয় নাই।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ইউক্লিডের জ্যামিতির ত্রুটি বের করে বলেছেন যে, এই জ্যামিতির ভিত্তিমূল দোষশূন্য নয়। যদি ইউক্লিডের গোড়ার তত্ত্বগুলি আমাদের দেশোচিত সহজ বুদ্ধি দ্বারা স্থিরীকৃত হতো, তাহলে ইউক্লিডের জ্যামিতি সর্বাংশে নির্দোষ হতো বলে তিনি মনে করতেন। এপ্রসঙ্গে তিন আরো বলেছেন—'আমরা ইউক্লিডের বিরোধী পক্ষ বলিয়া নহে পরন্তু আমরা তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত বলিয়া তাঁহার সেই দোষগুলির সংশোধনে এতাধিক আয়াস পাইতেছি।' অর্থাৎ অবজ্ঞা নয়, অনুরক্তির কারণেই তিনি ত্রুটিগুলি বের করে তাঁর সংশোধন করতে চাইছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথমেই ইউক্লিডের বিন্দু ও রেখার সংজ্ঞা বিচার করেছেন। ইউক্লিড বলেছেন, যার স্থান মাত্র আছে, কিন্তু আয়তন নেই তাকে বিন্দু বলে, আর যার দৈর্ঘ আছে প্রস্থ নেই তাকেই বলে রেখা। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই যুক্তি খণ্ডন করে নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন। উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও বিজ্ঞানের দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক।

'এ দুটি কথা বুঝিতে হইলে অতীব মার্জিত বুদ্ধিকেও পরাস্ত মানিতে হয়, প্রথমতঃ আয়তনই জ্যামিতি-বিদ্যার যথাসর্বস্ব, আদবেই যাহার আয়তন নাই জ্যামিতি সম্বন্ধে তাহা কিছুই নহে, যাহা কিছুই নহে, তাহার স্থান নির্দেশ করা অসম্ভব, অতএব বিন্দুর আয়তন নাই অথচ তাহার স্থান আছে একথা যুক্তিতে স্থান পাইতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ আদবেই যাহার প্রস্থ নাই এরূপ দৈর্ঘ অসম্ভব; পুনশ্চ দৈর্ঘ কি, প্রস্থ কি, বেধ কি, তাহা জানিতে হইলে তিনটি সরলরেখা একটি বিন্দু হইতে আড়কোণে রাইট অ্যাঙ্গেল ত্রিধা প্রসারিত হইয়াছে এটি অন্ততঃ জানা চাই, সুতরাং সরলরেখা কি তাহা জানা চাই; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, রেখার সংজ্ঞা আয়ত্ত করিতে গেলে সরলরেখার সংজ্ঞা না জানিলে চলে না—কিন্তু রেখার সংজ্ঞা নিরূপণের পূর্বে সরলরেখার সংজ্ঞা নিরূপণ আর শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া—একই ব্যাপার; সুতরাং ইউক্লিডের কৃত রেখার উক্ত সংজ্ঞা নামমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।' (ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৮৬, পৃ ৩৭৯)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের গণিতপ্রতিভা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। রীস সাহেব ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। তিনি কাউকেই বড় একটা প্রশংসা করতেন না। কেবল একবার দ্বিজেন্দ্রনাথের বুদ্ধির প্রশংসা করেছিলেন।

'দ্বিজেন্দ্রবাবু সেই সময়ে নূতন প্রণালীতে একখানি জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে সেই বই একখণ্ড দিল—তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন, দিস ম্যান হ্যাজ ব্রেইনস।

গণিতশাস্ত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তার প্রমাণ মেলে নিজের জীবনস্মৃতি বর্ণনায়। শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপধ্যায় সম্পাদিত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ (বিদ্যাভারতী, ১৩৭৩, নতুন সং) গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় আছে—

'অঙ্ক আমার ভাল লাগিত, কিন্তু ক্লাসের বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে অঙ্ক কষা ও গণিতশাস্ত্র অধ্যায়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ভাল লাগিত ট্রিগোনোমেট্রি ও মেনসুরেশন, বাড়ীতে ইচ্ছামত তাহাই আলোচনা করিতাম।' বিগত ১৩২৭ বঙ্গাব্দের দোলপূর্ণিমার দিন এই আলোচনা হয়েছিল।

ক্লাসের বাঁধাধরা ছকের মধ্যে অঙ্ক কষতে ভাল লাগে নি বলেই তিনি জ্যামিতির নূতন সংস্করণ রচনা করার মত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

(দশ)

সরলরেখার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইউক্লিড বলেছেন, দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী যত রেখা হতে পারে, তাদের মধ্যে যে রেখা সবচেয়ে ছোট, তাকেই সরলরেখা বলা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন, ইউক্লিডের এই সংজ্ঞাটি উপযুক্ত হয়নি। তার প্রমাণ, যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা ইউক্লিডকে স্বতন্ত্র একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে হয়েছে যে, ত্রিকোণের দুই ভুজ অপেক্ষা তার তৃতীয় ভুজ ছোটো, আর এক কথায় এই যে দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী সরলরেখাদ্বয়ের সমষ্টি-জাত ভগ্ন রেখার চেয়ে উক্ত বিন্দু দুটির মধ্যবর্তী সরলরেখা ছোট।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ইউক্লিডের কোণের সংজ্ঞারও ত্রুটি বের করে বলেছেন—ইউক্লিডের মতে দুই যোগযুক্ত রেখার পরস্পরের প্রতি অবনতিকে কোণ বলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন, ইউক্লিডের এই সংজ্ঞা ঠিক হলে সেই অবনতির ন্যূনাধিক্য অনুসারে কোণ ছোট কি বড় তা বোঝা যাবে, কিন্তু এর ফলে ঠিক তার বিপরীত দেখতে পাওয়া যায়—অবনতির মাত্রাধিক্য হলে কোণ বড় না হয়ে ছোট হয় এবং তার মাত্রা অল্প হলে কোণ ছোট না হয়ে বড় হয়, এবং 'এইরূপ কোণের পরিমাণ-কালে তাহার সংজ্ঞার বিপর্যয় দশা উপস্থিত হয়'।

ইউক্লিড কেবলমাত্র শূন্য আকাশের আয়তনকেই জ্যামিতির মধ্যে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ জড়বস্তুগত আকাশের আয়তন গণনার মধ্যে নিয়েছেন।

'ইহাতে কেহ যদি ইউক্লিডের পক্ষ অবলম্বনপূর্বক আমাদিগকে এই বলিয়া দোষ দেন যে, ভৌতিক বস্তুর আয়তন সকলকে আমলে আনা বাড়ার ভাগ—তাহাতে ফল কিছুই নাই, লাভের মধ্যে জ্যামিতির বিশুদ্ধতাটি নষ্ট করা হয়, তবে তাঁহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, শূন্য আকাশে বদ্ধ থাকাই যদি জ্যামিতির বিশুদ্ধতা হয়, তবে ইউক্লিডের হস্তে বহুকাল যাবৎ মারা গিয়েছে; ইউক্লিড যখন তাঁহার প্রথম সর্গের চতুর্থ প্রস্তাবে একটা ত্রিকোণকে আর একটা ত্রিকোণের গাত্রসাৎ করিয়া বসাইতে বলিয়াছেন, তখনই পূর্বোক্ত ত্রিকোণকে জড়বস্তু স্বীকার করা হইয়াছে, যেহেতু শূন্য-আকাশখণ্ডকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া কোন মতেই সম্ভবে না,—সুতরাং সেই প্রস্তাবের সিদ্ধান্তের উপর আর যতগুলি প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে, সকলেরই বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিন্দু ও তার স্থান সম্বন্ধে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এবারে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিন্দুর সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এইভাবে—'যে জড়বস্তুর আয়তন এত অল্প যে, তদপেক্ষা অল্পায়ত বস্তু ইন্দ্রিয়-মনের গ্রহণ-সাধ্য নহে, তাহাকে বিন্দু কহে।' বিন্দুর স্থান সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'যে-কোন আকাশখণ্ডকে যে-কোন জড়বস্তু সর্বাংশে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা সেই জড়-বস্তুর ব্যাপ্তিস্থান এবং যে-কোন আকাশ-খণ্ডকে যে-কোন বস্তু ঐরূপে অধিকার করিয়া থাকিলেই থাকিতে পারে, তাহা সেই বস্তুর ব্যাপ্যস্থান বলিয়া উক্ত হয়। বিন্দুর স্থান বলিলেই বিন্দুর ব্যাপ্তিস্থান বুঝায়।'

জড়বস্তুর ব্যাপ্তিস্থান বহির্ভূত সমস্ত আকাশকে তার বহিরাকাশ বলেছেন। রেখার সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন এমনিভাবে—'যে বস্তুর ব্যাপ্তিস্থান বিন্দুর প্রয়াণোপযোগী একটি মাত্র পথ, তাহাকে রেখা কহে। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, রেখা এত সরু যে, তদপেক্ষা সরু বস্তু ইন্দ্রিয়-মনের গ্রহণ-সাধ্য নহে।' সরলরেখার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—যে-রেখার দুই প্রান্ত স্থানের মধ্যে তার একটি ছাড়া আর ব্যাপ্যস্থান নেই, তাকে বলে সরলরেখা। 'কোণে'র সংজ্ঞা পরিবর্তন করে তিনি বলেছেন, কোন একটি বিন্দু থেকে দুটি রেখা দু'-দিকে প্রসারিত হলে উভয়ের মধ্যবর্তী আকাশ-উন্মীলনকে কোণ বলে এবং সেই রেখাদ্বয়কে সেই কোণের ভুজ বলে এবং ভুজদ্বয়ের সন্ধিস্থলকে কোণের চূড়া বলে।

'সমান্তরাধ্যায়' (ভারতী, পৌষ, ১২৮৬ পৃ, ৪১৬) নিবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন—রেখা বা ক্ষেত্র বা অন্য যে-কোন জ্যামিতিক বস্তু এবং তার ব্যাপ্তিস্থান দুয়ের মধ্যে শুদ্ধ কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, কথিত জ্যামিতিক বস্তু এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যাপ্তিস্থান স্থানান্তরিত হইতে পারে না, এই প্রভেদটি যদি ধরা না যায়, তবে জ্যামিতির চক্ষে উভয়েই অবিকল সমান, এজন্য উভয়ের একটি সম্বন্ধে যাহা কিছু স্থিরীকৃত হয়, অন্যটির সম্বন্ধে তাহাই খাটিতে চায়।

'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ, ১২৮৭ সংখ্যাতেও দ্বিজেন্দ্রনাথের 'জ্যামিতির নূতন সংস্করণ' শীর্ষক প্রবন্ধের মতো আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের (১২৮৭) মাঘ মাসে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (ভৌতিক-বিজ্ঞানের মূল-পত্তন) পূর্বেকার জ্যামিতিক সংজ্ঞাগুলির পরিমার্জনা করা হয়েছে। জ্যামিতির যে নূতন প্রণালীগুলি তিনি দিয়েছেন, সেগুলি রীতিমত খাটালে জ্যামিতি চর্চার সহজ অথচ সুবিচার-সঙ্গত নতুন একটি পথ উদ্ঘাটিত হতে পারে। 'ভৌতিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন' প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, এই প্রবন্ধে ভৌতিক বিদ্যার মূল-তত্ত্বগুলি এবং যে-সকল অকাট্য তত্ত্ব তা থেকে সহজে পাওয়া যেতে পারে, তার কথাই বলা হবে। এখানে আরো বলা হয়েছে যে, জ্যামিতি ভৌতিক বিজ্ঞানেরই অঙ্গবিশেষ।

'রেণু ও বিন্দুর' সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—'যে-বস্তুর আয়তন প্রত্যক্ষ-গম্য অথচ এত অল্প যে, তাহা অপেক্ষা অল্পায়ত বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য নহে, তাহা রেণু বলিয়া উক্ত হয়।'

রেণু কর্তৃক যেটুকু আকাশ পূরিত হইতে পারে, তাহা বিন্দু বলিয়া উক্ত হয়।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, রেণুর যে বাস্তবিক কোন অংশ নেই তা নয়, কিন্তু তা প্রত্যক্ষের অতীত; অতএব জ্যামিতির ব্যবহারে আসতে পারে না। কারণ, জ্যামিতির কাছে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বস্তুই বস্তু, প্রত্যক্ষের অতীত বস্তু নহে, কাজেই রেণু অনায়ত বস্তু। তবে যে বস্তু বহুরেণুর সমষ্টি তাকে বলে আয়ত বস্তু।

এই প্রবন্ধে ধারা ও রেখার নতুন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যে আয়ত বস্তুর প্রতিটি খণ্ডের প্রান্তরেণু সেই খণ্ডের একটিমাত্র রেণুকে স্পর্শ করে, তাছাড়া সে খণ্ডের দ্বিতীয় কোন রেণুকে স্পর্শ করে না তাকে 'ধারা' বলে। ধারা কর্তৃক যতটা আকাশ পূরিত হতে পারে তাকে 'রেখা' বলা হয়।

গতি, বেগ ও আনুপূর্বিক বেগের সুন্দর সংজ্ঞা এখানে দেয়া হয়েছে। 'গতি'র সংজ্ঞা—'কোন বস্তুর, এক স্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্তি, গতি বলিয়া উক্ত হয়।' বেগ কাকে বলে?—'নির্দিষ্ট কালের মধ্যে আয়ত পথ অতিক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি বেগ বলিয়া উক্ত হয়।' আনুপূর্বিক বেগের সংজ্ঞা হলো—'যে বেগের প্রভাবে প্রত্যেক সমদীর্ঘ কালাংশে সমদীর্ঘ পথাংশ অতিবাহিত হয় তাহা আনুপূর্বিক বেগ বলিয়া উক্ত হয়।' 'বলে'র (ফোর্স) সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—'বস্তু-বিশেষের বেগের উৎপত্তি ধ্বংস ও হ্রাস-বৃদ্ধির কারণকে বল কহে।'

১২৯০ সালের পৌষ সংখ্যায় ভারতী পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি উল্লেখ-যোগ্য কীর্তি 'স্থান-মান' প্রবন্ধ প্রকাশ। এই শিরোনামের প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের 'ভূমিকা' অংশে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন যে ইউক্লিড নিঃসন্দেহে মহাজ্ঞানবান তপস্বী। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে ত্রুটিগুলি আছে 'যদি দৃঢ় বস্তুর বিনা-সাহায্যে সে দোষগুলির সংশোধনের পথ কেহ আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারো, তবে আমরা অসংকুচিত চিত্তে সেই পথের অনুগামী হইব।'

'স্থান-মান' শব্দের অর্থ কি? উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন তা হলো স্থানের পরিমাণ কার্য। স্থান কি? তা হলো

'আকাশ-খণ্ড'। আকাশ বললে দুটি রূপে বোঝায়—এক হলো অসীম আকাশ যার পরিমাণ সম্ভব নয়, তাকেই বলে মহাকাশ। আর হলো সীমাবদ্ধ আকাশ, যার পরিমাণ করা সম্ভব—তাকে বলে খণ্ডাকাশ বা আকাশ-খণ্ড। মহাকাশ হলো অপরিমিত এবং নিরাকার, খণ্ডাকাশ হলো পরিমিত এবং সাকার।

বিষয়টি বোঝানোর জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি আঙ্কিক উদাহরণ দিয়েছেন।

ক গ
চ
খ ঘ
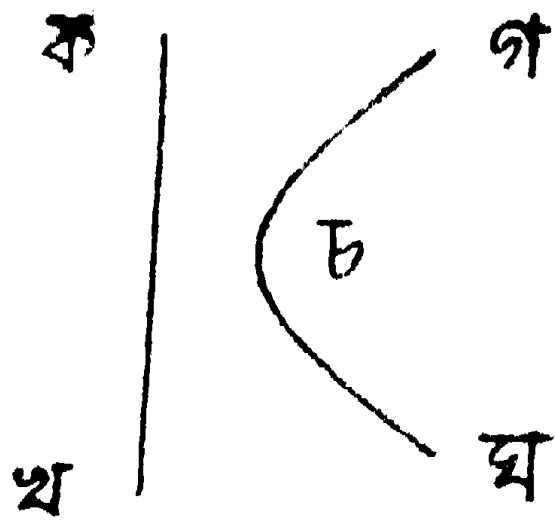
মনে করা যাক, একটি ঋজু লৌহ-শলাকা, কখ, কখ—স্থান (কখ—আকাশ-খণ্ড) অধিকার করে আছে। ঐ ঋজু শলাকাটিকে বাঁকিয়ে যদি তাকে গ-চ-ঘ রূপী বক্র শলাকায় পরিণত করা যায় তাহলে তার আয়তন কমেও না, বাড়েও না, শুধুমাত্র তার আকারের পরিবর্তন হয়।

অতএব গচঘ-রূপী বক্র স্থানটিও যতখানি আয়ত, ঋজু স্থানটিও ঠিক ততখানি আয়ত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখ-স্থানের (বা কখ আকাশ খণ্ডের) আয়তন যেমনি গ চ ঘ স্থানের আয়তনের সমান, তেমনি কি উভয়ের আকারও সমান। কিন্তু তা কখনোই হতে পারে না। কখ-শলাকার আকার যেমন ঋজু, তার অধিকৃত কখ-স্থানও তেমনি ঋজু এবং গ চ ঘ-শলাকা যেমন বক্র, তার অধিকৃত স্থানও তেমন বক্র। সুতরাং কখ এবং গচঘ এই দুই স্থান যদিও সমদীর্ঘ তবুও উভয়ে সম আকৃতির হতে পারে না। যদি কখ স্থান ঋজু আকার পরিত্যাগ করে গচঘ স্থানের অনুরূপ বক্র আকার ধারণ করতে পারতো, তবে গ চ ঘ রূপী বক্র বস্তুও কখ-স্থান অধিকার করতে সমর্থ হতো, কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা নেই। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে আকাশ-খণ্ড মাত্রেরই নির্দিষ্ট আয়তন আছে, আছে নির্দিষ্ট আকৃতি, তার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

(এগারো)

দ্বিজেন্দ্রনাথের আরো একটি উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ ১৩০৬ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্বাদশস্বীকার্য বর্জিত জ্যামিতি'। এই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তগুলিই (থিওরেমগুলিই) জ্যামিতির কাজের অবয়ব; করণীয় কার্যগুলো (প্রোব্লেমগুলো) জ্যামিতির বাজে ডালপালা।'

তিনি এই প্রবন্ধে কতগুলি নতুন সংস্কার অবতারণা করেছেন। যেমন, প্রস্থের পারদ্বয়—নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রস্থের সীমাবাহিনী রেখাদ্বয় উহার পারদ্বয় বলিয়া উক্ত হইবে।' পারাশ্রিত প্রস্থ হলো—দুই পারের মধ্যবর্তী হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন প্রস্থ।' পারান্তর রেখা হলো 'পারাশ্রিত প্রস্থের পারদ্বয়ের একটি আরেকটির পারান্তর। এবং পারদ্বয় মাত্রই পরস্পরের সঙ্গে সমবাহী হবে।'

এই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'নূতন সম্ভাব্য', 'নূতন স্বীকার্য' এবং কয়েকটি 'স্বতঃসিদ্ধের' সংজ্ঞা দিয়েছেন। নূতন সম্ভাব্য (পস্টুলেট) হলো দুই রেখা পরস্পর কাটাকাটি করিলে একটির প্রান্ত-স্থানের মধ্য দিয়া আরেকটির পারান্তর প্রসারিত হইতে পারে।' নতুন 'স্বীকার্য' (অ্যাক্সিঅ্যাম) হলো— পারাশ্রিত সমান প্রস্থদ্বয়ের একটির এপারে আরেকটির এ পার লিপ্ত করিয়া দ্বিতীয় প্রস্থটিকে যদি প্রথম প্রস্থটির গাত্রসাৎ করিয়া বসানো যায়, তবে দ্বিতীয়টির ও-পার প্রথমটির ও-পারের গাত্রসাৎ হইয়া যাইবে।'

প্রস্থদ্বয়ের একটিকে আর একটির গাত্রসাৎ করে বসানো জ্যামিতি পাঠকের সাধ্যায়ত্ত কি না সে কথাটাই আগে ভাবতে হবে। ইউক্লিডের চতুর্থ প্রতিজ্ঞা তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ প্রথম থিওরেম), আর তাঁর সেই প্রথম সিদ্ধান্তেই তিনি স্বপক্ষ সমর্থনের আর কোন উপায় না দেখে দুটি সম অবয়ব ত্রিভুজের একটিকে আর একটির গাত্রসাৎ করে বসিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন—কিভাবে ইউক্লিড এ কাজ করলেন? না, কল্পনা। এই যুক্তি দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের স্বীকার্যটিকেও যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'প্রথম স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব' হলো—'দুই সমজাতীয় দ্বিসীমক জ্যামিতিক বস্তু যদি সমান হয় তবে একটির **এক সীমায়** আরেকটির এক **সীমা** লিপ্ত করিয়া দ্বিতীয় বস্তুটিকে প্রথমটির গাত্রসাৎ করিয়া বসানো হইলেই দ্বিতীয়টির **অপর সীমা** প্রথমটির **অপর সীমার** গাত্রসাৎ হইয়া যাইবে।'

'দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব' হলো—'দুই কোণ যদি সমান হয় তবে দোঁহার **আগায়** আগা এবং এধারে এধার মিলাইয়া একটিকে আরেকটির গাত্রসাৎ করিয়া বসানো হইলেই প্রথমটির ওধার দ্বিতীয়টির ওধারের গাত্রসাৎ হইয়া যাইবে।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বারোটি সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও প্রমাণ করেছেন। সেগুলি হলো—

(১) দুই সমান প্রস্থের সমকোণিক সেতুদ্বয় সমান। তেমনি আবার একই প্রস্থের দুই সমকোণিক সেতু সমান। পুনশ্চ সমকোণিক সেতুদ্বয়ের পৃষ্ঠশায়ী সমকোণদ্বয়ের সম্মুখবর্তী অন্তস্কোণদ্বয় সমান।

(২) অসমান প্রস্থদ্বয়ের সমকোণিক সেতু বড়র-টি বড় এবং ছোটোর-টি ছোটো।

(৩) সমসূত্র কোণদ্বয় মাত্রই সমান। মধ্যম কোণদ্বয় তথৈবচ।

(৪) দুই সরলরেখা যদি পরস্পর কাটাকাটি করে তবে উভয়ের সন্ধিস্থানকৃত প্রতিমুখী কোণদ্বয় সমান।

(৫) পার-দ্বয়ের যোজক সেতুর পৃষ্ঠ-শায়ী বৈবর্তিক কোণদ্বয় সমান। উহার সমপৃষ্ঠশায়ী বাধাহিত কোণদ্বয় সমান। এবং উহার সমপৃষ্ঠশায়ী অন্তস্কোণদ্বয়ের সমষ্টি=সমসূত্র কোণ।

(৬) কোনো রেখাদ্বয়ের যোজক সেতুর পৃষ্ঠশায়ী বৈবর্তিক কোণদ্বয় যদি সমান হয়, তবে সেই দুই রেখা পরস্পরের পারান্তর।

(৭) দুই রেখা যদি একই রেখার পারান্তর হয় তবে উভয়ে পরস্পরের পারান্তর।

(৮) ত্রিভুজের ত্রিকোণ-সমষ্টি=সমসূত্র কোণ। মধ্যম কোণিক ত্রিভুজের মধ্যমেতর দ্বিকোণ সমষ্টি=মধ্যম কোণ। যদি কোনো ত্রিভুজের দ্বিকোণ সমষ্টি হয়=মধ্যমেতর কোণ, তবে তাহার অবশিষ্ট কোণ মধ্যম কোণ। ত্রিভুজের বহিস্কোণ=বাধাহিত অন্তস্কোণদ্বয়ের সমষ্টি।

(৯) দুই ত্রিভুজের একটির দ্বিকোণ-সমষ্টি যদি হয়=আরেকটির দ্বিকোণ সমষ্টি, তবে দোঁহার অবশিষ্ট কোণদ্বয় সমান। দুই মধ্যম কোণিক ত্রিভুজের একটির কোনো মধ্যমেতর কোণ যদি হয়=আরেকটির কোনো মধ্যমেতর কোণ তবে দোঁহার অবশিষ্ট মধ্যমেতর কোণদ্বয় সমান।

(১০) এ প্রস্থের এ সেতু এবং ও প্রস্থের ও সেতু যদি পরস্পরের সমকোণিক হয় তবে

এ প্রস্থ ঃ ও প্রস্থ=এ সেতু ঃ ও সেতু অথবা যাহা একই কথা।

এ সেতু ঃ ও সেতু=এ প্র[illegible] ঃ ও প্রস্থ।

(১১) দুই ত্রিভুজের [illegible]টির এ কোণ এবং ও কোণ যথাক্রমে যদি হয়=আরেকটির এ কোণ এবং ও কোণ, তবে প্রথমটির এ কোণের সম্মুখবর্তী ভুজ ঃ তাহার ও কোণের সম্মুখবর্তী ভুজ=দ্বিতীয়টির তথৈবচ।

(১২) কোনো দুই রেখার যোজক সেতুর কোনো পৃষ্ঠের অন্তস্কোণ সমষ্টি যদি সমসূত্র কোণ অপেক্ষা ছোটো হয় তবে সে দুই রেখা যোজক সেতুর সেই পৃষ্ঠের সম্মুখভাগে যথাপরিমাণে প্রবর্ধিত হইলে যথাস্থানে সম্মিলিত হইবে।

এই দ্বাদশ সিদ্ধান্তটি হলো ইউক্লিডের দ্বাদশ স্বীকার্য।

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ১৩১৬ সালের ৩য় সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট গাণিতিক প্রবন্ধ আছে। সেটি হলো 'ঘর পূরণ'। একটি উদাহরণ দিলেই সকলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। যেমন, ১৫ পূরণের সাধন-মন্ত্র

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

আদর্শ ক্ষেত্র হলো

আদর্শ ক্ষেত্র

ক+৩	ক—৪	ক+১
ক—২	ক	ক+২
ক—১	ক+৪	ক—৩

১৫ পূরণ

৮	১	৬
৩	ক=৫	৭
৪	৯	২

ক'কে যদি ধরা যায়=৬		তবে ইষ্টলাভ হবে	১৮
ঐ	৭	ঐ	২১
ঐ	৮	ঐ	২৪
ঐ	৯	ঐ	২৭ ইত্যাদি

একটি চমৎকার কবিতায় অঙ্কের রহস্যটি আছে। বলা বাহুল্য কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রনাথের—

চূড়ার মাঝে চন্দ্র থুয়ে
　　ঘোড়ায় চ'ড়ে নাবো দুয়ে।।
ছর দিয়ে রেকাব ভিনে
　　দুই থেকে ওঠো তিনে।।
চৌগাঁয়ে নেবে পড়'।
　　ঘোড়া রেখে' হাতি চড়'।।
গজের পিঠে সেজে' বেরিয়ে,
　　ছয়ে যাও পাঁচ পেরিয়ে।।
সিন্ধুকুলে লাগিয়ে নাও,
　　ঘোড়ায় চ'ড়ে আটে যাও।।
ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগিয়ে,
　　নয়ে নাবো রাশ বাগিয়ে।।
মত্ত হাতির এড়িয়ে হাত!
　　ঘোড়ার চালে কিস্তিমাত!!

(বারো)

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৯০ বঙ্গাব্দের পৌষ—বৈশাখ, ১২৯১) 'স্থান-মান' প্রবন্ধসমূহ নিয়ে আবার আলোচনার সূত্রপাত করছি। ইতিপূর্বে স্থান-মানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছিল।

আকাশ-খণ্ডের আকার এবং আয়তন উভয়েই অপরিবর্তনীয় সে সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ নতুন বক্তব্য রেখেছেন—তা হলো, স্থান (অর্থাৎ শূন্য আকাশ-খণ্ড) মাপতে হলেই স্থূল বস্তুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়—শূন্য স্থান দিয়ে কিছু-আর শূন্য স্থান মাপা যায় না। স্থূল বস্তু দ্বারাই শূন্য স্থানের পরিমাপ কার্য সম্ভব। এক গজ মাপতে হলে, এক গজ পরিমাপের মান-দণ্ড সাহায্যে সেই শূন্য স্থানটিকে পূরণ করতে হয়। তেমনি গ্রহসকলের পরিধি আয়তন নির্ধারণ করতে হলেও স্থূল যন্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যক হয়। তাই স্থান-মানের আলোচনা ক্ষেত্রে, শূন্যস্থানের যেমন প্রবেশাধিকার আছে, তেমনি বস্তুরও প্রবেশাধিকার আছে। শূন্যস্থানের পূরণকর্তা হলো বস্তু এবং শূন্যস্থানের পরিমাপকও বস্তু।

এবারে খতিয়ে দেখা যাক বস্তু শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে। বস্ ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে বস্তু শব্দ। বস্ ধাতুর অর্থ—বাস করা। এখন বাস করা কথাটি বললেই বোঝাবে কোন স্থানে বাস করা। তাহলে স্থান কি? —না পরিমিত আকাশ-খণ্ড। তাহলে দেখা যাচ্ছে যা পরিমিত আকাশ-খণ্ডের অধিবাসী তাকেই 'বস্তু' বলে।

এই বস্তু শব্দ নিয়ে আলোচনার সময়ে দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নটি হলো—বাহ্য বস্তুই যদি বস্তু হয় তবে আত্মা কি বস্তু নয়? এর উত্তর নিজেই দিয়েছেন এমনিভাবে—আত্মা একহিসেবে শরীরে বাস করে, আর এক হিসেবে আকাশের অতীত। যে হিসেবে আত্মা শরীরে বাস করে, সেই হিসেবে আত্মাকে বস্তু বলা চলে এবং যে হিসেবে আত্মা আকাশের অতীত সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে আত্মা পুরুষ শব্দের বাচ্য।

নানা বস্তুর নানা লক্ষণ। তার মধ্যে যেসব লক্ষণ স্থান-মানের উপযোগী তাকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, আধিষ্ঠানিক লক্ষণ। আধিষ্ঠানিক লক্ষণের নিদর্শন হলো এমনি রকমের—'যে কোন বস্তুর যে কোন লক্ষণ এরূপ যে, সে লক্ষণ যেমন সেই বস্তুকে আরোপিত হইতে পারে, তেমনি সেই বস্তুর অধিকৃত স্থানেতেও আরোপিত হইতে পারে, সেই লক্ষণই আনুষ্ঠানিক শব্দের বাচ্য।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, স্থান মাপতে হলে দৃঢ়বস্তু দ্বারা শূন্য স্থান পূরণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন দৃঢ়বস্তুর বিভিন্ন লক্ষণ এবং তার ক্রিয়াও বিভিন্ন। 'সেই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কেবল আধিষ্ঠানিক লক্ষণ (জিওমেট্রিক্যাল প্রোপার্টি) এবং যে সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে কেবল অধিক্রিয়া (একুজেশান অফ স্পেস) এখানকার আলোচ্য বিষয়। অধি-ক্রিয়া তিনটি অবয়বে বিভক্ত—স্থিতি, সংস্থিতি, প্রস্থিতি।' যখন কোন একটি দৃঢ় বস্তু একটি শূন্যস্থান পূরণ করে তখন বলা হয় যে ঐ বস্তু উক্ত স্থানে স্থিত রয়েছে। একাধিক বস্তু একসঙ্গে মিলে যখন কোন একটি স্থান পূরণ করে, তখন সেই একাধিক বস্তু সেই স্থানে সংস্থিত হয়। কোন একটি বস্তু এক স্থান ছেড়ে যদি অন্য কোন স্থান অধিকার করে তবে তা পূর্বোক্ত স্থান থেকে শেষোক্ত স্থানে প্রস্থিত হয়।

বস্তুই স্থানে স্থিতি করে—স্থান আর স্থানে স্থিতি করে না, অতএব স্থিতি কেবলমাত্র বস্তুরই ধর্ম—স্থানের ধর্ম নয়।

স্থিতি দ্বারা আমরা কি স্থির করি? এক দৃঢ় বস্তু যেখানে ছিল, আর এক দৃঢ় বস্তু যদি ঠিক সেখানে অবস্থিতি করে, তবে ঐ দুই বস্তুর আকার এবং আয়তন ঠিক সমান। প্রস্থিতি সাহায্যে আমরা স্থির করি যে, যে স্থানের খণ্ডগুলি সন্নিহিত অংশাবলী যে দৃঢ়বস্তু কর্তৃক উত্তরোত্তর অধিকৃত হয়, সেই স্থানের আয়তন সেই দৃঢ়বস্তু অপেক্ষা ততগুণ বেশী। উদাহরণস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কাপড় মাপিবার একটি গজ, সাত গজ কাপড়ের সাতটি উত্তরোত্তরবর্তী সন্নিহিত অংশ উত্তরোত্তর ক্রমে অধিকার করিলে, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সেই কাপড়ের দৈর্ঘ্য এক গজ অপেক্ষা সাতগুণ বেশী।'

সংস্থিতি দ্বারা আমরা স্থির করি যে, কতকগুলি সমাকৃতি ও সমায়ত দৃঢ়বস্তু একসঙ্গে মিলিয়া যদি একটি স্থান পূরণ করে, তবে সেই দৃঢ়বস্তুগুলির সংখ্যা যত, সেই স্থানের আয়তন উক্ত বস্তুগুলির প্রত্যেকের অপেক্ষা ততগুণ বেশী।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'প্রচলিত জ্যামিতির সঙ্গে আমাদের মেলে না। প্রচলিত জ্যামিতিতে দৃঢ়বস্তুর বা কঠিন বস্তুর (রিজিড অর সলিড বডি) প্রবেশ নিষেধ। অতএব সেখানে স্থিতি, প্রস্থিতি, সংস্থিতি—এই কথাগুলির উত্থাপন হতে পারে না। তিনি আরো বলেছেন, দৃঢ়বস্তুর সাহায্যেই স্থান মাপা সম্ভব, শূন্য-স্থান দ্বারা স্থান মাপার কাজ করা যায় না। অতএব 'যাহারা দৃঢ়-বস্তুকে জ্যামিতির মধ্যে অধিকার দেন না, তাঁহারা পাকে-প্রকারে তাহা করিতে বাধ্য হন।'

জ্যামিতির ক্ষেত্রে দৃঢ়বস্তুকে অবতারণা করায় সুবিধে হয়েছিল এই যে, স্থান মাপার জন্য আমরা যদি কোন একটি দৃঢ়বস্তুকে এক স্থান থেকে আর-এক স্থানে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন মনে করি, তাহলে স্বচ্ছন্দে আমরা তা করতে পারব। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইউক্লিডের দ্বাদশ মূলতত্ত্বকে, মূলতত্ত্ব পদবীর অনুপযুক্ত মনে করেছেন।

ত্রিকোণের কোণত্রয়ের সমষ্টি দুই ঋজু কোণের সমান, এটি প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে প্রমাণ করতে হলে ঐ মূলতত্ত্বটির সাহায্য গ্রহণ না করলে চলে না, কিন্তু দৃঢ়বস্তুর অবতারণা প্রসাদে আমরা ঐ কৃত্রিম মূলতত্ত্বটিকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি, শুদ্ধ কেবল প্রস্থিতি প্রকরণ দ্বারা আমরা প্রমাণ করিতে পারিয়াছি যে, ত্রিকোণের কোণত্রয়ের সমষ্টি দুই ঋজু কোণের সমান।' (ভারতী, পৌষ, ১২৯০)

স্থান-মান হলো সাধারণ গণিত বিদ্যার একটি শাখা—বীজগণিত সেই সাধারণ-গণিত বিদ্যা। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই প্রস্তাব করেছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের আগে বীজগণিতের অন্ততঃ অমিশ্র সমীকরণ পর্যন্ত শিখিয়ে তার পরে স্থান-মান ধরানো উচিত।

১২৯০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় ভারতীতে সম্পূরক অংশ, অন্তঃপাতী অংশ, আনব অংশ, আয়তন, মুক্ত রেখা, **প্রান্তদ্বয়, সান্ধ্যান্তিক রেখাদ্বয়, যুক্ত-রেখা,**

সাম্প্রতিক প্রতিরূপ, রেখা, ধারা, তনু, দৈর্ঘ্য, ঋজুরেখা, শলাকা, ঋজু তনু, তানব অংশ, পরিরতানব অংশ, রেখাবচ্ছিন্ন স্থান এবং তাহার পরিধি, তল, ক্ষেত্র, সামতলিক স্থান, সামতলিক বস্তু, মহাসমতল, সহতল, ইত্যাদির সংজ্ঞা ও তৎসহ মন্তব্য রচনা করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

আণব অংশ—যে কোন বিষয়ের যে-কোন অংশ একটি অণুর সমাকৃতি তাকে সেই বিষয়ের আণব অংশ বলে।

আয়তন—যে কোন বিষয় এক অণু অপেক্ষা যতগুণ বড় বা ছোট, ততগুণ বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব সেই বিষয়ের আয়তন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—মনে করা যাক কোন একটি বিষয় একটি অণুর চেয়ে ১৩ গুণ বড়, তাহলে তার অর্ধাংশের আয়তন অণুর চেয়ে ৬½ গুণ বড়। তেমনি আবার, দুটি বিষয়ের একটির আয়তন যদি অণুর চেয়ে ৬½ গুণ বড় হয় ও আর একটি আয়তন অণুর চেয়ে ১৩ গুণ বড় হয়, তবে শেষোক্তের আয়তন পূর্বেকার চেয়ে দ্বিগুণ বড়। এমনও হতে পারে যে এক বস্তুর আয়তন অপেক্ষা আর এক বস্তুর আয়তন $\sqrt{২}$ গুণ বা $\sqrt{৩}$ গুণ বড়।

মুক্তরেখা—যে কোন স্থানের অন্তপাতী আণব অংশ দুয়ের ন্যূনাধিক নয়, সেই স্থানকে মুক্ত রেখা বলে। এই সংজ্ঞা দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন—মনে করা যাক, কোন একটি ঋজু বা বক্র-শলাকা এত সরু যে, তার দুই প্রান্তে তার যে দুটি আণব অংশ আছে তা তার অন্তপাতী অংশ, তাছাড়া তার তৃতীয় কোন আণব অংশ তার অন্তপাতী অংশ নয়, অর্থাৎ তৃতীয় কোন আণব অংশ তার কোন দুটির সম্পূরক অংশের একটি বা আর একটি নয়, তাহলে সেই শলাকাটির অধিকৃত স্থানকে মুক্ত রেখা বলা চলতে পারে। একটা বর্গ বা চৌকা, বা ত্রিকোণ (ত্রিভুজ) বা ষট্‌কোণ ফলকের আণব অংশ মাত্রই তার অন্তপাতী অংশ, এজন্য তার অধিকৃত স্থান রেখা শব্দের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

১২৯০ সালের চৈত্র সংখ্যার ভারতীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'দৃঢ়বস্তুর প্রস্থিতি' অর্থাৎ 'একস্থান ছাড়িয়া অন্যস্থানে গমন' সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি উপস্থিতি, স্থান অতিক্রমণ, স্থান পরিবর্তন, চলমান দৃঢ়বস্তু, গতি, প্রয়াণ স্থান, গম্যস্থান, পদাঙ্ক, পদাঙ্ক-বিন্দু, গমন পথ, অতিক্রান্ত অতিবাহিত বা অঙ্কিত পথ, সামতলিক বস্তুর সংস্থিতি এবং প্রস্থিতি, সামতলিক স্থান ও বস্তু, মহাসমতল ও সমতলবর্তী সামতলিক বিষয়সমূহ, অর-শলাকা, অর-শলাকার এবং তার বহিঃপ্রান্তের ঘূর্ণন পরিসর ও ঘূর্ণন-কেন্দ্র, কর-দ্বয়ের সহবর্তী অর-শলাকা, অপরিহার্য সমতলবর্তী কোণ, সমসূত্র কোণ, সহজ কোণ, ঋজু কোণ, তির্যক কোণ, তীক্ষ্ণ কোণ, স্থূল কোণ, উত্তর কোণ, উত্তর সমসূত্র, ঋজু, তির্যক, তীক্ষ্ণ ও স্থূল কোণ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

এর মধ্যেকার কয়েকটির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

কর, করদ্বয়, করাবলী ও আকর : যে কোন অণু থেকে যে কোন ঋজু তনু একটানে প্রসারিত হয়, সেই ঋজু তনু সেই অণুর কর (অর্থাৎ কিরণ) বলে উক্ত হয়, এবং সেই অণুকে সেই ঋজু তনুর আকর বলা হয়। একই কোন আকর থেকে দুটি কর প্রসারিত হলে উভয়কে বলে কর-দ্বয় এবং এই কোন আকর থেকে দুয়ের বেশী কর প্রসারিত হলে তাদের বলা হয় করাবলী।

অর-শলাকা, ঘূর্ণন কেন্দ্র ইত্যাদি : কোন একটি অপরিহার্য মূলস্থিত করধারা যদি অপরিহার্য সমতলস্থ হয়, তবে তাকে বলে অর-শলাকা। যদি কোন একটি অর-শলাকা স্বস্থান থেকে ঘুরতে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে নুতুন নতুন পদাঙ্কের মধ্য দিয়ে আবার নিজের জায়গাতে হাজির হয়, তবে সেই অর-শলাকার তখনকার গমন-পথকে সর্বকালেই সেই অর-শলাকার ঘূর্ণন পরিসর বলে এবং তার বাইরেকার গমনপথকে সর্বকালেই তার বহিঃ প্রান্তের ঘূর্ণন পরিসর বলে।

সামতলিক স্থান, মহাসমতল : সমতল বা তার আণব অংশ, তানব অংশ, কিম্বা বিস্তৃত অংশকে সামতলিক স্থান বলে। অসীম বিস্তৃত কোন একটি সমতলকে মহাসমতল বলা হয় এবং মহাসমতলের অংশ-মাত্রই ও সেই অংশের অধিবস্তু মাত্রই সেই মহাসমতলে অবস্থিত থাকে।

কোন কর-দ্বয়ের সহতল-বর্তী অর-শলাকা যদি সেই কর-দ্বয়ের মূলপ্রান্ত থেকে প্রসারিত হয়, তবে সে অর-শলাকা সেই কর-দ্বয়ের সহবর্তী। কোন কর-রেখাদ্বয়ের সহবর্তী অর-শলাকা ঐ কর-দ্বয়ের একটির সমদিক্-বর্তী স্থানে ঘুরে গেলে, সেই অর-শলাকা কর্তৃক যতটুকু পাক অতিক্রান্ত হয়, ততটুকু পাক সেই কর-রেখা দ্বয়ের কিম্বা সেই কর-রেখা দ্বয়ের দৃঢ় অধিবস্তু-দ্বয়ের কোণ বলা হয়, আর সেই কর-দ্বয়কে সেই কোণের কর-দ্বয় বলা হয় এবং সেই কর-দ্বয়ের মূলপ্রান্তকে সেই কোণের শিখর বা চঞ্চু বলা হয় এবং কর-দ্বয়ের বহিঃপ্রান্ত-দ্বয়কে সেই কোণের বহিঃপ্রান্ত বলা হয়।

উত্তর কোণ, উত্তর ঋজু, সমসূত্র, তির্যক, তীক্ষ্ণ কোণ : যে কোন তির্যক কোণ ঋজু কোণের চেয়ে ছোট তাকে বলে তীক্ষ্ণ কোণ, যে কোন তির্যক কোণ ঋজু-কোণের চেয়ে বড় তাকে বলে স্থূল কোণ। যে কোন কোণ সমসূত্র কোণের চেয়ে বড় হলে তাকে উত্তর-কোণ বলে। উত্তর-কোণ যদি সমসূত্র কোণের চেয়ে দেড় গুণ মাত্র বড় হয় তবে তা উত্তর ঋজু-কোণ সৃষ্টি করে। উত্তর কোণ যদি দুই সমসূত্র-কোণের সমষ্টি হয় তবে তাকে উত্তর সমসূত্র কোণ বলে। উত্তর ঋজু কোণ এবং উত্তর সমসূত্র-কোণ ছাড়া আর যে কোন উত্তর কোণ হোক না কেন, তাকেই বলে উত্তর তির্যক কোণ। উত্তর তির্যক কোণ যদি উত্তর ঋজু কোণ অপেক্ষা ছোট হয় তবে তাকে বলে উত্তর তীক্ষ্ণ কোণ, আর যদি উত্তর ঋজু-কোণের চেয়ে বড় হয় তবে তাকে উত্তর স্থূল কোণ বলে। এতক্ষণ আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ভাবনার সামান্য নজির নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছি। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতাবস্থায় পরিচিত ছিলেন দার্শনিক-সাহিত্যিকরূপে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধই সর্বাধিক। কিন্তু তাঁর যে দিকটির মূল্যায়ন একেবারেই হয় নি তা হলো তাঁর বিজ্ঞান চিন্তার দিক।

বিজ্ঞান হলো সত্যাশ্রয়ী, সত্য অন্বেষণ করাই বিজ্ঞানের একমাত্র কর্তব্য। যিনি বিজ্ঞানসেবী হবেন তাঁর মধ্যে এই বিশেষ গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরে এই পরম বোধ, সত্যের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা, কৌতূহলী বৃত্তি অতিমাত্রায় জাগ্রত ছিল।

তাঁর বিজ্ঞান প্রীতির যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং ক্রমবিবর্তনবাদ তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে-সব দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞান প্রবেশ করেছে তার মধ্যে ডারউইনের গবেষণা প্রভাব সর্বাধিক। পরবর্তীকালে [illegible] তাঁর চিন্তা জগতের অনেকখানি জুড়ে ছিল।

উপনিষদের আবহমণ্ডলে পরিপুষ্ট দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরে ধর্ম-প্রবণতা ছিল সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে দর্শন ও বিজ্ঞান চিন্তা। তাই তাঁর রচনায় পাওয়া যায় ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সহযোগিতার কথা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্ঞান-তপস্বী। জ্ঞানের ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ। কিন্তু প্রকাশে যদি আনন্দ না হয় তবে প্রকাশ হলেই বা লাভ কি? প্রাণের চাওয়ার সঙ্গে পাওয়াও পাশাপাশি লেগে থাকা চাই, তা না হলে প্রাণের বেঁচে থাকা ভার।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে বলেছেন ('জ্ঞান প্রাণের হরগৌরী ভাব', মানসী, কার্তিক, ১৩১৬, পৃঃ ৪০৫), যাঁরা নিউটনের মতো বিজ্ঞান সমুদ্রের ডুবুরি বা সক্রেটিসের মতো তত্ত্বজ্ঞান-সমুদ্রের ডুবুরী, তাঁদের জ্ঞান কখনোই পুরোনো হয় না, সর্বদাই তা নবীন, চিরভাস্বর। নিউটন এবং সক্রেটিসদের জ্ঞানের পাওয়া যেমন অতলস্পর্শী, চাওয়াও তেমনি, অভ্রভেদী মহান। নিরাসক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ এই ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। জ্ঞানের বিশাল জগতে তিনি চিরপথিক।

আরশিনগর

অনুপম দত্ত

পানপাতার মুখ। কালোর ঘনিষ্ঠ সবুজ ভাবলে তেমন রং মুখে। চোখ দুটো এখন দেখা যাচ্ছে না। যখন যাচ্ছিল তখন তেল মাখান সাদা জমি কালো মণি চকচকে। শাড়িটা ময়লা। কিন্তু সবুজে। উবু হয়ে বসেছে। দু-হাত অঞ্জলিবদ্ধ। অঞ্জলির মধ্যে দর্পণ। সবুজ। তেলে জবজবে। তাতে এখন প্রতিবিম্ব পড়ে আছে পেছনের ঝাঁকাল আঁশ শেওড়া গাছ, অশ্বত্থের পিছল পাতা, কটা তালগাছের পাতার ফলক কিংবা গোলপাড়ির। বিকেলের লাল আলো নেই তবে মৃদু জ্যোতির টানাটানা রেখা গাছপাতার ফাঁক থেকে ছুটে লুটোতে গিয়ে ওখানে আটকে পড়েছে। হাতটা একটু কাঁপছে আলোর রেখা দুলছে, গাছপালা, নিজের এলান চুলের প্রতিবিম্ব।

'না। নড়াচ্চোও না গো মেয়ে। নড়াইলে কুছু উঠবেক না।'

অতএব স্থির। নিশ্বাস বন্ধ হবার মত নিষ্কম্প হতে গিয়ে। অঞ্জলিবদ্ধ হাতের তলায় দর্পণ। তেলে মসৃণ, চকচকে। সবুজে নয়, কালোর ঘনিষ্ঠ সবুজে মলাটে প্রতিবিম্ব।

'কুছু ঠাওর হচ্ছে গো?'

ধূপ পুড়ছে। বিকেলে স্নান করে শীত লাগছে একটু। ধূপের গন্ধ শীতে মাথার ভেতর জড়িয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ মুখ চোখ নামিয়ে একদৃষ্টি দিতে গিয়ে মুখের ভেতর শুকনো স্বাদ, চোখে জ্বালা।

গোবরের পুঁটলিতে তুলসীর চারা। চারপাশে গোল করে জলের গণ্ডি। টাটকা দুইয়ে আনা কাঁচা দুধে কয়েকটা সাদা কড়ি চুবিয়ে রাখা। পেতলের কানা উঁচু থালায় দেখা যাচ্ছে কড়িগুলোর পিঠ। নয়নতারা ফুলের পাপড়ি ভাসছে সাদা দুধের উপর। বেগুনি রং। মোটা গাল, লাল চোখ আর ঝাঁকড়া চুল নিয়ে লোকটা সেই গণ্ডির বাইরে। তারও পেছনে অনেক বুড়ি, আইবুড়ি, বউ-ঝিরা। তাদের মধ্যে বেটাছেলেরা। সবাই এইদিকে তাকিয়ে আছে নিশ্বাস চেপে নিশ্চল হয়ে। নড়লে, শব্দ হলে যদি আয়োজন ব্যর্থ হয়। যদি ঠিকমত চেনা না যায়। তাই সকলের চোখগুলো শুধু বড় বড় হয়ে পলক ফেলছে ঘনঘন। আর কিছু নেই মুখ, হাত-পা, শরীর। শুধু চোখ। এবং তাদের মিলিত দৃষ্টি সামনের নামান চোখের পাতা থেকে পিছলে চিকন দর্পণে পড়ছে। কিংবা উঠে এসে সেই গণ্ডির গা ছুঁয়ে মোটা গাল, লাল চোখ, ঝাঁকড়া চুলের মুখটার উপর।

লোকটা জানু রোজা। ভূতপ্রেত তাড়ায়, বাঁধন কাটান দিয়ে সাপের বিষ নামায় চাপায়। বায়ু-বাউণ্ডুলে হলে কবচ দেয় ঝাড়ে ফোঁকে। আবার চুরি-চামারি হলে কড়ি চালায়, বাটি দৌড়োয়, পান দর্পণ নখদর্পণ করে। সে বলল, 'কি মেয়ে কুছু নজরে ঠাওর লিছে?'

'না।' মুখ তুলল গণ্ডির ভেতর বসে চিকনি। ওর চোখ দর্পণের মত সাদা জমি কালো মণিতে চকচক করল। বলল, 'কুছুই নাই।'

'নাই।' জানু কর্কশগলায় বলল, 'আসবেক। জরুর আসবেক। উর বাপ আসবেক। তুমি নজর সরায়ো না।'

আবার চিকনি ফিরিয়ে দিল তার দৃষ্টি সেই অঞ্জলিবদ্ধ পানপাতার দর্পণে।

জানু অসম্ভব জোর দিয়ে বলল, 'আসতে লাজ হচ্ছে। চুরি করতে লাজ নাই আসতে লাজ। আমার কাছে উসব রেঙু-চালাকি চলবেক নাই। অ মেয়ে টুকছি নজরটা চালাই দেখ—ছেঁড়ার পাখা পেখমে ইতুটুকুন সর্ষের পারা দর্পনে ফুটছে না?'

চিকনি এবার সত্যি দেখলো তেলমাখান পানপাতায় একটা ছায়া ফুটলো। একটা অবয়ব। অস্পষ্ট ধূসর। ওর চোখ জ্বালা

করছিল। শীত করছিল বলে ধূপের গন্ধ মাথার মধ্যে আরো জড়িয়ে যাচ্ছিল। কানের ভেতর বিকেলের হাওয়ার শব্দ পাখির ডাক অনেক দূরের মনে হচ্ছিল। পানপাতার ছায়াটা নড়ছিল। চিকনি নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'চিনতে লারছি।'

'লারবে, লারবে আখুনে।' জানু রোজা উৎসাহিত হয়ে নিজের হাঁটু চাপড়াল। বলল, 'পিছা ফিরে বইছে কি। ছামু বাগে আথুনি ফিরবেক। তুমি নজর সরাবো না মেয়ে।'

অবয়বের পেছন দিক। অস্পষ্ট ধূসর। বোঝা যায় না। অথচ বুঝতে চাইলে মনে হয় —মনে হয় মনে হয়, চিকনি মনে হওয়াতে চাইল সোনার হারটা আংটিটা রুপোর বিছেটা যে ওর সন্ধেবেলায় ঘর আঁধার দেখে লোক নেই দেখে সরিয়ে নিয়েছে সে। সে কে মেয়ে না ছেলে বুড়ো না জোয়ান কিছু জানে না চিকনি। কিন্তু এখন হাতের তলার ঝকঝকে সবুজ একটা পানপাতার গায়ে মাখান চকচকে তেলের উপর যে অবয়বটা ফুটছে হারাচ্ছে তাকে যা কিছু মনে হওয়াতে একটা মূর্তি ফুটবে স্পষ্ট, নিখুঁত। চোখ বন্ধ করলে যেমন চিকনি তাদের মঙ্গলি গাইটাকে দেখে সবুজ মাঠে ঘাস খাচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে তার তুলোর মত বাছুরটাকে ডেকে উঠল হাম্বা রবে। ঝুমঝুমি ছাগলছানাটা লাফাচ্ছে তো লাফাচ্ছেই। দরজার গোড়ায় কুকুরটা লেজ নাড়িয়ে ভাত চাইছে। বেড়ালটার কটা চোখে দুধের কড়াই মাছের টুকরো খুঁজি। গাঁয়ের পাশে নদী চোখ বুজলে কোনো সময় ফোটে। গাঁয়ের পাতা ধোয়া জলটুকু নরম। জলটুকু দৌড়ে দৌড়ে যায়। যেতে যেতে এ গাঁয়ের মাটির কাছ থেকে ও গাঁ হুজরংপুরের ধারে থমকে থাকে। সেখানে চিকনি যেতো গত অগ্রহায়ণে। যোগীন চেনা ছেলে। দুজনের একটা সম্পর্ক ছিল। তারপর বলা যেতো না, 'এই যোগে না ঠিক যেখানে না থাকে বলে দুব।' বা, 'যোগে না দুয়োকপুর যেছিস আমার লেগে একটা সোনামাখী ছাঁচ আনিস তো।' তখন মাকে মনেও 'যোগে' নামটা উচ্চারণ করতে মানা। একলা নামটা ছিল শুধু। তারপর—

'কি গো মেয়ে ছামু বাগে মুখ ফিরাইয়েছে?'

চিকন হঠাৎ পানপাতার ঘন সবুজে যোগিনের মুখটা দেখে ফেলল। বর্ষায় চাষ দেওয়া মাঠের মাটির মত মুখে রঙ। নরম। নরম গোঁফ ঘাসের মত। জমির আলো গজিয়ে উঠলে যেমন। চোখের পল্লবের আড়ালে ভিজে আকাশ কালো মেঘ। একদম 'পিকিত'। কোনো ভুল নেই। আর দেখেই চমকে উঠল চিকন। তার গলা দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরুল ভয়ের। হঠাৎ জলে ডুবে গেলে যেমন নিশ্বাস বন্ধের শব্দটা জলের উপর ভেসে উঠতে পারে না। কেবল খানিকটা হাওয়া বুদবুদি কেটে উপরে উঠে আসে।

অভিজ্ঞ জানু রোজার চোখ কিংবা বলা যায় শ্রবণশক্তি এড়াল না। আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল তার ধুনুচির গাঢ় ধোঁয়া নিয়ে চিকনের মুখের সামনে। বলল, 'হুঁ। উই বেটে মেয়ে, উই। সাঁঝ বিলায় পেথম অঙ্গুরিয়টি লিয়েছে। চিন, উকে চিন।'

যোগিন এখন পানপাতায় সম্পূর্ণ। সেই হলুদ গেঞ্জি গায়ে। পরনে ময়লা ধুতির মালকোঁচা। যেন হাসল চিকনকে দেখেই। যেন বলল,—শীত করছিল চিকনের, চারিদিক সুমসাম, ধূপের ধোঁয়া নাকের ভেতর দিয়ে সরাসরি মাথায় যাচ্ছিল, হাতের ভেতর পানপাতা নড়ছিল। একটা কি ধরনের বাতাস কানের পাশ দিয়ে চুলের ভেতর বইছিল। চিকন অদ্ভুতভাবে শুনল, 'এই অংগুরিটি তুর চিকন।'

'হেই বাবা, আমি কেনে লুব?'

'আনলম।'

'কেনে?'

'ভুল গেল। মিলাতে দেখলম নিকাছে। আয় পরাই দি।' যোগিন কাছাকাছি ঘন হয়ে দাঁড়াল তাদেরই ঘরের ছবি পানপাতায়। উঠের দিকে গোয়াল। পেয়ারা গাছ। তলায় নির্জন ছায়া। গরুগুলো মাঠে গেছে। ঝাঁড়তে গোবর ডাঁই করা। রাশীকৃত বিচালী কাটা শেষ। যোগিনের হাতে নকল পাথরের লাল রঙ জ্বলছে আংটিতে। যোগিন চিকনির আঙুল ধরল। অনামিকায় পরাবে।

চিকনি হাত টানল, 'না মা দেখবে।'

'তো কি?'

'বকবেক।'

দ্বিধায় দাঁড়িয়ে থাকল যোগিন। বাতাস এসে কাটা খড় ওড়াচ্ছে। পেয়ারা গাছের পাতা দোলাচ্ছে।

'আখুনো চিনতে লারছ মেয়ে?' জানু রোজার মুখটা লাল চোখ চিকনির পানপাতায় ঝুঁকে যেন দেখে নেবার মত করে এগুল।

আতঙ্কিত হল চিকনি। অঞ্জলিবদ্ধ হাত দোলাল। ভেসে যাচ্ছে ছবি। বলল 'বুঝতে লারছি।'

'হুঁ হুঁ—হুঁ। লরাইলে আরো লারবে। টুকচি থির হ্'য়ে দেখ। হুঁ, দেখ ইবার।' মন্ত্রের মত বিড় বিড় করে কি বলল জানু রোজা। হাতের আঙুলে বাঁকাল সোজা করল কি মুদ্রায়।

কিন্তু পানপাতায় এখন কিছু নেই। কেবল বোশেখের বিকেলের ছায়া দর্পণে। দাওয়ায় মাদুর পেতে দাও নতুন সম্বন্ধের কথাবার্তা হতে থাক্ অনেক অনেকক্ষণ, লাখ কথা হয়ে যাবে তবু রাতের আলো লাগবে না এমন বিকেল। বাতাস ধরা যায় কেবল ফুলের পাপড়িতে। মঙ্গলী 'চরাট' থেকে এখনো কেন ফিরছে না এমনি একটা ছলনার উদ্বেগ নিয়ে চিকনি যেন উঠান আড়াল পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়াল। পানপাতায় এখন অনেকগুলো লোকের ছায়া। উঠানে মাদুর পেতে বসে। 'স সম্বন্ধের' আলোচনা হচ্ছে। হাতে হাতে হুঁকো ফিরছে। হুজরংপুরের তিনকড়ি মোড়ল বলল, 'তা খুব মালয় অলংকার পাতি কি দিছেন বলুন।'

'হুঁ। সিট দুব। আমার খেমতায় পারা দুব।' চিকনির বাবা তার খড়িখড়ি মুখে হাত বোলাল। বলল, 'ধরুন কেনে, অঙ্গুরি একটা হাতে চুড়ি আজ্ঞে দু গাছা, কানপাশা, কুমরে বিছা।'

'আর গলা, গলাট?' তিনকড়ি শব্দ করে তামাক টানতে টানতে বলল, 'উটো ফাঁকা থাকবেক্ ঘুষ মাশয়?'

'না। দুব, হার দুব—

'কত?' তিনকড়ি তাকাল যোগিনের বাবার দিকে। বলল, 'বল হে সুবল, কভরি হার হবেক?'

গলা একটু পরিষ্কার করল সুবল যোগিনের বাবা। বলল, 'মানে মেয়ে যখন পছন্দ হ্'য়েছে তখন দেনা-পাওনা লিয়ে আর কি! তিন ভরি চার ভরি যা হোক দিবেন।'

তিন ভরির হার। কলান-ছোটান সোনার পাতার হলুদ আলো দেখলো চিকনি পানপাতায়। পানপাতায় তার নিজের মুখ। গলায় সতী হার দুলছে। চোখ বুজল চিকনি।

বোশেখের বিকেল উদাসী বাউলের মত। দাঁড়িয়েছে সেই কখন থেকে। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা। রঙ ছেটাচ্ছে আকাশে মাটিতে। একতারায় হাল্কা সুর শরীরের কি যে ছুঁইয়ে বাতায় বোঝা যায় না। কেবল তার চোখের মণিতে নদীর ঝিকিমি জলবিন্দু উঠে এসে কাঁপতে থাকে। ঠোঁটের কোণে শুকনো উদাস হাসি। চোখ খুললে তেমনি একটা ছবি দেখলো নিজের মুখে পানপাতায় চিকনি। দর্পণের চিকনির গলায় এখন সতী-হার নেই।

জানু রোজা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সমস্ত মুখ এখন রাগে আরো [illegible] দারুণ প্রতিজ্ঞার মত করে সে বলল, 'আমি ঠিক চিনে লিয়েছি কে বেটে। ই টি দাগী আসামী। খুব ছল-চাতুরী জানে। বুঝলা বুঝছ? ত্যাবে আমিও বেটাছেলে বটি হে। একটা মেয়েছেলে আমার সঙ্গে রেঙ-চালাকি করবেক সি টি হবেক্ না মাশয়রা। উ মেয়েনুক বেটে। দপ্পনে আসছে ঠিকই কিন্তুক জিনেকে লুকুই রাখছে।'

চমকাল চিকনি। বলল, 'না না ই লয়, লয় গো—' কান্নার মত কথাগুলো টানল সে।

'চিনেছ মেয়ে?' জানু রোজা আগ্রহে ঝুঁকল, 'তাহলে চিনেছ!'

'হুঁ।' অসহায়ভাবে মাথা দোলাল চিকনি।

'উই, উই বেটে।' জোর দিয়ে বলল জানু রোজা, 'বল, নামটি বলে ফেলাও মেয়ে—'

চিকনির হাত শরীর থরথর করে কাঁপল। শীত আরো জড়িয়ে এল সারা শরীরে। অঞ্জলিবদ্ধ আঙুল আড়ষ্ট হয়ে থামচে ধরে পানপাতার দর্পণটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে চাইল।

জানু রোজা চিকনির অত্যন্ত কাছে সরে এসে বলল, 'ভয় নাই, কুনু ভয় নাই মেয়ে। বল, দপ্পনে কে বেটে বল।' [illegible]

চিকনির প্রথম বাসে চাপার অনুভূতিটা এই মুহূর্তে ফিরে এল। এখান থেকে দু' মাইল হেঁটে বাস স্ট্যান্ড। সঙ্গে তার বাবা ছিল, যোগিন ছিল, ভাই ছিল। আরো পাড়া-প্রতিবেশী অনেক। জয়দেবের মেলা যাচ্ছিল ওরা। ভীড় নিয়ে হেঁটে যাবার মত বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই ওরা হুড়মুড় করে একসঙ্গে সবাই বাসে ঢুকতে চাইছিল। পা-দানি পেরিয়ে ভেতরে যাওয়ার জন্যে ঠেলাঠেলি করছিল ওরা। চিকনি কোনক্রমে হ্যান্ডেল শক্ত মুঠোয় ধরে মাটিতে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় বাসটা ছেড়ে দিয়েছিল। এবং চিকনির শক্ত মুঠি হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিয়ে বাসটা ছুটে চলে গিয়েছিল। কেঁদে উঠেছিল চিকনি দারুণ আতঙ্কে। একা হয়ে যাবার ভয়ে। কিন্তু একা নয় পেছনে তার পাড়া-প্রতিবেশী ক'জনা উঠতে পারেনি। তাদের সঙ্গে পরের বাসে জায়গা পেয়ে মেলায় এসেও চিকনির সেই হাতের মুঠো ছিটকে ছুটে যাওয়া বাসের আতঙ্ক যায়নি। সারা মেলায় অমনি সমস্ত হাতের মুঠো থেকে খসে যাওয়া, পেতে পেতে হারিয়ে যাওয়া ভাব। তেমনি অনুভূতিতে চিকনি বলল, 'আমি লি নাই গো, আমি লি নাই। দপ্পনে যে আমার মুখ রইছে গো!'

'তোমার মুখ!' জানু রোজার কাঁধ থেকে দুটো হাত শিথিল হয়ে ঝুলে এল যেন। চুলের গোছা নেতিয়ে পড়ল। লাল দু চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল। বলল, 'তুমি বেটে মেয়ে?'

'ই বাবা।' চিকনির মা ফাটা গলায় চিৎকার করল গন্ডীর বাইরে থেকে, 'আমার কি সব্বনাশ গো। লিজের বিটি চুর বেটে!'

'আঁ! চিকনি লিজের জিনিস লিয়েছে!'

'হেই বাবা। তাইলে?

'ধুর্। সি ট লয়। মেয়েট রেঙা বেটে। চিনতে লারছে ঠিক।'

ভীড়ের মানুষগুলোর অস্থির সিদ্ধান্তের মধ্যে জানু রোজা হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমরা চিঁচায়ো না হে। উ লয়। যি লিয়েছে সি ছল করে উর পারা মুর্তিটি সেজে দপ্পনে দেখাইছে। আখুনি ঠিক লিজের রুপট ফুটাবেক। একবার যখুন আইছে তখুন আর ছাড়ান নাই বাবা। ডাইনীট বড় মায়া জানে।'

'হু'। ইটো হতে পারে। ই টো ঠিক।' ভীড়টা আশ্বস্ত হল। প্রত্যেকের মনের ভেতর যেন একটা পরিচিত মুখ প্রত্যাশায় ভেসে থাকল। সবাই তাকে চেনে। যে চুরি করেছে তাকে। কেবল দর্পণে এলেই বিচার শেষ।

জানু রোজা আরো ধুপ ছেটাল ধুনুচিতে। বিকেলের আলো খুব আস্তে পায়ে একটা নিকষ দরজার দিকে হাঁটছে। এখন সেখানে পৌঁছতে তার দেরী বেশ। তারি মধ্যে তেল মাখা পানে ঠিক চোরের ছবি আনা চাই। জানু রোজা সেই ধোঁয়ার অন্ধকার চিকনির চোখের সামনে তুলে বলল, শুন মেয়ে ঠিক তখুন সাঁঝবেলা। তুমার বাবা ঘরে নাই, মা ঘাটে গেইছে। তুমি সাঁঝ পিদিমট লিয়ে খামারে গেইছ। ঘরের দুয়ার খুলো। কেউ নাই। সেই সময়েতে—'

চিকনি সরল করে শ্বাস টানতে টানতে চকচকে সবুজ দর্পণে চেয়ে থাকল। দর্পণে এখন জানু রোজার কথা মত ঘরের ছবি। বাইরের কপাট খোলা। আর কিছু না। স্থির বাঁধান ছবি। জানুর কথা মত চিকনি দর্পণে ছবি দেখতে লাগল।

জানু বলে চলল, 'সেই সময়েতে কেউ কুঁথাও নাইখ দেখে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পেথমে অঙুরী তা বাদে সতী-হার শ্যাষে বিছাট লিলেক। যি লিলেক সি টি কে দেখ মেয়ে, তুমার কুমরের বিছা লিয়ে হুই আস্তে আস্তে যেছে। দপ্পনে দেখ, দেখ মুন লাগাইয়ে—'

চিকনি এবার দর্পণে সত্যি ছবি দেখলো। মানুষের পূর্ণ অবয়ব। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কে। তখনি মনে হচ্ছে পুরুষ তখনি নারী। চিকনি চেয়ে থাকল নিষ্পলক চোখে।

জানু রোজা বলল, 'আইছে দপ্পনে?'

'হু'।' নিশ্চল থেকে চিকনি বলল।

'তাইলে ইবার চিন। চিনে লাও।'

একজন সত্যি পেছন ফিরে হাঁটছে এমনি ছবি চিকনি হাতের দর্পণে দেখলো। অনেকক্ষণ। যেমন একদিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল চিকনি সেই ছবিটা এখন ফিরে এল তার হাতের মুঠোর তলায়। চকচকে একটা সবুজ পাতায়। তার কাঁধে ব্যাগ। পরনে টাইট প্যান্ট, ছাপকাটা জামা। ছুঁচলো জুতো। যেতে যেতে পেছনে ঘুরে যেমন সে তাকিয়েছিল—দর্পণে তেমনি ভাবেই তাকাল। আর ফেরান মুখ স্পষ্ট হতেই মনে মনে উচ্চারণ করল দুরন্ত বিস্ময়ে চিকনি, 'চিষ্টি দাদা!'

'হু' হু' বল।' জানু রোজার বড় বড় চোখের থমথমে মুখ উদ্ভাসিত হল। বলল, 'জুরে বল মেয়ে, জুরে। কে বেটে?'

ঠোঁট দুটো চেপে বিস্ফারিত চোখে চিকনি দেখলো শুধু। পানপাতায় দাঁড়িয়ে সৃষ্টিধর দাস হাসছে। হাসতে হাসতে চোখ টিপছে। চোখ টিপতে টিপতে কোমর জড়িয়ে ধরল। তার আর সৃষ্টিধরের একদিনের ছবি সারা পানপাতা জুড়ে। সেই সময়ের সারা মুখের লাল রঙ এখন পান-পাতার থেকে তার মুখে ছড়িয়ে এল। সেই সময়ের লজ্জা। সেই সময়ের সুখের স্বাদ। যে স্বাদে গলতে গলতে চিকনি বলেছিল, 'তুমি সত্যি আমাকে লিয়ে যাবে?'

'হাঁ লিশ্চয়ই।' আরো গভীর করে জড়াল সৃষ্টিধর চিকনিকে। বলল, 'দুর্গাপুর সি যা জায়গা চিকন একেবারে ইন্দপুরী। রেতের বিলায় লাইটে লাইটে চলে যাও সড়ক ধরে ধরে যতদ্দুর তক ইচ্ছে কুথাও আঁধার নাই। দিনের বিলায় গাছের ছেঁতে ছেঁতে চলে যাও সড়ক ধরে কুথাও রুদ্ নাই।'

'হু'-অ!' গলে যাচ্ছে চিকনি সৃষ্টিধরের বুকে। যেমনভাবে বর্ষায় মাটি নরম হয়ে গলে যায় ধানের জন্যে সবুজ ঘাসের জন্যে তেমনি একটা নিজস্ব ঘরের জন্যে গলে যাচ্ছে চিকনি সৃষ্টিধরের বুকে। কেননা অগ্রহায়ণ এসে ফিরে গেছে। হুজরৎপুরে তার যাবার সব কথাই ঠিক ছিল। অথচ যাওয়া হল না। তারপরও মাঘ ফাল্গুন গেল। চোত এল। আর তার প্রথম দিকেই এল দূর সম্পর্কের এই সৃষ্টিধর দাস তাদের বাড়ী বেড়াতে। এর আগে সৃষ্টি-ধরকে দেখেছে আর ভুলে গেছে চিকনি। কিন্তু এবারের সৃষ্টিধর দুর্গাপুরে চাকরী করে। টেরিলিনের নিভাঁজ সরু প্যান্ট, ছাপ দেওয়া অদ্ভুত জামা গায়ে দেয়। চুলে তেল মাখে না। পরিষ্কার করে প্রত্যেক দিন দাড়ি কামিয়ে মোটা গোঁফ নিখুঁত ছাটে। আর ঘন ঘন সিগারেট খায়। সেই সৃষ্টিধর তার সমস্ত চেতনা কেড়ে কোথায় ডুবো সাঁতারে নিয়ে যাচ্ছিল বুঝতে না পেরে চিকনি বলল, 'হু'। এমন জায়গা বেটে!'

'তবে কি।' সৃষ্টিধর তার সারা মুখ চোখে সুখের দুর্গাপুরের শহর এঁকে বলল, 'কুথাও ধুলো নাই কাদা নাই। মাটির ঘর খেড়ের চাল নাই। দালানঘর। সুইচ টিপলেই আলা জ্বলবেক, বন্‌বন্‌বন্ করে ফ্যান ঘুরবেক, কল ঘুরইলেই জল—'

'তুমার ঘরেও?'

'আলবাৎ। লিশ্চয়ই।' সৃষ্টিধর তার ভ্রূ নাচাল। বলল, 'চল আমার সঙ্গে দেখবে একেবারে রাজরাণীর পারা সুখ।'

'কবে, কবে লিয়ে যাবে?'

চিকনি সর্বাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সৃষ্টিধরের সঙ্গে মিলে গিয়ে সেই মুহূর্তে এক, একাকার হতে চাইল। বলল, 'কবে, কবে গো?'

সৃষ্টিধর একটু ভাবল। তারপর আঙুলে গুনে গুনে বলল, 'ধর চোত, বোশেখ, জষ্ঠি, আষাঢ় ঠিক চার মাস—চার মাসে বাদে।'

'না না।' চিকনি অধৈর্য হল। বলল, 'মরে যাব। অতদিন হলে মরে যাব।'

'তাইলে!'

'আখুনি। কালকে। লয়তো পরশু তুমার সাথেই।'

'কিন্তুক', একটু দ্বিধায় দূরত্ব তৈরী করল সৃষ্টিধর। বলল, 'কিন্তুক চিকন, আমার হাতে আখুন যি টাকাপয়সা কম। তুমাকে লিয়ে গিয়ে যদি সুখে না রাখতে পারি তাইলে—'

'তুমার সাথে থাকলেই আমার সুখ।' সমস্ত কিছু ডুবে গেছে চিকনির এখন।

চিকনি দেখলো পানপাতায় : তখন চিকনি সৃষ্টিধরের ডুব সাঁতারের গতিতে ভুলে গিয়ে কেমনভাবে ব্যাকুল হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমার কুনু ভাবনা নাই। আমার বিয়ের লেগে গড়ান অঙুরি, চুরী, গলার হার, কুমরে বিছা রইছে, সেগুলান লিয়ে যাব। উগুলা তুমার, সব তুমার।'

পানপাতার সবুজ জমিতে দুটো জড়ান শরীর ভেঙে দুমড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্ধকার নামছিল। দীর্ঘশ্বাসের মত লম্বা টানা অন্ধকার। সেখানে সৃষ্টিধর কদিন পর সব ঠিকঠাক করে ফিরে এসে চিকনিকে নিয়ে যাবার কথা বলে চলে যাবার দৃশ্য ঘটতে ঘটতে অন্ধকার, শুধু শূন্য দর্পণের তেলতেলে অস্বচ্ছতা দাঁড়াল। আর কিছু দেখা যায় না। কিছু না। অবেলায় আবার

স্নান করা শরীর ধরে শীত উঠছিল চিকনির সর্বাঙ্গে। বুকের ভেতর বাতাস আটকে আটকে যাচ্ছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল বড় করে চিকনি।

জানু রোজার সঙ্গে গণ্ডীর বাইরের মানুষগুলো দীর্ঘ অপেক্ষায় উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে পড়েছে। তারা সংশয়ের গলা তুলল, 'পান দর্পনে হবেক নাই।'

'হুঁ। ই চুল বড় পাকা বেটে।'

'বেটে। বেটেই তো সবাই জানে। লথ দর্পনে পানদর্পনে উ কখনো আসে নাই।'

'ঠিক। সিবার মধু মণ্ডলের ঘটি হারাইছিল। তখন কাড়ি চালাই যাই করতে হল দেখ নাই?'

'ঠিক ঠিক। রুজা মাশয় তুমি কাড়ি চালাও।'

'কাড়ি চালাওহে, কাড়ি। লইলে হবেক নাই।'

'হবেক' জানু রোজার সমস্ত মুখ চোখে আগুন ধরে গেল যেন।

পশ্চিমের আকাশে শেষ বিকেলের আলো এতক্ষণে রঙ হয়ে গেছে। টকটকে লাল কমলা। গাঢ় রঙের বিচ্ছুরণ চারপাশে। রোদ রঙে বিশিলষ্ট হতে না পারলে নিকষ দরজাটা খুলতে পারে না। দাঁড়িয়ে থাকে ঠায় রঙ হবার জন্যে। এবার দরজা খুলবে।

জানু রোজা সেই রঙ মেখে বলল, 'ঐ দর্পনেই উকে আনব আমি। জানরুজা দর্পনে আজ চুর ধরবেক ই লয়তো রুজা-গিরি ছেড়ে দিবেক জন্মের পারা।'

তারপর সে চিকনির দিকে চেয়ে বলল, *'অ মেয়ে তুমি ইবার লতুন এই দর্পনটি ধরতো। ইটোতে এই মা কালীর গায়ের পারা কাজল লিপে দিলম। আর শুধু ত্যাল লয়। ইবার তুমি দর্পনটি ধরে যা* লজরে আসবেক সিটি জুরে জুরে বলবে, কেমন? ধর ধর—'

চিকনি সেই কালোর ঘনিষ্ঠ সবুজ চকচকে পানপাতা ফেলে নতুন দর্পণ দু' হাতের অঞ্জলির মধ্যে নিল। কুচকুচে কালো পটভূমি। সহজে চারপাশের পরি-বেশের ছায়া ধরে না। ঝাঁকাল আশ-শেওড়া গাছ অশ্বত্থের পিছল পাতা, আকা-শের রংদার সতরঞ্চ কিংবা চিকনির মুখের পাশ এলান চুল কিছুই প্রতিবিম্ব ফেলতে পারছিল না আর ওই কালোতে। রঙ গিলে খাওয়া কালো নিকষ কাটা পানপাতা তার হাতের মুঠোর ভেতর ভবিষ্যতের মত ধরা থাকল।

জানুরোজা বলল, 'বইলে মেয়ে ইবার দেখ সেই মূর্তিটি কেমন পারা সেজে আসছেক। যি মূর্তিটি আমাদের এই নুক-গুলার মধ্যে রইছে, কি ই গাঁ ঘরে কুথাও লুকাই রইছে, জেনেলে নাই ফাটকে নাই—'

চিকনি অদ্ভুতভাবে সেই কালোর উপর দশদিন একমাস পরও কথা দিয়ে ফিরব বলে যে সৃষ্টিধর আসেনি তাকে দেখলো। ফিরবে সেই আশায় দেখলো। তার আংটি, চুরী, সতী-হার কোমরের বিছে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে বলে দেখলো। এবং বলল 'হুঁ। দেখছি।'

'কি রকম পারা দেখছ মেয়ে?' জানু-রোজা এবার জেরার মত প্রশ্ন দিয়ে দোষীর মূর্তিটা দাঁড় করাবে।

'একটা মানুষ।'

'হুঁ। মানুষ ত বেটে। লিচ্চয় মানুষ। বাঘ ভালুক কুকুর ছা লয়। তা কি পরে রইছে?

দেখে দেখে পোষাকের বর্ণনা দেবে ভাবতে চিকনি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল এবং তীক্ষ্ণ করতেই শূন্য কালো পাতা আবার। বড় বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে চাইল চিকনি। অস্ফুটস্বরে বলল, 'নাই।'

'পালাই গেল। ইবার চিনে লিবে বলে পালাই যেছে সাটাম। ঠিক আছে আবার ভাল মেয়ে। পালাই গেলেও রক্ষে নাই। দর্পনের জেহেল অত সুজা লয়।'

দর্পণের জেল। চিকনি কথাটা শুনল কান দিয়ে। কথাটার চারপাশে দ্রুত বিকেল শেষে ঘরে ফেরা পাখিদের গলার শব্দ মিশে গেছে। মঙ্গলী গাই উঠানে দাঁড়িয়ে গোয়ালে যাবার জন্যে একবার ডাকল। আর তুলোর মত বাচ্চাটা কোথায় দাঁড়িয়ে কি দেখছে। চিকনি এই শব্দের মধ্যে কথাটা আবার ভাবল। দর্পনের জেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পানপাতায় যোগিনের মুখ ভেসে এল। ছ' মাস আগের দেখা যোগিন এ নয়। যেন কোথায় যোগিন মুখ লুকিয়ে বসে আছে। একটা ঘর অন্ধকার। একটা ঘর বড় বড় লোহার শিক দিয়ে আটকান। একটা মুখ শুকনো ম্লান। মনে পড়ে চিকনির যোগিন শহরে গিয়েছিল তারপর আর ফেরে নি। ফেরেনি তবে খবর পেয়েছে সবাই যোগিন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। তার জেল হয়েছে। এক বছর মেয়াদী। শুধু যোগিন নয় এমনি অনেক। এ গাঁ ও গাঁ শহর বাজার। সব জায়গায় জোয়ান ছেলেদের কে যেন জেল হয়ে যাচ্ছে এখন চিকনি শুনেছে। আর এখন তা মনে হতেই যে ভয়টা কখনো জাগেনি, সম্ভা-বনাটা মনে আসেনি তাই চিকনির সমস্ত চেতনা জড়িয়ে হু হু অন্ধকারের মত ছুটে এল। দুরন্ত পরিচয়ের নিকষ দরজা খুলে যাচ্ছে। বিশিলষ্ট রঙগুলো আকাশের গা থেকে খসে যাচ্ছে। চিকনি পানপাতার কালো ফ্রেমে যোগিনকে দেখতে চেয়ে সৃষ্টিধরকে দেখে ফেলল। সমস্ত শরীর তার কাঁপছিল। তার শরীরের ভেতর একটা খুব ছোট শরীরের অঙ্কুর যেন লুকিয়ে যাচ্ছে এমনি মনে হল এই মুহূর্তে। আর একটা শরীর। আর একটা প্রাণ। প্রাণের উদ্গত অঙ্কুর। কিন্তু এই বিচিত্র জটিল অনুভব বুঝতে না পেরে পানপাতায় যোগিন সৃষ্টিধর সৃষ্টিধর যোগিন, যোগিন যোগিন, সৃষ্টিধর সৃষ্টিধর দেখতে দেখতে চিকনি চেরা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'কেনে গো কেনে?'

হা হা করে হঠাৎ হেসে উঠল জানু রোজা। বলল, 'কেনে কি মেয়ে। যি চুর বেটে সি মান সম্ভম জানে না। তার লোজ্জা সরম কুছুই নাই। হুই দেখ মেয়ে তুমার পানপাতায় আখুন ফুকলা দাঁতে উ দাঁড়াই রইছে। রইছে না?'

কিছু শুনতে পাচ্ছিল না চিকনি যেন আর। কিছু বুঝতে পারছিল না। কেমন ঘোর ঘোর হয়ে আসছিল সমস্ত চেতনা। শীত জমাট হয়ে আসছিল। মাথার ভেতর ফাঁকা পেয়ে বাতাস সোঁ সোঁ শব্দ করে ঘুরপাক খাচ্ছিল। চিকনি ঘুমতে চাইছিল। সেই ঘুমের মধ্যে সে বলল 'হুঁ'

'পাকা চুল, পিঠটা বেঁকা করে দাঁড়াই রইছে লয়?'

'হুঁ।'

'হাতে হুই ত্যাল অলংকারগুলিন রইছে।'

'হুঁ।'

জানু রোজা অহংকারে জয়ে ফেটে পড়ার মত করে বলল, 'বল, নামটি বল এবার মেয়ে, নামটি বলে ফেলাও।'

দু' চোখ বন্ধ। পানপাতা কাত হয়ে গেছে অঞ্জলির ভেতর। চিকনি বিড় বিড় করে বলল, 'তাইলে কে বেটে, কে বেটে, জটিবুড়ি—'

অনেকক্ষণের প্রত্যাশিত নাম পেয়ে গণ্ডীর বাইরের মানুষগুলো একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল আটকে থাকা নিশ্বাস ছেড়ে দেবার মত, 'জটি বুড়ি—ই, চুর—চুরুনী জটি মাগী। চল চল উকে ধরে লিয়ে আসি। মাগীকে ইবার জিয়ন্ত পুঁতে দুব—'

সমস্ত আকাশটা সহসা কালো দর্পণ হয়ে গেল। চিকনির শরীরে কোনো সাড়া নেই। বিকেল ফুরিয়ে যাওয়া বোশেখের রাতে হাওয়া নেই, আর শব্দ নেই। চিকনি সেই গণ্ডীর মধ্যে ঘাড় গুঁজে পা দুটো টেনে হাঁটু বুকের মাংসে ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রবল শীত দু হাতে চেপে ধরে ওকে নাড়াতে লাগল জোরে জোরে।
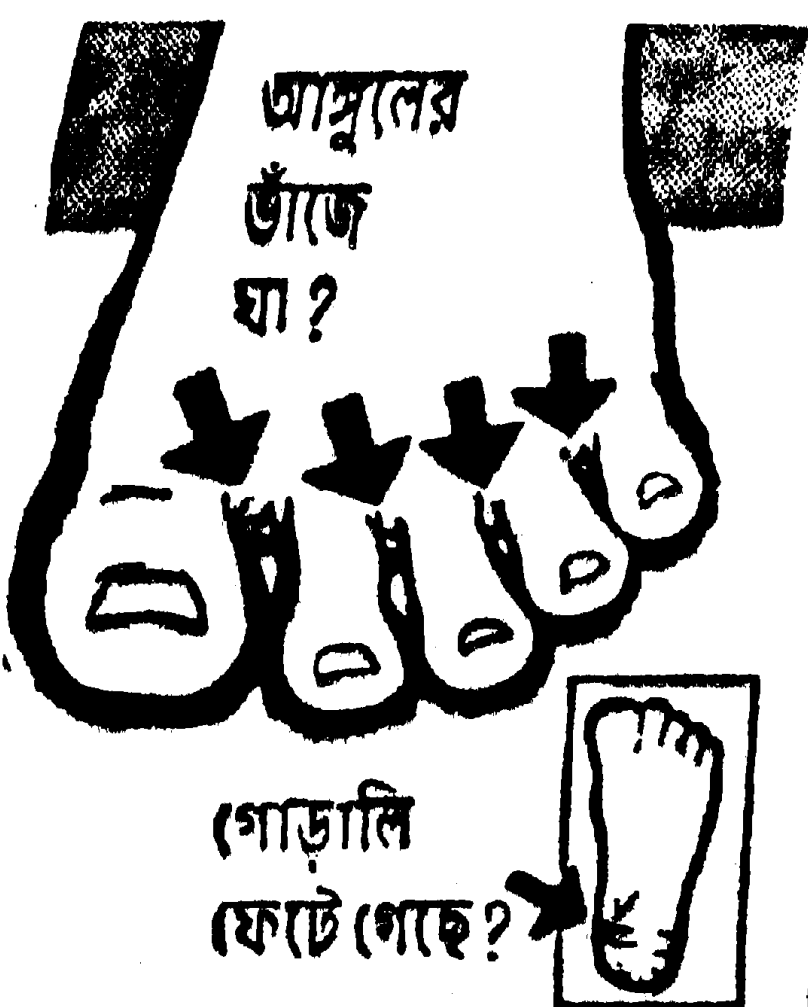
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

।। ডাইনী শিকার : জুরীর বিচার ।।

কোর্ট-কাচারির মধ্যে অনেক মানবিক নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে পারেন দক্ষ লিপিকার। লুইস নাইজার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর কাল ধরে ওকালতী করছেন। নিউ ইয়র্কের ওকালতি ব্যবসায়ের এক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'ফিলিপস, নাইজার, বেনজামিন অ্যান্ড ব্যালন''—এই প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রবীণ অংশীদার। তিনি কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের লেখক তার মধ্যে "থিংকিং অন ইয়োর ফিট" এবং "মাই লাইফ ইন কোর্ট" বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। শেষোক্ত গ্রন্থটি ১৯৬২-র বেস্ট সেলার।

খুব কমলেখকই কোর্টরুমের সত্যকার চাঞ্চল্যকর কাহিনীকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন, আর খুব কমসংখ্যক বিচার-ই জন হেনরী ফালকের বিচারের মতো এত বৈচিত্র্য, বিস্ময় ও চমকে পরিপূর্ণ। জন ফালক একজন টেলিভিশন-রেডিয়োর শিল্পী। চিত্তবিনোদন করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করাই তাঁর কাজ।

কয়েক বছর ধরে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় বেতার শিল্পকে এক প্রবল আতঙ্কের শিকার করে তুলেছিলেন। এর 'কালো তালিকা' বা ব্ল্যাকলিস্ট বানাতেন আর সেই ব্ল্যাকলিস্টে নাম ওঠা মানে অনশনে সপরিবারে মৃত্যু। ব্যবসায়িক জীবনের অবসান এবং সব দিক থেকেই বেতার শিল্পীর মৃত্যু বলা যায়। ফালক যখন আক্রান্ত হলেন তখন তিনি বেতার শিল্পী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত একরকম খ্যাতির উচ্চ-শিখরে। তাঁর সর্বনাশ করা হল এই 'ব্ল্যাকলিস্টের' আকস্মিক অশনিপাতে।

নাইজার তাঁর একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'দি জুরী রিটার্নস' নামক গ্রন্থে যে চারটি মামলার বর্ণনা দিয়েছেন ফালকের মামলা তার অন্যতম। এই গ্রন্থটিও "বেস্ট সেলার" শ্রেণীভুক্ত।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। টেলিভিসন শিল্পী ও নিজস্ব বেতার প্রদর্শনীর একজন 'স্টার' ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর এক অপরাহ্নে অফিসে ফিরে এসে একটি টেলিফোন পেলেন। টেলিফোন করছেন নিউ ইয়র্ক টাইমসের একজন রিপোর্টার। তিনি জানালেন ফালক-কে কম্যুনিস্ট এই অভিযোগ দিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, তিনি একজন দেশদ্রোহী।

ফালক একেবারে বসে পড়লেন। তারপর যখন শুনলেন এই অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে "এ্যওয়ার" ইনকরপরোটেড কর্তৃক প্রচারিত একটি বুলেটিনে তখন তিনি ভীষণ আতঙ্কিত হলেন। "এ্যওয়ার" বুলেটিন একটি লাভহীন প্রতিষ্ঠান, দেশ-প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এঁরা কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই বুলেটিনের মারফতে কোন শিল্পী 'কম্যুনিস্ট ফ্রন্টে'র কর্মী বা কে 'পিংক' ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করা হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিস্ট অন্তর্ঘাতমূলক কার্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে এই আতঙ্ক সমগ্র দেশকে গ্রাস করে। আর ব্রডকাস্টিং শিল্প যার প্রতিটি নিঃশ্বাস জনপ্রিয়তা অর্জনের সহায়ক এই আতঙ্কের শিকার হয়ে উঠেছিল। তাই এই "এ্যওয়ার" যার সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জনের বেশী নয় এবং প্রচারসংখ্যাও সীমিত তার শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছিল ভীষণভাবে। এর ডাইরেক্টার ভিনসেন্ট হার্টনেট কর্তৃক সরবরাহ করা তথ্য ও রিপোর্ট থেকে তথাকথিত "ব্ল্যাকলিস্ট" প্রস্তুত হত। এই রিপোর্ট-ই একমাত্র সূত্র এবং এই লিস্ট সর্বত্র প্রচারিত হত। ফালক বুঝলেন কালো তালিকায় যদি নাম উঠে থাকে তাহলে কোনো কাজকর্ম পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

দেখা গেল "এ্যওয়ার বুলেটিনে" সাতটি চার্জ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে চারটি বিশেষ ক্ষতিকর—

(১) ডেইলী ওয়ার্কারের ৫ই এপ্রিল ১৯৪৮ তারিখের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে প্রগ্রেসিভ সিটিজেনস অব আমেরিকা (একটি কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক হেনরী ওয়ালেসের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনী অভিযানে যে নাটক মঞ্চস্থ করা হয় ফালক তার মাল-মশলা সরবরাহ করেছেন। হেনরী ওয়ালেস যদিও সরকারিভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী তথাপি তাঁর সব সমর্থকরাই কম্যুনিস্ট ছিলেন না।

(২) ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিটিজেনস কমিটি অব দি আর্টস, সায়েন্সেস, অ্যান্ড প্রফেস্যানস-এর (সরকারিভাবে কম্যুনিস্ট ফ্রন্ট) উদ্যোগে আয়োজিত একটি প্রোগ্রাম ২৫শে এপ্রিল ১৯৪৬-এ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জেমস ফালক আরেকজন কম্যুনিস্ট সহযোগীর সঙ্গে একটি প্রোগ্রাম করেছেন।

(৩) "বুলেটিন অব পিপলস সঙ-"এর (সরকারীভাবে কম্যুনিস্ট ফ্রন্ট) ৩য় খণ্ডে উল্লেখ আছে যে ফালক "পিপলস সঙ"-এর ২য় বার্ষিকীতে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

(৪) জন, এইচ, ফালক "আমেরিক্যান কনটিনেন্টাল কনগ্রেস ফর পীস' ১৯৪৯-এর ৫ই অকটোবর তারিখে আয়োজিত এক-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। এই পীস কনগ্রেস আমেরিকান হাউস কমিটি কর্তৃক আমেরিক্যান বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য চিহ্নিত।

ছাপার অক্ষরে যা প্রকাশিত হয় অধিকাংশ মানুষ তাকেই অবিসংবাদিত সত্য বলে গ্রহণ করে। লোকে এটা জানে একেবারে মিথ্যা প্রকাশ করা সম্ভব নয় কারণ তাতে মানহানির মামলায় ঝুঁকি নিতে হয়। সুতরাং অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্যক্তিই এই জাতীয় সংবাদাদি প্রকাশ করেন। যত বড় মিথ্যা জোর করে বলা হয় সেটা তত বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

"এ্যওয়ার বুলেটিন" ২২৮৫ জন গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো হয়। সমস্ত টেলিভিসন ও বেতার কেন্দ্রে এই বুলেটিন পাঠানো হয়। এডভার্টাইজিং এজেন্সি, বিভিন্ন উদ্যোক্তা, প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও স্তম্ভলেখকগণ, মোশান পিকচার্স কোম্পানীবৃন্দ, প্রডিউসার, প্রকাশক এবং থিয়েটার ইউনিয়নকে এই পত্রিকা পাঠানো হয়। এর প্রতিক্রিয়া অতি দ্রুত। ফালকের রেডিও শো-র জন্য যেসব বিজ্ঞাপন আসত তা বন্ধ হয়ে গেল, টেলিভিসনে দর্শনদানের আমন্ত্রণ নাকচ করা হল। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবৃন্দ ঘন ঘন ডাক পাঠাতে লাগলেন, সহযোগী বন্ধুরা তাঁর দিকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাকাতে শুরু করলেন—

ফালক বুঝলেন তাঁর পায়ের মাটি খসে যাচ্ছে।

যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল তা ব্যক্তিগত আক্রমণের চেয়েও অনেক বেশী কিছু। এই কালোতালিকার ব্যাপারটি বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশ্যে ঝড় উঠল। আমেরিক্যান ফেডারেশন অব টেলিভিসন অ্যান্ড রেডিও এ্যাফেয়ার্স (এএফটিআরএ) নামক ইউনিয়নের নূ্য ইয়র্ক শাখা একটি প্রস্তাবে "এওয়ার" কর্তৃক এইভাবে কলঙ্ক লেপনের কুৎসিত রূপের প্রতিবাদ করলেন। এইভাবে শিল্পীদের রুটিতে হাত দেওয়া হচ্ছে। ভীষণ বিতর্ক শুরু হল। এওয়ারের সমর্থক ছিল ইউনিয়নে অনেক। শেষে ৯৮২—৫১৪ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এরপর কার্যকরী সদস্যদের আবার নতুন নির্বাচন হয়। উগ্র কম্যুনিস্ট বিরোধী সদস্যদের সমর্থন করা হয়। এরা 'মিডল অব দি রোড' এই অভিধা-চিহ্নিত। এরা কম্যুনিজম ও ব্ল্যাক-লিস্ট উভয় বস্তুরই বিরোধী।

"এওয়ার" ব্যাপারটি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারল না। বিশেষ করে হার্টনেট ও তাঁর মিত্র লরেন্স এ জনসন। লরেন্স জনসন একজন পয়সাওলা সুপারমার্কেটের মালিক এবং হার্টনেটের রিপোর্ট কার্যকরী করার জন্য প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এএফটিআরএ'এর ব্ল্যাকলিস্ট বিরোধী কর্ম-কর্তাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পান তাঁর নাম জন হেনরী ফালক। ফালক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে হারনেট, জনসন এবং 'এওয়ার বুলেটিন' উগ্র স্বদেশ-প্রাণতা বা প্যাট্রিয়টইজমের আধিক্যে ও শক্তিরমোহে তাঁরা ফালককে ধ্বংস করতে ব্রতী হলেন। এই অভিযানটিকে একটা ভয়াবহ দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রচার করার উদ্দেশ্য যাতে অন্য সবাই আতঙ্কিত হয়।

সাফল্য লাভ করল হারনেটের দল। ফালক কর্মচ্যুত হলেন, তাঁর সম্মান গেল, মর্যাদা গেল, যেন তিনি একজন সাধারণ আসামী। প্রায় সাড়ে ছ'বছর তিনি কোনো-রকম চাকরী পেলেন না, অজস্র চাকরীর আমন্ত্রণ পেয়ে গ্রহণ করার মুহূর্তে তিনি তা থেকে বঞ্চিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পরিবার বুভুক্ষার কবলে কবলিত হলেন। আর পরের বছর "এএফটিআরএ"-র নির্বাচনে "এওয়ার" সমর্থকদলই সব পদ অধিকার করলেন। পরিপূর্ণ বিজয় লাভ হল এওয়ার গোষ্ঠীর। ডাইনী শিকারীদের কাজ বা উইচ হানটিং-এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেল।

লুইস নাইজার তাঁর গ্রন্থে জেমস ফালক সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "Faulk made an excellent impression when I met him. Clean-cut and unfailingly courteous, he looked much younger than his 42 years. His tweed jacket and pipe lent him a pleasing professional air. He had a decided Texas accent—his home town was Austin. Further, he had a gift of impersonating southern characters, and their homely, quaint phrases constantly intruded his conversation".

এই কটি কথার মধ্যে ফালকের আবৃত্তি ও প্রকৃতির একটা রেখাচিত্র পাওয়া যায়। ফালকের রেকর্ড অতি চমৎকার। তিনি সুপণ্ডিত এবং স্বদেশপ্রেমিক। টেকসাস ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজীতে এম-এ পাশ করেছেন, পি-এইচ-ডি করার সময় অধ্যাপনা করেছেন সেইখানে। মার্কিন লোকগীতির প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং প্রাচীনকালের নিগ্রো প্রচারকদের গান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সমধিক। এই সব গানের মধ্যে কাব্যধর্মী সুষমা বর্তমান। তিনি জাপানীরা পার্লহারবার আক্রমণ করার পরে যুদ্ধের কাজে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও চার্চের বক্তৃতা করেছেন অনেক, এমন কি এফ বি আই এজেন্টদের সভাতেও "মার্কিন উত্তরাধিকার" বিষয়ে বলেছেন। এমন একজন মানুষকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা এক তাজ্জব ব্যাপার। মানহানির মামলা শুধু নয় "এওয়ারের চালাকি ভেঙে দেওয়ার জন্যও আগ্রহী হলেন ফালক। লুইস নাইজার এই মামলার ভার নিতে রাজী হলেন তবে এই মামলা লাতে অনেক অসুবিধা আছে তাও বুঝলেন। শুধু হার্টনেট নয় তাঁর পৃষ্ঠ-পোষক ও অর্থ সাহায্যকারী মিত্র সত্তর বছর বয়সের জনসনকেও একজন প্রতিবাদী করা হল। ফালককে একবার প্রশ্ন করা হয় তাঁর এই দুর্দশার জন্য কে বেশী দায়ী—হার্টনেট না জনসন? ফালক তার উত্তরে বলেন—কেউটে না গোখরো কে কামড়েছে এ নিয়ে কি কেউ বিতর্ক করে?

পরবর্তী অংশে এই বিচিত্র মামলা ও জুরীদের চূড়ান্ত অভিমত বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হবে।

—অভয়ঙ্কর

THE JURY RETURNS: By Louis Nizer: Published by Doubleday Publishers 105 Bond St. Tornoto: ONT. Price: 7.95 Dollars only.

সংবাদ

আরব: অশিক্ষিতের হার

কুয়ায়েত-এর ত্রৈমাসিক আল আরাবীর বসন্ত সংখ্যায় আরবদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেছে। পত্রিকার সম্পাদক ডঃ আহমেদ জাকি ইউনেস্কো সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার গ্রন্থে এই পরিসংখ্যানটি উদ্ধৃত করেন। পত্রিকাটিতে সেটি ছাপা হয়েছে।

দেশ	অশিক্ষিতের হার শতকরা
সৌদিআরব	৯৭
মরক্কো	৮৯
সুদান	৮৬.৫
লিবিয়া	৮৪
ইরাক	৮১
আলজেরিয়া	৮১
মিশর	৭০
জর্ডন	৬৯.৭
তিউনিসিয়া	৬৮.৭
সিরিয়া	৬০.৮
কুয়ায়েত	৪৭.৭
লেবানন	৪০

ইসরায়েলের নতুন বই: ইসরায়েলের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস্-এর পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে ৯,০০০,০০০ কপি বই ছাপা হয় সেদেশে। আগের বছরে এই সংখ্যা ছিল ৬০০,০০০। ৭০-৭১ সালে ছাপা বইয়ের মধ্যে ১,৮৯০টি হোল নতুন বই। আগের বছরে ছাপা নতুন বই সংখ্যায় ছিল ২,০৮০টি। নতুন বছরে পুনর্মুদ্রিত বই সংখ্যায় বেশী। ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ১০২১টি। তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৪৫০টি। নতুন বই ছাপার ক্ষেত্রে ইসরায়েল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছে। তার স্থান তৃতীয়। ১০০,০০০ জনের জন্য গড়ে ৭৪টি বই ছাপা হয়েছে। সুইডেন ১০০,০০০ জনের জন্য ৯২টি বই প্রকাশ করে। এই সংখ্যা হল্যান্ডে হোল ৮৬। ১০০,০০০ জনের জন্য ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানী ৫৮টি নতুন বই প্রকাশ করে। আর আমেরিকা ও সোভিয়েত যুক্ত-রাষ্ট্রে এই সংখ্যক জনগণের জন্য ৩১টি নতুন বই প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

নতুন বই

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রবলেমস্‌ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি : গ্রন্থকার—অরুণ ভট্টাচার্য, প্রকাশক—বিকাশ পাবলিকেশান, দিল্লী। ২১ টাকা।

স্বাধীনতার আগে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংবাদপত্র সেবাকে স্বদেশ সেবার সামিল মনে করা হত সেদিন। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পর এদেশে সংবাদপত্রের ভূমিকা বদলেছে। সংবাদপত্র এখন একটি শিল্প। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত সংবাদপত্র শিল্প। যে ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান থাকে তার গুরুত্বও বদলায় রাজনীতিতে। কিভাবে এই পরিবর্তন ঘটল ভারতের সংবাদপত্র জগতে, তারই ঐতিহাসিক বিবরণী ও বিশ্লেষণ করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্য বছর কয়েক আগে দিল্লীর প্রেস ইন্সটিটিউট অব ইণ্ডিয়ার সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি প্রকৃত পরিশ্রম করে যে অনুসন্ধান কার্য চালান, এই বইটি তারই ফলশ্রুতি।

সুলিখিত এই বই-এ আছে আঠারটি পরিচ্ছেদ। সংবাদপত্রের জন্য সরকারি আইন কানুন, কাগজ সংক্রান্ত আমদানী নীতি, কাগজে একচেটিয়া মালিকানা, কাঁচা মালের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার। এই বই-এর আরেকটি বিশেষত্ব হল সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা যেমন, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি।

ভারতে টেলিভিশনের আগমন নতুন। এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে অনেকখানি, তাছাড়া রয়েছে ফটো সাংবাদিকতা নিয়ে।

এই বইটি শুধু সাংবাদিকদের জন্যেই তা নয়, সাংবাদিকতার ছাত্র-শিক্ষকদেরও বহু প্রয়োজন মেটাবে এই বইখানি। বই-খানির লেখা, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হয়েছে। এই বই-এর বহুল প্রচার কামনা করি।

ধূমকেতুর নজরুল—আবদুল আজীজ আল আমান। হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীসহ 'ধূমকেতু'

নজরুলের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ ক'রে শুক্রবার, ২৬ শ্রাবণ ১৩২৯ সাল (আগস্ট ১৯২২ খৃঃ)। রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখেছিলেন—

> আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
> আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
> দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
> উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
> অলক্ষণের তিলক রেখা
> রাতের ভালে হোক না লেখা,
> জাগিয়ে দেবে চমক মেরে
> আছে যারা অর্ধচেতন।

সম্পাদক নজরুল এবং মানুষ নজরুলের এক অসামান্য আলেখ্য শ্রীআবদুল আজীজ আল আমান তুলে ধরেছেন তাঁর 'ধূমকেতুর নজরুল গ্রন্থে'। ধূমকেতুর দুষ্প্রাপ্য ফাইলকে তিনি যেভাবে সংগ্রহ করে সম্পাদক নজরুলের চরিত্র-পরিচয় তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই বিরলদৃষ্ট। ধূমকেতুর আসরে সেকালের প্রায় সবশ্রেণীর লেখকই এসে মিলিত হতেন, আর লিখতেন প্রায় তাদের সকলেই। শ্রী আমান সেইসব দিনের অনন্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। সাংবাদিক নজরুলের মহিমময় প্রকাশ ঘটে ধূমকেতুতে। 'ধূমকেতুর নজরুল' গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ। বই-এর শেষে নজরুল ইসলামের লেখার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কুহেলি (জুন '৭২)—সম্পাদক : চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ২।১বি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। পঞ্চাশ পয়সা।

মাসিক পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ খুব বেশিদিনের নয়। এই স্বল্পদিনে সাহিত্য-ভাবনায় বিশিষ্টতায় পাঠকদের সাদর সম্বর্ধনা লাভ করেছে। আলোচ্য সংখ্যাটি বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য ও সমাজের ওপর নানান বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য লেখক হলেন : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অজিত গুপ্ত, রমেশ চৌধুরী, ডঃ রেবতীমোহন সরকার, কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

চিত্ররথ (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ৭২)—সম্পাদক : এ এস জাহিরুল হক খান। ৫৩, দীননাথ সেন সড়ক, ঢাকা : ৪। ষাট পয়সা।

ওপার বাংলার ছায়াচিত্র জগতের মাসিকপত্র। অন্তরঙ্গ আলোকে (শিল্পী-পরিচিতি), স্টুডিওর খবর, চিত্রসমালোচনা, বিদেশী ছায়াছবির খবর, সাংস্কৃতিক খবরাখবর, হাস্যকৌতুক, সাক্ষাৎকার, খেলাধুলো ইত্যাদি, নানান বিভাগের সমাবেশে পত্রিকাটি চিত্রপ্রিয় দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার আন্তরিক আয়োজন লক্ষ্য করার মতো। ছায়াচিত্র-জগতের রঙ্গনট-নটীদের ছবি আছে অনেকগুলো। আছে দুটি হাল্কা ধরনের গল্পও। ওপার বাংলার ছায়াচিত্র-জগতের হাল-হদিশ এ থেকে পাবেন এপার বাংলার ছায়াচিত্র-অনুরাগীরা।

চিত্ররথ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন '৭২)—সম্পাদক : এ এস জাহিরুল হক খান। ৫৩, দীননাথ সেন সড়ক, ঢাকা : ৪। ষাট পয়সা।

ওপার বাংলার ছায়াচিত্র জগতের মাসিকপত্র। অন্তরঙ্গ আলোকে (শিল্পী পরিচিতি), স্টুডিওর খবর, চিত্র সমালোচনা, বিদেশী ছায়াছবির খবর, সাংস্কৃতিক খবরাখবর, হাস্যকৌতুক, সাক্ষাৎকার, খেলাধুলো ইত্যাদি নানান বিভাগের সমাবেশে পত্রিকাটি চিত্রপ্রিয় দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার আন্তরিক আয়োজন লক্ষ্য করার মতো। ছায়াচিত্র জগতের রঙ্গনট-নটীদের ছবি আছে অনেকগুলো। আছে দুটি হাল্কা ধরনের গল্পও। ওপার বাংলার ছায়াচিত্র-জগতের হালহদিস এ থেকে পাবেন এপার বাংলার ছায়াচিত্র-অনুরাগীরা।

কৃশানু (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৮)—সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সিংহ। ৯৪, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬। এক টাকা।

এ সংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য রচনা : 'নোয়াখালির মাটি ও মানুষ'। লিখেছেন নলিনীরঞ্জন মিত্র। এ-ছাড়া লিখেছেন বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সিংহ, সুনীল বসু, কুমার মিত্র, প্রবীর নাহা এবং আরো দু'একজন। পত্রিকাটি অনেকের কাছেই ভালো লাগবে।

নির্ঝর (বসন্ত সংখ্যা)—সম্পাদক : অরুণ ঘোষ এবং ফণীন্দ্র আচার্য। দেশবন্ধু-পাড়া। শিলিগুড়ি।

বর্তমান সংখ্যায় দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন হরেন ঘোষ (নেপালীদের কুসংস্কার) এবং রঞ্জন বিশ্বাস (ছায়াময় শব্দে জীবনানন্দ)। গল্প ও কবিতা লিখে-

ছেন শ্যামল চৌধুরী, ফণিভূষণ আচার্য, অশোক দস্তচৌধুরী, নীরজ বিশ্বাস, সুকুমারের ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

জোনাকি : (১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা '৭২)— সম্পাদক : নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ! ৯, কানাই ধর লেন, কলকাতা-৯।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটিতে স্মরণে সাহিত্যপিপাসুদের নানান ধরনের লেখা ছাপা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা সর্ব অবয়বে। প্রচ্ছদে তারুণ্যের দীপ্তি, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য পত্রিকার ইংরেজি নামকরণ দৃষ্টি-কটু।

শিশুমেলা (নববর্ষ : '৭১)— সম্পাদক : অরুণ চট্টোপাধ্যায়। ৮২।৩এ, ধ্রাক্তা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা-৪৭। তিরিশ পয়সা।

মাত্র তিরিশ পয়সা! এত সুন্দর কিন্তু এত সস্তা। প্রচ্ছদে কিশোর রবীন্দ্রনাথের (চৌদ্দ বছর বয়সের) প্রতিকৃতি থেকে শুরু করে শেষ পাতাটি পর্যন্ত এত যত্ন করে ছাপা যে, যে দেখবে তারই মন টানবে—ছোটদের তো বটেই বড়োদেরও। দামী আর নামী লেখকদের সংগে এ মেলায় ভিড় করেছে ছোটরাও—তাদের লেখাও বেশ করেকটা ছাপা হয়েছে। লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, শান্তশীল দাশ, ডাঃ শুদ্ধাংশু বড়ুয়া এবং আরো অনেকে। বারো বছরের প্রথম সংখ্যা এটি। সবচেয়ে বড় দোষ সংখ্যাটি বড় রোগা। তা হোক, সম্পাদকের মুন্সিয়ানায় সাবাস জানাতেই হয়।

জ্ঞানবচন (এপ্রিল-জুন '৭২)—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১এ, বিধানসরণী, কলিকাতা-৪। দেড় টাকা।

বিজ্ঞানবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির একাদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা নানান আলোচনায় ভরা। আলোচনগুলি সিরিয়াস পাঠকদের অনেক চিন্তার খোরাক জোগাবে। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও আছে দুটি প্রবন্ধ : 'অটোমেশন প্রসঙ্গে' ও পরীক্ষা সংস্কার এবং বাংলাদেশের পটভূমিকায় রচিত একটি নাটক : 'বেগ্মমা-বেগমী'। সুধীরচন্দ্র রায়ের 'পরীক্ষা সংস্কার' এ সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। শিক্ষা সংস্কারের ওপর নতুন চিন্তার আলো পড়েছে। তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট ভাষণের জন্যে শ্রীরায় অবশ্যই শিক্ষাসচেতন মানুষদের সাধুবাদ পাবেন।

সাহিত্যচিন্তা (বৈশাখ '৭১)—সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১, গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা-৪৭। এক টাকা।

সাময়িক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও লক্ষের পরিচয় মেলে এর নামে। সাহিত্যভাবনার নানান প্রসঙ্গে সমৃদ্ধ পাবলো নেরুদায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন : আশিস সেনগুপ্ত, এজ্রা পাউণ্ড সম্পর্কে রণজিত সিংহ, নজরুল প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তে। আছে কাফকার লরেন্স এবং গার্কির পত্রাংশের অনুবাদও। এছাড়া রয়েছে নবীন ও প্রবীণ কবিদের স্বরচিত কবিতা ও অসমীয়া কবিতাগুচ্ছ।

সংস্কৃতি পরিক্রমা (তৃতীয় সংখ্যা)—অমূল্য চক্রবর্তী। ৭, নন্দী স্ট্রীট, কলকাতা-২৯। এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত এই পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যায় তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ), গোবিন্দ ঘোষাল (বাঙালীর সামাজিক আন্দোলনে অসঙ্গতি) ও দীপক গুহরায় (ভারতীয় জীবনদর্শনের বিবর্তন)। গল্প-কবিতাগুলি মোটামুটি সুনির্বাচিত। সংস্কৃতি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনাগুলি সময়োপযোগী এবং সুলিখিত। পত্রিকাটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সামচক্র (প্রথম বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংকলন) —অরুণ ধর ও দেবীপ্রসাদ দত্ত। হরিতলা। বারাসাত। ২৪ পরগণা।

সমাজবাদী মানসিকতার পরিবেশ সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যে 'সামচক্র' পত্রিকাটির আত্ম প্রকাশ। যুগ ও জীবন নিয়ে মহানগরী কলকাতার বাইরে এই ধরণের তাত্ত্বিক আলোচনাপূর্ণ পত্রিকা বিশেষ প্রকাশিত হয় না। 'সামচক্র' সেক্ষেত্রে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাটি বেশ মূল্যবান। রামমোহন ও অরবিন্দ প্রসঙ্গ লিখেছেন দেবপ্রসাদ দত্ত এবং নিখিল দে। কবিতাগুলিতে পরিণত চিন্তার অভাব লক্ষ্য করা গেল।

মহিলা (বৈশাখ '৭১) সম্পাদিকা ডক্টর আশা দেবী। ১২৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬। একটাকা।

বাঙালী মেয়েদের নিজস্ব সাময়িকী মহিলার নববর্ষ সংখ্যাটি মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা নানান স্বাদের রচনায় ভরা। ফ্যাসান থেকে শুরু করে রান্নাঘর সম্পর্কে ও নিয়ম-নির্দেশ আছে। লেখিকাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বাণী রায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, ডাঃ সুমিত্রা সেন, সেনা হাসনাৎ, অর্চনা মিত্র, গৌরী গুপ্ত, কুন্তলা দত্ত, বাসন্তী বাগচী,অমিতা দেবী, সুপ্রভা কর, বিশুপ্রিয়া নন্দন প্রমুখ।

বর্তিকা (নববর্ষ সংখ্যা '৭১)— সম্পাদক : মণীশ ঘটক। গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। এক টাকা।

সতেরো বছরের প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছে গল্প, প্রবন্ধ, আলোচনা, ছোটদের আসর, খেলাধুলো এবং নানান ধরনের কবিতা। কবিতার সংখ্যাই বেশি। শ্রীঅরবিন্দের ছাত্রদের প্রতি কবিতাটি বাংলায় প্রশংসনীয় ভাবে অনুবাদ করেছেন পণ্ডিচারী আশ্রমের তরুণ কবি ও কথাকার কান্তপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া লিখেছেন মণীশ ঘটক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বোম্বানা বিশ্বনাথম, জ্যোতি রায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

স্বপনসবুজ (জুন, '৭২)— সম্পাদক : গোঁসাইলাল দে। মিলন পার্ক, সাহাগঞ্জ, হুগলী। কুড়ি পয়সা।

সংকেত গ্রীষ্ম সংকলন, '৭২)—সম্পাদক অলোক ভাদুড়ী, শ্যামল আচার্য। পলাশখোলা, আদ্রা, পুরুলিয়া, পশ্চিম-বঙ্গ।

ষষ্ঠিমধু (চৈত্র '৭১)—সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ। ২৪।৩।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪। পঞ্চাশ পয়সা।

সাহিত্য-দর্পণ (প্রথম সংকলন)—সম্পাদক : অমর দেব, স্বপন মজুমদার। খিদিরপুর, বালুরঘাট। তিরিশ পয়সা।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)-র স্মারক গ্রন্থ। মানকর, বর্ধমান।

বারবেলা (জুন '৭২)—অর্ধেন্দুশেখর দেব। বাণীপুর, ২৪ পরগণা। পঁচিশ পয়সা।

ভাঙড়াবার্তা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : ভূতনাথ শম্ভুচরণ পাল। ৩৭৪ গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড (উত্তর), হাওড়া-৬। ১৫ পয়সা।

নীরাঙ্গনা (বৈশাখ-আষাঢ় '৭১)—সম্পাদক : প্রিয়লাল মৌলিক। ৩৫সি মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা-২৯। [illegible] পয়সা।

নবায়ন (জুন, ১৯৭২)—সম্পাদক : সুবোধ-বিকাশ দত্ত। ৬৫এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। তিরিশ পয়সা।

মন্দিরা (২য় বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা)—সম্পাদক : কল্যাণজয় রায়চৌধুরী। কুচবিহার। পঞ্চাশ পয়সা।

অকলঙ্ক (৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা)—সম্পাদক : বৈদ্যনাথ মৈত্র। ১১সি টাউনসেন্ড রোড, কলকাতা—২৫। পঁচিশ পয়সা।

রবিবাসরীয় (জুন, '৭২)—সম্পাদক : ভবতোষকুমার রায়। ৩১ রাজা রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পঞ্চাশ পয়সা।

গোধূলি (বৈশাখ '৭১)—সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়। গোন্দলপাড়া, চন্দননগর হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

অভিষেক (সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা)। কৃষ্ণনগরের সিদ্ধেশ্বরীতলা ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রীদের রচনাসম্ভারে পরিপূর্ণ। সম্পাদনা করেছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপক বিশ্বাস।

সোনার হরিণ চাই

বিমলেন্দু দাশগুপ্ত

এ যুগের জানকীদেরও সেই একই বায়না—আমার সোনার হরিণ চাই। তবে আধুনিক রামচন্দ্রের দল অবশ্য ধনুর্বাণ হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ান না সেজন্য। তাঁরা যা করেন তা জানতে হলে আমাদের যেতে হবে পারস্য উপসাগরের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তের বালুকাময় বন্ধ্যা একটি দ্বীপে, যার অভ্যন্তরে সমুদ্র তার শান্ত নীল জলের রাশি অনেকদূর পর্যন্ত ঠেলে দিয়েছে। এই খাড়ীর নিস্তরঙ্গ জলে অন্তত খান পঞ্চাশেক স্পীড বোট সব সময় বাঁধা থাকে। তারপর হয়ত হঠাৎ দেখবেন একটা স্পীড বোটকে নড়ে উঠতে, শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিনে গুঞ্জন তুলে নীল জলের উপর একটি ফেনিল সাদা রেখা টেনে ছুটে যাবে সেটা চপলচরণ হরিণের মত অতি দ্রুত বেগে। নীল আকাশ, পেঁজা তুলো-মেঘ, চলন্ত সি-গাল পাখী আঁকা দিগন্ত পর্দার অন্তরালে আচরে অদৃশ্য হয়ে যাবে তারপর সেই বোট লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা গর্ভে ধারণ করে। যে সোনা গোপনে প্রবেশ করবে ভারতে। যে সোনা ভারতের অসীম স্বর্ণতৃষা কিছুটা অন্তত মিটাতে সাহায্য করবে—যে ভারতীয়দের স্বর্ণতৃষা প্রবাদতুল্য, বিশেষতঃ ভারতীয় রমণীদের। এ যুগের সোনার হরিণ এই স্পীড বোট, এ যুগের স্বর্ণলংকা এই দ্বীপের নাম ডুবাই।

সীতা চরিত্রে সর্বগুণের সমাবেশ ঘটিয়েও মহাকবি তাঁর সোনার লোভ কমাতে পারেন নি। এই লোভ তাঁর দৃষ্টিতে অক্ষমনীয় অপরাধ বলেই মনে হয়েছিল; তাই তিনি শাস্তিও দিয়েছিলেন সীতাকে অতি নির্মমভাবে। শাস্তি আমাদেরও পেতে হয়। সোনার হরিণের পিছনে ছোটার খেসারৎ দিতে হয় আমাদেরও। বছরে দেড়শো থেকে দুশো কোটি টাকার সোনা গোপনে এসে থাকে ভারতে বিদেশ থেকে। যার ফলে এর মূল্য বাবদে বছরে দেড়শো থেকে দুশো কোটি টাকার অমূল্য "ফরেন একসচেঞ্জ" হাতছাড়া হয় আমাদের। "ফরেন একসচেঞ্জের" এই ক্ষতি অপূরণীয়।

১৯৬৬ সালে লণ্ডনের সোনার বাজারে সবচেয়ে বড় খদ্দের ছিল অবিশ্বাস্য ছোট একটি দেশ, যার নাম ডুবাই। মাত্র ষাট হাজার এর জনসংখ্যা। শুধু সোনা নয়, প্রায় বারো কোটি টাকার হাত ঘড়িও কিনেছিল সে ঐ বছর লণ্ডন থেকে। এই সোনা ও হাত ঘড়ির প্রায় সবটাই এসেছে ভারতে ওখান থেকে গোপন পথে। সারা পৃথিবীতে এমন দেশটি খুঁজে পাওয়া কঠিন যে দেশের ঐশ্বর্যের উৎস হল স্মাগলিং এবং তার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা হলেন সে দেশেরই শাসনকর্তা শেখ সাহেব।

১৯৬৬ সাল সময়টা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়; কারণ ঐ বছর মোরারজী-প্রবর্তিত স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে দেশাইমহাশয় চেষ্টা করেছিলেন এদেশবাসীর স্বর্ণপ্রীতিকে ১৪ ক্যারেটের প্রতিষেধক দিয়ে খর্ব করতে। বিশুদ্ধ সোনাকে ২৪ ক্যারট বলা হয়। আমাদের দেশে ২২ ক্যারেটের সোনা চালু আছে, সেই সোনা দিয়েই যা কিছু গয়না-গাঠি তৈরী হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু ১৪ এবং তারও কম ক্যারেটের সোনা সাধারণে ব্যবহার করে থাকে। একশোর বেশী স্বর্ণকার আত্মহত্যা করে এই স্বর্ণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল—এছাড়া সভা, বিক্ষোভ ও মিছিল তো ছিলই এর বিরুদ্ধে। তিন বছর পরে সরকার নতিস্বীকার করল। স্বর্ণআইন সংশোধন করে আবার ২২ ক্যারেটের সোনা ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হল। এইভাবে মোরারজী-প্রবর্তিত স্বর্ণআইন চোরা-কারবারীদের পথে যেটুকু বাধা সৃষ্টি করেছিল, তা দূর হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল সোনার হরিণের আনাগোনা আবার পুরোদমে, যা এখনো চলেছে একইভাবে।

ডুবাই থেকে সেই যে আমরা স্বর্ণগর্ভা স্পীড বোটকে সমুদ্রে অদৃশ্য হতে দেখেছি, সেই খবর বেতার মারফৎ তখনই ভারতে যথাস্থানে পৌঁছে গেছল। তার ফলে দেখা গেল বোম্বাই শহরের কাছাকাছি কোন জেলে বসতি থেকে কয়েকজন জেলে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে গেল বার সমুদ্রে মাছ ধরার ছলে। সাক্ষাতের জায়গা তাদের নির্দিষ্ট আছে। সেখানে স্পীড বোট থেকে সোনা এই নৌকায় এবং নৌকা থেকে টাকা স্পীড বোটে বিনিময় হয়।

প্রথমদিকে ভারতীয় টাকায় এই সোনার দাম দেওয়া হত। কারণ তখন ডুবাই তথা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় নোট টাকা চালু ছিল। স্পীড বোটের এই টাকা তখন ওখানকার কোন ব্যাঙ্ক মারফৎ আবার প্রেরিত হত ভারতে এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার বিনিময়ে "ফরেন একসচেঞ্জ" দিয়ে দিতে বাধ্য ছিল। সোনার চোরা-চালানকারীদের অন্য কোনভাবে জব্দ করতে না পেরে অবশেষে ভারত সরকার উপরোক্ত উপসাগরীয় অঞ্চলের জন্য "গালফ নোট" নামে একপ্রকার লালরঙের নোট চালু করে। আইন করা হয়, যে সব ভারতীয় ঐ অঞ্চলে যাবে তারা এই লাল নোট ছাড়া অন্য নোট সেখানে ভাংগাতে পারবে না এবং ঐ অঞ্চলের কোন ব্যাঙ্ক এই লাল নোট ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় নোট "ফরেন একসচেঞ্জে"র জন্য পাঠাতে পারবে না ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে।

এর ফলে সোনার চোরাচালানকারীরা বেশ অসুবিধায় পড়ল। লক্ষ লক্ষ টাকার "গালফ নোট" সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এ অসুবিধা দুদিনের। এরপর দেখা গেল তারা পিপে ভর্তি ভারতীয় মুদ্রার (কয়েন) সাহায্যে সোনার দাম দিচ্ছে। বাজার থেকে খুচরো পয়সা হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ায় আমরা যখন ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হই তখন কি আমরা কল্পনাতে আনতে পারি, এর প্রকৃত কারণ কি? অবশ্য এই মুদ্রা আবার ডুবাই থেকে ভারতে ফিরে আসে কয়েক-দিনের মধ্যে।

কিন্তু 'কয়েনে' দাম দেবারও নানা অসুবিধা আছে। তাই এ পন্থও পরিত্যক্ত হল। বর্তমানে এই সোনার দাম চতুর্বিধ উপায়ে শোধ করা হয়ে থাকে। এক—রূপো দিয়ে, যার জন্য বছরে অনুমান দেড় কোটি তোলা রূপো বিদেশে চলে যায়। দুই—ভারতে আগত বিদেশী টুরিস্টদের কাছ থেকে ডলার, স্টার্লিং দেড়া দামে এরা কিনে নেয়। যেমন ডলারের বিনিময় মূল্য যখন ৭·৫ টাকা তখন তারা এর দাম ১১·২৫ টাকা দিয়ে থাকে। সুযোগসন্ধানী টুরিস্ট যারা তারা এই সুযোগ নিতে কুণ্ঠিত হয় না। তৃতীয় পন্থা হল সোনার দামের বদলে নিষিদ্ধ ভারতীয় ভেষজ রপ্তানি করা। ঐ স্পীড বোটেই সে
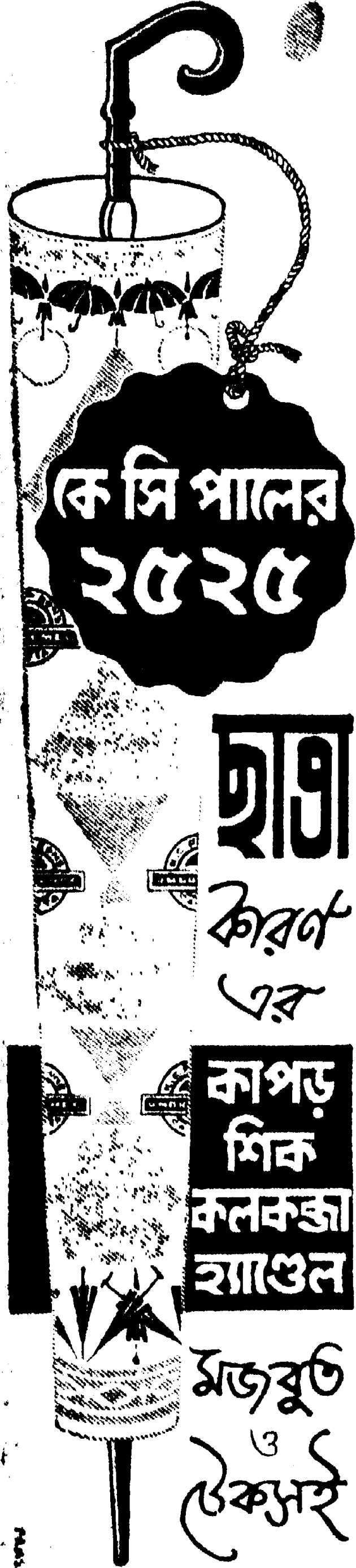
ভেষজ প্রথমে যায় দুবাই, তারপর সেখান থেকে গোপন পথে ইওরোপ। চতুর্থ উপায় হল, বিদেশে কর্মরত ভারতীয়দের বেতনের টাকা বেশী দামে কিনে নেওয়া। প্রবাসী ভারতীয় যদি দেশে টাকা পাঠাতে চায়, সে ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠাতে পারে; কিন্তু তাতে লাভ নেই। সে যত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবে তত টাকাই দেশে আসবে। তার থেকে অনেক বেশী টাকা পাওয়া যাবে এদের মারফৎ টাকা পাঠালে। এদের কাছে সেই ডলার বা স্টার্লিং জমা দিলে ভারতে নির্দিষ্ট ঠিকানায় তার দেড়া টাকা এরা পৌঁছে দেবে নি-খরচায়। এইভাবেও এরা প্রচুর বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করে থাকে।

কচ্ছের রন থেকে কন্যা কুমারিকা—ভারতের এই বিশাল পশ্চিম উপকূল সোনার হরিণদের (চোরাকারবারীদের) সামনে খোলা সিংহদ্বার এবং গোটা ভারত তাদের বিচরণ ক্ষেত্র—এ মন্তব্য বোম্বাইয়ের এক প্রবীণ কাস্টমস অফিসারের। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম আইন করে বিদেশ থেকে সোনা আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু আইন করে রাতারাতি মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অভ্যাস ও ধ্যান-ধারণাকে বদলানো যায় না। প্রধান-মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাই বললেন—"এই শত শত বৎসরের স্বর্ণপ্রীতি কয়েক বৎসরের চেষ্টায় দূর হতে পারে না বড় রকমের কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার ভিন্ন। বস্তুতঃ জন-মানসে গভীর-ভাবে প্রবিষ্ট এই স্বর্ণপ্রীতি একমাত্র সামাজিক বিপ্লবের দ্বারাই দূর করা যেতে পারে।"

ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে সোনার স্থান অনেক উচ্চে। চণ্ডীদাস বলেছেন, রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম। একথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা। যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় তাকেই আমরা সোনার সঙ্গে তুলনা করি। রবীন্দ্রনাথও একই মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে জন্ম-ভূমিকে বলেছেন—সোনার বাংলা। একান্তপ্রিয় আপন জনকে আদর করে আমরা বলি—সোনা। হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ-রূপে দেবতাকে স্বর্ণালঙ্কার উৎসর্গ করে থাকি আমরা। কিন্তু এ তো গেল সংস্কার ও ভাবজগতের কথা; যা কিনা দাঁড়িয়ে আছে এক বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর। সেই প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের বুলিয়ন এ্যাসোসিয়েশনের এক প্রাক্তন সভাপতির অভিমত দেওয়া হল।

প্রথমে ভারতীয় ললনাদের স্বর্ণপ্রীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—হিন্দুধর্মে মেয়েদের পিতা বা স্বামীর সম্পত্তির উপর কোন অধিকার নেই। তাই এদের মৃত্যুর পর কন্যা অথবা স্ত্রী যাতে পথে না বসে সেজন্য নিরাপত্তামূলক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের স্বার্থে এদেশে মেয়েদের যত বেশী সম্ভব স্বর্ণালঙ্কার দেবার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল; সেগুলিকে সাধারণতঃ স্ত্রীধন বলা হত। স্ত্রীধন যার যত বেশী হয়, দুর্দিনে তার পক্ষে সেটা ততই বেশী সহায়ক হয়। এটা হল তাদের চলন্ত জীবন-বীমা।

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক মান-মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের প্রশ্নকেও এদেশে সোনার সঙ্গে জড়িয়ে দেখা হয়। সেইজন্য অতি দরিদ্র পিতাও তার কন্যার বিয়েতে যে করে হোক কিছু না কিছু স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে থাকে।

স্বর্ণপ্রীতির তৃতীয় ও সর্বপ্রধান কারণ তাঁর মতে—ভারতের কৃষক জনগণের ভাগ্য মোটামুটিভাবে মৌসুমী বায়ুর খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল হওয়ায় প্রতিনিয়ত তারা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে থাকে। এইরকম সংকট দেখা দিলে অর্থাৎ অজন্মা, অনাবৃষ্টি বা বন্যা ইত্যাদি দেখা দিলে, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই তারা মূল্যবান কিছু সঞ্চয় করে রাখার চেষ্টা করে। এদেশ বলে নয়, সারা পৃথিবীতে সর্বজনগ্রাহ্য মূল্যবান বস্তু হিসাবে সোনার স্থান সবার উপরে। এজন্য ভাল ফসল হলেই কৃষক সে বছর চেষ্টা করে কিছু সোনা কিনে রাখতে। কৃষকদের এই প্রথা আজকের নয়, অতি দীর্ঘকালের।

এইভাবে বিভিন্ন কারণে ভারতে যে সোনার ক্ষুধা সৃষ্টি হয় তার বিশালতা কিন্তু আমাদের কল্পনারও অতীত। এসম্পর্কে একজন অর্থনীতি বিশারদ সাংবাদিক যে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি পরিবেশ করেছেন তা এই ভারতের বারো কোটি পরিবারে যদি পনেরো বছর অন্তরও একটি করে বিবাহ অনুষ্ঠান হয় এবং গড়ে প্রতি বিবাহে যদি কম করে এক তোলা সোনা দরকার হয়; তাহলে শুধুমাত্র এই বিবাহ-অনুষ্ঠানের জন্যই ভারতে বাৎসরিক সোনার চাহিদা দাঁড়াবে ৮০ লক্ষ তোলা বা প্রায় ১০০ টন। এছাড়া উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আরো বিবিধ অনুষ্ঠান ও পূর্বোক্ত কৃষক ও মহিলাদের স্বর্ণসঞ্চয়ের প্রবণতার জন্য সোনার আরো চাহিদা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ১৯৬৩ সালে মোরারজীর স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের আগের বছর শুধুমাত্র বোম্বাইয়ের বুলিয়ন এ্যাসো-সিয়েশনই দশ কোটি তোলা সোনার কারবার করেছিল। এই সংস্থার সোনা গালানোর ফার্নেসে এখন রূপো গলানো হয়, যে রূপো সোনার চোরাচালানের দাম শোধ করতে দেশের বাইরে পাচার হয়।

এই অবস্থায় স্বভাবতঃই স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সোনার উপর কোন নিষেধবিধি আরোপ করাকে সুনজরে দেখেন না। বরং

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, দেশের মধ্যে এই যে বিরাট স্বর্ণ-ক্ষুধা রয়েছে, এটা মিটানো জাতীয় কর্তব্য এবং যারা এ কাজ করছে তারা প্রকৃতই দেশ-প্রেমিকের কর্তব্য পালন করছে।

ভারতে সোনার উৎপাদন প্রায় নেই বললেই চলে। মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি থেকে বছরে প্রায় ৪।৫ কোটি টাকার সোনা পাওয়া যায়, যার সবটুকুই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়ে নেয়। এখন তাহলে দেশের বাজারের সোনার চাহিদা মিটানোর উপায় কি? সে চাহিদাকে তো অবান্তর বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না? জাপান সরকারও একই রূপে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যে রাস্তা নিয়েছে এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখনীয়। তারা আন্তর্জাতিক বাজারে পঁয়ত্রিশ ডলার দরে এক আউন্স সোনা কিনে নিজ দেশে তাই সাতান্ন ডলারে বিক্রি করে যেমন একদিকে প্রচুর মুনাফা করে, অন্যদিকে চোরাকারবারের পথেও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকারও যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফৎ এইভাবে সোনার কারবার করেন তাহলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

সোনার চোরাকারবারীদের ধরার জন্য সম্প্রতি আমেরিকার একটি সংস্থা এক ধরনের যন্ত্র তৈরী করেছে। ট্রানজিস্টরযুক্ত এই যন্ত্র থেকে অল্পশক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে, যে রশ্মি সোনার উপর পড়লে তা থেকে রঞ্জনরশ্মি বেরিয়ে আসে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় এই যন্ত্রে পাখীর ডাকের মত শব্দ হয়। জাপান অবশ্য এর থেকে আরো কম জটিল আর এক ধরনের "গোল্ড ডিটেকটর" বার করেছে, যার সাহায্যে তারা ইতিমধ্যে টোকিও বিমানবন্দর বেশ কয়েকটি সোনার হরিণ ধরে ফেলেছে।

দুবাই ছাড়া ভারতে সোনা চোরাচালানের আর একটি কেন্দ্র হল হংকং। ভারতে চোরাচালানের এক চতুর্থাংশ সোনা আসে এখান থেকে। কলকাতায় পঞ্চাশ হাজার স্থায়ী চৈনিক বাসিন্দারা হংকংয়ে তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রেখে এই কারবারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে থাকে। ১৯৬০ সালে কলকাতা বন্দরে এম ভি রুথ এভারেট নামে যে জাহাজ থেকে প্রায় তিপ্পান্ন লক্ষ টাকার বে-আইনী সোনা উদ্ধার করা হয়েছিল তা এসেছিল এই হংকং থেকে। কিম্বা কয়েক বছর আগে বজবজের কাছে গঙ্গায় লক্ষ লক্ষ টাকার যে সোনা পাওয়া গেছল, তাও হংকংয়ের সোনা।

এই যে বিপুল পরিমাণ সোনা প্রতি বছর আসছে এদেশে এর কতটা কোথায় জমছে তার কোন হিসাব পাওয়া মুস্কিল। তবে সহজেই অনুমেয় যে, এর সিংহভাগই গিয়ে জমছে মুষ্টিমেয় লোকের সিন্দুকে। প্রাক্তন রাজা-মহারাজা ও দেবমন্দিরগুলির স্বর্ণ ভাণ্ডার ইতিহাসবিখ্যাত। তবে এ ব্যাপারে সকলকে টেক্কা দিয়েছে রাজস্থানের মারোয়ারী সম্প্রদায়। অর্থনীতিবিদদের ভাষায় গোটা রাজস্থান হল এক স্বর্ণখনি বিশেষ।

হিন্দুশাস্ত্রে সোনাকে অগ্নি-রেতঃ বলা হয়েছে। কথিত হয় সপ্তর্ষি জায়াদের অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শনে কাম-বিহ্বল অগ্নিদেবের রেতঃ স্খলিত হয়ে পৃথিবীতে পড়লে তাই সোনায় রূপান্তরিত হয়। অন্যত্র সোনাকে "গিরিসম্ভবা" বা পর্বত-জাত ধাতু বলা হয়েছে। এছাড়া গাঙ্গেয়, কলধৌত, জাম্বুনদ ইত্যাদি নামের মাধ্যমে সোনাকে নদীগর্ভজাতও বলা হয়েছে।

আয়ুর্বেদে সোনার উচ্ছ্বসিত গুণ কীর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ সুবর্ণ বলকর, শুক্রজনক, নেত্রহিতকর, বুদ্ধি মেধা স্মৃতিদায়ক, আয়ুবর্ধক, দেহদার্ঢ্য সম্পাদক, কান্তিদায়ক, সর্বপ্রকার বিষ-ক্ষয়কারক, উন্মাদ, ত্রিদোষ জ্বর ও শোথ প্রশমক। একই শাস্ত্রে বিশুদ্ধ স্বর্ণ চেনার উপায় হিসাবে বলা হয়েছে—'দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিষেকে কুঙ্কুমপ্রভম।' অর্থাৎ যে সোনা পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ এবং নিষেক করিলে কুঙ্কুমপ্রভ হয় সেই সোনাই উত্তম। সোনা এই ভাবে রোগ নিবারণ করে মানুষের দেহ ধারণ (রক্ষণ) করে বলেই একে ধাতু বলা হয়।

হেম প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধ শেষ করছি। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অর্থনীতিবিদ বলেছেন—'সোনা হল বর্বর যুগের স্মৃতি চিহ্ন।' আর একজন বলেছেন—'মানব শ্রমের অপব্যয়ের প্রতীক হল সোনা।' রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিন বলেছেন—'ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে সোনার কোন দাম থাকবেনা। তখন সাধারণ শৌচাগারের দেয়াল ও মেঝে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হবে।' সোনার কথায় কিন্তু শেষ কথাটি বলেছেন আমাদেরই দেশের একজন। বৈদান্তিক ঋষি শঙ্করাচার্য বলেছেন—'কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা।' অর্থাৎ তাঁর মতে সংসারে হেয় বস্তু হল হেম ও হেমাঙ্গিনী সম্প্রদায়।

তাকে খুঁজে ।।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পাহাড়তলির লেভারে
এখন ধর্মঘটের মতো ফেটে পড়ছে সমুদ্র :
কোথায় ? কোথায় ?

গাঁ-গঞ্জ থানাতল্লাশ করে
দাঁতাল শুয়োরের ক্রোড়ে গলি-ঘুপচি চিরে
এখন চৌমাথায় দাঁড়িয়ে
হাতের মুঠোয়
রুমালের মতো নাচাচ্ছি আমার অধীর হৃৎপিন্ড :
কোথায় ? কোথায় ?

উনপঞ্চাশীর ঝোড়ো মাদলে
পাইনের মাথায় আছড়ে পড়ছে
বিদ্যুতের বল্লম-বেঁধা মেঘ,
প্রতিটি পাতার শিরা থেকে
অন্ধকার ধুয়ে দিচ্ছে বৃষ্টি,
আমি আশার বিরুদ্ধে আশা
আশার বিরুদ্ধে
আশা
করতে করতে
সেই অসম্ভব স্বপ্নের দিকে
মেলে রাখি আমার অনিদ্রা—
যেখানে
অশোক বনের নিচে কালো চুল মেলে
পিঠের প্রান্তরে
সে ডেকে এনেছে রাত্রি।

যে গল্পের শেষ নেই ।।

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

তারপর সময়
হাত ধরে নিয়ে গেল
এক নদীর কাছে।
বলল
'এই তো তোমাদের আলাপ হয়ে গেল
এবার
আমি তবে যাই।'—
সময় চলে গেল।
তারপর সেই নদী
হাত ধরে হাত ধরে...
নিয়ে গেল এক সমুদ্রের কাছে—
তার কানায় কানায় টল্ টল্ করছে জল।
"এই তো তোমাদের দেখা হল" বলেই
খিল খিল করে হা তে হাসতে
নদী
ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে।
তারপর সমুদ্র বলল—"চলো—
তোমাকে আকাশের কাছে নিয়ে যাই।।"

জলের তরঙ্গে ছায়া ।।

আশিস সান্যাল

কিছু ভালোবাসা চাই,
কিছুটা উজ্জ্বল, কিছু প্রেম;
ভোরের আলোয় ধৃত কিছুটা আকাশ।
দুধের মতন স্নিগ্ধ
জোছনার অমল প্রান্তরে
চাই কিছু প্রতিধ্বনি,
বিজন বৃষ্টির দিনে
প্রত্যাশায় আলোড়িত
চাই কিছু ধ্বনিময় দূরের বাতাস।

কোথাও জীবন আছে—
জীবনের প্রস্তাবিত মৌলিক আহ্বান
না হলে কেমন করে
শুভ্রতায় একদিন ধরিবে বিহান?
প্লাবিত স্রোতের নীলে
কেমনে প্রস্তুত হবে
জাগরণে উদ্ভাসিত দূরে বনভূমি?
কিছুটা ফসল চাই,
কিছু ফুল,
ভয়াল ঝড়ের শেষে কিছু প্রতিধ্বনি।

জলের তরঙ্গে ছায়া,
আলো-ছায়া
ছায়া-ঘন হিম শিলাপাত।
সূর্যের কোমল স্পর্শে
বেদনায় পরিণামী ফুল,
অমোঘ দাম্ভিক মন্ত্রে
আত্মনিবেদনে
পেতে চাই সাধারণ্যে
বরাভয় প্রসারিত জলীয়-প্রপাত।।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। ২৫ ।।

মণিকার প্রথম সন্তান ছেলেই হল। মায়ের মতো অত সুন্দর নয় হয়ত—তবে নিমাইয়ের মতোও নয়। মোটের ওপর দেখতে ভালই। রঙ এখন যতটা অত থাকবে না, তবু ফরসা ঘেঁষাই হবে। বেশ স্বাস্থ্যবানও হয়েছে।

হেমন্ত আদর করে নাম রাখল 'গোপাল'। নিমাইচরণ নিজেদের নিয়মে কৃষ্ণচরণ রাখতে চেয়েছিল—কালীচরণেও আপত্তি নেই জানিয়েছিল—হেমন্ত ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল, 'রাখ দিকি! তোর বংশের বিন্দুবাষ্পও ছোঁয়া না লাগে ছেলেটার। যদিবা কেষ্ট নাম রাখতুম, ফরসা ছেলের কেষ্ট নাম রাখতে দোষ নেই—কেলে ভূত যদি নিমাই গৌর হতে পারে তো ফরসা ছেলের কেষ্ট হওয়াই উচিত—তা ঐ জন্যেই রাখব না, ও আমার গোপালই ভাল।'

মণিকার অবশ্য কৃষ্ণ বা গোপাল কোনটাই পছন্দ নয়। ষোড়শীবাবু নাকি কবে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে হলে রবীন্দ্রনাথ নাম রাখব'—সেইটেই ধরেছিল মণিকা, বললও শাশুড়িকে—হেমন্ত তাও উড়িয়ে দিল।

'হ্যাঃ! গণ্ডা গণ্ডা রবীন্দ্রনাথ চারদিকে গড়াগড়ি খাচ্ছে সবাই কি রবিঠাকুর হচ্ছে নাকি? দ্যাখো গে যাও কত রবীন্দ্রনাথ বিড়ি পাকাচ্ছে, কত জেল খাটছে বসে।'

আর কথা বলতে পারে না মণিকা। তবে কৃষ্ণচরণ যে নাম রাখেনি তার জন্যে শাশুড়ির কাছে সে কৃতজ্ঞ। মাগো, ঐ আবার একটা নাম নাকি? সবাই ডাকবে কেষ্টা বলে। চাকর বাকরের মতো।...ওদের বংশের ধারা। রক্ষে করো। বংশের ছেলেদের যা নমুনা। ঐ তো এসেছিল সব জ্ঞাতি-ভাইরা, কী এক-একখানি চেহারা আর তেমনি কথাবার্তা। তেমনি সব কীর্তি-কাহিনী। ওদের জন্যেই তার সাধটা হতে পারল না। নিসেধো হল ছেলেটা, সে আর এক রাগ। এর কে ভাইপো এক, গোরা না গৌর—সাধের যেদিন ঠিক হয়েছিল, তার দুদিন আগেই মারা গেল। অশৌচ পড়ল—সে-অশৌচ যখন কাটল, তখন আর পাঁজিতে দিন নেই, আর তারপর—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ছেলেও তো হয়ে গেল।...সে ভাইপোও তেমনি, উনিশ-কুড়ি তো মোটে নাকি বয়েস—বলেতো, কত ঠিক কে জানে—এরই মধ্যে খারাপ রোগ ধরিয়ে বিনি চিকিচ্ছেয় মরে গেল। শেষে নাকি গায়ে এমন পচা গন্ধ হয়েছিল যে, কেউ ওর ঘরে যেত না। ধসা পশ্চিমে না কি বলে—তাই হয়ে গিছল।...

ঐ তো গুণধর ভাইপো—ইনি আবার বলেন সে-ই নাকি ওর গোপাল হয়ে এ-বাড়িতে এসেছে আবার। ভাগ্যিস, শাশুড়ি অনেক জানেন শোনেন, তিনি বলেছেন, 'তা কখনও হয়, পাঁচ মাসে প্রাণ এসে যায় ছেলের—আর এ তো মরেছে বৌমার ভরা ন'মাসে। তোর যেমন কথা!...তা শাশুড়িও তো ঐ গুণধর নাতির জন্যে কেঁদেকেটে চোখ ফোলালেন। এদের বাড়ির কি ব্যাপার ভগবানই জানেন!...

ছেলে ভালভাবেই মানুষ হতে লাগল। হেমন্তর যত্ন খুব। নিয়মকানুন জানেও অনেক, ঘড়ি ধরে নাওয়ানো খাওয়ানো করে। নিজেই করে। সেদিক দিয়ে মণিকা অনেক নিশ্চিন্ত। তবে কড়াও খুব। ষোড়শীবাবুর স্ত্রী নাকি হঠাৎ মারা গেছেন, শুনে বাপের বাড়ি যাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, হেমন্ত যেতে দিল না। ছেলের নাকি অযত্ন হবে, অনিয়ম হবে। সেইটেই প্রধান কারণ। তারপর বলল, 'আর তার বৌ মরেছে, তুমি গিয়েই বা কি সান্ত্বনা দেবে! তোমাদের জ্ঞাতি কি আত্মীয়ও নয়। তার বাড়িতেও ঢের লোক—তোমাকে শোক ভোলাতে যেতে হবে কেন? বৌ মরেছে বেশ হয়েছে, ভাগ্যিমানের বৌ মরে। পয়সা আছে, চেহারা ভাল, বয়স বোঝা যায় না—আবার দু'মাস পরেই দেখো একটা বিয়ে করবে। ওদের আবার শোক, ওদের আবার দুঃখু!'

এর পরে আর কিছু বলতে পারে না মণিকা, মুখ ভার করে থাকে। ষোড়শীবাবু এর ভেতর দু-একবার দেখা করতে এসেছিলেন, হেমন্তর সঙ্গেও দেখা করে গেছেন। 'বেয়ান' বলেননি, বলেছেন 'মাসীমা'। চলে যেতে হেমন্ত ভ্রূকুটি করে বলেছে, 'কী রকম সম্পর্ক তোমাদের বৌমা? অতবড় মানুষটা, যতই হোক—পঞ্চাশের মতো বয়স তো হবেই, হয়ত দু-এক বছর এদিক-ওদিক হতে পারে, বেশী হওয়াও আশ্চর্য নয়—তা তুমি কাকা কি মামা কি মেসো কিছু বলো না? সে সুবাদে আমাকে তো বেয়ান বলা উচিত। কী বলে ডাকো তুমি?'

ভাল করে জবাব দিতে পারেনি মণিকা, জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে, 'না, আমরা—মানে—এমনি কিছুই বলি না—মানে ডাকার তো দরকার হয় না!...আড়ালে ষোড়শীবাবুই বলি। তেমন হলে—এক-আধবার বুঝি ষোড়শীদাও বলেছি।...কে জানে, অত মনে নেই—।'

'অতবড় মানুষটা তোমার দাদা হতে গেল আবার কি সুবাদে!' অপ্রসন্ন মুখে মন্তব্য করেছে হেমন্ত।...

অবশ্য সান্ত্বনা দেবার জন্যে মণিকাকে যেতে হল না, নেবার জন্যে ষোড়শীবাবুই এলেন। এবার যেন একটু ঘনঘনই আসতে লাগলেন। এসে হয়ত বলেন, 'এই—একটু কাজ ছিল এদিকে—ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টারের সঙ্গে দেখা করতে হল একবার।' নয়ত 'একবার একটু ম্যাটর্ণী বাড়ি যেতে হয়েছিল—তাই বলি তোর একটু খোঁজ নিয়ে যাই।' কিম্বা 'রেভিনিউ' আপিসে একটা কেস ছিল তাই আসতে হল। বলি যে যাই একবার—' ইত্যাদি।

হেমন্ত এখনি কিছু বলে না, শুধু একদিন আর থাকতে পারেনি, বলেছিল, 'বৌমার ভদ্রলোকের দেখছি ঘনঘন কলকাতায় আসবার দরকার হচ্ছে। ঘরে বোধ-হয় একেবারেই মন টিকছে না আর!'

মণিকা ফোঁস করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে, 'তা ভদ্রলোক আসছেন, উপকারী লোক, আমাদের অন্নদাতা—ও'কে কি মুখের ওপর আসতে বারণ করে দেবো? উনি কি কোন খারাপ উদ্দেশ্যে আসেন?'

হেমন্তও শীতল কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'এ আবার কি ধরনের কথা বৌমা! আমি তো বারণ করার কথা বলিনি, উদ্দেশ্যও খুঁজতে যাইনি। এ তো ঠাট্টা করেই বলা—এমন তো হামেশা বলে থাকে লোকে। এ আমি ও'র মুখের ওপরই বলতে পারি। একথা তোমার গায়েই বা বাজে কেন? বলে পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে!...তাহলে কথাটা তোমার মনেও লেগেছে বুঝতে হবে!''

এরপর চুপসে চুপ করে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। হঠাৎই কথাটা বেরিয়ে গিছল মুখ দিয়ে, এতটা ভাবেনি।

এর দিনকতক পরে ভদ্রলোক আর একদিন একটা ছুতো করে এলে হেমন্ত খাতির করে বসিয়ে জলখাবার খাইয়ে—নিজেও সামনে চেপে বসল। অন্যদিন, বাপের বাড়ির লোক এলে একটু আড়ালে ওদের কথা কইতে দেওয়া উচিত বলেই কোন একটা ছুতো করে অবসর দিয়ে সরে যায়। আজ ইচ্ছে করেই গেল না। কুশল প্রশ্নের পর বৌমার বাবা-মা-ভাইবোনের খবর নিয়ে বলল, 'বেইমশাই (বেই শব্দটায় একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ করল) এমন সময়ই আসেন, একদিনও আপনাদের জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় না। আজ বরং থেকে যান, আলাপটালাপ করে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে যেতে পারেন যাবেন—নয়ত একটা রাত না হয় গরিব মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি কাটালেনই!'

'বেইমশাই' শুনেই মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল ষোড়শীবাবুর, তার ওপর 'মেয়ে-জামাই' যোগ করাতে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। তবে তিনিও—ছোটখাটো হলেও জমিদার ও ব্যবসাদার, বললেন, 'না সে আজ আর হবার জো নেই মাসিমা, বলা-কওয়া তো নেই, তাছাড়া মা-মরা ছোট ছেলেটা, রাত্রে আমি কাছে না থাকলে বড় কান্নাকাটি করে। আর একদিন তখন সময় করে—একটা ছুটির দিন দেখে এলেই হবে।'

তারপর একটু কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে বললেন, 'তা আপনি আমাকে বেইমশাই বললেন কি সুবাদে? আমি তো আপনাকে মাসিমা বলি, আর মনুও তো দাদা বলে আমাকে—!'

'তা বটে। ঐ দেখুন—মনের ভুল। বয়েস হয়েছে তো। তাছাড়া আপনাকে বয়সের তুলনায় একটু বড়ই দেখায় বলে—কেমন যেন বৌমার দাদা ভাবতে পারি না, গুলিয়ে যায় সম্বন্ধটা। কাকা কি মেসো ডাকতেই ইচ্ছে করে।...তা আপনি আমার বেয়াইকে কি বলেন—কাকা না মামা না মেসো?'

খুবই সরল, সহজ কণ্ঠস্বর—প্রশ্নেও কোন জটিলতা নেই। কিন্তু ষোড়শীবাবু এতেই ঘেমে উঠলেন। বললেন, 'না, মানে কী যে বলি কখন—আসলে তার কিছু ঠিক থাকে না। কিছু যে সম্পর্ক পাতিয়ে ডাকি—তা মনে হয় না।...আপিসে তো, অবিনাশবাবুই বলি বেশির ভাগ।'

মণিকার মুখও রাঙা হয়ে উঠেছে এ-প্রশ্নে। সে জলখাবারের খালি রেকাবিটা নিয়ে বাইরে রাখতে চলে গেল। হেমন্ত পুনশ্চ তেমনি অমায়িক সহজকণ্ঠেই বললে, 'আমার অবিশ্যি বলা শোভা পায় না, আস্পর্দার মতোই শোনায়—তবু যখন মাসিমা বলেন, সেই অধিকারেই বলছি—এমন কিছু বয়েস নয়তো আপনার—আর একটা বিয়ে করে ফেলুন, দেরি করবেন না। *শুধু শুধু এমন করে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ নেই এখানে ওখানে, এতে শান্তি পাবেন না, ঘরের ফাঁকাটা ভরবে না তাতে। কতদিন বাঁচবেন তার তো ঠিক নেই, কদ্দিন আর অপরের ভরা ঘর দেখে নিঃশ্বেস ফেলবেন? বিয়ে করতেই হবে, করবেনও—সেক্ষেত্রে মিছিমিছি আরও খানিকটা বয়েস না বাড়িয়ে কাজটা সেরে নিন।...আর, যদি আপনি অপরাধ না নেন তো বলি, এদের তো আপনি ভালবাসেন—বৌমার বোন-টিকেই দয়া করে গ্রহণ করুন না। তারও জানাশুনো ঘর—আপনার ছেলেমেয়েরাও তাকে চেনে—বাইরে থেকে কাকে আনবেন, সে কি রকম লোক হবে তা তো জানেন না, সেগুলোর হয়ত দুর্গতির সীমা থাকবে না। এ গরিবের মেয়ে, আপনার ঘরে পড়লে কত্তে যাবে, প্রাণ দিয়ে খাটবে।*

ঘামের ফোঁটাগুলো বড় বড় ধারায় গড়িয়ে পড়তে শুরু করে ষোড়শীবাবুর কপাল গলা বেয়ে। দরজার বাইরে মণিকাও যেন পাথর হয়ে যায়—উত্তরটা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। শাশুড়ি যে একথাটা পাড়বেন তা স্বপ্নেও ভাবে নি, তবে এখন মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

'কিন্তু সে তো মানে'—ষোড়শীবাবু আমতা আমতা করেন, কী যে বলবেন যেন ভেবে পান না।

'সে দেখতে ভাল নয়, রঙ ময়লা—এই তো? তা নাই বা হল বেই—ঐ দেখুন আবারও সেই ভুল, বাবাই বলি—তা না-ই বা হল বাবা, একবার তো সুন্দর পেয়ে-ছিলেন, এতকাল তো ভোগও করলেন—এখন সেবাযত্ন ঘরকন্না করবে গুছিয়ে, ছেলেমেয়েদের দেখবে—এই জন্যেই তো বিয়ে করা? এখন আপনি একটা সুন্দরী অল্পবয়সী বৌ আনলে সে আপনাকে পছন্দ করবে কিনা তাও ভাবুন। মিছি মিছি বুড়ো বয়েসে অশান্তি জোটানো।'

ষোড়শীবাবু এতখানি জীবনে কখনও এমন বিব্রত বোধ করেন নি বোধ হয়। তাঁর যেন মনে হল তিনি একটা খাঁচা কলে পড়ে গেছেন। অন্য কোনভাবে বিস্তার দিতেন মণিকা তাঁর দলে আসত, এ পরিস্থিতিতে তার কি মনোভাব হবে সেটা বুঝতে না পেরেই আরও অস্বস্তি তাঁর।

ফলে তিনি যেন একটু ক্ষুব্ধই হয়ে উঠলেন। আর রাগ হলে খুব বুদ্ধিমান লোকও যা-তা বলে বসে। ষোড়শীবাবুও হঠাৎ বলে ফেললেন, 'তা তাহলে মনুর সঙ্গে শালী সম্পর্ক হয়ে যাবে—তখন তো রোজ এলেও আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।'

'ওমা, তা এখনই বা আপত্তি করছে কে! আমরা কি কখনও আপত্তি করেছি? আপনি রোজই আসুন না। আমি তো আপনাকে উলটে থেকে যেতেই বলছিলুম আজ।...তা নয় বাবা, এতে কি আপনার লাভ হবে? *স্পষ্ট কথা বলছি কিছু মনে করবেন না—অনেক বয়েস হল, দেখেছি শুধু শুধু চোখেচোখে কথা বলতে গিয়ে কোন লাভ হয় না—এখানে, আপনার দিক থেকেই বলছি, নিত্য না আসাই ভাল। চোখের সামনে এই চেহারা দেখলে এমনি বোই চাইবেন, কিন্তু এ চেহারা পাওয়া কি এত সোজা? আর দোজবরে, যতই যা বলুন পঞ্চাশের কাছাকাছি তো বয়েস গিয়েইছে, আপনাকে এত সুন্দরী মেয়ে দেবে কেন?* এ জিনিসও পাবেন না, সে তো আর হবার নয়—এমন জিনিসও পাবেন না। এ ভুলে যাওয়াই ভাল। আপনার মঙ্গলের জন্যেই কথা বললুম বাবা, হয়ত একটু রূঢ় শোনাল—নিজ গুণে অকথা বুঝে ক্ষমা করবেন।'

আর বসতে পারলেন না ষোড়শীবাবু। রাগ, না ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা, তা তাঁর কাছেও স্পষ্ট নয় তখন—শুধু এই মহিলাটির তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাওয়া দরকার—এইটেই মনের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রবল। মণিকা এই দরজার বাইরেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, তা অনেকক্ষণ ধরেই আড়ে দেখছেন। তবু চোখের দিকে চাওয়া তো দূরের কথা, যাবার সময় একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত করে গেলেন না। কোনমতে হেমন্তর দিকে একটা হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গী করে দ্রুত নেমে চলে গেলেন।

।। ২৬ ।।

ষোড়শীবাবুর আসা এবার বন্ধ হল। সুরেন তো বহুদিনই আসা বন্ধ করেছে—নমাসে ছমাসে হয়ত একদিন আসে—মণিকা অনুযোগ করলে কাজের অজুহাত দেখায়, বলে, 'টিউশ্যানী ধরেছি সন্ধ্যে-বেলার দিকে, ফিরতে বড় ক্লান্ত হয়ে যায়। আর অন্যদিন কোন কাজ সারা হয় না, রবিবারের জন্যে সব তোলা থাকে বলে সেদিনও নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাই না।' নিছাৎ হেমন্তর শরীর খারাপ শুনলে কিম্বা কোন উপলক্ষে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে না পাঠালে সে আর আসে না। এলেও একটু পরে চলে যায়।

এতে মণিকার মন তিক্তই হয়ে ওঠে ক্রমশ। স্বামীর কাছাকাছি আসা হয় না—বরং এর ফলে আরও যেন দূরেই সরে যায়। চাঁদ সামনে না থাকলেও জোনাকী জোনাকীই থাকে। তার আলোয় চাঁদের কাজ হয় না।

হেমন্ত এটা লক্ষ্য করে, চিন্তিত হয়।

প্রথম প্রথম ভেবেছিল—গোড়ায় একটু আশাভঙ্গ হয়েছে ক্রমে সেটা সয়ে যাবে; যখন দেখবে বুঝবে যে বিয়ে ফেরানো যায় না, এর সঙ্গে জীবনের মতোই গ্রন্থি বন্ধ হয়েছে, তখন আস্তে আস্তে ভাগ্যকে মেনে নেবে। কিন্তু যতদিন যায় ততই যেন স্বামী সম্বন্ধে অবজ্ঞা আর তিক্ততা বাড়ে মণিকার। বরং যতদিন সুরেন আসত, এমন কি তারপর যখন ষোড়শীবাবুর আসা যাওয়া বাড়ল—তখনও যেন অনেকটা সয়ে থাকত—বন্ধ জীবনে এরাই কতকটা বাতায়নের কাজ করত—আরও, এদের সামনে বলেই হয়ত মানিয়ে নিয়ে চলত। কিন্তু সর্বদিকের বাতায়ন বন্ধ হয়ে গিয়ে যখন পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা বাস্তব-জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াল তখন যেন প্রথম নিজের অবস্থাটা বুঝল—এবং আরও তিক্ত, আরও রুক্ষ হয়ে উঠল।

এ অবজ্ঞা না-বোঝার মতো বোকা নিমাই নয়। কিন্তু সে সইতে জানে, নইলে হেমন্তর ঘরে অদ্বিতীয় হয়ে থাকতে পারত না আজ। তাছাড়া নিজের সম্বন্ধে তার নিজের ধারণা স্ত্রীরই অনুরূপ—সে জানে যে সে কোন অংশেই এ স্ত্রীর যোগ্য নয়। রূপসী, তার তুলনায় লেখাপড়া জানা মেয়ে—গান জানা, ভদ্রসমাজের উপযুক্ত কথাবার্তা কইতে পারে, তাদের সঙ্গে সমানে মিশতে পারে—এ বৌ তার মতো মূর্খ মিস্ত্রীর হাতে পড়ার কথা নয় কোনমতেই। সেশেঘাটে যেসব বিবাহযোগ্যা মেয়েকে দেখেছে তাদের সঙ্গে কোন মিলই নেই এর। নিতান্তই তার ভাগ্যের জোর আর জ্যাঠাইয়ের পয়সার জোরে এ ঘরে এসেছে ঘর করতে।

তাই, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেলে কিছু লাঞ্ছনা সইতে হবে—এটা সে মেনেই নিয়েছিল। বিশেষ চাঁদ যখন করায়ত্ত তখন একটু আধটু লাঞ্ছনাতে কিছু এসে-যাবে না। তাছাড়া মণিকার মতো স্ত্রী তাকে ধমক দেওয়ায়, শাসন করাতেও নিমাই একরকমের সুখ অনুভব করত, এক ধরনের গর্ব বোধ করত। কারণ তার থেকে সর্বাংশে উচ্চস্তরের না হলে এ অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারত না এবং এই উচ্চস্তরের জীব যতই যা করুক—সে যে তারই স্ত্রী তারই ঘরনী, চিরদিনের মতো ইহজন্মের মতো তার সঙ্গে বন্ধ—তিরস্কারের প্রতিটি শব্দে সেই সত্যেরই স্বীকৃতি প্রকাশ পাচ্ছে না কি?

কিন্তু তবু, সহ্যেরও সীমা আছে। প্রথমদিকের সৌভাগ্য-বিহ্বলতা একটু একটু করে কাটে। সুন্দরী স্ত্রীর অভিনবত্বও ক্রমে সহনীয়, অভ্যস্ত হয়ে আসে। বন্ধুবান্ধবদের কারও কারও কাছে অবস্থাটা বর্ণনা করলে তারা পরিহাস করে, বলে, 'তুই যে গোড়া থেকেই মাগের ভেড়ো হয়ে রইলি হাত জোড় করে—তাকে বুঝিয়ে দিলি যে সে লাথি মারলেও তোর সুখ, তার গালাগাল তোর অঙ্গের ভূষণ। লাথি খেলে তার পায়ে লাগল কিনা সেই চিন্তেই তোর বেশী হবে। এ করে কি আর বৌকে বশ করা যায়! ওরে, ওরা হল লাথখোরের জাত, লাথি না খেলে ঢিট থাকে না। লাথির ঢেঁকি চড়ে সোজা হয় না—তা জানিস তো? প্রথম থেকেই বেচাল দেখলেই যদি চুলের ঝুঁটি ধরে ঘা কতক দিতিস তো দেখতিস সে-ই তোর কাছে হাত জোড় করে থাকত, পিছু পিছু ঘুরত।...নেঃ! সুন্দরী, সুন্দরী তো কী হয়েছে। তুইই বা কমতি কিসের? নিজেকে ছোট মনে করিস কেন? হাজার হোক তুই তো তার মরদ, সে তোর বাঁদী। যতই ভাল হোক—বাপের এক পয়সার মুরোদ নেই, ভিখিরীর মেয়ে—তার আবার অত অহঙ্কার কিসের। ওকে বাড়তে দেওয়াটাই তো ভুল হয়েছে।'

ওরা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা মতোই বলে। জীবনের যে স্তরের মানুষ তারা সেই রকমই। এ দুই স্তরে তফাৎ আছে খানিকটা, তা নিমাই জানে। তবু এতেই, এই অবিরাম ধিক্কারেই একটু একটু করে শক্ত হয় নিমাই, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এতদিন পরে তা আর সম্ভব হয় না। মিছিমিছি তিক্ততাই আরও বেড়ে যায়। এতকাল যে সর্বপ্রকার বশ্যতা স্বীকার করে ছিল—এখন সে পা থেকে মাথায় উঠতে চায় দেখে আরও জ্বলে যায় মণিকা। খিটিমিটি লাগে প্রায় প্রত্যহই—দুজনেরই মুখের রাশ আলগা হয়ে আসে। ক্রমে মতান্তরটা মনান্তর—শেষে ইতর কলহে পৌঁছয় গিয়ে।

হেমন্ত ভেবেছিল একটা ছেলেমেয়ে কিছু কোলে এসে গেলে এটা কমে যাবে—এই আশাভঙ্গের ভাবটা। সন্তানই সেতু রচনা করবে মা-বাবার মনে। তারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হয়ত, গোপাল তার কাছেই বেশির ভাগ মানুষ হতে লাগল বলে সে সেতু বন্ধন সম্ভব হল না।

হেমন্ত অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, অনেক উপদেশ অনেক উদাহরণ দিয়ে—কিন্তু মণিকার যেন কিছুই পছন্দ হয় না নিমাইয়ের। চেহারা, চালচলন, কথাবার্তা অভ্যাস স্বভাব কিছুই না। সব বিষয়েই সে নিমাইকে তার অযোগ্য অনেক নিম্ন-স্তরের জীব বলে মনে করে। ক্রমে হেমন্তরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। এতই বা কিসের অহঙ্কার, কত তফাৎ ওর স্বামীর সঙ্গে? এমন কিছু আহামরি সুন্দরী, নূরজাহান নয় মণিকা। লেখাপড়া! একটা পাসও তো করেনি, দুচারটে ক্লাস বেশী পড়েছে এই পর্যন্ত। গানবাজনা শেখা যাকে বলে তাও শেখে নি—শুনে শুনে দুচারটে গান গাওয়া, সে তো গাড়োয়ানরাও গেয়ে থাকে। তেমন কোন নামকরা বংশের মেয়েও নয়। বাপের তো না চাল না চুলো—না পরিচয় দেবার মতো কিছু। বড়লোকের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছিল, সে লোকটার কুমতলব ছিল বলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত, প্রশ্রয় দিত—তাতেই যদি নিজেকে জমিদারের বাড়ি রাজার বাড়ি পড়বার যোগ্য বলে ভেবে থাকে তো সেটা ওর আহাম্মুকি। বোকারা দেওয়ালে মাথা ঠুকতে যায়—তাতে দেওয়ালের কোন ক্ষতি হয় না, নিজেরই কপালে লাগে, কপাল ভাঙ্গে।

প্রকারান্তরে এই কথাগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে জ্বালা যেন আরও বাড়ে, বিতৃষ্ণা বিদ্বেষে পরিণত হয়। বিদ্বেষটা হেমন্তর ওপরও, বরং ওর ওপরই বেশী। মণিকার মনে হয় ওর টাকার জোরে গরিব বাপমার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে, কেড়ে এনেছে। সে বিদ্বেষ তর্কাতর্কি বাদানুবাদের মুখে বেরিয়েই যায়, এখন আর ঢাকবার চেষ্টাও করে না।

কদর্যতা ও ইতরতা—আপাত শান্ত মানুষের মধ্যে থেকেও ঐ দুটো বস্তু টেনে বার করে, বেনোজলের মতোই। হেমন্তের আজকাল এমনিই মেজাজ উগ্র হয়েছে, সে এত স্পর্ধা সইতে পারে না। ভদ্র সংস্কারের মুখোশ খসে পড়ে। সে বলে, 'আর কে জুটত তোর—রাজা মহারাজা লাটবেলাট! বাপের তো ঐ মুরোদ—দুশো টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, তাও চেয়ে চিন্তে, ভিক্ষে করে। ডবকা মেয়ে দেখিয়ে মনিবের বাড়ি এসে বসে তার ঘাড় ভেঙ্গে বিয়ে দিলে—তাও সে মনিবও তো কৈ খরচা করে ভাল পাত্তরে দিতে পারল না। সে নামও তো করে নি, দিন গুনছিল কবে বৌটা মরবে তোকে নিয়ে গিয়ে বসাবে—বুড়ো বাপের বয়িসী ভাতারের সেবা করার জন্যে আর এক পাল সতীনপো-সতীনঝি মানুষ করার জন্যে। কপাল ভাল তাই এমন ঘরবার পড়েছিল। মাতাল নয়, গেঁজেল নয়—রাঁড়খোর নয়, যা রোজগার করে একটা সংসার স্বচ্ছন্দে চলতে পারে—তাতেও বৌয়ের কাছে জোড় হাত করে আছে সর্বদা। আর কি চাস তুই? যা অবস্থা তাতে ঝিউড়ীগুলা কি গাড়োয়ানের হাতে পড়বার কথা!'

একথায় উত্তর দেওয়া যায় না, ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসে মণিকা।

'ওগো বাবা গো, দেখে যাও গো—কী রাজার ঘরে বিয়ে দিয়েছ! কী খোয়ার হচ্ছে তোমার আদরের মেয়ের!' ইত্যাদি—

অন্য সময় হয়ত বলে, 'এর চেয়ে গরিব কেরাণীর হাতে পড়ে বাসন মেজে রান্না করে সংসার চালাতুম সে আমার ঢের ভাল ছিল! মানুষের মতো মানুষ হলে তার জন্যে সব করা যায়!'

অনুচ্চ কণ্ঠে হয়ত বলে, হাতে একটা কাজ করতে করতে। তবু রান্নাঘর কি পাশের ঘর থেকে হেমন্তরও জবাব আসে সঙ্গে সঙ্গে, 'তারা তোকে নেবে কেন? আ মলো যা! মানুষের মতো মানুষ—মানে তো আমাদের সুরো, তা তার সঙ্গেও তো সম্বন্ধ পাড়তে গিয়েছিল—কৈ হল, তাকে রাজী করাতে পারলে!... লাট সায়েবের ঘরে পড়লে তো আরও ভাল হত। তা তো সকলকার হয় না। কী করবি বল। এই যা পেয়েছিস তাই ভাগ্যি বলে মান। গুণ তো যা দেখতেই পাচ্ছি, ওরই মধ্যে একটু চকচকে চামড়া—তা তার জন্যে কি স্বর্গের দেবতারা এসে সেধে নিয়ে যাবে ভেবেছিলি?'

অশান্তি বেড়েই যায়। নিমাই এক একদিন রাগ করে বলে, 'ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও জ্যাঠাইমা—কত ধানে কত চাল হয় বুঝে আসুক!'

কিন্তু কে জানে কেন এই প্রসঙ্গেই কেমন চুপ্‌সে যায় মণিকা।

খবর আসেই সেখান থেকে, কেউ না কেউ খবর দেয়—আর সে খবর নাকি ভাল নয়। ওর বোনকে বিয়ে করেন নি ষোড়শী-বাবু, কোথা থেকে একটি বয়স্কা মেয়ে ধরে এনেছেন, সে নাকি আগে খুব 'নেটিপেটি' ছিল, এখন উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে একেবারে। কারও কাছ থেকে কিছু শুনেছে কিনা কে জানে, অবিনাশ-বাবুদের ওপর প্রচণ্ড কোপ এসে পড়েছে; বলেছে, 'কর্মচারী আছে কর্মচারী আছে—বাড়ীতে এনে তোলা কেন? কাছে না থাকলে বুঝি রাসলীলে করার সুবিধে হয় না? ওদের ভালয় ভালয় বিদেয় করবে তো করো নইলে আমি নিজেই একদিন ঝেঁটিয়ে সাফ করব। বুড়ো বরের ঘর করতে এসেছি—তার আবার ভাগ দিতে পারব না।'

মণিকার বোনই বলে পাঠিয়েছে, 'তুই যেন ভুলেও কোনদিন আসার চেষ্টা করিস নি, তাহলে সত্যিই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে। মনে হয় তোকে জড়িয়েই কেউ কিছু রটিয়ে থাকবে, সে রটনা ওর কানে উঠেছে—'

সেই জন্যেই চোখের জল চোখে মেরে সয়ে থেকে হয় সব। বাপের বাড়ির জোর না

থাকলে শ্বশুরের বাড়িতে মুখে থাকে না দাঁড়াবার—এ কথাটা ওর মা-ই অনেকবার বলেছে, আজ তার মূল্য বুঝল।

নইলে, এক একদিন লোভ হয় খোঁজ যে, গিয়ে দেখে একবার—ষোড়শীবাবুর ভাবখানা কি? না, কোন অসৎ কি অবৈধ কিছু করতে চায় না—বৌ হতে পারলে তবু কথা ছিল, একটা আধবুড়ো লোকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করার মতো বোকা সে নয়। তেমন কন্দর্প কামদেব কি রাজা-মহারাজাও নন ষোড়শীবাবু। সে সব কিছু না, এমনিই, স্রেফ একটু নেড়েচেড়ে দেখা—এখনও আগের প্রভাবের কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, এখনও তাঁর চোখে সে মুগ্ধতা, সে বিহ্বলতা ফোটে কিনা ওকে দেখে! শুধু এই কৌতূহলটাই মেটাতে চায় মণিকা, এতে কি লাভ হবে তা জানে না—সে হিসেব করে দেখে নি, শুধু এইটুকু জানার জন্যেই, ষোড়শীবাবুর চোখে নিজের মূল্য যাচাই করার জন্যেই ছটফট করে সে।

কিন্তু সে আর হবার উপায় নেই। ভগবানই মেরেছেন, এই অন্ধকূপেই পড়ে থাকতে হবে চিরকাল।

হেমন্ত এইবার যেন ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করে নিজেকে।

কেবলই মনে হয় সে ফুরিয়ে গেছে. তার জীবনে আর কিছু করারও নেই, পাবারও নেই।

কে যেন অহরহ বলে মনের মধ্যে, 'ছেলে বৌ নিয়ে ঘর করার সাধ তো মিটল, আর কেন? এখনও কোন্ লোভে সংসারে পড়ে থাকতে চাও!'

সবেতেই বিতৃষ্ণা আসে। আরও ওর বিপদ, যে-ভগবানে মন দিয়ে রিক্ত নিঃস্ব দুঃখী মানুষ সান্ত্বনা বা অবলম্বন পায়—সেখানে ওর কোন আশ্রয় নেই। পুজো করে নিত্য, পুজোর সময় বাড়িয়ে দেয়—কিন্তু আর কেউ না জানুক ও নিজে জানে যে এসবই লোক দেখানো কতকটা।

হ্যাঁ, মন দেওয়ার চেষ্টা করে, মনকে বাইরে থেকে টেনে তাঁর পায়ে সংহত করার জন্যে ভগবানকে ডাকেই প্রত্যহই—তার মধ্যে কোন ফাঁকি কি ভেজাল নেই—তবু সে মন ঈশ্বর থেকে বহু দূরেই সরে থাকে। সেই যে তারক আর কমলাক্ষর মৃত্যুর পর ভগবান সম্বন্ধে বিরূপ হয়েছিল, বিশ্বাস হারিয়েছিল মন—সে বিরূপতা আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না। ফলে শূন্যতা আর হাহাকারও গেল না জীবন থেকে।...

খাঁ খাঁ করে যেন বাড়িটা। গোপাল যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ তাকে নিয়ে একরকম কাটে, দুপুরে যখন ঘুমিয়ে পড়ে কিম্বা সন্ধ্যায়—তখনই যেন বড় অসহ্য বোধ হয়। আজকাল আর রান্নার দিকে যেতে পারেন না—যেতে ইচ্ছেও করে না—কদাচ কোনদিন সুরেনের আসবার কথা থাকলে রান্নাঘরে ঢোকে নয়ত ঠিকে বামনী বা ঠাকুর আর মণিকাই যা পারে করে। দুপুরে বেলাটা ঘুমও হয় না আজকাল, ফাঁকা খালি বাড়িতে প্রেতিনীর মতো নিঃশব্দে এঘর-ওঘর ওপরনিচ করে। কাজ নেই, বিশ্রামও নেই। খবরের কাগজখানা সকালেই উল্টে দেখা হয়ে যায়; লাইব্রেরী থেকে বই আনায় কিন্তু তাতে আজকাল আর মন বসে না, কোন তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ তো পড়তেই পারে না—সে শ্রেণীর বইয়ের মধ্যে মহাভারত ছাড়া কিছুই পছন্দ হয় না ওর। গীতাটা পুজোর সময় নিয়ম করে পড়ে এই পর্যন্ত।

সব চেয়ে অসহ্য এই দুপুরগুলোই। নিজের জীবনের ব্যর্থতা তার দুঃসহ স্মৃতিগুলো নিয়ে যেন তাড়া করে বেড়ায়। তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতেই আরও যেন—অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। অকারণেই কখনও নিচে নামে, কখনও ওপরে ওঠে। মাঝে মাঝে এক একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েও পড়ে, রিকসা করে গঙ্গার ধারে চলে যায়। সন্ধ্যাবেলা আহ্নিক শেষ করেই ওপরে চলে যায়। গোপাল এই সময় থেকেই ঘুমোয়। নিমাই আসে, স্বামীস্ত্রীর ঘর-সংসারের কথা হয়। কলহকোঁদল তো আছেই, দোকান বাজার করতে বেরিয়ে যায় আবার; ওপর থেকে সবই টের পায় হেমন্ত—দাম্পত্য আলাপের স্বরগ্রাম এখান অবধি পৌঁছয় মধ্যে মধ্যে—কিন্তু কোন কিছুই আর তাকে আকৃষ্ট বা বিচলিত করতে পারে না। মানুষের চেয়ে সংসারের চেয়ে টবের এই গাছগুলো ভাল, ঋতুতে ঋতুতে বর্ষে বর্ষে যার যা সাধ্যমতো ফুল ফল দিয়ে যাচ্ছে, এরা কখনও বেইমানী করে না। সুরেন কোথা থেকে একটা কমলালেবুর চারা এনে বসিয়েছিল বড় একটা টবে, নিজেই কোথা থেকে পুঁটিমাছ পচা না কি সব সার এনে দিয়েছিল—এবার তাতেও দুটো তিনটে লেবু হয়েছে। সুপুরির মতো ছোট ছোট তবু হয়েছে।

এখানেই যা একটু সান্ত্বনা, যা একটু শান্তি। কিন্তু এদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যখনই ওপর দিকে কি আশপাশে চায়, তখনই আবার যেন সেই রিক্ততার হাহাকার, মন হু-হু করা ভাবটা ফিরে আসে। বাড়ির পর বাড়ি চারিদিকে—অসংখ্য ছাদ আর পাঁচিল—এসময় লোকজন কম থাকে, থাকলেও অন্ধকারে দেখা যায় না—আর ওপরে কলকাতার ধূম্রমলিন আকাশের বিবর্ণ ধূসর জ্যোৎস্না—কিম্বা অস্পষ্ট নক্ষত্ররাজি এই আকাশ আর পৃথিবী—পৃথিবীর ঘরবাড়ি মানুষ—সবই তার কাছে অরণ্য বলে মনে হয়। মনে হয় সীমাহীন এই বনে সে সম্পূর্ণ একা, এখানে তার কেউ আপন নেই, কিছুই আপন নেই; তার বর্তমান নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই; একা একটা বিশাল শূন্যতার মধ্যে দিয়ে সে চলেছে অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে। কোনদিন কোথাও এর মধ্যে সে আশ্রয় পাবে না, শান্তি পাবে না, শেষও হবে না এই নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনযাত্রা।...

ভাবতে ভাবতে নিজের জন্যেই বেদনায় তার দুই চোখ জ্বালা করে জল আসে, মনে মনে বলে, 'ভগবান সত্যিই যদি তুমি থাকো—আমার জন্যেই বা যেছে বেছে এমন জীবন বরাদ্দ করেছিলে কেন? কেন আমার ওপর তোমার এত বিদ্বেষ। আমি তো তোমার কিছু করি নি, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই কপালে আমার ভাগ্য-লিপি লিখে দিয়েছ। সে সময় কি কোন ভাল কথা মনে পড়ে নি তোমার, বিষ ছাড়া কোন ভাল জিনিস দিতে পারো নি? অকারণ এ আক্রোশ কেন তোমার—একটা মেয়েছেলের ওপর? কেন? কেন?'

(ক্রমশঃ)

সিসিল ডে লুইস

রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

গত ২২শে মে ৬৮ বছর বয়সে সিসিল ডে লুইস-এর মৃত্যু হয়েছে। লুইস ছিলেন তিরিশ দশকের সেই তিনজন সৃষ্টিশীলতায় বলীয়ান ইংরেজ কবির একজন যারা অকস্মাৎ এলিয়টদ্রোহিতায় মুখর হয়ে উঠলেন। অপর দুজন হলেন অডেন আর স্পেণ্ডার। সযত্ন ও সচেতন সাধনায় যদিও এ'রা এলিয়ট-এর কাছ থেকেই শিখেছিলেন ভাষা ব্যবহারের বাহুল্যবর্জিত রীতি, এবং যদিও এ'দের সবচেয়ে প্রয়াসী কবিতাগুচ্ছে এলিয়ট-এর প্রভাব ছিলো তর্কাতীত, তবুও চৈতন্যক্লিষ্ট, সন্ধানী, সংগ্রামশীল এসব কবিরা শেষ পর্যন্ত গভীরতম অর্থে ব্যক্তিগত, যেন এক একটি আভ্যন্তরীণ আত্মজীবনী। এলিয়ট যেখানে অবিরলভাবে অতীত-সঞ্চারী কিংবা ভালেরির অর্থে মননশীল ও নৈর্ব্যক্তিকতায় ভাস্বর, লুইস সেখানে, তিরিশের তামসতম দশকেও, মানবজন্মের উদ্ভ্রান্তি ও আনন্দে স্পন্দিত এবং স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের বিপুল ভূকম্পন পেরিয়ে এসেও, ধৈর্যপরায়ণ ও অনাগতের জন্য আশান্বিত।

এলিয়ট-এর সঙ্গে লুইস, অডেন, স্পেণ্ডার-এর পার্থক্য মৌল বিশ্ব উপলব্ধির। ইহুদি পুরাণ, গ্রীক পুরাণ, খৃষ্টীয় নববিধান, ভেনিসের দৃশ্য বা বিষণ্ণ সন্ধে—যা কিছুই এলিয়ট-এর কাছে নিরঞ্জন ধ্যানের বিষয়, সেসব তিরিশের নতুন কবিদের কাছে হয়ে উঠলো অনুভূতির বস্তু। অর্থাৎ তিরিশের নতুন কবিতার ন্যায়ের জটিলতার বদলে দেখা দিলো মানবিক সহানুভূতি, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতি সমবেদনা, এলিয়টী বক্রোক্তিতে যার একান্ত অভাব।

১৯৪০-এর কাছাকাছি লুইস নিজেকে কম্যুনিস্ট বলে ঘোষণা করলেন। রাজতন্ত্রের প্রতি এলিয়টী শ্রদ্ধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে হলেন সোচ্চার। যে-টাইপিস্ট মেয়ে এলিয়ট-এর কাব্যে করুণার পাত্রী, লুইস ও অডেন-এর কাছে সে পেলো সমবেদনা। এছাড়া ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী এলিয়টকে যে কারণে, লুইস-এর কাছে অন্তত, সেকেলে এবং শোচনীয়ভাবে সংকীর্ণ মনে হলো তা হচ্ছে মার্ক্সবাদ ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের নতুন অভিঘাত। লুইস অবশ্য কোনো গভীর অর্থে কম্যুনিজম-এ বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর সাম্যবাদী মতবাদকে বলা যেতে পারে বামপন্থী রোম্যান্টিক র‍্যাডিক্যালিজম। তাই হোক, এই নতুন সমাজসচেতনতার ফলে লুইস-এর কবিতায় এলিয়টী নিস্পৃহতার বদলে এলো বেদনাস্পৃহতা, নিখিল নাস্তির বদলে জীবনের উদ্ভ্রান্তি ও আনন্দ। তাছাড়া বিশুদ্ধ মননের এলিয়টী শিখর থেকে লুইস নেমে এলেন সহজিয়া সুরের সাধনায়, যেন অনেকটা লোরকার মতো এবং যেন এলুয়ার আর আরাগঁ-র মতো কম্পিত হলেন আশ্চর্য সংসারের প্রতিধ্বনিতে এবং প্রায় এলিয়ট-এর বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে লিখলেন রোম্যান্টিক প্রেমের কবিতা।

লুইস-এর প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিলো ১৯২৫-এ। কোনরকম সাড়া জাগেনি। ১৯২৮-এ বেরুলো 'কানট্রি কমেটস্'। এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের ভাষাকে সযত্ন পরিশ্রমে আটপৌরে বুলির কাছাকাছি আনা হয়েছে। এছাড়া এখানেই প্রথম দেখা দিলো কবির ঐতিহ্য ও শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অনুভূতির সংঘাতপ্রসূত আধুনিক মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির সুচারু মিশ্রণ—যা আধুনিক প্রকরণের একটি লক্ষণ—অন্যধারে তীব্র অথচ পরিশীলিত আবেগ কাব্যগ্রন্থটিকে দিয়েছে এক প্রবল মৌল আবেদন।

১৯২৯-এ প্রকাশিত হলো সাড়া-জাগানো 'ট্রানজিশনাল পোয়েমস'। সমগ্র গ্রন্থে একটি মাত্র কবিতা যার বিষয়বস্তু সামাজিক ও নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্বাসের অনিবার্য দ্বন্দ্ব। আবার, একদিকে জীবনের ক্ষণিকতা সম্বন্ধে সচেতনতা, অন্যদিকে পৃথিবী সম্বন্ধে আস্থা—এ-দুই বিরোধী স্রোতের দেখা মেলে এই দীর্ঘ কবিতায়। আর মাঝে মাঝে, প্রায় সমগ্র কবিতাটি জুড়ে প্রবন্ধধর্মী বিস্তীর্ণ দার্শনিক আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে, ঝিলিক মারে আন্তরিক পংক্তি।

প্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর আছে কবিতাটির আঙ্গিকের নতুনত্বে ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিশুদ্ধ গ্রন্থনে।

দু-বছর পরে বেরুলো 'ফ্রম ফেদারস টু আয়রন' যার বিষয়বস্তু—নারী-পুরুষের যৌন অভিজ্ঞতা যার মধ্য দিয়ে এক পালকনিভ ভালোবাসা পরিণত হচ্ছে দায়িত্বশীল লৌহ-কঠিন সামাজিক বন্ধনে। এই বন্ধনের মধ্যে পদে পদে ঘটে ক্লিন্ন আত্মসমর্পণ, কিন্তু তাকেই সমস্ত মহৎ ও রোম্যান্টিক স্বপ্নসঞ্চার সত্ত্বেও, মেনে নিতে হয় শেষপর্যন্ত।

'দ্য ম্যাগনেটিক মাউন্টেন' বেরুলো ১৯৩৩ সালে। এবারেও সমগ্র গ্রন্থটিতে বিভিন্ন খণ্ডে একটি মাত্র কবিতাকে উপস্থিত করা হলো যার বিষয়বস্তু দ্বন্দ্ব ও সামাজিক অবিচার। কবিতাটি এক দীর্ঘায়িত যাত্রার বর্ণনা যা ক্রমেই হয়ে ওঠে সামাজিক বিবর্তনের সার্থক প্রতীক। কবিতাটিতে অডেন-এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া সমগ্র কবিতাটির পরিকল্পনা কতকটা সিনেম্যাটিক। বিশেষ করে আইজেনস্টাইন ও পুদোভকিন-এর প্রভাব আছে। ১৯৩৫-এ প্রকাশিত 'এ টাইম টু ডান্স' কয়েকটি ছোটো কবিতার গুচ্ছ। এই কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'এ টাইম টু ডান্স' কবিতাটি। কবিতাটি দুজন নিঃসঙ্গ মানুষের এক দীর্ঘ যাত্রার বর্ণনা যা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত কৌতুকাবহ। কিন্তু এই হাল্কা হাস্যরসের তলায় আছে এক কুটিল আবর্ত যা ক্রমেই আমাদের কাছে উন্মোচিত হতে থাকে। ক্রমশ কবিতাটি হয়ে ওঠে সংবৃত ও বিশ্লেষণধর্মী, একান্ত ব্যক্তিগত ও বিশিষ্ট। আবিষ্কার করি, কখনো ইঙ্গিতে বা কখনো অনুল্লিখিতভাবে, কবিহৃদয়ের সব সংশয় ও বেদনা, মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অক্ষমতা ও যুদ্ধকালীন তিমির যেন গ্রথিত হয়ে আছে কবিতাটির পরতে পরতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে প্রকাশিত 'ওভারচারস টু ডেথ' (১৯৩৮) এক তিমিরাশ্রয়ী কবিতা যার পাতায় পাতায় ছায়া ফেলে অন্ধকারে উড়ে আসা ঝাঁক-ঝাঁক বোমারু বিমান।

১৯৪০-এ প্রকাশিত 'পোয়েমস ইন ওয়ারটাইম'-এ আরো একবার শোনা গেলো ইউরোপব্যাপী ধ্বংসের মাঝে কবিকণ্ঠের আর্ত হাহাকার।

১৯৪৮-এ প্রকাশিত 'পোয়েমস'-এ যেন সংশয়ের সব বিস্তীর্ণ ভূমি পেরিয়ে এসে কবি খুঁজে পেয়েছেন তার হারানো বিশ্বাস। ব্যক্তিগত জীবনের তুমুল বিশৃঙ্খলারও যেন এখানেই সমাপ্তি। যেন কবি শেষপর্যন্ত খুঁজে পেয়েছেন অস্তিত্বের সেই বৃহত্তর পরিধি যার মধ্যে সমস্ত ক্ষণিক, অসংলগ্ন ও পরিবর্তমান অভিজ্ঞতা একই পূর্ণের বিভিন্ন খণ্ডরূপে প্রতিভাত। ১৯৫৩-তে প্রকাশিত 'আন ইণ্ডিয়ান ভিজিট' কবিতায় কবি বিশ্বাসের সেই দৃঢ় ভূমিতে উত্তীর্ণ যেখান থেকে চ্যুত হননি কখনো।

১৯৬৮ সালে মেজফিল্ডের মৃত্যুর পর, লুইস হয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের পোয়েট লরিয়েট। পরবর্তী পোয়েট লরিয়েট কি অডেন?

সোনার বাঙলা

শিপ্রা আদিত্য

গরুড়

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা

রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা সারা বাংলাদেশের গৌরবের বস্তু। বাংলাদেশে শিক্ষার ইতিহাসে এ এক স্মরণীয় ইতিহাস। তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কর্মপরায়ণ লোকের অক্লান্ত প্রচেষ্টারই কর্মফল 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা'।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর বাঙলার সংবাদপত্রে সে এক চাঞ্চল্যকর খবর ছিল—'বাঙলার বড়লাট লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালার নতুন বাড়ী উদ্বোধন'। প্রথমে রাজশাহীর সাধারণ পাঠাগারে সমিতির যাবতীয় কাজকর্ম চলতো। ক্রমেই সংগৃহীত বস্তু-সংখ্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছুলো যে সমিতির জন্য আলাদা বাড়ী দরকার হয়ে পড়লো। সমিতির পৃষ্ঠপোষক দিঘাপাতিয়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় মহাশয় সমিতিকে কিছু জমি দান করেন। প্রাচীন গৌড়ের স্থাপত্যের অনুকরণে বহু খরচে সমিতির চিত্রশালাটি নির্মিত হয়। বাড়ীটি দেখতে বেশ জমকালো। দুপাশে খানিকটা করে খোলা জায়গা। ফটকের পাশেই সামনের দিকে বড় দালান। আয়তনে প্রায় ১৮ ফুট এর দুদিকে দুটি বড় বসবার ঘর, প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৯১০ ফুট। পাশে বারান্দা—২২ ফুট লম্বা। তার পাশে গ্রন্থাগার, পড়ার ঘর, পরামর্শের ঘর অতিথি অভ্যাগতদের থাকবার ঘর। আরেক দিকে রান্নার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর, চাকর-বাকরদের ঘর, অন্যান্য কর্মচারীদের ঘর, কল-বাথরুম বাগান-বাগিচা নিয়ে মোট খরচ পড়েছিল সে কালেই ৬৩০০০ টাকা। পুরো খরচ জুগিয়েছিলেন দিঘাপতিয়ার রাজপুত্র (প্রমদানাথ রায়ের ছেলে) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এবং বসন্তকুমার রায়। এই শরৎকুমার রায়ই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি ছিলেন।

এবার আলোচনা করা যাক সমিতির সংগৃহীত মূর্তিগুলির কথা। প্রাচীন কলা বিদ্যার অনুকরণে যেসব স্মৃতিচিহ্ন সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে প্রস্তর ভাস্কর্য তাম্রমূর্তি, শিলাখণ্ড, স্থপতি কলার নানা নিদর্শন, তাম্রশাসন, তাম্রফলক, তাম্রলিপি, নানাবিধ প্রাচীন মুদ্রা, গ্রন্থাগারে প্রাচীন ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ও শিল্পশাস্ত্রের ওপর মোট ৮৫২খানি বই আছে। এছাড়া ১৩৪৮টি সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও এই সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত। এগুলি সমিতির রত্নবিশেষ।

ইতিহাস স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্যকলা ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে যারা আগ্রহী তাদের কাছে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালা অবশ্যই দর্শনীয়। দেখার চোখ নিয়ে দেখলেও অনেক জ্ঞানার্জন করা যায়। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—সেন ও পাল বংশীয়দের রাজত্বকালে ভারতীয় শিল্পকলা এবং ভাস্কর্য দিকে দিকে কিরূপ উন্নতি করেছিল। এই ভাস্কর্যগুলির সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুশীলনের জন্য ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কয়েকটি গান্ধার ভাস্কর্য সমিতিকে দান করে। গুপ্তযুগের বুদ্ধ ও দ্বারপালের যে দুটি মূর্তি গৌড়ে পাওয়া গেছে সেগুলি উত্তমোন শিল্প-যুগের সৃষ্টি বলেই ধারণা করা যায়। এছাড়া বোধিসত্ত্ব, তারা, মরীচি, হারীতি প্রভৃতি মূর্তিগুলি মহাযান দেবসমাজের সুন্দর প্রতিকৃতি। এই মূর্তিগুলির সঙ্গে নেপালী কলাশিল্পের বিশেষ মিল দেখা যায়। অর্থাৎ গৌড়, মগধ ভাস্কর্যের সঙ্গে নেপালী ভাস্কর্যের সাদৃশ্যই স্পষ্ট হয়। সংগৃহীত নিদর্শনগুলি থেকে বোঝা যায় বঙ্গীয়-গৌড় শিল্পরীতিই একসময়ে নেপালে অধিষ্ঠিত হয়। কলিঙ্গ ও জাভার শিল্পকলা কীরূপ উন্নতি করেছিল তা প্রমাণ করতে অক্ষয়কুমার মৈত্র ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ যেরূপ পরিশ্রম করেছেন, নেপালী কলার সঙ্গে গৌড়ীয় কলার সাদৃশ্য বা প্রথাগত মিলের সম্পর্ক দেখাতে কোন প্রচেষ্টাই ব্যয়িত হয়নি। শিল্পকলার প্রাদেশিক সম্পর্কের কথা বাদ দিলেও প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখলে এটির অনুধাবন ও অনুসন্ধান যথেষ্টই সহায়তা করে বিশেষ করে প্রতিমা-নির্মাণ বিদ্যায়। সূর্য ও

নৃত্যরত গণেশ

বিষ্ণুর যেসব মূর্তি সংগৃহীত, তা দেখলেই বোঝা যায় সেকালে প্রতিমা-নির্মাণ বিদ্যা কীরূপ উন্নতি করেছিল। তুলনামূলকভাবে দেখা যায় প্রাচীন বাঙলায় এই কলাবস্তুটি উড়িষ্যা, জাভা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে। উড়িষ্যার ভাস্কর্যগুলি থেকে সেরূপ কোন আভাষ পাওয়া যায় না। তবুও উভয়ের মধ্যে যথেষ্টই মিল দেখা যায়। উড়িষ্যার কলার গতিবিধি ভারতীয় ভাস্কর্যের মূল ধারারই অনুরূপ। এটির মধ্যে মধ্যভারতের মথুরার কলা পদ্ধতির মিশ্রফল। এদিকে গৌড়ীয় কলাবিদ্যা মগধীয় কলাবিদ্যার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এটির মধ্যে যে অনেক অভিনব এবং দেশজ উন্নতির লক্ষণ আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। সমিতির সংগৃহীত এমনকিছু মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলি বাঙলার বাইরে এখনো কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। সমিতির সমুদয় মূর্তিগুলির শ্রেণীবিভাগ করে সমিতি মূর্তির এক তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, সেটির পুনরাবৃত্তি।

মূর্তিগুলির শ্রেণীবিভাগ :

১। বৌদ্ধমূর্তি
(ক) বুদ্ধ, (খ) বোধিসত্ত্ব (গ) তারা, (ঘ) মরীচি, (ঙ) হারিতি (চ) বুদ্ধের নীতি, (ছ) জোগীশ্বরী।

২। জৈনমূর্তি

৩। শৈবমূর্তি
(ক) শিবলিঙ্গ, (খ) সদাশিব, (গ) অর্ধনারীশ্বর, (ঘ) উমামহেশ্বর, (ঙ) নটেশ্বর, (চ) শিবভৈরব, (ছ) কার্তিকেয়।

৪। শাক্তমূর্তি
(ক) চণ্ডী, (খ) মহিষমর্দিনী, (গ) দুর্গা, (ঘ) চামুণ্ডা, (ঙ) মাতৃকা,

৫। বৈষ্ণব মূর্তি
(ক) বিষ্ণু, (খ) অবতার।
(গ) গড়ুর, (চ) বলরাম।

৬। সৌরমূর্তি
(ক) সূর্যদেব, (খ) নবগ্রহ, (গ) রেবন্ত।

৭। গাণপত্য মূর্তি
(ক) উপবিষ্ট গণেশ, (খ) নৃত্যপর গণেশ

৮। বিবিধ মূর্তি
ব্রহ্মা, যম, গঙ্গা, মনসা, সরস্বতী ইত্যাদি।

মকরমুখ

যেসব স্মৃতিচিহ্ন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ও মুসলমান বাস্তু-বিদ্যার দৃষ্টান্তরূপে পাওয়া গেছে সেগুলি থেকে সহজেই জানা যায় যে, মন্দির, মসজিদ ঘরবাড়ী বাস্তবিকই মনোহর ছিল। এদিক থেকে বিচার করলে মহীসন্তোষের ভগ্নাবশেষগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। পঞ্চদশ শতাব্দীর তৈরী হিন্দু ও বৌদ্ধ উপকরণে মহীসন্তোষে এক বড় মসজিদ তৈরী হয়েছিল। সেটির ভগ্নাংশ এবং কিছু হিন্দু দেব-দেবীর খোদাই মূর্তি এই সমিতির সংগ্রহশালার অন্তর্ভুক্ত। সংগৃহীত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় প্রাচীন বাঙলার রাজা ও রাজত্বের কথা।

বাঙলার কীর্তি-কলাপের এই সব অভিনব নিদর্শন প্রাচীন বাঙলার অতীত ইতিহাসের অনেক গুপ্ত দিকই আলোকিত করে। রাজা এবং রাজত্বের রদ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে, অনেক রাজনৈতিক বিপত্তির মধ্য দিয়ে। বাঙলার জীবনযাত্রা অতিবাহিত হলেও—তার শিল্পচেতনা বা কর্মপটুতা যে যথেষ্ট ছিল তার প্রমাণ সেদিনের সাহিত্য এবং শিল্পকলায় রয়েছে।

এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতারা সমিতিটি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তেমনি সাধারণের জ্ঞান-বৃদ্ধির একটি জীবন্ত অধ্যয়নকেন্দ্র করে রেখেছিলেন। এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ১। গৌড়ের রাজমালা (গৌড় রাজাদের ইতিহাস), ২। গৌড় লেখমালা (গৌড়ের শিলালিপি কাহিনী), ৩। গৌড় শিল্পমালা (গৌড়ের শিল্পকাহিনী), নামে তিনটি মূল্যবান তথ্য সম্বলিত বই প্রকাশ করেছিলেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ১৯১৭ সালে প্রচুর অর্থব্যয়ে মৃত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য সবিতা স্মৃতি পুস্তকমালা প্রকাশ করতে থাকেন। এই পর্যায়ে প্রথম প্রকাশিত 'ভাষাবৃত্তি' বইখানি লক্ষণ সেনের আদেশে লিখিত পানিনির টীকা পুস্তক। আরো দুটি গ্রন্থ হোল 'ধাতু-প্রদীপ' ও 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ'। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের লিখিত সমিতি দ্বারা প্রকাশিত—'হিন্দু-আর্য-জাতি' বইটি এক মূল্যবান সংযোজন। এই বইটিতে লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয় ভারতীয় আদিম জাতির স্তর—বিভাগ ও শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সে কারণেই ভারত তথা বাঙালীর কাছে এ এক মূল্যবান গ্রন্থ।

সমিতির নতুন বাড়ীর উদ্বোধনের দিন লর্ড কারমাইকেল তাঁর ভাষণে বলেছিলেন 'যে দুটি কারণে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কাজ অমূল্য। প্রথমত নানা প্রয়োজনীয় গুপ্ত তথ্য প্রকাশিত করার জন্য, দ্বিতীয়ত অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন ও দেশের অন্যান্য অংশের শিক্ষিত লোকের কৌতূহল ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য। সমিতির আবিষ্কার সকল বাঙলার ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করবে তা সাধারণে সহজেই বুঝতে পারেন। এইরূপ অনুসন্ধানের কাজ শিক্ষাকে জীবন্ত করিয়া তুলে এবং শিক্ষিত লোকের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া দেয়।'

আমরা আজ যারা এই সমিতির প্রচারিত প্রকাশিত এবং সংগৃহীত বস্তুমালার সঙ্গে অপরিচিত তারা বুঝতে পারবেন না কি অপরিসীম এর মূল্য! আমাদের পূর্বসূরীদের মহান শিল্পনিদর্শনগুলি আজ 'মিউজিয়াম পিস' হিসাবেই আমাদের কাছে মূল্যবান নয়, এগুলি আমাদের জ্ঞান ও শিল্পকে জগতের কাছে মেলে ধরেছে। শিক্ষা এবং তার উন্নতি ছাড়াও সৌন্দর্যপ্রিয় নাগরিকের কাছেও এটির আদর কম নয়। প্রাচীন গৌড় ও তার প্রাচীন ইতিহাস অতীত হলেও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কল্যাণে এর বিচিত্র পাষাণ-চিত্রাবলীর সৌন্দর্যই আজ জীবন্ত ইতিহাস।
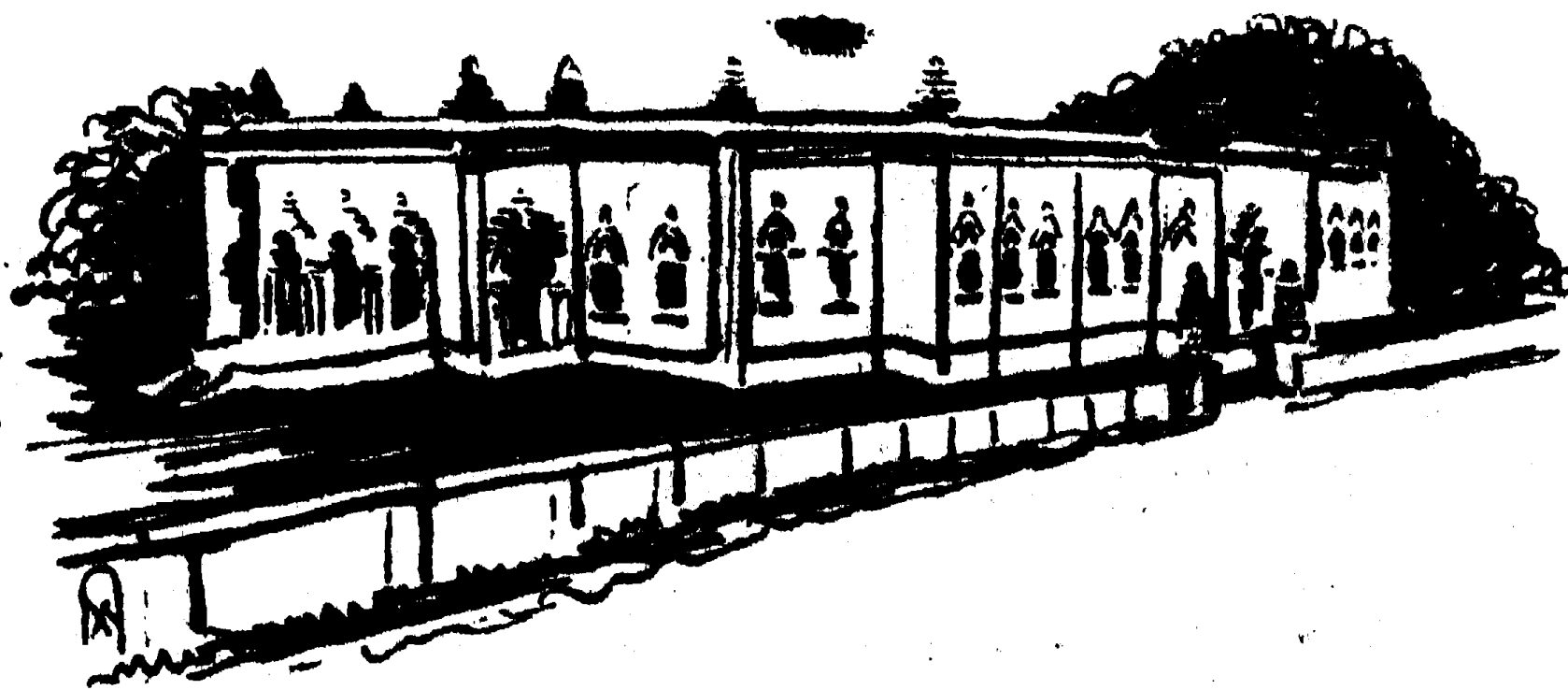
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির বাড়ী

সবারে আমি নমি

কানন দেবী

(সাত)

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" হোল আমার নিউ থিয়েটার্সের দিনগুলি। কিন্তু অত সাধের নিউ থিয়েটার্সও একদিন ছাড়তে হোল। আর এ সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই যে, আমায় ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। ছেড়েছি স্বেচ্ছায় এবং আমার স্থিরচিত্তের অবধারিত সংকল্পে।

তখন অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জেগেছিল, আমি নিউ থিয়েটার্স কেন ছাড়লাম? যে এন টি আমায় যশগৌরবের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, তার কাছ থেকে সরে আসাটা সকলের কাছেই একটা প্রচণ্ড কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার বস্তু হয়ে উঠেছিল। আর সকলের চেয়ে বড় বিস্ময় ছিল আমার নিজেরই কাছে। আজও আমার আশ্চর্য লাগে ভাবতে কি করে পেরেছিলাম অমন সাফল্যের তীর্থক্ষেত্র থেকে অত সহজে আপনাকে গুটিয়ে নিতে?

এ ঘটনার বহুদিন বাদে শ্রদ্ধেয় তুষারবাবুর সঙ্গে ঘটনাচক্রে একই ট্রেনে ভ্রমণকালে উনিও আমায় প্রশ্ন করেছিলেন কেন ছাড়লাম নিউ থিয়েটার্স?

কোন ঘটনার তিক্ততা অথবা পরিস্থিতির বাধ্যতার কারণে নয়। এর মূলে আমার প্রতি অবিবেচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনের তীব্র প্রতিবাদ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তারচেয়েও বড় ছিল তীব্র আত্মসম্মানবোধ, স্পর্শকাতর চিত্তের অভিমানী বেদনা। মনের দুর্জয় শক্তির বলেই ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে পেরেছিলাম।

কবির রোডে বাড়ী তোলার কথা আগেই বলেছি। এই বাড়ীর জমি কেনবার সময় নিউ থিয়েটার্সের কাছে পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছিলাম। তাছাড়া বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার কারণেই আমার এতদিনের অর্জিত অর্থের প্রায় সমস্তটাই খরচ হয়ে গিয়েছিল, এই বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে। নিউ থিয়েটার্সের টাকা শোধ হয়ে গেলেও বাড়ী তোলার সময় নানা কারণে অপব্যয় এবং অপচয়ও যথেষ্ট হয়েছিল। এছাড়াও নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে আমার চুক্তিও শেষ হয়ে যায়।

কনট্রাক্ট রিনিউ করবার সময় আমি তাই কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব করলাম আমার মাস মাইনে হাজার থেকে ১৪০০৲ টাকা অন্ততঃ— করা হোক যাতে এই অর্থসংকট থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পেতে পারি।

আমার এ প্রার্থনা অন্যায্য অথবা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ বলে সেদিনও যেমন মনে করিনি আজও করি না। বরং আজকের বক্তব্যে আমি আরো নিঃসংশয়। তখন এত সিনেমা পত্রিকা অথবা খবরের কাগজের নিয়মিত সিনেমা বিভাগের মাধ্যমে দর্শকের অভিমতের সঙ্গে শিল্পীদের এমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন পাবলিক ফাংশনে চিত্রজগতের নায়কনায়িকাদের প্রধান অথবা বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত করে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে অবহিত করবার অবকাশও ছিলো না। কোনো সভায় শিল্পী সম্বর্ধনারও এমন ঘনঘটা ছিল না। এখনকার দিনের মত এতসব উর্বশী পুরস্কার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার কিংবা বিদেশের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি পাঠাবার প্রথাও চালু হয় নি।

তবু বাইরের জগতের বিপুল জনপ্রিয়তার খবরের ছিটেফোঁটাও কি কানে এসে পৌঁছত না? রেকর্ড কোম্পানীর রয়ালটি, ভক্তদের অজস্র চিঠি আর স্টুডিওর হঠাৎ-কানে-আসা গালগল্প থেকেই জেনেছিলাম জনপ্রিয়তায় আমি কারো নীচে ছিলাম না। বরং যাকে বলে "টপমোস্ট", সেই পোজিশনেই ছিলাম। (আমার একান্ত অনুরোধ সহৃদয় পাঠক আমার এ উক্তিকে যেন অহংকার ভেবে ভুল না বোঝেন। প্রকৃত সত্য প্রকাশের খাতিরেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করছি)।

তারপর যা বলছিলাম। ওঁরা ১২০০৲ টাকা অবধি উঠলেন। তবু মাত্র ২০০৲ টাকা বাড়িয়ে কোম্পানীর এতদিনের শিল্পীর আবেদনের মর্যাদা রাখলেন না. সেই নিউ থিয়েটার্স যে নিউ থিয়েটার্সকে

আমি একান্ত আপনার করে রেখেছি, আর আমার শিল্পীসত্তার সমস্ত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা দিয়ে এ'দের প্রয়োজনকে শ্রেষ্ঠ করে তোলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

তবু হয়ত এ'দের সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতাম যদি না দেখতাম আমারই সমান অথবা আমার চেয়েও কম জনপ্রিয় শিল্পীকে সেই মাইনেই দেওয়া হচ্ছে যা আমাকে দিতে এ'রা কুণ্ঠিত।

তখন বিপরীত ব্যবস্থা হিসাবে নিউ থিয়েটার্স ছাড়া অবসর সময়ে অন্য একটি কোম্পানীর ব্যানারে একখানা মাত্র ছবিতে কাজ করবার অনুমতি চাইলাম। তাতে আমিও ৭ হাজার টাকা পেতাম। কোম্পানীরও মাইনে বাড়াবার দরকার হোতো না, আমার অর্থাভাবেরও খানিকটা সুরাহা হোতো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতেও আপত্তি জানালেন।

যখন দেখলাম যে দুটি সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করা হচ্ছে তার প্রত্যেকটিই অন্যান্য শিল্পীরা পাচ্ছেন—নিজেকে অত্যন্ত হীন ও অপমানিত মনে হোল। মনে হোল আত্মমর্যাদাই যদি না থাকল তবে এ শিল্পীখ্যাতির মূল্য কতটুকু? আর এতবড় অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার করে নিজের মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দেবার সময় কি আর আছে? জীবনের প্রারম্ভে, নিঃসম্বল অবস্থায় যে বিরুদ্ধতা, যে অন্যায় সহ্য করেছি তারও পর আমার নিজের কোনো হাত ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর যখন আজ দাঁড়াবার মাটি দিয়েছেন—তখন হয়ত বা তাঁর প্রতি বিশ্বাস অথবা আমার ন্যায়নিষ্ঠতা পরীক্ষা করবার জন্যই আমায় এতবড় সমস্যার সম্মুখীন করলেন। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভেতর আশ্চর্য জোর পেলাম আর দুম্ করে রেজিগ্‌নেশন দিয়ে বসলাম এন, টির চাকরীতে। হাতী মার্কা ব্যানারের অমন নিশ্চিত আশ্রয়কে ত্যাগ করতে মনে এতটুকুও দ্বিধা জাগল না। মনের এই দৃঢ়তাই আমার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আর এই দৃঢ়চিত্ততা আজ অবধি কখনও আমায় ঠকায় নি।

কণ্ঠহার-এ জহর গাঙ্গুলীর সঙ্গে

পরিচয় চিত্রে সায়গল এবং কানন দেবী

এই প্রসঙ্গে বলি আমার প্রতি কোম্পানীর এই অবিচারের জন্য আমি কিন্তু ভুলেও কোনোদিন মিঃ বি এন সরকারকে দায়ী করিনি, কারণ এসব ব্যাপারে তাঁর কতটা সায় ছিল অথবা আদৌ সায় ছিল কিনা, কিংবা এসব কথা তাঁকে জানানো হোত কিনা সে বিষয়ে আজও আমি নিঃসন্দেহ নই। তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। আমাদের অভাব অভিযোগের কাহিনী তাঁকে ভায়া-মিডিয়া জানানো হোত। তাই এ বিষয়ে আমি সোজাসুজিভাবে তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হয় নি। মিঃ সরকারের সহকারীরা জানিয়েছিলেন তাঁরা যা জানিয়েছেন—তাছাড়া নূতন কিছু জানবার বা জানাবার নেই। এ বিষয়ে তাঁদের কথাই চূড়ান্ত এবং তাঁদের মতামতই আমি মিঃ সরকারের মতামতরূপে মানতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'—অথবা 'রাজার' মতই মিঃ সরকারের উপস্থিতি এবং অভিমত আমাদের দেখা ও জানার অগোচরেই থাকত।

এত কথার অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই কারণে যে এত অন্যায় ও অবিচারের আঘাত পেয়েও মিঃ সরকারের ওপর শ্রদ্ধা

সাথী চিত্রে শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে

কোনোদিন এতটুকুও শিথিল হয় নি, বরং তাঁর এই নির্বিকার নীরবতাকে একটা অমার্জনীয় ঔদাসীন্য ভেবেই আহত হয়েছি। এন, টিতে কি আমি কয়দিন কাজ করলাম? এই প্রতিষ্ঠানের বিস্ময়কর প্রগতি, সুনাম ও প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য কৃতী শিল্পী, পরিচালক অথবা কর্মীদের সঙ্গে আমারও কি কোনোই অবদান ছিল না? আমার শত অবহেলার কথা যে কোন কারণেই হোক, তিনি হয়ত সঠিকভাবে অবগত নন: কিন্তু আমি যে এন, টি, ছেড়ে দিচ্ছি খবরটুকু ত জানতেন নিশ্চয়? একথা জেনেও কি আমায় তাঁর কিছু বলার অথবা আমার কাছে কিছু জানার ছিল না? তিনি হোন, মহৎ, কিন্তু আমি তাঁর এতটুকু মনোযোগ পাবারও অযোগ্য? তিনি আমায় এতখানি তুচ্ছজ্ঞান করেন? মনে ঘনিয়ে উঠত অভিমানের মেঘ, চোখে জল আসত। কিন্তু এ-সবকেও ছাপিয়ে গর্জে উঠেছিল প্রতিবাদী মন, আত্মাবমাননাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয় — হৃদয়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে এ অবিচারের প্রতিবাদ করতে হবে, তারপর দেখা যাবে ভাগ্যে কি আছে।

নিউ থিয়েটার্সের ছোটবড় সবার সম্পর্কেই মনের মধ্যে নিজের অজানাতেই একটা আত্মীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল। আমি সবার সঙ্গেই একটা সৌহার্দ্যসম্পর্ক রাখতেই চেয়েছিলাম। সবাই যে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতেন তা নয়, তবু একান্নবর্তী পরিবারের মতই সকল অসামঞ্জস্য ও তিক্ততা ছাপিয়েও কেমন একটা অনির্দেশ্য স্নেহের রাখীসূত্রে যেন সকলের সঙ্গে মনটা বাঁধা থাকত অনেকটা অর্কেষ্ট্রার কনকর্ড, ডিসকর্ডের হার্মোনাই-জেশনের মতই। আজ সবার কাছেই আমার ঋণ স্বীকারের পুণ্যলগ্ন। তবু থেকে থেকে মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় যখন ভাবি এতবড় শিল্পে বরণীয়, পূজনীয় পথিকৃৎ যাঁরা, তাঁরা কেন ষ্টুডিওফ্লোরকে গ্লানির পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে সাধনার পীঠক্ষেত্র করে তোলায় ব্রতী হলেন না? কেন, নিষ্পাপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে নির্লজ্জ বাসনার শ্রীহীন উদ্দামতাকে বড় হয়ে উঠতে দিতেন? বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্য আর একটু কাহিনীতে আসা দরকার। গুরুর মত শ্রদ্ধা করতে চেয়েছি, এমন কেউ নির্জনে পেয়ে নিস্পৃহ দার্শনিকের ভঙ্গীতে নারী-দেহের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে চাইবেন একথা কি কোনোদিন কল্পনায় আনতে পেরেছি? এখানে প্রতিবাদ অথবা প্রত্যাখ্যান করা মানেই দুর্বাসার কোপে পড়া এবং অমোঘ নিয়তির মতই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হোল ভাল রোল থেকে চিরদিনের জন্য বাদ।

এখানেই দেখেছি কত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের অসংদের কামনার বিকৃত রূপ। সেটা কেমন? ধরুন কাজের ফাঁকে ভাবছি একটু জিরিয়ে নিয়ে পরের পর্বের জন্য প্রস্তুত হব। হঠাৎ ডাক পড়ল পরিচালকের ঘরে। (শুধু পরিচালকই নয় রীতিমত নামকরা পরিচালক) 'কথা আছে, বোসো' বলে গম্ভীরভাবে বসতে বললেন। তারপরই সকল গাম্ভীর্য পরিণত হোল লোলুপ কৌতূহলে স্বামীর সঙ্গে গত রাত্রিযাপনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানতে চাওয়া। ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমায় বিব্রত, বিরক্ত ও তিক্ত করে সাহচর্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে হয়ত বা এক সময় থামত তার সীমাহীন জিজ্ঞাসা। কিন্তু মুখে চোখে ফোটে পড়া সেই অভিব্যক্তি সহজে মিলতো না চোখের সামনে চর্ব্যচোষ্য ভোজনরত কাউকে দেখলে ক্ষুধার্তের চোখেমুখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে। ঘৃণ্য পিচ্ছিল এই প্রবৃত্তি যেন তার নির্লজ্জ স্বরূপ নিয়ে সামনে এসে

সাথী চিত্রে শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে

দাঁড়াত। সে ভয়াবহ মুহূর্তের অসহ্যতা আজ দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয়।

আবার পরবর্তী যুগেই দেখেছি শ্রীহীন অবাঙালী ... সংকীর্ণ-মনা জটিলা-কুটিলা হয়ে উঠতে। একটু রুচিসম্মত সাজে (শিল্পীর পক্ষে সেইটেই কি স্বাভাবিক নয়?) স্টুডিওতে গেলেই চোখরাঙানীর শাসন 'এরকম ... পরে আস কেন? শাড়ী ব্লাউজ আর একটু সিম্পল পরতে পার না? এত সেজে আসা স্টুডিও মালিক পছন্দ করেন না।" বলা বাহুল্য স্টুডিও মালিকের জবানীতে এটা বক্তারই মনের কথা।

আবার এ'দেরই কাউকে (তিনি হয়ত কোম্পানীর ব্যবস্থাপকদেরই অন্যতম কর্ণধার) দেখেছি তাঁরই বিশেষভাবে পছন্দ-করা কোন হিরোইনের ওপর কাণ্ডজ্ঞানহীন পক্ষপাতিত্ব দেখাতে। আমার জন্য হয়ত থাকত নিউ থিয়েটার্সের বরাদ্দমাফিক সজ্জা, শাড়ী, ব্লাউজ মেক-আপ। বেশীর ভাগ সময়ই আমার নিজের খরচেই ভূমিকার উপযোগী পোষাক করিয়ে নিতে হোত। কিন্তু ঐ বিশেষ নায়িকার জন্য ঐ বিশেষ কর্তাব্যক্তির আদেশে কোম্পানীর খরচেই আসত বাহারী পোষাক, নতুন ডিজাইনের শাড়ী। নির্বাক হয়ে দেখে যাওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে কিই বা করার ছিল?

অত্যন্ত বেদনা জেগেছে যখন দেখেছি আমার তখনকার খ্যাতিকে শুধু মেয়েরাই নয়, পুরুষের দলও যেন প্রীতির চোখে দেখতে পারতেন না। একটা অযোগ্য, অপদার্থ মানুষ হঠাৎ যেন মাথা ছাপিয়ে বড্ড বেশী উঠে যাচ্ছে। এ অসহ্য। এইরকমই একটা ভাব দেখেছি সবারই মধ্যে।

কোনো কোনো পরিচালকের পিঠ-চাপড়ানো ভাব দেখে রাগও হোতো আবার হাসিও পেত। কথায়বার্তায়, হাসিতে ইঙ্গিতে এমনই একটা ভাবপ্রকাশ করতেন যেন আমায় তিনিই তৈরী করে দিয়েছেন।

এসবের গ্লানিতে মন বিদ্রোহ করেছে, জীবনে ধিক্কার এসেছে অসংখ্যবার। কিন্তু কোনো গ্লানিই চিত্তকে বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন রাখতে পারেনি। থেকে থেকে কেবল এই প্রশ্নই জেগেছে মানুষের মধ্যে কেন পশুত্বের উত্তেজনাই বড় হয়ে ওঠে, তার মানবত্ব এমন কি দেবত্বকেও ছাপিয়ে? যে শিল্পজগৎ সাধনার তীর্থভূমি হয়ে উঠতে পারত কেন বাঁধভাঙা বাসনার নির্লজ্জ লোলুপতায় তা হয়ে ওঠে পঙ্কিল নরক?

কারো যদি উচ্চাশা থাকে, থাকে ইতরতার ধূলোবালি থেকে জীবনকে মুক্ত রাখবার স্বপ্ন, ফুলের মত এক একটি পাপড়ি মেলে ফোটবার আকাঙ্খা কেন তাকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেবার অসুন্দর অক্লান্ত মাতামাতি যে স্থূলে লালসা, ধূলিকাঁকরের বিরোধিতাই সত্য আর মিথ্যে হোল কল্পনার আকৃতি? কেন কেউ বোঝেনি হৃদয়ের এইসব গভীর দরদের রাজ্য, স্বপ্নের আকাশ ছিল আমার কত আদরের?

ধূলোবালির জগতে গরমিল, বিরুদ্ধতা সয় কিন্তু উর্ধ্ব আকৃতি যে পাখা মেলতে চায় কল্পনারই আকাশে? সেখানে এতটুকু বাধা হয়ে ওঠে পর্বতপ্রমাণ।

তাই চোখ বুজে কেবল সেই বাস্তবকেই অস্বীকার করতে চাইতাম যে বাস্তব নারীদেহকে নিয়ে শকুনের মত কাড়াকাড়ি করাটাকেই জীবনের চরম সত্য বলে জানে।

এই সঙ্গে আর একটা কথাও ভুলতে পারি না। সে যুগে অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমাদের ওপর যে পীড়ন চলত সেই দানবশক্তির কাছে আমরা অনেক সময়ই ছিলাম নিরুপায়। কিন্তু এখন ত সেই অমানিশার রাত কেটেছে। শিল্পীরা এখন ইচ্ছে করলেই শিল্প-সাধনার নিষ্কলুষ জীবনকে বরণ করে চিত্রজীবন ও জগৎকে সুন্দর করে তুলতে পারেন। কিন্তু আজও কেন দেখলাম না চিত্রজগতের সেই মহৎ রূপান্তর—সারাজীবন ধরে, হৃদয়ভরা সাধ নিয়ে যা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছি?

বেদনার্ত চিত্তে লক্ষ্য করেছি অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা আর বাঁধনহারা অসংযমকেই বুঝি এখনকার যুগ ... সাহসের পরাকাষ্ঠা ... মনে করেন। অবাক হয়েছি দেখে সিনেমা পত্রিকায় নায়ক-নায়িকার বিশেষ সংখ্যায় একই রাত্রে নায়কের মশারীতে সমাগতা অভিসারিণীদের সংখ্যাধিক্যের কাহিনী বর্ণনা করে নায়কের আকর্ষণী শক্তির গৌরবময়তা ঘোষণা করা হয়, অথবা গৌরবের সঙ্গে জানানো হয় কোন্ নায়িকার কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন কতজন পুরুষ?

এগুলোকে সম্ভবত যোগ্যতার সার্টিফিকেট বলেই মনে করা হয় নিশ্চয় নিলে তা ফলাও করে লেখাই বা হবে কেন, ছাপাই বা হবে কেন, আর সহস্র সহস্র বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকা এত আগ্রহভরে তা পড়বেনই বা কেন?

এসব দেখি আর ভাবি আজ কোথায় সেই নীতিবাগিশ সমাজ যে সমাজ তার রক্তচক্ষুর শাসনে আঘাত করেছিল আমার সেই ব্যাকুলতাকে—যে আকুল ... জীবন থেকে আপনাকে ... রাখতে চেয়েছে? সমাজ কি আর ঘুমিয়ে? না সমাজ বলে কিছু নেই?

এই সঙ্গে মনে পড়ে একটি জাপানী উপকথা। মানুষ থাকে আত্মমগ্ন, তুচ্ছ বিষয়ে মেতে আপনার দেবসত্তাকে বিস্মৃত হয়ে। দেবতা চান তার সঙ্গে মিলতে। প্রতি দশকল্প বছর অন্তর আসেন আর বলেন "মানুষ, দেবতা হবি?" মানুষ তাকায় অসহায় দৃষ্টিতে। নিজের রচিত হাজারো বাধার কারাগারে সে যে বন্দী। দেবতার দিকে হাত বাড়াতে যেয়েও সরে আসে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, 'সে কেমন ক'রে হয়? আমার আবিল বুকে কেমন করে ফুটবে তোমার প্রসন্ন দীপ্তি?" দেবতা রাগ করে চলে যান।

দশকল্প বছর পরে সৃষ্টির নতুন আবর্তন। দেবতা আবার আসেন। বলেন "মানুষ দেবতা হবি?" দেবতা জানেন কি উত্তর আসবে, মানুষও জানে তার সাধ্যের সীমা। তবু দেবতার আসা ও মানুষের পিছিয়ে যাওয়ার পালা সমানে চলে। আজও চলছে?

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

(ক্রমশঃ)

দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

(দুই)

খাওয়া-দাওয়া সেরে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে এসে বাগানের রোদে বসলেন সুরেশবাবু। খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গায়ে কাঁটা দিয়ে শীত করছিল। গেঞ্জির ওপর সোয়েটারটা পরে নিলেন তাড়াতাড়ি করে। পরে অতসীকে ডেকে বললেন, 'আমায় একটা পান দিস তো রে।'

অতসী পান নিয়ে এলে, পানটা হাতে নিলেন তিনি। ওর চোখের দিকে একবার চাইলেন সুরেশবাবু, কি ভেবে একটু অবাক হলেন যেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'চোখ দুটো যেন আবার একটু ফুলো ফুলো লাগছে। এদিকে আয় তো।'

অতসী কাছে এলো। মুখটা নীচু করে দাঁড়াল সে। ওর চোখ দুটো ভাল করে দেখলেন কয়েকবার, কপালে তিনি হাত রাখলেন একটু সময়, পরে সস্নেহ গলায় বললেন, 'তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

'তবু একটু সাবধানে থাকিস, ঠাণ্ডা-কাণ্ডা লাগে না যেন।'

'সাবধানেই তো থাকি, আর ভাল লাগে না।' নিজের ওপরই রাগ হলো যেন ওর।

অতসী চলে গেল। সুরেশবাবু সিগারেট ধরালেন এবার। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চারদিকটা আলগোছে দেখে নিচ্ছিলেন তিনি। বকুল গাছের ডালে দুটো শালিক এসে বসেছে। রোদের গায়ে যেন এক ঝিম ঝিম ভাব এখন। রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে তিনটে গরুর গাড়ি চলে যাচ্ছে। একটা মালগাড়ি চলে যাওয়ার শব্দও শুনেছেন বসে বসে। রোদটা বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। এখানে আসার পর মেয়েটা অনেক সুস্থ বোধ করেছে, ঘোরা-ঘুরি, হাসিও ফুটেছে মুখে। শরীরের ফ্যাকাসে ভাবটাও দেখতে দেখতে কেটেছে। উৎসাহ বেড়েছে, সবচেয়ে বড় কথা একধরনের লাবণ্য ও সুস্থতা একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছে আবার। এ পরিবর্তনটা সবারই চোখে পড়েছে। দেখে ভাল লেগেছিল সুরেশবাবুর। কিন্তু আবার যদি শরীরটরীর খারাপ করে! মিহি সুতোর মতন সারা মুখটায় একটা দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে থাকল।

এবার কলকাতায় এসে সুরেশবাবুর খারাপ লেগেছিল। অতসীকে দেখে খুব কষ্টবোধ করেছেন তিনি। এ কি চেহারা হয়েছে, এত সুন্দর গায়ের রঙ ছিল ওর! তিনি ভাইদের ওপর রীতিমতন রাগই করেছিলেন। ওরাও তাঁর ওপর একজন্যে একটু অসন্তুষ্ট।

সুরেশবাবু বাইরে বাইরেই থাকেন। চাকরিটাও তাঁর ভাল। আগে বছরে দু' তিনবার করে কলকাতায় আসতেন। ইদানীং বছর দুই তিন অন্তর অন্তর আসেন। আগের মতন আর উৎসাহবোধ করেন না আজকাল। সব কেমন বদলে গেছে। নিজের নিজের সংসার নিয়েই এরা যেন জড়িয়ে গেছে। তিনিই সবার বড়। তারপর চারু চারুর পরে নরেশ, বিনোদ। ওরা একসঙ্গেই আছে। সুরেশবাবু বিয়ে করেন নি। ওরা করেছে, দেখতে দেখতে সংসারও বড় হয়েছে ওদের। নরেশের এক ছেলে দু মেয়ে, বিনোদের দুটিই মেয়ে। ছেলেমেয়েরাও বড় হয়েছে। খরচ বেড়েছে।

চারুর মেয়েই অতসী। তিন ভাইয়ের একটিই বোন। অল্পবয়েসেই অতসীকে নিয়ে বিধবা হয়েছে চারু। এই সংসারেই এসে উঠেছিল ও, মা বাবা তখনও বেঁচে রয়েছে। চারুকে ঠেলে দিতে পারেনি, সেই থেকে ওরা এখানেই থেকে গেছে। সুরেশ-বাবু চাকরি নিয়ে বাইরে যাওয়ার সময়ই বুঝেছিলেন, চারুরা এদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। মাও দুঃখ নিয়েই চলে গেলেন। সুরেশবাবু মাঝে মাঝে এসব দেখেশুনে অবাক হয়ে ভাবেন, বড় অদ্ভুত জায়গা এই সংসার। এখানে আমাদের সম্পর্কগুলো যেন প্রয়োজন আর স্বার্থ দিয়ে বাঁধা। মনে মনে যেন তিনি ওদেরকে বললেন, তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে যখন যেটুকু দরকার করবে, অসুখ-বিসুখ করলে অস্থিরতা দেখাবে, ডাক্তারের কাছে ছুটবে, ওদের কিছু হলো তো চিন্তায় তোমাদের ঘুম হয় না; আর ওই মেয়েটার বেলায়ই যত টালবাহানা, কেন? তোমাদের সংসারেই তো ও জন্মের পর থেকে আছে, ওর জন্যে কি এতটুকুও মায়ামমতা থাকতে নেই তোমাদের!

সুরেশবাবু মনে মনে হাসলেন একটু। বিয়ে করেন নি বলেই কি তিনি এসব ভাবতে পারছেন! চারু এবং অতসী যে ওদের সংসারে বাড়তি ঝামেলা, এটা সুরেশবাবু কলকাতায় এসে প্রতিবারই টের পেয়েছেন। এতগুলো মানুষের খাওয়া-পরা যদি চলতে পারে তবে এদের চলবে না কেন! সুরেশবাবু এজন্যে বিনোদ নরেশকে ধমকেও ছিলেন একটু। তিনিও তো মাসে মাসে এদের কাছে টাকা পাঠান। দরকারে অদরকারে তিনি কাউকেই তো বিমুখ করেন নি। তাছাড়া এসব করে কি লাভ আছে কোন! বললেই কি আজ চারু কোথাও চলে যাবে, নিজের লোক বলতে তো এরাই। সবাইকেই মানিয়ে নিতে হবে।

এবার কলকাতায় এসে অতসীকে দেখে তিনি চমকে গেছেন। আগের চেহারার আর কিছু নেই। মেয়েটার জন্যে মনে মনে তিনি দুঃখ বোধ করেছেন। চারুর ওপরও তিনি রেগে গিয়েছিলেন। ওর ওখানে মেয়েকে নিয়ে কিছুদিন থাকতে বলেছিলেন তিনি। শুনল না। তিনি এখন যেখানে আছেন, স্বাস্থ্যকর জায়গা, খাওয়া-দাওয়ার সুখ প্রচুর। চিঁড়িমিড়ি, পাহাড়টাহাড় কয়লা-খনিও আছে। গেলে ভালই করত। এখানে যে কি মধু আছে! মধু তো দূরের কথা, চারুর কাছে সব কেমন তেতো হয়ে গেছে। তবুও পড়ে আছে, মেয়ের জন্যেই। চারু বলে, 'আমারও ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে, এখানে আর মন টেঁকে না, তবু আছি, মেয়েটা একটা প্রাইমারী স্কুলে কাজ করে, নিজের খরচা নিজে চালায়, কলেজেও পড়ছে।'

'শরীরটা যে খারাপ হচ্ছে খেয়াল আছে।' সুরেশবাবু একটু রুক্ষ গলায় কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'আমার কিছু করার নেই বড়দা, আমিও তো দেখছি আমার চোখের ওপরই দিন দিন চেহারাটা কী ভাঙছে ওর; কথা না শুনলে আমি কি করবো বল।'

'এবার সুরেশবাবু কলকাতায় এলে চারু কান্নায় ভেঙে পড়েছিল. বলেছে, 'বড়দা, তোমাদের কাছে নিজের জন্যে কখনই কিছু চাই নি, আজ চাইছি। একটা মাত্র মেয়ে আমার, ওর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি, ওর যেন কিছু না হয়, ওকে যে করেই হোক সারিয়ে তোল তোমরা।'

'আহা, এত ভেঙে পড়ার কি আছে, অসুখবিসুখ তো মানুষেরই হয়।'

'হয়, কিন্তু আমার তো কিছুই নেই।'

'দেখা যাক না, কি করা যায়।'

এখানে আসার পরই সুরেশবাবু শুনেছিলেন সব। ডাক্তার সন্দেহ করেছে, অতসীর হার্টে কঠিন কোন রোগ ঢুকেছে। মোটামুটি চিকিৎসা চলছে। আসলে ভেতরে ভেতরে অনেক ক্ষয়ে গেছে মেয়েটা। এত পরিশ্রম সইবে কেন! তিনি তো আগের-বারেই চারুকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এর ফলে আর একধরনের অশান্তি বেড়েছে এই সংসারে। সবাই ভয় পেয়েছে অতসীর রোগের কথা শুনে। আগে যদিও বা এক আধবার কথা টথা বলত নরেশ আর বিনোদের ছেলেমেয়েরা, আজকাল আর ধারেকাছেও কেউ আসতে চায় না, সবাই কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ফলে মনের দিক থেকে ও আরো নিঃসঙ্গ বোধ করত নিজেকে। এরকম অবস্থায় সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যায়। মনটাকে সব সময় হাসিখুশি প্রফুল্ল রাখতে হয়, রোগ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করলেই অনেক আরাম। বেশি ভাবলেই মনের ওপর চেপে বসে। সুরেশবাবু এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, এখানে এই পরিবেশে অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে চারুর আর থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া এভাবে থাকলে মেয়েটারও অসুখ সারবে না, আরো বাড়বে; শেষে মনের কোন জটিল ব্যাধিও এর সঙ্গে আসবে। তখন আরো অসহায় বোধ করবে চারু। জায়গা বদল করলে অনেকটা সেরে উঠবে মেয়েটা, ডাক্তারবাবুও সেই পরামর্শই দিয়েছেন। ওষুধে যতটুকু সারবার সেরেছে. কিন্তু মনের আনন্দ ফিরে পাওয়া দরকার। অসুখটা এখন শরীরে যত না আছে, মনে তার চেয়ে বেশি, এখানে নাকি ডাক্তার-বাবুর আর করার কিছু নেই। তবু তিনি ওষুধ পথ্যাদি লিখে দিয়েছেন। চারু যেভাবে ভেঙে পড়েছিল, প্রথমটায় তিনিও ভেবেছিলেন, মারাত্মক ধরনের কিছু একটা হয়েছে অতসীর। পরে ডাক্তার দেখিয়ে জানলেন. মারাত্মক হতে পারতো, তবে প্রথম স্টেজেই ধরা পড়ায় ভয়ের কিছু নেই, খাওয়া দাওয়া, রেস্ট, ফুর্তিতে থাকা। ওষুধ তো আছেই। কিন্তু এখানে থাকলে রোগ সারবে না, বরং আরো অশান্তি। সুরেশবাবু ভাবছিলেন, কোথায় যাওয়া [illegible]

ওদেরই দেখতে হবে, ও বেচারার আর জায়গা কোথায় যাওয়ার! ভাবতে গিয়ে শেষে সরোজের কথা মনে পড়ল। সরোজ ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু। ওদের একটা বাড়ি আছে হাজারীবাগ রোডে। কলকাতায়েই থাকে ওরা। সুরেশবাবু গিয়ে দেখা করলেন ওর সঙ্গে। সরোজ এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। মালীর কাছে চিঠিও লিখে দেবে বলল।

সুরেশবাবু ছুটিতে এসেছিলেন, তিনি ছুটি বাড়িয়ে নিলেন। চারুর কপালটা যে শেষে এরকম হবে কে ভেবেছিল, ওর মেয়েটাও বড় দুঃখী। এসব ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। সিগারেটটা জ্বলতে জ্বলতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আঙুলে তাপ লাগছিল। টুকরোটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে একটা সিগারেট ধরালেন। মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়া হুহু করে ছুটে আসছে। গাছের পাতা কাঁপতে কাঁপতে ঝরে যাচ্ছে। ধুলো উড়ছিল। সুরেশবাবু অপলকে এসব দৃশ্য কিছু সময় দেখলেন। কেমন রিক্ত শূন্য মনে হচ্ছিল, সব খোওয়াবার এমন উদাসী চেহারা তো আগে কখনো চোখে পড়ে নি। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল সুরেশবাবুর। তিনিও তো জীবন প্রায় শেষ করে এনেছেন। প্রকৃতির এই বৈরাগ্য যেন তাঁকে মাঝে মাঝে কেমন উদাসীন করে দেয়। মনে মনে তিনি কতদিন ভেবেছেন, আমাদের চারপাশে বিরাট এক রহস্যের জগত, এখানে কত কি আয়োজন, প্রলোভনের সামগ্রী থরে থরে সাজানো। এদের মধ্যে আমরা, কি নেবো আর কি নেবো না, তা যেন ঠিক করতে হবে। এ অনেকটা ছেলে-বেলার সেই গোলকধাম খেলার মত। কেউ কেউ সারাজীবন ঘুরে ঘুরে খালি নরকেই পড়ছে, যমপুরীতে শাস্তি ভোগ করছে, আবার কারো কারো বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি। সুরেশ-বাবু আজকাল যেন এরকমভাবেই সব ভাবেন। বিয়ে থা না করে ভালই করেছেন তিনি। সেজন্যেই চোখ খোলা রেখে এখনও সব দেখতে পারেন। দেখছেন তো ওদের! আবার এমনও হতে পারে, সংসার করলে হয়ত তাঁরও অভিজ্ঞতা ওদের মতনই হতো। নাও হতে পারত, কিছুই বলা যায় না জোর করে। এটা যেন আর এক ধরনের অভিজ্ঞতা। কি ভেবে হাসলেন সুরেশ-বাবু। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিলেন তিনি।

অতসী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে চাদর জড়ানো। হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ, ওতে সোয়েটার বোনার উল কাঁটা, আরো টুকিটাকি সরঞ্জাম। মুখে ভাজা মসলা।

'আজ বেশ শীত পড়েছে. তাই না, রাঙামামা?' বলতে বলতে উঠোনে নেমে এলো অতসী। কামিনী ফুলের গাছটার কাছে তখনো কয়েকটা বেতের মোড়া পড়ে রয়েছে। এখানে বসে বসেই রোদে পিঠ দিয়ে সকালে মামু মামুর সঙ্গে গল্প করেছে, গাছের পাতা ছিঁড়েছে, ফুল [illegible]। মোড়াগুলো এখনও ঘরে নেওয়া

হয় নি। খেয়েদেয়ে এসে এখানেই আবার বসল অতসী। সারাক্ষণই রোদ থাকে এখানটায়। আগে কখনো এমনভাবে রোদ গায়ে মাখে নি। এত আলো হাওয়া, প্রকৃতির ঐশ্বর্য জীবনে এই যেন সে প্রথম দেখছে। রাঙামামার জন্যেই এখানে আসা সম্ভব হলো তাদের। ওর ধারণা হয়েছিল ওদের ওখানে থাকলে বেশিদিন আর বাঁচতো না। সবদিকের আলো যেন বন্ধ হয়ে আসছিল ক্রমশ। মেজমামা আর ন মামার সঙ্গে রাঙামামার কত তফাৎ। অথচ তিনজনই তো ওর নিজের মামা। রাঙামামার কথা মনে হলে বুকটা গভীর এক শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভরে ওঠে। এত স্নেহ সে আর কারো কাছে পায়নি জীবনে। মার কথা অবশ্য আলাদা। মার জন্য ওর দুঃখই হয়েছে। হাওয়ায় কামিনীফুলের গন্ধ এসে নাকে লাগছে।

সুরেশবাবু অতসীর দিকে চাইলেন একবার. মৃদু হেসে বললেন, 'জায়গাটা বেশ ভাল. তাই না রে?'

'ভালোই তো লাগছে, তবে দেখার মতন কিছু একটা নেই এখানে।'

'দেখার চেয়ে থাকাতেই এখানে বেশি সুখ, লাভ; জলটা তো খুবই ভাল, খেতে না খেতেই আবার খিদে।'

'তা ঠিক।' অতসী ব্যাগ থেকে কাঁটা-গুলো তুলে নিয়েছে, সোয়েটার বুনতে বুনতে আবার বলল, 'আমারও দেখছি এখানে এসে খিদেটা বেড়েই গেছে।'

'বাড়বেই। আমার তো খালি রাক্ষসের মতন খিদেই পায়।'

'মোটেই না, তুমি আবার একটু বাড়িয়ে বলছো।' অতসী ছেলেমানুষের মতন হাসলো।

'আর একটু পরেই যখন খেতে চাইব, তখন বিশ্বাস করবি তো!' সুরেশবাবু হাসতে হাসতেই ফের বললেন, 'আজকাল খাওয়া দাওয়ার আর সুখ নেই। একে তো জিনিসপত্তরের দাম বেড়েছে, তার ওপর ভেজাল!'

'ভেজাল খেয়ে খেয়েই অভ্যস্ত হয়ে গেছি।' অতসী মাথা নীচু করে হাসল।

'আমাদের সময়ে কিন্তু অত ছিল না; এখন যেন এটা সংক্রামক রোগের মতন ছড়িয়ে পড়েছে, সারাবার কোন লক্ষণই তো দেখি না।' সুরেশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কি ভেবে একটু পরে আবার বললেন, 'এই যে দুধ খাই, আমি ঠিক বুঝতে পারি না, দুধে জল মিশিয়েছে না জলে দুধ মিশিয়েছে।'

অতসী হেসে উঠেছে ওর মামার কথা শুনে। হাসতে হাসতেই বলল, 'এখানে কিন্তু কলকাতার মতন অত নয়; তরি-তরকারী মাছটাছের তো বেশ স্বাদ আছে।'

'আছে, ওই দেহাতীদের কাছ থেকে নিলে। এ ছাড়া সবই বড় বড় শহরের মতন,

বরফের মাছ, বাসি জল দেওয়া শাকসব্জি, দুধেও জল।'

'বাজারের তুলনায় লোক বেশি হয়ে পড়েছে। মাঝপথেই সব শেষ হয়ে যায়!'

'ওদের আর দোষ কি, আমরাই ওদের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছি। এই সময়টাতেই ওরা যা একটু আয় করে।'

'কদিনেই কি ভিড় বেড়েছে দেখেছো!'

'ভিড়টা আরো থাকবে কিছুদিন, পরে আস্তে আস্তে কমে আসবে। তখন দাম-টামও অনেক কমবে।'

'একটা জিনিস এলে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোকগুলো। বুঝেসুঝেই দাম চায় এরা।'

অতসী একটু সময় কোন কথা বলল না আর। পরে সুরেশবাবুর ওপর দৃষ্টিটা স্থির রেখে বলল, 'সেদিন ওই লোক-গুলোর ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল, তুমি দর করছো, মাঝখান থেকে ওরা এসে কোন কিছুই জিজ্ঞেস করল না, গাড়িতে নিয়ে তুলল।' একটু দম নিয়ে অতসী বলতে লাগল, 'আমি ওদের আরো কদিন দেখেছি, ভীষণ অসভ্য!'

সুরেশবাবু হাসলেন সামান্য, একটু উদাসীন গলায় বললেন, 'নিজেদের চরিত্রটা বাইরে এসেও জাহির করছে, এদের জন্যেই বাইরে আমাদের এত বদনাম আজ।'

সুরেশবাবু একটু সময় নীরব থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'এরা এসে মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে, যার ফলে আমাদের মতন প্রবাসী বাঙালিদের খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়।'

অতসী কি ভাবছিল মনে মনে। কি একটা বলবার জন্যে উসখুস করল। পরে বলল, 'আমি বৈজুকে আজ হাট থেকে মুরগী আনতে বলে দিয়েছি।'

'ভাল করেছিস। আমিও ভাবছিলাম, মুরগীটুরগী হচ্ছে না, কি ব্যাপার!'

'মানুরাও খাবে।' অতসী মুখ নীচু করে মৃদু মৃদু হাসছিল।

'নিশ্চয়ই খাবে। তুই কালই বলে আসবি গিয়ে।' সুরেশবাবু উৎসাহ বোধ করলেন, তাঁকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে, হাসতে হাসতে বললেন, 'অনীশও বাদ যায় না যেন।'

'আমাদের মতন ওরাও দুজনই মাত্র আমিষ খাইয়ে।' অতসীও হেসে উঠল।

'তবে তো দারুণ কিছু একটা করতে হয় রে!' সুরেশবাবু জোরে জোরে হাসতে লাগলেন।

অতসী মুখ টিপে টিপে হাসল। একটু পরে উঠে এলো সে, কাছে এসে গায়ের মাপ নিল, এবার আর আগের জায়গায় গিয়ে বসল না, কাছেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে ঘর ফেলছিল। গলাটা ঠিক হচ্ছে না, এ নিয়ে তিনবার খুলেছে।

সুরেশবাবু ওদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'এবার শেষ করতে পারবি তো?'

'তুমি কি যে বল না রাঙামামা, দু-দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, শুধু তো গলাটা।'

'ভালই করেছিস, আমারও এই সোয়েটারটা ছিঁড়ে গেছে।'

'সেজন্যেই তাড়াতাড়ি করছি।' একটু চুপ করে থাকল অতসী, পরে ওর মামার মুখের দিকে চেয়ে শুধলো, 'এ ডিজাইনটা তোমার পছন্দ হয়?'

'আমার আবার পছন্দ কি, একটা হলেই হলো।'

'কেন, কেন পছন্দ থাকবে না শুনি?'

'সেই বয়েস কি আর আছে।'

'তুমি কি এখনই বুড়ো হয়ে গেছ ভাবছো?'

'দোষ কি ভাবতে। বয়েস তো কম হলো না।'

'কত হয়েছে শুনি।'

'তুই-ই বলতো কত হয়েছে আমার।'

অতসী একবার ভাল করে দেখে নিল মামাকে, কাঁটাটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে রেখে গম্ভীরভাবে কি ভাবল একটু সময়, পরে বলল, 'বড় জোর সাতচল্লিশ আটচল্লিশ।'

'বলিস কি, তোর মারই তো এটা আটচল্লিশ চলছে, চারুর চেয়েও আমি দু' বছরের বড়।' সুরেশবাবু হেসে ফেলেছেন, 'বয়েস কম হলো না রে, এবার তো আমার যাওয়ার সময় হয়ে এলো।' সুরেশবাবু পাতাঝরা গাছগুলোর দিকে চেয়ে কি ভাবলেন যেন। একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাঁকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। এবার অতসীর মুখের দিকে চাইতে চাইতে বললেন, 'এর মধ্যে কলকাতার একটা চিঠি অন্তত আশা করেছিলাম, ওরা আমার চিঠিটারও জবাব দিল না।'

অতসী কিছু বলল না, দু একবার মামার মুখের দিকে তাকাল। দেখতে দেখতে ওর মুখ মলিন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে, চোখের কোলে কপালে সামান্য বিরক্তি দেখা গেল। হাতের কাঁটা যেন একটু তাড়াতাড়ি চলছে। মনে মনে অসহিষ্ণু, ক্ষুব্ধ অতসী। মুখ না তুলেই ও বলল, 'আমরা চলে আসায় তো ওরা বেঁচে গেছে, ওদের জন্যেই আমার এই অসুখ। আমার আর চিনতে বাকী নেই ওদের।'

এত লেখাপড়া শিখে দিন দিন ওরা যে এমন অমানুষ হবে, ভাবতে পারছি না।'

'লেখাপড়া ওই বাইরেই, তুমি তো সব জান না রাঙামামা।' অতসী ওদের প্রসঙ্গে সামান্য উত্তেজিত যেন। মামার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

'কিছু কিছু জানি, নিজের চোখেও দেখেছি খানিকটা।'

'এই জন্যেই তো, একটাও ছেলেমেয়ে ভাল হলো না; এত হিংসে থাকলে কি আর ভাল হয়! দিনরাত ঝগড়া, মারামারি আজেবাজে গালাগালি। বাবলুটা তো পাড়ায় গুন্ডামি করে বেড়ায়, পুলিশেও ধরেছে ক বার। রুমি জয়ন্তীও কম ধড়িবাজ মেয়ে নয়, ওদের কেলেংকারীও একদিন শুনবে।'

'কলকাতায় এলে আজকাল আমারও ভাল লাগে না।' একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, 'ওরা নিজেরাই ভুগবে, আমার আর কি। খারাপ হলে শুনতে কারই বা ভাল লাগে, হাজার হোক এই বংশেরই তো ওরা। ছেলেমেয়ের আসল শিক্ষাটা বাপ মায়ের কাছেই।'

'আমার অসুখের কথা শুনে ওরা আরো ক্ষেপে গেল। অবাক কান্ড। মার সংগে তো ঝগড়া, কথাই বন্ধ হয়ে গেল। তুমি একবার ভাব দেখি, আমার তখন কথা বলার শক্তি নেই, মাথা ঘুরছে, নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে, আর ওরা তখন মার সংগে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করছে, আমাদের চলে যেতে বলছে।' একটু থেমে অতসী দম নিয়ে নিল, আস্তে আস্তে ফের বলল, 'বাড়ির একটা পশু পাখির জন্যেও তো মানুষের মায়া মমতা থাকে, এদের যেন তাও নেই! আমাদের ওপর যে কী বিষনজর না, তুমি না দেখলে ভাবতেও পারবে না। ভাবলে আমার এখনও কান্না পায়। আমাদের কেউ নেই বলেই তো আমরা ওদের কাছে পড়ে আছি।' অতসীর গলা ধরে এলো শেষের দিকে।

'আমি তো এখনও আছি রে, অত ভাবছিস কেন; তাছাড়া তোদের বাবদ মাসে মাসে আমি টাকা পাঠাই না, কি বলবো আর, ওদের মন বলে আর কিছু নেই, নোংরায় ভরতি, সব স্বার্থপর। আমি তো ওদের কম সাহায্য করি না!

'ওদের ওখানে আমরা আর যাবো না, মরে গেলেও না।'

'যতদিন খুশি থাক না এখানে। আমি সরোজকে একটা চিঠি লিখে দেবো। বাড়িটা তো পড়েই থাকে।'

'তাহলেও কলকাতায় তো যেতেই হবে আমাদের, আমার স্কুল আছে, পরীক্ষাটাও দেবো এবার। তবে ওখানে আর উঠবো না।' অতসী মোড়াটা সরিয়ে এনে আবার রোদে পিঠ দিয়ে বসল।

মার জন্যেই অতসীর দুঃখটা আরো বেশি। ওদের সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তার মাকেই করতে হয়। অথচ এত করেও মন পায় না তার মা। সবাই কথা শোনাবে। অতসী ছেলেবেলা থেকেই শুনেছে ওদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, এখানেই যখন থাকতে হবে তখন মুখ বুজে থাকাই ভাল। অথচ ভালটা যে কি ও কখনোই তা বুঝতে পারল না। মা ওর কানে কানে কত কথাই না বলেছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ও দেখেছে, মার সংগে ওদের একটা দুরত্ব তৈরী হয়ে গেছে। এখানে অতসী বা ওর মার কোন সম্মান, মর্যাদা ছিল না। সবাই কথা শোনাবে, যা বলা উচিত নয় তাই বলে যাবে, অথচ তার মা এসবের কোন প্রতিবাদ করবে না; এই অপমান নোংরামি, অতসীর ভাল লাগত না, বড় হওয়ার পর এজন্যে ও মাঝে মাঝে ফোঁস করে উঠেছে। মার ওপরও রাগ হয়েছে ওর। মা তাকে ধমক দিয়েছে। এই ছোটখাটো টুকরো টুকরো কথা নিয়েও কতরকমের অশান্তি। মার মতন এমন অসহায় করুণ চেহারা আর কোথাও দেখে নি অতসী। এসব দেখেশুনে কারো সংগে কথা বলতে ইচ্ছে করত না ওর। ধীরে ধীরে কখন যেন একদিন গুটিয়ে নিল নিজেকে। ওর এই নির্লিপ্ততা নিয়েও কতরকমের জল্পনা কল্পনা। সব কিছু ওদেরই মর্জি মতন হবে! হায়রে! ওদের সংগে অতসীদের সম্পর্কটা কখনোই আন্তরিক হলো না। অতসী হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে, এ নিয়েও কত কথা। এত পড়া-শুনোর দরকারটা কি, যা হয়েছে এই তো ঢের, খাওয়া-পরা তার ওপর আবার পড়া-শুনোর খরচ, খেতে পেলে মানুষ শুতে চায় ইত্যাদি আরো বিচ্ছিরি সব মেয়েলি কথাবার্তা। রাঙামামা ওর জন্যে টাকা পাঠিয়েছে। কলেজে ভর্তি হয়েও অতসী লুকিয়ে লুকিয়ে চাকরির চেষ্টা করেছে, ছোট ছোট দু তিনটে ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে কলেজের বেতন চালায়। পার্ট ওয়ান দেওয়ার পর সকালে প্রাইমারী স্কুলে একটা কাজ পেয়েছে। মাকে নিয়ে ওখান থেকে চলে আসতে চেয়েছে অতসী। ওর এই সামান্য টাকার ওপর যেন মা ভরসা করতে পারল না। এ অপমান নিয়ে আর কতকাল এখানে থাকবে ওরা! ঝি-এর মতন দিনরাত খাটছে, অথচ কোন পুরস্কার নেই এজন্যে, উপরন্তু উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, কেন? তোমাদের সংগে আমার মার যে রক্তের একটা সম্পর্ক আছে, তারও কোন দাম নেই, স্বীকার করতে লজ্জা হয়?

এখানে আসার পর কলকাতার কথা তার একবারও মনে হয়নি। একটা দুঃস্বপ্নের মতন যেন। এত হালকা আর আনন্দ আগে কখনো বোধ করেনি। রাঙা-মামা এসে যেন ওদের বাঁচিয়েছেন। এত সুখ, তৃপ্তি এই প্রথম অনুভব করছে অতসী। আপাতত আর ওদের কাছে ফিরতে হচ্ছে না এই বোধটাই অনেক শান্তি, সান্ত্বনা এনে দিয়েছে। সব কিছুই

চোখের সামনে খুশিতে, সজীবতায় ভরে উঠেছে। যা দেখছে দু চোখ ভরে, তাই ভাল লাগছে; অতসীর মুখের ওপর থেকে এই প্রথম মলিন আবরণটা সরে গেছে, অনেককাল পর আবার যেন মুখে এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি ও লাবণ্য ফুটে উঠেছে ওর।

কি ভেবে অতসী উঠে এলো। একটু চুপচাপ থেকে বলল, 'তোমার তো অনেক চেনাজানা রাঙামামা, আমায় একটা চাকরি করে দাও না!'

'করছিস তো একটা।'

'নামেই চাকরি, এতে দুজনের চলবে না বলেই তো এখনও পড়ে আছি।'

'ঠিক আছে, কলকাতায় গিয়ে এবার চেষ্টা করবো।'

'চেষ্টা নয়, তোমাকে করেই দিতে হবে।'

সুরেশবাবু কিছু না বলে সামান্য হাসলেন।

এমন সময় ফটক খোলার শব্দ হলো। বৈজু হাট থেকে ফিরেছে। হাতে ঝুলছে দুটো মুরগী, মাথায় তরিতরকারীর ঝুড়ি। মাঝে মাঝে বৈজু ওদের বাজারটাজারটা করে দেয়। হাটেটাটে গেলে নিজে থেকেই এসে সে জেনে নেয়, কিছু লাগবে কিনা। বারান্দায় এনে জিনিসগুলো নামিয়ে রাখল বৈজু। মুরগী দুটো ডাকতে লাগল। শব্দ শুনে চারুও বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এই খানিকক্ষণ আগে ঘরের টুকিটাকি কাজ শেষ হয়েছে।

অতসী মার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হেসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি কাজ আর ফুরোয়ই না?'

'অভ্যেস কি আর অত সহজে যায় রে!'

সুরেশবাবু মুখ ঘুরিয়ে চারুকে কিছু সময় দেখলেন অপলকে, গম্ভীর গলায় বললেন, 'এখানে এসেও যদি ঘরের মধ্যেই খালি খুটুস-খুটুস করবি, তবে আর কি দরকার ছিল আসার!'

'তোমরা শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছো। আমার কিছু অসুবিধে হয় না তো!' চারু তার দাদার দিকে তাকাল।

'মুখটা একবার আয়নায় দেখেছিস!'

চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, 'আমি ভালই আছি, আমার জন্যে অত ভেবো না তো তোমরা।'

'মার এই জেদ, কারো কথা শুনবে না।'

কি যেন ভাবছিল চারু। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'এখানে আর কি করি, কিছুই না।'

'এই তোর কিছুই না!' সুরেশবাবু যেন ক্ষুণ্ণ হলেন একটু। পরে এ-প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গেলেন। বৈজুর দিকে চেয়ে শুধোলেন, 'মুরগী দুটো কত নিল?'

'চার রুপেয়া, আউর জাদা দাম মাঙল!'

'চার টাকা হলে তো সস্তাই হয়েছে।' সুরেশবাবু একটু আশ্চর্যই হয়েছেন যেন।

'কলকাত্তার বাবুলোক আনেসে তো সব চিজকো বহুৎ দাম হো জাতা।' খানিক পরে বৈজু চলে গেল।

'আর সেদিন বাজারে একটার দাম চাইল চার টাকা।' অতসীও অবাক হলো।

'এরাও কলকাতার বাবুদের বুঝে ফেলেছে, যার কাছ থেকে যা নিতে পারে।' সুরেশবাবু হেসে উঠলেন।

হাওয়া দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। সুরেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দূরে মাঠে ক্ষেতে গাছের মাথায় হিম জমছে একটু একটু করে। রোদের রঙ দ্রুত পাল্টাচ্ছে, এবার একটু শীত শীত করছিল। আকাশের বুক দিয়ে কিছু বক উড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় লাল ধুলো উড়ছিল।

'ঠাণ্ডা লাগে না যেন দেখিস।' চারু মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল।

'আর বাইরে থাকিস না, ঘরে যা এবার।' সুরেশবাবু এগিয়ে এলেন।

অতসী বেতের মোড়াগুলো বারান্দায় এনে তুলে রাখল। পরে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'মুরগীটা তাহলে তুমি রাঁধবে তো রাঙামামা?'

'কেন, তোদের চেয়ে খারাপ রাঁধি আমি?'

'বারে, আমি কি তাই বলেছি নাকি?'

সুরেশবাবু অতসীর দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছেন, শেষে চারুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কিরে চারু, বল না একবার!'

'আমি আবার বলবো কি, ও নিজেই তো ভাল করে জানে।' চারুর মুখেও মৃদু মৃদু হাসি।

'জানি বলেই তো বলছি, খুব ভাল হবে।'

'আমার মারও রান্নার খুব নাম ছিল, বড়দা তো তবু কিছু কিছু শিখেছে।' চারু যেন হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হলো।

'আমায় কয়েকটা শিখিয়ে দিও তো রাঙামামা!'

সুরেশবাবু অতসীকে কি একটা বলার জন্যে চোখ তুলেছেন। হঠাৎ গেটের দিকে চোখ চলে গেল, তিনি সেদিকে চেয়ে জোরে জোরে হাসলেন, 'এই যে মানুদি এসে গেছে, আর তুই এখনও বসে আছিস!' সুরেশবাবু ভেতরে চলে গেলেন।

'কি গো অতসীদি, আজ আর বেরোবে না বুঝি?'

'তুমি একা যে, ওরা কোথায়?' অতসী হাসি হাসি চোখে দেখছিল ওকে।

'দিদিটার কথা আর বলো না, কুঁড়ের একশেষ, এত করে বললাম, শুনলই না।' মানুর গলায় ঈষৎ অভিমান ফুটে উঠেছে। অতসীর মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হেসে মানু বলল, 'মা তো বিকেলে বেরোতেই চায় না, আর সোনাদা, ও-ও পয়লা নম্বরের কুঁড়ে, দেখলাম চা খাচ্ছে।' একটু চুপ করে থেকে মানু অতসীর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'কিন্তু তোমার মতলবটা কি শুনি?'

'খুব সোজা, হাত মুখে জল দিয়ে শাড়িটা বদলে নেবো খালি।' অতসী আলতোভাবে একটা চিমটি কেটে দিল মানুকে।

'কদ্দূর যাবে তোমরা?' অতসীর মা মানুর চোখের দিকে চেয়ে শুধোলেন।

'এই সামনেই।'

'আজ ঠাণ্ডাটাও বেশ পড়েছে।'

'ভেতরে এসো মানু।' অতসী ডাকল ওকে।

'আমি আছি, তুমি রেডি হয়ে নাও!'

'বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।' অতসী চলে গেল।

চারুও বারান্দা থেকে শাকসব্জিগুলো গুছিয়ে নিয়ে ঘরে গেল।

একটু পরে অতসী আর মানু রাস্তায় এলো। যেতে যেতে কি ভেবে একসময় অতসী মানুকে ফিসফিস করে বলল, 'তখন তোমার দাদা আবার কিছু মনে করেনি তো।'

মানুর চোখে মুখে রহস্যের হাসি, বলল, 'আমি কি করে বলবো। তাছাড়া আড়ালে তোমাদের কি কথা হয়েছে, শুনিনি তো।' মানু তখনো হাসছে।

'খুব দুষ্টুমি না?' অতসী মানুকে চিমটি কাটল। দুজনেই জোরে জোরে একসঙ্গে হেসে উঠল এবার।

সূর্য তখন ডুবু ডুবু, আলোটা ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে নামবে, ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে।

(ক্রমশ)

খোয়া একটি জাতির নাম

সুমিত সান্যাল

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। বিরাট একটি পার্বত্য ভূমি। চারিদিক দিয়ে ঘেরা হিমালয়, ভূটান, তিব্বত, বর্মা এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। এই বিরাট পার্বত্য ভূমিকে ভাগ করা হয়েছে পাঁচ ভাগে। তাদের নাম কামেঙ্গ, সুবর্ণশ্রী, সিয়াং, লোহিত ও তিরাপ। এই নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের অরুণাচল প্রদেশ।

এর মধ্যে কামেঙ্গের নাম বোধহয় অনেকেই শুনে থাকবেন। কামেঙ্গের মধ্যে দিয়ে দলাই লামা ৩১শে মার্চ, ১৯৫৯ ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর চীনা আক্রমণের সময় বোধহয় অনেকেই বোমডিলা, সেলো-পাস এবং তওয়াং-এর নামও শুনে থাকবেন। এসব জায়গাগুলো কামেঙ্গের অন্তর্গত।

অতসব জানলেও, অনেকেই বোধহয় কামেঙ্গের লোকজনদের সাথে পরিচিত নন। কামেঙ্গে মোট সাতটি পার্বত্য জাতি আছে। তাদেরই একটি জাতির নাম 'খোয়া' আর অন্যান্য জাতির নাম মোনপা, শেরদুকপেন, আকা, মিজো, দফলা এবং সুলুঙ্গ।

খোয়ারা নিজেদের 'বগুন' নামে পরিচয় দেয়। কিন্তু সমতলবাসীরা তাদের 'খোয়া' বলেই অভিহিত করেন। তার সঠিক কারণ কেউই কিছু বলতে পারে না যুক্তিসংগতভাবে। এদের লোকসংখ্যা প্রায় ২,০০০-এর মত। মোট আটটি গ্রাম। তার মধ্যে নামসী, কাম্পি ও সিঙ্গচুঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদের গ্রামকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে খোয়ারা থাকে। আর এক ভাগে খোয়া জাতি থেকে বহিষ্কৃত জাতিরা থাকে। এই বহিষ্কারের কারণ সম্বন্ধে কথিত আছে যে, যারা নীচ কাজ করত, তাদেরই মূল জাতি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর সত্যতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে নিরূপণ করার কোন উপায় নেই। আজকাল অবশ্য কাউকে নীচ কাজ (মেথর) করতে দেওয়া হয় না।

খোয়া জাতি কবে কোথা থেকে কামেঙ্গে এসেছে, তারও কোন সঠিক হদিশ পাওয়া যায় না। পূর্বে শেরদুকপেনরা এদের জনমজুরের মত খাটাতে। তার পরিবর্তে কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য শ্রম-দক্ষিণা হিসেবে দিত। 'আকা' জাতিদের জন্যও খোয়ারা ক্ষেতে জনমজুর হিসেবে কাজ করত। বাড়ীঘর বানিয়ে দিত। কিন্তু তার পরিবর্তে খুব সামান্যই মজুরী পেত। এক কথায় এরা শেরদুকপেন এবং আকাদের অনেকটা কেনা গোলামের মত ছিল। আজকাল সেই জবরদস্তির হাত থেকে ওরা রেহাই পেয়েছে। অন্যদের ছেলেমেয়েদের মত এরাও লেখাপড়া শিখছে। এদের গ্রামেও লোয়ার প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এদের পোশাক-পরিচ্ছদ 'মিজো' জাতির পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে অনেক মিল আছে। কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত এক লম্বা কাপড়ে ঢেকে রাখে। তার নীচে অনেকটা আমাদের সেমিজ-জাতীয় পোশাক পরিধান করে মেয়েরা। পুরুষেরা কাঁধে পিন দিয়ে আটকে রাখে কাপড়টি। এরা বনন-শিল্পে মোটেই পারদর্শী নয়। বরং শেরদুকপেনরা বিশেষভাবে পারদর্শী। তাই বস্ত্রাদির জন্য এরা বিশেষভাবে শেরদুকপেনদের উপরেই নির্ভরশীল।

একরকম পুঁথির মালা এরা খুব পছন্দ করে। আশেপাশে জাতিদের মধ্যে কেবল খোয়াদের মধ্যেই এই মালার রেওয়াজটা খুব বেশী দেখা যায়। সব সময়েই এদের সাথে দা থাকে। দা-এর বাঁট তৈরী হয় বাঁশ, কাঠ অথবা রৌপ্যের দ্বারা। রৌপ্যের কাজ খোয়ারা জানে না। শেরদুকপেনদের কাছ থেকে কিনতে হয়।

খোয়ারা মিথন, ছাগল, শুকর ও মুরগী প্রতিপালন করে। মিথন এদের কাছে বহুমূল্য স্বরূপ। যেখানে বহুমূল্যের আদান-প্রদানের কথা হয় নিজেদের মধ্যে, তখন তা মিথনের আদান-প্রদানের মারফৎ হয়। তারপরেই ছাগল। ছাগলের বিনিময়ে ওরা বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করে।

আরও একটি মজার রীতি আছে। খোয়া পুরুষেরা মিথন, ভেড়া, ছাগল, হরিণ, গাই, শুকর এবং মুরগীর মাংস ভক্ষণ করতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা ভেড়া এবং মুরগীর মাংস ভক্ষণ করতে পারে না। অবশ্য এই রীতির সঠিক কারণ কেউই বলতে পারে না। মদ্য এরা সবাই পান করে।

চাষ এরা ঝুম প্রথায় করে। অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর এক-একটি নতুন ক্ষেত বেছে নেয়। পুরাতন ক্ষেতে আর পাঁচ থেকে সাত বৎসর চাষ করে না। ভূমির উপর এদের স্থায়ী অধিকার হয়। প্রয়োজনে অপরের জমিতেও চাষ করতে পারে। জন্য ফসলের ভাগ দিতে হয় না। চাষ করার পূর্বে অনুমতি নিতে সাধারণতঃ এরা জোয়ার, গম, আলু, আলু এবং নানাপ্রকার সব্জীর চাষ থাকে। শাক-সব্জী এরা প্রচুর পরিমা উৎপন্ন করে। নিজেদের চাহিদা মিটি আকা ও শেরদুকপেনদের দিয়ে—পরিবর্তে অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করে।

গৃহাদি তৈরীর রীতি আকা শের কপেনদের চেয়ে বিশেষ কোন পার্থ নেই। প্রথমে বড় বড় কাঠের খোঁটা পোঁ হয়। তারপর মাটি থেকে অন্ততঃ ৪ উঁচুতে বাঁশ ও তক্তা দিয়ে একটা বানানো হয়। তারই উপর তৈরী হয় বাড়ী। মঞ্চের নীচে থাকে ভেড়া, ছাগ শুকর কিংবা মুরগীর খোঁয়াড়। ঘরের ভিত যে চালা তৈরী হয় (সিলিং) তার রেখে দেয় ক্ষেতের ফসল। আলা কোন গোলা থাকে না। আজকাল বি শালীরা স্বতন্ত্র গোলাও বানাচ্ছে শস ভাণ্ডারের জন্য।

বহুপত্নী প্রথা আজও এদের প্রচলিত আছে। বিবাহাদি খুব ছোট বয়সে হয়। ছেলের যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে বাপ-মা বিয়ের কথাবার্তা একরকম করে দেয়। অবশ্য কন্যা নির্বাচন অদ্ভুত রীতিবিশেষ। কন্যা নির্বাচন অন্যান্য কথাবার্তা স্থির হওয়ার কুলপুরোহিত একটি মুরগী নিধন করেন তারপর মুরগীর মাংস দেখে রায় বিবাহ হতে পারে কিনা। নবদম্পতি হবে কিনা। এবং তার রায়ই চূড় নির্বাচন।

এরপরে বাপ-মা কথাবার্তা নিষ্প করে নেন এবং বিবাহের তোড়জোড়ে লে যান। বিয়ের দিন বরের পিতা বর ও যাত্রীসহ কন্যার গৃহে উপস্থিত হ কন্যাপক্ষ তখন একটি শুকর, কিছু কাপ চোপড়, গাই এবং অন্যান্য আহারাদি পানীয়ের উপঢৌকন দেন। এছাড়া কন পক্ষের তরফ থেকে আরও একটি ভোজে ব্যবস্থা করা হয়। তারপর বরপক্ষ কন্যার পিতামাতা এবং বরযাত্রীসহ আসেন নিজ আলয়ে। সেখানেও এক ছোটখাট ভোজের ব্যবস্থা হয়। কন পিতা বর ও বধূকে এক সেট করে ন বস্ত্রাদি দান করেন। কিছু বাসনপত্র দান করেন।

বিবাহাদি মামাতো অথবা খুড়তু ভাই-বোনদের মধ্যে চলে। কোন মৃত্যুর পর তার স্ত্রী নিজের দেবর ভাসুরের সাথে স্ত্রীরূপে থাকতে পা অবশ্য যদি সেরকম কোন- সম্বন্ধ না অন্য কাউকেও বিয়ে করতে পারে। কোন বিধিনিষেধ নেই।

মৃত্যুর পর খোয়া জাতির মধ্যে দেওয়ার রীতি প্রচলিত। আত্মীয়পরি মৃত হলে—তাকে গৃহ থেকে কিছু মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গর্ত কবর দেওয়া হয়। সাথে সাথে

শীবিতকালে ব্যবহৃত সব সামগ্রীকেও কবর দেওয়া হয়। কবরে মাটি চাপা দেওয়ার পর বড় বড় পাথরে সব ঢেকে দেওয়া হয়। মৃতের আত্মার শান্তির জন্য ক্রমাগত পাঁচ-দিন পর্যন্ত খাওয়াদাওয়ার জিনিস (ভোজ্য) তিনবেলা কবরের উপর দেওয়া হয়। পাঁচ-দিন পর ভোজের ব্যবস্থা হয় আর সারা রাত ধরে নাচ আর গান হয়, গ্রামের সবাই তাতে যোগদান করে।

পিতার সম্পত্তি পুত্রে পায়। আমাদের মতন পিতার মৃত্যুর পর তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সব ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। যদি কোন অবিবাহিত ভগ্নী থাকে, তবে তাকে ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত আর কিছু দেওয়া হয় না। অবশ্য পিতার মৃত্যুর পর ভগিনীর অন্য সব দায়িত্ব ভাইয়ের উপরই বর্তায় অন্ততঃ যতদিন না পর্যন্ত ভাই ভগিনীর কোন বিবাহ দিতে পারছে। বিবাহের পর কন্যার পিতার সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না। যদি মৃত পুরুষের কোন পুত্রসন্তান না থাকে, তাহলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভাইয়েরা হয়, স্ত্রী নয়।

প্রকৃতপক্ষে খোয়ারা কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী নয়। এরা বৌদ্ধও নয়, হিন্দুও নয়। তবে দুয়ের প্রভাব এদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাছাড়া স্থানীয় বিশ্বাসও প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের মধ্যে দেবতা ও প্রেতাত্মার পূজা হয়। সেই পূজাতে তাদের সামনে গরু, ভেড়াকে বলি দেওয়া হয়। দেবতার সামনে বলি দেওয় হয় দেবতার ক্ষমতার অনুসারে। দেবতা যদি খুব শক্তিশালী হয়, তবে বলিও খুব বড় আকারের হয়। দেবতার ক্ষমতা যদি ছোটখাট হয়, তাহলে তার সামনে বলিদানও ছোটখাট জীবেরই হয়ে থাকে। এসবই হয়ত আমাদের তান্ত্রিকতার সাথে মেলে।

একবার বীজ বপনের সময় পূজা করা হয়। আবার ফসল কাটার সময় পূজা করা হয়। চস্রম নামক দেবতাকে এরা সর্বশক্তি-মান বলে থাকে। কারণ সে অতি দয়ালু দেবতা। যা কিছু তার কাছে মানত করা যায়, সে তাই মেনে নেয়। জানুয়ারী মাসে যখন ঘরে ঘরে ফসল ওঠে, তখন এরা পাঁচদিনব্যাপী চস্রম দেবতার পূজা করে। পূজাতে নানা পদার্থের সম্মিলিত উপাচার দেওয়া হয়। আহারাদি, পানীয়াদি এমনকি পশুবলি পর্যন্ত। পাঁচদিনব্যাপী এই পূজাতে গ্রামের লোক কেউ বাইরে যেতে পারে না এবং বাইরের কোন লোক গ্রামেও আসতে পারে না। পূজাতে সবাই সম্মিলিত হয় এবং বাড়ী বাড়ী থেকে নানাবিধ উপাচার সংগ্রহ করা হয়। উৎসবের এই ক'দিন নাচগান ও সুরাপান সবই চলে।
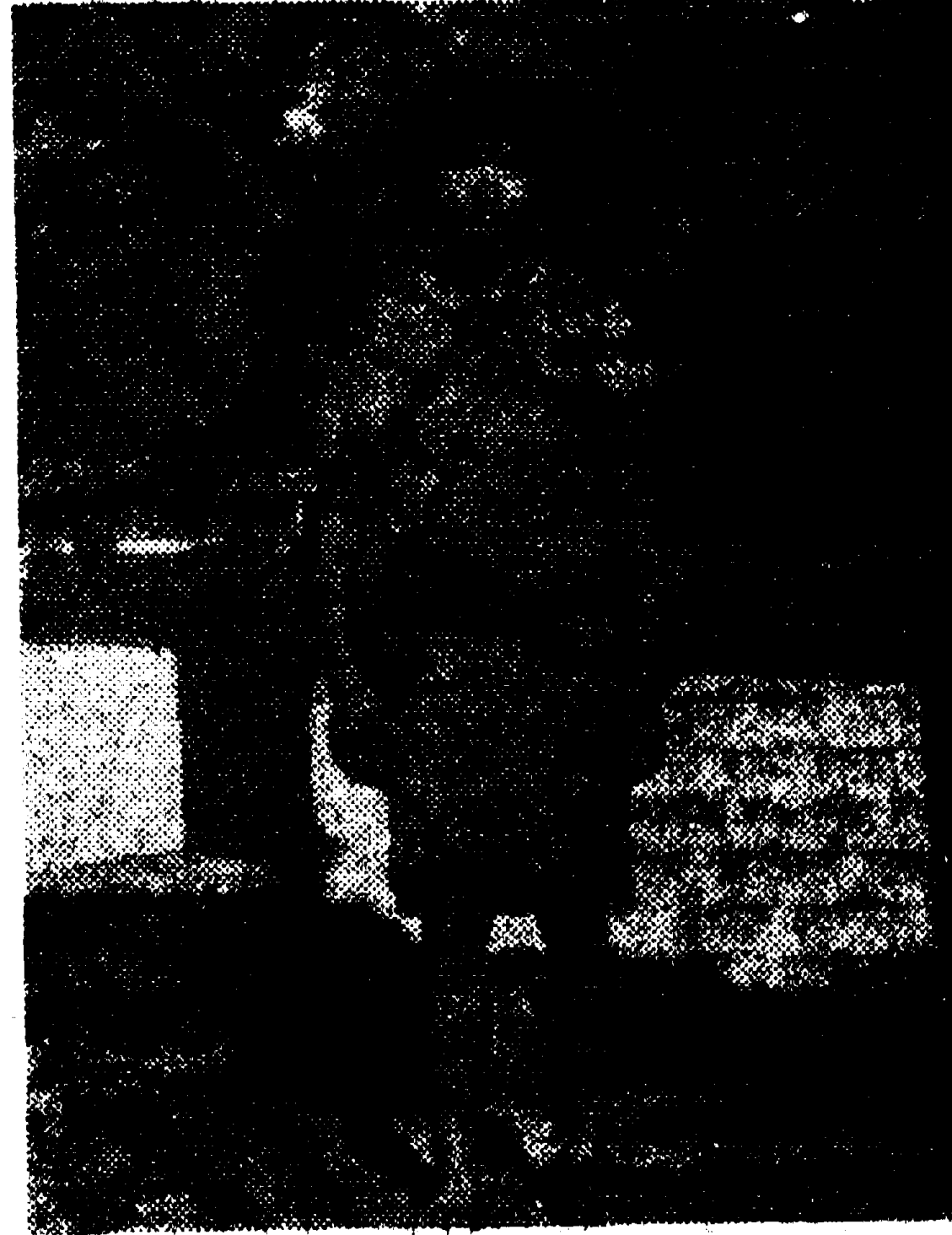
আস্তে আস্তে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। আসামের গ্রামে গ্রামে যেরকম নামঘর থাকে সেইরকম একটি নামঘর কালিম্প গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন পুরোহিতও আছেন। কালক্রমে কোন একটি ধর্ম প্রভাব লাভ করতে পারে।

খোয়া কিশোরী

খোয়া পুরুষ

গ্রামের শাসনব্যবস্থা গ্রামের লোকদের হাতে। এবং তা অত্যন্ত গণতান্ত্রিক উপায়েই করা হয়। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে কমিটি থাকে। কমিটি তিনজন গাঁও-বুড়োকে নিয়ে গঠিত। তাদের পদমর্যাদা—প্রথম গাঁও-বুড়া, দ্বিতীয় গাঁও-বুড়া এবং তৃতীয় গাঁও-বুড়া। দুজন করে গ্রামের চৌকিদার থাকে। এছাড়া [illegible] [illegible] থাকে। তাদের কাজ গাঁও-বুড়োদের [illegible] করা। এছাড়া তাদের অন্য কোন কাজ নেই।

গাঁও-বুড়া সকলের বিবাদ মেটাবেন। জরুরী প্রয়োজনে গাঁয়ের সবাইকে সমবেত করবেন। গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। এক কথায় প্রথম গাঁও-বুড়া গ্রামের প্রধান নেতা। গ্রামের [illegible] তিনিই ত্রাতা।

রঙ্গনবাব রঙ্গনায়িকা

নর্তকী মুন্নি বেগম

অংশুরঞ্জন সেন

(পাঁচ)

সেদিন এক নতুন রূপ নিয়েছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ। সে তার পুরাতন মূল্য হারিয়ে পা দিয়েছে এক স্বতন্ত্র পথে। সে-পথে এক অচেনা ভিন্নধর্মী পরিবেশ চির-পরিচিত ধারাটিকে ঠেলে দিয়েছে বিস্মৃতির গন্ডে। তারই সঙ্গে সেখানে এক আকস্মিক রূপান্তর ঘটেছে রাজনীতিক এবং অর্থ-নীতিক বনিয়াদের। আর তার প্রতিভূ হকে নবাব মীর জাফর তখন বাংলার মসনদে আসীন। কিন্তু রাজ্যশাসনের বদলে তিনি প্রমোদে গা ঢেলে দিয়েছেন। মেতে উঠেছেন সুরা, সংগীত আর নর্তকীদের নিয়ে। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর কানে গেল মুর্শিদাবাদে এক নটীর আবির্ভাবের কাহিনী। সেই নটীর সুরেলা কণ্ঠ আর অপূর্ব নৃত্য-ভঙ্গিমা নাকি রাজধানীকে মুখর করে তুলেছে। শুনে নবাব চঞ্চল হলেন। তিনি সানন্দে আমন্ত্রণ জানালেন নটী ও তার সম্প্রদায়কে।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করল নটী। সহচরীদের নিয়ে একদিন সে হাজির হল নবাবের প্রমোদসভায়। তার অতুলন রূপের ছটায় অনেক সুন্দরীর আসন টলে উঠল। গোপন ঈর্ষা জাগল তাদের মনে। কিন্তু তা অন্তরেই চেপে রাখতে হল। অন্যদিকে নবাব হর্ষোচ্ছ্বাসে রূপসী নটীকে অভিনন্দন জানালেন। সেদিন শুধু তাকে নিয়েই আসর বসল। সেই নটীর নূপুরনিক্কন আর সুরের ঝঙ্কারে মোহমুগ্ধ হলেন নবাব। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর হাত ধরে হারেমে নিয়ে প্রধানা বেগমের আসনে বসালেন তাকে। ক্রমে ক্রমে এই নটীই হলেন বাংলার রাজপ্রতিনিধি আর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশ্বস্তা বন্ধু। এই নারীই বহুখ্যাত মুন্নি বেগম।

এই নেপথ্য নায়িকার জন্ম অতি সাধারণ ঘরে। সিকান্দ্রার অদূরে বোলকুন্ডা গ্রামের এক দরিদ্র বিধবার মেয়ে ছিল মুন্নি। অভাবের তাড়নায় মা তাকে বেচে দেন বিশু নামে ধনী সম্মন আলি খাঁর এক ক্রীতদাসীর কাছে। বিশু পাঁচ বছর দিল্লীতে কাটিয়ে-ছিল। সেখানে সে মুন্নিকে নৃত্যে পার-দর্শিনী করে তোলে। তারপর অল্পকালের মধ্যেই মুন্নির নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এভাবে দেশের পর দেশ ঘুরতে ঘুরতে এক-দিন সে আর তার দল হাজির হল মুর্শিদাবাদে। আর সেখানেই হল তার ভাগ্যো-দয়। সম্মন আলি খাঁর মেয়ে বুব্বুও পরে মীর জাফরের অন্দরমহলে পেয়েছিল স্থান।

মুন্নির প্রধানা বেগম হওয়ার মূলে সাহায্য করেছিল তাঁর কর্মনৈপুণ্য, চাতুর্য আর নবাবের প্রতি অকপট ভালবাসা। এর ফলে তিনি মীর জাফরের বৈধ পত্নী অর্থাৎ মীরনের মা শা খানমকেও ঠেলে দিলেন অপাঙ্ক্তেয়ের অন্তরালে। এভাবে মুন্নি তাঁর উত্তরজীবনে মীর জাফরের সমস্ত ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হতে পেরেছিলেন। আর এই ঐশ্বর্য মীর জাফর সিরাজের মোতিঝিল প্রাসাদ থেকে সরিয়েছিলেন। মুন্নি বেগমের
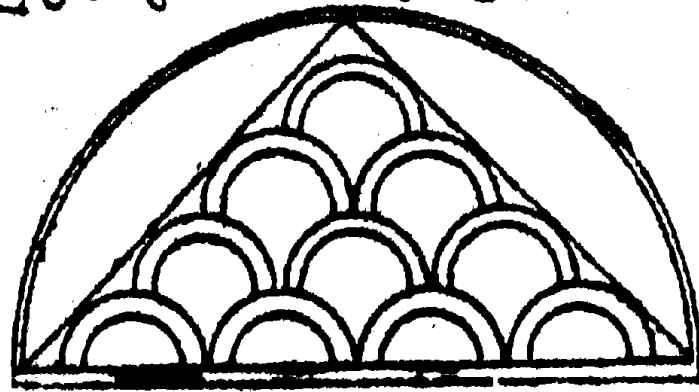
…জাত মীর জাফরের দুই ছেলের নাম …দ্দৌলা আর সৈয়েফউদ্দৌলা। অপরদিকে …বেগমের ছেলের নাম ছিল মুবারক…লা।

…৭৬৫ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি মুর্শিদা… মীর জাফরের জীবনাবসান ঘটে। সম… …ক একজন লেখকের মতে, মুন্নি …নাকি তখন তাঁর ছেলেকে মসনদে …ার জন্যে ইংরেজ কোম্পানিপ্রধানকে …উৎকোচ দিয়েছিলেন। কলকাতার …দল মুর্শিদাবাদের মসনদে মীর …র নাবালক ছেলে অর্থাৎ তাঁর একমাত্র …ন্তান মীরনের দাবী নাকচ করে মুন্নি …র পনেরো বছরের ছেলে নজমউদ্দৌলার …তুলে দিলেন শাসনভার। মৃত্যুর আগে, …জাফর পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে …ছলেন ক্লাইভকে দেওয়ার জন্যে। …দ্দৌলার শাসনকালে মুন্নি বেগম …সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মৃত …র নির্দেশ রক্ষা করেন।

…১৭৬৬ সনের ৮ই মে নজমউদ্দৌলা …আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর তাঁর …ভাই মসনদে বসলেন বটে, কিন্তু …২ সনের মার্চ মাসে তাঁরও হল অকাল…। ফলে বব্বু বেগমের বারো বছরের …মুবারকউদ্দৌলাকেই বসানো হল …দে।

মুন্নি বেগম তাঁর ছেলেদের শাসনকালে …বতই প্রাধান্য পেয়েছিলেন আর তাঁদের …ারের রক্ষণাবেক্ষণেরও ভার ছিল তাঁর …। কিন্তু তাঁর মহৎ প্রবৃত্তি এবং বহুল …র সহকারী নবাব মুহম্মদ রেজা খাঁকে …ন্বিত করে তুলল। তিনি বব্বু …কে বসাতে চাইলেন মুন্নির জায়গায়, …এর জন্যে তিনি দুই বেগমকে এক …দ্বন্দ্বে ফেলে তাঁর কাজ হাসিল …লেন। বব্বু সে সময়কার গভর্নর কার্টি… …র কাছে তাঁর দুঃসহ অবস্থার কথা …নিয়ে তাঁর ছেলের পরিবারের কর্তৃত্ব দাবী …লেন। কার্টিয়ার এ সম্বন্ধে কিছুই …তেন না। তিনি সেই মুহূর্তেই মুর্শি… …দের নায়েব দেওয়ানকে বেগমদের অবস্থা …ন্ধান করতে লিখলেন। এর উত্তরে …খাঁ এই প্রস্তাব করলেন যে, যদিও …তপক্ষে সম্মানের পদ বব্বু বেগমেরই …, তবু এই দুজন বেগমকে সমান …া এবং কর্তৃত্ব দেওয়াই ভাল।

…কিন্তু গভর্নরের মতে এরকম এক …থা দুই বেগমের বিবাদ মেটানোর বদলে …ক চিরস্থায়ী করে তুলবে। তাই তিনি …সিদ্ধান্ত করলেন যে আসল ক্ষমতা …ান নবাবের মা বব্বু বেগমেরই হাতে …া হবে আর অপরদিকে প্রথা ও শিষ্টা… …রক্ষা করে তিনি মুন্নি বেগমকে তাঁর …স্থানীয়া হিসেবে শ্রদ্ধা করবেন। …ার সেই অনুসারে মুন্নি বেগমকেও …লেন যে, বর্তমানে যেহেতু মসনদ …রকউদ্দৌলার অধিকারে রয়েছে সেই …ে তাঁর পরিবারের দায়িত্ব তাঁর আপন …র হাতেই ছেড়ে দেওয়া …

কাজ। এরপর ১৭৭০ সনের জুন মাসে মুহম্মদ রেজা খাঁ এবং মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মিঃ বেচার গভর্নরের আদেশ অনুযায়ী নবাব-পরিবারের সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন বব্বু বেগমের ওপর।

মুহম্মদ রেজা খাঁ ছিলেন একজন প্রভাবশালী মানুষ। তিনি ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা এবং লর্ড ক্লাইভের বন্ধু। নবাব নজমউদ্দৌলার নাবালক অবস্থায় তিনি মুজফফর জঙ উপাধিধারণ করে নায়েব নাজিম বা সহকারী শাসকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারপর সৈয়েফউদ্দৌলা এবং মুবারকউদ্দৌলার অধীনে তিনি এই দপ্তরের সঙ্গে নায়েব দেওয়ানের কাজ চালিয়ে কার্যতঃ বাংলার শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

কিন্তু শাসনকাজে রেজা খাঁ ছিলেন অপরিণামদর্শী। তাঁর পীড়ননীতি আর অতিমাত্রায় রাজস্ব আদায়ের ফলে বাংলার অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা রইল না। ইতিপূর্বে ১৭৬৯ সনে অনাবৃষ্টির দরুন শীতের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল: কিন্তু রাজস্ব আদায়ের রীতি রয়ে গেল অপরিবর্তিত। ফলে ১৭৭০-৭১ সনে দেখা দিল সর্বগ্রাসী 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। এর আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক। আবার অন্যদিকে জেগে উঠল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এই সন্ন্যাসীরা লুণ্ঠন ও আক্রমণ চালিয়ে বিপর্যস্ত করে দিল বাংলার শাসনব্যবস্থাকে। কোম্পানীর পরিচালকরা সন্ত্রস্ত হয়ে তখন ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর করে পাঠালেন এই সংকটময় অবস্থার প্রতিকারের জন্যে। ১৭৭২ সনে বাংলায় পৌঁছে তিনি স্বরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের আদেশে রেজা খাঁকে প্রবঞ্চনা এবং তহবিল তছরূপের অভিযোগে বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে এলেন বিচারের জন্যে।

এবার কোম্পানী রাজস্ব আদায় এবং সমস্ত জমি তত্ত্বাবধানের ভার পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নিল। বিভিন্ন জেলার ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের জন্যে হেস্টিংসের সভাপতিত্বে একটা 'কমিটি অফ সারকিট' বা 'ভ্রাম্যমান সমিতি' গঠন করা হল। কাশিমবাজারে এই সমিতির অবস্থানের সময় হেস্টিংস নবাবের প্রাসাদ পরিদর্শন করতে যান। মুন্নি বেগমের বয়স তখন পঞ্চাশ। হেস্টিংস কমিটির মত নিয়ে মুন্নিকে বার্ষিক এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ভাতার ভিত্তিতে নবাবের অভিভাবিকা নিযুক্ত করলেন। এছাড়া তাঁর দেওয়ান হিসেবে মনোনীত হলেন মহারাজা নন্দকুমারের ছেলে রাজা গুরুদাস। বেগমের এই মনোনয়নের সমর্থনে কমিটি তাঁদের যুক্তি দেখিয়ে এক ক্ষুদ্র বিবরণী পেশ করলেন ১৭৭২ সনের ১১ই জুলাই :

'আমরা স্বর্গত নবাব মীর জাফরের বিধবা পত্নী মুন্নি বেগম ছাড়া এমন আর কারো কথাই জানি না যিনি নবাবের অভিভাবক হওয়ার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা রাখেন। বেগম তাঁর মর্যাদাবলে এই প্রাধান্য পেতে পারেন আর এতে আমাদের নিজেদের কর্মপন্থায় কোন বিপদ ঘটবে না। অপরদিকে দেশের আইন ও আচার অনুসারে রচিত স্ত্রীজাতির নির্দিষ্ট নিয়মগুলির সঙ্গেও এই নিয়োজনের কোন অসংগতি চোখে পড়বে না, কারণ বেগমের কর্তৃত্ব নবাবের প্রাসাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে আর যেসব ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং প্রকাশ্যে বার হতে পারছেন না সেসব ব্যাপারে অবশ্য দেওয়ানই কাজ করবেন। যদিও একজন পর্দানশীনের কাছ থেকে অসামান্য কর্মক্ষমতা প্রত্যাশা করা যায় না, কিন্তু এসব ব্যাপারে তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিমতী। আর এরকম একটা সীমিত দায়িত্বের জন্যে কোন অসাধারণ বুদ্ধিবিস্তারের প্রয়োজন হয় না।'

কিন্তু কুৎসারটনাকারীরা থেমে রইল না। তারা একথা প্রচার করল যে মুন্নি বেগমের অর্থই নাকি হেস্টিংসকে তাঁর সমর্থক করে তুলেছে। কিন্তু আসলে এক গূঢ় অভিপ্রায় ছিল হেস্টিংসের। আর সেই কারণেই তিনি এই কাজে নেমেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবাবী শাসনকে রেজা খাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত করা। সাত বছর ধরে রাজ্যশাসনের প্রতিটি বিভাগেই ছিল রেজা খাঁর একচেটে কর্তৃত্ব। তাঁর বর্তমান অসম্মানের পরেও নবাবের পরিবার এবং রাজধানীতে তাঁর প্রভাবের মাত্রা খুব বেশি ক্ষুন্ন হয়নি। তাই বিশেষ করে তাঁর এই প্রভাবের বীজ উৎপাটন করার উদ্দেশ্যেই মুন্নি বেগম আর রাজা গুরুদাসকে মনোনীত করা হল। আর একই কারণে নবাবের মা বব্বু বেগমকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি অন্তরে ছিলেন রেজা খাঁর পক্ষপাতিনী।

ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৭৭৪ সনের ২০শে অক্টোবর, আর সেসময় একটা নতুন কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল চারজন সদস্য নিয়ে। এই চারজন সদস্য হচ্ছেন মিঃ ফিলিপ

ফ্রান্সিস, জেনারেল ক্লেভারিং, জেনারেল মনসন এবং রিচার্ড বারওয়েল। এঁদের মধ্যে বারওয়েল ছাড়া বাকি তিনজন ছিলেন হেস্টিংসের ঘোরতর বিরোধী। এই দুই পক্ষের তীব্র মতভেদ ক্রমে এক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করল। এবার গভর্নর জেনারেলের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে তাঁদের অনেকদিনের জমানো বিদ্বেষ মেটানোর এক শ্রেষ্ঠ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁরা এই প্রধান অভিযোগ আনলেন যে, তিনি মুন্নি বেগমকে নবাবের অভিভাবিকারূপে নিয়োগ করার সময় তাঁর কাছ থেকে দেড় লাখ টাকার উৎকোচ নিয়েছিলেন। কিন্তু বেগম দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন : 'এই টাকা আতিথেয়তার প্রথা হিসেবেই দেওয়া হয়েছিল। এর আগে মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনে এসে প্রত্যেক শাসকই দৈনিক ২০০০ টাকা কিংবা সেইমতো পেয়েছিলেন যা বস্তুতঃ কোন শর্ত না করেই দেওয়া হয়েছিল।'

কিন্তু মুন্নি বেগমের পরিচালনা-পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐ তিন সদস্যের দল। সেই কারণে ১৭৭৫ সালের মে মাসে তাঁরা তাঁকে পদচ্যুত করলেন। তাঁরা এই নীতির সমর্থনে একথা বললেন যে বেগমের কোন বংশমর্যাদা নেই আর তিনি হচ্ছেন একজন ক্রীতদাসী এবং পেশাদার নর্তকী। তাঁদের মতে, এরকম একজন নারীর পরিচালনায় কোন ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে এগোতে পারে না। সুতরাং তাঁরা রাজা গুরুদাসের ওপর 'নিজামত' বা শাসনকর্তার পদের যাবতীয় কর্তব্যভার অর্পণ করলেন।

হতাশ হলেন হেস্টিংস। বেগমের এই আকস্মিক পদচ্যুতি বিভ্রান্ত করল তাঁকে। এ-ব্যাপারে তিনি মিঃ লরেন্স সুলিভান নামে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে ১৭৭৬ সনের ২১শে মার্চ এক চিঠি লিখে জানালেন :—

'তাঁরা বেগমকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করেছেন ; আমি কোম্পানির কর্তৃত্বকে অনধিকার হস্তক্ষেপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপদ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁকে এই পদে নিয়োগ করেছিলুম।'

হেস্টিংসের এই মন্তব্য থেকেই তাঁর আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে আমাদের চোখে। কোম্পানির স্বার্থের খাতিরেই তিনি বেগমকে অনুগ্রহ করেছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর মনে।

মুন্নি বেগম হেস্টিংসের একজন বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু হিসেবে কাটিয়ে গেছেন সারাজীবন। আজো কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ঐতিহাসিক আসবাবপত্রের অংশ হিসেবে একটি গজদন্তনির্মিত চেয়ার এবং ঐ বস্তুরই একটি ছোট টেবিল তাঁর বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ শ্রীমতী হেস্টিংসকে উপহার দিয়েছিলেন। অনেক বছর ধরে তারা ইংলণ্ডে হেস্টিংস সাহেবের দেশ ডেলসফোর্ডে রক্ষিত ছিল। তারপর তাদের এদেশে নিয়ে আসা হয়।

অপরদিকে মুন্নি বেগমের সুখ-সুবিধার প্রতি হেস্টিংসের যত্ন অব্যাহত ছিল শেষ পর্যন্ত। বেগমের কোন আবেদন তিনি কখনো নাকচ করেন নি, বরং তাঁর অনেক প্রস্তাব সময়োচিত মনে হয়েছে তাঁর কাছে। তাই ভারত ছাড়ার আগে তিনি ১৭৮৭ সনের ৩রা নভেম্বর কোম্পানির পরিচালকবর্গকে মুন্নি বেগমের প্রশংসায় এক আবেগময় চিঠি লিখে এই অনুরোধ করলেন যেন বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক মোটা বৃত্তি দেওয়া হয় তাঁকে।

রাজপ্রতিনিধির পদ থেকে মুন্নি বেগমের অপসারণের ফলে মুবারকউদ্দৌলা পেলেন মুক্তি। কিন্তু মুন্নি বেগম তখনো সমগ্র নবাব পরিবারের ওপর তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখার উপায় উদ্ভাবন করছিলেন, কারণ তাঁর অধিকার ছিল এক বিশাল সম্পদ আর তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ কুশলী। অবশ্য তাঁর সে-প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তবে তাঁকে মাসিক বারো হাজার টাকার এক ভাতা দিয়ে বেগমের মর্যাদায় থাকতে দেওয়া হল, আর এভাবে তিনি তাঁর শেষজীবন কাটিয়ে গেলেন মুর্শিদাবাদে। তাঁর ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য এতই বিশাল ছিল যে, মৃত্যুকালে তিনি পনেরো লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন।

১৭৯৩ সনে মুবারকউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বাবর আলি খাঁ অর্থাৎ দ্বিতীয় মুবারকউদ্দৌলা বসলেন মসনদে। কিন্তু ১৮১০ সনে বাবর আলির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার নিয়ে এক কলহ শুরু হয়। সে সময় মুন্নি বেগম প্রথম মুবারকউদ্দৌলার মেজো ছেলে অর্থাৎ বাবর আলির ভাই সৈয়দ আবুল কাশিমকে মসনদে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো বাবর আলির বড় ছেলে আলি জাহ্-র পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁকেই নবাবের পদে বসালেন।

বাংলার ইতিহাসে মুন্নি বেগম 'কোম্পানির পালিকা' নামে পরিচিতা। যেদিন তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে শোকে ও দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন সে-সময় একদিন লর্ড ক্লাইভ তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন—'আমরা আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ কোরবো, আর কখনো আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব না।' এটা বলা হয়ে থাকে যে কোম্পানিকে অতি প্রচুর পরিমাণে ভেট দেওয়ার জন্যেই বেগম 'কোম্পানির পালিকা' এই খেতাবটি পেয়েছিলেন।

'গদিনসীন' বেগম নামে পরিচিতা কয়েকজন শাসনকর্ত্রীর মধ্যে মুন্নি বেগম ছিলেন একজন। এঁরা হচ্ছেন নবাব-নাজিমদের প্রধানা রাজ্ঞী। বব্বু বেগমও লক্ষ টাকা ভাতা পেতেন। কিন্তু মুন্নি বেগম এই ভাতার সমস্ত টাকা দান ইত্যাদি পুণ্যকাজে খরচ করতেন। এই দানশীলতার অনেক নিদর্শন মেলে তাঁর জীবনে। একবার তাঁর এক পরিচারিকা অর্থাভাবে তার মেয়ের বিয়ে দিতে না পারার দরুন অত্যন্ত দুর্দশায় পড়েছিল। বেগম তা শুনে তৎক্ষণাৎ ৭০ থেকে ৮০টা সোনার মোহর এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে। এরকম দানকর্ম ছাড়াও তিনি আরো অনেক কিছুই করে গেছেন মানুষের জন্যে। মুর্শিদাবাদে যে চক্ মসজিদ আজো বর্তমান রয়েছে তা মুন্নি বেগমেরই কীর্তি। ১৭৬৭ সনে তিনি তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এভাবে কখনো আলো কখনো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে একদিন এই ঘটনাবহুল জীবনের অবসান হল ১৮১৩ সনের ১০ই জানুআরি। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এই বুদ্ধিমতী নারী শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন নেপথ্যে দাঁড়িয়ে। সে-পথে এসেছে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা বাধাবিঘ্নের ঢেউ। কিন্তু তিনি দমেন নি কখনো। স্থির ধীর চিত্তে তাদের প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছেন তিনি। তাঁর বিচারবুদ্ধি, মিতব্যয়িতা, এবং সব ব্যাপারে তাঁর অখণ্ড মনোযোগের দ্বারা তিনি নিজেকে যথেষ্ট যোগ্য প্রমাণ করেছেন। যে কোন কাজের দায়িত্ব একবার তাঁর ওপর পড়েছে তা তিনি নিষ্পন্ন করতে কখনো ব্যর্থ হন নি, কারণ সাফল্যের সোপানে পৌঁছে দেওয়ার কোন না কোন উপায় তিনি তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু তবুও শাসনব্যাপারে মুন্নি বেগম সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না। এর কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর এক হীনমনা, নিষ্ঠুর এবং মূঢ় সহকারী ইতবর আলির হাতে সব কাজের ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এবং এই ইতবর আলি ছিল অনেকেরই কষ্ট এবং অশান্তির কারণ। এখানেই বেগম করেছিলেন মস্ত ভুল। এরকম একটি লোকের হাতে এতখানি ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া তাঁর উচিত হয়নি। তিনি যদি তা না করে প্রতিদিন পর্দার আড়ালে বসে নিজেই মানুষের নানা অভিযোগ বক্তব্য ইত্যাদি শুনে কাজ করতেন তাহলে মুর্শিদাবাদের শাসনভার সহজে কখনো তাঁর হাত থেকে খসে পড়া সম্ভবপর হত না।

তাঁর মৃত্যু ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মনকে নাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে। এমন একজন বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুকে হারিয়ে তাঁরা শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তাই তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে ১৮১৩ সনের ১৪ই জানুআরি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে নব্বইবার তোপ দাগা হয় গভর্ণর জেনারেলের আদেশে। আর পতাকা

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু সুহৃদ গোপাল দত্ত

জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের প্রারব্ধ কর্মজীবন

বাশীষ ৰ্যীচত্তাত্মা ত্যাক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
ৰীরং কেবলং কর্ম
কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।
গীতা—৪।২১

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৪৭ সালে পণ্ডিচেরী আশ্রমে ন আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বার্ট। তের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্বে আকৃষ্ট দিব্য জীবনকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠক্রম তালিকাভুক্ত করলেন। হার্ভার্ড বদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ এ. সোরোকিন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন কে অবহিত হয়ে বললেন যে, বর্তমান র ব্যক্তিমানসের আদর্শ বিন্যাসের জন্য] জীবন' একটি অপরিহার্য পাঠ্য। রেকার [illegible] দর্শনশাস্ত্রের র্য ডক্টর পাইপার শ্রীঅরবিন্দের ষাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে ত্রী মহাকাব্যের মধ্যে লুক্কায়িত বজ্ঞানের অনন্য রূপায়ণকে প্রত্যক্ষ র অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন তাঁর e Hungry Eye গ্রন্থে। ইংলণ্ডেও ধ্বনিত হলো এক সুর—ভারতের দ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান যুগের দার্শনিক। মনীষী রেভারেণ্ড হিল বের ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ হলেন,

'the living embodiment of all the past spiritual achievement of India and also the Master-leader of her future spiritual destiny"
"Because Aurobindo is in this world, the world is becoming able to express progressively Unity in Diversity instead of Division, Love instead of Hatred, Truth-consciousness instead of Falsehood, Freedom instead Tyranny, Immortality instead of Death; it is becoming progressively that which it is; a movement of the Sprit in itself." (39)

---

(39) Would Review, October, 1949.

বৃটিশ বুক নিউজ বিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মবিজ্ঞানের ভাষ্যকার শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে লিখলো—

"Aurobindo promises to outshine all the latter-day prophet'.

এইভাবে নির্মাণমুক্তির ঋত্বিক ভারতবর্ষের সনাতন বাণীকে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের হৃদয়ে প্রবেশ করালেন তাঁর প্রজ্ঞার বিকিরণে। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের উপর গবেষণা করে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন হরিদাস চৌধুরী। ১৯৪৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলেন সুবিদিত 'কাট্টামাঞ্চ রামলিঙ্গ জাতীয়-পুরস্কার' নিবেদন করে।

১৯৪৯ সালে 'দিব্য জীবন' গ্রন্থের দি লাইফ ডিভাইন প্রাণপুরুষকে চাক্ষুষ দেখার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছলেন ডক্টর ফ্রেডরিক স্পীজেলবার্গ। এই সময়ে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্পর্কে বিশ্বের কৌতূহল প্রকাশিত হলো। সবাই জানতে চায়, আসতে চায় বিশ্ববাসীর এই অনন্য পীঠস্থানে। ১৯৪৯ সালের ২৪শে এপ্রিল—দর্শনের পবিত্র দিন এগিয়ে এলো। শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে দেখলেন সমাগত ভক্তবৃন্দরা। ঐ সময়ে বিদেশী অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী আলোকচিত্রশিল্পী হেনরি কার্টিয়ার ব্রেসন। তিনি এক অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব করলেন যা আশ্রমে নিষিদ্ধ ছিল দর্শনের সময়ে তিনি শিব ও শক্তির দুই প্রতিমূর্তিকে আলোকচিত্রে ধরে রাখবেন। বিগত চল্লিশ বছরের প্রথা অনুযায়ী সবাই জানত যে, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে প্রস্তাব সর্বজ্ঞের অনুমোদন লাভ করল। বিস্মিত হলেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে, এই আলোকচিত্র গ্রহণ প্রথম এবং শেষ—আগামী বছরের এই দিনে আশ্রমের প্রাণপুরুষ আলোকচিত্রের সীমিত গণ্ডির বাইরে চলে যাওয়ার প্রস্তুতিপর্বে ব্যস্ত থাকবেন। ঐ বছরের বিজয়াদশমীর দিনে শ্রীমার বাণীতে এই প্রস্তুতিপর্বের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল :

"It is the devil of depression and despondency that we shall slay to-night so that all those who have the sincere will to get rid of this disease will receive the necessary help to conquer"—

'depression' আর 'despondency' এই দুটি অসুর যে আশ্রমবাসীদের এবং শিষ্যভক্তদের খুব শীঘ্র আক্রমণ বা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করবে সেদিন কেউই কল্পনা করেনি।

১৯৫০ সাল। পৃথিবীর নানা দেশের জ্ঞানতপস্বীরা ভারতের বিজ্ঞানময় পুরুষের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্যে শ্রীঅরবিন্দের নাম প্রস্তাব করলেন সুইডেনের নোবেল পুরস্কার কমিটির কাছে চিলির নোবেল-লরিয়েট গাব্রিয়েল মিস্ত্রাল। প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে পাঠালেন আমেরিকার নোবেল-লরিয়েট পার্লবাক্। প্রস্তাবটি নির্দ্বিধায় গ্রহণীয় বলে সারা ভারত একবাক্যে সমর্থন-পত্র পাঠাল। কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষ তখন প্রারব্ধ-কর্মের শেষ

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ

পর্বে এসে নিরাকার জ্যোতির্লোকের পথে যাত্রার প্রস্তুতিকর্মে নিমগ্ন। যেখান থেকে তিনি পৃথিবীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রাণ-শক্তিকে মুক্ত করে, জাগ্রত করে মহাপ্রাণের মধ্যে লীন করে দেবার চেষ্টা করবেন—যে প্রচেষ্টার সাফল্যপর্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বিশ্ববাসীর দেবজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা, মর্তলোকের স্বর্গলোকে রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা। যেখান থেকে মানুষের মনে পরা-চেতনার আলোর স্পর্শে এনে মানুষকে তিনি দেবভাবে আনতে পারবেন। তিনি অমৃতের আস্বাদ পাবার পরে তৃপ্ত হননি, তাই জ্যোতির্লোক থেকে তিনি বিশ্বমানবকে অমৃতের আস্বাদ দেবার কাজ করে যাবেন যাতে পৃথিবীর মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী নিজেদের অমৃতের সন্তান বলে বুঝতে পারে।

স্রষ্টার সঙ্গে একাত্মবোধে সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্যের মূল সূত্রটি উপলব্ধি করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। বিধিলিপির প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন যে, নির্মাণ মুক্তিকামী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের প্রদর্শিত পথ অনুসরণে ব্রহ্মক্ষুধাকে জাগ্রত, প্রজ্জ্বলিত এবং পরিতৃপ্ত করে আগামীদিনের মানুষ দেবত্ব অর্জন করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর মানুষ ধ্যানশক্তির অধিকারী। সুতরাং ধ্যানের পথে তারা শরীর থেকে ঊর্ধ্বতন সূক্ষ্ম কোনো কিছুর দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম। এই অগ্রগতি বা ঊর্ধ্বগতি মানুষকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এনে দেবে। কিভাবে ঊর্ধ্বগতি হবে সে পথ দেখাবার জন্যেই তো নির্মাণ মুক্তিকামী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। শান্ত, সমাহিত, অব্যক্ত, নির্গুণ পরা-চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়িত হলো। এই আলোড়িত চেতনাতেই জন্ম নিলে স্বতঃআলোড়নশীল পরমাণু। গড়ে উঠল অণু। সৃষ্টি হলো গতিশীল পৃথিবী। মূর্ত হলো—উদ্ভব হলো জড় এবং … সৃষ্টির এই আদি লীলায় পরা-… স্বেচ্ছায় বন্দী হলেন। এই বন্দী হ… মধ্যেই সুপ্ত হয়ে রইল সৃষ্টির … চেতনায় প্রত্যাবর্তনের অবশ্যম্ভা… সম্ভাবনা। পরা-চেতনা ব্যক্ত হলেন, … হলো প্রকৃতি। প্রকৃতির রহস্যময় … মাঝেই লুকিয়ে রইল বিধিনির্দিষ্ট … নিয়তি। সেই পথে সৃষ্টি পরিক্রমা … বিবর্তনের ছন্দে। ক্রমবিবর্তনের ফলে … কিছু অবাঞ্ছিত তা চলে যাচ্ছে বা চির… লুপ্ত হচ্ছে এবং যা কিছু বাঞ্ছিত … থেকে যাচ্ছে, উন্নীত হচ্ছে, অগ্রগতি … সেই চিরবাঞ্ছিত ও বিধিনির্দিষ্ট … পথে। বিবর্তনের পথেই মানুষ এসে… মানুষের মধ্যে ব্রহ্মক্ষুধা এসেছে। মানু… মধ্যে সেই ক্ষুধা প্রজ্জ্বলিত করার … এসেছে। মানুষের মধ্যেই জন্ম নিয়ে … সেই ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করবার পথও … দেখাবেন তাঁরা। তাঁদের প্রদর্শিত … অনুসরণ করেই মানুষ এগিয়ে … ধারণার সীমা অতিক্রম করে অধিমান… অতিমানসের গভীরে। যেখানে … সময়েই বিবর্তনের গণ্ডিকে সে … করবে। তার ক্রমিক নিবৃত্তি … বিবর্তনের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিবর্তনের … গিয়ে সে অজ্ঞ থেকে সর্বজ্ঞ হয়ে … এবং মুক্তপুরুষ হিসাবে সে … হয়ে যাবে সেই সৎ চিৎ আনন্দময় … চেতনায়—যেখান থেকে কোন এক অতী… মুহূর্তে তার জীবনের যাত্রা … হয়েছিল। মনে হয় আমরা নিবর্… বিবর্তনের হাইপারবোলিক … সংকীর্ণতম মোহনায় এসে পড়েছি … এবং আকস্মিকতায় মোড় ঘোর… ঊর্ধ্বপানে উঠে চলব অপ্রতিহত … গতিতে। ...বিংশ শতকেই সর্বপ্রথম মন … উপলব্ধি করল বিবর্তনের ভবিষ্যৎ … নূতনতর পর্যায়ের আবশ্যকতা ; এবং … আমাদের চেতনার ও সংকল্পের একটি … উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে আজ। ইতিপূর্বে … কখনো প্রকৃতিকে তার নিজের পক্ষে … সম্বন্ধে এভাবে ভাববার সুযোগ … হয়নি, এবং নিজের অন্তর্নিহিত … সুদিব্য পরিণতির দিকে ত্বরান্বিত গতি… অগ্রসর হবার অবকাশও সে পায়… প্রকৃতির ঊর্ধ্বমুখী এই অভিযান সম্প… আমরা যে ভাবতে শিখেছি এবং আমা… মনেও পাচ্ছি তারই সমর্থনে তীব্র … আস্পৃহা, এবং তার সহযোগিতা কর… সুযোগও—এ-ই তো স্পষ্ট লক্ষণ যে, … বিবর্তনের পথে যথেষ্ট নিবর্তিত হ… অনেক বেশি শক্তিশালী এবং দ্রু… পদক্ষেপে, ইতিহাসে এই প্রথম। কা… এই প্রক্রিয়ার সিদ্ধি আসতে যে শত… বছর লেগে যাবে না, তা নিশ্চি… এমন কি, কে জানে, হয়তো বা রূপান্ত… সেই জ্যোতির্ময় মানবের সূচনা আম… মধ্যে ইতিপূর্বেই সম্ভব হয়েছে? … অনেকেই বিশ্বাস করেন, শ্রীঅরবি…

...বং পরমজ্ঞানের জ্যোতির্ময় সেই মহা-...নবদের প্রথম জন, তাঁর পণ্ডিচেরী আশ্রম ...ক গবেষণাগার যেখানে অতিমানবের ...বর্তন চলেছে।......শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন ...লেননি যে, সমগ্র মানবতাই হঠাৎ করে ...কদিন রূপান্তরিত হয়ে যাবে, সেই ...্যাতির্ময় মানবতায়। সমস্ত পরমাণুই কি ...ফিউ জারিয়াল প্লান্টে' পরিণত হয়, না ...স্ত বানরই মানুষে? তেমনি, সব মানুষই ...তে পারবে না অতিমানব। মানুষ ...কবেই, এবং তারাই পরবর্তী জীবজাতির ...ত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।' (১৯)।

'......দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে ...রাট সাধনার সূত্রপাত করেছিলেন, ...বেকানন্দের পর, শ্রীঅরবিন্দই তার ...রিপূর্ণ সম্ভাবনাকে প্রকট করে গেলেন। ...নবসভ্যতার ইতিহাসে মানবসাধনার চরম ...ঙ্কটের লগ্নে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মানবসভ্যতার ...ত্তির যে পথনির্দেশ করে গেলেন, তাঁর ...্রিয়তম শিষ্য সেই পথ অনুসরণ করে সেই ...দর্শকেই বিশ্বমানবের চেতনায় অনু-...বিষ্ট করে দিয়ে গেলেন, বিবেকানন্দের সেই অসমাপ্ত কাজকেই সম্পূর্ণ করে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দের জীবনে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বিশেষ অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলো। ভারতের ইতিহাসের মধ্যে মানবতার চরম অভিব্যক্তির যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল, এই তিনজন মহাপুরুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায় তা অখণ্ডভাবে পরিপূরিত হয়েছে। বাইরের হীনবল অসহায় ভারতবর্ষের বাস্তবতার আড়ালে যে অবিনাশী শাশ্বত ভারতবর্ষ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, ভারত ধর্মতত্ত্বের ত্রিমূর্তির মত এই তিনজন মহাপুরুষ সেই শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বচেতনার মনচিত্তে চিরদীপ্যমান করে দিয়ে গেলেন। এবং একদিন সমগ্র জগৎকে যে ভারতবর্ষের কাছে মাথা নত করে আসতে হবে, আমাদের চরম সৌভাগ্য, আমাদের চোখের সামনে দেখলাম, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সেই অমর ভারতবর্ষের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রবাণীতে শুনলাম, সেই ভারত-যজ্ঞে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণ-লিপি—বেদে-উপনিষদে ছিল ভারত-ঋষির অমৃতত্বের যে প্রতিশ্রুতি, শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনে পেলাম তার পরিপূর্তি।..... ভারতবর্ষের যে যোগবিজ্ঞান সাধনহীনতার অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দের অপরূপ মানবীয় সাধনায় দিয়ে গেলেন তাকে দিব্যজ্ঞানের মর্যাদা, তপস্যায় উত্তীর্ণ হলেন মানবীয় ক্রমবিবর্তনের অনিবার্য পরবর্তী স্তরে......মনের ঊর্ধ্বে অতিমানস লোকে...এবং সেই অতিমানসের বিচ্ছুরিত আলোর ইঙ্গিত দৈব-অনায়াসে রচনা করে গেলেন, মানব মনের মহাকাব্য 'সাবিত্রী'... মনের ঊর্ধ্বে সেই অতিমানসের আলোক লেখা অপরূপ মহাকাব্য।' (৪০)।

১৯৫০ সালের ১৫ই আগস্ট চলে গেল। শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'সাবিত্রী' মহাকাব্য শেষ করতে হবে। দেহে ব্যাধির প্রাধান্য প্রকাশ পাবার চেষ্টা করছে কিন্তু যোগীশ্বরের উপেক্ষা ব্যাধিকে সংযত করে রেখেছে। 'সাবিত্রী'র দুটি সর্গ তখনো বাকী—'দি বুক অফ ফেট্' এবং 'দি বুক অফ ডেথ্'। উনি বলে যান এবং ডাক্তার নীরদবরণ শ্রুতিলেখকের কাজ করেন। গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের 'দি বুক অফ ফেট্' রচনা শেষ করবার জন্যে। এই ব্যস্ততার মধ্যে কিসের ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল তা সঠিক কেউই বুঝতে পারেনি—অবশ্য শ্রীমার কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষ দিব্য-দৃষ্টির অভাবে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এগিয়ে চলে তার অভ্রান্ত উত্তর থাকবে এই রচনার মধ্যে। দেবী সরস্বতী গুরুদেবের জিহ্বাগ্রে আশ্রয় নিলেন—অলকানন্দার মত প্রবাহিত হতে থাকল কাব্যস্রোত। সেই মহাকাব্য রূপান্তরণের ধৃষ্টতা না করে সেই দিব্য-বাণীর ছায়াশ্রয়ে কয়েকটি ছত্র লেখা হলো।

অভ্যুত্থান।
মানুষের মনে—
জ্যোতিধারা স্নানে—
দিব্যভাব—সুপ্ত, অর্ধ-বিকশিত—
হবে প্রস্ফুটিত।
হবে মুক্ত গুহাদ্বার—হৃদয়ের—
জাগে পদধ্বনি—দিব্য-জীবনের।
মহাদ্যুতি বিকিরণে,
সঞ্জীবন প্রাণে প্রাণে।
প্রজ্ঞার বোধনে হবে নব-জাগরণ।
দীর্ণ তমো-আবরণ—নামে প্রজ্ঞার প্লাবন।

রিপু-ভস্ম শুভ্রদেহী অমৃত-সন্তান—
অঙ্গে সাম্য-সজ্জা, হাতে একতা-নিশান—
সেই মৌন দিব্য-যন্ত্র,
জপে পরা-মন্ত্র—
'মুমুক্ষু জীবের মুক্তি, বিশ্বের কল্যাণ'—
কামনা-বিহীন কর্মে আত্ম-বলিদান।

নারায়ণ—স্থাবরে-জঙ্গমে বন্দী।
পরম-ব্রাহ্মণ—ঈক্ষা-চক্ষে,
প্রকাশে সগুণে।
বিবর্তনে ব্যক্ত বিভু।
দিব্য-লীলা—
অন্তে যাবে অন্তকালে।
পরা-ব্রহ্মে পূর্ণলীন—নিবর্তনে,
কল্প-অন্তে—প্রতি-আবর্তনে।

কার ইন্দ্রজালে—
বিশ্ব-বিবর্তন ঊর্ধ্বপথে চলে?
ধরাধামে, স্বর্গের সুষমা নামে?
ধূসর-ধরণী শোভে, অপরূপ-শুভ্র-সাজে?
ভরে মধুগন্ধ—অণু-পরমাণু মাঝে?
দিব্য-রেণু স্পর্শে, দিব্য-শিহরণে
এ কোন প্রস্তুতি আসে প্রকৃতির প্রাণে?

আসন্ন বুঝি বা—সেই শুভক্ষণ—
যবে বিধি-বরে মর্ত্যে হবে অভীষ্ট রতন—
সৎ-এর চেতনা ভরা সে দিব্য-জীবন।

ভূমায় কল্যাণে নামে কল্যাণ-সুন্দর—
জ্যোতির্ময়, প্রেমময়, শান্তির নির্ঝর।
সাজে পরা-কন্যা—
সগুণ-প্রকৃতি-আলোর কিরীটে,
আলোর বাহনে চড়ি' যায় ঊর্ধ্ববাটে।
জগতের চেতনায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিকীরিত
—পরা-তেজ—
প্রাণেতে প্রাণেতে,
অণুতে অণুতে যেন শুভ্র-উপবীত।
অনন্য সজ্জায় বিশ্ব সাজে।
মর্ত্যে বুঝি নন্দন-কানন,
ধরণীর বৈকুণ্ঠের মাঝে।
প্রগতির ভ্রান্ত পথ ছাড়ি—
ব্যক্ত-চরাচর ব্যস্ত তাই জানাতে প্রণাম—
অভিজ্ঞাত অণিমায়—
অদ্বিতীয়ে—
সেই তৎ-সৎ-এ।
স্থাবরে-জঙ্গমে ঘেরি দিব্য-প্রতিচ্ছবি,
আনন্দ, করুণা, ঘেরা অপূর্ব প্রগতি।

জাগে সগুণ প্রকৃতি।
তৃপ্তির জোয়ার আসে মনে—
রুদ্ধক্ষুধা প্রশমিত—প্রাণে।
নিষ্প্রাণের মাঝে, প্রাণের স্পন্দনে—
শত শত অহল্যারা জাগে—
চলে অনন্তের টানে—
সাযুজ্য-সন্ধানে।
ছিন্ন মায়া আচ্ছাদন—
বিবস্ত্রা পৃথিবী।
নাশি মোহ-আবরণ—
বিজ্ঞাত মানব।
নাহি অন্য ধ্বনি—
সোঽহং সুশ্রুত।
কোথা ভিন্ন প্রাণী—
সবই অরূপ প্রসূত।
ব্রহ্মময় রূপ—
আত্মার দর্পণে
দিব্য দরশন।
সমাধিতে মুক্তি আস্বাদন।

মনোভূমি হতে ঊর্ধ্বে—
বিকশিত পারিজাতে—
অধিমানসের দিব্যমঞ্চে—
কাঁদে আত্মার অদৃশ্য দূত,
যেন ভগীরথ—
মূর্তিমান নীরব আকুতি—
কাঁদে কার পদ চুমি।
'দাও সাড়া'—হে সৎ-চেতনা,
অমৃত আধার।
ওগো পরম করুণা—
সাড়া দাও, সাড়া দাও
জীবনের পণে।
কোন ঊর্ধ্বলোক হতে নামে
মহাস্রোত। নামে
অতিমানসের আলো—
অধিমানসের দিব্যমঞ্চে।
আলোর জোয়ারে হলো
পরম-সম্ভব। ভগীরথ অর্ঘ্য দিল—

(১৯) পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সমা-সাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। পৃঃ ১৪৪-৪৫

(৪০) শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। গল্প-ভারতী। শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা।

মনোভূমি সিক্ত হলো—তমসায় অবরু
জ্যোতিস্নানে।

প্রজ্ঞার নির্ঝর মাঝে—
ব্রহ্মাণ্ডের উৎস হতে—
ধরণীর বুকে, মানবের মনে—
স্থাবরে-জঙ্গমে—
প্রকৃতির মহাজিজ্ঞান লাগি।
নির্মলা প্রকৃতি-হাসে
সংবর্ধিতে নবীন জীবন।
জ্যোতি বিকিরণে—
অবিদ্যার নিশি-অবসানে—
আসিবে নতুন ঊষা—
সত্য যুগে করিতে বরণ।
একাত্মের সুরে গাওয়া
অমৃত আত্মার গানে—
হবে সমবেত প্রেম সংঘে—
পৃথিবীর অমৃত-স্পন্দন।
কোষে কোষে,

তন্তুতে তন্তুতে,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
ক্ষরণে ক্ষরণে—
প্রবাহিবে দিব্যশক্তি—
দিব্য-শিহরণ।
মর্ত্ত্য হবে দিব্য-রবে গরীয়ান
সে এক মহান জীবন।

পরা আকর্ষণে মুক্ত হবে দেবতারা—
ধরণীর পুরন্দর হতে।
অধোমুখী বিশ্ববিবর্তন হবে ঊর্ধ্বমুখী—
হতে লীন অমৃত-সঙ্গমে—
মহা উত্তরণে। যাবে অস্তাচলে—
দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, ভেদ, নানাত্বের বিচিত্র-বিন্যাস—
যত কিছু দিব্য-পরিহাস।
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরে
—সত্য-শক্তি—
বিজ্ঞান-ভাস্কর, আনন্দ-আকর।
সেই এক পিতৃ-পরিচয়,
দীপ্ত রবে ধ্রুবতারা সম
—'সেই এক', 'সেই তৎ-সৎ
—ক্রম-বিবর্তনে।

অবতরণ।
বিশ্বের মুক্তি তরে—
নরে নারায়ণ।
বিধাতার-লিখন—
ঘুচাইতে মোহ-অন্ধকার
নামে অবতার।
শিখাইতে ব্রহ্মের বিজ্ঞান
আসে সত্যবান।
জাগাবে আত্মায় জাগরণ—
সেই দিব্য-উত্তরণ।
পাঞ্চজন্যে আসে আমন্ত্রণ।
'উঠ, জাগ, মুক্ত কর'—
সুপ্ত যাহা আছে অন্তঃপুরে।
শোন ধ্বনি, অন্তরে তোমার—
তোমারি কল্যাণে কাঁদে—
তোমারি হৃদয়ে বন্দী—
সেই সৎ-চিৎ, সেই আনন্দ-আধার।
মুক্ত করি—যেতে দাও তারে
অনন্তের পানে।
করো আত্মসমর্পণ।

কোটি জীবনের মাঝে,
অণুতে অণুতে বন্দী—
সত্যের চেতনা।
মুক্ত করো তারে—
ওহে মুক্ত কচ্ছ,
নির্বাণেরে করি তুচ্ছ—
নির্মাণের হও অধিকারী—
বিধাতার বরে।
বিশ্বজনে করি নিরঞ্জন—
দিব্য-কর্ম্ম কর সম্পাদন।
সুপ্ত দেব-ভাব ব্যক্ত হোক—
নীতি-আচরণে।
অনেকের দলে, কিছু পাক ঊর্ধ্বগতি—
কিছু রহস্যের সমাধান—
মুহূর্তের জ্যোতিস্নানে।
মধুভাবে নউ-নউ মনোবন—
নিসর্গ-দ্যোতনা মাঝে,
জীবনের মহা-উত্তরণ।
ঊষার বোধন।
নব সূর্য্যোদয়ে—
চেতনার স্তরে স্তরে—
জ্যোতির পরশে—
হৃদয়ের অরবিন্দ মেলে দল—
দিব্য-জাগরণ।
জ্যোতির্ময় নামে—
ভূমার কল্যাণে।
তরঙ্গের সমুত্থান—
স্থাবরে জঙ্গমে, অণু-পরমাণু মাঝে—
এ কোন প্রগতি! কোন ঊর্ধ্ব অভিযান—
কোন নিয়তি-লিখনে!
কর্মযোগী, ধর্মব্রতী,
প্রজ্ঞাবান দেবজ্যোতি
—নর নারায়ণ।
জাগে সুপ্ত ভগবান।
দেব-সংঘে কলরিত অমৃত-সন্তান।
নিসর্গ-সৌন্দর্যভরা—
অপরূপ মধুক্ষরা—
সে দিব্য-জীবন।
'রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে
তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে'—
হবে প্রতি-অবর্তন কল্পান্তের কালে—
নিয়তি-লিখন।

সাবিত্রী মহাকাব্যের সর্গ দুটি শেষ হলো। পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন মহাপুরুষ। ডাক্তার নীরদবরণ প্রশ্ন করলেন, 'বুক অফ ডেথ এবং এপিলগ' এই দুটি যে লেখা বাকি রয়েছে? 'ঐ দুটো? এখন থাক—পরে দেখব'—উত্তর দিলেন প্রসন্ন হেসে শ্রীঅরবিন্দ। নভেম্বর মাস পড়ল। শীতের সঙ্গে দেহযন্ত্রের বৈকল্য ধীরে ধীরে আশ্রমবাসীদের চিন্তিত করে তুলল। দেখতে দেখতে এসে পড়ল নভেম্বর মাসের দর্শনের দিন। কলকাতা থেকে এলেন বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সত্যব্রত সেন পণ্ডিচেরীতে। গুরুদেবকে পরীক্ষা করে বললেন, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডটি বড় হয়ে গেছে' সুতরাং অপারেশন প্রয়োজন। নিদেনপক্ষে, ক্যাথিটার দেওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সর্বজ্ঞ পুরুষ মত দিলেন না। রোগের প্রকোপ আসা-যাওয়া কর লাগল। দর্শনের দিন অসুস্থতা সত্ত্বেও পুরুষের ভক্তদের বিমুখ করলেন না। দর্শনও শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়ে উঠল রোগের খারাপ লক্ষণগুলো। ২৪ নভেম্বর কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক প্রভাত সান্যাল পণ্ডিচেরী থেকে টেলিগ্রাম পেলেন 'ক্লাই আরজেন্ট, প্রাণাম'। ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যে ছ'টার আগেই তিনি আশ্রমে গেলেন। শ্রীমা ব্যস্ত রয়েছেন—১লা ও ২ ডিসেম্বর আশ্রমের বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে। এই উৎসবও নির্বিঘ্নে শেষ হলো। উৎসব শেষ হয়েছে শুনে তাঁর মুখে উঠল তৃপ্তির হাসি। ৩রা ডিসেম্বর রোগের লক্ষণগুলো হঠাৎ যেন দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়, তাঁর রোগের ইতিহাস অনুধাবন করলে একটি জিনিস চোখে পড়ে। 'সাবিত্রীর কা... দর্শন ও উৎসব এই তিনটি ঘটনার, যা... শেষ তিনটি নিম্নমুখী স্তরের সাথে নি... সম্বন্ধ। শেষ স্তরে এসে পার্থিব প্রয়োজনের সাথে তাঁর মহাদেহের যোগসূত্র অবশিষ্ট ছিল তা ছিন্ন করে তিনি ডুব দিলেন গভীরে। শরীরের বিরু... যন্ত্রের প্রতি তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক... ৪ঠা তারিখে সন্ধ্যাবেলা। ... সম্পূর্ণ বাহ্যচেতনায় ফিরে এলেন ... কোনও আপত্তি না শুনে বিছানায় ... চেয়ারে ঘন্টাখানেক বসলেন। ... বিস্ময় রোগের সমস্ত কষ্ট লক্ষণ যা... যাদু-স্পর্শে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ... সুবর্ণ সুযোগে তাঁকে তাঁর একান্ত সা... ডাঃ নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন আ... 'কি সুস্থতার জন্যে অধ্যাত্মশক্তি প্র... করছেন?' 'না!' সংক্ষেপে উত্তর দিল... ......একঘন্টা পরে বিছানায় যখন ফি... এলেন দ্বিগুণ জোরে দেখা দিল স... পূর্ব লক্ষণ, আর তিনিও শেষ নি... হলেন অতলে।' রাত্রি ১২টা কেটে গেল ৫ই ডিসেম্বর শুরু হলো—ঊষা ত... অনাগত। আস্তে আস্তে অবস্থা খা... হতে হতে সেই নিদারুণ ১-২৫ মি... উপস্থিত হলো নিয়তির বিধান নি...

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর ঊষা... ১-২৫ মিনিটে বিজ্ঞানময় পুরুষের প্রা... কর্মের শেষে দেহ পরিবর্তনের নি... নির্দেশ ছিল। এর পর কি বিদেহ কৈব... না। উনি বিশ্বের কল্যাণে তা প্রত্যা... করে নির্বাণের আনন্দ থেকে নিজে... বঞ্চিত করে নির্মাণমুক্তির পথ নিয়েছি... প্রারব্ধ কর্মের শেষে, দেহত্যাগে মন... শ্রীঅরবিন্দ সমস্ত বিষয়ে মুক্ত, স্বতন্ত্র স্বাধীন হলেন। ব্রহ্মসত্যে অন... জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যতীত যাব... ব্যাপারে তিনি কর্তৃত্ব লাভ করলেন। ... দেহের অস্তিত্ব রইল না কিন্তু ... রইলেন পূর্ণ-যোগের কাজ সম্পূর্ণ ক... জন্য আমাদের মধ্যে কায়ব্যূহ রচনা ক...

(ক্রমশঃ

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

॥ ১৮ ॥

রের কপাটটা কে যেন বন্ধ করল। জেগে উঠেছিল।

কি? ওঠো নি এখনও?' সজল শুনল, অরুণার গলা।

জল লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে। চেটো দিয়ে দুচোখ ভাল করে ঘষে।

জা খুলে রেখে তুমি শোও নাকি?' আবার জিজ্ঞেস করল।

জল বলল, 'না, রাত্রে আদৌ ঘুম ল না। শেষ রাত্তে উঠে মাথা লাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে । দরোজায় ছিটকিনি দিতে ভুলে '

রুণা বলল, 'অফিসে ফোন করে না—তাই চলে এলাম।

জল ভালো করে অরুণার দিকে । ওর চোখ দুটো ফোলা ফোলা।

শুকনো। বোধহয় কান্নার সূক্ষ্ম মুখে ছড়িয়ে আছে।

রুণা বলল, 'যাও মুখ ধুয়ে এসো।'

জল স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। বলল, বস। আমি চা কিনে আনছি।'

জল কাচের গ্লাসটা নিয়ে দ্রুত গেল।

জনে বসে বসে কথা বলতে বলতে ছিল। বেলা প্রায় সাড়ে ন'টা।

রুণা গম্ভীর গলায় বলল, 'আজ যেও না। চল, কোথাও বসে সব কথা দিদির সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। রকার।

জলের মুখ শুকিয়ে উঠেছিল।

থা না বাড়িয়ে সে রাজি হল। বলল, তুমি স্নান করবে কি করে?'

সজল জোর করে সহজ স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল।

অরুণা হাসল একটু। হাসিটা কান্নার মত। 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না'।

সজল বলল, 'তবে ঠিক আছে। চল, দুজনে পথে কোথাও খেয়ে নেব।'

দাড়ি কামিয়ে সজল স্নান করল। স্যুটকেশ থেকে কাচা জামা কাপড় বের করল। তারপর এক বালতী জল এনে দিয়ে, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে একসঙ্গে বেরুল।

পাশের বাড়ীর দাওয়ায় তরকারি কুটছিল বুড়ী। হেসে বলল, 'ঠাকমাকে পেন্নাম করে যা?'

দুএকজন বৌও ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল দুজনকে।

অরুণা বলল, 'ঘাবড়ে যাচ্ছ না ত?'

একটাও দাঁত না থাকার জন্য বুড়ীর কথাগুলো কেমন অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। গলার স্বরটা অস্বাভাবিক, খনখনে, ভয়ঙ্কর।

পরিবেশটাকে সহজ করার জন্য সজল বলল, 'জানো, প্রথম যখন বাসা করি। এই বুড়ী আমাকে আঁচ ধরাতে শিখিয়েছিল। কথাবার্তা প্রায় হয় না অবশ্য আর। সেই যেদিন রায়টের সময় মার খেয়ে এলাম, সেদিন খুব উপকার করেছিল আমার'।

অরুণা সজলের দিকে সুন্দর করে তাকিয়ে বলল, 'একদিন তোমার খোঁজে এসে বুড়ীর গলার স্বর শুনে, বিশ্বাস কর, আমি ঘাবড়ে গেছলাম।'

হাঁটতে হাঁটতে হাজরার মোড়ে এসে দুজন দাঁড়াল। বাসে ট্রামে বড্ড ভীড়।

কালিঘাট ট্রাম ডিপো থেকে যে ট্রামটা আসছিল, সজল আর অরুণা তাতেই উঠে বসল। ভীড়টা একটু কম। যেখানে ওরা যাবে, সে জায়গাটা থেকে অবশ্য দূরেই ট্রামটা থামবে। কিন্তু তাতে কি! আজ কারুর তাড়া নেই।

তাছাড়া দুজনে একসঙ্গে বসে গড়ের মাঠের মাঝখান দিয়ে যাবে—এ ছবিটা মনে করতে, ভাবতে, সজল চেষ্টা করছিল। অনেকদিন সে মাঠে বেড়াতে আসে নি। গাছগুলো এখন নিশ্চয়ই ঘন সবুজ পাতায় ছেয়ে আছে। মাঠের নরম পরিচ্ছন্ন ঘাসে: এই সকালের রোদ বিছিয়ে পড়েছে এখন। মাটিতে আকাশে, নদীর জলে নতুন কবিতার মত বিস্মিত আনন্দ। সজল এই রকম একটা ছবি ভাবতে চেষ্টা করল।

মৃদু ঠেলা খেয়ে সজল তাকাল।

অরুণা মুখটা কাছে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল, 'কোথা নামবে?'

সজল মিষ্টি হেসে বলল, 'এসপ্লানেডে'।

'খিদে লাগেনি তোমার? অন্যদিন এমন সময় ত খাও'।

'লেগেছে। তাছাড়া কাল রাত্রে খাইনি বলতে গেলে?'

অরুণা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওমা, কেন?'

'সন্ধ্যা বেলায় একজনের বাড়ীতে গেছলাম। একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছল'।

'তাই সেই সাতটা থেকে এই বেলা দশটা অবধি কিছু খাওনি?'

সজল হেসে বলল, 'ঐ যে তোমার সঙ্গে চা খেলাম?'

অরুণা অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

অরুণার এই খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসার মধ্যে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেবার মধ্যে, আজ সজল আশ্চর্য একটা স্বাদ পাচ্ছিল। সজল উপলব্ধি করছিল, ওরা দুজনে কি করে যেন জীবনের খুব কাছাকাছি এসেছে।

খুব কাছাকাছি বসে থাকা সত্ত্বেও, সজল অনুভব করছিল, অরুণা সজলের অগোচরে আরো নিবিড় হয়ে আসছে। একটি করুণ নিবেদনের মত, অরুণার ডান হাতের সুন্দর আঙুলগুলো সজলের হাতটা আলগোছে ছুঁয়ে আছে।

কেবিনটা ছোট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। বাইরের গাড়ী চলাচলের শব্দ এখানে আসছে না। শ্বেত পাথরের ওধারে অরুণা একটা ছবির মত চুপচাপ বসে আছে। বসে বসে কি যেন ভাবছে। মুখের প্রোফাইলটার এক কোণে চোখের দিকে ছায়া পড়েছে। সকালের সেই শাড়ীটাই পরেছে এখন। তবে একটু স্নান করে নিয়েছে, বা ভিজে তোয়ালে দিয়ে শরীরটা মুছে নিয়ে, মাথাটা ধুয়ে নিয়েছে। এমনভাবে মুখে পাউডার বুলিয়েছে যে, প্রসাধনটা ঠিক বোঝা যায় না। চোখ দুটোতে অচেনা দুঃখের আভাস।

'বয়' তখনো খাবার দিয়ে যায় নি।

সজল প্রথম কথা বলল, 'কি বলবে বলে যে ডেকে আনলে?'

অরুণা গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিল। একটু খুয়ে বলল! জলের গ্লাসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একবার। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আগে খেয়ে নিই এস।'

বয় খাবার নিয়ে এল। ভাত ডাল মাংস। স্যালাড।

সজল খেতে খেতে বলল, 'চাটনীটা খেয়ো না, বড্ড ঝাল'।

অরুণা বলল, 'ঝাল ভাল লাগে আমার'।

'হুঁ, মেয়েরা ঝাল ভালোবাসে। আমার ভুল হয়েছিল'।

অরুণা বলল, 'চাটনিটা না খেলে আমায় দিয়ে দাও কিন্তু'।

সজল দেখছিল, অরুণা প্রথম থেকেই চাটনি খেতে শুরু করেছে।

অরুণা একটু মাংসের ঝোল সজলের পাতে ঢেলে দিল। বলল, 'ওরকম করে খাচ্ছ কেন? খিদে পেয়েছে বলছিলে না?'

সজল হাসল, 'আমি পেটুক নই?'

'কে আবার পেটুক বলছে?'

অরুণা সজলের খোলা বুকের দিকে তাকিয়েছিল। সজল বাঁ হাত দিয়ে সার্টের বোতামটা লাগাল। তার লজ্জা পাচ্ছিল, অস্বস্তি লাগছিল। অরুণা এতদিন পরে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সেই রাত্রির কথা তার মনে হচ্ছিল।

সজল আর খেল না। অনেকটা ভাত ফেলে রেখে, বেসিনে মুখ ধুয়ে এল।

অরুণা তখনও চাটনিটা পুছে পুছে খাচ্ছিল, যেন আর একটু হলে ভাল হয়। দৃশ্যটা সজলের চোখে ভালো লাগছিল না।

অরুণা বেসিনে মুখ ধুতে যাচ্ছিল। সজল বারণ করল। বয় একবাটি গরম জল রেখে গেল।

অরুণা সেই গরম জলে ভাল করে হাত ধুল। আঙুলের তেলটা রগড়ে রগড়ে তুলল। আলতোভাবে মুখটা ধুয়ে নিল। রুমাল দিয়ে সাবধানে মুছল।

বেয়ারা প্লেট, বাটি সব নিয়ে যাবার জন্য আসতে অরুণা বলল, 'একটু ছাঁকা করে দু'কাপ কফি দিয়ে যাও।'

'একটা কথা, সজল?'

অরুণা আবার চুপ করল।

ভীত সজল বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

'তোমাকে সে কথা বলার সময় এসেছে'—অরুণা থেমে থেমে বলছিল।

অরুণা মুখ নিচু করে আবার বলল, 'আমি না বলে পারছি না। এ আমার মরা বাঁচার প্রশ্ন'। কান্নায় ভেঙে পড়ছিল অরুণা।

সজলের হাত থেকে গরম কফির কাপটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। একটা বিশ্রী ঝনঝন শব্দে ছোট কেবিনটা ভরে উঠেছিল। গরম কফি অনেকটা জামা কাপড়েও পড়ে গেছে।

বয় দ্রুত পর্দা ঠেলে ভেতরে এ[সে] দাঁড়াল।

সজল বিবর্ণ মুখে মৃত মূর্তির ম[ত] বসে রইল শুধু।

শহর এখন নিঝুম। ঘরের এক কো[ণে] একটা ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলছিল। তার আ[লো] বড় মৃদু, বড় আবছা। নতুন বিছান[ার] ওপর রক্ত গোলাপের কিছু পাপড়ি ক[ে] ছড়িয়ে গেছে। তারি গন্ধ আসছিল।

সজল চুপ করে বসেছিল একধারে। একটু আগে যে সব দৃশ্য অভিনীত হ[য়ে] গেছে, সজল সেগুলিকে ভাবতে চে[ষ্টা] করছিল।

তাকে কেন্দ্র করেই আজ এই উৎস[ব]। সব কিছুরই নায়ক সে আজ। কিন্তু [তবু] তার মনে হচ্ছিল, সমস্ত ঘটনার মধ্যে [তার] কোন যোগসূত্র নেই! অর্থাৎ সজলের ম[ন] এখন সেই নির্জন সত্তাটা কাজ করে চলে[ছে] যে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ঘটনাগুলি দেখতে পারে, সব কিছু থেকে নিজে[কে] বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে।

আজ তার বাবা ও মার কথা ম[নে] পড়ছিল। পরলোক থেকে কি তাঁরা ত[াকে] আজ দেখছে? ছোটো মা মত দিয়[েছে] বিয়েতে। কিন্তু বিবাহ জীবনের সাধা[রণ] ঘটনা নয়, বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযো[গ্য] ঘটনা। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এই স্থূল জী[বন] উপন্যাসের তিনটি বৃহৎ অধ্যায়। কি[ন্তু] জন্ম ও মৃত্যু নিজের আয়ত্তের বাই[রে], বিবাহই জীবনে জাগ্রত সত্তা, যার জন্য [সে] নিজেই দায়ী। সজল দুটো অধ্যা[য়] পেরিয়ে এল। তাহলে বাকি রইল, মৃত্যু'।

ধীরে ধীরে কেমন আচ্ছন্নতা এ[কটা] নামছে। বালিশের তোয়ালে থেকে ভা[রী] সুন্দর গন্ধ আসছে একটা। বোধহ[য়] আতরের। দুটো বালিশ পাশাপাশি, একটা অরুণার জন্য। পাশ বালিশটা ওধা[রে] রয়েছে। আজ সে আর অরুণা নিশ্চি[ন্তে] পাশাপাশি থাকবে। এই আকাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠানটুকু, এক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণে[র] অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণটুকু, তাকে সেই অধিকা[র] দিয়ে গেছে।

কিন্তু এইটুকু না দিলে, এই আচা[র] অনুষ্ঠানটুকু না করলে কি ক্ষতি ছিল? [কি] মূল্য এর? আসল মূল্য ত ভালোবাসা।

সজল ভাবছিল, আজ কার্তিক সবচে[য়ে] আনন্দিত। তাকে দেখলে মনে হয় সে-ই [এ] সংসারের মালিক। এমনকি কাজ কর[তে] করতে, সে করুণাকেও ধমক দিচ্ছিল। করুণা কেমন সেজেছে আজ, যেন বিয়ে[টা] অরুণার নয়, করুণার নিজেরই। তা হো[ক], একদিন করুণার সঙ্গে কার্তিকেরও বি[য়ে] হবে!

এদের কাউকে সজলের খুব একটা ভালো লাগে নি। ভালো লেগেছে করুণাকে...

আত্মীয়দিকে। ওরা নাকি সব কমরেড। কিন্তু খুব ভদ্র, সংযত। নিজেরাই রান্না বান্নার জোগাড় করল। রান্নার শেষে সকলে মিলে খেয়ে, ঘরদোর পরিষ্কার করে চলে গেল। যেন পিকনিক করতে এসেছিল। খাওয়ার শেষে অবশ্য একটু ছোট অনুষ্ঠান। তাতে করুণা নিজের কবিতা পড়ল, একজন কমরেড সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করল। একজন আবার ম্যাজিক দেখাল। সজলকে কার্তিক ধরল গান গাইতে। সজল গাইল না। শেষ পর্যন্ত অরুণাই একটা আধুনিক গান গাইল। একজন কমরেড বলল, 'সজলবাবুর কিছু একটা করা উচিত। বিয়ে করে অরুণাকে নিয়ে এমনি চলে গেলেই হল! গান করুন, আবৃত্তি করুন—কিছু একটা করতেই হবে'।

এতক্ষণ সজলের সত্যি লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু ম্যাজিক দেখানোর পরে, ক্রমশঃ সহজ হয়ে উঠছিল সে। বলল, 'নেহাৎ না ছাড়লে আমি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আবৃত্তি করতে পারি'।

সজলের আশা ছিল, ওরা আর যাইহোক রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনতে চাইবে না। এই বুর্জোয়া কবি ওদের সমাজে অপাঙক্তেয়! অতএব ফাঁড়াটা এর ওপর দিয়েই কেটে যাবে।

কিন্তু সেই কমরেড বলল, 'তাই শুনব। হাত ত খুলুক আগে'।

অরুণা না বলছিল।

'ও করুণাদি, অরুণা দেখছি আজ থেকেই সজলবাবুকে কনট্রোল করতে আরম্ভ করে দিল'—সেই কমরেড হাসতে হাসতে বলছিল।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সজল, আবৃত্তি করেছিল—'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ'।

শেষ হতে কমরেড খুশি হয়ে বললেন, 'মার্ভেলাস। সুন্দর গলা আপনার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এতবড় একটা গদ্য কবিতা, আপনি মুখস্থ রেখেছিলেন? আচ্ছা ঐ জায়গাটা আর একবার বলুন ত?'

সজলের বেশ ভাল লাগছিল। সজল আবার বলল, 'দূরে দূরান্তে, অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে, এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—"তুমি সুন্দর," আমি ভালোবাসি' বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে—বলবেন, 'বলো তুমি সুন্দর', বলবেন, 'বলো, আমি ভালোবাসি?"

ছোট্ট ঘরের এই অনুষ্ঠানটুকু কেমন স্তব্ধ হয়ে উঠেছিল তখন। কি ছিল এই কবিতার মধ্যে।

কমরেড আবার বললেন, অরুণার 'সিলেকশান' দেখছি 'প্যারফেক্ট'।

বাসরঘরে সজল চুপচাপ বসে বসে আজকের ঘটনাগুলোর কথা ভাবছিল।

নতুন ঘড়িটায় এখন রাত দুটো বাজে। সে কোন যৌতুক নিতে চায় নি। কিন্তু অরুণাই নাকি বলেছিল, ওর ঘড়ি নাই। তাই ঘড়িটা নিতেই হল।

অরুণার জন্য কী রকম একটা অনুভূতি আজ সজলকে এখন আচ্ছন্ন করে তুলছে। কী সুন্দর লাগছিল ওকে বিয়ের পিঁড়িতে। লাল বেনারসী, হাতে নতুন সামান্য কিছু গহনা, মুখে চন্দনের সুন্দর ফোঁটা। সব মিলে একটা সুন্দর ছবি। সব কিছু ওকে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী করে তুলেছিল। হাতে হাত রাখতে সজল চমকে উঠেছিল, যেন সে তাকে আর কখনো স্পর্শ করেনি।

তাহলে বিবাহ জীবনের সত্যিই এক স্মরণীয় ঘটনা!

অরুণা আসছে না কেন? আসবে না নাকি? সজল অধীর হয়ে উঠছিল। ওকি অন্য কোথাও শুতে গেল? আচ্ছা, ওপরের এই ঘরটা একদিনের জন্য পাশের ভাড়াটে পরিবারটি ছেড়ে দিয়েছে বোধহয়।

রাত্রি ক্রমশঃ গম্ভীর হচ্ছে। ফুটপাতে, বাড়ীর ছাদে, গাছের ভেজা পাতায় অন্ধকারগুলো থিতিয়ে বসছে এখন। আকাশ থমথমে।

কতক্ষণ কেটে গেছে। সজল শুনল, সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ। শব্দটা ক্রমশঃ কাছের দিকে এগিয়ে আসছে। ভেজানো কপাটটা নিঃশব্দে খুলে গেল। অরুণা ঘরে ঢুকল। সজল অপেক্ষা করতে পারছিল না। শরীরের সমস্ত রক্ত কেমন অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠছে।

সজল অরুণাকে ধীরে ধীরে বিছনায় বসাল। তারপর কপাটটা তেমনি আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিয়ে এসে পাশে বসল।

অরুণা নিজেই সজলের কাছে ঘন হয়ে আসছে।

সজল কিছু বলার কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। অথচ একটু আগে ওর জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে করতে আজ সারা রাত ধরে কত কিছু বলবে বলে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এই মৃদু আলোকিত ঘরের ছায়াচ্ছন্নতায়, এই রক্ত গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো শয্যায়, অরুণার ঘনিষ্ট স্পর্শের মধ্যে সজল সব কথা হারিয়ে ফেলেছে।

হে ঈশ্বর, এই অনুভবটুকু, এই ভালো লাগাটুকু অনন্তকাল স্থায়ী হোক!

অরুণাই প্রথম কথা বলল, কানের কাছে মুখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "ঘুম পাচ্ছে?" সজল অরুণার মুখটা নিজের চোখের উপর তুলে ধরল, বলল, 'না'।

সজল দেখছিল, একটি নিবিড় চুম্বনের জন্য অরুণার ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠছে।

'তুমি সেই থেকে কেমন গম্ভীর হয়ে আছ?'

সজল হাসতে হাসতে বলল, 'না, কেমন কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে, এই বিয়েটা একটা স্বপ্ন।'

'সে কি গো? এ আবার কি অলুক্ষুণে কথা?'

সজল তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, খারাপ কিছু নয়। আমার মাঝে মাঝে এই রকম মনে হয়।'

অরুণা সুন্দর করে হাসল। হাত দিয়ে সজলের মুখটা ঢেকে দিয়ে বলল, 'কবিদের নাকি এরকম হয়। শোনো, ঐ ভদ্রলোক তোমার খুব প্রশংসা করছিল। জানো?'

সজল এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। বলল, 'কি প্রশংসা করছিল?'

'কবিতা আবৃত্তির। আর দিদি ত বলেছিল, পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল'।

'আর পড়াশোনায় ভাল! কি হল জীবনে তাতে?' সজলের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছিল। অরুণা মাথার কাপড়টা নামিয়ে দিল। একটু সহজ, স্বাভাবিক হয়ে বলল 'আর কি বলছিল জানো?'

'কি বলছিল?'

'তুমি নাকি খুব সুন্দর দেখতে?'

সজল খুশি হয়ে বলল, 'তাই নাকি?'

অরুণা বিছানায় পা তুলে বসল। 'আচ্ছা, বাসাটা কোথায় পেয়েছ?'

'মির্জাপুর স্ট্রীটে'।

'ক'খানা ঘর?'

'দেড়খানা। একটা ছোট ঘর আছে ছাদে। ঐটা আমার পড়ার ঘর হবে কিন্তু।'

'বড় ঘরটা কোন তলায়? নীচতলায় নয়ত? বাথরুম আলাদা? রান্নাঘর আছে?'

'বড় ঘরটা দোতলায়'।

'ছাদের ঘরটা ছোট মানে, কত ছোট বল ত?'

'এই রকম একটা তক্তপোষ পড়লে, আর সামান্য জায়গা থাকবে'।

অরুণার খুব খুশি হল। 'ভাড়া কত?'

'পঞ্চাশ টাকা। লাইট চার্জ আলাদা'।

অরুণা কি একটু ভাবল মনে মনে। তারপর বলল, 'ভাড়াটা একটু বেশি চয়েছে, অবশ্য।'

সজল বলল, 'না, না, সেন্ট্রাল ক্যাস-কাটায় এর চেয়ে সস্তায় দেড়খানা ঘর হয় না। আমি অফিস হেঁটে যাব। মিনিট চল্লিশ লাগবে মাত্র।'

অরুণা মাথার কাঁটাগুলো খুলল, খোঁপা আলগা করল একটু। সজলের মনে হচ্ছিল, অরুণা এবার শুতে চায়। হাই তুলছিল। আশ্চর্য। সেই প্রথম দিকের সুরটা এখন কেমন যেন ঘর সংসারের আটপৌরে কথায় ডুবে গেল। এই বোধহয় সংসারের নিয়ম। কিছুদিন যেতে না যেতেই, বিবাহিত জীবনের সব রস নিঃশেষ হয়ে যায়। জীবনের খোবড়াগুলো শুধু পথের ওপর পড়ে থাকে।

অরুণা শুয়ে শুয়ে তার অফিসের কথা, কার্তিকদার কথা বলে যাচ্ছিল। সজল কিছু শুনছিল, কিছু শুনছিল না। তার মনে হচ্ছিল, যে গভীরতার জন্য এই রাত্রিটি চিহ্নিত, তার অভাব কোথায় ঘটতে চলেছে। অরুণার কাছে এই রাত্রির অন্য কোন স্বতন্ত্র মূল্য নাই। না থাক। সজল অরুণাকে ভুল বুঝবে না। তার ভালো-বাসাতে কোথাও খাদ নেই! সজল অরুণাকে আরও একটু কাছে টেনে আনল।

সজল ওর দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিল। মুক্ত পুষ্ট খোঁপার ছড়ানো ঘন দীর্ঘ চুলের একটা মিষ্টি গন্ধও আসছিল। বালিশের তোয়ালেতেও আতরের মৃদু গন্ধ। প্রদীপের আবছা, নরম আলোয়, সজল দেখছিল অরুণা তার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। হাতটা সজলের ঘাড়ের নিচে। আধ-বোজা স্তব্ধ চোখ দুটিতে ক্লান্তির কালো-ছায়া! যে কাজলের স্পর্শ বিয়ের পিঁড়িতে বসার সময় সজল দেখেছিল, কি করে তান চোখের নিচের দিকে তারই একটি অগোছালো ম্লান রেখা। ঠোঁট দুটি সিক্ত শিশিরভেজা পাপড়ির মত নরম, একটু রক্তাভ। সজলের লিপস্টিক ভালো লাগে না বলে অরুণা একটু আগে কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেলেছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তুমি বড্ড আলাদা টেস্টের।'

ধীরে ধীরে সজল দেখছিল অরুণাকে। গায়ের কাপড় এখন কিছুটা অসংবৃত। গলায় সরু একটা হার। গলাটা সলেতাদির মত সুন্দর নয়, কোন রেখায় কারুকার্য নেই, দীর্ঘও নয়। কিন্তু তাই বলে অসুন্দর নয়। বরং পুষ্ট, মসৃণ।

অরুণা কাপড়টা টেনে নিল বুকের ওপর, সজলের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু।

সজল দেখছিল ক্ষীণ কোমরের নিচ থেকে বেয়ে যাওয়া দুটি নিটোল পা। পায়ের নিচের দিকটা অনাবৃত। মসৃণ, মাংসল পায়ের পাতার শেষে আঙুলে আলতার লাল রঙটা ফুলের মত কেমন সুন্দর লাগছে। অমৃতপুরের বাড়ীর উঠানে এই পায়ে অরুণা হেঁটে গেলে কেমন লাগবে সজল ভাবছিল। উঠোনের ধুলায় একটি একটি করে আলতা পায়ের ছাপ পড়বে। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে কলমী শাক-ভরা পুকুরটার কাছে এসে। কয়েকদিনের ছুটি পেলেই ওকে নিয়ে অমৃতপুর যাবে: না, যাওয়া যাবে না। অমৃতপুরে অরুণা থাকতে পারবে না। ঘরদোর আগে ঠিক করতে হবে।

অরুণা সজলের পায়ের ওপর, তার একটা পা তুলে দিয়ে হেসে বলল, 'মাথা-মুন্ডু কিসব ভাবছ?'

সজল বুঝতে পারছিল, অরুণার সঙ্গে ব্যবহারটা ঠিক হচ্ছে না। ওর বাঁ হাতটা নিজের বুকের ওপর রেখে হেসে বলল, 'তোমার কথা?'

'সে ত বুঝলাম। কিন্তু আমার কি কথা?'

'তোমাকে দেখতে সুন্দর লাগছে?'

'অরুণা চোখ তুলে বলল, 'আমি দেখতে সুন্দর নই, এখন সুন্দর লাগছে। তাই না?'

সজল অরুণাকে আরো কাছে টেনে আনল। ওর পুষ্ট গ্রীবায় হাত রেখে অন্য কোন আনন্দের স্পর্শ খুঁজছিল।

রাত্রি প্রায় শেষ হতে চলেছে। ঠান্ডা বাতাস আসছে জানালা দিয়ে। শীত শীত করছিল সজলের।

অরুণা শাড়ীর আঁচলটা সজলের গায়ে ঢেকে দিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'এবার ঘুমাও। আর দুষ্টুমি নয়। আমার কথা ত শুনবে না?'

সজলের ক্লান্তি লাগছিল। পিপাসা পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এক গ্লাস জল পেলে খুব ভাল লাগত। কিন্তু ঘরে কোথাও জলের চিহ্ন নাই। শুধু দলিত, লাঞ্ছিত শুষ্ক পাপড়িগুলি, একরাশ বেদনা নিয়ে বিশৃঙ্খল বিছানার এখানে ওখানে ছড়ানো।

কতক্ষণ কেটে গেছে। অরুণা ঘুমিয়েছে পাশ ফিরে। রাত্রি এখন কত? সজল জানালা দিয়ে একটু আকাশ দেখতে চাইল, দেখতে বড় ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু সব কালো অন্ধকারের কবরে ঢাকা। একটা নক্ষত্রও জেগে নেই।

ঘরের দিকে তাকাল সজল। বুঝতে পারেনি, প্রদীপটা কখন নিভে গেছে। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল তার।

।। ১৯ ।।

বাজারের ব্যাগটা রান্নাঘরের কাছে ফেলে দিয়ে সজল চলে যাচ্ছিল। অরুণা জিনিসপত্র ঢালতে ঢালতে বলল, 'শুনছ? দু পয়সার নুন এনে দিয়ে যাও না। তখন বলতে ভুলে গেছি।'

সজল সরু সিঁড়িটার অর্ধেকটা পর্যন্ত উঠে গেছল। সেখান থেকেই বলল, 'ওবেলা এনে দেব? আমার কাজ আছে।'

অরুণা হেসে বলল, 'ওমা! এবেলা কি হবে তবে? নুন ছাড়া রান্না হয় নাকি? যাও না লক্ষ্মীটি।'

সজলের আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। নুন আনতে হলে আবার সেই বড় রাস্তার ওপরে যেতে হবে। এই যাওয়া আসার ফলে সেতারটা নিয়ে বসার ইচ্ছা চলে যাবে। ইমনের গৎটা হাতে উঠেছে এখন। সজল সকালটা নষ্ট করতে চায় না। অফিস থেকে ফিরে সজলকে ঘরের কাজ-কর্ম এক আধটু করতে হয়। অরুণার ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়ে থাকে। নইলে তার ফিরে এসে আঁচ ধরিয়ে রান্না করতে করতে রাত্রি সেই সাড়ে নটা দশটা বাজে। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়া এবং খুব ভোরে ওঠাই সজলের অভ্যাস। আর অরুণা ঠিক এর উল্টো।

সজল বিরক্ত মুখে নেমে এল। অরুণা মাছ কুটছিল। ভাত নেমে গেছে। আঁচে বোধহয় ডাল হচ্ছে। ডাল নামিয়ে ঝোল চাপিয়ে দেবে। নুনটা তা হলে এক্ষুনি দরকার।

সজল বলল, 'দাও। নুন বেশি করে আনব। অনেক দিন চলে যাবে।'

অরুণার মাছকোটা শেষ হয়ে আসছিল। বঁটিটা সরিয়ে রেখে হাসতে হাসতে বলল, বেশি আনলে 'রাখব কোথায়: বড় জায়গা কি আছে?'

'ও তা বটে!' সজল থলিটা নিয়ে আবার বেরুল।

অরুণা অবাক। 'নুন কিনতে হলে থলি নিয়ে যেতে হয় নাকি?'

'তবে?'

'তোমার সঙ্গে পারব না, বাপু! দোকানদার ঠোঙায় করে দেবে না?'

অরুণা কলতলায় যেতে যেতে বলল, 'এসব কাজ আর করতে হবে না তোমাকে। বাড়ীওয়ালার বউ একজন ঠিকা ঝি ঠিক করে দেবে বলেছে'।

সজল কথাটা যেন শুনতে পায়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে গোমরা মুখে বেরিয়ে

গেল। যেতে যেতে ভাবছিল, ঝি রাখতে গেলে আরও খরচ বাড়বে। কিন্তু কিছুদিন পরে অবশ্য ঝি লাগবেই। তা ভাল। সজল এসব টুকিটাকি কাজের ঝামেলা থেকে বাঁচবে। সকালে উঠে চা খেয়ে, বাজার করে দিলেই তার ছুটি। এ একরকম মন্দ হয় না।

দুজনে একসঙ্গে খেতে বসেছিল।

অরুণা ডাল দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত মাখতে মাখতে বলল, 'আচ্ছা কটা বাজল বলত'

'সোয়া নটা।'

'ওকি, আর ভাত নিলে না যে? ঝোল দেব, নাও না একটু ভাত?'

সজল বলল, 'কম খেলে বেশিদিন বাঁচব।'

'ইস আজ দেরি হয়ে গেল দেখছি।' অরুণা আরও দ্রুত ভাতগুলো গিলতে লাগল।

সজলের এরকম খাওয়া দেখতে ভালো লাগে না। কোন সৌন্দর্য নেই এর মধ্যে। বলল, কাল থেকে আর একটু সকালে ওঠো। তাহলে এরকম তাড়াতাড়ি করে খেতে হবে না।' আচ্ছা একদিন তোমার দিদি বাড়ি থাকলে, আমিই রান্না করে খেতে ডাকব। বুঝলে?'

অরুণা হেসে বলল, 'বুঝলাম। কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠব? ঘুমতে ঘুমতে সেই রাত বারোটা একটা। তখন ত কই বাজার খেয়াল থাকে না?'

কথাটা শুনে সজলের কেমন বিশ্রী লাগল।

অরুণা ডাল শেষ করে ঝোলটা নিতে নিতে বলল, 'রান্না কেমন হয়েছে গো? একটু মাছ নেবে?'

সজল হাসতে হাসতে বলল, 'মাছটা না এনে দিলেই ভাল হত।'

অরুণা ঝোলটা চাখল একটু। তারপর মুখ কুঁচকে বলল, 'আচ্ছা, তুমি খাচ্ছ কি করে? একবারও বললে না যে, এত নুন হয়েছে? ছিঃ। তোমার ভালো করে খাওয়া হল না আজ?'

সজল হেসে বলল, 'ওতে কি? একটু জল মিশিয়ে নিয়েছি। বেশ লাগছে। তুমিও একটু মিশিয়ে নাও না?'

'ঝোলে জল মিশিয়ে নিয়েছ? হায় কপাল আমার।'

সজল ঘরে এসে কাপড় ছাড়ছিল। অরুণা দ্রুত ঘরে ঢুকে বলল, 'জামাটা নিয়ে তোমার পড়ার ঘরে যাও। বড্ড দেরি হয়ে গেল আমার।'

পড়ার ঘরটা ছোট হলেও সজল সাধ্যমত সাজিয়েছে। একটা কমদামি টেবিল। অরুণার হাতের এম্ব্রয়ডারী করা টেবিল ক্লথ তার ওপর বিছানো। তাতেই বাবার বইগুলো এবং নিজের কলেজের দু-একটা বই কাঁথতাম খাতা, গীতাঞ্জলিটা সাজানো আছে। দেয়ালের দিকে সামান্য একটু খালি জায়গা। তার মধ্যে সেতারটা বিছার ওপর মেঝেতে বসিয়ে দেয়ালে হেলান দেওয়া আছে। এখনও তক্তপোষ কিনতে পারেনি। আগের বাসার বিছানাটাই মেঝেতে পেতে রেখেছে। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর দুটো সস্তা দামের বাঁধানো ফটো। মির্জাপুরের ওদিকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছের একটা ছবি বাঁধাইয়ের দোকান থেকে কেনা। ইচ্ছা আছে একটা চেয়ার কিনবে।

সজল জামা পরতে পরতে ভাবছিল এসব। ঘড়িতে এখন সাড়ে নটা। সজল হেঁটে যাবে। সোয়া দশটার মধ্যে অফিস পৌঁছতে পারবে। কিন্তু ট্রামে না গেলে অরুণার দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া মার্চেন্ট অফিস। খুব স্ট্রিক্ট এসব ব্যাপারে।

কপাটে তালা বন্ধ করে দুজনে নামছিল।

অরুণা বলল, 'ঝিটা এমাস থেকে আসবে। এলে বাঁচি বাবা!'

'মাইনে কত দিতে হবে?'

'বেশি নয়, টাকা পাঁচেক। খুব বিশ্বাসী।'

'ঘুঘুদের বাড়ী নয় ত?'

অরুণা বাঁকা চোখে তাকিয়ে হাসিয়ে হাসিয়ে বলল, 'না না। সবে শাড়ী ধরেছে। তোমাদের কাব্যময় ভাষায় মুকুলিকা! বুঝলে না? নজর-টজর দিও না যেন?'

সজল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

ইউনিভার্সিটির সামনের স্টপেজে দুজনে দাঁড়াল। ট্রাম ঐ দূরে আসছে। সজল সামনের সেনেট হল-এর গম্ভীর থামগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! সজলও একদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারত। এইখান থেকেই সে বেকারত্ব জেনে নিয়ে আত্মীয়ের বাসায় গেছল।

কিছুক্ষণের জন্য সজল বড় অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে।

ট্রামটা এসে গেছল। অরুণা উঠতে উঠতে বলল, 'ফিরতে দেরি কোর না।'

কিছু বলার আগেই ট্রামটা স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

কয়েকদিন পরে বিকেলের দিকে বৃষ্টি নেমেছিল। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে এখানে-ওখানে জল জমে আছে। আকাশ তখনো মেঘলা। সজল সুরেন ব্যানার্জী রোড ধরে, ওয়েলেসলিতে পড়ে উত্তরদিকে দ্রুত হাঁটছিল।

আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে। সকালবেলা ঘর-সংসারের কথা নিয়ে অরুণার সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছিল। অরুণাও হয়ত তাড়াতাড়ি আসবে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই আসবে। তারও নিশ্চয়ই সারাটা দিন খারাপ গেছে!

অফিসে ঝগড়ার কথাটা মনে হতে সজলের অনুতাপ হচ্ছিল। বাস্তবিকই অরুণার খুব কষ্ট হয়। সেও তো চাকরী করে, সারাদিন খাটে। সকালে রান্না, অফিসে খাটুনি, ফিরে এসে আবার রান্না। এ করতে গেলে মেজাজ খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। সেই তুলনায় সজল বাজার করে দিয়েই খালাস। তারপর অফিস থেকে ফিরে যদি দেখে অরুণা আসেনি, তখন শুধু আঁচটা ধরিয়ে দেয়।

ভাবতে ভাবতে সজল হাঁটছিল। তা ছাড়া এসময় মেয়েরা একটু বিশ্রাম চায় বোধহয়। প্রথম সন্তান হওয়াটা কেমন অস্বাভাবিক লাগে মেয়েদের পক্ষে। সজল আশ্চর্য হয়ে ভাবে, সে পিতা হতে চলেছে। কথাটা ভাবলেই একটা আচ্ছন্নতা নামে। ছেলে হোক মেয়ে হোক দেখতে সুন্দর হবে নিশ্চয়ই। অরুণা দেখতে খারাপ নয়। একটি সুন্দর দুষ্টু চঞ্চল শিশু—সে ত এক সম্রাট! সজল অফিস থেকে গিয়ে তাকে আগে কোলে নেবে। আস্তে আস্তে বড় হবে শিশু। সজল নিজে তাকে পড়াবে। ছেলেই হোক মেয়েই হোক সে তাকে সংস্কৃতে এম-এ পাশ করাবে। নিজের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। তার শিশুর জীবনকে সে ব্যর্থ হতে দেবে না!

কিন্তু হঠাৎ অনেকদিন আগের একটা কথা সজলের মনে পড়ে যায়। করুণাদি বিয়ের পরদিন কথায় কথায় একবার বলেছিল, 'সজল বি মডার্ণ। বিয়ের পরই ছেলেপুলে হলে জীবনকে তোমরা 'এনজয়' করবে কখন? শিশু, ম্যারেড লাইফের পক্ষে একটা বাধা। একটা অনুভব। ছেলে যাতে না হয়, সে চেষ্টা করবে। আর নেহাৎ হলে 'এ মেডিক্যাল প্রসেস তাকে 'রিমুভ' করে ফেলবে। একথা তোমাকে বলছি দিদি বলে নয়, 'এ্যাজ এ ওমেন উইমেন!'

করুণা কথাটা বলে হাসছিল। অরুণা কাছে ছিল না। অন্য কেউও নয়। সজল শুধু শুনতে হয় বলে শুনেছিল। সে অত মডার্ণ নয়। এই বন্ধনকে সে বাধা বলেই মনে করে না। ভ্রূণ হত্যা? সে ত

পাপ। পৃথিবীতে এমন পাপ আর নেই। না, অরুণাই বোধহয় সত্যি মনে-প্রাণে আধুনিকা।

অরুণা শুনলে নিশ্চয়ই দিদির ওপর রাগ করত। সজলও কখনো তাকে বলেনি অরুণার কথাটা! তার চেয়ে অরুণার কোলে একটি সুস্থ সুন্দর শিশু, সে শিশু আধো-আধো কথা বলবে একদিন, সজলের টেবিলের বই পত্তর ছড়াবে, সেতারটার তার টেনে ছিঁড়বে—এই ছবি অনেক বেশি সুন্দর সুস্থ, পবিত্র।

সজল জীবনকে অস্বীকার করতে চায় না।

বৌবাজারের মোড়ে কয়েকটা ফুলের দোকান।

দোকানদার পাতা দিয়ে মালাটা জড়িয়ে দিল। তাজা রজনীগন্ধার মালা। কেমন সুন্দর গন্ধ আসছে।

অরুণার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথমদিকের দিনগুলির কথা সজলের মনে আসছিল। এই মনে আসার মধ্যে একটা সুন্দর মাদকতা আছে। ভালোবাসার এই দিনগুলি জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে মধুর পরিচ্ছেদ। ফলবান বৃক্ষের মত এই অধ্যায়টি নম্র, নত, আনন্দিত। হ্যাঁ, অরুণা তাকে এই অতুলনীয় ঐশ্বর্য দিয়েছে!

সজল মনে মনে ভাবছিল, মালাটা অরুণাকে সে এখন দেখাবে না। রাত্রে তার হাতে দেবে। অরুণা তখন সকালের কথা ভুলে গিয়ে, সজলের কাছে আরো ঘন হয়ে উঠবে, একটি ফুলের মত আত্মসমর্পণের গান বাজবে তার শরীরে। হীরক খণ্ডের মত সেই মুহূর্তগুলিকে সজল একটি একটি করে গেঁথে তুলবে।

আসন্ন বৃষ্টিস্নাত মিলিত রাত্রিটার কথা ভেবে, সজলের এখন থেকেই ভালো লাগছিল, বুকের মধ্যে রক্তের চঞ্চলতার সাড়া পাচ্ছিল সে।

বাড়ী পৌঁছতেই, আবার বৃষ্টি নামল। সজল জামা-কাপড় ছেড়ে আঁচটা ধরাল। ভাবছিল, আঁচটা ধরে উঠলে দু'কাপ জল বসিয়ে দেবে কিনা?

সজল পড়ার ঘরে এসে সেতারটা নামাল। মনটা খুব হালকা লাগছে এখন। তাদের বিয়ের পর এই প্রথম বৃষ্টি। এই প্রথম তারা একই বিছানায় কাছাকাছি শুয়ে দূরের বৃষ্টির শব্দ শুনবে।

কতক্ষণ সেতারটা নিয়ে বসেছিল সজলের খেয়াল নেই। হয়ত বেশি সময় নয়। অরুণা কি তবে এখনও ফেরেনি?

সজল দ্রুত নিচে নেমে গেল। দেখল, অরুণা ফিরেছে। ভিজে শাড়ীটা বারান্দায় মেলা রয়েছে। কিন্তু তাকে রান্নাঘরেও দেখা যাচ্ছিল না।

ডাক শুনে ঘর থেকে যে বেরিয়ে এল, সজল এই বর্ষাভেজা সন্ধ্যায় তাকে এখানে দেখবে বলে আশা করেনি, কল্পনাও করেনি। তাই চমকে উঠেছিল একটু।

কার্তিক বেরিয়ে এসে বলল, "অরুণার মাথা ধরেছে। তাই শুয়ে আছে।"

সজল কি বলবে বুঝতে পারছিল না। অথবা ঘরে গিয়ে অরুণার খোঁজ নেবে কিনা বা মাথায় হাত দিয়ে শরীরের উষ্ণতা পরীক্ষা করবে কিনা অর্থাৎ করা উচিত কিনা, সজল বুঝতে পারছিল না। তাছাড়া কার্তিকের গলার স্বরে অরুণার ওপর তার কর্তৃত্বের আভাস ছিল।

সজল চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল অদৃশ্য কঠিন আঘাতে, এই সুন্দর সন্ধ্যা ও রাত্রির সব কল্পনা, আনন্দের সব আয়োজন, ধূলিসাৎ হয়ে গেছে!

তবু কিছু একটা বলতে হয় বলে, সজল জোর করে হেসে বলল, 'কখন এলেন আপনি?'

কার্তিকেরও ভেজা ট্রাউজার, ভেজা জামা।

'এই ত খানিকক্ষণ এলাম।' আপনি সেতার নিয়ে বসেছেন দেখে, আর অরুণা ডাকেনি'।

কার্তিকের কথা বলার ভংগীটা এমন, যেন এটা তারই বাড়ী। সজল অতিথি এবং অবাঞ্ছিত অতিথি।

কার্তিকের আসাতে সজল তবু খুব খুশি হওয়ার ভান দেখিয়ে বলল, 'এদ্দিন পরে মনে পড়ল বুঝি আমাদের?'

কিন্তু কথাগুলো সজলের নিজের কানেই বড্ড বেসুরো লাগছিল।

অরুণা কথার মাঝখানে উঠে এসে আঁচে চায়ের জল চড়িয়ে বলল, 'দ্যাখোনা গরম সিংগাড়া কোথাও পাওয়া যায় কিনা? কার্তিকদা খেতে চেয়েছিল।'

অগত্যা, সজল ভিজতে ভিজতে কার্তিকের জন্য গরম সিংগাড়া কিনতে বেরিয়ে পড়ল।

রাত্রে চুপচাপ খাওয়ার পর সজল নিজের ছোট ঘরটায় ফিরে এসেছিল।

অরুণা এখন থালা ধুচ্ছে। তারপর একটু প্রসাধন সেরে শুতে যাবে। কিন্তু সে চিন্তার মধ্যে এই মুহূর্তে আনন্দের কোন স্পর্শ ছিল না। সব কিছু বিস্বাদ লাগছে এখন। তার মনে হচ্ছিল, একটি প্রথম দুর্লভ বৃষ্টিস্নাত রাত্রি আজ নষ্ট হয়ে গেল। সন্ধ্যার সমস্ত গান বেসুরে হয়ে গেছে কখন!

ধীরে ধীরে সজল মালাটা নিয়ে এসে কানা গলিটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, অন্ধকার খোলা আকাশের নিচে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল!

এখন বৃষ্টি পড়ছে না। সারা শহরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেঘও অন্ধকারগুলি রাত্রির অভিমানের মত শান্ত।

অরুণা সজলের গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, 'এ পাশ ফিরে শোও, একটা কথা বলব। শুনছ?'

সজল চুপ করে রইল।

'কেন যে রাগ করেছ সেই সন্ধ্যা থেকে বুঝতে পারলাম না? কার্তিকদা আসার জন্য?'

সজল তবু কথা বলল না।

'কিন্তু জানো, হঠাৎ কলেজ স্কোয়ারের কাছে দেখা হয়ে গেল। না ডাকলে, কেমন দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে আসছিল ত? ভাববে, দেখছ—ভিজছি, বাসার কাছে এলাম। তবু একবার মুখের মত ডাকলে না?'

সজল পাশ ফিরল। সত্যি না ডাকলে অভদ্রতা হোত।

'জানো কার্তিকদা দিদিকে বিয়ে করার কথা দিয়েছে। দিদি বড় 'আনহ্যাপি'। মানে, বয় ফ্রেন্ডরা সবাই ওকে 'চীট' করেছে। অথচ দিদিই আমার সব, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, মানুষ করেছে নিজে কত কষ্ট করে। সেই দিদির জন্য কার্তিকদাকে আমি 'ডিসপ্লীজ' করতে চাইনে। বিয়েটা হয়ে যাক। বিয়ে করতে দিদির খুব ইচ্ছে। আমি আর কিছু চাইনে, দিদি সুখী হোক, দিদি সুখী হোক।'

অরুণার গলা ধরে এসেছিল।

সজল আস্তে আস্তে অরুণার মাথায় হাত রাখল। ওর মধ্যে যে এমন একটা প্রাণ আছে, সজল তা জানত না। সজল বলল, 'জানো আজ বৃষ্টি হচ্ছে দেখে, তোমার জন্য একটা রজনীগন্ধার মালা নিয়ে এসেছিলাম। রজনীগন্ধা আমার ভীষণ ভালো লাগে। তা কার্তিক আর তার বিশ্রী কথা-বার্তা সব গণ্ডগোল করে দিল।'

'কই দাও— ওমা, এতক্ষণ বলোনি! তুমি ভীষণ চাপা মানুষ। কিছু দেবে তো?'

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'ওটা আর নেই। আর একদিন নিয়ে আসব।'

অরুণাকে সজল আরো বুকের কাছে নিয়ে এল।

অনেক রাতে মেঘ ডাকার শব্দে সজল জেগে উঠেছিল। কিন্তু অরুণা কোথা গেল? ঘরে নেই, বারান্দায় নেই, বাথরুমের আলোও নেবানো? তা হলে কোথায়? সজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

সজল ছাদে উঠে গেল। এখানে কি?

অন্ধকার ছাদের এককোণে, যেখান থেকে সজল আজ সন্ধ্যায় রজনীগন্ধার মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরুণা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

সজল এসেছে বোধহয় জানতে পারেনি।

কিন্তু এমন অজস্র কান্না কেন? কী এমন দুঃখ? কী এত যন্ত্রণা অরুণার?

হাত ধরে কাছে টানল সজল। অরুণা বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতক্ষণ সে একটা আশ্রয় খুঁজছিল, একজনের স্পর্শ খুঁজছিল—যে স্পর্শ সান্ত্বনার মত ছায়াচ্ছন্ন। সারা সমুদ্রের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে একটা জাহাজ এইমাত্র বন্দরের কোলে ফিরে এল!

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'ঘরে চল। আমার রাগ ত সেই কখন থেমে গেছে।'

অরুণা তবু ছাদের একধারে বর্ষা রাত্রির অন্ধকারে সজলের হাতটা নিজের বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে, একটা মূর্তির মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল!

(ক্রমশঃ)

মরুভূমি

শৈলেশ সেন

পাতলা ঝির ঝিরে বৃষ্টি নামল। সারা দিনের উত্তপ্ত ক্লান্তির পরে মরুভূমির বুকে যেন অবসাদ ঘনিয়ে এল। বৃষ্টির জলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে চাইল অজস্র বালুকণা। সামনে সীমাহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। স্বয়ং শয়তানও বোধহয় এখন সব কাজ ফেলে রেখে বিশ্রামের কথা ভাবত।

সারি সারি অজস্র বালির বস্তা। আর্টিলারী সৈন্যরা তার আড়ালে বসে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণরত। বহু দূরে দু-একটা আলোর বেশ মাঝে মাঝে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছিল।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ-এর মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল রাশি রাশি হাওয়া। বৃষ্টির স্পর্শে বাতাস যেন উন্মত্ত আক্রোশে মেতে উঠল। ঝড়ে বৃষ্টিতে মরুভূমি যেন আলাদা হয়ে যেতে চাইল সমস্ত পৃথিবী থেকে। দিনের উত্তপ্ত মরুভূমি তুষার শীতলতায় কাঁপতে লাগল গভীর-রাতে।

এই নির্দয় আবহাওয়ায় দূরের আলোগুলোতে ফুটে উঠল ব্যস্ততার মৃদু আভাস। অভিজ্ঞ সৈন্যরা বুঝল আজ কিছু ঘটবে। কয়েক দিনের বিশ্রামের বিলাস আজ নিশ্চয় শেষ হতে চলেছে। বৃষ্টি আর ঝড় আরও জোরে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দিল।

একজন ট্যাঙ্ক সৈন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। পাশের ছোকরা সৈনিক অকারণে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল—হাইল হিটলার।

ক্যাম্প কমান্ডার কর্ণেল কার্ল প্রিয়েন টেন্টের শক্ত পর্দাটা টেনে দিলেন। আর কতক্ষণ? কর্ণেল মনে মনে হিসাব করলেন। হাতের কাগজটা আর একবার দেখলেন। জিরো আওয়ার—আর মাত্র দুটি ঘন্টা। তারপরেই শুরু হবে জার্মান ডেজার্ট ফোর্সের উনবিংশতম আক্রমণ। কর্ণেল টেন্টের দেওয়ালে টাঙানো ফুয়েরের এবং জেনারেল রোমেলের বিরাট ছবি দুখানার

দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হাইল হিটলার।

তারপর চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন কর্ণেল। মেজর রিভান মুখ বাড়ালেন। সঙ্গে ক্যাপ্টেন টেনাগ। এবং তৃতীয় আর একজন। কর্ণেল এগিয়ে এসে সকলকে আমন্ত্রণ জানালেন।

কর্ণেল আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন কোণের ডিকেন্টারের দিকে। ভারমুথের বড় বোতলটা থেকে লম্বা গ্লাসটায় ঢক ঢক করে মদ ঢাললেন। এক চুমুকে সবখানি শেষ করে তিনি আবার এগিয়ে এলেন। তিনজনেই তখনও দাঁড়িয়ে। কর্ণেল তীব্র দৃষ্টিতে তৃতীয় আগন্তুকের দিকে তাকালেন। না, তাঁর ভুল হয় নি। ভুল তাঁর হতে পারে না। মেয়েটা আজই মরবে। বড়জোর আর ঘণ্টাখানেক। তার বেশী সময় দেবার উপায় তাঁর নেই, আজই। হাইল হিটলার।

এই পাগলা রাতগুলো বড় বিভ্রান্তিকর, কর্ণেল কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। বার্লিনেও ঠিক এরকমই ঘটত। ঝড়ের রাতে, পেঁজা বরফের আচ্ছন্নতায় তখন সারা-জীবনটাকে যেন মুঠোয় ধরা যেত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এখনও হাতের মুঠোয়—কিন্তু কত তফাৎ। সেদিন আর আজ। তখন বয়স কত ছিল? মাত্র কয়েকটা বছরের ব্যবধান। মনে হয় কয়েক দশকের সীমা অতিক্রম করে এই মরুভূমির বুকে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন।

কর্ণেল আবার জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। হাতে সুন্দর কাঁচের গ্লাসে তাঁর লাল সুরা। ঝড়ের বেগ কি একটু কম? কার্ল মুহূর্তের মধ্যে বার্লিনের স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেলেন।

কার্ল আর তাঁর বন্ধু মিলার। জার্মান আর ইংরেজ। মনে মনে নিজের তখনকার বয়স হিসাব করে ফেললেন। বড়জোর পঁচিশ, ঊনিশশো তিরিশের কাল, একসঙ্গে ওঁরা অর্থনীতি পড়তেন। মিলারের একটি মাত্র বোন। লরা। কিছুই করত না লরা, শুধু ছবি আঁকত আর ঘুরে বেড়াত। আর গান করা সকল দরদ দিয়ে। ওর গলায় জার্মান ওস্তাদের শিক্ষা ছিল না। কিন্তু বিঠোফেন-বাচ-মোজার্ট যেন মূর্ত হয়ে উঠত ওর সুরের মূর্ছনায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত কার্ল গান শুনতেন। ওঁর সংগীতপিপাসু মন হাজার নিদর্শতার মধ্যে আজও হারিয়ে যায়নি।

—কর্ণেল, কর্ণেল।

সকল নিস্তব্ধতা গুঁড়িয়ে দিয়ে মেজর রিভান উঠে দাঁড়ালেন।

বিরক্ত ক্ষুব্ধ চোখে কর্ণেল ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর স্বভাবের একটি বিশেষত্ব ছিড টান এখনও মুছে ফেলতে পারেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে যা একেবারেই অচল। চিন্তার মাঝখানে ব্যাঘাত কর্ণেল কার্ল অসহ্য মনে করেন। কিন্তু...কার্ল নিজেকে সংযত করলেন। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। মেজর নিশ্চয়ই কর্ণেলের লাগামহীন চিন্তা-স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারেন না।

—বলুন মেজর? শান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে কর্ণেল প্রশ্ন করলেন।

—কর্ণেল, ইনি ফ্র্লা কেটি ফ্রিডেল। মাত্র আধ ঘণ্টা আগে আমাদের ট্রুপ লাইনে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সেভেনথ কোর অ্যামবুলেনস, ব্রিগেডের নার্স ছিলেন বলে ইনি দাবী করছেন। ব্রিটিশ প্রিজন ক্যাম্প থেকে আজই সন্ধ্যায় পালিয়ে এসেছেন।

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন মেজর রিভান।

চমৎকার, কর্ণেল হাসলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর অনেক গুপ্ত তথ্য এখন তাকে শুনতে হবে। ট্রুপ মুভমেন্ট, অ্যাটাক টাইম আরও কত কী!

মিলার আর লরা কবে যেন বার্লিন ছেড়ে চলে গেল? মনে নেই। স্মৃতির সবুজ ভাব নিঙড়ে নিঙড়ে এতদিনে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। হিটলার তখন জেগে উঠেছে, মিলার আর লরা বাধ্য হয়ে বার্লিন ছাড়ল। হিটলারের শাসনে জার্মানীতে বিদেশীদের স্থান নেই। যুদ্ধের দামামা এখনও বেজে ওঠেনি। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে রেষারেষি পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। ব্রিটিশ তরুণী লরার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার জন্য কার্ল নাৎসী পুলিশের চার্জশীট পেয়েছিলেন। তারপরেই এল প্যানজার বাহিনীতে যোগদানের অমোঘ নির্দেশ। কিন্তু সে কারণে তাঁর কোন অনুযোগ নেই।

জার্মান রক্তের চাঞ্চল্য আর দশজন জার্মানদের মত তিনিও পুরোপুরি অনুভব করতেন। তবুও লরাকে তিনি ভালবাসতেন, মিলারের উপায় ছিল না, তাকে নিজের দেশে ফিরে যেতেই হবে, কিন্তু লরাকে তিনি রেখে দিতে পারবেন এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। জার্মান ভাষা-সাহিত্য-সংগীতের মধ্যে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল লরা। অনেক-খানি আশা আর আস্থা নিয়ে ওকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কার্ল।

প্রথমেই বাধা দিয়েছিল মিলার।

—তোমরা কেউ সুখী হতে পারবে না, কার্ল। থার্ড রাইখের সবগুলো দরজা আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

হয়তো সেদিন ভুল বলেনি মিলার। ঠিক, ঠিক। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বন্ধ দরজাগুলো আমরা সকলে আরও শক্ত করেই এঁটে দিয়েছি। নির্বাসনে গেল আমাদের সব প্রেম, ভালোবাসা।

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন বার বার এসে আঘাত করে। কার্ল জানেন, জার্মান জাতটাকে লরা মনে-প্রাণে কী দারুণ শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। একটুখানি ঝুঁকি, আত্মত্যাগ ওর কাছে প্রত্যাশা করা নিশ্চয় অন্যায় ছিল না। লরার সত্যিকার মতামত কী ছিল? স্পষ্ট উত্তর সেদিন পাওয়া যায়নি।

—আজ আর তা হয় না কার্ল। এর বেশী উত্তর তুমি আমার কাছে পাবে না। আমি দুঃখিত।

বার্লিন ছেড়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে এই মাত্র বলেছিল লরা। বিয়ের পরে জার্মান সিটিজেন হওয়া কি সে অগৌরবের মনে করত? জার্মান জাতির বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ কি লরার কাছে আত্মগ্লানির কারণ হয়েছিল?

আসলে তাদের তখনকার প্রেমও বোধহয় নিখাদ ছিল না। সবকিছু রাজনীতির অস্থির আবর্তে ঘুরপাক খেত। তারা ভালবাসত নিজেদের স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব বজায় রেখে, নিজেদের দেশ সম্পর্কে সজাগ অভিমান নিয়ে। হায় যুদ্ধ আর যুদ্ধকালীন প্রেম!

—ফ্র্লা কেটি সম্পর্কে আমাদের অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কর্ণেল আপনি কি নিজেই ওকে জেরা করতে চান?

অধৈর্য মেজরের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

কর্ণেল ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। ভারমুথের ছোট গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে লম্বা চেয়ারটাতে সোজা হয়ে বসলেন। কর্ণেলের ধীর গম্ভীর কণ্ঠ ঝড়ের শব্দ বিদীর্ণ করে গম গম করে উঠল। কার্ল এখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। মেজর এবং ক্যাপ্টেন এই কার্লকে প্রচণ্ড ভয় করে সমীহ করেন।

—ফ্র্লা, ব্রিটিশ প্রিজন ক্যাম্পে আপনাকে কতদিন কাটাতে হয়েছে?

—পুরো দুই মাস, কর্ণেল।

—আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত, নয় কি?

কেটি ফ্রিডেল কর্ণেলের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। নতদৃষ্টিতে চুপ করে রইল কিছুটা বিভ্রান্তের মত।

কর্ণেল উঠে গিয়ে ব্র্যান্ডির বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে নিয়ে এলেন। এগিয়ে দিলেন মেয়েটির দিকে।

—একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে নিন। আপনি বেশ তাজা বোধ করবেন।

কেটি ফ্রিডেল গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে সবটা শেষ করে ফেলল।

—পুরো দুমাস আপনি প্রিজন ক্যাম্পে ছিলেন, তাই নয়? সে তুলনায় আপনি বেশ সুঠাম, সুন্দর এবং সবল রয়েছেন বলা চলে। প্রিজনার হিসাবে আপনি বেশ বহাল তবিয়তেই ছিলেন বলতে হবে।

কর্ণেলের কণ্ঠে প্রচণ্ড ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

কোর্টি ফ্রিডেল বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে বলে মনে হল না। ওর দৃষ্টি স্থিরভাবে কর্ণেলের উপর নিবদ্ধ।

হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে তীব্র স্বরে বলল, ওয়েল, কর্ণেল, আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী নই। হোয়াই নট টেল ইওর অফিসারস হু আই অ্যাম।

কোর্টি ফ্রিডেল এই প্রথম ইংরেজীতে কথা বলল। এতক্ষণ সকলেই কেবলমাত্র জার্মান ভাষাতে কথা বলেছে, কোর্টির মুখে ইংরেজী শুনে মেজর এবং ক্যাপ্টেন চমকে উঠলেন। ওঁদের চোখে-মুখে গভীর বিস্ময়।

—লরা আমার পূর্ব পরিচিত। আমরা দুজনে বার্লিনে একসঙ্গে ইংরেজী শিখেছি। ভালই হল, শত্রুপক্ষের ভাষাটা আবার ঝালিয়ে নেওয়া যাবে। হয়তো পরে কাজে লাগতে পারে।

কার্ল হাসতে হাসতে বললেন। তারপর হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। বড় দ্রুত এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। জিরো আওয়ারের দিকে।

—মেজর রিভান, ক্যাপ্টেন টেনান, আপনারা এখন যেতে পারেন। ঠিক আধ-ঘণ্টা পরে আপনারা রিপোর্ট করবেন। একটা জরুরী আদেশ তখন দেওয়া হবে।

মেজর এবং ক্যাপ্টেন যেন নিভে গেলেন। কৌতূহল দমন করে উঠে দাঁড়াতে হল। জার্মান আর্মির ডিসিপ্লিন কৌতূহল ক্ষমা করে না। হাইল হিটলার। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিলেন দুই অফিসার।

'ওয়েল, ওয়েল,' ঝরঝরে স্পষ্ট ইংরেজীতে কথা বললেন জার্মান কর্ণেল—দিস ইজ এ স্ট্রেঞ্জ ওয়ার্লড অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ আর দি ওয়েজ অফ গড।

—ইয়েস, কার্ল, ভাবতে পারি নি এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। বেশ ভালই আছ মনে হয়। সম্মান, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি সবই তুমি লাভ করেছ।

—ঠিক, ঠিক, অনেক কিছুই আমি পেয়েছি—নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে। তবে কখনো ভাবিনি এভাবে নোংরা এক স্পাই-এর কাজে তোমাকে দেখতে পাব, শেম শেম। মিলার, মিলারও কি একই কাজ করছে?

কার্লের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা ঝরে পড়ল। ইচ্ছে করে যেন গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেন মেয়েটিকে।

—মিলার রয়েল এয়ার ফোর্সের পাইলট। আর আমি? এই কাজ নিয়ে আমার নিজের কোন ক্ষোভ নেই। তুমি যুদ্ধোন্মাদ সৈনিক, আমি অন্য পথে নিজের দেশকে সাহায্য করছি।

—অর্থাৎ বলা চলে আরও বৃহত্তর হত্যার সুযোগ সন্ধান করে দেওয়াই তোমার কাজ।

বিমর্ষ অবশ কণ্ঠে লরা বলল, কার্ল, তোমার করণীয় তুমি করতে পার। কোর্ট মার্শালের জন্য আমি তৈরীই আছি। পরস্পরের মন বিষিয়ে লাভ নেই—আমি ভিন্ন রাস্তার নিঃসঙ্গ পথিক।

কর্ণেল কার্ল বিষণ্ণ চোখে লরাকে লক্ষ্য করলেন। জার্মান অ্যামবুলেন্স কোরের পুরাতন পোষাক, নিখুঁত জার্মান উচ্চারণ, আর্মি ডিটেলস, সব মিলিয়ে স্পাই-এর একটি চূড়ান্ত পারফেকশান। ওর উদ্দেশ্য ছিল নানা গোপন তথ্য সংগ্রহ করে আবার সুযোগমত পালিয়ে যাওয়া। শুধুমাত্র কার্লের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কর্ণেল মনে মনে সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনা করলেন। জিরো আওয়ার দ্রুত এগিয়ে আসছে। এ সময়ে কোনরকম দ্বিধার সুযোগ নেই। কর্তব্যপালনে কার্ল নিজেও কোন দ্বিধা অনুভব করছিলেন না। লরার প্রতি বিন্দু-মাত্র প্রেম বা অনুকম্পার অনুভূতি তাঁর নেই। কার্ল আশ্চর্য বোধ করলেন। এই নির্মম ডেভাস্টেটিং ওয়ার ধীরে ধীরে, অতি নিঃশব্দে ওঁর অনেক কিছু যেন শুষে নিয়েছে। বালুভূমির নিঃসীম শূন্যতা এই যেন প্রথম কার্ল অনুভব করলেন।

শীতে কাঁপছে লরা, কিন্তু ভেঙে পড়বে না বোঝা যায়। ওর পরনের জীর্ণ খাকি পোষাক শীত আটকাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুটি মিডিয়াম গ্লাস পূর্ণ করে ব্র্যান্ডি ঢাললেন কার্ল। দুহাতে গ্লাস দুটো নিয়ে টেবিলে ফিরে আসার সময় কোণের গ্রামোফোনটার দিকে নজর গেল। বিটোফেনের রেকর্ডটা এখনও খুলে নেওয়া হয় নি। সামান্য একটু বেজেই থেমে গেছে রেকর্ডটা, এখনও খুলে নেওয়া হয়নি। সামান্য একটু বেজেই থেমে গেছে রেকর্ড-খানা। গ্রামোফোনটারও ঐ একই দশা। কেমন একটা ভাঙা ভাঙা আওয়াজ বেরোচ্ছে। তবুও কর্ণেল ওটাকে ফেলে দিতে পারেননি। তিনি নিজে গান শেখেননি কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তাঁর বেড়েই চলেছে। যুদ্ধের উন্মাদনা তাতে ছেদ টানতে পারেনি।

কর্ণেল লরা সম্পর্কে ভীষণভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ওর গলায় কি বিটোফেন, বাচ, মোজার্ট আর বেজে ওঠে না? লরার মনের ভিতরকার সব খবরই একদিন তিনি জানতেন। সেই লরা ওঁর একটি অনুরোধ কি রাখবে না?

—লরা, অনেক কথা বললাম, একটা যদি অনুরোধ করি?

—অনুরোধ? আদেশ নয়?

—না, যা আদেশের অনেক উপরে, আবেদন বা প্রার্থনাও বলতে পার।

—কী? লরার বিস্মিত কণ্ঠ।

—তুমি জান আমি সংগীত কত ভালবাসি, আমার পুরনো গ্রামোফোনের সঙ্গে আছে ভাঙা কখানা রেকর্ড। একখানা মাত্র বিটোফেন, দুখানা করে বাচ আর মোজার্ট। লরা, তোমার গলায় জার্মান সংগীত বড় সুন্দর ফুটে উঠত, তখন তোমার গান শোনার জন্য পাগল হয়ে উঠতাম, আজও তোমার কাছে আমার ঐ একই প্রার্থনা।

স্পষ্ট মিনতির কণ্ঠে কার্ল কথা বললেন।

কয়েকমুহূর্ত ইতস্ততঃ করল লরা। অনুরোধের আকস্মিকতায় কিরকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। তারপর শান্ত স্তব্ধতার স্থির হয়ে গেল লরা। সমস্ত দরদ ঢেলে সে গান শুরু করল। অস্ফুট থেকে মাঝা-মাঝি পর্দায়, পর পর দুখানা। ঘরের কোণে অনুজ্জ্বল একটি কেরোসিন ল্যাম্প। আবছা অন্ধকারের মধ্যে কার্লের সম্মোহিত মূর্তি। কর্কশ ডান হাতখানা কপালে রেখে বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কর্ণেল কার্ল প্রিয়েন। তাঁর মনে হচ্ছিল জীবনের পূর্ণপাত্র থেকে সমস্ত আনন্দরস নিংড়ে পান করে তিনি পরিতৃপ্ত, অথচ সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করছিলেন নিদয় এক হতাশা। লরার গানের শেষ দুটি কলি গভীর আনন্দ আর বেদনার রেশ ছড়িয়ে দিয়েছে, ওঁরা দুজনেই তার আচ্ছন্নতায় নিমগ্ন,—জীবন বড় সংক্ষিপ্ত, সামান্য একটু আশা, একটুখানি স্বপ্ন—তারপর? হে বন্ধু, বিদায়।

কখন নিজের অজ্ঞাতে উঠে এসেছেন কর্ণেল। লরার সামনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধের উপর নিজের হাত রাখলেন। নিমেষের মধ্যে প্রশস্ত বুকের মাঝে টেনে নিলেন স্পাই মেয়েটিকে। গভীর যত্নের সঙ্গে ওর কপালের মাঝখানে নিজের ঠোঁট ছোঁওয়ালেন। অবিশ্বাস্যের দোলায় লরার সারা শরীর ওঁর বন্ধনের মধ্যে কাঁপছে। কার্ল নিজে কোন সংকোচ বোধ করছিলেন না। তাঁর কর্তব্য তিনি স্থির করে ফেলেছেন: জার্মান বাহিনীর ডিসিপ্লিন তিনি ভাঙবেন না, এই মরুভূমির বিস্তৃতার মধ্যে বাচ-মোজার্টের সংগীতের মর্যাদাও তিনি রাখবেন।
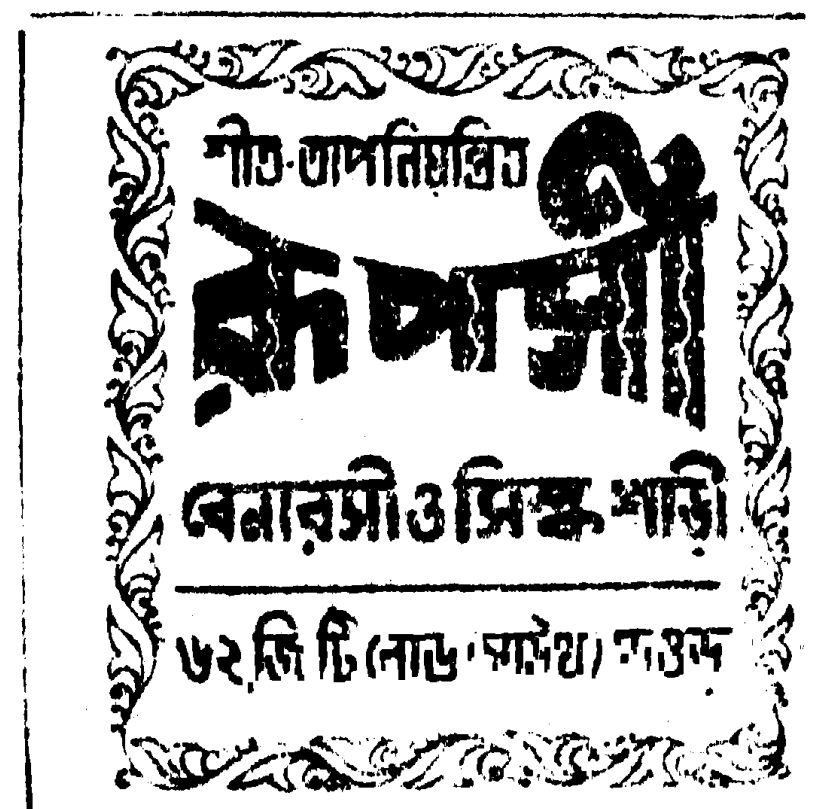
টেন্টের বাইরে মেজর রিভান এবং ক্যাপ্টেন টেনাসের গলা শোনা গেল। আধ ঘণ্টা সময় এর মধ্যে পেরিয়ে গেল?

ক্যাপ্টেন এবং মেজর দ্রুতপদে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন কার্ল—ফ্রয়লা কেটি ফ্রিডেল সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওঁকে একটা গুরুদায়িত্ব দেওয়া হবে। ফ্রয়লা ইংরেজী জানেন, ব্রিটিশ লাইনে, রয়েল আর্মির নার্স সাজিয়ে ওঁকে আমি পাঠাতে চাই।

—স্পাইয়িং? কিন্তু কর্ণেল, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে কোর কম্যাণ্ডের অনুমতি দরকার হবে।

মেজর বিভান তাঁর সংশয় জানালেন।

—আমাদের হাতে মোটেই সময় নেই মেজর। ব্রিটিশ লাইনের ট্রুপ মুভমেণ্ট সম্পর্কে ইনফরমেশান আমার দারুণ কাজে লাগবে। আমাদের অ্যামবুলেন্স কোরের কাজ কেটি ফ্রিডেল না থাকলেও নিশ্চয় চলতে পারবে।

ক্যাপ্টেন বা মেজর কেউই কর্ণেলের যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না।

—ক্যাপ্টেন টেনাস, আপনি ওঁকে ব্রিটিশ অ্যামবুলেনস কোরের নার্সের পোষাকে সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। তারপর ওঁকে আমাদের ট্রুপ লাইন ক্রস করিয়ে দিতে হবে। মিস, ডু ইউ রিকোয়ার এনিথিং এলস ফর ইওর মিশন? নাথিং?

ক্যাপ্টেন টেনাস নির্দেশ অনুযায়ী বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই একজন সেপাই ব্রিটিশ নার্সের পোষাক এনে সামনের টেবিলে রাখল।

ইঙ্গিত দেখিয়ে দিয়ে সকলে টেন্টের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'আই অ্যাম রেডি'—মিনিট দুয়েকের মধ্যে লরার গলা শোনা গেল।

কার্ল টেন্টের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—'নাউ ইউ লুক ইওর একজ্যাকট সেল্ফ, লরা।

—কার্ল, তোমাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি কি সত্যিই মুক্তি পাচ্ছি?

—আমি না, তোমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হল। ফিফটি-ফিফটি চান্স। লরা, আজকের এই একটু সময়ের জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী, ইনডেটেড। ট্যাঙ্ক, গ্রেনেড, অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট, ধোঁয়া আর বারুদের মধ্যে আমি হারিয়ে যেতে বসেছিলাম। আজকের এই ক্ষণিকের মুক্তির মূল্য আমার কাছে অনেকখানি।

কর্ণেল কার্ল অন্ধকার মরুভূমির দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। কার্ল হঠাৎ লরার জন্য দুঃখ অনুভব করলেন। এই নির্জন অন্ধকারে মাইলের পর মাইল আবার ওকে ফিরে যেতে হবে, সঙ্গে থাকবে অসাফল্যের বিরাট বোঝা, নিজের বাহিনীতে ও কি পোঁছুতে পারবে? কি জানি? কার্ল আবার ভাবলেন—ফিফটি-ফিফটি চান্স।

ক্যাপ্টেন টেনাস টেন্টের বাইরে এক পাহাড় বালির বস্তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হয়তো খেয়ালী কর্ণেলের ভাবভঙ্গী দেখে মজা পাচ্ছে। স্পাই মিশন নিয়ে যাওয়া মেয়েটার সঙ্গে, কী এত কথা থাকতে পারে? আধ ঘণ্টা ধরে কর্ণেল তো ওকে ডিউটি বুঝিয়েছেন। তাতেও কি হয়নি? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে, পরে এই নিয়ে কোর কমাণ্ডের সঙ্গে আবার খিটিমিটি না লেগে যায়। মেজর রিভান আপনমনে বালির উপর পায়চারি করছেন। ওঁরও বোধহয় ঐ একই ভাবনা।

মেয়েটিকে সঙ্গে করে কর্ণেল নিজেই এগিয়ে এলেন। ফ্রয়লা যুবতী হিসেবে বড়ই নিরুত্তাপ, সম্ভবতঃ স্পায়িং মিশনে ওর সম্মতি নেই। মেজর মনে মনে ভাবলেন। ক্যাপ্টেন ওকে নিয়ে ফ্রন্ট লাইনের দিকে এগিয়ে চললেন।—গুড লাক, ফ্রয়লা। কর্ণেল হাত নেড়ে বললেন, মেয়েটা একবার ফিরেও দেখল না। নীরবে ক্যাপ্টেনকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল।

—মেজর রিভান?

কর্ণেলের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আহ্বানে মেজর চমকে উঠলেন।

—ইয়েস, কর্ণেল?

মেজর তাঁর লম্বা ডানহাতখানা সামনের দিকে প্রসারিত করে কার্লকে অভিবাদন জানালেন। কর্ণেলের হাতের মুঠোর মধ্যে ছোট এক টুকরো কাগজ। সেটি নিঃশব্দে মেজরের হাতে তুলে দিলেন। জিরো আওয়ারের স্পষ্ট নির্দেশ। জেনারেল রোমেলের স্বাক্ষরিত। আর সময় নেই। প্রতিটি সৈন্যকে এক্ষুনি পজিশন নিয়ে নিতে হবে। ক্ষিপ্র চাঞ্চল্যে মেজর রিভান সাঁজোয়া বহরের দিকে ছুটে গেলেন।

সামান্য একটু সময়ের মধ্যেই জেগে উঠল সমস্ত বাহিনী। সর্বত্র সাজ-সাজ রব: তারপরেই শুরু হবে রোমেলের দুধর্ষ ডেজার্ট ফোর্সের এগিয়ে চলা শত্রু শিবিরের দূরত্ব বোধহয় দশ-বারো মাইল। সাঁজোয়া বাহিনীর গুম গুম শব্দে মরুভূমির শান্ত নিস্তব্ধতা গুঁড়িয়ে গেল। কামানগুলো ডাইনে-বামে সামনের দিকে ঘুরে শেষে সামনের দিকে স্থির হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য তীব্র সার্চলাইটের আলো জ্বলে উঠল। কর্ণেল সম্মুখে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর চোখে-মুখে খেদের চিহ্নমাত্র নেই।

বিঠোফেন-বাচ-মোজার্ট আর আর্মি ডিসিপ্লিনের মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় তিনি সাধন করেছেন। লরাকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই পুরো সুযোগ তাকে দেননি। আধঘণ্টা সময় আর মরুভূমির এই সুদীর্ঘ পথ, সে কি পোঁছুতে পারবে—না কি অনেক আগেই তাকে ধরে ফেলবে জার্মান কামানের অজস্র গোলা?

নাৎসী কর্ণেল তাঁর আবমার্ড কারের অভ্যন্তরে বসে ক্রস আঁকলেন। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, মে গড সেভ হার।

অঙ্গনা

মহিলা গোয়েন্দা
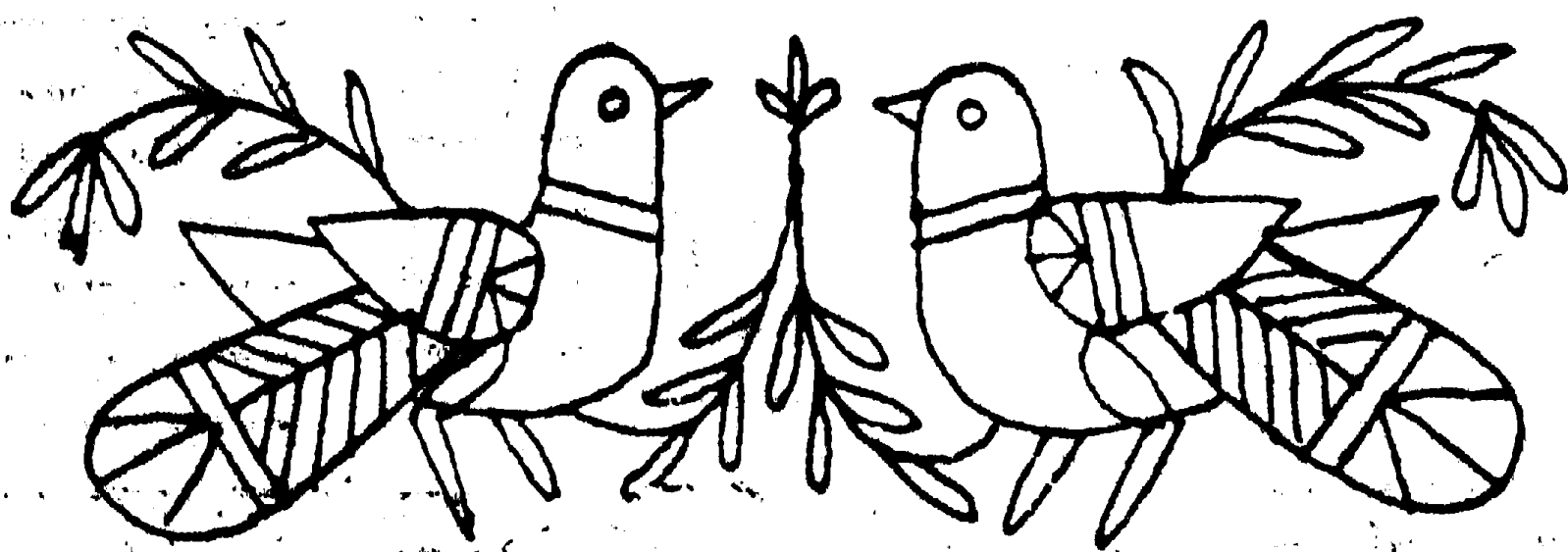
গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে কার না ভাল লাগে? সবাই আমরা অল্প বিস্তর এর অনুরাগী। কাহিনীর চরম মুহূর্তে আমাদের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোয়েন্দা কেবল ক্ষুরধার বুদ্ধিতে শয়তানের চক্রকে ভোঁতা বানিয়ে দিচ্ছেন। সেই মুহূর্তে একদিকে তাঁর বুদ্ধির চাতুর্য এবং অন্যদিকে দৈহিক শক্তির নিপুণ প্রয়োগে তিনি আমাদের হৃদয়ের সবখানি জুড়ে থাকেন। তখন আমাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা জট খুলে বেরিয়ে এসে কখন তিনি সত্যকে সকলের সামনে স্পষ্ট করবেন। পরিশেষে আমাদের প্রতীক্ষা জয়যুক্ত হয়। প্রায় অবিশ্বাস্য সাফল্যে উপনীত হন তিনি। কাহিনীর জট খুলতে শুরু করেন। সুর-অসুরের দ্বন্দ্বে সুর জয়ী হয় আর অসুর যে পর্যুদস্ত সে কথা বলাই বাহুল্য। ঠিক তখনই আমাদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। এরকম একটি পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করে থাকি।

কিন্তু এর বিপরীত যদি কিছু ঘটে যেখানে গোয়েন্দা সফল হতে পারলেন না। এরকম কোন কথা আমরা গোয়েন্দার সম্পর্কে ভাবতে পারি না। আমাদের ধারণায়, তাঁর জীবনে শুধু সাফল্যই থাকবে। অসাফল্যের ব্যর্থতায় তাঁর জীবন কখনো গ্লানিময় হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে গোয়েন্দাও আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ। ভুল ত্রুটি তাঁর জীবনে খুবই স্বাভাবিক। শুধু সফলতার একচেটিয়া ফসল কেউ ঘরে তুলতে পারেন না। ব্যর্থতা কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। তবে এই ব্যর্থতা সফল ব্যক্তির জীবনের ভিত আরো পাকাপোক্ত করে। কিন্তু কাহিনীকার খুবসম্ভব পাঠকের মুখ চেয়ে গোয়েন্দার জীবনের এদিকটা পুরোপুরি চেপে যান। তাঁদের তুলিতে চিত্রিত গোয়েন্দার জীবন শুধুই সাফল্যে ভরপুর। ব্যর্থতার কোন ছোঁয়াচ সেখানে নেই। গোয়েন্দার ব্যক্তি জীবনে এরকমটি সচরাচর হয় না। সাফল্য-ব্যর্থতা সেখানে হাত ধরাধরি করে চলে।

এরকম একটি ব্যর্থতার কাহিনীই এবার বলবো। গোয়েন্দার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। চিরাচরিত বিশ্বাসে পুরুষ নয়, একজন মহিলা হলেন এই গোয়েন্দা এবং ঘটনা সম্পূর্ণ বাস্তব। একদিন সাতসকালে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল এই গোয়েন্দার। আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। তাই এ সময় ঘুমটা বেশ জেঁকেই এসেছিল। একবার ভাবলেন যে টেলিফোন ধরবেন না। বেজে বেজে আপনি থেমে যাবে। কিন্তু যিনি ফোন করছেন তিনি নাছোড়বান্দা। তাই টেলিফোন বাজতেই লাগলো। মাঝে মাঝে দু' একবার থেমে যায়। আবার বাজতে থাকে। অর্থাৎ ভদ্রলোক লাইন কাটেন লাইন জোড়েন। বেশ বিরক্তির সঙ্গে পাশ ফিরে হাত বাড়িয়ে গোয়েন্দা টেলিফোনটা ধরলেন। ওপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোকের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, আপনাকে আমার বিশেষ দরকার। যদি অনুমতি করেন তো তাহলে এক্ষুণি আপনার সঙ্গে দেখা করি। গোয়েন্দা ভদ্রলোকের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁর প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন এবং তাঁকে বাড়িতে আসতে বললেন।

একটু পরেই ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। তিনি খুবই হন্তদন্ত। গোয়েন্দা তাঁকে শান্ত কণ্ঠস্বরে বসতে বললেন। এমনি করে দু' এক মিনিট নীরবতায় কেটে গেল। গোয়েন্দা লক্ষ্য করলেন যে কথা না বলা পর্যন্ত ভদ্রলোক স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাই এবার তিনি তাঁর কাছে ঘটনাটা কি জানতে চাইলেন। উত্তরে ভদ্রলোক যা বললেন তা নিতান্তই তাঁর পারিবারিক ব্যাপার। ঘটনাটা হলো এরকম: ওদের স্বামী-স্ত্রীর সংসার। সন্তান বলতে একটি মাত্র বছর আটেকের মেয়ে। বেশ সুখেই ওঁরা ছিলেন। কিন্তু সুখ এবার ছুটি খুঁজছে। এখন প্রতি পদেই অশান্তি আর মেয়েটিকে নিয়েই হচ্ছে যতো ঝামেলা। স্ত্রী ভদ্রমহিলা এখন আর স্বামী ভদ্রলোককে তেমন পছন্দ করছেন না। তিনি অন্য লোককে ভালবাসছেন এবং এজন্য বিবাহ বিচ্ছেদ চান। কিন্তু চাইলেই তো আর সব কিছু হয় না। এখন যদি স্ত্রীর ইচ্ছেমত বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে এই ছোট মেয়েটার কি গতি হবে? এজন্যই তিনি গোয়েন্দার স্মরণস্থ হয়েছেন একটা কিছু সুপরামর্শের জন্য।

গোয়েন্দা সব কিছু শুনলেন। কিন্তু তিনি পরামর্শ দেবার আগে জানতে চাইলেন যে এব্যাপারে সেই স্বামী ভদ্রলোক কিছু ভেবেছেন কিনা। এর উত্তরে তিনি জানালেন যে, একবার যদি স্ত্রীর নতুন প্রণয়ীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তাহলে সমস্যার একটা হিল্লে হয়ে যায়। এতে তাঁর কি সুবিধে হবে গোয়েন্দার এ ধরণের জেরার উত্তরে তিনি বললেন যে, সেই ভদ্রলোককে তিনি সব কথা খুলে বলবেন এবং বিশেষ করে তাঁর মেয়েটির অসুবিধার কথা। আর তাঁর ধারণা যে, সব বুঝিয়ে বললে ভদ্রলোক খুব একটা অবুঝের মতো কাজ করবেন না। হয়তো এ যাত্রায় বিবাহ বিচ্ছেদের হাত থেকে রেহাই মিলতেও পারে।

সব শুনে গোয়েন্দা বললেন যে, এজন্য তিনি তাঁকে কি ধরণের সাহায্য করতে পারেন। ভদ্রলোক জানালেন যে, একবার যদি কোনক্রমে স্ত্রীর এই প্রণয়ীর সঙ্গে গোয়েন্দা তাঁকে দেখা করিয়ে দিতে পারেন তাহলেই চলবে। কারণ, ইতিপূর্বে অনেক চেষ্টা করেও তিনি প্রার্থিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে পারেন নি। অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে এদিকে দিনের পর দিন অবনতি ঘটছে। তাই এই সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেওয়াই আপাতত গোয়েন্দার কাছে তাঁর একমাত্র আরজি। অন্য কোন সাহায্য তোলা থাক ভবিষ্যতের জন্য।

গোয়েন্দা সব শুনলেন। ভদ্রলোকের আকুতি ভরা কণ্ঠস্বরে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং কেসটা হাতে নিলেন। তারপর শুরু হলো তাঁর কাজ। তিনি সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চললেন এবং প্রথম দিনেই সফল হলেন। দিনের শেষে এক যাদুঘরে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে আবিষ্কার করলেন এক পুরুষের সঙ্গে। তাঁর মনে হলো যে এই হয়তো নতুন প্রণয়ী। কিন্তু একদিনেই তো আর এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তাই তাঁর এই অনুসরণ কার্য চলতে লাগলো। ওঁরা বেশ চালাক। রোজ একই জায়গায় মিলিত হন না। রোজই জায়গা পালটান। দু' একদিন ওঁদের লক্ষ্য করলেন। তারপরে এক ফাঁকে এসে আলাপ জমালেন। কিন্তু ওদের একটুও ধারণা করতে দিলেন না যে তিনি গোয়েন্দা এবং এ কাজে তাঁকে

নিযুক্ত করেছে তাঁর স্বামী। আলাপ-পরিচয় হলো। এক ফাঁকে তিনি জেনে নিলেন কালকে ও'রা কোথায় যাচ্ছেন?

তিনি জায়গার হদিশ পেয়ে গেলেন। আর তার কোন দরকার নেই। এবার শুধু দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর প্রয়োজন। তাহলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ। তবে বিবাহবিচ্ছেদ না হলেই তাঁর দায়িত্ব তিনি সফলভাবে শেষ করতে পারবেন। বিশেষত, মেয়েটার ভাবনা তাঁকে রীতিমত চিন্তিত করে তুলেছে। পরদিন তিনি ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন সেই জায়গায়। দূরে থেকে তিনি লোকটাকে চিনিয়ে দিয়ে সরে গেলেন। স্ত্রী ভদ্রমহিলা এরকম অবস্থার জন্য মোটেই তৈরি ছিলেন না। তিনি সযত্নে তাঁর নতুন প্রেমিককে স্বামীর কাছ থেকে দূরে রাখছিলেন। কারণ, তিনি যেভাবে বিবাহবিচ্ছেদে বাদ সাধছেন তাতে হয়তো নিষ্কণ্টক হবার জন্য এই নতুন প্রণয়ীকে খুনও করে দিতে পারেন। তাই তাঁর এই সতর্কতা।

কিন্তু এতো সতর্কতা টিঁকলো না। ধরা পড়ে গেলেন। এবং ধরা যখন পড়ে গেছেন তখন আজই এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। ও'রা তিনজন এক টেবিলে বসলেন। স্বামী ভদ্রলোক নতুন প্রণয়ীকে সব কথা জানালেন। এবার তাকালেন স্ত্রীর দিকে। কিন্তু কারো মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন না। কিছুক্ষণ পরে স্বামী ভদ্রলোকের মনে হলো যে, তিনি যেন নিষ্প্রাণ জড়বস্তুর সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর কথা তাঁকেই বিদ্রূপ করছে। তাই তিনি সোজাসুজি সেই প্রণয়ী ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলেন যে এরকম একটা বছর আঠেকের মেয়ে নিয়ে তাঁর মতো অবস্থায় পড়লে তিনি কি করতেন? কিন্তু একথারও কোন জবাব তিনি পেলেন না। বোঝা গেল স্ত্রী ভদ্রমহিলা যেমন বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অনড় তেমনি এই নতুন প্রণয়ীও তাঁকে বিয়ে করতে সম্পূর্ণ আগ্রহী এবং এ ব্যাপারে তিনি কোন কিছু বিবেচনা পর্যন্ত করতে রাজি নন। তাই যা চূড়ান্ত পরিণতি তাই ঘটলো। স্বামী স্ত্রীর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালেন না। স্ত্রী এতদিনের সব মায়া-মোহ পরিত্যাগ করে নতুন প্রণয়ীর সঙ্গে ঘর বাঁধলেন।

গোয়েন্দার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তিনি তা সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ রোধ করতে পারলেন না। তাহলে তাঁর গোয়েন্দাগিরি পুরোপুরি সফল হতো। এবং এটিই ইভা সিমেন্সের গোয়েন্দা জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরাজয়ের কাহিনী। তাই এধরনের কেস আর তিনি নিতে চান না। তবু এই সমস্যায় আক্রান্ত অনেকেই তাঁর কাছে আসেন। তাঁদের সরাসরি তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন না। সে তাঁর বিবেকেই কিরকম বাধে। তাই হিসেব নিলে দেখা যায় যে, প্রতি চারটে কেসের একটাই হলো এই বৈবাহিক সমস্যাসংক্রান্ত এবং বর্তমান বিয়ের মর্মান্তিক পরিণতিতে তিনি রীতিমতো দুঃখিত।

কিন্তু এ থেকে এরকম সিদ্ধান্ত করা সঠিক হবে না যে তিনি কেবল এধরনের ছোটখাটো কেসই করে বেড়ান। অগ্নি-সংযোগ থেকে চোরাই চালান পর্যন্ত নানা কেস তিনি দেখে থাকেন। খুনের কেসও তাঁর কাছে আসে। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ যখন ঠিক ঠিক হদিশ করতে পারে না তখনই লোকেরা তাঁর শরণাপন্ন হন। এখন তিনটে খুনের কেস তাঁর হাতে এবং প্রত্যেকটি কেসেই পুলিশকে নতুন করে কেসবুক খুলতে হয়েছে। নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করাই হলো তাঁর কাজ। অবশ্যই পুরনোর সূত্র ধরে। এজন্য তাঁকে মাঝে মধ্যে কোর্টেও যেতে হয়।

একবার একটা খুব মজার কেস তাঁর হাতে পড়েছিল। একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম-প্রস্তুতকারী কারখানার খুব ক্ষতি হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই সব মূল্যবান সরঞ্জাম কে বা কারা সরিয়ে ফেলে। অনেক চেষ্টা করেও অপরাধী আর বামাল কোনকিছুরই হদিশ পাওয়া যায়নি। এবার তাঁর উপর দায়িত্ব পড়লো চোর ধরার। দায়িত্ব নিয়ে সাধারণ কর্মীর মতোই তিনি কারখানায় ঢুকলেন। কিন্তু অনেকদিন পরও কোন কিছুর হদিশ পেলেন না। এদিকে প্রতি মাসে একইরকম ক্ষতি হচ্ছে। তিনি আরো তৎপর হলেন এবং চোরও ধরা পড়লো। দেখা গেল যে কাজের শেষে কয়েকজন জঞ্জাল স্তূপ থেকে কি সব বের করছে। সন্দেহক্রমে সেগুলো তিনি আটকালেন। আর দেখা গেল যে সেগুলোই হলো চোরাই মাল। বামালসমেত চোর ধরা পড়লো। সফল গোয়েন্দা ইভার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।

গোয়েন্দাগিরিতে ইভার গুরু হলো তাঁর স্বামী। তিনিই হলেন আসল গোয়েন্দা। কানাডায় শিক্ষানবীশ ছিলেন। ইভা ও'র কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। এখন কাজকর্ম একসঙ্গেই করেন। এই দীক্ষাটুকু ছাড়া ইভার নিজের যোগ্যতাও কম নয়। একাধিক কাজে তিনি হাত পাকিয়েছেন। সেলস টেকনিক তাঁর ভালভাবে জানা। হেয়ারড্রেসার থেকে ওয়েট্রেসের কাজে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সর্বোপরি গোয়েন্দা সংস্থায় তিন বছর কাজ শিখেছেন। নানা শারীরিক কসরত তিনি আয়ত্ত করেছেন যে-কোন বিপদের মোকাবিলার জন্য।

গোয়েন্দার পেশায় মেয়েরা মোটেই বেমানান নয়—জার্মান-দুহিতা ইভা দৃঢ়তার সঙ্গে এমত পোষণ করেন। তাছাড়া আরো সুবিধা যে, মেয়েদের চট করে গোয়েন্দা বলে ঠাউরে ওঠা কারো পক্ষে সহজ নয়। সেদিক থেকে এ পেশায় মেয়েদের সফল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

মেয়েদের মধ্যে এই পেশা উৎসাহ জাগাতে পারবে কিনা সেটাই ভাববার কথা।

—প্রমীলা
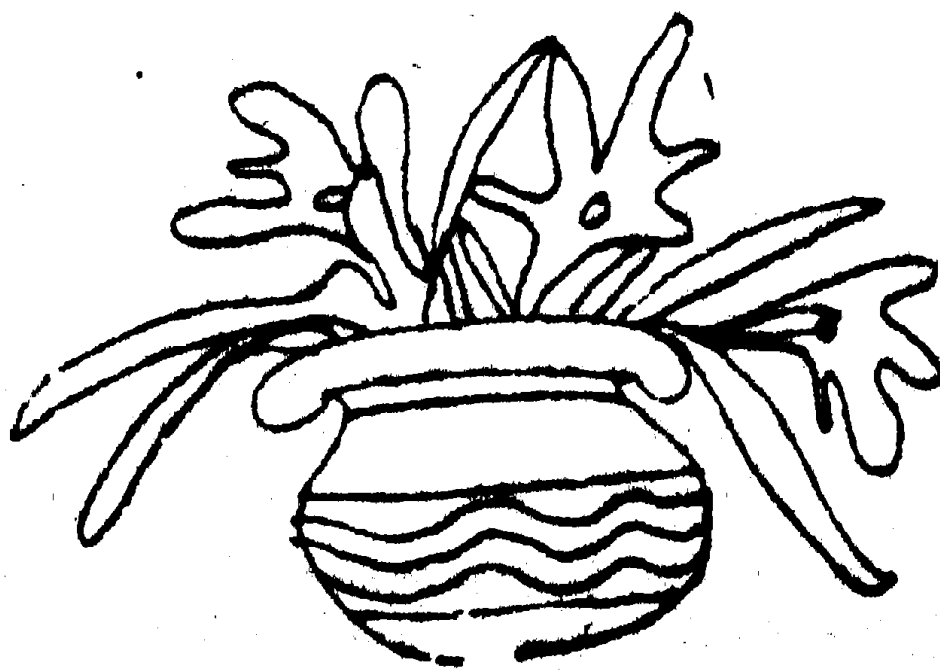
পরবের দিনে সাঁওতাল

বর্তমান যুগে মানুষের ভাবনা-চিন্তা, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি প্রভৃতি দিনকে দিন বদলে যাচ্ছে। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। বর্তমানের মানুষ বিচারবুদ্ধি দিয়ে তাঁর সংস্কারের খানিক রদবদল করে তাঁর ভবিষ্যৎ গড়তে চায়। এটাই বোধহয় তাঁর সংস্কৃতির গড়ন-পিটন। এটাই তাঁর চিন্তা, শিক্ষিতমনের সুস্থ প্রকাশ। এই গড়ন-পিটন, চিন্তা-ভাবনা সবগুলোই আসছে তাঁর অতীতের আর বর্তমানের সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে।

পরিবর্তন যেমন আধুনিক সমাজে হচ্ছে তেমনি এই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগছে আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে। উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতালদের নামই প্রথম মনে আসে। সভ্যতার আলোকে আজকে এরাও উদ্ভাসিত। প্রতিবেশী বিভিন্ন হিন্দুজাতির সঙ্গে বসবাস করে মেদিনী-পুরের সাঁওতালদের অনেকেই খানিক হিন্দুয়ানা রপ্ত করতে চাইছে। সেইহেতু সাংস্কৃতিক মিলনের স্রোতেও তারা অবগাহন করছে। আজ তাদের অনেকেরই অঙ্গে শোভা পাচ্ছে হিন্দুদের মত জামা-কাপড়, জুতো, ঘড়ি, কলম কিন্তু পুজো-পার্বণ প্রায় সব কিছুতেই তারা নিজস্ব সংস্কৃতি জিইয়ে রেখেছে। তাই আজও তাদের মাদলের তালে তালে গলা মিলিয়ে গান শোনা যায়। তাই তাদের সংস্কৃতি আমাদের বিস্ময় আনে, জাগায় কৌতূহল।

বিশেষজ্ঞদের মতে সাঁওতালরা বৈদিক ঋষিদের বর্ণিত 'নিষাদ' ও 'শবর'দের বংশধর, অথবা দস্যুরা ছিল এদের পূর্ব-পুরুষ। 'নিষাদ' ও 'দস্যুদের' এইসব বংশ-ধরদের আরও অন্যান্য শাখারা আজ দারিদ্র্যের জন্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের সাঁওতালদের পরবের মধ্যে পৌষসংক্রান্তিতে টুসু উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবটি শুরু হবার দিনকয়েক আগে থেকেই উৎসবের মহড়া, হৈ-হুল্লোর শুরু হয়ে যায়। হিন্দুদের মতই পৌষ-সংক্রান্তিতে সাঁওতাল মেয়েপুরুষেরা দল বেঁধে উল্লাসে, আনন্দে মকর স্নান সমাপ্ত করে। তারপর মেয়েপুরুষ সমবেতভাবে টুসুর সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে তাদের উৎসব শেষ করে। নারীপুরুষ এককভাবেও তাদের এই গানগুলো গেয়ে থাকে। সারারাত ধরে তাদের এই গানের সুর আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে, পল্লীর শালবনকে ছাপিয়ে শহরবাসীকে রোমাঞ্চিত করে। ওরা গান গায়—

"টুসুর কাছে আলো জ্বলে
 দেখায় লো কালো কালো।
বিষ্ণুপুরে টুসু আমার
 খুঁজে গো ঝাড়ের আলো।।
মেদিনীপুর দেখে আইলাম
 সোনার টুসু যায় চলে।

মেদি বা মেহেদী দিয়ে হাতে পায়ে নকশা কাটার রেওয়াজ রাজস্থানী ও মুসলমানদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। এসকল স্থানের নারীরা বিয়ে ছাড়া বিশেষ কোন উৎসবে নিজেদের এভাবে চিত্রিত করে সাজতে ভালবাসেন। এ সাজের চলন বহুদিন থেকেই চলে আসছে। আধুনিকাদের মধ্যে আজকাল এভাবে হাত-পা রাঙিয়ে মন রাঙাতে বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নিচে মেদিতে ছাপানো দুটি হাতের নকশা দেওয়া হল—

হায়রে হাতে নাইরে পয়সা
 লিতম টুসু দর করে।।
ওরে ওরে ও চৌকিদার,
 কোন কুলিতে হাঁক দিলি।
আমার পাড়ায় টুসু চুরি;
কোন্ থানেতে ঘুমিয়েছিলি।।"

এমনিধারা আরও গান গেয়ে টুসু উৎসবটি পালন করে। টুসু উৎসবের সমারোহ ও জাঁকজমক মানভূম থেকে শুরু করে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে অঞ্চলেই বেশী লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের পৌষ-পার্বণের উৎসবের মত সাঁওতালদেরও ধান কাটা-ঝাড়া-পোঁছা শেষ হলে সবচেয়ে বড় পরব দেখা যায়—সোহরায় পরব। এই পরবও চলে কয়েকদিন ধরে। এই সোহরায় পরব শস্য উৎপাদনের জন্য অর্থাৎ শস্য উৎসবও বলা যায়। এই পরবটির মধ্যে গো-উৎসবটি বেশী আকর্ষণীয়। এই পরবটিতে তারা গরুকে তাড়া করে গোলঘেরা 'খন্টে'র কাছে নিয়ে আসে আর গায়—

"ঠাকুরাহি সিরিজালা
 বোমা পিরিথিমা হো;
ঠাকুরাহি সিরিজালা
 গাইরা-বো য়ো রে।"

তারপর সাধারণতঃ গরুর পা ধুইয়ে, শিঙেতে ভাল করে তেল মাখিয়ে সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এরপর জোর কদমে বাজায় মাদল আর শুরু হয় হাঁড়িয়া খাওয়ার ঘটা। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে বুড়োবুড়িরা সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লে সাঁওতাল যুবকেরা গোয়ালঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাদল বাজায় গানের সুরে—

'গাইঁমনী আওয়ে বেরে না ডুবায়োহে
মাহিসিনি আওয়ে আধা রাতা য়ো য়ো রে.
মাহিসিনি আওয়ে আধা রাতা য়ো—

গরু ফেরে আঁধার ঘনাবার আগে আর মোষ ফেরে ঘন অন্ধকারে মধ্য রাতে। এমনি বিভিন্ন রকমের গান গেয়ে সাঁওতাল যুবারা মাদল আর বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে ফেরে, মেয়েরা এরপর গরু বরণ করে। দূর্বাঘাস, ধান আর আতপচাল গোয়ালের দিকে ছড়িয়ে গান গায়—

"হাতে লেলা আওয়া চাল,
গোছা লেলা পাকাল পান,
চালি বেলা আর্মাক দেবী
গাইয়ে চুম্বাই।"

হাতে নিয়ে আতপ চাল, সঙ্গে কোঁচড়ে পাকা ধান, আর্মাক দেবী চল গরু চুম্বাই! অতঃপর আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়নের জন্য খাট, পিঁড়ি পেতে দেওয়া হয়, এক মুঠো চিঁড়ে-মুড়ির অভ্যর্থনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গান গাওয়া হয়—

"ডুডু ডুডুসোনায়াতে
আয়েলে হো সাঙ্গা ভাইয়া
বাইসা হে সোনেরে পালাকে;
কিছুই নাহি করাল্য হো,
সাঙ্গা ভাইয়া, মাহিতে মরি।"

বন্ধুকে ডেকে বলে 'সাঙ্গা' ডুডু ডুডু বাজনা যখন তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তখন সোনার পালঙ্কেই বোসো। কিন্তু বন্ধুদের জন্য আয়োজন বেশী কিছু করতে না পেরে সংকুচিত হয়ে সাঙ্গাভাইকে এক ছিলিম তামাক ও জল দিয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মান দেয় ও আতিথেয়তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ করে এবং নিজেরা এক অনির্বচনীয় আনন্দ ভোগ করে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

জলসা

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে উদ্গাতা প্রযোজিত 'হাজার বছরের বাংলা গান'—এক উল্লেখযোগ্য সংগীতানুষ্ঠান। উদ্যোক্তা দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদার, আহ্বায়ক জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। এছাড়া কলকাতার সকল গুণী এবং শিল্পীই এই উল্লেখ্য প্রচেষ্টার সঙ্গে ছিলেন যুক্ত। দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদারকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন—চর্যাগীতির কাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের আধুনিক গান পর্যন্ত এক হাজার বছরের প্রচলিত বাংলা গানের গ্রন্থনা এবং সুর-রূপায়ণে ব্রতী হওয়ার জন্যে।

শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও এই কথাই বলব এই ধরনের প্রচেষ্টার নানা সার্থকতার মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলা গান নতুন করে তার সনাতন ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়িত হবে। এই অনুষ্ঠানের আর একটি উজ্জ্বল দিক হোলো—এই সংগীত সন্ধ্যায় সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হবে বৃদ্ধ অশক্ত ও বিপদাপন্ন শিল্পীদের সাহায্যার্থে। সর্বোপরি শিল্পীবৃন্দ শিল্পী-সুলভ উদারতাতেই বিনা পারিশ্রমিকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। সংগীত-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল চর্যাগীতি, মঙ্গল-কাব্য, শাক্তপদাবলী, বৈষ্ণবপদাবলী, কীর্তন, বাউল, টপ্পা, ভাটিয়ালী, ভক্তিমূলক থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ তথা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল-প্রসাদ, নজরুল—সলিল চৌধুরী ও বর্তমান যুগের গান।

এত গান, তাদের প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহ এবং সুরসংকলনের জন্য দীপ্তিপ্রকাশ-বাবুকে যে পরিমাণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও অধ্যয়ন করতে হয়েছে তা রীতিমত সাধনার পর্যায়ে পড়ে। এছাড়া পরিকল্পনা ও সংগীতপরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাঁর।

গৌতম বসু, গৌরী ঘোষ ও জগন্নাথ বসু—প্রতিটি গানের আগে তার পটভূমিকা ও অধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের সুললিত ভাষ্যপাঠ গানের রসোপভোগের আকর্ষণীয় সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

চর্যাগীতি গেয়ে শোনান স্বয়ং দীপ্তিপ্রকাশবাবু, টপ্পা ও ঠুংরী অনাথনাথ বসু, নজরুলগীতিতে ছিলেন আঙ্গুরবালা দেবী, ভক্তিমূলক গানে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ভাটিয়ালীতে অমর পাল, আলাওলে অংশুমান রায়। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগীতপরিবেশনায় ছিলেন বিমলভূষণ, ললিতা ঘোষ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক বাগচী, শিপ্রা বসু, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা সাহা, চিত্রলেখা চৌধুরী, স্নিগ্ধা ঘোষ, বলরাম দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দশজন শিল্পী। স্থানাভাবে সকলের নামোল্লেখ করা সম্ভব হল না, এজন্যে দুঃখিত। সংগতে প্রায় সকল প্রথিতনামা তবলচিই ছিলেন।

আপনাপন যোগ্যতা অনুযায়ী সকলেই মর্মগ্রাহী অনুষ্ঠান পেশ করেছেন। কিন্তু ভোলা যায় না সত্তরোর্ধ অনাথনাথ বসুর এই বয়সেও কণ্ঠের দাপট, জমজমাট প্রতিটি দানার উজ্জ্বল দীপ্তি ও গায়নশৈলীর সতেজ, সুস্পষ্ট বক্তব্য। বিশেষ অনুরোধে এঁর নারীকণ্ঠে গাওয়া ঠুংরী অনেক নারীরই কণ্ঠলাবণ্যকে হার মানায়।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর ভক্তিমূলক গান 'মা মা বলে ডাকব না আর' এবং 'আপনাতে আপনি থাক' ভক্ত শিল্পীর আত্মনিবেদিত চিত্তকে যেন মেলে ধরেছিল।

অমর পালের সরস ভঙ্গিতে গাওয়া ভাটিয়ালীতে অচিন গাঙের মাঝির দাঁড় টানার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা গেল। ললিতা ঘোষের গানের মৃদুতা ও মাধুর্য মনকে স্পর্শ করে।

প্রসূনবাবু গীত, রামমোহনের গান ও রাগসঙ্গীত রসিকসমাজের সানন্দ সাধুবাদে অভিনন্দিত হয়েছে।

এই অসাধারণ সঙ্গীত অনুষ্ঠান সব দিক দিয়ে বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এজন্যে অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদারকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবরং সঙ্গীত সম্মেলন

মুনাব্বর আলি খাঁ আয়োজিত ক... মন্দিরে সবরং সঙ্গীত সম্মে... কোলকাতার রসিকবৃন্দ সুযোগ পেয়ে... তাঁদের অতি আদরের শিল্পী '... গোলাম আলি খাঁর স্মৃতির প্রতি শ... প্রদর্শন করতে। তাঁর অপরূপ আ... মাখানো গায়নশৈলীকে নতুন করে ... করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও সুষ্ঠুভাবে পা... হয়েছে। এজন্য মুনাব্বর খাঁ সাহেব ও ... সহযোগী উদ্যোক্তবৃন্দ ধন্যবাদার্হ।

প্রবেশদ্বারের কাছেই খাঁ সাহে... বিরাট তৈলচিত্র—তার সামনের ... পুষ্পস্তবক—অসংখ্য সংগীতানুরাগীর... শ্রদ্ধা ও আবেগের ...পটিকে যেন ... দিয়েছিল।

যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যমণি ছিলেন ... বিলায়েৎ খাঁ সাহেব। বহুদিন ... যাদুকর সেতারীর মঞ্চে উপস্থিতি ... প্রেক্ষাগৃহকে যেন আনন্দে, উচ্ছ্বাসে মা... তুলেছিল। শিল্পী ধরলেন 'বাগেশ্রী'। পরিচিত হাসি, সেই প্রাণকাড়া ... দীর্ঘস্থায়ী রেশ যেন অনেকদিনের ... যাওয়া গানের একটি কালকে স্মরণ ক... দেয়। শক্তিমান শিল্পী দৃঢ়নিবদ্ধ মৌজ... গণ্ডীমুক্ত করে অন্তহীন সুরের আ... বিহাররত করেছেন তাঁর কল্পনা... রাগমূর্তিকে। এ আবেশ কি জো... এর সঙ্গে অপূর্ব সঙ্গতরস সৃষ্টি ক... রঙের রাজা কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব।

আর এক আকর্ষণ ছিল পণ্ডি... জি যোগ ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বেহালা ও হার্মোনিয়ম বাদন। শুদ্ধতা অনাহত রেখেও ভাব, রস, স... ছন্দের অনবদ্য সংহতিতে এ জ... রসোত্তীর্ণ।

বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত ও আমজেদ খাঁ আপনাপন বাদনশৈলীর যথ... নিদর্শন উপহার দিয়েছেন।

মুনাব্বর আলি খাঁর 'বেহাগ'—তাঁর বলিষ্ঠ গায়কী ও তানশৈলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই উপভোগ্য। কিন্তু বেহাগের শান্ত মধুর রূপকে তানের চাঞ্চল্যে একটু বিপর্যস্ত মনে হোলো। তুলনামূলক বিচারে অনেক ভাল লেগেছে তার 'কেদারা' রাগের তারাণা।

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বৈতকণ্ঠে গীত 'ললিত' অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। প্রসূনের শান্ত বিস্তারে মীরার তানের ঝলক বৈদগ্ধ্যে মার্জিত, শিল্পচিন্তায় গভীর।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'মালকোষ' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। শিল্পীর মেজাজ, স্বতঃস্ফূর্ত সুরবিহার ও তানের কারুকার্যের সঙ্গে কণ্ঠের স্বাভাবিক মাধুর্য মিশে উচ্চাঙ্গের রসরূপ সৃষ্টি করেছে।

কালিদাস সান্যালের 'বাগেশ্রী কানাড়া'র বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বিস্তারের গাম্ভীর্য বজায় রেখেও পরিমিত তানে তিনি রাগের রূপকে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। খাঁ সাহেবের জীবনের প্রায়াবসানের কালে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বল্পসময়েই তাঁর পদ্ধতিকে গ্রহণ করে নিজের গায়কী'কে সমৃদ্ধ করেছেন।

খাঁ সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ শিষ্যা প্রভাতী মুখোপাধ্যায় মুগ্ধ করে দিয়েছেন 'কেদারা' ও 'পিলু'র সুন্দর রূপায়ণে। এঁর আপন নিষ্ঠায় খাঁ সাহেবের মধুর ভঙ্গিকে আপনার করে নেওয়ার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ওস্তাদ আমীর খাঁর পাণ্ডিত্যগভীর অনুষ্ঠান দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

এ সম্মেলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো আমীর খাঁ ছাড়া কণ্ঠসংগীতের সকল শিল্পীরাই বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের শিষ্য।

রবীন্দ্র জয়ন্তী: গত ২০ মে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট ননগেজেটেড কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মহাকরণ ক্যান্টিন হলে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শ্রীহেরম্বকুমার ঘোষ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করেন শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি, যন্ত্রসংগীত ও তবলা সংগতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রমেশ ভট্টাচার্য, দীপংকর দাশগুপ্ত, তিমিরবরণ সিনহা, শ্যামবরণ বিশ্বাস, রবি রায়, রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিগুরুর 'জুতো আবিষ্কার' কবিতাটি অবলম্বনে একটি মূকাভিনয় প্রদর্শন করা হয়। যুগ্ম পরিচালনায় সর্বশ্রী অনন্ত মুখোপাধ্যায় ও সরোজ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অংশগ্রহণে বেহালাস্থ সরকারী আবাস ভবনের শিশু শিল্পীবৃন্দ। শিশু শিল্পীগণ সমাগত দর্শকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। মঞ্চসজ্জা ব্যবস্থাপনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন সমিতির দপ্তর সচিব শ্রীসুধীর দাস ও উৎসাহী কর্মী শ্রীদিলীপ সরকার এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন সাংস্কৃতিক উপ-সমিতির আহবায়ক শ্রীবিশ্বরূপ মণ্ডল।

বিদায় উৎসব

গত ২রা মে তারিখে দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ে ১৩৭৯ সালের বিদায়-উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অধ্যক্ষ শ্রীপ্রতীপকুমার মুখোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এর পর বৈশাখ বন্দনা নামে একটি ছোট অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। বৈশাখ বন্দনা পরিবেশন করে প্রথম বর্ষ বাংলা সাম্মানিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেয় নির্মল দাশগুপ্ত, স্বপন সিংহ, স্বদেশপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, নূপুর মুখোপাধ্যায়, মধুমিতা ঘোষ প্রমুখ। একটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করে ছাত্ররা, নাম 'ঘরে ফেরার দিন'। রচনা ও নির্দেশনায় ছিল অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে অংশ নেয় শক্তিপদ সরকার, প্রবাল দাশগুপ্ত, অমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, সমীর দাস, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রন্তিদেব সরকার। বুলেন হাজরা ও সম্প্রদায়ের সঙ্গীত এবং স্পেকট্রাম অর্কেস্ট্রার যন্ত্রসঙ্গীতও উপভোগ্য হয়।

বিচিত্রানুষ্ঠান

বসিরহাটের নেতাজী যুবক সংঘের যুবকবৃন্দ এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল বিখ্যাত মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর মূকাভিনয়। গায়ত্রী সেনগুপ্ত, অসীম চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম মজুমদারের গান শ্রোতাদের তৃপ্তি দিতে পেরেছে। অল্প অবকাশে প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের যন্ত্রসংগীতও অনুষ্ঠানটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। তবলা সংগতে ছিলেন বাবলু সেনগুপ্ত ও বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যনাট্য প্রদর্শন

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ডি জি এস এ্যান্ড ডি ইন্সপেকটরেট ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপিত হয়। নৃত্যাচার্য নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিল্পীদের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য সুঅভিনীত হয়। নৃত্য-পরিচালনায় সহকারীরূপে ছিলেন স্বপ্না সেনগুপ্ত ও পাপড়ি বোস। সুললিত কণ্ঠে শ্রীমতী কমলা বোসের সঙ্গীত পরিচালনা দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একক সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। যন্ত্রসংগীতে রবীন্দ্র সংগীতের সুর পরিবেশন করেন হিমাংশু বিশ্বাস ও তাঁর সম্প্রদায়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন কবি আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন। বিভিন্ন নৃত্যে প্রশংসা অর্জন করেন পাপড়ি বোস, [illegible] শ্যামেলী রায়, নন্দিনী চৌধুরী, [illegible] শিপ্রা সেন, কস্তুরী দত্ত, অরুণা দে, শান্তি চৌধুরী ও নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কমলা বোস, স্বপন রায়, স্বপ্না সেনগুপ্ত, অনিল ঘোষ, অরবিন্দ মিত্র, কালাচাঁদ চ্যাটার্জি প্রভৃতি সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে সুর যোজনা করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রী পি কে চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মনীষী কথাশিল্পী অন্নদাশংকর রায়।

গৌড়ীয় গীতিসংস্থার 'মহুয়া বনে আগুন': গৌড়ীয় গীতিসংস্থার শিল্পীরা গত ১৪ জুন রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ এক অনন্য লোক-নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। লোকনৃত্যনাট্যটির নাম 'মহুয়া বনে আগুন।' এটি রচনা করেছেন মোহনলাল সাও ও অশোক দাস। সঙ্গীত, আবহ, নৃত্য ও আলোর নির্দেশনায় ছিলেন যথাক্রমে নিখিল চক্রবর্তী, তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীত বসু, কনিষ্ক সেন। গ্রন্থনায় ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ ও দিলীপ মৌলিক। সংগীতাংশে ছিলেন রমেন ভট্টাচার্য, কাজল দত্ত, সুপ্রিয় রায়, শ্রীমন্ত মালিক, পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়ব্রত নন্দ, মীনা মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা বিশ্বাস, দীপ্তি কর্মকার, মণিকা সোম, তৃষ্ণা চক্রবর্তী, স্বপ্না মুস্তাফী, কণা ভদ্র, পাঞ্চালী গঙ্গোপাধ্যায়, পিয়ালী চক্রবর্তী, পত্রালী চক্রবর্তী, উৎসা রায়, রাধা রায়চৌধুরী, গৌরী রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত চক্রবর্তী, প্রবীর দাশগুপ্ত, অনিল ঘোষ।

আনন্দ আসরের বার্ষিক উৎসব

দশই জুন শনিবার সন্ধ্যায় হরিনাভি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনন্দ আসর তাদের বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টারের (রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর) অধ্যক্ষ শ্রীশিবশংকর চক্রবর্তী। পুতুল ভৌমিক, মলয়া রায়চৌধুরী এবং কৃষ্ণা ঘোষের কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের পর শ্রীমতী সুচিত্রা চক্রবর্তী পুরস্কার বিতরণ করেন। উৎসবে ছোট ছেলেমেয়েরা নাচেগানে অংশগ্রহণ করে। সমবেত কণ্ঠে 'আমরা সবাই রাজা' ও 'মোমের পুতুল' গানদুটি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের গান অবলম্বনে 'ষড়ঋতু' গীতি আলেখ্যটি পরিবেশন করেন বড়রা। হাসির নক্সা 'রোগীর চিকিৎসা'ও অভিনীত হয় এই উৎসবে। নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীমতী মাধুরী দাস। মণীন্দ্র ঘোষালের গানের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার নিচ্ছেন সত্যজিৎ রায় এবং পৃথ্বীরাজ কাপুরের মরণোত্তর ফালকে পুরস্কার নিচ্ছেন রাজ কাপুর। ফটো ঃ অমৃত।

১৯তম রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী উৎসব

গেল ৪ জুলাই, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে ১৯তম রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব কলকাতায় এই প্রথম। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ বর্তমানে শূন্য থাকায় (শ্রীমতী সৎপতি এই সেদিন পর্যন্ত এই পদে ছিলেন) ঐ বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীধরমবীর সিংহ সকলকে স্বাগত জানিয়ে চলচ্চিত্রশিল্পে বাঙলার ঐতিহ্যপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেন। অতীতে নিউ থিয়েটার্স এবং বর্তমানে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, অসিত সেন, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ কৃতী চলচ্চিত্রকারদের শিল্পসৃষ্টি বিষয়ে নবধারা প্রবর্তনের কথা তিনি স্মরণ করেন। এবারের পুরস্কারপ্রাপকদের সংবর্ধিত করে তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত আশার কথা যে এবারের পুরস্কৃত চলচ্চিত্রগুলিতে অধিকতর বৈচিত্র্য এবং গভীরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-কথাও বলেন যে, পঁচিশ বছরের স্বাধীনতার মধ্যে সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন দেখা গেলেও চলচ্চিত্রশিল্পে ব্যবসায়ীদের অর্থলোলুপতাই প্রকট হয়ে ওঠে। আজকে ভারতীয়দের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যেখানে উন্নতির লক্ষণ সুপরিস্ফুট, সেখানে ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন চলচ্চিত্র-প্রযোজকরা তাদের অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চাইছেন না। কিন্তু বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হচ্ছে এই শিল্পেও, যদিও সমগ্রের তুলনায় তা অত্যন্ত নগণ্য। আজ ভারত পৃথিবীর মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে বৃহত্তম চলচ্চিত্রনির্মাতা, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে সে এখনও বহু নীচে। সদ্য পরলোকগত পৃথ্বিরাজ কাপুর, মীনাকুমারী ও মাদ্রাজী অভিনেতা সান্তানের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করে শ্রীসিংহ শ্রীমতী সৎপতি ও শ্রীরায়কে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীসিংহের ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তৃতার পরে ১৯৭১ সালের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ ভি কে নারায়ণ মেনন তাঁর রিপোর্টে বলেন কমিটি এবারে ২৬টি কাহিনীচিত্র, ৭টি শিশু চলচ্চিত্র এবং ২২টি হ্রস্ব চিত্র—যার মধ্যে আছে সংবাদচিত্র, শিক্ষামূলক চিত্র, সামাজিক তথ্যচিত্র, উন্নয়নমূলক চিত্র (ব্যবসায়ভিত্তিক এবং তার বাইরের), পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক চিত্র এবং অঙ্কন চিত্র। পরে তিনি পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত চিত্র, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্পর্কে উপযোগী মন্তব্য প্রকাশ করেন।
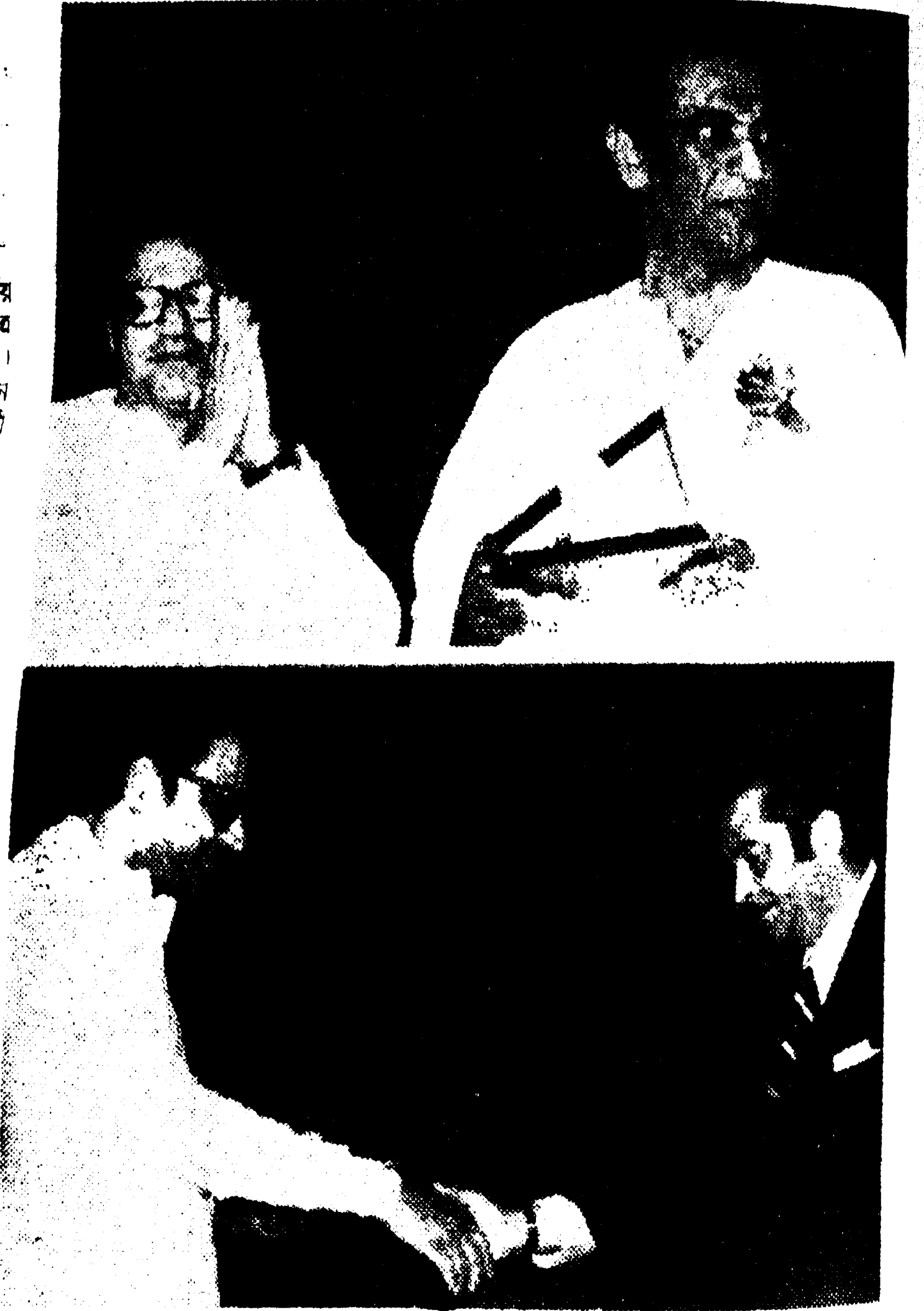
এর পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় প্রধান অতিথিরূপে তাঁর সরস বক্তৃতা দ্বারা দর্শকদের আনন্দবর্ধন করেন। তিনি যখন বলেন, শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার কাজে অভিনেতা রাজ কাপুর, ইন্সপেক্টার জেনারেল অব পুলিশ থেকেও বেশী ক্ষমতা ধরেন, তখন তাঁর যুক্তি শুনে দর্শকবৃন্দ রীতিমত চমৎকৃত হন। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের সহায়তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করছেন, সে সম্পর্কে তাঁর ঘোষণা অভিনন্দিত হয়।

সবশেষে সভানেত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি সত্যজিৎ রায় প্রমুখ বাঙলার চলচ্চিত্রকারদের শিল্পগত ও কলাকৌশল বিষয়ে নব নব উন্মেষণী প্রতিভার প্রতি প্রশস্তিজ্ঞাপনের পরে ভারতের চলচ্চিত্র প্রযোজকদের অনুরোধ করেন, ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি নজর রেখে তাঁরা যেন চিত্রনির্মাণে ব্রতী হন।

পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। প্রথমেই পরলোকগত পৃথ্বিরাজকে প্রদত্ত 'ফালকে' পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র প্রযোজক পরিচালক-অভিনেতা রাজ কাপুর। ও পরে 'সীমাবদ্ধ', 'অনুভব' ও 'দো বুঁদ পানি'—সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পুরস্কৃত তিনখানি ছবির প্রযোজক, পরিচালক

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন তপন সিংহ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত।

নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে আঞ্চলিক ভিত্তিতে পুরস্কৃত ফকির ভী (হিন্দী), 'শান্তাতা কোর্ট চালু আহে' (মারাঠি) 'নিমন্ত্রণ' (বাঙলা), 'আরণ্য' (আসামী), 'ভেগুলিকেপান' (তামিল), 'পাট্টিলো মাণিকাম্' (তেলেগু), 'বংশবৃক্ষ' (কানাড়া), 'কর-কন-কদল' (মালয়ালম) ছবির প্রযোজক, পরিচালক ও নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে অনুরূপভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। চলচ্চিত্র প্রয়োগশিল্পের বিভিন্ন বিভাগে পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্যে পুরস্কৃত হন ঃ যুগ্মভাবে বি. ভি. কারন্থ ও গিরিশ কর্ণাড (পরিচালনা), নন্দ ভট্টাচার্য (সাদা-কালো চিত্রগ্রহণ), শ্রীরামচন্দ্র (রঙীন চিত্রগ্রহণ), তপন সিংহ (চিত্রনাট্য রচনা), এম. জি. রামচন্দ্রন (অভিনয়—পুরুষ), ওয়াহিদা রেহমান (অভিনয়—স্ত্রী), মাস্টার শচীন (অভিনয়-বালক), হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (নেপথ্য কণ্ঠ—পুরুষ), পি সুশীলা (নেপথ্যকণ্ঠ—স্ত্রী), জয়দেব (সংগীতপরিচালনা), এবং প্রেম ধাওয়ান (গীতরচনা)। হ্রস্ব চলচ্চিত্রে পুরস্কার লাভ করে 'উইংস অব ফায়ার' (শিশু চলচ্চিত্র), ভুটান (তথ্যচিত্র), 'রেক-লেকসান্স' (শিক্ষামূলক চিত্র), 'এ ভিলেজ স্মাইল্স্' (সামাজিক দলিল চিত্র) এবং 'ক্রিয়েসান্স ইন মেটাল' (ব্যবসায়িক উন্নয়ন-মূলক চিত্র)। এবং 'দিস্ মাইল্যাণ্ড' (ব্যবসায় ভিত্তিকের বাইরে উন্নয়নমূলক চিত্র)। পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত ছিলেন ওয়াহিদা রেহমান, শর্মিলা ঠাকুর এবং বি. ভি. করন্থ।

ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি দ্বারা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরে মূল অনুষ্ঠানের কাজ শেষ হয়। সামান্য বিরতির পরে উদয়শঙ্কর কালচার সেণ্টার দ্বারা 'যুগচ্ছন্দ' নৃত্যনাট্যটি সমবেত সুধিজনের সমক্ষে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে অভিনীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্যবসায় এবং রাজ্য সরকার

গেল ৫ মে তারিখে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর) ৩৫তম বার্ষিক শংসাপত্র বিতরণী উৎসবে (অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড গিভিং ফাংসান-এ) প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঘোষণা করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পকে তার ন্যায়সঙ্গত মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর। ঐদিন থেকে মাত্র দু'মাস অতিবাহিত হতে না হতেই গেল ৪ জুলাই ঐ একই রবীন্দ্রসদনে ১৯তম রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় সমবেত সুধিবৃন্দের আনন্দবর্ধন করে ঘোষণা করলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নকল্পে রাজ্য সরকার এই জুলাই মাসের মধ্যেই একটি ফিল্ম বোর্ড (চলচ্চিত্র পরিষদ) স্থাপন করবেন এবং উন্নয়ন-কার্যের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত রাখছেন। শ্রীরায় পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলেন, ১৯৭০ সালে সারা ভারতে উৎপন্ন ৩৯৬টি ছবির মধ্যে বাঙলা ছবির সংখ্যা মাত্র ৩৩টি। শ্রীরায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়নকল্পে কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা নিশ্চয়ই কোনো সংকীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধিপ্রণোদিত বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়, কারণ পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্প আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পেরই অংশবিশেষ এবং এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই চলচ্চিত্রের উন্নত-মান সংক্রান্ত ধারণা প্রসারতা লাভ করেছে। তিনি আরও বলেন, শিল্পীদের কুসীদ-জীবীদের কবল থেকে বাঁচাতেই হবে। শ্রীরায় পশ্চিমবঙ্গে আরও চিত্রগৃহ নির্মাণের জন্যে লাইসেন্স ব্যবস্থাকে

ঐন্দ্রজালিক ও পি আগরওয়াল

যথাসম্ভব উদার করবার কথাও ঘোষণা করেছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অগণিত সুধিবৃন্দের মতো আমরাও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং কামনা করি, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্যবসায়ের সর্বাত্মক উন্নতিকল্পে তাঁর প্রচেষ্টা যেন জয়যুক্ত হয়। আশা করছি, অনতিবিলম্বেই যে-ফিল্ম বোর্ড (চলচ্চিত্র পরিষদ) গঠিত হবে, তার সুনির্বাচিত সদস্যরা বাঙালীর এই গৌরবময় ঐতিহ্যবাহক শিল্প ও ব্যবসায়টির বহুবিধ সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও পরীক্ষা করবেন এবং একে একে তাদের সমাধান করতে যত্নবান হবেন। শিল্পটিকে অর্থের দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তোলবার জন্যে শ্রীরায় আমাদের এখানে হিন্দী, আসামী, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু ভাষাতেও ছবি তোলবার প্রস্তাব করেছেন। এ সম্বন্ধে বলবার কথা অনেক আছে। একদা বি. এন. সরকার পরিচালিত নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে নির্মিত 'পূরাণ ভকত', 'চণ্ডিদাস', 'রাজরাণী মীরা', 'দেবদাস', 'ধুপছাঁও', 'বিদ্যাপতি', 'দুশমন', 'প্রেসিডেণ্ট', 'ছায়াবাহী', 'ক্রোরপতি' 'দোশমন' 'মাই সিসটার' প্রভৃতি ছবি আসমুদ্রহিমাচলকে আলোড়িত করেছিল।

কিন্তু শোনা যায়, সেই নিউ থিয়েটার্সেরই 'ছোটি বৌ' ছবিকে বোম্বাই শহরে মুক্তি দেবার জন্যে হিমালয়প্রমাণ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সেদিন কলকাতায় তৈরী হিন্দী ছবি 'মমতা' ('উত্তর ফাল্গুনী'র হিন্দী)-র মুক্তির জন্যেও প্রযোজক-পরিবেশককে কম বেগ পেতে হয়নি। আজ অবস্থা এমনই যে, এখানকার তৈরী একখানি সর্বাংশে উৎকৃষ্ট হিন্দী ছবিকে পশ্চিমবঙ্গেরই চিত্রগৃহগুলিতে প্রদর্শিত হবার ব্যবস্থা করতে প্রযোজক ও পরিবেশককে রীতিমত হিমসিম খেতে হবে। কাজেই বাঙলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ছবি তৈরী করতে ব্রতী হতে বলার আগে চিন্তা করতে হবে ছবিগুলিকে মুক্তি দেবার কথা। মনে রাখতে হবে, হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে বোম্বাই ও মাদ্রাজের তীব্র প্রতিযোগিতার কথা। ছবি তৈরীর কাজে তাদের যে উন্নতধরনের যান্ত্রিক কলাকৌশলের সহায়তা আছে, আমাদের তার কিছুই নেই। আজ সাদা-কালো ছবিকেও মনের মতো ভাবে নিখুঁত করবার জন্যে আমাদের সত্যজিৎ রায়কেও ছুটতে হয় বোম্বাই বা মাদ্রাজ। বাঙলায় চলচ্চিত্রকারেরা আজ 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দারের' সামিল। এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

আধুনিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত ফিল্ম স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরী, রঙীন ছবি তোলবার ও পরিস্ফুটিত করবার সুবিধা, বহির্দৃশ্য তোলবার আধুনিকতম সরঞ্জাম, তথ্য, সংবাদ, ছন্দ ও বিজ্ঞাপন চিত্র তোলবার সুবিধা ও সুযোগ, কেন্দ্রীয় ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের একটি পূর্বাঞ্চলীয় শাখা প্রতিষ্ঠা, ফিল্মস ডিভিসনের একটি পূর্বাঞ্চলীয় শাখা প্রতিষ্ঠা এবং সবশেষে বললেও, সকলের আগে বিবেচ্য, আমাদের ছেলেমেয়েদের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক (থিয়োরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল) জ্ঞানলাভের সুযোগ দান (এ-বিষয়ে রবীন্দ্র-ভারতীতে একটি সর্বাঙ্গীন চলচ্চিত্র বিভাগ খোলা যেতে পারে)—বাঙলার চলচ্চিত্রকে মানে উন্নত করে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এই ব্যবস্থাগুলি করবার আশু প্রয়োজনীয়তা আছে।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আজকাল সাধারণ বাঙলা ছবির মান অত্যন্ত নিম্নগামী। অধিকাংশ বাঙলা ছবিই সাধারণ দর্শককে আনন্দ ও তৃপ্তি দিতে অসমর্থ। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুশী করবার মতো ক্ষমতা রাম-শ্যাম-যদুর থাকে না। সত্যজিৎ রায়ের জীবনী যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরাই জানেন, প্রতিভার সঙ্গে কতখানি সাধনা মিলিত হয়ে সত্যজিৎ রায়ের মতো চলচ্চিত্রকারের জন্ম সম্ভব হয়েছে। কাজেই চলচ্চিত্র-পরিচালক হবার জন্যেও যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, এ-কথা না মেনে উপায় নেই। এবং রাম-শ্যাম-যদু যাতে ভুঁইফোঁড় পরিচালক সেজে না বসতে পারে, জাতীয় স্বার্থের জন্যেই সেদিকে নজর রাখতে হবে।

উন্নত মানের বাঙলা ছবি তৈরীর সম্পর্ক রেখে বাঙলাবাসীর মনকে তার দিকে ফেরাতে হবে। অপরের কথা আর কি বলব, আজ বাঙালীই বাঙলা ছবি দেখে না। দর্শকের মনকে বাঙলা ছবির দিকে ফেরাবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ সিনেমা হাউসেই যাতে বাঙলা ছবি চালানো হয়, তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে হবে। প্রয়োজন হলে আসছে তিন বছরের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত সকল ছবির ওপর থেকে প্রমোদকর নেওয়া বন্ধ করা যেতে পারে। এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। এর ওপর যে-সকল ছবি প্রকৃত উন্নত মানের বলে বিবেচিত হবে, উৎকর্ষ অনুসারে তাদের প্রথম তিনটিকে দেড় লক্ষ, এক লক্ষ এবং পঁচাত্তর হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে।

রাজ্য সরকারের সহায়তায় ফিল্ম বোর্ডের পক্ষে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব, যেগুলি একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত চলচ্চিত্রগুলির মানোন্নয়নে সহায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যাপকতর প্রদর্শনীকে সম্ভব করবে এবং তাদের বাজারকে সম্প্রসারিত করবে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবুদ্ধির অভাব নেই, অভাব আছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগব্যবস্থার।

চিত্রসমালোচনা

হত্যা এবং অনুশোচনা

জীবনবীমার দালালি করে যাকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয়, তাকে অধিকাংশেরই মতো নির্মলেন্দু রায়কে বেশীর ভাগ সময়েই নিতান্ত অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে হত। [illegible] বাজারের বাঁধাকু মহাজন ধনঞ্জয় সাহা[illegible] কাছে তার দেনা বেড়ে বেড়ে তিন হাজারে[illegible] উপরে উঠেছিল। ১৯৫৯-এর এপ্রিল মাসের যে-দিনটা ছিল বুধবার, ১ বৈশাখ, সেদিন সন্ধ্যায় সে গিয়েছিল ধনঞ্জয়ের কাছে একটি জীবনবীমা করাতে। ধনঞ্জয় জীবনবীমার দরখাস্তপত্রে (পলিসি ফর্মে) সই না করে নির্মলেন্দুকে রোজগার করবার একটি সহজ পথ বাতলে দেয়—, বলে, [illegible] ঘরের যুবতী স্ত্রীকে তার কাছে পেঁ[illegible] দিলে সে ওকে অনেক টাকা [illegible] নির্মলেন্দু ক্ষেপে যায়। কিন্তু বেহায়া ধনঞ্জয়ের হাসি থামে না। সে বারবার বলতে থাকে, একই কথা—গরীবের ঘরে সুন্দরী স্ত্রীদের অমন একটু এদিক ওদিক করতে হয়ই, তাতে কোনো [illegible] হয় না। অতএব নির্মলেন্দুও যেন সু[illegible] বালকের মতো......কথা ও হাসি মাত্র [illegible] শেষ হলো, যখন নির্মলেন্দু মরীয়া [illegible] উঠে ধনঞ্জয়ের কেশবিরল মস্তকের [illegible] সজোরে বসিয়ে দিল একটি গদাপ্রমাণ [illegible] খেঁটে লাঠির ঘা। না, নির্মলেন্দু [illegible] ভাবেনি, তার ঐ একটি ঘায়েই ধনঞ্জয়

প্রাপ্ত ঘটবে। সে কিছুক্ষণ ...র্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে ...রইল ধনঞ্জয়ের লাটিয়ে পড়া দেহটার ...। পরে সেই ভীষণ মোটা লাঠিটাকে ... করে মুছে একপাশে রেখে দিয়ে সে ...য়ের প্রবেশ দরজাটিকে ভিতর ... ভেজিয়ে দিল এবং পাশের দরজা ...ওর শয়নঘরে ঢুকে সেই ঘর ... বাইরে যাবার দরজা খুলে ...য় এল বারান্দায়। আশ্চর্য। ওরই ... ওখানে এসে পৌঁছেছে রেলওয়ে ...সার্ভিসের (আর-এম-এস-এর) শর্টাস-... রাখালদাস তার স্ত্রীর হাতের এক-... চুড়ী বাঁধা রেখে ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে ... টাকা নিতে। কিন্তু গদাধরের দরজা ... সে যে দৃশ্য দেখল, তাতে তার চক্ষু ...ছে। ফেরবার মুখে সিঁড়ি দিয়ে ... গিয়ে সে মুখোমুখি হল ...লেন্দুর। ভীত, সন্ত্রস্ত রাখালদাসকে ...লেন্দু ধনঞ্জয়ের হত্যাকারী বলে ...ত্তে করল। কম্পমান রাখালদাস ...ক্রমে বাড়ী পালিয়ে এল। —না, ... তার আঠারো দিন ধরে টায়ফয়েড ... পড়ে থাকা একমাত্র ছেলের চিকিৎসার ... করতে পারল না। গেল সে কাজে ... নিতে, মাথায় তার টাকার চিন্তা। ...প্যায় হয়ে সে কায়দা করে মেল-ব্যাগ ... কিছু ইনসিওর্ড টাকা ভর্তি খাম ও ...সরিয়ে ফেলল এবং একটি স্টেশনে ...র আগেই চলন্ত গাড়ী থেকে থলি ... অবস্থায় ফেলে দিল। কিন্তু বিধি ... চলন্ত গাড়ী থেকে ফেলে-দেওয়া সেই ... সে কিছুতেই খুঁজে পেল না। ...বিপর্যয়ে সে উন্মাদ হয়ে গেল ...র্তের মধ্যে। পুলিশ যখন ধনঞ্জয়ের ...কারী সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করতে ... তখন সে উন্মাদ। একমাত্র নির্মলেন্দুর ...তে বাধ্যায় হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত ... উন্মাদাশ্রমে বন্দী অবস্থায় কাল ...তে লাগল।

...এর দশ বছর পরের ঘটনা। ইনসিওর্ড ... ভর্তি খামসমেত খোয়া-যাওয়া থলিটি ...মে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ডেড লেটার ...সে আসে এবং সেখানকার কর্তৃপক্ষের ...শানুসারে খাম ও চিঠিগুলি লিখিত ...নায় বিলি হয়। এমনই একখানি চিঠি ... পড়ে নির্মলেন্দুর স্ত্রী ইলার হাতে। ...খানি লিখেছেন ধনঞ্জয় সাহা ...লেন্দুকে প্রাপ্য তিন হাজার টাকার ...দ দিয়ে। ইলা চিঠির তারিখ ধরে ...য়ে দেখতে চায় সেই সময়কার ...লেন্দুর দুর্বোধ্য কার্যকলাপকে। আবার ... কাগজের রিপোর্টার রাখালদাসের ...ত্র পুত্র এবং নির্মলেন্দুর একমাত্র ... সীমার প্রণয়ী প্রবীরও ঐ চিঠির ...দে ধনঞ্জয় - রাখাল - নির্মলেন্দুর ...ত্তকে নতুন করে গড়তে তৎপর হয়। ... নির্মলেন্দু একজন প্রতিষ্ঠাবান ...য়ী—প্রেসিডেন্ট অব দি ফেডারেশন ...র অব কমার্স, জাস্টিস অব পীস্। ...ই অনুসন্ধিৎসার ফলে নির্মলেন্দুর

অন্তঃকরণ হয়ে ওঠে বিষাক্ত, তার চোখের সামনে ফেরে দুঃস্বপন। ধনঞ্জয় সাহার মৃত্যুর ছবি তার সুখ নেয় ছিনিয়ে।

—উষা ফিল্মস্-এর নিবেদন, অজীত সরকার প্রযোজিত 'অন্ধ অতীত' ছবিটির উপরে লিখিত সংক্ষিপ্ত কাহিনী থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, আমরা যদিও ধনঞ্জয়ের হত্যাকারী কে, তা আগেই জানিয়ে দিয়েছি, তবু প্রকৃত হত্যাকারীই রাজসাক্ষী হিসেবে একজন নিরপরাধকে হত্যাকারী প্রতিপন্ন করে ফাঁসীতে ঝোলাতে চেয়েছিল এবং ঐ নিরপরাধ রাখালদাস নেহাত উন্মাদ বলেই ফাঁসীতে না লটকে উন্মাদাশ্রমে পচে মরছিল। কিন্তু নির্মলেন্দু আইনের চোখে নির্দোষ থেকেও প্রতিনিয়তই অনুশোচনার আগুনে পুড়ে মরছিল। বিশেষ, দশ বছর পরে তার নামে প্রেরিত ধনঞ্জয়ের চিঠিখানি যেদিন থেকে তার স্ত্রী ইলার হস্তগত হয়, সেদিন থেকে সে হয়ে পড়েছিল ঠিক ভূতগ্রস্ত রোগীর মতো। কোনো কিছুতেই তার স্বস্তি ছিল না।

কাহিনীটিকে আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে চিত্রনাট্যাকারে গ্রথিত করেছেন পরিচালক হীরেন নাগ। হত্যাকাণ্ডটিকে উহ্য রেখে ছবির অগ্রগতির পথে যেখানে যেটুকু ফ্ল্যাশ-ব্যাক করলে দর্শকের উৎকণ্ঠা ক্রমেই বর্ধিত হয়, তিনি সে কৌশল যথেষ্ট আয়ত্ত করেছেন। যখন তিনি ফ্ল্যাশব্যাক মারফত হত্যার দৃশ্যটি দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তখন থেকে তিনি দর্শকমনে প্রশ্ন জাগ্রত করেছেন, নির্মলেন্দু কখন, কিভাবে, কার কাছে চরম স্বীকারোক্তিটি করবেন। কিন্তু শ্রীনাগের কাছে আমাদের একটি ছোট্ট প্রশ্ন রাখছি : ধনঞ্জয় নির্মলেন্দুকে ১ বৈশাখ, বুধবার তারিখে কোন্ ঠিকানায় চিঠি লিখেছিল? এবং সেই চিঠি দশ বছর বাদে কোন্ কোন্ ঠিকানা ঘুরে ইলার হাতে এসে পড়ল?

নির্মলেন্দুর চরিত্রটিকে অপরূপভাবে চিত্রিত করেছেন বাঙলা চলচ্চিত্রজগতের অবিসংবাদী নায়ক উত্তমকুমার। প্রতিটি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি করেছেন তাঁর ভাবপরিবর্তন। সব

সময়েই অবচেতন মনে তাঁর একটি দ্বন্দ্ব চলেছে, এই ভাব তিনি অক্লেশে পরিস্ফুট করেছেন। স্ত্রী ইলা যেন নির্মলেন্দুর বিবেক-বুদ্ধির প্রহরী ...... (কনসান্সেস-কিপার)—ঠিক এই অভিনয়ই করেছেন সুপ্রিয়া দেবী অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে। রাখালদাসের ছেলে প্রবীর প্রেমিক, কিন্তু কর্তব্য সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সজ্ঞান। এই চরিত্রটিকে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন স্বরূপ দত্ত। ভূমিকাটিতে তিনি প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছেন। তরুণী সীমায় চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন নবাগতা বুলায় হাজরা। নবাগতা হিসেবে তিনি মোটের ওপর সাফল্যলাভ করেছেন। মাত্র কয়েকটি স্থানে তাঁর কয়েকটি সংলাপকে মাত্রার মধ্যে রাখতে পারলে আরও ভাল হত। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন তরুণকুমার (জেনারাম), কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (রাখালদাস), বাসুদেব পাল (রাখালদাসের সহকর্মী), গীতা দে (রাখালদাসের স্ত্রী), খগেশ চক্রবর্তী (চিকিৎসক) প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। ছবির আবহসঙ্গীত বিভিন্ন পরিস্থিতির সহায়তা করেছে।

উমা ফিল্মস নিবেদিত এবং অসীম সরকার প্রযোজিত 'অন্ধ অতীত' অপরাধ-মূলক সাসপেন্সধর্মী চিত্র হিসেবে দর্শক-সাধারণের চিত্তগ্রাহী হবে।

—নান্দীকর

স্টুডিও সংবাদ

নতুন ধরনের ছবি 'ছায়ার মায়া'

হিমাংশু চক্রবর্তী প্রযোজিত নবজাত প্রোডাকসন্সের 'ছায়ার মায়া' বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। চলচ্চিত্রের সঙ্গে শিল্পী, কলাকুশলীদের জীবনকেন্দ্রিক এই চলচ্চিত্র রূপালী পর্দার অন্তরালে যে আলো-আঁধারি জীবন, সেই জীবনকে রূপ দিতে ব্রতী হয়েছেন বহু সফল ছবির পরিচালক শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীতপরিচালনা, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা ও চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে নচিকেতা ঘোষ, অমিয় মুখার্জী, সুনীতি মিত্র ও বিজয় ঘোষ। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী শ্যামল মিত্র, আল্পনা দাশগুপ্তা ও অনুপ ঘোষাল।

চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন স্তরের কলাকুশলীদের সঙ্গে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যাবে 'ছায়ার মায়ায়'। পিনাকী সেনগুপ্ত, কল্যাণী মণ্ডল, রূপা চৌধুরী, কৃষ্ণা বসু, জহর রায়, রবীন মজুমদার, সর্বেন্দ্র, বাসন্তী চ্যাটার্জী, মৃণাল মুখার্জী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, পিনাকী মুখার্জী, কাজল মজুমদার, জগদীশ মণ্ডল, সতীশ হালদার, নবেন্দু চ্যাটার্জী, মনীশ দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখার্জী, পবিত্র চ্যাটার্জী, অমিয় মুখার্জী, সন্তোষ চ্যাটার্জী, অনাদি ব্যানার্জী, শ্যামসুন্দর ঘোষ, নৃপেন পাল, ভানু চ্যাটার্জী ও শ্রীপঞ্চানন প্রভৃতি। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—মিলি পিকচার্স।

'মেঘের পরে মেঘ' চিত্রগ্রহণ শেষ!

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত-পরিচালিত টেকনিসিয়ান্স ওন প্রোডাকসন্সের রহস্য ছবি 'মেঘের পরে মেঘ'-এর চিত্রগ্রহণ গত ৪ঠা জুলাই শেষ হয়েছে। বর্তমানে ছবিটির সম্পাদনা চলছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার। সংগীতাংশ ছবিটির একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হবে। গানগুলিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন শ্যামল মিত্র, তরুণ ব্যানার্জি, বনশ্রী সেনগুপ্ত, নির্মলা মিশ্র, ও বাচ্চু রহমান। অনিল চ্যাটার্জী ও লুই ব্যানার্জী ছবিটির নায়ক-নায়িকা। এই ছবিতে একটি নতুন মুখ দেখা যাবে। অভিনয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এই নবাগত শিল্পী কৌশিক চৌধুরী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন— কণিকা মজুমদার, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, অলক সরকার, শান্তি নাগ, কৃষ্ণা দত্ত, নীতা চ্যাটার্জি ও অজয় ব্যানার্জি। কার্শিয়াং-এর প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। নৃপুর চিত্রমের পরিবেশনায় ছবিটি বর্তমানে মুক্তির দিন গুণছে।

নতুন ছবি 'টুরিস্ট'

'মেঘের পরে মেঘ' ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ করেন তরুণ চিত্র পরিচালক শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পরবর্তী ছবি টুরিস্ট-এর চিত্রগ্রহণ আগামী ১৬ই জুলাই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে শুরু করছেন। শ্রীমতী স্মৃতিকণা রায় প্রযোজিত রোজ মেরী মুভীজের টুরিস্ট ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন নবীন সরকার শ্রীআনন্দ মুখার্জী। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপদান করছেন অনিল চ্যাটার্জী ও লুই ব্যানার্জী। অনিল চ্যাটার্জী ও লুই ব্যানার্জী। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন কৌশিক চৌধুরী।

মঞ্চাভিনয়

'পঞ্চপ্রদীপে'র দুটি একাঙ্ক : দক্ষিণ কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী পঞ্চপ্রদীপের শিল্পীরা সম্প্রতি দুটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। থিয়েটার সেন্টারে অভিনীত নাটিকা দুটি হোল 'দেশপ্রেমিক' ও 'প্রস্তাবনা'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল' কবিতার অবলম্বনে 'দেশপ্রেমিকে'র নাট্য বিষয় গড়ে উঠেছে; সুন্দর নাট্যরূপ দিয়েছেন পরিতোষকুমার ঘোষাল। এই শ্রেণীর ভণ্ড দেশপ্রেমিকের মুখোশ নাটিকাতে খুলে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চে আলোয় 'নন্দলাল' চরিত্রটিকে প্রাণময় মূর্ত করে তোলেন দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন ... মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল নন্দ ও অলোক অধিকারী।

প্রস্তাবনার সংঘাত গড়ে উঠেছে শিল্পীজীবনের আবর্তকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন সুধীর দাস, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বপন মুখোপাধ্যায়, বাবলু সমাদ্দার, পরেশ বাউর, ননীগোপাল নন্দ, সীতা গুহঠাকুরতা।

দুটি একাঙ্কিকার প্রয়োগপরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভাড়াটে চাই : ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন সেলস ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা সম্প্রতি হিন্দী হাইস্কুল মঞ্চে অভিনয় করলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' নাটক। এস-পি ঘোষের নির্দেশনায়

সমগ্র নাটকটির পরিবেশনা প্রাণবন্ত ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রে ছিলেন সৌমেন্দ্র দত্ত, বিকাশ চাকলাদার, ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অরুণ হালদার, সরোজ বিশ্বাস, গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়, পি কে গুহ, রণজিৎ দত্ত, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ সেন।

সাহেব বিবি গোলাম। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা তাঁদের চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠানে যে নাটকটি প্রযোজনা করবেন বলে তৈরী হোচ্ছেন তা হোল বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম।' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিচ্ছেন সমীর মিত্র, প্রকাশ ঘোষ, অশোক ঘোষ, নিশীথ বড়াল, অচ্যুত সিনহা, প্রশান্ত বোস, মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দত্ত, অবিনাশ দে, অজিত ঘোষ, সন্তোষ বোস, জগবন্ধু ভাণ্ডারী, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, মঞ্জুলা দাস, ইরা মিত্র, বীথি গঙ্গোপাধ্যায় ও দিলীপ মৌলিক। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন দিলীপ মৌলিক।

একক দশক শতক : সেণ্ট্রাল একসাইজ এ্যাণ্ড কাস্টমস ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করলেন বিমল মিত্রের 'একক দশক শতকে'র নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়ে সামগ্রিক প্রযোজনাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেন শিবানী ভট্টাচার্য, সরোজ দে, কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, এস পি গঙ্গোপাধ্যায়, আরতি ঘোষ ও বীণা রায়।

নাট্য প্রতিযোগিতা : ফ্রেণ্ডস রিক্রিয়েশন ক্লাবের ৬ষ্ঠ বার্ষিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৯শে জুলাই। যোগাযোগের ঠিকানা—আন্দুল মৌড়ি, হাওড়া।

বিবিধ সংবাদ

জাপানে ভারতীয় যাদুকরের অভূতপূর্ব সাফল্য : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় ঐন্দ্রজালিক ও পি আগরওয়াল চার মাস যাবৎ জাপানের ৫২টি শহরে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি 'ম্যাজিকানা অব ইণ্ডিয়া' যাদু প্রদর্শনের পর সম্প্রতি স্বদেশে ফিরেছেন।

গ্রেট আগরওয়াল তাঁর জাপানী স্পনসরের আমন্ত্রণে গেল ৩ জানুয়ারী 'ম্যাজিকানা অব ইণ্ডিয়া'—দলসহ টোকিও পৌঁছান। ৩২ জন ভারতীয় ও জাপানী শিল্পীর এই দলকে বহু ভি আই পি'র উপস্থিতিতে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। টোকিওর সুবিখ্যাত 'হিবিয়া পাবলিক হলে' ৫ জানুয়ারী আগরওয়ালের প্রথম যাদু প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। দর্শকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত করতালির ধ্বনিতে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ বারম্বার মুখরিত হয়ে ওঠে। দুদিন টোকিওতে শো হবার পর 'ম্যাজিকানা অব ইণ্ডিয়া' পার্টি ওসাকা, কিয়োটো, নারা, হিমেজী, গিফু, নাগোয়া, হিরোসিমা, কাগোসিমা, কোবে, নাগাসাকি, ফুকুয়ে, সতসুয়ামা প্রভৃতি জাপানের প্রসিদ্ধ শহরগুলিতে বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। সবসমেত ১৫০টি শো হয়—এবং প্রতিটি স্থানেই রেকর্ড সংখ্যক দর্শক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। নয়টি টেলিভিশন প্রোগ্রামের মাধ্যমেও (একটি ৭০ মিঃ রেকর্ড সময়ের) সমস্ত জাপান দেশ এই রঙীন যাদু সম্ভার উপভোগ করেন। আসছে বছরের জন্য যাদুকর ইতিমধ্যে প্রচুর আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

গ্রেট আগরওয়ালের 'ম্যাজিকানা অব ইণ্ডিয়া' যাদুজগতে সত্যই অভূতপূর্ব সংযোজন। 'সেক্স চেঞ্জ' খেলায় একটি পুরুষকে একটি নারীতে রূপান্তরিত করার পর মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে তার গর্ভ থেকে একটি শিশু সন্তান প্রসব করান। এই খেলায় তিনি দেহতত্ত্ব ও শরীরবিদ্যার সমস্ত নিয়মকে তাঁর মায়াবলে অতিক্রম করে যান। 'ইন্দো-জাপান ফ্রেণ্ডশিপ' খেলাটি ভারত ও জাপানের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ়তর করার প্রতিশ্রুতি বহন করে। 'ম্যাজিক কার্পেট' 'মাইণ্ড ওভার ম্যাটার', 'সুপার ফ্লাইটো ইলিউশন', 'টাইম এন্ড স্পেস' প্রভৃতি খেলাগুলি দর্শকদের কাছে সমস্ত কল্পনা দ্বারা অভিভূত করে ফেলে। তবে যাদুসম্রাট কয়েকজন ভি আই পি আরোহীসহ একটি মোটর গাড়ী মুহূর্তে মধ্যে স্টেজ থেকে উধাও করে দিয়ে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন। পরিশেষে আশ্চর্য মায়াবলে মুগ্ধ দর্শকবৃন্দের নিয়ে যাওয়া হয় এক স্বপ্নের দেশে।

কিছুদিন পরেই গ্রেট আগরওয়াল তাঁর বিরাট পার্টিসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাদু প্রদর্শনের জন্য যাত্রা করবেন।

রাজবল্লভপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের বার্ষিকোৎসব

গত ২৪ ও ২৫শে জুন রাজবল্লভপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ১৬শ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হল। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ফাদার পি ফাঁলো ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীসুধাংশু বোস।

প্রথম দিনে পুরস্কার বিতরণ, রবীন্দ্র নজরুল অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, মূকাভিনয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র, শ্রীতিলক চক্রবর্তী, শ্রীমান অরিন্দম প্রমুখ। দুই দিনের অনুষ্ঠানই উপভোগ্য হয়।

বর্ষপূর্তি উৎসব

সোকায়নের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উৎসব ১৩ই জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় উদযাপিত হবে থিয়েটার সেণ্টার রঙ্গমঞ্চে। এই উপলক্ষে গুণীশিল্পীসমাবেশে কথিকা, আবৃত্তি এবং সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশিত হবে। শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজদর্শন' নাটিকাটির পরিচালনা করবেন সংস্থার পরিচালক শ্রীঅরুণ রায়, অংশগ্রহণ করবেন সংস্থার সভ্যবৃন্দ।

খেলাধুলা

দর্শক
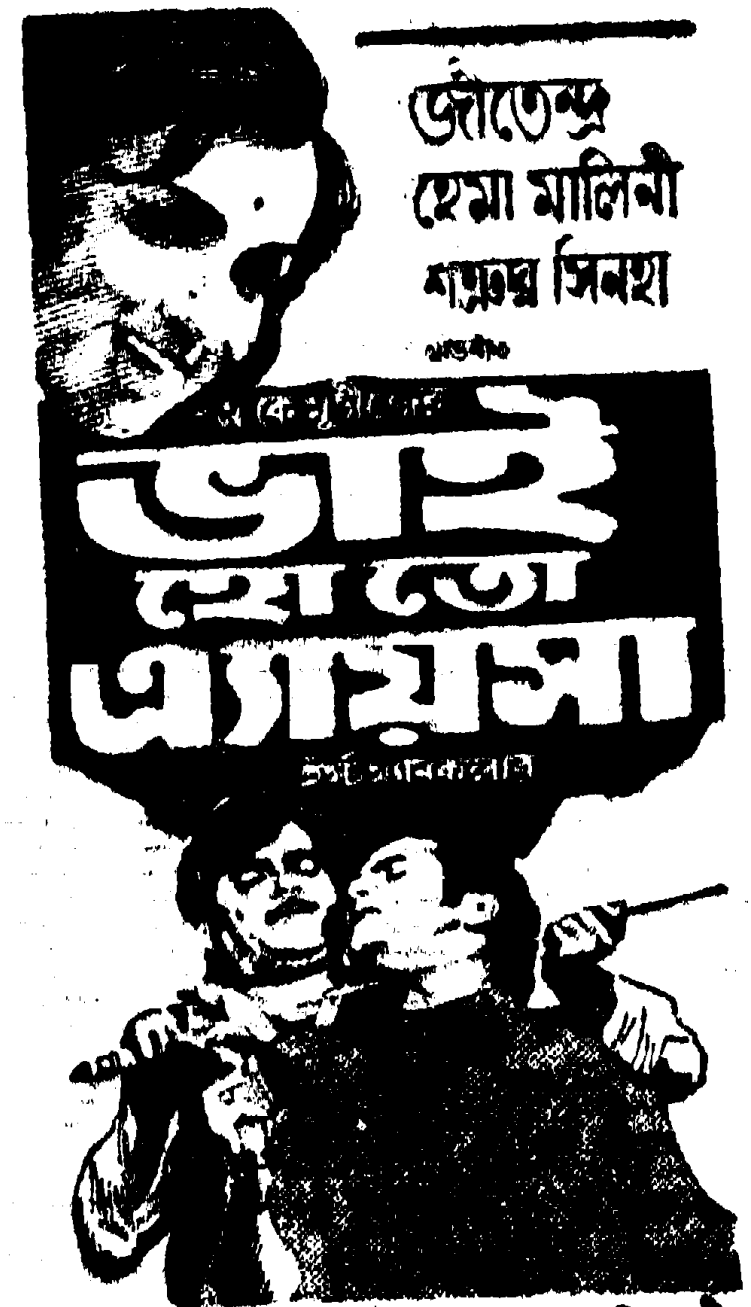
উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭২ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকার খেলোয়াড়রা পুরুষদের সিঙ্গলস, মেয়েদের সিঙ্গলস ও মেয়েদের ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই আমেরিকার স্ট্যান স্মিথ ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৪-৬ ও ৭-৫ গেমে ২নং বাছাই রুমানিয়ার ইল নাসতাসেকে পরাজিত করেন। এ'রা দুজনেই সামরিক বাহিনীর পদস্থ ব্যক্তি—স্ট্যান স্মিথ আমেরিকার সামরিক বাহিনীর কর্পোরাল এবং ইল নাসতাসে রুমানিয়ার সামরিক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট। উইম্বলেডনের সুদীর্ঘ ৮৬ বছরের খেলার ইতিহাসে সামরিক বিভাগের দুজনকে একই বছরের ফাইনালে এই প্রথম খেলতে দেখা গেল। আরও লক্ষ্য করার আছে, ১৯৬৩ সালের পর আমেরিকার খেলোয়াড় আবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার পক্ষে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছিলেন 'চ্যাক' ম্যাককিনলে। এ বছরে যেমন আমেরিকা পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেল তেমনি একই বছরে এই দুই খেতাব শেষ পেয়েছিল ১৯৫৫ সালে। আমেরিকার পক্ষে ১৯৫৫ সালে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন টনি ট্রাবার্ট এবং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন লুই ব্রাউ। আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং তাঁর এ বছরের সিঙ্গলস ও ডাবলস খেতাব নিয়ে গত ১২ বছরের প্রতিযোগিতায় (১৯৬১-৭২) ৪ বার সিঙ্গলস, ৮ বার ডাবলস, ২ বার মিকসড ডাবলস খেতাব এবং একবার (১৯৬৭ সালে) 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভের গৌরব লাভ করেছেন। ১৯৭২ সালের প্রতিযোগিতায় দুটি খেতাব পেয়েছেন একমাত্র শ্রীমতী বিলি জিন কিং। সুতরাং ১৯৭২ সালের প্রতিযোগিতায় আমেরিকার সাফল্য নানা দিক থেকেই উল্লেখ করার মত।

মহিলাদের সিঙ্গলস খেলার ফাইনালে ২নং বাছাই আমেরিকার বিলি জিন কিং (কুমারী জীবনে বিলি জিন মোফিট) ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই ইভন গুলাগংকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে মোট চারবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৬৬-৬৮) সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে শ্রীমতী কিং মোট সাতবার সিঙ্গলসের ফাইনালে খেললেন—উপর্যুপরি ফাইনালে খেলেছেন ৫ বার (১৯৬৬—৭০)। তাঁর সাতবারের ফাইনাল খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে জয় ৪ বার এবং পরাজয় ৩ বার।

আলোচ্য বছরে মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে বিলি জিন কিং ৬—২ ও ৬—৪ গেমে ৬ নং বাছাই রোজমেরী ক্যাসালসকে (আমেরিকা) এবং ইভন গুলাগং ৪—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে অবাছাই খেলোয়াড় ক্রিস এভার্টকে (আমেরিকা) পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন।

ফাইনালে জয়লাভের দরুণ শ্রীমতী কিং নগদ ২,৪০০ স্টার্লিং পুরস্কার পেয়েছেন। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার আধা-আদিবাসী খেলোয়াড় কুমারী গুলাগং পেয়েছেন ১,৩০০ স্টার্লিং। এখানে উল্লেখ্য শ্রীমতী কিং গত বছরের সেমি-ফাইনালে কুমারী গুলাগংয়ের কাছে হেরেছিলেন।

১৯৭২ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিঙ্গলস ও ডাবলস খেতাব বিজয়িনী শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা)। শ্রীমতী কিংয়ের হাতে ১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতায় সংগৃহীত তিনটি পুরস্কার (সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস)।

খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার করে টেনিস খেলার পন্ডিতেরা ১৯৭২ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের নামের যে বাছাই তালিকা তৈরী করেছিলেন তার মর্যাদা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ থেকেছে। পাঁচটি বিভাগের মধ্যে তিনটি বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মেয়েদের সিঙ্গলস এবং মিকসড ডাবলসের ফাইনালে ১নং ও ২নং খেলোয়াড়রা উঠেছিলেন বাকি দুটি বিভাগে পুরুষ ও মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালে খেলেছিলেন ১নং ও ৩ নং বাছাই জুটি। ফাইনালে খেতাব জয়ী হয়েছেন পুরুষদের সিঙ্গলসে ১নং বাছাই, মেয়েদের সিঙ্গলসে ২নং বাছাই, পুরুষদের ডাবলসে ১নং বাছাই জুটি, মেয়েদের ডাবলসে ১নং বাছাই জুটি এবং মিকসড ডাবলসে ২নং বাছাই জুটি। পাঁচটি বিভাগের মধ্যে তিনটি বিভাগে ১নং বাছাই খেলোয়াড়রা এবং ২টি বিভাগে ২নং বাছাই খেলোয়াড়রা খেতাব জয়ী হয়ে শেষপর্যন্ত খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকা রচয়িতা-পন্ডিতদের মুখ রক্ষা করেছেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস ঃ ১নং বাছাই স্ট্যান স্মিথ (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৪-৬ ও ৭-৫ গেমে ২নং বাছাই ইলি নাসতাসেকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ ১নং বাছাই জুটি বব হিউইট এবং ফ্রিউ ম্যাকমিলান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬-২, ৬-২ ও ৯-৭ গেমে ৩নং বাছাই জুটি স্ট্যান স্মিথ এবং এরিক ভ্যান ডিলেনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ঃ ২নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে ১নং বাছাই ও গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ইভন গুলাগংকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ঃ ১নং বাছাই জুটি শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং কুমারী বেটি স্টোভ (হল্যাণ্ড) ৬-২, ৪-৬ ও ৬-৩ গেমে ৩নং বাছাই জুটি শ্রীমতী জুডী ডালটন (অস্ট্রেলিয়া) এবং কুমারী ফ্রাঁসোয়াজ ডুরকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ঃ ২নং জুটি ইলি নাসতাসে (রুমানিয়া) এবং রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা) ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ১নং জুটি কিম ওয়ারউইক এবং ইভন গুলাগংকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং

যে-উইম্বলেডন খেতাব জয়ের সূত্রে টেনিস খেলোয়াড়রা বে-সরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয়ের স্বীকৃতি লাভ করেন শ্রীমতী কিং একাধিকবার নানা নজির রেখে তা পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার আসরে তাঁর আবির্ভাব অনেকটা ধূমকেতুর মতই আকস্মিক ঘটনা। অঘটনঘটনপটীয়সী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নামডাক। ১৯৬২ সালে তিনি তাঁর কুমারী জীবনে সেই সময়ের নাম বিলি জিন মোফিট। উইম্বলেডনের সিংগলস খেলার প্রথম রাউণ্ডেই সে-বছরের ১নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথকে (বর্তমানে শ্রীমতী কোর্ট) ১—৬, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে হারিয়ে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই একজন অবাছাই খেলোয়াড়ের কাছে ১নং বাছাই খেলোয়াড়ের পরাজয়ের নজির উইম্বলেডনের ৮৬ বছরের খেলার ইতিহাসে আর নেই। ১৯৬১ সালে মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালে তিনি তাঁর মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিজয়ী হন। করেন হান্টজের সহযোগিতায় ৩নং বাছাই জুটি মার্গারেট স্মিথ এবং লেহানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে উইম্বলেডনের ডাবলস খেতাব পান। এখানে উল্লেখ্য ১৯৬১ সালের বাছাই তালিকায় তাঁরা কোন স্থানই পান নি। ১৯৬৩ সালের বাছাই তালিকায় কোন স্থান না পেয়েও তিনি ফাইনালে উঠে শেষ পর্যন্ত ১নং বাছাই মার্গারেট স্মিথের কাছে হেরে যান। তিনি ১৯৬৬ সালের সিংগলসের বাছাই তালিকায় ৪র্থ স্থান পেয়ে সেমি-ফাইনালে ১৯৬৫ সালের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই কুমারী মার্গারেট স্মিথকে পরাজিত করেন এবং ফাইনালে ২নং বাছাই ও তিনবারের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিলের মারিয়া বুয়েনোকে ৬—৩, ৩—৬ ও ৬—১ গেমে পরাজিত করে প্রথম সিংগলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

উইম্বলেডনের খেতাব জয়

আন্তর্জাতিক উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী বিলি জিন কিং-এর খেতাব জয়ের খতিয়ান ঃ

সিংগলস খেতাব ঃ ৪ বার (১৯৬৬—৬৮ ও ১৯৭২)

ডাবলস খেতাব ঃ ৮ বার (১৯৬১—৬২, ১৯৬৫, ১৯৬৭—৬৮, ১৯৭০—৭২)

মিক্সড ডাবলস ঃ ২ বার (১৯৬৭ ও ১৯৭১)

ত্রি-মুকুট সম্মান ঃ ১ বার (১৯৬৭)

সিংগলসের ফাইনালে

সিংগলসের ফাইনালে শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের জয়-পরাজয় ঃ

জয় (৪ বার) ঃ

১৯৬৬ সালের ফাইনালে ৪র্থ বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে ২নং বাছাই এবং তিনবারের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিলের মারিয়া বুয়েনোকে ৬—৩, ৩—৬ ও ৬—১ গেমে পরাজিত করেন।

১৯৬৭ সালের ফাইনালে ১নং বাছাই খেলোয়াড়ের স্থান পেয়ে ৩নং বাছাই শ্রীমতী অ্যান হেডেন জোন্সকে (বৃটেন) ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে পরাজিত করেন।

১৯৬৮ সালের ফাইনালে ১নং বাছাই খেলোয়াড়ের স্থান পেয়ে ৭ নং বাছাই কুমারী জুডি টেগার্টকে (অস্ট্রেলিয়া) ৯—৭ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৬৬—৬৮) সিংগলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

১৯৭২ সালের ফাইনালে ২ নং বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে ১৯৭১ সালের চ্যাম্পিয়ান এবং ১ নং বাছাই ইভন গুলাগংকে (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে পরাজিত করেন।

পরাজয় (৩) ঃ

১৯৬৩ সালে ১ নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ, ১৯৬৯ সালে ৪ নং বাছাই বৃটেনের অ্যান জোন্স এবং ১৯৭০ সালে ১ নং বাছাই মার্গারেট স্মিথের কাছে পরাজিত হন। শ্রীমতী কিং ১৯৬৩ সালের বাছাই তালিকায় কোন স্থান পান নি। ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালের বাছাই তালিকায় তিনি ২য় স্থান পেয়েছিলেন।

১৯৬৭ সালের উইম্বলেডন প্রতিযোগিতা তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বছর তিনি তিনটি খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন—সিংগলস, ডাবলস (রোজমেরী ক্যাসলসের সহযোগিতায়) এবং মিক্সড ডাবলস (ওয়েন ডেভিডসনের সহযোগিতায়) খেতাব।

উইম্বলেডন টেনিস

বিবিধ রেকর্ড

সর্বাধিকবার যোগদান ঃ ২৯ বার—জঁ বোরোত্রা (ফ্রান্স)

সর্বকনিষ্ঠা চ্যাম্পিয়ান ঃ কুমারী চারলোট ডড (ইংল্যাণ্ড) ১৮৮৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে পুরুষ ও মহিলাদের পক্ষে সব থেকে কম বয়সে সিংগলস খেতাব পান। জন্ম ১৮৭১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর।

সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ চ্যাম্পিয়ান ঃ উইলফ্রেড ব্যাডলি ১৮৯১ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁর ১৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন বয়সে পুরুষদের সিংগলস খেতাব পান। জন্ম ১৮৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী।

সর্বকনিষ্ঠ ডাবলস চ্যাম্পিয়ান ঃ অস্ট্রেলিয়ার লুই হোড এবং কেনেথ রোজওয়াল ১৯৫২ সালে ১৮ বছর বয়সে পুরুষদের ডাবলস খেতাব পান। হোডের জন্ম ১৯৩৪ সালের ২৩ নভেম্বর এবং হোডের থেকে রোজওয়াল তিন সপ্তাহের বড়।

সর্বাধিক খেতাব জয় ঃ ১৯টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)—মহিলাদের ডাবলস খেতাব ১২টি এবং মিকসড ডাবলস খেতাব ৭টি। কুমারী রায়ানের প্রথম খেতাব জয় ১৯১৪ সালে এবং শেষ ১৯তম খেতাব জয় ১৯৩৪ সালে।

সর্বাধিক খেতাব জয় (পুরুষদের) **ঃ** ১৪টি—উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)—৭টি সিংগলস খেতাব এবং ৭টি ডাবলস খেতাব (যমজভাই আর্নেস্ট রেনশ-র সঙ্গে)।

সর্বাধিক সিংগলস খেতাব জয় ঃ ৮টি—আমেরিকার কুমারী হেলেন উইলস-মুডী (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী রোয়ার্ক)। প্রথম সিংগলস খেতাব ১৯২৭ সালে এবং শেষ ৮ম সিংগলস খেতাব ১৯৩৮ সালে।

সর্বাধিক পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয় ঃ ৭টি—উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)

সর্বাধিক উপর্যুপরি খেতাব জয়

পুরুষদের সিংগলস ঃ ৬ বার (১৮৮১-৮৬) —উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)

মহিলাদের সিংগলস ঃ ৫ বার (১৯১৯-২৩) —মাদমোয়াজেল সুজান লংলঁ (ফ্রান্স)

সর্বাধিক পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয় ৮টি—দুই সহোদর আর এফ এবং এইচ এল ডোহার্টি (ইংল্যাণ্ড)

সর্বাধিক মহিলাদের ডাবলস খেতাব জয় ১২টি—এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)

সর্বাধিক মিকসড ডাবলস খেতাব জয় ৭টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)

বিদেশীদের প্রথম খেতাব জয়

পুরুষদের সিংগলস ঃ ১৯০৭ সালে নরম্যান ব্রুকস (অস্ট্রেলিয়া)

মহিলাদের সিংগলস ঃ ১৯০৫ সালে কুমারী মে সাটন (আমেরিকা)

স্বামী-স্ত্রীর মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়
১৯২৬ সালে শ্রীযুক্ত এবং শ্রীযুক্তা এল এ গডফ্রি। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে দুই বোন
লিলিয়ান এবং মাউড ওয়াটসন (১৮৮৪ সালে)। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির। এই খেলায় কুমারী মাউড সিংগলস খেতাব জয়ী হন।

সুদীর্ঘ ৬০ বছরের ইতিহাসে (১৯১৩-৭২) একই বছরের খেলার আসরে তিনটি খেতাব জয়ের সূত্রে দুর্লভ 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন মাত্র ৮ জন খেলোয়াড় (মহিলা ৫ জন এবং পুরুষ ৩ জন)

মহিলা খেলোয়াড়

লুজান লংলং (ফ্রান্স) : ৩ বার (১৯২০, ১৯২২ ও ১৯২৫)

এলিস মার্বেল (আমেরিকা) : ১ বার (১৯৩৯), লুই ব্রাউ (আমেরিকা) : ২ বার (১৯৪৮ ও ১৯৫০), ডরিস হার্ট (আমেরিকা) : ১ বার (১৯৫১), বিলি জিন কিং (আমেরিকা) : ১ বার (১৯৬৭)

পুরুষ খেলোয়াড়

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) : ২ বার (১৯৩৭ ও ১৯৩৮), ববি রিগস (আমেরিকা) : ১ বার (১৯৩৯), ফ্রাঙ্ক সেজম্যান (অস্ট্রেলিয়া) : ১ বার (১৯৫২)

উপর্যুপরি ২ বার 'ত্রিমুকুট' সম্মান :
ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা)—১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে

প্রথম যোগদানের বছরেই 'ত্রিমুকুট' সম্মান :
১৯৩৯ সালে ববি রিগস (আমেরিকা)

অলিম্পিক হকি

আগামী আগস্ট মাসের ২৭ তারিখ থেকে মিউনিখে অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১৬টি দেশ সমান দু'ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। প্রতিযোগিতার 'এ' গ্রুপ এবং 'বি' গ্রুপে যোগদানকারী দেশগুলির নামের তালিকা নীচে দেওয়া হল :

'এ' গ্রুপ : পাকিস্তান, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মাণী, স্পেন, বেলজিয়াম, মালয়েশিয়া, উগান্ডা এবং আর্জেন্টিনা।

'বি' গ্রুপ : অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, কেনিয়া, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, বৃটেন, মেক্সিকো এবং পোল্যান্ড।

ভারতবর্ষের খেলা

আগস্ট ২৭	:	বিপক্ষে	হল্যান্ড
আগস্ট ২৮	:	...	বৃটেন
আগস্ট ৩০	:	...	অস্ট্রেলিয়া
আগস্ট ৩১	:	...	পোল্যান্ড
সেপ্টেম্বর ২	:	...	কেনিয়া
সেপ্টেম্বর ৩	:	...	মেক্সিকো
সেপ্টেম্বর ৪	:	...	নিউজিল্যান্ড

অলিম্পিক ভারতীয় হকি দল

মিউনিখ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৮ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল তৈরী হয়েছে। পাঞ্জাবের হরমিক সিং অধিনায়ক এবং রেল দলের মুখবেন সিং সহ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলা দেশ থেকে এই দলে স্থান পেয়েছেন এই তিনজন খেলোয়াড়—অজিত সিং, অশোককুমার এবং পেজ।

দলে নির্বাচিত ১৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সার্ভিসেস দলের ৪ জন, পাঞ্জাবের ৪ জন, রেলদলের ৪ জন, বাংলার ৩ জন, তামিলনাড়ুর ২ জন এবং ভূপালের ১ জন খেলোয়াড় আছেন। বর্তমান দলে নির্বাচিত হয়েছেন দুই ভাই—হরমিক সিং এবং অজিত সিং। অতীতে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে দুই ভাইয়ের স্থান পাওয়ার নজির আরও দুটি আছে—১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালে ধ্যানচাঁদ ও রূপসিং এবং ১৯৬৮ সালে বলবীর সিং ও গুরবক্স সিং।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

গোল (২জন) : ম্যানুয়েল ফ্রেডেরিক (সার্ভিসেস) এবং চার্লস কর্নেলিয়াস (পাঞ্জাব)।

ফুলব্যাক (৩ জন) : মুখবেন সিং (রেলওয়ে)—সহ-অধিনায়ক, মাইকেল কিন্ডো (সার্ভিসেস) এবং আসলাম শের খান (ভূপাল)।

হাফ-ব্যাক (৫ জন) : পেরুমল কৃষ্ণমূর্তি (তামিলনাড়ু), বীরেন্দর সিং (রেলওয়ে), অজিতপাল সিং (পাঞ্জাব) ভি ই পেজ (বাংলা) এবং হরমিক সিং (পাঞ্জাব) —অধিনায়ক।

ফরোয়ার্ড (৮ জন) : মোল্লারা গণেশ (সার্ভিসেস), বিজয় ফিলিপস (রেলওয়ে), হরবিন্দর সিং (রেলদল), কুলবন্ত সিং (পাঞ্জাব), অজিত সিং (বাংলা), অশোক কুমার (বাংলা), বিনিমোগা গোবিন্দ (তামিলনাড়ু) এবং হরচরণ সিং (সার্ভিসেস)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ৩-৮) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের যে ১৮টি খেলা হয়েছে তার ফলাফল : জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি ১১ এবং খেলা ড্র ৭।

বর্তমানে লীগ তালিকা প্রথম তিনটি স্থানের এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে: ১ম মোহনবাগান—১৫টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট ২য়—ইস্টবেঙ্গল—১৪টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট এবং ৩য় মহমেডান স্পোর্টিং ১৫টী খেলায় ২৫ পয়েন্ট। আলোচ্য সপ্তাহে হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা ড্র করে (০—০) ইস্টবেঙ্গল একটা মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করেছে। তারা এখনও একটা গোলও খায়নি, অপরদিকে গোল দিয়েছে ৩৬টা। লীগের খেলায় এখনও অপরাজিত আছে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। লীগ তালিকায় সব নিম্ন স্থানে আছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন—১০টা খেলায় মাত্র ৪ পয়েন্ট (৪টে খেলা ড্র)।

টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

অগ্রদূত ক্লাব পরিচালিত টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা [illegible] স্কুল হলে অনুষ্ঠিত হয়। বালক বিভাগে সুবীর দাস এবং সাধারণ বিভাগে [illegible] ব্যানার্জি চ্যাম্পিয়ান হন। দলগত প্রতিযোগিতার ফাইনালে বুলস্টার ৩—১ খেলায় অগ্রদূত ক্লাবকে পরাজিত করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনশ্বর ৫৲

লেখক এই বইয়ের অর্ধেক লিখে পরলোক গমন করেন। ২২ বছর পরে সেই বই শেষ করলেন তাঁর পুত্র

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
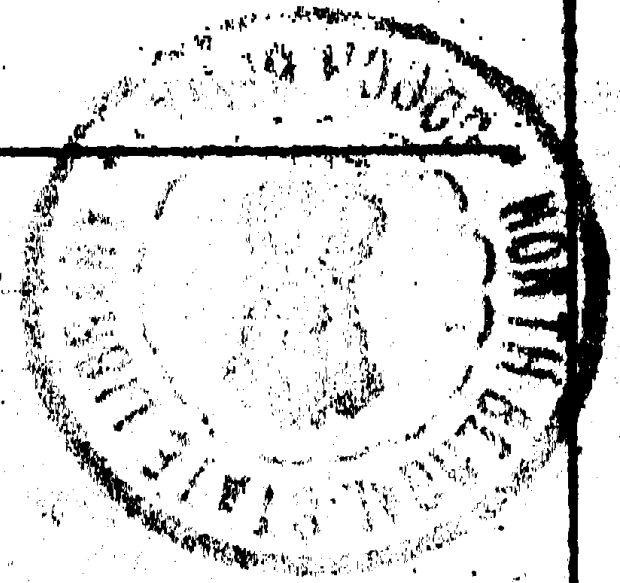
জ্যোতিষবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

জ্যোতিষাচার্য ভৃগুজাতকের

নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন ২৲

১১০০০ কপি বিক্রয়ের পর নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে

আরো একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলো

মুকুলচন্দ্র চক্রবর্তীর

ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ ৪৲

এই গ্রন্থটি বিভূতিভূষণের জীবনী ও সাহিত্যের মূল্যায়নে ডকুমেণ্টারীর কাজ করবে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তারাশংকর রচনাবলী

১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ২০টি খণ্ড হবে। প্রধান ভূমিকা—আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। ১ম খণ্ডের মূলে ভূমিকা প্রমথনাথ বিশী। ২য় খণ্ডে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা গ্রাহকগণ সত্বর বই সংগ্রহ করুন। ডাক ব্যয় আলাদা।

॥ কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ গ্রন্থ ॥

তরুণকুমার ভাদুড়ীর **সন্ধ্যাদীপের শিখা ৫৲**

সৈয়দ মুজতবা আলীর **টুনি মেম ১০৲**

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **কলকাতার কাছেই ৯৲** **বহ্নিবন্যা ১১৲**

বিভূতিভূষণের **পথের পাঁচালী ৮৲** **আরণ্যক ৭॥** **দেবযান ৭॥**

শংকর-এর **সীমাবদ্ধ ৬৲** **স্থানীয় সংবাদ ৬৲**

যে গ্রন্থগুলি চলচ্চিত্রে আশু মুক্তিপ্রতীক্ষায়

ছবি দেখার আগে মূল বইটি পড়ুন

শঙ্কু মহারাজের **বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা ৯৲**

জরাসন্ধর **ছায়াতীর ৫৲**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের **ছিন্নপত্র ৫৲** **রাতের রজনীগন্ধা ৫৲** **কাজললতা ৬৲**

বিমল মিত্রের **স্ত্রী ৬৲**

অশনি সংকেত ৫৲

বিভূতিভূষণের **আরণ্যক ৭॥** **অথৈজলে ৫॥**

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪৩৪৯২ ॥ ৩৪৮৭৯১

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১২ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 21st July, 1972 শুক্রবার, ৫ শ্রাবণ, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীপ্রদীপ দাস

কবি বিষ্ণু দে'র নতুন সম্মান

● ● ●

অনন্য রাত ॥ বিষ্ণু দে

হিমগিরি ছেড়ে সে কেন আসবে বদ্বীপে?
মানসহ্রদের হিমানীস্বচ্ছ কন্যা!
যদিচ হয়তো তুষারের ঝড়ে, কখনও ঘরের প্রদীপে
আঁধার ঘনায়, নীলিমায় তোলে বন্যা।

দেহাতীত সে যে, নাকি বলা যাবে তাপ তার
জড়িয়ে গিয়েছে উহ্য স্মৃতির পাতকে?
আরোহী শিখরে সমতলে আদি পাপ কার?
বেঁধেছে সীমানা আপন মৌল জাতকে?

বাস করি চরে চড়ায় বালিতে বন্যায়,
ভেসে যাই কত মন্দাকিনীর অতলে।
হিমানীতে নয়, দিন কাটে জলে পাতালে,
তবু অনন্য রাত চায় ঐ কন্যায়!

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিষ্ণু দে এ-বছর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কবিতার বইটির জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি। এর আগে ১৯৬৫ সালে এই বইটির জন্যেই তাঁকে 'সাহিত্য আকাদমী' পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। তাঁর এই নতুন সম্মানে আমরা সকলেই খুবই গৌরবান্বিত।

আধুনিক বাংলা কবিতা যে কয়জন কবির সাধনায় নতুন চারিত্র অর্জন করেছে, বিষ্ণু দে তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনায় একই সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ এবং সমকালীন জীবনচেতনা নতুন কাব্যরূপ লাভ করেছে। কাব্যভাষা আর দৃষ্টিভঙ্গী দুদিক থেকেই তিনি বিশিষ্ট। কবিজীবনের সূচনাতেই এই অনন্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত নীরক্ত বিবর্ণতা ও কৃত্রিমতার উপর তিনি তীর্যক ভঙ্গিতে সমালোচনার আলো ফেলেন, এবং আমাদের জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার বিষয়ে সচেতন করে তোলেন। অন্যদিকে, নিজে নাগরিক কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সহানুভূতিকে তিনি গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের দিকে প্রসারিত করেন। এরই ফলে তাঁর কবিতায় একটি সদর্থক সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাই, কবি-জীবনের শুরুতে তিনি দুর্বোধ্য কবি হিসাবে পরিচিত হলেও, জনজীবনের সঙ্গে এই সহমর্মিতার ফলে ক্রমে ক্রমে তিনি জনস্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি তাঁর সাহিত্যকৃতির দ্বারা আমাদের চেতনার দিগন্ত সুদূর-প্রসারিত করেছেন। আধুনিক জীবনের বহুমুখী জটিলতা এবং চিন্তাভাবনার বিষয়েও সচেতন করে তুলেছেন তিনি। সেজন্যে কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ এবং প্রবন্ধ রচনাতেও সমান আগ্রহ দেখা যায় তাঁর। আমাদের দেশের পাঠক-সাধারণকে বর্তমান কালের অগ্রবর্তী চিন্তাচেতনার বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্যে তাঁর এই আগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করি আমরা।

আর এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথই যে তাঁর পূর্বসূরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুরস্কার পাওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে বিষ্ণু দে নিজেও তা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতোই একই সঙ্গে তিনি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠ অবদানকে মেলাতে চেয়েছেন। এবং তাতে যে তিনি সার্থক হয়েছেন, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র অনেক কবিতা এবং 'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী', 'অম্বিষ্ট', 'এলসিনোরে', 'ক্রেসিডা' ইত্যাদি কবিতাতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বিষ্ণু দে-র জন্ম হয় ১৯০৯ সালে, কলকাতায়। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৪০ খানা, তার মধ্যে কবিতার বই ১৬ খানা।

কর্মজীবনে তিনি সরকারী কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। সম্প্রতি বছর-তিনেক হল তিনি অবসর নিয়েছেন।

তাঁর প্রথম কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে তিনি সত্যিকারের একজন নতুন কবি হিসাবে পরিচিত হন। এবং সে নতুনত্বের দীপ্তি আজো সমান অম্লান রয়েছে। আমরা এই সঙ্গে 'অমৃতে' প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতা তুলে দিলাম। আরো দীর্ঘকাল তিনি বাংলা কবিতাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করুন।

সম্পাদকীয়

স্থায়ী শান্তির সন্ধানে

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের যে উপমহাদেশ গঠিত তার মাটিতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়েই সিমলাতে শীর্ষ বৈঠক ও শীর্ষ চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দীর্ঘকালের বৈরিতা ও ভুল বোঝাবুঝির পর পাকিস্থানের সঙ্গে যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বহু বিষয়ে মীমাংসার পথ সুগম করা হল, এটা কম কথা নয়। রাজনীতিকদের হাতে আলাদীনের প্রদীপ নেই। রাতারাতি উভয় দেশের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপিত হয়ে যাবার দুরাশাও আমরা করি না। কিন্তু নিরাশাবাদীদের মতো এ কথাও আমরা বলব না যে, এর দ্বারা কিছুই হবে না। পাকিস্তানই জিতে গেল।

হারজিতের প্রশ্ন শান্তি আলোচনায় অবান্তর। শান্তি আলোচনার অর্থই হল উভয়পক্ষে আদান-প্রদান, ভুল বোঝাবুঝির অবসান এবং নতুন পথে যাত্রা শুরু। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে যে শান্তি আলোচনার জন্য আসতে হয়েছিল তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, আগেকার স্টাইলে রাজনীতি করা তাঁর পক্ষেও আর সম্ভব নয়। তবে একটিমাত্র বৈঠকে এতদিনকার পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। পরে আবার বৈঠক বসবে। উভয়পক্ষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনার পর তার সমাধানের চেষ্টা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিমলা বৈঠকের তাৎপর্য খানিকটা ব্যাখ্যা করেছেন সুস্পষ্ট ভাষায়। এই চুক্তি নিয়ে এদেশে এবং ওদেশে একশ্রেণীর কট্টর রক্ষণশীল লোক নানারকম অপব্যাখ্যা করছে। এতে আমাদের বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ, ভারতের বৃহৎ জনসমষ্টি সিমলা চুক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন এবং তাঁরা এই চুক্তিকে কার্যকর করার সুযোগ দিতে প্রস্তুত। ছোটোখাটো বাধা বা অসুবিধা সব চুক্তিতেই থাকে, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বাস্তববুদ্ধি থাকলে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তা দূর করা অসম্ভব নয়। এই চুক্তির বড় কথা হল, উভয় দেশের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিরোধ আছে তা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবে। একটা শুধু ব্যতিক্রম, তা হল কাশ্মীর। কাশ্মীর সমস্যাও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিষ্পত্তির কথা উল্লেখ আছে। তবে তা যদি না হয় তাহলে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে তৃতীয়পক্ষের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। চুক্তির এই ধারা নিয়ে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে যে কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে ভারতের বক্তব্যের মিল নেই। তিনি বলেছেন যে, কাশ্মীর প্রশ্ন রাষ্ট্রসংঘ থেকে তুলে নেওয়া হবে না। পাকিস্তানী আইনমন্ত্রীর এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই ভারত মেনে নেবে না। তবে এর ওপর অযথা অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে দুই দেশের বৃহত্তর স্বার্থ এই মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া যায় না। কারণ, পাকিস্তানের রাজনীতিকরা এতকাল যে-ধরনের আশ্বাস দিয়ে জনসাধারণকে বুঝিয়ে এসেছেন হঠাৎ তার উল্টোটা বলা তাঁদের পক্ষে খুব সহজ নয়। কিন্তু যখন বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি তাঁরা হবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে আলোচনাই বেশি ফলপ্রদ হবে। আরেকটি বড় প্রশ্ন, পাকিস্তানীদের কাছে, হল যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি। পাকিস্তান এই বন্দীদের ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য খুবই ব্যাকুল। প্রধানমন্ত্রী সোজা ভাষায় বলেছেন যে, এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম না হবার আগে যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। এই যুদ্ধবন্দীরা হল পাকিস্তানের জঙ্গীবাহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। এদের পরিবার-পরিজন স্বভাবতই পাকিস্তান সরকারের ওপর খুব চাপ দিচ্ছে। ভারত যদি এখনই ওদের ছেড়ে দেয় তাহলে পাকিস্তানকে কাশ্মীর ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় রাজী করানো মুস্কিল হবে। এবং কাশ্মীর ব্যাপারে কোনো সমাধানের সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত। সুতরাং পাকিস্তানকে চিন্তা করে দেখতে হবে কাশ্মীর সমস্যার জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছেই ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে, না দিল্লী ও ইসলামাবাদ হট লাইনই এই সমস্যার সমাধানের পথ খুলে দেবে। কাশ্মীর ও স্থায়ী শান্তির সম্পর্ক আজ ঘনিষ্ঠ।

পটভূমি

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা হয়ত শুধু কল-কারখানার এক ধরনের কাঁচা মালের সমস্যা, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পশ্চিম বাংলার প্রতি ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। কাপড়ের কলের জন্যে প্রয়োজনীয় তুলোর দাম নিয়ে রাজ্য সরকার দিল্লীতে যে রীতিমতো দরবার শুরু করেছেন তার সাফল্য বা অসাফল্যের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবটাও নতুন করে যাচাই হয়ে যাবে। এ-পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র এই প্রশ্ন বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা প্রধানতঃ তাঁরই দপ্তরের ব্যাপার। শ্রীমিশ্র হয়ত তাঁর কথা রাখার চেষ্টা করবেন। পাটের দাম (যার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা বিশেষভাবে জড়িত, কারণ দেশের শতকরা ৫৫ জন পাটচাষীই এই রাজ্যের অধিবাসী) সম্পর্কে তিনি, ইদানিং যে মনোভাব দেখিয়েছেন সেটা আশাব্যঞ্জক, কারণ পাটচাষীদের কথা এযাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কেউই তেমন ভাবেন নি। তবু শ্রীমিশ্র একা চেষ্টা করলেই তুলোর দাম সম্পর্কে সুবিচার হবে, এতটা আশা করা হয়ত ঠিক হবে না। কেন হবে না, সেকথায় পরে আসছি।

তার আগে দেখা যাক পশ্চিম বাংলা সরকার কী চাইছেন। তাঁরা চাইছেন, সারা দেশে সব কাপড়ের কল যেন সমান দরে তুলো কিনতে পায়। এই ধরনের দাবির কারণ? কারণ এই যে, সব কাপড়ের কল যদি সমান দরে তুলো কিনতে পায় তবে তারা সমান তালে পাল্লা দিতে পারবে। পশ্চিম বাংলায় মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা গোটা চল্লিশ। তাদের চাহিদা মেটাতে হলে যতোটা তুলো দরকার সেই পরিমাণ তুলো রাজ্যের মধ্যে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অভাব মেটাতে হয় রাজ্যের বাইরে থেকে তুলো আমদানি করে। তুলো উৎপাদনের প্রধান জায়গা আবার সেই সুদূর মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে। সেখান থেকে তুলো আনতে গিয়ে রেলের মাশুল লাগে অনেক। তাই পড়তা পড়ে যায় অনেক বেশি। ওদিকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে যে-সব কাপড়ের কল রয়েছে তাদের কতো সুবিধে দেখুন। ঘরের কাছেই তারা তুলো পাচ্ছে। রেলের বাড়তি মাশুল লাগছে না। তাই কাপড় তৈরির খরচও কমে যাচ্ছে। একেই তো মহারাষ্ট্র-গুজরাটের (এবং তামিলনাড়ুরও) অধিকাংশ কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সব আধুনিক ধরনের। তার ওপর এই সস্তায় তুলো পাওয়ায় তাদের সঙ্গে পাল্লায় পশ্চিম বাংলার কলগুলো এঁটে উঠতে পারছে না। এখন কেন্দ্রীয় সরকার যদি সারা দেশে এক দরে তুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করেন তবে এই রাজ্যের কাপড়ের কলের মালিকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মনে হতে পারে, এটা পশ্চিম বাংলার একটা অন্যায় আব্দার। কেন্দ্রীয় সরকারের কেষ্টবিষ্টুরা বলতে পারেন যে, তোমাদের রাজ্যে তোমরা বেশি তুলো ফলাতে পারো না তার জন্যে আমরা কী করব? তুলোর ফলন বাড়িয়ে এই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলাই কি ভালো নয়? কিন্তু সোজাসুজি এমন কথা বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তার পথ বন্ধ। কারণ ইস্পাত ও কয়লা সম্পর্কে তাঁরা যে নীতি চালু করেছেন তার কথা মনে রাখলে পশ্চিম বাংলার দাবির মধ্যে অন্যায় কিছুই নেই।

তুলো যেমন সব রাজ্যে সমান হারে ফলে না, ইস্পাতও তেমনিই দেশের সর্বত্র তৈরি হয় না কয়লাও সর্বত্র পাওয়া যায় না। ভৌগোলিক কারণেই কয়লা উৎপাদন ও ইস্পাত তৈরির প্রধান কেন্দ্র পূর্ব-ভারত। সুতরাং তুলোর ব্যাপারে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের যে সুবিধে রয়েছে ইস্পাত বা কয়লার ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার (এবং বিহার বা ওড়িশার) সেই সুবিধে রয়েছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েক বছর পরে দাবি ওঠে কয়লা ও ইস্পাত কল-কারখানার পক্ষে খুবই দরকারি, সুতরাং পূর্ব-ভারতে ঐ দুটি জিনিস সুবিধে দরে পাওয়া যায় বলে পশ্চিম বাংলায় (ও বিহারে) অনেক কল-কারখানা গড়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। কিন্তু দেশের সর্বত্র যদি কল-কারখানার প্রসার ঘটাতে হয় তবে সব জায়গাতেই যাতে সমান দরে ইস্পাত ও কয়লা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

এই দাবি ওঠায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারির মন গলে গেল। তিনি এই ব্যবস্থা করে দিলেন। কথায় বলে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কল-কারখানার সুবিধে হলো ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় শিল্পপ্রসারের পথে বিরাট একটা বাধা খাড়া করে দেওয়া হলো। কারণ এতদিন পর্যন্ত এই রাজ্যে কল-কারখানা স্থাপনের যে স্বাভাবিক সুবিধে ছিল সেটা চলে গেল। ঘরে বসেই যদি পশ্চিম বাংলার মতো একই দরে ইস্পাতের মতো দরকারি কাঁচা মাল এবং কয়লার মতো জ্বালানি পাওয়া যায় তবে আর শিল্পপতিরা কেন কষ্ট করে 'বাংলা মুলুকে' আসতে যাবেন? এই রাজ্যে শিল্পপ্রসারের মন্থরগতির অনেক কারণ আছে, কিন্তু কৃষ্ণমাচারিজীর এই 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' যে একটা বড় কারণ সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী?

*

কিন্তু কৃষ্ণমাচারিজীর কল্যাণে শুধু যে পশ্চিম বাংলার স্বাভাবিক সুবিধেটাই চলে গেল তা নয়, বাড়তি বোঝা এসে চাপলো এই রাজ্যের ঘাড়ে। সেই বোঝাটা চাপালো রেলদপ্তর। কী ভাবে এই বোঝা চাপানো হলো তা দেখা যাক। জামশেদপুর থেকে কলকাতায় এক টন ইস্পাত আনতে রেলের মাশুল গোটা তিরিশ টাকার মতো লাগার কথা। কিন্তু কেন্দ্রের নবিধানের ফলে লাগে ৭৫ টাকার মতো। কেন এই বাড়তি মাশুল দিতে হচ্ছে পশ্চিম বাংলাকে [illegible] হচ্ছে তার কারণ, পশ্চিম বাংলার ক্রেতারা এই বাড়তি মাশুল না-দিলে দেশের অন্যান্য প্রান্তের ক্রেতারা এক দরে ইস্পাত পাবেন না। জামশেদপুর থেকে বোম্বাইয়ে এক টন ইস্পাত পাঠাতে গেলে মাশুল লাগার কথা ১২৫ টাকার মতো। কিন্তু বোম্বাইয়ের ক্রেতাকে আসলে ৭৫ টাকার বেশি দিতে হয় না। এই যে রেলের প্রতি টনে ৫০ টাকার মতো ক্ষতি হচ্ছে সেটা তো রেল দপ্তর নিজের পকেট থেকে দেবে না। তাই সেই ক্ষতিটা পূরণ করতে হচ্ছে পশ্চিম বাংলার ঘাড়ে বাড়তি বোঝা চাপিয়ে। এইভাবেই ইস্পাতের দর সারা দেশে সমান করা হয়েছে।

কয়লার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ব্যাপার ঘটেছে, অর্থাৎ যতোটা মাশুল লাগা উচিত তার চেয়ে কম মাশুলে রেল দপ্তর পূর্ব-ভারত থেকে দূর দূরান্তে কয়লা পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। যেমন ধরুন, রাণীগঞ্জ থেকে সেই পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় এক টন কয়লা পাঠাতে রেল মাশুল লাগছে পঞ্চাশ টাকার মতো। আসলে তার বেশি লাগাই উচিত। কিন্তু তা লাগছে না। অথচ ঐ একই ওয়াগনে যখন পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় তৈল-বীজ আসছে তখন প্রতি টনে মাশুল দিতে

হচ্ছে ৯০ টাকার বেশি। আর তুলোর জন্যে রেল মাশুল পড়ছে প্রতি টনে ১৬৫ টাকা।

পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পদপ্তরের মন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদিন তুলোর দামের প্রসঙ্গে অনেক তথ্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, গুজরাটে যে তুলো উৎপন্ন হয় সেই তুলোর প্রতি ক্যান্ডির দাম পড়ে ২৪ টাকা। কলকাতায় ঐ তুলো কিনতে হয় ৭৩ টাকা দরে। আমেদাবাদ থেকে যে তুলো আসে বোম্বাইয়ে তার দর ৩৮ টাকা, অথচ কলকাতায় ৮৪ টাকা। প্রতি কুইন্টাল তুলোর জন্যে কলকাতার কাপড়ের কলের মালিকদের বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলনায় বাড়তি রেল মাশুল দিতে হয় যথাক্রমে সতের টাকা ও সাড়ে আঠারো টাকার মতো। এই রাজ্যের কাপড়ের কলগুলিতে বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ কুইন্টালের মতো তুলো লাগে। এর বেশির ভাগটাই রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানি-করা। সুতরাং বাড়তি রেল মাশুল বাবদ যে কতো টাকা খরচ হয় সেটা অনুমান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

পশ্চিম বাংলার কাপড়ের কলগুলি নানা সমস্যায় পীড়িত। তার অধিকাংশেরই যন্ত্রপাতি মান্ধাতার আমলের। মিহি কাপড় অথবা চটকদার পোষাকের কাপড় তৈরির ক্ষমতা তাদের নেই। তাই মোটা কাপড় তৈরির ওপরই ভরসা। ওদিকে মোটা কাপড়ের দাম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাই দাম বাড়িয়ে পড়তা পোষাবার পথও বন্ধ। বেশ কয়েকটি কাপড়ের কল যে পঙ্গু হয়ে পড়েছে তার এইসব কারণ তো আছেই, তার সংগে যুক্ত হয়েছে তুলোর চড়া দাম।

এই অবস্থায় সিদ্ধার্থশংকর রায় ও জয়নাল আবেদিন যদি তুলোর দামের প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনে থাকেন তবে অন্যায় কিছুই করেন নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি মানবেন কিনা সেটাই হলো প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে একটা উল্টো যুক্তি খাড়া করা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। সেটা হলো, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট থেকে পশ্চিম বাংলাকে চড়া দরে তুলো কিনতে হচ্ছে বটে, তবে ঐ দুটি রাজ্য থেকে তৈরি কাপড় অপেক্ষাকৃত সুবিধে দরে পশ্চিম বাংলায় চালান করা হচ্ছে তো, সুতরাং পশ্চিম বাংলার খুশি থাকা উচিত। এই যুক্তি মেনে নিলে তো এই রাজ্যে কাপড় তৈরি বন্ধ করে দিলেই হয়, কারণ তা হলে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলের মালিকরা অনায়াসেই পশ্চিম বাংলার কাপড়ের বাজারটা পুরোপুরি দখল করতে পারবে। দ্বিতীয় কথা হলো, তুলোর ক্ষেত্রে যদি এই যুক্তি মানতে হয় তবে তো ইস্পাত অথবা কয়লার ক্ষেত্রেও এই যুক্তি খাটা উচিত। অর্থাৎ শুধু পূর্বভারতে কল-কারখানা থাকলে তারাই তো অন্যান্য রাজ্যের চাহিদাও মেটাতে পারত। কিন্তু তখন সেই যুক্তি না-দেখিয়ে বরং বলা হয়েছিল গোটা দেশেই কল-কারখানার প্রসার দরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক মহলে এই ধরনের মনোভাব আছে বলেই পশ্চিম বাংলার ন্যায্য দাবির স্থান শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা মুশকিল। সারা দেশে তুলোর দাম সমান করার প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বাধা আসবে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কাছ থেকে এবং অংশতঃ পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কাছ থেকে। কারণ এই ব্যবস্থা চালু হলে ঐসব রাজ্যে তুলোর দর বেড়ে যাবে, ফলে সেখানে কাপড়ের কলগুলি বাড়তি খরচের মধ্যে গিয়ে পড়বে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের স্বার্থ দেখার মতো প্রভাবশালী লোক দিল্লীতে যথেষ্টই আছে, যেমন আছে পাঞ্জাব-হরিয়ানার গমচাষীদের স্বার্থ দেখার লোক। সরকার চাষীদের কাছ থেকে যে-দামে গম কেনেন সেটা সামান্য কমাবার যখন কথা হলো তখন 'গেল গেল' রব উঠলো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব যখন এলো তখন পাঞ্জাবের মুখপাত্র এমনই বেঁকে বসলেন যে, দাম কমানো গেল না। গমের দাম কমাবার ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল, তবু কমানো গেল না। তুলোর দাম সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার ন্যায্য দাবি যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠবে তখন এই রাজ্যের হয়ে কথা বলবার কেউ থাকবে না, অথচ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মুখপাত্রদের 'যুক্তফ্রন্ট' থাকবেই।

কিন্তু তবু দিল্লীর উচিত পশ্চিম বাংলার এই দাবিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে আসা। কারণ তা না হলে দিল্লীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ উঠবে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও এখন বুঝতে সুরু করেছেন যে, এতদিন তাঁরা যে-ধরনের মাশুল নীতি অনুসরণ করে এসেছেন তাতে পূর্ব ভারতের ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের বৈষয়িক সমীক্ষায় সে-কথা স্বীকারও করা হয়েছে। সুতরাং এখন সেই ভুল সংশোধনের একটা সুযোগ দিল্লীর সামনে এসেছে।

১৪।৭।৭২　　—দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

সিমলায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার কালি শুকোতে না শুকোতেই এই চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে দুদিক থেকে দুরকম ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে।

গত ১০ জুলাই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অনুমোদনের জন্য এই চুক্তি পেশ করে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী মহম্মদ আলি কাসুরি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন, সিমলা চুক্তির পর পাকিস্তান যে কাশ্মীর প্রসঙ্গটি রাষ্ট্রসংঘ থেকে তুলে নেবে তা নয়।

কিন্তু সিমলা চুক্তির ধারা পর্যালোচনা করে একথাই মনে হবে যে, এই চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাওয়ার পর এখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের কোন প্রসঙ্গই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বাইরে তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে যেতে পারে না। চুক্তিতে তাই আছে। চুক্তির ধারায় এমন কোন কথাই নেই যা থেকে এই ব্যাখ্যায় আসা যেতে পারে যে, কাশ্মীর প্রসঙ্গটি তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের জন্য তুলে রাখা যাবে এবং সেই তৃতীয় পক্ষ বলতে রাষ্ট্রসংঘ বোঝাবে। এই চুক্তিতে পুরোপুরি জোর দেওয়া হয়েছে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ওপর, যেটা বলতে গেলে এই চুক্তির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভারত বরাবরই এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এসেছে। সিমলা সম্মেলনের একটা বড় সার্থকতা এই যে, সেখানে ভারত তার প্রস্তাবে পাকিস্তানকে রাজি করাতে পেরেছে।

কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তান এ ব্যাপারে বেসুরো গাইতে আরম্ভ করে দিয়েছে। পাকিস্তান যদি এখনও কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘকে একটা সংশ্লিষ্ট পক্ষ হিসাবে গণ্য করতে চায় তাহলে কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার আশা খুবই ক্ষীণ। কেননা, রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ কাশ্মীর বিরোধের মধ্যে যে জটিলতা এনেছে একমাত্র তা থেকে বেরিয়ে গিয়েই এই বিরোধ মীমাংসার জন্য দুই দেশ নতুন করে চেষ্টা করতে পারে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, দুই কোরিয়ার মধ্যে সম্প্রতি যে বোঝাপড়া হয়েছে তাতেও রাষ্ট্রসংঘর প্রস্তাবের আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে।

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তান সিমলা চুক্তির যে ব্যাখ্যা করছে তার ভুল ধরিয়ে দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেরি করেননি। ১২ জুলাই নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন যে, পাকিস্তান যদি এখনও কাশ্মীর প্রসঙ্গটিকে রাষ্ট্রসংঘের আলোচ্য বিষয়-তালিকার মধ্যে রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করে তাহলে তার সেই কাজের সঙ্গে সিমলা চুক্তির মর্মার্থের যথাযথ সঙ্গতি থাকবে না।'

শ্রীমতী গান্ধীর ভাষা সংযত; কিন্তু তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তান এখন আর রাষ্ট্রসংঘের দোহাই পাড়তে পারবে না। যদি সে তা করে তাহলে সেটা হবে সিমলা চুক্তির বিরোধী।

আরও একটা কথা, যা এতদিন উহ্য ছিল, সেকথাটা খোলসা করে বলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। বাংলাদেশে যে প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে তাদের মুক্তিদানের অধিকার একমাত্র ভারতের নয়, বাংলাদেশেরও। তাছাড়া পশ্চিম রণাঙ্গনে আরও হাজার তিনেক পাকিস্তানী সৈন্য বন্দী হয়েছে। তারা অবশ্য ভারতেরই বন্দী, তাদের ব্যাপারে বাংলাদেশের কোন ভূমিকা নেই।

বন্দী মুক্তির ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র পাকিস্তান-বাংলাদেশ সমঝোতার ব্যাপার হত তাহলে পশ্চিম রণাঙ্গনে ধৃত পাকিস্তানী সৈনিকদের মুক্তির ব্যাপারে বিশেষ কোন জটিলতা থাকত না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা না দেখা পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেবে না।

তার মানে এই যে, প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর পক্ষে যুদ্ধবন্দীদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া আদৌ 'সহজ হবে না। শ্রীমতী গান্ধী যা বলেছেন তার খোলাখুলি অর্থ হল, কাশ্মীর প্রশ্নের একটা মীমাংসায় আসতে পাকিস্তানকে বাধ্য করার জন্য ভারত প্রয়োজনমত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের আটকে রাখবে। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই ব্যাপারে ভারত বাংলাদেশের সহায়তা পাবে।

*

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সিমলা চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিতে ভুট্টো সাহেবের বিশেষ বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের প্রধান প্রধান প্রায় সব দলই এই চুক্তি সমর্থন করেছে। কিন্তু চুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তিও তোলা হয়েছে কোন কোন মহল থেকে, এমন কি ভুট্টোর নিজের দলের ভিতর থেকেও। যেমন, বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান যে হাজার পাঁচেক বর্গমাইল জমি ভারতের কাছ থেকে ফিরে পাবে সেটা ত মরুভূমি মাত্র, আর সে জায়গায় ভারতকে পাকিস্তান যে ৭০ বর্গমাইলের মত জমি ফিরিয়ে দেবে সেটা ভাল, তৈরি জমি। অর্থাৎ, চুক্তির বিরোধীদের বক্তব্য, এই বিনিময়ে ভারতেরই লাভ।

সিমলা চুক্তির পিছনে পাকিস্তানের জনমতের ব্যাপক সমর্থন দেখান এখন প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে খুবই জরুরী। অথচ এই সময়েই ভুট্টোর নিজের প্রদেশ সিন্ধুতে তাঁর সরকার বেকায়দায় পড়েছেন। সেখানকার প্রাদেশিক পরিষদে সিন্ধীকে একমাত্র প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন প্রণয়ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অঞ্চলের উর্দুভাষীরা মারমুখী হয়ে উঠেছেন। করাচী, হায়দরাবাদ, লিয়াকতাবাদ প্রভৃতি শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধেছে। এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রায় ৬০ জন মারা গেছে।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সিমলা চুক্তি অনুমোদনের প্রাক্কালে এই হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলার পিছনে ভুট্টো-বিরোধীদের হাত আছে কিনা সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, তবে, এই ধরনের একটা নেপথ্য যোগাযোগ থাকা আদৌ বিচিত্র নয়।

*

১৯৫৯ সালে কেরলের প্রথম কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে ঐ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কতগুলি সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

সেবার কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে 'বিমোচন সমরম' চালান হয়েছিল তার পুরোভাগে ছিলেন নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ও গির্জার নেতৃবৃন্দ। এবারও কেরলের নায়ার ও খৃশ্চান সম্প্রদায়ের নেতারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন। গতবারও বিরোধের প্রথম স্ফুলিঙ্গটি দেখা দিয়েছিল কেরল শিক্ষা বিল উপলক্ষ করে। কেরলে যাঁরা বেসরকারী কলেজ চালান (তাঁদের মধ্যে নায়ার ও খৃশ্চান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিও আছে) তাঁরা সে সময়ে আশঙ্কা করেছিলেন যে, ঐ বিল তাঁদের স্বার্থের ক্ষতি করবে। এবারও বিরোধটা দানা বেঁধে উঠছে বেসরকারী কলেজগুলিকে কেন্দ্র করে।

কেরলে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে মোট যে ১৩৮টি কলেজ আছে তার মধ্যে ১১৪টিই বেসরকারী পরিচালনাধীন। শতকরা ৮৫ জন ছাত্রই এইসব বেসরকারী

কলেজে পড়েন। এই সব কলেজ যাঁরা চালান তাঁদের মধ্যে আছেন নায়ার সার্ভিস সোসাইটি, বিভিন্ন গির্জা, শ্রীনারায়ণ গুরু ধর্ম পরিপালন যোগম (ইড়ুভা সম্প্রদায়ের সংস্থা), মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি প্রভৃতি।

এই বেসরকারী কলেজগুলিতে পড়ার জন্য ছাত্রদের সরকারী কলেজের তুলনায় বেশি বেতন দিতে হয়। যেমন, আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে সরকারী কলেজগুলিতে ফি-এর হার যেখানে বছরে ১৪৪ টাকা সে-জায়গায় বেসরকারী কলেজগুলির ফি-এর হার ১৬০ টাকা। ছাত্ররা কিছুকাল যাবৎ বেসরকারী কলেজগুলির ফি-এর হার কমাবার জন্য আন্দোলন করছিল। তাছাড়া ঐ সব কলেজের আয়-ব্যয় সম্পর্কেও ছাত্র-দের অভিযোগ ছিল।

ছাত্রদের দাবী বিবেচনা করার জন্য কেরল সরকার ১৯৭০ সালে একটি কমিশন গঠন করেন। পদ্মকুমার কমিশন নামে পরিচিত এই সমীক্ষা গোষ্ঠী বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সুপারিশ করেন যে, সরকারী কলেজগুলির ফি-এর হার কিছুটা বাড়িয়ে এবং বেসরকারী কলেজ-গুলির ফি-এর হার কিছুটা কমিয়ে মাঝা-মাঝি এক জায়গায় এই দুটি ফি-এর হার এক করে দেওয়া হোক। কমিশন এইসব বেসরকারী কলেজ সম্পর্কে অভিযোগেরও যথার্থতা দেখতে পেয়েছিলেন। যেমন, তাঁরা অনুসন্ধানে জানতে পেরেছিলেন যে, এই কলেজগুলিতে ভর্তি করার জন্য প্রতি ছাত্র পিছু এককালীন ১০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত 'ক্যাপিটেশন ফি' আদায় করা হয়ে থাকে এবং ঐসব কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পাওয়ার জন্য প্রত্যেককে ৩০০০ টাকা থেকে ১২০০০ টাকা পর্যন্ত 'দান' করতে হয়।

ইতিমধ্যে বেসরকারী কলেজগুলির অধ্যাপকরা দাবী জানাতে থাকেন যে, সরা-সরি সরকার তাঁদের বেতন দিন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের সরাসরি বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হলে ঐসব কলেজে ছাত্র ভর্তি ও অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারেও সরকারের হাত থাকতে হবে। রাজ্য সরকার প্রস্তাব দেন যে, অধ্যাপক নিয়োগের জন্য পরিচালকদের একজন প্রতিনিধি, একজন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকারের একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত কমিটির উপর অধ্যাপক পদের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ভার দেওয়া হোক। এই কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের জন্য দুটি করে নাম প্রস্তাব করবেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ দুজনের মধ্যে একজনকে নিয়োগ করবেন। ছাত্র ভর্তি সম্পর্কে রাজ্য সরকার প্রস্তাব দেন যে, শতকরা ৮০ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হবে ফলাফলের ভিত্তিতে, বাকি শতকরা ২০ জন ছাত্রকে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিবেচনা অনুসারে ভর্তি করতে পারবেন।

বেসরকারী কলেজ [illegible] সরকারের এই শর্ত [illegible] রাজী হননি। তাঁরা যুক্তি দেন যে, বেসরকারী কলেজগুলিতে সরকার যে অর্থ সাহায্য দেন সেটার পরিমাণ প্রতি ছাত্রের মাথাপিছু গড়ে মাত্র ২১৩ টাকায় দাঁড়ায়। আর সরকারী কলেজগুলিতে ছাত্র পিছু ব্যয় করা হয় ৬৩৭ টাকা। একথাও বলা হয় যে, বেসরকারী কলেজগুলির ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের এই প্রস্তাব সরকারের আসল অভিপ্রায়ের গৌরচন্দ্রিকা। ঐ আসল অভি-প্রায় হচ্ছে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যে অধিকার সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে সেই অধিকার বাতিল করা।

কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন কেরল ছাত্র ইউনিয়নের একটি সিদ্ধান্তের ফলে বেসরকারী কলেজগুলির পরিচালক কর্তৃ-পক্ষের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। পদ্মকুমার কমিশনের সুপারিশের বিরোধিতা করে কেরল ছাত্র ইউনিয়ন বলল, সরকারী কলেজগুলির ছাত্র বেতন বাড়ান চলবে না, বেসরকারী কলেজগুলির ছাত্র বেতন কমিয়ে সরকারী কলেজগুলির সমান স্তরে নিয়ে যেতে হবে। ছাত্র সংগঠন ও যুব কংগ্রেসের চাপে কেরলের কংগ্রেস একই সিদ্ধান্ত করল। আর কংগ্রেসের চাপে কেরলের যুক্তফ্রন্টের সংযোগ কমিটিও স্থির করল যে, বেসরকারী কলেজগুলির ছাত্র বেতনের হার কমিয়ে সরকারী কলেজগুলি বেতনের হারের সমান করতে হবে। বেসরকারী কলেজগুলির পরিচালকরা দাবী করলেন, তাঁদের বেতনের হার কমাতে হলে সরকারকে সেই বাবদ খেসারত দিতে হবে। কেরল ছাত্র ইউনিয়ন, কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের সংযোগ কমিটি এই খেসারতের দাবীও প্রত্যাখ্যান করল।

যুক্তফ্রন্টের সংযোগ কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেরল সরকার গত ২৬ জুন একটি অর্ডিনান্স জারি করে নির্দেশ দিলেন যে, বেসরকারী কলেজগুলির ছাত্র বেতনের হার কমিয়ে সরকারী কলেজগুলির সমান করতে হবে। বেসরকারী কলেজগুলির পরিচালকরা ঘোষণা করলেন, সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদে তাঁরা গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলবেন না। কেরল বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খোলার তারিখ কয়েকবার পিছিয়ে দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশমত কলেজ না খুললে অনুমোদন কেড়ে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে বেসরকারী কলেজগুলির পরিচালকদের ঐক্যে অবশ্য কিছুটা ফাটল ধরেছে। কংগ্রেসের নেতা শ্রীআর শংকর 'এস এন ডি পি যোগম'-এর একজন প্রধান। কংগ্রেসের চাপেই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, যোগমের পরিচালনা-ধীন ১৪টি কলেজ সরকারী নির্দেশ মান্য করে ক্লাস আরম্ভ করেছে। মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির কলেজগুলিও খুলেছে। কিন্তু নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ও গির্জার কর্তৃপক্ষ বেঁকে বসেছে। তাঁরা সরকারী শর্তে কিছুতেই কলেজ খুলবেন না। বিশ্ব-বিদ্যালয় যে শেষ তারিখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তার পরও কেরলের ৮৫টি বেসরকারী কলেজ খোলেনি। কংগ্রেস দাবী করেছে, দরকার হলে সংবিধান সংশোধন করেও অবাধ্য কলেজগুলির পরিচালনাভার সরকারের নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। এদিকে নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ও গির্জার প্রধানরা বেসরকারী কলেজগুলির প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তাঁরা বিরোধী দল কেরল কংগ্রেসের সমর্থন পাচ্ছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম শরিক মুসলিম লীগও বেসরকারী কলেজগুলিতে সরকারী হস্ত-ক্ষেপের ব্যাপারে উৎসাহী নয়।

নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ইতিমধ্যে ১৯৫৯ সালের মত 'বিমোচন সমরম'-এর আহ্বান জানিয়েছে। সরকারী আক্রমণ থেকে বেসরকারী কলেজগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রাইভেট কলেজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলছেন। অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের রাজনৈতিক আবহাওয়া যেন ফিরে আসছে। বড় তফাৎ এই যে, সেদিন যেসব শক্তির সাহায্য নিয়ে কংগ্রেস কম্যুনিস্ট সরকারকে উৎখাত করেছিল সেইসব শক্তির একাংশ এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেছে এবং কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টি এবার একই নৌকায় আরোহী।

•

সাত বছরের অধিককাল জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থেকে আইসাকু সাতো পদত্যাগ করেছেন। ইদানীংকালে আর কেউ তাঁর মত এত দীর্ঘকাল জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। তিনি কথা দিয়েছিলেন, তিনি 'হানামিচি'র (কুসুমাস্তীর্ণ পথের) উপর দিয়ে বিদায় নেবেন। তাঁর সেই কথা তিনি পুরোপুরি রাখতে পারেননি। বিদায় নেওয়ার আগে

তিনি অবশ্যই কিছু কৃতিত্বের নজির রেখে গেছেন যেগুলির জন্য দেশের মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে। যেমন, তাঁর আমলে জাপান বৈষয়িক সমৃদ্ধির চূড়ায় উঠেছে, তাঁর আমলে ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার থেকে জাপানের অধিকারে ফিরে এসেছে, তাঁর আমলে জাপানের সংগে দক্ষিণ কোরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে তাঁকে এমন কি তাঁর স্বদলের কাছ থেকেও এই অভিযোগ শুনতে হয়েছে যে, তিনি জাপানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদানত করে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর আমলে চীনের সংগে জাপানের স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুই করা হয়নি বা করা যায়নি, এটাও সাতো সরকারের একটা বড় ব্যর্থতা।

সাতো চেয়েছিলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন যিনি তিনি আমেরিকার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফুকুদাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন।

কিন্তু লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তাদের বিদায়ী নেতার সেই ইচ্ছার প্রতি সম্মান না দেখিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-মন্ত্রী কাকুই তানাকাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছে। তানাকা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল, চীনের সংগে জাপানের সম্পর্কের উন্নতি করার জন্য তিনি উদ্যোগী হবেন' ইতিমধ্যেই তানাকা এবিষয়ে অগ্রসর হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

১৩।৭।৭২ —পুণ্ডরীক

ভবানী সেন পরলোকে

প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতা শ্রীভবানী সেন বুলগেরিয়ায় গিয়েছিলেন ডিমিট্রভের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে যোগদান করতে। ফেরার পথে মস্কোয় আসেন: এবং গত ১০ জুলাই তিনি সেখানেই মারা গেছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে।

ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, কৃষক আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম শরিক ও নেতা। দীর্ঘকাল কিষাণ সভার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে যে তেভাগা আন্দোলন, তাও হয়েছিল তাঁরই নেতৃত্বে। ১৯৭০ সালে তিনি সারা ভারত কিষাণ সভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯০৯ সালে তাঁর জন্ম হয়, অবিভক্ত বাংলার যশোরে। কিশোর বয়সেই তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। যৌবনে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন ডেটিনিউ হিসেবে। সেই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

এর জন্যে তাঁকে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। দুদুবার তিনি আত্মগোপন করে পার্টির নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রথমবার ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয়বার ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত—এই তিন বছর।

চীন-ভারত যুদ্ধের সময়, কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলে, ভবানী সেন সি পি আইয়ের রাজ্য শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। অবশ্য, তার আগেই তিনি পলিট ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে।

ভারতবর্ষে কমিউনিজমের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অন্যতম তাত্ত্বিক ও ব্যাখ্যাতা। মার্কসীয় দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করেছে। ভারতে কৃষিসংস্কার বিষয়ে শ্রীসেনের নির্দেশিত পথ, মার্কসীয় তত্ত্বনির্ভর। এই অনুন্নত দেশে তার প্রয়োগ হবে সুফলপ্রসূ।

গত ১৩ জুলাই তাঁর মরদেহ মস্কো থেকে দিল্লী হয়ে কলকাতায় আনা হয় বিমানযোগে। সংগে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এস এ ডাংগে। ১৪ জুলাই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

আমার জীবন

নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা ঃ

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন'। নবীনচন্দ্র সেন মহাকাব্যধারায় মধুসূদনের অনুবর্তী একজন কবিরূপেই সাহিত্যপাঠক ও সমালোচক মহলে পরিচিত। একথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, নবীনচন্দ্র ছিলেন একজন কুশলী গদ্যশিল্পী। নবীনচন্দ্রের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বহু আধুনিক সমালোচক তাঁর আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য ও প্রাবল্য, শিল্পচাতুর্যের অভাব ইত্যাদি ত্রুটি প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর গদ্য রচনায় এ জাতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি হ্রাস পেয়েছে মাত্রই নয়, গদ্য লিখতে নবীনচন্দ্র যখনই কলম ধরেছেন তখনই দেখি, একদিকে তিনি হয়ে উঠলেন বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ উত্তরসাধক ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য পূর্বসূরী। তাঁর 'প্রবাসের পত্র' বইটির তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রসাহিত্যেই মেলে। অথচ নবীন সমালোচকেরা অনেকেই হেম-নবীনের কাব্য-কলার ছিদ্রান্বেষণে সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করে একপ্রকার উদাসিকতায় আক্রান্ত হয়েই তাঁদের সমগ্র সাহিত্যকৃতির যথাযথ মূল্যায়ন করছি না। তাই আজও বাংলা-সাহিত্যের কয়েকজন মাত্র পাঠক, সমালোচকই ওয়াকিফহাল আছেন যে, নবীনচন্দ্র ছিলেন ঊনবিংশ শতকের একজন বিজ্ঞ; নিপুণ, রসিক গদ্যসাহিত্যিক—যাঁর সঙ্গে সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরই তুলনা হতে পারতো। নবীনচন্দ্রের অন্যতম গদ্যগ্রন্থ 'আমার জীবন' প্রসঙ্গে সমালোচক ও অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ বিশীর মন্তব্য উল্লেখ-যোগ্য,—

> নবীন সেনের সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ কাব্য নয়, পঞ্চখণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবন',......শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ একাধারে চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক। 'আমার জীবন' চিত্তাকর্ষক তাহা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের খসড়া। এইসব কারণে তাহা বাংলা সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ এবং নবীন সেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আমার ধারণা।
>
> —চিত্র চরিত্র, পৃঃ ৯৬।

যথার্থই নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' একটি চিত্তাকর্ষক, তথ্যসমৃদ্ধ, সাহিত্য গুণ-সম্পন্ন জীবনীগ্রন্থ। নবীনচন্দ্রের অন্যতম গ্রন্থ পত্রসাহিত্য 'প্রবাসের পত্র' সম্পর্কেও এ মত সমভাবে প্রযোজ্য।

নবীনচন্দ্রের সমগ্র গদ্যরচনাবলীর মধ্যে আছে 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কবি নবীন-চন্দ্রের বৃহদায়তন আত্মজীবনী পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবন.' 'প্রবাসের পত্র,' 'ভানুমতী'—গদ্যে পদ্যে লেখা উপন্যাস এবং শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয়চণ্ডীর অনুবাদের সংরচিত গদ্যে 'আভাষ' অংশটুকু। তার মধ্যে 'আমার জীবন' শ্রেষ্ঠ।

(২)

বাংলাসাহিত্যের আত্মজীবনী শাখার নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' একটি উল্লেখ-যোগ্য আত্মজীবনী। চর্যাপদের যুগ থেকেই বাংলাসাহিত্যে ভনিতা বা অন্য আকারে কবিরা আত্মপরিচয় দান করেছেন। আধুনিক যুগের সূত্রপাত থেকেই ক্ষুদ্র বৃহদায়তন আত্মজীবনচরিত রচনার অজস্র প্রয়াস লক্ষণীয়। রামমোহন, ১ দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী সেকালের বহু গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি আত্মজীবনী রচনা করে গেছেন। নবীন পরবর্তী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ সমস্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের মধ্যে নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' অনেক বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ রচনা।

নবীনচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরে লিখেছেন এই পাঁচখণ্ড 'আমার জীবন.' আনুমানিক ১৮৯৩।৯৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয়। তখন তাঁর মধ্য বয়স। ২।

আমরা অনুমান করি, রচনাকাল অন্তত রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা প্রকাশের পর। 'আমার জীবন' প্রথমভাগে 'নৌযাত্রা' অধ্যায়ে 'রবিবাবুর' 'সোনার তরী'র উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়ভাগের পাণ্ডুলিপিতে তারিখ আছে—৩রা মার্চ ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। ১৯০১ থেকে ১৯০৪এর মধ্যে রচিত হয় 'আমার জীবন' তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ। কারণ চতুর্থ ভাগ লেখা শেষ হবার পূর্বেই কবি সরকারী কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন।

> আমি আজ পেনসন লইয়া বঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্তস্থিত চট্টগ্রাম জেলার পূর্বপ্রান্তে একটি পল্লীগ্রামের শান্তিছায়ায় একটি মৃন্ময় কুটিরে বসিয়া এই ম্যালেরিয়া মাহাত্ম্য ও কলিকাতা কলঙ্ক রচনা করিতেছি।
>
> নবীনচন্দ্র রচনাবলী—৩।১৬০
> (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং)

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের কয়েকমাস পরেই পুত্রের কর্মস্থল রেঙ্গুনে যান। অতএব উপরোক্ত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দেই চতুর্থ ভাগ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। পঞ্চম ভাগের পাণ্ডুলিপির তারিখ '১৮ই আগষ্ট ১৯০৫'। 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাস' এই মহাকাব্য 'ত্রয়ী' রচনার ব্যয় হয়েছিল—'চতুর্দশ বৎসর।' গদ্যে যে মহা-কাব্যকল্প আত্মজীবনী লেখা হল তার জন্যও সময় লেগেছে দীর্ঘ বারো তের বৎসর।

'আমার জীবনের প্রকাশকাল প্রথম ভাগ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কবির জীবদ্দশায়, অবশিষ্ট ভাগগুলি তাঁর দেহাবসানের পর ৩ যথাক্রমে ১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে।

(৩)

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনী শাখায় একক উদাহরণ হয়ে আছে। গ্রন্থটি আকারে বৃহৎ ও তথ্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ; বিচিত্র মনোরম। কবির জন্ম-লগ্ন থেকে মৃত্যুর চার বৎসর পূর্বে ঘটনা-বলী এতে বর্ণিত। বিপুল প্রসর, এই 'আত্ম-

---

১। রামমোহনের আত্মজীবনী তাঁর দ্বারাই রচিত কিনা এসম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন।

২। শ্রীসজনীকান্ত [illegible] [illegible] রচনা-বলীর প্রথমভাগের ভূমিকায় এ মত প্রকাশ করেছেন।

৩। কবি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মরজগত ত্যাগ করেন।

জীবনীর পটভূমি এক সম্পূর্ণ যুগ, এক পূর্ণাঙ্গ সমাজ। বঙ্গ ইতিহাসের এক স্বর্ণ-যুগে—নবজাগরণের যুগে এর কালসীমার পরিধি বিস্তৃত। আত্মকাহিনী রচনার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে নবীনচন্দ্র সেই সৃজনশীল যুগকে, নবজাগ্রত জাতির আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের অভীপ্সাকে রূপ দিয়েছেন। তুলে ধরেছেন সে যুগের সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক অবস্থা ও ধর্মীয় আন্দোলনের ছবি। সমান আগ্রহে বর্ণিত হয়েছে সমুদ্র মেখলা, ভূ-ধর কুন্তলা চট্টলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও সমসাময়িক ইংরেজ শাসনের দোষ ত্রুটি অনাচার অক্ষমতা। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে—

> —'তৎকালীন সামাজিক দলিল হিসাবে ঐ গ্রন্থ স্মরণীয়।' ৪

স্বরূপত এটি মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। গ্রন্থটির অন্তরঙ্গ চরিত্রে ও বহিরঙ্গ রূপে কহাকা-ব্যচিত বিস্তারই এর বৈশিষ্ট্য। 'কাব্য বিতানের' ভূমিকায় প্রমথ বিশী লিখেছেন,—

> নবীনচন্দ্র যদি মধুসূদনকে অনুকরণ করিয়া কাব্য না লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া উপন্যাস লিখিতেন হয়ত তাঁহার কীর্তি সময়ের বিচারে অনেক টেকসই হইত।

'সবুজ পত্রের' জনক লিখলেন,—

> এই বইখানি সেনমহাশয়ের জীবন চরিত হলেও একখানি নভেল বিশেষ। আর সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।

প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের স্থান গ্রহণ করেছে উপন্যাস—

> The Novel is the Epic form of our modern bourgeois society —Ralph Fox

এর মতো আমরা সকলেই এই মত পোষণ করি। নবীনচন্দ্র নব্যবঙ্গের মহাকাব্য রচয়িতা। বঙ্কিম-কথিত

> 'The Mahabharata of the nineteenth century'.

তাঁর 'কাব্য ত্রয়ী' না 'আমার জীবন?' 'আমার জীবনে'ই নবীনচন্দ্র সাহিত্যরস পরিবেশন করলেন—স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতা, কেশবচন্দ্রের প্রভাব প্রতিপত্তি, লালবিহারী দে এবং কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ, ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধ, শশধরী হিন্দু ধর্মান্দোলন, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিপত্তি ও প্রভাব, জাতীয় কংগ্রেসের দলাদলি, চট্টগ্রাম চা-বাগানের মোকদ্দমার সজীব বর্ণনা পাই 'আমার জীবনে'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হেমচন্দ্র, ভূদেব শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস ইত্যাদি সে যুগের খ্যাতনামা গুণী, স্বদেশহিতৈষী বহুব্যক্তি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অনুদ্ধৃত বহু মূল্যবান তথ্যের আকর এই বিপুলায়তন জীবনী গ্রন্থটি।

(৪)

'আমার জীবন' একটি মূল্যবান সামাজিক দলিল হলেও নীরস ও তথ্যকন্টকিত জীবনী-গ্রন্থ নয়। বাস্তব জীবন ও চরিত্র যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয়ে হার্দ্য ও লেখকের পরিহাসসরস বাগভঙ্গীর গুণে অনবদ্য। এখানে 'আমার জীবন' দ্বিতীয়ভাগ থেকে নড়াইলের জমিদার গৃহশিক্ষক নিয়োগের প্রহসনটি উদ্ধৃত হল,—

> শেষে অনেক শিষ্টাচারবহির্ভূত বাগ-বিস্তারের পর একটা বেতন স্থির হইল তিনি বলিলেন, কিন্তু আমার পোলারে তিনটি কথা শিখাইতে পারিবে না। (১) আমাদের দেবদেবীগুলিন মাটি ও খড়ের পুতুল। (২) আমি মরিয়া গেলে মরা গরু ঘাস খায় না বলিয়া আমার শ্রাদ্ধ না করা। (৩) আর আমার পূর্ব পুরুষেরা বলিয়া গিয়াছে পৃথিবী তিনকুণে, তুমি গোল বলিয়া শিক্ষা দিবা না। শিক্ষক তাহাই করিলেন। শিক্ষক যদিও ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ভূগোল শিক্ষা দিতেছিলেন, কিন্তু তাহার পিতা উপরোক্ত তিন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কিরূপ সদুত্তর দিতে হইবে, তাহা তালিম দিয়া রাখিয়াছিলেন। জমিদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাহার পরীক্ষা লইতেন।
>
> প্র। কহ দিনি আমাদের দেবদেবীগুলিন কি?
>
> উ। দেবদেবীগুলিন মাটি ও খড় নহে।
>
> প্র। মরা গরু ঘাস খায় কিনা?
>
> উ। খায়।
>
> প্র। পৃথিবী কিরূপ?
>
> উ। তিনকুণে।

—নবীনচন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং) ১।২৭১

কোথাও বিহারের দেহাতের স্নিগ্ধ সজীব জীবনছবি। লেখকের রসসৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত—

> আম্রকাননে অনতিদূরে গ্রাম, গ্রামে গৃহের উপর গৃহ, তাহার উপর গৃহ। গৃহাবলী মৃন্ময়, পুরু প্রাচীরের উপর খাপড়া ও খড়।......গ্রামখানি একটি ক্ষুদ্র জগৎ। ইহাতে গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় সকলই আছে। সূত্রধর আছে, চর্মকার আছে, ধোপা, নাপিত কুমার কাচারিতে জল তুলিবার কাঁধু এবং ধাত্রী পর্যন্ত আছে। এমনকি প্রত্যেক গ্রামে এক একটি ডাকিনী পর্যন্ত আছে। কাহারও ছেলে মারা গেলে তাহারই কার্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, ও তজ্জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হয়। ন, র, ১।৩০৯

শান্তিপুরের রাস, ঘোষপাড়ার মেলা, সাহিত্য তীর্থ ফুলিয়া, হালিশহর, হরিদাসের পাট, কাঁচড়াপাড়ার ঈশ্বর গুপ্তের পৈতৃক ভিটার বর্ণনা যুগপৎ উপভোগ্য ও মূল্যবান।

ইতিহাস ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় নবীনচন্দ্রের আগ্রহ ছিল সহজাত। যখনই এসেছেন কোন ইতিহাস বা পুরাণ প্রসিদ্ধ স্থানে অত্যন্ত আন্তরিকতাভাবে জাতির যথার্থ ইতিহাসকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। বিহার, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রয়াগ তথ্যভারাক্রান্ত ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক বিবরণ মাত্রে পর্যবসিত হয়নি। কবির অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অতীত ও বর্তমানকে এক করে উদ্ঘাটন করেছে এদের সম্পূর্ণ পরিচয়টিকে।

সুতরাং পাঁচখণ্ড 'আমার জীবন' পড়া শেষ হলে উপলব্ধি করি যে, এটি ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ জীবনেতিহাস মাত্র নয়, এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রচিত হয়েছে বিস্তৃত এক যুগ, এক বিশাল মানব গোষ্ঠীর আত্মবিকাশের, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। পূর্ণাঙ্গ একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করলেই তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব। ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে তার যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের সমকালীন পাঠক,সমালোচকের কাছে গ্রন্থটি তত সমাদৃত হয়নি। এর কারণ তিনটি। প্রথমতঃ 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে'র রচয়িতা কবির অসামান্য জনপ্রিয়তার পর হয়ত গদ্যে লেখা এ গ্রন্থটি পাঠকদের পছন্দসই হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, এখানে নবীনচন্দ্রের 'প্রকট আমি'—ও তাঁর আত্মগরিমা প্রচার অনেকের কাছেই আপত্তিজনক ঠেকেছে। তৃতীয়তঃ তাঁর পরিচিত সে যুগের বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির ত্রুটি-পতনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন নির্দ্বিধায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাঁর ভক্তবৃন্দ কুপিত হয়ে অনায়াসে বিস্মৃত হয়েছেন নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টিকে। 'মূল্যবান সামাজিক দলিলটি' কাল কবলিত হোক এই হয়ত ছিল তাঁদের অভিপ্রায়।

পরবর্তীকালের বিজ্ঞ সমালোচকদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি বিস্মৃতির বল্মীক স্তূপ থেকে আবিষ্কার করেছে 'আমার জীবন'কে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতের বেদ-ব্যাসের সুরচিত যথার্থ মহাকাব্যটির সমগ্র পরিচয় এখনও অনুদ্ঘাটিত। আমরা অপেক্ষা করে থাকব সেই দিনটির জন্য যেদিন নবীন মহাকবি গবেষক সমালোচকের বিনিদ্র তপস্যার দ্বারা তাঁর প্রাপ্য সম্মান লাভ করবেন।

৪। প্রমথ বিশী: চিত্র চরিত্র ৯২

জীবনের আরেক নাম

মিহির আচার্য

আপিসে ফোন পাওয়ার পর থেকে সংবাদটা একটা মৃঢ় চেতনার মতো তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল। প্রথমে বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছিল জীবন। তা নাহলে আশার কণ্ঠস্বর অমন আর্ত, ক্লান্ত, শূন্য শোনাত না। হ্যাঁ এমন একটা পরিণতি মোটেই অনিবার্য ছিল না। সাবধানে বনের মধ্যে চলতে গেলেও সাপের ল্যাজে পা দেবার সম্ভাবনাটুকু লোপ পেয়ে যায় না।

'হ্যালো, আশা, তুমি কী এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ?'

'আমি কী ইয়ারকি করছি তোমার সঙ্গে?'

'না, মানে, ভুল তো হয়।'

'এ ব্যাপারে আমাদের অনুমানে ভুল হয় না।'

[illegible] ঠিক।'

বিশুদ্ধ নীরবতা।

'তুমি যে একেবারে চুপ করে গেলে...'

'ডাক্তার চৌধুরির কাছে যাবে? তোমার তো চেনা—'

'আমি?'

'আমার গেলে যদি চলত তাই যেতুম। দেখবেন তো তোমাকে, অাঁ?'

'আমি পারব না।'

'তাহলে? আচ্ছা বিকেলে অপেক্ষা কোরো, আমি যাচ্ছি।'

'এসো কিন্তু।'

আশা যখন মৃঢ় গলায় জানাচ্ছে তখন ঘটনাটা নির্ভুল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবল জীবন। পিতৃত্ব একটা দায়িত্বপূর্ণ অনুভূতি, আশ্চর্য জীবন 'কানো দায়িত্ব বোধ করছে না। অনিয়ন্ত্রিত মিলনের সম্প্রীতির ফলে এ জিনিস ঘটেছে। জীবন বা আশা কেউই পিতৃত্ব-মাতৃত্বের গৌরবের কথা ভাবেনি। নিছক দেহ থেকে আনন্দ কুড়িয়ে-নেয়া। আনন্দ? হ্যাঁ উত্তেজনা, স্পন্দন, সৌরভ এবং উষ্ণতা। বেঁচে-থাকার ন্যূনতম শর্ত এগুলি। 'আশা, তোমার সৃষ্টির নাম রেখো আনন্দ।' আহ্, কী ভাবছে জীবন। অন্যরকম হতে পারত, স্বীকার করতে হয় তা হয়নি। দ্বৈত শরীরের উত্তাপ থেকে নতুন একটি শরীরের জন্ম ঘোষণা। তাদের উভয়ের মনের মধ্যে এরকম কী একটা ইচ্ছের মুকুল ছিল? মনে হয় না। পিতৃত্ব-মাতৃত্ব একটা স্থির প্রত্যয়। সে প্রত্যয়ভূমি কারুরই চেতনায় ছিল না। জীবন নিজেকে বাবা কিংবা আশাকে মা ভাবতে পারেনি। দুজনেই যথেষ্ট সাবধান ছিল। দুজনের বন্ধ দেয়ালে তৃতীয় মুখের জন্যে কোনো ফাটল তারা হতে দেয়নি। দেয়নি যেহেতু স্থায়ী দায়িত্ববোধের অঙ্গীকার কারুর

ছিল না। সম্মত মিলনের শয্যায় আর কারুর জায়গা ছিল না। এখনো জীবনের দৃশ্যপটে ভিজে জবার মতো আশার প্রখর অনুভূতি ভাসছে। সেই করুণ জলজ চোখের ভাষা, সিক্ত ঠোঁট, আর ঝাউগাছের সংগতে দীর্ঘনিশ্বাস। 'তুমি অমন কোরে চেয়ো না, আমার লজ্জা করে।' 'আশা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' 'আমাকে ক্লান্ত করে দিয়ে ঠিক এই সময়ে কথাটা বোলো না। মনে হয় বানিয়ে বলছ।' 'আশা, ভালোবাস কারে কয়?' 'তোমার এই স্বার্থপরতাগুলো।' 'স্বার্থ?' 'এই আবেগ, উত্তাপের বাইরে তোমার কোনো ভালোবাসা নেই। তোমার প্রভুত্ব বাধা পেলেই তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলো।' 'প্রভুত্ব? তবে এই প্রভুত্বকে মেনে নাও কেন?' 'না মানলে একা থাকতে হয়।'

জীবন আপিস থেকে নেমে এল।

পিতৃত্বের স্বাদটাকে জীবন পুনর্বার স্মরণ করতে চেষ্টা করল। আশা কী কখনো তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছে? এবং আশা তার স্ত্রী? নাঃ কিছুই ভাবতে পারছে না জীবন। আশা তার আনন্দ, উত্তাপ, স্পন্দন। অথচ, আশ্চর্য, জীবন আশার অন্তঃসত্ত্বার কারণ। নিছক কারণ আর কিছু নয়। তাহলে ও তার কাছে কিসের দাবি করছে? পিতৃত্বের? নিছক একটা কারণকে আশা মিথ্যা একটা গৌরবে আচ্ছাদিত করতে চায়। যখন সে জানে জীবনের পিতৃত্বের কোনো বোধ নেই। আশাও কী নিজেকে মাতৃত্বের আংরাখায় জড়িয়ে রাখতে চায় তাহলে! আশা, মিথ্যা হয়ো না। আরো দীর্ঘকাল বাঁচতে হবে। জীবন অবশ্যই তাকে পিতৃত্ববোধের একটি সম্মতিপত্র লিখে দিতে পারে। কিন্তু...? যে-দায়িত্ববোধ জীবনের চেতনায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তাকে সম্মান দেয়া কী গৌরবের হবে! এটা একটা নির্দোষ অ্যাকসিডেণ্ট, নয় কী? দুর্ঘটনার ব্যাপারে কারুর কোনো হাত নেই। বসন্তের টীকা নিলে তোমার কলেরা হবে না, কেউ বলতে পারে না। তাহলে? প্রকৃত বাস্তবের সম্মুখীন হও।

তারপর বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে দেখল জীবন সর্বাংগে শাড়িটাকে জড়িয়ে কেমন কুঁজো হয়ে পার্কের গেট পেরিয়ে আশা ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এল। জীবন ঢোক গিলে ভাবল ওকে বেশ নোংরা আর দরিদ্র দেখাচ্ছে। এবং লোভীও।

আশা নিচু মুখে ওর পাশে বসল।

গির্জের মতো মৌন গাম্ভীর্য।

জীবন সিগারেটের ধোঁয়া গিলল। বেঞ্চে পিঠ ঠেসে দিয়ে পা লম্বা করে বসল।

'কিছু বলছ না যে?'

আশা বিবর্ণ হাসল।

আশ্চর্য, ওর হাসিতে এখনো কিশোরের বোকাটে মায়াটা জড়ানো। নিঃশব্দে সিগারেট টানল জীবন। তারপর সোজা হয়ে বসে চিন্তাগুলোকে কুড়িয়ে নিল।

'আমরা কী চাইছি সেটা আগে জানা দরকার।'

আশা নিরুত্তর।

'এটা ঠিক ইচ্ছে করে আমরা কেউই এই পরিস্থিতিতে আসতে চাইনি। কাজেই একটা অনিচ্ছুক বস্তু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।'

আশা খুকখুক করে কাশল। আরো গুটিয়ে বসল।

'আশা করছি তুমি এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করছ না? আমার কোনো হাত ছিল না। তোমারও। এটা একটা নির্বোধ অ্যাকসিডেণ্ট। তুমি কিছু বলছ না?'

আশা বলল : 'না।'

'বিষয়টাকে তুমি কীভাবে ভাবছ?'

'তুমি যা বলবে।'

'আমি! এখানেও কী সেই প্রভুত্বের প্রশ্ন? দ্যাখো আশা, এ ব্যাপারে তুমিও জানো আমিও জানি, আমরা কিছু করিনি, হয়েছি। তুমি কী এটা চেয়েছিলে?'

'না।'

'আমিও না। তাহলে? ব্যাপারটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলে মেনে নেয়াই ভালো। জীবনে অ্যাকসিডেণ্টে পড়লে তার হাত থেকে অব্যাহতির পথও খুঁজতে হবে। কারণ আমাদের এতদিনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অ্যাকসিডেন্টটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পরস্পরের কাছে আমাদের চাওয়া ফুরিয়ে যায়নি। আমরা আমাদের আসক্তির দাম দিতে চাই।'

'তুমি যা বলবে।'

'আমি তো এইভাবেই ব্যাপারটা দেখি। ডাক্তার চৌধুরীর কাছে যাও। তিনি নিশ্চয় আমাদের এই অনিচ্ছাকে সমর্থন করবেন।'

'আমি পারব না।'

'কেন?'

'পারা যায় না।'

'মিথ্যার মূল্য কী?'

আশা চুপ।

'তুমি তো স্বীকার করছ আমরা কেউই এটা চাইনি।'

'করছি।'

'তবে? মিথ্যাকে বহন করা কী একটা অন্যায় নয়? বেঁচে থাকার অর্থই হচ্ছে সত্য হওয়া, খাঁটি হওয়া।'

'কেন একে মিথ্যা বলছ? আমার শরীরের রক্তে-মাংসে...'

'আশা, তুমি মা হতে চাওনি।'

'না।'

'বিবাহিত জীবনকে তুমি ভয় করো।'

'করি।'

'তাহলে? একে আশ্রয় দেবে কী করে?'

'আশ্রয় দিতে না চাইলেও তো অতিথি আসতে পারে। আসে। তাকে ফেরাতে পারি না তো।'

'অতিথি দরজার কড়া-নাড়া দিয়ে আসে।'

'কড়া-নাড়া দেয়নি সেই অপরাধে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনে।'

জীবন উঠে দাঁড়িয়ে বেঞ্চের সামনে কয়েকবার পদচারণা করল। আবার একটা সিগারেট ধরাবে কীনা ভাবল। অন্যমনস্কে আশার নত মুখের দিকে চোখ রাখল। তারপর—

'সিদ্ধান্ত যখন নিজেই নিয়েছে তখন আমাকে আর ডাকা কেন?'

'তুমি কী এ-সিদ্ধান্ত পছন্দ করছ না?'

'না।'

'কেন?'

'তাহলে আমাদের এতদিনের জীবন-ধারণাটাই মিথ্যে হয়। স্বামী-স্ত্রী কী মা-বাবা হওয়া তুমি-আমি কেউই ভেবে রাখিনি। প্রথম-যৌবনের আবেগে একদা তোমাকে আমিই বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়ে-ছিলাম। তোমার মনে পড়ে?'

'হুঁ—'

'তুমি রাজি হওনি।'

'সুধাকর টাইফয়েডে মারা গেল। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম'...

'মৃত লোকের কাছে কথা-দেয়ার দাম কী? সে তো আর দাবি জানাতে আসত না।'

'ওর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আমাদের সম্পর্কটা জানত।'

'তুমি কী কথা রাখতে পেরেছ? তাহলে আমি কী করে এলাম তোমার জীবনে!'

'আমি তোমাকে সব বলেছিলাম। তুমি মেনে নিয়েছিলে। আর, তোমার এই মেনে নেয়ার জন্যে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করেছ। তোমার কাছে সহজ হয়েছি।'

জীবন আরো কয়েকবার পায়চারি করল।

'কিন্তু এরপর সুধাকরকে তুমি কোথায় রাখবে? তার মানসিক অস্তিত্বের জায়গায় যে আগন্তুক শরীরের ছায়া পড়েছে।'

'সুধাকরকে আমি কোনোদিন ওই-ভাবে কল্পনা করিনি। না, ওই বয়েসে ও বা আমি কেউই শারীরিক কৌতূহল-গুলো উলটে পালটে দেখবার তেমন আগ্রহ বোধ করিনি।'

'তার মানে তোমাদের প্রেম শুদ্ধ পবিত্র ছিল? আর, আমি, আমরা—?কী ভেবে কী চিন্তা করে তুমি আমাকে তোমার অন্তরঙ্গতার অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'একেকজনের চাওয়া একেক রকমের। প্রথম দিনই বেনারসের গঙ্গায় নৌকোর মধ্যে তুমি আমাকে অপ্রস্তুত করে চুমু খেয়েছিলে।'

'আমি কী করে জানব তুমি প্রস্তুত ছিলে না?'

'রাগ কোরো না। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছিনে। আমি সেদিনই বুঝেছিলাম তুমি

ওইরকমই। যা পেতে হবে তার জন্যে তোমার কাছে অপেক্ষার অর্থ নেই।'

'এটা তোমার প্রশংসা না অপ্রশংসা বুঝতে পারছিনে।'

'বোঝবার দরকারও নেই। সেদিন থেকে আমি তো সরে আসিনি। যখন যেমন চেয়েছ—'

'আচ্ছা? তুমি বলতে চাও সেসব মুহূর্তে তুমি নিষ্ক্রিয় ছিলে?'

'কোন্ দুঃখে? আমি তো একা থাকতে পারিনে। কেন থাকব? আমাকে বাঁচতে হবে তো।'

'আমি সুধাকরকে অতিক্রম করতে পারিনি।'

'কেন পারবে? আমার মুখ চেয়ে তুমি তো তা চাওনি। তোমার জায়গা অন্যখানে।'

'নরকে?'

'স্বর্গ নরক জানিনে: তুমি জানো আমি তোমাকে ঠকাইনি।'

'কী করে বুঝব?'

'তুমি তাহলে আর আসতে না।'

জীবন এবার একটা সিগারেট ধরাল।

'আমি এখনো বুঝতে পারছিনে......'

'কী?'

'তোমার বুড়ো বাবা-মা, ছোটো ভাই...'

'ওদের যদি বোঝাতে না পারি তাহলে একাই থাকতে হবে। তুমি তো রয়েছ, নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে যাবে না।'

'ঠিক আছে। চলো কাল বিকেলে ডাক্তারের কাছে যাই।'

একটা সুপরামর্শ পেলে মন্দ হত না, জীবন রাস্তায় চলতে চলতে ভাবনার সূত্রটাকে তুলে নিল। এখন বুঝতে পারছে বৃহৎ জীবনটা সম্পর্কে একেবারে শিশুর মতো ধারণা। মেঘে মেঘে বয়েস হল, কিছুই জানে না। আশ্চর্য, জীবনের অনেক কিছু না-জানলেও বেঁচে-থাকা চলে। জীবন নিজেকেই যেন দর্পণে ফেলে বিচার করতে বসল। এই তুমি, একটি আটত্রিশ বছরের যুবক, তুমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি, হায়ার ম্যাথামেটিকস সায়ান্স, টেকনলজি, কিছুই জানো না। তোমার এই চাকরি, একটা অভ্যেস। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও অভ্যেস। একটা ছকে-বাঁধা জীবন। সম্প্রতি এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তোমার চেতনার জগৎটাও অস্বচ্ছ। হ্যাঁ তুমি মনে মনে বিব্রত হচ্ছ। কারণ এই নতুন বিষয়টা সম্পর্কে তুমি একেবারেই আনাড়ী। অথচ—

সহকর্মী মুকুলকে ডেকে কী পরামর্শ নেবে? নাঃ, মুকুল বুঝবে না। জীবনের মনে হচ্ছে সমস্যাটা তার ব্যক্তিগত, বাইরের কেউ সমাধান করতে পারবে না। সোনা বউদি? দূরে। 'দাদা, লাইফ ইনসিওরেন্সের অফিসটা কোথায়?' 'জানিনে।' জীবন দ্রুত পা বাড়াল। একটা কলঙ্কজনক বিষয়কে বিনা দ্বিধায় সমর্থন করে বসল আশা? অবিশ্বাস নয়, সন্দেহ নয়, আপত্তি নয়। অথচ বিষয়টাকে সহজেই ঝেড়ে ফেলে দেয়া যেত। আজকাল এসব সহজ হয়ে গেছে। জীবন প্রথমাবধি ভেবে রেখেছিল আশা এই জাতীয় প্রস্তাব দেবে। এবং জীবনও মোটামুটি খরচের কথাটাও ভেবে রেখেছিল। আশার শক্ত মুখ দেখে কিছুই বলা গেল না। কী যেন অতিথির কথা বলল ও? এত মনের জোর ও কোথা থেকে পেল? মনে হল না যে এ-ব্যাপারে ও তাকে খুব বিশ্বাসভাজন মনে করেছে। যেন একটা সম্পদ পেয়ে গেছে সেটা রক্ষার দায়িত্ব তার একার। জীবনের কোনো মূল্যই নেই তার কাছে। তাহলে তাকে ডাকা কেন? ডাকার অর্থ এই নয় কী যে জীবনকে সে এই ঘটনার কারণ মনে করে? অবশ্যই কারণ সম্পর্কে জীবনের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। জীবন তা অস্বীকারও করেনি। তাহলে এবিষয়ে তারও কিছু বক্তব্য ছিল। ছিল। আহা, জীবন কী করত? জীবন নিজের উপরেই রাগ করল। তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে আশাকে নোংরা লোভী এবং মূর্খ মনে হল।

কেন? ও নোংরা কেন, লোভী কেন? শব্দগুলো মনে মনে উচ্চারণ করেও যেন অর্থ বুঝতে পারল না জীবন। নাকি তাকে ফ্যাসাদে ফেলেছে বলেই কী ও নোংরা লোভী ইত্যাদি? আহ্, জীবন, তুমি কিসের আকর্ষণে পুরনো অপরাধীর মতো একই বৃত্তে বারবার ফিরে আসো? অপরাধ! শব্দগুলোতে চমকালো জীবন। সংসারের নিত্য প্রবাহিত স্রোত-রেখা থেকে তুমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কৃত্রিম একটি জলাশয় বানিয়ে তুলেছ। একান্ত গোপন, ভীরু। বাস্তবের সূর্যালোকে তুমি অস্থির দুর্বল। না না, জীবন চীৎকার করে প্রতিবাদ করতে চাইল। অন্ধকারের পোকা! না-না। মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ। না-না, একটা ঠুনকো বেগোয়ারি জীবন। দর্শন আওড়াবার চেষ্টা কোরো না জীবন। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় দৈবাৎ পুরুষজন্ম পেয়েছ ছাড়া তোমার আর কোনো অহংকার নেই। কী বলছ? আশা তোমাকে সহ্য করেছে কেন? ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ, আশা তোমার চরিত্রের সীমা ধরে ফেলেছে, তোমাকে বুঝতে আর ওর এতটুকুও কষ্ট হয় না। আশা হেঁয়ালি নিয়ে তো বাঁচতে পারে না! তোমার ওঠাবসা প্রতিটি আচরণ মুখস্ত আশার কাছে। অস্পষ্টতার সঙ্গে মেয়েরা বসবাস করতে পারে না। আশা তোমার কাছে আশ্বস্ত। ভয়াবহ বাইরের পৃথিবীর রোদ-বৃষ্টির থেকে তুমি তার আচ্ছাদন।

জীবন মুখ বিকৃতি করে নিজেকেই ভ্যাংচাতে চাইল।

ডাক্তার চৌধুরি ভারি পরদার আড়ালে আশার শারীরিক অবস্থাটা সরেজমিনে তদন্ত করতে নিযুক্ত থাকলে জীবন পাথর হয়ে বসে রইল। এসব ব্যাপারে কতক্ষণ সময় লাগে ধারণা নেই জীবনের। ডাক্তারকে বিধাতাপুরুষের মতো নির্দয় মনে হল।

জীবনের অবসন্ন চোখের ওপর পরদাটা নড়ে উঠল। প্রথমে ডাক্তার কিছু পরে আশা। বাতির আলোকে ওকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

ডাক্তার চৌধুরি টেবিলে বসে খসখস করে কী লিখলেন। তারপর কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন : 'যদিও আমার এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তবু যখন জোর করে বলছেন আপনারা যথেষ্ট সাবধান ছিলেন, তখন এই ট্যাবলেটটা খান। প্রেগন্যান্সি না হলে ব্যাপারটা ঈজি হয়ে যাবে।'

'না হলে?' বোকার মতো প্রশ্ন রাখল জীবন।

'ইট্স এ সেটেল্ড ফ্যাক্ট...' ডাক্তার বিধাতাপুরুষের মতো হাসলেন।

'কিন্তু আমি—আমরা যথেষ্ট সাবধান ছিলাম?'

ডাক্তার চৌধুরী বললেন ঃ 'প্রথমবারে সব দম্পতিই এরকম একটা ব্যাপারে অকারণ আপসেট হয়ে পড়েন। অবশ্যই মাতৃত্ব-পিতৃত্ব বোধটা অচেতন ভাবেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। সজ্ঞানে কেউই মা-বাবা হয় না।'

জীবন শক্ত হয়ে বলল ঃ 'আপনাকে আগেই বলা উচিত ছিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী নই।'

ডাক্তার বললেন ঃ 'সেটা বোঝবার বয়েস কী আমার হয়নি ভেবেছেন?'

'তবে?'

'বিয়ে করে ফেলুন।'

'আর ইউ সিরিয়াস ডক্টর? এই ঘটনাটুকুই বিয়ে করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ?'

'কেন? আপনি ম্যারেড লাইফ চান না?'

'আমি এখনো সেসব ভাবিনি।'

'এখন ভাবুন। না-কি কোনো বাস্তব অসুবিধে রয়েছে?'

'না, আমি বিবাহিত নই।'

'তাহলে ভাবনার কী আছে? আপনি একজন হেলদি ইয়ংম্যান। শারীরিক মানসিক যথেষ্ট সাউন্ড। না?'

জীবন বলল ঃ 'আমি এর জন্যে প্রস্তুত নই।'

'ইন্টারেস্টিং। আপনি কী চান তাহলে?'

'আমি জানিনে।'

আশার দিকে ফিরে চিন্তিত ডাক্তার বললেন ঃ 'মাই ইয়ং লেডি এ-ব্যাপারে তোমার কী মত?'

সলজ্জ আশা নিচু গলায় বলল ঃ দেখুন, ওকে আমি কোনোদিনও স্বামী হিসেবে ভাবতে চাইনি। আজও...'

'বাহ, তাহলে তোমাদের সম্পর্কটা কী?'

'ও আমার ফিয়াসে'।'

ডাক্তার হাসলেন। 'তোমরা বড্ড আগে-আগে জন্মে গেছ।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

ডাক্তার চৌধুরী পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ 'তোমাদের ফিলসফি অব লাইফ সমর্থন না করি স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। আমি কেবল আগন্তুক শিশুটির জন্যে উদ্বিগ্ন। তোমাদের দর্শন ওর পক্ষে গ্রহনীয় নাও হতে পারে।'

'আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

'সমাজের চোখে তার এই অবৈধ অস্তিত্ব আকাংক্ষিত হবে না।'

'সমাজ!' নিজেকে বিদ্রোহী ঘোষণা করতে চাইল জীবন।

ডাক্তার বললেন ঃ 'সমাজে থেকে সামাজিক সব সুবিধেগুলো নেবো আর তাকে অস্বীকার করব তা হয় না। জীবন ধারণের জন্যে এই সমাজ আপনাকে চাকরি দিয়েছে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে, কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে সব রকমের স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনি এর কোনোটাই অস্বীকার করেননি, তাহলে ম্যারেজ ইনস্টিটিউসনকে কেবল সুবিধে মতো অস্বীকার করতে পারেন না।'

রাস্তায় আগে আগে চলছিল আশা।

জীবন অনেক পিছনে। একটু জোরে পা চালালেই ওর নাগাল পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনের সামর্থ্য অফুরান নয়। সিগারেট হাতে নিয়ে ও দেশলাই খুঁজল। একটার পর একটা কাঠি নিবে যেতে লাগল। 'দাদা, এই রাস্তাটা কোথায় গেছে?' 'ট্রাফিক পুলিশকে জিগ্যেস করুন।' জীবন অনেক কষ্টে সিগারেট ধরাল। ঘরে-ফেরার পথটুকু কী আলোচনা করতে-করতে যাওয়া যেত না? দশ হাত দূরে দূরে আশার যাবার দরকার কী? জীবন কখনোই মনে করে না সে একা-একা মস্ত বীর পুরুষ। তবে কী জীবন ভয় পাচ্ছে? ভয়! না, তা নয়। কথাটা হচ্ছে ঃ 'জীবন হাই তুলল ঃ সমস্যাটা দুজনের। অথবা তিনজনের।...জবাব কী দেয়া যেত না? জীবন ডাক্তারের পিতামহ-সুলভ হাসিমুখ স্মরণ করল। অযাচিত সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা! এই আমি, জীবন, নিজের দায়িত্বে পৃথিবীতে আসিনি। কে চেয়েছিল সমাজ-নামক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হতে জন্মলাভ করতে! সাধ্য থাকলে আমি বাধা দিতাম। পিতামহ-ডাক্তার বলুন, আমি কী মনুষ্য-জন্মের জন্যে দায়ী? যেন মুখের মতো জবাব হল মনে করে বুদ্ধিমানের হাসি হাসল জীবন। আমার জন্মগ্রহণ ব্যাপারটা যখন ঘটে গেছে তখন আমার খাওয়া-থাকা সমূহ নিরাপত্তার ভার সমাজের। আমার বার্থ-রাইট। হাসতে গিয়ে খুক-খুক করে কাশল জীবন। তাই বলে আমার বিবেক, আমার চৈতন্য, আমার স্বাধীনতাস্পৃহা...? জীবন 'বাপরে' বলে লাফিয়ে ফুটপাথে না উঠলে লরীটা তাকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যেত। সোআইন, ইংরাজিতে গালি দিল জীবন ঃ সান্-অব-এ-বিচ্। আমার এই জীবনটার জন্যে কখনোই আমি সমাজের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাব না! নেহাত মাতা-পিতা সূত্রে প্রাপ্ত। সামাজিক আজ্ঞা এবং নিষেধগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দেবার অর্থ নেই

'এটা কী হল?' আশার খাটে ধপ করে বসে পড়ে জানতে চাইল জীবন।

'বোসো। চা করি।' বাথরুমের দরজা বন্ধ করবার শব্দ। ঝরঝর জল-পড়ার শব্দ।

জীবন শয্যাশায়ী হল। বালিশে গন্ধ, আলনার জামা-কাপড়ের গন্ধ। একটা গন্ধময় চেতনো যেন এইমাত্র অবগাহন করল জীবন। গন্ধটা রোজকার। আশ্চর্য, এমন অন্তরঙ্গ স্থির শিখার মতো এর আগ যেন তাকে আকর্ষণ করেনি। এটা যেন মাতাকার একটা ঘর-নামক আশ্রয় হয়ে উঠেছে। আলনায় ওই ফিরোজ রঙের জামাটা গতকাল পরেছিল আশা. তার ওই শাদা শিফনের শাড়িটা। ওকে রাজহাঁসের মতো দেখাচ্ছিল। গর্বিত, সম্রাজ্ঞীর মতো। জীবনের করতলে ওর মুখের ডৌল, কাঁপা পাঁপড়ি, চোখের নক্ষত্রের ঝিকিমিক, স্ফুরিত রসালো অধর...। আহ্ কী ভাবছে জীবন, সে কী পাগল হয়ে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল আশা. চুয়ে ভিজে জলের রেখা, তেলতেলে মুখ গলার নীচে জামাটা ভেজা, কোনোরকমে কোমরে জড়িয়ে-রাখা তাঁতের শাড়িটা। আয়নার দাঁড়িয়ে পিঠের ওপর চুলের রাশ উলঙ্গ করে দিল আশা। দাঁতে ঠোঁট চেপে লম্বা লম্বা চিরুনি টানছে।

'চা নিয়ে আসি। চা খেয়ে চান করে নাও। অনেক বেলা হয়েছে। বাড়ি গিয়ে কাজ নেই।'

জীবন শয্যায় নির্জীব হয়ে পড়ে পুনর্বার তার চোখের সামনে দেখল ঘরটা আশার ভিজে গন্ধে ভরে উঠেছে শূন্যে কুয়োয় ঢিল ছুঁড়ে দেয়ার [illegible] শব্দ-তরঙ্গটা কেঁপে-কেঁপে তার সমগ্র সত্তার রিম রিম করে উঠল। জীবনের মনে হল তার গোটা অস্তিত্বটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

'নাও হে চা খাও।'

আশার গলার কাছে জামাটা ভিজে। কানের পাশে সাবানের গুঁড়ো। হলুদ-শাড়ির গন্ধ। এবং 'নাও হে চা খাও', ওর কন্ঠস্বরটা এমন লজ্জা-দুঃখগৌরব আনন্দের মতো বাজল কেন।

জীবন ওর মণিবন্ধ খামচে ধরল।

'এই—'

আশা ওর কাঁধে হাত রাখল। 'কাজের সময় কী আটকে রাখা চলে? আগে রান্নাটা শেষ করে ফেলি। তারপর তোমার কথা শুনব।'

জীবন ফিসফিস করে বলল ঃ 'তোমাকে একদণ্ড ছাড়তে পারছিনে।'

আশা গ্রীবা পাকিয়ে বলল ঃ 'তা আর পারবে কেন? তাহলে যে তোমার অস্তিত্বের অহংকার খর্ব হয়?'

জীবন বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ডাইনী শিকার—জুরীর বিচার

ভিনসেণ্ট হারটনেট-কে প্রতিবাদী করা হল কিন্তু সেই সঙ্গে লরেন্স এ জনসনকেও জড়ানো হল। হারটনেট 'এ্যাওয়ার' পত্রিকা মারফৎ অভিযোগ করতেন এবং জনসন সেটি কার্যকরী করতেন উদ্যোক্তা, বিজ্ঞাপনদাতা ইত্যাদি যারা বেতার-শিল্প পরিচালনা করেন তাঁদের কাছে অর্থনৈতিক একঘরে করার ভীতি প্রদর্শন করে—সন্দেহভাজনদের ভাতে মারার ব্যবস্থা করতেন। জনসন পাকা চুল সত্তর বছরের বৃদ্ধ। তাঁর ধারণা কম্যুনিস্টরা বেতার-শিল্পকে গ্রাস করছে। রেডিও ও টি-ভি তাদের কুক্ষীগত। বেতার জগতে জনসনের নামকরণ করা হয়েছিল 'সিরাকুজের মুদী'। সিরাকুজে তিনি ছ'টি সুপারমারকেটের মালিক। যে কোনো পণ্যসামগ্রীকে চল বা অচল করতে তিনি একাই যথেষ্ট। নিজের প্রভাব বাড়ানোর জন্য জনসন ভেটারনস এ্যাকসন কমিটি অব সিরাকুজ সুপার মার্কেটস ও এ্যান্টি সাবভারসিভ কমিটিরও একজন কর্মকর্তা। 'এ্যাওয়ার' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসন বিভিন্ন বেতার ব্যবসায়ী কোম্পানী ও বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানীকে 'পয়েজন-পেন-লেটার' বা বিষাক্ত কলমের চিঠি পাঠাতেন—লোকটিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য। এমন কি নিজেই অনেক কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। ফালককে তাঁর উকীল জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই দুজনের মধ্যে তাঁর দুর্দশার জন্য কে বেশী দায়ী। তার উত্তরে ফালক বলেছিলেন—কেউটে ও গোখরো দুয়ের মধ্যে কে বেশী ক্ষতিকর এ নিয়ে ত' তর্ক চলে না।'

লুইস নাইজার ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মামলা দায়ের করলেন। তখনও ডব্লু সি বি এস—রেডিওতে ফালক কাজ করছেন, আর সব কাজ খতম হয়েছে। এটা আছে চার্লস কলিন গাউডের অনুগ্রহে তিনি ন্যুইয়র্ক এ এফ টি আর এ-এর প্রেসিডেণ্ট।

আমেরিকার আইনবিধি অনুসারে বিবাদী-প্রতিবাদী একে অপরের অভিযোগের সত্যাসত্য বির্ণিনয় করতে পারতেন এবং বিবাদের বাহুল্য অংশ বর্জন করে সারাংশটুকু গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রাথমিক আইনের লড়াই চলল দু' বছর ধরে এই দু'বছরের মধ্যে কলিং গাউড তাঁর প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বঞ্চিত হলেন, 'সি বি এস' থেকে মরোকে সরানো হল 'এ্যাওয়ার' পত্রের বিরামবিহীন আক্রমণের ফলে। এর ফলে ফালক তাঁর শেষ কাজটুকুও খোয়ালেন।

ইতিমধ্যে ফালক কিছু কিছু কাজের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তখন তা গ্রহণ করেন নি, এখন সেইসব জায়গায় চেষ্টা করে দেখলেন একের পর এক দরজা বন্ধ। সবাই 'এ্যাওয়ার' এবং জনসনের ভয়ে আতঙ্কিত। ফালক বিবাহিত। স্ত্রী এবং চারটি সন্তান নিয়ে তাঁর সংসার, এখন সামনে অন্ধকার, একদম কর্মহীন। কেউ নেবে না! দু-এক জায়গায় কাজ পেয়েছেন, সব ঠিক, চুক্তিপত্র সই হবে এমন সময় সব বাতিল হয়ে গেল অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে।

প্রাক-বিচারকালীন বৈঠক চলতে লাগল। শপথ নিয়ে প্রতিবাদীদের প্রশ্ন করার অধিকার বিবাদীর আছে। আসল বিচার শুরু হওয়ার পূর্বে সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পর্কে উভয়পক্ষের সুযোগ লাভ হয়। এই সূত্রে লুইস নাইজার সুযোগ পেলেন ভিনসেণ্ট হারটনেটকে দেখার। তিনি লিখছেন—

'অমন দুর্ধর্ষ মানুষটা কিন্তু দেখতে অতি ভীরু, দুর্বল, অথচ এই মানুষ অসংখ্য মানুষের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করেছে। লোকটি শীর্ণ, ভীতচকিত দৃষ্টি, বছর চল্লিশ বয়স—ওজন ১৩০ পাউণ্ডের বেশী নয়। লোকটার চোখ দেখে মনে হয় সে ভীতিগ্রস্ত।'

নাইজার জেরা করতে লাগলেন, বেতার শিল্পীদের রাজনৈতিক রেকর্ডাদি তিনি কিভাবে সংগ্রহ করেছেন তার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন। মাঝে মাঝে তিক্ততার সৃষ্টি হত। তারপর একদিন এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার উদ্ভব হল। 'এ্যাওয়ার বুলেটিনে' অভিযোগ করা হয়েছিল জ্যাক ফালক 'ক্লাব ৬৫'-এ একদিন অভিনয় করেছিলেন। 'ক্লাব ৬৫' একটি কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান। ফালক প্রকৃতপক্ষে এরকম কোনো অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা হার্টনেট ভালো করে পরীক্ষা করেন নি, 'জ্যাক' নামটি যে একজন নিগ্রো অভিনেতার তা তিনি জানতেন না। ঘটনাচক্রে এইদিনকার অভিনয় ছিল সম্পূর্ণভাবে 'নিগ্রোদের অভিনয়'। পরে আরো জানা গেল এটা একটা কম্যুনিস্ট-বিরোধী অভিনয় এবং 'ক্লাব-৬৫' আদৌ কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান নয়।

এই সর্বপ্রথম হার্টনেট স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তাঁর ভুল হতে পারে। তাঁর এই জবাবে একটা নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। তাঁকে বলা হল এমন হতে পারে অনেকে ঠিক জেনেশুনে না হলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন যা পরে কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান বলে জানা গেছে। তাদেরও তিনি সর্বনাশ করেছেন। এর জবাবে তিনি বললেন—হতে পারে। আমি হয়ত একটু বেশী কঠোর হয়েছিলাম।

এই সূত্রে একবার হার্টনেট স্বীকার করলেন আমাকে একবার এক ঝুড়ি মিথ্যা তথ্য বিক্রি করা হয়।

মজা হল তিনি নিজে তদন্তকারী ও গবেষক, আজ তিনিই ত্রুটি স্বীকার করছেন। লোকটি এমনই অজ্ঞাতসারে কথাগুলি বলেছিলেন যে তাঁর কথার ওপর আক্রমণ চালালে তিনি তখনই সতর্ক হয়ে পড়তেন। জেরা চলছিল। হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'আজ যদি টেলিভিসনে ফালক কোনো কাজ পায় তাহলে আপনি কি তা সমর্থন করবেন?' হারটনেট বলে ফেললেন—'হ্যাঁ।'

তৎক্ষণাৎ মামলা মুলতুবী করা হল। হারটনেটের এটর্ণি এবং ফালকের তরফে নাইজার দুজনে একত্রে লাঞ্চ খেতে গেলেন মামলার অবস্থা বিবেচনা করাটাই ছিল উদ্দেশ্য। ফালকের চাকরীপ্রাপ্তিতে আপত্তি নেই। আরো দুটি বিষয় নিয়ে মীমাংসা করার ছিল, (এক) সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার ও মার্জনা প্রার্থনা, (দুই) ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা। ওদের পক্ষের এটর্ণি বললেন—জনসন কিছু দেবেন না, এদের টাকা কম—কোনো রকমে দশ হাজার ডলার পর্যন্ত খেসারত তোলা যাবে।

নাইজার ফালককে বললেন—জ্যাক তোমার সব অক্ষত রইল। এবার তুমি অনেক টাকা

পাবে। ধার শোধ হবে। আমায় ফি-র জন্য তুমি ভেবো না।'

ফালক বলল—দেখুন মামলা যদি আদালতের বাইরে মিটিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ওদের ডাইনী শিকার প্রবৃত্তির অবসান হবে না। আদালতে ওদের মুখোশ খোলা না হলে 'এ্যাওয়ার' আর জনসনকে ঠান্ডা করা যাবে না। আমার যা দুর্দশার জন্য দুঃখ করব না ওদের যদি সায়েস্তা করা যায়।

নাইজার বলেছেন—ফালকের সিদ্ধান্তই যে সঠিক তা আমরা মেনে নিলাম।

এর পরবর্তী অধ্যায় নাটকীয়। হারটনেট বললেন—নাইজার আমার মগজ ধোলাই করেছেন্। হারটনেট পক্ষের উকীল পরিবর্তিত হল। তাঁরা তাঁকে উপদেশ দিলেন প্রাক-বিচারকালীন জেরায় কোনো কিছু কবুল না করতে। এমনকি আদালত বাধ্য না করলে হারটনেট কোনো অধিবেশনে আসেন না। প্রতিপদে বাধা। জনসন সম্পর্কেও ঐ এক হাল। ফলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এমনকি বছরও কেটে গেল। ইতিমধ্যে ফালক একেবারে পথের ভিখারী হলেন। কোনো-রকম কাজ পাওয়া গেল না। চাকরী দিয়েও তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হত জনসন হারটনেটের হুঁশিয়ারী আর হুমকির ভয়ে। এদিকে মামলা শম্বুকগতিতে চলতে থাকে।

মামলা রুজু হওয়ার সাত বছর পর অবশেষে ন্যুইয়র্কের আদালতে হাজির হওয়ার সময় পেলেন ফালক। মানহানির এই মামলা প্রতিবাদীর সমর্থন করলেন টমাস এ বোলার আর তাঁর সহযোগী হলেন জন এফ ক্ল্যাং—প্রাক্তন এফ বি আই। জুরিদের কাছে বসলেন নাইজার, তার পাশে তাঁর সহযোগী পল মার্টিনসন আর সঙ্গে রইলেন আমাদের নথীপত্রের তদারককারী জর্জ বার্কার। হারটনেটের ঠিক বিপরীত দিকে বসলেন ফালক।

জুরি নির্বাচন করতেই পুরো দেড়টি দিন লেগে গেল। দুপক্ষের উকীলরা উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। তারপর সাক্ষ্য গ্রহণের পালা। নাইজার আহ্বান জানালেন—'মিঃ জন হেনরী ফালক আপনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসুন।'

ফালক এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠলেন। তাঁর ডানদিকে জজ আব্রাহাম এন গেলার বাঁদিকে জুরীবৃন্দ, সামনে জনাকীর্ণ আদালত কক্ষ। সব দৃষ্টি ফালকের মুখের ওপর।

নাইজার প্রশ্ন করলেন ফালকের প্রথম দিকের জীবনের কথা, তাঁর শিক্ষা, সামরিক বৃত্তি এবং রাজনৈতিক মতামত প্রসঙ্গে। তারপর এল ব্রডকাস্টিং ও টেলিভিসন জগতে তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ইতিহাস, তিনি সংপ্রচারতার হয়ে উঠছেন এমন সময় এই 'এ্যাওয়ার বুলেটিনে'র আক্রমণ।

জুরীদের সামনে অজস্র সাক্ষ্যপ্রমাণ জমতে লাগল। পাহাড়প্রমাণ এইসব কাগজ-পত্র যেন হারটনেটকে আড়াল করে একটা প্রাচীর রচনা করল। এর পর টিভি প্রডিউসার সর্মাসনভকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হল। সর্সাকিনড জানালেন যে রাজ-নৈতিক সন্দেহের বশে অন্তত ৫০০০ হাজার জনের নাম প্রতি বছর খারিজ করতে হয়। এদের খারিজ করার সময় হয় বলা হত—প্রয়োজনীয় মাপের নয়, লম্বায় একটু কম, কিংবা কেউ বেশী লম্বা—বা ঐ জাতীয় কোনো কিছু, তাদের জানতে দেওয়া হত না যে পিছনে রাজনৈতিক কারণ আছে। সর্সাকিনড সাক্ষ্য হিসাবে বললেন একটি ছোট্ট অভিনেতাকে কেন খারিজ করা হয় এবং কিভাবে,

'We required the services of a seven or eight-year-old-child actress. It was a back breaking assignment to find a child, who could act well enough, we finally found a child, eight-year old female. The child's name came back unacceptable, politically unreliable'.

এই কথায় আদালতে হাসির ঢেউ উঠল। জজ গেলার তৎক্ষণাৎ সবাইকে চুপ করিয়ে দিলেন। সর্সাকিনড জানালেন মেয়েটার বাবা 'ব্ল্যাকলিসটেড' হয়েছিল সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে। তাই তার মেয়েও সন্দেহভাজন। একটি অন্য মেয়ে নিতে সর্সাকিনড বাধ্য হন।

১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের কোনো কোনো সভা, সমিতিতে ফালক যোগ দিয়েছিলেন তার কোনোটি কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান কিনা এসব নিয়ে কথা উঠল। ফালক সে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন তাতে সমস্ত অভিযোগ খণ্ডিত হল।

এ পর্যন্ত লরেন্স জনসন আদালতে আসেন নি একদিনও। তিনি আবেদন করেছিলেন অসুস্থতার দোহাই দিয়ে। ফালকের মামলায় জনসনের যোগাযোগ প্রমাণের জন্য যে সাক্ষ্যটুকুর প্রয়োজন ছিল তা পাওয়া গেল টমাস মরের সাক্ষ্য থেকে। তিনি একটি এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সীর কাজ করতেন ও ফালকের ব্যাপারে তিনি যখন একটি কাজের চুক্তি স্থির করছিলেন তখন জনসন ফোন করে সতর্ক করে দেন, এবং আমেরিক্যান লিজিয়নকে দিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন। জজ এই সাক্ষ্য থেকে জনসনের যোগাযোগ মেনে জুরিদেরও তা মেনে নিতে উপদেশ দিলেন।

হারটনেটকে অজস্র প্রশ্ন করে পেড়ে ফেলা হল। শেষকালে তাঁর নিজের মুখের উক্তি 'আমাকে এক কুড়ি মিথ্যা তথ্য বিক্রী করা হয়।'

এরপর আরো নাটকীয় কাণ্ড ঘটে আদালতকক্ষে। দেখা গেল হারটনেট পকেট থেকে একটা গোলাপী কাগজ বের করে কি সব নোট করছেন। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল উকীলকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এই নোট। পরে বোঝা গেল আদালতে যাঁরা প্রবেশ করছেন তাঁদের বৃত্তান্ত। তখন নাইজার প্রশ্ন করলেন, আপনি কি যাঁরা আদালতে আসছেন তাঁদের কারো কারো নাম টুকে রাখছেন।

হারটনেট জবাব দিলেন—হ্যাঁ। নাইজার তখন জুরীদের দিকে চাইলেন। এরপর হারটনেটের উকীল এই প্রসঙ্গ তুললেন—এবং কে কার পাশে বসেছিলেন তা বলে গেলেন। নাইজারের মনে হল কে কার পাশে বসেছেন এই বুঝে এ্যাওয়ার পত্রিকায় কোনো এক ভবিষ্যৎ সংখ্যায় তাঁদের সর্বনাশ করা হবে।

নাইজার পরে যখন হারটনেটকে আর একবার প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন তখন বললেন—আপনি মিসেস ফালক কোনজন বলতে পারেন?

হারটনেট জবাবে বললেন—হ্যাঁ, ঐ যে—

নাইজার তৎক্ষণাৎ সেই মহিলাকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম বলতে বললেন, আর সেই মহিলা জানালেন তাঁর নাম সোফার। তিনি মিসেস ফালক নন।

আদালতে হাসির রোল উঠল। নাইজার তৎক্ষণাৎ বললেন—এই আপনার মানুষ চেনার পদ্ধতি? হারটনেট যে বেঠিক দায়িত্বহীন এবং অপরিণামদর্শী তা প্রকাশিত হল স্পষ্টভাবে।

উভয়পক্ষের উকীল সওয়াল করলেন। নাইজার যখন জনসনের কথা বলছেন এমন সময় সংবাদ এল জনসনকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়েছে একটা 'মোটেলে'। জজের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পরামর্শ করা হল। তিনি উপদেশ দিলেন জনসনের মৃত্যু উল্লেখ না করে যা বক্তব্য তা যেন বলা হয়। জজ অভিমত দিলেন যে জনসনের মৃত্যু হলেও তার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ চালু থাকবে। পরে জুরিদের সব কথা জানিয়ে বিকাল ৫-৩৫ মিঃ হতে জজ গেলার বললেন—

'You may now retire and deliberate—'

বারোজন পুরুষ ও নারী জুরির একটি আলাদা ঘরে বসে ভাগ্য নির্ণয় করছেন। মাঝে মাঝে দু একটা কথা জানার জন্য জুররদের কাছ থেকে লোক এসেছে কিন্তু কোনো সংবাদ নেই। শেষে রাত ১১-৪০ মিঃ আবার আদালত বসল—জুরীরা ফালকের স্বপক্ষে অভিমত দিয়েছেন—

১১—১ ভোটে জুরীরা স্থির করেছেন এ্যাওয়ার, জনসন এবং হারটনেট ফালককে খেসারত দিতে হবে। তাঁদের রায় ফালকের স্বপক্ষে। তাঁরা হারটনেট ও জনসনদের তরফে ১,০০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ

ছাড়াও পিউনিটিভ ড্যামেজ হিসাবে এ্যাওয়ারের তরফে ১,২৫০,০০০ এবং ১,২৫০,০০০ হারটনেটের তরফে দিতে হবে এই নির্দেশ দিলেন।

আদালত স্তব্ধ। নাইজার বলেছেন, আমরাও এতটা আশা করিনি। বোলান প্রতিবাদীদের তরফ থেকে আবেদন জানিয়েছিলেন এই রায়টা নাকচ করা হোক। জজ গেলার জুরিদের অভিমত সমর্থন করে বলেন—

> It seems to the Court, that it was the Jury's purpose that this large award, even if it were not collectible, should stand as a warning to others against indulging in similar conduct.'

চরিত্র-হননের প্রচেষ্টা বিফল হল এবং শক্তিশালী ডাইনী-শিকারী চক্রের হাত থেকে একজন শেষ পর্যন্ত ত্রাণ পেলেন। জুরীর বিচার বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রইল।

নাইজারের এই সুবৃহৎ গ্রন্থ একালের এক জলন্ত ডকুমেন্ট।

অভয়ংকর

THE JURY. RETURNS : By LOUIS NIZER : Published by Doubleday Publishers. 105, Bond Street, Toronto, Ontario, CANADA ; Price : $ 7·95 cents.

সাহিত্যের খবর

পরলোকে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যিক সাংবাদিক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ জুন বাহান্ন বছর বয়সে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মারা গেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবন কবিতা দিয়ে শুরু হলেও, পরে গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। শান্তিরঞ্জনের লেখনভঙ্গী এবং রচনা কুশলতা ছিল স্বতন্ত্রধর্মী। জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ছিল বাস্তবাশ্রিত। 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' তাঁর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ। গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল : জীবন-যৌবন, রাম ও রহিম, শুভরাত্রি, অমিত্রাক্ষর মুখোমুখি, এসো নীপবনে, মিত্রাগিনী, প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি, সন্ধ্যা-সকাল, নিকষিতপ্রেম, সুসমাচার, তিমিরাভিসার, নতুন নায়িকা, রাত্রির আকাশসূর্য। অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে আছে : জন্তুজনোলা, খ্রিস্তমাসু, রাজসূয়, করুণা করো না সেতুবন্ধ, গোধূলির গান, আশ্চর্য রাত। কবিতা গ্রন্থের নাম চন্দ্রসূর্য।

বাংলাদেশের বগুড়ায় ১৯২০ খৃঃ শান্তিরঞ্জনের জন্ম। শিক্ষা জীবনের শেষে কিছুকাল সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। সাংবাদিক জীবনের প্রারম্ভে সওগাত, স্বরাজ, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা এবং সত্যযুগের সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৫৪ খৃঃ আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই কাগজেই সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

শহীদুল্লাহ স্মরণ সভা : পরলোকগত মনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ৮৬-তম জন্মদিবস গেছে গত ১০ জুলাই। জ্ঞানতাপস শহীদুল্লাহ ছিলেন মহাপণ্ডিত। ভাষা-বিজ্ঞানী শহীদুল্লাহ ইংরাজি, ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত পালি, প্রাকৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, বৈদিক, আবেস্তান, তিব্বতী, হিন্দী, সিংহলী, মৈথিলী, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সারা জীবন অধ্যাপনা, অধ্যয়ন এবং লেখার মধ্যেই কাটিয়ে গেছেন। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ, গবেষণাগ্রন্থ, রসরচনা, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মণীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

এই বিশিষ্ট মণীষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়নি দুপার বাংলার কোথাও। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় যা সামান্য আলোচনা বেরিয়েছে মাত্র। ডক্টর শহীদুল্লাহের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে গত বুধবার ১২ জুলাই ঢাকার ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে একটি সভার আয়োজন করা হোয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হল ছাত্র-সংসদ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডক্টর এনামুল হক, ডক্টর মযহারুল ইসলাম, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ও ডক্টর মনিরুজ্জমান। ডক্টর মনিরুজ্জমান বলেন যে ডঃ শহীদুল্লাহের বিপুল অপ্রকাশিত রচনা বাংলা আকাদেমির প্রকাশের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সভাপতিত্ব করেন ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম। অন্যান্য আলোচক ছিলেন কবি আবদুল কাদির, অধ্যাপক ইদ্রিস আলী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

অসমীয়া সাহিত্যিকের লোকান্তর : প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দ ভারতী গত ৭ জুলাই জোড়হাটে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হোয়েছিল ৮৯ বছর।

সংস্কৃত ভাষাবিদ সম্মেলন : ইউনেস্কোর সহায়তায় এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক ভারতীয় ও বিদেশী পন্ডিতদের উপস্থিতিতে ২৬ মার্চ থেকে সপ্তাহকালব্যাপী সংস্কৃত ভাষাবিদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশী-বিদেশী সংস্কৃত ভাষা বিশেষজ্ঞরা বহু প্রবন্ধ পাঠ করেন। নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান-ভবনে প্রদর্শিত 'জার্মানীতে ভারততত্ত্ব' প্রদর্শনীটি যোগদানকারী প্রতিনিধিদের, অতীতের জার্মানী ভারততত্ত্বের চর্চা থেকে কি অর্জন করতে পেরেছে এবং বর্তমানে তাদের গবেষণার ক্ষেত্র কি সে সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়া হয়।

এই সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধগুলির মধ্যে তুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পল থিমে রচিত 'ভাষাতত্ত্বে পাণিণির অবদান' শীর্ষক লেখাটি উপস্থিত সুধীবৃন্দের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া তিনি আরকিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য সাহিত্যিক সাক্ষ্য প্রমাণ ও ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ দ্বারা বৈদিক দেবতাদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেন। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জবুলু রাও 'মৃৎপাত্র নির্মাণ' বিষয়ে বৈদিক রচনা সম্পর্কে একটি লেখা দেন। কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কে এল জানের্ৎ প্রাচীনতম ভারতীয় পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষে প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় প্রভাব,' গোটেনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এইচ বেসার্ট 'মধ্য এশিয়ায় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি' এবং হাইডেলবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি ডঃ জি সোথাইমার 'ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নে জার্মান অবদান' সম্পর্কে রচনা পাঠ করেন।

ডঃ থিমে বলেছেন এই সম্মেলনে সংস্কৃত ভাষার মহিমান্বিত প্রতীকের পদপ্রান্তে আমরা আমাদের পুষ্পার্ঘ্য রাখতে পেরে নিজেদের সুখী ও ধন্য মনে করছি। সংস্কৃত ভাষা এবং বহু যুগের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা—দেবী সরস্বতীর পদপ্রান্তে যাকে আমরা প্রত্যেকে নিজস্ব পদ্ধতিতে সাধনা করেছি, তাকে শুধু ফুল দিয়ে নয় বরং বিনম্র মহান উৎসর্গীকৃত সেবা নিবেদন করবো। সংস্কৃত ভাষার মহত্ত্ব ভারতেই নয় বরং সারা বিশ্বে কতখানি সেই চিন্তা করার জন্য আমরা এই সমসাময়িক পৃথিবীতে একত্রিত হয়েছি। আমাদের এই বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রত্যেকটি বস্তুই যেন প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। গতকাল যা ছিল আজ তার চিহ্ন মাত্র নেই। তা সত্ত্বেও এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন কতকগুলি মূল্যবোধ আছে যা আমরা হাত ছাড়া হতে দেব না। অতীতের স্মৃতি ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে আমরা ধরে রাখবো।

নতুন বই

অমিত রায়ের '[illegible]': ১৭।১ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা বারো আনা।

মোট নয়টি গল্প এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। রাজনৈতিক গল্প এবং সাধারণ গল্প। সাধারণ গল্পগুলির মধ্যে দর্শনের সুর স্পষ্ট শোনা যায়। লেখকের সূক্ষ্ম শিল্প দৃষ্টি, ডায়ালগ চমৎকার। সামগ্রিকভাবে ভাষা স্বচ্ছ, পরিশীলিত। 'হেম-ক্ষ' গল্পটির মধ্যে 'থার্ড ডাইমেনসান' এর আভাষ স্পষ্ট। অনেকটা 'ওল্ডম্যান এ্যান্ড দ্য সী'-র (হেমিংওয়ে) প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

রাজনৈতিক গল্পগুলি, যেমন—'শ্রেণী-শত্রু', 'অনি', 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' প্রকৃতই বাস্তবধর্মী। বর্ণনা সুন্দর, সাবলীল। সিচুয়েশন তৈরীও প্রায় পূর্ণাঙ্গ। সাম্প্রতিক-কালে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে যেসব নারকীয় ঘটনার রক্তাক্ত সমাবেশ ঘটে গেছে, তার প্রতিচ্ছবি এই শ্রেণীর গল্পগুলির উপাদান। এই উপাদানের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়। সেদিক থেকে শ্রীরায়ের নতুনত্ব অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, এই উগ্র এবং ব্যর্থ রাজনীতির মূলে কেন্দ্রভূমিতে পৌঁছবার মত মানসিক শিক্ষা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে। যন্ত্রণার উৎস ক্ষেত্রে তিনি সহজেই পৌঁছেছেন।

শুধু একটি অসম্পূর্ণতা এই শ্রেণীর গল্পগুলিকে কিছুটা পঙ্গু করে রেখেছে বলে মনে হয়েছে। এই গল্পগুলির সমাপ্তির মধ্যে গভীর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ততটা বাজেনি, যতোটা লেখক হয়ত মনে মনে প্রত্যাশা করেছিলেন।

যেমন 'অনি' গল্পটি। উগ্রপন্থী রাজনৈতিক কর্মী অনি গুলীতে নিহত। তার পিতা, এককালে যিনি উগ্রপন্থী রাজনীতি করতেন এবং যিনি হিংসাকেই সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির পথ বলে সারাজীবন স্বীকার করে এসেছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে নিজের ছেলের মৃতদেহ দেখছেন। এখানে পিতার মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা, তাঁর দুঃখ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি (যা গল্পের এতখানি পথ হেঁটে আসার পর প্রথম ও শেষ ফসলের মত) অসম্পূর্ণ শুধু নয়, অস্বাভাবিক। 'নিজের মৃতদেহের সামনে এলে মানুষের কি কোন বক্তব্য থাকে?' বক্তব্য যেমন থাকে না, তেমনি 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে'—এমন জীবনানন্দ-সুলভ মানসিকতাও তখন থাকে কি?

'শ্রেণী শত্রু, ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'—রাজনৈতিক গল্প দুটিও তীরভূমির প্রান্তে এসে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। ছোট গল্পের সমাপ্তি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গল্পের জোয়ার দূরে সেখানে এসে ক্ষীরের মত ঘন হয়, তার রস নিবিড় হয়। এই নিবিড়তায় না এলে ছোট গল্প সংবাদপত্রের রিপোর্টের একটা উন্নত সংস্করণ হয় মাত্র, গল্প হয় না।

লেখককে এই সমাপ্তির দিকে আরো একটু গুরুত্ব দেবার জন্য আমরা অনুরোধ জানাবো।

শতাব্দী তোমার দস্তানা খোলো (কাব্য-সংকলন)। ধ্রুব মুখোপাধ্যায়। বিদ্যা, ৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—৯। তিন টাকা।

'শতাব্দী তোমার দস্তানা খোলো' তরুণ কবি ধ্রুব মুখোপাধ্যায়ের সম্ভবত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবির আলোর পিপাসা অসাধারণ। এ পিপাসা কবির অমৃত-ভাবনারই প্রতীক। কবিকণ্ঠে অনন্ত শতাব্দীর প্রতীক-প্রতিমে স্বেচ্ছার হাতে পেরেছেন এই বলে—'তুমি যে আমার সূর্যের মুখ দেখতে দেবে না—। এ আমি কেমন করে সহ্য করবো।' দুঃখের মুক্তা দিয়ে এবং নিয়ে কবি অনন্তকাল যাত্রা করতে চান। তাই কবির অকপট স্বীকৃতি—'রজনীগন্ধার বুকে শিশিরের মত/আমি তোমার স্বাক্ষর নিয়ে যাত্রা করবো/শেষ বিদায়ের বাঁশী বাজলো—/ তোমার চোখের জলে আমার যাত্রা শুরু।' কবি কখনো গদ্যছন্দ, কখনো বা মাত্রাবৃত্তে অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। প্রেম, নারী, বাংলাদেশ, [illegible] এ সমস্ত বিষয়কেই কবি যে ছন্দ ও চিত্রল শব্দের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন, তা কবির সূক্ষ্ম কবিত্বের পরিচায়ক।

রক্তমাংস সমাচার (গল্প সংকলন)। জগত বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ, ৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'রক্তমাংস সমাচার' গল্পগ্রন্থটি লেখক জগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনটি ছোট গল্প আছে—'রক্তমাংস সমাচার', 'কায়ানগরের গল্প' ও 'চড়ুই'। জগতবাবু ছোট গল্পের প্রচলিত কোন রীতি মানেন নি। অর্থাৎ কাহিনী, ঘটনা, বাস্তব চরিত্র ও চরিত্র-নিহিত জটিল মনস্তত্ত্ব, তদনুরূপ পরিণতি তার রচনায় মিলবে না। সুতরাং 'এ্যাভারেজ পাঠক' এ গ্রন্থ পাঠে নিশ্চয়ই হতাশ হবেন। কারণ গল্প তিনটির বিষয় তুচ্ছ, প্রকাশভঙ্গি চিত্র-রসাত্মক ও কবিত্বপূর্ণ। কাহিনী, ঘটনা বাদ দিয়ে যাঁরা প্রতীকী ও নিরংগরীতির গল্প লিখতে অভ্যস্ত, জগতবাবু তাঁদের মধ্যে একজন সত্যিকারের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ও ক্ষমতাবান শিল্পী। গ্রন্থটির নাম গল্পের নায়িকা চুমা, চুমার স্বামী অতীন আর গল্পের ধুয়ার মত ল্যাশড্রীম সেই কথাটি 'রোমা, অ বোমা, কাঠটা' এবং শেষে চুমার আত্মহত্যার ব্যঞ্জনা—সব মিলিয়ে গল্পের ভূমিতে জটিল প্রতীকী বাগান এনেছে। 'কায়ানগরের গল্পে' শীর্ণ ক্ষিধির মেয়েটার চিত্র, 'চড়ুই' গল্পে পাখির রূপকে পল্টু, সদানন্দের চড়ুই ও [illegible] সংক্রান্ত ভাবনার [illegible] কবিত্বে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। জগতবাবুর [illegible] প্রকাশভাবনা কাব্যধর্মী, চিত্রাত্মক। কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পে পর পর এত চিত্রের সমাবেশ, যেখানে একটা শব্দ বা বাক্যাংশ অথবা সমগ্র বাক্যই সূক্ষ্ম চিত্রের ব্যঞ্জনা দেয়, নিরংগ গল্পের স্বভাবী পাঠককে ক্লান্ত করবে না কি? পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদপট বিষয়-অনুসারী।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কণ্ঠস্বর সম্পাদক—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ১১।২ [illegible] লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য ৫০ পয়সা।

প্রতি বছরের মত এবারও কণ্ঠস্বর রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যা বের হয়েছে। আধুনিক কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখপত্র এ পত্রিকাটির এবার পাঁচ বছর পূর্ণ হল। প্রধানতঃ তরুণদের দ্বারা, তরুণদের জন্য এ পত্রিকাটির প্রায় [illegible]টি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে প্রকাশিত অসংখ্য পত্র-পত্রিকার মাঝে এ পত্রিকাটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকায় অনেকেই এ সংখ্যাটি সংগ্রহ [illegible] রাখবেন বলে বিশ্বাস। পরিচ্ছন্ন এ সংখ্যাটির প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা, প্রবন্ধ, সুখ্যাত সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের দুটি চিঠি সংখ্যাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। 'আমার সত্তায় রবীন্দ্রনাথ' এই পর্যায়ে লিখেছেন—মণীন্দ্র রায়, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল, বিমল মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ প্রমুখ। লেখাগুলি এককথায় চমৎকার। শিলাইদহের উপর অমিতাভ চৌধুরীর রচনাটি সংখ্যাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। শিলাইদহে একার রবীন্দ্র অনুষ্ঠানেও এ পত্রিকাটি হাজির ছিল।

নিনাদ (একুশের সংকলন)— সম্পাদক : নাজমুল বারী। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা মহাবিদ্যালয় শাখা কর্তৃক প্রকাশিত।

ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র হলেও সংকলনটি সুনির্বাচিত রচনায় আকর্ষণীয়। শামসুল ইসলাম নিজামীর আঁকা একটি ছবি যেন যুদ্ধের ভয়াবহতা ও মুক্তাঙ্গন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে আশ্চর্যরকম। এই সংকলনে লিখেছেন শামসুর রাহমান, মুনাওয়ার আফসার, মাহবুব জামান, সরদার ফজলুল করিম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল এবং আরো কয়েকজন। খুবই ভালো লাগল গোলাম [illegible] দোস্তগীরের 'গোদোর জন্য প্রতীক্ষা'। ল্যাঙ্গস্টোন থেকে টিম 'ওয়েটিং ফর গোদো' অনুবাদের লেখা একটি নতুন আঙ্গিকের রচনা।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।।২৭।।

ক্রমশই এই নিঃসঙ্গতা বোধ ও সংসার সম্বন্ধে বীতস্পৃহা বেড়ে যায় হেমন্তর। কেউ নেই তার। কিছুই নেই—মিছিমিছি কেন এই ঠাট? এই কথাই কেবল মনে হয়।

মণিকার আবার একটি মেয়ে হয়েছে, গোপালের দু বছর বয়সে ওদের দেখাশুনো. হেমন্ত নাম রেখেছে কমলা। ফুটফুটে মেয়ে, মায়ের মতোই দেখতে হত হয়ত—কিন্তু ফরসেপ ডেলিভারীর সময় শেষ পর্যন্ত বুঝি ডাক্তারের আঙুলের প্রবল চাপে রগ দুটো অস্বাভাবিক চাপা হয়ে গেছে। হয়ত বড় হলে এতটা থাকবে না, এখন খুব খারাপ দেখায়, অত সুন্দর মুখের শ্রীটাই গেছে নষ্ট হয়ে।

দুটো ছেলেমেয়ে দেখার অসুবিধে বলে হেমন্ত আলাদা একটি ঝি রেখেছে—পুরনো জানাশুনো—খরচের কোন ত্রুটি করে না সে. খাওয়া-দাওয়ায় জামায়-পোশাকে ওষুধে ধনীর সন্তানের মতোই মানুষ হয় ওরা। এক-একবার মনে হয় আগেরদিন হলে বলতও—মণিকাকে শুনিয়ে বলে, 'তোর ষোড়শীবাবুর ছেলেমেয়ে কি এ ভাবে কোনদিন মানুষ হয়েছে? তার ঘরে পড়লি না বলে তো দুঃখে পরাণ ফাটে, সেখানে কি এই রাজার হালে থাকত ছেলে-মেয়ে? বুকে হাত দিয়ে সত্যি করে বল দিকি।' কিন্তু বলে না, অপ্রীতি বাড়াতে ইচ্ছে করে না। কিছুই বলতে ইচ্ছে করে না কাউকে প্রীতিকর অপ্রীতিকর কোন কথাই—নির্লিপ্ত উদাসীনভাবেই থাকতে চায়। যা কিছু কথা ওর এই বাচ্চা দুটোর সঙ্গেই। কমলা কথা বলতে পারে না, তবু তার সঙ্গেই এক তরফা বকে যায়—তাতেই খানিকটা শান্তি।

মণিকারও সে উত্তাপ সে জ্বালাটা কমেছে অনেকটা। নিমাইয়ের চেষ্টাতেই বোনের একটা বিয়ে হয়ে গেছে। ওরই আপিসের এক সহকর্মীর ভাই, আবাদায় বাড়ি, ম্যাট্রিক পাশ, রেলে কাজ করে—নিজেদের বাড়িঘর আছে। আশাতীত ভাল সম্বন্ধ ওদের পক্ষে। হেমন্ত বিয়ের সময় এক জোড়া বালা ও নগদ দুশো টাকা মণিকার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাতেই নাকি কোন মতে সম্মান রক্ষা হয়েছে।

কৃতজ্ঞ হওয়ারই কথা, স্বামী-শাশুড়ি দুজনের কাছেই। বিশেষ এবার ষোড়শী-বাবু, নতুন স্ত্রীর ভয়েই সম্ভবত, একখানা হাওড়ার হাটের তাঁতের শাড়ি ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি। তবু মণিকার সে উদ্ধত ভাবটা যায় না। অবশ্য আগের জ্বালা আর নেই, কথায় কথায় নিমাইকে অপমান করা, অকথাকুকথা শোনানোটা বন্ধ হয়েছে, ভাগ্যকে অনেকটা মেনেই নিয়েছে— কিন্তু কে জানে কেন হেমন্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাবটা যেন কিছুতেই যায় না। কেন, তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না হেমন্ত, নিমাইও না। একি শাশুড়ি সম্বন্ধে বধূদের সহজাত বিদ্বেষ—শাশুড়ি হলেই তার ওপর আক্রোশ হবে— না অন্য কোন কারণ আছে?

তবু দিন-রাত খটাখটি, কথা কাটা-কাটি রূক্ষ রূঢ় কথার আদানপ্রদানটা কমেছে—এই একটু তবু শান্তি। এতেই অনেকটা খুশী হেমন্ত। আর কিছু না হোক নিজের মনটা উত্যক্ত, নিজের মুখটা ছোট হওয়ার থেকে তো অব্যাহতি। নিজেকে নিয়ে, নিজের ভাগ্য নিয়ে একা চুপচাপ থাকতে পায়—এইটুকুই ঢের।

হয়ত এইভাবেই চলত, অনন্তকাল না হোক, অনেকদিন। হয়ত এইভাবেই ছেলে-মেয়ে দুটো বড় হত, লেখাপড়া করত, পৈতে বিয়েথা হ'ত— আরও ভাইবোন হয়ে যেত ওদের, তাদেরও মানুষ করত এই রকম করে—একটানা একঘেয়ে জীবন-যাত্রা বয়ে যেত যেমন আর পাঁচটা পরিবারে যায়। তাই ভেবেছিল নিমাই, মনে মনে আশার বিরাট সৌধ গড়ে তুলে-ছিল। মণিকাও ভেবেছিল তাই—তবে সে অন্যরকম; কোনদিন নিজের মতো করে নিজের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী হওয়া আর হবে না—এইভাবেই বুড়ি হয়ে যাবে সে একদা। হয়ত কিছুদিন আগে হলে হেমন্তও তাই ভাবত, আর তাতে বিস্মিত হবার, ক্ষুব্ধ হবার—অন্য কিছু ভাববার কি পরি-বর্তন করার কোন কারণ দেখত না।

কিন্তু ক্রমশ হেমন্তর আর এই একঘেয়ে জীবন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা' গোছের এই গতানুগতিক একটি বিশেষ বাঁধা ছকে বাঁধা পথে আবর্তন এ যেন আর সহ্য হল না। অনেকদিন ধরেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল—আর নয়। এখানে এভাবে আর নয়। নিঃসঙ্গই যদি থাকতে হয় কারও সঙ্গে দুটো প্রাণ খুলে কথাই না বলতে পারে, তাহলে এ সংসারে থেকে লাভ কি? নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে থাকা! এ ঠাট তুলে দেওয়াই তো ভাল।...

কলকাতায় যারা পরিচিত ছিল, আপনার লোকের মতো তারা সকলেই চলে গেছে। পূর্ণবাবুর স্ত্রী এক দায়িত্ব ছিল—তিনিও মারা গেছেন। এখানে আর কোন আকর্ষণ কোন বন্ধন নেই। এক যে পায়ের বেড়ি হতে পারত, গোরা—তার ওপরই যা একটু অপত্যস্নেহ পড়েছিল সে নিজে থেকেই বেড়ি ভেঙ্গে অব্যাহতি দিয়ে গেছে। নিমাই কোনদিনই আপন হয়নি, হয়ত হেমন্তরই দোষ সেটা, আপন করতে চায়নি। যাই হোক, নিজের সংসার নিয়ে সুখী না হোক, ব্যস্ত পরিপূর্ণ সে থিতু হয়ে গেছে। আর কেন?

সম্পর্কে আপনার লোক কিছু আছে বৈকি। কিন্তু হেমন্ত তাদের আপন হতে বা আপন করতে পারেনি।

নিজের বোন বোনপোরা কে কোথায় ছড়িয়ে আছে, যোগাযোগ হয়নি। করারও ইচ্ছে নেই আর। অনেক তো করে দেখল; তার অদৃষ্টে কোন স্নেহের বন্ধন লেখেননি ভগবান। মিছিমিছি আরও আঘাত আরও অপমান যেচে নিতে গিয়ে লাভ কি? সবচেয়ে বড় কথা—যাকে অবলম্বন করতে পারলে শেষ জীবনে একটু শান্তি পেতে পারত, হয়ত, তাকে নিজেই সরিয়ে দিল—এই বাইরের জঞ্জাল জড়িয়ে, ছেঁড়াচুলে খোঁপা পরতে গিয়ে।...কে জানে, সুরেনেরই ক্ষতি করল কিনা।

সুরেন এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কুষ্ঠিয়ায় এক কাপড়ের কলে কাজ নিয়ে চলে গেছে। অনেক ধরপাকড় করেই নাকি সে চাকরি যোগাড় করেছে, অথচ আর্থিক সুবিধা কিছু হয়নি। প্রায় একই রকম আয় থেকে গেছে, হয়ত চার-পাঁচ টাকা বেশী হতে পারে। এ যেন কলকাতা থেকে পালাবার জন্যেই চলে যাওয়া। এই মেয়েটা বুঝি সুরেনের জীবনেও অভিশাপের মতো এল। কেউ নয় সে নিমাইয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নেই, মাঝখান থেকে হেমন্তই তাকে জড়িয়ে এই অনিষ্টটি করল। নিজেরও, সুরেনেরও।

একবার ভাবে তখন যদি নিমাইকেই সরিয়ে দিত—তাহলে হয়ত সুরেনকে অবলম্বন করা অসম্ভব হত না। আবার ভাবে, তাতে আরও কুফলই হত হয়ত। তার জন্যে মণিকারা পর হয়ে গেল, পথে বসল—এ জেনে সে কিছুতেই ওর কাছে আসত না, কোনদিনই। সে প্রস্তাবেই হয়ত চাকরি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে যেত। অনিষ্ট যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছে, এই বিয়েতে তাকে জড়াতে গিয়েই।

কিন্তু এসব চিন্তাও তো এখন অনর্থক। জীবন ভোর তো ভুলই করে গেল। কোনটা কতটুকু বেশী আর কোনটা কতটুকু কম, সে হিসেব এখন আর কষে লাভ নেই।

হঠাৎই মন স্থির করে ফেলল একদিন। নিমাইকে ডেকে বলল, 'তুই একটা ভাল মেসটেস দেখে নে নিমে, এখানকার পাট তুলে দোব এবার।'

বিনামেঘে বজ্রাঘাত কথাটা বহুবার শুনেছে নিমাই, এইবার জিনিসটা বুঝল। প্রথম তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না ভাল করে, হতভম্ব হয়ে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইল, তারপর যদি বা অবস্থা আবছা, শব্দগুলো নিজের মনে মনে পুনরাবৃত্তি করে একটু বুঝতে পারল—সে শুধু তার শব্দগত অর্থই, মর্মার্থ তখনও মাথায় পৌঁছল না। গলা এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, কোন প্রশ্ন করা কি কথার উদ্দেশ্যটা বুঝতে চাওয়ারও শক্তি রইল না অনেকক্ষণ।

এতদিন, সবে—এই বোধহয় মেয়েটা জন্মাবার পর অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে আশার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল—এই সম্পত্তি তার না হোক তার ছেলেমেয়েদের কপালেই নাচছে এই রকম একটা ধারণা হতে শুরু করেছিল সেই সঙ্গে তার সংসারও এখানেই দৃঢ়মূল হল এই রকম একটা বিশ্বাস, এমন সময়ে এ আবার কী রকম কথাবার্তা?......

অনেকক্ষণ, বোধহয় পাঁচ-ছ মিনিট পরে, বিস্তর চেষ্টায় গলায় স্বর ফুটল 'তার—তার মানে?'

'কেন, মানে না বোঝার মতো কিছু বলেছি নাকি?' হেমন্ত ধমক দিয়ে ওঠে প্রায়, 'এখানকার সংসার তুলে দোব। এখানে থাকলে ছেলেমেয়ে দুটো মানুষ হবে না, সেই গোরার মতোই হাল হবে। কাশীতে বাড়ী কিনব, সেইখানেই থাকব গিয়ে। ওরা সেখানে পড়বে—স্যানি বেসান্তের ইস্কুলে।'

আবারও কিছুক্ষণ সময় লাগে—কথাগুলোর মধ্যে থেকে বার্তাটা ছেঁকে নিতে। প্রশ্ন করতে আরও খানিকটা। গলা যে আপনিই এমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় মানুষের, কোন পরিশ্রম কি রোদে ঘোরাঘুরি না করেও—তা কে জানত! অবশেষে অনেক কষ্টে শুধু তিনটি শব্দ উচ্চারণ করে, 'তা ওদের গর্ভধারিণী?'

'আ মরণ তোমার! ওদের গর্ভধারিণী ওদের সঙ্গেই যাবে। সে আবার কোথায় থাকবে!...আবার শুদ্ধভাষা—গর্ভধারিণী! ...ঐ কাঁচা শিশু দুটোকে নিয়ে যাচ্ছি কার ভরসায় তাহলে?...মা ছেড়ে কি থাকতে পারে এখন থেকে? ওদের সবাইকে নিয়ে চলে যাব একেবারে, এখানের বাড়ি ভাড়া দিয়ে। সেই জন্যেই তো তোকে মেস দেখতে বলছি একটা!'

আবারও কিছুক্ষণ কয়েকমুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা একটা।

আবারও অতি কষ্টে, যেন আর কার ঠোঁট ও জিভ নড়ে তেমনি প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, 'তা তারপর?'

'তারপর আর কি, তুই মেসে থাকবি, চার মাস ছ মাস অন্তর যেমন যেমন ছুটি পাবি গিয়ে দেখে আসবি। তোর তো সংসারের জন্যে এক পয়সা খরচ হচ্ছে না, শুধু মেসে থাকা খাওয়ার যেটুকু—সেই পয়সাটা রেল কোম্পানিকে দিবি, তাতেও ঢের বাঁচবে।...তোর আপিসে যে সব হিন্দুস্থানী মিস্ত্রী আছে, তারা কি করে খোঁজ করে দেখিস, কেউ এক বছর কেউ দেড় বছর অন্তর দেশে যায়। ঐ মাইনেতেই তাদের সংসার চালাতে হয় বলে ঘন ঘন যাওয়া হয় না, তোর তো সেসব দায়-দায়িত্ব রইল না।'

আর কোন কথা বলতে পারল না নিমাই। কী বলবে? এ প্রস্তাব যে কেউ করতে পারে, করা সম্ভব তাই তো ধারণায় আসে না। এতো মাথা খারাপের লক্ষণ। উন্মাদ-পাগল না হলে একথা কেউ বলত না, সেক্ষেত্রে সে কী জবাব দেবে, কাকে দেবে? এরকম কোন প্রস্তাবের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা মাথায় থাকলে তার উত্তর একটা ভাবার চেষ্টা করত। এখন তো তারই মাথা খারাপ হবার যোগাড় এই আকস্মিক আক্রমণে—কিছু ভাবা কি বোঝার মতোই তো অবস্থা নেই।...

তখনও কিছু বলতে পারল না, তারপরও অনেকক্ষণ নয়। গুম হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ সেইখানেই। হেমন্তর তখন 'বোমা' ফেলা হয়ে গেছে—সে নিশ্চিন্ত হয়ে তার হিসাবপত্রের খাতা নিয়ে বসল, নিমাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না বা এ প্রসঙ্গে অন্য কোন আলোচনা করারও চেষ্টা করল না।

সেই ভাবেই নিঃশব্দে বসে থাকার পর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল নিমাই। উঠলও না, খেতেও গেল না।

হেমন্ত যে সে খবর না পেল তা নয়, তবে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করার মানুষ নয় সে। জীবনের এসব স্তর অনেকদিন পেরিয়ে এসেছে। যাদের জন্য এতটা বাস্ত হওয়া চলত তারা কেউ নেই আর। উদ্বিগ্ন হওয়ারও কোন কারণ নেই। কেন যে খাচ্ছে না সে কারণ তো জানাই। একটু বিচলিত হবে বৈকি, আকস্মিক এত বড় একটা পরিবর্তন—বলতে গেলে একটা বিপর্যয়ের প্রস্তাবে।

সাধাসাধি মণিকাও করল না। ঠিকে লোক রান্না করে চলে গেছে। রাত্রের খাবার ওই পরিবেশন করে। হেমন্ত এখন রাত্রে শুধু দুধ আর ফল খায়—তার খাবার সাজিয়ে দিয়ে নিজে খেয়ে রান্নাঘর সেরে নিশ্চিন্ত সহজভাবেই শুতে এল।

দরজা বন্ধ হতে প্রথম প্রশ্ন করল নিমাই, 'শুনলে কথাটা? সব শুনলে?'

'শুনলুম বৈকি।'

'এরপরেও মুখে ভাত উঠল, বেশ খেতে পারলে! ধন্য, ধন্য, তুমি!'

'ওমা, তা এর সঙ্গে না খাওয়ার কি আছে? খাওয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম এখানেও তাঁর কাছে আছি সেখানেও তাঁর কাছে থাকব। এর মধ্যে এত আপোস-তাপোস করার কি আছে?'

'তার মানে? তা হলে তুমি চলে যাবে ওর সঙ্গে?'

'তুমি বড় বাজে কথা বল। আমি কি যাওয়া না-যাওয়ার মালিক! আমি কে যে, যাবো কি যাবো না ঠিক করব, ভাবতে বসব আমি হলুম হুকুমের বাঁদী, যা হুকুম করবে তাই করব। শাশুড়ি-শাশুড়ির ছেলে—সবাই তো আমার মালিক, আমার মাথা কিনে রেখেছে। আমার কিছু ভাবারও নেই, ঠিক করারও নেই। তোমরা তোমাদের মতো ঠিক করবে—আমি যেমন হুকুম পাবো তেমনি তেমনি কাজ করব। আমার অত ভাবনার দরকার কি!'

এই বলে সে যেন বেশ গুছিয়ে আরাম করে শোয়, পাশ বালিশটা টেনে নিয়ে।

প্রায় সেই সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে নিমাই, 'উঃ! হুকুম! কিসের হুকুম! ওসব হুকুমটুকুম আমি মানি না। আমার পরিবার আমার ছেলেমেয়ে। তারা কোথায় থাকবে না থাকবে সে আমি বুঝব। ও'র সঙ্গে সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে ভ্যাগাবোন্ডের মতো ঘুরে বেড়াব নাকি?'

'তোমার পরিবার তোমার ছেলেমেয়ে পোষবার মতো ক্ষমতা আছে? তা থাকলে

হুকুম শুনবেই বা কেন? আর তা থাকলে এ হুকুম দেওয়ারও সাহস হত না। জানে যে এক কড়ার মুরোদ নেই, তাই চোখ রাঙাতে সাহস করে।'

'আচ্ছা! মুরোদ আছে কি নেই সে বোঝা যাবে। আমি আমার মতো চলব। মাথার ওপর যে এলেকটার পাখা ঘোরাতে হবে কি রাঁধুনী বামুন রেখে বসে খেতে হবে তার কি মানে আছে? আমার সঙ্গে কাজ করে হরিশ বসাক, সাতটা প্রাণী তার সংসারে, খাচ্ছে না? ওপোস করে আছে, নাকি?'

আর কথা কয় না মণিকা। এইটেই ঝোঁকের মাথায় বেশী বলে ফেলেছে, শাশুড়ির প্রতি বিদ্বেষটা প্রবল বলেই। বলার আগে অতটা তলিয়ে বোঝেনি তখনও। হরিশ বসাকের বৌয়ের মতো সংসার করার—একমাত্র নিমাইয়ের ভরসায়—খুব উৎসাহ নেই তার। এত আকর্ষণ নেই স্বামীর ওপর, অত পরিশ্রম করারও সাধ নেই।

সারারাত ঘুমোয় না নিমাই। বলতে গেলে জীবন-মরণের প্রশ্ন তার সামনে। অনেক সহ্য করেছে সে এই বিষয়ের মুখ চেয়ে, অনেক সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অমানুষিক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছে একসময়। সেই বিষয়—এই বিপুল বিত্তের আশা এক কথায় ছেড়ে দেবে? এতদিনের এত দুঃখ এত কষ্ট সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

আবার অন্যদিকটাও ভাবে।

জ্যাঠাইয়ের যে কথা সেই কাজ এতদিন ধরে দেখে এটুকু বেশ চিনেছে সে। গোঁ যখন ধরেছে তখন ছাড়বে না। বাধা দিলে আরও বেঁকে দাঁড়াবে। মোষের সিং বাঁকা যোঝবার বেলায় একা। এ মানুষকে নোয়ানো যাবে না। বিষয়ের আশা রাখতে গেলে, ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে—তারা ভালভাবেই মানুষ হবে হয়ত ওখানে গেলে—এই মতে মত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার মানে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম তুলে দেওয়া।

হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে আবার নরম হতে পারে, তখন হয়ত ওকেই সেখানে নিয়ে যেতে পারে কিম্বা আবার কলকাতাতেই ফিরে আসতে পারে—তবে সে অনিশ্চিত, মর্জির মুখ চেয়ে থাকা।...এক যদি মরে যায়। বয়স হয়েছে, মরার বয়সই হয়েছে। কিন্তু এখনও যা শক্ত শরীর সহজে মরবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এ সংসারে যারা জ্বালাতে এসেছে তারা চট করে মরে না।

সারারাত ভেবেও মন স্থির করতে পারল না।...মণিকার কাছ থেকে কোন সাহায্য—যুক্তি-পরামর্শ পাবার উপায় নেই। সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সুতরাং সকাল-বেলায়ও দুশ্চিন্তা নিয়েই উঠল।

সেই ভাবেই কাটল ঘণ্টাখানেক।

হয়ত এই চিন্তা নিয়ে আপিসে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করলে মধ্য-চিন্তা কিছু বেরোত কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বুদ্ধি-বিবেচনা ভবিষ্যতের চিন্তা গেল ভেসে।

হেমন্ত মেয়েটাকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে নিমাইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন ঝাঁপিয়ে কোলে চলে এল; আর ঠিক সেই সময়ই স্নান করে সিঁদুরের ফোঁটা পরে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো ভিজে চুলের রাশি পিঠে এলিয়ে তার ওপর দিয়ে আলতো মাথার কাপড় টেনে সামনে এসে দাঁড়াল মণিকা।

কিরকম কী একটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল মাথার মধ্যে। নিমেষে আগুন জ্বলে উঠল। সব বিবেচনা সব হিসেব ভেসে চলে গেল কোথায়। দুম দুম করে পা ফেলে নিচে নেমে গিয়ে সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে উচ্চ-কণ্ঠে স্বগতপাঠ করে উঠল, একটা অদ্ভুত সুরে করে বলে উঠল, 'উঃ, হুকুম মানতেই হবে। পরিবার আমার রায় দিয়ে বসে রইলেন! কেন, কিসের জন্যে মানব আমি অন্যায় হুকুম! আমি কি এতটা বয়েসে যে

করেছি আমার বৌ ঐ বুড়ির সেবা করবে বলে?...আর আমি এখেনে মেলে পড়ে পড়ে হাপুস গিলব! তারপর ঐসব ছাইভস্ম গুগোবর খেয়ে আমার শরীরটি যখন যাবে তখন? একে আমরা হলুম গে অল্পভুগীয় বংশ!...তাছাড়া বলি শরীলের ধম্মও তো আছে! শেষে কি ভাইপোটার মতো কুচ্ছিত রোগ ধরিয়ে বসে থাকব।.. না, ওসব হবে টবে না, এই বলে দিলুম। বৌ ছেড়ে ছেলে-মেয়ে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তোমার শাশুড়িকে বলে দিও। হুঃ!

বক্তব্যের শেষেও একটা বিচিত্র সুরে বার করে গলা দিয়ে।.....

এক মুহূর্তের জন্যে কি চোখে আগুন জ্বলে উঠেছিল?

ভ্রূকুটিতে দেখা দিয়েছিল বজ্রের আভাস?

কে জানে, মণিকার সাহস হয়নি সেদিকে চেয়ে দেখার।

তবে কথা যখন কইল হেমন্ত তখন কণ্ঠস্বরে কোন জ্বালার আভাসমাত্র নেই। বরং বড় বেশী শান্ত, বড় বেশী কোমল বলে মনে হল।

'তা অমন করে চোখের আড়ালে গিয়ে আর একজনকে উপলক্ষ করে বলছিস কেন? এ আর এমন কি দোষের কথা যে সামনা-সামনি বলা যায় না? আমিই বা রাগ করব কেন এতে? তোমার মাগছেলে নিয়ে তুমি তোমার মতো ঘর করবে সে ক্ষমতা হয়েছে তোমার—এতো অতি উত্তম কথা।...খুব ভাল কথা! সুমতি হয়েছে তোমার বুঝতে হবে। এত সহজে অব্যাহতি দেবে আমাকে তা ভাবিনি।...তা বেশ, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করো তাহলে।...এই কথা পাকা তো?

তবুও নিমাইয়ের সাহস হয় না ওপরে এসে মুখোমুখি কথা কইতে। সেখান থেকেই উত্তর দেয়, ব্যবস্থা করে বললেই তো আর এখুনি করা যায় না। এখুনি বেইরে যাও বাড়ি থেকে বলবে আর অমনি বৌছেলে নে বেইরে যাবো সুড়সুড় করে তা হবে না। নোটিশ দিতে হবে। সময় চাই আমার। একটা ভাড়াটে তুলতে গেলেও এক মাসের নোটিশ লাগে!'

'সে তো লাগবেই। ভাড়াটে তো লক্ষ্মী, তারা টাকা দেয়, খাওয়ায়। তাদের সঙ্গে কি আর পথের শ্যালকুকুরের তুলনা! তাদের তো দূরদূর করে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত, দ্যাখমার দ্যাখমার করে। তা তবে সেও অত ভয় পেতে হবে না। সময় দিচ্ছি, সময় নাও! এক মাসের নোটিশই দিলুম। বাড়ি বিক্রি করাও তো একদিনে হচ্ছে না, দালাল ধরাব, খদ্দের দেখবে, দরদস্তুর আছে, বায়না, সার্চ, রেজেস্ট্রী—অনেক সময় লাগবে। তোমাদের অবিশ্যি অতদিন থাকতে হবে না। তোমরা তোমাদের সুবিধেমতো যখন খুশি চলে যেয়ো।'

তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বলে, তোমার কিছুই ছিল না, এক বস্তরে এসেছিলে মনে আছে বোধহয়—শ্বশুরেও ঐ একপ্রস্থ দানের বাসন ছাড়া কিছু দেয় নি। তবু যা যা দরকার, যা যা ভোগ করছ—বাসন বিছানা খাট—সব নিয়ে যেয়ো, স্বচ্ছন্দে। কুকুরে মুখ দেওয়া বাসন, বেরাল শোওয়া বিছানা ওতে আমার দরকার নেই। ...একটু আগেই ঘর ঠিক করে যা নেবার নিয়ে যেয়ো, কেননা—এসবও তো রাখব না, খাট চেয়ার টেবিল বাসনকোসন—সব বেচে দোব। খদ্দের ঠিক হলে যা থাকবে সব নিয়ে চলে যাবে। তোমাদের যা নেবার তার আগেই আলাদা করে নিও, আমাকে দেখিয়ে।'

শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠে, বিচারকের রায় দেবার মতো করেই বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল হেমন্ত, সহজ ধীর গতিতে।

সেই সিঁড়ির কাছেই অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিমাই। তারপর কেমন একরকমের করুণ অসহায় কণ্ঠে বললে, 'এ—এসব আবার কি কথা? এ বাড়ি বিক্কিরি করে দেবে নাকি? তবে যে শুনে-ছিলুম ভাড়া দিয়ে চলে যাবে।

'সে তো তখন তোমরা একদিন বাস করবে—এই কথা ভেবেছিলুম। সে পাট যখন চুকেই গেল, তখন আর এসব ঝামেলা কার জন্যে রাখব? কে দেখবে কে মেরামত করবে? কে সময়ে ট্যেক্সোখাজনা দেবে?' ঘর থেকেই তেমনিভাবে উত্তর দেয় হেমন্ত।

আরও কিছুক্ষণ সময় লাগে নিমাইয়ের সাহস সঞ্চয় করতে, তারপর গোটা পাঁচছয় ধাপ উঠে এসে বলে, 'তা একাজগুলো কি আমি করব না বলেছি? এসব তো দেখাশুনো আমিই করতে পারি, যেমন করছি—'

'হ্যাঁ, অমনি ভাড়াটা আদায় করেও খেতে পারি! সে জানি। অত উপকার তোমাকে না করতে হয়, অত কষ্ট, সেই জন্যেই সব ঘুচিয়ে দিয়ে চলে যাবো। তুমি স্বাধীন জীবন বেছে নিয়েছ, নিজের ছেলে-মেয়ে নিজের বৌ নিয়ে নিজের বাড়িতে নিজস্ব সংসার পাতবে—তার মধ্যে আর এসব কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না। মিথ্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এসব পিছটান জঞ্জাল পায়ে না বাধানোই তো ভাল। আমিই বা অত কষ্ট দোব কেন? তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, আমাকেও সেটা দেখতে হবে বৈকি। পাল্টা মুক্তি দিতে হবে না?'

আরও খানিক পরে নিমাই কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল হেমন্ত, 'চোপ!...আর একটা কথাও না শুনি। ফের যদি ঐ ক্যানক্যানানি প্যাজোর প্যাজোর শুনি—তাহলে এখুনি এই দণ্ডে তোর আর তোর বোয়ের পেছনে লাথি মেরে বার করে দোব—তোর কোন বাবা কোন শ্বশুর রুখতে পারবে না বলে দিচ্ছি। হারামজাদা! ডুড়ও খাবো টামাকও খাবো—নিজের নিজের হিসেব ষোলআনা বুঝে নেব, অথচ তোমারটাও ষোল আনা চাই—না? অত আহ্লাদ এখানে চলবে না। নিজের পথ বেছে নিয়েছ—দেখে বুঝে—ঐখানেই ইতি করো, আর এ সম্পর্ক নয়।'

সেদিন আর আপিস গেল না নিমাই। খেলও না কিছু। থুম মেরে বসে রইল শুধু। কথাটা যখন বলে তখন কোন জ্ঞান ছিল না তার। থাকলেও এ পরিণতি হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। সত্যি সত্যিই সব বেচেকিনে দিয়ে চলে যাবে। হয়ত বা কোন মঠে কি হাসপাতালেই দান করে দেবে—এ সম্ভাবনার কথা মাথাতেই যায়নি তার। কিন্তু এখন আর কথাটা তামাশা বলে মনে হচ্ছে না। এ বুড়ি সব পারে।.....এ কী হল তাহলে তার? এখন কি হবে? একটা মিনিটের ভুলে এতদিনের সব কষ্টে অন-র্থক হয়ে যাবে নাকি?......

সারা দিন ভেবে বিকেলের দিকে শুষ্ক মুখে রুক্ষ চুলে হেমন্তর কাছে গিয়ে বসল। গলায় একটা কান্নার মতো আওয়াজ করে পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, উঁহুঁ, উঁহুঁ-হুঁ, আর কখনও এমন করব না, উঁহুঁ-হুঁ, এই বারটির মতো মাপ করো। মাথাটা খারাপ হয়ে গেছল তাই—উঁ হুঁ হুঁ—আরও ঐ মাগীর জন্যে, দিনরাত জ্বালায়, আমার জন্যে এমন করে সব্বত্যাগী হলে আমাকেও তাহলে আপ্তঘাতী হতে হয়। হুঁ-হুঁ, বলে কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়—'

কথাটা শেষ করা গেল না। প্রচণ্ড এক চড় এসে পড়ল গালে তার মধ্যেই, সে চড়ের বেগে কিছুক্ষণের জন্যে চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল নিমাইয়ের, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সামলাবার আগেই প্রচণ্ডতর লাথি!

'হারামজাদা! আমার সঙ্গে ন্যাকাপনা করতে এসেছ! ঐ মায়াকান্নায় আমাকে ভোলাবে! মানুষ চেন নি এতদিনেও! ফের যদি আর একটা কথা শুনি, এখুনি এক-কাপড়ে বের করে দোব বাড়ি থেকে—মাগ-ছেলেমেয়ে সুদ্ধ! কাল সকালবেলাই যেখানে হোক ঘর খুঁজে নিয়ে চলে যাবি এই বলে দিলুম, যদি লাথি খেয়ে না বেরোতে চাস! আপ্তঘাতা! আপ্তঘাতা হবার হলে অনেকদিন আগেই হতিস—যদি লজ্জাঘেন্না কিছু থাকত! বেইমান, বজ্জাত, লাথ-খোর! লাথখোরের জাত!'

এরপর আর একটা কথাও বলার সাহস হল না নিমাইয়ের। আঘাতে অপমানে এবার সত্যিকার চোখের জল ফেলতে ফেলতেই উঠে আসতে হল।

(ক্রমশঃ)

তারকা হোটেল প্রসঙ্গে

অলোক সেন

অত্যন্ত অভিজাত-দর্শন প্রকাণ্ড প্রাসাদখানির, সামনে দাঁড়িয়েছিল উজ্জ্বল-পোশাকী প্রহরী। গাড়ীর সারি লম্বা বারান্দায় ব্যস্ত যাতায়াত। কোন লক্ষপতির প্রাসাদ? উঁহু, আরো একটু বেশী। এটি বহু লক্ষপতির আশ্রয় — পঞ্চতারকা হোটেল একটি। চিত্রতারকার সঙ্গে তারকা-হোটেলের এক জায়গায় মিল—এর দর্শনধারী, দুর্লভ প্রকৃতিতে। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য নয়। বিলাসের চূড়ান্ত, প্রমোদের শেষ কথা এই তারকা হোটেলের সংখ্যা এদেশে হাতে গোনা যায়।

'তারকা' কথাটির অর্থ কি? ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের দপ্তরে বিলাস-হোটেলের যে তালিকা আছে, তাতে তারকা ব্যবহৃত হয় শ্রেণী-বৈষম্য নির্দেশ করতে। যেমন ধরুন পঞ্চ-তারকা কুলীনশ্রেষ্ঠ—সর্বোচ্চ শ্রেণীর। তারপর ক্রমশঃ চার, তিন, দুই, এক। শেষোক্তটি ভুঁইফোড় বড়লোক, পরিচ্ছন্ন আরামের ব্যবস্থা আছে, গ্ল্যামারের কিন্তু অভাব।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে ভারতীয় হোটেল-ব্যবসায়ের নাড়ীনক্ষত্র সন্ধান করতে প্রথম কমিটি বসেছিল। তারপর আরো তিনটি অনুসন্ধান কমিটি এসেছে গেছে, শ্রেণী-বিভাগ কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে। কিন্তু দরকার কি ছিল এত কাণ্ডের? দরকার একটা আছে, পর্যটন ব্যবসা বাড়ছে— ভারত-ভ্রমণে আসা বিদেশী পর্যটকের সম্প্রতিকতম সংখ্যা জানা গিয়েছে ৩০০,০০০; পর্যটনবাবদ আয় ৪০ কোটি টাকা (১৯৭১)—সুতরাং এদেশের হোটেলগুলিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার সময় এসেছে। বিদেশে তো আমাদের বহু বদনাম আছেই, তারপর যদি একথাটা প্রচারিত হয় যে, ভারতে অর্থব্যয় করতে চাইলেও সুযোগ জোটে না, তাহলে পর্যটন ব্যবসার সমূহ ক্ষতি। এদেশে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যের ছড়াছড়ি, দরকার আরো বেশী থাকবার জায়গা, আরো ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা। উপরন্তু, পণ্যের জন্যও চমকদার বিজ্ঞাপন প্রয়োজন হয়, অন্যান্য দেশের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি প্রমোদের নূন্যতম আয়োজন না করতে পারলে বিদেশীরা বিমুখ হবে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভাটা পড়বে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হোটেলগুলি নিজেরাও উন্নতির সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিটি হোটেলই তাদের মান বাড়াবার চেষ্টা করছে, যাতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা মেলে।

বম্বের তাজমহল হোটেলে বসে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অ্যাশোসিয়েশনের পশ্চিম ভারত শাখার সম্পাদক শ্রীকান্ত যোশীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। শ্রীযোশী বয়স্ক লোক, অভিভাবকসুলভ ভারী চেহারা নিয়ে আরামে বসেছিলেন। বললাম ভারত সরকারের তারকা নীতি সম্বন্ধে আপনার কি মত? সোজা উত্তর এল না, সরকারের সঙ্গে ওঁদের কোন বিরোধিতা নেই জানালেন। শ্রীযোশী বিলাস-হোটেল সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেন। ওঁর দুঃখ, অনেক কিছু করার আছে, অথচ করা হচ্ছে না। অন্ততঃ প্রয়োজনের তুলনায় প্রচেষ্টা সামান্যই। একটা উদাহরণ দিলেন। পর্যটকদের মোট ব্যয়ের চল্লিশ শতাংশ হোটেলের সরাসরি আয়। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে দু' শতাংশের বেশী আদায় করা যায় না। মানের উন্নয়ন দূরে থাক, সুনাম বজায় রাখার জন্যও খরচ দিন দিন বাড়ছে। সরকার কি আরো একটু উদার হতে পারেন না?

হোটেলের শ্রেণী বিভাগের জন্য এখন দেশে চারটি আঞ্চলিক কমিটি আছে, একটি আছে কেন্দ্রীয় কমিটি। হোটেলগুলি যোগাযোগ করেন আঞ্চলিক কমিটির সঙ্গে। এক, দুই এবং তিন—তারকা হোটেলগুলির অধিকাংশই স্বত্বাধিকার (মালিকানা) বা অংশীদারত্ব ভিত্তিক। চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর হোটেলগুলি যৌথ প্রতিষ্ঠান—ভারত সরকারের অর্থনৈতিক দাক্ষিণ্য যা-কিছু, এদের কপালেই জোটে। তাছাড়াও আছে বৈদেশিক সহযোগিতার প্রশ্ন। বিদেশী হোটেলগুলি এদেশে যুক্তভাবে যা কিছু করছে, সবই চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণী-পর্যায়ে। এই কারণে শেষের শ্রেণীর তিনটি কিছু অবহেলিত, কিছু বা কবলত-নাম।

১৯৬৭ সালে খান্না কমিটির তত্ত্বাবধানে সর্বশেষ শ্রেণী-বিভাগ সম্পন্ন হয়েছে। মাপকাঠি ১৯৬২তেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। ৭১টি শহর থেকে মোট ২২১টি হোটেল ও ৯৪টি রেস্টুরেন্ট সাড়া দেয়। খান্না কমিটির তৎকালীন সুপারিশ: পঞ্চতারকার জন্য—১৩, চার—১৫, তিন—১৬, দুই—২১ এবং এক—৭। এতবড় দেশে মাত্র ১৩টি পঞ্চতারকা হোটেল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। ১৯৭০এ দ্বিতীয় খান্না-কমিটি নিযুক্ত হয়েছে—তাদের সুপারিশ অবশ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি। শ্রেণী-নির্দেশ ও নিয়মিত পরিদর্শন করবার জন্য একটি স্থায়ী কমিটির কথা বলা হচ্ছে। শুধুমাত্র 'তারকা' নির্দিষ্ট করে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। মান রক্ষা আরো কঠিন কাজ।

কোন ভিত্তিতে তারকা বিতরণ হয়? পাঁচ তারার জন্য এ পর্যন্ত হোটেলগুলিকে মোট ৩৩টি দাবী পূরণ করতে হত এর মধ্যে আছে, অন্ততঃ ২৫টি শয়নকক্ষ ('অ্যাটাচড্ বাথ' সহ) শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, গাড়ী দাঁড় করাবার জায়গা, লাউঞ্জ, ক্লোকরুম, লন থেকে শুরু করে সুইমিং পুল: টেনিস, গলফ বা স্কোয়াশ খেলার কোর্ট পর্যন্ত। এই বিপুল খরচ সকলের সাধ্যের সীমানায় আসে না। সুতরাং তারকা-হোটেলের সীমিত সংখ্যায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এবার প্রশ্ন আসছে, তাহলে এই শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠপোষকতা আসে কোথা থেকে? ব্যক্তির একক প্রচেষ্টা নিষ্ফল এক্ষেত্রে। এর প্রায় সবই শিল্পগোষ্ঠী, বৈদেশিক সংস্থা, সরকার এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ভূতপূর্ব রাজা-মহারাজাদের মদতে বেঁচে আছে। রাজকীয় প্রসঙ্গে পরে আসছি। শিল্প-বাণিজ্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য। বর্তমান ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। কয়েকটি বড় বাণিজ্য সংস্থা এখন একের পর এক হোটেল শুরু করছেন বা চালু ব্যবসার দায়িত্ব নিচ্ছেন। ওবেরয় (ইস্ট ইণ্ডিয়া হোটেল) এদেশের (ভিন্ন মতে, এশিয়ারও) সর্ববৃহৎ বেসরকারী হোটেল-ব্যবসায়ী। ভারতে এ গোষ্ঠীর হোটেল আছে ১০টি—

দিল্লী, কলকাতা, বম্বে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরে। এছাড়া সিঙ্গাপুরে, তেহেরান, সিংহল, নেপাল, ইন্দোনেশিয়ার বাজারেও এরা প্রবেশ করেছেন। কলকাতার 'গ্র্যান্ড হোটেল' এঁদেরই। বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারেও ওবেরয় ভাগ্যবান। ইউ-এস-এইড ঋণ এঁরা পেয়েছেন এ পর্যন্ত দুবারে, অন্যান্যরা এ সুযোগ পাননি। তা ছাড়া আছে বৈদেশিক হোটেল-সংস্থার আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতায় যৌথ হোটেল। বম্বেতে ৩৪-তলা এবং চারশ ঘর বিশিষ্ট 'ওবেরয় শেরাটন' তৈরী হলে শুধুমাত্র এ দেশের সর্বোচ্চ প্রাসাদই নয়, সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলও হবে।

ওবেরয়ের কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বী বম্বের 'ইণ্ডিয়ান হোটেল কোম্পানী'। এদের তালিকাও বড় সামান্য নয়। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল তাজমহল (বম্বে) এদের। রাজস্থানের দুটি প্রাসাদ-হোটেলের—লেক প্যালেস, উদয়পুর ও রামবাগ প্যালেস, জয়পুরে (কাশ্মীরের 'শ্রীনগর প্রাসাদ' হোটেলটি পেয়েছেন ওবেরয়)—দায়িত্ব বহন করা ছাড়াও এঁরা হায়দ্রাবাদের নিজামের পরিকল্পিত হোটেল ও মাদ্রাজের তাজ-করোমণ্ডলের ভার নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। নিজামের ফলকনুমা প্রাসাদের উপর অবশ্য দুটি দলেরই সমান আসক্তি। দীর্ঘদিন ধরে এক অঘোষিত যুদ্ধ চলেছে। আমেরিকার হিলটন (টি ডবলু এ), ইন্টার-কন্টিনেন্টাল (প্যান-আম), শেরাটন বা হলিডে-ইনের মত হোটেল সংস্থাও এদেশে আসতে ভীষণ আগ্রহী। আরবসাগরের তীরে ৬৯ বছরের পুরোনো তাজমহল হোটেলটির পাশে দীর্ঘায়তন ২২-তল-বিশিষ্ট ইন্টার-কন্টিনেন্টাল তৈরী হচ্ছে। বাঁশের ভারা ও ক্লান্ত শ্রমিকরা যখন বিদায় নেবে, তখন হোটেল তাজমহল ইন্টার-কন্টিনেন্টাল এক বৃহত্তর ও মহত্তর রূপ পাবে। ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ও ইণ্ডিয়ান হোটেল কোম্পানীর যুক্ত হোটেল হবে এটি।

সরকার এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানও রঙ্গভূমিতে নেমে পড়েছেন। ভারত সরকারের পক্ষে আই-টি-ডি-সি এ পর্যন্ত ৮টি হোটেল খুলেছেন, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নতুন দিল্লীর 'অশোকা'। সবচেয়ে আশ্চর্য, সরকারী প্রচেষ্টা, তবুও লাভের গুড় সবটাই পিঁপড়েতে খাচ্ছে না। ১৯৭০-৭১ সালে 'অশোকা' ৩০ লাখ টাকার মুনাফা করেছিল। বাঙ্গালোরে আর একটি 'অশোকা' হোটেল খোলা হয়েছে—শুরুতেই খানিকটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল প্রচলিত ক্যাবারে নাচের পরিবর্তে ভারতীয় নৃত্য-নাট্য ও ভরতনাট্যম শুরু করাতে। শোনা যাচ্ছে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে আই-টি-ডি-সি একটি চার তারকার হোটেল শুরু করবেন। বিমানবন্দরে হোটেল করছেন এয়ার ইণ্ডিয়াও। শ্রীটাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টি ডবল্যু এ বা প্যান-আমের দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা পেয়েছেন কিনা জানি না; কিন্তু বিমান কোম্পানীর অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে উঠতে শুরুতেই দুটি হোটেল খোলবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তারা 'হোটেল কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, লাভ করেছেন এল আই সির আর্থিক দাক্ষিণ্য। একটি হোটেল হচ্ছে বম্বের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে, অন্যটি জুহুর বীচে। প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

সম্প্রতি রাজন্যভাতা বন্ধ হয়ে যাবার পর বহু পূর্বতন শাসকও এই লাভজনক ব্যবসাটির দিকে ঝুঁকেছেন। এঁদের এ ভূমিকার শুরু কিন্তু বহু আগেই। জয়পুর ও উদয়পুরের প্রাসাদ দুটি হোটেলে রূপান্তরিত হয় তদানীন্তন মহারাজাদের আগ্রহেই। শ্রীনগর প্রাসাদও একই পথ ধরেছিল। কিন্তু রাজকীয় কল্পনার সঙ্গে সুদক্ষ অর্থনীতি ও পরিচালনাক্ষমতার যোগ না থাকায় এগুলির ব্যবসায়িক সাফল্যের আশা অন্তর্হিত হয়। তিনটি হোটেলই এখন ভিন্ন পরিচালকের হাতে সমর্পিত। আরো বহু রাজকীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি নিজামের ফলকনুমা দুর্গ ও মহীশূরের রাজার 'বাঙ্গালোর প্রাসাদ'ও হোটেলের রূপ নেবে শোনা যাচ্ছে। নিজাম তামিলনাদের উটিতেও একটি পঞ্চতারকা হোটেল খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাঙ্গালোরে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটেছে। মহীশূরের রাজা তাঁর প্রাসাদটিকে 'চামুণ্ডী হোটেলে' পরিণত করার অভিলাষ ঘোষণা করেছিলেন। নিজের তত্ত্বাবধানে দুটি কোম্পানী খুলেছিলেন ১১০ একর জমির উপর এই হোটেল-নগরীটি শুরু করার জন্য। নাইরোবির একটি হোটেলের অনুকরণে গাড়ীতে বসে দেখা যাবে এমন সিনেমা (ড্রাইভ-ইন সিনেমা : ৫০০ গাড়ীর ব্যবস্থা); ড্রাইভ-ইন রেস্টুরেন্ট, সুইমিং পুল, জিমনাসিয়াম, গল্‌ফ মাঠ এবং একটি যোগশিক্ষা কেন্দ্রের পরিকল্পনা তৈরী ছিল। শেষোক্তটি সন্দেহ হয় ভ্রমণরত যুক্তরাষ্ট্রের তরুণদের উদ্দেশ্য করে। কিন্তু নির্মেঘ আকাশ থেকে অকস্মাৎ বজ্র নামল। এক প্রসন্ন প্রভাতে বাঙ্গালোর শহরের কর্পোরেশনের প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হল, বাঙ্গালোর প্রাসাদকে হোটেলে পরিণত করার অনুমতি তাঁরা দিচ্ছেন না: এটিকে একটি ঐতিহাসিক স্মরণ-স্তম্ভ করে রাখতে চান। মহারাজার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, সুধী পাঠক, আমার জানা নেই।

কোথায় যেন পড়েছিলাম তাজমহলের 'রাজপুত সুইটের' দৈনিক ব্যয় সাড়ে তিনশো টাকা। এ হিসাব ১৯৭০-এর। আমেরিকান পদ্ধতিতে 'ফ্লায়েড এগের' দাক্ষিণ্য ন' টাকা। কিন্তু এতেই সন্ত্রস্ত হবার দরকার নেই। কারণ সরকারী কমিটি হিসাব করে দেখিয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় বিলাস হোটেলের খরচ ন্যায্যই। একটি নামী সরকারী হোটেলের প্রায় ১৬ বছর আগের দৈনন্দিন খরচ তালিকা শুনুন : সিঙ্গলরুম (ব্যালকনি সহ)—৪৫৲; (ব্যালকনি ব্যতীত)—৪০৲; ডিল্যুকস্ সুইট—২০০৲; স্পেশাল ডিল্যুকস্ সুইট—২৫০৲। এ ঘোষণা সরকারের। আর কমিটির বক্তব্য, হংকং, থাইল্যাণ্ড বা জাপানের তুলনায় আমাদের পঞ্চতারকা হোটেলের খরচ আহামরি কিছু বেশী নয়। পঞ্চতারকা হোটেলে 'সিঙ্গল' ঘরের জন্য ব্যয় ৬৫৲ (কলকাতা, আগ্রা)—৯৫৲ (দিল্লী); ডাবলের জন্য ১০০৲ (কলকাতা)—১৭২৲ (দিল্লী)। যে-হিসাবে এই তিনটি দেশের মিলিত তুলনায় 'সিঙ্গল'ঘরের ন্যূনতম দাক্ষিণ্য ৫৬৲, সর্বাধিক ১৭২-৫০ পয়সা (দুইই হংকংয়ে) ও ডাবল ঘরের সর্বনিম্ন দাক্ষিণ্য ৭৯-৮০ পয়সা (জাপান), সর্বাধিক ২১০৲ (হংকং, জাপান)। এসব হিসাবও কিছু পুরোনো—এর মধ্যে গঙ্গা নদীতে কিছু জল কি আর প্রবাহিত হয়নি?

ভারতীয় হোটেল ব্যবসায় সম্বন্ধে মোটামুটি এই বক্তব্য। কিন্তু পরিশেষে কটি প্রশ্ন তুলব। (ক) সরকারী কমিটির কথামতই পাঁচ ও চার তারকা বাদ দিয়ে নীচের তিনটি শ্রেণীর হোটেলের মান আশানুরূপ নয়। এদের আর্থিক সমস্যার কথা আগেই বলেছি। জিজ্ঞাসা, বিদেশী পর্যটকদের সকলেরই তো তাজমহল বা ওবেরয়ের হোটেলে থাকার ক্ষমতা নেই। তাহলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-বিত্ত পর্যটকদের জন্য যে তিন, দুই বা এক শ্রেণীর হোটেলগুলি রয়েছে, তাদের সংস্কারের দায়িত্ব কে নিচ্ছেন?

(খ) হোটেল চালনার জন্য রীতিমত পেশাদারী দক্ষতা কই? পরামর্শ দেবার জন্য 'কনসাল্টেন্সী সার্ভিস' বা অন্যান্য উঁচুমাত্রার কাজের জন্য লোক পাওয়া যায় না। বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ ও কলকাতা এই চারটি মাত্র হোটেল বিষয়ে শিক্ষাকেন্দ্র—যাদের দায়িত্ব আবার সরকারের শিক্ষা-বিভাগেরও নয়, খাদ্যমন্ত্রকের। সংশ্লিষ্ট কিছু আত্মসন্তুষ্টি লাভ নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু কাজ পুরো হয়েছে কি?

এবং (গ) সরকার পর্যটন বিভাগের মোট আয়ের থেকে আরো কিছু বাড়তি টাকা হোটেলগুলির উন্নয়নকাজে ব্যয় করতে পারেন না কি? আমরা ক্রমাগত শুনছি পর্যটন ব্যবসায় সমৃদ্ধি এলে দেশের বৈদেশিক অর্থ-তহবিল বাড়বে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সংকল্প ১৯৭৩-এর মধ্যে পর্যটকের সংখ্যা ৪০০,০০০এ নিয়ে যাবেন। কথাটা ভাল। তাহলে আসুন না, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় পর্যটন-বাণিজ্য তথা হোটেল-ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব এনে দিই?

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু ● সুহৃদ গোপাল দত্ত

'ইহ আত্মানম অনুবিদ্য ব্রজন্তি
এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্,
তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি।'
—ছান্দোগ্য ৮।১।৬

১৯৫০ সালের ৬ই ডিসেম্বর। জন-স্রোত প্রবাহে আশ্রম প্লাবিত। বিজ্ঞানময় পুরুষ যে দেহ পরিত্যাগ করে গেছেন সেই দেহে তখনো ছড়িয়ে রয়েছে অতিমানসের জ্যোতি। ডাক্তার প্রভাত সান্যালের ভাষায়, 'বিজ্ঞানের কল্যাণে মৃত্যুর যে-সব লক্ষণ আয়ত্ত করেছিলাম, তার একটিও খুঁজে পেলাম না গুরুদেবের অঙ্গে, তিলমাত্র বিবর্ণ হয়নি কোথাও, সামান্যতম পচনের চিহ্নও চোখে পড়ল না। শ্রীমা চাপা গলায় বললেন,

> 'As long as the supramental light does not pass away, the body will not show any sign of decomposition, and it may be a day or it may take many more days'.

আমিও অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় সেই আলো, মা,—যার কথা তুমি বলছ? আমার পক্ষে কি তা দর্শন করা অসম্ভব?' শ্রীঅরবিন্দের শয্যার পাশেই শ্রীমায়ের চরণতলে নতজানু হয়ে বসেছিলাম, হেসে মা অনন্ত করুণার সঙ্গে তাঁর হাতখানি আমার মাথায় রাখলেন। আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল—নীলাভ সোনালী জ্যোতির্মণ্ডিত গুরুদেবের সর্বাঙ্গ।'

৭ই ডিসেম্বর এলো—তখনও সেই পরিত্যক্ত দেবদেহে বিকৃতির লেশমাত্র দেখা যায়নি। এই দিন আদ্যাশক্তিরূপিণী মায়ের মুখ থেকে ভক্ত-শিষ্যেরা শুনতে পেলে ভাবীকালের নির্দেশ: 'ভগবান, আজ প্রাতে তুমি আমায় বরাভয় দিয়েছ যে, যতদিন তোমার কাজ অপূর্ণ থাকবে ততদিন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে—শুধু নিয়ন্ত্রী চেতনার আশ্রয়ে নয়—আমাদের সকল গতির ছন্দে। তোমার বরাভয়ে অভ্রান্ত আশ্রয় পেয়েছি যে, পৃথিবী দিব্যভাবে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ভূমণ্ডলেই থাকবে আমাদের সঙ্গে। আশীর্বাদ কর, তোমার কৃপায় আমরা যেন তোমার এই অপরূপ ব্যক্তির উপযুক্ত ধারক ও বাহক হিসাবে কায়মনোবাক্যে তোমার দিব্য-কর্ম উদ্‌যাপনে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।' আরও একটা দিন কেটে গেল। ৮ই ডিসেম্বর সেই অবিকৃত দেবদেহের দর্শনের সঙ্গে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগে উঠল গুরুদেবের দেহত্যাগের মধ্যে দিব্যশক্তির কি লীলা প্রচ্ছন্ন রয়েছে? কেনই বা তিনি আত্মবিসর্জন দিলেন? এর উত্তর সেই দিনই মা দিয়েছিলেন—

> "The lack of receptivity of the earth and men is mostly responsible for the decision Sri Aurobindo has taken regarding his body......"

অসুর শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে স্থূলদেহের বাধা অনেক সুতরাং সূক্ষ্মদেহের আশ্রয়ে যুদ্ধ করা এক অনন্য দিব্য-কৌশল। সাধক কবি অমল-কিরণ এই মহাপ্রয়াণের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, '...শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগ তাঁর নিজের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে নয়। এ হল বিবর্তমান পার্থিব-চেতনাতে এক মহা দুর্যোগ— ভগবানের দ্বারা আক্রান্ত অচেতনার বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ-অভিযান তাঁর নিজের উপরই তাঁকে নিতে হলো শেষে, জীবন সংশয়ের বিপদ স্বীকার করে মৃত-বিষাচ্ছন্ন মূর্ছার ছলে, যাতে তাঁর কাজের গোপনে সাহায্য হয়—সে কাজ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধির চেয়েও সর্বদাই যে তাঁর কাছে বড় ছিল। ...এ কাজ ভবিষ্যতের অনুকূল নিয়তির অঙ্গ। (৪১)।

৯ই ডিসেম্বর বিকাল ৫টার সময় শ্রীমা অনুমতি দিলেন সেই পরিত্যক্ত দেবদেহকে মহাসমাধিস্থ করবার। সমাধির জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা ছিল:

> "Under the 'Service tree' in the place where the giant maidenpair plants are arranged."

এক অনাড়ম্বর সমাবেশের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের সংস্কারমুক্ত এবং নির্লিপ্ত মন নিয়ে রোজ-উডের আধারে সেই দেবদেহকে মহাসমাধিতে, অনন্তশয়ানে

(41) K. D. Sethna: The Passing of Sri Aurobindo: P.5.
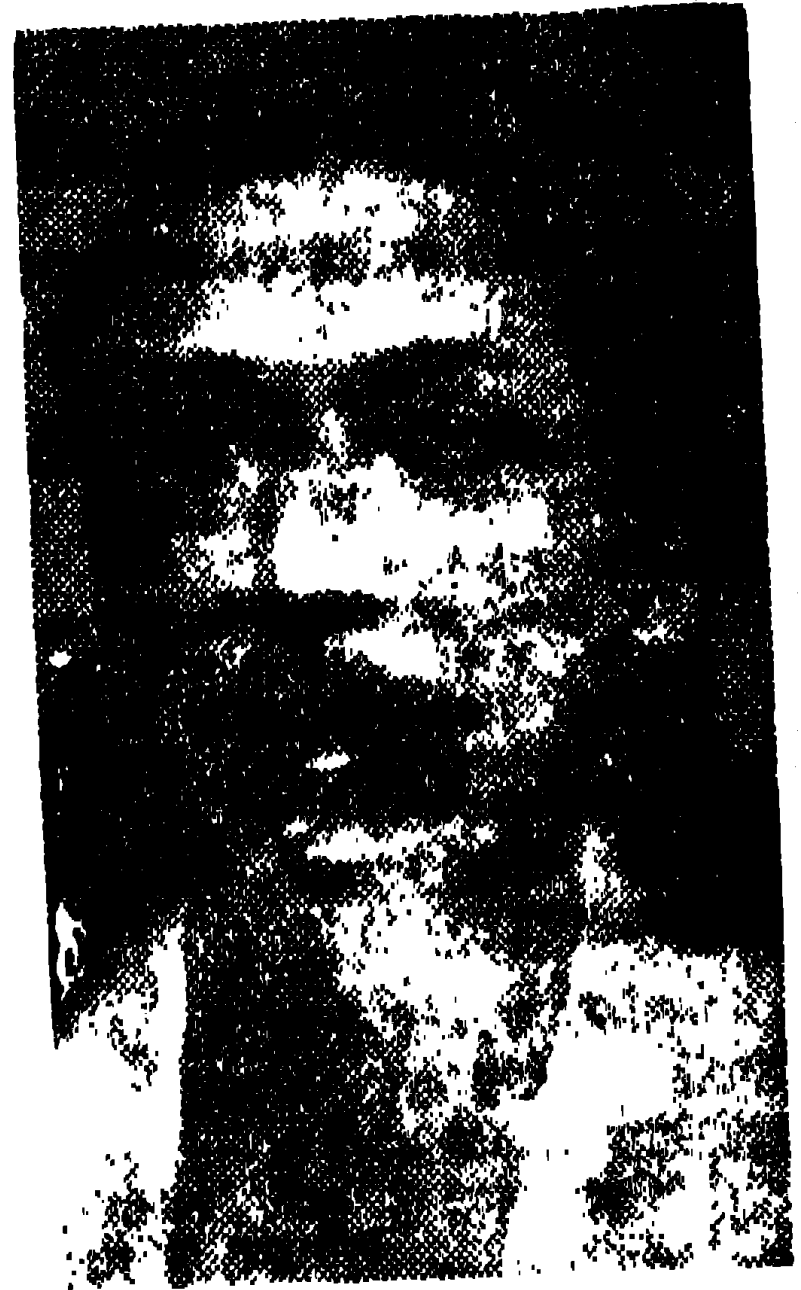
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

শায়িত করল সেই পরিত্যক্ত দেবদেহ। সমাধি-ফলকে লেখা রইল শ্রীমার রচিত এক পবিত্র দেব বন্দনার মন্ত্র:

হে সচ্চিদানন্দময় অবতরণে তুমি আমাদের গুরুদেবের অন্নময় দেহের কারণ-স্বরূপ হয়েছো, সচ্চিদানন্দময় তোমার কাছে আমরা চিরঋণী রইলাম। সেই সচ্চিদানন্দময়ের কাছে, যিনি আমাদের জন্য সব কিছুই করেছেন, সঙ্কল্প নিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, অনেক আশা নিয়ে সব কিছু সহ্য করেছেন, সেই সচ্চিদানন্দময়ের কাছে, আমাদের কল্যাণে, এই সবই যাঁর ইচ্ছা, যাঁর প্রচেষ্টা, যাঁর নির্মাণ, যাঁর অভীষ্ট-সিদ্ধি, সেই পরমপুরুষের কাছে আমরা আনতমস্তকে প্রার্থনা জানাচ্ছি যেন কোনোদিন আমরা তাঁকে বিস্মৃত না হই, এমনকি

শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি মন্দির (পণ্ডিচারী)

মুহূর্তের জন্যও নয়, হে তৎ-সৎ আমাদের সব কিছুর জনাই তোমার কাছে আমরা ঋণী।

পণ্ডিচেরীর আকাশে-বাতাসে প্রতি-ধ্বনিত হতে থাকল সেই দিব্য-বাণী যে বাণী শ্রীমা শুনেছিলেন :

"I have left this body purposely. I will not take it back I shall manifest again in the first supramental body built in the supramental way". (42).

মনস্পতি পুরুষ সম্পর্কে ব্রহ্মসূত্র এই কথাই বলেছেন।

অগণিত ভক্ত-শিষ্যের চোখের সামনে দিব্যশ্রী শোভিত হয়ে পরিস্ফুট হলো গুরুদেবের লিখিত বাণী :

"One day I will return, a bringer of light,
Then I will give to thee the mirror of God".

বিজ্ঞানময় পুরুষের লীলাসহচরদের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হতে থাকল সেই অভয়বাণী :

"I am here, I am here".

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যাঁরা তাঁদের সত্তাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, দেব সঙ্ঘের সেই ব্রতী পুরুষেরা পূর্ণযোগের শেষ অঙ্কের জন্য কাজ করে চললেন জগদ্ধাত্রী শক্তির নির্দেশে। যোগ-ঐশ্বর্যের সব কিছুর উত্তরাধিকারিণী সব সময়েই সঙ্গে রয়েছেন গুরুর প্রতিমূর্তিরূপে সুতরাং তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন গুরুদেবের স্বপ্ন-সম্ভবের শেষ অঙ্কে।

১৯৫১ সালের ২৪শে এপ্রিল শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শুরু হলো শ্রীঅরবিন্দ মেমোরিয়াল কনভেনশনের দুদিনব্যাপী অধিবেশন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমা প্রস্তাব করলেন—শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সংকল্প। তিনি বললেন, 'শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে, এই উপায়েই ভবিষ্যতের মানুষকে সুন্দরভাবে অতি-মানসের জ্যোতি গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যে জ্যোতির ধারায় মানুষ রূপান্তরিত হবে দিব্য-জীবনের আধাররূপে এবং সেই মানব-সংঘের সহায়তায় পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে নতুন আলো, নতুন শক্তি, নতুন জীবন।' উপস্থিত সুধীজনের আন্তরিক সমর্থনে সভাপতি দ্বিতীয় দিনে তিনটি সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং সমাপ্তি ভাষণে বললেন, 'আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করছি এই উদ্দেশ্যে যে, এখানে মহত্তম আদর্শ অনুসারে শিক্ষিত হয়ে উঠবে নরনারী, অংশ নেবে নবমানবজাতি সৃষ্টির মহা-ব্রতে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারে না যদি তেমন নরনারী আমরা না পাই, যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের উপর শুধু ভক্তিই রাখবেন না, তাকে কাজে ফলিয়ে ধরতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবেন। এ রকম লোকবল আশ্রমেই রয়েছে—তাঁরা এই গুরুদায়িত্ব নিতে পারবেন। যে আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠবে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়, আশা করি তা উদ্বুদ্ধ করবে সমস্ত বিশ্বের নরনারীকে। ...শ্রীমা যখন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন আমাদের মনে অণুমাত্র দ্বিধা নেই যে, এই বিশ্ব-বিদ্যালয় দিনে দিনে বিস্তার লাভ করবে এবং শুধু ভারতের নয়, সমগ্র সভ্যজগতের এক গৌরবের সামগ্রী হয়ে উঠবে।...... একদিন এখানে যে বাণী ধ্বনিত হবে তা সমগ্র জগৎকে শুনতেই হবে। ...শ্রীঅরবিন্দ দিয়ে গেছেন সেই বাণী। একদিন পৃথিবীর সকল লোক চলবে শ্রীঅরবিন্দের প্রদর্শিত এই পথে।' (৪৩)। ১৯৫২ সালের ৬ই জানুয়ারি শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন শ্রীমা। দিব্য-যন্ত্রেরা কাজ করে চলেছিলেন দিব্য-নির্দেশে এবং দিব্য-উদ্দেশ্য।

'ভগবান পৃথিবীতে আমরা আছি তোমারই রূপান্তরের কর্মসাধনের উদ্দেশ্যে। তাই আমাদের একমাত্র সঙ্কল্প, আমাদের একমাত্র অভিনিবেশ। আমাদের প্রার্থনা, তাই যেন হয় আমাদের একমাত্র সংকল্প, আমাদের একমাত্র অভিনিবেশ। আমাদের প্রার্থনা, তাই যেন হয় আমাদের একমাত্র জীবনবৃত্তি, এবং যেন আমাদের সমস্ত কাজেই আমাদের সহায় হয় এই লক্ষ্যের পথে।' —শ্রীমার বাণী।

১৯৫৩ সালে সাধক অম্বুভাই পুরাণী পরিব্রাজক-প্রচারক হিসাবে পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকান দেশগুলিতে বহন করে নিয়ে গেলেন গুরুদেবের পূর্ণযোগের বীজমন্ত্র। অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে সেই ভূখণ্ডের আকাশে, বাতাসে, জনগণের মনে ছড়িয়ে দিয়ে এলেন সেই বীজ। ১৯৫৪ সালে সুদূর চীনের হংকং শহরে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের পাঠ-চক্রে শ্রীমায়ের আশীর্বাণী সেখানকার প্রকৃতিতে দিব্য আলোর বিকিরণ ঘটালে :

"Let the eternal Light dawn on the eastern horizon—Mother".

Italian Institute for the Middle and the Far East

সংস্থার উদ্যোগে রোমে ১৯৫৪ সালে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শনের উপর আলোচনা চক্রে ভারতের অধ্যাত্মবাদ সেই মহাপুরুষের বাণী অবলম্বনে ইতালীয় সুধীজনের অন্তরে প্রবেশ করল। নিখিল বিমানে সর্বব্যাপী সূক্ষ্মদেহ, পণ্ডিচেরীতে জীবন্ত প্রতিমা, এবং তাঁদের সংকল্পে ধীরে ধীরে বিশ্বচরাচর এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে দিব্য-জীবনের সন্ধানে। অন্যতম বাহক হিসাবে ডারহাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Spalding Lecturer in Indian Philosophy and Religion দর্শনাচার্য আনন্দমোহন বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সাল। শ্রীমা বাণী দিলেন :

"No human will can prevail against the Divine's Will. Let us put ourselves deliberately and exclusively on the side of the Divine and the Victory is ultimately certain."

ডারউইনের বিবর্তনবাদের ভাবে অনু-প্রাণিত বিজ্ঞানীদের মনে জীবন্ত প্রতিমার এই বৈপ্লবিক বাণী চিন্তার আলোড়ন এনে দিল। নতুন ধারার বিবর্তনবাদকে বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন : সৃষ্টির মূল কথা হলো সিসৃক্ষা—যার গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং বাসুদেব—স্থাবরে, জংগমে, বিশ্বলীলায় নিজে আত্মগোপন করে থাকবেন বলে। সৃষ্টির মধ্যে বিভেদের দৃষ্টি এসেছে অজ্ঞানতার ফলে—দেখা দিয়েছে সৃষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম। জ্ঞানের অভাবে এই দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম প্রাণের সংহারের কারণ হয়ে ওঠে কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই দ্বন্দ্ব নানাদের অবসান ঘটিয়ে প্রাণকে সংধারণ করে দিব্যাশ্রয়ী করবার জন্যে, সংগ্রাম চলে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভময়কে জীবনে মূর্ত করবার জন্যে। এই সংগ্রামে জয়ী হয় দিব্যভাবে দীক্ষিত মানবজাতি। দিব্য-

(42) Mother India June, 1952: P. 16.

(৪৩) শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিকা, আগস্ট, ১৯৫১।

চেতনার জাগরণে যাঁরা একককে উপলব্ধি করেন, প্রাণের সংধারণে অমিতশক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন তাঁরা—ব্রহ্মতেজে বলীয়ান হয়ে। বিধিলিপি বলে, এই ব্রহ্মতেজে বলীয়ান মানব সন্তানের দলই বাঁচবেন—শেষ পর্যন্ত। দিব্য-জীবনের আশ্রয় ব্যতীত প্রাণের সংরক্ষণ বা সংধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং 'জীবনযুদ্ধে বিশিষ্টতম উপযুক্ততার অধিকারী যে হবে সেই বেঁচে থাকবে'—এখানে 'বিশিষ্টতম অধিকারী' শব্দটি ওঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—যাঁরা দিব্য-কর্মের দক্ষতা নিয়ে দিব্য-জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে সংগ্রামে জয়ী হবেন সত্যের কারণে, সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার জন্যে। কারণ নিয়তি লিখনে দিব্য-ইচ্ছাই জয়ী হবে, মানুষের ইচ্ছা নয়।

এই জয় আসবে নিঃশব্দে। ১৯৫৬ সালে প্রজ্ঞাবতী বাণী দিলেন :

"The greatest victories are the least noisy. The manifestation of a new world is not proclaimed by beat of drum."

এই জয়ের জন্য প্রয়োজন পৃথিবীতে প্রজ্ঞা-স্রোতের প্লাবন অতিমানসের অবতরণ। যে ধারাস্নানে ধরণী শুভ্র হবে। এর জন্যই বিজ্ঞানময় পুরুষ দেহ পরিবর্তন করেছেন। এর জন্যই পণ্ডিচেরীতে জীবন্ত প্রতিমা এখনও দিব্য-কর্মে রত। এর জন্যই আশ্রমের দেব-সংঘের ব্রতী পুরুষেরা নিঃশব্দে কর্মযোগে মগ্ন। যার জন্য চলেছে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানযজ্ঞ—বিশ্বের ভূখণ্ডে সেই যজ্ঞের যজ্ঞাশ্বের প্রতীক হিসাবে ছুটে চলেছেন ব্রতী পুরুষেরা, একের পর এক জ্ঞান পীঠস্থানে, উত্তোলন করছেন ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিজয় পতাকা।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দের সংকল্পের রশ্মি বিশ্বের চিন্তা-নায়কদের মনে নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি করলে, যে চিন্তাধারার আদ্যে এবং অন্তে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যেন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কেউ উড়িয়ে দিয়ে গেছে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির বিজয় পতাকা।

বিশ্ববিশ্রুত মনীষী জুলিয়ান হাকসলের উপলব্ধিতে উপস্থিত হলো এক নতুন পৃথিবী—কল্পনাতীত শুভ সম্ভাবনায় ভরা—যেখানে নরে মূর্ত হবেন নারায়ণ। ধীমান কোয়েসলার উপলব্ধি করলেন এক অভিনব দিব্য-চেতনার উদ্ভব। দার্শনিক সার্ডিন তাঁর দূরদৃষ্টিতে বিবর্তনবাদের নব-বিশ্লেষিত রূপে দেখতে পেলেন—বিবর্তনের মূল লক্ষ্য ঊর্ধ্ব পথে সেই পরা-চেতনায় উত্তরণ। প্রথিতযশা লাকোমতে দ্যু' ন্যুয়ে দেখতে পেলেন বিবর্তনের এক নতুন পর্যায়ের ঘোষণায় আগত এক নবীন উষার পদক্ষেপ। যেন ফিল্গার এবং পিটিরিম সোরোকিন প্রমুখ চিন্তানায়কদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ এক শান্ত সৌম্য মানবজাতি, সাম্যের জয়গানে মুখরিত ধরণী, বিশ্বব্যাপী সেই একের বিজয় পতাকা। বিশ্বব্যাপী দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনের শুভ সূচনা। জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা ভারতবর্ষের এক প্রান্তে নিঃশব্দে

জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা শ্রীমা

কাজ করে চলেছেন যেমনটি শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন সাবিত্রী মহাকাব্যে সাবিত্রীর উক্তির মাধ্যমে—'......আমি চুপ করে বসে নেই। দেবতাদের পৃথিবীতে আমি নামিয়ে আনছি, নিরাশার বুকে আশা এনে দিচ্ছি, উচ্চ-নীচে সকলকে সমানভাবে শান্তি দান করছি, মূর্খ ও জ্ঞানীর উপর সমভাবেই করুণা বিকিরণ করছি। পৃথিবী যদি উদ্ধার হতে চায় ত আমি তাকে উদ্ধার করবো, তখন এই মর্তধামেই প্রেম অক্ষত চরণে বিচরণ করবে, মানুষের মন সত্যকেই সম্রাট বলে মেনে তার বিধানেই চলবে এবং শরীর বহিবে গুরুভার তুরীয়ের, অবতীর্ণ তার মাঝে হবে ভগবান'। '

১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ধরণীর উপর অতিমানস অবতীর্ণ হলেন। এপ্রিল মাসে জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা তাঁর বাণীতে বললেন, এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যখন ধরণীর সব কিছুতে পরা-চেতনার ধারা বিকিরিত হয়েছে—যা ছিল স্বপ্ন তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এখন থেকে পৃথিবী এবং আমরা সবাই আর কখনই সেই পরা-চেতনার ধারা থেকে বিযুক্ত হব না—সব সময়েই যুক্ত থাকব। আমাদের মধ্যে সেই দিব্য-প্রভাব ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠবে। আমরা ক্রমশ এগিয়ে যাব উত্তরণের পথে, দিব্য-জীবনের প্রতিষ্ঠায়। যে জীবনে থাকবে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ—থাকবে নিসর্গ সুষমা, সত্য এবং আনন্দঘন চেতনা।'

১৯৫৮ সালে শ্রীমা বললেন, 'বিশ্বের সর্বত্র অতিমানসের তেজে পবিত্র হয়েছে এবং অতিমানসের আধার হওয়ার উপযুক্ততা আসতে শুরু করেছে পৃথিবীতে—এক অভ্যুত্থানের মধ্যে মানুষের সীমিত মনো-ভূমিব্যাপী নতুন চেতনা জাগছে নতুন সৃষ্টিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।' এই প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছিলেন যে, এই (আধার) প্রস্তুতির একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের সূচনা হবে ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীমার বাণীতে ঘোষিত হলো—'দিব্য-ক্ষণের মধ্যেই আমরা এখন এসে গেছি'—এই দিব্যলগ্নেই তো গুরু-দেবের কথামত দিব্য-জীবনে উত্তরণের কাজ ত্বরান্বিত হবে। গুরুদেবের লীলাসহচর নলিনীকান্ত গুপ্তের ভাষ্য অনুযায়ী : 'বিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়েই পৃথিবীর মানুষ (অবশ্য জনসাধারণ নয়) প্রথম অধিমানসের দিব্য-মণ্ডে অবস্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং অতিমানসের ধারাস্নানের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিবর্তনের চক্রে এ এক নতুন উষার সূচনা—যখন মানুষ উন্নীত হলো ঊর্ধ্বতর স্তরে। অধিমানসের দিব্য-মণ্ডে অবস্থানের সময় সেই মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি

অরোভিল, পণ্ডিচেরী
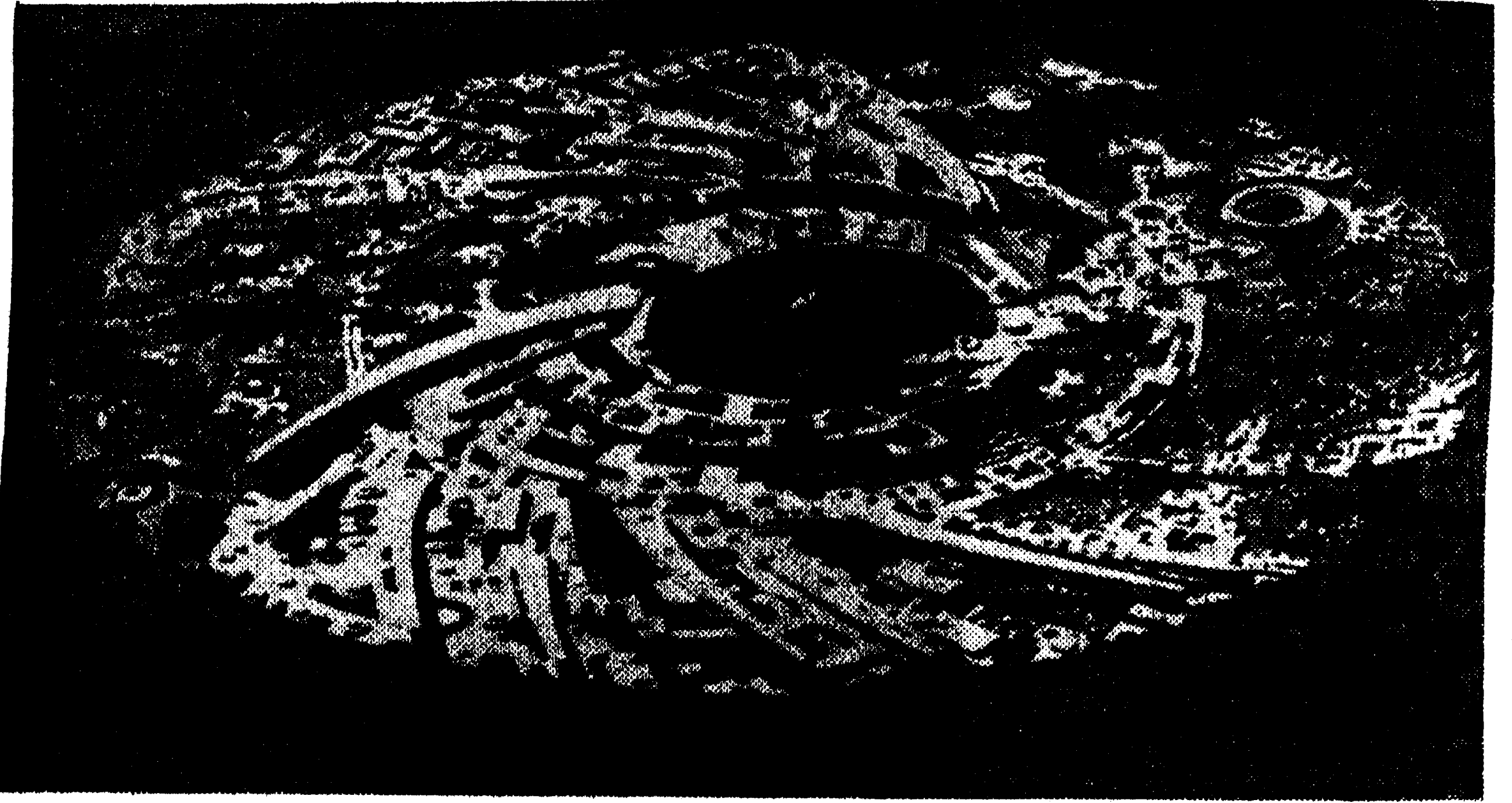
করতে পারল পরা-আকর্ষণের তীব্রতা। কারণ, সেই দিব্য-মঞ্চে অতিমানস অবতীর্ণ হয়েছেন পৃথিবীর দিকে, সেই আকর্ষণ নিম্নাভিমুখী হয়ে প্রকৃতির লীলাকে অমৃতের স্পর্শ দিয়েছে। ইন্দ্রিয়ের অধিকারী প্রাণে অতীন্দ্রিয়ের আবির্ভাব মানুষকে প্রজ্ঞাবান করেছে। কোন এক অমোঘ এবং অদৃশ্য নির্দেশে একই সংগে চলেছে : অতিমানসের অবতরণ, যার তীব্র আকর্ষণে প্রকৃতি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, এবং সৃষ্টির লীলায় দেখা দিয়েছে নিবর্তন এবং উত্তরণের প্রবণতা।' (৪৪)

চরৈবেতি। ১৯৬৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি নির্মাণমুক্তি যজ্ঞের যুগোপযোগী বেদীর উদ্বোধন করলেন শ্রীমা—ইউনেস্কোর আন্তরিক সহযোগিতায় মূর্ত হলো আগতপ্রায় দিব্য-জীবনের এক অভিনব প্রাণকেন্দ্র অরোভিল। অরোভিল মহানগরী—নিসর্গ মাধুরীভরা মর্ত্যের বৈকুণ্ঠলোক। এর উপর অধিকার থাকবে সমগ্র বিশ্বের দিব্য-জীবনের অভিযাত্রীদের। এর মধ্যে থাকবে সেইসব সম্পদ যা অতীতের ঐশ্বর্য বর্তমানকে সমৃদ্ধ করবে ভাবী প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার জন্যে, একান্তভাবে আর্ষ পন্থায় : 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।'

১৯৬৯ সালের প্রথম দিনের ঊষা আবির্ভূতা হলেন পরা-চেতনার ধারাস্নানে পবিত্র হয়ে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমার তপঃপ্রভাবে ১লা জানুয়ারির ঊষার প্রাক্কালে অধিমানসের দিব্য-মঞ্চে অতিমানসের প্রভাব অধিষ্ঠিত হলো। শ্রীমা বলেছেন, এই অধিষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী নয়—

"but it is established there and is fully operating."

বিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশকে পরা-চেতনা এমনি এক স্তরে নেমে এসেছে যেখানে গুরুবল থাকলে মানুষী চেতনা উঠতে পারে। তাই ১৯৭০ সালের নববর্ষের বাণীতে শ্রীমা বললেন :

"The world is preparing for a big change. Will you help "

হে বিশ্ববাসী, অমৃতের পুত্রগণ তোমরা সহায়ক হও, প্রতিবন্ধক হয়ো না। তিনি যেন বললেন, তোমরা অন্তরে আকুতি ফুটিয়ে তোলো—'তম্র মাম্ অমৃতম্ কৃধি' —তা না হলে তোমরা সেই বিরাট পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে কি করে! দিব্য-জীবনকে পৃথিবীতে মূর্ত করবার অদৃশ্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিজ্ঞানময় পুরুষ যে অনাগত ঊষাকে বন্দনা করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছলেন—'ঊষা আসবে'—সেই ঊষা এসেছে। এই সময়েই 'অহংশূন্য' দল বা সংঘ দিব্য-জীবনের প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে—বলে গেছেন দিব্য-জীবনের দিশারী শ্রীঅরবিন্দ। বিশ্বজনের সামনে ভাসছে শ্রীমার যুগোপযোগী বাণী :

"Divine Power alone can help India. If you can build faith and cohesion in the country it is much more powerful than any man-made power."

এই নতুন মন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই অতীত ঋক্-মন্ত্রের পবিত্র সুর : 'সমানী বা আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।। যথা বঃ সুসহাসতি।।' বিশ্বমুক্তি যজ্ঞের যজ্ঞমণ্ডপে যাঁরা বিশ্বকল্যাণের ব্রত নিয়ে নিষ্কামচিত্তে সমবেত হবেন তাঁদের সমধর্মী মনে হৃদয়ে একই আকূতি ভরে থাকবে। তবেই তাঁরা সুসংবদ্ধ হতে পারবেন—অভীষ্ট সিদ্ধির কারণে।

অনেকের দলে কিছু ভাগ্যবান দিব্য-জীবনের স্পন্দন অনুভব করে দিব্যাহ্বে স্থিত হবেন। ১৯৭১ সালের আশীর্বাণীতে শ্রীমা বললেন :

"Blessed are those who take a leap towards the Future."

এখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিব্যজীবনের শিলালিপি নির্দেশিত ভবিতব্যের।

আজ বিশ্ববাসীর মনে ঝঙ্কৃত হোক মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দের গায়ত্রী-মন্ত্র : 'তৎ সবিতুর্বরং রূপ জ্যোতিঃ পরস্য ধীমহি। যন্নঃ সত্যেন দীপয়েৎ।।

আজ বিশ্বের দিকে-দিগন্তে ধ্বনিত হোক সেই প্রার্থনার বাণী যা শ্রীমা জানিয়েছেন মনস্পতির আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে : 'হে পরম-পিতা, সনাতন সত্য আমরা যেন একমাত্র তোমারই আজ্ঞাধীন হই এবং আমাদের জীবন যেন সত্যাশ্রয়ী হয়ে থাকে।' (৪৫)।

......মা বলেছেন : 'শ্রীঅরবিন্দ অতীতের সম্পদ নন্—তিনি কালজয়ী পুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরণের পথে চলমান এক আশ্চর্য প্রগতি। আমাদের প্রগতির কারণে আমরা সেই অক্ষয় যৌবনের আশ্রয় গ্রহণ করবো যাতে আমরা সমান তালে চলতে পারি, পথ-চলায় পিছিয়ে না পড়ি।' (৪৫)।

মা-র আশীর্বাদে দিব্য-অভিযানে এগিয়ে যাবার পরিবেশ, প্রস্তুতি এবং শক্তি বিশ্ববাসী পাচ্ছে—তারা এগিয়ে চলেছে এবং চলবেও। তারা চলবে ততদিন, যতদিন না মনস্পতির মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

চরৈবেতি। চরৈবেতি।। চরৈবেতি।।

(44) Nolini Kanto Gupta: The Yoga of Sri Aurobindo: Part 10: p.p. 174—5.

(45) Sri Aurobindo's Action: Special Issue: August 15, 1971

দুঃখে সুখে বাঁচো

নিখিলচন্দ্র সরকার

৩

চা খেতে খেতে অনীশের খেয়াল হলো, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। আর দুটো কি তিনটে কাঠি পড়ে আছে প্যাকেটে। সিগারেট না হলে তো রাত্রে ভীষণ কষ্ট হবে! চা শেষ করে কেটের পাঞ্জাবিটা পরে নিল সে, শালটাও জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। মানু ঘরে ছিল না; সম্ভবত অতসীর ওখানে। বেশ আছে ওরা। নিজেরাই খুশি-মতন ঘুরে বেড়ায়। অতসীর কথা ভাবতে গিয়ে কি যেন মনে পড়ে গেল হঠাৎ, আপন মনেই হাসল একটু।

দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। গাছে গাছে ছায়া ক্রমশ ঘন হচ্ছে। পাখি-দের কিচির মিচির। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ আলোটুকুও মরে যাবে। মাঠে ক্ষেতে শাল মহুয়ার মাথায় ছোপ ছোপ কুয়াশা জমছে। শীত বাড়ছে যেন একটু একটু করে। এরই মধ্যে ধুলো, ঘাস অল্প অল্প ভিজে উঠেছে।

অনীশের আজ বেরোবার কোন রকম ইচ্ছে ছিল না। দুপুরে খেতে খেতে প্রায় দেড়টা বেজে গিয়েছিল। রোদে পিঠ দিয়ে খানিকক্ষণ, গতকালের কাগজ পড়েছে, সেই খুনোখুনি, গলাকাটা। অনীশের ভাল লাগেনি। দীপেন্দুর মুখটা আবারো মনে পড়েছে। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে শেষে খেলাধুলো সিনেমার পাতা উল্টে পাল্টে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর কাগজটা একপাশে রেখে উঠে পড়েছে অনীশ। চোখ দুটোও যেন একসময় ভারী হয়ে উঠেছে। ঘরে এসে লেপটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমটা যেন কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না। অবেলায় ঘুমিয়ে খারাপই করেছে সে। শরীরটা বেজুত লাগছে, গলাটাও একটু ভার ভার।

রাস্তায় বেশ লোকজন। গরম জামা-কাপড় পরে সব বেড়াতে বেরিয়েছে। অনীশের ইচ্ছে, সিগারেট দেশলাই, আরো টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনে, তাড়া-তাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। মন্দিরটার কাছা-কাছি এসেছে অনীশ। মানু আর অতসীর সঙ্গে ওর দেখা। ওরা ফিরছে তখন। অনীশকে দেখে ওরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে, অতসী মানুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। লাজুক চোখে ও তাকে দেখছিল। অতসীর মুখে অল্প অল্প হাসি। মানুও হাসছে।

'কতটা গিয়েছিলি তোরা?' অনীশ মানুকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে করতে প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে নিল।

'কোথায় আর যাব, এখানেই ঘোরা-ঘুরি করছি।'

'মনে হচ্ছে, খুব ঘুমিয়েছেন?' অতসী তাকাল নম্র ভঙ্গিতে।

'দেখে বোঝা যায়?' অনীশ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুধোয়।

'হুঁ—।' অতসী ঘাড় হেলিয়ে ফের বলল, 'চোখ দুটো ফোলা ফোলা লাগছে।'

'নাঃ, এই অবেলার কাজটা ঠিক হয়নি।'

'আমার তো খালি ভয় হয়, ঘুমোলেই বুঝি জ্বর এসে যাবে। সেই ভয়েই দুপুরে আর ঘুম হয়ে ওঠে না।' অতসী ভরাট চোখে ওকে একবার দেখল।

'শীতকালে ঘুমোলেই দেখেছি, শরীরটা আরো বেশি ম্যাজ ম্যাজ করে।'

'তবে আর ঘুমোন কেন!' অতসী হেসে ফেলেছে। হাসিটা ওর ভারি মিষ্টি, হাসলে ওকে দেখতে আরো ভাল লাগে।

'খুব বলেছো অতসীদি, জান না তো, ঘুমের ব্যাপারে সোনাদার জুড়ি নেই!'

'একটু একটু বুঝতে পারছি!' অতসীর গলায় সামান্য কৌতুক ছিল যেন।

'ঘুমোতে পারলে ওর মতন কি আর জিনিস আছে, কি বলো অতসী?' অনীশ ওর মুখের দিকে হাসি হাসি চোখে চেয়ে রইল একটু সময়।

অতসীও হেসে ফেলল, 'কি জানি, এখনও বুঝবার সুযোগ পাইনি। ভয়ে ভয়েই পারি না। শরীরটাই গোলমাল করে ফেলে।' অতসী ছোট ছোট চোখ করে দেখল একবার।

"অনেক সময় ওষুধেরও কাজ করে এটা, তা জান?' অনীশ মুখের ওপর থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল।

'না।' অতসী মাথা হেলিয়ে হাসল, কোমল গলায় পরে বলল, "যখন শরীর খুব খারাপ ছিল, তখন খালি ঘুম পেত, বেশি হাঁটা-হাঁটি করতে পারতাম না, মাথা ঘুরত। দেখেছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার হাঁপ ধরে যেত।" অতসী এবার আরো মজা পেয়েছে যেন।

"তোমরা দেখছি ভীষণ বেরসিক।"

"মোটেই না, সবাই আপনার মতন হলে, কি ব্যাপারটা হবে একবার ভেবেছেন?" বলেই খিল খিল করে হাসতে লাগল অতসী। ওর চোখে মুখে কিসের এক দুষ্টুমি।

"সে তো হলো, কিন্তু তুমি এই এখন বেরিয়েছো যে?" মানুর গলায় কৃত্রিম বিস্ময় ও গাম্ভীর্য ছিল।

"তুই যেন অবাক হয়ে গেলি!"

"হওয়ারই তো কথা, আমি তো ভাবতেই পারছি না।" মানু চোখ মুখের এক ভঙ্গি করে হাসল।

"মানু ঠিকই বলেছে। আপনি কিন্তু সত্যিই খুব একটা বেরোন না।" অতসী গাঢ় চোখে একবার চেয়েই মুচকি হেসে সরিয়ে আনল দৃষ্টি।

"এটা ঠিক বললে না, বলতে পার কম বেরোই।" সিগারেটটা শেষ করে এনেছে অনীশ, আর কয়েকবার টেনে নিয়ে টুকরোটা ফেলে দিল, পরে সোজাসুজি ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "কোথায় আর বেরোবো বলো, সেই তো স্টেশন, ধানোয়ার রোড আর ঐ ঝিলের কাছটায় ঘোরাঘুরি করা, অনেকবার তো হয়েছে!"

"দুবেলা তাই তো করছে সবাই।"

'বিশ্বাস কর, হই হট্টগোলটা আমার ভাল লাগে না।"

"এখানে আবার হট্টগোল কোথায়?" মানু তেরছা চোখে তাকায় দাদার দিকে, পরে চোখ ঘুরিয়ে আনতে আনতে বলল, "নিজেরা খুশিমতন একটু হাঁটবো, বেড়াবো তার আবার হট্টগোল!"

"ভিড়টা আমারও একদম সয় না।"

"তুমি আর বলো না অতসীদি, একটুতেই যা হাঁপিয়ে পড় না!"

"এই, এখন হাঁপাই না।" অতসী মানুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বলল ফিসফিস করে। ও হাসছিল অল্প অল্প।

মানু ওর দাদার দিকে তাকিয়ে থেকে শুধালো, 'কোনদিকে যাবে তুমি?' অতসীও চেয়ে থাকল। ওর থুতনীটা মানুর কাঁধের কাছে ছুঁইয়ে রেখেছে।

'সিগারেট কিনতে বেরিয়েছি, ফুরিয়ে গেছে।'

'তাই বলো!'

'শুধু এইজন্যেই বেরিয়েছেন?' অতসী ওর চোখে চোখে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

'এটা একটা কারণ তো বটেই, তাছাড়া একটু ঘুরে আসা।'

'কী নেশা বাবা!' অতসী সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখেমুখে প্রচ্ছন্ন একটু মজা।

'নেশা ভীষণ পাজী জিনিস।' অনীশও ওর মুখের দিকে চেয়ে হালকাভাবে হাসল। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'তবে নেশা ছাড়া মানুষ নেই।'

'তা নেই, কিন্তু এরও তো জাতবেজাত আছে।' অতসী পিঠের চুলগুলোকে খোঁপা করে নিতে নিতে হাসল।

'মজাটা কি জান, যে নেশা করে তার কাছে ওর বিচারটা অন্যরকম।'

'ওসব বিচারে আমাদের কাজ নেই। তারচেয়ে চলো সোনাদার সঙ্গে ঘুরে আসি।' মানু তাকাল ওর দাদার মুখের দিকে।

'চল ঘুরেই আসি একটু।' অনীশও বোনের মুখের ওপর চোখদুটো কিছুসময় স্থির করে রাখল। পরে অতসীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে শুধোল, 'তোমার কষ্ট হবে না তো হাঁটতে?'

'না—।' অতসী মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল, কি ভেবে হেসে উঠল পরমুহূর্তেই। একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'মানু তো আবার এক্ষুনি বলে উঠবে, আমি হাঁটতেই পারি না, খালি হাঁপিয়ে উঠি?'

'ও নিজেই বা কি!'

'ইস্—আমার সঙ্গে অতসীদি পারবেই না হেঁটে!'

'তা হয়তো পারবো না, কিন্তু আগের চেয়ে অনেক শক্ত হয়েছি বলো।' অতসী টান টান চোখ করে একপলক দেখে নিল ওকে। বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

'কোনদিকে যাবে?'

'তোরাই বল না কোনদিকে যাবি?'

'কি অতসীদি, বলো।'

'স্টেশনের দিকে নয়, তার চেয়ে ধানোয়ার রোড অনেক নিরিবিলি।'

'তোমার খালি নিরিবিলি!' মানু অতসীকে মৃদুভাবে একটা ঠেলা মেরেছে। ওর ঐ কথা বলার মধ্যে কী এক ঈর্ষা ছিল।

অতসীও মানুকে খুব আস্তে একটা চিমটি কাটল, অস্ফুটে বলল, 'খুব ফাজিল হয়েছো, দাঁড়াও!' অতসী হঠাৎ যেন কেমন লজ্জা বোধ করতে লাগল। মানুর সঙ্গে তার এই ধরনের আকারে ইঙ্গিতে অনেক কথাই হয়। ওর কাছ থেকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতসী অনেক কিছু জেনে নিয়েছে। ওর দাদার সম্পর্কে অতসীর কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। ওর দাদাও ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়ের মতন গভীর সহানুভূতি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছে। মানুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা আরো সহজ, মধুর হয়েছে। কখনো কখনো মনে হয় ওরা যেন অনেক-কালের চেনা, পরস্পর পরস্পরের দীর্ঘ-কালের বান্ধবী। মাঝে মাঝে ইয়ার্কি ফাজলামিও চলে। মানুটা হঠাৎ হঠাৎ এমন-সব ছেলেমানুষী করে! ওভাবে তখন বলার কি দরকার ছিল ওর দাদার কাছে! বেছে বেছে ওরা দুজনই তো বাগান থেকে ফুল-গুলো তুলেছে। কোন বুদ্ধি থাকে যদি ওর, কে দিয়েছে সেটা না জানালে কি চলতো না ওর! কী লজ্জাতেই না পড়ে-ছিল সে। আবার বলে কিনা গায়ে এসে প্রজাপতি বসেছে! কি ভাবল ওর দাদা। এখনও যেন মনের মধ্যে সেই প্রজাপতিটা উড়ছে তো উড়ছেই!

'হঠাৎ যে খুব গম্ভীর হয়ে গেলে অতসীদি!'

'মোটেই নয়।' অতসী খিল খিল করে হেসে উঠেছে।

'তোমাকে গম্ভীর দেখলে আমার খারাপ লাগে।' মানুও সশব্দে হেসে উঠল।

'মাঝে মাঝে এক একটা এমন কথা বল না যে গম্ভীর না হয়ে উপায় আছে?'

'বললে তো খুব খুশি হও দেখি।'

'এমা—, কী অসভ্যরে!' অতসী ইশারা করে মিহিগলায় বলল, 'শুনবে, আস্তে বল।'

মানু খুব কাছে এগিয়ে এলো হঠাৎ, আস্তে আস্তে ইয়ার্কি মেরে বলল, 'আমি কিছু খারাপ করছি না তোমার, উল্টে বরং উপকারই করছি।'

'তুমি না আজ দুদিন ধরে যা তা বলছো আমায়!'

'ও, বললেই বুঝি দোষ, কিছু টের পাই না আমি, না?'

'মোটেই না।'

'লুকিয়ে লাভ নেই, আমারও বোঝার বয়েস হয়েছে।' একটু থেমে হেসে হেসে মানু আবার বলেছে, 'সোনাদার সম্বন্ধে তো তোমার আগ্রহের শেষ নেই।'

'তোরা ফিসফিস করে কি বলছিস আর হাসছিস রে?'

'না, কিছুই না, ও আমাদের কথা।' মানু অতসীকে জোরে একটা চিমটি কেটে দিয়েছে।

'উঃ।' অতসীও ওকে ধরতে গিয়েছে, পারল না। মানু এক দৌড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে।

সন্ধ্যের ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। গাছে গাছে পাখিদের চীৎকার ক্রমশই বাড়ছে। শোঁয়ার মতন কুয়াশা জমছিল মাঠে ক্ষেতে গাছের মাথায়। ঝোপের ভেতরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল। ঘাস মাটি গাছগাছালি লতাপাতা ধুলোর বেশ একটা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কয়েকবার টেনে টেনে গন্ধটা নাকে নিল অতসী, নিতে নিতে একবার অনীশকে পরিপূর্ণ চোখে দেখল, ওর সারা চোখে মুখে এখন কী এক সুখ যেন ফুটে রয়েছে, হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'গন্ধটা বেশ লাগে, তাই না?'

'আমার তো খুবই ভাল লাগে।'

অতসী আর অনীশ পাশাপাশি হাঁটছিল, হাঁটতে গিয়ে অনেক সময় ওর হাতটা অতসীর গায়ে লেগে যাচ্ছে। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ, ফলে অন্ধকারটা ওখানে সামান্য গাঢ় যেন।

হাঁটতে হাঁটতে অতসী এক সময় বলল, 'এই সন্ধ্যের সময়টাই বড় খারাপ লাগে আমার।' অতসীর চোখ থেকে এই মুহূর্তে যেন খানিক আগের সুখের লাবণ্যটুকু ফুরিয়ে গেল। আবার সেই ক্লান্তি, সামান্য বিষণ্ণতা, হয়তো বা কোন দুঃখও চোখ দুটোতে জড়িয়ে আছে। সে অন্য কোন কথা ভাবছিল এখন। সন্ধ্যের অন্ধকারটাকে বড় যেন ভয় তার।

অনীশ সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলল, 'কেন?'

'কেন বলতে পারবো না, আলোটুকু ফুরিয়ে এলেই আমার কী রকম করতে থাকে।'

'এটা তো জগতেরই নিয়ম। কোন মানে নেই এই ভয়ের।'

'হয়তো নেই। আগে তো এটা আমার খুবই হতো, আজকাল কমেছে। অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না।'

'অদ্ভুত লাগছে তো!'

'আমি যেন অন্ধকারটাকে বুঝতে পারি, টের পাই। আমার অস্বস্তি [illegible]। ওই সময়টুকু পেরোলেই সব [illegible] আবার।'

একটু থামল অতসী। কি ভাবল যেন মনে মনে। পরে বলল, 'আমার নিজের কি মনে হয় জানেন?' বলে অতসী আবার যেন কি ভেবে নিল, একটু উদাসীন দুঃখী গলায় বলল, 'বাবার কথা আমার প্রায় কিছুই মনে নেই, তবু একটা ছবি অস্পষ্ট-ভাবে মনে পড়েছে বহুবারই; ঠিক সন্ধ্যের মুখটাতেই বাবাকে খাটিয়ায় চাপিয়ে হরিবোল দিতে দিতে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। ওটা যেন কেমন করে সেই অবুঝ মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।' অতসী কথা শেষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানু দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'মাঠ দিয়ে যাবে?'

'না, এখন সোজাই চল, পরে সর্টকাট হবে।' অতসী বলল।

'ঠিক আছে, তুমিই তাহলে আমাদের গাইড।'

'তবে আর নেই আমি।' অতসী ক পা পিছিয়ে গেল।

'আর হলোই বা, এতে তোমার ভয়ের কিছু নেই।' অনীশ হাসছিল মৃদু মৃদু। এর এই কথার মধ্যে আরো একটা অর্থ ছিল যেন।

অতসী চোখ আনত করেছে। অনীশের কথাটা নিয়ে সে মনে মনে খানিকক্ষণ খেলা করল। হাঁটতে হাঁটতেই চুপি চুপি

এক সময় বলল, 'সময় হলে এমনিতেই হবো, কিছু বলতে হবে না তখন।' অতসী মুখ উঁচু করে এবার হেসে উঠল।

কি একটা বলার জন্যে মুখ তুলেছিল অনীশ, তাকিয়ে দেখে, মানু ওদের দিকে কেমন একধরনের চোখ করে চেয়ে আছে। সে চুপ করে গেল। কথা না বলে ওরা হাঁটছিল।

পথের দু-ধারের বাড়িগুলোর লোক এসে গেছে। আলো জ্বলছিল, হইচইও শোনা যাচ্ছে। অনেকেই রাস্তায় নেমে পড়েছে। কেউ কেউ আবার ট্রানজিস্টার নিয়েও ঘুরছে। স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটাই ধানোয়ার রোডের সঙ্গে এসে মিশেছে। বড় রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে সরু একটা পথ নেমে গিয়েছে। জমিটা এখানে অনেক ঢালু। খানিকটা এগুলে ধান জমি, আর গুটি-কতক বাড়ি। বাড়িগুলো ফাঁকা, ভাঙাচোরা। লোকজন নেই বললেই হয়, সব কেমন খাঁ খাঁ করছে। ওদিকটায় খুবই নির্জন। ফসল তুলে নেওয়ার ক্ষেতগুলোকে আরো বেশি ফাঁকা লাগে। একদিন কি খেয়ালে, রোদ উঠে যাওয়ার পরও ওদিকটায় সে দেখতে গিয়েছিল, তখনই কেমন এক অস্বস্তি হয়েছিল তার। এখানে কারা ছিল একদিন?

খানিকটা এসে একটা মুদির দোকান পেয়েছে ওরা। দোকানের মালিক একজন বাঙালী। পুরনো, রং উঠে যাওয়া একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে দোকানের মাথায়। নির্ভরযোগ্য বাঙালীর একমাত্র প্রতিষ্ঠান নাকি। বিজ্ঞাপনে আছে সর্ব রকমের সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায় এখানে। কটা লোক একটা বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়ছে, চা খাচ্ছে, কেউ কেউ আবার কোথায় কি দেখার আছে, খাওয়ার ব্যবস্থা কি ইত্যাদি জেনে নিচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, আরো বহু রকমের খবরাখবর নিচ্ছে।

এগিয়ে এসে অনীশ সিগারেট আর দেশলাই কিনল। একটা বিস্কুটের প্যাকেট আর চা-ও নিয়েছে। কাল সকালেই তো আবার লাগবে। অনেক দিন থাকবে বলে একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। একটা কথা ভদ্রলোককে আজ জানাবারও দরকার ছিল অনীশের। আগামীকাল আধ মণের মতন চাল পাঠিয়ে দিতে বলে গেল।

রাস্তায় নেমে অনীশ সিগারেট ধরাল। ওরা আস্তে আস্তে হাঁটছিল। কটা গরুর গাড়ি শব্দ করে করে চলে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় বাড়ি, বাগান, ইউক্যালিপটাস গাছ, রাস্তার ঠিক ওপরই শিশু-গাছ আর আম।

এক সময় অতসী চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ, দেখ মামু।"

সবাই তাকিয়ে দেখল, বিরাট চাঁদটা গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে উঠে আসছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার সরে যাচ্ছিল।

অনীশ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বলল, "চাঁদটাকে আজ সম্পূর্ণ নতুন লাগছে। সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল।"

"কলকাতায় থাকতে একদিনও দেখিনি এসব।"

"আমরাও না।" মানু অতসীর কাঁধে একটা হাত রাখল। অল্প অল্প হাসছিল ও। "কোত্থেকে দেখবি, যেখানে আলো-হাওয়াই ঢুকে না, সেখানে আবার চাঁদ!" অনীশ খানিকটা ধোঁয়া গিলে ফেলেছে, কথা বলতে গিয়ে গলার কাছে কি যেন একটা আটকে গেছে মনে হলো। হঠাৎ কেমন কাশি এলো তার।

"হয়তো কখনো সখনো ভুল করে দেখে ফেলেছি, মনে নেই কিছু।" অতসী সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবল, পরে আস্তে আস্তে বলল, "দু-জায়গার পরিবেশই আলাদা, এখানে তো যা দেখছি সবই ভাল লাগছে আমার।"

"আমারও ভীষণ ভাল লেগেছে অতসীদি।" মানু হেসে উঠল। আবেগে চোখ ছোট ছোট হয়ে এসেছে ওর। অতসীকে জড়িয়ে ধরেছে ও।

"আসলে কলকাতা আমাদের অনেক-কালের চেনা তো, তাছাড়া সুখের চেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতাই বেশি ওখানটায়।" অনীশ সিগারেট টানতে টানতে অতসীকে একবার দেখে নিল।

"ওসব ভাবলে এখনও আমার ভয় হয়।" অতসীর গলাটা যেন বেদনায় ভিজে উঠেছে। কথা বলতে বলতেই সে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

চাঁদটা ইতিমধ্যে আরো অনেকখানি উঠে এসেছে। লাল টকটকে পোষাকটা আর নেই এখন। স্নিগ্ধ নরম জ্যোৎস্নায় সব ভরে উঠেছে। ওরা হাঁটছিল আস্তে আস্তে। একটা মোটরগাড়ি জোরালো হেডলাইট জ্বালিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। ওরা সরে দাঁড়িয়েছে একপাশে। নাকে মুখে রুমাল চেপে ধরেছে। ধুলো কমলে আবার হাঁটতে লাগল। অতসী তখনো রুমাল চেপে রয়েছে মুখে। বিরক্তি নিয়ে সে বলে উঠল, "লোকগুলো একেবারে অসভ্য, ইতর।"

গাছের ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। দেখে মনে হয় কে যেন নিপুণ হাতে আলো-ছায়ার বরফি কেটে রেখেছে। মানুর কি খেয়াল হলো হঠাৎ। ওই কালো আর সাদার ছকের ওপর দিয়ে সে এক্কা-দুক্কা খেলার মতন করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল।

অনীশ সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল একটু পরে। অতসী আরও ধীরে-ধীরে হাঁটছিল। অনীশ জিজ্ঞেস করল, "তোমার মামা আজ বেরোন নি!"

"তা কি আর বেরোয় নি, তবে আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি!"

"উনি খুব দেশ ঘুরেছেন, অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে নাকি, কিছু-কিছু বলবেন বলেছেন।"

রাঙা মামার চাকরিই তো বাইরে-বাইরে, অনেক জঙ্গলে-টঙ্গলেও গেছেন।" একটু সময় চুপ করে থাকে অতসী। অনীশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল, "মাকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল, কোথাও বেরোতে চায় না।"

"আমার মারও তাই। ঘরের কাজই যেন ফুরোয় না!" অনীশ হাসতে থাকে, অতসীও হাসল।

"আমার মার ব্যাপারটা একটু আলাদা।" অতসী দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, "পরের ঘরে খেটে খেটে মা যেন আজ নিজের অধিকারটাও ভুলে গেছে। মার দিকে তাকালে আমার কষ্টই বাড়ে খালি।" অতসীর গলা ধরা-ধরা, একটু বিষণ্ণও। ও মুখ নীচু করে হাঁটছিল।

অনীশও কথা বলল না কিছু সময়, সেও নীরবে ওর পাশে পাশে হাঁটছে। কি ভেবে ওর দিকে তাকাল, অতসীর মুখের ওপর বিষণ্ণতাটুকু এখনও যেন লেগে রয়েছে. ওকে দেখতে দেখতে অনীশ বলল, "দুর্ভাগ্য যে কখন কার ওপর কিভাবে আসে বলা শক্ত, এই সানুকেই দেখ না। এরই মধ্যে সব শেষ করে বসে আছে ও।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে অন্যদিকে চোখ ফেরাল সে, একটু নীরব থেকে আবার বলল, "আমরা যে ওকে এত করে বলি একটু ঘোর-টোর, ভাল লাগবে, ও শুনেই না। কথাও কম বলে আজকাল।"

"মানুর কাছে আমি সব শুনেছি।" বলতে বলতে চোখ তুলেছে অতসী। কি একটা ভাবতে ভাবতে একটু পরে আবার বলল "সানুদির আর দোষ কি, আমিও তো দেখেছি, দুঃখ অসহ্য হলে কথাও কমে যায়, কিছুই ভাল লাগে না তখন।"

"সময়ও তো পিছিয়ে আসে এক সময়।"

অতসী চোখ ছোট ছোট করে একবার দেখল অনীশকে, বলল, "আসে, তবে কারো কারো বেলায় অনেক সময় লাগে।"

"আমি তো উল্টোটাই দেখছি, যত দিন যাচ্ছে, সানুটা যেন আরো মনমরা হয়ে যাচ্ছে. মনে মনে ভীষণ ভেঙে পড়ছে ও।"

"ছোটটাও তো কম নয়!"

"তাই বলে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে না?" অনীশ অন্যদিকে তাকাল। তার কষ্ট হচ্ছিল।

"হয়তো চেষ্টা করছে সান্দি, পারছে না।"

"সংসারে কম-বেশি আমরা সবাই তো দুঃখ পাই, পেয়েছি, কে জানে আরো হয়তো পাওনা আছে অনেক, তবু এর মধ্যেই আমাদের মানিয়ে চলতে হয়, না হলে বাঁচা যায় না!" একটু থেমে আবার বলল, "এছাড়া উপায়ই বা কি! ঠেকানো যখন সম্ভব নয় আমাদের, তখন মেনে নেওয়ার জোরটুকুই দরকার।" অনীশ চুপ করল, সিগরেট ধরাল আবার, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল। কি ভেবে অতসীর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধলো, "তুমি দুঃখ পাওনি, আমি পাইনি?"

অতসী অস্ফুটে বলল, "পাইনি আবার!"

"পাই বলেই তো অন্য দুঃখকেও মেনে নিতে পারি।" ধোঁয়া ছেড়ে অনীশ আবার বলল, "সান্টা না বোকা, ভীষণ বোকা।" বোঝা যাচ্ছিল অনীশ বোনের জন্যে এই মুহূর্তে গাঢ় মমতা ও কষ্ট বোধ করছিল। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছিল সে।

একটু সময় কোন কথা বলল না কেউ। সান্দির জন্যে ওরও এখন দুঃখ হচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে অনেক দিন সে দেখেছে, সান্দি বসে পড়েছে এক জায়গায়। ঘুরতেও ভাল লাগে না। কেমন উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জড়ানো গলায় মানুকে বলেছে, "তোরা যা। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।" অতসী অবাক হয়ে গেছে। পরে মানু তাকে সব বলেছে এক এক করে। সংসারে কি তারা এতই দুঃখী। ভাবতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসে বুকটা ভরে উঠেছে শুধু।

অতসী এখন অন্য কথা ভাবল। এই দুঃখের প্রসঙ্গ আর ভাল লাগে না। ওর মুখের ওপর থেকে ম্লান ভাবটা সরে গেছে এখন। সামান্য হেসে বলল, "এখানে এসে তো আমার খুবই ভাল লাগছে। সব নতুন মনে হচ্ছে আমার। না এলে অনেক কিছুই হারাতাম!" অতসী চোরা চোখে দেখতে দেখতে হাসল কি ভেবে।

"হ্যাঁ—, আমিও তো বলি, এসব জায়গায় মানুষ শরীর মন সারাতেই আসে।" অনীশ হেসে উঠল।

অতসীর মাথায় কী এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে, চোখের তারায় দুষ্টুমি, অল্প-অল্প হাসছে, বলল, "মনের ব্যাপারটা বড় জটিল।"

"জটিল বলে কি তাকে আরো জটিল করতে হবে?" অনীশ একদৃষ্টে চেয়ে থাকল ওর মুখের দিকে।

অতসী হাসল, "কেউ কি আর সাধ করে তা করে, হয়ে যায়।" পরে ধীর গলায় বলে, "এই আমাকেই দেখুন না, আপনারা না থাকলে যে কী হতো কে জানে।" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার।

"আমরা তো উপলক্ষ মাত্র।"

"উপলক্ষ!" শব্দটা টেনে টেনে অস্ফুটে উচ্চারণ করল অতসী। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলল, "ভাগ্যিস, এই উপলক্ষটাই সময় সময় আসলের মতন হয়ে যায়!"

"কি জানি!" অনীশ মজা করে হাসছিল।

"আপনি স্বীকার করেন না?" অতসী পরিপূর্ণ চোখে তাকাল অনীশের দিকে।

"অস্বীকারও করছি না, হলে তো ভালই।" সিগারেটটা খেতে আর ইচ্ছে করছিল না তার, ফেলে দিল বিরক্তিতে। সকাল থেকে আজ অনেকগুলো খাওয়া হয়ে গেছে। জিভে যেন কোন স্বাদ নেই। একটু একটু জ্বালাও করছিল।

অতসী নীচু হয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা আমপাতা কুড়িয়ে নিল, পাতাটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, "আমার এইটুকু বয়েসেই কম অভিজ্ঞতা হলো না, আমি তো দেখেছি অন্যের দুঃখ বোঝে, এমন মানুষের সংখ্যা সংসারে বড় কম।" অতসী মুখ নীচু করেছে। ধীরে ধীরে হাঁটছিল ওর পাশে পাশে।

অনীশ সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। অতসীর এই কথাগুলো তার মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলেছে যেন। এটা ওর কথার কথা নয়, অতসীর বিশ্বাস। ওর মতন সেও তো অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছে, তার দুঃখও বুঝতে চায়নি কেউ. বিশ্বাস করে ঠকেছে, কষ্টই বেড়েছে শুধু। অনীশ কেমন আবেগ বোধ করছিল, বলল, "তুমি জান না অতসী, আমরাও যে পোড়খাওয়া, অনেক কিছুই দেখেছি।"

অতসীর চোখেও এক ধরনের আবেশ নেমে এসেছে, অনুচ্চ গলায় বলল, "আপনাদের সঙ্গে মিশে এই কদিনেই মনে হয়েছে, আপনারা যেন আমাদের অনেক কালের চেনা, দীর্ঘদিনের আত্মীয়।"

"কথাটা সবার ক্ষেত্রেই খাটে।" দুজনেই চোখে চোখে তাকাল, কি ভেবে একসঙ্গে হেসে উঠল।

মানু দাঁড়িয়ে পড়েছে, বলল, "আরো এগোবে?"

"কি দরকার, এবার ফেরা যাক।" অতসী অনীশকে আস্তে করে বলল।

"হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তোমার?"

"বলুন তো, আরো অনেকটা যেতে পারবো।"

"না, এই হিম খাওয়া ঠিক হবে না আর, ফিরেই চলো।" পরে অনীশ মানুকে ডাকল, আজ আর নয়, চলে আয়।"

মানু এগিয়ে এলো।

"এবার বাড়ি চলো মানু।" অতসী মানুর ওপর চোখ রেখে হাসল, হেসে হেসেই ফের বলল, "আমি কিন্তু আরো যেতে পারতাম।"

"তাই তো দেখছি!" মানুও মুচকি মুচকি হাসছিল।

অতসী মাথা মুখ ঘোমটার মতন করে ঢেকে নিয়েছে। ঠান্ডা ক্রমশই বাড়ছে। পা দুটোও ভিজে উঠেছে শিশিরে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল সব। সেই জ্যোৎস্না-ভেজা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অতসী বারবার যেন অন্যমনস্ক হচ্ছিল।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের কথা

* গ্রামের মানুষের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা— একটি পরাজয়ের দলিল

* আবহাওয়াকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সর্বনাশা পরিকল্পনা

আমাদের দেশে শতকরা আশিজন থাকেন গ্রামে। কাজেই দেশের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার কিছু ব্যবস্থা করতে গেলে গ্রামের দিকেই আগে নজর দেওয়া দরকার। এখনো পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে হেল্‌থ সেণ্টার ইত্যাদির মাধ্যমে যতোটুকু আয়োজন করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য, তদুপরি চিকিৎসক ও ওষুধপত্রের অভাবে অকার্যকর। তা ছাড়া, সরকারী দুর্নীতি তো আছেই, যার প্রশ্রয়ে এমন কি পরিবার পরিকল্পনা পর্যন্ত ভেস্তে যায় ও লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব হতে পারে।

যাই হোক, শোনা যাচ্ছে ভারত সরকার গ্রামাঞ্চলের জন্যে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা রচনা করেছেন এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তা কার্যকর হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় পরামর্শে ও কেন্দ্রীয় অর্থানুকূল্যে রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে এই রকম : রেজিস্ট্রিভুক্ত চিকিৎসকরা (যোগ্যতাসম্পন্ন ও যোগ্যতাহীন), যাঁরা কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন বা শিক্ষানবীশী করেছেন এবং ভারতীয় ব্যবস্থা মতে (আয়ুর্বেদ, য়ুনানী, সিদ্ধা) ও হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন, তাঁরাই ২,০০০ বা তারও বেশি গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার নেবেন। তারাই হবেন রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার বা গ্রামের চিকিৎসক। চার মাসের একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে তাঁদের জন্যে। প্রশিক্ষণের উদ্যোক্তা হবেন ভারতীয় ভেষজ ও হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রীয় গবেষণা পরিষদ। প্রশিক্ষণ চলবে আয়ুর্বেদীয়, হোমিওপ্যাথিক, য়ুনানী ও সিদ্ধা কলেজে, হাসপাতালে ও ভারতীয় ভেষজের প্রথম শ্রেণীর ডিসপেনসারিগুলিতে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে গ্রামের চিকিৎসকদের এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলা যাতে তাঁরা সাধারণ পীড়াগুলির নির্ণয় ও চিকিৎসা করতে পারেন, রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারেন, স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, প্রাথমিক শারীরবিদ্যার জ্ঞান অর্জন করেন, গুরুতর রোগগুলো ঠিকভাবে চিনতে পারেন ও সেই রোগাক্রান্তদের বড়ো হাসপাতালে পাঠাতে পারেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, চার মাসের প্রশিক্ষণের মধ্যেই এই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা যাবে, অর্থাৎ গ্রামের চিকিৎসকরা উল্লিখিত বিষয়গুলোতে পারঙ্গম হয়ে উঠবেন। চার মাসের প্রশিক্ষণে কতটা সময় কোন বিষয়ে তারও একটা হিসেব পরিকল্পনায় পাওয়া যাচ্ছে। ছয় সপ্তাহে শারীরবিদ্যা, শারীরস্থান, স্বাস্থ্য বিষয়ক ধারণা, রোগ এবং রোগের উদ্ভব ও বিস্তার, সাধারণ আঘাত ও ক্ষত, পৃথক পৃথক রোগ ও রোগনির্ণয় এবং বড়ো হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে রোগের সঠিক বিচার। বাকি দশ সপ্তাহে পৃথক পৃথক রোগের চিকিৎসা ও তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থাদি। এই দশ সপ্তাহের মধ্যে তিন সপ্তাহে আয়ুর্বেদ, চার সপ্তাহে হোমিওপ্যাথি ও তিন সপ্তাহে প্রাথমিক চিকিৎসা (ফার্স্ট এইড) সমেত অ্যালোপ্যাথি।

গ্রামের চিকিৎসকদের থাকতে হবে হেল্‌থ সেণ্টারের মেডিকেল অফিসারের পরিচালনায়। তাঁরা বেতন পাবেন মাসে ১৫০ টাকা, ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। গ্রামের যে-সব মানুষ চিকিৎসিত হবেন তাঁদের মধ্যে তিন একরেরও অধিক জমির মালিকদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া হবে—প্রেসকৃপসনের জন্যেও, ওষুধের জন্যেও (অথচ এই মানুষটিই যদি শহরের সেরা হাসপাতালে যান কিংবা হেল্‌থ সেণ্টারে তাহলে বিনা পয়সায় চিকিৎসিত হতে পারেন)।

পরিকল্পনাটি শুধু যে অবৈজ্ঞানিক তাই নয়, বিপজ্জনকও বটে।

অবৈজ্ঞানিক এ কারণে যে গ্রামের এই চিকিৎসকদের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের বিজ্ঞানসম্মত নয়। কথাটা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। রোগ সারাবার জন্যেই ওষুধ, রোগ সারাবার বিদ্যে হিসেবেই ওষুধের শুরু। ওষুধ দিতে হলে অবশ্যই জানতে হয় কোন রোগে কী ওষুধ ইত্যাদি। যাকে বলা হয় ভেষজবিদ্যা। এই ভেষজবিদ্যা সব সময়েই যে বিজ্ঞানসম্মত ছিল তা নয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের জন্যে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বহুবিধ উপায় অবলম্বিত হয়ে এসেছে, কোনোটা ফলপ্রসূ, কোনোটা নয়। আগেকার কালে এই সমস্ত উপায়ের মূলে ছিল অনেকখানি কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস। বিজ্ঞানকে তখন পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজকের দিনের অবস্থা তা নয়। ভেষজবিদ্যা এখন নিশ্চিতরূপেই একটা বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গত কারণেই আগেকার কালের ফলপ্রসূ উপায়গুলোও এখন এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের কোনো একটি দেশজ উপায় ভেষজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবার পরে দেশজ থাকে না, হয়ে ওঠে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অবশ্যই গ্রহণীয়। কাজেই দেশের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের জন্যে এখন আমরা কাকে গ্রহণ করব— যে-কোনো দেশজ উপায়কে, না ভেষজ-বিজ্ঞানকে? অবশ্যই বিজ্ঞানকে। আর এই বিজ্ঞানের মধ্যেই তো দেশজ প্রত্যেকটি উপায় যথোচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে অন্তর্ভুক্তও হয়ে থাকে। এ-কারণে একথা কেউ বলবেন না যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের দেশজ উপায়গুলো নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান বন্ধ হোক। বরং উল্টো। সারাদেশ জুড়ে আরো বৃহৎ পরিকল্পনা ও আরো প্রচুর অর্থসংস্থান নিয়ে এই গবেষণা ও অনুসন্ধান চলুক। তাতে ভেষজবিজ্ঞানই সমৃদ্ধ হবে, বিজ্ঞান হিসেবে আরো সম্পূর্ণতা পাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাটা থেকেই যায়, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের গ্রাহ্যপথ একটিই—ভেষজবিজ্ঞানের পথ। দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

বলা বাহুল্য, ভেষজবিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে নি। বিশেষ করে গ্রামের মানুষদের কাছে একেবারেই না-পৌঁছবার মতো। সেটা ভেষজবিজ্ঞানের দোষে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। দেশের সরকারও এজন্যে অবশ্যই দায়ী। কিন্তু এ ব্যাপারটার ফল হয়েছে মারাত্মক। ভেষজবিজ্ঞান যেখানে পৌঁছতে পারেনি সেখানে অখণ্ড প্রতাপে কায়েম হয়ে রয়েছে তাগা-তাবিজ, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড [illegible] ত ধাতু ধারণ, অন্ধবিশ্বাস ও এমনি আরো অনেক কিছু। হাতুড়েদের পসার হয় এ-কারণে যে কিছু রোগ বিনা ওষুধেই সারে (হয়তো একটু বেশি সময় নিয়ে)। কোনো একটি টোটকায় অসুখ সারলেও সারতে পারে কিন্তু তাই বলে সেই টোটকাটি চলতে পারে না, যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই টোটকার বিশ্লেষণ চাই, তাকে ভেষজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা চাই। তাই বলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের জন্যে সরকারী কোনো পরিকল্পনায় এগুলো গ্রাহ্য নয়।

সরকারী পরিকল্পনায় 'অ্যালোপ্যাথিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভেষজবিজ্ঞানের কোনো বইয়ে কিন্তু এই শব্দটি পাওয়া যাবে না। অভিধানে অবশ্যই আছে। শব্দটি প্রথম প্রবর্তন করেন 'হ্যানিমান্'। তাঁর নিজের চিকিৎসা-ব্যবস্থাটি হচ্ছে হোমিওপ্যাথি, তার বাইরে অন্য চিকিৎসা-ব্যবস্থা হচ্ছে অ্যালোপ্যাথি—যে ব্যবস্থায় লক্ষণের বিপরীত ক্রিয়া বিশিষ্ট ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। যাই হোক, এই 'অ্যালোপ্যাথি' বিদ্যা রপ্ত করার জন্যে সরকারী পরিকল্পনায় বরাদ্দ সময় মাত্র তিন সপ্তাহ—তারই মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার বিদ্যাটিও রপ্ত হবার কথা। আধুনিক ভেষজবিদ্যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান যাদের নেই একমাত্র তাঁরাই এমন একটি অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা ভাবতে পারেন।

তাহলে এই পরিকল্পনায় কোন উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? একদল যোগ্যতাসম্পন্ন বা যোগ্যতাহীন ব্যক্তি—যারা আয়ুর্বেদ ইউনানী সিদ্ধা বা হোমিওপ্যাথি সম্মত চিকিৎসা করে থাকে—তাদের ১৬ সপ্তাহের জন্যে একজোট করে আয়ুর্বেদ হোমিওপ্যাথ ও অ্যালোপ্যাথের অপাচ্য ককটেল গেলানো হচ্ছে এবং তাদেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে মানুষের চিকিৎসার ভার। অর্থাৎ সরকারী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের একমাত্র বৈজ্ঞানিক পথটি পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই চিকিৎসাও বিনামূল্যে নয়। জমির পরিমাণের ওপরে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধের মূল্য ধার্য হবে। জমির পরিমাণ নির্ধারণ করবে কে? সরকারী নথিপত্র থেকে তার কোনো হদিশ পাওয়া যাবে কি?

এই ষোল সপ্তাহের প্রশিক্ষণ যদি প্রকৃত ভেষজবিজ্ঞানেও হত তাহলেও গ্রামের এই চিকিৎসকরা চিকিৎসাবিদ্যায় বা এমন কি রোগনির্ণয়েও কতখানি পারঙ্গম হতে পারতেন সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকও বহু বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েও অনেক সময়ে রোগনির্ণয়ে ভুল করে থাকেন। অভিজ্ঞতা যতো কম, ভুল হবার সম্ভাবনা ততো বেশি। প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের একটা সীমানা থাকা দরকার যাতে রোগনির্ণয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে না পারে।

পরিকল্পনার রচনাকারীরা (অর্থাৎ ভারত সরকার) বলছেন, 'আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ভেষজব্যবস্থায়' রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা বড্ড বেশি 'সফিস্টিকেটেড', তার জন্য প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম চাই, প্রচুর অর্থ চাই। গ্রামে গ্রামে আরো বেশি হেলথসেন্টার স্থাপন করার মতো অর্থ সংস্থানও নেই। তা ছাড়া 'অ্যালোপ্যাথিক ভেষজব্যবস্থায়' শিক্ষিত ডাক্তাররা শহরের সুখসুবিধা ছেড়ে গ্রামে যেতে চান না। অতএব—

অতএব গ্রামের মানুষের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া হোক এমন একদল ব্যক্তির হাতে যাঁরা 'ভারতীয় ভেষজব্যবস্থা, হোমিওপ্যাথি, য়ুনানি ইত্যাদি' মতে চিকিৎসা করে থাকেন!

সমস্যাটি বিরাট সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারত সরকারের এই জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় (গ্রামের মানুষের জন্যে) সমস্যার মোকাবিলা করা হচ্ছে না, সমস্যার সামনে পরাজয় স্বীকার করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে গ্রামের মানুষ ভেষজ-বিজ্ঞানের সুফল থেকে পুরোপুরিভাবেই বঞ্চিত হবেন।

*

কলকাতার সোভিয়েত প্রচার দপ্তর থেকে ৬ জুলাই তারিখে প্রচারিত বুলেটিনে নিচের সংবাদটি রয়েছে, যা এই সঙ্গে পড়া যেতে পারে।

১৯৭৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৮৪০,০০০ ডাক্তার

আগামী শরৎকালে ৪০,০০০ জন নতুন ডাক্তার এবং ফার্মাসিউটিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে যোগদান করবেন।

শহর এবং গ্রামের পলিক্লিনিকগুলিতে হাসপাতালে, কারখানায় এবং দূরবর্তী পার্বত্য গ্রামগুলিতে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা কাজে নিযুক্ত থাকবেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মধ্যএশিয়া, সাইবেরিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের নতুন প্রকল্পগুলিতে কাজ করার ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সমস্ত স্নাতকই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে কাজ পাবেন।

নতুন ডাক্তারদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক আছে। স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নগুলিতে ৮০টিরও বেশি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষাকেন্দ্র আছে। স্নাতকদের চিকিৎসা বিষয়ে সর্বপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। বাইওফিসিকস, চিকিৎসাবিষয়ক মনস্তত্ত্ব, ইলেকট্রনিকস এবং সাইবারনেটিকস—এসবই তাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত।

ডাক্তারের সংখ্যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর অত্যন্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকেও অতিক্রম করেছে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ডাক্তারের সংখ্যা হবে ৮৪০,০০০।

জারের আমলের রাশিয়ায় মানুষের জীবনের প্রত্যাশিত গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর। আর বর্তমানের সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের জীবনের প্রত্যাশিত গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭০ বছর।

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার ৫০ বছরে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে যে বৈষম্য ছিল সে বৈষম্য এখন লুপ্ত হয়েছে।

আবহাওয়াকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সর্বনাশা মার্কিনী পরিকল্পনা

যুদ্ধাস্ত্র সীমিত করা হবে, জৈব-রাসায়নিক যুদ্ধ বন্ধ করা হবে—এমনি ধরনের ঘোষণা বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষ থেকে গত কয়েক মাসে নানাভাবে শোনা গিয়েছে। এই নিয়ে বড়ো গোছের সম্মেলন হয়েছে (সল্ট), দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা হয়েছে (সোভিয়েত-মার্কিন শীর্ষ বৈঠক), এমন কি গোটাকতক চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। যুদ্ধাস্ত্রের প্রসার আরো ব্যাপক হয়েছে, জৈব-রাসায়নিক যুদ্ধ বন্ধ হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সকলেই বুঝতে পারেন, কথাটা বলা হচ্ছে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে লক্ষ করে, কেননা আজকের দুনিয়ায় একমাত্র এই রাষ্ট্রটিই অপর দেশের জমিতে যুদ্ধে লিপ্ত। সম্প্রতি আরো ভয়ংকর কথা শোনা যাচ্ছে। মার্কিনী যুদ্ধবাজরা নাকি এমন একটি প্রকল্প রচনা করেছেন—সাংকেতিক ভাষায় যার নাম দেওয়া হয়েছে 'নাইল ব্লু'—যেটি কার্যকর হলে আবহাওয়াকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলবে। অর্থাৎ আবহাওয়ার মধ্যে এমন একটা অদলবদল ঘটানো হবে যার ফলে সামরিক প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

ভিয়েতনামে মার্কিনীরা কি-ধরনের যুদ্ধ চালাচ্ছে, বিশেষ করে জৈব-রাসায়নিক যুদ্ধ,

তার কিছু বিবরণ বিজ্ঞানের কথায় আগে আমরা দিয়েছি। এমন সমস্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে বৃহৎ এলাকা জুড়ে অরণ্য নিশ্চিহ্ন, সেটা এমনই শোচনীয় ভাবে যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেখানে নতুন অরণ্য সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা কম। ফলে পশুপাখির জগতও লোপ পাবার মুখে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা তো বটেই, এমন কি খোদ আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও এই ক্রুর ধ্বংসকাণ্ডের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের নিন্দা করেছেন এবং বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার বন্ধ করার দাবি তুলেছেন। নির্বিচারে বোমা ফেলাটাও প্রকাণ্ড একটা যুদ্ধাপরাধ। শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপরে নয়, মার্কিনীরা ভিয়েতনামের যেখানে-সেখানে বোমা ফেলে যাচ্ছে, এমন কি শহরের বাইরে ফাঁকা এলাকাতেও। ফলে গোটা দেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে বড়ো বড়ো গর্ত, যেখানে জল জমে আর মশার জন্ম হয়। ভিয়েতনামে ম্যালেরিয়া রোগটি যে আবার ফিরে এসেছে সেজন্যে সরাসরি দায়ী মার্কিনী যুদ্ধবাজরা। আরও শোনা যাচ্ছে, বোমা ফেলে বাঁধগুলো নাকি ভেঙে দেওয়া হবে। তার মানেই গোটা দেশে প্লাবন। এ থেকে বোঝা যায় মার্কিনী যুদ্ধবাজরা কি ধরনের যুদ্ধ চালাতে চায়।

এমনি ধরনের যুদ্ধ চালাবারই নতুন অস্ত্র—নাইল ব্লু। অরণ্য লোপ করা, ম্যালেরিয়া ডেকে আনা, প্লাবন ঘটানোর চেয়েও এবারের অস্ত্র আরো, কী বলব, পৈশাচিক। আর কোনো শব্দ না পেয়ে পৈশাচিক বললাম। ব্যাপারটা জানলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন, এমন কি পিশাচরাও তুলনায় অনেক মানবিকবোধ-সম্পন্ন।

এই অস্ত্র কোনো বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তৈরী নয়। এ হচ্ছে এমন কতকগুলো উপায় যা আবহাওয়াকে বদলে দেয়। যেমন, বৃষ্টি ঝরানো। বিজ্ঞানের কথার পাঠকরা জানেন নির্দিষ্ট এলাকায় কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটাতে বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, তাঁদের এই সাফল্য খরা এলাকায় কৃষিকাজের সহায়ক হবে। কিন্তু মার্কিনী যুদ্ধবাজরা এই সাফল্যকেই ব্যবহার করতে চায় যুদ্ধের প্রয়োজনে। সম্ভবত ইতিমধ্যেই ব্যবহার শুরু হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে জবরদস্তি বৃষ্টি ঝরানোর এলাকাটি, অনেকের অনুমান, হো চি মিন সড়ক।

শুধু বৃষ্টি ঝরানো নয়, আরো আছে। ভূমিকম্প, বন্যা, তাপমাত্রায় হেরফের ঘটিয়ে প্রাণিজগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি—এই হচ্ছে অস্ত্রের আরো কয়েকটি প্রয়োগ। অর্থাৎ, প্রকৃতিজগতে এমনিতেই যে অস্থিরতাগুলো থেকে গিয়েছে তাকে এমনভাবে উস্কে তোলা যাতে একটা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে যেতে পারে, প্রকৃতিজগতে যা মাঝে মাঝে ঘটেও থাকে।

আরো আছে। সকলেই জানেন আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকে ওজোন গ্যাসের একটি স্তর আছে যা সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মিকে ঠেকিয়ে রাখে। এই ওজোন স্তরটি আছে বলেই সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারে না ও জীবজগৎ বেঁচে যায়। অর্থাৎ মায়ের আঁচলের মতো একটি পর্দা যেন পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। মার্কিনী অস্ত্রে এই পর্দায় ফুটো করার কথা বলা হয়েছে। তখন? তখন সেই ফুটো দিয়ে অতি-বেগুনী বিকীরণের পুরো ঝলকটি এসে পড়বে ফুটোর তলার নির্দিষ্ট এলাকার মাটিতে এবং সেখানকার গোটা জীবজগৎ ছারখার করে দেবে।

ওজোন পর্দায় ফুটো করাটা মোটেই অসম্ভব কাজ নয়। ভৌতিক উপায়ে হতে পারে, রাসায়নিক উপায়েও। শুধু ফুটোটি করার সময়ে হিসেবটি এমন পাকা হওয়া চাই যেন ফুটোর তলার নির্দিষ্ট এলাকার মাটিটি হয় ভিয়েতনামের।

ভূমিকম্প? কোনো জায়গায় ভূমিকম্প ঘটতে চলেছে কিনা, এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আগে থেকে তা বলতে পারেন না। কিন্তু কোনো জায়গার ভূস্তকের টানগুলো যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় তাহলে ঠিক সময় বুঝে দূরে একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই জায়গাটিতে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব।

বন্যা? এক্ষেত্রেও ঠিক-ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক মাত্রায় কতকগুলো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নির্দিষ্ট একটি এলাকার ওপরে আছড়িয়ে পড়ে।

নাইল ব্লু প্রকল্পের সবটাই জানা গিয়েছে তা নয়। ইউরোপের পত্রপত্রিকায় এ-বিষয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে 'সায়েন্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিপোর্ট' (খণ্ড ১, সংখ্যা ২২)-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সূত্রে। তবে যারা এই প্রকল্পের রচয়িতা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ—তারা এ-ব্যাপারে একেবারেই নির্বাক, একটি কথাও প্রকাশ করতে রাজী নয়। প্রবন্ধলেখক অন্য নানা সূত্রে খবর সংগ্রহ করেছেন। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১৯৭২ সালে ৩০ লক্ষ ডলার খরচ করা হচ্ছে।

হিমালয়ের জন্ম কিভাবে?

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, দুই মহাদেশের মধ্যে ধাক্কা লাগার ফলে কিভাবে পর্বত গড়ে ওঠে হিমালয় হচ্ছে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক্ষেত্রে দুই মহাদেশের একটি হচ্ছে ভারত, অপরটি অবশিষ্ট এশিয়া। কিন্তু হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল জিও-ফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডঃ আর এন আথাভালে বলছেন, দুই মহাদেশের মধ্যে ধাক্কা লাগার জন্যে নয়, হিমালয় তৈরী হয়েছে ভারত নামক মহাদেশ ও টেথিআন নামক সমুদ্রতলবাহী ভূত্বকের দুই অংশের মধ্যেকার শক্তির ফলে। টেথিআন সমুদ্র বিস্তৃত ছিল আজকের ভারত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, আজ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগে। ভারত ছিল আফ্রিকার লাগোয়া, অতীতের বিরাট মহাদেশ গোন্ডওয়ানাল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত। সেখান থেকে প্রাচীন টেথিআন সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে উত্তরদিকে সরতে সরতে ভারত শেষপর্যন্ত এশিয়ায় পৌঁছেছে। ডঃ আথাভালের মতে, দুই মহাদেশের মধ্যে এই ধাক্কা লাগার আগেই হিমালয় তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কেননা, সাম্প্রতিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে বয়সের হিসেবে হিমালয়ের কোনো কোনো পাথর এই ধাক্কা লাগারও আগেকার কালের।

নীল তিমির ভবিষ্যৎ

জীবিত প্রাণীদের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে নীলতিমি, লম্বায় ১০০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে, ওজনে ১০০ টন পর্যন্ত। আশঙ্কা করা হচ্ছে, নীলতিমি লোপ পাবার মুখে। লোপ যাতে না পায় সেজন্যে গত কয়েক বছরে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নীল তিমির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

নীল তিমি যদিও কোনো বিশেষ এলাকার নয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় মেরু সমুদ্রে, বিশেষ করে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। তারপরে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে, উত্তর আটলান্টিকে ও অন্যত্র।

খোলা নৌকায় যখন তিমি শিকার করা হত, নীলতিমির বিরাট আকার ও তৎপরতার জন্যে নীলতিমি শিকার করা তখন প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। নীলতিমির ব্যাপক শিকার শুরু হয় হার্পুন বন্দুকের আবিষ্কার ও জাহাজে ভাসমান কারখানার প্রচলন হবার পরে। ১৯৩০-৩১ সালে প্রায় ৩০,০০০ নীলতিমি শিকারীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল।

তারপরে অবশ্য এই সংখ্যা আরো কমেছে, কিন্তু বন্ধ হয়নি। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে কতকগুলো সময়ে নীলতিমির শিকার বন্ধ রাখার জন্যে, বাচ্চা নীলতিমি ও সবৎসা নীলতিমিকে অব্যাহতি দেবার জন্যে—কিন্তু বিশেষ ফল পাওয়া যায়নি। তখন আন্তর্জাতিক তিমি কমিশন নীলতিমির শিকারের ওপরে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন—প্রথমে উত্তর আটলান্টিকে ও ১৯৬৫ থেকে গোটা বিশ্বে। কিন্তু আশঙ্কা করা হচ্ছে, গোটা বিশ্বের নীলতিমির সংখ্যা এখন এতই কম যে এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নীলতিমির বিলোপ ঠেকানো যাবে না।

—[illegible]

কীটপতঙ্গের প্রেম

আনসারউদ্দিন আহমদ

ঝিঁঝি পোকা সকলেই চেনেন। অনেকে এও জানেন ঝিঁঝি পোকা ঘরের ভিতর দিব্বি ডেকে থাকে। আমাদের দেশে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আমগাছে ঝিঁঝি পোকা ডাকলে আমরা ধরে নেই আম পাকার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আম পাকার সঙ্গে ঝিঁঝি পোকার কোন সম্পর্ক জানা না গেলেও একথা সত্য ঝিঁঝি পোকার ডাকার তারতম্যের সঙ্গে তাপমাত্রা উঠানামা করে। গেছো ঝিঁঝি পোকার ক্রমবর্ধমান ডাক থেকে দিনের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়। পনেরো সেকেন্ডে পোকাটি কতবার ডাকে সেটা প্রথমে গুনে নিন। এর সঙ্গে ৩৯ যোগ করুন। মোট সংখ্যা যত হোল, সেটাই ফারেনহাইট তাপমাত্রায় দিনের তাপমাত্রা বলে বিবেচিত হবে।

উপরের এ তথ্যগুলি হয়তো কমবেশী অনেকেরই জানা, তবে ওটা প্রায়ই অজানা যে প্রেম-নিবেদন মুহূর্তে ঝিঁঝি পোকার ডাকের পরিবর্তন ঘটে। ঝিঁঝি পোকার প্রতিটি ডানায় একটা করে মসৃণ করার যন্ত্র ও একটা ধারালো যন্ত্রের মত রয়েছে। ডানা দুটির পরস্পর ঘর্ষণের ফলে যে শব্দ বের হয় সেটাই ঝিঁঝি পোকার ডাক। মসৃণ করার যন্ত্রের মত অংশে ঝিঁঝি পোকার দাঁত রয়েছে। পুরুষ ঝিঁঝি পোকা (সত্যিকার অর্থে গায়ক) সাধারণত ডাকার সময় শতকরা ৪৭টি দাঁত ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য সে যখন প্রেম নিবেদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন দাঁতের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, শতকরা ৮৯-এ গিয়ে পৌঁছে। এছাড়া তখন তার ডাক এত অনিয়মিত হয়ে পড়ে যে, দিনের তাপমাত্রা বলা সে মুহূর্তে সম্ভব নয়। তখন একমাত্র এটুকুই কল্পনা করা যায় যে, ওরা এখন পূর্বরাগে ব্যস্ত।

পুরুষ ঝিঁঝি পোকা যখন একনাগাড়ে ডেকে চলে মেয়ে ঝিঁঝি পোকা তখন পাশে বসে কষ্টকর সময় কাটায়, মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে পুরুষটাকে কনুই দিয়ে ধাক্কা দেয়। ভাবখানা, 'কী বেরসিক রে বাবা! এই যে পাশে বসে আছি একবার চোখ তুলে তাকাতেও কি নেই!' শেষপর্যন্ত পুরুষ ঝিঁঝি পোকা তার গান থামায়, পাখা দুটি উপরে তুলে ধরে। মেয়ে ঝিঁঝি পোকাটির কানে ওর গান যদি সুধা বর্ষণ করে একমাত্র তখনই সে ওর পিঠে চেপে বসে এবং পুরুষ ঝিঁঝি পোকাটির পাখার সন্ধিস্থলের ঠিক পিছনে অবস্থিত পেয়ালার মত দেখতে মাংসগ্রন্থি থেকে খেতে শুরু করে। মাংসগ্রন্থি থেকে একরকম আঠালো রস বের হয় যা মেয়ে ঝিঁঝি পোকাটি খেতে খুব ভালবাসে। পুরুষটির গান গাওয়া ও মেয়েটির কনুই দিয়ে ধাক্কা মারা—মন দেওয়া-নেওয়ার এই খেলা প্রায় আধ ঘন্টা সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়ের ভিতর মেয়ে ঝিঁঝি

মেয়ে ম্যান্টিসপোকা

মে মাছি
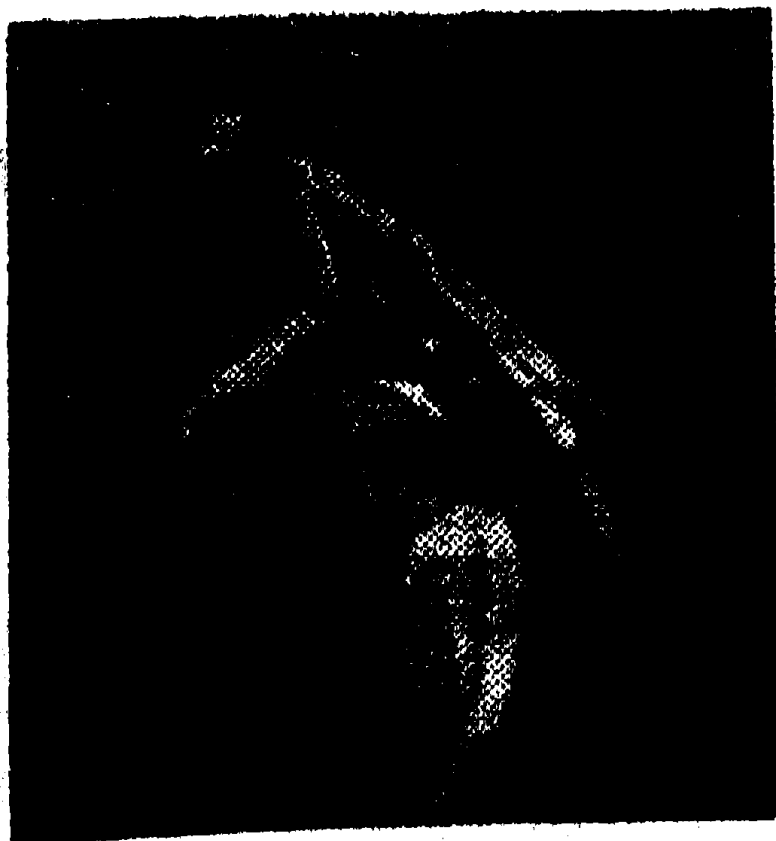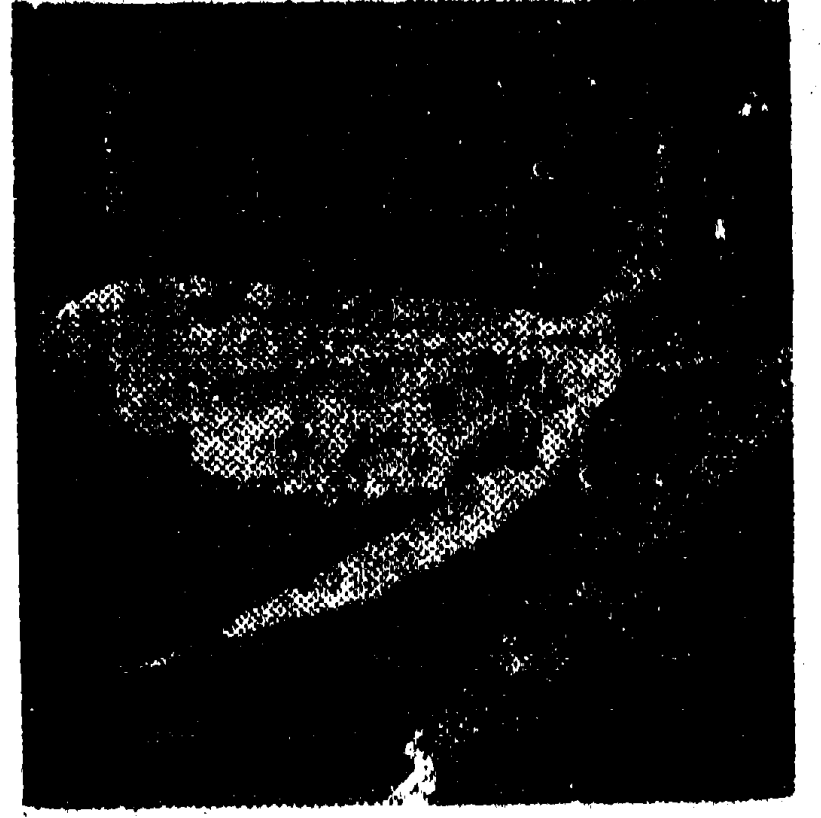
পোকা পরিতৃপ্তি লাভ করে, পুরুষটি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। পূর্বরাগ এখানে ইতি টানে। এরপর তাদের মিলন ঘটে।

একটা প্রবাদ রয়েছে, সেটা হোল—মানুষের মনে ঢুকতে হলে মুখ দিয়ে ঢুকতে হয়। অর্থাৎ ভাব জমানো বা মনপাওয়া যাই বলুন না কেন, খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে তার দ্রুত প্রসার ঘটে। এ যেন রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবক-এর ভূমিকার মত, যার উপস্থিতিতে বিক্রিয়া তাড়াতাড়ি ঘটবে বটে অথচ নিজে বিক্রিয়ায় কোন অংশ নেবে না। তাই বলছিলাম প্রকৃতির মধ্যে প্রেম ও খাওয়ার আনন্দের ভিতর প্রায় একটা যোগসূত্র রয়েছে। এ আনন্দ স্ত্রী ম্যান্টিস পোকা যুগপৎভাবে উপভোগ করে থাকে। পুরুষ ম্যান্টিস স্ত্রী ম্যান্টিসের সংগে জোড় বাঁধার সময় কখনও কখনও স্ত্রী পোকাটি তার প্রেমাস্পদকে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। গুপ্ত প্রণয় শেষ হওয়ার আগে স্ত্রী ম্যান্টিস পোকা পুরুষ পোকাটির প্রায় অর্ধেক গলাধঃকরণ করে। জীবন কিংবা ভাবী বংশধরের মধ্যে স্বাক্ষর রেখে যাওয়া এর কোনটার জন্য বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ ভাব তার মনে দোলা দেয় না। পুরুষ ম্যান্টিস পোকা নীরবে প্রেমের বেদীতে আত্মাহুতি দেয়।

প্রেম ও পুষ্টির ব্যাপারে উন্নতি লক্ষ্য করা যায় 'এমপিড মাছির' কিছু প্রজাতির মধ্যে। এরা চিত্তাকর্ষক খাদ্যের অংশ শিকার করে থাকে। এ ধরনের খাদ্যের ভিতর রয়েছে ছোট মাছি অথবা ফুলের পাপড়ি। এমপিড মাছির সামনের পায়ে অবস্থিত মাংসগ্রন্থি থেকে নির্গত এক ধরনের পাকানো সূক্ষ্ম রেশমী সুতো মাছি বা ফুলের পাপড়িকে জড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পছন্দ করা মেয়ে বধূর সামনে এনে হাজির করে। জীব-বিজ্ঞানীরা ঠিক এমনি ধরনের প্রেম প্রমিক ক্লুসে মাছির বেলায়ও লক্ষ্য করেছেন। এর ফলে ম্যান্টিস পোকার মত করুণ পরিণতি এদের ভাগ্যে ঘটে না। এরা বরং অনেক চালাক। স্ত্রী এমপিড মাছি

রেশমী সুতায় জড়ানো শিকারের তারিফ করবে আর পুরুষ মাছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তারিফ শুনবে এমন ধাতেরই নয় ওরা। এমনকি শ্রমিক ক্ষুদে মাছিগুলি পর্যন্ত তাই। স্ত্রী মাছিগুলি যখন খাওয়ার জন্য সুতায় জড়ানো শিকার খুলতে ব্যস্ত, সে সময় পুরুষ মাছি ওদের সঙ্গে খুব তাড়াহুড়া করে প্রেম করতে এগিয়ে আসে।

রুপালী প্রজাপতি এমন কাণ্ড শুরু করে দেয় যা দেখে মনে হয় উপাসনা-সঙ্গীতের প্রয়োজন রয়েছে। সে তার এ্যানামোরাটার সামনে উড়ে এসে বসে, তার সুন্দর পাখা মেলে ধরে, শুঁড় নাড়াতে থাকে আর আড়চোখে লক্ষ্য করে কখন ও প্রায় রাজী হয়ে মত দিয়ে ফেলবে। এরপর চরম মুহূর্তে প্রেম নিবেদনের ভঙ্গীতে সে মাথা নুইয়ে পাখার ভিতর শুঁড় ভাঁজ করে রেখে দেয়। রুপালী প্রজাপতি সামনের পাখায় একপ্রকার ছোট থলি বয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং এই আনন্দ উৎসবকালে অতি অল্প পরিমাণ সুগন্ধ পুরুষটির থলি থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটির সংবেদনশীল শুঁড়ে মাখিয়ে দেয়। মেয়ে রুপালী প্রজাপতির মধ্যে এতক্ষণ যদিবা লাজনম্রভাব বজায় ছিল, সুগন্ধির কোমল ও সুন্দর এই উপহার লজ্জার রেশটুকুও দূর করে দেয়; মিথুন-লগ্ন পেরিয়ে যায়, মেয়ে প্রজাপতিটি নিয়মানুযায়ী ভাবী মা হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রেম করতে হলে পোষাক-আষাকের প্রতি উদাসীন হলে চলে না। কে না চায় প্রেমিকা তার নতুন প্যান্টের প্রশংসা করুক। 'সত্যি তোমার রুচির প্রশংসা করতে হয়। টাইটা কী সুন্দরই না মানিয়েছে তোমাকে। ইচ্ছে হচ্ছে......' ব্যাস্ ব্যাস্। ওটুকুই যথেষ্ট। প্রেমিক-প্রবর তখন কি আর পৃথিবীতে আছেন। প্রেয়সীর এহেন উক্তির পর তিনি স্বর্গলোকে বিচরণ করছেন তখন। বাহ্যিক আভরণের প্রতি এই যে আকর্ষণ কীট পতঙ্গের জগতেও তা দুর্লভ নয়। তবে সব কথার গোড়ার কথা—'লাভ লুকস্ নট উইথ আইজ, বাট উইথ মাইণ্ডস্'—এটাই বড় সত্য। তাই বহুকাল ধরে একথাই মনে করা হত যে, মথের সুদৃশ্য গায়ের রঙ, গাঢ় লালবর্ণের ডানার 'পরে আঁকা উজ্জ্বল আরক্ত চক্ষু—এসবের জন্যই বুঝিবা তাদের প্রথমে প্রেম ও পরে বিয়ে হয়ে থাকে। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অবশ্য একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে মথের তীক্ষ্ণ সন্ধানুভূতিই মিলন ঋতুতে পরস্পরকে কাছে টেনে রাখে। (মানুষ ছাড়া প্রায় জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে।)

কোন কোন প্রজাতির স্ত্রী মথের সুগন্ধি গ্রন্থি রয়েছে। এজাতীয় স্ত্রী মথকে কোন বন্ধ কাচের পাত্রে বন্দী করে রাখা হলে পুরুষ মথের করণীয় অবশ্য কিছু নেই, কেননা কাচের পাত্র ভেদ করে তো আর প্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা চলে না। তবে যদি কাচের পাত্রে কোন ছিদ্র থাকে এবং যদি স্ত্রী মথ বিরহকাতর হয়, তাহলে অবিশ্বাস্য দূরস্থান থেকেও অন্ধকার ভেদ করে পুরুষ প্রেমিক প্রিয়া দর্শনে ছুটে আসে, আর সংখ্যায় একটা দুটো নয়—চল্লিশ পঞ্চাশজন প্রেমিক মাত্র একজন প্রেমিকা মথের চারপাশে গুঞ্জন তোলে।

প্রেমিকাদের এই সুগন্ধ গ্রন্থি এমন এক বিশেষভাবে তৈরী যা পাণিপ্রার্থীদের আকর্ষণ না করে যায় না। পেটের অগ্রভাগ উত্তোলিত করে এবং দ্রুত তির্যতির করে পাখা নাচিয়ে, চারিদিকে বাতাসে সুগন্ধি ছড়িয়ে সে আহ্বান জানায়, 'এসো, এদিকে এসো।' স্ত্রী মথের এমন এক সঠিক সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে যে, বাতাস চারিদিকে সুগন্ধি ছড়িয়ে দিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না করলে সে কখনও আহ্বান জানায় না। প্রেমিক নির্বাচনে সে কখনও পার্থক্য নির্ণয় করে না। এ ব্যাপারে তাকে উদারপন্থী বলা চলে। 'প্রথমে আস, ভালবাস'—এই হচ্ছে স্ত্রী মথের নীতি।

'গান দিয়ে পাই মনের নাগাল'—গান ও নাচ চোখ ও কানকে মোহিত করে, মনকে বশে আনে। মানব সমাজের এ রীতি কীট-পতঙ্গ জগতেও দেখা যায়। মরিস বার্টন কীট-পতঙ্গের নাচ সম্বন্ধে 'প্রাণীর পরিণয়' নামক তার বইয়ে লিখেছেন, 'মে মাছি ও ডাঁশ পোকাকে নদীর উপর বা আশেপাশে নৃত্যরত দেখা যায়। নাচের সময় ওরা তাড়াতাড়ি পাখা ঝাপটিয়ে উপরে ওঠে ও পরে মন্থর গতিতে নিচে নামে। বার বার এর পুনরাবৃত্তি চলে। নাচিয়েদের প্রায় সকলেই পুরুষ। তবে মাঝে মাঝে এক বা একাধিক মেয়ে পোকা এসে নাচে যোগ দেয়। প্রতিটি মেয়ে পোকা বেছে বেছে জোড় বাঁধে, তারপর দুজনে কোথাও পালিয়ে যায়।

সাধারণ প্রাণীর মধ্যে এ ধরনের ভাবের আদান-প্রদানকে 'প্রেম' নামে আখ্যা দিতে কিছু কিছু জীব-বিজ্ঞানী উৎসাহ বোধ করেন না। অথচ কীট-পতঙ্গের মিলন পর্যবেক্ষণ কোরলে মানুষের মধ্যে লক্ষণীয় সবরকম প্রণয়ের বৈশিষ্ট্যই ফুটে ওঠে। যেমন বশ্যতা স্বীকার, সৌজন্য প্রদর্শন, চুম্বন, আদর করা, আরাম দেওয়া, আলিঙ্গন, উপহার দেওয়া, সুগন্ধির সাহায্যে প্রলোভিত করা, রাত্রিকালে প্রণয়ীকে গান দিয়ে আপ্যায়িত করা, নাচ দেখানো—এমনকি নাকে নাক ঘষা ও নির্লজ্জ যৌন আবেদন প্রদর্শন।

কিন্তু কেন হয়—এ রহস্য রহস্যই থেকে গেছে। মেয়ে ড্রাগন মাছি পুরুষ মাছির সঙ্গে একত্রে সংযুক্ত হয়ে মিলনের আগে ঘন্টার পর ঘন্টা কেন বা ঘুরে বেড়ায়, জলের উপর জন্মানো কোন গাছের পাতা বা কাণ্ডের উপর ডিম পাড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেনই বা পুরুষ মাছিটি স্ত্রী মাছিটিকে সাইকেলের পিছনে বসিয়ে নেওয়ার মত করে বনবন্ করে উড়ে বেড়ায় এগুলোর বৈজ্ঞানিক সদুত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

* ম্যান ইস্টম্যান-এর লাভ অ্যাণ্ড ইনসেক্টস প্রবন্ধের সাহায্য নিয়ে লেখা।
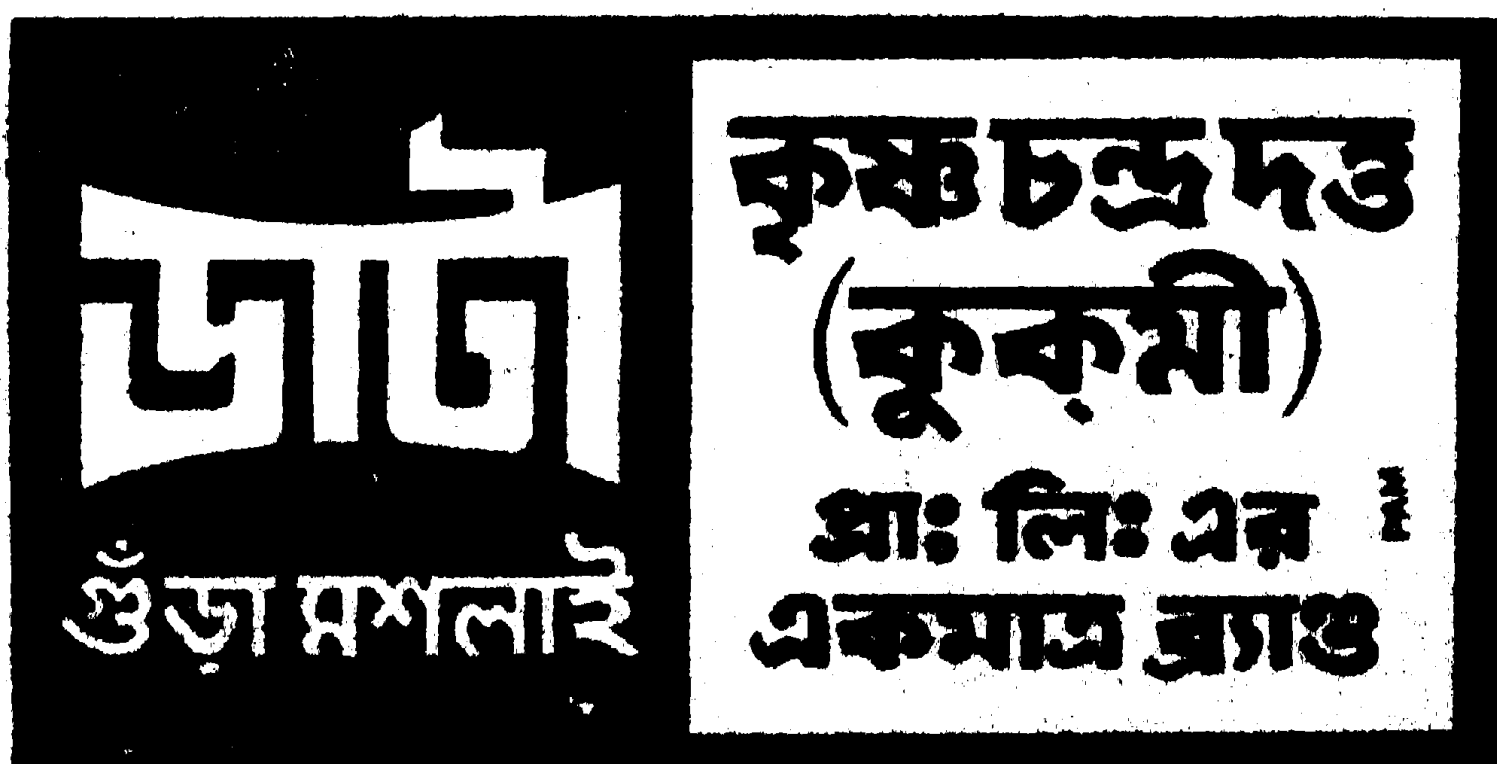
অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

॥ ২০ ॥

আজ একটু দেরি করে বাজার যাবে সজল। নিমন্ত্রণ বিকেলে। তাই সেতারটা নিয়ে বসেছিল। ভাবছিল, আরতি এসে তাকে একটা ভৈরবীর গৎ দিতে বলবে। ঢিমে নয়, মধ্যলয়ের।

সজল কোমল পদাগুলো বাজাবার চেষ্টা করছিল। আশ্বাস যেমন করে কোমল রেখাবে এসে দাঁড়াত একটু।

নিচু থেকে অরুণার গলা শোনা যাচ্ছিল—'যা ওপরে বাবুর ঘরটা ঝাঁট দিয়ে মুছে আয়। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজ করিস, বাপু। রবিবার অনেক কাচাকুচি আছে, লোকজন আসবে।'

সজল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছিল। ঝি এক্ষুনি ঝাঁট দিতে এসে পড়বে ভেবে সেতারটা দেয়ালের কাছে রেখে এল। আজ থেকেই ওর আসার কথা।

ততক্ষণে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ কে! সজল অবাক হয়ে ঝির দিকে তাকিয়েছিল। চিনতে পেরেছিল তাকে। জীবনে তা হলে এমন বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে!

সজলের সেই বালিগঞ্জ স্টেশনের কথা মনে পড়ছিল। সেদিন সে অপমানিত, নিঃস্ব!

পুঁটিও ভীষণ অবাক। 'দাদাবাবু তুমি! ওমা! তোমার ঘর-সংসার, বৌ!'

পুঁটি অনেক লম্বা হয়েছে। একটা কম দামী রঙিন শাড়ী পরেছে। তবে গলার স্বর তেমনি তীক্ষ্ণ, গিন্নী মানুষের মত কথা বলার পাকা-পাকা ঢং। বোধহয় তেমনি মুখরাও আছে।

সজল হাসতে হাসতে বলল, 'তুই কি করে এসে জুটলি রে?'

পুঁটি হেসে বলল, 'আমি ত ঐ সামনের বাড়ীতে ঝির কাজ করতাম গো। তা, সে ভাড়াটেরা কোথায় উঠে গেল। এ বাড়ীর ঠাকরুণকে বললাম, নতুন ভাড়াটে এলে একটা কাজ জুটিয়ে দিও, মা বড্ড টানাটানি চলছে। তা কপালে, আমি কি জানতাম তুমি?'

'কোথায় থাকিস আজকাল?'

'আমহার্স্ট স্ট্রীট, ঐ যে কি একটা বড় কলেজ আছে, ওর কাছে বস্তিতে।'

'তোর মা কোথায় থাকে? ক্যানিং-এ ফিরে যায়নি?'

'যাবে বলে দিন-রাত বায়না ধরে আছে কিন্তু মার যে অসুখ! বাতে ধরেছে বুড়ীকে! চলতে পারে না।'

পুঁটির ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ হয়ে গেছল। বালতিতে করে জল, আর ছেঁড়া কাপড়ের ন্যাতা নিয়ে এল।

নিচ থেকে অরুণার রুক্ষ গলা শোনা যাচ্ছিল, 'কাকে 'তুমি তুমি' বলে কথা বলছিস রে? তোর মুখ ত বড্ড খারাপ দেখছি?'

সজল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। অরুণা রান্না চাপিয়েছিল। এখন ভাত ফুটছে হাঁড়িতে।

সজল বলল, 'এক কাপ চা করে দাও না?'

'ভাত ফুটছে নামাতে পারব না এখন'—অরুণা মুখ ঝামটা দিল।

সজল মোড়াটা টেনে নিয়ে কাছে বসে বলল, 'জানো, পুঁটিকে আগে চিনতাম ভালো মেয়ে।'

অরুণা কেন যেন চটে আছে। ভাতটা ঘাটতে ঘাটতে রুক্ষ গলায় বলল, 'ভালো মেয়ে তো আমাকে উদ্ধার করেছে! আসতে না আসতেই তুই তোকারি আরম্ভ করে দিয়েছে দেখছি?' এমন বেয়াদব ঝি আমি রাখতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।'

সজলের বড্ড খারাপ লাগছিল। পুঁটির কথা অরুণাকে সব বলা যায় না। কিন্তু প্রথমদিন চাকরী করার পর, তাকে ছাড়ানোটা বড় অন্যায়। বিশেষ করে তার মা যখন অসুস্থ।

পুঁটি যাতে না শুনতে পায়, তেমনি করে সজল গম্ভীর হয়ে বলল, 'সব বলব তোমাকে পরে। কিন্তু এখন চিৎকার কোরো না।'

ভাত নেমে গেছল। অরুণা দু'কাপ জল দিয়ে চায়ের কেটলিটা বসাল। সজল ওপরে গিয়ে চুপচাপ বসেছিল। এক সময় অরুণা চা করল, নিজে এককাপ নিল, সজলকেও দিয়ে এল এককাপ।

কিন্তু পুঁটিকে দিল না!

সজল তেমনি বসেছিল। চা খাওয়ার ইচ্ছা হঠাৎ আর তার ছিল না।

পুঁটি ঘরদোর পরিষ্কার করে, থালা বাটি মেজে জল তুলে চলে যাচ্ছিল। অরুণা বলল, 'ওবেলা সকাল সকাল আসবি। কলে জল আসার আগে। দেরি হয় না যেন?'

করুণ গলায় পুঁটি বলল, 'হ্যাঁ মা আসব?'

সজল নিজের ঘরে বসে ভাবছিল, ও হয়ত বাড়ীতে চা খেয়ে আসেনি। মনে আছে, সেবার তেলেভাজা খাবার জন্য দুটো পয়সা নিয়েছিল সজলের কাছ থেকে।

অরুণা এত নিষ্ঠুর, না হলেই পারত।

'কি বাজার টাজার যেতে হবে, না আকাশ পাতাল ভাবলে চলবে?' —অনেকক্ষণ পরে অরুণা সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছিল।

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, তা হলে?'

'খাবে না ত, চা করতে বলছিলে কেন আমাকে? খালি খালি দুধ চিনি চা নষ্ট করা?' অরুণা পুরো চায়ের কাপটা তুলে নিল।

চা-টা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে কখন!

বিকেলে সকলের আগে রেণুদি এল। হাতে একগোছা ফুল, কাগজের সুন্দর একটা বাকস। ওপরে বড় দোকানের নাম লেখা। সজল বুঝতে পারছিল, ওতে শাড়ী আছে। রেণুদি যে এত টাকা দিয়ে শাড়ী কিনে নিয়ে আসবে, সজল তা ভাবতে পারেনি, তা আন্দাজও করেনি।

রেণুদিকে অফিসের বাইরে, এই গৃহিণীর সাজে বেশ লাগছিল দেখতে। অফিসের চেয়ে অনেক সুন্দর, সংযত, ঘরোয়া।

সজল রেণুদিকে ঘরে নিয়ে বসাল। কিন্তু বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল ওকে।

'বাঃ শাড়ীটা বেশ সুন্দর ত? কত নিয়েছে?' অরুণা লোভীর চোখ নিয়ে শাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইল।

রেণুদি বলল, 'সেই কবে থেকে সজলকে বলছি, তোমার বউ দেখতে যাব। তা ওত গ্রাহ্যই করে না।'

অরুণা হেসে বলল, 'গ্রাহ্য আর কাকে করে? সংসারের একটা কোন কাজ যদি ওকে দিয়ে হয়। শুধু বাজারটা করে দিয়েই খালাস। আর পেয়েছে একটা সেতার। রাত নেই, দিন নেই, পিড়িং পিড়িং করে বাজাচ্ছে। নয়ত কি ছাইপাঁশ লিখছে। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল রেণুদি, জীবন পোড়া কাঠ হয়ে গেল।'

সজল চুপচাপ বসেছিল একধারে। কোন কথা বলছিল না।

রেণুদি ঠাট্টা করে বলল, 'ওকে দিয়ে করবেটা কি? বিছানা পাতবে? ঘর ঝাঁট দেবে? আঁচ ধরাবে?'

সজল বলল, 'আঁচ কিন্তু আমি অনেকদিন ধরাই রেণুদি। জিজ্ঞেস করুন ওকে, সত্যি বলছি কিনা?'

রেণুদি জিজ্ঞেস করল না। 'সাক্ষীর দরকার নেই, ভাই সজল। তুমি ত শংকরাচার্য। মিথ্যে কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুবে? তা হলেই হয়েছে?'

অরুণা শুকনো মুখে বলল, 'সিমেন্টের দপ্তরে কাজ করে কত লোক কলকাতায় বাড়ী গাড়ী করে ফেলল। আর ওর মাসের পনেরদিন থেকে পয়সা থাকে না? বুঝুন একবার?'

সজলের ভীষণ খারাপ লাগছিল কথাটা। এর আগেও অরুণা ওকে এসব কথা বলেছে। সজল তখন গ্রাহ্য করেনি। ঠাট্টা করেই অরুণা বলছে বলে, তার মনে হয়েছিল। কিন্তু তার অফিসের রেণুদিকে, প্রথম দিনেই এ কথাটা বলার জন্য সজলের বড় দুঃখ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে ঘুষ নেয় না বলে অরুণার এই অসন্তোষটা আন্তরিক।

রেণুদি বলল, 'তুমি ওকে কতটুকু চেন, অরুণা? আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তা, তুমিওত চাকরী কর শুনেছিলাম?'

অরুণা বলল, 'করলে হবে কি? ডানে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। যা দিনকালের বাজার!'

সজল যে অরুণার কাছ থেকে বাড়ী ভাড়ার টাকাটা ছাড়া আর কিছু নেয় না, সে কথাটা রেণুদি জানে না।

সজল বলল, 'রেণুদিকে একটু সরবৎ করে দাও না, অরুণা?'

রেণুদি বলল, 'না, না, এক গ্লাস জল দাও ভাই।'

অরুণা শুধু এক গ্লাস জলই নিয়ে এল।

রেণুদিকে খালি জল দিল বলে সজলের খারাপ লাগছিল।

সিঁড়ি দিয়ে কাদের উঠে আসার শব্দ। একটু পরেই করুণাদি আর কার্তিক এল।

করুণাও ফুল আর ঠোঙায় করে মিষ্টি নিয়ে এসেছে।

সজল রেণুদিকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

কার্তিক আগের মতই হৈচৈ করে কথা বলছিল। 'আবহাওয়ার কথা শেষ করে, রাজনীতিতে পড়তে যাচ্ছে এমন সময় নিচ থেকে ডাক ভেসে এল—

'সজল? আছিস নাকিরে'......

সজল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'হারাধনদা এসেছে, আমি যাই।'

একটু পরেই হারাধনদা ঢুকে ধপ্ করে তক্তপোষের ওপর পা তুলে বসে পড়ল। গায়ে সেই চিরন্তন হাফসার্ট, ভুঁড়ি আছে বলে পেটের দিকটা উঁচু হয়ে আছে। হাতে তালি দেওয়া ছাতা, ফাটা আধময়লা কাপড়ে কোঁচাটা উল্টে নিয়ে কোমরে গোঁজা। হাতে খবরের কাগজে জড়ানো কয়েক ফিট লম্বা সরু কি একটা জিনিস।

করুণা এবং কার্তিকের মুখ, হারাধনের এই কিছুটা অমার্জিত আচরণে কেমন রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। রেণুদিও যেন একটু অবাক হয়ে গেছে।

হারাধনের ওদিকে খেয়াল থাকার কথা নয়। গোঁফটাই দু'একবার মুছে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কিরে বৌমা কোথায়? ডাক দেখি তাকে?'

সজল হারাধনদাকে একটু থিতিয়ে আনার জন্য শান্ত গলায় বলল, 'এই ত এলে। বোসো। ভাল হয়ে। এসেছ যখন, তখন তো দেখবেই?'

'তুই বললেই হল? ডেকে নিয়ে আয় তাকে? আগে বৌমাকে দেখি। চালাক চতুর কিনা? বি-এ পাশ করলে হবে কি? তুই ত একটা আস্ত হাঁদারাম। সংসারের ঘোর প্যাঁচ কিছু বুঝিস জানিস?'

হারাধনদা নিজের স্পীডেই বলে যাচ্ছিল।

সজল বলল, 'তোমাকে একটা পাখা এনে দেব, হারাধনদা? গরম লাগছে?'

'দে তাই দে। মোটা মানুষ, একটু গরম লাগে?'

সজল হাতপাখা আনতে গিয়ে দ্যাখে, অরুণার মুখ হাঁড়ি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পুঁটি এসে গেছে কখন।

সজল বলল, 'তুমি যাও একবার। হারাধনদা ডাকছে?'

অরুণা আলু কোটা থামিয়ে সজলের দিকে কটমট করে তাকাল।

সজল শান্ত গলায় বলল, 'হারাধনদা গ্রামের লোক। এমনি করে কথা বলাই অভ্যেস। তাই বলে তুমি রাগ করবে? হারাধনদা আমার কত উপকার করেছে, তুমি জান?'

অরুণার গলার ঝাঁঝ শুনে সজলের কান লাল হয়ে উঠেছিল। 'তোমার উপকার করল ত আমার কি? ছিছি দিদি, কার্তিকদা কি ভাববে বলত? যতসব 'লোফার' ছোটলোক নিয়ে তোমার কারবার?

সজল গম্ভীর হয়ে বলল, 'মানুষ হিসেবে তোমার দিদি আর কার্তিকদার চাইতে হারাধনদা অনেক বড়!'

সজলের গলার স্বরটা ইস্পাতের মত শক্ত। অরুণা তাকিয়ে রইল সজলের কঠিন মুখের দিকে।

পুঁটিও অবাক হয়ে দুজনকে দেখছিল।

'বৌমা কইরে? এল না?' দ্রুত হাত পাখা চালাতে চালাতে হারাধনদা আবার চেঁচিয়ে বলল। অরুণা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হারাধনদা অবাক হয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল অরুণার দিকে। তারপর নিজেকে সামলে নিল একটু—'এই ত বেশ বৌমাটি হয়েছে। বৌমা, ওই সজলের ওপর বিশ্বাস টিশ্বাস করবে না। ওকে আমি জানি। একটা বোকা, হাঁদা। সেই আমার সঙ্গে কলকাতা এসেছিল...।'

সজল মাঝপথে থামিয়ে দিল, 'হারাধনদা ও রান্না করতে করতে এসেছে।'

'ও তাই নাকি? বেশি কিছু রান্না করবে না বৌমা। এ অবস্থায় করতে নেই। খালি ডাল, আলুভাতে ভাত? ব্যাস্।'

অরুণা এতক্ষণে কথা বলার অবকাশ পেয়ে শুকনো ভদ্রতার হাসি হেসে বলল, 'আমরা গরীব মানুষ। এর চেয়ে বেশি কি খাওয়াব আপনাকে?'

হারাধনদা বড্ড মজা পেল—'এই ত বেশ বলেছ বৌমা? এসো, এদিকে এসো। হ্যাঁ, এইটা খোল ত?'

অরুণা অনিচ্ছা সত্ত্বেও খবর কাগজে মোড়া জিনিসটা খুলল।

করুণা, কার্তিক, রেণুদি সকলেই তাকিয়েছিল, জিনিসটা দেখার জন্য। কিন্তু কেউ চিনতে পারল না। শুধু সজল চিনল এবং জিনিসটা কত দামী তা বুঝতে পারল।

সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে হারাধনদা বিজয়ীর মত বলল, 'আপনারা চিনতে পারলেন, জিনিসটা কি?'

কার্তিক সবজান্তার মত বলল, 'কি আর। মাদুরত দেখছি?'

হারাধন যেন ধমকে উঠল, 'মাদুর? এমন মাদুর দেখেছেন কোথাও?'

রেণুদি অবাক হয়ে বলল, 'মাদুর বটে। তবে এমন সরু, মিহি, সুন্দর—কখনো দেখিনি।' করুণা মুখ বাঁকিয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করলো একবার।

সজল বিরক্ত হয়ে বলল, 'হারাধনদা, কুড়ি পঁচিশ টাকা খরচ করে তুমি আমাদের জন্য এটা নিয়ে এলে কেন? আমরা তোমার পর? আমাদের সঙ্গে তোমার ভদ্রতা?'

হারাধন ধমকে উঠল, 'তুই চুপ কর ত! তোর জন্য নিয়ে এসেছি এটা? আমি ত বৌমার জন্য নিয়ে এলাম। তুই চিৎকার করছিস কেন? এ্যাঁ?'

জিনিসটা যে কি, অরুণা তখনও বুঝতে পারেনি। কিন্তু সজলের মুখে দামটা শুনে অবাক হয়ে গেছল।

একটু পরে অরুণা চা করতে গেল।

কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাত্রি নামছে। ছাদের কার্ণিশ শিশির পড়ে পড়ে ভিজে উঠছে।

সজল এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে উঠছিল। আরতি তা হলে আসবে না। হয়ত চিঠি পায়নি। হয়ত বিয়ের খবর তাকে দিইনি বলে অভিমান হয়েছে।

আরতি আসবে না—এই কথাটা মনে আসতেই সজলের মন কেমন একটা বিষন্নতায় ভরে ওঠে। আজ সন্ধ্যায় তার কাছে সে-ই সবচেয়ে আকর্ষণ, সবচেয়ে সুন্দর অতিথি। কতোদিন তাকে দেখেনি সজল। সে না এলে আজকের সব আয়োজন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে!

সজল ছাদের ওপরে গিয়ে রাস্তাটা যতটুকু দেখা যায়, দেখে এল একবার। কিন্তু আরতিকে দেখা গেল না।

ঘরের ভেতর সকলে চা খাচ্ছে। প্লেটে করুণার নিয়ে আসা সন্দেশ। অরুণা পুঁটিকে দিয়ে সিঙ্গাড়া আনিয়েছে কখন।

একটু আগে খেয়েছে বলে সজল আর চা খেল না। অরুণা অগত্যা চা-টা পুঁটিকে দিয়ে দিল।

ভালো না লাগার জন্য সজল নিজের ঘরে চলে এসেছে। নিচে থাকার খুব একটা দরকার নেই। রেণুদির সঙ্গে কার্তিকবাবু আর করুণা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। হারাধনদা বসে বসে হাত পাখা নেড়ে চলেছে। পরিবেশ সম্পর্কে তার তেমন চেতনা নাই। সজলের অনুপস্থিতি সম্পর্কে সে কিছু মনে করবে না।

সজল চুপ চাপ শুয়েছিল বিছানায়। এই মুহূর্তে বড় ক্লান্ত লাগছে, ব্যর্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। আরতির বাসায় নিজে গিয়ে বলে আসা উচিত ছিল। তা হয়নি বলে এখন অনুতাপ হচ্ছিল সজলের।

সজল ঘড়িটা দেখল, রাত সাতটা। এর মধ্যেই মনে হয়, অনেক রাত হয়েছে। আকাশের দূরত্ব এখন নিঃশব্দ শিশির পাতে বিষন্ন হয়ে উঠছে। বড় রাস্তার ওপর দিয়ে কোন রিকসার টুংটাং শব্দ, একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বেজে বেজে, আবার মিলিয়ে গেল। স্তব্ধ ঘরটায় তারই প্রতিধ্বনি যেন কিছু-তেই থামছে না! যেন এই দেয়ালে টেবিলের ওপর, সেতারের ওপর একটি অপসৃয়মান ছন্দ, শব্দ এখনও করুণ বৃষ্টি বিন্দুর মত ঝরে ঝরে পড়ছে!

সজল কতক্ষণ চুপচাপ শুয়েছিল। কার গলার স্বর শুনে চমকে উঠল, কান পাতল ভালো করে...।

সজল প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু সে জানে, এই শান্ত গলার স্বর, এই সেতারের সরু তারের প্রতিধ্বনির মত মৃদু সুরেলা কথা, তার ছাড়া আর কারুর নয়।

সজল দ্রুত নিচে নেমে গেল!

গান গাইছিল কার্তিক তবলা বাজাচ্ছিল হারাধন।

গানের প্রস্তাবটা অবশ্য হারাধনের। রান্না হতে দেরি আছে। অথচ সকলে মিলে গল্প করার মত পরিবেশ এটা নয়। আরতি অত্যন্ত শান্ত। শুধু তাই নয়, তার নীরব নম্র ব্যক্তিত্ব, তার প্রশান্ত উপস্থিতি অন্য সকলকে অনেকখানি প্রভাবিত করে রেখেছে, যার ফলে রাজনীতি বা অন্যকোন মুখরোচক আলোচনা জমছে না। রেণুদির আরতিকে খুব ভাল লেগেছে। হাতে মেজরাব দেখেই রেণুদি ধরেছিল, একটু সেতার বাজাও না ভাই। আরতি রাজি হচ্ছিল না।

হারাধন বলল, 'কেউ গান জানে না?'

করুণা কার্তিককে দেখিয়ে বলল, 'জানে মানে? গানের মাস্টার। স্কুল আছে।'

হারাধন দু হাত জোড় করে নমস্কার করল। এ ভঙ্গিটা তার এত আন্তরিক ছিল যে, কেউ অভিযোগ করল না বা হাসল না।

হারাধন ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ও সজল একটা হারমোনিয়াম জোগাড় কর না কোথা থেকে? গান টান শুনি একটু। ইনি ওস্তাদ লোক আছেন।'

কার্তিক অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'শুধু হারমোনিয়াম কি হবে? তবলা ছাড়া?'

করুণা বলল, 'তবলা আবার কে বাজাবে কার্তিক?'

হারাধনদা বিনীত গলায় বলল, 'আমি এক গ্রাম দেশের মত একটু আধটু ঠেকা দিই। তাতে যদি চলে?'

চলে ত বোঝাগেল, কিন্তু ঐ দুটো বস্তু পাওয়া যাবে কোথায়? শেষ পর্যন্ত পুঁটি সন্ধান দিল, বাড়ীওয়ালীর মেয়ে গান শেখে, তবলা হারমোনিয়াম দুই-ই আছে।

সজল চুপচাপ গান শুনছিল। আধুনিক গান সে সহ্য করতে পারে না। আধুনিক গানের কথা, সুর, তার রুচিকে আঘাত করে। কিন্তু কোন উপায় নাই। ভরসার কথা এই দ্বিতীয় গানটা হলেই বোধহয় শেষ হবে।

আরতিও জানালা দিয়ে চুপকরে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কাচের গ্লাসে একগুচ্ছ সতেজ শুভ্র রজনীগন্ধা সাজানো। আরতি এই টাটকা ফুলগুলি নিয়ে এসেছে। সজলের মনে হচ্ছিল, এত জনের উপহারের মধ্যে আরতির এই উপহারটুকুই সৌন্দর্যে, আন্তরিকতায় তুলনাহীন।

আরতির মুখ দেখেই সজল বুঝতে পারছিল, এই আধুনিক গান তারও ভাল লাগছে না।

রেণুদি চুপ করে আরতির গা ঘেঁষে বসেছিল। করুণা কার্তিকের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাল দিচ্ছে।

গান থামতে আরতি বলল, 'বেশ'।

হারাধনদা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, গলা বটে একখানা।'

রেণুদি কিছু বলল না।

করুণা বলল, 'ময়দানে হাজার হাজার লোকের সামনে কার্তিক গান গেয়েছে। কার্তিক, ঐ গানটা গাওনা?'

শুধু সজল চুপ করেছিল। তার মনে হচ্ছিল, আরতি কার্তিককে 'কনসোলেশন প্রাইজ' দিল।

এতক্ষণে রেণুদি কথা বলল, 'আরতি সেতার শোনাও একটু।' সজল নিয়ে এস যন্ত্রটা। সেই কখন থেকে বলছি!'

আরতি সেতারটা আস্তে আস্তে বাঁধছিল। চোখ বুজে সুরটা মেলাচ্ছিল। বা হাতটা প্রসারিত করে সেতারের কানে মোচড় দিচ্ছিল কখনো কখনো। সজল দেখছিল একটি দীর্ঘ একটি নিটোল নিরাভরণ হাত, কী সুন্দর আঙুলগুলি, যেন সুন্দর বেদনায় ভরে আছে।

অনেকক্ষণ পরে আরতি মুখ তুলে তাকালো। কিন্তু সে তাকানো হয়ত কোন নির্দিষ্ট বস্তুপুঞ্জকে দেখার জন্য নয়। সে তাকানো উদাসীন, অপার্থিব!

সজলকে ইশারায় কাছে ডাকল আরতি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে, আরতি সজলকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, 'বল? কি বাজাব?'

সজল কিছু বলল না। অর্থাৎ আরতি যা খুশি বাজাতে পারে।

কি ভেবে নিয়ে আরতি আবার কয়েকটা পর্দা নতুন করে বাঁধল।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। ঘরে একটা কম পাওয়ারের নীল আলো জ্বলছিল। আরতির কাছেই গ্লাসে-রাখা শুভ্র রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলি এখন আরও জীবন্ত।

আরতি আলাপ শেষ করেছিল। রাগ 'জয়জয়ন্তী'। কোমল গান্ধারটি আশ্চর্য রূপ নিয়ে বারবার ফুটে উঠছে। সজলের মনে হচ্ছিল, আব্বাসের আত্মা আজ এই ঘরের কোন অন্ধকার কোণে বসে, আরতির ঐ আলাপ শুনছে! আলাপ হল ধ্যান। কথাটা আব্বাস বলেছিল একদিন। বাইরের পৃথিবীর সব চঞ্চলতাকে নিজের অন্তরের নীরবতায় নিমগ্ন করে তুলতে না পারলে, আলাপ হয় না। সজল কি কোনদিন এমনি করে আলাপ করতে পারবে? এ জীবনে কি তা সম্ভব?

তান শেষ করে ঝালা বাজিয়ে আরতি শেষ করল। তবলাটা কেউ বাজায়নি।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলছিল না। হারাধনদাই প্রথম বলল, 'দেখেই বুঝেছিলাম গুণী মেয়ে।'

রেণুদি বলল, 'তুমি ভাই, রূপে গুণে সরস্বতী। কী মিষ্টি হাত তোমার?' আরতি আসার জন্য সজল আজ গর্বিত।

কার্তিক বলল, 'হ্যাঁ, সেবার সেতার শুনেছিলাম বটে এক জনের কাছে। সেও জয় জয়ন্তী বাজাচ্ছিল। কী হাত! যেন বিদ্যুৎ।'

সজলের মনে হচ্ছিল, কথাটার মধ্যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ আছে। অর্থাৎ আরতির হাত সেই বিদ্যুৎ গতি শিল্পীর হাতের মত নয়। এর দ্বারা আরতিকে ছোট করার যে চেষ্টা আছে, তাতে কার্তিক আনন্দ পাচ্ছে মনে মনে।

আরতি চুপ করে রইল। শুধু হাসল একটু।

কিন্তু এই হাসিটুকু, কি করে যেন ঘরের সমস্ত বিদ্রূপের আবিলতাকে অস্বীকার করে আলোর মত বিজয়ী হয়ে ফুটে রইল!

অতিথিরা খেতে বসেছিল। সজল বসেনি, যদিও আরতি বলেছিল বসতে।

অরুণা পরিবেশন করছিল। কিন্তু সজলের তা ভালো লাগছিল না। হারাধনদা গ্রামের মানুষ। খেতেও পারে সে। বালিচকের শশীর হোটেলে সে ঠাকুরকে নাস্তানাবুদ করেছিল। আর আজ ত মাছ হয়েছে, মাংস হয়েছে।

সজল অরুণাকে বলল, 'হারাধনদাকে আর একটু মাংস দাও, ঝোল দাও।' অরুণা দিল, কিন্তু যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে। ছোট একটা টুকরো মাংস, যাতে শুধু হাড় আছে। আর আধ চামচ ঝোল।

'আর একটু ভাত দাও হারাধনদাকে'।

অরুণা এর আগেও ভাত দিয়েছে। আবার একটু ভাত দিল।

হারাধনদা গোগ্রাসে সেগুলোও খেয়ে ফেলল।

সজলের কেমন করুণ লাগছিল। স্ত্রী ছেলেমেয়ে ছেড়ে থাকা হারাধনদার এই জীবনটার কথা ভাবলে সজল অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে!

করুণা আর কার্তিক হারাধনের খাওয়া দেখছিল। রেণুদি নির্বিকার।

আরতি বলল, 'রান্না খুব সুন্দর হয়েছে বৌদি।'

কিন্তু সজল লক্ষ্য করছিল, আরতি নিজে প্রায় কিছু খাচ্ছিল না।

অরুণা এবং কার্তিকের দিকে সজলের মনোযোগ না দেবার জন্য অরুণা মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিল হয়ত আরতির কথা শুনে শুকনো মুখে বলল, 'আমরা ত ভাই তোমাদের মত গুণী মানুষ নই।'

রেণুদি বলল, 'গুণে কম কি? এই ত সুন্দর রান্না করেছ। গান গাও শুনলাম। চাকরীও কর। আর কি চাই?'

সকলের খাওয়া হয়ে গেছল। তাই দেখে হারাধন তাড়াতাড়ি শেষ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

খাওয়া শেষ হতে দেরি হওয়ার জন্য হারাধনদার মনে একটা ক্ষীণ অপরাধ বোধ এসে থাকবে বোধ হয়।

একটু আগে করুণা আর কার্তিক ট্যাক্সি করে চলে গেছে। রেণুদি ঐদিকেই যাবে। কিন্তু তবু সে ওদের সঙ্গে যায়নি।

সজল এগিয়ে দিতে এসেছিল। রেণুদির ট্রাম এসে যাওয়ায়, হারাধনদাকে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে আরতির হাত ধরে বলেছিল, খুব ভালো লাগল ভাই তোমাকে। আমার বাড়ী এসো একদিন। রেণুদি ঠিকানাটা লিখে দিল তাড়াতাড়ি করে।

হারাধন বড় বাজারের দিকে যাবে এবং আরতি যাবে মৌলালি। সেজন্য তিন জনই গোল দীঘির ধার দিয়ে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের দিকে হাঁটছিল। যেতে যেতে হারাধন বলল, 'সজল দেশে টেসে যাবি না এখন?'

সজল একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'না বলছি, গেলে আমার বাড়ী যাস্। তেমাথানিতে নেমে দশগ্রামের দিকে এই মাইল ছয়েক গেলেই আমার বাড়ী। যাকে জিজ্ঞেস করবি হারাধন অধিকারীর ঘর সেই দেখিয়ে দেবে।'
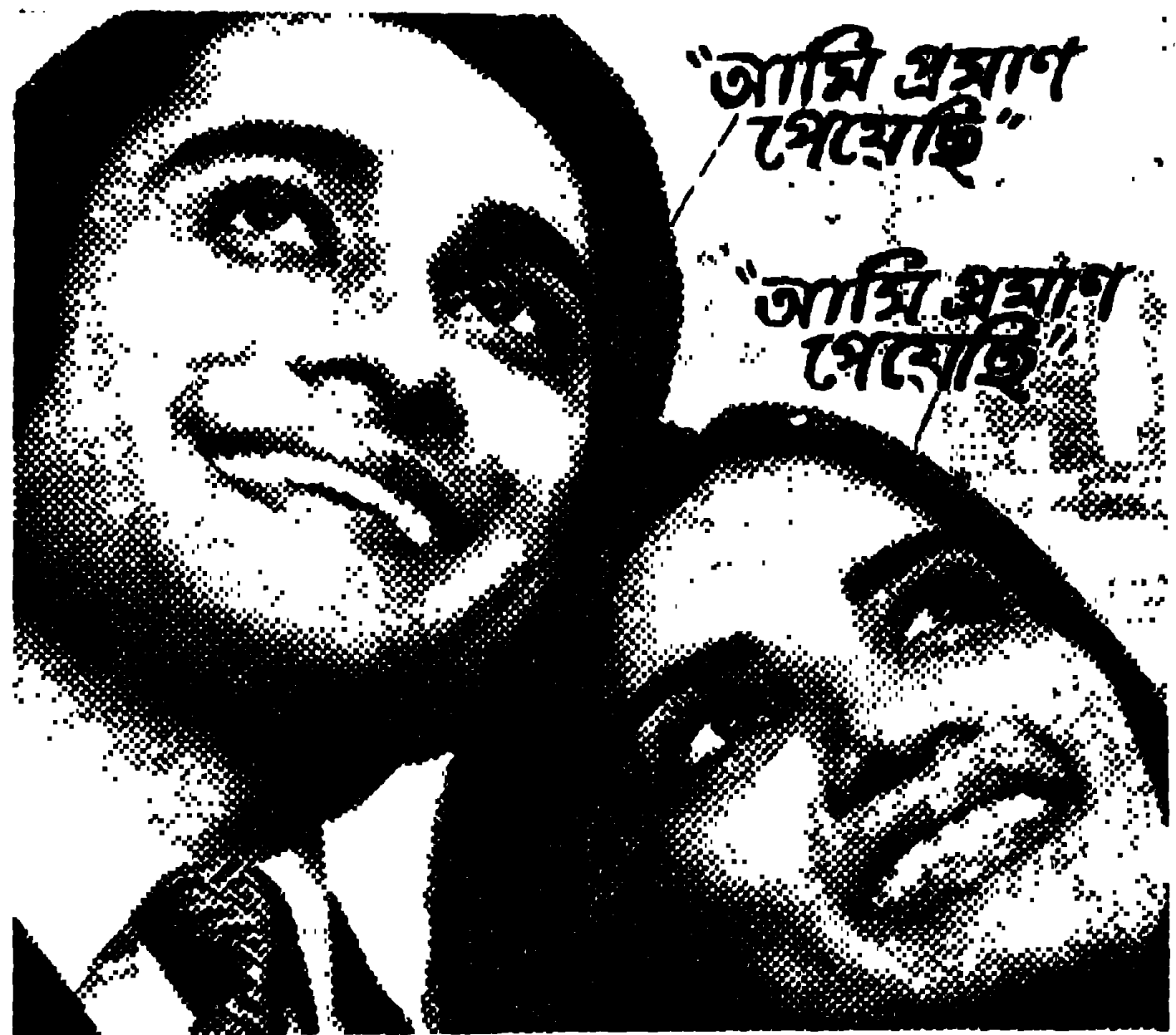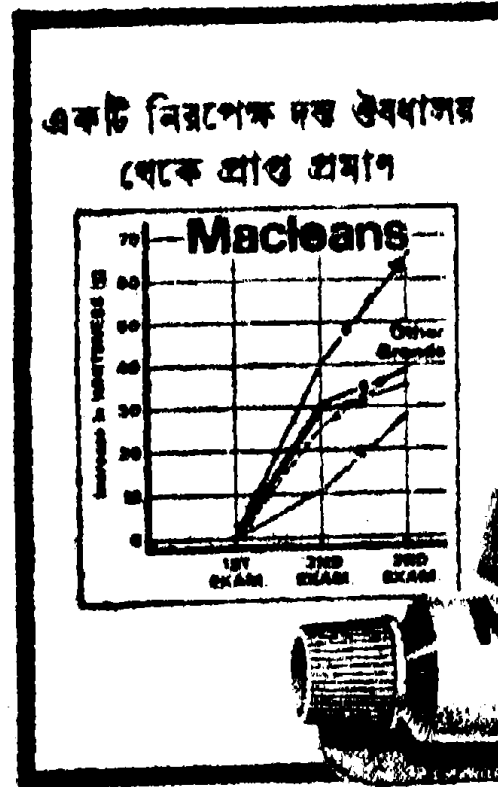
সজল কিছু বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তার হাসি পাচ্ছিল। ব্যাপারটা হারাধন অধিকারীর মামুদের দোকান দেখানোর মত।

হারাধনই বলল, 'ও শালা, বুড়োর চাকরী আর পোষাচ্ছে না। বয়স হল। যে দু পাঁচ বিঘা জমি, জায়গা, পুকুর টুকুর আছে, তাই নিয়েই থাকব ভাই। শালা, চাকরী মানেই চাকরগিরি? বুঝলি না? তোর মত আর দু তিনটা পাশ দিইনি? বাঁদরে চাকরী কোথায় পাব বল?'

হারাধনদা সজলের দুর্দিনের আশ্রয়, এবং সে আশ্রয় সেদিন যে কতবড় ছিল, তা অরুণা জানে না! জানার মত মনের গঠনও তার নয়।

হারাধনের 'বাস' এসে যাচ্ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'হাঁ শোন, বৌমাকে ডাক্তার টাক্তার দেখাবি। প্রথম পোয়াতী। সাবধানে থাকতে বলবি?' তুই ত আবার একটা গাধা। ছোটমাকে নিয়ে এসে রাখনা ক'দিন।

সজল বলল, 'সে আসবেনা। লিখেছিলাম।'

হারাধনদার বাসটার চলে যাওয়ার দিকে সজল অনেকক্ষণ বিবশ চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

আরতি ধীরে ধীরে বলল, 'লোকটি বড় ভালো'।

সজল হাঁটতে হাঁটতে আরতিকে তার প্রথম কলকাতায় জীবনের ঘটনা বলছিল।

হারাধনদা সেদিন না থাকলে সজল কোথায় অন্ধকারে তলিয়ে যেত। গুণময় মহাপাত্রের দোকানের একধারের রান্নাঘরে সেই রাত্রি আটটার সময় কলাই-ওঠা থালাতে ভাত খাওয়া! কী দুর্দিন গেছে তখন। হারাধনদা তার সেই কদিনের একমাত্র আশ্রয়!

আরতি বলল, একটু চল। ঐ শেয়ালদা দেখা যাচ্ছে।

রাস্তায় এই রাত্রে এখন লোক চলাচল একটু কম। হ্যারিসন রোডের বাঁ দিকের ফুটপাত ধরে দুজনে আস্তে আস্তে চুপচাপ হাঁটছিল।

এক সময় আরতি হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল, 'তোমার বড় দুঃখ, না সজল দা?' সজল বিস্মিত হল, এমন একটা সত্য প্রশ্ন, এতো সহজভাবে, বিনা দ্বিধায় যে আরতি জিজ্ঞেস করতে পারে, তা সজল ভাবতে পারেনি।

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি বুঝলে কি করে, আরতি?'

আরতি একটু মৃদু হাসল। 'তোমাকে চিনি বলে?'

সজল অসহায়ের মত বলল, 'কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না। বিয়েটা একটা এক্সিডেন্ট। বিশ্বাস কর, আমি বাধ্য হলাম!'

আরতি সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে বলল, তা কদ্দিন আগে? মাস চার পাঁচেক আগে, একটা সন্ধ্যায়। আমাকে, মানে বুঝলে না...!'

'চার পাঁচ মাস? আরতি যেন একটু চমকে উঠল। তারপর বলল, ঐ কার্তিকবাবু, করুণা, এরা খুব ভালো লোক নয় বলে মনে হয়। অবশ্য নিন্দা করা আমার ঠিক নয়, সজলদা। কিন্তু তোমার জন্য বড় ভয় হচ্ছে। তুমি যে বড্ড সরল, সহজ দুর্বল। তোমার নিজের জগতে তুমি থাক। অথচ সে জগৎটা খুব একটা বাস্তব নয়।'

সজল কথাগুলো নীরবে শুনে যাচ্ছিল।

আরতি আবার বলল, দুঃখ তোমাকে পেতেই হবে, সজলদা। ভুল করলে তার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তা নিতে হবে। তবে দ্যাখো, কখনও কখনও দুঃখটা জীবনের পরীক্ষা। তারপর হাসতে হাসতে বলল, এবার জীবনের ইউনিভার্সিটিতে পড় কিছু দিন। মাস্টার ডিগ্রী পেয়ে যাবে!'

সজল এই হাসিতে যোগ দিতে পারল না। একটু ভেবে সে বলল, 'অরুণার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের যে এতো অমিল, এটা বিয়ের আগে বুঝতে পারিনি, আরতি!'

আরতি বলল, 'জানি। মেয়েদের অভিনয় ধরতে পারা খুব কঠিন কাজ, সজলদা। সে তোমার মত লোকের সাধ্য নয়। কিন্তু তুমি আর কদ্দুর যাবে?'

'চল, আর একটু তোমার সঙ্গে সংগে হেঁটে যাই। বড় ভালো লাগছে আজ। আমার দুঃখ কেউ বোঝেনি, আরতি। কেউ না? শুধু তুমি বুঝেছ।'

আরতি আস্তে আস্তে বলল, 'খুব ধৈর্য ধরবে সজলদা। এখন তোমার সবচেয়ে কঠিন সময়। ধৈর্য হারালেই কিন্তু ভেসে যাবে।'

সজল কিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আরতি, যদি কোন দিন আমার বিপদ হয়, তুমি আসবে?'

আরতি সজলের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু এই অন্ধকারে মুখের রেখা দেখা যায় না।

'কি, কিছু বললে না?'

তখনও আরতি নিরুত্তর।

নীলরতন সরকার হাসপাতালের ওপরে এখন অন্ধকারগুলো মৃত্যুর মত ঘন। একতলা টালির শেডটা এই রাত্রে অপারেশন টেবিলের মত শুয়ে আছে। হাসপাতালের সামনের ফুটপাতে ন্যাড়া গাছটার নিচে এর মধ্যেই একটা ভিখিরি রাত্রির বিশ্রামের জন্য ছেঁড়া চট বিছিয়েছে। পাশে একটা পথের কুকুর।

একটু পরে আরতি বলল, একি! হাঁটতে হাঁটতে এদ্দুরে এসে পড়লে?

সজল এদিক ওদিক তাকাল একটু। জায়গাটা সে ঠিক চিনতে পারছে না!

'বাস আসছে, উঠে পড়।'

সজল এ পকেট ও পকেট হাতড়াল। আরতি হেসে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে পয়সা দিয়ে বলল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

সজল বলল, 'আমার প্রশ্নটার কোন উত্তর দাওনি, আরতি!'

আরতি মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, 'মুখে না বললে উত্তর হয় না বুঝি?'

সজল জীবনে এমন অমৃতের স্পর্শ আর কখনো পায়নি। এর কাছে জীবনের অনেক দুঃখও তুচ্ছ! অনেক আঘাতও সহনীয়। অনেক যন্ত্রণাও বেদনার আরোগ্যের অধিকার, এই নম্র ভালোবাসার স্নিগ্ধতার মধ্যে! সজল আজ ধন্য হয়ে গেল!

ঘরটা অন্ধকার। অরুণা শুয়ে পড়েছে তা হলে! ইস আজ যা পরিশ্রম গেছে ওর শরীরের ওপর দিয়ে! খেয়ে নিয়ে ভালোই করেছে। তাছাড়া সজল অনেক দেরি করেও ফিরল!

রান্নাঘরে ঢুকে সজল আলো জ্বালাল। তার ভাত তরকারি ঢাকা আছে। ক্ষুধিত সজল ঢাকা খুলে খেতে বসল।

নিজেকে তার এখন খুব হালকা লাগছিল। জীবনের সমুদ্রে সে যখন দিক হারিয়ে ফেলছিল, তখন দূরে বাতিঘরের ক্ষীণ আলোটা চোখে পড়ল তার। আর অন্ততঃ দিক ভ্রম হবে না। একটা নিরাপদ বন্দর পাওয়া যাবেই!

খাওয়া শেষ করে সজল শুতে এল। কিন্তু একি! অরুণা ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ করেই শুয়েছে? অনেক ডাকাডাকিতেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অগত্যা সজল নিজের ঘরে এসে বইগুলোকে তোষকের নিচে দিয়ে বালিশের মত করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে।

॥ ২১ ॥

একটা অতৃপ্ত তন্দ্রার মধ্যে সজলের আবছা মনে হচ্ছিল, কে যেন দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে।

সজল কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শুনল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে কপাট খুলল। অরুণা অভিমানের সুরে বলল, 'তুমি শুতে যাওনি কেন ঘরে?' সজল খুশি হল। 'কতো ডাকলাম, তোমার ঘুম ভাঙ্গল না। তাই—' 'এমা! ঘরে জায়গা থাকতে এখানে এসে শোবে? চল ঘরে যাই'।

সজল ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সব তিক্ততা ভুলে যাচ্ছিল। অরুণার হাত ধরে তাকে বিছানায় নিয়ে এল। বড্ড ছোট্ট তোষকটা। দুজনের শুতে কষ্ট হয়।

অরুণা খুব কাছে সরে এল, হাত দিয়ে সজলের গলা জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় আস্তে বলল, 'জানো, আমি কিন্তু জেগেছিলাম। রাগ করে দরজা খুলিনি। সেই যে আরতিকে

এগিয়ে দিতে গেলে, আর পাত্তা নেই। কি পাও ও মেয়েটার মধ্যে, হ্যাগো! আর এদিকে দুজনে একসঙ্গে শাল মুড়ে বসে আছি তো আছি-ই। শোনো-তুমিই বল, আমি আর কতক্ষণ জেগে রইব? কী টায়ার্ড ছিলাম আজ!'

সজল খুশি গলায় বলল, 'তাইতো আমি রাগ করিনি। খেয়েদেয়ে দিব্যি শুয়ে পড়লাম।'

অরুণা ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানের সুরে বলল, 'তুমি কাছে না শুলে আমার ঘুম ভালো হয় না, জানো? কেমন ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগে।'

এই গভীর রাতে, এই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সজলের মনে, শরীরে একটা উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছিল।

পৃথিবীটা এখন ক্লান্ত, ধূসর অন্ধকারের ডানা দিয়ে ঢাকা। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। কেবল নীরব শিশির বিন্দুগুলি আকাশের সমগ্র শরীর থেকে তীব্র মদের মত চুইয়ে চুইয়ে ঝরছে পৃথিবীর মাটিতে, শহরের ফুটপাতে।

অরুণা সজলের দিকে পাশ ফিরে শুতে শুতে জিজ্ঞেস করল, 'আরতি, রেণুদি কি বলল গো আমার কথা'?

'ভালো বলেছে। সবাই খুশি।'

'আর তোমার হারাধনদা?'

'হারাধনদা ত আমাকে কত সাবধান করে দিয়ে গেল। প্রথম পোয়াতী বলে আগে থেকে ডাক্তার দেখাতে বলল, ছোটমাকে আসার জন্য লিখতে বলল'।

'যাই বল বাপু, তোমার হারাধনদা কিন্তু বড্ড 'আনপলিশড়'। কার্তিকদা, দিদি সে কথা বলছিল'।

সজলের পিঠে যেন কেউ হঠাৎ চাবুক মারল!

'ওকে আজ ডাকা তোমার ঠিক হয়নি। অন্যদিন ডাকলে পারতে'। দিদিরা ভাবল তোমার 'টেস্ট' ভালো নয়।' সজল চুপ করে রইল।

'আর রাক্ষসের মত কী খেতে পারে? ভাতাটাত সব কম পড়ে গেছে? পুঁটির জন্য আবার পাউরুটি কিনে আনলাম। কি? কথা বলছনা কেন?' ঘুম পাচ্ছে?'

অরুণা সজলের পিঠে খোঁচা মারল।

'হারাধনদার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না'।

অরুণা সজলের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল।

সজল আবার বলল, 'তোমাদের ঐ পোষাকী ভদ্রতার ধার ধারিনা আমি।'

সজল এমন কড়া কথা বলতে পারে, এমন ব্যক্তিত্বও যে তার মধ্যে আছে, অরুণা তা ভাবতে পারেনি।

'এই হারাধনদা কতদিন নিজে কম খেয়ে আমায় খাইয়েছে। তুমি আজ তারই খাওয়ার খোঁটা দিলে? লোককে খেতে ডেকেছি, পেট ভরে খাওয়াব বলেই। তোমার মন যে এত ছোট, তা আমি ভাবতে পারিনি'!

সজল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এই বিছানায় শুয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। অরুণার শরীরের স্পর্শ যেন গরম লোহার মত দাহ আনছে!

আলোটা নিবিয়ে সজল দরজা খুলে পথে বেরিয়ে পড়ল। একটু খোলা হাওয়ার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে!

সজল ধীরে ধীরে হাঁটছিল। মির্জাপুর স্ট্রীট এখন নির্জন। দোকান পাটের দরজা বন্ধ।

সারা শহরটা যেন প্রাগৈতিহাসিক কোন মৃত মহানগরী যেখানে জীবনের কোন স্পন্দন নেই। শুধু মাঝে মাঝে রাস্তার আলোগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা সাদা চোখে তাকিয়ে আছে।

সজল এগিয়ে যাচ্ছিল, গোলদীঘির ধারে কোন বেঞ্চে বসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে একটু শান্ত হতে পারে।

কিন্তু গেটগুলো বন্ধ। ভেতরে ঢুকতে হলে বেড়া ডিঙোতে হবে। সজলের তা ইচ্ছা করছিল না। তার শরীরেও এখন একটুও শক্তি নেই।

এগিয়ে যেতে যেতে সজল সেনেট হলের সামনে এসে দাঁড়াল। স্তব্ধ গম্ভীর হলটাকে এখন এই গভীর রাত্রির ক্যানভাসে, মহেঞ্জোদরোর মত কোন বিরাট প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বলে মনে হয়। বিরাট বিরাট থামগুলি বিশাল উঁচু খিলান, বিস্তীর্ণ সিঁড়িতে বেজে ওঠা প্রতিধ্বনি, আর ওপরের সমুদ্র-আকাশ, সব যেন এক ধ্রুপদের মন্থর গম্ভীর আলাপ!

একটি থামের আড়ালে সজল কতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। দেয়ালের দিকে দু-একজন ভিখিরী ঘুমিয়ে আছে। সামনে গোলদীঘির জলের ওপর অন্ধকারের স্তর জমা হয়ে আছে এখন।

রাত্রি শেষের বাতাসে শীত শীত করছিল একটু। সজল ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসছিল। মনের উত্তাপ ধীরে ধীরে কমে আসার পর কেমন একটা বিষণ্ণতা, লজ্জা, তাকে ঘিরে ধরছিল। আশ্চর্য, বিবাহটা এমন কঠিন দুরারোগ্য বন্ধন হয়ে উঠবে জীবনের ওপর এত অত্যাচার হয়ে উঠবে, সজল তা ভাবেনি। ভাবতে পারেনি। একটা গভীর ব্যর্থতাবোধও তাকে এই মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে তুলছিল।

সজল কতোক্ষণ হাঁটুতে মুখ গুঁজে চুপ করে বসেছিল! দূরে থেকে ভেসে-আসা একটা শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখল, শ্যামবাজার থেকে প্রথম ট্রাম আসছে। তারি আলো পড়ছে ট্রাম লাইনের ওপর।

সজল পূর্ব দিকে তাকালো। নতুন বাড়ীর ছাদের ওপরের আকাশে রঙ ফিরছে এখন। অন্ধকার ভেঙে ভেঙে, আবার দিনের সূর্যের আবির্ভাবের জন্য ভূমিকা রচনার মঞ্চ এখন।

ঠিক এমনি ভোরে বাবা বিছানা ছেড়ে যেত। অমৃতপুরের গাছপালায় মাটিতে, ধানমাঠে আকাশে তখনও রাত্রির ঘুমের আর্দ্রতা। পথঘাটে কেউ নেই। শুধু খড়ুই গ্রামের উত্তর ধার দিয়ে ব্রজ্ঞাণদীঘির দিকে যে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে, তারি ওপর দিয়ে হয়ত একটা গরুর গাড়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। তার পেছনে পথের দুধারে দিগন্তের শেষ আলোয় বিচ্ছিন্ন নিম ও অশথ গাছের সারি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাবা মাঠের ধারে সূর্যোদয়ের পানে মুখ করে স্তব্ধ তাকিয়ে আছে।

সেই অমৃতপুরের স্মৃতি, অমৃতপুরের অনুভব, অমৃতপুরের জীবন আজ ক্রমশঃ আবছা হয়ে উঠছে। শিকড় থেকে, উৎস থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে সে। জীবনের আশ্চর্য পরিবর্তন! কী আশ্চর্য দৃশ্যান্তর! কী করুণ বিস্ময়কর ব্যর্থতা!

সেদিন অফিস শেষে বিশ্বনাথের বাড়ী যাবে বলে সজল সোজা দক্ষিণ দিকে হাঁটছিল। পথে কোথাও ট্রামে-বাসে উঠে পড়বে একটু খালি দেখে। কোনদিকে খেয়াল ছিল না। হাজরার মোড়ে সব সময় ভীড় লেগে থাকে। ভীড়টা এড়িয়ে পশ্চিমদিকের ফুটপাত ধরে একমনে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল, তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে! কিন্তু কে ডাকে? প্রথমে ভেবেছিল, বন্ধু মহলের কেউ ডাকছে বোধহয়। বহুদিন সে কাছাকাছি জায়গায় কাটিয়েছে। পটলওয়ালারা তার চেনা, সজল নিজেই একদিন পটল দিয়েছিল।

সজল ভালো করে কান পাতল। কিন্তু ডাকতে ডাকতে যে প্রৌঢ় লোকটি দ্রুত এগিয়ে এল, সে আর কেউ নয় তারই আগের বাড়ীওয়ালা বৈকুণ্ঠ দাস। 'নমস্কার সজলবাবু।'

সজল নমস্কার করল। বৈকুণ্ঠবাবু খুশি হয়ে বলল, 'সেই যে গেলেন মশায় একবারও এলেন না এদিকে। বেঁচে আছি কিনা সে খোঁজ-খবরও ত নিতে হয়। আর তাই বোলে আপনার সঙ্গে ত মশায় বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্ক ছিল না?'

সজলের মনে পড়েছিল, দুদিন যে একবার বাড়ীওয়ালা ভাড়া নিতে চায়নি। সজল বিনীত গলায় বলল, 'এদিকে এদিন পরে এলাম। আচ্ছা, ঐ ঘরে নতুন ভাড়াটে এসেছে নিশ্চয়ই। কেমন লোক?'

বৈকুণ্ঠবাবু একটু করুণ গলায় বলল, 'না, মশায়, আর ভাড়াটে বসাইনি। তাছাড়া আপনার মত খাঁটি হাত-পাওয়ালা ভাড়াটে কোথায় পাব বলুন? একজন ভদ্রলোক মাত্র ছিল। এখানে নাকি লোকজন মুখ দেখা যায় না। তাই চলে গেল। আমরাই থাক। নিজেদেরই থাক ওটা। কিন্তু আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন বলুন?'

সজলের কথা বলতে বিশেষ ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু পাছে সে মনোভাবটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এজন্য বেশি আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'থাকি মির্জাপুরে। অফিসটাও কাছে হয়।'

'আপনি নাকি সিমেন্ট দপ্তরে কাজ করেন?'

'হ্যাঁ তা করি।'

তা হলে খুলেই বলি, 'সজলবাবু। এক টনের মত সিমেন্ট করে দিতে পারবেন? বাড়ীটা মেরামত করব'। সব শালাই ব্ল্যাকের দাম চায়!'

সজলের আদৌ ভালো লাগছিল না। তবু এই কথায় যদি শেষ হয়, সেই ভেবে বলল, 'দরখাস্ত করুন। দেখব তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় কিনা? তবে কথা দিচ্ছি না।'

বৈকুণ্ঠবাবু কন্ট্রোলের দামে একটন সিমেন্ট পেতে পারে শুনে বোধহয় ধন্য হয়ে গেল।

না, ট্রামে ওঠা যাবে না। সজল ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

বেল বাজতেই আজ হরিহরদা কপাট খুলে দিল। সজল বলল, 'শুচিতা নেই?'

শুচিতা ওপর থেকে গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে নেমে আসছিল।

সজলের ইচ্ছা করছিল এই বোনটাকে আজ একটু আদর করে কিন্তু তা হয় না। মিনু বেঁচে থাকলে আজ এতবড় হত। মিনুকেও এখন এমনি করে আদর করা আর সম্ভব হত না! সকালবেলার আলো চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যেরও রং বদল হয়। অথবা শীতের পাতা ঝরার শেষে বসন্তের আয়োজন।

শুচিতা সজলকে ওপরে নিয়ে এসে বিশ্বময়ের ঘরে বসাল। দুহাত দিয়ে নিজের সুন্দর চুলগুলো দুদিকে সরাতে সরাতে এক সময় গম্ভীর গলায় বলল, 'কী ব্যাপার বলুন ত? ভুলে গেলেন আমাদের?'

শুচিতা কেন এত বিষণ্ণ, গম্ভীর, সজলের জানতে খুব ইচ্ছা করছিল। কারণ সজল কোনদিন ওকে এমন অবস্থায় দেখেনি।

'কি? কোথায় ছিলেন এদ্দিন?'

সজল বিয়ের কথাটা বলতে চায় না। বলল, 'এ বাসায় তো এখন নেই। সেই আমি কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে চলে গেছি। অফিসে কাজের চাপ। তাই আসা হয়ে ওঠেনি। সে যাক, বিশ্বময়ের খবর কি বল?'

শুচিতা বলল, 'দাদার খবর আপনার কাছ থেকে পাব বলেই তো মনে করে-ছিলাম। অপেক্ষা করেছিলাম এদ্দিন।'

'কেন? আমাকে বিশ্বময় চিঠি লেখেনি বহুদিন।'

'আমাদেরও না'। তবে শেষ চিঠিতে লিখেছিল 'মানব মুক্তি' কাগজ চলছে না। বন্ধ হয়ে গেছে। আদৌ বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়নি। সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিল, ছেড়ে চলে গেছে। চারদিকে দেনা। বাবাকে অবশ্য দেনার কথাটা বলিনি আমি। যাবার আগে বাবার সঙ্গে কি নিয়ে খুব তর্ক হয়েছিল। রাজনীতিটিতি বুঝিও না আমি এসব।'

সজল অবাক হয়ে বলল, 'তারপর?'

এদিক ওদিক তাকিয়ে শুচিতা শুকনো মুখে বলল, 'বাবাকে বলবেন না যেন, আমি লুকিয়ে আড়াইশ টাকা পাঠিয়ে-ছিলাম। কিন্তু জানেন, দাদা টাকাটা নেয় নি। ফেরত দিয়ে দিয়েছে।'

সজল অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'ভিক্ষে করে নাকি মানবমুক্তি আসবে না। শুনুন কথাটা একবার! আমি কি ওসব মুক্তিফুক্তি বুঝি? আমি বুঝি, দাদা অসুবিধায় পড়েছে। তা টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল! ভাগ্যি বাবা বাড়ীতে ছিল না কদিন। নইলে জানাজানি হয়ে যেত!'

সজল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বিশ্ব-ময়কে শুচিতা এতো ভালবাসে!

অথচ বিশ্বময়ও সত্য, তার আদর্শের দিক থেকে। সে তার নিজের দায়িত্ব নিজেই বইবে। ভুলের দায়িত্ব, সফলতার দায়িত্ব, সবই তার নিজস্ব।

শুচিতা বলল, পাটনায় নাকি চাকরীর চেষ্টা করছে। চাকরী করে দেনা শোধ করবে।' তদ্দিন মানবমুক্তির চেষ্টা বন্ধ থাক। পৃথিবীর কোন মহৎ আদর্শ রূপায়ণের নাকি সর্টকাট পথ নেই। বুঝলেন কিছু?

সজল বলল, 'আর কিছু লেখে নি?'

'হ্যাঁ, ছবি আঁকছে এখন'—কথাটা বলেই শুচিতা হাসল।

অর্থাৎ বিশ্বময় যে ছবি আঁকছে, এই একটা ব্যাপারে শুচিতা খুশী। বসতে বলে, শুচিতা ঘর থেকে চলে গেল।

তারপর একটু পরে ফিরে এসে বলল, 'আজ এক্ষুনি যাবেন না যেন।'

সজল বলল, 'যাব না একটা শর্তে। সেই গানটা শোনাবে একটু?'

শুচিতা চোখ দুটো বড় বড় করে অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, কোন গানটা?'

'যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ...সবারে আমি নমি?'

যে জীবনে সুখ দিয়েছে তাকেও নমস্কার করি, যে দুঃখ দিয়েছে তাকেও। সজল ভাবছিল, এতো গীতায় সেই স্থিত প্রজ্ঞের কথা!

'আচ্ছা সজলদা আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভালোবাসেন। তাই না?'

'ভালোবাসি কিনা, বা কতটা ভালো-বাসি কি করে বলব? তবে কি জান? বাবার বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম এক সময়। তাই থেকে মনে হয়, এই গান-গুলি মন্ত্রের মত, কখনও বা তার চেয়েও বেশী। সেই জন্যই বার বার শুনতে ইচ্ছা হয়।'

'তবে শিখুন না? কি গলা আপনার? আমার মাস্টার মশায়কে বলব?'

'বলবে। মৃত্যুর পরে।' তদ্দিন মুখ বুজে অপেক্ষা কর।'

শুচিতা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'বড্ড বুড়োর মত কথা বলছেন আজ।'

হরিহরদা অনেক খাবার নিয়ে এল। অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী। সজলের মনে হচ্ছিল, আজ যেন উৎসব বাড়ী।

শুচিতা প্লেটগুলো সাজিয়ে রাখছিল। 'নিন, খান। আমি বসে আছি। অফিস থেকে ফিরলেন ত?'

সজল ঠাট্টা করে বলল, 'আগে থেকে তোমার পাশ করার খাওয়াটা খাইয়ে দিচ্ছ নাকি?'

'দিচ্ছি। তখন যদি না আসেন। আসবেন ত আবার ছ' মাস পরে।'

'দেরী করে এলে বেশী আদর পাওয়া যায়। বুঝলে না? এই দেখ, কত খাবার?'

অনেকক্ষণ পরে সজলকে এগিয়ে দিতে এসে সুচিতা কপাট ধরে দাঁড়াল। সজল লক্ষ্য করছিল, ওর মনটা আবার ভারী হয়ে উঠছে। বোধহয় বাড়ীতে একা থাকার জন্য। ওর কোন বন্ধুকেও সজল কখনও দেখে নি। হয়ত ওর বাবা স্বদেশী করে বলে, এই অভিজাত পল্লীতে ওরা একটু স্বতন্ত্র, একটু আলাদা। তাই শুচিতার বন্ধু হয় নি কেউ।

অথবা সজলের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে।

সজল যাবার জন্য তৈরী হয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এরকম খাওয়াবে বললে ঘন ঘন আসব।'

শুচিতা এ ঠাট্টায় যোগ দিল না। তাকে এখন অনেক শান্ত, গম্ভীর মনে হচ্ছিল।

'জানেন সজলদা, আজ দাদার জন্ম দিন ছিল। কোথায় সে আজ আছে, কেমন আছে, কিছু জানতে যদি দেয়? কি যে রাগ ধরে, আপনাকে কি বলব?'

শুচিতা বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করল!

সজল মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়েছিল। তারপর এক সময় বলল, 'কিছু ভেব না শুচি, বিশ্বময় যেখানে থাক ভালই আছে। সে তোমাকে ভালোবাসে। কোথায় তোমাদের ছেড়ে যাবে? মন খারাপ করো না। কেমন? আজ আসি।'

মাথা নীচু করে সজল ধীরে ধীরে পথে নামল।

(ক্রমশঃ)

ঊনিশ শতকের তিনজন রবীন্দ্রানুরাগী মহিলা কবি

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

(ক)

স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী ও মৃণালিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি। এ'রা তিনজন গত শতাব্দীর পর পর তিন দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারীর জন্ম হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে, মাইকেল মধুসূদনের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, মৃণালিনীর (সেন) জন্ম হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে।

স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা হলেও তাঁর সাহিত্যরচনার সূত্রপাত ঘটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের সমসাময়িক কালে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপ নির্বাণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তারও কয়েক বছর পরে। মৃত্যুর (১৯৩২) মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর শেষ উপন্যাস 'মিলনরাত্রি' প্রকাশিত হয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে স্বর্ণকুমারীর কাব্য উজ্জ্বল রবিকরেই সাধিত হয়েছে। মানকুমারী ও মৃণালিনীর কাব্য-সাধনার কালও রবীন্দ্রপ্রতিভাদীপ্ত। এই তিনজন কবিই সেই সূর্যলোক থেকেই ভাবনা আহরণ করেছেন— এখানে তাঁদের মিল রয়েছে। এ'রা রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগিণী, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবনায় ভাবিত—যদিও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ কবির কবিতার প্রভাবও এ'দের উপর লক্ষণীয়।

এই তিন কবির চেয়েও কামিনী রায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনেক বেশী। কিন্তু এই ত্রয়ী শুধুমাত্র রবীন্দ্র-প্রভাবের বিচারেই সহগামিনী তা-ই নয়, এ'রা একে অপরের কবিতারও অনুরাগিণী—এদিক থেকেও এ'দের বিশেষত্ব রয়েছে। মৃণালিনীর 'প্রতিধ্বনি' কাব্যের দ্বিজসুরেন্দ্র কবিতাটি, 'আগমনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত উপন্যাসের চার চরিত্র কমল, নীরজা, হীরণ ও শ্রাবণের উদ্দেশ্যে লেখা। মৃণালিনীর নির্ঝরিণী কাব্যের 'হেমন্তী' লেখা হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাসখানি লক্ষ্য

মৃণালিনী সেন

করে। আবার নির্ঝরিণীর কবি মৃণালিনীকে উদ্দেশ্য করে মানকুমারী লিখেছেন 'নির্ঝরিণীর কবি'।

(খ)

স্বর্ণকুমারী ১২৬৫ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ) ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জানকীনাথ সিভিলিয়ান ছিলেন। পরবর্তী কালে দেশসেবকরূপেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। স্বর্ণকুমারী তাঁর 'দি কেটাল গারল্যান্ড'-এর ভূমিকায় লিখেছেন যে, তাঁর স্বামীর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে কবিরূপে আত্মপ্রকাশ সম্ভব হত না। সংগীতের প্রতি তাঁর বাল্যকাল থেকেই গভীর অনুরাগ ছিল। ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক বাতাবরণে তাঁর কাব্যপ্রীতি জন্মলাভ করে, সেই প্রীতি বিকশিত হল তাঁর স্বামীর সোৎসাহ অনুপ্রেরণায়।

স্বর্ণকুমারীর প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তিনি প্রায় আঠারো বৎসরকাল 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এই-ই স্বর্ণকুমারীর তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি। ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখিকারূপে তাঁর নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

স্বর্ণকুমারীর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম : দীপনির্বাণ (উপন্যাস, ১৮৭৬) ; ছিন্নমুকুল (উপন্যাস, ১৮৭৯), মালতী (উপন্যাস ১২৮৬ বঙ্গাব্দ), কাহাকে ? (১৮৯৮) স্নেহলতা (১২৯৯ বঙ্গাব্দ), মিবাররাজ (১৮৭৭), বিদ্রোহ (১৮৯০), ফুলের মালা (১৮৯৪), বিচিত্রা (১৯২০), স্বপ্নবাণী (১৯২১), মিলনরাত্রি (১৯২৫)। কাব্যগ্রন্থ —গাথা (১২৮৭ বঙ্গাব্দ), বসন্ত-উৎসব (১৮৮০), কবিতা ও গান (সংকলন ১৩০২ বঙ্গাব্দ), দেবকৌতুক ও যুগান্ত কাব্যনাট্য। তাঁর অন্যান্য রচনা—মোহম্মদ মোহসীনের জীবনী 'হুগলীর ইমামবাড়ী (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) গল্পস্বল্প, পৃথিবী।

স্বর্ণকুমারীর সর্বশেষ উপন্যাস সম্পর্কে সমসাময়িক এক পত্রিকার অভিমত ছিল এইরকম : 'মিলনরাত্রি—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থের লেখিকা মহোদয়ার পরিচয় দিতে হইবে না, অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল হইতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন ; এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সেবা ত্যাগ করেন নাই। মিলনরাত্রি তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। তিনি যে কথাটি যখনই বলিতে চান, সুন্দর ও স্পষ্ট করিয়া বলেন, কোন ঘোর-পেঁচ রাখেন না। আর তাহার কথা—তিনি সে বিষয়ে অগ্রণী রূপেই অধিষ্ঠিতা। উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ স্বদেশী ব্যাপার, সুতরাং সকলেরই ভালো লাগিবে।' (ভারতবর্ষ, ১৩শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

১৯৩২ খৃঃ স্বর্ণকুমারী পরলোকগমন করেন।

মানকুমারী বসু তাঁর আত্মকাহিনীতে বলেছেন, '১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ রাত্রিকালে মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর

বিজ্ঞাপন।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি।

শ্রীমতী মানকুমারী-প্রণীত, [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গভাষার অতুলনীয় কাব্য।

[illegible]

কবিতা ও গান।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।

কার্ত্তিক ১৩০২।

মূল্য দুই টাকা।

জন্ম হয়। শিশুকালে আমাকে 'অভিমানিনী' দেখিয়াই নাকি আমার নামকরণ হইয়াছিল মানকুমারী।

আমার মনে হয়, একদিন আমার এক ভগিনীকে দিয়া একখানি ছোট খাতা বাঁধাইয়া লইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'খাতাখানা আমাকে দে, আমি তোকে গান লিখিয়া দিব।' আমি তাহা দিলাম না। অতি নির্জনে বসিয়া সেই খাতা এবং দোয়াত কলম লইয়া তাহার নামকরণ করিলাম 'লাইবাইটের উপাখ্যান'। কিন্তু সেই লাইবাইট পুস্তকে কি লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার ভাল মনে নাই।...যাহা হউক সেই লাইবাইটই আমার প্রথম রচনা।' (বঙ্গের মহিলা কবি/যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।

মানকুমারী যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বংশে মাইকেল মধুসূদন ছাড়াও একাধিক ব্যক্তি কবি-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মানকুমারীর এক পিতামহ 'মানিকরাম দত্ত সুকবি ছিলেন। মানকুমারীর পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরীও দুর্গাস্তব, শিবস্তব, গণেশবন্দনা প্রভৃতি রচনা করেছিলেন।

সাগরদাঁড়ি গ্রামের নিকটবর্তী বিদ্যানন্দকাটী গ্রামের বসু পরিবারে ১২৭৯ সালের ৭ই মাঘ মানকুমারীর বিয়ে হল। তাঁর স্বামী গোপনে তাঁর কবিতা রচনায় উৎসাহ দিতে লাগলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে মানকুমারী 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীর-রসপূর্ণ এক কবিতা লিখে স্বামীকে দিয়েছিলেন!

কিন্তু মাত্র সাড়ে আঠারো বৎসর বয়সে মানকুমারী তাঁর স্বামীকে হারালেন। তাঁর শোকোচ্ছ্বাস 'প্রিয়প্রসংগ' নামক গদ্য-কাব্যে লিপিবদ্ধ হল। গঞ্জনার ভয়ে লেখিকার নাম ও পরিচয় গ্রন্থে অনুল্লেখিত রইল।

মানকুমারী দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি সাহিত্য-চর্চা করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল এবং কয়েকটি পুরস্কৃতও হয়েছিল।

১৯৪৩ খৃঃ মানকুমারীর মৃত্যু হয়।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নাম : 'প্রিয়প্রসঙ্গ' ও 'বনবাসিনী' (১৮৮৮), 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', কনকাঞ্জলি (১৮৯৬) ও বীরকুমার বধ (১৩১০ বংগাব্দ)।

মৃণালিনী সেনও দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন। ১৮৭৭ খৃঃ তাঁর জন্ম হয়। মাত্র সম্প্রতি ৮ই মার্চ, ১৯৭২, তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃণালিনীর পিতার নাম লাডলিমোহন ঘোষ। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী

তাঁর গ্রন্থাদির নাম প্রতিধ্বনি (১৮৯৫), নির্ঝরিণী (১৮৯৫), কল্লোলিনী, মনোবীণা (১৯০০)। এই চারটি কাব্যগ্রন্থ হতে কবিতা নির্বাচন করে এবং পরবর্তী কিছু কবিতা যোগ করে ১৯৬২ খৃঃ মৃণালিনীর কাব্য-সংকলন 'প্রনিকম ও উত্তরা' প্রকাশিত হয়।

স্বামীর অকালমৃত্যু মৃণালিনীর [illegible]-ভাবনাকে উৎসারিত করেছিল। কিন্তু মৃণালিনী এক অর্থে বিদ্রোহিনী। স্বর্ণকুমারী ও মানকুমারী, বিশেষ করে দ্বিতীয়জন অতি অল্পবয়সে স্বামীহারা হন। কিন্তু মৃণালিনী বৈধব্য বেশিদিন মানলেন না। হয়তো তিনি বুঝেছিলেন, পৃথিবীকে তাঁর অনেক কিছু দেবার আছে। ২৬ বৎসর বয়সে মৃণালিনী কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন। নির্মলচন্দ্র সেন তখন ইণ্ডিয়া অফিসের 'শিক্ষা উপদেষ্টা' ছিলেন। নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে তিনি লণ্ডন চলে যান এবং সেখানেই বাস করতে থাকেন। বিদেশে গিয়ে তিনি ইংরাজী লেখা শুরু করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সভায় যে সকল ভাষণ দিয়েছিলেন, ১৯৫০ খৃঃ 'নকিং অ্যাট দি ডোর' নামে তার সংকলন প্রকাশিত হয়। ডঃ কালিদাস নাগ এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন।

First woman Flier in India/
Nikhil Sen, Sunday Magazine,
Th Amrita B. Patrika, 26.3.72

নানা কারণে তাঁর নাম বাঙালীর ইতিহাসে স্মরণীয়। এই দুঃসাহসিক মহিলা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিমানযানে ভ্রমণ করেন। আবার মিস ক্যাথরিন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হলে মৃণালিনী তার যথাযোগ্য জবাব দিয়েছিলেন।

পাইকপাড়ার রাণী মৃণালিনী বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত মহিলা সমাজে উনবিংশ শতকের সুযোগ্য প্রতিনিধি। উনবিংশ শতকের নারীজীবনের মহিমা ও সংস্কার, এবং সেই সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নবজীবনের জয়গান—এই দুই ধারায় তাঁর কাব্য প্রবাহিত।

ইংরাজী ভাষায় তাঁর রচনাসমূহও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। প্রসঙ্গত, লণ্ডনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর বাংলা ভাষা শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯১৭ খৃঃ ওয়েস্টমিনস্টারের 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' এক সভায় মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক ভাষণ দেন। বিদেশে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে এ ঘটনা তৎকালীন সময়ের বিচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(গ)

'গাথা' স্বর্ণকুমারীর প্রথম প্রকাশিত কাব্য। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৬৩) ডঃ সুকুমার সেন 'গাথা' কাব্যের প্রকাশকালরূপে সন ১২৯৭ বঙ্গাব্দ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ঐ কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের টাইটেল পৃষ্ঠায় সন ১২৮৭ সাল মুদ্রিত আছে। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত'—এই বয়ানের নীচে সাল উল্লেখিত। 'উপহারে' 'স্নেহের রবিটি' বলে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ।

'গাথায়' চারটি কবিতা আছে—(১) সাশ্রু সম্প্রদান (২) সাধের ভাসান (৩) খড়্গ পরিণয় ও (৪) অভাগিনী। 'খড়্গ পরিণয়ের' কাহিনী টডের 'রাজস্থানে'র প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মেবারের রাণা রত্ন ও অম্বররাজকন্যার গোপন বিবাহ অবলম্বনে রচিত। বিহারীলালের শেষ কাব্য 'সাধের আসন'। এই কাব্যের প্রথম তিন সর্গ 'মালঞ্চ' পত্রিকায় সন ১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। 'গাথা' কাব্যের টাইটেল পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সাল যদি নির্ভুল হয়, তবে নিশ্চিত যে স্বর্ণকুমারীর কাব্য 'গাথা' বিহারীলালের কাব্যের পূর্বে প্রকাশিত হয়। অতএব 'সাধের ভাসান' এই নামকরণে বিহারীলালের প্রভাব নেই।

'সাশ্রু পরিণয়ের' কাহিনী রোমাণ্টিক এবং তাতে বিশেষ জটিলতা নেই। অজিত নলিনীকে ভালবেসেছিল। কিন্তু নলিনী শৈশবেই আর একটি যুবককে হৃদয় সঁপে দিয়েছে। পূর্ব প্রণয়ী বিদেশ থেকে ফিরে এলো। নলিনীকে সে ভুল বুঝলো। তারপর নলিনী সন্ন্যাসিনী হয়েছে। কত বর্ষ কত মাস কেটে গেছে। শেষে একদিন অনুতপ্ত প্রণয়ী নলিনীকে এক বিজন বনে যোগিনীরূপে আবিষ্কার করল। সেই বিজন বনে কোথায় পুরোহিত? সেই বনের মধ্যে এক কালিকা মন্দিরের

স্বর্ণকুমারী দেবীর গাথাকাব্যের উপহারপত্র

উপহার।

ছোট ভাইটি আমার,

যতনের গাথা হার কাহারে পরাব আর ?

স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,

যেন রে খেলার ফুলে ছিঁড়িয়ে ফেলোনা খুলে,

দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।

পুরোহিতকে তারা বিবাহকার্য সম্পাদন করতে অনুরোধ করল। তারপর,

'মন্ত্রপাঠ করি, পরাইয়া মালা
বালার হাতটি স্বহাতে নিয়ে,
সম্প্রদান তাহা করিল যুবারে,
বিধিমতে দিল তাদের বিয়ে।
একবার শুধু আটকিল কথা
একবার হিয়া কাঁপিল তাতে,
একফোঁটা তার আঁখিজল শুধু
পড়িল তখন বালার হাতে।'

১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় স্বর্ণকুমারীর কবিতা ও গানের সংকলন 'কবিতা ও গান'। সংকলনগ্রন্থের মুখবন্ধরূপে যে বিজ্ঞাপন সন্নিবিষ্ট আছে, তাতে লেখিকা বলেছেন যে, 'গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থ হইতে সংকলিত, কেবল 'বসন্ত উৎসবের' সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই; প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি গান উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই একটি গান ইংরাজী ভাব লইয়া রচিত।' 'রচয়িত্রী' মুখবন্ধ রচনার স্থান ও তারিখ নির্দেশ করেছেন—'মহীশূর, ভাদ্র, ১৩০২'।

সংকলন গ্রন্থটি 'ভাই'-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কোন ভাই তার উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে এ সময়ে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাই, মনে হয়, গ্রন্থখানি তাঁকেই উপহৃত। উপহার একটি ক্ষুদ্র কবিতায়—

ভাই,
সামান্য এ উপহার যোগ্য নহে তব!
শুষ্ক ফুল দু'চারিটি, নাহি বাস নব ;
তবু যদি লহ হয়ে ও পুণ্য স্নেহের স্পর্শে
সরস সুভাষে পুন হাসিবে এ সব।'

কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি কবির বাল্যরচনা। 'স্বর্ণকুমারীর কবিতা রচনায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও বিহারীলালের প্রভাব দেখা যায়।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। দ্বিতীয় খণ্ড। নবীন গীতিকবিতা।) রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও অস্পষ্ট নয়। অধিকাংশ কবিতায় নারী হৃদয়ের সহজ সরল উচ্ছ্বাস প্রকাশিত।

সংকলিত রচনাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) কবিতা (২) গান (৩) জাতীয়সঙ্গীত ও (৪) ধর্মসঙ্গীত। কবিতার তুলনায় গানগুলিতে পরিণত কবিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রত্যেকটি গানের প্রারম্ভে রাগ ও তালের নির্দেশ আছে। রজনী [illegible] কয়েকটি গান রচিত। 'মল্লার কাওয়ালি' রাগের একটি গান—

[illegible] রাতে—
কম্পিত পল্লব দক্ষিণ বাতে,
পেখলু, সজনি,
সতিমির রজনী,
অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতে।'

স্বর্ণকুমারীর ধর্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্রাহ্ম উপাসনা সঙ্গীত। আবার কৃষ্ণ ও শ্যামাবিষয়ক পদও আছে। 'মিশ্র রামপ্রসাদী সুরে' রচিত 'মা বলে আর ডাকব না মা! নাম রেখেছি পাষাণের মেয়ে......' গানে শুধু রামপ্রসাদী সুরই নয়, প্রসাদী গানের শৈলীপ্রভাবও সুস্পষ্ট।

স্বর্ণকুমারীর জাতীয়সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটি অপূর্ব। 'জয়জয়ন্তী' রাগের এই জাতীয়সঙ্গীতটি রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালের সঙ্গীতকার অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জাতীয়সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বড় সাধ বড় আশা বড় আকিঞ্চন—। পরাতে, জননি, তোরে রত্ন আভরণ—!'

স্বর্ণকুমারী কাব্য-কবিতা ছাড়া উপন্যাস এবং বিজ্ঞানবিষয়ক নিবন্ধও রচনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণকুমারীর যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তাছাড়া আরও অন্তত দুখানা পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। 'ভারতী' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ কর্তৃক, 'কাশিয়াবাগান বাগানবাটি, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা' হতে প্রচারিত স্বর্ণকুমারী, সত্যেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'গল্পস্বল্প' ও 'পৃথিবী' নামের দুখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাই। প্রথমখানিতে স্বর্ণকুমারী রচিত 'বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জক গল্প কবিতাদি' রয়েছে এবং দ্বিতীয়খানিতে তিনি 'পৃথিবী সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানরহস্য' বর্ণনা করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থগুলি তৎকালীন সংবাদপত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর একখানি গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'ওপিনিয়নস্ অব দি প্রেস' সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ক্যালকাটা রিভিউ বলেছেন—

"We should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal".

তাঁর 'বসন্ত উৎসব' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে সমসাময়িক সমালোচকের মন্তব্য এই—

"There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so thoroughly chaste and sweet, so rich in charms of poetry, and, therefore, so well calculated to improve the taste of the play-going public, we have little hesitation in declaring that it will, at no distant date revolutionise the existing style of opera-writing in Bengali ...... "Indian Mirror.

ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রে 'বসন্ত উৎসব'কে 'সুপিরিয়র মরাল টোন অ্যান্ড পিউরিটি অব সেণ্টিমেণ্টস অ্যান্ড এক্সপ্রেশনস্'-এর জন্যে উচ্চপ্রশংসা করা হয়েছে। একখানি বাংলা পত্রিকা 'নব-বিভাকর' লিখেছেন—'ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে পরিপূর্ণ।'

(ঘ)

মানকুমারী বসু মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্রী। মানকুমারী (১৮৬৩-১৯৪৩) 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' 'কনকাঞ্জলি' 'বীরকুমার বধ' প্রভৃতি কবিতা ও কাব্য রচনা করে মহিলাকবিরূপে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মহিলাকবিরূপে তাঁর স্বীকৃতিস্বরূপ কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৯ সালে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে।

যশোহর জিলার সাগরদাঁড়ির নিকট-বর্তী শ্রীধরপুরে তাঁর জন্ম। পিতার নাম আনন্দমোহন দত্তচোধুরী। সাগরদাঁড়ি এবং কপোতাক্ষ নদতীরবর্তী ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মাইকেলের কবিপ্রতিভা তাঁকে কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে। মাইকেল স্মরণে রচিত তাঁর কবিতা 'কবির শ্মশানে' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' মানকুমারীর প্রথম কবিতাগ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কনকাঞ্জলি'তে সংকলিত কবিতাগুলি শৈলী ও ভাবনার বিচারে অধিক পরিণত। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। বস্তুতপক্ষে কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মানকুমারী খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' সংকলনে গ্রথিত 'আমার দেশ' কবিতাটি প্রথম 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মানকুমারীর গ্রন্থের প্রকাশকের নিকট লিখিত পত্রে ঋষি রাজনারায়ণ লিখেছেন যে ঐ কয়েকটি পংক্তি তিনি বার বার পাঠ করে মুখস্ত করেছিলেন। ঐ পত্রে তিনি আরও লিখেছেন, 'মায়ের কুটীর' শিরস্ক কবিতা হৃদয়বিদারক। উহা পড়িবার সময় অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না।' [পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের নিকট লিখিত রাজনারায়ণ বসুর পত্র, ৭ই কার্তিক, ব্রাহ্ম শক ৬৪]

কবি নবীনচন্দ্র সেন মানকুমারীকে লিখেছেন, 'আপনার সুললিত কবিতার অক্ষরে অক্ষরে আপনার সরল রমণী-হৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কবিতার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ'। [২৯শে অকটোবর, ১৮৯৩]

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কনকাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় সন ১৩০২ সালে। 'হেয়ার প্রাইজ ফান্ড এসে' রূপে গ্রন্থখানি শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত হয় [কলিকাতা, ২৫নং পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, জয়ন্তী প্রেসে বি. কে চক্রবর্তী এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা]

গ্রন্থের উৎসর্গপত্র কবিতায় লিখিত। প্রারম্ভে শ্লোক 'তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।' শেষের কয়েকটি পংক্তি—

'জ্বলন্ত অক্ষরগুলো
এনেছিনু 'দিব' বলি,
ও চরণে দিতে, একি!—
হইল 'কনকাঞ্জলি'!!
আমি কি করিব প্রভো!
কি দোষ আমার তায়?
তোমার বাতাসে, ছাই—
কেন সোনা হয়ে যায়?'

'নিবেদন' শিরোনামায়, 'পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণে' উদ্দিষ্ট পত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কবি লিখেছেন, 'দেব! এ জগতে ফুলের ফুটিয়াই সুখ, পাখীর গান গাহিয়াই সুখ, মানবেরও লিখিয়াই সুখ, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে, ফুলের শোভা ও সৌরভ যখন অপর-চিত্ত বিনোদন করে, তখনই ফুলের ফুলজীবন সার্থক হয়, বিহঙ্গ-গীতি যখন অপরের শ্রুতি মুগ্ধ করে, তখনই কলকণ্ঠের গান করা সার্থক হয়, মানবের কবিতাও যখন পরের হৃদয়ে আদরপ্রাপ্ত হয়, তখনই সে কবিতার জীবন সার্থক হয়।' গদ্য রচনার ভঙ্গীতে বঙ্কিমী প্রভাব লক্ষণীয়।

'প্রকাশকের নিবেদনে' 'শ্রীশ্রীতারা-মা'র দাসানুদাস শ্রীতারাকুমার শর্মা লিখেছেন—'শ্রীশ্রীতারা-মা'র চরণে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, গ্রন্থকর্ত্রীর এই সকল গাথা বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে কীর্তিত হউক, এবং ইঁহার স্বর্গীয় প্রতিভার পুণ্যালোক লাভ করিয়া জীবলোক পবিত্র হউক।' [কলিকাতা, ২৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, শ্রীতারাকুমার শর্মা]

মানকুমারীর কবিতার বক্তব্যও প্রধানত রোমান্টিক। জীবন সম্পর্কে ভাবাবেগময় রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের রচনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, বলা বাহুল্য, মহিলাকবিগণের রচনা তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এই গোটা যুগটাই উচ্ছ্বাসের, স্বপ্নের বা স্বপ্নভঙ্গের, বেদনার অব্যক্ত আর্তির। তাই একালের কবিদের রচনায় স্ফূর্তি ঘটেছে গীতিকবিতায়। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' এইকালের নারীহৃদয়ের মর্মবাণী। মানকুমারীর 'অভিনন্দন' (আলো ও ছায়ার কবির প্রতি) কবিতায় ঐ একই অনুভূতি ব্যক্ত।

মানকুমারীর কবিতা, হেমচন্দ্রের ভাষায়, 'বিশদ, উদার, গম্ভীর এবং মধুরভাবে পরিপূর্ণ।' তারাকুমারের নিকট লিখিত এক পত্রে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'পুস্তকখানি পড়িয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। যেখানেই খুলি, সেই-খানেই মন আকৃষ্ট হয়। ...কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই, যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকর্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার প্রতিভার ছটায় মোহিত এবং পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না [কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র, ২০শে জানুয়ারী, ৯৫]।

একই বৎসরে মৃণালিনী দেবীর দুই-খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিধ্বনি' প্রকাশিত হয় সন ১৩০১ সালের ১৬ই শ্রাবণ (ভূমিকার তারিখ), ঐ একই বৎসর চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নির্ঝরিণী'।

প্রথম গ্রন্থ 'প্রতিধ্বনির' ভূমিকায় কবি লিখেছেন, '১২ বৎসর বয়স হইতে এই ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি যতগুলি কবিতা সময়ে সময়ে রচনা করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল।'

প্রতিধ্বনির সূচী বৈচিত্র্যময়। কয়েকটি গান আছে, যথা—মধু চাঁদিনী রাত্রিতে, শরতে মধু জ্যোছনায়, আমার কাছে এসো গো তবে, আকুল হৃদি, কে যাবি তোরা প্রভৃতি। কবিতায় লিখিত পত্র আছে (বালাসখী—শ্রীমতী কমলিনী দেবী স্নেহাস্পদেষু, ভাগলপুরে), প্রকৃতি বর্ণনামূলক কবিতা আছে 'প্রভাতে প্রকৃতি', আছে স্মৃতিপূজামূলক কবিতা 'পরম পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে', 'বঙ্কিম বিয়োগে ভারতমাতার আক্ষেপ' ও "সরোজিনী (পরম পূজনীয়া পরলোকগতা অগ্রজা সহোদরাভগিনী সরোজিনীর প্রতি)। কয়েকখানি ধর্মসংগীতও আছে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নির্ঝরিণী' উৎসর্গীকৃত হয়েছে 'স্বামীদেবের স্বর্গা-রোহণ চিরস্মরণীয় জন্য'। তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় ১৩০১ সালের [illegible] জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, দশমী তিথিতে। প্রথম কবিতা-গ্রন্থের 'পত্র' কবিতা পাঠ করলে বোঝা যায় শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সঙ্গে তখনও মৃণালিনীর পরিচয় ঘটেনি। (১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস), কিন্তু 'নির্ঝরিণী' কাব্যগ্রন্থটি মৃণালিনী উপহার দিয়েছেন গিরীন্দ্রমোহিনীকে। উপহার-কবিতা নিম্নরূপ—

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী—পূজনীয়া ভগিনী শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু—

দিদি!

সারা বৎসর ধরে,—
আকুল অশ্রান্ত স্বরে,
গাহিছ যে গান, মোর
এ হৃদয় নির্ঝরিণী,
সামান্য মানবভাবে—
ধীরে ধীরে ভেসে আসে—
বাহিরে, দু' একটি তার
ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি।

* * *

এক বৎসর আগে—বহিত আরেক ভাগে
এ হৃদয় নির্ঝরিণী,
গাহিত আরেক গান,
এক বছরের মাঝে—
স্রোতোমুখে ফিরিয়াছে,
এখন সঙ্গীতে তার
নাহিক আর সে তান।

সে উচ্ছ্বাস নাহি আর—
এখন এ গানে তার,
এখন যা আছে,
মূল্য কে বুঝিবে তার আর?
যদি কেহ বোঝে, দিদি!
তবে ঐ তব হৃদি,
তাই লয়ে আসিয়াছি
দিতে তোমা' উপহার।'

চৈত্র, ১৩০১
আপনার সেই
স্নেহের মৃণাল।

মৃণালিনীর কবিতার ভাষা ও ভাব বিহারীলাল ও রবীন্দ্রানুসারী। 'সাধের আসন' 'বিরহিনীর উক্তি' 'বিদায় সঙ্গীত' 'বঙ্গদেবতা' প্রভৃতি কবিতার শীর্ষনাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে মৃণালিনীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আবার রবীন্দ্রনাথের ভগিনী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর সখ্য ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী এবং স্বর্ণকুমারী পরস্পরকে 'মিলন' বলে ডাকতেন। এই সূত্রে মৃণালিনীও রবীন্দ্রভাবপরিমণ্ডলেরই একজন। ভাষা ও ভাবগত অনুগামিতার কথা বাদ দিলেও, রবীন্দ্রনাথের প্রতি মৃণালিনীর শ্রদ্ধা যে কতখানি গভীর ছিল তা 'নিন্দুক' (নির্ঝরিণী) কবিতা থেকে বোঝা যাবে।

নিন্দুক

কোন বিখ্যাত কবির বিরুদ্ধে শ্লেষোক্তি
পাঠ করিয়া লিখিত।

হে নিন্দুক! তুমি কেমনে বুঝিবে
কবির প্রাণের ভাষা?
বামন হইয়া ধরিতে চন্দ্রমা
দেখি যে তোমার আশা!

* * *

আসিয়াছে রাহু! কবিরে গ্রাসিতে
আশাই হয়েছে সার,
রবির প্রখর কিরণে তুমিই
পুড়ে হবে ছারখার।

* * *

পাবে বাহাদুরী, হিংসুকের কাছে—
তোমার মত যে হবে;
'মূর্খের কাণ্ড' বলিয়া হাসিবে
সুজন, সুবুদ্ধি সবে।

(২০শে মাঘ, ১৩০১)

'বামন' 'রাহু' প্রভৃতি শব্দ উদ্দিষ্ট সমালোচককে চিহ্নিত করে দিয়েছে। কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'রাহু' এই ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রথম সংস্করণ (১২৯৩) সম্বন্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন। এই ব্যঙ্গ কবিতাসমষ্টির দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা, ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে সন ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সর্বপ্রথম সমালোচনা ব্যঙ্গ কবিতা দিয়ে হল।

একটি কবিতার দৃষ্টান্ত—

'উঁড়ুগনে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা
তোর বকবকম্ আর ফোঁসফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাবমাখা!
তাও ছাপানি গ্রন্থ হল।
নগদ মূল্য—এক টাকা!!!

* * *

চুনোগলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে!!
রবি ঠাকুর লেখে।' —রাহু [দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৬২, রবীন্দ্র পরিচয়-গ্রন্থপঞ্জী, পুলিনবিহারী সেন সংকলিত]

'নির্ঝরিণী'র অধিকাংশ কবিতায় স্বামীহারা কবিহৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই কাব্য-সংকলনেও 'নিন্দুক' ও 'বিশ্বপ্রেম' বা 'কবির প্রাণের ভাষা' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বা তাঁকে নিবেদিত কবিতা রয়েছে। কবির সমস্ত শোকোচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যে সমাহিত হয়েছে। দ্বিতীয় কবিতায় মৃণালিনী লিখেছেন—

'তুমি প্রেমকমলের সে সুরভি-ঘ্রাণে
হইয়া পাগলপারা,
তাই,—অধীরে ব্যাকুলি খুঁজিয়া বেড়াও
আপনি আপনহারা।
যেন, নাভির সুরভে পাগল হরিণ
ছুটিয়া বেড়াও বনে,
আছে,—আপনাতে তাহা ভ্রমেও বারেক
উদয় হয় না মনে।

* * *

আমি,—বুঝেছি তোমায়, বুঝেছি তোমার
ও অসীম প্রেমরাশি!
তাই,—দিতে উপহার, এনেছি আমার
প্রেম, ভক্তি, অশ্রু, হাসি।

(চৈত্র, ১৩০১)

উপর্যুক্ত কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয় (যথা, 'আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগলপারা', 'আমি পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম/কস্তুরীমৃগ সম')। মৃণালিনীর আরও একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'হাসি' কবিতাটি ('শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রাজর্ষি উপন্যাসে'।) রাজর্ষি উপন্যাসের বালিকাকে উপলক্ষ্য করে লেখা। কবিতার শেষ স্তবকে রাজর্ষি উপন্যাসের স্রষ্টার উদ্দেশ্যে কবি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এইভাবে—

'যে গঠেছে এই করুণা প্রেমের
মধুর জ্বলন্ত ছবি,—
অনন্ত প্রেমের পাইয়া আস্বাদ
অমর সে মহাকবি।'

(হাসি। নির্ঝরিণী,
৪ঠা আশ্বিন, ১৩০১)

ঊনবিংশ শতকের মহিলা কবিদের রবীন্দ্রানুগামিতার এক লক্ষণ তাঁদের কাব্যে উদার মানবিকতা ও স্বদেশপ্রীতির উৎসার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা ও স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সমাজ-সচেতন মহিলাকবিদের হৃদয়েও তা সঞ্চারিত হয়েছিল। অবশ্য এই মানবিকতা ও স্বাদেশিকতার পূর্বসূত্র রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথে তার পুষ্টি। এই সার্বিক জাগরণ নারীসমাজেও তীব্র আলোড়ন তুলেছিল। রবীন্দ্রসেবিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতকের মহিলাকবিগণ মুক্তচিত্তে কবিতার জগতে বিচরণ করতে পেরেছেন।

এই আলোড়ন নারীসমাজের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে তাকে সংস্কারমুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটলো। ইংরেজ কবিদের ভাবনা তাদের ওপর ছায়া ফেলল। স্বর্ণকুমারী ইংরেজ কবি মুরের অনুবাদ করেছিলেন, মৃণালিনী ওয়ার্ডসওয়ার্থ (আমরা সাতটি) এবং মেমাস হেমানের (বালকের শোক) কবিতার অনুবাদ করেছিলেন।

সংস্কারমুক্তির এই মহাক্ষণে প্রাচীন সমাজের নীতিমালা তাদের কবি-ভাবনাকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি। স্বর্ণকুমারী 'থাক ভোর' (গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমর), 'চুপ চুপ' (কচের প্রতি দেবযানী), 'কি দোষ তোমার' (অর্জুনের প্রতি জলকুমারী উলুপী) প্রভৃতি কবিতা লিখেছিলেন। এই সমস্ত কবিতার নায়ক-নায়িকাদের প্রেম সমাজনিষিদ্ধ হলেও তা মহিলাকবিদের কবি-ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। মান-কুমারী বসু আরও দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তাঁর 'স্রোতের ফুল' (কনকাঞ্জলি) একটি পতিতা অল্পবয়স্কা রমণী দর্শনে লিখিত। কবিতার বক্তব্য বর্তমানকালের বিচারেও একান্ত দুঃসাহসিক—

"আমাদের ভয়ে ফুল যদি ভেসে যায়
যদি অনুতাপী পাপী প্রীতি নাহি পায়,
বৃথা গান ধর্মগীতি
বৃথা জ্ঞান 'বিশ্বপ্রীতি'
আমাদের এ জীবন বৃথা এ ধরায়!
আয় তোরা বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ি,
বাঁধিয়া আনিব কূলে স্নেহমমতায়।

মানকুমারীর 'প্রতাপ' (স্বর্গত বঙ্কিম-চন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপ) কবিতায় প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমমহিমা সংকীর্তিত।

উদার মানবিকতা, সংস্কারমুক্ত ভাবনা ও সমাজহিতৈষণা তিন কবিরই বৈশিষ্ট্য। 'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'দুর্গোৎসব' কবিতায় মৃণালিনীর এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয়েছে ফরিদপুরের দৈবদুর্বিপাকের উল্লেখ করে মৃণালিনী লিখেছেন—

'মাগো তোর তনয়ার, রেখেছিস কিবা আর,
সুধসাধ নিয়েছিস হরে;
সব তুই দিয়েছিলি, এবে মাঝে কেড়ে নিলি,
এবে এই ধরণী উপরে
আর মোর কিছু নাই, স্বদেশে ভগিনী ভাই
ইহাদেরই মুখ চেয়ে আছি
এদের দেখিলে দুখ, বিদরে যেন রে বুক
তাই তোর কাছে এই যাচি।

গান্ধারী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

NITAI GHOSH

শনিবার সুতরাং বিলাস সকাল সকাল বাড়ী ফিরেছে। বগলে একটা বড় প্যাকেট। আরতি হাসিমুখে এগিয়ে এলো ঃ বাঃ আজ বেশ তাড়াতাড়ি এসেছো। কি আনলে গো? দেখি।

বিলাস আরতিকে এড়িয়ে ঘরে ঢুকে গেলো—তুমি বড় বিরক্ত কর। দেখছো খেটে-খুটে আসছি, আগে একটু জিরোতে দাও। এখনও ভদ্রতা শিখলে না।

আরতি লজ্জায় চুপ্‌সে গিয়ে বল্লে—না না আমি বুঝতে পারিনি, তোমার শরীর খারাপ। ভুল হয়ে গেছে কিছু মনে কোরো না।

বিলাস ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আরতি একটা হাতপাখা এনে আস্তে আস্তে হাওয়া করতে লাগল।

আরতির সংগে বিলাসের বিয়ে খুব বেশীদিন না হলেও, বেশ কিছুদিন হয়েছে; কিন্তু জড়ের ব্যবহারে চালচলনে, কোথায় [illegible]

ভালবাসা ইত্যাদি তাদের দুজনকে এখনও যেন নিঃশেষে মিলিয়ে দিতে পারে নি। সঙ্কোচের একটা বিরাট ব্যবধান দুজনকে পৃথক করে রেখেছে।

বিলাস চোখ বুজিয়ে বেশ একটু কর্কশ-ভাবেই বল্লে, মাথাটা টিপে দাও। স্নেহের দাবী নয় যেন একটা প্রচণ্ড আদেশ।

আরতি পাখা রেখে মাথা টিপতে লাগল।

—জোরে, জোরে। বিলাসের যেন যথেষ্ট আরাম হচ্ছে না।

—আরো জোরে। বিলাস ভুরু কুঁচকে আদেশটা ছুঁড়ে দিল।

আরতি তার রোগা হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব জোরে জোরে টিপতে লাগল। পরিশ্রমের বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো কপালে।

বিলাস হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসল—তোমার হাত দুটো দিন দিন যেন লোহার ...র কুলীদের মত খস... হয়ে যাচ্ছে। থাক আর দিতে হবে না।

আরতি হাঁপাতে হাঁপাতে খুব আস্তে বল্লে, কি করব বল, বাসন মাজতে মাজতে আর জল তুলতে তুলতে হাতে এই অবস্থা হয়েছে। আগে কি এরকম ছিল!

বিলাস তিড়বিড় করে উঠলো—তোমার ঐ এক কথা। খোঁটা দিতে পারলে আর ছাড়ো না। আমার অবস্থায় কুলোয় না তাই ঝি রাখতে পারি না। এই কথাটা সময়ে অসময়ে তুলে খোঁটা দিতে পারলেই তোমার শান্তি।

আরতি কাপড়ের আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে, ভয়ে ভয়ে বল্লে— না আমি অতসব ভেবে বলিনি। সত্যি বিশ্বাস কর।

বিলাস কিছুমাত্র নরম না হয়ে বল্লে তা-ছাড়া কি? থেকে থেকে তোমার ঐ এক কথা। আমি বুঝিনা ভাব? তোমার হাত কবে নরম ছিল? মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ-ঝিরা দেখগে যাও তোমার চেয়ে ভারি ভারি শত কাজ করেও কেমন সুন্দর। তাদের একটা লাবণ্য আছে। তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আর তোমার!

আরতি শোনাই যায় না এমনি মৃদু কণ্ঠে বল্লে—ঠিক আমি অস্বীকার করি

আমি তো বলছি আমাকে দেখতে সুন্দর নয়। তুমি দয়া করে বিয়ে করেছ।

—কি, কি বল্লে, এক মুহূর্তও কি বাড়ীতে শান্তিতে থাকতে দেবে না। যখনই আসব এই চুলোচুলি। বিলাস রেগে উঠে পড়ল—ঠিক আছে আমি চল্লুম। ঘরের চে... আমার রাস্তাই ভাল। অনেক শান্তি।

আরতি ভয়ে দৌড়ে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো—না না যেয়ো না। এই দেখো তিন সত্যি করছি, আর যদি কখন কোন কথা বলি। আমার অন্যায় হয়েছে। তুমি বস চা, জলখাবার খাও।

বিলাস কোন উত্তর দিল না। একে একে অফিসের ধরাচুড়া খুলতে লাগল। আরতি ইতিমধ্যে স্টোভ জেলে ফেলেছে। তৈরী হবে লুচি আর আলুভাজা। বিলাস বাথ-রুমের তোলাজলে চান সেরে ঘরে এল। আরতি একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বল্লে—তোমার সাবানটা আজকে একটু দেবে? অনেকদিন সাবান মাখিনি।

—বাঃ, তোমাকে তো এ মাসে একটা সাবান এনে দিয়েছি।

—ওমাসে নয়তো, তারও আগের মাসে।

—ওই একই হোলো।

—একটা সাবান তিন মাসের বেশী চলে না।

—তোমার সাবানের খরচ জোগানো আমার সাধ্যের বাইরে। একটা জমিদারী থাকলে চেষ্টা করে দেখতুম, তা যখন নেই খইল দিয়ে গা ধোও।

বিলাস তার নিজের ভালো সৌখীন সাবান আলমারিতে চাবি দিয়ে রাখল। আরতি দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলে আপন মনে লুচি ভাজতে লাগল। বিলাস ভালো জামা কাপড় পরে ইজি চেয়ারে এসে বসল। বেশভূষা অতিশয় সৌখীন। মিহি ধুতি, গিলে পাঞ্জাবি। কানে আতর। মুখে কিছু স্নো এবং পাউডারের প্রলেপ।

—ওকি হচ্ছে? বিলাসের আকস্মিক প্রশ্নে আরতি চমকে মুখ তুলে তাকালো।

—কেন তোমার লুচি ভাজছি তো।

—কজন খাবে শুনি। ও তো তুমি পঞ্চাশজনের মত ভেজেছ। তোমার মত লম্বা হাত গরিবের সংসারে চলে না। কতদিন বলেছি ঐ একটিন ঘিয়ে পুরো মাস চালাতে হবে। সারাদিন অফিসে মাথার কাজ। সারা মাস একটু ঘি খেয়ে সামলে নেবো, তোমার জন্যে তারও উপায় নেই। ধুমধাড়াক্কা সাতদিনেই সব শেষ করে দেবে দেখছি।

—তুমি যেন কি? এই তো মাত্র তোমার মত বারোখানাই ভেজেচি। আরতি একটু হাসবার চেষ্টা করল। বড় করুণ আর ফিকে।

—একটু বুঝতে শেখো। সারাদিন যারা মাথার কাজ করে তাদের একটু করে ঘি না [illegible]

মাথার কাজ করে না তাদের শাক-পাতা যা হোক খেলেই চলে—বুঝেছ।

—সে তো আমি বুঝি। আমার জন্যে আর কবে লুচি ভেজেচি।

—ঐ, ঐ দেখ। ঠিক বেঁকা রাস্তায় গেলে। মেয়েদের আর কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। যা পাচ্ছো তা অনেক বাড়ীতেই মিলবে না। একটু লুচি খাচ্ছি, অমনি হিংসে। তাও সখ করে নয় নিতান্তই স্বাস্থ্যের জন্যে। আশ্চর্য!

—কি বলছ তুমি? তোমার মন এত নীচু! আমি কি বল্লুম আর তুমি কি মানে করলে।

—ঠিকই বুঝেচি। তোমার মনের কথা আমি বুঝি না! এতদিন ঘর করচি।

আরতি আর কথা না বাড়িয়ে, বিলাসকে খেতে দিল। নিজের ভাগে জুটলো এক কাপ চা।

—এই দেখো। বিলাস একটু শ্লেষের হাসি হেসে বল্ল। আরতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে?

—তোমাকে হাজার দিন বলেছি, এত বড় বড় কাপে পুরো এক কাপ চা দেবার কোন দরকার নেই, সেই এক কাপ চা!

—ভাবলুম তোমার শরীর খারাপ, তাই একদিন দিয়েছি।

—তোমার দিতে আর কি? রোজগার তো আর করতে হয় না। এদিকে মাসে মাসে চায়ের খরচ জোগাতে আমার জিভ বেরিয়ে যায়।

—ঠিক আছে আমি চা খাওয়া ছেড়েই দেবো। তাহলে তোমার খরচ বেঁচে যাবে।

—ঐ কথায় কথায় অভিমান। বাপ-মা তো আর সংসার কি করে চালাতে হয় শেখান নি, খালি নাচতে আর গাইতে শিখিয়েচেন।

—সব দেখে শুনেই তো বিয়ে করেছিলে।

—সামান্য ভদ্রতাও তো শেখো নি। অনবরত মুখে মুখে জবাব আর তর্ক।

বিলাস বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

আরতি ভয়ে ভয়ে জিগেস করল—তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ? এখুনি আসবে তো?

—কেন?

—বাজার ফুরিয়েচে। বাজার না করলে রান্না হবে না। বিলাস কোন উত্তর না দিয়েই চট, চট করে বেরিয়ে গেল।

শনিবার, শনিবার ক্লাবে জোর আড্ডা জমে। নাটুকে দল ভাড়া করা মেয়ে এনে রিহার্শাল দেয়। বিলাস সটান সেখানে গিয়ে হাজির হল। বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল—

—আরে এসো এসো, ঠিক সময়ে এসেছ ব্রাদার। পাঁচটা টাকা জলদি ছাড়ো [illegible]

—কি হবে টাকা?

—আরে ব্রাদার টাকাতে কি না হয়!

চিত্রা পার্ট মুখস্থ করবার ফাঁকে একবার আড় চোখে বিলাসের দিকে তাকালো। তারপর একটু সরে এসে বল্ল:

—টাকায় কি হবে আমার কাছে শুনুন।

—বলুন। বিলাস একগাল হেসে একেবারে যেন গলে গেল।

—আজ শনিবার জানেন তো?

—খুব জানি, ঘাড়ে যা বায়বেলা চেপেছিল।

—ও তাই নাকি?

—হ্যাঁ, শেষে পালিয়ে এসে বাঁচি।

—ও হো, বৌদি বুঝি সিনেমার আবদার ধরেছিলেন। যাক শুনুন, আজ শনিবার, সবাই চাঁদা দিন একটু ভোজের ব্যবস্থা করা যাক।

—উত্তম প্রস্তাব। তা পাঁচ টাকাতেই হবে তো?

—দশ টাকা দিলে অবশ্য আরো ভাল হয়।

—তা নিন না। বিলাস এক কথায় ফট্ করে দশ টাকার একখানা নোট বুক পকেট থেকে বার করে চিত্রার হাতে গুঁজে দিল।

—হুর্‌রে। থ্রী চিয়ার্স ফর বিলাস চন্দ্র। চীৎকারে ঘর ফেটে গেল।

বিলাস সিগারেট ধরিয়ে এক কোণে ব্রিজ খেলতে বসে গেল। দেখতে দেখতে খেলা বেশ জমে উঠল। তন্ময় খেলোয়াড়দের অলক্ষ্যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল পাকে পাকে।

রাত তখন অনেক। বিলাস বাড়ী ফিরল, লুচি, কষা মাংস আর রাবড়ীর ঢেঁকুর তুলতে তুলতে। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটু ব্রান্ডি খেয়েছিল। বেশ একটা গোলাপী নেশা হয়েছে। শরীর গরম, মনও বেশ শরিফ। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলো।

আরতি জানালার গরাদে মাথা রেখে, অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল, ঘাড় না ফিরিয়েই জিগেস করল—এত রাত হল?

—হ্যাঁ তা একটু হল, কি করা যাবে?

—ভাত যে এদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

—যাক্ গে, আমি আর খাবো না, খেয়ে এসেছি।

—বাঃ! ভাল হয়েছে। আজকে যা অখাদ্য রান্না হয়েছে তুমি খেতে পারতে না।

তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দাও, আমি এখনি শুতে চাই।

—দাঁড়াও, তুমি তো ভাল মন্দ খেয়ে এলে, আমি দুটি পিন্ডি গিলে নি।

বিলাস জামা-কাপড় ছাড়ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্ল—হ্যাঁ আমার সংসারের সামান্য জিনিস তো তোমার কাছে পিন্ডিই হবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার তো আর করতে হয় না তোমাকে। আমি আজ সাফ বলে রাখছি এর চেয়ে ভাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যদি তুমি আর কোথাও পাও, বিনা দ্বিধায় তুমি চলে যেতে পার।

—ইস্ তুমি কি বলছ যা তা কথা, ছি ছি।

—ঠিকই বলছি। ভাবো তোমার মনের কথা বুঝতে পারি না। মেয়েদের পরীক্ষার, মেয়েদের সততা আর চরিত্র পরীক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায়—দারিদ্র্য—অভাব!

—তুমি কি তাই আমায় পরীক্ষা করছ। আজ দু' বছর হল একখানা কাপড় দাও নি। আমি ছেঁড়া আর ময়লা কাপড় পরে ঘরে বসে থাকি, কোথাও যেতে পারি না। ও বাড়ীর দিদি এসে কত কথা বলে—তোমার স্বামী এতবড় চাকরে, তুমি এমন ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে থাক কেন? আমি কোন রকমে কাটিয়ে দি—ভাল কাপড় তোলা আছে দিদি। কাজকর্মে এত ভাল কাপড় পরে আর কি হবে!

—থামাও তোমার মহাভারত। রাত্তিরে ঘুমোবার সময় ঘ্যান ঘ্যান আর ভাল লাগে না।

—থামবো কেন? তুমিই তো আরম্ভ করালে। এই সেদিন তুমি নিজের জন্যে এক জোড়া ভাল কাপড় এনেছ আবার আজ এনেছো আর এক জোড়া। এদিকে আমার কাপড় আর সেলাই করে করে চলছে না।

—ও এরই মধ্যে প্যাকেট খুলে দেখা হয়ে গেছে। আর হিংসেয় জ্বলতে আরম্ভ করেছ।

—খুলে দেখতে যাব কেন। ঐ তো দেখাই যাচ্ছে ছেঁড়া প্যাকেটের ফাঁক দিয়ে।

—বাইরে ভদ্র সমাজে মিশতে গেলে, ফরসা ভালো জামা-কাপড় না পরলে মান থাকে না—সে বুদ্ধি তোমার আছে?

—পর না কে বারণ করছে। কিন্তু তোমার তো আট দশখানা কাপড়। আর আমি বল্লেই বল—এ-মাসে বড় টানাটানি চলছে মাসে। তার মানে তুমি আমায় পরীক্ষা করতে চাও। আজ কতদিন সিনেমা দেখি নি! কতদিন একটু ভাল খাই নি। তুমি তো রোজই বাইরে বেশ ভালো ভালো খেয়ে আস!

বিলাস আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল—সারা রাত তুমি কোঁদল কর। আমাকে এখন ঘুমোতে দাও, সারাদিন খাটুনির পর।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। তারার আবছা আলোয় আরতির ছায়া মূর্তি জানালার ধারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

—তাহলে তুমি আমাকে খেতে দিলে না আজ, বেশ!

আরতি অন্ধকারেই ভাতের হাঁড়িতে এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে এল। হঠাৎ পাশের বাড়ীতে সকলে এক সঙ্গে সজোরে কেঁদে উঠল। আরতি তাড়াতাড়ি জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। বিলাস বিছানায় একটু উস্‌খুস্ করে অবশেষে জিগেস করল—

—কি হল ও বাড়ীতে?

—জিতেনবাবুর বৌ ভুগছিলেন। বোধ হয় এক্ষুনি মারা গেলেন। ঐ তো বাড়ীর সামনে ডাক্তারের গাড়ী দাঁড়িয়ে। আহা এই সেদিন বিয়ে হয়েছিল।

—ও। যাক ভদ্রলোক বেঁচে গেলেন। আবার একটা বিয়ে করলেই হল। জানালাটা বন্ধ করে দাও।

—কেন থাক না খোলা।

—না, ও-সব প্যান-প্যানানি রাত দুপুরে ভাল লাগে না।

আরতি জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে ওপাশের জানালার ধারে সরে গেল। তার মনটা কেমন যেন খু-খু হু-হু করছে। ফুটফুটে সুন্দর বৌটা এই তো কেমন চলে গেল। জিতেনবাবু তো প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন শোনা যায়। কই ধরে রাখতে পারলেন!

ওপাশের বড় তিনতলা বাড়ীর জানলায় জানলায় আলো জ্বল জ্বল করছে। ঐ ঘর থেকে হঠাৎ তবলার তেহাই আর ঘুঙুরের ঝম ঝম শব্দ ভেসে এল, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।

—ও কি? বিলাস অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

—ঐ তিনতলার বাড়ীটায় সেই সিনেমার নাচিয়ে মেয়েটা থাকে না! আজ শনিবার, দেখ না বাড়ীটার সামনে কত বড় বড় গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কত বড় বড় লোককে যে মেয়েটা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

—জানালাটা বন্ধ করে দাও।

—থাক না, বেশ হাওয়া আসছে।

—না ভদ্রপাড়ায় ওসব বেলেল্লাপনা চলবে না। বন্ধ কর, বন্ধ কর।

আরতি জানালাটা বন্ধ করে সরে এলো। ঘরের ভেতর মৃদু কান্না, আর মৃদু সংগীত একই সংগে ভেসে বেড়াতে লাগল।

—নাও একবার আলোটা জ্বেলে চট্ করে খেয়ে নাও।

—নাঃ আজ আর খেতে ভাল লাগছে না। সত্যি বলছি। তাছাড়া ভাতেও জল ঢেলে দিয়েছি। আজ শুয়ে পড়ি। আরতি পা গুটিয়ে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল।

—আজ সারাদিন ভয়ানক [illegible] গেছে।

—কেন অত ঘুরলে? [illegible] বিলাসের কপালে হাত রাখল।

—আর বল কেন? মাথাটা একটু টিপে দাও না।

আরতি নিঃশব্দে মাথা টিপতে লাগল। বাইরের নানা রকম শব্দ ঘরে ভেসে আসছে। উচ্চকিত হাসি, মর্মন্তুদ কান্না, আবার সোমের মুখে তবলা, ঘুঙুর আর বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত আঘাত। সব পাশাপাশি অত্যান্ত সুস্পষ্ট।

রাত বাড়তে থাকে। ক্লান্তি আর মাংস আর প্রবৃত্তি সব মিলেমিশে বিলাসের মধ্যেও এক কনসার্ট শুরু করে দেয়। স্বামী হিসেবে আরতির কাছ থেকে তার রাতের সব পাওনা আদায় করে নেয়। ছাড়ে না কিছুই! রাত গড়িয়ে চলে, অন্ধকার চন্দ্রাতপের তলায়। ক্লান্ত বিলাস এখন ঘুমে অচেতন। আরতির চোখে ঘুম নেই। তার ভাবনা কেবল সাংসারিক সুখ-দুঃখ আর জীবনস্বপ্নকে ঘিরে পাকবিত্ত হয়। পরিপূর্ণ একটি সংসারের, শান্তি দিয়ে ঘেরা সুখের একটি সংসারের ছবি যেন সোনার হরিণের মত তার সামনে দিয়ে পালিয়ে যেতে চায়।

এক সময় শেষ রাতে হয়ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিলাসের ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসল।

—নাও নাও ওঠো। মনে নেই, আমাকে আজ সকালেই বেরোতে হবে।

আরতি চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে পড়ল। চোখ দুটো তার জ্বালা করছে। রীরে যেন তার কোন শক্তি নেই। স্রেফ নের জোরে চলছে। সে একটু অবাক য়ে প্রশ্ন করল—

—আজ তো রবিবার!

—হ্যাঁ রবিবারই তো, আজ আমাদের ায়মণ্ডহারবারের স্টীমার পার্টি আছে না!

—আজ আর যায় না। চল আমরা জনে কোথাও একটু ঘুরে আসি। অনেক-ন এক সংগে বেরোই নি।

—ওসব বাজে কথা রাখো। চট্ করে কটু চা করে দাও। বিলাস ব্রাস করতে রতে মুখ ধুতে চলে গেল।

আরতি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে ল। চোখ দুটো ভীষণ কড়কড় করছে। ন মনে ভাবল চোখ দুটো একবার াক্তারকে দেখালে হয়। প্রায়ই মাথা ধরে, কটু পড়াশোনা করলেই জল গড়ায়, াপসা দেখে। কাল রাতে খোলা জানালার াশে অতক্ষণ না দাঁড়ালেই হত। ঠাণ্ডা াগে গেছে।

এখুনি স্টোভ ধরাতে হবে। বিলাসের চাই, ডিম সেদ্ধ চাই, টোস্ট চাই। খুনি সে বেরোবে। স্টোভ নেড়ে দেখল ল আছে, চলে যাবে। স্পিরিটের শিশি লি। বড় শিশিটা উঁচু তাকে তোলা াছে। ভাল হাত পায় না। বিলাসের জন্যে পেক্ষা করতে হলে দেরি হয়ে যাবে। আর রি মানেই গালাগাল। পায়ের আঙুলের পর ভর দিয়ে দেহটাকে যতদূর সম্ভব চু করে আরতি স্পিরিটের শিশিটা াগালের মধ্যে পেতে চাইল। হাত লেগে াশের একটা ছোট্ট শিশি কাত হয়ে ড়িয়ে পড়ল। আলগা কাচের ছিপি করে পড়ল মেঝের উপর। শিশির তরল-দার্থ তাক থেকে গড়িয়ে আরতির কপালে, খান থেকে তার দু' চোখে।

অসহ্য জ্বালায় আরতি চিৎকার করে ঠলো।

বিলাস বাথরুম থেকে জিগেস করল— হলে?

—শিগির এস, আমার চোখে কি ড়েছে?

—কি আবার পড়ল। জ্বালাতন!

বিলাস কাজ সেরে ঘরে এল—কই াথায়। আরে এ তো কার্বলিক এ্যাসিড। সর্বনাশ!

—চোখ দুটো জ্বলে যাচ্ছে। কি হবে া! একবার দেখ না।

—একবার দেখ না! সাত তাড়াতাড়ি খানে কি করতে গিয়েছিলে? নিজের নাক টে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করা। কোথায় চা য়ে তাড়াতাড়ি বেরোবো।

—না না তুমি চলে যাও। দেরি হয়ে যাবে তোমার।

—চোখে জল দাও।

আরতি হাতড়ে হাতড়ে বাথরুমের দিকে চলে গেলো। বিলাস ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাজগোজ নিয়ে। ধোপ-দুরস্ত ফাইন জামা-কাপড়, চকচকে জুতো, রুমালে সেন্ট।

আরতি হাতড়ে হাতড়ে ফিরে এল। জল দেওয়ার ফলে জ্বালা আরো বেড়ে গেছে। কপালের উপর চামড়া পুড়ে কুঁচকে হলদে হয়ে গেছে।

—কমলো! বিলাস কোঁচা ঠিক করতে করতে জিগেস করল।

আরতি দাঁতে দাঁত চেপে বল্ল— অনেকটা। যন্ত্রণায় তখন আর অর মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না।

—নারকেল তেল লাগিয়ে দাও, আর চোখ বুজে চুপ করে সারাদিন শুয়ে থাক। আমি চল্লুম। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিলাস বেরিয়ে গেল তার পিকনিকে।

সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নামল। তারায় ভরা আকাশ তখন ঝিম ঝিম করছে চার-পাশে। বিলাস ফিরে এল। সারা দিনের হৈ হুল্লোড়ে আরতির কথা তার মনেই ছিল না। বাড়ীর সামনে আসতেই পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন—

—এই যে বিলাসবাবু, আপনার সংগে একটা কথা ছিল।

বিলাস অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে গুছিয়ে বল্লেন—

—আপনি চলে যাবার পর, আপনার বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। মানে আপনার স্ত্রী তাকের উপর থেকে কি পাড়তে গিয়েছিলেন এমন সময় তাঁর চোখে এ্যাসিড পড়ে যায়। আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন আপনার বাড়ীতে। তিনিই প্রথম খবরটা জানতে পারেন। তারপর আমরা সবাই মিলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি।

বিলাস হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করল— 'আমি চলে যাবার পর ঘটেছে?

—হ্যাঁ। আপনার স্ত্রী বল্লেন ঠিক আপনি বেরিয়েছেন আর সেই সময়।

—ও।

—আপনি একবার দেখে আসুন। ডাক্তার বলছিলেন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আর একটু আগে আনলে হয়ত চোখ দুটো বেঁচে যেত।

বিলাস আবার ফিরে চল্ল যে পথে এসেছিল সেই পথে। একটা খালি ট্যাক্সি আসছিল, উঠে বসল। হাসপাতালের বিরাট হলঘর। সারি সারি বিছানা। বিচিত্র রোগের পসরা সাজিয়ে রোগীরা অপেক্ষা করে আছে। ... বেদনায় ... যেন ... হয়ে গেছে।

বিলাস টিলের চেয়ারটা সরিয়ে এনে আরতির বিছানার পাশে বসল। তার কপাল আর চোখ দুটোর পরে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

—কে এলে।

বিলাস নীচু গলায় বল্ল—আমি। এখন কেমন আছ।

—ওই আছি এক রকম। আরতির মুখে ফিকে হাসি। তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্ল—বোধহয় অন্ধ হয়ে যাব। তখন কি হবে বল ত?

—কি আবার হবে। দেখতে পাবে না।

আরতি বিলাসের জবাব দেবার ধরণ দেখে চুপ করে রইল। কিন্তু অজস্র চিন্তা তাকে আবার সবাক করে তুলল।

—এমন হবে জানলে, তোমাকে শেষ বারের মত ভাল করে একবার দেখে নিতুম। আর তো তোমাকে দেখতে পাব না। কি গো। চুপ করে রইলে। ভাবছ বোধহয়, অনেক খরচ হয়ে যাবে তোমার। এই হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধ।

বিলাস যেন একটু চমকে উঠল—না না কি যা তা বলছ। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো।

—ভাল হয়ে উঠলেও তোমার কোন কাজেই তো আমি আর লাগব না। আমি তো অন্ধ হয়ে যাব।

—সে দেখা যাবে।

—তুমি বরং আর একটা বিয়ে কর।

—হ্যাঁ ওসব এই নির্ভয় আশ্রয়ে থেকে কল্পনা করতেই ভাল লাগে। একটা বিয়ে করেই হিম-সিম আবার আর একটা করে না খেয়ে মরি।

—আমি না হয় ভিক্ষে করে খাব।

—ওসব তোমার মনের আশংকা। আমার মনটাকে যাচাই করে দেখছ। করলে কি তোমার সত্যি ভাল লাগবে;

—কেন লাগবে না! তুমি সুখী হও এই আমি চাই।

—বাজে বোকো না, চুপ করে শোও।

—আমার বোধহয় মরে যাওয়াই ভাল। এ জীবন আর কি কাজে লাগবে?

—ভাল হতে পারে; কিন্তু তুমি মরবে না। যাক আমি এখন চলি। আবার কাল আসা যাবে।

—একবার কাছে সরে এস না, একটু হাত দিয়ে তোমাকে দেখি।

—না না ওসব ছেলেমানুষীর কোন মানে হয় না।

বিলাস চলে এল। আরতির দীর্ঘ হাসপাতাল জীবন বিলাসের এমনি ছাড়া-ছাড়া সহানুভূতিহীন আসা-যাওয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেল। বিলাসের হাত ধরে সে ফিরে এল তার ঘরে। কত দীর্ঘ পরিচিত পরিবেশের মাঝে শুরু হল তার অপরিচিত জীবন।

বিলাস কখন আসে কখন যায় আরতি টের পায় না। কেবল গভীর রাতে বিছানায় তার উপস্থিতি আরতি বুঝতে পারে। তখন আরতির জগৎ আবার ফিরে আসে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। তখন মনে হয় সে পৃথিবীতেই আছে, পৃথিবীর কামনা বাসনাময় অতি পরিচিত ভোগরাজ্যে। কিন্তু অন্য সময় মনে হয় সে যেন পৃথিবীর বহু দূরে। অস্পষ্ট শব্দ আর জীবনের কলরব যেন বিগত জীবনের স্বপ্ন। চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না মন দিয়ে তার নাগাল পেতেই দিন কেটে যায়।

আরতির কাছে আরতির জীবন মরে গেছে। কিন্তু বিলাস বেঁচে আছে। সে যেন নতুন করে জীবন পেয়েছে। তার সব কটি ইন্দ্রিয়ে যৌবনের জোয়ার খেলছে। বাইরের রূপ-রস-গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে তার গভীর আত্মীয়তা। তাই আরতি যখন মাঝে মাঝে বলে—

—আজ একটু বস না গো আমার পাশে। দুটো কথা বলি। বিলাস লাফিয়ে ওঠে—আমার অত সময় নেই। ক্লাবে যেতে হবে। ঐ বামুনদির সঙ্গে কথা বল।

—ও বুড়ী মানুষ, রান্নায় ব্যস্ত থাকে।

—আমার সঙ্গে রাত্তিরে বোলো।

—বাব্বা! রাত্তিরে কি আর কথা বলার মত অবস্থা থাকে তোমার। কি সব ছাই-পাঁশ খেয়ে আস। তারপর আমাকে এমন পাগলের মত জড়িয়ে ধর। আমার বাপু তখন যেন কেমন ভয় ভয় করে। ইচ্ছে করে তোমার চেহারাটা তখন কেমন হয় একবার দেখি।

—সারাদিন নিষ্কর্মার মত বসে থেকে দিন দিন যাচ্ছেতাই অশ্লীল হয়ে যাচ্ছ তুমি।

—কেন যা ঘটে তা মুখে বল্লেই বুঝি অশ্লীল হয়ে যায়।

—তোমার সঙ্গে তর্ক করার সময় আমার নেই।

বিলাস বেরিয়ে গেল। আরতি ডুবে গেল চিন্তার অন্ধকার রাজ্যে। বিলাস চলে গেল ক্লাবে।

—এসো এসো বিলাসচন্দ্র, আজ এ দেরী!

—আর বল কেন ভাই, ঝামেলা বি একরকম। উনি ঠিক বেরোবার মুখে বল্লেন, আবদারই বলতে পার—এস, পাশে বস একটু, গল্প করি।

বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠল।

—আরে তুমি বলেই ভাই এইস 'বেয়ার' কর। একটা অন্ধ মেয়েকে সারা জীবন বয়ে বেড়ান। তুমি ভাই আদর্শ স্বামী—আইডিয়াল হাসব্যান্ড।

চিত্রা রসিকতা করে বল্ল—আরে মশা কানা মেয়েও মেয়ে। তার চোখদুটো যে পারে কিন্তু শরীরের আর পার্টস্ গুলি দিয়ে সে পুরুষের ... মেটাতে পারে বিলাসবাবু চালাক ...ক, সব বোঝেন।

বিলাস বল্লে—ওর চোখদুটো গি একদিকে বেশ ভালই হয়েছে। আ আমার উপর ওর একটা দাবী ছি এখানে নিয়ে চল, ওখানে নিয়ে চল। এ দাও, ঐ দাও। এখন আর তা নয়। এখ আমার দয়ার উপর নির্ভর করে আ ভয়! পাছে আর একটা বিয়ে করে ফেল

বন্ধুরা আর এক দফা হাসলে বিলাসের কথাটা তাঁরা রসিকতা ভাব বোধহয়। আরতির নির্জন গৃহকো দর্শন এইসব চক্ষুষ্মানদের কা উপেক্ষিত। এখানে সবাই চোখ দিয়ে দে মন দিয়ে উপভোগ করে। এখানে প্রমো আর আনন্দের ছড়াছড়ি।

এই জগতে রোজ রোজ বিলাস এ গাহন করে। ইন্দ্রিয় ভরে নেয় উত্ত তারপর ফিরে যায় তার গৃহকোণে। সেথ প্রস্তুত আছে নারী তার উত্তপ্ত যৌ ভরা দেহ নিয়ে। নাইবা থাকল তার দ ডাগর চোখ। রাতের গভীর অন্ধক বিলোল কটাক্ষের কিবা প্রয়োজন। শুনতে চায় তার সারাদিনের চিন্তা, অ গভীর দার্শনিক কথা। পৃথিবীর মা তাকে নামিয়ে আনে প্রয়োজনের সংক গণ্ডীতে। সেখানে সবাই ধৃতরাষ্ট্র সেথ সবাই গান্ধারী।

সবারে আমি নমি
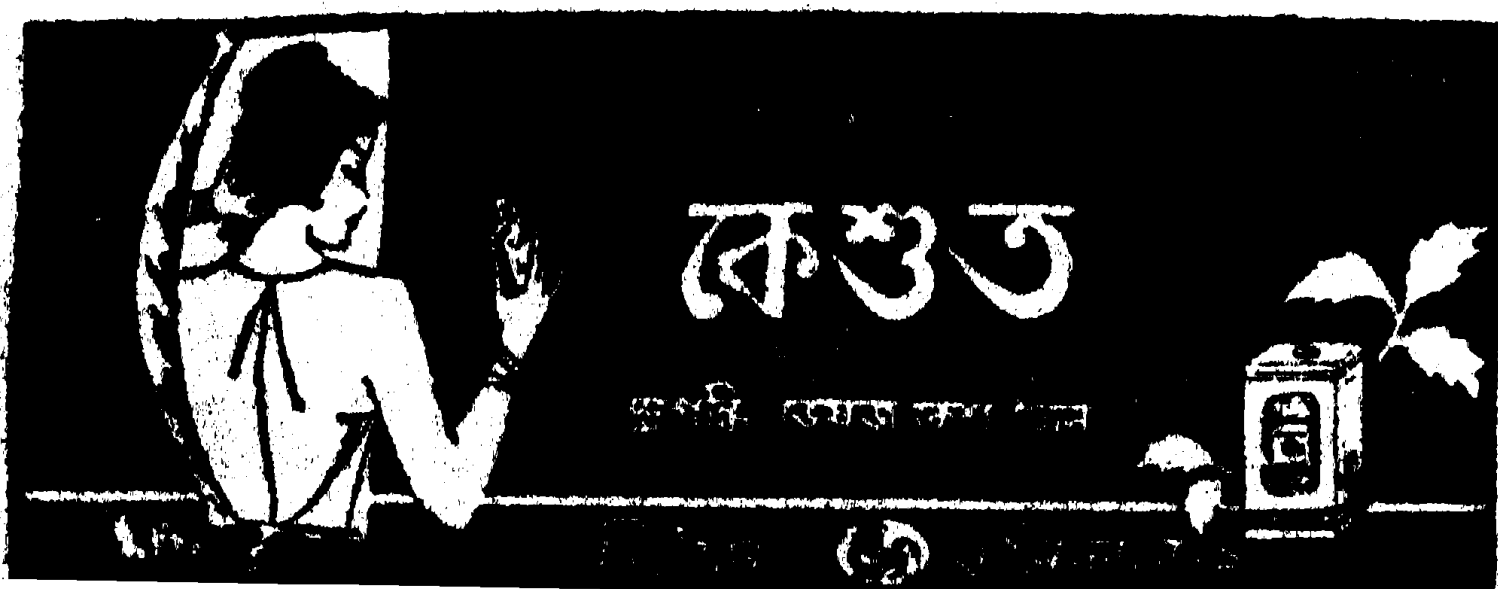
কানন দেবী

।। আট ।।

হৃদয়ে চেতনার আলো স্পষ্ট করে ফুটে ওঠবার আগেই অজানতে যেন বিধাতার কাছে চেয়ে বসেছি সৌন্দর্য-মাধুর্যের বরাভিক্ষা। তাঁর অকৃপণ দানে আজ আমার প্রাপ্তির করপুট পূর্ণ। তবু একটা কথা বারবার মনে হয়। দেবতা তাঁর আলোর বন্যায় আমাদের স্নান করিয়ে দিতে উন্মুখ থাকলেও সদা উদ্যত রাখেন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঘাতপ্রতিঘাতের নির্মম শাসনদণ্ড। যারা যত দুরাভিসারী তাদের পরীক্ষাও বুঝি ততই কঠিন। মূল্য না দিয়ে কোনো কিছুই পাবার উপায় নেই। পাওয়ার আনন্দ তাতে অনেকখানি ম্লান হয়ে যায় বলেই কি?

এই নিবন্ধের প্রথমে যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করে আবার বলছি, আমার জীবনের চলার পথ উঁচু-নীচু, পাহাড়ের মতই এবড়ো-খেবড়ো, অসমতল ছিল। গাঁইতি দিয়ে কেটে কেটে পথ সৃষ্টি করতে করতে আমি আপন লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছি। আর তারজন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতিকেই ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি।

এর জন্য সাধ্যের অতীত মূল্য দিতে হয়েছে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভ্রূকুটিতে চমকে উঠেছি কতবার। কিন্তু থমকে দাঁড়াইনি একবারও। আজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতায় সারা মন নুইয়ে পড়ে, যিনি আমায় দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছিলেন।

মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব দেখেছি। উদারতাও দেখেনি এমন নয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশী দেখেছি সীমাহীন নীচতা, অসহ্য কপটতা আর অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বর্বর রূপ। তাইত আজ হৃদয় আনন্দে ঝলমল করে ওঠে যখন ভাবি মহৎ স্বপ্নকে আমি বাস্তবের কাছে দেউলে হতে দিইনি। কোনো ভয়ই আমাকে সত্যিকারের ভয় দেখাতে পারেনি। আর এইখানেই বোধহয় আমার জিত। কারণ এইখানেই বিধাতার দেওয়া কল্পনার জয়ধ্বজা ওড়াতে পেরেছি।

আজ মনে হয়, তখনকার সাময়িক ব্যর্থতার অসহনীয় অন্ধকার, তিক্ত অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন ছিল পরবর্তী জীবনে প্রাপ্তির গৌরবকে শাণিত করে তোলার জন্য। আরও একটা মধুর অভিজ্ঞতার প্রসাদে সারা চিত্ত যেন পুণ্যস্নান করেছে বারবার। সেটি হচ্ছে এই, অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে ওঠে, তখনই আসে আলোর দূতী। যখন অকুলপাথারে মনে হয় তরী না ডুবেই পারে না, ঠিক তখনই মেলে কূলের দিশা।

তাই ত এই বিরূপতার জন্য আমার মনে এতটুকুও ক্ষোভ নেই। বরং বাধা ছিল বলেই তাকে অতিক্রম করবার সংকল্প এমন দুর্বার হয়ে উঠেছে। কত উপত্যকা, খাদ, গহ্বর অতিক্রম করে আসতে হয় বলেই না মোহানার কাছে নদীর বেগ এত প্রবল?

আজ ভাবতে ভারী মজা লাগে, এ যেন কোন অদৃশ্য দানবের সঙ্গে আমার শক্তির লড়াই। অনুভব করেছি আমাদের চারপাশেই শুধু নয়, আমাদের ভেতরেই রয়েছে অনেক বিরোধী শক্তির ছায়াচর, যারা প্রতিমুহূর্তে চাইছে অন্তরের অটল সাধনাকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে। বাইরের চেয়ে অন্তরের এই অদৃশ্য শক্তির জোর অনেক বেশী। বাইরের বাধা যদি বা কাটানো যায়, অন্তরের দুর্বলতাকে জয় করা অনেক সময়ই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সর্বনাশের প্রান্তে দাঁড়িয়েও তার করাল গ্রাসের দৃঢ়মুষ্টি ছাড়িয়ে ছুটে আসা এবং অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবার শঙ্কা থেকে নিজেকে মুক্ত করার রোমাঞ্চের মধ্যে কূলছাপানো আনন্দের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ ঘটত কি যদি-না এসব বিপত্তি থাকত?

মানুষের হৃদয়ে কল্পনার ধারা অতি ক্ষীণস্রোতে বয় বলেই না জগতে দুঃখ এত বেশী? কিন্তু কারো অন্তরাত্মা যদি প্রতি রক্তকণা দিয়ে কিছু কামনা করে, মানুষ জোর করে তার কণ্ঠরোধ করে দিতে পারে না। হতাশার চরম মুহূর্তেও হঠাৎ সামান্য ঘটনা প্রতিদিনের বাঁধাধরা জীবনের ছকের

যোগাযোগ চিত্রে কানন দেবী ও জহর গাঙ্গুলী

মধ্যেও যেন হঠাৎই জেবলে দেয় ভরসার আলো।

কেমন করে? অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটিই তুলে ধরি।

নিউথিয়েটার্সে' 'বিদ্যাপতি' ছবির কাজ করবার সময়ই স্বর্গত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে। বিস্মিত হয়ে দেখতাম, বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে না পেলেও তাঁর অনুভূতি এমন আশ্চর্য রকমের জাগ্রত যাকে বলা যায়—মানসচক্ষু অথবা তৃতীয় নেত্র। কোন্ দৃশ্যে, কোন্ সময় সাথীশিল্পীর কতটা কাছে, কোন্ দিকে যেতে হবে বা দাঁড়াতে হবে, পরিচালক একবার দেখিয়ে দিলেই তিনি এমন নির্ভুলভাবে তা পালন করতেন যে, অনেক চক্ষুওয়ালারাও তাঁর কাছে হার মেনে যেত। গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম অন্ধ-গায়ক আপন মনে পদক্ষেপ দিয়ে অথবা হাত দিয়ে চলাফেরার পরিধিটুকু মেপে নিতেন। দু-চার মুহূর্ত নীরব থেকে ভেবে নিয়ে আপন ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হতেন। তারপরই ফাইনাল 'টেকে' তাঁকে দেখতাম সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে।

শুধু কি তাই? ঘরের মধ্যে বসে আছেন, হঠাৎ বাইরে কোনো কিছু ঘটলে [illegible] টের পেয়ে যেতেন। অমনই ত্রস্তপদে বাইরে এসে তার সঙ্গে হাসি-তামাশার মজলিশ চলত।

ওঁকে দেখতাম আর ভাবতাম জীবনের এতবড় দুর্ভাগ্যকে বহন করেও যিনি সার্থক হতে পেরেছেন, লক্ষ লক্ষ শ্রোতা ও দর্শককে আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছেন, তিনি ঈশ্বরের রুদ্ররূপের অন্তরালের বরাভয়কেও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। নইলে অন্ধের মধ্যে এত আনন্দ এত প্রাণময়তা এলো কেমন করে? আর বিধাতার সবচেয়ে বড় দান দৃষ্টিশক্তি না পেয়েও ইনি আপনাকে অসহায় মনে করেন না ত? তাহলে আমার আর নিজেকে নিঃসহায় মনে করা চলে কি? এঁর তুলনায় আমি ত অনেক সবল। মনের মধ্যে নূতন করে জোর পেতাম যেন।

'বিদ্যাপতি'তে কৃষ্ণচন্দ্র দের মুখে আমার নাম ছিল 'রাধে'। মনে পড়ে, রঙ্গরহস্যের মেজাজে থাকলে সেটের বাইরেও উনি আমায় ঐ নামেই ডাকতেন। আবার কোনো বিষাদস্তব্ধ মুহূর্তে হঠাৎ যদি তাঁর মুখো-মুখি হতাম কেমন করে জানি না আমার মনটা যেন তিনি দেখতে পেতেন বাইরের প্রত্যক্ষ দৃশ্যবস্তুর মতই। বলতেন 'রাধে, হৃদয়-বৃন্দাবন আঁধার রাখলে তিনি এসে বসবেন কোথায়?'

কখনও বলতেন, 'যে কঠিন তপস্যায় তুমি রত তাতে বাধা ত আসবেই। তুমি যে শ্রীরাধা। অশ্রুপাথার পার না হলে কি শ্যামের কাছে পৌঁছানো যায়? তুমি ত এত বেদপুরাণের গল্প পড়। তপস্বীদের ধ্যান ভাঙাবার জন্য শোনোনি কি দেবতাদের ছলা-কলার খবর? ধ্রুবের পরীক্ষা?'—সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের মতই তাঁর সাধককণ্ঠে অনুরণিত হোতো—'হে ধনী কর অবধান'—

ঐ কথাগুলির মধ্যেই যেন কোন অন্ত-রালের দেবতার আশ্বাসবাণী শুনতে পেতাম। তখনই মনে হোতো ব্যথামন্থনের মাঝে যে গরল ওঠে বোধহয় কেবল তাই পান করেই মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। বাকী সবই ভাববিলাসিতা। এই বেদনামন্থনের সময় নিরাশা আসে। আসে ক্ষোভও। কিন্তু সে আবিলতা কেটে যেতে না যেতেই আভাষ পাই যে বাইরে থেকে যা দেখতে অভিশাপের মতন, তা হয়ত বরদানেরই রূপান্তর। আর এই বরদানকে চেনা সম্ভব একমাত্র বর-দাতার দেওয়া দিব্যদৃষ্টির প্রসাদেই।

কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখলেই চলবে না। জীবনের হাজারো পরীক্ষা, অবিশ্বাসের বাধা ও সন্দেহের আঁধি থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে তার অটল সত্যতায়। ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ মূলত ধ্যানজগতের জীব, মাংস-পেশীর জগতের নয়। যদিও শোষের প্রলো-ভনই মনকে সহজে টানে—আর তার চেয়েও সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।

তাই ত আজ আমার স... চেতনা জুড়ে একটা সোনালী প্রত্যয় ...ন উঁকি দিয়ে বলে যে, এসব অসঙ্গতি, স্বতোবিরোধ, এতসব গ্লানি আর দুর্বোধ্য থাকবে না যদি অন্তরে সেই আলো একবার নামে। তার একটি স্ফুলিঙ্গ দিয়ে শিল্পী জ্বালায় শিল্পের বাতি, জ্ঞানী জ্বালায় জ্ঞানের দীপ, প্রেমিক প্রেমের তারা। কেবল করতে হবে তারজন্য দুশ্চর তপস্যা। নৈলে সে আলো তার রাঙা পা রাখবে কোথায়? আজকাল-কার ক্ষুদ্র, বামন, শ্রীহীন মরচেতনার পঙ্কপুটে? ছিঃ!

আগে হৃদয়কে হতে হবে শুভ্র সহস্র-দল যার পাপড়িতে চাঁদের হাসি, মৃণালে প্রত্যয়ের আগুন, পরিমলে নীলিমার পুণ্য-গন্ধ। সবচেয়ে দুঃখ বাজে দেখে গড়পড়তা সাধারণ জীবনের স্বস্তি নিয়ে অধিকাংশ মানুষই সুখে থাকে। কিন্তু যে আলোর কণিকাপ্রসাদে বেঁচে সুখ, ভাবাবেশে আনন্দ, কর্মে তৃপ্তি, তার পূর্ণ দানকে এড়িয়ে চলার জন্য আমরা হয়ে উঠি পাগল। যেন ক্ষুদ্র জানার এতটুকু পরিধির বাইরে আর কিছুই নেই। যেন ঐ বদ্ধচেতনার চতুঃ-সীমার বাইরের মরুরূপ মিথ্যা।

তাই বলছিলাম, জীবনকে নির্ভরে দেখতে শিখলে তবেই সত্যের দর্শন মেলে নৈলে নয়।

(চলবে)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

বিজয় দেব

দর্শন সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার বলেছিলেন : 'তুমি যা জান তাই বিজ্ঞান আর যা তুমি জান না, তাই হলো দর্শন'। অতি শৈশব থেকেই তাঁর জীবনে এই ধরনের মর্মভেদী প্রশ্ন ভীড় করে। এমন কি জন্মের ইতিহাসও যেন সেই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর মা কোথাও লিখেছিলেন, 'খোকার বয়স যখন মাত্র তিনদিন তখনই মাথা তুলতে সুরু করে। ...খুব চটপটে। তার চোখ যেন সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।' ঠিক মৃত্যুর মুহূর্ত অবধি তাঁর দৃষ্টি একইভাবে বিশ্ব চরাচরে নিবদ্ধ ছিলো।

উই নদীর তীরে ১৮৭২ খৃঃ ১৮ই মে এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম মুহূর্তেই ডাক্তার বলেছিলেন : 'অদ্ভুত ছেলে'। তাছাড়া এ ধরনের নাদুস-নুদুস শিশু খুবই কম দেখা যায়। তাই নামকরণের সময় ঠাকুরমার ইচ্ছে ছিলো নাম রাখা হোক 'গালাহাদ'। দিদিমা রেগে গিয়ে ঈশ্বরের দিব্যি দিয়েছিলেন : এই নাম সত্যি সত্যি তার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। পরিশেষে একটি বোঝাপড়ায় এসে সেদিনের অনুক্ষণ কৌতূহলী শিশুর নাম রাখা হয় বার্ট্রাণ্ড রাসেল।

জীবনের সায়াহ্নকালে দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন : 'আমার ছোটবেলা ছিলো নিতাই দুর্দশাগ্রস্ত। জন্মের এক বছর পরই বাবা দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আমার কাকা উন্মাদ হয়ে যান। দিদি রাচেলের বয়স যখন দু বছর তখন মা ডিপথেরিয়ার সংক্রমণে আক্রান্ত। দাদা ফ্র্যাঙ্কেরও ডিপথেরিয়ার আক্রমণে জীবনসংশয় হয়ে ওঠে। রাচেল ও মা একই রোগে মারা যান। তারপর বাবা প্রায় ১৮ মাস জীবিত ছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক কাঁদছিলো। আমি কেমন যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে পরপর সব দেখছিলাম।'

রাসেলের বাবা ছিলেন যুক্তিবাদী। তাঁর বন্ধু ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তাই ছেলেদের শিক্ষার জন্য তিনি দুজন নিরীশ্বরবাদীকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসেন। [illegible]-

মাতৃহীন হয়ে পিতামহ-পিতামহীর আশ্রয়ে পেমব্রুকের বাড়ীতে উঠে আসেন।

রাসেলের জীবনব্যাপী যার প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষণীয়, তিনি হলেন পিতামহী লেডি রাসেল। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের অনেক প্রথাগত ধারণাকে ভেঙে দিয়েছিলেন তাঁর উদার মতবাদ দ্বারা। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে সমালোচনা করে আইরিশ হোমরুলের স্বপক্ষে তাঁর আপন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই বাড়ীর আবহাওয়ায় একদিকে যেমন ছিলো প্রাচীন নীতিবাদের অনুশাসন, তেমনি অন্যদিকে উদার মতবাদের মুক্ত হাওয়া। সেই পরিবেশে দু ভাই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। রাসেলকে তাই জীবনের কোন এক মুহূর্তে বলতে শুনি : 'মূলতঃ নীতিবাদী শিক্ষায় আমার বাল্য, কৈশোর কাটলেও আমি আমার অপরাধ ত্রুটী, পাপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গভীরভাবে তা বিবেচনা করতাম।'

একবার মাদার শিপটন রাসেলের সামনে বলে ওঠেন : '১৮৮১ সালের শেষে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।' সেই বছরই কোন একটি দিনে আকাশ ঘন অন্ধকারে ডুবে গেলো। ঝড় বইতে সুরু করলো। সবাই ভাবলো এই বুঝি বা প্রলয়! কিন্তু কিছুই ঘটলো না। এমন কি ধীরে ধীরে ১৮৮১ খৃঃ কেটে গেলো, যেই পৃথিবী সেই পৃথিবীই রয়ে গেলো। তখন বালক রাসেলের মনে প্রথম সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হলো। তাই বোধহয় আজও তিনি সন্দেহবাদী বলে পরিচিত।

অংকশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের কারণ বলতে গিয়ে যেন তিনি স্মৃতিভারে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন : 'জানো বয়ঃসন্ধিকালে কোন একটি ঘটনা আমাকে আত্মহত্যার জন্যে প্ররোচিত করে। কিন্তু হঠাৎ যেন এই গণিতশাস্ত্রই আমাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এলো।'

রোমাণ্টিক কবিতা বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে প্রায় সম্মোহিত করে রাখতো : 'কবিতা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশ্ব-সংসার যেন ক্রমশঃ মিলয়মান রেখায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো... তখন সত্যিই মনে হতো আমি কোথায়?'

যখন তিনি প্রায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন তখন জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা তাঁর হাতে আসে। মুহূর্তেই যেন কি এক বিপ্লব ঘটে যায়। ... দেখতে [illegible] বিশ্বাস ভেঙে [illegible]

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জীবনে প্রথম প্রণয় যার সঙ্গে ঘটে তিনি হলেন কোয়েকার গোষ্ঠীভুক্ত এলিস পিয়ারসেল স্মিথ। পারিবারিক দিক থেকে তখন তিনি প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন। এখানে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য তাঁকে কূটনৈতিকের দায়িত্ব দিয়ে প্যারিসে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি ১৮৯৪ খৃঃ এলিসকে বিয়ে করেন। অবশ্য এ বিয়ে মাত্র সতেরো বছর স্থায়ী ছিলো। এলিসের ব্যক্তিগত দিক থেকে কোন চাহিদা ছিলো না বলেই রাসেলের পক্ষে অংকশাস্ত্রের জগতে গভীর অনুসন্ধানে থাকা সম্ভব ছিলো। বস্তুতঃ এলিস তখন তাঁর জীবনে প্রায় অপরিহার্য। ১৯১০ খৃঃ বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকার' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

এই গবেষণামূলক রচনা সম্বন্ধে প্রখ্যাত প্রয়োক্তিবার্ন মন্তব্য করেছিলেন : 'আমার ধারণা রাসেল বা হোয়াইটহেড কেউই বইখানি আগাগোড়া পাঠ করেন নি।' বার্ধক্যের উপান্তে এসেও তাঁকে শুনতে হয়েছে : 'কুড়িজন পাঠকও বোধহয় সমগ্র রচনা পড়েন নি।' তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে রাসেলের রসিকতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

একবার বিখ্যাত অংকশাস্ত্রবিদ জি এইচ হার্ডিকে রাসেল তাঁর একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনের বিবরণ দেন। দু-শত বৎসর পর একদিন তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে দেখতে পেলেন সেখানের কোন একজন কর্মী তার হাতের ঝুড়িতে অপ্রয়োজনীয় বই শেলফ থেকে তুলে নিয়ে রাখছে। তারপর নষ্ট করে ফেলছে। হঠাৎ যেন সেই কর্মী লাইব্রেরীতে রক্ষিত একমাত্র কপি 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' তুলে নিয়ে মুহূর্তমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত... ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে যায়।'

এমন কতগুলো ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে যা পৃথকভাবে বিস্ময়কর মুহূর্ত সদৃশ হয়ে আজও বিরাজ করছে। বিভিন্ন বিষয়ের লেখাপড়া ও বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে অবসর মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে গিলবার্ট মারে, জি এইচ লরেন্স, লুডউইগ উইটগেনস্টাইন, জোসেফ কনরাড,

ব্লুমসবেরী গোষ্ঠী, টি এস এলিয়ট এবং জোসেফ কনরাড-এর মতো বিরাট ব্যক্তিদের সংগে বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রবেশ করেন। তাছাড়া কনরাডের উপর তাঁর বিশেষ দুর্বলতাও পরিলক্ষিত হয়, যার জন্য তাঁর দুই ছেলের নামই—তিনি 'কনরাড' রাখেন।

১৯২০ খৃঃ বিপ্লবের আদর্শ তাঁর মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। এবং তখনই তাঁর রাশিয়া পরিভ্রমণ ঘটে। তিনি সেখানের এই রূপান্তরকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেই সংগে দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থা এবং দুর্দশার মুখোমুখী হয়ে তিনি হতাশ হয়েও পড়েন। যে ক্যাপিটেলিজমকে একদা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এখন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছেন যে, এখানে যথাযথ বিকল্প কোন ব্যবস্থাও নেই। রাশিয়া থেকে ফিরে আসার সংগে সংগে ১৯২০-২১ খৃঃ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ নিয়ে যান। এবং সেখানে প্রায় দুমাস কাটিয়ে তিনি গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়েন, এমন কি খবরের কাগজে নিজের মৃত্যুসংবাদ দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। ডোরা ব্ল্যাক তখন তাঁর সংগী। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগেই তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৯২৯-৩১ খৃঃ মধ্যে প্রায় পনেরোখানি বই প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে সমাজিক চিন্তাধারার বর্ণচ্ছটা প্রসারিত হয়ে আছে। যেমন 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মরালস'। এখানে তিনি প্রচলিত নৈতিক বোধকে অনাবৃত করেছেন। ধর্মীয় এবং নৈতিক প্রতারণাই যে বিশ্বের পরিহার্য দুঃখ এবং দুর্দশার কারণ তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি নারীজাতির ক্ষেত্রে সমকক্ষ যৌন-স্বাধীনতা দাবী করেন। সেই সংগে প্রাক-বিবাহ ক্ষেত্রে রমণীর যৌন-অভিজ্ঞতা অবশ্য কাম্য, এমন কি সেই সংগে অপরিহার্যও বটে। তাছাড়া বিয়ের পর আনুগত্যকে তিনি সেকেলে বলে অভিহিত করেছেন। অবিশ্বস্ততাই মূলতঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ নয়, সেখানে ঈর্ষাই সর্বক্ষেত্রে কারণ হিসেবে প্রযোজ্য। ভালবাসার ক্ষেত্রে কোনরূপে বাধা নিষেধ আরোপ করা সংগত নয়। কারণ তাই হলো পার্থিব দুঃখের মূল কারণ। ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত 'কনকোয়েস্ট অব হ্যাপীনেস'-এ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লক্ষণীয়। এখানে মানবসমাজকে প্রচুর উৎপাদনে ক্ষমতাসম্পন্ন বিষয়ের জন্য আবেদন করেছেন যে তারা যেন তাদের আত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকে নিজেদের বিচার করে তাহলেই তাদের [illegible]

১৯২২ খৃঃ এবং ১৯২৩ খৃঃ দুবার রাসেল 'চেলসা' কেন্দ্র থেকে শ্রমিক প্রার্থী হিসেবে পার্লামেন্টের সদস্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এবং তখনই সোভিয়েট রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালান।

১৯৩০ খৃঃ থেকে তাঁর জীবনে দুঃখবাদ এবং বিষন্নতার পর্ব সুরু। সেই সময়েই তিনি দর্শনের জগতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্থির করেন তাঁকে যে করেই হোক দার্শনিক খ্যাতি পুনরুদ্ধার করতে হবে।

১৯৩৬ খৃঃ রাসেল তাঁর সচিব প্যাট্রিসিয়া স্পেন্সকে বিয়ে করেন। ইতিপূর্বে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ডোরা নিজের প্রেমিককে নিয়ে একই বাড়ীতে বাস করতেন। যার চারটি সন্তানের মধ্যে দুটোর জনক বলে রাসেল নিজেকে পরিচিত করেন। প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে তিনি 'এম্বার্লি পেপারস্' সম্পাদনা করেন।

১৯৩৭ খৃঃ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে পাড়ি দেন। তবে সেখানে অতি শীঘ্রিগিরই তাঁর 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মরালিটি'র জন্য বিশেষ বিতর্কের সূচনা হয়। পরিশেষে তাঁর নিয়োগপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কারণ হিসেবে ছিলো আমেরিকার শিক্ষানীতির সংগে রাসেলের নৈতিক অসংগতি। সমগ্র আমেরিকা তখন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে তাঁকে অবরোধ করে রাখে। কর্তৃতঃ তখন তাঁকে বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়। কিছুদিন পরই তিনি বার্নস ফাউণ্ডেশানে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। অবশ্য দু বছর পরই তাঁকে এই চাকরীও হারাতে হয়। ফাউণ্ডেশানের প্রধান তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে অভিযোগ করেন যে, তাঁর বক্তৃতা ভাসা-ভাসা। কিন্তু সেই বক্তৃতাবলীই তাঁর পরবর্তী রচনা 'হিস্ট্রী অব ওয়েস্টার্ন ফিলজফি'র অন্তর্গত। পরিশেষে রাসেল কেসে জয়ী হন এবং ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। সেই সংগে তিনি আজীবন সদস্যরূপে নির্বাচিত হন।

জাপানে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরই হাউস অব লর্ডস-এ এক অসাধারণ বক্তৃতা দান করেন। সেখানে হাইড্রোজেনের ধ্বংসক্ষমতা সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গকে সতর্ক করে দেন। ১৯২৩ খৃঃ প্রকাশিত তাঁর 'এ-বি-সি অব দি এটম'এ এমি বোমার [illegible]

১৯৫০ খৃঃ তিনি অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে বের হন। তারপর অধ্যাপনার কাজ নিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। এখানে জানতে পেলেন যে, তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

১৯৫২ খৃঃ তাঁর জীবনে নতুন যুগের সূচনা হয়। তখন প্যাট্রিসিয়ার সংগে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এবং আমেরিকার লেখিকা এডিথ ফিনচকে রাসেল বিয়ে করেন। তখন রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করে তুলেছিলো।

১৯৫৭ খৃঃ বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য রাসেলকে কলিংগ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

কিউবান সংকটের মুহূর্তে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করার জন্য তিনি ক্রুশ্চেভ এবং কেনেডীকে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন। তেমনি 'চিনো-ইণ্ডিয়ান' মীমাংসা সমস্যায় তিনি নেহরু এবং চু এন-লাইকে একইভাবে সমাধান করার জন্য লিখেছিলেন।

১৯৬৩ খৃঃ পর থেকে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ভিয়েৎনাম যুদ্ধের জন্য ব্যয় হয়। তিনি আমেরিকার নির্লজ্জ ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং সেই সংগে আমেরিকার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন থাকাতে প্রতিবাদস্বরূপ লেবার পার্টির সভাপদ ত্যাগ করেন। এবং ১৯৬৭ খৃঃ তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনা 'ওয়ার ক্রাইমস্ ইন ভিয়েৎনাম'।

রাসেল কখনো কাজে বিরতি টেনে আনেননি। ১৯৬৩ খৃঃ কোন এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর দিনের কর্মসূচী সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করেন, তা হলো : সকাল ৮টা থেকে ১১-৩০ মিঃ চিঠিপত্র এবং খবরের কাগজ দেখা (প্রতিদিন গড়ে ১০০ খানি চিঠি আসে); ১১-৩০ মিঃ থেকে বেলা ১টা—লোকজনের সংগে দেখা করা; বেলা দুটো থেকে চারটে—সাধারণতঃ সাম্প্রতিক পরমাণবিক রচনা দেখি; বেলা চারটে থেকে রাত সাতটা—আবার তখন লোকজনের সংগে সাক্ষাৎকার অথবা আমার লেখা; রাত আটটা থেকে ভোর একটা—তখন আমি নিজেকে হয় লেখার টেবিলে অথবা পড়ার টেবিলে বসিয়ে রাখি।

ছোটগল্প রচনায়ও তাঁকে দেখা যায়। আশী বছর বয়সে তিনি প্রথম ছদ্মনামে তাঁর গল্প 'গো' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

পঁচিশ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। প্রথম সংকলন 'স্যাটান ইন দি সাবার্বস' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন : আমার জীবনের প্রথম আশী বছর কেটে গেলো দর্শনের জগতে এখন আমার একান্ত কামনা পরবর্তী আশী বছর যেন উপন্যাস বা ছোটগল্প নিয়ে কাটে।'

ব্রিটীশ এম্পায়ারিসিস্ট ঐতিহ্যের সদস্য এবং ম্যাথমেটিক্যাল লজিসিয়ান বার্ট্রাণ্ড রাসেল ৯৭ বছর বয়সে নর্থ ওয়েলস-এ ১৯৭০ খৃঃ ২ ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জওহরলাল নেহরু সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন, তা যেন নিম্নলিখিত পত্রাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সেই সঙ্গে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ সম্বন্ধেও একখানি চিঠি উল্লেখযোগ্য।

১৯২৩ খৃঃ ২২ ফেব্রুয়ারী 'ন্যু লীডার'এ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লোয়েস ডিকিনসন বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট একটি সভার বর্ণনা দিচ্ছিলেন : কেমব্রিজ গার্ডেনে জুনের এক সন্ধ্যা।. মিঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আমি এবং টেগোর নিরিবিলিতে সেখানে বসে রয়েছি। তিনি তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রায় সংগীতের মতো আবৃত্তি করলেন। কি অপূর্ব কণ্ঠস্বর! তাছাড়া রয়েছে অচেনা ঢং। সর্বমিলে ঐকতান যেন এই জমাট অন্ধকারে ভেসে ফিরছিলো। তারপর রাসেল কথা বলতে সুরু করেন। সেই সন্ধ্যায় তখন মনে হচ্ছিলো রাসেলের কথা যেন বিদ্যুতের মতই ঝলমলে। টেগোর তখন নীরবতায় তলিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কোন এক সময়ে তিনি বলেছিলেন, সেদিন রাসেলের কথাগুলো তাঁর কাছে বারবার আশ্চর্য মনে হচ্ছিল। তখন সজ্ঞানতার চরম পর্যায়ে তাঁর উত্তরণ ঘটেছিলো বলে তিনি বহুদূর থেকে তা যেন শুনতে পেয়েছিলেন। আমার কাছে আজও চরম বিস্ময় তিনি কি সব শুনেছিলেন ?'

প্রিয় মিঃ চ্যাটার্জি,

১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

...লোয়েস ডিকিনসন যেসব সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছিলেন, তা অস্পষ্ট হলেও এখনো আমার স্মৃতিতে তা উজ্জ্বল হয়ে আছে। এর আগে রবার্ট ট্রেভেলিয়ান এবং লোয়েস ডিকিনসন টেগোরকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমার স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, তাঁর অতিন্দ্রীয়বাদে বিশ্বাসীর ভাবভঙ্গী আমাকে মোটেই আকর্ষণ করতে পারেনি। বরং আমার একান্ত ইচ্ছে হচ্ছিলো যদি তিনি এই মুহূর্তে অধিক স্পষ্ট হতেন। তাঁর কোমল বরং ছলনাময় ব্যবহার যেকোন ব্যক্তিকে অনুভব করার সুযোগ দেবে যে একমাত্র লজ্জাই তাঁকে বিনিময় বা যোগাযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাঁর আত্মসমাহিত ভাব যেন তাঁর আবেগকে দুর্বল করে তুলে। স্বাভাবিকভাবে বাণী হিসেবে তাঁর অতিন্দ্রীয়-দর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু যুক্তির মাধ্যমে তা সত্যিই সম্ভব নয়।

শুভেচ্ছা সহ

আন্তরিকভাবে আপনার

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

প্রিয় মিঃ বীলডে,

মিঃ নেহরু আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি অবশ্য স্নায়ুযুদ্ধ (কোল্ড ওয়ার) প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করেছিলেন। যদিও তিনি ভারতের দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে আন্তরিক হয়েও সফলকাম হতে পারেননি...,

আন্তরিকভাবে আপনার

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

২৬ নভেম্বর, ১৯৬৫

প্রিয় মিঃ রবার্টসন,

...আপনার মনোবল ভঙ্গের বেদনার প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু নিষ্ঠুর যুদ্ধে আমেরিকা যে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার সক্রিয় প্রতিরোধ এখন সত্যিই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।...

আমেরিকার জনগণকে হতাশ করা আমার উচিত নয়। যদিও সেখানের জনসাধারণকে তাদের সরকার পরিচালিত যুদ্ধের চরিত্র সম্বন্ধে কখনোই ওয়াকিবহাল করতে দেওয়া হয়নি।

...সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকান পরিচালিত ভিয়েৎনামের যুদ্ধই প্রথম এবং শেষ নয়। বিশ্বের জনগণ যেখানে মুক্তির সংগ্রামে রত, সেখানে আমেরিকার জনগণের বোঝা উচিত তাদের সরকারের চরিত্র এবং যা সময়মতো তা কাটানো যায় তার জন্য সচেষ্ট হওয়াও উচিত।

সম্প্রতি আমাদের কাজের বিবরণের পুস্তিকা পাঠাচ্ছি। অবিচার প্রতিরোধে আপনার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি। সেই সঙ্গে আপনি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

আন্তরিকভাবে আপনার

বার্ট্রাণ্ড রাসেল।

অঙ্গনা

স্বামী যদি দুষ্কৃতিকারী হয়

মহামুনি বাল্মীকি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্যু রত্নাকর। পৌরাণিক কাহিনীতে দস্যু রত্নাকরের রূপান্তরে দৈবী মহিমার প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। কারণ, দেবতারাই উদ্যোগী হয়ে তাঁর লুন্ঠনবৃত্তি এবং নরহত্যার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রত্নাকর পরম বিশ্বাসে উত্তর দিয়েছিলেন যে তাঁর এই বৃত্তি যদি পাপ হয় তবে তার অংশীদার সবাই অর্থাৎ তাঁর মা, বাবা এবং সর্বোপরি স্ত্রী। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস টলে উঠলো যখন বাড়ি গিয়ে তিনি সবার কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁর এ কাজ যদি পাপ হয় তবে তাঁরা এতে অংশ নেবেন কিনা? মা-বাবা সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে, সন্তানের পাপ-পুণ্যের অংশ তাঁরা নেবেন না। বৃদ্ধবয়সে সন্তানের দায়িত্ব মা-বাবার দেখাশোনা করা। রত্নাকর শুধু সে দায়িত্ব পালন করছে তার বেশি কিছু তাঁরা জানতে চান না। এবার তিনি এলেন স্ত্রীর কাছে। ইতিমধ্যে মা-বাবার উত্তর শুনে তিনি বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন। এবার সেই বিপন্নভাব কাটিয়ে সহজ স্বাভাবিক হতে পারবেন এই আশায় তিনি স্ত্রীর কাছে সেই একই প্রশ্ন রাখলেন। কিন্তু এবারও তাঁকে হতাশ হতে হলো এবং প্রচন্ডভাবে। স্ত্রী সোজাসুজি তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে ভরণপোষণ করা। এটাই শাস্ত্ররীতি। এবং স্বামী কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করবেন সেকথা তো তাঁর জানার কথা নয়। তিনি আরো জানিয়ে দিলেন যে শুধু স্বামীর পুণ্যেরই তিনি আধা অংশীদার, পাপের নয়। রত্নাকর চমকে উঠলেন। তিনি এতদিন স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে, অন্তত স্ত্রী তাঁর পাপ-পুণ্যের সহ-অংশীদার। মা-বাবার কথা ছেড়ে দিলেও স্ত্রী যে তাঁকে এতখানি হতাশ করবেন একথা তাঁর জানা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট পাপবোধ তাঁকে পেয়ে বসলো। তিনি আতংকে শিউরে উঠলেন এই ভেবে যে বিরাট পাপের বোঝা তাঁকে একা বইতে হবে। অথচ এতদিন তিনি পরম নিশ্চিন্তে সকলের কল্যাণের জন্য এই পাপকার্য অনুষ্ঠিত করে যাচ্ছিলেন। এমন কি স্ত্রীও তাঁর পাপের দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। তিনি যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এ রকম যে ঘটতে পারে তা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কখনো আশা করেন নি। এরপর তিনি ছুটে এলেন ছদ্মবেশী দেবতাদের কাছে এবং সব পাপ স্বীকার করে মুক্তির পথনির্দেশ চাইলেন। সেদিনই এবং সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর জীবনে এলো রূপান্তর। মুক্তির নির্দেশ পেয়ে তিনি গভীর ধ্যানে সমাধিস্থ হলেন। এবং ঘটনা-পরম্পরায় তিনি দস্যু রত্নাকর থেকে উন্নীত হলেন মহর্ষি বাল্মীকিতে। রত্নাকর নামের যথার্থ মহিমায় তিনি উদ্ভাসিত হলেন স্বীয় কর্মের সুকৃতিতে।

রত্নাকরের জীবনের এই যে ব্যাপক পরিবর্তন এজন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দাবী করে এসেছেন দেবতারা। কিন্তু সেদিন মা-বাবার কাছ থেকে বিমুখ হবার পরেও তিনি যদি স্ত্রীর কাছে বিমুখ না হতেন তাহলে হয়তো লুন্ঠনবৃত্তি এবং নরহত্যা থেকে তিনি কোনক্রমেই বিরত হতেন না এবং পথিকরূপী দেবতাদের মৃত্যুও তাঁর হাতে অনিবার্য ছিল। আর এ তো তাঁর স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যে স্ত্রী অন্তত সব কাজে তাঁকে সমর্থন করবেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর সেই প্রগাঢ় বিশ্বাসের ভিত আলগা হয়ে গেল তখন তিনি আর দাঁড়াবার মতো জায়গা খুঁজে পেলেন না। তাই মনে হয় যে, রত্নাকরের এই পরিবর্তনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। দেবতারা কৃতকর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় সৃষ্টি করেছিলেন একথা সত্য। তবে সেই সংশয় দৃঢ়তর করতে এবং সমস্ত পাপের জন্য শুধু রত্নাকরকে নির্দিষ্ট করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। এই মহৎ ভূমিকার কথা কিন্তু কোথাও তেমন সোচ্চারে ঘোষিত হয় নি। রত্নাকরের স্ত্রী তাই কাব্যে উপেক্ষিতার মতো। যিনি কিনা এমন একটি দুর্লভ রত্ন আমাদের উপহার দিলেন তাঁর কথা আমরা ভুলে রইলাম। রত্নাকরের পরিবর্তনে দেবতাদেরই জয় জয়কার। কোথাও এ কৃতিত্বে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা যুক্ত করা হয় নি। অথচ রত্নাকরকে বাল্মীকি রূপে পাওয়ার মূলেই হচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি স্বামীকে সৎপথে পরিচালিত করতে স্ত্রীর ভূমিকা কতখানি সে পথ নির্দেশও রেখে গিয়েছেন এরই মাধ্যমে। বিশ্বের প্রণম্যা নারী শিরোরত্নদের মধ্যে রত্নাকর-পত্নী এক সুপবিত্র দীপশিখা। যুগ থেকে যুগান্তরে তিনি সকল স্ত্রীকে এমনিভাবে স্বামীর অন্যায় কাজের বিরোধিতা করে তাঁকে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দেবার ইংগিত করছেন।

স্বামীকে অন্যায় এবং অসত্য সম্বন্ধে সচেতন করে সুপথে পরিচালিত করাই এই হলো ভারতীয় নারীর সুমহান ঐতিহ্য।

এবার এক নজর নিজেদের দিকে নেওয়া যাক। কোন সুনির্দিষ্ট নিরিখে নয়। এমন কি এই সুমহান ঐতিহ্যের পটভূমিকাতেও। কারণ, যে নারী একদিন এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক অধ্যায় রচনা করেছিলেন আজকের নারীর সেই ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা তাঁকে লাঞ্ছিত ক্ষুব্ধ এবং ক্লান্ত করবে। তাই উপরিউক্ত কাহিনীটুকু শুধু বলার জন্যই বলা হলো।

আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলি। সমাজবিরোধিতার মূলকে উপড়ে ফেলার ইচ্ছে প্রকাশ করি। খুবই ক্লান্তিকর হলেও ঘুরে ফিরেই একথাগুলি আমাদের শুনতে হয় এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে শোনাতেও হয়। এককথায় আমাদের মনের সদিচ্ছাকে প্রকাশ করার জন্যই এতসব করা। কিন্তু আমরা কখনো হিসেবের কড়ি মিলিয়ে দেখি না। কি বললাম আর কি করলাম তা ভাবি না। এর ফলে আমরা নিজেদের যে কি ভীষণ ক্ষতিসাধন করে চলেছি সেটুকু ভেবে দেখি না। আমাদের লাভের পাল্লাটা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হচ্ছে এবং লোকসানের ভার বয়ে বয়ে অন্যদিকের পাল্লাটা মাটিতে ঠেকেছে। আর এ তো খুবই স্বাভাবিক

কারণ একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামীর কি আয় তা স্ত্রীমাত্রেরই বেশ জানা। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা তো আমাদের গগনচুম্বী। স্বামীর আয়ে কুলোক আর না কুলোক এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের চরিতার্থ করতেই হয়। আর সব ব্যাপারেই একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব আমাদের পেয়ে বসেছে। সব কিছুতেই নিজেরটা সাত-কাহন করে প্রচার করা চাই। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে আমি থাকতে পারছি না। আমাদের মতো মাঝারি আয়ের পরিবারে একটা বড় অংশ যে চলে যায় ডাক্তারি খাতে একথা খুবই সত্যি। কিন্তু তা নিয়েও কেউ কেউ গর্ব প্রকাশ করতে ছাড়েন না। আমার এক আত্মীয়া ডাক্তারের কথা উঠলেই বলেন যে, বড় ডাক্তার না দেখালে আমাদের বাড়ির অসুখ সারার নয়। এই তো সেদিন খুকুর এমনি একটু সর্দিজ্বর হলো এতো টাকা ফি দিয়ে বড় ডাক্তার আনতে হলো। তারপর তিনি বেশ গর্বভরে টাকার অঙ্কটা বললেন। তাঁর মনোভাব এরকম যে শুনতে এখানে তিনি জিতে গেছেন। এরকম জয়ের আত্মতৃপ্তিতে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তবে প্রশ্ন হলো যে সাধারণ সর্দিজ্বরে অতো টাকা ফি দিয়ে বড় ডাক্তার ডাকার মতো আয় তাঁর স্বামীর নয়। অসুখ-বিসুখ হলে বড় ডাক্তার ডাকতে হবে বৈকি। তাবলে সবসময় বড় ডাক্তার নিয়ে পড়ে থাকলে এই বাড়তি টাকা আসবে কোত্থেকে সে হুঁশও তাঁর থাকা উচিত। কিন্তু আমার ধারণা সে জ্ঞান তাঁর নেই। তাঁর শখ বড় ডাক্তার ডাকা, সুতরাং স্বামীকে সেই শখ পূরণ করতেই হবে। নাহলে স্ত্রী বিগড়ে বসবেন। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার জানিয়ে বলবেন যে, স্বামীর সংসারে এসে তাঁর কোন শখই পূরণ হলো না। অথচ পাশের বাড়িতে নিত্য বড় ডাক্তারের যাতায়াত। তিনি আরো অনেক অভিযোগ করবেন তবু একবার তলিয়ে দেখবেন না পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর স্বামীর আয়ে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অশান্তি এড়ানোর জন্য স্বামী পূরণ করে চলেন স্ত্রীর বড় ডাক্তারের সাধ। আর এর জন্য তাঁকে চিন্তা করতে হয় মাইনের বাইরে আরো কিছু আয়ের। বলা বাহুল্য যে সে পথে সাধুতা থাকে না। কিন্তু অসাধুতা ছাড়া স্ত্রীর মন জোগানো সম্ভব নয়। এমনিভাবে স্ত্রীর সাধ মেটাতে গিয়ে স্বামী দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। যার অপর নাম সমাজবিরোধিতা। রত্নাকর-পত্নী স্বামীকে সমাজবিরোধী কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। আর আমরা জেনেশুনে স্বামীকে সে নরকে ঠেলে দিচ্ছি। এজন্য বিন্দুমাত্র আমাদের বিবেক-দংশন হয় না।

এর মূল কারণ সম্ভবত যে, আমরা দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধিতাকে ভিন্নরূপে দেখছি। অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করাকে দুষ্ট হওয়াকে আমরা বলি দুর্নীতি। আর কোন গর্হিত অপরাধ অর্থাৎ খুন ইত্যাদিকে বলি সমাজবিরোধিতা। রত্নাকর একই সঙ্গে দুটি কাজই করতেন। আরো সহজ করে বলা যায় যে, অর্থ উপার্জনের জন্যই তিনি নরহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। এর কোনটাই সামাজিক ন্যায়বিধান অনুসারী নয়। দুটি কাজই ঘোরতর সমাজবিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আমরা বে-আইনী অর্থ উপার্জনকে সমাজবিরোধিতার পর্যায়ে ফেলি না। এ শুধু নিজেদের স্বার্থে। অথচ আমরা সবাই জানি যে, খুন-ছিনতাই যেমন সামাজিক অপরাধ তেমনি উৎকোচ গ্রহণও সামাজিক অপরাধ। এমনিতে দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ যা তা হলো যে একটা ভদ্রবেশী শয়তান এবং অন্যটা ভদ্রতাবর্জিত। যার সাহসে কুলোয় এবং ভদ্রতার বিদ্যায় যারা হাত পাকাতে পারে নি তারা শেষ পথের আশ্রয় নেয়। আর একদল চোস্ত ভদ্রতার মুখোশ পরে প্রথম পথে চলছেন।

দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধিতার মূলোচ্ছেদে স্ত্রীর ভূমিকাই এখন সর্বাধিক সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। স্ত্রী স্বামীর পুণ্যের সহ-অংশীদার, পাপের নয়। তাই স্বামীকে পাপের পথে যেতে দিয়ে স্ত্রী স্বতন্ত্র পাপ অর্জন করছেন। যার অপর নাম সামাজিক অপরাধ। এই অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে এবং স্বামীকে নিবৃত্ত করতে তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন যা করেছিলেন রত্নাকর-জায়া। কিন্তু সে-পথে আমাদের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো লোভ। লোভের পোকা আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই স্বামীর সামর্থ্যের অভাব জেনেও আমরা বেমক্কা বায়না ধরি। নিজেকে বাদ দিয়ে আমরা খোকা-খুকুর দোহাই পাড়ি। কোন কোন মা একথা বলতে খুব গর্ববোধ করেন যে, তার ছেলে বা মেয়ে থিন-এরারুট বিস্কুটে সন্তুষ্ট নয়। একটু দামি বিস্কুট নাহলে ওদের রোচে না। তারা স্বামীর কাছে আব্দারের সুরে বলেন যে, 'সেই সেদিন কে তোমাকে খুব ভাল বিস্কুট দিয়েছিল সেরকম আর পাও না। খুকু শুধু ওই বিস্কুট খেতে চায়'। উপলক্ষ্য সামান্য বিস্কুট কিন্তু পথনির্দেশ খুবই পংকিল। এই বিস্কুট থেকে যে কি লোভের গহ্বর তৈরী হয়ে রয়েছে তা তিনি জানেন না। না জেনে-শুনে তিনি স্বামীকে আরো এগিয়ে দিলেন গহ্বরের কাছাকাছি।

স্ত্রীর কর্তব্য সর্বপ্রকারে স্বামীকে দুর্নীতিমুক্ত করা। স্ত্রীর কাছে স্বামী প্রায় কোনকিছুই গোপন করেন না। সব জেনেও যদি স্ত্রী স্বামীকে দুর্নীতি মুক্তিতে সাহায্য না করেন তবে যে সামাজিক অপরাধ জমা হবে তা থেকে তাঁরা কেউ রেহাই পাবেন না। একথা সত্য যে, সব স্ত্রীই স্বামীর দুর্নীতির জন্য দায়ী নন। তবু জানার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে স্ত্রীর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাঁর দরকার। বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গলবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তা করা উচিত। রত্নাকর-জায়াও একদিন এই মঙ্গলবোধেই অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামীকে অশুভ কর্ম থেকে নিরত হতে সাহায্য করেছিলেন। আর সেখানেই রয়েছে, স্বামীর তথা সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণে স্ত্রীর যথার্থ পথনির্দেশ। আর এ পথেই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ সম্ভব।

—প্রণীতা

এক নজরে

দেহদান : ইদানিং পশ্চিমী দুনিয়ায়, বিশেষ করে আমেরিকায় যে চক্ষুদান, দেহদান (আক্ষরিক অর্থে) প্রভৃতির হিড়িক পড়েছে তা তার মানবিক মূল্য হারিয়ে একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক দশক আগেও ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মেডিকাল ছাত্রদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে মড়া পাওয়া একটা কঠিন সমস্যা ছিল। কারণ আমাদের দেশের মতো অগণিত ভিক্ষুক, ভবঘুরে সেসব দেশে কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। সুতরাং মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালগুলিতে রেডিমেড মড়া পাওয়ার কোন উপায় ওদের নেই। তারপর সব মৃতব্যক্তির দেহ ধর্মীয় মতে সমাহিত করার রীতি এতদিন পর্যন্ত সেসব দেশে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে এসেছে। এসব কারণে একদা এশিয়া আফ্রিকা থেকেও পশ্চিমী দেশগুলিতে মৃতদেহ চালান যেত এবং ঐ ব্যবসা করে পয়সাও করেছিল অনেকে। আর ঐসব দেশেরই একদল শব-চোর রাত্রির অন্ধকারে কবর থেকে সদ্যসমাহিত শব তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে বিক্রি করে প্রচুর রোজগার করত। শব চুরির হিড়িক ইংলন্ডে একসময় এত বেড়ে গিয়েছিল যে তা বন্ধের জন্য ঐ অপরাধে মৃত্যুদন্ডের বিধান সেদেশে একদা বলবৎ হয়েছিল। ক্যাথলিক দেশগুলিতে এখনও মেডিকাল কলেজে ব্যবচ্ছেদের জন্য চুরি করা শব ব্যবহার পোপের নির্দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মেডিকাল ছাত্রদের শিক্ষার জন্য শবের অভাব দূর করতে ইদানিং মানবতাবাদী এবং মরণোত্তর ধর্মীয় রীতি-নীতিতে অবিশ্বাসী কিছু কিছু লোক মৃত্যুর পর তাঁদের দেহ বিশেষ কোন মেডিকেল কলেজে দান করার জন্য—'উইল' করা শুরু করেন এবং তাঁদের সে মহৎ দান একদা বিশেষ সংবাদ হিসাবে সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হত। কিন্তু সম্প্রতি ঐ মহৎদানের চাপ আমেরিকার মেডিকাল কলেজগুলির পক্ষে একটা রীতিমতো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বহু কলেজ কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, বেশ কিছুদিনের মধ্যে আর কোন দেহ তাঁদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ইলিনয় মেডিকাল স্কুলে সারা বছরে ৩৬০টি মৃতদেহের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই বছরের অর্ধেক না পেরোতেই তাদের হাতে ৩৯০টি উইল করা মৃতদেহ জমে গেছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আরও ২৯,০০০ ইলিনয় রাজ্যবাসী মেডিকাল স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছেন। তাঁদের মৃতদেহ যেন মেডিকাল ছাত্রদের শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের সারা বছরে ৮০টি মৃতদেহের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এখনই তাদের হাতে ১২৭টি মৃতদেহ জমে গেছে, তাদের কোল্ড স্টোরেজে আর শব রাখার জায়গা নেই। ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন মেডিকাল স্কুলে বছরে ৬০টি শব-ব্যবচ্ছেদ হয়, কিন্তু ঐ কলেজের দপ্তরে পাঁচ হাজার দেহদানীর আবেদন স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে।

এই দেহদানের জন্য গণ-আবেদনের পিছনে দুটি বড় কারণ আছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম কারণ, ধর্মের আবেদন মানুষের মনে আর আগের মতো সাড়া জাগায় না, তাই মরণোত্তর ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি এখন অনেকের কাছেই অবশ্য পালনীয় বলে মনে হয় না। তাঁরা এখন দেহকে মাটির নীচে পুঁতে মাটিতে পরিণত করার চেয়ে শিক্ষার মহৎ কারণে দান করাকে বড় বলে মনে করছেন। আর দ্বিতীয় কারণ, যেটি প্রথম কারণের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে মাটিটুকুর নীচে বিগত-প্রাণ দেহটির শেষ আশ্রয় পাওয়ার কথা তার ক্রয়মূল্য সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমেরিকার যে কোন কারখানায় এখন দু-হাত চওড়া, চার হাত লম্বা জমির দাম কয়েক হাজার ডলার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মবিশ্বাস বাড়ছে : কদিন আগে সরকারীভাবে '৭১ সালের লোকগণনার যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে মনে হয়, এদেশে মানুষের ভগবানে বিশ্বাস বাড়ছে। ইতিপূর্বে '৬১ সালে যখন লোকগণনা হয় তখন সারা ভারতে মোট এক লক্ষ ১০ হাজার ৯৮৮ জন জানিয়েছিল যে তাদের কোন ভগবানে বিশ্বাস নেই; ঐ সংখ্যা ছিল সারা ভারতের তৎকালীন মোট জনসংখ্যার ০·০৩ শতাংশ। এবার সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে, মোট ৩৬ হাজার ৮৩ জন জানিয়েছে যে তারা নিরীশ্বরবাদী এবং ঐ সংখ্যা এবারের মোট জনসংখ্যার ০·০১ শতাংশ।

এবার দেখা যাচ্ছে, গুজরাতের অধিবাসীদের মধ্যে নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাকে অনুসরণ করেছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও মণিপুর। গুজরাতে ১৯৬১ সালে মাত্র দুজন জানিয়েছিল যে তাদের ভগবানে বিশ্বাস নেই; কিন্তু এবার সে রাজ্যের ৯,৫৪৭ জন ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। মহাত্মা গান্ধী, মোরারজি দেশাইর দেশের কয়েক হাজার মানুষের হঠাৎ ভগবান সম্পর্কে এত বেপরোয়া মনোভাব নেওয়ার কারণ কি তা অবশ্য সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়নি। গুজরাতের প্রতিবেশী রাজ্য মহারাষ্ট্রেও পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ জানিয়েছে যে তারা বিশেষ কোন ধর্মানুসারী নয়; পাঞ্জাবে ঐ সংখ্যা কিঞ্চিদধিক চার হাজার এবং বৈষ্ণবের দেশ বলে পরিচিত মণিপুরে নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। সারা ভারতে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যার প্রত্যেকটি অধিবাসী নিজেকে কোন-না-কোন ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিয়েছে।

প্রকাশিত রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তাহলে এ রাজ্যের সব জড়বাদী কি নিজেদের একই সঙ্গে জড়বাদ ও ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাসী বলে জানিয়েছেন? মোট কথা, সেন্সাস রিপোর্টে নিরীশ্বরবাদের ব্যাপারটি খুব বিশদভাবে আলোচনা করা হয়নি।

ভিক্ষাবৃত্তির মর্যাদা : কেরল রাজ্যের ভিক্ষুকরা ভিক্ষাকে একটি মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তিতে উন্নীত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। আপাতত তৌল্লিচেরি, কান্নানোর ও কোঝিকোড় এই তিন শহরের ভিক্ষুকরা মিলিত হয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করেছে এবং তাদের সে ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছেন রাজ্যের কুষ্ঠরোগী এসোসিয়েশনের প্রধান শ্রীভার্গিজ কোরাট্টি। ভিক্ষুক ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের সদস্যরা যত্রতত্র ভিক্ষা চেয়ে শহরবাসীদের উত্যক্ত না করে শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে ইউনিয়নের ব্যাজ পরে ভিক্ষা চাইবে। তাতে ভিক্ষা অনেক বেশি পাওয়া যাবে ব'লে তাদের ধারণা। আর রোজ সকলে ভিক্ষায় না বেরিয়ে তারা অন্যান্য শ্রমজীবীদের মতো সপ্তাহে দেড়দিন অন্তত ছুটি ভোগ করবে। প্রয়োজন হলে আট ঘন্টার শিফ্‌ট ডিউটিও তারা চালু করবে এবং প্রতিদিন যা সংগ্রহ হবে তা তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেবে।

পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে অভিনব, এবং এর মধ্যে একটা সাম্যবাদী চিন্তাধারারও পরিচয় মেলে। কিন্তু কেরলের ভিক্ষাজীবীরা ঐ পরিকল্পনার ফাঁকটুকু নিশ্চয়ই নজর করেনি। তারা না হয় শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে চলমান পথিকদের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের ইউনিয়নের যারা সভ্য নয় সেই সব ভিক্ষুক ত সেই সময় তাদের ছেড়ে যাওয়া স্থানগুলি দখল করে নিয়ে আগের মতোই আর্তকণ্ঠে ভিক্ষা চেয়ে সব পথ মুখর করে রাখবে! তাদের ত গায়ের জোরে সরানো যাবে না, কোনরকম গন্ডগোল হলেই সেখানে পুলিশের আবির্ভাব ঘটবে আর সেই সঙ্গে অনর্থ। সুতরাং পরিকল্পনাটি সফল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

—প্রত্যক্ষদর্শী

॥ মিনারের ওপরে মিনার ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কুঠী নয়, কোটি কোটি
মিনারের ওপরে মিনার
        আকাশেরে স্পর্শ করে আছে,
যদিও রয়েছে ছুঁয়ে মনের কিনার—
এ দৃষ্টি পেঁৗছে না সেথা
        যতই না আসি তার কাছে।
পদ্মার প্রমত্ত নীরে
ছায়া তার সুচির ভাস্বর,
আমরা বিমুগ্ধ হই
সে নদীর শুনে কলস্বর।
সবুজ সবুজ সোনা
দিকে দিকে প্রাণের প্রকাশ,
হেথা মৃত্যু অস্বীকৃত
জীবনের পরম আশ্বাস।
এই সে শিলাইদহ
নবতম শান্তিনিকেতন,
যুগতীর্থে এসে করি
শতাব্দীর কবিরে স্মরণ।
এ বাতাস এ মাটিতে
এসে যেন স্বর্গ পেলাম,
এ ধুলোয় মনখানি
সহস্র প্রণতি সাথে রাখিয়া গেলাম।

॥ দুর্গাপুর ব্রীজ ॥

অনীতা গুপ্ত

যেন কোন দর্পিত সম্রাট—
প্রসারিত দুই বাহু,
কঠিন মুঠিতে বন্ধ দুই তীর,
মায়াবী এ চাঁদের আলোয়
দ্যুতিমান ইস্পাতের হীরক মুকুট।

তথাপি আঁধার দেখ অতল গভীরে।
অবাধ্য ঢেউয়ের কান্না কঠিন কপাটে,
সামনে সুদৃঢ় লৌহ,
সম্রাট অটল।

সাফল্যগর্বিত এক উর্ধ্বশির জীবনে আঁধারে
অশ্রুর দারুণ বিদ্রোহ;
আসন্ন বর্ষায় তার মুক্তি সুনিশ্চিত।

॥ যেমন দেহের কোষে মন ॥

শিশির ভট্টাচার্য

যেমন দেহের কোষে মন,
অণু অণু খুঁজে
                কিংবা
প্রসারিত ভেঙে
কোথাও
পাবে না কেউ তাকে।
যদিও সে আছে,
              একাকী
অত্যন্তভাবে কাছে
এবং সম্পৃক্ত
মনছাড়া শরীরের অস্তিত্বে পৃথক।

তেমনি রক্তের কণে তুমি—
চেতনার উজ্জয়িনী স্রোত,
যেন ওতঃপ্রোত
              ধমনী শিরায়
সমুদ্রের জোয়ার সফেন
শঙ্খচিল এবং নুলিয়া।

অথচ কেমন তুমি
দ্বিধাহীন সহজ উধাও
আশ্চর্য স্বাধীন—
উদ্ভাসিত রৌদ্রময় নীলে;
যখন মিছিলে
আমি শুধু গোত্রহীন মুখ
অতিক্রান্ত দিন থেকে দিনে
উদাসীন প্রখর গৈরিকে।

মৃত্যুর কাছ থেকে

নির্মলেন্দু রক্ষিত

বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সুস্মিতা।

এতক্ষণে কেমন যেন ভয় ভয় করছে। হাতের তালু ঘেমে গেছে। গলা শুকিয়ে গেছে যেন।

সামনে সেই দীর্ঘ বাড়িটা। সাততলা উঁচু। অ্যামেরিকান ধাঁচে তৈরী। সোজা চওড়া গলির মতো। দুদিকে নিরেট দেওয়াল। খানিক দূর গিয়ে দুটো পাশাপাশি লিফ্ট। কেতাদুরস্ত নারীপুরুষ ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। দু-একটা উর্দিপরা বেয়ারা ছোটাছুটি করছে চারদিকে।

সুস্মিতা চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিল। পাশেই ফুটপাতের গা ঘেঁষে সারি সারি গাড়ি দাঁড়ানো। নিশ্চয়ই অফিসারদের। বিরাট বিরাট সব দেশী সাহেব। এদেরকেই বেশী ভয় সুস্মিতার।

ও একবার ভাবল এসেই ভুল করেছে। বরং ফিরে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের মুখটা ভেসে উঠল। শীর্ণ একটা অস্তিত্ব। সূক্ষ্ম সুতোয় জীবনটা ঝুলছে যেন। সুস্মিতার মনে হল পদ্মপাতায় জল।

সুতরাং শীলাকে চাই। পেতেই হবে তাকে। যেমন করেই হোক।

সুস্মিতা এগিয়ে গেল।

গলাটা কেঁপে উঠল। আবার হাতের তালু ভিজে গেল।

কোনো রকমে সুস্মিতা বলল — এটাই তো কন্টিনেন্টাল ট্র্যাভেলিং—

বিজ্ঞের মতো দারোয়ান হাসল। বলল—এখানে অনেকগুলো অফিস আছে। কন্টিনেন্টাল সাততলায়। লিফটমে উঠিয়ে যান। ডানদিকে—

ভয়ে ভয়ে সুস্মিতা একবার লিফটের দিকে তাকাল। সেখানে তখনও ব্যস্ত নারী-পুরুষের ভিড়। পাশাপাশি দুটো লিফ্ট অনবরত উঠছে নামছে।

একটু হেসে সুস্মিতা বলল — মানে, আমার এক বন্ধুর কাছে এসেছি। ও আসতে বলেছিল। কিন্তু ও অফিসে এসেছে কিনা—

দারোয়ান বলল—ঠিক আছে। ডানদিকে ওই ঘরে চলিয়ে যান—জিজ্ঞেক করুন কোইকে।

ডানদিকের কাঁচের আস্তরণটার দিকে চেয়ে সুস্মিতা বলল—ওখানে?

দারোয়ান মাথা নাড়ল।

সুস্মিতা এগিয়ে গেল।

কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। সারি সারি চেয়ার টেবিল। এক দঙ্গল লোক নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। একটা মেয়ে

যাবে। কিন্তু যেতে হবে কোনখান দিয়ে? মাঝখানে যে কাঁচের এক পাঁচিল।

হঠাৎ দেখল এক জায়গায় লেখা 'পুশ'।

সুস্মিতা আলগোছে ঠেলল। মুহূর্তে ভেতরে যাওয়ার পথ হয়ে গেল।

আ, কি ঠাণ্ডা ভেতরটা। শরীরটা জুড়িয়ে গেল যেন।

সুস্মিতা ইংরেজী তর্জমা করে নিল। বলতে হবে—আমি শীলা ব্যানার্জির বন্ধু। দেখা করতে এসেছি। আই শ্যাল বি থ্যাংকফুল—

সামনে শোকেসের মতো কাঁচের টেবিল। ওপরে একটা কালো বোর্ডে লেখা রিসেপসনিস্ট। স্বল্পবেশী একটা মূর্তিমতী আগুন টেলিফোনের রিসিভার নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলছে।

সুস্মিতা দু একটা মুহূর্ত ইতস্তত করে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটি রিসিভার ক্রেডলে রেখে বলল, ইয়েস—

ব্যস, সব গুলিয়ে গেল সুস্মিতার। এতক্ষণের তর্জমা কোথায় হারিয়ে গেল আবার। সেই হাতের তালু ঘেমে গেল। গলা শুকিয়ে গেল একেবারে।

অনেক কষ্টে বলল—মানে এখানকার শীলা ব্যানার্জি— আপনাদের কমার্শিয়াল

মেয়েটি এবার বিস্মিতভাবে চাইল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, ও হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো এখানে আর কাজ করেন না। দিন পনেরো হল—

যেন আর্তনাদ করে উঠল সুস্মিতা। ফিসফিস করে বলল—কাজ করে না, কিন্তু আমি যে—

মেয়েটি বলল বোধ হয় আপনি ওর রিলেটিভ বা ফ্রেণ্ড। আপনাকে বেশী কিছু বলতে পারবো না। শুধু শুনে রাখুন, সি ইজ স্যাকড।

এবার চমকে উঠল সুস্মিতা। চাকরী চলে গেছে শীলার? এরা তাড়িয়ে দিয়েছে? তাহলে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছিল। এই মুহূর্তে নিজেকেই যেন অপরাধী বলে মনে হল সুস্মিতার। যেন সবাই ওর দিকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জঘন্য কোনো অপরাধে বিতাড়িত বান্ধবীর জন্য যেন এতক্ষণে সুস্মিতাই সবাইর কাছে ছোট হয়ে গেছে।

কিন্তু শীলা কি এখন স্রেফ বেকার? নাকি অন্য কোথাও চাকরী জুটিয়ে নিয়েছে?

ওর ভেতরের আগুন তো এত তাড়াতাড়ি নিভে যাওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই ও এতক্ষণে অন্য কোনো কাচের ঘরে বসে ডিকটেশন নিচ্ছে। অথবা বসের সাথে ইন্সপেকশনে গেছে মনোরম কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে।
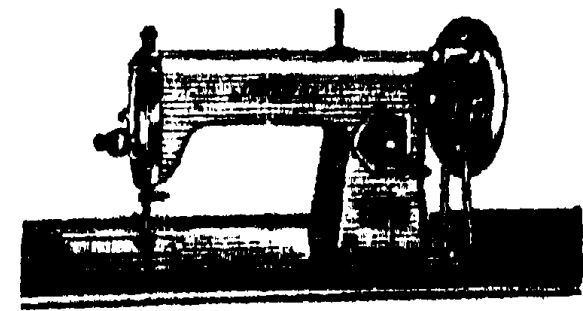
আবার কেমন যেন নিজেকে অসহায় মনে হল সুমিতার। যেন সব আলো নিভে গেছে হঠাৎ। যেন হঠাৎ পায়ের নীচের মাটি সরে গেছে। ও যে কত আশা নিয়ে এসেছিল এখানে—একটা মেয়ে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। এবারে সে উঠে এল। ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো সুমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—শুনুন, ওর ঠিকানাটা শুধু আমি জানি। আপনাকে লিখে দিলাম। জগুবাজারের স্টপেজে নামবেন। ডানদিকে—

কয়েক মুহূর্ত কাগজটার দিকে চেয়ে সুমিতা সম্বিত ফিরে পেল। হনহন করে বেরিয়ে এল ওখান থেকে। নমস্কার জানানোর ভদ্রতাটুকুও মনে রইল না।

বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে শুধু ও শীলার কথাই ভাবল।

এক স্কুলে ওরা পড়েছে। একেবারে ফাইনাল পর্যন্ত। এক পাড়াতেই বাড়ি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে শীলা। ওর বাবা কোথায় যেন সামান্য কি একটা কাজ করতেন। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টের সংসার।

শীলা এই অবস্থা মেনেই নিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু কলেজে উঠেই যেন ও হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। মেতে উঠল হৈচৈ নিয়ে। পিকনিক, এক্সকারসান এসব নিয়েই দিন কাটাল। ক্লাশের চাইতেও বড়ো আকর্ষণ হয়ে উঠল ক্যান্টিন আর কফি হাউস। বান্ধবীর সংখ্যা তখন নগণ্য। বাছা বাছা ধনীর দুলালরাই ওর নিত্যকার সঙ্গী।

ক্রমে সুমিতার সঙ্গে ওর দূরত্ব বাড়ল। ইংরেজীতে অনার্স পেয়ে ও কোথায় যেন চলে গেল। কানাঘুষো শোনা গেল অনেক। কেউ বলল ও বোম্বেতে পালিয়েছে এক মার্চেন্টের ছেলের সঙ্গে। কেউ বলল ও বিয়ে করেছে এক নাভাল অফিসারকে।

ক্রমে শীলার নামটা মুছে গেল সবাইর স্মৃতি থেকে।

ওর চলে যাবার কিছুদিন আগে সুমিতা ওকে একদিন শুধু বলেছিল—ন্যাখ্, তোর কথা আমি প্রায়ই ভাবি। এমনি করে চললে কোনদিন শান্তি পাবি তুই? তার চাইতে—

শীলার দুচোখ জ্বলে উঠেছিল।

বলেছিল—নো, নেভার। আমি তোদের মতো ভাঙা ঘর থেকে ফুটো সংসারে যেতে জন্মাই নি। জীবন আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আমি দেখিয়ে দেবো যে ইচ্ছে করলে সোসাইটির উঁচুতলায় উঠে যাওয়া যায়—ইফ্ ইউ হাভ অ্যাম্বিশন, অ্যান্ড, অ্যান্ড—

ওকে শেষ করতে না দিয়েই চলে এসেছিল সুমিতা।

সেই সুমিতাকেই প্রচন্ড এক অ্যাম্বিশনের মূর্তিমতী রূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল শীলা। মাস সাতেক আগে।

কি একটা কারণে স্কুল সেদিন হঠাৎ [illegible]।

সুমিতারা কয়েকজন সিনেমা দেখতে এল চৌরঙ্গী পাড়ায়। সুমিতা আগে এদিকে আসেনি। চাকরী পাওয়ার পরেও এই ঝলমল পৃথিবীতে এসে রঙীন জীবনের স্বাদ নেওয়ার সাহস ওর হয়নি। বাস থেকে এই পাড়ার ব্যস্ততা আর প্রাচুর্যের ছবি দেখে ওর বারবার মনে হয়েছে যে, এখানে ও বড্ড বেমানান।

সেদিন ওরা এলিটের দিকে এগোচ্ছে। পাশে ফুটপাতের কাছে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল জাহাজের মতো ঢাউস এক মোটর। স্যুটপরা দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। পেছনে পেছনে স্বল্পবেশী এক তরুণী।

এক মুহূর্তে সুমিতা স্তব্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, শীলা ব্যানার্জি।

একটা নীল সিল্কের শাড়ি। ম্যাচ করে ব্লাউজ। গলায় কি একটা মালা। বোধহয় মুক্তোর। খোঁপাকে মাথার ওপরে তুলে বাঁধা। ঠোঁটে রঙ। গায়ে দামী সেন্টের গন্ধ। হাতে বাটিকের কাজ করা একটা ব্যাগ।

পুরুষটি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে কি যেন বলতে বলতে যাচ্ছিল।

সেই সময় শীলা দেখল সুমিতাকে।

লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটে এল। অন্য শিক্ষিকাদের কাছ থেকে এক ঝটকায় সুমিতাকে সরিয়ে নিয়ে এসে বন্যার মতো উচ্ছল হয়ে উঠল।

—সুমি না? অবাক হয়ে গেছিস? তারপর কেমন আছিস, বল? কোথায় যাচ্ছিস? মাসীমা কেমন আছেন রে? কি করছিস এখন?

সুমিতা সব কথারই উত্তর দিল একে একে।

শীলা বলল—কিন্তু তোর চেহারা এইরকম হয়ে গেল কেন রে? বিয়ে হবে কি করে?

সুমিতা হাসল। বলল—সেজন্য চিন্তিত নই। তারপর বল্, তোর কি খবর?

শীলা হাসল। মুক্তোর মতো দাঁত দেখা গেল এবার।

বলল—দেখতেই তো পাচ্ছিস। ও হ্যাঁ, ওই যে লোকটা দেখছিস না, ও হল আমার বস। আমি ওর পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট। ইচ্ছে করেই আগুনে পুড়ে মরবে, আমি কি করব, বল্?

ও আফশোষের ভঙ্গিতে মুখে চুকচুক করে শব্দ করল।

সুমিতা কি যেন ভাবছিল।

শীলা বলল—যাক্ গে। হ্যাঁরে, তুই স্কুলে কত পাস?

এই মুহূর্তে সুমিতার কেমন যেন লজ্জা করল শীলার কাছে। ইতস্তত করে বলল—শ' দুইয়ের মতো হয়।

ভ্রু দুটো কুঁচকে শীলা কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। নীচের ঠোঁটটা একটু ঝুলে গেল।

বলল—গত মাসে আমি একটা ইনা
মেন্টই পেয়েছি আড়াইশো টাকার। থা
গে, চলি রে।

ব্যাগ থেকে একটা ছোট সাদা ক
বের করে বলল—রেখে দে। একদিন স
করে এলে ভাল করে কথা বলব, কেম
উইস ইয়ু—

তারপর অনেকদিন ভাল করে ঘুমো
পারে নি সুমিতা। কোনো কাজে মন ল
নি। সারা মাস মেয়ে ঠেঙিয়ে, গলা ফা
চিৎকার করে দুশো টাকাও জোটে
আর একটা ইনক্রিমেন্ট আড়াই শো টাকা
তার মানে মোট কত পায় শীলা?

অথচ বাবা রিটায়ার করার
সুমিতার ওপরেই সংসার। বাবার পেন্স
সাতষট্টি টাকার মধ্যে অর্ধেক তো
ওঁর ওষুধপত্র আর পথ্যে। মায়ের ক্যান্স
চিকিৎসা করা ওর সাধ্যাতীত। এ
আশা ছিল বাবুয়া। কলেজে পড়ছ
যদি ভাল করে পাশ করে

বাসে উঠেই বসতে পেল সু
জগুবাজারের স্টপেজে নামতে হবে। ড
দিকে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড। জিজ্ঞেস ক
হবে কারুকে সতেরো বি কোথায় হবে। অ
দেখা করতেই হবে শীলার সঙ্গে। যে
করেই হোক।

কাল ওকে ডেকেছিলেন ডকটর বা
বলেছিলেন—ডোন্ট মাইন্ড, আপন
আর্নিং মেম্বার কে কে?

একটু গর্বের সঙ্গেই সুমিতা বলে
—আজ্ঞে আমিই।

ভ্রু কুঁচকে ছিলেন ডকটর বাসু।

বলেছিলেন—শুনুন, রেডিয়ম
হলে অন্ততঃ দুটো অ্যাপ্লিকেশনের
প্রস্তুত থাকতে হবে। ধরুন হাজার
টাকা। অবশ্য এক্ষুনি না হলেও চ
যদি জোগাড় না করতে পারেন, মাস
পর্যন্ত অবশ্য, তারপরে বুঝলেন
মানে—

রাতে শুয়ে শুয়ে সুমিতা ঠি
শীলার সঙ্গে দেখা করতে হবে। স্বপ্ন
আদর্শ নয়। তার চাইতে জীবন
বড়ো। তার চাইতেও বড়ো কর্তব্য।
চাকরী বা প্রাইভেট ফার্মের চাকরী-
প্রশ্নই নয়। কি করতে হয়, সেটাই
আজ এই মুহূর্তে সব চাইতে
প্রয়োজন একটা বেশী মাইনের চাকরী
মাসের মধ্যে যদি—। আর ভাবতে পা
সুমিতা।

ফুটপাতে পাছা পর্যন্ত সো
ঢেকে কতগুলো ছেলে জটলা
বাবুয়ার কথা মনে পড়ছে সু
কতো আশা ছিল। রীতা এখনো
কতটুকুই বা ও বোঝে। কিন্তু
বড়ো হয়েছে। ওর উচিত ছিল স
পাশে এসে দাঁড়ানো। নিজের চোখে
দেখলে সুমিতার দিনযাপনের
চাকরীর পর তিনটে টিউশনি। খাতা
চামড়ার ব্যাগে নকশা করে দেওয়া—

অথচ এতবড়ো ছেলে—সারাদিন
ায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত
াহেই সুমিতা জেনেছে যে কলেজের
ায় ওর নাম নেই। অথচ মাইনে
ছে নিয়মিত।

াতে ওর জন্য বসেছিল সুমিতা।
বাবুয়া খেয়ে আসতেই ধরেছিল।
ীরভাবে সব কথা ও শুনল।
তারপর বলল—হ্যাঁ, নাম নেই। কি হবে
? পরীক্ষা মানে তো টোকা। তাছাড়া
ী দেবে কে? কি হবে এই অর্থহীন—
চিৎকার করে উঠেছিল সুমিতা।
ছিল—শাট্ আপ, তুই সংসারের
থ দেখিস? জানিস—

ওকে থামিয়ে দিয়ে সহজ কণ্ঠে বাবুয়া
ছে—এটাই হয়দিন, এটাই নিয়ম। শুধু
দের নয়, ঘরে ঘরে। আর শ্রেণী-
মের এই স্তরে—
ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিয়েছিল
তা।

বাবুয়া তারপর বেরিয়ে গেছে। আর
নি। সুমিতা, রীতা আর বাবা
বা সব জায়গাতেই খুঁজছে ওকে।
কোনো খবর পাওয়া যায় নি এখনও।
মাঝে মাঝে কি একটা যন্ত্রণা হয়
র ভেতরে।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ও চমকে উঠল।
পূর্ণ সিনেমা। জগুবাজার পেরিয়ে
ছ কখন। হন্তদন্ত হয়ে সুমিতা
। হেঁটেই ওইটকু ফিরে যেতে হল।
একটা বাচ্চা ছেলে সাহায্য করল।
একটা এঁদো গলির মতো। নীচে
র দোকান। তার পাশ দিয়েই ওপরে
ার রাস্তা। কাঁচা নর্দমা একদিকে।
লো নোংরা বাচ্চা খেলছিল।

নহন করে সুমিতা উঠল। একটু
তে করে কড়া নাড়ল।
এক ভদ্রমহিলা একটুখানি মুখ বের
ন।
মিতা বলল—শীলা, মানে, আমি
কুলের বন্ধু—
ভদ্রমহিলা একটুখানি কি ভেবে
ন—আসুন—

তক্ষণে সুমিতা চিনেছে। শীলার মা।
একি চেহারা হয়েছে। চেনাই যায় না।
ামনে ছোট্ট একফালি বারান্দা।
য়ারে শীলা বসেছিল।
মিতা চমকে উঠল।
ই কি সেই শীলা? চোখ মুখ বসে
চোখের নীচে গভীর কালি। চোয়াল
এসেছে। কালচে হয়ে গেছে গায়ের

একটু হাসল।
লল—ঠিকানা কোথায় পেলি? নিশ্চয়
দিয়েছে। জানিস মেয়েটা অ্যাংলো—
মিতা থামিয়ে দিল। বলল—ওসব
াক। তোর কি হয়েছে বল। চেহারার
অবস্থা কেন? চাকরী ছাড়লি কেন?
আর এখন কি করছিস? জানিস, আমি
তোর কাছে বড্ড আশা নিয়ে—

যাকগে, তোর কথা আগে বল।

শীলা আবার হাসল।

বলল—সে অনেক কথা। শুধু শুনে রাখ, আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ওদের কাছে। সুতরাং, বুঝতেই তো পাচ্ছিস।

শীলার মা চা দিতে এলেন। সুমিতা প্রণাম করল। উনি নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। সুমিতাকে যেন চিনলেনই না।

শীলা বলল—সঙ্কটের সময় মায়ের কাছেই এলাম। মায়ের মতো কে আছে বল?

ওর চোখ থেকে জল নেমে এল।

বলল—সুমি, অ্যাম্বিশানের জন্য বড্ড দাম দিলাম রে। তোরা তো জানিস, আমি ছোট্ট একটা অভাবের সংসার চাই নি। আমি জ্বলতে চেয়েছিলাম, উঠতে চেয়েছিলাম। একেবারে উঁচুতলায়। উঠেছিলামও কিছুটা। কিন্তু, কিন্তু দি প্রাইস ইজ টু হাই।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে ও বলল—এর চাইতে ছোট্ট একটা সংসার, একজন সহৃদয় পুরুষ—

জানিস, আমি না, আমি না একদম ফুরিয়ে গেলাম। আউট আউট ব্রিফ ক্যান্ডেল—

সন্ধ্যে হয়ে এল। কেমন যেন বিষণ্ণতা ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

কোথায় যেন শঙ্খ বাজল।

দুচোখ বুঁজে হাত জোড় করে শীলা নমস্কার করল।

তারপর বলল—তুই সেই স্কুলেই আছিস তো?

সুমিতা বলল—হ্যাঁ।

ফিসফিস করে সুমিতা বলল—হ্যাঁ, তাই থাক। বড্ড অনারেবল প্রফেসান রে। টিচিং হল একটা মিশন। একটা মহৎ সেবা, দেশের জন্য, ভবিষ্যতের স্বপ্নের জন্য। তোরা থাক সুমিতা আগামী দিনের প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য। শোন, ওদের শেখাবি যেন জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে। অ্যাম্বিশান নয়, থ্রিল নয়, অ্যাডভেঞ্চার নয়। ছোট্ট একটু জীবন— সেই যে গানটা তুই জানিস—আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—

সুমিতার চোখেও জল এসে গেল।

বলল—জানিস আমি এসেছিলাম তোর কাছে তোদের এখানে একটা চাকরির জন্য। মায়ের ক্যান্সার—

কথাটা শেষ করতে পারল না সুমিতা। চুপ করে রইল।

শীলা চিন্তিতভাবে বলল—বুঝতে পারছি। কিন্তু—

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

আস্তে আস্তে শীলা বলল—আমি চেষ্টা করলে তোকে সেইরকম কিছু একটা জোগাড় করে দিতে পারি। তাতে তুই মাসীমাকে বাঁচাতে পারবি, কিন্তু সুমি, নিজে যে বাঁচবি না। নারে, সে হয় না। আমি তা পারব না।

ওর কথাগুলো শেষদিকটায় যেন শোনা গেল না। মমতায় দুটো চোখ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

সুমিতার মনে ভেসে উঠল মায়ের বিষণ্ণ মুখটা। শীর্ণ এক লাবণ্য।

মনে হল মা যেন এই পৃথিবীর কেউ না। যেন অনেক আগেই মা ফিরে যাওয়ার পরোয়ানা পেয়ে গেছে। আজ আর করার কিছুই নেই। যাকে প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত করে তোলার জন্য সে এখানে ছুটে এসেছে, সেই মা আসলে বহুকাল আগের মৃত এক স্তব্ধ ফসিল।

সুমিতার ডানহাতের মুঠোটা শীলা তুলে নিল।

বলল—সুমি, লক্ষ্মী বোন, দুঃখ করিস না। শোন, মাসীমা যতদিন বাঁচেন, সেবাযত্ন কর। কিন্তু, কি করবি আর বল, একটু স্বার্থপর হতেই হবে।

দুজনে আবার চুপ করে বসে রইল। অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল।

সুমিতার একবার মনে পড়ল বাবুয়ার কথা। ও যদি পাশে থাকত। কোথায় এখন ও কি করছে কে জানে। কি খাচ্ছে, কি ভাবে আছে, সে খবর কেউ দিতে পারবে না। ওর মুখটাও ঠিক মায়ের মতো। মায়ের মতো ছোট্ট কপাল।

শীলা বলল—আমরা সবাই বড়ো অসহায় রে। কোন পথ নেই আমাদের।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

পাশের ঘরে শাঁখ বাজল।

শীলার মুখের দিকে চাইল সুমিতা। এই মুহূর্তে শীলাকে বড়ো পবিত্র, বড়ো শান্ত বলে মনে হচ্ছে। ওর ক্লান্ত দুটো চোখের দিকে সুমিতা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

রীতা এতক্ষণে নিশ্চয়ই সন্ধ্যে দিয়েছে। শাঁখ বাজাচ্ছে গাল ফুলিয়ে। মা হয়তো শুয়ে শুয়েই দুহাত জোড় করেছেন। মা ছোটবেলায় মাঝে মাঝে সুমিতাকে ভয় দেখাত। সুমিতা দুষ্টুমি করলে মা চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ত। সুমিতা তখন মায়ের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ত। বলত—মা, চোখ মেল, আমি আর কোনোদিন—

শীলা বলল—সুমি, ওঠ, তোর দেরী হয়ে যাবে।

গা ঝাড়া দিয়ে সুমিতা উঠে দাঁড়াল।

বলল—মাসীমাকে বলা হল না। তুই বরং—

শীলা বলল—হ্যাঁ, আমিই বলে দেব। মা ঠাকুরঘরে এখন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শীলা বলল—মাকে শুধু দুঃখই দিলাম। এর চাইতে যদি আমি—

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামল। সুমিতার মনে হল ওঠার সময় কিন্তু এতগুলো সিঁড়ি যেন ছিল না। কি করে যে এত উঁচুতে উঠেছিল, কে জানে।

দরজার কাছে গিয়ে শীলা থমকে দাঁড়াল। সুমিতার কাঁধে হাত রেখে বলল—সুমি, শোন্, আমার তো ইংরেজীতে অনার্স ছিল। তোদের স্কুলে অথবা অন্য কোথাও যদি—

কথাটা ও শেষ করতে পারল না। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

সুমিতা বলল—নিশ্চয় দেখব, শীলা। তুই বিশ্বাস কর। আমি, আমি আপ্রাণ চেণ্টা করব।

শীলা ওর হাতটা মুঠোতে তুলে নিল। তারপর ম্লান হেসে বলল—মনে থাকে যেন। বড় উপকার—

আর শুনতে পারল না সুমিতা। হনহন করে হাঁটতে শুরু করল ও। মায়ের মুখটা আবার ওর মনে ভেসে উঠল। সেই শীর্ণ কারুণ্য।

সুমিতার মনে হল মা কোনো একটা জীবন্ত প্রাণী নয়। আসলে মা যেন মৃত সত্তা। যেন বহুকাল আগেই মা [illegible] হয়ে গেছে। অথবা ফসিল হয়ে সং[illegible] এক কোণে জায়গা করে নিয়েছে।

সুমিতা বিড়বিড় করে বলল [illegible] দুঃখিনী মা আমার। তোমায় [illegible] পারতাম। কিন্তু আমার মৃত্যুর মধ্যে [illegible] বেঁচে তুমিও তো সুখী হতে না, সেটা হয় না। হয় না।

ততক্ষণে চব্বিশ নম্বর ট্রাম এসে [illegible]

বিকেলে ভোরের ফুল/উত্তমকুমার এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। পরিচালনাঃ পীযূষ বসু।
ফটোঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

...ড়ী আছে, ঘর নেই

...আজকের দিনে বড়ো বড়ো শহরে গৃহ... দেখা দিয়েছে প্রচণ্ডভাবে, এটা ...সবাই জানা কথা। এই গৃহসমস্যাকে ...লক্ষ্য করে একদা পরিচালক তরুণ মজুমদার ...করেছিলেন 'এতটুকু বাসা' নামে হাসির ...। এবং এই সেদিন বোম্বাই শহরের ...সমস্যাকে উপজীব্য করে চিত্রনাট্যকার ও ...লেখক রূপে সুপরিচিত রাজেন্দ্রসিং ...ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশনের টাকায় ...জীবনে প্রথম পরিচালনা করলেন ...অভিনবধর্মী ও বেশ কিছুটা গুরুগম্ভীর ...'দস্তক'। স্মরণ থাকতে পারে, এই ...কালো ছবিটিতে সু-অভিনয় করে ...বছর ১৯৭০ সালের রাষ্ট্রীয় 'ভরত' ...'উর্বশী' পুরস্কার পান এই ছবির ...নায়িকা সঞ্জীবকুমার ও রেহানা ...েন। এবং এই একই সমস্যাকে সামান্য ...বর্তিত দৃষ্টিকোণ থেকে হাসির ...আড়ালে নিরুদ্ধ অশ্রুর চিত্র রূপে অঙ্কিত ...হয়েছে রাজশ্রী প্রোডাকসন্স নিবেদিত, ...তারাচাঁদ বরজাতিয়া প্রযোজিত এবং বাসু ...চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ইস্টম্যানকালার ...ত 'পিয়াকা ঘর' ছবিটির মাধ্যমে।

...মফঃস্বলের উদার, উন্মুক্ত, প্রসারতার ...লালিত পালিত, মা-বাপ ও জেঠা-...জেঠিদের আদরের মেয়ে মালতী একটি ...লোভী ঘটকের চেষ্টায় বিবাহিত হয়ে ...বোম্বাই শহরের এক প্রকাণ্ড ভাড়াটিয়া ...ীর তিনতলার একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে। ...র পার্টিশান দ্বারা বিভক্ত সেই ছোট্ট ...টি সদ্য বিবাহিত দম্পতির জন্যে নির্দিষ্ট ...অন্ধঘরটি, যে ঘরের একটি জানলার ...া পাল্লা নেই এবং যে ঘরে আছে ...র কল এবং আরও অনেক কিছু ...দামী জিনিস।

...যে তক্তপোশে নব বিবাহিতদের শোবার ...বন্দোবস্ত হয়েছে, তাতে বসা মাত্র উঠল শব্দ, যা কাঠের পার্টিশান ভেদ করে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে রামের (মালতীর যার সংগে বিবাহ হয়েছে, তার নাম রাম) দাদা-বৌদির কানে। অতএব তক্তপোশকে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা মেঝেতেই পাতল ওদের সুখশয্যা। কিন্তু না, সুখ এবং সান্নিধ্য ওদের কপালে লেখা নেই। বৌদি এলেন এক গেলাশ জল নিতে এবং একটু পরেই হঠাৎ কলে জল আসতে (যেটা বোম্বাই শহরে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা) বন্ধ দরজায় পড়ল ঘন ঘন আঘাত এবং দরজা খুলতেই দেখা গেল জনাকয়েক ...

...জন্যে। এর ওপর ঘরের ভিতরের আলো নেভালেও খোলা জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের তীব্র আলো ঘরকে এমন উদ্ভাসিত রাখে যে, জানলার বাইরে থেকেও ঘরের সর্বত্র নজর চলে। অতএব সুখ এবং সান্নিধ্য ওদের কপালে দুরন্ত। না, প্রেমের প্রথম চুম্বনরাগও অঙ্কিত হবার উপায় নেই, অন্যান্য অভিব্যক্তির কথা তো স্বতন্ত্র। এ অবস্থায় দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকলেও বিপদ: মনের মিলন প্রতি মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষা করবে দেহের মিলন। কাজেই অন্তরের ক্ষোভকে অপ্রকাশ রেখে মালতী ...

অলাদা শহুরে। কয়েকদিনের মধ্যে রামের বাপ-মা, দাদা-বৌদি সিনেমা দেখবার অছিলায় সন্ধ্যের আগেই বাইরে চলে গেল মালতীকে বাড়ীতে একলা রেখে। সন্ধ্যে হয়ে বৌদি বলে গেল রাম অফিস থেকে ফিরে এলে ওরাও যেন সিনেমায় যায়; তবে পরিহাস করে এও বলল, দুজনে নিরিবিলি কাটানোর সুযোগ ত্যাগ করে সিনেমায় যাওয়া কি চলবে? আজ ঐ ফ্ল্যাটে অন্তত ঘণ্টা চারেকের জন্যে মালতী একা। সে সাজল, ভালো কাপড় পরল, গান গাইল এবং তার প্রিয়তমের আশাপথ চেয়ে বসে রইল। কিন্তু স্ত্রীর ভালোবাসা কি করলে বেশী পাওয়া যায়, বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া সেই সংক্রান্ত উপদেশ মতো রাম সেইদিনই দেরী করে বাড়ী ফিরল এবং মালতী ওর প্রতীক্ষায় চার ঘণ্টা একা

ফিল্ম ডিভিশনের রিকালেকশন-এর দৃশ্য

কাটিয়েছে শুনে বন্ধুকে যখন অভিসম্পাত দিচ্ছে, তখনই ফিরল বাড়ীর সকলে। আরও একবার বাড়ীর আর সকলের অনুপস্থিতির সুযোগ নষ্ট হল বৌদির ছোট বোন প্রভার স্বামীসহ অতর্কিত আগমনের ফলে। শেষ পর্যন্ত রাম ঠিক করল, একদিন মালতীকে নিয়ে ও সারা বোম্বাই শহর বেড়াবে এবং দিনান্তে কোনো হোটেলের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে দুজনে কিছুক্ষণের জন্যে একান্তে থাকবে। চিন্তামাফিক কাজ ঠিক ঠিকই চলছিল; মালতীও এতদিন [illegible] ক্রমেই আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠছিল; কিন্তু সমুদ্র উপকূলবর্তী হোটেল ঘরের একান্তে সুখের মাত্রা যখন চরমে ওঠবার সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল, ঠিক সেই সময়েই পড়ল বাধা। রামকে অন্য কোনো দোষী মনে করে পুলিশ অফিসার ওকে থানায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এবং যখন হোটেল বয়ের কথায় পুলিশ অফিসার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিদায় নিলেন, তখন ওদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে গেছে। ভগ্নহৃদয় নিয়ে মালতী ও রাম বাড়ী ফিরে দেখল মালতীর জেঠামশাই গৌরীশঙ্করবাবু প্রকাণ্ড 'ভারত-মহলের' এক চিলতে জমিতে ওদের সংকীর্ণ বাসস্থান দেখে উত্তেজিত হয়ে ঐ নরক থেকে মালতীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করছেন এবং বাড়ীর কারুরই অনুনয়বিনয়ে কর্ণপাত করছেন না।—কিন্তু সত্যই যখন যাবার ক্ষণ সমুপস্থিত হল তখন মালতীর মন বেঁকে বসল; সকল অসুবিধা সত্ত্বেও সে তার ভালোবাসার নিধিকে ছেড়ে যেতে পারল না।

আগেই বলেছি, কাহিনীটিকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে এমনভাবে দর্শকদের

যায় যে, নায়ক-নায়িকার কাছে যা [illegible] হৃদয়বিদারক এবং দর্শকদের [illegible] যা প্রচণ্ড সহানুভূতি পাবার [illegible] ব্যথা-বেদনার বস্তুকে দর্শকদের [illegible] বেশন করা হয়েছে লঘু হাস্য [illegible] উপভোগ্যতার মাধ্যমে। [illegible] লিখিত কাহিনীটি থেকে একটি চিত্রনাট্য প্রস্তুত করে [illegible] তাতে উপযোগী [illegible] সংলাপ [illegible] যোজনা করেছেন পরিচালক [illegible] পাধ্যায় এবং গীতিকার [illegible] ওঁদের সংযত প্রচেষ্টাকে সার্থক [illegible] রূপ দিয়েছেন চিত্রশিল্পী [illegible] শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত [illegible] মুখতার আহমেদ, সংগীত [illegible] লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এবং পরিচা[illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই [illegible] কাহিনীটি সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞা[illegible] আমাদের এই কলকাতাতেও অপ্রতুলতা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় [illegible] দেখি, বিবাহের পর নবদম্পতি[illegible] পরিবারভুক্ত অন্য লোকেরা [illegible] কারও বাসাবাড়ীর সব থেকে [illegible] খানি বা ঘরের সব থেকে নি[illegible] অন্তত দু-চার দিনের জন্যেও [illegible] বোম্বাই শহরের বিরাট ফ্ল্যাটবা[illegible] কামরার বাসিন্দাদের মধ্যে কি [illegible] নেই?

'পিয়া-কা-ঘর' ছবিটির প্রত্যে[illegible] আন্তরিকভাবে সু-অভিনয় করে[illegible] ওঁদের মধ্যে নায়িকা মালতী [illegible] ভাদুড়ী ছবির প্রতিটি [illegible] পরিবেশোচিত ভাবপ্রকাশে যে [illegible] দেখিয়েছেন, তা উচ্চ প্রশংসার যো[illegible] রামের ভূমিকায় অনিল ধাওয়ান[illegible] অভিব্যক্তিও সমুচিতভাবে [illegible]

...রীলাল রূপে আগা দর্শকদৃষ্টিকে আকর্ষণ ...তে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া মুখরী, ...ট মুখুজ্জে, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, ...টল রাজা পরাঞ্জপে, সুন্দর, সুরেশ ...ওয়াল, প্রভৃতি সকলেই যে সু-অভিনয় ...ছেন, সে কথা আগেই বলেছি।

ছবির চারখানি গানের মধ্যে তিন- ...কে আবহসঙ্গীত রূপে ব্যবহার করে ...চালক রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ...র মধ্য বক্তব্য অনুসারী থীমসঙ হিসেবে ...হ ত হুয়ে জীবন হায়' গানখানি ...শ্রেষ্ঠ। নায়িকার মুখের 'পিয়াকা ঘর ...ইয়ে' গানটিও বারংবার শোনবার মতো, ...ন ছবির প্রথম গান 'ইয়ে জুল কৈসী ...' গানটি।

সর্বাংশে পরিচ্ছন্ন ছবি 'পিয়া-কা-ঘর' ...তে আনন্দোপকরণ হিসেবে অনবদ্য।

...ন্‌স ডিভিশনের পুরস্কারপ্রাপ্ত
...বিগুলি

...তম রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র বিজ্ঞান... ...সার উৎসবে ফিল্মস ডিভিশনের যে ...নি ছবি বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হয়ে ...কার লাভ করেছে, একটি বিশেষ ...নীতে সেগুলোকে কলকাতায় নিমন্ত্রিত ...দের দেখাবার ব্যবস্থা করে ফিল্মস ...ভিশনের কর্তারা আমাদের ধন্যবাদ অর্জন ...ছেন। প্যারাডাইস সিনেমায় প্রদর্শনীর ...সারে ছবিগুলির নাম:

(১) ভুটান, (২) উইংস অব ফায়ার, ...প্রেশান ইন মেটাল, (৪) এ ভিলেজ ...স, (৫) রেকলেকশান্স এবং (৬) দিস ...ল্যান্ড।

...বিন্দ মুখার্জি পরিচালিত নায়িকার ভূমিকায় চিত্রে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন

(১) 'শিশু রূপে ফিল্ম' এই পর্যায়ে 'উইংস অব ফায়ার' ছবিখানি কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক দুটি সাতখানি শিশু চলচ্চিত্রের কোনোটিই পুরস্কারের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্ররূপে পুরস্কৃত হয়েছে। সিনেগ্রাফিক আর্টস প্রযোজিত এবং এম এম শর্মা পরিচালিত ৩৯৮ মিটার দীর্ঘ এই রঙীন ছবিখানিতে কচ্ছের সীমান্তবর্তী জলাভূমিতে হাজার হাজার গোলাপী ও কালচে লাল রঙের সারসজাতীয় পাখীর (ফ্ল্যামিঙ্গো) বার্ষিক সমবেত হওয়া, কিছুদিন থেকে ডিম পাড়া, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুনো এবং বসন্তান্তে আবার অন্যত্র চলে যাওয়া প্রভৃতির দৃশ্যাবলী অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে দেখানো হয়েছে। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, আবহসংগীত, নেপথ্য-ভাষণ, এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তুর গুণে এই ছবিটিই দর্শকদের কাছে সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

(২) কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে সব থেকে প্রশংসাযোগ্য ছবি হচ্ছে 'সমাযোজনের মাধ্যম হিসেবে ফিল্ম' এই পর্যায়ের

অন্তর্ভুক্ত এবং শিক্ষামূলক ছবি হিসেবে পুরস্কৃত, মোহন বাধওয়ানি প্রযোজিত ও বীরেন দাশ পরিচালিত 'রেকলেকশান' নামে রঙীন ছবিটি ভারতে ডাকযোগে চিঠিপত্র বিলি হওয়ার সময় থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যেসব ডাক টিকিট ব্যবহৃত হয়েছে, তাদেরই বর্ণোজ্জ্বল চিত্রেতিহাস ৩১৮ মিটার দীর্ঘ এই ছবিটির মাধ্যমে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বিধৃত হয়েছে। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যের সাহায্যে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রতিটি শটে তারতম্য ঘটিয়ে যে খণ্ড চিত্রগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল, তাদের মাঝে অঙ্কিত চিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে সম্পাদক সুক্ষ্ম কলাবোধ প্রয়োগ করে তাদের সাজিয়েছেন এবং একটি শট থেকে পরবর্তী শটে যাবার জন্য কোথাও বা 'অপটিক্যালস', আবার কোথাও বা 'অ্যানিমেশন ক্যামেরা' কিংবা 'মিক্সিং' প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন। আবহ-সংগীতের প্রয়োগ ছবিটিকে অধিকতর ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে।

(৩) সংবাদমূলক তথ্যচিত্র হিসেবে ২ রীল দীর্ঘ 'ভুটান' ছবিটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ভুটানের আদিম সংস্কৃতি, ধর্ম, দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সভ্যতার অনুপ্রবেশের সংগে সংগে তাদেরও জীবনযাত্রার পরিবর্তন, শিক্ষার আধুনিকীকরণ, শিল্পের বিস্তার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপকভাবে দেখানো হয়েছে এই রঙীন ছবিটির মাধ্যমে। প্রমোদ পতি প্রযোজিত এবং পি এন কাউল পরিচালিত এই ছবিখানি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ভুটান সম্পর্কে একটি নিখুঁত তথ্য-চিত্র।

(৪) ব্যবসায় ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রবর্তক শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে হোমি ডি সেঠনা প্রযোজিত ও পরিচালিত প্রায় দেড় রীল দীর্ঘ (৪৩৫ মিটার) রঙীন ছবি 'ক্রিয়েশান ইন মেটাল'। পিতল, তামা প্রভৃতি ধাতুর সাহায্যে নানা প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও কত রকম সুন্দর সুন্দর শিল্প বস্তু সৃষ্ট হয় তারই এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই ছবিটির মাধ্যমে। কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত আবহসঙ্গীত ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ।

(৫) ব্যবসায় বহির্ভূত উন্নয়ন প্রবর্তক ছবি রূপে পুরস্কৃত হয়েছে এন এস থাপা রচিত ও প্রযোজিত ৩০০ মিটার দীর্ঘ রঙীন ছবি 'দিস মাই ল্যাণ্ড'। আমাদের এই বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কি অগ্রগতি হয়েছে, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ভারত, দেশাত্মবোধক হিন্দী, বাংলা, তামিল গুজরাটি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি গানকে একের পর এক আবহসঙ্গীতরূপে ব্যবহার করে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গানগুলির প্রয়োগে সঙ্গীত পরিচালক বিজয় রাঘব রাওয়ের কৃতিত্ব উচ্চ প্রশংসনীয়।

(৬) সামাজিক তথ্যমূলক ছবি হচ্ছে এস সুখদেব কৃত ৪৬৩ মিটার দীর্ঘ সাদা-কালো চিত্র 'এ ভিলেজ স্মাইলস'। বড়ো বড়ো নদী প্রকল্পের জলাধার ও বাঁধগুলি গ্রামীণ জীবনে যে কি বিরাট পরিবর্তন এনেছে, তারই একটি উজ্জ্বল চিত্র দিয়েছেন চলচ্চিত্রকার সুখদেব এই ছবিটির মাধ্যমে।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

সায়মের 'মুহ্যমান ব্যাঙ' : আজকের নতুনতর নাট্যচর্চার দিকে দৃষ্টি দিলে যে ধরনের নাট্যপ্রযোজনা মোটামুটি আমাদের চমকিত করছে তা হোল অ্যাবসার্ড নাটক। আপাতদৃষ্টিতে এই নাটকগুলোকে উদ্ভট বলে মনে হোলেও গভীরতর চিন্তার দর্পণে এর মর্মসত্য প্রতিভাত হয়। 'সায়মে'র শিল্পীরা এই ধরনের একটি নাটক কয়েক-দিন আগে 'থিয়েটার সেণ্টার' মঞ্চে পরি-বেশন করলেন। নাটকটির নাম হোল 'মুহ্যমান ব্যাঙ'।

আজকের মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীদের নানা আশা-নিরাশা কান্নাহাসির আবর্ত থেকেই এ-নাটক অগ্রগতির ছন্দ নিয়েছে। তাদের নানা সমস্যা এক-একটি রূপক ধরে নাট্যমুহূর্তে বিধৃত হয়েছে। নাটকের বাচ্চু, পাগলা, সুধীর, সোমনাথ, প্রদীপ, শৈবাল, কল্যাণী, সীতেশদা সবাই আমাদের চেনা। এরা সবাই অন্ধকারের সীমাহীনতায় যন্ত্রণাদগ্ধ, কিন্তু সবাই বেরিয়ে আসতে চাইছে অন্ধকার ছিন্ন করে এক আলোকিত সকালে।

নাট্যকার রাজা চট্টোপাধ্যায় নিজেই নাটকের প্রয়োগপরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়ে-ছিলেন। বহু ক্ষেত্রে তিনি নতুনতর প্রয়োগ-রীতিকে ব্যবহার করেছেন। মঞ্চসজ্জা ব্যবহারে রূপকধর্মী বক্তব্য প্রকাশ পেয়ে... কয়েকটি কম্পোজিসন নিঃসন্দেহে না... নির্দেশনার সুক্ষ্ম শৈল্পিক মানসের পরি... বহন করে।

প্রতিটি চরিত্রই হয়েছে সুঅভিনী... অভিনয়ে ছিলেন বিল্টু চট্টোপাধ্যা... সোমেন চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যা... শম্ভু ভট্টাচার্য, প্রীতিনাথ চৌধুরী, উৎ... মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ, মিহির ... মৃগাঙ্ক চৌধুরী, সলিল ঘোষ, উজ্জ্ব... মুখোপাধ্যায় ও টুটুল চট্টোপাধ্যায়।

'বোধন' নিবেদিত 'শুভা' : রবী... নাথের অপরূপ ছোটগল্প 'শুভা'র এ... স্নিগ্ধ নাট্যরূপ সেদিন পরিবেশিত ... এক নতুনতর প্রাণময় ছন্দে। প্রকৃ... মমতাছোঁয়া এই গল্পের মর্মকথাকে আ... নৈপুণ্যে মঞ্চের আলোর মূর্ত করে তু... পেরেছেন 'বোধনে'র শিল্পীরা। শুভা প্রকৃতিরই কন্যা, প্রকৃতির প্রতিটি ... স্পন্দনে শুভাও যেন প্রাণের আবেগ ... পায়, মিশে যায় তার চাঞ্চল্যের প্রবাহে ... অপূর্ব তন্ময়তার গল্পকে নাট্যরূপ ... দিয়েছেন পরিতোষকুমার ঘোষাল ... মুন্সিয়ানাভাবে তিনি গল্পটির মর্মস্পর্শ ... পেরেছেন।

নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনা ... সন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। এ-ব... অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা ... উল্লেখ করার মতো। 'শুভা'র ... সুন্দর অভিনয় করেন পাপিয়া চট্টো... অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শৈল চট্টো... অলোক গুপ্ত, বিনয় রায়, ... অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, ...

আলোকসম্পাত ও ... নাটকের মূল মে... র সঙ্গে ঠিক ... রাখতে পারেনি মনে হয়।

"বিষাইছে বায়ু" নাট্যাভিনয়

সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস প... কাউণ্টার রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্য ও... বৃন্দ কর্তৃক শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায়... "বিষাইছে বায়ু" নাটকটি আগস্ট... প্রথম সপ্তাহে টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউ... অভিনীত হবে। নাটকটি পরিচাল... ছেন সর্বশ্রী সামু চট্টোপাধ্যায় ও প্রণ... অভিনয়াংশে আছেন শিবনাথ মুখো... সামু চট্টোপাধ্যায়, প্রণব রায়, ... মণ্ডল, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, কানাই ... পাধ্যায় ও শ্রীমতী কল্পনা মিত্র।

সিরাজদ্দৌল্লা মঞ্চাভিনয়

গত ২৮শে জুন রঙ্গনা... শ্রীশোভন সাধুখাঁর পরিচালনায় মঞ্চ... প্রথম অবদান সিরাজদ্দৌল্লা অভিনী... বিভিন্ন চরিত্রে সনৎ ঘোষ, বটকৃ... বলরাম দাস, কার্তিক সাধুখাঁ, দী... নিজ নিজ চরিত্রে দক্ষতা দেখিয়েছে... স্ত্রী চরিত্রে মন্দিরা ঘোষ দরদ দিয়ে করেছেন। শোভন সাধুখাঁ পরিচা... ওয়াটস-এর চরিত্রাভিনয়ে দক্ষতা... ছেন।

বিবিধ সংবাদ

একাদেমী অব ফাইন আর্টসে শিশু শিল্পী দের অংকিত চিত্র প্রদর্শনীর। উদ্বোধন করছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। ছবিতে লেডী রাণু মুখার্জিকেও দেখা যাচ্ছে।

শিশুচিত্র প্রদর্শনী

গত ১৫ জুলাই শনিবার নবম সারা ভারত 'পরিচয়' শিশুচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অমৃত ও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছেন ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

শিশু মনের বিচিত্র অভিব্যক্তি এই সব ছবির মধ্য দিয়ে রঙে ও রেখায় শরীরী হয়ে উঠেছে। ছবিগুলি আঁকা হয়েছে জল-রঙ, ক্রেয়ন, প্যাস্টেল এবং কালিতে। বয়সানুসারে শিশুশিল্পীরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে জায়গা পেয়েছে ৯ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের ছবি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের ছবি স্থান পেয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীতে আছে ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী বাচ্চাদের ছবিগুলি।

বিষয়ের দিক থেকে ছবিগুলির অধিকাংশই চলতি ঘটনার স্বাক্ষরবাহী। যেমন, শহরের রাস্তাঘাট, লোকজনের ব্যস্ততা, বাংলাদেশের যুদ্ধ, ল্যান্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট এবং জন্তু-জানোয়ারের একেকটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে রঙে ও রেখার সারল্যে।

আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি খোলা থাকবে একাডেমী অব ফাইন আর্টসে।

শিল্পী-সংসদের সাধারণ বার্ষিক সভা

গত ২৮শে জুন শিল্পী-সংসদের ময়রা স্ট্রীটস্থ বাসভবনে শিল্পী-সংসদের ৫ম সাধারণ সভা সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃতি জগতের পরলোকগত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি শ্রীউত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে শিল্পীদের প্রতিষ্ঠিত করতে, অসহায়ভাবে নিঃস্বভাবে যাতে মৃত্যুবরণ না করে তার জন্যে শিল্পী-সংসদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এ ব্যাপারে আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি—প্রয়োজনে আরো দেব'।

সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅর্ধেন্দু মুখার্জি ও নাট্য-উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রীভূপেন রায় শিল্পী-সংসদের কার্যাবলী, একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা, ক্যারাম প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন।

সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১। দুঃস্থ ও অক্ষম শিল্পী-

দের সরকারী পেনসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে শিল্পী-সংসদের অনুষ্ঠান প্রচারের সুযোগ দিতে হবে, যে সম্মান-দক্ষিণা পাওয়া যাবে, সেই অর্থ দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য ব্যয় করতে হবে। ৩। চলচ্চিত্র ও পেশাদার নাটকের ক্ষেত্রে নবীন প্রতিভাদের, সুযোগ দিতে হবে। ৪। চলচ্চিত্র-উপদেষ্টা পর্ষৎ ও সেন্সার বোর্ডে শিল্পী-সংসদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করা হচ্ছে। ৫। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি বর্ষে জাতীর রঙ্গমঞ্চের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানানো হচ্ছে। ৬। ক্রীড়ার ক্ষেত্রে শিল্পী-সংসদের সভ্যদের উৎসাহ দেবার ও প্রয়োজনার্থে ময়দানের নিকট ভূখণ্ডের জন্যে আবেদন করা হবে, উক্ত ভূখণ্ডে শিল্পী-সংসদের নিজস্ব ক্রীড়াগৃহ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। ৭। অশ্লীল ও অপকৃষ্টিমূলক দেশী বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে। ৮। সংস্কৃতি জগতের একজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর দাবী বর্তমান সরকারের নিকট জানানো হবে। ৯। বর্তমানে চলচ্চিত্রের বর্ধিত প্রমোদকরের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত জনসাধারণ ও চলচ্চিত্র শিল্পের জন্যই ২-২০ টাকা টিকিট পর্যন্ত বর্ধিত প্রমোদকর যাতে বর্ধিত না করা হয় সেজন্য পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। এই সভায় শিল্পী-সংসদের নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় সভাপতি : শ্রীউত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক সর্বশ্রী বিকাশ রায়, অমলাশংকর, সতীনাথ মুখার্জি, তরুণ রায়, স্বপনকুমার মুখার্জি। সম্পাদক শ্রীঅর্ধেন্দু মুখার্জি। সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীভূপেন রায়। সহ-সম্পাদক শ্রীশ্যামল মিত্র ও শ্রীঅনিল চ্যাটার্জি। কোষাধ্যক্ষ শ্রীজহর রায়। কার্যকরী সমিতি সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখার্জি, অসীমকুমার সরকার, অধীর বাগচী, গুপী দে, অজিত মিত্র নির্মল ঘোষ, শিপ্রা মিত্র, জয়শ্রী সেন সীতা দেবী। দপ্তর সম্পাদক সর্বশ্রী প্রফুল্ল রায় ও ইন্দু বসু। জন-সংযোগ সচিব শ্রীপঞ্চানন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রযোজক শাখার চেয়ারম্যান, বিমল দে গেল শুক্রবার, ১৯ জুলাই এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংসদ স্থাপন ও ২৫ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে দান করবার ঘোষণাকে স্বাগত জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সংশয় প্রকাশ করে বলেন ওইটুকু অর্থে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের কতটুকুই বা উন্নতি সাধিত হবার সম্ভাবনা। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ৩৮০টি চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র ৬০টিতে বাংলা ছবি দেখানো হয়। যাতে প্রতিটি চিত্রগৃহই কিছু না কিছু বাংলা ছবি দেখাতে বাধ্য হয়,, সে ব্যবস্থা না করলে বাংলা ছবির আয় বাড়বার পথ কোথায়? এবং সেও করতে হবে চিত্রগৃহগুলির রক্ষাকবচের কথা বাদ দিয়ে মাত্র লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা করে। এছাড়াও সেন্সার ভিত্তিক প্রদর্শনী ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গের জন্যে একটি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন, বাংলাভাষার ছবির প্রযোজকদের এককালীন সাহায্যদান বা প্রমোদকর প্রত্যর্পণ, স্টুডিও এবং ল্যাবোরেটারীগুলিকে উন্নয়নের জন্যে এককালীন সাহায্যদান, বাংলা ছবির অধিকতর মুক্তি সম্ভব করবার জন্যে আরও মুক্তিচিত্রগৃহের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। যদি কোনো চিত্রগৃহের মালিক লোকসানের অজুহাতে তাঁর চিত্রগৃহ বন্ধ করতে চান, সেই চিত্রগৃহের পরিচালনাভার সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীদে বলেন, আমোদকরের টাকা বাদ দিয়ে টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৭৫ ভাগ পান প্রদর্শক এবং বাকী ২৫ ভাগ পান পরিবেশক ও প্রযোজক যুগ্মভাবে। তিনি আরও বলেন, আজ বাংলা ছবির মান যদি নিম্নগামী হয়ে থাকে, তার যথার্থ কারণ কি, তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। প্রতিযোগিতায় বাঁচবার জন্যে কোনো কোনো ছবিতে ক্যাবারে দৃশ্য প্রভৃতি দেখানো হচ্ছে, এটা আমাদের চলচ্চিত্র জগতের অসুস্থতারই চিহ্ন।

ডঃ জেমস ডি হ্যাচ সেদিন আমেরিকান লাইব্রেরীতে মাত্র আটদিনের চেষ্টায় মোট তেরোটি ছেলেমেয়েকে দিয়ে 'ইয়েস, ইয়েস... ইয়েস ইয়েস' নামে যে নাট্যসৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলেছেন, তারই একটি নিদর্শন দিলেন। প্রথমে অভিনয়ের অভ্যাসের জন্যে যে-সব ব্যায়াম করা প্রয়োজন, যেভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এলিয়ে দিতে হয় তাদের বশে রাখবার জন্যে, তারই কিছু, পরিচয় দিলেন উৎসাহী ছেলেমেয়েদের সাহায্যে। পরে 'রাজা' নামে একটি ছেলের জন্ম থেকে শুরু করে তার ওপর বাপ-মার প্রভাব, তার শিক্ষা, প্রতিদিন জনতার সংস্পর্শে তার নতুনতর শিক্ষা, তার বাতি খোঁজার চেষ্টা, তার প্রথম প্রেম, সাধুসঙ্গ, তার দ্বিতীয় জন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান, স্ত্রীলাভ, ব্যবসায়িক রূপ, প্রভৃতির পরে তার আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত অভিনয়ের মারফত দেখানো হল। অভিনয়-রীতির সঙ্গে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের একটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেল।

থিয়েটার কমপ্লেকস—২৮শে জুলাই 'মিনার্ভা'য় থিয়েটার কমপ্লেকস-এর ষষ্ঠ প্রযোজনা শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'উত্তাল-তরঙ্গ'। নির্দেশনায় ও অভিনয়ে থাকছেন শ্যামল রায়চৌধুরী। সংগীত পরিচালনায় শ্রীকাশীনাথ।

গীতালি সংগীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

পঞ্চমবর্ষ গীতালি সংগীত প্রতিযোগিতার 'ক' থেকে 'ঙ' পর্যন্ত সকল বিভাগের ও বিষয়ের কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারীদের নাম এখানে উল্লিখিত হল :

ধ্রুপদ : দেবশ্রী মুখার্জি, রীণা চ্যাটার্জি, শীলা রায়চৌধুরী। ধামার : শীলা রায়চৌধুরী, খেয়াল : মধুমিতা বসু, অজন্তা মিত্র, কল্যাণী দাসগুপ্ত, রীণা চ্যাটার্জি, তৃপতি পান্ডা, রঞ্জা বসু। ধুন : দেবীকা চৌধুরী। রাগপ্রধান : মধুমিতা বসু, মিতা চ্যাটার্জি, গৌরী সরকার, স্বপ্না ভট্টাচার্য, ভজন : শ্রাবণী দে, মিতা চ্যাটার্জি, ইন্দ্রাণী মিত্র, আলো সেন, শ্যামা সংগীত : শুভ্রা মজুমদার, চিত্রিতা গাঙ্গুলী, নবনীতা লাহিড়ী, আলো সেন, প্রাচীন বাংলাগান : মধুমিতা দাস, সোনালী দত্ত, পাপিয়া চৌধুরী, পলি ভাট্টাচার্য, দেশাত্মবোধক : সুজাতা বর্মন, পলি ভট্টাচার্য, লোকসঙ্গীত : মধুমিতা বসু, মিতা চ্যাটার্জি, নবনীতা লাহিড়ী, স্বপ্না ভট্টাচার্য, আরতি ঘোষ, আধুনিক : শর্মিষ্ঠা প্রামানিক, মিতা চ্যাটার্জি, রত্না চ্যাটার্জি, রীণা চ্যাটার্জি, অনিন্দিতা গুহ, বন্দনা রক্ষিত, রথীনকুমার দাস, গীত : মধুমিতা দাস, জয়শ্রী গুহ, রবীন্দ্রসঙ্গীত : মধুমিতা দাস, মিতা চ্যাটার্জি, শুক্লা মিত্র, রীণা চ্যাটার্জি, সমর চ্যাটার্জি, শম্পা চক্রবর্তী, পার্বতী সেন, তথাগত চক্রবর্তী, দেবীকা চৌধুরী, নজরুল : মধুমিতা বসু, মিতা চ্যাটার্জি, নবনীতা লাহিড়ী, রীণা চ্যাটার্জি, সুবিমল ঘোষ, প্রবীর গাঙ্গুলী, দেবীকা চৌধুরী, পাশ্চাত্য : শীলাশ্রী পাল, কথক : মণিকা বসু, কেকা পান্ডা, ভারতনাট্যম : মণিকা বসু, কেকা পান্ডা, তবলা : মনোজিৎ মাইতি ও কল্লোলকুমার সেন।

১৮৭২—নতুন নাটক : রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা রঙ্গসভা নতুন নাটক '১৮৭২' মঞ্চস্থ করবেন ঠিক করেছেন। এটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়। শীঘ্রই নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

অরোবার 'দুরন্ত জয়' মুক্তি প্রতীক্ষায়!

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রযোজক ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ এর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও [illegible] নাকের ছবি 'দুরন্ত জয়'-এর চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। 'আমি মন্ত্রী হবো' খ্যাত নাট্যকার সুনীল চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন—প্রবীণ চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জী। রবীন চ্যাটার্জী ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চরিত্রচিত্রণে আছেন—ভাস্কর চৌধুরী, নবাগতা বৈশালী চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি, সমিত বিশ্বাস, জহর রায়, আনন্দ মুখার্জী, নবাগতা কাকলি রায়, শিখা ভট্টাচার্য, রবীন ঘোষাল, সজল ঘটক, সীতা মুখার্জী, রবীন ঘোষাল, পরিমল সেন, শিশির মিত্র, পিন্টু মজুমদার ও বিধু দে।

চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে আশু দত্ত ও বিশ্বনাথ মিত্র।

ভ্রম সংশোধন

১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত সিসিল ডে লুইস প্রবন্ধকারের নাম রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হবে।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ জয়ী হন। এই নিয়ে তিনি উপর্যুপরি র টসে জয়ী হলেন। টসে জিতে তিনি ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে । এখানে উল্লেখ্য, টসে জেতার পর ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করতে শেষ রছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টেড টার ১৯৬৪ সালে লর্ডস মাঠের তীয় টেস্টে। সেই খেলা শেষ পর্যন্ত নিংসত থেকে যায়। বর্তমানের ৩য় ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট তে দিয়ে অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ সুবিধা আশা করেছিলেন তা শেষ ন্ত তার কপালে জোটেনি। ভেবেছিলেন জ পিচ দলের দুই ফাস্ট বোলার—জন । এবং পিটার লেভারের সহায়ক হবে।

অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের রান লাঞ্চের য় ছিল ৮৮ (১ উইকেটে) এবং পানের সময় ১৯৬ (৪ উইকেটে)। প্রথম নর খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের উইকেট পড়ে ২৪৯ রান দাঁড়ায়। নিং ব্যাটসম্যান কিথ স্ট্যাকপোল একাই ৪ রান তুলে দলকে বিপদমুক্ত করেন। ন তাঁর ৪৬ রানের মাথায় দু'বার উট হওয়া থেকে খুব জোর বেঁচে যান। মবার তাঁর ক্যাচ ফেলে দেন উইকেট-পার এ্যালান নট এবং দ্বিতীয়বার টার পারফিট। স্ট্যাকপোল শেষ পর্যন্ত টার পারফিটের হাতেই ধরা পড়ে আউট রছিলেন। প্রথমদিনের খেলায় ইংল্যান্ডের ট বোলার জন স্নো ৬৫ রানে ৪টে কেট পান। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট র দান ছেড়ে দিয়ে অধিনায়ক রে ংওয়ার্থ যে খুব ভুল করেননি তা লার এক সময় দর্শকরা স্বীকার রছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার এই সংকটকালে কপোল দৃঢ়তার সঙ্গে না খেললে লার গতি ইংল্যান্ডের অনুকূলে ঘুরে ত।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে স্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৯৫ রানের থায় শেষ হয়। এই দিনের খেলায় স্ট্রেলিয়া তার শেষ ৪ উইকেটের নিময়ে ৬৬ রান যোগ করেছিল।

পিটার পারফিট অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে পাঁচটা 'ক্যাচ' ধরেন। টেস্টের এক ইনিংসে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের পক্ষে (উইকেট কিপার বাদে) পাঁচটা 'ক্যাচ' ধরার নজির আর মাত্র একটা আছে।

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংসের খেলায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ডেনিস লিলি চা-পান বিরতির ঠিক আগের ওভারের শেষ বলে ল্যাকহার্স্টকে এল-বি-ডবলিউ করেন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৫১ (১ উইকেটে)। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ইংল্যান্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ১১৭ রান দাঁড়ায়। বব ম্যাসির মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা কোণঠাসা হয়ে খেলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পরবর্তী ২৫ মিনিটে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস মাত্র ১৮৯ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১২৬ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের শেষ ৬টা উইকেটে মাত্র ৭২ রান যোগ হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার লিলি ৩৫ রানে ৪টে এবং ম্যাসি ৪৩ রানে ৪টে উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে খেলার গতি ঘুরিয়েছিলেন বব ম্যাসি। তৃতীয় দিনের খেলায় তিনি প্রথম ১৩টা বল দিয়ে ইংল্যান্ডের ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া ১২৬ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দুটো উইকেটের বিনিময়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়া ২৮৩ রানে এগিয়েছে এবং হাতে জমা আছে দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট।

ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার রডনি মার্শ 'ক্যাচ' ধরে পাঁচজন খেলোয়াড়কে আউট করেন। প্রথম টেস্টের ২য় ইনিংসেও তিনি পাঁচটা 'ক্যাচ' ধরেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে মার্শ এপর্যন্ত ১৬ জনকে আউট করেছেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের ৩২৪ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ৩য় উইকেটের জুটিতে গ্রেগ চ্যাপেল (৭২ রান) এবং রস এডওয়ার্ডস (নট আউট ১৭০ রান) দলের ১৪৬ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩য় উইকেট জুটির রেকর্ড রান করেন। ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩য় উইকেট জুটির পূর্বের রেকর্ড রান ছিল ৭২ (ডন ব্রাডম্যান এবং স্ট্যান ম্যাককেব (১৯৩৮)। রস এডওয়ার্ডস ১৭০ রান তুলে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৫১ রান তুলতে ইংল্যান্ড ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ১ উইকেট খুইয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যান্ডের আরও ৩৪১ রানের দরকার। এদিকে তাদের হাতে জমা পুরো একদিনের খেলার সময় এবং ৯টা উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩১৫ রান (স্ট্যাকপোল ১১৪ এবং কোলে ৫৪ রান। স্নো ৯২ রানে ৫ এবং গ্রিগ ৮৮ রানে ২ উইকেট)

ও ৩২৪ রান (৪ উইকেটে ডিক্লে: এডওয়ার্ডস নট আউট ১৭০, জি চ্যাপেল ৭২ এবং আয়ান চ্যাপেল ৫০ রান। স্নো ৯৪ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড : ১৮৯ রান (এডরিচ ৩৭ রান। লিলি ৩৫ রানে ৪ এবং ম্যাসী ৪৩ রানে ৪ উইকেট)

ও ১১১ রান (১ উইকেটে। ল্যাকহার্স্ট নট আউট ৬০ রান)।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের হাবিবের দ্বিতীয় গোল দেওয়ার দৃশ্য। ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে জয়ী হ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ১০—১৫) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের যে ১২টা খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১১ এবং খেলা ড্র ১।

বর্তমানে লীগ তালিকায় প্রথম তিনটি স্থানের অবস্থা এইরকম দাঁড়িয়েছে : ১ম মোহনবাগান—১৭টা খেলায় ৩০ পয়েন্ট, ২য় ইস্টবেঙ্গল—১৫টা খেলায় ২৯ পয়েন্ট এবং ৩য় মহমেডান স্পোর্টিং—১৭টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট। তবে লীগ চ্যাম্পিয়ান-শিপের লড়াইয়ে গত দু বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই এগিয়ে আছে। তারা মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে দুটো ম্যাচ কম খেলে মোহনবাগানের থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট পিছনে আছে, অপরদিকে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে ১ পয়েন্ট বেশী সংগ্রহ করেছে। গত শনিবারের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহন-বাগানকে হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ পাওয়ার পথ অনেক পরিষ্কার করে নিয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল দল তার দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মনোবল ভেঙে দিয়েছে।

অর্জুন পুরস্কার

অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনু-মোদনে ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালের বিভিন্ন খেলাধুলায় কলাগুণা ব্যক্তিগত ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য চারজন মহিলা সমেত মোট ২৫ জন খেলোয়াড় 'অর্জুন' পুরস্কার লাভ করেছেন। এই ২৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাংলার দুজন ফুটবল খেলোয়াড়—নঈম এবং চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ আছেন। তাছাড়া নামের তালিকায় মিউনিখ অলিম্পিকগামী এই ৭ জন আছেন : অজিতপাল সিং এবং পেরুমল কৃষ্ণমূর্তি (হকি), মহিন্দর সিং গিল এবং এডওয়ার্ড সিকুইরা (অ্যাথলেটিকস), সুদেশ কুমার (কুস্তি), এম ভেনু (বক্সিং) এবং সোয়াব জামসেদ কণ্ট্রাক্টর (নৌচালনা)।

রাষ্ট্রপতি ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের অর্জুন পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

১৯৭০ সালের পুরস্কার বিজয়ী

মহিন্দরসিং গিল (অ্যাথলেটিকস), শ্রীমতী দময়ন্তী ত... (ব্যাডমিণ্টন), আব্বাস মুন্তাসির (বাস্কেটবল), মাইকেল ফেরারা (বিলিয়ার্ডস), জামাল আ... পিটছায়া (বল ব্যাডমিণ্টন), দিলীপ সার দেশাই (ক্রিকেট), সৈয়দ নঈম ... (ফুটবল), অজিতপাল সিং (হকি), সুধীর ভাস্কররাও পারাব (খো-খো), জি জগন্... (টেবল টেনিস), সুদেশ কুমার (কুস্তি), লেঃ কর্ণেল সোবাব জামসেদ কণ্ট্রাক্ট (নৌ-চালনা) এবং অরুণকুমার দা... (ভারোত্তোলন)।

১৯৭১ সালের পুরস্কার বিজয়ী

এডওয়ার্ড সিকুইরা (অ্যাথলেটিকস), কুমারী শোভা মূর্তি (ব্যাডমিণ্টন), ম... মোহন সিং (বাস্কেটবল), এম ভে... (বক্সিং), ভেঙ্কটরাঘবন (ক্রিকেট), চ... শ্বর প্রসাদ (ফুটবল), পি কৃষ্ণমূর্তি (হকি), কুমারী অচলা সুব্বারাও দেবর (খো-খো), মহারাও ভীম সিং (স্যুটিং), কুমারী কে চাজর্ম্যান (টেবল টেনিস), ভানওয়ার (সাঁতার) এবং শ্যামলাল সালও (ভারোত্তোলন)।

শেষ সংবাদ

ট্রেট ব্রিজে ইংলাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়েছে। শেষ ৫ম দিনে ইংলাণ্ডের ২য় ইনিংসের সংক্ষিপ্ত স্কোর : ২৯০ রান (৪ উইকেটে। লাকহার্স্ট ৯৬, ডালিভেরা নট আউট ৫০ এবং গ্রীগ নট আউট ৩৬ রান। লিলি ৪০ রানে ২ উইকেট)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১৩ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 28th July 1972 শুক্রবার, ১২ শ্রাবণ, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

'এক নজরে'

মহাসাগরীয় অপচয় :

রাষ্ট্রসংঘের এক সমীক্ষক কমিটির হিসাবে প্রকাশ, সারা বিশ্বে প্রতি বছর সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় হয় বিশ হাজার কোটি ডলার, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার কোটি টাকা। ঐ টাকায় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণ ছাড়াও ২ কোটি ৩০ লক্ষ সৈন্যের ভরণপোষণের ব্যয়নির্বাহ হয়।

সারা বিশ্বের ঐ সামরিক ব্যয় আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের ১৩০ কোটি লোকের মোট আয়ের চেয়েও বেশি। সারা পৃথিবীর সকল দেশের যা মোট উৎপাদন তার ৬.৫ শতাংশ ব্যয় হয় সামরিক প্রয়োজনে, যেখানে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় মোট উৎপাদনের ২.৫ শতাংশ। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র সামরিক অস্ত্রের মারণ ও বিধ্বংসী শক্তি বৃদ্ধির গবেষণায় মোট ব্যয় করে আড়াই হাজার কোটি ডলার, অর্থাৎ ১৮,২৫০ কোটি টাকা। অথচ চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যয় হয় ২,৯২০ কোটি টাকা।

অবশ্য সামরিক প্রয়োজনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় সারা পৃথিবীতে, তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ ব্যয় করে পৃথিবীর ছয়টি দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, বৃটেন, চীন ও পশ্চিম জার্মানি। মোট যে টাকা ব্যয় হয় তার অর্ধেক যায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ সৈন্যের ভরণপোষণে, এবং অপর অর্ধেক অস্ত্রনির্মাণে ও সামরিক গবেষণায়। সৈন্যদের সংগে আরও যেসব লোক অস্ত্র-নির্মাণ, পোশাকপরিচ্ছদ নির্মাণ প্রভৃতি সামরিক প্রয়োজনে কর্মরত তাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি, যা প্রায় ফ্রান্সের জনসংখ্যার সমান। পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশ যে পরমাণু বোমার পাহাড় গড়ে তুলেছে, বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে, সেটা সারা পৃথিবীর সাড়ে তিনশ কোটি লোকের মাথাপিছু ১৫ টন টি-এন-টির সমান।

সারা পৃথিবীতে সামরিক প্রয়োজনে যে অর্থব্যয় হয় তার সবটা যদি এক বছরের জন্যও শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হত তবে পৃথিবীতে কেউ নিরক্ষর থাকতো না, অপর এক বছরের ব্যয় দিয়ে সারা পৃথিবীর সব শিল্প সম্ভাবনা যথাযথ কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত করা সম্ভব হত। কিন্তু এ সবই মিথ্যা কল্পনা, কারণ সামরিক শক্তিতে দুর্বল হওয়ার ঝুঁকি কোন দেশই নিতে রাজি নয়। সামরিক প্রস্তুতির সমর্থনে আর একটি যে যুক্তি দেখানো হয় তা হল, ঐ প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিকে ভিত্তি করে যে শিল্প গড়ে উঠেছে এবং পাঁচ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে তার অর্থনৈতিক গুরুত্বও সামান্য নয়। কিন্তু এ যুক্তি অর্থহীন, কারণ ঐ টাকা দিয়ে যে সব কল্যাণমূলক শিল্প গড়ে উঠতে পারে তাতে শুধু ঐ পাঁচ কোটি নয় আরও বহু কোটি মানুষকে প্রকৃত উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করা সম্ভব।

ভয়ংকর ষড়যন্ত্র : পূর্ব আফ্রিকার দেশ মালায়িতে ৩১ জন নরনারী ও শিশুকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ছাব্বিশ বছরের এক যুবক, ওয়াজা লাইনি কাওইসা, ফাঁসিতে ঝোলার আগে যে স্বীকারোক্তি করে গেছে, তা ঐ রাজ্যের সর্বত্র দারুণ চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশজনেরও বেশি লোকের জীবন অনিশ্চিত করে তুলেছে।

হত্যার ঘটনাগুলি ঘটে ১৯৬৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে, এবং সেগুলি ঘটে রাজধানী ব্লাণ্টীর ও তার সমীপবর্তী বিভিন্ন পল্লীতে। শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী সকলেই ঐ হত্যাকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, আর খুব কম ক্ষেত্রেই হত্যার পেছনে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যেতো। সেকারণে আতঙ্কটা বিশেষ কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা রাজ্যের মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে এবং কোন হত্যারই কিনারা হচ্ছে না বলে সকলেই সরকারকে দুষতে থাকে।

কাওইসা ফাঁসিতে যাওয়ার আগে স্বীকার করে গেছে যে, শুধু একটিমাত্র কারণেই সে ও তার সঙ্গীরা একের পর এক মানুষ খুন করে। তারা ভাড়াটে খুনে, প্রতি খুনের জন্য তারা মাথাপিছু ৩৩ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছ'শ টাকা করে পেতো। আর যারা তাদের ঐ টাকা দিতো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশময় আতঙ্ক ছড়িয়ে সরকারকে জনচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা। সে আরও বলে যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের মোট দু'শ লোককে হত্যা করার বন্দোবস্ত তারা নিয়েছিল কিন্তু একত্রিশটি হত্যাকাণ্ডের পরই তারা ধরা পড়ে যায়। কাওইসা জানায় যে, সে সবকটি হত্যাকাণ্ডের সংগেই জড়িত ছিল।

কাওইসার স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে যে বিশজনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন ঐ রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী গোমিলি কু. তুমানজি এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বোগি চিরওয়া, যিনি ব্যবসায়িক কারণে বহু বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করেছেন। ডঃ হেস্টিংস বান্ডার সরকারকে জনচক্ষে হেয় ও অযোগ্য প্রতিপন্ন করতে তাঁরা রাজ্যব্যাপী মানুষ খুনের এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন—এই অভিযোগ কাওইসার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। যে বিশজন এখন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চরম দণ্ডের প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন তাদের মধ্যে আছেন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী দুজন, পার্লামেন্টের সদস্য একজন, রাজনৈতিক দলের জনৈক নেতা ও পূর্বোক্ত ব্যবসায়ী। তাঁরা অবশ্য সকলেই নিজেদের নির্দোষ বলেছেন এবং কাওইসা কথিত ষড়যন্ত্রের কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে যে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ এখন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল এই যে, কাওইসার ফাঁসি ও তাদের গ্রেপ্তারের পর গত এক বছরে সারা মালায়ি রাজ্যে রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড আর একটিও ঘটেনি।

খুড়োর দেশ : আমাদের প্রতিবেশী দেশ বর্মার সমাজ-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পরস্পরের প্রতি সম্বোধনে সম্পর্কের নৈকট্য প্রকাশ করা। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় যে মিস্টার, মঁশিয়ে, হের, সিনর প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যক্তিবিশেষের নামের আগে ব্যবহৃত হয় তার কোন প্রতিশব্দ বর্মার ভাষায় নেই। বর্মায় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে পুরুষ মাত্রই 'খুড়ো' এবং নারীরা 'খুড়ি'। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন সেক্রেটারি-জেনারেল উ থাণ্ট, বর্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ নু প্রকৃত অর্থে খুড়ো থাণ্ট, খুড়ো নু। এইভাবে বর্মার সব বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই 'উ' অর্থাৎ খুড়ো এবং তার স্ত্রীলিঙ্গ হল 'দ' (ডি-এ-ডবলিউ)। বর্মার মধ্যবয়স্কা যে কোন নারীই 'দ' অর্থাৎ খুড়ি নামে সম্বোধিত। মোটামুটিভাবে বিশ বছর বয়সের ব্যবধান হলে সব বয়ঃকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠদের 'উ' বা 'দ' নামে সম্বোধন করে। কিন্তু বয়সের ব্যবধান আরও বেশি হলে খুড়ো হয়ে যান জ্যাঠা, যার বর্মি প্রতিশব্দ হল বাগী এবং স্ত্রীলিঙ্গে গী দ'।

খুড়ো, জ্যাঠা, মেসো মাসী অবশ্য আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত সম্বোধনের শব্দ। কিন্তু সেই সঙ্গে 'শ্রী' শব্দটিও প্রচলিত, এবং লিখতে বা ভাবতে কারও উল্লেখ করতে গেলে আমরা শ্রীরায় বা শ্রীমুখোপাধ্যায় বলে থাকি। কিন্তু বর্মার রীতি এদেশে প্রচলিত থাকলে আমরা বলতাম খুড়ো রায় বা জ্যাঠা মুখোপাধ্যায়। সুতরাং, সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের অজ্ঞাতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবকে বছর দশেক ধরে 'খুড়ো' নামে সম্বোধন করে এসেছেন, এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রনেতা থাণ্টের ক্ষেত্রে সে সম্বোধন যে যথোপযুক্ত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

জয় বাংলার পর জয় সিন্ধু

এটা প্রত্যাশিতই ছিল যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। ভাষার সঙ্গে জাতীয়তার প্রশ্নও জড়িত। পাকিস্তান চেয়েছিল ধর্মকেই জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে। ভাষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক সান্নিধ্যের কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল না। অর্থনৈতিক শোষণই ছিল তাদের শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য। তার পরিণতিতে বাংলাদেশের মাটিতে ঘটল আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। তারই প্রতিক্রিয়ায় অবশিষ্ট পাকিস্তান আজ কম্পমান। জয় বাংলার পর শোনা যাচ্ছে নতুন শ্লোগান জীয়ে সিন্ধু অর্থাৎ জয় সিন্ধু।

সিন্ধু, পাঞ্জাব, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে এখনকার পাকিস্তান গঠিত। পাকিস্তানী শাসকরা এই প্রদেশগুলোর অস্তিত্ব বিলোপ করে এক ইউনিট গঠন করেছিল। তার ফলে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠির নিজস্ব সত্তা বলে কিছু ছিল না। উর্দুভাষাকে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা করে অন্য সব ভাষাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। উর্দুর মারফতে পাঞ্জাবীরা এবং ভারতত্যাগী উদ্বাস্তুরাই পাকিস্তানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। কিন্তু ইতিহাসের দিনবদল হয়। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে যে, এতকাল কিভাবে ধর্মের ধাপ্পা দিয়ে এবং ভারত-বিরোধিতা জীইয়ে রেখে তাদের স্বার্থ নষ্ট করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর নিজের প্রদেশ সিন্ধু থেকেই তার সূত্রপাত।

সিন্ধু প্রাদেশিক আইনসভা জুলাইয়ের ৭ তারিখ একটি বিল পাশ করে সিন্ধীকেই একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে উর্দুভাষীরা মহা খাপ্পা। ভারত থেকে আগত উর্দুভাষীরা সিন্ধুপ্রদেশে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করাচী শহরের শতকরা ৪০ ভাগই নয়া সিন্ধী বা উর্দুভাষী উদ্বাস্তু। সিন্ধুর অন্যান্য শহরেও এদের প্রাধান্য বেশ। তার ফলে সিন্ধীরা দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। তাদের ভাষারও কোনো স্বীকৃতি ছিল না। অথচ সিন্ধী একটি উন্নত ভাষা এবং সিন্ধী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও সর্বত্র স্বীকৃত। সিন্ধীভাষার এই স্বীকৃতিতে আপত্তি জানিয়েছে উর্দুভাষীরা। এতকাল তারা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিল সিন্ধী সরকারী ভাষা হলে তা থাকবে না বলেই এই আপত্তি। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো প্রথমে সিন্ধীভাষার আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখেন নি। পাকিস্তানকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র হিসেবেই একে তিনি প্রথমে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু পরে জনমতের চাপে তাঁকে এই প্রস্তাব মেনে নিতে হয়েছে। তিনি উর্দুভাষীদের ১২ বৎসর সময় দিয়েছেন সিন্ধীভাষা শিখে নেবার জন্য। এই বারো বৎসর উর্দুভাষীদের বিরুদ্ধে চাকরী ইত্যাদি ব্যাপারে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতি আইনে লিপিবদ্ধ করা হবে। কিন্তু তাতেও উর্দুভাষীরা শান্ত হয় নি। বিক্ষোভ চলছে।

ভাষার জন্য এই আন্দোলন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন যে সিন্ধীভাষার দাবীকে তিনি এবং বাংলাদেশের মানুষ সমর্থন করেন। বাঙালীরাও ভাষার জন্যই প্রথম সংগ্রাম শুরু করেছিল। পরে তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। পাকিস্তানের শাসকরা যদি বাংলাদেশের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না থাকে তাহলে সিন্ধুর আন্দোলন পাকিস্তানের ধ্বংস ডেকে আনবে। সিন্ধুর নেতা শ্রী জি এম সৈয়দ তো পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, সিন্ধীদের পৃথক জাতি হিসাবে স্বীকৃতি না দিলে তারা পাকিস্তানে থাকবে না। তিনি দেখিয়েছেন যে, উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই ভাষা নয়। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তু ও বালুচিই পাকিস্তানের ভাষা। এদের ন্যায্য অধিকার খর্ব করে উর্দু চাপিয়ে দেবার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। পাকিস্তানের নেতারা গিয়েছিলেন ভারত থেকে এবং উর্দু ছিল তাঁদের জবান। উর্দুর জন্য পাকিস্তান তার পূর্ব অংশকে হারিয়েছে। সেই উর্দুই আবার অবশিষ্ট পাকিস্তানে বিপদ ডেকে আনছে। অদূরদর্শী নেতৃত্ব একটি দেশের কি সর্বনাশ করতে পারে পাকিস্তান তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মৃত্যু জয়ী বীর

তুষারকান্তি ঘোষ
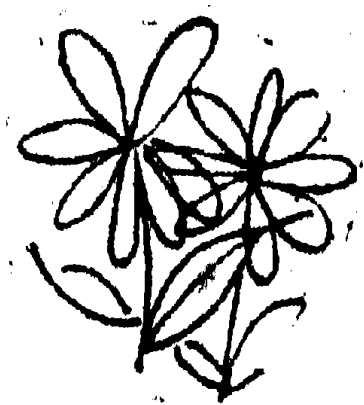
আচ্ছা, বেড়ালের প্রাণশক্তি কি অন্য প্রাণীদের চেয়ে বেশী? সম্প্রতি আমার সংসারে একটি ঘটনা ঘটেছে যা থেকে আমার মনে হয় যে, বেড়াল যে অবস্থায় পড়লে বেঁচে থাকতে পারে সে অবস্থায় অন্য প্রাণীর মরণ নিশ্চয়।

এইবার ব্যাপারটা বলছি। আমার স্ত্রী বছরের বেশীর ভাগ সময় এলাহাবাদেই থাকেন, গরমের সময় কলকাতায় কিম্বা অন্য কোথাও যান এবং ভাল রকম বৃষ্টি পড়ে গেলে, এলাহাবাদে ফিরে আসেন।

এবারেও তাঁর নিয়ম অনুসারে এলাহাবাদ যাবার দিন স্থির হয়েছিল ১৮ জুলাই। বেশ কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন বলে তাঁর আলমারিগুলো ভাল করে গুছিয়ে রাখছিলেন। তাঁর শোবার ঘরে দুটো বড় গোদরেজের আলমারি আছে। এই দুটো ভাল করে গোছাবার জন্যে আলমারি দুটোর দরজা খুলে রেখে তিনি ঘরের একপাশে বসে কাপড়-জামা ভাঁজ করে গোছাচ্ছিলেন। তাঁর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে একটা বেড়ালের বাচ্চা একটা আলমারির মধ্যে ঢুকে কাপড়-জামার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। বিকেল পাঁচটার সময় আলমারির ভেতর বেড়াল ছানাটার অস্তিত্ব না জেনে তিনি আলমারির চাবি বন্ধ করেন এবং সন্ধ্যেবেলা বম্বে মেলে এলাহাবাদ রওনা হয়ে যান। সেই রাত্রে আমি যখন সেই ঘরে একা ঘুমোচ্ছিলুম, তখন আমি মধ্যে মধ্যে বেড়ালের মিউ মিউ শব্দ শুনছিলুম। কোন বেড়ালটা কোথা থেকে ডাকছে সে আমি বুঝতে পারিনি, কারণ এখন আমাদের বাড়ীতে অনেকগুলো বেড়াল

হয়েছে। আমাদের বাড়ীতে কতকগুলো কুকুর আছে কিন্তু ইঁদুরের অত্যাচারে অস্থির হয়ে একটা মদ্দা বেড়াল পুষে-ছিলুম। এই মদ্দা বেড়ালটার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ দিন কয়েকের মধ্যেই সে ইঁদুরের বংশ ধ্বংস করে ছেড়েছে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে সে কোথা থেকে একটা মাদী বেড়াল ধরে নিয়ে এল। তার পরেই বংশ বৃদ্ধি। এখন আমাদের বাড়ীতে যে কতগুলো বেড়াল হয়েছে তা আমরা নিজেরাই জানি না। এখন প্রায় সব সময়, সব ঘরেই বেড়ালের কেঁউ কেঁউ শব্দ শোনা যায়। কাজেই আমি মোটেই বুঝতে পারিনি যে এই বাচ্চাটা আলমারির ভেতর থেকে ডাকছে। তার পরের রাত্রেও অর্থাৎ ১৯শে জুলাই সেই রকম ডাক মধ্যে মধ্যে শুনেছিলুম। কিন্তু কোথা থেকে ডাকছে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তার পরদিন বিকেলবেলা কি কাজে আমি শোবার ঘরে যাওয়াতে আবার সেই রকম শব্দ শুনতে পেলুম। আমার মনে হল যেন একটা আলমারির পেছন থেকেই সে ডাকছে। আমি সেটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে আলমারিটার পাশে ও নিচে অনেক উঁকি-ঝুঁকি মারলুম কিন্তু কোথাও তার শারীরিক অস্তিত্ব খুঁজে পেলুম না। তখন আমার মনে হল যেন আলমারির ভেতর থেকেই শব্দটা আসছে। তখন আমার বৌমা, নাতনীরা, আমার বেয়ারা দুর্গা ও আমি খুব ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলুম যে, ব্যাপারটা তাই বটে, বেড়ালটা আলমারির ভেতর থেকেই ডাকছে।

কিন্তু এটাকে তখন বার করি কি করে? এ আলমারির চাবিটা তো বাড়ীর গৃহিণী এলাহাবাদে নিয়ে গেছেন। তখনি ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে এলাহাবাদে তাঁকে বলা হল পত্রপাঠ কারুকে দিয়ে এই চাবিটাকে পাঠিয়ে দিতে। বেড়ালের বন্দীদশা শুনে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন এবং সেই রাত্রের ট্রেনেই চাবি পাঠিয়ে দিলেন।

আমরা এদিকে তখুনি আলমারিটা খুলে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম। অন্য গোদরেজের চাবির একটাও লাগল না এবং চাবিওলা এসেও কোন রকমে আলমারি ভাঙতে কিম্বা চাবি খুলতে পারল না।

তখন আমাদের মনের অবস্থা ভাবুন। বেড়ালটা ১৮ তারিখের বিকেল বেলা বন্দী হয়েছে এবং তখন ২০ তারিখের সন্ধ্যে-বেলা, ৪৮ ঘন্টার ওপর কিছু খায়নি এবং আলমারির ভেতর যথেষ্ট বাতাস পাচ্ছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না। যাই হোক তখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না।

সে রাত্রে বেড়ালটার গলার স্বর খুব অল্পই শোনা গিয়েছিল। আমি ভেবে-ছিলুম যে, এইবার বোধহয় বেড়ালটা মরে গেল। আমার শোবার ঘরে এ-রকম একটা কান্ড হওয়াতে আমার কুসংস্কারা-চ্ছন্ন মনটা শুধু উদ্বিগ্ন নয়, অত্যন্ত ভীতিগ্রস্তও হয়েছিল।

তার পরদিন হাওড়া স্টেশনে লোক পাঠিয়ে ঐ আলমারির চাবি নিয়ে আসা হল। আলমারি খোলবার আগে ঐ বাচ্চাটার মাকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে এলুম এবং একটা বাটিতে দুধ ও একটা বাটিতে জল রেখেছিলুম। আমি কিন্তু ততক্ষণে বুঝতেই পেরেছি যে বাচ্চাটা মারা গেছে।

কিন্তু আলমারি খুলে আমি স্ত স্তম্ভিত এবং অবাক। দেখি যে বাচ্চাটা একটা তাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং আলমারির দরজা খোলা মাত্র অক্লা করে নিচে লাফিয়ে পড়ল এবং ছুটে তার মার কাছে গেল। আমার জীবনে আমি অনেক সময় অনেক আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু তখন আমার মনে আনন্দের যে বান ডেকেছিল সে আমি কখনও ভুলব না। একটু পরেই দেখলুম যে বাচ্চাটা আর তার মা এক সঙ্গে দুধ খাচ্ছে। আধ ঘন্ট বাদে দেখি যে, সেটা একদম নরম্যা (স্বাভাবিক)। অন্যদিন যে রকম এ-ঘ ও-ঘর করে বেড়ায়, তখনও সে রক করে বেড়াচ্ছে। বলা বাহুল্য তখনি এলাহ বাদে আমার স্ত্রীকে খবর দিয়ে দিলুম বাচ্চাটা বেঁচে গেছে শুনে তিনি অত্য আনন্দিত হলেন।

এইবার ব্যাপারটা একটু ভাল ক ভেবে দেখা যাক্। বাচ্চাটা ১৮ তারিখের বিকেলবেলা আলমারিতে বন্দী হয়েছে। হয়তো তারও দু-তিন ঘন্টা আগে থেকে সে কিছু খেতে পায়নি। আর সে খালা হল ২১ তারিখের বেলা দশটার পর আশ্চর্যের কথা এই যে সে যে শুধ বেঁচেছিল তাই নয়, তার শরীরটাও দুর্বল হয়েছে, তারও কোন লক্ষণ দেখা না। অন্য কোন প্রাণী এই অবস্থ পড়লে তার কি হত ভেবে পাচ্ছি ইংরাজীতে একটা proverb (প্রব আছে যে, "a cat has nine lives" অর্থাৎ একটা বেড়ালের নটা প্রাণ। এই ঘটনার পর আমি ভাবছি যে অন্তত বেড়ালের দুটো প্রাণ আছে। একটা প্রা হলে কি বাঁচত!

পটভূমি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রশাসন ঢেলে সাজানো হবে, মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশের পর যে এই ধরনের একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠবে তা বোধ হয় অনেকেই আঁচ করতে পারেন নি। প্রশাসন বলতে এখানে অবশ্য প্রধানত জেলা প্রশাসনকেই বোঝানো হচ্ছে. কারণ মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিটা প্রথমে ঐ দিকেই গিয়ে পড়েছে। লাল দীঘির পাশে লাল বাড়ির মধ্যে নজর দেবার যে রীতিমতো প্রয়োজন আছে তা অনেকের মতো সিদ্ধার্থবাবুও নিশ্চয়ই জানেন। সত্যি কথা বলতে কি. রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার গলদের অধিকাংশেরই উৎস ঐ লাল বাড়িই। প্রশাসনিক সংস্কারের কোনো কাজ যেখানেই সুরু হোক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত মহাকরণে এসে থামতে বাধ্য। তবু যে সিদ্ধার্থবাবুর নজর প্রথমে জেলা প্রশাসনের ওপর গিয়ে পড়েছে তার কারণ আছে।

সিদ্ধার্থবাবু আগে এই রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, বিরোধী দলের নেতাও ছিলেন, পরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছেন। কলকাতায় প্রশাসনের কাজ কিভাবে চলে সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধারণা তাঁর ঐ সময়েই হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসন সম্পর্কে গভীরভাবে জানার যে-সুযোগ এবার তিনি পেয়েছেন আগে তা পান নি। জেলা প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর চোখ বিশেষভাবে খুলে দিয়েছে সাম্প্রতিক খরা। এই খরার সময় তিনি দেখলেন যে, রাজ্য সরকারের, বিশেষভাবে তাঁর নিজের উদ্যোগ, টাকাকড়ির ব্যবস্থা মালমশলা প্রভৃতি সব ঠিকমতো থাকা সত্ত্বেও খরার সমস্যা ঠিকমতো মোকাবিলা করা গেল না। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে অনাহারে মৃত্যু নিয়ে যে-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের রিপোর্ট পাওয়ার পর তা হয়ত চাপা পড়বে। কিন্তু মৃত্যু ঘটুক আর না-ঘটুক, খরার মোকাবিলা সম্পর্কে ব্যর্থতার সমালোচনা শুধু ডাঃ জয়নাল আবেদিন নয়, চব্বিশ পরগণার আর এক মন্ত্রীর কাছ থেকেও শোনা গেছে। তিনি বলেছেন যে, খরা এল. খরা গেল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না।

এই রকম একটা জীবন-মরণ সমস্যায় জেলা প্রশাসনের ব্যর্থতা যদি সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। ঐ প্রশাসনকে কী করে চাঙ্গা করে তোলা যায় তার পথ বাৎলাবার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী একটি জেলা প্রশাসন সংস্কার কমিটিও গঠন করেছেন। তবে যে-ধরনের কমিটি গঠিত হলে জেলা প্রশাসনের গলদগুলি ভালোভাবে ধরা পড়ত ঠিক সেই ধরনের কমিটি গঠিত হয় নি। ঐ কমিটি একরকম আমলাদেরই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমলারা নিজেরাই যদি নিজেদের রোগ নির্ণয় করতে পারেন এবং রোগ নিরাময়ের পথ খুঁজে বার করতে পারেন তবে যে খুব ভালো হয় তা ঠিক, কিন্তু তা কতো দূর সম্ভব হবে বলা মুস্কিল।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের এক বৈঠকও ডাকেন। উদ্দেশ্য ছিল, জেলায় জেলায় উন্নয়নের কাজ কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা। আসল সমস্যার কথা যতোটা আলোচনা হয়ে থাকুক না কেন, ঐ বৈঠকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্বেগের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ালো কিভাবে নিজেদের সাম্রাজ্য বাড়ানো যায়। প্রশাসন সংস্কার নিয়ে যে-গোলমাল পাকিয়ে ওঠার কথা একেবারে গোড়াতেই বলেছি সেই গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে এই সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে।

* * *

আপনি হয়ত ভাবতে পারেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই তো এ-দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান অফিসার। তিনি গোটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অনেক জেলাতেই তিনি. একাধারে বিচারবিভাগীয় এবং শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের আক্ষেপ থেকে মনে হয়, তাঁদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা নেই। আর সেই ক্ষমতা নেই বলেই যতো গণ্ডগোল। সেই জন্যেই উন্নয়নের কাজ হতে পারছে না। নামেই তাঁরা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আসলে জেলার অনেক সরকারী অফিসারের ওপর তাঁদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। জেলায় পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, রয়েছেন চিকিৎসা বিভাগের চিকিৎসক। তাঁরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থোড়াই কেয়ার করেন। কারণ তাঁদের ওপর খবরদারি করার ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেই। সেই ক্ষমতা রয়েছে তাঁদের দপ্তরের কর্তাদের, যাঁদের অধিষ্ঠান রাইটার্স বিল্ডিংসে। ফলে জেলায় যদি কোনো রাস্তা বা সেতু তৈরি হয় তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানতে পারেন না, স্বাস্থ্য কেন্দ্রও তৈরি হয় তাঁর অগোচরে। এই অবস্থায় কেমন করেই বা তিনি গোটা জেলার উন্নয়নের কাজ তদারক করতে পারেন? সুতরাং তাঁকে আরো ক্ষমতা দেওয়া হোক। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যদি তাঁকে না-দেওয়া হয় তবে উন্নয়নের কাজের বিশেষ অগ্রগতি হতে পারবে না। আর এই নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ইঞ্জিনিয়ারদের "কনফিডেনশিয়াল ক্যারেক্টার রোলস্" (সি-সি-আর) লেখার ক্ষমতা আবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দেওয়া হোক।

জেলা শাসকদের এই দাবির কথা শুনে সরকারী ইঞ্জিনিয়াররা খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বলছেন, এই ধরনের কথাবার্তা বলে জেলাশাসকেরা এই কথাই প্রমাণ করতে চাইছেন যে, উন্নয়নের কাজে প্রধান বাধা হলেন ইঞ্জিনিয়াররা। এই যখন জেলাশাসকদের মনোভাব তখন তাঁরা নিশ্চয়ই প্রথম সুযোগেই সি-সি-আরে ইঞ্জিনিয়ারদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য লিখে বসবেন। ফলে ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরি নিয়েই হয়ত টানাটানি পড়বে।

* * *

এমনিতে মনে হতে পারে, জেলা শাসকেরা যা বলছেন তা তো ঠিকই। গোটা জেলার সব সরকারী অফিসারকে নিয়ন্ত্রণ করতে না-পারলে তাঁরা উন্নয়নের কাজের তদারক করবেন কী করে? বিশেষত ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়াদের সি-সি-আর লেখার ক্ষমতা তো তাঁদের ছিলই। প্রফুল্ল সেন মশায়ের আমলেই এই নিয়ম [illegible] হয়। সুতরাং জেলাশাসকেরা তো [illegible] দের পুরানো ক্ষমতাই আবার ফিরে [illegible]ইছেন, এটা নতুন কোনো দাবি নয়।

এখন দেখা যাক, জেলাশাসকদের বক্তব্যের মধ্যে কোনো ফাঁক আছে কিনা। একথা ঠিক, সরকারী ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর জেলাশাসকদের কোনো সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু তাঁর মানে কি এই যে, ইঞ্জিনিয়াররা তাঁদের স্বরাজ্যে সর্বেসর্বা? মোটেই তা নয়। নানা ব্যাপারেই তাঁদের জেলাশাসকদের দ্বারস্থ হতে হয়। কোনো কাজের জন্যে যদি জমি দখল করার দরকার হয় তবে জেলাশাসকের সাহায্য ছাড়া তা কী করে সম্ভব হয়? এমন কি. জেলার মধ্যে কোন্ জায়গায় কোনো একটি প্রকল্প গড়ে উঠবে, তাও জেলাশাসকের সহায়তা ছাড়া স্থির হতে পারে না। কারণ, এই সম্পর্কে প্রতি জেলায় যে কমিটি আছে জেলাশাসক তার অন্যতম সদস্য।

তা ছাড়া আরো কথা আছে। প্রতি জেলায় একটি করে উন্নয়ন কমিটি রয়েছে। জেলাশাসকই তার চেয়ারম্যান। প্রতি মাসে এই কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। যদি সেই বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়, তবে জেলাশাসকেরা উন্নয়নের কাজ সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর পান না, এই অভিযোগ ঠিক হয় কী করে? যদি এই অভিযোগ জেলাশাসকেরা তোলেন তবে এই কথাই ধরে নিতে হয় যে, ঐ কমিটির

বৈঠক ঠিকমতো হয় না, অথবা হলেও তাতে কোনো কাজ হয় না। এঞ্জিনিয়ারদের নিয়ন্ত্রণ করাই যদি প্রধান সমস্যা হয় তবে ঐ কমিটি তো তার বেশ একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

সুতরাং এই নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটা শুনলে মনে হতে পারে, ব্যুরোক্র্যাট বনাম টেকনোক্র্যাটের লড়াই বলে একটা কথা চালু হয়েছে সেটা খুব মিথ্যে নয়। এই লড়াই যে নতুন তা-ও নয়। অনেকদিন ধরেই এই লড়াই চলছে। আই-এ-এস অফিসাররা চান ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ারদের ওপর আরো খবরদারির ক্ষমতা। ওদিকে, ডাক্তার-এঞ্জিনিয়াররা আবার আই-এ-এস অফিসারদের কব্জা থেকে বেরিয়ে আসতে চান। এঁদের অনেক দিনের দাবি, অন্ততঃ সেচ, বিদ্যুৎ, পূর্ত প্রভৃতি বিভাগের সেক্রেটারির পদ এঞ্জিনিয়ারদের দেওয়া হোক। তেমনই চিকিৎসা বিভাগের সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্ব দেওয়া হোক কোনো চিকিৎসককে। এই বিশেষজ্ঞ সেক্রেটারিদের অধীনে দপ্তরের কাজ আরো ভালোভাবে চলবে। এখন সেক্রেটারির পদে আই-এ-এস অফিসারদের প্রায় নিরঙ্কুশ অধিকার। এই আই-এ-এস অফিসাররা 'সবজান্তা' হতে পারেন, কিন্তু কোনো টেকনিক্যাল দপ্তরের [illegible] সম্পর্কে তাঁদের তেমন জ্ঞান থাকে না। ফলে কাজ ব্যাহত হয়। টেকনোক্র্যাটদের এই দাবির পিছনে যতো যুক্তিই থাক, সরকার কিন্তু এই দাবি এখনও মেনে নিতে পারেন নি। তার কারণ, আই-এ-এস অফিসারদের দাপট বড় কম নয়।

কিন্তু এই সব তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আসল ব্যাপারটাই হারিয়ে যাচ্ছে। আর এই বিবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহটাও সেখানেই। কারণ এই ধরনের তুচ্ছ বিবাদের মধ্যেই যদি প্রশাসন সংস্কারের সব উদ্যোগ সমাধিলাভ করে তবে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ চাপা পড়ে যাবে। তার ফলে ব্যাহত হবে আসল উন্নয়নের কাজ। এবং ঈশ্বর জানেন, পশ্চিমবাংলায় উন্নয়নের কাজ কতো জরুরী।

এই ধরনের বিবাদের সূত্রপাত করে আমাদের প্রশাসনের মূল ত্রুটিটাকেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই ত্রুটিটা হলো, এই প্রশাসন ব্যবস্থাকে কখনোই উন্নয়নের কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় নি। বিদেশী শাসকরা একটা উপনিবেশের ওপর তাদের বজ্রমুষ্টি কায়েম রাখার জন্যে যে শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল সেই ব্যবস্থা দিয়েই আমরা কোটি কোটি মানুষের গরিবি হটানোর মতো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে চাইছি। যে-প্রশাসন প্রধানত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ঐতিহ্য পালনের জন্যে গড়ে উঠেছে তাকে দিয়ে আমরা দ্রুত উন্নয়নের কাজ করাতে চাইছি। গাধা দিয়ে যব মাড়াইয়ের কাজ কোনো দিন হয় কিনা জানি না, কিন্তু ঔপনিবেশিক ধাঁচের প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়ে একটি উন্নতিশীল দেশের চাহিদা মেটানো যায় না।

এর জন্যে কোনো ব্যক্তি-বিশেষ অথবা ব্যক্তি-গোষ্ঠীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ব্যক্তিরা এখানে একটা 'সিস্টেমের' শিকার হয়ে পড়েছেন। সেই সিস্টেম গড়ে উঠেছে মান্ধাতার আমলের কতকগুলি নিয়মকানুনকে কেন্দ্র করে। ঐসব নিয়মকানুনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোনো কাজ ত্বরান্বিত করা নয়, সেই কাজে বাধা দেওয়া। সরকারী কাজে সতর্কতার প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু সেই সতর্কতা আজ চমৎকারভাবে দায়িত্ব এড়াবার অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব নিয়মকানুন যতোদিন বজায় থাকবে, এঞ্জিনিয়ারদের সি-সি-আর লেখার ক্ষমতা হাতে পেলেও জেলাশাসকেরা বিশেষ কিছু করতে পারবেন কি?

২২।৭।৭২　　—[illegible]

দেশে বিদেশে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভার কিছু রদবদল করবেন, এমন কথা বেশ কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। এই রটনা মোটেই অকারণ ছিল না। মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকটি আসন শূন্য ছিল। গত [illegible] মাসের মধ্যে [illegible] ক্যাবিনেট [illegible]

[illegible]

পারছিলেন। তাঁরা এটাও অনুমান করছিলেন যে, এই শূন্য স্থানগুলি পূরণের সুযোগে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভাকে ঢেলে সাজতে পারেন। তাতে কিছু পুরানো মুখকে বিদায় নিতে হতে পারে এবং তাঁদের জায়গায় কিছু নতুন মুখ দেখা যেতে পারে।

সংসদের বর্ষা অধিবেশনের প্রাক্কালে মন্ত্রিসভার কিছু রদবদলের কথা ঘোষণা করা হল বটে, তবে যতটা বড় রকমের নাড়াচাড়া হবে বলে কোন কোন মহল থেকে অনুমান করা হয়েছিল ততটা নাড়াচাড়া আদৌ পড়ল না।

প্রথমত, আভাসিত কল্পনাজল্পনা কোন কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের এই অনুমান মিথ্যা হয়ে গেল যে, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রবীণ সহকর্মীদেরও কারও কারও দপ্তর না আবার বদলে দেবেন। [illegible]

[illegible]

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন জগজীবন রাম—এমন কথাও শোনা গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রবল প্রতিবাদ আসার পর অবশ্য এই রটনা বন্ধ হয়েছিল। অন্য যেসব রটনা চলছিল সেগুলির মধ্যে ছিল:—স্বরণ সিং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসছেন এবং শ্রীমতী গান্ধী নিজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভার নিচ্ছেন, চ্যবনকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সরান হচ্ছে অথবা কতকগুলি বিভাগকে সরিয়ে নিয়ে ঐ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব হ্রাস করা হচ্ছে।

তাছাড়া আরও খবর ছিল, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোটেই সন্তুষ্ট নন এবং সেই কারণে তিনি অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়গুলির পুনর্গঠন করতে চাইছেন এবং পুনর্গঠিত মন্ত্রণালয়গুলিতে নতুন লোক এনে বসাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যেটুকু রদবদলের কথা শনিবার ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে এসব কোন কিছুই নেই।

আরও এক রকমের রটনা শোনা গিয়েছিল। [illegible]

চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি রামঘেঁষা কিছু মন্ত্রীকে বাদ দেবেন। যাঁরা এই কথা বলছিলেন তাঁরা শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর দিল্লি থেকে ভুবনেশ্বরে যাওয়ার মধ্যে তাঁদের সংবাদের সত্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁদের সংবাদ যদি সত্য হত তাহলে কোম্পানি বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে ভি রঘুরাম রেড্ডি বাতিলের তালিকায় পড়তেন। কিন্তু তা তিনি পড়েন নি।

শ্রীমতী গান্ধী দু'জন মন্ত্রীকে বিদায় দিয়ে নতুন দু'জনকে মন্ত্রী করলেন এবং সি সুব্রহ্মণ্যম্‌কে ঠাঁইনাড়া করলেন, মাত্র এটুকু ছাড়া বলতে গেলে মন্ত্রিসভায় হাতই দেন নি।

নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ ধরকে অবশ্য পুরোপুরি নতুন বলা চলে না। শ্রীধর ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকে ইদানীং যে আন্তর্জাতিক কূটনীতির লড়াই লড়তে হয়েছে তাতে শ্রীধর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মন্ত্রিসভার সদস্য না হয়েও তিনি প্রায় মন্ত্রীর মর্যাদা নিয়েই কাজ করছিলেন। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হল বলে, একথা বুঝতে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু তবু তাঁকে যে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের জায়গায় পরিকল্পনা মন্ত্রীর পদ দেওয়া হবে, এটা সম্ভবত অনেকেরই হিসেবের বাইরে ছিল। যেসময়ে নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই নিতান্ত অকারণে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বদলান নি। হয়ত, পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনাকে একটা নতুন চেহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীমতী গান্ধী এই সময়ে দপ্তরে নতুন মন্ত্রী আনলেন। পরবর্তী পরিকল্পনা-টির ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। "গরীবী হঠাও" কর্মসূচী বাস্তবে পরিণত করার ব্যাপারে কংগ্রেস কতটা আন্তরিক সম্ভবত তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে যাবে ঐ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। আশা এই যে, দুর্গাপ্রসাদ ধরের নেতৃত্বে আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হবে।

টৌমসে অনন্ত পাই রাজধানীর রাজ-নীতিতে নবাগত। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের আগে তিনি ছিলেন সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের কর্তা। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর তিনি ধাপে ধাপে জীবনবীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন। গত মার্চ মাসে তিনি ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজ্যসভার সদস্য হন। তখন থেকেই বাজারে এরকম একটা প্রচার ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিয়ে এসে কোন অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের ভার দিতে চান। তারপর গত এপ্রিল মাসে রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্ত শ্রীপাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের কাস্টোডিয়ান হিসাবে তিনি ব্যাঙ্কের একটি বাড়ি জলের দামে তাঁর ভাইকে কিনিয়ে দিয়েছেন। শ্রীপাই ও তাঁর ভাই, উভয়েই এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, তখন থেকে শ্রীপাইয়ের নামটা যেন একটু চাপা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি মন্ত্রিসভায় এলেন। কিন্তু কোন অর্থ-নৈতিক মন্ত্রণালয়ে তাঁর স্থান হল না। তিনি এলেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ে কে হনুমন্তায়ার জায়গায়, যিনি শ্রীপাইয়ের মতই মহীশূর থেকে নির্বাচিত সদস্য।

শ্রীহনুমন্তায়াকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় দেওয়া সহজ হয় নি। সংবাদেই দেখা যাচ্ছে, তিনি ও তাঁর সমর্থকরা বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। দিল্লির "প্যাট্রিয়ট" পত্রিকার খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেছেন, একথা যখন তাঁকে জানান হয় তখন তিনি রীতিমত ক্রোধ প্রকাশ করে বলেন, "আমি নিজলিঙ্গাপ্পা নয়, আমাকে এভাবে সরান চলবে না।" তিনি নাকি এই হুমকিও দিয়েছিলেন যে, তাঁকে বিদায় দেওয়া হলে তিনি অন্য দলে যোগ দেবেন। (শ্রীহনুমন্তায়া অবশ্য এই সংবাদ অস্বীকার করেছেন।) মহীশূরে বিধানসভায় হনুমন্তায়ার যেসব সমর্থক আছেন তাঁরা শ্রীহনুমন্তায়ার মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার জন্য মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রীর মারফত দিল্লির উপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ তাতে সম্মত না হওয়ায় সেই চেষ্টা সফল হয় নি। শ্রীহনুমন্তায়ার সঙ্গে রেলওয়ে উচ্চ পদাধিকারীদের অনেকের বনিবনা হচ্ছিল না। তাঁর ব্যবহার ভাল নয় বলে রেলওয়ে কর্মীদের কোন কোন নেতার অভিযোগ ছিল। পার্লামেন্টের কিছু সদস্যেরও একই ধরনের ক্ষোভ ছিল। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁর কলহকে তিনি যেভাবে একটা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারিতে পরিণত করেছিলেন তাতে সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেও রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে প্রকাশ। শ্রীহনুমন্তায়ার এসব ঘটনা অজানা থাকার কথা নয়। তিনি যখন দেখলেন, তাঁকে পদত্যাগ করতেই হবে, এমনকি তিনি পদত্যাগ করতে রাজি না হলে প্রধানমন্ত্রী গোটা মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতেও প্রস্তুত তখন তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। পদত্যাগপত্র দাখিল করার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে শুধু একটি অনুরোধ করলেন। তাঁর আবেদন, বাঙ্গালোরে যাওয়ার জন্য তিনি আগে থেকেই দিনক্ষণ ঠিক করে রেখেছিলেন, তাঁকে সেখানে রেলওয়ে মন্ত্রী হিসেবে যেতে দেওয়া হোক। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এই শর্তে যে, তাঁকে বাঙ্গালোর রওনা হওয়ার আগেই পদত্যাগপত্র দিয়ে যেতে হবে, তবে তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছবার আগে প্রধানমন্ত্রী সেই পদত্যাগ-পত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবেন। এই শর্ত পূরণ করতে হল বলেই শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভার রদবদলের কথা ঘোষণা করতে দিন দুয়েক দেরি হয়ে গেল।

শ্রীহনুমন্তায়ার মত আরও একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে বিদায় নিয়ে যেতে হল। তিনি হচ্ছেন আসাম থেকে নির্বাচিত মইনুল হক চৌধুরি। ইনি এক সময়ে শ্রীমতী গান্ধীর বিশেষ আস্থাভাজন বলে পরিচিত ছিলেন। আসাম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সরাসরি কেন্দ্রের পর্যায়ের মন্ত্রী করায় সেসময়ে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, ইদানীংকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আস্থা অনেকখানি হারিয়েছেন। রাজধানীর রাজনৈতিক মহলের খবর হল, শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে তিনি সন্তোষ-জনক কাজ দেখাতে পারেন নি বলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে হতাশ হয়েছেন। তাছাড়া, আসামের কংগ্রেস নেতারাও তাঁর প্রতি বিরূপ। তার ওপর আবার রাজ্য-সভায় ভূপেশ গুপ্ত তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছিলেন তাতে তাঁর রাজ-নৈতিক ভাগ্যাকাশ কতকটা মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে। শ্রীগুপ্ত অভিযোগ করেছিলেন, চৌধুরি সাহেব নির্বাচনী তহবিল থেকে বাইশ হাজার টাকা সরিয়ে সেটা তাঁর নিজস্ব ফালতু আয় হিসেবে দেখিয়েছেন। শিল্পোন্নয়ন দপ্তর থেকে তাঁকে সরিয়ে সে জায়গায় যে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের মত একজন অভিজ্ঞ, প্রবীণ মন্ত্রীকে আনা হল তাতেই প্রমাণিত হল যে, প্রধানমন্ত্রী ঐ দপ্তরের কাজের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে চান।

যে দু'জন মন্ত্রী রাজধানীর স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হলেন তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন প্রশ্ন উঠেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীহনুমন্তায়াকে রাজ্যপালের পদ ও মৈনুল হক চৌধুরিকে রাষ্ট্রদূতের পদ দিতে চাওয়া হয়েছে। শ্রীহনুমন্তায়া জানিয়েছেন, তিনি রাজ্য-পালের পদ নেবেন না, পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবেই কাজ করবেন। তিনি মনে করেন, রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করার মানে হচ্ছে যে জনগণ তাঁকে নির্বাচিত করেছেন তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, কেননা,

রাজাপাল হিসেবে জনগণের সেবা করার কোন সুযোগ নেই। চৌধুরি সাহেব কি করবেন সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। আপাতত তিনি অসুস্থ অবস্থায় দিল্লির হাসপাতালে শয্যাশায়ী।

* * *

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের জমাট বরফ গলা শুরু হতে না হতেই অন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা চলছে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী শিরিমাভো বন্দরনায়ক সম্প্রতি পিকিং সফর করতে গিয়ে সেখান থেকে ভারতের জন্য একটি বার্তা নিয়ে এসেছেন এবং সেটি তিনি যথাসময়ে নয়াদিল্লিস্থিত সিংহলী রাষ্ট্রদূতের মারফত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, বি বি সি থেকে সম্প্রতি এইরকম একটি সংবাদ প্রচার করে। তারপর থেকেই এই বিষয়ে নতুন করে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। নয়াদিল্লি ও কলম্বো, উভয় রাজধানী থেকেই এই সংবাদ অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু তাতে বিষয়টি নিয়ে চর্চা বন্ধ হয় নি। তার একটি কারণ হল, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন, সম্প্রতি পোল্যান্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশে ভারতীয় ও চীনা রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে ও উভয় দূতাবাসের অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে মেলামেশা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে এবং এইসব মেলামেশায় এখন একটা হৃদ্যতা দেখা যাচ্ছে যা বহুদিন লক্ষ্য করা যায় নি। হংকং থেকে একাধিক ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধি যে খবর পাঠিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, চীন ও ভারতের মধ্যে সহজতর সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে বাংলাদেশের প্রশ্নটি যে বাধার সৃষ্টি করেছিল সেই বাধাটি চীন এখন সরিয়ে ফেলতে চাইছে। তাদের এই আগ্রহ বোঝাবার জন্য তারা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পিকিংয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতি-যোগিতায় যোগ দিতে ভারতকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। তবে, ভারতীয় সাংবাদিকরা লিখছেন, চীন আশা করে যে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করার পথে প্রথম পদক্ষেপ নেবে ভারতবর্ষ। পিকিং থেকে ভারতই আগে রাষ্ট্রদূত সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। এখন ভারত যদি আবার পিকিংয়ে রাষ্ট্রদূত পাঠায় তাহলে চীনও সাড়া দেবে এবং দুই পক্ষের সংলাপ আরম্ভ হতে কোন বাধা থাকবে না।

* * *

ইতিমধ্যে, প্রত্যাশা অনুসারেই, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সিমলা চুক্তি অনুমোদন করেছেন এবং সেই অনুমোদনের কাগজপত্র ইসলামাবাদ থেকে সুইস দূতাবাসের মারফত নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছেছে। উভয় দেশের সম্পর্কের উন্নতির কিছু লক্ষণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। গত বছর জানুয়ারি মাসে একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং তারপর এক দেশের ওপর দিয়ে অন্য দেশের বিমান চলাচল বাতিল করা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতে ও আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থায় যে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি গিরির আফগানিস্থান থেকে দেশে ফেরার সময় পাকিস্তানের অনুমতি নিয়ে সেদেশের আকাশপথ দিয়ে উড়ে এসেছেন। পাঞ্জাবের সীমান্তের অপর পারে কয়েকটি স্লুইস গেট খুলে দেওয়ার অনুরোধ রক্ষা করে পাকিস্তান পাঞ্জাবের কয়েকটি অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির সরকারি মহল এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, সিমলা চুক্তির সমর্থনে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন তার কোন কোন অংশ এই চুক্তি পালনের সহায়ক নয়। যেমন, তিনি কাশ্মীরের জনগণকে "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" আদায় করার জন্য সংগ্রাম করতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের সেই সংগ্রামে পাকিস্তানের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাছাড়া, তিনি কাশ্মীর প্রসঙ্গটিকে যে আবার রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে যাওয়ার আশাও ছাড়েন নি সেকথা ভুট্টো জাতীয় পরিষদে বলেছেন।

ভুট্টোর এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে দিল্লির সরকারি মুখপাত্র খুব সতর্ক ও সংযত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেছেন, সিমলা চুক্তি মেনে চলা না হলে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে যে দ্বিতীয় পাক-ভারত শীর্ষ বৈঠক হওয়ার কথা আছে তা শেষ পর্যন্ত নাও হতে পারে।

ফ্রান্সের এক জায়গায় [illegible] একটি সীলকরা লরির ভিতর থেকে সংগঠিত দাস ব্যবসায়ের চাঞ্চল্যকর কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লরিটি রোম থেকে আসছিল। পথে সেটি অচল হয়ে পড়ে। পুলিশ সন্দিগ্ধ হয়ে লরিটি খুলে তার মধ্যে ৫৯ জন আফ্রিকানকে দেখতে পায়। এই আফ্রিকানরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় ছটফট করছিল এবং দম বন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করছিল। ইতালির পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, এই আফ্রিকানরা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক দাসব্যবসায়ী দলের "পণ্য"। মালি, আইভরি কোস্ট, সেনিগল প্রভৃতি দেশের দরিদ্র অঞ্চল থেকে এই আফ্রিকান-দের নিয়ে আসা হয় ফ্রান্সে কায়িক শ্রমের কাজ করার জন্য। সীমান্তে যাতে তারা ধরা না পড়ে সেজন্য বন্ধ গাড়ীর ভিতর পুরে তাদের রোম থেকে ফ্রান্সে চালান দেওয়া হয়। রোমে তল্লাসি করে এমন ৬৮ জন আফ্রিকানকে পাওয়া গেছে যারা চালানের অপেক্ষায় ছিল।

২২-৭-৭২ —পুণ্ডরীক

রক্তহীন হত্যা

শিবশম্ভু পাল

আমাদের পাশের বাড়িতে এক ভদ্রলোক নতুন ভাড়া এসেছেন। আসতে যেতে প্রায়ই তাঁর চেহারা আমার চোখে পড়ে যদিও চোখে পড়বার মতো কী আর এমন, সাড়ে পাঁচফুট হাইটের ভুঁড়ি-গজানো বাঙালী আপিসবাবু-মার্কা চেহারা। কথাবার্তা হয়নি, এই তিরিশ পেরোনো বয়সে উপযাচক হয়ে আলাপ করা আর পোষায় না; অথচ এই গল্পের দু-একটা জায়গায় বিশেষত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁকে আমি ব্যবহার না করে পারছি না। সুতরাং একটা নাম দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা দরকার। হ্যাঁ, নিরাপদ দত্ত। কী করব, টেরিলিন-রেয়নে, ঘাড়ে পাউডারের শাদাটে যত। বয়ে, স্টেটস-ম্যান হাতে সকাল সাড়ে নটার বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো যে মূর্তি, বাড়িতে থাকার সময় 'কই কোথায় গেলে, এদিকে শোন তো', কিংবা 'মুন্নি, আয় আয়, হাঁটি-হাঁটি-পা-পা' বলবার সময় আহ্লাদে গলেযাওয়া যার কণ্ঠস্বর তার একটা লাগসই নাম দিতে গেলে 'নিরাপদ'টাই দত্ত পদবীসমেত অনায়াসে কলম থেকে বেরিয়ে এল। প্রতি-বেশীর নাম অবশ্য অনায়াসেই জানা যায়, জানতেও পেরেছি, কিন্তু এটা যখন গল্প, তখন এইরকমই থাক। যাই হোক আমি এই কল্পিতনামা (অথবা সার্থকনামা) নিরাপদর মতোই চালিয়ে যাচ্ছিলুম। অর্থাৎ বাড়ি-আপিস - বন্ধুদের - রবীন্দ্রসংগীত - কফি-হাউস মিতুল-নীলিমা-রেকর্ডিং। কিন্তু হঠাৎ এই চেনাটা বেশ অন্যরকম হয়ে গেল। মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে গেলে হবেই।

সরস্বতী পুজোর দিন সন্ধ্যাবেলার একটা জায়গায় গগন, আমার জনৈক বন্ধু, আমায় গান গাইবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল।

সেখানে শ্রোতা অনেকেই ছিল, আশেপাশের বাড়ি থেকে সব এসেছিল। একেবারে সামনে তুঁতে রঙের কাতান বেনারসী পরা ফরশা একটি মেয়ে—তখনো পর্যন্ত সে মেয়েই, কেমন দেখতে, কী বৃত্তান্ত, এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো তাগদই অনুভব করিনি—বসেছিল। কোন এক সময় 'আচ্ছা এটা জানেন?' বলে একটা গান ফরমাস করলো সে। খুব একটা বাজারচালু গান নয় সেটা, রবীন্দ্রসংগীতের দীক্ষিত শ্রোতা না হলে 'ও চাঁদ চোখের জলে' গাইবার জন্যে কেউ বলে না। ও বলেছিল, আর তখনই স্পষ্ট করে দেখলুম। বা, বেশ মজা আছে তো মুখখানায়! গোল ধরনের মুখ আমার তেমন ভালো লাগে না; কিন্তু পাঞ্জাবি মেয়েদের মতো চোখা নাক, গালের টোল মেয়েটির মুখখানাকে একটা শিল্পকর্মের মতো গড়ে তুলেছে। বেশিক্ষণ তাকানো ইচ্ছে সত্ত্বেও অনুচিত। অতএব চোখের চাউনির জোরালো উজ্জ্বলতাকে কমিয়ে জিরোপাওয়ারের আলোর ঠাণ্ডায় নামিয়ে, যেহেতু আমি আবার শিল্পী, ধরলুম ফরমায়েশি গান। ঘরে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা ছিল বলতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু ছিল না। দেশটা এত-খানি তৈরি হয়নি। কিম্বা, আর সেটাই বরং বলা ভালো, তেমন জমাতে পারিনি। তেমন করে গাইতে পারলে—। অবশ্য পরে এই কথাটাকে পূরবী, অর্থাৎ মুখখানায় যার বেশ মজা ছিল, 'বিনয়ের বাড়াবাড়ি' বলে ঠাট্টা করেছিল ভিক্টোরিয়ার ঘাসে বসে।

বুঝতেই পারছেন, সরস্বতী পুজোর সেই সন্ধ্যে থেকে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের এই সন্ধ্যের অন্তর্বর্তী সময়ে দ্রুত কিছু কাজ সেরে নিয়েছিলুম। সংক্ষিপ্ত ঘটনাক্রম এই রকমঃ গগনের বাড়ি, সেখান থেকে ওর মাসতুত বোনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক-ভাবে আলাপ পরিচয়, স্বাভাবিক নিয়মেই গগন তৃতীয় ব্যক্তি, ওকে কাটিয়ে দিলুম, পূরবীর মায়ের সঙ্গে বলতে গেলে এক-রকম রান্নাঘরেই আলাপ জমিয়ে নিয়েছি। আমার চেহারার মধ্যে একটা গোলগাল হাসি-খুশি ভাব আছে, কথাবার্তায় ইচ্ছে করেই পাড়ে রেখেছি বাঙালে অ্যাকসেন্ট। সুতরাং দেরি হয়নি। সরলতাকে পুঁজি করে আমার সুবিধেই হয়েছে। পূরবীকে প্রায়ই গান তুলিয়ে দেবার জন্যে ওর দোতলার ঘরে চলে যেতুম, মাসীমা বলে দিতেন, 'যাও ওপরে আছে।' চলে যেতুম। সব সময় নিশ্চয়ই গান-টান হোত না। আসলে গানের ব্যাপারটা, প্রায় গগনের মতোই, তৃতীয় অস্তিত্ব, যা নিছক একটা অছিলা হয়ে দাঁড়ালো, কথাবার্তাই ভালো লাগতো। লাগবেই। এবং তখন পূরবী নীলিমার প্রসঙ্গ কোন না কোনভাবে তুলতোই। 'কই আলাপ করিয়ে দিলেন না তো', 'বৌদি ভালো আছেন?' 'মিতুনকে নিয়ে একদিন আসুন না', 'বৌদিকে নিয়ে একদিন কিন্তু আসতেই হবে', ইত্যাদি। উপায়, নেই। সরলতা। সরলভাবেই কোন একদিন ওকে বা মাসীমাকে কোন এক মেজাজের মাথায় নিজের বৌ-বাচ্চার কথা বলে থাকব। এবং সরলতা, অন্তত আমার বেলায়, মূর্খতা নয়: প্রমাণ পূরবীকে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাস্তায় আনতে পেরেছি। একটু আগেই তো ভিকটোরিয়ার ঘাসের ওপর বসে থাকার কথা বললুম। উপরন্তু নীলিমা-মিতুন সম্পর্কে ওকে সম্পূর্ণ অবহিত করানো সত্ত্বেও ও যদি গলা নামিয়ে কথায় কথায় 'অসভ্য' বলতে পারে, তবে দায়িত্ব ওরই। মজাটা পুরোপুরি আমার।

তাহলে জড়িয়েই পড়লুম। একবার পড়েছিলুম অনেক আগে, প্রায় বছর পাঁচ-ছয় হবে, নীলিমাকে প্রথম আদর করেছিলুম, পরীক্ষামূলকভাবে, আমাদের বাড়িতেই, দোতলায়, সিঁড়ির অন্ধকার বাঁকে। বেচারি আসছিল দোলনের পড়ার ঘর থেকে। দোলন আমার বোন, নীলিমা ওর সহপাঠী, বন্ধু; আর আমি বোনের সামনে একটু দাদাটে গাম্ভীর্য নিয়ে ওকে মৃদু উপদেশ দিতে আরাম বোধ করতুম। তারপর একসময় দোলন, বেশ বোঝা যায়, ইচ্ছে করেই চলে যেত, যেতই। এইরকম সুযোগ ও আমায় সেই সময় অকৃপণভাবে দিতে রাজি। বাংলা-দেশের হালচাল যেন ও জেনে ফেলেছে। এ পোড়া দেশে ভালোবাসাবাসির ক্ষেত্রে বোনের বন্ধু আর বন্ধুর বোনের শুভযোগ ছাড়া প্রেমটা গজায় কোথায়—এই গূঢ় তত্ত্ব জেনে নেওয়ার মতো চালাক হবার বয়স ওর চোখের কোণে, হাসির ঠোঁট-চাপা ঝিলিকে ভালোই জানান দিয়েছে। তাছাড়া সত্যি বলতে কী, প্রেস্টিজের মাথায় বাড়ি মেরে একদিন খোলাখুলি দোলনকে নীলিমা সম্পর্কে বলেই ফেলেছিলুম—যাকগে সেসব, মোটকথা, দোলনের ঘর থেকে নীলিমা নামছিল, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আমিও উঠছি একেবারে মুখোমুখি, সংঘর্ষ, বিদ্যুৎ। 'কী হচ্ছে—' এছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না ওর, খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না জিনিসটা; মনে হয় এর জন্যে ভূমিকা যথেষ্টই ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছিল। তরতর করে নীচে নেমে গেল। উঃ, কী দারুণ লেগেছিল সেদিন! অবশ্য এসবের পেছনে আমার তদানীন্তন বন্ধু ত্রিদিবেশের প্ররোচনা ছিল সাংঘাতিক। 'তোর দ্বারা কিসসু হবে না', 'তুই একটা উদো', 'পঁচিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, একটা মেয়ে জোটাতে পারলি না'—এইসব ক্রমাগত শুনে শুনে রক্তের ভেতর থেকেই একটা ধিক্কারবোধ আমায় দখল করছিল। না, ওসব ভাবার সময়, মেজাজ কিছুই আমার ছিল না প্রেম যে 'করা' যায় না, 'হয়ে ওঠে', এই ধরনের দর্শন নিয়ে বুঁদ হয়ে বসে চামনা পোড়াতে আমি চাইতুম না। আসলে চোখে সামনে দেখছি পার্কে, রাস্তায়—ইডে গার্ডেনে তো চোখ তুলে হাঁটাই যায় না-জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে ফিরছে, নিরঙ্কুশ মতো একটা নিরেট ইস্পাত একটাকে কীভাবে, কে, জানে—ক [illegible] সিনেমাটিনে যাচ্ছে; সুতরাং দর্শ[illegible]লে মারো। এক জেদ, নেশা, পঁচিশ বছরের রক্ত-মা আমাকে চেখে চেখে ভোগ করার দু তাগিদে একরকম হন্যে হয়ে উঠেছিল আর এইরকম একটা সংকটের সময় পেলুম নীলিমাকে। কালচে রঙ, চ পাতলা ঠোঁট, চোখের শাদায় নীলচে আ টুকু পুরোপুরি যায়নি, এবং ভাইট স্টাটিসটিকস কমবেশি ৩৪-২৫-৩৪। মাত্রই মনে মনে বলেছিলুম, 'একেই আ চাই।' দোলন এবং ঈশ্বরকে ধন পেলুমও। প্রকৃতপক্ষে চেহারা ছাড়া কিছু বাছবিচার করবার মতো অবস্থা আমার ছিল না। আর থাকবেই বা লেখাপড়া রুচি ইত্যাদি বিষয়ে মে চিরকালই আমরা অনেকখানি ছাড় এসেছি। সব মেয়েই প্রায় একঃ গয়না- সিকিউরিটি-উল্টোরথ-ম্যাটিনি আর এরই ফাঁকে একটার পর পরীক্ষায় দেদার বই মুখস্থ করে পাশ নেওয়া। অতএব বছর দুই লুকিয়ে চুটিয়ে প্রেম করে যখন একরকম 'ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা'র আর্থনীতিক কানুনে অ অবসাদ অনুভব করছিলুম, দু-চ দেখা না হলেও যখন আকাশ পড়তো না, তখন একদিন নীলিমা 'এবারের সম্বন্ধটা কিন্তু কিছুতেই পারছি না।'

কাজেই যেত না, যেরকম ভঙ্গীতে ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে গালে হাত রেখে আমার গান শুনতো তাতে আমার বেশ অহঙ্কার বোধ হোত।

'আপনি কেন গান শিখলেন না', ও বলতো, 'শিখলে কিন্তু কলম পিষতে হোত না আপনাকে।'

পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বেই আমার আশিক্ষিতপটুত্বের কথা ওকে বলেছিলুম। বলতুম, 'শিখিনি, শিখতে চাইও না। ইচ্ছে করেই।'

'ওমা, কেন?'

'শিখে তো অনেকেই গাইতে পারে, এতে আর ক্রেডিট কোথায়? আমি না শিখেই গাইছি, এবং খুব একটা যে খারাপ গাইনা, তার প্রমাণ তুমি আমার ভক্ত। তা এর একটা বিস্ময় আছে, নয় কি? সেটা নষ্ট করতে চাই না।'

'উঃ, কী শয়তান রে বাবা, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।' পূরবী দম করে বলে ফেলেছিল। সাংঘাতিক সত্যি কথা উচ্চারণ করেছিল ও, যা জেনেই।

দুই।। 'আপনি কাল আসেননি; অথচ আপনার জন্যে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা যাইনে, জানেন?'

'কী করে জানব', জানলার ধারে বসে একটা পেয়ারাগাছের দিকে ফাঁকা চাউনি মেলে জবাব দিয়েছিলুম—এটা আমার অভ্যাস, টপ করে মেয়েদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারি না। একটু সরিয়ে আনি দৃষ্টিটা, হয়তো এতে নিজেকে সহজ বলে মনে হয়, সেইভাবে জবাব দিয়েছিলুম, 'আমার না আসা আর তোমার সিনেমা না যাওয়ার মধ্যে আমি তো কোন সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য জানলে আসতে চেষ্টা করতুম হয়তো।'

'কথার কায়দা ছাড়া আপনি তো কিছুই জানেন না।'

'শুধু কথা? আর কিছু নয়? গান?'

'থাক, গানের কথা আর বলবেন না। গান গাইতে জানা আর গান জানা এক জিনিস নয়। এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ।'

'সেটাও তো একটা আর্ট। কজনে আড্ডা মারতে পারে বলো তো?'

'কেউ দিতে পারে না এক আপনি ছাড়া। উঃ, এত বাজে কথা বলেন না!'

'কাজের কথা বলা তো এ জন্মে হোল না!' (নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।)

'আজে!'

ওর রীতিমত নার্ভাস মুখ দেখে তৈরি জবাবটা না দিয়ে ঘুরিয়ে দিলুম কথার মোড়। মিঠুন আর নীলিমার ফোটো কতক অটো মাদা প্রিন্ট করিয়ে এনেছিলুম, সেগুলো পকেট থেকে বার করে বললুম, 'মানে হচ্ছে এই।'

ছবিগুলো দেখে নিশ্চয়ই ভেবেছিল, নীলিমা বলতে এখানে পূরবীকেই বোঝাচ্ছে। নইলে উত্তরে ও 'অসভ্য' শব্দটি উচ্চারণ করে নীচে নেমে গিয়েছিল কেন?

তা এই সমস্ত কথাবার্তার সাহায্যে পূরবী আমাকে একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলেছিল। ধ্বংসস্তূপের অনুভূতিটাই আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিল। একটা ভোঁতো, পানসে দিনযাপন আমার ঢেকে রেখেছিল, আমার যাবতীয় ভাবনা অনুভাবনাকে যেন পুঁতে ফেলেছিল। পূরবী আমাকে টেনে তুলেছিল সেই অসাড় অজস্র ধ্বংসস্তূপ থেকে। মনে হোল, আকাঙ্খাহীনতার আর এক নাম ধ্বংস, নিশ্চেতনাও সেও। পূরবীর পাশে নীলিমাকে ফেলে রেখে দেখলুম, নীলিমা, হায়, তারও আর এক নাম ধ্বংস।

ফলে যা হবার তাই হোল। নীলিমা বাধা দিল। ওর দোষ নেই। কিন্তু আমি তা শুনতে আদৌ রাজি নই। দোষ আমারও নেই। সরলতা যেখানে দেখানো কাজ হয়, সেখানে পূরবীদের বাড়িতে, দেখিয়েছি; কিন্তু কখনো নীলিমাকে কোন ফাঁকেই পূরবী সংক্রান্ত কোন কিছু বলিনি। তবু ও সব জেনে গেছে। একদিন খুব একটা অদ্ভুত বেজায়গায়—চেনাশোনা লোকের গায়েপড়া উপদ্রব এড়ানোর জন্যেই—আমরা দুজন পাশাপাশি হাঁটছি, সেখানেই, সর্বনাশ, দীনেনের মুখোমুখি পড়ে গেলুম। এ চুলোয় ওর কী দরকার কে জানে। দীনেন নীলিমার দাদা এবং আমার অভিশাপ। সেদিনই বুঝে গেছি, হয়ে গেল।

অশান্তি অনিদ্রা আমাদের সংসারকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বেচারি মিতুন। এই সব ঝগড়াঝাঁটি দেখে দেখে কেমন যেন কাঠ-কাঠ হয়ে থাকতো। মনোযোগটা ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে অনেক অনেকদিন পর নীলিমার ওপর পড়লো, যদিও অন্যভাবে। অর্থাৎ আমি ওকে ঘৃণা করতে শুরু করলুম। সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওর চোখে দাউদাউ জ্বলতো। সবসময়। দীনেন ওর বোনকে যা বলেছিল,—নিশ্চয়ই বলেছিল—ও প্রায়ই আমাদের বাড়ি দরকারে অদরকারে আসতো, তা 'রাজাবাজারে রণেনকে দেখলুম একটা ফর্সা মেয়ের সঙ্গে'—এর বেশী আর কী, হয়তো বড়জোর, 'মেয়েটাকে চিনিস তুই?'—কিন্তু নীলিমার কাছে এতো একটা ব্যাখ্যার লাইন। লাইনের পর লাইন, পাতার পর পাতা সন্দেহ আর অনুমান দিয়ে লিখে গেছে, শুধু লেখেনি, শুনিয়েছে। কী কুৎসিত গ্রাম্য সেই ভাষা। আমি প্রতিবাদ করতুম, 'পরে ওর 'একশবার বলব, হাজারবার বলব' শোনার পর রক্ত চড়াৎ করে মাথায় উঠে যেত। সজোরে ওর গালে মিতুনের সামনেই, চড় মেরে ওকে লুটিয়ে ফেলতুম মেঝেয়।

এসমস্ত ঘটনা আমার দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বলেছিলুম। তারা আমার বিপক্ষেই রায় দিয়েছিল। 'কোন বৌ-ই এতখানি ইনভলবমেন্ট সহ্য করবে না, পূরবীকে তুই ছেড়ে দে। ওসব বিবেক, একঘেয়েমি, বৌচন্দ্র এসব ছাড়। বৌকে ডিভোর্স করতে পারবি? পূরবীকে বিয়ে করতে পারবি?' তারা বলতো, 'তাছাড়া স্ক্যান্ডালের ভয় নেই? টাকা দিয়ে পারবি সেসব বন্ধ করতে? ধর নীলিমা সুইসাইড করলো, এসব ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়, টাকা ঢেলে থানা-পুলিশের হাঙ্গামা চাপা দিতে পারবি না। তবে?'

কথাগুলির সারবত্তা অস্বীকার করি না। পূরবীকে নিয়ে আমি কীইবা করতে পারি। একদিন না একদিন ওর বিয়ে হবেই। তখন? তখনকার কথা তখন—এইভাবে নিজেকে বুঝিয়ে প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ ধামাচাপা দিয়ে ওর বাড়ির দিকে পা বাড়াতুম সন্ধ্যের পর। কিন্তু আশ্চর্য, ইদানীং পূরবীর ব্যবহারও কেমন যেন পাল্টে গেছে। গগন কি কিছু ওকে বলেছে? হয়তো। প্রায় দিনই ওকে বাড়িতে পেতুম না, পেলেও কথাবার্তা তেমন বলতো না, দু'একটা আটপৌরে কথা বলাবলির পর নীচে নেমে যেত, গানের কথা তো উঠতোই না। একদিন দেখলুম গগনের সঙ্গে বসে বেশ হো-হো করে হাসছিল পূরবী, রেডিওয় চলছে বিবিধভারতী। আমি ঘরে ঢুকতেই পূরবী তরতর করে নেমে গেল। চুপচাপ একটা থাপ্পড় মারলো আমার গালে। গগনকে জিগ্যেস করলুম, 'এর মানে?'

'মানে পূরবী মোহমুক্ত। সেদিনই তো তোকে বললুম—'

'কিন্তু কী এমন হোল [illegible] ও এইভাবে—তুই কি কিছু বলেছিস ওকে?'

'বলিনি। তবে একদিন হয়তো বলতে পারি। কিন্তু ওর এই যে অ্যাটিচুড দেখলি, তাতে বোধহয় এমনিতেই ওর চৈতন্যোদয় হয়ে গেছে। তাছাড়া এ বাড়িতেও তো অবস্থা সুবিধের নয়। ওর মা এই ব্যাপারটাকে একদম নিতে পারে নি। এক-আধদিন আসতে পারতিস, কিন্তু তুই একে মাস্টারির ছলে রেগুলার আসতে শুরু করে দিলি। আমার অবস্থাটা ভাব একবার।' গগন তোড়ে আমায় বকে যাচ্ছিল। পূরবী এইসময় একবার এসেছিল গগনকে ডাকতে। আমি ওকে ডাকলুম : 'পূরবী শোন।'

'কি বলুন।'

রেডিওটা আমি নিজেই বন্ধ করে [illegible] দিকে চোখ স্থির করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার এইভাবে আমাকে অপমান করার মানে?'

পূরবী চুপ করে রইল।

আমি প্রশ্নটা আবার একই [illegible] রাখলুম। গগন কলম নিয়ে হিজিবিজি কাটছিল। এবারও পূরবী নিরুত্তর। স্তব্ধতা টাইমপিসের শব্দ। ঘরের আমরা তিনজন। আমি পূরবীর কাছে কিছু শুনতে চাই। কিন্তু ও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আমাকে উপেক্ষার চ[illegible]

উঠিয়ে সেখান থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ও ঘর থেকে চলে গেল।

কারণ রহস্যময় অথবা স্বাভাবিক যাই হোক না কেন পূরবী যা করলো তাতে নীলিমার ইচ্ছেই শেষ পর্যন্ত সম্মানিত হোল। পূরবীর বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলুম। রাগে অপমানে ওকে যা খুশি বলতে পারতুম নীলিমার চেয়েও তীব্র ভাষায়। সুযোগ পাইনি। ফলে ছটফট করছিলুম। কিন্তু ওদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলুম।

'এই তো চাই,' গগন বলেছিল 'এই সংযমটাই তো দরকার।'

মেট্রোর পাশে কাফে-ডি-মনিকোর দোতলায় বসে বসে আমাদের কথাবার্তা চলছিল। এর আগে আমি শূন্যমনে, অফিস থেকে বেরিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরছিলুম। লোকজন, শিল্প-সাহিত্য, বন্ধুবান্ধব অর্থহীন; পূরবী—ওর এতখানি স্পর্ধা, কী ওর আছে রূপ ছাড়া, তাইবা কী এমন, পথেঘাটে ওর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী দেখা যায়। না, মেয়েদের মুখ আর দেখতে ইচ্ছে করে না, মুখ দেখলেই ভালোবাসার টানে পৌঁছিয়ে যেতে হয় স্মৃতিতে, পূরবীর ঘরে। না, মুখ না, শরীর, চেহারা, যৌবন। ধাঁধিয়ে দেয় চোখ, বোধ স্মৃতি, সত্তা, খসিয়ে দেয় দেহ থেকে মন, দৃষ্টি থেকে ভাব। কলকাতার উজ্জ্বলতা: জঙ্গল ছাড়া কিছু নেই: অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই, রাত্রি ছাড়া কিছু নেই; শুধু চেয়ে দেখ, বন্দি হও, ডুবে যাও জঙ্গলের অন্ধকারে: কে বললে শূন্যমনে, মিথ্যে কথা; ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ঐতো একটা গোলাপি শাড়ি: দেখ: কাটাও ভিড় সরাও, এগোও। এগোচ্ছিলুম। এমন সময় গগন পাকড়াও করলো। তারপর চা খেতে খেতে আমার পূরবী-সংক্রান্ত সংযম অনুমোদন করলো। উপদেশ দিল সমাজ, ঐতিহ্য, স্বাধীনতার সীমারেখা সম্বন্ধে। চায়ের পয়সা গগনই দিয়েছিল। সুতরাং উপদেশগুলো চায়ের সঙ্গেই গিলতে হয়েছিল।

নীলিমা রোগা হয়ে গেছে। একদিন ভালো করে ওকে দেখলুম। ব্লাউজের হাতা-দুটো ঢলঢলে হয়ে গেছে; পিঠের শিরদাঁড়া আগে ঢোকানো থাকতো, দুপাশে নরম মসৃণ মাংস উপচে পড়তো, এখন শিরদাঁড়া ফুটে উঠেছে। ভালো করে খায় না, ঘুমোয় না, মিতুনকে নিয়ে টানাপোড়েনও কম নয়। সারাদিন আমি তো বাড়ি থাকি না। মায়া হোল। সেদিন রাত্রে ওকে কাছে টেনে আদর করতে ইচ্ছে করলো।

'আমার গায়ে তুমি হাত দেবে না', আমাকে সরিয়ে দিয়েছিল ও, 'ওই হাতে তুমি একটা নষ্ট মেয়েছেলেকে ছুঁয়েছিলে। এখনও ছোঁও।'

'নষ্ট মেয়ে বলছ কেন?' বোঝাবার ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

'বলব না! বৌ রয়েছে, মেয়ে রয়েছে যার, তাকে নিয়ে ঢলাঢলি—ওর তো ওই পেশা।' নীলিমার ক্রোধ ওর সুন্দর ভুরু দুটোকে বিশ্রীভাবে কুঁচকে একটা কুটিলতাকে আকার দিল। আমি ধৈর্য হারালুম না তা সত্ত্বেও।

'নীলিমা, প্লিজ, ওসব বোল না। তোমার আর আমার মধ্যে কোন থার্ড পার্সন আনতে চাই না। ওর কথা বাদ দাও।'

'বাদ আমি দেব কেন, তুমিই দাও। আর থার্ড পার্সনের কথা বলছ? মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না। তুমি মিথ্যেবাদী।' কাঁদছিল।

'একটা মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটলে কি, গল্প করলে ভালোবাসা হয়, তুমি মানো?' নীলিমাকেও প্রবোধ দেওয়া আমি জরুরি বোধ করছিলুম। অনেক অনেকদিন পর, মনে হোল, আমার নিজের বলতে নীলিমা ছাড়া কে আছে। সেদিন ওকে প্রবোধ দিতে গিয়ে যা যা বলেছি তার সবই সত্যি নয়, হতে পারেও না এবং সব কথাই যে ও বিশ্বাস করেছিল তাও নয়; কিন্তু সব জড়িয়ে সেই রাত্রি—এবং আরও অনেক রাত গেছে এ ধরনের কথায়- আমার অনুতাপের সুরটাই প্রচ্ছন্ন ছিল। অনুতাপ, সেই সঙ্গে বুদ্ধিমত্তাও কাজ করছিল বৈ-কি। বুদ্ধি, কেননা সব কথাই সত্যি বলতে পারিনি এবং অনুতাপের আন্তরিকতা এই সমস্ত অনিবার্য ও সুচিন্তিত মিথ্যের মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে কোন পাথরই ছুঁড়তে বাকি রাখিনি। হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা কথা জানাতে ভুলে গেছি, পূরবীকে একদিন নিউমার্কেট থেকে বেরুতে দেখছিলুম, সঙ্গে বেশ লম্বা স্মার্ট চেহারার একটা ছোকরা। এই তথ্যের সঙ্গে যে ভাষাটা যোগ করেছিলুম নীলিমাকে শোনাবার জন্যে তা এই: 'নীলিমা, তুমি ঠিকই বলেছিলে, পূরবী আসলে বাজে টাইপের মেয়ে।'

এই সিদ্ধান্তটা আমার পক্ষে খুব প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন নীলিমার স্বার্থে, মিতুনের স্বার্থে আর এদের স্বার্থ বাঁচাতে গিয়ে আমারও স্বার্থে। পূরবীকে সরিয়ে দিতেই হবে। নীলিমা চেয়েছিল। এতদিন পর আজ আমিও তাই চাইছি। যে সিদ্ধান্ত দুঃসাধ্য অকল্পনীয় ছিল, কত সহজেই তা নিষ্পন্ন হোল। পূরবীকে ধন্যবাদ। ওর ব্যবহারই শেষে একটা ধারালো দয়াহীন ছোরা হয়ে আমার ভাবনায় ধরা দিল। এই ছোরাতেই ওর সম্পূর্ণ অজান্তে ওকে আমূল বিদ্ধ করলুম। সেই ছোরা যা ওর ব্যবহার অথবা ওর ব্যবহার থেকে জাত আমার সিদ্ধান্ত: বিচ্ছেদ, অর্থাৎ সেই দুঃসাধ্য বিচ্ছিন্নতা, মানে, পূরবী, তুমি অত্যন্ত বাজে টাইপের মেয়ে। বিচ্ছেদ শব্দের অর্থ তোমাকে গণিকা বলে ভাবা। বড় ভালো পদটা লিখেছিল সুদীন। ঠিক কথা। তবে শুধু ভাবা নয়, এর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তিও খাড়া করতে হবে। কী দরকার ছিল ওর আমাকে? কী করতে পারতো ও আমায় নিয়ে? কিচ্ছু না। শুধু আমাকে ওর একটা মজার উপকরণে পর্যবসিত করা, আমাকে অবলম্বন করে নিজের যৌবনটাকে রাণীর অহংকারে আমার সামনে জাহির করা, হয়তো ওই ছোকরাটির সঙ্গে এই নিয়ে হাসাহাসি করা। আমি চিৎকার করে মনে মনে ঐ বিগলিত কণ্ঠে যুবকটিকে বলেছিলুম: মহাশয়, আপনি কি জানেন, এই মেয়েছেলেটি কে? ঐটি হ্যান্ড টাচড হার কিসড হার, এই সেদিনও টাঙ্গাতে—ইয়েস পূরবী, সি ইজ এ স্ট্রাম্পেট, বেশ্যা!

মারা গেল। ছুরিটায় তাজা খুন জ্বলজ্বল করছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে তা মুছে নিলুম। নিশ্চিহ্ন দিয়ে শান্তিতে। তবে একেবারে পরিষ্কার হয়নি, মুছতে মুছতেই হবে। তারপর ফিরে এলুম কোজা প্যারাডাইসে, নিরাপদ দুর্গের খাঁচের ভেতর।

রামমোহনের বিচার

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

একটি চাবি দিয়ে যেমন সমস্ত তালা খোলা যায় না তেমনই একই মানদণ্ডে সব মানুষের বিচার হয় না। বিশেষত রামমোহনের মতো বহু স্তর-ও-মাত্রা-বিশিষ্ট বিরাট ও জটিল পুরুষের বেলায় বিচারের মানদণ্ড বারেবারেই পাল্টে নিতে হবে। আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে একটি দৃষ্টান্ত দিলে। বেদান্ত চর্চার মৃত ধারাকে রামমোহনই বাংলায় পুনরুজ্জীবিত করেন। অথচ যখন কোম্পানী সরকার বেদান্ত শিক্ষার কলেজ খোলার পরিকল্পনা করল তখন আবার তিনিই তার বিরোধিতা করেন। যদি একটিমাত্র মানদণ্ডে তাঁর আচরণকে বিচার করতে চাই তাহলে দেখব, এখানে তাঁর আচরণ নিঃসন্দেহে স্ববিরোধতা ও অসঙ্গতিতে লাঞ্ছিত।

এবার মানদণ্ডটি পাল্টে দেখা যাক যে, রামমোহনের ওই দু রকম আচরণের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা। ধর্ম হলো ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর চর্চার বিষয়, অন্য পক্ষে রাষ্ট্র হলো বহুতর বিশ্বাসসম্বলিত জনসাধারণের স্বার্থ কল্পনা করার জন্যে প্রতিষ্ঠান। তাহলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ চর্চার জন্যে কলেজ কেন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে? সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগ্রন্থ চর্চার কলেজ ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র তা পারে না এইটেই ছিল রামমোহনের ওই আপত্তির ভিতরের যুক্তি। মুশকিল হচ্ছে, সবাই সব বোঝে না। ধর্ম ও রাষ্ট্র দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস, দুটির এক্তিয়ারও দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এলাকায়। সেকুলারিজমের এই মূল কথাটা এখনও অনেকে বোঝে না, তখনকার কালে তো আরও কেউ বুঝত না। সুতরাং যেমন যুক্তি বড়োলাট সাহেবের বোধগম্য ছিল তেমন যুক্তিই রামমোহন দিয়েছেন।

আসল কথা হলো, বহু দিকের বহু পরিকল্পনা মস্তিষ্কের আলাদা আলাদা দেরাজে আলাদা আলাদা তাক-তাকিতে গুছিয়ে রেখেছিলেন রামমোহন। সেজন্যে আমাদেরকেও তাঁর পরিকল্পনাগুলি আলাদা আলাদাভাবে বেছে বের করে, সেগুলোর নির্ঘণ্ট তৈরী করে এমনভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে তাঁর বিচিত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের একটা পুরো ছবি সম্পূর্ণ চোখেই খুব স্পষ্ট ফুটে পায়।

কিন্তু ব্যক্তিকে পরিকল্পনার [illegible] দিয়ে প্রথমেই একটা সমস্যার সম্মুখীন হই। [illegible] এই ঃ রামমোহনের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের সম্পর্কটাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করব? শুনে হয়ত অনেকে অবাক হবেন, কেননা সকলেই জানেন, রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের জনক। তার মানে তাঁর সঙ্গে দেশের সম্পর্কটা অনেকখানি পিতাপুত্রের সম্পর্ক, তিনি হলেন জনক আর আধুনিক ভারত তাঁর ভাব-সন্তান।

এখানে উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, ওইভাবে জনক-সন্তানের সম্পর্ক নির্ধারণ করলে সত্যিই রামমোহনের অনন্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ও যথার্থ ধারণা আমরা লাভ করি কিনা। তেমন ধারণা লাভ করতে হলে জানা চাই যে আধুনিক ভারতবর্ষ কাকে বলে। আধুনিক মানে এখনকার কাল বোঝায়, নাকি এখনকার কালের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়? আবার বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ দিলে আরও গোল বাড়ে ঃ এখানে বৈশিষ্ট্য বলতে শুধু চলতি বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবে, না এমন কোনও বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবে যা আগেকার কালেও ছিল, তবে আগেকার কালে তা ছিল অপ্রধান রূপে, ছাই-চাপা আগুনের মতো?

এসব গোলমেলে ব্যাপার এড়াবার একটা সহজ পথ আছে। যদি বলি, আগে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও মারা হতো বা মরতে হতো, তার মানে আগে সতীদাহ প্রথা ছিল, এখন নেই কিম্বা আগে বিজ্ঞান শেখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, এখন আছে, সুতরাং সতীদাহ প্রথার অভাব, বিজ্ঞান শেখার ব্যবস্থা ইত্যাদি আধুনিক জিনিস এবং এই জিনিসগুলি প্রবর্তনের পেছনে রামমোহনের অবদানই প্রধান তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায় নাকি? কিন্তু আগেকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের একরকম প্রতিতুলনা করার একটা সমস্যা আছে। সেই সমস্যাটা বোঝার জন্যে সতীদাহ প্রথার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। এই প্রথা আগেকার কালেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ছিল না, এখনও নেই, এর থেকে কি সত্যিই কিছু প্রমাণিত হয়? না, অনাধুনিকতা বা আধুনিকতা কোনটাই এই ঘটনাতে প্রমাণিত হয় না।

[illegible] আমরা অনেক সময়ই বিশিষ্ট ব্যক্তির [illegible] তাঁর জীবনের কতকগুলি ঘটনার আগে উল্লেখ করি, তারপরে বলি যে সেগুলো তাঁর আধুনিকতার সাধনা। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাটা যে আধুনিকতারই একটা অঙ্গ বা লক্ষণ তা প্রমাণ করা হলো না। এই পদ্ধতিকে বলতে পারি ব্যক্তি বিশেষের জীবনীর মাপ অনুসারে আধুনিকতাকে মাপ খাইয়ে নেওয়া। অর্থাৎ আগের থেকেই ব্যক্তিকে আমরা আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসেবে ধরে নিই এবং পরে তাঁর আচরণগুলিকে ব্যাখ্যা করি আধুনিকতার পথে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে। এতে আমরা ব্যক্তিবিশেষের আচরণ দিয়ে আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করি।

উল্লিখিত পদ্ধতির প্রধান সুবিধা এই যে, এতে আলোচনাকারীকে বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। রামমোহনের মূল্যায়ন করার সময় এই পদ্ধতির প্রয়োগ কি রকম হতে পারে? তাঁর একখানি জীবনী হাতের কাছে রেখে তার থেকে তাঁর জীবনের কতকগুলি কাজের একটা তালিকা প্রস্তুত করে নেব আগে, তারপরে সেই কাজগুলোকে তাঁর অনন্যতার সাক্ষ্য বলে ঘোষণা করব এবং সেই সাক্ষ্যগুলোকে ঐতিহাসিকের মতো ভঙ্গীতে এ [illegible] তাঁর আধুনিকতার জাজ্বল্য প্রমাণ বলে দাবী করব। এটা হলো ব্যক্তির মানদণ্ডে আধুনিকতার পরিমাপ।

উল্টো পদ্ধতি হলো আধুনিকতার মানদণ্ডে ব্যক্তির মূল্যায়ন। এতে আগেই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আলোচনাকারীর মতে আধুনিকতা জিনিসটা কি; এবং তারপর সেই মানদণ্ডে আলোচ্য ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ, বক্তব্য ও চিন্তা কতটুকু বা কতখানি খোপে টেঁকে তার বিচার করতে হবে।

এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো, আধুনিকতার সম্যক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। সে-সংজ্ঞা এমন হওয়া চাই যা বাংলার বেলায় যতটা খাটবে মহারাষ্ট্রের বেলাতেও ততটাই খাটবে, মহারাষ্ট্রের বেলায় যতটা খাটবে ইটালীর বেলাতেও ততটাই খাটবে, জার্মানীর বেলাতেও ততটাই খাটবে, কিংবা ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের বেলাতেও ততটাই খাটবে, আবার রাশিয়া বা চীনের বেলাতেও তা হওয়া চাই সমান সত্য। সমস্ত কাল ও সমস্ত দেশের বেলাতেই যা আধুনিক তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সোজা নয়।

সাধারণভাবে আধুনিক বলতে আমরা বুঝি এমন জিনিস যা আগে ছিল না। যদি কেউ বলেন যে, ভারতবর্ষের আধুনিকতার সংজ্ঞায় ইংরেজী ভাষার প্রচলন একটা

বিবেচ্য বিষয় তাহলে কালের তুলনায় উনি সত্যি কথাই বলেছেন, কেননা আগে এদেশে ইংরেজী ভাষা ছিল না, এখন তা আছে। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে যে আধুনিকতার এই সংজ্ঞা শুধু দেশ সম্পর্কিত তুলনায় সীমাবদ্ধই নয়, তা পুনরুক্তিদুষ্ট সংজ্ঞাও বটে। এ ধরনের সংজ্ঞাকে ইংরেজীতে বলে টটোলজিক্যাল ডেফিনেশন : যা আগে ছিল না অথচ এখন আছে তাকে আধুনিকতা বলাও যেমন, যা বিনা তারের যন্ত্র তাকে বেতার বলাও তেমনই। আবার অনেকে বলেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেনেশাঁসের ফলে যেসব ভাবধারার উদ্ভব হয় সেগুলো-কেই আধুনিকতা বলে। এই সংজ্ঞাকে কালজ্ঞাপক বলতে পারি। কিন্তু কাল বা সময় তো একটা ধারাবাহিক প্রবাহ। তাহলে বলতে হয় যে কালের গর্ভে বাহিত হয়ে এসে কতকগুলি ধারণা যখন স্রোতের উপরে ভেসে ওঠে তখন তা আধুনিকতা আখ্যা পায়, অর্থাৎ সে-ধারণাগুলি আগে-কার কালেও ছিল, তবে তা ছিল চোখের আড়ালে, আপাত অদৃশ্য ভাবে, এবং যখন আপাত দৃশ্যমান হলো তখনই তা আধু-নিকতা হলো। এখানে আধুনিকতার বিচারে 'আপাত' ব্যাপারটার উপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নাকি? আধুনিকতা একটা আপাত ব্যাপার নাকি মৌল ব্যাপার? আবার অনেকে বলবেন, প্রযুক্তি-বিদ্যার অধিকতর প্রয়োগই হলো

আধুনিকতা। এই দৃষ্টির প্রকারে বলা হয় যে ভারতবর্ষে বিশেষ ব্যবহারেরো কখনও উঁচুতেই আধুনিকতা নির্ধারণীয়, তার কোনও তত্ত্বগতভাবে ব্যবহারিক ভিত্তি নেই।

এরকমভাবে আধুনিকতার আরও অনেকগুলো সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কোনও সংজ্ঞা দিয়েই আধুনিকতার সমগ্র স্বরূপকে ব্যক্ত করা যায় বলে মনে হয় না। তাই সংজ্ঞা দেওয়ার চাইতে আধুনিকতার লক্ষণগুলোকে তালিকাবদ্ধ করার চেষ্টাই বাস্তববোধসম্মত।

এই লক্ষণগুলো খুঁজে খুঁজে বের করার সময় তিনটি কথা মনে রাখতে হবে: প্রথমত, লক্ষণগুলো হবে এমন যা আগে ছিল না, যা ঐতিহ্যের থেকে স্বতন্ত্র, যা সংরক্ষণের ধারার অন্তর্গত নয়, যা সংযোজনের ধারার অন্তর্গত, দ্বিতীয়ত, উপরন্তু সেগুলো হওয়া চাই সম্পূর্ণরূপে মানুষের জীবনের উপরে নির্দেশীয়; এবং, তৃতীয়ত, সেগুলোর সঙ্গে মানুষের ভালো-মন্দের বা মূল্যবোধের প্রশ্ন অবশ্যই সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই।

এবার আধুনিকতার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ খুঁজে বের করা যাক।

প্রথম লক্ষণ, পরলোকের চাইতে ইহলোকের, অলৌকিক জীবনের চাইতে লৌকিক জীবনের গুরুত্ব বৃদ্ধি। আগের কালের মানুষ, এমন কি প্রাগ্রসর সম্প্রদায়ও, সাধারণভাবে মৃত্যুর পরে কি হবে না-হবে তা নিয়েই বেশী ভাবিত ছিল; যে উচ্চ সম্প্রদায় ভোগবিলাসে জীবন কাটাত তারাও নীতিগতভাবে বিশ্বাস ও প্রচার করত, ইহলোকের কর্তব্যকর্ম হলো পরলোকের জন্যে পাথেয় সঞ্চয় করা। আধুনিক জীবনে পারলৌকিক ও অলৌকিক চিন্তা একেবারে লুপ্ত না হলেও ইহলৌকিক ও লৌকিক চিন্তার মূল্য নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলো—মানুষ অসংকোচে দাবী করল যে মৃত্যুর আগেই, মর্তের জীবনেই তার আনন্দ ও প্রসাদ, শ্লাঘা ও সুখ, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য চাই।

দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয় ও সেই পরিচয়ের জন্যে মর্যাদাবোধের উন্মেষ। আগে মানুষের পরিচয় ছিল তার জন্ম বংশ সম্প্রদায় বর্ণ জাতি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ সমাজে তার স্থান নির্ধারিত হতো তার এমন সব পরিচয় দিয়ে যার উপরে তার নিজের কোনও হাত থাকত না—একবার কোনও বিশেষ বংশের বা বর্ণের ঘরে জন্মালে তার মৃত্যু পর্যন্ত সে-পরিচয় [illegible] [illegible] লেবেল রূপে তার গায়ে সেঁটে থাকত, নিম্ন বর্ণের ঘরে জন্মালে পাশাপাশি [illegible] অধিকার সে পেত না, মন্দিরে ঢোকার নিষেধ ছিল তার জন্যে, পক্ষান্তরে [illegible] [illegible] [illegible] তারা যদি হীন আচরণে [illegible] [illegible] হতো, [illegible] তারা যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পরিচয়ের স্থান নিল মানুষের বিকাশশীল পরিচয়। এতে দেখা গেল মানুষ নিজের প্রয়াস ও প্রযত্ন নতুন নতুন দিকে তার বৃত্তিগুলোকে চালনা করতে পারে, শূদ্র হয়ে পারে ব্রাহ্মণের চাইতে বেশী বিদ্বান, দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেও স্বোপার্জিত প্রতিভার বলে একজন হতে পারে অসামান্য ধনিক। এমনও দেখা গেল যে মানুষ নিজের প্রবৃত্তি ও পরিবেশকে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত করতে পারে, গড়ে তুলতে পারে আপন অস্তিত্বের পরিপোষক রূপ, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার টানে জন্ম-পরিচয়কে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার সম্পূর্ণ একান্ত নিজস্ব পরিচয়। এটা হলো মানুষের ব্যক্তি-পরিচয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক স্ব-এর ব্যক্তিত্বের পরিচয়।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা হলো আধুনিকতার তৃতীয় লক্ষণ। আপাতদৃষ্টিতে যা-ই মনে হোক, নিবিড় দৃষ্টিতে ব্যক্তি-পরিচয় আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা একই জিনিসকে বোঝায় না। যেমন মানস সরোবরের অন্যতম পরিণাম গঙ্গা নদী তেমনই দ্বিতীয় লক্ষণটির অন্যতম পরিণাম তৃতীয় লক্ষণটি। যদি ব্যক্তি হিসেবে আমি যা তুমিও তা-ই আর সেও তা-ই হয় তাহলে তুমি যা বলবে আমি তা চোখ-কান বুজে সত্য বলে মেনে নেব না, আমার মতো আমি বিচার করে দেখব কোনটা বেঠিক কোনটা সঠিক, কোনটা মিথ্যা কোনটা সত্য, কোনটা বর্জন করব আর কোনটা করব গ্রহণ। ব্যক্তির বিকশিত বিদ্যাবুদ্ধিতে পরীক্ষা ও বিচারের পরে প্রাপ্ত সত্যকে নিজের জীবনে পালন করার, গ্রহণ করার যে-অধিকার তাকে বলব ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পর্ক এতই অন্তরঙ্গ যে দুটোকে আলাদা করাই কঠিন, কেননা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরও তাৎপর্য একই। নিজের সামর্থ দিয়ে স্বাধীনভাবে সত্যকে খুঁজে বের করার যে-নীতি তাকেই বলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে অনেক সময় যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কথাটাও ব্যবহৃত হয়।

ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সবাইকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় যে সকলেই এই স্বাধীনতার কম-বেশী সমর্থক, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এখানে তাদের মধ্যে যুক্তির মাত্রা অত্যধিক, কেননা কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতার পথে বাধা দুস্তর। জীবনধারণের জন্যে, অন্নসংস্থানের জন্যে অর্থাৎ অর্থনীতির কতকগুলি স্থূল কারণে যাকে অন্যের উপরে নির্ভর করতে হয় তাকে অন্যের মর্জি বুঝে, মন জুগিয়ে, প্রসাদ কুড়িয়ে চলতেই হয়, সেখানে সেই পরনির্ভরশীল ব্যক্তিটি নিজের স্বাধীন মত অনুসারে যুক্ত বুদ্ধিতে চলতে গেলে আর অন্ন-সংস্থান না-ও পেতে পারে, আশ্রয়ও হারাতে পারে, তার গোটা অস্তিত্বই বিপন্ন

মেয়েদের অবস্থার দিকে তাকালেই আর্থিক স্বাবলম্বিতার গুরুত্ব বোঝা যায়। আর্থিক স্বাবলম্বিতাই হলো ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান প্রাকশর্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ আর্থিক স্বাবলম্বিতা হলো আধুনিকতার চতুর্থ লক্ষণ।

এই চতুর্থ লক্ষণটির প্রকাশ ঘটে কোনখানে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে জানা চাই যে একজন-দুজন ব্যক্তির আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রকাশ আমাদের অভিপ্রেত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির সমষ্টিগত যে-রূপ বা যে-রূপকে জনসাধারণ বলে তার বেলাতে আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রকাশের ক্ষেত্রটিই আমাদের মূল অন্বিষ্ট। অর্থাৎ আমরা জানতে চাইছি যে, জনসাধারণের বেলাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত হলো কি হলো না তা যাচাই করা হবে কিসের ভিত্তিতে? সেই ভিত্তিটা হলো রাজনীতি। কাকে বলে রাজনীতি? জনসাধারণের জীবন সম্পর্কিত বিধান ও ব্যবস্থাগুলোর প্রতি অনুধাবনা। আগেকার কালে রাজনীতি ছিল একথা সত্যি বটে, কিন্তু সেকালে রাজনীতি নিয়ে শুধু রাজা ও রাজকর্মচারীরাই সাধারণত মাথা ঘামাত। আধুনিকতার পঞ্চম লক্ষণ হলো নিজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ও অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জড়িত বিষয়গুলোতে তথা রাজনীতিতে জনসাধারণেরই সচেতন হয়ে ওঠা।

ইংরেজীতে যাকে এমপ্যাথি বলে তাকে বাংলায় বলতে পারি আত্মসম্প্রসারণক্ষমতা এবং এইটে আধুনিকতার [illegible] লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে এইটে হলো [illegible] লক্ষণ। ব্যক্তি) ইহকালীন লৌকিক জীবনের সম্ভার (দ্বিতীয় লক্ষণে বর্ণিত), বিকাশশীল ব্যক্তিসত্তার, (চতুর্থ লক্ষণে বর্ণিত) স্বাবলম্বিতাতে সুরক্ষিত (তৃতীয় লক্ষণে বর্ণিত) নিজের স্বাধীন অধিকারে (পঞ্চম লক্ষণে উল্লিখিত) জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে সনাক্ত করার ক্ষমতা। এতে এক ব্যক্তি নিজস্ব পরিচয়ের গণ্ডি লঙ্ঘন করে অপর কোনও ব্যক্তির পরিচয়ের ভিতরে ঢুকে বেমালুম মিশে যেতে পারে। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। যদি প্রশ্ন করি, তোমাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করলে কি করবে? তাহলে তিন রকম উত্তর পেতে পারি—আমি কখনও ও-সব [illegible] নিয়ে মাথা ঘামাই না, অথবা, মিনিটারী নামিয়ে সব ফাঁকিবাজকে রাতারাতি ঠিক করে দেব বা এরকম কিছু, অথবা, এমন কোনও উত্তর যা প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান কল্পনার সঙ্গে ভালোভাবে মেলে। প্রথম উত্তর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে উত্তরদাতা নিজের পরিচয়ের গণ্ডি ছেড়ে বেরোতে রাজি নয়, দ্বিতীয় উত্তরদাতা অবশ্য বেরোবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার কল্পনা এমনই উদ্ভট যে বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে গেছে কিম্বা বাস্তবের দিকে আসতে পারেনি, তৃতীয় উত্তর থেকে বোঝা যায় যে উত্তরদাতা ব্যক্তিটি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর স্থানে নিজেকে কল্পনা করতে পেরেছে, [illegible] প্রধানমন্ত্রীর

পরিচয়ের মধ্যে, একাত্ম হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। শেষের কবিতা'র নায়ক বলেছে, সব অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকার নামই সভ্যতা। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে ওইটে আসলে সভ্যতার নয়, আধুনিকতারই একটি অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ — প্রধানমন্ত্রীর অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, আবার বিদেশে গিয়ে বিদেশী খাওয়া-দাওয়া আচার-প্রথা আবহাওয়া সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই প্রস্তুত থাকার জন্যেই চাই আত্মসম্প্রসারণক্ষমতা, সকলের সঙ্গে নিজেকে সনাক্ত করার ক্ষমতা।

এভাবে আধুনিকতার বহু লক্ষণ একে একে নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হলো আধুনিকতার সমস্ত লক্ষণ-গুলোর তালিকা তৈরী করা নয়, রাম-মোহনের বিচার করার কি কি পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করতে পারি সে সম্বন্ধে খানিকটা পরিষ্কার ধারণা অর্জন করা। ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উল্লিখিত দু-টি লক্ষণই যথেষ্ট। এখন দেখা যাক যে লক্ষণ-গুলোর সঙ্গে রামমোহনের বিভিন্ন ভাবনা-ধারণা কতখানি মেলে। মনে রাখা ভাল যে ঘটনার কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্য আধুনিকতার বিচারে নেই। রামমোহন বেদান্ত প্রচার করলেন অথবা রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করলেন এসব ঘটনা সাঁচা কি মিথ্যে তা নিয়ে তর্ক চালালে আর আধুনিকতার সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক নির্ধারণ করা যাবে না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মধুসূদন সরস্বতীর মতো বৈদান্তিক রামমোহনের অনেক আগেই বাংলায় জন্মেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, মধুসূদন সরস্বতী যা জানেন না বিদ্যার দেবী সরস্বতীও তা জানেন না। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে মধুসূদনের নাম যোগ করার কথা কারও মাথাতেই আসে নি। কেননা, বেদান্তের চর্চা করা—শুধু এই ঘটনাটি আধুনিকতার সঙ্গে কোনমতেই সম্পৃক্ত নয়। তাহলে কি সেই জিনিস যার সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক এমন যে তাকে বাদ দিলে আধুনিকতাই পাত্রচ্যুত জলের মতো এলিয়ে-গড়িয়ে-ছড়িয়ে পড়ে যায়? সেই জিনিস হলো ঘটনার পেছনে যেসব নীতি ও সূত্র, যেসব আদর্শ ও কল্পনা কাজ করে সে সবের সমষ্টিগত ভাবসত্ত্ব। সুতরাং আমরা আগে ঘটনার উল্লেখ করব, তারপর তার আদর্শগত ভিত্তির সন্ধান করব।

আধুনিকতার প্রথম লক্ষণটির সঙ্গে রামমোহনের জীবনের অসংখ্য ঘটনারই খুব গভীর মিল আছে, সেই ঘটনাগুলোর মধ্যে শুধু একটি ঘটনারই এখানে উল্লেখ করব। সেই ঘটনাটি হলো বেদান্ত শিক্ষার জন্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে ১৮২৩ খৃস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের চিঠি—তাইতে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে কলেজ প্রতিষ্ঠার সরকারী উদ্যোগ দাবী করে-ছিলেন। বিজ্ঞান কি শিক্ষা দেয়? ইহ-লৌকিক জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার, ওই জীবন ও জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হওয়ার শিক্ষা দেয়। তার মানে বিজ্ঞান শিক্ষার তাৎপর্য হলো ইহ-লোক ও লৌকিক জীবনের সত্য সম্বন্ধে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ঘটনার পেছনে এই তাৎপর্যটাই বড়ো কথা।

এবার দ্বিতীয় লক্ষণটির প্রতি মনো-যোগ দিই। এর সঙ্গেও রামমোহনের জীবনের অসংখ্য ঘটনার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান—যেমন জন্মসূত্রে তিনি যাঁদেরকে আত্মীয়স্বজন হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশ ছিন্নই হয়ে যায়, যাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাঁরা সকলেই তাঁর নিজের সৃষ্ট স্বজন; তাঁর বিপুল সম্পত্তিরও তিনি নিজের বুদ্ধি ও শ্রম দিয়েই উপার্জন করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর স্বজন-সম্পদ সবই তাঁর বিকশিত ব্যক্তিত্বের উপার্জন। আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি : রামমোহন বেদান্তের বাংলা অনুবাদ করে সেগুলো বিলিও করেন। এইটে খুবই নতুন ব্যাপার, অন্যান্য ধর্ম-সংস্কারকরা সর্বসাধারণের জন্যে ধর্মগ্রন্থের উদার ব্যাখ্যাই এতদিন পর্যন্ত দিয়ে এসেছেন," কিন্তু রামমোহনই সর্বপ্রথম সর্বজনবোধ্য ভাষায় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করে দিলেন। কোনও নতুন ব্যাখ্যা না দিয়ে, মোটামুটি শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যারই পুনরাবৃত্তি করে তিনি কেন শাস্ত্রগুলি বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন? তার মানে তিনি চাইলেন যে সকলে সরাসরি শাস্ত্রগুলিই পড়ুক, নিজেরা পড়ুক, নিজেরা ব্যাখ্যা করুক, নিজেরা বিচার করুক। কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করার ও বিচার করার কে? আমি কি মুনি-ঋষি, আমি কি ঈশ্বরের অংশে জন্মেছি, আমি কি সরস্বতীর বিশেষ আশীর্বাদে ধন্য, আমি কি মহাবিদ্বান ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান? এসব কিছুই আমি নই, তবু আমি বেদান্ত পড়ার, বেদান্ত বিচার করার অধিকারী কেননা আমি যে ব্যক্তি বা প্রাতি-স্বিক এইটাই আমার সবচাইতে মহিমান্বিত পরিচয়।

ব্যক্তি-পরিচয়ের অধিকারে আমি না হয় বেদান্ত পড়লাম, বিচার করলাম, কিন্তু যদি দেখি যে এ-জিনিস আমার উপযুক্ত নয়, তাহলেও কি আমি এই শাস্ত্র মেনে চলতে বাধ্য থাকব? বাধ্যতার প্রসঙ্গ এলে বিচারের প্রশ্ন অনর্থক এবং যখন রামমোহন বিচারের প্রশ্নটি নীরবে উপস্থাপন করেছেন তখন বুঝতে হবে বাধ্যতার প্রসঙ্গকে তিনি নীরবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বিচার করে দেখেছিলেন যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাই তাঁর পক্ষে গ্রহণীয়, কেননা তা উচ্চতর মানসিকতার উপযুক্ত। তার মানে যে ব্যক্তি বিচারের পরে অন্যরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন তাঁর অন্যরূপ উপাসনা করার স্বাধীনতা আছে। প্রথম জীবনে রামমোহন এই স্বাধীনতা স্বীকার করেন নি, কিন্তু ব্যক্তি-পরিচয়ের মূল্য যতই বুঝতে থাকলেন ততই ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্যও মানতে থাকলেন। এই স্বাধীনতার ভিত্তিতে ব্যক্তি কোনটা বর্জন, কোনটা গ্রহণ করবে সেটার উপরে সমাজের চোখ-রাঙানি অসংগত, সেটার জন্যে কাউকে পতিত করা, হীন করা, অসুবিধায় ফেলা তার কাঙ্ক্ষিত কাজে বাধা দেওয়া ইত্যাদি হলো ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপরে খবরদারী—এখানে অনুশাসন আচার ঐতিহ্য প্রথা প্রভৃতির চাইতে ব্যক্তির স্বাধীনতাই বড়ো।

কিন্তু স্বাধীনভাবে চলতে চাইলেই মানুষ চলতে পারে না। মনে করা যাক, স্ত্রী যে-রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করতে চায়, স্বামী সে-রূপে করতে চায় না। এমন

অবস্থায় কোনও স্বামী বলবে স্ত্রীকে, তুমি তোমার মতো করো, আমি আমার মতো করি? বরং এখানে বলা হয়, আমার মতে না চললে তুমি তোমার খুশিমতো জায়গায় যাও, আমার বাড়িতে এসব চলবে না। স্ত্রী জানে যে তার যাওয়ার জায়গা নেই, তার এমন কোনও অবলম্বন নেই যে, স্বাধীনভাবে চলে সে তার অস্তিত্ব রক্ষা করবে। তার স্বাধীনভাবে চলার ইচ্ছেটাকে তাই সে গলা টিপে মারে। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', 'স্ত্রীর পত্র', 'হৈমন্তী' প্রভৃতি উপন্যাসে ও ছোটগল্পে ব্যক্তির স্বাধীনতার সংগে জড়িত আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রশ্ন কখনও প্রকট কখনও প্রচ্ছন্নরূপে উপস্থিত। পারিবারিক জীবনে নারীর স্বাধীনতা পদে পদে দলিত হয় প্রধানত এই কারণে যে, সে আর্থিক ব্যাপারে পুরুষের কাছে সম্পূর্ণ অধীন। তেমনই সামাজিক জীবনে রামমোহন দেখেছিলেন যে, কৃষক হলো জমিদারের কাছে সম্পূর্ণ অধীন। আগেকার কালে জমিদারের বাড়িতে জামাই এলে জামাইকে আদর-আপ্যায়ন করার খরচও চাষীদের দিতে হতো, একে বলত জামাই-কর। জমিদারের বাড়িতে পুজো হবে, তার জন্যে কর দিতে হবে প্রজাকে। একালে যাকে আমরা চাঁদা বলি, সেকালে তা সাধারণত জমিদাররাই আদায় করত, তাকে চাঁদার বদলে বলত কর। চাঁদার বেলায় ছাড়ান থাকলেও করের বেলায় কোনও ছাড়ান ছিল না। জমিদার মহাশয়রা এসব কর কেমন করে আদায় করতেন, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনাতে সুলভ; এ প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের লেখা 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি এক অসামান্য দলিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনায় রামমোহন বলেছেন যে, আগে চাষের অধিকার থেকে চাষীকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা জমিদারের ছিল না, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জীবনধারণের জন্যে চাষের বা পরিশ্রমের সুযোগ থেকেও চাষীকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা জমিদারকে দেওয়া হয়। যে-কৃষক খাটবার সুযোগের জন্যেও জমিদারের উপর নির্ভরশীল, সে কখনও নিজের স্বাধীন মতামতে চলতে পারে না, তার কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতা একটা নিষ্ঠুর রসিকতা।

১৮২২ খৃস্টাব্দে দায়ভাগ-প্রণেতা জীমূতবাহনের কঠোর সমালোচনা করে রামমোহন দাবি করলেন যে, নারীকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দিতে হবে। যদি মেয়েদের একটি কোনও নিজস্ব অবলম্বন থাকে, তাহলে তারা স্বাধীন মতে চলার খানিকটা সাহস পাবে, তার অন্তত এটুকু জোর থাকবে মনে যে, স্বামী যদি স্বাধীন মতামতের অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে সে চট করে না-খেয়ে মরবে না। তেমনই ১৮৩১ খৃস্টাব্দে রামমোহন হাউস অব কমন্সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংশোধন করে কৃষককে জমিতে চিরস্বত্ব দেওয়ার দাবি তুললেন। কৃষক যদি বোঝে যে স্বাধীন মতামতে চলার অপরাধে জমিদার তাকে জমি থেকে উৎখাত করতে পারবে না, তাহলে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে তো পারবেই না, তাহলে সে স্বাধীন মতামতে চলার জোর পাবে। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীনতা চাইলেই হয় না, সে স্বাধীনতা যাতে সম্যক রূপে বাস্তবে পরিস্ফুট হয়, তার জন্যে বাস্তব অবস্থা বা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন, কিন্তু তিনি যেখানে এটাকে 'ভুল' বলেছেন, রামমোহন সেখানে এটাকে 'অবিচার' বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই ভুল বহুদিন ধরে চলে এসেছে বলে তার সংশোধন সম্ভব নয়; পক্ষান্তরে রামমোহনের মতে একটা অবিচার সংশোধনের পক্ষে কোনও বিলম্বই যথেষ্ট বিলম্ব নয়।

লক্ষণীয় যে শুধু মেয়েদের বেলায় আর চাষীদের বেলায় আর্থিক স্বাবলম্বিতার দাবিতে রামমোহন সোচ্চার; পরিবারের বা সমাজের কাঠামোয় আরও যেসব মানুষ আছে, তাদের কথা আলাদাভাবে তিনি বলেন নি। তাহলে কি ধরে নেব যে, অন্যান্যদের জন্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ প্রয়োজনীয় নয় বলে তিনি মনে করেন? একটু স্থিরবুদ্ধিতে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এখানে রামমোহন ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান শর্তটির অন্তর্নিহিত সূত্রটাকে শুধু ধরিয়ে দিয়েছেন, দেশভেদে, কালভেদে এই সূত্রের পরিবর্তন হবে না। পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে যারা সবচাইতে বেশি পরাধীন, তাদেরকেই সর্বাগ্রে আর্থিক স্বাবলম্বিতা দিতে হবে, তাহলেই অপেক্ষাকৃত কম পরাধীনরাও আর্থিক স্বাবলম্বিতা পাবে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক জীবনে যে-সূত্র খাটে তা বিংশ শতাব্দীর স্বাধীন ভারতেও খাটে আবার একই সূত্র একালের যে-কোনও উন্নত দেশের বেলাতেও খাটে, কিন্তু তখন শুধু 'কৃষকের' বদলে 'শ্রমিক' শব্দটি বসিয়ে নিতে হবে। এখানেই রামমোহনের দাবির পেছনে নিহিত সূত্রটির যাথার্থ্য।

অন্তর্নিহিত সূত্রের প্রসঙ্গ থেকে আসা যাক অন্য এক ঘটনার প্রসঙ্গে। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে প্রেস অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট চালু করা হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করে। এই আইনের প্রতিবাদে রামমোহন লেখেন যে, শাসিতরা নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা সংবাদপত্রের মাধ্যমেই করতে পারে, সুতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করলে জনসাধারণের মতামত জানবার উপায়টি ধ্বংস করা হয়। সরকারের কাজকর্মে জনসাধারণ কণ্ঠক্ষেপ করতে পারে—এই ধারণার ভিত্তি কোন্‌খানে? জনসাধারণের জীবন-সম্পর্কিত বিষয় ও সমস্যাবলী সম্বন্ধে যে চেতনাকে আগে চিহ্নিত করেছি রাজনৈতিক চেতনা বলে, সেইটেই হলো ওই ধারণার ভিত্তি। জনসাধারণের একজন হিসেবে রামমোহন রাজনৈতিক ভিত্তির উপরে নিজেই দাঁড়িয়ে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যে, শুধু তিনি কেন, জনসাধারণের একজন হিসেবে যে-কেউই ওই ভিত্তির উপরে দাঁড়াবার অধিকারী। তার মানে এখানে রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার অধিকার উৎসারিত হলো জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার থেকে। সোজা বাংলায় কথাটাকে সাজালে কী দাঁড়ায়? প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে নিজের স্বাধীনতা বলে একটা স্বাধীনতা আছে সেইটেই প্রমাণিত হয় রাজনৈতিক ব্যাপারে তার মতামত প্রকাশের অধিকার থেকে। যেখানে দেখা যায় যে জনসাধারণের সে-অধিকার নেই, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই। তবে মনে রাখা উচিত যে, জনসাধারণের ওই অধিকারের পরিমাণ কতটুকু বা কতখানি, তার সীমানা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১৮২৭ খৃস্টাব্দে জুরী বিলের প্রসংগে রামমোহন ওই প্রশ্নটিও তুলেছেন : দেশবাসীর মনোভাব ও ভালোমন্দের প্রশ্ন উপেক্ষা করে, দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন-বোধ ও পরামর্শ বিবেচনা না করে কোনও রাজা বা শাসক কোনও আইন দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থ দিয়েই শাসকের শক্তি সীমাবদ্ধ—এখানে জনসাধারণের সার্বিক স্বার্থই হলো সবকিছুর শেষ কথা।

কথায় কথায় আমরা জনসাধারণের কথায় চলে এসেছি। কিন্তু জনসাধারণ কাকে বলে? ভারতীয় জনসাধারণ বললে বুঝি ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সমষ্টিগত একটা সত্তা। কিন্তু 'ভারতীয়' বিশেষণটি বাদ দিলে জনসাধারণের অর্থ বিশ্ব জুড়ে সম্প্রসারিত হয় নাকি? এই প্রসংগে রামমোহনের জীবনের বহু ঘটনার ও বহু অবিস্মরণীয় উক্তির উল্লেখ করার লোভ সামলানো খুবই কঠিন। এখানে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করি। ১৮২১ খৃস্টাব্দে একদিন রামমোহনের নিমন্ত্রণ ছিল ক্যালকাটা জার্নাল-এর সম্পাদক বাকিংহামের বাড়িতে, এদিকে সেদিনই খবর এল, নেপলসের স্বৈরাচারী রাজার ও তাঁর পবিত্র মিত্রবর্গের সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে সেখানকার গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। এই খবরে রামমোহন এত শোকার্ত হলেন যে, বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ বাতিল করে চিঠি পাঠালেন, নেপলসবাসীদের উদ্দেশ্য তাঁর নিজেরই উদ্দেশ্য এবং তাদের শত্রু তাঁরও শত্রু। এখানে নেপলসবাসীদের সঙ্গে তিনি নিজেকে কতখানি সনাক্ত করেছেন সেইটে লক্ষণীয়। আবার ১৮২৩ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা পাওয়ার খবরে রামমোহন সমস্ত বাড়ি আলো দিয়ে সাজালেন। এতে কোনও ভদ্রলোক কটাক্ষ করে টিপ্পনি কাটলে রামমোহন জবাবে বললেন, স্বার্থ বা ধর্ম ভাষা দিয়ে বিভক্ত হলেও তাঁরই মতো মানুষের সুখ-দুঃখে তিনি নির্বিকার থাকতে পারেন না। অন্যের সঙ্গে একাত্ম-বোধের এতটা ক্ষমতা ছিল বলেই ১৮৩১ খৃস্টাব্দে

ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে রিফর্ম বিল নিয়ে বিতর্ক উঠলে তাঁর একবারও মনে হয়নি যে, এটা ইংরেজদের একান্ত নিজস্ব সমস্যা, তাই স্পষ্ট ভাষায় লেখেন যে শুধু জনসাধারণের খরচে নয়, জনসাধারণের সর্বনাশ করে যে-মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিজেদের পকেট ভারী করছে, তাদের হাতে একটা জাতি শিকার হয়ে থাকতে পারে না। একই সময়ে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিবের কাছে তিনি জাতিতে জাতিতে সদ্ভাব ও মৈত্রী জাগাবার উদ্দেশ্যে একটি জাতি-সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন, তাতে তিনি বলেন যে, সমগ্র মানবতা একটি বিশাল পরিবার। এগুলোর থেকে রামমোহনের অতুলনীয় আত্মসম্প্রসারণ-ক্ষমতা অমোঘ রূপেই প্রকাশিত হয়। নিজের দেশের বঞ্চিত ও শোষিত নারী বা কৃষকের সঙ্গে নিজেকে তিনি সনাক্ত করেছিলেন তো বটেই, তাছাড়াও কত দূর-দেশবাসী, অন্য ভাষাভাষী, অন্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন, তাদের আর্তিতে আর্ত, তাদের উল্লাসে উল্লসিত হয়েছিলেন, সেইটেই এখানে অনুধাবনার বিষয়।

বলা বাহুল্য, এভাবে আধুনিকতার মূল লক্ষণগুলোর তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে রামমোহনের জীবন ও রচনার থেকে দৃষ্টান্তের সংখ্যা আরও অনেক বিস্তৃত ও বিশদ করা যায়। তা করার প্রয়োজন নেই, কেননা আমার অভিপ্রায় হলো রামমোহনের মতো ব্যক্তির মূল্যায়ন করার কয়েকটি পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া। প্রথমে বলেছি, রামমোহনের জীবনী অনুসারে আধুনিকতার ধারণাগুলোকে গড়ে তোলার পদ্ধতির কথা, পরে আধুনিকতার লক্ষণগুলো অনুসারে রামমোহনের জীবনের আদর্শগুলি বা তাঁর জীবনসাধনাকে পরিমাপ করার পদ্ধতির কথা বলেছি।

আরও দুটি পদ্ধতি সর্বজনজ্ঞাত : একটি স্থানগত বিচারের, অন্যটি কালগত বিচারের পদ্ধতি। এখানে স্থানগত মানে যে ভৌগোলিক আর কালগত মানে যে ঐতিহাসিক, সেইটে সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এই দুটি পদ্ধতি শুনতে যত সরল, প্রয়োগের বেলায় তা নয়, কেননা তখন দেখা যায় যে, পদ্ধতি দুটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা খুবই কঠিন, একটি প্রশ্নের অনুষঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়।

প্রথমে স্থানগত বিচারের কথা বলি। কারও কারও বিচার হয় একটি ছোট জায়গার পরিপ্রেক্ষিতে, কারও হয় আর একটু বড়ো জায়গার পরিপ্রেক্ষিতে, কারও হয় আরও বড়ো বা গোটা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলার বাঘ আশুতোষের কথাই ধরা যাক : সম্ভবত তিনিই বিশ্বের প্রথম ছাত্র-আন্দোলনের নেতা, কিন্তু তাঁর যেটা বিশেষ মূল্য সেটা সাধারণভাবে বাংলার ভৌগোলিক সীমানাতেই আবদ্ধ। সাহিত্যিকের মূল্য অধিকাংশ সময়েই বহুলাংশে ভৌগোলিক, যেমন ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের মূল্য, কিন্তু আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যের প্রবর্তকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র ভারতেই সম্মানিত। পক্ষান্তরে সাহিত্যিকের পরিচয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির নাম রাজনীতিবিদ হিসেবে মহারাষ্ট্রের বাইরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচিত, কিন্তু জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা প্রথম প্রাণ দিয়েছিলেন সেই বাসুদেও বলবন্ত ফাদকে, দামোদর চাপেকার প্রভৃতির খ্যাতি প্রাদেশিক গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। আবার গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জবাহরলাল প্রভৃতির নাম গোটা বিশ্বের কাছে পরিচিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তির ভৌগোলিক পরিচয়ের তিনটি বিভাগ থাকা সম্ভব : অঞ্চল বা প্রদেশভিত্তিক, দেশভিত্তিক, আর, বিশ্বভিত্তিক। এই তিনটি বিভাগ অনুসারে রামমোহনের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

জ্ঞানচর্চার বাহন হিসেবে বাংলা গদ্যের ব্যাপক প্রয়োগ রামমোহন প্রথম করেছেন বলেই তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলি। কিন্তু বাংলা গদ্যের উদ্ভবের যে তাৎপর্য তা বাংলার বাইরে হয় নগণ্য নতুবা মূল্যহীন। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় : বাংলায় উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তারাই ছিল ওই সংগীতের শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষক, সংগীত-শিল্পীরাও যে জীবনযাপন করত তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের মিল বা যোগাযোগ ছিল না এই উচ্চাঙ্গ সংগীতকে ধনীর বিলাস-মহলের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিলেন রামমোহন. বাংলাভাষায় শাস্ত্রীয় রাগরাগিণী অনুসারে গান রচনা করলেন, এসব সংগীতের শিল্পী ও অভিপ্রেত শ্রোতা উভয়েই খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ বা তাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। এ-দুটি ক্ষেত্রে রামমোহনের যে-অবদান বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই তার মূল্য, বাংলার বাইরে তার মূল্য বোঝা যাবে না। রামমোহনের এরকম আরও বহু অবদানের তাৎপর্য ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের পক্ষে গুরুত্বহীন, কিন্তু বাংলাতে সে-সবের অসীম গুরুত্ব।

আবার রাজনৈতিক চেতনার জন্মদাতা ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রামমোহনের যে-তাৎপর্য একান্তরূপেই তা সর্বভারতীয়; এর যথার্থ তাৎপর্য বোঝার জন্যে ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টিক্ষেপ করা দরকার। আমরা যাদেরকে ভারতীয় বলি, তাদের অধিকাংশই একদা গণ্য হতো বিদেশী বলে, এরকম বহু বিদেশাগত জনধারা মিলে-মিশে গঠিত হয়েছে একালের ভারতীয় জনসাধারণ। ভারতীয় বর্ষ গণনার হিসাবকে শকাব্দ বলি বটে, কিন্তু শকরাও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকেই এদেশে এসেছিল এবং প্রথমদিকে তারা বিদেশী আক্রমণকারী হিসেবে তৎকালীন ভারতীয়দের প্রচণ্ড সামরিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। তারপর একটা যুগ এল যখন বিদেশীরা আসতে শুরু করল নিজেদের লিপিবদ্ধ সংহত সুসম ধর্মনিয়ে, এদের মধ্যে তুর্কী আরবী ইরানী আফগানী নানা জাতির মানুষ ছিল বটে, কিন্তু ধর্মীয় সমতার জন্যে এদের সবাইকেই চিহ্নিত করা হলো মুসলমান বলে। কালক্রমে মুসলমানরাও ভারতবর্ষে বসবাস করতে করতে ভারতীয় হলো। ভারতীয় সংস্কৃতি পরিণত হলো হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির যোগফলে। হাউস অব কমন্সে রামমোহন যে-সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায়, ভারতীয় বলতে যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বোঝায় আর ভারতীয় সংস্কৃতি বলতেও যে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি দুরকম সংস্কৃতিকেই বোঝায় এই ধারণাটা তাঁর কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল, এবং ভারতীয় বলতে যাতে শুধু হিন্দু না বোঝায়, সে-বিষয়েও তিনি ছিলেন সর্বদা সতর্ক। হিন্দু যুগের মতোই মুসলিম যুগও সম্পূর্ণরূপে

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কাল। মুঘল আমলের কথাই ধরা যাক। বিদেশী হিসেবেই বাবর এসেছিলেন ও ভারতবর্ষে শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—এক পুরুষে কারও পক্ষে পুরোপুরি স্বদেশী বনে যাওয়া সম্ভব নয়—এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে একথাও বলা যায় যে, তাঁর বংশধরদের সম্বন্ধে ভারতীয় কথাটি প্রয়োগ করা যায় বটে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যায় না, তিনি বিদেশী বাদশাহরূপেই জীবন কাটিয়েছিলেন। তার মানে বাবরের আমলকে বিদেশী শাসনের আমল বলে অনায়াসে মেনে নেওয়া যায়। লক্ষণীয় যে সেই সাক্ষাৎ একজন বিদেশী কর্তৃক শাসনের সময়ও রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষের মাটিতেই। ব্রিটিশদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বরাবরই এখানকার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় শক্তি বিধৃত থেকেছে। কিন্তু কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হলো ইংলণ্ডে। বিভিন্ন সূত্রে যেসব শিক্ষিত ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এখান থেকেই সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। সেসব সংবাদ-পত্রের কোন কোনটিতে কোম্পানী শাসনের সমালোচনাও প্রকাশিত হতো। তখন ইংলণ্ডে অবস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ওইরকম সমালোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই যুক্তিতে যে, ভারতবর্ষে বসবাসকারী যেসব ইংরেজ ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সংবাদ-পত্রে সরকারের সমালোচনাতে রত, তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, রাষ্ট্রীয় নীতি-গুলো নির্ধারণ করা হয় ইংলণ্ড থেকে, সুতরাং ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রগুলিতে ওইরকম সমালোচনা করা যেতে পারে, এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে তা করা অন্যায়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্র যে ভারতবর্ষের মাটি থেকে ইংলণ্ডের মাটিতে স্থানান্তরিত হয়েছে—এ-সত্যটাকে তলিয়ে দেখা দরকার। এর ফলে ভারতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। রামমোহন সেই শূন্যতাকে পূরণ করলেন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে। তিনি যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করলেন, তার তাৎপর্য বাংলাকে ছাপিয়ে গেল, তা ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতবর্ষে, কিন্তু ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানাকে ছাপিয়ে তো গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শাসন-তান্ত্রিক আদর্শে রাজনৈতিক চেতনাকে প্রকাশ করার যে-ধারা তিনি প্রবর্তন করেন মূলত তা-ই অবিচ্ছিন্নভাবে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুসৃত হলো। এখানে রামমোহনের যে-অবদান আর যাথার্থ্য নির্ণীত হবে গোটা ভারতবর্ষের পরি-প্রেক্ষিতেই—শুধু বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করতে গেলে সে-অবদানকে যেমন খাটো করা হবে, তেমনই বিরাট বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিচারের চেষ্টাও হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে।

রামমোহনের কাজ ও চিন্তার থেকে এরকম দৃষ্টান্তই সবচাইতে বেশি, যেগুলোর তাৎপর্য সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষেই বিচার্য। হাউস অব কমন্সের কাছে তিনি আইন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেমন মতামত দেন ও সমালোচনা করেন, তার সাকুল্য তাৎপর্যই সর্বভারতীয়। তাঁর সে-বিশ্লেষণের মধ্যে একটি ধারণা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়েছে—ভারতের এক এক অঞ্চলের জন্যে এক এক রকম আইন বিচারের পথে যেমন বাধা ও সমস্যা সৃষ্টি করে, তেমনই কে ইয়োরোপের, কে ভারতবর্ষের বংশোদ্ভূত, কে হিন্দু বা ইসলাম বা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী, এসব বিবেচনাও ন্যায়বিরুদ্ধ—ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের জন্যে এবং ভারতবর্ষে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের জন্যেই চাই সমতাযুক্ত ও সংগতিপূর্ণ আইন। আবার বিজ্ঞান শিক্ষার আহ্বায়করূপেও আমরা রামমোহনকে দেখতে পাই। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা আগে বলেছি। কিন্তু উদ্দেশ্য আর আদর্শ এক জিনিস নয়। এক কথায় বিজ্ঞান শিক্ষার আদর্শ কী? উত্তর—পড়ে-পাওয়া সত্যকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বর্জন বা গ্রহণ করা। পরবর্তীকালে এরূপ শিক্ষার জয়গান করে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন যে, পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনার চাইতেও নিজের রোজগার-করা দু আনার মূল্য বেশি। যে-ভারতবর্ষ গুরুবাদী শিক্ষার আদর্শে আচ্ছন্ন, সেখানে রামমোহন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবান এরকম আরও বহু রামমোহনের অবদানের উল্লেখ করা যায়। এসব ক্ষেত্রেই রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের যথার্থ জনক। প্রসঙ্গত আর একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী-কালে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, দাদাভাই নৌরজি ও বিশেষত রমেশচন্দ্র দত্ত যে-ইকনমিক ড্রেনেজ থিয়োরী বা দেশীয় সম্পদের বহিঃস্রোতের তত্ত্ব বিশদরূপে উপস্থাপন করেন তার গুরুত্ব রামমোহনই আবিষ্কার করেন।

ভারতবর্ষের সম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছিল এটা যেমন সত্যি, তেমনই রামমোহনের অবদানগুলির কোন-কোনটির তাৎপর্যও বাইরের পৃথিবীর পক্ষে সত্যি। এর স্বপক্ষে পরোক্ষ প্রমাণ হলো, যে-স্পেনীয় ঘোষণা কার্ডিজের সংবিধান বলে পরিচিত তা উৎসর্গ করা হয় রামমোহনের উদ্দেশে। যেকালে এক দেশ থেকে আর-এক দেশে যাতায়াত করা ছিল দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক সেই তখনকার দিনে তাঁর আচরণ ও রচনা-বলীর তাৎপর্য এতই দূরপ্রসারী হয় যে তাইতে হাজার হাজার মাইল দূরস্থিত নিপীড়িত মানবতার এক অংশ পেয়েছিল গভীর প্রেরণা এবং স্বাধীনতাকামীদের সে-উৎসর্গ প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের থেকে পাওয়া প্রেরণারই স্বীকৃতি। পৃথিবীর যে-প্রান্তেরই অধিবাসী হোক না কেন, যার মুখ্য পরিচয় মানুষ হিসেবে মহিমান্বিত, তারই অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতায়—এই ভাবসত্যের মূল্য সমগ্র বিশ্বেই সমান। ধর্ম, ভাষা ও দূরত্ব দিয়ে বিচ্ছিন্ন হলেও যারা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামে ব্যাপৃত, তারা শেষপর্যন্ত জয়ী হবেই—রামমোহনের এই ঘোষণার অন্তর্নিহিত সত্য কোনও বিশেষ দেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকতে পারে না, তা সমগ্র বিশ্বের তাবৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদেরই পরম প্রেরণা। আন্তর্জাতিক মৈত্রী, সদ্ভাব ও শান্তি রক্ষার জন্যে রাম-মোহন কংগ্রেস অব নেশন্স বা জাতি-মহাসভা সংগঠনের যে-পরিকল্পনা করেন, তারও তাৎপর্য একান্তরূপেই বিশ্বভিত্তিক। শক্তিমানদের পদলেহনকারীর ধারণা জন্মায় যে, সমস্ত উচ্চ ও উদার চিন্তাগুলো শক্তি-মানদের দেশ থেকে এদেশে আমদানি হয়েছে। এপ্রসঙ্গে রামমোহন ও ইংলণ্ডের যুক্তিবাদী দার্শনিক জন স্ট্যুয়ার্ট মিলের অবস্থান খুবই কৌতূহলোদ্দীপক—ভারত-বর্ষের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বে বাংলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে রামমোহনের জন্ম আর মিলের জন্ম, ইংলণ্ডের সবচাইতে আলোকো-জ্জ্বল পর্বে দুনিয়ার এক নম্বর মহা-নগরীতে অর্থাৎ মিল যেমন অস্বাভাবিক ভৌগোলিক সুবিধার অধিকারী ছিলেন তেমনই রামমোহন ছিলেন বিপরীত প্রতি-বেশে পর্যুদস্ত। কিন্তু নারীর মুক্তি প্রসঙ্গে মিল-এর রচনায় এমন যুক্তির দেখা মেলে না যার পূর্বচ্ছায়া একই প্রসঙ্গে রাম-মোহনের রচনায় নেই; প্রতিনিধিমূলক সরকারের প্রসঙ্গে দুজনের [illegible] শুধু ভাবগত সাদৃশ্যই চোখে পড়ে না, তার সঙ্গে বহু স্থলেই শব্দগত এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাগত, সাদৃশ্যও চোখে পড়ে। উপযুক্ত দলিল-দস্তাবেজের অভাবে প্রমাণ করা কঠিন যে মিল কোনও ভাবে রামমোহনের ভাবধারায় প্রত্যক্ষ রূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা, তবে এইটে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে নারীর মুক্তি আর শাসকের ক্ষমতার সীমার প্রসঙ্গে রাম-মোহনের ধারণাগুলির তাৎপর্য ইংল্যান্ডের পক্ষেও মূল্যবান। এসব ক্ষেত্রে রামমোহনের বিচার শুধু ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়, তাঁর অবদানের মূল্যায়ন এখানে করতে হবে সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে।

এই যেমন গেল স্থানগত বা ভৌগো-লিক মানদণ্ডে বিচারের পদ্ধতি তেমনই আছে কালগত বা ঐতিহাসিক মানদণ্ড বিচারের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইতিহাসে কোন ব্যক্তির স্থান কোন ব্যক্তির অপেক্ষা আগে বা পরে সে প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসে এবং এজন্যে এতে বিচার্য ব্যক্তির স্থান কোন কোন ক্ষেত্রে সবার প্রথমে অথবা বহু-কালের ব্যবধানে নির্ণয় করা যায় সেইটে খোঁজার দিকে ঝোঁক বেশি পড়ে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ধর্মীয় সত্য যে শুধুই হৃদয়োপলব্ধির বস্তু নয়, বিচারপ্রবণ মনন

বা যুক্তি দিয়েও অনুধাবন করার বস্তু এই ধারণায় প্রথম অসংকোচ প্রকাশ দেখি বুদ্ধদেবের জীবনে, তারপরের প্রায় সওয়া দু হাজার বছর ধরে চলল অনুশাসন, আইন-বিধান, প্রথা ইত্যাদি মেনে অথবা ঐকান্তিক ভক্তির পথে ধর্ম-সাধনার সুদীর্ঘ পর্যায়, আবার রামমোহনে এসে ধর্ম-সাধনা লাভ করল যুক্তি-বাদিতার ভিত্তি। এখানে ভালো-মন্দের প্রশ্ন তোলা অনর্থক, সে-প্রশ্ন ওঠে আধুনিকতার মানদণ্ডে বিচার করার সময়, কিন্তু ঐতিহাসিক মানদণ্ডে ব্যক্তির তুলনামূলক বা আপেক্ষিক স্থান নির্দেশ করাটাই বড়ো কথা।

অবিরাম বিকাশশীল মানবিকতার অধিকারী মানুষের সম্বন্ধে ধারণা অথবা মানুষকে জাত-কুল-সম্প্রদায় ইত্যাদির থেকে নিরপেক্ষরূপে, নিতান্তই মানুষরূপে, একেবারে মর্ত্যের মানুষরূপে মূল্য দেওয়ার কোনও ধারা ভারতবর্ষে আগে ছিল না, মানুষ তথা ব্যক্তি সংপৃক্ত এক অভিনব মূল্যবোধের প্রবক্তা ও প্রবর্তক রামমোহন। দিব্য প্রতিভার অধিকারীদের রচনা বলে যা এতকাল মূল্য পেয়ে এসেছে সেগুলির যথার্থ বিচারের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই—এই প্রতীতির জন্মদাতাও রামমোহন। সুস্থ মানুষ হিসেবেই যে আমি অসামান্য মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী —একথা রামমোহনের আগে কেউ আমাকে বলেননি। আমি প্রজা হলেও মানুষ হিসেবে আমি রাজার সমান। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে? উল্লিখিত স্বত্বে আমরা মানে জনসাধারণ রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার ততটাই অধিকারী যতটা আমাদের শাসক অধিকারী। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা ইহকালের ও পরকালের বহু জটিল গূঢ় বিষয়ে গভীর চেতনার পরিচয় দিয়ে এসেছি, কিন্তু শক্তি-সমষ্টি বা জনসাধারণের জীবনসম্পৃক্ত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলিতে চেতনার অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিইনি —জনসাধারণের জন্যে রাজনৈতিক চেতনা রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয় ইতিহাসে জাগালেন।

কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বা অবদানেরই আবার দুরকম তাৎপর্য থাকে: একটা তাৎক্ষণিক তাৎপর্য, অন্যটি হলো তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘকালীন বা চিরন্তন তাৎপর্যের সমন্বয়ে গঠিত তাৎপর্য। প্রথম তাৎপর্যের স্থান শুধু ঐতিহাসিক বর্ণনায়, পুঁথির পাতায় নিষ্প্রাণ দশায়, সেখানেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে নিঃশেষিত হয় তার সার্থকতা অর্থাৎ সেই অবদানে পরবর্তী প্রজন্মগুলির আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু অন্য বা শেষোক্ত তাৎপর্যে বিকৃত অবদানের স্থান নির্ধারিত হয় ইতিহাসের প্রবহমান ধারায়, সেই ধারায় নতুন নতুন প্রয়োজন মেটাবার সামর্থ্য থাকে, যেমন অবদানের, অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে তার অবিরাম গতি এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলি জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক সেই অবদানগুলিকে ক্রমাগত বিনিয়োগ করতে থাকে তাদের বিকাশশীল পরিবর্তমান জীবনচর্যাতে।

বর্ণনামূলক ইতিহাস রচিয়তার আদর্শে মনে হতেই হয় যে সতীদাহ নামক হিংস্র সামাজিক প্রথাটি নিবারণের জন্যে রামমোহনের আগে আরও অনেকে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সে-সবই শক্তি বিশেষের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রয়াস—এমনকি শ্রীরামপুরের মিশনারীরাও যে উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন তা বিশেষ এলাকায় বিশেষ অঞ্চলবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সত্যটি মনে রাখলে বুঝতে পারব যে, সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের অনন্যতা কোথায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মতো রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন জনসাধারণের মানসে উক্ত-প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত গড়ে তোলার জন্যে আন্দোলন সংগঠনে। সতীদাহের বিরোধীদের মধ্যে তাঁর স্থান সকলের আগে নয়, কিন্তু তিনি ওই প্রথার বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সংগঠক বটে।

দৃঢ় অর্থে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন আন্দোলন শুরু করেন ১৮১৮ খৃস্টাব্দে এবং তাঁরই আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খৃস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মানুষ খুন করার সমপর্যায়ভুক্ত অপরাধ হিসেবে এই প্রথা আইনত সম্পূর্ণ বিলোপ করেন। তাহলে আন্দোলনটির আয়ুষ্কাল হলো দশ বছর। এর পরে সতীদাহের ঘটনা এতই কমে যায় যে, তা স্বতন্ত্র উল্লেখ করার দরকার নেই। রক্ষণশীল হিন্দুরা ওই আইনের প্রত্যাহার করার জন্যে ইংলণ্ডে আবেদন করলে রামমোহন আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন সাময়িকভাবে, কিন্তু রক্ষণশীল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্যে এবার তাঁকে কোনই বেগ পেতে হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে রামমোহন যতগুলি আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার মধ্যে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনটিই সবচাইতে সার্থক, কেননা এখানে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপেই সিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, যখন থেকে সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলো তখন থেকে এই আন্দোলনের তাৎপর্যও নিঃশেষ হয়ে গেল, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ে উঠল ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এক চমকপ্রদ নিদর্শন। পরের প্রজন্মগুলি ক্রমশ সতীদাহ প্রথাটির কথাই বিস্মৃত হতে থাকল—কিন্তু এটা শুধু বিস্মৃতির কথা নয়, কেননা বিলুপ্ত প্রথার সম্বন্ধে কৌতূহলের নির্বাপণই হলো সংগত ঘটনা। ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কজনক একটা ভয়ংকর বর্বর প্রথার স্মৃতি কেই বা বাঁচিয়ে রাখতে চায়?

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই একে এখনকার বা একালের জনসাধারণের কাছে তাৎপর্যহীন, অনাবশ্যক, বর্তমান জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, শুধু, কীটদষ্ট ইতিহাসের জীর্ণ পাণ্ডুলিপির বিতর্কের বিষয়ে পরিণত করেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সঙ্গে আদর্শবাদের গভীর পার্থক্য বিদ্যমান। সতীদাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে রামমোহন নারী-মুক্তির যে আদর্শকে উপস্থাপন করেছিলেন সেই আদর্শের কোনও মূল্যহ্রাস হয়েছে কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়।

এমনই একটি আদর্শ বা সূত্রের কথা এখানে বলা যায়। মুখ্যত সম্পত্তি-বঞ্চিত বা সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত বহুকালের বহুবিধ অভ্যাস, আচার, সংস্কার ইত্যাদির ফলেই নারীর স্থান নির্ধারিত হয়েছে পুরুষের পেছনে, কিন্তু শক্তির বিকাশের উপযুক্ত বা অনুকূল পরিবেশ পেলে নারী মননের ক্ষেত্রে ও দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে, কেননা মানসিক ক্ষমতা ও সামাজিক যোগ্যতা নারী ও পুরুষ দুজনেরই সমান। এবিষয়ে রামমোহন ও জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্য ও যুক্তির মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্যের কথা আগেই বলেছি। এখানে প্রকাশ থাকে যে, নারীর মূল্য ও মর্যাদার প্রসঙ্গে রামমোহনের স্থান নিশ্চিতভাবেই মিল সাহেবের আগে, তদুপরি আজ যখন ইস্কুল-কলেজের পরীক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্র পর্যন্ত নারীর মূল্য ও মর্যাদা সেই কাদম্বিনী গাঙ্গোপাধ্যায়ের আমল থেকে ইন্দিরা গান্ধীর আমল পর্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে তখন রামমোহন কর্তৃক প্রস্তাবিত সূত্র ক্রমশই অধিকতর তাৎপর্যময় হয়ে উঠছে। এসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে বহুতর বিপরীত প্রমাণ সত্ত্বেও নারীর প্রতি পুরুষের সাধারণ মনোভাব আজও হেয়সূচক। আশা করা যায় যে, এই মনোভাব ভবিষ্যতের কোনও একদিন অধিকাংশের মন থেকে দূর হবে, কিন্তু যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণাগুলির মূল্য পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকবে এবং ততদিন, আমরা হয়তো বা না-জেনেই, রামমোহন-কল্পিত প্রবর্তক ও নিবর্তক চরিত্র দুটির মতো তর্ক আর তর্কের সময় ওই দুটি চরিত্রের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে যাব।

তাৎক্ষণিক তাৎপর্যের আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টের কাছে যে রকম শিক্ষার জন্যে রামমোহন চিঠি লিখেছিলেন সে-রকম শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁর জীবদ্দশাতে সম্পন্ন হয়নি বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে তা সম্পন্ন হয়েছে—এই শিক্ষাকে সরলীকৃত করে সাধারণত ইংরেজী শিক্ষা বলা হয়, যদিও

যে-রকম শিক্ষা তখন পর্যন্ত খোদ ইংলণ্ডেই পুরোপুরির চালু হয়নি। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় তথা ভারতবর্ষে যে জাগরণ হয় তা বিশেষভাবে ইংরেজী শিক্ষারই সুফল, এবং এজন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অসীম। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিকে যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝব যে ওই শিক্ষা আমাদের সমস্ত জাগতিক উন্নতিসাধনের পক্ষে আর পর্যাপ্ত নয়, বরং ওই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত নানাবিধ সংকট আমাদের সমাজ-জীবনে ক্রমশই দুর্লক্ষণ হিসেবে পরিস্ফুট হচ্ছে। এখন যে-রকম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে তাকে, আর যা-ই বলা যাক, কোনমতেই ইংরেজী শিক্ষা বলা যাবে না। মোটামুটিভাবে তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে নতুন ফসলে আমাদের সমাজ-জীবনকে যতখানি সমৃদ্ধ করা সম্ভব ছিল ততখানি করেছে এবং এই ফসলের কাল হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত একশ বছরের কালকে চিহ্নিত করতে পারি। সুতরাং উল্লিখিত শিক্ষাকে আবাহনের জন্যে রামমোহনের যে-অবদান তার তাৎপর্যও উল্লিখিত সময়ের সীমানাতেই আবদ্ধ। সতীদাহ প্রথা নিবারণের সঙ্গে তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষার আবাহনের পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত বিষয়ে রামমোহনের অবদানের মূল্য দশ বছরের হিসেবে আর শেষোক্ত বিষয়ে একই মূল্য একশ বছরের হিসেবে নির্ণীত হবে।

কিন্তু রামমোহন যে-রকম শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার বাইরের লক্ষণগুলোকে উপেক্ষা করে ভিতরের বৈশিষ্ট্যকে খুঁজতে গেলে কী দেখি? এই শিক্ষার ভিতরের কথা হলো ব্যক্তি তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও সন্ধানবৃত্তিকে প্রয়োগ করে সত্য অর্জন করবে। এখানে এসে পড়ছে ব্যক্তির সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা ও সেই ধারণা অনুসারে ব্যক্তির নতুন অধিকারের প্রশ্ন। শুনলে যদিও মনে হয় যে, ব্যক্তির অধিকার আর ব্যক্তিগত অধিকার একই জিনিস তবু এ-দুটি একই জিনিস তো নয়ই, উপরন্তু পরস্পর-বিরোধী। একটু খুলে বলি। ব্যক্তিগত অধিকারের সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশে থাকে বংশগত, জাতিগত, কুলগত প্রভৃতি জন্মের সূত্রে পাওয়া কতকগুলি অধিকার—যেমন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালে উপবীত ধারণের যে অধিকার জন্মায় তা ব্যক্তিগত অধিকার কিংবা কোনও বিশেষ বংশে জন্মালে ভূসম্পত্তি রাখার যে-অধিকার জন্মায় সেইটেই ব্যক্তিগত অধিকার এবং অধিকাংশ সময়েই ব্যক্তিগত অধিকারকে রক্ষা করা হয় দেশে প্রচলিত আইন দিয়ে। ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চবিংশতিতম সংশোধনের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত বা আইনসম্মত অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তির বা সামাজিক অধিকারের দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট হয়েছে—এই সংশোধনের যাঁরা বিরোধী তাঁরা মনে করেন যে এটা ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ, পক্ষান্তরে এই সংশোধনের সমর্থকরা মনে করেন যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির অধিকার দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের ভূসম্পত্তির সীমা বেঁধে দেওয়া সামাজিক ন্যায়বিচার-সম্মত। রামমোহনের চিন্তাপ্রণালীর যুক্তিসম্মত পরিণাম হলো এই যে ব্যক্তির মূল্যায়নে ও ব্যক্তির অধিকার নির্ধারণে কুল-জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়, সে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছে কি জন্মায়নি, সে স্ত্রী কি পুরুষ ইত্যাদির বিবেচনা অসিদ্ধ। একথা ঠিক যে ব্যক্তির যে-ধারণাকে রামমোহন আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন বাস্তবে তার স্বীকৃতি বা প্রতিফলন এখনও খুবই নগণ্য, কিন্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সেই ধারণাকেই আমরা আস্তে আস্তে স্বীকার করে নিচ্ছি, সেজন্যেই সংশোধন করছি সংবিধানেরও। যতদিন না ভারতীয় জীবনে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা পূর্ণরূপে স্বীকৃত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ব্যক্তির সম্বন্ধীয় ধারণাতে রামমোহনের অবদানের তাৎপর্যও থাকবে সমান অম্লান। সে যে কতদিন তা আমরা কেউ বলতে পারিনে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের ভাবসম্পদগুলির এক প্রস্থ হয়ে গেছে অতীতের বিষয়, কিন্তু আর এক প্রস্থ আমাদের চেতনাতে এখনও জীবন্ত, এখনও সক্রিয়, এবং নিশ্চিতভাবে সেগুলো সমান জীবন্ত ও সক্রিয় থাকবে ভবিষ্যতেও, তার মানে শেষোক্ত প্রস্থের তাৎপর্য শুধু তাৎক্ষণিক নয়, তা এতই দীর্ঘকালীন যে তাকে চিরকালীন বলাই সমীচীন। লক্ষণীয় যে চিরকালীন তাৎপর্যের ভাবসম্পদগুলিই সংখ্যায় অধিক।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্যে আন্দোলন যে রামমোহনই প্রথম শুরু করেন, এগুলো ঐতিহাসিক তথ্যই শুধু নয়, রামমোহনের অসামান্যতার পরিচায়কও বটে; কিন্তু সে অসামান্যতার আয়ুষ্কাল কতটুকু বা কতখানি সেইটেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। পক্ষান্তরে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা এবং জনসাধারণের ন্যায়সংগত অধিকার সম্বন্ধে ভারতবর্ষে অশ্রুতপূর্ব যেসব ভাবনা-ধারণা রামমোহন আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেন সেগুলোর আয়ুষ্কাল কতটুকু বা কতখানি এবং সেই অনুসারে রামমোহনের মহত্ত্ব ও মহিমা কী ভাবে নির্ধারণ করা হবে সেইটেও মূল্যায়ন করে দেখা আবশ্যক। রামমোহনের সমগ্র জীবন-সাধনার বিস্তারকে একটি বাক্যের নির্যাসে প্রকাশ করতে চাইলে এ রকম দাঁড়ায় : ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পাদনে যার শুরু জনসাধারণের বাস্তব জীবন-দশার সার্বিক উন্নয়নে তার সারা। বহু দূরে, বহু উচ্চে রামমোহন তাঁর লক্ষ্যকে স্থাপন করেছিলেন, সেই লক্ষ্য পৌঁছনোর পথটা যেমন দুর্গম তেমনিই সুদীর্ঘ তাই সে লক্ষ্যকে অচিরে বিদ্ধ করার সাফল্য প্রত্যাশা করাটাই সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাঁর যেটুকু সাফল্য আমরা দেখতে পাই তা হলো জলে ভাসমান বরফখণ্ডের উপরের ভাগটুকু, নয় ভাগে এক ভাগ মাত্র, বাকি আট ভাগ জলের নিচেই আছে অর্থাৎ রামমোহনের বেশির ভাগ অবদানই আমাদের অলক্ষ্যে আমাদের মধ্যে জীবন্ত ও সক্রিয়।

এভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা পদ্ধতিতে রামমোহনের বিচার চলতে পারে। তা না হলে সমস্ত ব্যাপারটা অন্ধের হস্তী প্রদর্শনের মতো সত্যমিথ্যার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ হবে—প্রকৃত স্বরূপের [illegible] তার বৈসাদৃশ্যই বড়ো হয়ে যা[illegible] তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা সর্বদা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। বেদান্তের মর্ম বোঝার জন্যে অন্যের ব্যাখ্যার চাইতে বেদান্ত স্বয়ং, অধ্যয়নের উপরে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বাইবেল নিয়ে যখন খৃস্টান মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর তর্ক শুরু হলো তখন তিনি বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের উপরে নির্ভর করে তর্কে নামেননি, মূল বাইবেলে সত্যিই কী আছে তা স্বয়ং পরীক্ষা করার জন্যে হিব্রু ভাষা শিখে হিব্রুতে বাইবেল পড়ে তারপর অনুবাদ-পড়া মিশনারীদের সঙ্গে তর্কে নেমেছেন—তেমনই রামমোহনের সম্বন্ধে কোনও প্রকৃত ও যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে অন্যের ব্যাখ্যা ভাষ্য বা বর্ণনার উপরে নির্ভর না করে একেবারে রামমোহনেরই নিজস্ব মূল রচনা থেকে যাচিয়ে নেওয়া দরকার যে সত্যি সত্যিই তিনি কী চেয়েছিলেন, কী লিখেছিলেন, সত্যি সত্যিই কোন্ বিষয়ে তার কী মতামত, কী বক্তব্য, কী প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির মুখ বা লেখা থেকে রামমোহনের বক্তব্য না জেনে সরাসরি রামমোহনের মুখ বা লেখা থেকেই তাঁর সওয়াল-জবাব জেনে নিয়েই আমরা রামমোহনের বিচার করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি এবং রামমোহনের যে-কোনও বিচারের এটাই হলো প্রথম শর্ত।

পূর্বপুরুষ
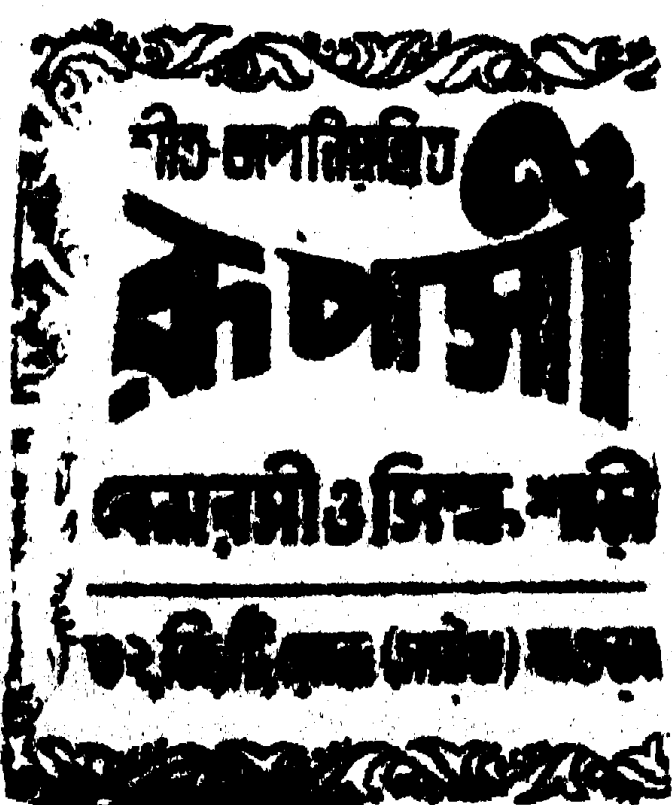
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।।২৮।।

পরের দিনই দু'তিন জনকে ডেকে দালাল ধরিয়ে দিল হেমন্ত। বাড়ি জমি যেখানে যা আছে সব বিক্রী করবে সে। এ ছাড়াও ফার্ণিচার, গহনাপত্র বিক্রী করতে শুরু করল। ঠিক পরের দিন না হ'লেও দিন-তিনেকের মধ্যেই নিমাইকে চলে যেতে হয়েছিল। তবে অবশ্য এক কাপড়ে নয়—মায়ের মাথায় যা বলেছিল—খাট বিছানা বাসন-কোসন যা-যা ওদের দরকার হ'তে পারে সবই দিয়ে দিল হেমন্ত। মায় কাপড়-চোপড় রাখার একটা বড় তোরংগ—বাসন-পত্র রাখার কাঠের বাক্স, আলনা সব। যাবার সময় মণিকা প্রণাম করতে এসেছিল তাকে কিছু বলেনি, তবে সেই সময়ই বলে দিয়েছিল, 'ঐ হারামজাদা না আমার সামনে আসে বৌমা, বারণ ক'রে দিও। আমার মেজাজের ঠিক নেই, আবার একটা কেলে-ঙ্কারী ক'রে বসব হয়ত যাওয়ার সময়!'

সে সাহস এমনিও হ'ত না—একথা শোনার পর তো হবেই না—চোরের মতোই চলে গিয়েছিল নিমাই একদিক ঘেঁষে, ঘাড় হেঁট ক'রে।

যাত্রার সময় মণিকা ছেলেমেয়ে দুটোকে কোলে দিতে গিয়েছিল, হেমন্ত তাও নেয় নি, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল একেবারে।

এর পর একেবারেই বাড়ি খালি হয়ে গেল, শুধু ঝিয়ের ভরসায় থাকা। এভাবে থাকা উচিত নয়—ঝি নতুন, তা ছাড়া সে মুখ্যু মেয়েছেলে তার দায়িত্বজ্ঞানের ওপরও ভরসা করা ঠিক হবে না বুঝে—প্রশান্তবাবুর ছেলেকে গিয়ে ধরল। সে তার জানা একটা মজবুত আর বেশ শক্ত সমর্থ দেখে দারোয়ান ঠিক করে দিল, বলল, যতদিন না আপনি যান, বাড়ি খালি করেন, ততদিন একেই রেখে দিন। এর প্রাণ থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। লোকও জেলায় বাড়ি, বুড়ো হ'লে কি হয়, সুযোগ এখনও চলন্ত ট্রেণে উঠে দু-চারটে লোকের মুণ্ডু কেটে নিয়ে আবার নেমে আসতে পারে। ওর হাতে লাঠি থাকতে বন্দুক, পিস্তল নিয়ে কেউ এলেও ভয় নেই। তবে তেমনি মনিবের কোন অনিষ্ট কখনও করবে না। যার নিমক খেয়েছে তার জন্যে যে কোন সময় জান দিতে তৈরী। একেই রাখুন, বাইরে টাইরে বেশী পাঠাবেন না, দিন-রাত পাহারা দেবে সে-ই ভাল।'

বাড়ি জমি সবই দ্রুত বিক্রী হয়ে গেল, তিন-চার মাসের মধ্যেই। কিছু হয়ত কম পেল—ধৈর্য ধরে থাকলে সবগুলোরই কিছু কিছু বেশী দাম পেত—কিন্তু কমে ছাড়ল বলেই তাড়াতাড়ি বিক্রী হ'ল। ধৈর্যই আর নেই হেমন্তর। কলকাতা যেন তাকে বেঁধে মারছে মনে হয়—চারিদিক থেকে গলা টিপে ধরছে। যত তাড়াতাড়ি হয় এখানের পাট চুকিয়ে যেন পালাতে পারলে বাঁচে—এই রকম মনের ভাব তার। লোকসান হয় হোক, তার আর লাভই বা কি লোক-সানই বা কি, দু-পাঁচ হাজার কম পেলে তার এমন কি ক্ষতি হবে—তার চেয়ে মনের শান্তির দাম ঢের বেশী।

সব বেচে দিল মানে অধিকাংশই। সামান্য কিছু সোনার গহনা ও কখানা গিনি হাতে রাখল। বিদেশে গিয়ে যদি থাকতে হয় একা—হঠাৎ কোন দরকার পড়তে পারে, ভারী অসুখ-বিসুখ কিছু যদি হয়—তখন এগুলো কাজে লাগবে। সোনা ফেললে রাত দুপুরে টাকা মেলে, আর কোন জিনিসের বদলেই অত তাড়াতাড়ি টাকা পাওয়া যাবে না। এছাড়া যা কিছু টাকা-বাড়ি জমি ফার্ণিচার বাবদ পাওয়া গেল সব ব্যাংকে জমা ক'রে দিল। বলে দিল সুদের টাকাটা তাকে দুমাস অন্তর পাঠাতে। প্রশান্তবাবুর ছেলের পরামর্শেই—সামান্য যা শেয়ার কোম্পানীর কাগজ ছিল তাও ব্যাঙ্কেই জমা করে দিল। তারাই যাতে সুদ আদায় করে নিতে পারে।

ওর পরামর্শেই তিনটে ব্যাঙ্কে ভাগ করে রাখল টাকাটা, দিনকাল খারাপ, ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়, বড় বড় কার বারীরা টলমল করছে। স্বদেশী হাঙ্গামা সাহেবদের কারবার অনেকে গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কোন ব্যাঙ্ক কখন ফেল কেউ বলতে পারে না। তবে এসব ব্যাপারে হেমন্তরও কিছু জ্ঞান-অভিজ্ঞতা হয়েছে এতদিনে—সুদ কম পাবে জেনেও ইম্পি রীয়াল ব্যাঙ্কেই বেশির ভাগ টাকা জম করে দিল।...

এবার তল্পি গুটোবার পালা। আর না এখানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার সম হ'ল। শেষ বাড়িটা রেজেস্ট্রি হবার আগে সে সুরেনকে একটা টেলিগ্রাম করল— যেন অতি অবশ্য এই রবিবার এসে এ সঙ্গে দেখা করে। সৌভাগ্যক্রমে সেই শনি বারেই মুসলমানদের কী একটা বড় প পড়েছিল, দুদিন ছুটি—একদিন আগেই এ পড়ল সুরেন।

'কী ব্যাপার পিসীমা, এমন জরুর তলব? আমি তো হন্তদন্ত হয়ে ছু আসছি, কেবল ভাবছি অসুখ-বিসুখ ধা না করে থাকে? হে ভগবান!...কিন্তু কী? বাড়ির কি হাল? জিনিসপত্তর কোথায় গেল?—খালি বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাচ্ছ নাকি?, সেই জন্যে খবর দিয়েছেন?...নিমা দারা কোথায় গেল, তাদেরও তো দেখ না—?'

'বোস বোস, বলছি। তুই এক নিঃশ্বে সব জিজ্ঞেস করে যাচ্ছিস—উত্তরটা দে অবসর না পেলে কেমন করে দোব?...কি সারারাত জেগে এসেছিস, আগে কাপ চোপড় ছাড়, মুখ-হাত ধো বলছি আমায় একটা থানই পড়, কী আর হ

অনেক বেঁচেছে দাদা, তার আর অকল্যাণ হবার ভয় নেই।'

তার পর, সুরেন স্নান-আহ্নিক সেরে জলখাবার খেয়ে সুস্থ হয়ে বসলে সবই খুলে বলল হেমন্ত। ওর প্রস্তাব থেকে নিমাইয়ের প্রতিক্রিয়া—তাকে তাড়ানো, সব। সেইজন্যেই সুরেনকে ডেকেছে সে। এবার এখানকার যা-কিছু সম্পত্তি বেচে দিয়ে, এখানের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে, পাট উঠিয়ে, চিরদিনের মতো কাশীবাসী হতে চায় সে। বিক্রী সব হয়ে গেছে, বালিগঞ্জের বাড়িটা বাকি ছিল, সেও বায়না হয়ে গেছে তারা সার্চ প্রভৃতি যা করবার সব করিয়েছে, সামনের পরশু রেজেস্ট্রি হলেই তার সব দায় শেষ। এ-বাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে গত মাসেই, তারা কটা দিন দয়া করে রেখেছে; তবে এবার ছেড়ে দিতেই হবে। সেই জন্যেই সুরেনকে এত জরুরী তলব পাঠাতে হয়েছে।

সুরেন এসব কিছুই জানত না। ইচ্ছে করেই হেমন্ত লেখেনি এসব। যে শান্তির জন্যেই এখান থেকে সরে গেছে—তাকে আর উত্যক্ত করে লাভ কি?

সমস্ত শুনে সুরেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তার পর ঈষৎ একটু অনুযোগের সুরেই বলল, 'এটা কেন করতে গেলেন পিসীমা। এ-কি মানুষে পারে। সবে দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে, অল্পবয়সী স্ত্রী, তাদের সেই কোন মুলুকে রেখে এখানে পড়ে থাকবে—একি সম্ভব? এ কেউই রাজী হ'ত না। এ আপনার তাকে তাড়াবার জন্যেই মতলব করা!'

অনুযোগের সুরটা শেষ পর্যন্ত যেন তিরস্কারের সুরেই পরিণত হয়।

হেমন্ত অভিযোগটা মেনে নিল। বলল, 'তা যে একেবারে মিথ্যে তা বলতে পারি না। আসল কথা বৌটা ঐ রকম, নিমেটার অবশ্য কিছু করার নেই, তাকে দোষ দেওয়া বৃথা—আমার, যেন কেবলই মনে হ'তে লাগল, নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে আছি—একা, নিঃসঙ্গ। এতগুলোকে নিয়ে রয়েছি, এত খরচ করছি, গতরেও খাটছি, তবু আমার কেউ নেই। আমি একা।...এইটেই সহ্য হ'ল না বাবা। এতে যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে তো হয়েছে। তবে কি জানিস, নিমের যদি অমন মতিচ্ছন্ন না হ'ত, মুখের ওপর কথা না বলত—কি হাতে-পায়ে ধরে সময় চাইত—কি যদি আমার কথাটা বলত, মিথ্যে ক'রেও, যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—তাহ'লে কি হ'ত বলা যায় না। হয়ত আমিই মত বদলাতুম, কিম্বা হয়ত ওদেরই এ-বাড়িতে রেখে আমি একা কাশী চলে যেতুম। ওরও অদৃষ্টে দুঃখ আছে, গ্রহ বিরূপ—তাই অমন ভ্রমমতি হ'ল।...তবে এ একরকম ভালই হ'ল, বুঝলি? সে তার জোর বুঝেছে, বৌ ছেলে নিয়ে সংসার পেতেছে—এত চিন্তাই বা কি? এতদিন তো টানলুম, পয়সাও হাতে জমেছে কিছু নিশ্চয়।...আর সে যা হয় করবে। গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হবার তো হয়েই গেছে।'

'হয়ে কি গেছেই ঠিক? আর ফেরানো যায় না।'

'না। ওর মনের চেহারাটা দেখতে পেয়েছি। আর আমার সাধ নেই সংসারের বাবা। আমারও তো ঢের বয়স হল—আমার দিকটাও তো আমার ভাবার অধিকার আছে!'

'তা আমি এখন কি করতে পারি বলুন।'

সুরেনের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ একটু শঙ্কার আভাস।

হাসে হেমন্ত। বলে, 'ভয় নেই, নিমের বদলে তোকে নিয়ে সংসার পাততে চাইব না। ভাল ঘোড়ার এক চাবুক, তোকে আমি সেই এক দিনেই চিনে নিয়েছি।...আর সে শখ থাকলে সব বেচে কিনে দিয়ে তোকে খবর দোব কেন, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই ডাকতুম!'

তারপর বলে, 'তা নয়। তোকে একটু সাহায্য করতে হবে বাবা। এই বোধহয় শেষ, আর তোকে বোধহয় বিরক্ত করতে হবে না। মনে তো হচ্ছে আর ফিরব না, যা হবার বাবা বিশ্বনাথের চরণেই হবে। আমাকে একটু গিয়ে থিতু করে দিয়ে আসবি শুধু। একা তো কখনও যায় নি কোথাও; কেউ না কেউ সঙ্গে গেছেই।... তারক যখন যায়, ডাক্তারবাবু পুরুত-ঠাকুরকে ঝিকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এমনি বেড়াতে যাওয়া সে তবু এক রকম। এ ধর—সংসার ভেঙে নিয়ে চিরদিনের মত এখানের বাস উঠিয়ে যাওয়া, এই বয়সে আর একা যেতে ভরসা হয় না। হ্যাঙ্গামা ঝঞ্ঝাটও তো কম নয়। কলকাতা শহর দাঁদুড়ে বেড়াই চিরদিনই, আমাদের সে আমলে পালকী ছিল, ব্যায়রাদের বলতুম অমুক জায়গায় যাবো—নিশ্চিন্ত, উড়ে ব্যায়রারা তখনকার দিনের গুণ্ডা-বদমাইশ কি চোর-ডাকাত ছিল না। একালে ট্যাকসী হয়েছে, একা ট্যাকসী চড়তেও অবিশ্যি সাহস হয় না, তেমনি রিকশাও আছে, যেখানে খুশি যাওয়া যায়। কাশী শুনেছি গুণ্ডার জায়গা—বড় ভয় করে।'

'তা জেনেশুনে সে দেশে যাচ্ছেন কেন তাহলে?' দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে ফেলে সুরেন।

'বদমাইশও আছে, বাবাও আছেন।' হেমন্তও হেসে জবাব দেয়, 'তাছাড়া সবাই কি আর বদমাইশ গুণ্ডা, ভাল লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্ন্যাসী সাধক বিস্তর আছেন। আমার মতো অনাথা অবীরে বিধবাদের তো কথাই নেই। আমাদের তো ও-ই জায়গা বাবা! এমন তো হাজারে হাজারে ওখানে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তোকে বলা এই জন্যে যে, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, আমার ঝোঁকটা পছন্দটাও জানিস। তুই তিন-চারটে দিন আগে চলে যা—কোথাও একটা হোটেল-মোটেলে থেকে—আমার জন্যে একটা বাড়ি কি ঘর খোঁজ। কোন ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে একটু আলাদা বন্দোবস্ত—এই হলেই ভাল হয়। একেবারে একা থাকতেও ভরসা হয় না, অথচ আবার কারও সঙ্গে পাশাপাশি গাওয়া-গাওয়িও থাকতে পারব না—এক জায়গাতেই জল-কল হবে হয়ত, তাই নিয়ে দিন-রাত খ্যাচখ্যাচানি, নোংরার দল যত, ছেলেপুলে থাকলে ক্যালব্যাল—সে আর এ বয়সে বরদাস্ত হবে না।...মানে, একটা বাড়ির দোতলা কি তেতলা নিয়ে রইলুম, অন্য অংশে বাড়িওলা কি অন্য ভাল ভাড়াটে রইল—এই রকম হলেই সবচেয়ে ভাল।...আর সেই সঙ্গে মা-গঙ্গার ধারে কাছে হয়—চট করে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে পারি কি জানলা ছাদ থেকে দর্শন হয়।...অনেকখানি ফরমাশ মনে হচ্ছে কিন্তু তা নয় রে, গোটা বাঙ্গালীটোলাটাই বলতে গেলে গঙ্গার ধারে, ওদিকেও শহরের ধার দিয়েই তো মা গেছেন—এমন বাড়ির অভাব হবে না।'

'তারপর? আপনি যাবেন ... সঙ্গে? আবার ফিরে এসে নিয়ে যেতে হবে তো?'

'উঁহু, সে এখন আমার যে দারোয়ান আছে—সুখু, গোণ্ড জেলায় বাড়ি, এদিকে ডাকাত শুনেছি কিন্তু খুব বিশ্বাসী, নজরও খুব চারদিকে।...মালপত্তর যা আলাদা যাবে তা বুক করিয়ে দেবে এখন, সে লোক আমার আছে। এই বাড়ি যে কিনেছে সে রেলেই কাজ করে—সে বলেছে আপনি নিশ্চিন্তভরসায় থাকুন—আমি বুক করিয়ে রসিদ এনে যাবার আগে পৌঁছে দেব।...তুই বাড়ি ঠিক করে টেলিগ্রাম করিস একখানা, আমি আর দারোয়ান এখান থেকে রওনা হয়ে যাবো, তুই ইস্টিশানে নামিয়ে নিস। যেটুকু গিয়েই দরকার হবে, বাকস একটা বিছানা, ঠাকুর আর রান্নার বাসন—এই শুধু সঙ্গে যাবে, মোট তিন-চারটে মাল, সে দারোয়ানই নিয়ে যেতে পারবে। ও ধমুবাবুর আমলের লোক, ও'র কাছে যখন ভর্তি হয় তখন কুড়ি-একুশ বছর বয়েস—ধমুবাবুর সঙ্গে ঘোরাই ওর কাজ ছিল বাইরে বাইরে।'

সুরেন তখনই কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে চুপ করে বসে রইল। বোধহয় মনে মনে একটা হিসেব করে নিলে, তারপর বললে, 'এ যা বলছেন, যাওয়া আসা, বাড়ি দেখা, আপনাকে বসিয়ে

থিত করে আসা—অন্তত পনেরোটি দিনের ধাক্কা। বেশী তো কম নয়। এত দিন ছুটি তো পাবো না আমি। পাওনাও নেই, বছরে কটা দিনই বা ছুটি, এই কমাস আগে মায়ের কাজেই চলে গেছে, বেশীই নিতে হয়েছিল দু-একদিন। আর, ওসব কাপড়-কলের ব্যাপার, পাওনা থাকলেও অত দিন একটানা ছুটি দিত না। এমনিই ছুতো খুঁজছে অবিরত জবাব দেবার। আমি বড়-বাবুর থুঁ দিয়ে তাঁকে ঘুষ খাইয়ে চুকি নি। তাঁর একটা গাত্রদাহ আছে। নিহাৎ মা-মারা গেছেন, তাঁর কাজ বলে কিছু বলতে পারে নি। এ বাজারে চাকরি গেলে আর কোথাও কাজ পাবো না।... ধীরুটা ঐ কাণ্ড করে বসে রইল, যা হোক তবু মাসে কুড়িটা-পঁচিশটা টাকাও দিত—সে তো বন্ধ হলই, বেরিয়েও কোথাও কাজ পাবে না। আমার যদি কাজ যায় এখন—ঐ এক গন্ধ রইল গায়ে, আমিও অন্য চাকরি পাব্যো না।'

'সে কি রে! ধীরু আবার কি করল? শুনি নি তো। ধীরু মানে তোর ছোট ভাই ধীরেন?'

একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে সুরেন বললে, 'সে আপনাকে লেখা হয় নি বটে। এমনিই তো চিঠিই লিখি না বিশেষ—মনেও ছিল না। তাছাড়া এসব খবর লেখাও উচিত নয়, আপনার পেছনে টিকটিকি লেগে থাকত। এখন আমাদের সব চিঠি খুলে পড়ে।'

'কেন, কি করল কি?'

'আর বলেন কেন, চাকরি-বাকরি ছেড়ে—হঠাৎ খেয়াল হল নাইট ইস্কুল করবে, চরকা কাটা খদ্দর বোনা এই সব শেখাবে। মা মারা যাবার আগেই—মা মারা গেছেন তা বোধ হয় শোনেও নি—বলে আমি তো সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করছি না, এসব ব্যাকওয়ার্ড জায়গা, পশুর মতো জীবন-যাপন করে সব, না খেয়ে মরছে—না শিক্ষা না কিছু— শাঁষ যেটুকু রাজাই শুষে নিচ্ছে —দু পায়ে থ্যাঁৎলাচ্ছে এদের। এর বিহিত না করতে পারি চেষ্টাও করব না, তবে আর মানুষ কি?...এসব দেশ হলেও না হয় হত—ইংরেজের খাশ দখলে—ওখানে রাজার অনেক হাত পুলিশের ব্যাপারে, তিনি এসব প্রজা ক্ষেপানো, বিশেষ তাদের সচেতন করে দেওয়া নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে—ভাল চোখে দেখবেন কেন? তিনিই বোধ হয় কলকাঠি টিপে দিয়েছিলেন, কাছাকাছি একটা স্বদেশী ডাকাতি হতেই তার সঙ্গে ওকে জড়িয়ে সাক্ষী-সাবুদ এমনভাবে সাজালে—ওর সেই নাইট ইস্কুলের ছাত্ররাই সাক্ষী দিয়ে এল দু-তিনজন। কি করবে তাদেরও প্রাণের ভয় আছে তো?—প্রমাণ হয়ে গেল যে, ধীরু সে দলে ছিল, যদিও আসল ডাকাত একজনকেও ধরতে পারে নি নাকি, টাকা-পয়সাও রিকভার করতে পারে নি। তবে তাতে কিছু এসে গেল না, ধীরুর জেল হয়ে গেল দু বছর। এখনও সেই জেল খাটছে।'

হেমন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, 'বলিস কি রে, তা বাড়ির কথা, মা-বাপ ভাইয়ের কথা ভাবল না একবার?'

'সে বলে তোমরা তো ভাবছই। সবাই যদি বাড়ির মার কথা ভাবে তো এ মার কথা ভাববে কে? দেশও তো মা। দেশের জন্যে, দেশের লোকের জন্যে সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।'

বলে একটু হাসল সুরেন, বিষণ্ণ ম্লান হাসি। বলল, 'আমাদেরই কি আর ইচ্ছে করে না দেশের কাজে লাগতে? চোখের সামনে যেদিন দেখলুম মদের দোকানে পিকেটিং করছিল বলে পুলিশ দুটো ছেলেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে খোয়া বার-করা রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—জামা ছিঁড়ে পিঠের চামড়া কেটে রক্তারক্তি, তার ওপর লাথি মারছে বুট সুদ্ধ—সেদিন কি আর রক্ত গরম হয় নি, ইচ্ছে হয় নি কি ছুটে গিয়ে ওদের পিস্তল বন্দুক কেড়ে নিয়ে ওদের গুলী করে মারি? কিন্তু মহাত্মাজীরও নিষেধ আছে, আর তা ছাড়া বড় কথা বুড়ো বাপ-মার কথা ভেবেই, তারা উপোস করে থাকবে হয়ত, হয়ত কেঁদে কেঁদেই প্রাণটা দেবে—আর সাহসে কুলোয় নি।'

শুনতে শুনতে হেমন্তর কঠিন শুষ্ক চোখও জলে ভরে এসেছিল। বলল, 'আহা, বাছারে!...দাদা জানে এসব কাণ্ড?'

'জানে বৈকি। না বলে আর কত ঢেকে রাখব পিসীমা! জীবনে অনেক আঘাতই তো পেলেন, জীবনভোরই তো ভাগ্যের কাছে আঘাত খাচ্ছেন, একটা-দুটো বেশী-কমে কি এসে যাবে?'

এর পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। তারপর হেমন্ত আস্তে আস্তে বলল, 'শোন! তোকে চাকরির ঝুঁকি নিয়ে যেতে বলব না, এটা ঠিক। সে আমার কপালে যা-ই থাক। তবে একথাও ভেবেছি, তোর ছুটির কথাও। আগে মনে পড়ে নি, একটা কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল কদিন আগে, এই তোকে চিঠি লিখব লিখব ভাবতে ভাবতেই। তোদের কলের যিনি বড়-কর্তা বা মালিক—চক্রবর্তী মশাইয়ের সঙ্গে আমাদের ওঁর, মানে ডাক্তারবাবুর—পূর্ণ ডাক্তার আর কি—খুব জানাশুনো ছিল। উনি একবার কি একটা সংকটাপন্ন অবস্থায় নাকি ভদ্রলোকের স্ত্রীকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে ছিলেন, দিন-রাত পাশে বসে থেকে, আহার নিদ্রা জ্ঞান না রেখে, সেই থেকেই খুব ভাব, বন্ধুত্বের মতো, মানে উনি পূর্ণবাবুকে খুব ভক্তি করতেন, দেবতার মতো দেখতেন। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গেও জানাশুনো, আমার এখানে এসেছেনও কবার। তাছাড়া ওঁর—মানে ডাক্তারবাবুর ভারী অসুখের সময় অনেকবার [illegible] পাশেই বসে থাকতেন। আমার সঙ্গেও খুব জানাশুনো [illegible] হয়ে গিছল। অনেকবার বলেছেন, আপনি যা করলেন, যা করছেন তার জন্যে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। ডাক্তারবাবু ভাল হয়ে উঠলে, একবার আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের ওখানে —নদীর ওপর বাড়ি, দু দিন বিশ্রাম করবেন।...সে অবশ্য আর যাওয়া হয় নি, তবে আমার তো মনে হয় আমাকে ভোলেন নি একেবারে।...আমি এই সব ভেবেই একখানা চিঠি লিখে রেখেছি তাঁর নামে। চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে তুই তাঁর হাতে দিস, যদি সামনে পর্যন্ত পৌঁছতে না পারিস তো কাউকে দিয়ে পাঠাস, নয় তো ওখান থেকেই রেজেস্ট্রি করে ডাকে দিস। তাতে তোর নাম-ধাম সব দিয়ে দিয়েছি, দরকার হলে মন হলে নিজেই খুঁজে বার করবেন। ...আমার তো মনে হয় এ চিঠি চক্রবর্তী-মশাইয়ের কাছে পৌঁছলে তোর ছুটির অভাব হবে না, চাই কি চাকরীতেও কিছু উন্নতি হতে পারে। আমার নিজের ভাইপো আমার ওপর অভিমান করে ওখানে ঐ কাজ করছে, তা ছাড়া খুব আত্মমর্যাদা জ্ঞান, স্বাবলম্বী—সেই জন্যেই আরও, কিন্তু এ আয়ে সংসার করা সম্ভব নয়, এই ভাবেই লিখেছি।'

সুরেন খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল পিসীর মুখের দিকে, তারপর বললে, 'এসব আবার লিখতে গেলেন কেন? শুধু ছুটির কথা লিখলেই হত। কি মনে করবেন, ভাববেন হয়ত আমিই লিখিয়েছি!'

'তাতে কি তোর মাথা কাটা যাবে?' হেমন্ত এবার ঝেঁঝে ওঠে, 'আ গেল যা! আমি তো তোর পিসী। লোকে চাকরীর জন্যে কত লোকের সুপারিশ ধরে—পিসীকে ধরলেই যত দোষ!'

'না তা নয়'—অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সুরেন, বলে, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে বড়-বাবুটি খাপ্পা হয়ে থাকবেন—শত্রুতা করবেন বাগে পেলেই। বার বার তো অত বড় লোকের কাছে যেতে পারব না।'

হেমন্ত শুধু বলে, 'দ্যাখো না। আমার তো মনে হয় খুব সুবিধে করতে পারবে না কেউ আর।...ভাবছিস বুড়ি নিজেকে মস্ত লাট-বেলাট ভাবে, তা এর আগে তো এমন কথা বলি নি আর কখনও—জাঁক করা স্বভাব এমন তো বলতে পারবি না!'

তারপর চোখে ওঁর নিজস্ব বিশেষ কৌতুকের ভঙ্গী করে বলে, 'আজ এই দেখছিস পিসীকে অসহায় একা। একা চিরদিনই অবিশ্যি — তবু, একদিন এই কখানা হাড়েই ভেলকি খেলেছে। আজ কি আর সে ক্ষমতার কিছুই নেই?'

আর কিছু বলে না সুরেন।

ঝুঁকি যতই হোক, এই অসহায় মানুষকে এভাবে ত্যাগ করতে পারবে না সে।

(ক্রমশঃ)

পারস্পর ॥ জগন্নাথ চক্রবর্তী

তোমার জন্য আমিই দায়ী
আমার জন্য তুমি।

এই যে তুমি প্রেমের খেলায়
হার মানো, হার মানি,
এই যে আমি তোমার ছলা
সব জানি সব জানি,
এই যে তুমি আমার ঠকাও
তোমার ঠকাই আমি—
সবের জন্য আমিই দায়ী
আমার জন্য তুমি।

মানুষের জন্য ॥ অজয় সেন

মগ্ন উপত্যকা ছেড়ে ঘন কুয়াশার গভীরে চলে যায় ম্লান মানুষেরা
আলো ঝলমলে জন্মদিন থেকেই মানুষের রুক্ষ, বিষন্ন হাঁটাচলা
তাদের রঙিন বিস্মৃতি, নিজেদের দিকে তাকিয়ে থাকা একনাগাড়ে
আমাকে মাথা হেঁট করিয়ে রাখলো সমস্ত দুপুর—আজ;
একদিন বৃষ্টির মধ্যে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছি সমস্ত কলকাতা
আড়ালে আবডালে দেখেছি
প্রতিটি মানুষের ফিসফিসানি ও সাবধানী অঙ্গভঙ্গি
শুনেছি সতর্ক পায়ের শব্দ, ছুটে যেতে গুপ্ত ঘাঁটির দিকে—যা ক্রমশই
নেবে গ্যাছে গুপ্তঘাঁটির গভীরের থেকে অন্য গভীরতায়;
অথচ বোঝে না মানুষ, প্রতিটি কানাগলির দুঃখ ঐ গভীরতারই জন্য।
বহুদিন নিশ্চুপ থেকেছি, উজ্জ্বল পোশাকে কত সন্ধ্যায় কেঁপে ওঠে
কলেজ স্ট্রীটের আনন্দফলক
তবুও, হে জীবন, কত অচেনা তুমি, কত নগ্ন তোমার হাত এবং পা
দুঃখী মানুষ সারাজীবন তাকিয়ে রইলো তোমার দিকে,—
আশ্চর্য, দুরন্ত দৃশ্যের মতই অদৃশ্য রইলে চিরকাল:
আজ সারাদিন বুকের মধ্যে বাজলো মানুষের জন্যে ভালবাসা
কলকাতার পথে পথে রোদের দিনে আমি রোদের মধ্যে
কলকাতার আনাচে কানাচে বৃষ্টির দিনে
আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াই
শুধু এই দীনদুঃখী মানুষেরই জন্য।।

পাহারায় কেউ নেই ॥ অরুণ চক্রবর্তী

রাতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন
আমি তখন বাইরে থেকে
বাড়িটাকে দেখি।
ঘুমন্ত মানুষ মানুষ কোলে,
বাড়িগুলো অন্ধকারে
কালো কালো পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে
উন্মুক্ত পৃথিবীর ময়দানে, অথচ
বাড়ির পাহারায় কেউ নেই,
স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত ঘুমে অচেতন সবাই।

শুধু আমি—আমিই দেখি
[illegible]

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিষ্ণু দে : একটি কাব্য আন্দোলনের ইতিহাস

বিষ্ণু দে এই বছর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। বাঙালী কবির এই সম্মানে প্রতিটি বঙ্গভাষী সম্মানিত। বিষ্ণু দে বহু বিতর্কিত এবং সেই সঙ্গে বহু প্রশংসিত কবি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে যে বাঙালী কবির সর্বাধিক কবিতা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর নাম বিষ্ণু দে। মৃত কবি জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে ইদানীং কিছু কিছু আলোচনা দেখা যায়, কিন্তু বোধহয় বিষ্ণু দে একমাত্র জীবিত কবি যাঁর কবিকৃতি এবং কবি-জীবন প্রসঙ্গে বিগত বর্ষে অন্ততঃ পাঁচ-ছখানি পত্রিকায় সুলিখিত এবং সুদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিষ্ণু দে সম্পর্কে আগ্রহ আছে এক শ্রেণীর পাঠকের যেমন না-পড়েই প্রবল অনীহা আছে আরেক শ্রেণীর। এর মধ্যে পরম প্রশান্তিতে কবি বিষ্ণু দে প্রায় লোকলোচনের বাইরে বসে সাধনামগ্ন। অতিশয় শান্ত এবং সমাহিত এই কবির সম্মান লাভে তাই অনেকেই পুলকিত।

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা পত্রের জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যায় জীবনানন্দ প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধের প্রায় গোড়াতেই লিখেছিলেন তাঁর সম্পাদিত কল্লোলের সহধর্মী প্রগতি পত্রিকার কথা:—তিনি সেদিন প্রগতির লেখকদের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন :

'প্রগতির নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে' 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় সদ্য সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন। অত্যাসন্ন, উপক্রমনিক, বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে অপরিচয়ের ব্যবধান তখনো ভেঙে যায় নি। আর এঁদের মধ্যে সম্পাদক দুজনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হতো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্ম নামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর ছদ্মনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতির' পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়। লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম বলে ভুল করেছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'র মতো সংক্ষিপ্ত সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।'

বুদ্ধদেব বসু যে অত্যাসন্ন কবির কথা পৌষ ১৩৩১-র 'কবিতা'য় লিখেছেন তখন সেই কবির বয়স সতের কিম্বা আঠারো। তখনো তিনি 'শ্যামল মিত্র' না 'বিষ্ণু দে' কোনটি রাখবেন তা স্থির করতে পারেন নি। সেই সতের-আঠারো বয়সের কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে একদা বর্তমান লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের ফলে তখনই মনে হয়েছিল এ কবি জনতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার নয়, জনতারই একজন তবু যেন বিশিষ্ট। শিষ্ট এবং মিষ্ট তাঁর ব্যবহার অথচ তাঁর সেই বয়ঃসন্ধিকালেই ছিল অসামান্য দৃঢ়তা। বিষ্ণু দে ভদ্র অথচ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি। সেই ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য তাঁকে দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রেখেছে এবং নানা ঝড়-ঝাপটায় তিনি বিপথচালিত না হয়ে স্বধর্মচ্যুত হন নি। অর্থাৎ যা তাঁর ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকা থেকে সরে আসেন নি। এই কারণেই বিষ্ণু দে-র নামটির সঙ্গে জড়িয়ে বেশ কয়েক দশকের কাব্য-আন্দোলনের ইতিহাস।

বিষ্ণু দে'র কাব্য-বিচারে কেউ কেউ তাঁকে মার্কসবাদী বলেছেন। জানি না এই লেবেল তাঁর নামের গায়ে সাঁটা কতখানি সংগত হবে, বিষ্ণু দে মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর সদাজাগ্রত কবিসত্তায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় যেটুকু আছে সে তাঁর সুগভীর মানবিকতা বোধেরই লক্ষণ। তিনি সমাজ সচেতন। এই ব্যক্তিনিরপেক্ষ মনোভঙ্গী তাঁকে এক সহজ অথচ অনিবার্য পথ নির্বাচনে সহায়তা করেছে।

নিরলস কাব্য-সাধনায় ব্রতী বিষ্ণু দে কবিতার প্রকরণগত পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন প্রায় তাঁর কবি জীবনের সূত্রপাত থেকে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারাটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় সুগভীর। তাঁর কবিত্বশক্তি পরিণতি লাভ করেছে তাঁর কবি জীবনের প্রায় সূত্রপাতে। তাঁর রচিত মৌলিক কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা চোদ্দ, অনূদিত বিদেশী কবিতা গ্রন্থ তিনটি। সেই সঙ্গে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ রচনা করেছেন। ইংরাজীতে অবনীন্দ্রনাথের ক্ষীরের পুতুলের অনুবাদও তিনি করেছিলেন মনে পড়ে। বয়স এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকে না, প্রতিদিনে তার পরিবর্তন, নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতা। কবি বলেছেন—

'যতই না ঘনায় বয়স
জীবনের তৃষ্ণা পায় তত ক্ষিপ্র তীব্র ব্যাপ্ত
ব্যাস
যত পরিণতি যত দৈনিকের অভিজ্ঞ সাহস
তত তীক্ষ্ণ মানবিক সম্ভোগের বিচিত্র
সন্ন্যাস।'

২৬।১২।৭১ তারিখে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "পৌষ ১৩৭৮"এ 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধের শেষাংশে যে কথা কটি লিখেছিলেন তা বর্তমান মুহূর্তে বিশেষ-ভাবে বিবেচনাযোগ্য। বলা বাহুল্য হীরেন্দ্র-নাথ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যে কথা কটি লিখেছিলেন সেই কথাগুলির আজ সমর্থন মিলেছে বহু বিভিন্ন মহলে, সেই কারণে হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য আংশিক উদ্ধৃত করা সংগত মনে করি :

'কিন্তু আমার ধারণা যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অপর শৃঙ্গের তুঙ্গে যদি কাউকে দেখি তো তিনি হলেন বিষ্ণু দে।'

স্বর মৃদু, কণ্ঠ অনুত্তোলিত, অথচ জীবনসত্যের সন্ধানে অবিরাম বিশ্বরূপ দর্শনে পুলকিত, চিন্তায় গভীর চেতনায় স্বচ্ছ এই কবির শব্দের ঝংকারে যে সিন্ধুর পরিচয় তা বাঙালী পাঠক মাত্রেরই গর্ব।

যুক্তি দিয়ে, তথ্য হাজির করে, সাহিত্য-বিচারের বিভিন্ন অভিজ্ঞানের উল্লেখ করে কবিপ্রতিভা বিশ্লেষণের সামর্থ্য বা সময়

আমার নেই। ...আমি শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত হব যে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' গ্রন্থটি পেয়ে যা আমার মনে আলোর মত ঝলকে উঠেছিল তাই আমার শেষ কথা—বিষ্ণু দে আজ বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। এ নিয়ে বিসম্বাদের কোন স্থান নেই।'

এরপর ২৬ই জুলাই বেতার মাধ্যমে এসেছে বিষ্ণু দে'র জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ। হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য আর একবার সমর্থিত হল।

পুরস্কার যে লেখকের সম্মান বৃদ্ধি করে না একথা বার বার বলা হয়েছে, তবে পুরস্কার নিঃসন্দেহে একটা স্বীকৃতি। সেই দিক থেকে বিষ্ণু দে'র এই পুরস্কার-প্রাপ্তি এক আনন্দ সংবাদ। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের গ্রন্থ পড়ে পাঠকের একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয় শুনেছি। বিষ্ণু দে'কে কবি হিসাবে যদি বাঙালী পাঠক আজ পুনরাবিষ্কার করতে পারে তাহলে প্রকৃত লাভ হবে সেই পাঠকসমাজের। আমাদের সমাজ একালে অতিশয় উচ্ছ্বাসে আকুল এবং আবেগচপল। সেই উচ্ছ্বাস ও আবেগ কাটিয়ে মুক্তমনে বিষ্ণু দে'র প্রায় ৪৫ বছর কাব্যআন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির দিকে তাকালে অতি সহজেই বোঝা যাবে যে বাংলা কবিতার সাবালকত্বের পিছনে এই মহৎ কবির কি অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

বিষ্ণু দে শুধু কবি নন, তিনি প্রাবন্ধিক, ছান্দসিক ও চিত্ররসিক। তাঁর কলা বিষয়ক আলোচনাগুলির মধ্যে চিত্র-সমালোচনার নতুন ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। বাংলার মত ইংরেজীতেও তাঁর কলম সমান দক্ষতার পরিচায়ক।

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় কবির সমগ্র কাব্যভাবনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বিষ্ণু দে'র কবিতা ও বিষ্ণু দে'র ছন্দ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। সম্ভব হলে সেই আলোচনা করার বাসনা আছে।

আজ বিষ্ণু দে'কে বাঙালী পাঠক নতুন করে বিচার করুক। বিষ্ণু দে'র সামগ্রিক রচনার মূল্যায়ন করুক এই আমাদের কাম্য।

আজ পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন কবি। শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। অনেক আগে লেখা 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্য গ্রন্থের 'রাত্রি' কবিতাটির কয়েকটি লাইন উধৃত করছি:

'চিত্তের সমুদ্র আজ শান্ত স্থির
বিস্মরতী বীথি,
নক্ষত্র দেয়ালি নেই,
গোধূলির দেহহীন আলো।
এ আলোতে আমি আছি,
আর আছে বিশ্ব মোর পাশে,
সে বিশ্ব আমারই মূর্তি—
দীর্ঘ ছায়া সে মোর মনের।'

আত্মসচেতন কবির স্বগতোক্তি বর্তমানে যেন আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

—[illegible]

নতুন বই

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড, শিক্ষা)—সত্যেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। গোপাল হালদার প্রধান সম্পাদক। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির পক্ষে নলিনরঞ্জন রায় কর্তৃক কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। তিন খণ্ড একত্রে সত্তর টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ও বাঙালীর ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিপুরুষ। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের কর্মোদ্যোগের মধ্যে দুটি মূল বিষয় যা সমাজ-মানসের উপর বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা হল তাঁর শিক্ষাচিন্তার ও সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা। তাঁর সাহিত্যচর্চা শিক্ষাচিন্তার পূরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ'-র ১ম খণ্ড সেই 'শিক্ষা' দিয়ে আরম্ভ করেছেন সম্পাদকমণ্ডলী। এই প্রথম গ্রথিত হয়েছে বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা, নীতিবোধ, চরিতাবলী, বোধোদয়, বাংলার ইতিহাস এবং আখ্যানমঞ্জরী ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ দিয়ে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টের মধ্যে আছে ইংরেজীতে 'নোটস অন দি সাংস্কৃট কলেজ', ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র, শিক্ষা পরিষদের অনুজ্ঞা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র এবং বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ও ঊনিশ শতকের বাংলার সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী। ঈশ্বরচন্দ্রের দুখানি বিভিন্ন বয়সের চিত্র, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের একটি চিত্র এবং বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী ও পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি স্বতন্ত্র চিত্র এই খণ্ডের শোভাবর্ধন করেছে।

এই খণ্ডে মুখবন্ধ রচনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা রচনা করেছেন সম্পাদক গোপাল হালদার। সুদীর্ঘ ভূমিকার মধ্যে অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সর্বাঙ্গীন দিক ব্যাখ্যাত করেছেন। মুদ্রণ, কাগজ ও বাঁধাই রুচিসম্মত ও উচ্চাঙ্গের।

রবীন্দ্র সমীক্ষণ (সংকলন)—রবীন্দ্র পরিষদ, পাটনা। গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে [illegible] চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। দশ টাকা।

'রবীন্দ্র সমীক্ষণ' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় বিবিধ আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। প্রধানতঃ এই সংকলন গ্রন্থটি পাটনার রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্র-ভবনে যে বক্তৃতামালার আয়োজন স্বর্গত ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার করে গিয়েছিলেন, তা থেকেই উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার বহুবিধ দিক আলোচিত হয়েছে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমলেন্দু বসু, উমা রায়, বাসন্তী চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, মৃণালিনী ঘোষ, সিস্টার পুষ্প ও চারিজন মহাপ্রাণের মূল্যবান কয়েকটি রচনার দ্বারা। এই সংকলনে ভূমিকা লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়। শিল্পী আনন্দরূপ চক্রবর্তী অঙ্কিত একটি কবির দৈর্ঘ্য চিত্র গ্রন্থখানির প্রকৃত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

সূর্যরাগ (কবিতা)—সুধীর বেরা। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। সাড়ে চার টাকা।

সুধীর বেরা রাজনীতিবিদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য। কিন্তু ইতিমধ্যে কবি হিসাবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। আলোচ্য 'সূর্যরাগ' নামক কাব্য গ্রন্থের পূর্বে তাঁর 'গগন' ও 'সাহানা' নামক আরও দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূর্যরাগ-এর মধ্যে ঊনিশটি ছন্দবদ্ধ কবিতা আছে এবং অধিকাংশই দীর্ঘাবয়ব। কবিতাগুলির মধ্যে বেদনার সুর যেমন ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি আশাবাদীর আনন্দ-উচ্ছ্বাসেও কবি মুখর। এই বেদনা ও আনন্দ মানুষের জীবন-চক্র ঘিরেও যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি নিসর্গনিষ্ঠার মধ্যেও প্রকাশ হয়েছে। কাব্যামোদীদের কাছে এই কাব্যগ্রন্থের সমাদর হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শার্লট ব্রন্টি—এমিলি ব্রন্টি (জীবনী)—অজয় আচার্য। গ্রন্থালয়ম, ৮৬।৩৮বি, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা ১৩, ছয় টাকা।

ঊনিশ শতকের মহিলা ঔপন্যাসিক হিসাবে শার্লট ব্রন্টি ও এমিলি ব্রন্টি দুই ইংরেজ ভগ্নীদ্বয়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁদের জীবন-কথা, রচনার বৈশিষ্ট্য ও রচিত উপন্যাসগুলির পরিচয় অত্যন্ত স্বচ্ছ,সহজভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে বইখানির মধ্যে। সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ব্যতীত ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা এই গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। লেখকের

শ্রীমতী আচার্যের লেখার ধরনটি ভারী সুন্দর। জীবন-কাহিনী অংশটি লেখার মধ্যে যেমন তার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি শার্লট ব্রন্টির উপন্যাস 'জেন আয়ার' ও এমিলি ব্রন্টির 'উয়েদারিং হাইটস্'-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিন্যাসের মধ্যেও পাওয়া যায় বিশেষ দক্ষতার নিদর্শন।

বংগবন্ধু মুজিবর ও ভারতরত্ন ইন্দিরা (বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম)—মিলন দত্ত। দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯। দশ টাকা।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তি সংগ্রামের প্রধান হোতা শেখ মুজিবর রহমানের উপর পশ্চিম বাংলায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশই উচ্ছ্বাস-প্রণোদিত, ইতিহাস সেখানে আচ্ছন্ন। চিত্রসম্পদের দিক থেকে অনেক গ্রন্থ সমৃদ্ধ হলেও, সর্বাংগীণভাবে আলোচ্য গ্রন্থ যেমন ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ঘটনাবহুল, তেমনি চিত্রসম্পদ ও সাজসজ্জায় অতুলনীয়। বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার হাফটোন চিত্র আছে গ্রন্থখানির মধ্যে এবং এই চিত্রগুলির মধ্যে এমন কয়েকখানি আছে, যা অন্যত্র কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিনা সন্দেহ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের পূর্ব-পাকিস্তান কিভাবে গণ-প্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হল, তার চাঞ্চল্যকর, রোমহর্ষণ ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে।

কুমড়োপটাস—নগেন দত্ত, লোকায়ন সাহিত্য, ৭।স।৮২, সি আই টি বিল্ডিংস, কলকাতা-১০। তিন টাকা।

'কুমড়োপটাস' কিশোরদের জন্য লেখা। কিন্তু এই ছোট গ্রন্থটি সহজেই বড়দের মনকে ধরতে পারে। এক সময় বইটির জনপ্রিয়তা ছিল প্রবল। দীর্ঘকাল ছাপা ছিল না। মোট চারটি ছোটগল্পের সংস্করণ হল 'কুমড়োপটাস'। নামগল্পটি ছাড়া আর যে তিনটি গল্প—সেগুলি হল—'দুষ্টুমি', 'শিবাই পণ্ডিতের সমর যাত্রা' ও 'পটলের কীর্তি'। চারটি গল্পের মধ্যে 'কুমড়োপটাস' গল্পটিই আকারে বড়। বাস্তবিকপক্ষে অধুনা কিছু শিশুদের জন্য লিখিত গল্পে উদ্ভট কল্পনা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার আনুষ্ঠানিক বিষয়, শিশুদের মনের সংগে সংগতিহীন ঘটনা যুক্ত করে গল্প লেখা হচ্ছে। শিশুদের মন ও কল্পনা সহজাত, স্বাভাবিক। গল্পগুলি যেমন তাদের স্বাভাবিক মানসিকতার অনুপন্থী হবে, তেমনি তাদের বিস্ময়, কল্পনা, জিজ্ঞাসা, তাদের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনের খেলাকে বাড়িয়ে দেবে, কল্পনার খেলার ক্ষেত্রকে করবে প্রসারিত। 'কুমড়োপটাস' গ্রন্থের গল্পগুলিতে আশ্চর্যভাবে দিকগুলির পরিচয় আছে। 'কুমড়োপটাস' গল্পের জম্বুক, শম্বুক, ঢেঁকি-বুড়ি, কুমড়োপটাস—এদের নিয়ে যে মজার জীবন ও মনের সংসার রচনা করেছেন লেখক, তা কৌতূহলী শিশুমনকে অনায়াসেই নিবিষ্ট করতে পারে। লেখকের ভাষা ও গদ্যরীতি শিশুমনের কৌতূহলকে ধরে রাখতে সক্ষম। শিশুসাহিত্যে এমন সাবলীল গদ্য নতুন করে পেলাম।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সমন্বয় (প্রথম সংখ্যা) — সম্পাদক : স্ফুলিংগ সেন। ২৬৪, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা-৩৪।

পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

: 'আজকের দিনে মানুষের জীবনের সাথে সাহিত্যের কোন সমন্বয় নেই। তাই মানুষের জীবন আর সাহিত্য—এই নিয়েই 'সমন্বয়'।' খুবই মহৎ উদ্দেশ্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন পীযূষকান্তি বসু, অমিতেশ দত্ত রায়, সুজিত চৌধুরী, শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর দাস, মণি ভট্টাচার্য, অনিমা বসু, স্ফুলিংগ সেন এবং একটি ওড়িয়া গল্পের অনুবাদ করেছেন রজত চক্রবর্তী।

রূপলেখা (বৈশাখ ১৩৭৯)—দীপালি দত্ত। ২৭বি শিকদার বাগান স্ট্রীট, কলকাতা ৪। পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রিকাটির বয়স এত? দীর্ঘ উনিশ বছর প্রকাশের পর, বিশ বছরে পা দিয়েছে। কিন্তু চমকপ্রদ কোনো ঘটনা তৈরী করতে পারেনি। এ সংখ্যায় লিখেছেন শান্তশীল দাস, গোপাল ভৌমিক, নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ চন্দ, কুমারেশ ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

কবিতা এবং কবিতা (তৃতীয় সংকলন)—সম্পাদক : শান্তিকুমার ঘোষ। ১৬/১ ফার্ণ রোড, কলকাতা ১৯। পঞ্চাশ পয়সা।

অনেক কবিতার সংগে তিনটে গদ্যরচনা ও একটি কাব্যনাটক ছাপা হয়েছে এই সংকলনে। বিশেষ করে, সুবন্ধু ভট্টাচার্যের 'ষাট দশকের কবি' শীর্ষক আলোচনাটি ভালো। কবিতা লিখেছেন রাধানাথ মণ্ডল, সুশান্ত ঘোষাল, তরুণ চক্রবর্তী, সুভাষ সরকার, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর রুদ্র, কার্তিকচন্দ্র মিত্র, বিশ্বেশ্বর সামন্ত, সৌরভ ঘটক এবং আরো কয়েকজন।

সমকাল (বৈশাখ ১৩৭৯)—সম্পাদক : বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৬, নেপাল সাহা লেন, হাওড়া—১। দাম : এক টাকা।

এ সংখ্যার দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন শিশির লাহিড়ী ও সুনীল হাজরা। কবিতাগুলিও মন্দ নয়। তবে ভালো লাগে শিপ্রা ঘোষ, চিন্ময় গুহঠাকুরতা ও শম্ভু রক্ষিতের কবিতা তিনটি। পত্রিকা প্রসংগে সম্পাদক লিখেছেন : 'সমকালকে অস্বীকার করা প্রগতিহীনতার লক্ষণ, পশ্চাৎতার প্রতীক। পুরোনো, জীর্ণ ধ্যান-ধারণা ভেঙে নতুন চিন্তা নতুন পদ্ধতির প্রচেষ্টাই হল সমকালীন চিন্তা। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে সমকালের প্রকাশ।' পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জা রুচিসম্মত। আবদুল মান্নান সৈয়দের 'ছোট গল্প : ধনুর্বান, ধনুর্ভঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে।

জ্যৈষ্ঠের ঝড় : সম্পাদক : জীবন সরকার, বিশ্বনাথ ঘোষ ও কুমারেশ চক্রবর্তী। ৪, অনরেট ফাস্ট লেন, কলকাতা ১৪। পঁচিশ পয়সা।

নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত এই সংকলনে লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়, মানস রায়চৌধুরী, শিশির ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ চক্রবর্তী, জীবন সরকার এবং আরো অনেকে। নজরুল প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও শৈলজানন্দের তিনটি রচনাংশের পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে।

গোধূলি (বিশেষ সংখ্যা) সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়। পোঃ গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

মফঃস্বল শহর থেকে বেরুলেও পত্রিকাটি নিম্নমানের নয়। বেশ আন্তরিকতার সংগেই পত্রিকাটি বের করেন কর্তৃপক্ষ। এ সংখ্যায় লিখেছেন বোম্মানা বিশ্বনাথন, আনব মৈত্র, অমল হালদার, সরোজকুমার চক্রবর্তী রাণু সমাজদার, কাজল রায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল সমাজদার, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

সপ্তদীপা (ত্রৈমাসিক : ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম সংখ্যা '৭২)—সম্পাদক : রবীন দত্ত, জীবনময় দত্ত। এ/১২৪ কংকরবাগ কলোনী, পাটনা-১। এক টাকা।

প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য পত্রিকাটির সবাংগে যত্ন ও আন্তরিকতার ছাপ। নানান অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পিপাসু তরুণদের এই উদ্যম ও সাহিত্য-প্রীতি অভিনন্দনযোগ্য। মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতায় মন টানে। বিষয়বৈচিত্র্যে সকল শ্রেণীর সাহিত্যপাঠকদের খুশী করবে। এ সংখ্যার বিশেষ উল্লেখ্য লেখা হল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনাটি : 'বাঙালী : ইতিহাসের পথ ধরে'। বাঙালী-প্রেমী পাঠকদের বিস্তর চিন্তার খোরাক এর মধ্যে আছে। সুবোধকুমার চক্রবর্তীর তীর্যক দৃষ্টিপাতে উজ্জ্বল : 'সাহিত্যের ব্যবসা' নিবন্ধটি উল্লেখ করার মতো। এছাড়া ছাপা হয়েছে নানান কবিতা ও আলোচনা।

ছোটদের কাগজ (১২শ বর্ষ : ৫র্থ সংখ্যা : '৭২)—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। ১৯ ললিতমোহন ভট্টাচার্য স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটদের কাগজে ছোটদের জন্যে লিখেছেন বড়োরা। ছোটদের কিছু লেখাও ছাপা হয়েছে। লেখাগুলি ছোটদের আনন্দের কিছু সৎ শিক্ষাও দেবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যাঙ্কের ভূমিকা

সমর দত্ত

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ আগস্ট। এর পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বৈষয়িক উন্নতির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কাল থেকেই এদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চিন্তা এবং প্রস্তাবনার সূত্রপাত হয়। ১৯৩৪ খৃঃ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় 'ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতি' নামক এক পুস্তকে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৩৮ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। যুদ্ধের ফলে এই কমিটির কাজ বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। তবে কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কে টি শাহের সম্পাদনায় কতকগুলি মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

ভারত সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে ১৯৪১ খৃঃ। পরে এই কমিটির স্থান অধিকার করে 'পুনর্গঠন কমিটি'। ১৯৪৩ খৃঃ শেষের দিকে বোম্বাইয়ের বারজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনাটি 'বম্বে পরিকল্পনা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১৩০ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৫০০ বর্ধিত করাই এই পরিকল্পনাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। ১৫ বৎসরের মধ্যে মাথা পিছু আয় যাতে শতকরা ১০০ টাকা বৃদ্ধি পায় সেটাও ছিল এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'গণ কল্পনার' কথা ঘোষণা করেন। ১৯৪৪ খৃঃ স্যার আর্দেশীর দালালের পরিচালনায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হয়। তৎকালীন প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির সরকারকে পরিকল্পনা বিভাগ গঠন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৬ খৃঃ ভারতবর্ষে শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পরিকল্পনার ব্যাপারে সুপারিশের জন্য শ্রী কে সি নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৪৮ খৃঃ ভারত সরকারের শিল্প নীতি ঘোষিত হয়। এই শিল্পনীতিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৫০ খৃঃ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া বেরোয় ১৯৫১ খৃঃ। ১৯৫২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত আকার প্রাপ্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি ভারতীয় পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে। ইতিমধ্যে যে সমস্ত ছোটখাটো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রচলিত ছিল সেগুলিকে এই পরিকল্পনার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করে পরিকল্পনাটির সময় নির্দিষ্ট করা হয় ১৯৫১ খৃঃ ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ খৃঃ ৩১শে মার্চ—এই পাঁচ বৎসর।

উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হবার পর পরিকল্পনা থেকে তিন বৎসর ছুটি (প্ল্যান হলিডে) গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ ১৯৬৯-৭০ সালে শুরু হয়। বর্তমানে এই পরিকল্পনার কাজ চলছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল (ক) যুদ্ধ ও দেশ বিভাগজনিত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসমতা দূর করা এবং (খ) উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির সাহায্যে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা ও জনসাধারণের জন্য পূর্ণতর বৈচিত্র্যময় জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল (ক) উন্নয়নের গতি দ্রুততর করা, (খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি স্থাপন করা, (গ) কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা এবং (ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাতের কার্যকর রূপ দেওয়া।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (ক) পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক শতকরা ৫ অথবা ঊর্ধ্বে হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে যাতে ঐ হার বজায় থাকে সেই পরিমাণ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(খ) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(গ) আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যার ফলে অধিকতর শিল্পোন্নয়নের সকল উপকরণ দেশের অভ্যন্তরেই লাভ করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে ইস্পাত, রাসায়নিক পদার্থ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎশক্তি এবং যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ করা।

(ঘ) দেশের জনশক্তির সদ্ব্যবহার করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা ব্যাপকতর করা।

(ঙ) অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদূর সম্ভব দূর করে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়া।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব রক্ষা করে অধিকতর বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রশস্ত করা। বৈদেশিক ঋণ থেকে দেশকে যতদূর সম্ভব মুক্ত করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাও এই পরিকল্পনাটির অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য।

এই হল ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন দেখা যাক, উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির কার্যকর রূপদানে এদেশের ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এতাবৎ কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজনীয় যে, প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুনাফা অর্জন করা। ঐ যুগে বৃটিশ ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি অনুসরণেই এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আমানতকারীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে চড়া সুদে অর্থলগ্নী করাই ছিল প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এ যুগে অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা কেবল গতানুগতিক পদ্ধতিতে এই ব্যবসা পরিচালনা করে প্রভূত মুনাফা অর্জন করা নয়। এ যুগের ব্যাঙ্ক পরিচালনায় বিশেষ উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ব্যাঙ্কের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব

পালন করা। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে স্বাধীনতাত্তোর ভারতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ব্যবসাটিকে নতুন প্রণালীতে পরিচালনার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতিকালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতিগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ঋণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করছে; পরিকল্পিত অর্থনীতির সার্থক রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ঋণ বন্টন করছে, ব্যাংকশিল্প সম্প্রসারণের ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নানা রকম বৈষম্য হ্রাস করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছে এবং জেলাভিত্তিক ঋণদান পদ্ধতির ব্যাপারে সচেষ্ট হচ্ছে। এমনিভাবে নবীন ভারতের অর্থনৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতির উদ্দেশ্যে এদেশের ব্যাংকগুলি নিজ নিজ কর্তব্য সমাধানে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এই কর্তব্য সম্পাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার পূর্বে ব্যাঙ্ক পরিচালনাঘটিত ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে ব্যাংক ব্যবসার কাঠামো যাতে সুদৃঢ় করা যায় এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যাংকের কর্মধারা যাতে উন্নততর হয় সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী আইন প্রবর্তন করে। এই আইনটি ১৯৪৯ খৃঃ ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন নামে পরিচিত। এই আইনটির মূল ধারাগুলি এইরূপ :—

(ক) ব্যাংকিং কোম্পানীর সূত্র নির্ধারণ।

(খ) ব্যাঙ্ক হিসাবে গণ্য নয় এমন কোম্পানীগুলির অর্থলগ্নীর ব্যবস্থা নিষিদ্ধকরণ।

(গ) প্রচলিত ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে লাইসেন্স গ্রহণে বাধ্যকরণ।

(ঘ) ব্যাংক পরিচালনায় ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ।

(ঙ) তপশীলবহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা সংরক্ষণে বাধ্যকরণ।

(চ) ব্যাংকগুলির শাখা সম্প্রসারণের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ।

(ছ) অনুমোদিত মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সীমা রক্ষার জন্য ব্যাংকগুলিকে বাধ্যকরণ।

(জ) ভারতের বাইরের বিধিবদ্ধ ব্যাংকগুলিকে এই আইনের গণ্ডীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ।

(ঝ) ব্যাংকগুলির ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরনের ব্যালেন্স সীটের প্রচলন এবং ব্যাঙ্কগুলির নিকট থেকে প্রয়োজনীয় রিটার্ণ আদায়ের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে ক্ষমতা দান।

(ঞ) ব্যাঙ্কগুলির বইপত্র এবং হিসাবনিকাশ পরীক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দান।

(ট) রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ঋণদান সংক্রান্ত মৌল নীতি নির্ধারণ এবং ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক ঐ নীতি অনুসরণ।

(ঠ) আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পণ।

(ড) ব্যাংকের কারবার গুটানো সম্বন্ধে নিয়মকরণ।

(ঢ) সঙ্কটকালীন অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য দানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকের ওপর ক্ষমতা অর্পণ।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, এই আইনটির অনুকূলতায় ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে এবং সুবিন্যস্তভাবে ব্যাংকগুলির সম্প্রসারণ ঘটেছে। তথাপি বৃহৎ ব্যাংকগুলির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে কায়েমীস্বার্থের ধারক ও বাহকদের মুনাফা অর্জন অব্যাহত থাকে। সেই জন্য কেবলমাত্র আলোচ্য আইনটি প্রবর্তন করেই ভারত সরকার ক্ষান্ত হয় নি। অর্থনৈতিক সৃজন ব্যাপারে সরকারী আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, জাতীয় অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যের সংগে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য এবং সর্বোপরি ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সরকার ব্যাংকশিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করে। তদনুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ১৯৫৫ খৃঃ ১ জুলাই রাষ্ট্রায়ত্ত হয় এবং ষ্টেট ব্যাংক জন্মলাভ করে। এই নবজাত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক প্রসংগে স্টেট ব্যাংকের মুখপত্র 'মান্থলি রিভ্যু'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় বলা হয় :—

"The primary intention of this move was to extend banking facilities on a large scale, more particularly in the rural and semiurban areas and for diverse other public purposes, such as assistance to small-scale industries, co-operative and other development work which would stimulate economic expansion. The role of the State Bank of India has also been to set a pattern for the purposive and dynamic growth of banking in India and for taking up such developmental banking as may not prima-facie appear to be acceptable by traditional concepts."

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিগত ১৪ বৎসর যাবৎ রাষ্ট্রীকৃত ষ্টেট ব্যাংক ভারতবর্ষের বড় বড় শহর ছাড়াও শহরতলী অঞ্চলে এবং গ্রাম ভারতের বিভিন্ন অংশে জনসাধারণের নিকট ব্যাংক শিল্পের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। এই ব্যাংকটি বিগত ১৯৭০ খৃঃ ৫২ কোটি টাকার কৃষি ঋণ দেয়। কৃষিকর্ম সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করবার জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করে। এই ঋণের বৃহদাংশ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। ১৯৬৮ খৃঃ এই ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২·৭ কোটি টাকা এবং এই ঋণ ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ১৯৬৯ খৃঃ শেষে ১৮৪·১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। এইভাবে ষ্টেট ব্যাংকের কৃষি ঋণ শতকরা ১৯৩·৬ বেড়ে যায়। ১৯৫৬ খৃঃ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে দাদন বাবদ ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টাকা। ঐ টাকার পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে ১৯৭০ খৃঃ শেষে ২০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬৯ খৃঃ ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা প্রচলিত হয়। ফলে অধিকতর উদার ঋণ লাভের পথ উন্মুক্ত হয় এদের জন্যে। 'ওয়্যার হাউসিং' পরিকল্পনা অনুসারে ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ১৯৫৬ খৃঃ শেষে ছিল ৩·৮ কোটি টাকা। ঐ টাকা ক্রমশ বেড়ে ১৯৬৯ খৃঃ শেষে ৬·৯ কোটি টাকায় পরিণত হয়। তাছাড়া এই ব্যাংকটি বহির্বাণিজ্যের সম্যক উন্নতির জন্য এবং দেশের সমবায় সংস্থাগুলির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক ঋণের যোগান দিচ্ছে। অপর দিকে রাষ্ট্রীয়করণের ১৪ বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২শ নতুন কার্যালয় স্থাপিত হয় এবং

আনুমানিক ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার নতুন লোক প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কার্যালয়ে নিযুক্ত হয়।

স্টেট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব-বর্তী এবং পরবর্তীকালে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপিত হয়। দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপায়ণে এই সংস্থাগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থাগুলির মধ্যে ১৯৪৮ খৃঃ বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে মধ্য-মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফীন্যান্স কর্পোরেশন গঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অংগরাজ্যে মাঝারি এবং ছোট শিল্পগুলির অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য স্টেট ফীন্যান্সীয়াল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে ১৯৫৪ খৃঃ ন্যাশানাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভালপমেণ্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৬৩ খৃঃ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা কেবলমাত্র পরামর্শ-দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৫৫ খৃঃ বিশ্বব্যাঙ্কের আনুকূল্যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ঝুঁকি বহন করবার জন্য মূলধনের ব্যবস্থা করা। ১৯৫৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশানাল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী ক'রে দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের সুবিধাজনক সর্তে বিক্রয় করা। ১৯৬২ খৃঃ একটি আমানত বীমা কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য কোন ব্যাংকের পতন ঘটলে বীমাকারী ব্যাঙ্ককে আমানতকারীদের পাওনা মেটাবার জন্য বীমা তহবিল থেকে অর্থ যোগান দেওয়া। ১৯৬৪ খৃঃ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভালপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য দেশের বিভিন্ন ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সংস্থার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা, এগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা এবং ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদী শিল্প পরিকল্পনাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

কৃষি ঋণের জন্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৬৩ খৃঃ এগ্রি-কালচারাল রিফাইনান্স কর্পোরেশন সংগঠিত হয়। কৃষি এবং কৃষি সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের যোগান দেওয়াই এই কর্পোরেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাংক, রাজ্য সমবায় ব্যাংক, তপশীলী ব্যাংক এবং অনুমোদিত সমবায় সমিতিসমূহ কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে ঋণ দেয় তার বিরুদ্ধে এই কর্পোরেশন পুনরায় অর্থনৈতিক দাদন লাভের সুযোগ দেয়।

ভারত সরকার ১৯৬৯ খৃঃ ১৯ জুলাই পঞ্চাশ কোটি অথবা তদূর্ধ্ব আমানতের অধিকারী এইরূপ ১৪টি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংককে একটি অর্ডিনান্স বলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নেয়। এই অর্ডিনান্সটি যথাসময়ে কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীজ (অ্যাকুইজিসন অ্যাণ্ড ট্রান্সফার অব আণ্ডারটেকিংস) অ্যাক্ট ১৯৭০ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ভারতের বহু বিঘোষিত পরিকল্পনা ও নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে একটি নতুন এবং উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। প্রধান-মন্ত্রীর মতে এদেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকেও ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। এই রাষ্ট্রীয়করণের মূল উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ—(ক) মুষ্টিমেয়ের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা। (২) কৃষি, শিল্প এবং রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য অধিক পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করা। (গ) ব্যাংক পরিচালনার মধ্যে পেশাগত দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করা। (ঘ) এক শ্রেণীর নতুন শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। (ঙ) ব্যাংক কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ ও চাকুরীর যুক্তিসংগত শর্তাবলী রচনা করা।

রাষ্ট্রীয়করণের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৯ খৃঃ জুলাই মাস থেকে ১৯৭০ খৃঃ জুন মাস পর্যন্ত ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০৪৩টি নতুন শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪টি ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণের সময়ে ব্যাঙ্কগুলি প্রদত্ত কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয়করণের প্রথম বৎসরে এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি ৫৪ কোটি টাকার নতুন ঋণের যোগান দেয়। রাষ্ট্রীয়করণের প্রথম বৎসরেই এই ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ৫১ কোটি টাকার নতুন ঋণ মঞ্জুর করে। ফলে এই ঋণের পরিমাণ ১৯৭০ খৃঃ মার্চ মাসের শেষে ১৯৯ কোটি টাকায় পরিণত হয়। তাছাড়া স্ব-নিযুক্ত কর্মীদের অর্থাৎ ট্যাক্সীচালক, ট্রাকচালক এবং বিভিন্ন প্রকার যানবাহন চালককে ১৭ কোটি টাকার নতুন ঋণ প্রদান করে। আমানত সংগ্রহের ব্যাপারেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির অবস্থা আশাপ্রদ, কারণ উল্লিখিত বৎসরে সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ৩৮৭৪-৩ কোটি টাকা থেকে ৪৩৬০-৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তবে আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে এদেশের ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির অনেক কিছু করণীয় আছে। বলা বাহুল্য সংগৃহীত আমানতই ব্যাংক ব্যবসার প্রাণবায়ু।

যাই হোক আজ থেকে প্রায় বিশ বৎসর আগে ভারত সরকার যে পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মসূচী গ্রহণ করে দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি সেই পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি। এই পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণই এদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচায়ক। ভারতের মত একটি গণতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দেশীয় সরকার ব্যতীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থারও সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। সেইজন্য ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে সরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরকরূপে এদেশের ব্যাংকগুলি নিজ নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করে চলেছে। একথা অনস্বীকার্য যে দেশোন্নয়নের কল্যাণকর কর্মে বিগত দুই দশকে ব্যাংকগুলির ভূমিকা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। সরকারী কর্ম-প্রচেষ্টার সংগে সংগতি রেখে ব্যাঙ্কগুলি নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের পরিধি যত বিস্তার করবে দেশের অর্থনৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতির পথ ততই প্রশস্ত হবে।
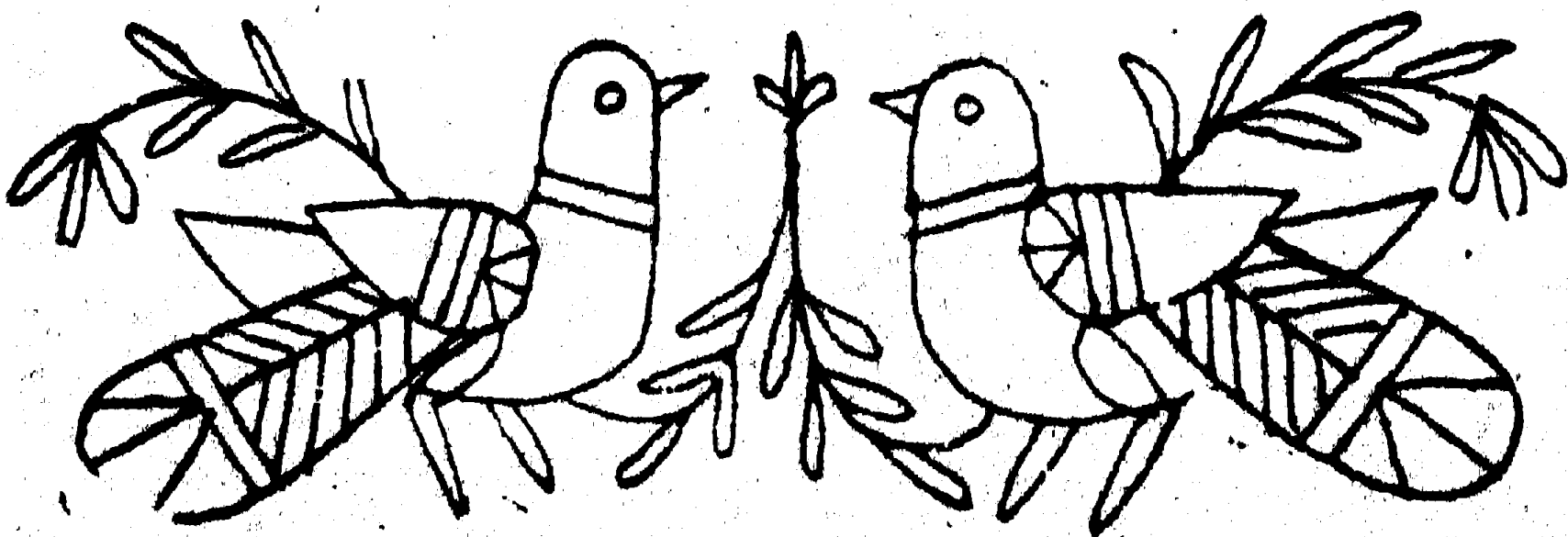
দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

(৪)

বারান্দা পেরিয়ে রোদ এখন ঘরে এসে পড়েছে। ঘরের সবগুলো জানলাই খোলা। সানু লেপ-তোষক-বালিশ রোদে মেলে দিল এক এক করে। মানু ভেতরে। শাড়িটা আটো করে পেঁচিয়ে নিয়েছে, চুল শক্ত করে বেঁধে নিলো। ঘর ঝাড়পোঁছ করছে সে। আজ সকালে আর বেরোয় নি মানু। উঠতে দেরি হয়েছিল, চা খেতে খেতে আরো বেলা হলো। রোদ্দুরে বেড়াতে ভাল লাগে না তার। তার চেয়ে ঘরের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নীলিমা দেবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিরে, আজ বেরোলি না যে?'

'এত বেলায় কোথায় যাব আর। তারচেয়ে বরং জামা-কাপড় সেদ্ধ করি, ঘরে ঝুল জমেছে, ঝাড়পোছ করি।' বলে মানু দাদার ময়লা পাজামা পাঞ্জাবি গেঞ্জি, সায়া ব্লাউজ থান কাপড় বিছানার চাদর, মশারী, বালিশের ওয়াড় সব এক সঙ্গে জড়ো করে সাবান সোডা দিয়ে সেদ্ধ বসাল। তারপর ঘর পরিষ্কারের কাজে হাত লাগিয়েছে। সানুর সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে দুজনই ভাগ ভাগ করে কাচবে।

সানু একটু বিরক্ত হয়েছে, বলল, 'একদিনে অত কাচার কি দরকার ছিল রে?'

'দরকার ছিল মানে, এত ময়লা হয়েছে যে দেখা যায় না আর।'

'তাই বলে একসঙ্গে সব?' সানুকে সামান্য অপ্রসন্ন দেখাল।

'আমিও তো বারণ করেছিলাম, এতগুলো একদিনে পারবি না, মেয়ের কানে গেল না কথা।'

'মাথায় একটা ঢুকলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

'ও তো এই রকমই, ধরবে না ধরবে না, ধরলে আবার সব নিয়ে পড়বে, সামলাবো তখন দায়।'

'এটা আবার বেশি বেশি।' সানু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

'আমি না ধরলেও তো আবার হয় না দেখি।' মানুও অসন্তুষ্টের গলায় বলল, 'অত কথার কি দরকার, তোকে কাচতে হবে না, আমি একলাই পারবো।'

'আর বলিস না, আমার জানা আছে সব।'

'জানিস তো জানিস, চুপ কর এবার।'

'আগুলে দিলেই হয় না, সব কাজেরই একটা ধারা আছে।'

'বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না।' মানু ঘরের ঝুল পরিষ্কার করতে করতে একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'সেই জন্যেই তো এই নোংরাও চোখে পড়ে না!' মানুর গলায় সামান্য উপহাস ছিল, সে হাসছিল।

'আর কথা বাড়াস না, ওর মতন ওকে করতে দে।' নীলিমা দেবী সানুর মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, 'আর একটা থালা নিয়ে আয়, আমি বারান্দায় বসছি।' নীলিমা দেবী বটি, কাঁচা তরকারীর ঝুড়ি, আর একটা থালা নিয়ে এসে বারান্দায় রোদে বসেছেন। সানুও থালা নিয়ে এলো। এসে মার পাশে বসে পড়েছে। ঝুড়ি থেকে গতকালের অর্ধেকটা লাউ তুলে নিলেন নীলিমা দেবী, খানিকটা টুকরো টুকরো করে সানুকে বললেন, 'যা ভালো ফেলে দিয়ে আয়। এই কাঁচা লঙ্কাগুলো দিস।'

সানু উঠে গেল।

কটা সিম আলু কাঁচকলা লাউ ফালাফালা করে কেটে এক জায়গায় রাখলেন নীলিমা দেবী। পরিমাণটা একবার দেখে নিলেন হাত দিয়ে, পরে নিজের মনেই অস্ফুটে বললেন, 'এতেই হয়ে যাবে, আর লাগবে না।'

সানু ফিরে এসে আগের জায়গায় বসেছে, মার দিকে চেয়ে আস্তে করে শুধোল, 'কি হবে, শুক্তো?' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বড়ি দেবে না এতে?'

'দেবো, না দিলে স্বাদ হবে কেন?' নীলিমা দেবী হাসতে হাসতে মাথা নাড়লেন। তিনি বাঁধাকপি কুটছিলেন খুব সরু সরু করে। সানু মাথা নীচু করে কড়াইশুঁটি ছাড়াচ্ছে।

একটু পরে সানু মার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'অত তরকারী দিয়ে কি হবে!'

'অত কোথায় রে, মিলিয়ে এই একটুখানি হয়ে যাবে।'

সানু হাসছিল, বলল, 'আর কি কি হবে শুনি।'

'আবার কি, একটা শুক্তো ডাল, বাঁধাকপি আর বাজার থেকে মাছ টাছ আনলে ওদের জন্যে মাছের ঝোল এই তো।'

'আজ আর অতগুলো পদ না করলেও পারতে। একেই তো মানুটা এই কাণ্ড করে বসে আছে।'

'অত আর কোথায়!'

'তুমি পারও!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, নীলিমা দেবী। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল তাঁর, বললেন, 'আমারই কি আর ভাল লাগে কিছু, করতে হয় করি।' নীলিমা দেবী সানুর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, বললেন, 'খোকা যে আমাকে শেষে এভাবে জ্বালাবে, স্বপ্নেও ভাবি নি, আমার কপালটাই খারাপ।' একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন তিনি। বুকটা থেকে থেকে কেমন ধড়ফড় করতে থাকে। খোকা কবে ফিরে আসবে তার কাছে? সাত পাঁচে তিনি এই দুঃখকে ভুলে থাকতে চান, পারেন না। মনে হলে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। একটু একটু করে বড় করে তুলেছিলেন কি এইজন্যেই? ও কি একবারও মার কথাটা ভাবল না? এত কষ্ট যে আর সইতে পারেন না তিনি। বুকটা ফেটে যায়। হায় রে, কী কপাল করেই না তিনি জন্মেছিলেন! আগে একআধটা চিঠিও আসত, এখন আসে না। অনীশকে জিজ্ঞেস করেন, ও-ও কিছু পরিষ্কার করে বলতে পারে না। মনে মনে

মানু অতসীর মুখের দিকে চেয়ে কেন যেন হেসে ফেলেছে। অতসীও সামান্য অপ্রস্তুত, কেমন অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল তাকে। পরমুহূর্তেই আবার সামলে নিয়েছে, মুচকি হেসে বলল, 'ভাল হচ্ছে না কিন্তু মানু!' চোখ বড় বড় করে কৃত্রিম শাসনের গলায় বলল।

মানু তখনো হাসছে, বলল, 'বারে, আমি তো কিছু বলিনি তোমায়!' হাসিটা বেশ অর্থময়।

'আবার বলবেটা কি!'

মানুও কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল অতসীকে। এমন সময় অনীশ ঘরে ঢুকেছে, ঢুকেই একটু অবাক হলো, মানুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এ কি করেছিস রে!'

'একেবারে লঙ্কাকাণ্ড তো!' হাসে মানু, পরে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'নোংরা হয়েছিল, তাকানো যাচ্ছিল না।'

অনীশ সিগারেট ধরিয়ে নেয়। ধোঁয়া মুখে নিয়ে এবার অতসীর মুখের ওপর চোখ স্থির রাখল একটুক্ষণ, কি যেন ভেবে নিল, বলল, 'আজ ভোরে তো তোমায় দেখলাম না!'

'না, আজ আমি বেরোইনি।' অতসী শান্ত গলায় বলল, হঠাৎ মানুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো, ও মুখ টিপে টিপে হাসছিল। ঘর পরিষ্কার করতে করতে মাঝে মাঝে মানু অতসীকে চোরা চোখে দেখছে।

রোদ উঠে গেছে অনেক, গায়ের চাদরটা খুলে ফেলেছে অনীশ, বিছানার ওপর রাখতে রাখতে মানুকে বললো, 'যা করেছিস, ঘরে বসার উপায় নেই, বাইরেই যাচ্ছি।'

'আর তো একটুখানি, কাচাকুচি পড়ে আছে না?'

'বেশ মজা তো দেখছি! সানুও কাপড় কাচছে, তুইও যাবি, মা রান্নাটান্না নিয়ে ব্যস্ত: আমরা বুঝি আর চা-টা খাবো না!' অনীশ যেন এদের এই বাড়াবাড়ির জন্যে ক্ষুন্ন হয়েছে এমন গলায় বলল।

'কেন খাবে না, এই তো এলে, একটু জিরোও-টিরোও।' মানু হঠাৎ অতসীর মুখের দিকে চাইল, হাসি হাসি মুখে বলল, 'এই অতসীদি, তুমি তো কিছুই করছো না, চায়ের জলটা স্টোভে বসিয়ে দাও তো। আজ অতসীদিই চা করে খাওয়াক!'

'নিশ্চয়ই, বল, কোথায় কি আছে!'

'রান্নাঘরে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর!'

'ওকে আবার কষ্ট দিলি তো!' অনীশ হেসে ফেলেছে এবার।

'আমার অভ্যেস আছে, অত আনাড়ী তা নয়, তুমি এলে কথা বলতে, আর তোমাকে কাজ দিয়ে বসল।'

'আমি বুঝি আর কিছু করি না!' অতসীর চোখে মুখে চাপা হাসি।

'বেশ, করো তাহলে!' অনীশ ধোঁয়া গিলতে গিলতে হাসল।

অতসী রান্নাঘরে গেল।

অনীশ বারান্দায় এসে রোদে পিঠ লাগিয়ে মেঝেয় বসল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়েছে। এতখানি হেঁটে এখন কিছুটা ক্লান্ত সে। ভেবেছিল ঘরে এসে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নেবে। তার আর উপায় নেই। মনে মনে বিরক্ত হলো। এত ধোওয়া-মোছার কি আছে! মানুটার আবার বাড়াবাড়ি, আর করবিই যদি একদিনে কেন! অন্যমনস্ক অলস মেজাজে আঙুল কাটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো তার, নখগুলো বেশ বড় বড় হয়েছে, কাটা দরকার। কি ভেবে উঠে পড়ল, ঘর থেকে একটা ব্লেড নিয়ে এসে আবার সেই জায়গায় বসল। নখ কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে সামনের বাগান, গাছগাছালি দেখছিল। দূরে ছোলা, কলাই ক্ষেত। রোদটা এখন শুকনো।

একটু পরে অতসী একটা প্লেটে করে দুটো ল্যাংচা, দুটো কালাকাঁদ আর এক গ্লাস জল এনে ওর সামনে রাখল, 'মাসীমা পাঠিয়ে দিলেন' অতসী চলে আসছিল।

'এই দাঁড়াও।'

অতসী দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঘাড় হেলিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, 'কি বলুন।'

'এগুলো নিয়ে যাও, আমি খেয়ে এসেছি, শুধু চা।' অনীশ ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল।

'শুধু চা দেওয়া বারণ আছে।'

'মা বুঝি শিখিয়ে দিল!'

'আর শেখালেনই বা, এগুলো আপনাকে খেতেই হবে।'

'পারবোই না।'

'ওসব শুনবো না!' অতসী মাথা নাড়িয়ে কোমল গলায় বলল।

'খেতে পারি, তবে তোমাকেও অর্ধেকটা ভাগ নিতে হবে।'

'আমার জন্যে ওখানে আছে, বুঝলেন?' অতসী চোখ টান টান করে তাকাল।

'তাহলে পড়ে থাকবে, আমার কি!'

'চা-টা নিয়ে আসি আগে।' অতসী ভেতরে চলে গেল।

অনীশ মনে মনে হাসল। নখ কাটা শেষ হয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরায় আবার।

অতসী চা নিয়ে এলো, 'কি, এখনও খেলেন না যে!'

'বলেছি তো ভাগ নিতে হবে।' চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চায়ে চুমুক দিল

অতসী দাঁড়িয়ে থেকে এক মুহূর্ত কি ভাবল, হেসে ফেলে কাছে এগিয়ে এসে ওর একেবারে সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, 'দিন আমার মুখে দিয়ে দিন।' অতসী হাঁ করল। একটা কালাকাঁদ ভেঙে ওর মুখে দিতে দিতে অনীশ বলল, 'একবারে খেলে গলায় আটকে যেতে পারে।' অনীশ একটা ল্যাংচা ভেঙে মুখে পুরল, খেতে খেতে আবার বলল, 'আমারটা রেখে তুমি নিয়ে যাও।'

'না না, অত পারবো না।' অতসী হাসছিল মধুর ভঙ্গিতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে ধীরে ধীরে বলল, 'আজ সন্ধেয় আমাদের ওখানে রাঙামামা যেতে বলে দিয়েছে আপনাকে। খুব জরুরী ব্যাপার কিন্তু, ভুলে যাবেন না আবার!'

'কি অমন জরুরী?' অনীশ মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

অতসী এবার আর হাসল না, একটু গম্ভীর হলো যেন, বলল, 'আমায় কিছু বলেনি।'

'তবে আর জরুরী কি?'

'আমায় তো তাই বলে দিল, না গেলে আমাকে আবার আসতে হবে।' অতসী অনীশের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আনল, অন্যদিকে চেয়ে কি ভেবে হাসল সামান্য।

'তাহলে তো যেতেই হয়।' অনীশ একটু অন্যমনস্ক হলো এই মুহূর্তে।

সানু কাচা বিছানার চাদর আর মশারী নিয়ে এলো, রোদে মেলে দিতে দিতে এক ফাঁকে অতসীকে বলল, 'একবার ধর তো এসে একটু।'

অতসী আর সানু দুজনে মিলে মশারীটা টাঙিয়ে দিয়েছে।

'এরকম করে দিলে তাড়াতাড়ি শুকোবে।' অতসী বলল।

'যা মশা না এখানে!'

সানু আবার ভেতরে চলে গেল।

অতসী গ্লাস, চায়ের কাপ প্লেটগুলো তুলে নিয়ে ঘরে গেল। একটু পরে বারান্দায় এসে খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল, বেলা বাড়ছে। অনীশের মুখের দিকে চেয়ে এক সময়ে বলল, 'আমি তাহলে যাচ্ছি।'

'থেকে গেলেও আপত্তি নেই।' অনীশ ধোঁয়া ছেড়ে হাসল।

অতসী পলকে ওকে একবার দেখে নিল, চোখে মুখে কী গভীর এক আবেগ যেন মুহূর্তে ফুটে উঠেছে তার। সে আর দাঁড়াল না। কী এক লজ্জা যেন জড়িয়ে ধরেছে। আর একটু থাকলেই অনীশের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

অনীশ কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একজোড়া শালিখ এই মুহূর্তে বারান্দায় উঠে এসে ওকে কেমন অবাক হয়ে দেখছিল।

(ক্রমশ)

পুতুল।। ময়মনসিংহ

সরা।। ফরিদপুর

সোনার বাংলা

শিপ্রা আদিত্য
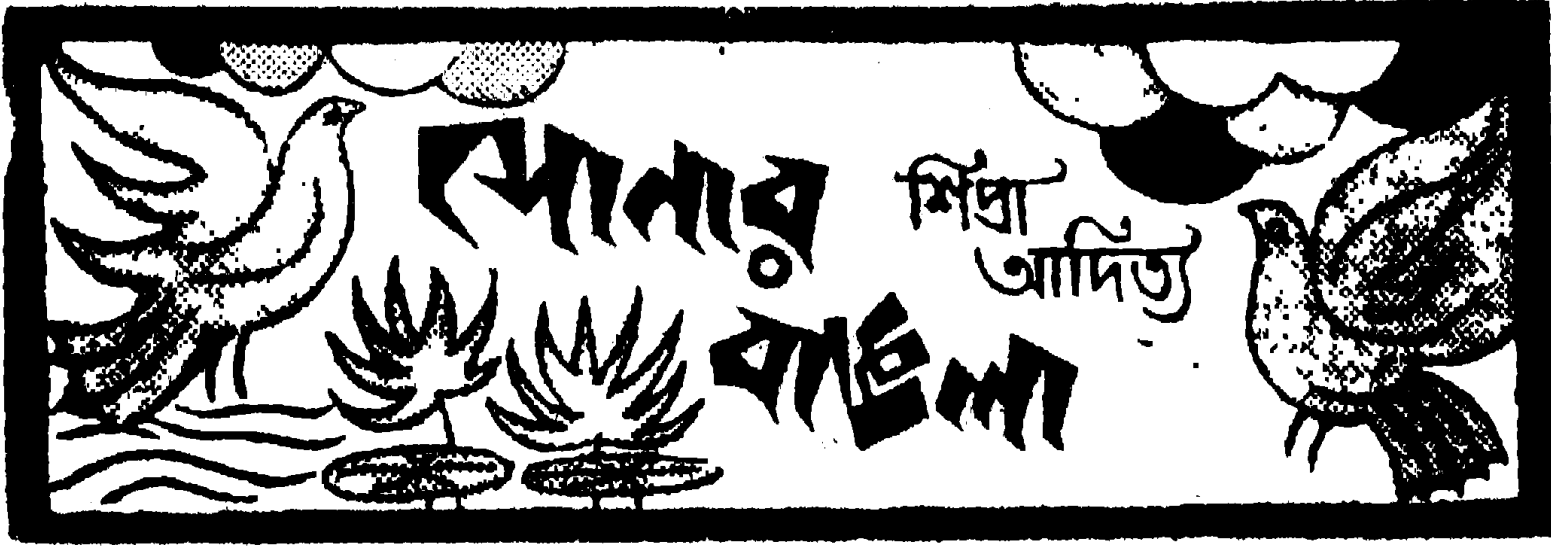
এ পর্যন্ত আমরা "সোনার বাংলার" স্থাপত্যশিল্প নিয়েই আলোচনা করে এসেছি। সোনার বাংলার আরো অনেক রত্ন লুকিয়ে আছে তার লোককথায়, লোকশিল্পে। বর্তমান সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের প্রবহমান শিল্প-ধারাটি আজ প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। আজকের যান্ত্রিকতায় দ্বিধাবিভক্ত সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক ছেড়ে হয়েছে শহরমুখী। ফলে এসব শিল্পীর দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা গেছে কমে, তারপর বিদেশী শিল্পসামগ্রী, মিশ্র-ধাতু, প্ল্যাস্টিককে ছেয়ে গেছে বাজার. ফলে এই জীবন্ত শিল্পধারাটি চরা-পড়া নদীর মত শুকোতে বসেছে। এই লোকশিল্পের অনেকাংশই আজ বাস্তুহারা হয়ে এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে মেয়েরা একদিন গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গাই নিয়ে আকাশের কাছে জল চেয়ে ব্রত করতো, তাদের সে ব্রতের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় আকাশ, বাতাস, মাঠ, পুকুর বা ঘর-উঠোনের আজ দারুণ অভাব। সেই সঙ্গে জীবনধারণের প্রয়োজনে অব-কাশেরও অভাব। ঠিক এই কারণেই স্রোত জমা ছাড়া ছিন্নমূল চাষীও ভুলতে বসেছে তার বীজবোনা, ফসল ঘরে তোলার লক্ষ্মী, দুর্গার চালচিত্রী বা ব্রতর আলপনা আঁকা। কাপড়ে নক্‌সা করা তাঁতী, শাঁখায় সূক্ষ্ম কাজ করা শাঁখারী জীবনধারণের তাগিদে বাধ্য হচ্ছে ভিন্নতর পেশা নিতে। তবু সেদিনের প্রবহমান শিল্পধারাটির কারিকু নিদর্শন শিল্পী ও শিল্পকে নিয়েই এ রচনা।

প্রথমেই আসা যাক বাংলার ঘর-বাড়ীর আলোচনায়। প্রাচীন বাংলায় স্বল্প কয়েকটি পাকা বাড়ীর আমলে বেশীর ভাগই ছিল খড়ের ঘর। এই ঘরগুলির খুঁটিগুলো ছিল সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের। আর ছিল কাঠের টুকরো, নলতে বাঁশ (তলতা) আর বেত দিয়ে তৈরী সুন্দর চাঁদোয়ার মত ছাদের সিলিং। সেদিনের সেই শিল্পধারাটি বর্তমানে লুপ্ত। কারণ আমরা জানি যে—বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রতি বছরের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত এমন সব হাজারে হাজারে ঘরবাড়ী। নতুন পরিকল্পনায় বাঁশ আর খড়ের জায়গায় এল পুরোপুরি কাঠ আর টিনের ঘর-বাড়ী একতলা থেকে দোতলা সমান। এখানেও ছাদের কার্ণিশে, বারান্দার গ্রিলের ঢঙে অলংকরণ আজো চোখে পড়ে। বর্ষার প্লাবন দেখা দিলে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচতে বাড়ীর কাঠ আর টিনগুলো খুলে অন্যত্র ঘরবেঁধে বসবাস করতো। আজো গ্রামে এই প্রথা চালু আছে।

ঘরের পরই আসে ঘর অলংকরণের কথা। বাংলার বাঁশ আর বেতের কারু-কার্যের কথা কে না জানে। বাঁশের ঝুড়ি, মাছের খলুই, চিক, মাদুর শীতলপাটির জন্য বিখ্যাত বাংলার কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর অঞ্চল। গ্রাম বাংলার রাঙিন দড়ির "সিকে" আজকের শহুরে বাঙালীদের ড্রইংরুমে শোভাবর্দ্ধন করে চলেছে। রঙিন দড়ির সিকে ছাড়াও রঙিন দড়ির ব্যাগের জন্য আজও ঢাকা বিখ্যাত।

নকশি-কাঁথা—শিল্পচেতনার ইতিহাসে প্রাচীন বাংলার লোকশিল্পগুলির মধ্যে নকসি-কাঁথার অবদান অনস্বীকার্য। বর্ণ-বৈচিত্র্য নক্‌সা, বিষয়বস্তু প্রায়ই সে যুগের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে এনে হাজির করে। এই কাঁথার জন্য বিখ্যাত বাংলা-দেশের—যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলা। পুরানো কাপড়ে রঙিন সুতোর ফোঁড় দিয়ে আলপনা করা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাসলীলা, হিন্দু ধর্মের নানা ব্যাখ্যার ছবি প্যাওয়া যায় কাঁথাশিল্প থেকে। এমন কি সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ছবিও প্রতিফলিত হত সামান্য কাঁথায়, তারই উদাহরণরূপে পাওয়া গেছে —এলোকেশী হত্যা, আর তারকেশ্বর মহান্তের ছবি। যেখানে শিল্পী শুধু সমবেদনাই প্রকাশ করেন নি ব্যঙ্গও করে-ছেন। সেদিনের বিলাসিনী পেশাকরদের ছবি এঁকে ব্যঙ্গ করেছেন সমাজব্যবস্থাকে। কাঁথাশিল্প প্রসঙ্গেই এই সেদিন সাক্ষাৎ ঘটেছিল ৯২ বছরের বৃদ্ধা শিল্পী প্রমদা-সুন্দরী সেনের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় (১৯৫০ খৃঃ) প্রাণভয়ে চলে আসার সময় সযত্নে এনেছিলেন কয়েকটি অসাধারণ কাঁথা, বললেন কান্নাঝরা কাঁপা গলায়।'

শুধু তাই নয় ১৯৫৫ খৃঃ ২৩শে অক্টোবর কলকাতা যুবসঙ্ঘ আয়োজিত চারু ও কারুকলা প্রদর্শনীতে ধর্মতলার ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে প্রথম প্রদর্শিত হয় এই শিল্পকলা·নিদর্শন। তারপর ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ "ওয়ারস" যুব উৎসবে সেলাই প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক প্রথম·পুর-স্কার পায় প্রমদাসুন্দরীর কাঁথা। সে আজ অনেক আগের কথা, বললেন শিল্পী নিজে।

সোনার বাংলার ঢাকার এমন শিল্পী চরম দুরবস্থায় বাস করছেন এপার বাংলা তথা কলকাতার মিঞাবাগান বস্তিতে। বয়সের ভারে জর্জরিত, চোখে গ্লানি। স্বাভা-বিক কারণেই শিল্পকলাটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে শিল্পীর। ঢাকার এই শিল্পী ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন শিল্পীদের কাছ থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু কাঁথা কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম এবং গুরুসদয় মিউজিয়ামে সুরক্ষিত।

ধাতু শিল্প—ধাতুশিল্পেও বাংলাদেশের কারিগররা একদিন সারা ভারত তথা দুনিয়াকে বিস্মিত করেছিল। ঢাকার সেকরাদের হাতে তৈরী সূক্ষ্ম অলঙ্করণ সমৃদ্ধ অলঙ্কার সেদিন মহিলা জগতের গর্বের বস্তু ছিল। রূপোর সূক্ষ্ম তারে

গাজীর পট।। কুমিল্লা
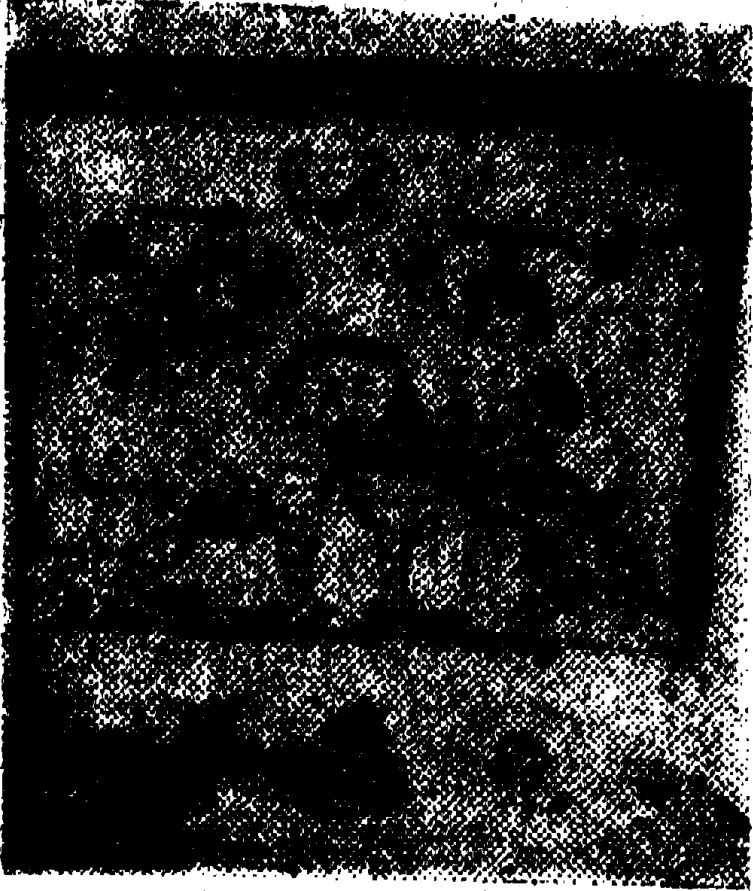
কাঁথা।। ফরিদপুর
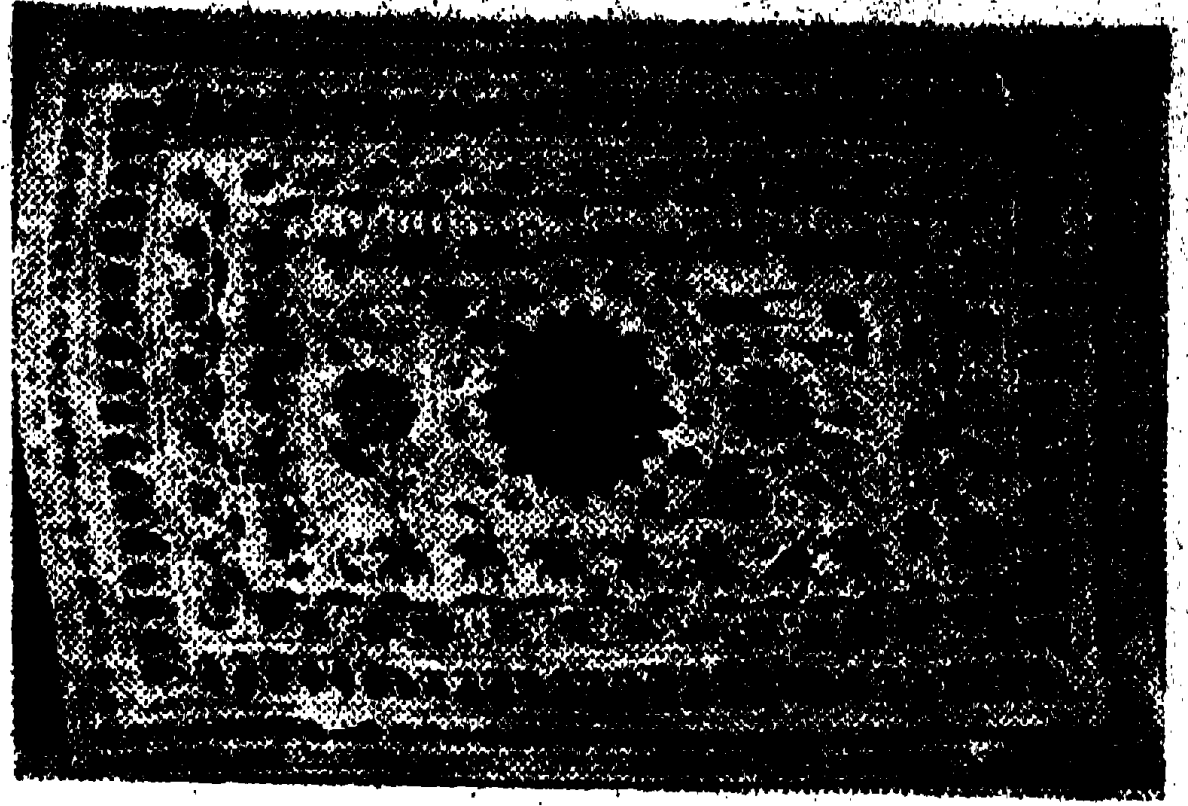
শিল্পী বাংলাদেশের সেই সনাতন শিল্পধারাটি সযত্নেই পালন করে আসছেন।

বাংলাদেশের কাঠের পুতুল পশ্চিমবাংলার কাটোয়ার নতুনগ্রামের বা কালীঘাটের মতন অত সুন্দর না হলেও সুন্দর বলা চলে। বাংলাদেশের কাঠের বউ পুতুল আজও রুচিবান গৃহস্থের গৃহসজ্জার অঙ্গ। বাংলাদেশে ধামরাই-এর কাঠের রথের সুন্দর কারুকার্য সারা বাংলার গৌরবের বস্তু ছিল। খানসেনারা রথটি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

প্রতিমা—বারোমাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাতেও দেব-দেবীর মূর্তির বহুল চলন, বিশেষ করে শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, শীতলা, মনসা, কালী এমন কত কি। জেলা অনুসারে শিল্পীদের কাজেও রকমফের দেখা যায়। সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য ঢাকা জেলা। বহু সুদক্ষ মৃৎশিল্পীই উদ্বাস্তু হয়ে আজ পশ্চিম বাংলায় বসবাস করছেন। তাঁদেরই একজন হচ্ছেন, ঢাকা জেলার শ্রীযামিনী পাল। ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের তোরণদ্বারে শোভিত যামিনী পালের মূর্তিগুলি সেদিন কলকাতার রসিকসমাজকে বিস্মিত করেছিল।

কলকাতার কুমোরটুলী বা নদীয়ার কেস্টনগরের শিল্পীকুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজও এই শিল্পীরা সুনিপুণ ভাবে মূর্তি গড়ে চলেছেন।

শোলার পুতুল—"ডাকের" শোলার কাজের জন্য এক সময় ঢাকা খুবই বিখ্যাত ছিল। ডাকের কাজ ছাড়াও শোলার ফুল, নক্সা, পাখী, পুতুল, নৌকা এমন কত কির জন্য বিখ্যাত ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জায়গা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় শোলার কাজের প্রচলন ছিল। আজকাল বারোয়ারী পুজোয় কিছু এবং বনেদী পরিবারের পুজোয় ডাকের কাজ দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ থেকে আগত কিছু উদ্বাস্তু মালাকার পরিবার বর্তমানে মানিকতলার বাগমারী অঞ্চলে বসবাস করছে। এদের মধ্যে শিল্পী গোপীবল্লভ মালাকারের কাজই খুব উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পীর হাতের কাজ দেখে কলকাতার রসিকবৃন্দ বারে বারে বিস্মিত হয়েছে ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মঞ্চে, উল্টোরথ পত্রিকার পুরস্কার বিতরণ উৎসবের মঞ্চে অথবা চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় সম্মান উৎসব উপলক্ষে টেকনিসিয়ান স্টুডিওর প্রাঙ্গণে।

বাংলাদেশে মহরমের তাজিয়ার, জন্মাষ্টমীর মিছিলেও শোলার কারুকার্যের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছিল। এ মিছিল খুবই বর্ণাঢ্য হত।

শঙ্খশিল্প—"চাই ঢাকাই শাঁখা"—এমন সুর করে শাঁখাওয়ালা বা শঙ্খবণিকেরা হামেশাই ডাক দিয়ে যায়। এমন পরিচিত সুরটিকে খুঁজতে গেলে চলে যেতে হবে পদ্মা পেরিয়ে সেই বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়। পূর্ব বাংলায় এক সময় শাঁখার খুব নামডাক ছিল। শুধু তাই নয় সমগ্র বাংলা জুড়েই ছিল এর প্রতিপত্তি। সেখানকার কিছু শাঁখারি উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসে এই পশ্চিমবাংলায় অর্থাৎ কলকাতায়। বাগবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, প্রভৃতি জায়গায় বসতি বা ব্যবসায়িক কেন্দ্র।

শুধু শাঁখাই নয়, শঙ্খে তৈরী নানাবিধ অলংকার, বোতাম, ব্রোচ, পুতুল, চামচ প্রভৃতি শিল্পবস্তুগুলির যথেষ্টই চাহিদা আজ বিদেশে। আজও বাংলাদেশ শঙ্খশিল্প বিদেশে রপ্তানী করে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

আমাদের বিশেষ আবেদন লুপ্তপ্রায় এই শিল্পধারাগুলিকে আবার পুনর্জীবিত করার দায়িত্ব শুধু বাংলাদেশ সরকার-এর নিজেরই হবে না, জনগণকেও সমানভাবে সহযোগিতা করতে হবে। তবে বাঁচবে এই সব লোকশিল্পের কারিগর আর লোককলাটি।

এ সংখ্যার লেখা বাঙলাদেশের লোকশিল্পের যাবতীয় আলোকচিত্র গুরুসদয় সংগ্রহশালার সৌজন্যে

আমসত্ত্বের ছাঁচ।। ফরিদপুর

গদর বিপ্লবের গোড়ার কথা

অন্তোষকুমার অধিকারী

—তোমার নাম কি?
উত্তর হ'লো—বিদ্রোহ।
—তোমার কাজ?
—বিদ্রোহ।

আবার প্রশ্ন—এ বিদ্রোহ কোথায় হবে?

উত্তর—কেন, ভারতবর্ষে। যেখানে মানবে ব্রিটিশ শাসনের নিপীড়নে বিপর্যস্ত, সেইখানে।

ওপরের কথোপকথন কোন নাটকের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করা হয়নি। আমেরিকায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'গদর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে এই প্রশ্নোত্তর বেরিয়েছিল। এই পত্রিকা হিন্দী, উর্দু, গুরুমুখী, বাংলা ও মারাঠি ভাষায় যুগান্তর প্রেসে মুদ্রিত হ'তো। তত্ত্বাবধানায় ছিলেন—লালা হরদয়াল, বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও ডাঃ খাঁ খোজে।

এই 'গদর' পত্রিকায় 'চাকরি খালি' বিজ্ঞাপন বার হ'ল একদিন।

লোক চাই। হিন্দুস্থানের বিদ্রোহে যোগ দেবে এমন সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য সাহসী যুবক চাই।

পারিশ্রমিক—মৃত্যু
পুরস্কার—শহীদত্ব
কর্মস্থল—হিন্দুস্থান
পেনসন দেওয়া হবে স্বাধীনতায়।

আমেরিকা এবং কানাডায় তখন পাঞ্জাবীদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। দরিদ্র পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ কৃষকেরাই বেশীর ভাগ ছুটেছে বাইরে। আমেরিকায় কাজ তাদের জুটতো কিন্তু জুটতো না সম্মান। উপরন্তু শ্বেতাঙ্গ জাতির লোকেরা কালো চামড়ার ভারতীয়দের 'ক্রীতদাসের জাত' 'নিগার' ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করতো। প্রবাসী ভারতীয়েরা মর্মে মর্মে বিদ্ধ হ'তো কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না। এমন সময় ১৯১৩ সালের নভেম্বরে হঠাৎ তাদের কাছে এসে পৌঁছলো ছাপা পত্রিকা 'গদর'। যার অর্থ 'বিদ্রোহ'।

অন্য অঞ্চল নয় সানফ্রান্সিসকো ও

সভা হয়ে গেল। এই সভাতে সৃষ্ট হল হিন্দুস্থানিক সমিতি 'গদর'। সভাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীন হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠার দাবিকে তুলে ধরা হলো। সমিতির সভাপতি পদে বৃত হলেন বাবা সোহন সিং ভাকনা এবং সম্পাদক হলেন লালা হরদয়াল।

'গদর' পত্রিকার কর্মখালির সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে শত-শত দরখাস্ত পড়লো। আমেরিকা ও কানাডার সর্বত্র 'গদর' পার্টির শাখা। 'গদর পত্রিকা' আমেরিকা থেকে কানাডা তারপর বার্মা, শ্যাম, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর হ'য়ে ভারতে এসে পৌঁছলো। সর্বত্র পার্টির কাজ প্রকাশ্যেই শুরু হয়ে গেল। যাঁরা পার্টির জন্য প্রাণপাত করে খাটতে লাগলেন, তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র বরকতুল্লা, জগৎরাম ও কর্তার সিং সরোবার নাম আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ইতিহাসে।

'গদর' পত্রিকা সম্পর্কে সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বলা হ'য়েছে—

> "It was of a violent anti-British nature, playing on every passion which it could possibly excite, preaching murder and mutiny in every sentence and urging all Indians to go to India with the express object of committing murder, causing revolution and expelling the British Govt by any and every means".

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা ধ্বনি বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে 'গদর' দলের সভ্যদের মুখে শোনা গেল— চলো হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানে ফিরে চলো, আর ইংরাজদের দূর করে দাও। এই সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত একটি ঘটনায় সমস্ত পাঞ্জাবের মনে আগুন জ্বলে উঠলো। বাবা গুরুদিত্ত সিংয়ের নেতৃত্বে চারশ' জন শিখের একটি দল কানাডায় ঢুকতে না পেরে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসছিল। তারা এলো কোমাগাটামারু নামের জাপানী জাহাজে। বজবজে সশস্ত্র ব্রিটিশ পুলিশের একটি সশস্ত্র দল এদের বাধা দেয় এবং প্রায় আঠারো জনকে গুলী করে মারে। বাবা গুরুদিত্ত সিং ও অন্য ২১জন শিখ পুলিশের

কিন্তু শুধু তারা ফিরছে না। বিদ্রোহীদের বড় একটা দল 'তোমামারু' জাহাজে ফিরছে। তারা সুদূর প্রাচ্যের প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার চালাতে লাগলো। মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করতে তারা দৃঢ় সংকল্প হলো এবং গণ-বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে তারা মেতে উঠলো। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও তারা প্রবেশ করলো এবং ডাক দিলো সকলকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দাঁড়াতে। বিদ্রোহীদের একটি পুস্তিকা 'গদর-ই-গুঞ্জ' (বা বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি) লিখলো—'আমরা সরকারী সম্পত্তি লুঠ করে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করবো, এবং সমস্ত পাঞ্জাবকে জাগিয়ে দেবো। ইউরোপীয়দের ধন-সম্পত্তি লুঠ করে আনতে হবে আমাদের প্রয়োজনে।'

বিদ্রোহের সংগঠনের জন্য আমেরিকা থেকে বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও কর্তার সিং সরোবা পাঞ্জাবে ফিরে এলেন। তাঁরা সেনাবাহিনীতে প্রচার চালিয়ে তাদেরকেও বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ হ'তে ডাক দিলেন। পিংলে ও ভাই পরমানন্দ বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এবং বাঙালীদের তৈরী বোমা পাওয়া যাবে এমন ভরসা দিলেন তাঁদের দলের লোকদের। বিজন জঙ্গলে, মাঠে ও নদীর ধারে তাঁরা ঘাঁটি তৈরী করলেন, এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষী মজুরদেরও বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করলেন। দিল্লী হার্ডিঞ্জ বোমার মামলার পলাতক বিপ্লবী রাসবিহারী বসু লাহোরে এলেন দলের নেতৃত্ব নিতে। তাঁর সহযোগিতায় রইলেন, বারানসীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্রে দেখা যায় যে, আমেরিকায় রামচন্দ্র জার্মান কনসালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। আমেরিকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন হরদয়াল। তাঁর সঙ্গে এবং প্রবীণ বিপ্লবী সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গেও জার্মানদের যোগাযোগ থাকে। জার্মান থেকে জাহাজ ভর্তি হয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ভারতে আসবে এমন পরিকল্পনাও ঠিক হয়ে যায়। কয়েকজন বিপ্লবী বর্মার পথে ভারতে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কাজ শুরু করেন। এঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নিভীক দেশপ্রেমিক সোহনলাল পাঠক।

অন্যান্য পুস্তিকাগুলির দ্বারায় এই বিদ্রোহকে পরিচালনা করা হতে লাগলো। 'গদর' পত্রিকার বক্তব্য হ'লো—আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাবো, কারণ আমরা বিপ্লবকে সৃষ্টি করতে চাই। আমরা চাই সমস্ত ইউরোপীয় ব্যক্তিকে হত্যা করতে। সরকারী কর্মচারীদেরও আমরা রেহাই দেবো

না। বর্তমান গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদ করে আমরা এক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

বিপ্লবের বাণী প্রচার করলো 'ঘদর-ই-গদর'। তার পৃষ্ঠায় কাব্য রচনা করে বলা হ'ল—

...এবার সেই সময় এসেছে, যখন আমাদের অসি কোষমুক্ত করতে হবে; যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

...প্রস্তুত করো সেই বিদ্রোহের মুহূর্তকে। এই লৌহ-পেষণের প্রতিটি চিহ্নকে করো বিলুপ্ত।

...যুদ্ধ দেশের জন্যে, যুদ্ধ শ্বেতাঙ্গদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে।

...আমাদের সকল ভুল ফুল হয়ে উঠবে, যখন আমাদের দেশের জন্যে আমরা লড়াই করবো।

...সংকল্প গ্রহণ করো এবার— বিতাড়িত করতে হবে শত্রুকে। শত্রুর রক্তে তৃপ্ত হোক তোমার তৃষ্ণা।

...ওঠো, জাগো, দেশের কাজে এগিয়ে চলো। প্রস্তুত হও বিপ্লবের জন্যে।

'ঘদর' পত্রিকার প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলা হ'লো—'এবার সময় এসেছে, জাগার; সময় এসেছে ইউরোপীয়দের হত্যা করে দেশকে মুক্ত করার। যে যুদ্ধ ঘোষিত হ'য়েছে তারই কথা বলছি। সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে লড়াই। তোমরা কি এখন অলস হ'য়ে বসে থাকতে পারো? এই যুদ্ধে এগিয়ে যাও, সমবেত হও, বর্তমান সরকারকে উন্মূলিত করো। প্রতিষ্ঠা করো প্রজাতন্ত্রের।'

সেই প্রজাতন্ত্রের রূপও বর্ণনা করা হলো। '—এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার নিয়ে আসবে সুখ ও সমৃদ্ধি। যেমন এনেছে চীন ও দক্ষিণ আমেরিকা। বিপ্লবের উদ্দেশ্যকে আরও সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন সোহনলাল পাঠক—"আমরা সময়েই একটি গণতান্ত্রিক সরকার চাইবো। আমাদের দলের উদ্দেশ্য—যে কোন উপায়েই হোক, স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করা।'

১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের ৫৭ বছর পরে ১৯১৪-তে আবার সব ভারতীয় ভিত্তিতে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হ'ল। বিপ্লবে যোগদানের জন্য দেশীয় সেনাবাহিনীগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হ'ল। উত্তর ভারতের সবগুলি সেনা-ব্যারাকে প্রচার চালিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করা হ'ল। রাসবিহারী বসু নির্দেশ দিলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) এই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটবে। ওইদিনে একসঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়দের বন্দী করা হবে এবং অস্ত্রাগারগুলি দখল করা হবে।

বাবা সোহন সিং ভাকনা
[সর্দার জগমোহন সিং (লুধিয়ানা)-এর সৌজন্যে]
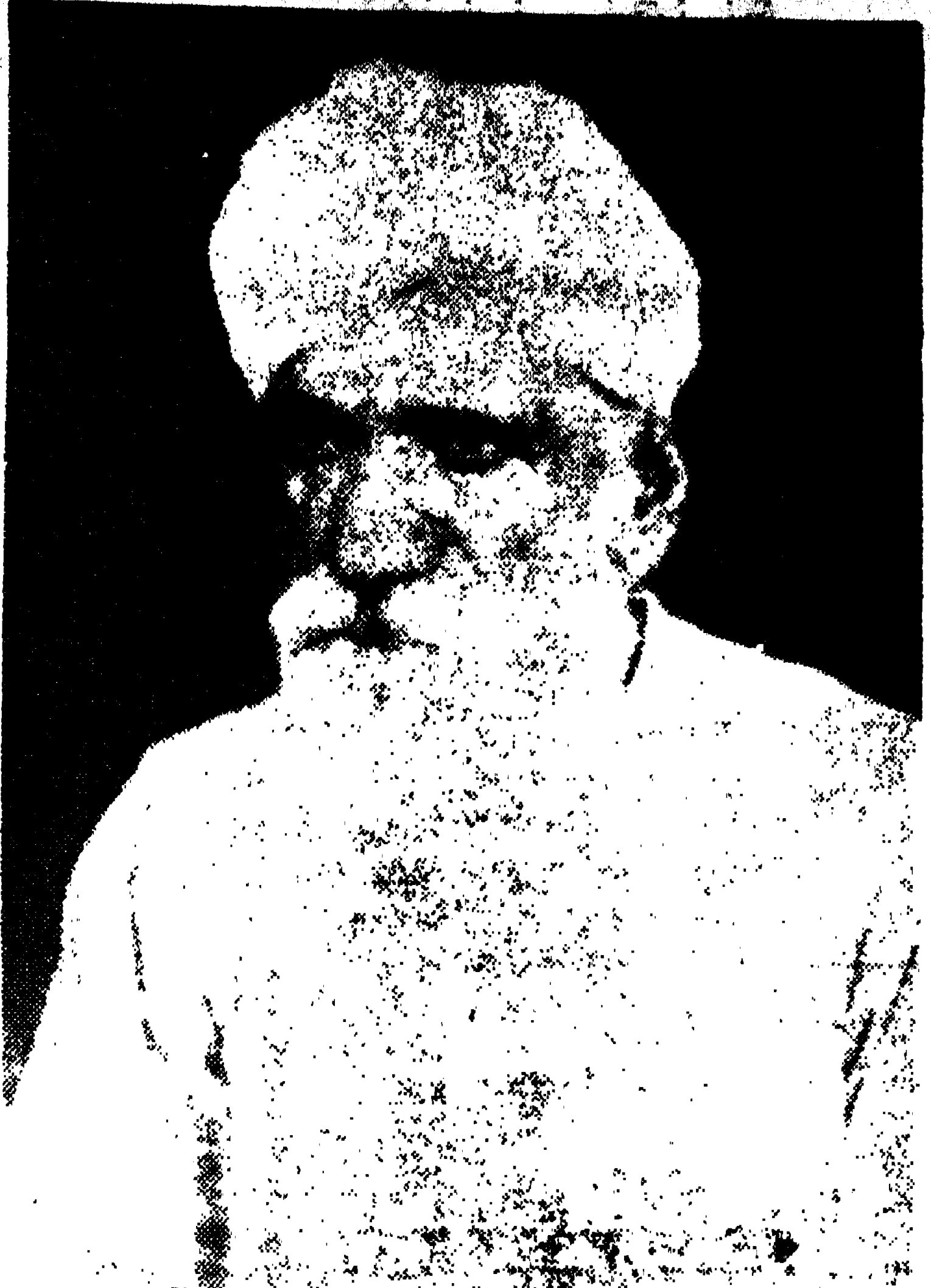
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সমস্ত দেশকে মুক্ত করবে। এই পরিকল্পনামত বারানসীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন কি ভারতের বাইরেও বিপ্লবীরা প্রস্তুত হয়ে রইলো।

কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, যে বিপ্লবী দেশ-প্রেমিকদের সকল সাধনাই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণদের আবির্ভাবে। 'ঘদর পার্টি'র সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো হঠাৎ বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিংয়ের অর্থ লোভে। এই লোকটি গোপনে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষকে জানিয়ে দিলো সব খবর। ফলে হঠাৎ ধরপাকড় শুরু হ'য়ে গেল, এবং লাহোর ও পাঞ্জাব থেকে পার্টির নেতৃস্থানীয় সকলকেই বন্দী করে ফেললো গভর্ণমেণ্ট। হতাশায় রাসবিহারী বসু পলাতক হ'লেন।

বিপ্লব আসতে আসতে থেমে গেল। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। একবার অভ্যুত্থান ঘটলে, তারা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে তলিয়ে যেতো। ভারতের মুক্তি অর্জনের সেই শুভক্ষণটিকে ব্যর্থ করে দিলো কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতা।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় 'গদর' বিপ্লবীদের বিচার করা হয়। মোট ২৯১জন অভিযুক্তের মধ্যে বিয়াল্লিশজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এ'দের মধ্যে ছিলেন উনিশ বছরের নির্ভীক তরুণ কর্তার সিং সরোবা ও জন্মবিপ্লবী মহারাষ্ট্রীয় যুবক বিষ্ণুগণেশ পিংলে। এছাড়া ১১৪ জনকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয় আর ৯৩ জনকে দেওয়া হয় কারাদণ্ড।

'ঘদর' বিপ্লবের পদধ্বনি ঠিক উষার মুহূর্তে বেজে উঠেই থেমে গেল; এবং শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করতে হ'ল। কিন্তু বিপ্লবের যে আহ্বান তাঁরা দিয়েছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তারই ইশারায় যুবসমাজ বহু দুঃসাহসিক কাজে ও আত্মদানের চরম ব্রতে মগ্ন হয়েছে।

বারে আমি নমি

কানন দেবী

(পূর্ব)

নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার কিছুদিন বাদেই এল জীবনের এক অভাবনীয় মোড় ঘোরার অধ্যায়।

একদিন মেট্রোর একটা ম্যাটিনী শোতে ছবি দেখতে গিয়ে ইন্টারভ্যালে লবিতে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রমথেশ বড়ুয়া। কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি করছ?'

জানালাম নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার পর থেকে কিছুই প্রায় করছি না। তাছাড়া বাড়ী করতে গিয়ে যে প্রচণ্ড অর্থসংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি সেকথাও তাঁকে জানালাম। মিঃ বড়ুয়া হেসে জিজ্ঞেস করলেন 'কাজকর্ম করবার ইচ্ছে আছে, না খেয়ে, ঘুমিয়ে গড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও?'

'কাজকর্ম করবার ইচ্ছে নেই? বলেন কি মিঃ বড়ুয়া? শিল্পীর জীবনে কাজ-না-থাকা মানেই ত মৃত্যু। আপনি কি আমায় এরই মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে বলছেন?'

'আমি বলছি না। তুমি চাইছ কিনা জানা দরকার ছিল। যাক কাল সকালে বাড়ী আছ ত? আমি যাচ্ছি। একটা কাজের কথাই আলোচনা করব।'

পরদিন যথাসময়ে মিঃ বড়ুয়া এলেন সঙ্গে এম-পি প্রোডাকসনের মালিক মুরলীধর চ্যাটার্জিকে নিয়ে। ওঁদের কাছেই জানা গেল মুরলীবাবু কয়েকটা ব্যবসায়ে বেশ কিছু অর্থলগ্নি করে ফেলেছেন এবং শেষ অবধি বড়ুয়ার সহায়তায় একটি ছবি করবার ইচ্ছে তাঁর প্রবল। কিন্তু মন সংশয়মুক্ত নয়। যদি এবারেও ব্যর্থ হন তাহলে যে কি হবে ভাবা যায় না। একমাত্র ভরসা বাংলা চিত্রজগতের ভগবানস্বরূপ মিঃ বড়ুয়ার আশ্বাস। ছবিতে দুজন হিরোইন। তারই একজনের ভূমিকা আমি গ্রহণ করতে রাজী কিনা। যদি রাজী হই আমার চাহিদা যথাসম্ভব পূর্ণ করতে ইনি চেষ্টা করবেন। তবে তাঁর তৎকালীন আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে একটু যদি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ভাবাভাবির আর ধৈর্য নেই। কয়েক মাস কাজ না করে হাঁপিয়ে উঠেছি। তাছাড়া অর্থের প্রয়োজন ত ছিলই। চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলাম। 'শেষ উত্তর' ও তার হিন্দী ভার্সন—'জবাব'-এর দক্ষিণাস্বরূপ মুরলীবাবু আমায় সঙ্গে সঙ্গেই ২৫ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। অর্থ সমস্যার অনেকখানিই সমাধান হল। এর পরের মাসে মাসিক ৬ হাজার টাকা মাইনে ও শতকরা ১০ টাকা পাবার কথাও পাকাপাকি হয়ে গেল।

বহুদিন বাদে স্টুডিও ফ্লোরে গিয়ে মনটা আনন্দে ঝলমল করে উঠল। এ যেন একটা বহুমূল্য রত্ন হারিয়ে আবার খুঁজে পাওয়া। কাজের উদ্দীপনাও শত গুণ বেড়ে গেল। সেই 'মুক্তি'র পর আবার এই ছবিতে মিঃ বড়ুয়ার পরিচালনায় এবং তাঁরই বিপরীতে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া গেল

এ ছবিতে কাজ করবার সময়ই মিঃ বড়ুয়ার অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির অনেক বন্ধ দুয়ার খুলে যাবার দরুণই যেন মিঃ বড়ুয়ার মত অমন দুর্লভ প্রতিভাবানের নতুন করে মূল্যায়ন করা সম্ভব হলো। আগেই বলেছি 'শেষ উত্তর'-এর নায়িকা দুজন। একজন ধনীকন্যা, উগ্র আধুনিকা তথাকথিত অভিজাত মহলের আলোকপ্রাপ্তা। অপরজন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নম্র, শান্ত ঘরোয়া মেয়ে। একজন নায়কের বাগদত্তা, অপরজন প্রণয়িনী। নায়কের হৃদয়ের আকর্ষণ দ্বিতীয়ার প্রতিই। তবু তিনি প্রথমাকেই বিবাহ করতে দৃঢ়সংকল্প। কারণ তাঁর কাছে হৃদয়ের দাবীর চেয়ে অনেক বড় ছিল স্বর্গত পিতার দেওয়া কথার প্রতি সম্মান-রক্ষার সজাগ কর্তব্যবোধ।

কর্তব্য ও হৃদয়ের গোপন চাওয়ার দ্বন্দ্বের চঞ্চল নায়ক—আর তারই দোলায় দোলায়িত দুই নায়িকার হৃদয়বেদনার কাহিনী ছিল 'শেষ উত্তর'।

প্রথম নায়িকা ছিলেন যমুনা, দ্বিতীয়া আমি।

বড়ুয়া বরাবরই অদ্বিতীয়। কিন্তু এখন দেখলাম আত্মবিশ্বাস তাঁর আরো বলিষ্ঠতর, আরো গভীর তাঁর দৃষ্টি আর সংযত সংক্ষেপ তাঁর নির্দেশনা। কিন্তু আচার-ব্যবহার, কথাবার্তায় আগের সেই গম্ভীর কাঠিন্যের আবরণ যেন কিছু শিথিল যার জন্য আগের চেয়ে তাঁকে অনেক সহজ, অনেক কাছের মানুষ মনে হত।

একটা কথা ছিল যমুনাকে (আমার ... বৌদি বলতাম) বলছে

যোগাযোগ / জ্যোতি প্রকাশ ও কানন দেবী

'আমার এলাহাবাদ যেতে ইচ্ছে করছে না। এইখানেই থাকব।' উত্তরে মীনা বলবে 'ইচ্ছে-অনিচ্ছে সবই কি আপনার একার? আমি যদি বলি আমি আপনাকে আমার দেব না?' মনোজ তখন ভুল বুঝে অভিমানভরে নায়িকার কাছে গচ্ছিত-রাখা ব্যাগটা ফেরত চাইবে। কারণ চলে যাবার জন্য সে তখন মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। মীনার প্রশ্ন 'আপনি সত্যিই আপনার ব্যাগটা ফেরত চাইছেন?' অন্যমনস্ক নায়ক দৃঢ়স্বরে বলে 'আমি সত্যিই আমার ব্যাগটা ফেরত চাইছি।' অতঃপর নায়িকার নীরবে ব্যাগ এনে দেওয়া।

শটের আগে মিঃ বড়ুয়া বললেন 'ব্যাপারটা বুঝলে ত? নায়ক অভিমান করেই ব্যাগটা ফেরত চায়। কিন্তু নায়িকার পাল্টা অভিমান তার অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যই সে বোঝে নি। তাই অত জোরের সঙ্গে ব্যাগটা চাইল। সাধারণ মেয়ে হলে ঐ দৃঢ়তাকে ভুল বুঝে, নিজেকে অপমানিত মনে করত এবং চড়া সুরে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু মীনা শুধু প্রচণ্ড অভিমানিনীই নয়, সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং প্রকাশকুণ্ঠ। তাই এখানে তার অভিব্যক্তি নীরব। অতএব Let the silence speak here

একটা শটেই ফাইনাল টেক হয়ে গেল। সকলে চলে যেতে এই প্রথম কেন জানি না মিঃ বড়ুয়াকে প্রশ্ন করলাম 'মিঃ বড়ুয়া, আপনাকে খুশী করতে পেরেছি কি?'

'তা পেরেছ? কিন্তু তুমি খুশী ত? না, এখনও মনের মধ্যে কোন অভিযোগ অসন্তোষ আছে?'

চলে যাচ্ছিলাম। ও'র প্রশ্নের ধাক্কায় যেন চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি সেই অন্তর্ভেদী দুটি চোখের গভীর দৃষ্টি সোজাসুজি আমার ওপর ন্যস্ত। কিন্তু ঠোঁটের কোণে যেন মৃদু হাসি স্থির হয়ে আছে।

'একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন মিঃ বড়ুয়া?' আমার প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে মৃদু হাসি সারা মুখে যেন আলোর মত ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বিনাভূমিকায় তাঁর সহজাত অনাড়ম্বর ভঙ্গীতেই বললেন 'তোমার মনেই কি আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিল না যে, আমি ইচ্ছে করে তোমায় ডিটেলস-এ কোন চরিত্র বুঝিয়ে দিই না? আর এর কারণ......তারপর আমার লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে যেন হঠাৎ থেমে গিয়েই বললেন 'যাক কারণটা আর নাই বললাম।'

'কিন্তু একথা আপনি জানলেন কেমন করে? আমি ত কারো সঙ্গেই এ বিষয়ে কোন আলোচনা করি নি! (করতাম কেমন করে? 'বড়ুয়া সাহেবে'র পরিচালনার বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করবার সাহস ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কার ছিল? আমি ত সামান্য হিরোইন।)

'কানন, জীবনে একটা সময় আসবে যখন বুঝবে তোমার সম্বন্ধে অন্যের ইম্প্রেশন জানবার জন্য কোন আলোচনা করবার অথবা শোনবার দরকার করবে না। মানুষের একটা ভঙ্গীতেই এমন অনেক
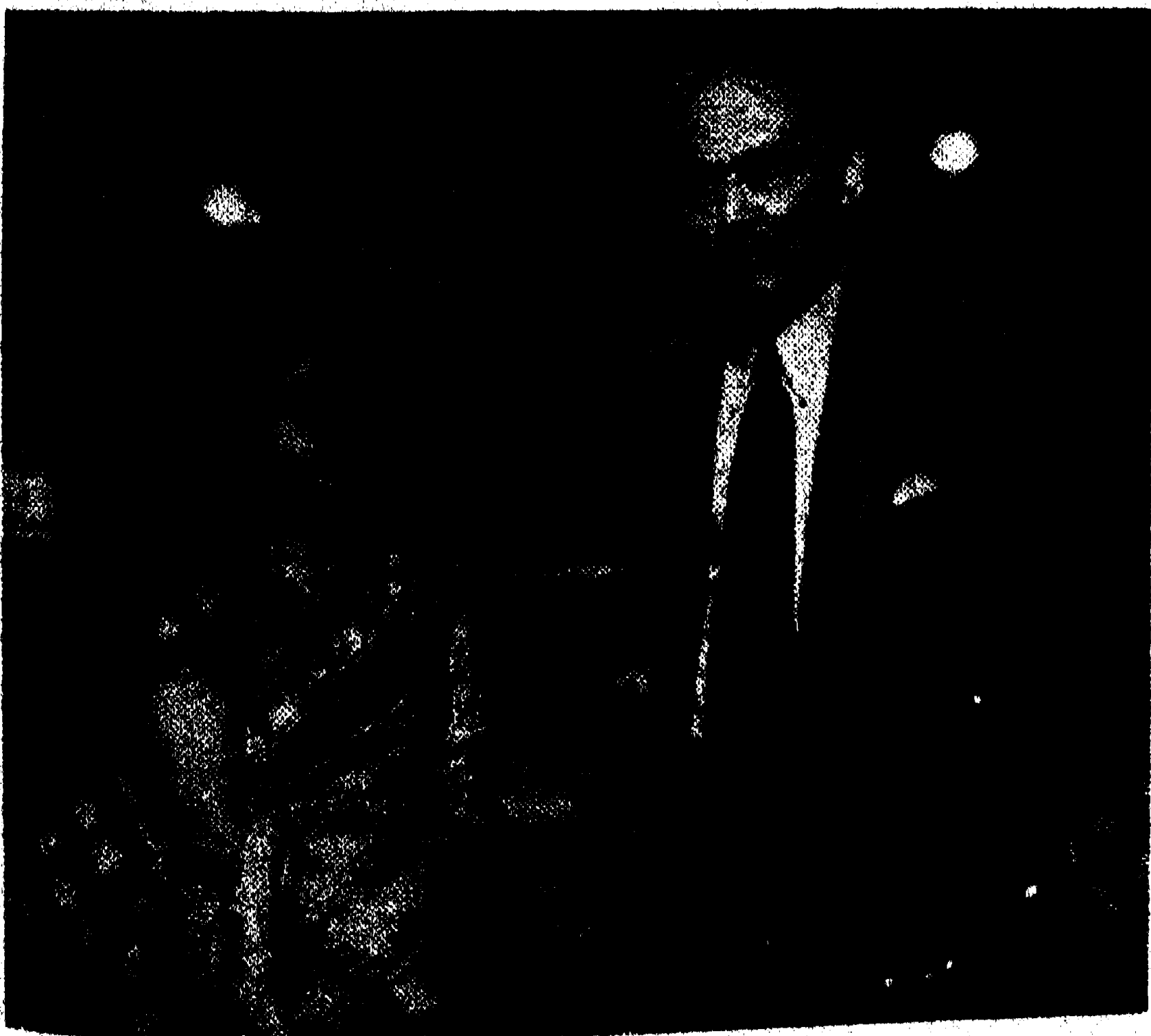
তিনি আর আমি চিত্রে ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে

'পথ বেঁধে দিল' চিত্রে জহর গাঙ্গুলি, ছবি বিশ্বাস এবং কানন দেবী

কথা বোঝা যায়, হাজারটা কথায় যা যায় না?'

আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। স্বল্প-ভাষী মানুষটি এতগুলি কথা বলেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমি একটু দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে আসছিলাম। উনি আবার ডাকলেন 'যেও না, শোন।' তারপর সেই অন্তর্ভেদী-গভীর দৃষ্টি আবার স্থির হয়ে গেল আমার মুখের ওপর। বললেন 'যাকে যতটুকু বলার দরকার তাকে আমি ঠিক ততটুকুই বলে থাকি। তারচেয়ে বেশীও বলি না, কমও না। তোমাকে কোন ভূমিকা বুঝিয়ে দেবার সময় আমি কোনদিন বেশী কথা বলি নি, কারণ আমি জানতাম তোমার মত আর্টিস্টকে বেশী বলার দরকার নেই। বুঝেছ?'

এবার আর আস্তে নয়, একেবারে ছুটতে পালিয়ে এলাম ও'র সামনে থেকে। প্রমথেশ বড়ুয়ার মত সংযত চাপা মানুষের সামনে অবাধ্য আবেগের অশ্রুবর্ষণ করা? ছিঃ।

নিজেকে সেদিন বড় সম্মানিত মনে হয়েছিল। যে সে লোক নয়। বাংলা চিত্র-জগতের প্রায় ভাগ্যবিধাতার মতো ব্যক্তি প্রমথেশ বড়ুয়ার এত বড় কমপ্লিমেন্ট আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে? একি স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ নয়? চোখের জল মুছে তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। কিন্তু তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম বলে সেদিনও যেমন লজ্জিত ছিলাম না, আজও লজ্জিত নই। কেন? সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আজ এইটুকু অন্তত বুঝেছি যে, আমরা জোর গলায় বিশ্বাসের মহিমা প্রচার

সম্বন্ধে আলো পাবার পক্ষে অবিশ্বাস একটা মস্ত সোপান। তবে এই আলো পাবার ইচ্ছেটাই আন্তরিক হওয়া চাই। সেখানে কোন খাদ থাকলে চলবে না।

যাক যা বলছিলাম। 'শেষ উত্তর' সব দিক থেকে সৌভাগ্যেরই ইঙ্গিতবাহী হয়েছিল। তবে সকল সৌভাগ্যকে ছাপিয়ে উঠেছিল মিঃ বড়ুয়ার যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ।

আর একটি কথা আগে মনে হয়েছিল যা এ কাহিনীর একটি অধ্যায়ে আমি বলেছি, ক্যামেরায় ফোকাশের বেশীর ভাগটাই মিঃ বড়ুয়া রাখতেন নিজের দিকে হয়ত নিজেকেই বেশী প্রাধান্য দেবার জন্য। ইদানীং আমাকেও ছবি তোলার নেশায় পেয়েছিল। দু-তিনটি তখনকার দিনের বেস্ট মডেলের ক্যামেরাও কিনেছিলাম। ছবি তোলার প্রতিযোগিতায় বেনামীতে ছবি পাঠিয়ে প্রাইজও পেয়েছি। ক্যামেরা সম্বন্ধে

অনুরাধা চিত্রে

শেষ উত্তর/ যমুনা বড়ুয়া ও কানন দেবী

একটু জ্ঞান হওয়ার দরুণই বোধহয় বুঝেছিলাম আগের ধারণা কত ভ্রান্ত। কেন?

মিঃ বড়ুয়া ছিলেন ছোট্টখাট্ট এতটুকু মানুষ। উনি যখন হাফপ্যান্ট আর স্পোর্টিং গেঞ্জী পরে স্টুডিও লনে ব্যাডমিন্টন খেলতেন দূর থেকে দেখে মনে হতো যেন 'স্কুল বয়'। সেই মানুষটাই যমুনা, কমলেশকুমারী, চন্দ্রা, এদের মত দীর্ঘাঙ্গী (চলতি বাংলায় যাকে বলে লম্বা-চওড়া) মেয়েদের বিপরীতে হিরোর পার্ট করেছেন। কিন্তু এতটুকু বেমানান ত লাগেই নি, উপরন্তু ব্যক্তিত্বে, অভিব্যক্তির অনন্যতায় এবং স্বাভাবিকতায় তিনি সে যুগের সকলকেই ছাপিয়ে উঠেছিলেন। (এ যুগেই বা তাঁর ধারে-কাছে দাঁড়াবার মত কজন আছে? 'দেবদাস' আর কাউকে ভাবা যায়?)

না, কথার খেই হারাই নি। আমি বলছিলাম মিঃ বড়ুয়ার ঐ উদাসী বিষণ্ণতা, ঐ অভিনব এক্সপ্রেশনের অনেকখানিই পর্দার বুকে যথাযথভাবে ফুটে উঠতে দূর থেকে এত ছোট দেখায় যে, তার অস্তিত্বই অনেক সময় না-মঞ্জুর হয়ে যায়। বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির প্রথম শ্রেণীর ক্যামেরাম্যান প্রমথেশ বড়ুয়া এ সত্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলেই ক্যামেরা সন্নিবেশ সম্বন্ধে তাঁর এত সাবধানতা। ছবির সামগ্রিক সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হত বলেই হিরো বড়ুয়ার চেহারার চরিত্রকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য ক্যামেরাম্যান বড়ুয়া এত ব্যস্ত, এত সজাগ ছিলেন।

আজকাল আমার একটা কথা প্রায় মনে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেরই কাজের অবসরে ছবি তুলতে পারাটা একটা শিক্ষার অঙ্গ করে নেওয়া উচিত। যেমন উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের গায়ক-বাদকের তবলা বাজনাটা মোটামুটি রপ্ত থাকে বলেই লয় ও সুরের ভারসাম্য রাখাটা তাঁদের কাছে সহজ হয়। ওস্তাদ আল্লারাখার কাছে গান শেখবার সময় আমাকেও একটু একটু তবলা শিখতে হয়েছে। ওস্তাদ বলতেন [illegible] আমার সঙ্গে সঙ্গে কিনা। না রাখলেই নৌকা বানচাল হয়ে যাবে।'

তাই বলছিলাম শিল্পীদের ক্যামেরার জ্ঞান থাকলে শুধু পরিচালকের যথাযোগ্য সহায়তা করাই হয় না। চেহারার কোন্ এ্যাঙ্গল ক্যামেরার চোখে কেমন দেখায় সেই বোধেই অভিনীত চরিত্রের বক্তব্যকে আরো জোরালো করা যায়।

এ ত গেল মানস-জগতের লাভের হিসেব। 'শেষ উত্তরে'র বাস্তব সাফল্যও উল্লেখ করবার মতই।

'শেষ উত্তর' ও তার হিন্দী ভার্সন 'জবাব'-এ প্রমথেশ বড়ুয়ার চ্যালেঞ্জ উন্নত-শিরে বিজয়পতাকা ওড়ালো।

এ ছবি শুধু সুপার হিট করে নি। ১৯৪২ সালে বি এফ জে এর বিচারে 'শেষ উত্তর' শ্রেষ্ঠতম চিত্ররূপে ঘোষিত হলো। আমি পর পর ২ বছর (১৯৪১ সালে পরিচয় ১৯৪২-এ 'শেষ উত্তর') এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছি।

১৯৪২ সালের ২৫শে জুলাই পূর্ণ, শ্রী ও পূরবীতে এ ছবির মুক্তি হয়। হিন্দী ভার্সনও সেই বছরেই হল আর অর্থসৌভাগ্যও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন শুনেছিলাম এ ছবি থেকে ২৭।২৮ লক্ষ টাকা লাভ হয়, সেখানে ছবি তৈরীর খরচ ছিল তিন থেকে সাড়েতিন লক্ষ টাকা। এখন ত দুটি ভার্সনের ছবি করতে কমপক্ষে ১২।১৪ লক্ষ টাকা খরচ।

'শেষ উত্তর' ছবি করবার সময়ে [illegible] যমুনার কাছাকাছি আসবার সুযোগ [illegible]। এর আগে ওর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ থাকলেও অন্তরঙ্গতা ছিল না। খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের নিরীহ মেয়ে বলে যমুনাকে বরাবরই খুব ভাল লাগত। এখানে ওর আতিশয্যবিহীন আন্তরিকতা আমায় মুগ্ধ করেছে।

সংসারে অভিন্নহৃদয় বন্ধু পাওয়াটা সবচেয়ে বড় হলেও সংসার এবং কর্মজীবনের নানা লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রীতির নানা শ্রেণীর ছোট-বড় দানের ভূমিকাও তুচ্ছ করবার মত বস্তু নয়।

মাত্র কয়েক মাস আগে আমার ছেলের বিয়েতে যমুনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে যেতেই ওর সেই হাত দুটি জড়িয়ে ধরার উষ্ণতা যেন পুরোনো দিনের যমুনাকে মনে করিয়ে দিল। আমার তাড়া ছিল। বললাম 'যমুনা লক্ষ্মীটি ভাই আজ আর বসব না।' 'হুস শৌখ হয় নাকি? আমি তোমায় জোর করে ঘরে টেনে নিয়ে যাব।' সত্যিই গেল। এই জোরের সঙ্গে যদি হৃদয়ের উত্তাপ থাকে তা হৃদয়কে স্পর্শ করেই তার পরিধি এতটুকুই হোক আর এতবড়ই হোক।

মনে হল কালের স্থূল হস্তক্ষেপ মানুষের বাইরেটার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু অন্তরের নিভৃতলোকে মানুষ বুঝি চিরকালই এক ও অভিন্ন।

(অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন)

([illegible])

অমৃতপুরের যাত্রী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

।। ২২ ।।

মির্জাপুরে স্ট্রীট থেকে তার বাসায় যাওয়ার গলিটার মুখে হঠাৎ এ সময় কালি-মাখা খাঁকি ট্রাউজার পরা একটি ডাগড়াই ছেলেকে দেখে সজলের কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছিল। ছেলেটিকে সে কোথায় দেখেছে। মুখের আদলটা চেনা। কিন্তু আদৌ মনে করতে পারছে না।

'আমায় চিনতে পারেন বাবু? আমি হাবুল।'

সজল চিনতে পারল না। 'কে হাবুল?'

'ঐ যে সেবার বালিগঞ্জ ইষ্টিশানে কেনা, পটলা আপনার জিনিস চুরি করেছিল।'

'ও। তা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?'

সলজ্জ হাবুল মুখ নীচু করে একটু হেসে বলল, 'আজ্ঞে পুটি আপনার বাড়ীতে আছে। এখনো আসে নি। তাই।'

সজলের কেমন আশ্চর্য লাগছিল। ভেবে ভেবে একটা সিদ্ধান্তে আসতে ভালো-লাগছিল তার। পুটিকে হাবুল তাহলে ভালোবাসে। দেখা করার জন্য এত রাত অবধি তাই দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এ তা' হলে হাবুলচন্দ্রের অভিসার।

সজল বলল, চল, আমার বাসায় চল।'

হাবুলকে দেখে পুটিও অবাক। কিন্তু ভালোবাসার লজ্জা, রং ওর মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সময় পুটিকে দেখতে সজলের খুব ভালো লাগছিল। পুটি যে সুন্দর এবং তারও ভালোবাসবার মত বয়স হয়েছে, এ খবরটা সজলের জানা ছিল না।

অরুণা এখনও ফেরেনি। তাই পুটি বাসা ছেড়ে যেতে পারেনি। ভাত নামিয়েছে, ডালও বসিয়েছে। দাদাবাবুও আসেনি আর বৌদিও বাড়ী নাই। বরদোর সে কার কাছে রেখে যাবে? তার ত একটা দায়িত্ব আছে। জ্ঞানগম্যি আছে। না ঝি বলে দুটো কাজ করেই খালাস।

সজল বলল, 'হাবুল, কি করিস রে তুই?'

'ঘুষুড়িতে চটকলে চাকরি করি, বাবু'

'সে কি রে? সে ত অনেক দূরে?'

'তা হোক বাবু। সেই সকালে শেয়ালদা হয়ে বাস-এ চলে যাই। আর ফিরি রাত্রে। যাবার সময় ঐ পুটির সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। আজ আর বাড়ী ফেরেনি দেখে...'।

সজল বাকিটা শেষ করল, 'দেখে এখানে চলে এলি। তা দাঁড়িয়েছিলি কেন রাস্তায়?'

'পুটি হল ঝি। কে কোথায় কি বলবে? আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।'

হাবুল চা খাচ্ছিল। সজল নিজে গিয়ে আজ সিঙাড়া সন্দেশ কিনে নিয়ে এসেছে। পুটি প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছে সব।

হাবুল খেতে খেতে বলছিল, 'সেবার ঐ কেনা-টা আপনার জিনিস নিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল পটলা। পুটি যখন বলল, বাবুর জিনিস নিবি না, খবর্দার! তা কেনা, পটলা কি শোনে। ওকে ত পাত্তাই দিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ঝাড়লাম একটা বাঁ হাত দিয়ে! তা মুখটা ধাঁ করে ঘুরে গেল ডান দিকে! পটলাটা একটু তেরিমেরি করছিল। বললাম, শুয়ারকা বাচ্চা, পুটির চেনা লোকের জিনিস চুরি? ইয়ার্কি পাত্তা হ্যায়। আভি মাল ফ্যাল? তারপর কি হল শুনুন—'।

পুটি ধমক দিল হাবুলকে। 'কি সব বলা হচ্ছে বাবুর সামনে? মুখ সামলে কথা বলবি ত?'

'কিছু খারাপ কথা বলছি? বাবু, আপনি বলুন?'

সজল খুশি মনে হাসতে হাসতে হাবুলের কথা শুনছিল। বলল, 'না, তুই বলে যা?'

'না বাবু, আপনি বরং ঐ পুটিকে বুঝিয়ে বলুন, একটু যেন ভদ্রসভ্য হয়ে কথাবার্তা বলে। দিনরাত দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আছে আমার ওপর। জিন্দেগী বরবাদ করে দিল, শালা!'

সজল বলল, 'তবু ত তুই ওর জন্য দাঁড়িয়ে থাকিস'।

'থাকব না কেন বাবু। ওর সঙ্গে আমার কি আজকের চেনাশোনা। সেই ছেলেবেলা থেকে। জন্মেছিলাম ফুটপাতে। ছিলেম ছিঁচকে চোর। ও-ই ত গালাগাল দিয়ে ফাদারের নাম ভুলিয়ে দিল। সেই আপনার বাবার পর থেকে। বলে, বিয়ে করবি ত চাকর খোঁজ গোলামের ব্যাটা!' চাকরী না করলে মুখে নুড়ো জেলে দেব তোর। অগত্যা চটকলে চাকরী।'

'কত টাকা পাস'?

'ওভারটাইম ফাইম নিয়ে তা চল্লিশ টাকা হয়'। কুড়ি টাকা আমার, বাকি টাকা ঐ পুটির হাতে দিতে হয়।

সজল হঠাৎ লক্ষ্য করল হাবুলকে পুটি চোখ টিপে দিচ্ছে।

সজল বলল, 'তোরা যা এবার। আমি ত এসে গেছি'।

পুটি বলল, 'ভাত বেড়ে দিয়ে যাব?'

'না, না, দরকার নেই। তোর বৌদি এসে যাবে এক্ষুনি।'

সজল খেতে বসেছে, এমন সময় অরুণা এল। এসেই রান্নাঘরে ঢুকল। তারপর একমুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, 'দিদির ওখানে গেছলাম। তাই দেরী হয়ে গেল। তোমাকে ফোন করেও পেলাম না। তা তুমি এত দেরি করে খাচ্ছ কেন?'

সজল জল খেয়ে আস্তে আস্তে বলল, রান্না ত এই শেষ হল'।

'কে রান্না করল, তুমি?'

'না, পুটি'।

'তা হলে ত ভালোই লাগবে? কি রান্না করেছে দেখি?'

সজলের কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। ভাবছিল, অরুণা কী সুন্দর অভিনয় করে!

অরুণা আরও কাছে সরে এসে একটা আসন পেতে বসল। বলল, 'দিদি বলেছে, একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে। রোগের পজিশন কি? এই দেখ, পা দুটো যেন একটু ফোলা ফোলা।'

অরুণা দুটো পায়ের কাপড় সরাল।

রাত্রি এখন নিঝুম। ওপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে সজল বিশ্বময়ের কথা ভাবছিল। ওর কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছিল আজ। সারা মানবসমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা, তা থেকে মুক্তির কথা, সজল কি একদিনের জন্যও চিন্তা করেছে? সে তো শুধু নিজের ছোটখাট সুখ দুঃখ, নিজের স্বার্থ, এই নিয়েই ডুবে আছে! একি একটা জীবন? বিশ্বময়ের মত, একদিনের জন্যও তো সে বিপুল মানবসমাজের দুঃখ বেদনা অনুভব করেনি? সে কত ছোট কত সাধারণ, কত স্বার্থপর।

বিশ্বময়ের জন্মদিনে শুচিতা আজ তাকে এই বৃহৎ দিগন্তের দিকে একবার তাকাবার কথা মনে করিয়ে দিল। মনে করিয়ে দিল, ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। কবে মানব-সমাজের মুক্তি আসবে, দারিদ্র্য থেকে, শোষণ থেকে, ধনীর অত্যাচার থেকে, ক্ষমতাবানের ঔদ্ধত্য থেকে, আজ তার জন্য বিশ্বময় সব ছেড়ে চলে গেছে। একমাত্র বোনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা, বাবার স্নেহ, নিজের ভবিষ্যৎ—সব কিছু হেলায় সরিয়ে রেখে বিহারের কোন এক শহর থেকে কাগজ বের করার কাজে লেগেছিল। কাগজই হল তার হাতিয়ার। মূলধন, তার সত্য আদর্শ। চলতে চলতে পথে হোঁচট খেয়ে পড়েছে, কাগজ উঠে গেছে, কিন্তু মাটি থেকে সে একাই উঠবে, উঠতে চায়। যাকে অপরের দয়ায় উঠতে হয়, অপরের সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়, আর যা হোক মানবসমাজকে চলতে সাহায্য করা তার পক্ষে কঠিন। বিশ্বময় চাকরী করেই দেনা শোধ করবে! আদর্শের প্রতি এত বড় একনিষ্ঠতা সজল জীবনে আর কোন বন্ধুর মধ্যে দেখেনি!

আজ মনে হল, বিশ্বময়ের কাছে সজল কত ছোট! তবু বিশ্বময়ের জন্য তার গর্বের শেষ নেই। বিশ্বময় তার বন্ধু।

সজল বিশ্বময়ের মুখটা মনে করতে চেষ্টা করল। সেই গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি-পরা, ফর্সা, লম্বা চেহারাটা। কিন্তু মুখের আদলটা যে আদৌ মনে পড়ছে না! সজল অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। না, শুচিতার মুখের আদল নেই বিশ্বময়ের মুখে। শুচিতা একধরনের সুন্দর, বিশ্বময় আর এক ধরনের।

সজল কি তবে বিশ্বময়কে ভুলে যাচ্ছে! নইলে মুখটা মনে করতে পারছে না কেন! নিজের ওপর বড্ড ক্ষোভ হল সজলের। সে অকৃতজ্ঞ, বড় অকৃতজ্ঞ! সে এই ক' মাসের বিবাহিত জীবনে সবকে ভুলে [illegible] কি ভুলে

আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে। সবচেয়ে ভালো হত, বিশ্বময়ের মত কোথাও বেরিয়ে পড়লে! পৃথিবীর পথ সবদিকে চলে গেছে। সব পথই এক একটি তীর্থ। মাটির পথ, বালু-ঢাকা সমুদ্রতীরের পথ, কাঁকর ছাওয়া পাহাড়ী পথ অথবা বনস্পতির ছায়ার স্নেহমাখা অরণ্যপথ—সবই এক একটি তীর্থ। মানুষ তীর্থে যেত। অর্থাৎ পরিচিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সীমা ভেঙে সে বাইরের বিশ্বের পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হতে। এই মুক্তির গান, ছন্দ যেখানে বাজে সেইখানেই তীর্থের পথরেখা! সজল কি কোনভাবে সেই তীর্থপথে বের হতে পারে না!

আজ এই রাতে, জীবনের কোন গম্ভীরে, কোন দূরে বিশ্বতীর্থ পথের ডাক সজল শুনতে পেল।

ক'দিন পর সজল অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে সেতার বাজাচ্ছিল।

পুঁটি বলল, 'বাবু কে ডাকছে আপনাকে?'

'কে? নাম কি?' অর্থাৎ সজলের উঠতে ইচ্ছে করছিল না। বাজাতে বাজাতে মেজাজ এসে গেছল।

'নাম কি পেরানে লিখে রেখেছি? সেই যে নিমন্ত্রণে যেতে এসেছিল। ইয়া গোঁফ'!

'সে কি রে? হারাধনদা এসেছে?' তাড়াতাড়ি সেতারটা রেখে সজল চিৎকার করে নিচে নামছিল।

সামনেই হারাধন দাঁড়িয়েছিল। হাতে তালিমারা ছাতা, গায়ে সেই চিরন্তন ঢিলে হাফসার্ট। হাতে মরচে পড়া সেই সুটকেশটা। মুখটা বড় বিষণ্ণ।

মনে হচ্ছে হারাধনদা কোথাও চলে যাচ্ছে।

'কি ব্যাপার? আরে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? জ্বর হয়েছিল?'

হারাধন ধীরে ধীরে বলল, 'দেশে চলে যাচ্ছি রে। তা যাবার সময় ভাবলাম একবার তোর সঙ্গে দেখা করে যাই'।

হারাধনদাকে সজল জোর করে টেনে নিয়ে এল ঘরে। 'কেন? চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ? তা যা দামী চাকরী তোমার? থাকলেও বা কি, গেলেও বা কি?'

'নারে, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে?'

'মানে?'

'গুণময় মহাপাত্র মারা গেছে।'

ক্ষণিকের মধ্যে সজলের মনে, একটা খিটখিটে চেহারার লোকের ছবিটা ভেসে উঠেছিল। গলায় তুলসী কাঠের মালা, নিকেলের চশমা চোখে। পৃথিবীর যত ক্রোধ, ঘৃণা, তিক্ততা সব ঐ মুখে এসে জমা হয়েছিল। কি গালাগালি দিত হারাধনদাকে?

সজল বলল, 'ট্রেন কখন?'

'প্যুরী প্যাসেঞ্জার। রাত দশটা'।

'তাহলে এইখানে খেয়ে যাও'।

'না, না, না,' হারাধনদা অস্থির হয়ে

সজল বলল, 'দাঁড়াও আসছি'।

পুঁটিকে খাবার আনতে পাঠিয়ে সজল ফিরে এসে বসল।

'হ্যাঁ, কি হয়েছিল বুড়োর?'

হারাধন লিভারের কাছে হাত দিয়ে দেখাল। 'শালা, পচে ঢোল। যমে মানুষে টানাটানি। দোকান বিক্রি হয়ে গেল।'

'তা তোমার চেহারা এমন হোল কেন?'

'আরে তুই কি যে বলিস? দোকানেই ত ছিল। লটঘট বল, সেবাশুশ্রুষা বল,—যত হোক, তারই ত খেয়েছি পরেছি রে। বুঝলি না? ব্যামো হয়েছে বলে সরে পড়ব? সেটা কি মানুষের কাজ? তুই বল?'

সজল হারাধনের এই চরিত্রের খবর জানে না, এমন নয়। তবু আশ্চর্য হচ্ছিল, গুণময় মহাপাত্র কি অত্যাচারটা করত ওর ওপর।

'তারপর দোকানেই মারা গেল?'

'না, না। শেষ পর্যন্ত এক কাউন্সিলারকে ধরে হাসপাতালে দিয়ে এলাম।'

'তবু বাঁচল না?'

'না। শালার যমে টেনেছে। টানবে না? যমের কি অপরাধ বল? এদিকে সারা-জীবন টেনে এসেছে যে?'

'তা মরল কবে?'

'কাল রাতে।'

'এই ক'দিনে তোমার মুখচোখ কালো হয়ে গেল?'

এদিক ওদিক হারাধন [illegible] ফিসফিস করে বলল, '[illegible]ার রক্ত দিয়েছি। আর খাওয়া-দাওয়া [illegible]। ছেলোটা রক্ত দিতে চাইল না। তার আমার রক্তের সঙ্গে কি সব মিলে গেল। তা তিনবার দিলাম। কিন্তু যমে যাকে নেবে!...তা উঠি এখন। যাবার সময় দেখাটা হয়ে গেল তোর সঙ্গে।'

পুঁটি এসে গেছল।

'এত খাবার?'

'বকতে হবে না, খাও।'

গোগ্রাসে খেতে খেতে হারাধন বলল, 'বৌমা কোথায় রে?'

'এখনো ফেরেনি।'

'সে কি রে পোয়াতী বৌ? অফিস পাঠালি কেন? তোর কি জ্ঞানগম্যি কোন কালেই হবে না রে সজল? আর গেল ত ফিরল না কেন? এলে বকে দিস্। এ বড় অন্যায়, বড় অন্যায়!'

সজল চুপ করে রইল।

পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে গোঁফটা দুবার মুছে হারাধন বলল, 'বড় খুশি হলাম রে। তুই ভাল চাকরি করছিস, সংসার ঘর-সংসার করছিস, মানুষ হয়েছিস গ্রামের লোক আমি আবার গ্রামেই ফিরে যাচ্ছি!'

সজলও উঠে দাঁড়াল। জামা পরল কাপড় ছাড়ল।

হারাধন অবাক, 'তুই উঠলি যে? এ [illegible] কোথায় যাবি

ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে। একটা জায়গা করে হারাধনদাকে সজল বসিয়ে দিল। সুটকেসটা নিজেই বাঙ্কের ওপর তুলে রাখল। তারপর কাছে এসে বসল।

প্রথম কলকাতা আসার দিনের কথা মনে পড়ছিল তার। হারাধনদাই বালিচক স্টেশনে এই পুরী প্যাসেঞ্জারে তার জন্য ঠেলেঠুলে জায়গা করে দিয়েছিল।

আজ সজল তাকেই শেষবারের মত ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে। হারাধন চুপ করে বসেছিল। ঘাড়টা নুয়ে পড়ছে একটু। বড় কাঁচাপাকা গোঁফটাও আজ আরো ঝুলে পড়েছে।

এতদিনের কলকাতার জীবন ছেড়ে যেতে ওর কষ্ট হচ্ছে আজ। সজল অনুভব করছিল, হারাধনদার মনেও যেন অনেক কান্না জমে উঠছে।

চারধারে যাত্রীদের ভীড়, চিৎকার। কুলীদের হৈ-হল্লা। তবু এত কোলাহলের মধ্যে দুজন চুপ করে কতক্ষণ বসেছিল।

হারাধন ধীরে ধীরে বলল, 'তুই এবার যা সজল। বৌমাকে ডাক্তার দেখাবি। আর ছেলেমেয়ে হলে চিঠি দিবি। ভুলিসনি যেন।' ঠিকানা মনে আছে ত?

সজল ঘাড় দেখল। রাত্রি দশটা। সিগন্যাল দিয়েছে। ধীরে ধীরে ট্রেন থেকে নেমে এল। জানালার কাছে দাঁড়াল একটু। হারাধনদাকে কি যেন বলতে ইচ্ছে করছিল তার। হয়ত বলতে ইচ্ছে করছিল, তার কাছে সজল অনেক, অনেক ঋণী। কিন্তু তা বলা হল না! তা বলা যায় না!

একজন টিকেট কালেকটার এল টিকিট দেখতে। হারাধন টিকিটটা বের করল।

একটু পরে গার্ড নীল আলো দেখাল, হুইসল দিল। ট্রেনটা নড়ে উঠল এবার।

সজল একটু হেঁটে গেল ট্রেনের সংগে।

হারাধন তেমনি করে একদিকে তাকিয়েছিল। যেন তার খেয়াল নেই।

'তাহলে আসি, হারাধনদা?'

হারাধন মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে আস্তে আস্তে বলল, 'আয়! মনে রাখবি রে তোর হারাধনদাকে মনে রাখবি, ভুলে যাসনা যেন। আমার বাড়ী যাবি। বালিচক থেকে বাস-এ গিয়ে তেমাথানিতে নেমে যাকে জিজ্ঞেস করবি, হারাধন অধিকারীর বাড়ী কোথায়—সে-ই বলে দেবে! ভুলবি না......।'

সজল চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

ট্রেন কখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে সজল জানে না।

(তেইশ)

হাসপাতালে সজল এর আগে কখনো আসেনি। তাছাড়া এই মেটার্নিটি বিভাগে এক বিচিত্র পরিবেশ। ওধারের বেঞ্চে সারি সারি গর্ভবতী মহিলাদের ভিড়।

একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক পাশের তরুণী বৌটিকে বলছিল, 'এই নিয়ে আটবার এলাম ভাই। আগের বার দোতলার ঐ কোণের 'বেড'-এ ছিলাম। তুমি বুঝি নতুন পোয়াতী? দেখে রাখো, ঐ দিকটা লেবার রুম। সব আমি চিনি। প্রায় ফি বছর আসতে হয় কিনা।'

তরুণী বৌটি মুখ টিপে হেসে বলল, 'সে কি দিদি! সাতবার হয়ে গেছে আবারও এলেন?'

'কি করব মা। সবই তাঁর ইচ্ছা—ঐ যিনি ওপরে আছেন'।

মেয়েটি দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

সজল দূরে থেকে কথাগুলো শুনে অবাক।

একটা অপরিচ্ছন্নতা, বহু আসন্ন-প্রসবা মহিলার খিচুড়ি জাতীয় সমাবেশ। সজলের ভালো লাগছিল না। প্রায় দু'ঘন্টা হল টিকিট করেছে। এখনও ডাক আসেনি।

অরুণা সজলের পিঠে একটা খোঁচা মেরে বলল, 'পুঁটিকে নিয়ে আসতে চাইলাম, শুনলে না। এখন মেজাজ খারাপ

হয়ে উঠছে। যাও, চা-টা খেয়ে এসো না, বাইরে গিয়ে'।

সজল ঘড়ি দেখে বলল, 'আর একটু দেখি'।

সিস্টার নাম ধরে ডাকছিল, 'অরুণা ভট্টাচার্য অরুণা ভট্টাচার্য আছেন নাকি?'

সজল অবাক! অরুণা তাকে কিছু না জানিয়েই ভেতরে চলে গেল।

একটু ক্ষুন্ন হল সজল। আজ সকাল থেকে অরুণা তার উপস্থিতিটা ঠিক যেন সহ্য করতে পারছে না। একটা অস্বস্তি বোধ করছে, যেন এড়িয়ে যেতে চাইছে।

তবু সজল মনে মনে প্রার্থনা করছিল, অরুণা হাসিমুখে বেরিয়ে আসুক। ডাক্তার বলুক—না, কোন 'ট্রাবল' নেই বেবি 'অলরাইট', সুস্থ, স্বাভাবিক।

এমন কাতরতা নিয়ে সে কখনো ঈশ্বরকে স্মরণ করেনি।

হঠাৎ সিস্টার বেরিয়ে এসে ডাকল, অরুণা ভট্টাচার্যের সংগে কে এসেছেন?'

সজল ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

'ভেতরে আসুন'—

সজল যেন তার মৃত্যুদণ্ড শুনল! তবে কি বেবীর কিছু হয়েছে!

খাকি হাফপ্যান্টপরা বুড়ো দরোয়ান ভারিক্কি চালে বলল, 'যাইয়ে, অন্দর যাইয়ে'।

সজলের বুক কাঁপছিল। ভেতরে গিয়ে দেখল, একজন বৃদ্ধ ডাক্তার আর কয়েকজন জুনিয়ার অরুণাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। মুখ নিচু করে অরুণা বিছানায় বসে আছে।

গলায় স্টেথিসকোপ, গম্ভীর চেহারা, চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা, হাতে রাবারের গ্লাভস। বৃদ্ধ ডাক্তার বললেন, 'আপনি মিঃ ভট্টাচার্য?'

সজল ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'পেসেন্ট ঠিক বলতে পারছে না কনসেপসান-এর এ্যাপ্রক্সিমেট টাইমটা কবে। আপনি জানেন?'

বহুদিনের একটা ক্ষীণ সন্দেহ মুহূর্তের মধ্যে সজলের মনে ছায়া ফেলে গেল!

সজলের গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল। তবু সেই প্রথম রাত্রির ঘটনার তারিখ থেকে মোটামুটি হিসেব করে বলল, 'মাস সাতেক হবে'।

ডাক্তারবাবু নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কি বলাবলি করলেন। একজন জুনিয়ার মাথা নাড়ল। 'না স্যার এ হয় না'।

ডাক্তারবাবু আবার বললেন, 'না। কোথাও ভুল আছে। বেবির বয়েস নমাসের বেশি। এ তো বেশ এডভান্সড স্টেজ। এ পেসেন্টকে স্টিচ দেওয়ার অসুবিধে আছে। আরো আগে আসা উচিত ছিল'।

সজল চমকে উঠল, গায়ে কাঁটা দিল তার। তার মনে হচ্ছিল, মাথাটা ঘুরছে, সিমেন্টের লাল মেঝেটাও যেন কাঁপছে এখন। সে কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে!

... আশ্বাস দিলেন, 'না, না,

সজল বলল, 'একটা সিটের ব্যবস্থা করে দিন, স্যার। বাড়ীতে আর কেউ নেই। বড় উপকার হয় তা হলে।'

বড়ডাক্তার টিকিটের ওপর প্রেস-ক্রিপসন লিখে দিলেন। একটা টনিক, ট্যাবলেট। বললেন, 'নুনটা কম খাবে। আলো না হলেই ভাল। যান, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু পেসেন্টকে এখানে সিট দিতে পারব না। ইট ইজ টু লেট'। অন্য কোথাও দেখুন। টিকিটটা আগে করিয়ে রাখলেন না কেন?'

রিকসায় ফিরছিল দুজন। সজল কোন কথা বলছিল না। অরুণাও চুপ।

একটা বড় কঠিন সন্দেহ তার মনে ধীরে ধীরে ঘনকালো মেঘের মত সঞ্চারিত হচ্ছিল। অথচ সে সন্দেহটা প্রকাশ করার মত সাহস তার নেই। সে সন্দেহটা বড় রুচিহীন, কিন্তু একটা জীবনকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবার মত প্রচণ্ড শক্তি তার মধ্যে উত্তপ্ত লাভাস্রোতের মত সঞ্চিত হয়ে আছে।

তাকে প্রকাশ করতে সজল ভয় পাচ্ছে।

অরুণা অন্যদিকে মুখ করে বসেছিল। বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে, বড় করুণ মনে হচ্ছে ওর চোখ দুটি।

বহুদিন ঝগড়া হয়েছে, মনোমালিন্য হয়েছে, তবু দুটি জীবন কোথায় একই সূত্রে বাঁধা ছিল। কেউ একটু বেশি দূরে গেলে টান পড়ত। আজ সজল প্রথম উপলব্ধি করল, সে সূত্রটা সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন সে আর অরুণা দুটি পৃথক জীবন নিয়ে পথে চলছে। কারুর হৃদয়, কারুর হৃদয়ের ওপর আজ নির্ভর-শীল নয়। একজনের বেদনা অন্য জনকে বিষণ্ণ করে না!

কিন্তু অতীত জীবনে কি তা সত্যি ছিল? সজল এ কথাটা কি আগেও কখনো ভেবে দেখেছে?

খেতে বসেও দুজনের মধ্যে আজ কোন কথা হল না।

খাওয়া শেষে সজল নিজের ঘর থেকে জামাকাপড় পরে বেরুল।

এতক্ষণে অরুণা কথা বলল, 'এতো বেলায় অফিস যাবে?'

'যাব'।

সজল নিচে নেমে গেল।

ট্রামটা বৌ-বাজার ক্রসিং পেরিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছিল। এক সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে পড়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ও পেরিয়ে গেল। খেয়াল ছিল না সজলের। হঠাৎ অনেক লোককে নামতে দেখে সে-ও এক জায়গায় নেমে পড়ল। দেখল, এসপ্লানেড তখনো আসেনি। মামার কথা কিন্তু ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে।

আসলে সে এতো বেশি আত্ম-মগ্ন ছিল, এমন একটা চিন্তা তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল যে সে ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না।

'এ্যাই—এ্যাই—গাড়ী চাপা পড়বেন নাকি মশাই?'

সম্মিলিত চিৎকারে সতর্ক হওয়ার আগেই সজল পেছনে একটা চলন্ত ট্যাকসির জোরে ব্রেক কষে দাঁড়ানোর শব্দ শুনতে পেল—'ক্যা আন্ধা হ্যায়? আঁখমে দেখনা নেহি মিলতা?'

পাঞ্জাবী ড্রাইভার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গালাগাল দিচ্ছিল সজলকে।

তাড়াতাড়ি ফুটপাথে উঠে এলো সজল, কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কলকাতায় বিচিত্র জনতার স্রোত, গাড়ীর একটানা মিছিল, ফুটপাতে হকার-দের চিৎকার, কার্জন পার্কের ওপর বিছানো দুপুরের অজস্র রোদ—সজল এই মুহূর্তে কেমন বিমূঢ় হয়ে যায়! তার চেতনা দূর ছায়াচ্ছন্নতায় আবৃত হয়ে উঠছে, অবসন্ন হয়ে উঠছে।

দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা সবকিছু কেমন করে তাকে বিভ্রান্ত, বিষণ্ণ করে তুলছে তখন।

আরতির কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল ঠিকই বলেছিল সে। 'নিজের ওপর কণ্ট্রোল হারালে তোমাকে ভেসে যেতে হ... সজলদা।'

সজল কি তার সকল সংযম হারি... ফেলছে? কই না তো? অরুণাকে সে এক... কথাও বলেনি। এমন গভীর যন্ত্রণাটাকে ... নীলকণ্ঠের মত গলায় ধারণ করে রেখেছে... সে হৈ-চৈ করেনি, ঝগড়া করেনি অরু... সংগে। কৈফিয়ৎ দাবি করেনি তার কাছে... কারণ, এসব তার রুচির বাইরে।

কিন্তু এভাবেও বাঁচা যায় না! জীবন দুঃসহ, মরুভূমির মত ভয়ংকর ...

অফিসের দিকে কিছুটা এ... গিয়েও সজল ফিরে এল। একটু নির্জ... চাই, একটু শান্ত অবকাশ চাই, যে... নিজের সংগে নীরবে কথা বলা যায়, স... মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়, জীবনের ... একটি মুহূর্তের নির্ভুল বিশ্লেষণ যে... সম্ভব!

অনভিজ্ঞ সজল জীবনের মূল্যে ... কতো নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার পণ্য কিনবে...

এই দুপুর বেলায়ও গঙ্গার ... আশানুরূপ নির্জন নয়। কলেজ পা... অফিসে পালানো প্রণয়প্রার্থীদের ... এখানে ওখানে। ঘন ঘন দ্রুত গাড়ী... শব্দ।

তবু জলের একেবারে কাছে, ... বুনো লতানো গাছের একটু ... কতোক্ষণ সে বসে কাটালো।

সজল ভাবছিল, একি প... জীবনের গৃহ আর কতো ... শেখাবে!...এ সন্তান তার নয়।...তা... সমগ্র বিবাহিত জীবনটাই একটা ... মিথ্যার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আ... মিথ্যাকে টেনে চলা সম্ভব কি... সম্ভব না হলে তারপর কি হবে।

জীবনে এমন অনেক দুঃখ... আর কারুর বাইরে প্রকাশ করা যায়...

সান্ত্বনা, সমবেদনা প্রত্যাশা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। শুধু এই দুঃখগুলি তুষের আগুনের মত জীবনকে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ করে চলে, ভেতরে ভেতরে তাকে নিঃস্ব করে দেয়।

ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের গোপন দুঃখগুলিও তাই।

সজলের মন, তার সমগ্র সত্তা দু'টি হাত পেতে আজ এই মুহূর্তে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করছিল!

উপনয়নের সময় যে মন্ত্র সে অন্তরে গ্রহণ করেছিল, কলকাতার জীবনে কতোদিন সে মন্ত্রের ধ্যান করা হয়নি। সজল তার ভিত্তিভূমি থেকে কোন এক অলক্ষ্য মরীচিকার মায়ায় ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। প্রতিদিন সে নিচে নেমে যাচ্ছে। এই পতন, মৃত্যুরই আরেক নাম!

গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ বসে কাটাবার ফলে সজলের মনটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে উঠেছিল। একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, ঘটনার কেন্দ্রভূমি থেকে নিজেকে কিছুটা দূরে রেখে, সজল তার প্রাক-বিবাহিত জীবনের ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করছিল।

অরুণা তবে কি তার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর প্রতারণা করল? সে কি তবে তাকে ভালোবাসে না? তার আচরণের মধ্যে ভালোবাসার সুর কি কখনো বাজেনি? তার সেবা কি তবে অভিনয়? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনগুলি থেকে বিবাহিত জীবনের এই প্রান্ত পর্যন্ত সবটাই কি কেবল একটা জঘন্য চক্রান্ত?

সজলের কিন্তু তা ঠিক বিশ্বাস হয় না। অরুণার সঙ্গে তার রুচির পার্থক্য আছে, দুজনের জীবনের সুর আলাদা—একথা সত্য। এবং একথাও সত্য যে, ব্যবহারিক জীবনে, দৈনন্দিন জীবনে, রুচির মিল না থাকলে বিবাহিত জীবনের সকল সৌন্দর্য, সকল শিল্প সকল কারুকার্য সেখানে নষ্ট হয়। ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখা কখনো সম্ভব হয় না! সজল তখন বুঝতে পারে, অরুণার সঙ্গে বিরোধ তার হোতোই। তবে বিরোধের বর্তমান কারণের মত এতো কুৎসিত হয়ত হোতো না।

অথচ এজন্য কি সজল অংশতঃ দায়ী নয়? নিশ্চয়ই সজল দায়ী। এই ধ্বংসের খেলায় তারও অংশ আছে।

কিন্তু সে তো নিজে থেকে অগ্রসর হয়নি। সমগ্র ঘটনার ইতিহাসে তার ভূমিকা অপ্রধান। তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটা তীব্র অথচ লোভনীয় স্রোতের দিকে। যখন সে সচেতন হয়ে উঠেছিল, তখন দেখল, ফেরার পথ নেই। পেছনের সেতুটা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে!

সজল এক কুটিল পরিণতির নিরীহ শিকার মাত্র। আধুনিক নগরজীবনকে সম্পূর্ণরূপে সচেতনভাবে না জানার মাশুল তাকে দিতেই হবে!

কিন্তু অরুণা কি?

অরুণা কি তবে এক দ্বৈত সত্তার সমন্বয়? কার্তিকের [illegible]

আছে, ওদের দুজনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘদিনের। সজলের প্রতি তার আকর্ষণ একটা আকস্মিক বা সাময়িক ঘটনামাত্র। যা এমন ঘটনা, যার ওপর সারাজীবনের ভার সয় না।

কিন্তু তবু প্রশ্ন, অরুণা কার্তিককে বিয়ে করল না কেন। এই নাটকের পাণ্ডুলিপিতে আরো কি কোন চরিত্র আছে? যদি থাকে তবে সে কে?

ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসছিল। ভাঁটার জলের স্রোত এখন অনেক নেমে গেছে।

সজল ভাবছিল, যে চরিত্রই থাক, যে ঘটনাই ঘটুক এবার তার যাবার পালা। দিন শেষ হয়ে আসছে। আকাশে মাটিতে এখন ঘরে ফেরার বিষণ্ণ আলো।

নতুন অধ্যায় এবার শুরু করতেই হবে। কিন্তু সকলের আগে চাই, এমন জীবিকা যা জীবনকে সহজ করে, সুন্দর করে, বিত্তশালী না করুক।

সজলের বর্তমান জীবিকা তা নয়। দুর্নীতির এই নরকে সে কতোদিন খাঁটি থাকবে! ডেপুটি ডাইরেক্টার মিঃ মুখার্জির কথা মনে পড়ল,—'সজল এডুকেশনই তোমার লাইন। তুমি 'রং প্রফেশন'এ এসে গেছ।' সে শিক্ষকেরই ছেলে, যে শিক্ষাদান ব্যবসা ছিল না। সজল আজই অমৃতপুরের ভাই স্কুলের হেডমাস্টারমশায়কে লিখবে। মাসখানেকের মধ্যে যে-কোন শিক্ষকের একটা চাকরি পাওয়া যেতে পারে কিনা! এক সময় স্কুলের সেরা ছাত্র ছিল সে। হয়ত হয়ে যেতে পারে। ঠিকানাটা আরতির বাড়ীর দিতে হবে। কে জানে, কখন কি হবে!

এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরে সজল খুশি হোলো। নিজের ওপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা নির্ভরতা ফিরে এল। মনটা তার নরম মাটির মত, সহজেই লোকের পায়ের ছাপ পড়ে। কিন্তু তেমনি এক বৃষ্টিতেই সে ছাপ ধুয়ে-মুছে যায়। আবার মাটি মসৃণ হয়। তার মনে হল জীবনে ভুল তো হয়ই। সে ভুল থেকে নিজেকে মুক্ত না করাটা আরো বৃহৎ ভুল!

।। ২৪ ।।

সিঁড়ির নিচেই পাঁচুটির সঙ্গে দেখা। ওর হাতে কয়েকটা পয়সা।

সজল বলল,—'কোথা যাচ্ছিস তুই?'

পাঁচুটি মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিল, 'ঐ কার্তিকবাবু এয়েছেন। গরম সিংগাড়া আনতে বলছে।'

সজল নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। দেখল অরুণার ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজা, জানালা বন্ধ।

সজল নিজের ঘরে চলে গেল, জামা-কাপড় ছাড়ল। তারপর পাতা বিছানায় ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিল।

দুজনে উত্তেজিত। সজল যে এখন ফিরতে পারে তা বোধহয় ওরা ভাবেনি।

কার্তিকের সেই মোটা কর্কশ গলা—'কেমন? আমি বলছিলাম না—ক্লিয়ার করে দাও, তখন শুনলে না। এখন?'

সজল চমকে উঠল কার্তিকের কথাটা শুনে। কিন্তু—

অরুণার উত্তরটা বোঝা গেল না।

কার্তিকের গলাটাই জোরালো শোনা যাচ্ছে। 'পাপ পুণ্যের 'মিনিং' পাল্টে গেছে এ-সেঞ্চুরিতে, তা জানো?'

'কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসার মিনিংটা পাল্টে যায়নি, কার্তিকদা'—অরুণার গলার স্বর এতক্ষণে শোনা গেল। সে-স্বর স্থির কঠিন।

কার্তিক চুপ করে রইল।

অরুণা এবার বলল, 'আমার যা হবার হোক। এবার তুমি বল, দিদিকে বিয়ে করবে কিনা? কতোদিন আগে তুমি 'প্রমিস' করেছ। বল, কবে তোমার কথা রাখবে?'

'আরে, তোমার ঝামেলাটা মিটুক।'

'আমার ঝামেলা? দরদ দেখাচ্ছ? মনে ছিল না, একা পেয়ে যেদিন জোর করে—' অরুণা কেঁদে উঠল। 'আমি এতো সয়েছি, শুধু তুমি দিদিকে সুখী করবে বলে। দিদির মুখ চেয়ে তোমার সব অত্যাচার আবদার সহ্য করেছি, নিজের জীবনের কথা না ভেবে। বল, বল, কবে তুমি কথা রাখবে?'

'তোমার ব্যাপারটা চুকে যাক। কি? পণ্ডিতমশায় কি বলে? খুব 'পাজল্ড' হয়ে গেছে, তাই না?'

অরুণা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, 'ওর নিন্দা তুমি করবে না, বলে দিচ্ছি।'

'বাবা, লোকটা মাইরি ম্যাজিক জানে। আমি সে-ই কবে থেকে ঝুলেছি। আর ও এই কদিনেই উড়ে এসে জুড়ে বসল একেবারে। চেহারাটা না হয় ভালো। তাই বলে—'

'কার্তিকদা, ফাজলামো রাখো। আমার উত্তরটা আগে শুনতে চাই।'

'তাহলে শোন' কার্তিকের গলার স্বর কঠিন,—'ওটা এবসার্ড'। নিরেট বায়োলজিক্যাল ব্যাপার। ওই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের বুড়ীকে কেউ বিয়ে করে না, আর যা করুক।'

অরুণার গলায় উত্তেজনা, কান্না। 'তবে কেন? কেন? আমার জীবন, দিদির জীবন তুমি এমন করে নষ্ট করলে, কেন? কেন? আমি জানি, গলায় দড়ি দিয়ে আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু দিদি কি অপরাধ করেছে? কতোদিন ধরে তুমি তাকে আশা দিয়ে এসেছ। বল, উত্তর দাও!'

'আগেই নিয়েছি। ইট ইজ ইমপসিবল। ইট ইজ টোট্যালি—'

'শয়তান, তুমি একটা শয়তান—' দেয়ালে কাঁচের কি একটা শক্ত জিনিস জোর আঘাত খেয়ে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল।

'এই থামো—থামো—'। কার্তিক চেঁচিয়ে উঠল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

সজলেই বিমূঢ়, স্তব্ধ। ঘরে অস্বাস্তিকর নীরবতা।

অরুণাকে এভাবে দেখবে বলে সজল আশা করেনি। কান্নায়, উত্তেজনায় পাগলের মত। দুটো চোখ ফুলে গেছে। একরাশ খোলা দীর্ঘ চুল ছড়ানো।

ধীর স্থির সজল এতক্ষণে কথা বলল, কথাগুলো ইস্পাতের মত কঠিন, ধারালো। 'আপনি আজ আসুন কার্তিকবাবু।'

মাথা নিচু করে কার্তিক বেরিয়ে যাচ্ছিল।

পদটি সিঙ্গাড়ার ঠোঙা নিয়ে ওপরে উঠে আসতে আসতে কার্তিকের যাওয়ার দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পদ্‌টি সেই কখন রান্না করে চলে গেছে। এখন রাত্রি প্রায় বারোটা। কেউই খেতে আসেনি। অরুণার ঘর থেকে কোন সাড়া আসছে না। আলো নেবানো।

সজল ধীরে ধীরে নেমে এসে অরুণার ঘরের সামনে দাঁড়ালো।

'অরুণা, কপাট খোলো।'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সজল জোরে কড়া নাড়ল।

অরুণা কপাট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

সজল আস্তে আস্তে বলল, 'খাবে চল। এ সময় না খেয়ে থাকা ঠিক হবে না।'

অরুণা ভারি গলায় দেয়ালের দিকে মুখ করে উত্তর দিল, 'তুমিও তো অফিস থেকে এসে কিছু খাওনি।'

'খিদে ছিল না। তাছাড়া, আজ অফিস যাইনি।'

'তবে সারাটা দিন—'

'সারাদিন গঙ্গার ধারে বসে বসে কাটালাম। সেই প্রথম দিন তুমি আমি যেখানে বসেছিলাম, তারই একটু দূরে।'

অরুণা চুপ করে রইল।

সজল সহজ হতে চেষ্টা করছিল, যেন কিছুই হয়নি।

খেতে খেতে কেউ কোন কথা বলছিল না। অরুণা একবারও মুখ তোলেনি।

ওর খাওয়া শেষ হতে সজল বলল, 'থালাগুলো থাক্। মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

মুখ ধুয়ে সজল উপরে ওঠার আগে অরুণার অন্ধকার ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালো। কি ভাবলো কয়েক মিনিট।

'ঘুমলে নাকি? একটু আসতে পারি তোমার ঘরে? কথা ছিল।'

অরুণা বলল, 'ঘরটা তোমার। এসো খোলা আছে।'

আলো জ্বলল ঘরে।

সজলের সামনে ভেসে উঠল বিছানায়-ঢাকা সেই জোড়া তক্তপোষ, কমদামী টেবিলটা। অরুণা শোবার আগে ওখানে দু গ্লাস জল গড়িয়ে রাখত। ওরই একধারে পাউডারের কৌটো, চুল বাঁধবার ফিতে, কাঁটা এমনি টুকিটাকি জিনিস।

বিবাহিত জীবনের টুকরো টুকরো স্নান কাহিনীগুলো যেন কথা বলে উঠল।

আশ্চর্য! সেই অন্তরঙ্গ দিনগুলির মধ্যে আজ সমুদ্রের ব্যবধান!

'বোসো, কয়েকটা কথা বলনি।'

একটা মস্ত মূর্তির মত অরুণা বসে রইল।

সজল গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে স্থিরভাবে বলল, 'অরুণা, সব ঘটনা আজ আলোর মত পরিষ্কার। তুমিই বল এবার আমি কি করব?—না, না, আমার কোন অভিযোগ নেই। প্রথম বড় দুঃখ পেয়েছিলাম, রাগ হয়েছিল, ঘৃণা হয়েছিল। বিশ্বেস কর, এখন আর তা নেই।'

অরুণা ধরা গলায় বলল, 'জানি।'

'কি করে জানলে?'

'তোমাকে চিনি বলে।'

অরুণার গলা ক্রমশঃ একটু স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, সেও তার মনের কথাগুলো খুলে বলতে চায়।

'সবই আমার দোষ, সবই আমার কপাল! তুমি ঠিক বুঝবে না আমার কথা। আমাদের জীবনের মূল তো মাটিতে নেই। বরং তোমার আছে। আমরা শেওলার মত ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াই। দ্যাখো, এই সমাজ, এই চেনাজানা—সুযোগ পেলে সবাই শোধ নেয় আমাদের ওপর।'

সজল মাঝখানে বলে উঠল, 'আমার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই, অরুণা। আমাকে শুধু মুক্তি দাও, আমি চলে যাই। আমি নতুন করে জীবনটা শুরু করতে চাই।'

অরুণা চুপ করে রইল।

রাত্রি অনেক।

দূরে কোথায় একটার ঘন্টা বাজল।

সজল আবার বলল, 'হয়ত দেশে ফিরে যাব। তুমি তো ঠিকানা জানো। কখনো কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে বলবে, বন্ধু ভেবে। ডেলিভারির জন্য তিনশ টাকা রেখে যাচ্ছি। তোমাকে...তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।'

সজলের গলার স্বর করুণ হয়ে উঠছিল। দেখল, অরুণা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাতরভাবে কাঁদছে।

এক সময় নিজেকে একটু সংযত করে বলল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ভালোবাসার যোগ্য নই আমি। সেটা মনে মনে বুঝতাম, তবু লোভ হয়েছিল। আমাকে ছেড়ে চলে যাও তুমি। তোমার পথে কাঁটা হবো না আমি। যা আছে ভাগ্যে তাই হবে। তুমি যাও। আমায় শান্তিতে আমাকে পেতে দাও।...'।

অরুণা আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সজল কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে যেতে হবে, ছুটি হোক না হোক। এভাবে বাঁচা যায় না, কেউই বাঁচতে পারে না। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে এলো।

সারা রাত একটুও ঘুমোয়নি সজল। ছুটি হয়ে গেছে তার, পুরনো জীবন থেকে ছুটি। কিন্তু তবু কেন কান্না আসে। ভালো বাসা কেন স্লেটে লেখা অক্ষরের মত নয় যা মুছে দিলে অন্ধকারের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যাবে! কেন এই কদিনের মিলিত জীবন এতো বিরোধ সত্ত্বেও আজ তার দু-চোখ অশ্রু ভরে তুলছে।

সারা রাত ভাবতে ভাবতে কেটে গে

জিনিসপত্র, বইগুলি আর সেতা গুছিয়ে নিল সজল। নিঃশব্দে পড়ে কলেজ স্কোয়ারের কাছে রিকসা পা যাবে। কোথায় যাবে, তা এখনও স্থির নে তবু যেতে হবে।

ভোর হয়ে আসছে। সারা শহর পূর্ব দিকটা এখন একটু ফাঁকা। শুক জ্বলজ্বল করছে। দূর থেকে প্রথম ট্রা শব্দ ভেসে এলো।

সজল ধীরে ধীরে নিজের ঘরটা করে নিঃশব্দে নেমে গেল। আর, ফি তাকালো না।

গোরক্ষনাথের পূজো ও গান

সুনীল পাল

উত্তর বাংলার (জলপাইগুড়ি-কোচবিহার) গ্রামীণ মানুষের মধ্যে যে সব পুজো ও গীত প্রচলিত আছে তার মধ্যে গোরক্ষনাথের পুজো ও গীত অন্যতম। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও এ পুজো প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এই পুজো উত্তর বাংলায়ও বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। পুজোয় আগের মতন তেমন আড়ম্বর নেই। বিলোপের কারণ অর্থনৈতিক সংকট। আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক ও প্রাচীন কৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞাও অন্যতম কারণ। গোরক্ষনাথের পুজো করে থাকেন কৃষিজীবী রাজবংশী সমাজ। কিন্তু পশ্চিম ডুয়ার্সের রাজবংশী জাতির পাশাপাশি রাভা নামে একটি উপজাতি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন, তাঁদের মধ্যেও এই পুজো ও গীতের প্রচলন আছে দেখা যায়। রাভা যদিও মোঙ্গল জাতির একটি শাখা, কিন্তু বর্তমানে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে রাজবংশী জাতির অনুসারী।

গোরক্ষনাথ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে—'প্রাচীন কাল হইতে বাঙলাদেশে নিরীশ্বর এক যোগী সম্প্রদায় ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের মতে শিবের অনুজ এবং শিষ্য-প্রশিষ্য চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন — মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা বা কানুপা। এই সিদ্ধদের অলৌকিক কাহিনী পূর্ব-ভারতে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। সে কাহিনীগুলি দুই ভাগে পড়ে। এক গুরু-শিষ্য মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী আর মাতা - পুত্র ময়নামতী - গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী। এই দুই দফার কাহিনী লইয়া দুই রকম শাখার উদ্ভব হইয়াছে—গোরক্ষবিজয় এবং গোবিন্দচন্দ্রের গীত। গোরক্ষবিজয়ের বিষয়—দেবীর (পার্বতী) ছলনায় মীননাথের মোহপ্রাপ্তি এবং পরে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁহাকে চৈতন্য দান।'

(ডঃ সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', পৃঃ ১৫৭)

বর্তমানে গোরক্ষনাথের পুজো ও গান যেভাবে প্রচলিত আছে তা হল পৌষ মাসে ধান কাটা হয়ে গেলে গ্রামের কৃষক পরিবারের কিশোরেরা মাস শেষ হবার ছয়-সাত দিন আগে দলবদ্ধভাবে সন্ধ্যাবেলায় মাঙনে বের হয়। এই মাঙনের দলের কিশোরদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বাঁশের লাঠি থাকে, যার পরিমাপ লম্বায় নিজ নিজ কান পর্যন্ত। তারা পরিক্রমায় বের হয়ে যখন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করে তখন হাতের লাঠিগুলি এক সঙ্গে মাটিতে সশব্দে ঠোকে এবং মুখে সমস্বরে বলে 'শুভ'। তারপর কয়েকটি গান গাওয়া হয়।

দলনেতা এককভাবে গানগুলির এক-একটি পঙ্‌ক্তি প্রথমে সুর করে গেয়ে যায়। তারপর দলের অন্যেরা সমবেতভাবে গায়। এইভাবে গ্রামের কৃষকদের বাড়ী পরিক্রমা করে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত মাঙন সংগ্রহ করে। মাঙন হিসেবে তারা ধান, চাল, টাকা, পয়সা ইত্যাদি পায়।

(২)

পৌষ-সংক্রান্তির দিনে গ্রামের মধ্যস্থলবর্তী কোনো এক মাঠের মধ্যে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। ঐ স্থানে গোরক্ষনাথের দলের কিশোরদের হাতের লাঠিগুলি পুঁতে রাখা হয়। কোনো কোনো গ্রামে লাঠির বদলে বাঁশের আগাল পোঁতা হয়। তারপর ঐ স্থানে পুজো উপচার রাখা হয় কলার মাইজ পাতে। উপচার হিসেবে আতপ চাল, চিঁড়ে, বাতাসা এক খণ্ড কলা দেওয়া হয়। ধূপ দীপ এবং ফুলও রাখা হয়। পুজো পরিচালনার জন্যে কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। দলের নেতা বা কোনো কিশোরই পুজো পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। কোনো মন্ত্র নেই। সমবেতভাবে নামকীর্তন করার পর প্রসাদ গ্রহণ করে ঘরে ফিরে যায়। এই পুজো সম্পর্কে "রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্মণ মহাশয় বলেছেন—"নতুন ধান ঘরে আনিয়া গোরক্ষনাথের গান করিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে পুজোর ধান সংগৃহীত হবার পরে পূজা হয়। এই গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্মপ্রচারক। এই গানে কৃষিজীবী রাজবংশী সমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় আছে"। এ তথ্য থেকে দেখা যায় যে নাথ সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম গোরক্ষনাথ কালক্রমে দেবত্বে উন্নীত হয়েছেন এবং কৃষিজীবী মানুষের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। কবে থেকে তাঁর পুজো এইভাবে প্রচলিত হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে গোরক্ষনাথের পুজো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে নাথ সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথ শেষ পর্যন্ত ফসল ও গোসম্পদের রক্ষাকর্তারূপে কৃষকদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। এ সম্পর্কে ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

> The Puja is done to save the paddy from the ravages of beasts & of thieves".
>
> "The Raj Bansis of North Bengal, Page-141.

পৌষ মাসের পুজো ছাড়াও শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসেও এই পুজো করা হয়। যদি দেখা যায় বৃষ্টির অভাবে ধান রোপণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে তখন গোরক্ষনাথের পুজোর জন্যে কিশোরেরা গোরক্ষনাথের মাঙনে বের হয়। এই সময়ে তাদের হাতে লাঠির পরিবর্তে ছোট ছোট কাঠের লাঙল থাকে এবং কিছু ধানের চারাও থাকে কারও হাতে আবার মাছ ধরা 'জাকৈ' থাকে।

তারা গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করে উঠোনে জমিচাষ, মইদেওয়া, জলসেচ করা ধান রোয়ার অভিনয় করে অবিকলভাবে। কিশোরদের মধ্যে থেকে দুইজন বলদের অভিনয় করে। সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি গাওয়া হয়—

রাম বলারে হরি বলা
চতরু পাশে কাঁচ কেলা
কাঁচ কেলারে বড় বড় পির
চালত কুমরা ঘিরা ঘির
হোক কোর কুমড়ার থুইম পুর
হাতীর শুঁড়ে তুলে পানি
শুক্‌কান কাদ টানা টানি।
শুক্‌কান কাদ গেইক রোয়া
মাচা পাত ধান থোয়া
মাচায় না ধরে ধান
গোরক্ষনাথে কর দান।।

এইভাবে ছয় সাতদিন মাঙন সংগ্রহ করার পর পূর্বোল্লিখিত ভাবে গোরক্ষনাথের পুজো দেওয়া হয়। কৃষকরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন—এই পুজো দেওয়ায় দেবতা তুষ্ট হয়ে বর্ষার প্রসন্ন ধারা বর্ষণ করে খরার অবসান করে তাদের রক্ষা করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তরবঙ্গে অনাবৃষ্টির হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্যে গ্রামীন মহিলারা 'হুদুম দেও'র পুজো করে থাকে।

এর মূলে জাদু-বিশ্বাস (Imaginative Magic) নিহিত রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কেননা এই ধরণের জাদু-বিশ্বাস সব প্রাচীন সমাজেই রয়েছে।

গোরক্ষনাথের মাঙনে বের হয়ে কিশোরেরা যে সব গান গায় তা ছড়া জাতীয়। এর মধ্যে লোকায়ত জীবনের বিচিত্র রূপ পরিস্ফুট হয়েছে সুন্দরভাবে। গানগুলির রচয়িতা কে তা জানা যায় নি, তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায় এ গুলির। এখানে গানগুলি সন্নিবেশিত হল।

(১)

শিবে মা মা রে শিব সাজে,
কানা কড়িটা ঝমেরে বাজে,
বাজুক ঝমুর বাজুক তাল,
এই গিরিটার১ জগৎ ভাল।
জগৎ না তে উনি ঝুনি
সোনার বান্দং পাঁচ কুনি২
সোনার এ রয়ো বাঁশ
আগ দুয়ারে নেখং হাস
হাস নেখং জোড় জোড়
পায়রা নেখং বত্রিস জোড়
পায়রা রে দ্যাখং শুয়া৩
আমার হরিটা না খায় গুয়া।৪
গুয়া খায়া না খালেক চুন
পন্তা ভাত ত ঢালে নুন
পন্তা ভাতটা ঝল মলায়
আমার হরিটা খেলা খেলায়
খেলা খেলাইতে কত দূরে
খেলা খেলাইতে মদনপুরে
মদনপুরে পাইব পাড়া
তিন ছয় আঠার ঘোড়া
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝাইল
পাঁচ বামনে বুঝাইল।
পাঁচ বামন নেখোড়
গিরির বউটা খেবেরি।
চার কোনায় ঘিয়ে বাতি
পুবের ভানু পোহাইল রাতি।।

সমস্বরে—"শিবে"॥

শব্দার্থ

১। গিরি (গৃহি)—অবস্থাপন্ন কৃষক
২। পাঁচ কুনি—পাঁচন, খুরপি
৩। দেখং শুয়া—দেখতে ভাল
৪। গুয়া—সুপারী

(২)

হরিণ যায় রে হরিণ যায়,
ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া যায়।
ভাঙ্গিল না ভাঙ্গিল কুতি
ভাই যাইসরে তুই কুতি।
যোধিকার মন সোধি যাং
ভাল্ গিরস্থর বাড়ী যাং।
ভাল্ গিরস্থর একে না ঘর
সানাই-সোদর আসিল তর।
সাজিয়া আন গুয়া খাই
গুয়া খাইতে চুন না খাই।
তোমরা যাবেন কত্তেক দূর
ওদি গেইলে বেগম পুর।
বেগম পুরে পাইক পাড়া
তিন ছয় আঠার ঘোড়া
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝাইল
বাইশ বলদটা হঠাইল
বাইশ বলদ গাজি গুজি
বিসকরমে ধরিয়া পুজি
বিশ করমে বিশা নাধি
মাঠতে আছে ধানের আঁটি
দিশ পাঠিটা আনিল ধান
মাইয়া বেটি বাড়া বান।।

সমস্বরে—'শিবে'।

শব্দার্থ

কুতি—কোথায়
যোধিকার—যেখানকার
সোধি—সেখানে
যাং—যাই
সানাই-সোদর—আত্মীয় স্বজন
ওদি—ওইদিকে
বিশকরমা—বিশ্বকরমা
মাইয়া-বেটি—স্ত্রী ও কন্যা
একেলা—একখানী

(২)

গিরি—হাল বাড়ী যাং মুই
পন্তা ধরিয়া খাইস তুই।
বউ— পন্তা ধরিয়া যাং মুই
পন্তা ধরিয়া না যাং মুই
গিরি—পন্তা ধরিয়া না যাব তুই
পেন্টি ধরিয়া ডাঙাইম মুই
বউ— পেন্টি ধরিয়া ডাঙাব তুই
বাপের বাড়ী যাইম মুই
গিরি—বাপের বাড়ি যাব তুই
পিঠি করিয়া আনিম মুই
বউ— পিঠি করিয়া আনিব তুই
পিঠ ভরিয়া হাসিম মুই
গিরি—দোলাত্ যায়া ধুইম মুই।
বউ— দোলাত্ যায়া ধুবে তুই
শাল-শোল হইম মুই।
গিরি—শাল-শোল হবো তুই
ঝাঁকি জাল ফেলাম মুই
বউ— ঝাঁকি জাল ফেলাব তুই
কাঁকড়া খালোত সোঁধায় মুই

গিরি—হাত ডুবিয়া ধকেলাম মুই
বউ— বাড়ীতে যায়া মরিম মুই।

সমস্বরে—শুভ

শব্দার্থ

হাল-বাড়ী—মাঠ
যাং—যাই
পেন্টি—গরু তাড়ানো/রাখালের হাতের লাঠি
ডাঙাইম—মারিব
পিঠি—পিঠে
দোলাত—নিচু জমি/খাল
ডুবিয়া—ঢুকিয়ে
ধকেলাম—ধরলাম

(৪)

আইলাম রে অরনে
মা লক্ষীর চরণে
মা লক্ষী দিবে বর
চাউল কড়ি বাইর কর
চাউল দিয়া না দিবে কড়ি
তাক করিম রে নাড়ি ঝারি
নাড়ি ঝাড়ি করিম রে
সোনার কড়ি পাইম রে

সোনার নাঙল রুপার ফাল
ঘর দেয়া ব্যাটা বয় হাল
হাল থো ফাল থো
চাল ত আনি পেন্টি থো
ওদি যারে ঘরের পাছ
ওদি আছে মানের গাছ
কাটিয়া আনেক মানের পাত
মানের পাতে বুল বুলা ভাত
বুল বুলা ভাতে দিনাল কাঞ্জি
পাড়িয়া উঠিল বাকের মানঝি।।
সমস্বরে—ঐ গিরিটার গোলা ভরি

(৫)

চাইর পাকে চাইর ...
হাউর দিয়া আছ তুমি
হাউর খুলিয়া দ্যাও জগর ভাই
খাবার চাইনা নিবার চাই
দশ বাড়ী মাসিবার যাই
গোরখনাথ যায় পাণ্ডের কূল
পিছিয়া আইসে চামপার ফুল
চামপার ফুল বে চরতন বান
হাসিয়া হাসিয়া বিদায় আন।

(৬)

চো চামি ঘর আমার বিরু বাঁশের ঘর
বাইর করবে গাইকন্যের বউ বাটা ভরা
বাটা ভরা গুয়া আমার গোরখনাথ য
তোক দেখি বাঘ ভালুক তরাসে পালা
না পালান ও বাঘ ভালুক না পালান
একটুকু জায়গা দাও মইষয়া করি ত

শব্দার্থ

নাড়ি-ঝারি—হেনেস্থা
ঘর জোয় ব্যাটা—ঘর জামাই
পেন্টি—গরু তাড়ানো লাঠি
* (পুজোর তথ্যাদি সংগৃহীত কামাখ্যাপুর অঞ্চলের রাজবংশী ও অধিবাসীদের সহায়তায়)।

আশ্রয়

সুনীল চৌধুরী

হিংস্র নেকড়ের মতো বীর বাহাদুরের ছোট ছোট চোখ দুটি জ্বলছে। চীনেমাটির পানপাত্রের তরল ছং একটু একটু করে গলায় ঢালছে আর চোখের জ্বলুনী বাড়ছে। দেখছে নির্মলা প্রধান। বীর বাহাদুরের আশ্রিত মেয়েমানুষ বাইশ-তেইশ বছরের ভরভরান্ত যুবতী নির্মলা প্রধান।

নির্মলাকে অবশ্য বীর বাহাদুর প্রকাশ্যে নিজের বিয়ে করা বউ বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু বাইরের সবাই জানে বউ না ছাই, আসলে জোর-জবরদস্তি করে আটকে রাখা রক্ষিতা। বনের পাখি—সুযোগ পেলেই উড়ে যাবে সঙ্গী পেলে। অবশ্য সকলেই জানে বীর বাহাদুরের পক্ষপুট থেকে অত সহজে ছোট্ট পাখিটা উড়ে যেতে পারবে না, অন্তত যতোদিন ওর দেহে যৌবনের মদ আছে। উড়তে গেলে বাজপাখির মতো দিগন্তের যে কোনো শূন্য থেকে থাবা দিয়ে নিয়ে আসবে। এর আগে যতোগুলো উড়তে গেছে তাদের সকলকেই ধরে এনে নির্মম অত্যাচার করে পাপের খাদে ফেলে দিয়েছে।

বীর বাহাদুরের এ স্বভাব-চরিত্র আজ তিন বছরে বিলক্ষণ চিনে নিয়েছে নির্মলা। প্রথম দিকে ওকে শ্রদ্ধা করত আশ্রয়দাতা হিসেবে। অনেকটা ও বীর বাহাদুরের মেয়ের বয়সী। কিন্তু প্রথম যেদিন বীরবাহাদুর ছং খেয়ে ওকে আদর করল সেদিনই নিজের সর্বনাশের ছায়া দেখল। মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছিল, বাপের বয়সী লোক আদর করলে দোষের কিছু নয়। আর আদর করতে গেলে একটু গায়ে গা তো গালবেই। কিন্তু তবু যেন মনকে প্রবোধ দিতে পারল না। মেয়েদের চোখে পুরুষের দৃষ্টি এড়ায় না।

পানপাত্র শেষ করে বীর বাহাদুর নির্মলার হাতটা ধরে বুকের কাছে টেনে আনল। নির্মলা সামান্য বাধাও দিল না। বলল, আর একটু ছং দি?

বীরবাহাদুর খুশিতে ডগমগ। কারণ, এমন আদুরে সুরে নির্মলা ওকে আজ পর্যন্ত কোনো অনুরোধ করেনি। চীনা পানপাত্রটা বাড়িয়ে দিল অন্য হাতে।

নির্মলা বীরবাহাদুরের বুক থেকে সামান্য আড় হয়ে বোতল থেকে ছং ঢেলে দিল পানপাত্রে। বীর বাহাদুর দারুণ খুশি আর উত্তেজিত। এক হাতে নির্মলার উত্তপ্ত দেহ অপর হাতে উত্তপ্ত তরল ছং—মাথাটাই ঘুরে গেল ওর।

নির্মলা ছোট্ট রুমালে গাল মুছে সরে বসল। এটাই চেয়েছিল। সংকল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

বীর বাহাদুর বোতলটা শেষ করে নির্মলার দিকে আবার হাত বাড়াল।

আর একটু খাও। নির্মলা উঠে গেল দ্বিতীয় বোতল বার করার জন্যে।

—আর নয় নির্মলা, অনেকটা হয়ে গেছে। বীর বাহাদুর জড়ান গলায় বলল।

নির্মলা বাক্স থেকে বোতল বার করে ঘুরে দাঁড়াল। মুখ ভার করে বলল, আমার কোনো কথাই তো তুমি রাখ না। মন হয়েছিল আজ তোমার সংগে একটু ছং খাব...ঠিক আছে...রেখে দিচ্ছি।

বীর বাহাদুর আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। এমন অভিমানের কথাও শোনেনি কখনো। নির্মলাকে উৎসব ছাড়া ছং খাওয়াতে পারেনি। আর আজ ও-কিনা বীর বাহাদুরের সঙ্গে বসে ছং খাওয়ার মন করছে। টলতে টলতে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরে নির্মলাকে।

—ছাড়। আমায় কত ভালবাস তা জানা আছে।

বীর বাহাদুর ভুল শুনেছে না তো? তিন দিনের অনুপস্থিতিতে মেয়েটার হল কি? ভালবাসার কথা দূরে থাক ওর ছায়া পর্যন্ত যে মাড়াতে ঘেন্না করে তার মুখে এমন কথা যেন অবিশ্বাস্য!

—তোকে ভালবাসি না নির্মলা? বললি কি?

—ভালবাসলে আমায় বিয়ে করতে, রক্ষিতা করে রাখতে না।

—ছিঃ ছিঃ। ও-কথা বলিস নি। ঠিক আছে, সামনের রবিবার তোকে মহাকাল মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে আনব।

—রবিবার! সে তো এখনো চারদিন।

—তবে কালই চল। বীর বাহাদুর কথাটা বলেই নিজে বাক্স থেকে কড়া ছংয়ের বোতলটা বার করে নিয়ে এসে বসল।

বীর বাহাদুর এক এক চুমুকে ছংয়ের পাত্র খালি করে দিচ্ছে। নির্মলা একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে পেয়ালায়। আজ মাতালের অভিনয় করতে হবে। মাতাল বানাতে হবে বীর বাহাদুরকে। নিজে মাতাল হলে চলবে না। বীর বাহাদুর বেহুঁস হলে অনেকটা পথ ওকে পাড়ি দিতে হবে। অন্ধকার রাত। তাড়াতাড়ি চলা যাবে না। মাথার ঠিক না থাকলে যে সুযোগ আজ হাতে এসেছে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে, আর জীবনভোর আক্ষেপে মরতে হবে।

জীবনে একবার ভুল করেছিল। দ্বিতীয়-বার আর ভুল করা চলবে না। অবশ্য যে বয়েসে ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছিল সে বয়েসে অনেকে অমন ভুল করে বসে। মাত্র আঠারো বছর বয়েসে বুদ্ধিবৃত্তি আর কতটা পাকবে? পাকা বুদ্ধি থাকলে মা-বাপের নিরাপদ আশ্রয় থেকে অমন একটা বাউণ্ডুলে ছেলের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়বে কেন? যে ছেলে দু মুঠো অন্নের সন্ধানে উদয়-অস্ত পাথর ভেঙে পথ তৈরি করেও আর একজনকে খাওয়াতে পারে না।

উঃ। সুকিয়া পোখরির সেই দিনগুলো আজ বড় ভয়াবহ বলে মনে হয়।

ঠাণ্ডা বেশি নয় এবং থাকার আস্তানা ছিল না বলে এক মাড়োয়ারীর দোকানের সামনের বারান্দায় রাত কাটাতো ওরা। আঠারো বছর বয়েস হলে হবে কি? দেহে তখন নানা রেখার আঁকিবুকি অদল-বদল চলেছে দ্রুত গতিতে। হরক বাহাদুর ওকে সত্যি ভালবাসত। কিন্তু মুখের কথা ছাড়া সেই ভালবাসা জানাবার সুযোগ কোনো দিন পায়নি। প্রকাশ্য দোকানের খোলা বারান্দায় অন্ধকারেও অনেকগুলো লোভাতুর চোখের ঝাপটা সহ্য করতেই হাঁপিয়ে উঠত। অন্য কিছু তো অসম্ভব।

সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করত হরক বাহাদুর। নির্মলা সুকিয়াপোখরির সহরটা ঘুরে ঘুরে দেখত। আর সারাদিন ওর পেছনে মদে চুর চুর এক গাদা ছেলে ঘুরত শিস দিত। নির্মলা রাতে অনুযোগ করত হরক বাহাদুরের কাছে, একটা ঝোপড়া ভাড়া করলে মান-ইজ্জত বাঁচে। কিন্তু তখন কি নির্মলা জানত যে, হরক বাহাদুরের দুমুঠো অন্ন যোগাতে কাল ঘাম ছুটছে, -ঝোপড়া স্বপ্ন!

একদিন রাতে মাড়োয়ারীর দোকানের সামনের বারান্দায় অন্যদের মতো দুটো বিছানা পেতে হরক বাহাদুরের জন অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল নির্মলা। মাঝ রাতে একটা স্পর্শে ঘুম ভেঙে দেখে পাশে কেউ ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে।

নির্মলা শিউরে উঠল। আজ দু মাসে মধ্যে একদিনও হরক বাহাদুর ওকে জড়িয়ে ধরা দূরের কথা, গায়ে প্রায় গা ঠেকায়নি প্রকাশ্য বারান্দায়। হল কি হরকের! নিশ্চয় খুব আরক কিম্বা ছং গিলে এসেছে।

—এই ছাড়। নিজেকে ছাড়িয়ে নি গিয়ে দেখল ওকে জড়িয়ে থাকা লোক হরক বাহাদুর নয়—অন্য আর কেউ।

নির্মলার গলার শব্দ শুনে লোক ওকে সম্পূর্ণ দখলে নিয়ে নিল। তার শুরু হল নির্মম দংশন। দু হাতের চ হাড়-পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিতে লাগল ব দেহের সব শক্তি দিয়ে বাধা দিচ্ছে নিম কিন্তু পারছে না। দুটো লোহার ম শক্ত হাতের আলিঙ্গনে দেহে যন্ত্রণার ত ছুতি। কি-এক গহ্বগ্রাসের মধ্যে যেন তা যেতে বসছে। জ্ঞান হারাবার আগে শর' সব শক্তি গলায় জড়ো করে চিৎকার উঠল নির্মলা।

জ্ঞান ফিরতে দেখল ভোরের ম ফুটছে। চারদিকে উৎসুক জনতার সেই ভিড়ে তখন নির্মলা একটা খুঁজেছে বার বার। কিন্তু দেখেনি কে সে মুখ হরক বাহাদুরের। পরে শ হরক আগের দিনই কোথায় উধাও গেছে।

হরক বাহাদুরের বদলে এমন মুখ দেখল সেদিন নির্মলা যাকে করা যায়। সে মুখ বীর বাহাদুরের।

বীর বাহাদুর ওকে আশ্রয় দিল। দিল নিজের কাছে এনে। আশ্রয়

সময় বলেছিল, ক'দিন বিশ্রাম নাও, তারপর তোমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব।

সান্দাকফা-পোখরির খোলা বারান্দা থেকে গৌরিবাস-এর হিমশীতল তিন কামরার একটা ঘরে আশ্রয় পেয়ে হাঁপ ছেড়েছিল নির্মলা। ইজ্জত বাঁচল মান বাঁচল।

বীর বাহাদুর পয়সাওলা মানুষ এ-অঞ্চলের। একটা বড় জোংগা আছে। জোংগায় করে মাল চালান দেয় সান্দাকফা-পোখরি আর ঘুমের বাজারে। তাছাড়া মরশুমে মানুষের পিঠে করে মাল চালান দেয়। নীচ থেকে নিয়ে আসে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী যা এই পাহাড়ে পাওয়া যায় না।

গৌরিবাসের আস্তানায় চোলাই মদের ঢালাও বিক্রি ব্যবস্থা। পথচারি আর ব্যবসায়ীরা আসে এদিকে। সামনের বড় ঘরটায় তাদের রাতের আস্তানা। কাঁচা পয়সা যা কিছু কামায় তার প্রায় সবটা ঢেলে দিয়ে যায় এখানে। চারটে মেয়ে আছে। তারাই খদ্দেরদের পরিবেশন করে আরক আর ছং। আরক ঢেলে দেবার ফাঁকে হাসি-মশকরা চলে।

মেয়ে চারটে যে কে, বীর বাহাদুরের সংগে তাদের কোন্ সম্পর্ক তা বুঝতে পারত না নির্মলা। হয়তো ওর আপনজন। পরে শিউরে উঠেছে জেনে তাদের প্রকৃত পরিচয়। খদ্দেরদের আরক বিক্রির সংগে সংগদানও করতে হয়। মেয়েগুলোই ওর চোখে আংগুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তার শেষ পরিণতির কথা। একদিন ওকেও নাকি মেয়ে চারটের সংগে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। ঘৃণায় ভয়ে গা শির শির করছিল সেদিন।

গৌরিবাসের আস্তানায় আশ্রয় পেয়েও তাই ভরসা পেল না। এ কোথায় এসে পড়ল। মা-বাপ আর ছোট ভাইবোনদের জন্য মন কেমন করে। বীর বাহাদুর বলেছে ক'দিন বাদেই সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ঘরে ফেরার নাম শুনে যেমন আনন্দ হয়েছে তেমন ভয়ও হয়েছে। মা-বাবা কি ক্ষমা করবে ওকে। ঘরপালান মেয়েকে নেপালী মা-বাপ মেনে নেয় না। মেনে নিলে যে আবার সমাজচ্যুতির ভয় আছে। ঘর-পালান মেয়ে যদি মনেরমানুষের শক্ত হাত ধরে মা-বাপের কাছে আসে সেক্ষেত্রে আদর-আপ্যায়ন পায়। কিন্তু নির্মলা কার হাত ধরে ফিরবে ঘরে?

বীর বাহাদুরের হাতটা খুবই শক্ত, কিন্তু তাকে যে বাপের মতো শ্রদ্ধা করে নির্মলা। আর বীর বাহাদুর ওর ডবলের চেয়েও বয়সে বড়। তাছাড়া ঘরে হয়তো বউ আছে। না-না, এ কল্পনা অবান্তর। ভাবতে মন খারাপ হয়ে যায়।

একটা মাস পার হয়ে গেল বীর বাহাদুরের দেখা নেই। ওকে সেই যে গৌরিবাসে রেখে জোংগা নিয়ে বেরিয়েছে তারপর কোথায় গেছে কেউ জানে না। বীর বাহাদুর না থাকলেও নির্মলার কোনো অসুবিধে নেই এখানে। সাক্ষাৎ যেন বীর বাহাদুরের মেয়ের সম্মান পাচ্ছে। সন্ধ্যে হলেই ওকে আর ঘর থেকে বাইরে আসতে দেয় না মেয়েগুলো। বলে, নানা লোক আসে এখানে, তোমার বাইরে গিয়ে দরকার নেই।

যেমন হঠাৎ জোংগা নিয়ে বেরিয়েছিল বীর বাহাদুর, তেমনই মাসখানেক বাদে হঠাৎ ফিরল। কোথা থেকে প্রচুর মালপত্র এনেছে সংগে। পরে শুনেছে বীর বাহাদুর নেপাল থেকে চোরাই পথে ভারতে চালান দেবার জন্য বহু দামী বিদেশী মালপত্র আনা-নেওয়া করে। এদিকে নেপাল আর ভারত গায়ে-গায়ে। একদিকে দার্জিলিং জেলা অপর দিকে নেপাল। চোরাই মাল একটা মাত্র সরু রাস্তা পার হলেই অন্য দেশে চলে যায়। অবশ্য এতে নির্মলার কিছু আসে যায় না।

যেদিন বীর বাহাদুর এলো তার পর দিনই নির্মলাকে ডেকে পাঠাল। নানা খোঁজ-খবর করল। এখানে কেমন আছে তাও জিজ্ঞাসা করল। নির্মলা খুব সহজভাবে উত্তর দিল সব প্রশ্নের। ওর যে গৌরিবাস খুব ভাল লাগছে তাও বলল।

দিন সাতেক বাদে একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ নির্মলার ঘরে এসে বসল বীর বাহাদুর। ওর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করল। কে কে আছে সেখানে বলল নির্মলা। হঠাৎ বীর বাহাদুর ওকে কোলের ওপর টেনে নিল। প্রথমটায় খুব চমকে গেছিল। কিন্তু বীর বাহাদুরের বয়েস হিসেব করে তেমন কিছু ভয় পাবার মতো খুঁজে পেল না। বছর খানেক আগেও বাপের কোলে নিজে গিয়ে কত বসেছে। বাপের আদর কেড়েছে।

বীর বাহাদুর ওকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছে। ভীষণ লজ্জা লাগছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারেনি।

সেদিন সারা রাত ঘুমতে পারেনি নির্মলা। নিজের মনের সংগে লড়াই করেছে। বীর বাহাদুরের সন্ধ্যার ব্যাপারটায় আমল দিতে চাইছে না একটা মন। আর একটা মন কিসের এক ইংগীত করছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বারে বারেই মনে হচ্ছে বুঝি সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

ক'দিন বাদে নিজের সর্বনাশের ছায়া দেখে চমকে উঠল। ইতিমধ্যে রোজ সন্ধ্যায় বীর বাহাদুর আসে ওর ঘরে আর আদর করে ঘন্টার পর ঘন্টা। দেহের ওপর সামান্য অত্যাচারও চলে। নির্মলা প্রাণপণে খারাপ কিছু না ভাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। বাপের বয়সী লোক হলেও আদর করার সময় চোখের চেহারা অমন হিংস্র হয়ে ওঠে কেন?

নিজের সর্বনাশের ছায়া যেদিন দেখল নির্মলা সেদিন একটু রাত করেই ওর ঘরে এলো বীর বাহাদুর। যেহেতু মাতাল অবস্থা। ঘরে এসেই মিষ্টি হেসে ডাকল নির্মলাকে। ভয় পেলেও না এসে উপায় ছিল না। কাছে আসতেই হাত ধরে বুকের ওপর টেনে নিয়ে চুম্বনের ঝড়ে মুখে অজস্র বন্য দংশন বসিয়ে দিল। তারপরের ঘটনা ভাবতে আজও শিউরে ওঠে। নারীদের অমন অপমানের কথা ভাবতে কারই বা ভাল লাগে।

সেদিন যে পিঞ্জরে আটকা পড়েছিল নির্মলা আজও সেই পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ আর থাকবে না নির্মলা। মুক্তির আহ্বান শুনেছে। শুনিয়েছে বীর বাহাদুরের দূর সম্পর্কের ভাই ক্ষেম বাহাদুর।...

বীর বাহাদুর চীনা মাটির পানপাত্র নিঃশেষ করে নামিয়ে রাখল। নির্মলারও পানপাত্র শেষ হয়ে গেছে। চোখে রং ধরেছে ওর। বীর বাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র এক টুকরো হাসি বিকিয়ে দিয়ে কোলে মাথা রেখে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। আজ সম্পূর্ণ সমর্পণ। বিপদের দিনের আশ্রয়দাতার পিঞ্জর থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে উড়ে যাবার আগে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আজ আর নির্মলার আপত্তি নেই।

এমনভাবে কোনো দিনই বীর বাহাদুরের হাতে সঁপে দেয়নি নিজেকে। যখনই বীর বাহাদুর ওর দেহের দখল নিতে এসেছে জোর করে বিনা আপত্তিতে বিনা লড়াইয়ে নিজেকে সঁপে দেয়নি। ফলে মার খেয়েছে বেদম, অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিয়েছে ওর নরম দেহের কোষে কোষে।

আজ মনে পড়ছে নির্মলার, গৌরিবাসের সেই প্রথম রাতের পর সাত দিনের জন্য উধাও হয়ে গেছল বীর বাহাদুর। চারটে মেয়ে ওকে দিনরাত পাহারা দিয়েছে আর

ঘুমিয়েছে, চোখে যখন ধরেছে বীর বাহাদুরের তখন কিছু ঘুমিয়ে নাও, অন্ততঃ যতো দিন তোমার শরীরের মধ্যে চুর চুর হয়ে থাকবে মনিব। তারপর কিন্তু তোমার হাল আমাদের মতো হবে। দুনিয়ার লোকের ঘর করতে হবে—তা তোমার শরীর ভাল থাকুক আর না থাকুক।

পালাবার ফিকির করেছে প্রতিদিন। কিন্তু কোথায় পালাবে? এই দুনিয়ার কোন্ জায়গাটা চেনে ও।

গৌরিবাস থেকে একদিন নির্মলাকে নিয়ে বীর বাহাদুর চলে এলো সেকমো-তে। ওখানে তখন নতুন নতুন ঘরবাড়ি হচ্ছে। গৌরিবাসের বাড়িটাও রইল। সেকমোতে এসে পরিচয় দিল ওকে বিয়ে করা বউ বলে। আর সেই সঙ্গে শাসিয়ে দিল, উড়তে গেলে বিপদে পড়বি।

সেকমোয় আসার পর প্রায় মাস দুয়েক কোথাও নড়েনি বীর বাহাদুর। তারপর আস্তে আস্তে বেরুতে শুরু করল। নির্মলা স্বপ্ন দেখে ওড়ার। কিন্তু বহুদিন পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার ফল হিসেবে উড়তে গিয়ে দেখল ডানা দুটোয় কোনো জোর নেই। মনের সাধ থাকলেও সাহস হারিয়ে ফেলেছে।

এমন সময় হঠাৎ দক্ষিণ হাওয়ার আমেজ এলো। বীর বাহাদুরের দূর সম্পর্কের ভাই ক্ষেম বাহাদুর এলো ওদের বাড়িতে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের তরতাজা জোয়ান ছেলে মালয়ে ব্রিটিশ আর্মিতে কাজ করে। ছুটিতে দেশে এসে ভায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলো। ক্ষেম বাহাদুরকে দেখে মজল নির্মলা। ক্ষেম বাহাদুরও বাদ গেল না। আধবুড়ো দাজুর এমন কচি বউ! ওদের সমাজে অবশ্য এমন আকচার আছে। আবার দাজুর বউ নিয়ে পালানোর ঘটনাও আকচার ঘটে। কিন্তু নির্মলা তো আর দাজুর বিয়ে-করা বউ নয়। সেক্ষেত্রে পাপটাপ হবার ভয় নেই।

ভায়ের অনুপস্থিতিতে শলা-পরামর্শ চলে। নির্মলা স্বপ্ন দেখে অজানা এক দেশের। যে দেশে যেতে হলে কালাপানি পার হতে হয়। অজানা সেই দেশে ছোট একটা ঘরে ক্ষেম বাহাদুরের ঘরণীর ছবি ভেসে উঠতেই কেমন যেন বিচিত্র শিহরণ লাগে। আর এই স্বপ্ন দেখার মুহূর্তে ক্ষেম বাহাদুরের ভীতু ভীতু আদরে অস্বস্তি লাগে না, বরং একটা পরম পরিতৃপ্তির আমেজ পায় নির্মলা।

হঠাৎ খেয়াল হল নির্মলার যে বীর বাহাদুরের কোলে মাথা রেখে ও এত তন্ময় হয়ে গেছে যে, শেষে ধরা না পড়ে। চোখ চেয়ে দেখল বীর বাহাদুর ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে কি দেখছে।

—কি দেখছ?

—তোকে।

—আমায় আজ নতুন দেখছ নাকি?

—সত্যি তোকে আজ নতুন নতুন লাগছে।

—ও তোমার চোখের দোষ। আমি যা ছিলাম তাই তো আছি।

—এমনটা ছিলি না নির্মলা।

—কি রকমটা?

—ঠিক এখন যেমনটা...

বুক কেঁপে উঠল নির্মলার। ধরা পড়ে গেল নাকি? ওর তো শয়তানের চোখ। হঠাৎ বীর বাহাদুরের গলা জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ ঘসে বলল, এত দিন তাহলে আমার ঠিক মতো দেখো নি। আমি এমনটাই আছি সেই প্রথম দিন থেকে।

বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল বীর বাহাদুরের। মানুষের স্নেহ আর ভালবাসা এমনভাবে কোনো দিন পায়নি। ভালবাসা না পেয়ে হলো হয়ে আদায় করেছে জবরদস্তি। এই নির্মলার ওপর কতই না অত্যাচার করেছে। আজ বুঝতে পারছে মেয়েটাও ভালবাসার কাঙাল। ওকে আগেই বিয়ে করলে হয়তো এই ভালবাসা পেত। এতদিন বিয়ে না করার জন্য আজ মর্মবেদনায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

ধরা গলায় বীর বাহাদুর বলল, সত্যি নির্মলা তোকে চিনতে পারিনি এতোদিন। দোষটা আমার।

কপট রাগের ভংগীমায় গলা ছেড়ে দিয়ে নির্মলা বলল। থাক, খুব হয়েছে।

বীর বাহাদুর নির্মলার হালকা দেহটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, তোর ওপর অনেক অন্যায় করেছি। আমায় ক্ষমা কর নির্মলা। তোর সব সাধ আমি পুরিয়ে দেব। যা তুই বলবি।

—সত্যি! আমায় তুমি বাবার কাছে নিয়ে আসতে পারবে?

বিস্মিত হতভম্ব বীর বাহাদুর। তারপরই ভাবল নির্মলা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করছে ওকে। বলল, তুই চাইলে নিশ্চয়ই নিয়ে আসব। যে দিন বলবি।

—তোমার চলবে কি করে?

—তুই আসার আগে যেমন চলছিল তেমন চলবে।

নির্মলার বিস্ময়ের অন্ত নেই। হিংস্র মানুষটার একি হল! এমন শান্ত গলা কোনো দিন শোনেনি বীর বাহাদুরের। হঠাৎ মনে হল এটা ওর ছল। আসলে কথা বার করতে চায়। সাবধান হতে হবে। আজকের রাতটা ভোর হলে মুক্তির আর কোনো আশাই থাকবে না। নির্মলা বীর বাহাদুরের বুকে নিজের বুকটা এলিয়ে দিয়ে বলল, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

বীর বাহাদুর ছোট্ট একটা পাখিকে যেন পরম আদরে বুকে চেপে রেখেছে যার ওড়ার মতো আর আকাশ নেই এই পৃথিবীতে।

বীর বাহাদুরের চওড়া বুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল নির্মলা। হঠাৎ দরজায় টোকা দেবার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখল। আবার টোকা পড়ল দরজায়। ক্ষেম বাহাদুর কথা মতো রাত-দুপুরে এসেছে। দূরে ওর জিপ গাড়িটা রেখে হালকা পায়ে বাড়ির কাছে এসে ডাকছে নির্মলাকে।

মনে পড়ছে সব। এবার বীর বাহাদুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে যেতে হবে পেছনের দরজা দিয়ে। তারপর জিপে গিয়ে উঠলে ক্ষেম বাহাদুর উৎরাই পথে ঠেলে নিয়ে যাবে গাড়িটাকে রাস্তার বাঁক পর্যন্ত। বাঁকে পৌঁছনর পর ক্ষেম বাহাদুর লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেবে। তীব্র বেগে জিপ ছুটবে সিংবাড়ির দিকে। সিংবাড়ি থেকে সদাকিফু পোখরি হয়ে ঘুম। ঘুম থেকে শিলিগুড়ি। ভোরের ট্রেন ধরে কোথায় কোথায় দিয়ে কোথায় যাবে। সেখান থেকে জাহাজ। থামবে গিয়ে মালয়ের স্যাগিল এস্টেটে। সেখানেই একটা ছোট্ট ঘরে নতুন সংসার পাতবে নির্মলা। যার মালিক তরতাজা জোয়ান সৈনিক ক্ষেম বাহাদুর।

বীর বাহাদুরের চওড়া বুক থেকে উঠতে গিয়ে কেমন যেন শক্তিহীন মনে হল ওর। শরীরে জোর পাচ্ছে না। ছোট্ট পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিটার ডানা দুটো যেন বড় ভারি। বাইরে আবার টোকা পড়ল।

নির্মলা দেহের সব শক্তি একত্রিত করে বীর বাহাদুরের বুক থেকে নিজের মুক্তি চাইল। উঠে বসল। চীনা দেওয়াল ল্যাম্পের টিমটিমে আলো পড়েছে বীর বাহাদুরের মুখে বুকে। নির্মলা বিদায়ের আগে আশ্রয়দাতার মুখটা একবার দেখে নিতে গিয়ে অবাক হল। যেন একটা নিষ্পাপ শিশু ঘুমে অচেতন। এ শিশুর মুখে কোনো পাপ নেই, নেই কোনো হিংস্রতার ছাপ।

এমন মুখ তো আগে কখনো দেখেনি বীর বাহাদুরের। ওর চওড়া বুকের আশ্রয়টা বড় টানছে। বাইরে দরজায় অধীর টোকা পড়ছে।

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিটা ভারি ডানা দুটো ঝটপট করে শেষ বারের মতো মুক্ত আকাশে উড়তে চেয়ে শেষে পড়ে গেল। ক্লান্তিতে বসে পড়ল খাঁচার মধ্যে।

নির্মলার চোখ দুটো ঘুমে ক্লান্ত নিষ্পাপ শিশুর মতো ঘুমে অচেতন বীর বাহাদুরের চওড়া বুকের আশ্রয়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে পরম প্রশান্তিতে চোখ বুজল

মাওরি কবিতা

নবকুমার সান্যাল

মাওরি নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী। মাওরি শব্দের অর্থ নাম। তরুলতা, পশুপাখী এবং ব্যক্তিবিশেষের নাম বোঝাতে মাওরি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নিউজিল্যাণ্ডবাসীরা এই অর্থেই শব্দটি প্রয়োগ করে থাকে। মাওরি আদিবাসীদের একটি পৃথক ভাষা ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে থেকে এবং সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসেও তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করে চলেছে। নিউজিল্যাণ্ডের অন্যান্য অধিবাসী থেকে মাওরিদের স্বচ্ছন্দে পৃথক করা যায়।

মাওরি আদিবাসীর একটি প্রধান সম্পদ হল তার কবিতা। মাওরি কবিতা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়। কবিতাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ কবিতার মর্যাদা দেওয়া যায়। আজ থেকে একশো বছরেরও আগে মাওরি ভাষা পৃথক হরফে প্রথম লিখিত হয়। ভাষা লিখিতরূপ পাবার আগে কবিতা মুখে মুখেই চলে আসত। সেই সময়ে স্যর জর্জ গ্রে (নিউজিল্যাণ্ডের গভর্ণর ছিলেন ঃ ১৮৪৫-১৮৫৩ এবং ১৮৬১—১৮৬৮) মাওরি আদিবাসীর লোক-কাহিনী এবং কবিতা সংগ্রহ করতে ও তার হিসেব রাখতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর সংকলন গ্রন্থের নাম মিথলজি অ্যাণ্ড ট্র্যাডিশন অব দি নিউজিল্যাণ্ডারস। তাঁর এই সংকলনে মোট ৫০৭টি কবিতা আছে। এর অধিকাংশই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। কতকগুলি কবিতার ভাব অস্পষ্ট অথবা সন্দেহপূর্ণ। কিন্তু যাঁরা সেগুলি ঠিকমত পড়তে পেরেছেন, তাঁরা তার মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন।

মাওরি কবিতা সংগ্রহের পুরোভাগে আছেন স্যর জর্জ গ্রে। তাঁর পরেও প্রার্থনা, সংগীত এবং শোকবিষয়ক অনেকগুলি মাওরি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। সব সময় যে সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া গেছে, তা নয়। গ্রের সংগ্রহকে পরিবর্ধিত করার জন্যে স্যর অপিরাণা ন্গাত (১৮৭৪—১৯৫০) আরো অনেকগুলি মাওরি কবিতা সংগ্রহ করেছেন এবং তার কিছু কিছু অনুবাদও তিনি নিজে দিয়েছেন। তাঁর সংকলনের নাম জার্ণ্যাল অব দি পলিনেশিয়ান সোসাইটি। স্যর অপিরাণা ন্গাত সংগৃহীত এবং অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে ল্যামেন্ট ফর তে হুহু, তিপারে ও নিউ, আনসারস টু এ ম্যারেজ প্রপোজল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনুবাদ কবিতা প্রায় ক্ষেত্রে সুন্দর হয়েছে। কবিতাগুলির পাঠ বেশ সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দগতি। একথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁর অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য রক্ষা পেয়েছে। টেলর, এস পার্সি স্মিথ, হেয়ার হোংগি প্রভৃতি পণ্ডিতরাও মাওরি কবিতা নিয়ে চর্চা করেছেন। তাঁদের এই প্রয়াসে মাওরি জীবন ও ঐতিহ্যের একটা প্রাথমিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইংরেজি কাব্য-রীতি বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময়ে মূল কবিতার মেজাজ ঠিক ধরতে পারেননি।

মাওরি কবিতা নানাপ্রকারে রচিত হয়েছে। ওয়াইয়াতা (সংগীত), তাংগি (শোক প্রকাশ), ক্যারাকিয়া (আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা) এবং এ রেও তাস (বর্শায় শান দেওয়ার জন্যে স্তব)—প্রধানত এই চার প্রকারের মাওরি কবিতা দেখা যায়।

ওয়াইয়াতা সুরে দিয়ে গাওয়া হত। এগুলি হয়ত কোনো মাওরি চারণ-কবির রচিত নতুবা প্রাচীন সংগীত থেকে গৃহীত। কিছু প্রাচীন ওয়াইয়াতা এখনো আসরে গাওয়া হয়ে থকে। এদের কোনো লিখিত স্বরলিপি নেই। তবে কিছু কিছু গানের টেপ রেকর্ড আছে। তাংগি (শোক-কবিতা) সাধারণত কোনো নামকরা লোকের মৃত্যুর সংগে জড়িত এবং শোক উৎসব উপলক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগুলি রচিত। ক্যারাকিয়া (আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা) আজকে গীর্জার প্রার্থনা সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রাচীন ক্যারাকিয়ার সংগে গীর্জা-সংগীতের সাক্ষাৎ কোনো সম্পর্ক নেই।

এবার মাওরি কবিতার কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করলে বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

একটি ছোটো বাঁশীর মধ্যে দিয়ে গানের কথাগুলি প্রকাশ করে দেওয়া মাওরিদের পক্ষেই সম্ভব। একজন ভালো বাঁশীবাদক মাওরি সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়।

অ্যান এনসেন্ট ফ্লুট সং কবিতায় বাঁশীর সংগীতই যেন শোনা যায়।

ওহে, তেল চকচকে কোকিল
তোমার লম্বা লেজ নিয়ে
আমাকে ডেকে তোমার বসন্তের খবর দাও।
বাতাস শিথিল হয়ে ভয়ানক বিঁধছে
যেখানে রিপিরো শুয়ে আছে
তার সংকার এখনো হয়নি।
[illegible] থাক।
[illegible] বাঁশি থেকে
গর্তগুলির অন্ধকার দূরে হয়ে যাক।
ঘুরন্ত বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে এসে
মনের নির্জন আকাশে তোমার বাসা বাঁধো।

তিপারে ও নিউ কবিতায় মা তাঁর ছেলের জন্যে শোক প্রকাশ করছেন। এতে সর্বকালীন জননীর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তিপারে ও নিউ পর্যন্ত
যে রাস্তা দিয়ে তোমরা হেঁটে যাও
আমার চোখের জলে তা ভাসিয়ে দেবো।
ছায়া আর চোখের জলের বন্যায়
সমস্ত দীর্ঘ-রাত্রি যন্ত্রণায় ঢেলে দিয়ে
আমি সীমান্ত দেশ দেখেছি
কিন্তু জলের ধারে গাছের নীচে
যেখানে মৃত শিশুটি নিশ্চিন্তে
শুয়ে আছে
এমন কি তাকে দূরে থেকেও দেখিনি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠছে।। যুদ্ধের বীভৎসতায় প্রকৃতি রাজ্যেও যেন আলোড়ন সৃষ্টি করছে। মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ই যুদ্ধ ভয়ে ভীত। কারণ এতে তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে পারে। শেষে যুদ্ধ-দেবতার বিদায় এবং সকলের স্বস্তি। এই চিত্রের আলোকে চান্ট বিফোর ব্যাটল কবিতাটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মাওরি চারণ-কবি বলছেন—

যুদ্ধ দেবতা বিদায় নেয়
তার দীর্ঘ পদক্ষেপের সংগে
চাঁদ এবং তারা মৃত্যুর হাত থেকে
পালিয়ে যায়, ছুটে পালিয়ে যায়।

ল্যামেন্ট ফর তে হুহু কবিতাটি একটি শোক-গাথা। ছোটো ভাই বড় ভাইয়ের জন্যে শোক প্রকাশ করছে। প্রাকৃতিক জগতেও তার শোকের ছায়া পড়েছে।

কবর পাহাড়ের উপরে —
বিদ্যুৎ আকাশ চূর্ণ করে ঃ
মৃত্যু ছাড়া এর কি অর্থ হতে পারে?

আমার ভাইয়ের ছায়া চলে গেছে,
আমার বন্ধুকে শীঘ্রই ভুলে যাবে,
তোমার হাত থেকে অস্ত্র তুলে নেওয়া হল
ওহে যাজকবৃন্দ
কোন্ রাত্রে সে মারা গিয়েছিল?
সেদিন কি চাঁদ উঠেছিল?

ভাইয়ের মৃত্যুশোক আর ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই; আদিবাসী সমাজও সেই শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছে। শোক-সন্তপ্ত ভাইটি বলছে—

অন্য মানুষ সম্বন্ধে কথা বলতে
আমার ক্লান্তি বোধ হয়
উপজাতিরা আজ অসহায়, পৃথিবী কাঁপে,
তুমি আমাদের যেখানে রেখে গিয়েছিলে
নিশ্চল খোঁটার মত আমরা সেখানে
দাঁড়িয়ে আছি
কেবল চোখের জল দিয়ে তোমার চামড়া
ভিজিয়ে দিতে পারি।

অঙ্গনা

সহধর্মিণী-সহবাসিনী

বিবাহ কি সামাজিক বন্ধনের চাবিকাঠি? এরকম একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হলে একসময় অবলীলাক্রমে ইতিবাচক উত্তর দেওয়া চলতো। কারণ, যে সমাজের ছত্রছায়াতলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বেড়ে উঠেছিলেন তার বিধি-বিধানের যোগ্য মর্যাদাদান এবং পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল তখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। তখনকার সামাজিক মূল্যবোধই এখন প্রায় বিপর্যস্ত হতে বসেছে। তাই সেদিনে আর এদিনে ফারাকও বিস্তর। এ প্রশ্নের ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর দেওয়া সেকারণেই এখন খুব সহজসাধ্য নয়। তবে একথাটা দিনে দিনে সহজ হয়ে যাচ্ছে যে বিবাহের সেদিনের মুখ্য উদ্দেশ্য এখন গৌণ হয়ে পড়ছে। বস্তুত এর সামাজিক বন্ধনের দিক সম্বন্ধে অনেকেই আর তেমন ভেবে দেখতে চাইছেন না বা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের দেশে এই সমস্যা এখনো তেমন প্রকট না হলেও বিভিন্ন দেশে এই সমস্যা সেখানকার শাসক ও সমাজকর্তাদের রীতিমতো চিন্তিত করে তুলেছে। কিছুদিন আগে অমৃতের 'একনজরে' বিভাগে প্রকাশিত একটি সংবাদ নিশ্চয়ই অনেকের নজরে ঠেকেছে। সেই সংবাদে বলা হয়েছিল যে, সুইডেনে আনুষ্ঠানিক বিবাহ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। যুবক-যুবতীরা আইন বা চার্চের কোন পরোয়া না করেই যে যার মনের মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধছেন। ...১৯৬৬ সালে সেদেশে বিবাহ হয়েছিল ৬১,১০১টি: আর গত বছরে বিবাহ হয় মাত্র ৩৯ হাজার। মাত্র পাঁচ বছরে সুইডেনে আনুষ্ঠানিক বিবাহের সংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। প্রায় শতাব্দীকাল আগে যখন সেদেশ থেকে দলে দলে লোক আমেরিকায় চলে যেতে থাকে কেবলমাত্র সে সময় সুইডেনে বিবাহের সংখ্যা বছরে চল্লিশ হাজারের নীচে নেমে আসে। এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে ২৩-২৪ বছরের মেয়েরা আর ২৫-২৬ বছরের ছেলেরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ...আনুষ্ঠানিক বিবাহে সুইডেনের ছেলেমেয়েদের এই অনীহা কেন? বিভিন্ন মহল থেকে এর কারণ বাতলানো হয়েছে। ছেলেমেয়েরা নিজেরা অবশ্য বলছেন যে, তাঁদের ভালবাসা এতই গভীর যে, তা চার্চ বা আইনের স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ অর্থনীতিবিদ বা ধর্মযাজকরা সেকথা মানতে চান না। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, সাবেক বিবাহরীতি আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে অনাবশ্যক বন্ধন বলে মনে হয়। অর্থনীতিবিদরা বলেন, এর মূলে রয়েছে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি আর আত্মনির্ভরতা। তাঁরা পুরুষের সংস্পর্শে আসেন যৌবনের আকর্ষণে। কিন্তু সেজন্য কোন দায়-দায়িত্বের বন্ধনে তাঁরা যেতে চান না। আর যাজকেরা বলেন, বর্তমান যুবসমাজের কাছে ধর্মের আবেদন দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। তাই সমাজ জুড়ে এই অনাসৃষ্টি।

এটা অনাসৃষ্টি কি নতুন সৃষ্টি সে বিচারের দিন এখনো অনেক দেরি। তবে এই তরঙ্গ সমুদ্র অতিক্রম করে আমাদের উপকূলেও আছড়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে আমাদের দেশের 'ম্যারেজ ইনস্টিট্যুটে' তাঁরা বিশ্বাসী নন এবং নিজ নিজ পছন্দমতো তাঁরা ঘর বাঁধতেও শুরু করেছেন। কোন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান নয়, এমনকি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার পর্যন্তও তাঁরা যাচ্ছেন না। অথচ স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করছেন। সামাজিক বা আইনী স্বীকৃতির অপেক্ষা এরা রাখেন না। ইচ্ছে হলো স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করছেন। আবার যখন পোষাবে না, ভালবাসার উত্তাপ কমে এলে বন্ধনগ্রন্থি ছিন্ন হতেও সময় লাগে না।

আমাদের দেশে এই জিনিসের এখনো তেমন ব্যাপকতা দেখা দেয়নি। তাই বিবাহ-বিহীন মিলন যেমন নজরে পড়ছে না, তেমনি এ ধরনের বিচ্ছেদও আমাদের খুব একটা শংকিত করছে না। তবে নানা দেশে এ সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে ভালবাসার বন্ধনে ভালবাসায় ভাটা পড়লেই নেমে আসে বিচ্ছেদ। আর এসবই হয় আইনের বাইরে। বিয়েতেই যাঁরা আইনের তোয়াক্কা করেন না, বিচ্ছেদে তাঁরা সেধার দিয়ে যে যাবেন না সে তো খুবই স্বাভাবিক। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের হিসেবের মধ্যে এ-সবের কোন রেকর্ড থাকে না। আর এমনিতেই সেসব দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদও খুব বেড়ে গেছে। সুইডেনের কথায়ই বলা যায় যে, সেদেশে এখন প্রতি তিনটি বিবাহের একটি দশ বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬০ সালে সেদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় ৮,৯৫৮টি আর ১৯৬৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২,২৩৮টিতে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অভিযোগ ব্যভিচার, মাতলামি। তবে এর সবচেয়ে গোড়ার কথা হলো মানসিক ব্যাধি। যা কি না দুরারোগ্য। আর এখান থেকেই সামাজিক অনাসৃষ্টি বা নতুন সৃষ্টির শুরু।

আবার এই বিবাহ-বিচ্ছেদের বাইরে রয়েছে অবিবাহিত দম্পতিদের বিচ্ছেদ।

ইউরোপের নানা দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের ঠিক ঠিক তুলনা চলে না। তবু একথা সত্য যে, ওদের প্রতিটি জিনিসই আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে। বিবাহ-বিহীন স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করাটা সেই প্রভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ওদেশের মেয়েরা দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করেছেন। তাই তাঁরা জীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে সুন্দর রসাশ্রয়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতেছেন। সামাজিক বন্ধনকে পর্যন্ত তুচ্ছ করছেন। আর আমরা তো সে তুলনায় নিতান্তই হাঁটি-হাঁটি পা-পা। এরই মধ্যে সামাজিক অস্বীকৃতির ঝোঁক আমাদেরও পেয়ে বসেছে। অন্য দেশের পটভূমিকায় এদেশের এই ট্রেন্ডকে গোড়ার ওটা দুর্লক্ষণ বলে মনে হলেও এজন্য মূলত দায়ী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অসদাচরণ। আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে ২৫-৩০ বছরের একজন যুবক বিয়ে সম্বন্ধে এ ধারণায় স্থিরনিশ্চয় থাকতেন যে, 'আমার স্ত্রী সারা জীবন ঘরসংসার আগলাবে এ[বং] সন্তানসন্ততির পরিচর্যা [ক]রবে। আমার দুঃখ কষ্ট, ব্যথা-বেদনার কথা সে ধৈর্য সহকারে শুনবে। আমার সেবার জন্য সে স[ব] সময় তৎপর থাকবে। আমি রোজগার কর[ব] আর সে সংসার করবে। গুরুজনদের প[রি]চর্যার কথা তো বলাই বাহুল্য।'

এই ছিল সেদিন স্ত্রীর কাছে স্বাম[ীর] প্রত্যাশা। অর্থাৎ স্বামীপ্রবর নেবেন স[ব] কিন্তু দেবার বেলা নেই। আরো সহজ[ভাবে] বলা যায় যে তিনি কেবলই নেবেন, [ভোগ] করবেন, দেবেন না কিছুই। তাই ত[িনি] একাই সুখ চান যেন এটা তার জন্ম[গত] অধিকার এবং সুখে স্ত্রীর কোন অধি[কার] নেই। তাই সেজন্য তিনি কোন ব্যব[স্থা] করবেন না। আজ যদি মেয়েরা পুরু[ষের] উপর পূর্বকৃত অন্যায়ের শোধ [নিতে] এগিয়ে আসেন তবে তাকে তেমন দো[ষ] বলা চলে না। কিন্তু আচার-আচরণে তেমন মনে হচ্ছে না। আসলে কথা [হলো] এর দ্বারা গোটা সমাজকে বৃদ্ধা[ঙ্গুষ্ঠ] প্রদর্শন করা। তাই বিদেশের বিবাহ[হী]ন মিলন আমাদের দেশেও জলচল হল ব[লে]।

এরকম জনা কয়েক যুবক-যু[বতীর] এক আলাপ-আলোচনায় আড়ি পেতে [শোনার] সুযোগ হয়েছিল আমার। ঘটনাস্থল এক কফিখানা। আমি বসে মোক্ষ

কাফেতে ঢুকে পড়েছিলাম। সঙ্গে ছিল অনেক দিনের অদেখা এক বান্ধবী। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলছে, এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ওঁদের প্রবেশ। পাশের টেবিলেই বসলেন। ওঁরা ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করছিলেন। এই উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটা কান সেদিকে এগিয়ে দিলাম। আলোচনা এবং উত্তেজনার মূল সূত্র বোধগম্য হতে এবার আর বিলম্ব হলো না। ওঁদের একজন বিয়ে করছেন এবং সামাজিক মতে। তিনি অবশ্য এই টেবিলে অনুপস্থিত। এই বিয়েতে ওঁদের সায় নেই। যুবকদের একজন বললেন, মালাচন্দনে সেজে আর টোপর পরে ছাদনাতলায় দাঁড়ানোর মতো হাস্যকর বোধহয় আর কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণী সায় দিয়ে বললেন, আর মেয়েটাই বা কেমন? ওরকমভাবে সেজেগুজে সংয়ের মতো অচেনা-অজানা একটা লোকের চারপাশে ঘুরতে লজ্জা করবে না। এদিকে তো শুনছি এম এ পাশ এবং রেজাল্টও নাকি বেশ ভালোই।

আলোচনা ক্রমেই উত্তেজনার স্তর ছাড়িয়ে চলেছে। একজন মন্তব্য করলেন, সবচেয়ে জঘন্য লাগে বিয়েবাড়ির খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা। বালতি থেকে সবাইকে খেতে দেওয়া হয়। যেন গরুর জাব দেওয়া হচ্ছে। টেবিলের সবাই একথার সোৎসাহ সমর্থন জানালেন। একটু পরেই ওঁরা এ ব্যাপারে একমত হলেন যে বিয়ে বয়কট করা হবে। তারপর বিয়ে-সংক্রান্ত প্রচলিত সামাজিক রীতি নিয়ে অনেক কাটাছেঁড়া করলেন ওঁরা। এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন।

বিয়ের রূপ অনেকবার বদলেছে। ইতিহাসে তার অনেক সাক্ষ্য মেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা থেকে অর্জুনের সুভদ্রা হরণ এবং পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী এ সংক্রান্ত প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পরিবর্তন কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। প্রতি বছর, প্রতিদিন এবং প্রতি ঘণ্টায় এর পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ, কোন পরিবর্তনই এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না বা শেষ হয়ে যায় না। স্বাভাবিক নিয়মেই তা এগিয়ে চলে। তবু এরই মধ্যে একটা ধরাবাঁধা সামাজিক রীতি ছিল এবং আজো তা শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু কালের দুর্বার গতিতে তা যে আর কতদিন টিকবে তাই বলা শক্ত। কিন্তু স্বীকৃতি ব্যতিরেকে স্বামী-স্ত্রীরূপে মিলন নেহাতই জৈবিক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা। যদিও দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা চালু আছে তবু সেজন্য উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে মামলা দায়ের করে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। সেই ঝামেলা এড়ানোর জন্যই এই সহজ ব্যবস্থা। যখন খুশি একজন আরেক জনের কাছ থেকে সরে যাবেন। আবার নতুন করে ঘর বাঁধবেন। সোজা বাংলায় মন দেওয়া-নেওয়া পালাটা চলবে যতদিন সম্ভব।

কিন্তু সবাই এর সুফল পাবেন না। অপ্রেকাদিন কোন পুরুষ-রমণীর একসঙ্গে বসবাস করার ফলে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিবাহ ব্যতিরেকেও। এক্ষেত্রে একজন যখন আর একজনকে পরিত্যাগ করে, তখন সেই দীর্ঘদিনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের দোহাই পেড়েও কোন লাভ হয় না। এমনি একটি ঘটনা ঘটে সম্প্রতি বোম্বাইয়ে। একটি দম্পতি দীর্ঘ দশ বছর স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করেন। হঠাৎ একদিন স্ত্রী দেখলেন যে স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য একজনকে নিয়ে ঘর বেঁধেছেন। স্ত্রী প্রমাদ গুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বামীকে উকিলের চিঠি ধরালেন যে আইনত তিনিই তাঁর স্ত্রী এবং পুনরায় তাঁকে সেই মর্যাদা দেওয়া হোক, আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তাঁকে খোরপোষ দেওয়া হোক।

স্বামী বলে বর্ণিত সেই ভদ্রলোক উকিলের চিঠি খারিজ করে ভদ্রমহিলার স্ত্রীর দাবি নস্যাৎ করে দিলেন। ভদ্রমহিলা তখন কোর্টে গেলেন। কিন্তু সেখানে তিনি তাঁদের বিয়ে প্রমাণ করতে পারলেন না। তখন তিনি হাইকোর্টে আপীল করলেন এবং আরো অভিযোগ করলেন যে তাঁকে পরিত্যাগ করে তাঁর স্বামী অন্য মহিলাকে বিয়ে করেছেন। মকদ্দমা চললো। কিন্তু ভদ্রমহিলা না তাঁর নিজের বিয়ে বা তাঁর স্বামী বলে বর্ণিত সেই ভদ্রলোকের দ্বিতীয় বিয়ের কথা কোনটাই প্রমাণ করতে পারলেন না। মামলা খারিজ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন। শুধু কোর্ট-কাছারি ছোটাছুটি সার হলো।

ভদ্রমহিলা আধুনিক যুগের পথ ধরে চললেন আবার কোর্ট-কাছারিও করলেন। কিন্তু যে বিয়ে সামাজিক রীতিতে সম্পন্ন হয়নি তার আইনী সমর্থন মেলা ভার। যতক্ষণ একসঙ্গে থাকা যায় ততক্ষণই স্বামী-স্ত্রী। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেই সব মিটে গেল। কোন দাবিদাওয়া চলবে না। যার যার পথ বেছে নিতে হবে। আর এদিকেই এখনকার যুবক-যুবতীদের আকর্ষণ। এখনো এই মনোভাব তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। স্বোপার্জনে সবাই এখনো স্বনির্ভর থাকতে চায় না। তবে কেউ কেউ অনন্য-নির্ভর থাকতে ভালবাসেন এবং তাঁরা এ পথেই বিয়ের পর্ব মিটিয়ে ফেলছেন।

তবে এ বিয়ে সম্বন্ধে একটা কথা এক্ষুনি বলা চলে। নানা দেশও এই একই সমস্যায় ভুগছে। সমস্যাটি হলো অবৈধ শিশুকে কেন্দ্র করে। এই অবিবাহিত দাম্পত্য জীবনযাপনের ফলে সুইডেনে প্রতি পাঁচটির একটি শিশু হয় অবৈধ। সেদেশে অবৈধ শিশুর সমস্যা তেমনভাবে সমাজকে বিচলিত করে না এবং স্বামী-স্ত্রীর মনকেও গভীরভাবে নাড়া দেয় না। ওদেশে এই রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। কিন্তু আমাদের দেশে হালে আমদানি করা বিবাহবিহীন পারস্পরিক বসবাসে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তার দায়িত্ব কে নেবে? ওদেশের মেয়েদের পক্ষে যা সম্ভব আমাদের দেশের রমণী-সমাজের পক্ষে কি তা সম্ভব হবে? আমার সন্তান আমি জীবিত থাকতে পরিচয়বিহীন হয়ে অনাথ আশ্রমে মানুষ হবে, মায়ের পক্ষে এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না।

অবিবাহিত দাম্পত্যের বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য সুইডেনে এখন নানা প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত হলো, সাবেক বিবাহরীতির বদলে এমন এক বিবাহরীতি প্রবর্তন করা হোক, যার বন্ধন হবে মামুলি এবং যা ছিন্ন করার জন্য কোন পক্ষকে আদালতে যেতে হবে না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও অবিবাহিত দম্পতিদের বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হবেন। তাঁদের সুগভীর চিন্তাপ্রসূত এরকমই কোন হালকা-পলকা আইন রচিত হবে এদের বৈধীকরণের জন্য। সেদিনের কথা আপাতত তোলা থাক। ভবিষ্যতের সর্বনাশের চিত্র যত কম কল্পনা করা যায় ততই ভাল। তবে একটি নীট লোকসান প্রতি মুহূর্তে আমাদের জানান দিয়ে যাচ্ছে। আর তা হলো ছাদনাতলার রোমান্স। দিনের গতি যেদিকে তাতে অবিবাহিত দম্পতিদের বৈধ করার জন্য যত আইনই হোক না কেন, কোন আইন রচিত হবে না এই মধুর জিনিসটি ধরে রাখার জন্য—যা এখনো প্রত্যেক দম্পতির নিশ্বাসে সুঘ্রাণ বয়ে আনে। সেই ছাদনাতলার জন্য তখন আমাদের স্মৃতি রোমন্থন সার হবে মাত্র।

—প্রমীলা

তওয়াং-এর গোম্পা

সুমিত সান্যাল

উরগেলিং-এ ষষ্ঠ দলাই লামার জন্মস্থান। এখন একটি ছোট গোম্পা।

কামেঙের উত্তর প্রান্ত। একটি পার্বত্য উপত্যকা। নাম তওয়াং। উত্তরে তিব্বত। পূর্বে ভুটান। দক্ষিণে আসাম। পশ্চিমে সুবর্ণশিরি। উচ্চতা ১১ হাজার ফিট। লোকসংখ্যা ১৫ হাজার। উচ্চতার জন্য আবহাওয়া অনুমেয়। গ্রীষ্মকালে চলাফেরা যায়। শীতকালে বরফ জমে থাকে। বারো মাসই শীত বলা যায়। আশেপাশে মিলিয়ে আট নয়টি গ্রাম।

এক সময়ে মেজর আর খাটিং এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন। তিনিই ১৯৫১ খ্রীঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী তওয়াংকে স্বাভাবিক শাসন কার্যের আওতায় নিয়ে আসেন। ঐ সময় তওয়াং কামেঙের একটি সাব ডিভিসন হিসেবে পরিচিত হয়। কালক্রমে তওয়াং অরুণাচলের একটি বিশেষ শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

তওয়াং থেকে তিব্বতে যাওয়ার মোট তিনটি পথ। তার দুটি পথ ১৮,০০০ ফিট উঁচুতে। অধিক উচ্চতার জন্য এই পথ দুটি জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। তৃতীয় পথটি তওয়াং থেকে চুস্তাংথু হয়ে যায়। এ পথের উচ্চতা ৫,৫০০ ফিট। সারা বছরই এ পথ খোলা থাকে।

আগেকার দিনে পায়ে হেঁটেই যেতে হোত। বোম-ডিলার পর রাহুং। রাহুং থেকে দীরাং জোং। তারপর নীকমা জোং সেঙ্গে জোং এবং ১৪,৫০০ ফিট উচ্চতাসম্পন্ন সেলা পাস অতিক্রম করে যেতে হোত তওয়াং। নদীটির নাম তওয়াং চু। যেন এই পথ বেয়েই চলেছে নাচতে নাচতে। ১১,৫০০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত মানুষের বসতি। তারপরেই সবুজের সমারোহ। শেষটায় যেন সব তুষারে ঢাকা। বেশীর ভাগ সময়েই কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু সে কুয়াশা কেটে গেলে—উজ্জ্বল আলো যখন ঠিকরে পড়ে তখন দৃশ্য সত্যিই মনোরম।

তওয়াং মোনপা অধ্যুষিত অঞ্চল। এখান থেকেই মোনপারা ছড়িয়ে পড়ে দীরাং ও কলেকটং এ। মোনপা সংস্কৃতিও এখান থেকেই বিস্তার লাভ করেছে মধ্য ও দক্ষিণ কামেঙে।

কথিত আছে যে, তওয়াং-এর গোম্পাটি নাকি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম গোম্পা। অর্থাৎ লামার গোম্পার পরই নাকি তওয়াং-এর গোম্পার নাম করা যায়। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বুদ্ধ ভারতে তওয়াংই বৃহত্তম গোম্পা।

বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বত থেকে তওয়াং এ অনুপ্রবেশ করে। অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে গুরু পদ্মসম্ভা যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তা ছিল তান্ত্রিকভাবে প্রভাবিত। পরবর্তী কালে 'হরিদবর্ণ শিরাচ্ছাদন পরিধান' এর প্রবর্তক তেসাং খাপা (১৩৫৭ - ১৪১৯) অনেক কিছুরই সংস্কার করেন। কালক্রমে এই সম্প্রদায় ক্ষমতার আসনে আসীন হন। দলাই লামাও এই সম্প্রদায়ের। তওয়াং-এর লামারাও এই সম্প্রদায়ভুক্ত। অবশ্য তাঁরা আজকাল আর হরিদবর্ণ শিরাচ্ছাদন ব্যবহার করেন না।

তওয়াং-এর এই বিখ্যাত গোম্পা প্রতিষ্ঠা করার সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্পও প্রচলিত আছে।

পূর্বে ভুটান। সেখানে বাস করতেন লোডরা গীয়াৎসো নামক একজন লামা। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁকে যেতে হবে তওয়াং এলাকায় একটি গোম্পা প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যাবেন কি করে? পথ তো তাঁর জানা নেই। তখন তিনি ছুটিয়ে দিলেন তাঁর শ্বেত অশ্ব।

শ্বেত অশ্ব ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছাল এই পার্বত্য উপত্যকায়। থেমে পড়ল এক জায়গায়। পা দিয়ে খুঁড়তে লাগল মাটি আর পাথর। লোডরা গীয়াৎসো চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। মুগ্ধ হলেন এই সুন্দর উপত্যকাটি দেখে। দূরে দূরান্তে তুষার আবৃত পাহাড়। তার পাশ দিয়ে যেন একটি শ্যামলিমার রেখা। তার পরই এই বসতি। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা। দেখলেন সত্যি এই এলাকাটি একটি গোম্পা প্রতিষ্ঠার পক্ষে আদর্শ।

আর কাল বিলম্ব না করে গ্রামবাসীর সাহায্যতায় যোগাড় করতে লেগে গেলেন ইঁট কাঠ পাথর। শুরু হয়ে গেল এই প্রাসাদোপম গোম্পার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা। একে একে কেটে গেল বারটি বছর। সম্পূর্ণ হলো এই গোম্পাটি।

তারপর লোডরা গীয়াৎসো গেলেন লাসায়। অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করলেন দলাই লামাকে। তিনি নিজে এসে যেন এই নবনির্মিত গোম্পাকে আশীর্বাদ করেন। তিব্বতে তখন দলাই লামা ক্ষমতার আসনে। তিনি আবার জন্মেছিলেন উর গেলিং-এ। বর্তমান গোম্পা থেকে মাইল দুয়েক দূরে।

তিনি বড় ব্যস্ত মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হলো না। তবে তিনি আশীর্বাদও পাঠালেন। আর নামকরণ করলেন এই উপত্যকাটির। যেহেতু এই এলাকাটি খুঁজে বের করেছে একটি অশ্ব, তাই তিনি এর নামকরণ করলেন তওয়াং। তা—কথার অর্থ অশ্ব: আর ওয়াং—কথার অর্থ আশীর্বাদ। সেই থেকে এই এলাকার নাম হলো তওয়াং।

আসলে আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে (১৬৮০ খৃঃ) এই গোম্পাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ষষ্ঠ দলাই লামাকে উরগেলিং থেকে খুঁজে পেতে নিয়ে যাওয়ার কয়েক বৎসর পরই এই গোম্পাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গোম্পাটি আজ তওয়াংবাসীর কাছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

দূরে থেকে মনে হবে পাহাড়ের টীলার উপর এই গোম্পাটিকে ঠিক যেন একটি দুর্গের মত। তওয়াং সার্কিট হাউস থেকে তাকালে দূরে নজর পড়বে ঘনবসতি। তার নাম সেও বস্তি। তারই কাছে প্রাসাদোপম অট্টালিকাটিই গোম্পা। আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে আরও ঘর-বাড়ী।

গোম্পায় যেতে যেতে অনেক মানে, প্রার্থনার চাকা, পতাকার মালা অতিক্রম করে গিয়ে পড়লে একটি কাকালিং এ, কাকলিং দর্শনের পর মূল দরজার কাছে একজন লামা আমাদের স্বাগত জানালেন।

তাওয়াং গোম্পার অভ্যন্তরে প্যানেল

আমরা তাঁকে কিছু চা-পাতা ও চিনি প্রণামী স্বরূপ দিলাম। তিনি একটি করে সাদা চাদর দিয়ে আমাদের সম্মানিত করে অভ্যর্থনা জানালেন। চাদরটি অনেকটা স্কার্ফের মত লম্বা। কিন্তু জালি মত। প্রবেশ-দ্বারের উপর লেখা 'হর্ষ শিলা বিহার'। দেবনাগরী হরফে।

দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার পর ডান দিকের দেয়ালে লাইন ধরে প্রার্থনা চাকা। পাশ দিয়ে একটি রেলিং। আমাদের লোহার রেলিং এবং প্রার্থনা চাকার মধ্যবর্তী পথ দিয়ে প্রার্থনা চাকাগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে হলো। প্রার্থনা চাকাতে সেই তিব্বতীয় ভাষায় 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' লেখা। তারপর এসে পৌঁছলাম প্রশস্ত আঙিনায়। আঙিনাটি সীমেণ্ট করা। ডান দিকে মোড় নিতেই গোম্পার প্রবেশ দ্বার।

মন্দিরটি ত্রিতল। চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে সব কিছুই আছে। প্রায় দুশত লামা এখানে থাকেন। কুমারীদের জন্য আর একটি গোম্পা। তার নাম আনি গোম্পা। সেটি একটু দূরে। জিপ যাওয়ার রাস্তা নেই। হেঁটে যেতে সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের হাতে সে সময় ছিল না।

প্রবেশ দ্বারের বারান্দায় দু-পাশে রেলিং দেওয়া। উপর থেকে পর্দা কুঁচি দিয়ে নামিয়ে ঠিক রেলিং-এর মাঝামাঝি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার উপর একটু নকসাও আছে। ওপর থেকে দেড় ফুট মত ঝালর দেওয়া। বারান্দার দু-পাশে দুটি বিরাট হাতীর দাঁত দাঁড় করিয়ে দেওয়া। দোতালারও বারান্দায় রেলিং। তারও উপর সুন্দর ঝালর দিয়ে সুসজ্জিত।

ভিতরে প্রবেশ করে পাওয়া যায় মূল প্রার্থনালয়। বিভিন্ন দেব-দেবতার মূর্তিতে সুসজ্জিত। তাতে আছে অবলোকিতেশ্বর, মহাকাল ও প্রজ্ঞা পারমিতার মূর্তি। যা থেকে বোঝা যায় গোম্পার লামারা মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত।

সবচেয়ে দর্শনীয় এবং আকর্ষণীয় ৪২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন টেরাকোটার বুদ্ধ মূর্তিটি। খুবই সুন্দরভাবে তৈরী করা হয়েছে মূর্তিটি। মুখে প্রসন্ন শান্ত সমাহিত ভাব। যা দেখলেই কেমন যেন আপনা থেকে একটা ভক্তির ভাব এসে যায়। শুনেছি ১৯৫০ খৃীঃ ভূমিকম্পে এই সুন্দর মূর্তিটি একটু ফেটে যায়। কিন্তু দেখে তার কিছুই বোঝা যায় না।

আমাদের গাইড এবং গোম্পা প্রদর্শনকারী একজন লামা একটি ঘরে নিয়ে এসে বসালো। ঘরটি সুন্দর কার্পেটে সুসজ্জিত। অপূর্ব সুন্দর সেই কার্পেটগুলোর ডিজাইন। দরজা জানলায় কুঁচি দেওয়া সব পর্দা। ধারে ধারে আবার সব গোছ ধরে ধরে বাঁধা। মাঝখান দিয়ে আবার ঝালর দেওয়া। ঘরের মাঝখানটায় একটি সেণ্টার পিস (চৌকোনা) টেবিল। তার দু পাশ দিয়ে দুটি সরু ধরনের ডিভান। সুন্দর গালিচায় ঢাকা। মাঝখানের টেবিলের এক পাশে একটি প্রণামীর বাকস।

এই ঘরেই নাকি অতিথিদের এনে বসানো হয়। এখানেও একজন লামা আমাদের আবার একটি করে সেই সাদা চাদর উপহার দিলেন। আমরা প্রণামী-স্বরূপে সবাই কিছু কিছু সেই প্রণামী বাকসে দিলাম। ডিভানের উপরে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের সুন্দর সুন্দর চীনা কাপে চা এনে দেওয়া হলো। এই চা নুন আর মাখন দিয়ে তৈরী। মাখন তৈরী হয়েছে ইয়াকের দুধ থেকে। কাজেই স্বাদটা অনুমেয়। প্রীতি বিনিময়ের পর আমাদের আর একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল।

রিমপোচে নিজে এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু আরও সুন্দরভাবে সাজান। চারদিকে কুঁচি দেওয়া পর্দা, ঝালর, চাঁদোয়া। অপূর্ব সব গালিচা। একদিকে দেয়াল ঘেঁষে প্রশস্ত সুসজ্জিত ডিভান। আর একদিকে কয়েকটি আধুনিক চেয়ার। তার উপরেও গালিচা। একদিকে দুটি খোলা জানলা। তা দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস যেন ঘরটিকে যথার্থই সুন্দর করে তুলেছে। এখানেও রিমপোচে আবার সাদা চাদর দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। এই চাদরগুলো সিল্কের।

গোম্পার প্রধান লামাকে বলা হয় রিমপোচে। অনেকে আবার খেম্পুও বলেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক। গোম্পার উপর তলায় থাকেন। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা লাসায় হয়েছিল। তাঁকে মোনপা সমাজে প্রথম শ্রেণীর অবতার হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভদ্রলোক আমাদের গাইড ছিলেন তিনিও এগার বছর লাসায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শৈশব থেকে। পরে অবশ্য পার্থিব জগতে ফিরে আসেন। ভাল হিন্দীও বলতে পারেন। সেজন্য তিনি আমাদের দোভাষীও বটে।

কয়েকজন খুব অল্প বয়স্ক লামাকেও দেখতে পেলাম। সুন্দর স্বাস্থ্য। গাল দুটি গোলাপের মত লাল। মুখে লেগে রয়েছে এক ঝিলিক মিষ্টি হাসি। বয়স্ক লামারাও সানন্দে হেসে দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা করেন। পরিধেয়র রং কমলা। শীতের জন্য পোশাকগুলো খুব ভারী মনে হয়। সবই গরম পরিধেয়। কম বয়সী লামারা ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করেন। অবশ্য সেটাই তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। তা-ছাড়া তাঁরা ক্ষেতেও কাজ করেন। নিজেদের খাদ্যশস্য নিজেরাই উৎপন্ন করেন। খাদ্যশস্য উৎপন্ন করাও তাঁদের শিক্ষার আর একটি অঙ্গ বিশেষ।

গোম্পার দেয়ালে কোথাও কোথাও কয়েকটি রঙিন চিত্রও আছে। রংয়ের ব্যবহার বেশ বলিষ্ঠ। লাল, নীল, কালো, সবুজ রংয়ের ব্যবহার বেশ জোরালো। এ দেখে বোঝা যায় যে, মোনপারা রং ব্যবহারে বেশ পারদর্শীও বটে। অতীশা এবং পদ্ম-সম্ভবারও চিত্র আছে। কতকগুলো চিত্র শুধু বৌদ্ধ ধর্মীয় ডিজাইনের মত। কয়েকটি ড্রাগন এবং ড্রাগনের মত চিত্রও আছে। বিভিন্ন চিত্রের বৌদ্ধ ধার্মিক ব্যাখ্যা পারদর্শীরাই করতে পারবেন।

তাওয়াং-এর গোম্পায় একটি বেশ বড় পাঠাগার আছে। পাঠাগারে মোট ৭০০র মত বই আছে। বইগুলির জন্য কাঠের ব্লক লাসায় নির্মিত হয়েছিল। কিছু বই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তার ব্যাখ্যা তিব্বতীয় ভাষায় লেখা কয়েকটি বই-এ। কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থ হলো গোটোম্পা। তার তিনটি খণ্ড সোনালী হরফে লেখা। এক সময়ে এদের ছাপাখানাও ছিল।

একটি ঘরে নানারকম মুখোশ আছে। বড় বড় কাঠের বাক্স ভর্তি নানারকম পোশাকও আছে। এই পোশাক বিভিন্ন প্রকার নাচের সময় ব্যবহার করা হয়। নাচ অনেকটা থিয়েটারের মত, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ আছে। তাওয়াং-এ যখন বিশেষ অতিথি আসেন তখন ইয়াকছাম্ বা ইয়াক নৃত্য এবং সিংহ ও ময়ূর নৃত্যই দেখান হয়।

তাওয়াং-এর গোম্পা মোনপাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হলেও বহুল পরিমাণে তিব্বতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। সেই বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকেই একদা তিব্বতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তাওয়াং-এ তিব্বত থেকেই বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করল না ভারত থেকেই করল তা গবেষণা সাপেক্ষ। মনে হয় হয়ত তিব্বত থেকেই তাওয়াং-এ বৌদ্ধধর্ম এসেছে। কারণ ষষ্ঠ দলাই লামা উরগেলিং থেকে নির্বাচিত হওয়ার কয়েক বৎসর পর তাওয়াং-এর গোম্পাটি তৈরী হয়। সম্ভবত ষষ্ঠ দলাই লামার মাতৃভূমির প্রতি টান থেকেই, তাঁর প্রচেষ্টা ও আনুকূল্যে গোম্পাটি গড়ে ওঠে। সেইজন্যই মোনপা এবং তাওয়াং-এর গোম্পায় তিব্বতীয় সংস্কৃতির ছাপ বেশী।

আঁধার পেরিয়ে/নিমু ভৌমিক, অনিলকুমার, মাধবী চক্রবর্তী এবং শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা: তপন সিংহ। ফটো: অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

স্নেহের বন্ধন

সুন্দরী তরুণী সীমা সেনকে সুনন্দা রায়ের ঊনিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া টুলু হিসেবে হাজির করলেন তাঁরই পরলোকগত স্বামীর উকীল বন্ধু ব্রজনাথ রায়চৌধুরী। ব্যবস্থা ছিল, সীমা শ্রীমতী রায়ের বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়া মাত্র ঐ বিষয়ের অর্ধেক পাবেন ব্রজনাথ এবং বাকী অর্ধেক পাবেন সীমার গরীব কাকা যতীনবাবু। রায়-বাড়ীতে এসে সীমা প্রথমটা ও'দের প্ল্যান মতোই কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সঙ্কল্প-চ্যুত হতে বাধ্য হল বিধবা সুনন্দার প্রাণঢালা স্নেহে অবগাহন করে। আগে অর্থোপার্জনের জন্যে সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনয় করা তার অভ্যাস ছিল; তাই সে রায়বাড়ীতে পদার্পণ করবার আগে ভেবেছিল ঊনিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া টুলুর ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করে সে নিজের এবং সেই সঙ্গে তার উপোসী কাকা ও তাঁর উপকারী বন্ধু ব্রজবাবুর স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে। কিন্তু অভিনেত্রী সীমা কেমন করে যেন রায়বাড়ীর মেয়ে টুলুতে পরিণত হয়ে গেল অল্পদিনের মধ্যেই। এবং তারই ফলে উকীল ব্রজনাথের সমস্ত প্ল্যান হয়ে গেল বানচাল। যখন সীমার মুখ থেকেই প্রকাশ পেল, সে হারিয়ে-যাওয়া টুলু নয়, তখন মর্মাহত সুনন্দা তাকে তাঁর সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিজের ভাইপো উদ্দালকের মুখ থেকে সীমার অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা শুনলেন, তখন তিনি হলেন অনুতপ্ত এবং এর পরে যখন নাটকীয় মুহূর্তে তিনি সীমাকে আবার কাছে পেলেন, তখন তিনি তাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে ফেলে বরাবরের জন্যে তাকে কাছে রাখবার ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করলেন না।

চিত্রযুগ-এর নিবেদন, প্রকাশচন্দ্র নান প্রযোজিত এবং অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'নায়িকার ভূমিকায়' ছবির এই হচ্ছে কাহিনীসার। ছবির যে অংশে রাত্রের অন্ধকারে সুনন্দা দেবীর নগদ অর্থ এবং অলঙ্কার চুরি করেও বিবেকের দংশনে সীমা শেষ অবধি চুরি করতে পারল না এবং উদ্দালকের কাছে সে যে জাল-টুলু, এ-কথা স্বীকার করে নিজের মুখে সমস্ত সত্য কথা সুনন্দা দেবীর কাছে প্রকাশ করতে চাইল, সেইখান থেকে যে দর্শক-কৌতূহল জাগরিত হয়, সেই কৌতূহল বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে ছবির শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে এবং এইখানেই চিত্রনাট্যকাররূপে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব। আবেগপ্রধান ছবিখানির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ উপভোগ্য ভিন্ন স্বাদ তিনি আনতে সমর্থ হয়েছেন

উদ্দালক ও সীমার একান্ত দৃশ্যগুলিতে। প্রথমে যেখানে উদ্দালক জানে সীমা তারই পিসতুতো ছোট বোন টুনু, অথচ সীমা মনে মনে জানে সে তা নয়, সেখানেও যেমন, আবার যেখান থেকে উদ্দালকের ভুল ভেঙে যায় এবং সীমাকে সে নতুন সম্পর্কে পেতে চায়, সেখানেও ঠিক তেমনই উপভোগ্য। বাৎসল্য ও প্রেমের টানা-পোড়েনের মাঝে চক্রীর চক্রান্ত বিভিন্ন রস পরিবেশনের মাধ্যমে ছবিটিকে যে বৈচিত্র্য দিয়েছে, কাহিনীর সকল দোষত্রুটি তাতে সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়েছে। শুধু ছবির চারখানি গানের মধ্যে অনুপ ঘোষালের গাওয়া উদ্দালক-বেশী শুভেন্দুর মুখের 'এক যে আছে কন্যা'টি ছাড়া বাকী তিনখানিকেই অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

সীমার ভূমিকাভিনেত্রী অপর্ণা সেনের অভিনয় ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। গোঁফ-দাড়ি পরিহিত থিয়েটারী মেক-আপ-করা নির্বাক চেহারা থেকে শুরু করে একেবারে শেষের দৃশ্যে সুনন্দা দেবীর বক্ষলগ্ন, আনন্দাশ্রুনয়না সীমা পর্যন্ত সর্বত্র তিনি দর্শককে সম্মোহিত রেখেছেন তাঁর চূড়ান্ত নাটনৈপুণ্যগুণে। উদ্দালকবেশী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সহজ সাবলীল অভিনয় ছবিটির আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ। লক্ষ্য করবার বিষয়, শ্রীচট্টোপাধ্যায় ক্রমেই তাঁর ভূমিকাগুলির সঙ্গে একাত্ম ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছেন। প্রথম দিকের দু' একটি দৃশ্য বাদে বিধবা সুনন্দা রায় বেশে দীপ্তি রায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভূমিকাটিতে একটি ব্যক্তিত্ব আরোপের সঙ্গে তার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়কে উদ্ঘাটিত করেছেন। অসিতবরণকে এই ছবিটিতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেল। মৃত বন্ধুর বিধবার কাজ-কারবার দেখাশোনা করবার অছিলায় তাঁর সম্পত্তিগ্রাসেচ্ছু এক কুচক্রীর ভূমিকায় তাঁর বিশেষ কায়দাদুরস্ত অভিনয়শৈলী (স্টাইলাইজড অ্যাকটিং) লক্ষ্য করবার মতো। সীমার হারানো কাকা যতীনবেশী গৌর শীকে প্রতিটি দৃশ্যে প্রায় একই ধরনের অভিনয় করতে হয়েছে বলে তাঁকে কিছুটা একঘেয়ে মনে হয়েছে। অপরাপর ভূমিকায় জহর রায়, তপতী দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্যামেরার কাজ সর্বত্র সমান দেখলুম না। এর জন্যে ল্যাবোরেটারীর ত্রুটি কতখানি যা আদৌ আছে কিনা, তা অবশ্য মাত্র একবার ছবি দেখে বলা যায় না। ছবির গোড়ার অংশটিকে সম্পাদক আর একটু সংঘবদ্ধ ও হ্রস্ব করতে পারতেন। গানের কথা আগেই বলা হয়েছে।

অপর্ণা সেন ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় অভিনয়দীপ্ত 'নায়িকার ভূমিকায়' চিত্র-রসিক দর্শকসাধারণকে খুশী করবে।

প্রাচুর্যের অভিশাপ

ভালোই ছিলেন হিমাংশু গুপ্ত তাঁর দৌলতপুরের বাসায়। স্কুল-মাস্টারির জীবনে অর্থ ছিল না বটে, কিন্তু স্ত্রী মলিনা এবং দুটি ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে নিয়ে তাঁর ছিল একটি শান্ত সুখী জীবন। কিন্তু আজ ডিক্‌সন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি কলকাতা শহরে প্রকাণ্ড বাড়ীতে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেন বটে, কিন্তু আফিসের কাজ তাঁকে সংসারের দিকে মুখ ফেরাতে দেয় না। ছেলেমেয়ে দুটি বড়ো হয়ে উঠেছে; ছেলে হীরু ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বাপের আফিসেই কাজ করছে। কিন্তু আফিসের সর্বেসর্বা তার বাবা, এই জ্ঞান তকে কর্তব্যে অবহেলা করতে প্ররোচিত করল। তার বিলাসব্যসনের খরচ মাস মাহিনা দ্বারা সঙ্কুলান হয় না বলে সে কন্ট্রাকটরের কাছ থেকে মোটা ঘুষ নিয়ে তার চুরিকে প্রশ্রয় দেয়। চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ বোস ব্যাপারটা হিমাংশু গুপ্তের—উনি এখন মিঃ গুপ্ত—গোচরে আনলে সত্যাশ্রয়ী, নিষ্ঠাবান হিমাংশু ছেলের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়ে তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ডিরেকটর্স বোর্ডের অনুকম্পায় হীরু চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেল। মিঃ গুপ্ত কিন্তু ছেলের এই রেহাই পাওয়ায় খুশী হলেন না। স্ত্রী মলিনা গৃহস্থালির তত্ত্বাবধান করাকে উপেক্ষা করে তাঁর প্রিয় পাত্র শোভনের 'শুভানন্দ নিলয়' ক্লাব নিয়ে মেতে উঠেছেন। এতেই স্বামীর সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল; তার ওপর ছেলের ব্যাপার নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। মেয়ে সীমা তার নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে বিবাহ করতে চেয়ে এই মতান্তরকে আরও ঘনিয়ে তুলল। ব
সীমার পছন্দ-করা ছেলেকে পা
করলেন; মা তাকে আদৌ যোগ্য
বিবেচনা করে তাঁর প্রিয়পাত্র শোভ
সঙ্গে মেয়ের মিলন ঘটাতে চাইলেন। ে
রেজেস্ট্রীকৃত বিবাহ করে পিতৃগৃহ ত
করে চলে গেল। ছেলেও গেল সুদ
একটা চাকরির যোগাড় করে। স্বামীস্ত্র
মধ্যে আরও বেশী তিক্ততার সৃষ্টি হ
স্বামীর ব্যক্তিগত স্টেনো কণিক
মলিনার কদর্য সন্দেহের দরুন। ক
অক্লান্ত সেবায় মিঃ গুপ্তের অসুস্থ দে
সেরে উঠেছিল। তিনি ওর নিঃস্ব
ভালোবাসাকে ও'র শুষ্ক মরুভূমির ম
জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করতে
কিন্তু মিথ্যা অপবাদের যন্ত্রণা থেকে ম
পেতে কণিকা যখন তার প্রতি প্রীতি
এক যুবককে বিবাহ করল, তখন মিঃ গ
নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও একা
করলেন। তাই তিনি সব ছেড়ে বে
পড়লেন কোথাও একটু শান্তি, এ
ছায়ায় ঘেরা শ্রান্তিবিনোদনের
খোঁজবার জন্যে।

রমেশ সাইগাল প্রোডাকসন্স
নিবেদন 'ছায়াতীর' ছবির কাহিনীর
হচ্ছে সংক্ষিপ্তসার। জরাসন্ধ রচিত
কাহিনীটিকে চিত্রনাট্যকার, পরিচ
সুশীল বিশ্বাস কতখানি বিশ্বস্ত
অনুসরণ করেছেন এবং কতটুকুই বা
থেকে সরে এসেছেন, সে আলোচন
করেই বলব, চিত্রনাট্যটি অত্যন্ত বিশৃ
ভাবে লিখিত বলে কাহিনীটি কে
দানা বেঁধে উঠতে পায়নি। অপটু হ
ছাপ ছবির সর্বত্র। কাজেই ছবির যে
ঘটনা উপলক্ষ্যেই দর্শকের মনে কিছ
কৌতূহল উদ্রেক ক যায়নি,
কৌতূহল বজায় রাখা ত দূরের কথা

নাটনৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ বে
এই ছবিতে? নাটকীয় পরিবেশ কৈ?
মিঃ হিমাংশু গুপ্তের স্টেনোর ভূ
মাধবী চক্রবর্তী তাঁর স্বাক্ষর র
চেষ্টা করেছেন এবং নিজের
দু' একটি নাটকীয় মুহূর্তও
করতে পেরেছেন। মিঃ হিমাংশু গুপ্ত
বিকাশ রায় চরিত্রটির মানসিক
প্রকাশের যথোচিত চেষ্টা করে
এ-ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অজয় গাং
(ধূর্জটি), রবি ঘোষ (শোভন), স
মজুমদার (ডাক্তার), জহর রায় (
শিশির বটব্যাল (বড়বাবু হা
গীতালি দত্ত (সীমা) প্রভৃতির অ
উল্লেখ্য। কিন্তু মলিনার ভূমিকাটির
বিনতা রায় নিজেকে ঠিক খাপ খা
পারেননি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বি
কাজ সর্বত্র সমান নয়—কোথাও
কোথাও মন্দ এবং কোথাও চল
সম্ভবত ছবিটি বহুদিন ধরে
হয়েছে বলেই এই অসম অবস্থা।
দের গাওয়া, চিন্ময় রায়ের মুখের "
মানুষগুলোর বুদ্ধি আছে' গানটি

পক্ষে নিতান্ত অত্যাবশ্যকীয় হলেও চলচ্চিত্র উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে।

একটি জাতির জন্ম কেমন করে সম্ভব হল?

তুলনামূলকভাবে প্রতিষ্ঠাবান পরিচালক এস, সুকদেব তাঁর 'নাইন মন্থস্ টু ফ্রীডম' ছবিটির কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীর পরে নানা কথার মধ্যে বলে উঠলেন, 'আমার কাছে যা সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে, সে হচ্ছে কত অল্প সময়ের মধ্যে একটি জাতির জন্ম সম্ভব হল!' সত্যিই, আমাদের একান্ত প্রতিবেশী নবজাত বাঙলাদেশ কি প্রচন্ড মূল্যের বিনিময়ে কত অল্প সময়ের মধ্যেই না স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রায় ছ' হাজার ফুট দীর্ঘ ছবিটির মাধ্যমে শ্রীসুকদেব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব পাকিস্তান কেমন করে স্বাধীন বাঙলাদেশে পরিণত হল, তারই একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস বিবৃত করেছেন। অবশ্য প্রথমে তিনি শুরু করেছিলেন 'টৌর‍্যানী' নামে একটিমাত্র এক মিনিট স্থায়ী ফিল্ম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়, এই যে লাখে লাখে লোক তার জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে অনিশ্চিতের মধ্যে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে পাকিস্তানী সৈন্যদের নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে, তাদের অবস্থাটিকেও ছবির মধ্যে ধরে রাখা প্রয়োজন। ক্রমেই তিনি নিজেকে ওই জাতির জন্মযাতনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেললেন এবং শেষ পর্যন্ত নির্মিত হল 'নাইন মন্থস্ টু ফ্রীডম'। ছবির প্রতিটি শট, তার আশ্চর্য সম্পাদনা, তাদের রঙের বৈচিত্র্য এবং তার নেপথ্য ভাষণ—সব মিলিয়ে এমন একখানি তথ্যচিত্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে, যার জন্যে পৃথিবীর যে কোনোও দেশ গর্ববোধ করতে পারে। বিশেষ করে ছবির গতির তারতম্য সৃষ্টি এবং তার বক্তব্য অনুযায়ী রঙের পরিবর্তন এমনইভাবে দর্শককে দৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে অবহিত করে তোলে, যার তুলনা কোনোও তথ্যচিত্রে মেলে না। শ্রীসুকদেব দীর্ঘজীবী হোন।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

টালীগঞ্জ স্টুডিও মহলে সবাই যখন নির্মীয়মান 'আবদুল্লা মর্জিনা' ছবির একটি সেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আমি তখন ভেবেই পাচ্ছিলাম না, কি এমন সেট তৈরী হয়েছে যার জন্য চারিদিকে এত হৈ-চৈ, রৈ-রৈ কান্ড। বাধ্য হয়ে সপ্তাহখানেক আগে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর পর পর দুটো গেট পেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে প্রকান্ড আকাশছোঁয়া পর্বত। ভাবলাম বুঝিবা ভুল করেছি। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর বদলে অন্য কোন বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু এক ভদ্র-মহাজন (বেলা তখন ৯টা) আমার মাথা খারাপ হয়নি তো? এতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যখন ভাবছি—সে সময় আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো—এই যে দাদা, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? পেছন ফিরে দেখলাম—শিল্পনির্দেশক সূর্য চ্যাটার্জি এবং তাঁর পেছনে ছায়া দেবী মিটিমিটি হাসছেন। শিল্পনির্দেশক শ্রীচ্যাটার্জি জানালেন—এটি দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'আবদুল্লা মর্জিনা' ছবির সেট এবং তাঁরই নির্দেশনায় তৈরী হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করে ভেতরে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম—বাঁদিকের একটি সম্পূর্ণ ফ্লোর এবং বাইরের খালি জায়গাটা জুড়ে সেট পড়েছে। ছোট বড় পাহাড়, ঘন অরণ্য, বিরাট বিরাট গাছ দিয়ে সুন্দর একটা পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। তারই মাঝে ঝর্ণার জল পাহাড়ের গা বেয়ে বয়ে চলেছে।

সূর্য চ্যাটার্জি আমাদের ঘুরিয়েফিরিয়ে সেটটি দেখালেন। দেখালেন—চিচিং ফাঁক—চিচিং বন্ধ-এর অপূর্ব কৌশল। আমরা স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। সেটের ভেতরে টাকা-পয়সা, মোহর, হীরা-জহরত-এর ছড়াছড়ি। উজ্জ্বল আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপক্রম। আমি তখন সূর্য চ্যাটার্জিকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালাম তাঁর এই অপূর্ব সৃষ্টির জন্য।

জানতে পারলাম এখানে একটানা সাতদিন স্যুটিং চলবে। ছবির শিল্পী-তালিকায় কে কে আছেন তা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। তবুও আপনাদের সুবিধার্থে আবার জানিয়ে দিচ্ছি—এ ছবির আবদুল্লা ও মর্জিনা-চরিত্র দুটিতে আছেন—রবি ঘোষ ও মিঠু মুখোপাধ্যায়। ডাকাত সর্দারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন উৎপল দত্ত। আলিবাবা ও তার ছেলে হোসেনের চরিত্র দুটিতে অভিনয় করছেন—সন্তোষ দত্ত ও দেবরাজ রায়। তাছাড়া আছেন—শেখর চ্যাটার্জি, কাজল গুপ্ত, গীতা দে প্রমুখ। ছবির সঙ্গীতপরিচালনার দায়িত্বে আছেন—সলিল চৌধুরী এবং নেপথ্যে কন্ঠ পরিবেশন করেছেন—আশা দে, সবিতা চৌধুরী ও অনুপ ঘোষাল। লতা মঙ্গেশ-

করকে দিয়েও নাকি একখানা গান রেকর্ড করা হবে বলে জানা গেল।

পরিচালক অজয় করের 'কায়াহীনের কাহিনী'র চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এ ছবিতে বাসবী নন্দীকে নেওয়া হয়েছে নবাগতা ঊর্মিলা দে-র পরিবর্তে। খবরে প্রকাশ, নবাগতা দে-কে নিয়ে তিনদিন স্যুটিং করার পর কোন ব্যক্তিগত কারণে তাঁকে ছবি থেকে বাদ দিয়ে বাসবী নন্দীকে নেওয়া হয়েছে।

আপনারা আগেই জেনেছেন এ ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন বর্তমানের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রে—বিকাশ রায়, তরুণকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী দেবী প্রমুখ। ছবির প্রযোজনা ও সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব বম্বের মুকুল রায়ের। কিছুদিন আগে আশা ভোঁসলেকে দিয়ে কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি পরিচালক অজয় কর তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য রমাপদ চৌধুরীর জনপ্রিয় উপন্যাস খড়ি ডিঙ্গিংয়ের সাঁকো'-র চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন।

প্রখ্যাত পরিচালক তপন সিংহের পরবর্তী বাঙলা ছবি চিত্তরঞ্জন মাইতি রচিত 'আঁধার পেরিয়ে'-এর শিল্পী নির্বাচন মোটামুটি ঠিক করেছেন। এ পর্যন্ত যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে—শুভেন্দু চ্যাটার্জি, সুমিত্রা মুখার্জি, হাসু ব্যানার্জি মাধবী চক্রবর্তী, কল্যাণ চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছবির চিত্রগ্রহণ আগস্ট মাস থেকে শুরু হবে।

ইতিমধ্যে পরিচালক শ্রীতপন সিংহ তাঁর রঙীন হিন্দী ছবি 'সাগিনা মাহাতো'র স্যুটিং পর্ব শেষ করবেন। এই রঙীন হিন্দী ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে দিলীপ-কুমার, সায়রাবানু। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন—ওমপ্রকাশ, অপর্ণা সেন, অনিল চ্যাটার্জি, স্বরূপ দত্ত, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জি প্রমুখ।

প্রখ্যাত পরিচালক অগ্রদূতগোষ্ঠীর অন্যতম বিভূতি লাহা এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে আমায় জানিয়েছেন—তাঁর পরবর্তী ছবি 'সোনার খাঁচা'-র চিত্রগ্রহণপর্ব শেষ হয়ে বর্তমানে তিনি সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত আছেন। বীরেশ্বর সরকার রচিত ও সুরারোপিত এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, সুব্রতা চ্যাটার্জি, নির্মলকুমার, তরুণকুমার, কণিকা মজুমদার, সুলতা চৌধুরী, হারাধন ব্যানার্জি, অপর্ণা দেবী, রবীন মজুমদার প্রমুখ। ভারতবিখ্যাত এক কণ্ঠশিল্পীর অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির মোহজাল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক বাস্তবসম্মত কাহিনী এ ছবির চিত্রনাট্যের বিস্তার। ছবিতে পাঁচ-ছখানা গান আছে, গেয়েছেন—লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখার্জি, দ্বিজেন মুখার্জি, মৃণাল চক্রবর্তী, মীনা মুখার্জি এবং একটি ইংরেজী গান গেয়েছেন—করবী নাথ। সব গানগুলোই আমি শুনেছি। অপূর্ব সুরারোপ করেছেন—বীরেশ্বর সরকার। প্রতিটি গানেই বৈচিত্র্যের স্বাদ আপনারা পাবেন একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

পরিচালক পীযূষ বসুর এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। শুনেছি তাঁর হাতে এখন ছ'সাতখানা ছবি। প্রথমে তিনি যে ছবিটি আরম্ভ করছেন, তার নাম—'বিকেলে ভোরের ফুল'। সমরেশ বসু রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—পরি-চালক শ্রীবসু স্বয়ং। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন—উত্তমকুমার ও সুমিত্রা মুখার্জি। কে এল কাপুর প্রোডাকসন্স নিবেদিত এই ছবির চিত্রগ্রহণ এই মাসের শেষভাগ থেকে শুরু হবে।

শ্রীবসুর দ্বিতীয় ছবিটির প্রযোজক অসীম সরকার। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র পুনরায় চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে। 'পথের দাবী'র নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'সব্যসাচী' নামে। নামভূমিকায় উত্তমকুমার থাকবেন বলে স্থির হয়েছে। নিজস্ব চিত্র-নাট্যের ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করবেন —পরিচালক শ্রীপীযূষ বসু।

শ্রীবসুর তৃতীয় ছবি অভিনেত্রী সন্ধ্যার প্রযোজনায় গৃহীত হবে। ছবির নাম—'যার যেথা ঘর'। সব্যসাচী-র পর এই ছবির কাজে শ্রীবসু হাত দেবেন বলে স্থির করেছেন।

তাছাড়া যে ছবিগুলি পরিচালক শ্রীবসুর ওপর ন্যস্ত হয়েছে তার মধ্যে প্রযোজক দেবেশ ঘোষের পরবর্তী ছবি (সে আমি ও সখা), মুক্তামালা পরিবেশিত একটি ছবি এবং অভিনেতা দিলীপ র প্রযোজিত একটি ছবির নাম অন্যতম।

মেট্রোতে নতুন ফুলের গন্ধ : ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হাইকমি নিবেদিত এটসেট্টা ফিল্মস-এর সামা পটভূমিকায় তোলা ছবি 'নতুন ফু গন্ধ' প্রাপ্তিক ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশ মেট্রোসহ অন্যান্য চিত্রগৃহে ২৭শে জু মুক্তিলাভ করবে। একটি অন্য মে ব্যথাভরা কাহিনী পরিচালক মম আলী অতি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রা করেছেন। সুর দিয়েছেন—আলি হোে ছবির নায়িকা চরিত্রে আছেন বাংলাদে জনপ্রিয় ও বহু আলোচিত অভি কবরী চৌধুরী। অন্যান্য চরিত্রে আছে কবির সরকার, মুস্তাফা, আজিমল র রাজ্জ, রবিউল, সাজাদ খান, সবিতা আনোয়ারা। আব্বাসউদ্দীনের ফরসোদী বেগমের গাওয়া গান ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ। কি অভি কি কাহিনী, কি পরিচালনা—সকল থেকে 'নতুন ফুলের গন্ধ' এক নবয স্চনা করবে।

আমি সিরাজের বেগম : মানিক প্রযোজিত এম, আর, প্রোডাকসন্সের ছবি শ্রীপারাবত রচিত বহুপঠিত বি উপন্যাস অবলম্বনে 'আমি সিরাজের ে ছবির একটানা প্রায় পনের দিনের চি কাজ গত সপ্তাহে নিউ থিয়ে স্টুডিওতে সুশীল মুখার্জির পরিচা শেষ হয়েছে। জানা গেল আগামী স থেকে আবার একটানা কাজ শুরু কাজের গতি দেখে মনে হচ্ছে অ দু-মাসের মধ্যেই ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ যাবে। যে স্যুটিং হয়ে গেছে তাতে যাঁদের অংশগ্রহণ করতে দেখেছি হলেন—বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, প সান্যাল, চন্দ্রাবতী, দিলীপ রায়, নন্দী, সীমা দাস প্রভৃতি। সুর দিে অনিল বাগচী। ছবিখানির পরি দায়িত্ব নিয়েছেন এম, আর, ফিল্মস। গেল, ছবিখানিকে সব দিক থেকে করে তোলার জন্য যেমন পরিচালক পরিশ্রম করছেন—প্রযোজকও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করছেন না।

নতুন দিনের আলো : বাদল চার্সের ৮ম নিবেদন অজিত গা পরিচালিত 'নতুন দিনের আলো' ছ সেন্সার ছাড়পত্র পেয়ে মুক্তির দিন কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন চালক শ্রীগাঙ্গুলী স্বয়ং। গান লিখে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর দি নচিকেতা ঘোষ। প্রযোজনা : বা লাহা। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে —সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী পাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায় (ত তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, বঙ্কিম চৌধুরী প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্ত। জি, আর, ফিল্মস পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

মঞ্চাভিনয়

রূপারূপের 'বাতিঘর' : সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে মানুষের কণ্ঠে যে প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে—'অনন্ত আলোর উৎস কোথায়?' তার রেশ আজকের চলমান-তায়ও মুখর হয়ে উঠছে। নানা সমস্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে উঠছি আমরা, কিন্তু মন থেকে অন্ধকারের বুকে সূর্য আঁকবার স্বপ্নকে দূরে করতে পারছি না। আশা করে আছি আমাদের বিশ্বাস বহন করবার জন্য পথের কোন বাঁকে কেউ হয়তো প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই কি দেবে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত 'বাতিঘরে'র সন্ধান! 'রূপারূপ' প্রযোজিত 'বাতিঘর' নাটকটির সংঘাত ও অগ্রগতির ধারা এই সত্তার পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব গুহের উপন্যাস অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত হয়েছে, নাট্যরূপে বিধৃত করেছেন সজল ভট্টাচার্য। সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে পরিবেশিত এই নাটকটির বৈশিষ্ট্যদীপ্ত প্রযোজনা নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা অর্জন করে।

চরিত্রের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিটি শিল্পী অভিনয় করায় সামগ্রিক প্রযোজনাটি কখনো শিথিল হয়ে পড়েনি। ভূমিকা-লিপিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হোলেন সজল ভট্টাচার্য (অভীক চাটার্জি), অরুণ চক্র-[বর্ত]ী (বুবু রায়), জয়ন্ত গুপ্ত (বিজয়), শংকর বল্লভ (মহেশ পোদ্দার), [ক]মল খান (তরুণ বোস), সিদ্ধার্থ চক্র-[বর্ত]ী (বীরেন গাঙ্গুলী), সলিল দে [দ]ত্ত), অতীন দাস (রাজীব কাপুর), [..]ন বড় (সতীশ), প্রিয়েন্দু দাশগুপ্ত [..]সাহেব), বেবী সেনগুপ্তা (রীণা ও [..]নি)।

নাটকটি নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা [কে]রন শ্রীপংকজ গুপ্ত।

ফেরারী ফৌজের অভিনয় : ডি, ভি, রিক্রিয়েশন ক্লাব কলকাতার ৩য় বার্ষিক [উৎ]সব উপলক্ষে ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের [তৃ]তীয় নাট্য নিবেদন মঞ্চস্থ করলেন [মু]ক্তাঙ্গনা থিয়েটারে গত ৪ জুলাই, ১৯৭২। [বি]খ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীউৎপল [দ]ত্তর 'ফেরারী ফৌজ' এবারের প্রযোজনা। [প]রিচালক হিসাবে প্রভাত বকসী বিশেষ [দক্ষ]তার পরিচয় দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত অভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্যের [প]রিচয় দিয়েছেন হিতেন দারোগার [ভূ]মিকায় অতীন রায়চৌধুরী, অশোক [চ]রিত্রে সমীর গুহঠাকুরতা, যোগেন রমা-[প্র]সাদ চট্টোপাধ্যায়, নীলমণি দেবনাথ [চ]ক্রবর্তী ও জ্যোতির্ময় লাহিড়ীর ভূমিকায় [জ্যো]তির্ময় দাস। জমাদার ফুলাগানের [চ]রিত্রে রাসবিহারী ব্যানার্জির অভিনয়ের [ম]ধ্যে মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। [এছা]ড়া অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় [কর]লেন রবীন ভট্টাচার্য (হরিশ), দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য (শিবু মণ্ডল), শ্রীমান অসিত ওরফে পাইলট (বালক), সর্বানন্দ মজুমদার (সিরাজুল), শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (বিপিন), সন্তোষ দে (প্রথম কৃষক), চিররঞ্জন চক্রবর্তী (কুমুদ), কে এল রায়চৌধুরী (প্রকাশ)। স্ত্রী চরিত্রে শচীর ভূমিকায় শিপ্রা চক্রবর্তী, রাধা চরিত্রে মালা দাস ও বঙ্গবাসীর চরিত্রে শাশ্বতী রায়। চরিত্রানুগ অভিনয় করেন সকলেই। একটি ছোট্ট মেয়ের ভূমিকায় কুমারী অনিতা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকটির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল চারণকবি মুকুন্দ দাসের ভূমিকায় শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের অপূর্ব কণ্ঠসঙ্গীত।

ঝরাপাতা : কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের রোগী বোনদের প্রযোজনায় সম্প্রতি হাসপাতাল-মঞ্চে অভিনীত হোল সুশীল চন্দ রচিত 'ঝরাপাতা'। একটি সংগ্রাম মেয়ের জীবনকাহিনী এই নাটকের সংলাপে আর সংঘাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই মেয়েটি কেমন করে সমাজের গ্লানিময় পরিবেশ থেকে একটি আলোর সকালে এসে উন্নীত হোতে পেরেছিল, তারও কাহিনী আছে এই নাটকে।

অভিনয়ে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তাই সমগ্র প্রযোজনাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে এতটুকু বাধা পায়নি। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হোলেন—কল্পনা সাউ, গীতা সেন, ইন্দু হালদার, আদর বিশ্বাস, সন্ধ্যা কর, শংকরী দাস, লক্ষ্মী দাস, অর্চনা ভট্টাচার্য :

নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

সূর্যগ্রাস : এ ডব্লিউ ফিগাগিস স্টাফ লাইব্রেরীর সদস্যরা স্টার থিয়েটারে শ্রীকমল লাহিড়ীর 'সূর্যগ্রাস' নাটকটির অভিনয় করেন সম্প্রতি। আজকের নিম্ন-বিত্ত পরিবারের মেয়েরা জীবিকার তাড়নায় কিভাবে চাকরী করতে গিয়ে লোভাতুর চরিত্রভ্রষ্টদের শিকার হয়ে পড়েন এবং তারই প্রতিবাদে সৎ আদর্শবাদী কর্মী মালিকের বিষনজরে পড়ে কর্মচ্যুত হন নাটকটিতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নাটকটি মন্থর গতিতে অভিনীত হওয়ায় দর্শকদের যথাযথ আনন্দদান করতে পারেনি। দমরুকের কথা প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। শিল্পীরাও যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দেননি। মোটামুটিভাবে যাঁরা সুঅভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন রবীন চক্রবর্তী, কালীকিংকর রায়, দাস, মুখোপাধ্যায়, হরিপদ রায়চৌধুরী, দুলাল চক্রবর্তী, মালা দাস ও মীরা চক্রবর্তী।

মেমসাহেব/উত্তম-অপর্ণা

হিত্য করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-
য়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী,
অতিথির আসন অলংকৃত করেন
য়নাল আবেদীন এবং মানপত্র বিতরণ
াংবাদিক বিজয় দত্ত।

থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত চারদিন
বীন্দ্রসদনে উচ্চসংগীতের যে-আসর
চাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ করছেন ঃ
জুলাই—ভি জি যোগ, এ কানন ও
াকুর; ২৭ জুলাই—বাহাদুর খাঁ,
কানন ও কঙ্কনা বন্দ্যোপাধ্যায়;
াই—বেগম আখতার, রাধিকামোহন
পিত চক্রবর্তী এবং ২৯ জুলাই—
তারাপদ চক্রবর্তী, মণিলাল নাগ ও
রণধীর রায়।

হাজারিবাগ 'শিশু রঙমহলের উৎসব'

সম্প্রতি হাজারিবাগ শিশু রঙমহল কয়েকটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের চতুর্থ বার্ষিকী উৎসব পরিপূর্ণ করলো। সেই সংগে ডি-ভি-সিতে একটি নূতন শাখার উদ্বোধন করলেন ডি-ভি-সির ডাইরেক্টার। চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেন্টজেভিয়ার্স মঞ্চে। উৎসবে সঞ্জয় গুহঠাকুরতার "ঘোড়সওয়ার" নাটকটি প্রচুর সমাদর লাভ করে। পুরুলিয়ার ছো নাচের ছায়ায় রচিত এ নাটকে অভিনয় করেন মলয় রায়, মৃণাল সেন, যথাক্রমে ঘোড়সওয়ার ও বাদকের ভূমিকায়, মনোজ সেন, প্রেমাংশু চক্রবর্তী, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে অভিনয় করেন নেতা, সন্যাসী, পূজারীর চরিত্রে। সংগীত ও নাটক নির্দেশনায় ছিলেন সঞ্জয় গুহঠাকুরতা। ঐ একই অনুষ্ঠানে দুলেন্দু ভৌমিকের গুপ্ত-বিদ্যাও অভিনয় করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। অলকনন্দার চোর ভোলা যায় না। গুপ্তবিদ্যা নাটকের সাফল্যের জন্য আমরা তরুণ পরিচালক মনোজ সেনের প্রশংসা করি। মূল অনুষ্ঠানগুলিতে সভাপতিত্ব করেন অমলকৃষ্ণ বসু এবং তারকনাথ মল্লিক ছিলেন প্রধান অতিথি।

গুডউইন পিকচার্স পরিবেশিত 'এভারেস্ট' এবং 'ওয়াইল্ড লাইফ অব ইণ্ডিয়া'

১৯৬৫ সালে একটি সর্বভারতীয় দল পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ 'মাউন্ট এভা-রেস্ট অভিযানে যাত্রা করে নেপাল রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত উত্তর বিহারের জয়নগর থেকে। নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে দলটি সাউথ কলে গিয়ে পৌঁছোয় মে মাসের গোড়ায়। সেখানে আকস্মিক হিমানী-সম্প্রপাতের ফলে ওদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় বেশ কয়েকদিনের জন্যে। কিন্তু প্রচুর ধৈর্য সহকারে ওরা অপেক্ষা করে দুর্যোগ কেটে যাবার জন্যে। এবং প্রকৃতি আবার অনুকূল হলে ওরা পাঁচটি দুজনের দলে বিভক্ত হয়ে পরে এভারেস্ট শিখরে গিয়ে ওঠে। প্রথম দলে ছিল কোম্বু ও ঘীমা। ওরা শিখরে উঠেছিল ১৯৬৫-র ২০ মে তারিখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল এইভাবে শিখরারোহণ করবার পরে চতুর্থ দলের একজন সহসা পেটের রোগে আক্রান্ত হয়। তখন বাকী একজন পঞ্চম দলের সংগে যুক্ত হয়ে একসংগে তিনজন এভারেস্ট আরোহণ করে। এই প্রথম তিনজন এক-সংগে ওখানে গেল।

প্রচণ্ড শীত, দুর্গম পথ, বরফের ধ্বস নামা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে মানুষ তার অদম্য উৎসাহ নিয়ে দুর্জয়কে কেমন করে জয় করে তারই বিচিত্র আলেখ্য রূপে ওই দলবর্তীদেরই তোলা এই 'এভারেস্ট' ছবি-খানি দর্শককে চমকিত, বিস্মিত, মুগ্ধ না করে পারে না। ন' রীল দীর্ঘ এই ছবিটি যে কোনোও কাহিনী চিত্রের মতোই রুদ্ধ-শ্বাসে দেখতে হয়।

'ওয়াইল্ড লাইফ অব ইণ্ডিয়া'তে দেখতে পাওয়া যায় কাশ্মীর থেকে শুরু করে কাজিরঙ্গা, গীর, মহীশূর রাজ্যের সংরক্ষিত বনভূমি প্রভৃতির জীবজন্তু সিংহ, হাতী বাঘ, চিতা, হরিণ, একশৃঙ্গ গণ্ডার বাইসন, নীল গাই প্রভৃতির ইতস্তত বিচরণ চমৎচমকপ্রদ। ছবিটিতে তিনটি সাপের মিলন দৃশ্য একটি অতি দুর্লভ চিত্র।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উৎসব

এ বছরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উৎসব শুরু হচ্ছে মহা-সমারোহ ও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে। শতবর্ষপূর্তি উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্যে বাংলা এবং বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় উৎসব কমিটি গঠিত হয়েছে যার পুরোভাগে আছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী জাতীয় উৎসবের সভাপতি। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি হলেন নাটক এবং নাট্য-আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ মন্মথ রায়। মন্ত্রণা পরিষদে আছেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর রমা চৌধুরী, ডকটর সত্যেন সেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তুষারকান্তি ঘোষ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এ ছাড়াও সহসভাপতিপদে বৃত হয়েছেন শিল্প-সাহিত্য-নাট্যরসিক স্বনাম-ধন্যেরা। সাধারণ সম্পাদক : অমর গঙ্গোপাধ্যায়। সংযুক্ত সম্পাদক হিসেবে আছেন : মলিনা দেবী, অনুপকুমার ও রমেন লাহিড়ী।

শতবর্ষপূর্তি উৎসব পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলায় ও বহির্বাংলায় বাঙালীপ্রধান জনপদগুলিতে যোগ্যভাবে পালনের জন্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে শাখা-কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাক-শতবর্ষপূর্তি উৎসব হিসেবে সমিতির উদ্যোগে ইতি-মধ্যেই বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সহযোগিতায় 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'শেষরক্ষা' অভিনীত হয়েছে এবং কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

শতবর্ষপূর্তি উৎসব-সূচী এখানে দেওয়া গেল।

(ক) ১৯৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর আপার চীৎপুরের মল্লিক ভবনে যেখানে ১৮৭২ এর ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম নাট্যশালা স্থাপন করেন, ঠিক সেই স্থানে সেই শতবর্ষের নাটক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের দ্বারা মূল উৎসব শুরু। (খ) ১৯৭২ এর ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭৩ এর ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত একমাসব্যাপী ময়দানে বিরাট প্রদর্শনী ও উৎসব অনুষ্ঠান। প্রদর্শনী স্থান মোট এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার বর্গফুট। (গ) ঐ প্রদর্শনীর অঙ্গ—দীর্ঘ ১০০ বছরের মঞ্চ ইতিহাস মাটির পুতুলে প্রদর্শনী। (ঘ) শতবর্ষের নাট্য-শালার ইতিহাস ছবিতে, পোস্টারে, লেখায় প্রদর্শনী। (ঙ) শতবর্ষের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ও শিল্পীকলাকুশলীদের পরিচয় প্রদর্শনী। (চ) পূর্ণ একমাসকাল প্রতিদিন সভা, সম্মেলন, বিতর্ক ও আলোচনা। (ছ) শতবর্ষে লিখিত সম্ভাব্য নাটকের পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন অভিনয়ের ছবি প্রদর্শনী। (জ) বিগত দিনের নাট্যশালার ব্যবহার্য সামগ্রীর প্রদর্শনী। (ঝ) মো[illegible] ১২০০ পাতার একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ[illegible] (ঞ) প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ (যাতে থাকব[illegible] বিভিন্ন দলের পরিচয়)। (ট) ২৫ বছ[illegible] মঞ্চের সঙ্গে যে কোন বিষয়ে যুক্ত আছে[illegible] যাঁরা, তাঁদের শতবর্ষের পুরস্কার প্রদান[illegible] (ঠ) বিদেশী অভিনেতৃদের আমন্ত্রণ[illegible] সম্মেলন। (ড) ১৯৭৩ এর ১৫ই জানুয়া[illegible] হইতে প্রতি জেলায় প্রদর্শনী, সপ্তাহব্যাপ[illegible] নাট্যাভিনয় ও সম্মেলন। (ঢ) শতবার্ষি[illegible] ডাকটিকিট প্রকাশ করার জন্য কেন্দ্র[illegible] সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন। (ণ) রা[illegible] সরকার ও পৌরসভা যে সকল পাঠাগার[illegible] অনুদান দিয়ে থাকেন, সেই স[illegible] পাঠাগারের কর্তৃপক্ষকে এই বছরে কেবল[illegible] নাটক কেনার অনুরোধ জানানো হ[illegible] (ত) প্রদর্শনীতে মোট দুটি রংগ[illegible] থাকবে। এবং একটিতে তিরিশটি পূর্ণ[illegible] নাটক অভিনয় করবেন বাংলার বি[illegible] নাট্যসংস্থা। অপরটি মোট নব্বইটি এক[illegible] নাটক অভিনয় করবেন বাংলার বি[illegible] নাট্যসংস্থা। নাট্যনিবন্ধনে আগ্রহী সং[illegible] গুলিকে অবিলম্বে উৎসব সমিতির স[illegible] যোগাযোগ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানি[illegible] উৎসব সমিতির সম্পাদক। নাম তালিক[illegible] করার শেষ তারিখ ৩১শে আগস্ট, ১৯[illegible] এ বিষয়ে বিস্তৃত খবর নিম্নলিখিত ঠিকানায় : কেন্দ্রীয় অফি[illegible] : ৩৯[illegible] গোপালনগর রোড, কল[illegible]-২৭ ও [illegible] অফিস—অভিনেতৃ সংঘ, ৪১, লেনিন স[illegible] কলকাতা-১৩।

●

"আমার পিতা ও গুরুর প্রতি-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমি পূর্ণ সচেতন" —আলি আকবর

অসুস্থ পিতা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে দেখে ক্যালিফোর্নিয়া ফেরার পথে ওস্তাদ আলি আকবর খান মেজর চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন।

খাঁ সাহেব জানালেন—পিতা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্বাস্থ্য ও অন্যান্য খবর সম্বন্ধে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী ও ভক্তদের অবহিত করাই এই সাংবাদিক সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। সম্প্রতি কোনো কোনো পত্রিকার মারফত এই খবরই প্রচারিত হয়েছে যে ভারতীয় সঙ্গীতের মহান সাধক গুরু আলাউদ্দিন খাঁ বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় অবহেলিত এবং সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছেন। এই মর্যাদাহানিকরই নয়—তাঁর প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা-জামাতা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

ওস্তাদ আলি আকবর খান জানান, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব একাধারে তাঁর কাছে পিতা গুরু ও ভগবান। 'বাবার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। আমার নাম যশ শিল্পীখ্যাতি সবই তাঁর সৃষ্টি এ সত্য সম্বন্ধেও আমি সম্পূর্ণ অবহিত। পিতার সেবা করে বিজ্ঞপ্তির ধ্বনি তোলাটা অত্যন্ত অশোভন এ রুচিবিগর্হিত কাজ বলেই আমি মনে করি। কিন্তু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব শুধু আমারই পিতা নন—সারা দেশের পূজনীয়, পিতৃকল্প এবং গুরুসদৃশ। শিল্পীমহল আজও তাঁকে 'বাবা' বলে ডেকে শ্রদ্ধা জানায়। তাঁদের 'বাবা' আজ রোগশয্যায় [illegible] অবহেলায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুন[illegible] এ চিন্তাও তাঁদের কাছে ব্যথাপ্রদ, এ সম্বন্ধে তাঁরা আগ্রহী—একথা বলেই প্রকৃত তথ্য তাঁদের জানানো [illegible] বলে মনে করি।

আমি সব সময় দেশে না থা[illegible] আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আছেন। প্রত্যেকেই পালা করে কেউ-ন[illegible] মাইহারে থাকেন।

বাবার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, পথ্য ও চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা [illegible] করেছি। তা ছাড়া মাইহার স[illegible] ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি দিয়ে তাঁর [illegible] চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক[illegible] এ ছাড়াও আমার স্ত্রী অধিকাংশ [illegible] বাবার সেবার জন্য মাইহারে [illegible] বিদেশে থাকলেও প্রায়ই টেলিফ[illegible] মাধ্যমে সব সময়েই আমি বাবার খবর [illegible] থাকি।

জলসা

বাবার অসুস্থতার সংবাদ পেয়েই গত ২৫ জুন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রওনা হয়ে ২৭ জুন মাইহার পৌঁছই। এবারেও শুধুমাত্র বাবাকে দেখবার জনাই আমি ক'দিনের জন্য দেশে এসেছিলাম এবং আপনাদের সকলের আশীর্বাদে বাবাকে সুস্থ দেখে ফিরছি। গতবার প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই রবিশঙ্করও এসেছিলেন। তিনি যখনই আসেন মাইহারে গিয়ে বাবাকে একবার দেখে আসাটা তাঁর অবশ্য কর্তব্যের তালিকার মধ্যেই রাখেন। এবারও তিনি আসতেন। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েকটি কনসার্ট ট্যুরে ব্যস্ত আছেন বলে আসতে পারলেন না। তাছাড়া আমার অনুপস্থিতিতে আমার কলেজও তিনি দেখাশোনা করছেন বলে ওখানের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত।'

এর পর সাংবাদিক মহল থেকে প্রশ্ন আসে—শিল্পী হিসেবে দেশের প্রতিও তাঁর একটা কর্তব্য আছে এবং দেশবাসীও তাঁর সঙ্গীতপিয়াসী। দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পীদেরও গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু স্বদেশকে বঞ্চিত করে বিদেশেই কায়েমী হয়ে বসার কারণটা কি?

'বিদেশে থেকেও আমি দেশেরই সেবা করছি। আমার পিতার প্রতি তাঁর গুরুর আশীর্বাদ ছিল পৃথিবীর যেখানে চন্দ্রসূর্য উঠবে সেইখানেই আলাউদ্দিনের যশ ছড়িয়ে পড়বে। তাঁরই ইচ্ছেয় আমি ও রবিশঙ্কর সারা পৃথিবীময় ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার করছি।'

এ দেশ থেকে প্রতি বছর ভারতীয় যন্ত্র রপ্তানী করে ভারত দশ থেকে পনের হাজার ডলার বিদেশী মুদ্রা আয় করেন। এটাও দেশসেবারই অঙ্গ।

শিক্ষার ব্যাপারে তিনি আশা করেন—তাঁর সুযোগ্য শিষ্যশিষ্যারা এদেশের শিক্ষার্থীদের পরিচালনার সহায়ক হবেন। যেভাবে তিনি শিক্ষা দিতে চান নানা কারণে এ দেশে সেটা সম্ভব নয়। গভর্নমেণ্ট থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া ত যায়ই নি উপরন্তু আয়করের তাগিদে তাঁকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে। ওদেশে সরকারের কাছ থেকে তিনি হয়ত কোনো আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেন না। কিন্তু যেসব সহযোগিতা পান তা স্বচ্ছন্দচিত্তে কাজ চালাবারই সহায়তা করে।

আর দেশবাসীর সঙ্গীত শোনার প্রসঙ্গে হেসে বলেন—'ঘরকী মুর্গী ডাল ভাত'—কোলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকাকালে আমি 'লোকাল আর্টিস্টে'র তালিকার অন্তর্ভুক্ত এই অজুহাতে আমার স্বল্প দক্ষিণা ধার্য করবার প্রস্তাব করেছিলেন কোনো কোনো সঙ্গীত সম্মেলন পরিচালক।

তাছাড়া সর্বসাধারণের জন্য আমি ত এসে বাজিয়েই থাকি। যদি সত্যিই আমাকে কোনো প্রয়োজন থাকে আপনারা ডাকলেই আমি আসব।'

এর পরের প্রশ্ন, বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এখন কিরকম এবং ওদেশের শিক্ষার্থীরা ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছেন?

উত্তরে শিল্পী শিল্পীর যোগ্য সুন্দর ভঙ্গীতে বলেন—পূর্ণ বিকশিত গোলাপের মতই সুর, তাল, লয় ও ভাব-সমৃদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীতের পূর্ণতায় ওঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। শ্রোতাহিসাবে ওঁরা সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল।

শিক্ষার্থী হিসাবে ওরা মেধাবী, গ্রহণশীল, অধ্যবসায়ী। এই ক'বছর শিক্ষায় ও রেওয়াজে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ওরা একটি সুষ্ঠু ধারণা গড়ে তুলতে পেরেছে। এখন ওরা একাদিক্রমে দু তিন-ঘণ্টা ভারতীয় রাগ বাজাতে পারে। এ ছাড়া ওদের চার্চেও প্রায়ই সকালবেলার রাগ বাজিয়ে থাকে।

খাঁ সাহেব ওখানে 'সেকেণ্ড মাইহার ব্যাণ্ড' নামে একটি অর্কেস্ট্রা পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে প্রায় পঁচাত্তর জন বিদেশী ছাত্রছাত্রী আছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও দুইশত এবং আরো বাড়বে বলেই তিনি আশা করেন। কলেজের অধিকর্তা তিনিই। তবু অগ্রগতি ও উন্নতিকল্পেই একটি পরিচালকমণ্ডলীও গঠিত হয়েছে যার মধ্যে আছেন ইহুদী মেনুহিন, জর্জ হ্যারিসন, রবিশঙ্কর এবং ওদেশের আরো সঙ্গীতশিল্পীরা।

খাঁ সাহেব একথাও জানালেন—রবিশঙ্কর শীঘ্রই গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে দেখতে আসবেন। আর আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আর একটু সুস্থ হলে তাঁকে দিল্লী, বোম্বে অথবা কোলকাতায় স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।

সেইদিনই সার্কুলার রোডে হেমেন ঘোষ প্রদত্ত নতুন সরোদে খাঁ সাহেব তাঁর পিতার ঢংএর বাদনশৈলীতে কাফি-কানাড়া, ছায়ানট ও ভৈরবী বাজিয়ে শ্রোতাদের চিত্ত বিমোহিত করে দিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে কল্যাণী রায়

মরিশাসের সুবিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ পোর্ট লুইসের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক উৎসবে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-রূপে আহূত হয়েছিলেন একমাত্র বাঙালী শিল্পী প্রখ্যাতা সেতারবাদিকা কল্যাণী রায়।

সেখানে এক সাফল্যদীপ্ত সফরের পর কয়েকদিন আগে ক্যানাল স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত অদ্রিজা মুখোপাধ্যায় আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী রায় তাঁর চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনালেন। এ সম্মেলনের মূল বক্তা ছিলেন আহ্বায়ক অদ্রিজা মুখোপাধ্যায়। তবু ওরই মধ্যে লাজুক ও স্বল্পভাষী কল্যাণী রায়কে প্রশ্ন করে জানা গেল এর আগে মরিশাস-বাসীর 'সেতার' নামক কোনো বস্তুর সঙ্গে একেবারেই পরিচয় ছিল না, উচ্চাঙ্গ-সংগীত সম্বন্ধে ত নয়ই।

'কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম এই সাতদিনে সেতার ও রাগসঙ্গীত তাদের যে শুধু ভাল লেগেছে তাই নয়—এ যন্ত্র যেন তাদের অত্যন্ত আপনার এবং এ যন্ত্রের সঙ্গে এঁরা যেন জন্মাবধি পরিচিত এইরকমই একটা ভাব দেখলাম। এ সাফল্য আমার নয়—একে আমি গুরুর আশীর্বাদ বলেই মনে করি' আবেগভরা কণ্ঠে বললেন শ্রীমতী রায়।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে ইনি বাজিয়ে-ছেন 'জয়জয়ন্তী', 'পিলু' ও বিহারী লোকসঙ্গীতাশ্রিত 'সোহর'। 'সোহর' কারো জন্মদিন উপলক্ষ্যেই বিহারে গাওয়া হয় বলেই রঙ্গমঞ্চের জন্মক্ষণটিকে ভারতীয় শিল্পী ভারতের এই রাগ বাজিয়ে অভিনন্দিত করলেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ যেন আবেগে বিগলিত হয়ে পড়েছিল। এর পর সাতদিনের বিভিন্ন জায়গার অনুষ্ঠানে তিনি 'টোরি' ভৈরবী', 'ভাটিয়ালী' ইত্যাদি গম্ভীর রাগ ও ধুন বাজিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বাজনাসহ সেতারের বিশেষ অলঙ্কারগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশেষ অনুরোধে, বিশেষ চেম্বার মিউজিকেও এককভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রতিবারই সাড়া পেয়েছেন আশাতীত। শুধু তাই নয়। ওদেশের সুবিখ্যাত সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতায় পুরোভাবে সমালোচকদের অকৃপণ প্রশংসা অর্জন করেছেন। এ ছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্পেশ্যাল ডেপুটেশনে পনর মিনিটব্যাপী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রিত হন।

শ্রীমতী রায়ের অনুষ্ঠানে গভর্নর জেনারেল, মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর দর্শকই প্রথম থেকে শেষ অবধি উপস্থিত থাকতেন।

দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি হোলো 'ইন সার্চ অফ বিউটি' নামাঙ্কিত এক বিশেষ উৎসবের 'টাইটেল মিউজিক'-রূপে গৃহীত হয়েছিল আমার সেতারের সুর।

প্লাজা থিয়েটারের এক অনুষ্ঠানে কল্যাণী যখন 'দরবারী কানাড়া', 'পিলু' ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগ বাজিয়ে উঠে পড়লেন, শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে তুমুল অনুরোধ টেগোরের 'কৃষ্ণকলি' তারা শুনবেই।

কবরী
চৌধুরী

*

এ বাজনার জন্য শ্রীমতী রায় প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু একাধারে তানপুরা-বাদক, অনুষ্ঠান পরিচালক ও ভাষাকার অদ্রিজাবাবু সপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়িয়ে 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন। সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছুটা গানের সুরে কিছু ইম্প্রোভাইজেশন করে শ্রীমতী রায় যে তাৎক্ষণিক সুর রচনা করে শোনালেন তার শেষে শ্রোতাদের 'এনকোর' থামতে চায় না।

শ্যামল বসুর তবলাবাদন ওদের এমন মুগ্ধ করেছে যে সাত দিনেই তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো একটি শিষ্যমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। অনেকে প্রচুর অর্থ দিয়ে তাঁর বাঁয়াতবলাও কিনতে চেয়েছে। এ ছাড়াও উভয় দেশের প্রীতিবন্ধনের স্মারক চিহ্ন-স্বরূপ এঁরা পেয়েছেন বহু মূল্যবান পুরস্কার।

হেমামালিনী প্রদর্শিত ভারতনাট্যম

কলামন্দিরে সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাব পরিবেশিত হেমামালিনীর নৃত্যনাট্য সম্প্রতিকালের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বেশ কয়েক বছর আগে সদারং সঙ্গীত সম্মেলনে হেমামালিনীর ভারতনাট্যম দেখবার সুযোগ ঘটে। রূপলালিত্য ও গ্ল্যামার ছাড়া নৃত্যগত কোনো বৈশিষ্ট্য তখন চোখে পড়েনি। এবার শাস্ত্রীয় নৃত্যে [illegible] ধারণার সুস্পষ্টতা নৃত্যরসিকদের যথার্থ আনন্দ দিয়েছে।

প্রথমার্ধে আলারিপু, জাতিস্মরম, বর্ণম, মণ্ডুদোচি, নারায়ণীয়ম, তিলানা তথা ভারতনাট্যমের বিভিন্ন পর্যায় ছিল এঁর অনুষ্ঠান তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতনাট্যমের ভাব, রাগ ও তালের চাহিদা তিনি আশ্চর্য শিল্পশৈলী দিয়ে পূর্ণ করতে পেরেছেন। অভিব্যক্তির মাধুর্য, প্রতিটি গতিভঙ্গির সুষমা ৪৫ মাত্রার খণ্ডজাতির অসমতালে, চপু এবং চম্পক তালের লয় দক্ষতায় একাধারে আঙ্গিক ও সাহিত্যের এক চিত্তগ্রাহী সমন্বয় ঘটিয়েছে।

আলারিপু ও জাতিস্মরমে নৃত্য ও নৃত্যাঙ্গের ওপর যথাযোগ্য আলোকপাত করে শিল্পী এলেন 'বর্ণমে'—পৌঁছলেন তাঁর শিল্পীসত্তার চরম বিকাশে। এখানে ভাস্কর্যসৌন্দর্যের সঙ্গে গতিরেখার অনবদ্য মিলন এক অনুভবসমৃদ্ধ রূপ-সৃষ্টি করে। সঙ্গতে অন্তঃপ্রবাহী কাব্য-সৌন্দর্যের মতই অনুরণিত হয়েছে কে, পি, কিট্টপ্পা পিল্লাই-এর নট্টুভঙ্গাম।

শেষার্ধের 'মোহিনীনাট্যমে' হেমা সত্যিই মোহিনী হয়ে উঠেছিলেন। 'সুরবাঠা' এবং 'মিশ্রবাঠা' উভয় সঙ্গতেই শিল্পীর প্রেরণাকে সমছন্দে উদ্দীপ্ত করেছেন তাঁর কৌশলী সঙ্গতিয়াগোষ্ঠী।

সুরসভার বর্ষবরণ

গত ১৪ই এপ্রিল বালীগঞ্জস্থিত রবিতীর্থ ভবনে সুরসভার 'বর্ষবরণ' উৎসব শ্রীমতী মীরা সমাদ্দারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে [illegible] চৌধুরীর পরিচালনায় এক [illegible] নুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি, অতুলপ্রসাদের গান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন [illegible] রায়, [illegible] শ্যাম, [illegible] শিপ্রা ভট্টাচার্য, [illegible] ঘোষ, [illegible] সরকার, [illegible] ঘোষ, [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] চট্টোপাধ্যায়। যন্ত্র-সঙ্গীতে ও সঙ্গতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, গৌর বসাক ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

বীণাপাণি সংগীত সমাজের (বেহালা) নাট্যার্ঘ্য : সংস্থার সভ্যেরা আগামী ২২শে ও ২৯শে (পুনরাভিনয়) জুলাই, সন্ধ্যা সাতটায় থিয়েটার সেন্টারে দুটি ভিন্নস্বাদের একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করবে। নাটক দুটির একটি পরশুরামের গল্প অবলম্বনে তরুণ-কুমারের 'কে-থাকে-কে-যায়' অন্যটি আধুনিক সমাজচিন্তাকে কেন্দ্র করে লেখা রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'মাশুল'। নির্দেশনার দায়িত্ব সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন মানিক গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল ভট্টাচার্য, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ পালিত, সুনীল ভট্টাচার্য, বেবী ঘোষ প্রমুখ।

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

আইসল্যান্ডের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান রাশিয়ার বোরিস স্প্যাসকি এবং আমেরিকার ববি ফিশারের ফাইনাল খেলা উপলক্ষ করে যেভাবে জল ঘোলা হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক খেলাধূলার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমেরিকার গ্র্যান্ড মাস্টার ববি ফিশার। তাঁর চাল-চলন এবং দাবী-দাওয়ার ঠেলায় এই দাবা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেডারেশনের কর্মকর্তারা হিমশিম খাচ্ছেন। অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যে খেলা হচ্ছে।

ফাইনালের ২৪টি খেলার মধ্যে এ পর্যন্ত (জুলাই ২৪) ৬টি খেলা হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার গ্র্যান্ড মাস্টার ববি ফিশার ৩.৫—২.৫ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। ফিশারকে বিশ্ব খেতাব পেতে হলে ১২.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে। অপরদিকে স্প্যাসকির বিশ্ব খেতাব হাতে রাখতে ১২ পয়েন্টের দরকার।

খেলার ফলাফল

ফিশার (জয় ৩) : ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ

স্প্যাসকি (জয় ২) : ১ম ও ২য় (ওয়াক-ওভার)। ড্র (১) : ৪র্থ খেলা

লিডস মাঠের টেস্ট খেলা
ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

আগামী ২৭শে জুলাই ইয়র্কসায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের 'হেড কোয়াটার্স' লিডসের হেডিংলে মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪র্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। এই দুই দেশের ১৯৭২ সালের অসমাপ্ত টেস্ট সিরিজের প্রথম তিনটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের জয় ৮৯ রানে, দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮ উইকেটে এবং তৃতীয় টেস্ট ড্র।

লিডসের এই হেডিংলে মাঠের উদ্বোধন ১৮৯২ সালে। এই মাঠটি ১৯০৩ সালে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের 'হেড কোয়াটার্সে' পরিণত হয়। ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মহলে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের খুব নামডাক। তারা এ পর্যন্ত ৩০-বার (এর মধ্যে একবার যুগ্ম-বিজয়ী) কাউন্টি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং গিলেট কাপ জয়ী হয়েছে ২-বার।

টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর লিডসে প্রথম বসে ১৮৯৯ সালের ২৯শে জুন। লিডস মাঠের এই টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রথম আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। লিডসের এই প্রথম টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি।

লিডসে এপর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ১৪টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার বিভিন্ন দিকের উল্লেখযোগ্য রেকর্ড নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল। নীচের রেকর্ডগুলি ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলারই এবং তা একান্তভাবে লিডস মাঠের রেকর্ড, তবে কোন রেকর্ড খেলা [illegible] পরিণত হয়েছে।

[illegible] সংক্ষিপ্ত ফলাফল

খেলা ১৪, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৫, ইংল্যান্ডের জয় ২ এবং খেলা ড্র ৭।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়া : ৫৮৪ রান, ১৯৩৪

ইংল্যান্ড : ৪৯৬ রান, ১৯৪৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ইংল্যান্ড : ৮৭ রান, ১৯০৯

অস্ট্রেলিয়া : ১৪০ রান, ১৯৫৬

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

ইংল্যান্ড : ১৪৪—এফ জ্যাকসন, ১৯০৫

একটি খেলায় সর্বাধিক রান

১৭২৩ রান (৩১ উইকেটে), ১৯৪৮

ইংল্যান্ড : ৪৯৬ ও ৩৬৫ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)

অস্ট্রেলিয়া : ৪৫৮ ও ৪০৪ (৩ উইঃ)

৪র্থ ইনিংসে ৪০০ রান

৪০৪ রান (৩ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৪৮

দ্রষ্টব্য : এই খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে (অপরদিকে খেলার ৪র্থ ইনিংসে) ৪০৪ রানের দরকার ছিল। অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪০৪ রান তুলে ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

একদিনের খেলায় ব্যক্তিগত ৩০০ রান

৩০৯ রান (আজও বিশ্ব রেকর্ড) : ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

দ্রষ্টব্য : প্রথম দিনের (১১ই জুলাই) খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৪৫৬ রানের (৩ উইকেটে) মধ্যে ব্র্যাডম্যান একাই ৩৪০ মিনিটে ৩০৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। এই খেলায় প্রথম দিনের লাঞ্চের আগেই তিনি সেঞ্চুরী (১০৫ রান) করার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, এপর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলার দীর্ঘকালের ইতিহাসে প্রথম দিনের খেলায় লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করেছেন কেবল অস্ট্রেলিয়ারই তিনজন খেলোয়াড় এবং তা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

[illegible]

অস্ট্রেলিয়া [illegible] ইংল্যান্ড [illegible]

সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৪টি : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) —৩৩৪ রান (১৯৩০), ৩০৪ রান (১৯৩৪), ১০৩ রান (১৯৩৮) এবং ১৭৩ নট আউট (১৯৪৮)

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউন্ডারী

৪৬টি (আজও বিশ্ব রেকর্ড) : ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

৯৯ মিনিটে : ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

একদিনে দলগত ৪০০ রান (এক দলের পক্ষে)

৪৫৮ রান (৩ উইঃ) : অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩০

৪৫৫ রান (১ উইঃ) : অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩৪

হ্যাট-ট্রিক্স

জে টি হিয়ার্ণ (ইংল্যান্ড), ১৮৯৯

খেলার ফলাফল

অস্ট্রেলিয়ার জয় (৫) :

১৯০৯ : ১২৬ রানে

১৯২১ : ২১৯ রানে

১৯৩৮ : ৫ উইকেটে

১৯৪৮ : ৭ উইকেটে

১৯৬৪ : ৭ উইকেটে

ইংল্যান্ডের জয় (২) :

১৯৫৬ : এক ইনিংস ও ৪২ রানে

১৯৬১ : ৮ উইকেটে

খেলা ড্র (৭) :

১৮৯৯, ১৯০৫, ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩৪, ১৯৫৩ এবং ১৯৬৮ সালে।

উইম্বলেডন সমাচার

আন্তর্জাতিক লন টেনিস মহলে উইম্বলেডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের আকর্ষণই সব থেকে বেশী। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের যে-কোন একটির খেতাব জয়ের অর্থ বে-সরকারী-ভাবে বিশ্ব-খেতাব লাভ। পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস, পুরুষ ও মেয়েদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস—এই পাঁচটি খেতাবের মধ্যে পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাবের সম্মান বেশী। বর্তমানে এই দুই খেতাবের জন্যে নগদ পুরস্কারের পরিমাণ এইভাবে বরাদ্দ করা আছে—পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাবের জন্যে ৫,০০০ স্টার্লিং এবং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাবের জন্যে ২,৪০০ স্টার্লিং।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের জন্যে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা একটানা ৬ বছর (১৯৪০—৪৫) বন্ধ ছিল। পুনরায় ১৯৪৬ সাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুদ্ধোত্তরকালের গত ২৭ বছরের প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬—৭২) পুরুষদের সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা এবং মেয়েদের সিঙ্গলসে আমেরিকার খেলোয়াড়রা সর্বাধিক খেতাব জয়ের সূত্রে বিরাট প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। গত ২৭ বছরে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব গেছে অস্ট্রেলিয়াতে ১৪ বার, আমেরিকায় ১০ বার এবং একবার করে স্পেন, ফ্রান্স ও ইজিপ্টে। অপরদিকে এই সময়ে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে আমেরিকা ১৮ বার, অস্ট্রেলিয়া ৪ বার, ব্রেজিল ৩ বার এবং বৃটেন ২ বার। পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার গত ১৭ বছরে (১৯৫৬—৭২) অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা ১৩ বার খেতাব পেয়েছেন। একটানা খেতাব জয়ের পর্যায়ে আমেরিকান মেয়েরা পুরুষদের টেক্কা দিয়েছেন। মেয়েদের সিঙ্গলসে আমেরিকান মেয়েরা যেখানে একটানা ১৩ বার (১৯৪৬—৫৮) খেতাব পেয়েছেন, সেখানে পুরুষদের একটানা খেতাব জয়ের রেকর্ড আমেরিকার ৫ বার (১৯৪৭—৫১) এবং অস্ট্রেলিয়ার ৫ বার (১৯৬৭—৭১)। যুদ্ধোত্তর কালের খেলায় পুরুষদের সিঙ্গলসে কোন খেলোয়াড়ই উপর্যুপরি ৩ বার খেতাব পাননি। অপরদিকে মেয়েদের সিঙ্গলসে আমেরিকার তিনজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি ৩ বার করে সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন—লুই ব্রাউ (১৯৪৮—৫০), মৌরিন কনোলী (১৯৫২—৫৪) এবং বিলি-জিন কিং (১৯৬৬—৬৮)।

গত ২৭ বছরে (১৯৪৬—৭২) পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয় সম্পর্কে যে-সব রেকর্ড হয়েছে, তারই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীচে দেওয়া হল :

পুরুষদের সিঙ্গলস

উপর্যুপরি পাঁচবার জয়

আমেরিকা (১৯৪৭—৫১)

অস্ট্রেলিয়া (১৯৬৭—৭১)

উপর্যুপরি দুবার খেতাব জয়

লিউ হোড (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৫৬-৫৭

রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৬১-৬২

রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৬৪-৬৫

রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৬৮-৬৯

জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৭০-৭১

সর্বাধিক খেতাব জয়

৪ বার : রড লেভার (১৯৬১-৬২, ১৯৬৮-৬৯)

মেয়েদের সিঙ্গলস

উপর্যুপরি সর্বাধিক খেতাব জয়

১৩ বার — আমেরিকা (১৯৪৬—৫৮)

উপর্যুপরি তিনবার খেতাব জয়

লুইস ব্রাউ (আমেরিকা) ১৯৪৮—৫০

মৌরিন কনোলী (আমেরিকা) ১৯৫২—[illegible]

বিলি-জিন কিং (আমেরিকা) ১৯৬৬—[illegible]

সর্বাধিক খেতাব জয়

৪ বার — লুইস ব্রাউ

৪ বার — বিলি-জিন কিং

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ১৭— [illegible]) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের যে [illegible] খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল: জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি [illegible] এবং ড্র ৪।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্ট বেঙ্গল ২—০ গোলে পোর্ট কমিশনার্স দলকে পরাজিত করার সূত্রে ১৬টা খেলায় ৩১ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তাদের [illegible] ইস্টার্ন রেল, ওয়াড়ী এবং এরিয়ান সঙ্গে খেলা বাকি। ইস্টবেঙ্গল তাদের এই বাকি তিনটে খেলায় ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করলেই লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ খেতাব পেয়ে যাবে। তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের খেলা শেষ হয়ে গেছে। মোহনবাগান ১৯টা খেলায় ৩৪ পয়েন্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১৯টা খেলায় ৩২ পয়েন্ট [illegible] করেছে।

লীগের নীচের দিকের তিনটি অবস্থা এই রকম—কালীঘাটের খেলায় ৯ পয়েন্ট, ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলায় ৮ পয়েন্ট এবং স্পোর্টিং ইউ ১৬টা খেলায় ৭ পয়েন্ট।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।